৪০শ ব[illegible]ত্তিক, ১৩৬৮] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা

কথামৃত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[illegible]চ ধর্ম্ম[illegible] সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।
[illegible] [illegible]রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

যে দিন হইতে [illegible] আবির্ভাব সেই দিন হইতে সত্যযুগের উৎপত্তি।—স্বা[illegible]নন্দ।

সীতারাম [illegible] দিজো, ভুখে অন্ন, পিয়াসে পানি, নেঙ্গ্‌টায় বস্ত্র দিজো।

সংসার ?—যেমন আমড়া; শস্তের সঙ্গে খোঁজ নাই; কেবল আঁটি চামড়া, খেলে হয়—অম্লশূল।

দয়া কে মূল হায়, নরক মূল "অভিমান"। তুমি প্রভু, আমি দাস; [illegible] মা, আমি সন্তান—এ অভিমান ভাল। "থাক্ শালা দাস হয়ে"।

শ্রীগুরুকৃপায় মনের সকল ধাঁক্ (সংশয়) ঘুচিয়া যায়।
এক বাৎসে ঠাণ্ডা পড়ে গা খোঁজ খবর না পাই।

* * * *

সাচ্ কহো, অধীন হোও, ছোড়ো পরধন্ কি আশ।
ইস্‌মে না হরি মিলে ত জামিন তুলসী-দাস ॥

মানুষ কর্ম্মেই ছোট এবং কর্ম্মেই বড় হয়,—যেমন কর্ম্ম। যতক্ষণ "[illegible]মি" ততক্ষণ কর্ম্ম। "তিনি" থাকিলে তাঁরই কর্ম্ম তাঁরই ফল।

আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী,—যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি। সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ। তুমি, তুমি, তুমি।

তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমন নাচাও তেমান নাচি।—শ্রীরামপ্রসাদ; গীতা ৫—১০।

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—ঠুংরী।

লাগা রহো মেরি মন।
পরম ধন কি মিলে বিন্ যতন ॥
যাঁহা ভাসাওয়ে উঁহি ভাস্‌কে চল্‌না,
কব্ আঁধিয়া উঠে উস্‌কা কেয়া ঠিকানা,
মগন্ রহ্‌কে আপনা সামাল্‌না—
হরবৃদম্ উসিপর নজর ফেল্‌না,
ওহি হ্যায় দোস্ত, আওর কাঁহা মিলে কোন্ ॥
ওহি আপনা, সবহি বেগানা,
সমঝ লেনা কো আপন,
এক হ্যায়, উও—পরম-ধন ॥—গিরিশচন্দ্র।

এর তার চুরি না করে, তাঁর চুরি কর। দক্ষিণে না গিয়ে উত্তরে যাও—মোড় ফেরাও।

ঠাকুর-গীত।

আপ্‌নাতে মন আপনি থাক যেওনাক কা'র ঘরে,
যা চা'বি তুই বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন সে পরশমণি যা চাবি তাই দিতে পারে।
কত হীরে মানিক পড়ে আছে (আমার) চিন্তামণির নাচ্‌দুয়ারে॥

মন্দ করতেও যতক্ষণ, ভাল করতেও ততক্ষণ। তাঁর দিকে এক পা এগুলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন।

"কর্ ভালা হোগা ভালা, অন্ত্‌ ভালেকা ভালা।" মহাত্মা ভোলাগিরি।

তাঁর ঐশ্বর্য্য চাইলে তিনি দেন আর তাঁকে চাইলে তিনি আসবেন না? তাঁর জন্য দশ পা এগুলে তিনি একশ পা এগিয়ে আসেন। লোকে অনিত্য লইয়া পাগল, তাঁকে চায় কে?

"কালে ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে।"

কর্ম্ম বাড়ান ভাল নয়। তাঁর কাজ মনে করে—যেটা সামনে পড়ে সেইটাই করতে হয়। ভগবানের কাছে কি হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্সারি চাইবে? কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য—সাবধান, অহঙ্কার না আসে। Eternal love and service free."

সেবা করে, দান করে ধন্য করলুম নয়! নিজেই ধন্য হ'লাম। Give as the rose gives perfume.—Vivekananda.

গী: ১৭-২০।

ঢাঁক জমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে,
আমি লুকিয়ে মায়ের করব পূজা দেখবে না কেউ জগজ্জনে।

—শ্রীরামপ্রসাদ।

● ● ● ●

ও মন তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ না দেখে।

রাগিনী সিন্ধু ভৈরবী—তাল খয়রা।

সাধন বিনা পায় না তোমায় সাধন যে জন চায়।
শক্তিহীনে নিজগুণে রাখ রাঙ্গা পায়॥
যে তোমারে পেতে চায়—বিদায় দেয় সে বাসনায়,
(আমার) অনন্ত বাসনা ধায় কি হবে উপায়,—
নয়ন কোণে কৃপাধীনে হের করুণায়॥
তোমা বিনে ত্রিভুবনে, চায় না কেউ আর মুখপানে (আমার)
কে আর বল দীনহীনে রাখে চরণে; (ঠাকুর)
(তাই) পতিত বলে, নাও হে তুলে—তোমারি ত দায়॥

—স্বামী যোগেশ্বরানন্দ।

সংকীর্ত্তন।

পতিতপাবন নামটি শুনে বড় ভরসা হয়েছে মনে,
(নামে আপনি আশা জাগে প্রাণে)
আমি হই না কেন যেমন তেমন স্থান পাব রাঙ্গা চরণে॥
(ঠাকুর তুমিত ভরসা আমার)
ঠাকুর আমার মত জন সাধনহীনে স্থান দিবে রাঙ্গা চরণে;
(বড় দয়াল ঠাকুর রামকৃষ্ণ)
ওহে দীনদয়াল, আমি পতিত কাঙ্গাল—
(তোমায় পতিতপাবন সবাই বলে)
(শরণ লয়েছি তাই চরণতলে)
আমায় না তরালে দয়াল নাম আর কেউ না লবে জগজ্জনে॥

(বল কোথা যাব কার মুখ চাব—
ঠাকুর পতিতের আর কেবা আছে)
তোমার অকলঙ্ক নামে এবার কলঙ্ক দিবে জগজ্জনে॥
তোমার নাম ভরসা, দীনের পুরাও আশা,
(শুনি তোমা হ'তে তোমার "নামটি" বড়)
ওহে অধমতারণ অনাথশরণ দয়া কর নিজ গুণে॥
(ওহে কাঙ্গালের ঠাকুর রামকৃষ্ণ)
এস রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ—বস হৃদি পদ্মাসনে॥
(আমার হৃদয়-আসন শূন্য আছে, আমরা বড় আশে [illegible] হে,—
আজ তোমার দেখা পাব বলে) [illegible] কৃষ্ণধন।

Feel my boys—feel! Love for the poor, the downtrodden even unto death this is our motto. I am ready to go—to hundred-thousand hells to serve others. Let my life be a sacrifice at the altar of Humanity.—Swami Vivekananda.

সকল ধর্ম্মের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। গীতা ৪-১১।

যত মত তত পথ। Means to an end. নিজেরটিই বড় দেখিও না। কেন্দ্র হইতে সব রাস্তা সমান। গীতা ৪-১১।

আকাশাৎ পতিতং তোয়ং—যথা গচ্ছতি সাগরং।
সর্ব্বদেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি॥
তুঁহি উপাজি পুনঃ তুঁহি সমায়ত—সাগর লহরী সমানা।

—পদাবলী।

যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।

—শ্রীরামপ্রসাদ।

উদ্দেশ্য ঠিক রাখিও, উপায় লইয়া ঝগড়া করিও না।
Help—not fight.—Vivekananda.

"তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য,
দণ্ডদাতা পিতা স্নেহময়ী মাতা, তুমি ভবার্ণবে কর্ণধার।"

মা'র উপর ছেলের যত আব্দার—বাপের কাছে তত ভরসা হয় কি?

ভগবান সাকার নিরাকার এবং আরও কত কি। তিনি ইচ্ছাময়, তাঁর ইচ্ছায় কি না হয়? "পাষাণে জল ঝরে ভাই, শুকনো গাছে কলি ফোটে।"—গিরিশচন্দ্র।

তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ—যেমন কাঠ ও আগুন। ঈশ্বরের হ্লাদিনী শক্তিকে "রাধা" বলে।

ভক্তির ভগবান্। সেবা আত্মবৎ।

কে তোমা পুঁজতে পারে, পূজা জানে কেবা?—অজ্ঞান মানব,
আপন উন্নতি মাত্র তব পদ সেবা—তব ধ্যান পরম উৎসব,—

গোষ্পদ দুরন্ত ভবার্ণব,	দুষ্ট ষড়রিপু পরাভব,
ভুলায় যন্ত্রণা জ্বালা,	তব নাম জপমালা,

অহঙ্কার—দমিত দানব,
অর্চ্চনার অধিকার অতুল বৈভব।—গিরিশচন্দ্র

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ)

[ক্রমশঃ

—স্বামী যোগবিনোদ মহারাজের ঠাকুরের কথা হইতে।

শক্তিতত্ত্ব-মধুরিমা

বঙ্কুদাস উপাধ্যায়

মাতৃভাবের সাধনা এবং তাহার সুমহতী ভাবরাশি ভারতভূমির একান্ত নিজস্ব সম্পদ্। ভারতভূমিতে শক্তিতত্ত্বের সুশৃঙ্খল জ্ঞানোপলব্ধি এবং দর্শন পরিবেশন একান্তভাবে মধুর এবং প্রজ্ঞানের আত্মরূপের মধ্যে সীমিত।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মাতৃতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনুধ্যান অন্যান্য দেশে বিশেষ কিছুই পুষ্টিলাভ করে নাই। কোন কোন অঞ্চলে অবশ্য মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। বহু দূর-দূরান্তর হইতে পূজা প্রদানের নিমিত্ত সে সব মন্দিরে লোকসমাগমও হইত। খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে অধুনালুপ্ত এসিয়া-মাইনরের অন্তর্ভুক্ত 'ক্যাপাডোকিয়া' রাজ্যে এমনি একটি বিখ্যাত দেবীমন্দিরের উল্লেখ আছে। খৃষ্টজন্মের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে রোমান সেনাপতি মরিয়াস (Marius) দেবীপূজার্থ তথায় গমন করিয়াছিলেন। (Smith's History of Rome, Page 208)। এরূপ অধিকাংশ দেবীমন্দির সম্ভবতঃ ভারতীয় ঔপনিবেশিক অথবা বণিকবৃন্দের কীর্ত্তি। আরব সাগরের উপকূলে এখনও বহু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। তন্ত্রে মিশরের (পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল মিশ্রদেশ) নীল নদ 'কালী নদী' নামে পরিচিত। তথাপি ভারতীয় পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রসমূহে মাতৃভাবের বৈশিষ্ট্যাবলী যেরূপভাবে পরিলক্ষিত হয়, তাহা উচ্চগ্রামের দার্শনিকতা এবং আধ্যাত্মিকতায় সমাবেশে পরিপূর্ণ। জগতের চিন্তা-জগতে উহার সৌন্দর্য্য এবং অনুভূতি সম্পূর্ণ অতুলনীয় ও অবিচিন্ত্য।

স্ত্রী-ভগবানকে শক্তি বা মাতৃরূপে প্রত্যক্ষ করিবার আরাধনাই তন্ত্রের মূল প্রাণতা। তন্ত্রের যন্ত্র এবং চক্রের বর্ণনাদি অথর্ব্ববেদ, তৈত্তিরীয়-আরণ্যক প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থাদিতেও উল্লিখিত আছে। তন্ত্রমত অনেকের মতে অথর্ব্ববেদের সৌভাগ্য কাণ্ডের পরিবর্ত্তিত রূপ। তাই আমাদের দেশে বেদের ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত তন্ত্রের দেবীতত্ত্বের অপূর্ব্ব সমন্বয় ধর্ম্মক্ষেত্রে মাধুর্য্যের পরমাতিপরম আস্বাদন। বেদের প্রণব মন্ত্র তন্ত্রে উমা নামে পরিবর্ত্তিত, আবার সাধককণ্ঠে উমা 'মা ! মা !' মন্ত্রশব্দে ছন্দিত।

বৈদিককাল হইতে সমস্ত স্ত্রীজাতির মধ্যে মাতৃরূপ পরিদর্শন নিঃসন্দেহে শক্তিতত্ত্বের মধু প্রলেপন। ইহা অমৃতময় ; কারণ, ইহা আমাদিগকে স্ত্রীজাতির মধ্যে 'সাবিত্রী জননী পরা' মহামায়ার এই স্বরূপ দর্শন করাইয়া সমস্ত স্ত্রীজাতির প্রতি অকুণ্ঠ স্তব করিতে শিখাইয়াছে। বেদেও মাতৃজাতির স্থান আর্য্যভাবভাস্বর। বেদে স্ত্রী গৃহে মুখ্যস্থানীয়া, জননী, কল্যাণকারিণী, মঙ্গলময়ী, সৌভাগ্যময়ী প্রভৃতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রীকে অমৃতরূপে অথর্ব্ববেদ বর্ণনা করিয়াছেন—

> পূর্ণং নারি প্রভর কুম্ভমেতং ঘৃতস্য ধারামমৃতেন
> সংভৃতাম্। ইমাং পাতৃ ণমৃতেনা সমংগ্ধাষ্টা
> পূর্ত্তমভি রক্ষাত্যেনাম্। অথর্ব্ববেদ ৩।১২।৮

"হে স্ত্রী। অমৃতরসে পূর্ণ এই কুম্ভকে আরো পূর্ণ করিয়া আন, অমৃতপূর্ণ ঘৃতাধারকে আন, পিপাসুকে অমৃতরসে তৃপ্ত কর, ইষ্ট-কামনার পূর্ত্তি গৃহকে রক্ষা করিবে।"

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এইরূপের ব্যাখ্যান শুধুমাত্র কল্পনার বস্তু নহে, ইহা ভারতের শিক্ষা এবং সংস্কারের বাস্তব আলেখ্য। প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি মহীয়সী নারী আজিও বিশ্ববরেণ্যা এবং জগজ্জননীরই অঙ্গাভরণ। একমাত্র ভারতের নারী মৈত্রেয়ী একদিন ভোগৈশ্বর্য্যের দিকে চাহিয়া প্রশান্ত-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম'—যাহা দিয়া আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না, তাহাতে আমার কি প্রয়োজন ? 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ'—একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। ভারতের গার্গী একদিন রাজা জনকের রাজসভায় ভারতের সকল প্রান্ত হইতে সমাগত ঋষিবৃন্দের মুখপাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উচ্চ সোপানে আলোচনান্তে পরাজিত হইয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভারতের নারী তাই ভোগের বস্তু নহে, সে পূজ্যা। পুরুষ তার স্ত্রীকে জায়া বলিয়া সম্বোধন করে, কারণ সে পুত্ররূপে স্বীয় স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। ভারতভূমিতে মাতৃরূপের সুমধুর বিন্যাস। ঋগ্বেদে মাতৃভাষা, মাতৃসভ্যতা এবং মাতৃভূমি তিন দেবীমূর্ত্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (ঋগ্বেদ ১।১৩।৯)

প্রধানতঃ শক্তিতত্ত্ব হইতেই নারীর মধ্যে বিশ্বজননীকে প্রত্যক্ষ করিবার অনুপ্রেরণা আসিয়াছে। তন্ত্রে দেবীশক্তিই জগতের সমস্ত শক্তির উৎস।

> "বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ! ভেদাঃ
> স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
> ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
> কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ।" —শ্রীশ্রীচণ্ডী

'হে দেবি ! ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাসকল তোমা হইতে উৎপন্না। সমস্ত জগতে সমস্ত স্ত্রীরূপে তুমি বিদ্যমানা। ঐ পরিদৃশ্যমান জগৎ একা তোমা দ্বারা পরিপূর্ণ। তুমি সর্ব্বলোকবরণীয়া। তোমার স্তুতি করিতে কে সমর্থ ?'

অপূর্ব বাণী—'ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।' ভারতভূমিতে স্ত্রীজাতি তাই মাতৃজাতি। ভারতে স্ত্রীজাতির মধ্যেই শক্তিরূপের পরম প্রকাশ। বিশ্ব-প্রকৃতির সমস্ত কিছুতেই অনন্ত শক্তির মনোহারী রূপ। বনের শ্যামল শোভার মধ্যে বনচণ্ডীর রূপ ; মলয় পবন হিল্লোলিত ধান্যক্ষেত্রে মহালক্ষ্মীর বর্ণাঢ্য অঞ্চল, জগতের প্রতীকরূপে গাভীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। সকলের মধ্যেই বিশ্বজননীর বিশ্বাত্মিকা রূপ পরিস্ফুট। অহং তত্ত্বের মূর্ত্তপ্রতীক মহিষাসুর বধের পর দেবগণ শ্রীশ্রীজগজ্জননীর স্তব করিয়া বিশ্ববাসীকে শক্তি তত্ত্বের মূল আলেখ্য দান করিয়াছেন।—

> "বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
> বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
> বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তী
> বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ।" —শ্রীশ্রীচণ্ডী

—'তুমি এই বিরাট বিশ্বের বিশ্বেশ্বরী, তুমি বিশ্বের পালনকারিণী, তুমি বিশ্বের আত্মারূপিণী এবং তুমিই বিশ্বধারিণী জগদ্ধাত্রী। তুমিই বিশ্বের আশ্রয় এবং বিশ্বেশ্বরেরও আরাধনীয়া। যাহারা তোমার শ্রীচরণকমলে ভক্তিভরে অবনতশির হয়, তাহাদের সুখ-সৌভাগ্যের শেষ কোথায় !'

একাধারে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের অপূর্ব্ব বিগ্রহ এবং ভারতীয় সাধনার অমৃতময় ফল শ্রীশ্রীকালীমূর্ত্তি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিনরূপ মাতৃতত্ত্বের মধ্যে বিদ্যমান।

অমানিশার ঘোরান্ধকার প্রাকৃতিক পরিবেশে শিবরূপী (শবরূপী শিব) নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মশক্তির উপর সবিকল্প ব্রহ্মশক্তির নৃত্য। ইহার মধ্যে নিহিত আছে নিজকে বহুরূপে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।' তিনি তখন এক এবং অখণ্ড আনন্দ-পারাবারে নিমগ্ন হন। সে আনন্দের এক কোণ আমাদের অন্তরে আদর্শরূপে প্রবর্ত্তিত হয়। তাই আমাদের হৃদয় স্নেহ, মায়া, মমতা, সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়। মা চিৎ বিভু আর জীব চিৎ কোণ—জীব তাঁর সন্তান। জীব তাঁহার সন্তান বলিয়াই জীবের মধ্যে তাঁহার অনন্ত শক্তিকণার প্রকাশ। অনন্ত বিভুর মধ্যে সৎ-চিদ্-আনন্দ সূক্ষ্মরূপে অধিষ্ঠান থাকে, তাই সন্তানগণ স্থূলে যাহা অনুভব করে, তাহার মূলাধার বিশ্বজননী। সাধনার পূতাগ্নি স্পর্শে সমাহিতচিত্তে সূক্ষ্ম রসাস্বাদন হইলেই এ সত্য হৃদয় আলোকিত করে। তখন জাগ্রত কুলকুণ্ডলিনী চক্রে অনুভূত হয় যে, আনন্দের দ্বারাই সমস্ত ভূতের জন্ম এবং আনন্দের প্রভাবেই ভূতসকল বাঁচিয়া থাকে। এই সৃষ্টি এবং স্থিতি তাঁহার আনন্দরসভাবে লীন হইবার ইচ্ছার ভিতরেই পরিব্যাপ্ত। নির্ব্বিকল্প অবস্থা হইতে সবিকল্প ভাবগ্রহণে তিনি হন স্পন্দনময়, ইহা অখণ্ড চৈতন্য শক্তিরই অবস্থান্তর গ্রহণ। ইহাই তন্ত্রে আত্মাশক্তি নামে অভিহিত।

—মা আত্মাশক্তি, তিনি বিশ্বপ্রসাবনী—জগজ্জননী।

নিস্পন্দ চৈতন্যশক্তির উপর স্পান্দিত রূপের নৃত্য। যে কোন একটি বস্তুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে শেষ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র শক্তিই অবশিষ্ট থাকে; তাই আমরা তন্ত্রে পাই—শক্তি হইতেই পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই সৃষ্ট হইয়াছে। নিস্পন্দ চৈতন্যশক্তি যখন আত্মারাম রূপে নিজের মধ্যে সমাহিত, তখন তাঁহার সৃজনী স্পৃহা থাকে না, পরে যখন তাঁহার মধ্যে লীলায়িত হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় তখন অনন্ত শূন্যব্যাপী কম্পনে রূপ রস গন্ধে ভরা যে বিশ্বের প্রসব হয়, তাহা তাঁহার ক্রিয়াশীলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মাত্র। একবার তাঁহার মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান, আবার তাঁহার লীলায় অণু-পরমাণুর সঙ্গে ওতঃপ্রোত জড়িত ভাব। অনন্ত বিশ্ব তাঁহার মধ্যে—তিনি বিশ্বময়ী। অখণ্ড চৈতন্যের নিস্পন্দ অবস্থায় সমস্ত বিশ্ব তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কল্পান্ত: আবার আত্মাশক্তি বিস্তারে কল্পারম্ভ। তন্ত্রের সাধকও মায়ের মধ্যে অর্জ্জুনের মত বিশ্বরূপ দর্শন করেন।

"মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি!
নিয়তে! ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥" —শ্রীশ্রীচণ্ডী

—তুমি মেধাস্বরূপিণী, তুমি সরস্বতী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তুমি সত্ব, রজঃ, তমোগুণযুক্তা, তুমিই নিয়তি। হে পরমেশ্বরি নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার, তুমি প্রসন্না হও। অপ্রাকৃত বস্তুমাত্রই আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানগম্য। সবিশেষ দৃষ্টি লইয়া প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতার উপরেই বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব হয়। এ দর্শনে স্নিগ্ধতার পরিবেশ, পরমাতিপরম আনন্দ-রসের পূর্ণতা মনে-প্রাণে। সুমধুর অনুভূতি। মধুরস আপন প্রভাবেই মধু,—মধুতে মধু হইতে অন্য কোন বহির্গত বস্তু বা রসের প্রয়োজন হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থে কবি কর্ণপুর গাহিলেন,—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি-মধুস্মিত মেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥"

—তিনি মধুর, ইহা ভিন্ন উপমার আর কিছুই নাই। মা হৃদয়-মনের অধিশ্বরী,—তিনি মধুরূপা, তাই ইহা সম্ভব। শক্তির ধ্বংসের যে রূপ দেখি অহংকাররূপী মহিষাসুর বধের সময়ে,—চিকীর্ষারূপী চিক্ষুর, আর অনন্ত কামনার বীজ কামকূট রক্তবীজ সংহার কালে মায়ের সে রূপ এবং তাঁহার বরাভয়দায়িনী-রূপ—এই উভয়ের অপূর্ব্ব সমন্বয় শ্রীশ্রীকালী মূর্ত্তির মধ্যে সাধকের শিল্পী মনে অবিনশ্বর তুলিকায় চিত্রায়িত চিরভাস্বর মূর্ত্তিমন্ত দর্শন। সাধনায় লব্ধ এ রূপের তুলনা নাই। জগতে সমস্ত দর্শনশাস্ত্রে এ মূর্ত্তি বিশ্ব-রহস্যের মূর্ত্তিমন্ত বিগ্রহ।

জগতে শুধু সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ নাই—আনন্দ আছে নব নব বৈচিত্র্যের প্রয়োগ সাধনে। মহাশক্তি যাহা সৃষ্টি করেন তাহার ধ্বংসের মূর্ত্তি যেমন সেই মহাশক্তি, তেমনি তিনি যাহা ধ্বংস করেন তাহার ধারকও সেই অনন্ত মহাশক্তি স্বয়ং। ধ্বংসের প্রেরণার প্রতীক যেমন খড়্গ, সেই ধ্বংসকে ধারণ করিবার প্রতীকও তেমনি নরমুণ্ড। ইহা ধ্বংসের করাল মূর্ত্তি, কিন্তু তাহার মধ্যেই মায়ের বরাভয়দায়িনী, মনোমোহিনী রূপ। এক হাতে বরদান, অন্য হাতে অভয় প্রদান।

'ব্রাহ্মী স্থিতি'ই জীবনের লক্ষ্য। একের মধ্যে বহুকে প্রত্যক্ষ করাই দার্শনিকতা—ইহাই দর্শন। মাতৃসাধক ঋষি মায়ের ত্রিগুণাতীত কালোরূপের মধ্যে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন —খুঁজিয়া পাইয়াছেন অরূপের অপরূপ রূপ,—অপার আনন্দ, উল্লাস। সবিশেষ ব্রহ্ম—পরম মূল চৈতন্যস্বরূপকে 'মা! মা!' বলিয়া ডাকিয়া কত সুখ। তিনি জগতের আলো উত্তাপ,—তিনি প্রাণ-শক্তি, দয়া মায়া স্মৃতি লজ্জা সব কিছু। আর্য্য ঋষির মা পৃথিবী-স্বরূপিণী—তিনি জগতকে জলরূপে তৃপ্তি দান করেন।

"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি!
অপাং স্বরূপস্থিত। ত্বয়ৈত—
দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥" —শ্রীশ্রীচণ্ডী।

—তুমি জগতের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপিণী, কারণ তুমি পৃথিবীরূপে রহিয়াছ। হে দেবি! তোমার শক্তিকে কেহ ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তুমি জলরূপে এই জগতকে তৃপ্ত করিতেছ।

বাৎসল্যরস যাঁহার, তাঁহার কাছে তিনি কন্যা; আর সকলের তিনি মা। তাঁহার আগমনীতে মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠে। ধান্য দূর্ব্বা দ্বারা গৃহস্থ তাঁহাদের সাধের কন্যাকে বরণ করে—সীমন্তে সিঁদূরের রেখা, আর গণ্ডদেশে চুম্বন আঁকিয়া দেয়। মায়ের সন্তানসন্ততিগণ মায়ের চরণে কত শত প্রণাম নিবেদন করে। বাংলার ঘরে ঘরে সোনা দিয়া বাঁধান এই ছবি। এ সোনা পৃথিবী-গহ্বরে পাওয়া যায় না, ইহা পাওয়া যায় বাঙ্গালী-বধূর হৃদয়কন্দরে। আমরাও, যে দেবী চৈতন্যরূপে সারা জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজিতা, সেই দেবীকে বার বার নমস্কার করি—তাঁহার রাতুল চরণে নিজেকে বিলাইয়া দিই।

"চিতি রূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্যস্থিতাজগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥" —শ্রীশ্রীচণ্ডী

—যে দেবী চৈতন্যরূপে সারাজগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে সেই দেবীকে বার বার নমস্কার।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তা

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ

রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিক-উৎসবে জাতীয়-স্বাধীনতা-আন্দোলনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অমর-জীবন-সিদ্ধি ও অবদানের কথা বড় একটা আলোচিত হচ্ছে না—বিশ্বমানবাত্মার সিদ্ধ-সাধক মানবধর্মের উদ্গাতা ঋষি-কবিকেই বিশেষ করে স্মরণ করা হচ্ছে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণার মানস-উৎস রবীন্দ্রনাথকে দেশ-হৃদয় যেন ভুলেই গেছে। আমি আপনাদের সামনে ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তার কথাই উপস্থাপিত করতে চাই। রবীন্দ্র-সাধনার ঐশ্বর্য্য-সম্ভারের মধ্যে—কাব্য-কবিতা, কথা-কাহিনী, নাট্য-সংগীত, গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ-ভাষণ, আলোচনা-সমালোচনা ইত্যাদির বিচিত্র বিভাগে কবির দৃষ্টির আলোকে নব নব সৃষ্টি আমাদের চোখে প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু সব কিছুকেই ধারণ করে আছে কবির স্বদেশ-প্রেম। এই স্বদেশ-প্রেমেই বিকশিত হয়ে উঠেছে জাতীয় জীবনের ক্রান্তিকালে স্বদেশ-চিন্তার বিচিত্র বিপুল আন্দোলনের ভাব-ভাবনার তরঙ্গমালা। বৈদেশিক শাসনের অধীনস্থ দেশের অবস্থা—রাজনৈতিক সামাজিক ভাবে দেশাত্মবোধে কবিচিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কবি তাই দীপ্ত কণ্ঠে বলেন—

"দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে, শক্তিকে, ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে। সেই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্ম এদেশে মানুষের আত্মা অহরহ কাঁদিতেছে। সেই কান্নাই ক্ষুধার কান্না, মারীর কান্না, অকালমৃত্যুর কান্না, অপমানের কান্না।"

স্বদেশ ও জাতির আত্মার মর্মান্তিক দুঃখ-দুর্দশাকে ভুলে কবি কোন কালেই নন্দনের আনন্দ ও পারিজাত-সুরভিতে আত্মমুগ্ধ থাকেননি—দেশের মানুষের আত্মার আত্মীয়রূপে তিনি সকলের সঙ্গে সর্বদা মিলিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে স্বদেশ-চিন্তার বৈচিত্র্যময় প্রকাশের মধ্যে দেখি—কবি চিন্তায়, কর্মে ও সাধনায় বৈদেশিক অত্যাচার ও লুণ্ঠন-নীতির অপমানের প্রতিবাদ করেছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন রূপকে ধিক্কার দিয়েছেন। হিজলি জেলে রাজবন্দীদের উপর বর্বরোচিত গুলিচালনা, চট্টগ্রামে বৃটিশ সরকারের পশুসুলভ নগ্নমূর্তি দেখে তিনি ঘৃণার সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে কবিগুরুর দৃপ্ত প্রতিবাদ ভারতের স্বাধীনতার অধিকারকে মানবিক মর্যাদাদান করেছে। স্বদেশ-দীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ জাতিকে বললেন—"স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত—এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা।" (রাশিয়ার চিঠি)

শাস্ত্রে কবিকে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা বলা হয়। রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণায় ভারতবর্ষের মৃন্ময় রূপটি দিব্যরূপে প্রকাশিত হয়ে উঠেছিল বলেই কবি ভারত-জননীর বন্দনা গানে বললেন—"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে, প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে, জ্ঞান-ধর্ম কত কাব্য-কাহিনী! চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন—জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা, পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী।"

ভারতবর্ষের মাতৃরূপের মধ্যে কবি জনক-জননী-জননীকে দেখলেন। বন্দেমাতরম্-এর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃরূপ বন্দনার সুরে রবীন্দ্র-কাব্য-বীণার তন্ত্রীতে সুর উঠেছে বারবার। কবির "ভারত-তীর্থ" সর্বমানবের তীর্থক্ষেত্র—এখানে দেশজননীর কল্যাণমূর্তি মানবজাতির মিলনের আদর্শ ঘোষণা করেছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথের বাণীমন্ত্র বঙ্গভূমিকে আলোড়িত করে—বঙ্গের ঐক্যের মধ্যে বাঙালীজীবনের প্রকৃত রূপটি তাঁর দৃষ্টিতে নতুনভাবে জ্বলজ্যান্ত হয়ে ওঠে। কবি বঙ্গমাতাকে দেখে বললেন—

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।"

এই সঙ্গীতের সুরে সুরে বাঙ্গালী-হৃদয় মেতে ওঠে। বাঙ্গালী দেখল সোনার বাংলারূপিণী দেশমাতাকে। কবি দেশমাতাকে দেখে বললেন—

"ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাট-নেত্রে আগুন বরণ।
ওগো মা, তোমার কি মুরতি আজি দেখি রে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।
তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ তলে রৌদ্রবসনী।
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!"

ইতিহাসে দেখি ইটালীর মহাকবি দান্তে বিভক্ত ইটালীর নবযুগের পুরোধা। ভারতের ইতিহাসেও রবীন্দ্রনাথ নতুন যুগের প্রবর্তক। স্বদেশ-চিন্তার অবদানেই কবি ভারতবর্ষের প্রকৃত মূর্তি আমাদের চোখে মূর্ত করে তুলেছেন। তাই কবি-দৃষ্টির প্রসাদেই জনক-জননী-জননী ভারতবর্ষকে আমরা সোনার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছি। কবি নববর্ষের প্রভাতে বললেন—

"নব বৎসরে করিলাম পণ, লব স্বদেশের দীক্ষা
তব আশ্রমে তোমার চরণে, হে ভারত, লব শিক্ষা।"

কবির এই ভারত-দীক্ষামন্ত্রই স্বদেশ-ধর্ম—আত্মনিবেদনের মন্ত্র উচ্চারণ করে কবি বলেন—

"তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম,

লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা!
তোমার গরবে গরব মানিব লইব তোমার দীক্ষা।"

কবি দীক্ষার মন্ত্র উচ্চারণ করেই কর্তব্য শেষ করলেন না—সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করলেন—

"জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা,
কে দিবি প্রাণ।"

প্রাণ-তর্পণের আহ্বান কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—এই মন্ত্র রুদ্রের ভৈরব-স্তব পাঠ। কবি দেখলেন সামনেই—

"অমর মরণ রক্ত বরণ নাচিছে সগৌরবে,
সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

কবি দেখলেন দুর্বলের মাতৃপূজা হয় না—স্বদেশ-ধর্মে চাই শক্তিব্রত উদ্‌যাপন। কবির বীণায় ঝঙ্কার উঠলো—

"আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে?
উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া ভেঙে পড়িস না রে।"

আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে চলার আনন্দেই আছে দুঃখজয়ের অমৃত। কবি তাই সাহস রেখে চলতে বললেন—

"অভয় চরণ স্মরণ করে বাহির হয়ে যা রে।"

ভয়হীন প্রাণের মধ্যেই ভারতের আত্মার সঙ্গীত ধ্বনিত। কবি ভারত-ভাগ্য-বিধাতার উদ্দেশে বললেন—

"এনেছি মোদের প্রাণ!
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ তোমারে করিতে দান।"

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তা, মানবতা-বোধ, জাতীয়তা-বুদ্ধির সার্বভৌম রূপ আত্ম-নিবেদনের সুরে সুরে স্বদেশ-স্বাধীনতা-যুদ্ধে আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা সঞ্চার করল জীবন-মন্ত্রে। কবি গাইলেন—

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

মহান্ ভারতবর্ষের হৃদয়ে বিশ্বকে কবি আহ্বান করেছেন বিশ্বমৈত্রীর সাধনায়। ভাবী বিশ্বের তীর্থভূমিতে স্বদেশপ্রেমকে তিনি নতুন ভাবে দেখেই বললেন 'এই মহামানবের সাগরতীরে'—মানুষের নতুন ধর্মের কথা! কবির জাতীয়তাবাদ মানবতাবোধ-সমৃদ্ধ, উগ্র জাতীয়তা-সুলভ জঙ্গীবাদ নয়।

রবীন্দ্র-কাব্য-কবিতা-সঙ্গীতের বিশাল ভাণ্ডারে স্বদেশ-চিন্তার বিচিত্র নৈবেদ্য-নিবেদন দেখি স্বদেশ-জননীর পাদমূলে। কবির গানের সুরে সুরে স্বদেশের প্রতি ধূলিকণা, প্রতি তৃণাঙ্কুর প্রাণময় হয়ে উঠেছে—চিন্ময়ী দেশমাতার স্নেহের সুধারসে। দেশপ্রেমে সদাজাগ্রত চিত্তে কবি ডাক দিয়েছেন—

"আজ যে তোর কাজ করা চাই,
স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই,
এখন ওরা যতই গর্জাবে ভাই,
তন্দ্রা ততই ছুটবে,
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে।"

তন্দ্রা হচ্ছে আলস্য। কবি বাস্তবের কঠোর সত্য সম্মুখে রেখে কর্ম ব্রতে জেগে ওঠার আহ্বান তুলেছেন—অলস কল্পনার দিন গত, তাই কাজ করার ডাক দিয়েছেন। স্বাধীন ভাবে আত্মবিকাশের সাধনার দিকেই কবির সতর্ক দৃষ্টি সর্বদা সজাগ দেখি—নিছক দেশপ্রেমের দুর্বলতায় অন্ধ সংস্কারের নিকট আত্ম[illegible] দান কবি[illegible]র কাম্য নয়। কবি দেখলেন—সামনেই ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যতে ভারত মহাজাতির আত্মিক জাগরণের মধ্যে নবীন ভারতবর্ষের মহাপ্রকাশ অপেক্ষা করছে। পরাধীন জাতির পদে পদে বাধা অগ্রগমনের পথে। কবি ভবিষ্যতের জ্যোতির্ময় আলোকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চলতে আহ্বান করে বললেন—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ওরে ভয় নাই ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

দেশকে ভালোবাসার অর্ঘ্য সাজিয়ে কবিকণ্ঠ মুখর হয়ে উঠল—

"মুক্ত কর ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো,
মুক্ত কর ভয়, নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।"

কবির স্বদেশ-পূজার অর্ঘ-উপচার জাতীয় জীবনের কল্যাণ ও শ্রেয়ের জন্যই নিবেদিত হয়েছে। সকল অমঙ্গলের অবসানে কবি দেখেছেন সত্য-শিব-সুন্দরের মঙ্গল আলোকের মধুময় হাসি।

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই আত্মার আত্মবিকাশের মন্ত্র নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথ সেই মন্ত্রের উদাত্ত ধ্বনিতেই দেশের চিত্তকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। এদিক থেকে কবির স্বদেশপ্রেম একটি দার্শনিক তত্ত্বের মত—Real ও Ideal এর সমন্বয়-সাধনা।

জাতীয় চেতনার উন্মেষ-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তা ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনে কেবল প্রেরণা নয়—প্রাণ-চঞ্চল আন্দোলন সৃষ্টি করে। জাতীয়তার মহত্তম আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত কবিমন বিশ্ব-মানবতাকে স্বীকৃতি দিয়ে একথাই প্রমাণ করেছে যে, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের উত্তাল আবেগের মধ্যেও বিশ্ববোধ নিহিত থাকে। একটি দেশের স্বাধীনতা আর একটি দেশকে যেমন আদর্শে অনুপ্রাণিত করে, তেমনি মানবতাবাদী একটি দেশের নাড়ীর স্পন্দন একটি বিশেষ চিহ্নিত দেশের সীমায় সীমিত থাকে না—সর্বমানবের কল্যাণেই স্বাদেশিকতা-বোধ দেশের খণ্ড-সীমার মধ্যে অখণ্ড মানুষের হৃৎস্পন্দন ধ্বনিত করে তো[illegible]। সর্বমানবের প্রতি প্রেম, করুণা এবং মৈত্রীর বাণী স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিকশিত দেখি। এই মহান্ জীবন যেন দেশবাসীকে বলছে—"আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ।"

তাই দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তা একটি বিশেষ দার্শনিক দিক নিয়ে বিকশিত—জাতীয় আত্মার সান্নিধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন 'মানব আত্মার আত্মীয়তা'।

সত্য ও ন্যায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তার উৎস রূপে স্থান পেয়েছে। কবি কূটনৈতিক বা ছলচাতুরীগত রাজনীতি[illegible] বনায়ে স্বদেশ-চিন্তা কোনদিন করেননি—আত্মশক্তি-নির্ভরশীল আত্ম-বিশ্বাস-সমৃদ্ধ জীবনের জয়-সঙ্গীত কবিকণ্ঠে বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। কবি তাই সর্বোপরি মনুষ্যত্বকেই মহিমময় দেখেছেন। সেই মহিমায় মনুষ্যত্ব-মণ্ডিত পৌরুষ আত্মার অপরিমেয় শক্তিতে প্রাণময়। কবি তাই দেশবাসীকে আহ্বান করেছেন—

"দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়,
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।"

ভয়হীন প্রাণের সঙ্গীতেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তার মৌলিক রূপ।

জগন্নাথ কথা

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়
ও
বীথিকা গঙ্গোপাধ্যায়

বিষ্ণুর অবতার বামনকে রথারূঢ় দেখলে পুনর্জন্ম হয় না—"রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"—নিষ্ঠাবান হিন্দুর মনে এই বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত।

রথযাত্রার কথা বললে পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রার কথাই স্বভাবতঃ লোকের মনে পড়ে। বাংলা দেশে মাহেশে বা মহিষাদলে রথযাত্রায় লক্ষাধিক লোক সমবেত হয়। পুরীর রথযাত্রায় প্রত্যেক বৎসরই যে এর চেয়ে বেশি জনসমাগম হয় তা নয়। কিন্তু পুরীর রথযাত্রার আকর্ষণই আলাদা। তার সর্বভারতীয় আবেদনও অন্য কোন রথযাত্রার নেই। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ তীর্থাদি করেও পুরীতে জগন্নাথকে রথারূঢ় না দেখে কোন নৈষ্ঠিক হিন্দু শান্তিতে চোখ বুজতে পারে না।

রথযাত্রার তাৎপর্য ও উৎপত্তি নানাজনে নানারকমে ব্যাখ্যা করেছেন। গীতায় আত্মা ও শরীরের রথী ও রথ সম্বন্ধ বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে—আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র রথযাত্রার বৌদ্ধ প্রভাবের কথা বলেছেন। বুদ্ধদেবের জন্মোৎসবে বৌদ্ধরা নাকি রথযাত্রা উৎসব করতেন। পুরীতে জগন্নাথের যে সব বিশেষ বেশ বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে করা হয়, বুদ্ধবেশ তার অন্যতম। বিভিন্ন হিন্দু পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার রথযাত্রার উল্লেখ দেখা যায়। রথের সঙ্গে গতির সম্পর্ক। জীবনও গতিশীল। রথ তাই জীবনের প্রতীক। বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ উপাস্যকে রথারূঢ় করে, তিনিই যে জীবনদেবতা—হয়তো এই তথ্যটি বোঝাতে চেয়েছে। অনেকে বলেন যে, জগন্নাথের রথযাত্রা কৃষ্ণের বৃন্দাবন থেকে মথুরা গমনের স্মারক। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছেড়ে দিলে বলা যায় যে, মন্দিরের গণ্ডিতে আবদ্ধ উপাস্যকে বাইরে উন্মুক্ত স্থানে লক্ষ লোকের সমাবেশে নিয়ে এসে রথযাত্রা করানোয় যে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং উত্তেজনাময় আনন্দ আছে, তাই হয়তো এই উৎসব-প্রবর্তকদের কল্পনাকে প্রেরণা দিয়েছিল।

জগন্নাথদেবের রথযাত্রার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক কাহিনী পাওয়া যায়। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে এসে ব্রহ্মা গুণ্ডিচা বাড়িস্থিত জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্র—এই বিগ্রহ চতুষ্টয়কে রথে চড়িয়ে মন্দিরে নিয়ে এসেছিলেন। হয়তো তারই স্মরণে বৎসরে একবার করে মূর্তি চারটিকে রথে চড়িয়ে গুণ্ডিচাবাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা পুরীর মন্দিরের নির্মাণকর্তা এবং বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাতা বলে প্রসিদ্ধি আছে। পুরাণ কাহিনীতে এর বিবরণ জানা যায়। মালবদেশে অবন্তী নগরে ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজধানী ছিল। এক পরিব্রাজকের মুখে ইনি শোনেন যে পুরীধামে অক্ষয় বটমূলে নীলেন্দ্রমণিময় ভগবান নীলমাধব অবস্থিতি করছেন। তাই শুনে তিনি নিজ পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে প্রকৃত তথ্য জেনে আসতে প্রেরণ করেন। স্থানীয় জনগণ নীলমাধব সম্বন্ধে গোপনীয়তা পালন করতো। বাইরের লোক যাতে তাঁর প্রকৃত অবস্থান জানতে না পারে, সে সম্বন্ধে তারা খুব সতর্ক ছিল। অরণ্যের মধ্যে নীলমাধব অবস্থান করতেন। সুতরাং বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ কিছুতেই নীলমাধবের সন্ধান পেলেন না। তখন তিনি এক কৌশল অবলম্বন করলেন। বিশ্বাবসু নামে স্থানীয় এক শবরের কন্যাকে তিনি বিবাহ করলেন। বিশ্বাবসু প্রতিদিন নীলমাধব দর্শনে যেতেন। তিনি রোজ কোথায় যান—নিজ স্ত্রীর নিকট থেকে কিছুদিনের চেষ্টায় কৌশলে তা জেনে নিয়ে বিদ্যাপতি নীলমাধব দর্শন করলেন।

প্রত্যাগত হয়ে ইন্দ্রদ্যুম্নকে নীলমাধবের বিবরণ জানালে রাজা পরিবার-পরিজন নিয়ে স্থায়িভাবে পুরীধামে বসবাস করার জন্য যাত্রা করলেন। তাঁর পথপ্রদর্শক ও পরিচালক হলেন নারদ। পথে রাজার বামাঙ্গ কম্পিত হলে ভীত হয়ে তিনি নারদকে এই অমঙ্গল-নিদর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। নারদ বললেন, যেদিন বিদ্যাপতি নীলেন্দ্রমণিময় নীলমাধব মূর্তি দর্শন করে প্রত্যাগত হন, সেইদিন প্রবল ঝড় হয় এবং সমুদ্রের বালুকা নীলাচল আবৃত করে, নীলমাধব মূর্তি পাতালে প্রবেশ করে। এই কথা শুনে রাজা অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে পড়লে সান্ত্বনা দিয়ে নারদ বললেন, ভগবান নীলমাধবের দর্শন না পেলেও তাঁর চার দারুমূর্তি দর্শনে রাজার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। তিনি রাজাকে সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ করতে পরামর্শ দিয়ে বললেন, যজ্ঞান্তে রাজার বাসনা পূর্ণ হবে।

রাজা যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞশেষে একরাত্রে তিনি স্বপ্নে শঙ্খ-চক্রাদি-চিহ্নযুক্ত বহু কল্পবৃক্ষ দেখলেন। নারদ বললেন, যজ্ঞফলেই তাঁর এই দর্শন হয়েছে। শীঘ্রই তাঁর অভিলাষ পূর্ণ হবে। অল্পকালমধ্যে রাজা সংবাদ পেলেন, স্বপ্নে যেরূপ দেখেছিলেন তেমনি একটি বৃক্ষ সমুদ্রতটে ভেসে এসেছে। তার সুগন্ধ ও তেজ চতুর্দিক পূর্ণ করেছে। নারদ বললেন, এই সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট বৃক্ষ। এ দিয়ে ভগবানের দারুমূর্তি নির্মাণ করতে হবে। রাজা যখন ভাবছেন যে

কিরূপে ভগবানের মূর্তি তৈরী হবে, তখন সহসা আকাশবাণী হ'ল, মূর্তির রূপ স্থির করে ভগবান নিজেই আবৃত ও নিভৃত মহাবেদীতে আবির্ভূত হবেন। রাজা যেন এক পক্ষকাল বেদীগৃহ আবৃত করে রাখেন এবং এক দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ এলে তাঁকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়ে দ্বার বন্ধ করে দেন। মূর্তি প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত কেহ ভেতরে যাবে না এবং বাইরে ততক্ষণ নানারূপ বাদ্যবাজনা হতে থাকবে। অন্যথায় মহা অনিষ্ট হবে।

দৈবাদেশ অনুসারে কাজ হলো। কিছুদিন অতীত হলে এক আশ্চর্য দিব্যগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হল, মন্দারকুসুম-বৃষ্টি ও দিব্যসঙ্গীত হতে লাগল এবং দেবগণ বেদীর সম্মুখে এসে ভগবানের স্তব করতে লাগলেন। পক্ষকাল পরে নির্মাণগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হল এবং দেখা গেল যে, বেদীর উপর জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা এবং সুদর্শনচক্র—এই চার মূর্তি প্রকাশিত হয়েছেন। তখন জগন্নাথদেবকে নীলবর্ণে, বলরামকে শুভ্রবর্ণে এবং সুভদ্রাকে কুঙ্কুমবর্ণে রঞ্জিত করে পট্টবস্ত্রে শোভিত করা হল।

মূর্তি হল। এবার প্রয়োজন মন্দিরের। নীল পর্বতের উপরে অক্ষয়বটের মূলে নীলমাধব-মূর্তি বিরাজিত ছিলেন। সেই বৃক্ষের নিকটে রাজা মনোহর মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করলেন। সহস্র শিল্পী এ কাজে নিযুক্ত হ'ল। যখন মন্দির সমাপ্তপ্রায়, তখন নারদের পরামর্শে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মলোকে গেলেন পিতামহ ব্রহ্মাকে আনতে। ব্রহ্মার সম্মুখে তখন হরি-সংকীর্তন হচ্ছিল। সংকীর্তনান্তে রাজার প্রার্থনা শুনে পিতামহ বললেন, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, তুমি যে স্বল্পকাল এখানে আছ মর্ত্যের পক্ষে তা বহু শত বৎসর। ইতিমধ্যে সেখানে বহু পরিবর্তন হয়েছে। তোমার স্বজন-পরিজন সৈন্য-সামন্ত কিছুই নেই। কেবল তোমার মন্দির ও মূর্তি চারটি বর্তমান আছে। তুমি যেয়ে প্রতিষ্ঠার আয়োজন কর। আমি অনতিবিলম্বে যাচ্ছি।

রাজা নীলাচলে ফিরে দেখলেন তাঁর মন্দিরে মাধবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এ সম্বন্ধে কিছু জানতে না পেরে তিনি অক্ষয় বটের কাছে একটি ছোট মন্দির করিয়ে তাতে মাধবমূর্তি রক্ষা করলেন।

গাল নামে এক রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের মন্দিরে মাধবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাকে আনতে গেলে প্রলয়কালীন প্রবল ঝড়ে সমুদ্রের বালিতে মন্দির সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। কালক্রমে নীলাচল অঞ্চল মনুষ্যবসতিহীন বন্য জন্তুর বাসস্থানে পরিণত হয়। সেই সময় একদিন গাল রাজা শিকারের উদ্দেশ্যে নীলাচলে আসেন। সমুদ্রতীরে বালির উপরে যেতে যেতে সহসা তাঁর ঘোড়ার পা আটকে যায়। রাজা নেমে দেখলেন, বালিতে প্রোথিত চক্রের ন্যায় কোন জিনিষে ঘোড়ার পা আটকে আছে। চক্রটি কোন মন্দির-চূড়ার বিষ্ণুচক্র বলে মনে হতে তিনি লোকজন আনিয়ে বালি অপসারিত করালেন—ইন্দ্রদ্যুম্নের মন্দির আবির্ভূত হল। মন্দিরের বিবরণ জানতে চেষ্টা করেও সক্ষম না হয়ে এবং মন্দিরে কোন মূর্তি নেই দেখে তিনি মাধবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে, নিজ রাজ্যে চলে যান। এখন যখন তিনি শুনলেন যে ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁর মাধবমূর্তি অপসারিত করেছেন, তখন অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তিনি ইন্দ্রদ্যুম্নের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন।

নীলাচলে এসে মন্দিরের আনুপূর্বিক সব কথা শুনে তাঁর ক্রোধ আর থাকল না। তিনি সানন্দে ইন্দ্রদ্যুম্নকে মন্দির প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের লোকবল ছিল না। গাল রাজা তাঁর লোকজনের সাহায্যে আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন। যথাকালে ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ এলেন। মূর্তি চারটি এতদিন গুণ্ডিচা বাড়িতে ছিলেন। ব্রহ্মা তাঁদের সংস্কার করে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করলেন এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের মন্দিরে মূর্তি চারিটি নিয়ে যাবার জন্য তিনটি রথ প্রস্তুত করলেন। জগন্নাথের রথ হ'ল গরুড়ধ্বজ, বলরামের তালধ্বজ এবং সুভদ্রার রথ পদ্মধ্বজ হ'ল। তারপর রথারোহণ করিয়ে ইন্দ্রদ্যুম্নের মন্দিরে আনিয়ে সুমন্ত্রজলে তাঁদের অভিষেক ও পরে প্রতিষ্ঠা হ'ল।

পৌরাণিক কাহিনীটি মনোরম, বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয়। বস্তুতঃ বলা চলে, সাধারণ লোক মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এই কাহিনীটিই জানে। ইতিহাস বলে যে, ১৯২, ফুট উঁচু এই পাথরের মন্দির উৎকল অধিপতি অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গের সময়ে নির্মিত হতে আরম্ভ হয়। অনন্তবর্মণই সর্বপ্রথম উড়িষ্যাকে এক শক্তিশালী রাজ্যরূপে গড়ে তোলেন। সম্ভবতঃ ১০৭৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১১৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। এই সুদীর্ঘ ৭২ বৎসরের রাজত্বকালে তিনি পুরীর জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ সুরু করে যেমন ধর্মপ্রীতির পরিচয় দেন, তেমনি সংস্কৃত ও তেলেগু সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। জগন্নাথমন্দির তাঁর সময়কার উড়িষ্যার "কলাশক্তি ও সমৃদ্ধির জীবন্ত নিদর্শন" বলে ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করেছেন। অনন্তবর্মণের উত্তরাধিকারীরা যোগ্য ছিলেন। তাঁরা সার্থকভাবে মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং উড়িষ্যার সমৃদ্ধি বজায় রাখেন। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান ছিলেন প্রথম নরসিংহ (১২৩৮-১২৬৪)। বাংলার মুসলমান রাজশক্তি এঁর হাতে উল্লেখযোগ্যভাবে পরাভূত হয়। সম্ভবতঃ ইনিই জগন্নাথ-মন্দিরের অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করান এবং কোনার্কের পৃথিবীখ্যাত সূর্যমন্দির তৈরী করান। ইনিই এই বংশের শেষ কীর্তিমান রাজা। এঁর পর এই বংশের পতন হতে থাকে এবং চৈতন্যশিষ্য রাজা প্রতাপ রুদ্রের পিতামহ কপিলেন্দ্র প্রায় দু'শ বছর পরে ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি এই বংশের স্থলে উড়িষ্যায় এক সূর্যবংশের আধিপত্য স্থাপন করেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা নীল পর্বতে মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন বলে পুরাণ কাহিনীতে বলা হয়েছে। মন্দিরের অবস্থিতি দেখলে মনে হয় যে, অনতি উচ্চ ও নাতিবৃহৎ কোন টিলার উপর মন্দিরটি তৈরী। টিলার একেবারে চূড়ায় মন্দির। বাইরের সমতল জায়গা থেকে মন্দির পর্যন্ত টিলার পৃষ্ঠ ক্রমশঃ উঁচু হয়ে গেছে। বাইরের সমতলে মন্দিরের সু-উচ্চ বহিঃপ্রাচীর, যার নাম মেঘনাদ। মেঘনাদ ২৪ ফুট উঁচু ও ২২ ফুট প্রশস্ত বলা হয়। মেঘনাদ থেকে মন্দির পর্যন্ত ক্রমোচ্চ ভূপৃষ্ঠে আছে বড় বড় সিঁড়ি ও প্রাঙ্গণ। এগুলি পেরিয়ে গেলে সু-উচ্চ দ্বিতীয় প্রাচীর, যার নাম অন্তঃপ্রাচীর। মেঘনাদ-বেষ্টিত ৬৫২ ফুট দীর্ঘ এবং ৬৩০ ফুট প্রশস্ত সম্পূর্ণ মন্দির-এলাকাটি একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ বিশেষ। মেঘনাদের বাইরে মন্দিরের প্রধান দ্বারে আছে অরুণস্তম্ভ। অরুণস্তম্ভ ২২ হাত উঁচু; একটি মাত্র কালো পাথর কেটে এটি তৈরী। কোনার্কের সূর্যমন্দিরের সামনে থেকে তুলে এনে অরুণস্তম্ভ পুরীর মন্দিরের সামনে

বসান হয়েছিল। অরুণ সূর্য্যের সারথি। জগন্নাথ-মন্দিরের সঙ্গে তাঁর কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই। বলা হয় যে, মন্দিরের মধ্যে যে বেদীর উপর জগন্নাথাদির বিগ্রহ স্থাপিত, সেই রত্নবেদী এবং অরুণস্তম্ভের চূড়া এক সমতলে অবস্থিত। টিলার উপর অবস্থিত বলে বহুদূর থেকে মন্দিরটি স্পষ্ট দেখা যায়। সাক্ষীগোপাল হয়ে রাজপথে পুরী আসতে আসতে দূর থেকে মন্দির দেখতে পেয়ে প্রেমাবিষ্ট মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য "জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে" বলতে বলতে উন্মাদবৎ মন্দির লক্ষ্য করে ধাবিত হয়েছিলেন।

পুরীতে জগন্নাথের রাজসিক ভাব, ঐশ্বর্যভাব। সেই গোপবালক ও গোপবধূসখা রাধাবল্লভ কৃষ্ণ তিনি নন। তিনি দ্বারকার মুকুটবিহীন রাজা। নিজে রাজা নন, কিন্তু "কিং মেকার"। পুরীর পাণ্ডারা সপ্রেমে তাঁকে 'রাজার বেটা রাজা' বলে। জগন্নাথ-মন্দিরের গায়ে ক্ষোদিত বা অঙ্কিত আছে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি। মূল মন্দিরের চতুর্দিকে মন্দির-এলাকার মধ্যেও বহু দেবদেবীর পৃথক মন্দির আছে। চলতি কথায় বলে, পুরীর মন্দিরে তেত্রিশ কোটি দেবদেবী আছেন। তা সত্ত্বেও বৃন্দাবনের স্মারক কোনো কিছুর সন্ধান মূল মন্দিরে পাওয়া দুঃসাধ্য। তবে, অন্তঃপ্রাঙ্গণ ও বহিঃপ্রাঙ্গণে ৫টি অপ্রধান রাধাকৃষ্ণ-মূর্তি আছে। যাকে ছাড়া কৃষ্ণকে কল্পনাও করা যায় না, সেই গোপীমুখ্যা মহাভাবস্বরূপিণী রাধার সেখানে প্রাধান্য নেই, কিন্তু সত্যভামা ও লক্ষ্মীর পৃথক বড় মন্দির আছে। যে সব অনুষ্ঠান মন্দিরে হয়, তাতেও ঐশ্বর্যভাবের সঙ্গিনীদেরই প্রাধান্য। মন্দিরে অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব হল রুক্মিণী-বিবাহ। ঐদিন মদনমোহন গুণ্ডিচা-উদ্যানে রুক্মিণীকে হরণ করে অক্ষয় বটমূলে বিবাহ করেন।

জগন্নাথের নিত্যসেবা-বিধিও রাজসিক। সকালে দুন্দুভিনাদ ও আরতি দ্বারা তাঁকে জাগান হয়। তারপর তাঁর দন্তধাবন, বস্ত্র-পরিধান এবং ক্ষীর, ননী, দধি ও "নড়িয়া" (নারিকেল) দিয়ে বাল্যভোগ অর্থাৎ প্রাতরাশ। ঠিক দশটায় তিনি খিচুড়ি ও পিঠে খাবেন এবং দুপুরে খাবেন লাঞ্চ অর্থাৎ প্রধান ভোগ। এতে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি থাকে। এরপর বিকেল চারটা পর্যন্ত মন্দির-দ্বার বন্ধ। বিকেল চারটায় নিদ্রাভঙ্গে উঠে জগন্নাথ জলযোগ করেন জিলিপি দিয়ে। তারপর বৈকাল-ভোগ। এতে থাকে খাজা, গজা, মতিচুর প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য। দিনের শেষ ভোগকে বলে বড় শৃঙ্গার ভোগ বা নৈশ ভোগ, যাতে নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য থাকে। প্রত্যেক ভোগে প্রথমে পুরীর রাজার ভোগ এবং পরে প্রসাদ-বিক্রেতা পাণ্ডাদের ভোগ নিবেদন করা হয়। সমস্ত দিনে-রাত্রে জগন্নাথের তিন-চারবার বেশ পরিবর্তন হয়। সকালে মঙ্গল-আরতি বেশ, অপরাহ্নে হয় প্রহর বেশ, তারপর আরাম বেশ এবং রাত্রে বড় শৃঙ্গার বেশ। এই সব বেশে বিশেষ যে একটা সাজসজ্জা হয় তা নয়। সাধারণতঃ পুষ্পমাল্যে ত্রিমূর্তিকে সাজান হয়। তবে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে যে বৃদ্ধ বেশ, দামোদর বেশ, পাবন্দী বেশ, বামন বেশ ও গণেশ বেশ হয়, তাতে জাঁকজমক থাকে। জগন্নাথদেবের নিত্যপূজা বলতে বিশেষ কিছু নেই। প্রতিদিন যে তাঁকে সাজসজ্জা করান হয় এবং "৫৬ বার" প্রধান-অপ্রধান ভোগ নিবেদন করা হয়, তাই তাঁর পূজা। বৈষ্ণবেরা আত্মভাবে উপাস্যকে সেবা করেই তাঁর পূজা করেন। যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা।

১৯৫১'র লোকগণনায় পুরীর পাণ্ডাদের সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার বলে জানা যায়। এদের 'ছড়িদার' অর্থাৎ সহকারী, অন্যান্য কর্মচারী প্রভৃতি নিয়ে এক বিরাট পাণ্ডাবাহিনী পুরীতে আছে। পরিবারে সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এই বাহিনী ক্রমশঃ বর্ধমান। ফলে গড় আয় ক্রমশঃ নিম্নমুখী হচ্ছে। অনেক পাণ্ডা তাই পাণ্ডাগিরির সঙ্গে অন্যান্য অর্থকরী বৃত্তিতে হাত দিয়েছে। পুরীর এই বিরাট পাণ্ডা-বাহিনীর মধ্যে মাত্র দু'চার জনকে ধনী বলা যায়। তাদের নিজস্ব মোটর গাড়ি আছে। তারা ভাল আয়করও দিয়ে থাকে। অবশ্য এ স্বচ্ছলতার এক প্রধান উৎস তাদের ব্যবসা।

বোধহয় কামাখ্যা দেবীর পাণ্ডারা ভারতে সবচেয়ে নিরীহ ও ভদ্র পাণ্ডা। দু' মাইল পথ অযাচিতভাবে অনুসরণ করে মাত্র তিন পয়সা নিয়ে এক পাণ্ডা আমাকে কামাখ্যা দেবীর দর্শন করিয়েছিল। পুরীর পাণ্ডারা এত নির্লোভ ও নিরীহ না হলেও, মোটামুটিভাবে aggressive নয়। তাদের উপর নির্ভর করা চলে। অসহায় যাত্রীকে তারা পথে বসায় না। প্রতি বছর বহু নিঃসহায় মহিলা পুরীধামে রথযাত্রা উপলক্ষে যেয়ে থাকেন। পাণ্ডাদের তত্ত্বাবধানেই তাঁরা থাকেন। পাণ্ডাদের সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ অভিযোগ আছে বলে শুনিনি।

পুরীর বিরাট পাণ্ডাবাহিনী মন্দিরজীবী। দিবারাত্র এরা মন্দির আঁকড়ে পড়ে থাকে। মন্দিরে সব সময়েই উৎসবের আবহাওয়া। বৎসরের সকল সময়েই পুরীতে যাত্রী আসে। তাঁদের খাওয়া, থাকা, দেবদর্শন ও অন্যান্য তীর্থকর্ম পাণ্ডাদের তত্ত্বাবধানে হয়। পাণ্ডাদের রোজগারের অপর প্রধান সূত্র প্রসাদ বিক্রি।

সকলেই জানে, জগন্নাথের প্রসাদ বিক্রি হয় এবং আ-দ্বিজ চণ্ডাল সকলে "আনন্দবাজার" থেকে এই প্রসাদ কিনে খেতে পারে। জগন্নাথের রোজকার ভোগ বরাদ্দ আছে। কিন্তু মরশুম ও যাত্রীসমাগম বুঝে অতিরিক্ত ভোগ রন্ধন করে জগন্নাথকে নিবেদন করা হয়। এই অতিরিক্ত প্রসাদ বিক্রি হয়। মরশুমভেদে দু'চার মণ থেকে দশ-বিশ মণ পর্যন্ত অতিরিক্ত ভোগ রন্ধন হয়। পাণ্ডাদের মধ্যে এই অতিরিক্ত ভোগ-রন্ধনের অধিকার পালা করে দেওয়া আছে। তারা মরশুম বুঝে Speculate করে অতিরিক্ত ভোগ-রন্ধন করায় এবং জগন্নাথকে নিবেদনান্তে বিক্রি করে।

মন্দিরসংলগ্ন বিরাট রন্ধনশালায় প্রত্যহ ভোগ রান্না হয়। 'মহাপ্রসাদ' নামে এই ভোগ বিখ্যাত। এতে সাধারণতঃ চার প্রকারের দ্রব্য থাকে—ভাত, ডাল, তরকারি এবং দুগ্ধজাত জিনিষ। বেসর, রসাবলী প্রভৃতি নানা জিনিষ রান্না হয়। রান্নারও মজা আছে। রান্নায় মশলার প্রাধান্য নেই। যা যা দেবার একবারে দিয়ে এক এক চুলোয় হাঁড়ির উপর হাঁড়ি বসিয়ে দেয় এবং বাষ্পে সিদ্ধ হয়ে রান্না তৈরী হয়। কোনরকম ঘাঁটাঘুঁটি করতে হয় না। রান্নার এই সরল প্রক্রিয়া সত্ত্বেও মহাপ্রসাদের একটি স্বতন্ত্র স্বাদ আছে। জগন্নাথের সকল প্রসাদ বিশুদ্ধ গব্যঘৃতে রান্না হয় এবং তাঁর বিরাট গোশালার দুগ্ধ থেকে এই ঘৃত তৈরি হয়—লোকমুখে এই কাহিনী প্রচলিত আছে। আসলে এর কোন ভিত্তি নেই। জগন্নাথের কোন বিরাট 'গোশালা' নেই। তাঁর মূল ভোগ ঘৃতপক্ব সন্দেহ নেই, কিন্তু বাকি সব আদি ও অকৃত্রিম ডালডায় রান্না হয়। 'আনন্দবাজারে' সবাই দর-দাম করার সময় হাঁড়ি থেকে

একটু একটু চেখে চেখে খায়। পরিবেশও অপরিচ্ছন্ন। তাছাড়া ভাল জিনিষ 'আনন্দবাজারে' বিশেষ যায় না। ভোগ নিবেদনের পর যাত্রীরা স্ব স্ব পাণ্ডার মারফৎ মন্দির থেকে কুলি দিয়ে বড় বড় ঝাঁকায় প্রসাদ আনিয়ে থাকে। প্রতিদিন অন্নভোগের পর দলে দলে কুলি মাথায় করে মহাপ্রসাদ যাত্রীদের বাসায় পৌঁছে দিতে মন্দির থেকে হেই", হেই" করতে করতে বেরিয়ে পড়ে। দেখতে ভারি সুন্দর লাগে।

জগন্নাথেরা বিরাটবপু দেবতা। দু'ভাই উচ্চতায় ৫½ ফুটের উপর। ওজনেও তিন মণের কম নন। ভগ্নী অবশ্য ভাইদের তুলনায় ক্ষীণাঙ্গী। বৎসরে এঁদের ১৭টি উৎসব ও ২৫টি যাত্রা হয়। তার মধ্যে দুবার—স্নানযাত্রা ও রথযাত্রায় বিগ্রহদের মন্দির থেকে বাইরে আনতে হয়। অন্য সকল অনুষ্ঠানে 'মদনমোহন' নামক ক্ষুদ্রমূর্তি জগন্নাথের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই বিশালকায় বিগ্রহদের উচ্চ রত্নবেদী থেকে নামিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে স্নানবেদীতে এবং রথে স্থাপন করতে, গুণ্ডিচাবাড়ী নিয়ে যেতে, সেখানে রথ থেকে নামিয়ে আবার বেদীতে স্থাপন করতে এবং পুনরায় মূল মন্দিরে ফিরিয়ে আনতে পাণ্ডারা যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়, তা দেখলে পাণ্ডাদের প্রতি শ্রদ্ধা না হয়ে পারে না। এই সব আসা-যাওয়ায় জগন্নাথ বলরামের সম্মান আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তাঁদের সর্বাঙ্গ মোটা মোটা কাছি দিয়ে বাঁধা হয়। তারপর ক্রমাগত ঠেলতে ঠেলতে এই ভীমকায় বিগ্রহদ্বয়কে স্নানবেদীতে আনা হয়। রথে তোলার সময় তো ঐ কাছি-বাঁধা অবস্থায়ই টেনে-হিঁচড়ে উঠান হয়। ভগ্নী সুভদ্রাকে পাণ্ডারা কোলে করে নিয়ে যায়। রত্নবেদী থেকে স্নানবেদী এবং রথ বহু দূরে। তা ছাড়া এই পথ ক্রমশঃ নিম্নমুখী। সুতরাং জগন্নাথ-বলরামকে স্নানবেদীতে ও রথে স্থাপন করতে পাণ্ডা বেচারীদের প্রাণান্ত হয়।

রন্ধনশালার পালার ন্যায় মন্দিরের বিরাট রাজকীয় সেবাকার্য্যও পালাক্রমে পাণ্ডাদের মধ্যে ভাগ করা আছে। বিশ্বাবসু শবরের কন্যাকে ইন্দ্রদ্যুম্ন-পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতি বিয়ে করে তাঁর সহায়তায় নীলমাধবের অবস্থিতি জানতে পেরেছিলেন। জগন্নাথ কথার গোড়ায় আছেন নীলমাধব। বিশ্বাবসুর বংশধরেরা এখন "দৈতাপতি" (দৈত্যপতি ?) নামে পরিচিত। এরা ব্রাহ্মণ নয়। বিশ্বাবসু কন্যার সহায়তার স্বীকৃতি ও পুরস্কার স্বরূপ জগন্নাথ সেবার শ্রেষ্ঠ সম্মান দৈতাপতি পাণ্ডারা পেয়ে থাকে। প্রতি বছর স্নানযাত্রা পর্য্যন্ত তাদের পালা পড়ে। স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা জগন্নাথ-সেবার কঠিনতম অংশ। এর যত ধকল ও দায়িত্ব দৈতাপতিদের ঘাড়ে পড়ে। এই সময়ে পালা পড়া পুরস্কার ত নয়ই, কঠিন শাস্তি। কিন্তু দৈতাপতিরা এবং সকল পাণ্ডারাই একে চরম পুরস্কার ও সৌভাগ্য জ্ঞান করে থাকে। স্নানযাত্রার পর উন্মুক্তস্থানে স্নানের ফলে বিগ্রহদের "জ্বর" হওয়ায় একপক্ষকাল মন্দির বন্ধ থাকে। ফলে দৈতাপাতদের আর্থিক ক্ষতি হয়। তবে রথযাত্রার সময় তাদের এ ক্ষতি পূরণ হয়ে যায়।

পাণ্ডারা জগন্নাথকে একান্ত জীবন্ত এবং প্রিয়তম জ্ঞান করে। তাদের অনন্ত বিশ্বাস ও ভালবাসার কথা তাদের মুখে শুনলে অভক্তের হৃদয়ও আর্দ্র হয়। সেবার কোন রকম বিঘ্ন উৎপন্ন হলে তা দূর করার জন্য ভারপ্রাপ্ত পাণ্ডা জগন্নাথকে নানারকম স্তব-স্তুতি করে, কাকুতি-মিনতি করে এবং প্রলোভন দেখায়। অনাহারে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকে। সে ঠিকই জানে যে, জগন্নাথ উপায় একটা করবেনই।

পাণ্ডাদের মুস্কিল আসানে জগন্নাথের কৃপার নানা কাহিনী শোনা যায়। মন্দিরের গর্ভ-গৃহ এবং ভোগ-মন্দির প্রতিবার ভোগ নিবেদনের আগে ও পরে ভাল করে ধোয়া হয়। সুতরাং প্রতিদিন মন্দিরে ধোয়াধুয়ির কাজে প্রচুর জল ব্যবহার হয়। এই জল নালি বেয়ে বাইরে চলে যায়। মন্দিরের অন্তঃপ্রাচীর ও বহিঃপ্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত পবিত্র "গঙ্গা" ও "যমুনা" কূপ দুটির জল মন্দিরের সকল কাজে ব্যবহার হয়।

একবার মন্দিরের জল বাইরে যেতে পারছিল না। সম্ভবতঃ নালিতে কোথাও কিছু আটকে যাওয়ায় জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। যে পাণ্ডার উপর জল নিকাশনের ভার ছিল, তার কাজ বেড়ে গেল। সে বহু রকম চেষ্টা করল কিন্তু কোথায় এবং কি আটকেছে, বেচারী কিছুতেই তার সন্ধান পেল না। এদিকে মন্দিরে জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় সেবার বিঘ্ন হচ্ছে। সকলে বিব্রত। বেচারী পাণ্ডা জগন্নাথের কাছে বহু কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, ধর্ণা দিল, নানা প্রলোভন দেখাল। অবশেষে জগন্নাথের দয়া হ'ল। একদিন প্রবল বৃষ্টি নামল, তার সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুৎ। মন্দিরের উপর একটি বাজ পড়ল এবং সেই বাজ দরজা দিয়ে গর্ভগৃহে ঢুকে জল বেরোবার নালি দিয়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে নালি পরিষ্কার। মন্দিরে আর জল দাঁড়ায় না। পাণ্ডার মুস্কিল আসান। কৃতজ্ঞতায় ও প্রেমে পাণ্ডাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হ'ল।

পুরীর মন্দির বৈষ্ণবদের পীঠস্থান। কিন্তু মন্দিরের নিকট অন্তঃ-প্রাচীরের মধ্যেই শাক্তদের একটি মন্দির আছে। সেটি হ'ল বিমলাদেবীর মন্দির। এটি একটি পীঠস্থান। এখানে সতীর নাভি পড়েছিল। এই বিমলাদেবীর ভৈরব হলেন জগন্নাথ।

"উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজা-ক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ।"

বৈষ্ণব মন্দিরে পশুবলি অকল্পনীয়। কিন্তু পুরীর মন্দিরের উদারতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এখানে বিমলাদেবীর মন্দিরে বৎসরান্তে একটি বলি হয়। এ ছাড়া মন্দিরের অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব হল শিব-পার্ব্বতীর বিবাহ। শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত গোবর্ধন মঠ থেকে বর বেশে সজ্জিত সপারিষদ শিব মন্দিরে এসে পার্ব্বতীকে বিবাহ করেন। পুরীর প্রধান শৈব মন্দির হ'ল লোকনাথের মন্দির। নিকটে ভুবনেশ্বরের অবস্থিতি, এ অঞ্চলে সেকালে শৈব প্রাধান্যের সাক্ষ্য দেয়। পুরীর মন্দিরে শৈব মতের সম্মান বৈষ্ণবদের সহনশীলতা, উদারতা তথা compromise-এর নিদর্শন।

জগন্নাথের রথযাত্রা কোন abrupt উৎসব নয়। দীর্ঘদিন পূর্ব থেকে এর প্রস্তুতি চলতে থাকে। দুর্গাপূজার যেমন একটি ভূমিকা আছে, তেমনি আছে পুরীর রথযাত্রার। প্রতি বৎসর রথ তিনটি নতুন করে বিশেষ ধরণের এক হাল্কা ও শক্ত গাছ দিয়ে তৈরি হয়। নির্দিষ্ট অরণ্য থেকে এই গাছ আনা হয়। রথ তৈরি করার লোকও নির্দিষ্ট আছে। পুরুষানুক্রমে তারা জায়গীর ভোগ করে এবং রথ তৈরি করে। বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন অর্থাৎ রথযাত্রার

প্রায় তিন মাস আগে রথ তৈরি আরম্ভ হয়। মন্দিরের নিকটে প্রশস্ত রাজপথের পাশে রাজবাড়ির সামনে রথ তৈরি হয়। বহু লোক একসঙ্গে বড় বড় আস্ত আস্ত গাছ চেঁছে-ছুলে রথ তৈরি করতে থাকে। সেখানে যেন এক কারখানা বসে যায়। বহু লোক প্রত্যহ রথ তৈরি দেখতে আসে। রথ তৈরিতে অবশ্য কোন রকম নৈপুণ্য প্রকাশ পায় না। যেমন তেমন করে ছোট বড় গাছ জুড়ে রথগুলি দাঁড়করান হয়। নৈপুণ্য দেখিয়েই বা লাভ কি? কেননা রথযাত্রার পর রথগুলি ভেঙ্গে জ্বালানি কাঠ হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়। তবে রথের কাঠামোতে কোন কারুকার্য না থাকলেও রথযাত্রার সময় রথের অঙ্গ বিরাট বিরাট আবরণী, ধ্বজ-পতাকা, পুষ্পমাল্য প্রভৃতি দিয়ে সুন্দর করে সাজান হয়।

তিনটি রথই দ্বিতল। তিনটি রথের মধ্যে বলরামের রথটি সবচেয়ে বড়। সুভদ্রা ও জগন্নাথের রথ ক্রমান্বয়ে ছোট। জগন্নাথের রথ ৪৫ ফুট উঁচু এবং এর সমকোণী ভিত্তিটি হ'ল ৩৫ ফুট। ১২টি ৭ ফুট ব্যাসের বিরাট বিরাট চাকার উপর রথটি দাঁড়িয়ে থাকে। বলরামের রথে চাকা থাকে ১৬টি এবং সুভদ্রার রথে ১৪টি। রথযাত্রার প্রথমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার, পরে ভগ্নীর এবং সব শেষে জগন্নাথের রথ যায়। রথের আকার তারতম্যে এবং গমনের পারম্পর্যে সুন্দর বিনয় ও সামাজিক শিষ্টাচারের পরিচয় পাওয়া যায়।

রথ তৈরি অনেকটা অগ্রসর হতে হতে স্নানযাত্রা এসে পড়ে। স্নানযাত্রাকে রথযাত্রার অধিবাস বলা যায়। স্নানযাত্রা থেকে উৎসব ও আনন্দের ভাব ও আবহাওয়া ক্রমশ: বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং রথযাত্রার দিন তা শিখরে আরোহণ করে। ভারতের দূরদূরান্ত থেকে সমাগত লক্ষ লক্ষ ভক্ত নরনারী এই মহা উৎসবে উপস্থিত হয়ে নিজেদের ধন্য মনে করে।

উত্তর-ভারতে পুরীর মন্দিরের ন্যায় কোন চালু মন্দির নেই। ভুবনেশ্বরের মন্দির বড় হলেও তার বর্তমান অবস্থায় তাকে চালু বলা যায় না। দক্ষিণ-ভারতে বড় বড় সুন্দর মন্দির আছে কিন্তু সমারোহে সেগুলি পুরীর মন্দিরের নিকট দাঁড়াতে পারে না। এই দিক থেকে পুরীর মন্দির ভারতে অনন্য। ইতিহাসে সোমনাথের মন্দিরের যে বর্ণনা আছে, তাতে মনে হয়, বিরাটত্ব এবং সমারোহ—এই উভয়ের বিচারে সম্ভবত: সেই মন্দিরই পুরীর মন্দিরের সঙ্গে তুলনার যোগ্য ছিল।

এই বিরাট মন্দিরের দেবমূর্তি যদি বিরাটাকৃতি না হত, তাহলে মানাত না। এই মূর্তির কল্পনাকারীদের অনুপাত-জ্ঞানের প্রশংসা করতে হয়। মূর্তি তিনটি এমন সুন্দর অনুপাতে তৈরি ও রত্নবেদীর উপর স্থাপিত যে, মন্দিরের দর্শনগৃহ থেকে দেখলে গর্ভগৃহের ঈষৎ অন্ধকার পটভূমিকায় ফুটে ওঠা উজ্জ্বল মূর্তিত্রয়ের সঙ্গে গর্ভগৃহের বিরাট প্রবেশ-পথের সুন্দর সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। ভোগের সময় গর্ভগৃহের দরজা বন্ধ থাকে। জগন্নাথের বিশ্রামের সময়ও গর্ভগৃহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রতিবার দ্বার উন্মুক্ত করার পূর্ব থেকে শত শত দর্শনাকাঙ্ক্ষী মন্দিরের ভিতরে একাগ্র হৃদয়ে সমবেত হয়। দ্বার উন্মুক্ত হলে তারা সমস্বরে হরিধ্বনি ও মহাপ্রভু জগন্নাথের জয়ধ্বনি করে ওঠে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমবেত ভক্তগণ মহাপ্রভুকে আপন আপন হৃদয়ের আকুতি জানাতে থাকে। একই সঙ্গে সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা, তামিল, উড়িয়া, মারাঠী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অলস্ত বিশ্বাস নিয়ে করজোড়ে সাশ্রুলোচনে প্রার্থনা-রত ভক্তগণকে দেখে এবং সেই সঙ্গে বিপুলবপু, প্রসন্নমূর্তি, আলিঙ্গনের জন্য উন্নতবাহু জগন্নাথ ও বলরামের দিকে তাকিয়ে সেই বিপুল অনুজ্জ্বল মন্দির-গর্ভে দণ্ডায়মান শত শত ভক্তজন-পরিবৃত হয়ে অভক্তের হৃদয়ও আর্দ্র হয়ে ওঠে।

পুরী সহর পুরী জেলার হেডকোয়ার্টাস। তাই প্রশাসনের সকল আধুনিক ব্যবস্থা সেখানে বর্তমান। তাছাড়া পুরী সহরে বহু ভ্রমণকারী আসে বলে তাদের জন্য অনেক আধুনিক হোটেল সমুদ্রতীরে আছে। এই আধুনিকতার মধ্যে অবস্থিত মন্দিরের আবহাওয়া কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মেঘনাদ-পরিবেষ্টিত মন্দির-এলাকায় প্রবেশ করলে মনে হয় যেন অন্য জগতে এলাম। সেখানে সর্বদা অগণিত দর্শনাকাঙ্ক্ষী ভক্তিনম্রহৃদয়ে আনাগোণা করছে, পরস্পরের সঙ্গে পারমার্থিক আলোচনা করছে, বা অন্তঃ বা বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রদীপের মৃদু আলোকে উড়িয়া ব্রাহ্মণের কম্পিত কণ্ঠের পুরাণ পাঠ শুনছে। কোথাও দক্ষিণী পণ্ডিত বিশুদ্ধ সংস্কৃতে শাস্ত্রালোচনা করছে, কোথাও মুদিতনেত্রা তিলক-কণ্ঠীধারিণী নিভৃতে জপলীনা হয়ে আছে! কোথাও পাকশালা থেকে মন্দিরে ভোগবহনকারীদের হুঙ্কারে দর্শনার্থীরা সন্ত্রস্ত, কোথাও বা আশু মন্দির-দ্বার উন্মোচনের উজ্জ্বল আশায় যাত্রীকুল উন্মুখ।

"দূর কী বনসী সুহাওয়ন লাগে"। দূরের বাঁশী মধুর লাগে, কিন্তু কাছে গেলে তার নানা ত্রুটি বেরিয়ে পড়ে। তীর্থক্ষেত্র সম্বন্ধে নানা কাহিনী ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে মানুষ তার সঙ্গে নিজের মনের রং মিশিয়ে নতুন নতুন কল্পমূর্তি তৈরি করে। কাছে গেলে সেই কল্পনার রং যায় ধুয়ে। তখন তার যে মূর্তি প্রকট হয়, তা সব সময় নয়ন-মন-সুখকর নয়। অভক্তের কাছে তার নানা দোষ আবিষ্কৃত হয়। কল্পনার দেবদাসীর স্থলে পুরীর মন্দিরে উড়িয়া গীত ও গীতগোবিন্দ সঙ্গীতকারিণী অবশিষ্ট শেষ ষোড়শ কুরূপা, প্রৌঢ়া, সাধারণ উৎকল রমণীদের দেখে সে চমৎকৃত হবে। পবিত্র বলে বর্ণিত মার্কণ্ডেশ্বর সরোবর, শ্বেত গঙ্গা বা ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে অবশ্যকর্তব্য স্নান সারতে গিয়ে তাদের নোংরা জল দেখে পিছিয়ে আসবে। জগন্নাথের চেয়ে মন্দির-গাত্রের কামমূর্তিগুলিই তার কাছে প্রাধান্য পাবে। আসলে ভক্তিই হল প্রথম প্রয়োজন। সেই ভক্তি হল "পরানুরক্তিরীশ্বরে"। তা না থাকলে জগন্নাথের পরিবর্তে মাচার লাউ দেখেই ফিরে আসতে হয়।

জগন্নাথের মন্দির উড়িষ্যার রাজার সম্পত্তি। মন্দির পরিচালনার জন্য একটি কমিটি আছে, তবে উড়িষ্যার রাজাই এই মন্দিরের প্রধান সেবাইত। বর্তমান রাজার উপর পাণ্ডাকুল সন্তুষ্ট নয়, কেননা মন্দিরের প্রধান সেবাইত হতে হলে যে সব গুণ বা নিষ্কলুষত্ব থাকা প্রয়োজন, পাণ্ডাদের বিশ্বাস, তাঁর তা নেই। উড়িষ্যা সরকার মন্দিরটির ব্যবস্থাপনার ভার আইন বলে স্বহস্তে গ্রহণ করছেন। সরকারী তত্ত্বাবধানে এলে "Orthodox Hindu"-দের জন্য সংরক্ষিত এই মন্দিরের বহুবিধ প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হয়ে হয়তো অনেক উন্নতি হবে।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, এম্‌-এ, পি-আর এস্

'প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি' সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে প্রথমেই ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রদর্শন করা আবশ্যক। ভারত শব্দের উত্তর ছ (পাণিনি) বা ঈয় (কলাপ) প্রত্যয় করিয়া 'ভারতীয়' পদটি সাধিত হইয়াছে। উক্ত ছ অথবা ঈয় প্রত্যয়টি হিতার্থে ব্যবহৃত হয়। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন "তস্মৈ হিতম্‌" এবং কলাপ ব্যাকরণের সূত্র "ঈয়স্তু হিতে।" উল্লিখিত হিতার্থ প্রত্যয়টি ভারত শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বুঝাইতেছে যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে সংস্কৃতি বিদ্যমান থাকিয়া ভারতীয় জনগণের হিতসাধন করিত, তাহাই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি।

এক্ষণে, সংস্কৃতি বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহাও বলা প্রয়োজন। অনেকে ইংরেজী Culture শব্দের স্থলে সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। বস্তুত: Culture এবং সংস্কৃতির মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। ইংরেজী Culture শব্দটি সম্ভবত: সংস্কৃত কৃষ্টি শব্দের অপভ্রংশ। আমাদের বিবেচনায় ইংরেজী Culture শব্দের বাংলা বা সংস্কৃত করিতে হইলে কৃষ্টি শব্দের প্রয়োগই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি শব্দ দুইটির ব্যুৎপত্ত্যর্থ প্রদর্শন করিলেই ইহাদের পার্থক্য পরিস্ফুট হইবে। গণপাঠে কৃষ ধাতুর অর্থ লিখা আছে—'কৃষ বিলেখনে'; অর্থাৎ বিলেখন বা রেখাপাত অর্থে কৃষ ধাতুটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কৃষধাতু হইতেই কর্ষণ শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে। কর্ষণ শব্দের অর্থ আমরা সকলেই বুঝি। সহজ বাংলায় কর্ষণকে আমরা চাষ বলিয়া থাকি। ভূমি কর্ষণ করিতে হইলে লাঙ্গল দ্বারা তাহাতে অসংখ্য রেখাপাত করা হয়। ফলে শস্যভূমি নরম হইয়া ক্রমশ: ফসল উৎপাদনের উপযোগী হয়। এইভাবে যে কর্ম্মধারা বা আচরণ অসভ্য মানুষের মধ্যে ক্রমশ: সভ্যতার আলোক সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাই কৃষ্টি নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

সংস্কৃতি শব্দের অর্থ কিন্তু ঠিক এইরূপ নহে। কৃ ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী সম্‌ উপসর্গের পরে একটি সুট্‌ আগম হইয়া জানাইতেছে যে, সুসভ্য মনুষ্যের যে আচরণ বা কর্ম্মধারা তাহাদের সভ্যতাকে অধিকতর উন্নত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিল, তাহারই নাম 'সংস্কৃতি'।

যদিও চেম্বারের ইংরাজী অভিধানে Culture শব্দের সভ্যতা-বিশেষ (a type of civilisation) রূপ অর্থ স্বীকার করা হইয়াছে, তথাপি তাদৃশ সভ্যতার কোন বর্ণনা দেওয়া হয় নাই। উল্লিখিত অভিধানে সভ্যতাবিশেষকে Culture বলা হইয়াছে, আর আমাদের মতে সভ্যতাবিশেষের প্রকাশক কর্ম্মধারা বা আচরণই Culture বা কৃষ্টি।

সুসভ্য মানুষের কর্ম্মধারা স্বভাবত: বহুমুখী হইয়া থাকে; সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে বহু ভাগে বিভক্ত করা যায়। শিক্ষা, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি ভেদে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বহুধা বিভিন্ন। বর্ত্তমানে তাহার কয়েকটি প্রধান অংশের দিঙ্‌মাত্র আলোচনা করিতেছি।

শিক্ষা

শিক্ষা বলিতে আমরা জ্ঞানের বিতরণকে বুঝিয়া থাকি। আমরা কোন উপায়ে একবার যাহা জানিয়াছি, অপরকে তাহা জানাইতে গেলেই বলা হয়—তাহাকে উহা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সুসভ্য মানুষের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। আর্য্য ঋষিগণের জ্ঞানরাশিও বিশাল বারিধির ন্যায় বহুবিস্তৃত। ইহাকে তাঁহারা কখনও চারি ভাগে, কখনও চৌদ্দ ভাগে, কখনও বা আঠারো ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি—এই চারিটি বিভাগে বিভক্ত করিয়া যখন দেখা গেল, প্রাচীন ভারতের বিপুল জ্ঞান-ভাণ্ডারের অধিকাংশই ইহাদের বাহিরে থাকিয়া যাইতেছে, তখন পুনরায় চৌদ্দটি বিভাগ কল্পনা করা হইল। উক্ত চৌদ্দটি বিভাগ যথা—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তর:।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥"

[৬ বেদাঙ্গ, ৪ বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র]

তাহার পরও দেখা গেল চারিটি উপবেদ বাহিরে থাকিয়া যাইতেছে। ইহারা বেদ নহে; সুতরাং চারি বেদ হইতে ইহাদের পার্থক্য অস্বীকার করা চলে না। তখন এই চারিটি উপবেদ সহ অষ্টাদশ বিদ্যার কল্পনা করা হইল। উক্ত চারিটি উপবেদ যথা—আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ এবং অর্থশাস্ত্র। উল্লিখিত আঠারোটি বিদ্যার কথা একটি পৌরাণিক শ্লোকে বলা হইয়াছে; যথা—

"সষড়ঙ্গা চতুর্ব্বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তর:।
আয়ুর্ব্বেদং ধনুর্ব্বেদং গান্ধর্ব্বমর্থশাসনম্‌।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা অষ্টাদশ স্মৃতা:॥"

উল্লিখিত অষ্টাদশ বিদ্যার প্রত্যেকটি বিপুলায়তন এবং লোকাতীত জ্ঞানের অপরিমেয় ভাণ্ডার। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ইহাদের তুলনা নাই।

বেদই যে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ, একথা সকল দেশের মনীষীরাই একবাক্যে স্বীকার করেন। এই অতি প্রাচীন গ্রন্থে ভারতীয় ঋষিগণ

গুরুভক্তি ও প্রবল জ্ঞানপিপাসা। গুরুকে তাঁহারা দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং গুরুর প্রত্যেকটি কথার শ্রবণে তাঁহাদের প্রগাঢ় মনোনিবেশ পরিলক্ষিত হইত। গুরুবাক্যের প্রতি এইরূপ মনোযোগ থাকার ফলে শীঘ্রই তাঁহারা গুরুর যাবতীয় জ্ঞান আহরণ করিতে সমর্থ হইতেন। জ্ঞানের পরিপন্থী ভোগবিলাস তাঁহাদের নিকট ছিল চির-অপরিচিত। একদিকে অতুল ঐশ্বর্য্য এবং অপরদিকে তত্ত্বজ্ঞান রাখিয়া, ইহাদের মধ্য হইতে কোন্‌টি গ্রহণ করিবেন জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা হেলাভরে ঐশ্বর্য্যরাশি ঠেলিয়া ফেলিয়া জ্ঞানলাভের জন্য উৎসুক হইতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি উপাখ্যানে ইহার সুন্দর উদাহরণ দেখা যায়।

ধনবান্ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী নাম্নী পত্নীদ্বয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া তপশ্চর্য্যার জন্যে বনে যাইতে চাহেন। যাজ্ঞবল্ক্যের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার বিদুষী পত্নী মৈত্রেয়ী বলিলেন—"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহন্তেন কুর্য্যাম্?" অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমি অমরত্বলাভ করিতে পারিব না, সেই ধন দ্বারা কি করিব? বিদুষী মৈত্রেয়ী ঐশ্বর্য্যরাশি পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানের পথই বাছিয়া লইয়াছিলেন। বাস্তবিক, এইরূপ নিষ্ঠা না থাকিলে জ্ঞানলাভ হয় না।

ধর্ম্মনীতি

ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ। এই দেশেই সর্ব্বপ্রথম সনাতন সত্য-ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় এবং স্মরণাতীতকাল হইতে এই দেশের ঋষিরাই প্রকৃত সত্যধর্ম্মের প্রচার করিয়া আসিতেছেন। পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য দেশে যে সকল ধর্ম্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের ঋষিদের নিকট হইতেই সত্যধর্ম্মের স্বরূপ অবগত হইয়া তাহার প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। মহাত্মা যীশু যে ধর্ম্মপ্রচারের পূর্ব্বে বেশ কিছুদিন ভারতবর্ষে থাকিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বহু মনীষী কর্ত্তৃক স্বীকৃত। মহাত্মা যীশু পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে বৎসরাধিক কাল থাকিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করেন এবং তথা হইতে ভারতের অন্যান্য তীর্থ পর্য্যটনান্তে তিব্বতে গিয়া কিছুকাল বাস করেন। এইভাবে ভারতবর্ষ হইতে প্রাচীন আর্য্যদের ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া যীশু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তাহার পরই ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হন।

হজরত মহম্মদও ধর্ম্মপ্রচারের পূর্ব্বে দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া যে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, মুসলমান ঐতিহাসিকেরাও একথা স্বীকার করিয়াছেন। কোরাণ শরীফের ইংরেজী অনুবাদক ও ভাষ্যকার মৌলানা মহম্মদ আলীর কোরাণ-শরীফের ভূমিকায়ও এই ঐতিহাসিক সত্য স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া বৌদ্ধ নৃপতিগণের অত্যাচারের ফলে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারাও বিভিন্ন দেশে ভারতীয় ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বৌদ্ধ নৃপতিরা যে ভারতীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে পাইকারীভাবে নির্ব্বাসিত করিতেন, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এনথ্-সাং তাঁহার রচিত "সি-উ-কি" নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে অন্ততঃ একটি সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার লেখা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই পাঁচ শতাধিক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম ভারতবর্ষের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্মরণাতীত কাল হইতে এই দেশের লোকেরা কেবলমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মই করিয়া আসিতেছেন। ত্যাগই ভারতীয় ধর্ম্মের মূলনীতি। এই দেশের লোকেরা চিরদিনই বিশ্বপ্রেমিক এবং ত্যাগসর্ব্বস্ব। তাঁহারা জানেন—পরের উপকার করাই ধর্ম্ম এবং পরকে পীড়া দেওয়াই পাপ। তাঁহারা অর্থ উপার্জ্জন করেন, অপরের বিঘ্ন উৎপাদন না করিয়া এবং নিজের শরীরকেও অধিক পীড়া না দিয়া। তাঁহারা জানেন, দানই সকল ধর্ম্মের সার। ঐশ্বর্য্যশালী নৃপতিও যে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সমুদয় রাজৈশ্বর্য্য দানের পরও নিজের ব্যবহারের বাসনপত্র, এমন কি, গাত্রাবরণ পর্য্যন্ত দান করিয়া স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইতে পারেন, এইরূপ দৃষ্টান্ত একমাত্র ভারতবর্ষেই পুনঃপুনঃ দেখা যায়। এদেশের দরিদ্রতম গৃহস্থও গৃহাগত ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে মুখের গ্রাস দান করিয়া নিজে অনাহারে থাকিয়াও জীবন ধন্য মনে করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা আজীবন সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্য ধ্যান, জপ, তপঃ, সন্ধ্যা ও তর্পণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেবলমাত্র মানুষের মঙ্গল চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত হন না; ইতর প্রাণী, এমন কি, তরু-লতা প্রভৃতির পর্য্যন্ত মঙ্গল চিন্তা করিয়া থাকেন। তর্পণ করিবার সময়ে তাঁহারা "আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত" সমগ্র জগতের তৃপ্তি কামনা করিয়া জলাঞ্জলি দান করেন। অনার্য্য এবং অহিন্দুরা মৃতের সৎকার না করায় ঐ সকল মৃতের আত্মার মুক্তি হইবে না ভাবিয়া তাঁহারা তাহাদেরও মঙ্গলের জন্য শ্রাদ্ধকালে পিণ্ড এবং তর্পণকালে জলাঞ্জলি দান করিয়া থাকেন। পুণ্যভূমি গয়ায় গিয়া প্রত্যেক হিন্দু নিজের মাতাপিতার মুক্তি কামনার পর বিশ্বের সমুদয় পাপী তাপীরও মুক্তি কামনা করেন। এইরূপ বিশ্বপ্রেম কেবলমাত্র হিন্দু ধর্ম্মেই দেখা যায়।

হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম্মের তুলনা করিয়া মহামনীষী ৺স্বামী বিবেকানন্দ একদা বলিয়াছিলেন—

"I go forth to preach a religion, of which Buddhism is nothing but a rebel child, and Christianity a distant echo." (আমি এমন এক ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইতেছি, বৌদ্ধধর্ম্ম যাহার বিদ্রোহী সন্তান, এবং খৃষ্টধর্ম্ম যাহার দূরবর্ত্তী প্রতিধ্বনিস্বরূপ।)

হিন্দু ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের তুলনা করিয়া অন্য একজন মনীষী বলিয়াছেন—"মুসলমানের প্রীতি স্বজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ, খৃষ্টানের প্রেম মানুষমাত্রের প্রতি প্রযোজ্য, এবং বৌদ্ধদের ভালবাসা প্রাণিমাত্রে পরিব্যাপ্ত; কিন্তু হিন্দুদের প্রীতি চেতন, অচেতন নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি প্রযুক্ত।" এই উক্তিটি যথার্থই বটে।

ভারতীয় ঋষিগণ একেশ্বরবাদের দ্রষ্টা এবং প্রচারক হইয়াও, সাধারণ মানুষের পক্ষে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা সম্ভব নহে বুঝিয়া, ক্রমশঃ দেবতার বিভিন্ন রূপও কল্পনা করিয়াছেন। ব্রহ্ম বা শ্রীভগবান্ সর্ব-শক্তিমান; সুতরাং তিনি সর্ব প্রকার রূপ ধারণে সমর্থ। যে সাধক যে রূপেই তাঁহার ধ্যান করুন না কেন, সেই রূপ নিয়াই ব্রহ্ম বা শ্রীভগবান্ উক্ত সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া

থাকেন। সিদ্ধ মহাপুরুষগণের উক্তি হইতেই আমরা এই সত্য অবগত হইয়াছি।

যাঁহারা হিন্দুদের এই সাকার উপাসনা-পদ্ধতির নিন্দা করিয়া ইহাকে পৌত্তলিকতা নামে অভিহিত করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা যে কতদূর ভ্রান্ত, মৎ-প্রণীত "বেদ ও কোরাণের সাদৃশ্য" নামক গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা ইহা প্রদর্শন করিয়াছি। যিনি সর্বশক্তিমান তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ ধারণ করিতে পারেন না, এরূপ কল্পনা একান্ত বালকোচিতই বটে। যাঁহার রূপ গুণ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণনা নাই, কোন সাধারণ মানব তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করিতে পারে না—এই সত্য ভারতীয় ঋষিগণের সূক্ষ্ম দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল।

সর্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তার বিভিন্ন কার্য্যের স্মরণে তাঁহার যে বিভিন্ন রূপ সাধকেরা কল্পনা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা হিন্দু-ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষই সাধিত হইয়াছে। এই সাকার উপাসনার অনুকূলে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করার পর ৺স্বামী বিবেকানন্দ একদা বিরুদ্ধবাদীদিগকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—সাকার উপাসনা দ্বারা যদি ঠাকুর রামকৃষ্ণের মত সিদ্ধ মহাপুরুষ সৃষ্ট হইতে পারেন, তাহা হইলে এইরূপ উপাসনা বর্জ্জনের কি কারণ থাকিতে পারে?

বেদের কর্ম-কাণ্ডের বিপক্ষে নাস্তিকগণ কর্তৃক যে সকল কুযুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, মীমাংসা-দর্শনের সূত্র ও ভাষ্যসমূহে বিভিন্ন মনীষী এবং বেদভাষ্যে আচার্য্য সায়ণ তাহা সম্যকরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। নাস্তিকেরা যখন হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কুযুক্তি প্রদর্শন করে, তখন অজ্ঞ লোকেরা তাহাকেই সুযুক্তি মনে করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়। ইহারই ফলে হিন্দু-সমাজে এত বেশী অনাচার প্রবেশ করিয়াছে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিরুদ্ধে উচ্চারিত একটি কথাও সহ্য করা অপরাধ বলিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষতঃ কোরাণে ঘোষিত হইয়াছে; কিন্তু অতি উদার হিন্দু শাস্ত্র সকলকেই যে-কোন মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রের এই উদারতার সুযোগ নিয়াই বেদ-দ্রোহীরা তাহাদের অপপ্রচার চালাইয়া যাইতে পারিতেছে। চার্ব্বাক প্রভৃতি নাস্তিকদের প্রদর্শিত দুই একটি কুযুক্তির উল্লেখ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া চার্ব্বাক বলিয়াছেন—

(১) যতদিন বাঁচিয়া থাক, জীবনটাকে উপভোগ কর। ঋণ করিয়াও ঘি খাও। মৃত্যুর পর দেহ ভস্মীভূত হইলে সে আর কোথা হইতে আসিবে?

[যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য ভূতস্য পুনরাগমনং কুতঃ।।]

(২) "জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে নিহত হইলে পশু যদি স্বর্গে যায়, তাহা হইলে যজ্ঞকারী নিজের পিতাকে সেই যজ্ঞে হত্যা করেন না কেন?

[পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং যাতি জ্যোতিষ্টোমে মখে।
স্বপিতা যজমানেন কথন্তত্র ন হিংস্যতে?]

(৩) এখানে প্রদত্ত দ্রব্যাদি দ্বারা যদি স্বর্গস্থ পিতৃগণের তৃপ্তি সাধিত হইতে পারে, তাহা হইলে দ্বিতলে অবস্থিত লোকদের জন্য নীচের তলায় খাদ্য দেওয়া হয় না কেন?

[স্বর্গস্থানাং যদি তৃপ্তিরিহস্থৈরেব জায়তে।
প্রাসাদস্যোপরিষ্ঠানামত্রৈব কিং ন দীয়তে?]

চার্ব্বাকের উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তরে আমরা নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিতে চাই—

(১) প্রত্যেক মানুষই যদি আত্মসুখের জন্য ঋণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ঋণ দিবে কে? আর তুমি যদি অপরের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া তাহাকে বঞ্চনা করিতে পার, তাহা হইলে অপরেই বা তোমাকে বঞ্চনা করিবে না কেন? তুমি যদি অন্যকে ঋণ না দেও, তাহা হইলে সে-ই বা তোমাকে ঋণ দিবে কেন? যে রাষ্ট্রে প্রত্যেকেই চোর হয়, সেই রাষ্ট্র যেমন টিকিয়া থাকিতে পারে না, ঠিক তেমনি যে ধর্ম্মে বা সমাজে প্রত্যেকেই আত্মসুখের জন্য নিজের উপার্জ্জিত সমুদয় অর্থ ব্যয় করিবার পর অপরের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে চায়, সেই ধর্ম্ম বা সমাজ টিকিতে পারে না।

অতএব, চার্ব্বাকদের উল্লিখিত নীতির প্রচারের ফলে একটা উচ্ছৃঙ্খল দলের সৃষ্টি হইয়া শান্তিকামী মানবদের অশান্তি সৃষ্টিমাত্র করিতে পারিবে; এতাধিক কিছুই হইবে না। হিন্দুশাস্ত্র বলেন—"তোমার উপার্জ্জিত অর্থের একাংশ পরহিতার্থে ব্যয় কর"; আর নাস্তিক চার্ব্বাকেরা বলিলেন—"পরের ধন আনিয়া আপনার সুখের জন্য তাহা ব্যয় কর"। এই উভয় নীতির মধ্যে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ, সাধারণ লোকেরাও তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন।

(২) জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে বিহিত পশু বলিদান করিলেই সেই পশু স্বর্গে গমন করে বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের বিধানে দেখা যায়, বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত ছাগপশুই এই কার্য্যের জন্য বিহিত হইয়াছে। উল্লিখিত যজ্ঞে নরবলির বিধান নাই এবং প্রাচীন ভারতে আর্য্যসমাজের আচরণীয় কোন ধর্ম্মকর্ম্মেই নরবলির বিধান ছিল না। সুতরাং চার্ব্বাকের উল্লিখিত যুক্তি ও প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, চার্ব্বাকের পিতা যদি বিশেষ-লক্ষণাক্রান্ত ছাগপশু হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে তাঁহাকে বলিদান করিলে তিনি স্বর্গে যাইতে পারেন। কোন আর্য্য-সন্তান নিজের পিতাকে পশু মনে করেন না; সুতরাং জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে মানুষের পিতৃহত্যার কোন প্রশ্নই উঠে না।

(৩) চার্ব্বাকের উল্লিখিত তৃতীয় উক্তি হইতে বুঝা যায়, নীচের তলায় অন্ন স্থাপন করিলে যদি তাহা উপরের তলার লোক পাইতে পারেন, তাহা হইলে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধের উপযোগিতা তিনি অস্বীকার করিবেন না। বিদ্যুচ্চালিত লিফ্‌টের সাহায্যে আজকাল আমরা যত তলা খুসী উপরে উঠিতে পারি। এইরূপ বিদ্যুচ্চালিত কোন আধারে অন্ন রাখিয়া কল টিপিলেই সেই অন্ন উপরের তলার লোকের নিকট অনায়াসে পৌঁছিতে পারে। শ্রাদ্ধে যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তাহারা এইরূপ বৈদ্যুতিক তারের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে; সুতরাং চার্ব্বাক এই ক্ষেত্রে তাঁহার নিজের যুক্তিদ্বারাই পরাস্ত হইলেন।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণ কিরূপ ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন, তাঁহাদের রচিত অসংখ্য যজ্ঞের বিধানমূলক গ্রন্থ—ধর্ম্মসূত্র, কল্পসূত্র, গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি হইতে আমরা তাহার প্রমাণ পাই। যজ্ঞ যদি নিষ্ফল হইত, তাহা হইলে ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ শতাব্দীর পর

…দী ধরিয়া অনবরত এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন না। বেদের সংহিতা, পুরাণ এবং ইতিহাসেও আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বহুবিধ যাগযজ্ঞ ও পূজার্চ্চনার বিধি এবং তাহাদের বর্ণনা দেখা যায়।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে—পূর্ব্বকালে যে যজ্ঞ যেরূপ বিধান অনুসারে সম্পাদন করিয়া বাঞ্ছিত ফল লাভ করা গিয়াছে, বর্ত্তমানে আমরাই সেইরূপ বিধানে সম্পাদন করিলেও কেন তাদৃশ ফল লাভ হয় না? ইহার উত্তর অতি সুস্পষ্ট।

প্রাচীনকালে এদেশের ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত সদাচার-পরায়ণ এবং শুচিপবিত্র ছিলেন। তাঁহারা যেখানে সেখানে যার তার স্পৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিতেন না। বর্ত্তমানে অনাচারে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। সুতরাং অথবা পরম্পরাসম্বন্ধে আজ এদেশের প্রত্যেক ব্রাহ্মণই অল্পাধিক কলুষিত। ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধ বৃত্তিও বর্ত্তমানে আর নাই। অনেক ব্রাহ্মণদিগকে অব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয়। ইহার ফলে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বেরও হানি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণের জীবিকার জন্য সাত্ত্বিক ধন সম্প্রতি এদেশেও আর পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণেরা ম্লেচ্ছভাবাপন্ন অব্রাহ্মণদের নিকট হইতে রাজসিক ও তামসিক ধন গ্রহণ করিয়া নিজেদের ব্রাহ্মণত্বের হানি করিতেছেন। এই সকল কারণে সম্প্রতি তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা বিধি-অনুসারে যজ্ঞ করিলেও তাহা আর ফলপ্রসূ হয় না।

সনাতন ধর্ম্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা অতি নির্জ্জনে লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিয়াও সাধন করা চলে; এবং এইরূপ নির্জ্জনে সাধিত ধর্ম্মই অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। এই কারণে আজও যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিরা গভীর অরণ্যে ও পর্ব্বতে গিয়া নির্জ্জন-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কদাচিৎ লোকহিতার্থে যখন তাঁহাদের দুই-একজন লোকালয়ে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করেন, কেবলমাত্র তখনই আমরা তাঁহাদের অস্তিত্বের কথা জানিতে পারি। হিন্দুর ধর্ম্মাচরণে আড়ম্বর অপরিহার্য্য নহে। লোকশিক্ষার জন্য দুর্গোৎসব প্রভৃতি কোন কোন অনুষ্ঠানে আড়ম্বর বিহিত হইয়াছে বটে; কিন্তু হিন্দুদের অধিকাংশ ধর্ম্মীয় আচরণই নির্জ্জনে সাধ্য। এমন কি, প্রাত্যহিক সন্ধ্যানুষ্ঠান পর্য্যন্ত নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া সম্পাদন করিবার জন্য মহর্ষি মনু নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

হিন্দুর ধর্ম্মাচরণে আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক হিন্দুকে আদর্শ-মানবে পরিণত করার উদ্দেশ্যে তাহার মাতৃগর্ভে থাকার সময় হইতে বিবিধ বৈদিক সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত করা হয়। মাতৃগর্ভে প্রবেশের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া নিজের বিবাহানুষ্ঠান পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি আর্য্য-সন্তানকে অন্ততঃ ১০ বার বৈদিক বিধানে সংস্কৃত করিবার জন্য শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যথাবিধি এই সকল সংস্কার অনুষ্ঠিত হইলে, তাহা দ্বারা দেহ ও মনের বিশুদ্ধি সম্পাদনের ফলে সেই সংস্কৃত মানব আদর্শ-মনুষ্যে পরিণত হওয়ার সর্ব্ববিধ সুযোগ লাভ করে।

প্রত্যহ তিনবার সন্ধ্যোপাসনা, প্রত্যহ অভীষ্ট দেবতার অর্চ্চনা, আহারের প্রাক্কালে ইষ্টদেবতার নিকট আহার্য্যদ্রব্যের নিবেদন, দেবতার উদ্দেশে গ্রাস দান প্রভৃতি আচরণ দ্বারা হিন্দুরা এই শিক্ষাই লাভ করেন যে, তাঁহারা পরের জন্যই জীবনধারণ করিতেছেন। বর্ত্তমান আত্মকেন্দ্রিকতার যুগে মোহগ্রস্ত মানব হিন্দুর এই সদাচার-পরিপূত ধর্ম্মকে বোকামি বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারেন; কিন্তু চিন্তাশীল মনুষ্যের নিকট চিরদিনই ইহার ন্যায্য মর্য্যাদা উপলব্ধ হইবে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

বাদুড়

বীরু চট্টোপাধ্যায়

আমরা বাদুড় বৃক্ষের ডালে—
নিম্নে রাখিয়া শির,
আঁখি মুদে থাকি দিনের আলোয়
সহে না সূর্য্যতাপ।
রাতের আঁধারে আমরাই রাজা
সুপ্ত এ বনানীর;
অশুভ-লগ্ন বাহক আমরা,
বিধাতার অভিশাপ

বিফল চেষ্টা করগো
মোদের আলোক দিতে।
জনম অবধি অসভ্য মোরা
আঁধারেই ভালবাসি।
ধর্মকাহিনী মিছেই ঢালিলে
জন্ম-শঠের চিতে।
আজিকে শোনালে জ্ঞানের মন্ত্র
এ কোন সর্বনাশী!

বেশ ছিনু হায় ডানায় ডানায়
অকল্যাণেই বহি।
কেন গো আনিলে মঙ্গলরূপী
আবর্জনার ডালি!
রাতের তিমিরে সুখে ছিনু মোরা,
সকলের ঘৃণা সহি।
আঁখিরে মোদের দিলে ঝলসিয়া—
জ্ঞানের আলোক জ্বালি!

পত্র-সাহিত্যে নজরুল

এক

অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খানের পত্রোত্তরে ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা "সওগাতে" নজরুলের যে অবিস্মরণীয় চিঠি ছাপা হয়েছিল, তার একস্থানে তিনি লিখেছেন :…"একটি হাত দিয়েছি অনেকগুলি কাজেই—তা'তে করে হয়ত কোনোটাই ভাল করে হচ্ছে না।" এই 'ভাল করে' হ'ল কি না তার স্বরূপ বিচারের ভার রসজ্ঞ ও তার্কিক পাঠকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মহাকালের ওপর ছেড়ে দিয়ে আমরা নিঃসন্দেহে এইটুকু বলতে পারি, নজরুল ইসলাম তাঁর স্বল্পস্থায়ী অরুগ্ন শিল্প-জীবনে বল্গাহারা দুর্দমনীয় অশ্বের মত সাহিত্যের প্রায় সকল ভূমিতেই বলিষ্ঠ পদচিহ্ন অঙ্কিত করেছেন। ছোট গল্পের প্রান্তভূমি হতে বার হ'য়ে তাঁর কল্পনা-বিলাসী মন উপন্যাস, নাটিকা, কাব্য, সংগীত ইত্যাদি সর্বত্রই রূপ-পাগল পথিকের মত ঘুরে বেড়িয়েছে। বাংলার পত্র-সাহিত্য বিভাগটিও কবির তাজা প্রাণের সজীব স্পর্শ হতে বঞ্চিত হয়নি। সাহিত্যের এই বিভাগটিও কবির বিরাট প্রাণের বিপুল স্পর্শে ধন্য হয়েছে। পত্র-সাহিত্যে নজরুল-অবদানের আলোচনা করার পূর্বে আমরা এই বিভাগটির ঐতিহাসিক কাঠামোটি চিনে নিতে চেষ্টা করব।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মত পত্র-সাহিত্যের উৎসমূল খুলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আপন প্রাণ-প্রাচুর্য যে তাকে সাবলীল ও বেগবান করে তুলেছেন, সেকথা আজ ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয়েছে। প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে এই ধারাটির জন্মক্ষণ সূচিত হলেও, সাহিত্য-রাজ্যে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র সে তখনো পায়নি। তখন চিঠি কেবল চিঠিই। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কাছে দাসখত লিখে দিয়ে সে কতুর হ'য়ে গেছে। বিশেষ ব্যক্তির প্রয়োজন-ঋণ মিটিয়ে সে দেউলিয়া হয়ে পড়তো। যে গুণে চিঠি ব্যক্তিগত হ'য়েও সর্বসাধারণের আনন্দের, ব্যষ্টির হয়েও সমষ্টির সম্পদে পরিণত হয়, প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে তার স্বচ্ছ একটা সন্ধান মেলে না। বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি তাঁর রচনা-বিচারের মানদণ্ড হ'য়ে উঠেছে। সুতরাং সে চিঠি প্রয়োজনের বেড়ি পায়ে পরে মরণ-মুখে এগিয়ে গেছে। মীর মোশাররফ হোসেন সাহেবের চিঠিতে সাহিত্যের সঞ্জীবন-স্পর্শ থাকলেও, তাঁর চিঠির সংখ্যা এত নগণ্য (আজ পর্যন্ত আমি তাঁর তিনটি চিঠি দেখেছি) যে, তার জন্যে পৃথক কোন সাহিত্যিক-মূল্য দিতে মন সায় দেয় না। মধুসূদনের চিঠির বিশেষ রস-মূল্য আছে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সীমানা ডিঙিয়ে সে চিঠি সাহিত্যিক মর্যাদা দাবী করার স্পর্ধা রাখে, কিন্তু তাঁর সমুদয় চিঠি ইংরাজীতে লেখা। প্রমথ চৌধুরীর চিঠিই বোধহয় বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম চিঠি—যার একটি বিশেষ রসমূল্য আছে। প্রয়োজনের ইস্পাত-কঠিন সীমারেখা সহজেই ছিন্ন করে দিয়ে সে চিঠি সাহিত্যের দরবারে আপন আসনটি দখল করে নিয়েছে। চৌধুরী মহাশয়ের পত্রাবলীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাদের বুদ্ধি-দীপ্ত মনন-প্রধান আলাপচারণা। এই নতুন ভঙ্গী, নতুন বাগ-বিন্যাসের মূলে রয়েছে চৌধুরী মহাশয়ের সুকল্পিত গদ্য-রীতি। এই অননুকরণীয় বুদ্ধি-মুখর গদ্য-রীতি চৌধুরী মহাশয়ের পত্রাবলীর এক বিশেষ গুণ। তবুও এই চিঠিগুলিকে ঠিক যেন অন্তরের সঙ্গে এক করে মনের মানুষটির সাথে মিলিয়ে গ্রহণ করা যায় না। মনে হয় কোথায় যেন কি একটা মস্ত বড় ফাঁক রয়ে গেছে। ঠিক ঠিক যতটা ঘরোয়া ও আপন হ'লে আমাদের মন আনন্দে নেচে ওঠে, এই চিঠিগুলি ঠিক সেই পরিমাণে ঘরোয়া নয়। তাই সকল প্রাচুর্যের মাঝেও যেন চিঠিগুলি ঠিক প্রাণবন্ত ও আপন হ'য়ে ওঠেনি। পত্র-সাহিত্যের এই সকল দুর্বহ দোষ-ত্রুটি হ'তে মুক্ত করে রবীন্দ্রনাথ তাকে এক অপূর্ব সৌকুমার্য ও রূপ-লাবণ্য দান করলেন। এতদিন যে অকুলীন মেয়ের মত পথের ধূলায় পরিত্যক্তা হয়ে আপন দেহ-ভার নিয়ে লজ্জা-মলিন হয়েছিল, আজ সেই পত্র-সাহিত্যই কৌলীন্যের জয়টিকা কপালে এঁটে সাহিত্যের রাজ-দরবারে অসংখ্য রাজপুত্রের মাঝখানে অকস্মাৎ স্বয়ম্বরার পসরা খুলে বসল। রবীন্দ্রনাথের হাতে লালিত-পালিত হয়ে বাংলার পত্র-সাহিত্য বিপুল সম্ভাবনায় বিকশিত হয়ে উঠেছে।১ সুদীর্ঘ গৌরবময় সাহিত্য-জীবনে ও বৈচিত্র্যময় কর্ম-জীবনে কবিকে নানাভাবে নানা জনের কাছে পত্র লিখতে হয়েছে। কখনো তাগিদে, কখনো লৌকিকতায়, কখনো খেয়ালে, কখনো খুশীতে, কখনো কারণে, কখনো অকারণে। কৈশোরের প্রথম কবিতা-উন্মেষের সূত্রপাত হতে শুরু করে আমরণ চলেছে এই চিঠি-লেখা-লিখি। ফলে সংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখতে পাব—বাংলার আর কোন কবি সাহিত্যিক এত বেশী সংখ্যক চিঠি লেখেননি। গুণের দিক দিয়েও

---

১ রবীন্দ্র-পত্র-সাহিত্যের মধ্যে ছিন্ন পত্র, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, পথে ও পথের প্রান্তে, জাপানে পারস্যে, জাভা যাত্রীর পত্র, রুশিয়ার চিঠি এবং সম্প্রতি 'দেশ' সাপ্তাহিকে ক্রম-প্রকাশিত শ্রীমতী নির্ঝরিণী কুমারী মহলানবিশকে লেখা পত্রাবলী প্রধান।

[প]ত্র-পত্র-সাহিত্য দর্পিত-শীর্ষ হিমালয়। সে শিখর স্পর্শ করার দুঃসাহস অন্য কোন কবি-সাহিত্যিকের নেই। প্রকৃতপক্ষে [রবী]ন্দ্র-প্রতিভা সেই জাতের—যা কেবল উন্নত-শীর্ষ হ'য়ে [মহি]মান্বালোকে নিজেকে প্রকাশ করে না—সঙ্গে সঙ্গে আড়াল করে অনেককে। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মত পত্র-সাহিত্যেও [এ]র ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবুও রবীন্দ্র পত্র-সাহিত্যের রাহু-গ্রাস-[বল]য়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে নজরুল ইস্‌লামের পত্রাবলী একটি [বি]শিষ্ট রূপ-মর্যাদায় বিকাশমান। নিম্নে আমরা নজরুল-পত্রগুচ্ছের বিশিষ্ট রূপবৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

দুই

৮ ১, পান বাগান লেন থেকে ২-১-২৯ তারিখে জনাব আবদুল [কাদি]রকে লিখিত একটি চিঠিতে কাজী সাহেব লিখেছেন: "রবিবাবু [চিঠি] পেয়েই তার উত্তর দিয়ে ভদ্রতা রক্ষা করেন, তিনি মস্ত বড় কবি। [আ]মি চিঠি পেয়ে তার উত্তর না দিয়েই আমার অভদ্রতার প্রিন্সিপল্‌ [রক্ষা] করি। আমি মুসাফির কবি। ভদ্রতা, সৌজন্য, স্নেহ, প্রীতির [ধা]র কোন দিনই করিনি। এই যা সান্ত্বনা। রবিবাবুকে চিঠি [দিয়ে] লোক ভাবে, উত্তর এল বলে। আমাকে চিঠি দিয়ে কারুর [উৎক]ণ্ঠায়ন্তির আশঙ্কা নেই; সে দিব্যি নিশ্চিন্ত থাকে, তার চিঠির [উত্ত]র কোন দিনই পাবে না।" এই উত্তর না দেওয়াটা চারণ কবির [উদা]সতা ছাড়া আর কি বলব, খেয়ালীর নির্মম খেয়াল ছাড়া আর [কি]ছুই নয়। এবং এ জন্যেই কাজী সাহেবের চিঠির সংখ্যা নিতান্ত [কম]—আজ পর্যন্ত মাত্র চুয়াল্লিশখানি চিঠি আমার হস্তগত হ'য়েছে। [কি]ন্তু, যা' পাইনি তার হিসাব মিলিয়ে লাভ নেই—যা' পেয়েছি, তার [জমা] খরচ টানা যাক্‌।

চিঠি-পত্রের বিচার-বিশ্লেষণের প্রথমেই একটি বিষয়ের উল্লেখ না [ক]রলে বোধহয় নজরুল-পত্র-সাহিত্যের প্রতি আমরা অবিচার করব। [পত্র] সাহিত্যের যে দু'টি বিশেষগুণের ওপর রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন, [সে দু]টি হ'ল 'ভাবহীন সহজের রস' এবং 'ব্যক্তিগত রস'। চিঠি [দু]টি হৃদয়ের মধ্যে যোগ-সেতু, দুটি মনের নিভৃত আলাপনের সুরে [বাঁধা]। একজন লিখবেন, লেখায় আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে দেবেন। [আর] একজন পড়বেন, পড়ে আনন্দ পাবেন। সুতরাং চিঠিতে যেন [অহে]তুক বাক্যজালের ছায়াপাত না ঘটে। কেননা লিপি-চাতুর্য [এবং] বাক্‌-বিন্যাসের আড়ালে ব্যক্তিগত রস ঢাকা পড়ে যায়। [অথচ] চিঠির সব থেকে বড় সম্পদ এই ব্যক্তিগত রস। [লেখ]ক-শিল্পীর এই ব্যক্তিগত রসটুকু পান করার জন্যেই পাঠকবর্গ [পত্র]-সাহিত্যের প্রতি আগ্রহশীল হ'য়ে ওঠেন। আর এই ব্যক্তিগত [রসই] পত্র-সাহিত্যের কেন্দ্রীয় শক্তি। নজরুল-পত্রগুচ্ছের মধ্যে [আর] যারই অভাব ঘটুক, এই ব্যক্তিগত রসের অনটন পড়েনি [কোথা]ও। প্রায় প্রতিটি চিঠির পাতায় পাতায় এই দিল খোলা [মানুষ]টি আপনার ব্যক্তিগত স্বরূপটিকে একান্তভাবে মেলে ধরেছেন। [আর] এখানেই রবীন্দ্র-পত্র-সাহিত্যের সাথে নজরুল-পত্রগুচ্ছের এক [বড়] ব্যবধান গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় পত্রাবলীতে [ব্য]ক্তিগত রসটি তথা ও তত্ত্বপ্রকাশের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। [চিঠির] সাথে লিরিক কবিতা বা প্রবন্ধ লেখেন' বলে কবিগুরুর নামে [দুর্না]ম রটেছে, তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। কোন

কোন চিঠিতে তিনি নিষ্ঠাবান সমালোচক, কোন কোন চিঠিতে তিনি নিষ্ঠাবান প্রাবন্ধিক, আবার কোন কোন চিঠিতে সৃষ্টিশীল কবি। সুতরাং সে সকল চিঠিতে যে ব্যক্তিগত রসটির বড় অভাব, তা' সহজেই অনুমেয়। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, নজরুলের চিঠি এই সব তথ্য ও তত্ত্বের ভারে পীড়িত নয়, সাহিত্যিক কলা-কৌশলে ভাষাও অযথা ঘোরাল নয়—কোথাও নজরুল-ব্যক্তিমানসটি ভাষা-শিল্পের ব্যবসায়িক রীতিতে ঢাকা পড়েনি। কৃষ্ণনগর থেকে ১-২-২৬ তারিখে শ্রীব্রজবিহারী বর্মণকে লেখা একটি ছোট্ট চিঠি এই:
"পরম স্নেহভাজনেষু,

স্নেহের ব্রজ! আজ সকাল ছ'টায় আমার একটি পুত্রসন্তান হ'য়েছে। তোমার বৌদি আপাততঃ ভাল আছে। আমিও আজ সকালে ফিরে এলাম যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর প্রভৃতি ঘুরে। টাকার বড্ড দরকার। যেমন করে পার পঁচিশটি টাকা আজই টেলিগ্রাফ মণি-অর্ডার করে পাঠাও। তুমি ত' সব অবস্থা জান। বলেও এসেছি তোমায়। কেবল সঞ্চিতার প্রুফ পেলাম, সর্বহারার শেষ প্রুফ কই? সর্বহারা কখন বেরুবে? যেদিন বেরুবে অন্ততঃ পঁচিশ কপি আমায় পাঠিয়ে দেবে। ভুলো না যেন। টাকা কর্জ করেও পাঠাও। স্নেহাশীষ নাও। পত্র দিও। ইতি—তোমার কাজীদা।"

এই চিঠির অন্তদিকের বিচার ছেড়ে দিয়ে আমরা এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এই চিঠিতে সমসাময়িক কাজীদার ব্যক্তিহৃদয় ও মানস-পুরুষ অভিনব বর্ণাঢ্যশিল্পনে সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে।

কবিগুরুর চিঠিতে ব্যক্তিগত রস-বিলুপ্তির আর একটি প্রধান কারণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি যে সকল চিঠি লিখতেন, সেগুলির প্রত্যেকটির মুদ্রিত হয়ে জনসমক্ষে প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা ছিল—হয়ত বিশ্বজোড়া কবি-খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাই এর মূল। আজ সন্ধ্যায় যে চিঠি তিনি লিখলেন, যা একমাত্র তাঁরই গোপন মনের বাসনা-কামনার রং-এ রঙীন—কাল সকালে তা' মুদ্রিত হ'য়ে কোটি চোখের দর্শনীয় হয়ে উঠেছে, গোপন রং-টুকু থাকেনি। এই মুদ্রণ-ভীতি তাঁর বহু চিঠির স্বাভাবিক আলাপনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাঁর বহু চিঠি কেবল মুদ্রণের জন্যই লিখিত। ফলে প্রায় চিঠিতে সজ্ঞান তথ্যের প্রকাশ ঘটেছে। গুছিয়ে না রাখা সাদা কথায় চিঠি লেখা তাঁর পক্ষে তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি। এবিষয়ে হাবিলদার কবির কথা একেবারেই স্বতন্ত্র। যে লোক নিজের কবিতা সম্পর্কে 'পরোয়া করি না বাঁচি বা না বাঁচি' বলে বাঁচার সজ্ঞান-প্রয়াস থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছেন, চিঠিতে যে তিনি সতর্ক আলাপন রেখে যাবেন না, সে-কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর সকল চিঠি তাই কেবল চিঠি, ব্যক্তি-মনের বর্ণছায়ায় মূর্তিমান। আমাদের বক্তব্যের ধারাটি স্পষ্ট করার জন্যে কয়েকটি চিঠির অংশবিশেষ তুলে দিলুম:
"প্রিয় শৈলজা!

কনফারেন্সের হিড়িকে মরবার অবসর নেই। কনফারেন্সের আর মাত্র এক মাস বাকী। হেমন্ত দা আর আমি সব করছি এ যজ্ঞের। কাজেই লেখাটা শেষ করতে পারিনি এত দিন। রেগো না লক্ষ্মীটি। আমি তোমাদের লেখা দিতে না পেরে বড় লজ্জিত আছি।…আমি

এবার কলকাতায় গিয়েছিলুম—আল্লা আর ভগবানের মারামারির দরুণ তোমার কাছে যেতে পারিনি।…আজ ডাকের সময় যায়।… মুরলীদা ও প্রেমেনকে ভালবাসা দিও।"… ২

ছোট চিঠি—কিন্তু কি গভীর অন্তরাবেগে কম্পমান। সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিয়ে তিনি লিখছেন—'রেগো না লক্ষ্মীটি', বিদ্রোহী কবির এই প্রাণ-ঢালা সুর রীতিমত উপভোগ্য—এখানে ব্যক্তিপুরুষের স্বরূপটি সহজবোধ্য এবং সুন্দর। হিন্দু-মুসলিম মিলনের পক্ষপাতী কবি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ঘৃণার চোখে দেখেন। সেই ঘৃণা 'আল্লা আর ভগবানের মারামারির' ভিতর দিয়ে যেন উপচে পড়েছে। শ্রীমুরলীধর বসুকে লেখা আর একটি চিঠিতে কবির অন্তঃপুরুষটি অক্ষরের আলিম্পনে অনবদ্য রূপ পেয়েছে। নজরুল-কাব্যের সুর ও সাধনা, বীণা ও বাণীর সমগ্র স্বরূপটি মাত্র কয়েকটি ছত্রে বর্ণদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। চিঠিটি এই :

"প্রিয় মুরলীদা !

আজ তোমার চিঠি পেয়ে জ্বর-জ্বর মনটা বেশ একটু ঝরঝরে হ'য়ে উঠল। দু'টো কথাতেই তোমার যে প্রীতি উপচে পড়েছে, তা' আমার হৃদয়দেশ পর্যন্ত গড়িয়ে এসেছে। দিন দুয়েক থেকে ১০৩, ৪, ৫ ডিগ্রি করে জ্বরে ভুগে আজ একটু জ-জ্বর হয়ে বসেছি। পঞ্চাশ গ্রেন কুই ইন মস্তিষ্কে উনপঞ্চাশ বায়ুর ভীড় জমিয়েছে। আমার একটা মাথাই এখন হয়ে উঠেছে দশমুণ্ডু রাবণের মত ভারী, হাত দু'টো নিসপিস্ করছে—সেই সঙ্গে যদি বিশটা হাত হ'য়ে উঠত! তা' হ'লে আগে দেবতাগুলির নিকুচি করে আমাদের ভাঙাঘরে সত্যিকারের চাঁদের-আলো আসে কি না দেখিয়ে দিতাম। মুস'কল হয়েছে মুরলীদা, আমরা কুম্ভকর্ণ হ'তে পারি, বিভীষণ হ'তে পারি—হ'তে পারিনে শুধু রাবণ। দেবতা হবার লোভ আমার কোন দিনই নেই—আমি হ'তে চাই তাজা রক্ত-মাংসের শক্ত হাড্ডি-ওয়ালা দানব—অসুর ! দেখেছ কুইনাইনের গুণ।"… ৩

এই চিঠির মস্তবড় গুণ এই যে, কবি এখানে হাস্যোচ্ছল পরিবেশের মধ্য দিয়ে অনেক গুরু-গম্ভীর কথা বলেছেন—তাঁর বিদ্রোহী স্বভাবের মূল সুর এখানে ধ্বনিত। ব্যক্তিগত রস উপচে পড়েছে, কবির ব্যক্তিস্বরূপও ঢাকা পড়েনি অথচ স্ফটিক-স্বচ্ছ প্রাণোদ্বেল হাস্যরসের ধারায় সমগ্র চিঠিটি অভিসিঞ্চিত।

শ্রীমুরলীধর বসুকে লেখা আর একটি চিঠিতে সমসাময়িক ও নজরুল ও শৈলজানন্দ বন্ধুদ্বয়ের স্বরূপটি সুন্দর হয়ে ফুটেছে। ছোট্ট চিঠিতে যে কত বেশী ভাব প্রকাশ করা যায়, এটি তারই উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে :

"মুরলী দা !

এই মাত্র তোমার চিঠি পেলাম।…এখন সন্ধ্যা। আজ সকালে শৈলজার চিঠি পেয়েছি। চিঠি ত নয়, বুক চাপা কান্না। দুই বাল্য বন্ধু যৌবনের মাঝ দরিয়ায় এসে পরস্পরের ভরা ডুবি দেখছি। কারুর কিছু করবার শক্তি নেই। যত ভাঙা তরীর ভীড় এক জায়গায়।…

আমার সম্বন্ধে আমার চেয়ে তুমি বেশী চিন্তিত, কাজেই আমার কোন চিন্তা নেই, যা করবার তুমি ক'রো।

বসে শুয়ে লিখবার কসরৎ করি, আর ভাবি, কূল-কিনারা নেই সে ভাবার।…আমার জ্বর আসে কিস্তিবন্দী হারে। দ্বিতীয় কিস্তির সময় কখন আসে—কে জানে। আজ 'কালিকলম' পেলুম। এত ভাল কাগজ বলেই এর অবস্থা এত মন্দ।…নজরুল।" ৪

পূর্বেই বলেছি চিঠিপত্র দিয়ে আমরা কবি-সাহিত্যিকের ব্যক্তি-স্বরূপটি চিনে নিতে চেষ্টা করি এবং পত্র-সাহিত্যের সব থেকে বড় উপকারও সেখানে। কিন্তু চিঠিপত্র প্রকাশের একটা মস্তবড় বিপদও এখানে সসংকোচে আত্মগোপন করে আছে। চিঠিতে ভালমন্দ নির্বিশেষে কবি-শিল্পীর সমগ্র স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। কবির সৃষ্টির সাথে পরিচিত হ'য়ে, তার কাব্য-উপন্যাস পড়ে, তাঁর সম্পর্কে আমরা তাঁর যে মহান নিষ্কলুষ পবিত্র মূর্ত্তি আপন মানস-পটে অঙ্কিত করে নিই, চিঠিপত্রের মধ্যে বহু সময় এমত অজ্ঞাত ও অপ্রীতিকর ঘটনা প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে যা' সেই স্বর্ণ-প্রতিমাকে ভূ-লুণ্ঠিত করে কবির উদার জীবন-মহিমাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। বুঝি এই জন্যে ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণীকে লেখা কবিগুরুর পত্রাবলী হ'তে ব্যক্তিগত অংশ 'ছিন্ন' করে ছিন্নপত্র সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং 'ছিন্নপত্র' চিঠি না হ'য়ে পরিপূর্ণ নিখাদ নিটোল সাহিত্য হ'য়ে উঠেছে। তাই মানুষ-রবীন্দ্রনাথকে সেখানে পাওয়া যায়নি। অবশ্য জন্ম শতবার্ষিকীতে কবিকে নিয়ে যে ব্যাপক অনুষ্ঠান ও শ্রদ্ধা নিবেদন পর্ব অনুষ্ঠিত হ'য়েছে তার কোথাও রবীন্দ্রনাথকে মানুষ হিসেবে দেখার চেষ্টা হ'য়েছে বলে মনে পড়ে না। সর্বত্র ধূপ-ধূনা জ্বালিয়ে মানুষ রবীন্দ্রনাথকে দেবতার আসনে বসিয়ে অর্চনা করা হয়েছে। তাই আজ পর্যন্ত এদেশে সত্যিকারের একখানিও রবীন্দ্রজীবনী লেখা হল না। এ প্রসংগে বিশিষ্ট সমালোচক আবুল ফজলের একটি মন্তব্যের উদ্ধৃতি লোভ সংবরণ করা গেলনা। তিনি লিখেছেন—"প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বিপুল পরিশ্রম করে যে বিরাট রবীন্দ্রজীবনী খাড় করিয়েছেন, তা' আর যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের বায়োগ্রাফী যে হয়নি, এ বিষয়ে বোধ করি রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে দ্বিমত নেই। এই বিরাট গ্রন্থে আমরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে, চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথকে, শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে, এমনকি, সমাজনেতা রবীন্দ্রনাথকেও খুঁজে পাই। কিন্তু পাইনা মানুষ রবীন্দ্রনাথকে, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে, পাপে-পুণ্যে-দোষে-গুণে রক্তমাংসের আটপৌরে রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ শুধু পোষাকী ছিলেন, একথা মনে করা, আর তাঁকে মানুষের সীমানা থেকে বের করে দেওয়া—এক কথাই। শৈশব থেকে আমৃত্যু তিনি শুধু গুরুদেবের আলখাল্লা পরেই কাটিয়েছেন, একথা মনে করলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিছুমাত্র সুবিচার করা হয়না।" যাক ও কথা।

নজরুলের যে-কটি চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে, তাতে নজরুল সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়েছে। বিশেষ করে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা চিঠি চারখানি এদিক দিয়ে সবিশেষ মূল্যবান। ব্যক্তি নজরুলকে জানার জন্যে এ তিনখানি চিঠি

২। এটি কৃষ্ণনগর থেকে ১০-৪-১৯২৬ তারিখে 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদক কবি-বন্ধু শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত।

৩। ১৯২৫ সালে ২৫শে নভেম্বর তারিখে হুগলী থেকে শ্রীমুরলীধর বসুকে লিখিত।

৪। কৃষ্ণনগর থেকে ২-১-২৭ তারিখে মুরলীধর বসুকে লিখিত।

অপরিহার্য্য। "নজরুল-জীবনীর উপকরণ" প্রবন্ধে অধ্যাপক আবুল ফজল লিখেছেন, "বাংলাসাহিত্যে মধুসূদনের পর একমাত্র নজরুলজীবনই বায়োগ্রাফীর উপযুক্ত, আদর্শ ও লোভনীয় বিষয়। অমন একটা সবল বহুবিচিত্র বর্ণাঢ্য জীবনের কোন তুলনা নেই আমাদের দেশে। বায়রণ এবং শেলী যেন এক মোহানায় এসে মিশেছে নজরুলে। ···মানুষ নজরুল আমাদের চোখের সামনে থেকেও একরকম অপরিচিতই রয়ে গেছেন।···তিনি জিতেন্দ্রিয় ছিলেন না, বরং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দাস ছিলেন বলতে পারি। ভালবেসেছেন প্রাণ ঢেলে, ভালবাসা পেয়েছেনও অপর্যাপ্ত, প্রেমে না পড়েও প্রেম করেছেন। প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, প্রত্যাখ্যানও করেছেন, বিরহের অনলে নিজে পুড়েছেন, অন্যকেও পুড়িয়েছেন। এমন কি, তাঁর জন্য আত্মহত্যাও করেছেন নারী।" প্রকৃত পক্ষে—এই তো রক্ত-মাংসের—নজরুল। কিছু সংখ্যক বুদ্ধি-দীপ্ত মনন সর্বস্ব বন্ধুদের সংগে আলোচনা করে—দেখেছি, নজরুল-চরিত্রের কিছু ঘনিষ্ঠ তথ্যের প্রকাশ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে কেমন যেন একটা 'চুপ চুপ' ভাব রয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, এর কোন সংগত কারণ আমি খুঁজে পাইনি। রুশোর মত মনীষী, শেক্সপীয়রের মত মহামানব চরিত্রের যে সকল গোপনীয় তথ্য জনসমাজে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, তাতে করে তাঁরা যে আমাদের কাছে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হয়ে পড়েছেন, এমন কথা বিশ্বাস করতে মন কিছুতেই সায় দেয় না। বরং আমার তো মনে হয়, প্রাণোচ্ছল তাজা সজীব জীবনের সন্ধান পেয়ে আমরা তাতে খুশীই হয়েছি।

অধ্যাপক মোতাহার হোসেনকে লিখিত চিঠিগুলিতে আমরা এক অনন্ত বিরহীর চিত্র পাই। এই বিরহী হতাশপ্রেমিক স্বয়ং কবি নিজেই। চিঠি ক'খানিতে ভদ্রমহিলার নামোল্লেখ নেই। তা না থাকলেও এটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তিনি নিতান্ত সাধারণ মহিলা নন। কাজী কবির মত একটা বিপুল প্রাণকে নাড়াবার মত, তীব্রতর আকর্ষণে হৃদয়-বেলাকে উদ্বেল করার মত যথেষ্ট শক্তি তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি কবির কাছে ধরা দেননি। 'প্রেমে না পড়েও প্রেম করার' অনিবার্য ফলস্বরূপ কবির বুকে বেজেছে ব্যর্থ প্রেমিকের চির অতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাস। জীবনমূলে যে ক্ষত আর ব্যথার সৃষ্টি হয়েছে, তার অনবদ্য প্রকাশ দেখি একটি চিঠির প্রথমেই :

"বন্ধু,

আজ সকালে এসে পৌঁচেছি। বড়ডো বুকে ব্যথা। ভয় নেই, সেরে যাবে এ ব্যথা। তবে ক্ষতমুখ সারবে কিনা ভবিতব্যই জানে। ক্ষতমুখের রক্ত মুখ দিয়ে উঠবে কিনা জানি না। কিন্তু আমার সুরে, আমার গানে, আমার কাব্যে সে রক্তের যে বন্যা ছুটবে তা' কোনদিনই শুকোবে না।" ৫

এই প্রেমে পড়ার ব্যাপারটি নজরুল-জীবনীকারদের উপকারে তো আসবেই—সব থেকে বেশী উপকৃত হয়েছে বাংলা কাব্যসংগীত—আর পত্রসাহিত্য। এই ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করে লেখা চিঠি চারখানি নজরুল-পত্রসাহিত্যের মধ্যমণি। চিঠি তো নয়, যেন চারটি শিশিরসিক্ত নিটোল মুক্তা। চিঠিগুলির হৃদয়াকাশ সায়াহ্ন-কোমল গোধূলির রোমাঞ্চ রংয়ে রঙীন। এক নতুন ফরহাদ জন্ম নিয়েছেন এই চিঠিগুলির পৃষ্ঠায়। রূপপাগল মজনু খুঁজে ফিরেছেন তাঁর জীবনের লাইলীকে। এই অপরিচিতা 'লাইলী' যে কবির সৃষ্টিতে অলক্ষ্যে থেকে বিপুল বেগ সঞ্চার করেছে, তা' বলাই বাহুল্য—ফ্যানি ব্রাউন যেমন করেছে কীট্সের সৃষ্টিতে। কবির লেখা চিঠিতে তারও স্বীকৃতি মেলে।

"আচ্ছা, আমরা রক্তে রক্তে শেলীকে, কীট্সকে এত করে অনুভব করছি কেন? বলতে পার? কীট্সের প্রিয়া ফ্যানিকে লেখা তাঁর কবিতা পড়ে মনে হচ্ছে যেন এ কবিতা আমিই লিখে গেছি। কীট্সের লোরখে টি হয়েছিল—আর তাতেই মরল শেষে—অবশ্য তার সোর্স হার্ট কিনা কে বলবে। কণ্ঠ-প্রদাহ রোগে আমিও ভুগছি ঢাকা থেকে আসা অবধি, রক্তও উঠছে মাঝে মাঝে—আর মনে হচ্ছে আমিই যেন কীট্স। সে কোন্ ফ্যানির নিষ্করুণ নির্মমতায় হয়ত বা আমারও বুকের চাপধরা রক্ত তেমনি করে কোন্দিন শেষ ঝলক উঠে আমায় বিয়ের রঙের মত করে রাঙিয়ে দিয়ে যাবে।" ৬

পৃথিবীর সকল দেশের সকল শ্রেষ্ঠ কবির জীবনেতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, তাঁদের কাব্যসৃষ্টির মূলে বেগ সঞ্চার করেছে এমনি এক মানসী প্রতিমা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের এ প্রেম ব্যর্থতায় পর্যবসিত। বৌঠান যে কবিগুরুর কাব্য-প্রেরণার উৎস, একথা আজ সর্ববাদিসম্মত সত্য। কাজী কবির জীবনেও কাব্যসৃষ্টিতে যে এই প্রেম স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছায়া ফেলেছে, তা বলাই বাহুল্য। নজরুল-জীবনীকার ও সাহিত্য-সমালোচকদের বড় কাজ হবে এই অন্তঃস্রোতা প্রেমের ফল্গুধারা হ'তে অমৃত নিয়ে কবি যে সকল কাব্য ও গীতাঞ্জলিকে অমর করেছেন, সেগুলি পৃথক করা। একাজ সম্ভবপর হলে নজরুল-সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে হয়ত অনেক ভুল ধারণার নিরসন ঘটবে এবং কবির চিত্ত-বিকাশ ধারাটি অনুধাবন করা সহজতর হবে।

এই প্রেমের ব্যাপারটি যে প্রেমবিলাস নয়—চিঠিগুলির বহু স্থানে তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। বুকের রক্ত আর চোখের জল এ-প্রেমে এক হয়ে মিশেছে। বিরহের সুর-গুঞ্জন কাকলীমুখর হয়ে উঠেছে এই কয় লাইনে : "খবর দিও—সব খবর। বুকের ব্যথা হয়ত তাতে কমবে। এখন কি ইচ্ছে করছে জান? চুপ করে শুয়ে থাকতে, সমস্ত লোকের সংস্রব ত্যাগ ক'রে পদ্মার তীরে একটি একা কুটীরে। হাসি-গান-আহার-নিদ্রা সব বিস্বাদ ঠেকছে।"

অন্যত্র : "তোমরা কেমন আছ জানিয়ো। তার কিছু খবর দাও না কেন? না সেটুকুও নিষেধ করেছে? সময় মত ওষুধ খায় তো?" ৭

"সময় মত ওষুধ খায় তো?"—ছোট্ট একটি জিজ্ঞাসা, অথচ কী গভীর মর্মবেদনার হাহাকারে ভরা। অতলান্ত বিরহের সঘন দীর্ঘশ্বাস এখানে মর্মরিত হয়ে উঠেছে। এই একটি মাত্র লাইনে কবির কাতর প্রাণ বিরহের উচ্চগ্রাম স্পর্শ করেছে। [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

—আব্দুল আজীজ আল্-আমান।

৫ ২৫-২-২৮ তারিখে কৃষ্ণনগর থেকে কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত।

৬ ১৫, জেলিয়াটোলা স্ট্রীট হতে ৮-৩-২৮ তারিখে কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত।

৭। অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত।

বিচিত্র যাদু-কথা

অজিতকৃষ্ণ বসু

এই শতাব্দীর তখন সবে শুরু। অতলান্তিক মহাসাগরের দুদিকে দুই মহাদেশ—ইউরোপ আর আমেরিকা—যাদু-জগতের মহা বিস্ময় হ্যারি হুডিনি-র (Harry Houdini) যশোগানে মুখরিত, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে মন্ত্রমুগ্ধ। হাতকড়া, মুখ বন্ধ থলে, দড়ি দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা তালাবন্ধ বাক্স, সিন্দুক, জেলখানার কয়েদ-ঘর, কয়েদী গাড়ী—কোনো কিছুই অলৌকিক যাদুশক্তিধর হুডিনিকে বন্দী করে রাখতে পারে না, তিনি তা থেকে 'পলায়ন' করে বেরিয়ে আসেন। কি করে যে আসেন, বুদ্ধি দিয়ে তার ব্যাখ্যা মেলে না। নানারকম জল্পনা-কল্পনা আর গবেষণা চলে। ঐশী, দানবিক বা ভৌতিক শক্তি আরোপ করা হয়। কেউ কেউ এমন পর্যন্ত ভাবেন, হুডিনির দেহের অণু-পরমাণুগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা আলাদা ভাবে বেরিয়ে তারপর বাইরে এসে আবার আগেকার মতো একত্রিত হয়ে আস্ত হুডিনির রূপ ফিরে পায়। গাঁজাখুরি, অবিশ্বাস্য ব্যাখ্যা, কিন্তু অবিশ্বাস্য অলৌকিক কাণ্ড-কারখানার ব্যাখ্যাও অবিশ্বাস্য হলে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে!

ঠিক এমনি সময় ইংলণ্ডের যাদুজগতে একজন তরুণ যাদুকর বেশ একটু সাড়া জাগালেন অনেকটা হুডিনির মতো ভঙ্গিতে লণ্ডনের রঙ্গালয়ে পলায়নী যাদুর খেলা দেখিয়ে। যাদুজগতে তাঁর পেশাদারী নাম ছিল "হ্যান্‌কো" (Hanco)।

যাদুকর হ্যান্‌কো মঞ্চে আবির্ভূত হতেন জেলখানার কয়েদীর পোষাক পরে। দর্শকদের বলতেন, "এককালে আমি জেলখানার কয়েদী ছিলাম। জেলে থাকতে নানাভাবে মাথা খাটাতাম কি করে সবার চোখে ধুলো দিয়ে বন্দিদশা থেকে পালানো যায়। তাই থেকেই পলায়নের কতকগুলো অদ্ভুত কৌশল আমি আবিষ্কার করেছি। জেলখানায় খুব ভদ্র কয়েদী ছিলাম; আমার ভালো স্বভাবের জন্য পুরস্কারস্বরূপ শাস্তির মেয়াদ পুরো হবার আগেই আমাকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমি ঠিক করেছি অপরাধের পথে না গিয়ে এখন থেকে সৎপথে থেকে সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জন করব। তাই এ ভাবে পলায়নী যাদুর খেলা দেখিয়ে আপনাদের মনোরঞ্জন করছি।"

আগাগোড়া ধাপ্পা। কিন্তু হ্যানকো ঐ কথাগুলো এমনভাবে বলতেন যে, বেশির ভাগ দর্শকই বিশ্বাস করতেন। হ্যানকোর প্রতি স্বভাবতই তাঁদের সহানুভূতি জাগত। তাছাড়া পলায়নী খেলাগুলিও হ্যান্‌কো খুবই চমৎকার দেখাতেন। আর সবার ওপরে হ্যানকোর এই সব খেলার তাঁর সহকারিণী মেয়েটি ছিল দেহসৌষ্ঠবে, চেহারায়, ভাবভঙ্গিতে সুন্দরী, মোহময়ী। এই সুগঠিতা সুন্দরীর আকর্ষণ ছিল যাদুকর হ্যান্‌কো'র যাদু-প্রদর্শনীর একটা বড় আকর্ষণ। সুতরাং হ্যানকো যে রঙ্গজগতের বাজার প্রায় মাৎ করে এনেছিলেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তিনি এভাবে এগিয়ে যেতে থাকলে পৃথিবীর যাদুর ইতিহাসে হয় তো বা হুডিনির যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে হ্যানকোও বেঁচে থাকতে পারতেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। সুতরাং ট্র্যাজেডি এলো যাদুকর হ্যান্‌কোর জীবনে। তাঁর জীবন হলো যাকে বলা যায় বিয়োগান্ত নাটক।

হ্যানকোর বেদনা-করুণ কাহিনী শুনিয়ে গেছেন স্বর্গীয় উইল গোল্ডষ্টন (Will Goldston)। তিনি ছিলেন ইংলণ্ডের যাদু-জগতের একজন বড় পাণ্ডা, বহু বিখ্যাত যাদুকরের যাদু-প্রদর্শনের নানারকম দরকারী জিনিষপত্র, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তিনি তৈরি করে দিতেন।

একদিন হঠাৎ উইল গোল্ডষ্টনের কাছে এসে হাজির যাদুকর হ্যানকো। বললেন "যাদু প্রদর্শন আমি ছেড়ে দিচ্ছি, মিঃ গোল্ডষ্টন।"

আশ্চর্য! বলে কি লোকটা! অসামান্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যার খেলা, চারদিকে জয়জয়কার শুরু হবার যার দেরি নেই, সে কিনা এখন এমন তৈরি ক্ষেত্র ফেলে চলে যেতে চায়! মাথাটা কি একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে?

গোল্ডষ্টন বললেন "সে কি? আপনার ভবিষ্যৎ যে অসামান্য উজ্জ্বল আর নিশ্চিত।"

ম্লান হাসি হেসে হ্যানকো বললেন, "ভুল, ভুল, মিঃ গোল্ডষ্টন। আপনি জানেন না, আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আমি চললাম।"

"কোথায় চললেন আপনি?" শুধালেন ধাঁধাগ্রস্ত গোল্ডষ্টন।

"সে খবর যথাসময়ে খবরের কাগজেই পাবেন।" বললেন হ্যানকো। "তার আগে একটা অনুরোধ আছে। আমার পিপের খেলার গুপ্ত কৌশলটা আপনি কিনবেন? আড়াই পাউণ্ডেই আমি ছেড়ে দেবো।"

পিপের খেলা, অর্থাৎ বন্ধ পিপের ভেতর থেকে আশ্চর্য উপায়ে বেরিয়ে আসার খেলাটাই ছিল হ্যানকোর তালিকায় সেরা খেলা। খেলার কৌশলটা কিনেই নিলেন গোল্ডষ্টন। তারপর বললেন "কিন্তু কোথায় যাচ্ছেন সে কথাটা একটু বলে যাবেন না?"

"ঐ যে বললাম। সে খবরটা খবরের কাগজেই পাবেন যথা-সময়ে।"

খবরের কাগজে যথাসময়ে পাওয়া গেল যাদুকর হ্যানকো'র আত্মহত্যার খবর! তিনি তাঁর লিভারপুলের বাসায় নিজের বুকে ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যা করেছেন!! কিন্তু কেন আত্মহত্যা করে তিনি অকাল-মৃত্যু বরণ করলেন? সে রহস্য ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হয়ে আসল কথাটা জানা গেল।

তরুণ যাদুকর হ্যানকো তাঁর সুন্দরী তরুণী সহকারিণীর রূপে-যৌবনে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে আকণ্ঠ ডুবেছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে প্রবল সন্দেহ, মেয়েটি তাঁকে তাঁর প্রেমের প্রতিদান দেয়নি, মেয়েটি অবিশ্বাসিনী, মেয়েটির হৃদয়ে অন্য তরুণেরও ঠাঁই আছে। সন্দেহে, ঈর্ষায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন কাঁচা বয়সের খেয়ালী যাদুকর হ্যানকো। তরুণী সুন্দরী যাদু-সহকারিণীর প্রেমে উন্মাদ যাদুকর হ্যানকো'র অবস্থা হয়েছিল অনেকটা কুমারী ফ্যানী ব্রণের (Fanny Braune) প্রেমে মুগ্ধ তরুণ ইংরেজ কবি কীট্‌স্‌-এর (Keats) মতো।

হ্যান্‌কোকে বোঝাবার আর সান্ত্বনা দেবার অনেক চেষ্টা করল মেয়েটি। কিন্তু বৃথা। বুঝলেন না হ্যান্‌কো, পেলেন না সান্ত্বনা। বললেন, "তোমাকে এমন শিক্ষা দিয়ে যাবো, যা তুমি জীবনে ভুলবে না।" বলে টেবিলের ওপর থেকে বড় একখানা মাংস-কাটা ছুরি তুলে নিয়ে নিজের বুকের বাঁ ধারে আমূল বসিয়ে দিলেন। তাইতেই তাঁর মৃত্যু হলো। পলায়নী যাদুর ওস্তাদ যাদুকর চিরতরে পলায়ন করলেন ইহজগৎ থেকে। কে জানে, ওভাবে তাঁর অকাল-মৃত্যু না ঘটলে হয়তো সেরা যাদুকরদের অন্যতমরূপে যাদুর ইতিহাসে তিনি আজও বেঁচে থাকতেন। বিধাতার বিধানে সেটা হতে পারল না, কিন্তু পাকা গল্প-লিখিয়ের হাতে পড়লে একটি চমৎকার ছোট গল্পের নায়ক হওয়া স্বর্গীয় যাদুকর হ্যান্‌কোর পক্ষে শক্ত হবে বলে মনে হয় না।

* * *

পলায়নী যাদুর (Escapes) প্রসঙ্গে মনে পড়ছে বাংলার বিখ্যাত যাদুকর স্বর্গীয় গণপতি চক্রবর্তীর কথা। তাঁর জীবনে একটি ছোট্ট কাহিনী শুনেছিলাম। এ শতাব্দীরই প্রথম দিকের কথা। গণপতি তখন বিখ্যাত "বোসের সার্কাস"-এ যাদুর খেলা দেখাচ্ছেন। তাঁর তিনটি পলায়নী খেলা বিখ্যাত, এবং অসামান্য জনপ্রিয়,—ইলিউশন বক্স, ইলিউশন ট্রী এবং "কংস কারাগার"। প্রথম খেলায় গণপতি বন্ধ বাক্সের ভেতর থেকে যথেচ্ছ বেরিয়ে আসতেন। দ্বিতীয় খেলায় তাঁকে খাড়া একটি কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে আটকে দেওয়া হতো, তা থেকে তিনি চোখের নিমেষে মুক্ত হয়ে আবার তেমনি তাড়াতাড়ি সেই বন্দিদশায় ফিরে যেতেন। তিন নম্বর খেলাটাই ছিল সব চেয়ে বেশি নাটকীয়; কবিত্বপূর্ণও বলা যায়। খেলার নামটি শুনেই কৃষ্ণভক্তদের মনে পড়ে যেতো নবজাত কৃষ্ণকে নিয়ে কৃষ্ণ-জনক বাসুদেব কংসের কারাগার থেকে পলায়ন করেছিলেন; সেই পৌরাণিক পলায়ন-কাহিনী।

বোসের সার্কাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ—কখনো কখনো হয় তো শ্রেষ্ঠতম—আকর্ষণ ছিল যাদুকর গণপতির এই নাটকীয় উত্তেজনাপূর্ণ "কংস কারাগার" খেলা। বোসের সার্কাসের বিজ্ঞাপনে বিশেষ আকর্ষণরূপে এই খেলাটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হতো।

কারাগার থেকে পলায়নের খেলায় যে দর্শকবৃন্দ অভিভূত হতো তার কারণ আমাদের প্রত্যেকেরই মনে একটা পলায়নী মনোভাব, কল্পনা, বা কামনা সুপ্ত রয়েছে। অবচেতন মনে আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করি আমরা যেন বন্দী নানা নিয়মের কারাগারে—প্রাকৃতিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি। আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে রয়েছে নানাবিধ বাধাবন্ধন, সেই বাধাবন্ধনের কারাগার থেকে প্রতিমুহূর্তে মুক্তি চাইছে আমাদের অন্তরাত্মা। মুক্তি চাইছে, কিন্তু মুক্তির উপায় দেখতে পাচ্ছে না।

তাই কারাগারের অসহায় বন্দী-অবস্থা থেকে যখন যাদুকর গণপতি অবিশ্বাস্যভাবে 'পলায়ন' করে, মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতেন, তখন প্রত্যেক দর্শক অবচেতন মনে তাঁর সঙ্গে অভিন্ন একাত্মতা অনুভব করে মুক্তির আনন্দে কিছুক্ষণের জন্যেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। কথাটা "দার্শনিক তত্ত্বকথা"র মতো শোনালেও অতিশয় বাস্তব, 'প্র্যাকটিক্যাল' কথা।

তা যাই হোক, একটি লোক একবার নিরিবিলিতে এসে দেখা করল যাদুকর গণপতির কাছে।

"কি চাই?"

"আজ্ঞে, শ্রীচরণে একটা নিবেদন আছে।"

"বলে ফেল।"

"আজ্ঞে, ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব?"

"নির্ভয়েই বলো।"

"অধমকে কৃপা করে একটা বিদ্যে শিখিয়ে দিতে হবে।"

"কি বিদ্যে?"

"আজ্ঞে, ঐ আপনার কারাগার থেকে পালিয়ে বেরোনোর কৌশলটা।"

গণপতি বললেন, "সে কি হে? তুমি কি আমার অন্ন মারতে চাও নাকি?"

"আজ্ঞে না, সে কি কথা? খেলা দেখাবার জন্যে নয়। তবে কিনা, কৌশলটা জানা থাকলে আমার একটু সুবিধে হয়।"

ক্রমে পরিষ্কার হলো—লোকটিকে মাঝে মাঝে সরকার বাহাদুরের কারাগারে অতিথি হতে হয়। সেই সময়ে এ কৌশলটা জানা থাকা বিশেষ সুবিধাজনক, সেইজন্যই অশেষ আশা নিয়ে যাদুকরের শ্রীচরণে নিবেদন জানাতে এসেছে।

গণপতি বললেন, "বাপু হে, এ বিদ্যে শেখার অনেক ঝঞ্ঝাট, অনেক সাধনার দরকার। তুমি বরং এমন কর্ম আর কখনো কোরো না, যাতে কারাগারে যেতে হয়।"

লোকটি এর পর কারাগারে যাবার রাস্তা ছেড়ে দিয়েছিল কিনা জানি না, কারণ গল্পটি স্বয়ং গণপতির মুখে শুনিনি।

* * * *

সম্প্রতি একদিন কলকাতার একটি ছোট রাস্তা দিয়ে চলছিলাম—দেশপ্রিয় পার্কের অনতিদূরে। চলেছিলাম কি একটা কাজের কথা ভাবতে ভাবতে; দেখলাম, ফুটপাথের ওপর ভিড় জমেছে এক জায়গায়। কৌতূহল হলো। ভিড়ের ভেতরে না ঢুকে ভিড়ের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় ভিড়ের অন্য সকলের মাথা আমার চাইতে নিচু হওয়ায় সহজেই দেখতে পেলাম ভিড় জমেছে খানিকটা ফাঁকা জায়গা ঘিরে। সেই ফাঁকা জায়গার মাঝামাঝি এক বছর আটেকের ছোট ছেলে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, আর ফাঁকা জায়গার এক ধারে ভিড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে

এক ছোকরা মাদারি, অর্থাৎ পথে পথে ভ্রাম্যমান যাদুকর। ছোকরা যাদুকরের বয়স মনে হলো আঠারো কি উনিশ, বড় জোর কুড়ি। তার পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা কাপড়ের থলি—মাদারিদের যেমন থাকে—, যাদুর খেলার কিছু বিচিত্র সরঞ্জাম, সমাগত দর্শকবৃন্দের কাছ থেকে দর্শনী সংগ্রহ করবার জন্য একটি থালা এবং একটি ডুগডুগি। শেষোক্তটি বাজিয়ে ভিড় জমাতে সুবিধে হয়; এটি হচ্ছে মাদারিদের ভিড় জমানো যন্ত্র। ভিড় জমে গেলেও কখনো কখনো ডুগডুগি বাজানো হয়ে থাকে রহস্য-উত্তেজনা বাড়াবার জন্য।

আমি যখন গেলাম, তার আগেই বিভিন্ন জিনিষ নিয়ে কিছু কিছু খেলা দেখিয়ে ফেলেছে ছোকরা যাদুকর। এবার শুরু হলো নতুন খেলা. এ খেলা হাত সাফাই-এর খেলা বা কোনো রকম যান্ত্রিক কৌশলের খেলা নয়।

খেলার আসরের মাঝখানে চিৎ-শয়ান বালকটির চোখের ওপর পুরু কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো, কিছু যেন সে দেখতে না পায়। ছোকরা যাদুকর তারপর বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে একটির পর একটি বিভিন্ন রকমের জিনিষ নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল, আর চোখ ঢাকা ঐ বাচ্চা ছেলেটা চোখে কিছু না দেখেই প্রত্যেকটি জিনিষ নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে যেতে লাগল। শুধু ভেতরে দাঁড়িয়েই নয়, ভিড়ের বাইরে এসেও ছোকরা যাদুকর কয়েকজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে ফাউন্টেন পেন, নোট বই, রুমাল, পেন্সিল ইত্যাদি নিয়ে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করতেই ভিড়ের আড়ালে শয়ান ছেলেটি প্রত্যেকটি জিনিষের এবং তার মালিকের চমৎকার বর্ণনা দিয়ে যেতে লাগল। তরুণ যাদুকরের প্রশ্ন এবং তার ঐ বাচ্চা সহকারীর জবাব অনেকটা এই ধরণের :—

"এটা কি ?"

"লিখবার জিনিষ।"

"কি জিনিষ ?"

"ফাউন্টেন পেন।

"কি রং ?"

"লাল।"

"এই বাবু কি রকম ?"

"এ বাবু বহুৎ বঢ়িয়া। ছোটখাট, ফরসা।"

"আর ?"

"চোখে চশমা।"

"বাবু কি পোষাক পরে আছেন ?"

"ধুতি। পাঞ্জাবী। পায়ে স্যাণ্ডেল।"

"এ বাবুর পকেট থেকে কি নিলাম ?"

"নোট বই। নীল মলাটের নোট বই।"

প্রশ্নোত্তরগুলি অবশ্য হিন্দীভাষায় হয়েছিল; আমি বাংলায় তর্জমা করে দিয়েছি। খেলাটি দেখে উৎসাহিত হয়ে আমি বেশ কিছুক্ষণ রয়ে গেলাম সেখানে। বাচ্চা ছেলেটির প্রতিটি জবাব নির্ভুল। সে যে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে প্রশ্ন শোনামাত্রই অমন নির্ভুল জবাব দিচ্ছিল কোন্ যাদুমন্ত্রবলে ?

ব্যাপারটা বিস্ময় উৎপাদন করারই মতো, কিন্তু তেমন বিস্মিত হতে দেখলাম না কাউকে। এ খেলায় দুটি ছেলেরই—তরুণ যাদুকরের এবং তার ঐ বাচ্চা সহকারীর যে কৃতিত্ব অসাধারণ, সেটা বুঝবার মতো সমঝদার সেই ভিড়ের ভেতর কেউ ছিল না। সব সস্তা তামাসা-দর্শকের দল।

অথচ এই ধরণের খেলা দেখিয়েই অসামান্য খ্যাতি এবং অসামান্য পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে গেছেন পাশ্চাত্ত্য যাদু-জগতে বিখ্যাত জ্যানসিগ (Zancig) দম্পতি—জুলিয়াস জ্যানসিগ এবং অ্যাগ্নিস (Agnes) জ্যানসিগ। এঁদের জীবন-কাহিনী চমৎকার রোমান্টিক।

জুলিয়াস জ্যানসিগ ডেনমার্কের লোক। গরীব পরিবারে তাঁর জন্ম। অন্য কোনো ভালো পেশায় বা ব্যবসায়ে যাবার মতো সঙ্গতি না থাকায় জুলিয়াস লোহা গলাবার আর ঢালাই করবার কাজ শেখেন। কাজ শেখা হয়ে গেলে পর তিনি চলে গেলেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে, স্বদেশ ডেনমার্কের চাইতে যেখানে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা অনেক বেশী।

মার্কিণ দেশে গিয়ে জুলিয়াস দেখলেন ডেনমার্কের অনেক ভাগ্যান্বেষীর ভিড় সেখানে। এদেরই এক সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি একটি বিকলাঙ্গ তরুণীকে দেখেই চমকে উঠলেন। মেয়েটি বিকলাঙ্গ, চেহারাও তার তাকিয়ে দেখবার মতো নয়, কিন্তু তবু যেন কি কারণে তার দিকে মন আকৃষ্ট হচ্ছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল অনেক বছর আগে ডেনমার্কে দেখা একটি মেয়ের মুখ। সে মেয়েটির নাম ছিল অ্যাগ্নিস। খুব ছোট বয়সে ভাব জমেছিল জুলিয়াস আর অ্যাগ্নিসের ভেতর, তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। অ্যাগ্নিস মুছেও গিয়েছিল জুলিয়াসের মন থেকে। বহুদিন পর বিদেশে এসে এই মেয়েটিকে দেখে হঠাৎ খুব যেন চেনা চেনা লাগল।

জুলিয়াস বলল "অ্যাগ্নিস না ?"

মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ, আমি অ্যাগ্নিস।"

"আমি জুলিয়াস। মনে আছে আমার কথা ?"

"আছে বৈকি ! তোমাকে আমি দেখেই চিনেছিলাম।"

বিকলাঙ্গ, বিষণ্ন মেয়ে অ্যাগ্নিস। রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়বার মতো মেয়ে নয়। কিন্তু জুলিয়াসের শৈশবের প্রিয়া অ্যাগ্নিস। হারিয়ে দূরে সরে গিয়েছিল তার কাছ থেকে, আবার কাছে এসেছে বিধাতারই বিধানে। জুলিয়াস দেখলে নিদারুণ দারিদ্র্যে দুরবস্থায় দিন কাটছে অ্যাগ্নিসের। একা, বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ অ্যাগ্নিস। কোনো আকর্ষণ তার নেই, কে আসবে তার সঙ্গী হতে ? অ্যাগ্নিসের প্রতি গভীর মমতায় ভরে উঠল জুলিয়াস জ্যানসিগের বুক, বহুদিন ভুলে থাকা পুরাতন প্রেম জেগে উঠল নতুন করে। অ্যাগ্নিসের পাণি প্রার্থনা করলেন জুলিয়াস। মঞ্জুর হলো প্রার্থনা। জুলিয়াস এবং অ্যাগ্নিস হলেন জ্যানসিগ দম্পতি।

একবার একটি সাহায্য-অনুষ্ঠানে তাঁদের যোগ দেবার অনুরোধ এলো। গাইতেও জানেন না, বাজাতেও জানেন না। কি করবেন ? তখন জুলিয়াসের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি ভাবলেন গান-বাজনা, নৃত্য, বক্তৃতা, এ সব তো মামুলি ব্যাপার; একটা নতুন কিছু দেখাতে হবে, যাতে বেশ একটু সাড়া পড়ে যায়। ভেবে ঠিক করলেন, চিন্তা পরিচালনার (thought transference) খেলা দেখিয়ে চমক লাগাতে হবে। দুজনে মিলে গোপনে অভ্যাস চলল।

তাঁদের প্রথম প্রদর্শিত খেলা খুবই সাধারণ হলেও অভিনবত্বের জন্তেই বেশ চিত্তাকর্ষক হলো। আরো কয়েকটি অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁরা চিন্তা-পরিচালনার খেলা দেখালেন। দর্শকদের দেওয়া এক একটি জিনিষ হাতে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করেন জুলিয়াস, জুলিয়াসের মগজ থেকে সে চিন্তা পরিচালিত হয়—যেন বেতার-তরঙ্গে—দূরে চোখ বাঁধা অবস্থায় অ্যাগ্নিসের মগজে। আর প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকটি জিনিষ বর্ণনা করে দেন অ্যাগ্নিস।

খেলাটি জনপ্রিয় করে তুলল এঁদের দুজনকে। কিন্তু তখনো তাঁরা এটা পেশারূপে গ্রহণ করবার কথা ভাবেন নি। জুলিয়াস তখন কাজ করছেন এক লোহা ঢালাইয়ের কারখানায়। বিধাতা যাঁকে টেনে এনে বিখ্যাত করবেন যাদুজগতে, লোহা ঢালাইয়ের জগতে অখ্যাত হয়ে থাকতে তিনি পারবেন কেন? একদিন কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটল, গলানো লোহা হাতে পড়ে ভীষণ রকম আহত হলেন জুলিয়াস। বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী হয়ে থেকে সেরে ওঠার পর ঠিক করলেন কারখানার ঐ বিপজ্জনক কাজে আর ফিরে যাবেন না। তার চাইতে অ্যাগ্নিসকে নিয়ে যে চিন্তা পরিচালনার খেলা দেখাতেন, সেটাকেই দুজনে মিলে পেশারূপে গ্রহণ করবেন।

তাই করলেন। আরো মাথা খাটিয়ে তাঁদের প্রদর্শনী-পদ্ধতিটিকে আরো ব্যাপক, আরো উন্নত করে তুললেন। চলে গেলেন কোনি আইল্যাণ্ডে (Coney Island)। এই দ্বীপটি আমেরিকার একটি জনপ্রিয় আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র। এখানে সামান্য দর্শনীতে তাঁরা প্রতিদিন অনেকবার খেলা দেখাতেন। এখানেও বিধাতার লীলা। এখানেই একদিন তাঁদের খেলা দেখলেন বিখ্যাত যাদুকর হোরেস গোলডিন (Horace Goldin)। অভিজ্ঞ, দূরদর্শী যাদুকর গোলডিন সঙ্গে সঙ্গে যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন জ্যানসিগ দম্পতির এই খেলার অসামান্য ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। তিনি উদ্যোগী হয়ে একদিন জ্যানসিগ দম্পতির খেলা দেখাতে নিয়ে এলেন নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত রঙ্গালয়-পরিচালক এবং প্রমোদব্যবস্থাপক হ্যামারষ্টেইনকে (Hammerstein)। ফলে হ্যামারষ্টেইনের রুফ-টাপ গার্ডেন থিয়েটারে কয়েকমাস খেলা দেখাবার সুযোগ পেলেন জ্যানসিগ দম্পতি। এতে আয় বাড়ল, খ্যাতি বাড়ল, কিন্তু তবু মন ভরল না। যাদুজগতের তীর্থক্ষেত্র লণ্ডনে আসর মাৎ না করা পর্যন্ত তাঁদের তৃপ্তি হবে না। রওনা হয়ে গেলেন লণ্ডনে।

লণ্ডনের অভিজাত 'আলহামরা' (Alhambra) রঙ্গালয়ে হলো তাঁদের প্রথম প্রদর্শনী। এতে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা "ডেইলি মেল"-এর মালিক লর্ড নর্থক্লিফ (Lord North-cliffe) এবং বিখ্যাত "রিভিউ অভ রিভিউজ" (Review of Reviews) মাসিক পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক উইকহ্যাম ষ্টেড। অভিভূত হলেন দুজনেই। দুজনেই নিঃসন্দেহ হলেন, জ্যানসিগ-দম্পতি সত্যি সত্যিই 'সাইকিক' (Psychic) বা আত্মিক ক্ষমতার অধিকারী—এ ক্ষমতা তাঁদের ঈশ্বরদত্ত। এতে ছল, চাতুরি বা কৌশল কিছু নেই; সত্যি সত্যিই এঁদের দুটি মগজের চিন্তাপ্রবাহে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পরদিনই বহুলপ্রচারিত ডেইলি মেল" কাগজে বেশ ফলাও করে প্রকাশিত হলো অসাধারণ আত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন জ্যানসিগ দম্পতির বিপুল প্রশস্তি। ইংলণ্ডে প্রচারিত হয়ে গেল "এই অসাধারণ দম্পতি"-র খ্যাতি। নিশ্চিত হয়ে গেল তাঁদের অসামান্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, এই অসামান্য মূল্যবান প্রচারের ফলে।

জুলিয়াস জ্যানসিগ আমেরিকায় মারা যান ১৯২১ সালে। তার আগে সস্ত্রীক এই 'আত্মিক' শক্তির খেলা দেখিয়ে তিনি বহুলক্ষপতি হয়েছিলেন।

লর্ড নর্থক্লিফের মতো বিরাট প্রভাবশালী ব্যক্তি জ্যানসিগের এই অদ্ভুত ক্ষমতাকে খাঁটি 'আত্মিক' (psychic) শক্তি বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন এবং তাঁর বহুলপ্রচারিত খবরের কাগজের মারফৎ জ্যানসিগের খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন চারিদিকে। জ্যানসিগ স্বীকার করতেন তাঁর বিপুল সাফল্যের মূলে লর্ড নর্থক্লিফের এই মহামূল্যবান সহায়তা।

আসলে কিন্তু জ্যানসিগ-দম্পতির ক্ষমতা ঠিক অলৌকিক বা আত্মিক ছিল না—অবশ্য অসাধারণ স্মরণশক্তিকে যদি 'সাইকিক' (psychic) বা অলৌকিক আত্মিকশক্তি বলা না হয়। জুলিয়াস এবং অ্যাগ্নিসের ভেতর এমন ব্যাপক 'কোড' (code) বা গুপ্ত সংকেত-ব্যবস্থা ছিল, যার সাহায্যে জুলিয়াস সংকেতের দ্বারা প্রায় যে কোনো জিনিষের বিস্তারিত বিবরণ চোখ-বাঁধা অ্যাগ্নিসকে জানিয়ে দিতেন। চোখ দিয়ে দেখা অ্যাগ্নিসের দরকারই হতো না, গুপ্ত সংকেতে জুলিয়াস তাঁকে যে বিবরণ দিতেন, তা থেকেই অতি সহজে প্রত্যেকটি জিনিষের খুঁটিনাটি বর্ণনা করে যেতেন তিনি। সুতরাং এ খেলায় কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রয়োজন হয়নি—যদিও লর্ড নর্থক্লিফ এবং আরো অনেকে এঁদের অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী বলেই ভুল করেছিলেন, অন্য কোনো ভাবে এর ব্যাখ্যা সম্ভব নয় ভেবে। এ খেলার প্রয়োজন হয়েছিল শুধু বেশ ব্যাপক এবং জটিল একটি সংকেত-পদ্ধতি, সেই পদ্ধতির অগুনতি সংকেতের প্রত্যেকটি নিখুঁতভাবে মনে রাখার মতো অসামান্য স্মরণশক্তি; তার ওপর চমৎকার অভিনয়-ক্ষমতা এবং উপস্থিত-বুদ্ধি।

লণ্ডনের বিখ্যাত, জনপ্রিয়, হাল্কা ধরণের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় দেড় হাজার পাউণ্ড দক্ষিণার বিনিময়ে জুলিয়াস জ্যানসিগ তাঁর গুপ্ত সংকেত-পদ্ধতিটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এভাবে রহস্য ভেদ করে দেবার পরও জ্যানসিগ দম্পতির এই প্রদর্শনীর জনপ্রিয়তা বা সাফল্য কিছুমাত্র কমেনি। সম্ভবতঃ সাপ্তাহিক পত্রিকাটিতে ("Answers") যখন জ্যানসিগ দম্পতির গুপ্ত সংকেতের পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল, তার আগে থেকেই তাঁরা সেই পুরোনো পদ্ধতি বাতিল করে দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা নতুন পদ্ধতিতে খেলা দেখানো শুরু করেছিলেন।

এক মন থেকে অন্য মনে অতীন্দ্রিয়ভাবে (অর্থাৎ কোনোরকম ভাষা বা ইঙ্গিত ব্যবহার না করে একেবারে সরাসরি) পাঠানো বা সঞ্চারিত করে দেওয়ার নাম 'মেন্টাল টেলিপ্যাথি' (Mental telepathy)। জ্যানসিগ দম্পতির অদ্ভুত কৃতিত্বে হাজার হাজার লোকের মনে বিশ্বাস হলো 'টেলিপ্যাথি' সত্যি সত্যিই সম্ভব। তাঁদের সংকেত-পদ্ধতি প্রকাশিত এবং আলোচিত হবার পরও অনেকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাননি যে, তাঁদের প্রদর্শিত 'টেলিপ্যাথি' খাঁটি অতীন্দ্রিয় টেলিপ্যাথি নয়, নিতান্তই লৌকিক গুপ্ত কৌশলের খেলা, এবং আধুনিক যাদুক্রীড়ার পর্যায়ে পড়ে।

এ ধরণের খেলা বর্তমান যাদু-জগতে—অন্তদিক থেকে বিচার করে—'সেকেণ্ড সাইট' (Second Sight) বা 'দ্বিতীয় দৃষ্টি' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় দৃষ্টির অর্থ হচ্ছে দিব্য-দৃষ্টি বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, অর্থাৎ চর্মচক্ষুর সাহায্য ছাড়াই দেখা। ভাবটা যেন—চোখ বাঁধা অবস্থায় যাদুকরের সহকারী বা সহকারিণী তাঁর 'দ্বিতীয়' অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়দৃষ্টির সাহায্যেই বিভিন্ন জিনিষগুলো দেখছে এবং বর্ণনা করছে।

প্রথমা পত্নী অ্যাগ্নিস মারা যাওয়ার ফলে জুলিয়াস জ্যান্‌সিগ বেশ একটু দমে গেলেন। কিন্তু দমে থাকবার পাত্র নন জুলিয়াস। অ্যাগ্নিসের শূন্য স্থান পূর্ণ করবার জন্য পেলেন 'আডা' (Ada) নাম্নী একটি মহিলাকে। আডা রাজী হলেন জুলিয়াসের জীবন-সঙ্গিনী এবং যাদু-সঙ্গিনী হতে। কিছুদিনের মধ্যে তালিম দিয়ে আডাকে তৈরি করে নিলেন। আবার শুরু হলো জ্যানসিগ দম্পতির মানসিক যাদু-প্রদর্শন। সাফল্য এলো বটে, কিন্তু আগের মতো নয়, কারণ জুলিয়াসের দ্বিতীয়া পত্নী আডা ব্যক্তিত্বে, উপস্থিতবুদ্ধিতে এবং অভিনয়-ক্ষমতায় অ্যাগ্নিসের কাছাকাছিও যেতে পারেননি।

জুলিয়াস জ্যান্‌সিগের অসামান্য সাফল্যের মূলে তাঁর নিজের সাধনা ছিল, একথা অস্বীকার না করেও বলা যায়, সৌভাগ্য এবং যোগাযোগই তাঁর বরাত খুলে দিয়েছিল। সে সময়কার সেরা যাদুকর হোরেস গোল্‌ডিনের, এবং তাঁর মাধ্যমে প্রমোদ-জগতের বিখ্যাত প্রযোজক হ্যামারষ্টেইনের এবং পরে বহুলপ্রচারিত "ডেইলি মেল" পত্রিকার মালিক লর্ড নর্থক্লিফের নেকনজরে না পড়লে তিনি এত খ্যাতি, এত জনপ্রিয়তা, এত প্রভূত অর্থলাভ করতে পারতেন কিনা সে বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ নিশ্চয়ই করা যায়।

এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে একটু আগেই যার কথা বললাম, কলকাতার রাজপথের সেই কিশোর যাদুকর আর তার বালক সহকারীর কথা, যারা ফুটপাথে এই 'টেলিপ্যাথি' বা 'সেকেণ্ড সাইট'-এর খেলাই অতি চমৎকার দেখাচ্ছিল নিতান্তই বেরসিক অসমঝদার জনতার সামনে। ওরা ছিল নিরক্ষর, গরীব, যাযাবর, নিতান্তই সাদাসিধে, সস্তা। ওদের কৃতিত্বে কেউ মুগ্ধ হচ্ছিল না, বিনা পয়সায় তামাশা দেখছিল সবাই। কিন্তু মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ওদের সেই খেলাই জমকালো, সম্ভ্রান্ত, অভিজাত পরিবেশে, কোনো প্রখ্যাত প্রমোদ পরিবেশকের প্রযোজনায় এবং পরিচালনায় প্রদর্শিত হলে তার কদর এবং আদর হতো সম্পূর্ণ অন্য রকম।

বিখ্যাত জ্যান্‌সিগ দম্পতির খেলাও প্রথমে খুব সামান্য ধরণেরই ছিল। সেই সামান্য শুরুতেই উৎসাহ পেয়ে তাঁরা তাঁদের সংকেতের পুঁজি বাড়িয়ে বাড়িয়ে অসামান্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, উক্ত কিশোর যাদুকর তেমন উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তার ঐ বালক সহকারীর সহযোগিতায় ঐ সামান্য খেলাটিকেই আরো বাড়িয়ে তুলে অসামান্য করে তুলতে পারত। ওর ভেতরে যে জুলিয়াস জ্যান্‌সিগের সম্ভাবনা সুপ্ত ছিল না, কে বলতে পারে?

ত্রিধারা ঃ সঙ্গম

শেখ সিরাজুদ্দীন আমেদ

শান্তিঘন ছায়াঢাকা পত্রপুট
মধ্যাহ্নের অবিমিশ্রিত কূজনে
মনের যেখানে প্রবেশ করে
তার স্তব্ধতায় হারিয়ে যায় চিন্তার খেই।

আঁকাবাঁকা পথের বাঁকে
যে পথিকের পদক্ষেপ
হারিয়ে যায় আর কোন পথের শেষে
তার শব্দহীন কল্লোল তান ধরে সেখানে,
অপসৃয়মান মূর্তি
খুঁজে দেয় হারানো খেই
খুলে দেয় জটকে।
যখন একটি উৎসুক প্রাণ
চেয়ে দেখে দূরের বিলীয়মান চেহারার দিকে-
ধরিত্রীর আবরণের লেলিহান শিখা
মনে করিয়ে দেয় জীবনের শূন্যতাকে
যখন কেঁপে কেঁপে জানায় সে আক্ষেপ
নীরব, নিঠুর ক্লান্তিহীন ভাষায়
তখন সেই প্রাণ শূন্যতায় গণ্ডুষ ভরিয়ে দেয়
খাপছাড়া চিন্তার আবেগে।

নৈঃশব্দ ঃ হৃদয়

অনুরাধা মুখোপাধ্যায়

অভীপ্সার ছায়া খুঁজে ডুবে যাবে সুরম্য-মিছিলে,
এ-ছায়ার মৃত্যু হ'লে, শরীরের প্রতি কোষ, প্রতি পর্ব্ব জুড়ে—
কে আর জ্বালাবে বল মনের আগুন? তখন কি দিলে
আর কিবা পেলে তার খতিয়ান, সমাপ্তি সঙ্গীত-সুরে—

মনে হ'ত শান্তির নিরালা মেঘে উড়ে গেছো :···মনে মনে ছুঁয়ে নিতে
পুরাম সে—আলোর অম্বর।···হৃদয়টা মেঘে ঢাকা রাত্রির বিভায়
ভয়ঙ্কর পাঁকে পাঁকে ডুবে যাবে, তখন ফিরিয়ে দিতে
পারবে কি হিসাবের কড়ি? সমস্ত জীবন বুঝি মুছে যাবে
সৌন্দর্য্যের গাঢ় প্রতিভায়!

: বিশেষ প্রেমের সংজ্ঞা কোনদিনই শেখোনি'ক, এই বুকে নেই
বুঝি গভীর প্রেমের ঢেউ—আয়ুহীন অলক্ষ্যের স্রোতে,
একবার পারো তুমি জীবনকে চূর্ণ করে দিতে? মুহূর্ত্তেই
অজস্র-অজস্র কয়েকটা ইচ্ছার জলছবি, পারো যদি ডুবে যাও
একেবারে সমাপ্তির ব্রতে।

অভীপ্সার ছায়া খুঁজে ডুবে যাবে, কীর্ত্তির পাতালে
নিভিয়ে আগুন; হৃদয়টা লুঠ করে নিয়ে গেছে কোন সে লুব্ধক
দূরের বন্দরে। সমস্ত চেতনা, সাড়া দূরে ঐ নক্ষত্রের জালে
জ্বলে-পুড়ে গেল—তোমাকে এখনও খোঁজে সভ্যতার
শেষ বিদূষক।

ঈশ্বর

শ্রীলক্ষ্মীনিবাস বিড়লা

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"

আমার এক বন্ধু প্রাতঃকালে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেম। শীতের দিন ছিল। পণ্ডিতজীও সেই সময় চাদর জড়ি দিয়া আসিয়া বসিলেন।

"কি ভাই, আজ নূতন খবর কি আছে?" বসিয়াই পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করিলেন।

"লুমুম্বাকে হত্যা করা হইয়াছে"—আমার বন্ধু বলিলেন।

"খবর ঠিক তো?"

"হ্যাঁ ঠিকই বোধ হইতেছে।"

পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাকে হত্যা করিতে কে দেখিয়াছে? আর সে কথা কি ভাবে স্বীকার করি?"

"রয়টারের সংবাদদাতা পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করিয়া এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন।"

পণ্ডিতজী ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "বেশ, তবে আপনি শ্রুতিপ্রমাণ মানিয়া লইতেছেন। সেদিন তো আপনি কেবল চাক্ষুষ প্রমাণ মানিতেন।"

ব্যাপারটি ছিল এই—সেদিন "ঈশ্বর" সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। পণ্ডিতজী ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ দিয়াছিলেন। আমার বন্ধু বলিয়াছিলেন যে তিনি তো কেবল চাক্ষুষ প্রমাণই মানেন। এই তো সেদিনের কথা—অধ্যাপক মার্টিন [illegible]ইল ছয় জন বৈজ্ঞানিকের সহিত সহযোগিতায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ব্রহ্মাণ্ড তৈয়ারী করা হইয়াছে, নিজে তৈয়ারী হয় নাই।

পৃথিবী আপন অক্ষদণ্ডের উপর প্রতি ঘণ্টায় এক হাজার মাইল গতিতে ঘুরিতেছে। যদি সেই গতি কমিয়া প্রতি ঘণ্টায় একশত মাইল হইয়া যাইত তাহা হইলে আমাদের দিন ও রাত্রি এত বড় হইয়া যাইত যে দিনের বেলায় প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপে সকল বস্তুই [illegible] ছাই হইয়া যাইত এবং যাহা থাকিত তাহা রাত্রি বেলায় [illegible] চাপে শেষ হইয়া যাইত।

যদি সূর্য্যের তাপমান বর্তমান অপেক্ষা ঈষৎ বাড়িয়া যাইত তাহা হইলে পৃথিবীতে কোন প্রাণী জীবিত থাকিত না। এখন আমরা ঠিক এই পরিমাণে সূর্য্যের তাপ পাই যাহাতে আমরা বরফে [illegible] হইয়া শেষ না হইয়া যাই। যদি চাঁদ বর্তমানে যে দূরত্বে [illegible] তাহা হইতে নিকটে হইত, তাহা হইলে সমুদ্রে এত অধিক [illegible] দেখা দিত যে সকলে ডুবিয়া মরিয়া যাইত।

আকাশ-গঙ্গা অসংখ্য তারকা সমাবেশে গঠিত। এই সমাবেশে [illegible] সূর্য্য আছে। প্রত্যেক সূর্য্যের গড়ে পাঁচটি গ্রহ ও পৃথিবীও আছে। এই গ্রহগুলিতে যে সব প্রাণী আছে তাহারা মনুষ্য অপেক্ষা অধিক সভ্য এবং চতুর হইতে পারে। ফোর্ডহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর বার্থালেমিউ নেগী ও ডক্টর ডগলাস হেনেসী অসংখ্য উল্কাপাত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে অন্যান্য পৃথিবীতেও প্রাণী অবশ্যই আছে। নিত্য নূতন পৃথিবীও গড়িয়া উঠিতেছে। এইরূপ আকাশ-গঙ্গা হাজার হাজার আছে এবং তাহাতে সূর্য্যও এত দূরে আছে যে তাহার প্রকাশ পৃথিবীতে পৌঁছাইতে এক অর্বুদ বৎসর লাগিয়া যায়। অন্ততঃপক্ষে এক অর্বুদ বৎসর পূর্ব্বে সেখানে সূর্য্য ছিল, সূর্য্যরশ্মি পৌঁছিতে পৌঁছিতে সরিয়া গিয়া থাকে তাহা জানা যায় না। কিন্তু তাহা অপেক্ষা দূরে আরও সূর্য্য আছে, এইরূপ ধারণা বর্ত্তমান। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষুদ্র মানুষের সামর্থ্য কি? কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বত্রই বিরাজমান। তিনি প্রতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীর সংবাদ রাখেন এবং তাহাদের ডাকে নিশ্চিত সাড়া দেন, সাহায্য করেন।

রুশদেশ শুক্র গ্রহে রকেট পাঠাইয়াছে। যদি কোন মানুষ শুক্র গ্রহে গিয়া আবার ফিরিয়া আসে, তাহাতে তাহার কেবল ছয় মাস লাগিবে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর তিন শত বৎসর পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহার পক্ষে কোন লোককে চিনিতে পারা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। রকেট প্রস্তুতকারীদের প্রস্তুতকারী (ঈশ্বর) তাহাদের অপেক্ষাও মহান, এই কথাই মানিয়া লইতে হইবে।

শিশু জন্মাইবার পরই স্তন্যপান করিতে শিখিয়া যায়, তাহাকে শিখাইতে হয় না। মৎস্য জন্মাইবার পরই সাঁতার দিতে সুরু করে। বোলতা কীটপতঙ্গকে হুল ফুটাইয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলে এবং তাহাদের যত্নের সহিত রাখিয়া তাহারি পাশে ডিম পাড়ে। ডিম হইতে বাহির হওয়া বোলতা বাচ্চাগুলির আহারের জন্য পতঙ্গগুলি তৈয়ারী থাকে। মরা কীট-পতঙ্গ তাহাদের জন্য ঘাতক হয়। ছোট বোলতাগুলি বড় হইয়া নিজেদের বাচ্চাদের জন্য এই কাজই করে, তাহাদের কেহ শিখাইয়া দেয় না।

ছোট আরশুলার কথাই ধরুন। আরশুলা দৌড়ায়, সাঁতার দেয়, আবার ওড়ে। তাহাদের শরীর কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। যদি কিছুদিন সে অভুক্ত থাকে তাহা হইলে কাচের মত তাহার আবরণের এপার হইতে ওপার দেখা যায়। আরশুলার বয়স মানুষ অপেক্ষা তিন গুণ বেশী হয়। কথাবার্তা বলার জন্য আরশুলাদের মধ্যে বেতার সংকেতের ব্যবস্থা আছে। ইহার দ্বারাই তাহারা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা চালায়।

মৌমাছি সম্পর্কে তো অনেক কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি

অস্ট্রিয়ার এক অধ্যাপক আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মৌমাছিরা পরস্পরের মধ্যে ইঙ্গিতে কথাবার্তা চালায়।

নিশাচর চামচিকে তো সংকেত প্রেরক রাডারের জন্মদাতা। যখন চামচিকে ওড়ে তখন রাডার মাধ্যমে সংকেতধ্বনি প্রেরণ করে, তাহার ফলে সম্মুখের বাধা-বিঘ্নের সংবাদ বুঝিতে পারে। তাহার শরীরে যদি রাডার যন্ত্র না থাকিত, তাহা হইলে ধাক্কা লাগিয়া সে কবে প্রাণ হারাইত।

গ্রীষ্মকালে নানা প্রকারের পাখী উত্তরদিকে চলিয়া যায় এবং শীতকালে দক্ষিণদিকে ফিরিয়া আসে। শীতকালে আলাস্কা হইতে লক্ষ লক্ষ পাখী আফ্রিকায় চলিয়া যায়। প্রতি বৎসরই তাহারা উড়িয়া আসে এবং যায় আর ঠিক আপন জায়গায় পৌঁছিয়া বিশ্রাম করে। অথচ হাজার হাজার পাখী মরিয়া যায়, তথাপি অন্যান্য পাখীদের উড়িয়া যাওয়া বন্ধ হয় না।

সর্বাপেক্ষা বিচিত্র জীবন হইল 'ঈল' মাছের। নদী বা ঝিল যেখানেই ঈল মাছের জন্ম হোক না কেন, তাহারা হাজার হাজার মাইল সাঁতার দিয়া বার্মুডা দ্বীপের নিকট নিজেদের ঘাঁটিতে পৌঁছিয়া যায়। সেখানেই তাহারা মরে এবং সেখানেই ডিমও পাড়ে। বার্মুডার পথের মানচিত্র তাহাদের কেহ বলিয়া দেয় না।

ইহাদের সকলের বিচিত্র জীবনযাত্রা ও নিত্য নূতন মহিমা অনুসন্ধান করিবার শক্তি মানুষেরই আছে। মানুষ তো একটি ভ্রাম্যমান কারখানা। মানুষের শরীরে অনেক যন্ত্র আছে। কোথাও অ্যাসিড উৎপন্ন হয়, কোথাও আয়োডিন, কোথাও বা চিনি। আমরা ইউরিয়া তৈয়ারী করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার কারখানা স্থাপন করি, আর মানব শরীর তাহা বাহির করিয়া ফেলিতে থাকে।

যদি শরীরে কোথাও আঘাতের ফলে ক্ষত হইয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্ক-কেন্দ্রে সংকেত প্রেরিত হয় এবং ঐ ক্ষত নিরাময় ও পূরণের জন্য মানবশরীর উদ্যোগী হয়। রক্তচাপ একেবারে নামিয়া যায়। রক্ত শীঘ্র জমাট বাঁধিয়া ক্ষতস্থান হইতে রক্ত পড়া বন্ধ করিয়া দেয়। যদি বেশী পরিমাণ রক্তপাত হয়, তাহা হইলে প্লীহা আপন সঞ্চয় হইতে শরীরের সর্বত্র রক্ত শীঘ্র সঞ্চারিত করিয়া দেয়। রক্তকণিকাগুলি জলীয়ভাগেই থাকে; কিন্তু ক্ষতস্থানে হাওয়া লাগিলে তাহা শুকাইয়া যায়, আর শুকাইবার পর ফাটিয়া গেলে ক্ষতস্থান হইতে আবার রক্ত প্রবাহিত হইবার আশঙ্কা থাকে। বাহির হইতে জীবাণুর ভিতরে প্রবেশের পথও উন্মুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু রক্তকণিকাগুলি ভাঙিয়া গিয়া তাহা হইতে এইরূপ রস নিঃসৃত হয়, যাহা হইতে তুলার মত পদার্থ বাহির হইয়া ছিদ্রপথগুলিকে বন্ধ করিয়া দেয়। এই পদার্থকে ফাইব্রিন বলা হয়। দূষিত বীজাণুগুলিকে বিনষ্ট করার জন্য আর এক প্রাণী উৎপন্ন হইয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সাফাইকারী আসিয়া মৃত তন্তুগুলিকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া যায়, আর মেরামতকারী শ্বেতকণিকাগুলি মেরামত করার কাজ শুরু করিয়া দেয়। এইরূপ বিস্ময়কর "মেরামত-ঘর" ঈশ্বরই তৈয়ারী করিতে পারেন।

কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হইল তাহার বুদ্ধি। এই বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ আজ প্রকৃতিজগৎ ও প্রাণিজগতের সব কিছু হইতে কাজ আদায় করিতেছে এবং পৃথিবীর মালিক হইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু এত প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও কখনো কখনো এমন কাজ করিয়া বসে যে ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন পশুও তাহা করে না। অতিরিক্ত ভাবাবেগে চালিত হইয়া কখনো বা মৃত্যুর শিকার হইয়া যায়। ঐ সময় বোঝা যায় না, মানুষের বুদ্ধি গেল কোথায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও ঈশ্বরের শক্তির কিছু না কিছু প্রয়োজন অবশ্যই ঘটে।

আর এই মনুষ্য-সৃষ্টিকারী শুক্র এতো ক্ষুদ্র যে এক চামচের মধ্যে লক্ষ মানুষ সৃষ্টিকারী শুক্রকীট থাকিতে পারে। এই সব ছোট ছোট প্রাণীর মস্তিষ্কে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের পিতা, পিতামহের অভ্যাস, বুদ্ধি ও বিকার সবই রহিয়াছে। শুক্রের মধ্যে যে প্রকার অভ্যাস আর বুদ্ধি থাকে, ঠিক সেই প্রকারেই সে মানুষ সৃষ্টি করে।

সর্বাপেক্ষা বড়ো প্রমাণ এই যে, পিতামাতা যেভাবে শিশুকে সান্ত্বনা দেন, দুঃখের মধ্যে কোন মানুষ যদি ঈশ্বরকে স্মরণ করে, তবে ঐভাবে তাহারও নিশ্চিত সান্ত্বনা লাভ হয়। মানুষ অতি ভয়ঙ্কর বিপদেরও সম্মুখীন হয় ও তার সঙ্গে লড়াই করে, আর সেই সময় মানুষকে শক্তি যোগায় তাহার অন্তঃকরণপ্রসূত প্রার্থনা।

এই শক্তি কেবল শ্রুতিনির্ভর নয়, দৃষ্টিশক্তিবিহীন মানুষের সামনেও তাহা প্রকট হয়। এই শক্তিকে দেখার জন্য দৃষ্টিশক্তির কোন প্রয়োজন হয় না।

'ঈশ্বর আছেন'—ইহার প্রমাণ দেওয়া ঐ অজ্ঞেয় শক্তির নিরাদর করা।

আগুন নিয়ে খেলা করবেন না

প্রত্যহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে অসংখ্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, প্রাণহানি থেকে বিকলাঙ্গতা পর্যন্ত ঘটবার দৃষ্টান্তও সুলভ, অথচ সামান্য একটু সতর্ক হলেই আমরা এর হাত থেকে বাঁচতে পারি। দেশলাই বা সহজ দাহ্য বস্তু সর্বদাই আগুনের কাছ থেকে দূরে রাখা উচিত, এবং শিশুদের কাছ হতেও। হাতের কাছে অগ্নিশলাকা অরক্ষিত অবস্থায় পেলে শিশুদের মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ হয় তড়িৎ-গতিতেই এবং তা থেকে সমূহ বিপদ ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়। বিজলী তার বা ইলেক্ট্রিসিটির ব্যবহার আজ ঘরে ঘরে, বৈদ্যুতিক-শক্তির নানাবিধ সুবিধা আজকের মানুষের জীবনযাত্রায় লাগানো হয়, কিন্তু অসতর্কতার ফলে এর থেকেও বহু দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। ইলেক্ট্রিক ইস্ত্রীর ব্যবহার ঠিকমত না করার ফলে শুধু কাপড়ই পুড়ে যায় না, ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডেরও সূচনা ঘটতে দেখা যায়।

আমাদের জাতীয় কয়েকটি প্রমোদে ও উৎসবে বাজী পুড়িয়ে আনন্দ করার অভ্যাস প্রচলিত, কিন্তু এর পরিণাম সব সময়ে আনন্দ করা হয় না, অসাবধানতার ফলে সমস্ত আনন্দ মুহূর্ত মধ্যে ঘোর নিরানন্দে পরিণত হতে পারে, বস্তুতঃ বাৎসরিক শ্যামা পূজার বাজীতে প্রতি বৎসরই অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটে থাকে এবং কখনও কখনও তা ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়। ধূমপায়ীদের অসতর্কতার ফলেও অনেক সময় অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হতে দেখা যায়, হাতের সিগারেট বা বিড়িটি ছুঁড়ে ফেলার আগে যে ভাল করে নিবিয়ে দেওয়া দরকার একথা ক'জনই বা মনে রাখেন? নিজেদের অসাবধানতায় এই ধরণের অগ্নিকাণ্ডের সূচনা আমরা অনেক সময়ই করে থাকি যার পরিণামে শুধু নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হই না, নাগরিক জীবনকেও বিপন্ন করে তুলি। অতএব আগুন নিয়ে খেলা করবেন না।

৪০

গান গাইছে আর নাচছে অদ্বৈত। ভাবাবেশে প্রভু বাহ্যস্মৃতিহীন। সেই সাহসে অদ্বৈত বারে বারে তাঁর পা স্পর্শ করছে। আর বলছে, 'এত দিন এই দীর্ঘ চব্বিশ বছর সবাইকে ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপন করে ছিলে, এবার তোমাকে আমার ঘরের মধ্যে পেয়েছি, এবার বেঁধে রাখব আষ্টেপিষ্টে।'

যত গান শুনছেন তত কৃষ্ণসঙ্গের জন্যে ব্যাকুল হচ্ছেন প্রভু, ততই বাড়ছে বিরহকষ্ট। শেষ পর্যন্ত পড়লেন ভূতলে। তখন অদ্বৈত তার নাচ বন্ধ করল। কিন্তু মুকুন্দ জানে প্রভুর অন্তরের ভাব কী। সেই অনুসারে সে গান ধরল :

'হাহা প্রাণ প্রিয়সখি কি না হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে॥
রাত্রি-দিনে পোড়ে মন, সোয়াস্ত না পাঙ।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাহাঁ উড়ি যাঙ॥'

কিন্তু ফল কী হল? প্রভুর চিত্ত বিদীর্ণ হল। দেখা দিল বহু বিচিত্র ভাব। নির্বেদ আর বিষাদ, অমর্ষ আর চাপল্য, গর্ব আর দীনতা। ভাবের প্রহারে জর্জর প্রভু আবার লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। শরীরে শ্বাস নেই।

নির্বেদ কী? দুঃখে, বিরহে ও ঈর্ষায় নিজের প্রতি যে অবমাননা-জ্ঞান, তাই নির্বেদ। বিষাদ কী? ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি বা অপরাধ থেকে যে অনুতাপ, তাই বিষাদ। অমর্ষ কী? তিরস্কার বা অপমানের ফলে যে অসহিষ্ণুতা, তার নাম অমর্ষ। আর চাপল্য? রাগদ্বেষের ফলে চিত্তের লঘুতা বা গাম্ভীর্যহীনতার নাম চাপল্য। গর্ব কী? সৌভাগ্য, রূপ, যৌবন, গুণ বা ইষ্টলাভহেতু অন্যের প্রতি যে অবজ্ঞা, তাই গর্ব। আর দৈন্য কাকে বলে? দুঃখে ও ত্রাসে বা অপরাধীবোধে নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করাই চাপল্য।

প্রভুর এ অবস্থা দেখে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল।

আচম্বিতে প্রভু হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন : বলো, বলো, আরো বলো। যেখানে গেলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, সেখানে উড়ে যাব পাখা মেলে। কোথায় কৃষ্ণ!

'শুন মোর প্রাণের বান্ধব।
নাহি কৃষ্ণপ্রেমধন দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব॥'

দরিদ্র যেমন ধনের অভাবে তার পরিবারের লোকদের ভরণ-পোষণ করতে পারে না, আমারও তেমনি প্রেমের অভাবে আমার দেহ, আমার ইন্দ্রিয় রইল নিষ্ফল অনশনে। যদি তাদের দিয়ে কৃষ্ণসেবাই করতে না পারি তাহলে তারা তো নিরর্থক। আর প্রেম বিনা শুধু দেহে শুধু ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা হয় কী করে?

আবার প্রবল ভাবতরঙ্গ উপস্থিত হল। কখনো হর্ষে কখনো বিষাদে উদ্দণ্ড নাচতে লাগলেন প্রভু। তিন দিন উপোসের পর আজ প্রথম আহার করেছেন, তারপর এই দীর্ঘ নৃত্য, প্রভু ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু প্রেমাবেশে ক্লান্তির অনুভব কোথায়? নিত্যানন্দ ধরে রইল নিমাইকে আর অদ্বৈত তাকে শয্যায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল।

কতক্ষণ পরে নিতাই জিগগেস করল নিমাইকে : 'একবার নবদ্বীপ যাব?'

'কেন?' চোখ তুলে তাকালেন গৌরহরি।

'মা এখনো বেঁচে আছেন কিনা একবার খোঁজ নিয়ে

আসি।' নিতাই বললে, 'আমরা তো আজ মুখে অন্নজল দিলাম, কিন্তু মা বোধ হয় এখনো কিছু খাননি। তোমার শ্রীবাস মুরারিও হয়তো উপবাসে আছে।'

'যাও, দেখে এস।'

'যদি তারা কেউ আসতে চায়, নিয়ে আসব সঙ্গে করে?'

'যে-যে আসতে চায় নিয়ে এস।'

'হ্যাঁ, জানি, শুধু মা আসবেন। বিষ্ণুপ্রিয়া আসবে না। সে চাইবেই না আসতে।

সে শুধু আমার পাদুকা নিয়ে জীবনযাপন করবে। তার সর্বাঙ্গ সে প্রভুকে অর্পণ করেছে, এই অঙ্গ প্রভুর বস্তু, সুতরাং ওকে পালন-পোষণ করতে হবে। বিষ্ণুপ্রিয়াই তো আমার অনপায়িনী শ্রী, মনুষ্যনাট্যে ভক্তিস্বরূপা। ও কেন বিচলিত হবে? ওর তো নিজের সুখের জন্যে আকিঞ্চন নেই। ও বিশুদ্ধ প্রেমোল্লাস। গৌরশূন্য গৌরগৃহের মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে ও মূর্তিমতী নীরবতা।

পরদিন সকালে দোলায় চড়ে এলেন শচীমাতা। সঙ্গে চন্দ্রশেখর আচার্য।

না, বিষ্ণুপ্রিয়া আসেনি। সে আসবে কেন? সে যে সর্বত্যাগিনী পরাভক্তি। তার দুঃখেই সে যে আমার শিক্ষাকে মহনীয় করতে এসেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গের প্রাণ বিষ্ণুপ্রিয়া। স্থানে-কালে ব্যবধান নেই। সর্বাঙ্গ অবিচ্ছেদ।

বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্ণশক্তি। সেই সর্বশক্তি-গরীয়সীর প্রাণবল্লভ বলেই গৌরহরি পূর্ণশক্তিমান।

আঙিনায় দোলা থেকে নামলেন শচীমাতা। আর তক্ষুনি প্রভু ছুটে এসে মার চরণে দণ্ডবৎ হলেন।

এ কি, সন্নেসী হয়ে মাকে প্রণাম করল? সন্নেসীর তো সন্নেসী ছাড়া আর কাউকে প্রণাম করা বারণ। তবে নিমাই ও করল কী?

মার সামনে ওর কোনো নিয়মকানুন নেই। পুত্র সন্নেসী হলেও মা—মা।

শচীদেবী নিমাইকে কোলে তুলে নিলেন। কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। মাথার চুল নেই দেখে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। বাৎসল্যভরে নিমাইয়ের গা মুছে দিলেন, মুখে চুমু খেলেন, একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে কিছুই আর দেখতে পেলেন না, দু'চোখ যে অশ্রুতে ভরে উঠেছে।

'শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া॥
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল॥
অঙ্গ মোছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায়—অশ্রু ভরিল নয়ন॥'

শচী দেবী বললেন, 'নিমাই, বাবা, বিশ্বরূপের মত নিষ্ঠুর হয়ো না। সন্নেসী হয়ে আর সে আমায় দর্শন দিল না। তুমিও যদি তেমনি করো, আমাকে আর দেখা না দাও, তাহলে আমি বাঁচব না কিছুতেই।'

'মা গো, শোনো,' গৌরহরি বললেন, 'এই শরীর দেখছ, এ তো তোমারই। তোমার থেকেই এর জন্ম, তোমার হাতেই এর লালন-পালন। কোটি জন্মেও ঋণ শোধ করতে পারব না। সন্ন্যাস নিলে কী হবে, তোমার প্রতি উদাসীন থাকব না। যেখানে থাকতে বলো সেখানেই বসবাস করব, তোমার কথার অন্যথা করব না।'

'জানি বা না জানি কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস॥
তুমি যাঁহা কহ আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ, সেই তো করিব॥'

দলে দলে লোক এসেছে নবদ্বীপ থেকে, তাদের প্রাণধন নিমাইকে দেখতে। এসেছে শ্রীবাস, এসেছে রামাই, এসেছে বিদ্যানিধি। কে নয়? এসেছে গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, শুক্লাম্বর, মুরারি। নন্দন আচার্য, বুদ্ধিমন্ত খান, দামোদর, বাসুদেব। শ্রীধর, বিজয়, সঞ্জয়, মুকুন্দ। কত আর নাম করব? সে এক বিপুল সমাবেশ।

আহা, নিমাইয়ের মাথায় চুল নেই, কিন্তু দেখ দেখ কী অপার সুন্দর! এত রূপ কি মানুষের হয়, না, আর কারো? 'কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুখ। সৌন্দর্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ॥' সত্যি, এ কী আনন্দসাগর! এ সাগরের তল নেই, পার নেই, অন্ত নেই কোনোখানে।

কিন্তু এ কী বলল শচীমাতাকে? বলল, মা যেখানে থাকতে বলবেন সেখানেই সে বাস করবে। তা হলে শচীমাতা তাকে নবদ্বীপেই থাকতে বলুন না কেন? নিমাই সর্বক্ষণ থাকবে আমাদের চোখের উপর।

কিন্তু শচীমাতা কি তাই বলবেন? যদি নবদ্বীপে

থাকলে সন্ন্যাসী নিমাইয়ের নিন্দে হয়? মা হয়ে ছেলের নিন্দে সইব কী করে?

শুনি না নিমাই কী বলে?

ভক্তদের একত্র করে প্রভু বললেন, 'তোমাদের না জানিয়েই যাচ্ছিলাম বৃন্দাবন, কিন্তু যাওয়া হলনা, বিঘ্ন আমাকে ফিরিয়ে আনল। আমি সন্ন্যাস নিলে হবে কী, তোমাদের আমি ছাড়ব না, ছাড়ব না মাকে। কিন্তু বলো, যাই কোথা, থাকি কোথা? নিজ জন্মস্থানে আত্মীয়দের নিয়ে থাকা তো সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়।'

'তোমা সভা না ছাড়িব—যাবৎ আমি জীবো।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥'

ভক্তদের মুখ শুখিয়ে গেল। এখন শচীমাতা কী বলবেন?

শচীমাতা বললেন, 'ও যদি এখানে থাকে তা হলে তো আমার সুখের অন্ত নেই, কিন্তু এখানে থাকলে যদি ওর ধর্মচ্যুতি হয়, লোকে যদি ওকে নিন্দে করে, তাহলে আমার তা সহ্য হবে না।'

তবে উপায়?

'এমন উপায় করো, যাতে দুই ধর্মই বজায় থাকে।' বললেন গৌরহরি, 'আমার জন্মস্থানেও থাকা হয় না, তোমাদেরও ত্যাগ করতে হয় না।'

সে উপায়ও শচীমাতাই বলে দিলেন।

বলে দিলেন, 'নীলাচলে গিয়ে থাকো।'

নীলাচলে? সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শচীমাতার দিকে।

'হ্যাঁ, নীলাচলে থাকলেই সমস্যার সমাধান হয়।' বললেন শচীমাতা, 'নিমাইকে জন্মস্থানেও থাকতে হয় না আর আমরাও তার সংবাদ পেতে পারি। তোমরাও তার কাছে যেতে পারো নীলাচলে, আর নিমাইও নবদ্বীপে আসতে পারে গঙ্গাস্নানে।' 'নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর। লোক-গতাগতি বার্তা পাব নিরন্তর॥'

এমন মা না হলে কি এমন পুত্র হয়?

'নিজের দুঃখ গণনার মধ্যেও আনি না', বললেন শচীমাতা, 'যাতে আমার নিমাইয়ের সুখ, তাইতেই আমার একমাত্র আনন্দ।' 'আপনার সুখদুঃখ তাহা নাহি গণি। তাঁর যেই সুখ সেই নিজসুখ মানি।'

সকলে ধন্য ধন্য করে উঠল।

মায়ের কথাই বেদ-আজ্ঞা, সানন্দে মেনে নিলেন মহাপ্রভু। যাব নীলাচল। থাকব নীলাচল।

'তোমরা এবার তবে বাড়ি ফিরে যাও।' নবদ্বীপ-বাসীদের সকলকে সম্মান করে বললেন মহাপ্রভু, 'বাড়ি গিয়ে কৃষ্ণসঙ্কীর্তন করো। আমি নীলাচলে যাই। সকলকে বলে যাচ্ছি, মাঝে মাঝে তোমাদের মধ্যে ফিরে আসব, দেখা দিয়ে যাব।'

'ঘর যাঞা কর সদা কৃষ্ণসঙ্কীর্তন।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আমি তোমায় দিব দরশন॥'

হরিদাস এসে কেঁদে পড়ল। বললে, 'তুমি শ্রীক্ষেত্রে গেলে আমার কী গতি হবে? আমার তো সেখানে যাবার অধিকার নেই। আমি যে যবন, আমি যে অস্পৃশ্য। তোমাকে না দেখে আমার এ পাপিষ্ঠ জীবন বাঁচবে কি করে?'

প্রভু বললেন, 'হরিদাস, তোমার দৈন্য সংবরণ করো। তোমার দৈন্য দেখলে অস্থির হয়ে পড়ি। তোমার ভয় নেই, তোমার কথা জগন্নাথের চরণে নিবেদন করব, তাঁর কৃপায় তোমাকে নিয়ে যাব শ্রীক্ষেত্রে।'

কে এই জগন্নাথ? এই জগতের নাথ?

যিনি ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ, বাইরে গৌরবর্ণ, যিনি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের দিয়ে নিজের বৈভব প্রকাশ করেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সঙ্কীর্তনরূপ অর্চনায় আমরা আশ্রয় করেছি। রাধিকার গৌরকান্তি অঙ্গীকার করেছেন বলেই তিনি গৌর। সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ।

উপপুরাণে ব্যাসকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, 'কোনো কলিযুগে সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করে আমি পাপহত মানুষদের হরিভক্তি শিখিয়ে থাকি।'

সকল কলিতে নয়, কোনো এক কলিতে। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা প্রকটিত করেন, সন্দেহ কী, তারই অব্যবহিত পরবর্তী কলিতে।

তাহলে শাস্ত্রেই বলা আছে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ। ভগবান ছাড়া কার এত বিভূতি গোচরীভূত হয়? কোন মানুষে সম্ভব এত প্রেমবিকার? কার সাধ্য বন্য পশু-পাখিকে প্রেমদানে বশীভূত করবে? সন্দেহ কী, চৈতন্যই পরতত্ত্বের সীমা, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। আর লীলারস আস্বাদনের ভিত্তিই তত্ত্বজ্ঞান বা সিদ্ধান্ত। তর্কে নয় সিদ্ধান্তেই জাগবে সুদৃঢ় নিষ্ঠা।

'চৈতন্যগোসাঞিঃর এই তত্ত্ব নিরূপণ। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥'

অদ্বৈত বললে, 'তুমি এক্ষনি যেও না। দিন দু চার থাকো কৃপা করে।'

দশ দিন থাকলেন মহাপ্রভু।

শচীমাতা বললেন, 'এ কদিন আমি রান্না করব। রান্না করে খাওয়াব আমার নিমাইকে। আর সকলে অন্যত্র কতো তো দেখতে পাবে নিমাইকে, কিন্তু আমি আর কোথায় তার দর্শন পাব?'

না, না, তুমিই রান্না করে খাওয়াবে বৈকি। তুমি থাকতে আর কার হাতে খাব? আর কার ব্যঞ্জন সুস্বাদু লাগবে?

শুধু কি নিমাইয়ের জন্যে রান্না? বহুতর ভক্তই প্রসাদপ্রত্যাশী।

তা হোক, প্রভুর কৃপায় অদ্বৈতের কি অপ্রতুল আছে? তার ভাণ্ডার অক্ষয়-অব্যয়। যতই ব্যয় করো ততই আবার তা পূর্ণ হয়ে ওঠে। কোত্থেকে আসে, কে জোটায়, তা কে বলবে!

'আনন্দিত হইয়া শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ॥
আচার্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি গৃহ সম্পদ ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভু-আরাধনে॥'

ভোজনতৃপ্ত পুত্রমুখ দেখে শচীর গভীর আনন্দ।

দিনে ভক্তদের নিয়ে কৃষ্ণকথা, আর রাত্রে নর্তন-কীর্তন—এ চলছে নিয়মিত। কৃষ্ণকথায় কেমন শান্ত নিমাই, কিন্তু নর্তনে-কীর্তনে একেবারে উন্মাদ। স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদগদ প্রলয়—এসব তো হচ্ছেই, থেকে থেকে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ছে।. শচীমা হাহাকার করে উঠছেন, নিমাইয়ের শরীর বুঝি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করছেন, 'দেখো আমার নিমাইয়ের শরীরে যেন ব্যথা না লাগে। বাছা আমার সন্ন্যাস করেছে বলে কি তার শরীরে ব্যথা লাগে না?'

ব্যথার মধ্যেই যে আনন্দের বাসা। এ যে বিষামৃতে একত্র মিলন।

যাত্রার দিন উপস্থিত হল।

'হরি বোল।' হুঙ্কার করে উঠলেন মহাপ্রভু। 'হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই। ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই।'

ক্রন্দনের রোল তুলল ভক্তদল।

প্রভু বললেন, 'ঘরে ফিরে যাও সকলে। যা বলেছি, কৃষ্ণকীর্তন করো। আবার আমাদের দেখা হবে। মা-ই তো বলেছেন, তোমরা নীলাদ্রি যাবে আর আমি গঙ্গাস্নান করতে নবদ্বীপে আসব।'

ভক্তের আশ্রমে, ভক্তির আশ্রয়েই আমি সর্বক্ষণ বিরাজ করি। ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় নেই কেউ। যদিও আমার স্বতন্ত্র বিহার, তবু আমি ভক্ত-পরবশ। তোমরাই আমার সর্বস্ব। তোমাদের ছেড়ে আমার তিলার্ধও বিচ্ছেদ নেই।

'ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতামাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিহ ভক্তবশ-স্বভাব আমার॥
তোমরা সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার।
তোমা সবা লাগি মোর সর্ব অবতার॥
তিলার্ধেও আমি তোমা সবারে ছাড়িয়া।
কোথাও না থাকি সভে সত্য জান ইহা॥'

ভগবানের যত লীলা, সমস্তেরই উদ্দেশ্য ভক্ত-চিত্ত-বিনোদন। ভক্ত যেমন ভগবানের সুখ ছাড়া আর কিছু জানে না, ভগবানও তেমনি ভক্তের সুখ ছাড়া আর কিছু জানেন না। প্রেম-রস আস্বাদনের জন্যেই কৃষ্ণের প্রকটলীলা, আর এই আস্বাদনেই তাঁর ভক্তকে অনুগ্রহ। 'এইসব রসনির্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সর্ব ভক্তেরে প্রসাদ॥' ভক্তকে নিয়েই ভগবান এই জগতের মেলা বসিয়েছেন, ভক্তের হৃদয়েই তাঁর রসের খেলা চলছে, এই অনুভবটিই তাঁর অপার অনুগ্রহ। 'রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম।' ধর্ম মানে বেদধর্ম, লোকধর্ম, আর কর্ম মানে যাগযজ্ঞ, বৈদিক অনুষ্ঠান। ধর্মকর্মের উদ্দেশ্য ইহলোকের বা পরলোকের সুখ। এ সুখ অনিত্য। কৃষ্ণসেবানুখের তুলনায় তুচ্ছ।

তাই কৃষ্ণে নির্মল অনুরাগ করো। ভগবানে পক্ষপাতিত্ব দোষ আরোপ কোরো না। সূর্য সর্বত্র সমানভাবেই রোদ দিচ্ছে। ঘরের মধ্যে শীতার্ত মনে হয়, বাইরে রোদে এসে বোসো। ঘরে বন্দী হয়ে থেকে সূর্যের দোষ ধোরো না। সূর্য-সান্নিধ্যে, কৃষ্ণ-সান্নিধ্যে চলে এস।

ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ দেখাবার জন্যেই ভগবান সর্বচিত্তহারিণী লীলা করছেন। ভক্তের মুখে সেই লীলাকথা শুনবে আর সকলে। শুনে তারা আবার

বলবে তারা আবার ভগবৎপরায়ণ, লীলাকথাপরায়ণ হবে। ভক্ত ভগবৎ-লীলার অনুষ্ঠান করবে না—সাধ্য কী সে সমুদ্রোদ্ভব বিষ পান করে—সে শুধু ভগবৎ-লীলাকথা শুনবে, বলবে, ভাববে অনন্যনিষ্ঠ হয়ে।

শচীমাতাও কি কাঁদছেন? তিনি তো অনুমতি দিয়েছেন যেতে। তবু অশ্রুধারা বারণ মানছে না। অশ্রুধারার সান্ত্বনা কোথায়?

মাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলেন প্রভু। আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'মা, তুমি উতলা হয়ো না। শুধু কৃষ্ণকে স্মরণ করো। তা হলেই আমাকে পাবে কোলের কাছে।' 'প্রভু বলে মাতা দুঃখ না ভাবহ মনে। সর্বসিদ্ধি হইবেক কৃষ্ণ আরাধনে॥ যদি শ্রদ্ধা আমা প্রতি আছে সবাকার। কৃষ্ণ ভজ তবে সঙ্গ পাইবে আমার॥'

চারজন সঙ্গী নিলেন মহাপ্রভু। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ দত্ত আর দামোদর। কিন্তু পথে পা বাড়িয়েছেন কী, বহু বৈষ্ণব ভক্ত পিছু নিল। আমাদেরও সঙ্গী করো। আমাদের ফেলে যেও না।

'বলেছি তো, ঘরে গিয়ে কৃষ্ণ নাম গান করো।' ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন মহাপ্রভু, 'আমার বিরহে দুঃখ পাবে ভেবেছ? কেউ দুঃখ পাবে না। কৃষ্ণকীর্তনে ডুবলে কারু দুঃখ থাকে না। তোমাদের তো আমি বৃহৎ সম্পত্তিই দিয়ে গেলাম। আর দেখবে যখনই কৃষ্ণভজন করবে, আমি তোমাদের কোলে বসে আছি।' 'কাহারো হৃদয়ে নাহি রবে দুঃখশোক। সঙ্কীর্তন-সমুদ্রে ডুবিবে সর্বলোক॥ কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচী। যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি॥'

তোমার পথ আর কে নিরোধ করতে পারে বলো। যখন নীলাচলে চিত্ত তোমার স্থির হয়েছে, সাধ্য নেই কেউ তোমাকে নিবৃত্ত করে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন তোমার কিঙ্করের কিঙ্কর। দুর্ঘট সময় হোক, উড়িষ্যার রাজায় আর বাঙলার নবাবে বিবাদ হোক, তাতে তোমার কী! আমরা ফিরে যাচ্ছি। তুমি সুখে থাকো। তোমার ইচ্ছায়ই সব হচ্ছে। তোমার ইচ্ছার জয় হোক।

'যে করেন মনে কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয়॥
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে।
তাহা বই আর কেহো করিতে না পারে॥'

একমাত্র কৃষ্ণভক্তরাই ভক্তিরস আস্বাদন করতে পারে। যারা অভক্ত, তাদের পক্ষে ও রস-আস্বাদন অসম্ভব। যাদের ভক্তি বিষয়ে আদর নেই, যারা ফল্গুবৈরাগ্য ধারণ করেছে, যারা শুষ্ক জ্ঞানের অভ্যাসে তৎপর, যারা তার্কিক, কর্মকাণ্ডপরায়ণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মসন্ধানী, তারা এ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত। যাদের চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণপদাম্বুজই যাদের সর্বস্ব, তাদেরই এ রসে অধিকার। নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞানও নিরর্থক, যদি তা ভক্তিবর্জিত থাকে। 'কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে। কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥' যারা শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ, তাদের মায়ামুক্তি জ্ঞানের সাহায্য ছাড়াই হতে পারে। ভক্তি পরমস্বতন্ত্রা। ভক্তিরেব ভূয়সী। ব্রহ্মা তাই কৃষ্ণকে বলছে, মঙ্গলহেতুভূতা তোমাতে ভক্তি ছেড়ে যারা জ্ঞানের জন্যে ক্লেশ স্বীকার করে, তারা অন্তঃসারহীন স্থূল তুষকেই আঘাত করে। অর্থাৎ তাদের ভাগ্যে তণ্ডুল জোটে না, তাদের পরিশ্রমই সার।

বঙ্গদেশের শেষপ্রান্তে সাগরসঙ্গমের কাছে ছত্রভোগের দিকে যাত্রা করলেন মহাপ্রভু। ডায়মণ্ডহারবারের দিকে জয়নগর-মজিলপুরের কাছাকাছি গ্রাম এই ছত্রভোগ। এখানে বিরাজমান অম্বুলিঙ্গ মহাদেব।

[ক্রমশঃ।

রবীন্দ্র সংগীত

রত্নাবলী সেনগুপ্ত

যেন এই বেদনার
অন্তহীন নদী পার হ'য়ে
সে কোন মায়াবালোকে
উষার বর্ণালী,
মৌন চরাচরে ভাসে
পাখীদের আনন্দ কূজন
নিখিলে কোথায় বাজে
কার করতালি।

কোন্ বনফুল গন্ধে
আমোদিত মন
কুয়াশায় অন্তরালে
সে কোন ভুবন?
আমরা উপনীত হই
সেইখানে
গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্তে ও শীতে
অফুরান জ্যোতির্ময় রবীন্দ্র সংগীতে।
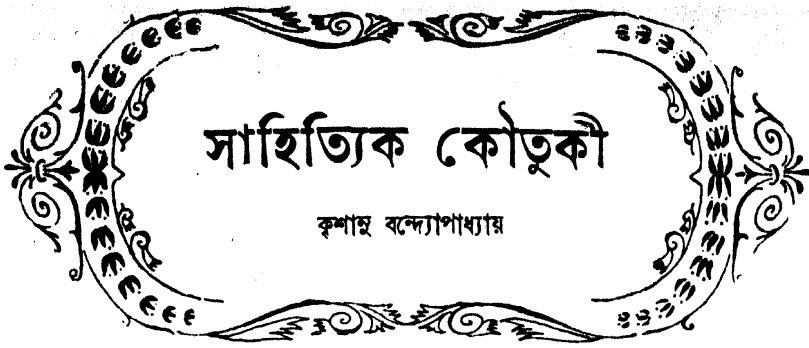
সাহিত্যিক কৌতুকী

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

এক সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে একটি ক্লাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ ক্লাবটির নাম দিয়েছিলেন "খাম-খেয়ালী মজলিস।" মাসে বার চারেক করে মজলিসের সভা বসত। খাম-খেয়ালী ভাবে সাহিত্য আলোচনা, সঙ্গীতচর্চ্চা, নাটকাভিনয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা চলত সেখানে। কিন্তু প্রচ্ছন্ন ভাবে এই মজলিসের আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল। তা হল, বিলাত-ফেরৎদের উৎকট সাহেবীয়ানা দূর করা।

একদিন "খাম-খেয়ালী মজলিসের" আসর বসেছে কিন্তু গুরুগম্ভীর আলোচনার পরিবর্ত্তে সভ্যরা সকলেই কেমন চিন্তিত ভাবে বসে রয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অস্থির ভাবে ঘরময় পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। ব্যাপার যা ঘটেছে, তা সামান্য হলেও বিরক্তিকর। রবীন্দ্রনাথ একজন ঘোর সাহেব ভদ্রলোককে মজলিসে যোগ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ভদ্রলোক সম্প্রতি বাড়ীবদল করার দারোয়ান তাঁকে সেখানে পায়নি। সেখানে তখন বাস করছেন অন্য একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। বৃদ্ধটি দারোয়ানের হাত থেকে নিমন্ত্রণ-পত্রটি প্রায় কেড়ে নিয়ে বলেছেন,—"ও রবীন্দ্রবাবুর নিমন্ত্রণ? বেশ বেশ। অবশ্য যাঁর নিমন্ত্রণ-পত্র তিনি বাড়ী বদলেছেন। তা হোকগে, আমি যাব এখন। তুমি রবিবাবুকে বোলো আমি ঠিক সময়ে আসবো।" দারোয়ানের মুখ থেকে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সভ্যরা এই সংবাদ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। ওই বৃদ্ধটি সত্যি এসে উপস্থিত হলে কি হবে, এই চিন্তায় সকলে অস্থির। যে লোক বিনা-দ্বিধায় গায়ে প'ড়ে নিমন্ত্রণ নিতে পারে, সে যে কি ধরণের ভদ্রলোক, তা বেশ অনুমান করা যাচ্ছে। মাঝ থেকে আজকের মজলিসটাই মাটি হল।

যাঁকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে এই বিপত্তি, সেই ঘোর সাহেব ভদ্রলোকটিও মজলিসে উপস্থিত রয়েছেন। তাঁকে পরে নতুন ঠিকানায় নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠান হয়েছিল।

শেষে রবীন্দ্রনাথ সেই সাহেব ভদ্রলোককে বললেন,—"আপনি সময় মত নতুন ঠিকানার কথা জানালে আর এই কাণ্ডটি ঘটত না। কাজেই শাস্তি স্বরূপ আজ আপনাকেই রবীন্দ্রনাথ সেজে host-এর কাজ করতে হবে।"

প্রথমে আপত্তি করে শেষে ভদ্রলোক এই প্রস্তাবে রাজী হলেন।

কিছুক্ষণ পরে নীচে একটা ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল। সকলে জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখলেন, তৃতীয় শ্রেণীর একটা ঘোড়ার গাড়ী থেকে ময়লা বালাপোষে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঢেকে এক বৃদ্ধ নামলেন। গ্যাসের আলোয় অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পয়সা গুণে গাড়োয়ানের হাতে দিলেন।

মজলিসের সকলেই বুঝলেন সেই আপদ এসে পৌঁচেছে।

তারপর চটি ফট ফট করে বৃদ্ধভদ্রলোক উপরে উঠে এলেন। ঘরের দরজার গোড়ায় এসে উঁচু গলায় বললেন,—চটিজোড়া কোথায় রাখব?

জাল রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে গিয়ে, তাঁকে কাদা মাখানো ছেঁড়া-চটি পরেই ঘরে প্রবেশ করতে বললেন।

সপ্রতিভভাবে বৃদ্ধ সকলের মাঝখানে গিয়ে বসে বললেন,— "তোমারই নাম রবিঠাকুর? শুনেছি তুমি বেশ ভাল পদ্য লেখ। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে কোথায় আলাপ হয়েছিল বল দেখি?...অমুক জায়গায় কি?"

বৃদ্ধ এমন কতকগুলি জায়গার নাম করলেন, যেখানে আসল রবীন্দ্রনাথ জীবনে যাননি। এরপর সেই জাল রবীন্দ্রনাথকে ছিনা-জোঁকের মত ধরে রইলেন বৃদ্ধ। তাঁর সেকেলে রসিকতায় বিপর্য্যস্ত করে তুললেন ভদ্রলোককে। সমবেত মজলিসের সভ্যরা বৃদ্ধের কাণ্ডকারখানায় স্তম্ভিত। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে ঘোর সাহেব ভদ্রলোকটি রবীন্দ্রনাথকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে করজোড়ে বললেন,— দোহাই আপনার, এ-মুস্কিল আসান করুন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন,—তাও কি সম্ভব? আপনি যখন ঝোঁক সেজেছেন, তখন এতদূর এসে ঝেড়ে ফেলবেন কি ভাবে? সহ্যকরা ছাড়া উপায় কি?

অগত্যা আবার রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাতে অভিনয় চালিয়ে যেতে হল তাঁকে। এক সময় তিনি গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পাশে এসে বসলেন এবং আলবোলায় তামাক খেতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাছোড়বান্দা বৃদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে নিতান্ত অশিষ্টভাবে আলবোলার নলটা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললেন,—"এতক্ষণ তামাক না খেয়ে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছে। আঃ—বেশ তামাকটি ত।"

ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত হল। সকলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে আরম্ভ করলেন। বৃদ্ধের ভয়ে ঘোর সাহেব ভদ্রলোক আগে ভাগেই নীচে নামার উপক্রম করলেন। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়।

বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠলেন,—"ওগো রবিবাবু, আমায় ফেলে তুমি যাচ্ছ কোথায়? আমি তোমাকে ধোরে ধোরে নীচে নামতে চাই।"

সুতরাং ভদ্রলোককে থামতে হল। বৃদ্ধ এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। নীচে নামতে নামতে রসিকতার ফোয়ারা চলল। বৃদ্ধের

ব্যবহারে সকলে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। কিন্তু উপায় কি—। সকলে একে একে খাবার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। এক একটি চেয়ার অধিকার করলেন এক একজন। প্রশস্ত ডাইনিং টেবিলের উপর নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত।

বৃদ্ধ সমস্ত দেখেশুনে বললেন,—"গিন্নী বলে দিয়েছেন তাঁর জন্যে ভাল খাবার কিছু ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যেতে। একখানা সরা চাই মশাই—এখনই চাই। কোন জিনিষ উচ্ছিষ্ট হবার আগে চাই। কারণ, গিন্নী প্রত্যহ পূজা-আহ্নিক করেন কিনা।"

সরা এলো। বৃদ্ধ নিজের দুপাশের অতিথিদের পাত থেকে টপাটপ করে মিষ্টি তুলে সরা বোঝাই করলেন। অতিথিরা সকলে ধৈর্য্যের শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছেন।

ঠিক এই সময় এই বিরক্তিকর পরিস্থিতির নাটকীয় ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটল। বৃদ্ধ মিষ্টির সরা মাটিতে নামিয়ে রেখে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—"মহাশয়গণ, আমাকে মাপ করবেন। আপনাদের এতক্ষণ ধরে যথেষ্ট বিরক্ত করেছি—আর নয়।" কথাটা শেষ করেই তিনি নিজের গায়ের ময়লা বালাপোষটি দূরে ফেলে দিয়ে এবং নিজের চাপ দাড়িটা খুলে ফেলতেই সকলে অবাক বিস্ময়ে দেখলেন—বৃদ্ধ আর কেউ নয়—সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। সকলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

ক্রমে জানা গেল, "খামখেয়ালী মজলিসে" একটা অভিনব আমোদ সৃষ্টি করবার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ অর্দ্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে পরামর্শ করে এই অপূর্ব্ব অভিনয়টির ব্যবস্থা করেছিলেন।

* * *

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'বিচিত্রা'র এক বিশেষ অধিবেশনে শরৎচন্দ্র এসেছেন। তিনি কার মুখে যেন শুনলেন, ঘরের বাইরে জুতো খুলে রাখলে নাকি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সেদিন আবার শরৎচন্দ্র নতুন জুতো পরে এসেছিলেন। অগত্যা তিনি বারান্দার একধারে গিয়ে খবর কাগজ দিয়ে জুতো জোড়াটি মুড়লেন। তারপর মোড়কটি হাতে নিয়ে সভায় রবীন্দ্রনাথের সামনে এসে বসলেন।

একসময় রবীন্দ্রনাথ মোড়কটির দিকে তাকিয়ে বললেন,—শরৎ ওটা কি?

একটু ইতস্ততঃ করে শরৎচন্দ্র বললেন,—আজ্ঞে, আছে একটা জিনিষ।

আবার প্রশ্ন করলেন রবীন্দ্রনাথ, কি জিনিষ শরৎ? বই টই নাকি?

শরৎচন্দ্র মাথা চুলকাতে লাগলেন।

রবীন্দ্রনাথ এবার হাসতে হাসতে বললেন,—কি বই শরৎ, পাদুকা-পুরাণ বুঝি?

সভার সকলে উচ্চ হাস্য করে উঠলেন।

* * *

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ক্লাস নিচ্ছেন। তাঁর পড়াবার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। তিনি যা পড়াতেন, ছাত্রদের মনে তা গাঁথা থাকত।

সেদিন শান্তিনিকেতনে কয়েকজন বেড়াতে এসেছেন। তাঁরাও দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। ক্লাস শেষ হবার পর কথা প্রসঙ্গে এক ভদ্রলোক বললেন, ছেলেরা ত খুব receptive দেখছি। খুব সহজেই এরা আপনার ইঙ্গিতে respond করল।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই, বাঙ্গালী ছেলের intellect দেখে। ভারতবর্ষে অনেক জায়গায় পড়িয়েছি কিন্তু ছেলেদের এত সহজে সাহিত্যের ভাষা ও ভাব আয়ত্ব করতে দেখিনি।

—আপনার পড়াবার পদ্ধতিও অতি চমৎকার। আপনি নিজে কোনদিন ভাল করে স্কুলে পড়লেন না। এখন পরের ছেলে নিয়ে—.

রবীন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বললেন, প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্ত!

* * *

রামকৃষ্ণ একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ীতে এলেন। দু'জনের দেখা হল।

রামকৃষ্ণ বললেন, আজ সাগরে এসেছি; কিছু রত্ন নিয়ে যাব।

বিদ্যাসাগর হেসে উত্তর দিলেন, কিন্তু এ সাগরে নোনাজল ভিন্ন আর কিছুই পাবেন না।

* * *

টলষ্টয়ের সঙ্গে কয়েকজন দেখা করতে এসেছেন। নানা রকম কথাবার্ত্তা হচ্ছে তাঁদের সঙ্গে লেখকের। হঠাৎ একজন প্রশ্ন করলেন, মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার অভিমতটা এখন বলবেন কি?

সারা মুখ হাসিতে ভরিয়ে টলষ্টয় বললেন, যখন আমার একটা পা থাকবে কবরে তখন আমি মেয়েদের সম্বন্ধে পুরো সত্যি কথা বলব। আমি বলব এবং বলেই আমার কফিনে লাফিয়ে পড়ব—পড়েই ঢাকা দিয়ে দেব আপাদ-মস্তক।

* * *

আলেকজাণ্ডার ডুমা অত্যন্ত দ্রুত-লিখতে পারতেন এবং লিখতেনও প্রচুর। তবু প্রকাশকরা তাঁকে লেখার জন্যে তাগাদা দিতে কসুর করতেন না।

এমনি একজন প্রকাশক তাঁর একখানা উপন্যাস হস্তগত করার পরও আবার চিঠি দিলেন। চিঠিতে লেখাছিল "?"।

সঙ্গে সঙ্গে ডুমা উত্তর দিলেন। প্রকাশক খাম থেকে চিঠি বার করে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে "!"।

* * *

ষ্টালিনের সঙ্গে বার্ণার্ড-শ ও লর্ড এ্যাষ্টারের কথা হচ্ছে।

শ বললেন, চার্চ্চিলকে আমন্ত্রণ জানান সম্ভব কি?

ষ্টালিন বললেন, মিঃ চার্চ্চিল অবশ্যই বেসরকারী ভাবে আসতে পারেন। তাঁকে সমস্ত কিছু দেখবার সুযোগ দেওয়া হবে।

লর্ড-এ্যাষ্টার বলে উঠলেন, যদিও ইংলণ্ডের সংবাদপত্র সোভিয়েট-বিরোধী, তবে ইংলণ্ডে সোভিয়েটের প্রতি যথেষ্ট শুভেচ্ছা আছে।

শ বললেন, আপনি অলিভার ক্রমওয়েলের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? আয়ার্লণ্ডে ক্রমওয়েল সম্বন্ধে একটা শাখা আছে। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে উপদেশ দিয়েছিলেন—

Put your trust in god, my boys.
And keep your powder dry.

অর্থটি হৃদয়ঙ্গম করে মৃদু হেসে ষ্টালিন বললেন, রাশিয়ার বারুদ যথেষ্ট শুকনো রাখা হয়।

* * *

একদিন বিকেলে চার্চ্চিল এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। রাত্রে তাঁর আবার রেডিওতে বক্তৃতা আছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে

তিনি চালককে বললেন, তুমি B. B. C. র ষ্টুডিওর সামনে অপেক্ষা করলে, আমি রাত্রে তোমায় গাড়ীতেই ফিরতে পারি।

—আপনাকে অন্যগাড়ী দেখতে হবে স্যার।

—কেন ?

—রাত্রে রেডিওতে মি: চার্চ্চিলের বক্তৃতা আছে। আমাকে বাড়ী গিয়ে তাই শুনতে হবে।

চার্চ্চিল মহা খুশী হলেন এবং বুঝলেন চালকটি তাঁকে চিনতে পারেনি। তিনি আনন্দের ঝোঁকে পকেট থেকে কিছু বেশী অর্থ বার করে তার হাতে দিলেন। এবার নোটগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে চালকটি বলল,—বেশ, আমি তাহলে B. B. C-র সামনেই অপেক্ষা করব। চার্চ্চিলের বক্তৃতা তোলা থাক এখন।

* * *

বৈশাখ মাসের দুপুর বেলা। ভাগলপুরের প্রচণ্ড গরমে মানিক সরকার রোডে এক ডাক পিয়ন হয়রান হয়ে ঘুরছে। একটা খামে মোড়া চিঠির মালিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাঙ্গালী দেখলেই পিয়ন তাই প্রশ্ন করছে, কহিয়ে তো বাবুজী, মচ্ছর চন্দর চ্যাটার্জ্জী কোন হ্যায় ?

কেউ আর বলতে পারে না। শেষে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক পিয়নকে পরামর্শ দিলেন Not found লিখে চিঠিখানা ফেরৎ দিতে। এই সময় শরৎচন্দ্র সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে ও চিঠিখানা দেখে বললেন, এ চিঠি আমার ছোটমামা লিখেছেন।

বৃদ্ধ বললেন, কিন্তু মচ্ছরচন্দ্র কে হে ?

—মচ্ছরচন্দ্র নয়, মৃচ্ছরচন্দ্র।

—সর্ব্বনাশ। তাই বা কে ?

—আমি।

—তুমি! তার মানে ?

মৃদু হেসে শরৎচন্দ্র বললেন, ছোটমামা ব্যাকারণে খুব পাকা কিনা, তাই শ্রীমৎ আর শরৎচন্দ্র এই দুটি শব্দের সন্ধি করে শ্রীমচ্ছরচন্দ্র করেছেন।

* * *

মার্কটোয়েনের বাড়ীতে বই আর বই। সমস্ত ঘরগুলির মেঝের উপর স্তূপাকার হয়ে রয়েছে বইগুলি। একদিন এক পরিচিত ব্যক্তি টোয়েনকে প্রশ্ন করলেন, আপনার এত বই অথচ বুককেশ নেই কেন ?

হাসতে হাসতে টোয়েন বললেন, তুমি কি জাননা যে, বই ধার করা কত সহজ আর বুককেশ ধার করা কত শক্ত।

* * *

বার্ণাডশ'র এক বিরাটবপুওয়ালা বন্ধু একদিন বললেন, বাইরের লোকে তোমাকে দেখলে ভাববে, ইংলণ্ডে বুঝি দুর্ভিক্ষ হয়েছে।

শ' অলস কণ্ঠে উত্তর দিলেন, তারা সঙ্গে সঙ্গে তোমায় দেখবে আর বুঝতে পারবে দুর্ভিক্ষের কারণটা কি।

* * *

মানিকতলার বোমার মামলা চলেছে তখন আলিপুর কোর্টে। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ইত্যাদি তখন সকলেই জেলে। জেলে তাঁদের উপর অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করা হত। এমনকি, মাথায় তেল পর্য্যন্ত মাখতে দেওয়া হতনা। সকলেরই উস্কখুস্ক রুক্ষ মাথা। শুধু শ্রীঅরবিন্দের মাথা তেল-চকচক করছে। একদিন সাহস করে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনি স্নান করার সময় মাথায় তেল দেন ?

শ্রীঅরবিন্দ মৃদু কণ্ঠে বললেন—আমি স্নান করিনা।

—আপনার চুল তবে এত চকচক করছে কেন ?

—আমার শরীর থেকে চুল ফ্যাট টেনে নেয়।

* * *

ছুটিতে দেশের বাড়ীতে গেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বিকেল হয়েছে। সদরঘাটের সামনে বসে আছেন তিনি। আরো অনেকে আছেন। দৌহিত্র দুজনও রয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি বই পড়া হচ্ছে তোমাদের ? দুজনই একসঙ্গে বলল, ভূগোল, ইতিহাস—

—ভারতের চৌহুদ্দে কি বল দিকি ?

ছেলে দুটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—ভারতের চারিদিকের সীমানা কি বল।

কোন উত্তর নেই।

—বাউণ্ডারি-লাইন কি ভারতের বলতে পার ?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাওয়া গেল। জলের মত মুখস্ত বলে গেল ছেলে দুটি ভারতের বাউণ্ডারি সম্বন্ধে।

ভারী গলায় রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, মাছ-কাটা বঁটি দিয়ে কাটতে হয় মাষ্টারদের গলা। বুঝিয়ে না দিয়ে শুধু মুখস্ত করান—।

* * *

আর্থার কোনান ডয়েল নিজেই নিজের একটি নাটকের রিহার্সাল চালাচ্ছেন। তরুণ চার্লি চ্যাপলিন (তখন অখ্যাত) এই নাটকে একটি কমিক পার্ট পেয়েছেন। তাঁর মাইনে সপ্তাহে তিন পাউণ্ড। চ্যাপলিনকে ভাল লাগে ডয়েলের। অবসর সময়ে তাঁর সঙ্গে গল্প করেন তিনি।

একদিন চ্যাপলিন বললেন, স্যার আমার সঙ্গে একটা চুক্তি করবেন ? আজকে যদি আপনি আমার মাইনে ডবল করে দেন, আমি লিখিত ভাবে চুক্তি করতে পারি, আমি আমার ভবিষ্যতের আয়ের অর্দ্ধেক আপনাকে দেব।

কোনান ডয়েল ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, এত বোকা পৃথিবীতে কাউকে পাবেনা।

* * *

একদিন অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন,—দাদা, আপনার সমস্ত বইয়ের মধ্যে আপনার কোনখানা ভাল বলে মনে হয় ?

কিছুমাত্র চিন্তা না করে শরৎচন্দ্র বললেন, "নববিধান"। তোমার কোনখানা ভাল লাগে ?

কিছুমাত্র চিন্তা না করে অসমঞ্জও বললেন, আমারও "নববিধান"।

শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন, বুঝতে পেরেছি। আসল কথাটা বলি তা হোলে। "নববিধান"কে বড় একটা কেউ আদর করে না, তাই ওই অনাদরের বইখানাকে আমি একটু আদর দিয়ে নাম করলুম।

* * *

বার্ণাড শ'র Heart break House নাটকটি তেমন জমছিল না। সারা সপ্তাহের বিক্রী মাত্র ৫০০ পাউণ্ড। কর্তৃপক্ষ শেষটা অভিনয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এর পরই বার্মিংহামের রেপার্টরী থিয়েটার-এর ব্যারী জ্যাকসন যখন নাটকটি আবার মঞ্চস্থ করলেন, তখন শ' অবাক না হয়ে পারলেন না। এমন কি,

একদিন ম্যাটিনি শো দেখতে এলেন তিনি। অভিনয়ের শেষে ব্যারি জ্যাকসন বললেন, আপনার Back to Methuselahর অভিনয়ের অনুমতি দিন?

শ বললেন, তোমার পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের কিছু সংস্থান করা আছে?

—সব ব্যবস্থা ঠিক করা আছে।

—তথাস্তু।

* * *

লণ্ডনের এক বিখ্যাত অপেরায় আইনষ্টাইন তাঁর এক পদার্থ-বিজ্ঞাবিৎ বন্ধুকে নিয়ে অনুষ্ঠান দেখতে গেছেন। তাঁদের একপাশে বসেছেন এক ধনবতী মহিলা। অনুষ্ঠান বিরতির সময় মহিলাটি দেখলেন, আইনষ্টাইন ও তাঁর বন্ধু একটা খাম নিয়ে নিজেদের মধ্যে দেওয়া নেওয়া করছেন এবং প্রতিবারই খামের পেছন দিকে তাঁরা কিছু লিখে দিচ্ছেন।

মহিলাটি সহজেই অনুমান করে নিলেন, অঙ্কের কোন ফরমূলা খামের উল্টো দিকের শাদা অংশে লেখা হচ্ছে। এদিকে খামের আদান প্রদানের বিরাম নেই। শেষে মহিলাটি আর ধৈর্য্য রাখতে পারলেন না, তাঁদের দিকে ঝুঁকে দেখবার চেষ্টা করলেন আইনষ্টাইন Theory of relativityর মত নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন কিনা।

অবশ্য ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আইনষ্টাইন তখন তাঁর সঙ্গীটির সঙ্গে tick-tack-toe খেলছিলেন।

* * *

অন্নদাশঙ্কর রায় তখন লণ্ডনে।

এই সময় কোন এক সান্যাল আত্মহত্যা করেন এক বোর্ডিং-হাউসে। আত্মহত্যার কথা নিয়ে প্রচুর জল্পনা-কল্পনা চলেছে অন্নদাশঙ্কর ও বন্ধুদের মধ্যে। এমন সময় নলিনাক্ষ সান্যাল এলেন সেখানে, কেমন একটা মনমরা ভাব তাঁর। অন্নদাশঙ্কর প্রশ্ন করলেন, এত বিমর্ষ কেন? মুখে নেই হর্ষ কেন?

নলিনাক্ষ বললেন, কে একজন সান্যাল আত্মহত্যা করেছে। খবর কাগজে পড়ে দেশের লোক ভেবে নেবে আমিই সেই সান্যাল। কাজেই গাঁটের কড়ি খরচ করে তার করে দিতে হল গোটা কয়েক, আমি সেই সান্যাল নই যে আত্মহত্যা করেছে।

* * *

ইরাকের সুপ্রসিদ্ধ লেখক মালি সুলেমান বাগদাদের এক সভায় গিয়েছিলেন বক্তৃতা দিতে। বক্তৃতার বিষয় বস্তু ছিল, সদ্য প্রকাশিত তাঁরই যুগান্তরকারী বই "দেশে আর তস্কর নেই" সম্বন্ধে।

কিন্তু সভা থেকে তিনি বাড়ী ফিরে এসে দেখলেন, চোরে সমস্ত তচনচ করে গেছে। একটি মূল্যবান জিনিষও রেখে যায়নি।

যমজ কেন হয়?

যমজ কেন হয়—এ সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত মতামত দিতে না পারলেও, সতর্ক পর্যবেক্ষণের ফলে যমজ ছেলে-মেয়েদের কয়েকটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের কথা জানা গিয়েছে।

সাধারণতঃ দেখা যায় যমজ শিশুদের আকৃতি ও প্রকৃতি এক ধরণের হয়, এমন কি, অনেক ক্ষেত্রেই এই মিল এত বেশী থাকে যে, একজন থেকে আরেকজনকে আলাদাভাবে চেনাও দুষ্কর হয়ে ওঠে, এবং সেজন্যই রামকে শ্যাম বলে ভুল করা মোটেই অসম্ভব নয়। এক এক জায়গায় আবার এই ধরণের যমজ যুগলের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরণের মানসিক একাত্মতাও চোখে পড়ে; সে সব ক্ষেত্রে যমজদ্বয়ের আকৃতি-প্রকৃতিই শুধু একরকমের হয় না, তাদের অনুভূতিও একই সময়ে একই ধারায় চালিত হয়। এই প্রসঙ্গে দুটি বিদেশী তরুণীর কথা উল্লেখযোগ্য। ডারহাম শহরের শ্রীমতী জরাথি ক্লিফ ও শ্রীমতী মেরি মিউস্ দুটি যমজ সহোদরা; জরাথি গর্ভবতী হলে পর মেরির দেহেও সমস্ত রকম গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে—যদিও ডাক্তারী পরীক্ষায় পরে তা মিথ্যা সপ্রমাণিত হয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও মেরি পুরো নয়মাস কাল অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যগুলি সমস্ত ভোগ করে, এমন কি, জরাথির প্রসব বেদনা অবধি ঠিক একই সময়ে মেরিকেও ভোগ করতে দেখা যায় সমভাবেই।

বিজ্ঞানে এ সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট সমাধান পাওয়া যায় না এবং সেজন্যই যমজদের এই মানসিক একাত্মতাকে সচরাচর টেলিপ্যাথীক মনঃসঞ্চালনকারিতার প্রভাবাধীন বলে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে।

ক্যালিফর্ণিয়ার দুই যমজ ভ্রাতা চার্লস ও জো ক্রেলের উদাহরণ আরও কৌতূহলোদ্দীপক; এই দুটি ভাই একই সঙ্গে লালিত পালিত হয়, চার্লস উত্তরজীবনে সুপিরিয়র কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়। শিক্ষাবস্থায় বিদ্যালয়ে এই দুই ভাইয়ের লিখন ও পঠনরীতি নাকি অবিকল এক ছিল, কোন প্রশ্নের উত্তর তারা এমন ভাবে দিত যে, শিক্ষকরা প্রায়ই সন্দেহাকুল হয়ে উঠতেন। এবং এটাকে হাতেনাতে পরখ করার জন্য একবার প্রধান শিক্ষক তাদের দুজনকে বিভিন্ন কক্ষে সতর্ক প্রহরার মধ্যে বসিয়ে একই প্রশ্নপত্র উত্তর করতে বলেন, তাদের লেখা শেষ হলে পর দুজনের খাতা মিলিয়ে দেখা যায় যে, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণভাবে অভিন্ন, এমন কি, একজনের বানানভুলটি পর্যন্ত অপরের লেখায় প্রতিফলিত।

এই অভিন্নতা যে ঠিক কেন দেখা দেয়, এ সম্পর্কে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা যদিও সুনির্দিষ্ট কোন উত্তর দিতে পারেন না, তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে যে দেখা দেয় সে সম্বন্ধে তাঁরা একটা সুনিশ্চিত অভিমত দিয়ে থাকেন। বিশেষজ্ঞদের মতে যে সব যমজ সন্তান ডিম্বাশয়ে একটি ডিম্ব ও একটি শুক্রকীটের মিলনে উৎপাদিত, তাদেরই আকৃতি-প্রকৃতি ও মানসিক একাত্মতাতে সামগ্রিক মিল থাকে, অপর পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন শুক্রকীট ও ডিম্বের মিলনে উদ্ভূত যমজের ক্ষেত্রে এই অভিন্নতা দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম এবং এই শেষোক্ত শ্রেণীর যমজ শিশুদের মধ্যে সাতোদর ভাই-বোনের ভিতর যে সাদৃশ্যটুকু প্রায় সর্বত্রই লক্ষণীয়, মাত্র সেটুকু সাদৃশ্য থাকাই সম্ভবপর। এইজন্যই অনেক যমজ সন্তান যেমন একে অন্যের হুবহু প্রতিমূর্ত্তি হয়, অনেকে আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতির ও প্রকৃতির হয়ে থাকে।

বিজ্ঞান আজ অনেকদূর অগ্রসর হলেও, আজও যে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ জয় করতে সমর্থ হয়নি, যমজ শিশুর আবির্ভাব তারই এক অকাট্য প্রমাণ, স্বাভাবিক রীতির বিরুদ্ধে প্রকৃতি যেন মাঝে মাঝে প্রতিবাদ জানায় রঙ্গভরে, এবং সেজন্যই অনেক সময় প্রকৃতির নিয়মে এত খামখেয়ালের নিদর্শন পাওয়া যায়।

যমজ শিশুও সেই খামখেয়ালেরই আর এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

হিন্দু সম্মেলন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডাঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতভূমিতে আক্রমণঃ পাকিস্তান ও চীন

হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পরের ঘৃণার উপর ভারত ও পাকিস্তান গঠিত হইয়াছে। আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমাদের ঐক্য হারাইয়াছি। বৃটিশ জনগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছে। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ায় হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা আরও জটিল ও ক্ষতিকর হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু দেশ বিভাগে সম্মতি দেন, পরে (১৬ই অক্টোবর, ১৯৪৯) স্বীকার করেন যে, যদি তিনি পরিণাম বুঝিতে পারিতেন, তবে পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করিতেন। বর্ত্তমানে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে কলহ অব্যাহতভাবে চলিতেছে।

ভারত সীমান্তে পাকিস্তানের হানা দেওয়ার কথা আমরা কার্য্যতঃ প্রতিদিন সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া থাকি। পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ইতিমধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসাপূর্ণ বক্তৃতা সুরু করিয়া দিয়াছেন। এই ভদ্রলোক সেদিনও একজন মিলিটারী জেনারেল ছিলেন, রাতারাতি একজন রাজনীতিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছেন এবং পণ্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধে অস্বীকার ও অসম্মতি এবং ডিগবাজি খাওয়ার অভিযোগ করিয়া অন্য দেশের চক্ষে ভারতকে হেয় করিতেছেন। অবশ্য তাঁহার বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতা আছে। তিনি ইচ্ছামত যাহা খুসি বলিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার নিন্দাবাদ অপর দেশে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাহা তিনি বিবেচনা করেন না। ভারতের আত্মবলিদানমূলক সহনশক্তি সত্ত্বেও তিনি নির্লজ্জভাবে বলিতে পারেন যে, পাকিস্তান ভারতের প্রতি বন্ধুত্বের হাত সম্প্রসারিত করিয়াছিল, ভারত তাহা গ্রহণ করে নাই। প্রেসিডেণ্ট বলিয়াছেন যে, কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে কোন শান্তি হইবে না। ইহার দ্বারা তিনি কি বলিতে চাহেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

কাশ্মীর কি ভাবে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়াছে তাহা সুবিদিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইবার পর বৃটিশ সরকার ও ভারতীয় জনগণের মধ্য মীমাংসার আলোচনা করিবার জন্য স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস ভারতে আসেন। তিনি কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ভারতীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, দেশীয় নৃপতিবৃন্দ স্বাধীনভাবে নিজেদের ভবিষ্যৎ স্থির করিতে পারেন। পাকিস্তান অথবা ভারতে যোগ দিবার ইচ্ছামত অধিকার তাঁহাদের থাকিবে এবং বৃটিশ সরকার এই বাছাই করার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই বিষয়টি তিনি সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি কাশ্মীরের মহারাজাকেও এই কথা বলেন। তাঁহার আশ্বাসের উপর বিশ্বাস করিয়া কাশ্মীরের মহারাজা কোন্ রাষ্ট্রে যোগ দিবেন তাহা স্থির করেন এবং কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়। সুতরাং কাশ্মীরের প্রতি ইঞ্চি জমি ভারতের। দুর্ভাগ্যক্রমে, পাকিস্তান বে-আইনী ভাবে ও কোন যুক্তি ব্যতীত ভারতের এক অংশ জমি দখল করিয়াছে ও তাহা নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। যে সময়ে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এই জমি পুনরুদ্ধার করিতে পারিত, তখনই দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি হয় ও জমি ফিরিয়া পাওয়া যায় নাই।

কাশ্মীরের একাংশ বে-আইনীভাবে পাকিস্তানের দখলে রহিয়াছে। সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর, যাহা এখন ভারতের অংশ, তাহাও কি পাকিস্তান গ্রাস করিতে চায়? অথবা এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দুইটি রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইবে? সম্প্রতি কাশ্মীর মুসলিম লীগ সম্মেলনের সভাপতি অজুহাত তুলিয়াছেন যে, আজাদ কাশ্মীর সরকারকে স্বীকার করিতে হইবে। 'আজাদ কাশ্মীর সরকারকে' সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীরের বৈধ সরকার হিসাবে স্বীকার করিবার জন্য তিনি পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। বিস্তারিত কিছু না জানাইয়া গত ২০শে আগষ্ট লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, বহু দেশ (কান্?) 'আজাদ কাশ্মীর সরকারকে' কাশ্মীরের জনগণের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক এবং 'আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে সাম্প্রতিক পরিবর্ত্তনের' ফলে কাশ্মীর সম্পর্কে নীতি সংশোধনের জন্য তিনি পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ করেন। তথাকথিত 'কাশ্মীর মুক্তি আন্দোলন' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, 'আলজিরীয় মুক্তি আন্দোলনের ধরণে সম্ভবতঃ ইহা একটি বাস্তব আন্দোলন হইবে'। (খুব বোধগম্য উপমা নয়)। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমানা চিহ্নিত করার জন্য চীন হইতে পাকিস্তানে যে সীমানা-কমিশন আসিবে, সেই কমিশন যাহাতে নূতন সরকারের সহিত আলোচনা করিতে পারে তজ্জন্য নূতন আজাদ কাশ্মীর সরকার চীনের নিকট হইতে স্বীকৃতি প্রার্থনা করিবে। এই ভদ্রলোক হইতেছেন একজন পাকিস্তানী নেতা। ইতিপূর্ব্বে অপর কোন নেতা এই কমিশন সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নাই। এই বিবৃতি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং বহু লোক মনে করে যে, প্রেসিডেণ্ট আয়ুব কি ভাবে কাশ্মীর প্রশ্ন মীমাংসা করিতে চান, ইহা তাহার আভাষ হইতে পারে। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে ভারত পাকিস্তানকে যতই সুবিধা দিতেছে, পাকিস্তান শান্তির নামে ততই তাহার দাবী বৃদ্ধি করিতেছে। যদি পাকিস্তান মনে করিয়া থাকে যে, ভারত কোন অবস্থাতে শক্তি প্রয়োগ করিবে না, তবে সে ভ্রান্ত। ভারত শান্তি চায়। যুদ্ধ হইতে ভালো কিছু হয় না। যুদ্ধের মাধ্যমে প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায় না, অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে হৃতবুদ্ধিকর বিরোধের মীমাংসা হয় না। শান্তিতে বসবাসের জন্য তাহাদের মধ্যে প্রকৃত ইচ্ছা থাকা চাই। যদি প্রকৃত বিরোধ থাকে, তাহার মীমাংসা সম্ভব। যদি মিথ্যা বিরোধ উত্থাপন করা হয় শুধু বিরোধ উত্থাপনের জন্য, তবে যাহার বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপন করা হয় তাহার সহিত দাবীদারের কোন বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না।

ইহা সুবিদিত যে, মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে পাকিস্তানকে কোটি কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পাকিস্তান তুষ্ট হইলে বন্ধু-ভাবাপন্ন হইবে। সম্প্রতি খালের জল সংক্রান্ত বিরোধ অবসানের জন্ম ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি বিরোধের অবসান ঘটাইবে কিনা, ভবিষ্যতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এমন কি, বেরুবাড়ীর পর পাকিস্তানের অযৌক্তিক দাবী পূরণের জন্ম ভারতের পবিত্র সংবিধানকে পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। পাকিস্তানের অসহায় সংখ্যালঘুদের উপর, বিশেষতঃ খুলনা, রংপুর, সৈয়দপুর এবং গোপালগঞ্জ মহকুমার ৪০টি গ্রামের হিন্দুদের উপর পাকিস্তানীদের অত্যাচার এবং আসামে অগণিত পাকিস্তানীদের অনুপ্রবেশের কথা উল্লেখ করিয়া লাভ নাই।

পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন হইলেও, এই ব্যাপারে এখনও চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ভারত সরকার যে এখনও চূড়ান্ত আঘাত হানার কথা চিন্তা করেন নাই, ইহাকেই পাকিস্তান ভারতের দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করিয়াছে, শান্তিকামনায় ভারতের আন্তরিকতার প্রমাণ হিসাবে নহে।

প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান বলিয়াছেন,—পাকিস্তান ভারতের বিরোধিতার জন্ম বাঁচিয়া থাকিবে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর বিবৃতি আরও প্রগল্ভ। তিনি বলিয়াছেন—কাশ্মীরের প্রশ্নে কোন আপোষ হইবে না। এই সকল বিবৃতি যদি চ্যালেঞ্জ হিসাবে প্রদত্ত হইয়া থাকে, ভারত তাহা গ্রহণ করিবে এবং মোকাবিলা করিতে প্রস্তুত থাকিবে। ভারতও পাকিস্তানের বিরোধিতা করিয়া যাইবে।

ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধের সহিত চীন ও ভারতের বিরোধের পার্থক্য আছে। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে পাকিস্তান ও ভারত পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। চীনের সহিত এই দুটি দেশের সেইরূপ সম্বন্ধ নাই। ভারত ও পাকিস্তানের উত্তরে বিরাট হিমালয়, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে গর্জ্জনশীল মহাসমুদ্র। চীন-ভারত অথবা চীন-পাকিস্তানের ক্ষেত্রে অবস্থা সে রকম নহে। শত্রুর শত্রু হইতেছে বন্ধু, এই নীতিতে পাকিস্তান যদি চীনকে তাহার বন্ধু মনে করে, তবে সে পুনরায় ভুল করিবে।

চীন ভারতের জমিতে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছে। বৃটিশ আমলে ভারত ও চীনের মধ্যে যে সীমারেখা ছিল, তাহা উপেক্ষা করা হইয়াছে এবং সীমানার প্রশ্ন মীমাংসার জন্ম চীন প্রাচীন দলিলপত্রের উল্লেখ করিয়াছে। চীন ঔদ্ধত্যের সহিত ভূগোলকে উপেক্ষা করিতেছে। এই সম্পর্কে কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতার একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি কার্টুনের কথা উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না—কার্টুনের বিষয় হইতেছে হাস্যরত চৌ আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে আলিঙ্গন করিতেছেন। তাঁহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেও, চৌ-এর হাতে একটি ছোরা আছে, উহা তিনি পণ্ডিত নেহরুর পৃষ্ঠে বসাইবার লক্ষ্য করিতেছেন, আর সেই সময় 'হিন্দি-চীনী ভাই ভাই' ধ্বনিতে ভারতের আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চীন ভারতের ভূমিতে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছে। এই আক্রমণের সংবাদ প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষামন্ত্রীর কাছে আসিয়া পৌঁছায়। তাঁহারা কেহই এই কাহিনী বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং ভারতের জনগণকেও এই বিষয়ে কিছু জানান হয় নাই। চীন যখন নিজেই তাহার মৌলিক আদর্শ নষ্ট করিতেছে, তখন সে 'পঞ্চশীল'-এ স্বাক্ষর করিবে, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

আক্রমণের সংবাদ বেসরকারী সূত্র দিয়া ভারতীয় জনগণ ও ভারতের পার্লামেণ্টে আসিয়া পৌঁছায়। জনগণ প্রকাশ্যভাবে বলে যে, দুঃখের বিষয়, পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার জন্ম ভারতের যথোচিত নীতি নাই। তাহারা আরও বলে যে, জরুরী অবস্থায় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্ম সরকারের দূরদৃষ্টি ও আগ্রহ নাই। তাহারা আরও বলে যে 'পঞ্চশীল' নীতি ব্যর্থ হইয়াছে। ভারত যদি 'পঞ্চশীলের' ভিত্তিতে চীনের সহিত চুক্তি না করিত, তাহা হইলে চীন ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে আক্রমণ করিতে সাহস করিত কি না, এবং ভারতের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের একাংশ দখল করিতে সাহস করিত কি না, আমার সন্দেহ আছে। অতীতে তিব্বত ভারতের অংশ ছিল। ইহা একটি স্বয়ংশাসিত অঞ্চলরূপে স্বীকৃত হয়। কিন্তু চীন যখন তিব্বত আক্রমণ করে তখন তিব্বত দখল ও তিব্বতের উপর চীনের অধিরাজ ক্ষমতার সম্মতি দিয়া ভারত চুক্তি করে। বাস্তবিক লোকে বলিতেছে যে, ভারত চীনের তিব্বত দখলে মৌনভাবে সম্মতি দিয়াছে। তিব্বতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সুবিদিত।

চীন ভারতের বন্ধুত্বের পূর্ণ সুযোগ লইয়া আক্রমণ চালাইয়াছে এবং ভারতভূমির একাংশ বেআইনী ভাবে দখল করিয়া আছে। ভারতকে এই জমি পুনরুদ্ধার করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে যত শীঘ্র সে সুস্পষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করে, ততই ভালো।

ভারত ও পাকিস্তানের সমস্যা অপেক্ষা ভারত ও চীনের প্রশ্ন মীমাংসা করা আরও কঠিন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আসলে ভারত ও পাকিস্তান এক। সাংস্কৃতিক দিক হইতে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। পাকিস্তানে মুসলমান ও হিন্দু আছে। ভারতেও মুসলমান ও হিন্দু আছে, যদিও আনুপাতিক হারে পার্থক্য আছে। কিন্তু এই পার্থক্যের জন্ম মূলতঃ বিষয়টির কিছু যায় আসে না। দুইটি রাষ্ট্রকে শান্তিতে বাস করিতে হইবে। পাকিস্তান যদি মনে করে যে, ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি শান্তি ও তোষণ-নীতি বলিয়া পণ্ডিত নেহরু যে ঘোষণা করিয়াছেন তজ্জন্ম ভারত কখনও যুদ্ধ করিবে না, তাহা হইলে পাকিস্তান ভুল করিয়াছে। পাকিস্তান যদি মনে করে যে, তাহাদের মধ্যে সজ্ঘর্ষ বাধিলে বিশ্বযুদ্ধ হইবে, সুতরাং ভারত সজ্ঘর্ষ এড়াইয়া চলিবে, তাহা হইলে পাকিস্তান পুনরায় ভুল করিবে।

বর্ত্তমান যুগে যে দুইটি দেশ একদিনের মধ্যে পৃথিবীকে ধ্বংস করিতে পারে, তাহারা হইতেছে—রাশিয়া ও আমেরিকা। উভয়ের কাছে ভয়াবহ ধরণের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আছে। কিন্তু এই দুইটি দেশ এখনও পর্য্যন্ত পাগল হইয়া যায় নাই এবং একান্ত তাহাদের ঠেলিয়া দেওয়া না হইলে অথবা আমাদের সৃষ্ট শূন্যতা পূরণ করিতে বাধ্য না হইলে, তাহারা যে এই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য দেশে ব্যবহার করিবে না, তাহা

আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি। চীন ও ভারত অথবা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যদি সঙ্ঘর্ষ হয়, তবে এই দুইটি দেশের সহিত রাশিয়া অথবা আমেরিকার যত বন্ধুত্ব থাকুক না কেন, তাহারা কোন পক্ষ গ্রহণ করিবে বলিয়া আমি মনে করি না। কারণ, আমেরিকা জানে যে, যদি সে এক পক্ষ গ্রহণ করে, রাশিয়া অপর পক্ষ গ্রহণ করিবে। এই মনোভাব তাহাদিগকে আত্মঘাতী যুদ্ধে পরস্পরের বিরোধী হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবে। বার্লিণ-প্রশ্নই ইহার প্রমাণ। বিরাট শক্তিসমূহ পূর্ব্ব ও পশ্চিম বার্লিণ সীমান্ত বরাবর সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কেহ ব্যাপারটি লইয়া জোর করিয়া আগাইয়া যায় নাই।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সেদিন রাজ্যসভায় বলিয়াছেন যে, কয়েক বৎসর গবেষণার পর ভারতীয় প্রতিরক্ষা-বিভাগের বৈজ্ঞানিকগণ প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান ও শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে বর্ত্তমানে একটি 'আধুনিক সৈন্যবাহিনী' বলা যাইতে পারে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করে, তাহা হইলে ভারতের আতঙ্কিত হইবার প্রয়োজন নাই। তিনি সর্ব্বদা যেমন বলিয়া থাকেন, তেমনই বলেন যে, ভারত কখনও আক্রমণশীল হইতে চাহে নাই, এমন কি, আক্রমণশীল হইবার ইচ্ছাও তাহার নাই, কিন্তু যদি ভারতের উপর আক্রমণ হয়, তবে আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে পূর্ণরূপে সজ্জিত হইতে হইবে।

সুতরাং বন্ধুগণ, আমাদের সৈন্যবাহিনীকে সুসজ্জিত করিতে যদি আরও অর্থ ব্যয় করিতে হয়, তবে তাহা অবশ্য করিতে হইবে। আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও যদি পাকিস্তান অথবা চীনকে ভারতের ভূখণ্ড ছাড়িয়া দিতে রাজী করান না যায়, তবে সামরিক শক্তির উপর আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে। উহাই একমাত্র বিকল্প পন্থা।

ভারত ও পাকিস্তানের পক্ষে একযোগে কাজ করা যদি সম্ভব না হয়, তবে অন্ততঃ বিবাদ বন্ধ রাখার জন্য ভারতকে যে-কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে। ভারত অপর দেশের হুমকির নিকট মাথা নত করিবে না। নিজের দেশ রক্ষার জন্য তাহাকে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে এবং নিজের অধিকার রক্ষা অথবা অহেতুক আক্রমণ রোধে যদি ধ্বংস নামিয়া আসে, তাহা হইলে অবিরত ভয়, অবিরত আবেদন-নিবেদন, সর্ব্বদা তোষণ ও সর্ব্বদা আপোষ করিয়া বাস করার পরিবর্ত্তে সে বরং ধ্বংস হওয়া পছন্দ করিবে। ভারত সকল দেশের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করিয়াছে। কিন্তু সে তাহার ভূমি অথবা সম্মান বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নয়।

সুতরাং সমগ্র জাতিকে অস্ত্রধারণের ভিত্তিতে সমস্ত দেশকে শিক্ষিত করিয়া তোলার মহান্ দায়িত্ব আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। আমাদের যুবকদের বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে এবং সেইজন্য একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা স্থির করিতে হইবে। ভারতে অনেক মিলিটারী জেনারেল আছেন, যাঁহারা আমাদের যুবকদের শিক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে পারেন।

এই সম্মেলনের নাম হিন্দু সম্মেলন হইল কেন?

এই অভিভাষণ লিখিবার সময় কয়েকজন বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেন,—এই সম্মেলনকে "হিন্দু সম্মেলন" বলা হইল কেন? তাঁহারা আরও প্রশ্ন করেন—ইহা কি মুসলিম সম্মেলনের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা? দ্বিতীয় প্রশ্নে আমার জবাব হইতেছে নেতিবাচক। প্রথম প্রশ্নে আমি উত্তর দিয়াছি যে, নিমন্ত্রণ-পত্রে যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ইহা প্রকৃতই একটি জাতীয় সম্মেলন। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, এই সম্মেলনকে যদি ভারতীয় সম্মেলন অথবা জাতীয় সম্মেলন বলা হয়, তবে উহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আরও বেশী জাতীয় হইবে না অথবা আওতা সম্প্রসারিত হইবে না।

এই সম্মেলন বলিতে চাহে যে, ভারতে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে যদি কেবল তাহার নিজের জন্য স্বতন্ত্র দাবী করিতে দেওয়া হয় এবং তাহা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ভারতের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে এবং হিন্দুরাই সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কারণ তাহারাই ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। যদি কেহ মনে করেন অথবা মনে করা পছন্দ করেন যে, সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম সম্মেলনের বিরুদ্ধে ইহা পাল্টা ব্যবস্থা, তবে তিনি এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শোচনীয়রূপে ভুল ধারণা করিবেন।

'হিন্দু' কথাটি মূলতঃ সম্পূর্ণ জাতীয়, ইহার অর্থ হইল সিন্ধু নদীর চারিদিকের দেশ ও সেখানে যাহারা বসবাস করে সেই সব লোক। ইহা হিন্দু কথাটির কষ্টকল্পিত ও বিকৃত ব্যাখ্যা নহে। ঐতিহাসিক পটভূমিকার সহিত ইহার বিশেষ অর্থগত যোগ রহিয়াছে। কেম্ব্রিজের ভারতের ইতিহাসে একটি অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, "অবেস্তায় ভারতের নাম রহিয়াছে হিন্দু, প্রাচীন পারসিক হি (ন্) দু কথাটির মত উহা ইন্দাস (ইংরাজী) নদী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সংস্কৃতে উহাকে সিন্ধু বলা হয়—নদীর নামটি উহার ও উহার শাখানদীর সংলগ্ন অঞ্চলের উপর আরোপ করা হইয়াছে।" মুসলিম বিজেতাগণ জনসাধারণ ও তাহাদের ধর্ম্মকে 'হিন্দু' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, বিশ্বকোষে বলা হইয়াছে—ইহার কারণ মনে হয়, ভারতে তাহারা নিজেদের যে ধর্ম্ম—ইসলাম ধর্ম্ম আমদানী করিয়াছিল, তাহার সহিত ব্যবধান রক্ষা করিবার জন্য এই দেশের অধিবাসী ও ধর্ম্মকে হিন্দু নাম দিয়াছিল। হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লোক নহে। হিন্দু সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মীয় সম্প্রদায় আছে। সুতরাং হিন্দু সম্মেলন কথাটির কোন সাম্প্রদায়িক তাৎপর্য্য থাকিতে পারে না। একথা সত্য যে, হিন্দুরা নানা জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত, কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর ভিত্তিতে এই বিভাগ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা সকলে হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে বিশ্বাস করিত ও এখনও সেই বিশ্বাস আছে। বিভাগ ও পার্থক্য সত্ত্বেও হিন্দুরা একটি জাতি। যেমন বৃটন, রুশীয়, আমেরিকান ও ফরাসীরা এক একটি জাতি। জাতীয়তার পরীক্ষা হইতেছে দেশের অভিন্নতায়, সংস্কৃতির অভিন্নতায় ও ধর্ম্মীয় বিশ্বাসের অভিন্নতায়। [ক্রমশঃ।

Before marriage a woman will lie awake all night thinking about something you said. After marriage she'll fall asleep before you finish saying it. *—Helen Rowland.*

—তপতী রায়
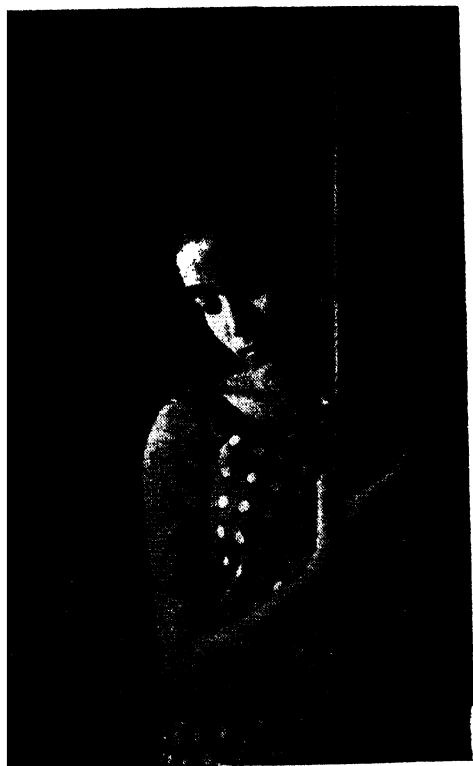
ব্যর্থ প্রতীক্ষা

—দীপক চাকলাদার

অবসর বিনোদন

—অলক লাহিড়ী

প্রথম যাত্রা — বিজয় ঘোষ

শিশুমহল

—ননী দাস

—মিহির বসু

ধূম্রপায়ী

—চিত্ত নন্দী

বন্দী

—অবতার সিং
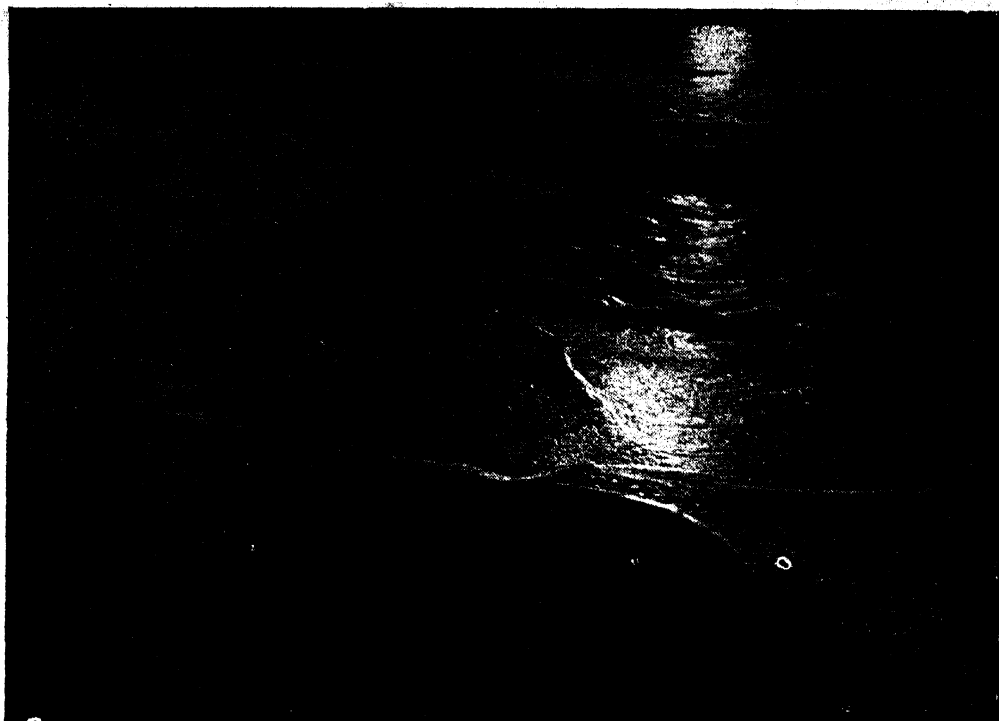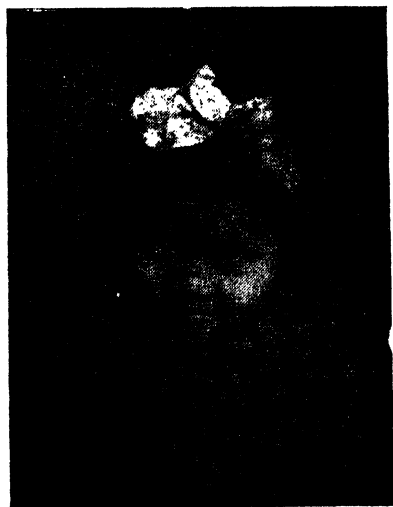
পশুর খেলা

মতি মসজিদ (আগ্রা)

—অশোক ধর

সিন্ধু যূথীর মালা

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

তের
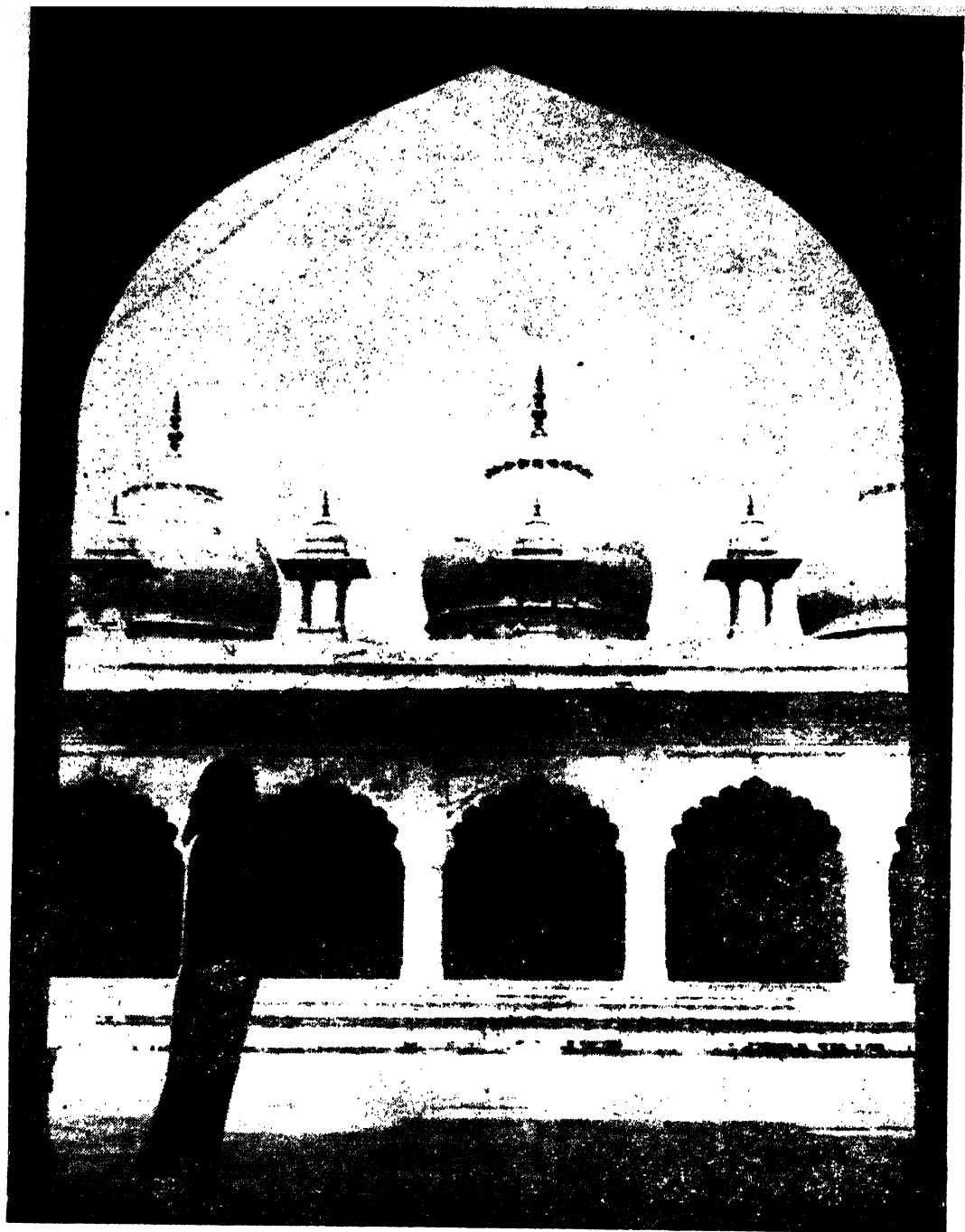
সেই মাত্র প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত হয়েছে, দীপংকর তখনও অফিসে বেরোয়নি।

টুকুনকে নিয়ে শর্মিষ্ঠা এল। আসবার কথা আছে জানত, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করল। বেশ চোখে পড়ার মত বাহুল্য রকমে। বিব্রত করাই উদ্দেশ্য, অন্য কেউ হলে হ'তও। উলটো রকম একটা কিছু মনে করে বসত হয়তো বা।

শর্মিষ্ঠা সহাস্যে বলল, "যাক, দুর্ভাবনা গেল। অফিস যদি উঠেও যায়, রিসেপসনিষ্টের চাকরি একটা নির্ঘাত জুটে যাবে।"

কথায় পারে না দীপংকর, সে চেষ্টাও করে না বিশেষ। এখনও হাসি মুখে দেখতে লাগল শর্মিষ্ঠাকে।···সাদা শাড়ীর সবুজ পাড়ে স্নিগ্ধ-শ্যামলতা···তারই আভা ছড়িয়ে আছে সারা দেহ ঘিরে, উজ্জ্বল চোখে প্রাণচাঞ্চল্য।···চেয়ে-চেয়ে নিজের মনটাই বেশী প্রফুল্ল লাগছে··· বিশেষ আনন্দের কারণ ঘটেছে বুঝি, দেহ-মনে এমনই অনুভূতি। চেয়ে-চেয়ে দেখাটা শর্মিষ্ঠার লক্ষ্য এড়ায় নি। অপ্রতিভ হবার পাত্রী নয়, কি একটা মন্তব্য করতে গিয়েও কি ভেবে করল না কিন্তু।

কি কাজে ছিল নন্দিতা, এসে দাঁড়াল। আঁচলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করল শর্মিষ্ঠাকে, "করেছিলি ?"

শর্মিষ্ঠা মাথা নাড়ল কেবল, সম্মতিসূচক

—"ঠিক আছে তো ?"

—"আশা করি।"

—"না নয় তো, তাহলে ঠিক আছে।"

বিজয়িনীর ভংগীতে হাসছে নন্দিতা। দীপংকর কৌতূহলী, "কি ব্যাপার ?"

—"কিছু নয়।" নন্দিতা গম্ভীর তখনই।

শর্মিষ্ঠা ধমক দিয়ে উঠল, "আপনার এত সব কথায় কি দরকার মশাই! অফিস যাচ্ছেন, মনটা সেই দিকে দিন।"···

দুপুরে টুকুনকে রেখে দুই বন্ধুতে নিউ মার্কেটে গিয়েছিল। শনিবার, মার্কেটের অধিকাংশ দোকানই বন্ধ হয়ে যায় বিকেলের আগেই। ওদেরও বাড়ী ফেরার তাড়া ছিল। তবুও এদিক-ওদিক করতে করতে দেরীই হয়ে গেল বেশ। ফিরল যখন সাড়ে চারটে বেজে গেছে।

বাইরের ঘরের দরজার সামনে কালু, ভেতরে টুকুনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল।···চেয়ারে হেলান দিয়ে সামনের টেবিলে পা তুলে শুভজিৎ বসে, কোলের ওপর টুকুন। কচি হাত নেড়ে নেড়ে বলছে অনেক কিছু। স্বরচিত শব্দ-বাহুল্য এবং অস্পষ্টতায় ভাষাটা প্রায় অবোধ্য শর্মিষ্ঠাই বোঝে না অনেক সময় শুভজিৎও যে বুঝেছে এমন বোধ হয় না। তবু মনোযোগের অভা নেই, সমজদারী ভংগীতে সহাস্যমুখে মাথা নাড়ছে!

ওদের দেখে পা নামিয়েছে টেবিল থেকে, টুকুনকে কোলে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল তারপর।

অতিথি এসে একা বসে আছে দেখে নন্দিতা অপ্রস্তুত একটু : "অনেকক্ষণ এসেছেন ?"

—"না, এইমাত্র—মিনিট দশেকও হয়নি। আপনি অবধি নেই দেখে চলে যাচ্ছিলাম, এমন সময় টুকুন এল।"

শর্মিষ্ঠা হেসে মাথা নাড়ল, "সেইজন্যেই তো বুদ্ধি করে রেখে গেলাম ওকে।"

নন্দিতা একবার দেখে নিল শুভজিৎকে, হাসি চেপে শর্মিষ্ঠার দিকে চাইল তারপর, "চিনতে পেরেছে এই আশ্চর্য, আমি তো ভুলে যাচ্ছিলাম প্রায় চেহারাটা।"

—"আমার ট্রেনিংয়ের গুণ।"

শুভজিৎ নিরুত্তর, ইংগিতগুলো হজম করল নীরবেই। হাসল একটু।

নন্দিতা উঠে গেল চায়ের ব্যবস্থা করতে।

শর্মিষ্ঠাকে দেখেই ঝাঁপিয়ে তার কোলে চলে এসেছিল টুকুন, কালুকে ডেকে তাকে খেলতে পাঠিয়ে দিল শর্মিষ্ঠা।

শুভজিৎ বেশ কিছুদিন পরে দেখল টুকুনকে। স্বাস্থ্যের অপেক্ষাকৃত উন্নতিটুকু ডাক্তারি চোখ এড়ায় নি। সে কথা বলতেই শর্মিষ্ঠা উৎসাহিত হয়ে অনেক রিপোর্ট দাখিল করে ফেলল। গুরুগম্ভীর আলোচনা কিছুক্ষণ।

নন্দিতা ফিরে এল, "ডাঃ চৌধুরী, শুনুন—বলেছিলাম তো বেড়াতে যাব, যাচ্ছি না। ইভিনিং শোতে মেরি ওয়ালেস্কা দেখতে যাব সবাই, দাদাও।"

—"অনেক ধন্যবাদ। বইটা আমার দেখার ইচ্ছে অনেক দিনের —গ্রেটা গার্বো—চার্লস্ বয়ার কাসটিং, তাই না ?"

—"হ্যাঁ তাই। ইচ্ছে দেখেই টিকিট কেটে ফেলেছি···ভয়ে ভয়ে ছিলাম, আপনার মাথার খেয়ালী পোকাটা না নড়ে ওঠে। ধন্যবাদ তো আপনারই প্রাপ্য···এসেছেন যে, তাই!"

শুভজিতের গভীর চোখে কৌতুকের ছায়া, প্রসংগটা পরিবর্তন করে ফেলল হঠাৎ, "আজ কোথা থেকে ফোন করা হয়েছিল ?"

—"কেন, যেখান থেকে করি।"

—"মানে পাবলিক টেলিফোন থেকে···কিন্তু অত ছোট ছেলের গলা পাওয়া যাচ্ছিল কি করে বলুন তো ?"

থমকে গিয়ে আড়চোখে একবার শর্মিষ্ঠার দিকে তাকাল নন্দিতা। নির্লিপ্ত মুখে বসে আছে, সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ দৃষ্টি।

নিজেই সামলে নেবার প্রয়াসে সপ্রতিভ ভাবে হাসতে লাগল, শুভজিতের প্রশ্নটাই হাস্যকর যেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করল তারপর, "ছোট ছেলে আবার কোথা থেকে এল?"

—"সেই কথাই তো জানতে চাইছিলাম। তবে কথা হচ্ছে টুকুন ঘরে না থাকলেও গলার স্বরে বুঝতে পারা যেতই।"

দীপংকর ঢুকল ঘরে, পরিবেশ দেখে উৎফুল্ল।

শুভজিতের কথাটা কানে গেছে, "কি বুঝতে পারা যেত রে?"

চা খেতে খেতে ঘটনাটা শুনল। সকালে হাসপাতালে ফোন করেছিল শর্মিষ্ঠা, পরিচয় দিয়েছে নন্দিতা বলে। জানিয়েছে রাত্রে মা নিমন্ত্রণ করেছেন সবাইকে, ডাঃ চৌধুরী না গেলে দুঃখিত হবেন। আর বিকেলে সবাই মিলে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে—ডাঃ চৌধুরী যদি বেলেঘাটায় আসেন! দাদাকেও ধরে নিয়ে যাওয়া হবে।··· প্রতিশ্রুতি শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে নি, বক্তব্য পেশ করেই কেটে দিয়েছে ফোন।··শুধুমাত্র এইটুকু থেকেই সন্দেহ হতে পারত। নন্দিতা শান্ত, একটু বা লাজুক···এমন ঝপ করে ছেড়ে দিতে পারত না। গলার স্বরে, বাচনভংগীতে তফাৎ তো আছেই। তার ওপর টুকুন বোধহয় শর্মিষ্ঠার কোলেই ছিল, তা যদি বা না হয় তো কাছাকাছি।

দীপংকর হাসল খুব। শর্মিষ্ঠাদের প্ল্যান শুনেও খুসী, আরও খুসী শুভজিৎ ধরে ফেলেছে বলে।···সকালের না-বোঝা কথাগুলো পরিষ্কার এবার।

রহস্য-ভেদের আনন্দে মাথা নাড়তে লাগল, "তাই সকালে দুজনে অমন ইসারায় কথা বলা হচ্ছিল! জানতে চাইলাম বলে ইনি চোখ রাঙালেন!"

শর্মিষ্ঠার প্রতি অঙ্গুলীনির্দেশ, অভিযুক্ত হয়েও সে চুপ করেই আছে। সহজে অপ্রতিভ হবার অপবাদ শত্রুতেও দিতে পারে না···তবু চুপ করে কি ভাবছে যেন।

শুভজিৎ হঠাৎ তাকেই আক্রমণ করল, "কিন্তু কারণটা তো শোনা হল না, নন্দার নাম করে ফোন করার মানে কি?"

—"মানে আবার কি? নন্দা আর পারে না রোজ ফোনে ধস্তাধস্তি করতে, তাই।"

উত্তরটা বেপরোয়া, ভংগীটা উদ্ধত। তবু হাসিটুকু রক্তিম। শুভজিৎ চুপ করে গেল নিজে ফোন করতে অপ্রকাশ্য কোন বাধা হয়তো ছিল। দেবাশীষের মুখটা চকিতেই এল মনের মধ্যে।

দীপংকর অত তলিয়ে দেখে না কিছু, বরং মজা পেয়েছে। এটুকু বুঝছে শর্মিষ্ঠা অপ্রস্তুতে পড়ে গেছে খুব, এমন ঘটনা সুলভ নয়। শুভজিতের প্রকৃতিটা সিরিয়াস, অকারণে এমন পরিচয় গোপন করার চেষ্টায় কিছু মনে করে থাকতে পারে···অন্ততঃ শর্মিষ্ঠা সেই আশংকাতেই অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে। ভাবছে নিশ্চয় ঝোঁকের বশে হঠকারিতা হয়ে গেছে।···আরও একটু জব্দ করার বাসনা প্রবল হয়ে উঠছে তাই···এমন সুযোগ বড় একটা আসে না।

শুভজিৎ যে প্রশ্ন করতে গিয়েও থামল, সেই প্রশ্নটাই করল তাই, "বেশ তো, তাই না হয় বন্ধু-ত্রাণে এগোলেন, পরিচয় গোপন করার কি সম্বন্ধ তার সংগে?"

মুখে বিস্ময়াভাস, শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারছে সেটা প্রচেষ্টাকৃত।

ঝাঁঝিয়ে উঠল, "আচ্ছা জ্বালা তো! বলছি তো এমনি! আর প্ল্যানটা আপনার বউ দিয়েছে—চার্জ করতে হয় তাকে করুন··আমি তৃতীয় ব্যক্তিমাত্র, আমায় নিয়ে টানাটানি কেন?"

দীপংকর নাছোড়বন্দা তবু, "আত্মপরিচয় গোপন করাটা অবশ্যই অপরাধ, এর ফলে সমাজের—"

শেষ করা হল না। রিষ্টওয়াচটা দেখে নিয়ে শর্মিষ্ঠা লাফিয়ে উঠল প্রায়, "আচ্ছা ব্যারিষ্টার সায়েব, আমার অপরাধের বিশ্লেষণটা আপাততঃ স্থগিদ থাকে। সাড়ে পাঁচটা হ'ল, ছ'টার শো—অনুমতি করেন তো তৈরী হয়ে আসি।"

সিনেমা দেখে সবার সঙ্গে হল থেকে যখন বেরিয়ে এল, শুভজিৎ আর নিজের মধ্যে ছিল না···অন্য এক অনুভূতির প্লাবনে ঝাপসা হয়ে গেছে বাস্তব।···চার পাশে লোকের ভীড় চোখে পড়ছে না যেন।···হলের বাইরের আলোকসজ্জার চোখ-ঝলসানো বিরক্তিটুকু সজ্ঞানে অনুভব করতে পারছে না।···এয়ারকনডিসন্ আর মুক্ত বাতাসের দমবন্ধকরা মিলনকেন্দ্রটাকে খেয়ালও করেনি।

···মনটা নিভৃত ছায়ায় একা হতে চাইছিল।···

সংগীদের এড়িয়ে এখন ফুটপাথ ধরে একা একা চলতে চলতে চিন্তার বল্গা শিথিল করে দিতে পারলেই খুসী হ'ত। কিন্তু তা হয় না। সুষমা নিমন্ত্রণ করেছেন ভোলেনি, সেটা অগ্রাহ্য করা চলে না কিছুতেই।···

খেতে বসে অনেক রকম গল্পের মধ্যে হঠাৎ এক সময় অমরনাথ বললেন, "সম্প্রতি তোমার দিদির চিঠি পেয়েছ নাকি দীপংকর?"

প্রশ্নটা নেহাৎ অপ্রাসংগিক। থতমত খেয়ে দীপংকর মুখ তুলে তাকাল, "না তো।"

—"তাহলে কাল নিশ্চয় পাবে। আমায় লিখেছেন তোমাদেরও দিলেন একই সংগে। যাক, পাওনি যখন, আমিই বলি। লিখেছেন, তোমাদের কাছে একবার আসবার বড় ইচ্ছে···নন্দাকে দেখেন নি তো—তা সংসারের ঝামেলায় হয়ে উঠছে না। এখন আবার বম্বেতে বদলী হয়েছেন তোমার ভগিনীপতি।"

অমরনাথ থামলেন একটু। দীপংকর দ্বিধান্বিত, প্রসংগটা ধরা যাচ্ছে না ঠিক। তবু কিছু একটা বলতে হয় তাই বলল, "আসবে বলে চিঠিও দিল কবার, পারছে না। আর এই বদলির ঝঞ্ঝাটে আরও মুশকিলে পড়ে গেছে।"

—"তাই ওঁর ইচ্ছে কিছুদিন তোমরা ওঁর কাছে ঘুরে এস, আমায় লিখেছেন অনুমতি চেয়ে।··দেখ দেখি কাণ্ড, তোমরা দিদির কাছে যাবে, অনুমতির কি দরকার?"

তবু চিঠিখানা পেয়ে অমরনাথ যে বিলক্ষণ সন্তুষ্ট, বলে দিতে হবে না কাউকে।···সুষমাকে নিজেই বলেছেন সহস্রবার।··দীপংকরের দূরবর্তিনী দিদির বহু গুণের সন্ধান পেয়েছেন মানুষটাকে না দেখেও, দীপংকরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন নতুন উদ্যমে। সংগে সংগে নিজেরও। জামাতা নির্বাচনের সমস্ত বুদ্ধি-বিবেচনা যে তাঁরই, সে কথা বহুবারের মত আরও কয়েকবার ঘোষণা করেছেন। অভিযোগ করেছেন পাওনা সুখ্যাতিটা পুরোপুরি পান নি বলে।

খাওয়ার পর আর বেশী দেরী করেনি শুভজিৎ। কারণ অবশ্য

উপলক্ষ্য যা-ই হোক না কেন উৎসবে যোগ দিতে গেলে চাই প্রসাধন। আর প্রসাধনের প্রথম এবং শেষ কথাও হচ্ছে কেশবিন্যাস। ঘন, সুকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, সযত্ন পারিপাট্যে উজ্জ্বল, আপনার লাবণ্যের, আপনার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। কেশলাবণ্য বর্দ্ধনে সহায়ক লক্ষ্মীবিলাস শতাব্দির অভিজ্ঞতা আর ঐতিহ্য নিয়ে আপনারই সেবায় নিয়োজিত।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল

গুণসম্পন্ন, বিশুদ্ধ, শতাব্দির ঐতিহ্য-পুষ্ট

এম, এল, বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ • লক্ষ্মীবিলাস হাউস, • কলিকাতা-৯

এই নয় যে রাত অনেক হয়ে গেছে। দীপংকররা তো রইলই এখনও। মেসে ফিরে কাজ কিছু আছে যে তাও নয়···ওদের সংগে ফিরলেই চলত। তার ওপর দেবাশীষ স্বয়ং উপস্থিত ছিল, রাত হয়ে যাওয়া কি কাজ থাকার অজুহাতে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দুরূহ। সত্যই আটকে রেখে সে জরুরী কাজ পণ্ড করে দিতে পারে, ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া অবধি জোর করে ধরে রেখে অনায়াসে বলতে পারে, "শমি যাবার পথে নামিয়ে দেবে।"

আজ শুভজিৎ এমনই হঠাৎ চলে এল, দেবাশীষও বাধা দেবার অবকাশ পেল না।···

পথে সারাদিনের কর্মমুখর ব্যস্ততা কমে এসেছে। চলতে গিয়ে ঠেলাঠেলি ভীড় এড়াতে সর্বদা সচেতন হয়ে থাকতে হয় না আর। ···তবুও শুধু দিনযাপনের গ্লানি নিয়ে এখনও সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েনি কলকাতা। এখনও বড় রাস্তায় নিওন-আলোকিত হিন্দু হোটেল খদ্দেরদের হাঁকাহাঁকি আর বয়দের ছোটাছুটিতে সরগরম। গলির মোড়ে পানের দোকানটার পাতলা সবুজ কাগজে মোড়া আলোর সামনে ঢিলে পায়জামা আর মলমলের পাঞ্জাবি পরা ছোকরাদের ভীড় সবে জমতে শুরু করেছে।···জীবনরণে ক্লান্ত ঘরমুখো আধঘুমন্ত সৈনিকদের বাড়ী পৌঁছে দেবার দায়িত্ব এখনও সারা হয়নি বাসগুলোর। ···ডিউটি সমাপ্তির সময়টা নিকটবর্তী জেনে ভীড় কমে আসা পথে চলার গতি অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে ট্রামচালক।

শুভজিৎ হাঁটা-পথ ধরেছে। সোজা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ধরে।

অনেকক্ষণ থেকে মনটা পালাই-পালাই করছে। এতক্ষণে নিজের নিভৃত কন্দরে ফিরে এসে বাঁচল। ইচ্ছে করেই হাঁটতে শুরু করেছে তাই। শ্যামবাজার থেকে হ্যারিসন রোড—হেঁটে ফিরতে সময় লাগবে। ভালই, মনটা আজ পথে-বিপথে এমনই পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, ফিরে গিয়ে যে ডাক্তারি জার্ণালে মন বসবে এমন আশা নেই। সেক্ষেত্রে আজকের দিনটাতে সমাপ্তিরেখা টেনে দেবার মত সময়ে পৌঁছোলেও ক্ষতি নেই কিছু।

সিনেমা দেখে না এমন নয়। কলকাতায় এসে অবধি ওদের পাল্লায় পড়ে অনেক ভাল ছবি দেখেছে। সম্প্রতি কিছুদিন অবশ্য ওদের সংগে সিনেমা দেখেনি। তবু হিসেব করলে বোধ হয় এই সময়টাতেই সব চেয়ে বেশী সিনেমা দেখেছে।···ঘরের মেঝেয় পড়ে থাকা ছুঁচটা যেমন দিনের আলোয় হঠাৎ চোখে পড়ে যায় তেমন করেই হঠাৎ একদিন মনের একটা গোপন চিন্তাকে আবিষ্কার করে শিউরে উঠেছে শুভজিৎ, সরে আসতে চাইছে। সে চিন্তার সূত্র অন্বেষণ করলে শুভজিতের অনেক অর্থহীন ব্যবহারের ব্যাখ্যা মিলবে। ···সে চিন্তার খর্পরে পড়ে ওদের সংগে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠছে। সেই চিন্তারই বাঁধন কাটতে সিনেমা দেখতে হয়। শুধু ওদের সংগটা বর্জন করলেই সমস্যার সমাধান হবে না, নিজের মনের গতিটারই মোড় ফেরানো দরকার। চিন্তাটা আষ্টেপৃষ্টে বাঁধে যখন, নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী মনে হয়—অথচ চিন্তাটাকে সরিয়ে দিতেও পারে না কিছুতেই, তখন চোখ-কান বুজে চৌরংগীপাড়ার যে কোন একটা হলে ঢুকে পড়ে, অনেক সময় দেখা বই দেখতেও। ভাল-মন্দ বিচার করে না, রুচিবোধের প্রশ্ন তোলে না, শুধুমাত্র সব ভুলে কয়েকটা ঘণ্টা কাটিয়ে আসার সুযোগের লোভে হালকা মার্কিণ ছবিও দেখতে যায়। সারা হল যখন হেসে ওঠে, হাসবার কোন উপাদান খুঁজে পায় না, চারপাশের সরস মন্তব্যগুলো অসহনীয় লাগে। শো শেষ হলে বেরোয় যখন, সময়টা বাজে খরচা হল ভেবে মেজাজটা অনেক সময়ই অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।···কিন্তু সিনেমা দেখতে দেখতে হঠাৎ যখন আবিষ্কার করে পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে মাত্র, মনটা সেই গোপন চিন্তাটাকে নিয়ে একান্তে নাড়াচাড়া করে চলেছে, তখন আর বিরক্তির অবধি থাকে না।

আজ সন্ধ্যায় দেখা ছবিটার ছায়ায় কিন্তু মনের আর সব ভাবনা ঢাকা পড়ে গেছে। সব চিন্তাকে দূরে সরিয়ে, সব দুর্বলতাকে চাপা দিয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে কেমন। একটা ভাল সিনেমা দেখে আসার তৃপ্তি নয়, শিল্পীদের চরিত্র রূপায়ণের সার্থকতা অনুভব করার আনন্দ নয়, এ আরও বৃহত্তর কিছু।···বদ্ধ ঘরের অন্ধকারে আজ এক শাশ্বত সত্যকে দেখে এল, দেশে-কালে তার পরিমাপ করা যায় না।···তন্বী যুবতী গ্রেটা গার্বোর অপূর্ব অভিনয়ে যে নারী রূপে-প্রেমে-বেদনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে, তাকে যে বিশেষ একটি দেশের বিশেষ একটি মেয়ে বলে চিনতে হবে এমন কোন কথা নেই··· বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে সে।···চার্লস বয়ারের ত্রুটিহীন অংগসজ্জায় আর অননুকরণীয় দক্ষতায় বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের যে রূপটি ফুটেছে, সে রূপটি একান্তভাবে নেপোলিয়নের বটে, তবু পুরুষ হিসেবে অনেক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেও তার সন্ধান মিলবে।

মেরি ওয়ালেস্‌কা···মেরি···মারিয়া···শুভজিৎ ভাবছে। কখন যে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট আর বিবেকানন্দ রোডের মোড় পেরিয়ে এল খেয়ালও করেনি। মনে বাজছে একটা নতুন সুর, সে সুর অনুরণন তুলেছে তার সর্বদেহে, তার প্রতিটি রক্তবিন্দুতে। সব ভাবনা অতলে তলিয়ে দিয়ে জেগে আছে শুধু একটি ছবি···জানালার সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে, ঘন-পল্লবিত দুটি স্বপ্নময় চোখে বেদনার ছায়া, দৃষ্টি প্রসারিত সম্মুখের উন্মুক্ত সমুদ্রের একটি জাহাজে—যাত্রা তার শুরু হল বলে।···যে নিষ্ঠায়, যে পরিপূর্ণতায় প্রাণের দেবতাকে অঞ্জলি ভরে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করে দিয়েছিল, তারই পুণ্যফল তার সামনে··· দুচোখ-ভরা কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে সে—ঐ একই দিকে। তার কাছে আপন অন্তরের আকুতিটুকু উজাড় করে দেয় মেয়েটি, "প্রে ফর দি এমপ্‌রার"—সম্রাটের জন্যে প্রার্থনা কর।··· অভিযোগ নেই, অভিমান নেই, যে অশ্রুতে সিক্ত হয় তার চোখ সে অশ্রুতে নিজের জন্য বেদনার অনুভূতি নেই তিলার্ধও, সে অশ্রু চিরন্তন কালের অশ্রু। সে অশ্রু পরম স্নেহে, পরম প্রেমে ঝরে নারীর চোখে, ঝরে পুরুষের জন্য। বিচার করে না, বিশ্লেষণ করে না, ভেবে দেখে না কতটা পুরুষের প্রাপ্য। শুধু আপন মহিমায় আপনি ঝরে পড়ে, ঝরে আপন নির্মল স্নিগ্ধতায়।···

মেসে ফিরে স্নান করল শুভজিৎ, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল তারপর। বাহুতে মাথা রেখে সামনে খোলা জানালা দিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সেই একই নারীর মূর্তি··· মনে মনে সেই একই চিন্তার ভাঙাগড়া।···এমনি অন্ধকার রাত্রির শান্ত নির্জনতায় এক আশ্রয়-বৃক্ষ হতে নিঃশব্দে ঝরে পড়ল একটি ফুল··· সবটুকু শুভ্র সৌন্দর্য নিয়ে স্বেচ্ছায় এসে দাঁড়াল বসন্তের উতলা সমীরণের উদ্দাম গতিপথের সম্মুখে।

মেরি ওয়ালেস্‌কা নেশা ধরিয়েছে মনে, সব কিছুর থেকে পৃথক একটা জীবন্ত সত্তা আছে বইটার। জীবন-যাত্রার ক'খানা ছেঁড়া

যাতা যেন।··নেপোলিয়নের ঘটনাবহুল প্রখ্যাত জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের মাঝে কোন্ অতলে হারিয়ে গেছে তাঁর নিতান্ত ব্যক্তিগত জীবনের ক'টি মুহূর্ত, ঐতিহাসিক মাথা ঘামান না তা নিয়ে। সাধারণ মানুষ কিন্তু নেপোলিয়নের যুদ্ধজয়ের দিনপঞ্জীর চেয়ে অনেক মূল্যবান সত্যের সন্ধান পেয়েছে এই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, উপেক্ষিত মুহূর্ত ক'টিতে।···যে মুহূর্ত ক'টিতে কালের স্রোতকে অগ্রাহ্য করে লেখা হয়ে গেছে একটি প্রেম-কাহিনী, একটি পরিণতিহীন ভালবাসার ইতিহাস।···

যৌবন-সুরভিত দেহের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য নিয়ে বৃদ্ধ স্বামীর অংগনে ফুটেছিল মেরি···লর্ড পরিবারের ঐশ্বর্যের মধ্যে নিজেকে বিস্মৃত হয়ে হয়তো শান্তিতেই ছিল। হঠাৎ-আসা ভাইকে সহাস্যেই বলতে পারত, "জান কত বড় নাতি আছে আমার, আমি·ছেলেমানুষ!"—সে কথা'র মধ্যে ব্যথা যদি বা থাকত কোন নিভৃত কোণে, সে বোধহয় নিজেও জানতে পারে নি কোনদিন।···হঠাৎ একদিন ঝোড়ো বাতাস ধাক্কা দিয়ে খুলে দিল তার ঘরের রুদ্ধ দুয়ার···জয়গর্বে দপ্ত নেপোলিয়ন, ক্ষমতার দর্পে উদ্ধত নেপোলিয়ন, যৌবন-মদে মত্ত নেপোলিয়ন মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকালেন তার দিকে।···প্রথমে বিপন্ন বিস্ময়, তারপর ভীত বিহ্বলতা—রাজা নেপোলিয়নকে সেদিন মারিয়ার দিক থেকে এইটুকুই মাত্র দেবার ছিল। দুটি রূপমুগ্ধ চোখের নিঃসংকোচ দৃষ্টি দৃঢ়বলেই উপেক্ষা করেছিল মারিয়া।···তারপর? নৃপতির বাহ্যিক পূর্ণতা ভেদ করে সামনে এসে দাঁড়াল এক রিক্ত, বুভুক্ষু পুরুষ—প্রেমহীন, নিঃসংগ, একাকী! অমনি অসীম মমতায় দ্রবীভূত হ'ল রমনী-হৃদয়···আপনাকে ভুলে, জগৎকে অগ্রাহ্য করে ক্ষুদ্র দুটি কোমল করে ধৌত করে দিতে চাইল তার সমস্ত বেদনা, সমস্ত গ্লানি।···প্রেমের বন্যাধারায় ভাঙল সংকোচের বাঁধ, সম্বোধনে লাগল ঘরোয়া সুর, সম্রাটের আড়ষ্ট দুটি বলিষ্ঠ পায়ে নৃত্যের ছন্দ ফোটাবার ব্যর্থ প্রয়াসে খুসীর হাসি ঝিলিক দিল মারিয়ার বংকিম ওষ্ঠপ্রান্তে।

··তবু পূর্ণতা পেল না পুরুষের মন।···

পাবে কি করে? যেখানে মারিয়ার সমস্ত সত্তা জুড়ে আছেন একটি মাত্র পুরুষ, যাঁর মাঝে আপন অস্তিত্বটাকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছে মারিয়া, তাঁর প্রেম যত সত্যই হোক, তবু তাঁর সহস্র রূপের মধ্যে সেটা তাঁর একটি রূপ মাত্র।···বাইরের ডাক কানে এসে বাজছে অহরহ। সাধ্য কি মারিয়ার ধরে রাখবে তাঁকে ক্ষুদ্র গৃহকোণে? মারিয়ার একনিষ্ঠ প্রেমের পূর্ণ মর্যাদা দেবার শক্তি নেপোলিয়নের কই? বিস্তৃত তাঁর কর্মক্ষেত্র, বহুমুখী দৃষ্টি। কত শত অতৃপ্ত বাসনা রক্তে ধরিয়েছে আগুন।···একদিকে বিশ্ব জয়ের নেশা, অন্যদিকে উত্তরাধিকারীর ধমনীতে রাজরক্ত বইয়ে দেবার দুর্দম আকাংখা···তৃপ্ত হতে দিল না নেপোলিয়নকে, আশ্রয় নিতে দিল মা কোমল স্নেহচ্ছায়ায়। আর সেই সংগে নিষ্ঠুর হাতে কেড়ে নিয়ে গেল একখানি সুকুমার মুখের পবিত্র হাসি।

নতুন আগন্তুকের আগমনী-সুর বেজেছে তখন মারিয়ার দেহে-মনে, বেজেছে তার সমস্ত জগৎ জুড়ে।···কিন্তু সান্ধ্যাবকাশে প্রশস্ত বক্ষতলে লীন হয়ে সে সুর শোনাবার দিন হয়েছে গত।···অগণিত কামনার

কাছে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন নেপোলিয়ন, মারিয়ার কোমল দুটি হাতের বাঁধন তুচ্ছ তার কাছে।···কঠোর আঘাত এসে হানল শেল, মারিয়ার স্বপ্ন-সৌধ ভেঙে দিয়ে গেল।···শুধু রেখে গেল একটি স্মৃতি, রেখে গেল তার জীবন-ভ'রে।·· সম্রাট-সম্রাজ্ঞী···নবজাত রাজকুমার···জনগণের অভিনন্দন ধ্বনি···সব কিছুর বাইরে সেই রেখে যাওয়া স্মৃতিটুকু নিয়ে নতুন জীবন শুরু হ'ল।

খাঁটি সোনা পুড়ে আরও বিশুদ্ধ কিছু হয় কি? নারীর নিকষ প্রেম পুরুষের দেওয়া দুঃখের আগুনে পুড়ে স্বর্গীয় দীপ্তিতে আরও কি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে?···না হলে আবার একদিন সব বিপদের বাধা অগ্রাহ্য করে ছোট আলেকজান্ডারের হাত ধরে কি করে এসে দাঁড়াল মারিয়া নেপোলিয়নের দ্বারে? অন্তরের কোন্ অনন্ত মহিমায় ক্ষমা ভরা চোখে দু'হাত বাড়িয়ে আশ্রয় দিতে চাইল তাঁকে, বিপদ-বেষ্টনী হতে চিরতরে আড়াল করতে চাইল?

···নারী যা চায় তাই যদি পেত, যদি কণ্ঠভরা আকুতি আর দু'চোখ ভরা বেদনায় কোনদিন বদলে দিতে পারত পুরুষের অস্থির, চঞ্চল স্বভাব, তা হলে পৃথিবীর চেহারা অন্য রকম হ'ত।

···হত বটে, বিনিময়ে দিতে হ'ত অনেকখানি।···বৈচিত্র্য থাকত না কোথাও, জীবন-সংগীত স্তব্ধ হয়ে যেত।

···বিধির বিধানে পুরুষ তাই অশান্ত···অতৃপ্ত···উদ্দাম।···

যুগে যুগে তাই নেপোলিয়নরা দুর্ভাগ্যের অন্ধকার সরিয়ে সৌভাগ্যের দীপ জ্বালাতেই ব্যগ্র হয়ে থাকেন···মারিয়াদের আহ্বানে প্রলোভন যতই থাক, কণ্ঠস্বর ফুটে সাড়া জাগে না। শান্ত জীবনের আশ্বাস পথ-প্রান্তে ফেলে রেখে এগিয়ে যেতেই হয়।

তবু তারই মধ্যে ক'টি মুহূর্তের মালা গেঁথে আপন কণ্ঠে দুলিয়ে নেয় কাল, ক্ষয়হীন লয়হীন এক অবোধলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়।··· কালের ভাণ্ডারের সেই সঞ্চয়ে পূর্ণতা দিতে তাই তারই নির্দেশে সুপ্রশস্ত কর্মক্ষেত্রের বেড়াজাল ডিঙিয়ে নেপোলিয়নকে এসে দাঁড়াতে হয় মারিয়ার মাতৃমূর্তি দেখতে।

···দেখতে গিয়ে আপন সন্তানের জীবনের মাঝে আপন জননীর ছায়াটুকু চোখে তাঁর মুহূর্তের জন্যও পড়ে কি?

শুভজিতের চোখে অন্ততঃ মারিয়ার মাতৃরূপটাই প্রধান হয়ে উঠেছে, হয়তো বা ছবিতে যা দেখেছে তার চেয়েও।·· শয্যাপ্রান্তে নতজানু শিশু-পুত্রের প্রার্থনারত মূর্তিটির দিকে অপরিসীম স্নেহে চেয়ে থাকা দুটি চোখ মনের দরজায় এসে ঘা দিয়েছে বারবার।·· ঐ আলেকজান্ডার-জননীর চোখ দুটো তার অতি-চেনা। ডাক্তারের পেশা নিয়ে অবধি বহু অট্টালিকায়, বহু পর্ণকুটিরে ঐ চোখের দৃষ্টি দেখল, হাসপাতালের আউট ডোরেও নিত্য···কিন্তু পেশা-সংক্রান্ত দেখার বাইরেও দেখেছে···ও চোখের চাউনি কত শত বার চোখে পড়েছে কত বিভিন্ন পরিবেশে। নিজের জীবন থেকে ও চোখের ছায়া যত দিনই মিলিয়ে গিয়ে থাক, আজ ঐ দুটি চোখের চাওয়া দেখবার আশায় উন্মুখ হয়ে থাকে। তাই যখন পথ চলতে চলতে হঠাৎ চোখে পড়ে কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো ছেলে কচি-হাতে কড়া নাড়ছে কোন বাড়ীর···দরজা খুলে গিয়ে ডুরে শাড়ীর আঁচল উঁকি দিচ্ছে, হয়তো নিজের অজ্ঞাতেই গতিটা মন্থর হয়ে আসে। উন্মুক্ত দরজায় গৃহ-প্রত্যাগত ক্লান্ত শিশুর হাতখানি একখানি কোমল হাতে ধরা পড়ে যখন, তরুণী মায়ের চোখে চেনা ছায়াটুকু দেখবার আশায় লোভীর মত তাকায়।···মেসের ঘরটার জানালা দিয়ে পাশের ফ্ল্যাট বাড়ীর যে সংসারটা একটু-আধটু চোখে পড়ে, তাদের বাচ্ছাটা যেদিন সারারাত কাঁদে একটানা—স্বরে ঘুমপাড়ানি গান, ঝিনুক-বাটি নাড়ানাড়ি আর পুরুষ কণ্ঠের মৃদু বিরক্তির আভাস পাওয়া যায় ···তার পরদিন সকালেও আর্দ্র চুলগুলি পিঠের ওপর ছড়িয়ে ঘুরে ঘুরে সংসারের কাজ করতে দেখে বৌটিকে। তার ক্লান্ত পদক্ষেপে যে মাধুর্য মাখানো থাকে, সেটুকু প্রভাতের ঝিরঝিরে হাওয়ার মত স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দেয় সর্বাঙ্গে। আন্দাজ করে নেয় বাচ্ছাটা ভালো আছে, ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে শান্ত হয়ে। কল্পনায় দেখে অপরিচিতা বৌটির বিনিদ্র রজনীর জড়িমা-মাখানো চোখে ঐ দুটি চেনা চোখের ছায়া। [ক্রমশঃ।

ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট

[আমেরিকার বিশিষ্ট স্থপতি ও শিল্পী]

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

শেফালি সেনগুপ্তা

ফ্র্যাঙ্কের ব্যক্তিগত জীবনের একটি সঙ্গোপন দরজা এতদিন রুদ্ধ ছিল। মাস-তিন পর ক্যাথারিণ আত্মীয়ের বাড়ী থেকে শিকাগোয় ফিরে আসাতে আপনা থেকেই উন্মুক্ত হোল রুদ্ধ-কপাট। ফ্র্যাঙ্ক চঞ্চল হয়ে উঠল। সুলিভান—তার গুরু, তিনিই আবার বন্ধুও—তাঁকেই ফ্র্যাঙ্ক খুলে বলল ব্যাপারটা।

"স্যার, একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। ক্যাথারিণ তার নাম, হাইড পার্ক স্কুলের ছাত্রী। সতেরো বছরের মেয়ে।"

"আঃ হাঃ, এত তাড়াতাড়ি?" সকৌতুকে বলে উঠলেন তিনি।

"সকলেই তো তাই ভাবছে আর বাধাও দিচ্ছে।"

"হুঁ, তা তো দেবেই।"

"আর আপাততঃ আমার তো কোন সঙ্গতিও নেই।"

"নেই? আচ্ছা—এ সম্বন্ধে আমরাই তো যা হোক্ কিছু একটা স্থির করতে পারি। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে একটা চুক্তি করলে কেমন হয়?"

অ্যাডলার, সুলিভানের সহকারী কর্মী। তাঁকে ডেকে সুলিভান্ বললেন—"ফ্র্যাঙ্ক বিয়ে করতে চায়, অথচ ওর নাকি তেমন সঙ্গতি নেই। আমি বলি কি, ওর সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য কাজের চুক্তি করি, তোমার কি মত?"

অ্যাডলারও সুলিভানের কথায় সায় দিলেন।

তাঁর ব্যবস্থার ফলেই ক্যাথারিণ ও ফ্র্যাঙ্ক পারিবারিক নানা আপত্তি সত্ত্বেও পরস্পর একাত্ম হবার সুযোগ পেল। কচি বয়সের নবদম্পতি ফ্র্যাঙ্ক ক্যাথারিণকে রাখতে চাইল ছোট্ট মনোরম সাজানো গোছানো একটি বাড়ীতে। সুলিভানই ছোট্ট একটা বাড়ী তোলার মত কিছু টাকা ধারস্বরূপ দিলেন ফ্র্যাঙ্ককে। ঠিক হোল ফ্র্যাঙ্ক পাঁচ বছরের মধ্যে পারিশ্রমিক থেকে কিছু কিছু টাকা দিয়ে ঋণ শোধ করবে। দেখতে দেখতে শিকাগো অ্যাভিনিউয়ের বনাঞ্চলে, ওক-পার্কের সুন্দর এক জমির ওপর ফ্র্যাঙ্ক আর ক্যাথারিণের ভালবাসা গড়ে উঠল।

এদিকে পারিবারিক বৃত্তের পরিধি যতই বাড়তে লাগল—আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও সেই পরিমাণে কমতে লাগল। নিজের পারিশ্রমিকের বেশ একটা অংশ কাটা যায় সুলিভানের ঋণ বাবদ। তার ওপর সংসারের প্রাত্যহিক দাবী আছে—শিশুদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা আছে।

অক্লান্ত পরিশ্রম সুরু করল ফ্র্যাঙ্ক। দিনের অধিকাংশ সময় কাটে সুলিভানের অফিসে—ঘরে ফিরেও বিশ্রাম নেই। উপার্জন-উপার্জন করে পারিবারিক সুখস্রোতের গতি অব্যাহত রাখার জন্য ক্লান্তিবিহীন এই প্রচেষ্টা। সুলিভানের অফিসে কাজের চাপ প্রচণ্ড—তার ওপর, ও বাইরের কাজ নিয়ে সারা রাত জেগে বাড়ীতেই সেগুলো সম্পন্ন করত।

সুলিভান কিন্তু তার এই অতিরিক্ত কাজ নেবার কথা জানতে পেরে অসন্তুষ্ট হলেন। বল্লেন "রাইট্, তুমি বাইরের কাজ নিয়ে চুক্তির নিয়ম ভাঙছো। যতদিন না তোমার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়, ততদিন অফিস সংক্রান্ত কাজেই তোমায় আগ্রহশীল থাকতে হবে। আমার অফিসে থেকে এই কাজ ভাগাভাগি ব্যাপার, এ আমি সহ্য করব না।"

সেই সুলিভান, ফ্র্যাঙ্ককে যিনি এত স্নেহ করতেন, সেই মানুষই বদলে গেলেন। অকারণ রূঢ় ভাষণে ফ্র্যাঙ্ককে তিনি প্রতি পদে অপদস্থ করতে লাগলেন। এতখানি অপমান সহ্য করা সম্ভব হোল না ফ্র্যাঙ্কের পক্ষে—আবার কাজে ইস্তফা দিয়ে ধীর পায়ে ও বেরিয়ে এল অফিস থেকে।

ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইটের মাথার ওপর দুলছে অনিশ্চিত রুদ্র ভবিষ্যৎ; চোখের সামনে ভাসছে পিতৃত্বের প্রবল দায়িত্ব। তবুও সাহসে বুক বেঁধে ওক্ পার্কের বাড়ীতেই গড়ে তুলল ষ্টুডিও ওয়ার্কসপ। ঠিক করল দুঃখ যতই হোক্—আর পরের দ্বারে ঘোরাঘুরি নয়, স্বাধীন মতে, স্বাধীন পথে জীবিকার সন্ধানে এগিয়ে যাবে দৃঢ় পায়ে। সুলিভানের কাছ থেকে আঘাত না এলে ফ্র্যাঙ্কের হয়তো এত শীঘ্র এই প্রখর চেতনা, এই উত্তুঙ্গ আত্মপ্রত্যয় জাগত না। জীবনে আঘাতের দাম আছে, অপমানেরও দাম আছে। ফ্র্যাঙ্ক আঘাতকে নিল বরণ করে। ওক পার্কের বাড়ীতে দুই বিপরীতধর্মী কাজের ধারা বইতে লাগল—বহির্মুখী ধারা আর অন্তর্মুখী ধারা। কাজের প্রাঙ্গণে রইল গৃহস্বামী, সংসার-অঙ্গনে গৃহপত্নী।

এখন আর ফ্র্যাঙ্ক নবযতি ফ্র্যাঙ্ক নয়। বয়সে নবীন, স্বাধীন জীবিকাশ্রয়ী সুযোগ্য স্থপতি রাইট্—ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট্ নামে আত্মপ্রকাশ করলেন সুবিশাল কর্মজগতে।

সুখদুঃখের নাগরদোলায় কেটে গেল উনিশটা বছর এক ওক পার্কের বাড়ীতেই। এই দীর্ঘ সময়ের বেশীর ভাগ দিন কেটেছে আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে। তবুও গৃহস্বামীর চিত্তে শান্ত সমুদ্রের প্রশান্তি। টাকা নেই? ভাবনার কি তাতে, আজ না

হোক, দুদিন পরে আসবেই।" কখনও কখনও এমনও হয়েছে যে, বাড়ীতে একটা ডাইমও নেই। ব্যাঙ্ক থেকে চেক্ ফেরৎ এসেছে, তলায় লাল কালির দাগ টানা। মুদীওয়ালীর দোকানে মাসের পর মাস বিল জমা হয়েছে। একবার এক মুদীওয়ালী তো আটশো পঞ্চাশ ডলারের এক ভারী বিল নিয়ে হাজির হোল। অনেক মাসের টাকা বাকী পড়েছে নাকি। কি ভাগ্য, তিনি তখন কিছু টাকা পেয়েছিলেন। পাওনা মিটিয়ে দিলেন অবিলম্বে। কিন্তু অশেষ সৌভাগ্য তাঁর, এর জন্যে তিনি কোনদিনও কারুর কাছে অবিশ্বাসের পাত্র হননি। তিনি যখন Schiller buildingএ তাঁর প্রথম অফিস আরম্ভ করেছিলেন, তখনও এরকম ভাবে প্রায় সাত-আট মাসের বাড়ী-ভাড়া একবার বাকী পড়েছিল। বাড়ীওয়ালা অগাধ বিশ্বাসে বলেছিলেন—"Never mind Mr. Wright : You are an artist. I have never yet lost any rent owed me by an artist. I know you will pay me."

টাকাকড়ি যখনই পেতেন, শিশু-সন্তানদের মনোরঞ্জনের জন্য অকাতরে তা ব্যয় করতেন। তাদের প্রত্যেকের শিক্ষা-দীক্ষা আচার-ব্যবহার ও রুচির দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সঙ্গীত-প্রীতি, সঙ্গীতানুরাগিতা রাইট-পরিবারের রক্তের মধ্যে বিদ্যমান। ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইটও অসামান্য সুরজ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন তাঁর পিতার জন্যই। এবার তিনি সেই সুরজ্ঞানের প্রভাব ছড়িয়ে দিলেন সন্তানদের মাঝখানে। অল্পবয়স থেকেই তারা প্রত্যেকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে হাতেখড়ি নিল। জ্যেষ্ঠ লয়েড্ বাজাত চেলো, জন্ ভায়োলিন্, দ্বিতীয় ক্যাথারিণের কণ্ঠে ছিল স্বর্গীয় সুর-মাধুর্য। ফ্র্যান্সেস্ শিখল পিয়ানো, ডেভিড বাঁশি আর সর্বকনিষ্ঠ লেওয়েলনের ঝোঁক দেখা গেল গীটার আর ম্যান্‌ডোলিনেই বেশী। ওক্ পার্কের বাড়ীতেই রীতিমত অর্কেষ্ট্রা পার্টি গড়ে উঠল। অবসর সময়ে ফ্র্যাঙ্ক্ আর ক্যাথারিণ ছোটদের জলসায় যোগদান করতেন, নিজেরাও পিয়ানো বাজাতেন। ছোটরা ক্রমশঃ বড় হোল। হোমস্কুল থেকে কেউ গেল কলেজে—হাইস্কুল থেকে কেউ কেউ ইউনিভার্সিটিতে। অভাব-অনটন সবই ছিল ; কিন্তু স্থপতি পিতা তাঁর মনের এই উদ্বেগ, উত্তেজনা, চিন্তা কখনও ঘুণাক্ষরে জানতে দেন নি সন্তানদের। যাতে ক্ষণিকের জন্যও এসব চিন্তা তাদের সুকোমল মনে ছায়া না ফেলে, সেদিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ফলে সুস্থ ও স্বাভাবিক, প্রীতিময় পরিবেশে তারা বড় হতে লাগল নববর্ষার জলধারাসিক্ত চারাগাছের মত।

প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র

আত্মপরিচয় ও আত্ম-প্রস্তুতির জন্য জীবনে ত্যাগস্বীকার, দুঃখবরণের মূল্য আছে—শত দুঃখের সাঁকো পার হতে হতে এ মহাবাণীর যথার্থতা উপলব্ধি করলেন ফ্র্যাঙ্ক্ লয়েড্ রাইট। কিশোর-কালের স্বপ্ন, কিশোরকালের উচ্চাশাকে বাস্তব ভূমিকায় রূপ দেবার জন্য যে একদিন ঘর ছেড়ে পরবাসে, স্থপতি কার্যালয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরে কোনমতে জীবিকার সন্ধান পেয়েছিল—সে বালক এখন স্বাধীন শিল্পজীবী, স্বাধীন স্থপতি। স্থাপত্য-আকাশে উদীয়মান সূর্য তিনি, গৃহী পৃথিবীকে নতুন আলো দেখানোর প্রয়াস নিয়ে, প্রতিজ্ঞা নিয়ে, স্বয়ং এসে দাঁড়ালেন কর্মজীবনের পূর্ব দিগন্তে।

শিকাগোর ১৫০১ খৃষ্টাব্দে Schiller buildingএর উঁচু তলায় ধীরে ধীরে একটি কার্যালয় গড়ে উঠল। কত মমতা, কত প্রেরণা, কত সাধের নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান। ক্রমে আস্তে আস্তে এক এক করে কাজের সন্ধানও আসতে লাগল। Winslow Ornamental Iron Worksএর কর্মকর্তা W. H. Winslow রিভার ফরেষ্ট অঞ্চলে একটি বাসগৃহ নির্মাণের জন্য তাঁর কাছে এলেন। স্বাধীন জীবিকা অবলম্বনের পর এই প্রথম তাঁর ডাক পড়ল বিশাল কর্মপ্রান্তরের এক কোণ থেকে।

বাড়ীটি তৈরী হবার পর জনশ্রুতি শোনা গেল—River. forest অঞ্চলে এক অপূর্ব নতুন গৃহের সৃষ্টি হয়েছে। এমন অভিনব ধরণের বাড়ী আগে কারুর চোখে পড়েনি। অদ্ভুত তার সৃষ্টি-কৌশল, অদ্ভুত তার আকর্ষণ। বাড়ীটির সম্বন্ধে প্রশংসা হোল যত, নিন্দাও হোল সেই পরিমাণে। সেই তো পৃথিবীর রীতি। সমালোচনা আছে বলেই না সৃষ্টি ঝিমিয়ে পড়েনি। মানুষের মত যত, পথও তত। মতের থেকে পথ আরও ব্যাপক, আরও বিস্তৃত ; সেই বিস্তৃত পথেই ক্রমশঃ এগিয়ে এগিয়ে গেলেন মিঃ রাইট্।

এরপর একদিন তিনি অফিসের দরজা খুলে বাইরে বেরোচ্ছেন, এমন সময় অফিস-দরজায় এক দম্পতিকে দেখে চমকে উঠলেন ভীষণ। এ কি ? এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার ! স্বয়ং মুর দম্পতি স্বেচ্ছায় এসেছেন তাঁর অফিসে ? মিঃ মুর সে সময় শিকাগোর বিখ্যাত আইনজ্ঞ ছিলেন। তাঁর অতি প্রকাণ্ড বাড়ীর ডিজাইন করবার জন্য মার্কিন মুলুকের বাঘা বাঘা স্থপতি হাজির হয়েছিলেন তাঁর কাছে—বাকী ছিলেন শুধু একজন, তিনি ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মিঃ মুর বললেন—"কি ব্যাপার, মিঃ রাইট ! আমার বাড়ী তৈরীর জন্য জানা অজানা কত স্থপতি দেখা করলেন আমার সঙ্গে, আর আপনি আমার বাড়ীর পাশেই থাকেন, কই একটি কথাও তো উচ্চবাচ্য করেননি এ সম্বন্ধে ?"

মিঃ রাইট্ জিগেস করলেন—"American Institute of Architects-এর প্রধান, মিঃ প্যাটন্ কি দেখা করেছেন আপনার সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনি তো সব প্রথম এসেছেন, কিন্তু আপনি আসেন নি কেন ?"

"কি করে জানব যে আপনি আমার কাজ চান ? তাছাড়া আপনিও তো জানেন, কোথায় এলে আমাকে পাওয়া যায়। আপনি তো আইনজীবী, ব্যাপারটা ধরতে পারবেন। ধরুন, কোন লোক যদি আইনঘটিত ব্যাপারে কোন সু-আইনজ্ঞের পরামর্শ চান, তিনিই তো সব প্রথম যাবেন আপনার দিকে এগিয়ে, না কি আপনিই যেচে আসবেন সে ভদ্রলোকের কাছে ?"

অকাট্য যুক্তি, মোক্ষম উত্তর। তার ওপর কোন কথা চলে না। অনবদ্য সৃষ্টির স্রষ্টা যিনি—তিনি কেন করুণা প্রসাদ যেচে বেড়াবেন ধনীজনের দুয়ারে দুয়ারে ?

মুর দম্পতি বিনা বাক্যে তাঁকেই বাড়ীটির ডিজাইন তৈরীর ভার দিলেন। এ কাজে অবশ্য তিনি তৃপ্তি পান নি। মুর দম্পতি ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে বাড়ীটির রূপ দিয়েছিলেন তিনি—সেই সনাতন রূপেরই প্রতিচ্ছবি—পুরোনো ইংলিশ কটেজেরই সংস্করণ। তাঁর ওপর সম্পূর্ণ আস্থা নিয়ে তাঁর দরজায় এসেছেন এক জ্ঞানবৃ

ক্তি—সেই কথা ভেবে তিনি তাঁদের সখ, তাঁদের ইচ্ছাই মেনে লেন সর্বাগ্রে।

ক্রমশ: তিনি গৃহবিজ্ঞানকে উন্নত প্রণালীতে সুন্দর ও আধুনিক রে গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করলেন। "Form follows function" সুলিভানের বিশিষ্ট আবিষ্কার, তাঁর স্বপ্নকে ফ্র্যাঙ্ক য়েড রাইট স্থাপত্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন। ক্লাসিকালের র্কা মারা ছাপ পরিহার করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে স্থাপত্যে রা ষ্টাইলের আমদানী করলেন তিনি। ষ্টাইলের মধ্যে শন—জড় বস্তুতে যেন প্রাণের সাড়া উঠল। Organic Simplicity, Organic Plasticityর যাদুমন্ত্রে তাঁর পরিকল্পিত গুলি হয়ে উঠল উদ্বেল ও ভাষাময় শিল্প। বিভিন্ন ভাব বনার সংমিশ্রণে ও বিভিন্ন মাল-মশলার উপাদানে আয়তন কৃতি ও রূপে প্রত্যেক বিল্ডিং-এর মধ্যে বৈশিষ্ট্য ফুটে ঠল।

এই নতুন আদর্শে গৃহনির্মাণ করতে প্রথম প্রথম খুব বেগ পেয়েছিলেন তিনি। স্থাপত্য এমনি এক শিল্প যেখানে জনসাধারণকে নিয়ে কারবার করতে হয়—জনমতকে অবহেলা করে যা খুশী তাই করে তাদের বা ব্যক্তিবিশেষকে শান্ত রাখা যায় না। ব্যক্তির মনের মধ্যে স্থপতি তাঁর মনোগত ধ্যান-ধারণা যতক্ষণ না স্পষ্টরূপে গেঁথে দিতে পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে প্রশ্ন করবে—সমালোচনা করবে। দেশ ও দশকে শেষ পর্যন্ত বোঝাতে পেরেছেন তিনি। প্রথম প্রথম তাঁর সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় তারা অবিশ্বাস আর সন্দেহ করেছে বেশী। কিন্তু পরে তাঁর সৃষ্টির স্থায়িত্বে ও নব-নবত্বে বিস্মিত বিমুগ্ধ না হয়ে পারেনি।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইলিনয়েসের ওক্ পার্ক অঞ্চলে একটি গীর্জা নির্মাণ কাজের ভার পেয়েছিলেন তিনি। গীর্জা বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে গথিক ষ্টাইলে চিরাচরিত ছাঁদের উচ্চতাবিশিষ্ট ও ক্রমশ: সরু হয়ে যাওয়া চূড়োর ছবি। চার্চ নির্মাণেও তিনি রোমানেস্ক ছাঁদ পুরোপুরি বর্জন করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত "Unity Church"এর ছাদ হয়েছিল সমতল ও নীচু এবং এটি আগাগোড়া শুধু কংক্রীটেই নির্মিত হয়েছিল। তখনকার যুগে পৃথিবীর মধ্যে সেই সব প্রথম আগাগোড়া কংক্রীটমণ্ডিত ভবন নির্মাণ করেছিলেন তিনি ওক্ পার্কে—এই Unity Church পৃথিবীর প্রথম concrete monolith হিসেবে আজও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে।

এভাবে প্রথমে আমেরিকা, পরে ইউরোপের চারিধার থেকে তাঁর ডাক আসতে লাগল। তাঁর কীর্তি ও খ্যাতি তখন আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। শিকাগোর সীমিত ক্ষেত্র থেকে তিনি বেরিয়ে পড়লেন দূরদেশের আহ্বানে। তাঁর প্রতিভা যেন একখণ্ড চকমকি পাথর—যেখানেই যান সে প্রতিভার স্পর্শে সমস্ত স্থান দীপ্ত হয়ে ওঠে। এই লীলাবিদের অজস্র স্থাপত্য সৃষ্টির প্রত্যেকটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, প্রত্যেকটি অনুপম ও সম্পূর্ণ নতুন। সে সবের বর্ণনা অল্প কথায় জানান সম্ভব নয়। এর মধ্যে দু'তিনটি ভবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে শিল্পীর কলাকুশলতার কিছুটা হয়তো হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

টেলিসিন্ (Taliesin) আশ্রম ও বাসগৃহ

টেলিসিন্—উইস্কনসিনের অন্তর্গত পাহাড়ের কোল ঘেঁষা এক পার্বত্য অঞ্চল। প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্যে টেলিসিন্ মনোরম ছবির মত সুদৃশ্য। বন্য পাহাড়ী ফুলে ভরা, ওক্-পপলার-লোম্বার্ডির ছায়ায় ঘেরা এই পার্বত্য পথের ধুলোয় তাঁর শৈশবের শত স্মৃতি বিজড়িত হয়ে রয়েছে। অনেক সময়, অনেক দিন কেটেছে এই উইস্কনসিন্ প্রদেশে। কতবার এসেছেন শৈশবে, টেলিসিনের পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকা গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ কুড়তে। দেহ-মনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকা উইস্কন্সিন, মাতা-মাতামহীর পুণ্য জন্মস্থল—এখানেই তিনি গড়ে তুলতে চাইলেন তাঁর নিজের বাসগৃহ। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সারা ইউরোপ পর্যটনের পর তিনি ওক্ পার্ক থেকে স্থানান্তরিত হলেন উইস্কন্সিনের অন্তর্গত টেলিসিনের পার্বত্য অঞ্চলে। পাহাড়ের ওপর টেলিসিনের অবস্থিতি, সুতরাং স্থানটির সৌন্দর্য্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে অবিকল পাহাড়ী প্রকৃতি, বন-প্রকৃতির রূপের সঙ্গে রূপ মিলিয়ে এক নিসর্গ গৃহ সৃষ্টি করলেন রাইট্। দেখে মনে হয় বাড়িটি বুঝি পাহাড়েরই একটা অবিচ্ছিন্ন অংশ। বাড়ীটার নামও টেলিসিন—একাধারে তাঁর বাসগৃহ, আশ্রম ও ফার্মহাউস এটি।

পাহাড়ের মতই টেলিসিন ভবন কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। পাহাড়টির ঢাল অনুসারে ঢাল নেমেছে টেলিসিনেও। পাহাড় ও অরণ্যের রঙের সঙ্গে গৃহের রঙের সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য এ ভবনটির অধিকাংশ পাথর আর কাঠের উপাদানে নির্মিত হয়েছে। পর্বতগাত্রের মত কোথাও ধূসর, কোথাও শ্যামল রঙের প্রলেপ দেখতে পাওয়া যাবে গৃহ-গাত্রেও। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর এত সাধের টেলিসিন্ দু-দুবার অগ্নি-বিধ্বস্ত হয়েছে আকস্মিক ভাবে। প্রথমবার তিনি তখন শিকাগোর সরকারী কাজে আহূত হয়ে ওখানে গেছেন। হঠাৎ খবর এল আগুন লেগে টেলিসিন ধ্বংস হয়েছে। তাঁর এক নিগ্রো ভৃত্য থাকত টেলিসিনে। লোকটার কিছুদিন আগে মস্তিষ্ক-বিকৃতি হয়—সেই আগুন লাগিয়েছে বাড়ীটাতে। মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা আগে তিনি টেলিসিনের লীলা-নিকেতনে ছাত্র-কর্মী-সন্তান সকলের সঙ্গে আনন্দোচ্ছল মুহূর্তগুলি কাটিয়ে সবে এসেছেন শিকাগোয়, এর মধ্যে এই কাণ্ড। মর্মাহত হয়ে ফিরে এলেন টেলিসিনে। অসংখ্য ড্রইং, মূল্যবান্ কাগজপত্র, বই তো গেছেই—তার সঙ্গে প্রাণ হারিয়েছে সাতজন তরুণ ছাত্রকর্মী। ভারাক্রান্ত মনে নিজে প্রিয় ছাত্রদের কবর দিলেন। আগুনের হাত থেকে কেবলমাত্র তাঁর ষ্টুডিও ওয়ার্কসপটি কোনমতে রক্ষা পেয়েছিল। দ্বিতীয়বারও, যখন তিনি টেলিসিন্‌কে আরও সুন্দর করে গড়ে তুললেন—তখনও এমান আকস্মিক বজ্রপাতে টেলিসিনে আগুন ধরেছিল। দুবার এত বড় ক্ষতি ও মানসিক আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন এত সাহসী মানুষটি।

সময় শোক-ব্যথা ভুলিয়ে দেয়। কালের তালে জননীও পুত্রশোক ভোলে। সময়ে তিনিও দুঃখ-শোক ভুলে পূর্ণোদ্যমে, দ্বিগুণ উৎসাহে, পর্যাপ্ত অর্থব্যয়ে, প্রভূত উপাদানে তৃতীয়বার টেলিসিন্ ভবন নির্মাণ করলেন।

বর্তমানে এটি একটি বিরাট আশ্রমে পরিণত হয়েছে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে বিস্তৃত ছাত্রাবাস আর তার সংলগ্ন বাগান। দূর-দূরান্ত থেকে সারা পৃথিবীর ছাত্র তাঁর কাছে বসে জ্ঞানলাভের আশায় দলে দলে আসে টেলিসিনে। এটি সাধারণ বোর্ডিং-হাউস বা কলেজের মত নয়। হাতে-কলমে এখানকার ছাত্ররা কাজ তো করেই, তা ছাড়া নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্ত কাজও ছাত্রকর্মীরা নিজের হাতে করে। নানা রকম খেলাধুলো, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও রয়েছে টেলিসিনের ভেতরেই। এখানকার পড়াশোনার ধারাতেও চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম দেখা যায়। স্থাপত্য ছাড়াও এখানে টেক্সটাইল, টাইপোগ্রাফি, সেরামিক্স, পেণ্টিং, ভাস্কর্য ও কাঠের কাজও শেখান হয়। প্রত্যেক ছাত্রকর্মীর জন্য এখানে নির্দিষ্ট কক্ষ আছে। তারা সস্ত্রীক বসবাসও করতে পারে। টেলিসিনের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা অতি সাধারণ, আড়ম্বরহীন অথচ সরস গৃহ-জীবনের স্বাদে পূর্ণ। মার্কিণ মুলুকে এমন আদর্শের আশ্রম দুর্লভ বৈকি।

টোকিওর ইম্পিরিয়েল হোটেল

১৯১৫ সালে দ্বিতীয় টেলিসিনের নির্মাণ-কাজ সবেমাত্র শেষ হয়েছে, দেহ-মন দুইই ক্লান্ত রাইটের, সে সময় জাপান থেকে তাঁকে সাদর আহ্বান জানান হোল। টোকিওর ইম্পিরিয়েল হোটেল-এর নির্মাণ-পরিকল্পনার ভার গ্রহণ করলেন তিনি। জাপানী স্থপতি য়োশিটাকি (Yoshitaki) এবং হোটেলটির ম্যানেজার আইশাকু হায়াশি (Aisaku Hayashi) প্রমুখ এক কমিশন আদর্শ বিল্ডিং পর্যবেক্ষণের জন্য পৃথিবী সফরে বেরিয়েছিলেন। আমেরিকায় পৌঁছে তাঁরা নতুন ধরণের স্থাপত্যদর্শনে অভিভূত হলেন। আমেরিকায় নতুন নতুন বাড়ীগুলির অধিকাংশই তখন রাইটের ডিজাইনে তৈরী হয়েছে। জাঁকজমকশূন্য সাদাসিধে চেহারার বাড়ীতে কি আশ্চর্য প্রাণময়তা, কি সৌন্দর্যে ভরা। সেগুলি দেখতে জাপানী গৃহের মত না হলেও ওদেশের পরিবেশে মানায় চমৎকার—এ কথা তাঁদের বার বার মনে হোল। এমন শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য তাঁরা উৎসাহী হয়ে উঠলেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেরাই টেলিসিনে উপস্থিত হয়ে রাইটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। টেলিসিনের সৃষ্টিপন্থায় তাঁরা বিমুগ্ধ হলেন এবং টেলিসিনেই কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে তাঁরা ফিরলেন স্বদেশে।

এই ঘটনার ক'মাস বাদেই টোকিওর বৃহত্তম হোটেল নির্মাণ পরিকল্পনার জন্য কমিটির পক্ষ থেকে তিনি আমন্ত্রিত হলেন। দেশ-বিদেশের জ্ঞানী গুণী, প্রবীণ পারদর্শী কত স্থপতি—তাঁদের সকলের মধ্যে থেকে, এই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবার জন্য তাঁর মত তরুণ স্থপতিকেই নির্বাচিত করা হোল। আমেরিকা থেকে সুদূর প্রাচ্যের সেরা দেশ জাপানে এসে পৌঁছলেন তিনি।

এই হোটেলটির নির্মাণ-পরিকল্পনা অতিমাত্রায় দুঃসাহসিক ও অতীব বিচিত্র। ভারতে বন্যার মতই জাপানের ভূমিকম্প ওদেশের নিত্যসঙ্গী। ঘরের দামাল ছেলের মতই সর্বক্ষণ তার অস্থিরতাময় অস্তিত্বের দাপটে সবাই কম্পমান। বিনা নোটিশে ক্ষণে-অক্ষণে মাটি কাঁপিয়ে জানিয়ে দিয়ে যায়—"আমি আছি, আমি আছি।" এ হেন টোকিওর এক ভূমিকম্পবহুল অঞ্চলে, কাদামাটির নরম ভিতের ওপর বিরাটায়তন রাজকীয় হোটেল নির্মাণ করতে

হবে তাঁকে, সোজা ব্যাপার নয় এবং হোটেলটি হবে বেশ কয়েকতলা উঁচু ভূকম্পরোধী হোটেল (Earthquake Proof Hotel).

হোটেল নির্মাণ পরিকল্পনার প্রথমেই তাঁর মনে হোল, জাপানের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপটিও হোটেলের চেহারার মধ্যে থাকা দরকার এবং একমাত্র দৈনন্দিন জীবন-প্রবাহের মাধ্যমেই সেই ছাপ অর্থাৎ জাতির রুচি-রীতি, আচার-ব্যবহার, কৃষ্টিধারার পরিচয় পাওয়া সম্ভব। তাই প্ল্যান পরিকল্পনার পূর্বে তিনি বহু পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার খুঁটিনাটি দেখবার ও জানবার সুযোগ পেলেন।

সুপরিচ্ছন্ন, সৌখীন অথচ অনাড়ম্বর মার্জিত রুচিবোধের অধিকারী এরা—সর্বত্রই এই জিনিষটি লক্ষ্য করলেন তিনি। মুগ্ধ হলেন ওখানকার সাদাসিধে অথচ উন্নতাদর্শের স্থাপত্য-নিদর্শন আর গৃহসজ্জার নমুনা দেখে। জাপানী গৃহে বাহুল্য বা অনাবশ্যকতার স্থান নেই। যেখানে যেটি প্রয়োজন ও একান্ত মানানসই, ঠিক সে কটি জিনিয দিয়েই পরিচ্ছন্ন পন্থায় সাজান প্রত্যেকটি বাড়ীঘর। ঘরের প্রতি আসবাব ও গৃহস্থালী জিনিষপত্র এমন সুকৌশলে রাখা হয় যে, প্রয়োজন হলে সেগুলি রূপান্তরিত, স্থানান্তরিত করা যায় অতি সহজেই।

হোটেলটি সম্পূর্ণ অভিনব পরিকল্পনায় নির্মাণ করলেও, তার বাহ্যিক কাঠামোয় ও আভ্যন্তরীণ রূপসজ্জায় তিনি জাপানের এই স্থাপত্য ও ললিত শিল্পকলার ধারাটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

টোকিওর এই হোটেলকে কি কৌশলে, কি পন্থায় ভূমিকম্পের কবল থেকে সংরক্ষিত করা যায়, সেই চিন্তায় তিনি ধ্যানস্থ থাকতেন সর্বক্ষণ। খেতে-শুতে সেই এক চিন্তা। যতক্ষণ না সমস্যার সমাধান হয়, ততক্ষণ শান্তি নেই। এক এক সময় এক এক পরিকল্পনা জেগে ওঠে—গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেত, স্বপ্নে যেন নতুন পথের এক সন্ধান পেতেন তিনি। কল্পনা করতেন, যেন ভূকম্পনে চারিধার, পায়ের তলার মাটি তীব্র দোলায় অসম বেগে উঠছে আর নামছে, ঠিক যেন বাত্যাবিক্ষুব্ধ অশান্ত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মতই মাটির এই ওঠানামা। এখন কি করে রক্ষা পাবে হোটেল-বিল্ডিং ? অন্ধ ভাবনারাশির মধ্যে আলোর উপকূল দেখতে পেলেন যেন ক্ষণিকের জন্য। ভাবলেন মনে মনে—"আচ্ছা ধরা যাক সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের উর্মিমালার তালে তালে একটা বিরাট নানা-দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ যুদ্ধজাহাজ ভেসে চলেছে। মহাসমুদ্রের অস্থির বুকে নানা কক্ষবিশিষ্ট সেই জাহাজও তো একটা বাড়ীর মত। ঢেউয়ের উত্তাল দোলায় জাহাজ দুলছে অবিরাম, তবুও তো ডোবে না। তাহলে ? তাহলে হোটেলের প্ল্যান কি সে রকম ভাবে করা যায় না ? অর্থাৎ ভূমিকম্পের সময় মাটির দোলায় বাড়ীটি দুলবে, ওঠানামা করবে, অথচ ভাঙবে না।"

হোটেলের ভিত্তি পরিকল্পনার প্রথম বছরে তিনি কর্মস্থলে গিয়ে নিজেই ভিত পরীক্ষা করতে লাগলেন। দেখা গেল, জমির ঠিক ৮ ফিট নীচে থকথকে নরম কাদামাটির স্তর রয়েছে প্রায় ৬০ কি ৭০ ফিট পর্যন্ত। এমন মাটির ওপর কংক্রীট ও লোহার একটি ভারী গাঁথুনী তুললে ভূমিকম্পে সে বাড়ীর পতন অবশ্যম্ভাবী। এই নরম কাদামাটির ওপর তিনি খুব হাল্কা ধরণের ভাসমান হোটেল নির্মাণ করতে চাইলেন। "ভিত গাঁথবার সময় জমিতে সমান মাপে ফাঁক ফাঁক করে পৃথক ভাবে কংক্রীটের হাল্কা ফাঁপা Piles পুঁতে তার ওপর বাড়ী তুললে হয়তো কৃতকার্য হতে পারি।" এভাবে মোটামুটি একটা প্ল্যানের খসড়া প্রস্তুত করে ফেললেন রাইট্।

এবার সমস্ত জমিতে সারিবদ্ধ ভাবে সমান মাপে ফাঁক ফাঁক করে ৮ ফিট পর্যন্ত লম্বা কংক্রীটের খুঁটি পোঁতা হোল এবং এই সমান দূরত্ববিশিষ্ট পৃথক পৃথক খুঁটির ওপর এক একটি সিধে দেয়াল উঠল। ভিত্তি নির্মাণের পর ৬০ ফিট লম্বা ও সমান দূরত্ব-বিশিষ্ট কতকগুলি অংশে হোটেল-বাড়ীটিকে ভাগ করা হোল। তার এক একটি ভাগের সঙ্গে অতঃপর নির্ভুল ক্যালকুলেশনে মেঝে, দেওয়াল ও ছাদের পরস্পর সংযোগ স্থাপিত হোল। এখনও ভূকম্পনে হোটেলের ভিত ও নীচেকার নরম থকথকে কাদামাটি ওঠানামা করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা করে হোটেল-বাড়ীটিও; কিন্তু পৃথক পৃথক Piles এর ওপর পৃথক ভাবেই গাঁথুনী তোলা হয়েছে বলে সেগুলো ওঠানামার সময় একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ভেঙে পড়ে না। ভূ-আলোড়নে যাতে দেওয়াল ও মেঝের জোড়স্থানে এতটুকু ফাটল না ধরে, সে ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। এ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ তাঁর মনে এক নতুন ধরণের পরিকল্পনার আগ্রহ জাগল।

"A construction was needed where floors would not be carried between walls, because Subterranean disturbances might move the walls

and drop the floors. Why not then carry the floors as a waiter carries his tray on upraised arms and fingers at the centre—balancing the load? All supports centred under the floor slabs like that instead of resting the slabs on the walls at their edges as is usually the case?" (আত্মচরিত, ফ্র্যাঙ্ক লয়েড্ রাইট, পৃষ্ঠা ১১২)

দেওয়াল ও মেঝে একত্র জোড়া লাগাবার সময় সাধারণতঃ সংযোগকারী Supportগুলো দেয়ালের কিনারা ঘেঁসিয়েই লাগান হয়ে থাকে। কিন্তু হোটেল বিল্ডিং-এর ক্ষেত্রে অনুরূপ ভাবে দেওয়াল ও মেঝের পারস্পরিক সংযোগসাধন সম্ভবপর ছিল না। ভূমিকম্পে দেওয়ালগুলি নড়ে উঠলে মেঝেও নড়ে উঠবে, তার ফলে দেওয়াল ও মেঝেতে ফাটল ও গর্তের সৃষ্টি হবে। কাজে কাজেই এই প্রণালীতে দেওয়াল ও মেঝের সংযোগসাধন অচল হোল। তখন রাইট ভাবলেন Concrete Canteliver Support-গুলো যদি দেওয়ালের কিনারা ঘেঁসিয়ে না লাগিয়ে মেঝের কেন্দ্রস্থলে বসানো যায়, তাহলে হয়তো দেওয়াল ও মেঝের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে। ঠিক যেমন করে হোটেল-বেয়ারা ট্রের মাঝখানে দু'হাতের আঙুল রেখে ট্রেটা চেপে রাখে। যে কোন ভঙ্গীতেই তারা চলাফেরা করুক না কেন, এভাবে ট্রের কেন্দ্রস্থল চেপে থাকার ফলে কোন অবস্থাতেই তা হস্তচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকে না।

পরিকল্পনা অনুসারে, ধীরে ধীরে লোহা, কাঠ, কংক্রীট, লাভা, ইট, মোজায়েকের উপাদানে jointed monolithরূপে এই রাজকীয় হোটেল গড়ে উঠল। বিল্ডিং গড়ে তোলার পর রাইট ৪০,০০০ ইয়েন ব্যয়ে একটা বিরাট জলাশয় নির্মাণ করতে চাইলেন ঐ হোটেলের মধ্যেই। এমনিতেই হোটেলটা এই নতুন প্রণালীতে গড়ে তুলতে বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছিল, তার ওপর আবার চল্লিশ হাজার ইয়েনের এক বিরাট জলাশয় নির্মাণ করতে হবে জেনে হোটেল-কমিটির কর্তাব্যক্তিরা তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। একে তো কমিটির সভ্যরা তাঁর এই অদ্ভুত ধরণের প্ল্যানের তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি। এ ব্যাপারে দেশময় কাণাঘুষা, বিরুদ্ধ সমালোচনা সুরু হোল। সবাই বলাবলি সুরু করলেন—এ বিল্ডিং ভূমিকম্পে টেঁকতে পারে না, কিছুতেই না। নিন্দামন্দে কাণ পাতা যায় না। প্রতিমুহূর্তে জবাবদিহি করতে হয় প্ল্যানের জন্য। এর ওপর আবার ৪০,০০০ ইয়েন্ ব্যয়ে জলাশয় নির্মাণ? তিনি তখন কমিটির চেয়ারম্যান্ Baron Okura-কে বোঝালেন যে "ভূমিকম্পে, অগ্ন্যুৎপাতে আগুন নেভানই জলাশয় নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য। এত বিরাট, নানা দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ রাজকীয় হোটেল এটা, বিপদের সময় বাইরে থেকে এর প্রয়োজন-মাফিক জল আনা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া ভূমিকম্পে বাইরের জল প্রায়ই বিশুদ্ধ থাকে না, তখন একমাত্র এই জলাশয়েরই জল হোটেলবাসী, হয়তো অধিকাংশ টোকিওবাসীর জলাভাব দূর করবে।"

হয়েছিলও তাই, তাঁর এ কথা সফল হোল ঠিক দু'বছরের মধ্যেই।

হোটেলের কাজ শেষ করে তিনি ফিরে গেলেন স্বদেশে। তখন ১৯২৩ সাল—তিনি লস্-এঞ্জেলস্-এ। একদিন বাতাসের বেগে পথে-ঘাটে এক দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। "টোকিও ও ইয়াকোহামা বন্দর নিশ্চিহ্নপ্রায়। এমন সর্বধ্বংসী ভূমিকম্প ইতিপূর্বে আর ঘটেনি।" সংবাদপত্রের শিরোনামা দেখে, দুর্বিষহ দুশ্চিন্তা ও মর্মপীড়ায় সে রাত্রি তাঁর দুঃস্বপ্নের মত কাটল। পরদিন এক সংবাদপত্রের সম্পাদক ফোনে জানালেন তাঁকে, ইম্পিরিয়েল হোটেলের আর চিহ্নমাত্রও নেই। কে যেন সজোরে তাঁর হৃৎপিণ্ডকে মুচড়ে দিল। তবুও দৃঢ়কণ্ঠে জিগেস করলেন সম্পাদককে "কেমন করে জানলেন?" সংবাদপত্রের খানিকটা গড় গড় করে পড়ে গেলেন সম্পাদক। সুদীর্ঘ ইম্পিরিয়েলের তালিকা। "ইম্পিরিয়েল ইউনিভার্সিটি, ইম্পিরিয়েল থিয়েটার, ইম্পিরিয়েল হস্পিটাল, ইম্পিরিয়েল এটা ওটা সেটা ইত্যাদি।" রাইট বললেন, "অন্যান্য ইম্পিরিয়েল-এর সঙ্গে আমার ক্রিয়েশন জড়াচ্ছেন কেন? জেনে রাখুন, টোকিওর মাটিতে যদি কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকে, সে শুধু হোটেল বিল্ডিংটিরই অস্তিত্ব থাকবে।"

রিসিভার রেখে দিলেন তিনি সশব্দে। এর দশ দিন পরে তাঁর নামে এঞ্জেলস-এ কেবল এল। টোকিওর থেকে Baron Okura জানিয়েছেন—"Hotel stands undamaged as monument of your genius. Hundreds of homeless provided by perfectly maintained service. Congratulations." Baron Okura.

তাঁর কথামত জলাশয়টিও আগুন নেভানর কাজে দ্রুত সহায় হয়েছিল ও হাজার হাজার লোকের পিপাসা দূর করেছিল। এরপর বহুবার, এখনও মাঝে মাঝে ভূ-আলোড়নে হোটেল বিল্ডিং আলোড়িত হয়, এদিক-ওদিক চলকে ওঠে..."As a tea tray on waiter's fingers".

Falling Water (প্রপাত-ভবন)

তাঁর পরিকল্পিত অন্যান্য বিল্ডিং-এর মধ্যে "Falling Water" "Arizona Desert Camp" বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। "Falling Water" বা প্রপাত-ভবন সার্থকনামা বিল্ডিং Pennsylvania অঞ্চলে Bear Runএর ছোট নদীর রূপোলী জলধারার ওপর প্রপাত-ভবনের অবস্থিতি। মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি কৌশলে বাড়ীটাকে এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, দেখে মনে হয়, একমুঠো উচ্ছ্বাস ও কৌতুক যেন এর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। উঁচু যায়গা থেকে নদীর জলধারা নীচে সশব্দে নেমে আসছে—সে ধারা এদিক-ওদিক বিভক্ত হয়ে গেছে মাঝখানের ভূমিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের গায়ে প্রতিহত হয়ে। Canteliverএর ওপর দণ্ডায়মান বাড়ীটাকে মনে হবে মাঝখানের সেই জমে থাকা জলের ওপর মৃদু মৃদু ভাসছে। গঠন-বৈচিত্র্যে অপরূপ তার দৃশ্য। উজ্জ্বল স্বপ্ন, সুমধুর স্বপ্ন চোখ খুললেই মিলিয়ে যায়; কিন্তু এ স্বপ্নের রাজ্য একেবারে প্রত্যক্ষ। এর অস্তিত্ব দুচোখ ভরে দেখে তারিফ করার মত। বাড়ীটার যে কোন স্থান, কি বসবার ঘর, কি শোবার ঘর, কি বারান্দা, সব দিক থেকে চোখে পড়ে সফেন জলরাশি। শীতে সে জল জমাট বরফ, গ্রীষ্মে বিগলিত ধারা। রাইট এই বিল্ডিংএর প্ল্যান করেন ১৯৩৬ সালে। বাড়ীর মালিক Edger. T. Kaufmann পর্যন্ত গৌরবের অধিকারী হয়েছেন প্রপাত-ভবনের দৌলতে।

দেশ-বিদেশের অগণ্য পর্য্যটক ও স্থপতি 'প্রপাত-ভবন' পরিদর্শন করতে আসেন ও এসেছেন বিভিন্ন সময়ে। তাঁদের মনে বিভ্রম জেগেছে—নিরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু এক প্রশ্ন "স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু!" "স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়" ভাষায় বলতে গেলে একমাত্র বলা যায়, রোমান্টিক ল্যাণ্ডস্কেপ আর্কিটেকচারের এ এক বিচিত্র সত্তা, অতীব বিস্ময়!

—Illinois Building—

সম্প্রতি তিনি আমেরিকার ইলিনয়েস্ বিল্ডিং পরিকল্পনার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। সুদীর্ঘ বছর ধরে অজস্র ধরণের গৃহ নির্মাণে তিনি যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তার তুলনা মেলে না। কিন্তু চরম বিস্ময়াবহ, গগনচুম্বী ইলিনয়েস ভবনের পরিকল্পনা সফল হলে পৃথিবী তাঁকে স্মরণ করবে যুগ যুগ ধরে।

এ ভবনের পরিকল্পনা শুনলে বিশ্বাসের থেকে অবিশ্বাস হয় বেশী। সম্পূর্ণ তৈরী হলে না জানি কেমনতরো হবে এ বস্তু—জগতের সব স্থপতির মনেই এ চিন্তা জাগছে থেকে থেকে।

এই বিশিষ্ট বিল্ডিংটি হবে এক মাইল উঁচু অর্থাৎ গগনচুম্বী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিংএর চেয়েও পাঁচগুণ ও সেন্ট পলস্ চার্চের চেয়েও পনের গুণ বেশী উঁচু। ভাবলেও যেন আয়ত্তের মধ্যে আনা যায় না উচ্চতার পরিমাপটা! আলো-বাতাসের অবাধ সঞ্চালনের জন্য এই Sky-scraperএর চারপাশে থাকবে দিগন্তবিস্তৃত মাইলের পর মাইল জোড়া ঘন সবুজ পার্ক। Tripod Principleএ নির্মিত হবে ইলিনয়েস্ বিল্ডিং এবং সম্পূর্ণ বাড়ীটি এমন কতগুলো মালমশলায় উপাদানে গঠিত হবে যে, ইচ্ছানুসারে তার আকার পাল্টানো যাবে অনায়াসে, প্রয়োজন বোধে আভ্যন্তরীণ দেওয়ালগুলো খোলা বা জোড়া লাগান যাবে বিনা কষ্টে।

আণবিক শক্তির বলে এই বিল্ডিংএ ৫৬টা লিফট চলবে অতি দ্রুত গতিতে এবং ১৫,০০০ গাড়ী দাঁড়ানোর মত জায়গা থাকবে নীচে। ১০০টা হেলিকপটারের জন্য Landing decksএর বন্দোবস্ত থাকবে এর মধ্যে। অবিস্মরণীয় স্থাপত্যকীর্তির স্মারক হবে এটি, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তাতে।

প্রায় একটি শতাব্দীর সীমানায় তাঁর আয়ু এসে পৌঁছেছে, এই একটি শতাব্দী ধরে এই স্থিতধী, সংযতবাক্ মানুষটি কেবলই সৃষ্টিখেলায় মগ্ন রেখেছেন নিজেকে। Modern Architectureএর শিখরদেশে স্বর্ণ-গৌরবে জ্বলছে তাঁর নাম। কেমন করে তিনি দুরূহ দুরধিগম্য সমস্যার নির্ভুল সমাধান করে গৃহবিজ্ঞান সাধনায় সফলকাম হয়েছেন, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—"Every problem carries within itself its own solution to be reached only by the intense inner concentration of a sincere devotion of truth. I can say this out of a lively personal adventure in realizations that gives true scheme, line and colour to all life and, so far as Architecture goes, life to what otherwise would remain more unrelated fact. Dust, even if stardust."*

---

* এই প্রবন্ধে গৃহীত আলোকচিত্র স্থপতি শ্রীমানসিং রাণার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রবন্ধটি লিখতে যাবতীয় পুস্তক ও তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন স্থপতি শ্রীধ্রুব সেন ও শ্রীঅমিতাভ সেনগুপ্ত।

শেষ

রাত জাগা ভোরে

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

বই-পড়া প্রেমে মনটা দাবার ঘুঁটি,
চৌকো ঘরের চৌকাঠ ভেঙে চলা
কার ইচ্ছায়; নিঃসাড় ছুটোছুটি—
জেগে-থাকা ঘুমে আড়ষ্ট কথা বলা।
ধুলা-বালি আর নর্দমা অলিগলি
মুখ ঢেকে চুপ নীল ফরাসের চাপে,
মেঘ ফুঁড়ে খসা তারাদের গলাগলি,
ঝকঝকে চাঁদে শান দেওয়া মন কাঁপে।

রাত জাগা ভোরে আলো নেভা চিমনিতে
কালি লেপা ছবি। সর্পিল গলি ঘুরে
একরাশ হাওয়া এসেছে কী ছুঁড়ে দিতে:
নগ্ন থাবার দাপাদাপি কাছে দূরে।
বিদ্ধ আকাশ, উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে
জড়ায় মনকে রোদঝরা আশ্বাসে।

বার্ষিকী

(স্টেফান গেয়র্গে)

বোনটি আমার! পোড়া মাটির কলসী নিয়ে এসো।
এসো আমার সঙ্গে: তুমি ভোলোনি নিশ্চয়
স্মৃতির ভারে আমরা যে-সব বিধান মেনেছিলাম।
সাতটি বছর কেটে গেলো এই দিনটির আগে,
কুয়োতলায় কত কথাই হ'তো তখন, ভাবো!

একই দিনে আমরা কিনা নিঃস্ব হ'য়ে গেলাম—
বিধবা ও সর্বস্বান্ত, স্মৃতির দ্বারা ভারাক্রান্ত, আতুর!
ওই ওখানে কুয়োতলায় এসো,
পোড়া মাটির কলসী নিয়ে জল আনতে চলো—
যেখানে ওই মাঠের মধ্যে খাড়া
লম্বা দুটো মিলের পাখা একটি কেবল মস্ত পাইন নিয়ে॥

অনুবাদ: ভবানীপ্রসাদ ঘোষ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীগৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

অতি সন্তর্পণে পথ চলছেন বিশুবাবু।

নিস্তব্ধ জনবিরল পথ। মাঝে মাঝে টিম টিম করে আলো জ্বলছে এখানে-সেখানে—একটা পোষ্ট বাদ দিয়ে অপরটায়। মনে পড়ে গেল শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তর কথা—"চোখের জোর থাকলে একটা আলো থেকে আর একটা আলো দেখা যায়"। মফঃস্বল সহরের এই ত চেহারা—আগেও এই ছিল, এখনও প্রায় তাই-ই আছে। ব্যতিক্রম শুধু ঐ সর্ব্বনাশা ক্লাব-বাড়ীটা। মাথার ওপর মেঘে-ঢাকা মসীকৃষ্ণ অন্ধকার আকাশ—একটা তারাও চোখে পড়ে না। বিশুবাবুর মনে হয়, মানুষের এই নির্লজ্জতায় আকাশের তারারাও বুঝি লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে। শুধু লজ্জা নেই মানুষের।

কথাটা ভাবতেও বিশুবাবুর মনে কষ্ট হল। এই আমাদের সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশ—আর তার দেশের লোক এবং তার অফিসারের দল। রুচি নেই, কৃষ্টি নেই, শালীনতা নেই, সততা নেই—নেই একটা মেরুদণ্ড। আছে শুধু ভীরুতা, নির্লজ্জতা, নোংরামী, কপটতা আর মিথ্যা অহঙ্কার। এরাই গড়ে তুলবে আদর্শ ভারত, আমাদের স্বপ্নের ভারত, গান্ধীজীর রামরাজ্য। হায়রে আশা, হায়রে কুহক।

অন্যমনস্কভাবে পথ চলেছেন বিশুবাবু—দেখা হল রাস্তার মোড়ের ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে। সেলাম করে জিজ্ঞাসা করলে সে—হুজুর আপনি—এত রাত্রে? তারপরই একটু উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, খোখী কেমন আছে বাবুজী? বোখার কি আরও বেশী হয়েছে?

একটা ম্লান হাসি হেসে মাথা নাড়লেন বিশুবাবু, মুখে কিছু বললেন না। আরও উৎকণ্ঠ হয়ে উঠলো কনস্টেবলটি, বললে, এখন কি আর ডাগদার বাবুকে পাবেন বাবুজি? একটু জলদি করে চলে যান—পানি আসতে পারে। ছাতাও একটা লেন নি যে বাবুজি! বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর সত্য সত্যই ভারি হয়ে আসে।

আকাশের দিকে একটু চেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন বিশুবাবু। যাক, বাঁচা গেল—কোন মিথ্যা জবাব দিতে হল না। নিজের জবাব নিজেই পেয়ে গেছে পাঁড়েজী। চলতে চলতে অকস্মাৎ তাঁর মনে হল—তা হলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বুক এখনও শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায় নি—একটা-আধটা বুকে এখনও জেগে আছে স্নেহ-মমতার শ্যামল ঝর্ণাধারা।

দীর্ঘ এক মাইল পথ—পায়ে-পায়ে তা-ও শেষ হয়ে গেল। বিশুবাবু এসে পৌঁছালেন পোষ্ট-অফিসের বন্ধ-দরজায়। টেলিগ্রাম করতে হবে কমিশনার সাহেবকে, চীফ সেক্রেটারীকে আর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এখনই—নৈলে কালকের অ্যারেষ্টকে আর ঠেকানো যাবে না। বহু কষ্টে ডেকে তুললেন বিশুবাবু ঘুমন্ত পোষ্ট-মাষ্টারকে। অবাক হয়ে সব কথা শুনলেন তিনি, তারপর একটা ম্লান হাসি হেসে বললেন, বোলতার চাকে ঘা দিয়েছেন বিশুবাবু, অনেক হাঙ্গামা আপনাকে পোয়াতে হবে এবার। বলে ফন্ কটা তুলে নিয়ে তাঁর তারের যন্ত্রে ঝঙ্কার তুললেন।

যাক, লাইন পাওয়া গিয়েছে—স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন বিশুবাবু। তারপর টাকা-পয়সা চুকিয়ে দিয়ে এসে দাঁড়ালেন তিনি অফিসের বারান্দায়। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হতে শুরু হল—ক্রমে সেটা বেড়ে ঝম ঝম করে মুষলধারে বর্ষণ আর সেই সঙ্গে শুরু হল মেঘের গর্জ্জন আর বজ্রনিনাদ। বিশুবাবুর মনে পড়ে গেল নিজের গৃহের কথা—কি জানি কেমন আছে মেয়েটা! কি কচ্ছে হৈমন্তী—তার আবার বড় ভয় ঐ আকাশের বিদ্যুৎকে!

ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে—ভেসে যাচ্ছে পথের যত ধুলো-কাদা, নোংরা ময়লা ঐ জলস্রোতে। এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে ভাবতে থাকেন বিশুবাবু। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকে ঘুমন্ত পাড়ার বাড়ীগুলো তাঁর চোখে পড়তে থাকে। সকলেই ওখানে সুপ্ত—সকলেই ঘুমাচ্ছে ওখানে শান্তিতে, আরামে—আর যত অশান্তি আর অনিদ্রা শুধু তাঁর দুটি চোখে আর এক মাইল দূরে থাকা আর একটি হতভাগিনীর দুটি কালো চোখে।

কড় কড় করে বাজ পড়লো একটা। চমকে উঠলেন বিশুবাবু। বাজকে বড় ভয় করে হৈমন্তী। বিশ্ব-সংসারের আর কোন কিছুতে তার ভয় নেই—যত ভয় ঐ আকাশের বাজকে। মনে পড়ে গেল বিশুবাবুর তাঁর বিয়ের বছরখানেক পরের একটা ঘটনার কথা। সেদিনও

ছিল এমনই অন্ধকার রাত। হঠাৎ শুরু হল বিত্যুতের ঝকমকানি আর মুষলধারায় বৃষ্টি। বিশুবাবু উঠে বসলেন খাটের উপরে আর চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন বাইরের আকাশের দিকে। সাদা সাদা বিত্যুতের রেখাগুলি কালো আকাশের বুকের একদিক থেকে অপর দিক পর্য্যন্ত নির্মম ভাবে ছুরি দিয়ে চিরে দিয়ে যাচ্ছে আর চারিদিক হঠাৎ আলোয় ঝলমলিয়ে উঠছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিশুবাবু সেই দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময়ে হৈমন্তী আস্তে আস্তে তাঁকে বললেন, জানালাগুলো বন্ধ করে দাও না। অবাক হয়ে বিশুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? হৈমন্তী একটু ভীত আর সলজ্জ হাসি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, আমার বড্ড ভয় করে। তার সেই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই পড়েছিল ভীষণ শব্দে একটা বাজ আর সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তী তাঁকে নাগপাশের মত জড়িয়ে ধরেছিলো সেদিন। তা নিয়ে উত্তরকালে তিনি তাকে বহুদিন বহু পরিহাস করেছিলেন।

সেই ভয়কাতরা হৈমন্তী পড়ে আছে আজ বাড়ীতে একা। সব ছেলেমেয়েরা হয়ত অঘোরে পড়ে ঘমাচ্ছে। কত ভয়ই না জানি পেয়েছে হৈমন্তী! কেমন আছে না জানি সেই রুগ্না মেয়েটা।

কার মুখের দিকে চাইবে এখন হৈমন্তী? কে তাকে দেবে সাহস—কে দেবে সান্ত্বনা? মনে পড়ে গেল গৃহদেবতা লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের কথা। মনে মনে প্রণাম করলেন তাঁকে।

প্রণাম করলেন বিশুবাবু গৃহদেবতা লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে—প্রণাম করলেন নৃমুণ্ডমালিনী মা কালিকাকে—প্রণাম করলেন দশপ্রহরণ-ধারিণী, মহিষমর্দ্দিনী, সর্ব্ব অশিবনাশিনী মা তুর্গাকে। নিত্যই তিনি এঁদের পূজা করেন, বন্দনা করেন, সেবা করেন। আজ এই বর্ষণ-মুখর অন্ধকার রাত্রে জনহীন পোষ্ট অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিশুবাবু আবার প্রণাম করলেন এঁদের উদ্দেশে আর প্রার্থনা করলেন তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যার কল্যাণ। তুহাত জোড় করে, একান্ত ভক্তিভরে বিশুবাবু এঁদের উদ্দেশে প্রণাম করলেন।

চোখ খুললেন বিশুবাবু। হঠাৎ যেন অপূর্ব্ব প্রশান্তিতে ভরে গেল তাঁর সমগ্র অন্তর। দূর হয়ে গেল তাঁর সমস্ত ভয়, সমস্ত আতঙ্ক, সমস্ত উদ্বেগ। মনে হল যে তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন মা অভয়ার সেই অভয় মূর্ত্তি। তিনি দেখেছেন—মসীকৃষ্ণ দিক-দিগন্তের পটভূমিতে আঁকা খেটক-খর্পরধারিণী, নৃমুণ্ডমালিনী, অসিকরা দিগম্বরী মায়ের বরাভয়দায়িনী অভয়া মূর্ত্তি। সে মুখে অপূর্ব্ব মধুর হাসি, সে চোখে অপার করুণা, সেই ভঙ্গিমায় এক অপরূপ কল্যাণময়ী শ্রী। স্পষ্ট দেখলেন বিশুবাবু সেই মূর্ত্তিমতী কল্যাণী যেন দিব্যমূর্ত্তিতে তাঁরই গৃহে তাঁরই স্ত্রী-কন্যাদের মাঝে হাস্যমুখে বিরাজ করছেন।

ভরে গেল বিশুবাবুর সমগ্র অন্তর এক অপার্থিব আনন্দের স্নিগ্ধ হিল্লোলে। কোন তুঃখ, কোন ক্ষোভ নেই আর তাঁর অন্তরে। শান্ত হয়ে গেল সমস্ত জ্বালা, সমস্ত অশান্তি। মনে মনে বুঝলেন বিশুবাবু, বড় রকম আঘাত না পেলে পাওয়া যায় না বড় রকম কোন আনন্দ—বড় ক্ষতি না হলে হয় না কোন বড় লাভ। সারা অন্তর ভরে গেল তাঁর এক অতি অনাবিল শান্তিতে।

তু'হাত বুকের ওপর চেপে ধরে ভাবতে থাকেন বিশুবাবু—মা তোমার কল্যাণী—কল্যাণময়ী। অথচ কি আশ্চর্য্য মানুষের মন, একটু আগেই আমি সন্দেহ করেছি মা তোমার কল্যাণশক্তিতে, সন্দেহ করেছি তোমার কল্যাণময়ী কার্য্যধারায়। মনে মনে ভেবেছি, হে নারায়ণ,

হে মা জগদম্বা। জীবনভোর তোমাদের সেবা করে আসছি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে—ইচ্ছা করে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেইনি জীবনে, সত্য, ন্যায় নিষ্ঠাকে আদর্শ করে জীবনভোর যে এই পথে চলে এলাম—আজ এই প্রৌঢ় বয়সে তার তুমি কি মূল্য দিলে! ভেবেছিলাম জীবনভোর যারা করে এল অন্যায়—করে এল অধর্ম, তাদের তুমি ত দিয়ে চলেছ প্রচুরভাবে—মুক্তহস্তে। এ তোমার কি বিচার মা!

কিন্তু এবার যেন চোখ খোলে বিত্তবাবুর। তিনি দেখতে পেলেন—এমনই হয়ে আসছে বিশ্ব-সংসারে চিরদিন—হয়েছে, হয় এবং হবেও। সত্যের পথ চিরদিনই দুর্গম—ক্ষুরধার। যারা চলেছে এই পথে, সর্ব্বাঙ্গে ঝরে গেছে তাদের রক্তের বসুধারা—পদে পদে হয়েছে তারা পীড়িত, জর্জ্জরিত, লাঞ্ছিত। এই পথে চলতে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে হারাতে হয়েছে রাজ্য, যেতে হয়েছে বনে, কেঁদে কেঁদে সিক্ত হয়েছে রাত্রি-দিন প্রাণাধিকা সীতাকে হারিয়ে, এমন কি ছায়ার মত অনুগামী প্রাণপ্রিয় যে ভাই তাকে সমর্পণ করতে হয়েছে তামসী সরযূর বুকে মৃত্যুর অন্ধকারে। এই পথ অনুসরণ করতে গিয়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে হারাতে হয়েছে রাজ্য, বরণ করতে হয়েছে বনবাস, লাঞ্ছিতা হয়েছে, তাঁর ধর্ম্মপত্নী, আর তাঁদের গ্রহণ করতে হয়েছে অপরের দাসবৃত্তি। আর এই ত সেদিন দেখেছেন তাঁরা সকলেই নিজের চক্ষে এমনই এক সর্ব্বত্যাগী, কৌপিনধারী ন্যায়নিষ্ঠ সত্যের সাধককে—যাঁকে আজ আমরা জাতির জনক বলে পূজা করে থাকি—সেই নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ মহাপুরুষটি পেয়েছেন সারাজীবন অজস্র লাঞ্ছনা আর শত্রুর নির্ম্মম কশাঘাত—কাটিয়েছেন জীবনভোর কারাগারে আর বন্দি-দশায় এবং ভোগ করেছেন শত্রু-মিত্রের দেওয়া কতই না নিষ্ঠুর মর্ম্মপীড়া আর আঘাত। আর সর্ব্বশেষে তাঁর জীবনব্যাপী অহিংস সাধনার পুরস্কার হিসাবে পেলেন এক অতি নির্ম্মম মৃত্যু তাঁরই দেশের একটি ছেলের হাতের হিংসামুখর এক রিভলভারের বুক থেকে। তাঁর জীবন দিয়ে এনে দেওয়া স্বাধীনতার এই-ই হয়ত শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

৫

কয়েকটা দিন বেশ শান্তিতেই কেটে গেল।

তারপর শুরু হল এক নতুন জাতের অশান্তি। রাত্রির শান্তি নষ্ট হলেও একদিন নষ্ট হয় নি তাঁর দিনের আরাম। এবার এটিও গেল। সমস্ত হাকিমের দল পরস্পর যুক্তি করে তাঁকে জব্দ করবার জন্য অবলম্বন করলেন এক অদ্ভুত পন্থা। সে কি বিস্ময়কর পরিস্থিতি! নিশ্চল ভাবরেখাহীন মুখে বসে থাকেন এই সব হাকিমরা। বিত্তবাবুর মামলার সময় তাঁর কোন কথাই তাঁরা কান দিয়ে শোনেন না। মনে হয় শুধু অবান্তর ভুল কথা বলে চলেছেন বিত্তবাবু, ওতে শোনবার মত কিছুই নেই—আর তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলবাবুরা যা কিছু বলেন তা যেন কত মূল্যবান। সাগ্রহে সেই সম্বন্ধে আলাপ করেন এবং প্রকাশ্যভাবে তারিফ করেন তাঁদের উক্তির। ফলে একটার পর একটা মামলায় হার হতে লাগলো বিত্তবাবুর। এই হার হওয়ার মধ্যে ভাল-মন্দ মামলার বাদবিচার নেই। হার—হার—শুধু হার—একটানা নিরবচ্ছিন্ন শুধু হার। যে বিত্তবাবু সাধারণতঃ শতকরা নব্বইটি মামলায় জিততেন—সেই বিত্তবাবু এখন শতকরা একশতটি মামলায় হারতে লাগলেন। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বিত্তবাবু।

আর রাত্রে—কলকাতা থেকে অভিনেত্রী আনিয়ে নাটক করার প্রচেষ্টা বন্ধ হলেও শুরু হল এক নূতন ব্যবস্থা। দ্বিগুণ জোরে আর হল হল্লা এবং চিৎকার আর বিত্তবাবুর উদ্দেশে নাম না করে তীব্র বিদ্রূপ আর বক্রোক্তি। সমস্ত বন্ধ দরজা-জানলা ভেদ করে রাত্রির স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে ঘুমন্ত বিত্তবাবুকে বার বার জাগিয়ে তোলে সে উৎকট চিৎকার আর তীব্র শ্লেষ এবং বিদ্রূপ। সর্ব্বনাশা ক্লাবের এক নবতর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি।

ছুটলেন বিত্তবাবু কলকাতায়—বারবার দেখা করলেন বড় বড় রাজকর্ম্মচারী আর মাথাওয়ালা সব মন্ত্রী মহাশয়দের সঙ্গে। সাড়ম্বরে জানালেন তিনি তাঁদের কাছে তাঁর দুর্গতির কথা, তাঁর উপর অত্যাচারের সমগ্র কাহিনী। কিন্তু বধির হয়ে গিয়েছে সব কান—কোন দাগ পড়ল না সেখানকার পাষাণ হৃদয়ে। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন বিত্তবাবু। তবু হাল ছাড়লেন না তিনি। বারবার লিখলেন তিনি পত্রের পর পত্র—অভিযোগের পর অভিযোগ। অনুনয়-বিনয় থেকে সক্রোধ অভিযোগ অবধি কতই জানালেন সেখানে—কিন্তু কোন ফলই হল না। জবাব এল সেখান থেকে—"মামলায় যদি হার হয়ে থাকে, উচ্চ আদালতে আপীল করুন। আর গোলমালের দরুণ মামলা আছে—সেখানে বিচার হবে।" সুতরাং কিছুই করার নেই এই উপরওয়ালাদের আর।

বড় দুঃখে মনে হল বিত্তবাবুর, এর চেয়ে ঢের ভাল ছিল পরাধীন ইংরাজ আমল। কোনদিন কোন রাজকর্ম্মচারীর এই জাতের নৈতিক বিশৃঙ্খলাকে তাঁরা এভাবে প্রশ্রয় দেননি। একটা বেনামী সাদা কাগজে লিখিত অভিযোগও তখনকার দিনে এভাবে অগ্রাহ্য করা হয়নি। অথচ বিশেষ বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করে নাম দিয়ে লেখা বিত্তবাবুর দরখাস্তগুলির কোন সত্যকার তদন্ত হল না। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বিত্তবাবু।

এ কেমন দেশে বাস করি আমরা—ভাবতে থাকেন বিত্তবাবু—ন্যায়, ধর্ম্ম, সততা যেন এ দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে। আছে শুধু মিথ্যা, অধর্ম্ম আর নীচ নোংরামী। নেই কোন লোকের সৎসাহস, সৎ-চরিত্র, আর সত্যকার সুশিক্ষা। সবাই হয়েছে অসৎ, কপট আর মিথ্যাচারী। আর সব চেয়ে লজ্জার ব্যাপার হয়েছে এই যে, এই অসাধুতা, কপটতা আর নোংরামীলব্ধ সাফল্যকে নিয়ে গৌরব বোধ করে সমস্ত লোক।

দেশ ভরে গিয়েছে আজ অসাধু আর কাপুরুষের দলে। ছোট ছোট হীন স্বার্থ ই এদের সব—কোন নিষ্ঠা নেই, কোন সাধুতা নেই, নেই কোন আদর্শবোধ। রাজকর্ম্মচারীরা হয়েছে সব অসৎ আর অসাধু আর জনসাধারণ হয়েছে নীচ এবং ভণ্ড। সমস্ত দেশ আজ ধাপে ধাপে নেমে চলেছে অধঃপতনের অতল অন্ধকারে। অথচ যে পরিমাণ অর্থব্যয় হচ্ছে জনসাধারণের উন্নতিকল্পে তা যদি সত্যকার সদ্ব্যয় হত, তবে দেশ আজ হয়ে উঠতো সোনার দেশ। এই আমাদের স্বাধীন ভারত—আমাদের নবজাগ্রত উপ-মহাদেশ!

হাহাকার করে ওঠে বিত্তবাবুর মন। কোথায় ওগো ভারতের ভাগ্যবিধাতা—ওঠ, জাগো। হাতে নাও তোমার সোনার দণ্ড। বজ্রভৈরবে তুমি ডাক দাও, পুড়িয়ে ফেল মানুষের মনের মালিন্য এবং কালিমা··দূর কর এদের নোংরামী আর নীচতা, শুদ্ধ কর এদের অন্তর আর পবিত্র কর, মোহমুক্ত কর এদের মন। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, চৈতন্যদেবের দেশের মানুষকে তুমি চৈতন্যদান কর।

স্বপ্ন ভেঙে যায় বিত্তবাবুর ক্লাবের আর একতারফা উদ্দাম

...ায়ে। বিরক্তিতে আবার ভরে ওঠে তাঁর মন—সঙ্গে সঙ্গে আসে ... একটা বিষাদ আর একটা অদ্ভুত বেদনাবোধ। এই সব তাঁর ... ছেলেরা—সকলেই প্রায় তাঁর পুত্রের বয়সী—অথচ সাধারণ ...নতাবোধও ওদের মধ্যে নেই। একজন পিতৃতুল্য বয়স্ক ...লোকের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তাও তারা ভুলে গিয়েছে। অথচ এরাই আমাদের দেশের আশা—আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন। এরাই প্রচার করবে সাম্য-মৈত্রী, এরা বিস্তার করবে অশোকের মত সেই তথাগতের বাণী।

বড় দুঃখে বিশুবাবুর মুখে ভেসে এল অত্যন্ত দুঃখের মর্ম্মরাঙা হাসি। ভুল, ভুল, সমস্ত ভুল। নীতিজ্ঞানহীন, ধর্ম্মজ্ঞানহীন, সাধারণ ...বোধ বর্জ্জিত এই সব লোকেরা—যারা নিজের স্বার্থ আর নীচ ...বাদ ছাড়া আর কিছু জানে না—নোংরামী আর নীচতা যাদের ... ভূষণ, তারা দেশকে নিয়ে যাবে গান্ধীজীর স্বপ্নের রামরাজ্যে!

ক্রমে গভীর হয়ে এল রাত্রি। নিস্তব্ধ হয়ে গেল চারিদিক আর চলে গেল সমস্ত লোক ঐ সর্ব্বনাশা ক্লাব বাড়ী থেকে। ঢং করে দেওয়ালের ঘড়িতে একটা বাজলো। উঠে বসলেন বিশুবাবু বিছানা ছেড়ে। ঘুম তাঁর চোখ হতে বিদায় নিয়েছে। প্রেসারের রোগী তিনি—বহু কষ্টে ওষুধ খেয়ে বা সাধনায় আনতে হয় ঐ ঘুমকে। একবার সে বিদায় নিলে আবার তাকে ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন হয় বহু সাধনার। অথচ এইভাবে কেটে চলেছে প্রতিটি রাত্রি গত ছয়-সাত মাস ধরে। দিনে নেই শান্তি—রাত্রে নেই ঘুম। দিন-রাত্রি এক অদ্ভুত পীড়নের মধ্যে তাঁর জীবন চলেছে। এ কি সর্ব্বনাশা অশান্তি এল জীবনে।

বাইরের বারান্দায় এসে বেড়াতে লাগলেন বিশুবাবু বহুক্ষণ ধরে। মাথার মধ্যে তাঁর আগুন জ্বলছে। ঘটি করে জল ঢাললেন বারবার—অথচ এটা পৌষ মাস—তবু কোন শান্তি পেলেন না বিশুবাবু। বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করে ইঞ্জিন চলছে অহরহ—তারই বাষ্পে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে তাঁর চোখ, মুখ, মাথা। বিশুবাবুর মনে হল তাঁর বুকের মধ্যে যে জ্বালা গুমরে বেড়াচ্ছে, সে জ্বালা বোধহয় ভিসুভিয়াসের বুকের জ্বালার চেয়ে ঢের বেশী। একটা নিষ্ফল আক্রোশে তাঁর জ্বালাময় মাথাটাকে ঐ পাথরের থামের গায়ে আছড়াতে ইচ্ছাহতে লাগলো।

সামনের নীল আকাশের দিকে তাকালেন বিশুবাবু। শীতের রাত্রির আকাশ—যেমন শান্ত, তেমনই নীল। কত শান্তি—কত পবিত্রতা ওখানে—বললেন বিশুবাবু—আর যত অশান্তি, যত আগুন তা শুধু আমার বুকে। ঐ শান্ত নির্ম্মল আকাশের দিকে চেয়ে বার বার আপন মনে উচ্চারণ করলেন বিশুবাবু ...দের বাণী, "সহোহসি সহংময়ি ধেহি।" ... আর যে সহ্য হয় না ঠাকুর! জ্বলে-পুড়ে ... খাক হয়ে গেলাম। আর কত জ্বালা ...মায় তুমি দেবে বিশ্বদেব।

ঘরে ফিরে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন ...বাবু। যত্ন সাধনা করলেন ঘুমের। কিন্তু, না, ঘুম তাঁকে ত্যাগ করেছে। কত চেষ্টা করলেন মনে মনে—সাদা সাদা বকের সারি চলেছে আকাশ ছেয়ে—একটার পর একটা। সাদা-সাদা, শুধু সাদা—কৈ না, ঘুম ত এল না! কল্পনা করতে লাগলেন তিনি—নীল সমুদ্র—তার বুকে ফুটে রয়েছে নীল পদ্ম রাশি রাশি অজস্র নীল পদ্ম—তার উপর একটি করে নীল পরী। নীল, নীল, শুধু নীল—আর কোন রঙ নেই। ভাবতে লাগলেন, নীল সমুদ্রের বুকে শুয়ে আছেন—নীলোৎপললোচন অনন্ত শয্যাশায়ী নারায়ণ। তবুও না—তবু ঘুম এল না। ঘুম তাঁকে ত্যাগ করেছে, সত্য সত্যই পরিত্যাগ। রাগে ক্ষোভে দু' চোখ জ্বালা করে উঠলো বিশুবাবুর। তিনি হাতজোড় করে ভগবানের উদ্দেশে প্রার্থনা করলেন, ঠাকুর, তুমি আমার জীবন নাও, আমার সর্ব্বস্ব নাও—বিনিময়ে তুমি আমাকে ঘুম দাও, আমাকে শান্তি দাও। আমি ঐশ্বর্য্য চাই না, রাজত্ব চাই না, কিছু চাই না, চাই শুধু এই দুটো পোড়া চোখে এক ফোঁটা ঘুম, এই অশান্ত মনে একটু শান্তি। তবু ঘুম এল না তাঁর চোখের পাতায়।

ঢং ঢং করে তিনটে বাজলো কাছারীর ঘড়িতে। চমকে উঠলেন বিশুবাবু—তিনটে বেজে গেল, তবু ঘুম এল না। ও আর আসবে না,—বললেন বিশুবাবু—নির্লজ্জ ক্লাবের সর্ব্বনাশা হাসি আমার ঘুমকে হত্যা করেছে। ঐ ক্লাবকে আর আমি হাসতে দেব না। ঐ হায়নার হাসি আমি চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেব—

বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন বিশুবাবু। সতর্ক ভাবে চারদিক চেয়ে দেখলেন—সকলেই ঘুমাচ্ছে,—বেশ শান্তির ঘুম। ঘুমাচ্ছে হৈমন্তী, ঘুমাচ্ছে ছেলে-মেয়েরা—ঘুমাচ্ছে পাড়ার সমস্ত লোক। বিশ্ব-সংসার ঘুমাচ্ছে নিঃশব্দে, পরম শান্তিতে। নিশ্চিন্ত হয়ে বার হলেন বিশুবাবু বাড়ী থেকে। এক পা এক পা করে গিয়ে উঠলেন তিনি ঐ মানুষ-খেকো ক্লাব-বাড়ীর বারান্দায়।

সর্ব্বনাশা মানুষ-খেকো ক্লাব বাড়ী। রক্তের পিপাসায় লক্ লক্ করছে ওর করাল জিহ্বা। একবার এক দুর্দ্দান্ত নও-জোয়ানের তাজা

রক্ত পান করে তৃপ্ত ছিল কিছু দিন। আবার জেগেছে ওর বুকে রক্তপানের দুর্দ্দান্ত তৃষা। অই বুঝি নির্ম্মম ভাবে আকর্ষণ করছে ঐ প্রৌঢ় ব্রাহ্মণকে। নিশিতে পাওয়া অভিভূতের মতন ঐ সর্ব্বনাশা বাড়ীর বারান্দায় গিয়ে উঠলেন বিশুবাবু। আপন মনে হেসে উঠলেন তিনি—তারপর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আবৃত্তি করলেন, রক্ত চাস—রাজরক্ত? রাজ-রক্ত না পেলেও, পাবে রাক্ষসী ব্রহ্ম-রক্ত। পাবে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বুকের রক্ত। তাই খাও—তাই খেয়ে তৃপ্ত হোক তোমার লোল-রসনা।

হঠাৎ বিশুবাবু যেন স্পষ্ট অনুভব করলেন, ঠিক তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে সেই উদ্ধত হাণ্টার সাহেবের সময়কার মৃত সেই তেজী নওজোয়ান—রক্ত-রাঙা তার চোখের দৃষ্টি, সর্ব্বাঙ্গ থেকে ঝরে পড়ছে অজস্র রক্তের বন্যধারা। কি বীভৎস সুন্দর সেই মূর্ত্তি। সে যেন স্পষ্ট কানে কানে বললে, এই যে, তুমি এসেছ। তোমার জন্যই এতদিন ধরে অপেক্ষা করে বসে আছি। নাও নাও, রক্ত দাও—দাও তোমার প্রাণ, দাও তোমার জীবন···নৈলে তৃপ্ত হবে না এই সর্ব্বনাশী রাক্ষসী। দুর্দ্দান্ত ওর বুকে রক্তের তৃষা। তোমার বুকের রক্ত মৈলে ও তৃপ্ত হবে না। আমার রক্তে মেটেনি ওর তৃষা, আরও রক্ত ও চায়। ও চায় তোমার বুকের তপ্ত রক্ত।

উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন বিশুবাবু। দেবেন তিনি রক্ত—তাঁর বুকের তাজা রক্ত। তাতেই যদি বন্ধ হয় এই রাক্ষসী ক্লাবের ঐ সর্ব্বনাশা মোহরামী, তবে তাই তিনি দেবেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, পরদিন প্রভাতে সারা সহরের লোক ভেঙে পড়ছে ঐ ক্লাবে। মুখর হয়ে উঠেছে সারা সহর ঐসব অফিসারদের নিন্দায়···কমিশন এসেছে মহানগরী থেকে···প্রতিকার হচ্ছে তাঁর উপর ঐ সমস্ত লোকেদের নির্য্যাতনের। আর বন্ধ হয়ে গিয়েছে চিরদিনের তরে এই সর্ব্বনাশা ক্লাবের পৈশাচিনী হাসি।

গায়ের চাদরখানা খুলে ফেললেন বিশুবাবু। বারান্দায় কড়ির সঙ্গে বাঁধতে হবে এটাকে আর অপর প্রান্তকে বাঁধতে হবে তাঁর গলার সঙ্গে। তার কয়েকটা মুহূর্ত্ত পরই হবে তাঁর মুক্তি—পাবেন তিনি শান্তি। এত সাধ্য-সাধনায় যে ঘুমকে পাওয়া যায় না নাগালের মধ্যে, সেই ঘুম আর তাঁকে ফাঁকি দিতে পারবে না। পরম শান্তিতে তিনি এবার ঘুমাবেন। সে ঘুম ভাঙাতে পারবে না কারও অট্টহাসি, কি কারও বিদ্রূপ। স্থির শান্ত ভাবে তিনি এবার নিদ্রা যাবেন চিরদিনের তরে।

দরজার পাশের টুলের ওপর দাঁড়িয়ে চাদরটাকে খুলে নিলেন গা থেকে বিশুবাবু—তারপর সেটা শূন্যে তুলে ধরবার জন্য হাত বাড়ালেন তিনি। চমকে উঠলেন বিশুবাবু—কে চেপে ধরলো চাদরটাকে দু' হাত দিয়ে? কে ও? হাণ্টার সাহেব? সাদা পোষাক-পরা কে ও? নেমে পড়লেন বিশুবাবু টুল থেকে—মরা আর হ'ল না।

পিছন ফিরে চেয়ে দেখলেন বিশুবাবু—কেউ নেই কোথাও। আস্তে আস্তে চাদরটিকে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন বিশুবাবু।

রক্ত-মাখা কালো নওজোয়ান হেরে গেল সাদা হাণ্টার সাহেবের কাছে।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকালেন বিশুবাবু, চোখে পড়লো ঐ ক্লাব বাড়ী···জনহীন, অন্ধকার, মৃত্যুপুরীর মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে নেই তার আর সেই বারবিলাসিনীর লজ্জাহীন হাসি। নিদারুণ ব্যর্থতায় সে যেন লজ্জায় ঘৃণায় পাথর হয়ে জমে গিয়েছে। আজিকার এই সর্ব্বনাশা খেলায় সে যে নির্ম্মমভাবে পরাজিত হয়েছে। আর তাই যেন তার সমস্ত দেহে রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে।

হৈমন্তী গেটে তালা বন্ধ করে দিলেন।

ক্ষুধা

রমেন্দ্র ঘটক চৌধুরী

ক্লান্তির রথ আঁধার রাতের চোখে
পাণ্ডুটে ঠোঁটের পুটে
সজল আঁখির মায়া তুলে।
বাদল-হৃদয় সিক্ত—বেলা শেষে ধূসর আকাশে;
নিতান্ত অকেজো দিন বনে বনে রহস্য-মলিন।
প্রলয় ক্ষুধার মতো পৃথিবীটা একান্ত স্থবির।
অরণ্যের স্তব্ধ পত্রে গোধূলির নৈরাশ্য পাহাড়
বাঁধনে প্রিয়র মৃত্যু মধ্যাহ্নের সাহারা প্রসার।

দীঘল চোখের পটে মৌনতার নিশ্চুপ প্রহরা
মনের জৌলুস নেই—নেই ব্যগ্র
রক্তিম ইশারা।
নগ্ন বক্ষে শুষ্ক স্তন অচেতন জাতক কালের
ঝাউ বৃক্ষে সিক্ত সুর শন্ শন্ কান্নার সানাই।
জীবন-প্রাসাদশৃঙ্গ শূন্যতার বিপুল সম্রাট
শবের মেদুর হাসি—
মিনতির জীবন অস্থির।

সমুদ্রের লোনা জলে কামনার সফেন ঝঙ্কার
জঠরে ক্ষুধার জ্বল এই মর্ত্যে কোমল গান্ধার।

GOVERN
LIBRARY
Cooch Behar

PEARS
TALCUM
MADE IN INDIA FOR A. & F. PEARS LTD., ENGLAND

প্রশান্ত চৌধুরী

১১
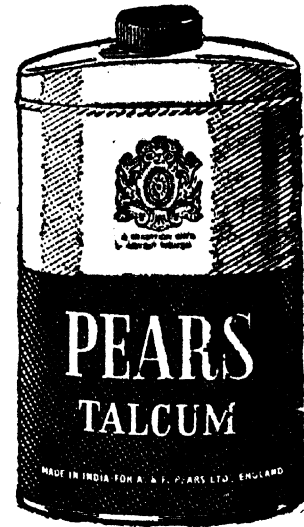
ঘরের মেঝেতে নরম নক্সাকাটা গালচে, কড়িকাঠে জরির ঝালর দেওয়া মস্ত টানাপাখা, দেয়ালে-দেয়ালে মোমবাত্তি-বসানো দেয়ালগিরি, চারিদিকে আয়নার মত পালিশ করা দামী দামী কত রকমের সব আসবাব, সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো প্রকাণ্ড আয়নাটায় মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবখানি একসঙ্গে দেখা যায়।

সেই ঘরে ঢুকল মেনকা বিদ্যাধরীর হাত ধরে।

বিদ্যাধরী বলল,—বোসো।

মেনকা বসল। ঘরের মাঝখানে মেহগনি কাঠের যে ফুলকাটা পালঙ্ক, তার ওপর;—ধবধবে সাদা চাদর পাতা নরম গদিতে।

ডুবে গেল মেনকা। ডুবে গেল নরম গদি আর অনাস্বাদিতপূর্ব এক বিহ্বলতার মধ্যে। মেনকা ঘামতে লাগল।

ওকে পালঙ্কে বসিয়ে চলে গেল বিদ্যাধরী ঘর ছেড়ে। মেনকা একদৃষ্টে দেখতে লাগল সেই দিকে, বিদ্যাধরীর সেই চলে-যাওয়ার দিকে।

কী ফর্সা পা, কেমন রস-টৈটুম্বুর টেঁপারির মতন ফুলো-ফুলো পায়ের আঙুল, পায়ের পাতার চারিধারে কেমন দুধে-আলতার আভা! রূপকথার গল্পে এমনি পায়ের পা-ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই তো মাটিতে পদ্মফুল ফুটে ওঠে! মেনকার মনে হল, মেঝেতে গালচে পাতা না থাকলে বিদ্যাধরীর চলনেও নিশ্চয়ই এতক্ষণে পদ্ম ফুটে উঠত কতো!

আহা! মেঝেতে কেন রইল গালচেটা?

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল একজন। হাঁটুর ওপরে গুটোনো খাটো ধুতি, গায়ে ফতুয়া, কাঁধে গামছা, কালো গায়ের রং, হাতে আঁকুশির মতন কিসের মুখের দিকে আগুন জ্বলছে।

সেই আগুন-জ্বলা আঁকুশি দিয়ে নানা রঙের দেওয়ালগিরির মোমবাতিগুলোকে একে একে জ্বালিয়ে দিয়ে সে যখন চলে গেল, মেনকার মনে হল, ও যেন রূপকথার সেই রাজ্যে এসে পড়েছে, যেখানে হীরের গাছে মোতির ফুল ফোটে!

মেনকা যেন হঠাৎ হারিয়ে গেল কোথায়! সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না, সে নেই।

সে নেই, সে নেই!

কে জানে কতক্ষণ পরে মেনকা যখন আবার 'নেই' থেকে 'আছে' হল, তখন সে দেখতে পেল ততক্ষণে কখন সেই অপরূপ বিদ্যাধরী ঘরে ঢুকে চাবি ঘুরিয়ে খুলে ফেলেছে সিংহের মুখের নক্সাকাটা লোহার সিন্দুকের ডালা। বের করে এনেছে কাশ্মীরি জাফরাণ কাঠের একটা গহনার বাক্স। বলছে,—কোন্‌টা পছন্দ গো তোমার?

বিস্ময়ে বিস্ফারিত মেনকার চোখ।

মেনকা স্বপ্ন দেখছে নাকি!

সব গয়না খাঁটি! খাঁটি সোনার, খাঁটি হীরের, খাঁটি মুক্তোর!

প্রজাপতি-বসানো সোনার টায়রাটাকে বিদ্যাধরী নিজেই পরিয়ে দিল মেনকার ছোট্ট মাথায়। তারপর মাথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে শুধু বলল,—বাঃ!

মেনকা সেই শুনে ভয়ে ভয়ে তাকাল সেই প্রকাণ্ড বড় আয়নাটার দিকে। তার মধ্যে নিজেকে সবখানি দেখতে পেল। তারও বলতে ইচ্ছে করল,—বাঃ!

কিন্তু তাই কি বলা যায়? ভয় করে যে। লজ্জা করে যে।

বিদ্যাধরী বলল,—এইবার? গলার গয়না কী নেবে বল? চিক্‌ না কণ্ঠী? পেলী না সাতনরী?

মেনকা তখন একেবারে বোবা হয়ে গেছে!

এমন সময় এক দাসী এসে ঢুকল ঘরে। ধপ্‌ধপে সাদা থান ধুতি তার পরনে; ধপ্‌ধপে সাদা সেমিজ তার গায়ে। কাঁচায় পাকায় মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা, গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। হাতে তার রুপোর গেলাসে তরমুজের শরবৎ, রুপোর রেকাবিতে খোসা ছাড়ানো বেগমপসন্দ আমের টুকরো।

বিদ্যাধরী বলল,—খেয়ে নাও আগে।

খাবে কী মেনকা! খাবার জো কী তার! সেই যে বাবাদের মোক্ষদাপিসি,—অনেক শাস্ত্র-পুঁথি পড়া আছে যার, পাড়ার সবাই যা

...ব্রতকথা শুনতে ছোটে, ইতুর ছড়া শুনতে ছোটে, বিধান নিতে ...—মেনকার মনে হতে লাগল, সেই মোক্ষদাঠাকুরুণের ব্রতকথার পুঁথির হলদে-হয়ে যাওয়া পুরোনো পাতার মধ্যে হারিয়ে গেছে সে। তার নাকে আসছে সেই পুঁথির পাতার অদ্ভুত গন্ধ, তার কানে আসছে ষষ্ঠীবুড়ির কালো-বেড়ালের ম্যাও ম্যাও আওয়াজ, তার চোখে ভাসছে শঙ্খদ্বীপের রাজপুরীর ঝলমলানো ঐশ্বর্য! মেনকা হারিয়ে গেছে সেই ব্রতকথার দেশে, সেই রূপকথার রাজত্বে!

—কই, খেয়ে নাও।

বিদ্যাধরী এবার নিজে হাতে গেলাসটা বাড়িয়ে ধরে বলল।

মেনকা তখন তরমুজের শরবৎটা মুখে তুলতে যাচ্ছে, এমন সময় সেই মস্ত আয়নার মধ্যে দেখা গেল একজনকে। উল্টোদিকের দরজার ভারী পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকছেন তিনি। তাঁর কপালের ওপর শুঁড়তোলা চুলের কেয়ারি, হাতের কবজিতে বেলফুলের মালা, গোঁফের দু-প্রান্তে মোমের পাক, হাঁটুঝুল চুড়িদার কামিজের কোমরে ফেট-করা চাদরের বাঁধন।

ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখে বিদ্যাধরী বাঘিনীর মত গর্জন করে উঠল,—এখানে কেন? এখন কেন?

লোকটি থমকে দাঁড়ালেন। যেন কানে কম শোনেন, চোখে কম দেখেন, এমনিধারা ভঙ্গিতে ভুরু কোঁচকালেন।

বিদ্যাধরী আবার গর্জন করে উঠল,—যাও বলছি ঘর থেকে। কচি মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছ না?

মেনকা তরমুজের শরবৎ নামিয়ে রেখেছে।

সেই লোকটি কেমন যেন স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। পা-দুটোকে বাগ মানাতে গিয়ে বারবার জুতো ঘষড়াচ্ছেন গালচের ওপর। কথাও কেমন জড়ানো!

লোকটি বললেন,—কিছু না, এখখুনি চলে যাব। সত্যি বলছি। একটা কথা শুধু তোমায় শুধোতে এসেছি সরোজিনী,—এখন তোমার মালিক কে? আমি, না বিদয় শুঁড়ি?

ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের দরজার পর্দা সরিয়ে আরো একটা লোক এসে ঢুকল ঘরে। তার পা-দুটোও তেমনি টলোমলো। তবে মিশমিশে কালো তার গায়ের রঙ, চেহারাটা ছোটখাটো হাতির মতন, আর চোখ দুটো কুৎকুতে।

সেই দ্বিতীয় লোকটা প্রথম লোকটির মতই জড়ানো-গলায় বলল,—কে? আমি, না সতু বক্সি?

প্রথম লোকটি গর্জে উঠলেন,—সতু নয়, সত্যেন্দ্রনাথ।

দ্বিতীয় লোকটি তার চেয়েও বাজখাঁই গলায় বলল,—শুঁড়ি নয়, সাহা।

ওদের দুজনের চিৎকারের ছোঁয়াচ লেগে বিদ্যাধরীর অমন সুন্দর মিষ্টি মিহি গলাও কেমন কনকনিয়ে উঠল যেন। সে চিৎকার করে বলল,—ঘরের বাইরে যাবে কি তোমরা?

শুনে সত্যি সত্যিই বেরিয়ে গেল ওরা।

শুধু দুজনে দুজনের জামার গলা খামচে ধরেছে তখন।

বিদ্যাধরী মেনকাকে বলল,—উঠো না তুমি। যেমন আছ, তেমনটি চুপ করে বসে থাক। আমি এক্ষুণি আসছি।

ঘরের সেই পর্দা-দেওয়া দরজা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল বিদ্যাধরী। মেনকা অজানা অচেনা মস্ত ঘরে একলাটি বসে রইল টায়রা মাথায় দিয়ে। তরমুজের শরবৎটা খেতে তার খুবই ইচ্ছে করছিল, তেষ্টাও পেয়েছিল,—কিন্তু শরবৎ খাওয়াটা তখন উচিত হবে কি না বুঝতে পারল না।

বন্ধ দরজার ওধার থেকে ভেসে আসতে লাগল সেই লোক দুটোর চিৎকার। সে-চিৎকারের ভাষা বুঝতে পারছিল না মেনকা, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিল, কী নিয়ে যেন তুমুল ঝগড়া করছে ওরা।

চিৎকারের শব্দটা ক্রমেই তীব্র হতে লাগল। তারপর কিসের সব দুমদাম ঝনঝন শব্দ হতে লাগল;—যেন কী সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে গলা বুক সব শুকিয়ে আসতে লাগল মেনকার। কান্না পেতে লাগল তার।

এমন সময় কেমন তীব্র একটা শব্দ উঠেই হঠাৎ সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু গোটাকতক পায়ের শব্দ যেন এধার থেকে ওধারে ছুটোছুটি করল কিছুক্ষণ; তারপর কোথাও আর এতটুকু সাড়াশব্দ নেই!

মেনকা ঢকঢক করে তরমুজের শরবৎটা খেয়ে ফেলে প্রাণপণে যতদূর সম্ভব বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল দরজার দিকে।

কত যুগের পর খুলল সেই দরজা!

ঢুকল সেই অপরূপা বিদ্যাধরী। কিসের উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে। কিসের ভয়ে যেন বিবর্ণ। বিদ্যাধরীর সঙ্গে একজন লম্বা-চওড়া দরোয়ান গোছের মানুষ। মেনকার দিকে তাকিয়ে বিদ্যাধরী বলল, —তুমি এই লোকের সঙ্গে এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাও মেনকা। ও তোমাকে তোমাদের বাড়ির সামনে পৌঁছে দেবে।

সেই বিশালকায় দরোয়ান গোছের মানুষটার হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল মেনকা। ঘরের বাইরের দালানটা পার হবার সময় দেখল, সেখানে যেন কিছুক্ষণ আগে ভূমিকম্প হয়ে গেছে। আর, সতু বক্সি নামের সেই টেরি-বাগানো লোকটা শূন্যের পানে তাকিয়ে স্থির হয়ে পড়ে আছে মেঝেয়। মেঝেটা রক্তে লাল।

কেমন শুকনো ফিসফিসে গলায় বিদ্যাধরী বলল,—এখানে যা দেখেছ, যা শুনেছ, সব ভুলে যেও। কিচ্ছু মনে রেখ না, কিচ্ছু বোলো না কারুর কাছে। এ-জীবনে না। বুঝলে?

মেনকা বলল,—হুঁ।

কিন্তু মেনকার কণ্ঠস্বর মেনকা নিজেই শুনতে পেল না।

চারিদিক আঁটা একটা ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে অনেকটা পথ এনে বাকি পথটা হাঁটিয়ে মেনকাকে তাদের বাড়ির কাছের সেই অশথ গাছের কাছ অবধি পৌঁছে দিয়ে চলে গেল সেই দরোয়ান গোছের মানুষটা।

মেনকা চীৎকার করে ডাকল,—মা গো।

ডাক শুনে মা পড়ি কি মরি করে ছুটে এল হ্যারিকেন নিয়ে। বলল,—কোথায় ছিলি? ভেবে খুন হই যে আমরা!

হ্যারিকেনের আলোয় মেনকার মাথার সোনার টায়রা ঝিলিক দিয়ে উঠল অন্ধকারে।

মেয়েকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে মা বলল,—এ তুই কোথায় পেলি মেনকা?

মেনকা শুধু বলল,—বিদ্যাধরী দিয়েছে।

তারপর মায়ের কোলে মাথা গুঁজে সেই যে কাঁদতে লাগল

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে,—ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বার আগে তার আর বিরাম হল না।

সোনার টায়রা ফিরিয়ে দেবার জন্যে পরদিন বিকেলে মেয়েকে নিয়ে মা গিয়ে বসল আদিগঙ্গার ধারে। কিন্তু সেই সবুজের ওপর লাল আর নীলের নক্সাকাটা সুন্দর বজরাটাকে আর দেখা গেল না কোনোদিন।

বিদ্যাধরী অদৃশ্য হয়ে গেল এ-দুনিয়া থেকে।

তারপর?

তারপর ঠানদির বয়েস যখন···

আ-হা, ঠানদি কেন? ঠানদি নয়, মেনকা।

মেনকা যখন এগারো পেরিয়ে বারোয় পড়ি-পড়ি করছে, তখন তার জীবনে এসে হঠাৎ হাজির হল একজন। তার নাম শশিকান্ত।

হ্যাঁ, সেই শশিকান্ত, গঙ্গার ঘাটের বাজ-পড়া নেড়া নিমগাছের গোড়ায় নিজের হাতে মেনকার আর নিজের নাম খোদাই করে রেখে গেছে যে। পাকা দাড়ি-গোঁফওয়ালা যে শশিকান্ত চট মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকত শ্মশানঘাটের ধারে, টুকরো কাঠে ছেলে-ভুলানো পুতুল বানাত, ঠানদির দোকানের আলমারিটা যার হাতে তৈরি, ঠানদির দোকানের চোর ধরতে গিয়ে মরেছিল যে,—সেই শশিকান্তই।

জোওয়ান তখন শশিকান্ত। তখন মাথায় তার বাবরি চুল, পায়ে পাম্পসু, গায়ে কাশী-সিল্কের পাঞ্জাবি। শশিকান্ত তখন যাত্রাদলে ক্লারিওনেট বাজায়, বার্ডসাই সিগ্রেটের ধোঁয়া টানে, হাতে বুলবুলি পাখি নিয়ে বেড়াতে বেরোয়।

সেই শশিকান্ত কিছুদিন থেকে ঘোরাঘুরি করতে লাগল মেনকাদের বাড়ির আশেপাশে। মেনকার বাপ-মা হাটে-বাজারে গেলে মেনকা যখন একলা থাকে, তখন সে অশথগাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে তাকে। বলে,—আড়ালে আয়, কথা আছে।

মেনকার যেতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু তবু যায় না। লোকে যে নিন্দে করবে।

একদিন মেনকা যখন তার বাপের গড়া হাঁড়িকুঁড়িগুলোকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রোদে দিচ্ছিল,—জলের কলসি কেনবার নাম করে তার কাছে এসে একলা পেয়ে গুনগুনিয়ে এমন একটা গান শুনিয়ে গেল শশিকান্ত, যা শুনে কানের ডগা কেমন ঝাঁঝাঁ করতে লাগল মেনকার। ছুটে পালিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। কিন্তু তারপরেই দরজা ফাঁক ক'রে লুকিয়ে দেখতে লাগল শশিকান্তকে।

আহা, কেমন সোন্দর মানুষটা গো। রূপের গাঙে যেন ভেসে যায় রূপ।

আরেকদিন মেনকাকে আরো নিরিবিলিতে পেয়ে শশিকান্ত বলল,—আমাকে বিয়ে করবি মেনকা? তোকে অনেক গয়না গড়িয়ে দেব।

মেনকা বলল,—দূর, আমার বুঝি বিয়ে করতে আছে! আমি যে বুড়ো-শিবের মন্দিরের নন্দীবাবার স্বপ্নে-দেওয়া মেয়ে। বারো বছর আমার যেই ভরতি হবে, অমনি আমাকে চলে যেতে হবে মা-বাবাকে ছেড়ে।

—কোথায় যাবি?

—তা কে জানে? হয়ত নন্দীবাবা নিজেই আসবে। কিম্বা কোনো সন্সিসি। এসে বলবে,—'বারো বছর ভর্তি হয়েছে, এবার ফিরিয়ে দাও মেয়েকে।'—কিম্বা স্বয়ং যমরাজই আসবেন হয়ত আমাকে নিতে।

—কে বলেছে তোকে এসব আজগুবি কথা?

মেনকা গাল ফুলিয়ে বলল,—ওমা! আজগুবি কি বলছ গো? এ যে আমার বাপ-মা, মোক্ষদাঠাকরুণ, সব্বাই জানে। এ যে স্বপ্ন-আদেশের কথা! একথা কি মিথ্যে হয়?

তা' কী আশ্চর্য! হলও কি না সত্যি!

সন্ধে তখন। মেনকা ঘুঁটে ছাড়াচ্ছিল দেয়াল থেকে। এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে হাজির।

বলল—আয় বেটি।

মেনকা বলল,—কে তুমি?

সন্ন্যাসী বলল,—চিনতে পারলি না?

মেনকা বলল,—আগে তো তোমায় এ-পাড়ায় দেখিনি কোনোদিন;—চিনব কেমন করে?

সন্ন্যাসী বলল,—বুড়ো-শিবের মন্দিরে তোর মা কী স্বপ্ন দেখেছিল ভুলে গেছিস এরই মধ্যে? আজ বারো বছরে পা দিয়েছিস যে তুই।

মেনকা বলল,—বা রে! আজ কেন? সাতদিন আগেই তো বারো বছরে পড়েছি আমি। তুমি কিচ্ছু জান না।

সন্ন্যাসী বলল,—আজ তিথি ভাল।

মেনকা বলল,—কিন্তু এখন আমার বাপ যে হাটে, মা যে মোক্ষদাঠাকরুণের সঙ্গে ভবানীপুরের সাধুর আস্তানায় গেছে আমার কুষ্ঠি গোনাতে। ওরা আগে ফিরুক। ওদের সঙ্গে দেখা করে যাই।

সন্ন্যাসী বলল,—ওরা ফেরবার আগেই নিয়ে যাব তোকে। নৈলে চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে গেলে ওদের যে বুক ফেটে যাবে।

মেনকা বলল,—আমি যদি না যাই?

সন্ন্যাসী বলল,—কথার খেলাপের জন্যে তোর বাপের গায়ে কুষ্ঠ হবে তাহলে, তোর মা মরে যাবে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে, আর তুই—

মেনকা বলল,—এক্ষুণি যাচ্ছি গো সন্সিসীঠাকুর। পায়ে পড়ি তোমার। আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে চল। আমার মা-বাপকে বাঁচিয়ে রাখো।

দু-ঘোড়ার একটা পালকি-গাড়ি, তারই জানলা-দরজা সব বন্ধ ক'রে সেই সন্সিসীর সঙ্গে যেতে লাগল মেনকা। মেনকা খুব কাঁদতে লাগল। মা-বাপের জন্যে ওর বুকটা যেন ফেটে যাবার মতো হল।

সন্ন্যাসী বলল,—কেঁদে লাভ নেই। সবই বুড়ো-শিবের বিধান। এর কি আর নড়চড় হবার জো আছে? কাঁদলে তোর মা-বাপের পাপ লাগবে।

মেনকা প্রাণপণে কান্না থামিয়ে ফুলে ফুলে শক্ত হতে থাকল।

তারপর থামল গাড়ি এক সময়।

কালীঘাটের মায়ের মন্দির।

সন্ন্যাসী বলল,—আয়।

সেই মন্দিরের ধারে ধারে খড়ের ছাউনি-দেওয়া সারি সারি অনেক মাটির ঘর। সেই ঘরের একটাতে গিয়ে ঢুকল ওরা। সেই অন্ধকার

সি ঘরের মধ্যিখানে রোগা ডিগডিগে একটা লোক বসে ছিল ড়ো একগাছা পৈতে গলায় দিয়ে। সেই লোকটা অমনি দাঁড়িয়ে উঠে তেল-সিঁদুরের একটা পাতা সেই সন্ন্যাসীর হাতে দিয়ে বলল,—লাগিয়ে দাও মায়ের সিঁথের।

সন্ন্যাসী তাই করল। আর, সিঁদুর লাগিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে খুলে ফেলল মাথার জটা আর মুখের দাড়িগোঁফ।

শশিকান্ত!

মেনকা চিৎকার করে বলল—তুমি!

শশিকান্ত হেসে বলল,—হ্যাঁ, আজ থেকে তুই আমার বিয়ে-করা বউ হয়ে গেলি। মা-কালীর পায়ে ছোঁয়ানো সিঁদুর পড়েছে তোর মাথায়। ভুলে যাসনি যেন।

মেনকা কাঁদ কাঁদ গলায় বলল,—বাড়ি যাব।

শশিকান্ত বলল,—আর কি তা' হয়? বারো বছরের পর আর মা-বাপের নোস যে রে তুই। তাদের মুখ দেখা নিষেধ।

মেনকা বলল,—তুমি জোচ্চোর, ঠক্।

শশিকান্ত,—আমি ঠক্ হলেও, বুড়ো-শিবের দৈববাণীটা তো আর মিথ্যে হয়ে যায় না। সেটা তো হক্ কথা। আজ থেকে তুই অন্য গোত্তরের মেয়ে হয়ে গেলি। তুই আমার।

মেনকা মুখে আঁচল দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

শশিকান্ত মেনকার কাঁধে হাত দিয়ে বলল,—কাঁদছিস কেন রে বোকা মেয়ে!

মেনকা দু-হাতে আঁচড়ে কামড়ে একসা করে দিল শশিকান্তর সারা দেহ।

সেই মাটির ঘরের আলোটা কখন নিবে গেল টুপ্ ক'রে।

তারপর?

তারপর ঠান্‌দি·····

আঃ, এর মধ্যে ঠান্‌দি আসছে কেন? মেনকার ঠান্‌দি হয়ে ওঠবার আগে যে আরো অনেক কথা, অনেক গল্প, অনেক মানুষ, অনেক ছবি আছে।

ঠান্‌দি আজ সেই ছবিগুলো পর পর দেখতে পাচ্ছে যেন।···

তারপর?

তারপরে দিন কেটে গেল। মা-বাপকে দেখতে না পাওয়ার দুঃখুটা একটু একটু করে কেমন সয়ে গেল মেনকার। সয়ে না গিয়েই বা উপায় কি। মা-বাপের সঙ্গে দেখা ক'রে তাদের তো আর নরকে পাঠাতে পারে না মেনকা!

মা-বাপ ক্রমে ক্রমে দূরে চলে গিয়ে ঝাপসা মতন হয়ে যেতে লাগল। শশিকান্তই জুড়ে রইল তার সমস্ত মন। শশিকান্ত খুব ভালবাসতে লাগল তাকে। কেটে গেল একটা দুটো তিনটে চারটে বছর।

কিন্তু তারপর থেকেই কেমন যেন বদলে যেতে লাগল সব। ঘরে চাল থাকে তো ডাল থাকে না, নুন থাকে তো তেল থাকে না। শেষ অবধি মেনকার হাতের গালা-ভরানো বালা জোড়াও একদিন খুলে নিয়ে গেল শশিকান্ত।

শশিকান্ত দিনে দিনে কেমন যেন অন্যধারা মানুষ হয়ে যেতে লাগল।

একদিন মেনকা রাগ করে বলল,—তুই যে বলেছিলি, বিয়ে করলে অনেক গয়না দিবি, তা কই? যা ছিল, সেটুকুও কেড়ে নিলি যে। এবার দে, গয়না দে, গয়না মুড়ে দে আমাকে।

শশিকান্ত চোখদুটোকে কেমন করে ঘুরিয়ে বলল,—দোব, দু-চার দিনের মধ্যেই দোব। গয়নার পাহাড়ের চুড়োয় বসে থাকবি।

তা' চার দিন পর্যন্ত আর সবুর করতে হল না, তিনদিনের দিন দুপুর নাগাদ খাওয়া-দাওয়ার পর শশিকান্ত বলল,—তোর সেই ফুলকাটা পাছাপেড়ে ভাল শাড়িটা গুছিয়ে পরে নিয়ে চল্ তো মেনকা।

মেনকা বলল,—কোথায়?

শশিকান্ত বলল,—গয়না কিনতে।

কিন্তু গয়নার দোকানের ধারে-কাছেও নিয়ে গেল না শশিকান্ত। নিয়ে গেল বড়শের দিকে মস্ত বড় একটা বাড়িতে। তার পুবমুখে দেউড়িতে বন্দুকধারী সেপাই-এর পাহারা।

মেনকা বলল,—এ তো দোকান নয়, এ যে বাড়ি!

শশিকান্ত বলল—বন্ধকী গয়নার কারবার। চল্ না।

দেউড়ি পেরিয়ে প্রকাণ্ড উঠান। মাঝখানে পাথরের ফোয়ারা, ফোয়ারার চারিধারে পাথরের তৈরি চারটি অর্ধোলঙ্গ মৎস্যকন্যা আর, সেই চারটি মৎস্যকন্যাকে পাশবিক উল্লাসে আঁকড়ে ধরেছে চারটে পাথরের দৈত্য। দৈত্যদের নিষ্পীড়নে কাঁদছে মৎস্যকন্যারা। তাদের চোখের জল ফোয়ারা হয়ে ঝরে পড়ছে নিচের পাথর-বাঁধানো চৌবাচ্চার জলে।

সেই ফোয়ারা-ওলা উঠান পেরিয়ে কত দালান কত বারান্দা কত সিঁড়ি ঘুরে দোতলায় গিয়ে উঠল শশিকান্ত।

প্রকাণ্ড একটা ঘর। বিদ্যাধরীর ঘরের মতই দামী দামী আসবাবে সাজানো। মেনকাকে বাইরের দালানে দাঁড় করিয়ে রেখে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল শশিকান্ত।

[ক্রমশঃ

আকাশ অনেক উঁচু

শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ অনেক উঁচু বুক তার বড় ফাঁকা ফাঁকা,
বেদনার সোনা রং ক্ষণ তরে হয় তাতে আঁকা।
সমতল ধরাতল, কতো নীচু আকাশের চেয়ে,
চিরকাল ধরে তার থাকে শুধু মুখপানে চেয়ে।
কামনার আগুনে সে অন্তরে অন্তরে জ্বলে,
ফুলে ওঠে বুক তার আকাশের ছোঁওয়া পাবে বলে।

সঙ্কোচে দুরাশায় শূন্যতা করে তার জয়
থরে থরে প্রেম সেই জমে উঠে গড়ে হিমালয়।
দুজনায় মিশে যায়, দুজনার আঁখি ছল ছল,
গিরি নদী বয়ে যায়, নির্মল ছল ছল জল।
তারই তীরে ভেদ করে পাহাড়ের চটা-ওঠা হাড়,
ধীরে ধীরে জন্মায় শত শত গোলাপের ঝাড়।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

দুই

[গ]

আমার স্ত্রী!

সুন্দরমের কণ্ঠোচ্চারিত আমার স্ত্রী কথাটা যেন ভিষগরত্নকে একটা ধাক্কা দেয়। কয়েকটা মুহূর্ত সুন্দরমের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে পুনরায় হতচেতন মৃণ্ময়ীর রোগতপ্ত, রক্তিম শীর্ণ মুখখানির দিকে দৃষ্টিপাত করেন ভিষগরত্ন।

নেশার ঘোরটা বুঝি অনেকটা তখন তাঁর কেটে এসেচে।

সন্তর্পণে মৃণ্ময়ীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলেন ভিষগরত্ন।

কোমল রোগতপ্ত হাতখানি।

বামহস্তের 'পরে মৃণ্ময়ীর হাতখানি রেখে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও তর্জনী সহযোগে মণিবন্ধের নাড়ীটা চেপে ধরলেন।

নাড়ীর গতি দ্রুত এবং চঞ্চল।

নাড়ী ধরে বেশ কিছুক্ষণ দুটি চক্ষু মুদ্রিত করে গভীর মনোযোগ সহকারে নাড়ীর গতি অনুধাবন করতে লাগলেন।

রোগিণীর শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট ও নাড়ীর গতি থেকে ভিষগরত্নের বুঝতে কষ্ট হয় না—বক্ষে শ্লেষ্মা জমেছে।

ধীরে ধীরে এক সময় রোগিণীর হাত নামিয়ে রেখে ভিষগরত্ন সুন্দরমের মুখের দিকে তাকালেন।

কেমন দেখলেন কবিরাজ মশাই?

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুন্দরম।

বুকে শ্লেষ্মা জমেছে।

ভয়ের কোন কারণ নেই তো? সেরে উঠবে তো?

সেরে উঠবে তো? মুখ ভেংচে উঠলেন সহসা ভিষগরত্ন, আমি ভগবান যে বাঁচবে কি মরবে বলে দেবো? চিকিৎসার প্রয়োজন, চিকিৎসা কর—

চিকিৎসা তো করবোই, কিন্তু—

সত্যি বল তো সুন্দরম, মেয়েটি কে?

বললাম তো আমার স্ত্রী!

থাম বেটা দৈত্য। তোকে আমি চিনি না! কারো তো খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই তোর মত একটা দস্যু বোম্বেটের হাতে জেনে শুনে অমন! ফুলের মত একটা মেয়ে তুলে দেবে! হ্যাঁ-রে, মেয়েটা জাত কি?

আজ্ঞে, ব্রাহ্মণের কন্যা।

বলিস কি? ব্রাহ্মণ-কন্যা! বেটা বিধর্মী, একটি নিরপরাধিনী ব্রাহ্মণ-কন্যার জাত মেরেছিস? নরকেও যে তোর স্থান হবে না রে।

হ্যাঁ, তোমাদের হিন্দুর স্বর্গে স্থান হবে না সত্যি বটে কবিরাজ মশাই; কিন্তু আমাদের ক্রেস্তানদের হেভেনে (Heven) ঠিক দেখো জায়গা পাবো। যাক গে ও-সব কথা, ওর এখন চিকিৎসার ব্যবস্থা কর তো।

বাড়িতে চল, ঔষধ নিয়ে আসবি।

তবে আর দেরি কেন, চল—

ফেরার পথে দু'জনার মধ্যে একটি কথাও আর হলো না।

নিঃশব্দে দু'জনে অন্ধকার নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় ভিষগরত্নের গৃহদ্বারে এসে উপনীত হলো।

ইতিমধ্যেই সমস্ত পাড়াটা যেন একেবারে নিঃসাড় হ'য়ে গিয়েছে।

গৃহে গৃহে আলো নিভে গিয়েছে।

রাত এমন কিছু বেশী হয়নি; কিন্তু ইতিমধ্যেই যেন মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা চারিদিকে ঘনিয়ে এসেছে।

গৃহের দ্বার খোলাই ছিল।

এবং উন্মুক্ত দ্বারপথে গৃহে পা দিতেই অদূরে আবছা অন্ধকার দাওয়ায় উপবিষ্ট হরনাথের প্রতি ভিষগরত্নের নজর পড়লো।

হরনাথ যায়নি, তখনো ভিষগরত্নের জন্য অপেক্ষা করে দাওয়ায় বসে।

সারাদিনের হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমে বসে থাকতে থাকতে বোধ করি তার দুই চোখের পাতা নিদ্রায় ভারী হ'য়ে বুজে এসেছিল।

নিজের অজ্ঞাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল হরনাথ।

করালীচরণ ভিষগরত্ন কল্পনাও করতে পারেন নি তাঁর প্রত্যাবর্তনের আশায় অত রাত পর্যন্ত সত্যি সত্যিই হরনাথ বসে অপেক্ষা করবে। তাই আঙ্গিনায় পা দিয়ে একটু যেন বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করেন, কে? কে ওখানে বসে?

ভিষগরত্নের কণ্ঠস্বরে হরনাথের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

সে চোখ মেলে তাকিয়ে বলে, আমি।

আমি! আমি কে?

মমতাময়ী মায়ের [illegible]
জিনিষই চাই:—

পরিবারের জন্য মায়েদের পছন্দ ডালডা

মায়ের বুকের সবটুকু ভালবাসা দিয়ে, মা তাঁর সন্তানকে গড়ে তোলেন। ভালবাসেন বলেইতো মা কেবল ভাল জিনিষই এদের দিতে চান। সব ব্যাপারেই মায়েরা পথ্যই ভালবাসেন। রান্নার বেলাতেও মায়েদের কেবল ডালডা-ই পছন্দ। ডালডায় রাঁধা ডাল তরকারী খেয়ে সবার তৃপ্তি।... সবচেয়ে সেরা ভেষজ তেল থেকে ডালডা তৈরী। শিশুর দৈহিক পুষ্টি সাধনের প্রয়োজনীয় উপাদান ভিটামিনও এতে রয়েছে। মায়ের হাতের মিষ্টি রান্নায় ডালডা খাবারকে আরও সুস্বাদু করে তোলে। রেঁধে তুষ্টি, খেয়ে আনন্দ—তাই আপনার বাড়ীতেও আজ থেকে ডালডা-ই চাই।

ডালডা বনস্পতি - রান্নার খাঁটি, সেরা স্নেহপদার্থ

DL. 70A-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

আমি হরনাথ মিশ্র।

মানে! ওখানে বসে কি করছো?

আপনার জন্ত বসে অপেক্ষা করচি।

কৃতার্থ হলাম। তা কেন বল তো?

আজ্ঞে আমার স্ত্রী অসুস্থ।

তাই বলে আপনি মনে করেচেন নাকি এই রাত ছুপুরে আপনার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে আপনার সেই অসুস্থ স্ত্রীকে দেখে নিজেকে কৃতার্থ করতে যাবো।

পুনরায় কথা তো নয়, যেন ভেংচে উঠলেন ভিষগরত্ন।

হরনাথের দিক থেকে কোন প্রত্যুত্তর আসবার পূর্বে এবারে সুন্দরমই কথা বললে, নিশ্চয়ই ওর স্ত্রী খুব অসুস্থ ঠাকুর মশাই। আমাকে ঔষধপত্র যা দেবার দিয়ে একটিবার না হয় যান না—

আহা, কি আমার দয়ার অবতার রে. নিজের জোটে না শঙ্করাকে ডাকে—

তাহ'লে কবিরাজ মশাই আমি কি ফিরে যাবো? কথাটা বলে এবারে হরনাথই।

না। এসেচেন যখন দয়া করে বসতে আজ্ঞা হোক, আসচি আমি। তবে হ্যাঁ, ছ'কুড়ি টাকা চাই। বলতে বলতে ভিষগরত্ন অন্দরে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং কিছুক্ষণ বাদে শুষ্ক কদলীপত্রে জড়ানো ঔষধ নিয়ে এসে সুন্দরমের সামনে দাঁড়ালেন, এই নে রে—দশটি বটিকা আছে—আর প্রলেপ আছে এর মধ্যে। প্রহরে প্রহরে একটি করে বটিকা মধু ও পানের রস অনুপান সহযোগে খাওয়াবি—আর প্রলেপটা দিবি বুকে—

সুন্দরম ঔষধগুলো নেবার জন্ত হাত বাড়িয়েছিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভিষগরত্ন নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, দাঁড়া শালা, টাকা দে আগে—

ও হো, ভুল হয়ে গিয়েছে—

শালা বোম্বেটে আসলেই ভুল। দে—

কুর্তার জেব থেকে সুন্দরম এক মুঠো টাকা বের করে ভিষগরত্নর দিকে এগিয়ে দেয়, নিন—

ভিষগরত্ন টাকাগুলো গুণে নিয়ে বললেন, কম আছে, আরো দে—

কত কম? শুধায় সুন্দরম।

দশ।

সুন্দরম আবার এক মুঠো টাকা বের করে ভিষগরত্নর হাতে দেয়। আবার টাকাগুলো গুণলেন ভিষগরত্ন এবং ছটি টাকা ফেরৎ দিলেন, নে—ছটো বেশী আছে—

থাক্।, ও আপনিই নিন।

খিঁচিয়ে উঠলেন ভিষগরত্ন, কেন রে শালা, তোর টাকা আমি নেবো কেন? ব্রাহ্মণ হাত পাতবে ম্লেচ্ছ শূদ্রের কাছে। তোর স্পর্ধা তো কম নয়।

আহা চটেন কেন ঠাকুর মশাই। না নেন, দিন ফিরিয়ে—

সুন্দরম টাকা ছটো গ্রহণ করে।

সুন্দরম ঔষধ নিয়ে বের হ'য়ে যেতে উদ্যত হতেই ভিষগরত্ন হরনাথের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, চল হে—

কিন্তু কবিরাজ মশাই—

আবার কি হলো!

যে টাকা আপনি চাইলেন অত দেবার মতো তো সামর্থ আমার নেই। আপনি অনুগ্রহ করে দয়া না করলে—

হরনাথের কথা শেষ হলো না। দরজার গোড়া থেকে চলতে চলতে ততক্ষণে সুন্দরম ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং মুহূর্তের জন্ত যেন কি ভাবে সুন্দরম। তারপর এগিয়ে আসে ওদের দিকে।

ভিষগরত্ন ততক্ষণে চিৎকার করে উঠেছেন, বিনা অর্থে পাদমেকং ন গচ্ছামি! ন গচ্ছামি!

সহসা ঐ সময় সুন্দরম তার কুর্তার জেব থেকে এক মুঠো টাকা বের করে হরনাথের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, নিন ঠাকুর, নিয়ে যান ওকে—

হরনাথ বিস্মিত হতবাক।

সামান্ত কিছুক্ষণের পরিচয়ে যে কেউ এমনি করে অযাচিত ভাবে এতগুলো টাকা কাউকে দিতে পারে, বিশেষ করে একজন বিধর্মী দস্যু, যেন হরনাথের কল্পনারও অতীত ছিল।

বিহ্বল হরনাথ চেয়ে থাকেন সুন্দরমের মুখের দিকে। বাক্যস্ফূর্তি হয় না তাঁর।

নিন ঠাকুর ধরুন, আমায় আবার অনেকটা পথ ফিরে যেতে হবে।

কবিরাজ ভিষগরত্নও এতক্ষণ ব্যাপারটা দেখছিলেন, তিনি বলে ওঠেন, ও: শালা আমার সাহেনশা, বাদশা এলেন—যা, যা—নিজের কাজে যা! তারপর হরনাথের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, চল হে ঠাকুর—

কথাটা বলে ভিষগরত্ন আর দাঁড়ালেন না, বহির্দ্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

হরনাথ তাঁকে অনুসরণ করেন।

কিন্তু হরনাথ মিশ্র জানতেন না যে স্ত্রী নয়নতারার সময় ফুরিয়ে এসেচে। নয়নতারার অঙ্গে দুরারোগ্য কর্কট ব্যাধি ধরেছে।

এবং সেই ব্যাধির বীজ দেহের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বিস্তার লাভ করেছে।

সুনয়না তার পিতার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় তখনো জেগেই ছিল।

হরনাথ এসে বন্ধ দুয়ারে আঘাত দিতেই সুনয়না এসে দুয়ার খুলে দিল, এত রাত হলো যে বাবা?

কবিরাজ মশাই এসেচেন—তোমার মা কি ঘুমাচ্ছেন।

না। জেগেই আছে বোধহয়।

দেখ তো—

সুনয়না ঘরের মধ্যে গিয়ে একটু পরে ফিরে এলো, কবিরাজ মশাইকে নিয়ে এসো বাবা।

আসুন কবিরাজ মশাই—

ছোট অপ্রশস্ত একটি ঘর।

এক পাশে পিলসুজের 'পরে প্রদীপ জ্বলছে।

অস্বচ্ছ আলো-আঁধারী ঘরের মধ্যে।

ভূশয্যায় শায়িতা ছিলেন নয়নতারা। ওদের পদশব্দে তাকালেন।

কবিরাজ এসে শয্যাপার্শ্বে বসে নয়নতারার হাতটি তুলে নিলেন নিজের হাতের মধ্যে এবং চক্ষু মুদ্রিত করে নাড়ীর গতি পরীক্ষা করতে লাগলেন।

প্রায় মিনিট দশেক চক্ষু মুদ্রিত করে নাড়ী ধরে বসে রইলেন।

তারপর এক সময় হাতটি নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন, চলুন ঠাকুর বাইরে যাওয়া যাক।

ঘরের বাইরে উভয়ে অপ্রশস্ত বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

অন্ধকার রাত্রি। স্তব্ধ সমাহিত যেন। মাথার 'পরে রাত্রির নক্ষত্রখচিত আকাশের একটা অংশ যেন নির্নিমেষে বহু নিম্নে শান্ত ধরিত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে।

কবিরাজ মশাই।

মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন হরনাথ মিশ্র।

উঁ।

কেমন যেন নির্বাক করালীচরণ।

আমার স্ত্রীকে কেমন দেখলেন?

কিছুই করবার নেই আর, মানুষের চিকিৎসার বাইরে উনি এখন।

কবিরাজ মশাই!

একটা আর্ত্ত ব্যাকুলতা যেন হরনাথের কণ্ঠ চিরে অস্ফুট নির্গত হয়।

দুরারোগ্য কর্কট ব্যাধি! মৃত্যু অবধারিত আর তারও বিলম্ব নেই—আজকের রাতটা অতিবাহিত হলেও কালকের সন্ধ্যা পেরুবে না।

না, না—কবিরাজ মশাই, এ আপনি কি বলচেন? দয়া করে আপনি আর একবার ওকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন—

পরীক্ষা করে দেখবার আর কিছু নেই। আমি চলি—যাবার জন্য পা বাড়ালেন করালীচরণ।

কবিরাজ মশাই, কিছুই ঔষধ দেবেন না?

করুণ কণ্ঠে কথাটা বলে দু'পা এগিয়ে এলেন হরনাথ।

কোন ফল হবে না—

করালীচরণের কথা শেষ হলো না—সহসা ঐ সময় পশ্চাৎ থেকে সুনয়না ছুটে এসে একেবারে করালীচরণের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কেঁদে উঠলো, আমার মাকে বাঁচিয়ে দিন কবিরাজ মশাই। আমি জানি আপনি পারবেন, আপনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী—

সুনয়নার কাতরোক্তিতে করালীচরণের মত পিশাচেরও চোখে বুঝি জল এসে যায়। প্রথমটায় কি বলবেন কি করবেন বুঝে উঠতে পারেন না, তারপর বলেন, ওঠো মা—পা ছাড়ো—

না, না— আগে বলুন মাকে আপনি বাঁচিয়ে দেবেন—

ভগবানকে ডাকো মা।

না, না—না—

বেশ মা, তুমি পা ছাড়ো, আমি ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি—তারপর হরনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, চলুন ঠাকুর মশাই—

হরনাথ মিশ্র বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

করালীচরণের কথায় সে কেবল একবার তাঁর মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টি তুলে তাকাল।

যাও মা—তুমি ঘরে তোমার মার কাছে যাও—

করালীচরণ আবার বললেন।

বিচক্ষণ কবিরাজ করালীচরণের ভুল হয় নি।

নয়নতারার নাড়ীর গতি তাঁকে প্রতারণা করেনি। অনুমান তাঁর মিথ্যা হয় নি।

পরের দিনই দ্বিপ্রহরের দিকে নয়নতারার শেষ মুহূর্ত্ত ঘনিয়ে এলো। স্বামীর পদধূলি মাথায় নিয়ে সজ্ঞানে সতী সীমন্তিনী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে পার্শ্বে উপবিষ্ট স্বামী হরনাথের চোখে জল দেখে নয়নতারা বললেন, আশ্চর্য, তুমি কাঁদছো!

নয়ন।

বলো।

আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলো না। তুমি স্বামী—পরম গুরু, ইহকাল পরকালের দেবতা—সুনয়নাকে দেখো আর—আর—

বল নয়ন!

আশীর্বাদ করো পরজন্মে যেন সম্পূর্ণ ভাবে তোমাকে পাই!

কথাটা বলতে বলতে নয়নতারা চক্ষু বুজলো এবং তার মুদ্রিত চক্ষুর কোল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

[ক্রমশঃ

কালপুরুষ

সন্ধ্যের কিছুক্ষণ পরেই মনে পড়ল—কুমারের বন্ধুর গতকালকার কথা। আমার প্রয়োজন ওর ফুরিয়েছে,—ও চায় আবার নূতনতর নারীদেহ! নূতন রূপ, নূতনতর মোহ। কিন্তু আমাকে তো কোথাও যেতে হবে। কোথায় যাব—কে বা এর পরে আশ্রয় দেবে? বাবার কাছে?—না। তাঁর মনে এত বড় আঘাত দিতে পারব না। তা হলে তিনি একদিনও বাঁচবেন না। মামার কাছে ফিরে যাওয়ারও পথ নেই। এই কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ আবার দরজায় কার ছায়া পড়ল। কুমারের বন্ধু! অপরাধীর দোষ স্বীকার ভঙ্গীতে নীচু স্বরে বলল—তোমাকে নিয়ে যেতে এলাম।

আমি চমকে উঠলাম। ঘরে একটা মৃদু আলো ছিল। তার সেই অল্প আলোতেও তার চোখ এড়াল না; শুধাল—চমকালে কেন? আমি বললাম—আবার? জানি না, আমার কণ্ঠস্বরে কান্নার সুর ঝরে পড়েছিল কিনা, তবে সে উত্তরে বলল—ভয় নেই। এবার তুমি মুক্ত। আর কোথাও কেউ নেবে না তোমায়। আমি অতটা পশু নই যে তোমার এই দেহটাকে নিয়ে যে কোন লোককে ছিনিমিনি খেলতে দেব। নাও, দেরি করলে আবার রাত হয়ে যাবে তো। অবশ্য রাতের ভয় আমার নেই, সে-কথা বোধ হয় জানো। বলে হাসতে লাগল।

আমি শুধালাম—আবার কোথায় নেবেন আমাকে? তার চাইতে আমাকে একেবারে মেরে ফেলুন। মুছে যাক আমার নাম পৃথিবীর পৃষ্ঠা থেকে। এ জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে কি হবে?

—তা আমি জানিনে। কিন্তু এখানে তো তোমার থাকা চলে না। এটা তো বাড়ী নয়—বাগানবাড়ী। তা ছাড়া, এখানে তো মেয়েমানুষ কেউ নেই।

রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল আমার। বললাম—এত কথা, এত ধর্ম্মজ্ঞান কাল আপনার কোথায় ছিল?

এক কথায় উত্তর দিল সে—মাঝে মাঝে ওসব কথা খেয়াল থাকে না। আবার মাঝে মাঝে যেন তত্ত্বকথা মাথায় এসে যায়। নাও, ওঠ, দেরি কর না।

—কোথায় নিয়ে যাবেন, না জানলে উঠব না।

—আজ আর আমি যাব না। ড্রাইভার একাই যাবে। কোন ভয় নেই। তাকে বলা আছে, সে ঠিক বাড়ীতে পৌঁছে দেবে।

—মামার কাছে আমি যাব না। তা যদি হয়, তবে আমি গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব। এ কিন্তু আপনাকে এখনি জানিয়ে রাখলাম। আর ভয়? আজ আর আমার কোন ভয়ই নেই। মানুষেরও না—পশুরও না। ও দুটোর চেহারাই দেখলাম কিনা।

—মামার কাছে তোমাকে যেতে হবে না। তবে বিশ্বাস করো, ভাল জায়গায়ই তোমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমার এখানে আর কোনদিনও তোমায় আসতে হবে না।

ওর কথাটা কেমন দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালীর মত মনে হতে লাগল। তবে আমি ভাবলাম, মরে তো আমি গেছিই; সুতরাং আর কি ভয় আমার? তাই মন স্থির করে উঠে দাঁড়ালাম—চলুন, কই আপনার ড্রাইভার?

একটু দাঁড়াও।—বলে কাকে যেন ইঙ্গিত করলেন—সঙ্গে সঙ্গে সে একটা প্লেটে করে দুটো সন্দেশ আরও কি-কি মিষ্টি, আর এক গ্লাস জল এনে দিল কুমারের বন্ধুর হাতে। আমার সামনে ধরে মিনতি করল সে—একটু মুখে দাও। কাল থেকে তো জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করলে না।

আমার এ ন্যাকামি সহ্য হল না। রাগে সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে তখন। হাতের এক ধাক্কায় প্লেটটাকে উলটে দিলাম। সিমেন্টের মেঝেয় সেটা পড়ে খান খান হয়ে গেল। খাবারগুলো ছিটকে পড়ল দু'ধারে। জলের গ্লাসটা তখনও তার হাতে ছিল। ত্বরিতগতিতে সেটা নিয়ে ছুঁড়ে দিলাম ওর মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে। ঘরের মৃদু আলোতেও দেখলাম ওর কপালে রক্তের দাগ। মুখে লেগে অবশ্য কাঁসার গ্লাসটা ঝন্ ঝন্ শব্দ করে পড়ল মেঝের উপর। আমি আর মুহূর্ত্তমাত্র দাঁড়ালাম না। বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ী ছিল দাঁড়িয়ে গতকালকার মত। একেবারে তৈরি। উঠে বসলাম। ড্রাইভারকে গম্ভীর ভাবে বললাম—চলুন, দেখি আপনি আবার কোথায় নিয়ে যান।

কথার ঝাঁজটুকু ড্রাইভার লক্ষ্য করেছিল। সে নম্রস্বরে উত্তর করল—দেখুন মা, পেটের দায়ে না হয় চাকরি-ই করি এখানে। তা বলে কি আর মেয়েদের সম্মান দিতে জানিনে?

আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হলাম। বললাম—মাপ করবেন, আমার ভুল হয়েছিল।

গাড়ী চলতে আরম্ভ করল। বাগানবাড়ী ছেড়ে একটু এসেই ডানদিকে ঘুরে গাড়ী পড়ল সদর রাস্তায়। মসৃণ কালো রাস্তা —রূপালী চাদরে মোড়া। ঝোপে ঝোপে জোনাকীরা অসংখ্য টিপের মত জ্বলছে আর নিবছে। আমরা দুজন চুপচাপ। গাড়ীর গতি মন্থর।

ড্রাইভারই হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বলল—কি বলব মা, দু' একদিন রাত্রিতে এখানে যা কাণ্ড হয়, তা আর বলার নয়। প্রায় সারা রাত্রি ধরে যে পৈশাচিক উৎসব চলে, তার কথা আমরা ভাবতেও পারি না। এত মেয়ে যে আসে কোথা থেকে, তা বুঝতে পারি না। মনে হয়, ওর মধ্যে ভদ্রঘরেরও দু' একজন থাকে। আমিই সব আনা-নেওয়া

করি কিনা। ভাল লাগে না আর এই পাপকার্য্যের অংশীদার হতে। ভাবছি, এখানকার চাকরি ছেড়ে দেব।

আমি একটু অন্তমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এ ড্রাইভার? সে কোন্ অতল সর্বনাশের মুখে? একটা গর্ত্তের মধ্যে গাড়ীটা পড়তেই মৃদু ঝাঁকানি লাগল। তাতেই যেন চেতনা ফিরে পেলাম। শুধালাম ড্রাইভারকে—আচ্ছা, আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে বলেছেন আপনার মনিব?

—ওহো, তা' উনি বুঝি আপনাকে বলেন নি? কি শয়তান দেখেছেন! আমি জানি এ কথা আপনি জানেন। আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন ওঁর বাড়ী থেকে খানিকটা দূরে একটা দোতলা বাড়ী আছে, সেখানে আরও মেয়ে আছে। আপাততঃ ওখানেই তো আমাকে যেতে বললেন। আশ্চর্য্য যে, আপনি কিছুই জানেন না। সেখানে বোধ হয় এই রকম মেয়েরাই থাকে। আমার তো ভিতরে যাওয়ার হুকুম নেই। নামিয়ে দিয়ে চলে আসি। একজন বুড়ী ঝি নিয়ে যায় ভিতরে।

—প্রমীলার রাজ্য!

—আমার কিন্তু মা ভাল মনে হয় না যায়গাটা। যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করি—আপনার কি আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও নেই? বলুন আপনাকে আমি সেইখানে পৌঁছে দিয়ে আসব।

তারপর? আপনার অবস্থা কি হবে?

আমার জন্যে ভাবেবেন না। সে আমি একরকম ব্যবস্থা করে নেব। কিন্তু মা আপনাকে ও যায়গায় রেখে দেব না।

কিন্তু আমার তো আত্মীয়-স্বজন তেমন কেউ নেই। আর থাকলেও এরপর কি ঘরে নিতে চায় কেউ? মেয়েমানুষের কলঙ্ক যে কি জিনিস সে তো নিশ্চয় আপনি জানেন।

ড্রাইভার যেন কি ভাবল কিছুক্ষণ ষ্টীয়ারিংএর উপর হাতখানা আলগোছে ধরে-রাখা অবস্থায়। তারপর হঠাৎ এক সময় বলে উঠল—একটা কথা বলব মা, অপরাধ নেবেন না। আপনার যদি আপত্তি না থাকে—তবে না-হয় আমার বাড়ীতেই আপাততঃ কিছুদিন—

আমি উল্লসিত হয়ে উঠলাম—বেশ তো। তাই চলুন তবে।

কিন্তু—

আবার কিন্তু কি?

আমারও কিন্তু বাড়ীতে কেউ নেই। একটা মেয়ে আছে বটে, তাও কুড়িয়ে-পাওয়া।

কুড়িয়ে-পাওয়া!

হাঁ, একরকম তাই বটে। তবে শুনুন।—এই আপনি যেমন আজ যাচ্ছেন এক অনির্দ্দিষ্ট ভাগ্যের পথে, জানেন না তার সীমা কোথায়, ও মেয়েটাও তেমনি সেদিন জানত না তার ভাগ্যের পরিণতি তাকে কোথায় নিয়ে যাবে। আমিই ছিলাম সেদিন চালক এই গাড়ীরও, বোধহয় তার ভাগ্যেরও। তবে সেদিন এমন জ্যোৎস্না ছিল না। ছিল অন্ধকার কালো রাত্রির আবরণে চারিধার ঢাকা।

এবার ড্রাইভার বলে উঠল—গাড়ী তো ফিরেই যাবে। তা চলুন, আপনাদের দুজনকে পাড়াতে পৌঁছেই দিয়ে যাই।

আমি এবার তাকে বললাম—তা না হয় দিলেন; কিন্তু মনিবকে কি বলবেন?

সেজন্যে কিছু ভাববেন না মা।

ঐ গাড়ীতে চড়েই বাড়ী এলাম—মহেন্দ্রর নির্জন কুটিরে। ড্রাইভারকে বলে দিলাম—দয়া করে একবার যেন এখানে আসেন।

হাতজোড় করে নমস্কার করে ড্রাইভার বলল—আসব বৈকি মা। একদিন আসার ইচ্ছা নিয়েই আজ বিদায় নিচ্ছি।

গাড়ীখানা চলে গেল। পেট্রোল পোড়ার গন্ধে বাতাস খানিকক্ষণ ভরে রইল। আমি একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইলাম। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—অদ্ভুত!

মহেন্দ্রর বিস্মিত ভাবটা তখনও কাটেনি। আমার কথাটা তার কানে যেতেই সে ভাবটা কেটে গেল, বলল—কে অদ্ভুত—কি অদ্ভুত?

হাসলাম একটু।—বলব, পরে বলব। আগে চল, কিছু খেতে তো দাও—অন্তত: একটু জল। হাঁ, তার আগে তোমার একখানা লুঙি থাকে তো দাও। মাথায় দু'বালতি জল দিয়ে আসি।

স্নান করতেই যেন অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম। গত রাত্রির ঘটনাও যেন ঐ সঙ্গে ধুয়ে মুছে গেল; একটা দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে উঠলাম যেন।

সামান্য কিছু জলযোগ করে এসে বসলাম উঠোনে—একখানা মাদুর পেতে। চারিদিকে জ্যোৎস্নার বান ডেকে যাচ্ছে। আকাশ এত নীল। এত উদার! মাঝে মাঝে ২।১টি কাক ভোর হল মনে করে ডাকছে। কোথায় যেন একটা কোকিল ডাকছে কোন্ গাছের ঘন পত্র-শাখার অন্তরালে! এমন অনাবিল সৌন্দর্যের মধ্যে আমারই সর্বাঙ্গ আবিলতায় ভরা, লাঞ্ছনার চিহ্ন সারা দেহ-মনে!

মহেন্দ্র এসে বসল পাশে। আমি একটু হাসলাম। তাতে মহেন্দ্র শুধাল—হাসলে কেন?

—হাসলাম কেন? দুঃখে। আমার সব ইতিহাসটুকু যদি শোন, তবে আমার পাশে বসতে তোমার ঘৃণা বোধ হবে।

—জানি তবু। তুমি জানো না—ইতিহাস তোমার যাই হোক, অতি তোমার যাই হয়ে থাকুক না কেন—তুমি আমার কাছে ঠিক সেই আগের দিনের নির্মলাই আছ।

অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ওর দিকে তাকালাম। অনেকক্ষণ। শেষে আমার চোখ দুটো জলে ভরে গেল তাকিয়ে থাকতে থাকতে। ঝরে পড়ল অশ্রু—সে কি কৃতজ্ঞতার—সে কি ভালবাসার?

মহেন্দ্র আমার পিঠের উপর লুটিয়ে পড়া আঁচল তুলে নিয়ে চোখ মুছিয়ে দিল। কণ্ঠস্বরে বলল—কেঁদো না নিমু। আমি বুঝতে পারছি—তার মমতায় ও স্নেহে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে তখন আমার।

—সাগ্রহে তার হাত দুটো চেপে ধরলাম আমি।—বুঝতে পেরেছ তুমি—পারবেই তো। বলো—আমাকে তাড়িয়ে দেবে না তোমার আশ্রয় থেকে কোনো দিন—কোন কারণেই না। বলো—আমাকে ছুঁয়ে বলো।—তার একটা হাত টেনে নিয়ে রাখলাম আমার মাথায়।

হাসল মহেন্দ্র। তারপর আমার মাথায় হাত রেখেই বলল—বলো কি বলতে হবে? তুমি যা বলবে তাতেই আমি রাজী।

ব্যস, ওতেই হবে। একটা মৃদু চাপ দিয়ে ওর হাতখানা নামিয়ে দিলাম।

তোমাকে বলতে আমার কোন বাধাই নেই।—বলে আমি যেই শুরু করতে যাব আমার ইতিহাস, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল—মহেন্দ্রর হয়ত রান্নাই হয়নি। বললাম—তোমার তো বোধ হয় রান্না-বান্না কিছুই হয়নি।—

বাধা দিল ও। বলল, এ-বেলা রান্না আমি প্রায়ই করিনে। ও-বেলার-ই থাকে। তা ছাড়া, সময়ও হয় না।—দোকানে একা মানুষ তো।

সে কি।

হাঁ, তোমাদের ওখানে তো চাকরি ছেড়ে দিয়েছি—তুমি মামার বাড়ী যাওয়ার পরই। এখন নিজেই একটা দোকান করেছি এখানে। ওখানকার বাড়ীও বেচে দিয়েছি। এই কুঁড়েটুকু আপাতত করেছি।

ভাল করেছ? কিন্তু, আজ তোমার রান্না করতেই হবে। চল সব দেখিয়ে দাও, আমি রান্না করব আজ। ওই ভাত-তরকারি আজ আর তোমায় কিছুতেই খেতে দেব না।

তোমার কথা তো কই শোনা হল না?

চল, রান্না করতে করতে সব শোনাব তোমায়। সব তাতেই তোমার যেন তাড়াতাড়ি।—কৃত্রিম কোপের সুরে বললাম আমি।

আচ্ছা চল।—মৃদু হাসল মহেন্দ্র।

আমি উঠে পড়তে পড়তে বললাম—মাদুরটা তুলে এনো কিন্তু।

মহেন্দ্র মাদুর হাতে করে আমার পিছন পিছন এল।

রান্না করতে করতে মহেন্দ্রকে বললাম সব কথা—কোন কিছু গোপন করি নি।

মহেন্দ্র শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে উঠল। আমার বাঁ পাশে সে বসেছিল। বাঁ হাতে একটা ঠেলা দিয়ে তাকে বললাম—হঠাৎ গুরুমশায়ের মত অত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?

ভাবছি—এত বড় লম্পট সহরের বুকে কেমন নির্বিবাদে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে; আর কত মেয়ের সর্বনাশ করছে। আর একটা কথাও ভাবছি। বোধ হয় জানো না, মামার কাছ থেকে খবর পেয়ে তোমার বাবা পুলিশে খবর দিয়েছেন।

তা তো দেবেনই।

কিন্তু বেশি কেলেঙ্কারী যদি না করতে চাও, তবে তোমাকে বলতে হবে যে, তুমি স্বেচ্ছায় আমার কাছে এসেছ। এতে ব্যাপারটা অনেক সহজে মিটে যাবে।

তা আমি খুব বলতে পারব। তুমি যদি সত্যিই আমাকে আশ্রয় দাও, তবে এ আর এমন কঠিন কথা কি?

তোমাকে আমি চিরদিনের তরে এইখানে স্থান দিয়েছি এক দেব—বলে তার বুকের মাঝখানে হাত রাখল।

অনেক রাত্রিতে সেদিন খাওয়া-দাওয়া সারা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে প্রায় মাস চারেক কেটে যায়। আমি বুঝতে পারি আমার দৈহিক পরিবর্তন। বললাম আমার সন্দেহের কথা মহেন্দ্রকে। আশ্চর্য, মহেন্দ্র তাতে ঘৃণা প্রকাশ করল না বা আমার উপর কোন অশ্রদ্ধাও দেখাল না।

আমি বললাম—ডাক্তার দেখিয়ে এখনও তো নষ্ট করা যায়।

মহেন্দ্র এবার দৃঢ় এবং কিছু উচ্চ স্বরে বলে উঠল—কোন প্রয়োজন নেই তার।

কিন্তু তুমি তো জানো মহেন্দ্র, কুমারীর সন্তান যে কত লজ্জার বিষয়।

জানি, সব জানি।—আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগল মহেন্দ্র। —তবু বলছি আর তার সব দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।

আমি শুধু মহেন্দ্রর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম; চোখ দুটো ভরে এল জলে। বললাম—মহেন্দ্র, তুমি মানুষ নও, দেবতা।

হাসল মহেন্দ্র, একটি কথাও বলল না।

হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, পুলিশে বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। তারপর আমাদের দুজনকেই নিয়ে আসে থানায়।

তোমার বাবা?

মারা গিয়েছেন সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। অর্থাৎ আমারই এ মুখ আর ওদিকে দেখাবার উপায় ছিল না।

আর মহেন্দ্র—আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

জানিনে।—এই কথা বলেই হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নির্মলা বলল—অনেক বেলা হল। চান করবার সময় হল। আচ্ছা, এবার উঠি। নমস্কার।

হাত জোড় করল নির্মলা। আমিও।

ওর উঠতে গিয়ে আলমারীর বড় তালাটা মাথায় লাগল ঠকাস্ করে। মাথার স্বল্প ঘোমটাও সেই সঙ্গে খসে পড়ে গেল।

আমি হাসলাম—লাগল তো?

নির্মলাও মিষ্টি হেসে উত্তর করল—না লাগেনি। একথা মুখে বলল বটে, কিন্তু পালিয়ে গেল তাড়াতাড়ি; একেবারে গেটে। জমাদারণী ওকে নিয়ে গেল ভিতরে আমার ইঙ্গিতে। আমি এলাম বাইরে।

৭

বীণাপাণি এসেছিল ওর স্বামী নিরাপদর সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে ছিল দুটি ছেলে। একটির বয়স বছর ছয়, আর একটির বয়স বোধ হয় বছর দশেক হবে। দৈহিক চিহ্ন ঘোষণা করছে আরও একটি সন্তানের অচিরাৎ আগমন।

স্বামী নিরাপদ আজ নূতন জেলে আসেনি। বয়স ওর বেশি হবে না, কিন্তু এরই মধ্যে পাঁচ বার জেল-খাটা হয়ে গেছে। তাই জেলের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও ওর কম নেই। প্রায় প্রতিবারই জেলে আসবার পর নিজের সাফাই গাইতে ও কসুর করে না পাতা-ভর্তি পিটিশনের মারফতে। সত্যি-মিথ্যে ভগবানই জানেন।

বীণাপাণি কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।—এগুলোকে (ছেলে দুটিকে দেখিয়ে) কি খাওয়াই? পরের ভাতই বা কি করে দিই? তুমি তো বেশ দিব্যি এখানে খাওয়া-দাওয়া করছ। ইচ্ছা করে কোথায় গঙ্গায় মাথা ঢুকি। বৌ-ছেলেকে খেতে দিতে পারো না তো বিয়ে করা কেন?

নিরাপদর পৌরুষ-সত্তা আহত হয়ে গর্জে উঠল—বেশ করেছি। যাঃ, এখন ত্যাগ করলাম। যা করে পারিস, নিজের ব্যবস্থা করে নে, পারব না আমি খেতে দিতে।

বেশ। আমিও আসছি তোমার কাছে এই জেলখানাতে। নিশ্চিন্তে খাওয়া তো চলে যাবে তোমার মত।—বলে বীণাপাণি চলে গেল।

মেঘে-ঢাকা জ্যোৎস্নার মত এখন রূপ বীণাপাণির। এক কালে রূপসী যে ছিল, তা কাহিনী নয়।

বীণাপাণি চলে গেলে নিরাপদর জেলের বন্ধুরা প্রশ্নবাণে অস্থির করে তুলল—কি রে নিরাপদ, তোর বৌয়ের আবার জেলে আসতে হবে নাকি?

নির্লিপ্ততার সঙ্গে উত্তর দেয় নিরাপদ—কি জানি।

অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয় বন্ধুরা; আবার প্রশ্ন করে—তার মানে? তুমি জানো না তো জানে আবার কে?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর করে সে—ঐ মাগীই জানে।

বন্ধুরা ওর যে একটা অবিশ্বাস করে কথাটা, তা নয়; আবার বিশ্বাস যে কেউ কেউ না করে, এমনও নয়। কারণ এমন ঘটনা ওদের জীবনে প্রায়ই ঘটে থাকে। অনেকের কাছে বিবাহ কথাটার অর্থ শুধু কয়েকটি অক্ষর আর মায়ার সমষ্টি।

নিরাপদর মেজাজ ঠিক নেই—শেষে এই সিদ্ধান্ত করেই একে একে সরে পড়ে বন্ধুর দল।

বীণাপাণি গেট থেকে এসে আছাড়ি পিছাড়ি করে জমাদারের বাড়ীতে। জমাদার থাকে পরিবারবর্গ সমেত সরকারী কোয়ার্টারে। মা-লক্ষ্মীর কৃপা তার উপরে আছেন। লক্ষ্মীর তেমন নেই।

কোলে
গ্লুকোজ
বিস্কুট

রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দ্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

বীণাপাণি দাঁড়াতেই কে যেন খিঁচিয়ে উঠল—হবে না, যাও এখন। আমাদেরই বলে দিন চলে না,—তোমাকে রোজ-রোজ খাওয়াই কোথা থেকে?

কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যিই এ-বাজারে একটা নয়, দুটো নয়, ৭।৮টি লোকের খোরাক জোটানো সহজ কথা নয়। আর বীণাপাণিও আজ নূতন এসে দাঁড়ায়নি। প্রায়ই আসে ও। আর এখানকার কারো-না-কারো বাসা থেকে এই ভাবে চেয়ে-চিন্তে কোনরকমে চালায়।

দাঁড়াতে না পেরে বীণাপাণি বসে পড়ল একেবারে দোরগোড়ায়। একে তো খাওয়া-দাওয়ার কিছুই ঠিক নেই; তা'পর একজনের ভার শরীরে ধারণ করতে হচ্ছে।

জমাদারের অন্তঃসত্বা বড় মেয়ে বেরিয়ে এল। সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করল একবার বীণাপাণির। তারপর কি ভেবে বলল—দাঁড়াও, আসছি আমি। বলে একটা থালায় করে ভাত এনে দিল—আর কিছু ডাল। থালাখানা নামাতে-না-নামাতে ছেলে দুটি গোগ্রাসে গিলতে লাগল। অল্প-ক্ষণের মধ্যেই থালা পরিষ্কার হয়ে গেল। নিকটের পুকুর থেকে থালাখানা ধুয়ে এনে দিতেই জমাদারের বড় মেয়ে বলল—তোমার তো কিছুই জুটল না!

থাক মা, আমার আর লাগবে না। ওরা খেয়েছে, তাতেই আমি তৃপ্তি পেয়েছি।

না, না,—তা কি হয়? তোমার এই অবস্থায়—

করুণ হাসি হাসল বীণাপাণি।—ক'দিন তুমি আমায় করবে, দিদি? আমার তো নিত্যি অভাব। এই থালা রইল।

এক মিনিট দাঁড়াও। দ্রুতপদে ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে এল জমাদারের বড় মেয়ে। এই নাও—বলে চকিতে তার শীর্ণ হাতে গুঁজে দিল একটি টাকা।

জমাদারের স্ত্রী দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—কি দিলি রে ও মাগীর হাতে?

মেয়ে বলল—একটা টাকা, মা। ভাতে তো ওর কুলাল না। ওর এই অবস্থায়—

বাধা দিল মা। মুখ ভেঙচিয়ে বলে উঠল—ওর এই অবস্থায়—এদিকে তো কম যায় না। খেতে দিতে পারে না—বিয়োবে গণ্ডা গণ্ডা। গলা টিপে মেরে ফেলতাম অমন ছেলে আমি হলে।

অথচ তিনিও ৭।৮টি সন্তানের মা। সংসারও প্রায় অচল।

চমকে উঠল বীণাপাণি। মায়ের কথাই হয়ত সত্যি। এ-সব সন্তানের গলা টিপে মারাই উচিত।

চলে গেল বীণাপাণি ক্লান্ত পা দুটো টেনে টেনে।

পরের দিন বীণাপাণিকে ধরে নিয়ে এল পুলিশে। অপরাধ মারাত্মক—খুন। খুন করেছে নিজের ছেলেকে। মা হয়ে ছেলেকে খুন করতে পেরেছে—কেমন ধরণের মা!—বললেন একজন পুলিশ অফিসার। বীণাপাণি উত্তর করেনি কিছু মনে পড়ল আমার আগের দিনের কথাগুলি।

কিন্তু বীণাপাণি যা বলল তাতে বুঝলাম, পূর্ব্বদিনের কোন কথাই ওর মনে দাগ কাটেনি। নেই তার জন্যে কিছু দুঃখ। সন্তানকে মারতে কোন মা-ই পারে না। চোখের সামনে তার মৃত্যু দেখতে পারে না।—ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল বীণাপাণি হঠাৎ।

একটু সুস্থ হয়ে নিয়ে আবার বলতে লাগল সে—আমি মারিনি বাবু ছেলেকে।

অবাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকাতেই সে বলে উঠল—এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, বাবু, আমি মেরে ফেলব বলে মারিনি।

—থাক, থাক,—পায়ে হাত দিতে হবে না, বললাম আমি।—তুমি বল, কি করে মরল তোমার ছেলে।

কাল সন্ধ্যেবেলার ঘটনা। সূর্য্যি প্রায় ডোবে-ডোবে। আমার শরীরটা ভাল লাগছিল না। তাই শুয়েই ছিলাম। সন্ধ্যের একটু আগে উঠে বসেছি। রাজ্যের অবসাদ নেমে এসেছে সারা শরীরে। তবু ঐ ছেলে দুটোর জন্যেই পয়সা চারেকের মুড়ি আনতে দেবার বাসনায় ঐ ছেলেকে খুঁজছিলাম। চেঁচাবারও শক্তি বেশি নেই, দেখছেন তো শরীরের এই অবস্থা।—এই পর্য্যন্ত বলে হাঁপাতে লাগল বীণাপাণি।

আমি ওকে বসতে বললাম। অতি কষ্টে আগে মাটিতে হাত রেখে থপাস করে বসে পড়ল সে।

একটু জিরিয়ে নিয়ে বলতে লাগল—ছেলেটা যখন এল, তখন সন্ধ্যে উৎরে গিয়েছে। আমি ওকে খুব বকলাম।—কোথায় থাকিস, আমি এদিকে ডেকে ডেকে হয়রান। জানি বাবু,—ধরা-গলায় বলে চলেছে বীণাপাণি—জানি, এক কোঁটা ছেলে, কত আর ও করবে! তবু তো কখনও-সখনও মাছটা ধরে আনা, কোথাও থেকে কাঁচা তরি-তরকারী চেয়ে আনা—এ-সব ও করে। তা মিথ্যে নয়, বাবু! ইদানীং ওর স্বভাবটা খারাপ হয়েছিল। পকেট মারতে শিখেছিল। রক্তের দোষ, বাবু। বাবা সিঁদেল চোর—ছেলে পকেটমার! এই তো সেদিন বাস-ষ্ট্যাণ্ডে কার পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। ২।৪ জন ভদ্রলোক ছেলেমানুষ বলে ছেড়ে দিল। আমিও অবশ্য বাবুদের হাতে-পায়ে ধরেছিলাম সেজন্যে। দু' একজন তাতে একটা বাঁকা চাউনি হেনে বলল—ওঃ, তোমার ছেলে, তাই বল। না হলে আর এমন হবে কেন? এইটুকু বয়সেই ও শিখেছে পকেট মারতে! পেটেরটি তো শিখবে পেট থেকে পড়েই।

ওকে যতই বলি—ও কোন কথা বলে না। আমিও বিরক্ত হয়ে ওকে বললাম—যা, চার পয়সার মুড়ি নিয়ে আয়। পয়সা নিয়ে নীরবে চলে গেল ও।

এদিকে আমি বসে আছি,—এই আসে, এই আসে।

'লম্ফ'টায় তেল বেশি ছিল না, তাই ছেলের দেরী দেখে সেটা নিবিয়ে দিলাম।

দরজার গোড়ায় বসে বসে আমার একটু ঝিম্ ধরে এসেছিল। কতক্ষণ পার হয়েছে জানি না,—হঠাৎ 'মা' ডাক শুনে চমকে উঠলাম।

মুড়ি এনেছিস্—দে।

কোন উত্তর নেই। ছেলেটা গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াল বাইরে জ্যোৎস্নার আলো। ঘরে সেই আলোতে আবছা দেখলাম, ছেলেটা মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

কি রে, মুড়ি কই? এক ঘণ্টা পর ফিরে এলি, তা-ও শুধু হাতে! কি করেছিস বল পয়সা নিয়ে?

তবুও তার মুখে কোন উত্তর নেই।

এক চড় কষিয়ে দিলাম রাগের মাথায়।—হতভাগা ছেলে! বল শিগগির, পয়সা কি করলি?—অন্ধকারে দেখতে পাইনি কোথায়

লাগল সেই চড়। ধপাস্ ক'রে একটা শব্দ হতেই বুঝতে পারি ছেলেটা ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে। দিলাম আরও কয়েক ঘা তার উপর।

সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, আহা, পয়সাটা হয়ত হারিয়ে ফেলেছে, তাই ভয়ে বলতে পারেনি কিছু। যা হোক—তাড়াতাড়ি বাতি জ্বেলে যা দেখলাম, তাতে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল।—বলেই বীণাপাণি উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল।

আমি বুঝলাম এর পরের ইতিহাস। কিন্তু বীণাপাণি আবার বলতে লাগল একটু সুস্থ হয়ে নিয়ে—

আপনি যা ভাবছেন, বাবু, তা নয়। নিজে হাতে করে ছেলেকে মেরে ফেললাম বলে আমি পালিয়ে যাইনি ভয়ে। বরং ঘরে শিকল তুলে দিয়ে, সামান্য যা কাপড়-চোপড় নিজের ছিল, একটা পুঁটলিতে বেঁধে, বগলদাবা করে ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে একেবারে উঠলাম গিয়ে থানায়। বললাম—আমার ছেলেকে আমি মেরে ফেলেছি। তোমরা আমাকে 'এ্যারেষ্টো' করো।

বাবুরা আর সিপাইরা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। আমি তাই দেখে বললাম—বিশ্বাস না হয় একজন লোক দাও আমার সঙ্গে। লাশ এখনও পড়ে আছে ঘরের মেঝেয়। বাতি জ্বলছে সে-ঘরে। ঘরে শিকল দেওয়া। চল—এখখুনি। দেখছ না, আমি আমার সব সম্পত্তি নিয়েই বেরিয়ে এসেছি।—বলে পুঁটলিটা হাতে করে তুলে দেখালাম তাদের।

থানা থেকে সিপাই দেওয়া হল। আমি সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম আমার বাড়ীতে। সঙ্গে ছিলেন টাউনবাবু। তিনি বললেন—এ লাশ তো মর্গে পাঠাতে হবে।

আমি শুধালাম—কেন? আমি তো বলছি আমি মেরেছি। যে মরে গিয়ে স্বর্গে গেল তাকে আর মর্গে পাঠিয়ে কি কাজটা উদ্ধার হবে, শুনি? শুধু তো কাটা-ছেঁড়া চেরাই!

এক তাড়া দিলেন টাউনবাবু। চুপ করে গেলাম আমি।

মর্গে কাটা-চেরাই হবার পর শুনেছিলাম—ওর পেটে নাকি জিলিপির টুকরো পাওয়া গিয়েছিল। জিলিপি ও খুব ভালবাসত কিনা? প্রায়ই আমার কাছে বায়না ধরত সে জন্য। আমি গরীব মানুষ, পয়সা কোথায় পাব এত?

হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল—আমি এসেছি এবার জেলের ভাত খাওয়ার জন্য। নিরাপদর এত বড় বাড়, সে বলে কিনা—তুই আর এখানে! এবার দেখুক সে, এলাম কিনা!

কতদিন থাকতে হবে বাবু—সুর নরম করে প্রশ্ন করে আমাকে।

আমি বলি—তা তো জানিনে। তবে ৩।৪ মাস তো বটেই।

এ উত্তরে যেন সে কাণ দিল না। বলল—নিরাপদ বার বার চুরি করবে আর জেলে আসবে। আমি একা মেয়েমানুষ, কতদিন আর চালাই। তারপর কোথাও যে কাজ করব, তা ঐ ছেলে দুটোর জন্যেই কেউ রাখতে চাইত না। সবাই বলত—এক জনের খোরাক দিলে তো হবে না, ছেলে-দুটোরও দিতে হবে ঐ সঙ্গে। বলুন বাবু, পেটের ছেলে তো, ফেলে তো আর দিতে পারি নে!

আমি যার বাড়ীতে ভাড়া থাকতাম, সে মাগীটার স্বভাব-চরিত্তির ভাল ছিল না, বাবু। তা সে-কথাটা আগে জানতে পারিনি। নূতন গিয়েছি; তাকে বললাম সব খুলে। মেয়েমানুষের দুঃখ বোঝে, সে খুব দুঃখ করল।

কয়েকদিন পরই আমার একটা কাজ ঠিক করে দিল এক বাবুর বাড়ীতে। আমাকে বলল—তোর ঐ ছেলে দুটোর কথা বলিসনে যেন। আমার তখন দুরবস্থার চরম চলছে। ঘর ভাড়া বাকী পড়েছে দু'মাসের। আর ওদিকে নিরাপদর জেল হয়েছে ছ'মাস। সে অবস্থায় যা বললে একটা কাজ পাওয়া যায়, তাই আমাকে বলতে হয়েছে।

বাবুটি কি করত তা জানি না। তবে সকাল ৯।১০টায় বেরিয়ে যেত, আসত আবার রাত্রি ৯।১০টায়। বাড়ীতে কেউ নেই, নিজেও বিয়ে-থা করেনি—করবার বয়েসও আর নেই। আমি সকালবেলায় সব কাজ করে দিয়ে আসতাম, আর রাত্রিবেলায় বাবুর খাওয়া-দাওয়া সারা হলে কাজ সেরে ফিরতে বেশ রাত্রি হত। ছেলে দুটোকে সন্ধ্যের সময় কিছু খাইয়ে-দাইয়ে বাড়ীওয়ালীর কাছে রেখে যেতাম।

বাবু একদিন নিজেই শুধালেন, তোমার নাকি দু'মাসের ঘর ভাড়া বাকী। আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—হ্যাঁ। তখন ভেবে দেখিনি, কি করে তিনি জানলেন এ কথা, আর কেনই বা শুধাচ্ছেন প্রশ্নটি।

হঠাৎ তিনি পরের দিন বাড়ী ভাড়ার বাকী টাকা ক'টা ফেলে দিলেন আমার সামনে। কৃতজ্ঞতায় সজল হয়ে উঠল আমার চোখ দুটো। বললাম—এ টাকা শোধ দেব কি করে? কেমন একটা হেসে তিনি বললেন—দিতে হবে না। আমার ভয় হল তাঁর সেই হাসিতে—এতগুলো টাকা শুধু শুধু দিয়ে দিলেন! কি জানি—গরীবের উপর তাঁর এত দয়া!

মাসখানেক কেটে গেল। একদিন সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ তিনি এসে বললেন—আমাদের একটা পার্টি আছে অমুক বাগানে। ফিরতে অনেক রাত হবে। তুমি কি থাকবে, না চলে যাবে?

ভাবলাম—এত দরদী যিনি তাঁর জন্যে একটা দিন একটু কষ্টই না হয় করি—ক্ষতি কি?

সত্যিই তিনি বাড়ী ফিরলেন সেদিন অনেক রাত্রিতে। কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। চোখ দুটো লাল, পা কাঁপছে, কথা জড়ানো। ঐ অবস্থায় গিয়ে ধপাস করে বিছানায় পড়লেন। অল্প হেসে বললেন—এখনও বসে আছ, লক্ষ্মী! আচ্ছা, এবার বাড়ী যেতে পারো। হ্যাঁ—একটা কথা শোনো। এদিকে এস, কাছে এস।

গেলাম ধীরে ধীরে তাঁর বিছানার পাশে। হঠাৎ তিনি আমার হাত দুটো ধরে বললেন—এখনি চলে যেও না। আমার কেমন যেন ভয় করছে। আর একটু থাক।—হাত আর কিছুতেই ছাড়লেন না। এদিকে আমি চীৎকারও করতে পারিনে। মুস্কিলে পড়লাম। তাঁর ইচ্ছার হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিলাম এরপর, ছাড়াবার চেষ্টা মিথ্যে হবে জেনে।

এক হাত বাড়িয়ে বাতির সুইচ টিপে নিবিয়ে দিলেন। আমি অনুভব করলাম, তাঁর কোলের মধ্যে শুয়ে আছি। ঘর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সেই অন্ধকারের কালি দিয়ে যে-কাহিনী তিনি লিখে দিলেন, তা যে-কোন মেয়েরই বাকী জীবনের কলঙ্কের বোঝা।

মুহূর্তে যেমন জয় হয়, তেমনি পরাজয়ও হয় আবার মুহূর্তেই।

কিন্তু সে মুহূর্তগুলো আর ফিরে আসে না। আনন্দ-বেদনায় মাখা হয়ে তারা রচনা করে ভাবীকালের ইতিহাস।

আমি কাজ ছেড়ে দিতে চাইলাম; কিন্তু বাবুটি কেমন অসহায়ের ভঙ্গীতে তাকাল আমার দিকে। তারপর কাছে এসে মাথার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলল—কেন ছেড়ে যেতে চাও আমাকে?

আমার কান্না এসে গেল—বললাম, কি সর্বনাশ করেছেন আপনি আমার, ভেবে দেখুন তো!

হেসে উঠলেন খুব জোরে—ও হো, এই জন্যে। সে জন্যে ভেব না তুমি। আজ থেকে তোমার সব ভার আমি নিচ্ছি। নিশ্চিন্ত থাক তুমি।

হয়ত নিশ্চিন্তই থাকতাম। কারণ আমার ইহকাল-পরকাল দুই-ই সমান। কি হবে দারিদ্র্যের অনিশ্চিত দিনগুলোর বোঝা টেনে টেনে? খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে না পারলে মানুষের মধ্যে কিসের পরিচয় দেওয়া চলে? সমাজেও লোকে বলে—ওর খোঁজ নেয় না, স্বামী চোর; জেলের ভাত খেয়ে খেয়ে তার পেটে চর পড়ে গেল। দিনের পর দিন এইভাবে চলার চাইতে দুটো খেতে পরতে পাই যদি, তার চেয়ে বেশি আর কিছু চাইনে।

কিন্তু ভাগ্যে লেখা ছিল অন্য কথা। নিরাপদ হঠাৎ মাস চারেকের মধ্যে খালাস পেয়ে চলে এল বাড়ী। এসেই খোঁজ করল আমার। আশ্চর্য্য, সে একবার শুধাল না পর্য্যন্ত—এ কমাস আমার কি ভাবে চলেছে। তবু আমি নিজেই বললাম সব কিছু। কিছুই গোপন করিনি। তা নিরাপদ এরপর সেই যে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল, আর এল না তারপর দেখি—এখানে।

বুঝি বাবু দোষ আমার। কোন পুরুষ-মানুষই পরিবারের এই স্বেচ্ছাচারিতা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু আমি কি নিজের ইচ্ছায় এ কাজ করেছি? সে ছিল আমার অন্নদাতা। তার পরিণাম যে এমন হবে, তা কে জানত। তবু তিনি বলেছিলেন, তোমরা কোন ভয় নেই। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, তোমার সকল ভার আমার উপর আমি স্বেচ্ছায় টেনে নিলাম। বল, তুমি ক্ষমা করলে আমাকে? আমার হাত দুটো হাতের মধ্যে নিয়ে শুধালেন

চুপ করে আছি দেখে তিনি আবারও বললেন—না হয় আমি তোমাকে বিয়ে করব।

আমার সর্বশরীরে আগুন জ্বলে উঠল। বললাম—জানেন, আমার স্বামী আজও বেঁচে। কোন্ সাহসে একথা বললেন আপনি—বাজারের মেয়েমানুষ নই আমি।

এ উত্তরের পর তিনি যেন অন্য মানুষ বনে গেলেন। বললেন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে—থাক, আমার ভুল হয়েছে। তবে কথা দিচ্ছি, তোমার ভবিষ্যৎ ভেবেই তোমার নামে একখানা বাড়ী আমি দিয়ে যাব।

তাঁর কৃত দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত তিনি এইভাবে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান তাঁকে অন্যদিক দিয়ে মারলেন। রাত ১০টার গাড়ীতে নেমে লাইন পেরিয়ে আসতে গিয়ে কাটা পড়লেন রেলে। কেউ বলল—আত্মহত্যা। আমারও মনে হল তাই। তবে তাঁর স্মৃতি কেন যেন আমি নষ্ট করতে পারি না—করবও না। মানুষটার মনটা ছিল সত্যিই সরল। তবে ভুল তো মানুষেরই হয়। এও যেন একটা ভুল, তবে তার মাশুল দিতে হচ্ছে একা আমাকে। সত্যিই বোধহয় লোকটা আমাকে ভালবাসত। মত্ত অবস্থায় একদিন তারই চরম দুঃখের প্রকাশ দেখা গিয়েছে—সুস্থ সামাজিক ভাবে যা তিনি দেখাতে পারেন নি বা তার সুযোগ পাননি।

বীণাপাণি সত্যিই কথা রেখেছিল। ওর এই তৃতীয় সন্তানের জন্ম হয়েছিল জেলখানাতেই। এরকম সন্তান গর্ভে ধারণ করে বীণাপাণির দেহ নিয়ে যাবেন—মনও নয়। সন্তান-জন্মের পর সে ঠিক সেই আগেকার আরও দুজনের মায়ের মত তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়েছে নিবিড় মমতায়। নিরাপদ তার স্বামী; স্বামীর কর্তব্য সে পালন করে না, পিতার দায়িত্ব সে নেয় না। তবু তারই সন্তান সহ্য করে গর্ভে ধারণ করতে হবে,—কেন? এই 'কেন'র কোন উত্তর পায় নি বীণাপাণি।

একবার এই ছেলেটিকে দেখতে চেয়েছিল নিরাপদ। কিন্তু বীণাপাণির আপত্তিতে তা সম্ভব হয় নি। সে বলেছিল, না বাবু ও মেরে ফেলবে। কোনমতেই ওর হাতে এ ছেলে আমি দেব না।

বীণাপাণির ৬' মাসের সাজা হয়ে যায় এই খুনের (?) কেসটায়। এখান থেকে তারপর সে চালান হয়ে যায় বড় জেলে।

বঙ্গাভিধান।—স্বস্তি সমস্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরদের বিজ্ঞাপন কারণ আমার এই নিবেদন। বঙ্গভূমিনিবাসি লোকের যে ভাষা সে হিন্দুস্থানীয় অন্য২ ভাষা হইতে উত্তমা যেহেতুক অন্য ভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অত্যল্প কিন্তু বঙ্গভাষাতে সংস্কৃত ভাষার প্রাচুর্য্য আছে বিবেচনা করিলে জানা যায় যে বঙ্গভাষাতে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দের চলন তথাপি ইদানীং ঐ সাধুভাষাতে অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইতেছে তথাপি বিজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা পূর্বক কেবল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষা লিখিতে ও তদ্দ্বারা কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিলে নির্বাহ করিতে পারেন এই প্রকার লিখন পঠন ধারা অনেক প্রধান২ স্থানে আছে। এবং ইহাও উচিত হয় যে সাধু লোক সাধুভাষাদ্বারাই সাধুত্ব প্রকাশ করেন অসাধুভাষা ব্যবহার করিয়া অসাধুর ন্যায় হাস্যাস্পদ না হয়েন। অতএব এই বঙ্গভূমীয় তাবৎ লোকের পদগণনা অথচ সর্বদা ব্যবহারে উচ্চার্য্যমান যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে সেই সকল শব্দ লিখনে ও পরস্পর কথোপকথনে শুদ্ধ নষ্ট হয় এবং জ্ঞানবাহিরেক সংস্কারাদিতে শীঘ্রই বিস্মিত লোকের মানসিক ক্ষোভ সদা জন্মে তদ্দ্বারা পরিহারার্থ বঙ্গভাষা সম্বন্ধীয় সংস্কৃত শব্দসকল সংকলনপূর্বক (বঙ্গাভিধান) নামক এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।...

এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্ঠবার্থ এক দিকে তত্তদর্থক ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষারও বিন্যাস করা গেল তাহাতে ইঙ্গলণ্ডভাষা ব্যবসায়ি লোকেরদের উভয় পক্ষেই মহোপকার সম্ভাবনা আছে...।

—জয়গোপাল তর্কালঙ্কার

বিশ্বে গতি ও প্রকৃতি

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

আমাদের পরিদৃশ্যমান বিশ্বে সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য উহার গতি। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, অর্থাৎ গোটা বিশ্বই গতিশীল। কেহই স্থির নয়। 'গচ্ছতি' ইতি জগৎ। খুবই ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতেছে, সূর্য্য-পরিক্রমণ কক্ষপথে ঘুরিতেছে সেকেণ্ডে ১৮ মাইল বেগে। উভয় গতিই সৃষ্টি করিতেছে আমাদের জন্য দিন ও বৎসর (আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি দ্বারা)। আবার সূর্য্য তাহার সকল গ্রহ ও উপগ্রহ সমেত সেকেণ্ডে প্রায় ১৭৫ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে মহাকাশের কোন্ গন্তব্যপথে, কে তাহার সন্ধান রাখে। শুধু কি আমাদের সূর্য্যই ছুটিয়া চলিয়াছে? তাহা নয়, মহাকাশের অধিকাংশ নক্ষত্রই সূর্য্যের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে; কোন কোনটি সেকেণ্ডে ৭০০ কিংবা ৮০০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে! কোথায় চলিয়াছে কে তাহার সংবাদ দিবে? এইরূপ সদা পরিক্রমণশীল সৌর পরিবারে ও বিশ্বে অবস্থানহেতু মনুষ্য, পশু পক্ষী কীট-পতঙ্গ-অধ্যুষিত আমাদের পৃথিবীর প্রাণিগণ সদা চঞ্চল ও অস্থির চিত্ত অর্থাৎ গতিশীল। গতি যে আমাদের নিকট কত প্রিয়, আমাদের "সহজাত প্রবৃত্তিই" সেই পরিচয় দেয়। শিশুরা গতিশীল উড়ো জাহাজ, রেলগাড়ী ও ষ্টীমার দর্শনে আনন্দে নৃত্য করে, বয়স্ক ও বৃদ্ধরা মনে আনন্দ উপভোগ করে। কারণস্বরূপ বলা চলে—আমাদের সহজাত ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই গতির প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট। শুধু কি গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্রই গতিশীল; গ্রহের অন্তর্গত বায়ু, মেঘ ও জল গতিশীল এবং এক বিরাট গতির আবর্ত্তে ক্রীড়া করে। নদী সমুদ্রে, মহাসমুদ্রে পতিত হয়; কিন্তু সেখানেই তার সমাপ্ত নয়। সেই সমুদ্র ও মহাসমুদ্রের জলরাশি সূর্য্যকিরণ দ্বারা বাষ্পে পরিণত হয়। সেই বাষ্প বাতাসের আন্দোলনে উচ্চ পাহাড়-পর্ব্বতাদি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মেঘ-বাষ্পের সৃষ্টি করে, জলের সৃষ্টি করে। এইরূপে গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত বায়ু, মেঘ ও জল এক সুষ্ঠু গতির আবর্ত্তে আবর্ত্তিত। বাহ্যিক জগতে প্রাণী ও উদ্ভিদ ঐ একই গতির বশবর্ত্তী; পার্থক্য শুধু সময় ও সময়ের পরিমাপে। উদ্ভিদের বীজ হইতে ফুলে পরিণতি, ফুল হইতে ফলে পরিণতি একই গতির আবর্ত্তে ক্রীড়া করে; প্রাণিগণ শৈশব হইতে বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়। তারপর আসে মৃত্যু। কিন্তু সেখানেই তাহার গতির শেষ নয়। নদী ও মেঘের ঘূর্ণায়মান আবর্ত্তের ন্যায় প্রাণী আবার ফিরিয়া আসে—এই পৃথিবীতে নবকলেবরে, নবরূপায়ণে। আধ্যাত্মিকরা তাহার কারণ নির্ণয় করিয়াছেন 'মায়া' বা 'মোহ'। বৈজ্ঞানিকরা যেমন বলিয়াছেন "Matter is indestructible"—পদার্থের বিনাশ নাই অর্থাৎ রূপান্তর পরিগ্রহই উহার (পদার্থের) ধর্ম্ম। ঠিক অনুরূপভাবে বলা চলে 'Energy is never lost'—শক্তির বিনাশ নাই।' প্রাণিগণের দেহের অতীত অর্থাৎ দেহাতীত যে এক পরম বস্তু আছে, সেই 'মহাশক্তির'ও বিনাশ নাই। দেহের বিনাশ আছে; কিন্তু দেহের অন্তর্ভুক্ত সেই পরম শক্তিটির বিনাশ নাই। নিদ্রিত অবস্থায় প্রাণী অজ্ঞান, মৃত অবস্থায় প্রাণী সম্পূর্ণ অজ্ঞান। অতএব দেহ কেবল সেই মহাশক্তিটির ক্রীড়নক মাত্র। সেই মহাশক্তি যন্ত্রীরূপে সমগ্র দেহযন্ত্রকে চালনা করে। সেই শক্তি, সূক্ষ্ম রূপেই হউক কিংবা সূক্ষ্ম বাষ্পরূপেই হউক, আবার নবরূপায়ণে, নবকলেবরে ফিরিয়া আসে,—কারণ তাহার মায়া কিংবা মোহ যাহাই হউক না কেন। মেঘের বৈচিত্র্য, বায়ুর বৈচিত্র্য, আলোর বৈচিত্র্য বিভিন্ন ঋতুতে প্রাণিকুলের জীবনে বৈচিত্র্য আনয়ন করে। বৈচিত্র্যই জীবনের উপভোগ্য। বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা আমাদের রক্ত-মাংসে মজ্জাগত; জন্ম হইতেই আমরা সদা পরিবর্ত্তনশীল জগতের উপযুক্ত প্রবৃত্তি ও রুচিসম্পন্ন। আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ আচার, রীতি-নীতি, এমন কি ধর্ম্মানুষ্ঠানেও আমরা নূতনত্ব খুঁজিয়া বেড়াই। এখানে একটি চমকপ্রদ গল্প বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ফরাসী দেশে এক সুন্দরী তরুণী সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া ছুটিয়া যাইতেছিল। তাহাকে ছুটিয়া যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিয়াছিল, "আমার সাজ-পোষাক হয়তো পুরানো ও সেকেলে ধরণের হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিকতম নবীন পোষাক আমার প্রয়োজন। তজ্জন্যই আমি আধুনিকতম নবীন পোষাকে সজ্জিত হইতে যাইতেছি।" সুন্দরী তরুণীর এইরূপ উক্তি হাস্যকর মনে হইলেও পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বে নূতনত্বের আহ্বানে আমাদের প্রাণে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত করে। নূতন যত অবাস্তব, অসত্য ও অপ্রয়োজনীয় হউক না কেন, তাহাকে আমরা সাদরে আহ্বান জানাই। নূতন গান, নূতন ছন্দ নূতন নৃত্য, নূতন অভিনয়, নূতন পোষাক পুরাতন অপেক্ষা অসুন্দর হোক, অপ্রয়োজনীয় হোক, আমাদের বিচারবুদ্ধিকে বহুলাংশে বিমূঢ় করিয়া দেয়—নূতনের আহ্বানে। মহাকালের সত্যও নূতনের আহ্বানে বিনাশপ্রাপ্ত না হইলেও প্রাণীর নিকট অবাঞ্ছনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জীর্ণ বস্ত্রের মতই ধূলি-ধূসরিত অবজ্ঞাত অবস্থায় বিরাজমান থাকে। যুগধর্ম্মের প্রচণ্ড আলোড়নে ও আঘাতে শাশ্বত সত্যও প্রচুর উপেক্ষিত হইয়াছে, ইতিহাসে এরূপ নজীরের অভাব নাই। শাশ্বত সত্য (অর্থাৎ সুষ্ঠু ধর্ম্মজ্ঞান, সুষ্ঠু নীতিবোধ ও মনুষ্যত্ব) হইতে বিচ্যুতির ফলস্বরূপ হয়ত সেই সব জাতির অধঃপতনও ঘটিয়াছে। তথাপি মানুষের "সহজাত ও স্বাভাবিক" প্রবৃত্তি পুরাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সন্তুষ্ট থাকে না এবং সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। নাট্যকারেরা নাটকে যে বিভিন্ন রসের সমাবেশ করিয়া থাকেন, তাহার কারণও ঐ একই। একই বীরত্ব-ব্যঞ্জক কিংবা করুণ রস শ্রোতার নিকট অধৈর্য্য, অসাড়তা ও তিক্ততা আনয়ন করে। অতএব নাট্যকার অপ্রাসঙ্গিক ও মিথ্যা হইলেও তাঁহার নাটকে হাস্য ও বীভৎস রসের অবতারণা করিয়া থাকেন। অবসর-বিনোদনের সময়ই মানুষের অন্তর্নিহিত স্বরূপ বিশেষভাবে প্রকট হয়; অতএব তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ হয় অবসর বিনোদন প্রসঙ্গে, কঠিন বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে নহে। প্রগতি মানেই উন্নতি নহে। যদি সেই প্রগতি নিত্য সত্যের অবমাননা করে, তবে সেইরূপ প্রগতি অধোগতিরই কারণ হয়। গতি শুধু প্রাণী ও উদ্ভিদেই সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর গতিরও পরিবর্ত্তিত রূপই আমরা আজ দেখি। পৃথিবীর আজ যে গতি, সেই গতিই চিরকাল ছিল না। পৃথিবীর

পুরু স্তর আজ প্রায় দুই হাজার মাইল (বৈজ্ঞানিকদের অনুমান অনুযায়ী)। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় উহা দুই হাজার মাইল ছিল না। সর্বপ্রথমে এই স্তর মাত্র কয়েক ফুট উষ্ণ বাষ্প-মেঘখণ্ডবৎ ছিল। তাহার পর পৃথিবীর স্তর যখন কেবলমাত্র ৬০, ৭০ কিংবা ১০০ মাইলে সামাবদ্ধ ছিল, তখন পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর আবর্তনে ২৪ ঘণ্টা ব্যয়িত হইত না। কেবলমাত্র ৫ ঘণ্টা কিংবা ৬ ঘণ্টায় পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর আবর্তনে সমর্থ ছিল। অর্থাৎ কেবলমাত্র ৫ কিংবা ৬ ঘণ্টায় দিন ও রাত্রি সম্পন্ন হইত। আমাদের সৌর পরিবারের অন্যান্য গ্রহগুলি আজ যেরূপ প্রাণিগণের প্রতিকূল গ্যাসীয় অবস্থায় বিরাজমান, ভবিষ্যতে উহাদের বহুলাংশে রূপান্তর ঘটিবে (যেমন পৃথিবীর ঘটিয়াছে) ও গতিরও বহুলাংশ পরিবর্তন ঘটিবে। ঐ সব গ্রহের বর্তমান রূপই শেষ ও প্রকৃত ছবি নয়; যেমন কামারশালে কিংবা কুমারশালে অর্দ্ধসমাপ্ত হাঁড়ি-কুড়ি কিংবা তপ্ত কাস্তে, তপ্ত লৌহখণ্ডই ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় বস্তু নয়। ঐ সব গ্রহের রূপান্তর ঘটিবে বহুলাংশে জীব-সৃষ্টি পর্বে পৌঁছিবার পূর্বে। আজিকার ইউরেনাস, নেপচুন, শনি ও বৃহস্পতির মৃত্তিকাস্তর যত পুরু, তদপেক্ষা অন্ততঃ দ্বিগুণ কিংবা তিনগুণ স্তরবিশিষ্ট কলেবর ধারণ করিবে উক্ত গ্রহসমূহ প্রতিকূল গ্যাসীয় পর্বের সমাপ্তিতে অর্থাৎ জীবসৃষ্টি পর্বে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, বৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতি আজ কেবলমাত্র ১০ ঘণ্টায় স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর আবর্তনে সমর্থ, সেই বৃহস্পতি ভবিষ্যতে মৃত্তিকাস্তর পুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১০ ঘণ্টায় আবর্তনে অসমর্থ হইবে। অধিকতর মৃত্তিকাস্তর প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর আবর্তনে সময় ব্যয়িত হইবে হয়ত ২০ ঘণ্টা কিংবা অনুরূপ সময়। অতএব বৃহস্পতির গতিরও রূপান্তর ঘটিবে। অন্যদিকে এই সৌর পরিবারেই মঙ্গল গ্রহ আজ মৃত কিংবা অর্দ্ধমৃত। মঙ্গলের পাহাড়-পর্বতাদি আজ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সমতলভূমিতে পরিণত, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের ঘন পর্দা (প্রায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ন্যায় বায়বীয় পর্দা ছিল) আজ নিঃশেষিত, বৃক্ষাদিও প্রায় নিঃশেষিত, সর্বোপরি মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ আজ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গ্রহের অতি নিকটবর্তী হইয়া ঘুরিতেছে অদূর ভবিষ্যতে গ্রহের ক্রোড়ে বিলীন হওয়ার জন্য। মঙ্গলের উপগ্রহদ্বয়ের আজ যে কলেবর ও ঘূর্ণনের গতি, সেই কলেবর ও গতি উহাদের ছিল না। আজিকার তুলনায় উহারা বৃহত্তর কলেবরে বৃহত্তর দূরত্বে গ্রহ পরিক্রমায় নিযুক্ত ছিল। উপগ্রহদ্বয়ের গতি ও কলেবরের হইয়াছে বিরাট পরিবর্তন।

গ্রহের ভর ও উপগ্রহ গ্রহের অধিবাসীদের চরিত্র গঠনে বিশেষ সহায়ক। উপগ্রহ শুধু নদী কিংবা সমুদ্রের জোয়ার-ভাটাতেই সাহায্য করে না, প্রাণীদের চরিত্রের উপরও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, ৯টি উপগ্রহসমেত হাল্কা শনিগ্রহের অধিবাসীর কখনই কথায় ও কাজে এক হইবে না। তাহারা হইবে মিথ্যাবাদী, অথচ কর্মক্ষম, অস্থিরচিত্ত ও অসাধু; কিন্তু পৃথিবীর অধিবাসী অপেক্ষা অধিক কাব্যরসাত্মক, দার্শনিক ও ভাবপ্রবণ। গভীর চিন্তা ও গভীর ধ্যান-ধারণা শনির ভবিষ্যৎ অধিবাসীদের নিকট হইতে আশা করা যায় না। ১২টি উপগ্রহসমেত ভারী বৃহস্পতি গ্রহের অধিবাসীদের মধ্যে মিথ্যাবাদী, চোর ও জুয়াচোরের যেরূপ অভাব হইবে না, অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিকতাবাদী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও যোগীপুরুষের কিছুমাত্র অভাব হইবে না। তাহারা হইবে স্বভাবকবি ও সাহিত্যিক। গভীর চিন্তা ও গভীরতম জ্ঞান সৌর পরিবারে ভবিষ্যৎ বৃহস্পতির অধিবাসীদের মধ্যে আশা করা যায়। মঙ্গলগ্রহ আজ মৃত কিংবা অর্দ্ধমৃত অর্থাৎ উক্ত গ্রহে আজ আর মনুষ্য, পশুপক্ষী নাই। অতি নিম্নস্তরের প্রাণী থাকা অসম্ভব নয়, যেমন শামুক, সর্প ও টিকটিকি ইত্যাদি। উক্ত গ্রহের অধিবাসীরা কিরূপ ছিল? ক্ষুদ্র গ্রহ মঙ্গলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির স্বল্পতা-হেতু এবং চন্দ্রের অস্তিত্বহেতু পৃথিবীর অধিবাসীদের চেয়ে অধিকতর কর্মক্ষম, চালাক ও চতুর ছিল অর্থাৎ বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও কাব্যে পৃথিবীর অধিবাসীদের চেয়ে উন্নততর ছিল—এরূপ আশা করা যায়। তারপর আমাদের প্রিয় পৃথিবী। এক সূর্য্য ও এক চন্দ্রের অধীনে আমাদের পৃথিবীর অধিবাসীদের হওয়া উচিত সাধু অর্থাৎ কথায় ও কাজে এক। মুখে এক কথা ও কার্য্যে ঠিক তাহার বিপরীত এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু পৃথিবীর অধিবাসীদের স্বভাব আজ বহুলাংশে বিপরীত। ইহার কারণ অত্যধিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রচণ্ড চাপ এবং যে রক্ত একবার অশুদ্ধ হয় সেই রক্তকে বিশুদ্ধ করা কঠিন। পৃথিবীর অধিবাসীদের বর্তমান চেহারাই চিরকাল ছিল না। অতীতে পৃথিবীর অধিবাসী নিশ্চয়ই সাধু ও সজ্জন ছিল; যেমন মাত্র দু'হাজার বৎসর পূর্বে মেগাস্থেনিস-বর্ণিত ভারতের অধিবাসীরা অতিশয় সাধু ও সজ্জন ছিল।

তারপর শুক্রগ্রহ। উক্ত গ্রহটি কোন উপগ্রহের অধিকারী না হওয়ায় এবং সূর্য্যের অতি নিকটে অবস্থানহেতু উক্ত গ্রহের অধিবাসীরা হইবে সবল, সুস্থ, সাধু ও সরল। কপটতা ও অসাধুতা দীর্ঘদিন শুক্র অধিবাসীর নিকট অজ্ঞাত থাকিবে। সর্বাপেক্ষা কৌতুকপ্রদ ব্যাপার হইবে, ভগবান কিংবা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অদ্ভুত ও উদ্ভট জ্ঞান পোষণ করিবে। পৃথিবীর অধিবাসীর ন্যায় উহারা কোনকালেই কাব্য, দর্শন, সাহিত্য ও বিশেষতঃ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতিলাভে সমর্থ হইবে না।

মহাকাশে কত গ্রহ-উপগ্রহ, এমন কি সৌর পরিবারের নবজন্মলাভ হইতেছে ও ধ্বংস হইতেছে, কে তাহার খবর রাখে! মাঝে মাঝে উল্কাপিণ্ড মহাকাশের কোন শ্মশানের ছাইগাদা উড়াইয়া আনিয়া কত গ্রহ ও উপগ্রহের নশ্বরতার সংবাদ আনিয়া দেয়। মহাকাশ মহাসমুদ্রের ন্যায় কত নূতন নূতন দ্বীপের জন্ম দিতেছে ও ধ্বংস করিতেছে যাহা আমাদের বৈজ্ঞানিকদের নিকট আজও অজ্ঞাত। মহাকাল কিন্তু গতির আবেগে সঠিক পথেই ছুটিয়া চলিয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত অজ্ঞ তিন বৎসরের শিশুর মতই কোন অজ্ঞান মানুষ যদি বলে "যেতে নাহি দিব" তবে সেই বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বব্যাপী সেই গতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই সামিল। উহা যেরূপ হাস্যকর ও অগ্রাহ্য, বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বব্যাপী এই গতি তদ্রূপ সত্য, অমোঘ ও অনিবার্য্য। ইহাই সর্বাপেক্ষা সত্য যে আমাদের পৃথিবী এই গতিশীল বিশ্বে কেবলমাত্র একটি তরঙ্গ বিশেষ এবং মহাসমুদ্রে অনন্তকোটি তরঙ্গের মধ্যে একটিমাত্র তরঙ্গ কোথা হইতে উত্থিত হইয়া ঠিক অন্যান্য তরঙ্গের ন্যায় একই সত্য, সুন্দর, অমোঘ ও অনিবার্য্য নীতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে তীর অভিমুখে প্রশান্তির ক্রোড়ে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অবিনাশ সাহা

৬

রাখালের নির্দেশ মতো বিপিন জেলে ডিঙি নিয়ে রওনা হয়। শুধু ডিঙি নয়। সঙ্গে সাত দিনের খোরাকি চাল, ডাল, তেল, নুন, কেরোসিন। এ ছাড়া হাতখরচের জন্যেও নগদ পাঁচ টাকা। সকাল আটটার পরিবর্তে বিপিন ছ'টার মধ্যেই খালে এসে পৌঁছে। রহিমা তখন ঘাটে কাজ করছিল। কচি বাচ্চাগুলোর জন্য দুটি পান্তে-ভাত ফুটিয়ে নিয়েছে। সকলেই ওরা কলার পাতায় খাবে। কেউ এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। হাঁড়ি, পাতিল, সানকী কটা মেজে নেবার এই অপূর্ব সুযোগ। ঘাটে বসে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারই করছিল রহিমা, বিপিন এসে ডিঙি বাঁধে। গেতুর ঘুম ভেঙেছে কিনা খবর নেয়। রাখালের দেওয়া চাল, ডাল, তেল, নুনের কথা বলে। কোন কিছুর কথাও বাদ যায় না।

সংবাদ শুনে রহিমা হতবাক। ভেবে পায় না, সহসা জমিদারের এত দয়া কেন? ওর স্পষ্ট মনে আছে, সেবার যখন মেনির বাবা জেলে গেলো—জমিদারের হয়ে লড়তে গিয়েই তিন বছর সাজা পেলো—তখন কেউ ফিরেও তাকায়নি ওদের দিকে। বাচ্চাগুলোর জন্য এক মুঠো চাল চেয়ে পর্যন্ত পায়নি। জমিদারের লোক উল্টো শাসিয়েছে। আজ হঠাৎ ওরা এমন দানবীর হয়ে উঠলো কেমন করে! এ কি সত্যি পুরোনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত, না ছলনা!…হাঁড়িটা খল্ খল্ করে ধুতে ধুতে ভাবতে থাকে রহিমা। সহসা বিপিনের প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পায় না।

বিপিন সেদিকে লক্ষ্য করে আপন মনেই গদ গদ হয়। সরস কণ্ঠেই উচ্ছাস জানায়, কিগ নানি, আমারে আবার সরম লাগে নাকি? তড়াতড়ি চাচারে পাঠাইয়া দেও। রৈদ বাড়লে খোলা ডিঙিতে পোলাপানের কষ্ট হইবনে। আর এই টেকা পাঁচটা তোমার কাছে রাখ। চাচার হাতে পড়লে তো জান চদরি অর্ধেক কাইড়া নিইবনে।—বলতে বলতে টাকা পাঁচটা রহিমার হাতে দিয়ে হাসতে থাকে বিপিন।

ওর সে হাসির দমক রহিমার ঠোঁটেও লাগে। দুর্ভাবনার জড়তা কাটিয়ে রহিমা ভাবে, না না, এতে কোন সন্দেহের কারণ নেই। মেনির বাবা একদিন নিজের জান কবুল করে জমিদারবাবুর জান বাঁচিয়েছিল। এ তারই ইনাম। এমন তো হয়েই থাকে। মানুষের তকদিরের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। জমিদার মহাজনের এ রকম খেয়াল-খুশির কথা ও নিজেই অনেক জানে। এখানে মেনির বাবার ঋণ শোধই ওদের আসল উদ্দেশ্য। তাছাড়া ভাবনার কি থাকতে পারে? জমিদার তাঁর নিজের দখল করা জমি ওদের দিচ্ছেন। দিচ্ছেন সাফ কবলা করে। কারো সঙ্গে কোন রকম ঝগড়ার কারণ নেই। না না, এ খোদাতালার অসীম অনুগ্রহ। তাঁর দয়াতেই জমিদারের এমন সুমতি হয়েছে। এ ব্যাপারে দূরে থাকলে ঠকতেই হবে। মুহূর্তে চাঙা হয়ে ওঠে রহিমা। হাত বাড়িয়ে বিপিনের কাছ থেকে টাকা পাঁচটা নেয়। নিতে নিতে মন্তব্য করে, যা কইচ মোড়লের পো। তার হাতে টেকা গেলে গেঁজা খাইয়াই উড়াইয়া দিব। তুমি ডিঙিতেই বহ। আমি তারে পাঠাইয়া দেই। টেকার কথা যেন কিছু কইয় না তারে।…বলতে বলতে টাকা পাঁচটা আঁচলে বেঁধে হাঁড়ি-পাতিলগুলো পাঁজা করে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয় রহিমা।

ওপারের হিজল গাছের ফাঁক দিয়ে খালের জলে তখন প্রথম অরুণরাগ বিকীর্ণ। সে রাগে রহিমাকে খুব উজ্জ্বল দেখায়। ভাগ্যের নব সূর্যই যেন আজ ওর ললাটে উদিত।

সকাল আটটার মধ্যেই ওরা সকলে ডিঙিতে ওঠে। বাচ্চারা খেয়েও কিছুটা ভাত উদ্বৃত্ত হয়। শুধু একটু নুন আর মাড় জড়ানো দুটো ভাত। পরমানন্দে খেয়েছে খুদে রাক্ষসগুলো। অবশিষ্ট সব ক'টিই গেতুকে বেড়ে দেয় রহিমা। হিসেব মতো এতে ওর পেটের এক কোনাও ভরবার কথা নয়। তবুও তা থেকে অর্ধেকের মতো রহিমার জন্য রেখে এক ঘটি জল খেয়ে উঠে পড়ে। রহিমাও এ নিয়ে আজ আর কোন কথা বাড়ায় না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ডিঙিতে উঠতে যায়। গলুইতে তিনবার জল দিয়ে ডিঙির ওপর পা দিতেই কেমন যেন অবসাদ বোধ করে। বুকের ভেতরটা সহসা মোচড়াতে থাকে। পা পুনরায় জলে নামিয়ে পেছন ফিরে তাকায়। নজর পড়ে ফেলে আসা আস্তানাটার ওপর। ঘর-দোর কিছুই নেই। আমগাছের তলায় পড়ে আছে শূন্য ভিটিটা। গা কয়েক বাঁশের পচা খুঁটিমাত্র দাঁড়িয়ে। আর আছে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো জীর্ণ কয়েকটা পাট কাটির বেড়া। শুধু ডিঙিতে জায়গা হচ্ছে না বলেই ফেলে যেতে হচ্ছে ওগুলোকে। কিন্তু নিয়ে যেতে পারলে ক'দিনের জ্বালানির কাজ চলতো। না না, সামান্য কুটো ক'গাছার ভাবনাই এখন ও ভাবছে না; ওর মনে পড়ছে, ওদের দু'জনের মিলিত-

জীবনের কথা। বিয়ের পর ঐ আস্তানাটাতেই ও মেনির বাবার হাত ধরে উঠেছিল। ওখানেই ও এতগুলো সন্তানের জন্ম দিয়েছে। একটাকে আবার রেখেও যাচ্ছে বড় ঐ হিজল গাছটার তলায়। শক্রর বয়স সাত বছর হয়েছিল।···রহিমার দু'চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

গেছুর কোন রকম ভ্রুক্ষেপ নেই। বিপিনের সঙ্গে বসে দিব্যি তামাক টানছিল। রহিমাকে বিচলিত দেখে তাগাদা দেয়, কৈগ মেনির মা, বলি খামাকা খাড়ইয়া রইলা কেন্। তড়াতড়ি ওঠ।

রহিমা আর দাঁড়ায় না। সজল চোখেই ডিঙিতে উঠে বসে। দুপুর গড়াবার আগেই এসে পৌঁছে চর দ্বলায়—নবীর ভিটেয়।

পুব পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারদিক জুড়ে ঢিপির মতো উঁচু ভিটি। তিন দিকই শূন্য। ঘর-দোরের চিহ্ন নেই। শুধু পুবদিকের ভিটিতে খাড়া রয়েছে ঢেউ টিনের বড় ঘরখানি। টিনের চাল, টিনের বেড়া। মেঝেটা জায়গায় জায়গায় ধ্বসে গেছে। কিন্তু সে এমন কিছু নয়।···দুদিন হাত লাগালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। গাছতলার বদলে এ তো রাজপ্রাসাদ পেলো ওরা।···রহিমা খুব খুশী হয়। খুশী হয় বাচ্চাদের কথা ভেবে। বাড়িতে এত জায়গা যে তিনদিকের ভিটিতে ঘর তুলে নিলে কোনদিন ভাগতে হবে না। ওরা ভাইয়ে ভাইয়ে এক সঙ্গে থাকতে পারবে। কি সুন্দর ব্যবস্থা। চারদিক জুড়ে ঘর, মাঝখানে উঠোন। ধলেশ্বরীর জল যদি কখনো তীর ছাপিয়ে ওঠে তবু ঘরে জল ঢুকবে না। আবার মাচা বেঁধে নিলে সহজেই এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়া যাবে উঠোনের সুবিধেটাই সব চেয়ে বেশী। খামারের কাজ, জিনিসপত্র রোদে দেওয়ার কাজ খুবই চমৎকার ভাবে করা যাবে। মাথা গুজবার ঠাঁই মিললো, এখন চাই আবাদী জমি। তা না হলে এ পোড়া পেটের জ্বালা দূর হবে না। ভাগ্যে থাকলে একদিন হয়তো সবই হবে। কিন্তু এখন বাড়িতে যা জায়গা রয়েছে তাতেই ফলমূল তরিতরকারী লাগানো যেতে পারে। পয়সা তাতেও কম পাওয়া যায় না। আর সে পয়সা যদি মেনির বাবার হাতে না দিয়ে নিজে জমাতে পারি তা হলে দু'পাঁচ বছরের মধ্যেই কিছু জমি গস্ত করা সম্ভব। তারপর বাছারা বড় হলে মা লক্ষ্মীর গোলা আপনা থেকেই কেঁপে উঠবে।···রহিমা আর ভাবতে পারে না। আনন্দে বুক ফুলে ওঠে।

সবই ভাল হলো, শুধু ভয় ধলেশ্বরীকে। নদী তো নয়, যেন কালনাগিনীই অষ্টপ্রহর ফণা তুলে নাচছে। কে জানে কখন না গোটা বাড়িটাই গিলে বসে রাক্ষুসী। তার চেয়েও ভয় বাচ্চাগুলোকে নিয়ে। কেউ পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যাবে রাজার খাল এদিক থেকে ভাল ছিল। জলের কাজ মিটতো, অথচ তেমন কোন ভয়-ভাবনা ছিল না।

ধলেশ্বরী ছাড়া আর এক ভয়ও আছে—সাপের ভয়। ভিটির চারদিক জুড়ে যে গর্ত দেখা যাচ্ছে, ও তো সাপেরই গর্ত। বিষধর সাপ কিনা কে জানে। সকলের আগে ওগুলোকে বুজিয়ে ফেলাই বুদ্ধির কাজ। তারপর ঘরের মেঝেতে উঁচু করে একটা মাচা বেঁধে নিতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। সকলে মিলে ওপরে শোয়া যায়। মেনির বাবাকে বললে এক্ষুণি হয়তো কুড়োল কাঁধে বাঁশ কাটতে ছুটবে। কিন্তু এখানে কারো ওপর জোর-জুলুম ভাল দেখাবে না। বরং জমিদারের লোক হয়ে ওরা এখানে এসেছে। ওদের ইজ্জতেই তাঁর ইজ্জত। ও সাপ আর পাড়াপড়শীদের কোন জায়গায় না আছে? একটু সাবধানে থাকলেই হলো।···রহিমা সব ভাবনা কাটিয়ে সুখের স্বপ্নই দেখে। ওর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছুও তাই দেখে। হিসেব মতো বাঁশ কাটতেই বেরুতে চায় ও, কিন্তু রহিমা বাধা দেয়। সাবধান করে, বাঁশের চেয়ে ইজ্জত বড়। এতদিন যা করেছ—করেছ. এখন আর চুরি-ডাকাতি করতে পারবে না।

রহিমার কথায় গেছু হেসে কুটি কুটি হয়। হাসতে হাসতেই মন্তব্য করে, তুই ত দেখছি দুইদিনেই বেগম বাদশা বইনা গেলি মেনির মা।

হেসে রহিমাও এক খিলি পান মুখে দেয়। তারপর এক ঢোক রস গিলে নিয়ে পাল্টা উত্তর করে, তুমি আগে বাদশা হও, তবে তো আমি বেগম হমু।

তুই কচ্ কি মেনির মা; গেছু সেক্ হইব বাদশা!

বাদশা না হইবার পার একজন ভাল মানুষ ত হইবার পার। জায়গা-জমি পাইলা—চুরি ডাকাতি ছাইড়া এখন কামে লাগ।

হ দেখি, খোদায় কি করায়।

খোদায় ভালই করাইব। তার আগে তুমি গেঁজাডা ছাইড়া দেও।

অন্যদিন হলে এ কথায় গেছু তিড়িং করে উঠতো। কিন্তু আজ আর রাগে না। বেশ নরম সুরেই বলে, হ, কতদিনই ত ভাবি ও জিনিস আর জিব্বায় ঠেকামু না—আল্লার কসম। কিন্তু পারি কই? গঞ্জে গেলেই ত জান্ হদরির দোকান আমারে টাইনা নেয়।

তুমি হা পয়সা দিয়া আগে ভাগে মিঠাই কিনা খাইয়। তাই আর—

আরে ধুত্ তর মিঠাইর খেতাপুড়ি! তর ছাওয়ালগ পেট্ ভইরা ভাত খাওয়াইবার পারি না, আমি খামু মিঠাই!

তবে গেঁজা যখন কিন তখন ই কথা ভাব না কেন?

ঐ শোন কথা! তর তাইলে কইলাম কি এতক্ষণ! গেঁজা কি আর আমি কিনি—আমারে দিয়া কিনাইয়া ছাড়ে

তয় আস্তে আস্তে ছাইড়া দেও।

হ, ইডা তুই ভালই কইচ্চ। তয় দে দেখি আষ্ট আনা পয়সা।

পয়সা আমি কুথায় পামু?

পাবি—আমি জানি তর কাছে পাঁচটা টেকা আছে। বিপিন আমারে সবই কইছে।

না, ও টেকা খরচ করা যাইব না।

খর কথা কলি ত। তাতের পয়সাও দিবি না, আবার আমি বাঁশ কাটবারও পামু না। তয় করুম্ কি ক?

আইচ্ছা চাইর আনা দিতেছি—তার বেশী একটা কড়িও পাইবা না।

মুটে চাইর আনা! এক্কেবারেই অর্ধেক কইরা ফেললি! পেট্ জ্বলবনে যে!

যা দিতেছি তাই নেও তো নেও। নইলে—

আইচ্ছা, তবে তাই দে।

রহিমা আর কথা বাড়ায় না। উঠে গিয়ে বহু কষ্টে জমানো নিজের গাঁট থেকে চার আনা পয়সা এনে দেয়। রাখালের দেওয়া টাকায় হাত ছোঁয়ায় না।

গেছু পয়সা চার আনা হাতে পেয়ে গদগদ। আজ শনিবার—

গঞ্জের হাটবার। নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালে হাটুরে নৌকো একটা পাওয়া যাবেই। নয়তো গাঁটের টাকা খরচ করে খেয়া পার হতে হবে।···ব্যস্ত ভাবেই উঠে দাঁড়ায় গেন্থ।

রহিমা বাধা দেয়। আরো চার আনা পয়সা হাতে দিয়ে বলে, পোলাপানগ লেইগা তুই আনার জিলাপী আইনো। বাকী দুই আনা দিয়া পান সুপারি ও কাপড় কাচা সোডা।

সোডা দিয়া আবার কি করবি?—বিস্ময়ের সঙ্গে গেন্থ প্রশ্ন করে।

হেসে রহিমা বলে, তোমার ত আর ঘর-দরজার দিকে মন নাই যে দেখতে পাইবা। পোলাপানগ কাপড়-গামছার কি হাল হইচে চাইয়া দেখচ?

গেন্থ এবার আরো জোরে হেসে ওঠে, তুইত দেখচি দুই দিনেই ভদ্দরলোক হইবার চাস মেনির মা! দে তয়।

দেইখ, ই পয়সা দিয়াও যেন গেঁজা কিনা খাইয় না।

তুই কচ কি! গেন্থ সেকের তুই বেইমান ভাবলি!

হাসতে হাসতে রহিমা বলে, এলা যাও ত। তোমার জ্ঞান চন্দ্রির দোকান বন্দ হইয়া যাইবনে।

তোবা তোবা। তবে আর তর লগে কোন কথা নাই।—উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দেয় গেন্থ।

রহিমা ওর পথের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর জল আনতে পা বাড়ায় ঘাটের দিকে। যেতে যেতে ভাবে, মেনির বাবা আর যাই হোক কোন রকম ছলকলার ধার ধারে না। এবার ওদের সংসারের শ্রী ফিরবেই। খোদা হাত ধরেই ওদের সে রাস্তায় নিয়ে এলেন।

৭

সামনের মাসে পার্থর অন্নপ্রাশন। আর দু'চার মাস সময় পেলে মতির পক্ষে সব দিক গুছিয়ে নেবার সুবিধে হতো। কিন্তু এখন আর তার কোন উপায় নেই। গোঁসাই ঠাকরুণ আর মা দুজনেই তাড়া দিচ্ছেন। মহামায়াও কম উতলা নয়। পার্থ এখন আর আগের মতো চুপচাপ শুয়ে থাকে না। নিজে-নিজেই উপুড় হয়। হামা দিতেও হয়ত আর দেরী নেই। কিন্তু ওর দাঁত বেরিয়ে পড়লে যে সবই পণ্ড হবে। কেন-না, শাস্ত্রমতে দাঁত বেরুবার আগেই অন্নপ্রাশন হওয়া উচিত।

পার্থর অন্নপ্রাশন—আত্মীয়স্বজন সকলকেই আনতে হবে। মহামায়া কাউকে বাদ দিতে পারবে না। পার্থর জন্ম সকলের শুভাশিসই ওর দরকার। আবার শুধু আত্মীয়স্বজন আনলেই চলবে না। গ্রামের সকলকেও নিমন্ত্রণ করতে হবে। অষ্টপ্রহর মহোৎসব হবে পার্থর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে। সেই মহাপ্রসাদই পরিবেশিত হবে সকলের পাত জুড়ে। গোঁসাই ঠাকরুণ এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। আবার মার নির্দেশ, পার্থকে সব নতুন গয়না গড়িয়ে দিতে হবে। অনন্ত, বালা, হার, তোড়া, মল। শুধু পায়ের মলই হবে রূপোর, বাকী সব সোনার।

সকলের সঙ্গে মতির নিজের সখ-আহ্লাদও কম নয়। এরই মধ্যে কেমন নাড়ুগোপালের মতো হয়ে উঠেছে পার্থ। মাথা-ভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। সুঠাম হাত-পায়ের গড়ন। সদা হাসি-খুশী। এক মুহূর্তের জন্যেও কেউ ওর কান্না শুনতে পায় না। যতক্ষণ জেগে থাকে, দিব্যি মনের আনন্দে খেলে। মায়াভরা চোখে সকলকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু শুয়ে ও আর কতক্ষণই বা থাকে। ওকে কোলে করবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। পাড়া-পড়শীরাও ঘুরে-ফিরে এসে হাত বাড়ায়।

মতিরও ইচ্ছে, পার্থর অন্নপ্রাশন খুব ঘটা করে দেয়। এ কোন অনুরোধ-উপরোধের ব্যাপার নয়। ওর নিজের প্রাণের তাগিদেই ও সঙ্কল্প করে। কোন রকম অসুবিধাও হতো না, যদি না লগ্নি টাকা অনাদায় থাকতো। উৎসব অনুষ্ঠান তো দূরের কথা, মান ইজ্জত রেখে সংসার চালানোই এখন মুস্কিল। মাইনের টাকা ছাড়া আর কোন সম্বল এখন নেই। কিন্তু খরচ দিন-দিনই বেড়ে চলেছে। হয়তো বা ভাঙনি বেশী হয়ে যাচ্ছে।

দিন যতো ঘনিয়ে আসছে, ভাবনা ততোই বাড়ছে মতির। নবীনচন্দ্রের নির্দেশ মতো বগা মোকাম থেকে এর মধ্যে ঘুরে এসেছে। সেখানকার ঘর-দোরের যা করার ছিল তা-ও সবই প্রায় মিটিয়ে এসেছে। সেদিক থেকে কোথাও কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু ত্রুটি ঘটেছে মাধব পার্সেজারকে নিয়ে। হিসেবে দেখা গেছে, মাধব নগদ তিনশ' টাকা অতিরিক্ত ভেঙে বসে আছে। নিয়ম মতো নবীনচন্দ্রকে ওর এ খবর জানানো উচিত। শুধু জানানোই নয়, মাধবের ব্যক্তিগত চরিত্রের যে পরিচয় পেয়ে এসেছে তাতে ওকে তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত। কিন্তু সেই উচিত কাজ ও এখন কিছুতেই করতে পারছে না। মাধব ব্রাহ্মণ-সন্তান। ওর হাত জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে বেচারা। চাকরি গেলে ছেলে-পুলে নিয়ে পথে বসবে। যা করেছে অন্যায় করেছে। আর কখনো এ-রকম কাজ করবে না নারায়ণের নামে শপথ। কিছুদিন সময় পেলে ধীরে ধীরে ঘাটতি পূরণ করতে পারবে। কিছুতেই এর অন্যথা হবে না।···

যথেষ্ট দৃঢ় থেকেও শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের কান্নায় সায় না দিয়ে পারেনি ও। পারে নি পার্থর কথা মনে করেই। ব্রাহ্মণের অভিশাপে যদি কোন অমঙ্গল হয়। না—না—না, যা হবার হবে ব্রাহ্মণের অভিশাপ ও কিছুতেই কুড়াতে পারবে না। পার্থর মুখের দিকে চেয়েই তা পারবে না। মাধবকে কথা দেয় মতি, কাউকে ও কিছু জানাবে না। তবে তহবিলটা যেন যথা নিয়মে পুরিয়ে রাখা হয়।

তহবিলের হাল ফিরবে কি ফিরবে না সে ভাবনা পরে ভাবলেও চলবে। কিন্তু গঞ্জে পা দিতেই ওর মনে হয়, অন্যায় করে এসেছে ও। মাধবকে কথা দেওয়া ওর উচিত হয়নি। কেন না কথা দেবার ও কে? যাঁর ধন তিনি নিজে যা খুশি ব্যবস্থা করতেন। পরের ধনে পোদ্দারি করার ওর কি অধিকার আছে?···নিজের মনে দমে যায় মতি। কিন্তু এখন তো কিছু করার নেই। নবদ্বীপ থেকে জয়ের উল্লাস নিয়ে ফিরেছেন নবীনচন্দ্র। এখন বলতে গেলে অপদস্থ হতে হবে। মাধবের চাকরি তো যাবেই, নিজেকে নিয়েও টান পড়বে। তাড়াতে তো উনি অনেক দিন থেকেই চাচ্ছেন। শুধু সুযোগের অপেক্ষা। মাধবের ঘটনা ব্যক্ত করলে সেই সুযোগই ওঁকে হাতে তুলে দেওয়া হবে। অবশ্য এই হীন চাকরি ছাড়তে ওর এতটুকু আটকাতো না, যদি না নিজের টাকা পরকে দেওয়া থাকতো। দিন দিন আদায় উশুলের যা হাল দাঁড়াচ্ছে তাতে হয়তো কোন দিনই আর এ গোলামির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। লেখাপড়া শিখে অমিতাভ তো ঠায় বসে আছে। ও দাঁড়াতে পারলেও কিছুটা হাঁপ ছাড়া যেতো। ভাগ্য, সবই ভাগ্যের লিখন।···মুষড়ে পড়ে মতি দেওয়ান।

না, কোন রকম হৈ চৈ করে কাজ নেই। এখন শুধু নিয়ম রক্ষার্থে তার প্রসাদই পার্থর মুখে দেওয়া যাক। ধার-দেনা করে উৎসব-অন্দের কোন মানে হয় না। আজ যিনি আকণ্ঠ ভোজন করে গদগদ ন, কাল আবার তিনিই নিন্দায় হবেন পঞ্চমুখ। মানুষের ধর্মই । এই-ই ভাল ব্যবস্থা। এখন নিয়ম রক্ষা—পরে হালচাল বুঝে সব-আনন্দ। সকল ভাবনা ঠেলে ফেলতেই চায় মতি; কিন্তু পারে । পারে না স্ত্রী পুত্র কন্যা মা সকলের কথা স্মরণ করে। সকলেই উৎসবের জন্য দিন গুণছে। ওর একার কথা ভেবে সকলকে রাশ করতে পারে কি ও? আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীই বা বে কি? মাথা একবার হেঁট করলে আর তা উন্নত করা সম্ভব । নবীনচন্দ্রও পেয়ে বসবেন। না না, ও তা হতে দেবে না। য় ওর হাতেই রয়েছে। নিজের টাকা না থাকলেও চৌধুরী ষ্টেটের র টাকা ওর হাতে। তা থেকে দু' পাঁচ শ খরচ করলে কেউ ধরতে বে না। অন্ততঃ হিসেব-নিকেশের আগে তো নয়ই। ততো দিনে জর টাকা কিছু আদায় হবেই। তা থেকে অনায়াসেই তবিল করে রাখা যাবে। তবে আর ভাবনার কি?···ভেঙে পড়েছিল তি, আবার উৎসাহ বোধ করে। মানসনেত্রে ফুটে ওঠে সকলের সি মুখ। মা হাসছেন, মহামায়া হাসছে, আর হাসছে পার্থ। নতুন না পরে সে কি হাসির লহর ওর। যেন ভাগ্যলক্ষ্মী দু' হাত ভরে ল দিয়েছেন ওকে।···সকলের হাসিমুখ স্মরণ করে নিজের মুখেও সি ফোটে মতির। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তা মিলিয়ে যায়। ভুল করে ভাবে ও। ভাবে, যদি যথাসময়ে লগ্নির টাকা আদায় না ? তখন কি দিয়ে ঋণ শোধ হবে? মাধবও নিশ্চয় এ রকম একটা ছু ভেবে আজ ঠেকে গেছে। না না, মাধবের মতো ও কারো তে-পায়ে ধরতে পারবে না। অন্নপ্রাশন তো দূরের কথা, টাকার ভাবে পার্থর মৃত্যু হলেও না। না—না—না।

ঝোঁকের মাথায় কথাটা মুখ দিয়ে এনেই আঁৎকে ওঠে মতি। ক ঠেলে কান্না আসে। এ ও কি বললে! তিনটে মরে পার্থ। ই পার্থর মৃত্যুর কথা ও মুখে আনতে পারলো! দোহাই নাগর সাই, পার্থকে তুমি রক্ষা করো। আমি মূঢ়মতি, আমার অপরাধ য়ো না ঠাকুর। পার্থর মৃত্যুর আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।··· দিতে বসে হিসেব দেখছিল মতি—আবেগে বুকের ভেতরটা মোচড়াতে কে। হিসেব দেখা বন্ধ রেখে তক্ষুনি ছোটে বাড়িতে। পার্থকে কোলে নিয়ে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলাতে থাকে।···

অনেক ভেবে মতি ঠিক করে, না বলে একটি পয়সাও তবিল কে নেবে না। সুযোগ বুঝে নবীনচন্দ্রকে সরাসরি কিছু অগ্রিমের বলবে। রাজী হন ভাল, অন্যথায় মহামায়ার এক পদ গয়না বেচে াজ সারবে। তবু তবিল ভাঙবে না। কিন্তু সেটাও তো খুব সহজ-ধ্য ব্যাপার নয়। মহামায়ার গয়না ধরে টান দিলে মূল উৎসবেই ন পড়বে। কারো মুখেই আর হাসি থাকবে না। উৎসব হবে নিরুৎসবের ঘন-ঘটা। কি কুক্ষণেই না নিজের ধন পরকে দিয়ে কির হয়ে বসে আছে ও! এখন তো হাত কামড়ানো ছাড়া আর কিছু করার নেই। সুদের সুদ তো দূরের কথা, আসল থেকে কিছু ছেড়ে দিলেও এখন কারো কাছে কিছু পাবার উপায় নেই। রণমেই যে কি হবে তাই বা কে জানে! আচ্ছা, নবীনচন্দ্রকে না লে বউঠাকরুণকে বললে কেমন হয়? দু' পাঁচশ টাকা উনি যখন খুশি বার করতে পারেন। রামদা' তো ওঁর হাতে বেশ কিছু মোটাই দিয়ে গেছেন! হ্যাঁ, এই বেশ ভাল যুক্তি, নবীনচন্দ্রকে না বলে বউঠাকরুণকেই বলা যাবে। কিছুতেই উনি আমাকে না বলতে পারবেন না।

মতি এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত। ওর যা কিছু দরকার তা ও ৺রামচন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী শ্রীমতী উমাসুন্দরীকেই বলবে। এতে কোন মান-অপমানের প্রশ্ন নেই। বড়দি দেবেন তাঁর ছোট ভাইকে। আর তা দেবেন ভাইয়ের একান্ত প্রয়োজনে। অর্থাৎ কিনা ডান হাত দেবে বাঁ হাতকে। যাক, টাকার ভাবনা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। কি মুস্কিল যে এতক্ষণ এই সহজ রাস্তাটা মনে আসেনি। কিন্তু সময় তো আর বেশী নেই। দু'-পাঁচ দিনের মধ্যেই কথাটা পাড়তে হবে। মতি সুযোগ খুঁজে চলে।

সুযোগ অতি অল্প দিনের মধ্যেই এসে যায়। নবীনচন্দ্র ছেলেপুলে নিয়ে একদিন শ্রীশ্রীমাধব দর্শনের জন্য ধামরাই রওনা হন। হয়তো নবদ্বীপ বিজয়ের প্রণামী দেওয়াই উদ্দেশ্য। শরীর ভাল থাকলে উমাসুন্দরীও নিশ্চয় সঙ্গে যেতেন। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় যেতে পারেন না উনি। নবীনচন্দ্র সকলের যাত্রাই স্থগিত করতে চান। উমাসুন্দরী বাধা দেন। বলেন, আমার এমন কিছু গোলমাল নেই। মতি আমার কাছে থাকবে'খন। তোমরা ঘুরে এসো।

নবীনচন্দ্র তাই যান। মতি গদীর কাজ রেখে সেদিনটা উমাসুন্দরীর শয্যার পাশে এসে কাটায়। ফাঁকা ঘর—ঝি-চাকর কেউ নেই। মতি নিজের আর্জি পেশ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু

কিছুতেই মুখ খুলতে পারে না। আজ ও সর্বপ্রথম উপলব্ধি করে, টাকা কর্জ চাওয়ায় কি অসামান্য গ্লানি। ওর মতো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যখন-তখন হাত পাতে।

বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত মনের কথা ব্যক্ত করতে পারে না মতি। বরং উল্টো খরচের দিকটাই প্রসারিত করে আসে।

উমাসুন্দরী সতর্ক ভাবেই প্রশ্ন করেন, পার্থর অন্নপ্রাশনের দিন কবে স্থির করলি রে মতি?

অসংকোচে ও উত্তর দেয়, সামনের মাসের পাঁচ তারিখে।

খুশী হয়ে উমাসুন্দরী বলেন, তাহলে তো আর হাতে বেশী সময় নেই। দেখিস, আমরা যেন আবার বাদ না যাই।—বলে একটু মিষ্টি হাসি হাসেন উমাসুন্দরী।

হাসির বদলে মতিও ঠোঁটে হাসি টেনেই উত্তর দেয়, আপনাদের আশীর্বাদ না পেলে পার্থর ভাত খাওয়া সার্থক হবে না বৌঠান। সত্যি বলে রাখছি, আপনাকে কিন্তু দিন কয়েক আগে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

উমাসুন্দরীও হেসে হেসেই উত্তর দেন, তুই বললে যাবো আর নইলে নয়—কেমন?

মতি এ রসিকতার কোন উত্তর খুঁজে পায় না। উমাসুন্দরীর দরদে বুকখানা ফুলে সাত হাত হয়।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে উমাসুন্দরী আবার বলেন, পার্থর অন্নপ্রাশন, আমি কি নেমন্তন্নের অপেক্ষায় থাকবো রে! তবে আমাদের নবীনবাবুকে একটু ভাল করে বলিস। আজকালকার ছেলে, ওদের মনের ভাব বুঝে উঠতে পারি না। আর খরচপত্রও যেন খুব বেশী করিসনে। দিনকাল ভাল নয়।

মতি এতক্ষণ যাও বা তাক খুঁজছিল, এবার হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এ কথার পর সত্যি ওঁর কাছে কর্জ চাওয়া চলে না। ওষুধ-পথ্যের যথারীতি ব্যবস্থা করে দিয়ে সেদিনের মতো উঠে পড়ে। রাস্তায় চলতে চলতে ভাবে, উপায়?

উপায়ের কথা সত্যি আর ও ভাবতে পারে না। ও ঠিক করে, দুর্বার নিয়তি যেদিকে ওকে হাত ধরে নিয়ে যাবে, ও নির্দ্বিধায় সেদিকেই যাবে। টাকার জন্য আর একবারও ভাববে না। সখ-আহ্লাদ থেকে কাউকে বঞ্চিতও করতে পারবে না। মা, মহামায়া, গোঁসাই ঠাকরুণ—যেমন খুশি ব্যবস্থা করুন। ও সকলের ভারই নেবে। নতুন গয়না, সকলের জামা-কাপড়, মহোৎসব কিছুই বাদ যাবে না। পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন সকলের নেমন্তন্নই হবে পার্থর অন্নপ্রাশনে।

চৈত্র পাঁচ তারিখ—পার্থর অন্নপ্রাশন। খুশীর হাওয়া বইছে দেওয়ান-বাড়িতে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবে জমজমাট। সকলের সঙ্গে মতি নিজেও মহাখুশী। রোগশয্যা থেকে উঠেও উমাসুন্দরী না এসে পারেননি। অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন গতকাল ভোর থেকে আরম্ভ হয়েছে। উনি গতকালই এসেছেন। সুযোগ থাকলে আরো একদিন আগেই আসতেন। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। হয়ে ওঠেনি নবীনচন্দ্রের উদাসীনতার জন্যই। খালি হাতে তো আর উনি আসতে পারেন না। ভেবেছিলেন উপহার কি দেওয়া হবে তা নবীনচন্দ্রই সময় মতো ঠিক করে দেবে। মুখ বুজেই ছিলেন তাই। কিন্তু উৎসবের দু'দিন আগেও যখন নবীনচন্দ্রের কোন সাড়া-শব্দ নেই, তখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন আজ যে ওঁর না গেলেই নয়। মতি কি ভাববে!...

উমাসুন্দরী একাকী নিজের ঘরে বসে আঁকুপাঁকু করছিলেন—নবীনচন্দ্র সিঁড়িতে পা বাড়ান। নিমন্ত্রণ রক্ষা করবেন কিনা কো[ন] রকম ভ্রূক্ষেপ নেই। উমাসুন্দরী স্থির থাকতে পারেন না। গম্ভী[র] স্বরেই নবীনচন্দ্রকে পেছু ডাকেন।

নবীনচন্দ্র এ ডাকের অর্থ বোঝেন। তাই নিজেও গম্ভীর হয়ে উমাসুন্দরীর কাছে এসে দাঁড়ান। একান্ত নিরাসক্ত ভাবেই প্র[শ্ন] করেন, কিছু বলবে মা?

উমাসুন্দরী মুখ ভার করে উত্তর দেন, হ্যাঁ, কাল তো মতি ছেলের অন্নপ্রাশন। সকলেরই নেমন্তন্ন হয়েছে। কি দিবি ঠি[ক] করলি?

এতে আবার ঠিক করাকরির কি আছে? তুমি কি দে[বে] বলো।

উমাসুন্দরী এবার আর নিজেকে চাপতে পারেন না। রু[ক্ষ] ভাবেই বলেন, তোর বাবা বেঁচে থাকলে এ সব ব্যাপারে তিনি ঠিক করতেন।

বাবা পারতেন, আমি যদি না পারি!

না পারার মতো এমন কিছু শক্ত কাজ এ নয় নবীন। আমা[কে] ভুল বুঝাতে চাসনে।

বেশ তো, তাহলে তুমিই বলো না, কি করতে হবে?

কেন তুই বলতে পারিস না?

আমি যা বলবো তা কি তোমাদের ভাল লাগবে?

বেশ তো, বলই না কি তুই দিতে চাস?

আমার মতে দশ টাকা দিয়ে দেওয়ানজীর ছেলেকে আশীর্ব[াদ] করলেই যথেষ্ট।

তুই কি বলছিস নবীন!

আমি তো আগেই বলেছিলাম মা, আমার কথা তোমা[র] ভাল লাগবে না।

এটা কি একটা কথা হলো?

কি জানি, আমি তাহলে নাচার মা!

বেশ, তোরাই তা হলে নেমন্তন্ন রক্ষা করিস—আমি যে[তে] চাইনে।

আমিও তো যেতে পারবো না মা। কাল সকালের ল[ঞ্চে] আমাকে ঢাকা যেতে হচ্ছে।

তবে তো খুবই ভাল হলো। তোর ষ্টেটের দশটা টাকা অপব্যয় হবে না।

এ তোমার রাগের কথা মা। কাজের চেয়ে লোক-লৌকিক নিশ্চয় বড় নয়।

নিশ্চয় নয়। তুই তোর কাজেই যা নবীন—আমি তো ডেকে ভুল করেছি।—বলতে বলতে মুখ ঘুরিয়ে নেন উমাসুন্দরী।

নবীনচন্দ্রও মুখ ঘুরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মন্ত[ব্য] করেন, এও তোমার রাগের কথাই হলো মা। তুমি কি দিতে চ[াও] ভেবে আমাকে খবর পাঠিও। গদীতে সত্যি জরুরী কাজ আছে।

পায়ের পর পা ফেলে কয়েক ধাপ নেমে হঠাৎ আবার থম[কে] দাঁড়ান নবীনচন্দ্র। ভাবেন, কাজটা বোধহয় সত্যি ভাল হলো ন[া]

[...] দু'পাঁচ ভরি সোনা দিলেই যখন ঝঞ্ঝাট চুকে যায় তখন [...]বাড়ি না করাই ভাল। ভাবতে ভাবতে আবার উপরে উঠে [...]সেন নবীনচন্দ্র। মুখে কিঞ্চিৎ হাসি ফুটিয়েই মার ঘরের সামনে [...] দাঁড়ান। উমাসুন্দরী তখন প্রাতঃকালীন আহ্নিকের আয়োজন [...]ছিলেন। মুখ-চোখ থমথমে। নবীনচন্দ্র বেশ মিষ্টি করেই [...]স শুরু করেন, আচ্ছা মা, সকাল বেলাই কি ফ্যাসাদ বাধালে [...] তো। এ সব লোক-লৌকিকতার আমি কি জানি। বাবা [...]কে কি দিয়েছেন সে তুমি আমাকে বলে না দিলে আমি কি করে [...]নবো! আমি মাখন কর্মকারকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি— [...] দরকার বলে দিয়ো।

চন্দন ঘষছিলেন উমাসুন্দরী, পুত্রের আকস্মিক ভাবান্তরে মুখ [...]লে এক ঝলক তাকান মাত্র।

নবীনচন্দ্র বলেই যান, হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করবো কালকেই সন্ধ্যায় [...] ফিরতে। যদি না পারি তুমি তোমার বৌমা আর ছেলেপুলেদের [...]য়ে যেয়ো। তুমি গেলে আমার না গেলেও কোন দোষ হবে না।

উত্তরে উমাসুন্দরী আবারও চোখ তুলে তাকান। তাকিয়ে [...]বগম্ভীর ভাবেই বলেন, তোরও যাওয়া দরকার নবীন। মতি [...]তোর পিতৃতুল্য—ওর মনে কষ্ট দেওয়া উচিত হবে না।

আমি নিশ্চয় চেষ্টা করবো মা। কর্মকার এলে তাকে তুমি সব কথা গুছিয়ে বলে দিয়ো। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমি চলি। —বলতে বলতে উমাসুন্দরীকে আর কোন কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন নবীনচন্দ্র। নামতে নামতে ভাবেন, মা-মণি কি সত্যি খুব বাড়াবাড়ি করছেন না! হাজার হোক, কর্মচারী, কর্মচারীই—তার অতিরিক্ত কিছু নয়।

অতিরিক্ত যে কিছু নয় তা আর কেউ না জানলেও মতি ভাল করেই জানে। এবং জানে বলেই নবীনচন্দ্রকে পুত্রবৎ জেনেও আপনি আজ্ঞে করে সম্বোধন করে। তাতে আর কিছু না হোক, নিজের মান বাঁচে। সবই তো ভাগ্যের লিখন। নয়তো ওর উচিত ছিল শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চৌধুরীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই কাজে ইস্তফা দেওয়া। কিন্তু এখন আর কোন উপায়ই নেই। হাত-পা নাগপাশে বাঁধা। লগ্নির টাকাও আদায় হবে না, আর এ বন্ধন থেকেও মুক্তি নেই। ভাগ্য—ভাগ্য—সব ভাগ্যের খেলা। কারো ক্ষমতা নেই ভাগ্যের লিখনকে খণ্ডায়।···নবীনচন্দ্রকে অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত দেখে মনে মনে খেদ করে মতি। পার্থর ভাগ্য নিয়েও আশঙ্কা বোধ করে। কে জানে কি আছে ওর ভাগ্যে। উৎসব অবশ্য ধুমধামের সঙ্গেই হয়ে গেলো। একদা ওর মাতুল নাম রেখেছিল পার্থ। আজ আবার সেই মাতুলই ওর মুখে প্রসাদী পরমান্ন দিয়েছে। পার্থ এতটুকু কাঁদেনি। বেশ মুখ নেড়ে নেড়ে খেয়েছে। খেয়ে আবার খিল খিল করে হেসেছেও। পার্থর সঙ্গে সঙ্গে সকলেই প্রাণ খুলে হেসেছে। শুধু কিছুটা লজ্জা পেয়েছেন উমাসুন্দরী। লজ্জা পেয়েছেন নবীনচন্দ্রের আচরণে। সেদিন তো ঢাকা থেকে ফেরেনইনি, এমন কি তার পরের দিনেও নয়। এ ত্রুটির জন্ত কিছুতেই উনি মতির দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেননি। যদিও সোনা উনি পার্থকে পাঁচ ভরিই দিয়েছেন। লোকে তার জন্ত মুখে মুখে সুখ্যাতিও করেছে। কেউ কেউ আবার অবাকও হয়েছে। কিন্তু সেইটেই তো বড় কথা নয়। মতির মুখের দিকে যে তাকানোই যাচ্ছে না। কি অভদ্র ব্যবহারই না করলো নবীন! কিন্তু ওর এরকম আচরণ কি করে হলো! ওর বাবা তো কখনো এরকম ছিলেন না। মতিকে তো উনি মায়ের পেটের ভাইয়ের মতোই দেখেছেন। নবীন যে বংশের মুখে কালি দিলে।···পুত্রের লজ্জায় নিজে লজ্জা বোধ করেন উমাসুন্দরী। তবু মতিকে সান্ত্বনা দেবার জন্তে সস্নেহেই বলেন, নবীন বোধহয় কোন জরুরী কাজে আটকা পড়েই আসতে পারেনি মতি। তুই যেন কিছু মনে করিসনে ভাই।···

উত্তরে মতি শুধু একটুখানি হাসে—শুষ্ক ম্লান হাসি।

অনুষ্ঠানের ঝামেলা চুকে যায়। গঞ্জের মানুষের মুখে সুখ্যাতি ধরে না। এমন খাওয়া নাকি ওরা অনেকদিন খায়নি। ছোট বড়ো সকলেই বেশ খুশী। খুশী মতি নিজেও। পার্থর মায়াবী মুখখানার দিকে চাইলেই ওর সব ভাবনা দূর হয়ে যায়। তবু এক্ষেত্রে না ভেবে পারছে না। টাকা তো প্রায় শ'পাঁচেকের ওপরে খরচ হয়ে গেলো। সব ধার। মরশুমে ভাল আদায় না হলে নির্ঘাত ইজ্জত যাবে। মাধব পার্সোজারের হালই হবে। হয়তো বা তার চেয়েও অবমাননাকর কিছু।···চিন্তায় চিন্তায় এক একবার মনে হয় মতির, ছেলেটার বরাতেই এ সব হচ্ছে না তো! ওর জন্মের পর থেকেই তো একটা না একটা গেরো চলেছে। জানিনে, নাগর গোসাঁইয়ের কি ইচ্ছে! পার্থ তো—

না না, এ কি ভাবছি আমি! দেশ জুড়েই তো চলেছে হাহাকার। ওর কি দোষ! পাপ যদি কিছু করে থাকি তো আমরাই করেছি। আমরাই সুদের সুদ তস্য সুদ আদায় করে মানুষের বুকের রক্ত শুষে খেয়েছি। এ পাপ আমাদের। ফল ভোগও আমাদেরই করতে হবে। পার্থরা তো আজকের শিশু—নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক। ওদের বরাত কেন খারাপ হবে। ওরা যদি ধ্বংস হয় তো আমাদের পাপেই তা হবে। ওদের নিজেদের কোন দোষ নেই।···

ঘুমিয়ে ছিল পার্থ। মতি ওকে কোলে তুলে নেয়। বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে। চুমোয় চুমোয় ভরে দেয় ওর কচি সোনা মুখ।

[ক্রমশঃ।

গীতা কাপুরের আত্মহত্যা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

আঘাতটা সামলে পা চালিয়ে ঘরে ঢুকতে খিলক্ষণ সময় লাগল আমাদের। বেশ সাজানো ঘর এবং ঘরের দৈনিক দক্ষিণাও খুব বেশি—ঘরের চতুর্দিকে একবার চোখ বোলাতেই বোঝা গেল। টেলিফোন, আলাদা বাথরুম, দামী আসবাব; দেওয়ালের সঙ্গে রঙমেলানো পর্দার বাহার দেখে তারিফ করতে হয়। সোফা-সেটির মাঝখানের সেণ্টার টেবিলে বসানো দু'টি কফির রঙীন পেয়ালাও বুঝি পর্দার রঙের সঙ্গে মানানো।

"ঘরে যখন ঢুকেছেন তখন চেয়ারেও নিশ্চয়ই বসবেন!"

কথাটা কানে যাওয়া মাত্র সুড়-সুড় ক'রে চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লাম আমরা।

"এবার বলুন, কিসের খোঁজে আপনারা এসেছেন? সকাল অবধি সবুর যখন আপনাদের সইবে না, তখন আর উপায় কি? কী বলতে বা জানতে এসেছেন সেটা বিনা ভূমিকায় বলতে শুরু ক'রে দিন!"

"কর্ণেল শুক্ল কে তো দেখছি না?" এতক্ষণে বাক্যস্ফূর্তি হ'ল গুপ্তভায়ার।

"আপনাদের উপরে আসার খবর পেয়েই সে এ-পাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেছে—"

"খবরটা তাহলে পেয়েছিলেন? তা, এ-হোটেলের সার্ভিসই এই রকম; না এটা আপনার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা?"

"আপনার কোন্‌টা মনে হয়?"

"শেষেরটা।"

"আমি অস্বীকার করলেও তাহলে আপনার মন পাল্টাবে না।"

"তাহলে অস্বীকার করবেন না! এর জন্যে খরচও নিশ্চয়ই করতে হয়?"

"না—"

"বিনা খরচায় এই সিক্রেট-সার্ভিস?"

"আমি এঁদের বাঁধা খদ্দের।"

"কারণটা কী শুধু তাই?"

প্রশ্নটার উত্তর করল না শর্মা, চুপ ক'রে রইল।

"এ-হোটেলের ম্যানেজার কে?"

"নীচে ডেস্কে যার সঙ্গে কথা বলে এলেন—মিষ্টার মুসালিয়া।"

"আপনার এই সিক্রেট সার্ভিসটা কতদিন চলছে এবং কী কারণে এরা সেটা দিচ্ছে সেটা তাঁকেই জিগ্যেস ক'রে নেব'খন। আপনি শুধু অনুগ্রহ ক'রে সেই চিঠি ও টেলিগ্রামটা যদি আমাকে দেখান—"

"উপায় থাকলে নিশ্চয়ই দিতাম; কিন্তু আপনাকে বলে আসার পর এতক্ষণ ধরে খুঁজেও চিঠি ও টেলিগ্রামটা বার করতে পারলাম না। আসার তাড়াহুড়োতে বোধহয় কানপুরেই ফেলে এসেছি—"

"টেলিগ্রামে কী লেখা ছিল আপনার মনে আছে?"

"না থাকার কোনো কারণ নেই: কেন না স্মৃতিশক্তিটা আমার সঙ্গেই আছে। টেলিগ্রামে লেখা ছিল—'গীতার অবস্থা আশঙ্কাজনক। গত রাত্রে হাসপাতালে স্থানান্তরিত!' প্রেরক মিনতি সরকার!"

"আপনার তাড়াতাড়ি আসবার কথা কিছু লেখা ছিল না?"

"না—"

"কানপুরে ১১শে রাত্তে গিয়ে আপনি টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন ; সেটা কলকাতা থেকে কখন করা হয়েছিল এবং কানপুরে কখন পৌঁছেছিল নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন ?"

"হ্যাঁ। কানপুরে পৌঁছেছিল দুপুর ছুটো আর কলকাতায় করা হয়েছিল সকাল এগারোটা দশ !"

"কোন পোষ্টাপিস থেকে ?"

"সেটা লক্ষ্য করিনি—"

"আর চিঠিটা ? সেটা কবে পৌঁছেছিল কানপুর ?"

"কানপুরের ডাক-ঘরের ছাপ ছিল দশই আর কলকাতার আটই "আর চিঠিতে তারিখ ছিল সাতই ।"

"কী লিখেছিলেন আপনার স্ত্রী ?"

"এ-হোটেল থেকে সে চলে গিয়েছে এবং আমি কলকাতা ফিরে এলে এবং সে বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে ।"

"শুধু এইটুকু ?"

"সার কথা ঐটুকুই ।"

"হোটেল থেকে কেন চলে গিয়েছিলেন তার কোনো উল্লেখ ছিল না চিঠিতে ?"

"না ।"

"কেন গিয়েছিলেন সে-সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে ?"

"না। তবে সঙ্গে ঐ টেলিগ্রাম না পেলে মনে করতাম এ হোটেলে একা থাকতে ভালো লাগেনি বলেই হোস্টেলে ফিরে গিয়েছে—"

"চিঠিতে আপনার কলকাতা ফেরার এবং ওঁর বেঁচে থাকার কথাটায় কোনো খটকা লাগতো না আপনার মনে ?"

"লাগার কথা নয়। বিয়ের পর প্রথম বিচ্ছেদের স্বাভাবিক বিরহ প্রকাশ বলেই মনে হোত ।"

"টেলিগ্রামের সঙ্গে পেয়ে ?"

"সেই রাত্তেই ট্রেন ধরে ছুটে এসেছি কলকাতায় !"

"ছুটে আসার পর এবার ছুট যাবার কারণটা বলুন—"

"ঠিক বুঝতে পারছি না কথাটা—"

"তিন তারিখে যাকে বিয়ে করলেন তাকে ফেলে ছ'-তারিখেই হঠাৎ ফৈজাবাদ বা কানপুর ছুটে যাবার কারণ ?"

"ফৈজাবাদ বা কানপুর আমি ছুটে যাইনি, সেখানে যাওয়া আগে থেকেই ঠিক ছিল—"

"হ্যাঁ, টিকিটও করা ছিল, বার্থও রিজার্ভ ছিল ; কিন্তু সেগুলি ত্ব'-জনের—মিষ্টার ও মিসেস শর্মার জন্যে বলেই হঠাৎ একা যাবার কারণটা জিগ্যেস করছি ।"

এবার প্রশ্নটা না বুঝে আর উপায় রইল না শর্মার কিন্তু কোনো উত্তর করল না এবং বোধহয় সেইজন্য একটু হাসি দেখ দিল গুপ্তভায়ার মুখে, "এখন যে অসুবিধেটা হ'চ্ছে আপনার সেটা নিশ্চয় উত্তর দিতে—প্রশ্নটা বুঝতে আশা করি আর নয় ?"

শুনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার মুখ তুলে তাকাল শর্মা, তারপর বলল, "আমার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ার জন্যে ওকে রেখেই যেতে হয়েছিল আমাকে ।"
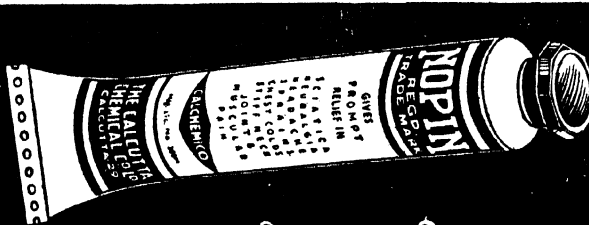
"গুরুতর কোনো অসুস্থতা ?"

"গোড়ায় সাবধান না হ'লে সামান্য অসুস্থতাই গুরুতর হ'য়ে উঠতে পারে।"

"তাহলে সামান্য অসুস্থতা এবং তার জন্য স্ত্রীকে রেখেই আপনি কানপুর বা ফৈজাবাদে চলে গিয়েছিলেন! কবে ফিরবেন কিছু বলে গিয়েছিলেন ? না, আপনার চ'লে যাওয়ার কথা ছিল কানপুর বা ফৈজাবাদ ?"

"না, আমারই ফিরে এসে ওকে নিয়ে যাবার কথা ছিল। তারিখ কিছু বলে যাইনি তবে ফৈজাবাদ থেকে কানপুরে গিয়ে সেটা জানাবার কথা ছিল!"

"কলকাতা থেকে যাবার পর স্ত্রীকে কোনো চিঠি লিখেছিলেন আপনি ?"

"না, লিখব লিখব ক'রে লেখা আর হয়নি! আর লেখা হয়নি বলেই কানপুরে এসে ঐ-রকম চিঠি পেয়েছিলাম গীতার!"

"ছু'-তারিখের পর ঐ চিঠি ছাড়া আপনার স্ত্রীর আর কোনো চিঠি আপনি পাননি ?"

"না।"

"আপনার বিয়েটা প্রণয়ঘটিত—বিয়ের আগে নিশ্চয়ই আপনি চিঠিপত্তর লিখতেন আপনার স্ত্রীকে ?"

"হ্যাঁ—"

"কোন্ ঠিকানায় ?"

"হোষ্টেলের ?"

"কাপুর নামে, না দাশগুপ্তা ?"

"দাশগুপ্তা।"

"হোষ্টেলে কোনোদিন গীতার খোঁজে আপনি গিয়েছিলেন ?"

"পৌছুতে কয়েক বার গিয়েছি ; তবে ঠিক হোষ্টেল পর্যন্ত যাইনি। দূরে নামিয়ে দিয়ে এসেছি—"

"টেলিফোন করেননি কখনো ?"

"না।"

"কেন ? কখনো প্রয়োজন হয়নি তাই, না আপনার স্ত্রী আপনাকে টেলিফোন করতে বা খোঁজ করতে যেতে বারণ করে দিয়েছিল ?"

দ্বিতীয়বার নিরুত্তর হ'ল শর্মা।

"প্রশ্নটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে আপনার ?"

"না। হোষ্টেলে টেলিফোন ছিল বলে আমি জানতাম না, আর হোষ্টেলে যেতে গীতা আমায় বারণ করে দিয়েছিল।"

"সেই সঙ্গে কারণও নিশ্চয়ই একটা বলেছিলেন ?"

"হাঁ, বলেছিল হোষ্টেলের অন্যান্য মেয়েদের প্রেম-কথা নিয়ে এত ঠাট্টা ও করেছে যে ওর প্রেমের খবর জানতে পারলে তারা ওকে পাগল ক'রে দেবে এবং নাকাল করতে আমাকেও ছাড়বে না—"

"আপনার মত বিয়ের আগে আপনার স্ত্রীও নিশ্চয় আপনাকে অনেক চিঠি লিখেছিলেন ?"

"হ্যাঁ—"

"আপনার সঙ্গে না থাক, সে চিঠিগুলি নিশ্চয় আপনার কানপুরের বাড়িতে আছে ?"

"না। বিয়ে ঠিকঠাক হওয়াতে চিঠিগুলি আমি সঙ্গে ক'রে কলকাতা নিয়ে এসেছিলাম এবং বিয়ের দিন রাতে সেগুলি পড়ে শোনাবার চেষ্টা ক'রেছিলাম গীতাকে। একটা দুটো পড়তেই লজ্জা পেয়ে গীতা সবগুলি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল এবং তারপর সেগুলি ওর কাছেই ছিল এবং ও কোথায় রেখে গিয়েছে আমি জানি না।"

শুনে কিছুক্ষণ নিষ্প্রশ্ন হয়ে বসে রইল গুপ্তভায়া, মেঝের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল ; আর যতক্ষণ না আবার মুখ তুলল ততক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল শর্মা।

"আপনার স্ত্রীর যে অসুস্থতার কথাটা বললেন, সেটার সূত্রপাত কি কর্ণেল শুক্লার ক্লাবের নেমন্তন্নে ?" আবার আরম্ভ করল গুপ্তভায়া।

"হ্যাঁ—"

"কিছু খেয়ে ?"

"না। সেদিন সকাল থেকেই ওর শরীরটা ভালো ছিলো না এবং তাই বেরতেও চায়নি। কিন্তু শুক্লা দুঃখিত হবে মনে ক'রে আমি একরকম জোর ক'রেই ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম ক্লাবে। সেখানে পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরেই গীতা বেশিরকম অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং চলে আসতে চায় ; কিন্তু শুক্লা কিছুতেই ছাড়তে চায় না। গীতা শেষ পর্যন্ত খাবার টেবিলে এসে বসতেও পারে না এবং আমি কোনোরকমে কিছু মুখে দিয়ে শুক্লার হাত থেকে ছাড়ান পেয়ে ওকে নিয়ে চলে আসি।"

"তখন আন্দাজ ক'টা ?"

"সাড়ে ন'টার সময় আমরা খেতে বসেছিলাম, হোটেলে যখন ফিরি তখন দশটা!"

"ক্লাবে গিয়েছিলেন ক'টায় ?"

"আটটা নাগাদ—"

"কর্ণেল শুক্লা কি শুধু আপনাদেরই নেমন্তন্ন করেছিলেন ?"

"আরো কয়েকজন ছিলেন, তবে উপলক্ষ আমরাই!"

"ক'জন ? একটু মনে ক'রে গুণে বলুন!"

"খাবার টেবিলে চোদ্দ জনের যায়গা হয়েছিল এবং গীতাকে বাদ দিয়ে আমরা প্রথমে তেরজন বসেছিলাম ; কিন্তু সেটা 'আনলাকি' বলে শুধু এসে সঙ্গে বসবার জন্যে গীতাকে একবার শর্মা ও একবার আমি ডাকতে যাই ; কিন্তু গীতা আসতে পারেনি—মাথায় তখন ওর ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মুখার্জি বলে একজন টেবিল থেকে উঠে 'বার'-এ চলে যায় এবং তখন আমরা বারোজন খেতে বসি।"

"মিঃ মুখার্জির সঙ্গে আপনাদের কি ঐ-ক্লাবেই আলাপ হয়েছিল, না আগে থেকেই আলাপ ছিল ?"

"বেশির ভাগ লোকের সঙ্গে ওখানেই আলাপ হয়েছিল।"

"তাদের নামগুলি মনে করবার একবার চেষ্টা করবেন ? আর সেই সঙ্গে আপনার বা আপনার স্ত্রীর পূর্বপরিচিতদের ?"

"আমাদের পূর্বপরিচিতদের মধ্যে শুক্লা, মেজর যশপাল ও তাঁর স্ত্রী, মেজর চোপরা ও তাঁর স্ত্রী। অপরিচিতদের মধ্যে ট্রেডের মিঃ মুখার্জি, মেজর যশপালের ভাই 'ইম্পিরিয়াল ড্রাগ'-এর মিঃ যশপাল ও তাঁর স্ত্রী, কী একটা মোটর ব্যবসার মিঃ নায়ার, লাইফ ইনসিওরেন্স করপোরেশনের মিঃ খাম্বেটে, তাঁর স্ত্রী এবং শালী মিস কী নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না—"

"বাঙালী শুধু মিঃ মুখার্জি ?"

"হ্যাঁ—"

"আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কি তাঁর ঐখানেই আলাপ হ'ল ?"

"হ্যা—"

আলাপ ক'রে কি মুখার্জির সঙ্গে আপনার স্ত্রীর কোনো পূর্ব-পরিচয় বা উভয়ের পরিচিত কোনো ব্যক্তি বা বন্ধু বেরিয়ে পড়েছিল ?"

"না, সে সুযোগই হয়নি। গীতার মাথায় যন্ত্রণা শুরু হওয়ায় ও একটু পরেই অন্ধকারে মিসেস চোপরার সঙ্গে লন-এ গিয়ে বসেছিল।"

"মোটর কারবারী মিঃ নায়ার কী পাঞ্জাবী ?"

"না, কেরালার লোক। মালওয়ারী।"

"মিঃ মুখার্জি ও মিঃ নায়ার ছাড়া সকলেই তাহলে পাঞ্জাবী ?"

মিঃ থাম্বেটে নন। উনি কোঙ্কনের লোক। মারাঠী বলতে পারেন।"

"মেজর যশপাল ও চোপরা এবং তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে আপনার কবে এবং কোথায় আলাপ হয়েছিল ?"

"ডায়মণ্ড হারবারে পিকনিক করতে গিয়ে আজ থেকে এই মাস দেড়েক আগে।"

"আর আপনার স্ত্রীর ?"

"ঐ সময়েই। ওর সঙ্গে তখন আমার বিয়ে স্থির হয়ে গিয়েছিল এবং শুক্লাও অনুরোধ করেছিল ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে।"

"শুক্লার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর আলাপও বোধহয় তার আগেই ?"

"হ্যাঁ, তার দু'তিন দিন আগে।"

"কোথায় ?"

"শুক্লার কোয়ার্টারে। কাকে বিয়ে করতে চাই দেখতে চেয়েছিল সে এবং আমি গীতাকে নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে ক'রে।"

"শুক্লার কোয়ার্টারে যেতে আপত্তি করেন নি আপনার স্ত্রী ?"

"না। কোনো রেস্তোরাঁ বা হোটেলে বসে আলাপ করতেই বরং আপত্তি করেছিল।"

"কারণ কিছু বলেছিলেন ?"

"না। তবে সিনেমা-রেস্তোরাঁ যা কোনো ভীড়ের জায়গায় যেতে গীতা একদম চাইত না। বিশ্বাস করুন, ওর সঙ্গে এই এক বছরের উপরের আলাপে একদিনও কোনো সিনেমায় যাইনি আমরা একসঙ্গে।"

"সিনেমা দেখতে ভালো লাগতো না ?"

"হ্যাঁ। ও বেড়াতে খুব ভালবাসত। পিকনিকে যেতে এবং কলকাতার কাছাকাছি সব ছোট-বড় মন্দির দেখে বেড়াতে এবং ভাঙ্গা পুরণো মন্দির দেখলে সেখান থেকে আসতে চাইত না সহজে।"

"ধর্মের দিকে ঝোঁক ছিল খুব।"

"হ্যাঁ, আর ঐ কারণে ওর প্রতি অত আকৃষ্টও আমি হয়েছিলাম। পূর্বের কোনো বিয়ে গোপন ক'রে ও আমাকে ঠকিয়ে বিয়ে করবে তাই আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত।"

মুখ নীচু ক'রে আবার চিন্তা করতে দেখা গেল গুপ্তভায়াকে। শর্মা হাই তুলে ঘড়ি দেখতে বুঝি ছেদ পড়ল সেই চিন্তায়, মুখ তুলে নিজের হাতের ঘড়িটা দেখল গুপ্তভায়া, তারপর আবার প্রশ্ন করল,

"মোটামুটি এক বছরের পরিচয়ের পর আপনি আপনার স্ত্রীকে বিয়ে করেন ; কিন্তু সেই পরিচয়টা প্রথম কী ভাবে ?"

"গত বছর দেওয়ালির সময়। শুক্লার কোয়ার্টারে নেমন্তন্ন খেয়ে আমি হোটেলে ফিরে আসছি—শুক্লার গাড়ি না নিয়ে ট্যাক্সি ধরবার জন্যে হেঁটে কেল্লা থেকে বেরিয়ে আসছি ; হঠাৎ একটি মেয়েকে গঙ্গার দিক থেকে মাঠের মধ্যে দৌড়ে আসতে দেখি এবং মেয়েটির পিছন-পিছন নাবিক পোশাকে তিনটি জোয়ানকে তেড়ে আসতে দেখতে পাই। মেয়েটি আমার সামনে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এবং তেড়ে-আসা জোয়ান তিনটি আমায় দেখে দূরেই দাঁড়িয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ দুর্বোধ্য চেঁচামেচি ক'রে ফিরে অন্ধকারের মধ্যে আবার মিলিয়ে যায়। জ্ঞান হতে মেয়েটির কাছে শুনি যে রণজি ষ্টেডিয়ামে একটি জলসা শুনতে সে এসেছিল এবং হোষ্টেলে ফেরবার তাগাদা থাকায় সে সঙ্গীদের ছেড়ে একাই ফিরছিল এবং সময় ও পথ সংক্ষেপ করবার জন্যে রাস্তা ছেড়ে মাঠের মাঝখান দিয়ে আসছিল এবং তখন তিনটি বিদেশী 'সেলর'-জাতীয় লোক প্রথমে তার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করে এবং তারপর ভয় পেয়ে সে ছুট দিলে তাকে ধরবার জন্যে তেড়ে আসে। মেয়েটিকে নিয়ে আমি তখনি একটা ট্যাক্সি ধরে থানায় ঘটনাটা রিপোর্ট করতে যেতে চাই ; কিন্তু মেয়েটি বলে হোষ্টেলে তার ফিরতে দেরি হয়ে যাবে এবং পরের দিন সকালে সে আমার প্রস্তাবমত আমার সঙ্গে গিয়ে থানায় ঘটনাটা রিপোর্ট করে আসবে। আমি তখন ট্যাক্সি করে মেয়েটিকে তার হোষ্টেলে নামিয়ে দেই এবং পরদিন মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে থানায় রাত্রের ঘটনাটা রেকর্ড করিয়ে দেই—"

"মেয়েটিকে তার হোষ্টেল থেকে তুলে নিয়ে যান ?"

"তাই কথা ছিল বটে, কিন্তু আমি হোটেল থেকে বের হবার আগেই মেয়েটি এসে আমার হোটেলে উপস্থিত হয় এবং আমাকেই জিগ্যেস করে একজন কুমারী মেয়ের পক্ষে থানায় গিয়ে ঐ ধরণের অভিযোগ করা উচিত এবং শোভন হবে কি না ?"

"আপনি কী বলেন ?"

"আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে এবং এ-ধরণের ঘটনা বন্ধ করা কী রকম প্রয়োজন জানিয়ে এবং ঐ সময়ে আমি ঐ জায়গায় উপস্থিত না থাকলে কী হতে পারত সেই সম্ভাবনার ইঙ্গিত করে তবে তাকে রাজী করিয়ে থানায় নিয়ে যাই—"

"রাতে ঐ মাঠের মধ্যে জ্ঞান হবার পর মেয়েটি তার নাম কী বলেছিল ?"

"মিস গীতা দাশগুপ্তা।"

"আপনার নাম ও হোটেলের ঠিকানা নিশ্চয়ই আপনি তাকে তখন বলে দিয়ে এসেছিলেন ?"

"হ্যাঁ। থানায় যাবার কথা বলতে মেয়েটি স্বভাবতই ঘাবড়ে গিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত পরদিন সকালেও থানায় যেতে চাইবে না বলে আমার মনে হয়েছিল এবং যাতে সে অবস্থায় আমায় ফোন ক'রে জানিয়ে দেয় এবং আমি যাতে একাই চলে যেতে পারি থানায় সেজন্য মেয়েটিকে পরিচয় ও ঠিকানা দিয়ে দিয়েছিলাম আমার।"

"তারপর ? থানার পর ?"

"থানায় যাবার জন্যে হোটেলে বসে বোঝাতে বোঝাতে বেশ দেরি হয়ে যায় এবং তারপর থানায় গিয়ে সেখানকার কাজ সেরে বেরোতে বেরোতে দুপুর বারোটা বেজে যায়। সেদিন শনিবার—মেয়েটি বলে

যে অত দেরি ক'রে আর সে তার আপিসে যাবে না এবং তখন আমি তাকে আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে বলি এবং লাঞ্চ খেতে খেতে মেয়েটির সঙ্গে আমার ভালো ক'রে আলাপ হয় এবং সেই আলাপের মধ্যে দিয়েই আমি জানতে পারি মেয়েটির অসহায় অবস্থা। সে পূর্ব-পাকিস্তানের 'রেফিউজি', বাবা স্বর্গত, মা স্বামীর ভিটে আঁকড়ে পাকিস্তানেরই একটি গ্রামে পড়ে রয়েছেন এবং মা ছাড়া তেমন আপন বলতে সংসারে আর কেউ নেই। পুরুষ অভিভাবকহীন সোমত্ত মেয়ে বলে সে চলে এসেছে পাকিস্তান থেকে। প্রথমে এসে উঠেছিল বহরমপুরে সম্পর্কিত এক মামার বাড়ি; কিন্তু সেখানে টিকতে পারেনি এবং তারপর ভাগ্য অন্বেষণে কলকাতা। কিন্তু পাকিস্তান থেকে খোদ কলকাতা শহরও কিছু বেশি নিরাপদ বলে তার মনে হচ্ছে না। সামান্য গান জানতো, তাই শিখিয়ে টাইপরাইটিং শর্টহ্যাণ্ড সে শিখেছে, চাকরিও করছে; কিন্তু ভবিষ্যৎ সমানই অন্ধকার দেখছে। গান বাজনা ভালো লাগে; কিন্তু গত রাতের ঘটনার পর আর কোনো জলসায় যাবার সখ নেই!"

"তারপর?"

"আমি নিজেও পাকিস্তান 'রিফিউজি' এবং সংসারে আমারও মা ছাড়া তেমন নিকট সম্পর্কের আত্মীয় বলতে আর কেউ নেই। ফলে স্বভাবতই আমি মেয়েটির প্রতি সহানুভূতি বোধ এবং প্রকাশ করতে থাকি। শিগ্‌গীরই ভালো একটা বিয়ে হয়ে তার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে মেয়েটিকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করি আমি; কিন্তু মেয়েটি সে কথা শুনে অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে বলে যে তার মত সহায়সম্বলহীনাকে বিয়েই বা করবে কে এবং করলে অনাথ-অসহায়া পেয়ে দুর্ব্যবহার যে করবে না তার গ্যারাণ্টি কী?" [ক্রমশঃ।

সুখকে কি বাঁধা যায়?

সত্যকার সুখ বলতে কি বোঝায়, এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। আজকের দুনিয়ার মানুষ তো এই বস্তুটির সন্ধানে সদাই ব্যস্ত, বেশীর ভাগ লোকই সুখ বলতে আনন্দ-উল্লাসের পাল তুলে জীবন-তরীখানি বেয়ে নিয়ে চলাটাই বোঝে কিন্তু সত্যই কি তাই?

মানুষ কখনও দুঃখ পাবে না, সদাই হাসবে—এ অবস্থা শুধু অলীকই নয়, অবাস্তবও। সুখের মত বেদনাও যে অতি স্বাভাবিক এক মানবিক অনুভূতি একথা আজকের মানুষ স্বীকার করতে চায় না মোটেই, আর এজন্যই কৃত্রিম আনন্দের রংমশালের আলোয় উজ্জ্বল করে রাখতে চায় জীবনের সব কটি মুহূর্ত্ত, যার ফলে সত্যকার সুখ বলতে যা বোঝায় তার দেখা পায় না সে কখনই, আর সেই সঙ্গে বঞ্চিত হয় শান্তির প্রসাদেও।

এই যুগ গতির। মানুষও যেন এই গতিশীলতার চাকায় আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছে। থামতে ইচ্ছা হলেও থামতে সে পারে না, পারে না আপন খেয়ালখুসী মত দুদণ্ড দাঁড়াতে, আপনার মনটাকে নিয়ে আপনি মাততে।

শিশুরা যদি একটু বিষণ্ণ হয় তখুনি এগিয়ে আসবেন তাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পিতামাতা, "মন খারাপ লাগছে কেন? যাও তো, খেলা কর গিয়ে। এমন করে কি একা একা বসে থাকতে আছে?" এই আনন্দ করা, খেলা করার নেশায় আজকের মানুষ একেবারে বিভোর। তাদের ভাবখানা, আনন্দ বা সুখ যেন গাছের পাকা ফলটি; শুধু পেড়ে নিতে জানা চাই। গভীর বেদনাসঞ্জাত অমৃতের খবর আজ আর কে রাখে! মানুষের মন যে নিভৃতি চায়, চায় দুদণ্ড আনমনা হতে, চায় অকারণ বিষণ্ণতার ভার মন্থর মুহূর্ত্তগুলিতে নিজের মনটার সামনাসামনি হয়ে দাঁড়াতে ক্ষণেকের তরেও, এ-কথা আজ এক অবিশ্বাস্য তথ্য।

সর্ব্বদা হাসিখুশী থাকতে হবে, না পারলে আজকের যুগের মানুষ ভাবতে বসবে কেন ভাল লাগে না, নানান গুণী তার বিশদ ব্যাখ্যা করতে কোমর বাঁধবেন, মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হয়ত বা এক নবতম অধ্যায়ই রচিত হবে সেই সব বিদগ্ধ গবেষণার ফলে।

মানুষের হৃদয় বস্তুটি যে দম দেওয়া যন্ত্রবিশেষ নয়, এই সামান্য সত্যটাকেও আজ আর কেউ আমল দিতে চায় না;—জোর করে হেসে-গেয়ে, নেচে-কুঁদে আধুনিক মানুষ প্রমাণ করবেই যে জীবনটা শুধুই উপভোগ্য, অনুভব্য নয়।

কিন্তু হায়, তবুও তো শেষরক্ষা হয় না। মাঝে মাঝেই যে বোতলে পোরা ভূতটার মত সত্য উঁকি দেয় তার নিজেরই মনের মাঝে, বিস্বাদ ঠেকে সব আনন্দ-উৎসব; উল্লাসের সমারোহে পড়ে ছেদ, আর তখনই সভয়ে সে আবিষ্কার করে শুধু সুখে থাকাটাই তার ধর্ম্ম নয়, সুখে-দুঃখে জড়িত হয়ে থাকাতেই তার সার্থকতা, স্বভাবজ প্রবণতা।

যে মানুষ শুধুই হাসে, কাঁদবার অবকাশ যার জীবনে আসে না কোন দিন, সে সত্যই হতভাগ্য!

প্রাকৃতিক লীলায় মেঘ ও রৌদ্র যেমন অবশ্যম্ভাবী এক ঘটনা, মানব-প্রকৃতিতেও তাই। বেদনার বারিধারে অন্তর সিক্ত না হলে পরম পাওয়ার আনন্দকে মানুষ কখনই উপলব্ধি করতে পারে না।

তাই কৃষ্ণাভিসারের দুর্গম পথে যাত্রা করে যখন রাধা হিয়া, বিরহের অশ্রুপাথার আস্তৃত থাকে তার সামনে। বেদনার অন্তহীন সমুদ্র অতিক্রম করে প্রিয় সান্নিধ্য হয়ে ওঠে মধুরতম, মন ভরে যায় চরম পাওয়ার আনন্দে। আনন্দ বা সুখকে তাই বাইরে খুঁজে বেড়ানোর উন্মত্ত প্রয়াস হাস্যকর, মনের গভীরে তার বাসা, বেদনার মৃণালেই শুধু ফুটতে পারে সত্যনিষ্ঠ আনন্দের সেই রক্তকমলটি।

আগের যুগের মানুষ মানবধর্ম্মের সহজ কথাটুকু সহজেই বুঝত অসংখ্য ইজমের দ্বারা মানুষের প্রত্যেকটি চিন্তাকে তখন নিয়ন্ত্রিত হতে হত না; হাসির মতই বিষণ্ণতাও যে অতি স্বাভাবিক এক চিত্তবৃত্তি সেটাও তখন স্বীকৃত হত সহজেই। আর সেজন্যই মানুষের আনন্দোপভোগের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকত্ব ছিল নবীনত্ব ছিল।

আজকের মানুষ জোর করে হাসতে গিয়ে অন্তরের রসের সহজ উৎসটিকে প্রায়ই চিরতরে শুকিয়ে ফেলছে, যার ফলে সত্যকার সুখের সন্ধান তার মেলে না কিছুতেই। অথচ কৃত্রিম আনন্দকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরার চেষ্টাতেও সে বিরত হতে পারে না কোনমতেই, তার পণ আনন্দকে সে জোর করে বাঁধবেই; আর হয়ত সেজন্যই সত্যকার আনন্দ আজ তার কাছে স্বর্ণমারীচের মতই অপ্রাপ্য অধরা থেকে গেল।

আশা দাস

অর্থহীন

চাকুরে মেয়ের বিয়ে হওয়া শক্ত নয়—এ রকম একটা জনশ্রুতি যেন শুনেছিলাম বলে মনে পড়ে। অবশ্য যে সব জায়গায় মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে কাজ করে, সেখানে শতকরা দশ ভাগ মেয়ে ওদের অফিসের ছেলেদের বিয়ে করে থাকে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আমি কিন্তু সে রকম বিয়ের কথা বলছি না। খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রী বিভাগে নজর দিলে দেখতে পাবেন চাকুরে পাত্রীর চাহিদা বিয়ের বাজারে বেশ আছে—অন্ততঃ বিজ্ঞাপন পড়ে তো তাই মনে হয়। তাই যখন আমার বন্ধু কল্পনা বললে ওর দূরসম্পর্কের খুড়তুতো বোন অনিন্দিতার জন্য পাত্র দেখছে, তখন ভেবেছিলাম সহজেই ওর বিয়ে ঠিক করতে পারবে। কারণ অনিন্দিতাও চাকরী করে। অবশ্য সামান্য চাকরী, একটা স্কুলে কেরাণীর কাজ করে। দু' একবার কল্পনার বাড়ীতে অনিন্দিতাকে দেখেছিও আমি। দেখতে ভাল, মুখশ্রী সুন্দর, পাতলা ছিপছিপে গড়ন। রং ফর্সা, মুখে একটা শান্ত কমনীয় ভাব। স্বভাবও খুব শান্ত প্রকৃতির। অনিন্দিতা যে বছর স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢোকে, সে বছরই ওর বাবা মারা যান। অনিন্দিতারা দুই বোন—দুজনকেই দেখতে ভাল। ওদের মা ঠিক তখনই হাতে যা পুঁজি ছিল তাই নিয়ে মেয়েদের বিয়ে দিতে চেষ্টা করলে হয়ত হয়ে যেতো। কিন্তু ওদের দুজনেরই ছিল পড়ার সখ। টিউশনি করে ও সামান্য যা জমানো টাকা ছিল তা ভেঙে বি-এ পাশ করে দুজনেই চাকরীতে ঢুকে গেল। এখন দুজনের আয়ে সংসারে অভাব বড় একটা নেই। তবে কলকাতায় ভাড়াটে বাড়ীতে থেকে দুজনের আয়ে ঐ সংসারই চলে—টাকা কিছুই প্রায় জমাতে পারে না। অনিন্দিতার মা কিন্তু এবারে ওদের বিয়ের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। নিজে অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে ছিলেন। স্বামীর অবস্থা সে রকম নয় বলে বাবা-মা মারা যেতে নিজের বাপের বাড়ীর সঙ্গেও যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছেন। নিজে দারিদ্র্যের জ্বালা সয়ে মেয়েদের আর গরীবের ঘরে বিয়ে দিতে ইচ্ছে নেই। উনি ভাবেন—মেয়ে আমার দেখতে ভাল, বি-এ পাশ—চাকরী করে। দু' একটি অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়ত হয়, কিন্তু পাত্রপক্ষ যেই শোনে এরা বিয়েতে টাকা খরচ করতে পারবে না, অমনি পিছিয়ে যায়।

অনিন্দিতার মা একদিন কল্পনাকে এসে ধরে পড়লেন—কল্পনার স্বামীর বন্ধু জিতেন দত্ত নাকি বিয়ে করবে, টাকা-পয়সা কিছু চায় না। শুনে কল্পনা প্রথমে অবাক হয়ে গেল, জিতেন তো কায়স্থ নয়। শেষ পর্যন্ত কি কাকীমা বেনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন? কাকীমা বলেন—'তাতে কি হয়েছে। জিতেনদের কলকাতায় তিন-চারখানা বাড়ী আছে, ব্যবসা আছে, মেয়ে খেতে-পরতে পাবে। জাত দিয়ে কি হবে?'

কল্পনা বলে—'কিসের ব্যবসা জানেন? সিনেমার আমি ওই সিনেমা লাইনের কোন লোকের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করতে পারব না।' কাকীমা নাছোড়বন্দা। কল্পনাও অটল। বলে, 'জেনে শুনে আমি অনিন্দিতার সর্বনাশ করতে পারব না।' কাকীমা নিজের দুঃখের কাহিনী শুরু করেন। কল্পনাকে ছোটবেলা থেকে শোনা সেই সব কাহিনী আবার শুনতে হয়। শেষ পর্যন্ত অনিন্দিতার জন্য পাত্র দেখবে কথা দিয়ে কাকীমার কাছ থেকে রেহাই পায়।

কাকীমা বিদায় নিলে মনে মনে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করতে থাকে সে। পরিচিত ও আত্মীয়র ভেতর অনেকের নামই মনে আসে। কিন্তু টাকা খরচ করতে পারবে না ভেবে পিছিয়ে যায়। হঠাৎ ওর মনে পড়ে রমেনদা'কে। কলেজে ওদের দু' ক্লাস ওপরে পড়ত রমেন। এম, এস্‌সি পাশ করে সম্প্রতি সরকারী কি একটা ডেভেলাপমেণ্ট অফিসে বড় চাকরী পেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শনিবার শনিবার বাড়ী আসে। একটু কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন ছিল রমেন বরাবর। বড়লোক বন্ধুদের দিনরাতই বিদ্রূপ করত। কল্পনার মনে হলো, রমেনদাকে বললে হয়ত টাকা ছাড়াও বিয়ে করতে রাজী হতে পারে। স্বামীকে বলে রমেনকে খবর দেয় ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য। রমেন ওর স্বামীরও পরিচিত। খবর পেয়ে রমেন পরের শনিবার কল্পনার সঙ্গে দেখা করতে আসে। একথা সেকথার পর কল্পনা বিয়ের প্রসঙ্গ তোলে—'বিয়ে করবে রমেনদা? আমার এক খুড়তুতো বোন আছে। দেখতে বেশ ভাল, গ্র্যাজুয়েট, চাকরী করে—কিন্তু পয়সাকড়ি বেশী নেই—খরচ করতে পারবে না বিয়েতে।' রমেন প্রথমে সলজ্জ, পরে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই খবর-টবর নেয়। বলে, 'একবার দেখতে পারি মেয়েটিকে?' ওর বিয়েতে আপত্তি নেই দেখে কল্পনা খুব উৎসাহ

বলে 'কবে, কোথায় দেখবে, বল।' ঠিক হয়, আসছে শনিবার বাড়ী ফেরার পথে কল্পনার বাপের বাড়ীতে যাবে তিনটে নাগাদ। সময় কল্পনা অনিন্দিতাকে নিয়ে ওখানে থাকবে।

পরের শনিবার দুপুর থেকে কল্পনার বাপের বাড়ীতে বেশ হৈ চৈ যায়। অনিন্দিতাকে নিয়ে অনিন্দিতার মা আসেন। কল্পনার বোনেরা উৎসুক হয়ে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। মা, কাকীমারা জলযোগের ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এদিকে তিনটে, সাড়ে তিনটে, চারটে বাজে—রমেনের দেখা নেই। কল্পনা অস্থির পায়ে ঘুরে বেড়ায়। ওর মা হেসে বলেন—'দেখ, তোর ঠিক পাত্র তো, এলে হয়। তখনই বলেছিলাম সরযুকে, ওর কথার কোন দাম আছে!'

সাড়ে চারটে নাগাদ কিন্তু দূর থেকে রমেনকে দেখা যায় বাড়ীর নম্বর খুঁজতে খুঁজতে আসছে। কল্পনা এবারে নিশ্চিন্ত হয়ে ডাকে। ওপরে উঠে আসে রমেন। মা, কাকীমা, ভাইবোনেরা সবাই ঘিরে বসে ওকে। কল্পনা অনিন্দিতাকে নিয়ে এসে বলে, 'এই যে বোনটির কথা বলছিলাম তোমাকে, রমেনদা।'

কল্পনা বসে পড়ে, অনিন্দিতাও বসে ওর পাশে। রমেন বেশ সপ্রতিভভাবে জিজ্ঞেস করে—অনিন্দিতা কোথায় কাজ করে, কোন্ কলেজে পড়েছিল ইত্যাদি। অনিন্দিতা ছোট্ট ছোট্ট জবাব দিয়ে চুপ করে থাকে। মা কাকীমারা দু'চারটে কথা বলেন। রমেন জলযোগ সেরে নিয়ে বলে, 'এবারে উঠি।' কল্পনা ওর মতামত জানার ইচ্ছেয় বলে, 'আমিও তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি, রমেনদা।' ও আশা করেছিল রমেনের অনিন্দিতাকে পছন্দ হয়েছে। রাস্তায় বেরিয়ে রমেন বলে—'মেয়েটি একেবারে কথা বলে না।' কল্পনা বলে, 'ও বরাবরই একটু চুপচাপ। তা ছাড়া আজ তো লজ্জাতেই কিছু বলবে না।' রমেন কিছুই বলে না। এবারে কল্পনা ওর মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারে ওর পছন্দ হয়নি অনিন্দিতাকে। কল্পনা আর কিছু না বলে নিজের বাড়ীতে চলে যায়।

অনিন্দিতার মা আবার এসে কল্পনাকে ধরে পড়েন। কল্পনা বলে, 'কি করব বলুন, রমেনদার ওকে ঠিক পছন্দ হয়নি।' অনিন্দিতার মা শুনে একেবারে মুষড়ে পড়েন। কল্পনা বলে, 'কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখুন না। অনেকেই তো চাকুরে পাত্রী চায়।'

পাত্রীর গুণ বর্ণনা করে ও বিয়েতে টাকা খরচ করতে সক্ষম নয় জানিয়ে রবিবারের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নগদ তেরোটি টাকা খরচ করে। ইতিমধ্যে কল্পনা একদিন বাপের বাড়ী গেছে। সেখানে নানা কথার মাঝে অনিন্দিতার বিয়ের প্রসঙ্গও ওঠে। কল্পনা জানতে চায় বিজ্ঞাপনের উত্তর এল কি না। ওর মা বলেন, 'পাঁচখানা চিঠি এসেছে জানিস না বুঝি? প্রথম চিঠি—পাত্র দু' বিষয়ে এম, এ পাশ, টাকা পয়সা কিছু চায় না। ওদের ব্যবসা আছে, সবই ভাল। কিন্তু'—

কল্পনা বলে 'বেশ ভাল তো।'

ওর মা ওকে থামিয়ে বলেন 'কিন্তু পাত্রের একটা পা নেই। দু' নম্বর চিঠি—এক ভদ্রলোক লিখেছেন ছয়টি সন্তান রেখে সম্প্রতি ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন। ওঁর ছেলেমেয়েগুলোকে মানুষ করলেই হবে। আর কোন দাবী ওঁর নেই।

কল্পনা এইটুকু শুনে বলে, 'আর বলতে হবে না বিয়ে হবার মত কি একটি চিঠিও আসেনি?'

'একখানি এসেছে বলতে পারিস। ছেলে বি, কম পাশ। প্রেসে চাকরী করে। দেড়শ টাকা মাইনে। ও লিখেছে, এই রোজগারে সংসার চালান সম্ভব নয়। কাজেই পাত্রীকে বিয়ের আগে একখানা বণ্ডে সই করতে হবে যে সে সারাজীবন চাকরী করবে। অন্ত কোন দাবী নেই। অনিন্দিতার মা শেষ পর্যন্ত ঐ পাত্রের সঙ্গেই কথা বলতে গেছেন।...'

একদিন শোভনাদির বাড়ী বেড়াতে যায় কল্পনা। শোভনাদি ছোটবেলা থেকে শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া করেছিলেন। গান-বাজনা ভালবাসেন। ছবি আঁকেন, গল্প লেখেন। কথাবার্তা ব্যবহার খুব মিষ্টি, পরোপকার করে বেড়ান। এন্তার লোকের সঙ্গে আলাপ। কথায় কথায় কল্পনা ওকে বলে, এমন কোন ছেলের খবর জানেন কিনা যে টাকা নেবে না, শুধু মেয়েটিকে দেখে বিয়ে করবে। শোভনাদি বলেন, চেষ্টায় থাকবেন।

কিছুদিন পর শোভনাদি খবর দিয়ে ওকে নিয়ে গেলেন ওঁর বাড়ী। বললেন, একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছেন। নাম অজিতশঙ্কর গুহ। খুব ভাল সেতার বাজায়। এম, এ পাশ; ভাল চাকরি করে। দেখতে সুন্দর, লম্বাচওড়া চেহারা। 'ওর সঙ্গে যদি তোমার বোনের বিয়ে হয় তো জানবে ভাগ্যের কথা। ওকে বলেছি একটি পাত্রী আছে আমার হাতে। টাকা-পয়সা বিশেষ নেই সে কথাও জানিয়েছি। ও রাজী হয়েছে দেখতে। কবে আসছ বল?'

পরের রবিবার দিন ঠিক করে কল্পনা ফিরে আসে।

রবিবার কল্পনা চার টাকার মিষ্টি কিনে অনিন্দিতা ও ওর মাকে নিয়ে শোভনাদির বাড়ী যায়। শোভনাদিদের বসার ঘরে মাঝখানে ছুটো গালচে বিছিয়ে গানের আসর সাজানো হয়েছে। একপাশে বেদীর মত, তার ওপর ফুলদানিতে ফুল, ধূপদানিতে ধূপ জ্বলছে। গান-বাজনার ব্যবস্থাও হয়েছে। আরো দু'চারজন এসেছে। কল্পনারা সবাই বসলে পর অজিত সেতার বাজাল, শোভনাদি গান গাইলেন, অজিতের এক বন্ধু গীটার বাজালেন। অনিন্দিতাকেও গান গাইতে বলা হল। কিন্তু বেচারা গান গাইতে জানে না। মনোরম পরিবেশে পাত্র-পাত্রী দেখার পর্ব শেষ হয়। পাত্র দেখতে সত্যিই সুপুরুষ, বেশী কথা বলে না। কল্পনার খুবই পছন্দ হয় ওকে। আসর ভঙ্গের পর মিষ্টিমুখ করে একে একে সকলেই বিদায় নেয়। কল্পনারাও উঠে পড়ে। শোভনাদি বলেন, 'পরে খবর দেব তোমাকে।'

দিন সাতেক পর শোভনাদির কাছ থেকে কল্পনার নামে ডাকে একখানা চিঠি আসে। খাম খুলে কল্পনা দেখে ভেতরে অজিতের চিঠি, শোভনাদিকে লেখা—শোভনাদি নিজে কোন চিঠি লেখেন নি। প্রকাণ্ড বড় চিঠি—ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কিছুই লেখা। মোট কথা—অনিন্দিতাকে ওর পছন্দ হয় নি। তবে সেজন্য অজিত যথেষ্ট আক্ষেপ করেছে। 'সুন্দরী, শিক্ষিতা, উপার্জনক্ষম একটি মেয়ের বর জুটছে না, বাংলা দেশের কি দুর্ভাগ্য! নিজেকে পণ্যারূপে দেখিয়ে বেড়াতে হচ্ছে—নারীত্বের একি অপমান!' সারা চিঠিটাই এই সুরে লেখা। কল্পনার চোখের সামনে অনিন্দিতার ম্লান মুখখানি ভেসে ওঠে।

এরপর প্রায় একমাস কেটে গেছে। একদিন রাত্তিরে বেড়িয়ে ফেরার পথে কল্পনা ও ওর স্বামী শোভনাদির বাড়ী যায়। গিয়ে দেখে শোভনাদিরাও তখনি ফিরলেন। ওদের দেখে শোভনাদির কি রকম যেন অপ্রতিভ ভাব। শোভনাদির স্বামী পার্বতীবাবু মুখ টিপে হেসে বলেন, 'জান, আমরা অজিতের বিয়েতে খেয়ে ফিরলাম। সবচেয়ে মজা হল, বৌ দেখতে ভীষণ কুৎসিত। তোমার বোন ওর তুলনায় অপ্সরা। এ বিয়ে নিশ্চয় ওর আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, এখানে বোধহয় এসেছিল একটু রগড় করতে।'

বিদ্যুৎ ঝলকের মত মনে পড়ে কল্পনার—কলেজে পড়ার সময় যেন গুজব শুনেছিল রমেনদা নাইট স্কুলে পড়াতো, তখন একটি হরিজন মেয়ের প্রেমে পড়েছিল। কে জানে ওর বিয়েও হয়ত ঠিক হয়ে আছে।

কল্পনা বুঝতে পারে—অর্থহীন বিয়ের চেষ্টা একেবারে অর্থহীন।

অই দূরে শাদা পাল

(লেরমনতফ)

অই দূরে শাদা পাল কাকে চেয়ে ওড়ে একা-একা
ফেনিল শীকরশীর্ষ নীলাম্বিকে সমুদ্র-সওয়ার;
সমাগত সৈকতের দূর-লক্ষ্যে চায় কার দেখা,
কাকে বা এসেছে ফেলে পরিত্যক্ত উপকূলে তার?

আর্ত স্বরে ডাকে হাওয়া, ছুটে আসে বিস্ফারিত ঢেউ,
নুয়ে পড়ে মুখোমুখী শিহরিত সশব্দ মাস্তুল;
সে খোঁজে না শুধু স্বস্তি, যাত্রারম্ভে বলবে না কেউ
সুখের ইন্ধন তার ছিলো ব্যাপ্ত অম্বিবার মূল।

গর্জায় লুটিয়ে পায়ে আমন্ত্রিত নীল উর্মিরাশি,
উপরে উলঙ্গ রৌদ্র ছুড়ে দেয় বিদ্যুৎ কৃপাণ—
ঝড়,—একটি আচম্বিত, উন্মোথিত ঝড়েরই প্রত্যাশী,
বিপ্লবী ঝটিকাপাতে স্থিতি পাবে এ-উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণ॥

অনুবাদ—অরুণাচল বসু

কংক্রীটের ব্যবহার

আজকাল সিমেণ্ট জমানো কংক্রীট দিয়ে বাড়ি-ঘর তৈরী ও অন্যান্য নির্ম্মাণ-কাজ হয়ে চলেছে হরদম। প্রত্যেক শিল্পোন্নত বা উন্নতিপ্রয়াসী দেশেই এর ব্যবহার বেড়ে গেছে আগের তুলনায় অনেক বেশি। হিসাব ঠিক রেখে নিখুঁতভাবে কংক্রীটের কাঠামো করতে পারলে তা যেমন মজবুত হয়, দীর্ঘস্থায়ী হয়, তেমনি ব্যয়ভারও কম বহন করতে হয়—এই দাবী গোড়া থেকেই রয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতে কংক্রীটের ব্যবহার খুব বেশিরকম হতে থাকে, এখনও ব্যবহারের হার বাড়ছে বই কমছে না।

কংক্রীট জিনিসটা নিজে অবশ্যি কোন মৌলিক বা খনিজ পদার্থ নয়—বালি, সিমেণ্ট, খোয়া ইত্যাদি জমিয়েই (নির্দিষ্ট পরিমাপে) এর সৃষ্টি। রি-ইনফোর্স'ড কংক্রীট বলে নির্ম্মাণ-কাজে ব্যবহারযোগ্য আরও একটি জিনিস যা আছে, সাধারণ কংক্রীটের চেয়ে এর গাঁথুনি অধিকতর মজবুত। সূত্র অনুযায়ী খোয়া, লোহা, সিমেণ্ট ইত্যাদির ঢালাই মারফৎ সৃষ্টি হয় রি-ইনফোর্স'ড কংক্রীট। এ যুগে মহানগরী-গুলোতে রি-ইনফোর্স'ড কংক্রীটের বাড়ি বহু সংখ্যায় গড়ে উঠছে—অন্য দেশে যেমন, এখানেও।

কিন্তু আজকে যে কংক্রীটের এত ব্যাপক ব্যবহার এবং যা এতটা প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান বলে স্বীকৃতি পেয়েছে, কিভাবে এর সম্ভাবনা হলো, নিশ্চয়ই জানবার বিষয়। একথা বোঝা যায় যে, মানুষ প্রথমে যখনই নির্ম্মাণ কাজে হাত দিতে চাইল, পাথরকুচিগুলোকে এক সঙ্গে কি ভাবে জমানো যায়, এই ভাবনা তার মাথায় আসে। নির্ম্মাণ ক্ষেত্রে আজও অবধি বিস্ময়কর পিরামিডগুলোর তৈরীর প্রশ্ন উঠলে এ জিনিসটি আরও চিন্তা করা হয় অধিক মাত্রায়। আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয়গণ সেদিনে নির্ম্মাণ কাজে কাদামাটি ব্যবহার করে; কিন্তু মিশরীয়রা চূণ ও জিপসাম (খনিজ পদার্থ) মর্টার মিলিয়ে-মিশিয়ে একটি শক্ত পদার্থ সৃষ্টি করে। গ্রীকগণ ক্রমে এর আরও যথেষ্ট উন্নতি করতে সমর্থ হয়। সব শেষে রোমানরা সিমেণ্ট উৎপাদন করে আর এই সিমেণ্টের সহায়তায় যে সব বাস্ত-কাঠামো তৈরী হয় সে যুগে—স্থায়িত্বের দিক থেকে তা অদ্ভুত প্রমাণ হয়ে যায়।

প্রাচীন রোমে যে সব বৃহৎ ভবন তৈরী হওয়ার ইতিহাস জানা যায়, সেগুলোর বেশির ভাগই সিমেণ্ট জমিয়ে করা হয় অর্থাৎ ঐ সকল কোন না কোন ধরণের কংক্রীট কাঠামো। খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তবিংশ শতকেও সিমেণ্ট মর্টার ব্যবহৃত হতো—রোমান স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শনসমূহে তা লক্ষ্য করা যায়। সিমেণ্ট উৎপাদনে রোমানদের এই সাফল্য কিভাবে দেখা দিয়েছিল, সে-ও একটি জানবার বিষয় বটে। ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির উদগীর্ণ ভস্মরাশির সঙ্গে জলের সহায়তায় পরিবর্ত্তিত চূর্ণ মিশ্রিত করে তখনকার দিনের কঠিন সিমেণ্ট উৎপাদিত হয়েছিল। তারপর অন্ধকার যুগ এলে এই মিশ্রণ কৌশল বা পদ্ধতি মানুষ ভুলে যায়—মাত্র দুই শতক আগে পুনরায় সিমেণ্ট ও কংক্রীটের গোপন তত্ত্বটি মানুষের মাথায় পুনরায় হাজির হয়েছে।

পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের নাম আজকের দিনে কারো প্রায় অজানা নেই। এটা কিন্তু জোসেফ আসপ্‌দিন নামক একজন ইংরেজ রাজমিস্ত্রীর সৃষ্টি বা আবিষ্কার। ১৮২৪ সালে নির্ম্মাণকাজের জন্য অত্যাবশ্যক এই জিনিসটির পেটেণ্ট আদায় করে নেয় আসপ্‌দিন। রান্না করার ষ্টোভে জ্বলন্ত চূর্ণীকৃত চূণাপাথর ও কাদামাটির সংমিশ্রণের দ্বারা এর সম্ভাবনা হয়েছিল সেদিনে। পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট নামটি ঐ রাজমিস্ত্রী তখন অমনি বেছে নেয় না। বৃটিশ উপকূলের অনতিদূরে পোর্টল্যাণ্ড দ্বীপে যে সব পাথর পাওয়া যায়, তার সঙ্গে নতুন আবিষ্কৃত জিনিষটির রঙের সাদৃশ্য দেখেই আসপ্‌দিন এই নামকরণ করে।

বর্ত্তমান সময়ে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত কংক্রীটের মৌল উপাদানই হলো পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট—বড় বড় নির্ম্মাণ কাজে (বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁধ, ড্রাই ডক, বিমানক্ষেত্র প্রভৃতি) এ না হলে চলেই না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সিমেণ্ট ও জল সহযোগে বালি পাথরকুচি প্রভৃতি পদার্থ জমাট করে নিলেই কংক্রীট হয়ে যায়। জল যেতে আসতে না পারে এমনি কঠিন নিশ্ছিদ্র করে কংক্রীটকে ইচ্ছানুরূপ এঁটে দেওয়া চলে। বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে তৈরী কংক্রীটে ছিদ্র রাখাও সম্ভবপর, এ-ও দেখা যায়। দিন যতই এগিয়ে চলেছে, বিজ্ঞানের সহায়তায় এই বিশেষ পদার্থটিরও অগ্রগতি হচ্ছে সেই অনুপাতেই।

ভারতের প্লাইউড শিল্প

বর্ত্তমান যুগে প্লাইউডের উপযোগিতা যে কত ভাবে উপলব্ধি হচ্ছে, তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। প্লাইউড শিল্পের দিক থেকে ভারত আজ অনেকটা অগ্রসর, অন্ততঃ বহু দেশের তুলনায়। কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যব্যবস্থা অনুসৃত হলে আরও অগ্রগতি নিশ্চয়ই সম্ভবপর।

সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত একটি সাম্প্রতিক হিসাবে জানা যায়, ১৯৪৭ সালে এ দেশে প্লাইউডের কারখানা ছিল মাত্র ৪৩টি। এক্ষণে এই শ্রেণীর কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭০টিরও অধিক। এই কারখানাসমূহে উৎপাদিত প্লাইউডের পরিমাণ হবে প্রায় ৬ কোটি ৪০ লক্ষ বর্গ ফুট। কাঠ উৎপাদক দেশ হিসাবে ভারতের স্থান প্রথম পর্য্যায়ে হলেও কাঠের চাহিদা এখানে মিটেছে, এ ঠিক নয়। প্লাইউডের উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা কাঠের এই অভাব পূরণ করা সম্ভবপর। তবে এর ব্যবহার এখনও আশানুরূপ ব্যাপকতা লাভ করে নি। সরকারী দাবী অনুসারে প্লাইউডের ব্যবহার বাড়াতে পারলে চলতি কাঠের ব্যবহার শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাস করা চলবে।

প্লাইউড শিল্পের উন্নয়নকল্পে সম্প্রতি ভারতের শিল্প দপ্তর চার দফা পরিকল্পনার সুপারিশ করেছেন, যা ভেবে দেখার মতো। আলোচ্য পরিকল্পনা অনুসারে প্লাইউড দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যাপক ব্যবস্থা, প্লাইউড শিল্পে বিভিন্ন ধরণের দ্রব্য উৎপাদন ও পরিত্যক্ত দ্রব্য ব্যবহার, রপ্তানীর জন্য কর্ম্মসূচী প্রণয়ন এবং উৎপন্ন প্লাইউডের উৎকর্ষ সাধন—এই সব লক্ষ্য নিয়ে প্লাইউড শিল্পকে উদ্যোগী না হলে নয়।

একথা ঠিক—এদেশে প্লাইউডের উৎপাদন হার বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এর জন্যে শিল্পের আধুনিকীকরণের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র অস্বীকার করা চলে না। শিল্পে যন্ত্রপাতি যা প্রয়োজন হয়, আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাধীনে তা তৈরীর ব্যবস্থা হলে ভাল। এখনও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা-পর্য্যালোচনার অনেকখানি অবকাশ আছে। সরকারী সহযোগিতা পেয়ে সমবায় ভিত্তিতে এই শিল্পোত্তম চালান যায় কিনা, তাও ভেবে দেখবার। শিল্পের লক্ষ্য হতে হবে শুধু আভ্যন্তরীণ চাহিদা মোটামোটি নয়, বাইরে রপ্তানীও। কাঁচা মালের যাতে অভাব না পড়ে, জাতীয় সরকার সে ব্যবস্থা করবেন। বর্ত্তমানে তক্তা তৈরী করবার সময় বিস্তর কাঠ পরিত্যক্ত টুক্‌রো ও গুঁড়া হিসাবে নষ্ট হয়। এই জিনিষগুলো কিভাবে সর্কোচ্চ লাভজনক কাজে লাগানো যেতে পারে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান-কর্ম্মী ও গবেষকদের সেদিকে সমধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে উপকার হবে। সব কিছুর ওপরে সরকারের দায়িত্বটি থেকে যাচ্ছে—সরকার যতটা সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসবেন, প্লাইউড শিল্পের উন্নয়ন তত বেশি ত্বরান্বিত হবে এবং নিশ্চিত হবে, এ বলাই বাহুল্য।

পোষাক-পরিচ্ছদ—কয়েকটি কথা

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বরও বাড়ছে—ষ্টাইল বা ফ্যাশন পাল্টাচ্ছে দিনের পর দিন। জামা-কাপড় আজকে যেটা খুব চালু, কিছুকাল বাদেই হয়তো দেখা যাবে সেটা সেকেলের পর্য্যায়ে পড়ে গেছে। সকল দেশে সকল সমাজেই এটা দেখতে পাওয়া যায়, নারী পুরুষ কেউ এর প্রভাব থেকে এতটুকু মুক্ত নয়।

গাছের বল্কল ছেড়ে মানুষ যখন বস্ত্র পরতে সুরু করল, এমন কি তখনকার অবস্থা ও আজকের অবস্থার মধ্যেও আকাশ-পাতাল তফাৎ ঘটে গেছে। তখন অবধি লজ্জা নিবারণটাই ছিল মুখ্য লক্ষ্য—কাজেই পোষাক-পরিচ্ছদের এভাবে বাড়াবাড়ি ছিল না। আজকাল খালি গায়ে ও খালি পায়ে চলা, বিশেষ করে সহরে মানুষের, একরূপ অচিন্তনীয় ব্যাপার। চলতে-ফিরতে কত রকমারী জামা-কাপড় চাই সভ্য সমাজে আসন পাবার জন্যে ফিটফাট হয়ে থাকা চাই প্রতিমুহূর্ত্তে। খাওয়ার চেয়েও পরাটাই আজ অত্যন্ত বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে—এখানে সাধ্য না থাকলেও সাধ না মিটিয়ে যেন উপায় নেই।

আগে এক এক দেশের বা এক একটি জাতির এক একরকম পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল। এখনও যে তা চলতি নেই, তা মোটেই নয়। তবে বিভিন্ন দেশের মানুষের মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদান বেড়ে যাওয়ায় পোষাক-পরিচ্ছদেরও আমদানী-রপ্তানী বেড়ে চলেছে। ইউরোপীয় পোষাক শুধু ইউরোপবাসীরাই এখন পরছে না, বাইরেও এর আজ বেশ চলতি ও সমাদর। এককালের ধুতি-চাদর পরা বাঙালী প্যাণ্ট, কোট, নেকটাইকে বৈদেশিক বলে বিদায় দেয়নি। অন্য ক্ষেত্রে যেমন, পোষাক-পরিচ্ছদের বেলাতেও তেমনি নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে।

পোষাকের ফ্যাশন চালু করবার জন্যে ফ্যাশন-সৃষ্টিকারী বা ব্যবসায়ী মহলের ভাবনা নিবদ্ধ করতে হয় অনেকখানি। বাজারে কোন্ জিনিসটি হাজির করলে অগণিত ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং চট্ করে সে জিনিস বিকাবে, অথচ মুনাফায়, এ সকল একই সঙ্গে না ভাবলে চলে না। আজকের দিনে যে-কোন বাজারের ন্যায় পোষাক-পরিচ্ছদের বাজারেও অসম্ভব প্রতিযোগিতা। তাই ফ্যাশন বা ষ্টাইল পত্তনের ঝুঁকি যাঁরা নিতে উৎসাহী হবেন, তাঁদের ভাবনার মাত্রা স্বভাবতঃই বেশি। শুধু আভ্যন্তরীণ বাজার নয়, বিদেশের বাজারসমূহে কি করে স্থান করে নেওয়া যায়, সেই লক্ষ্যটিও পাশাপাশি থাকবেই।

সব জায়গাতেই এখনকার যুগে পোষাক-পরিচ্ছদের বাজারে দুটি ব্যবস্থা রয়েছে—ক্রেতারা স্বেচ্ছামতো যে কোনটির সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। অর্ডার দিয়ে যেমন মাপ অনুযায়ী পছন্দসই পোষাক পাওয়া যায়, তেমনি যখন-তখন সংগ্রহ করা চলে রেডিমেড ড্রেস বা তৈরী পোষাক। শেষেরটির বাজারই তুলনায় বড় বলতে পারা যায়, অন্ততঃ এদেশে। তৈরী পোষাকের মধ্যেও ফ্যাসন সৃষ্টি করতে হয়, তাই এক একটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে এক-একটি বৈশিষ্ট্য দাবী করতে দেখা যায়। সময়ের চাহিদার দিকে বিশেষ নজর রেখে একাজ না করলে হয় না। কারণ, মাল অধিক পরিমাণে আটকে গেলে অর্থাৎ অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে থাকলেই ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

ফ্যাশন বা ষ্টাইল নিত্যপরিবর্ত্তনশীল—দেশে দেশে বিভিন্ন, যুগে যুগে স্বতন্ত্র। ইউরোপীয় পোষাকই ইউরোপের সব জায়গায় একরকম নয়। কোট, প্যাণ্ট, টাই কত রকমের ব্যবহার চলছে এই আজকের দিনেই—বলা চলে না। বৃটিশ টাই যে ধরণের—ইটালীয় টাই ঠিক সেই ধরণের নয়—জার্ম্মাণীতে যে পোষাক চালু, ফ্রান্সেই তা অনুরূপ। মাথার টুপীর দিক থেকেও দেশে-দেশে এই ভিন্নতা স্পষ্ট।

সব চেয়ে ফ্যাশন সৃষ্টির বাহুল্য দেখা যায় মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদের জগতে। এখানে নিত্য নতুন কাটিং হাজির না করলে বাজার টিকবে না। প্রাচ্য-প্রতীচ্য সকল জায়গাতেই এটা বিশেষ রকম লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় মেয়েদের প্রধান পরিধেয় শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া। অসংখ্য ডিজাইন বেরিয়ে চলেছে এ সকলের—বাজারে নতুন ফ্যাশন বা ষ্টাইল আমদানীর উদ্যমের অভাব নেই। অর্ডার দেওয়া পোশাক দামে যেমন বেশি, তেমনি টেকসইও হয়। অপর দিকে তৈরী পরিচ্ছদ দামে কমতি হলেও অনেকক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। নামকরা প্রতিষ্ঠানসমূহের তৈরী মাল অবশ্যি অর্ডারী মালের মতোই প্রায় হয়—অন্ততঃ সেই ধরণের দাবী তাঁরা রাখেন।
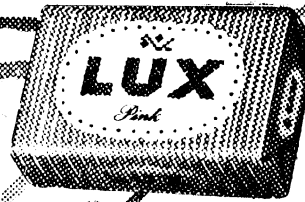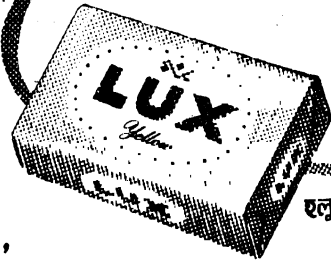
সবুজ

গোলাপী

হলুদ

'রঙগুলো এতই সুন্দর,
মনে হয়
সবই আমার চাই'
বৈজয়ন্তীমালা বলেন-

দেখুন! লাক্স এবার চমৎকার কত সব রঙে আর মানানসই
ক—সাদাটিও রয়েছে। প্রতিটিই আপনার বিশুদ্ধ লাক্স—লাবণ্য
যে সাবান চিরদিনই আপনি চেয়েছেন।

চিত্রতারকার
বিশুদ্ধ, কোমল
সৌন্দর্য্য-সাবান

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

কবি কর্ণপুর-বিরচিত
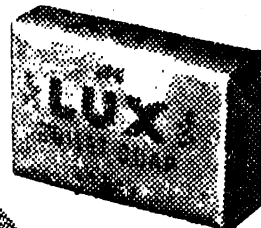
আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

১। তারপরে সকাল হল। সঙ্গে সহচর মণ্ডলী, এগিয়ে চলেছে ধেনুর দল, নবীন নটের মত ললিত-বেশে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের মতই রাজপুরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন ব্রজ-তিলক নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। দুটি উদ্দেশ্যে। এক, বন-বিহার, দুই, পশুপক্ষী তরুলতিকাদের বিরহ দুঃখের দূরীকরণ।

তিনি বেরলেন, আর শ্রীকৃষ্ণের একান্ত—স্বকীয় সহচর ব্রাহ্মণ তনয়, "কুসুমাসব, তিনিও তাঁর প্রচণ্ড মোটা ঘাড়খানি ঘোরাতে ঘোরাতে সরল মনে খোসমেজাজে বেড়াতে বেরলেন সারা গোকুলপত্তনে। অপূর্ব্ব এই পত্তন। সর্ব্ব-সুলক্ষণা-সৌভাগ্য-লক্ষ্মীদের যেন সিন্দুক ভেঙ্গে পত্তন করা হয়েছে এই পত্তনটির। ঐশ্বর্য্যে সৌন্দর্য্যে রম্ রম্ করছে গোকুল।

অনেক দেবতার মত ঘুরছেন ফিরছেন, এমন সময় তিনি নজরে পড়ে গেলেন কৃষ্ণ-প্রেয়সীদের শ্বশ্রূমাতাদের। তাঁরা স্থবিরা হলে হবে কি, কুসুমাসবকে দেখে তাঁরাও আহ্লাদে আটখানা। আদর করে তাঁকে ডাকলেন।

২। আহ্বানে কৌতুক বোধ করে কুসুমাসব তাঁদের কাছে উপস্থিত হতেই অতি বিনীতভাবে তাঁরা বললেন,—"বাড় বাড়ন্ত হোক্ আপনার প্রতিভার। কৃষ্ণের আপনি প্রিয় নর্ম-সহচর। তায় জগতের সেরা মেধাবী। নির্ভয় আপনি। তাই প্রশ্ন করছি, জ্ঞান-কে যা গয়না পরায় এমন কোন বিদ্যের আপনি পাঠ নিয়েছেন?"

৩। হাসতে হাসতে কুসুমাসব বললেন,—"আমি নিজেই একটি মহা জ্যোতিঃ পদার্থ। তায় জ্যোতিষ আর আগম আমার কণ্ঠস্থ। অতএব জ্ঞান বুদ্ধির রসকষ মিইয়ে দেয় এমন অন্য শাস্ত্র পড়ে আমার দরকার?"

তাঁরা বললেন,—"মানছি, জগতের সেরা পুরুষ আপনি। তাহলে এখন আমাদের খুলে বলুন, ঐ দুটির মধ্যে কোনটির নীতিকে আমাদের সারাধিক বলে জানা উচিত।"

৪। সরাসরি উত্তর এল রসিয়ে,—"হে শাশুড়ী ঠাকরুণগণ, আপনারা ব্রজপুরের পুরন্ধ্রী-প্রধানা অবহিত হোন। জ্যোতিঃ—প্রভাবগুলির প্রাধান্য সর্ব্বত্রই। তারা বয়ে নিয়ে বেড়ায় প্রভা। এই পৃথিবীতে বহু ধ্যেয় ভদ্রাভদ্র একখানি অতীত ছিল, শুভাশুভের মতন একখানি বর্ত্তমানও রয়েছে, কুশল ও অকুশলের সম্ভাবনা নিয়ে চিরদিন দাঁড়িয়ে থাকবে একটি ভবিষ্যৎ··এই তিনটিরই সঠিক খবরাখবর জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের পাঠ নিলেই জানা হয়ে যায়। আগমের গমকটি কিন্তু দেবতাদের আরাধনায় পথ ধরেই চলে, এবং ক্ষমতা রাখে সব কিছু করবার বা অ-করবার বা অন্যথা-করবার।"

৫। অচিরে শ্বশ্রূমাতারা বললেন,—"আহা, ফুলচন্দন পড়ুক আপনার মুখে। কী কথাই শোনালেন! প্রহরটাও সমীচীন। মাত্র দু'একটি প্রশ্ন করতে চাই। অবিশ্যি ভাল ভাল মোণ্ডা মেঠাইও খাওয়াব। তা, আমাদের প্রশ্নগুলোও আবার এমন যা গোকুলে আর কারো কাছে করার জো-টি নেই। একা আপনিই যদি প্রসন্ন হন তাহলে প্রকাশ্য হতে পারে প্রশ্ন। আমাদের অনুরোধ, সে প্রশ্নের আপনি যেন ঠিক্-ঠিক্ উত্তর দিয়ে খণ্ডন করেন আমাদের মনের সন্দেহ। সত্যিই, স্বর্গ মর্ত্ত্যে কেউ কি এমন রয়েছেন যিনি দেহ বা বিদ্যাকে পর-হিতায় না নিয়োগ করে থাকতে পারেন?"

৬। সহাস্য জবাব এল,—"আপনারা এক যদি আগে দান করেন বহু দুগ্ধবতী গাভী, তাহলে হয় তো আমার এই দারুণ ক্রূর ভাবখানা কেটে গিয়ে খুলতেও পারে আমার চৈতন্যের অরুণালোক। ঐ তখনই কিনা আসে আমার সব-কিছু বলবার ক্ষমতা। আমার ব্রহ্মণ্যের মধ্যে যে নির্বিরোধে নিদ্রিত রয়েছে,···ঐ সব সর্ব্বজ্ঞতা ইত্যাদি শক্তিগুলো;··একথা তো আর ভুল নয়।"

৭। বৃদ্ধারা সমস্বরে বলে উঠলেন,—"গাভী তো ধূলো! পৃথিবীর কোনো ধনই অদেয় থাকতে পারে না, যদি আমাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন আপনি।"

কুসুমাসব এবার বললেন,—"না না, ধন আমি চাই না। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে;··প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠাপন। বেশ, করুন আপনাদের প্রশ্ন।"

৮। বৃদ্ধাদের ভাষণটি সংক্ষেপে এই,···"আমরা সতী। নিষ্কণ্টক বসতি আমাদের ব্রজপুরে। এমন কিছু কাঁটার মতও নয়, দুষ্ট উদ্মার মতও নয়, তবু একটা মনস্তাপের কিন্তু কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারছি না আমরা। আমাদের বউ-গুলি রূপে পদ্মিনী হলে হবে কি, একটি থেকেও সুখ নেই আমাদের। বিয়ের দিন থেকেই দেখছি,··চোখের দেখা তো দূরের কথা, স্বামীর নাম এমন কি স্বামীর বন্ধুদের নাম শুনলেই এঁরা যেন কালা হয়ে যান, অন্ধ হয়ে যান। এমন পতি-বৈরস্য পৃথিবীর কেউ কি কোথাও দেখেছে? স্বামী বলে যে একটি বস্তু আছে সে অভিমানটুকুও এঁদের নেই। আজও নেই। দুঃখই আমাদের বেড়ে চলেছে। এর যে কী প্রতিকার, আমাদের সেইটি জানিয়ে দিগবিদিকে বিকীর্ণ করুন আপনার যশঃ।"

৯। ভাষণ শুনে কৃত্রিম-মৌনী হয়ে রইলেন কুসুমাসব। মানস সরস্বতীর কাছেই নিদান নেওয়া ভাল, এই যেন হল তাঁর কপট মনোভাব। ক্ষণকাল মনে মনে কী যেন বিড়বিড় করে বকলেন। তারপর আচার্য্য-পনা অভিনয় করতে করতে, দমগুণান্বিত ব্যক্তির মত, যেন কতই না বিষাদভরে নিগৃহীত করলেন নিজের মনস্বিতা। তারপরে একখানি শুষ্ক হাসি ঝরিয়ে, বাক্য-বিশারদ মেধাবী তিনি,··ছুটিয়ে দিলেন তাঁর কৌতুকে ভরা রথ ভাষার পথে;—

"অয়ি শুভবতীবৃন্দ, এই খবরটি কিন্তু যুবরাজ কৃষ্ণের গোচর …ই, নষ্ট' হয়ে যাবে আমার আনন্দ। অতএব, গোপীবৃন্দ, এটিকে …ই আমাদের সঙ্গোপন করে রাখতে হবে। যাক্‌, এখন আমি …শ করব···পতি-বৈমুখ্যের মুখ্য কারণটি কি। একটি ফল …য় আসুন তো।"

ফল নিয়ে আসা হল। ফলটি হাতে ধরে তিনি ক্ষণকাল কী … চিন্তা করলেন। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভিতর থেকে যেন একটা …ভা বেরতে লাগল, সে আভার যেন ক্ষয় নেই। সু-দুর্দ্ধর্ষ হয়ে …লেন কুসুমাসব। বললেন,—

১০। "আর্য্যাগণ, এক্ষেত্রে লৌকিক ও অলৌকিক কতকগুলি …ষ চোখে পড়ছে। লৌকিক দোষগুলি জ্যোতিশ্চক্র-শাস্ত্রোক্ত …গুলিতে লাগে না। ওগুলি অক্ষতই রাখে পতি-বিপক্ষতা। …লৌকিক দোষগুলি এবার বুঝে দেখুন···বেগে। আপনাদের …তিকূলে, চক্রে অবস্থান করছেন একটি যোগিনী। মন্ত্র পড়ে …লায় তাঁকে বিদায় করা যায় না। তাঁর পদ্মপায়ের নীরাজন …রেন যোগীরা, এত তাঁর মহিমা। অসীম তাঁর প্রতাপ। …কেও বিদীর্ণ করবার তিনি ক্ষমতা রাখেন। যোগবলেই তিনি …াবিনী। মায়া-বিবাহ ঘটিয়ে দিয়ে এই কৌতুকময়ীটি কিন্তু …থিবীতে কীর্ত্তন করে বেড়ান···'এইটাই জ্ঞানে বিবাহ,'···এবং যাঁরা …কে চেনেন না তাঁরা মায়া-বিবাহকে সত্যবিবাহ বলেই মেনে নেন। …নিই অতএব, এই বধূ-রাজির হৃদয়ে উৎপন্ন করেছেন নব-সমাজের …যোগ্য ঐ পতি-বিদ্বেষ।

১১। অতএব, স্বভাবতই আর এঁরা মানবী নন। এঁদের …ের সেই যোগিনীর তাই এত সুতীব্র প্রীতির আধিক্য। অতএব, …নব ও অমানবদের মধ্যে এই হেন মিলন অযোগ্য বিবেচনা করে, …প্রতি সেই ক্ষিপ্রা যোগিনী স্বয়ং এঁদের মতিভেদ ঘটিয়ে দিয়েছেন; …ং এই তেজস্বিনীদের পতি-স্পর্শাদি করায় বাধা দিচ্ছেন। অতএব …ন আপনাদের কর্ত্তব্য, যথাসত্বর বধূদের ঐ বধূ-ভাব খণ্ডন করা। … বিষয়ে উদাসীন থাকা উচিত নয়, কারণ যোগিনীর কৃপাতেই …ল্যাণ হয় গৃহের।

১২। এই গোকুলে পুত্রদের যদি দিগব্যাপিনী শ্রীবৃদ্ধি কামনা …রেন, তাহলে এমনভাবে আপনাদের চলা উচিত, যাতে পুত্রগণ বধূ …র্শ না পান। কৃষ্ণ-ভুজঙ্গের অবলাদের উপর বলপ্রয়োগ করলে …খের হবে না ব্যাপারটি। পুত্রদের সৌভাগ্য যে, এঁরা তাঁদের স্ত্রী।"

১৩। বিষণ্ণ হলেন, ব্যাকুল হলেন শ্বশ্রূমাতার দল। তবুও …দের নিরাময় কামনায় পুনর্বার বলে উঠলেন,—"সত্যিই, …পনি একটি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। ন্যায়-শাস্ত্রের চারটি প্রমাণই … স্ফূর্ত্ত আপনার মধ্যে। আপনার কথা কিন্তু ঠিক মানুষের …থার মত নয়, অসাধারণ আপনার সর্ব্বজ্ঞতা। পরম …্যোতির্বিদ আপনি দেখিয়েছেন বটে গ্রহশাস্ত্রের অধ্যয়নের প্রভাব, …ন্তু এবার আমাদের দেখিয়ে দিন···আগম-অধ্যয়নের মহৎ প্রভাব …থিবীতে। কষ্ট করে কোন দেবতাকে আরাধনা করলে বা কী ধন …লে ঐ যোগিনীর বিভূতি লোপ করা যায়, সেই বিষয়ে আমাদের …পদেশ দিন, আর বিবরণ দিন পূজার পদ্ধতির।"

১৪। কুসুমাসবের বুক ফুলে উঠল, বললেন,—"এক রয়েছে …পায়। তাতে অপায়ও ঘটবে না, আবর্জ্জনাও জমবে না। সেই ক্রোধিণী যোগিনীটির ক্রোধ-শান্তির উদ্দেশ্যে, অন্য কোনো দেবতার আপনারা উপাসনা করুন।" আহা যেন একটি চমৎকার সম্পত্তির খবর দিয়ে গেল এই উক্তির আনন্দ। বৃদ্ধাদের মনে হল তাঁরা যেন বৃদ্ধ গলায় হার চড়ালেন। বললেন,—

"ব্রাহ্মণ বটু, গুণের আপনি রত্ন-খনি। এখন বলুন, কে ঐ দেবতা-রতন? তাঁর নামই বা কি? তাঁর উপাসনারই বা ধারা কি? খুলে বলুন।"

সহর্ষ উত্তর এল কুসুমাসবের,—

"মহাভাগ্যবতীগণ, অবধান করুন।

এই বৃন্দাবনে একটি কুঞ্জ-দেবতা রয়েছেন। 'কাল-কুমার' তাঁর নাম। তিনি অত্যন্ত কালো। কালাতীতও তিনি। অথচ দেখলেই তাঁকে কন্দর্প বলে ভ্রম হবে। যোগিনী যেমন নীচদের সাদৃশ্য গ্রহণ করেন, এই কুঞ্জ-দেবতাটিও তেমনি কৃষ্ণকটাক্ষিণীদের যথাভীষ্ট সম্পাদন করেন। তিনি প্রসন্ন হলে বিষাদে ভেঙ্গে পড়ে না কোন মানব। আবার তিনি যদি রেগে যান, তাহলে পিনাক নিয়ে শিব ছুটে এলেও রক্ষে নেই কারোর।

কুঞ্জে কুঞ্জে তিনি ফেরেন, কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। যাঁরা অনন্য ভাবে ব্রত পালন করেন, একমাত্র তাঁদের কাছেই তিনি আবির্ভূত হন ধ্যানের মাধ্যমে। কিন্তু এঁর মুখ্য পূজারও একটি সময় আছে, নিয়ম আছে। বড় দুষ্কর এই পূজা। যাঁরা পুণ্যাত্মা, যাঁরা পরম কৃতিমান, তাঁরাই কেবল সেই মুখ্য পূজাটি করতে সমর্থ হন।

১৫। এ যে কত দুষ্কর তা বলছি শুনুন। পরার্দ্ধমণির অলঙ্কারে ও উত্তম বসনে মহিমান্বিত হয়ে, অঙ্গে শ্রেষ্ঠ গন্ধ বিলেপন, পূজারী বা পূজারিণীদের স্বয়ং যেতে হবে কোনো একটি পাখীচরা বনে,···ফুল তুলতে। তারপরে তাঁতে হৃদয়-মন সমর্পণ করে, লোকলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে, বৃথা বাক্য বিরচন না করে,···ভাবতে হবে তাঁকে।

১৬। যখন পূজারিণীর হৃদয় থেকে খসে পড়ে যাবে ঐশ্বর্য্যের শঠতা, তখনি আভিমুখিন হবেন তিনি। এবং তখনি তাঁর পূজার আয়োজন করতে হবে সাধিষ্ট ষোড়শোপচারে। তারপরে কুঞ্জে কুঞ্জে···আনন্দে নিমীলিত আঁখি···পুষ্প ধূপ প্রদীপ নিয়ে, প্রিয়-গন্ধ নৈবেদ্য সাজিয়ে, ত্রিসন্ধ্যা পূজা করতে হবে তাঁকে। পূজাবসানকালে নিজের দেহটিকে বিছিয়ে দিতে হবে নব-কিশলয়ের শয়নে। এবং তারপরে সবান্ধবে নিশি পালন করতে হবে জাগ্রত অবস্থায়।

১৭। প্রাতঃকালীন ও মধ্যাহ্নকালীন পূজা পূর্ণ করে পূজকের ধর্ম্ম, সায়ংপূজা সফল করে ব্যবসায় এবং নিশিপূজায় সিদ্ধ হয় অভিলাষ। এই যে ত্রিকাল পূজা বর্ণিত হল, মনুষ্যলোকে এর চেয়ে পরম ব্রত আর কিছু নেই। বহু সর্ব্বাতিরেক ও ত্রাণকারী মন্ত্র ব্যবহার করা হয় এই কুঞ্জদেবতার পূজায়। তাদের মধ্যে যেটি সর্ব্বপ্রধান সেটি অষ্টাদশ অক্ষরের এবং ব্রহ্মোপম। যদি আপনাদের শ্রদ্ধা থাকে তাহলে বর্ণনা করতে পারি।"

১৮। স্পষ্ট উত্তর এল"—"আমাদের আচার্য্যটি এখনও দেখছি শিশুই রয়ে গেছেন। কেউ কি কখনও শুনেছে···বিনি-মন্ত্রের উপাসনায় দেবতা মেলে? মন্ত্রটি আমাদের দিন। দিগব্যাপী হোক্‌ আপনার যশ। আমরা মন্ত্রটি বধূদের কানে দেব। ইচ্ছে না থাকলেও সে মন্ত্র নিতেই হবে বউদের।"

১১। "নিশ্চয় নিশ্চয়। তাহলে এখন তাই করাই বিধেয়। আশা করি দেবতা খুসী হবেন।"···এই বলে স্বস্তিবাচনাদিক মঙ্গলাচরণ করে কুসুমাসব প্রকাশ করলেন সেই দেশ-কালোচিত মন্ত্ররাজটিকে; যথা—

২০। "অচিন্ত্যমহসে কুঞ্জদেবতায়ৈ রসাত্মনে স্বাহা।" অতিমধুর মন্ত্রোচ্চারে চমৎকৃতা হয়ে গেলেন শাশুড়ি মহোদয়ারা। পুনর্ব্বার তাঁদের উপদেশ দিলেন কুসুমাসব,—"এই হল কুঞ্জচর দেবতাটির স-রহস্য ও প্রকাণ্ড উপাসনা কাণ্ড। বিবিক্ত স্থানে যথারীতি পূজিত হয়েছেন কুঞ্জদেবতা,···এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই বেগহীনা হয়ে যাবেন যোগিনী,···কুলাপ্লাবিনী নদীর মত। ইতি।

অতএব গণনাশাস্ত্র ও উপাসনাশাস্ত্র এই আগম দুটিতে হে আর্য্যাগণ, প্রকটিত হল আমার অভ্যাস-মর্য্যাদা এবং দাক্ষিণ্য।"

২১। নবামৃতায়মান ও অনবদ্য এই ভাষণটি দিয়েই কৌতুকপটু বটু তাঁর কপট ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে দ্রুত প্রস্থান করলেন সেখান থেকে। শ্বশ্রূমাতারাও ঘরে ফিরলেন। মনের মধ্যে অনুক্ষণ আলোড়ন চলতে লাগল কুসুমাসবের সুযুক্তিভরা উপদেশ। প্রসন্ন হল তাঁদের মন। অতএব পরশ্রীকাতরতা বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁরা আহ্বান করলেন নিজের নিজের বধূদের। হূয়মান দহন-শিখার মত জ্বলতে জ্বলতে তাঁরা বললেন,—

২২। "আপনারা অভিজাত বংশে জন্মেছেন। গুণশীল উদারতায় বলতে গেলে সুরাসুর-বধূদেরও হারিয়ে দিয়েছেন। জানি আপনারা ধন্যা। কিন্তু একটি মহৎ দোষ আপনাদের রয়েছে যা পৃথিবীতে দুর্লভ।···সেটি হচ্ছে ভর্ত্তৃ-বৈমুখ্য। এইটিই নারীদের মুখ্য দোষ। শত্রুরদেরও যেন এ দোষ না লাগে। এই দোষ দূর করতে হলে বা নিজেদের সুখী করতে হলে আপনাদের যে কি করা উচিত, আশা করি আপনারা তা ভেবেও দেখেন নি। কিন্তু আমরা ভেবেছি। সহজ উপায় আছে। আশা করি শুনবেন।

শ্রীবৃন্দাবনের ঠিক মাঝখানটিতে একটি দেবতা থাকেন। তিনি অনুপম। কুঞ্জে কুঞ্জে তিনি ঘুরে বেড়ান। নিখিলের নিখিল কামনাই তিনি পূর্ণ করেছেন। আশা করি এবার থেকে তাঁরই আরাধনায় আপনারা যত্নবতী হবেন। তাতে, সৌভাগ্যোদয়ের বা[ধা] কেটে যাবে, স্বামী সুখী হবে, শ্রদ্ধা-প্রীতি বাড়বে স্বামীতে, আ[র] গুরুজনদেরও হাতে আসবে একটি আনন্দের সম্পত্তি।"

২৩। শাশুড়িদের কথা শুনে বধূদের যেন ধ্বস্ত হয়ে গেল সন্তোষ। শঙ্কায় কাঁপতে লাগল প্রাণ। ভাবতে লাগলেন,—"তবে কি এঁরা আমাদের পরীক্ষা করছেন? না আমাদে[র] ঘাড়ে কিছু চাপিয়ে দিয়ে অন্য কিছু পরীক্ষা করবার জোগাড় করছেন? এ কি রগড় না শাস্তি? এক কাজ করি; যতক্ষণ ন[া] এঁরা আমূল সব কথা খুলে বলছেন ততক্ষণ চুপ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি[,] অভিনয় করতে থাকি হৃৎকম্পের।"

২৪। বধূগণ যখন কথঞ্চিৎ সুস্থির হলেন তখন তাঁদে[র] হিতৈষিণীরা, অর্থাৎ যাঁরা নানান ছলে স্বামীদের চোখের আড়ালে রাখতেন যোগিনীর অপকর্ম্মগুলি, তাঁরা আমূল বর্ণনা করে গেলে[ন] দেশাচার-লব্ধ সেই ব্রতকথা।

২৫। বধূরা বর্ণনাটি শুনলেন। কুসুমাসব যেন বর্ণনার মধ্য দিয়ে ফুলের মধু ঢেলে দিয়েছেন তাঁদের কানে! কীর্ত্তি বটে এই রসায়ন-প্রয়োগ! তারপরেই একসঙ্গে তাঁদের সকলেরই মনে উদ[য়] হল,—"আশ্চর্য্য, কুসুমাসব তো তাহলে দেখছি আমাদের জন্য একটা মহোৎসবের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন···"।

বিভাবনাটির সঙ্গে সঙ্গে মিলে মিশে যেতে লাগল এঁর মুখের বিভা ওঁর মুখের বিভায়। ভাষায় রসের উষা ফুটিয়ে সহজ ভাবেই তখন তাঁরা শাশুড়িদের বললেন,—"আপনারা পূজনীয়া। আপনাদের এমন একটিও বউ নেই, যিনি আপনাদের প্রদর্শিত পথ ধরে নিঃশব্দে না চলবেন। অতএব তাড়াতাড়ি ব্রত পালন করা আমাদের কর্ত্তব্য। শরীর ক্ষইয়ে দিতে হ[য়] তাও দেবো। ঘরে বসে মিথ্যে সময় নষ্ট করে কাজ নেই। একটি প্রহরও আমাদের কাটে না সার্থক ভাবে। প্রিয়-সৌভাগ্যের সা[ধ] সকলেরি হয়। গান গেয়ে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্ছে···প্রযত্ন তালিকা।"

[ক্রমশঃ।

অথ স্বর্ণমৃগ কথা

মাধবী ভট্টাচার্য

একটি দ্বীপের মধ্যে আমার ঘর।
একটি দ্বীপকে কেন্দ্র করে আমার বসতি।
আর সেই দ্বীপের প্রান্তে জলের নাগাল বেয়ে
ঘন-সন্নিবদ্ধ যে ঘাসের বন—
সেই বনে মাথা গুঁজে রোদ পোহায় আমার সোনার হরিণ।
আমি ওর শিঙ দুটো দুমড়ে ভেঙ্গে দিয়েছি—
নাভির নিচে মাথা রাখবার সুবিধার জন্যে।

ঘাসের বনে বাতাস যখন শির্‌শিরিয়ে ওঠে,
অথবা আমার একলা ঘর যখন
একা একা আমাকে নিয়ে গুম্‌রোয়;
অথবা আমিই যখন আমার চারপাশের অনুপস্থিতির আড়ালে
উপস্থিতির প্রলম্ব ছায়া দেখে ডুকরে কেঁদে উঠি,
ও তখন ওর নাভি কণ্ডূয়ন থেকে অন্ততঃ এক পলকের জন্যেও
দু'চোখ মেলে তাকায়।

ওর চাউনীটা বড় বড়
কিন্তু একরোখা।
ও যেন দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে চায়—
ওর ভাঙ্গা শিঙ আবার জোড়া লাগবে কিনা।
আমার দ্বীপের ছোট্ট ঘরে ওর আর আমার বোঝাবুঝির শেষ নেই।

বার্ধক্যে

বারানসী

নীলকণ্ঠ

ষোলো

আকাশে সেদিন এক ফোঁটা আলো নেই; কেবল অন্তহীন অমা। বর্ষণমুখরিত শ্রাবণ রাত্রির নিশ্চিহ্ন অন্ধকারে এক [illegible]র এসেছে এক সাধুর আশ্রমে! চোর এবং সাধু এক জায়গায় যে এক [illegible]কথা বোধ হয় ওই বেচারা চোর জানতো না। চোর এবং সাধু [illegible]গোচর দুজনেই। চোর ঘুরে বেড়ায় ধনসিদ্ধ হবার আশায়; [illegible]ধু জেগে থাকে যোগের আসনে ধ্যানসিদ্ধ হবার দুরাশায়। বেচারা [illegible]র যখন সেই সাধুর সামান্য যা কিছু অপহরণ করে পোঁটলা বেঁধে [illegible]ত্রার উদ্যোগ করছে, ঠিক তখনই গুপ্তস্থান থেকে কি কারণে কে [illegible]নে, বোধ হয় তস্করের কুষ্ঠি সেদিন বেজুত বলেই এমন হয়ে থাকবে, [illegible]ধু এসে পড়েছেন স'পোঁটলা প্রস্থানোদ্যত চোরের একেবারে [illegible]মনাসামনি। চোর ও সাধু দু'জনেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একটুখানি [illegible]ৎ ফিরে পেতে না পেতেই পোঁটলা-পুঁটলি সব ফেলে দিয়ে চোর [illegible]র্তে ভোঁ দৌড় দেয়। একটু পরে, খুব বেঁচে গেছে আজ মনে [illegible]রে অন্ধকারে হাঁফ ছাড়বার জন্যে যেই দাঁড়িয়েছে সেই বিদ্যুতের [illegible]লোয় চোর দেখে সর্বনাশ, সাধু দৌড়ে আসছেন তার পেছন-পেছন [illegible]রের ফেরৎ দিয়ে আসা সেই পোঁটলা বগলে করে। আবার [illegible]ড় সুরু হয়ে যায় চোরের। গন্তব্য-অনির্দিষ্ট এই দৌড়পাল্লায় [illegible] জেতে কে হারে শেষ পর্যন্ত বলা শক্ত হতো যদি না হঠাৎ [illegible]দ্যুতের মতোই চোরের পক্ষে আশ্চর্য এক চিন্তা না খেলে যেত [illegible]ই তস্করের মাথায়।

হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তেই সেই চোরটার মনে হলো, সাধু যদি [illegible]কে ধরবে বলেই তার পিছু নিয়েছেন তাহলে তাঁর বগলে চুরি [illegible]রতে না পারা পোঁটলা কেন? মনে করার জন্যে মুহূর্তের শ্লথগতির [illegible]লেই হবে, ততক্ষণে সাধু এসে পড়েছেন চোরের নাগালের মধ্যে। [illegible]র একটু তফাৎ থেকেই ছুঁড়ে দিলেন সাধু চোরের ফেলে রেখে [illegible]ওয়া সাধুর অমূল্যবান তবু অমূল্য সম্পত্তি। এবং জোড়হাত [illegible]রে অসাধুকে বলতে লাগলেন সেই সাধু: এগুলি আমার নয়; [illegible]মার। দয়া করে তুমি তোমার জিনিষ নিয়ে আমাকে করো [illegible]পমুক্ত। এগুলি নেবার সময় আমি অজ্ঞান্তে তোমার বাধা পাবার [illegible]বং শূন্য হাতে যাবার কারণ হয়েছিলাম,—এজন্যে আমার অপরাধের [illegible]স্তি দাও তুমি এগুলিকে গ্রহণ করে।

শ্রাবণাকাশের চেয়েও মানুষের চোখ থেকে যে উদ্গত হতে পারে [illegible]নেক বেশি জল,—একথা সাধুর সামনে দণ্ডায়মান সেই অসাধুকে [illegible]উ দেখতে পেলে কেবল সে-ই সৌভাগ্যবানই তা দেখতে পেত [illegible]রতো।

যে সাধু মুহূর্তের মধ্যে এক অসাধুকে রূপান্তরিত করেন সাধুতে, তিনি গাজীপুরের সিদ্ধযোগী পওহারী বাবা। তাঁর কথা বলবার আগে সেই চোরের কথা বলে নি আরেকটু।

নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হননি তখনও। নিজের দেশটাকে নিজের চোখে চেখে চেখে বেড়াচ্ছেন তখন চিরভ্রাম্যমান সেই অদ্বিতীয় ভারতীয় সন্ন্যাসী, মেরামত করবার আগে ইঞ্জিনীয়ার যেমন করে দেখে নেয় উল্টেপাল্টে ক্ষয়ে আসা যন্ত্রদানবকে। স্বদেশের বেদনায় তাঁর বুক বিদীর্ণ হয় বারবার। বইয়ে পড়া ভারত নয়; চোখে দেখা ভারতের দুঃখ, দৈন্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য চোখে দেখা যায় না বুঝি! দামাল ছেলে যেমন দাপাদাপি করে বেড়ায় ঘরময়; উল্টেপাল্টে নেড়েচেড়ে তছনছ করে জানতে চায় কি, কেন, কবে, কখন, কোথায়; তেমনই রামকৃষ্ণের দুর্নিবার শক্তি মূর্তিমান ভারত নরেন্দ্রনাথ ভারতমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করে বেড়াচ্ছেন নরেন্দ্র-থেকে অনাথের দ্বারে দ্বারে দুরন্ত বেগে অফুরন্ত আবেগে মুহুর্মুহুঃ মথিত হতে হতে।

সেই সময় হৃষীকেশে এক সাধু তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সাধুই সেই চোর, যাকে একজন্মে পওহারী বাবা চোর থেকে সাধুতে উত্তীর্ণ করে দিয়ে যান। নরেন্দ্রনাথের কাছে সাধু তাঁর চোরজীবনের অপরূপান্তরের কাহিনী অকপটে বিবৃত করবার পর বলেন: "তিনি (পওহারী বাবা) যখন আমায় নারায়ণ জ্ঞানে অকুণ্ঠিত চিত্তে সর্বস্ব দান করিলেন, তখন আমি নিজের ভ্রম ও হীনতা বুঝিতে পারিলাম এবং তদবধি ঐহিক অর্থ ত্যাগ করিয়া পরমার্থের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলাম

—[স্বামী বিবেকানন্দ : প্রথম খণ্ড : প্রমথনাথ বসু]।

স্বামীজ এই সাধুর কথা স্মরণে রেখেই ম্যারিকায় একবার বলেছিলেন 'পাপীর মধ্যেও সাধুর অঙ্কুর দেখা যায়।' রত্নাকরের বাল্মীকি হবার ইতিহাস রামায়ণের যুগের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়নি।' বিবেকানন্দর মতো ভারতপথিক সেই ইতিহাসের দেখা রামায়ণের দেশ ভারতবর্ষে বারবার পেয়েও বিস্মিত হননি কখনও।

আমি এর আগে বলেছি যে ভারতবর্ষের যতেক ধ্যানী ঈশ্বরান্বেষক আজও পর্যন্ত এসেছেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেককেই কখনও না কখনও কাশীতে আসতেই হয়েছে। কেউ কেউ আবার শেষ পর্যন্ত এখানেই থেকে গেছেন চিরকালের মতো। মর্ত্যলীলা প্রকট এবং সংবরণও তাঁরা কাশীতেই করেছেন। এখন আমি যাঁর কথা বলতে যাচ্ছি তিনি কাশীতেই আবির্ভূত হন। বারাণসীর অন্তর্গত গুজীর কাছাকাছি এক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে এই সাধকের আবির্ভাব। দীর্ঘকাল

ধরে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত গুহার মধ্যে অনাহারে অকাতর এই যোগীকে কিছু খেতে না দেখে লোকে তাঁকে পও(ন)-আহারী অর্থাৎ বায়ুভূক বলে জানতো। তার থেকেই সাধকের নাম দাঁড়িয়ে যায় পওহারী বাবা।

পওহারী বাবা কাশীতে জন্মান; কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও সাধনার ক্ষেত্র ছিলো গাজীপুর। ১৮৯০-এর জানুয়ারী মাসে নরেন্দ্রনাথ গাজীপুরে আসেন। পওহারী বাবাকে দর্শন করবার জন্যে আশ্রমের খুব কাছে এক লেবুবাগানে তিনি আশ্রয় নিলেন। পওহারী বাবার দেখা পাওয়া তখন ভগবানের দেখা পাওয়ার পরেই সব চেয়ে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিলো। রোজ ধর্ণা দিয়ে নরেন্দ্রনাথ পড়ে থাকতেন বাবাজীর দরজায়। একদিন এরই মধ্যে দর্শন হলো না বটে, তবে আলাপ হলো। দরজার এপারে নরেন্দ্রনাথের প্রশ্ন জাগে; দরজার ওপার থেকে উত্তর আসে পওহারী বাবার। নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন—তিতিক্ষা জাগে কি করে? পওহারী বাবার জবাব তৎক্ষণাৎ: গুরুর কাছে নৌকার মতো পড়ে থাকো। পওহারী বাবা নরেন্দ্রনাথ না জিজ্ঞেস করলেও যে কথাটা বারবার নিজে থেকে বলতেন সেটি তাঁর জীবনের পরীক্ষিত সত্য: 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি'।

পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ স্বয়ং পওহারী বাবার একটি ছোট জীবনচরিত রচনা করেন। সেই পুস্তিকার উপক্রমণিকায় স্বামীজী পওহারী বাবা এবং ওইরকম যোগীদের জীবনের এবং জীবনীর কি প্রয়োজন সে কথাই বোঝাতে গিয়েই বোধ হয় বলেছেন: যাঁহাদের বাক্যতুলিকা আদর্শকে অতি সুন্দর বর্ণে অঙ্কিত করিতে পারে অথবা যাহারা সূক্ষ্মতম তত্ত্বসমূহ উদ্ভাবন করিতে পারে, এরূপ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অপেক্ষা এক ব্যক্তি, যে নিজ জীবনে উহাকে প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছে—সেই অধিক শক্তিশালী।

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত যোগী জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য এবং সাধনাই এক। সে উদ্দেশ্য এবং সাধনার মর্মবাণী হচ্ছে: দর্শন ছাড়া দর্শনের কোনও অর্থ নেই জীবনে।

পওহারী বাবার পিতৃব্য আজন্ম ব্রহ্মচারী পওহারী বাবাকে গাজীপুরের উত্তরে নিজের জায়গায় নিজের কাছে এনে রাখেন। তাঁর এই সময়ের এবং কিছু পরের সঙ্গীরা যে সাক্ষ্য দেন তাঁর কিশোর-কালের তা থেকে জানা যায়, তিনি যেমন অধ্যয়ন, তেমনই রঙ্গপ্রিয় ছিলেন। কখনও কখনও তাঁর রঙ্গপ্রিয়তার মাত্রাতিরিক্ততার কারণে সঙ্গীরা সাঙ্ঘাতিক নাজেহাল হতেন। এর অল্পকালের মধ্যেই পিতৃব্যের পরলোকগমনে শোকাহত অধ্যয়ন ও রঙ্গরত যুবক যিনি শেষ জীবনে পওহারী বাবা নামে খ্যাত হন তিনি বিবেকানন্দর ভাষায় সেই সময় এই ভাবে উপস্থিত হয়েছেন: 'তখন সেই 'উদ্দাম যুবক, হৃদয়ের অন্তস্তল শোকাহত হওয়ায়, ঐ শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য এমন বস্তুর অন্বেষণে দৃঢ়সংকল্প হইলেন, যাহার কখন পরিণাম নাই।'

ভারতীয় দর্শন পাঠের পর অতঃপর এই সময়েই পওহারী বাবা ভারত দর্শন করতে বেরুলেন।

ভারত পরিক্রমার পথে গিরনার পর্বতের শীর্ষে তাঁর অন্বেষণের প্রথম পর্ব শেষ হয় বলে তাঁর বাল্যবন্ধুদের ধারণা। গিরনারে তাঁর বন্ধুদের মতে যোগসাধনার রহস্যে দীক্ষিত এই যুবক এর পর বারাণসীর গঙ্গাতীরে এক যোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ভ্রমণপর্বের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত আজ আর কোথাও পাবার উপায় নেই; তবে বিবেকানন্দের অনুমান: 'তাঁহার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ গ্রন্থ যে ভাষায় লিখিত সেই দ্রাবিড় ভাষাসমূহে তাঁহার জ্ঞান দেখিয়া এবং শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের প্রাচীন বাঙলা ভাষার সম্পূর্ণ পরিচয় দেখিয়া আমরা অনুমান করি, দাক্ষিণাত্যে ও বাঙ্গালাদেশে তাঁহার স্থিতি কম অল্পদিন হয় নাই।' এই সময়েই তিনি আবার বারাণসীতে আরেক সন্ন্যাসীর কাছে অদ্বৈতবাদের পাঠ নিচ্ছিলেন বলেও জানা যায়।

ভ্রমণ, অধ্যয়ন, সাধনার পর ব্রহ্মচারী সেই অন্বেষক ফিরে এলেন তাঁর প্রতিপালক পিতৃব্য-ভূমিতে। তাঁর বাল্যবন্ধুর দল ফিরে আসা বন্ধুর মধ্যে আর সেই পুরানো দিনের ভাব ফিরে পেলেন না। সেই মুখে তখন যে সংকেত, সে ভাষা যিনি পড়তে পারতেন সেই পিতৃব্য তখন ইহলোকে নেই। বিবেকানন্দ বলেছেন, পওহারী বাবার প্রতিপালক বেঁচে থাকলে সন্তানতুল্য ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখে তিনি নিশ্চয়ই সেই আলো দেখতে পেতেন যার জ্যোতিচ্ছটা দেখে স্মরণের অতীত এক কালে ঋষি তাঁর শিষ্যের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন: 'ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্যভাসি।' [ব্রহ্মজ্যোতিতে তোমার মুখ আজ জ্যোতির্দীপ্ত দেখছি, সৌম্য!]

পিতৃব্য-ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের পর সাধনোন্মত্ত ব্রহ্মচারী বারাণসীবাসী তাঁর যোগগুরুর মতো মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে গুহাবাসী হলেন। নির্মম নিভৃত তপস্যার জন্যে তৈরী হলেন তিনি। প্রথমে কয়েক ঘণ্টা বাস করতে এবং উপবাস করতে আরম্ভ করলেন সেখানে। কয়েক ঘণ্টা সেখানে কাটানোর পর উঠে আসতেন ভূমির উপরে আশ্রমে। রামচন্দ্রের পুজারী রন্ধনবিদ্যায় অসাধারণ পটু এই জীবনযোগী ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে বন্ধু এবং দরিদ্রনারায়ণকে বিলিয়ে দিতেন ভোগরাগ। আশ্রমে আর যারা ছিলো তারা নিদ্রিত হলে চলে যেতেন সাঁতরে গঙ্গার ওপারে। সেখানে অরণ্যসাধনা শেষ করে যখন ফিরে আসতেন ফের আশ্রমে, তখনও আশ্রমবাসী বন্ধুদের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি।

খাওয়া এক গঙ্গার ওপারে যাওয়া যত কমতে থাকে, ততই বাড়তে থাকে মাটির নীচে থাকার সময়। এক মুঠো তেতো নিম পাতা বা কয়েকটা লঙ্কা হলো সারাদিনের আহার। তারপর সুপবন বইলো অনুকূল পরিবেশে। গুহার মধ্যে কেটে যেতে লাগলো দুশ্চর তপস্যায় রত বিনিদ্র রাত। এই সময়ই তিনি কি খেয়ে থাকেন এই জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রশ্নকর্তারা নিজেরাই নির্ধারণ করলেন: পও [ন] অর্থাৎ শুধু বায়ু বলে। তাই থেকেই তাঁর নতুন নাম হলো পওহারী বাবা। জীবনে কখনও যোগ এবং এই গুহা-সংযোগ ত্যাগ করেননি তিনি। এবং অন্তত একবার, বিবেকানন্দর কথায়: 'তিনি এত অধিকদিন ধরিয়া ঐ গুহার মধ্যে ছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে মৃত বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কিন্তু অনেকদিন পরে আবার বাবা বাহির হইয়া বহু সংখ্যক সাধুকে ভাণ্ডারা দিলেন।'

বিবেকানন্দ যখন নরেন্দ্রনাথ তখন পওহারী বাবাকে তিনি প্রশ্ন করেন যে বাবা কেন গুহার বাহিরে এসে জগতের উপকারের জন্য কিছু কাজ করেন না? জীবনরসরসিক নিত্যযোগী হাসতে হাসতে এক গল্প বলেন। গল্পটি এক নাককাটা সাধুর। কোনও এক সময়ে কোনও এক অপকর্মের কারণে এক দুষ্ট প্রকৃতির লোকের নাক কেটে

...অন্য লোকে। কাটা নাক নিয়ে সমাজে বেরুতে লজ্জা ...য় সে বনে গেলো। সেখানে বাঘের ছাল পেতে, গায়ে ছাই ... বসলো। কারুর পায়ের সাড়া পেলেই চোখ বুজে ধ্যানের ...ত নাককাটাকে মস্ত সাধু মনে করে প্রথমে দু'একটি, পরে দলে ... সেই অরণ্যসন্নিকট গ্রামের লোকেরা আসতে আরম্ভ করলো। ... অনেকেই সাধুদর্শনে শূন্য হস্তে যেতে নেই বলে বেশ কিছু ...শহস্তের উপযুক্ত উপকরণ উপঢৌকন হিসেবে দিয়ে যেতে থাকলো। ...বিকানির্বাহের ভয় রইলো না আর নাককাটার।

'তাবচ্চ শোভতে মূর্খ যাবৎ ন ভাষতে',—এই অনুজ্ঞানুযায়ী ...ককাটা মৌনী থাকার ফলে সিংহচর্মাবৃত গর্দভের ধরা পড়বার সময় ...রপরাহত ছিলো। কিন্তু কালে দুঃসময় ঘনিয়ে এলো নাককাটা ...াক সেই অসাধুর। নিত্য আগন্তুক ভক্তদের মধ্যে একজন দীক্ষার ... এমন পীড়াপীড়ি করতে লাগলো যে তখন আর কিছু একটা না ...লে অথবা না করলে এতদিনের নীরব প্রতিষ্ঠা সব যায়। নিরুপায় ... নাছোড়বান্দা সেই দীক্ষাকাতর ভক্তকে নাককাটা একদিন ...া দিতে রাজি হলো। অথবা বলা উচিত হবে যে বাজি ...তে বাধ্য হলো। শুধু বললো: আগামীকাল্য একখানি ধারালো ... নিয়ে এসো দীক্ষার সময়ে। দীক্ষোন্মত্ত যুবক পরের দিন ...ক-প্রত্যুষেই তীক্ষ্ণধার ক্ষুর হাতে এসে দাঁড়াল। নাককাটা [...]-সাধু তাকে অরণ্যের আরও অভ্যন্তরস্থল নিয়ে গেলো এবং ... ক্ষুর নিজের হাতে নিয়ে তার তীক্ষ্ণধার পরীক্ষা করবার পর এক ...োপে যুবক দীক্ষেচ্ছুর নাক কেটে দিলো যুবক জানবার আগেই। ...রপরে ইষ্টমন্ত্র দিলো এই বলে যে: হে যুবক, আমি এইভাবেই এই ...মে দীক্ষিত হয়েছি। সেই দীক্ষাই আমি তোমাকে দিলাম। ...ন তুমিও সুবিধে পেলেই অনলস হয়ে এই নাককাটা-দীক্ষাই দিতে ...বে; কারণ তোমার না দিয়ে উপায় থাকবে না আর।

গল্প শেষ করে পওহারী বাবা বলেন নরেন্দ্রনাথকে: এইভাবে এক ...কাটা সাধু সম্প্রদায় দেশকে ছেয়ে ফেললো। তুমি কি আমাকেও ...প আরেকটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা দেখতে চাও?

একই সঙ্গে জীবনরসরসিক এবং ...নধ্যানী পওহারী বাবার মুখে রঙ্গের ...ধনু মিলিয়ে যেতে না যেতে দেখা দিলো ...ার তরঙ্গ। এবারে তিনি বললেন: ...মি কি মনে কর, স্থূলদেহ দ্বারাই কেবল ...রের উপকার সম্ভব? একটি মন শরীরের ...হায্য-নিরপেক্ষ হইয়া অপর মনসমূহকে ...হায্য করিতে পারে, ইহা কি সম্ভব বিবেচনা ... না?

পওহারী বাবাকে আরেকবার জিজ্ঞেস ...া হয় যে তিনি এত বড় যোগী হয়েও ...ম শিক্ষার্থীর করণীয় মূর্তিপুজা হোম ...্যাদি এখনও কেন করেন। এর জবাবে ...নযোগী বলেন: সকলেই নিজের কল্যাণের ... কর্ম করে, একথা তুমি ধরে নিচ্ছ কেন? ...জনের কি অপরের জন্যেও এসব ...তে বারণ?

বিবেকানন্দ অতঃপর তাঁর পওহারী বাবা-চরিতে পওহারী-চরিত্রের আরেকটি দিক সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পূজা যে মন নিয়ে করতেন ঠিক সেই মন নিয়েই, সেই শ্রদ্ধা নিয়েই পূজার তাম্রকুণ্ডও মাজতেন। তার কারণ তাঁর জীবন ও বাণী এক ও অভিন্ন: যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি। অর্থাৎ সিদ্ধির উপায়কেও এমন ভাবে আদর-যত্ন করিতে হইবে, যেন উহাই সিদ্ধিস্বরূপ। [পওহারী বাবা: তৃতীয় অধ্যায়]

গোখরো সাপের কামড়ে মৃতবৎ পওহারী বাবা বেঁচে উঠে বলেন একবার: পাহন দেবতা আয়া। শুধু সাপের নয়, রোগের আক্রমণকেও তিনি তাঁর প্রিয় পাহন দেবতার দূত জ্ঞান করে গেছেন বারবার। একথা ঠিক নয় যে পওহারী বাবার সাপের কামড়ে বা রোগের জ্বালায় দেহে কোনও যন্ত্রণা হতো না। না। বরং এর উল্টোটাই সত্য। অর্থাৎ তাঁরও নিদারুণ যন্ত্রণা হতো; তবুও। তাঁর ধ্যানের দেবতার দেওয়া এই দুঃখের আশীর্বাদকে কেউ অসুখ বলবে এ তাঁর অসহ্য ছিলো। তাই দুঃখের বরষায় চক্ষের জলকে কবি যেমন বন্ধুর রথ জীবনের দরজায় থামা বলে মনে করেছেন, এই মহাত্মাও বিষধরের কামড়কে মনে করেছেন ধনুর্ধর জীবনদেবতার মঙ্গল দূত!

দীর্ঘ, মাংসল, এক চক্ষু মানুষ পওহারী বাবার অসাধারণ বিনয়ের উৎস যে ভাব, পওহারী বাবা তার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দর রাজসিক ভাষায় তা: 'হে রাজন্, সেই প্রভু ভগবান অকিঞ্চনের ধন—হাঁ, তিনি তাহাদেরই যাহারা কোন বস্তুকে, এমন কি, নিজের আত্মাকে পর্যন্ত 'আমার' বলিয়া অধিকার করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছে।'

শেষ দশ বছর পওহারী বাবা লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে চলে যান। তাঁর গুহার উপরে স্থিত আশ্রম থেকে হোমের পবিত্র পাবকের ভাষা ধোঁয়ার আগুন উঠলেই বোঝা যেত তিনি সমাধি থেকে উঠে এসেছেন। একদিন সেই ধোঁয়ার সঙ্গে ভেসে এলো পোড়া মাংসের গন্ধ। দরজা ভেঙ্গে কৌতূহলীরা দেখলো সব শেষ, পওহারী বাবার শব পর্যন্ত তাঁরই জ্বালা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বিবেকানন্দর অনুমান তাঁর প্রিয় এই আচার্যের আগুনে পুড়ে শেষ হবার সম্পর্কে তাঁর ভাষাতেই এখানে উদ্ধার করে দিই: 'আমাদের বোধ হয়, মহাত্মা বুঝিয়াছিলেন তাঁহার শেষ সময় আসিয়াছে। তখন তিনি, এমন কি মৃত্যুর পরেও যাহাতে কাহাকেও কষ্ট দিতে না হয়, তজ্জন্য সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে আর্য্যোচিত এই শেষ আহুতি দিয়াছিলেন।'

আত্মার বাণী এক মহৎ জীবনের আহুতিতে তার আলোর ভাষা পেয়েছে আর একবার,—আমরা এই মাত্র বলতে পারি।

পওহারী বাবার কাছে নরেন্দ্রনাথ দীক্ষাপ্রার্থী হয়েছিলেন একবার,—পওহারী বাবার জীবনে এটি যেমন, রামকৃষ্ণের কাছে দীক্ষা পাবার পরেও পওহারী বাবার কাছে ভিক্ষা পাবার প্রচেষ্টাও তেমনই নরেন্দ্রনাথের জীবনেও অদ্বিতীয় ঘটনা। যোগমার্গে বিচরণশীল বিচারশীল সাধু পওহারী বাবার কাছে নরেন্দ্রনাথের দীক্ষা প্রার্থনার কারণ পওহারী বাবার মতো ওই পথের পথিক হবার ও দীর্ঘকাল এক জায়গায় বসে সমাধিস্থ থাকবার রহস্যাবগতির দুর্বার বাসনা ছাড়া আর কিছু নয়। স্বামীজীর জীবনচরিতকারেরা আরও জানাচ্ছেন যে স্বামীজি রাজযোগ-প্রার্থী মাত্র হয়েছিলেন পওহারী বাবার কাছে। একটি চিঠিতে অখণ্ডানন্দের কাছে তিনি লিখছেন: Our Bengal is the land of Bhakti and Jnana, Yoga is scarcely mentioned there. What little there is, is but the queer breathing exercises of the Hatha Yoga—which is nothing but gymnastics, Therefore I am staying with this Raja-Yogin—and he has given me some hope. [Life of Swami Vivekananda: by His Eastern and Western Disciples: Vol 1] পওহারী বাবার কাছে যোগপ্রার্থনা রামকৃষ্ণের প্রতি অভক্তির সূচনা মনে করতে পারতেন যে হতভাগ্যেরা, তাদের উদ্দেশে বিবেকানন্দ ওই চিঠিতেই লিখছেন: My motto is to learn to recognise good, no matter where I may come accross it. This leads my friends to think that I may lose my devotion to the Guru. These are ideas of lunatics and bigots. For all Gurus are one, fragments and radiations of God, the Universal Guru.

কিন্তু পওহারী বাবার কাছে শেষ পর্যন্ত কিছু পাওয়ার নেই, বিবেকানন্দর, তা বোঝাতে নরেন্দ্রনাথের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের শ্রীরামকৃষ্ণ। দীক্ষার দিন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তখন, চিঠিতে তিরস্কার করা সত্ত্বেও প্রেমানন্দ নরেন্দ্রনাথকে প্রতিনিবৃত্ত করতে এসে ব্যর্থ প্রত্যাবর্তন করেছেন তখন; নরেন দৃঢ়সঙ্কল্প,—পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা নেবেই সে। লেবুবাগানের নির্জন অন্ধকারে বিনিদ্র নরেন্দ্রনাথ প্রতীক্ষা করছেন দীক্ষাদিবসের। আর তখনই বিজন ঘরের নিশীথ রাতের দরজায় নিঃশব্দ চরণে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি, যিনি নরলোকে একদিন নরেনকে টেনে নিয়েছিলেন অন্ধকার থেকে আলোকে; মরলোকের কানে উচ্চারণ করেছিলেন অমরলোকের ভাষা,—সেই রামকৃষ্ণ। তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে শিষ্যের দিকে, সন্তানের দিকে সেই চোখে যে চোখ-এর জন্যে অন্ পৃথিবীর আকুল প্রার্থনা উচ্চারিত কবিকণ্ঠে: জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এস।

অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরপ্রান্তে ক্ষণকালের চিত্তবৈকল্যে ফেলে দিয়েছিলো গাণ্ডীব, তখন তাঁকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। নরেন্দ্র যখন নরের মতো ব্যবহার করতে উদ্যত হলো, তখন দেখা দিলেন অপরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ। রাম এবং কৃষ্ণ বার বার এসেছেন নরের জন্যে মরলোকে অমরলোক থেকে। জন্মমুহূর্তে মায়ের কাছে বলিপ্রদত্ত নরেন্দ্রনাথের জন্যে এসেছেন শুধু রামকৃষ্ণ। চিরশিষ্যের সঙ্গে চিরন্তন গুরুর চারি চক্ষের শুভদৃষ্টিমাত্র অশুভযোগ কেটে যায় নরেন্দ্রর। তাঁর মুখ থেকে হৃদয় বিদীর্ণ করে বিস্ফোরিত হয় জয়ধ্বনি: জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ!

পৃথিবীতে মধুগন্ধবহ যত পুষ্প তাদের প্রত্যেকের বাতাসে হেলেদুলে অধিকার আছে এ-মুখো সে-মুখো হবার। নেই শুধু সূর্যমুখীর; কি সূর্যোদয়ে, কি সূর্যাস্তে;—কারণ সূর্যমুখী কেবল সেই যে সদাই সূর্যোন্মুখ!

ঈশ্বর কোথায় নেই। তিনি উর্ধ্বে আছেন, অধে আছেন; সর্বভূমিতে আছেন ভূমা। ঈশ্বর বামে আছেন; দক্ষিণেও আছেন প্রতি নরের জন্যে; কিন্তু নরেন্দ্রনাথের জন্যে জেগে আছেন দক্ষিণেশ্বরে!

[ক্রমশঃ।

মাতৃ-গীতি

রমেন চৌধুরী

ওমা পারি না যে আর সহিতে,
ব্যথাভরা এই জীবনের বোঝা
মুখ বুজে শুধু বহিতে!
ক্ষণে ক্ষণে জ্বালা, পদে পদে দুখ
আঘাতে আঘাতে ভেঙে দেয় বুক
স্নেহের আঁচলে ঢাকিবে কে মোরে,
বিশাল তোমার মহীতে!

যারে পাই তারে দু' হাতে আমার
জড়ায়ে ধরেছি যে কতো যে,
হেলাভরে সবে দূরে সরে যায়
নহি কারো মনোমতো যে!
পাওয়ার বাসনা কিছু নাই আর
কোলে টেনে নাও জননী আমার
প্রাণের কথাটি তোরই সাথে মাগো চাহি যে এবার কহিতে!!

মায়ের মমতা ও
অষ্টারমিল্কে
প্রতিপালিত
OSTERMILK
আপনার শিশু অষ্টারমিল্কে প্রতিপালিত বলেই
এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, সদাই হাসি খুশী। কারণ
অষ্টারমিল্ক ঠিক মায়ের দুধেরই মতন। অষ্টারমিল্ক
খাঁটি দুধ থেকে শিশুদের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে
তৈরী। সেজন্য সহজেই হজম হয়। শিশুদের
রক্তাল্পতা থেকে বাঁচাবার জন্য অষ্টারমিল্কে লৌহ
আছে। এতে ভিটামিন 'ডি' ও যোগ করা হয়েছে,
ফলে আপনার শিশুর দাঁত ও হাড়
মজবুত হয়ে গড়ে উঠবে।
........মায়ের
দুধেরই মতন
বিনামূল্যে অষ্টারমিল্ক
পুস্তিকা (ইংরেজীতে)
আধুনিক শিশু পরিচর্য্যার সবরকম
তথ্য সম্বলিত। ডাক খরচের
জন্য ৫০ নয়া পয়সায় ডাক টিকিট
পাঠান—এই ঠিকানায়
'অষ্টারমিল্ক' পোঃ বক্স নং ২২৫৭
কোলকাতা—১

পরমাণুর কথা

অশোককুমার দত্ত

আমাদের চারপাশে যে সকল জিনিষ দেখতে পাই তাদের মূলে আছে পরমাণু, পরমাণুর সমবায়ে নিখিল বিশ্ব গঠিত। এই পরমাণু আকারে অত্যন্ত ছোট—এতো ছোট যে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তুমি তা দেখতে পারে না! আলপিনের মাথা লম্বায় এক ইঞ্চির ২৫ ভাগের এক ভাগ; কিন্তু পরমাণু তার থেকেও অনেক ছোট, পঞ্চাশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এতো ছোট জিনিষকে আমরা ঠিক ধারণা করতে পারি না, যেমন সূর্য্য যে কত বড় তা আমাদের ধারণায় আসে না। পরমাণু এতোই ছোট এবং সূর্য্য এতোই বড়!

সূর্য্য ও পরমাণু

এক বিষয়ে কিন্তু সূর্য্যের সাথে পরমাণুর মিল রয়েছে। পরমাণুর গঠন সূর্য্যের অনুরূপ। খুব আশ্চর্য্য লাগছে, তাই না? সূর্য্যকে কেন্দ্র করে যেমন নয়টি গ্রহ প্রদক্ষিণ করে, পরমাণুরও তেমনি একটি কেন্দ্রবস্তু আছে। এই কেন্দ্রের চারিদিকে অতি ছোট ছোট বস্তুকণা নিয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগুলোকে বলা হয় ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের কাজের সঙ্গে তোমরা কিন্তু সবাই পরিচিত। এমন অবাক হচ্ছো কেন? ইলেকট্রিসিটি মানে তো ইলেকট্রনেরই প্রবাহ। বিদ্যুতে আজ আলো জ্বলে, ইস্ত্রি গরম হয়, চাই কি রান্না করাও চলে—এ সব হলো এই ইলেকট্রনের ব্যাপার।

পরমাণুর উপাদান

ইলেকট্রন পরমাণুর এক উপাদান মাত্র। এমনি আরো উপাদান আছে (নামগুলো মনে রাখতে পারবে কি?)—প্রোটন, নিউট্রন, মেসন ইত্যাদি। এবার আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি পরমাণু নিজে খুব ছোট হলেও তার ভেতর আরো ছোট ছোট অনেক কিছু রয়েছে। এদের মধ্যে ইলেকট্রনই সবচেয়ে হাল্কা এবং তোমাদের মত দুরন্ত বা অস্থির—পরমাণুর মধ্যে অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রোটন বা নিউট্রন কিন্তু এমন নয়, তারা স্থির হয়ে পরমাণুর কেন্দ্রে বসে আছে।

ধরো, একটি পরমাণুকে মস্ত এক ঘরের সঙ্গে তুলনা করা... তখন তার কেন্দ্রস্থলে প্রোটন-নিউট্রনের মিলিত আকার হবে... মটরদানার মত। চঞ্চল ইলেকট্রনগুলি পিঁপড়ের মত আকার... দেওয়ালের চারপাশ ঘেঁষে অনবরত বেড়াবে। ফলে পরমাণুর... অধিকাংশ স্থানই ফাঁকা। সামান্য একটি পরমাণু, অথচ তার... কৌশল কত বিচিত্র!

তেজস্ক্রিয়তা

পরমাণুর ইংরেজী নাম হলো 'এটম্'। এটম্ মানে—'যাকে... যায় না।' এটা কিন্তু ঠিক নয়। মাঝে মাঝে পরমাণুগুলি... থেকেই ভেঙে যায়। ম্যাডাম ক্যুরীর নাম যদি শুনে... রেডিয়ামের কথাও নিশ্চয়ই শুনেছো। রেডিয়ামের পরমাণু... ভাঙতে শেষকালে সীসা বনে যায়। শুনে অবাক হওয়ারই কথা... তা হলে তো লোহার থেকে সোনা পাওয়া যেতে পারে! ... একশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক করে আসছিলেন বটে, কিন্তু তোমরা... কেউ তা পারেননি। তবে প্রাকৃতিক কারণে রেডিয়াম সীসা... পারে, অথবা ইউরেনিয়াম থেকে নূতন ধাতু পাওয়া যায়। ... বোধ হয় শুনেছো, পৃথিবীতে ৯২ রকমের পরমাণু আছে (... পরমাণু আর রেডিয়ামের পরমাণু এক নয়, যেমন লোহা এবং ... পরমাণু এক হতে পারে না)। কতকগুলি বেশ ভারী, কতক... আবার হাল্কা। ভারীগুলি ভেঙে হাল্কা পরমাণু হতে পারে। এ... তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিও একটিভিটি। নামটি বেশ শক্ত, কি... তেজস্ক্রিয়তার গুণে ক্যান্সার রোগ ভাল হয়।

পরমাণুর শক্তি

তোমাদের মধ্যে যারা বেশ বুদ্ধিমান, প্রশ্ন করতে পারে... পরমাণু ভেঙে ছোট পরমাণু হলো তা নয় বুঝলাম, রেডিয়াম ... তার থেকে এলো সীসা। কিন্তু সীসার পরমাণু গঠনের জন্য ... এটমের সবটুকু তো আর লাগছে না। রেডিয়ামের সেই ... অংশটুকু গেল কোথায়? এর উত্তরে আইনষ্টাইনের নাম ... করতে হয়। তিনি বলে গেছেন, পদার্থ এবং শক্তি একই জিনিষের... বিভিন্ন রূপ মাত্র. পদার্থের মূলে আছে পরমাণু, শক্তি* তা নয়; ... আশ্চর্য্যের কথা এই যে, পদার্থ শক্তিতে এবং শক্তিও পদার্থে রূপান্তরিত... হতে পারে। রেডিয়াম থেকে সীসা তৈরীর সময়েও কিছু পরিমাণ... পদার্থ শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। 'এটম্ বোমা'তেও তাই... 'হাইড্রোজেন বোমা'র মূল তত্ত্বটিও তাই। এমন কি, সূর্য্যের ভিতরে... একই জিনিষ হচ্ছে—পদার্থকে শক্তিতে নিয়ে যাওয়া।

সমস্যা ও সমাধান

এ কথায় তোমাদের অনেকে অবাক হবে। বলবে, তাই... হলো, তবে এটম্ বোমায় যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়, ... আবার সূর্য্যের প্রভাবে জীবনের বিকাশই বা হয় কি করে? খুব... প্রশ্ন সন্দেহ নেই, কিন্তু এক কথায় উত্তর দেওয়া চলে। পরমাণু... শক্তি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শক্তিকে তুমি ইচ্ছেমত কাজে লাগা...

---

* যার সাহায্য ছাড়া কাজ হয় না, তা হলো শক্তি। ... কাঠ, মাটি, লোহা, সোনা ইত্যাদি হাজারো পদার্থের ন্যায় শক্তি... নানা প্রকার: তাপের শক্তিতে ইঞ্জিন চলে, বিদ্যুৎশক্তিতে ... জ্বলে, আলোর শক্তিতে ফটো তোলা যায় ইত্যাদি।

...যেমন ধরো, দেশলাইয়ের আগুনে সন্ধ্যা-প্রদীপও জ্বালা চলে, ...রের ঘরে আগুনও দেওয়া যায়।

...র শক্তি নিয়ে মানুষ কি করবে তার উত্তর মানুষেরই

এক অপয়া হীরের কাহিনী

অমরনাথ রায়

... যে আছে হীরে। ভারি অপয়া সে। যার কাছে সে ...য়, তারই দুঃখ আর দুর্ভোগের শেষ থাকে না। শোন ...নী।

...দের ভারতবর্ষেই ওই দুষ্টু হীরেটির জন্ম। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ...—নাম তাঁর টাভার্নিয়ে—সেটিকে আমাদের দেশ থেকে ... যান। মস্ত বড় আর দামী হীরে ঘরে এল কিন্তু টাভার্নিয়ে ... পেলেন না। অসুখ বিসুখে তাঁর অশান্তি বেড়েই চললো। ...সী দেশের সম্রাট ছিলেন 'ষোড়শ লুই'। টাভার্নিয়ে তাঁর ...টিকে ফরাসী সম্রাটের কাছে বিক্রী ক'রে দিলেন। কিছুকাল ...গে ভুগে অনেক কষ্ট পেয়ে টাভার্নিয়ে সাহেব মারা গেলেন।

...রের মালিক তখন ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুই। সম্রাট লুই ...লেন আর তাঁর দেশে বিপ্লবও আরম্ভ হলো। সম্রাট শাস্তি ...নই না উপরন্তু বিপ্লবীদের হাতে ফাঁসীতে প্রাণটা হারালেন।

... বলতে ভুলে গেছি যে ফরাসী বিপ্লব যখন চলছিল তখন সম্রাট ... কাছ থেকে হীরেটি কি জানি কি ভাবে চুরি যায়। সেটি ...মের এক নামকরা মণিকারের হাতে আসে। হীরের সঙ্গে ... আসে ওই মণিকারের ঘরে।

... বড় আর অত সুন্দর হীরে দেখে মণিকারের ছেলে আর ...মলাতে পারে না। হীরেটি সে চুরি করে এবং বেচে দেয় ...সী ভদ্রলোককে। নাম তাঁর 'বোলিউ'। কি কারণে ...—মণিকারপুত্র কিছুদিনের মধ্যেই আত্মহত্যা করে।

...কে যে কাণ্ডটা ঘটলো—সেটা আরও খারাপ। বোলিউ ...হীরেটি কিনলেন ঠিক সেইদিনই মারা গেলেন। বেচারা ...!—ভাবছ এসব বুঝি আমি মন থেকে বানিয়ে বলছি। কিন্তু ...তা নয়। সব সত্যি।

...লিউ তো মারা গেলেন। অপয়া হীরেটি এলো 'টমাস হোপ' ...ক সাহেবের হাতে। এই সাহেবের অবস্থা বেশ ভালই ছিল, ...লে অত দামী হীরেটা তিনি কিনলেন কি করে! হীরেটা ...পর থেকেই কিন্তু হোপ সাহেবের আর্থিক অবস্থা দিন দিন ... হ'তে লাগলো। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর সংসারে ... টানাটানি খুব বেড়ে গেল। তাঁর নাতি তখন বাধ্য হ'য়ে ...ক বিক্রী ক'রে দিলেন এক ধনী আমেরিকান ভদ্রলোকের

...পর বেশ কয়েক হাত ঘুরে হীরেটি এল এক রুশ রাজপুত্রের ... রাজপুত্র ওটি কিনলেন এক মহিলাকে উপহার দেবার জন্যে। ...দিলেনও। কিন্তু তারপর কি হলো জান? রাজপুত্র কোন ...রণে নিজেই ওই মহিলাকে খুন করলেন। কিন্তু তিনি ...পেলেন না। ক্রুদ্ধ জনতার হাতে পড়ে তিনি প্রাণ হারালেন।

হীরেটি এবার কিনলেন এক গ্রীক বণিক। নাম তাঁর মন্থারাইডস। কিনে সেটিকে তিনি বিক্রী করলেন তুরস্কের সুলতান এর কাছে। কিছুদিন পরেই এক দুর্ঘটনা ঘটলো। মন্থারাইডস উঁচু জায়গা থেকে পড়ে মারা গেলেন।

এদিকে তুরস্কের সুলতান হীরেটি উপহার দিলেন তাঁর বেগমকে। বেগম তো মহা খুশী। কিন্তু হঠাৎ কি হলো কে জানে—কয়েকদিন পরেই সুলতান পিস্তল দিয়ে গুলী ক'রে বেগমকে মেরে ফেললেন। দেখছ তো হীরেটা কি অপয়া।

এমনি ভাবে অনেক হাত ঘোরার পর অপয়া হীরেটি কিনলেন এক আমেরিকান ব্যবসায়ী। নাম তাঁর 'ম্যাকলীন'। খবরের কাগজের ব্যবসা ছিল তাঁর। হীরে কেনার অল্প দিনের মধ্যেই এক সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটলো ম্যাকলীন সাহেবের পরিবারে। তাঁর ছোট্ট ছেলেটি মোটর গাড়ী চাপা পড়ে মারা গেল। শোকটা একটু সামলে নিয়ে ম্যাকলীন সাহেবের স্ত্রী হীরেটা বেচবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু কে নেবে—ইতিমধ্যে সব জায়গায় রটে গেছে—হীরেটা অপয়া। কেউ আর কিনতে সাহস করে না। না জানি কি দুর্ভোগ ঘটবে ওটি কিনলে!

এমনি ভাবে কত লোকের যে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়েছে ওই হীরেটি—তার ঠিক নেই। এই অপয়া হীরেটির নাম কি জান? নাম তার 'হোপ'। টমাস হোপ—যাঁর কথা একটু আগেই বলেছি—তাঁর নাম অনুসারেই হীরেটির নাম রাখা হয় 'হোপ'। যাই হোক—এই অপয়া হীরেটিই হলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় নীল আভাযুক্ত হীরে। এর ওজন ৪৪.৫ ক্যারাট। ক্যারাট কি—তা জান তো? সোনা, মণি, মুক্তো প্রভৃতি বস্তু ওজন করার এক রকম মাপ।

যাই হোক এই অপয়া হীরেটি এখন পৃথিবীর কোথায় আছে, কার কাছে আছে—এ সব খবর আমার জানা নেই। তোমরা একটু চেষ্টা করে দেখ না—যদি ওর কোন খোঁজ পাও। খোঁজ পেলে আমাকে জানাতে কিন্তু ভুলো না।

খোঁজ পেলেও এ কাহিনী শোনার পর ওই অপয়া হীরেটিকে তোমরা কেউ কিনতে চাইবে না নিশ্চই?

গল্প হলেও সত্যি

সুধাংশুকুমার ভট্টাচার্য্য

আহিরীটোলার নিমু গোস্বামী লেন হ'তে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ...দুপুর রোদে এতখানি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। তাও আবার পথ ভুল করে চলে গিয়েছিলো সাতপুকুরের দিকে। সেখান হতে বালকটি যখন দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছাল, তখন বেলা প্রায় দুটো। পথশ্রমে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় দেহ অবসন্ন; কিন্তু মনে সেই এক চিন্তা—কখন দেখা হবে পরমহংসদেবের সঙ্গে...। তাই দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়েই সে যাকে সামনে পায় তাকেই ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে, পরমহংসদেব কি এখানে আছেন? উত্তর এল, না, নেই। রাত্রে তাঁর দেখা পাওয়া যেতে পারে।

সতেরো বছরের বালক একথা শুনে একেবারে দমে গেলো। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সে মন্দিরের সিঁড়ির ওপরেই বসে প'ড়ে ভাবতে লাগলো, এখন কি করা যায়? বাড়ী ফেরবার পয়সাও নেই সঙ্গে।

তার ওপরে এই বিদেশ-বিভূঁইএ অপরিচিত জায়গায় কে তাকে খেতে দেবে? হেঁটে ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করতেই মনে ভয় হতে লাগল। বালক বসে বসে ভাবতে থাকে।

কিন্তু বেশীক্ষণ তাকে এ অবস্থায় থাকতে হ'লো না। মন্দিরের ওধার থেকে তারই বয়েসী আর একটি ছেলে বেরিয়ে এসে তাকে অভয় দিয়ে বলে, পরমহংসদেব নেই শুনে অত মুষড়ে পড়েছো কেন ভাই? জলে ত পড়নি। ভাবনা-চিন্তা রেখে দিয়ে গঙ্গায় স্নান করে এসো, তারপর দু'টো প্রসাদ খেয়ে বিশ্রাম করো। রাতে তাঁর দেখা পাবেই।

বালক আশ্বস্ত হয়। রাতে পরমহংসদেব ফিরলেন; কিন্তু দেখা হ'ল না। পরের দিন সকালে বালককে তিনি ডেকে পাঠালেন নিজের শোবার ঘরের মধ্যে। এর আগে বালক পরমহংসদেবের নামই শুনেছিল; কিন্তু তাঁকে কখনও দেখবার সুযোগ হয়নি। মনে মনে সে রামকৃষ্ণদেবের এক মূর্তির কথা চিন্তা করছিল—গৈরিক বসন-পরিহিত ত্রিশূলধারী এক জটাজুটশোভিত ভীষণ আকৃতি সন্ন্যাসীর; কিন্তু শোবার ঘরে ঢুকে সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল তাঁকে দেখে। এ কি রকম সন্ন্যাসী? জটা নেই, ত্রিশূল নেই, গৈরিক বসনও নেই। চোখ ঢুলু ঢুলু, মুখে মৃদু হাসি···তাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, বালক, আমার কাছে তুমি কি চাইতে এসেছ?

বালক উত্তর দিল, আমার ইচ্ছা হয় যোগ শিখতে। আপনি শিখাবেন কি?

ধীরভাবে মুখ তুলে তাকিয়ে রইলেন তিনি বালকের দিকে অনেকক্ষণ ধরে, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, নিশ্চয়ই শিখাব। আগের জন্মে তুমি বড় যোগী ছিলে। যোগসাধনার আর কিছুটা তোমার বাকী আছে, সেটা হ'লেই তোমার সাধনার শেষ হয়ে যাবে।

তারপর বালকের জিহ্বায় তিনি নিজের আঙুলের দ্বারা মূলমন্ত্র লিখে তার বুকে হাত রাখলেন। কিছুক্ষণ পরেই বালক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ এরূপ অবস্থায় থাকার পর তার জ্ঞান আনিয়ে তাকে কালীমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। এইভাবে বালক পরমহংসদেবের কাছ হ'তে যোগ শিখে বাড়িতে ফিরল।

প্রত্যেক সপ্তাহে দু'তিন দিন করে সে ঠাকুরের কাছে আসত। ঠাকুরও তাকে দেখবার জন্ম এত অধৈর্য্য হয়ে পড়তেন যে মাঝে মাঝে তাঁকে বলতে শোনা যেত: তুই না এলে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়—তোকে রোজই দেখতে ইচ্ছা হয়।

পরমহংসদেবের গলার অসুখ যখন উত্তরোত্তর বেড়েই চলল, তখন বালক আর স্থির থাকতে পারলো না। তাঁকে সেবা-যত্ন করাই তার একমাত্র ব্রত হয়ে উঠলো। এসময়ে বালকের বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন পিতা এসে ঠাকুরের কাছে যখন তাঁর ছেলেটিকে ভিক্ষা চাইলেন তখন ঠাকুর হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তোমার ছেলে যুগে যুগে আমার সঙ্গে এসেছে ও আসবে। আমি তাকে খেয়ে ফেলেছি। সে আর তোমার ছেলে নয়। সে আমার অন্তরঙ্গ পার্ষদ।'

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর দুশ্চর সাধনার দ্বারা এই বালকই একদিন স্বামী অভেদানন্দরূপে জগৎ সভার মাঝে নিজের দেশের কথা প্রচার করেছিলেন। সংসার আশ্রমে তাঁর নাম ছিল কালীপ্রসাদ। এই পরম যোগী সাধক একদা বলেছিলেন, "যে বিদ্যা হৃদয়ে প্রকৃত আনন্দের সৃষ্টি করে, নিম্ন হতে উচ্চ দিকে ধাবিত করে, সমস্ত অজ্ঞানতা দূর করে আত্মজ্ঞান দিতে পারে সেই বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা।" মহাপুরুষের এই বাণীর মধ্যে তোমাদের শিখবার অনেক কিছুই আ[ছে] আর একে কাজে পরিণত করার দায়িত্ব ত' তোমাদেরই।

যুগল শ্রেষ্ঠ

সুধীর চট্টোপাধ্যায়

সে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন চলছে রাজধানীতে। রাজধানী নয়, গোটা রাজ্যটাই যেন আজ উৎসবে ম[ত্ত]। ধনী গরীব নির্বিশেষে রাজ্যের প্রজারা সবাই আজ মেতে রয়েছে আনন্দোৎসবের ভেতর। যেখানে স্বয়ং রাজা এ উৎসবের প্র[ধান] উপদেষ্টা, সেখানে প্রজারা কি আর অংশ গ্রহণ না করে পা[রে]? গোটা ইছাপুর রাজ্যটাই যেন মেতে আছে আজকের উৎসবে।

যথাসময়ে উৎসবের বিভিন্ন পরিকল্পিত আয়োজনগুলি স[ম্পন্ন] হতে লাগল একের পর এক। অতঃপর শুরু হল শেষ উৎ[সব] পালা। এ উৎসব সামান্য নয়। পূর্ব্বের অন্যান্য আয়োজন[ের] অপেক্ষা এ উৎসব অনেক উন্নত ধরণের এবং বহু আশা-নিরা[শা] পূর্ণ উৎসব। শুরু হল কবির যুদ্ধ।

বাংলা দেশে সে সময় গুণী, জ্ঞানী, পণ্ডিতের অভাব ছিল [না]। আজকের এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করবার জন্য বহু জায়গা [থেকে] আমন্ত্রিত হয়েছেন এই সকল গুণী, জ্ঞানী, কবিগণ। তাঁ[রা] প্রত্যেকেই আজকে এ উৎসবে নিজ নিজ বিদ্যা প্রদর্শনের জন্য সম[বেত] হয়েছেন এই সভাস্থলে।

একে একে সকলেই যে যার আপন আপন রচনা পাঠ ক[রে] চললেন সভাস্থলে। অবশেষে বিপুল হর্ষধ্বনির ভেতর সম্পন্ন [হল] এ আয়োজন। কিন্তু গোল বাধল দুজন কবিকে নিয়ে। এ[দের] ভেতর কে প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাই নিয়েই শুরু হল আজ[কের] এই সমস্যা।

কবিযুগলের ভেতর একজন হলেন তরুণ যুবক ও অপর[জন] পক্ককেশ বৃদ্ধ। এঁদের উভয়েই সভাসদগণ কর্ত্তৃক বিচারে [শ্রেষ্ঠ] হিসাবে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। অথচ সভার নিয়ম অনুসারে কোন একজনই প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে[ন]। ব্যাপারখানা যখন চরমে উঠল, তখন স্বয়ং রাজা টোডরমল প[র্য্যন্ত] বিচলিত হয়ে পড়লেন কাকে তিনি নির্ব্বাচিত করবেন শ্রেষ্ঠ হিসা[বে]। উৎসব সভা লোকে লোকারণ্য। সমস্ত সভাপ্রাঙ্গণ আজ শত [শত] লোকে পরিপূর্ণ। দর্শকদের সবাই যেন এক একটি নিঃশ্বাস ফে[লে] আর প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে কতক্ষণে ধ্বনিত হবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম।

এমনই একটা অবস্থা যখন সারা সভায় চলছে ঠিক সেই [সময়] অপর পার্শ্বের সিংহাসন থেকে রাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হল এ[ই] আবেদন—"আপনারা আর একবার আপনাপন রচিত রচনা [পাঠ] করুন।"

এবার সর্ব্বপ্রথম স্বীয় আসন ছেড়ে উঠে এলেন যুবক [কবি] সমবেত দর্শকের সম্মুখে। দীর্ঘ উন্নত গৌরকান্তি দেহ। তাঁর [সর্ব্ব] অঙ্গের ভেতর কোথায় যেন লুকিয়ে আছে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য।

উঠে এসে তিনি খুব ভক্তি সহকারে শুরু করলেন স্তুতি[গান]। সে স্তুত কি অপূর্ব্ব ভাব, কি ভক্তিরসে পূর্ণ। শুনতে শু[নতে] সভাসদরা যেন ভুলে গেলেন তাঁদের জগৎ-সংসার। ভুলে গে[লেন]

সংসারের মায়া। একেবারে ভক্তিরসে অভিভূত হয়ে পড়লেন। থেকে থেকে কবি যখন "মা" বলে ডাকতে লাগলেন, সভাসদগণ যেন সাক্ষাৎ জগৎবিমোহিনী বিশ্বেশ্বরী জগন্মাতা দুর্গাকে দেখতে লাগলেন। সমবেত দর্শকদের বিপুল হর্ষধ্বনি এবং করতালির ভেতর কবি তাঁর পাঠ সমাপন করলেন।

সাহিত্যরসিক এবং ধর্ম্মসঙ্গীতপ্রিয় রাজা টোডরমল অভিভূত হয়ে পড়লেন ভক্তিরসে। শেষে তিনি নিজের গলার হার পরিয়ে দিয়ে সম্মানিত করলেন কবিকে।

এবার দ্বিতীয় কবির পালা।

স্থির পদক্ষেপে নিজ আসন ছেড়ে উঠে এলেন কবি। ইনি প্রথম কবির মত যুবক নন। পক্ককেশ বৃদ্ধ। অন্যান্য কবিদের মত এতক্ষণ তিনিও বসে ছিলেন দর্শকদের আসনের একপাশে।

যাই হোক, তিনি নিজের আসন ছেড়ে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে সভাসদগণের ভেতর শোনা গেল মৃদু গুঞ্জন। কেউ কেউ তাঁকে ফের নিজ আসনে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধও করলেন। কিন্তু তিনি স্থির অবিচল। দর্শকদের কোন কথাই তিনি শুনলেন না। সোজা উঠে এসে বর্ণনা করতে লাগলেন রাজা দশরথের মৃত্যুকাহিনী।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত দর্শকদের মনের ভিতর এই ধারণাই ছিল যে প্রথম কবি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন। কিন্তু এ কবি তাঁর রচনা পাঠ করবার কিছুক্ষণের ভেতর কি যেন ঘটে গেল। বৃদ্ধ কবি তাঁর অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই দুঃখ-বেদনাময় বার্ত্তা গাইবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভাস্থল যেন চমকিত হলো। হৃদয়ের সমস্ত ভাব এবং আবেগ সহকারে কবি যখন তাঁর অভূতপূর্ব্ব সঙ্গীত ও স্বর-মাধুর্য্য দিয়ে রাম-লক্ষ্মণ বিরহে বৃদ্ধ রাজার শোক বর্ণনা করতে লাগলেন, তখন সমস্ত সভাস্থল যেন স্তব্ধ। এমন কি, রাজা টোডর-মল পর্য্যন্ত আর চোখের জল সম্বরণ করতে পারলেন না। বললেন, "আর প্রয়োজন নেই। আপনারা দুজনই সমতুল্য। কেউ কারও অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নন। আপনাদের পরিচয় কি?" বলে নিজের হাতের আংটি খুলে পরিয়ে দিলেন কবির হাতের আঙ্গুলে। শেষে চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে কবির মুখের দিকে।

কবিযুগল উঠে এলেন নিজ আসন ছেড়ে। শেষে উভয়েই উভয়ের পরিচয় প্রদান করলেন রাজার কাছে।

এই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ কবিযুগল কে জান? এঁরা আর কেউ নন। একজন হলেন পরবর্ত্তীকালের প্রসিদ্ধ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। আর অপরজন হলেন ফুলিয়া গ্রাম নিবাসী রামায়ণের রচয়িতা কবি কৃত্তিবাস ওঝা।

ওমান্

(চীনের উপকথা)

শ্রীভূ[illegible]নাথ চট্টোপাধ্যায়

পুরাকালে চীন দেশে এক বনে বাস করতো একজন কাঠুরিয়া। নাম ছিল তার ওমান্। ওমান্ সারাদিন বনের কাঠ কাটতো আর তাই সহরের বাজারে বেচে সাঁঝ বেলায় ঘরে ফিরে কোনো রকমে দিন চালাতো। বড় দুঃখে ছিল ওমান্। যা উপায় করতো কাঠ বেচে, তা দিয়ে তার আহার জুটতো না। কারণ সহরের লোকগুলো ছিল বড় চালাক; তারা ঠকিয়ে দিত ওমান্‌কে কাঠের দামে। ওমান্ ছিল বড় সরল আর একটু বোকা গোছের মানুষ। যারা সরল হয় তারা নাকি একটু বোকাই হয়ে থাকে!

কি আর করা যায়! ওমান্ বেচারী ভগবান ফু'কে জানাতো তার দুঃখ।

"ভগবান, খেটেও পেট ভরে খেতে পাওয়া যায় না। তুমি এর বিহিত করো।"

একদিন ভগবান তার কথা শুনলেন—রাতে বিছানায় শুয়ে যখন সে ডাকতো ভগবান ফু'কে, তখন একদিন ফু' তার কথামতো তার কাছে এসে হাজির হলেন। আর বললেন: "তোমার দুঃখ দূর হবে। কালই তুমি বড়লোক হয়ে যাবে।"

ওমান্ তো অবাক ভগবানের কথা শুনে আর তাঁকে চোখে দেখে। কাতরভাবে ডাকলে তাহলে ভগবানকে পাওয়া যায় ওমান্ আজ একথাটা বুঝতে পারলো। সে ফু'কে নতি জানালো। তারপর বললো: "কেমন করে বড়লোক হবো ভগবান? তার উপায় বলে দাও আমাকে!"

"কাল বনের মাঝে তুমি একখানা সোনার কুড়ুল পাবে, তা' সহরে বেচে তুমি একদিনেই বড়লোক হয়ে যাবে।"

ভগবান ফু' চলে গেলেন। মনে খুসীর আমেজ এলো ওমানের। কখন ভোর হবে তারই তরে আকুল হোয়ে উঠলো তার মন। যাক, আর আধপেটা খেয়ে সারাদিন কঠোর খাটুনী খাটতে হবে না। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন এতদিন পরে। এবার তার দুঃখ ঘুচবে।

ভাবতে ভাবতে ওমান্ কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তা' নিজেই জানে না। সকাল হোলো। পাখীরা ডেকে উঠলো। ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হোয়ে গেল তার। ধড়মড়িয়ে উঠে ওমান্ ছুটলো বনের দিকে।

একটু পরেই বনের মাঝে এসে দেখলো একখানা সোনার কুড়ুল পড়ে আছে, তার আলোতে বন আলো হয়ে উঠেছে। ওমান্ আর দেরি না করে সেই কুড়ুলখানা তুলে নিল হাতে। তারপর মাথায় ঠেকিয়ে সেটাকে, ছুটলো সহরের পথে বেচবার তরে।

মনে মনে ভগবানকে একবার নতি জানাতে ভুললো না সে। ফু'এর দয়াতেই তো সে এবার থেকে পেটপুরে খেতে পাবে—বড়লোক হয়ে যাবে। সহরের পথে এসে পড়লো ওমান্ একরকম ছুটতে ছুটতেই!

সহরের পথে কত লোকজন। একজন লোক—চেহারাখানা যমদূতের মতো, তার সাথে সাথে চলতে সুরু করলো। ওমান জানে না এ কুড়ুল কোথায় বেচতে হবে? সুতরাং লোকটাকে ডেকে বললো ওমান্: "এটাকে কোথায় বেচলে বড়লোক হওয়া যায় বলো তো ভাই—তাহলে পেট পুরে খেতে পাওয়া যাবে।"

"তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

"চলো ভাই। আমি এটা বেচে বড়লোক হবো তো!"

"হাঁ-হাঁ, তা তো বটেই। তোমাকে বড়লোক করে দেবো আমি। এসো আমার সঙ্গে—তোমাকে পেট ভরে খাওয়াবো আমি, যা তুমি খেতে চাইবে!"

"তাই চলো!"

লোকটার সাথে ওমান্ একটা গলির মাঝে এসে হাজির হোলো। ভীষণ চেহারার লোকটা এবার একটা কাঠের বাড়ীর মাঝে ওমান্‌কে নিয়ে ঢুকলো।

"কুড়ুলটা আমাকে দাও, আর তুমি এইখানে বসে থাকো। আমি এখনি আসছি।"

বোকা ওমান্ সোনার কুঠারখানা সেই হোঁদল কুৎকুতের মতো চেহারার লোকটার হাতে তুলে দিল। লোকটা ওকে সেই ঘরের মাঝে বসিয়ে রেখে চলে গেল। বোকা ও সরল ওমান্ সেইখানে তার বড়লোক হওয়ার খুসী নিয়ে বসে রইলো।

অনেক—অনেক সময় কেটে গেলো। লোকটা আর ফিরলো না। বসে বসে বসে সকাল গড়িয়ে দুপুর—দুপুর গড়িয়ে সাঁঝের অন্ধকারে ভরে উঠলো সারা সহর।

কি আর করা যায়, ওমান উঠলো। বাড়ীতে ফিরতে হবে। আজ আর কিছু খাওয়াই জুটলো না। না, সে আর বড়লোক হতে চায় না। বড়লোকদের এমনিভাবে সোনার কুড়ুলের ভাবনায় সারাদিন খাওয়া জোটে না। তার অমন বড়লোক হোয়ে দরকার নেই।

ভগবানকে সে মনে মনে জানালো, সে আর বড়লোক হতে চায় না। পথে যেতে যেতে বনের মাঝে ভগবান তাকে দেখা দিলেন।

"কি হোলো তোমার? তোমাকে যে সোনার কুড়ুল দিলাম সেটা কোথা? তা' কি বেচেছো?"

"না, একজন ঠকিয়ে নিয়েছে। আমি বোকা লোক। আমি আর বড়লোক হতে চাই না, ভগবান তুমি আমাকে খাবার দাও—আমার ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে।"

"এই নাও খাবার।"

ওমান্ খাবার পেয়ে খুসীতে লাফিয়ে উঠলো। তারপর খেতে সুরু করে দিল তাড়াতাড়ি! ভগবান তার রকম দেখে হাসতে লাগলেন। ভগবান এই সরল লোকটিকে তিনি যার-পর-নাই ভালবেসে ফেলেছেন! ওমান্‌কে তিনি বড়লোকই করে দেবেন। এমন বড়লোক করে দেবেন, যাকে কেউ কোনোদিন আর বোকা আর সরল ভেবে ঠকাতে সাহস করবে না!

ওমান্ খেয়ে খুব খুসী হলো। ভগবানের পায়ে ছোঁয়ালো তার মাথা, নতি জানালো তাঁকে!

"তোমাকে বড়লোকই বানাবো আমি ওমান্। আর তোমাকে কেউ ঠকাতে পারবে না, বুঝেছো!"

"বড়লোক হতে আমি চাই না।"

"সাগরের মত মন তোমার। তোমাকে যাতে ভুবনের লোক মনে রাখে, তাই-ই তোমাকে করে দেবো ওমান্!

"তাই করুন দেব—আমি তাই চাই!"

"তুমি সাগর হও—বহু জনপদ তোমার তীরে গড়ে উঠুক—বহু জীবের তুমি জীবন হও!"

প্রভু চলে গেলেন। ওমান্ সাগর হোয়ে তাঁর কথামতো চীনের বহু জনপদের গড়ে উঠবার সহায় হলো। সে কখনো মরবে না—চিরদিন, ধরণী যতদিন থাকবে—বেঁচে থাকবে বহু জীব-জীবনের জীবন হয়ে!—

চৌকিদার

শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

জামা গায় জুতো পায়
মাথায় বেঁধে পাগড়ি,
রাত এলে বাধা ঠেলে
করতে যায় চাকরি।
লাঠি হাতে ঘোরে রাতে
পালোয়ানী দেহ তার,
নেই রাগ দেয় হাঁক
সারা রাত বার বার।
ঝোপ-ঝাড় আঁধিয়ার
জোনাকিরা জ্বলছে,
নেই চাঁদ অমারাত
জাগো ভাই বলছে।
সব চুপ রাত খুব
এক চলে চৌকিদার,
লাঠি হাতে বলে রাতে
জাগো ভাই হুঁশিয়ার।

রাজুর পিসি

কুমারী বীথিকা বসু

রাজু ঘোষের পিসি,
দাঁতে দিয়ে মিশি,
ঘোরে পাড়াময়,
সবাই করে ভয়।
গলায় মালা তার,
কোমরে গোট হার,
হাতে "কুঁড়জালি",
চলতে গিয়ে খালি,
এদিক-ওদিক চায়,
ভয়—পাছে ছোঁয়া যায়।
সাত সকালে উঠে,
পুকুরে যায় ছুটে,
আগেভাগে তাই,
স্নানটি সারা চাই।
সারা দিনভোর,
সময় নাই ওর,
সবার ঘরে গিয়ে,
খবর আসে নিয়ে।
তাইত তাকে দেখে,
কাপড়ে মুখ ঢেকে,
সকলে চটপট
দেয় ছুটে চম্পট!!

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

এই একটা দিনে আরো কিছু বিস্ময় সঞ্চিত ছিল ধীরাপদ জানত না। ধীরাপদ কেন, কেউ জানত না। কারখানার আঙিনা থেকে গতকালের উৎসবের আয়োজন এখনো গোটানো হয়নি। তাঁবু ওঠেনি, মঞ্চ বাঁধা, চেয়ারগুলো শুধু ভাঁজ করে রাখা হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে কারখানার হাওয়া উগ্র, বিপরীত।

ওদের হাব-ভাব ঘোরালো, চাউনি বাঁকা, কথাবার্তা ধারালো। বিশেষ করে স্বল্পবেতনের অদক্ষ কর্মচারীদের। কাজে হাত পড়েনি এখনো, জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে। গত রাতের উৎসবে গলা-কাঁধ-হাত পোড়া সেই লোকটার সমাচার শুনে ধীরাপদ বিমূঢ় একেবারে। ইনজেকশন দেবার দশ মিনিটের মধ্যে তানিস সর্দার গাড়ি করে তাকে ঘরে তোলার আগেই মারাত্মক অবস্থা নাকি। লোকটা কেঁপে ঝেঁপে হাত-পা ছুড়ে অস্থির। পাগলের মত অবস্থা সেই থেকে এ-পর্যন্ত! ঘন ঘন গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, কথা বলতে পারছে না, তোতলামি হচ্ছে, সর্বাঙ্গ জ্বলে জ্বলে যাচ্ছে, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, দেয়ালে মাথা ঠুকছে—হাসছে কাঁদছে লাফাচ্ছে, অনেক কাণ্ড করছে।

দোতলায় উঠেই ধীরাপদ আর এক নাটকীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন। সামনের করিডোরে লাবণ্য সরকারকে ঘিরে জনা কয়েক পদস্থ অফিসারের আর এক জটলা। জটলা ঠিক নয়, নির্বাক নারীমূর্তির চারদিকে ভদ্রলোকেরা মৌন বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে শুধু। একটু তফাতে জনা তিনেক সাধারণ কর্মচারী হাত-মুখ নেড়ে চিফ কেমিষ্ট অমিতাভ ঘোষকে বোঝাচ্ছে কি। ইউনিয়ানের পাণ্ডা গোছের লোক তারা, বক্তব্য থাকলে বলতে-কইতে দ্বিধা নেই।

ধীরাপদর মনে হল, তাকে দেখেই লাবণ্যর চোখে প্রথম পলক পড়ল যেন। চাপা স্বস্তির আভাস একটু। কিন্তু সে সামনে এসে দাঁড়ানোর আগে অমিতাভ ঘোষ এগিয়ে এলো। লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করল, কি ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল—অ্যাট্রোপিন অ্যাণ্ড মরফিন?

লাবণ্য নির্বাক এখনো, কিন্তু সাড় ফিরেছে। তাকালো তার দিকে। জবাব দিত না হয় ত, পিছনে ইউনিয়ানের অর্ধশিক্ষিত লোক ক'টাকে দেখেই মাথা নাড়ল বোধ হয়। অর্থাৎ, তাই।

ডোজ?

রমণীর কঠিন দৃষ্টি তার মুখের ওপর বিঁধে থাকল খানিক।—অ্যাট্রোপিন ওয়ান-হান্ড্রেড্থ গ্রেন, মরফিন ওয়ান-ফোর্থ।

মাথা ঝাঁকিয়ে অমিতাভ ঘোষ আবারো অসহিষ্ণু প্রশ্ন ছুড়ল একটা, অ্যাট্রোপিন একটা ট্যাবলেট দিয়েছিলে কি দুটো?

এবারেও ধৈর্য সংবরণ করল লাবণ্য সরকার। কিন্তু সে চেষ্টায় মুখের রঙ বদলাচ্ছে। নিষ্পলক কঠিন দুই চোখ তার মুখের ওপর স্থির। বলল, একটা—।

আর ইউ সিওর?

আর জবাব দিল না, কয়েক নিমেষ দাঁড়িয়ে মর্মান্তিক দেখাটুকুই শেষ করে নিল শুধু। তারপর ধীর পদক্ষেপে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

নালিশ নিয়ে যারা এসেছিল তাদেরই সামনে এ ধরণের বাক-বিনিময়ের ফলে বিড়ম্বনা বাড়ল বই কমল না। ধীরাপদর কাজে মন বসছিল না। লাবণ্য সরকার লোকটার ভালো করতেই গিয়েছিল, কিন্তু এ আবার কি কাণ্ড! সে কি দোষ করল? খানিক বাদে আবারও নিচে নেমে আসতে এক সঙ্গে অনেকে ছেঁকে ধরেছে তাকে। তাদের বক্তব্য, কোম্পানীর ডাক্তার রোগী দেখে এসে বলেছেন, ওষুধটা সহ্য হয়নি হয়ত। ডাক্তার সাহেব যেটুকু বলার ভদ্রতা করে বলেছেন সহ্য যে হয়নি সে তো তারা নিজের চোখেই দেখছে। সহ্য হবে কেমন করে? চীফ কেমিষ্ট জিজ্ঞাসা করছিলেন একটা 'টেব্লেট' দেওয়া হয়েছে কি দুটো—কিন্তু কটা দিয়েছেন ঠাকরোন ঠিক কি। মানুষকে তো আর মানুষ বলে গণ্য করেন না, হয়ত বা চাট্টে পাঁচটাই ফুঁড়ে দিয়ে বসে আছেন

ওদের সামনেই কোম্পানীর ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলল ধীরাপদ। তারপর তাদের বোঝাতে চেষ্টা করল, ডাক্তার সাহেব ওষুধ ভুল এ-কথা একবারও বলেন নি—পুড়ে গেলে সকলেই ওই ইনজেকশানই দিত। তবে কোনো বিশেষ কারণে কারো কারো শরীরে অনেক ওষুধ সয় না, এও সেই রকমই কিছু ব্যাপার হয়েছে—

কিন্তু কেন কি হয়েছে তা ওরা শুনতে চায় না। ওদের বিশ্বাস লোকটার জীবন বরবাদ হয়ে যেতে বসেছে, আর সেটা হয়েছে মেম-সাহেবের দোষে। তারা কৈফিয়ত চায়, বিহিত চায়। তারা কানুন জানে,—শ্রমিকদের কিছু হলে কোম্পানীর কোন্ ডাক্তার দেখবে তাদের, সেট কানুনে ঠিক করে দেওয়া আছে, মেমসাহেব কানুনের ডাক্তার না হয়েও সুই ফুঁড়তে গেলেন কেন? তা ছাড়া লোকটা তো বার বার

আপত্তি করেছিল, বার বার বলেছিল সে ঠিক আছে, তার কিছু হয়নি—তবু ধরে বেঁধে তাকে সুই দেওয়া হল কেন ?

আইনের দিকটা মিথ্যে নয়, ওদের চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট চিকিৎসক আছে কোম্পানীর। কিন্তু এরই মধ্যে ওদের আইন বোঝাতে গেল কে ? ধীরাপদর ধারণা, এই উত্তেজনার পিছনে মাথা-ওয়ালাদেরও সক্রিয় ইন্ধন আছে। লোকটার অবস্থা বা তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ, আগে বিহিতের কথা তুলছে। অন্যান্য কর্মচারীরাও ছদ্ম গাম্ভীর্যের আড়ালে কাউকে জব্দ করতে পারার মজা দেখছে যেন। অথচ গতকাল বড়সাহেবের ঘোষণার আর উৎসবের পরে মন-মেজাজ সকলেরই ভালো থাকার কথা।

ক্ষোভের হেতু স্পষ্ট হল ক্রমশ। বিকেলের দিকে বুড়ো অ্যাকাউনটেন্টই ধরিয়ে দিয়ে গেলেন। ভাষণের আগের দিন বিকেলে বড়সাহেবের হঠাৎ কারখানায় পদার্পণের খবর কে আর না রাখে ? ধীরাপদর অনুপস্থিতিতে অন্য কর্তাদের নিয়ে দু' ঘণ্টা ধরে মিটিং করা হয়েছে, প্রাপ্তির খসড়ায় অনেক লাল দাগ পড়েছে, মিস সরকার আর ছোট সাহেব তাদের পাওনার ব্যাপারে সায় দেয়নি—এই সবই তাদের কানে পৌঁচেছে হয়ত। একটুখানি পৌঁছুলেও বাকিটা অনুমান করে নিতে কতক্ষণ ? এত সবের পরেও বড়সাহেব মূল ঘোষণাপত্রটিই হুবহু পাঠ করেছেন, এ তারা বিশ্বাস করবে কেন ? কি পেয়েছে বা পাবে নিচের দিকের কর্মচারীদের স্পষ্ট ধারণা নেই এখন পর্যন্ত, কিন্তু তাদের বিশ্বাস মোটা প্রাপ্তির যোগটা শেষ মুহূর্তে কেটে ছেঁটে অনেক ছোট করা হয়েছে।

বুড়ো অ্যাকাউনটেন্ট এত সব বলেননি অবশ্য, হাসি মুখে একটু মজার আভাসই দিয়ে গেছেন শুধু। বলেছেন, ওরা এখনো ভাবছে আপনি আরো অনেক কিছুর সুপারিশ করেছিলেন, আর সেই দিন এসে এদের সঙ্গে পরামর্শ করে বড়সাহেব তার অনেক কিছু নাকচ করেছেন। কেউ বলছে, হিসেব-পত্র করে ধীরুবাবু তিন মাসের বোনাসের কথা লিখেছিলেন, কেউ বলছে, পেনশনের কথা লেখা ছিল, কেউ বা ভাবছে এখনই যা দেবার কথা সে-সব পরের জন্য ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

ধীরাপদ এটুকু থেকেই বুঝে নিয়েছে। ছোট সাহেব নাগালের বাইরে, মেমসাহেবকে জব্দ করার এ সুযোগ ওরা ছাড়বে না। আর কিছু না হোক, নাজেহাল করতে পারাটাই লাভ।···কিন্তু কাল রাতের সেই আধ-পোড়া দস্যি লোকটার সত্যিই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা নাকি ?

জনতার মেজাজ চড়লে যা হয় এ ক্ষেত্রেও তাই। বিশেষ করে চড়া প্রতিবাদ নেই যেখানে। এই দিন যারা চুপচাপ ছিল, পরের দিন তাদেরও গলা শোনা যেতে লাগল। জটলার জোর বাড়ছে, হুমকি বাড়ছে, বিহিতের দাবিটা আন্দোলনের আকার নিচ্ছে। নির্দয় মেমসাহেবের অপরাধ প্রতিপন্নই হয়ে গেছে যেন। চিকিৎসার নামে কানুন ডিঙিয়ে শ্রমিকের ওপর দিয়ে বাহাদুরী নেবার চেষ্টা বরদাস্ত করবে না তারা। কি সুই দিয়েছে কে জানে ? কি ওষুধ দিয়েছে, কে জানে ? কতটা দিয়েছে তাই বা কে জানে ? বাবুদেরই তো সন্দেহ হচ্ছে, তাছাড়া গড়বড় না হলে অতবড় জোয়ান লোকটা অমন ধড়ফড় করবে কেন ? নিষেধ করা সত্ত্বেও চোখ রাঙিয়ে সুই দেবার দরকার কি ছিল ? বড় সাহেবের কাছে মিলিত দরখাস্ত পাঠাবে তারা, কোর্ট করবে, ট্রাইবুন্যালে যাবে—বিহিত না হলে অনেক কিছু করার রাস্তা আছে তাদের।

কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে পরদিনও এই গণ্ডগোল, সেই লোকটা আছে কেমন সেই খবরটাই সঠিক সংগ্রহ করে উঠতে পারল না ধীরাপদ। যাকেই জিজ্ঞাসা করে সে-ই মাথা নাড়ে। অর্থাৎ, লোকটা আর নেই-ই ধরে নেওয়া যেতে পারে। ওদের ওই গরম জটলার মধ্যে তানিস সর্দারকে একাধিকবার লক্ষ্য করেছে ধীরাপদ। সেও মন্ত্রণাদাতাদের একজন। কিন্তু ধীরাপদ ফাঁকমত সামনাসামনি পেল না তাকে। মাতব্বরদের সঙ্গে শলা পরামর্শে ব্যস্ত বোধহয়। তাকে পেলে সঠিক খবরটা জানা যেত, ওই লোকটার কাছাকাছি ডেরাতে থাকে সে।

লাবণ্য সরকার অফিসে আছে কি নেই বোঝা যায় না। আছে—ধীরাপদ জানে। কিন্তু যে-ভাবে আছে কোনো জনমা বের মুখ দেখতেও রাজি নয় মনে হয়। মর্যাদার ওপর এমন আচমকা ঘা পড়লে এ-রকম হওয়া বিচিত্র নয়। তবু সে এগিয়ে এসে দু'কথা বললে বা বোঝাতে চেষ্টা করলে পরিস্থিতি এতটা জটিল নাও হতে পারত। কিন্তু এগিয়ে আসা দূরে থাক, এক কঠ স্তব্ধতার পাল্টা ব্যূহ রচনা করে তার মধ্যে বসে আছে যেন। দেখছে কতদূর গড়ায়। কর্মচারীদের এই উদ্ধত উত্তেজনার পিছনে পদস্থ ব্যক্তিরও উসকানি আছে ভাবছে হয়ত। ধীরাপদকে তাদের ব্যতিক্রম মনে করার কারণ নেই। আরো কারণ নেই সিতাংশু এই ঘর থেকে বেরিয়ে ওই পাশের ঘরেই গিয়ে ঢুকেছে যখন।

খানিক আগে হন্তদন্ত হয়ে সিতাংশু মিত্র এসে হাজির তার ঘরে। রীতিমত তেতেই এসেছিল, গলার স্বর তেমন চড়া না হোক কড়া বটেই।—কি ব্যাপার ?

কী ? প্রায় অকারণে রক্তকণাগুলো আজকাল উষ্ণ হয়ে উঠতে চায় কেন ধীরাপদ নিজেও জানে না।

কি সব গণ্ডগোল শুনছি এখানে ?

আর বলেন কেন, যতদূর সম্ভব নির্লিপ্ত ধীরাপদ, যেমন কাণ্ড এদের সব—

তা আপনি কিছু করছেন না বসে বসে শুধু কাণ্ডই দেখছেন ?

ধীরাপদ বসেছিল, সিতাংশু দাঁড়িয়ে। ধীরাপদ বসতে বলেনি, এ-কথার পর ঘরের দরজা দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু দরজা দেখানোর অন্য রীতিও জানা আছে। মোলায়েম করেই বলল, আপনি এসে গেছেন ভালই হয়েছে, দেখুন না কিছু করা যায় কিনা, আমিও কর্মচারী বই তো নয়···

সিতাংশু আর দাঁড়ায়নি। সম্প্রতি এই এক জনের ওপর সব থেকে বেশি রাগ তার।

কিছু করা যায় কিনা সে চেষ্টা সিতাংশু করে গেছে। মাতব্বরদের ডেকে পাঠিয়েছিল। তারা আসেনি, ছুতো নাতায় এড়িয়ে গেছে। কিছুকাল আগেও এ-ধরনের অবাধ্যতা ভাবা যেত না। নিচে নেমে ছোট-সাহেব হম্বি তম্বি করেছে, চোখ রাঙিয়েছে। কিন্তু এই সব মেহনতী মানুষদের ধাত আর ধাতু চিনতে এখনো অনেক বাকি তার। একবার কোনো জোরের ওপর দাঁড়াতে পারলে পরোয়া কমই করে। তাদের ক্ষুব্ধ চেঁচামেচিতে ছোটসাহেবের কণ্ঠস্বর ডুবে গেছে। ক্ষোভ তাদের শুধু মেমসাহেবের ওপরেই নয়।
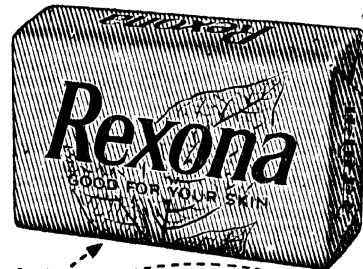
বিকেলের দিকে ধীরাপদ কোম্পানীর ডাক্তারকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালো। কিন্তু এই ভদ্রলোকও ব্যাপার গতিক ঠিক বুঝে উঠছেন না যেন। অ্যাট্রোপিন অ্যালার্জির কেস, প্রতিষেধক ওষুধ দিয়েছেন—রোগীর লক্ষণ খানিকটা অন্তত স্বাভাবিক হবার কথা, সুস্থ বোধ করার কথা—কিন্তু কিছুই হচ্ছে না, এক ভাবেই আছে। এ-রকমটা ঠিক হবার কথা নয় জানালেন—অবশ্য পোড়া ঘায়ের জ্বালা যন্ত্রণা আছেই।

রোগীর সম্বন্ধে আরো কিছুক্ষণ আলোচনা করে ডাক্তার ভদ্রলোককে বিদায় দিয়ে ধীরাপদ নিজেও উঠে পড়ল। পাঁচটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। বাইরে এসে লাবণ্যর ঘরের সামনে দাঁড়াল একটু, তারপর আস্তে আস্তে দরজার একটা পাট ঠেলে খুলল। চেয়ার টেবিল ফাঁকা, ঘরে কেউ নেই।

ধীরাপদ কি আশা করেছিল সঙ্কোচ ঠেলে লাবণ্য সরকার তার কাছে না এলেও তারই প্রতীক্ষায় নিজের ঘরে চুপচাপ বসে আছে? কেউ নেই দেখেও ঘরে ঢুকল! টেবিলটায় হাত ছোঁয়ালো, গোছান ফাইল-পত্রগুলিতেও। একটা অননুভূত দরদের ছোঁয়া লাগছে যেন। মায়া লাগছে। এ ভাবে সম্মানের হানি ঘটলে ধীরাপদ নিজে কি করে বসত বলা যায় না।

অফিসের রেজিস্ট্রি বই থেকে তানিস সর্দারের ঠিকানা টুকে এনেছিল ধীরাপদ। ডেরা খুঁজে পেতে দেরি হল না। ঘরের মেঝেতে বসে তানিস সর্দার খাচ্ছিল, ডাক শুনে তার বউ বেরিয়ে এলো।

বউটা মুখের দিকে হাঁ করে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে আচমকা তার পায়ের ওপর উবুড় হয়ে পড়ল একেবারে। দুই পায়ের ওপর ঘন ঘন মাথা ঠুকল কয়েকবার। ধীরাপদ সরে দাঁড়াবারও ফুরসত পেল না। মাথা ঠোকা শেষ করে তার জুতোর ধুলো জিভে ঠেকালো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভাষায় চেঁচামেচি করে উঠল, ওরে কে এসেছে শিগগীর দেখবি আয়!

তানিস সর্দার ভিতর থেকে দৌড়ে এলো। খালি গা, পরনে খাকী হাফ-প্যান্ট। সর্বাঙ্গের শুকনো পোড়া দাগগুলো কটকটিয়ে চোখে বেঁধে। আগন্তুক দেখে সেও হতভম্ব কয়েক মুহূর্ত।—হুজুর আপনি!

বউটা দৌড়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকল, আর তক্ষুনি বেরিয়ে এসে দাওয়ায় একটা আধা ছেঁড়া চাটাই পেতে দিল।—বৈঠিয়ে বাবুজী।

না বসব না, সর্দারকে বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে—

কথা যে আছে তানিস সর্দার বুঝেছে, এবং কি কথা তাও। কিন্তু এই একজনের মনের সত্যিকারের হদিস সে আজও পেল না যেন। চেয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে। শিক্ষা-দীক্ষা থাকলে তানিস সর্দারের বউ সরে যেত, কিন্তু সেও দাঁড়িয়েই রইল।

ধীরাপদ জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের সেই লোকটি এখন আছে কেমন?

খুব খারাপ। সর্দার গম্ভীর।

খারাপ তো তাকে ঘরে আটকে রেখেছ কেন, ডাক্তার সাহেব তো তাকে হাসপাতালে পাঠাতে বলেছেন?

সর্দার জানালো, ওই সুঁই নেবার পর হাসপাতালে আর যেতে চায় না, তার বহুও যেতে দিতে রাজি নয়—মরে তো ঘরেই মরবে। মরবে না। ধীরাপদর কণ্ঠস্বর অনুচ্চ কঠিন, ডাক্তারসাহেবের ধারণা সে ভালো আছে, তোমরা তাকে ভালো থাকতে দিচ্ছ না—

অন্য কেউ হলে লোকটা সমুচিত জবাব দিত বোধ হয়। একটু থেমে বিনীত জবাব দিল, কি রকম কষ্ট পাচ্ছে হুজুর নিজের চোখে দেখবেন চলুন।

ধীরাপদর দুই চোখ তার আদুড় গায়ের ক্ষতচিহ্নগুলির ওপর বিচরণ করে নিল একবার।—পোড়া ঘায়ে কি রকম কষ্ট পায় তুমি জানো না?

সর্দার চুপ। পাশ থেকে তার বউয়ের অস্ফুট কটূক্তি শোনা গেল একটা। কি বলল বা কার উদ্দেশ্যে বলল না বুঝে ধীরাপদ তার দিকে তাকালো একবার—তানিস সর্দারও।

গলার সুর পাল্টে নরম করে ধীরাপদ একটা অবান্তর প্রসঙ্গে ঘুরে গেল। বলল, তোমরা কি পেয়েছ কেউ জানো না, আস্তে আস্তে জানবে। আমরা যে সুপারিশ করেছি বড়সাহেব তার একটা অক্ষরও কাটছাঁট করেননি, কেউ বাধা দেয়নি, কেউ কোনো আপত্তি তোলেনি। আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো। মেমসাহেব আপত্তি করলে তোমাদের ক্ষতি হত, কিন্তু তিনি তা করেননি। তা ছাড়া, লোকটার ওই বিপদে সবার আগে যিনি সাহায্যের জন্যে ছুটে এলেন তাঁকেই জব্দ করার জন্য ক্ষেপে উঠেছ তোমরা? তোমাদের কি কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই!

আর একদিনও এই মেমসাহেবের দিক টেনেই কথা বলতে শুনেছিল হুজুরকে, সেদিন তানিস সর্দার সেটা ভদ্রলোকের রীতি বলে ধরে নিয়েছিল—বিশ্বাস করেনি। কিন্তু আজ সে অবাক হল। কারণ, তাদের এই হৈ-চৈয়ের পিছনে ভদ্রলোক বাবুদেরও তলায় তলায় একটু সমর্থন আছে—এ তারাও ধরেই নিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছোট সাহেবকে যতটা না হোক, ওই মেমসাহেবটিকে একটু-আধটু জব্দ করতে ভদ্দরলোক বাবুরাও সকলেই চায়। হুজুর কতটা মনের কথা বলছে মুখের দিকে চেয়ে সর্দার সেটা আঁচ করতে চেষ্টা করল। তারপর মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। দলগত কারণে তার পক্ষে কিছু বলা বা নিজেদের দোষ স্বীকার করে নেওয়াও শক্ত।

ধীরাপদ গম্ভীর আবারও, গলার স্বরও চড়ল একটু।—এভাবে মিছিমিছি গণ্ডগোল করলে কেউ সহ্য করবে না, ওই লোকটাকে হাসপাতালে যেতে হবে—তোমরা কি জন্যে কি করছ সবই বোঝা যাবে তখন। ওই লোকটার চাকরি যাবে, তোমাদেরও ফল ভালো হবে না। কালকের মধ্যেই গণ্ডগোল থামা দরকার সেটা তোমাদের দলের লোককে ভালো করে বুঝিয়ে দিও। আমি বলেছি বোলো—

এই হুঁশিয়ারিতেও ফল কিছু হত কিনা বলা শক্ত, কারণ উভয় সঙ্কটে পড়ে তানিস সর্দার মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়েই ছিল। কিন্তু তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বউটা এগিয়ে এসে হ্যাঁচকা টানে লোকটাকে হাত ধরে আর একধারে টেনে নিয়ে গেল। অসহিষ্ণু বিরক্তিতে ফিসফিস করে যা বলতে চাইল তার প্রতি বর্ণ ধীরাপদর কানে এসেছে। মরদগুলোর বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর আস্থা গেছে তার। ওদের ঘরোয়া ভাষা ধীরাপদ বলতে না পারুক, বুঝতে না পারার কথা নয়। সে শুনছে কি শুনছে না সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই বউটার। তার চাপা তর্জনের মর্ম, তোরা কি পেয়ে এই বাবুজীর সঙ্গে লড়বি নাকি নেমকহারাম বেইমান! তোরা না

...লাইনি মেমসাহেবকে কেউ দেখতে পারে না—এই বুদ্ধি তোদের, ...্যা ? চোখ কানা তোদের ! এই বাবুজী দেখতে পারে কিনা ...খছিস না ? নইলে তোর ঘরে আসে ? ফিসফিসানি আর এক ...দা নামল, কিন্তু বউটার কালো মুখে যেন আবিষ্কারের আলো ...গাছে ।—তোদের ওই মেমসাহেব বাবুজীর দিল কেড়েছে এখনো ...ছিস না বুদ্ধু কোথাকারের !

ধীরাপদ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। তার পায়ের নিচে ...টি দুলছে। তানিস সর্দার হতভম্ব মুখেই পায়ে পায়ে সামনে ...সে দাঁড়াল আবার। এক নজর চেয়ে বউয়ের বচন পরখ করে ...ল। বোকা-বোকা মুখখানা কমনীয় দেখাচ্ছে। তার পিছনে ...র কালো বউ চাপা খুশিতে ঝলমল করছে।

তানিস সর্দার বলল, আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে গিয়ে আরাম ...ন বাবুজী, আর কেউ টুঁ-শব্দটি করবে না, আমার জান কবুল।

ধীরাপদ নিঃশব্দে চলে এলো। ভালো-মন্দ একটা কথাও ...নি আর। এরপর কথা অচল।···তানিস সর্দারের ওই ...-কালো বউটা টিপ টিপ করে তার পায়ের ওপর কপাল ...ছে, পথের আবর্জনাময় জুতোর ধুলো জিভে ঠেকিয়েছে—সশরীরে ...ৎ কোনো দেবতারই পদার্পণ ঘটেছিল যেন ওদের দাওয়ায়। কিন্তু ...তে আসতে ধীরাপদ শিক্ষাদীক্ষা-স্বাস্থ্যজ্ঞানহীনা ওই শ্রমিক ঘরণীর ...দেশে মাথা না নুইয়ে পারে নি। সমস্ত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে সে ...রী, সেখানে সে শক্তিরূপিণী পুরুষের দোসরই বটে। সেখানে ...সহজ সুন্দর, সেখানে কোনো কালোকুলোর লেশমাত্র নেই।

ওদের এই নতুন আবিষ্কারের কোনরকম প্রতিবাদ করেনি ...রাপদ, একটু বিরূপ আভাসও ব্যক্ত করেনি। খবরটা ওদের মহলে ...রে ভালো করেই রটবে বোধহয়। কিন্তু সে-জন্য একটুও বিড়ম্বনা ...ধ করছে না ধীরাপদ, এতটুকু অস্বস্তিও না।

মাঝে আর একটা দিন গেছে। তানিস সর্দার কি ভাবে সকলের ... বন্ধ করেছে আর উত্তেজনা চাপা দিয়েছে সে-ই জানে। যারা ...া দেখার আশায় ছিল তারা নিরাশ হয়েছে। সোরগোলটা হঠাৎ ...ন মিইয়ে গেল কি করে ভেবে না পেয়ে অনেকে অবাকও হয়েছে। ...ম্পানীর সেই ডাক্তারটি পরদিনই এসে ধীরাপদকে খবর দিয়েছেন, ...র রোগী আপাতত অনেকটাই সুস্থ, পোড়া ঘায়ের জ্বালাযন্ত্রণা সত্ত্বেও ...টা আর লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করছে না—অস্থিরতা কমেছে।

তার পরদিন বিকেলের দিকে ধীরাপদকে প্রতিষ্ঠানের এক পার্টির ...ছে যেতে হয়েছিল। ফিরতে বিকেল গড়িয়েছে। এসেই টেবিলের ...র ছোট চিরকুট চোখে পড়েছে একটা। ধীরাপদ ঘড়ি দেখেছে— ...ড়ে ছ'টার এক ঘণ্টার ওপর বাকি তখনো। চিরকুট পকেটে ...লে তক্ষুণি আবার বেরিয়ে পড়েছে। ট্রামে বাসে গেলেও আধঘণ্টা ...গেই পৌঁছুত, কিন্তু ট্যাক্সি নিল।

লাবণ্য সরকার নার্সিং হোমের বারান্দার রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে রাস্তার ...কে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। ট্যাক্সি থামতে দেখল, ধীরাপদকে নামতে ...লল, কিন্তু আর এক দিনের মত সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এলো না।

চিরকুট তারই। খুব সংক্ষিপ্ত অনুরোধ। অনুগ্রহ করে ...কেলে একবার নার্সিং হোমে এলে ভালো হয়, বিশেষ ...া ছিল। সে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কি কথা থাকতে পারে ট্যাক্সিতে বসে, ধীরাপদ তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। শুধু মনে হয়েছে, অনুরোধটা লাবণ্য অফিসে নিজের মুখেই করতে পারত। ইচ্ছে করেই তা করেনি। ধীরাপদ অফিস থেকে বেরিয়েছিল সাড়ে তিনটেরও পরে। লাবণ্য তখন নিজের ঘরেই ছিল। বেরুবার আগে ধীরাপদ তার ঘরে এসেছিল। বলে গেছে, অমুক জায়গায় যাচ্ছে, কেউ খোঁজ করলে যেন বলে দেয়—পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আবার অফিসে ফিরবে তাও জানিয়েছে। বড়সাহেব সেই দিনই কানপুর রওনা হচ্ছেন, কাজেই খোঁজ করার সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু লাবণ্য তখনো কিছু বলেনি। দরকারী কথার আভাসও দেয়নি। হাতের কলম থামিয়ে চুপচাপ শুনেছে, তারপর আবার মুখ নামিয়ে লেখায় মন দিয়েছে।

আসুন। রেলিং থেকে সরে বসার ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল লাবণ্য সরকার। অস্ফুট ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলে সে ভিতরে চলে গেল। দুই এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে অদূরের সোফায় বসল।

কোন্ পর্যায়ের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হবে মুখ দেখে ধীরাপদ ঠিক ঠাওর করতে পারল না। জিজ্ঞাসা করল, কাঞ্চন চলে গেছে, না এখানেই ?

চলে গেছে। একটু থেমে সংযত অথচ খুব সাদাসিধেভাবে বলল, ওকে ওখানে ঢোকানোর জন্যে ম্যানেজার খুব খুশি নন দেখলাম, উনি আর রমেন হালদারের সম্বন্ধে এই কালই কি সব বলছিলেন।

ম্যানেজার কি বলেছেন বা বলতে পারেন ধীরাপদ অনুমান করতে পারে। সে নিজে এক সন্ধ্যায় যেটুকু লক্ষ্য করেছে তাইতেই অস্বস্তি বোধ করেছে। ম্যানেজার মাত্র আট ঘণ্টার প্রহরী। তাঁর ওইটুকু কড়া অনুশাসনের গণ্ডির মধ্যেই যদি ওদের আচরণ অসংগত লেগে থাকে, দিনের বাকি ষোল ঘণ্টার হিসেব কে রাখে ? ছেলেটাকে ভালই বাসে ধীরাপদ, ওর মত ছেলেকে ভাল না বেসে কেউ পারে না। দুই একদিনের মধ্যেই তাকে ডেকে পাঠাবে, সম্ভব হলে কালই।

পরিচারিকা দু পেয়ালা চা রেখে গেল। চায়ের কথা বলতেই লাবণ্য ভিতরে গিয়েছিল বোঝা গেল। সঙ্গে আনুষঙ্গিক কিছু নেই দেখে স্বস্তি বোধ করছে। থাকলে একটা কৃত্রিমতাই বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে পড়ত শুধু। তার বিশেষ কথাটা কাঞ্চনের কথাই কিনা ধীরাপদ ঠিক বুঝে উঠছে না। কারণ, আর তেমন কিছু বলার তাড়া বা প্রস্তুতি দেখছে না।

না, তা নয়, কাঞ্চন প্রসঙ্গ ওখানেই শেষ। ঝুঁকে চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে লাবণ্য আবার সোফায় ঠেস দিল। নিরুত্তাপ প্রশ্ন, মিঃ মিত্র আজ চলে গেলেন ?

যাবার তো কথা, গেছেন বোধহয়।

কবে ফিরবেন ?

দিন তিন-চারের মধ্যেই হয়ত, বেশি দিন লাগার কথা নয়।

ধীরাপদর পেয়ালাটা তার হাতে, ধীরে-সুস্থে চুমুক দিচ্ছে। নিজের পেয়ালাটা খালি করে লাবণ্য সামনের ছোট টেবিলে রাখল, তারপর সোফায় আর ঠেস না দিয়ে সোজাসুজি তাকাল তার দিকে। সবটা মুখ, এমন কি চাউনিটাও শান্ত।—অনেক রকম গণ্ডগোল দিয়ে

লুৎফুন্নেসা

শ্রীকিরণেন্দু বাগচী

সারা বছরটা হা-পিত্যেসে চেয়ে আছে বর্ষার আগমন প্রতীক্ষায়। সর্বংসহা ধরিত্রী আর যেন পারে না নিজেকে সামলে রাখতে—গ্রীষ্মের তাণ্ডবে বুকটা তার ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। তবুও সে দিন গোণে সুদিনের প্রতীক্ষায়। চাতক-চাতকী হায় হায় করে একটু স্ফটিক জলের আশায়। পাতালপুরীর প্রস্ফুটিতযৌবনা সুন্দরী ঘুমিয়ে থাকে ছাপর খাটে, কবে দিগ্বিজয়ী রাজপুত্র এসে সোনার কাঠির পরশে তার ঘুম ভাঙাবে—হাত ধরে নিয়ে যাবে আলোর স্বর্ণরাজ্যে। অন্ধকার যে তার আর সহ্য হয় না। রূপকথার ডাইনী বুড়ী এখনও তাকে পাহারা দিচ্ছে তার ঐ খাটখানার পাশে বসে। ধরিত্রীর কান্না দেখে আর স্থির থাকতে পারে না বর্ষাসুন্দরী। নেমে আসে বঙ্কিম ঠামে, ভিজে চুলে, ভিজে কাপড়ে, নূপুর-নিক্কণে—ধরণীর বুকে। শুরু হয় বর্ষামঙ্গলের আয়োজন। তরুণের স্বপ্ন জেগে ওঠে নবীনের মনে। পত্রপুষ্পে বেজে ওঠে সবুজের মন মাতান গান। নদী-নালা জেগে ওঠে নতুনের সাড়া পেয়ে। কত বা ময়ূরপঙ্খী চন্দনের প্রলেপ গায়ে মেখে মাঝদরিয়ায় ভেসে চলে। যে যার মত সকলেই এখন ব্যস্ত। নদীর ধারে বহু কষ্টে গড়ে তোলা কুঁড়েখানি সামলাতে গরীব যে, সেও আজ ব্যস্ত। ধনী আনন্দে মশগুল—প্রাসাদের আনন্দমহলের স্নানের জায়গাটার সিঁড়িগুলো প্রায় সবই ডুবে গেছে—ঘোলা জলে স্নান করে তাই। রঙীন স্বপ্নে বিভোর মির্জা মহম্মদ মেতে ওঠে সখীদের নিয়ে জলকেলী করতে "মনসুরগঞ্জ প্রাসাদের" অন্দরমহলের আঙ্গিনায় ভাগীরথীর জলোচ্ছ্বাসে। সুরা-সুন্দরীর প্রলোভন মির্জা মহম্মদকে টেনে নিয়ে যায় পঙ্কিল আবর্তে। মির্জা মহম্মদ সিরাজদ্দৌলা গড়ে তোলে তার সাধের স্বপ্নরাজ্য যৌবনের প্রথম লগ্নে, মাতামহ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদের মালিক নবাব আলিবর্দী সুজাউল্ মুলক্ (বঙ্গবীর), হেসামুদ্দৌলা মহবৎ জঙ্গ (রাজ্যের কৃপাণ ও নায়ক) খাঁ বাহাদুরের অন্তর নিঙড়ে। হীরাঝিলের কোল ঘেরা এই সুরম্য হর্ম্যরাজি, ভাগীরথীর পূর্বপারে কুলেরিয়াতে মুর্শিদকুলী খাঁর চেহেলসেতুন প্রাসাদ নবাব আলিবর্দীর অধিকারে। অপর পারে দৌহিত্রের উদ্যানবাটিকার পাদমূলে সাধের হীরাঝিল। হীরাঝিলের খরচ চলতে থাকে জমিদারদের বাধ্যতামূলক নজরানায় আলিবর্দীর আদেশে। নজরানার বাৎসরিক অঙ্ক দাঁড়ায় ৫,০১,৫৯৭৲ টাকা। সুযোগ বুঝে সিরাজ একদিন আলিবর্দীকে হীরাঝিলে আমন্ত্রণ ক'রে কয়েক সহস্র মুদ্রা মাতামহের কাছ থেকে হস্তগত করতেও ছাড়েনি।

মীর্জা মহম্মদের প্রতি কেন এত দুর্বলতা নবাবের? অপুত্রক নবাব দত্তক নিলেন কনিষ্ঠা কন্যা আমিনার পুত্র মীর্জা মহম্মদকে—বাংলার মসনদের উত্তরাধিকার দেবেন তাকে সিরাজদ্দৌলা নামে এই লোভে। বৃদ্ধ মাতামহের বাৎসল্যের সুযোগ গ্রহণ ক'রে দুর্বল মুহূর্তে সিরাজের উচ্ছৃঙ্খলতা দুর্বার গতি ধারণ করে।

মুর্শিদাবাদের হারেমে বসে "রাজকুঁয়ার" একাকী নিভৃতে চিন্তা করে মীর্জা মহম্মদের ভবিষ্যৎ জীবন। এই পরমাসুন্দরী ফুলের মত নিষ্পাপ ক্ষত্রিয় কন্যাকে মোহনলাল একদিন নবাব আলিবর্দী খাঁর কাছে ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ উপহার পাঠিয়েছিলেন। শৈশব থেকেই রাজকুঁয়ার নবাবের হারেমে মীর্জা মহম্মদের সঙ্গে নেচে-খেলে বড় হ'তে থাকে। বয়সের উন্মাদনায় রাজকুঁয়ার নিজেকে এগিয়ে দেয়নি মীর্জা মহম্মদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের সুরা-সঙ্গিনী হ'তে। তবুও সে চায় মীর্জা মহম্মদকে আপন করে পেতে। পাতালপুরীর রাজকন্যার মতই সে তার ব্যক্তিত্বকে লুকিয়ে রাখে আপন দৃঢ়চিত্তের স্বর্ণপিঞ্জরে। মীর্জা মহম্মদের প্রেম নিবেদন বালিকাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে না। উভয়ের অন্তঃস্রোতের মধ্যে গ'ড়ে-ওঠা বাঁধকে এত সহজে বিধ্বস্ত হওয়ার সুযোগ সে দেয় না।

একটি ব্রাহ্মমুহূর্তে চেহেলসেতুন প্রাসাদে সানাইয়ের সুর ভৈরবী রাগিণীতে ঘোষণা করে মীর্জা মহম্মদ আর রাজকুঁয়ারের মিলনবার্তা। আলোকমালায় সেজে ওঠে রাজপ্রাসাদ—সেজে ওঠে রাজপথ, সেজে ওঠে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে রোশ্‌নিবাগ। আনন্দের স্রোত বয়ে যায় মুর্শিদাবাদের প্রতি ঘরে ঘরে। রাজকুঁয়ার মীর্জা মহম্মদের গলায় পরিয়ে দেয় বরমাল্য—মীর্জা মহম্মদ পরিয়ে দেয় রাজকুঁয়ারের গলে জয়মাল্য; বর-কনে উভয়ে উভয়ের নখে মাখিয়ে দেয় মেহেদীর প্রলেপ—মেহেদীর রক্তিম আভায় নবদম্পতীর মন ওঠে রাঙিয়ে। আলিবর্দীর কন্যা আমিনা নিজহস্তে এতদিনের দৃঢ় বাঁধের প্রথম উপলখণ্ড সরিয়ে দেন। প্রবল স্রোতে বর্ষার জল দু'টি যৌবরাজ্যের উভয় কূলকে প্লাবিত করে।

আলিবর্দী আদর করে মীর্জা মহম্মদের নাম রাখেন সিরাজদ্দৌলা। সিরাজদ্দৌলা রাজকুঁয়ারকে বুকের মণিকোঠায় জড়িয়ে ধরে সোহাগের সুরে ডাকে 'লুৎফুন্নেসা' (লুৎফ—প্রিয়তমা, উন্নেসা—পত্নী)। লুৎফা তার নরম হাত দু'খানি দিয়ে সিরাজের কটিদেশ আবেষ্টন করে অভিমানভরে বলে, "জাঁহাপনা, এতদিন তো দেখলেন রাজকুঁয়ার সামান্য একজন ক্রীতদাসী হলেও তার নাগাল পাওয়া কত দুষ্কর। বরাঙ্গনাদের রূপের ঝলকে আপনি নিজেকে পুড়িয়েছেন, কিন্তু চাঁদের সুধা দূর থেকেই পান করেছেন। চাঁদে তো গ্রহণ লাগাতে পারেন নি। এতে আপনাকে কাপুরুষ বলব, না "মানুষ" বলব? আপনার মত ক্ষিপ্ত শার্দুলের পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক হত' না, যদি আপনি রাজকুঁয়ারের পার্থিব দেহটাকে নিয়ে পরম সুখে ছিনিমিনি খেলতেন··· মাঝে মাঝে আপনার ভয়ে আমি শিউরে উঠতাম, কিন্তু আপনার

'নতুনকে পরখের আনন্দ...'

বাঙালী গৃহিণী শ্রীমতী নন্দিতা রায় বলেন

"...এই সার্ফের কথাই ধরুন, নতুন নতুন এলো, ব্যবহার করে তবেই না বুঝলাম এর কত গুন' এখন আমি বাড়ীর সব কাপড়জামা সার্ফে কাচি।" শ্রীমতী রায় সময় কালে নতুন জিনিষ কিনে তার পরখ নিতে ভালবাসেন। তিনি বলেন, "সত্যিই সার্ফের তুলনা হয় না। এতে কাচাও কত সহজ! আর কাপড়ও কত ধবধবে ফরসা হয়!

Surf
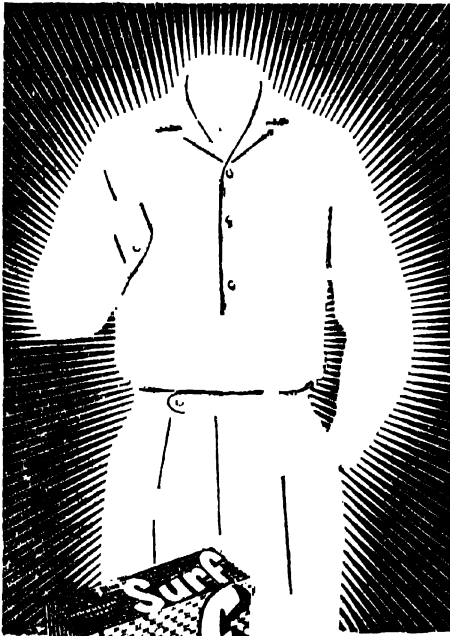
সার্ফে কাপড়জামা সবচেয়ে ফরসা করে কাচে

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

SU. 21-X52 BO

সে প্রলোভন ছিল না। যখন দেখলাম আপনার অন্তর কত বিরাট, সত্যি আপনি দাসীকে মনে-প্রাণে ভালবাসেন—বিলাস-ব্যসনের ছোঁয়া এতে লাগেনি—তখনই আমার অন্তর কেঁদে উঠল আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। আপনার উদ্দেশে রোজই রাজকুঁয়ারের গাল বেয়ে দু'ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ত। আপনাকে অসহায় দেখে মা আমিনা আমাকে অবরোধমুক্ত করলেন। লুৎফুন্নেসা এল সিরাজের স্বপ্নরাজ্যে।

সিরাজের আলিঙ্গন থেকে লুৎফা নিজেকে ছিটকে বার করে নেয়। আকাশের গা থেকে যেন তারা খসে পড়ে। রত্নখচিত পালঙ্কের একটা দিক অধিকার করে সপ্তদশী চেয়ে থাকে পার্থিব সুখের লালসায়। গোলাপী রঙের রেশম মসলিনের শাড়ী, ময়ূরকণ্ঠী রঙের চুমকী বসানো ওড়না, কচি কলাপাতা রঙের গাত্রাবরণ, মণিমাণিক্যাদি খচিত স্বর্ণালঙ্কারে রাজকুঁয়ার আজ যেন স্বর্গের অপ্সরাকেও হার মানিয়েছে।

"উঃ, আপনি কি নিষ্ঠুর জাঁহাপনা! ফৈজী—নর্তকী ফৈজী কি অপরাধ করেছিল? শুনেছি তার রূপের জৌলুষ আমাকেও হার মানাত। তবে···তবে···কেন আপনি তাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করলেন! আপনাকে বিশ্বাস কি জাঁহাপনা—আজ যাকে আপনি মুকুটের কোহিনুর করে রেখেছেন, কা'ল তাকে পথের ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে আপনার অন্তরের ভালবাসা কি একটুও সাড়া দিল না!···"

"তোমার ধারণা একটুও অমূলক নয় সুন্দরী। তবে কেন আমি তাকে বিসর্জন দিলাম তা শুনলে তোমার গায়ের লোমকূপগুলো শিউরে উঠবে নিশ্চয়ই।"

সিরাজ আর স্থির থাকতে পারে না। বলে চলে ফৈজীর আদ্যবৃত্তান্ত।

"হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলে যার একদিন খ্যাতি ছিল—যার রূপাঙ্গের লাবণ্য মানবচক্ষুকে করত বিভ্রান্ত, শরীরের ওজন মাত্র যার বাইশ সের—এমনই অসামান্যা সুন্দরী, চিবানো পানের রস যার কণ্ঠনালীর বহির্দেশেও সৃষ্টি করত অপূর্ব রক্তিমাভা—লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে লক্ষ্ণৌয়ের সেই সুন্দরী বাঈকে আমি নিয়ে এলাম হীরাঝিলে—দিল্লীর বাদশার শ্যেনদৃষ্টির অন্তরালে। ফৈজী হ'ল আমার সব চেয়ে আদরের বিলাসসঙ্গিনী। সুরাসক্ত সিরাজের আস্কারা পেয়ে সে মাথায় চড়ে বসল। রঙীন রসে ভরপুর হয়ে ফৈজীর চরিত্রে আমি একদিন বারাঙ্গনার রূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়েছিলাম। পাপীয়সী হয়ত ভেবেছিল আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়েছি। উত্তরে সে আমার জননী আমিনার চরিত্রে আঘাত হানে। প্রেম-ভালবাসা বলে যে বস্তু—মাতৃনিন্দায় যেন কোথায় লোপ পেয়ে যায় নিমেষে। অন্তরের হিংস্র প্রবৃত্তিটা যেন তড়িৎপ্রবাহের মত জ্বলে ওঠে···কঠোর আদেশ দেয় আমাকে—'যত বড় সুন্দরীই হোক না কেন—নর্তকী। ওকে আর বাড়তে দিও না।' ফৈজীর রূপ-যৌবন সব ভুলে গেলাম। আদেশ দিলাম মতিঝিল প্রাসাদের সংলগ্ন এক গবাক্ষহীন কক্ষে ফৈজীকে জীবন্ত সমাধি দিতে। ফৈজীর করুণ আর্তনাদ আমি আজও ভুলতে পারিনি সুন্দরী। কেবল মনকে প্রবোধ দিই এই বলে, মাতৃনিন্দার আমি উপযুক্ত শাস্তিবিধান করেছি।—সন্তানের কর্তব্য পালন করেছি মাত্র। মৃত্যুকালে না জানি সে কত যন্ত্রণাই না ভোগ করেছে। গবাক্ষের শেষ ছিদ্রটুকুও যতক্ষণ ছিল, বাঁচবার জন্য হতভাগীর কি করুণ আকুতি। তারপর"···

স্বামীকে বিচলিত দেখে লুৎফুন্নেসা প্রসঙ্গের গতিমুখ ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে! লুৎফা স্বামীর স্কন্ধে আপনার হাত দুখানি দিয়ে বুকের ওপর মাথাটি রেখে বলে, "দেখবেন জাঁহাপনা, রাজকুঁয়ারও তো সুন্দরী কম নয়। তারও যেন ফৈজীর দশা না হয় জনাব। তবে হ্যাঁ, অমন নিষ্ঠুরভাবে আমার দেহটাকে শাস্তি দিতে পারবেন কি বাংলার মসনদের ভাবী উত্তরাধিকারী? আজ আপনার কণ্ঠহার আমি নই কি জনাব? কিন্তু আপনার লুৎফার কণ্ঠহারের জহরৎগুলোর মধ্যে যে 'জহর' সঞ্চিত আছে, সে খবর কি রাখেন জনাব? জহর কি সময়কালে সে বিচারের অবকাশ দেবে প্রভু!"

সিরাজকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে লুৎফুন্নেসা খিলখিল করে হেসে ওঠে।

মীর্জা মহম্মদের নতুন জীবন শুরু হয়। মেঘোমুক্ত আকাশ নীলাম্বরীর ওড়না গায়ে উজ্জ্বল আনন্দে উদ্বেল। লুৎফা ছায়াসঙ্গিনীর মত সিরাজকে ঘিরে রাখে। দুরন্ত যুবক তবুও পথভ্রষ্ট হয়।

সিরাজের হঠকারিতাকে লুৎফা কোনদিনই বাড়বার সুযোগ দেয়নি। প্রেয়সীর প্রেমের ফাঁদে পড়ে সিরাজ নিজের পদস্খলনের কারণগুলো একে একে ব্যক্ত করে যায়।

—"দাদু আমার ওপর কেন এত দুর্বল ছিল জান বেগম সাহেবা। নবাব আলিবর্দী খাঁ ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে যেদিন বিহারের শাসনভার পান সেই শুভলগ্নেই আমার জন্ম হয়। সেইদিনই আনন্দের আতিশয্যে তিনি আমাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। জয়নুদ্দীন আমার পিতা। নবাব আলিবর্দীর কনিষ্ঠা কন্যা আমার গর্ভধারিণী। দাদুর তিনটি কন্যা ছাড়া আর পুত্রসন্তান ছিল না। আলিবর্দীর অগ্রজ হাজি মহম্মদের তিন পুত্রের সঙ্গে তিনি তিন কন্যার বিবাহ দেন। বড় ঘেসেটির সঙ্গে বিয়ে হয় নোয়াজেস মহম্মদের, মধ্যমার বিয়ে হয় সাইয়েদ আহম্মদের সঙ্গে—আর সব ছোট আমার মা আমিনা।

"আলিবর্দী খাঁ তাঁর এই তিন জামাতাকে ঢাকা, পূর্ণিয়া আর পাটনার শাসনভার বণ্টন করে দেন। আমি ক্রমে বড় হতে থাকলাম। আমার প্রতি যেটুকু শাসনের প্রয়োজন ছিল, শিশুকাল থেকেই দাদু তার কোন ব্যবস্থাই করেননি। যিনি যুদ্ধে কোনদিন পিছু হঠেননি তিনি একমাত্র পিছু হঠতেন সিরাজের শাসনের বেলায়। দাদুরও ঠিক দোষ দিতে পারি না। একে তো পঁয়ষট্টি বছর বয়সে নবাবই হলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশে বর্গীর হাঙ্গামা দেখা দিল। আলিবর্দী বর্গী দমনে ব্যস্ত, এই সুযোগে আফগান জায়গীরদারা নজরানা দেবার অছিলায় পাটনায় এসে আমার পিতাকে বড় নৃশংসভাবে হত্যা করে। মাকে আর পিতামহ হাজি আহম্মদকে বন্দী করে। ঐ বন্দী অবস্থায় সতেরো দিনের দিন পিতামহ মারা যান। বাল্যেই আমি পিতৃহারা। মা জীবিত থেকেও নেই বললেই চলে। পিতামহ যে, তিনিও আমার মায়া কাটালেন। চিন্তা কর উর্বশী আমার মানুষ হওয়ার পথে কত অন্তরায়। পাছে আমি মনে কষ্ট পাই সেইজন্য দাদুও আমাকে কোনদিন শাসন করেননি।"

"···আপনাকে বড়ই শ্রান্ত দেখাচ্ছে। দাসীর অনুরোধ রাখুন, আজ আর···"
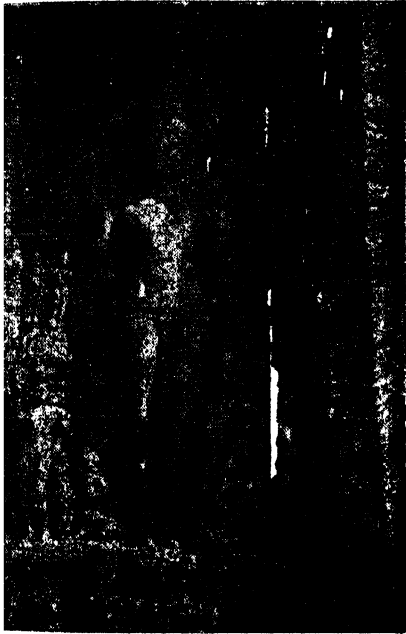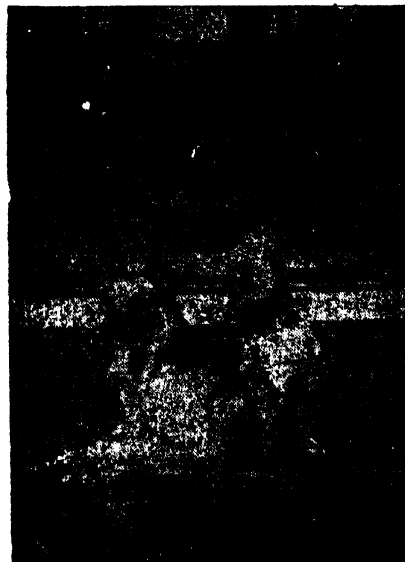
ঘূর্ণি

—সুপ্রভা ঘোষাল

সূর্য্যমূর্ত্তি (কোণারক)

—প্রতিভা বসু

দুঃসাহস —মৃণাল রায়

—রথীন রায়

বাঘ এবং তার মাসী

—সনৎকুমার রায়চৌধুরী

ভারতীয় মন্দির —সনৎকুমার রায়চৌধুরী

নেহেরু পার্ক (কাশ্মীর) —শিবানী চট্টোপাধ্যায়

ফুল আর আকাশ —মোনা চৌধুরী
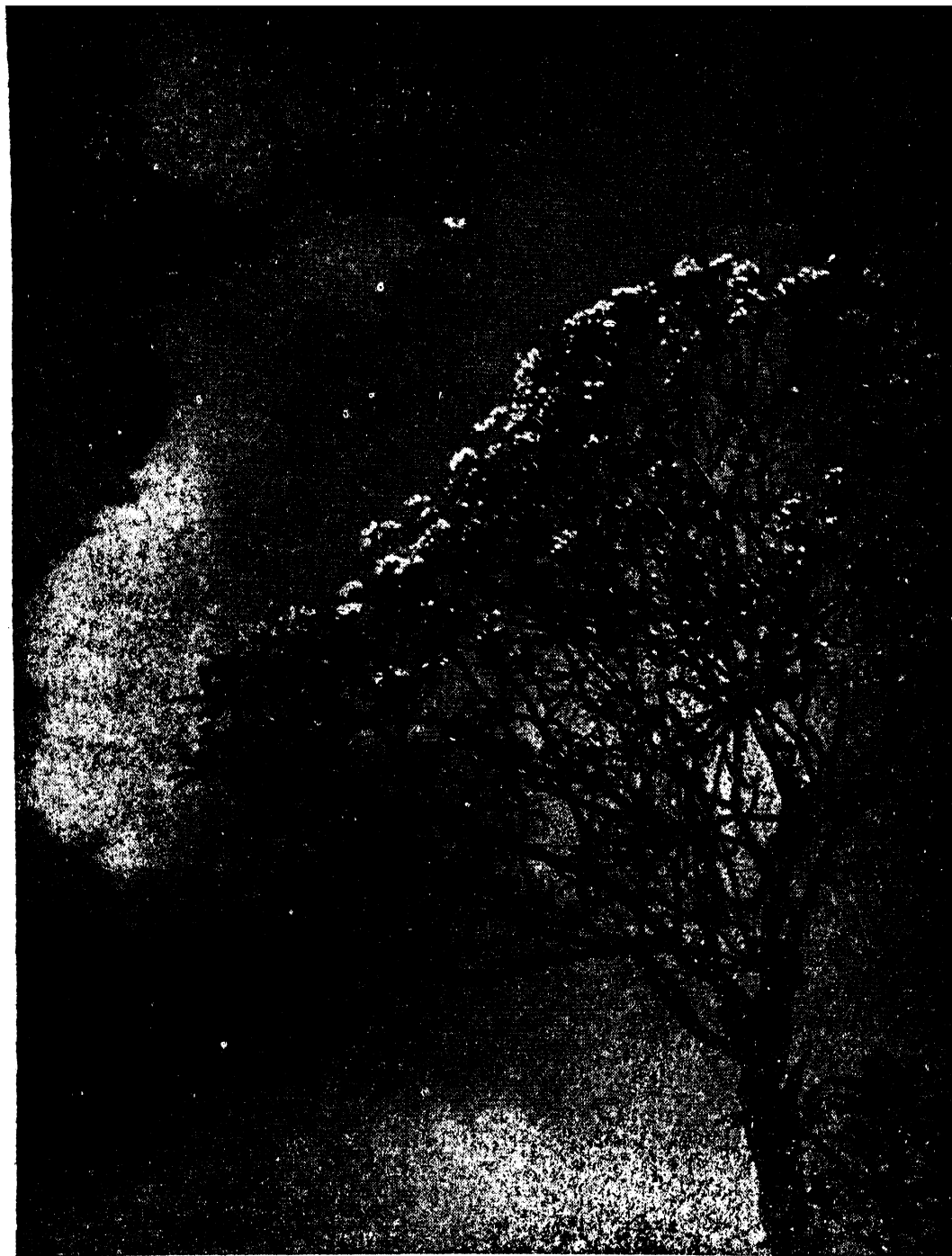
—"কে বললে আমি, শ্রান্ত কেবল অন্তরটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল মাত্র। প্রিয়জনদের এমন দুরবস্থায় কথা শুনে কার মাথার ঠিক থাকে বল? যদিও আমি ছেলেমানুষ, বাঘের মত হিংস্রতা আমার মনকে খেপিয়ে তুলল। রক্তের লালসা যেন আমার তীব্র হয়ে উঠল। নবাব আলিবর্দীর সঙ্গে পাটনা রওয়ানা হলাম। পাপের উপযুক্ত শাস্তি আমারই হাতে আফগানদের পেতে হ'ল। মাকে কারাগার থেকে মুক্ত করলাম; চারিদিকে বিভীষিকা দেখে পাটনা ছেড়ে আফগানরা পালাল। আমার বীরত্বের তারিফ করে দাদু আমার পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, 'শাবাশ, নানাসাহেব, তুমিই আমার উপযুক্ত সাকরেদ হ'তে পারবে'।"

—"সত্যিই বীর আপনি। এখন দেখছি ঐ হাতে কেবল মেয়েদের হৃৎপিণ্ডই ছেঁড়েননি, বাহুবল কাজে লাগিয়েছিলেন।"

"তারপর শোন, আমি অবাক হয়ে গেলাম। আলিবর্দী ছেড়ে দিলেন পাটনা আমার শাসনে। জানকীরামকে আমার সহায়তার জন্য বিহারের প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। কিছুদিন পরে দাদু আমাকে ফিরিয়ে আনলেন মুর্শিদাবাদে। গিরিয়া-সমরবিজয়ী দাদু আমার বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবী পেয়েও একটা রাত্রিও শান্তিতে ঘুমোতে পারলেন না। যুদ্ধ-যুদ্ধ-যুদ্ধ—কেবলই মার-মার কাট্-কাট। জগৎ শেঠের গুপ্ত অভিসন্ধিতে উড়িষ্যার শাসনকর্তা সুজা খাঁর জামাই দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী বালেশ্বরের কাছে আলিবর্দীর সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হল। কিন্তু তারই প্রধান সেনাপতি আবদ আল্লার বিশ্বাসঘাতকতায় হেরে গিয়ে কোন রকমে দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে।"

"......তারপর জনাব!"

"তার পরই মহারাষ্ট্র জাতির অভ্যুত্থান হল। দিল্লীর বাদশার শক্তিতে তখন ঘুণ ধরে আসছে। বর্গীরা ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ারের জোরে উত্তর ভারতে লুটপাট সেরে মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, হুগলী, মুর্শিদাবাদের চারিদিকে ব্যাপক অত্যাচার শুরু করল। আলিবর্দী কঠোর হাতে বর্গীর হাঙ্গামা দমনের ব্যবস্থা করলেন। ১৭৪৪এ মহারাষ্ট্রীয় রঘুজী ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে মনকরার যুদ্ধে নিহত করলেন। প্রথম প্রথম এই বর্গীদের দাদু কেমন যেন ভয় পেতেন। তাই একবার মোটা কিছু টাকার বিনিময়ে বালাজী রাও ও ভাস্করের দলকে দেশ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৭৪৫এ দাদুর এক সেনাপতি মুস্তফা খাঁ রাজ্যের লোভে দাদুরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসে। দাদু তাকে বেশ শিক্ষা দিয়ে দেন। হেরে গিয়ে মুস্তফা বর্গীদের দলে ভিড়ে পড়ল। ওদিকে ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যুর খবর পেয়ে ১৭৪৬এ বর্গীদলের রঘু সিং নবাবকে খুব বিব্রত করে তোলে। বাংলা দেশকেও করে তোলে শ্মশানের মত। গত্যন্তর না দেখে নবাব আলিবর্দী দেশের প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়ে নিজের ভগিনীপতি মীরজাফর খাঁকে ১৭৪৭এ সেনাপতির পদে বরণ করে উড়িষ্যায় পাঠালেন মহারাষ্ট্রীয়দের জব্দ করবার জন্যে। চিন্তা কর প্রেয়সী, বৃদ্ধ নবাবের মনের অবস্থাটা তখন কি দাঁড়িয়েছে! সুযোগ খুঁজছিল বিহারের শাসনকর্তা শামসের খাঁ; সেও ছিল আমার বাবার মৃত্যুর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। শামসের, দাদু সাহেবের হাতেই মারা পড়ল পাটনার কাছে 'বারে'। কটকে গিয়ে মীরজাফরের চরিত্র আমার মতই হয়ে পড়ল। সুরা আর সুন্দরী ছাড়া তিনি সবই ভুলে গেলেন। বিহার থেকে ফিরে এই খবর পেয়ে দাদু পাঠালেন আতাউল্লাকে তার সাহায্যের জন্য। ফল হ'ল ঠিক উল্টো। মীরজাফর আতাউল্লাকে নিজের দলে টেনে নিয়ে "যুদ্ধং দেহি" বলে আলিবর্দীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু দুই মিঁয়াই খুব জব্দ হলেন। হেরে গিয়ে দাদুর পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন। দাদুও গলে জল।"

—"এতবড় শয়তান! এতেও তাকে নবাব ছেড়ে দিলেন!"

—হ্যাঁ, দিলেন। আমি হ'লে কিন্তু ছাড়তাম না। ১৭৫০এ সেই বুড়ো বেচারীকেই আবার মহারাষ্ট্রীয়দের মেরে তাড়াতে হল কটকের বাইরে। কিন্তু হলে কি হয় গৃহ শত্রুর সুযোগ নিয়ে এবার তারা বেশ সেজে গুজেই এসে কটক অধিকার করে বসল। কোন প্রকারেই বর্গীদের দমন করতে না পেরে ১৭৫১এ এক চুক্তিতে নবাব উড়িষ্যা ছেড়ে দিলেন মহারাষ্ট্রীয়দের হাতে। দ্বিতীয় চুক্তিতে বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা কর এই বাংলাদেশ থেকেই পাঠাতে রাজী হলেন।"

—"উঃ, নানাসাহেবের কি অবস্থা তখন!!"

—"দাদুও এই নিয়ে ব্যস্ত। আমি ছেলেমানুষ। ইংরাজরা না এই সুযোগ কাশিমবাজার কুঠির চারদিকে প্রাচীর গেঁথে একটা ছোট খাটো দুর্গের মত সৃষ্টি করলে। দিলে তার দরজায় এক সার কামান বসিয়ে।

"ঠিক এর পরেই ১৭৫২এ আমারও একটা সুযোগ এসে গেল। দাদু আমাকে পাঠালেন হুগলীতে। ফরাসী, দিনেমার ও ইংরেজ বণিকেরা আমাকে প্রচুর উপঢৌকন দিলে।"

—"রাজমুকুটের ভার কি এতই গুরু জাঁহাপনা!"

—"গুরুভারই বটে। ঠিকই ধরেছ লুৎফা। দাদুকে এত বেগ পেতে হত না দেখতে যদি দিল্লীর মসনদ টলে না উঠত। অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথাই তোমাকে শোনালাম। তবে খবরগুলো তোমার জেনে রাখা ভাল তাই।"

নবাব আলিবর্দী খাঁর বার্দ্ধক্য এবং নানা ঝঞ্ঝাটের সুযোগ নিয়ে সিরাজ কায়েমী ভাবেই মা এবং স্ত্রীকে নিয়ে মনসুরগঞ্জে বসবাস শুরু করলেন। লুৎফার প্রেমের শাসনে হীরাঝিল প্রাসাদে এখন এক অভিনব স্বপ্নরাজ্য গড়ে উঠল। সুরা সুন্দরীর নূপুর নিক্কণ ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে এল। লুৎফার শাসনে ব্যাভিচারীর দলও যে যার মত গা ঢাকা দিল।

গো যান প্রস্তুত। যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। পাত্রমিত্র সৈন্য সামন্ত বহুজনই আজ যাত্রার জন্য প্রস্তুত। কেবল সিরাজদ্দৌলার আদেশের অপেক্ষা। মনসুরগঞ্জের পথে কাতারে কাতারে নরমুণ্ডের স্রোত ভেসে চলেছে। নহবৎ খানায় অবিরাম শানাইয়ের রাগিণী প্রহরের রূপ বর্ণনা করছে। মাতা আমিনা, প্রেয়সী লুৎফুন্নেসার নিকট পরিচারিকা—ফরমান হস্তে কুর্নিশ জানায়। বৃহৎ বলীবর্দ্দে সজ্জিত মখমলের গদী মোড়া 'সাম্পুনি' প্রাসাদের তোরণে উপস্থিত। আজ জননী এবং প্রেয়সী সমভিব্যাহারে সিরাজদ্দৌলা একই শকটে চলেছেন পাটনার পথে। বলিষ্ঠ বলীবর্দ দুটি প্রতিদিন আশি মাইল পথ অতিক্রম করে চলেছে।

লুৎফুন্নেসা প্রশ্ন করে, "আমার কোথায় চলেছি জনাব!"

সিরাজ উত্তর দেন, "পাটনায়, রাজ্যভার গ্রহণ করতে।"

—"তবে সঙ্গে এত যুদ্ধের সরঞ্জাম কেন?"

—"ও তুমি বুঝবে না সুন্দরি! জীবনটাতো রূপের গরবেই কাটালে। এ সবের কি বোঝ তুমি। নবাব রাজকার্য চালাবে—তাতেও স্ত্রীলোকের পরামর্শ নিতে হবে। বড্ড তোমার সাহস বটে!"

—"যাই বলুন প্রভু, এ সব আমার ভাল লাগছে না। কৈশোরে পা দিয়ে থেকে একটা দিনও শান্তির বাণী শুনলাম না। দিগন্ত-প্রসারী তাণ্ডবের বিভীষিকা। মা, আমরা কোথায় এলাম!"

—"সৈন্যদের মধ্যে কিসের এমন আর্তনাদ। কেনই বা ডঙ্কার শব্দ ম্লান। ভেরী নিনাদের সুর কেন ক্ষীণ হয়ে এল। আমার বড় ভয় করছে।"—ভীতি বিহ্বলা রাজকুঁয়ার আমিনার কোলে মাথা লুকায়।

"সেনাপতি মেহেদিনেসা জানকীরামের সৈন্যের হাতে মারা পড়েছে।"—অনুগত দূত গোলাম হোসেন খবর দেয়। "আমাদেরও নিস্তার নেই জাঁহাপনা। ছিঃ কি ভুলটাই না করলেন জনাব। মেহেদিনেসার পরামর্শে কেনই বা দাদুর কাছে ফরাসী ভাষায় এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্র পাঠালেন! এখন উপায়?"

"উপায়—আমি স্থির করে ফেলেছি। এই পত্র নাও। আর সময় নেই। যে কোন উপায়ে পার গোলাম হোসেন, পত্রখানি রাজা জানকীরামের হাতে পৌঁছে দাও।"—গোযানের ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে লুৎফুন্নেসার কোমল হাতটি লিপিখানি এগিয়ে দেয়।

লিপির বারতা জানকীরামকে কেমন যেন বিভ্রান্ত করে তোলে। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে জানকীরাম ভাবী নবাবকে উপযুক্ত সম্মানে সম্মানিত করেন।—সসম্মানে নিয়ে যান সিরাজ পরিবারকে আপন প্রাসাদের অন্তঃপুরে।

নবাব আলিবর্দী খাঁর জীবনপ্রদীপ ক্রমে নিষ্প্রভ হ'য়ে এল। লুৎফুন্নেসা তখন শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত। মাতামহী সরফ-উন্নেসা মাতামহ আলিবর্দী সিরাজকে উত্তেজিত করলেন হোসেনকুলি খাঁর বিরুদ্ধে। হোসেনকুলী ছিল সিরাজের পিতৃব্য নোয়াজেস মহম্মদের সহকারী। নোয়াজেসও এতে ইন্ধন জোগালেন। এই পাপাত্মাই নাকি একদিন সিরাজ জননীকে কুপথগামিনী করবার প্রয়াস পেয়েছিল। এই তার অপরাধ। সিরাজ ক্রোধেই অধীর হয়ে পড়লেন। রাজকুঁয়ারের সম্মুখে এ অপমান তাঁর বুকে শেলের মত বিঁধল। সিরাজের হাতেই হোসেনকুলিকে ইহজগতের মায়া কাটাতে হ'ল।

দিন এল ফুরিয়ে। চক্রবালের বুকে ম্লান সূর্যের গৈরিক রঙ ছড়িয়ে পড়ল। নবাব আলিবর্দী খাঁর অন্তিম উপস্থিত। অনেকদিন থেকেই তিনি শোথ রোগে ভুগছেন। পাত্রমিত্র সকলেই শয্যাপার্শ্বে। আলিবর্দী লুৎফা আর সিরাজের দুটি হাত বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে অশ্রুভারাক্রান্ত স্বরে বললেন, "দাদু তোমার তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে কত রাত্রিই না অনিদ্রায় কাটিয়েছি। হোসেনকুলি তোমার ভবিষ্যৎ পথ সুগম হ'তে দিত না। মাণিকচাঁদও তোমার পরম শত্রু হয়ে দাঁড়াত। সেই বিবেচনায় মাণিককে একটা বৃহৎ অট্টালিকা দিয়ে সন্তুষ্ট করলাম।··বৃদ্ধের শেষ অনুরোধ—ইংরেজ জাতটার সঙ্গে খুব বুদ্ধি করে চলবে। গতিবিধি লক্ষ্য রাখবে। তাদেরকে দেবে না দুর্গ নির্মাণ করতে। সৈন্য সংগ্রহ করতে বিন্দুমাত্র সুযোগ দেবে না। ও জাতটার বিষ বড় বেশী। কেউটে সাপের চেয়েও তীব্র। ছোবল দিয়েছে কি আর মাথা তুলতে পারবে না। কাশিমবাজারের কুঠিটা কি ভাবে তৈরী করল দেখলে তো। বিলাস পরিত্যাগ কর ভাই। বিলাসী হলেই রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে। রাজ কার্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। সুরাপান করবে না।··দিদিমণি লুৎফা, দাদু তোমার হাতে পড়ে অনেক শুধরেছে দেখছি। তুমি ছায়াসঙ্গিনীর মত থাকবে দাদুর সঙ্গে। বোকা ছেলে তবেই আমার মসনদের উপযুক্ত সম্মান দিতে পারবে।"

সিরাজ আলিবর্দীর জানুতে হাত রেখে শপথ করলে। ১৭৫৬ সালের ৯ই এপ্রিল ১৫ বছর নবাবীর পর ৮০ বছর বয়সে আলিবর্দী শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পরলোকগত নবাবের মরদেহ কুলেরিয়ার (মুর্শিদাবাদ) অপর পারে খোসবাগ সমাধিমন্দিরে তাঁরই জননীর কোলের কাছে সিরাজদ্দৌলা সমাহিত করলেন। নবাব আলিবর্দী এই সমাধি মন্দির নির্মাণ করেন জননীর স্মৃতি রক্ষার্থে। নবাবগঞ্জ আর ভাগুারদহের আয় থেকে বাৎসরিক ৩০৫৲ টাকার ব্যবস্থা করে দেন সমাধিমন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য।

১৭৫৬এর এপ্রিল মাসেই এক শুভলগ্নে সিরাজদ্দৌলার রাজ্যাভিষেকের সাড়া পড়ে গেল। শুভ্রবস্ত্রে সহস্র মৌলভী খোসবাগ সমাধিমন্দিরে মধুর গম্ভীরকণ্ঠে কোরাণের পবিত্র অধ্যায় পাঠে নূতন নবাবের কল্যাণ কামনা করে। পরলোকগত নবাবের সমাধি বেদীটি পুষ্পস্তবকে সজ্জিত ক'রে নতজানু লুৎফুন্নেসা প্রার্থনা জানায়। শ্রদ্ধাবনত মস্তকে সিরাজ দাদুর পবিত্র সমাধিতে তিনবার কুর্ণিশ জানালে। মনসুর গঞ্জ প্রাসাদে শত্রু মিত্র সকলেই আলিবর্দীর দৌহিত্রকে মনসুর উলমুল্‌ক্ (দেশ বিজয়ী) সিরাজদ্দৌল্লা (রাজ্য জ্যোতিঃ) সাহকুলি খাঁ, মীর্জামহম্মদ হায়বৎজঙ্গ (যুদ্ধের বিভীষিকা) নামে অভিবাদন জানিয়ে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার মসনদে অভিষিক্ত করলেন। ইউরোপীয় বণিকেরা নতুন নবাবকে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে সিরাজদ্দৌলার রাজ্যাভিষেকের খবর পাঠালেন ইউরোপে।

বহুবিধ বৈদেশিক দ্রব্যসম্ভারে সিরাজ মনসুরগঞ্জের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছিলেন এক সময়। রাজ্যভার গ্রহণ করে নবাব দেখলেন বৈদেশিকের বাণিজ্যে দেশীয় শিল্পের বিশেষ ক্ষতি সাধন হচ্ছে; এদেরই হাতে দেশের টাকা নিঃশেষ হ'য়ে যেতে বসেছে। ইংরাজ কোম্পানী এখানে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। বিনা শুল্কে জলেস্থলে বাণিজ্য করবার বাদশাহী ফরমানও পেয়ে গেছে। কিন্তু ফরাসী ওলন্দাজ দিনেমাররা কোনদিনই সুযোগ পায়নি বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার। এছাড়া কোম্পানীর মালিকেরা আপন আপন স্বার্থে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। সিরাজ তাদের স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন পূর্বের ব্যবস্থার কথা ভুলে যেতে এবং এও তাদের জানিয়ে দিলেন যে বর্তমান নবাবের ইচ্ছা নয় যে তাঁর রাজ্যের টাকা বিদেশীরা এভাবে লুটে নিয়ে যাবে। আর একটি বিশেষ ব্যাপারে ইংরাজ কোম্পানীর ঔদ্ধত্য তাঁর মনকে বিশেষ চঞ্চল করে তুলল। মনে পড়ল মাতামহের জীবিতকালে কলকাতার দুর্গসংস্কার এবং কোম্পানীর সৈন্য সংগ্রহের কথা। ফরাসীদের সঙ্গে ইউরোপে ইংরাজদের যুদ্ধ বাধল আর বাংলাদেশে দুর্গসংস্কার শুরু হল (?) সিরাজ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দুর্লভ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেওয়ান রাজবল্লভকে প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করতে অনুরোধ জানালেন নবাব। ক্রমে গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ল। রাজবল্লভের গোপন শত্রুতা সবই একে একে নবাবের গোচরীভূত হ'ল। ইংরাজ কোম্পানীর অনুগ্রহলাভের আকাঙ্খায় রাজবল্লভ নবাব সরকারের অনেক গোপন কথা কাশিমবাজার কুঠির গোমস্তা ওয়াট্‌স্ সাহেবের কাছে ফাঁস করে দিতে লাগলেন। ওয়াট্‌স্‌ও নবাব দরবারের তথ্য প্রতিনিয়তই কলকাতার ইংরাজ গভর্ণরের কাছে সরবরাহ করতে কোম্পানীর

বিশেষ সুযোগ ঘটে গেল। রাজবল্লভের প্রতিপত্তি ইংরাজ কোম্পানীতে যথেষ্ট বেড়ে উঠল।

"বন্দেগী জাঁহাপনা!"—নারী কণ্ঠস্বরে নবাব চমকিত হলেন।

"একি বেগম সাহেবা তুমি এখানে? হারেম ছেড়ে বাংলা বিহার উড়িষ্যার সম্রাজ্ঞী দরবারে উপস্থিত? স্ত্রীলোকের স্থান হারেমে তাও কি ভুলে গেলে প্রেয়সী!"

"ভুলিই বটে জনাব। আজ নবাব সাহেবকে এত বিচলিত দেখছি কেন। তাছাড়া শাহানশার হারেমে যাওয়ার সময় অতিক্রম করতে চলেছে। দরবার কক্ষে একা বসে কি ভাবছেন প্রভু?"

···"ভাবনার কি শেষ আছে সুন্দরী। বেশ ছিলাম আগে। কিন্তু দাদুর স্বর্ণ মুকুটে দেখছি আজ যেন চারিদিকে কাঁটা। সব দিকেই শত্রু, বিশ্বাসঘাতক। একটা লোককেও তো বিশ্বাস করতে পারছি না।"

···"নবাব সাহেব কি সেদিন নিজের দক্ষিণ হস্তখানিকে বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন। যেদিন সৈন্য নিয়ে নানাসাহেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাটনায় ছুটে গিয়েছিলেন। আর একটা কঠিন সমস্যা যে সামনে উপস্থিত, জনাব কি সে সংবাদ রাখেন কিছু। মতিঝিল প্রাসাদে দিবারাত্র কি হচ্ছে সে খবরটা কি বঙ্গবিধাতার গোচরীভূত হয়েছে!"

"কি সংবাদ!

"খবরটা বড় কিছু না হলেও গুরুত্বপূর্ণ বলেই অনুমান করি। আত্মীয় পরিজন পরিত্যক্ত অবস্থায় ঘেসেটি বেগমের কুচক্রীদের সঙ্গে মতিঝিল প্রাসাদে অবস্থান করাটা কি সমীচীন মনে করেন? রাজবল্লভের চক্রান্ত যে ভীষণ আকার ধারণ করেছে। মতিঝিলে নবাবের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। রাজবল্লভ এতে ভাল রকমই মাথা গলিয়েছেন।"

"খবর যা পেয়েছ তা মিথ্যে নয় বেগম। এ জাল আজই প্রথম বোনা শুরু হয়নি। মতিঝিল প্রাসাদটা বেশ কায়েম করেই গাঁথা হয়েছিল। এর প্রতিটি ইঁটের মাটিতে আছে সিরাজবিদ্বেষ। চাচা সাহেব নোয়াজেস আমারই বিরোধিতা করবার জন্য ঢাকা থেকে এলেন মুর্শিদাবাদে—আর অশ্বক্ষুরাকৃতি একটি ঝিলের বেষ্টনীতে সৃষ্টি করলেন মতিঝিল প্রাসাদের। সে আজকের কথা নয় বেগম। নোয়াজেসের প্রধান সহায় রাজবল্লভ। চাচী ঘেসেটিকে নিয়ে চাচা সাহেব সংসার পাতলেন সেখানে। আমারই কনিষ্ঠ সহোদরকে পোষ্য নিলেন—কারণ, তিনি অপুত্রক। কিন্তু তাঁর ইচ্ছাতে খোদাতালা বাদ সাধলেন। ছোটতেই ভাই মারা গেল। আল্লার কড়া হুকুমে চাচাকেও অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর দরবারে হাজির হ'তে হ'ল। এও শুনেছি, কাফের রাজবল্লভটার মতলব ছিল—নোয়াজেস যদি ইতিমধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করেন, আমার ঐ ভাইকে মসনদে বসিয়ে ঘেসেটি বেগমের নামে এই তিন সুবার প্রভুত্ব চালাবেন।"

···"প্রত্যহ মতিঝিলে যে গুপ্ত বৈঠক বসতে শুরু করেছে সে খবর কি রাখেন হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর!···"

···"গুপ্তচরের সাহায্যে রাজ্যের কিছুটা সংবাদ নিশ্চয় নবাবকে রাখতে হয় বেগম সাহেবা। এও আমি স্থির করে ফেলেছি, যে কোন উপায়ে চক্রব্যূহটা ভেঙ্গে দিতে হবে। ঘেসেটি বেগমকে সত্বর মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে আনবার ব্যবস্থা করছি।"

মতিঝিল প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে উপযুক্ত [illegible] নবাব সিরাজদ্দৌলা মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে এনে মাতামহী সরূপউন্নেসা এবং জননী আমিনার সঙ্গে অন্তঃপুরবাসিনী করলেন। সিরাজ মতিঝিলে আসছেন খবর পেয়ে সৈন্য নিয়ে রাজবল্লভ নবাবের পথ রোধ করলেন তাঁর নিজের ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনা করে। রাজবল্লভের এত দূর স্পর্ধা! তবুও নবাব রাজবল্লভকে বিশিষ্ট সভাসদের পদমর্যাদায় সন্তুষ্ট করে মতিঝিল হস্তগত করলেন।

মূল্যবান দ্রব্যসম্ভারে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করে হালছাড়া নৌকাখানি যেন মেঘে ঢাকা আকাশের নিচে কূলহীন মেঘনার পথে পা বাড়িয়েছে। সভাসদ সকলেই উপস্থিত; মীরজাফর, জগৎ শেঠ মহতাবচাঁদ, মাণিকচাঁদ—সকলেই আছেন। কিন্তু নেই কারো অন্তরের সাড়া। কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত। নবাব সবই লক্ষ্য করছেন। কিন্তু অন্তর্বিপ্লব বুকে চেপেই চুপ করে থাকেন। হারেমেও নবাবের মন টেঁকে না। লুৎফাকেও যেন আর ভাল লাগছে না। মাতামহীর স্তোকবাক্য তাঁর কাছে বিষের মত মনে হচ্ছে।

সামান্য ক'টা দিনের ভেতরেই ইংরাজদের স্পর্ধা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত নেচে উঠল। নবাব স্থির থাকতে পারলেন না। ৪ঠা জুন (১৭৫৭) কাশিমবাজার কুঠি অবরোধ করলেন। ওয়াট্‌স্ আর চেম্বার্স সাহেবকে মুর্শিদাবাদে নজরবন্দী অবস্থায় থাকতে হ'ল। ঐদিনই আর্মেনিয়াম খোজা পিক্রসের সাহায্যে উমিচাঁদের চেষ্টায় ওয়াট্‌স্ সাহেব মীরজাফরকে দিয়ে এক চুক্তিপত্র সই করিয়ে নেয়।

মনসুরগঞ্জ হারেমে এ সংবাদ পৌঁছানমাত্র জননীর আদেশে নবাব এদের মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। সিরাজের ভয়ে হেষ্টিংস সাহেব কাশিমবাজার কুঠি থেকে পালিয়ে কোম্পানীর দেওয়ান কাশিমবাজারের কান্তমুদীর আশ্রয়ে লুকিয়ে থেকে প্রাণ বাঁচালেন।

কালবিলম্বে সমূহ ক্ষতি বিবেচনায় সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে ক'লকাতা অভিমুখে ছুটে চললেন। সেনাপতি মীরজাফর প্রভৃতিকে নবাবের অনুগমন করতে হ'ল। ৭ই জুন কলকাতায় ইংরাজ কোম্পানীর গভর্ণর রোজার ড্রেকের নিকট সংবাদ পৌঁছাল নবাব কাশিমবাজার কুঠি হস্তগত করে কলকাতা আক্রমণে অগ্রসর হয়েছেন। এই সংবাদ দ্রুত সরবরাহের মূলে ছিলেন নবাবের বিশিষ্ট সভাসদেরা। অবিলম্বে রোজার ড্রেক ঢাকা, বালেশ্বর, জগদীয়া প্রভৃতি ইংরাজ কুঠিতে সংবাদ পাঠালেন—ধনরত্ন সামলে নিয়ে অন্যত্র আত্মগোপন কর। বিলম্বে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

কাশিমবাজার কুঠি অবরোধের পর হেষ্টিংস গোপনে বেশ মোটা রকমের উৎকোচ পাঠালেন নবাবের সভাসদদের কাছে।

কলকাতা আক্রমণের কথাতে জগৎ শেঠ, মাণিকচাঁদ, মীরজাফর, রাজবল্লভ একত্রে আপত্তি তুললেন।

বাংলার মসনদ টলে উঠেছে দেখে হিন্দু মোহনলালকে মহারাজ বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করে দেওয়ানজীর পদ দিয়ে তাঁকে রাজকার্য পরিচালনার সকল ভার অর্পণ করলেন নবাব। হরণ করলেন প্রধান অমাত্যগণের সকল ক্ষমতাই। রাজবল্লভকে হিসাব-নিকাশের দায়ে বন্দী করলেন। এমন কি সৈন্যের বক্সী মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁকে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন না করায় তুষের আগুন ধিকি ধিকি সিরাজের রাজ্যকে গ্রাস করতে বসল।

এবার প্রকাশ্যেই শত্রুতা শুরু হ'ল।

নবাব মুর্শিদাবাদ থেকে অর্ধপথ অগ্রসর হতে না হতেই ইংরাজ সৈন্য প্রবল বিক্রমে কলকাতার পাঁচ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে (এখন যেখানে শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেন) নবাবের ক্ষুদ্র "টানার" দুর্গ (যেখানে নদীপথ রক্ষার জন্য মাত্র পঞ্চাশ জন সিপাহী ও তেরোটি কামান থাকত) অকস্মাৎ আক্রমণ করে বসল। নবাব সৈন্য নিরুপায় হয়ে হুগলীতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। টানার দুর্গ ইংরাজদের কবলে খবর পেয়ে হুগলীর ফৌজদার দ্রুত সৈন্য চালনা করলেন। গতিক সুবিধে নয় বুঝে ১৪ই জুন ইংরাজ সৈন্য "টানার" দুর্গ ছেড়ে সরে পড়ল।

রাজবল্লভ নবাব পক্ষ সমর্থন করেছেন এই সংবাদে ইংরাজরা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ ও উমিচাঁদকে কলকাতার দুর্গে বন্দী করল। উমিচাঁদের বাড়া জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল।

সিরাজদ্দৌলা হুগলীতে পৌঁছে ফরাসীদের কাছ থেকে বেশ কিছু বারুদ সংগ্রহ করে রণপোত আর প্রয়োজন মত সৈন্য সাজিয়ে সেনাপতি মীরজাফরকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার দুর্গ আক্রমণ করলেন। হলওয়েল সাহেবের দুর্গ রক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। ২০শে জুন ১৭৫৬—অপরাহ্নে কলকাতার দুর্গে (ফোর্ট উইলিয়ম) নবাবের জয়পতাকা উড়ল।

পরক্ষণেই উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে বেঁধে নবাবের সামনে উপস্থিত করা হল। তাদের প্রতি কোন অসৎ ব্যবহার না করে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করলেন সিরাজ। নবাবের দাক্ষিণ্যে অনেকেই মনে মনে অসন্তুষ্ট হ'ল।

দুর্গ জয়ের পর সিরাজদ্দৌলা রাজা মাণিকচাঁদের হাতে দুর্গ রক্ষা এবং কলকাতা শাসনের ভার দিয়ে তাঁর সাহায্যে তিন হাজার সৈন্য রেখে নিজ শিবিরে ফিরে গেলেন। ২রা জুলাই কলকাতা থেকে রওনা হ'য়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে এলেন এগারোই জুলাই।

যে সমস্ত ইংরাজ শেষ পর্যন্ত কলকাতা দুর্গে মির্জা আমীর বেগের হাতে আটকে পড়েছিল, মীরজাফরের আদেশে তাদের পলতায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

মুর্শিদাবাদের হারেমে ফিরে সিরাজদ্দৌলা আনন্দের আতিশয্যে দুলিয়ে দিলেন আপনার জয়মাল্য বেগম লুৎফুন্নেসার শুভ্র মরাল-গ্রীবায়। আজ যেন নবাব কত নিশ্চিন্ত। লুৎফার কাছে নিজের পরাজয় স্বীকার করে বললেন—"আজ তোমাকে কি বলে সম্বোধন করব প্রিয়তমে! সম্রাজ্ঞী না দেবী! মানবী হলেও সত্যিই দেবী তুমি।..."

—"দেখবেন জাঁহাপনা, এত উর্ধ্বে ওঠাবেন না। শেষ পর্যন্ত যদি মইটা হারিয়ে ফেলেন। লুৎফা আপনার চরণের দাসী হয়ে থাকতেই ভালবাসে জনাব।"

"সুন্দরী, তোমার দূরদর্শিতা আমার মনের ভেতর কেমন যেন উন্মাদনার সৃষ্টি করে। আশ্চর্য কূটনীতিজ্ঞ তুমি। তোমার কথাগুলো কোরাণের কথার মত অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে। তুমি যদি আজ স্ত্রীলোক না হ'তে, নবাব দরবারের সর্বপ্রধান অমাত্যের পদ তুমিই পেতে পারতে। মীরজাফরকে যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তলায় তলায় কি যেন একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে। অভিসন্ধিটাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তাকে বিশ্বাস করতে না পেরে বাধ্য হলাম মাণিকচাঁদের হাতে কলকাতা শাসনের ভার দিয়ে আসতে।"

..."হিন্দুদের আপনি বড় বেশী ভালবেসে ফেলেছেন খোদাবন্দ। এক দিকে দেখছি বাংলার মসনদের চাবিকাঠি নিয়ে মোহনলাল বসে আছেন। অপর দিকে কলকাতার 'মাণিক' রক্ষার ভার আবার দিয়ে এলেন মাণিকচাঁদের হাতে?...ভুল আপনি করেননি নিশ্চয়ই সম্রাট। তবে নিস্তারও নেই আপনার।"

..."হেঁয়ালী কেন বসন্তের ফাল্গুনি? কি বলতে চাও পরিষ্কার করে বল।"

..."মীরজাফর—সেনাপতি মীরজাফর—পরমাত্মীয়ও বটে, পরম শত্রুও বটে। জগৎ শেঠ—তিনিও ইংরাজদের প্রচুর টাকা ধার দিয়েছেন। রাজবল্লভ, ইয়ারলতিফ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ এঁদের তো কোন তথ্যই বাংলার ভাগ্যবিধাতার কাছে লুকিয়ে নেই। চক্রান্তের এখনো অনেক বাকী আছে প্রভু—কাউকে বিশ্বাস করবেন না। তবে আপনি যে দুর্বল এ তথ্যটাও যেন প্রকাশ হ'য়ে না পড়ে। খুব সাবধান!"

● ● ● ●

২২শে আগষ্ট (১৭৫৬) ইংরাজ কুঠিয়াল জাহাজে এক বৈঠক বসল। রোজার ড্রেক, হলওয়েল, ওয়াট্স্, মেজর কিলপ্যাট্রিক প্রভৃতি এই বৈঠকে উপস্থিত হলেন। সভাপতি রোজার ড্রেক জানালেন মাদ্রাজ থেকে সৈন্য আসছে তাঁদের সাহায্যের জন্য। চিন্তার কোন কারণ নেই। ওদিকে কাশিমবাজারে হেষ্টিংস ও ডাক্তার ফোর্থ নবাব মন্ত্রিমণ্ডলীর সঙ্গে গোপন চক্রান্তে প্রবৃত্ত হলেন। মাণিকচাঁদকে দলে টানবার সতর্ক প্রস্তুতি সুরু হল ইংরাজদের।

বেহায়া উমিচাঁদ ইংরাজদের দুঃখে নবাব দরবারে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল।

আর্মেনিয়ান খোজা পিদ্রুস্. ও এব্রাহিম জেকব্স্ উমিচাঁদের কাছে থেকে এক গোপন পত্র নিয়ে কলকাতা থেকে পলতা এসে হাজির হল। তাতে স্পষ্টই উমিচাঁদ লিখেছে, "ইংরাজদের কল্যাণের জন্য আমি সর্বদাই তৎপর। যদি পত্রালাপ করতে চান, তারও আদান-প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থা করে দিতে পারব।"

উমিচাঁদের প্রস্তাবে ইংরাজরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। গুপ্ত অভিসন্ধি ক্রমে পরিপুষ্ট হতে লাগল।

এইবার ইংরাজদের চমৎকার সুযোগ এসে গেল। উমিচাঁদের পরামর্শে মাণিকচাঁদ ইংরাজদের পত্র দিলেন। ঠিক এই সময় এক অভাবনীয় সংবাদ ইংরাজদের ষড়যন্ত্রকে আরও যেন কায়েম করলে। হেষ্টিংস কলকাতার ইংরাজ দরবারে খবর পাঠিয়েছেন, "পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সওকত জঙ্গ বাংলা বিহার উড়িষ্যায় নবাবী করবার বাদশাহী সনন্দ পেয়েছেন। সম্ভবতঃ তিনি শীঘ্রই মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করবেন। সিরাজের সিংহাসন এবার ভালভাবেই টলেছে।"

এত বড় দুঃসংবাদ অমাত্যদের মধ্যে কেউ কেউ জেনেও সিরাজের গোচরীভূত করল না।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

তপতী চট্টোপাধ্যায়

কলেজ লাইব্রেরী। স্তব্ধ পুকুরের মতই নিঃঝুম, কিন্তু কম্পনোদ্গ্রীব। ছোট্টো ঢিল পড়লেও ওঠে বড় বড় ঢেউ। হঠাৎ মাথা না তুলেই সুমিতা শুনলো চাপা হাসির ঢেউ। চাইলো মুখ তুলে। দেখে অমলবাবু ঢুকলেন লাইব্রেরী ঘরে। বুঝলো ইনিই হাসির কারণ। পরের ক্লাসেই বলে অণিমাকে—"হ্যাঁ রে, হাসছিলি কেন রে তোরা তখন?"

উত্তর দেয় অণিমা—"ও মা, তাও জানিস না! বীথি ফোড়ন কাটে—"বা! ও জানবে কি করে? ভাল মেয়ে। জানে খালি ক্লাস, লাইব্রেরী আর প্রফেসার্স কমনরুম। অর্জ্জুনের লক্ষ্য ওর বাইরে যায় না।"

অণিমা বলে—"বলবো এখন। সে বিরাট কাণ্ড। পরের পিরিয়ডে অফ নেই তোর? আমার আছে। চল না কমনরুমে।"

কমনরুমে সর্ব্বদাই বিচিত্র আলোচনার ঝড়। শিশি-বোতল ওলার থলির মত তাতে নেই হেন জিনিষ নেই। কোন প্রফেসারের ক্লাস কার ভালই লাগে না, নেহাৎ পার্সেন্টেজের জন্যে যাওয়া। কার পড়ানো শুনতে কে সং সেজানে ঘোরে। বুদ্ধদেব বসুর কোন্ বইটা না পড়লে জীবনই বৃথা। কোন্ সাবজেক্ট বাদ দিলে পড়ায় ইণ্টেলিজেন্সের কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কার নতুন বৌদি বৈষ্ণব পদের রাধার মত চৌষট্টি কলায় পারদর্শিনী। আরো কত আলোচনাই চলে।

যাক, তারই এক পাশে জানলায় পা ঝুলিয়ে বসে বলে অণিমা—"কোন্ স্বর্গে থাক দেবা? সকলেই তো জানে বিভাদি' আর অমলবাবুর কথা।"

সুমিতা বলে, "ও মা, দুজনেরই তো বয়েস হয়েছে, বিবাহিতও বটে।"

বিরক্ত হয়ে অণিমা বলে, "ও সেকেলে কথা আওড়াসনি আর। বিয়ে হয়েছে তো প্রেম করতে কি?"

অপ্রস্তুত হতে হয় সুমিতাকে। সুমিতা মনে ঠিক মানতে পারে না। এমন কণ্ঠ মানুষ দিনে দিনে শিশুর মত অসহায় হয়ে যাচ্ছে। তার জন্যে কেমন অনুকম্পা হয়। হতেও পারে ওদের কথাই ঠিক। আদর্শবাদী বাবা-মার কাছে মানুষ হয়ে পদে পদেই অবাক হতে হয় সুমিতাকে।

বলে অণিমা, "অমল বাবু রোজ কাজ ফেলে চলে আসেন। লাইব্রেরীতেই বসে প্রেমালাপ চলে, চা-ও আসে। তবে একটা জিনিষ উল্টো ভাই—চা খাওয়ানোটা চিরকাল ছেলেদেরই একচেটে বলে জানতুম। এখানে দেখি উল্টো।"

অশোকা পাশ থেকে বলে, "কাল কি শুনলাম জানিস! বিভাদি বলছেন অমলবাবুকে, 'চুল বড় হয়েছে, চুল কাটবেন। দাড়িটাও কামাতে হবে।' শুনে বলি, 'বাবা এ যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ'।"

অণিমা বলে, "তাই অমলবাবু একদিন বলছেন শুনি 'এ জীবনে সুখ পেলুম না। কিসে সুখ পাওয়া যায় বলুন তো?' রীতিমত গুরুতর ব্যাপার।"

তনিমা দাদার বিয়ে উপলক্ষে অনেক দিন আসেনি; সে আসায় আলোচনা অন্যদিকে চলে যায়

প্রৌঢ়া লাইব্রেরীয়ান বিভাদির আজ মন হয়েছে অদ্ভুত বিশ্রী। মেয়েদের আলোচনা শুনে কানে যেন গরম সীসে ঢালছে। সারাটা বাস মন সেই বিরক্তিতেই ভরে রইলো। বাস ষ্টপে নেমে মনে হোল আজ যদি স্বামী তার ফেরার আগে বেরিয়ে যান, ভাল হয়। ফিরে দেখে, হয়েছেও তাই। অন্যদিন এতে মনটা খারাপ হয়। ছেলেমেয়ে দুটোও স্কুলে চলে যায়। মর্ণিং কলেজ সেরে বাড়ি ফিরে মনটা খারাপ লাগতো, মনকে বোঝাতে হোত এদেরই জন্যে তো চাকরী করা, একা কেরাণী অশোক কি পারতো ওদের মানুষ করতে। কিন্তু আজ কেউ নেই দেখে মনের যেন একটা বোঝা নেমে গেল। যাক, সারাটা দুপুর সব কথা ভেবে একটা কর্ম্মপন্থা ঠিক করে নেবে। খাবারগুলো ঢেকে ঝিয়ের জন্যে রেখে শুয়ে পড়লো। ভাবলো পূর্ব্বাপর অমলবাবুর কথা। এমন স্বাভাবিক সহজ মনে ওকে নিয়েছিলো বিভা, যেমন হঠাৎ কেউ গাড়ী চাপা পড়ছে দেখলে লোকে করে আর্ত্তনাদ। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখে, মেয়েদের আলোচনায় কোন কথাই তো মিথ্যে নয়। সহজ ভাবায় অমল বাবুর কথা বা ব্যবহারের মানে যা দাঁড়ায়, তারা তো তাই-ই করেছে। একটি পরলোক আর অধ্যাত্ম-তত্ত্বের পাগলকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সেও তো অস্বাভাবিক ব্যবহার করেছে। তাঁর অদ্ভুত জটিল প্রশ্নের ছেলে-ভুলোনো উত্তর দিয়েছে। আজ যেন সব ঘটনার ওপর এক ঝলক আলো পড়লো—দিনের আলোয় ঝকঝকে হয়ে উঠলো নিরাবরণ তথ্যগুলো। এই প্রৌঢ় বয়েসে নিজের কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় নিজেরই হাসি পায় বিভার। ভাবে—কি লজ্জা! কাজ ছেড়ে দেবে। এর চেয়ে অপবাদ আর কি আছে? কর্ম্মজীবনে নামার আগে একথা হাজার বার জপ করেছে—এমন কিছু যেন না হয় যাতে লোকে কিছু বলতে পারে। অশোককে বলবে সব কথা, কি কারণে কাজ ছাড়লো সে।

চিন্তার ঝড় অজস্র ধারায় এলোমেলো গতিতে বয়ে চলে। পাঁচটায় ঝিয়ের ডাকে চমক ভাঙে, "উঠার দিন মা, কতক্ষণ ঘুমোবে, তিন লোক আমরা। আজ কি রান্না হবে না।"

ততক্ষণে ছেলেমেয়েরাও এসে গেছে। খাইয়ে, জামাকাপড় ছাড়িয়ে পার্কে তাদের খেলতে পাঠিয়ে অশোককে বললো—"আজ অনেক কথা আছে।" বললো সব কথা।

শুনে অশোক বলে, "ছেলেমানুষি করে কাজ ছেড়ো না। কাজ পাওয়া কঠিন। ওরা যা বলছে তা তো মিথ্যে। কেন একটা মিথ্যে রটনার জন্যে এই দুর্দ্দিনে কাজ ছেড়ে দেবে? রুণু দেবুর কথা ভাবো। ওদের জন্যেই তো কাজ করতে দিতে হয় তোমাকে। নইলে আমিই কি দিতাম তোমায় কাজ করতে?

সব কথা শুনেও ঝরঝর করে চোখে জল আসে বিভার। বলে, "জান, কাল একটা মেয়ের বই খুঁজে দিতে দেরী হতে আমায় শুনিয়ে বললে—'উনি এখন বই খুঁজবেন তার সময় কোথায়—প্রেম করার বেলা যায়।' এমন ছোট্টো একটা মেয়ের সঙ্গে এমন কথার উত্তর দিতেও যে মাথা কাটা যায়।"

অনেক বুঝিয়ে অশোক বলে, "যাক্, কি আর করবে, কত কষ্ট করতে হয় ছেলেমেয়েদের জন্যে। আমার যখন এমন দুর্ভাগ্য নিজে তোমাদের সুখে রাখতে পারি না।"

চিরকালই এ কথাটি বিভার একমাত্র বাণ। এবারও ব্যর্থ হয় না। মনও ঠিক করে ফেলে। ভাবে একটা চিঠি নিয়ে যাবে অমলবাবুর জন্যে, আর মনের মমতাকে প্রশ্রয় দেবে না। আর সবাই তো ওর দুঃখে দৃক্‌পাত না করে সুখেই আছে। বিভারও তাই থাকারই কথা।

ভোর পাঁচটায় নিয়মমত কলেজ যাওয়ার জোগাড় করে বিভা। সারা বাস ভাবতে ভাবতে যায়। মনকে দৃঢ় করে নেয়। হোক না অমলবাবুর মন নিষ্পাপ শিশুর মত। কড়া হাতেই সে চিঠিটা এগিয়ে দেবে। শুরু দুরূহ তত্ত্বের চিন্তা করতে গিয়ে স্বাভাবিক বুদ্ধি হারিয়ে কেমন হয়ে যাচ্ছেন অমলবাবু। কত কাজের মানুষই ছিলেন। প্রিন্সিপাল মণীন্দ্রবাবু এক মিনিট ছাড়তেন না তাঁকে, চোখের সামনে ক' বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছেন। চাকরীই কি বেশীদিন থাকবে? ঘরে তাঁর টাকাও নেই, একটা সংসার ডুবে যাবে। মনে হোত একটা কথায় একটু উৎসাহ দিয়ে যদি বাঁচানো যায় একটা ডুবন্ত সংসারকে। কিন্তু তা ভাবলে তো চলবে না। সমাজে থাকতে গেলে তার সাধারণ নিয়ম মানতেই হবে। মন বেছে দেখার সময় কই মানুষের। কত মানুষই তো বিনা দোষে অপবাদের বোঝা বয়। তা থেকে বাঁচার উপায় তো একমাত্র সেই চলমান জীবনের ছকে নিজেকে ছকে নেওয়া।

কলেজে এসেই রেজিস্ট্রী খাতা হাতে বসে কাজের পর কাজ আসে। হঠাৎ দেখে, আসছেন অমলবাবু—মুখে সেই অসহায় সরল হাসি, "বড্ড মাথার যন্ত্রণা বিভাদি, চা খাব এক কাপ?" করুণায় মন ভরে ওঠে। চিঠি দিতে হাত ওঠে না। মনে পড়ে যায় ছোটবেলায় দেবুটা ঠিক এমনি করে তাকাতো। রোজকার মত বলে বিভাদি, "বসুন, চা আনিয়ে দিই বেয়ারাকে দিয়ে।"

রাধা প্রেম—লৌকিক এবং অলৌকিক

অচিন্ত্য রায়চৌধুরী

রাত্রিশেষের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল শুকতারাটির মতই বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীরাধা একটি অম্লান স্বর্ণময় জ্যোতি—মাধুর্য্যের এক অনুপম মূর্ত্তি—সাহিত্যের বিস্ময়। অনেক যুগের ব্যবধান সরিয়ে আজও যা নাকি বাঙ্গালীর মনে একটুখানি ভিজে মাটির স্পর্শ বুলিয়ে যায়—স্নিগ্ধ এক পবিত্রতার মৃদু-মধুর সুবাস।

ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী মনের গভীরে চিরন্তন প্রেমের যে ফল্গুধারাটি নিয়ত বহমান শ্রীরাধা তারই বাস্তব রূপ। তাঁর প্রেমের প্রথম অনুভূতির বর্ণসুষমায়—বিচিত্র অনুভূতির হাসি-কান্নার দোলায়, সুখে-দুখে কান্নায় বিজড়িত বিরহের অভিব্যক্তিতে—অভিসার রাত্রির মৃদু কম্পিত শঙ্কিত ভাবে ভঙ্গীমায় মর্ত্তোর মানুষ তার হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়ে পরিতৃপ্ত। আর এই প্রেম—এর জন্য ব্যাকুল করা আকুলতা আর্ত্তি, উদ্দাম্ বাসনা, অতৃপ্তি, জ্বালা-যন্ত্রণা, দুস্তর সাধনা—এই সমস্ত মিলিয়েই রাধাকে প্রেমের জগতে এক বিশেষত্বের আসন দিয়েছে—প্রেমাদর্শের সম্রাজ্ঞী করে তুলেছে আর স্বর্গের দূরত্বকে ঘুচিয়ে দিয়ে তাঁকে মর্ত্ত্যের কাছাকাছি টেনে এনেছে এক উন্নত প্রেমের জীবন্ত চিত্ররূপে।

শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমময়ী—কৃষ্ণ সমর্পিত প্রাণা। তাঁর "কৃষ্ণ বৈ অন্য নাই চিতে।" এই কৃষ্ণের জন্যই তিনি কুল ছেড়েছেন—ঘর ছেড়েছেন—লাজ-লজ্জা সব বাদ দিয়ে পথে বেরিয়েছেন—অভিসার রজনীর দুস্তরতার মাঝ দিয়ে একনিষ্ঠ আকুতিতে পথ খুঁজেছেন অতি বাঞ্ছিত মিলন-ধামের। আর এই পথের শেষে প্রিয় মিলনের আনন্দেই সমস্ত দুখের অবসান—

"তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল।
নন্দুক দুখ তৃণ হুঁ করি না গণলুঁ"

এই কৃষ্ণই তাঁর যথাসর্ব্বস্ব—কৃষ্ণ বিনা এক মুহূর্ত্ত সয় না। কৃষ্ণ-বিরহে তিনি জগৎ অন্ধকার দেখেন—সব শূন্য মনে হয়।

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে।"

কৃষ্ণ যে তাঁর কতখানি সুন্দর একটি উপমার মাঝে তারই পরিচয়।

"হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।"

এক কথায় রাধা-কৃষ্ণ অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ প্রেম সব রকম তুলনাকেই হার মানায়।

প্রেমের অগ্নি-পরীক্ষা বিরহে। কিন্তু এই বিরহ-মুহূর্ত্তেও রাধা কৃষ্ণ-তদ্‌গতা। কৃষ্ণ মিলন আশায় অভিসার পথের কঠোরতা কল্পনা করে আগেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন।

"কণ্টক গাড়ি কমল মম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি"।"

প্রেমের জন্য এই যে কৃচ্ছ-সাধন—এই তপস্যা, এ শুধু রাধা-প্রেমেই পাই। রাধার এই সাধনা যোগীর তপস্যার কথাই মনে করিয়ে দেয়। বস্তুতঃ রাধা-প্রেম যেন যোগীর তপস্যারই অন্য রূপ। এ প্রেমের জন্য—প্রেমাস্পদের জন্য এই যে কঠোর তপস্যা—দুস্তর ত্যাগ-স্বীকার, বাস্তবে তা দুর্লভ বলেই বিশেষ।

কিন্তু মিলনেও রাধার তৃপ্তি নেই। কিসের এক অতৃপ্তির ছায়া

বারে বারে মনে শঙ্কার ছায়াপাত করে—কোন অজানা ভয়ে বুক কাঁপে থরথর—কে জানে অত সুখ কি রাধার সইবে ?

"এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে ।
না জানি কানুর প্রেম তিলে যেন টুটে ।"

এই শঙ্কা—এই দ্বন্দ্বেই ত গভীরতার পরিচয় । চিরন্তন প্রেমের আকুতি । সব পেয়েও কিছু না পাবার এক অদেখা ভয় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে রহস্যময় অতৃপ্তির পথে টেনে নিয়ে গেছে সে পথের হদিশ অন্ত কারও জানা নেই । তাই ত কবি-কণ্ঠে বিস্ময় জাগে—

"এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি ;
পরাণে পরাণ বান্ধা আপন আপনি ।
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ।

প্রেমের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধাকে কিছুতেই যে নিবারণ করা যায় না । দুস্তর আবেগ, দুর্দম বাসনার স্রোতে সমস্ত লাজ-লজ্জা ঘুচে গিয়ে একান্ত মিলন ইচ্ছা প্রকট হয়ে ওঠে । দেহ-মনের একাতম মিলনে মন উন্মুখ হয়ে ওঠে—অঙ্গ তাই প্রিয়-পরশ ব্যাকুল—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর ।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে ।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ।।"

তবুও এ অনুরাগ কথায় বোঝানো যায় না । এর উপলব্ধি অসীম—এর বৈচিত্র্য নিত্য নব নব ।

"সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয় ।
সেই পিরীতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ।"

নিত্য নব নব প্রেমের বৈচিত্র্যে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা চির বৈচিত্র্যময়ী । এ প্রেমের আস্বাদনে বড় জ্বালা—বড় যন্ত্রণা—বড় অতৃপ্তি—এই অতৃপ্তির যেন কোন কূল নেই তল নেই—এ যেন অনাদি অনন্ত সমুদ্র । এই অতৃপ্তিই প্রেমকে নবীন করে তুলছে বারে বারে । প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে—কখনও ক্লান্তিতে থিতিয়ে পড়তে দেয় না । রাধা কৃষ্ণের এ লীলা—এ যেন নিত্য রসের লীলা—এর কোন শেষ নেই—পার নেই ।

"পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে ।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে ।

রাধা প্রেমের এই আকুল অমরতা সর্ব্বগ্রাসী প্রেমতৃষ্ণার চিত্রটি লৌকিক রসের ভিত্তিতে কল্পিত হলেও এর সবটুকু লৌকিক নয় —কোথায় যেন এক অনির্ব্বচনীয় অপার্থিবতার স্পর্শ রয়ে গেছে। প্রেম তার পবিত্র প্রবলতায় দেহের গণ্ডী অতিক্রম করে দেহাতীত রূপে পরিণত হয়েছে। এ প্রেম সাধারণ নর-নারীর প্রেম নয়—বাস্তবের অনেক উর্দ্ধে এর অবস্থান। এ প্রেমের সবটুকু নির্ম্মাল্যের মত অর্পিত হয়েছে পরম আনন্দময় সেই পরম-পুরুষ রসিক শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে। এই আত্মহারা প্রেমের অনুশীলনে সহ্ব জ্ঞান লোপ পায়—

"অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেলি মাধাই।"
—বিদ্যাপতি।

বিরহেই এ প্রেমের শেষ নয়। বিরহের মাঝেও দয়িতের রূপ হৃদয় থেকে মুছে যায় না—দয়িতের অনুপস্থিতিতে তখন তারই চিন্তা একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। হৃদয়ের মাঝখানে প্রেম তখন এক স্থায়ী আসন গড়ে নেয়। জগতের যা কিছু সবই তখন কৃষ্ণময় মনে হয়—তাই কৃষ্ণ বিরহে রাধা—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি।"

এই ভাব-তন্ময়তাই হল রাধা প্রেমের চরম ও পরম কথা। আর এই স্তরে এসেই রাধা প্রেম সকল বৈশিষ্ট্যের শেষ স্তরে পৌঁছে গেছে—এখানেই তার সার্থক পরিণতি।

"হৃদয় মন্দিরে মাধব ঘুমাওল
প্রেম-প্রহরী রহু জাগি।"

আর রাধা প্রেমের এই স্তরে পৌঁছেই অকস্মাৎ আমাদেরও সমস্ত কথা হারিয়ে যায়—যুক্তি থেমে যায়—স্বকীয়া পরকীয়া কোন প্রশ্নই আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন আপনা থেকেই এক স্নিগ্ধ পবিত্র রসে ভরে ওঠে মনের পাত্র কানায় কানায়—তখন—

"গুণ রহিতং কামনা রহিতং প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমানং
অবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভব স্বরূপম্"—সেই "অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপং"য়ের উদ্দেশ্যে হৃদয় আপনা থেকেই নত হয়ে আসে। সমস্ত আকাশ জুড়ে নিবিড়ঘন প্রসন্নতার সজল স্নিগ্ধছায়া।

শেকল

শ্রীশীলা চট্টোপাধ্যায়

তবলায় বিষ্ণুপ্রসাদের চাঁটি পড়ে। বোল ওঠে তুন চৌদুনো লম্বা আঙুলের কম্পন দেখা যায়। কখন যে তবলায় হাত পড়ছে উঠছে দেখা যায় না। কপাল থেকে লম্বা সোজা চুল মাথা ঝাঁকিয়ে সরিয়ে দেয় বিষ্ণুপ্রসাদ। শিরদাঁড়া সোজা। ঘামে ভিজে আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে আটকে বসেছে। কপালের দু'ধার দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। লম্বা জোয়ালো মুখ। চওড়া কপালের মাঝখানে একটা লম্বা খাঁজ, উঁচু নাক, পুরনো শিবমূর্ত্তির মত কাটালো ঠোঁট. প্রকাণ্ড বড় চোখ, চোখের পাতা মেয়েদের মত লম্বা আর লোমড়ানো। মনে হয় যেন চোখে সুরমা টানা আছে। বিষ্ণুপ্রসাদ তাকিয়ে দেখছে বাজপাখীর মত স্থির দৃষ্টিতে লাবণ্যর পা। কথক নাচের জলদ তালে লাবণ্যর পা উঠছে পড়ছে। মোটা চামড়ায় গাঁথা দু'পায়ের পেতলের ঘুঙুরে আওয়াজ বিষ্ণুপ্রসাদের তবলার বোলের সঙ্গে মিল রাখছে। তবলা আরো তাড়াতাড়ি বাজছে, যেন বিষ্ণুপ্রসাদ তার নিজের রক্তের চলাচল তবলায় বাজিয়ে যাচ্ছে। লাবণ্য দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে নেচে চলে পা অবশ হয়ে আসে হাঁটুর নীচে থেকে। তাল কাটা যায়, একবার দু'বার। গর্জ্জে ওঠে বিষ্ণুপ্রসাদ—'এ কি মানুষের নাচ না ঘোড়ার নাচ? সাত বচ্ছর নাচ শিখিয়েছি না?'

লাবণ্যর পায়ের পাতাগুলো ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে আসছে। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর অসাড় দু-ঘণ্টা অনবরত নাচের পর। বসে পড়ে মাটিতে পা মুড়ে। হাত দুটো কোলের ওপর, মুখটা নুয়ে মাটির দিকে। তবলা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল বিষ্ণুপ্রসাদ।

'হাঁপিয়ে গেছি মাষ্টার মশাই, একটু জিরিয়ে নি'।' তার চোখে ভারি ভয়। নাচের লাফঝাঁপে ফর্সা মুখ গোলাপি হয়ে গেছে। নীল সিল্কের শাড়ীর আঁচল দিয়ে হাতের মুখের ঘাম মুছতে লাগল।

'তোমার দ্বারা আর হয়েছে! চারদিন বাকি চন্দ্রকলার শো'র। ষ্টেজে উঠেও এই কোর। তার চেয়ে বেলা কি কেতকীকে এই নাচটা দিলে ভাল হোত।'

লজ্জায় লাবণ্যর মনে হয় মাটিতে মিশে যায়।

বিষ্ণুপ্রসাদ একটা সিগারেট ধরিয়ে ভিজে পাঞ্জাবীটা পিঠ থেকে ছাড়িয়ে নেয় কাঁধ ঝাঁকিয়ে। বিরক্তিতে তার দু'চোখের মাঝে একটা খাঁজ পড়ে। বিষ্ণুপ্রসাদ বড় দরের নাচিয়ে। আসল শিল্পী, তার সব কিছু নিখুঁত সুন্দর চাই। এতটুকু ভুলচুক হলে দপ করে জ্বলে ওঠে স্পিরিটে আগুন লাগার মতন। লাবণ্যকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তার সাত বছরের ছাত্রী, হয়ত একটু বেশী তার দিকটা টানে বিষ্ণুপ্রসাদ চন্দ্রকলার অন্য মেয়েদের চাইতে। সেটা ঠিক নয়। লাবণ্য বড় বেশী রোগা, বড়লোকের আদুরে মেয়ে, অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। খায়-দায় না নাকি? ওর মুখটা বড় সুন্দর, সেই জন্যেই ত কেতকীকে না দিয়ে ওকে নাচটা দিয়েছে বিষ্ণুপ্রসাদ। ষ্টেজে পোষাক-আষাক পরে লাবণ্যকে দেখায় অপ্সরার মতন। আর আজকালকার লোকেরা খালি নাচ বোঝে না, চেহারা ভাল কিনা আগে দেখে। বিষ্ণুপ্রসাদের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি দেখা দেয়। চন্দ্রকলার ছাত্রী দরকার। তার নাচের ইস্কুল চলবে না তা নইলে, তাই একটু-আধটু এসব দিকে লক্ষ্য রাখে বিষ্ণুপ্রসাদ। পয়লা বোশেখ তার স্কুলের উৎসবে মেয়েরা টিকিট বিক্রী করে নাচ দেখাবে।

এদিকে রাত্তির ন'টা বেজে গেল স্কুলের গোল ঘড়িতে। রাস্তায় হর্ণ শোনা গেল লাবণ্যর বাড়ীর গাড়ীর। চমকে উঠে দাঁড়ালো সে। তারপর মনে পড়ল। নাচ শেখা শেষ হয় নি। জড়সড় হয়ে জিগেস করলে—'মাষ্টার মশাই আমাদের বাড়ী কাল সকালে একবার যদি যান নাচ শেখাতে, যেমন আমি ছোট থাকতে যেতেন।'

'ছোট এখনও আছ। তোমার বয়স কত? তের না চোদ্দ?'

'না!—ষোল!'

'সে যা হোক, আমার সময় হবে না। তুমিই ইস্কুলে এসো।' লাবণ্য ঘুঙুরটা খুলে হাতে নিয়ে চলে গেল গাড়ীতে।

মা, ঠাকুমা বলছেন লাবণ্য বড় হয়েছে, আর ওর নাচ শেখা চলবে না। চাপা কান্নায় বুকের ভেতরটা লাবণ্যর ভারি লাগে।

আট বছর বয়স থেকে সে নাচ শিখছে। নাচের সময় কেমন একটা বাঁধনহারা স্বাধীন জগৎ সে পেয়ে যায়। নাচের ভঙ্গীতে তার যে আনন্দ, তা গাছের ফুল ফোটার আনন্দ, আকাশের মেঘ ভাসার আনন্দের সঙ্গে মিলে যায়। এক-একদিন চাঁদনী রাতে স্কুলের খোলা চাতালে বিষ্ণুপ্রসাদ গলায় মাদল বেঁধে লাফিয়ে লাফিয়ে মণিপুরী নাচ নাচে। লাবণ্যও নাচে তার সঙ্গে, কখনও তাকিয়ে দেখে। তখন বিষ্ণুপ্রসাদ বকে না। সে নিজের নাচে নিজেই মাতাল। মা ঠাকুমাকে লাবণ্য কি করে বোঝাবে তালে তালে সমস্ত শরীরে ছন্দের ঢেউ তুলে নাচার আনন্দ। কান্নাকাটি করে। মা বলেন, বায়না করার বয়স আর নেই। লাবণ্যর নাচের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিষ্ণুপ্রসাদ নিজে। ছোটবেলা থেকে দেখছে সে তাকে, প্রাণভরে ভালবাসে। অনেক রাতে ঘুম আসে না বিষ্ণুপ্রসাদের অদ্ভুত সুন্দর দেহের কথা ভেবে। শুনতে পায় বিষ্ণুপ্রসাদের ভরাট গলা নাচের বোল বলছে—যখন মাঝ রাত্তিরের অন্ধকারে টেবিলের ছোট ঘড়ির কাঁটাগুলো সবুজ হয়ে জানোয়ারের চোখের মত জ্বলছে। মেহগনির খাটে পাশবালিশের আড়ালে ওপাশে বুড়ী ঠাকুমা ঘুমোচ্ছে। লাবণ্য উঠে খুলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে থামে মাথা রেখে। সাদা তুলোর রাশ বিছিয়ে চাঁদ ঘুমোচ্ছে আর সামনের অর্জুন গাছের পাতার আড়ালে অনবরত গলা চিরে ডেকে চলেছে এক পাপিয়া। বিষ্ণুপ্রসাদ জানে না তার ভালবাসার কথা। জানলে কি করবে তা ভাবতে পারে না লাবণ্য। তার নিজের ওপর কোনও বিশ্বাস নেই, সে সুন্দর না কুৎসিত সে ঠিক জানে না, বোকা কি চালাক। তাকে বিষ্ণুপ্রসাদের মত পরম সুন্দর পুরুষ ছাত্রী ছাড়া অন্য চোখে দেখতে পারে কিনা কোনও ধারণা তার নেই। বাড়ীর লোকেরা নাচ বন্ধ করে দিলে সে বাঁচবে কেমন করে? বাবাকে ধরে অনেক করে রাজি করিয়েছে স্কুলের ১লা বৈশেখের শো'টা অবধি সে ছন্দকলা ছাড়বে না।

—'ঘরের কাজ শেখো, বুড়ো ধাড়ী হচ্ছ। ও বয়সে আমরা সাত ছেলের মা হয়েছিলাম। ধিঙ্গী মেয়ে নেচে বেড়াচ্ছেন।' ঠাকুমা বলেন সকাল থেকে।

—'কি কাজ শিখবো কি? ঘর ঝাঁট দেব, না ঘর মুছব?' লাবণ্য জিগেস করে: চোখে জল ভরে আসে।

—'শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না? শাশুড়ী আদর করে বসিয়ে রাখবে? মেয়ের চোখে জল এসে গেল অমনি!' ঠাকুমা গজ গজ করেন।

ছন্দকলার পয়লা বৈশেখ উৎসবের দিন লাবণ্যর পায়ের তাল কাটেনি। হল ভর্ত্তি লোকের হাততালিতে ছাতে চিড় ধরে। লাবণ্যর মা বাবা ঠাকুমা সবাই গিছলেন দেখতে। ওঁদের সবার খুব গর্ব। বিষ্ণুপ্রসাদ কিছু প্রশংসা করল না। তবে গালাগালও দিল না। পাথরের মূর্ত্তির মত একরকম গভীর চাপা হাসি হাসলে ঠোঁটের কোণে। তাইতেই লাবণ্যর আনন্দের শেষ নেই।

পরের হপ্তা থেকে লাবণ্য আর নাচের স্কুলে যাবে না, হুকুম হয়েছে। বিষ্ণুপ্রসাদ তখন একদল বাচ্চা মেয়েকে এক, দুই, তিন, করে নাচের প্রথম পা ফেলা শেখাচ্ছিল। বাচ্চাদের শেখাতে বিষ্ণুপ্রসাদের ধৈর্য্য অসীম। হাসিতে গল্পে ভরপুর। লাবণ্য দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর ডাকলে 'মাষ্টার মশাই'। ফিরে তাকাল বিষ্ণুপ্রসাদ ভুরু কুঁচকে। 'আমি লাবণ্য। আমি যাচ্ছি। স্কুল ছেড়ে দিচ্ছি।' এক নিঃশ্বাসে তাড়াতাড়ি বলে ফেলল কথাগুলো লাবণ্য। দুঃখে সে দু' টুকরো হয়ে যাচ্ছে তার রোগা শরীরের ভেতর।

অবাক হয়ে বিষ্ণুপ্রসাদ জিগেস করলে 'কেন'?

—'বড় হয়ে গেছি।' মাটির দিকে তাকিয়ে বললে লাবণ্য। চোখের জল এবার আর আটকে রাখতে পারল না। মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। ভাল দেখতে পাচ্ছিল না ঝাপ্‌সা চোখের জলে। শুনতে পেল বিষ্ণুপ্রসাদের পায়ের শব্দ, পিঠে হাত রেখে বললে বিষ্ণুপ্রসাদ 'ছিঃ কাঁদে না, সত্যি আমারও মন খারাপ লাগছে। তোমার জন্যে যতটা, তার চেয়ে বেশী আমাদের এই ধারণাগুলোর জন্যে। সাত বছর নাচ শিখিয়ে যখন সবে কিছু হাত-পা নাড়তে পারছে, ব্যস্ খতম। বয়স হয়েছে। বয়স না হাতী। ষোল বছর আবার বয়স নাকি!' বিষ্ণুপ্রসাদ লাবণ্যর পিঠে হাত বোলায় ছোট ছেলেকে ভোলাবার মতন।

লাবণ্যর কেঁদে চোখ লাল। কান্না ঢাকা আর চলে না, ধরা পড়ে গেছে। মুখ তুলে বলে—'মাষ্টার মশাই আমাদের বাড়ী যাবেন?'

বিষ্ণুপ্রসাদ হাসে। পিঠ চাপড়ে বলে, 'নিশ্চয়ই।'

লাবণ্যর বিয়ের ঠিক করতে উঠে-পড়ে লেগেছে বাড়ীর সকলে। ফর্সা রং, সুন্দর দেখতে, টাকার অভাব নেই, ছোট বয়সেই মেয়ের বিয়ে দেওয়া ভাল, ঠাকুমার মত। লাবণ্যর দিনগুলো খালি লাগে। আলমারির ভেতর ঘুঙুর দু'টোকে শাড়ীর তলা থেকে বের করে নেড়েচেড়ে চাপা দিয়ে রেখে দেয়।

লাবণ্যর বিয়ে পাকা হয়ে যায় যশীদপুরের জমিদার হরবিলাস রায়চৌধুরীর বাড়ী। জমিদারী উচ্ছেদ হবার পর কলিয়ারী ও চা-বাগানের ব্যবসা করছেন হরবিলাস বাবু। তাঁর সাত ছেলে। লাবণ্যর সঙ্গে যার বিয়ের ঠিক হয়েছে সে পাঁচ নম্বরের। ভীষণ পর্দা তাঁদের বাড়ী। পঞ্চাশ বছর আগের মত চালচলন। মেয়েরা গাড়ীতে বেরোলে চারদিকে পর্দা টেনে দেওয়া হয়। অন্দর মহলে মেয়েরা থাকে গয়না কাপড় ভরা সিন্দুক, আলমারি আর রূপোর পানের ডিবে নিয়ে মরণকাল অবধি, খাঁচায় পোরা সৌখিন পাখীর মতন।

লাবণ্যর ফর্সা রংএর জন্যেই তাকে ওঁদের এত পছন্দ। একদিন বর নিজে লাবণ্যকে দেখতে এল বন্ধুর সঙ্গে। হরবিলাসের পাঁচ নম্বর ছেলে কুঞ্জবিলাসের বয়স কুড়ি বছর; গোল মুখ, খুব মোটা, বেঁটে, ফর্সা, গোঁফ আছে, সমস্ত শরীরে মাংস থলথল করছে হাতীর মত। চর্ব্বির খাঁজে ঢাকা ক্ষুদে মুগ্ধ চোখে দেখে নিলে অনেকক্ষণ ধরে লাবণ্যকে কুঞ্জবিলাস।

—'আমি কখনও ওই মোটাটাকে বিয়ে করব না।' লাবণ্য বললে মাকে।

—'পুরুষমানুষের আবার রূপ কি?' মা বললেন। 'ওই বাড়ী বিয়ে হচ্ছে, নিজে যেচে নিয়ে যাচ্ছে কত ভাগ্যি, তা না মেয়ে আবার বায়না ধরেছেন। বিয়ে হোক না, জমিদার বাড়ীর ক্ষীর-ননী খেয়ে তুইও অমনি মোটা হবি'। মা হেসে বললেন সমস্যার শেষ করে দিয়ে।

লাবণ্যর চোখের সামনে ভাসে বিষ্ণুপ্রসাদের পাথরে গড়া শরীর, উঁচু নাক, আর বাঁকা হাসি। মাথার ভেতর যেন ভারি কুয়াশা সব অন্ধকার করে দেয়। কুঞ্জপ্রসাদকে স্বামী ভাবতে গেলেই আতঙ্কে শিউরে ওঠে। তার কত সাধ, আশা, সব ছিঁড়ে দিয়ে কুঞ্জপ্রসাদ বসবে তার স্বামী হয়ে। লাবণ্য খেতে পারে না, শুতে পারে না, কেবলই কাঁদে। মা বলেন—'ছোট মেয়ে, শ্বশুরবাড়ী যাবার ভয় হয়েছে। ও সবারই হয়। আমার বিয়ে হয়েছিল দশ বছর বয়সে। সে কি কাঁদতাম প্রথম প্রথম।'

হয়ত লাবণ্য সব সহ্য করে যেত, যদি না একদিন বিষ্ণুপ্রসাদ দেখা করতে আসত।

—'তোমার নাকি বিয়ে?' খুব খুসী হয়ে জিগেস করলে বিষ্ণুপ্রসাদ, 'কেষ্টকাকার কাছে খবর পেলাম।'

লাবণ্য চা আর মিষ্টির থালা এনে রাখলে বিষ্ণুপ্রসাদের সামনে। আঁচলের কোণ আঙুলে জড়িয়ে চুপ করে বসে রইল। কথার উত্তর দিলে না।

ওর মা এসে বললেন—'শ্বশুরবাড়ী যাবে বলে মন খারাপ।' ভারি ঠাট্টার কথা যেন।

লাবণ্যর চোখের কোণে কালি পড়েছে। হঠাৎ জিগেস করলো—'মাষ্টারমশাই, আপনি বেশ আছেন, না?'

—'কেন?'

—'এই আপনাদের জীবনটা কেমন আনন্দের। কোনও দুঃখ নেই।'

বিষ্ণুপ্রসাদ হো হো করে হেসে উঠল। 'তুমি আমার জীবনের কি জান? আমাদের পেটের খোরাক যোগান খুব আরামের নয় সব সময়। এমন দিন গেছে যখন—যাকৃগে।' বিষ্ণুপ্রসাদের মুখ শক্ত হয়ে যায় কি একটা কথা ভাবতে গিয়ে।

—'মাষ্টারমশাই আপনি সুখী না?'

বিষ্ণুপ্রসাদ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে লাবণ্যকে। মুখচোরা লাবণ্য বিষ্ণুপ্রসাদের মনের অবস্থা নিয়ে সোজাসুজি কথা জিজ্ঞাসা করে কেন? সত্যিই কি লাবণ্য বড় হয়ে গেছে? বিষ্ণুপ্রসাদের চা মিষ্টি পড়েই থাকে। তার শিল্পী মনে ডেকে এনেছে লাবণ্য তার ফেলে আসা দিনের সমস্ত বিষাদ, ঝড়, ঝঞ্ঝা, অপমান।

—'আমার চেয়ে তুমি অনেক সুখী হও।' জোর দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বিষ্ণুপ্রসাদ।

লাবণ্যর সারাদিন মনে পড়ে বিষ্ণুপ্রসাদের বিষণ্ন মুখ। লাবণ্য জানে বিদেশে তার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। সে একা নাচের স্কুল খুলেছে। আজ লাবণ্য যদি তার সঙ্গে থাকত, তাহলে লাবণ্য তাকে নিশ্চয় সুখী করতে পারত। আর লাবণ্য নিজে? তার চেয়ে বেপরোয়া আনন্দ কারো হবে না পৃথিবীতে।

আশীর্ব্বাদের সময় বড় বেশী কান্নাকাটি করেছিল লাবণ্য। বিরক্ত হয়ে মা, বাবা, ঠাকুমা সবাই খুব বকেছিলেন। শ্বশুরবাড়ীর দেওয়া লাল লাল ভেলভেটের বাক্সে সাজান হীরের মুকুটে ঝরে পড়েছিল ওর চোখের জল। বিরক্ত হয়েছিলেন জমিদার হরবিলাস, অমঙ্গল হবে ভেবে।

মা বললেন রেগে, 'বিদেয় হলে বাঁচি। অপমানের একশেষ। বাড়ী ভর্ত্তি লোক, ধেড়ে মেয়ের কান্নায় অস্থির।'

লাবণ্য অভিমানী। মার কথায় ওর মনে হল ঝাঁপ দিয়ে বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে। মা বুঝছেন না, ওর সমস্ত জীবন কুঞ্জবিলাসকে বিয়ে করে কি ভাবে কুৎসিত ভয়াবহ হয়ে উঠবে। মা বুঝছেন না ওর হাজারো আশা সুন্দর, সুপুরুষ প্রেমিকের স্বপন মিলিয়ে এক অন্ধকারের বিভীষিকা দিনের আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে।

মাঝরাতে খাওয়া দাওয়ার পর যখন বাড়ী শান্ত হয়ে এসেছে, লাবণ্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগান পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। সিঁড়িতে দু' একজন আত্মীয়র সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁরা বুঝতে পারেননি। তখনও চাকররা খাচ্ছে, পরিবেশন হচ্ছে। মা, ঠাকুমা জেগে।

চন্দ্রকলার রাস্তা ও চিনত। ট্যাক্সি ডাকতে সাহস হোল না। কখনও একলা ট্যাক্সিতে ওঠেনি। পায়ে হেঁটে চলল। ভাল লাগল আজ্‌ছন্নের মত পূর্ণিমা রাতে সব বাঁধন খুলে রেখে চলতে। লাবণ্যর মনে দুর্জ্জয় সাহস। সমস্ত পৃথিবী জয় করে ফেলতে পারে ও ইচ্ছে হলে। আজ আশীর্ব্বাদের সাজে নিজেকে আয়নায় দেখে ওর মনের দ্বিধা ঘুচে গেছে। লাবণ্য জেনেছে ও সত্যিই সুন্দরী। বিষ্ণুপ্রসাদ তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

গভীর রাত্তিরে অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ার পর বিষ্ণুপ্রসাদ ঘুম চোখে দরজা খুলে দাঁড়াল চোখ রগড়ে। খালি গা, লম্বা চুল এলোমেলো।—'কে?'

লাবণ্য দরজা ভেজিয়ে ঘরে চলে এসে বড় বাতিটা জ্বালিয়ে দিল। ঘরটা প্রকাণ্ড। বেশীর ভাগ খালি নাচের জন্যে। একদিকে দুটো তক্তা পাতা, তার ওপর সাজান তবলা, এসরাজ, মাদল। বিষ্ণুপ্রসাদ চোখ কুঁচকে তাকাল, যেন বিশ্বাস হচ্ছে না যা দেখছে। 'লাবণ্য। এত রাতে। কি হয়েছে?'

—'কিছু না। চলে এসেছি।' লাবণ্যর গলার স্বর কাঁপল না। 'আমি ও বিয়ে করতে পারব না।'

ভীষণ বিরক্ত হোল বিষ্ণুপ্রসাদ। বললে—'এ কি বায়স্কোপ পেয়েছ? এত রাত্তিরে বলতে এসেছ আমায় এ সব কথা! আমি তোমার মা, বাবা কেউ না। তুমি কাকে বিয়ে করবে না করবে জেনে আমার কি?'

লাবণ্য সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এসেছিল বিষ্ণুপ্রসাদকে কি বলবে। একটু গুলিয়ে গেল।—'অন্য লোককে বলে লাভ নেই। তাই আপনাকে বলছি।' একটু ঢোক গিলে মরিয়া হয়ে বললে—'আমি তোমাকে ভালবাসি।' তার নিজের কথার আওয়াজে সে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। একদৃষ্টে চেয়ে রইল বিষ্ণুপ্রসাদের দিকে। ভারি অবাক হয়ে বিষ্ণুপ্রসাদ তক্তার ওপর বসে পড়ল, হাত লেগে একটা সেতারের তার বেসুরো ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

মেঘের মত হাল্কা লাগছে লাবণ্যের, এতদিনের লুকিয়ে রাখা বয়ে চলা বোঝা খুলে দিয়েছে সে বিষ্ণুপ্রসাদের সামনে।—'নাচতে আমার ভীষণ ভাল লাগে। এত ভাল আমার জীবনে আর কিছু লাগে না। আমি আর কোথাও যাবো না, তোমার সঙ্গে থাকবো।' এগিয়ে গেল বিষ্ণুপ্রসাদের কাছে—'তুমি আমায় বিয়ে করবে?' চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে অধীর আগ্রহে।

বিষ্ণুপ্রসাদের বড় বড় মেলে ধরা চোখ নেমে এল। বিষ্ণুপ্রসাদ ভালবাসা চেনে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—'ছেলেমানুষি কোর না

াবণ্য। আমার বয়স কত জান? পঁয়তাল্লিশ বছর। দেখছ আমার পালের পাশে সব চুল সাদা হয়ে গেছে। তুমি আমার মেয়ের সী।'—

'বাজে কথা।'—স্বচ্ছন্দে বললে লাবণ্য? এই নতুন লাবণ্যকে ষ্ণুপ্রসাদ চেনে না। তার ভয় হতে লাগল। বান-ডাকা পদ্মার ত এগিয়ে এসেছে লাবণ্য।

—'চল, তোমায় বাড়ী রেখে আসি। কি বলবোই বা। দেখ খি কি গোলমালে ফেললে। এখন লোকে যা-তা ভাববে।' ষ্ণুপ্রসাদের সুর বিব্রত, কথায় জোর নেই।

—'আমি ত' বলেছি আমি আর বাড়ী যাব না।'

বিষ্ণুপ্রসাদ উঠে দাঁড়াল।—'চল আমার সঙ্গে।' লাবণ্যর হাত টেনে নিয়ে গেল দরজার দিকে।

হঠাৎ লাবণ্য ঝাঁপিয়ে পড়ল বিষ্ণুপ্রসাদের বুকে, গলা জড়িয়ে লে—'তাড়াও ত' দেখি আমাকে, কেমন পার।'

তলহারা আত্মবিশ্বাস লাবণ্যর, তার মনে অসীম শক্তি। ্রপ্রসাদ সেই মুহূর্ত্তে নতুন পরিচয় করে নিল নতুন লাবণ্যর । সে সুন্দর, নতুন যৌবনে পূর্ণ। বিষ্ণুপ্রসাদের নিঃশ্বাস ম হয়ে উঠল, এখুনি তলিয়ে যাবে সে। চোখ বন্ধ করে জোর র গলা থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলো লাবণ্যর। জানলায় বাইরে কারের দিকে চেয়ে মিথ্যে জোর টেনে এনে বললে—'লজ্জা করে তোমার এ রকম ব্যবহার করতে ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে? মার কি আছে কি, যার জন্যে তোমায় আমি ভালবাসব? যা নাচতে তাইতে আমার যোগ্য মনে কর নাকি নিজেকে? তুমি ত' সিত, রোগা।' গলা কেঁপে গেল শেষের দিকে এত বড় মিথ্যে কথা তে। আবার জোর গলায় বললে—'তুমি কুৎসিত।'

মুখ ঢেকে দেয়ালে মাথা রেখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল লাবণ্য খানিকক্ষণ। তারপর নিজেই বললে—'চলুন, বাড়ী পৌঁছে দিন।'

অন্ধকারে লাবণ্যর মুখ দেখতে পেল না বিষ্ণুপ্রসাদ। বাড়ীর কাছে মোড়ে এসে লাবণ্য বললে—'আপনি যান। বাড়ীর লোক আপনাকে দেখলে আরো মুস্কিল হবে।'—ফিরে তাকাল না।

বিয়ের দিন লাবণ্যকে দেখতে যাবার লোভ সামলাতে পারলে না বিষ্ণুপ্রসাদ। লাল শাড়ী পরা হীরে জড়োয়ায় মোড়া কনে। লাবণ্যর চোখে জল নেই। অস্বাভাবিক একটা রুক্ষতা। তার কোমল সাজগোজের সঙ্গে, নরম চেহারার সঙ্গে খাপ খায় না। বিষ্ণুপ্রসাদ ওকে দেখে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পাশের লোকের সঙ্গে কথা বলতে সুরু করলে। লাবণ্য এসে বললে—'আমি চললাম।' রূপোর মল বাজিয়ে চলল বাসরঘরে, মোটা, বেঁটে, কুঞ্জবিলাসের চাদরে আঁচল বাঁধা।

বিষ্ণুপ্রসাদের মনে হোল ভীষণ একটা ভুল হয়ে গেছে। কুঞ্জবিলাসের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে লাবণ্যকে। কিন্তু আর উপায় নেই। বিষ্ণুপ্রসাদ এক গেলাস ঠাণ্ডা সরবত তুলে নিয়ে চুমুক দেয়। দুনিয়ায় খেয়ালের মাথায় কাজ করা চলে না। জীবনের অভিজ্ঞতা তার কিছু কম নেই। সেই একবার লক্ষ্ণৌতে খসরুবাগে—যাক গে সে সব কথা।

লাবণ্যর পায়ের মল বাজে এলোমেলো, পা ফেলার সঙ্গে যেন কয়েদীর পায়ে শেকল বাজছে। ঘামে ভেজা কপালটা রুমাল দিয়ে ঘসে ঘসে মুছে নেয় বিষ্ণুপ্রসাদ।

এবার ফের

শ্রীমতী বসু

এবার ফের শান্ত কুলায়
দিনান্তে পশ্চিম প্রান্তে
আগুন লেগেছে বুঝি
আকাশের গায়।

শিখা তার
ওঠে কাঁপি থাকি থাকি
খালে আর বিলে
নদীতে ও ঝিলে
তাহারি ফলন দেখা যায়
এবার ফের শান্ত কুলায়।

এ আগুন নিভে গেলে
সন্ধ্যার অন্ধকার
দিগন্ত গ্রাসিবে
কেমনে আসিবে
ক্লান্ত ডানা মেলে
তোমার কুলায়

হাওয়া ঐ মৃদু হ'তে
হ'লো খরতর
এ যে হাওয়া ঝড়ো
পাতাজলি আর ধূলি
উড়ে উড়ে আসে
উন্মত্ত বাতাসে
মেঘের কর্কশ শব্দ
ঐ শোনা যায়।

পথ ভ্রান্ত হয়ে তুমি
হারাবে কোথায়,
হে পাখী এখনো ফের
তোমার কুলায়।
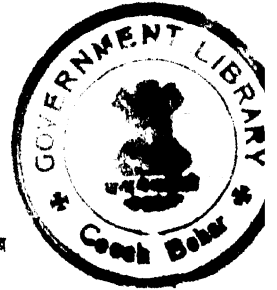
বিপ্লবের সন্ধানে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে কমিউনিষ্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। তার আগেই তাদের তরফ থেকে একখানা বই প্রকাশিত হয়েছিল Forward to Freedom, এবং তাতে বলা হয়ে ছিল,—"ভারতের যুদ্ধ (জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা—না, ব.) ভারতের নিজের হাতে নেওয়াই আজ সবচেয়ে বড় কর্তব্য।"…এই যুদ্ধ জয়ের জন্যে সংগ্রামের অর্থ দেশরক্ষা এবং স্বাধীনতা অর্জন।…সাম্রাজ্যবাদ আজ দেউলিয়া এবং বন্ধুহীন; মালয়ের মতন অসম্ভব ব্যর্থতা তাদের অপদার্থতার চূড়ান্ত নিদর্শন; কোন দেশপ্রেমিক ভারতবাসীরই আর এ সম্বন্ধে কোন মোহ বা ভ্রান্তি নেই; এখন আমাদের কর্তব্য হল সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া এবং ভারতের একতাবদ্ধ শক্তিকে সাম্রাজ্যবাদী স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা।

"এ যুদ্ধকে আমরা জনযুদ্ধ বলি এই কারণে যে, বর্তমান নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কল্যাণে জনগণই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠিকে পরাজিত করবে—এ যুদ্ধের শেষে চার্চিলের মতন সাম্রাজ্যগর্বীর দলের মাতব্বরীর অবসান হবে। এ যুদ্ধ সমর্থন করার অর্থ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের গোলামী নয়, পরন্তু গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন এবং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে গেছে, কিন্তু আমাদের দেশের যুদ্ধোদ্যমের প্রকৃতি বদলায়নি, এবং যে সরকার সেটার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে, তার প্রকৃতিও বদলায়নি।

"আমরা জনগণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে যে ক্ষেত্রে পারি সহযোগিতা করবো, এবং যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন, বাধা দোব এবং এই ভাবে জনগণকে নিজেদের গণস্বার্থ রক্ষায় সক্রিয় করে তুলবো। অবশ্য, জাতীয় সরকার ভিন্ন কোন প্রচেষ্টাই সফল হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তা যতদিন না হবে, ততদিন আমরা নিষ্ক্রিয় থেকে শুধু নিষ্ফল ক্রোধে গুমরে মরবো কেন?"

কি করতে বলা হল, তার কোনো দিশা পাওয়া গেল কি? শুধু এইটুকুই বোঝা গেল,—আমাদের যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতা করাই এখন কর্তব্য, এবং তার দৌলতেই আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার এবং জাতীয় সরকার পাবো।—অন্তিমে, যুদ্ধ শেষের পর, বিজয়ী ইংরেজের রাজী-নামার মারফতেই পাবো, কিম্বা তার আগেই পাবো? যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতার সংগ্রামের ফলে জাতীয় সরকার পাবো, অথচ জাতীয় সরকার না হলে কোনো প্রচেষ্টা সফল হবে না,—এই ঘোলা ধোঁয়াটে কথার এই অর্থ হতে পারে যে আমরা জাতীয় সরকার হওয়ার আ[গে] যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য করবো,—তার ফলে সরকার আমাদের গণতা[ন্ত্রিক] অধিকার এবং জাতীয় সরকার দেবে,—তার ফলে জাতীয় সর[কার] (কংগ্রেস সরকার) যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতা করবে,—এবং তার [ফলে] জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করা বৃটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব হ[বে।] একটা chain of reflex action!

এত কথা লেখার প্রয়োজন হ'ত না, যদি না কমিউনিষ্ট লী[ডার] হীরেন মুখার্জি তাঁর India struggles for Freedom না[মক] বইয়ে "Forward to Freedom" থেকে উপরোক্ত উদ্ধৃতি [দিয়ে] বলতেন—"ভারত অ্যাক্সিস শক্তি জোটের বিজয়ও চায় না, বৃ[টিশ] শাসন নর যন্ত্রণাকেও ঘৃণা করে, যে শাসন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ভার[তের] জনগণের সর্বশক্তি প্রয়োগের পথেরও বাধা স্বরূপ এই উভয় স[ঙ্কট] থেকে মুক্তির পথ খুঁজে না পেয়ে আমাদের নেতারা যখন দিশেহা[রা] —তখন একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই দেশের সম্মুখে একটা কার্যক[রী] অ-পরাজিত মনোভাব সুলভ দৃঢ় প্রত্যয়শীল কর্মসূচী উপস্থিত করেছি[ল] যার ফলে অচল অবস্থার অবসান, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং দে[শ] রক্ষা কার্যে জনগণকে সংগঠিত করা সম্ভব হতে পারতো।"

এতখানি বাগাড়ম্বরের মধ্যেকার আসল কথাটুকু হল এই। এখন আমাদের যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতা ও সাহায্য করাই প্রথম [ও] প্রধান কর্তব্য। বস্তুত এই নতুন নীতির কল্যাণেই কমিউনিষ্ট পা[র্টি] বে-আইনী থেকে আইনী হয়েছিল।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে লেনিনের বলশেভিক পার্টি বিপ্লব সংগঠিত ক[রে] জার এবং ধনিক শাসনের উচ্ছেদ করেছিল, আর সেই বলশেভি[ক] আদর্শে অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি দ্বিতী[য়] বিশ্বযুদ্ধে প্রথম দুটো বছর বিপ্লব-বিরোধী অহিংসাপন্থী গান্ধী-কংগ্রে[সের] নেতৃত্বে "সাম্রাজ্যবাদী" যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার করে হিটলারের রুশি[য়া] আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে "জনযুদ্ধ" ঘোষণা ক'রে, লিনলিথগোর যুদ্ধোদ্য[মে] সহযোগিতা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারই রাজীনামার জো[রে] "অচল অবস্থার অবসান" এবং কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যবহারি[ক] কার্যকরী কর্মসূচীর বড়াই করছেন!

শুধু তাই নয়,—এম এন রায় যখন যুদ্ধের গোড়া থেকেই যুদ্ধটাকে ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ বলে তার বিরুদ্ধে ভারত সরকারের যুদ্ধোদ্য[মে] সহযোগিতার পথ ধরেছিলেন এবং জাপানী আক্রমণের আসন্ন সম্ভাব[না] দেখে ভারত সরকারের কাছে হোমগার্ড গঠনের দাবী ও পরিকল্প[না]

পেশ করেছিলেন,—তখন কমিউনিষ্টরা আগাগোড়া বরাবরই তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন।

ইংরেজকে ভোগা দিয়ে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠার কমিউনিষ্ট নীতি, এবং ইংরেজকে ভোগা দিয়ে জনগণের হাতে অস্ত্র দেওয়ানোর রয়িষ্ট নীতি,—গান্ধী কংগ্রেসের দিশেহারা নীতির মতই ব্যর্থ হল। কংগ্রেসের ভক্ত মুরুব্বী, যাদের অর্থানুকুল্যে কংগ্রেসের সংসার চলে, সেই বিড়লা, টাটা প্রমুখ শিল্পব্যবসায়ী ধনিকগোষ্ঠি এবং তাদের শত শত কংগ্রেস ভক্ত অনুচরের সহযোগিতা ও সাহায্যেই লিনলিথগোর যুদ্ধোদ্যম সমানে চলতে লাগলো। নতুন যোগাযোগ হল এইটুকু মাত্র যে, কল-কারখানায় ধর্মঘট নিবারণের কাজে কমিউনিষ্ট পার্টিও তাদের "কোটা" পুরণ করতে নামলো পৃথকভাবে।

সরকার তাদের প্ল্যান নিয়ে কাজ করে চলেছে। জাপানের যুদ্ধে নামার সঙ্গে আমেরিকাও প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর ভারত সরকার সত্যাগ্রহী কংগ্রেস নেতাদের জেল থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তার পিছনে ছিল কংগ্রেসের সহযোগিতা পাওয়ার জন্যে বিলেতের লেবার পার্টির তাগিদ। কিন্তু চার্চিল লিনলিথগোর প্ল্যানের কোন পরিবর্তন হল না। তারপর সিঙ্গাপুরের পতনের পর তারা বাংলাদেশকেও খরচের খাতায় লিখে "ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ডের" মূল ঘাঁটি কলকাতা থেকে রাঁচিতে নিয়ে যায়—কারণ তারা ধরে নিয়েছিল জাপানের কলকাতা দখল ঠেকানো যাবে না, এবং তাদের ডিফেন্স লাইন হবে বিহার। তাই তারা পূর্ববঙ্গ থেকে নৌকা এবং চাল সরিয়ে নিয়ে জাপানীদের বে-কায়দা করার সঙ্গে দেশে দুর্ভিক্ষের গোড়া পত্তন করেছিল। তারপর কলকাতায় জাপানী বোমা পড়ার পর কলকাতা ছেড়ে সাধারণ মানুষ যখন পালাতে সুরু করেছে,—তখন ইংরেজ সরকারও কলকাতা ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হয়ে "Scorched Earth Policy" অনুসারে বড় বড় কল কারখানা, হাওড়া ব্রিজ, পাওয়ার হাউস প্রভৃতি ভেঙ্গে দিয়ে যাওয়ার জন্যে সর্বত্র "মাইন" বসায়।

"এই শয়তানী চক্রান্তের ফল দেশ যাতে রসাতলে না যায়, সেইজন্য ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ আসে ব্যাপক সংগঠন গড়ে তোলার, যাতে সুশৃঙ্খলায় এবং সজ্ঞানে জাপানীদের সঙ্গে আলোচনা করে অধিকার বদল (Transference of Control) করবার সম্ভাবনা জেগে ওঠে। দিনের পর দিন দারুণ দুর্ভাবনার ভিতর দিয়ে B. P. C. C.-র কর্তৃপক্ষকে কাজ করতে হয়। দেশে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল এবং দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সকল স্তরের লোক এগিয়ে এসেছিল।"—(বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—৫৫১ পৃষ্ঠা)।

"তখন মৌলানা আজাদ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। আমরাও কংগ্রেসী ছিলাম। পরামর্শ স্থির হল, মৌলানা সাহেবের সম্মতি নিয়ে বাংলায় 'নাগরিক রক্ষা সমিতি' (Citizens' Protection Committee) যেমন গড়ে' তোলা যাবে, তেমন অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ সমিতি গড়ে' তোলার সম্মতি মৌলানা সাহেব যেন দেন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে' উঠলে তাদের সাহায্যে দেশের বহু জায়গায় সময় বুঝে স্বাধীনতা ঘোষণা করা সম্ভব হবে।···

"কলকাতায় কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ মতো কংগ্রেস ও কংগ্রেসের বাহিরের লোক নিয়ে Bengal Civil Protection Committee গড়া হয়। ভূপতি (মজুমদার) সেক্রেটারী, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় মেডিক্যাল বিভাগের চেয়ারম্যান ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সভাপতি নির্বাচিত হন।···মূল কেন্দ্র ৪৮নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীটে (বিজয় সিং নাহারের বাড়ী), কুমার সিং হলে অ্যাম্বুলেন্স ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।"—(ঐ ৫৫০ পৃষ্ঠা)।

যাদুদা'ও রাঁচিতে এক নাগরিক রক্ষা সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। "আমরা স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহে মন দিলাম। সহরে যত রকম লোক আছে, সব রকম লোককে আহ্বান জানালাম। আদিবাসীরাও এগিয়ে এলেন। সব রকম লোকের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কার্য-নির্বাহক কমিটি হল। সভাপতি রইলাম আমি। সাধারণ সেক্রেটারী হলেন শ্যামকিশোর শাহু। এঁরা স্বামী ও স্ত্রী গান্ধীজির অনুচর, ওয়ার্ধা আশ্রমে অনেকদিন ছিলেন।

"নিম্নলিখিত বিভাগগুলি গড়া হল—(ক) আন্দোলন বিভাগ; (খ) লোক সংগ্রহ বিভাগ; (গ) প্রচার বিভাগ; (ঘ) চিকিৎসা ও শুশ্রূষা বিভাগ; (ঙ) অগ্নির উৎপাত থেকে রক্ষাকারী বিভাগ; (চ) সংবাদ সংগ্রহ বিভাগ; (ছ) অর্থ সংগ্রহ বিভাগ; (জ) স্বেচ্ছাসেবক বিভাগ; (ঝ) যোগাযোগ রক্ষা বিভাগ; (ঞ) বিপদ কালে নতুন আশ্রয় খোলার বিভাগ।"—(ঐ ৫৫২ পৃষ্ঠা)।

"জাপান যেমন সিঙ্গাপুর দখল করে বার্মা মুখো হল—এখানে ইংরেজ সৈন্যদের জঙ্গলের যুদ্ধ শেখাতে আনা হল। দুর্দিন যদি হঠাৎ আসে, তাহলে বোম্বাইয়ের দিকে পালাবার একটা নতুন রাস্তা ছোটনাগপুর থেকে তৈরীতে আগেই মন দিল।

"আমরা বিকেন্দ্রিক সংগঠনে মন দিই। দলে দলে লোকে স্বেচ্ছাসেবকের খাতায় নাম লেখাতে লাগলো। তাদের জমায়েত করে' লোক দেখানো হৈ চৈ করলাম না,—কিন্তু তাদের প্রস্তুতির শিক্ষা ভাল ভাবেই চলতে লাগলো।"—(ঐ ৫৫৩ পৃষ্ঠা)।

"গোয়েন্দা বিভাগ বিচলিত হল। শুনেছে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক আছে—কিন্তু তাদের দেখা যায় না। সন্দেহের কথা।

—(ঐ ৫৫৪ পৃষ্ঠা)।

"শ্যামকিশোর বললেন,—"স্বেচ্ছাসেবকদের চরকা কাটার ব্যবস্থা নেই বড় দুঃখের কথা।" আমরা জানালাম, "এ কাজের কর্মীরা চরকা কাটে না।"—(ঐ ৫৫৫ পৃষ্ঠা)।

"এদিকে গোয়েন্দা বিভাগ আমাদের সম্বন্ধে গুপ্তসংবাদ সংগ্রহে উঠে পড়ে লাগল। বহু নাগরিকের কাছে ঘোরাফেরা সুরু করে দিল। একদিন শুনি আমাদের সেক্রেটারী শ্যামকিশোর এক গোয়েন্দাকে ডেকে আমাদের সভ্য তালিকার খাতাটি দেখিয়ে দিয়েছে। সে সত্য ও অহিংসার লোক। তার কাছে এ ব্যাপারের অশোভনতা ধরা পড়েনি।"—(ঐ ৫৫৬ পৃষ্ঠা)।

"পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের মহা চিন্তা—আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের হৈ চৈ তারা দেখতে পায় না।···আগেই বলেছি আমরা বিকেন্দ্রিক সংগঠন গড়ে' ছিলাম। কারণ জাপানীরা রাঁচি আক্রমণ করলে প্রথমেই টেলিফোন অফিস ধ্বংস করে দেবে। টেলিফোন চলে গেলে সকেন্দ্রিক সংগঠন কাজে বাধা পাবে। বিকেন্দ্রিকের সে বালাই নেই। জাপানীর প্রথম উদ্দেশ্য রাঁচি আক্রমণ নয়। প্রথম উদ্দেশ্য টাটানগরের কারখানা আক্রমণ। কিন্তু কারখানা বাঁচাবার জন্যে রাঁচিতে সৈন্য সমাবেশ। সৈন্যদল এখানে রিজার্ভ থাকবে। টাটাস্থিত সৈন্যেরা লেগে যাবার পর তাদের সাহায্যে

লুটবে বাঁচিয় সৈন্যেরা, এরূপ সম্ভাবনা সরকার বুঝত। ওদের কাছ থেকে সংবাদ বার করে নিয়ে আমরাও জানতাম।

"সরকারের জমা করা সংবাদ থেকে জানতে পারলাম, জাপানীরা বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে উড়িষ্যা উপকূলে নামতে পারে। সেখান থেকে ময়ূরভঞ্জের গরুমহিষানতে লোহার যে খনি আছে তা দখল করবে এবং টাটার কারখানা হাত করবে বা ধ্বংস করবে।···এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কাজ করছিলাম।" —(ঐ ৫৬৯-৭০ পৃষ্ঠা)

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গোপন সার্কুলার, শ্যামকিশোর সাহু এবং বিপ্লবী নেতা যাদুদা মিলে এই যে রাঁচি মার্কা বিপ্লবী সংগ্রামের বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বাচি,—এই পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষবাবু ও রাসবিহারী বসুর আই-এন-এ সম্পর্কে কংগ্রেস ও বিপ্লবীদের নীতির বিচার করলেই গান্ধীবাদের বৈপ্লবিক ভূমিকাটা বোঝা যাবে।

যাই হোক, ইতিমধ্যেই বৃটিশ লেবার পার্টির চাপে বৃটিশ ক্যাবিনেট, কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার এক প্রস্তাব দিয়ে "সোসিয়্যালিষ্ট" সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠিয়েছিল—'৪২ সালের মার্চ মাসে। মাসখানেক আলাপ আলোচনার পর সে ক্রিপস-মিশন ব্যর্থ হল। তিনি ফিরে গেলেন, এবং বললেন, বৃটেনের সাদচ্ছা প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু ব্যর্থতার কারণ কংগ্রেসের অযৌক্তিক মনোভাব।

ক্রিপস যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় রুশিয়ায় বৃটিশ রাষ্ট্রদূত হিসেবে রুশ-বৃটেন সম্পর্কের উন্নতি সাধন করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন নেহেরুর ব্যক্তিগত বন্ধু, পাঠ্যাবস্থার সহপাঠি। মিত্রশক্তি মহলে বৃটেনের নিন্দা হচ্ছিল, সে ভারতের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ভারতের সহযোগিতা হারিয়ে মিত্রশক্তির যুদ্ধোদ্যমের ক্ষতি করেছে। সেই কলঙ্ক স্খালনের জন্যে চার্চিল নানা অন্যায় সর্ত-সঙ্কুল আট-ঘাট বাঁধা এক প্রস্তাব দিয়ে ক্রিপস-মিশন পাঠিয়েছিলেন, যাতে মিশন ব্যর্থই হয়, অথচ দোষটা পড়ে ভারতের ঘাড়ে। সে বিষয়ে চার্চিল সফল হয়েছিলেন।

কংগ্রেসের ধুরন্ধর নেতা রাজাগোপালাচারীর মতে লিনলিথগোর অনমনীয় ও অসহযোগী মনোভাবের জন্যেই সমঝোতা ফেঁসে গেছে। কিন্তু কংগ্রেস নেতারাও বৃটেনের অবস্থা কাহিল হয়েছে ভেবে আশা করেছিলেন, একটু টাইট থাকলে বৃটেন আরো নরম হবে, এবং তাঁদের দাবী মেনে নেবে। মিশন ব্যর্থ হলে, বোঝা গেল, বৃটেন তার প্ল্যানেই অটল আছে।

ক্রিপস-প্রস্তাবের মোদ্দা কথা ছিল, যুদ্ধের পরে ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেওয়া হবে, এবং বর্তমানে বড়লাটই থাকবেন সর্বময় কর্তা, কিন্তু প্রধান প্রধান ভারতীয় দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটা অ্যাডভাইসরী কাউন্সিল গঠিত হবে, যারা যুদ্ধে সক্রিয় সহযোগিতা করবে। বর্তমান সেনাপতি হবেন ডিফেন্স মিনিষ্টার, আর তাঁর অধীনে ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত হবে এক ডিফেন্স কো-অর্ডিনেশন মন্ত্রী দপ্তর, যারা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কয়েকটা নির্দিষ্ট কাজের ভার পাবে। যুদ্ধ পরিচালনের কর্তৃত্ব ভারতীয়দের হাতে দেওয়া চলবে না, কারণ ভারতীয় মানে তো "বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি!" বস্তুত ক্রিপস পৃথক পৃথক ভারতীয় দলের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবেই আলোচনা করেছিলেন।

কংগ্রেস রাজী হল না। মহাত্মাজী বললেন,—"যে ব্যাঙ্ক ফেল মারতে চলেছে, সে ব্যাঙ্কের পোষ্ট-ডেটেড চেকের ওপর ভারতের কোন লোভ নেই।" মিলিটারী কর্তৃত্ব সম্পর্কে ডিফেন্স কো-অর্ডিনেশান মন্ত্রী দপ্তরটাকে লোকে ঠাট্টা করে নাম দিলে—ষ্টেশনারী-ক্যান্টিন-পেট্রোল মন্ত্রীদপ্তর।

"যে ব্যাঙ্ক ফেল মারতে চলেছে"—অর্থাৎ এ যুদ্ধে জাপানই জয়ী হবে,—ইংরেজকে পরাজিত হয়ে ভারত ত্যাগ করতে হবে, এই সম্ভাবনার আশা বা আশঙ্কাই মহাত্মাজীর চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করছিল। কিন্তু ইংরেজ তা ভাবছিল না, কারণ লেণ্ড-লীজ চুক্তি ও জাপানীদের পরাজিত করার গরজে আমেরিকা ভারতে এসেছিল বৃটিশ যুদ্ধোদ্যমের সাহায্যের জন্যে।

যাই হোক, এপ্রিলের শেষে এলাহাবাদে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির এক মিটিংয়ে বলা হল,—"কোনো বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ বা আক্রমণ মারফৎ যে স্বাধীনতা আসতে পারে, কমিটি একথা বিশ্বাস করে না। সুতরাং বিদেশী আক্রমণকে বাধা দিতেই হবে। কিন্তু যেহেতু বৃটিশ সরকার ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় সম্মত নয়, অতএব ভারতীয়দের পক্ষে ঐ বৈদেশিক আক্রমণে বাধা দেওয়ার একমাত্র পন্থা হবে অহিংস অসহযোগ—আক্রমণকারীদের কোনো প্রকারে সাহায্য না করা। আমরা তাদের কাছে মাথা নত করবো না, তাদের আদেশ মানবো না, তাদের কৃপাপ্রার্থী হবো না, তাদের কাছে ঘুস খাবো না। আর তারা যদি আমাদের বাড়ী-ঘর জায়গা-জমি দখল করতে আসে, মরণ পণ করে বাধা দোব।"

এই সময়েই মহাত্মাজীর "কুইট ইণ্ডিয়া" শ্লোগানের উৎপত্তি হয়। মে মাসের গোড়ায় এক সাক্ষাৎকার উপলক্ষে তিনি বলেন,—"ভারতীয়দের ঐক্যের জন্যে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে আমি বুঝেছি যে, ভারত থেকে বৃটিশ শাসন অপসারিত না হলে ভারতীয়দের মধ্যে সত্যিকারের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না,—কারণ সকল দলই এই বৈদেশিক শক্তির সাহায্যের আশায় নিজ নিজ মতে দৃঢ় থাকবে।···কাজেই আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ভারত থেকে বৃটিশ-শক্তি অপসারিত হবে এবং অন্য কোন বিদেশী শক্তি তার স্থান অধিকার করবে না—এমন অবস্থা না হলে ভারতীয়দের মধ্যে আন্তরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।"

এই "কুইট ইণ্ডিয়া" শ্লোগানের আদর্শ অনুসারে ১৪ই জুলাই ওয়ার্ধাতে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিংএর এক প্রস্তাবে বলা হল: "ভারত থেকে বৃটিশ শাসন অপসারিত করার এই প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেস গ্রেট বৃটেন বা মিত্রশক্তি গোষ্ঠির যুদ্ধ পরিচালনার কোন অসুবিধা সৃষ্টি করতে চায় না,—কিম্বা জাপান বা অন্য কোন অ্যাক্সিস শক্তি কর্তৃক ভারত আক্রমণ বা চীনের প্রতি চাপ বৃদ্ধি করার সম্বন্ধে উৎসাহিত করতে চায় না। মিত্রশক্তি গোষ্ঠির প্রতিরক্ষাশক্তি ক্ষুণ্ণ করাও কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নয়। জাপানী আক্রমণে বাধা দেওয়া বা রক্ষা করার জন্য মিত্রশক্তি গোষ্ঠি যদি ভারতে তাদের সৈন্যবাহিনী রাখতে চায়, কংগ্রেস তাতে বাধা দেবে না। ভারত থেকে বৃটিশ-শক্তির অপসারণের এই প্রস্তাবের অর্থ এ নয় যে, ইংরেজদের সশরীরে ভারত ত্যাগ করতে হবে (physical withdrawal)।

"কংগ্রেস চায়, মালয়-সিঙ্গাপুর-বার্মার মতন বিপর্যয় যেন ভারতকে ভোগ করতে না হয়। তার জন্যে তারা জাপানী বা অন্য যে-কোন বিদেশী শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। কংগ্রেস চায়, বৃটেনের প্রতি বর্তমানে ভারতবাসীর যে বিদ্বেষ ভাব

দুধে জল মেশানো বন্ধ করবার জন্যে কি জলে রঙ মেশাবেন ?

দুধে জল মেশালে আমরা দুধওয়ালাকেই দোষ দিই, যাঁরা জল সরবরাহ করেন তাঁদের নিশ্চয়ই নয় ! কিংবা এমন কথাও বলবনা যে এই দুষ্কর্ম রোধ করার জন্যে জলে রঙ মেশানো হোক !

অথচ ঠিক একই ধরনের ব্যাপারে অর্থাৎ ঘিয়ে যখন বনস্পতির ভেজাল দেওয়া হয়, তখন অনেকে বনস্পতি রঙ করার দাবি জানিয়ে হৈ চৈ আরম্ভ করেন।

দুষ্ট লোকেরা ঘি ভেজাল করে নানা জাতীয় জিনিস মিশিয়ে—শুধু বনস্পতি মিশিয়ে নয়। তাছাড়া, রঙ ক'রে বা অন্য উপায়ে যদি বনস্পতির অপব্যবহার রোধ করাও যায়, খনিজ তেল ও মৃত জীবজন্তুর চর্বি তো ভেজালকারীদের হাতের কাছে থেকে যাচ্ছেই। এসব জঘন্য, নোংরা জিনিস মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনিষ্টকর। অতএব বনস্পতি রঙ করাও যা, না করাও তাই।

ভেজাল বন্ধ করার দু'রকম উপায়

ঘিয়ে ভেজাল বন্ধ করার দুটি সহজ ও কার্যকরী উপায় খোলা রয়েছে :

১। সীল করা পাত্রে ঘি বিক্রয়ের ব্যবস্থা—বনস্পতি ও অন্যান্য খাবার জিনিস এবং কোন কোন শহরে দুধ যেমন ক'রে বাজারে ছাড়া হয়।

২। খাদ্যের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধীয় আইন-কানুন আরও কঠোরতার সঙ্গে ষোল আনা বলবৎ করা। সমগ্র জাতির স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে শৈথিল্যের কোন কথাই উঠতে পারে না।

বনস্পতি-জাতীয় স্নেহপদার্থ পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহার করা হয়

আলবানিয়া, আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলেশিয়া, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ব্রেজিল, ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকা, বুলগেরিয়া, ব্রহ্মদেশ, কানাডা, মধ্য আফ্রিকান ফেডারেশন, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ইথিওপিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, গ্রীস, হাঙ্গেরী, ভারত, ইরান, ইরাক, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইস্রায়েল, ইটালী, জাপান, লিবিয়া, মালয়, মেক্সিকো, মরক্কো, নাইজিরিয়া, নরওয়ে, নেদারল্যাণ্ডস্, পাকিস্তান, পোল্যাণ্ড, পর্তুগাল, রুমানিয়া, সৌদী আরব, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, রাশিয়া, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ইয়েমেন, যুগোস্লাভিয়া।

আরও বিস্তারিত জানতে হলে
এই ঠিকানায় চিঠি লিখুন :

দি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব্ ইণ্ডিয়া
ইণ্ডিয়া হাউস, ফোর্ট স্ট্রীট, বোম্বাই

WTVMA 2692A

আছে, তার অবসান করতে,—এবং পৃথিবীর সকল জাতির স্বাধীনতার জন্যে যে মুক্ত প্রচেষ্টা চলছে, তার সকল দায়-দায়িত্বের অংশীদার হতে,—যেটা সম্ভব হতে পারে, শুধু যদি ভারত নিজে স্বাধীনতার আনন্দ অনুভব করতে পারে।

"কংগ্রেসের এই আবেদন যদি নিষ্ফল হয়, তাহলে অবশ্য গান্ধীজির নেতৃত্বে অহিংস সংগ্রাম ছাড়া কংগ্রেসের আর কোনো পথ খোলা থাকবে না,—এবং সে সংগ্রাম সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ৭ই আগষ্ট—এ-আই-সি-সির আগামী অধিবেশনে।"

এই হল "কুইট ইণ্ডিয়া" শ্লোগানের মোদ্দাকথা। সরকার এই আবেদনের জবাবে এলাহাবাদের এ-আই-সি-সির অফিসে হানা দিয়ে মহাত্মাজীর খসড়া প্রস্তাব সহ অন্যান্য কাগজপত্র দখল করে নিলে এবং প্রদেশে প্রদেশে সার্কুলার পাঠিয়ে (Suckle Circular) কংগ্রেসের সঙ্গে আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলে।

এই প্ররোচনার পর বাধ্য হয়ে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী বম্বের ৮ই আগষ্টের ঐতিহাসিক অধিবেশনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে সেই প্রস্তাবই বিখ্যাত "আগষ্ট প্রস্তাব" বলে পরিচিত। তাতে বলা হল:

"চীন ও রুশিয়ার মহামূল্য স্বাধীনতার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যাতে ক্ষুন্ন না হয়, এবং সম্মিলিত রাষ্ট্র গোষ্ঠির প্রতিরক্ষা শক্তির যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সে দিকে কমিটীর যথেষ্ট লক্ষ্য আছে,—কিন্তু ভারত এবং ঐ সব দেশের যে সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে, তাতে ভারতের পক্ষে এক বিদেশী শাসনের অনুগত হয়ে নিষ্ক্রিয় থাকাটা শুধু অপমানজনক বা তার আপন প্রতিরক্ষা শক্তির অক্ষমতাই নয়—পরন্তু সম্মিলিত রাষ্ট্রগোষ্ঠির সঙ্কটের প্রতিকারের ও ঐ সব দেশের জনগণের স্বার্থরক্ষারও অনুকূল নয়। অতএব ভারতের মুক্তি ও স্বাধীনতার অবিসংবাদী অধিকার প্রতিষ্ঠা কল্পে কমিটী যতদূর সম্ভব ব্যাপক আকারে অহিংস গণসংগ্রামে আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত মঞ্জুর করছে,—যাতে ভারত গত বাইশ বছরের সঞ্চিত সর্বপ্রকার অহিংস সংগ্রামের শক্তির ব্যবহার করতে পারে।"

এই মিটিংয়ের আগে এক সাক্ষাৎকার উপলক্ষে মহাত্মাজী বলেছিলেন,—"প্রস্তাব পাশ করার পর এবং সংগ্রাম সুরু করার আগে বড়লাটের কাছে অবশ্যই একখানা পত্র দেওয়া হবে,—চরম পত্র রূপে নয়, পরন্তু সংগ্রাম এড়ানোর জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ ক'রে। যদি অনুকূল সাড়া পাওয়া যায়,—তাহলে আমার সেই চিঠিই হবে আপোষ আলোচনার ভিত্তি।"

মিটিংয়ে মহাত্মাজী বলেছিলেন,—"জাপানীদের অভ্যর্থনা করার মনোভাব ত্যাগ কর। আমি চাই, তোমরা অহিংসাকে একটা পলিসী হিসেবেই গ্রহণ কর—আমার কাছে অহিংসা একটা ক্রীড,—কিন্তু তোমাদের কাছে এটা একটা পলিসীই হোক। সুশৃঙ্খল সৈন্যের মত তোমার পুরোপুরি এ নীতি গ্রহণ করবে, এবং সংগ্রামের সময় পুরোপুরি পালন করবে।"

সংগ্রাম হবে অহিংস,—তাও তখনো সুরু হয়নি,—এই অবস্থার মধ্যেই সরকার বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ করলে। ৯ই আগষ্ট সকালে মহাত্মা গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটীর সকল সদস্য গ্রেপ্তার ও বন্দী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশের সকল উল্লেখযোগ্য কংগ্রেস নেতাও গ্রেপ্তার হলেন। ওয়ার্কিং কমিটী, এ-আই-সি-সি, এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী গুলো বেআইনী ঘোষিত হল,—কংগ্রেসের এলাহাবাদস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয় সীল করা হল,—কংগ্রেসের তহবিলও বাজেয়াপ্ত করা হল। ছাপাখানার কণ্ঠরোধ করে' গ্রেপ্তার গুলী চালনা প্রভৃতির সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করা হল।

মহাত্মাজী ও কংগ্রেস নেতাদের খবর দাবানলের মতন দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং বিক্ষুব্ধ জনগণের সহিষ্ণুতার বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল—সারাদেশ যেন এক সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়ে সংগ্রামের জন্য তাল ঠুকে দাড়িয়েছিল,—এবং সেই দেশ জোড়া গণবিক্ষোভকে সরকার বাহাদুর লাঠি, টিয়ার গ্যাস, গুলী চালিয়ে স্তব্ধ করে দেওয়ার দুশ্চেষ্টায় ক্ষেপে গিয়েছিল।

নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালের ফাঁক দিয়ে চুইয়ে যে যৎসামান্য সংবাদ কাগজে প্রকাশ হ'ত—তাতে প্রকৃত অবস্থা জানার উপায় ছিল না। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় হোমমেম্বার কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ থেকে ১৯৪২ সালের শেষ পর্যন্ত সময়ের যে সরকারী বিবরণ পাওয়া যায়, তদনুসারে—

গ্রেপ্তারের সংখ্যা, ৬০,২২৯ জন; ভারত রক্ষা আইনে আটক বন্দীর সংখ্যা ১৮,০০০; পুলিস ও মিলিটারীর গুলীতে নিহত ৯৪০ জন, এবং আহত ১৬৩০ জন। ৬০টি জায়গায় সৈন্য আনা হয়েছিল,—৫৩৮টি ঘটনায় গুলী চালানো হয়েছিল, এবং জনগণকে ছত্রভঙ্গ করার.জন্যে ৫ বার বিমান ব্যবহার করা হয়েছিল।

বেসরকারী সূত্রের খবর থেকে অবশ্য জানা গিয়েছিল, সরকারী বিবরণে অত্যাচার অনেক কম করে দেখানো হয়েছিল—যা বলা বাহুল্য—যা সকলেই বোঝে।

তারপর জনগণের হিংসাত্মক কার্যকলাপের সরকারী বিবরণের কথা—প্রচলিত হরতাল, মিটিং প্রোশেশন থেকে সুরু করে কয়েক সপ্তাহ ধরে সরকারী আক্রমণের পাল্টা আক্রমণের কথা। সরকারী হিসাব মতে, ২৫০টা রেল ষ্টেশন বিধ্বস্ত বা ধ্বংস করা হয়েছিল; ৫০০র ওপর পোষ্ট অফিস আক্রান্ত হয়েছিল, যার মধ্যে ৫০টাতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং অন্যান্যগুলো বিধ্বস্ত হয়েছিল; উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশ ও বিহারের রেলপথ অনেকদিন পর্যন্ত অচল হয়েছিল,—ভারতের অনেক স্থানেই যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, বহু সরকারী ভবনসহ ১৫০র ওপর থানা আক্রান্ত হয়েছিল, কয়েকজন অফিসার ও সৈন্যসহ ৩০ জনের ওপর পুলিস নিহত হয়েছিল। বিহার—ইউ পির বালিয়া প্রভৃতি জেলা ও মেদিনীপুর জেলার অনেকখানি জুড়ে মাসখানেক পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল, সাতারায় সরকারী শাসনের পাশাপাশি বেশ কিছুদিন বেসরকারী শাসন ব্যবস্থাও চালু হয়েছিল। "এ-আই-সি-সি ডিরেক্টরেট" নাম নিয়ে একদল গুপ্ত পলাতক কংগ্রেসী "নাইন্‌থ আগষ্ট" নামক এক গুপ্ত পত্রিকা মারফৎ ধ্বংসাত্মক কার্যপ্রণালী প্রচার সুরু করেছিল।

পুণার আগা খাঁ প্যালেসের বন্দীনিবাস থেকে মহাত্মাজী '৪২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর বড়লাটকে যে চিঠি লেখেন, তাতে তিনি কংগ্রেসের নামে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার হিংসাত্মক কাজের নিন্দা করেন এবং তার জন্যে নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করে' বলেন,—"যে যা-ই বলুক, আমি বলি কংগ্রেসের অহিংসা-নীতি আজও অব্যাহত আছে। কংগ্রেস নেতাদের পাইকারী গ্রেপ্তারে জনগণের ক্রোধ আত্মসংযমের সীমা অতিক্রম করেছে। সর্বপ্রকার ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য সরকারই

দায়ী—কংগ্রেস নয়। আমার মনে হয়,—সরকারের পক্ষে একমাত্র উচিত কাজ হবে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেওয়া, দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করা এবং মিটমাটের উপায় অনুসন্ধান করা। হিংসামূলক কাজ রোধবার যথেষ্ট ক্ষমতা সরকারের আছে। দমন-নীতি শুধু বিদ্বেষ বিষ বাড়িয়ে তোলে।"

তারপর '৪৩ সালের ১১শে জানুয়ারী মহাত্মাজী বড়লাটকে আর এক পত্র লেখেন। তাতে তিনি হিংসামূলক গণ-বিক্ষোভের দায়িত্ব অস্বীকার করে বলেন :—

"যদি আপনি আমাকে একা কিছু করতে বলেন,—তাহলে আমি বলি,—যদি আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, আমি অন্যায় করেছি, তাহলে আমি তার যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করবো। আর যদি আপনি আমাকে কংগ্রেসের তরফ থেকে কোনো নতুন প্রস্তাব করতে বলেন,—তাহলে আমাকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মিলতে দিন। আমি মিনতি করি, এ অচল অবস্থার অবসানের জন্যে আপনি মনস্থির করুন।"

কিন্তু সরকার মহাত্মাজীর কোনো প্রস্তাবকেই আমল দিলে না, এবং ১৯ ফেব্রুয়ারী সরকার ও মহাত্মাজীর মধ্যে এ পর্যন্ত যে সব পত্র বিনিময় হয়েছিল সেগুলো প্রকাশ করলে। কারণ বারংবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে মহাত্মাজী ১৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ২১ দিন অনশন ঘোষণা করেছিলেন। এই পত্রগুলোর মধ্যে সরকার মহাত্মাজীর '৪২ সালের সেপ্টেম্বরের চিঠিখানা প্রকাশ করেনি, যাতে মহাত্মাজী জনগণের হিংসামূলক কাজের জন্য সরকারী অত্যাচারকে দায়ী করেছিলেন।

যাই হোক, এই অনশন ধর্মঘটের নোটিশের জবাবে বড় লাট যে জবাব দিয়েছিলেন, তাতে মর্মাহত হয়ে মহাত্মাজী আবার বড় লাটকে লিখলেন,—"আপনি আমার এই অনশনকে সস্তায় বাজী মাৎ করার কৌশল বলেছেন! একজন বন্ধু হয়ে আপনি যে কেমন করে' আমার ওপর এমন নীচতার এমন কাপুরুষসুলভ মতলবের আরোপ করতে পারেন, তা আমার ধারণার অতীত। আপনি যা বলেছেন, বলুন—কিন্তু তবু আমার পক্ষে এই অনশন সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কাছে ন্যায়বিচারের আবেদন ছাড়া আর কিছুই নয়—যে ন্যায়বিচার আমি আপনার কাছে বারবার চেয়েও পাইনি।"

ঐ অনশন ধর্মঘটের নোটিশের চিঠিতে মহাত্মাজী লিখেছিলেন,—"আকাল ও দুর্ভিক্ষের অবস্থায় কোটি কোটি ভারতবাসীর যে দুর্দশা হয়েছে, তা দেখে আমার বুক ফেটে যায়। যদি দেশে সত্যিকারের জাতীয় সরকার থাকতো, তাহলে লোকের এ দুর্দশা সবখানি না হলেও অনেকখানিই এড়ানো সম্ভব হত।"

যাই হোক, সরকার গ্রাহ্য না করলেও সারা দেশের সকল দল মহাত্মাজীকে বাঁচানোর জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো এবং সরকারের কাছে তাঁর মুক্তির দাবী জানাতে লাগলো। ভারতের খৃষ্টানদের সর্বোচ্চ পুরোহিত—মেট্রোপলিটান অফ ইণ্ডিয়া মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে বড়লাটের অনুমতি চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হলেন। এমন কি ভারতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত দূত উইলিয়াম ফিলিপস্ পর্যন্ত মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনশনের ২১ দিন কেটে গেল, মহাত্মাজীর মৃত্যু হল না। কিন্তু দেশ যেন হতাশায় ভেঙে পড়লো। এদিকে বাংলার লাটের বঞ্চনা-নীতির কল্যাণে বাজার থেকে চাল উধাও হল গিয়ে পড়েছে মজুতদার মুনাফাখোর চোরাকারবারীদের খপ্পরে। তার ওপর চাষের দুর্গতির ফলে অজন্মা হল। বিহার-উড়িষ্যা-মাদ্রাজেও অজন্মা। ফলে বাংলা দেশে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে, যাতে সরকারী মতে ১০ লাখের মতন, কিন্তু বেসরকারীমতে ৩৫ লাখ লোক মারা গেল। সরকার যেন ঠাট্টা করে কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে ইংরেজী পোষ্টার সেঁটে দিলেন Grow more food. এ ঠাট্টা পরবর্তী বহু বৎসর ধরে চলেছিল।

এইভাবে '৪৩ সাল কাটলো। '৪৪ সালের গোড়ায় অবস্থা ফ্যাসিস্ট শক্তিগোষ্ঠির পরাজয়ের পালা। রুশিয়ার লাল ফৌজ ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে নাজী সমরনায়ক পলাসকে সসৈন্যে বন্দী করে পশ্চিমমুখে ছুটছে, আর নাজী বাহিনী প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে। এই চোটেই '৪৪ সালের শেষ পর্যন্ত হিটলারী সমরযন্ত্র চুরমার হয়ে গিয়েছিল এবং হিটলার ঝাড়ে-বংশে নির্মূল হয়েছিল।

এদিকে '৪৪ সালের মার্চ মাসে উত্তর-পূর্ব ভারতে আসাম-মণিপুরে "জাপানী আক্রমণ" পৌঁছে গিয়েছিল,—কিন্তু তার কোন বড় রকমের প্রতিক্রিয়া ভারতে ঘটেনি। বৃটিশ সেনাপতির মতে সে আক্রমণ একটা "token invasion"।

মে মাসের গোড়ায় মহাত্মার ম্যালেরিয়া জ্বর হল,—এবং যে সরকার ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেছিল, আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার না করলে কিছুতেই মহাত্মাজীকে মুক্তি দেওয়া হবে না, সেই সরকার হঠাৎ "মেডিকাল গ্রাউণ্ড" মহাত্মাজীকে মুক্তি দিলে।

মুক্তি পাওয়ার পরই "নিউজ ক্রনিকেল" এর প্রতিনিধি ষ্টুয়ার্ট গেল্ডারের সাক্ষাৎকারে মহাত্মাজী বললেন,—এখন আবার আইন অমান্য
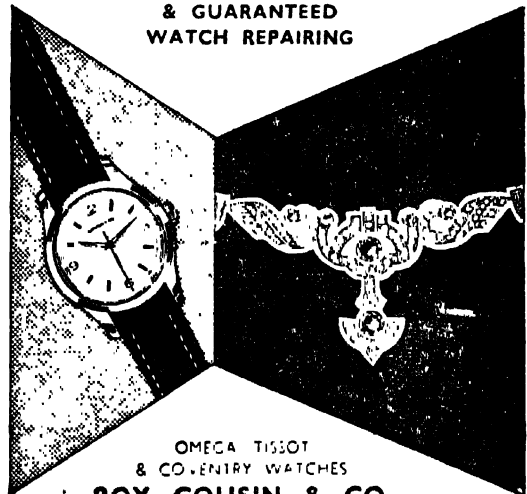
আন্দোলন আরম্ভ করার কথাই ওঠে না—'৪৪ সালটা '৪২ সাল নয়—আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহারের অধিকার তাঁর নেই, কারণ ওটা ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাব,—কিন্তু সে প্রস্তাবের ব্যবহারিক অংশ অহিংস সংগ্রামের মঞ্জুরী এখন তাঁবাদী হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে (lapsed)।

তখন লিনলিথগো গেছেন, এবং লর্ড ওয়াভেল বড়লাট হয়েছেন। মহাত্মাজী তাঁর কাছে চিঠি লিখে ওয়ার্কিং কমিটীর সঙ্গে দেখা করে বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করার অনুমতি চাইলেন,—এবং আবার এক নতুন প্রস্তাব করলেন যে, যদি অবিলম্বে ঘোষণা করা হয় যে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে,—এবং এখন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার কাছে দায়ী এক জাতীয় সরকার এই সর্তে গঠন করা হয় যে, যুদ্ধ যতদিন চলবে, ততদিন তার পরিচালনার বর্তমান ব্যবস্থাই বজায় থাকবে কিন্তু ভারতের ঘাড়ে আর ব্যয়ের বোঝা চাপানো হবে না,—তাহলে তিনি ওয়ার্কিং কমিটীকে যুদ্ধোদ্যমে পূর্ণ সহযোগিতা করার পরামর্শ দেবেন।

ওয়াভেল সটান জবাব দিলেন,—মহাত্মার প্রস্তাব আলাপ আলোচনার ভিত্তিরূপেও গ্রহণ যোগ্য নয়।

কিন্তু মহাত্মাজী অচল অবস্থা ঘোচাবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলেন। একদিকে তিনি অহিংসার মহিমা প্রচার, এবং এখন সংগ্রাম উচিতও নয়, সম্ভব নয় বলে ফতোয়া দিয়ে চললেন,—আর একদিকে রাজাগোপালাচারীর ফরমুলা নিয়ে জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার এবং বিশেষ বিশেষ এলাকায় মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্বন্ধে আলোচনা চালাবার প্রস্তাব করলেন।

হীরেনবাবু তাঁর বইয়ে (India Struggles for Freedom) বলেছেন: "দুই সর্ববৃহৎ সংগঠন এইবার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন করবেন ভেবে সারা দেশ উল্লসিত হয়ে উঠলো। কমিউনিষ্ট পার্টির আনন্দ হল সব চেয়ে বেশী, কারণ সকলের নিন্দা বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করে' তারাই '৪২ সাল থেকে বলে এসেছে, 'জাতীয় ঐক্যই আমাদের ঢাল ও তলোয়ার, আমাদের সব চেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে শক্তি ছিনিয়ে আনার জন্যে যে হাতিয়ার ভারতবাসীকে তৈরী করে নিতে হবেই।'

"দেশের স্বাধীনতা এবং সফল প্রতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্য এক অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা কল্পে কংগ্রেস ও লীগের সমঝৌতার প্রয়োজনীয়তাই ছিল তাদের প্রধান রণধ্বনি।—তারা কংগ্রেসীদের বোঝাতে চাইতো, মুসলিম জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মেনে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন, আর মোসলেম লীগকে বলতো, মুসলমানদের স্বাধীনতা আসতে পারে শুধু কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা।"

তখন "ভারতের ষ্টেলিন" পি সি যোশী কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ণধার, '৪৮ সালে যাঁকে "arch reformist" আখ্যা দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি বর্জন করেছিল, যিনি গান্ধীকে "জাতির পিতা" এবং সুভাষবাবুকে "ট্রেটর বোস" নাম দিয়েছিলেন। "অক্টোবর বিপ্লবের সন্তান" "লেনিন-ষ্টেলিনের পার্টি" কংগ্রেস-লীগের অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনে ইংরেজকে বাধ্য করার জন্যে যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে "আইনী" হয়ে "জাপানকে রুখতে হবে" বলে হুঙ্কার দিয়ে অহিংস গান্ধী কংগ্রেসের সংস্কারপন্থী রাজনীতির চক্রে যখন ঘুরপাক খাচ্ছে,—তখনকার কথা,—১৯৪৪ সালের মার্চ-মের কথা—হীরেনবাবু লিখলেন মার্চে আসাম-মণিপুরে জাপানী আক্রমণ এবং মে'তে মহাত্মার মুক্তি ও সংগ্রাম বিরোধী প্রচারের কথা।

যে কথাটা তিনি তাঁর বইয়ে একেবারে চেপে গেছেন,—সেটা হচ্ছে কোহিমায় সুভাষবাবুর আজাদ হিন্দ ফৌজের আগমন ও পতাকা উত্তোলনের কথা। তিনি বৃটিশ সেনাপতির উক্তি,—জাপানীদের token invasion এর কথা লিখলেন,—কিন্তু এ কথাটা লিখলেন না যে, সুভাষবাবু জাপানী সৈন্য নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেননি।

কিন্তু কোহিমায় আজাদ হিন্দ ফৌজের পতাকা উত্তোলনের কথা যখন জানা গেল, তখনই এ কথারও জবাব পাওয়া গেল,—কেন সরকার বাহাদুর ম্যালেরিয়ার অজুহাতে আশাতীত ভাবে উদার হয়ে হঠাৎ মহাত্মাজীকে মুক্তি দিয়েছিল। আর সুভাষবাবু ভুল করলেও, ব্যর্থ হলেও, একথা ইতিহাসে থেকে যাবেই যে, তিনিই বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার সর্বশেষ প্রতীকও প্রতিনিধি।

[ক্রমশঃ।

আপনি কি জানেন ?

১। বিল্হন কে ছিলেন ?
২। 'বীভৎসু' মহাভারতে কার নাম ?
৩। ভারতবর্ষে 'লীলাঞ্জন' নদী কোথায় ? লীলাঞ্জনের প্রকৃত পরিচয় কি ?
৪। 'অকাল বোধন' কথাটির অর্থ কি ?
৫। ব্রাহ্মণকে 'ষট্‌কর্ম্মা' বলা হয় কেন ?
৬। ভারতবর্ষের পৌরাণিক সীমানা কি বলতে পারেন ? যুগে যুগে বিদেশের লুব্ধ আক্রমণ সামলেও ভারতবর্ষের সেই সীমানা আজও কি অক্ষত আছে ?
৭। শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা কি কি ?
৮। কোন্ ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ প্রথম আবিষ্কার করলেন, পৃথিবী অচলা নয়, পৃথিবী সচলা ? তিনি আরও প্রমাণ করলেন, জ্যোতিষ্কগুলো নিশ্চল। পৃথিবীর গতি অনুসারেই তাদের উদয় ও অস্ত হয়।

[উত্তর ১৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত

[দেরাদুন বন-গবেষণা ইনঃ ও কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট]

সুস্বাস্থ্য, সুমার্জ্জিত আচরণ ও সুঠাম গঠন—এই তিনটি জিনিষের সমবায়ে যেন এখনও প্রদীপ্ত হয়ে আছেন মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বন-সংরক্ষক ও দেরাদুন বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও কলেজের প্রেসিডেণ্ট নাগপুর নিবাসী শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়।

রবীন্দ্রনাথ ১৯০২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর বর্দ্ধমান জিলার স্বগ্রাম শাঁখারীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺অতুলচন্দ্র দত্ত আগ্রা সেণ্ট জনস কলেজের পদার্থবিদ্যার সিনিয়র অধ্যাপক ছিলেন। তৎলিখিত "Text Book of Sound" বহুপঠিত পুস্তক। মাতা শ্রীমতী নর্ম্মদা দেবী।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালে আগ্রা সেণ্ট জনস বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা ও পরে স্থানীয় কলেজ হইতে আই, এস, সি ও বি, এস, সি পাশ করেন। ১৯২৫ সালে এলাহাবাদ মুইর কলেজ হইতে জুলজি (Zoology)-তে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন। সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট সার্ভিসে মনোনীত করিয়া তাঁহাকে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ষ্টেট স্কলারসীপ দেওয়া হয় এবং উক্ত বৎসরেই তিনি অক্সফোর্ড (ইংল্যাণ্ড) সেণ্ট ক্যাথারীণ সোসাইটীতে ভর্ত্তি হন। ১৯২৭ সনে তিনি Degree in Forestry পরীক্ষায় প্রথম হইয়া Currie বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পর গ্রেট ব্রিটেনস্থ 'ইণ্ডিয়া অফিস'-এ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে ৩৫ গিনি পুরস্কার পান। ইহা ছাড়া কর্ম্মস্থল নির্ব্বাচনের সুযোগ দেওয়ায় তিনি "C. P & Berar" প্রদেশকে মনোনীত করেন। তজ্জন্য ১৯২৭ সালে তিনি মাণ্ডলাতে প্রথম যোগদান করিয়া ১৯৫৬ সালে প্রাদেশিক সচিবালয় নাগপুরে প্রধান বন-সংরক্ষক পদে উন্নীত হন। পরে মহারাষ্ট্র প্রদেশ গঠিত হইলে তিনি মধ্যপ্রদেশের রেওয়াতে (Rewa) উক্ত পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের দেরাদুনস্থ বন-গবেষণাগার ও কলেজের প্রেসিডেণ্টের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৬০ সালে তিনি উহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

মধ্যপ্রদেশে থাকার সময় শ্রীদত্ত উহার বন বিভাগকে সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত করেন। দেরাদুন কলেজের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে তিনি ভারতের বিভিন্ন বন-গবেষণা কেন্দ্রগুলির যথেষ্ট উন্নয়ন করিবার প্রয়াস পান।

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীরের জন্য শ্রীদত্ত বহুদিন ফুটবল, হকি ও টেনিস ক্রীড়ায় যোগদান করিতেন এবং এখনও উহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অবিভক্ত বাঙ্গলার এক্সাইজ কমিশনার রায়বাহাদুর ৺শরৎকুমার বাহার তনয়া শ্রীমতী লীলা দেবীর সহিত শ্রীদত্ত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত জানান যে, জনসাধারণ বন-সংরক্ষণের সরকারী বাধা-নিষেধ পছন্দ করেন না—কিন্তু জমি ও জল-সংরক্ষণের জন্য উহা একান্ত প্রয়োজন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বনভূমি-বিস্তরণের (Afforestation) জন্য ব্যয়বরাদ্দ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত

তিনি সমর্থন করেন। আর বন-মহোৎসব পালনের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষামূলক প্রচারকার্য্য করা হয়—তাহাতে গ্রাম-ভারতের বাসিন্দাদের উপকার হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন।

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

[পাভলভীয় মনস্তত্ত্ববিদ্]

নারীর মনের কথা দেবতারাও জানতে পারেন না, পুরুষ তো কোন্ ছার। কিন্তু পুরুষের মনের কথাই বা কে জানতে পারে? মন জানাজানি বড় কঠিন কাজ। কারণ মন বস্তুটি অত্যন্ত জটিল এবং দুর্ব্বোধ্য। দার্শনিক আর বিজ্ঞানীর কাছে মন চিরকাল এক মহা বিস্ময়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত মন সম্পর্কে যত রকমের গবেষণা হয়েছে, সবেরই ভিত্তি ছিল অনুমান। তাই সেই সব গবেষণালব্ধ তত্ত্ব কখনও বিজ্ঞানের স্বীকৃতি পায়নি। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী পাভলভ মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য এক স্বকীয় পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ফল সর্ত্তাধীন পরাবৃত্ত (Conditioned Reflex) তত্ত্ব। তা দিয়ে নিঃসংশয়রূপে

প্রমাণ হল যে, মানব মস্তিষ্ক কোন আধ্যাত্মিক রহস্যের আধার নয়। সেটা বিবর্তনেরই এক বিশেষ অবস্থা। বস্তুই আদি ও প্রাথমিক। চৈতন্য বস্তু সাপেক্ষ। যাবতীয় মননক্রিয়া (চৈতন্য-সহ) বহির্বাস্তবের প্রতিফলন।

মনস্তত্ত্বের এই পাভলভীয় আবিষ্কার ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু তাকে যাঁরা এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করবার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে পাভলভ ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চাশ বছর বয়স্ক এই চিকিৎসকের আদি বাস খুলনা জেলার মূলঘর গ্রামে। লেখাপড়া তিনি শিখেছেন সিরাজগঞ্জ আর কলকাতায়। পিতা শৈলেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী ছিলেন শিক্ষক। ধীরেনবাবু ১৯৩৩ সালে মেডিকাল কলেজ থেকে এম. বি. পাশ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি যান অষ্ট্রেলিয়ায় Dairy Chemistry ও Milk Processing শিখতে। ১৯৩৯ সালে ভারতে প্রথম গুঁড়া দুধের কারখানা স্থাপিত হয়। ডাঃ গাঙ্গুলী সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সুরু থেকেই Technical Adviserরূপে যুক্ত ছিলেন। মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ আশৈশব। আগে তিনি ছিলেন ফ্রয়েড-এডলারের ভক্ত এবং মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় তাঁদেরই পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন। অষ্ট্রেলিয়ায় এক বিচিত্র ঘটনার মধ্যে পাভলভ তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি অবহিত হন এবং পাভলভের উপর পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯৫১ সালে পাভলভ ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা হয়। মানসিক ব্যাধি প্রতিরোধ করাই এই ইনষ্টিটিউটের প্রধান উদ্দেশ্য।

ডাঃ গাঙ্গুলী শুধু চিকিৎসক আর সমাজসেবীই নন, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক হিসাবেও সমধিক খ্যাতিসম্পন্ন। ইংরাজী ও বাঙলা দুই ভাষাতেই তিনি প্রবন্ধ লিখে থাকেন। কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও ছোট গল্প লেখেন বাংলায়। 'মানব মন' নামক মন বিষয়ক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক। তাঁর লেখা 'প্রেম', 'ছায়াপথ,' 'লিখি ইতিহাস,' 'মরুবক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থ সুধী সমাজে সমাদৃত হয়েছে।

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

ডাঃ গাঙ্গুলী ১৯৪৩ সালে দমদমে শ্রীমতী অমিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীমতী গাঙ্গুলী হাওড়া গার্লস কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল

[আরামবাগের জনপ্রিয় নেতা]

ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল—এই অবিসম্বাদী নেতার নাম আরামবাগের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের লোকের মুখে মুখে আজও সমানে ধ্বনিত হয়ে চলেছে। দুঃখ-কষ্টে ও দারিদ্র্যে তিনি মানুষের পাশে এসে সকল সময়ই দাঁড়িয়েছেন, তাদের সেবা করেছেন, তাদের কল্যাণের জন্যে বহু জনহিতকর কাজ তিনি নিজে করেছেন বা সরকারকে দিয়ে করিয়েছেন। তাই তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়। আরামবাগের মানুষ তাঁকে নিজের করে পেয়েছে; তাই রাধাকৃষ্ণবাবুও আজ আরামবাগের হাজার হাজার মানুষকে নিজের হাতের মধ্যে রাখতে পেরেছেন। রাধাকৃষ্ণবাবুর বিপুল জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তাঁর নির্দেশে আরামবাগের মানুষ প্রয়োজন হলে ল্যাম্পপোষ্টকেও ভোট দিতে পারে।

হুগলীর গৌরব আরামবাগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল ১৯০১ খৃঃ আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার অধীন রতনপুর গ্রামের বিখ্যাত ও প্রাচীন জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের আহ্বান ও সামাজিক জীবনের আমন্ত্রণ—যা আজ প্রৌঢ়ত্বে বিন্দুমাত্রও স্তিমিত হয়নি।

শৈশবে কুঁচিয়াকুল রাধাবল্লভ ইনষ্টিটিউশান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিনের জন্য বাঁকুড়া খৃশ্চান কলেজে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। পরে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে চিকিৎসা বিদ্যায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৩ সালে ছাত্রাবস্থায় তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে যোগদান করেন। ১৯২৬ সালে বাঁকুড়া জেলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৭ সালে মেদিনীপুর ও উড়িষ্যায় বন্যাপীড়িত আর্ত্ত জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে দেশগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসেন। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেন। লাহোর থেকে প্রত্যাবর্তন করে গোঘাট থানার লক্ষাধিক লোকের জন্য একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপূর্ব্বে গোঘাট থানা এলাকায় কোন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। ১৯৩০ সালে মহাত্মাজীর ডাণ্ডি অভিযানে আরামবাগ মহকুমার অধিবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তিনিই কারাবরণ করেন। ১৯৩১ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচনে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন। ১৯৩১ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র মেয়র নির্ব্বাচিত হ'লে রাধাকৃষ্ণ বাবু তাঁকে আরামবাগে নিয়ে আসেন এবং সুখ্যাত মদিনার মাঠে সুভাষনগর প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩২ সালে 'গান্ধী-আরউইন' চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার পর পুত্রকে আশ্রয়দানের অপরাধে তাঁর পিতাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হয়—যার ফলে সমগ্র ভারতে এক অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং তাঁর পিতাকে দশ হাজার টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল

১৯৩১ সালে স্বাধীনতা দিবসে তাঁর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী চারুশীলা পালও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের ফলে ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণ বাবু ৭ বার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

শিক্ষানুরাগী ডাঃ পাল আজীবন দেশবাসীর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। হুগলী জেলার আরামবাগের অধিকাংশ শিক্ষাকেন্দ্রেরই তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল কলা-বিজ্ঞান সমন্বিত আদর্শ মহাবিদ্যালয়—নেতাজী মহাবিদ্যালয় ও অঘোরকামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয় এবং বারসি জুনিয়ার হাই স্কুল এবং স্বগ্রামে পিতার নামে একটি জুনিয়ার গার্লস হাই স্কুল। তাঁর অক্লান্ত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একক পরিশ্রমের ফলে আরামবাগ মহকুমায় শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ সহায়তা হয়েছে।

শিক্ষা বিস্তার ছাড়াও তাঁর বহুমুখী সামাজিক কল্যাণ প্রচেষ্টা আরামবাগ মহকুমাকে এক নূতন রূপ দিয়েছে। রাস্তাঘাট, সেতু, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি বহু জনহিতকর কাজ তাঁরই উদ্যম ও উদ্যোগে আরামবাগে হয়েছে। সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রদ্ধেয় নেতা তাঁর বহুমুখী প্রচেষ্টার ফলে আজ আরামবাগের অবিসম্বাদী জননায়ক। ১৯৫২ সাল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বিধান সভার নির্ব্বাচনে একাধিক কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাংলার বিশিষ্ট নেতা ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে ২২ হাজার ভোটে পরাজিত করার নিদর্শন সমগ্র ভারতবর্ষের বিধানসভা নির্ব্বাচনে আর দেখা যায় না। এটা আকস্মিক ঘটনা নয়। তাঁর আজীবন সাধনা ও ত্যাগের ফলেই এ সম্ভব হয়েছে। আবার রাজনৈতিক জীবনের মোড় যখন ফিরলো, তখন এসে তিনি যোগ দিলেন কংগ্রেসে। দেশশুদ্ধ লোক মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখলো—তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের যে প্রফুল্ল দাদাকে বিপুল ভোটে পরাজিত করলেন, সেই দাদাকে সাদরে আহ্বান করে নিয়ে গেলেন পরের বারের নির্ব্বাচনে ঐ একই কেন্দ্রে; 'দাদা'র জন্যে নিজে ঐ কেন্দ্র থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং এবার প্রফুল্ল বাবু যে বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন তা পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্ব্বাচনে আর কোন প্রার্থীর পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

আগামী নির্ব্বাচনেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এই দুই "দাদা ও ভাই" খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন ও ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল আরামবাগ ও গোঘাট কেন্দ্র থেকে গতবারের মত দাঁড়িয়েছেন। নির্ব্বাচনের ফলাফল কি হবে তা আগে থেকেই পূর্ব্বাভাস দেওয়া যায়; তবুও বিরত থাকাই ভাল। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, সমগ্র জেলার অগণিত মানুষের ওপর নিজের কল্যাণকর প্রচেষ্টার দ্বারা কেউ যদি আধিপত্য বিস্তার করে থাকেন, তিনি হলেন আরামবাগের এই ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল।

শ্রীজানকীনাথ বসু

[বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশক ও সমাজসেবী]

সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি একটা বিশেষ অনুরাগ রয়েছে এঁর বরাবর, সমাজসেবার আগ্রহও এই মানুষটির মনে কখনই কম নয়। আপন গুণবত্তাবলেই আজ ইনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন এদেশের গ্রন্থজগতে, স্বপ্ন ও সঙ্কল্প এঁর রূপ পেয়ে চলেছে ক্রমিক ধারায়। কর্ম্মী শ্রীজানকীনাথ বসুকে যুব সমাজের কাছে সত্যি একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে হাজির করা চলে।

সারা দেশে তখন রাজনৈতিক আবহাওয়া খুব তপ্ত। স্বাদেশিকতাবোধ ও স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে পল্লী অঞ্চলেও। এমনি এক অনুকূল পরিবেশে ১৯১১ সালে জানকীনাথ জন্মগ্রহণ করেন ২৪-পরগণা জেলার আড়বালিয়া গ্রামে। একটু বড় হতেই গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা সুরু হয়ে যায় তাঁর। সন্তানের ওপর কড়া নজর রাখেন পিতৃদেব ৺সতীশচন্দ্র বসু।

গ্রামে থেকে যতটুকু শিক্ষা নেওয়া সম্ভব ছিল, জানকীনাথ তা পুরোপুরি গ্রহণ করেন। তারপরই তিনি চলে আসেন কলকাতায়—সেন্‌ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে পাশ করলেন প্রবেশিকা পরীক্ষা ১৯৩০ সালে। সিটি কলেজে তিনি নিয়মিত ভাবে আই. এ. পড়েন; কিন্তু পরীক্ষার ফি জমা দিয়েও ফাইন্যালের সময় গোলমাল বেধে যায়। জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে যেয়ে তিনি রাজরোষে পতিত হন, কারান্তরালে যেয়ে থাকতে হয় তাঁকে। মুক্তি পাওয়ার পর পরীক্ষা দিয়ে একে একে তিনি আই. এ. বি. এ. ও এম্. এ. সব কয়টিতেই উত্তীর্ণ হন। বি. এ. পড়বার সময় তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র আর এম্. এ. পড়েন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে—বিষয় ছিল আধুনিক ভারতীয় ভাষা।

ছাত্রজীবনে শ্রীবসু গোড়া থেকেই দেশের ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে সেদিনও তাঁকে সুভাষ-পন্থী বলা চলতো। সুভাষচন্দ্রের (নেতাজী) নামে আজও তিনি পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন।

কলেজে যখন তিনি পড়ছেন, তখন দেশে চলেছে গান্ধীজীর লবণ আইন অমান্য আন্দোলন। স্বর্গত জননেতা যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার নেতৃত্বে একটি সত্যাগ্রহী দল যায় সে সময় আড়বালিয়ায়। জানকীনাথের স্বাদেশক মন অমনি চঞ্চল হয়ে ওঠে—পড়াশুনা রেখে

শ্রীজানকীনাথ বসু

তিনিও এই সত্যাগ্রহী দলের সঙ্গে মিশে যান। এরই পরিণতিতে তাঁকে ছয় মাস কারাবরণ করতে হয়।

পরবর্ত্তী সময়ে রাজনীতির সঙ্গে শ্রীবসুর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেলেও সংস্কৃত চর্চা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে তিনি থেকে যান। তাঁর এম, এ, পড়বার সময় (১১৩৮) বাণী সংঘ নামে একটি সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার নামটি দেওয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের, আর এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অন্যান্যদের মধ্যে স্ব প্রমথ চৌধুরী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগ জানকীনাথের একটি গৌরব—প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তিনি ছি বাণী সংঘের সম্পাদক। তিনি এক সময় 'দোতারা' (অধুনালু নামক একটি দ্বৈমাসিক পত্রিকারও যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন।

১১৪২ সাল থেকেই জানকীনাথ পুস্তক ব্যবসায় জগতে এক নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ম্মানযুক্ত রয়েছেন। যে বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট ি আজ এতটা সুনামের অধিকারী, সেই প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রাণস্বরূপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে তিনি এর পরিচালনায় যথেষ্ট যোগ্যত স্বাক্ষর রেখে চলেছেন প্রতিদিন। তাঁরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এক শুধু বুকল্যাণ্ডের কলকাতা মূল কেন্দ্র কেন, এর এলাহাবাদ পাটনা শাখা সংস্থাও সুন্দরভাবে চলেছে। বসু, ভট্টাচার্য্য এ কোং প্রা: লিমিটেড-এরও (পুস্তক গ্রন্থন প্রতিষ্ঠান) তিনি ম্যানেি ডিরেক্টর।

শ্রীবসুর সুযোগ্য পরিচালনাধীনে 'বুকল্যাণ্ড' এই কয় বছ বাংলাদেশকে বহু মূল্যবান পুস্তক উপহার দিয়েছেন। গবেষণামূল গ্রন্থাদি-প্রকাশের জন্যই এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস বিশেষভাবে নিব সেটিও লক্ষ্য করবার। জানকীনাথের কাছে 'বুকল্যাণ্ড' বৃ সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুশীলনের পাশাপাশি সমাজসেবার একটি কেন্দ্র এরই মাধ্যমে তিনি যে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছেন, তারই স্প সাক্ষ্য—ক্রমাগত আট বছর ধরে তিনি বঙ্গীয় পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সমিতির সাধারণ সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। ভারতীয় প্রকাশক ও গ্রন্থ বিক্রেতা ফেডারেশনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিরও তিনি একজন সক্রিয় সদস্য। এ ছাড়া 'অবনীন্দ্র পরিষদ', 'বৈতানিক' প্রভৃতি বহু সংস্কৃতিমূলক সংস্থার দায়িত্বশীল পদেও তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। স্বগ্রাম আড়বালিয়ায় যে হায়ার সেকেণ্ডা মাল্টিপারপাস স্কুল রয়েছে, তিনি সেই স্কুলের পরিচালনা কমিটির সম্পাদক। পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন ও কল্যাণব্রতে জানকীনাথের অং রয়েছে নানাভাবে।

আপনি কি জানেন?

(উত্তর)

১। চালুক্যরাজ বিক্রমাঙ্কের সভাস্থ একজন কবি। 'বিক্রমাঙ্ক-চরিত' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে তৎকালের অনেক ঐতিহাসিক কথা বর্ণিত আছে। ইনি 'চোর কবি' নামেও বিখ্যাত ছিলেন।

২। অর্জ্জুন। দশটি নামের মধ্যে তাঁর অন্য একটি নাম 'বীভৎসু'। ইনি যুদ্ধে ন্যায়পূর্ব্বক শত্রু হনন করতেন। কখনও বীভৎস কর্ম্ম করতেন না। (বীভৎসু— বাভৎসতীতি বধ-সন্-উ)

৩। বোধগয়া বা বুদ্ধগয়ার পূর্ব্বে লীলাঞ্জন নদী প্রবাহিত। আসল নাম 'নৈরঞ্জনা'। এই নদী মোহনার সঙ্গে মিলিত হয়ে 'ফল্গু' নামে পরিচিত।

৪। এখানে 'অকাল' শব্দ অর্থে দেবতাদিগের রাত্রি। কারণ উত্তরায়ণ দেবতাদের দিন এবং দক্ষিণায়ণ রাত্রি। দেবতাদের রাত্রে কোন কার্য্য প্রশস্ত নয়। রাত্রে নিদ্রার কাল, এজন্য বোধনের পর পূজা করাই বিধেয়।

৫। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁরা জাতকর্ম্মাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত, তাঁরা ছয় প্রকার কর্ম্মে রত থাকেন। যেমন সন্ধ্যাবন্দনা, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা ও অতিথি সৎকার।

৬। ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু ও মৎস্যপুরাণে ভারতবর্ষের যে সীমা নির্দিষ্ট আছে, তা এই—

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদ্দক্ষিণঞ্চ যৎ
বর্ষং তদ্ভারতং নামে যত্রেয়ং ভারতী প্রজা।।"

অর্থাৎ, যে-দেশ সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ, তাহার নাম ভারতবর্ষ। এই স্থানের প্রজাগণ ভারতী নামে খ্যাত।

৭। শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা। যথা (১) সংস্কৃত, (২) প্রাকৃত, (৩) উদীচী, (৪) মহারাষ্ট্রী, (৫) মাগধী, (৬) মিশ্রার্দ্ধ মাগধী, (৭) শকাভীরী, (৮) শ্রাবস্তী, (৯) দ্রাবিড়, (১০) ঔড্রীয়, (১১) পাশ্চাত্য, (১২) প্রাচ্য, (১৩) বাহ্লীক, (১৪) রন্তিকা, (১৫) দাক্ষিণাত্যা, (১৬) পৈশাচী, (১৭) আবন্তী, (১৮) শৌরসেনী।

৮। আর্য্যভট্ট।

মধুরেণ
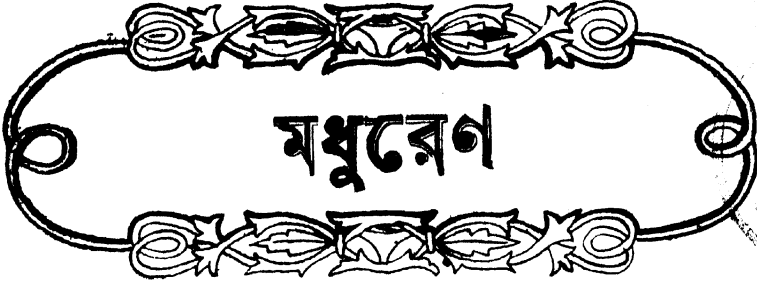
বিনতা রায়

Sc 1.

সময় সন্ধ্যা। কলকাতার চৌরঙ্গী। হোটেল, রেস্তোরাঁ, দোকানপাট আলোয় ঝলমল করছে। নিওনের আলোয় বিবিধ বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতা পুরোদমে স্বরু হয়ে গেছে। দুই দিক থেকে অসংখ্য গাড়ী, বাস কোনো দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে সুপটু হাতে পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে ছুটে চলেছে।

চার্চের ঘন্টায় ঢং ঢং করে বাজলো আটটা।

বড় একটা সিগরেটের দোকানের সামনে এসে থামলো একখানা গাড়ী। চালকের সিট থেকে নেমে সিগরেটের দোকানের দিকে এগিয়ে চললো রণধীপ।

হঠাৎ দেখা যায় উল্টোদিক থেকে অত্যন্ত দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে একটি তরুণী। দৃষ্টিতে তার সতর্কতা। কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা সেই দিকে নজর রাখতে রাখতে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে আসছে সে।

রণধীপ তাকে লক্ষ্য করে না। নিজের মনে এগিয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ মেয়েটি প্রায় তার গায়ে এসে পড়তেই চমকে ছিটকে একটু সরে গিয়ে অবাক হয়ে তাকায়।

মেয়েটির নাম অনুসূয়া।

অনু। (ভ্রূ কুঁচকে রাগত কণ্ঠে) চোখে দেখতে পান না?

রণ। বা রে, তা পাবো না কেন?

অনু। তবে ধাক্কা দিলেন কেন?

রণ। আমি—মানে—আমি তো ধাক্কা দিইনি। আপনিই তো একটু গা বাঁচিয়ে চলতে পারতেন।

অনু। আচ্ছা আচ্ছা, পারতাম তো পারতাম। আপনাকে আর—

কথাটা শেষ হবার আগেই কি যেন লক্ষ্য পড়তেই মুহূর্তে মুখে-চোখে একটা ভয় ফুটে ওঠে। আর কোনোদিকে না তাকিয়ে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে ঢুকে পড়ে সে রাস্তার ধারে দাঁড়ানো রণধীপের গাড়ীর ভেতর।

বিস্ময়ে রণধীপ সিগরেট কিনতে পর্যন্ত ভুলে যায়। মেয়েটিকে যেদিকে তাকিয়ে ভয় পেতে দেখেছিল সেদিকে তাকাতেই দেখে একটি মোটা মতো ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে। লোকটি রণধীপের সামনে এসে হাঁপাতে থাকে। এই অবসরে রণধীপ দোকানদারকে বলে—

রণ। চেস্টারফিল্ড—এক প্যাকেট।

দোকানদার সিগরেট রণধীপের হাতে দেয়। পয়সা বার করে দিয়ে রণধীপ ধীরে-সুস্থে গাড়ীর দিকে রওনা হতেই মোটা লোকটি তাকে থামিয়ে বলে। (লোকটির নাম বিরূপাক্ষ।)

বিরূ। ও মশাই, শুনছেন?

(রণধীপ ঘুরে দাঁড়ায়)

Cont.—

এই মাত্র একটি মেয়েকে এখান দিয়ে যেতে দেখেছেন?

রণ। একটি নয়, অনেককে দেখেছি। আপনি কার কথা বলছেন বুঝতে পারছি না।

বিরূ। আরে না না, অনেকের মধ্যেও সে আলাদা। সুন্দর চেহারা, হাতে ব্যাগ—

এই লোকটির হাত এড়াতেই যে মেয়েটি অমন ভাবে ছুটে গিয়ে তার গাড়ীতে আত্মগোপন করেছে, এটুকু বুঝে নিতে রণধীপের কোনো অসুবিধা হয় না। মুখের ভাব খুবই গম্ভীর ক'রে সে বলে—

রণ। (যেন কি একটু মনে করে নেওয়ার ভাণ করে) ও হ্যাঁ। হ্যাঁ, খুব সুন্দর চেহারা, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ—

বিরূ। (উৎসাহের আতিশয্যে বাধা দিয়ে) ঠিক ঠিক—কোন্ দিকে গেল বলুন তো? মেয়েটি মশাই আমার রুগী। বেরোনো একদম বারণ। নিশ্চয়ই পালিয়ে এসেছে।

রণ। তাই নাকি দেখে তো তেমন মনে হল না!

বিরূ। (খিঁচিয়ে উঠলো) মনে হ'ল না—সবাই চোখে দেখেই রুগী চিনতে পারলে আর আমাদের ডাক্তারদের কি প্রয়োজন ছিল—নিন্ এখন দয়া কোরে বলুন তো তিনি কোন দিকে গেলেন—

রণ। (নিজের গাড়ীটা দেখিয়ে) ওইটা আমার গাড়ী। ওরই পেছন দিয়ে ঘুরে গড়ের মাঠের দিকে গেলেন মনে হ'ল।

বিরূ। গড়ের মাঠ!

মুহূর্ত অপেক্ষা না করে বিরূপাক্ষ তার বপুটি নিয়ে ছুটলো মাঠের দিকে। কিন্তু দুধার থেকে সমানে গাড়ীর ভীড়ে মাঝপথেই আটকে পড়লো। ইতিমধ্যে রণধীপও ষ্টার্ট নিয়েছে গাড়ীতে। কানের পাশেই জোর হর্ণ শুনে চমকে পেছনে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে হাঁ হয়ে যায় ডাঃ বিরূপাক্ষ। রণধীপের গাড়ীয় পেছনের সিটএ বসে আছে অনুসূয়া। তারই নাকের ওপর দিয়ে স্পীডে গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে যায় রণধীপ।

প্রায় লাফ দিয়ে ছুটে আসে সে পূর্বের ফুটপাথে। ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে ট্যাক্সির জন্যে। একটা খালি ট্যাক্সির প্রায় সামনে গিয়ে পড়ে থামায় দুই হাত তুলে।

বিরূ। রোকো রোকো—

ট্যাক্সিটা থামতেই দরজা খুলে উঠে বসে ঝপাং ক'রে বন্ধ করে দেয় দরজাটা।

Cont—

জোরসে চলো। দূরমে ওই কালো গাড়ী যাতা হায়, ওরই পিছনমে যায়গা।

ট্যাক্সি ছুটে চলে। একটা লাল বাতির ইসারায় রণধীপকে থামাতে হয় গাড়ী। হঠাৎ সামনের আয়নায় দেখে সে অদূরে ছুটে আসছে একটা ট্যাক্সি, তাতে বসে আছে বিরূপাক্ষ।

হলদে বাতি জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটা এক মোচড়ে বাঁদিকে ঘুরিয়ে স্পীড বাড়িয়ে দেয় সে। Cut.

Sc 1a.

রাস্তা। বিরূপাক্ষর ট্যাক্সি ছুটছে। সামনের সিটের পেছনটা আঁকড়ে ধরে উঠে বসে আছে বিরূপাক্ষ, শিকার ধরার আক্রোশ তার চোখে-মুখে। Cut.

Sc 2.

অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তা। রণধীপের গাড়ী ছুটে চলেছে। পেছনের সিটে চুপচাপ বসে কি যেন ভাবছে অনুসূয়া। রণধীপ প্রশ্ন করে—

রণ। আপনাকে কোথায় পৌঁছে দেব?

অনু। শিয়ালদা স্টেশনে।

রণ। আপনি কলকাতার বাইরে থাকেন?

অনু। হ্যাঁ।

Sc 1b.

রাস্তা। রণধীপ গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে, সামনের আয়নায় লক্ষ্য রাখছে। Cut.

Sc 1c.

বিরূপাক্ষর ট্যাক্সি ছুটে চলেছে বিরূপাক্ষ তেমনি ঝুঁকে বসে আছে। হঠাৎ দু'-তিনটে গাড়ী এসে রণধীপের গাড়ীটা ঢেকে ফেলে। বিরূপাক্ষ আর ট্যাক্সি-ড্রাইভার দুই জানলায় ঝুঁকে পড়ে রণধীপের গাড়ীটা দেখতে চেষ্টা ক'রে দেখতে না পেয়ে দুটো হাত মুচড়ে অস্থির ভাবে প্রায় লাফিয়ে স'রে এসে মাঝখানটায় বসে একান্ত হতাশ ভাবে।

ড্রাইভার। (পেছনে তাকিয়ে বিরক্তির সঙ্গে) চুপসে বৈঠিয়ে বাব, প্রি: টুট যায়গি। Cut.

Sc 1d.

রণধীপ এই সুযোগ নষ্ট হ'তে দেয় । পেছনে বিরূপাক্ষর ট্যাক্সি ঢাকা পড়ে গেলে আয়নায় দেখে নিয়ে জানলা দিয়ে ঝুঁকে পেছনে একবার দেখে নেয়, তারপর চট করে ডান দিকের একটা গলিতে গাড়ীটা ঢুকিয়ে দিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করে। ঝুঁকে পেছনে বড় রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। অনুসূয়াও এক কোণে স'রে গিয়ে পেছনের কাচ দিয়ে লক্ষ্য করতে থাকে। দু'-তিনটে গাড়ীর পর বিরূপাক্ষর ট্যাক্সিটা হুস ক'রে বেরিয়ে যায় সোজা পথে। ছেলেমানুষের মতো খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে অনুসূয়া। রণধীপের ঠোঁটের কোণেও হাসি ফুটে ওঠে। ঘুরে-সুরে সে গাড়ী ব্যাক ক'রে নিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে যে পথ দিয়ে আসছিল সেই পথেই ঘুরে চালাতে থাকে গাড়ী। D

Sc 2. As it is.

রণ। দেখুন, বেশ বুঝতে পারছি আপনি একটা বিপদে পড়েছেন, জানতে পারলে কিছু উপকার হয়তো করতে পারতাম।

অনু। জানাতে বাধা আছে। তাছাড়া আপনাকেই বা আমি বিশ্বাস করবো কেন?

রণধীপ আর তার কথার কোনো জবাব দেয় না, একটু মাথাটা ঘুরিয়ে একবার দেখে নেয় অনুসূয়াকে, তারপর স্পীডে একটা মোড় ঘুরে শেয়ালদার রাস্তা ধরে। Desolves.

Sc 3.

পুরোনো আমলের একটা মস্ত বাড়ী। বাড়ীর দোতলায় একটা অংশে খান তিনেক ঘর বেশ সাজানো গোছানো। আর সবটাই দুখানা একখানা করে ভাড়া দেওয়া। রণধীপ ছিল ধনী পিতার সন্তান। কিন্তু বাপ এই বাড়ীটি ছাড়া আর সবই ঘোড়ার পেছনেই ঢেলেছে। চাকরি করার কথা রণধীপ ভাবতে পারে না তাই বাড়ীর এই ব্যবস্থা করে আয়ের পথটা তৈরী করে নিয়েছে। বৃদ্ধকে তার ভৃত্য ঠিক বলা যায় না বাপের আমলের শিবু চাকরের ছেলে ছোট থেকেই দুজনের মনের মিলটা খুব বেশী। বৃদ্ধর সখ সে গান শিখবে, রণধীপ তাকে হারমোনিয়ম, তবলা কিনে দিয়েছে। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে রাসভ কণ্ঠে গলা সাধছে সে। Cut.

Sc 4.

নীচের তলার ফ্ল্যাট। স্থূলাঙ্গিনী বনলতা শুয়ে আছে বিছানায়। বীভৎস বিকৃত কণ্ঠে বৃদ্ধর গান শোনা যাচ্ছে। খাটের সামনে ছটফট করে বার দুই পায়চারী ক'রে বনলতার স্বামী ঘনশ্যাম কোমরে কাপড়ের বাঁধনটা শক্ত ক'রে নিয়ে ঘুষি পাকিয়ে বলে—

ঘন। নাঃ আজ একটা এস্পার ওস্পার করে ছাড়বো—ব্যস্ত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরোতে যায় বাধা দেয় বনলতা।

বন। থাক ঢের হয়েছে আর বীরত্ব ফলাতে হবে না। চুপচাপ বসে থাকো। রুদ্র বাবু অতি ভাল লোক তাঁর ওখানে গিয়ে কোনো ঝামেলা করবে না।

ঘন। (চুপসে গিয়ে) তার মানে? তোমার এই রকম হাই প্রেসারের অসুখ, এ অত্যাচার সইবে কেন?

বন। (উঠে বসে) বলি, ঘটে বুদ্ধি শুদ্ধি কিছু আছে, না একেবারে ঠন ঠন? এত কম ভাড়ায় আর ঠাঁই পাবে কোথাও?

ঘন। মেয়েমানুষ আর কাকে বলে, ওদিকে ডাক্তারের খরচটা যে দিনকে দিন বাড়ছে—সেটা যে দিতে হয় এই শর্মাকেই। না আজ আমি আর কোনো কথা শুনবো না।

প্রায় ছুটেই বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। Cut.

Sc 4.

ঘরের বাইরের ছোট বারান্দা পেরিয়ে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। ঘনশ্যাম ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি উঠতে থাকে। Mix.

Sc 5.

দোতলার বারান্দা। ফ্ল্যাটের অন্যান্য আরও জনা ছয় সাত জড়ো হ'য়ে জটলা করছে। সবারই মুখে-চোখে বিরক্তি মারমুখী ভাব।

১ম ভাড়াটে। উঃ এর নাম কি গান ?

২য় „ । গান নয় মশাই 'গান্'। এক এক গুলিতে আমাদের জান নিয়ে ছাড়বে।

এমনি সময় ঘনশ্যাম এগিয়ে আসতে আসতে বলে—

ঘন। যা বলেছেন। যেমন মনিব তেমনি ভৃত্য। বাড়ীটাকে গাধার আস্তাবল বানিয়ে রেখেছে। আমার ঘরে প্রেসারের রুগী। ডাক্তার বিরূপাক্ষ বলেন এ রোগে যে কোনো উত্তেজনাই ক্ষতিকর।

১ম। রুগী কি বলছেন মশাই, আমরা সাধারণ লোকগুলোরই পাগল হবার জোগাড়।

ঘন। বাবু সারাদিন গাড়ী নিয়ে টো-টো করবে, ভৃত্য বসে এই রকম উৎকট গলায় গান সেধে সারা ফ্ল্যাটের লোকের নাড়ী ছাড়াবার ব্যবস্থা করবে বাপের জন্মে এমন তো শুনিনি। আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। আসুন আপনারা সব আমার সঙ্গে।

ঘনশ্যাম আবার কোমরে কাপড়টা শক্ত করে বাঁধে সার্টের হাতটা গুটিয়ে নিয়ে রণধীপের দরজার দিকে এগোয় পেছনে পুরো দলটি।

ঘনশ্যাম পেছনে দল নিয়ে চুপা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ পেছন ফিরে একটু সরে আসে সবাই তাকায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

ঘন। না, মানে—ইয়ে—রণধীপবাবু বাড়ীতে নেই তো ?

১ম ভাড়াটে। তা থাকলেই বা, আপনি কি ভয় পেয়ে গেলেন নাকি ?

ঘন। (চেষ্টাকৃত ভঙ্গীতে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে হাতা দুটো আর একটু কাঁধের দিকে তুলে দেয়।) ভয়! হ্যাঁ! অমন চারটে রণধীপের সঙ্গে লড়বার ক্ষমতা আমার আছে আমি কাউকে ভয় পাই না। আসুন আসুন—

আবার সবাই এগোয়।

৩য় ভাড়াটে। ভাল কথায় বুঝিয়ে হয় তো ঠিক আছে, নইলে আমরা পুলিশের সাহায্য নেব।

রণধীপের ঘরের বন্ধ দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায় সবাই। গান একই ভাবে চলছে। ঘনশ্যাম দরজার কড়াটা ধরে প্রথমে ভদ্রভাবেই নাড়া দেয়। কোনো ফল হয় না গানও বন্ধ হয় না।

১ম ভাড়াটে। ওতে হবে না, ধাক্কা দিন মশাই ধাক্কা দিন। ঘনশ্যাম জোরে দরজায় ধাক্কা দেয়। Cut.

Sc 6.

ঘরের ভেতর। একটা বন্ধ হারমোনিয়ম বাজিয়ে চোখ বুঁজে রাজ্যি ভুলে গিট কিরি দিয়ে চলেছে বুদ্ধু। প্রথম ধাক্কা তার কানেই যায় না দ্বিতীয়বার অত্যন্ত জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা পড়ায় চোখ খুলে গান বন্ধ ক'রে ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে সে। Cut.

Sc 7.

বাইরে সবাই দাঁড়িয়ে। গান বন্ধ হওয়ায় পরস্পরের দিকে তাকায়। দরজা খোলার অপেক্ষা করে। Cut.

Sc 8.

ভেতরে বুদ্ধ, ভ্রূ কুঁচকে একই ভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার গান শুরু করে। Cut.

Sc 9.

বাইরে সবাই আবার গান শুনে হতাশ হ'য়ে পড়ে।

১ম ভাড়াটে। দরজা ভাঙবো। না হয় মই লাগিয়ে জানলা দিয়ে ঢুকবো। আজ একটা কিছু না ক'রে আমি তো অন্ততঃ নড়ছি না এখান থেকে। Cut.

Sc 10.

ভেতরে বুদ্ধ, গান গাইতে গাইতে হারমোনিয়ম ছেড়ে গেঞ্জির হাতা দুটো একটু গুটিয়ে নেয়। তবলায় দু' চারটা ঘা দেয় তারপর উঠে গিয়ে খুব সাবধানে নিঃশব্দে

Sc 7.

দরজার ছিটকিনিটা খুলে রেখে আবার ফিরে এসে এক সঙ্গে হারমোনিয়মের যে কটা রীড আঙুলে ধরে এক সঙ্গে টিপে ধরে বিরাট হাঁ ক'রে বিকট আওয়াজে সারেগামা শুরু করে। Cut.

Sc 8.

বাইরে আবার সবার মধ্যে একটা চঞ্চলতা দেখা দেয়।

১ম ভাড়াটে। দিন মশাই, ধাক্কা দিন। ভেঙে ফেলুন দরজা।

ঘন। (হাতা গুটোতে গুটোতে প্রায় কাঁধের ওপর তুলে ফেলেছে। জোরে একটা দম নিয়ে) তাহ'লে দিই একটা জোরসে, কি বলেন ?

সবাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুরু করুন।

ঘনশ্যাম সমস্ত শরীরের শক্তি দিয়ে দরজায় ধাক্কা দেয়। খোলা দরজা ছিটকে দুভাগ হয়ে যায় আর ঘনশ্যাম সজোরে আছাড় খেয়ে সাষ্টাঙ্গে উপুড় হ'য়ে পড়ে বুদ্ধুর ঠিক পাশটায়। সকলে প্রথমটা হতভম্ব হ'য়ে যায়, তার পর এক সঙ্গে ঢুকে পড়ে ঘরের ভেতর তাকে সাহায্য ক'রতে। বুদ্ধ, বাজনা বন্ধ করে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে পাশেই পড়ে থাক। ঘনশ্যামের দিকে একবার তাকায়। টাকে হাত বুলোনোর মতো তার মাথায় হাতটা একবার বুলিয়ে নিয়ে অত্যন্ত মোলায়েম কণ্ঠে বলে—

বুদ্ধ। আ—হা লাগলো ?

ঘনশ্যামের গা জ্বালা করে উঠলো। এমনিতেই বেশ চোট খেয়েছে। উঠতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। এক হাতে বুদ্ধুর হাতটা ঝটকা দিয়ে ঠেলে দিয়ে বললো—

ঘন। (শুয়ে থেকেই মাথাটা উঁচু ক'রে) বলি এটা কি হ'ল ?

বুদ্ধ। একে বলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়া। খুব লেগেছে কি ?

ঘন। খু-ব লেগেছে। তাতে তোমার কি ? (একটু ওঠার চেষ্টা করতে করতে) কিন্তু পড়লাম কি ক'রে ? দরজা তো বন্ধ ছিল।

বুদ্ধ। (অতি বিনয়ের ভাব নিয়ে) আজ্ঞে না, খোলা ছিল।

ঘন। (ক্ষেপে উঠে) বন্ধ ছিল।

বুদ্ধ। খোলা ছিল।

১ম ভাড়াটে। আরে, এরা কি নিয়ে তর্ক শুরু করলো মশাই! আসল কথাটাই তো চাপা পড়ে যাচ্ছে।

২য় ভাড়াটে। হ্যাঁ শোনো, তোমার গলা সাধা বন্ধ করতে হবে। আচ্ছা বাড়ীওয়ালা জুটেছে।

বুদ্ধ। বাড়ীওলা জোটে না। বাড়ীওয়ালা থাকে, ভাড়াটে জোটে

৩য় ভাড়াটে। বাজে বাজে কথা। গান তুমি বন্ধ করবে কি না?

বুদ্ধ। না।

১ম ভাড়াটে। আজ আমরা শেষ কথা বলে যাচ্ছি, হয় তুমি গান বন্ধ করবে, নয় আমরা সবাই এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দেব।

বুদ্ধ। দেবেন। নতুন ভাড়াটে জুটিয়ে আনবো।

এমনি সময় রণধীপ এসে দাঁড়ায় সবার পেছনে। উঁকি দিয়ে ঘনশ্যামকে পড়ে থাকতে দেখে সকলকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে ঘনশ্যামের গেঞ্জীর পেছনটা ধরে বেড়ালছানার মতো উঠিয়ে দাঁড় করায়, আর ঠিক সেই সময়ই বনলতা তার বিপুল শরীরটা নিয়ে উঠে এসে রণধীপের হাত থেকে ঠিক তারই ভঙ্গীতে ঘনশ্যামের গেঞ্জীর মুঠোটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে একটা ঠেলা দিয়ে বাইরে বার করতে করতে বলে—

বনলতা। খুব বীরত্ব হ'য়েছে। চল, নীচে চল।

বনলতা ঘনশ্যামকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে আরও দু' চারজন তার সঙ্গে চলে যায়।

রণ। কি ব্যাপার বলুন তো! সবাই মিলে আমার ঘরে হামলা করছেন কেন?

১ম ভাড়াটে। মশাই, গান গেয়ে পাগল করে দিলে এই লোকটা। এটা কি চিড়িয়াখানা?

রণ। (সকলের ওপর দিয়ে চোখটা একবার বুলিয়ে নিয়ে) তাই তো বলে হচ্ছে নিজে ঘরে বসে একজন গান গাইবে, আপনারা বাধা দেবার কে।

২য় ভাড়াটে। পুলিস ডাকবো।

রণ। ডাকুন। (হাত গুটিয়ে এক পা এগোয়) জানেন আমি একজন নামকরা বক্সার?

তার এই মারমূর্তি দেখে সবাই ভয়ে পেছিয়ে যায়।

১ম ভাড়াটে। (শেষ পর্যন্ত তড়পানো থামায় না, পেছনে সরতে সরতে) আচ্ছা, দেখে নেব একবার।

Sc 9.

সকাল। রণধীপের ফ্ল্যাটের দোতলার বারান্দা। এক হাতে ওয়াটারপ্রুফ, অপর হাতে একটা লেডিস ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দ্রুত বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলেছে বুদ্ধ, উল্টো দিক থেকে এক কাপ চা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে ঘনশ্যাম। নাকে তার প্লাষ্টার করা। বুদ্ধ দ্রুত হাঁটতে গিয়ে ধাক্কা লেগে যায় ঘনশ্যামের সঙ্গে, কাপ-ডিসটা কোন রকমে ধরে ফেললেও চা ছলকে সমস্ত গায়ে পড়ে যায় ঘনশ্যামের।

ঘনশ্যাম। (ক্ষেপে চোখ পাকিয়ে) চোখ দুটো কি পকেটে পুরে হাঁটো?

বুদ্ধ। আর আপনার চোখ দুটো কি কপালের ওপরে সাঁটা? বারান্দা দিয়ে বহাল তবিয়তে চা খেতে খেতে চলেছেন, কেন নীচে বসে খাওয়া যায় না? ও? বৌদি দেয় না বুঝি?

ঘনশ্যাম। খবরদার বুদ্ধ, বউদি তুলে কথা বলবে না (কাপটা উঁচু করে ধরে ছুঁড়ে মারবার ভঙ্গীতে।)

বুদ্ধ। (তাড়াতাড়ি মাথার ওপর ব্যাগ আর ওয়াটারপ্রুফ তুলে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে) আহা দাদা চটছেন কেন, আপনার বড় একটুতেই রাগ হয়ে যায়। (খুব মোলায়েম ভাবে) তা দাদার নাকটা—

ঘন। (একবার প্লাষ্টার করা নাকে হাত বুলিয়ে নিয়ে) আমার নাকে যাই হোক, তোমার তাতে কি ?

বুদ্ধ। না ন', আমার আর কি ভাবছিলুম কি—যে—খুব অল্পর ওপর দিয়েই গেছে। যাই আসার, বড্ড তাড়া।

দ্রুত পা চালায়। ঘনশ্যাম খালি জোয়ালাটার দিকে চেয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে কাঁধটা কষে ঝাঁকিয়ে দেখে বুদ্ধকে।

বুদ্ধ এগিয়ে যাচ্ছে। একেবারে শেষ প্রান্তে তাদের ঘর। কাছাকাছি যেতে দেখা যায় খবরের কাগজে সমস্ত মুখটা ঢেকে একটা ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটি লোক এগিয়ে আসতে থাকে। বুদ্ধ সামনে এগিয়ে গিয়ে পা তুলে কাগজের ওপর দিয়ে একবার, নীচু হ'য়ে তলা দিয়ে একবার দেখবার চেষ্টা করে লোকটি কে। বুঝিয়ে করতে না পেরে হাত দিয়ে কাগজটা সরিয়ে দিতেই লোকটি চমকে উঠে রেগে যায়। লোকটি অত্যন্ত মোটা। নাম ব্রজবাবু। ভাঙাখাই গলায় বলে ওঠে—

ব্রজ। এই বেয়াদপ—ডিসটার্ব করলে কেন ?

বুদ্ধ। (অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে) স্যর, এটা কাগজ পড়ার যায়গা নয়। কাগজ পড়ার সবচেয়ে ভাল যায়গা হল বাড়ীর বাইরে চৌমাথার রাস্তায়। সেখানে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে পড়ুন, কাগজ পড়াও হবে, কাগজে মৃত্যু সংবাদটাও ছাপা হ'য়ে যাবে।

ব্রজ। (ভীষণ রেগে) কি—কি বললে ?

বুদ্ধ। যা বলার তা তো বললাম স্যর।

ব্রজ। (তর্জনী তুলে সাবধান করার ভঙ্গীতে রাগে কাঁপতে কাঁপতে) আমার মৃত্যুর কথা আর কোনোদিন উচ্চারণ করবে না। আমার মরবার বয়স এখনও হয়নি। দাঁত পড়লে আর টাক পড়লেই মানুষ বুড়ো হয়ে যায় না।

ঘনশ্যাম এতক্ষণ অদূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল ব্যাপারটা। কাপ-ডিস মাটিতে নামিয়ে রেখে কোমরে বাঁধনটা কষে হাত গুটিয়ে এগিয়ে এল।

ঘন। আমরা মরি আর বাঁচি তাতে তোমার কি ?

বুদ্ধ। না না, তাই বলছিলাম—নাক আর টাকটা বাঁচিয়ে চলতে পারলে এত শীগ্‌গির যমেও আপনাদের কিছু করতে পারবে না।

ঘন। তোমার নামে আমরা কেস করবো।

বুদ্ধ। লড়বো আর জিতবো।

কথাটা বলে এগিয়ে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বলে—

Cont—

উকিল দরকার হ'লে বলবেন, সাক্ষীও জোগাড় করে দেব দরকার হ'লে।

চিৎকার ক'রে শেষ কথাটা বলতে বলতে চলে যায় নিজের ঘরের দিকে। ব্রজ আর ঘনশ্যাম কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকে—

Cut

ঘন। আচ্ছা বেহায়া লোক মশাই।

Sc 10.

রণধীরের ঘর। রণধীর বাথরুম থেকে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢোকে। বাইরের দরজা দিয়ে ঢোকে বুদ্ধ।

রণ। কি রে চা টা দিবি না ?

বুদ্ধ। দেব। গাড়ীর মধ্যে এই ব্যাগটা ছিল।

ব্যাগটা রণধীরের হাতে দিয়ে একটু মুচকি হেসে ওয়াটারপ্রুফটা কোণের র‍্যাকে ঝুলিয়ে রাখে। রণধীর তার হাসি লক্ষ্য ক'রে বলে—

রণ। তুই অমন করে হাসলি যে—

বুদ্ধ। (মুখে হাত চেপে খুক্ খুক্ ক'রে আরও কিছুটা হেসে ফেলে) দিদিমণিদের ব্যাগ—

রণ। তাতে হয়েছে কি, দিদিমণিদের সঙ্গে আমার আলাপ থাকতে পারে না—

বুদ্ধ। না, এই নতুন দেখলুম তো, তাই—

রণ। যা যা, ফাজলামি করিস না—চা নিয়ে আয়।

বুদ্ধ গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে চায়ের জন্যে বাইরে চলে গেল। রণধীর ব্যাগটা হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলো, তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো মৃদু হাসি। ফাসনার টেনে সে ভেতরটা দেখতে গেল, ছোট একটা কার্ড হাতে ঠেকতে বার ক'রে চোখের সামনে ধরে জোরে জোরে পড়ল—

Cont—

অনুসূয়া চৌধুরী, ১১ নম্বর এলগিন রোড।

Desolves. [ক্রমশঃ।

বিদ্যাদর্শনের উদ্দেশ্য

"যখন যে জাতির মধ্যে সভ্যতা প্রবেশ করে, তাহার পূর্ব্বেই এই প্রকার প্রকাশ্য পত্রের সৃষ্টি হইয়া বিদ্যার পথ মুক্ত হইতে থাকে। এই পরম প্রিয়কর নিয়মের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া আমরাও বঙ্গদেশের মৃতপ্রায় ভাষায় পুনরুদ্দীপনে যত্ন করিতে অভিলাষ করিয়াছি, কিন্তু পাঠকগণকে কি প্রকারে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিব এই চিন্তা এইক্ষণে কেবল সংশয়ে পরিপূর্ণ রহিল, যেহেতুক আমাদিগের এবম্প্রকার উদ্যোগের ন্যায় এতদ্দেশে পূর্ব্বে এরূপ কোন কল্পনার সৃষ্টি হয় নাই, যে তাহার অনুগামি হইয়া আমরাও আমারদিগের অভিপ্রেত ব্যাপারে তত্তুল্য রচনাদি করিতে উদ্যত হই, সুতরাং এ প্রকার নূতন বর্ত্মে আমরা অতিশয় ভীতচিত্তে অগ্রসর হইলাম, এবং সংশয়াপন্ন হইয়া বিদ্যার্থিগণকে এই পথকে অবলম্বন করিতে নিমন্ত্রণ করিতেছি।" —অক্ষয়কুমার দত্ত

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে বাংলা হাসির গানের জন্মদাতা বলা যায়। তাঁহার পূর্বেও আমাদের হাসির গান ছিল না যে তাহা নয়, একদিন বাংলার কবিওয়ালা, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতির আসরে ভাঁড়ামি এবং রসিকতার নামে গ্রাম্যতা এবং অশ্লীলতার রীতিমতো বান ডাকিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রথম কৌতুকরসকে ভদ্রলোকের হাতে দেওয়ার মতো ব্যবস্থা করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার গানে বিলাতী আদর্শের সূক্ষ্ম রঙ্গব্যঙ্গের আমদানী করিলেন। তখনই প্রথম সবার সঙ্গে বসিয়া নিঃসঙ্কোচ মনে হাসির গান শুনিবার সৌভাগ্য বাঙ্গালা অর্জন করিল।

সে আমলের একজন বিশিষ্ট সমালোচক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে (১৮৮৬) এদেশে ফিরিয়া আসেন, তখন বাঙ্গালীর ভাবস্থবিরতা ঘটিয়াছিল। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতের Humour বা ব্যঙ্গের এদেশে আমদানী করিয়া দেশী শ্লেষের মাদকতা মিশাইয়া বিলাতী ঢঙের সুরে হাসির গান প্রচার করিলেন। সে গান বাংলা ভাষায় যেমন অপূর্ব, সে গানের সুর ও গীতিপদ্ধতিও তেমনি বাঙ্গালীর পক্ষে নতুন।"

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলি গাহিবার বিশিষ্ট রীতিকৌশল আছে। এই গীতিরীতিটি কবি নিজে গাহিয়া প্রচার করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন—

"বিলাত হইতে আসিয়া আমি ইংরেজি গান খুব গাহিতাম। ইংরেজি গান প্রায় কোন বাঙ্গালী শ্রোতারই ভাল লাগিত না। তখন ইংরেজি গান ছাড়িয়া দিয়া···কতকগুলি হাসির গান রচনা করি। এই হাসির গানগুলি অবিলম্বে অনেকের প্রিয় হয় এবং কার্যোপলক্ষে কোন নগরে যাইলেই আমায় স্বয়ং গাহিয়া শুনাইতে হইত।"

এই গানে গাহিবার কৌশলে নাটকীয়তার সৃষ্টি করা হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস মার্জিত হইলেও তাহাতে সঙ্কোচ নাই, হাসি প্রাণখোলা। সুরের অঙ্গে অঙ্গে হাসির প্লাবন ঢালিয়া গান মনঃপ্রাণকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, মুখ টিপিয়া অথবা ঠোঁট বাঁকাইয়া মৃদু হাসি হাসিলেই চলিবে না, গান গাহিতে গিয়া হাসিয়া অস্থির হইতে হইবে। এই Dramatic ভঙ্গীই দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের বৈশিষ্ট্য—

বলি ত হাসব না, হাসি রাখতে চাই ত চেপে,
কিন্তু এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে, যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে।
সাহেব-তাড়াহত, থতমত ভগ্নলক্ষ্য স্থীর,
ভূতভয়গ্রস্থ, পগারস্থ মস্ত মস্ত বীর,
যবে সব কদম ধরে, গলার জোরে, দেশোদ্ধারে ধায়;
তখন আমার হাসির চোটে, বাঁচাই মোটে, হয়ে ওঠে দায়॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হাসির গানে ব্রাহ্মসমাজসুলভ এক শ্রেণী সতর্কতা গ্রহণ করিতেন যে, তাহার সুর হইয়াছে সম্পূর্ণ কৃত্রিমতাপূর্ণ। তাঁহার হাস্যরস বুঝিতে হইলে যে পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে হাসিবার খরচ পোষায় না। তাহা ছাড়া, তিনি সুরের মধ্যে এই শ্রেণীর অভিনয়প্রবণতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার মতে, ইহাতে কলালক্ষ্মীর অপমান করা হয়।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে কিন্তু এই শ্রেণীর নাটকীয় ভঙ্গী খুবই সাধারণ বিষয়। দ্বিজেন্দ্রলালের কেবল হাসির গানেই নয়, অধিকাংশ গানেই ইহা আপনা হইতে চলিয়া আসিয়াছে। তিনি কতকগুলি ইংলিশ, স্কচ এবং আইরিশ গানের সুর হুবহু নকল করেন, সেগুলিতেও এই ভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন, 'Auld Lang Syne' গানের নকলে—

—পুরানো প্রেমকো নহি যাও ভুঁইয়া হো,
পুরানো প্রেমকো আওর যো দিন গিয়া হো;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভরকে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো॥

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের তিনটি বিভাগ করা যাইতে পারে—প্রথমতঃ, যে গানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাঁটা নাই, যেখানে প্রাণের রসাবেশ স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হাসিতে ছড়াইয়া পড়ে, শ্রোতারা যেখানে কাহারো ব্যক্তিত্বের উপর আঘাত অনুভব না করিয়াই আনন্দে যোগ দিতে পারে। যেমন,

এস এস বঁধু এস। আধ ফরাসে বোস,
কিনিয়া রেখেছি কলসী দড়ি (তোমার জন্যে হে)
তুমি হাতী নও, ঘোড়া নও
যে সোয়ার হয়ে পিঠে চড়ি,
তুমিও চিঁড়ে নও বঁধু, তুমি চিঁড়ে নও
যে খাই দধি গুড় মেখে (বঁধু হে)।

অসঙ্গতিকে লক্ষ্য করিয়া যে হাস্য তাহাই কবির গানের দ্বিতীয় বিভাগ। সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্মে, জীবনে আমরা বহু ভাবে লাঞ্ছিত হইতেছি, কোথাও তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করিবার সাহস নাই, আক্ষেপ মনের মধ্যে জমা হইয়া উঠিতেছে, নিজেদের অসহায়তাও মনে মনে গুমরিয়া উঠিতেছে। এই শ্রেণীর গানে চাপা আক্ষেপ অভিযোগ ফুটিয়া উঠিয়াছে—

খাও দাও নৃত্য কর মনের সুখে,
কে কবে যাবি রে ভাই শিঙ্গে ফুঁকে।
এক রকম যাচ্ছে যদি হাড় না কেটে,
পরে যা হবার হবে কাজ কি ঘেঁটে?
গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াও, কোমর এঁটে হাস্যমুখে॥

এই শ্রেণীর গান—

প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত,
জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জানত।
ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট, তার পরেতে যেসব কষ্ট,
বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত।

তৃতীয় ধারার হাসির গানে রীতিমত যুদ্ধ চলিয়াছে, আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের অন্ত নাই। সমাজের, রাষ্ট্রের কোন একটি অন্যায় অসঙ্গতিকে লক্ষ্য করিয়া 'হাসির বাণে শ্লেষ কথা হানা' হইয়াছে। কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত শ্রেণীকেই তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। বিলাত ফেরতা, ইরাণ দেশের কাজী, নতুন কিছু করো, নন্দলাল, বদলে গেল মতটা— প্রভৃতি এই শ্রেণীর গান। গানের মধ্যে বাস্তব বৈচিত্র্য আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

যদি জানতে চাও আমরা কে? আমরা Reformed Hindoos,
আমাদের চেনে নাকো যে, 'Surely he is an awful goose.'

সকল সাহেবিয়ানা, কপট দেশপ্রেম, ধর্মের সুবিধাবাদীয় ভণ্ডামি প্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিল। পরজের সুরে—

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা করেই হোক্ রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল 'আহাহা কর কি, কর কি নন্দলাল?'
নন্দ বলিল—'বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল?
আমি না করিলে, কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ?'
তখন সকলে বলিল—'বাহবা বাহবা বাহবা বেশ।'

এই শ্রেণীর গানে কবি তাঁহার সামসময়িক সমাজকে আক্রমণ করিয়াছেন। যে সমস্ত কপট দেশহিতৈষী বক্তৃতায় দেশ স্বাধীন করিতে চান, যে সমস্ত বিলাতফেরত বাঙালী সাহেব সাজিয়া তাঁহার দেশবাসীকে 'নেটিভ' বলিয়া বিদ্রূপ করেন, যে সকল জনসেবক নিজের আত্মীয় স্বজনকে দুঃখদুর্দশায় ফেলিয়া সমাজকল্যাণে মাতেন, তাঁহাদেরকে বিদ্রূপ ব্যঙ্গের শরে শরে জর্জরিত করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের উদ্দেশ্য রসের সঞ্চার নয়, স্বদেশের দুঃখদুর্দশায় রোদনসিক্ত তাঁহার এই হাসির গানগুলি। এই গানগুলির মধ্যে কবির গভীর দেশপ্রীতি এবং নিগূঢ় সহানুভূতি বিজড়িত আছে। রাজকীয় উচ্চতর শাসন কর্মে রত কবির পক্ষে স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় আমাদের হীনতা সম্পর্কে আক্ষেপোক্তি করিতে তাঁহার সঙ্কোচ হইত, সকলের সঙ্গে একত্রে বসিয়া দেশের দুঃখে ক্রন্দন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই—তাই এই বিদ্রূপের হাসির মধ্য দিয়া তিনি রোদনের করুণ কলরোল তুলিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই ধরণের হাসির গানের একদা বাংলার রসিক সমাজে বিশেষ আদর হইয়াছিল। তারপর যুগধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অপচারের প্রতিকার ও বহু সমস্যার সমাধান হইয়াছে, সে সকল গানের আদরও কমিয়া গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শে রজনীকান্ত সেন তাঁহার পর কিছু কিছু ঐ শ্রেণীর হাসির গান রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের আঘাত-প্রত্যাঘাত হইতে সন্তর্পণে দূরে দূরে থাকিতে চাহিয়াছিলেন, এ ধরণের গানের মধ্যে একটা সমাজচেতনার ভাব আছে। ইহার দ্বারা আক্রান্ত সমাজ বা ব্যক্তি ভবিষ্যতে নিজেদের সম্বন্ধে সতর্ক হইতে পারেন, তখন আর আক্রমণের মূল্য থাকে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল মনে করিতেন তাঁহার ব্যঙ্গ বিদ্রূপের দ্বারা কতকটা সমাজসংস্কার হইবে—

ব্যঙ্গ করি আমি? ব্যঙ্গ করি শুধু?
নিন্দা করি শুধু সকলে?
কভু না! আসলে ভক্তি করি আমি, ঘৃণা করি শুদ্ধ নকলে।
যেথা আবর্জনা, ধরি সম্মার্জনী, তাই বলে আমি অন্ধ না।
যেখানে দেবতা, ভক্তিপুষ্প দিয়ে স্তুতিছন্দে করি বন্দনা॥

বিদ্রূপের দ্বারা তিনি চাহিয়াছিলেন ত্রুটির সংশোধন করিতে। এজন্য যে আঘাত তিনি হানিতেন তাহা উপরে কঠিন মনে হইলেও ভিতরে দরদের রসে সিক্ত।

তুচ্ছ জিনিসকে অকারণে প্রাধান্ত দেওয়া অসঙ্গতির জন্ত আর একশ্রেণীর হাস্তরসের বস্তু। একপেয়ালা চা আমাদের প্রতিদিন সকালে চাই, এজন্ত যে রাজ্য সম্পদও ত্যাগ করিতে চান, তিনি হন আমাদের পরিহাসের পাত্র! নবাব সিরাজউদ্দৌলা নাকি জুতার জন্ত শত্রুহস্তে ধরা পড়েন-এ দুঃসংবাদেও আমরা মনে মনে হাসি; তাহার কারণ ঐ তুচ্ছ জিনিসের এই রকম অকারণ প্রাধান্ত!—

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই, যশ মান চাহি না:
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই ভাল এক পেয়ালা চা॥

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার হাসিকে সব সময়ে সতর্ক পাহারায় রাখিতেন, একটু অসতর্ক হইলেই হয় তো অশ্লীলতা না হোক্, গ্রাম্যতার স্তরে নামিয়া যাইতে পারে। এই ইচ্ছাকৃত সতর্কতাও (Careful Careless) হাসির জোগান দিয়াছে—

যখন কেউ প্রবীণ ভণ্ড, মহাষণ্ড পরেন হরির মালা,
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে রাখতে পারে কোন—!

'শালা' কথাটা উহ্য রাখার কৌশল!

হাসির পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য আছে, তাহাই সাহিত্যে ও রসের যোগান দেয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কেবল হাস্য রসের দ্বারা কেহ যথার্থ অমরতা লাভ করে না।···হাস্যরসের সঙ্গে চিন্তা এবং ভাবের ভার থাকিলে তবে তাহার স্থায়ী আদর হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের মধ্যে কবির হৃদয় রহিয়াছে, তাহার মধ্যে হইতে জ্বালা ও দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছে।"

—শ্রীজয়দেব রায়

সতীত্বের সংজ্ঞা

সতীত্বের প্রকৃত সংজ্ঞা কি এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। পুরাকালের দৃষ্টিভঙ্গী আজ লুপ্তপ্রায়, তাই আর সব বিষয়ের মত সতীত্বকেও নতুন চোখে দেখে আধুনিক যুগের চিন্তাশীল মানুষ প্রবৃত্ত হয়েছে তার নব রূপায়ণে। কথিত আছে সৃষ্টির আদিপর্বে, আদি নর ও নারী ঈশ্বরের বিধান অমান্য করে একদা নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে, আর আজ পর্য্যন্ত নাকি তারা তারই জের টেনে চলেছে বংশ পরম্পরায়। পুরোনো যুগের চিন্তাধারায় নর নারীর জৈবিক সম্বন্ধকে কঠোর নিয়মকানুনের বেড়ায় বেঁধে দেওয়াই সঙ্গত বলে বোধ হয়েছিল, যার জন্য বিবাহের গণ্ডীর বাইরের দেহমিলন মাত্রকেই মনে করা হত পাপ কর্ম বলে; আর সেই মিলন ঘটত যাদের মাঝে সমাজের অঙ্গুলি নির্দেশে তারাই হত অসৎ বা অসতী। যে পাশ্চাত্য সমাজে আজ যৌন স্বাধীনতার জয় পতাকা উড়ছে সদর্পে, সেই সমাজেই মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও নৈতিকতার মানদণ্ড ছিল কঠোর ভাবেই বিধিবদ্ধ। প্রেমহীন দাম্পত্যের যৌনক্রিয়ায় সমর্থন ছিল সমগ্র সমাজের, কিন্তু বিবাহ বন্ধনের বাইরে সত্যকার প্রেমের জন্ম হলেও সে প্রেম ছিল ব্যভিচার, সমাজ নিন্দিত, ভিক্টোরীয়ান সমাজ সে প্রেমকে কখনও স্বীকার করে নেয়নি। সেজন্তই সতীত্বের সঠিক কোন সংজ্ঞা নিরূপণ করা সহজ নয়, দেশে দেশে কালে কালে এর রূপভেদ ঘটেছে বারবার। সভ্যতার আলো যাদের কাছে এখনও পৌছতে পারেনি সেই সব জাতির মধ্যেও সতীত্বের নিরিখ এক ধরণের নয়। কোথাও বা দেহ মিলনকে অত্যন্ত সীমিত পরিধিতে আবদ্ধ রাখা হয়েছে, কোথাও বা আতিথ্য করতে স্ত্রীকে অতিথির কাছে সাময়িকভাবে দান করাটাই সামাজিক বিধি। তাতে তার সতীত্ব নষ্ট হচ্ছে বলে মনে করা হয় না, কারণ সেটাই তাদের সমাজে প্রচলিত রীতি। প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি চীনদেশে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত গরীব লোকে নিজের স্ত্রীকে সাময়িকভাবে ভাড়া খাটাতে পারত ইচ্ছামত সেজন্য সমাজ সেই নারীকে অসতী এই অভিধায় অভিহিত করেনি। আমাদের ভারতে তো পুরাকালে এক স্ত্রীর পঞ্চ পতি গ্রহণের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত সমাজসঙ্গত বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল এবং সেই রমণীর নাম আজও কুলকন্যারা পবিত্র মন্ত্রের মাধ্যমে স্মরণ করে থাকেন। বেশ কিছুদিন ধরে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই বিবাহ-মিলনকেই সতীত্বের একমাত্র সোপানরূপে গ্রহণ করা হয়ে এসেছে, অর্থাৎ যে নারী বিবাহ মন্ত্রের বন্ধনের মাধ্যমেই কেবলমাত্র দেহ দান করেছেন সমস্ত জগতের চোখে তিনিই সতী এবং যে পুরুষ একমাত্র বিবাহিতা পত্নীতেই উপগত হন তিনিই সচ্চরিত্র। কিন্তু আজকের দুনিয়া আর এই মতবাদকে শিরোধার্য্য করে রাখতে রাজী নয়। বর্ত্তমান যুগের চিন্তাধারায় প্রেমহীন দেহ মিলন মাত্রকেই ব্যভিচার এই আখ্যায় ভূষিত করা হয়ে থাকে, তা সে মিলন বিবাহিত স্ত্রী পুরুষেরই হোক বা অবিবাহিত অবৈধ মিলনেচ্ছু নর নারীরই হোক। আজকের দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী চিন্তানায়ক বার্ণার্ড শ' অবধি বলেছেন যে, সমগ্র বিবাহ প্রথাটাই একটা প্রকাণ্ড জুয়োচুরি, তাঁর মতে বিবাহ প্রথা "আইন অনুমোদিত বেশ্যাবৃত্তি" ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই সব মতবাদ থেকে এটুকু অন্তত: স্পষ্টই বোঝা যায় যে যৌন মিলন সম্বন্ধে মানুষের অন্ধ গোঁড়ামির অবসান ঘটেছে, দেহের এক স্বাভাবিক বৃত্তি বলেই একে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, আর সেই সঙ্গেই সতীত্ব সম্বন্ধে বহু প্রচলিত ধারণা ও হয়েছে অবলুপ্ত। সতীত্ব যে শুধুই দেহে সীমাবদ্ধ থাকেনা, একথাটা আজ অনেকেই মনে নেন, প্রকৃত পক্ষে মানুষের যৌনাচার যেখানেই মন নিরপেক্ষ সেখানে সেটা ঘৃণ্য পঙ্কিল, সেখানেই তার পাত্র পাত্রী অসৎ বা অসতী কিন্তু দেহ দেউলের বন্দনায় যাদের প্রেমের দীপটি জ্বলে অনির্বাণ সেখানেই মিলন সার্থক ও পবিত্র। প্রেমহীন দেহ মিলনে সমাজের স্বীকৃতি থাকলেও সে মিলনে থেকে যায় একটা প্রকাণ্ড ফাঁক, কারণ অন্তর সেখানে থাকে অস্বীকৃত, অবজ্ঞাত আর সেখানেই মানুষের চরম পরাজয়, তারই মধ্যেকার পশুত্বের হাতে। সতীত্বের প্রকৃত সংজ্ঞাও নিরূপণ করা সেজন্তই বড় কঠিন। একদিন মানুষ যেটাকে সতীত্ব বলে মনে নিয়েছিল, আজকের যুগমানসে তা সত্য বলে প্রতিভাত হয়না হয়ত আগামী কালে এর আরেক ধরণের মূল্যায়ণ সম্ভবপর হবে, সেদিনের মানুষই এগিয়ে আসবে সে কাজে।

বাঙলায় কনট্র্যাক্ট ব্রাজ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় দফার বা ফিরতি জিজ্ঞাসার ডাকের জবাব

(Responses to Second or Repeat Asking Bids)

	জিজ্ঞাস্য রংয়ে	অন্য রংয়ে
১।	সা (বা একক) অভাবে	ধর্ত্তব্য নয়
২।	সা (বা একক)	সাহেবের অভাবে
৩।	সা (বা একক)	১টি সাহেব বর্ত্তমানে
৪।	ঐ	দুটি সাহেব বর্ত্তমানে
৫।	ঐ	স্থিরীকৃত রংয়ের সাহেব
৬।	ঐ	৩টি সাহেব বর্ত্তমানে

জবাব

১। স্থিরীকৃত রংয়ে ফেরত (Sign off)।

২। নো-ট্রা-৫।

৩। সাহেব সহ দ্বিতীয় রংয়ের ডাক।

৪। দুটির মধ্যে যেটি দরে বেশী সেটির ডাক।

৫। স্থিরীকৃত রংয়ে একটি বাড়িয়ে ডাক।

৬। প্রথমে সম্ভব হলে নীচু দরের দুটি রংয়ের মধ্যে বড়টির ডাক এবং দ্বিতীয় দফায় স্থিরীকৃত রংয়ে একটি বাড়িয়ে ডাক।

৬নং ডাকের পরিস্থিতি ঘটা সম্ভব নয় এবং ঘটেও না সাধারণতঃ।

দ্বিতীয় দফার জিজ্ঞাসার ডাক দ্বিতীয় চক্রে রোখবার তাস জানবার জন্য প্রয়োগ করা হয় আগে বলা হ'য়েছে ; কিন্তু যে ক্ষেত্রে প্রথম জিজ্ঞাসার ডাকে সাহেব বা দ্বিতীয় চক্রে রোখবার ক্ষমতা জানবার পর একই রংয়ে দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার ডাক উক্ত রংয়ের বিবি বা তৃতীয় চক্রে রোখবার ক্ষমতা জানবার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়, এরূপ জিজ্ঞাসার ডাক সাধারণতঃ পাঁচের ডাকই হ'য়ে থাকে ; অন্যথায় তৃতীয় দফার জিজ্ঞাসার ডাক হয় ছয়ে। যেমন মনে করুন স্থিরীকৃত রং ইস্কাবন। প্রথম জিজ্ঞাসার ডাক হ'ল চি-৪ ও খেঁড়ী জবাব দিলেন হ-৪ (চিড়িতনে দ্বিতীয় চক্রে রোখবার তাস সহ হরতনের টেক্কা বা প্রথম চক্রে রোখবার তাস অর্থাৎ ছুট) ; দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার ডাক চি-৫ হ'লে বুঝতে হ'বে যে তিনি চিড়িতনে তৃতীয় চক্রে রোখবার ক্ষমতা জানতে চান। আবার দেখুন, হ-৪ জবাবের পর জিজ্ঞাসার ডাক হ'ল রু-৫ এবং উক্ত রংয়ে দ্বিতীয় চক্রে রোখবার ক্ষমতায় জবাব হ'ল নো-ট্রা-৫। তার পরের জিজ্ঞাসার ডাক চি-৬ উক্ত রংয়ের তৃতীয় চক্রে রোখবার ক্ষমতা জানবার জন্য প্রযুক্ত হয়।

তৃতীয় দফার জিজ্ঞাসার ডাকের জবাব

(Responses to Third Asking Bid)

জিজ্ঞাস্য রংয়ের বিবি বা মাত্র দুখানি তাস অর্থাৎ তৃতীয় চক্রে রোখবার তাসে জবাব হ'বে সমসংখ্যক নো-ট্রাম্প। জিজ্ঞাস্য রংয়ের বিবি বা মাত্র দুখানি তাস সহ অন্য কোন রংয়ের বিবি বর্ত্তমানে শেষোক্ত রংয়ে ছ'টির ডাক দিয়ে দেখান যায় যদি ডাকটি স্থিরীকৃত রংয়ের বা ছ'টি নো-ট্রাম্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

ব্লাকউড নো-ট্রাম্প (Blackwood 4-5 No-Trump)

রং স্থিরীকৃত হবার পর কোনও জিজ্ঞাসার ডাকের পূর্ব্বে নো-ট্রা-৪ ডাক ব্লাকউড পর্য্যায়ের ; কিন্তু জিজ্ঞাসার ডাকের পর ঐরূপ ডাক ব্যবহৃত হয় স্থিরাকৃত রংয়ের উচ্চতাস জানবার উদ্দেশ্যে। ব্লাকউড নো-ট্রা-৪ ডাকে টেক্কার ও পরে নো-ট্রা-৫ ডাকে সাহেবের খবর নেবার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়। জবাব নিম্নরূপ :—

			নো-ট্রা-৪এর	নো-ট্রা-৫এর
(ক)	একটিও না থাকলে	...	চি-৫	চি-৬
(খ)	একটি থাকলে	...	রু-৫	রু-৬
(গ)	দুটি "	...	হ-৫	হ-৬
(ঘ)	তিনটি "	...	ই-৫	ই-৬

ব্ল্যাকউড নো-ট্রা-৪ ডাকটি জিজ্ঞাসার ডাকের সঙ্গে প্রয়োগ ক'রে অনেক সময়ে সুফল পাওয়া যায় ; তবে সব সময়ে স্মরণে রাখতে হ'বে যে এই ডাকটির প্রয়োগ হ'বে জিজ্ঞাসার ডাকের আগে এবং জিজ্ঞাসার ডাকের পরে নো-ট্রা-৪ বা নো-ট্রা-৫ ডাক প্রয়োগ হবে স্থিরাকৃত রংয়ের উঁচুতাস জানবার উদ্দেশ্যে হাতে চা'রটি টেক্কা থাকলেও নো-ট্রাম্প-৪এর জবাব হ'বে চি-৫ (পাঁচটি নো-ট্রাম্প নয়)। উদ্দেশ্য খেঁড়ীকে সাহেবের অবস্থিতির জিজ্ঞাসার সুযোগ দেওয়া। জবাব পাঁচটি নো-ট্রা এলে আর সাহেবের খবর নেওয়ার জায়গা থাকে না। অপরপক্ষে চি-৫ জবাব এলে নো-ট্রাম্প-৫ ডাক দিয়ে খেঁড়ী সাহেবের খবর নিতে সক্ষম হয়। চি-৫ জবাব 'একটি টেক্কাবিহীন' বা 'চার টেক্কা সমেত' এ খবর বোঝবার অসুবিধা হতে পারে বলে মনেই হয় না পরস্পর ডাক বিনিময়ের পর। টেক্কাবিহীন তাসে উদ্বোধনী ডাকের উপযুক্ত হ'লে খেঁড়ির কাছ থেকে কোনও রূপ জোরদার ডাক আশাই করা যেতে পারে না টেক্কাহীন তাসে। সুতরাং চি-৫ জবাব টেক্কাবিহীন বা চার টেক্কা সমেত বোঝবার কোনওরূপ গোলমাল হবার সম্ভাবনা খুবই সুদূরপরাহত।

রংয়ের জিজ্ঞাসার ডাক

কোন রংয়ের জিজ্ঞাসার ডাক ও জবাবের পর নো-ট্রা-৪ ডাকের প্রয়োগ হয় স্থিরীকৃত রংয়ের উচ্চতাস জানবার প্রয়োজনে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রংয়ের টে, সা, বি'র মধ্যে দুখানি থাকলে ছোট স্লাম (Small Slam) এবং তিনখানিই থাকলে বড় স্লাম (Grand Slam) অনিবার্য্য, সেই সকল ক্ষেত্রে এই নব উদ্ভাবিত ডাকের কার্য্যকারিতা প্রচুর। ঠিকভাবে এই ডাকের প্রয়োগের দ্বারা যেরূপ সুফল পাওয়া যায়, তা অপর কোনও প্রণালীতে সম্ভবপর নয় বলেই মনে হয়। অল্পডাকের মধ্যে এইরূপ অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহের উপায় উদ্ভাবন Culbertson সাহেবের শেষ জীবনের একটি চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। এইরূপ নো-ট্রা-৪ ডাকের জবাবগুলিও অতি সরল, যথা :—রংয়ের উক্ত তিনখানি ছবি তাসের অবর্ত্তমানে চি-৫, একখানি থাকলে রু-৫, দুখানিতে হ-৫ এবং তিনখানিই থাকলে হবে ই-৫।
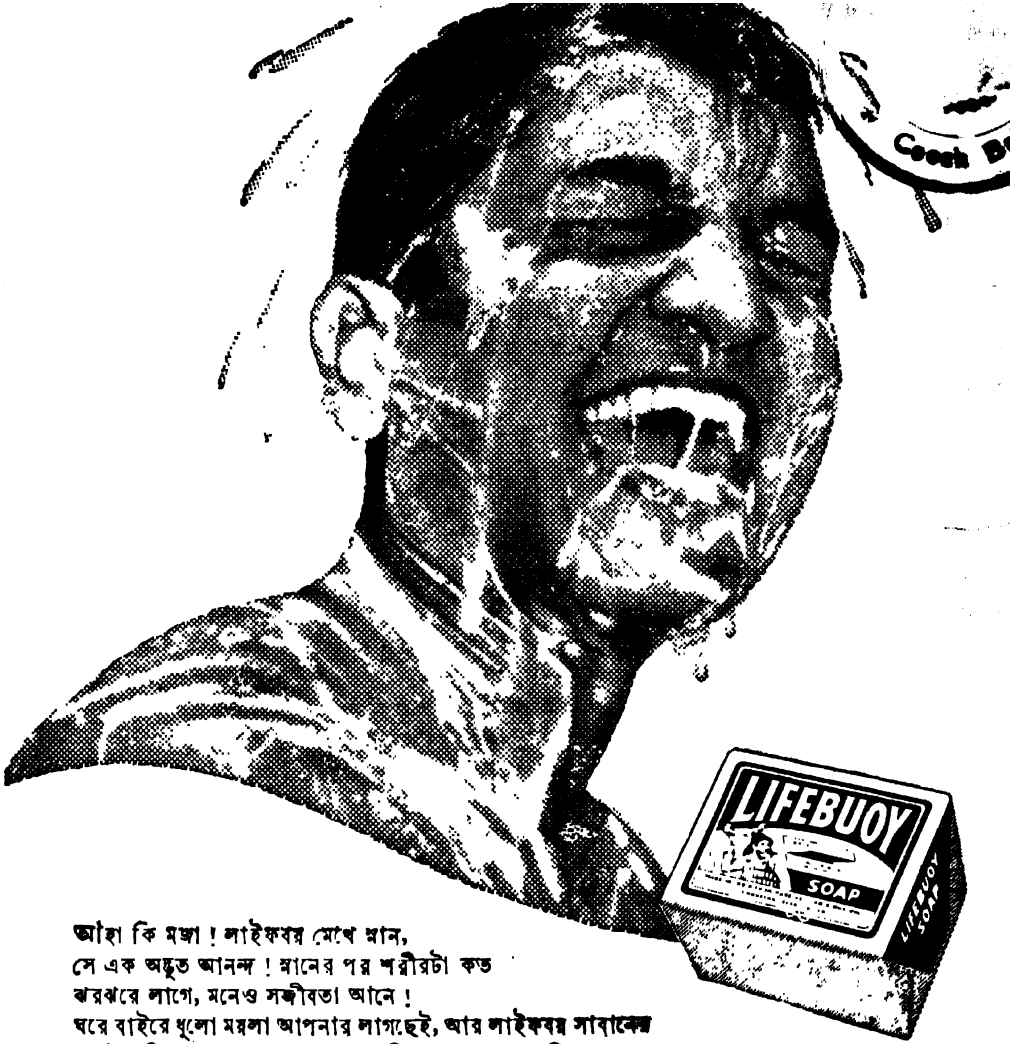
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP

উক্তরূপ রংয়ের উচ্চতাসের জিজ্ঞাসা ডাক ও জবাবের পর নো-ট্রাম্প-৫ ডাক হয় রংয়ের তাসের সংখ্যা জানবার উদ্দেশ্যে। জবাব ডাক হ'বে নিম্নরূপ :—

১। তিনখানি বা কম সংখ্যায় ...চি-৬
২। চারখানিতে ...রু-৬
৩। পাঁচ বা ছ'খানিতে ...হ-৬
৪। সাত বা বেশীতে ...ই-৬

বলা বাহুল্য যে ৪নং পরিস্থিতি সচরাচর ঘটে না।

মনে রাখা প্রয়োজন যে জিজ্ঞাসার ডাকের পর্যায়ে ডাক উঁচুতে উঠে গিয়ে সময়ে সময়ে রংয়ের ছবি তাস জানবার প্রয়োজনীয় নো-ট্রা-৪ ডাক দেবার অবকাশ থাকে না, তখন নো-ট্রা-৫ দিয়েও ঐ খবরটি জানা যায়। যেমন মনে করুন খেঁড়ী ডাক দিয়েছেন হ-১ এবং আপনার তাস নিম্নরূপ :—

ই-টে, বি, ৩
হ-টে, ১, ৭, ৫, ৩
রু-সা, বি, ৭
চি-৪, ২

আপনি প্রথমেই বুঝতে পারছেন যে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট তাস খেঁড়ীর হাতে থাকলে বড় স্লাম (Grand Slam) হ'তে পারে, গেমের প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং আপনি জিজ্ঞাসার ডাক দেন ই-৩ উত্তরে যদি খেঁড়ীর জবাব আসে নো-ট্রা-৩ তখন আপনার স্বাভাবিক উৎসাহ জাগে চি-সা বা দ্বিতীয় চক্রে রোখবার ক্ষমতা জানবার জন্ত এবং ডাক দেন চি-৪ (দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার ডাক)। এই ডাকের জবাবে নো-ট্রা-ডাক এলে তখন বড় স্লাম সম্পূর্ণ নির্ভর করে রংয়ের ছবি তাসের ওপর। সাহেব ও বিবি নিয়ে ডাক হ'লে সাতটি হরতনে খেলা করার কোনও ছিদ্র থাকে না এবং উক্ত ছবি তাসের একখানির অভাবে ছোট স্লামের খেলা নিশ্চিত। ঐ খবরটি জানবার উদ্দেশ্যে নো-ট্রা-৫ প্রয়োগ প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে রংয়ের উচ্চতাস জানবার প্রয়োজনে। জবাব হ'বে টে, সা, বি'র মধ্যে একখানিও না থাকলে চি-৬, একখানিতে রু-৬, দু'খানিতে হ-৬ এবং তিনখানিতে (এক্ষেত্রে সম্ভব নয় উক্ত ছবির মধ্যে একখানি আপনার হাতে থাকায়) ই-৬।

উদ্বোধনী দু'য়ের ডাকের পর জিজ্ঞাসার ডাক
(Asking Bids after "two" opening)

উদ্বোধনী দু'য়ের ডাকের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হ'য়েছে। সাধারণতঃ এই ডাক হওয়া উচিত এরূপ তাসে যে প্রায় একার শক্তিতেই গেম করা সম্ভব; যৎসামান্ত সাহায্য খেঁড়ীর কাছ থেকে পেলে স্লাম করাও অসম্ভব নয়। সুতরাং উক্তরূপ শক্তির অনুপাতে জিজ্ঞাসার ডাকের প্রয়োগ এবং জবাবের কিছুটা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। দু'য়ের ডাকের পর জিজ্ঞাসার ডাকের জবাবগুলি হ'বে নিম্নরূপ :—

১। জিজ্ঞাসার ডাকের সাহেব বা দ্বিতীয় চক্রে রোখবার তাসে ও কোনও টেক্কার অভাবে—

জবাব হ'বে—সমসংখ্যক নো-ট্রাম্প।

২। জিজ্ঞাস্য রংয়ের সাহেব ও কোনও টেক্কার অভাবে অথবা মাত্র একখানি তাস সহ কোনও টেক্কা বা ছুট বর্ত্তমানে—

জবাব হ'বে—যে রংয়ে টেক্কা বা ছুট বর্ত্তমান সেটিতে একটি বাড়িয়ে ডাক।

৩। জিজ্ঞাস্য রংয়ের সাহেব বা মাত্র একখানি তাস সহ অপর একখানি সাহেব বর্ত্তমানে—

জবাব হ'বে—অপর রংটিতে।

৪। জিজ্ঞাস্য রংয়ের সাহেব বা মাত্র একখানি তাস সহ স্থিরীকৃত রংয়ের সাহেব বা বিবি বর্ত্তমানে (একক নয়)—

জবাব হবে—রংয়ে একটি বাড়িয়ে ডাক

অর্থাৎ জবাবগুলি প্রায় একে উদ্বোধনী ডাকেরই অনুরূপ তফাৎ এই যে দু'য়ের ডাকের ক্ষেত্রে টেক্কা ও সাহেবের স্থান দখল করবে যথাক্রমে সাহেব ও বিবি।

একরূপভাবে প্রথম জিজ্ঞাসার ডাকে টেক্কা ও সাহেবের খবরের পর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার ডাক প্রযুক্ত হবে বিবি বা তৃতীয় চক্রে রোখবার তাসের জন্য। সুতরাং জিজ্ঞাস্য ডাকের বিবি বা তৃতীয় চক্রে রোখবার ক্ষমতা সহ অন্য একখানি বিবি বর্ত্তমানে শেষোক্ত বিবিটি দেখাবার উদ্দেশ্যে উক্ত রংয়ের ডাক হবে। যদি ডাকটি স্থিরীকৃত রংয়ের মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যের হয়।

টেক্কা সাহেব ও বিবি সম্বন্ধে খবর নেবার পরও জিজ্ঞাসার ডাক দেওয়া চলে গোলামের খবর নেবার উদ্দেশ্যে যদি দু'য়ের ডাকের মধ্যে সম্ভবপর হয়। জবাব হ'বে বিবির জিজ্ঞাসার জবাবের অনুরূপ।

বি-দ্র :—উপরোক্ত রংয়ে একটি বাড়িয়ে ডাকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য যে ডাকটি দু'য়ের ডাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে যতদূর সম্ভব নচেৎ সময়ে সময়ে বিপদে পড়তে হয়। জিজ্ঞাসা ডাক দেবার সময়ে এ বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা কর্ত্তব্য।

বিশেষ ধরণের জিজ্ঞাসার ডাক (Special modes of Asking Bids)

নিয়মিত জিজ্ঞাসার ডাক ছাড়াও কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর জিজ্ঞাসার ডাক প্রয়োজন হয় মাঝে মাঝে। সেগুলি সুচিন্তিত ভাবে ও ঠিকমত প্রয়োগে আকাঙ্খিত সুফল পাওয়া যায়।

(ক) বিপক্ষদলের ডাকে জিজ্ঞাসার ডাক।

বিপক্ষদলের ডাকে জিজ্ঞাসার ডাক দু' রকম অবস্থায় করা চলে—(১) খেঁড়ীর উদ্বোধনী ডাকের পর বিপক্ষদলের ডাকের উপর এবং (২) কেবলমাত্র বিপক্ষদলের ডাকের উপর। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রয়োগের অবকাশ খুব কমই ঘটে কিন্তু যখন এরূপ সুযোগ আসে তখন এই জিজ্ঞাসার ডাকের প্রয়োগে নির্দ্দিষ্ট তাসের খবর অতি সহজেই পাওয়া সম্ভব। প্রথমে খেঁড়ীর উদ্বোধনী ডাকের পর বিপক্ষদলের ডাকে জিজ্ঞাসার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

স্মরণে রাখতে হবে যে বিপক্ষদলের ডাকের পর উক্ত রংয়েই একটি বাড়িয়ে ডাক দিলে সেই রংয়ে প্রথম চক্রে রোখবার ক্ষমতা প্রকাশ করা হয় এবং দুটি বাড়িয়ে ডাক প্রথম জিজ্ঞাসার ডাক বোঝায়। দুটিতেই খেঁড়ীর ডাকে বিশেষ সাহায্যকারী তাসসহ নিশ্চিত গেমের সম্ভাবনা, এমন কি দ্বিতীয় প্রকারের ডাকের উপযুক্ত জবাবের উপর স্লাম নির্ভরশীল। যেমন,—

উ	পূ	দ
হ-১	ই-১	ই-২
হ-১	রু-২	রু-৩

দক্ষিণের ই-২ ও রু-৩ উক্ত রংয়ে প্রথম চক্রে রোখবার ক্ষমতাসহ হরতনে বিশেষ সাহায্য বোঝায়।

উ	পূ	দ
হ-১	ই-১	ই-৩ ?
হ-১	রু-২	রু-৪ ?

দক্ষিণের উভয় ডাকই একটি করে বাড়িয়ে করা হয়েছে সুতরাং ঐগুলি জিজ্ঞাসার ডাক।

মনে করুন দক্ষিণের তাস নিম্নরূপ এবং উত্তরের খেলোয়াড়ের হ-১ ডাকের উপর বিপক্ষদল ডাক দিয়েছেন ই-১ :—

১নং	২নং	৩নং
ই-টে, ২	ই-৭, ২	ই-৭, ২
হ-সা, বি, ৫, ২	হ-সা, বি, ৫, ২	হ-বি, ১, ৫, ২
রু-সা, ৫, ৩	রু-টে, ৫	রু-টে, ১০
চি-সা, বি, ১০, ৬	চি-টে সা, বি, ১০, ৬	চি-টে, সা, ১০, ৬, ২

১নং তাসে উচ্চশক্তি যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও উদ্বোধনকারীর অতিরিক্ত শক্তি না থাকলে স্লাম হওয়া শক্ত কিন্তু গেম সুনিশ্চিত সুতরাং ডাক হ'বে ই-২। ২নং তাসে গেমের সম্বন্ধে প্রশ্নই ওঠে না বরঞ্চ স্লাম নির্ভর করে ইস্কাবনে প্রথম বা দ্বিতীয় চক্রে রোখবার ক্ষমতার ওপর সুতরাং ডাক হবে ই-৩ (জিজ্ঞাসার)। ৩নং তাসে উচ্চশক্তিতে সমৃদ্ধ এবং গেম সুনিশ্চিত সুতরাং ডাক হ'বে হ-৩ (গেমে উৎসাহদানকারী)। উদ্বোধনকারীর ইস্কাবন রংয়ে রোখবার ক্ষমতাসহ বাড়তি শক্তি বর্ত্তমানে স্লামে চেষ্টা করবেন।

শুধু বিপক্ষদলের ডাকের ওপরও ঐরূপ ডাক প্রয়োগ করা চলে কিন্তু প্রয়োজন হয় পিঠ জয়ের অত্যধিক বেশী শক্তির। এক্ষেত্রেও একটি বাড়িয়ে ডাক প্রথমচক্রে রোখবার ক্ষমতা সহ খেঁড়ীকে বাধ্যতামূলক ভাবে কোনও রংয়ে ডাক দেবার আহ্বান জানানো হয়। ডাক আহ্বানকারী ডবলের চেয়েও এ ডাকটি বেশী আক্রমণাত্মক। ডাক আহ্বানকারী ডবলে খেঁড়ী পাছে ছেড়ে দেয় খেসারৎ আদায়ের উদ্দেশ্যে সেই অবস্থাটি বাঁচাবার জন্য এই ডাকের প্রয়োজন। নীচের যে কোনও তাসে ঐরূপ একটি বাড়িয়ে ডাক দেওয়া চলে বিপক্ষদলের রু-১ ডাকের পর :—

১নং	২নং
ই—টে, সা, ১০, ৫	ই—সা, বি, ১০, ৫
হ—সা, বি, ১০, ৩	হ—টে, বি, ৭, ৩
রু— ×	রু— ×
চি—টে, বি, ৯, ৮ ২	চি—সা, বি, গো, ৮, ২

৩নং

ই—টে, সা, গো, ৫
হ—সা, বি, ১০, ৩
রু— ৪
চি—টে, বি, গো, ৮

১ ও ২ নং তাসে রুহিতন একখানিও নেই এবং খেঁড়ী রুহিতন ছাড়া যে কোনও রংয়ে ডাক দিক না কেন সেই রংয়েরই বিশেষ সাহায্যকারী তাস বর্ত্তমান এবং পিঠ জয় করবার ক্ষমতাও প্রচুর। ৩নং তাসে একখানি রুহিতন আছে তৎসত্ত্বেও বিভাগত ও উচ্চতাসে এত সমৃদ্ধ যে ঐরূপ একটি বাড়িয়ে ডাক এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

(খ) জিজ্ঞাসাকারীর হাতে কোন রংয়ে ছুট থাকলে জানাবার উপায় (Aviding a duplication)

সময়ে সময়ে এরূপ তাস এসে পড়ে জিজ্ঞাসাকারীর হাতে যে সে নিজে কোনও একটি রংয়ে ছুট (void)। ঐ রংটি বাদে অপর দুটি টেক্কা খেঁড়ীর কাছে আছে জানতে পারলে ছয়ের বা সাতের খেলা করা সম্ভব। এইরূপ পরিস্থিতিতে জিজ্ঞাসার ডাকের জবাবের পর জিজ্ঞাসাকারী একটি বাড়িয়ে কোন নূতন রংয়ে ডাক দিলে বুঝতে হবে তিনি সেই রংয়ে ছুট। উক্ত রংয়ের টেক্কাটি বিশেষ কোনও সাহায্যকারী হবে না বিবেচনায় খেঁড়ী দুটি টেক্কা হাতে থাকা সত্ত্বেও স্থিরীকৃত রংয়ের ডাকে ফিরিয়ে দেবেন (Sign off) আর অগ্রসর না হ'য়ে কিন্তু টেক্কা দুটি উক্ত রং বাদে অপর রংয়ের হ'লে জবাব হবে সমসংখ্যক নো-ট্রাম্প। এই ডাক পাবার পর জিজ্ঞাসাকারী স্থির করবেন তার শেষ বা পরবর্ত্তী ডাক। যেমন—

১নং তাস		২নং তাস	
উ	দ	উ	দ
চি-১	হ-১	হ-১	হ-৩
ই-৩ ?	নো-ট্রা-৩	রু ৪ ?	নো-ট্রা ৪
রু—৫ (ক)		চি—৬ (খ)	

১নং তাসে জিজ্ঞাসার ডাকের নো-ট্রা-৩ জবাবে দক্ষিণের খেলোয়াড় দুটি টেক্কা জানাবার পর উত্তরের খেলোয়াড়ের রু-৫ (ক চিহ্নিত) ডাকটি রুহিতনে ছুট জানাবার উদ্দেশ্যে। উত্তরের খেলোয়াড়ের নিকট রুহিতনের টেক্কা সমেত দুখানি টেক্কা থাকলে তিনি হ-৫ ডাকবেন নচেৎ তাঁর ডাক হবে নো-ট্রা-৫। অনুরূপ ভাবে ২নং তাসে চি ৬ ডাকের পর (খ চিহ্নিত) দক্ষিণের খেলোয়াড় উক্ত রংয়ের টেক্কা সহ অপর টেক্কা থাকলে হ-৬ ডাক দেবেন এবং চিড়িতন ছাড়া অপর দুটি টেক্কা থাকলে ডাক দেবেন নো-ট্রা-৬।

(গ) অনুমানসিদ্ধ জবাব (Inferential Response)

আবার কোনও কোনও সময়ে এরকম তাসও এসে পড়ে যাতে কেবল মাত্র দুটি বা তিনটি সাহেব খেঁড়ীর কাছে আছে জানতে পারলে স্লামের খেলা করা খুবই সহজ। কিন্তু প্রচলিত নিয়মানুসারে টেক্কার অভাবে জিজ্ঞাসার ডাকের দ্বারা ঐ খবরটি সংগ্রহ করা যায় না। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় সামান্য পরিবর্ত্তন এবং এই পরিবর্ত্তন প্রয়োগ করা চলে কেবল মাত্র খেঁড়ী চিন্তাশীল ও সুদক্ষ হলে। যেমন মনে করুন আপনি উদ্বোধন করেছেন চি-১। বিপক্ষদল তার ওপরে রু-১ ডাক দিলে খেঁড়ী ডাকেন হ-১ এবং আপনার তাস নিম্নরূপ :—

ই—টে, বি, ৭
হ—সা, গো, ৪, ৩
রু— ×
চি—টে, সা, বি, ৬, ৫, ২

তখন আপনার পক্ষে স্লামের আশা করা খুবই সঙ্গত। খেঁড়ীর কাছে ইস্কাবনের সাহেব ও বিবি বড় হরতন পাঁচখানি থাকলেই ছোট স্লাম করায়ত্ত এবং টে, বি সহ পাঁচখানি হ'লে বড় স্লামও সুনিশ্চিত। টেক্কাটি না থাকলে কোনও জিজ্ঞাসার ডাকের জবাব পাওয়ায় আশা নেই এরূপ চিন্তা করে প্রাথমিক (Preparatory) জিজ্ঞাসার ডাক দেওয়া উচিৎ রু ৩ (উক্ত রংয়ে ছুট থাকা সত্ত্বেও)।

ডাকটি হ'বে নিম্নরূপ :—

	উ	পূ	দ
১ম চক্র ···	চি-১	রু-১	হ-১
২য় „ ···	রু-৩ ?	পাস	হ-৩

মন্তব্য

ধরে নেওয়া হ'য়েছে যে দক্ষিণের হাতে কোনও টেক্কা নেই। এটি প্রাথমিক জিজ্ঞাসার ডাক ও জবাব।

	উ	পূ	দ
৩য় চক্র ···	ই-৩ ??	পাস	?

মন্তব্য—

এটি দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার ডাক। দক্ষিণের হাত কোনও টেক্কা না থাকা সত্ত্বেও উত্তরের ডাকটি উদ্বোধনী দুয়ের পর্য্যায়ের ডাক অনুমান ক'রে জবাব হ'বে। কেবল ই-সা-৩ জবাব হবে নো-ট্রা-৩ এবং উক্ত সাহেব সহ হ-টে থাকলে জবাব হবে হ-৫। ই-সা এর অবর্ত্তমানে স্থিরীকৃত রংয়ে অর্থাৎ হ-৪ ডাক হবে।

(ঘ) প্রথমে পাসের পর জিজ্ঞাসার ডাক।

কয়েকটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জিজ্ঞাসার ডাকের ধারার সামান্ত রদবদলে বিশেষ সুফলই পাওয়া যায় এবং খেঁড়ী চিন্তাশীল হ'লে কোনওরূপ ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা খুবই কম। যেমন মনে করুন তাস পেয়েছেন নিম্নরূপ নিজে বণ্টন করে।—

ই-সা, ১০, ৭, ৫, ২
হ-৬, ৪, ৩, ২
রু-টে, ৩
চি-সা, ৮

হাতটিতে পিঠ জয়ের ক্ষমতা কম ও উচ্চতাসমূল্য মাত্র ১০ পয়েণ্ট থাকায় আপনি স্বাভাবিকতঃ পাস দেবেন। দ্বিতীয় খেলোয়াড়ও পাস দেবার পর আপনার খেঁড়ী ডাক দিলেন ই-১ এবং আপনার দক্ষিণে অবস্থিত খেলোয়াড়রা ডাক দিলেন হ-২। ডাক পাবার পর তাসটিতে গেমের প্রশ্ন ত ওঠেই না বরঞ্চ হরতনের দ্বিতীয় চক্রে রোখবার ক্ষমতা সহ ই-টে, বি রু-সা, ও চি-টে থাকলে ছোট শ্লাম নিশ্চিত আর এরূপ আশা করা খুব অসঙ্গতও নয়। প্রথমে পাস দেওয়ার পর ই-৩ ডাকে শুধু গেমে উৎসাহিত করা চলে কিন্তু তাসটি যে এরূপ সম্ভাবনাময় বোঝান যায় না। সুতরাং জিজ্ঞাসার দায়িত্ব খেঁড়ীর ওপর না ফেলে আপনার নিজেরই নেওয়া কর্ত্তব্য। এখন বিবেচনার বিষয় কিরূপভাবে জিজ্ঞাসার ডাকের প্রয়োগে সবগুলি প্রয়োজনীয় তাসের অবস্থিতি সম্বন্ধে খবর নেওয়া যায়। প্রথমে জানা দরকার হরতনে রোখবার ক্ষমতা আছে কিনা? এ খবরটি জানবার দরুণ নিয়ম মাফিক ডাক হওয়া উচিৎ হ-৪ (অর্থাৎ প্রয়োজন অপেক্ষা একটি বাড়িয়ে) কিন্তু ডাক তাতে এত উঁচুতে উঠে যায় যে পরে রু-সা ও ই-টে, বি'র খবর নেবার আর জায়গা থাকে না। সুতরাং একবার পাস দেবার পর বিপক্ষদলের ডাক প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি না বাড়িয়ে শুধু ঠিক ওপরের ডাক জিজ্ঞাসার ডাক হিসেবে গণ্য করতে আপত্তি বা অসুবিধা কোথায়? অনেকে হয়ত' বলতে পারেন যে সে সময়ে হরতনে প্রথম চক্রে রোখবার তাস থাকলে কি হবে বা পার্থক্য বোঝা যাবে কি করে? এর উত্তরে বলতে চাই যে সেরূপ ক্ষেত্রে অন্য রংয়ে জিজ্ঞাসার ডাক দিয়ে জবাব পাবার পর একটি বাড়িয়ে হরতন ডাক দিয়ে ছুট দেখান যেতে পারে। উপরোক্ত তাসে নিম্নোক্ত রূপ ডাক দিলে সব খবর পাওয়া যেতে পারে :—

উ	পূ	দ	প
পাস	পাস	ই-১	হ-২
হ-৩ (ক)	পাস	নো-ট্রা-৩ (খ)	পাস
রু-৪ (গ)	পাস	হ-৪ (ঘ)	পাস
নো-ট্রা-৪ (ঙ)	পাস	হ-৫ (চ)	পাস

(ক) ও (খ) প্রথম জিজ্ঞাসার ডাক ও জবাব যথা হরতনের দ্বিতীয় চক্রে রোখবার তাস সহ দুটি টেক্কা বা হরতনের টেক্কা বা অপর একটি টেক্কা।

(গ) দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার ডাক।

(ঘ) জবাব যথা রুহিতনে দ্বিতীয় চক্রে রোখবার তাস সহ হরতনে প্রথম চক্রে রোখবার ক্ষমতা।

(ঙ) রংয়ের উচ্চতাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা।

(চ) টে, সা, বি'র মধ্যে দুটি বর্ত্তমান।

প্রথম জিজ্ঞাসার জবাব থেকে উত্তরের খেলোয়াড় জানতে পারেন দক্ষিণের খেলোয়াড়ের নিকট হরতনে দ্বিতীয় চক্রে রোখবার ক্ষমতাসহ দুটি টেক্কা বা হরতনের টেক্কা সহ অপর একখানি টেক্কা বর্ত্তমান। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার উত্তরে বোঝা যায় যে রুহিতনের দ্বিতীয় চক্রে রোখবার তাস বর্ত্তমান এবং হরতন একখানিও নেই। পরে নো-ট্রা ৪এর উত্তরে যখন বুঝতে পারা যায় যে ইস্কাবনের টে ও বিবি দুইই বর্ত্তমান তখন নো-ট্রা-৫ ডেকে কখানি রং জেনে ৬টি বা ৭টির ডাক দিতে কোনও অসুবিধা হয় না উত্তরের খেলোয়াড়ের পক্ষে।

(ঙ) উদ্বোধনী রংয়ের দুয়ের ডাকে খেঁড়ীর বিশেষ ধরণের জবাব (Special type of response to opening Two-bids in a suit)

আগেই বলা হ'য়েছে যে উদ্বোধনী দু'য়ের ডাক বাধ্যতামূলক গেমের ডাক এবং খেঁড়ী ঐ রূপ ডাক বাঁচিয়ে রাখতে ন্যায়তঃ বাধ্য। নো-ট্রা-৩ ডাক দিতে গেলে প্রয়োজন ন্যূনপক্ষে ১½ ট্রিক। পিঠ জয়ে সাহায্যকারী তাসে ১ ট্রিক অথবা কোনও রংয়ে মাত্র একখানি তাস সহ তিনখানি রং বা কোন রংয়ে মাত্র দু খানি তাস সহ চার খানি রংয়ে ডাকটিকে তিনে তোলা চলে। কিন্তু উঁচু দরের (ইস্কাবন বা হরতন) রংয়ে দুয়ের ডাক প্রথম চক্রেই চারে তুলে দেওয়া চলে কয়েকটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে যেমন গোলাম বড় চারখানি বা ছোট পাঁচখানি রং ও অন্য রংয়ে একখানি বিবি বা মাত্র দু খানি তাস বর্ত্তমানে। এই রূপ একটি ডাকেই খেঁড়ীকে সাবধান করা যায় যে "খেঁড়ী কয়েক খানি রংয়ের তাস পৌছেছে হাতে এবং কোনও রূপ দ্বিতীয় চক্রের রোখবার তাস নেই। সুতরাং জিজ্ঞাসা করতে হ'লে তৃতীয় চক্রে রোখবার তাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পার এবং বিপক্ষদলের ডাকে ডবল দিলেও উক্ত রংয়ের বিভাগের বিষয় চিন্তা ক'রে দিও।" এই রূপ ডাকের পরও উদ্বোধনকারী নূতন রংয়ে চারে বা পাঁচে জিজ্ঞাসার ডাক দিলে বুঝতে হবে যে তিনি উভয় রংয়ে তৃতীয় চক্রের রোখবার তাস জানতে আগ্রহশীল। সুতরাং জবাব দিতে হবে সেই অনুসারে।

উপরোক্ত (ঘ) ও (ঙ) পদ্ধতি দুটি কার্য্য ক্ষেত্রে ব্যবহার ক'রে অনেক সময়ে সুফল পাওয়া সম্ভব হ'য়েছে। এর গুণাগুণ বিচারের ভার পাঠক পাঠিকার ওপর দিয়ে তাঁদের অভিমত জানতে ইচ্ছুক রইলাম।

[ক্রমশঃ।

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বই

রবি-বাসরে রবীন্দ্রনাথ

'রবি-বাসর' বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত সাহিত্য সভা। দীর্ঘ বত্রিশ বৎসর কাল ইহা সগৌরবে চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ রবি-বাসরের অধিনায়ক ছিলেন, রায় জলধর সেনবাহাদুর ছিলেন প্রথম বাধ্যক্ষ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলাদেশের খ্যাতনামা প্রায় সকল সাহিত্যিকই কোন-না কোন সময়ে রবি-বাসরের সদস্য ছিলেন। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত সাহিত্য সভাটির ইতিহাসও বিশেষ মূল্যবান, তার উপর, রবি-বাসরে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে যে সব ভাষণ দিয়াছেন তাহাও যে সংকলনযোগ্য তাহা বলাই বাহুল্য। সন্তোষকুমার দে বহু চেষ্টা, শ্রম ও অধ্যবসায়ে এই প্রয়োজনীয় দুরূহ কার্যটি সিদ্ধ করিয়া সাহিত্যরসিক ও রবীন্দ্রানুরাগীদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এ জন্য তাঁহাকে অনেক পুরাতন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র ঘাঁটিতে হইয়াছে এবং অনেক ব্যক্তির সহায়তা লইতে হইয়াছে।

আকারে ক্ষুদ্র হইলেও 'রবি-বাসরে রবীন্দ্রনাথ' একখানি মূল্যবান গ্রন্থ, ইহাতে কবি যে সব সাহিত্য সভার সহিত আশৈশব যুক্ত ছিলেন তাহার উল্লেখ খুবই প্রাসঙ্গিক হইয়াছে। ইহাতে 'রবি-বাসর' প্রতিষ্ঠানটির সচিত্র ইতিহাসও আছে; আর আছে কবিগুরুর প্রদত্ত ভাষণগুলি। কবি যে যে অধিবেশনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ,—শান্তিনিকেতনে কবির আহ্বানে অনুষ্ঠিত রবি-বাসরের অধিবেশনে গৃহীত গ্রুপ ফটোটি এবং প্রচ্ছদ চিত্রে রবি-বাসরে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও জলধর সেনের একত্রে গৃহীত ঐতিহাসিক চিত্রও বিশেষ মূল্যবান। পরিশিষ্টে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক মোহনলাল মিত্র এবং নরেন্দ্রনাথ বসুর রবি-বাসরে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে আলোচনা এবং কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার দুটি কবিতা এবং সন্তোষকুমার দে রচিত দুটি শতবার্ষিকী সঙ্গীত স্থান পাইয়াছে।—সন্তোষকুমার দে। বিচিত্রা প্রকাশনী, ৫১ কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—১৲

মহামানবের সাগরতীরে

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটির বৈশিষ্ট্য এই যে এতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে কটি রচনা সংগৃহীত হয়েছে, তার সবগুলিই বিদেশীর রচনা, রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলা তথা বাঙ্গালীর পরম ঐশ্বর্য্য হলেও তাঁকে যে দেশ-কালের গণ্ডীতে ধরে রাখা যায় না, তিনি যে সমগ্র বিশ্বের, এই সত্যটাই যেন নতুন করে চোখে পড়ে এই ধরণের গ্রন্থের মাধ্যমে। প্রত্যেকটি অবাঙ্গালী লেখক বাঙ্গলা ভাষারই মাধ্যমে কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়েছেন; তাঁদের এই প্রয়াস সাহিত্যের মাপকাঠিতে হয়ত বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে এর আবেদন শুধু অমূল্যই নয় অসাধারণ, বিশ্ব-সভার দরবারে রবীন্দ্রনাথ যে আসন অধিকার করে আছেন তা যে কত উচ্চ কত মহৎ, এই পরম সত্যটিকেই আমরা যেন আবার আবিষ্কার করি, যখন দেখি বিদেশীর চোখে, বিদেশীর মননে, বিদেশীর প্রাণে, আমাদের কবি কি পরিমাণ সাক্ষর এঁকে দিয়েছেন। রচনাগুলির মধ্যে কয়েকটি ভাবগম্ভীর, সুলিখিত, কয়েকটি একেবারে শিক্ষানবীশের অপরিণত হাতের পরিচয়বাহী, কিন্তু এক জায়গায় এরা এক ও অখণ্ড সে হল এগুলির প্রাণসত্তা, সব নদীই যেমন সাগর সঙ্গমের অভিলাষী, আলোচ্য প্রবন্ধগুলিও তেমনি একই রবীন্দ্র সঙ্গমের অভিলাষী, বিশ্বকবির প্রতি অপার ও অপরিমেয় শ্রদ্ধার উপচার বহন করাই এদের উদ্দেশ্য, আর সে উদ্দেশ্য তারা যথাযথ ভাবেই সাধিত করেছে। আমরা এই সংকলনটি পড়ে আনন্দ পেয়েছি ও এর বহুল প্রচার কামনা করি। ছাপা বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মোটামুটি। সম্পাদক—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, প্রকাশক—নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি, ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০, মূল্য—চারি টাকা।

শেক্‌স্‌পীয়র

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি জীবনীমূলক প্রবন্ধ পুস্তক। জগদ্বরেণ্য সাহিত্যসাধক শেক্‌স্‌পীয়রের জীবন ও কর্মধারার এক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন লেখক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে। শেক্‌স্‌পীয়রের সাহিত্য-কর্মকে উপলব্ধিগোচর করতে হলে, তার সামগ্রিক মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হলে এ ধরণের একটি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক শুধু শেক্‌স্‌পীয়রের জীবনকেই চিত্রিত করেন নি, পরন্তু তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবধারার এক বিশদ পরিচয় বিবৃত করে, সমগ্র শেক্‌স্‌পীয়রীয় সাহিত্যের পার্সপেক্টিভ বা পটভূমিটিকেও এঁকেছেন সুদক্ষ তুলিতে। বস্তুতঃ এই পটভূমিকে বিস্তৃত করে না দেখালে শেক্‌স্‌পীয়রের সুবিখ্যাত নাটকগুলিকে সম্যকরূপে বোঝা যায় না, তাদের সঠিক মূল্যায়ন করাও ঠিক সম্ভবপর হয় না। শেক্‌স্‌পীয়রের সমগ্র সাহিত্য-কর্মকে সুন্দরভাবে, শ্রেণীবদ্ধ করে সেগুলি সম্বন্ধে এক সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক পরিচয় দিয়েছেন লেখক। সরস ও বিরস এই উভয়বিধ নাটকই আলোচিত হয়েছে মননশীল প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে। বইটি মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করলে অনায়াসেই শেক্‌স্‌পীয়র ও তাঁর সাহিত্য-কর্ম সম্বন্ধে এক স্বচ্ছ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে পাঠকমনে, আর সেটাই লেখকের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব। বলা বাহুল্য মাত্র যে, প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থটি এক উল্লেখ্য সংযোজন। আমরা বইটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ শোভন, অঙ্গসজ্জা, ছাপা ও বাঁধাই

পরিচ্ছন্ন। লেখক—স্বৰি দাস, প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা—১২, মূল্য—আট টাকা।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

দুশো বছরের পরাধীনতার পর ভারত আজ স্বাধীন, কিন্তু এই স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য যে সব মহাপ্রাণ ত্যাগের হোমানলে একদিন নিজের বলতে সব কিছুই বিসর্জন দিয়ে গিয়েছেন, আজ তাঁদের কজনকেই বা আমরা স্মরণ করে থাকি? বর্ত্তমান গ্রন্থে এই সব বরেণ্য মানুষদেরই অন্যতম ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন ও কর্ম্মধারার এক বিশদ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অগ্নিযুগের প্রায় গোড়ার দিকে এঁর আবির্ভাব ঘটে, বৈধ আন্দোলনে যখন কোন ফল দেখা দিল না, বঙ্গ বিচ্ছেদের বিষময় প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র দেশের পরিস্থিতি যখন মথিত বিপর্য্যস্ত সেই সময় এই তেজস্বী নিষ্ঠাবান নির্ভীক মহাপুরুষ এগিয়ে আসেন প্রতিবাদ করতে। স্বহস্তে সম্পাদিত সন্ধ্যা কাগজের মাধ্যমে উদ্দীপনা সঞ্চার করে দেন সমস্ত দেশের মর্মমূলে। উপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন ও কর্মধারার এক ধারাবাহিক ও সুষ্ঠু পরিচয় বিবৃত করা হয়েছে আলোচ্য পুস্তকে, এত নিষ্ঠাভরে গ্রন্থকারদ্বয় এই কার্য্য সম্পাদন করেছেন যে বইটিকে স্বচ্ছন্দেই প্রামাণ্য বলে পরিগণিত করা যায়, সেই সঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য্য যে স্বদেশী আন্দোলনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যুগের অন্যতম মূল্যবান দলিল হিসাবেও এর এক স্বতন্ত্র মর্য্যাদা আছে। বইখানির অঙ্গসজ্জা যথযথ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক ও লেখিকা—হরিদাস মুখোপাধ্যায়, উমা মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—কে, এল মুখোপাধ্যায়, ৬।১-এ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা—১২। মূল্য—সাত টাকা।

অন্তরালের শিশিরকুমার

আলোচ্য গ্রন্থখানি জীবনীমূলক রম্যরচনার শ্রেণীভুক্ত। নটশ্রেষ্ঠ শিশিরকুমারের নাম বাঙ্গালী মাত্রেরই সুপরিচিত। অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের সুযোগে তাঁকে কিছুটা জানবার, কিছুটা বোঝবার যে সুযোগ লেখক পেয়েছিলেন, কালি-কলমের মিতালিতে সেটাই তিনি তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। নট শিশিরকুমার, বিদগ্ধ শিশিরকুমার ও ব্যক্তি শিশিরকুমার এই ত্রিবিধ সত্তারই একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা পাওয়া যায় রচনাটির মাধ্যমে, বিশেষ করে শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিমানসের অনেকটাই যেন ধরা দেয় পাঠকের মনের চোখে। মানুষ শিশিরকুমার ঠিক কেমন ছিলেন সেটা যেন অনেকটাই উপলব্ধিগোচর হয় পড়তে পড়তে। অযথা ভাবালুতায় আক্রান্ত হননি গ্রন্থকার কোথাও। শিশিরকুমারকে তিনি দোষে-গুণে গড়া মানুষরূপেই দেখেছেন ও দেখিয়েছেন আগাগোড়া; আর প্রধানত: সেজন্যই তাঁর রচনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া সহজ হয়ে উঠেছে এত। যে পরস্পর-বিরোধী ভাবধারায় শিশির-চরিত্র অনুপ্রাণিত ছিল, তার মূল সুরটি ধরতে সক্ষম হয়েছেন লেখক আর সেজন্যই মানুষ শিশিরকুমারকে তিনি উজ্জ্বল রেখায়ই উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং সেটাই অন্তরালের শিশিরকুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। লেখকের ভাষা সহজ ও সাবলীল, যা কাহিনীটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করে তুলেছে। স্বর্গত নটগুরুর দুটি সুন্দর প্রতিকৃতি গ্রন্থটিকে আরও মূল্যবান করেছে। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—তারাকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—ইষ্টলাইট বুক হাউস, ২০, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১। মূল্য—চার টাকা।

সেকালের বুখারায়

বর্ত্তমানে বৈদেশিক সাহিত্যের অনুবাদ হয়ে চলেছে প্রবলবেগে, অনুবাদ-সাহিত্য বাংলায় তাই আজ ক্রমেই পুষ্টিলাভ করছে, আলোচ্য গ্রন্থখানিও সেই শ্রেণীভুক্ত হওয়ার দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সেকালের বুখারার সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবন কেমন ছিল আলোচ্য গ্রন্থে তারই সন্ধান মিলবে। উত্তমপুরুষে বর্ণিত কাহিনীটি আগাগোড়াই কৌতূহলোদ্দীপক, বিশেষত: এক বিশেষ মুসলমান সম্প্রদায়ের পৌরাণিক রীতিনীতি আদব-কায়দার এমন নিপুণ বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে সেগুলি ছবির মতই ভেসে ওঠে পাঠকের চোখের সামনে। এক বিদ্রোহী মনুষ্যত্বের সুরও বাজে তারই মধ্যে, সেকালের অর্থহীন বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখকের বলিষ্ঠ প্রতিবাদও ধ্বনিত হয় কাহিনীর ছত্রে ছত্রে নায়কের জবানীতে। রুশ ভাষায় লিখিত মূল পুস্তকটি অনুবাদ করেছেন বিনয় মজুমদার, তাঁর ভাষারীতি স্বচ্ছন্দ ও ভাবগ্রাহী, বইটি পড়তে পড়তে কোথাও আড়ষ্ট ঠেকে না, সুতরাং বর্ত্তমান অনুবাদ কর্মটিকে অনায়াসেই রসোত্তীর্ণ এই আখ্যা দেওয়া যায়। বইটির প্রচ্ছদ বিষয়ানুগ, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—সদরুদ্দীন আইনী, প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

মুখের ভাষা বুকের রুধির

বহু বৎসরের প্রত্যাশার পর ভারত স্বাধীনতা লাভ করল, বৈদেশিক শাসনের গ্লানিমুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করল ভারতের স্বাধীনতা সূর্য, সে আজ প্রায় বারো-তের বৎসরের কথা। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগব্যাপী স্বাধীন ভারতের ইতিহাস কি শুধুই গৌরবের, শুধুই সাফল্যের? আমরা বাঙ্গালী, খণ্ডিত রুদ্ধশ্বাস বাঙ্গালী জাতি, অন্তত: এই কথাটাকে একবাক্যে স্বীকার করে নিতে পারব না। স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ বলার আগে অন্তত: একবার স্মরণ করব সাম্প্রতিক ভাষা আন্দোলনে আমাদের জাতীয় সরকারের কীর্তিকলাপ, আসামের বুকে যা ঘটে গেছে মাত্র কিছুকাল আগেই। বাংলাভাষী কাছাড় জেলায় সংঘবদ্ধ হয়ে সেদিন দাঁড়িয়েছিল একদল মানুষ মাতৃভাষাকে রক্ষা করার জন্য, অদম্য মনোবল ও সুদৃঢ় প্রত্যয়ই ছিল যাদের নিরস্ত্র সত্যাগ্রহ সংগ্রামের একমাত্র হাতিয়ার, যা দিয়ে তারা লড়েছিল পশুশক্তির বিরুদ্ধে, দলে দলে প্রাণ দিয়েছিল, কিন্তু পণ দেয়নি। আলোচ্য গ্রন্থ এই মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামেরই প্রামাণ্য দলিল। লেখক জাত-সাংবাদিক, কাছাড় আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই তিনি অকুস্থলে পৌঁছান সাংবাদিক হিসাবেই। নিজের চোখে তিনি যা দেখেছেন, যে সব বিবরণ সংগ্রহ করেছেন স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে, তাকেই তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে, কাজেই আলোচ্য কাহিনীটি শুধু মর্মস্পর্শী ভাবাবেগপূর্ণ এক রচনা মাত্রই নয়, কাছাড় ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে এক সুসম্পূর্ণ তথ্যবাহী রিপোর্ট আর সেখানেই এর প্রকৃত সার্থকতা। বর্তমান রাজনৈতিক কর্মধারার পরিপ্রেক্ষিতেই কেবলমাত্র বর্তমান গ্রন্থের প্রকৃত মূল্যায়ন করা সম্ভব। লেখকের ভাষা ভাববাহী ও স্বচ্ছন্দ, রচনার মূল্যমান যা বাড়িয়ে তোলে।

গ্রন্থখানি শুধু সুপাঠ্যই নয়, অবশ্যপাঠ্যও। আমরা এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। কয়েকটি প্রামাণ্য ছবি সন্নিবেশিত হওয়ায় রচনার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। ছাপা, বাঁধাই ও আঙ্গিক যথাযথ, প্রচ্ছদ বিষয়োচিত। লেখক—অমিতাভ চৌধুরী। প্রকাশক—গ্রন্থ প্রকাশ, ৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বৈশালীর দিন

আলোচ্য গ্রন্থখানি সমাদৃত সাহিত্যিক স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধুনাতম এক উপন্যাস। বৌদ্ধ যুগের পটভূমিতে আখ্যান ভাগটি গঠিত হয়েছে, বিখ্যাত ধনী শ্রেষ্ঠী কন্যা পটচোরা ভালবেসেছিল তারই পিতার ক্রীতদাস উপালীকে, বলা বাহুল্য সমাজে এ প্রেমকে স্বীকৃতি দেয়নি, জীবন যুদ্ধে সহজেই বিধ্বস্ত হয়ে গেল প্রেমিক যুগলের স্বপ্ন। একটি প্রাণের কণিকায় আপন প্রেমের স্বাক্ষর এঁকে দিয়ে পটচোরা একদিন শুকিয়ে গেল, ঝরে পড়ল নিদাঘতপ্ত ফুলের মতই, আর উপালী হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর, পটচোরার অকাল মৃত্যুতে সমগ্র বিত্তবান সমাজটাকেই ধ্বংস করার শপথ নিয়ে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করল সে। ইতিমধ্যে পটচোরার প্রাণ কণিকাটি ক্রমশঃই উজ্বল হতে উজ্বলতর হয়ে উঠছিল, মাতামহের আলয়ে পটচোরা ও উপালীর একমাত্র সন্তান পন্থক ক্রমে পরিণত হোল অনিন্দ্যকান্তি শান্তস্নিগ্ধ এক যুবাপুরুষে। আপন জীবনরহস্য অবগত হয়ে এই পন্থক সংসার ত্যাগ করে তথাগতের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করল, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করল সে ও অবশেষে ভগবান সুগতের নির্দ্দেশে পূর্ব্বাশ্রমের পিতা উপালীকে নিবৃত্ত করল চণ্ডবৃত্তি থেকে, তথাগতের অপার করুণায় দস্যুও রূপান্তরিত হল সাধকে, হিংসার ঘটল পরাজয়। এই রূপকধর্মী কাহিনীটিকে অনন্য কুশলতায় টেনে নিয়ে গিয়েছেন লেখক, এক অশ্রুজলের আভাসে সিক্ত সমস্ত আখ্যানটি সত্যই উপভোগ্য, বিশেষ এর সমাপ্তি মনকে ভরে তোলে অনির্ব্বচনীয়ের আস্বাদে। লেখকের ভাষা সুন্দর ও শিল্পধর্মী সমগ্র কাহিনীতে প্রাণ সঞ্চারী। আমরা বইটি পড়ে আনন্দ লাভ করেছি। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—কথাকলি, ১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা—৯। পরিবেশক—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

কত রঙ কত আলো

এক তরুণ চিত্রশিল্পীর জীবন ও জীবনদর্শনই বর্ত্তমান কাহিনীর মূল উপজীব্য, শিল্পী আনন্দর মুখ দিয়ে তিনি যুগজীবনের মর্মান্তিক জিজ্ঞাসাকেই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন ; যা কিছু সুন্দর সৎ ও স্বাভাবিক তার প্রতি আজকের মানুষের যে অপরিমেয় অবজ্ঞা, তারই ব্যথায় আনন্দের শিল্পীসত্তা পীড়িত পর্য্যুদস্ত, তবু একদিন তার সমস্ত জিজ্ঞাসা সমস্ত আকুতির উত্তরেই যেন দেখা দিল প্রেম। আপন মহিমায় অবিচল স্বপ্রকাশ সেই প্রেমের ছোঁয়ায় অবশেষে কুলায় ফিরে এল ক্লান্ত বিহঙ্গম। আনন্দর অশান্ত হৃদয় আশ্রয় পেলো উমার অতৃপ্ত হিয়ার অন্দরমহলে। মন্ডিত হল, সার্থক হল তারা। এদের পাশাপাশি সুজাতা ও অরবিন্দের কাহিনীও চলেছে সমান্তরাল গতিতেই, লম্পট ইতর-চরিত্র অরবিন্দই যে তার জীবনপথের বরেণ্য পথিক, একথা উপলব্ধি করে বিস্ময়াহতা হলেও সত্যকে অস্বীকার করলো না সুজাতা, বরং অনমনীয় দৃঢ়তায় এগিয়ে গেলো সে, সুজাতার চরিত্রের এই বলিষ্ঠ ঋজুতাই তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ; তুলনায় নায়িকা উমার চরিত্রটি যেন অনেক অস্পষ্ট অনেক ছায়াচ্ছন্ন। বর্ত্তমান যুগের অশান্ত জীবনস্পন্দনকেই চুলচেরা বিশ্লেষণে তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক। তাঁর এই প্রচেষ্টা আংশিকভাবে সফলও হয়ে উঠেছে। তবু মনে হয় কাহিনীটির আরও কিছুটা পরিণতির সম্ভাবনা ছিলো। লেখকের ভাষা সহজ ও গতিশীল ; সাবলীলতায় বহন করে গিয়েছে আখ্যানভাগটুকু সর্বত্র। বইটির প্রচ্ছদ শিল্প-সুষম, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—চার টাকা।

বনতুলসী

আলোচ্য বইখানি একটি গল্পসংকলন। শিক্ষাবিদ লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই সুপরিচিত তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থের মাধ্যমে। মোট চৌদ্দটি ছোট গল্প একত্র গ্রথিত হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখক বর্তমান প্রচলিত ভাষারীতি অবলম্বন না করে একটু পুরোনো ধারার আশ্রয় নিলেও তাঁর রচনার আবেদন একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি, অত্যন্ত সহজ সরল এক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর দেখা মেলে এগুলির মধ্যে। লেখকের হৃদ্য আন্তরিকতার স্পর্শে গল্পগুলি মধুর ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রায় সব গল্পগুলিরই পাত্র-পাত্রী অতি সাধারণ মানুষ, তথাকথিত বিদগ্ধতার কোন খোলসই নেই তাদের অঙ্গে, কোনরূপ ইজমেও ভারাক্রান্ত নয় তাদের জগৎ, তবু শুধুমাত্র সহজ সাধারণ মানুষের একান্ত ঘরোয়া হাসি-কান্নার পরিচয়েই আখ্যানগুলি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, পড়ে বেশ একটা আরাম পাওয়া যায়। আমরা সংকলনটির সাফল্য কামনা করি। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সাধারণ। লেখক—আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রকাশক—ক্যালকাটা বুক হাউস, ১।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, মূল্য—চার টাকা।

ফক্কড় তন্ত্রম্

আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা সাম্প্রতিক সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত, তাঁর সাহিত্যকর্ম মাত্রই এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়বাহী, বলাবাহুল্য বর্ত্তমান গ্রন্থেও তার ছাপ আছে।—জীবনের এক নির্দ্দিষ্ট পরিধিতে লেখকের যে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ একদিন ঘটেছিল, তারই পরিপেক্ষিতে গড়ে উঠেছে কাহিনীর বিষয়বস্তু।—মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি নামগুলি তন্ত্রশাস্ত্রের অবিদিত নয়, এই সব অলৌকিক বা আধিভৌতিক ক্রিয়াকর্মে আধুনিক যুগের মানুষের বিশ্বাস হয়ত নেই, কিন্তু কৌতূহল আছে প্রচুর পরিমাণে, আর সেই কৌতূহলেরই প্রচুর খোরাকের সন্ধান পাওয়া যাবে আলোচ্য গ্রন্থে।—বিশুদ্ধ সাহিত্যরস এতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত কিন্তু তার জন্য এর সাফল্য বিন্দুমাত্র ব্যাহত হবেনা। কারণ মানুষের মনের গহনস্থলে অশালীন ভাস্তব রসাস্বাদনের জন্য যে দুর্ব্বলতা লুকিয়ে থাকে, এ ধরণের রচনায় আবেদন সেখানেই।—লেখকের বাস্তববোধ আছে, রচনা রীতিরও একটা স্বকীয় বলিষ্ঠতা আছে, নেই শুধু পরিমিতি জ্ঞান, আশা করি ভবিষ্যতে তিনি এই

দিকটায় একটু নজর দেবেন।—ছাপা বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ।—লেখক—অবধূত, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্রৌঞ্চ নিষাদ

কথা-সাহিত্যের আসরে আজকাল অনেক নতুন পদক্ষেপ ঘটছে, এই আগন্তুকদের মধ্যে অনেকেই ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিয়ে থাকেন, আলোচ্য উপন্যাসখানির লেখকও এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত। বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা সমস্যার অবতারণা করা হয়েছে রচনাটির মাধ্যমে, আর তারই মাঝে দানা বেঁধে উঠেছে মূল কাহিনী। সর্বহারা উদ্বাস্তরা এলো নতুন করে বাঁধতে ঘর ভিন্ দেশের অঙ্গনে, আর তাদেরই দায়িত্ব নিয়ে এলো পুনর্বাসন বিভাগের তরুণ কর্মচারী সুকুমার। প্রবল উদ্দীপনা ও কর্মোৎসাহে ভরা মনে কাজ করতে নেমে গ্রাম্য সমাজপতি ও জমিদারের বিরুদ্ধতায় হকচকিয়ে গেল সুকুমার, অসত্য ও মিথ্যার বেড়াজালে প্রাণ তার অস্থির হয়ে ওঠে। এই দ্বিধাকর্টকিত মন নিয়েই একসময় উপলব্ধি করল সে যে অলক্ষ্যে পুষ্পধনু কখন শরাঘাত করেছেন—কুচক্রী জমিদারের সরলা কন্যা খুকুকেই ভালবেসেছে সে। দুর্বল সুকুমার ভালবাসল; কিন্তু বলিষ্ঠ স্বীকৃতিতে ধন্য করে তুলতে পারল না তার প্রেমকে, ফলে খুকু আশ্রয় নিল মৃত্যুর, অভিমানে হতাশায়। সুকুমারের চরিত্রটি আজকের যুগের দুর্বল মানসিকতারই এক প্রতীক যেন। উদ্দেশ্য তার মহৎ, মনও তার উন্নত, কিন্তু বাধা-বিঘ্ন দৃঢ়পদে অতিক্রম করার মত শক্তি তার কই? সঙ্কোচের বিহ্বলতায় নিজেকে তাই বারংবারই অসম্মান করে চলে সে। ভালয়-মন্দয় মেশানো সুকুমারের চরিত্রটি বেশ পাকা হাতেই সৃষ্টি করেছেন লেখক। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যেও কয়েকটি বেশ উজ্জ্বল। লেখকের ভঙ্গী জোরালো, কাহিনীবিন্যাসেও মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়; শুধু মাঝে মাঝে ভাষার শালীনতা তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। আশা করা যায়, তাঁর লেখনী পরিণতির দিকে এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে এই দোষ সম্বন্ধে সম্যক সচেতন হবে। বইটির অঙ্গসজ্জা, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—অজিত দাস, প্রকাশক—তিন সঙ্গী প্রকাশনী, পি৪৬, রায়পুর, কলিকাতা—৩২, পরিবেশক—এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—ছ টাকা।

যবনিকা

সাম্প্রতিক কালে নাট্য-সাহিত্যের প্রতি পাঠকের আগ্রহ ক্রমবর্ধমান, কারণ বাংলার নাট্যকলাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য একটা আন্তরিক প্রয়াস জেগেছে জনমানসে, লুপ্তপ্রায় এই শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য এগিয়ে এসেছেন বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসম্পন্ন একদল মানুষ। নাট্যকলার উন্নতির জন্য ভালো নাটক রচিত হওয়ার প্রয়োজনই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দিকে আধুনিক সাহিত্যকারও উদাসীন নন। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নতুন নাটকের রচনা হচ্ছে, বহু নবীন নাট্যকারেরও দেখা মিলছে যাঁদের ভবিষ্যৎ সত্যই প্রতিশ্রুতিময়। আলোচ্য নাট্যগ্রন্থখানি এমনই এক প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষরবাহী। চারটি একাঙ্ক নাটক গ্রথিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে, সত্যকার নাট্যরসের সন্ধান এই নাটকগুলিতে মেলে, বক্তব্য বিভিন্ন হলেও এদের মধ্যে একটি যোগসূত্র বর্তমান—তা হ'ল সত্যকার জীবন-জিজ্ঞাসা। একাঙ্ক নাটকের আরও একটি বিশেষ গুণ এদের মধ্যে লক্ষ্যণীয়, সেটা লেখকের পরিমিতিবোধ। নাট্য-সাহিত্যের মূল সুরটি সম্বন্ধে যে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন, নাটকগুলি পাঠে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আমরা এই নবীন নাট্যকার সম্বন্ধে যথেষ্ট আশান্বিত হতে পারি। তাঁর ভাষারীতিও স্বচ্ছন্দ ও প্রাণবাহী। আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—নীরেন ভঞ্জ, প্রকাশক—ভবানীপুর বুক ব্যুরো, ২ বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৫, দাম—সাড়ে তিন টাকা।

তীর ভাঙ্গা ঢেউ

আলোচ্য পুস্তকটি একটি ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস। এক সাধারণ রোমান্টিক কাহিনী হিসাবেই কেবল এই গ্রন্থের মূল্যায়ন সম্ভবপর। নামগোত্রহীনা কন্যা বর্ষাকে পথের ধূলি থেকে বুকে তুলে নেন সিদ্ধ সাধক এক মুসলমান ফকির। তাঁরই স্নেহে-যত্নে বড় হয়ে ওঠে বর্ষা, দেহের কূল তার ছাপিয়ে ওঠে সর্বনাশা রূপ-যৌবনের বন্যায়, আর তাতেই ঘনিয়ে ওঠে দুর্যোগের কাল মেঘ একদিন। রূপলোভী দানবের বর্বর হস্ত প্রসারিত হয় সাধকের শান্তিময় তপোভূমিতে বিপ্লব ঘটানোর জন্য, সেই দুর্দম উন্মত্ততার ঝড়ে ভেসে যায় সব কিছু, স্রোতে ভাসা ফুলের মতই ভেসে যায় কল্যাণী কুমারী-কন্যার জীবন। অশেষ গ্লানির পঙ্ক থেকে অবশেষে মুক্তি ঘটল একদিন, সংসারবৈরাগী পূর্ব প্রেমিকের মাতৃসাধনায় অবশেষে বর্ষার কলঙ্কমলিন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। মাতৃরূপা মহাশক্তির ভাবে উজ্জীবিতা হয়ে উঠল সে, পেল পরম চরিতার্থতার আস্বাদ। আজকের দিনে এ ধরণের রোমান্টিক ভাববিলাসিতার বিশেষ কোন মূল্য না থাকলেও গ্রন্থকারের আন্তরিকতায় কাহিনীটি সুপাঠ্য, ভাষারীতিও স্বচ্ছন্দ লেখকের। আঙ্গিক ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—প্রসাদ ভট্টাচার্য, প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, মূল্য—দুই টাকা।

পাখী আর পাখী

আলোচ্য বইটির বিষয়বস্তু প্রাণি-বিজ্ঞানের অন্তর্গত হলেও পরিবেশন-মাধুর্যে তা প্রায় রম্যরচনার মতই মনোহারী। আমাদের দেশে কত অসংখ্য রকমের পাখী আছে তার খোঁজ আমরা ক'জনই বা রাখি? অথচ পাখী-মানুষের মিতালিও তো যুগ যুগান্তের, পাখী পোষার সখ অনেকেরই আছে। তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মাঝেও পাখীর দেখা পাওয়া যায় মাঝে মাঝেই, অতএব তারা আমাদের অন্যতম প্রতিবেশী বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। আলোচ্য গ্রন্থে এই পাখীদেরই কথা বলা হয়েছে বিশদ ভাবে। ত্রিশরকম পাখীর কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটিকে আমরা প্রায় সকলেই দেখেছি। দেখা আর না-দেখা পাখীদের ভিড়ে মন হারিয়ে যায়, তাদের বিচিত্র রীতিনীতি খোস-খেয়ালের খবরে ঔৎসুক্য জেগে ওঠে। বালক-বালিকার হাতে তুলে ধরবার পক্ষে বর্তমান বইটি যে অত্যন্ত উপযোগী একথা অনস্বীকার্য। লেখিকার চিত্তাকর্ষক ভাষারীতিতে বইটির মূল্যমান বৃদ্ধি পায়। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখিকা—ইন্দিরা দেবী, প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭, দাম—তিন টাকা।

প্রথম টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত

দর্শকসমাকীর্ণ বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়াম। এখানেই ভারত ও ইংলণ্ডের প্রথম টেষ্ট খেলার আসর বসে। সুরু হওয়ার আগে খেলা সম্পর্কে অনেক কিছুই প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সবই অপূর্ণ থেকে গেছে। ইংলণ্ড দলের নব নির্বাচিত তরুণ অধিনায়ক ডেক্সটার "প্রাণবন্ত ক্রিকেট" খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ভারতের অধিনায়ক নরী কণ্ট্রাক্টরকেও এ ঢেউ স্পর্শ করেছিল। তিনি ঘোষণা করলেন—ভারত এবার তেজোদৃপ্ত ক্রিকেটের অবতারণা করবে। ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামের "পিচ" তত্ত্বাবধায়কও জানালেন এবার "পিচ" হতে বোলাররাও কিছু সাহায্য পাবেন। কাজে কাজেই সমস্ত ক্রিকেট-রসিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল বোম্বাইয়ের দিকে নতুন কিছু, অভাবনীয় কিছু, অপ্রত্যাশিত কিছু দেখবার আশায়। কিন্তু হা হতোস্মি! খেলা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। পাঁচ দিন ব্যাপী এই টেষ্টের পরিণতি ঘটলো মামুলী ভাবে। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হলো। কেউই নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। পাঁচ দিন ধরে চলল সেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি—মন্থর গতিতে রাণ সংগ্রহ—আর মারার বলকে না মেরে উইকেট রক্ষা করা 'ক্যাচ' উঠলে "ফিল্ডসম্যানদের" তা ফেলে দেওয়ার কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

এই খেলায় বোলাররা হালে পানি না পেলেও ব্যাটসম্যানরা সব সময়ই তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন।

ইংলণ্ড দল এই খেলায় রেকর্ড সংখ্যক পাঁচ শত রাণ তোলে। ফলে ভারতকে প্রায় এক রকম কোণঠাসা অবস্থাতেই প্রথম ইনিংসের খেলা সুরু করতে হয়। স্বভাবতই রাণ তোলা অপেক্ষা উইকেট রক্ষার দিকে সকল খেলোয়াড়েরই নজর থাকে বেশী। ফলে রাণ উঠতে লাগল শম্বুকগতিতে। "ফলো অন" রক্ষা প্রথম উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য খেলাটিকে সম্মানজনক অমীমাংসার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। শেষ পর্য্যন্ত ভারতের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এখানে একটা প্রশ্ন থেকে গেছে। অধিনায়ক ডেক্সটার এত বিলম্বে দ্বিতীয় ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলেন কেন? তিনি কি তবে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের যথেষ্ট সমীহ করেছিলেন এবং নিজের শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেছিলেন?

এই খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সেলিম ডুরাণী নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি দুটি ওভার বাউণ্ডারী সমেত কয়েকটি দর্শনীয় মার মেরে সকলের মন জয় করেন। মঞ্জরেকার, জয়সিমা ও কৃপাল সিং-এর ব্যাটিংও সকলের প্রশংসা লাভ করে। ইংলণ্ড দলের পক্ষে ব্যারিংটন ১৫১ রাণ করে অপরাজিত থাকলেও ডেক্সটার, পুলার ও রিচার্ডসনের ব্যাটিং দেখে সকলে বেশী খুসী হয়েছেন। ভারতের রঞ্জনে ও বোড়ে এবং ইংলণ্ডের লক ও এ্যালেন নিপুণ হাতে বল করেছেন।

যাই হোক বোম্বাইতে এবারের প্রথম টেষ্ট ক্রীড়া রসিকদের মনে অনেকদিন স্মরণ থাকবে এর বিভিন্ন রেকর্ড প্রতিষ্ঠার জন্য। নিম্নে সংক্ষিপ্ত রাণ সংখ্যা দেওয়া হলো:

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস (৮ উই: ডি:) ৫০০ (ব্যারিংটন ১৫১, ডেক্সটার ৮৫, পুলার ৮৩, রিচার্ডসন ৭১; রঞ্জনে ৭৬ রাণে ৪ উইকেট ও বোড়ে ১০ রাণে ৩ উইকেট)।

ভারত—১ম ইনিংস ৩৯০ (সেলিম ডুরানী—৭১, চান্দু বোড়ে ৬৯, মঞ্জরেকার ৬৮, জয়সিমা ৫৬, কৃপাল সিং নট আউট ৩৮; টনি লক ৭৪ রাণে ৪ উইকেট ও এ্যালেন ৫৪ রাণে ৩ উইকেট)।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস (৫ উই: ডি:) ১৮৪ (ব্যারিংটন নট আউট ৫২, রিচার্ডসন ৪৩, বারবার ৩১; সেলিম ডুরানী ২৮ রাণে ২ উইকেট)।

ভারত—২য় ইনিংস (৫ উই:) ১৮০ (মঞ্জরেকার ৮৪, জয়সিমা ৫১; রিচার্ডসন ১০ রাণে ২ উইকেট)।

বিভিন্ন রেকর্ডের খতিয়ান

পুলার ও রিচার্ডসনের প্রথম উইকেট জুটিতে ১৫০ রাণ ভারতের বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ডের নতুন রেকর্ড। পূর্ব রেকর্ড পুলার ও পার্কহাউস জুটির ১৪৬ (লর্ডস মাঠ ১৯৫৯ সাল)।

ইংলণ্ডের ৮ উইকেটে ঘোষিত ৫০০ রাণ—ভারতে ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ সংখ্যক রাণ। পূর্ব রেকর্ড ৪৫৬ রাণ (ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়াম ১৯৫১-৫২ সাল)।

কেন ব্যারিংটন নট আউট ১৫১ রাণ টেষ্ট খেলায় তাঁর নিজস্ব সর্বোচ্চ রাণ। পূর্ব রাণ ১৩৯ (লাহোরে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ১৯৬১ সাল)।

টনি লকের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় দুই সহস্র উইকেট লাভ ইহাও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

চান্দু বোড়ে ও সেলিম ডুরানীর পঞ্চম উইকেট জুটির ১৪২ রাণ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলায় নতুন রেকর্ড। পূর্ব রেকর্ড মঞ্জরেকর ও কৃপাল সিংয়ের ৮১ রাণ (লর্ডস মাঠে ১৯৫৯ সালে)।

দ্বিতীয় উইকেটে জয়সিমা ও মঞ্জরেকরের ১৩১ রাণ টেষ্ট খেলায় নতুন রেকর্ড। পূর্ব রেকর্ড কনট্রাক্টর ও আব্বাস আলী বেগের ১০৯ রাণ (ম্যাঞ্চেষ্টার ১৯৫৯ সাল)।

বিজয় মঞ্জরেকরের টেষ্টে দ্বি-সহস্র রাণ পূর্ণ হওয়ার পর ৩৮টি টেষ্টে ২০৮২ রাণ সংগ্রহ। ইহাও উল্লেখযোগ্য।

উইকেট রক্ষক কুন্দরামের প্রথম ইনিংসে পাঁচজন ব্যাটসম্যানকে আউট করার সহায়তা নতুন ভারতীয় রেকর্ড।

ভারতের প্রথম ইনিংসে অতিরিক্ত হিসাবে ৪৫ রাণ লাভ নতুন রেকর্ড। ভারত ও ইংলণ্ডের টেষ্ট খেলার ইতিহাসে কোন ইনিংসে এত বেশী অতিরিক্ত রাণ হয়নি।

কলিকাতায় জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠান

সম্প্রতি কলকাতায় জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার শরৎকালীন অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এর আগে আর একবার ১৯৫৭ সালে এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান কলকাতায় হয়েছিল। এবারকার শরৎকালীন গেমস উত্তর প্রদেশে হওয়ার কথা ছিল। বন্যার জন্য সেখানে অনুষ্ঠানের অসুবিধা থাকায় স্কুল গেমস ফেডারেশন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শরণাপন্ন হন এবং সরকারের শিক্ষা বিভাগ এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। অল্প সময়ের মধ্যে এই বৃহৎ প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তারা সত্যই প্রশংসার দাবী করতে পারেন।

এবারকার প্রতিযোগিতায় ১২টি রাজ্যের প্রায় পাঁচশত ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করেন।

পশ্চিম বাঙ্গালার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। তিনি উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেছেন যে দেশের তরুণ সমাজের সামগ্রিক উন্নতিই সকলের কাম্য। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্রগণ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিবৃন্দ যদি অনুভব করতে পারেন যে তাঁরা দেশমাতৃকার সন্তান—তাহা হইলেই সর্বভারতীয় এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সার্থক হবে। দেশের নেতৃবর্গ বর্তমানে জাতীয় ঐক্যপ্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর দেশের ছাত্র সমাজও তাদের নিয়ম-নিষ্ঠ আচরণে নেতৃবৃন্দকে সাহায্য করতে পারেন। সর্বশেষে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও প্রকৃত খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি গ্রহণ করতে তিনি আহ্বান জানান। ডাঃ রায়ের বক্তৃতা তরুণ খেলোয়াড়দের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করবে বলে মনে হয়।

পাঁচটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের কর্মসূচীভুক্ত থাকে।

বাঙ্গালা সন্তরণ প্রতিযোগিতায় নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় রেখেছে। প্রতিটি বিভাগের ফাইন্যালে বাঙ্গালার সাঁতারুরা শীর্ষস্থান পান। তা ছাড়া রিলে বাদে সমস্ত বিভাগেই বাঙ্গালা প্রথম দুটি স্থান লাভ করেছে। ছাত্র ও ছাত্রী উভয় বিভাগেই বাঙ্গালা চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। এবার যে ক'টি রেকর্ড হয় সবই বাঙ্গালার সাঁতারুরা করেন। ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলে মধুসূদন সাহ ১ মিঃ ৭'১ সেকেণ্ডে, ১০০ মিটার বুক সাঁতারে সৌরভ বানার্জ্জী ১ মিঃ ২৭ সেকেণ্ডে, ১০০ মিটার চিৎ সাঁতারে আলোক চন্দ্র ১ মিঃ ২৪'৮ সেকেণ্ডে এবং ৪—১০০ মিটার ফ্রি-ষ্টাইল রিলে ৪ মিঃ ৪৩'২ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে নতুন রেকর্ড করেন। ছাত্রদের টেবিল টেনিসে বাঙ্গালা এবং ছাত্রীদের মধ্যপ্রদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়। কপাটী ফাইন্যালে পাঞ্জাব জয়লাভ করে। খো-খো খেলায় মধ্যপ্রদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়। শরৎকালীন ক্রীড়ার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হলো—ফুটবল প্রতিযোগিতা। লীগ ও নক-আউট প্রথায় এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী অন্ধ্র-দলের সুকুর, পরমেশ্বর ও পাঞ্জাব দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড ইন্দার সিং-এর খেলার পদ্ধতি দর্শকদের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে। এই সকল তরুণ খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম তিনটি দল

ফুটবল

১ম—অন্ধ্রপ্রদেশ, ২য়—পাঞ্জাব ও ৩য়—মণিপুর।

কপাটী

১ম—পাঞ্জাব, ২য়—অন্ধ্রপ্রদেশ ও ৩য়—মধ্যপ্রদেশ।

খো-খো

১ম—মধ্যপ্রদেশ, ২য়—অন্ধ্রপ্রদেশ ও ৩য়—পাঞ্জাব।

টেবিল টেনিস (ছাত্র)

১ম—পশ্চিম বাঙ্গালা, ২য়—অন্ধ্র প্রদেশ ও ৩য়—পাঞ্জাব।

টেবিল টেনিস (ছাত্রী)

১ম—মধ্যপ্রদেশ, ২য়—পাঞ্জাব ও ৩য়—মণিপুর।

অন্ধ্র পুলিশ দলের ডুরাণ্ড কাপ লাভ

দক্ষিণ ভারতের সেরা দল অন্ধ্র পুলিশ তিন বছর পর পুনরায় ডুরাণ্ড কাপ লাভ করেছে। ১৯৫৭ সালে তারা সর্বশেষ এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জ্জন করেছিল। তবে তখন দলটি হায়দ্রাবাদ পুলিশ নামে পরিচিত ছিল।

এবারকার ফাইন্যালে অন্ধ্র পুলিশ গতবারের যুগ্ম বিজয়ী কলকাতার খ্যাতনামা দল মোহনবাগানকে এক গোলে পরাজিত করে। তাদের এবারকার সাফল্য সত্যই কৃতিত্বের পরিচায়ক। তারা কলকাতার তিনটি শক্তিশালী দল বি এন আর, ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে পরাজিত করে তাদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাদের দলগত ক্রীড়াপদ্ধতি যে উচ্চ পর্যায়ের হয়েছিল, সেমি-ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলাতে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তারা ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করার জন্য যেরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিল, ফাইন্যাল খেলায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তার স্বাক্ষর রাখে। তাদের এই উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্যই কলকাতার দলটির ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে বলা চলে। মোহনবাগান এবার নিয়ে উপর্য্যুপরি তিনবার ফাইন্যালে খেলার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছে। গতবার ১৯৫৯ সালে তারা ডুরাণ্ড কাপ লাভ করে এবং ১৯৬০ সালে তারা ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুগ্ম-বিজয়ী হয়।

ফুটবলের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার তিনটি খ্যাতনামা দলকে পরাজিত করে এবার ডুরাণ্ড কাপ লাভ করে অন্ধ্রপুলিশ দল যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছে। অন্ধ্র পুলিশ দলের এই সাফল্য ভারতের শ্রেষ্ঠ "কোচ" জনাব রহিমের শিক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি বাঙালী মেয়ের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্রটি বিমল ঘোড় গৃহীত।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

নেহরুর আমেরিকা সফর—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকো ভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার পথে তিনি লণ্ডন হইয়া গিয়াছেন এবং ফিরিবার পথে কায়রোতে তিনি প্রেসিডেণ্ট নাসের এবং প্রেসিডেণ্ট টিটোর সহিত দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের কথা কয়েক মাস আগেই স্থির করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ মিঃ কেনেডী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার অল্প পরেই পণ্ডিত নেহরু ওয়াশিংটনে আমন্ত্রিত হন এবং আগ্রহের সহিত এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। যখন এই নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেন তখন আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি মোটেই নৈরাশ্যপূর্ণ ছিল না। কিন্তু যে-সময়ে তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিলেন সেই সময় আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও বহুলোকের মনোভাব ভারতের প্রতি আরও বেশী বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। বিরূপ মনোভাব অধিকতর তীব্র হওয়ার প্রধান কারণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ মেননের একটি উক্তি। পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার জন্ম ভারতের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব জাতিপুঞ্জে উত্থাপিত হয় তাহারই আলোচনায় মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ মেনন বলিয়াছিলেন যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়া বায়ুমণ্ডল দূষিত করার দায়িত্ব সোভিয়েট রাশিয়া অপেক্ষা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কম নয়। তিনি রাশিয়া কর্ত্তৃক বায়ুমণ্ডলে বহু মেগাটন বোমার বিস্ফোরণকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মাটির নীচে বিস্ফোরণের সহিত একই পর্য্যায়ভুক্ত করেন। ইহাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জনমতের একটা বৃহৎ অংশ ভারতের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবে, ইহা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু জাতিপুঞ্জে শ্রীমেনন যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন ভারতের নিরপেক্ষ নীতির সহিত তাহার পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। কোন একটি রাষ্ট্রের উপর দোষারোপ করা বর্জ্জন করার নীতিই নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ভারত অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। কারণ, কোন একটি বিশেষ রাষ্ট্রের উপর দোষারোপ করিলে শক্তিবর্গের মধ্যে ব্যবধানটা আরও বেশী বিস্তৃত ও আরও বেশী গভীর হইয়া উঠে। পণ্ডিত নেহরু নিজেও এই নীতি ১৯৬০ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ঘোষণা করিয়াছিলেন। পঞ্চশক্তির প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট এবং রুশ প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে আলাপ আলোচনার জন্য প্রস্তাব করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি কাহারও প্রতি দোষারোপ করিতে আগ্রহী নয়, তাহারা চায় ব্যবধান দূর করিতে।

রাশিয়া একক ভাবে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে সুপার পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ আরম্ভ করায় উহার নিন্দা করিয়া উত্থাপিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া খুবই সহজ ব্যাপার। ভারত এইরূপ ভোট দেয় নাই একথা বলা যায় না। কিন্তু ভারত মনে করে পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ অন্যায়, এই বিস্ফোরণ রাশিয়াই ঘটাক আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই ঘটাক। আমেরিকার অন্যায়টা রাশিয়ার অন্যায়কেও ন্যায়সঙ্গত করিতে পারে না। তেমনি রাশিয়ার অন্যায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যায়কেও ন্যায়সঙ্গত করিতে পারে না। কিন্তু মার্কিণ জনগণের মনোভাব বর্ত্তমানে যেরূপ তাহাতে এই যুক্তিতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন ইহা আশা করাও সম্ভব নয়। একে তো ঠাণ্ডাযুদ্ধ অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। মঃ ক্রুশেভ জার্ম্মাণ ও বার্লিন সমস্যাকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছেন। উহার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমীশক্তিবর্গ যুদ্ধ সজ্জার হুমকী দিয়াছেন। রাশিয়া পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ চালাইয়া চলিয়াছে ইহার উপর শ্রীকৃষ্ণ মেননের ঐ উক্তি। কাজেই ভারতের প্রতি মার্কিণ জনগণের মনোভাব যে কত বেশী বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। এইরূপ একটা প্রবল বিরূপ ভাবের মধ্যে পণ্ডিত নেহরুর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ আরম্ভ হয়। বস্তুতঃ তাঁহার লণ্ডন হইতে নিউইয়র্কে পৌছিবার পরই এই বিরূপ মনোভাবের প্রকাশ দেখা দেয় টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের সময় তাঁহাকে কাটাকাটা প্রশ্ন করার মধ্যে। নিরপেক্ষ নীতি বজায় রাখিয়াই এই সকল প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নূতন করিয়া পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ আরম্ভ করিবার দায়িত্ব যে সোভিয়েট রাশিয়ারই সে-কথা তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার চুক্তি হওয়ার আগেই বিস্ফোরণ বন্ধ রাখা উচিত। তাঁহার এই উক্তিতে মার্কিণ জনমত কতটা শান্ত হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। কিন্তু একথাও সত্য যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও যুদ্ধ চায় না। যুদ্ধ আরম্ভ করিতে চায় না রাশিয়াও। কিন্তু উভয় পক্ষেরই মুখ রক্ষা করিয়া কি ভাবে জার্ম্মাণী ও পশ্চিম বার্লিনের সমস্যার সমাধান করা যায় তাহাই এখন প্রধান প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের ব্যাপারে পণ্ডিত নেহরু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া ওয়াশিংটন ও মস্কো উভয়েরই ধারণা।

পণ্ডিত নেহরু ৫ই নবেম্বর (১৯৬১) নিউ ইয়র্কে পৌছেন। গত ৯ই নবেম্বর নেশন্যাল প্রেস ক্লাবের মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় পণ্ডিত নেহরু কঠোর ভাষাতেই রাশিয়ার নূতন করিয়া বিস্ফোরণ আরম্ভ করার নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে রাশিয়ার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ আরম্ভ করাটা ক্ষতিজনক ও বিপর্য্যয় কারক। ইহাতে যুদ্ধের মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সঙ্গে তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, রাশিয়া শান্তির

চায়, এ বিষয়ে তাঁহার ধারণা সুদৃঢ়। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী এবং পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে চারিদিন ধরিয়া ঘরোয়া ভাবে আলোচনা চলে এবং ১ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার তাঁহাদের আলোচনা সম্পর্কে সরকারী ভাবে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্বদিন অর্থাৎ ৮ই নবেম্বর, বুধবার প্রেসিডেণ্ট কেনেডী সাংবাদিক সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরুর উচ্চপ্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, পণ্ডিত নেহরু সম্পর্কে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি তাঁহার ন্যায় অনুরক্তি আর কাহারও নাই। ভারত ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি বলেন, "The differences are the result of geography, internal conditions, tradition, culture and history" অর্থাৎ ভৌগোলিক অবস্থান, আভ্যন্তরীণ অবস্থা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের জন্য এই পার্থক্য। তিনি বলিয়াছেন, এই পার্থক্য যেন ভারত ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি না করে। গত ১০ই নবেম্বর পণ্ডিত নেহরু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি নূতন কিছু বলিয়াছেন একথা অবশ্য বলা যায় না। তিনি বলেন, মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া ইঁদুরের মত বাঁচিয়া থাকার কথা চিন্তা না করিয়া আণবিক যুদ্ধ এড়াইবার জন্য মানবজাতির সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত। তিনি আরও বলেন, "হয় আমাদের সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করিতে হইবে, না হয় আমাদের অস্তিত্ব থাকিবে না।" এক বৎসর ধরিয়া বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার জন্য কাজ করার সম্ভাবনা সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া দেখার উদ্দেশ্যে তিনি একটি কমিটী গঠনের কথা বিবেচনা করিবার জন্য পরিষদকে অনুরোধ জানান। উপনিবেশবাদ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ইতিহাসের দৃষ্টিতে উপনিবেশবাদের উচ্ছেদ হইয়াছে বটে, কিন্তু পর্তুগাল আজ পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। পণ্ডিত নেহরু মনে করেন, বৃটেন ও ফ্রান্স তাহার কাছে নগণ্য। পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের উপর স্বেচ্ছামূলক নিষেধাজ্ঞা জারী করিলেই সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, ইহা কেহই মনে করেন না। চুক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য ব্যবস্থাও বলবৎ করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে যতশীঘ্র সম্ভব এ সম্পর্কে চুক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়; কিন্তু ইতিমধ্যে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করা উচিত।

পণ্ডিত নেহরু বারদিন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। তাঁহার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফর একেবারেই ফলপ্রদ হয় নাই, একথাও বলা যায় না। সঙ্কট মুহূর্ত উপস্থিত হইলে কি রাশিয়া, কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কেহই ভারতের তথা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের কথা শুনিবে না, একথা সত্য। কিন্তু সেরূপ সঙ্কট মুহূর্ত এখনও আসে নাই। ঠাণ্ডাযুদ্ধের মধ্যে যখন সঙ্কট সময় দেখা দেয়, তখন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি সঙ্কট সমাধানের জন্য চেষ্টা করে। এ পর্যন্ত উহার ফল একেবারেই কিছু হয় নাই, একথাও বলা যায় না। ফল হওয়ার প্রধান কারণ, দুইটি শক্তি শিবিরের কোন শিবিরই এখন সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে চায় না। যদিও একথা সত্য যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বর্তমানে অধিকতর বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি পরমাণু যুদ্ধের সর্বাত্মক ধ্বংস সম্পর্কে সকলেই সচেতন।

কেনেডী-নেহরু যুক্ত ইস্তাহার—

প্রেসিডেণ্ট কেনেডী এবং পণ্ডিত নেহরু পৃথিবীর প্রায় সকল সমস্যা সম্পর্কেই আলোচনা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁহারা হয়ত একমত হইতে পারিয়াছেন, কিন্তু পন্থা সম্পর্কে একমত হইতে পারেন নাই। যুক্ত ইস্তাহার হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পণ্ডিত নেহরু তাঁহার নিরপেক্ষ নীতিতে অচল ও অটল রহিয়াছেন। বর্তমানে জার্মাণী ও পশ্চিম বার্লিন সমস্যাই সর্বাপেক্ষা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। এ সম্পর্কে যুক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বার্লিন সমস্যা সমাধানের জন্য সকল রকম চেষ্টা চালাইয়া যাওয়া হইবে বলিয়া প্রেসিডেণ্ট কেনেডী পণ্ডিত নেহরুকে আশ্বাস দিয়াছেন। সেই সঙ্গে এই সমস্যার সহিত সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের মতামতের গুরুত্বও তিনি পণ্ডিত নেহরুকে অবহিত করিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ বলিতে কি বুঝান হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। বার্লিন সম্পর্কে পশ্চিম জার্মাণী সহ পশ্চিমী শক্তিবর্গের নীতি কি হইবে সে সম্বন্ধে এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। পণ্ডিত নেহরুর সহিত আলোচনার পর প্রেসিডেণ্ট কেনেডী পশ্চিম জার্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনুয়েরে-এর সহিত আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার পর প্রকাশিত যুক্ত বিবৃতিতে বার্লিনের সঙ্গে অবাধ সংযোগ থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে উভয়েই 'নাটো'র শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিয়াছেন। নাটোর শক্তি বৃদ্ধি বলিতে উহাকে পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত করাই বোঝায়। রাশিয়ার সহিত আপোষের সর্ত হিসাবে উহাই পশ্চিম জার্মাণীর দাবী। কাজেই কেনেডী-এডেনুয়েরে যুক্ত বিবৃতির প্রতিক্রিয়া রাশিয়ায় কিরূপ হইবে তাহা অবশ্যই ভাবিবার বিষয়। নেহরু-কেনেডী যুক্ত ইস্তাহারে বহির্জগতের সহিত বার্লিনের সংযোগ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা পণ্ডিত নেহরু স্বীকার করিয়াছেন। চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে বহির্জগতের সহিত বার্লিনের অবাধ রক্ষার দাবী রাশিয়া মানিয়া লইতে পারে, এই আভাষ ইতি-পূর্বেই পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিত নেহরু অবশ্য একথাও বলিয়াছেন যে, এই সংযোগ রক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ব জার্মাণীর সঙ্গে চুক্তি করিতে হইবে। পূর্ব জার্মাণীর সহিত চুক্তি করার অর্থই হইল উহার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিয়া লওয়া। চ্যান্সেলার এডেনুয়েরে তাহাতে রাজী নহেন।

লাওসকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করা সম্পর্কে

প্রেসিডেণ্ট কেনেডী এবং পণ্ডিত নেহরু উভয়েই একমত হইয়াছেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এখনও নিরপেক্ষ লাওস রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। কেন হয় নাই সে-সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় লাওসের ন্যায় দক্ষিণ ভিয়েটনামও এক গুরুতর সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য লাওস হইতে দক্ষিণ ভিয়েটনামের সমস্যা অন্য রকমের। দক্ষিণ ভিয়েটনাম কার্য্যতঃ মার্কিণ প্রভাবাধীন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু তাহাতেও উহার সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। যুক্ত বিবৃতিতে দক্ষিণ ভিয়েটনামের উল্লেখ নাই, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। পণ্ডিত নেহরু নাকি দক্ষিণ ভিয়েটনামে মার্কিণ সৈন্য পাঠাইবার প্রয়োজনীয়তা মানিয়া লইতে পারেন নাই। আবার দক্ষিণ ভিয়েটনামে মার্কিণ সৈন্য পাঠাইবার প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে পণ্ডিত নেহরু যে যুক্তি দিয়াছেন, প্রেসিডেণ্ট কেনেডী তাহা মানিয়া লইতে পারেন নাই। পণ্ডিত নেহরুর যুক্তি নাকি এই যে, ভিয়েটনামে মার্কিণ সৈন্য প্রেরিত হইলে উত্তর ভিয়েটনামের নায়ক ডাঃ হো চি মীনের মর্য্যাদাই শুধু বৃদ্ধি পাইবে না; স্থানীয় সংঘর্ষ বৃহত্তর ও বিপজ্জনক সংঘর্ষে পরিণত হইতে পারে। পণ্ডিত নেহরুর এই যুক্তির মধ্যে যে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, তাহা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সামরিক জোট এবং সাহায্য কম্যুনিজমের অগ্রগতি রোধ করিতে পারে নাই। যুক্ত ইস্তাহারে 'ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক' শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে; কাশ্মীর বিরোধের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর ইস্তাহারে পাকিস্তান কাশ্মীরের কথা উল্লেখ করিয়াছিল। পণ্ডিত নেহরুর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যাত্রার প্রাক্কালে পাকিস্তান কাশ্মীর সম্পর্কে আমেরিকায় এক পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিল। কাজেই কেনেডী-নেহরু যুক্ত ইস্তাহারে কাশ্মীর প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ না থাকা তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ইস্তাহার হইতে ইহা বুঝা যায় যে, কঙ্গো সম্বন্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিমত কতকগুলি ইউরোপীয় দেশ অপেক্ষা ভারতীয় অভিমতের নিকটতর। পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার জন্য চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা প্রেসিডেণ্ট কেনেডী এবং পণ্ডিত নেহরু উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু চুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার আশ্বাস প্রেসিডেণ্ট কেনেডী পণ্ডিত নেহরুকে দিতে পারেন নাই। ভারত চায় বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার জন্য চুক্তি এবং নিয়ন্ত্রণ এবং এই বিষয়গুলির সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত পরীক্ষা বন্ধ রাখা। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট কেনেডী অনিয়ন্ত্রিতভাবে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ রাখার ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত নহেন। যুক্ত ইস্তাহারে এঙ্গোলা ও আলজেরিয়ার কথা উল্লেখ নাই, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

মস্কো বনাম পেইপিং—

সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের যে কাজ আরম্ভ হইয়াছে, গত পাঁচ বৎসরেরও অধিককাল তাহার জের চলিয়া আসিয়া দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসে উহা যেন একটা চরম রূপ গ্রহণ করিয়াছে। গত ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির ২০তম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনেই সর্ব্বপ্রথম ষ্ট্যালিনবাদের অবসান ঘোষণা করা হয়। অতঃপর পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরীতে যে হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়, তাহা ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীলদের কার্য্যের পরিণতি। রাশিয়ার ভিতরেও ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের বিরোধিতা গড়িয়া উঠার কথা আমরা শুনিয়াছি। যাঁহারা এই বিরোধিতা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে পার্টি-বিরোধী উপদল বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই পার্টি-বিরোধী দলে যাঁহারা আছেন বলিয়া বলা হইয়া থাকে, তাঁহাদের মধ্যে ম্যালেনকভ, মলটভ, কাগানোভিচ এবং ভোরোশিলভ অন্যতম। রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির একবিংশতিতম কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে। এই সম্মেলনে পার্টি-বিরোধীদের প্রভাবাধীনে রচিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাতিল করিয়া সপ্তবার্ষিক পরিকল্পনা গঠিত হয় এবং উহাতে মঃ ক্রুশেভের প্রধান প্রধান প্রস্তাব স্থান পাইয়াছে। ইহার পর গত অক্টোবর মাসে (১৯৬১) অনুষ্ঠিত হয় রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বাবিংশতিতম অধিবেশন। মঃ ক্রুশেভ নেতৃত্ব গ্রহণের পর এ পর্য্যন্ত তিনবার রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির কংগ্রেস আহুত হইল। অক্টোবর কংগ্রেসের উদ্বোধনী বক্তৃতায় জার্ম্মাণ সমস্যা সমাধানে আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে। সে-সম্বন্ধে গত মাসের মাসিক বসুমতীতে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ১৮ই অক্টোবর তারিখে রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির পরিকল্পনা উত্থাপন করা হয়। এই পরিকল্পনার কথা পূর্ব্বেই আমরা শুনিয়াছি। গত ৩০শে জুলাই (১৯৬১) উহার খসড়া প্রকাশিত হয় এবং যথাসময়ে (মাসিক বসুমতীর শ্রাবণ সংখ্যা) সে-সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিয়াছি। জার্ম্মাণ সমস্যা এবং নূতন অর্থ নৈতিক কর্ম্মসূচীর কথা বাদ দিলে ২২তম কংগ্রেসে প্রধান আলোচ্য বিষয় ষ্ট্যালিনবাদের অবসান সংক্রান্ত ব্যাপার এবং পার্টি-বিরোধী উপদলের কার্য্যকলাপ। এই কংগ্রেসে এই দুইটি বিষয়ই যে মুখ্যস্থান গ্রহণ করিয়াছিল তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

রাশিয়া ও চীনের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্বের কথা অবশ্য নূতন নয়। এই দ্বন্দ্বটা নাকি ২২তম কংগ্রেসে আরও তীব্র আকার ধারণ করে।

মঃ ক্রুশ্চেভ প্রত্যক্ষ ভাবে চীনকে আক্রমণ করিয়া কিছু অবশ্য বলেন নাই। কিন্তু আলবেনিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ করিয়া তিনি পরোক্ষভাবে চীনকেই আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। কংগ্রেসে আলবেনিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করিয়া মঃ ক্রুশেভ বলিয়াছেন, "The Albanian leaders......... do not like our party's policy aimed at resolutely overcoming the harmful consequences of Stalin's cult of personality..... They adopted a course of sharp deterioration of relation with our party and with the Soviet Union.' অর্থাৎ 'ষ্ট্যালিনের ব্যক্তিপূজা নীতির ক্ষতিকারক পরিণতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দৃঢ়তার সহিত আমাদের পার্টি যে নীতি অনুসরণ করিতেছে, আলবেনিয়ার নেতারা তাহা পছন্দ করেন না। তাঁহারা এমন একটি পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন যাহার ফলে আমাদের পার্টি এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়াছে।' তাঁহার এই মন্তব্যের তাৎপর্য্য বিশেষভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। কম্যুনিষ্ট ব্লকের দেশগুলির মধ্যে আলবেনিয়া ক্ষুদ্র একটি দেশ, যাহার আয়তন মাত্র ১০ হাজার শত বর্গমাইল। উহার একদিকে যুগোশ্লাভিয়া, আর এক দিকে এবং অন্য দিকে আড্রিয়াটিক সাগর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আলবেনিয়া বামপন্থীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। এনভার হোক্সহা (Enver Hoxha) গরিলা যুদ্ধ চালাইয়া একসিস শক্তিকে বিতাড়িত করেন। তিনি আলবেনা কম্যুনিষ্ট পার্টি সংগঠন করেন এবং বিরোধীদলের বিলোপ সাধন করেন। হোক্সহা প্রথমে টিটোর একজন বিশেষ সমর্থক ছিলেন। ১৯৪৮ সালে ষ্ট্যালিনের সহিত টিটোর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর আলবেনিয়া রাশিয়ার সহিতই সুদৃঢ় সম্পর্ক রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। সেই ক্ষুদ্র আলবেনিয়ার রাশিয়ার বিরোধিতা করা যে খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। আলবেনিয়া একক থাকিলে ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের বিরোধিতা করিতে সাহস পাইত কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। চীন তাহার সমর্থক, ইহাই অনেকে মনে করেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আলবেনিয়াকে হুমকী দিয়া মঃ ক্রুশেভ প্রকৃত পক্ষে চীনকেই হুমকী দিয়াছেন। তিনি ২২তম কংগ্রেসে তাঁহার বক্তৃতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের ব্যাপারে আলবেনিয়াই হউক আর অন্য কেহই হউক, কাহাকেও কোন রকম খাতির করা হইবে না। এই 'অন্য কেহ' বলিতে তিনি চীনকেই বুঝাইয়াছেন বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। ইহা কতকটা ঝি মারিয়া বৌকে শিখাইবার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। মঃ ক্রুশেভ অবশ্য চীনকেও রাশিয়ার অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক এবং সামরিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। আলবেনিয়াকে আক্রমণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, কোন কম্যুনিষ্ট দেশ যদি একাকী অগ্রসর হইতে চাহে তাহা হইলে সেই দেশ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। ইহাও চীনকে উদ্দেশ করিয়াই বলা হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। চীনের প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভের উক্ত নীতির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, উহাতে তাঁহাদের মিত্রদেরই ক্ষতি হইবে এবং আনন্দবর্দ্ধন করিবে তাঁহাদের শত্রুদের। চৌ এন লাই ভিয়েটনাম হইতে আলবেনিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের সহিত মৈত্রী ঘোষণা করেন। তাঁহার মন্তব্য নাকি শ্রোতৃবর্গের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি অবশ্য তাঁহার মন্তব্যকে কতকটা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়া রাশিয়ার নূতন কর্ম্মসূচীর প্রশংসা করেন। পরে মঃ ক্রুশেভের সহিত ব্যক্তিগত ভাবেও তাঁহার আলোচনা হয়। কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশনকালে ইটালি, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের কম্যুনিষ্ট নেতারা নাকি আলবেনিয়ার নেতাদের উক্তিকে ক্ষতিকর ও ভ্রান্ত বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন। আলবেনিয়ার নেতারা কি বলিয়াছিলেন তাহার কিছু আভাস মঃ মিকোয়ানের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। আলবেনিয়ার নেতারা নাকি বলিয়াছিলেন যে, ষ্ট্যালিন দুইটি ভুল করিয়াছেন। তিনি অনেক আগেই মারা গিয়াছেন এবং রাশিয়ার বর্ত্তমান নেতাদের ধ্বংস করেন নাই।

মঃ ক্রুশেভ রিপোর্টে ১৯৫৬-৫৭ সালে পার্টি-বিরোধীদের সহিত সংঘর্ষের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ! ষ্ট্যালিন যে-সকল দুষ্কার্য্য করিয়াছেন তাহার জন্য ম্যালেনকভ, মলটভ, কাগানোভিচ এবং ভোরোশিলভের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। অন্যান্য বক্তারাও প্রাক যুদ্ধযুগে এবং যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে যে-সকল হত্যাকাণ্ড, গ্রেফ্‌তার এবং নির্য্যাতন করা হইয়াছে তাহাতে ষ্ট্যালিনপন্থীদের যোগসাজস থাকার কথা উল্লেখ করেন। পার্টি হইতে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করার দাবীও করা হইয়াছে। ষ্ট্যালিনপন্থীদের সহিত বিরোধটা এই কংগ্রেসে বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই ষ্ট্যালিনের সমাধির উপর একটি পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। তাহাতে লেখা ছিল শ্রেষ্ঠ মার্কস্-লেনিনপন্থী জে ভি ষ্ট্যালিনের উদ্দেশ্যে। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হওয়ার পুর্ব্বেই চৌ এন লাই পেইপিংয়ে ফিরিয়া যান। মস্কোতে বলা হইয়াছে যে, চীনের গণ-কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনের জন্যই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইয়াছে। কিন্তু পেইপিংয়ে নাকি গণ-কংগ্রেস হওয়ার কোন কথাই শোনা যাইতেছে না। মঃ ক্রুশেভের তীব্র ভাষায় আলবেনিয়াকে আক্রমণটা যে মূলতঃ চীনের বিরুদ্ধেই তাহা আরও একটি ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। আলবেনিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ৮ই নবেম্বর চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হইতে শুভেচ্ছার বাণী চীনের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রীয় কমিটির বড় কর্ত্তা মাও সে তুং। এই শুভেচ্ছার বাণীতে বলা হইয়াছে যে, "চীন এবং আলবেনিয়ার জনগণের মধ্যে যে মৈত্রী এবং ঐক্য রহিয়াছে, পৃথিবীর কোন শক্তি তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না।" আলবেনিয়ার ডিক্‌টেটর জেনারেল হোক্সা হাও ৭ই নবেম্বর এক বক্তৃতায় ক্রুশেভের নীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, 'কম্যুনিষ্ট জগতে আলবেনিয়ার মিত্র আছে, তাহারা তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই এবং তাহাকে বিপদের মধ্যে অসহায় অবস্থায় ফেলিবে না।' পেইপিং রেডিওর এক ঘোষণায় প্রকাশ, রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির ২২তম কংগ্রেসে যে সকল বৈদেশিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে ৪০ জন আলবেনিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণে যোগদান করেন নাই।

আলবেনিয়া এবং পার্টি-বিরোধীদের বিরুদ্ধে মঃ ক্রুশেভের অভিযোগ রাশিয়া ও চীনের মধ্যে বিরোধের সহিত নিবিড় ভাবে জড়িত তাহা

সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রাশিয়া ও মধ্যে বিরোধটা যে আদর্শগত বিরোধ রূপেই প্রতিভাত হইতেছে তাহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু এই আদর্শগত বিরোধের মধ্যেও রাশিয়া ও চীনের জাতীয় স্বার্থের দাবী প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক দিক হইতে চীনও অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশ অপেক্ষা রাশিয়া অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। রাশিয়া অনেক অকম্যুনিষ্ট দেশকেও অর্থ সাহায্য দিতেছে। চীন ও অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশ মনে করে যে, ঐ অর্থ সাহায্য কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার নিকট হইতে তাহাদেরই ন্যায্য প্রাপ্য। তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখিয়া রাশিয়া অকম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে অর্থসাহায্য দিতেছে। অবশ্য ক্রুশেভের সমস্যাও কম নয়। জীবনযাত্রার মানের উন্নতির জন্য রাশিয়ার জনগণের দাবী প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই দাবী পূরণের জন্য অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন। মঃ ক্রুশেভ এইজন্য যুদ্ধ এড়াইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। চীন ও আলবানিয়ার কাছে উহাই 'রিভিসনিষ্ট' নীতি বলিয়া মনে হইয়াছে। মঃ ক্রুশেভ নিজের দেশের জনগণের দাবীর চাপ এবং চীন প্রভৃতি কম্যুনিষ্ট দেশের দাবীর চাপের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিতেছেন। সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব কিনা তাহা বলা খুব সহজ নয়। কারণ, কম্যুনিজমের সাফল্যের জন্য রাশিয়া ও চীনের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামরিক মৈত্রী যে সুদৃঢ় থাকা প্রয়োজন তাহা মঃ ক্রুশেভও যেমন বুঝেন তেমনি বুঝেন মাও সে তুং। তেমনি রহিয়াছে পরস্পরবিরোধী জাতীয় স্বার্থ।

ষ্ট্যালিনের মৃতদেহ—

ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের কর্ম্মসূচী অবশেষে ষ্ট্যালিনের মৃতদেহ উচ্ছেদ পর্য্যন্তও যাইয়া পৌঁছিয়াছে। ১৯৫৩ সালের ৯ই মার্চ্চ হইতে ১৯৬১ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ষ্ট্যালিনের মৃতদেহ রেডস্কোয়ারের লেনিন মৌসলিয়ামেই ছিল। ঐ দিন রাত্রে উক্ত মৌসলিয়াম হইতে ষ্ট্যালিনের মৃতদেহ অপসারণ করা হয়। ৩০শে অক্টোবর রুশ-কম্যুনিষ্ট পার্টির ২২তম অধিবেশনে রেডস্কোয়ার হইতে ষ্ট্যালিনের মৃতদেহ অপসারণের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৫৩ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর রাশিয়া ও কম্যুনিষ্ট জগতে যাঁহার প্রভাব ছিল অপ্রতিহত, মৃত্যুর ৮ বৎসর পর তাঁহার মৃতদেহ রেডস্কোয়ার হইতে অপসারণ নাটকীয় ঘটনার মতই বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইবে। শুধু রেডস্কোয়ার হইতে তাঁহার মৃতদেহ অপসারণই নয় ষ্ট্যালিনের নামে যে সকল স্থান ও সহরের নাম বার করা হইয়াছিল তাহারও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ষ্ট্যালিনগ্রাডের নাম রাখা হইয়াছে ভলগাগ্রাড। ইউক্রাইনের বৃহৎ সহর ষ্ট্যালিনের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রাখা হইয়াছে ডোনেটস্ক। সাইবেরিয়ার বৃহৎ নগরী ষ্ট্যালিনস্কের নাম নোভোকুৎনেইস্ক। তবু এখন ষ্ট্যালিনের নাম একেবারে মুছিয়া ফেলা হয়ত সম্ভব হয় নাই।

ষ্ট্যালিনের নামে মস্কোর কোন বৃহৎ রাজপথের নামকরণ করা হয় নাই তবে মস্কোর সহরতলী অঞ্চলে অনেক ষ্ট্রীট ও এভিনিউয়ের নাম ষ্ট্যালিনের নামে রাখা হইয়াছে। মস্কোর ১৭টি বোরোর একটি নাকি এখনও ষ্ট্যালিনের নামই বহন করিতেছে। মস্কোর একটি সাবওয়ে ষ্টেশনের নাম ষ্ট্যালিনস্কায়া। ঐ নামটি নাকি এখনও রহিয়াছে। পরে হয়ত থাকিবে না। মস্কোর রাজপথগুলিতে এবং প্রকাশ্য স্থানে ষ্ট্যালিনের যে সকল ষ্ট্যাচু ছিল তাহাও অপসারণ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাঁহার নামে যে সকল মনুমেণ্ট ছিল সেগুলি ১৯৫৬ সালে ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের সুরু হইতে ক্রমে ক্রমে অপসারণ করা হইতেছে। একদিন যাঁহার প্রতাপ ছিল দুর্দ্দমনীয়, যাঁহার কথার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করিবার উপায় পর্যান্ত ছিল না যিনি নিজের অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য বিনা দ্বিধায় সম্পন্ন করিয়াছেন রাশিয়া হইতে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিবার আয়োজন চলিতেছে। রাশিয়ার ইতিহাস হইতে কম্যুনিজমের ইতিহাস হইতে তাঁহার নাম মুছিয়া ফেলা হয়ত সম্ভব হইবে না। কিন্তু তাঁহাকে গভীর কালিমালিপ্ত করিয়া চিত্রিত করা হইবে। ষ্ট্যালিনের তিন জন অন্তরঙ্গ সহযোগীকে পার্টি হইতে বহিষ্কারের প্রস্তাবও মস্কো কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছে। তাঁহাদের নাম: (১) মলটভ, ম্যালেনকভ এবং কাগানোভিচ। মলটভ মঃ ক্রুশেভের যে পরিকল্পনাকে বিপ্লব-বিরোধী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন কংগ্রেসে তাহা অনুমোদিত হইয়াছে। রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১৭৫ জন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১১০ জনই নূতন। ১৯৫৬ সালে যাঁহাদিগকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মনোনীত করা হইয়াছিল নূতন কমিটিতে তাঁহাদের অর্দ্ধেকই বাদ পড়িয়াছেন।

লুমুম্বার হত্যাকারী—

কঙ্গোর প্রথম প্রধান মন্ত্রী লুমুম্বার মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ গত ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬১) নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। ঐ নির্দ্দেশ অনুযায়ী তদন্তের যে রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, লুমুম্বার মৃত্যু সম্বন্ধে বিশ্বের জনগণ যে সন্দেহ করিয়াছিল তাহাই সত্য। লুমুম্বা এবং তাঁহার সহযোগী মিঃ ওকিটো ও মিঃ পোলার মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্তের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষ হইতে কমিশন গঠিত হইয়াছিল। এই তদন্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, লুমুম্বা এবং তাঁহার সহযোগী দুই জনকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র অনেক পূর্ব্বে করা হইয়াছিল। এই ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল ক্যাপ্টেন গাট নামক একজন বেলজিয়ান সামরিক কর্ম্মচারী এবং আর একজন বেলজিয়ান এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছে। শোম্বে এবং তাহার সহযোগীরা এই হত্যাকাণ্ডের সময় উপস্থিত ছিল বলিয়া তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন। শোম্বে সরকার লুমুম্বা ও তাঁহার সহযোগীদের মৃত্যু সম্বন্ধে যে-বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন তদন্তকারীরা উহার সমর্থক কোন প্রমাণ পান নাই এবং তাঁহারা উহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কাটাঙ্গার বাহিরে কেহ এই হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল কি না, তদন্তে তাহা প্রকাশ পায় নাই।

লুমুম্বা ও তাঁহার সহযোগীদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্তকার্য্য যে ব্যাপক ও গভীরভাবে করা হয় নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। লুমুম্বা এবং তাঁহার সহযোগীদ্বয় কঙ্গোর তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের বন্দী ছিলেন। ঐ সময় কেন্দ্রীয় সরকারের নায়ক ছিলেন কাসাভূবু, ইলিও এবং মবটু। তাহারা কেন এবং কি উদ্দেশ্যে লুমুম্বা ও তাঁহার সহযোগী দুইজনকে শোম্বের হাতে অর্পণ করিয়াছিল সে সম্বন্ধে কোন তদন্ত করা হয় নাই। কেন করা হয় নাই, তাহা কি খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়? লুমুম্বাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র এলিজাবেথভিল হইতে লিওপোল্ডভিল

পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। লুমুম্বাকে হত্যা করার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এড়াইবার জন্যই তাঁহাদিগকে শোম্বের হাতে অর্পণ করা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই হত্যার অপরাধে কাসাভুবু, ইলিও এবং মবটু শোম্বে অপেক্ষা কম অপরাধী নয়। সুতরাং এই দিক দিয়া এই তদন্ত শুধু অসম্পূর্ণই নয়, পক্ষপাতদুষ্টও বটে। আরও অনেক সত্য এই তদন্তের ফলে উদ্ঘাটিত হওয়া উচিত ছিল।

অশান্ত দক্ষিণ ভিয়েটনাম—

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে কাম্বোডিয়াতে শুধু কম্যুনিষ্ট কার্য্যকলাপের কথা কিছু শোনা যায় না। কম্বোডিয়াতে নিরপেক্ষ নীতি বেশ ভাল ভাবেই কার্য্যকরী হইতেছে, ইহাই তাহার কারণ। লাওসে যুদ্ধবিরতি চলিতেছে কিন্তু মীমাংসা এখনও দূরবর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়। অবস্থা উদ্বেগজনক বলিয়া মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। থাইল্যাণ্ডে কম্যুনিষ্ট সমস্যা বর্ত্তমানে তেমন প্রবল নয়। কিন্তু মার্কিণ সাহায্য সত্বেও শাসকবর্গ একটা আশঙ্কার মধ্যে বাস করিতেছেন। কিন্তু সমস্যাটা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে দক্ষিণ ভিয়েটনামে। প্রাক্তন মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেসের নীতিই উহার জন্য দায়ী। লাওসের অশান্তির মূলেও ডালেসের নীতিই রহিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী লাওস সম্পর্কে ডালেসের নীতি বর্জ্জন করিয়াছেন এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে লাওসের প্রতিষ্ঠায়ও তিনি সম্মত। প্রিন্স সুভান্না ফুমা অন্তর্বর্ত্তী সরকারের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তবু অবস্থা এখনও যথেষ্ট জটিল। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েটনামের অবস্থা ক্রমশঃ যেদিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে উহাই হয়ত আর একটি ঝটিকাকেন্দ্রে পরিণত হইবে। জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী দক্ষিণ ভিয়েটনামে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং সাধারণ নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ভিয়েটনাম গঠিত হইতে পারে নাই। এই অবস্থা ঘটিয়াছে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে। দক্ষিণ ভিয়েটনাম মার্কিণ সামরিক সাহায্য পাইতেছে। মার্কিণ সাহায্য ও সহযোগিতায় দক্ষিণ ভিয়েটনামের নিরাপত্তা বাহিনীকে সুশিক্ষিত করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট গরিলার সংখ্যা সরকারী সৈন্যের প্রতি ১০ জনে একজন মাত্র। কিন্তু কম্যুনিষ্ট গরিলারা নাকি মাও সে তুং যে-ভাবে চীন জয় করিয়াছেন সেই কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। পল্লীর কৃষকদের অভাব-অভিযোগের সুযোগ গ্রহণ করিয়া সংগ্রামের সমস্ত স্তরে তাহারা কৃষকদের সক্রিয় সমর্থন পাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের কার্য্যকলাপ নাকি দক্ষিণ ভিয়েটনামের অর্দ্ধেক অংশে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। এমন কি দক্ষিণ ভিয়েটনাম সরকার এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন যে, উত্তর ভিয়েটনাম এবং লাওসের কম্যুনিষ্ট অধিকৃত অঞ্চলের সাহায্যে লিবারেশন সরকার গঠনের চেষ্টাও করিতে পারে।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল ম্যাক্সওয়েল ডি টেইলর দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়া সফরে গিয়াছেন। তিনি সাইগনে পৌঁছিয়াছেন। তিনি দক্ষিণ ভিয়েটনামের প্রেসিডেণ্ট নো দিন দিয়েম-এর সহিত আলোচনা করিয়াছেন। দক্ষিণ ভিয়েটনামে ৬৮৫ জন মার্কিণ সামরিক উপদেষ্টা আছে। সামরিক উপদেষ্টার সংখ্যা এক হাজার হইতে দেড় হাজার করিবার কথাও হইতেছে। দক্ষিণ ভিয়েটনামে মার্কিণ সৈন্য পাঠান পণ্ডিত নেহরু সমর্থন করেন নাই। প্রেঃ কেনেডী পণ্ডিত নেহরুর যুক্তি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু মার্কিণ সামরিক সাহায্য বৃদ্ধি করিলে সঙ্কট আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিবে।

বিচ্ছেদ

শ্রীসুষমা মৈত্র

আসন্ন বিয়োগ-বিধুরা
মনের সেতারে বাজে
করুণ রাগিণী। অন্তর শকুন কান্নায় ভরা'।

হাজার হাজার বছর ধরে পাহাড়ে পর্ব্বতে, নদী নালায় ঝরণায়,
ঝির ঝিরে হাওয়ায়, খালে-বিলে, ধানের আলে আলে কত কথা
কয়েছ প্রণয়ে—
তোমার আমার ভালবাসা অনন্ত স্মৃতিভারে ভারাক্রান্ত বিশ্ব-চরাচর
সে কি এতই সহজ ভোলা ?

দুষ্মন্তের বিস্মৃতি, অভিশপ্ত দেবকন্যা শকুন্তলার বিচ্ছেদ ব্যথা,
কচ-দেবযানী, যক্ষ বিরহ সহিতে না পেরে কেঁদেছি দু'জনে
কত দিবস রজনী হয়ে গলাগলি। এই ত সেদিনের কথা।

নিস্তব্ধ ধ্যানরতা তাজমহলের পাশে বিস্ময়ে বিমূঢ়
হতাশ—ভুবাহু আলিঙ্গনে বক্ষে টেনে লয়েছিলে মমতাজ জ্ঞানে।
তারপর ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম এডওয়ার্ডের প্রেমে উদ্বুদ্ধ
কাল্পনিক পৃথিবীর অধীশ্বর পদ হেলায় বিসর্জ্জিলে।

রাধাকৃষ্ণ—প্রেমের চিরন্তন ভালবাসার জোয়ারে জোগাবে
সমুদ্রের ফেন টেউ তুলে তুলে বেহুলার ভেলায়
চলেছ লখীন্দর হয়ে। কখনও তো কোন দ্বিধা বাধ নাই মনে ?
এই ত সেদিন রামচন্দ্র সেজে তুমি শবরী বানিয়েছিলে মোরে।

হায় প্রিয়তম—প্রথম প্রণয় জোয়ারে ভুলেছিলে কি
ভেদাভেদ দেবকন্যা কি কিন্নরী প্রণয়ী তোমার ?
স্থিতির প্রশ্নে তাই আজি উজ্জ্বল মোহ-বিলোপে চৈতন্য উদিল ?
আমি তবু স্মৃতিভারে প্রতীক্ষিব চাতক নয়নে।

আইরিশ নাটকের গোড়ার কথা

শৈলেনকুমার দত্ত

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ইংরেজী নাটকে মূলতঃ আইরিশ নাট্যকারদের দানই সমধিক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত কোন আইরিশ নাটক রচিত হতে দেখা যায়নি। শেরিডান্‌, গোল্ডস্মিথ, অস্কার ওয়াইল্ড, বার্ণাড শ' প্রমুখ নাট্যকারেরা আয়র্ল্যাণ্ডের বিষয়বস্তু নিয়ে তখনও নাটক রচনায় ব্রতী হননি। এক নতুন আন্দোলনের ঋত্বিক উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস মাত্র বাইশ বছর বয়েসে লণ্ডনে এসে হেনলি, মরিশ, অস্কার ওয়াইল্ড, শ' প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন এবং এঁদের সাহায্যেই লণ্ডনে আইরিশ সাহিত্য সংস্থা স্থাপন করেন। এই সংস্থার সভ্য হিসেবে ছিলেন তদানীন্তন আইরিশ লেখক ও সাংবাদিকেরা।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি অনুরূপ একটি সাহিত্য সংস্থা স্থাপন করেন আয়র্ল্যাণ্ডে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এই সংস্থা থেকেই সৃষ্টি হয় আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় নাট্যকলা। জনসাধারণের মধ্যে রূপক এবং উপাখ্যানমূলক নাটকের জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্যে তখন আরও একটি আন্দোলন হয়। ইয়েট্‌স ব্যক্তিগত ভাবে এই আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন এবং বুঝতে পারেন যে এই আন্দোলনের ব্যাপক প্রচার হলে শুধু মাত্র আয়র্ল্যাণ্ডে নয়, সমস্ত জগতের চিন্তাধারার পরিবর্তন হবে। সাহিত্যের সমস্ত শাখার মধ্যে যে সার্থক অভিনয়ই মানুষকে বেশী প্রভাবান্বিত করে, ইয়েট্‌স নিজে এটি বুঝতে পেরে প্রচারের জন্যে নাটকই মনোনীত করেন। কিন্তু নাটক মঞ্চস্থ করার অনুকূলে যে সমস্ত ব্যবস্থা ছিল তার প্রায় সবই ছিল পেশাদারী নাট্যমঞ্চগুলিতে। কিন্তু ইয়েট্‌স নিজে এগুলিকে একদম পছন্দ করতেন না।

সুতরাং ডাবলিনের বিখ্যাত পৌরাণিক সঙ্গীত ভবনে আইরিশ সাহিত্য সংস্থার প্রথম নাটক অভিনীত হল ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে। এ অভিনয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নাটকের মূল বক্তব্যটুকু জনসাধারণের মধ্যে নিপুণ ভাবে দেখানো। কাজেই মঞ্চের সাজ-সজ্জার দিকে এঁরা একেবারেই নজর দেননি।

তারপর এ অভিনয়ের সূত্রপাত হয় লেডী গ্রেগোরী এবং একটি প্রতিশ্রুতিবান দলের সক্রিয় সহায়তায়। বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভাবে আয়র্ল্যাণ্ডের হলেও প্রথমের দিকে অভিনয় এবং প্রযোজনার ব্যাপারে সকলেই ছিলেন ইংলণ্ডের লোক।

এঁদের প্রথম অভিনয়ের জন্যে যে দুটি নাটক মনোনীত করা হয় সে দুটি হল ইয়েট্‌সের The Countless Cathleen আর এডওয়ার্ড মার্টিনের The Heather Field। এঁদের অভিনয় এ সময়ে এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে পরের বছরেই ডাবলিনের Gaiety Theatre তাঁদের মঞ্চে অভিনয় করার আমন্ত্রণ জানান।

ইংলণ্ডের অভিনেতা এবং প্রযোজক নিয়ে আইরিশ সাহিত্য সংস্থার এই অভিনয় কিন্তু খুব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ডাবলিনের St. Teresa's Hall-এ ডবলু, জি, ফে'র নেতৃত্বে আয়র্ল্যাণ্ডের একটি অপেশাদারী অভিনেতৃদল ইয়েট্‌স এবং লেডী গ্রেগোরীর সহায়তায় দুটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। জর্জ রাসেলের Deirdre এবং ইয়েট্‌সের Countess in Houlihan

এই অভিনয় থেকেই আয়র্ল্যাণ্ডের বিখ্যাত অভিনেতা এবং জাতীয় নাট্যশালার জন্ম হয়। ১৯০৪ সালে মিস এ, ই, এফ, হর্নিম্যান-এর আর্থিক দানে ডাবলি শহরে এঁদের স্থায়ী আশ্রয় Abbey Theatre নির্ম্মিত হয়। এই অভিনব থেকে আয়র্ল্যাণ্ডের অনেক নতুন প্রতিভা নাটক রচনার অনুপ্রেরণা পান এবং আইরিশ অভিনেতারা আয়ের বৃদ্ধি দেখে প্রযোজনার ভার সম্পূর্ণ ভাবে নিজেদের দায়িত্বে আনেন। তাঁরা বুঝতে পারেন যে লাভের চেয়ে শিল্প এবং সাহিত্য সৃষ্টির মূল্য অনেক বেশী।

এঁদের এই মনোবৃত্তির জন্যেই আইরিশ সাহিত্য সংস্থার প্রধান কর্ণধার ইয়েটসের Countless Cathleen এবং The Land of Heart's Desire নামে যে দুখানি নাটক অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে—সে দুখানিই লেখা হয় কবিতার চমৎকারিত্বে। ইয়েটস ছিলেন মূলত কবি; সেই জন্যেই তিনি নাটক রচনায় নাটকীয় গতির চেয়ে কবিত্বকে অধিক মূল্য দিতেন।

অবশেষে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় নাট্যশালার নাট্যকারদের তালিকায় দুটি নতুন নাম সংযোজিত হল: লেডী গ্রেগোরী আর জে, এম, সিঙ্গ। ইয়েটস এবং এই দুই জন নাট্যকারই হলেন আধুনিক আইরিশ নাট্যকারদের পুরোনো শাখার দিকপাল।

অবশ্য নতুন শাখাতেও তিনটি নতুন নামের সংযোজন হল: সেণ্ট জন আরভিং, রবিনসন্‌ ও সীন ও' ক্যাসী। ঠিক এই সময়েই ইয়েট্‌স আবার রূপক এবং উপন্যাসধর্ম্মী নাটকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আইরিশ নাট্যসাহিত্যের গতি শহর এবং গ্রাম জীবনের দিকে ঝুঁকতে থাকে। নতুন জীবনধারায় ন্যায় আইরিশ নাট্যসাহিত্যও সমৃদ্ধ হতে থাকে নতুন ভাবে।

মা

নারীত্বের পূর্ণতা মাতৃত্বে। নারীকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে—প্রথম স্তরে সে নন্দিনী, দ্বিতীয় স্তরে সে ঘরণী, তৃতীয় বা চরম

তবে সে জননী—এইখানেই তার পরিপূর্ণতা, তার সার্থকতা। মাতৃত্বের পিপাসা নারীর সহজাত। এই মাতৃত্বপিপাসার অভিব্যক্তি বিভিন্ন ধরণের নারীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারে দেখা দেয়। চরিত্র-বৈচিত্র্যের উপরেই এই অভিব্যক্তির স্বরূপ নির্ণীত হয়। এই বক্তব্যকে পটভূমি করেই সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী স্বর্গীয়া অনুরূপা দেবীর 'মা' কাহিনীটি রূপ নিয়েছে। অনুরূপা দেবীর লেখনী থেকে বাঙলা সাহিত্যের কোষাগার যে সব উজ্জ্বল রত্ন লাভ করেছে, 'মা' তাদেরই মধ্যে অন্যতম। মায়ের গল্পাংশ বহুজনপঠিত ; সুতরাং বিস্তৃতভাবে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। কাহিনীর বৈশিষ্ট্য এইখানেই, ব্রজরাণী যতদিন পর্য্যন্ত অজিতের দেখা পায় নি ততদিন পর্য্যন্ত অজিত সম্বন্ধে তার বিমাতৃসুলভ মনোভাব পুরোমাত্রায় ছিল ; কিন্তু যখন অজিতের সে প্রথম দেখা পেল তখনই তার নিজেরই অজ্ঞাতে তার মনের রুদ্ধ দুয়ারের অর্গলগুলো এক-এক করে খুলতে আরম্ভ করল। রূপকথায় যেমন রাজপুত্রের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ঘুমন্ত রাজপুরীটা জেগে উঠল, তেমনই অজিতই ব্রজরাণীর সুপ্ত মাতৃত্বকে জাগিয়ে দিল। তার পর প্রথম প্রথম হয় তো সংকোচে, নয় তো কোন কল্পিত বাধায় সে এই স্নেহ প্রকাশ করেনি, মুখে বিমাতৃসুলভ মনোভাবই দেখিয়ে গেছে। পরে আর সে চেপে রাখতে পারে নি তার আপন স্নেহ। সর্ব্বশেষে অজিতের মাতৃসম্বোধনে কাহিনীর সমাপ্তি, এইখানে এক ব্রজরাণীর মধ্যেই অনুরূপা দেবী চিরন্তন মাতৃত্বের এক অনবদ্য আলেখ্য অঙ্কিত করে গেছেন।

ছবিটি পরিচালনায় চিত্ত বসু সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। ছবির গতি অব্যাহত, কোথাও শৈথিল্য নেই। ঘটনার বৈচিত্র্যে কোথাও কোনপ্রকার একঘেয়েমি থাকে না। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, আঘাত, দ্বন্দ্ব, বিরহ-মিলন দর্শকের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। এর আবেগধর্ম্মিতা মনকে অভিভূত করে ফেলে, ব্রজরাণীর মাতৃত্বের হাহাকার হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে স্পর্শ করে।

অভিনয়ে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য সন্ধ্যারাণী দেবীর নাম। সন্ধ্যারাণী এই চরিত্রে এক অসাধারণ শক্তির স্বাক্ষর রেখে গেলেন। ব্রজরাণী জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অভিনয়ে। বিকাশ রায়ের ও দীপ্তি রায়ের যথাক্রমে অরবিন্দ ও মনোরমা চরিত্রের অভিনয়ও প্রশংসার্হ। তাঁদের অভিনয়ে চরিত্রগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্যকরূপে প্রকটিত হয়েছে। অজিত চরিত্রে শ্রীমান বাবলু ও শ্রীমান পার্থেরও অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। শ্রীমানদ্বয়ের অপূর্ব্ব অভিনয় যে কোন হৃদয়ে সাড়া জাগাবে। ছবি বিশ্বাস, সন্তোষ সিংহ, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তমাল লাহিড়ী, জহর রায়, অনুপকুমার, অপর্ণা দেবী, সীতা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। শরৎশশীর ভূমিকায় অনুভা গুপ্তার অভিনয় এককথায় অনবদ্য। ছবিটির প্রসঙ্গে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে এই ছবিতে শিশিরোত্তর ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র একটি ছোট পার্শ্বচরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

আহ্বান

একটি মিষ্টি-মধুর প্রেমোপাখ্যানকে কেন্দ্র করে আহ্বান ছবিটির গল্পাংশ গড়ে উঠেছে। এক গ্রাম-প্রেমিক শিক্ষিত যুবক এ কাহিনীর নায়ক আর একটি গ্রাম্য-কিশোরী এর নায়িকা। তাদের প্রণয়-কাহিনীকেই পল্লবিত করা হয়েছে এবং সর্ব্বশেষে তাদের মিলনে কাহিনীর সমাপ্তি। মূলতঃ প্রেমোপাখ্যান হলেও আহ্বানের গল্প কেবলমাত্র প্রণয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। মাতৃস্নেহ গল্পের অন্যান্য সবগুলি দিকের তুলনায় প্রমূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। কাহিনীর নায়ক হিন্দু ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব, এক অতি বৃদ্ধা মুসলমানী তাকে তার সমস্ত স্নেহ উজাড় করে ঢেলে দিল। সেই স্নেহের সঙ্গে একমাত্র মাতৃস্নেহেরই তুলনা চলে। মাতৃস্নেহ জাত মানে না, সমাজ মানে না। জাত ও ধর্ম্মের দোহাইয়ে বৃদ্ধা ও নায়কের মধ্যে রক্ষণশীল সমাজ অনেক উচ্চ প্রাচীর সৃষ্টি করেছিল ; কিন্তু আন্তরিকতার প্রাবল্যে সে বাধার প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। এই ভাবে আহ্বান ছবিটির মধ্যে হৃদয়ধর্ম্মের জয়গান বিঘোষিত হয়েছে।

এই কাহিনীর যিনি স্রষ্টা, বাঙলা সাহিত্যের আকাশে তিনি এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অবিস্মরণীয় গল্পগুলির মধ্যে 'আহ্বান' অন্যতম। এর চিত্ররূপ দিয়েছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। চিত্রায়নে তিনি মূল কাহিনীর কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করেছেন। ছবিটি পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালক অশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই হৃদয়ধর্ম্মী কাহিনীর যথাযথ পরিচর্য্যা ঘটেছে তাঁর কুশলী হাতে। যে প্রেমকে কেন্দ্র করে নায়ক-নায়িকা বিকাশলাভ করেছেন, সেই প্রেমের বিস্তার এবং বিন্যাস ঘটিয়েছেন খুব দক্ষতা সহকারে। ছবিটিকে তিনি অযথা ভাবে ভারাক্রান্ত করেননি, মূল বক্তব্যটুকু বজায় রাখতে গিয়ে কোথাও কোন অসঙ্গতির পরিচয় দেননি ; ফলে কাহিনীর পরম্পরা কোথাও হারিয়ে যায়নি। সমগ্র ছবিটির মধ্যে পরিচালক এক শোভন রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। যে প্রেম শান্ত ও মধুর রসের সংমিশ্রণে রূপ পায়, যে প্রেম হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তি থেকে জন্ম নেয়, যে প্রেম উপলব্ধি ও অনুভূতির মধ্যে পূর্ণতা পায়, আহ্বানে সেই জাতীয় প্রেমের ছায়াপাত ঘটেছে। এরা বক্তব্য অন্তরের গহন কন্দরে গভীর ভাবে আবেদন জাগিয়ে তোলে। পরিচালকের রসবোধ ও শিল্পজ্ঞান অভিনন্দনীয়। সব চেয়ে আনন্দের বিষয় কাহিনীর মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র অশালীনতা নেই।

নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় প্রশংসনীয় অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। গঙ্গাপদ বসু, প্রেমাংশু বসু, প্রশান্তকুমার, অনুপকুমার, শোভা সেন, গীতা দে, শিপ্রা মিত্র, লিলি চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান সুখেন, নিভাননী দেবী, পারিজাত বসু, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আপন আপন চরিত্রে সুঅভিনয়ই করেছেন। প্রবীণা অভিনেত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী বৃদ্ধা মুসলমানীর ভূমিকাটিকে জীবন্ত করেছেন আপন অনন্যসাধারণ অভিনয়ে। সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করেছেন বাংলার তথা ভারতের স্বনামধন্য শিল্পী শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক। বলা বাহুল্যমাত্র যে, সঙ্গীতাংশ তাঁর প্রতিভার যথাযোগ্য পরিচয়ই বহন করে। আবহসঙ্গীত এবং কণ্ঠসঙ্গীত সবিশেষ উপভোগ্য হয়েছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ছবিটির সাফল্য কামনা করি।

কেন ছায়াছবিতে এলাম

প্রখ্যাতা অভিনেত্রী শ্রীমতী সবিতা বসু

১৯৫৩ থেকে ১৯৬১ সাল। ক' বছরই বা। কিন্তু এরই মধ্যে শ্রীমতী সবিতা বহু চিত্রের মুখ্য চরিত্রে অবতরণ করে

চলচ্চিত্র শিল্প জগতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরই সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় একটা দিনস্থির করে গেলাম তাঁর বাড়ী।

কেয়া ফুলের স্তবক অথবা Oriental Artএর কোন ছবি হয়তো ঘরের মধ্যে নেই, তবে এটা যে কোন শিল্পী বা সাহিত্যিকের ঘর তা দেখলেই অনুমান করা যায়।

এবার বলুন, আপনার অভিনয় জগতে আসার গোড়ার কথাটা। নেহাৎ সখের তাগিদেই কি এ লাইনে এসে যোগ দিয়েছিলেন?

আমার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী বসু বললেন, হাঁ একরকম সখের তাগিদেই বলতে পারেন। বাবার সঙ্গে একটা functionএ যোগ দিতে গিয়েছিলাম সেই সময় পরিচয় হয় পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনিই বাবাকে রাজী করিয়ে আমাকে চলচ্চিত্রে যোগ দেবার সুযোগ করে দেন। তবে তখন সেটা ছিল সখ, পরে তাই-ই হয়ে দাঁড়ায় নেশা এবং পেশা।

আমার অপর একটা প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী বসু ধীরে ধীরে বললেন, ১৯৫৩ সালে শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "আজ সন্ধ্যায়" আমি প্রথম চিত্রাবতরণ করি। Atmosphere সব সময়ই আমার বেশ lovely ছিল। সুধীরদা' আমাকে হাতে করেই একরকম গড়ে তোলেন। তবে আনন্দ বা তৃপ্তি সবচেয়ে বেশী পেয়েছি কোন্ বইতে যদি জিগ্যেস করেন—তাহলে বলব নির্মল দে পরিচালিত "দুজনায়" এবং বিকাশ রায় পরিচালিত "অর্দ্ধাঙ্গিনী" ছবিতে। প্রথমটা বেশী দিন চলেনি তবে দ্বিতীয়টি বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছিল।

ছবিতে যোগদানের পর সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে কোন পরিবর্ত্তন এসেছে কিনা—এ প্রশ্ন করাতে শ্রীমতী বসু বললেন, কি বিবাহের আগে কি পরে কোন ক্ষেত্রেই আমার সে রকম কোন পরিবর্ত্তন আসেনি। বরঞ্চ বলা চলে বিবাহের পর আনন্দটা আরও বেশী পাই। কারণ একদিকে আর পাঁচজন গৃহস্থ বধূর মত স্বামী শ্বশুর-শাশুড়ীর ঘর করছি আবার অন্যদিকে অবসর সময়ে গিয়ে শুটিং করে আসছি অবশ্য স্বামী এবং শাশুড়ীর অনুমতি পেয়েই। এ ছাড়া

শ্রীমতী সবিতা বসু

শ্রীমতী বসু বললেন, হাতে যেদিন সময় থাকে সেদিন সকলকে নিয়ে হিন্দী, ইংরাজী, বাংলা যে বই হয় একটি দেখে আসি।

এই প্রসঙ্গে আমি প্রশ্ন করলাম, কি রকম বই দেখতে আপনি ভালবাসেন?

বেশ মারপিঠ হৈ-হুল্লোড় থাকবে এরকম বই।

আপনার নিজের অভিনীত বই দেখেন কি? এবং তখন আপনার উপর তার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়?

দেখি এবং যতগুলি সম্ভব। আর যখনই দেখি তখনই মনে হয় এর চেয়ে আরো ভাল করা উচিত ছিল। এখানটায় কথাগুলো অত top voice বলা উচিত হয়নি। ওখানটায় কান্নাটা যেন বড় বিশ্রী ভাবে ফুটে উঠেছে বলেই হেসে উঠলেন শ্রীমতী বসু।

আচ্ছা Public stage এ আপনাকে অভিনয় করতে দেখি না কেন? সেখান থেকে কোন offer কোনদিন আসে নি কি?

সব বড় বড় Professional stage থেকেই offer এসেছিল কিন্তু আমি রাজী হইনি। কারণ আগাগোড়াই stageকে আমার যেন কেমন ভয় ভয় লাগে। তা ছাড়া আমার বাবা stage এ নামাটা যেমন পছন্দ করতেন না, তেমনি বিয়ের পর আমার স্বামীও সেটা ঠিক পছন্দ করেন না।

আচ্ছা প্রযোজক, পরিচালক এবং সাহিত্যিক গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু কি আপনার স্বামী?

হাঁ। ছোট্ট করে উত্তর করলেন শ্রীমতী বসু।

সম্প্রতি কোন বই কি তিনি প্রযোজনা করছেন?

না, কারণ উপন্যাস লেখা নিয়ে তিনি এখন ব্যস্ত আছেন। লক্ষ্য করেছেন বোধ হয় বসুমতীতেই তাঁর একখানি উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

তাঁর লেখা পড়তে আপনার কেমন লাগে।

ঠিক আমার অভিনীত চরিত্র যখন দেখি রূপালী পর্দায় তেমনি।

অর্থাৎ শ্রীমতী বসু বললেন, লেখাটা পড়ার পর মনে হয় ইচ্ছে করলে এটা আরো ভাল করা যেত। আর তখনই ওনার উপর খবরদারি চালাই। বলেই হাসিতে সারা মুখখানা ভরিয়ে তুললেন।

আপনার কি মনে হয় এই শিল্পে শিক্ষিত পরিবারের ছেলে মেয়েদের আরো বেশী করে যোগদান করা উচিত।

নিশ্চয়ই উচিত। শ্রীমতী সবিতা বসু বললেন, তাতে করে এ শিল্প দিন দিন আরো উন্নতি লাভ করবে।

আমি তাঁকে শেষ প্রশ্ন করলাম। কাল থেকে যদি নীতিবাগীশদের কারণে চলচ্চিত্র শিল্প অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় তা হলে আপনি কি করবেন? কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করবেন?

যাতে সেটা না হয় অভিনেত্রী হিসেবে যেটুকু করার প্রয়োজন আমি সেটুকু করবো। আর তা যদি সম্ভব না হয় তা হলে এক ভেবে নিয়ে শ্রীমতী সবিতা বললেন, যেমন ঘর-সংসার করছি তেমনি করব। বলে আবার হেসে উঠলেন।

এবার তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু বলি। শ্রীমতী সবিতা বসুর পিতার নাম শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আসল বাড়ী ঢাকা ডালটনগঞ্জ। কিন্তু পিতা মিলিটারী অফিসার থাকার দরুণ না

স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তারপর কলকাতায় এসেই বহুদিন বসবাস করেছিলেন। বর্তমানে শ্রীমতী বসু স্বামী, একমাত্র কন্যা টুসটুসি ও আর সকলকে নিয়ে এক দিকে যেমন শান্ত মাতৃত্বের পূর্ণতায় মহিমান্বিতা, তেমনি অপর দিকে দক্ষ অভিনেত্রী হিসেবেও সুপ্রতিষ্ঠিতা। —শ্রীজানকাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদ-বিচিত্রা

যে সকল ছায়াচিত্র কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যেই প্রদর্শিত হয় সেগুলিকে 'A' চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করার রীতি আছে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই চিহ্নিতকরণ প্রায়শঃই ব্যর্থতা বরণ করে থাকে অর্থাৎ অপ্রাপ্তবয়স্কের দলও প্রেক্ষাগৃহে ঢোকায় বাধা পায় না সুতরাং সে ক্ষেত্রে এই রীতির কোন অর্থই থাকে না। সম্প্রতি এ বিষয়ে পাঞ্জাব ষ্টেট চিলড্রেন্স ফিল্ম কমিটি পাঞ্জাব সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তার ফলে নির্দিষ্ট নিয়ম যাতে যথাযথভাবে পালিত হয় সে সম্বন্ধে পাঞ্জাবের রাজ্য সরকার প্রেক্ষাগৃহগুলিকে বিশেষভাবে সতর্ক এবং অবহিত করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সাব-ডিভিশনাল অফিসারদের উদ্দেশেও সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রেরিত হয়েছে।

অল্পকাল আগে অন্ধ্র প্রদেশ কালচারাল ফেসটিভ্যাল কমিটি শ্রীনাগেশ্বর রাওকে এক সম্বর্ধনার দ্বারা আপ্যায়িত করেন ও দেশবাসীর পক্ষ থেকে নাগেশ্বর রাওএর কর্মপ্রচেষ্টার উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন নিবেদন করেন। সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে শ্রীরাও নাট্যকলার উন্নয়নের প্রতি সরকারী দীর্ঘসূত্রতা ও উদাসীনতা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করেন। তাঁর ভাষণের সারমর্ম—বিজয়ওয়াদায় একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সরকারী লাল ফিতার মহিমায় চার বছরেও তা কার্যকরী হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন না। এই শৈথিল্যই কাজের সফলতা সম্বন্ধে তাঁর মনে যথেষ্ট নিরাশা সৃষ্টি করছে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু পৃথিবীর নানা অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন। মার্কিণ মুল্লুকেও তিনি একাধিকবার গেছেন। তবে তাঁর সাম্প্রতিক য্যামেরিকা ভ্রমণের মধ্যে অন্যান্য য্যামেরিকা সফরগুলির তুলনায় কিছু বিশেষত্বের স্পর্শ পাওয়া যায়। লস য্যাঞ্জেলসে এই তাঁর প্রথম পদার্পণ। ডিসনিল্যাণ্ড তিনি খুঁটিয়ে দেখেছেন। হলিউডের চিত্রসাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন, পাঠক-পাঠিকার তা আর অজানা নেই। সেখানে য্যামব্যাসেডার হোটেলের রয়্যাল স্যুটে শ্রীনেহরু কয়েকটি বিশিষ্ট অতিথিকে মধ্যাহ্নভোজনে আপ্যায়িত করেছেন। অভ্যাগতদের মধ্যে আলডুস হাক্সলি, কার্ল স্যাণ্ডবুর্গ, ক্রিষ্টোফার ইসারউড, আরভিং-ষ্টোন, মার্লন ব্র্যাণ্ডো এবং ড্যানি কে প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাই চিত্রজগতের নবীন নায়কদের মধ্যে মনোজ আজ যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। বিভিন্ন চিত্রে অভিনয় করে তিনি সুনামের অধিকারী হয়েছেন। সম্প্রতি বাহার ফিল্মসের সাদী চিত্রে অভিনয় করার সময় শিল্পী এক দুর্ঘটনার কবলে পতিত হয়েছেন। অভিনেয় অংশটি ছিল—কেশব রাধার কাছ থেকে সায়রা বানুকে উদ্ধার করার জন্যে মনোজ একটি জানালা খোলার চেষ্টা করছেন। সেই জানালাটি খোলবার চেষ্টা করতেই তাঁর হাতে প্রচণ্ড আঘাত লাগে এবং হাত কেটে গিয়ে রক্তনিঃসরণ হতে থাকে। বলা বাহুল্য তৎক্ষণাৎ প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

মনস্তত্ত্ববিজ্ঞার ইতিহাসে ফ্রয়েড একটি অবিস্মরণীয় নাম। আজকের দিনে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি তার মূলে তাঁর অবদান অতুলনীয়। মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষের মনে এক নতুন অর্থবোধের সৃষ্টি করে মনস্তত্ত্ববিজ্ঞার নতুন ভাষ্য রচনা করলেন তিনি। এই আধুনিক মনস্তত্ত্ববিজ্ঞার জনকের জীবনী ও কর্মধারা অবলম্বন করে একটি ছায়াছবি নির্মাণের পরিকল্পনা করেন জন হাষ্টন ১৯৩৮ সালে। কিন্তু যুদ্ধ এবং আনুষঙ্গিক আরও নানা বাধা-বিপর্যয়ের ফলে এই পরিকল্পনার রূপায়ণ ঘটে ওঠে নি। সম্প্রতি দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার রূপ দিতে অগ্রসর হয়ে হাষ্টন আবার বাধার সম্মুখীন হলেন, আর এ বাধা দুর্লঙ্ঘ্য নয়, অলঙ্ঘ্য। ফ্রয়েডের পুত্র আর্ণেষ্ট ফ্রয়েড এবং কন্যা ডাঃ য্যানা ফ্রয়েড এই পরিকল্পনায় তাঁদের অসম্মতি জানিয়েছেন। সুতরাং..

বিগত যুগের হলিউড-চিত্রজগতে রাডলফ ভ্যালেণ্টিনো ছিলেন একটি অবাক বিস্ময়। মাত্র একত্রিশ বছরের জীবনে যে বিপুল জনপ্রিয়তা তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন, সেদিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ কোন দ্বিতীয় জনকে দেখা গেল না। সেদিক দিয়ে তিনি আজও অপরাজেয়। চিত্রামোদীদের মনে ভ্যালেণ্টিনো যে অভূতপূর্ব দোলা লাগিয়েছিলেন, সমকালীন ইতিহাসই তার প্রধান সাক্ষ্য। তাঁর অভিনীত চিত্রগুলির মধ্যে "ফোর হর্সমেন অফ দ্য য্যাপোক্যালিপ্স"'র নাম উল্লেখযোগ্য। এই ছবিটি ভ্যালেণ্টিনোকে বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল। বর্তমানে সেই বিখ্যাত ছবিটি পুনরায় গৃহীত হচ্ছে বলে জানা গেল। ভ্যালেণ্টিনোর স্মৃতির উদ্দেশে বর্তমানকালে সারা হলিউডের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবেই ছবিখানি বিবেচিত হবে। ভ্যালেণ্টিনো অভিনীত ভূমিকাটি এবার রূপদান করবেন ছেচল্লিশ বছর বয়স্ক প্রখ্যাত অভিনেতা গ্লেন্ ফোর্ড।

সৌখীন সমাচার

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকার কর্মী সংঘের উদ্যোগে 'বঙ্গে বর্গী' নাটকটির অভিনয় সুসম্পন্ন হল। নন্দলাল মান্নার পরিচালনায় বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন ক্ষীরোদকুমার মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় খাণ্ডা, তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, দীপা হালদার, সুদর্শন মুখোপাধ্যায়, দেবীকুমার ভট্টাচার্য্য, প্রভরঞ্জন রাহা, পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী, মতিলাল মাইতি, অমলকুমার দত্ত, উপেন্দ্রনাথ শীল, তৃষ্ণা দত্ত ও বাণী রায়।

খ্যাতিমান নাট্যকার কিরণ মৈত্রের বারো ঘণ্টা মঞ্চস্থ হল তালদহ তরুণ দলের উদ্যোগে এবং হিমাংশু ঘোষের পরিচালনায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন প্রবোধ ঘটক, হিমাংশু ঘোষ, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদর্শন সিংহ রায়, তারাপদ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, গোপীনাথ চৌধুরী, ক্ষেত্রমোহন ঘটক, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সরস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী ঘোষ ও কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।

কার্ত্তিক, ১৩৬৮ (অক্টোবর-নভেম্বর, '৬১)

অন্তর্দেশীয়—

১লা কার্ত্তিক (১৮ই অক্টোবর) : বিহারের পাটনা ও মুঙ্গের জেলায় গঙ্গা নদীতে পুনরায় জলস্ফীতি—জনগণের অপরিসীম দুঃখ-দুর্দ্দশার সংবাদ।

২রা কার্ত্তিক (১৯শে অক্টোবর) : ঘাটশীলার অদূরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা—আপ হাওড়া-রাঁচী এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হওয়ায় ড্রাইভার সহ ৫০ জন নিহত ও প্রায় দুইশত জন যাত্রী আহত।

৩রা কার্ত্তিক (২০শে অক্টোবর) : 'গোয়ার মুক্তি অর্জ্জনের প্রয়োজনে ভারত সশস্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণের পথ বাতিল করিতেছে না'—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সতর্কবাণী।

৪ঠা কার্ত্তিক (২১শে অক্টোবর) : নয়াদিল্লীতে পুলিশ শত-বার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন—উদ্বোধনী ভাষণ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর উক্তি : অপরাধ বোধ ও অপরাধীদের খুঁজিয়া বাহির করাই পুলিশ বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব।

৫ই কার্ত্তিক (২২শে অক্টোবর) : অসুস্থতাহেতু প্রথম রুশ মহাকাশচারী গাগারিণের প্রস্তাবিত ভারত সফর স্থগিত—সোভিয়েট সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে ঘোষণা।

৬ই কার্ত্তিক (২৩শে অক্টোবর) : কেরলের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় ভাঙ্গন ধরিবার আশঙ্কা—সাংবাদিকদের নিকট কেরল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপট্টম থানু পিল্লাই'র বিবৃতি।

৭ই কার্ত্তিক (২৪শে অক্টোবর) : পার্ব্বত্য নেতৃ সম্মেলনের আহ্বানে পৃথক পার্ব্বত্য রাজ্য গঠনের দাবী জোরদার করার জন্য শিলং-এ পূর্ণ হরতাল।

৮ই কার্ত্তিক (২৫শে অক্টোবর) : 'ভারতভূমি হইতে সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটন করিতে হইবে'—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর দৃঢ় দাবী।

৯ই কার্ত্তিক (২৬শে অক্টোবর) : মহানগরীর (কলিকাতা) আকাশে পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত তেজস্ক্রিয় ভস্মের পরিমাণ বৃদ্ধি—বিভিন্ন বিজ্ঞানী মহলের অভিমত প্রকাশ।

১০ই কার্ত্তিক (২৭শে অক্টোবর) : পণ্ডিচেরী, মাহে ও কারিকল পৌরসভা নির্ব্বাচনে কংগ্রেস কর্ত্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন অধিকার।

১১ই কার্ত্তিক (২৮শে অক্টোবর) : কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী কর্ত্তৃক পুরুলিয়ায় তিন দিবসব্যাপী কংগ্রেস রাজনৈতিক সম্মেলনের উদ্বোধন।

গোয়ায় বিকল্প সরকার গঠনের জন্য মুক্তি-সংগ্রামীদের সিদ্ধান্ত—গোয়া-দমন-দিউ জাতীয় অভিযান কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমতী অরুণা আসফ আলির ঘোষণা।

১২ই কার্ত্তিক (২৯শে অক্টোবর) : উত্তর রেলপথে মেনপুরা ও ভেলগাঁও ষ্টেশনের মধ্যে টুণ্ডলা-ফরাক্কাবাদ প্যাসেঞ্জার লাইনচ্যুত—ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান সহ ২০ জন যাত্রী নিহত ও ৬১ জন আহত।

পুরুলিয়া সম্মেলনে শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রদেশ কংগ্রেসের (পশ্চিমবঙ্গ) সভাপতি নির্ব্বাচিত।

১৩ই কার্ত্তিক (৩০শে অক্টোবর) : 'দেশের ৪টি রাজ্যে (পশ্চিমবঙ্গ সহ) সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা ও অন্যান্য রাজ্যে অগ্রগতি'—দিল্লীতে রাজ্য সমবায় মন্ত্রী সম্মেলনের প্রসঙ্গে শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

১৪ই কার্ত্তিক (৩১শে অক্টোবর) : পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে বৈষম্যাচরণের অভিযোগ তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক কমিশন নিয়োগ—চেয়ারম্যান : প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীএস্. আর. দাশ।

১৫ই কার্ত্তিক (১লা নভেম্বর) : 'যুদ্ধায়োজনে সমস্যার সমাধান নাই, ভারত প্রবর্ত্তিত সহ-অবস্থান নীতিই বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ'—কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার-এর নব-নির্ম্মিত ভবনে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সম্মেলনে শ্রীনেহরুর উদ্বোধনী ভাষণ।

১৬ই কার্ত্তিক (২রা নভেম্বর) : পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও আণবিক অস্ত্র-নিষিদ্ধকরণের দৃঢ় দাবী—রুশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের কলিকাতাস্থ কনসালেটের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন।

১৭ই কার্ত্তিক (৩রা নভেম্বর) : ভারতের প্রথম বিমানবাহী জাহাজ 'বিক্রান্ত' বোম্বাই-এ উপনীত—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক পূর্ণ সামরিক কায়দায় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন।

১৮ই কার্ত্তিক (৪ঠা নভেম্বর) : গ্রামের মানুষ ও তাহাদের সমস্যাবলীর সহিত পরিচিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ—বাঁকুড়ার শালতোড়ায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নির্ব্বাচনী ভাষণ।

১৯শে কার্ত্তিক (৫ই নভেম্বর) : 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ভারত-আত্মার মূর্ত্ত প্রতীক'—স্বর্গত মহান জননায়কের ৯২তম জন্ম-দিবসে জাতির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

২০শে কার্ত্তিক (৬ই নভেম্বর) : 'কলিকাতার বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত তেজস্ক্রিয় আণবিক ভস্ম হইতে ক্ষতির আশঙ্কা নাই'—স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন বসুর অভিমত।

২১শে কার্ত্তিক (৭ই নভেম্বর) : 'উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক-মালিক সহযোগিতা অত্যাবশ্যক'—'শিল্পে লোকবল নিয়োগ' শীর্ষক আলোচনাচক্রে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণ।

২২শে কার্ত্তিক (৮ই নভেম্বর) : দক্ষিণ রেলপথের কোসগি ষ্টেশনে মাদ্রাজ-বোম্বাই জনতা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত—দুর্ঘটনায় ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান নিহত ও ৯ জন যাত্রী আহত।

২৩শে কার্ত্তিক (৯ই নভেম্বর) : কেরলে মসলেম লীগ কর্ত্তৃক কংগ্রেস ও পি. এস্. পি দলের সহিত সম্পর্ক (কোয়ালিশন) ছিন্ন।

২৪শে কার্ত্তিক (১০ই নভেম্বর) : 'ঘরোয়া আচার-অনুষ্ঠান-সমূহ জাতীয় ঐক্যের প্রতীক'—কলিকাতায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ফোঁটা গ্রহণান্তে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের (৮০) ভাষণ।

২৫শে কার্ত্তিক (১১ই নভেম্বর) : ভারতীয় সামরিক অফিসার লেঃ কর্ণেল ভট্টাচার্য্যের উপর পাক সামরিক আদালতের কঠোর দণ্ডাদেশে ভারত সরকার স্তম্ভিত—সর্ব্বমহলে বিচার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ।

২৬শে কার্ত্তিক (১২ই নভেম্বর) : স্বতন্ত্র পার্টির সহিত

উড়িষ্যার গণতন্ত্র পরিষদের সংযুক্তি প্রস্তাব—গণতন্ত্র পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে অনুমোদিত।

২৭শে কার্ত্তিক (১৩ই নভেম্বর): কর্ণেল ভট্টাচার্যের মুক্তির জন্য ভারত সরকারের উদ্যম—দিল্লীতে পাক হাই কমিশনারের (মিঃ হিলালী) সহিত ভারতীয় পররাষ্ট্র বিভাগীয় স্পেশাল সেক্রেটারী তায়েবজীর আলোচনা।

২৮শে কার্ত্তিক (১৪ই নভেম্বর): ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (উপ-রাষ্ট্রপতি) কর্ত্তৃক দিল্লীতে বৃহত্তম শিল্পমেলার উদ্বোধন।

২৯শে কার্ত্তিক (১৫ই নভেম্বর): প্রবীণ কম্যুনিষ্ট নেতা বিধান সভা সদস্য শ্রীবঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের (৬৫) লোকান্তর।

৩০শে কার্ত্তিক (১৬ই নভেম্বর): পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প বামপন্থী সরকার (কংগ্রেসের পাল্টা) গঠনের আহ্বান—কলিকাতা ময়দানে জনসভায় সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রণ্টের নির্ব্বাচনী অভিযানের উদ্বোধনে বিভিন্ন দলপতিদের ভাষণ।

বহির্দেশীয়—

১লা কার্ত্তিক (১৮ই অক্টোবর): প্রস্তাবিত মেগাটনী বোমা (পারমাণবিক) বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার জন্য রুশিয়ার নিকট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধসূচক প্রস্তাব।

২রা কার্ত্তিক (১৯শে অক্টোবর): "বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক পরীক্ষা রাশিয়া বন্ধ না করিলে আমেরিকাও অনুরূপ পরীক্ষা চালাইবে"—রাষ্ট্রসঙ্ঘের রাজনৈতিক কমিটিতে মার্কিণ প্রতিনিধির সতর্কবাণী।

৩রা কার্ত্তিক (২০শে অক্টোবর): অবিলম্বে আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের দাবীতে ভারত কর্ত্তৃক রাজনৈতিক কমিটিতে (রাষ্ট্রসঙ্ঘ) প্রস্তাব উত্থাপন।

৪ঠা কার্ত্তিক (২১শে অক্টোবর): মস্কোয় সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে আলবেনিয়া ও ষ্টালিনপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা—বুলগানিন, মলোটভ, ম্যালেনকভ প্রমুখ রুশ নেতৃবৃন্দের বিচার দাবী।

৬ই কার্ত্তিক (২৩শে অক্টোবর): রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরলোকগত সেক্রেটারী জেনারেল দাগ হামারশোল্ডকে ১৯৬১ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান।

৯ই কার্ত্তিক (২৬শে অক্টোবর): আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের আদেশ রুশ প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভ কর্ত্তৃক নাকচ—মস্কো টেলিভিশনে পরীক্ষা পুনরারম্ভের কারণ বিশ্লেষণ।

১০ই কার্ত্তিক (২৭শে অক্টোবর): ৫০ মেগাটনী বোমা বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার জন্য রাশিয়ার নিকট আবেদন—রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ভোটাধিক্যে প্রস্তাব গৃহীত।

১৩ই কার্ত্তিক (৩০শে অক্টোবর): শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়ার ৫০ মেগাটনী আণবিক বোমা বিস্ফোরণ—বিশ্বের বিভিন্ন মহলে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার।

রেড স্কোয়ার (মস্কো) সমাধি সৌধ হইতে ষ্টালিনের মৃতদেহ অপসারণের সিদ্ধান্ত—রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব।

১৪ই কার্ত্তিক (৩১শে অক্টোবর): রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সর্ব্বোচ্চ সভাপতিমণ্ডলী হইতে ৪জন পুরাতন সদস্যের বিদায়—পার্টি প্রধান পদে ক্রুশ্চেভ (প্রধান মন্ত্রী) পুনরায় নির্ব্বাচিত।

১৬ই কার্ত্তিক (২রা নভেম্বর): পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা স্থগিত রাখার জন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শক্তিগোষ্ঠীর প্রতি দাবী—রাষ্ট্রসঙ্ঘের রাজনৈতিক কমিটিতে ভারতের উদ্যোগে উপস্থাপিত প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত।

ফ্রান্সে বিদ্রোহী আলজিরীয় নেতাদের অনশন—ফরাসী জেলে আটক ১৫ হাজার আলজিরীয়কে রাজনৈতিক বন্দী গণ্য করার দাবী।

১৭ই কার্ত্তিক (৩রা নভেম্বর): রাষ্ট্রসঙ্ঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল পদে ব্রহ্মের উ থাণ্ট নির্ব্বাচিত।

১৮ই কার্ত্তিক (৪ঠা নভেম্বর): লণ্ডনে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ হারল্ড ম্যাকমিলানের সহিত ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বৈঠক ও বিশ্বের সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা।

'কোন অবস্থাতেই আণবিক অস্ত্র পরীক্ষার যৌক্তিকতা নাই'—রাশিয়ার অতি-বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

১৯শে কার্ত্তিক (৫ই নভেম্বর): 'আক্রমণ প্রত্যাহৃত না হইলে চীনের সহিত স্বাভাবিক সম্পর্ক অসম্ভব'—নিউ ইয়র্কে টেলিভিশন ভাষণে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা—ক্রুশ্চেভ (রুশ প্রধান মন্ত্রী) যুদ্ধ চাহেন না বলিয়া দৃঢ় আস্থা প্রকাশ।

২০শে কার্ত্তিক (৬ই নভেম্বর): 'বিশ্ব-নেতা হিসাবে শ্রীনেহরু আব্রাহাম লিঙ্কন ও ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের সমকক্ষ'—ওয়াশিংটনে সম্বর্দ্ধনা প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ভাষণ।

২১শে কার্ত্তিক (৭ই নভেম্বর): ওয়াশিংটনে কেনেডি-নেহরু গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক—বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর আলোচনা।

'সোভিয়েট ইউনিয়ন আর ৫০ মেগাটনী আণবিক বোমা ফাটাইবে না'—মস্কোয় বিপ্লব বার্ষিকী সমাবেশে ক্রুশ্চেভের ঘোষণা।

২৩শে কার্ত্তিক (৯ই নভেম্বর): দীর্ঘ বৈঠকান্তে ওয়াশিংটন হইতে নেহরু-কেনেডি যৌথ ইস্তাহার প্রকাশিত—নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহ পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি অনুষ্ঠান ও যুদ্ধের ঝুঁকি পরিহারের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত।

২৪শে কার্ত্তিক (১০ই নভেম্বর): লুকাইয়া বাঁচার কথা না বলিয়া যুদ্ধ প্রতিরোধে সর্ব্বশক্তি নিয়োগের আহ্বান: হয় সহ-অবস্থান, নয় বিলুপ্তি—একটি পথ বাছিয়া লইবার দাবী—রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে শ্রীনেহরুর (ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী) ভাষণ।

২৫শে কার্ত্তিক (১১ই নভেম্বর): পাকিস্তানে অপহৃত ভারতীয় অফিসার লেঃ কর্ণেল জি ভট্টাচার্য্য ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত—গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ঢাকায় সামরিক আদালতে বিচার।

২৬শে কার্ত্তিক (১২ই নভেম্বর): 'দক্ষিণ ভিয়েটনামে মার্কিণ সৈন্য প্রেরণ স্থায়ী সংঘর্ষ ডাকিয়া আনিবে'—ওয়াশিংটনে টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে শ্রীনেহরুর সতর্কবাণী।

২৭শে কার্ত্তিক (১৩ই নভেম্বর): ২৮শে নভেম্বর পর্য্যন্ত জেনেভায় ত্রিশক্তি আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ আলোচনা পুনরারম্ভের প্রস্তাব—সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট বৃটেন ও আমেরিকার লিপি প্রেরণ।

৩০শে কার্ত্তিক (১৬ই নভেম্বর): কঙ্গোর কিণ্ডুতে (কিভু প্রদেশ) রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১৩ জন ইটালীয় বৈমানিককে হত্যা—বিদ্রোহী কঙ্গোলী ফৌজের পৈশাচিক কাণ্ড।

রেল ব্যবস্থা

"রেলের ব্যবস্থা কোন্ স্তরে নামিয়া আসিয়াছে তাহা পুনঃ পুনঃ সংঘটিত দুর্ঘটনায় ও চন্দননগরের ষ্টেশন ক্রোকের পরোয়ানা জারীতেই বুঝিতে পারা যায়। সেজন্য বর্তমান রেল-মন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন না কেন, জিজ্ঞাসায় লালবাহাদুর শাস্ত্রীই বলিয়াছেন, কেন পদত্যাগ করিবেন? তাঁহার নিজের নজীর হাজির করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মাথায় পোকা নড়িয়া উঠিয়াছিল। ব্যয় কিরূপ বাড়িতেছে, তাহা গত সোমবারের লোকসভার ব্যাপারেই দেখা যায়। ঐ দিন অর্থমন্ত্রী অতিরিক্ত দশ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ টাকা মঞ্জুরীর জন্য উপস্থাপিত করেন—১। হাবেলীর প্রশাসনের জন্য ইহার কতকাংশ। ২। হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেডের অতিরিক্ত শেয়ারের জন্য ছয় কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। ৩। এয়ার ইণ্ডিয়ার দুইখানি বিমানের জন্য দুই কোটি তিরাশী লক্ষ টাকা (এই বিমানদ্বয়ের মোট দাম হইবে আট কোটি টাকা)। ঐ দিনই রেল-মন্ত্রী অতিরিক্ত ব্যয় আট কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা চাহিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে রেলপথের রেল গাড়ীর ও রেল বিভাগের ব্যবস্থার যে অবস্থা দেখা গিয়াছে, তাহাতে এই টাকায় প্রকৃত সংস্কার সাধিত হইতে পারিবে কি? যে স্থানে সর্বাঙ্গে ক্ষত, সে স্থানে কোথায় কিরূপ ঔষধ প্রদান করা হইবে? এই কয় কোটি টাকাও অপব্যয়িত হইবে না তো? অর্থাৎ এমন হইবে না তো যে, অর্থও ব্যায়িত হইবে এবং দুর্ঘটনার বাহুল্যে আরো লোক নিহত হইবে? তবে, একমাত্র ভরসা, জওহরলালের সম্বল বাক্যবল, সেই বলে সব অসাধ্যসাধন হইয়া যাইবে!"

—দৈনিক বসুমতী।

আমলারাজ

"দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সহিত তাঁহার কর্তৃত্বাধীন আমলাদের সম্পর্ক এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে গবর্ণমেণ্টের কাজকর্ম পরিচালনায় বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা না ঘটে। আমলারা কোন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নীতি বা ইতিকর্তব্য নিজেদের দায়িত্বে স্থির করিতে পারেন না, মন্ত্রীদের ডিঙাইয়া কখনই নয়। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে প্রয়োজনমত পরামর্শ তাঁহারা দিতে পারেন বটে, কিন্তু মন্ত্রীর অথবা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশই চূড়ান্ত। সে-সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ কোন আমলা অথবা আমলাচক্রের মনোমত না হইতে পারে, কিন্তু কোন রাষ্ট্রবিধানেই ব্যুরোক্রেসীর এমন অধিকার নাই যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করিতে পারে। ব্রিটিশ আমলের আমলাদের নিয়মানুবর্তিতা এক্ষেত্রে আদর্শ স্থানীয় ছিল, এখন সেই নিয়মানুবর্তিতা অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছে বলিয়াই গবর্ণমেণ্টের কাজকর্মে নিত্য নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা, বিচ্যুতি এবং দপ্তরের ভিতরে বাহিরে, উপর ও নীচের স্তরে বিরোধের অন্ত নাই। মন্ত্রীরা সকলেই পরিশ্রমী, কর্তব্যনিষ্ঠ, দৃঢ়ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমলারা নিজেদের খুশীমত নানারকম কলকৌশল খাটাইয়া গবর্ণমেণ্টের কাজকর্মে অনর্থ এবং অচলাবস্থা সৃষ্টি করিবার সুযোগ বেশী পাইতে পারে না। শাসনযন্ত্রের দুইটি অংশ, নীতি-নির্দেশদাতা মন্ত্রি-মণ্ডলী এবং কার্যকারক আমলাদের মধ্যে সহযোগিতার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকিলে জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের পদে পদে বিপত্তি ঘটিবেই।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

বিবাহ বিচ্ছেদের হিড়িক

"অন্য দিকটাও চিন্তনীয়; সহ-অধ্যয়ন ও সহ-চাকুরির ফলে বিবাহাতিরিক্ত প্রণয় পুরুষের জীবনেও হইয়া থাকে এবং তাহাও দাম্পত্য জীবনের ইমারতে ফাটল ধরানোর পক্ষে সমান মজবুত। প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য, কুশ্রী ব্যাধি, জুলুমবাজী ও দুর্ব্যবহারের ফলে কতগুলি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, আর কতগুলি হয় দুই পক্ষের যে কোন এক পক্ষের বিবাহাতিরিক্ত সম্পর্কের জন্য, তাহার বিশদ খতিয়ান নির্মিত হইলে দেখা যাইবে, পাল্লার ঝোঁক এদিকেই বেশী। লক্ষ্য করার বিষয় যে, উত্তর প্রদেশের তুলনায় মহারাষ্ট্র কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের আনুপাতিক সংখ্যা কত বেশী। তবু উত্তর প্রদেশে একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে এবং স্ত্রী-শিক্ষারও প্রসার হইতেছে। তাই সাড়ে পাঁচশত ঘটনা তাহার ৫১টি জেলায় এক বৎসরে ঘটিয়াছে। সে তুলনায় বিহার ও উড়িষ্যার সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। বলা বাহুল্য, ইহার কারণ আর কিছু নয়, যা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। যন্ত্রশিল্প-প্রভাবিত একালীন আদর্শের বাণিজ্য নগরী ভিন্ন সমৃদ্ধ দেশ গড়া সম্ভব নয় এবং দেশের দারিদ্র্য জয় করিতে গেলে নরনারীর মিলিত শ্রম নিয়োগ ভিন্ন উপায় নাই। অতএব স্বেচ্ছা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদকেও তফাতে রাখা সম্ভব নয়। পাশ্চিমী দেশগুলি দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বেকারদশা জয় করিয়াছে এবং সেই প্রয়াসের পথে স্থিতিশীল গার্হস্থ্য জীবন বলি দিয়াছে। বিবাহ বিচ্ছেদ সেখানে প্রাত্যহিক ও প্রায় সার্বজনীন ঘটনা। আমরা সবেমাত্র আধুনিকতায় পা দিয়াছি, আমাদেরও সম্ভাব্য পরিণাম একই হইবে এবং বর্তমান সংবাদটি তাহারই নির্দেশ বহন করিতেছে। বিবাহ বিচ্ছেদ ভালো কি মন্দ সে তর্ক না তুলিয়া বলা যাইতে পারে যে, পুত্র-কন্যার সমস্যাটাই পিতামাতার এই বিচ্ছেদের করুণতম অংশ। তাই পশ্চিমী সমাজ বিজ্ঞানীরাও আজ জিনিষটাকে চোখ বুজিয়া ভালো বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। সোভিয়েটে বিচ্ছেদের ডিক্রী দিতে পর্যাপ্ত বিলম্ব করা হয়, সে-ও এই জন্যই।"

—যুগান্তর।

শিক্ষা সংকোচন নীতির কুফল

"সরকারী শিক্ষা সংকোচন নীতি এবং ব্যর্থতার অনিবার্য্য কুফল হিসাবেই ছাত্রর উচ্চশিক্ষা লাভের পথে এক দুরধিগম্য প্রাকারের সম্মুখীন হইতেছে। আর শুধু উচ্চশিক্ষাই নহে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক ইত্যাদি সর্বস্তরের শিক্ষার ব্যাপারে উক্ত ক্ষতিকারক

নীতি এবং ব্যর্থতার স্বাক্ষর পরিদৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করিতেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক ছাত্রের স্থানাভাবে ভর্ত্তির সুযোগ-বঞ্চনার ঘটনাটি। অন্যান্য যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়িবার সুযোগ-প্রাপ্তদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কি রাজ্য সরকার আর কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, কেহই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রের উচ্চ শিক্ষালাভের পথে এই স্থানাভাব সমস্যার কণ্টক অপসারণে প্রবৃত্ত হইতেছেন না। এই মর্মে একটি সংবাদে উল্লেখ দেখিতেছি যে, জটিলতাবিহীন কয়েকটি নিয়মকানুনের অভাবেই উক্ত শ্রেণীতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হইতেছে না। উহা নাকি প: ব: সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে এক লজ্জাকর টানা-পোড়েনের অবশ্যম্ভাবী কুফল।" —স্বাধীনতা।

'অন্য পন্থার' অর্থ কি?

"পাকিস্তান এবারে এক হাতে ঢাল ও অন্য হাতে তরোয়াল না লইয়া দুই হাতেই তরোয়াল ঘুরাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পাক-প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ এক চোখ রাঙ্গাইতেছেন ভারতকে লক্ষ্য করিয়া এবং অন্য চোখে ভ্রূকুটি হানিতেছেন আফগানিস্থানের প্রতি। ভারত যদি শান্তিপূর্ণ পথে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য সম্মত না হয়, তাহা হইলে তাহার সমাধানকল্পে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া তিনি ছমকী দিয়াছেন এবং অন্যদিকে আফগানিস্থানকে উদ্দেশ করিয়া চক্কার ছাড়িয়াছেন যে, তাহাকে একচোট শিক্ষা দিয়া দিবেন। আফগানিস্থানের ক্ষেত্রে বেত্রদণ্ড হস্তে তিনি গুরু মহাশয়ের ভূমিকা অভিনয় করুন তাহা লইয়া আমরা মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন দেখি না, কারণ, উহা পাকিস্তান ও আফগানিস্থানের নিজস্ব ঘরোয়া সমস্যা; কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে যে অন্য পন্থা অবলম্বন করার কথা বলিয়াছেন, জানিতে কৌতূহল হয় বস্তুত: সে পন্থাটা কি।"

—জনসেবক।

গোয়া

"ভারতীয় জল এলাকায় ভারতীয় যাত্রীবাহী জাহাজ এবং জেলে নৌকাগুলির উপর পর্ত্তুগীজরা গুলি বর্ষণ করিয়াছে। ভারত সরকার যথারীতি 'প্রটেষ্ট' জানাইয়াছেন। জহরলাল লোকসভায় বলিয়াছেন, এরূপ ঘটনার যাহাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তাহার ব্যবস্থা তিনি করিবেন। ভারতের ভূমি হইতে পাকিস্তানীরা আমাদের মিলিটারী অফিসার ধরিয়া লইয়া জেলে দেয়, পর্ত্তুগীজরা ভারতের বুকের উপর বসিয়া ভারতীয়দের গুলি করিয়া মারে; কিন্তু ভারতের প্রধান মন্ত্রীর কিছুতেই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না। ধৈর্য্যের পরীক্ষায় পুরস্কার থাকিলে জহরলাল পৃথিবীর সকল শাসককে হারাইয়া দিতে পারিতেন। রাজ্য শাসন এবং রক্ষা করিতে যে পৌরুষের প্রয়োজন জহরলালের তার কণামাত্র নাই ইহা নি:সংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।" —যুগবাণী।

দেশ-বিদেশ

"লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল ভট্টাচার্যের বিচারের নামে আয়ুবশাহী সামরিক আদালতে যে জঘন্য বর্বরোচিত রায় বের হয়েছে তাতে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের কথা কল্পনা করা সম্ভব নয়; যদিও ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এই মৈত্রী স্থাপনের জন্য যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী। কর্ণেল ভট্টাচার্যও বলিষ্ঠ ভাষায় বলেছেন—তিনি দয়া ভিক্ষা চাহেন না। তিনি ভারতের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন। এখন ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কি জবাব দেবেন?"—জনমত পত্রিকা (জলপাইগুড়ি)।

শোকসংবাদ

বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়

প্রখ্যাতনামা কম্যুনিষ্ট নেতা ও রাজ্য বিধান সভার সদস্য বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় গত ২১এ কার্তিক ৬৫ বছরে বয়সে পরলোকগমন করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি বি, এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম, এস সি পাঠরত অবস্থায় কংগ্রেসকর্মী রূপে ১৯২০ সালে এঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। কম্যুনিষ্ট দলে ইনি যোগ দেন ১৯৩৬ সালে। বিধান সভায় ইনি কম্যুনিষ্ট দলের সহকারী নেতা ছিলেন। উত্তর প্রদেশের এটোয়ার জাতীয় বিদ্যালয়ে ইনি শিক্ষকতা করেন এবং এটোয়া পৌরসভায় সদস্য নির্বাচিত হন। ইনি ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ দি কম্যুনিষ্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া এবং জেনারেল কাউন্সিল অফ দি অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদস্য এবং অল ইণ্ডিয়া কিষাণ সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে এঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের সময় ইনি শেষবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৫ সালে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহকারী সম্পাদিকা মহারাষ্ট্রের স্বর্গতা শান্তা ভেলেরাওকে বিবাহ করেন।

তারাকুমার ভাদুড়ী

নটগুরু শিশিরকুমারের মধ্যম অনুজ বাংলার প্রবীণ অভিনেতা তারাকুমার ভাদুড়ী গত ৮ই কার্তিক ৬৯ বছর বয়েসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। দিকপাল অগ্রজের অধিনায়কত্বে তিনি চল্লিশ বছর আগে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন, তারপর অসংখ্য নাটকে ও ছায়াচিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি ও যশ অর্জন করেন। নির্বাক ছবি 'শ্রীকান্ত' এঁরই পরিচালনায় গৃহীত হয়। বোম্বাইয়ের চিত্রজগতের সঙ্গেও এর কিছুকাল যোগ ছিল। শিশিরকুমারের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের সময়ে তাঁর সঙ্গে অন্যান্য যে উল্লেখযোগ্য অভিনেতৃগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল, তারাকুমার ভাদুড়ীই ছিলেন তাঁদের মধ্যে শেষ জীবিত জন। বর্তমানে ভাদুড়ী ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র শ্রীমুরারি ভাদুড়ীই জীবিত রইলেন।

বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়

সুকবি বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৬এ আশ্বিন ৬১ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। দীর্ঘকালব্যাপী সাহিত্য সাধনায় মাধ্যমে সাহিত্যজগতে ইনি খ্যাতি ও সুনাম অর্জনে সমর্থ হন। অধ্যাপক হিসেবেও ইনি বিপুল প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। কয়েকটি সুপাঠ্য গ্রন্থের ইনি রচয়িতা। কলকাতায় এবং কলকাতার বাইরে নানাস্থানে অধ্যাপনা করে ছাত্রমহলে ইনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
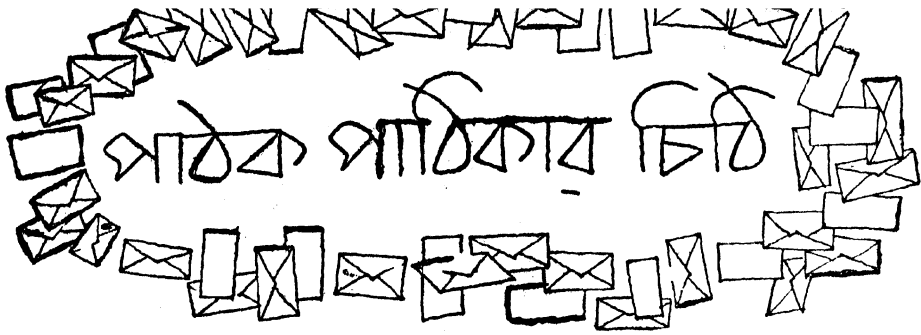
পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়—আপনার সর্বজন আদৃত ও বহুল প্রচলিত মাসিক বসুমতীর আশ্বিন ১৩৬৮ সংখ্যায় ১২৪০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত—'কেনা-কাটা' শীর্ষক প্রবন্ধে 'পালমারোসা' তৈলের মূল্য দ্বিতীয় পংক্তির চতুর্থ ছত্রে মূল্য প্রায় পাউণ্ড প্রতি ৪০, চল্লিশ টাকা পাঠে, মোতিয়া শ্রেণীর ঘাসের চাষ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া পড়ি। কার্য্যে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে প্রকাশিত প্রবন্ধটি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠে হতাশ হইয়াছি। নিম্নলিখিত সংশয়গুলি অনুগ্রহ করিয়া নিরসন করিলে কৃতার্থ হইয়া কাজে ব্রতী ও হইব। প্রথম পংক্তির শেষ চার ছত্রে লিখিত আছে "রপ্তানী হয়ে যায় কমপক্ষে ৬০লক্ষ টন। অন্ততঃ ২৫লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জিত হয়।" এখন হিসাবে দেখা যায়, ১ টনে ২৪৪০ পাউণ্ড, সুতরাং ৬০লক্ষ টনে ২৬৬৪,০০,০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ দুই হাজার ছয়শত চৌষট্টি কোটি পাউণ্ড ও উহাতে অর্জ্জিত মূল্য ২৫,০০,০০০ টাকা অর্থাৎ ২৬৬৪ পাউণ্ডের বিক্রীত মূল্য মাত্র ২৫ নঃ পয়সা অর্থাৎ ১০৬'৫৬ পাউণ্ড পালমারোসা তৈলের মূল্য এক নয়া পয়সা মাত্র, যাহা এ যুগ কেন কোনও যুগেই সম্ভব ছিল কি? উপরিউক্ত বিষয়ে আলোকপাত করিয়া সন্দেহ নিরসন করিলে কৃতজ্ঞতা বোধ করিব। বিরক্তির কারণে ক্ষমাপ্রার্থী। পত্রোত্তরের আশায় রহিলাম। ইতি বিনীত শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র, ৫৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—১।

পতিতাবৃত্তির প্রতিকার

আমি মাসিক বসুমতী পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। বসুমতীর ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীহৃদয় ভট্টাচার্য্যের লেখা 'পতিতাবৃত্তির প্রতিকার' প্রবন্ধটি আমার খুবই ভাল লেগেছে। লেখক যে মন্তব্য করেছেন, বর্তমান ধর্মের সম্পর্কহীন শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে মানুষের মন থেকে ধীরে ধীরে ধর্মভাব মুছে যাচ্ছে, ইহা খুবই সত্য। বর্তমানে ধর্মের সম্পর্কহীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় নর-নারীদের মনে পাপ মনোবৃত্তি বেড়ে চলেছে, যার ফলে পুরুষদের অনেকে দীর্ঘ বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে না করে পরের বাড়ীর বৌ ও মেয়েদের পিছনে ছুটে থাকেন এবং নারীদের অনেকে ব্যভিচারিণী ও পতিতাবৃত্তিতে আসক্তা হয়েছে, হিন্দুনারীর মুসলমান যুবকের সঙ্গে পলায়ন ও স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্টের আশ্রয়ে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বা মুসলমান স্বামী গ্রহণের সংখ্যা বেড়েছে।

লেখকের মতে রক্তের সম্পর্কহীন পুরুষদের সঙ্গে অবাধ মেলা-মেশা, বাইরের কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষদের একসাথে কাজ, যুবতীদের যৌনলিপ্সা বাড়িয়ে দেয় এবং অবৈধ কাজের বাসনা এনে দেয়। ইহাও পরম সত্য। আগুনের কাছে যেমন ঘি কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে না, সেরূপ রক্তের সম্পর্কহীন যুবকদের সঙ্গে যুবতীদের অবাধ মেলামেশা, একসাথে কাজ উভয়ের মধ্যে অবৈধ প্রেমের বীজ বপন করে। বর্তমানে দৈনিক পত্রিকায় প্রায়ই নারী হরণ, ধর্ষণ, অন্য যুবকের সঙ্গে যুবতীর পলায়ন, বিশেষ বিবাহ আইন অনুযায়ী অভিভাবকের অমতে যুবক-যুবতীর বিয়ে ইত্যাদি ঘটনা দেখা যায়, এইগুলো রক্তের সম্পর্কহীন যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলা মেশার কুফল। বর্তমান সরকার ও সাম্যবাদীদল এর জন্য কম দায়ী নয়। লেখকের মতে হিন্দু সমাজের পণপ্রথা অসংখ্য হিন্দু মেয়ের বিয়েতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছে এবং এই কুপ্রথা উচ্ছেদ করে প্রত্যেকটি হিন্দুমেয়ের যৌবনের প্রারম্ভে বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে অন্ন-বস্ত্র ও যৌনক্ষুধা পুরণের জন্য তাদের পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয় না। আশা করি, প্রত্যেকটি হিন্দুনারী এই বিষয়ে একমত হবেন। অতীতে প্রত্যেকটি হিন্দুমেয়ের অল্পবয়সে অল্প খরচে বিয়ে হতো বলে দেশে ব্যভিচার, পেটের দায়ে পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি ঘটনা একপ্রকার শোনা যেতো না। কিন্তু বর্তমানে হিন্দুসমাজের পাত্র ও পাত্রের অভিভাবকরা পণলোভী হওয়ায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের মেয়েদের সাধারণতঃ বিয়ে হয় না এবং এইরূপ মেয়েরা শেষ পর্য্যন্ত পেটের দায়ে বা যৌনক্ষুধায় ধৈর্য্য হারিয়ে অবৈধ কাজ করে থাকে। এর জন্য যুবতীদের দোষ দেওয়া অন্যায়, ইহার জন্য দায়ী সমাজের পণপ্রথা। বর্তমানে ভারতীয় মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। এইমত অবস্থায় প্রত্যেকটি হিন্দুমেয়ের বিনা পণে বিনা যৌতুকে বিয়ের ব্যবস্থা করতে না পারলে এবং বিয়ের মাধ্যমে প্রত্যেকটি হিন্দুমেয়েকে মাতৃত্বলাভের সুযোগ না দিলে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় ইউনিয়নেও হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ ও মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, যার ফল দাঁড়াবে ভারতীয় ইউনিয়নেরও পাকিস্তানভুক্তি। সুতরাং ভারত ইউনিয়নের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যও সমাজ থেকে পণপ্রথা উচ্ছেদ করে যাতে প্রত্যেকটি হিন্দুমেয়ের যৌবনের আরম্ভে বিয়ে হয়, সে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আর লেখক পতিতাবৃত্তির প্রতিকারের যে সমস্ত পন্থার উল্লেখ করেছেন, ঐ সমস্ত আমার মতেও পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের সঠিক পথ। আশা করি, মাসিক বসুমতীর আগামী সংখ্যায় চিঠিখানি প্রকাশ করিয়া সুখী করিবেন। ইতি—জ্যোৎস্না চক্রবর্ত্তী, এস, পি, ব্যানার্জ্জী ষ্ট্রীট, পোঃ আলমবাজার, কলিকাতা-১৫।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

* * * শ্রীঅমিয়কুমার সান্যাল, যুগ্মসচিব, করুণ পাঠাগার, এয়ার মেনস মেস, এয়ার ফোর্স ফ্লাইং কলেজ, ডাক যোধপুর, রাজস্থান * * * শ্রীমতী মঞ্জু চক্রবর্তী, ওয়ালচাঁদ বাঙলো, ম্যাষ্টপ হিল, বোম্বাই—৩১ * * * শ্রীমতী শীলা দত্ত, অবধায়ক শ্রী এস, কে, দত্ত, এ, ই, ই, এম, ই, এস, ক্লিমেণ্ট টাউন, ডেরাডুন, উত্তরপ্রদেশ * * * মহম্মদ মতিয়ার রহমণ, গ্রাম ও ডাক, তালিবপুর (সুরী হয়ে), জেলা—বীরভূম * * * শ্রীরমেশচন্দ্র পাল, ইনস্পেক্টর অফ ট্যাক্সেস, অফিস অফ দি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ ট্যাক্সেস, ডাক—বারপেটা, কামরূপ, আসাম * * * শ্রীসুনীলকুমার গুহ, কেরাণী, এ, এস, ই রেকর্ড (এস, টি), আওরঙ্গাবাদ, দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র ষ্টেট * * * দেওয়ানহাট প্রগতি সঙ্ঘ রুরাল লাইব্রেরী, ডাক—দেওয়ানহাট, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ * * * শিক্ষা ও সংস্কৃতি সঙ্ঘ রুরাল লাইব্রেরী, ডাক—পুণ্ডিবাড়ী, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ * * * শালবাড়ী যুব সঙ্ঘ রুরাল লাইব্রেরী, শালবাড়ী, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ * * * জাগৃতি সঙ্ঘ রুরাল লাইব্রেরী, ডাক—গোঁসাইয়ের হাট, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ * * * দেওয়ানগঞ্জ সাধারণ পাঠাগার রুরাল লাইব্রেরী, ডাক—দেওয়ানগঞ্জ, কুচবিহার পশ্চিমবঙ্গ * * * বাণীবিতান রুরাল লাইব্রেরী, ডাক—ভেটাগুড়ী জেলা—কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ * * * Sm. Dipali Ghosh, A 70 D-II Matibagh New—Delhi * * * প্রধান শিক্ষক, শালমারী হাই-স্কুল, গ্রাম ও ডাক—শালমারী, জেলা—পূর্ণিয়া * * * শ্রীএস, কে, ভট্টাচার্য, তুলাহাট টি, ই, ডাক—লখীমপুর (উত্তর), আসাম * * * প্রধান শিক্ষক, এস, বি, হাই-স্কুল, কুন্দাহাট, এস, পি * * * Sm. Sunanda Biswas, C/o Sri A. K. Biswas, Research and Planning Division, ECAFE Secretariat, Bangkok, Thailand * * * শ্রীফটিকচন্দ্র বটব্যাল, পাপোষ দোলামাইট কোয়্যারী, ডাক—রৌরকেল্লা-৪, জেলা—সুন্দরগড় * * * শ্রীমতী শৈলবালা দেবী, অবধায়ক—শ্রীকৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, রাঁচী * * * শ্রীমতী শরৎশশী দেবী, অবধায়ক—শ্রীঅনন্তকুমার বাগচী, ডাক—লালগোলা, জেলা—মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ * * * সচিব, পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগার, (রুরাল লাইব্রেরী), ডাক—পূর্বস্থলী, বর্ধমান * * * শ্রীঅশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য, প্রধান পণ্ডিত, মিউনিসিপ্যাল হাই-স্কুল, সদরঘাট রোড, শঙ্করীপুকুর, বর্ধমান * * * শ্রীমতী হেনারাণী ভট্টাচার্য, অবধায়ক—শ্রীবি, সি, ভট্টাচার্য, ১ ইন্দ্রাণী পার্ক, কলকাতা—৩২ * * * শ্রীমতী কবিতারাণী চক্রবর্তী, গ্রাম ও ডাক—ভঞ্জন, (নারায়ণগড় হয়ে), মেদিনীপুর * * * শ্রীদুর্গাপ্রসাদ সিংহ, চিকুমাটি টি এষ্টেট, পোঃ দলগাঁও, জেলা—দারাঙ, আসাম * * * The General Secretary, Tirup Club, P. O. Tirup (Ledo), N. E. F. Agency * * * সচিব, চিচুরিয়া রবীন্দ্র গ্রন্থাগার, ডাক—চিচুরিয়া (বাঙ্কুলা হয়ে), জেলা বর্ধমান * * * আওলোর রাজাসাহেব, আওল কুঠি, 'বরাদণ্ড', পুরী * * * শ্রীকুলদা সরকার, ডাক—কালীগাঁও, জেলা—মালদা, পশ্চিমবঙ্গ * * * Dr. Anil Kr. Sarkar, Resident in Pathology, Pittsfield General Hospital, Pittsfield, MASS. U. S. A. * * * শ্রীবিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, গ্রাম ও ডাক—বেতালি জেলা—বাঁকুড়া * * * শ্রীজয়ন্তকুমার বসু, য্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, বল্লভপুর কোলিয়ারী, ডাক—বল্লভপুর, জেলা—চান্দা, মহারাষ্ট্র * * * The Hony. Secretary. S. E. Rly. Institute, Po, Dongargarh, Dt. Durg, M. P. * * * প্রধানশিক্ষক, চকশিমুলিয়া কামাখ্যা বিদ্যাপীঠ ডাক—কুমারচক, মেদিনীপুর।

বাংলা ১৩৬৮ সনের বাৎসরিক মাসিক বসুমতীর চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠালাম। এ বারের সংখ্যা বেশ তাড়াতাড়ি পাওয়ায় বিশেষ ধন্যবাদ—Sm. Bibhabati Debi, Deoria. U. P.

Herewith Rs. 15/-being the subscription for monthly Basumati for the current year—1368 B. S.—Mrs. Anjali Ghose. Patna—1,

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা বাবদ ৭।০ টাকা পাঠাইলাম—শ্রীমতী মুকুল চৌধুরী, বাঙ্গালোর।

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের গ্রাহক মূল্য বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠালাম—Dr. P, C. Roy, Jaipur, Rajasthan.

Rupees fifteen for monthly Basumati for the current year—Aparna Das, Cachar, Assam.

বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম—M rs. Aparna Roy, Dhenkanal, Orissa.

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১৫৲ পাঠালাম—Sm. Amiya Chatterjee. Lucknow.

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা বাবদ ৭.৫০ নঃ পঃ পাঠালাম—Nivedita Rahut, Jalpaiguri.

Herewith I am sending the yearly subscription of Masik Basumati for the year 1368 B. S.—Manjusree Debi, Dibrugarh, Assam.

১৩৬৮ সনের বাৎসরিক মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠালাম। নিয়মিত বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। গত চৈত্র সংখ্যার বসুমতীতে প্রকাশিত আমার চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ।
—উমা মজুমদার, গোয়ালপাড়া, আসাম।

I remit herewith Rs. 15/- being the renewal fee of subscription for Masik Basumati from Baisakh.—Dipti Mallick.—Kalna, Burdwan.

নূতন বছরের মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।
—তৃপ্তি বসু, লক্ষ্ণৌ।

Sending herewith Rs 7·50 being the half-yearly subscription of Monthly Basumati from Baisakh '68 B. S.—Sm. Bani Dasgupta, Doom-Dooma, Assam.

Subscription for six months from Baisakh to Aswin 1368 B. S.—Bina Nag, Bilaspur. (M. P.)

The yearly subscription for the year 1368 B. S. of Monthly magazine 'Basumati', is remitted for favour of yours. Kindly sending my copies regularly—Sri Reba Moitra, Jalpaiguri.

১৫৲ টাকা পাঠালাম। পূর্ণ সেট পত্রিকা পাঠাবার বন্দোবস্ত করবেন দয়া করে। —সুধারাণী চৌধুরী, কাছাড়।

Annual subscription for Monthly Basumati is sent herewith. -Sm. Bela Banerjee, Dhanbad.

বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা জ্যৈষ্ঠ হইতে পাঠাইলাম।
—মঞ্জরী সেনগুপ্ত, যোধপুর, (রাজস্থান)।

One year's renewal subscription of Monthly Basumati from the expiry of the present subscription—Mrs. Sukumari Dey, B. A.—Navsari (Surat Dist.)

Sending herewith Rs. 15/- being the annual subscription of Masik Basumati for the current Bengali year—Jayanti Chatterjee, Darjeeling.

মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হওয়ার জন্য বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিন মাসের চাঁদা বাবদ ৭'৫০ পাঠাইলাম।
—শ্রীমতী প্রতিভা দত্ত, বৰ্দ্ধমান।

Rs 15/- is remitted herewith, please continue sending your magazine from Baisakh. of the current Bengali year,—Namita Banerjee, Jaipur, (Rajasthan.)

গত আষাঢ় হইতে আগামী জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম।
—গীতা দাশগুপ্তা, বীণা, (এম-পি)।

এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর মূল্য বাবদ ১৫৲ পাঠাইলাম। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।
—শ্রীমতী কল্যাণী গাঙ্গুলী, চাকুলিয়া, সিংভুম।

১৩৬৮ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র মাসের "বসুমতী"র জন্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। —Rina Roy, Jalpaiguri.

Herewith sending Rs. 15/- towards the subscription of Monthly Basumati for 1368 B. S. —Abdul Hossain Khan, Assam.

আমাকে বৈশাখ ১৩৬৮ সাল হইতে মাসিক বসুমতীর গ্রাহক করিয়া লইবেন; ১৫৲ পাঠালাম। —শ্রীমতী প্রতিমা ব্যানার্জ্জী, জলপাইগুড়ি।

Half-yearly subscription from Ashar and onwards—Head Master, Khaira High School, Balasore.

Sending Rs. 15/- on account of annual subscription for Monthly Basumati from Bhadra 1368 B. S.—Head Master S. B. High School, S. P.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। বৈশাখ সংখ্যা হইতে সংখ্যাগুলি পাঠাইবেন—Sm. Rama Bhattacharyya (Principal) Kanya Kumari Vidya Mandir, Varanashi, U. P.

I am hereby remitting 7·50 n.P. being half-yearly subscription from the month of Aswin to Falgoon—Secy. Wireless Recreation Club, Civil Wireless, Port Blair.

ভাদ্র হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত পুনরায় ছয় মাসের চাঁদা পাঠালাম—শ্রীদেবীদাস চক্রবর্ত্তী, ভূপাল।

অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার ছয় মাসের মাসিক বসুমতীর মূল্য গ্রহণ করিয়া আমায় বসুমতী পাঠাবেন—ঊষারাণী দেবী, আসাম।

Remitting herewith Rs. 15/- as Annual Subscription of Monthly Basumati from Aswin to Bhadra—Ranibandh Rural Library, Bankura.

Dr. (Mrs.) Dipa Sarker of Burdwan has remitted Rs. 24/- being the Annual Subscription of Monthly Basumati to be sent to her husband Dr. Anil Kumar Sarker, Resident in Pathology, Pittsfield General Hospital, Pittsfield, Mass, U. S. A.

মাসিক বসুমতীর ষান্মাসিক মূল্য ৭'৫০ পাঠাইতেছি—শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দাস। গড়বেতা, মেদিনীপুর।

৬ মাসের ৭॥০ টাকা মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম। শ্রীমতী প্রভারাণী পাহাড়ী, মেদিনীপুর।

Half-yearly Subscription of Rs. 7·50 for Monthly Basumati from Kartic to Chaitra—Mukul Debi, Burdwan.

বসুমতী মাসিক পত্রিকার ছয় মাসের চাঁদা পাঠালাম—Sm. Sunanda Biswas, ECAFE Secretariat, Bangkok, (Thailand)

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা পাঠালাম—Mrs. Snehalata Mazumder, Orissa.

মাসিক বসুমতী

॥ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ॥

(জলরঙ)

জলপ্রপাত

—শ্রীনগেন্দ্রনাথ হেমরাম অঙ্কিত

স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৪০শ বর্ষ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

কথামৃত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

"কে দেয় ?—সেই একজনই দেবার মালিক।"

"অজ্ঞানকূপমগ্নস্য নাস্তিংস্য গাতর্ম্মম।

দেহি দেহি রামকৃষ্ণ দেহিমে চরণাশ্রয়ম্ ॥"—মহাত্মা রামচন্দ্র।

চারা গাছে বেড়া দিতে হয়, নইলে ছাগল গরুতে মুড়োবে। গুঁড়ি হলে, হাতী বাঁধলেও কিছু হয় না। মধ্যে মধ্যে নির্জ্জন সাধন চাই।

ধ্যান করবে বনে, কোণে ও মনে। বিকারে—রোগীর কাছে জলের জালা—আচারের হাঁড়ি ? গীতা ২—৬২, ৬৩। Lord ! Save me from my friends. রিপু সকল বন্ধুর আকার ধারণ করে। যে ভগবানের পথে কণ্টক, সে বন্ধু নহে—রিপু।

মাগো ! আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলাইও না—আর চূষীকাটী দিয়া ভুলাইয়া রাখিও না—শ্রীচরণাশ্রয় দাও মা।

"(মাগো) ফিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি" * * *

যিনি সকল কর্ম্মে তাঁকে কর্ত্তা দেখেন, তিনিই বীর, তিনিই মুক্ত ও নির্লিপ্ত। গীতা ৫—৬, ৭।

তিন রকম জীব আছে—বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত ; সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণী।

লোকে বেশ্যালয়ে যায়, মা'কে কেন সঙ্গে নিয়ে যায় না—তা'হলে বেঁচে যায়। লুচ্চোরূপী নারায়ণ।

বারাণ্ডায় হুঁকো হাতে করে—সেও আমার আনন্দময়ী মা। জয় মা আনন্দময়ী !

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। শ্রীশ্রীচণ্ডী।

ওগো যদি একান্তই মদ খাবে ত মা কুলকুণ্ডলিনীকে দিচ্ছি বলে—একটু খাবে। জননী জাগৃহি।

"সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে"।

—শ্রীরামপ্রসাদ।

কলিতে নারদীয়া ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, যুগধর্ম্ম। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। ভগবান ব্যতীত জীবের গতি নাই। "তোমা হতে তোমার নামটী বড়।" গীতা ৯—১৪

তুম্ যেইসা রাম পর, তুম পর ঐসা রাম।

ডাহনে যাও ত ডা হনে যায়, বামে যাও ত বাম।

যেমন ভাব তেমন লাভ—মূল সে 'প্রত্যয়'। গীতা ৮—১৬।

ঈশ্বরকে জানিতে হইলে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কথায় বিশ্বাস করিতেই হইবে; বিশ্বাসেই মেলে। ঈশ্বর লাভের থেই—বিশ্বাস। গুরোর্বাক্যং সদা সত্যং। আপনাকে জানিলেই ঈশ্বরকে জানা যায়। কোন্‌টা—আমি?—প্রাণ বা চৈতন্য। প্রাণই ভগবান্‌, হাড়মাসের খাঁচাটা নহে! প্যাঁজের খোসা ছাড়ালে কিছুই থাকে না। প্রাণ-রূপেণ, চৈতন্যরূপেণ, শক্তি, বুদ্ধি···তুমি সর্ব্বস্ব, তুমি মা, তুমি আছ—তাই আছি। তুমিই—আমি। তুমি কায়া—আমি ছায়া। তুমি! তুমি! তুমি!!! ওগো আমি নয় আমি নয়, তুমি তুমি তুমি গো। "ম্যয়্‌কো কাঁহা ঢুঁড়ো বান্দো ম্যয় তো তেরে পাস্‌ মে"।

—কবীর।

নিত্য হইতে লীলা এবং লীলা হইতে নিত্য—যেমন বীজ হইতে, খোসা, খোসা হইতে বীজ। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়।

অদ্বৈতজ্ঞান হইলে চৈতন্য হয়—চৈতন্যে নিত্যানন্দলাভ। একাধারে তিন। এই তিনের সমষ্টি—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব!!!—মহাত্মা রামচন্দ্র।

অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর। এক জ্ঞানই জ্ঞান—বহুজ্ঞান অজ্ঞান। গীতা ৭-৬, ৭। ঈশ্বর এক—তাঁহার অনন্ত শক্তি। সাপ হয়ে খাই আমি রোঝা হয়ে ঝাড়ি। হাকিম হয়ে হুকুম দি পেয়াদা হয়ে মারি।

প্রাণোহহি ভগবানীশ: প্রাণোবিষ্ণু পিতামহ:।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোক: সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ॥

* * * *

এ দেহ দুর্ব্বল রামকৃষ্ণ বল—দিন গেলে দিন আর ফেরে না।

—মহাত্মা রামচন্দ্র।

* * * *

কর্ত্তা ব্যতীত কর্ম্ম হয় না। যেমন নিবিড় বনে দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। মূর্ত্তি প্রস্তুতকর্ত্তা তথায় নাই কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। সেই প্রকার এই বিশ্ব দর্শন করিয়া সৃষ্টি-কর্ত্তাকে জানা যায়।

এই বিশ্বোদ্যানে দেখিয়াই লোকে মুগ্ধ হইয়া যায়। এক পুত্তলিকা (কামিনী) এমন কি যোগী ঋষির পর্য্যন্ত মন আকর্ষণ করিয়া বসিয়া আছে, সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। উদ্যানাধিপতির দর্শনের জন্য কয়জন লালায়িত?

ব্রহ্মময়ং জগৎ। ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা। তেত্রিশকোটী দেবতা! "মা, ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছা যেমন"।—শ্রীরামপ্রসাদ। "থাক সর্ব্বঘটে অক্ষপুটে সাকার আকার নিরাকার—মা তুঁহি তারা।" শক্তি ব্যতীত ব্রহ্মকে জানিবার কোন উপায় নাই। অথবা শক্তি আছে বলিয়াই ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। যেমন কাষ্ঠ ও অগ্নির দাহিকা শক্তি। সেইরূপ শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি সমান—ব্রহ্মশক্তি অভেদ—এক।

ব্রহ্মের দুই রূপ। যখন নিত্য, শুদ্ধ, বোধরূপ, কেবলাত্মা, সাক্ষীস্বরূপ, তখন তিনি ব্রহ্মপদবাচ্য। আর যে সময়ে গুণ বা শক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন, তখন তাঁহাকেই ঈশ্বর কহা যায়।

নির্গুণ হায় তো পিতা হামারি, সগুণ হায় মাহ্‌তারী।
কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো—দোনো পাল্লা ভারি॥ তুলসীদাস।

নির্গুণ হইলে ব্রহ্ম এবং সগুণ হইলেই শক্তি। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যেমন দুধ ও তাহার ধবলত্ব। যে সরল মনে, প্রাণের ব্যাকুলতায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য ধাবিত হয়, তাঁহার নিকটে তিনি নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ভক্তিরূপ হিমে জমিয়া প্রেমঘন মূর্ত্তিতে তিনি সাকার হন এবং জ্ঞানসূর্য্যে গলিয়া তিনি বিরাট বা ব্রহ্মময়ং জগৎ হন। ব্যাকুল হইলে তবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। সাকার নিরাকার—সাধকের অবস্থার ফল।

মায়া মরে না মন মরে, মর্‌ মর গয়ো শরীর।
আশা তৃষ্ণা না মরে কহ্‌ গয়ে দাস কবীর॥

ব্রহ্মের শক্তির নাম মায়া। এই শক্তি অঘটন সংঘটন করিতে পারে। যাঁর মায়া এত সুন্দর, না জানি তিনি কত সুন্দর! কামিনীকাঞ্চনে অনিত্য আনন্দ, আর তাঁহাকে পাইলে নিত্যানন্দ লাভ হয়, সকল সাধ মেটে। তিনি রূপের রূপ।

মায়া দুই প্রকার, বিদ্যা এবং অবিদ্যা। বিদ্যামায়া দুই প্রকার—বিবেক এবং বৈরাগ্য। অবিদ্যামায়া ছয় প্রকার—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য।

আমার সন্তান ভাব। মা, আমার যদি কাম না যায় ত আমি গলায় ছুরি দোব। মাগো, তোমার কৃপায় তোমারে পায়, নাইত আর উপায়। * * * * "চেনা নাহি দিলে কেবা চিন্‌তে পারে, ধরা নাহি দিলে কেবা ধরতে পারে।" সেবক—কৃষ্ণধন।

কাফী মিশ্র—একতালা।
আমি হাতে হাতে দিই ধরা।
আমার কই সাজে হে ছল করা॥
আমি ত আপন হারা,
আমার ধরা দেওয়া—নয়তো ধরা,
আমায় ধরা দিতে—ধরায় এসে, মিছে ছল করা।
অ-ধর হয়ে দিছি ধরা,—
তোমার প্রেমের ঘোরে প্রাণ ভোরা॥—গিরিশচন্দ্র।

* * * *

চিনালে চিনিতে পারে নহে অসম্ভব—পুরুষ-প্রধান,
মত্তচিত্ত মহাঘোর বিষয়-আহব—হৃদয়ে না রহে তব স্থান,—
স্বপ্রকাশ হও বিদ্যমান—জ্ঞানাঞ্জনে করি দৃষ্টি দান;
তবু ক্ষণে মূঢ় মন, হয় রূপ বিস্মরণ
ইন্দ্রিয় তাড়না বলবান্‌।
হৃৎ-পদ্ম বিকাশিয়ে হও অধিষ্ঠান!!—"ভৈরব"—গিরিশচন্দ্র।
গীতা ১১-৫ হইতে ৮।

নির্লিপ্তভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। নৌকা জলে থাকুক, তাহাতে জল যেন না প্রবেশ করে। যেমন পদ্মপত্রে জল। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, পাঁক লাগে না গায়।" গীতা ৫-৭, ১০।

যেমন গৃহস্থের বাটীর দাসীরা সংসারের যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকে, সন্তানদিগকে লালন পালন করে, তাহারা মরিয়া গেলে রোদনও করে, কিন্তু মনে জানে যে তাহারা তাহাদের কেহই নহে। সংসারে দাসীর ন্যায় থাকিবে। তিনিই সত্য। মনটী রাখ—তাঁর চরণে।

যাঁর এখানে আছে, তার সেখানেও আছে—যার এখানে নাই তার সেখানেও নাই।

[ক্রমশ:।

—স্বামী যোগবিনোদ মহারাজের 'ঠাকুরের কথা' হইতে।

৺সিদ্ধেশ্বরীর ভৈরব দুলাল

অমিয় ভট্টাচার্য্য

এক

ইংরেজী ১৯১১ সাল।

বর্ষার এক অপরাহ্ণে মেদিনীপুর কর্ণেলগোলার প্রায়ান্ধকার সঙ্কীর্ণ গলিতে বহু প্রাচীন এক রহস্যের উপর নূতন আলোকপাত হল।

সত্যকিঙ্কর সরকার বলছিল বন্ধু ললিতমোহন রায়কে: দীর্ঘাঙ্গীবংশ আমাদের কুলপুরোহিত। আবার ঐ দীর্ঘাঙ্গীবংশ মা সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরেরও পুরোহিত। মা সিদ্ধেশ্বরী কতদিনের, কে জানে? তবে আজ তার একটা সূত্র বোধ হয় পাওয়া গেল।

সবিস্ময়ে ললিত বলল: তাই নাকি? কি ব্যাপার বল তো?

—আমাদের কুলপ্রথা ছিল, আমাদের বাড়ীর দুর্গোৎসবের সময় সন্ধিপূজোর বক্তনিবেদনের মাটির সরাটি বরাবর একটি একটি করে জমিয়ে যেতে হবে। তাই করা হচ্ছিল। বছর বছর জমতে জমতে সেই সরার সংখ্যা হয়েছিল পাঁচশো। বাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না, তাই সেই সরাগুলো আজ কংসাবতীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল। নদীর স্রোতে যখন সরাগুলো ভেসে গেল, মনে হল, এমনি করেই কত প্রাচীন কীর্ত্তি, প্রাচীন নিদর্শন কালের স্রোতে ভেসে চলে যায়। কেউ মনে রাখে না তাদের।

ললিত বলল: তাহলে তো মা সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির পাঁচশো বছরেরও আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

—আমাদের বাড়ীর দুর্গোৎসবই যদি পাঁচশো বছর ধরে চলতে থাকে, তবে তারও কতদিন আগে মা সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা নির্দ্ধারণ করতে কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই।

দুই

সত্যকিঙ্কর ঠিকই বলেছিল। সিদ্ধেশ্বরীর সেই প্রাচীন মন্দির আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেদিনীপুর সহরের হবিবপুর পল্লীর অবহেলিত এক প্রান্তে। তার কাল কিন্তু আজও নির্দ্ধারিত হয়নি। আজও শুধু অনুমানের উপরই নির্ভর করতে হয়। কোন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক আজও সেই অনুমানকে তথ্যসিদ্ধ রূপ দিতে পারেননি। সিদ্ধেশ্বরী সব কালকে নিজের মধ্যে নিহিত করে হয়েছেন মহাকালী।

দেখলাম মা সিদ্ধেশ্বরীকে। বিরাট মৃন্ময়ী কালীমূর্ত্তি। কিন্তু এ মূর্ত্তি প্রচলিত কালীমূর্ত্তি থেকে পৃথক। লোলরসনা, রক্তনয়না, নৃমুণ্ড-মালিনী, খর্পরধারিণী, বরাভয়দায়িনী মাতৃমূর্ত্তি এখানে হয়েছেন হাস্যময়ী, বিচিত্রাম্বরা, মুক্তাহার-শোভিতা। এই মূর্ত্তির ধ্যানমন্ত্র,—

শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং হসন্মুখীম্।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং গলদ্রুধির চর্চ্চিতাম্॥
সব্যহস্তে খড়্গমুণ্ডে বরাভয়ঞ্চ দক্ষিণে।
মুণ্ডমালা-ধরাং দেবীং চিত্রাম্বরাঞ্চ দ্বিপিনীম্॥
মুক্তাহার-শোভিতাঞ্চ আপীনতুঙ্গস্তনীম্।
ঘোররূপাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কঙ্কালরূপিণীং শিবাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সিদ্ধভৈরববন্দিতাম্॥

শ্রীশ্রীশ্যামার ধ্যানমন্ত্র থেকে পৃথক্।

আবার প্রণামমন্ত্রেও পার্থক্য পাই, সর্বশেষে "মাহেশ্বরি নমোঽস্তুতে"র উল্লেখে।

ধ্যানমন্ত্রে উল্লিখিত 'সিদ্ধভৈরবে'র তাৎপর্য্য সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে প্রশ্ন জাগল,—কে এই সিদ্ধভৈরব? কবে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন? কবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই বৈশিষ্ট্যময়ী মাতৃমূর্ত্তি? তাঁর সাধনার ধারা কোথায় এসে হারিয়ে গেল? কে তাঁর উত্তর-সাধক?

উত্তর মিলল না বটে। হয়ত প্রত্নতত্ত্ববিৎ বা পণ্ডিত গবেষক সঠিক তথ্য আবিষ্কার করতে পারবেন। কিন্তু আমার কাছে যতটুকু উত্তর মিলল, তার মূল্যও কম নয়।

তিন

মেদিনীপুরের যে অঞ্চল এখন 'হবিবপুর' নামে অভিহিত, পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে সেখানে ছিল নিবিড় অরণ্য শ্বাপদসঙ্কুল, দুরধিগম্য। এই অরণ্যের উত্তর প্রান্তে কর্ণগড়াভিমুখী সঙ্কীর্ণ পথের পাশেই ছিল সরকার-বংশীয় এক ভূম্যধিকারীর বাস। ঐ সরকার-বংশের কোন পুরুষের নামানুসারেই, যতদূর জানা যায়,—ঐ অঞ্চলের নাম হয় 'কৃষ্ণনগর',—রেনেল সাহেবের পুরনো দলিলেও এই নামের উল্লেখ পাই।

এই সরকার বংশ ছিলেন লাখরাজদার ও তালুকদার। এই বংশের কৃষ্ণ সরকার ঐ অঞ্চলে এক নগর স্থাপনা করেন। সম্ভবতঃ তাঁর নামেই 'কৃষ্ণনগরের' প্রতিষ্ঠা ঘটে। বর্ত্তমান হবিবপুর পল্লীতে সেই প্রাচীন কৃষ্ণনগরকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পঙ্কিল, অপরিচ্ছন্ন পুষ্করিণী, পূতিগন্ধময় ধ্বংসস্তূপ ও জীর্ণ অট্টালিকার মধ্যে কৃষ্ণনগরের সমৃদ্ধি আজ লুপ্ত।

এই সরকার বংশের পৌরোহিত্য করতেন 'দীর্ঘাঙ্গী'-পদ-যুক্ত এক ব্রাহ্মণ। এঁরই কুলগুরু ছিলেন তান্ত্রিক সাধক কালিকানন্দ। কৃষ্ণনগরের নিবিড় অরণ্যে কতদিন আগে তিনি তাঁর সাধন-পীঠ নির্ব্বাচন করেছিলেন, তা আজ শুধু কিম্বদন্তী-নির্ভর। জনশ্রুতি ও বংশ-ইতিহাস অনুসরণ করে যতদূর জানা যাচ্ছে, এই কাপালিক কালিকানন্দই শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর সাধনপীঠের সন্নিকটে। ঐখানেই পঞ্চমুণ্ডের আসনে তিনি সাধনা করতেন। এই পঞ্চমুণ্ড তন্ত্রোক্ত পঞ্চমুণ্ড থেকে স্বতন্ত্র। যতদূর জানা যাচ্ছে, কালিকানন্দের পঞ্চমুণ্ড ছিল,—(১) নরমুণ্ড, (২) বানরের মুণ্ড, (৩) হস্তীমুণ্ড, (৪) ছাগ মুণ্ড, (৫) মহিষ মুণ্ড। ঐ জীবগুলিকে বলি দিয়ে তাদের মুণ্ডগুলি মৃত্তিকা-নিম্নে প্রোথিত করে তার উপর বেদী নির্ম্মাণ করেছিলেন কাপালিক।

আজকের সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরে সেই পঞ্চমুণ্ডের আসন-বেদীর উপরে মার্ব্বেল পাথরের বেদী নির্ম্মিত হয়েছে। কালিকানন্দের প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রাকৃতি প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি, দুটি মাটির ঘট, পশুবধের জন্য একটি কাস্তের আকারের অস্ত্র, আজও সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরে সযত্নে রক্ষা করা হচ্ছে। কত যুগ আগে এই মূর্ত্তি, এই উপকরণ ও অস্ত্র এক বিভীষিকাময় অরণ্যে তান্ত্রিক মহিমা বহন করত, কত দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের পুণ্য স্পর্শে এই প্রাচীন-মন্দির-প্রাঙ্গণের ধূলি পবিত্র হয়েছে,

আজ তার কোন সন্ধানই মেলে না। তবু মা সিদ্ধেশ্বরীর প্রসন্ন দাক্ষিণ্যের অনাহত মহিমা সমগ্র মন্দির-ভবনকে এক অপরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত করেছে, মেদিনীপুরবাসীর আধ্যাত্মিক চেতনার উৎস এই মন্দির আজও কালের নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করে আপন মহিমায় উচ্চশির।

কাপালিক কালিকানন্দ নিঃসন্তান ছিলেন। সিদ্ধেশ্বরীর সেবার ভার তাঁর প্রিয় শিষ্য দীর্ঘাঙ্গী বংশের এক ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করে তিনি দেহত্যাগ করেন। মেদিনীপুর সহরের পূর্বপ্রান্তে 'লালদীঘি' নামক পুষ্করিণীর পূর্বপাড়ে তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়। তাঁর ভৈরবী সর্বাণী দেবী, সতীর গৌরব নিয়ে মহানন্দে চিতানলে ঝাঁপ দিয়ে স্বামীর সহগামিনী হন। 'সতীঘাটা' নামে সেই স্থান এখনো সেই স্মৃতি বহন করছে। চারপাশে অজস্র ধান-ক্ষেত। কিন্তু সতীঘাটায় আজও কেউ ধান চাষ করে না।···কত দীর্ঘকাল ধরে এই পুণ্য স্মৃতি রক্ষা করা হচ্ছে, কেউ বলতে পারে না। শুধু লালদীঘির কালো জল ছল ছল ছল শব্দে আজও সিদ্ধেশ্বরীর প্রথম ভৈরব-দুলাল কালিকানন্দের কথা বলে, সতীঘাটার অকর্ষিত ভূমি সতীর পুণ্য জ্যোতিঃ সগর্বে বহন করে।

যে দীর্ঘাঙ্গী বংশের ব্রাহ্মণের উপর সিদ্ধেশ্বরীর সেবার ভার কালিকানন্দ অর্পণ করে গিয়েছিলেন, তাঁর বংশের রামপ্রসাদ ও বৃন্দাবন আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে সিদ্ধেশ্বরীর পূজক ছিলেন, প্রাচীন দলিল থেকে এই পর্যন্ত জানতে পারি। ঐ রামপ্রসাদ ও বৃন্দাবন একটি শিবমন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন। সেই শিবমন্দির আজও বর্তমান, যদিও তার দ্বার-সংলগ্ন প্রস্তর-ফলকটি এখন আর অভগ্ন নেই। সেই ফলকে উৎকীর্ণ লিপি ছিল এইরূপ,—

"শ্রীশ্রীসদাশিবের মণ্ডপ দত্তে শ্রীরামপ্রসাদ ব্রাহ্মনেন প্রস্তাৎ শ্রীবৃন্দাবন তস্য অনুজ। গঠনে শ্রীনারায়ণ দাস বণানি ১৬০ টাকা, ১১০৫ সাল। তারিখ ১০ই মাঘ। ইতি,

২৬৩ বৎসর পূর্বে নির্মিত এই শিবমন্দিরটিই দীর্ঘাঙ্গীবংশের কীর্তির একমাত্র প্রাচীন নিদর্শন। ঐ বংশের কেউ আর এখন জীবিত নেই। শ্যামাচরণ দীর্ঘাঙ্গীর বিধবা স্ত্রী বামাসুন্দরী দেবী ইং ১৯১১ সালে সমস্ত সম্পত্তি দেবীর সেবার জন্য উইল করে দিয়েছিলেন। বর্তমানে শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরীর পূজায় ব্রতী আছেন।

আর, ইতিমধ্যে প্রাচীন মৃত্তিকা-নির্মিত সিদ্ধেশ্বরী-মন্দির আমূল সংস্কৃত হয়ে হর্ম্য-রূপ ধারণ করেছে। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে, আই, সি, এস, ৺প্রসন্নকুমার সাহা, ৺রামশরণ সাহা, ৺রমানন্দ সাহা, ও শ্রীদেবদাস করণের অক্লান্ত চেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে এই ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ মন্দির নব কলেবরে ভক্তজনের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। পূজার কাজ নিয়মিত পরিচালনা করবার জন্য তিনজন ম্যানেজিং এক্জিকিউটার নিযুক্ত আছেন,—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দে, শ্রীরবীন্দ্রকুমার দেব ও শ্রীগৌরহরি মিত্র।

ভৈরব-দুলাল কালিকানন্দ মা সিদ্ধেশ্বরীর আরাধনায় যে মন্দিরে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তাঁর সেই মাটির গড়া দেউলে এসেছিলেন প্রসিদ্ধ সাধক বামাক্ষেপা, সাধনা করেছিলেন পঞ্চমুণ্ডের আসনে ব'সে। তারপর, সে আসনে বসেছিলেন বাঁকুড়া জেলার কারকবেড় নিবাসী প্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়।

এখনো মেদিনীপুর বাসীর সান্ত্বনা, বিপদে পরম নির্ভর হবিবপুরের মা সিদ্ধেশ্বরী। সারা সহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিদ্ধেশ্বরী সহরের এক অবহেলিত কোণ থেকে যেন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন সহরবাসীর কত কৌতুক, কত ব্যথা জড়িয়ে আছে এই মন্দিরকে ঘিরে, প্রবীণ যে-কোন সহরবাসীর কাছ থেকে তা জানা যায়। কেমন করে এক কারাদণ্ড প্রাপ্ত আসামীর মা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মা সিদ্ধেশ্বরীর হাত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আবার হাত জুড়ে দেওয়ার পরই তাঁর ছেলে জেল থেকে ফিরে এসেছিল, কি বিচিত্র এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল এক বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনার আকুল আবেদনে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে মা সিদ্ধেশ্বরী কতবার কতভাবে, তাঁর ভক্তদের কৃপা বিতরণ করেছেন, মেদিনীপুরের হাটে-মাঠে-ঘাটে সে সব বিবরণ এখনো শুনতে পাওয়া যায়।

* * *

সিদ্ধপুরুষ কালিকানন্দ যে সিদ্ধেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর অভয়ঙ্কর রুদ্র প্রসাদ লাভ করে আর এক ভৈরব-দুলাল আবির্ভূত হয়েছিল হবিবপুরের এক ক্ষুদ্র কুটীরে,—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে। মৃন্ময়ী মা সিদ্ধেশ্বরীর মৃন্ময় মন্দির সেই মহা-জন্মক্ষণে দেবী-ইঙ্গিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল, বিপ্লবের বহ্নি-দীপ্তি বহন করে সেই জন্মদিনটি আজও বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। সেই মহাজন্ম ও একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে মা সিদ্ধেশ্বরীর লীলা কি বিচিত্রভাবে প্রকট হয়েছিল, সেই কাহিনী এবার শোনাই।

চার

১৮৮৪ সালের গ্রীষ্মের এক ক্লান্ত সন্ধ্যা।

হবিবপুরের সিদ্ধেশ্বরী-মন্দির-সংলগ্ন নির্জন পথে মা আর মেয়ে। চারদিকে নিবিড় জঙ্গল। কাছে জনবসতি বিশেষ নেই। এক বিপুল অন্ধকার বনস্থলীর সঙ্কীর্ণ পথটিকে এক রহস্যলোকে পরিণত করেছে। জোনাকীর সভায় ঝিঁঝিঁর ডাক সুরু হয়েছে।

মা লক্ষ্মীপ্রিয়া বলছিলেন মেয়েকে: 'অপু, তুই ঘরে ফিরে যা। আমি একাই আজ মায়ের মন্দিরে প্রদীপ দেবো···আর তোর পিসীকে বলিস্, আমি আজ আর বাড়ী যাবো না। আজ থেকে আমি মায়ের কাছে হত্যা দেবো।'

কন্যা অপরূপা কেঁদে উঠল: সে কি মা! মা কালীর কাছে হত্যা দেবে কেন তুমি? কি হয়েছে মা?

এক কঠিন অভিমান বেজে উঠল লক্ষ্মীপ্রিয়ার কণ্ঠে। নির্জন পথ তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল: 'কেন হত্যা দেবো না? মা আমায় কত জ্বালাচ্ছে, তোরা দেখতে পাচ্ছিস না!···দুটো ছেলে হল, রাক্ষসী মা দুটোকেই কেড়ে নিল। সাত বছরের ছেলে আমার বুক-জোড়া ধন সতীশ, তাকে পথের মধ্যে কুকুরে কামড়াল। তার কি হল, তাও তো জানিস্!'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অপরূপা: 'জানি মা। আর বোলো না!'

—না-না-সব জানিস না তোরা। তোর পিসীমা ডাক্তার-খানা থেকে ওষুধ নিয়ে এল, একটা খাবার, আর একটা মাজিশের, সেটা বিষ আর—আর সেই বিষাক্ত ওষুধটা ভুল করে ছেলেটাকে খাইয়ে দিল—ছটফট্ করে বাছা আমার চোখের সামনে মরে গেল।

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া। যোগ দিল অপরূপা দুটি নারীর ক্রন্দন সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির-সোপানে আকুল আবেগে আঘাত করতে লাগল।

কিছুক্ষণ থেমে লক্ষ্মীপ্রিয়া বললেন 'আর একটি ছে

হল। সেটিকে ঐ রাক্ষুসী মা আঁতুড় ঘর থেকেই কেড়ে নিয়ে গেল। দাই মা বলল, তাকে নাকি একটা সাপে কামড়েছিল। বিশ্বাস করিনে আমি সে কথা,—ঐ রাক্ষুসী—ঐ রাক্ষুসী মাই তাকে ছিনিয়ে নিয়েছে।···অপু, তুই ফিরে যা ঘরে, আমি যাবো না, আমি ঐ রাক্ষুসীর পায়ে হত্যা দোবো, আমি সঙ্কল্প করে এসেছি। পিসীকে বলিস্, কর্ত্তাকে যেন সব বুঝিয়ে বলে, মায়ের আদেশ না পেলে আমি ঘরে ফিরবো না।

অপু আর কি করবে? ফিরে গেল ঘরে। কর্ত্তা ত্রৈলোক্যনাথ বসু সব কথা শুনলেন।···মনে পড়ল, এই তো ক'বছর হল, নিজ পৈতৃকভূমি কেশপুর থানার মহুবনী গ্রাম থেকে এসে মেদিনীপুরের এই হবিবপুরে কাঁচা ঘর তৈরী করে বাস করছেন। কিন্তু এরই মধ্যে পর পর দুটি ছেলের মৃত্যু এইখানেই তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে হয়েছে। দেখেছেন, লক্ষ্মীপ্রিয়া নীরবে সব সহ্য করেছেন, আর মা সিদ্ধেশ্বরীকে ডেকেছেন। প্রতি সন্ধ্যায় সন্ধ্যাদীপ দিয়ে পুত্র-সন্তান লাভের আকুল কামনা মায়ের পায়ে নিবেদন করেছেন। মায়ের কৃপালাভ আজও সম্ভব হয়নি। আজ যদি লক্ষ্মীপ্রিয়া সঙ্কল্প করে মায়ের পায়ে হত্যা দিয়ে থাকেন, তাঁকে ত্রৈলোকানাথ ফেরাবেন কোন্ যুক্তিতে? নারীর সন্তান-কামনায় বাধা দেবার অধিকার পুরুষের নেই।

তিনদিন নির্জ্জলা উপবাসে, শীর্ণতনু লক্ষ্মীপ্রিয়া আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলেন সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে। সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন হৃদয়ে এসে মিলিত হয়েছে, আর সেই উদ্বেল হৃদয় থেকে উৎসারিত হচ্ছে একই দাবী, একই প্রার্থনা: 'পুত্র সন্তান দাও, মা। নীরোগ, বলিষ্ঠ, দেবশিশুর মত পুত্র।'

চতুর্দ্দিকে অন্ধকার নেমে আসছে। রজনী গভীর হচ্ছে।··· প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে।···সংলগ্ন বনভূমি থেকে শিবারব ভেসে আসছে।···আরণ্য বিভীষিকায় প্রাঙ্গণ পরিব্যাপ্ত।···

অকস্মাৎ সেই প্রেতায়িত স্তব্ধতার পটভূমিকায় স্তিমিত দীপশিখার তিমির-কবলিত আলোকে ক্ষীয়মানা লক্ষ্মীপ্রিয়ার তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—এক অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতিঃ রূপান্তরিত হল স্মিতাননা দেবী-মূর্ত্তিতে। সেই মূর্ত্তির কণ্ঠস্বরে বেজে উঠল এক অপূর্ব্ব দৈববাণী—

'লক্ষ্মী! তুমি এখান থেকে উঠে যাও। পুত্র-সন্তান তোমার ভাগ্যে নেই, পুত্র হলেও সে বাঁচবে না। তবে তোমার কাতরতায় আমি বিচলিত হয়েছি; তাই আমার এক ভৈরব-দুলালকে তোমার কোলে পাঠাচ্ছি,—সে কিন্তু বেশি দিন বাঁচবে না। তার কাজ শেষ হলেই সে একটা কীর্ত্তি রেখে চলে আসবে।'

ধীরে ধীরে সেই বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল। তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল লক্ষ্মীপ্রিয়ার। ব্যস্তভাবে উঠেই দেখেন, উষার আলোকচ্ছটা প্রবেশ করেছে মন্দিরে। মন্দিরের পুরোহিত শ্যামাচরণ দীর্ঘাঙ্গী দাঁড়িয়ে তাঁর সম্মুখে।

স্নেহগদ্‌গদ্ কণ্ঠে তিনি বললেন:—'আজ তিন দিন পেটে তোমার কিছু পড়েনি মা। মায়ের চরণামৃত পান ক'রে যাও, ঘরে ফিরে যাও। মা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।'

তারপর এলো সেই দিন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর মা সিদ্ধেশ্বরীর রুদ্র-তিলক ললাটে ধরে। ত্রৈলোক্য নাথ বসুর সেই কাঁচা ঘরে, লক্ষ্মীপ্রিয়ার কোল আলো ক'রে জন্মগ্রহণ করলো বাংলার অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম বসু। সিদ্ধপুরুষ কাপালিক কালিকানন্দের পরে সিদ্ধেশ্বরীর আর এক ভৈরব-দুলাল।

একটির পর একটি সন্তান যে মায়ের কোল শূন্য করে চলে যায়, গ্রাম্যসংস্কারের নির্দ্দেশে নবজাত সন্তানের উপর সে মায়ের সমস্ত অধিকার মাত্র কয়মুষ্টি ক্ষুদের বিনিময়ে বিসর্জন দিতে হয়। তাই ক্ষুদের বিনিময়ে জ্যেষ্ঠা ভগিনী অপরূপা ক্ষুদিরামকে কিনে নিলেন। গর্ভধারিণী লক্ষ্মীপ্রিয়ার দাবীর সেইখানেই শেষ। তারপর শহীদ ক্ষুদিরামের শেষ দিন পর্য্যন্ত অপরূপা সেই কয়মুষ্টি ক্ষুদের সম্মান সমানভাবেই রক্ষা করে গেছেন।

বহুদিন পর পুত্রসন্তান লাভ করে মহানন্দে ত্রৈলোক্যনাথ ইটের পাকা বাড়ী গাঁথতে সুরু করলেন পুরনো সেই গৃহস্থালীর উপরেই। সবাই নিষেধ করলেন: কুলপ্রথা ভাঙতে চাও না কি? জানো না, তোমাদের বংশে ইটের বাড়ী তৈরী নিষেধ? অকল্যাণ ডেকে আনতে চাও? ত্রৈলোক্যনাথ মহোল্লাসে বলে উঠলেন: 'আমার পুত্রের চেয়ে কুলপ্রথা বড় নয়। পুত্র ধন, আর কুলপ্রথা সংস্কার। আমি ধনগর্ব্বে ভাঙবো সংস্কারকে।'

হাঁ, ভাঙলেন ত্রৈলোক্যনাথ সংস্কারকে। তাইতো, ক্ষুদিরামের জন্মের ছয় বৎসর পরেই ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে হেমন্তের এক শিশির-সিক্ত রজনীর শেষভাগে মা সিদ্ধেশ্বরীর চরণামৃত পান ক'রে লক্ষ্মীপ্রিয়া স্বামীর কোলে মাথা রেখে মহানিদ্রায় ঢ'লে পড়লেন। আর তারই এক বৎসর পর শীতের এক মধ্যাহ্নে ত্রৈলোক্যনাথও সতীশিরোমণির সঙ্গে মিলিত হলেন সিদ্ধেশ্বরীর সিদ্ধপীঠে। ভৈরবদুলাল ক্ষুদিরামের ললাটে দুঃখের বহ্নি-তিলক। অগ্নি-শিশু বিপ্লব-তীর্থ-যাত্রীর রুদ্র অভিযান সুরু হল দুঃখবিজয়ী ভৈরব-মন্ত্রে।

কালের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে ত্রৈলোক্যনাথের সেই ইষ্টক-ভবন এখনো দাঁড়িয়ে আছে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির-সম্মুখে। সিদ্ধেশ্বরীর ভৈরব-দুলাল ক্ষুদিরামের জন্মস্থান নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত মায়ের মন্দির আলো করে রেখেছে। আজ ঐশ্বর্য্যের ধূপ-দীপে সেই আলোর স্পর্শ কি পাই আমরা, এ যুগের আত্মবিস্মৃত দেশবাসী?

কাহিনী শেষ করে ক্ষুদিরামের বাল্যসঙ্গী ললিতমোহন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। বললেন: ক্ষুদিরামের আগ্নেয় অভিযানের কাহিনী শুনবেন আজ?

বললাম: আজ থাক।

হঠাৎ চমকে উঠলাম একটা কথা মনে পড়তে। বললাম: শুধু বলুন তো, ললিতবাবু, তার মহাপ্রয়াণের তারিখটা। মা সিদ্ধেশ্বরীর ভৈরব প্রসাদের স্বাদ মুখে নিয়ে যেদিন সে জীবনের জয়গান গাইতে গাইতে ফাঁসীর মঞ্চে উঠেছিল, সে দিনটি কবে?

—১১ই আগষ্ট। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ। মঙ্গলবার, সকাল ৬টা।

—আর তার জন্মবার, জন্মক্ষণ?—আমার ব্যাকুল প্রশ্ন।

—মঙ্গলবার, সকাল ৬টা।

অগ্নিঋষি মঙ্গলবার। ভৈরব-দুলাল দেশের মঙ্গল কামনা বুকে নিয়ে এক প্রত্যূষে দেশের মাটিতে জন্মেছিল, আবার আর এক মঙ্গলবার প্রত্যূষে সেই একই কামনা বুকে নিয়ে মা সিদ্ধেশ্বরীর চরণপ্রান্তে স্থান পেল। জয় মা সিদ্ধেশ্বরী!

অতীতের সব স্বপ্ন মুছে দিয়ে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে নবজীবনের মঙ্গল-আরতি বেজে উঠেছে।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, এম্-এ, পি-আর-এস্

সমাজ-নীতি

অন্য যে-কোন দেশের সমাজ-ব্যবস্থা হইতে প্রাচীন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যান্য দেশে চিরকালই অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমাজের কাঠামো তৈরী হইয়া আসিতেছে। দুঃখের বিষয়, পশ্চিমী দেশগুলির অনুকরণে সম্প্রতি ভারতবর্ষও সেই পথেরই পথিক হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে অর্থই মর্য্যাদার মানদণ্ড ছিল না। জ্ঞান এবং গুণই তখন সর্ব্বাধিক মর্য্যাদার হেতুরূপে বিবেচিত হইত। একজন নিঃস্ব বিদ্বান্ ব্যক্তির সম্মান নৃপতির সম্মানের চেয়ে অধিক ছিল। "রাজ-স্নাতকয়োশ্চৈব স্নাতকো নৃপমানভাক্" এবং "ব্রাহ্মণো দশবর্ষস্তু শতবর্ষস্তু ভূমিপঃ। পিতাপুত্রৌ বিজানীয়াৎ ব্রাহ্মণস্তু তয়োঃ পিতা" প্রভৃতি মনুসংহিতার বচন হইতে ইহা স্পষ্টভাবেই জানা যায়। বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহার নিজ পরিবারস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণের চেয়েও অধিকতর সম্মানের অধিকারী হইতেন। অবিদ্বান ব্যক্তিরা সম্পর্কে বড় হইলেও বয়ঃকনিষ্ঠ ও সম্পর্ক-কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্মানদানে বাধ্য থাকিতেন। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি উপাখ্যানের সাহায্যেও এই তথ্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বিদ্যা ও অন্যান্য সদ্গুণের এইরূপ মর্য্যাদা দেওয়া হইত বলিয়াই প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা উক্ত দুইটি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বিদ্যা, দৈহিক সামর্থ্য, কৃষি ও ব্যবসায়-নৈপুণ্য এবং সদাচার প্রভৃতি সদ্গুণের ভিত্তিতে সমগ্র মানব-সমাজকে চারিটিমাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন শ্রেণীর লোকেরা যজ্ঞোপবীত ধারণ ও বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে স্থলবিশেষে অনুলোম বিবাহও প্রচলিত ছিল।

তখনকার দিনে সমগ্র সমাজে সুশৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল। মান্য ব্যক্তির সম্মান নাশে, ধনবানের ধন হরণে অথবা আচারনিষ্ঠ ব্যক্তির সদাচার বিনাশে কেহই অগ্রসর হইত না। সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন, এবং এই কারণেই ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্যে অগ্রসর হওয়া তাঁহাদের কল্পনারও অতীত ছিল। প্রত্যেক পরিবারে পিতা ও অন্যান্য মান্য-ব্যক্তির আদেশ সকলেই বিনা দ্বিধায় মানিয়া চলিত। গুরুজনের সঙ্গে মতের মিল না হইলে পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষেরা নিজ নিজ যুক্তি প্রদর্শন করিতেন বটে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পরিবারের প্রধান ব্যক্তির বিচারকেই তাঁহারা মানিয়া লইতেন। এইরূপ সুদৃঢ় শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকায় প্রত্যেক পরিবারই পরম সুখে বাস করিত। একই পরিবারে বহু লোক বাস করার ফলে তাহারা নানারূপ অপব্যয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইত; এবং বিপদের দিনে পরিবারের সকলের আন্তরিক সাহায্য বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধার-সাধনে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কাজ করিত। রাজশক্তি সকল সময়েই একান্নবর্ত্তী এবং একতাপ্রিয় পরিবারগুলিকে সমর্থন করিতেন। তাহার ফলেও লোকের একতাপ্রীতি ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইত। যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা আজ সমগ্র হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, তখনকার দিনের হিন্দুরা কোনদিন স্বপ্নেও এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার কল্পনা করেন নাই।

সেই যুগের নারী স্বামীর জন্য রাজ্যসুখ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া বনে চলিয়া যাইতেন। পুত্র তাহার পিতার সত্য পালনের জন্য স্বেচ্ছায় সিংহাসনের দাবী ছাড়িয়া বনবাস বরণ করিত। ভ্রাতা নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতার জন্য বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিয়া ভোগসুখে বিরত থাকিতেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা জ্যেষ্ঠভগিনীর বিবাহের পূর্ব্বে তাহার কনিষ্ঠেরা কদাপি বিবাহ করিতেন না। জ্যেষ্ঠ নিখোঁজ হইলেও দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। দশরথ-নন্দন ভরত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের জন্য সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর অপেক্ষা করিয়া সিংহাসন পাহারা দিয়াছিলেন; কিন্তু নিজে তাহাতে বসেন নাই। সেই ত্যাগব্রতী ভারত আজ পশ্চিমী দেশগুলির নিকট হইতে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বার্থসাধন শিক্ষা করিয়া কি ভাবে নরকের পথে অগ্রসর হইতেছে, ভাবিতেও হৃদয় ব্যথিত হয়।

প্রাচীন ভারতে নারী এবং পুরুষ প্রত্যেকেরই বিবাহ করা অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপে বিবেচিত হইত; কিন্তু কাহারও একাধিক বিবাহ প্রশংসনীয় ছিল না। নিঃসন্তান পুরুষ পত্নীবিয়োগের পর বংশরক্ষার জন্য পুনরায় বিবাহ করিতে পারিতেন। কখন কখন ধনী পুরুষেরা একাধিক বিবাহও করিতেন বটে; কিন্তু এরূপ কার্য্য কদাপি সমাজের আদর্শ ছিল না। শ্রীরাম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভারতের আদর্শ নরপতিগণ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও একাধিক পত্নী গ্রহণ করেন নাই।

বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ ছিল। ঋগ্বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ভারতবর্ষে বিধবার

পুনর্ব্বিবাহ অতিশয় গর্হিত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা পরাশর-সংহিতার একটি বচনের ভুল পাঠ ধরিয়া এবং ততোধিক ভুল ব্যাখ্যা করিয়া এই বিষয়ে একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রেরও তাঁহারা ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।"

এই পরাশর শ্লোকের চতুর্থ চরণে 'পতিরন্যো ন বিদ্যতে' এইরূপ পাঠও পরাশর সংহিতার বিভিন্ন সংস্করণে দেখা যায়। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা শেষোক্ত পাঠ গ্রহণ করেন নাই। তাহা ছাড়া পতি শব্দের সপ্তমীর একবচনে যে 'পত্যৌ' পদ হয়, 'পতৌ' হয় না, এই ব্যাকরণের বিধানটি পর্য্যন্ত তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই। বস্তুতঃ, নঞ্‌ তৎপুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন 'অপতি' শব্দের রূপই উক্ত শ্লোকে গৃহীত হইয়াছে। সন্ধিতে অপতি শব্দের অকার লোপ পাইয়াছে। অপতি অর্থ ঈষৎপতি, অর্থাৎ যাহার সহিত বাগ্‌দানাদি হইয়াছে, কিন্তু বিবাহ হয় নাই। তাদৃশ ঈষৎপতির মরণ প্রভৃতি ঘটিলেই আপৎকল্পে বাগ্‌দত্তা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ নারীকেও স্মৃতিশাস্ত্রে পুনর্ভূ বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত বিধবার বিবাহের বিধান পরাশর দেন নাই।

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং
গতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধীষোস্তবেদং
পত্যুর্জনিত্বমভিসংবভূথ।"

এই ঋগ্বেদের মন্ত্রে দেবর সহমরণোদ্যতা শিশু পুত্রের জননী ভ্রাতৃবধূকে বলিতেছেন—"হে নারি! তোমার স্বামী পুত্ররূপে এই পৃথিবীতেই অবস্থান করিতেছেন; এবং আমিও হস্তধারণ করিয়া তোমাকে ফিরাইয়া নিতে আসিয়াছি; অতএব বাঁচিবার জন্য মৃত পতির পাশ হইতে উঠিয়া আস।"

এই মন্ত্রে 'হস্তগ্রাভ' (হস্তগ্রাহ) শব্দটি দেখিয়া বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ধরিয়া লইয়াছেন যে, দেবর বিবাহ করিবার জন্যই ভ্রাতৃবধূকে ডাকিতেছে। বস্তুতঃ, এই শব্দটি যে সাধারণ হস্ত ধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, আচার্য্য সায়ণ অথর্ব্ববেদের ব্যাখ্যায় এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে যেরূপ দৃঢ়তার সহিত বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের চিন্তা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতেও ঋগ্বেদোক্ত উল্লিখিত শব্দটির হস্তধারণ মাত্র অর্থই উপলব্ধ হয়। মনু বলিয়াছেন—

"কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু।"

অর্থাৎ পতির মৃত্যুর পর বরং বিশুদ্ধ ফল-মূল মাত্র ভক্ষণ করিয়া দেহপাত করিবে, তথাপি অপর পুরুষের চিন্তামাত্রও করিবে না।

মহাভারতেও 'সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে' কথাটি দ্বারা বিধবা-বিবাহের প্রতিকূল উক্তিই করা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশে মনস্বিনী নারীরা "বালবৈধব্যাদ্ বৃহাজন্মাহলমীদৃশী" বলিয়া [illegible]নাইয়া দিয়াছেন যে, সেই যুগে বাল্য-বিধবাদেরও পুনর্ব্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। পরাশর-সংহিতার পরবর্ত্তী বচনগুলি দ্বারাও এইরূপ তথ্যই পরিবেশিত হইয়াছে।

হিন্দু-ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্মের সেবক লক্ষ লক্ষ ঋষি আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বিশ্ববাসীকে সংযম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আজও এইরূপ সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী এই দেশে বর্ত্তমান থাকিয়া সংযমের আদর্শ প্রচার করিতেছেন। হিন্দু নারীরাও সংযমে পুরুষের পশ্চাতে ছিলেন না। এই সংযম রক্ষার জন্যই বিধবা বিবাহ হিন্দু-সমাজে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আমলে গ্রীক্ পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস এই দেশের অধিবাসিগণের সংযম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। উক্ত মনীষী তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীর একস্থানে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন—ভারতের মত বিশাল দেশে কোথাও চুরি, ডাকাতি বা ব্যভিচার-রূপ পাপের অস্তিত্বই দেখা যায় না। হিন্দুদের সংযম শিক্ষার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

খৃষ্টান ও মুসলমানদের সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন আছে; অতএব হিন্দুদের মধ্যে যদি তাহা না থাকে, তবে হিন্দুরা অসভ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন—এমন অদ্ভুত কল্পনা আমরা করি না। বরং হিন্দুরা পশুভাবে বিভোর হন না, দেখিলেই আমরা গৌরব বোধ করিয়া থাকি। আমাদের বিবেচনায় প্রাচীন ভারতে বিধবা-বিবাহের প্রচলন না থাকা হিন্দু-জাতির পক্ষে গৌরব জনক।

প্রাচীন-ভারতে অসবর্ণ-বিবাহ সাধারণতঃ অপ্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তীকালে কোন কোন স্মৃতিগ্রন্থে যদিও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের বিধান দেওয়া হইয়াছে, তথাপি অসবর্ণ-বিবাহে ভিন্ন আচারের ব্যবস্থা করায়, অসবর্ণ পত্নীর গর্ভজাত সন্তান পিতৃধর্ণের অধিকারী হয় না বলিয়া পরিষ্কার উল্লেখ থাকায়, অধিকন্তু অসবর্ণা-সম্পর্কে উচ্চবর্ণের পুরুষও অধোগতি লাভ করেন বলিয়া অভিহিত হওয়ায়, ইহা যে নিন্দনীয় ছিল, এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া চলে।

প্রাচীনকালে এদেশে অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিবেচিত হইত। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—১২ বৎসর বয়সের মধ্যে যে ব্যক্তি মেয়ের বিবাহ দিতে না পারেন, তিনি নিরয়গামী হন। মেয়ের পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি প্রত্যেক অভিভাবককেই এইরূপ নরকের ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। ফলে ১২ বৎসর বয়সের মধ্যে সকল মেয়েরই বিবাহ হইত। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুফল এই ছিল যে, কোন নারীই একাধিক পুরুষকে স্বামীভাবে পাওয়ার জন্য চিন্তা করিবার সুযোগ পাইতেন না। কেবল অন্য পুরুষের সহিত দেহ-সম্পর্ক ঘটিলেই সতীত্ব নষ্ট হয় না; অপর পুরুষকে মনে মনে কামনা করিলেও সতীত্ব নষ্ট হয়—ইহাই ছিল আর্য্য ঋষিগণের সুচিন্তিত অভিমত এবং এই জন্যই তাঁহারা অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহের বিধান দিয়াছিলেন। তাঁহাদের এইরূপ বিধান অতি উত্তম ছিল বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

যে সকল মেয়ে স্কুল কলেজে না গিয়া বাড়ীতে থাকিয়াই পিতা, মাতা, সহোদর ভ্রাতা প্রভৃতির নিকট শিক্ষালাভ করেন, তাঁহারাও অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিলে, বিবাহিত জীবনে সহজে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারেন না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'যোগাযোগ' উপন্যাসে এই চিত্রটি অতি সুন্দরভাবে অঙ্কন করিয়াছেন। সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবধারায় শিক্ষিত এবং সর্ব্বথা

পরপুরুষসম্পর্করহিত আদর্শচরিত্র কুমুদিনীর ১১ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়; কিন্তু সে তাহার স্বামীর পরিবারে গিয়া কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে না। কুমুদিনীর ছোট-জা 'মতির মা' স্পষ্টই তাহাকে বলিয়াছে—"আমাদের ভাই অল্পবয়সে বিবাহ হইয়াছিল; সুতরাং নিজেকে শ্বশুর-পরিবারের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে কোনই অসুবিধা হয় নাই।"

ঊনবিংশবর্ষীয়া কুমুদিনী সবই বুঝে; কিন্তু নিজের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। ইহা তাহার ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নহে; অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকাই ইহার জন্য দায়ী। প্রাচীন-ভারতীয় ঋষিগণ এই সকল কথা উত্তমরূপে বুঝিতেন বলিয়াই মেয়েদের জন্য অল্প বয়সে বিবাহের বিধান দিয়াছিলেন।

আশাপূর্ণা দেবীর 'কল্যাণী' উপন্যাসেও পাশ্চাত্ত্য-ভাবাপন্ন আধুনিকাদের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অধ্যাপক চ্যাটার্জ্জির পত্নী 'বলাকা' কেবল স্বামীকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তিনি ধাবিত হন ব্যারিষ্টার বিরাম সেনের পশ্চাতে। তাহাকে বিবাহিত জানিয়াও মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি নিজেকে সংযত রাখিতে পারেন না। তিনি কখনও ধাবিত হন তরুণ ডাক্তার মিহির গুপ্তের পিছনে, কখনও বা জমিদার ভূপতি লাহিড়ীর পশ্চাতে। আবার এই ভূপতি লাহিড়ীরই পুত্রের রূপ এবং তারুণ্য তাঁহাকে আকর্ষণ করে। নিজের স্বামীর প্রিয় ছাত্রের রূপ ও তারুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহারও পশ্চাতে তাঁহাকে ছুটিয়া চলিতে দেখা যায়। লোকলজ্জাকেও তিনি গ্রাহ্য করেন না। এই আচরণের দ্বারা মিসেস চ্যাটার্জ্জি যে কেবল স্বামীর জীবনটাকেই নিরানন্দ করিয়া তুলিয়াছেন, এমন নহে, নিজের জীবনেও তিনি কদাপি শান্তি খুঁজিয়া পান না। আশাপূর্ণা দেবী প্রশ্ন করিয়াছেন—"এ বিক্ষোভ কি শুধুই চ্যাটার্জ্জি-দম্পতির?" সত্যই, এই অশান্তি শুধু চ্যাটার্জ্জি-দম্পতিরই নহে; আজ বাংলা দেশের আধুনিক ভাবাপন্ন অধিকাংশ পরিবারই এই বিষে জর্জ্জরিত।

রাষ্ট্রনীতি

প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল—ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু কি ভাবে এই রাজতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার বিবরণ অনেকেই অবগত নহেন। মহাভারতের আদিপর্ব্বে এবং বিভিন্ন পুরাণে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সর্ব্বপ্রথম যিনি রাষ্ট্রের শাসন ও পালনের ভার গ্রহণ করিয়া 'রাজা' উপাধি লাভ করেন, তিনি অন্য কাহাকেও ক্ষমতাচ্যুত করিয়া এরূপ অধিকার লাভ করেন নাই। মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, অতি প্রাচীনকালে একপ্রকার পঞ্চায়েৎ শাসন-প্রণালী এদেশে প্রচলিত ছিল। প্রত্যেকটি গ্রামে একজন নেতা থাকিতেন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশে গ্রামের লোকেরা চলিত। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ লাগিয়া থাকিত এবং এইরূপ বিরোধের ফলে যে সকল সঙ্ঘর্ষ বাধিত, তাহাতে প্রায়ই উভয়পক্ষের বহু লোক প্রাণ হারাইত। এইরূপ মারাত্মক অবস্থা হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন গ্রামের নেতাদের মধ্যে পরামর্শ হইতে থাকে, এবং সর্ব্বশেষে তাহারা সকলেই একমত হয় যে, একজন লোককে সকলের উপরওয়ালা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। মহাভারতের "পরস্পরং ভক্ষয়ন্তো মৎস্যা ইব জলে স্থিতাঃ" পংক্তিটির মধ্যে এইরূপ অবস্থার আভাষ পাওয়া যায়।

অতঃপর, কি ভাবে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মিলিত হইয়া জ্ঞানে ও গুণে শ্রেষ্ঠ মনুর নিকট গিয়া বহু অনুরোধ-উপরোধের পর রাজপদগ্রহণে তাঁহাকে সম্মত করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে। ইহাই ভারতে রাজতন্ত্রের জন্মকথা।

এই বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথম নৃপতি জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। ইঁহাকে প্রত্যেকটি মানুষ পৃথক্ পৃথক্ ভোট দেয় নাই; কিন্তু প্রত্যেক গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকর্ত্তৃক তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। গ্রামের অজ্ঞ লোকদের ভোটের বস্তুতঃ কোন মূল্য নাই; কারণ প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন করিতে হইলে যে সকল বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক, তাহা বিবেচনা করিবার মত শক্তি প্রায়ই তাহাদের থাকে না। অপর পক্ষে, বিবেচক বিচক্ষণ লোকেরা যাঁহাকে নির্ব্বচন করেন, তিনি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উপযুক্ত লোক হইয়া থাকেন। প্রাচীন ভারতের জনগণের মধ্যে কেবলমাত্র বিচক্ষণ লোকেরাই এইভাবে তাঁহাদের যোগ্য নেতা নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন।

এই রাজতন্ত্রের আমলে রাজা যেভাবে দেশের শাসন ও পালনকার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাহা বস্তুতঃ গণতন্ত্রেরই একটি উৎকৃষ্ট রূপ। দেশের জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আট জন লোককে লইয়া রাজা একটি বলিষ্ঠ মন্ত্রিসভা গঠন করিতেন। তাহা ছাড়া দেশের বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান লোকদের মধ্য হইতে প্রধান প্রধান কয়েকশত ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত হইত একটি পরিষৎ। প্রত্যেকটি জটিল কার্য্যে এই পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করা হইত এবং মন্ত্রী-মনোনয়নেও এই পরিষৎই রাজাকে পরামর্শ দিতেন।

অতএব, দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন ভারতে নামে রাজতন্ত্র থাকিলেও, কার্য্যতঃ গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমান কালের গণতন্ত্র হইতে প্রাচীন গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তখনকার দিনে নির্ব্বোধ অজ্ঞ লোকদের কোন ভোট গ্রহণ করা হইত না। ইহার ফলে লাভই হইত; কারণ নির্ব্বাচনের সময়ে উপযুক্ত লোককে পরাজিত করিয়া অনুপযুক্ত লোক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না। মূর্খ-অজ্ঞ লোকেরা যেমন ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন দেয়, বিচক্ষণ, বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কখনও তাহা করেন না, বা বিবেকের তাগিদে করিতে পারেন না।

প্রাচীন ভারতে রাজারা সর্ব্বতোভাবে নিজেদিগকে জনসাধারণের প্রতিনিধি মনে করিতেন। কোন রাজকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ আসিলে রাজা সকল সময়েই প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই কর্ম্মচারীকে সায়েস্তা করিতেন। নীতিশাস্ত্রকার স্পষ্ট বলিয়াছেন—

"ন ভৃত্য-পক্ষপাতী স্যাৎ প্রজাপক্ষং সমাশ্রয়েৎ।"

রাজা প্রজাদের নিকট হইতে এমনভাবে রাজস্ব গ্রহণ করিতেন, যাহাতে তাহাদের ক্লেশ না হয়। এই অল্প আয়ের দ্বারাই তখনকার দিনে দেশের শাসনকার্য্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হইত; কারণ, সেই যুগের রাজপুরুষেরা বিলাস-ব্যসনে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়াইতেন না। মন্ত্রীদের জন্য বড় বড় অট্টালিকা এবং পৃথক পৃথক গাড়ী দেওয়াও তখনকার দিনের রাজারা কর্ত্তব্য মনে করিতেন না। রাজকর্ম্মচারীমাত্রকেই

অল্প বেতন দেওয়া হইত এবং ফলে জনসাধারণ ও রাজকর্মচারিগণের মধ্যে অতি অল্পই প্রভেদ থাকিত।

প্রজাদের নিকট হইতে এইরূপ অল্প রাজস্ব গ্রহণ করিয়াও তখনকার দিনের রাজারা নিজেকেই প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মনে করিতেন। কোন প্রজার বাড়ীতে চুরি বা ডাকাতি হইলে, রাজার প্রথম কর্তব্য হইত—অপহৃত মাল উদ্ধার করিয়া মালিককে ফেরৎ দেওয়া; তাহার পর চোরের শাস্তি। যে ক্ষেত্রে অপহৃত মাল উদ্ধার করা সম্ভব হইত না, সেই ক্ষেত্রে রাজকোষ হইতে প্রজাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইত। বিষ্ণু সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ দেখা যায়—

"চৌরহৃতং ধনমবাপ্য সর্ব্বমেব সর্ব্ববর্ণেভ্যো দদ্যাৎ। অনবাপ্য তু স্বকোষাদেব দদ্যাৎ।"

দুঃখের বিষয়, আজকাল পৃথিবীর সকল দেশেই তথাকথিত গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টসমূহ জনসাধারণের নিকট হইতে প্রচুর রাজস্ব গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাহাদের ধনপ্রাণ রক্ষার এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করেন না।

যে কোন রাজার রাজ্যে কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছেন শুনিলে, রাজা তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার জীবিকার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। ধর্মশাস্ত্রকার বলিয়াছেন—যে রাজার রাজ্যে বিদ্বান ব্যক্তি ক্ষুধায় কষ্ট পান, সেই রাজার রাজ্য অচিরেই ধ্বংস হয়।

প্রাচীন-ভারতে বেকার-সমস্যা ছিল না। মানুষের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতাও দেখা যাইত না। বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ প্রায় সকলেই ভারতবর্ষে চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ অনুষ্ঠিত হইত না দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা যদি এই দেশের তদানীন্তন শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকিতেন, তাহা হইলে এইভাবে বিস্মিত হইতেন না। যে দেশে চুরি, ডাকাতি দ্বারা কোন ব্যক্তির ক্ষতি হইলে অবিলম্বে রাজকোষ হইতে সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দেওয়া হয়, চোরকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধরিতে না পারিলে পুলিশ-কর্মচারীকে পদচ্যুত হইতে হয়, এবং চোরের শাস্তি হিসাবে তাহার দক্ষিণহস্ত কাটিয়া ফেলা হয়, সেই দেশে কদাপি চুরি ডাকাতি হইতে পারে না। ভারতবর্ষে চুরি, ডাকাতি না হওয়ার কারণও প্রধানতঃ ইহাই ছিল। তাহা ছাড়া, সে যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থা ধর্মহীন ছিল না। ধর্ম ও সমাজের বিধি লঙ্ঘনকারীকে রাজদ্বারে বর্তমানকালের ন্যায় পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত না করিয়া, কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। মানুষের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা না থাকার ইহাও ছিল অন্যতম কারণ।

তখনকার দিনের রাজারা প্রত্যেক মানুষকেই সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। ভারতের আদর্শ নরপতি রামচন্দ্র গুহক-নামক চণ্ডালকে এবং দক্ষিণ-ভারতের তদানীন্তন অসভ্য মনুষ্যগণকেও বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। রাম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি নৃপতিরা দীর্ঘকাল মুনিদের সঙ্গে তপোবনে বাস করিয়া সাধারণ মানুষের ন্যায় জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন। রামের বা যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় বিদ্বান ব্যক্তিরা সকল সময়েই পর্য্যাপ্ত সম্মানলাভ করিয়াছেন। দুর্দ্ধর্ষ নরপতিগণও বিদ্বান ও আচারনিষ্ঠ দরিদ্র ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করা গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। দুষ্মন্তের সভায় কণ্বশিষ্য রাজার প্রতি কঠোর উক্তি করিয়াও ভর্ৎসিত হন নাই; বরং রাজাই তাহাতে লজ্জিত হইয়াছেন। কণ্বশিষ্য মার্জিত ভাষায় রাজাকে প্রকাশ্যে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘোষণা করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহা হইতে প্রাচীন ভারতের ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আজকাল পৃথিবীর যে-কোন দেশে রাষ্ট্রপতিকে তো দূরের কথা, একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকেও এইরূপ শক্ত কথা বলিয়া কেহ অব্যাহতি পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

উপসংহার

বর্তমানে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বিপক্ষে নানাপ্রকার জঘন্য প্রচারকার্য্য অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। অজ্ঞ অথচ পণ্ডিতম্মন্য লোকেরা হিন্দু-সংস্কৃতির কণামাত্র না জানিয়া তাহার সম্বন্ধে প্রায়ই নানারূপ বিরূপ মন্তব্য করিয়া থাকেন। কোন কোন বিখ্যাত জননেতা পুস্তক লিখিয়া এইরূপ অপ-প্রচার চালাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারতীয় লোকসভার বিখ্যাত সদস্য শ্রীযুক্ত এস, এ, ডাঙ্গে মহোদয়ের লিখিত "India from Primitive Communism to Slavery" নামক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিতে পারি। উক্ত গ্রন্থে লেখা হইয়াছে যে, দশরথ-নন্দন রাম তাঁহার সহোদর ভগিনী সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সীতাকে যে কারণে জনক-নন্দিনী বলা হয়, তাহা স্কুলের ছেলেমেয়েরাও জানে। লোকসভার বিদ্বান সদস্য অজ্ঞানতাবশতঃ এইরূপ উক্তি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি নিশ্চয়ই ইচ্ছা করিয়া বহির্জগতে ভারতীয় সভ্যতাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য এইরূপ মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর ক্ষমতাপন্ন নেতারা হিন্দুর ধর্মকর্ম-সমূহের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা প্রকাশ্য সভায় বলিয়া বেড়াইতেছেন—দেবতাদের নিকট মস্তক নত করা তাঁহাদের মতে কুসংস্কার। ঐ সকল নেতা চিন্তা করেন না যে, এইরূপ প্রচারদ্বারা মানুষের অপরাধ-প্রবণতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি দেবতার কাছে মস্তক নত করিতে শিখে না, সে নেতাদের বা রাষ্ট্রের নির্দেশ নির্ব্বিবাদে পালন করিবে—এরূপ আশা না করাই উচিত। ঐ সকল নেতারা বলিয়া বেড়াইতেছেন—যজ্ঞে আহুতিদান করা তাঁহারা অপব্যয় মনে করেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা শত শত কোটি টাকা অন্যায় পথে অপব্যয় করিয়া থাকেন।

আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরু অল্পদিন পূর্ব্বেও বিভিন্ন জনসভায় উল্লিখিত প্রকার মন্তব্য করিয়াছেন; অথচ Illustrated Weekly of India নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রায় ২½ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ হইতে আমরা জানিতে পারি, তিনি নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য ১৪টি বড় বড় কুকুর পুষিয়া থাকেন এবং ইহাদের প্রত্যেকটির পিছনে গড়ে মাসিক প্রায় ২০০ টাকা করিয়া খরচ হয় (চাকরের বেতন, মাংসের মূল্য ইত্যাদিতে)। আমরা প্রধান মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই—যে দেশের ডক্টরেট উপাধিধারী ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত অর্থাভাবে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হন, সেই দেশের প্রধানমন্ত্রীর উল্লিখিতপ্রকার ব্যয় কি সদ্ব্যয়?

অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে উল্লিখিত প্রকার মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারকে আমরা নৈতিক অপরাধ মনে করি।

অজিতকৃষ্ণ বসু

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার ইতিহাসে স্মরণীয় বছর, ইংলণ্ডের আনুগত্য থেকে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার বছর, যা থেকে শুরু হয়েছে স্বাধীন মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস। এই বছরে ইংলণ্ডের রাজধানীতে আবির্ভূত হলেন এক অসাধারণ রহস্যময় দম্পতি—অসুন্দর স্থূলকায় কাউণ্ট ক্যাগলিওস্ট্রো (Count Cagliostro) এবং তাঁর সুন্দরী তন্বী তরুণী পত্নী সেরাফিনা।

লণ্ডনের সেরা অভিজাত পান্থশালায় মহা জমকালো বিরাট জুড়ি গাড়িতে চড়ে এলেন পত্নীসহ কাউণ্ট ক্যাগলিওস্ট্রো। গাড়োয়ানের সাজ-পোষাকের জাঁক জমকেও চোখে চমক লাগে; গাড়ির আগে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে হুকুম-বরদার ভৃত্যদের জাঁকও কিছু কম নয়।

অত্যন্ত গম্ভীর, স্বল্পবাক, নেপথ্য-বিলাসী এই নবাগত অতিথি ক্যাগলিওস্ট্রো। তাঁকে ঘিরে যেন এক অলৌকিক রহস্যের আবহাওয়া, তিনি যেন এ জগতের মানুষ নন, এসেছেন অন্য কোনো জগৎ থেকে। তেমনি রহস্যময়ী তাঁর সঙ্গিনী সেরাফিনা, মুখে তাঁর মোনালিসার হাসির চাইতেও রহস্যময় মৃদু হাসি, দু'চোখে তাঁর বহু দূরের স্বপ্নময় ইংগিত, পরীর মতো হালকা যেন তাঁর পদক্ষেপ।

এই দু'জনের আগমনে বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটল সে অঞ্চলের মানসিক আবহাওয়ায়; বাসিন্দারা তাঁদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে অনুভব করলেন এক বিচিত্র, অবর্ণনীয় এবং কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর শিহরণ। কারা এই দু'জন? এসেছেন কোথা থেকে, এবং কেন? এঁদের চলাফেরা হাবভাব সব কিছুতেই রহস্য জড়ানো। বাইরের জগৎ থেকে নিজেদের আড়াল করে রাখায় অভ্যস্ত এঁরা; কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তো দূরের কথা, পরিচিত হবারও বিন্দুমাত্র আগ্রহ এঁদের দেখা যাচ্ছে না। পান্থশালার অন্যান্য অতিথিরাও বড় একটা এঁদের দর্শন পাবার সুযোগ লাভ করেন না। এঁদের আহার্যও সম্পূর্ণ আলাদাভাবে, কাউণ্টের বিচিত্র নির্দেশ অনুযায়ী বিশেষভাবে তৈরি করে এঁদের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এঁদের খানা পাকানোর পদ্ধতিতেই যে শুধু বিশেষত্ব তা নয়, কাউণ্টেরই নির্দেশমতো কিছু কিছু অদ্ভুত দ্রব্যও তাতে মেশানো হয়। পান্থশালার মুগ্ধ মালিক সদাই তটস্থ, পাছে এই অসাধারণ দম্পতির এতটুকুও অসুবিধা ঘটে; এমন দরাজ হস্ত, দিলদরিয়া, অভিজাত, রহস্যময় অতিথি তিনি জীবনে আর কখনো পাননি। অর্থ দিয়ে এই কাউণ্ট যেভাবে ছিনি-মিনি খেলেন, তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, তিনি অসাধারণ ঐশ্বর্যবান।

কাউণ্ট ক্যাগলিওস্ট্রো এবং তাঁর পত্নী সেরাফিনা সম্বন্ধে অসীম কৌতূহল শুরু হলো চারধারে, শুরু হলো তাঁদের নিয়ে নানারকম জল্পনা কল্পনা। এই রহস্যময় দম্পতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় যখন দেখা গেল খুব সুলভ নয়, তখন অদম্য কৌতূহল মেটাবার জন্য অনেকে শরণ নিলেন কাউণ্টের ভৃত্যদের। ভৃত্যদের মুখে যা শোনা গেল তাতে রহস্য বরং আরো বেড়ে গেল, আর বেড়ে গেল, ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা অথবা শ্রদ্ধাপূর্ণ ভীতি। প্রভু এবং প্রভুপত্নী সম্পর্কে ভৃত্যেরা সবাই একমত: এঁরা অসাধারণ ঐশ্বর্যবান, অসাধারণ দিল-দরিয়া, অসাধারণ রহস্যময়, এবং এঁরা দু'জনেই, বিশেষ করে কাউণ্ট ক্যাগলিওস্ট্রো, অলৌকিক শক্তির অধিকারী অতুলনীয় যাদুকর।

সেরাফিনা পূর্ণযৌবনা সুন্দরী, তাঁর বয়স তখন সবেমাত্র কুড়ি বছর হয়েছে, কিন্তু রটে গেল (অর্থাৎ সূক্ষ্ম কৌশলে রটানো হলো) তাঁর বয়স ষাট বছর ছাড়িয়ে গেছে। আশ্চর্য! কি করে এই স্থির যৌবন সম্ভব হলো? ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেলো (অর্থাৎ কায়দা করে ক্যাগলিওস্ট্রোই প্রকাশ করালেন) এই স্থির যৌবনের উৎস হচ্ছে যাদুকর ক্যাগলিওস্ট্রোর আপন হাতে প্রস্তুত করা সঞ্জীবনী রসায়ন—"মিশরী মদ"। এ রসায়ন প্রস্তুতের প্রকরণ কাউণ্ট ক্যাগলিওস্ট্রো বহু সাধনায় বহু অন্বেষণ আর গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন মিশরের প্রাচীন গুপ্তরহস্যের ভাণ্ডার থেকে, এ কথাও প্রচারিত হয়ে গেল। এই রহস্যময় সঞ্জীবনী রসায়নের অসীম ক্ষমতা যৌবন প্রলম্বিত এবং বার্দ্ধক্য বিলম্বিত করে আয়ু বৃদ্ধি করবার, মৃত্যুকে পিছিয়ে দেবার, হারানো যৌবন ফিরিয়ে আনবার।

আরেকটি চমকপ্রদ সংবাদ রটলো ক্যাগলিওস্ট্রো সম্বন্ধে—তাঁর কাছে এমন দ্রব্য আছে, যার সাহায্যে কয়েকটি গোপন প্রক্রিয়া দ্বারা তিনি যে-কোনো সস্তা ধাতুকে সোনায় পরিণত করে দিতে পারেন। এই বিদ্যা বা প্রক্রিয়ার নামই 'অ্যালকেমি' (Alchemy)।

যেমন রটে গিয়েছিলো, শ্রীমতী সেরাফিনাকে প্রায় নবযৌবনার মতো দেখালেও তিনি ষাট বছরের বুড়ি, অথবা তিনি বয়সে ষাট হলেও দেখতে যুবতী, তেমনি এও রটে গিয়েছিলো যে, এই রহস্যময় কাউণ্টকে দেখে তাঁর খুব বেশি বয়স মনে না হলেও তিনি বহুকালের বুড়ো, তাঁর বয়সের গাছপাথর নেই। নানারকম উদ্ভট সৃষ্টি-ছাড়া অনুমান বা গবেষণা চলছিলো তাঁর বয়স সম্বন্ধে। প্রত্যক্ষভাবে নয় (বলাই বাহুল্য), পরোক্ষভাবে নিজের সম্পর্কে এই নানারকম উদ্ভট কল্পনাকে উস্কে তুলতে সদা যত্নবান ছিলেন কাউণ্ট ক্যাগলিওস্ট্রো।

মুখে মুখে অতিরঞ্জিত হতে হতে নানারকম গাঁজাখুরি কিম্বদন্তী প্রচারিত হয়েছিল তাঁর সম্বন্ধে। যেমন, দ্বিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার এবং জুলিয়াস সীজারকে নিজের চোখে দেখেছেন ক্যালিওস্ট্রো; দেখেছেন রোম শহর আগুনে পুড়ে ছাই হবার দৃশ্য দেখতে দেখতে পরম পুলকে বেহালা বাজাচ্ছেন রোম-সম্রাট নিরো; এমন কি, যীশু খৃষ্টকে যখন ক্রুশ বিদ্ধ করা হচ্ছিল, তখন ক্যালিওস্ট্রোও ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে একজন!!!

মানুষ চায় নিজের যৌবন প্রলম্বিত করতে, ফিরে পেতে চায় হারানো যৌবন চায় অনেক দিন বেঁচে থাকতে। সোনার প্রতি মানুষের আকর্ষণও প্রচণ্ড। আর মানুষ যা বিশ্বাস করতে ভালোবাসে তাই বিশ্বাস করতে তার ইচ্ছা হয়, আর এই ইচ্ছাই প্রবল হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসে পরিণত হয়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম দক্ষতার সঙ্গে মানুষের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন সারা বিশ্বের অন্যতম সেরা ধাপ্পা-কৌশলী কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রো। অনেকের মতে ধাপ্পা-জগতের ইতিহাসে তিনি এখন পর্যন্ত অপরাজিত শিল্পী। পৃথিবীর যাদুচর্চার ইতিহাসেও ক্যালিওস্ট্রোর নাম চিরস্মরণীয়।

কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রো কিন্তু আসলে কাউন্টও ছিলেন না, ক্যালিওস্ট্রোও নয়। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিলো জোসেফ (বা 'জিউসেপ্পি') বলসামো, ডাক নাম ছিলো 'বেপ্পো।' তিনি জন্মেছিলেন খৃষ্টীয় ১৭৪৩ সালে, সিসিলি দ্বীপের প্যালার্মো শহরে এক নিতান্ত গরীব পরিবারে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন সাধারণ দোকানদার। দুষ্ট ছেলে বেপ্পো-র নানারকম উৎপাতে পাড়ার লোক অস্থির, শহরের লোক অস্থির। বেপ্পোর যেমন ষণ্ডা চেহারা, তেমনি সে বেপরোয়া ডানপিটে, বিবেকের কোনো বালাই তার নেই।

বারো বছর বয়সে বেপ্পোকে এক স্কুলে পাঠানো হ'লো বিদ্যা-চর্চার জন্য। সেখানে গুরুমশাইদের সঙ্গে বেপ্পোর ব্যক্তিগত সম্পর্কটা তেমন প্রীতিপূর্ণ হলো না, তাঁদের হাতের প্রচুর কানমলা খেয়ে খেয়ে বিরক্ত হয়ে তিনি পালালেন সেই স্কুল থেকে। তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে। মায়ের উদ্যোগে তিনি ভর্তি হলেন এক মঠে। মা'র বিশ্বাস মঠের সাধু সন্ন্যাসীদের শিক্ষাধীনে কিছুদিন থাকলে ছেলের স্বভাবচরিত্র শোধরাবে। কিছুদিন বাদে বেপ্পো হলেন মঠের চিকিৎসকের সহকারী; তাঁর কাজ হলো ওষুধের শিশি বোতল ধুয়ে সাফ করা, ওষুধের গাছ-গাছড়া লতাপাতা সংগ্রহ করা, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি। এসব কাজের সঙ্গে সঙ্গে বেপ্পো এই চিকিৎসকের কাছে কিছু কিছু চিকিৎসা-বিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্রের কিছু কিছু জ্ঞানও আয়ত্ত করে নিতে লাগলেন। শিষ্যের শিখবার অসামান্য আগ্রহ আর আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে এই চিকিৎসক গুরুটি খুশি হলেন তার ওপর! মাঝে মাঝে বেপ্পোর ওপর আরেকটি কাজ চাপতো—তিনি আহারের সময়ে সাধু মহাপুরুষদের অলৌকিক জীবনকাহিনী মোটা মোটা গ্রন্থ থেকে পড়ে শোনাতেন মঠের সাধুদের। এই 'মহাপুরুষ'দের অলৌকিক ক্ষমতার নানা কাহিনী পড়ে শোনাতে শোনাতে বেপ্পো বলসামোর কল্পনাপ্রবণ মন ভরে উঠলো নানা রকমের মতলবে আর রঙীন স্বপ্নে: ঐ রকম 'অলৌকিক' শক্তির নমুনা দেখিয়ে তিনিও কি লাভ করতে পারবেন না প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, অর্থ, সম্মান?

মঠের একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে একদিন বেপ্পো যে দুষ্টুমি কাণ্ড করলেন, তাতে তিনি মঠ থেকে বহিষ্কৃত হলেন। জালিয়াতিতে তাঁর হাতটি ছিল পাকা। মঠ থেকে বেরিয়েই তিনি নানা মক্কেলের হয়ে দলিল এবং দস্তখৎ ইত্যাদি জাল করে দিয়ে, এবং আরো নানা ধরণের চতুর অসদুপায়ে অনায়াসেই অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন।

একবার মারানো (Marano) নামে এক স্বর্ণকারের গভীর আস্থা অর্জন করে তিনি তাঁকে বোঝালেন সমুদ্রতীরের কাছাকাছি এক পাহাড়ের গুহার ভেতর মাটির তলায় রয়েছে বহুমূল্য গুপ্তধন। এই গুপ্তধনের সন্ধান দেবার বিনিময়ে মারানোর কাছ থেকে বেপ্পো কিছু পরিমাণ সোনা আগাম দক্ষিণা নিয়ে নিলেন। বেপ্পোর নির্দেশমতো মারানো কোদাল আর গাঁইতি নিয়ে সেই গোপন গুহায় মধ্যরাত্রে গেলেন বেপ্পোর সঙ্গে, উদ্দেশ্য—ঐ গুপ্তধন খুঁড়ে বার করা। বেপ্পো রহস্যময় ভঙ্গীতে বেশ গুরুগম্ভীর ভাবে মাটির ওপর ফস্‌ফোরাসের সাহায্যে যাদুচক্র আঁকলেন; ফস্‌ফোরাসে আঁকা বৃত্তটি জ্বলজ্বল করতে লাগ'লো মধ্যরাত্রির ঝাপসা অন্ধকারে। বেপ্পো তারপর অদ্ভুত দুর্বোধ্য ভাষায় নানারকম মন্ত্র পড়ে মারানোকে বললেন ঐ যাদু-বৃত্তের ভেতর খনন-কার্য শুরু করতে। কাজ শুরু করলেন মারানো। আনন্দে তাঁর হৃদয় ভরপুর, আজ বহুমূল্য গুপ্তধনের অধিকারী হবেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ একি??? বিকট চীৎকারে আতংক জাগিয়ে যেন শয়তানেরই চেলা-চামুণ্ডারা একসংগে চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কীল-ঘুঁষি চালিয়ে নাস্তানাবুদ করে তুলল স্বর্ণকার মারানোকে। সেদিন গুপ্তধন পাওয়া তো দূরে থাক, মার খেয়ে চোখ মুখ ফুলিয়ে আর ছেঁড়া জামা নিয়ে কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফিরলেন মারানো। তাঁর সঙ্গে টাকা-কড়ি যা কিছু ছিল তা কেড়ে রেখে দিয়েছিল ঐ শয়তানের অনুচরগুলোই। মারানো টের পেলেন ওরা যে শয়তানের চেলা, সে শয়তান স্বয়ং বেপ্পো; বেপ্পোরই ধাপ্পায় ভুলে তিনি বিশ্রী রকম বোকা বনেছেন। ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—এই প্রতারণা, অপমান আর প্রহারের উপযুক্ত প্রতিশোধ তিনি নেবেনই। আইনের সাহায্য নিতে গেলে নিজের বোকামিই প্রকাশ হয়ে পড়বে, বেপ্পোকেও তেমন কিছু জব্দ করা যাবে না, তাই ধনী স্বর্ণকার মারানো স্থির করলেন যে, ভাড়াটে ঘাতক দিয়ে তাকে হত্যা করিয়ে গুম করে ফেলবেন। মারানোর প্রতিশোধ এড়াবার জন্য বেপ্পো প্যালার্মো শহর ছেড়ে গোপনে পালিয়ে গেলেন।

প্যালার্মো থেকে পালাবার পর থেকেই শুরু হলো তাঁর নানা দেশে ভ্রমণ: গ্রীস, মিশর, আরবদেশ, পারস্য, রোডস দ্বীপ, মালটা, নেপল্‌স্, ভেনিস, রোম। নিজেকে ঘিরে একটা অদ্ভুত রহস্যগম্ভীর আবহাওয়া সৃষ্টি করে রাখা আর কাহিনী বানাবার আশ্চর্য ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সর্বত্রই তিনি ধাপ্পার জোরে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। লোক ঠকিয়ে প্রচুর পয়সা কামাতে তাঁকে কখনোই খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি, এমনি আশ্চর্য ছিল তাঁর ধাপ্পা-প্রতিভা এবং অভিনয়-ক্ষমতা। রোম নগরীতে এসে তাঁর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। তিনি বিবাহ করলেন লোরেন্‌জা ফেলিশিয়ানি নাম্নী এক সুন্দরী দর্জি-কন্যাকে। শিবের সঙ্গে শক্তির মিলন হ'ল যেন। সামান্য

এক দর্জির মেয়ে হলেও লোরেন্‌জার রক্তে ছিল অ্যাডভেঞ্চারের নেশা, চিত্তে ছিল রোমান্টিক কল্পনা আর উচ্চাশা। তিনি বুঝলেন এই লোকটিই হবেন তাঁর যোগ্য জীবন-সঙ্গী; এঁর ভেতর যে মাল-মশলা আছে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারলে জীবনের অনেক উচ্চাকাংখাই এঁর সহযোগিতায় পূর্ণ করে নেওয়া যাবে।

দক্ষ পরিচালিকার হাতে পড়ে এক আলাদা রূপ পেলেন বেপ্পো বল্‌সামো। নিজের ভ্রাম্যমান জীবনের যে সব আষাঢ়ে গল্প অম্লান বদনে বলে যেতেন নির্লজ্জ মুখর বেপ্পো, তারই মধ্যে লোরেন্‌জা পেলেন অসামান্য কল্পনাশক্তির পরিচয়। বেপ্পোর আত্মম্ভরিতায় তিনি দেখলেন অসামান্য আত্মবিশ্বাস আর আত্মনির্ভর। তাঁর অসুন্দর বিপুল দেহভারে দেখলেন ওজনদার ব্যক্তিত্ব। সুজনী কল্পনার চোখে লোরেন্‌জা দেখলেন তাঁর বিধাতা-প্রেরিত এই জীবন-সঙ্গীটির ভবিষ্যৎ রূপ। দেখে পুলকিত হলেন। খুব সম্ভব বেপ্পো বল্‌সামোর অসামান্য ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা এক লহমায় দেখে নেবার মতো দূরদৃষ্টি লোরেন্‌জার ছিল বলেই তিনি সানন্দে বরমাল্য পরিয়েছিলেন বেপ্পোর স্থূল কণ্ঠে। নইলে লোরেন্‌জার মতো সুন্দরীর বেপ্পো বল্‌সামোর মতো অসুন্দরের প্রেমে পড়বার অন্য কোনো কারণ ছিল না।

তালিম দিয়ে দিয়ে স্বামী বেপ্পোর বদ্‌গুণগুলোকে সদ্‌গুণে পরিণত করাতে লাগলেন লোরেন্‌জা, স্থূল হাবভাব আর স্বভাবগুলোকে মার্জিত করে তুললেন যথাসম্ভব, আগোছালো আবোল তাবোল মিথ্যাভাষণগুলোকে বেশ করে গুছিয়ে একটি সুসম্বদ্ধ কাহিনীতে পরিণত করে দিয়ে, সেই কাহিনীটিতেই অভ্যস্ত করে তুললেন বেপ্পোকে। সমাজের উঁচুমহলে মেলামেশা করবার উপযুক্ত আদব-কায়দা-দুরস্ত হয়ে উঠতে লাগলেন বেপ্পো বল্‌সামো—তাঁকে তালিম দিতে লাগলেন তাঁর উচ্চাকাংখিনী জীবনসঙ্গিনী লোরেন্‌জা ফেলিশিয়ানি।

তালিম ও প্রস্তুতি পর্ব শেষ হলে পর বেপ্পো বল্‌সামো হলেন "কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রো"। লোরেন্‌জা ফেলিশিয়ানি হলেন "সেরাফিনা"। তারপর শুরু হলো তাঁদের যুগ্ম ধাপ্পা-অভিযান, নিপুণ অভিনয়ে, অসাধারণ পরিকল্পনায়, বেপরোয়া দুঃসাহসিকতায় এবং দীর্ঘ সাফল্যে পৃথিবীর ইতিহাসে যার তুলনা বিরল। জমকালো চারঘোড়ায় টানা গাড়িতে—সঙ্গে এক ঝাঁক জাঁকালো উর্দিপরা ভৃত্য নিয়ে ইউরোপের নানা জায়গায় ভ্রমণ করতে লাগলেন পত্নী 'সেরাফিনা' সহ 'কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রো।' যেখানে যেতে লাগলেন সেখানেই অর্থ ছড়াতে লাগলেন দরাজ হাতে, বহুজনের বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা উৎপাদন করে। চারিদিকে খ্যাতি ছড়িয়ে গেল রহস্যময়, রাশভারি, অমিত ঐশ্বর্যবান, দিল-দরিয়া কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রোর। অকাতরে দান, দরিদ্রনারায়ণের প্রতি তাঁর অপরিসীম করুণা এবং ধনী হোমরা-চোমরাদের প্রতি তাঁর অপরিসীম অবজ্ঞা এবং অশ্রদ্ধা অসংখ্য হৃদয়ে তাঁকে অসামান্য শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে দিল।

কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রোর শ্রীমুখ-নিঃসৃত অসংখ্য আষাঢ়ে ধাপ্পা অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক গোগ্রাসে গিলেছিল ভেবে বিস্ময়ে আত্মহারা হবার কারণ নেই, কেন না, এই বিংশ শতাব্দীতেও বহু ধাপ্পা বহু শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে, এবং সে সব ধাপ্পাকে বেদ-বাক্য বলে মেনে নেবার মতো লোকেরও অভাব হচ্ছে না। দুনিয়ায় উজবুকের অভাব কোনোদিন হয় না বলেই বুজরুক ধাপ্পাবাজেরও কোনোদিন অভাব হয় না।

'অলৌকিক' প্রতারক ক্যালিওস্ট্রো যে যুগে তাঁর বুজরুকি দিয়ে বিরাট পসার জমিয়েছিলেন, সেই খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল যুক্তির যুগ, বুদ্ধির যুগ, মগজের যুগ, যাকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে 'এজ অভ রীজন্' (Age of Reason)। হৃদয়বৃত্তির চাইতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য বেশি ছিল বলেই সে যুগের সাহিত্যে কাব্যের চাইতে গদ্যেরই বিকাশ বেশি হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব সম্বন্ধে বুদ্ধির মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান যখন বৃদ্ধি পেলো, তখন এই বিরাট বিশ্বে আপন তুচ্ছতা উপলব্ধি করে মানুষের হতাশা, ভীতি এবং অসহায়তাবোধও বাড়লো, যা থেকে আমাদের মন চাইল মুক্তি। আমাদের মন স্বাভাবিক-ভাবেই সান্ত্বনা খুঁজলো অলৌকিক রহস্যে, যা সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না। নির্মম সত্য বা বাস্তব থেকে মানুষ চাইল রহস্যের রাজ্যে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে, মুক্তি পেতে চাইল অমোঘ নিয়মের নিগড় থেকে। মানুষের স্বভাবই এই। তাই তো যে যুগের ফরাসী দেশে দেখি ভোল্‌তেয়ারের মতো নির্মম বাস্তববাদী লেখক, সে যুগের ফরাসী দেশেই বহু রূপকথারও সৃষ্টি হয়েছিল। ডারউইনের (Darwin) বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ যে যুগে প্রকাশিত হয়েছিল, সে যুগেই রচিত হয়েছিল লিউইস ক্যারল-এর আষাঢ়ে রূপকথা "অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড।" রূঢ় বাস্তব আর নানা নিয়মের নিগড় থেকে মুক্তির কামনা বা 'পলায়নী মনোবৃত্তি' গড়ে উঠেছিল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রূপেই।

রূঢ়, অপ্রিয় বাস্তবের আওতা থেকে পলায়নের বিভিন্ন রকমের পথ আছে। আছে নানা রকমের দ্রব্যগুণ; আছে তথাকথিত ধর্ম বা অধ্যাত্মবিলাস, মনোজগতের সূক্ষ্ম আফিম; আছে এক দিকে সংগীত, শিল্প, সাহিত্য, আর অন্যদিকে নৈতিক জাহান্নামের পথ। আর আছে যাদু, যা ভব্দ করে বিধাতাকে, বাতিল করে দেয় প্রকৃতির নিয়মাবলী; যার মন্ত্রবলে দৈবকে পরাভূত করতে চায় মানুষ। এই যাদুর ক্ষেত্রকেই নিজেদের কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে নিলেন অসাধারণ দম্পতি ক্যালিওস্ট্রো সেরাফিনা।

সেরাফিনাই তালিম দিয়ে দিয়ে তার স্বামীটিকে শিখিয়েছিলেন তাঁর প্যালার্মো শহরের জীবন একেবারে ভুলে যেতে। ঠিক হলো তিনি এখন থেকে বিশ্বাস করবেন তিনি কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী ট্রেবিজণ্ড রাজ্যের শেষ নৃপতির হতভাগ্য পুত্র, সেই রাজ্যের পতনের পর পালাবার পথে দস্যুদের হাতে ধরা পড়ে তিনি মক্কা শহরের বাজারে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হন। সহৃদয় প্রভুর কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ভ্রমণ শুরু করেন, এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দরবেশ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসে সামান্য ধাতুকে সোনায় পরিণত করার রহস্যময় বিদ্যা আয়ত্ত করেন। দামাস্কাস শহরে বহু প্রাচীন গুপ্তবিদ্যার ভাণ্ডারী মহাগুরু আল্‌থোটাসের কাছ থেকেও নানা গুপ্ত বিদ্যায় গভীর জ্ঞান তিনি লাভ করেন। সেরাফিনার নির্দেশে এই কাহিনী মনে মনে বার বার আওড়াতে আওড়াতে ক্যালিওস্ট্রো এই বানানো কাহিনীকেই সত্য বলে কল্পনা করতে লাগলেন, অভিনেতা যেমন করে তাঁর অভিনীত ভূমিকা-চরিত্রের ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।

সীমিত

আশাপূর্ণা দেবী

কিসের প্রত্যাশা নিয়ে—
চিরকাল বসে আছি,
সে শুধু আমার মন জানে।
বাড়ী, গাড়ী ? ঝকমকে দামী আসবাব ?
মোটা-টাকা ব্যাঙ্কের খাতায় ?
কী হবে ও-সব নিয়ে ?

ছোট ঘর, নেওয়ারের খাট,
আর খানকত ভাল বই,
একখানি লেখবার খাতা,
এতেই তো বেশ চলে যায়।

খাওয়া-পরা ? ওষুধ-পত্তর ?
ওতে আর কতই বা লাগে ?
নিত্য প্রয়োজনটুকু
অল্পতেই যদি মিটে যায়,
কি হবে অনেক সমারোহে ?

তবে কি মৈত্রেয়ী আমি ?
'অমরত্ব নেই যাতে,
তা'তে মোর নেই প্রয়োজন',
এই কি আমার অভিমত ?

'সিদ্ধি' চাই ব্রহ্ম-সাধনায় ?
কী হবে সে 'সিদ্ধি' নিয়ে,
রাখবার জায়গা কোথায় ?
এই তো একটুখানি মন !

তবে কি ঈশ্বর চাই ?
সব চাওয়া-পাওয়ার চরম !
কী হয় ঈশ্বর পেলে,
সে কথা তো কিছুই জানিনা,
তবে কেন লোভ হবে ?

কাউকে না বলো যদি,
চুপি চুপি বলছি তোমাকে—
আমার উন্মুখ মন যে তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য পেতে চায়,
সে শুধু একটি মন !
যে মন, আমার মন ছুঁয়ে
বলবে গভীর সুরে—
'ভয় কি ? আমি তো কাছে আছি।'

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পত্র-সাহিত্যে নজরুল

তিন

"পত্র-সাহিত্য" নামের মধ্যেই পত্র-সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা নিহিত রয়েছে। পত্রকে একাধারে পত্র হ'তে হবে এবং সাহিত্য হ'তে হবে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা প্রতিদিন হাজার সংবাদ অবগত হই—কিন্তু সেগুলি সাহিত্য নয়, কেন না, নিছক সংবাদ পরিবেশন করা ছাড়া তার আর কোন চিরন্তন মূল্য নেই। যে চিঠির ভাষা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ঋণে দেউলিয়া হয়ে পড়ে, সাহিত্যের রসলোকে প্রবেশাধিকারের ছাড়-পত্র সে পায় না। ব্যক্তি-মনের প্রয়োজনের এলাকা ডিঙিয়ে চিঠি যখন অপ্রয়োজনের লীলারসের অংগীভূত হয়, তখনই পত্র হয়ে ওঠে পত্র সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলিই এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে কবিগুরু তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন—"কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী আর তারি মাঝখানে একটি সংগীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা। মনে হয় যেন একটি সোনার চেলী পরা বধূ, অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথার একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে, ধীরে ধীরে শত সহস্র গ্রাম-নদী প্রান্তর-পর্বত নদীর উপর দিয়ে যুগ যুগান্তর কাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লান নেত্রে মৌন মুখে শান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই, তবে তাকে এমন সোনার বিবাহ-বেশে কে সাজিয়ে দিলে? কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ!"

এটি তো চিঠি নয়, যেন একটি সু-কোমল লিরিক কবিতা আপন আভায় হীরকোজ্জ্বল। নজরুল ইসলামের চিঠির বহুস্থানে সাহিত্যের এই সঞ্জীবন স্পর্শ বিরাজমান। বহুস্থানেই কাজী-কবির চিঠি সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যিক নিদর্শন হয়ে উঠেছে। বহু সংগীতের স্বর-মূর্ছনার ইতিহাস, বহু কবিতার স্বপ্ন-বিহ্বল মুহূর্ত চিঠির বর্ণালিম্পনে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে, ভাবের জোয়ার প্লাবনে কবিচিত্ত বারবার উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, দু-কূল ছাপানো বান-ডাকা জোয়ার-প্লাবনের উচ্ছ্বাসে শোনা গিয়েছে সাহিত্যের উদাত্ত অসীম সমুদ্র-কল্লোল। কোন কোন চিঠিতে কবি কল্পনার স্বর্ণ মসলিনে আপন গহন মনের মান-অভিমানগুলি বেঁধে রেখেছেন। আবার কোন কোন চিঠিতে কল্পনার মদির বিহ্বলতায় আপনিই নেশাতুর হয়ে পড়েছেন। তাই কোন কোন চিঠিকে চিঠি বলেই মনে হয় না, এ যে কাকেও উদ্দেশ্য করে লেখা, তা' মনেই আসে না। মনে হয়, হৃদয়ের মোহাঞ্জন স্পর্শে রৌদ্রপিচ্ছিল নিটোল মুক্তার মত লিরিকের অখণ্ড সুরে বেজে উঠেছে। এ যেন আপন বীণায় আপন মনের আলাপন। চিঠিগুলি প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে অপ্রয়োজনের লীলারসের অঙ্গীভূত হয়েছে। ব্যক্তিগত হ'য়েও হয়েছে সমষ্টির আনন্দ-তাজমহল। কবির গদ্যরচনার সুকর্ষিত রীতি মাঝে মাঝে অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে। নিম্নে আমরা কাজী কবির চিঠির কয়েকটি বিরল-সৌন্দর্যের অংশ তুলে দিলাম:

"তার সুন্দর মুখে নিবু নিবু প্রদীপের ম্লান রেখা পড়ে তাকে আরো সুন্দর আর করুণ করে তুলেছে—নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে তার হৃদয়ের ওঠা-পড়া যেন আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি—তার বাম পাশের বাতায়ন দিয়ে একটি তারা হয়ত চেয়ে আছে—গভীর রাতে মুয়াজ্জিনের আজানে আর কোকিলের ঘুম-জড়ানো সুরে মিলে তার স্তব করছে—"ওগো সুন্দর! জাগো! জাগো! জাগো!"

"আঘাত করার একটা সীমা আছে; যেটাকে অতিক্রম করলে আঘাত অসুন্দর হ'য়ে ওঠে আর তখনই তার নাম হয় অবমাননা। গুণীও বীণাকে আঘাত করেই বাজান, তাঁর অঙ্গুলির আঘাতে বীণার কান্না হয়ে ওঠে সুর। সেই বীণাকেই হয়ত আর একজন আঘাত করতে যেয়ে ফেলে ভেঙে।" ৮

"নৈকট্যের একটা নিষ্ঠুরতা আছে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় কলঙ্ক নেই, কিন্তু চাঁদে কলঙ্ক আছে। দূরে থেকে চাঁদ চক্ষু জুড়ায়, কিন্তু মৃত চন্দ্রলোকে গিয়ে কেউ খুশী হয়ে উঠবেন বলে মনে হয় না। বাতায়ন দিয়ে যে সূর্যালোক ঘুরে আসে, তা' আলো দেয়, কিন্তু চোখে দেখার সূর্য দগ্ধ করে।" ৯

"কলকাতার ঘেরা-টোপে ঘেরা খাঁচায় বন্দী হ'য়ে নব ফাল্গুনের উৎসব দেখতে পাচ্ছিনে চোখ দিয়ে, কিন্তু মন দিয়ে অনুভব করছি। নীল আকাশ তার মুখ চোখ বোধহয় একটু অতিরিক্ত ধোয়া মোছা করছে, কেননা তার মুখে যখন তখন সাবানের ফেনা—সাদা মেঘ ফেঁপে উঠতে দেখছি। তার ফিরজা উড়নী বনে বনে লুটিয়ে পড়ছে। মাধবী লতায় পুষ্পিত বেণী, উড়ন্ত ভ্রমরের সারিতে আঁখি-

---

৮। অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত।

৯। অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খানকে লিখিত।

পল্লব, পায়ের কাছে দীঘিভরা পদ্ম। সমস্ত মন খুশীতে বেদনায় টলমল করছে।" ১০

মাঝে মাঝে দু'একটা লাইন সংগীত-রোলে বেজে উঠেছে: "আমার সুরলক্ষ্মী স্বর্গের উর্বশী নয়, মর্তের শকুন্তলা—বিরহশীর্ণা অশ্রুমুখী পরিত্যক্তা শকুন্তলা, উৎপীড়িতা লায়লি।" ১১

"যে বিপুলসমুদ্রের ওপর এত তরঙ্গোচ্ছ্বাস, এত ফেনপুঞ্জ, তার নিস্তরঙ্গ নিথর অন্ধকার তলার কথা কেউ ভাবে না।" ১২

"ফরহাদ, মজনু, চন্দ্রাপীড়, শাজাহান—এরা যেন এক একটা দৈত্য-শিশু। কিন্তু স্বর্গকে আজো ম্লান করে রেখেছে এরাই। ফরহাদ পাগলটা শিরি'র কথায় একটা গোটা পাহাড়কেই কেটে ফেললে! পাহাড়ের সব পাথর শিরি হ'য়ে উঠল। প্রেমিকের ছোঁয়ায় পাহাড় হয়ে উঠল ফুলের স্তবক। পাষাণের স্তবগান উঠল ঊর্ধে। কোথায় স্বর্গ! কোন তলায় রইল পড়ে।

লাইলী সাধারণ মেয়ে, মজনু তাকে এমন করে সৃষ্টি করে গেল, যেমন করে দেবতা ত' দূরের কথা—ভগবানও সৃষ্টি করতে পারে না।···

"এখানেই মানুষ স্রষ্টাকে হার মানিয়েছে!" ১৩

নজরুলের প্রথম বিবাহটা আজো অনেকের কাছেই একটা হেঁয়ালীর মত মনে হয়। বিবাহের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি চিরজীবনের মত ত্যাগ করে আসেন তাঁর সদ্য-বিবাহিতা পত্নীকে। এমন কি, ফুলশয্যার শুভ লগ্নটিও তাঁদের সম্পন্ন হয়নি। কিন্তু পরিত্যাগ করে এসেও কাজী কবি তাঁর প্রথম পত্নীর স্মৃতি বিস্মৃত হননি একটি দিনের জন্যেও। বিস্মৃত তো হননি, বরং সে স্বপ্ন-মর্মরকে হৃদয়াসনে ব'সিয়ে পূজারতি দিয়েছেন নিশিদিন। কবির বহু সৃষ্টিতে সে স্মৃতি বিপুল বেগসঞ্চার করেছে। বিচ্ছেদের সুদীর্ঘ ষোল বছর পর কবি তাঁর প্রথম স্ত্রীর নিকট লেখেন তাঁর প্রথম ও শেষ পত্র। নানা কারণে পত্রটি অত্যন্ত মূল্যবান্। প্রথমত: সমগ্র চিঠিখানি যেন একটি লিরিক কবিতা, দ্বিতীয়ত: কবির বহু মূল্যবান্ সৃষ্টির উৎসের কথা চিঠিখানিতে বলা হয়েছে, তৃতীয়ত: ভাব, ভাষা ও তথ্য—সকল দিক দিয়েই চিঠিখানি নজরুল পত্র-সাহিত্য-ধারার ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। ১-৩-৩৭ তারিখে কলকাতার 106, Upper Circular Road, "Gramophone-Rehearsal Room" থেকে লেখা এই চিঠিখানির বিশেষ অংশগুলি নিম্নে তুলে দিলাম:

"কল্যাণীয়াসু!

তোমার পত্র পেয়েছি—সেদিন নববর্ষার নবঘন-সিক্ত প্রভাতে। মেঘ-মেদুর গগনে সেদিন অশান্ত ধারায় বারি ঝরছিল। পনের বছর আগে এমনি এক আষাঢ়ে এমনি বারিধারার প্লাবন নেমেছিল, তা' তুমি হয়ত স্মরণ করতে পার। আষাঢ়ের নব মেঘপুঞ্জকে আমার নমস্কার—এই মেঘদূত বিরহী যক্ষের বাণী বহন করে' নিয়ে গিয়েছিল কালিদাসের যুগে, রেবা নদীর তীরে, মালবিকার দেশে, তাঁর প্রিয়ার কাছে। এই মেঘপুঞ্জের আশীর্বাণী আমার জীবনে এনে দেয় চরম বেদনার সঞ্চয়। এই আষাঢ় আমায় কল্পনার স্বর্গলোক থেকে টেনে ভাসিয়ে দিয়েছে বেদনার অনন্ত স্রোতে।···

আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা! কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি—তা' দিয়ে তোমায় কোনদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এই আগুনের পরশমানিক না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না—আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হ'তে পারতাম না। তোমার যে কল্যাণরূপ আমি আমার কিশোর বয়সে প্রথম দেখেছিলাম, যে রূপকে আমার জীবনের সর্বপ্রথম ভালবাসার অঞ্জলি দিয়েছিলাম, সে রূপ আজো স্বর্গের পারিজাত-মন্দারের মত চির অম্লান হয়েই আছে আমার বক্ষে। অন্তরের আগুন বাইরের সে ফুলহারকে স্পর্শ করতে পারেনি।

তুমি ভুলে যেওনা, আমি কবি—আমি আঘাত করলেও ফুল দিয়ে আঘাত করি। অসুন্দর, কুৎসিতের সাধনা আমার নয়। আমার আঘাত বর্বর, কাপুরুষের আঘাতের মত নিষ্ঠুর নয়। আমার অন্তর্যামী জানেন···তোমার বিরুদ্ধে আজ আমার কোন অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই, দাবীও নেই।

···তোমার আজিকার রূপ কি, জানি না। আমি জানি তোমার সেই কিশোরী মূর্তিকে, যাকে দেবী-মূর্তির মত আমার হৃদয়-বেদীতে অনন্ত প্রেম, অনন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। সেদিনের তুমি সে বেদী গ্রহণ করলে না। পাষাণ-দেবীর মতই তুমি বেছে নিলে বেদনার বেদী-পীঠ।·· জীবন ভরে সেখানেই চলেছে আমার পূজা-আরতি।

দেখা নাইবা হ'ল এ ধূলির ধরায়! প্রেমের ফুল এ ধূলিতলে হ'য়ে যাক ম্লান, হতশ্রী। তুমি যদি সত্যই আমার ভালবাস, আমাকে চাও, ওখানে থেকেই আমাকে পাবে। লাইলী মজনুকে পায়নি, শিরি ফরহাদকে পাইনি, তবু ওদের মত করে কেউ কারো প্রিয়তমকে পায়নি। আত্মহত্যা মহাপাপ, এ অতি পুরাতন কথা হ'লেও পরম সত্য। আত্মা অবিনশ্বর, আত্মাকে কেউ হত্যা করতে পারে না। প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শ যদি পেয়ে থাক, তা' হ'লে তোমার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে? তারি মায়াস্পর্শে তোমার সকল কিছু আলোময় হ'য়ে উঠবে।···

যাক্—আজ চলেছি জীবনের অস্তমান দিনের শেষ রশ্মি ধরে' ভাটার স্রোতে। তোমার ক্ষমতা নেই সে পথ থেকে ফেরানোর। তার চেষ্টা করো না।

তোমাকে লেখা এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি হোক। যেখানেই থাকি, বিশ্বাস করো, আমার অক্ষয় আশীর্বাদী কবচ তোমায় ঘেরে থাকবে। তুমি সুখী হও, শান্তি পাও—এই প্রার্থনা।···ইতি।

নিত্যশুভার্থী
নজরুল ইস্‌লাম।"

চার

সমাজ-সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার কথা নজরুলের বহু চিঠিতে ব্যক্ত হয়েছে। গোঁড়া রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের সাথে কবির যে প্রচণ্ড বিরোধ বেধেছিল, তা' একাধারে চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক।

১০। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদকে লিখিত।

১১। ১০-২-২৭ তারিখে কৃষ্ণনগর থেকে জনাব আবুল হোসেনকে লিখিত।

১২। অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত।

১৩। অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত।

দেব-দেবীদের নিয়ে যে লোক কবিতা লেখে, ভগবানের বুকে যে লোক পদ-চিহ্ন এঁকে দেয়—সে আর যাই হোক, মুসলমান নয়। আলেম সমাজ 'কাফের' বলে কবিকে অপাংক্তেয় করে দিল।

সমাজকে কলুষ-মুক্ত করে তাকে পবিত্র করার দায়িত্ব সাহিত্যিকদের। পাশাপাশি দুটি সমাজ—হিন্দু ও মুসলমান। অথচ এ দু'টি সমাজের মধ্যে কি বিরাট ব্যবধান রচিত হয়েছে। কবির কথায়—"হিন্দু লেখকগণ তাঁদের সমাজের গলদ-ত্রুটি-কুসংস্কার নিয়ে কিনা কশাঘাত করছেন সমাজকে—তা'সত্ত্বেও তাঁরা সমাজের শ্রদ্ধা হারাননি। কিন্তু এ হতভাগ্য মুসলমানের দোষক্রটির কথা পর্যন্ত বলবার উপায় নেই। সংস্কার ত দূরের কথা, তার সংশোধন করতে চাইলেও এরা তার বিকৃত অর্থ করে নিয়ে লেখককে হয়ত ছুরিই মেরে বসবে। আজ হিন্দু জাতি যে এক নবতম বীর্যবান জাতিতে পরিণত হ'তে চলেছে, তার কারণ তাদের অসমসাহসিক সাহিত্যিকদের তীক্ষ্ণ লেখনী। আমি জানি যে, বাঙলার মুসলমানকে উন্নত করার মূলে দেশের সব চেয়ে বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এদের আত্মজাগরণ হয়নি বলেই ভারতের স্বাধীনতা পথ আজ রুদ্ধ!"

বাংলার মুসলমান সমাজের অধঃপতনের মূল কারণটি কবি উপলব্ধি করেছিলেন সঠিকভাবে। এ সমাজের পরিচালকগণ ধর্মের প্রাণের অনুসরণ না করে ভংগিটির ওপর জোর দিয়েছেন অত্যন্ত বেশী। তাই সমাজের প্রায় সকলেই দাড়ি ও টুপি সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। দাড়ি, টুপি ধর্মের বাহ্যিক একটা অঙ্গ হতে পারে—প্রাণ নয়। মানবতাকে অস্বীকার করে কেবল নামাজ পড়লেই ধার্মিক হওয়া যায় না। কবি লিখেছেন,—"আমাদের বাঙালী মুসলমান সমাজ, নামাজ পড়ার সমাজ। যত রকম পাপ আছে করে যাও—তার জবাব দিহি করতে হয় না এ সমাজে, কিন্তু নামাজ না পড়লে তার কৈফিয়ৎ তলব হয়। অথচ কোরাণে ১১১ জায়গায় জেহাদের কথা এবং ৩৩ জায়গায় সালাতের বা নামাজের কথা বলা হয়েছে।"

মানুষের হৃদয়-ভূমি যত প্রশস্ত উদার হয় আদর্শ মানুষ ও ধার্মিক হিসাবে তার মূল্য যায় তত বেড়ে। কিন্তু এই মনের দিক দিয়ে যারা কাঙাল, নীচ হ'য়ে ওঠে, তাদের দ্বারা এমন কোন কাজ নেই যা আবদ্ধ হ'য়ে থাকে। বাংলার সমকালীন মুসলমান সমাজের হৃদয়হীনতার কথা কবি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে অনুধাবন করেছেন। অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁয়ের নিকট লেখা চিঠিতে সেই বেদনার কথা অভিনব হয়ে ফুটেছে:

"বাংলার মুসলমান সমাজ ধনে কাঙাল কিনা জানিনে, কিন্তু মনে যে কাঙাল এবং অতিমাত্রায় কাঙাল, তা' আমি অতি বেদনায় সঙ্গে অনুভব ক'রে আসছি বহুদিন হ'তে। আমায় মুসলমান সমাজ 'কাফের' খেতাবের যে শিরোপা দিয়াছে, তা' আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার বলে কোনদিন অভিযোগ করে'ছি বলে ত মনে পড়ে না। তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে, কাফের আখ্যায় বিভূষিত হবার মত বড় ত আমি হইনি। অথচ হাফেজ-খৈয়াম-মনসুর প্রভৃতি মহাপুরুষদের সাথে কাফেরের পংক্তিতে উঠে গেলাম!"

লক্ষ সমস্যার ঘেরা-টোপে বাংলার মুসলমান-সমাজ জর্জরিত। পর্দা-প্রথার দোহাই দিয়ে যে শ্বাসরোধী অবরোধ প্রথা গড়ে উঠেছে সমাজের বুকে, তার আশু সমাধান প্রয়োজন। কেন না, স্ত্রী-সমাজ যদি প্রবঞ্চনার অন্তরালে মূর্খ হ'য়ে পড়ে থাকে, তা' হলে এ সমাজের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। তা'তে, 'ছাগল-ভেড়ার' মত দিনে দিনে কেবল মূর্খের সংখ্যাই বাড়বে। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদকে লিখিত একটি চিঠিতে এই অবরোধ-প্রথা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন কাজী কবি:

…"আমাদের দেশের মেয়েরা বড় হতভাগিনী। কত মেয়েকে দেখলাম, কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে, কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের দাবীতে। ঘরের প্রয়োজন তাদের বন্দী করে রেখেছে। এত বিপুল বাহির যাদের চায়, তাদের ঘিরে রেখেছে বার হাত লম্বা আট হাত চওড়া দেওয়াল। বাহিরের আঘাত এ দেওয়ালে বারে বারে প্রতিহত হ'য়ে ফিরল। এর বুঝি ভাঙন নেই অন্তর হ'তে মার না খেলে। তাই নারীদের বিদ্রোহিনী হ'তে বলি। তারা ভেতর হ'তে দ্বার চেপে ধরে বলছে আমরা বন্দিনী।…অভিভাবক যিনিই হোন তোমার, তিনি যেন বিংশশতাব্দীর আলোর ছোঁয়া পাননি বলেই মনে হ'ল। তোমায় যে আজ কাঁদতে হয় বসে বসে কলেজে যাবার জন্য, এও হয়তো সেই কারণেই।"…

সমস্যা আছে অনেক। কিন্তু সেই সমস্যা-জাল ছিন্ন করে অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের বুকে নবীন সূর্যরশ্মিপাতের উপায় কি?… "কারুর পান থেকে এতটুকু চূণ খসবে না, গায়ে আঁচড়টি লাগবে না; তেল-কুচকুচে নাদুস-নুদুস ভুঁড়িও বাড়বে এবং সমাজও সাথে সাথে জাগতে থাকবে—এ আশা আলেম-সমাজ করতে পারেন, আমরা অবিশ্বাসীর দল করিনে।" সুতরাং এ সমাজকে সমস্যা-মুক্ত করার জন্যে চাই কঠিন আঘাত, চাই সুতীক্ষ্ণ ভয়াল অস্ত্রোপচার। যে বিষাক্ত ক্ষত ক্রমবর্ধিত হ'য়ে সারা দেহকে করেছে কলুষিত, নির্মম অস্ত্রোপচারে সমাজ-দেহ থেকে তাকে পৃথক করা ছাড়া গত্যন্তর নেই:…"আমার কি মনে হয় জানেন? স্নেহের হাত বুলিয়ে দেখতে পারেন। ফোঁড়া যখন পেকে ওঠে, তখন রোগী সবচেয়ে ভয় করে অস্ত্র-চিকিৎসককে। হাতুড়ে ডাক্তার হয়ত তখন আশ্বাস দিতে পারে যে, সে হাত বুলিয়েই ঐ গাকত ঘা সারিয়ে দেবে এবং তা' শুনে রোগীরও খুশী হ'য়ে ওঠবারই কথা। কিন্তু বেচারী 'অবিশ্বাসী' অস্ত্র চিকিৎসক তা' বিশ্বাস করে না। সে বেশ করে তার ধারালো ছুরি চালায় সে ঘায়ে। রোগী চেঁচায়, হাত-পা ছোঁড়ে, গালি দেয়। সার্জন তার কর্তব্য করে যায়। কারণ সে জানে, আজ রোগী গালি দিচ্ছে, দু'দিন পরে ঘা সেরে গেলে সে নিজে গিয়ে তার বন্দনা ক'রে আসবে।"

বাংলার গোঁড়া মুসলমান-সমাজকে সংস্কার-মুক্ত করার জন্যে যে নিয়ম-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন নজরুল, আজও যে সে নীতির প্রয়োজন সমানই, আশা করি সে সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই।

পাঁচ

লর্ড কার্জনের মন্ত্রদানের পর থেকে যুগের হাওয়াটা এমন কলুষিত হ'য়ে উঠেছে যে, মুখে যে যাই বলুন, সাহিত্য-শিল্পে এবং ব্যক্তি-জীবনে বাংলার সকল কবি-সাহিত্যিক হয় 'অতি হিন্দু', নয় 'অতি মুসলমান'। কিন্তু নজরুল এবিষয়ে এক দুর্লভ ব্যতিক্রম। তাঁর সৃষ্টির কোথাও এই কলুষতার চিত্র নেই। ব্যক্তিজীবনেও

তিনি ছিলেন অসীম আকাশের মত উদার। তাঁর জীবনে কোথাও কোন দিন এই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার ছায়াপাত ঘটেনি। তাঁর সাহিত্য, তাঁর বাণী, তাঁর সমগ্র জীবনাচরণের ভিতর দিয়ে হিন্দু-মুসলিমের ঐকান্তিক মিলনের কথাই ব্যক্ত হ'য়েছে। কোন কোন চিঠিতে তাঁর এই মনোভাব অদ্ভুত বাঙময়তা লাভ করেছে :···"হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এই পোড়া দেশের কিছু হবে না, এ আমিও মানি এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এই অশ্রদ্ধা দূর হ'তে পারে।···হিন্দু লেখক-অলেখক জনসাধারণ মিলে যে স্নেহ যে নিবিড়-প্রীতি-ভালবাসা দিয়ে আমায় এত বড় করে তুলেছেন, তাঁদের সে ঋণকে অস্বীকার যদি আজ করি, তাহ'লে আমার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না।···এঁদের অবিচারের জন্য সমস্ত হিন্দু-সমাজকে দোষ দিই নাই এবং দিবও না। তা'ছাড়া আজকার সাম্প্রদায়িক মাতলামির দিনে আমি যে মুসলমান—এইটেই হ'য়ে পড়েছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ—আমি যতবেশী অসাম্প্রদায়িক হই না কেন"···

১৭-৭-১৯৪১ তারিখে ১৫৪নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট হ'তে জনাব হায়দার সাহেবকে লেখা একটি চিঠিতে কবির বলিষ্ঠ মনোভংগী সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই চিঠি কবি যখন লেখেন তখন তাঁর দেহে বর্তমান রোগের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। কবির বাকশক্তি তখন স্তব্ধ কিন্তু লেখনীটি সচল ছিল। বাক্-শক্তি রহিত অবস্থায় জনাব হায়দার সাহেবকে লেখা কবির চিঠিখানির একটি মূল্যবান অংশ এই :···"৬ মাস ধরে হক সাহেবের [সমকালীন বাংলার প্রধান মন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হক] কাছে গিয়ে ভিখারীর মত ৫।৬ ঘণ্টা বসে বসে ফিরে এসেছি। হিন্দু-মুসলিম Equity-র টাকা কারুর বাবার সম্পত্তি নয়, বাঙলার, বাঙালীর টাকা। আমি ভাল চিকিৎসা করাতে পারছি না। একমাত্র তুমিই আমার জন্য Sincerely appeal করেছ সত্যকার বন্ধু হিসেবে। আমার হয়ত এই শেষ পত্র তোমাকে। একবার শেষ দেখা দিয়ে যাবে বন্ধু; কথা বন্ধ হ'য়ে গিয়ে অতি কষ্টে দু'একটা কথা বলতে পারি, বললে যন্ত্রণা হয় সর্বশরীরে। হয়ত কবি ফেরদৌসের মত ঐ টাকা আমার জানাজার নামাজের দিন পাব। কিন্তু ঐ টাকা নিতে নিষেধ করেছি আমার আত্মীয় স্বজনকে। হয়ত ভালই আছ। তোমার—নজরুল।"

এই চিঠির মাঝে ক্ষণিক হ'লেও যে সুর ধ্বনিত হ'য়েছে তা' ধূমায়িত আগ্নেয়গিরির শেষ অগ্ন্যুদ্গিরণ বলা যায়। বিদ্রোহী কবির সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর দিবসের শেষ রক্তিম আলোয় নতুন করে শোনা গেল।

কাজী কবির কোন কোন চিঠি একেবারে টেলিগ্রাফিক ছাঁদে লেখা। কর্মমুখর জীবনের এতটুকু অবসরের ফাঁকে লেখা ছোট্ট চিঠি অথচ ভাববহ। অলিন্দের গলি পথে নেমে আসা মনোরম সূর্যালোকের মত চিঠিগুলি স্পষ্ট এবং মধুর। ৩-১-৫৫ তারিখে ৩১, সীতানাথ রোড, কলিকাতা থেকে মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকাকে লিখিত একটি চিঠি এই : "কল্যাণীয়াসু। যে কোনো দিন সন্ধ্যা সাতটার পর আসতে পারেন। আমি সাধারণতঃ সন্ধ্যার পর বাড়ীতেই থাকি। আসবার দিন খবর দিয়ে এলে ভাল হয়। ইতি। শুভার্থী—নজরুল ইস্‌লাম।"

২০-১২-৩০ তারিখে মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহারকে লেখা একটি চিঠিতে এই টেলিগ্রাফিক সুর সুন্দর রূপে ফুটেছে : "প্রিয় বাহার! তোমার কাছে 'সাত ভাই চম্পা"র যে কবিতাগুলি ছিল—শ্রীমান কাদিরকে তা দিও। জেলে গেলে দেখা করো সেখানে গিয়ে। নাহার কোথায়? তার খোকা কেমন আছে? ইতি—"

কাজী কবির চিঠিতে শুরু ও শেষটিও লক্ষ্য করার মত। অন্তরঙ্গ আপন জনকে তিনি নাম ধরেই সম্বোধন করেছেন—যেমন : প্রিয় শৈলজা, প্রিয় মুরলীদা, স্নেহের নাহার, স্নেহের ব্রজ, স্নেহের বর্ষণ, প্রিয় মোতাহার, প্রিয় মিজান ভাই ইত্যাদি। কোন কোন চিঠিতে গতানুগতিক সম্বোধনের সুর এসে মিশেছে—যেমন : আদাব হাজার হাজার জানবেন, স্নেহভাজনেষু, শ্রীচরণেষু, কল্যাণীয়েষু, চির-আয়ুষ্মতীসু, জনাব সম্পাদক সাহেব, সবিনয় নিবেদন ইত্যাদি। আবেগ-প্লুত চিঠিতে সম্বোধনের মধ্যেও আবেগের কম্পন অনুভব করা যায়। এই শ্রেণীর দু'টি চিঠির একটিতে তিনি 'ভাই!' এবং অন্যটিতে 'বন্ধু!' বলে সম্বোধন করেছেন। স্নেহ, ভালবাসা এবং হৃদয়াবেগের কম বেশীতে চিঠির সমাপ্তিতে তারতম্যের পার্থক্য ঘটেছে। 'ইতি'র পর তিনি কোন কোন চিঠিতে স্বনামে প্রকাশিত হ'য়েছেন, কোন কোন চিঠিতে লিখেছেন নূরুদা, কাজীদা, কাজী ভাই ইত্যাদি।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি বেপরোয়া জীবনে নজরুল কোন দিন কোন কাজ গুছিয়ে করেননি। চিঠিতেও তাঁর এই অবিন্যস্ত মনোভাবের ইংগিত ধরা পড়েছে। গুছিয়ে চিঠি লেখা তাঁর পক্ষে কোন দিন সম্ভব হয়নি। তাই অধিকাংশ চিঠিতে দেখি চিঠির শেষে N.B. বা P.S. বা বিশেষ দ্রষ্টব্য বা পুনঃ যোগ করে, আরো কিছু লিখে দিচ্ছেন। বেগম শামসুন্নাহারকে লেখা একটি দশ পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ চিঠির মধ্যে শিষ্টাচারের আসল কথাটুকুই বলা হয়নি। তাই চিঠির শেষে তিনি যোগ করেছেন :

"পুনঃ—তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়ে এসেছি, সে সব ভুলে যেও। তোমার আম্মা ও নানী সাহেবার পাক কদমানে হাজার হাজার আদাব জানাবে আমার। শাম-সুদ্দিন ও অন্যান্য ছেলেদের স্নেহাশীষ জানাবে। তুমি কি বই পড়লে এর মধ্যে যা পড়েছ, কী কী লিখলে, সব জানাবে। তোমার লেখাগুলো আমায় আজই পাঠিয়ে দেবে। চিঠি দিতে দেরি ক'রো না। 'কালিকলম' পেয়েছ বোধ হয়। তোমার পাঠান হ'য়েছে। তোমার লেখা চায় তারা।"

আবদুল কাদিরকে লেখা একটি চিঠির শেষে P. S. দিয়ে তিনি লিখেছেন : "কংগ্রেসে আসনি ভালই করেছ। কংগ্রেস চৌত্রিশ ঘোড়ার রাজাকে এনে পেয়েছে চৌত্রিশ ঘোড়ার ডিম। দেখা যাক স্বরাজের কেমন বাচ্চা বেরোয়।"

ছয়

নজরুল ইস্‌লামের পত্রাবলীর আর একটি বিশেষগুণ— এর হাস্যরস। প্রায় প্রতিটি পত্রের মধ্যে হাস্যোচ্ছলতার একটি স্ফটিক-স্বচ্ছ স্নিগ্ধ ধারা আপন বেগে প্রবাহিত হ'য়েছে। প্রায় প্রতিটি পত্রের বুকে কৌতুক-কৌতুহল ও পরিহাস-প্রিয় কবি-মন ধরা পড়েছে। কোন কোন চিঠিতে গুরু-গম্ভীর তত্ত্ব কথায় কবি যেমন গম্ভীর, তেমনি কোন কোন চিঠিতে কৌতুক কৌতুহলের বেগবান স্রোতে উচ্ছল মুখর। কেবল

পত্র-সাহিত্যে নয়—কাব্য, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদির ক্ষেত্রেও কবির এই হাস্যপ্রিয় মনটি উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে। আসলে নজরুল ছিলেন একজন পরম হাস্যরসিক। সম্পূর্ণ হাস্যরসিক নজরুলের স্বরূপ এখন আলোচনা আবিষ্কারের অপেক্ষা রাখে। যা হোক, এই হাস্যরস সমগ্র পত্র-সাহিত্যকে এক বিশেষ রস-মূল্য ও বিরল বৈশিষ্ট্যদান করেছে।

অধ্যক্ষ ইব্রাহীমখানকে যে গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি লেখেন, তার একস্থানে তিনি অধ্যক্ষ সাহেব কর্তৃক প্রস্তাবিত 'মুসলিম-সাহিত্য' কথাটি নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার মাধ্যমে সমকালীন মুসলিম কবি-সাহিত্যিক সৃষ্ট কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কে সত্য কঠোর মন্তব্য করা হ'য়েছে—অথচ সমগ্র আলোচনাটি হাস্যোচ্ছলতার স্নিগ্ধ ধারায় অভিষিক্ত :

"আপনার 'মুসলিম-সাহিত্য' কথাটার মানে নিয়ে অনেক মুসলমান সাহিত্যিকই কথা তুলবেন হয়ত। ওর মানে কি মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য, না মুসলিম ভাবাপন্ন সাহিত্য ?···ইস্‌লামের সত্যকার প্রাণশক্তি : গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।···আমি ক্ষুদ্র কবি, আমার বহুলেখার মধ্য দিয়ে আমি ইস্‌লামের এই মহিমা গান করেছি। তবে কাব্যকে ছাপিয়ে ওঠেনি সে গানের সুর। উঠতে পারেও না। তাহলে তা কাব্য হয়ে না। আমার বিশ্বাস, কাব্যকে ছাপিয়ে উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠলে কাব্যের হানি হয়। আপনি কি চান তা বুঝতে পারি, কিন্তু সমাজ যা চায়, তা সৃষ্টি করতে আমি অপারগ। তার কাছে এখনও—

'আল্লা আল্লা বল ভাই নবী কর সার।
মাজা দুলিয়ে পারিয়ে যাব ভবনদীর পার।'

রীতিমত কাব্য। বুঝবার কোন কষ্ট হয় না, আল্লা বলতে এবং নবীকে সার করতে উপদেশ দেওয়া হল, মাজাও দুলল এবং ভবনদী পার হওয়া গেল। যাক্, বাঁচা গেল। কিন্তু বাঁচল না কেবল কাব্য। সে বেচারী ভবনদীর এপারেই রইল পড়ে।"

এর পর কবির জিজ্ঞাসা—"এ অবস্থায় কি করব বলতে পারেন? আমি হুজ্জতুল ইস্‌লাম লিখব, না সত্যিকার কাব্য লিখব?"

সাধারণ পাঠকের রসজ্ঞান সম্পর্কে কবির আলোচনাটি কম মুগ্ধকর নয়। তিনি লিখেছেন: "এরা যে শুধু হুজ্জতুল ইস্‌লামই পড়ে, এ আমি বলব না, রসজ্ঞানও এদের অপরিমিত। আমরা দেখেছি এরা দল বেঁধে পড়েছে :

'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল।'

অথবা : 'লাখে লাখে ফৌজ মরে কাতারে কাতার।
শুমার করিয়া দেখি পঞ্চাশ হাজার।'

আর এই কাব্যের চরণ পড়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে। উম্মর উম্মিয়ার প্রশংসায় রচিত :

'কাগজের ঢাল মিয়ার তালপাতার খাড়া।
আর লগির গলায় দড়ি দিয়ে বলে চল হামরা ঘোড়া।'

পড়তে পড়তে আনন্দে গদগদ হয়ে উঠেছে। বিদ্রূপ আমি করছিনে, বন্ধু, এ আমার চোখের জল যেখান হাসির শিলা-বৃষ্টি।

কবির প্রতি যাঁরা এক সময় মুক্ত কৃপাণে সাজোয়া হয়েছিলেন, প্রতিহিংসাপরায়ণ অকল্যাণকামী বন্ধুদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য এই : "মানুষের মুখ উল্টে গেলে ভূত হয়, বা ভূত হলে তার মুখ উল্টে যায়, কিন্তু মানুষের হৃদয় উল্টে গেলে সে ভূতের চেয়েও কত ভীষণ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র হয়ে ওঠে—তাও আমি ভাল করেই জানি।"

হাস্যরসের উদ্দাম প্রকাশ দেখি একটি চিঠিতে। নিজের স্কুল-জীবন সম্পর্কে তাঁর সরস মন্তব্যটি এই : "আমার স্কুল-জীবনে আমি কখনো ক্লাসে বসে পড়েছি, এতবড় অপবাদ আমার চেয়ে এক নম্বর কম পেয়েও যে ফাষ্ট বয় হয়ে যেত—সেও দিতে পারবে না। হাই-বেঞ্চের উচ্চাসন হতে আমার চরণ কোনদিন টলেনি, ওর সাথে আমার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই হয়ত আজো বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিলে মনে হয় মাষ্টার মহাশয় হাই-বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।"

৮।১, পানবাগান লেন থেকে ২-১-২৯ তারিখে জনাব আবদুল কাদিরকে লেখা একটি চিঠিতে হাস্যরস জমাট বেঁধে উঠেছে। এখানে পরিহাস-প্রিয় নজরুলের স্বরূপটি বড় সুন্দর।···"তুমি ত ফেল করতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছ জসীমদের সাথে।···আশা করি, এবারেও পাশ না করার জন্য তুমি চেষ্টার ত্রুটি করছ না।···ডিগ্রী যদি নাই পাও, অন্ততঃ তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। ডিগ্রীটা থাকে শেষের দিকে, অর্থাৎ ওটা ল্যাজের সামিল আর ও জিনিষটা অর্জন করার জন্যে গর্ব আর যাঁরাই করুন, আমি পাইনি বলে বিধাতাকে তার জন্য ধন্যবাদ দিই। ল্যাজ নিয়ে গর্ব করার মতন বুদ্ধি আজও হয়নি আমার। আমি মানুষের স্তরে উঠে গেছি, আমি নির্লাঙ্গুল।"

৪-২-২৯ তারিখে বেগম শামসুন্নাহার মাহ্‌মুদকে লেখা একটি ছোট চিঠিতে তিনি লিখেছেন :···"মহী খুব গলা সাধছে না? অর্থাৎ আমি চলে এলেও আমার ভূত এখনো চড়াও করে আছে?"

অধিক উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। কৌতুক সম্পর্কে যে আলোচনাটুকু আমরা করেছি, সে সম্পর্কে এইটুকু বুঝে নিতে পারলে যথেষ্ট যে, কৌতূহল ও পরিহাসের ধারাটি কবির রক্তে মিশে ছিল—তাই দেখি অত্যন্ত সিরিয়াস বিষয়ের আলোচনাতেও পরিহাস-ব্যঙ্গ তার দলবল নিয়ে উন্মাদের মত কবির লেখায় এসে ভীড় জমিয়েছে। চিঠির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় হাস্যরসের এমনি টুকরো ছড়ান। মনে হয়, এই নির্মল হাস্যরসের ধারাটি সমগ্র নজরুল পত্র-সাহিত্যকে একটি মাধুর্যময় সহজ সারল্য দান করেছে।

সাত

'পত্র-সাহিত্যে নজরুল' প্রবন্ধের উপসংহারে আর একটি কথা বলে নিতে চাই। কবির যে সব চিঠি-পত্র আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, তা' ছাড়াও বহু চিঠি আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে—সেগুলির আবিষ্কার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যাঁদের কাছে চিঠি আছে, তাঁদের উচিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে চিঠিগুলি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। মূল চিঠি পাঠাতে যদি আপত্তি থাকে তা'হলে নকল পাঠালেও চলবে। এই সম্পর্কে বিশেষ করে অধ্যাপক মোতাহার হোসেন সাহেবের নাম স্মরণ করতে চাই। নজরুলের চিঠি পেয়ে যাঁরা ধন্য হ'য়েছেন, ইনি সেই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান। এঁর কাছে লেখা চারটি চিঠি যথাক্রমে "পত্র, ২৪-২-২৮, সন্ধ্যা, Vulture রিয়ার"; "কৃষ্ণনগর, ২৫-২-২৮,

বিকেল"; "কৃষ্ণনগর, ১-৩-২৮, বিকেল"; এবং "১৫ নং জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কলকাতা, ৮-৩-২৮, সন্ধ্যা"র লিখিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মাত্র পনের দিনের ব্যবধানে মোতাহার সাহেব এই চিঠিগুলি পেয়েছেন। পত্রলেখক কৃপণ নজরুল মাত্র পনের দিনের ব্যবধানে এমন সুন্দর চারখানি চিঠি লিখে যে মোতাহার হোসেন সাহেবের কাছে আর চিঠি লিখেননি, এ কথা বিশ্বাস করতে মন কিছুতেই সায় দেয় না। বিশেষ করে এ সময়টা নজরুল-সাহিত্য-যৌবনের সময়। আমি স্থির প্রত্যয়ের উপর দাঁড়িয়েই বলছি, অধ্যাপক সাহেবের কাছে আরো চিঠি আছে। নজরুল হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তাঁর উচিত এই চিঠিগুলি (ব্যক্তিগত অংশ বাদ দিয়ে হলেও) জনসমক্ষে প্রকাশ করা। সব থেকে বড় কথা হ'ল—অধ্যাপক সাহেবের কাছে লেখা চিঠিগুলি ভাব, ভাষা, তথ্য প্রকাশ এবং ব্যক্তি-মানসের প্রতিফলন হিসেবে নজরুল-পত্রসাহিত্যের দিগ দর্শন হ'য়ে আছে। অনুরূপভাবে শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জনাব আফজালুল হক, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কবি জসিমউদ্দীনের নিকট কবির চিঠি থাকার আশা করাটা অন্যায় হ'বে না বলেই মনে করি।

মানুষকে আকর্ষণ করা ও কাছে টানার এক দুর্লভ শক্তি ছিল নজরুলের। এ শক্তি যেবদন্ত বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। গ্রামোফোন কোম্পানী, আকাশবাণীর কাজে নজরুল যখন আত্মনিয়োগ করেছিলেন তখন বহু তরুণ-তরুণী, গায়ক-গায়িকার সাথে তাঁর আলাপ হ'য়েছিল, হ'য়েছিল ঘনিষ্ঠতা। বহু রাজনৈতিক কর্মী এবং সাহিত্যিকের সাথে তাঁর ঘটেছিল ঘনিষ্ঠ সংযোগ। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লায় তিনি বহুবার গিয়েছেন এবং বহু ব্যক্তির সাথে তাঁর আলাপ হ'য়েছে। বিশেষ করে যে সব গৃহে সংগীতের বৈঠক বসত সে সকল গৃহের প্রত্যেকের সাথে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা ছিল অন্তরঙ্গ এবং ব্যক্তিগত। এঁদের অনেকের কাছে কবি চিঠি লিখেছেন। সে সকল চিঠির আবিষ্কার হ'লে একদিকে যেমন নজরুল-জীবনীর উপকরণ পাওয়া যাবে, তেমনি পুষ্টিলাভ করবে নজরুল-পত্র-সাহিত্য। এর সবটুকুই নজরুল-অনুরাগীদের অনুসন্ধিৎসার ওপর নির্ভর করছে।*

আবদুল আজীজ আল্-আমান।

---

* "পত্রসাহিত্যে নজরুল" প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বইগুলির সাহায্য নিয়েছি:

১। আবদুল কাদির—নজরুল রচনা সম্ভার।
২। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ—আমার দেখা নজরুল।
৩। মুজফ্‌ফর আহমদ—নজরুল স্মৃতি-প্রসঙ্গে।
৪। ডাঃ রথীন্দ্রনাথ রায়—সাহিত্য-বিচিত্রা।

সুমুখে নতুন দিন

বন্দে আলী মিয়া

এখন অনেক রাত—কেহ আর জেগে নেই
তুমি এসো পাশে,
নিরালায় দুটি কথা কহো আজ চুপি চুপি
লাজ নত ভাষে।
বাতাস বহিছে ধীরে—পূর্ণিমা চাঁদ হের
—আঁখি মেলি চাও,
আমার বিজন ঘর শয়ান ভরিয়া আজ
একেলা ঘুমাও।
এত দিন যে কথাটি বলি নাই রাণী
ভুবনে ভুবনে তাই হলো জানাজানি,
চুপি চুপি আজ তাহা বলো শুধু মোর কাণে
আর কারে নয়।
বাতাস কী গান গাহে—ফুলে ফুলে সেই বাণী
লেখা বুঝি রয়।

এখন অনেক রাত—নির্জন বনতলে
ঝরিছে বকুল,
পিছে রেখে আসিলাম একটি অতীত আর
জীবনের ভুল।
সবাকার শেষে তুমি আসিয়াছ অনাহূতা
মোর দ্বারে আজ—
সে দিন ছিলাম আশে—এতদিনে বুঝি তব
শেষ হলো কাজ।
পুরাণো বাঁশরী কিগো বাজিবে আবার
শেষের গান কি তুমি শুনিবে আমার।
ছিন্ন মালিকা কিগো গাঁথিব দু'জনে মিলি
আজি অবেলায়।
সুমুখে নতুন দিন—আমার পাশেতে আজ
বসো নিরালায়।

তামিল শৈব সাহিত্য

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

তামিল বৈষ্ণব-সাহিত্যের ন্যায় তামিল শৈব-সাহিত্যেরও সূচনা হয় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। তবে, এই দুই ধারার মধ্যে শৈব-সাহিত্যকে কিঞ্চিৎ অগ্রবর্তী বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রসিদ্ধ দ্বাদশ বৈষ্ণব কবি যেমন আলোয়ার নামে পরিচিত, সেইরূপ অগ্রণী শৈব কবি এবং ভক্ত পুরুষগণকে বলা হয় নায়নমার্ বা নায়নার্। (১) সংখ্যায় ইঁহারা ৬৩ জন হইলেও ইঁহাদের সকলেই যে কবি ছিলেন, তাহা নয়। আবার শৈব-কবিদের সকলেই যে নায়নমার-গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন, তাহাও নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ শৈব-কবি মানিক্ক—বাচকর্-এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মানিক্ক বাচকর্ প্রভৃতি যে সমস্ত কবিকে নায়নমার-তালিকায় পাওয়া যায় না, তাঁহারা হয় আবির্ভূত হন নায়নমার-গোষ্ঠী সংগঠনের পরবর্তীকালে, অথবা তাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল শৈব-ধর্মের মূল কেন্দ্র চোল-রাজ্যের বাহিরে। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে নায়নমার-গোষ্ঠী সংগঠিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। এই গোষ্ঠীর প্রায় সকল কবি বা ভক্ত পুরুষই চোল-রাজ্যের অধিবাসী। কুলচ্চিরৈ প্রভৃতি যে দু'তিনজন পাণ্ড্যমাতুর ভক্ত-পুরুষ নায়নমার-তালিকায় স্থান পাইয়াছেন, প্রথম যুগের জৈন-বিরোধী সংগ্রামে তাঁহারা ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত ছিলেন বলিয়াই এইরূপ সম্ভব হইয়াছে।

দশম শতাব্দীতে নাথমুনি যেমন বৈষ্ণব পদাবলী নির্বাচিত করিয়া সংকলন করেন "নালায়ির দিব্য প্রবন্ধম্" তেমনি প্রথম রাজরাজ চোলের রাজ্যকালে (৯৮৫-১০৩০ খৃঃ) শৈব-সাহিত্যের সংকলন করেন প্রসিদ্ধ শৈব-কবি নম্বিয়াণ্ডার-নম্বি। তামিল সাহিত্যে সেই সংকলন গ্রন্থ "তেবারম্" নামে পরিচিত। (২) বৈষ্ণব সংকলন গ্রন্থে পাওয়া যায় ১২ জন আলোয়ার কবির রচনা, কিন্তু শৈবসংকলন গ্রন্থ "তেবারম্"-এ সংকলিত হইয়াছে মাত্র তিনজন নায়নমার কবির পদাবলী। সম্বন্দর্, অপ্পর এবং সুন্দরর্—এই তিনজন কবির গীতাঞ্জলিই আরাধ্য দেবতার কণ্ঠমাল্য রচনায় উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

এখানেও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, শৈবভক্তির শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা দশম শতাব্দীর মানিক্ক বাচকর-এর কোনো পদ 'তেবারম্'-এ সংগৃহীত হয় নাই। ইহার কারণ বোধ করি এই যে, বৌদ্ধ-জৈন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করিয়া সপ্তম শতাব্দীর সম্বন্দর ও অপ্পর এবং অষ্টম শতাব্দীর সুন্দরর পরবর্তীকালের শৈব জনসাধারণের চিত্তে যে অলৌকিক ভক্তি শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবি মানিক্ক বাচকর-এর পক্ষে স্বভাবতই তাহা সম্ভব হয় নাই। মানিক্ক-বাচকর ব্যতীত ছোট বড় আরও অনেক কবি শৈবসঙ্গীতের দ্বারা তামিল সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সমগ্র শৈব-সাহিত্যকে অন্য একভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার আবশ্যকতা অনুভূত হইল। এই শ্রেণীবিন্যাসই তামিল সাহিত্যে 'তিরুমুরৈ' (অর্থাৎ পবিত্র বিভাগ) নামে পরিচিত। এইরূপ বারোটি 'তিরুমুরৈ' লইয়া সমগ্র শৈব সাহিত্য গঠিত।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিরুমুরৈ হইতেছে 'তেবারম্'-এ সংকলিত সম্বন্দর-এর পদাবলী। অপ্পর-এর পদাবলী লইয়া চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ তিরুমুরৈ। সপ্তম তিরুমুরৈ বলিতে সুন্দরর-এর পদাবলীকে বোঝায়। অষ্টম তিরুমুরৈ-তে স্থান পাইয়াছে মানিক্ক বাচকর প্রণীত 'তিরুবাচকম্' এবং 'তিরুক্ কোবৈ' গ্রন্থ দুইখানি। নয়জন অল্প পরিচিত কবির ২১টি 'পদিকম্' (৩) লইয়া গঠিত হইয়াছে নবম তিরুমুরৈ। দশম তিরুমুরৈ-তে আছে কবি তিরুমূলর প্রণীত দার্শনিক কাব্যগ্রন্থ 'তিরুমন্দিরম' (অর্থাৎ শ্রীমন্ত্র)। এইরূপ তিরুমুরৈ বা পবিত্র শ্রেণীবিন্যাসের কর্তা হইলেন 'তেবারম'-সংকলয়িতা কবি নম্বি-য়াণ্ডার-নম্বি। তিনি নিজের রচনাবলী বাদ দিয়া কারৈক্কাল অম্মৈয়ার, চেরমান পেরুমালের পট্টিনত্ত্ পিল্লৈ প্রভৃতি এগারোজন কবির রচনা লইয়া করিলেন একাদশ তিরুমুরৈ। পরে তাঁহার সমসাময়িক চোলরাজার নির্দেশে তাঁহার নিজের রচনাও একাদশ তিরুমুরৈ-র সর্বশেষে স্থান লাভ করে।

তিরুমুরৈ-র সংখ্যা বারোটি হইলেও আমরা এ পর্যন্ত এগারোটির পরিচয় পাইলাম। বস্তুতঃ নম্বি-য়াণ্ডার-নম্বি শৈবসাহিত্যের এগারোটি বিভাগই করিয়াছেন। দ্বাদশ তিরুমুরৈ রূপে পরিচিত কবি চেক্কিলার প্রণীত 'পেরিয় পুরাণম' রচিত হইয়াছে এক শ' বছরেরও অধিক কাল পরে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, চোল বংশীয় সম্রাট ২য় কুলোত্তুঙ্গ চোলন-এর রাজাকালে (১১৩৩-১১৫০ খৃঃ)। উক্ত চোল সম্রাটই 'পেরিয় পুরাণম' গ্রন্থকে দ্বাদশ তিরুমুরৈরূপে সম্মানিত করেন। ইহাই হইতেছে তামিল শৈবসাহিত্যের বারোটি তিরুমুরৈ-র মোটামুটি বিবরণ।

বিস্তৃত শৈবসাহিত্যের মধ্যে মাত্র পাঁচজন কবি এবং তিনখানি

(১) তামিলে 'ভক্ত' অর্থে উভয় শব্দেরই ব্যবহার আছে।

(২) তেবারম্—দেবতার কণ্ঠহার। দেবহারম্ (দেবআরম্) দেবারম্—তেবারম্।

(৩) পত্তু অর্থাৎ দশটি স্তবক-বিশিষ্ট পদের নাম 'পদিকম'। কখনও কখনও ইহাতে এগারোটি পদও পাওয়া যায়।

গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্বন্দর-অপ্পর-সুন্দরর প্রথম যুগের এই তিনজন, দশম শতাব্দীর মানিক্ক-বাচকর এবং দ্বাদশ শতাব্দীর চেক্কিলার—শৈবসাহিত্যে ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ কবি। প্রথম কবিত্রয়ের পদ সংকলন 'তেবারম', মানিক্ক বাচকরএর 'তিরুবাচকম' এবং চেক্কিলার-এর 'পেরিয় পুরাণম'—এই গ্রন্থ তিনখানি কেবল শৈবসাহিত্যের নয়, সমগ্র তামিল সাহিত্যের স্মরণীয় গ্রন্থ। 'তেবারম' এবং মানিক্ক-বাচকর সম্পর্কে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শৈবসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস অনুসরণ ক'রলে আমরা প্রথম কবিরূপে যাঁহার নাম পাই, তিনি হইতেছেন নেগাপট্টনম্-এর নিকটবর্তী করৈক্কাল নিবাসিনী মহিলা কবি পুনীতবতী (আবির্ভাব-কাল ৫৫০ খৃষ্টাব্দ)। তামিল সাহিত্যে ইনি করৈক্কাল-অম্মৈয়ার (অর্থাৎ করৈক্কালের জননী) নামেই পরিচিত। পতি-পরিত্যক্তা এই ভক্ত নারীর পারিবারিক জীবন বিশেষ বেদনাদায়ক। তাঁহার রচিত পদের সংখ্যা এইরূপ: ২২টি স্তবক বিশিষ্ট 'মূত্ত তিরুপ-পদিকম্' (অর্থাৎ প্রথম ত্রাপদিক) ২০টি স্তবকের 'তিরু ইরট্টৈ মণিমালৈ' এবং ১০১টি স্তবকে সম্পূর্ণ 'অররুদ তিরুবন্দাদি'। (৫)

অতি শৈশব হইতেই শিবের প্রতি ভক্তিমতী কবি পরিণত বয়সের দুঃখ যন্ত্রণায় পরিবৃত হইয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে এই বলিয়া কাতর আবেদন জানাইলেন—"জন্মলাভের পরে যখন প্রথম আধো-আধো কথা বলিতে শিখিলাম, সেই হইতেই তোমার প্রতি আমার সমস্ত ভালোবাসা। আজ আমি তোমার পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছি। হে উজ্জ্বল নীলকণ্ঠ দেবাদিদেব, সেদিন কবে আসিবে, যেদিন তুমি আমায় যন্ত্রণা হইতে মুক্তিদান করিবে।" (৬)

ভক্তির পথে কত অন্তরায় এবং কত বাধা-বিঘ্ন ভয়-ভ অতিক্রম করিয়া যে দেবতার কাছে পৌঁছিতে হয়, তাহারই বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—"আমরা তাঁহার কাছে কিরূপে অগ্রসর হইব? তাঁহার দেহের উপর একটি বৃহৎ সর্প নাচিতেছে এবং তাঁহার কাছে সে কাহাকেও যাইতে দেয় না। কেবল তাহাই নয়, তাঁহার গলায় আছে নরমুণ্ডের মালা এবং সেই বৃষবাহন দেবতা মহানন্দে ধারণ করিয়াছেন শুভ্র হাড়ের অলংকার।" (৭)

কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে দেবতাকে যতই ভয়ংকর বলিয়া মনে হউক না কেন, তাঁহাকে ছাড়া কবি স্বর্গবাসও কামনা করেন না। "হে চন্দ্রচূড়, হে সপ্তলোক-নয়ন, আমি মনের কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি (ইহাই আমার অভিপ্রায়)—তোমাকে দেখিয়া, তোমার চরণে প্রণত থাকিয়া যদি তোমার সামান্য সেবা না করিতে পারি, তবে স্বর্গ পাইলেও আমি তাহা চাই না।" (৮) কারণ কবির দৃঢ় বিশ্বাস, "যদি আমরা আমাদের প্রভুর স্বর্ণ-চরণ-যুগলকে পুষ্পমাল্য দিয়া ভূষিত করিয়া সানুরাগ একাগ্রচিত্তে শব্দ-মালার সাহায্যে বন্দনা করি, যদি আমরা সেই অদ্বিতীয় জ্ঞানময় ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া থাকি, তবে কর্মজনিত অজ্ঞান-অন্ধকার আমাদের কিরূপে দুঃখ দিবে?" (৯)

কিন্তু কোথায় সেই ভগবান? "কেহ বলে, তিনি আছেন স্বর্গে। বলুক না তারা। কেহ বলে, তিনি বাস করেন দেবরাজ ইন্দ্রপুরীতে। বলুক না তারা। কিন্তু আমি বলিব—সেই যে দেবতা, পুরাকালে বিষপানের ফলে কণ্ঠ যাঁহার কালো হইয়াও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তিনি আছেন আমার হৃদয়ের মধ্যে।" (১০)

কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে থাকিলেও কবি যে তাঁহাকে ঠিক ঠিক চিনিতে পারিয়াছেন, তাহা নয়। হৃদয়ের ধন হইলেও তিনি দুর্জ্ঞেয়। ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক কিরূপ, সে বিষয়ে কবির নিজের কথাই শোনা যাক:

"যেদিন আমি তোমার ভক্ত হইলাম, সেদিন তোমার শ্রীমূর্তি না দেখিয়াই ভক্ত হই। আজিও তোমার শ্রীমূর্তি আমি দেখিতে পাইতেছিনা। তাই তাহারা যখন জিজ্ঞাসা করে—'তোমার প্রভুর

---

(৪) ইরট্টৈ অর্থাৎ দুই। আলোচ্য গ্রন্থের ছন্দোব্যবহারে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ইত্যাদি অযুগ্মসংখ্যক স্তবকে একপ্রকার ছন্দ এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ইত্যাদি যুগ্মসংখ্যক স্তবকে অন্য প্রকার ছন্দ। তাই নাম হইয়াছে 'ইরট্টৈ মণিমালৈ' অর্থাৎ দুই ছন্দের মণিমালা।

(৫) অররুদ তিরুবন্দাদি—অদ্ভুত শ্রী অন্তাদি। পূর্ববর্তী স্তবকের অন্ত-স্থিত শব্দ বা শব্দাংশটি পরবর্তী স্তবকের আদিতে ব্যবহৃত হয়।

(৬) পিরন্দু মোৰিল পয়িণ্ড পিন্নেল্লাম্ কাদল্
চিরন্দু, নিন্ চেব্‌ডিয়ে চের্ন্দেন্—নিরম তিকলুম
মৈঞ্ঞ্ঞাণ্ড কণ্ডত্তু বানোর পেরুমানে।
এঞ্ঞান্‌ড তীর্প্পদু ইডর?
—অররুদতিরুবন্দাদি নং ১।

(৭) অন্বাল্ অডৈবন্দু এববারু কোল্? মোন্দৈয়ায় আডরবম,
ত্তন্পাল্ ওরুবরৈচ চারবোট্টাদু, অক্কুবেযুম অণ্ডু,
মুনবায়িন তলৈয়োড়ুকল্ কোণ্ডবৈ যারত্তু, বেন্ট্রৈ
এন্বায়িনবুম অণিন্দু অঙ্গোয় এরুগন্দেরুবদে।
—তিরু ইরট্টৈ মণিমালৈ ১৭নং

(৮) কণ্ডেন্দৈ এণ্ডু রৈক্কিক্ কৈপ্পণিয়ান্ চেয়েনেল্
অণ্ডম পেরিনুম অদু বেণ্ডেন্, তুণ্ডক্কের
পিন্নালুম তিঙ্গলায়! মিক্কুলকম এলিমুক্ক ম
কণ্ণালা! ঈদেন্ করুত্ত।
—অর্বুদ তিরু বন্দাদি ১২নং।

(৯) নামালৈ চূড়িয়ুম নমমীচন্ পোন্নডিক্কে
পুমালৈ কোণ্ডু পুনৈন্দু অন্বায়, নাম ওর
অরিবিনৈয়ে পৃ ট্রিনাল, এন্ট্রে তডুমে
এরিবিনৈয়ে এন্নুম ইরুল্?
—অর্বুদ তিরুবন্দাদি ৮৭ নং

(১০) বানত্তান্ এনবারুম, এনক, মট্রু উম্বরকোন্
তানত্তান এন্বারুম, তাম এনক; এত্তানত্তান্
যুন্ নঞ্জত্তান্ ইরুণ্ড মেয়রোলিচের কণ্ডত্তান্
এন্ নেঞ্জিত্তান্ এনবন্ য়ান্।
—ঐ নং ৩।

আকৃতি কিরূপ, তাদের কাছে আমি কি উত্তর দিব ? হে প্রভু, বল না তোমার আকৃতি কিরূপ।" (১১)

তামিল শৈবসাহিত্যের সম্বন্দর-অপ্পর-সুন্দরর-মানিক্কবাচকর—এই প্রধান কবি-চতুষ্টয় আর যাঁহারা ভক্ত কবিরূপে অল্পবিস্তর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চেরমান্ পেরুমাল্ (অষ্টম শতাব্দী,) তিরুমূলর (নবম শতাব্দী,) পট্টিনত্তু পিল্লৈয়ার (দশম শতাব্দী,) নম্বি-য়াণ্ডার-নম্বি (একাদশ শতাব্দী) এবং চেক্কিলার (দ্বাদশ শতাব্দী) —ইঁহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম রাজরাজ চোলের সম-সাময়িক কবি নম্বি-য়াণ্ডার-নম্বি বিষয়ে পূর্বেই বলা হইয়াছে। পট্টিনত্তু পিল্লৈ-ও কয়েকটি ভক্তিমূলক সুন্দর পদরচনা করিয়া গিয়াছেন। নবম শতাব্দীর কবি তিরুমূলর রচিত তিন সহস্রাধিক স্তবকে সম্পূর্ণ তিরু-মন্দিরম্ (অর্থাৎ শ্রীমন্ত্র) গ্রন্থখানি শৈবসাহিত্যে একটি বিশিষ্টস্থানের অধিকারী। এই গ্রন্থের প্রধান গৌরব কাব্যরস নয়, শাস্ত্রতত্ত্ব আলোচনা। (১২) তামিল ভাষায় একটি কথা খুবই প্রচারিত, যাহার অর্থ হইতেছে—গীতের (স্তোত্রের) মধ্যে যেমন 'তিরুবাচকম্' শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রের মধ্যে তেমনি 'তিরুমন্দিরম্' (১৩)। এই গ্রন্থের ভাব ও ভাষা দুই-ই অতিশয় নিগূঢ়। অপেক্ষাকৃত সরল দু'একটি পদের সাহায্যে আমরা 'তিরুমন্দিরম্'-এর রসাস্বাদনের চেষ্টা করিব।

প্রেম ও ভগবান যে একই বস্তু, সে সম্পর্কে কবি বলিতেছেন—

অন্বুম্ চিব়ুমু ইরণ্ডেন্ পররিবিলার়্,
অন্বে চিব়মাব়তারুম্ অরিত্তিলার়্,
অন্বে চিবম্ আব়তারুম্ অরিন্দপিন্
অন্বে চিবমায় অমরন্ তিরুন্দারে। —২৭০ নং

(মূর্খ লোকেরা বলে, প্রেম ও ভগবান দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু। প্রেম ও ভগবান্ যে একই বস্তু, একথা সকলে জানেনা। যখন তাহারা জানিতে পারে যে, প্রেম ও ভগবান একই, তখন তাহারা সারসত্য জানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।)

কবি ভগবৎ উপলব্ধির যে আনন্দলাভ করিয়াছেন, সমস্ত জগৎ সেই আনন্দের অংশীদার হউক, ইহাই কবির আকাঙ্ক্ষা—

নান্ পেট্র ইন্বম্ পেরুক ইব্বৈয়কম্,
'বান্ পট্রি নিণ্ড মরৈপ পোরুল চোল্লিডিন্,
ঊন্ পট্রি নিণ্ড উণাবুরু মন্দিরম
নাম্ পট্রপ পট্রচ্ তলৈপডুম তানে। —৮৫ নং

শৈবসাহিত্যের একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দ্বাদশ শতকে কবি চেক্কিলার-রচিত 'পেরিয়পুরাণম।' (১৪) 'তেবারম' ও 'তিরুবাচকম' এর পরেই ইহার স্থান। চোলবংশীয় রাজা ২য় কুলোত্তুঙ্গ (১১৩০-১১৫০) তাঁহার সাহস ও বীরত্বের জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনঃ চোল্ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। চেক্কিলার ছিলেন এই চোল সম্রাটে প্রধান মন্ত্রী। শৈববংশের সন্তান হইয়াও অনভয় চোল্ন শৈবসাহিত্য অপেক্ষা 'জীবক চিন্তামণি' প্রভৃতি জৈনগ্রন্থের প্রতি অধিকত অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শৈব ভক্ত সাধকদের জীবনী ও আদ সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। রাজার এইরূপ বিপরী মতিবুদ্ধি দেখিয়া চেক্কিলার অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং রাজাকে এ মর্মে উপদেশ দান করেন যে, শৈব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈনং গ্রহণ শস্য পরিত্যাগ করিয়া তুষ গ্রহণের মতোই নিরর্থক। দুগ্ধবত ধেনুর পরিবর্তে বন্ধ্যা ধেনু, শীতল উদ্যান ছাড়িয়া পঙ্কভূমি, সর ইক্ষুদণ্ডের পরিবর্তে লৌহখণ্ড এবং প্রদীপের পরিবর্তে খদ্যোত কেহ কি পছন্দ করে ? (১৫)

মন্ত্রীর উপদেশে রাজা শৈব সাধকদের প্রচলিত জীবনীগ্রন্থপা মনোনিবেশ করেন, কিন্তু সেইগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণে তৃপ্ত হইতে না পারিয়া স্বীয় মন্ত্রীকে একখানি বৃহৎকাব্য রচনার জন্য অনুরোধ করেন এইভাবে 'পেরিয়পুরাণম' রচনার সূত্রপাত ঘটিল। বিদ্বান্ ও ধার্মিক প্রধানমন্ত্রী চেক্কিলার রাজকার্য হইতে দীর্ঘ অবকাশ লই গ্রন্থরচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তৎপূর্বে ভক্তজীবনীসমূহে মধ্যে যে দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার একখানি অষ্ট শতাব্দীর কবি সুন্দরর লিখিত 'তিরু-ত্তোণ্ড-ত্তোগৈ' (অর্থাৎ শ্রীভ সমুচ্চয়) এবং দ্বিতীয়খানি একাদশ শতকের কবি নম্বি য়াণ্ডার ন লিখিত 'তিরু-ত্তোণ্ডর-অন্দাদি (অর্থাৎ শ্রীভক্তস্তবক)। চেক্কিলা এই গ্রন্থ দুইখানি ব্যতীত দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শৈব-আচার্য শৈব-কবিদের সম্পর্কে যে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করেন, তাহা অবলম্বন করিয়া বৃহৎ গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্যে রাজধানী (তিরুচি নিকটবর্তী) গঙ্গৈ কোণ্ড চোলপুরম্ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ শৈবতী চিদাম্বরম্-এ আসিয়া উপনীত হইলেন।

কথিত আছে, চিদম্বরম্-এর নটরাজ হইতে তিনি তাঁহা গ্রন্থরচনার প্রথম শব্দটির ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। পেরিয় পুরাণম্ এর প্রথম শব্দটি হইল—উলগেলাম্ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব। পূর্ণ শ্লোকা এইরূপঃ—

---

(১১) অণ্ডমুম্ তিরুবুরুম্ কানাদে আট্টপাটেন্,
ইণ্ডুম্ তিরুবুরুবম্ কাণ্গিলেন্—প্রণ্ডুম্তান্
এব্বুরুবো মুম্ পিরান্ এন্বারুকট্রু এন্ন রৈক্কেন্ ?,
এব্বুরুবো নিম্রুরুবম্ এত্ ?
—অরুবুদ তিরুবন্দাদি, ৬১ নং

(১২) Tirumantiram occupies a unique place in Tamil Philosophy. J. M. Nallaswami Pillai—Periya Puranam P. 70. (Tamil University publication series-4).

(১৩) তোত্তির ত্তিরকুত্ত তিরুবাচকম্,
শাস্ত্রিরকুত্ত তিরুমন্দিরম।

(১৪) ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী 'পেরিয়পুরাণম!' বে বলিয়াছেন,—a landmark in the history of Tami Saivism. (A History of South India P. 362)

(১৫) উমাপতি শিবাচার্য্য প্রণীত "চেক্কিলার্ স্বামিকল্ পুরাণম"-এর প্রাসঙ্গিক অংশ এইরূপ :···নেল কুত্তু উম্যাত্ত উমি কুৎি কৈবরুন্দি, করবৈ নিরক মলডুকরন্দু উলম্ তলরন্দু, কুলি পুত্তোলৈ বলিয়িরুক্ক কুলিয়িল বিলুন্দু অলরু পারন্দু, বিলৈতর মেল করুম্বু ইরুণ্ড ইরুবৈ মেত্তু, বিলক্কিরুক্ক মিন্মিনিত্তী কারন্দু···।

—পাদদস ২০

উলগেলাম্ উণরন্দু ওদরকরিয়বন্,
নিলবুউলাবিয় নীরমলি বেণিয়ন্,
অলকিল্ জোতিয়ন্ মবলন্তু আডুবান,
মলর চিলম্বু অডি বাললত্তিবণঙ্গুবাম। (১৬)

গ্রন্থ শেষও হইয়াছে নটরাজ-প্রদত্ত ঐ 'উলগেলাম্' শব্দটি দিয়া। একবৎসর পরে গ্রন্থরচনা সম্পূর্ণ হইলে চোল-সম্রাট একটি বিশেষ সমারোহপূর্ণ উৎসবের আয়োজন করেন। তামিলনাডের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সমাগত জনসমাবেশের মধ্যে চেক্কিলার এবং তাঁহার গ্রন্থ যে রাজ-সম্বর্ধনা লাভ করেন, তাহা সত্যই দুর্লভ। 'পেরিয়পুরাণম্' শৈবসাহিত্যের 'দ্বাদশ তিরুমুরৈ' রূপে স্বীকৃতিলাভ করিল।

রচনাগৌরবে অনেক উন্নত হইলেও বিষয়বস্তুর দিক হইতে চেক্কিলারের গ্রন্থ কিয়ৎপরিমাণে হিন্দী এবং বাংলা 'ভক্তমাল', জাতীয় গ্রন্থের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ২টি কাণ্ডম ও ১৩টি সরুক্কম্ (সর্গ)-এ বিভক্ত এবং সর্বশুদ্ধ ৪২৮৬টি স্তবকে সম্পূর্ণ চেক্কিলারের এই গ্রন্থখানির প্রকৃত নাম 'তিরু-ত্তোণ্ডর—পুরাণম্' (অর্থাৎ শ্রীভক্তপুরাণ) হইলেও উৎকর্ষে ও পরিমাণে পূর্বতন গ্রন্থগুলির তুলনায় মহত্তর ও বৃহত্তর বলিয়া সাধারণত ইহা পেরিয়পুরাণম্ (অর্থাৎ মহাপুরাণ) নামেই পরিচিত।

বিষয়বস্তুর দিক হইতে পেরিয়পুরাণম্ কাব্য এবং স্বভাবতই গীতিকাব্যের ন্যায় ইহার আবেদন দেশকালাতিশায়ী হইতে পারে না। তথাপি তামিলনাডের অধিবাসীদের চিত্তে যে প্রাচীন সাহিত্যসংগ্রহ বর্তমান যুগ পর্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে, পেরিয়পুরাণম্ অবশ্যই তাহার অন্তর্ভুক্ত। তামিলভাষী, বিশেষতঃ ভক্ত তামিলভাষীর দৃষ্টিতে ইহা একখানি অসামান্য গ্রন্থ। ইহাতে যে সমস্ত ভক্ত নরনারীর জীবনকথা বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহাদের জন্য সাধারণ তামিলীর মানসলোকে একটা চিরন্তন শ্রদ্ধার আসন পাতা রহিয়াছে। তামিলনাডের বাহিরে সেই ভক্ত নায়ন্মার গোষ্ঠী কেবল কতগুলি অপরিচিত দুরুচ্চার্য নামের সমষ্টি বলিয়া, তামিল যাঁহাদের মাতৃভাষা নয়, পেরিয়পুরাণম্ সম্পর্কে তাঁহাদের যথোচিত আগ্রহ না-ও হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, পেরিয়পুরাণম্ কেবল ভক্তিরসের গ্রন্থ নয়, ইহাতে ভক্তিরস ও কাব্যরস মিশ্রিত হইয়া আছে। কবি চেক্কিলার প্রকৃতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার রচনায় সেই নিসর্গপ্রীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য সেই সমস্ত বর্ণনার মধ্যেও হিন্দী কবি তুলসীদাসের ন্যায় আমরা তাঁহার ভক্ত হৃদয়টির সুমধুর আত্মপ্রকাশ দেখিতে পাই। (১৭)

---

(১৬) বিশ্ববাসী যাঁহাকে জানিতে এবং প্রকাশ করিতে পারে না, জটায় যাঁহার গঙ্গা এবং অর্ধচন্দ্রের অধিষ্ঠান, চিদাকাশে নৃত্য করেন যে অপরিমেয় জ্যোতির্ময়, আমরা তাঁহার পুষ্পতুল্য নূপুর-পরা চরণযুগল বন্দনা করি।

(১৭) আমরা এখানে কেবল একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। মাঠে মাঠে প্রচুর ধান জন্মিয়াছে। ফসল সংগ্রহের কাল আসন্ন। সেই পাকা ধানের গুচ্ছ লইয়া সারি সারি গাছগুলি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পাশাপাশি দুইটি সারি পরস্পরের দিকে ঝুঁইয়া পড়াতে মনে হইতেছে যেন পবিত্র দেবালয়ে দুই সারি ভক্ত তাঁহাদের সমস্ত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি ও বিনয়বশতঃ পরস্পরের সম্মুখে নত হইয়া পড়িয়াছেন।—'তিরুনাটুচ চিল্লপু। পদ নং. ২১ ও ২২।'

রেশমের মন

বিদ্যুৎকুমার দে রায়

প্রজাপতি ডানা তার সে এসেছে অন্ধকার হতে
মশালের আলো নিয়ে রক্তের জোয়ারে গন্ধবন
নির্মিল মনের ক্ষুধা অনাবৃত আশ্চর্য্য তপন
ধূলার কণায় জ্বালে অনিরুদ্ধ অপূর্ব্ব আলোতে।

অপূর্ব্ব সে আলো তার জ্যোতির সাগর যেন আসে
দেবদারু বনে বনে গোপনে গহন দীপ জ্বেলে
নীরবে নিবিড় ক্ষণে ধীরে ধীরে রঙ-পাখা মেলে
ছায়াঘেরা কান্নাতে আলো আনে আত্মিক বিলাসে।

মর্ম্মর সৌধের কাছে সামুদ্রিক উদাস হাওয়াকে
ভাল লাগে কিন্তু তাকে দাম দেবে মানস মিছিলে,
গুঁড়ো গুঁড়ো কুহেলীতে সোনা-ঝরা দিন রাত্রি দিলে
কেন সে বিবিক্ত মনে কুৎসিত চিন্তায় চেয়ে থাকে।

অনিকার বিপরীত চেতনার পাথরের ফুলে
হাওয়ার আভাস লেগে যে পাখাটি রঙ মাখা হ'ল
বিচিত্র বর্ণের রূপে ছবি তার ছায়াতে মিলালো—
গন্ধ তার বয়ে আনে আন্তরিক সহস্র বকুলে।

অভিজ্ঞান

পরিমল চক্রবর্ত্তী

শুধুই পতন নয়, কিছু কিছু উন্নতিও আছে
আমাদের এ-জীবনে; শুধু মাত্র ব্যথা বেদনায়
আমরা রাখিনি জ্বেলে আমাদের চেতনার দীপ—
কিছু কিছু আনন্দও মিশে আছে সেই দীপালোকে।
তাইতো পৃথিবী আজো অর্থময় আমাদের কাছে—
এখনো যাদের মন মরে নাই স্থূল যন্ত্রণায়
প্রাত্যাহিক জীবনেও; ভালো লাগে পলাশ ও নীপ
বনে বনে জোনাকেরা শুভদৃষ্টি জ্বেলে দুই চোখে।

কেবল মৃত্যুই নয়—জন্ম থেকে অন্য জন্মান্তরে
প্রত্যেকেই পথ হাঁটি প্রতিক্ষণ; স্মৃতির জগতে
প্রত্যেকেই কালজয়ী আনন্দের অনন্য দিশারী;
তাইতো প্রদীপ জ্বলে তুলসীতলায়—ঘরে ঘরে
প্রতিটি সন্ধ্যায় আজো; আর চড়ে আবেগের রথে
রাত্রিদিন পৃথিবীর আঁকাবাঁকা পথ দেই পাড়ি।

হিন্দু সম্মেলন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডাঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি হিন্দুদের 'বর্ণহিন্দু' ও 'তপশীলী জাতি' হিসাবে বিভক্ত করা হইয়াছে—উহা অত্যন্ত দুরভিসন্ধিপূর্ণ ও হিন্দুসমাজের মধ্যে একটি কীলক প্রবেশ করাইবার জন্য উহা করা হইয়াছে। 'তপশীলী জাতি' কথাটি বিদেশী। একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইহা আবিষ্কার করা হইয়াছে। তথাকথিত তপশীলী জাতিদের জীবনযাত্রায় পার্থক্য থাকিলেও তাহারা বর্ণহিন্দুদের ন্যায় সৎ হিন্দু। এই বিভাগ দূর করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং 'তপশীলী জাতি' কথাটি সংবিধান ও ভারতে বলবৎ অপর যে কোন আইন হইতে বাতিল করিয়া দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুরোধ করিব যে, যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে হিন্দু জীবনযাত্রা-প্রণালী কঠোরভাবে অনুসৃত না হইয়া থাকে (আজকাল ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে), তাহা হইলে দলভ্রষ্টরা যদি হিন্দুসমাজের মধ্যে আসিতে চাহে, তবে তাহাদের হিন্দুসমাজের মধ্যে গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। প্রাচীনকালের মত হিন্দুধর্ম্মের দ্বার উদারভাবে খুলিয়া দিতে হইবে। যে কেহ হিন্দু জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিবে, সেই হিন্দু।

আমি পুনরায় বলিতে চাই যে, এই সম্মেলন মুসলিম সম্মেলনের পাল্টা-ব্যবস্থা হিসাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে না। বস্তুতঃ, মুসলিম সম্মেলন আমাদের দৃষ্টিপথের বাহিরে এবং আপনাদের এই হিন্দু-সম্মেলনের ধ্যানধারণার সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। আমাদের লক্ষ্য সুস্পষ্ট।

সাম্প্রদায়িকতা অথবা দলগত আনুগত্যের দ্বারা বিভক্ত নয়—এরূপ ভারতীয় জাতির গুরুতর ও জরুরী সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। জাতির তথা ভারতের সকল অধিবাসীর মৌলিক স্বার্থরক্ষা ও তাহাদের উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষার সমস্যাগুলি সমগ্র দেশ ও জাতির দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার ও আলোচনা করিবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি।

আর একটি বিষয় আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। মিঃ জিন্নার দুই জাতিতত্ত্ব—হিন্দু ও মুসলমানের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ হইয়াছে। মুসলমানদের যে দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা এখন পাকিস্তান নামে পরিচিত। উহা একটি ইসলামীয় রাষ্ট্র। সুতরাং দেশের অপর অংশের সমস্যাবলী আলোচনার জন্য যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাকে হিন্দু সম্মেলন বলা ঠিক হইবে না। যাহা হউক, নামে কিছু যায় আসে না। উদ্দেশ্যটাই আসল কথা।

পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য

স্বভাবতঃই বলা যাইতে পারে, পাকিস্তানে যে সকল হিন্দু বাস করে তাহারা পাকিস্তানী অধিবাসী এবং তাহাদের রক্ষা করিবার দায়িত্ব ভারতের নাই; যেমন পাকিস্তানের মুসলিম অধিবাসীদের প্রতি ভারতের কোন কর্ত্তব্য নাই। কিন্তু সেখানেও একটা পার্থক্য রহিয়াছে। ভারত যখন বিভক্ত হয় তখন আমাদের নেতৃবৃন্দ বিভাগে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এই পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিয়া যে, তাঁহারা পাকিস্তানে হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষা করিবেন। পাকিস্তানের হিন্দুরা সেই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে। আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বলি না যে, পাকিস্তানের হিন্দুরা আইন মান্য করিবে না অথবা সংবিধানকে মর্য্যাদা দিবে না। যদি ধর্ম্মের কারণে শুধু পাকিস্তানে হিন্দুদের নিপীড়ন করা হয়, তাহাদের রক্ষার চেষ্টা করা ভারতের কর্ত্তব্য। যে ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হইয়াছে, ভারত তাহা আঁকড়াইয়া থাকিবে ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবে।

দেশ বিভাগের খড়গ বাংলা ও পাঞ্জাবের উপর প্রবলভাবে পতিত হইয়াছে। দুইটি প্রদেশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। এই দুইটি রাজ্য হইতে ব্যাপকভাবে লোকজন চলিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অসংখ্য হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। তেমনি পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে অসংখ্য হিন্দু ও শিখ তাহাদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ভারত হইতে মুসলিম অধিবাসীরা ব্যাপকভাবে পাকিস্তানে চলিয়া যায় নাই। ব্যবসায় অথবা অন্যান্য কারণে কিছুসংখ্যক মুসলমান হয়ত ভারত ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে গিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব সামান্য।

দেশ-বিভাগের সময় অবিভক্ত ভারতের মুসলিম অফিসারদের ভারত সরকার অথবা পাকিস্তান সরকারের অধীনে ইচ্ছামত চাকুরী করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে তাহাদের বিভাগ করা চলিবে না এবং দুইটি রাষ্ট্রে যাহাতে ভালো আবহাওয়া বজায় থাকে, তজ্জন্য চাকুরীর ক্ষেত্র হইতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূরে রাখিতে হইবে। এই প্রস্তাব উপেক্ষা করা হয়। সিদ্ধান্ত করা হয় যে, সমস্ত চাকুরীজীবীকে ভারত অথবা পাকিস্তানে ইচ্ছামত চাকুরী করিবার অধিকার দেওয়া হইবে। ফল হইয়াছে—প্রায় সকলেই—হিন্দু ও শিখরা ভারতে এবং মুসলিমরা পাকিস্তানে চাকুরী গ্রহণ করে। ভয়ে বিভ্রান্ত হইয়া অথবা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দরুণ বহু অফিসার পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছেন। এই মুসলিম চাকুরীজীবীদের প্রকৃতই কোন অভিযোগ ছিল কি? ভারতে হিন্দু অফিসারদের প্রতি যেরূপ আচরণ করা হয়, মুসলমান অফিসারদের প্রতিও সেরূপ আচরণ করা হয় না কি?

পাকিস্তান হইতে ভারতে ব্যাপকভাবে উদ্বাস্তু আগমন হইতেছে কেন? নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। পাকিস্তানে মুসলমানদের মত হিন্দুরাও নিজেদের ধর্ম্মের উপদেশ অনুসরণ ও নিজের ইচ্ছামত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার যোগ্য। হিন্দু ও মুসলমানদের নিজস্ব বিশেষ বিশেষ সামাজিক, নৈতিক ও শিক্ষাগত অসুবিধা আছে। সেগুলি অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণভাবে যে সকল রাজনৈতিক প্রশ্নের সহিত তাহারা সংশ্লিষ্ট, সে সকল বিষয়ে পৃথক

আচরণ হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই যে শুধু এই নীতি অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা নয়, রাজ্যগুলির ব্যাপারেও সমভাবে এই নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রকৃত প্রশ্ন হইতেছে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন। যদি তাহা না হয়, তবে শুধু প্রতিবাদে কিছু হইবে না। পাকিস্তানে হিন্দুদের রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা যে কোন রকমেই হউক না কেন। ভারতবিভাগের সময় হিন্দুদের যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই কার্য্যকরী করিতে হইবে। কর্ত্তব্য হইতে পিছু হটিলে চরম বিশ্বাসভঙ্গ করা হইবে। ইতিহাস তাহা ক্ষমা করিবে না।

পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের রক্ষা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নেহরু-লিয়াকত চুক্তির প্রাক্কালে পার্লামেন্টে বিতর্কের সময় বলেন, "পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের যদি দারুণ বিপদ হয়, তবে স্থির হইয়া থাকা অসম্ভব।" তারপর তিনি বলেন "শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্তানে হিন্দুদের একমাত্র পাকিস্তানই রক্ষা করিতে পারে।"

এই দুইটি বিবৃতি একসঙ্গে পাঠ করিলে তাহার একমাত্র অর্থ হইবে —মূলতঃ সংখ্যালঘুদের রক্ষার দায়িত্ব পাকিস্তানের উপর রহিয়াছে। কিন্তু যদি সে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতে ব্যর্থ হয়, তবে সংখ্যালঘুদের বিষয়টি গ্রহণ করিবার ও উহার জন্য সংগ্রাম করিবার দায়িত্ব ভারতের উপর আপতিত হইতেছে। "আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে। কারণ পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না।" অনেকে মনে করেন, দেশ বিভাগের সময় যেমন প্রস্তাব করা হইয়াছিল সেইমত যদি লোকবিনিময় করা হইত, তবে পাকিস্তানে হিন্দুরা নারীনির্য্যাতন ও উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইত।

ভারতের ঐক্যের পথে যে সকল বিভেদমূলক শক্তি অন্তরায় হইয়া আছে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

ভাষাবাদ

আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, সংবিধান অথবা ভারতে বলবৎ কোন আইনকে হেয় করিবার জন্য তাহা বলিতেছি এরূপ মনে করা উচিত হইবে না। আইনের বিরুদ্ধে কিছু বলা আমারও স্বভাব-বিরুদ্ধ। কিন্তু আইনজীবী হিসাবে আমি মনে করি, যে কোন আইন উৎপীড়নমূলক মনে হইলে তাহার প্রতিকারের জন্য আমি মন্তব্য করিতে পারি। বন্ধুগণ, এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া আমি এখন আপনাদের নিকট বক্তৃতা করিতেছি।

আমাদের সংবিধানে অষ্টম তপশীলে ১৪টি ভাষার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে একটি হইতেছে সংস্কৃত। সংবিধানে লিখিত আছে যে, সরকার হিন্দীভাষা প্রসারের এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন যাহাতে ইহা ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির সকল লোকের মতপ্রকাশের মাধ্যম হয়। সংবিধানে আরও ব্যবস্থা আছে যে, প্রয়োজন হইলে সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষা হইতে শব্দ লইয়া হিন্দী ভাষার শব্দকোষ সমৃদ্ধ করিতে হইবে। সুতরাং হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে এবং ইংরাজীর স্থান গ্রহণ করিবে। দুঃখের বিষয় যে, সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা করা হয় নাই। এই ভাষা ভারতের সাধারণ ভাষা হইবার খুব উপযোগী। ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে সংস্কৃতের গুরুত্ব সমধিক। ইহা মানবজাতির একটি শ্রেষ্ঠতম ভাষা এবং কাহারও কাহারও মতে অত্যন্ত নিখুঁত ভাষা। ইহা সৌন্দর্য্য ও সুষমা-মণ্ডিত ভাষা। ইহা আমাদের চমৎকার উত্তরাধিকার। ভাষা হিসাবে ইহার মননশীলতার মূল্য অনতিক্রমণীয়। সংস্কৃত হইতেই—উচ্চতর সংস্কৃতি সংক্রান্ত শব্দ পাওয়া যাইতে পারে। নূতন পরিস্থিতিতে ভারতে নূতন কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক শব্দ প্রয়োজন। একমাত্র সংস্কৃতভাষাই এই সকল শব্দ সরবরাহ করিতে পারে। লাটিন ও গ্রীক ভাষার মত ইহার প্রচুর মূল শব্দ আছে যাহা আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাগুলিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

যাহা হউক, সংবিধানের সর্ত্ত অনুসারে ভারত সরকার হিন্দীভাষা প্রচারের জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা হইয়াছে। বহুলোক তাহা করিতে অনিচ্ছুক। তাহারা যুক্তি দেখায় যে, তাহাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা হিন্দীভাষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। সুতরাং কেন তাহারা তাহাদের নিজস্ব ভাষার বদলে হিন্দীভাষা গ্রহণ করিবে? আমাদের সমগ্র ভারতের ক্রমপ্রসরমান প্রয়োজনে সমগ্র ভারতের সাধারণ ভাষার পক্ষে যে বৈচিত্র্যময় এবং বিরাট কাজ করিতে হইবে, হিন্দীভাষার শব্দসম্ভার এখন পর্য্যন্ত সেই পর্য্যায়ে উন্নত হইতে পারে নাই।

আমি হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধী—একথা মনে করা উচিত হইবে না। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, কালক্রমে হিন্দীভাষা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে এবং ভারতের জনগণ অবাধে উহাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবে। অন্যান্য ভাষাসমূহের শ্রীবৃদ্ধির নিজস্ব নিয়ম আছে ও বাহির হইতে উন্নত করা যায় না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ভাষার পুষ্টিসাধনে গতিবেগ বর্দ্ধিত করিতে পারে। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করিয়া যদি তাঁহাদের মতামত প্রকাশের জন্য সেই ভাষা ব্যবহার করেন, তবে অল্প সময়ের মধ্যে অসাধারণ উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু অত্যাবশ্যক সর্ত্ত পূরণ না হইলে কোন একটি বিশেষ ভাষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য একটি কমিটি অথবা একটি পরিচালকমণ্ডলী নিয়োগ করিয়া কোন কাজ হইবে না। ভাষাতত্ত্ববিদ ও সমালোচকদের একটি কমিটি বানান ও ব্যাকরণ সরলীকরণের জন্য নিয়মকানুন রচনা করিতে পারেন। তাঁহারা পারিভাষিক শব্দ আবিষ্কার ও নির্দ্ধারিত মান স্থির করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সাহিত্য উন্নয়নে প্রেরণা সৃষ্টি করিতে পারেন না। সাহিত্যের উৎস মানব হৃদয়ে লুক্কায়িত আছে। মামুলি প্রস্তাব ও সরকারী বুলেটিনের দ্বারা মানুষের গভীরতম আবেগকে আলোড়িত করা যায় না। ইংরাজীর স্থলে হিন্দী প্রবর্ত্তনের জন্য সংবিধান রচয়িতাগণ যে সময় সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেলেন, তাঁহারা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য এই অত্যাবশ্যক সর্ত্তগুলি উপেক্ষা করিয়াছিলেন মনে হয়।

প্রশ্নের এই সমস্ত দিক যদি মনে রাখা হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান বিরোধপূর্ণ ভাষা-সমস্যা উঠিত না। বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সামঞ্জস্য করিলে এখনও বিষয়টির মীমাংসা হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সুইজারল্যাণ্ডের কথা বলা যায়। সুইজারল্যাণ্ডে ভাষার প্রশ্নে কোন গোলযোগ নাই, যদিও সেখানকার লোকে জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইতালীয়—এই তিনটি ভাষায় কথা বলে। ইহা একটি ক্ষুদ্র দেশ, ইহার লোকসংখ্যা কলিকাতার অপেক্ষাও কম। ইহা ২৪টি স্বয়ং-শাসিত ইউনিটে বিভক্ত, প্রত্যেক ইউনিটের নিজস্ব ভাষা আছে ও সেই ভাষায় শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়। ইহার যে কোন একটি

ইউনিট হইতে পত্র পাইলে, যে ভাষায় পত্র লেখা হয়, ফেডারেল সরকার সেই ভাষায় জবাব দেন। ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও সুইজারল্যাণ্ডের জনগণ নিজেদের এক জাতি মনে করে। জরুরী অবস্থায় তাহারা বিশ্বের নিকট নিজেদের একটি শক্তিশালী জাতিরূপে উপস্থাপিত করে।

ভারতের অবস্থা এত সহজ না হইতেও পারে। সংবিধানে ইতিমধ্যে ১৪টি ভাষা স্বীকৃত হইয়াছে। এই তালিকায় আরও কয়েকটি ভাষা যোগ হইতে পারে এবং সুইজারল্যাণ্ডে যে নীতি চালু আছে, তাহা ভারতে গ্রহণ করিলে প্রশাসনের ব্যয় অত্যধিক হইবে। বাস্তবিক যে ভাষায় পত্র পাওয়া যাইবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই ভাষায় উহার জবাব দিতে হইলে তখন কেন্দ্রে বিভিন্ন ভাষা-জানা বিভিন্ন ধরণের লোক রাখিতে হইবে। সংবিধানে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করায়, আমি মনে করি, শ্রেষ্ঠ উপায় হইবে হিন্দীকে গ্রহণ করা, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাজ্য তাহাদের নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায় অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্য চালাইয়া যাইতে পারিবে এবং যে কোন রাজ্যের সহিত কেন্দ্রের যোগাযোগ ইংরাজী অথবা হিন্দীতে করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হিন্দীতে কোন পত্র লিখিত হইলে হিন্দীতে তাহার জবাব দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা ইংরাজীতে লিখিত হইলে ইংরাজীতে তাহার জবাব দিতে হইবে। তেমন রাজ্যগুলির মধ্যে যোগাযোগ সন্তোষজনক ভাবে সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে আমি মনে করি—বিরোধপূর্ণ প্রশ্নের উপযুক্ত সমাধান পাওয়া যাইতে পারে, কারণ এখন ইংরাজী ভাষা ভারতের সহযোগী ভাষা ঘোষিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমাদিগকে মহাত্মা গান্ধীর সতর্কবাণী মনে রাখিতে হইবে: "আমরা সকল প্রকার বিভেদমূলক মনোভাবের বিরোধিতা করিব এবং নিজেদের ভারতীয় মনে করিব ও সেইরূপ আচরণ করিব। এই বিষয়টিকে সবার উপরে স্থান দিয়া ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির পুনর্বিন্যাস করিলে শিক্ষা ও ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা হইবে।"

কোন ভাষার অগ্রগতি অপর ভাষাগুলির উন্নতি ব্যাহত করিবে, এরূপ মনে করা আজগুবি। পক্ষান্তরে, মনে করিতে হইবে যে, এক ভাষার উন্নতি অপর ভাষাকে সাহায্য করিবে। সুতরাং হিন্দী ভাষার অগ্রগতি ও প্রসারে ভারতীয়দের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নাই।

ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতা

বলা হইয়াছে যে, ভারত ধর্ম্মনিরপেক্ষ দেশ। কোন কোন লোক ইহার অর্থ করিতেছেন যে, ভারতে কোন ধর্ম্ম থাকা উচিত নয়। এই মনোভাব সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমার মতে ধর্ম্মনিরপেক্ষতা হইতেছে—কোন বিশেষ ধর্ম্ম অনুসরণ করার জন্য আইনের চক্ষে কেহ অযোগ্য বিবেচিত হইবে না। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী, শিখ, পার্সীগণ প্রভৃতি ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত সমান সুযোগ সুবিধা ও অধিকার পাইবে।

পোপের প্রভুত্ব মানুষের মনোজগতের উপর ছিল না, ছিল রাষ্ট্রের উপরে। এই প্রভুত্বকে অস্বীকার করেই ধর্ম্মনিরপেক্ষতার উদ্ভব হয়। "কিন্তু আমাদের নেতৃবর্গ ও তাহাদের অনুগামীরা হিন্দু মনোভাব সংশোধনের উদ্দেশ্য লইয়া অত্যন্ত অসতর্কভাবে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কথা বলিয়া থাকেন। ফলে ভারতে উহার প্রয়োজন একটা বিশেষ অর্থপূর্ণ ও উহাতে হিন্দুধর্ম্মের উপর অজ্ঞাতসারে নিন্দাবাদ করা হয়।"

শ্রীনেহরু আমেদাবাদে জেলে থাকিতে লিখিয়াছেন: "গণতান্ত্রিক সংবিধানে মৌলিক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা ব্যক্তি বিশেষ ও গোষ্ঠীর ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, মৌলিক অধিকার রক্ষা করিতে হইবে ও নিশ্চয়তা দিতে হইবে। উহা সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযুক্ত হইবে। ইহা ছাড়াও ভারতের সমগ্র ইতিহাস শুধু পরমত-সহিষ্ণুতা নয়, এমন কি, সংখ্যালঘু ও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে উৎসাহদানের সাক্ষ্য দেয়। ইউরোপে যে তীব্র ধর্ম্মীয় বিবাদ ও নিপীড়ন বলবৎ ছিল, ভারতের ইতিহাসে তাহার পরিচয় কোনদিন পাওয়া যায় নাই। ধর্ম্মীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরমত-সহিষ্ণুতার আদর্শের জন্য আমাদের তাই বিদেশের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। এই গুণ ভারতীয় জীবনযাত্রার মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে।" শ্রীনেহরু তখন এই মতেই বিশ্বাস করিতেন এবং এই অভিমতের সঙ্গে হিন্দুদের নিজস্ব অভিমতের কোন পার্থক্য নাই। হিন্দুরা বলে রাষ্ট্রে ধর্ম্ম-নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার। "ঈশ্বর নৃপতি সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রভু হইলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি প্রজাদের সেবক, কর হিসাবে তিনি তাঁহার বেতন গ্রহণ করেন এবং সমস্ত শ্রেণীর নর-নারীর রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য তিনি উহা ব্যয় করেন।"

পক্ষপাতশূন্য আচরণ হিন্দুরাজধর্ম্মের ভিত্তি ছিল। সম্রাট অশোক—যাঁহার প্রতীক ভারত সরকার নিজেদের প্রতীক রূপে গ্রহণ করিয়াছেন—ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি সর্ব্বশ্রেণীর নর-নারীর কল্যাণের জন্যই দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ধর্ম্ম ছাড়া কোন রাষ্ট্র টিকিয়া থাকিতে পারে না। বিখ্যাত রাজনৈতিক চিন্তানায়ক বার্ক বলিয়াছিলেন "প্রকৃত ধর্ম্মই হইতেছে সমাজের মূল ভিত্তি। ইহার উপরেই সকল প্রকৃত সরকার নির্ভর করে এবং ইহা হইতেই তাহার কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা শক্তি অর্জ্জন করে; আইন তাহার ক্ষমতা খুঁজিয়া পায়। ঘৃণা ও বিদ্বেষের বাষ্পে ইহা যদি একবার আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ইহার স্থায়িত্বই বিপন্ন হইয়া পড়ে।"

মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের মহান স্থপতি জর্জ্জ ওয়াশিংটন, যাঁহাকে রাজমুকুট দেওয়া হইলে প্রত্যাখ্যান করেন, একদিন বলিয়াছিলেন, "রাজনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত নীতি ও আচরণ একান্ত প্রয়োজন, তাহার মধ্যে ধর্ম্ম নীতিবাদ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মানবজাতির সুখের প্রধান উপাদান, প্রতিটি মানুষের কর্ত্তব্যের প্রধান অবলম্বন—এই গুণগুলি অস্বীকার করিয়া কোন ব্যক্তিই স্বাদেশিকতার দাবী করিতে পারে না। ধর্ম্ম ছাড়াই নৈতিক জীবনের মর্য্যাদা রক্ষা পাইতে পারে বলিয়া যে মতবাদ প্রচারিত হয়, তাহা আমাদের সরাসরি অস্বীকার করা উচিত। তথাকথিত শিক্ষিত মানুষেরা যাহাই বলুন না কেন, যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা এই শিক্ষালাভ করিয়াছি যে, ধর্ম্মীয় নীতি ব্যতিরেকে কোন জাতির নৈতিক চরিত্র রক্ষা পায় না।"

আমাদের শাসনতন্ত্র-রচয়িতাগণ মহাপুরুষদের ঘোষিত বাণী জানেন না, ইহা চিন্তা করা অসম্ভব। সুতরাং যখন তাঁহারা বলেন যে, ভারত ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইবে, তখন তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, ভারতে কোন ধর্ম্ম থাকিবে না, ইহা অচিন্তনীয়। তাঁহারা এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্য কাহাকেও পছন্দ করা অথবা বাদ দেওয়া যাইবে না।

[ক্রমশঃ।

বাংলা দেশের মসজিদ, কবর ও দরগা

(জেলাভিত্তিক ইতিবৃত্ত)

অধ্যাপক মাখনলাল রায় চৌধুরী এম, এ, ডি,লিট,

প্রতিটি বিজয়ের পরই মসজিদ স্থাপন মুসলমানদের নিয়মিত ব্যাপার ছিল। রোজ পাঁচবার প্রার্থনা (নামাজ) করাও ছিল প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে বাধ্যতামূলক। তাহা ছাড়া, এইরূপ বাঞ্ছনীয় ছিল যে, এক জায়গায় বিশেষভাবে শুক্রবার 'জুমা' বা জমায়েত দিবসে সকলে মিলিতভাবে নামাজ পড়িতে হইবে। মসজিদ ছিল ধর্মের দিক হইতে উপাসনা-ক্ষেত্র, সামাজিক দিক হইতে মেলামেশার আড্ডা আর রাজনৈতিক দিক হইতে তথ্য বিনিময়, কর্মসূচী ঘোষণা ও শাসনকারী সুলতানের নাম জাহিরের কেন্দ্র। এই কারণেই যে মুহূর্তে কোন মুসলমান বিজেতার কবলে একটি স্থান আসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখানে একটি মসজিদ স্থাপন করিতেন। এই মসজিদ দ্বারা বিজেতা ব্যক্তি এবং তাঁহার অনুগতদের অনেক উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইত। ভারতে কিন্তু মসজিদ স্থাপন করা ছিল তুলনায় একটি সহজ কাজ। কেননা, হিন্দুদের নিজস্ব উপাসনা-মন্দির ছিল—বৌদ্ধদের ছিল চৈত্য ও বিহার। এই ধর্মীয় ক্ষেত্রগুলিকে অনায়াসেই মসজিদে রূপান্তরিত করা চলিত। মন্দির ও বিহারগুলি হয় আংশিকভাবে নয় সম্পূর্ণভাবে ভাঙিয়া ফেলা হইত আর উহাদের ধ্বংসাবশেষের উপরই গড়িয়া তোলা হইত নূতন নূতন মসজিদ।

শুধু তাই কেন, হিন্দু মন্দিরগুলির চত্বরসমূহ মুসলমানদের গোরস্থান হিসাবে প্রায়ই ব্যবহৃত হইত। সম্মানিত মুসলিম পীর, ফকির কিংবা গাজীর কবর দরগায় রূপান্তরিত করা হইত এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কবরের পার্শ্বে নির্মিত হইত একটি করিয়া মসজিদ। দেখিতে না দেখিতে দরগাগুলি এক একটি তীর্থে পরিণত হইত। বিশেষভাবে এইটি বোঝা যাইত সংশ্লিষ্ট পীর, ফকির বা গাজীর মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে—যখন ভীড় হইত অসম্ভব। সেই পবিত্র দিনটিকে কেন্দ্র করিয়া মেলা (জমায়েত) বসিত কিংবা সর্ব্ব-সাধারণের জন্য একটি উৎসব (ঈদ) চলিত।

বাংলায় গোড়াকার দিনের প্রত্যেকটি মসজিদ দেশের বিভিন্ন অংশে মুসলিমদের সম্প্রসারণেরই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। মসজিদ ও সমাধিক্ষেত্রে পাথরে খোদাই করা যে সব লেখা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সব খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। সাধারণতঃ এইগুলি আরবী ভাষাতেই লেখা। ইহাতে কবে কি অবস্থায় কোন্ মসজিদ নির্মিত হইল, তখনকার ক্ষমতাসীন সুলতানের নাম কি, কোথাও কোথাও স্থপতির নাম—এ সব লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। একথা ঠিক মসজিদ, গোরস্থান ও দরগাগুলি ঘুরিয়া দেখিলে সেকালের বাংলায় মুসলমানদের বিস্তৃতির একটা সুন্দর ধারণা করা যায়।

মুসলিম সুলতান কিংবা ফকির কিংবা পীরগণ আসিয়াছেন, গিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের দ্বারা বা গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণ কর্তৃক নির্মিত মসজিদগুলি টিকিয়া আছে। যত্নের অভাবে কিংবা কালের স্বাভাবিক গ্রাসের দরুণ উহাদের কয়েকটি হয়ত ধ্বংসস্তূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু মুসলমান বা হিন্দু কেহই ইচ্ছা করিয়া কোন মসজিদ ভাঙিয়া দেন নাই, কোন সমাধি ক্ষেত্র অথবা দরগাও অপবিত্র করেন নাই।

মসজিদ, সমাধিস্থল ও দরগা—যা যা মুসলিম আমলের গোড়া পত্তনের দিনের, সেগুলি একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইখানে দেওয়া হইতেছে :—

(১) **বাখরগঞ্জ** (বরিশাল): সাধারণতঃ বরিশাল নামে পরিচিত বাখরগঞ্জ জেলায় গোড়াকার যুগের খুব বেশী মসজিদ নাই। ইহার কারণ, খিলজি শাসনের প্রথম ত্রিশ বৎসর এই অঞ্চলটি সেনাদের বংশধরদের দ্বারাই শাসিত হয়। তারপর ইলিয়াস শাহীর শাসন আমল আসে; তিনি নদীবহুল এই জিলার ব্যাপারে খুব আগ্রহান্বিত ছিলেন না। রাজা গণেশ ও দনুজমর্দ্দনের শাসনই চলে ১৪৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। সেই হেতু এই এলাকায় কোন মসজিদ ছিল না। ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র সর্বপ্রথম মসজিদ স্থাপিত হয় আর সেইটি পটুয়াখালি মহাকুমার একটি গ্রামে। এই গ্রামটি এখন মসজিদ-বাড়ী নামেই সর্বত্র জানা। তাহা ছাড়া, এই জিলা আরাকানী, মগ, টিপরা ও পর্ত্তুগীজদের রণাঙ্গন স্বরূপ ছিল—তাহারা কেহই মসজিদ বরদাস্ত করিবার পাত্র নয়।

(২) **বাঁকুড়া:** প্রথম আমলের কোন মসজিদের চিহ্নই এই জিলায় নাই। কারণ, মল্ল রাজারা সাফল্যের সহিত মুসলিমদের অনুপ্রবেশে বাধা প্রদান করেন। পাঠানরা মাঝে মাঝে তবু মল্ল রাষ্ট্রের সীমান্তে হানা দিত।

(৩) **বর্দ্ধমান:** কালনা আদালতের নিকটে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বদর সাহেব ও মজলিস সাহেবের কবর দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গে আছে দুইটি ক্ষুদ্র মসজিদ। এই সমাধিক্ষেত্র দুইটিতে যে পীররা শায়িত রহিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতিতে হিন্দু ও মুসলমানরা ফুল, ফল, মিষ্টি ও ছোট ছোট খেলনা ঘোড়া দিয়া থাকেন।

কাটোয়া হইতে পাঁচ মাইল দূরে মঙ্গলকোটে কয়েকটি ফকিরের সমাধি আর কতকগুলি পুরাতন মসজিদ আছে। এই মসজিদগুলির গঠন দেখিলে মনে করা চলে যে, মুসলিম অনুপ্রবেশের প্রথম আমলে এই সব নির্মিত হইয়াছিল।

(৪) **বীরভূম:** রাজনগরে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ রহিয়াছে—ইহার নামও নগর। জয়লাভের পর মুসলিমদের সেক্রেটারিয়েট (দপ্তর) এই মসজিদেই ছিল। কিন্তু রাজনগরে মসজিদের কোন চিহ্ন নাই।

(৫) **বগুড়া:** এই জিলাতেও মুসলিমরা গোড়ার দিকেই উপনিবেশ স্থাপন করে। বর্ত্তমান বগুড়া সহর হইতে ৮ মাইল দূরে দেবকোটে বাংলা দেশের প্রথম মুসলিম দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীন সহরে একটি মসজিদ আছে—বলা হয় ইবন বাক্তিয়ার ইহার স্থাপয়িতা। ইহা ছাড়া সেখানে পীর শাহ সুলতানের একটি সমাধি আছে। বাংলা দেশে যে ১২ জন আওলিয়া ইসলাম ধর্ম্ম-প্রচারে আসিয়াছিলেন, পীর শাহ সুলতান ছিলেন তাঁহাদের

অন্যতম। এই সমাধিগাত্রে একটি পাথর লাগানো আছে—স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 'খোদার পাথর' বলিয়াই জানেন। এই পাথরটি একটি বুদ্ধ মূর্ত্তির নিম্নদেশ—উল্টানো অবস্থায় স্থাপিত।

পীর শাহ সুলতানের সমাধির পার্শ্বেই আছে আর একটি মসজিদ। ইহার গাত্রদেশে প্রস্তরে যাহা খোদাই করা আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ফারুকশিয়ার উহা নির্ম্মাণ করেন।

আকবরনামায় শেরপুরের (বগুড়া) **খানকা মসজিদ** একটি খুব প্রাচীন মসজিদ বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহারই পার্শ্বে মীর্জ্জা মুরাদ ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে অপর একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। শেরপুর সহরেই দুইটি সমাধির তলদেশে পীর তুরকান সাহেবের দেহাবশেষ সংরক্ষিত আছে—একটি সমাধিতে রাখা আছে তাঁহার মস্তক এবং অপরটিতে তাঁহার অবশিষ্ট দেহ। লক্ষ্মণসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে তাঁহার মস্তক এমনিভাবে বিচ্ছিন্ন হয়।

শেরপুরে **গাজী মিঞার সমাধিও** রহিয়াছে। বাংলা জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় রবিবারে প্রতি বৎসরই তাঁহার বিবাহ উৎসব পালিত হয়। সম্ভবতঃ হিন্দু বালিকাদের সহিত মুসলিম বীরদের বিবাহের স্মরণিকা হিসাবেই এই উৎসব হইয়া থাকে এবং ইহার মাধ্যমে ইসলামের বিজয় গাথাই ঘোষিত হয়।

(৬) **চট্টগ্রাম ঃ** চট্টগ্রামের উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে বাংলায় মুসলিম অনুপ্রবেশের খুব সম্ভব সব চেয়ে প্রাচীন নিদর্শনসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। আরব বণিকরা জাহাজে আসিয়া চট্টগ্রামের উপকূলে অবতরণ করে। সহরের কেন্দ্রস্থলে পীর বদরের যে মসজিদটি রহিয়াছে, তাহা দূরবর্ত্তী আরব দেশ হইতে মুসলিমদের দুঃসাহসিক অভিযানের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। পীর বদর পূর্ব্ববঙ্গের নাবিক ও মাঝিদের কাছে একজন ঋষি বলিয়া আগেও পূজিত ছিল, এখনও পূজিত। আরাকানী রাজা মঙ্গাই যা মঙ্গল প্রেরিত ফকরুদ্দীন মুবারক ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম রীতিমত জয় করেন। এই বিজয় উৎসব উপলক্ষে কর্ণফুলি নদীর উপকূলে একটি মসজিদ স্থাপিত হয়। ইবন বতুতা তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে এই মসজিদটির কথা উল্লেখ করেন। ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট যাইবার পথে তিনি এইস্থানে প্রার্থনা করিয়া যান বলিয়া লিখিত আছে। **মুক্তালাহোচন কাব্যে** উল্লেখ আছে যে, ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে রাস্তি খান নামক এক ব্যক্তি চট্টগ্রামে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন।

সহরের প্রান্তে পর্ব্বতের ঠিক সানুদেশে পাহাড়গুলিতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর **বায়াজিদ বোস্তমির দরগা** ও সমাধি রহিয়াছে। ইহার গাত্রদেশে যে লেখা আছে, তাহা এখনও উদ্ধার করা যায় নাই।

(৭) **ঢাকা ঃ** সোনারগাঁর সন্নিকটে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের (মৃত্যু ১৪১০ খৃঃ) একটি সমাধি আছে। পোয়া মাইলের মধ্যেই রহিয়াছে পাঁচজন পীরের পাঁচটি দরগা ও পাঁচটি মসজিদ। সাধারণভাবে স্থানটিকে বলা হয় **পাঁচ পীরের দরগা।**

সোনার গাঁর (১৫১৯ খৃঃ) প্রাচীনতম মসজিদ হোসেন শাহ'র স্মৃতির সহিত জড়িত। এই মসজিদটি লাল ইটে তৈরী—তিনটি গম্বুজ তৈয়ারী নীল বর্ণের টালিতে।

মহল্লা নারিন্দায় ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে **বিনৎ বিবির** মসজিদ নির্ম্মিত হয়। ঢাকা সদরে এই মসজিদটিই সবচেয়ে প্রাচীন।

রামপাল হইতে ৮ মাইল দূরে আজি কসবার একটি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর **বাবা আদমের মসজিদ** (১৪৮৩ খৃঃ) নির্ম্মিত হয়।

(৮) **দার্জ্জিলিং ঃ** দার্জ্জিলিং জেলার সর্ব্বাধিক প্রাচীন মসজিদ শুকনা ও সোনদার মধ্যে কোর্ট রোডে অবস্থিত। কালগ্রাসে উহা এখন পাথরের স্তূপে পরিণত হইয়াছে। ইলিয়াস শাহের সৈন্যদের ব্যবহারের জন্যে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল—স্থানীয় পাহাড় অঞ্চলে তাহারা চালাইয়াছিল অভিযান। দেখিলে মনে হয়, গোড়ার দিকে উহা ছিল একটি বৌদ্ধ চৈত্য।

(৯) **দিনাজপুর ঃ** দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে দমদমা মসজিদ দমদমা নামীয় একটি মুসলিম ক্যান্টনমেন্টের সংশ্লিষ্ট ছিল। মুসলিম বাংলার সীমান্তে যতগুলি দুর্গ ছিল, তন্মধ্যে উহা ছিল অন্যতম প্রাচীন।

(১০) **ফরিদপুর ঃ** কলিকাতা হইতে ১৬৬ মাইল দূরে অবস্থিত বর্ত্তমান ফরিদপুর সহরের মধ্যভাগে কাচারী দরগার নিকট ফরিদপুরের ফরিদখান মসজিদ অবস্থিত।

পীর ফরিদখানের বীরত্বের উল্লেখ করিয়া স্থানীয় গাথা রহিয়াছে এই গাথায় সুলতান ইউসুফ শাহ'র (১৪৭৬ খৃঃ) আমলের উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা চলিতে পারে যে, মুসলিম সম্প্রসারণের গোড়াকার দিনগুলিতে মসজিদটি নির্ম্মিত হয়; তবে মুবারক শাহ'র (১৩৪০ খৃঃ) আগে নহে।

(১১) **হুগলী ঃ** জাফরখান সপ্তগ্রাম জয় করেন এবং ত্রিবেণীতে একটি মনোরম মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। মসজিদ-গাত্রের লেখা হইতে দেখা যায় যে, ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম যখন জয় হয়, সেই সময় উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। গঙ্গার সঙ্গমস্থলে একটি হিন্দু মন্দিরের অভ্যন্তরে জাফরখান কবরে শায়িত আছেন। এই স্থানটি পুরাতত্ত্ব বিভাগের রক্ষণাধীনে আছে। উহার গাত্রে যে শিলালিপি রহিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—১৫২৯ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ জামালুদ্দীনের সময় উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পাণ্ডুয়ায় সামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৬—১৪৮৩ খৃঃ) কয়েকটি হিন্দু মন্দিরকে বিখ্যাত **বাইশ দরজা মসজিদে** পরিণত করেন।

পাণ্ডুয়ার মসজিদের মিনার শাহ সৈফুদ্দীন নির্ম্মাণ করেন। এই সৈফুদ্দীনই পাণ্ডুয়ার পীর নামে প্রসিদ্ধ। হুগলীর (আরামবাগ) গড়মন্দারনে শাহ ইসমাইল গাজীর একটি সমাধি আছে। শাহ ইসমাইল গাজী ছিলেন রুকনুদ্দীন বারবক শাহ'র (১৪৬০—১৪৭৪ খৃঃ) একজন সেনাপতি (আরব)। **রিসালাত-আস-সাহোদায়** তাঁহার জীবনী সবিস্তার দেওয়া আছে। (এশিয়াটিক সোসাইটি জার্ণাল, ১৮৭৪, ৪৩শ খণ্ড)। বাংলার মুসলিম ক্ষমতা সম্প্রসারণে মন্দারানের রাজা গজপতিকে এই আরব সেনাপতি হারাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে লক্ষণাবতীতে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। তাঁহার মস্তকটি কাঁটাদুয়ারে এবং দেহভাগ মন্দারনে সমাধিস্থ করা হয়।

উভয় স্থানেই সমাধিস্তম্ভ রহিয়াছে। আরব সেনাপতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ হোসেন শাহ ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কবরের উপর প্রসিদ্ধ সমাধিস্তম্ভ ও মিনারগুলি নির্ম্মাণ করেন। সমাধি স্তম্ভটি **ছোট আস্তানা** নামে অভিহিত। পুরাতন জঙ্গলের পার্শ্বে কালে খান ও ফতে খান এই দুইজনের সমাধি আছে। তাহারা ছিল ইসমাইল গাজীর দেহরক্ষী—উক্ত সেনাপতির মাথা ও দেহ ভাগ কবর দেওয়ার জন্ম তাহারাই নিয়া আসে।

কালে খান টিবির উপরিভাগে স্থাপিত আছে **গঞ্জা শহীদ** (শহীদ সৈন্যদের সমাধি)।

(১২) **জলপাইগুড়ি:** জলপাইগুড়িতে কোন মসজিদের চিহ্ন নাই। ধর্ম্মান্তরকরণে ইবন বক্তিয়ার খিলজির মতো লোকই আগাইয়া আসেন। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া তিব্বত অভিযানের পথে তিনি আলি মেচ নামে একজন মেচ সর্দ্দারকে ধর্ম্মান্তরিত করেন। আলি মেচের ধর্ম্মান্তরকরণ ছাড়া আর কোন মুসলিমের ধর্ম্মান্তরকরণের কোনরূপ চিহ্ন সেখানে নাই।

(১৩) **যশোহর:** যশোহরের মুরালি কসবার নিকটে গরীব শাহ ও বাহারাম শাহ নামে দুইজন মুসলিম ফকিরের সমাধি আছে। তাহারা উভয়েই ছিল পীরখান জাহান আলির শিষ্য। পীরখান জাহান আলি ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে আসিয়াছিল। সুতরাং এই সমাধি দুইটি পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে নির্ম্মিত হয়। সমাধি দুইটির নিকট ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি প্রাসাদ ও একটি মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়।

যশোহর হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে **বড়বাজার মসজিদ** রহিয়াছে। কথিত আছে, এই মসজিদটি সপ্তগ্রামের বিজেতা জাফর খানের পুত্র বরখান গাজী স্থাপন করেন। বরখান গাজীর বিজয়-গাথা **গাজী মিঞানার বিয়া** (গাজী মিঞার বিবাহ) নামে খুবই জনপ্রিয়। হিন্দু মেয়েদের সহিত মুসলিম বীর যা গাজীদের বিবাহের বর্ণনা এই সকল গাথায় রহিয়াছে। **সাত ভাই চম্পার** চলতি কাহিনীটি মুকুট রায়ের সাত ছেলে ও তাহাদের বোন চম্পাবতীর কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। বরখান গাজীর ভাই কালু গাজীর কবল হইতে নিজের মর্য্যাদা বাঁচাইবার জন্ম চম্পাবতী আত্মহত্যা করিয়াছিল। এই গাজী নাকি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার নামে আজও পর্য্যন্ত সুন্দরবন এলাকার হিন্দু ও মুসলমানরা **সিন্নি** অর্থাৎ দুধ, মিষ্টি, ফল ও চাউল উৎসর্গ করিয়া থাকে।

ঝিনাইদহ মহকুমায় **গয়েশ গাজীর মসজিদ** স্থাপিত আছে। এই অঞ্চলটি এক সময়ে মুকুট রায়ের অধীনে ছিল। মুকুট রায়ের সৈন্যবাহিনীতে পাঠান সৈন্যও ছিল এবং এই সৈন্যদের কয়েকজনকে রাত্রির অন্ধকারে ভুলক্রমে রণদেবী কালীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ম বলি দেওয়া হয়। ইহাতে অন্যান্য পাঠান সৈন্যরা উত্তেজিত হইয়া উঠে,—তাহারা মুকুট রায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালায়। মুকুট রায় পরাজয় বরণ করেন। তাঁহার কন্যা চম্পাবতী মসজিদের নিকটবর্ত্তী একটি পুষ্করিণীতে ডুবিয়া দেহত্যাগ করে। এই পুষ্করিণীটি **কন্যাদহ** নামে অভিহিত।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, মুসলিমরা এমন কি ভাড়াটে সৈন্য হিসাবেও বাংলায় বেশ অভ্যন্তরে আগেই ঢুকিয়া পড়ে। গায়েশ গাজীর বংশধর বলিয়া পরিচিত কয়েকটি পাঠান পরিবার এখন অবধি দেখিতে পাওয়া যায়।

(১৪) **খুলনা:** খুলনার সেনের বাজারের **কাজী মসজিদটি** নির্ম্মাণ করে চতুরঙ্গ খান। হোসেন শাহ'র আমলে চতুরঙ্গ খান হিন্দু হইতে ধর্ম্মান্তরিত হয়। চতুরঙ্গ খানের মুসলিম পত্নীদের ঔরসে দুই পুত্র হয়—সুবী খান ও সুচী খান। সেনের বাজারের কাজী-পরিবারের তাহারাই প্রতিষ্ঠাতা।

খুলনার বাগেরহাটের পীর খান বাখান আলির দরগা ও **ষাট গম্বুজ মসজিদ** বাংলার পূর্ব্বাঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য সম্প্রসারণের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। (প্রসিদ্ধ ষাট গম্বুজ মসজিদে আসলে ৭৭টি গম্বুজ ও ৭টি মিনার আছে)।

মসজিদপুর গ্রামের **চাব্দখালি** মসজিদের মোট নয়টি গম্বুজ আছে—তিনটি সারিতে তিন তিনটি করিয়া গম্বুজ। এই মসজিদের মিনার আছে চারটি।

খুলনার সাতক্ষীরা হইতে দুইমাইল দূরে **লাবসা মসজিদ** অবস্থিত। **মাই চম্পার** (মা চম্পা) বিখ্যাত দরগাটি সেখানেই। যে চম্পাবতী নিজের মান বাঁচাইবার জন্ম জলে ডুবিয়া মরিয়াছিল, মাই চম্পা হয়ত তাহারই কোন বিকল্প নারী হইবে। কৌতূহলের বিষয় যে, আসল চম্পাবতী মুসলিম কবল হইতে পালাইয়া যাওয়ার পর মুসলমানরা কল্পনায় অনেক চম্পাবতী সৃষ্টি করে।

(১৫) **মালদহ** (গৌড়): একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর পয়গম্বরের পদচিহ্নের মর্য্যাদাস্বরূপ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে নাসারত শাহ **কদম রসুল** নির্ম্মাণ করেন। হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অংশে মহম্মদের এইরূপ অনেক পদচিহ্ন বিদ্যমান। ঐ পাথরটি সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে সরাইয়া নেন; কিন্তু মীরজাফর পুনরায় উহা গৌড়ে প্রেরণ করেন।

কদমরসুলের সন্নিহিত প্রাঙ্গণে একটি মসজিদ আছে—উহার নির্ম্মাণকাল ১৫২০ খৃষ্টাব্দ।

চিকা মসজিদ—কদম রসুল হইতে ঠিক ৪০ ফুট দূরেই আছে একটি মসজিদ—নাম চিকা মসজিদ। উহার গম্বুজও মাত্র একটি। উহা দেখিতে পাণ্ডুয়ার একলাখি মসজিদের অনুরূপ।

চামকাটি মসজিদ—ইহা ছিল একজন ফকিরের বাসভবন। এই ফকির বকর-ঈদের দিনে নিজের দেহ হইতে চামড়া কাটিয়া উৎসর্গ করিত। সেইজন্য উহার নাম চামকাটি (চর্ম্ম-কর্ত্তন) মসজিদ। গাত্রদেশের লেখা হইতে দেখা যায়—১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইয়ুসুফ উহা নির্ম্মাণ করেন।

তাঁতিপাড়া মসজিদ—সমগ্র গৌড় অঞ্চলে এই মসজিদের মতো সুন্দর মসজিদ আর নাই। সামসুদ্দীন ইয়ুসুফ শাহ ইলিয়াসের আমলে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে উহা নির্ম্মিত হয়। উমর কাজী নামে এক ব্যক্তি এই মসজিদের স্থপতি—মসজিদের পূর্ব্বপ্রান্তে উমর কাজীকেও কবর দেওয়া আছে।

[ক্রমশ:

অনুবাদ: অনিলধন ভট্টাচার্য্য

৪১

'পথের সম্বল কে কী এনেছ?' নিত্যানন্দকে জিগগেস করলেন প্রভু।

'একটা কানাকড়িও সঙ্গে নিইনি।' বললে নিতাই, 'সম্বলের মধ্যে দণ্ড, করোয়া, কৌপীন ও বহির্বাস। তোমার আদেশ ছাড়া কার সাধ্য আছে জিনিস নেয়!'

কথা শুনে খুশি হলেন গৌররায়। বললেন—'কেউ যে কিছু সঙ্গে নাওনি, তাতে বড় তৃপ্তি পেলাম। কৃষ্ণ ত্রিজগৎ পালন করেন, আমাদেরও করবেন। তাছাড়া, কৃষ্ণ যদি অন্ন মাপান, অরণ্যেও তা মিলবে। আর যদি না মাপান, রাজপুত্রও থাকবে অনাহারে। সর্বত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাই ফলবতী।'

'ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে-দিনে লিখন।
অরণ্যেও যাসি মিলে অবশ্য তখন॥
প্রভু যারে যেদিনে বা না লিখে আহার।
রাজপুত্র হউ তভো উপবাস তার॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নছত্র।
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিবে সর্বত্র॥'

ছত্রভোগে পৌঁছুবার আগে এলেন আটিসারায়। গ্রাম হলে কী হয়, সেখানে থাকে অনন্ত পণ্ডিত। তার ঘরে প্রভু অতিথি হলেন। কৌপীন বেশ, হাতে দণ্ড কমণ্ডলু, ভিক্ষেয় বেরুলেন! অনুচরদেরও নিলেন সঙ্গে। ভিক্ষাই যে সন্ন্যাসীর ধর্ম, তাই শেখালেন সবাইকে। আর যতক্ষণ গৃহে আছেন ততক্ষণ শুধু কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণকীর্তন।

ছত্রভোগে গঙ্গা শতমুখী। সেখানে জলময় শিবলিঙ্গ। ভগীরথ যখন গঙ্গাকে নিয়ে এল, তখন বিরহবিহ্বল শিব উপস্থিত হল ছত্রভোগে। গঙ্গাকে দেখেই তার জলে ঝাঁপ দিল। সেখানেই বিরাজ জলরূপে।

শাক্ত ও বৈষ্ণবদের তারকতীর্থ ছত্রভোগ। তারপর এখন আবার চৈতন্যচন্দ্রের পদস্পর্শ পড়ল।

শতমুখী গঙ্গা দেখে প্রভুর নয়নধারাও শতমুখী হল। তিনি অম্বুলিঙ্গ-ঘাটে স্নান করলেন। স্নানান্তে যে বহির্বাস পরেন, তাই আবার চোখের জলে ভিজে যায়।

ছত্রভোগ গৌড়রাজ্যের দক্ষিণ সীমা। সে দক্ষিণাংশের অধিকারী রাজা রামচন্দ্র খান। হোসেন শার অধীনস্থ কর্মচারী। ও পারেই উড়িষ্যা, প্রতাপরুদ্র যার রাজা। গৌড়ের সঙ্গে উড়িষ্যার তখন কলহ, সাধ্য নেই সহজে কেউ গৌড় থেকে যেতে পারে উড়িষ্যায়।

দোলায় চড়ে কোথায় যাচ্ছিল রামচন্দ্র। পথে এত কোলাহল কেন? মুখ বাড়িয়েই দেখতে পেল প্রভুকে। দেখল তেজোদৃপ্ত বিশাল পুরুষ। দেখেই কেমন ভয় হল। তাড়াতাড়ি নামল দোলা থেকে। নেমেই পড়ল প্রভুর পদতলে।

প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নেই। হা হা জগন্নাথ বলে কাঁদছেন আকুল হয়ে।

রামচন্দ্র খান ফাঁপরে পড়ল। এ আর্তির সম্বরণ হবে কী করে?

'দেখুন আপনার পায়ের কাছে কে পড়ে আছে?' নিতাই প্রভুকে বললে সকাতরে।

'তুমি কে?' গৌরসুন্দর চমকে উঠলেন।

'আমি আপনার দাসানুদাস।'

'ইনি এ এলেকার অধিকারী, নবাবের হয়ে শাসন করছেন।' বললে কেউ কেউ।

'তা হলে তো ভালো হল।' প্রভু তাকালেন রামের দিকে। 'আমি নীলাচলচন্দ্র দর্শন করতে চলেছি। তুমি পারো কিছু সাহায্য করতে?'

'পারি।' বললে রামচন্দ্র। 'গৌড় আর উড়িষ্যা, দুই রাজায় বিষম কলহ চলছে, ত্রিশূল পুঁতে নির্ধারণ করেছে সীমানা। যদি কেউ এ সীমানা লঙ্ঘন করে, তাকে গুপ্তচর মনে করে তক্ষুনি হত্যা করা হয়। কাউকে এ পথে যেতে দিই—আমার অধিকার নেই। যদি উপরে জানতে পারে, তা হলে আমার ফাঁসি হবে। তা হোক, আমার জাতি-প্রাণ-ধন সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, তবু আপনাকে আমি পাঠাবই নীলাচল। আপনার ইচ্ছার আমি অপূরণ হতে দেব না।'

রামচন্দ্রের দিকে শুভদৃষ্টিপাত করলেন প্রভু। দৃষ্টিমাত্র তার সর্ববন্ধনের ক্ষয় হয়ে গেল।

এক ব্রাহ্মণের ঘরে রাত কাটালেন। খেলেন নামমাত্র। কোথায় জগন্নাথ, কতদূর জগন্নাথ—রাত্রে-দিনে এই শুধু কাতরতা। কোথায় নীলাচলচূড়ামণি!

প্রহর খানেক রাত তখনো আছে, রামচন্দ্র এসে বললে, 'নৌকো এনেছি। রাত থাকতেই যাত্রা করুন।'

হরি-হরি বলে ত্বরিতে নৌকোয় উঠলেন গৌরহরি। একে একে অনুচরেরাও উঠল। উঠেই প্রভু নৃত্য করতে সুরু করলেন। মুকুন্দকে বললেন, কীর্তন লাগাও। 'হরিহরয়ে নমঃ' কীর্তন আরম্ভ করল মুকুন্দ।

মাঝিরা বিপদ দেখল। তারা ভেবেছিল গোপনে প্রভুকে উড়িষ্যায় নামিয়ে দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাবে। কিন্তু এ যে দেখছি ভরাডুবি! এভাবে নাচলে নৌকো বেসামাল হয়ে যাবে তলিয়ে। তাছাড়া কোলাহলে জলদস্যুরা আকৃষ্ট হবে। ধন-প্রাণ কিছুই বাঁচবেনা।

তখন তারা প্রভুর কাছে মিনতি করল: 'নাচের উৎপাতে নৌকো ডুবে গেলে কোথায় যাব, কোথায় পৌঁছিয়ে দেব? জল-ডাকাতরা ঘুরছে আশে-পাশে। গোলমাল শুনলেই সদলবলে চলে আসবে। আমাদের দেখছি, ডাঙায় বাঘ, জলে কুমির। নীরবে বসুন শান্ত হয়ে। আমাদের বাইতে দিন চুপচাপ।'

প্রভুর সঙ্গীরা সঙ্কুচিত হল। যা বলছে মাঝিরা তা অযৌক্তিক নয়।

প্রভু হুঙ্কার করে উঠলেন: 'তোমরা ভয় পাচ্ছ? ভয় কী! এই দেখ সুদর্শন চক্র। ঘুরে ঘুরে ভক্তদের সর্ববিঘ্ন খণ্ডন করছে। কিছু চিন্তা কোরো না, কীর্তন লাগাও। তোমরা দেখ কি না-দেখ, সুদর্শন ফিরছে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে।'

'ব্যপদেশে মহাপ্রভু কহেন সভারে।
নিরবধি সুদর্শন ভক্তরক্ষা করে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন-অগ্নিতে সে পাপী পুড়ে মরে॥
বিষ্ণুচক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে ভক্তজনেরে লঙ্ঘিতে॥'

প্রিয়বর্গ আবার কীর্তন ধরল। মাঝিরাও আশ্বস্ত হয়ে বাইতে লাগল নৌকো।

দিন কয়েক পরে উড়িষ্যায় বালেশ্বরের কাছে প্রয়াগঘাটে নৌকো থামল।

'কারে বোলে রাত্রি দিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল কিবা স্থল পার বা ও পার॥
কিছুই না জানে প্রভু ডুবি ভক্তিরসে।
প্রিয়বর্গ রাখে নিরবধি রহি পাশে॥'

প্রয়াগঘাটে প্রভু স্বগণদের নিয়ে স্নান করলেন। সেখানে যুধিষ্ঠিরের প্রতিষ্ঠিত মহেশ আছে, তাকে প্রণাম করলেন। ভক্তদের বললেন, 'তোমরা বোসো, আমি ভিক্ষে মেগে আনি।'

সে কী! তুমি যাবে কোথায়? ভক্তদল আপত্তি করল। আমরা কেউ যাই।

কারু আপত্তি শুনলেন না প্রভু। নিজেই বেরুলেন একা-একা। বহির্বাসকে ঝুলির মত করে ধরে।

লক্ষ্মী যাঁর পাদপদ্মে স্থান ভিক্ষে করছে, তিনিই কিনা পথের ভিখিরি! 'হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে। ন্যাসী রূপে ভিক্ষা-ছলে জীব ধন্য করে॥'

ওরে ত্যাখ, পথে কে এক নতুন সন্নেসী বেরিয়েছে। আহা, মরে যাই, কী সুন্দর দেখতে! ভিড় জুটে গেল চারপাশে। যার ঘরের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ান, সেই বিহ্বল হয়ে তাকায়, মনে হয়, এ সোনার বিগ্রহকে যথাসর্বস্ব দিয়ে দিই।

ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ফিরলেন গৌরহরি। মন্দিরে ভক্তরা অপেক্ষা করছিল, সেই মন্দিরে। ঝুলি তো নয়, এক সাম্রাজ্য নিয়ে ফিরেছেন! ভক্তরা তো অবাক। 'পারবে, তুমি পারবে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে। তুমিই আমাদের দেহের অন্ন, আত্মার পরমান্ন।'

আহারান্তে সুরু হল কীর্তন। সমস্ত গ্রাম ধন্য ধন্য করে উঠল।

উষাকালে আবার যাত্রা করলেন প্রভু।

কিন্তু এবার ঘাটের পাটনি পথ আটকাল। বললে, 'দান দাও, নইলে পার করব না।'

যিনি ভবসাগর পার করবেন—তাঁরই পথরোধ।

ভক্তরা বললে, 'কোত্থেকে দান দেব, আমাদের কপর্দক মাত্র নেই।'

'তা হলে ওদিকে গিয়ে বসো, এদিকে এসো না।' পাটনি অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিল।

কিন্তু সহসা প্রভুর চোখের উপর চোখ পড়ল পাটনির। কী হল কে জানে, পাটনি প্রভুকে লক্ষ্য করে বললে, 'আচ্ছা, তুমি এস। আর ওরা,' ভক্তদের নির্দেশ করল পাটনি, 'ওরা কি তোমার লোক?'

প্রভু বললেন, 'এ জগতে আমার কেউ নেই, আমিও কারু নই। আমি একান্তই একা।'

তা হলে তুমি এদিকে এস, একা শুধু তোমাকেই পার করব।'

প্রভু ভক্তদের ছেড়ে ঘাটের কাছে গিয়ে বসলেন।

ভক্তরা প্রমাদ গুণল, প্রভু কি তবে আমাদের ছেড়ে দিয়ে একাই নীলাচল যাবেন? প্রভু ছাড়া আমরা তবে বাঁচব কী করে?

নিত্যানন্দ বললে, 'ভয় নেই। প্রভু কি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারেন?'

'তোমরা তো গোঁসাইয়ের কেউ নও,' পাটনি ভক্তদের কাছে হাত পাতল: 'তবে ঘাটের কড়ি বের করো।'

সকলে ত্রস্ত হয়ে উঠল, কে যেন উচ্চরোলে কাঁদছে। কাঁদছে আর বলছে, জগন্নাথ, তুমি কতদূরে? দেখা দাও, দেখা দাও আমাকে।

পাটনি স্তম্ভিত হয়ে গেল। কাঠ-পাথর গলে যায়, এমন কান্নাও কাঁদা যায় নাকি? ভক্তদের জিগ্‌গেস করলে, 'এমন অদ্ভুত কাঁদছেন ইনি কে?'

'ইনি আমাদের ঠাকুর। সকলের ঠাকুর।' অশ্রুচোখে বললে ভক্তদল।

'কে ঠাকুর?'

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম শুনেছ? ইনি সেই নবদ্বীপের অবতার, ত্রিজগতের ঈশ্বর। সন্ন্যাসীবেশে জীবোদ্ধার করবেন বলে চলেছেন নীলাচল।'

পাটনি প্রভুর পায়ে গিয়ে পড়ল।

সর্বজীবনাথ হরি-হরি বলে উঠলেন। নৌকো চলল পরপার।

পৌঁছুলেন রেমুণায়। পরমমোহন গোপীনাথকে দর্শন করলেন। প্রণাম করতেই গোপীনাথের পুষ্পচূড়া প্রভুর মাথার উপর খসে পড়ল। তা মাথায় বেঁধে প্রভু নৃত্য করতে লাগলেন। গোপীনাথের সেবকেরা অবাক মানল। এত রূপ তারা কোনোদিন দেখেনি, দেখেনি এত প্রেম! কে গোপীনাথ! যে মন্দিরে স্থির, না, যে অঙ্গনে নৃত্যপর?

'এই যে ঠাকুর ইনি একদিন ভক্তের জন্য ক্ষীর চুরি করেছিলেন,' সমবেত সকলকে বলছেন প্রভু, 'তাই এঁর নাম ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।'

'কে সে ভক্ত?'

'মাধবেন্দ্র পুরী।'

বৃন্দাবনে তাঁর গোপালের গায়ে চন্দন মাখাবার স্বপ্নাদেশ হয়েছে, সেই চন্দনের সন্ধানে নীলাচলে যাচ্ছিলেন মাধবেন্দ্র, পথিমধ্যে থেমেছেন রেমুণায়, গোপীনাথকে দেখতে। গোপীনাথের বারোখানি ক্ষীর ভোগ হয়, বারো থালায় সাজিয়ে। সেই ক্ষীরের স্বাদ অমৃতের তুল্য বলে তার নাম অমৃতকেলি। মাধবেন্দ্র কোনোদিন কারু কাছে কিছু চেয়ে আহার করত না, কিন্তু সেদিন গোপীনাথের ক্ষীর খেতে তার আকাঙ্ক্ষা হল। আকাঙ্ক্ষা হতেই লজ্জায় মরে গেল মাধবেন্দ্র, এই আকাঙ্ক্ষায় তার অযাচক বৃত্তির হানি ঘটেছে। অপরাধ মোচনের জন্যে বিষ্ণু স্মরণ করতে লাগল। কিন্তু গোপীনাথ করল কী? গোপীনাথ মাধবেন্দ্রের জন্যে ক্ষীর চুরি করল, লুকিয়ে রেখে দিল ধড়ার আড়ালে। রাত্রে পূজারীকে স্বপ্ন দেখাল, ভোগের জায়গায় বারোখানা ক্ষীরের জায়গায় যে এগারোখানা ছিল লক্ষ্য করোনি। বাকি একখানি আমি আমার ভক্ত মাধবেন্দ্রের জন্য চুরি করে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি। যাও, সেই ক্ষীরখানি মাধবেন্দ্রকে দিয়ে এস। মাধবেন্দ্র হাটের আটচলার নিচে শুয়ে আছে।

'ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণ।
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবন॥'

ভক্তের জন্যে ভগবান চুরি পর্যন্ত করতে প্রস্তুত। ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের স্বীকৃতিতে গোপীনাথের নাম "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ"।

মাধবেন্দ্রের অমৃত চরিত ভক্তদের কাছে বর্ণন করলেন মহাপ্রভু। গোপালের জন্যে চন্দনভার বয়ে নিয়ে চলেছে, কোনো কষ্টকেই অন্তরায় বলে মানছে না। প্রগাঢ় প্রেমের এমনি স্বভাব যে প্রিয় সুখের জন্যে প্রেমিক সমস্ত দুঃখকে তুচ্ছ করতে পারে, সমস্ত বিঘ্নকে তুচ্ছতর। 'প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার। নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিক না করে বিচার॥' তারপর চন্দনভার নিয়ে যখন রেমুণায় এল, তখন গোপাল বললে, তোমাকে এ বোঝা বৃন্দাবনে বয়ে আনতে হবে না, তুমি গোপীনাথকেই চন্দন মাখাও, তাতেই আমি সুশীতল হব। ভক্তশ্রম লাঘব করে দিল গোপাল।

সেই মাধবেন্দ্র—পরম নিস্পৃহ, বৃথালাপবর্জিত, সর্বত্র উদাসীন, গ্রাম্যবার্তার ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গহীন, প্রতিষ্ঠা বা সুখ্যাতির ভয়ে চিরকাতর—যখন দেহ

রাখছেন তখন দিব্যোন্মাদগ্রস্তা রাধিকার মত বিলাপ করছেন: হে দীনদয়ার্দ্র কৃষ্ণ দেখা দাও, তোমার অদর্শনে প্রাণ যায়, তুমি দেখা না দিলে আমি কী করব, কী করতে পারি বলো।

মহাপ্রভু সেই শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তাঁরও মধ্যে দেখা দিল রাধিকার প্রেমোন্মাদ।

রেমুণা থেকে প্রভু এলেন যাজপুর। যাজপুরে বৈতরণী নদীতে স্নান করলেন, বরাহঠাকুরকে দর্শন করলেন, পীঠাধিষ্ঠাত্রী বিরজা দেবী ও ত্রিলোচনেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে গিয়েও প্রণাম করলেন। বিরজা দেবীকে দেখে তাঁর গোপীভাব উপস্থিত হল। বদ্ধাঞ্জলি হয়ে ভিক্ষে করলেন কৃষ্ণপ্রেম।

তারপর চলে এলেন কটক। প্রতাপরুদ্রের বাসস্থান, উড়িষ্যার রাজধানী এলেন সাক্ষীগোপাল দেখতে।

সাক্ষীগোপালের কাহিনীটি প্রভুকে শোনালে নিত্যানন্দ।

বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণ তীর্থ করতে গিয়েছে বৃন্দাবন। একজন বুড়ো, আরেকজন যুবক। যুবক সারাক্ষণ বৃদ্ধের সেবাযত্ন করছে। বৃদ্ধ খুশি হয়ে বললে, তোমাকে সম্মান না করলে আমার কৃতঘ্নতা হবে। অতএব আমি তোমাকে কন্যাদান করব।

যুবক বললে, এ অসম্ভব। আমি অকুলীন, উপরন্তু দরিদ্র, বিদ্যার্জনও বেশি করিনি, সুতরাং এ প্রস্তাব ফিরিয়ে নিন। আপনার সেবায় কৃষ্ণ খুশি হবেন—সেই আশায় আপনার পরিচর্যা করছি। পাত্র হবার মত আমার যোগ্যতা নেই।

বৃদ্ধ মানলনা। বললে, তুমি সংশয় কোরো না। আমি নিশ্চয় করে বলছি, তোমাকেই কন্যা সমর্পণ করব।

যুবক আবার বাধা দিল। বললে, 'আপনার অনেক জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, তাদের সম্মতি ছাড়া এ প্রস্তাব অর্থহীন।'

বৃদ্ধ বললে, 'কন্যা আমার আপনবিত্ত, তা দিতে অন্যের নিষেধ চলবে কেন? যদি জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কেউ বাধা দিতে আসে, তাদেরকে নিরস্ত করে বা বর্জন করে আমি কথা রাখব।'

'তাহলে গোপালকে সাক্ষী রাখুন।'

গোপালকে সাক্ষী রাখল বৃদ্ধ। গোপালের কাছে বললে, 'আমি আমার নিজধন নিজকন্যা এই যুবককে দান করব।'

'তুমি আমার সাক্ষী।' গোপালকে বললে যুবক, 'যদি অন্যথাচরণ দেখি, তোমাকে ডাকব সাক্ষ্য দিতে।'

গুরুবুদ্ধিতে বৃদ্ধকে যুবক সেবা করতে লাগল প্রাণপণে। দেশে ফিরে এসে বৃদ্ধ সমস্ত বৃত্তান্ত আত্মীয় বন্ধুদের কাছে বিবৃত করলে। সকলে হাহাকার করে উঠল, নীচ বংশে কন্যা দেবে—অমন হীন কথা মুখেও এনোনা। সমস্ত সমাজ উপহাস করবে আমাদের।

'কিন্তু তীর্থবাক্যের অন্যথা করি কী করে?' বৃদ্ধ বললে সকাতরে।

আত্মীয়-বন্ধুরা রুখে দাঁড়াল। বললে, তা হলে আমরা সকলে তোমাকে ত্যাগ করব। স্ত্রী-পুত্র বললে, বিষ খাব।

'ও যে তা হলে গোপালকে সাক্ষী ডাকবে।' বৃদ্ধ বললে, 'লাভের মধ্যে মামলাতে ও জিতবেই, আমাকে ধর্মভ্রষ্ট হতে হবে।'

'কিসের তোমার সাক্ষী?' পুত্র বললে রুষ্ট হয়ে, 'একটা নিশ্চল বিগ্রহ, তাও দূর দেশে রয়েছে। সে আসবে সাক্ষ্য দিতে!' পরে বললে নিভৃত হয়ে, 'যুবক যদি এসে কন্যা দাবি করে, আর তুমি সরাসরি মিথ্যে বলতে না পারো, বোলো, কী বলেছি আমার স্মরণ নেই। তা হলেই ওর মামলা টেঁসে যাবে।'

'তা আমি কী করে বলতে পারি? কথা দিইনি—এ যেমন মিথ্যে, স্মরণ নেই—এ আরো মিথ্যে। গোপাল, আমার দু-দিক রক্ষা করো।' বৃদ্ধ গোপালচরণে কাঁদতে লাগল। দেখো আমার ধর্মও যেন বাঁচে, আত্মীয়স্বজনও না রুষ্ট হয়। একদিন সত্যি-সত্যিই যুবক এসে দাবি জানাল। অঙ্গীকার রাখতে চেষ্টা করছেন না, এ আপনার কেমনতরো আচরণ?

বৃদ্ধ চুপ করে রইল। কিন্তু তার পুত্র এল ঠেঙা নিয়ে। তুমি বামন হয়ে চাঁদ চাইছ? কুলহীন অধম হয়ে চাইছ আমার বোনকে বিয়ে করতে?

যুবক পালিয়ে গেল প্রাণভয়ে। গ্রামস্থ পঞ্চজনের কাছে শরণ নিল। সালিশ বসল গণ্যমান্যদের। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তলব হল। বলো, কেন একে কন্যা দিচ্ছনা? কথা দিয়েছ তো কথার খেলাপ করছ কেন?

ছেলে যা শিখিয়ে দিয়েছিল তাই বললে বৃদ্ধ। বললে, কখন কী বলেছি আমার কিছু স্মরণ নেই।

তখন ছেলে অগ্রবর্তী হয়ে বললে, 'শুনুন। তীর্থযাত্রায় বাবার সঙ্গে অনেক টাকাকড়ি ছিল। ঐ পাষণ্ড বাবাকে ধুতুরা খাইয়ে অজ্ঞান করিয়ে সমস্ত লুট করে নিয়েছে। এখন রব তুলেছে, কন্যাদানের

অঙ্গীকার করেছে ব্রাহ্মণ। আপনারাই বিচার করে বলুন ঐ নরাধম কি পাত্র হবার যোগ্য ? ওকে বাবা কন্যা দিতে স্বীকার করবেন ?'

'কিন্তু সাক্ষী আছে, আমার একজন সাক্ষী আছে।' যুবক চিৎকার করে উঠল।

'কে সাক্ষী ?'

'এক মহাজন আমার সাক্ষী।'

'কে, তার নাম কী ?'

'তার নাম গোপাল। বৃন্দাবনের গোপাল। যার বাক্য সত্য বলে ত্রিভুবন মানছে। যার কাছে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণ স্বমুখে দিয়েছে প্রতিশ্রুতি।'

'তাই ভালো। গোপাল যদি এসে সাক্ষ্য দেয়,' বৃদ্ধ বললে, 'তবে নিশ্চয় কন্যার্পণ করব।'

'হ্যাঁ, গোপাল যদি এসে বলে—' ব্রাহ্মণের পুত্র সায় দিল।

বৃদ্ধের আশা—কৃষ্ণ নিশ্চয়ই দয়া করবেন, আমার বাক্য সপ্রমাণ করবেন ; আর পুত্রের আশ্বাস, প্রতিমা কখনো আসতে পারে ?

যুবক তখন সটান হাজির হল বৃন্দাবনে। গোপালকে গিয়ে বললে, 'গোপাল, তুই বিপ্রের ধর্ম রাখো। কন্যা পাব—এতে আমার গৌরব নেই, ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা থাকে—এতেই আমার গৌরব।'

কৃষ্ণ বললে, 'তুমি ফিরে যাও, আমি সভাস্থলে আবির্ভূত হয়ে ঠিক সাক্ষ্য দেব। প্রতিমাস্বরূপে আমি সেখানে যাব কী করে ?'

'না, না, তুমি যদি চতুর্ভুজ মূর্তিতে আবির্ভূত হও কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবেনা। তুমি যে মূর্তিতে আছ সেই মূর্তিতে যাবে আমার সঙ্গে।' বললে যুবক, 'তা হলেই সকলে তোমাকে মান্য করবে।'

'বা, প্রতিমা হাঁটবে কী করে ?' বললে কৃষ্ণ।

'তা হলে এখন কথা কইছ কী করে ?' বললে যুবক, 'তুমি প্রতিমা নও, তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। ভক্তের জন্যে তুমিই তো অকার্যকরণ করবে। মন্দির ত্যাগ করে আমার সঙ্গে যাবে, যাবে পায়ে হেঁটে, যেমন আমি যাব। যে ভাবে ভজন করব তোমাকে, তুমিও সেইভাবে আমাকে কৃপা করবে।'

'বেশ, আমি যাব তোমার পিছু-পিছু।' গোপাল রাজি হল, 'কিন্তু তুমি সন্দেহবশে পিছন ফিরে তাকাবেনা আমি সত্যি যাচ্ছি কিনা। যদি ফিরে তাকাও আমি তবে সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়ব।'

'বুঝব কী করে যে তুমি ঠিক অনুসরণ করছ আমাকে ?'

'আমার নূপুরধ্বনি শুনতে পাবে।'

যুবক গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করল। পিছনে শুনতে পেল নূপুরধ্বনি। তবে গোপালও চলেছে সঙ্গে-সঙ্গে।

চলতে চলতে বহুদিন পরে পৌঁচেছে গ্রামপ্রান্তে। এবার গ্রামে ঢুকব, বাড়ি যাব, সকলকে বলব সাক্ষী আনার কথা, কিন্তু সাক্ষীকে নিজে একবার স্বচক্ষে দেখব না ? আমার কেমন সাক্ষী একবার সনাক্ত করব না ? এই ভেবে যুবক তাকাল পিছন ফিরে। আর নূপুরধ্বনি নেই। গোপালও থেমে পড়েছে।

যুবক কাঁদতে লাগল।

গোপাল বললে, 'আমি আর অগ্রসর হব না। তুমি বাড়ি যাও, সকলকে ডেকে নিয়ে এস। আমি এখানে দাঁড়িয়েই সাক্ষ্য দেব।'

গ্রামে টি-টি পড়ে গেল। প্রতিমা হেঁটে চলে এসেছে সাক্ষ্য দিতে। হ্যাঁ, সেই মূর্তি। ত্রিভঙ্গবঙ্কিম মুরলীধর। পীতধড়া ও মোহনচূড়ায় সাজানো।

গোপাল সাক্ষ্য দিল। যুবককে কন্যাদান করল বৃদ্ধ। সর্ব আপত্তির মীমাংসা হয়ে গেল।

বিপ্রদ্বয়কে বর দিতে চাইল গোপাল।

'আর কিছু চাইনা আমরা। তুমি শুধু এইখানে থাকো অনন্ত সাক্ষী হয়ে।'

নিত্যানন্দের কাছে গোপালকথা শুনে বিহ্বল হলেন প্রভু। সাক্ষাৎ করতে গেলেন। ভক্তদল তাকিয়ে দেখল, গৌরাঙ্গ আর সাক্ষীগোপাল দুজনেরই একমূর্তি।

'দোঁহে একবর্ণ—দোঁহে প্রকাণ্ড শরীর।
দোঁহে রক্তাম্বর—দোঁহার স্বভাব গম্ভীর॥
মহাতেজোময় দোঁহে কমলনয়ন।
দোঁহার ভাবাবেশমন চন্দ্রবদন॥'

শ্রীচৈতন্যের রূপ কেমন ? তপ্তহেম সমকান্তি, প্রকাণ্ড শরীর। কণ্ঠস্বর নবীন মেঘধ্বানর চেয়েও গম্ভীর। দৈর্ঘ্যে নিজের হাতের মাপে চার হাত। দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ালে বিস্তারেও সেই চার হাত। বাহু আজানুলম্বিত, অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত ঝুলিয়ে রাখলে হাতের আঙুলের অগ্রভাগ হাঁটুকে স্পর্শ করে। নয়ন কমলসদৃশ, তিলফুলের চেয়েও সুন্দর নাক, মুখ চন্দ্রের চেয়েও মনোহর।

দেখা গেল সাক্ষীগোপাল সেই চৈতন্যমূর্তি গ্রহণ করেছে। [ক্রমশঃ]

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ,

এফ, সি, এস (লণ্ডন). এম, সি, এস (আমেরিকা), আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

[সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা]

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-জগতে সাধনা ঔষধালয়ের (ঢাকা) নাম দীর্ঘদিন ধরেই অগ্রভাগে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে নামটি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, সোজা কথায় যিনি সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতাই নয়, প্রাণস্বরূপ, তিনি হলেন অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ। এই মানুষটির উদ্যম ও অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য ও কর্ম্মদক্ষতা একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যেমনটি সত্যি সহজে চোখে পড়ে না।

একথা ঠিক, বালক বয়সে, এমন কি, যৌবনের প্রথম পাদেও আয়ুর্বেদের ওপর যোগেশচন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়নি। আবার সঙ্গে সঙ্গে এ-ও ঠিক, কলেজ-জীবনে রসায়নশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়ার নেশাটি ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রবল। রসায়নাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে থেকে মনের মতো শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন তিনি, এ কম গর্ব্ব করার নয়। প্রফুল্লচন্দ্রই যোগেশচন্দ্রকে আয়ুর্বেদ-বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত হবার জন্যে উৎসাহ জুগিয়েছেন সেদিনে প্রচুর। তিনিই জোর দিয়ে বলেছেন—এ ক্ষেত্রটিতে কাজ করায় দুর্গত মানুষের সেবা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

মহামনীষীর আশীর্ব্বাণী মাথায় রেখে যোগেশচন্দ্র ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেন। ইত্যবসরে ১৯০৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম-এ ডিগ্রী পেয়ে নিয়েছেন—পর বৎসরই ভাগলপুর কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকপদে তাঁকে অধিষ্ঠিত দেখা গেলো। আচার্য্যদেবের নিকট থেকে যে উপদেশ তিনি পেয়েছেন, এর ভেতর তিনি তা ভুলে গেলেন না। পরন্তু, ভাগলপুরে ক্রমাগত চার বছর আয়ুর্বেদ শাস্ত্রটি তিনি গভীর মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন। নতুন দৃষ্টি—নতুন পথ খুলে গেল যেন তাঁর সম্মুখে, ভাগলপুর ছেড়ে তিনি চলে এলেন ঢাকায়।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রী হয়ে ডাঃ যোগেশচন্দ্র সৃষ্টিমূলক ও জনকল্যাণকর একটা কিছু উদ্যমে ব্রতী হবার জন্যে অতিমাত্র ব্যস্ত হয়ে ওঠেন এবারে। পরিকল্পনা ঠিক করে নিয়ে ১৯১২ সালে ঢাকার বুকেই তিনি একটি ছোটখাট আয়ুর্বেদীয় গবেষণাগার চালাতে সুরু করে দেন। তাঁর সক্রিয় তত্ত্বাবধানে বহু রকমের মূল্যবান ওষুধ তৈরী হয়ে চললো এই সংস্থায়। অসংখ্য রোগী চমৎকার ফল পেতে থাকে এই ওষুধাদি সেবন করে—এমন দাঁড়ায় ওষুধের বিপুল চাহিদা এই ক্ষুদ্র কাঠামোতে আর মেটানো যায় না। দেখতে দেখতে একটি পূর্ণাঙ্গ কারখানা গড়ে উঠলো—১৯১৭ সাল থেকেই বৈদ্যুতিক শক্তি-চালিত যন্ত্রপাতির সহায়তায় ব্যাপক হারে সেখানে ওষুধপত্র তৈরী হয়ে চলে। আজকের দিনে যে বিশাল সাধনা ঔষধালয়কে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যার শাখা-প্রশাখা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রায় ৪৫ বছর আগে তার সূচনা হয় এমনিভাবেই।

সত্যি বলতে কি, 'সাধনা'র অগ্রগতি ডাঃ যোগেশচন্দ্রের অক্লান্ত শ্রম ও সাধনায় পরম সাফল্যের সাক্ষ্য বহন করছে। ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগ যখন হয়ে গেলো, কিছুদিন মধ্যেই ঢাকা (পাকিস্তান) থেকে সাধনা ঔষধালয়ের ভারতীয় শাখাসমূহে ওষুধপত্র প্রেরণ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এই মহাসঙ্কট অতিক্রমের জন্যে ১৯৪৭ সালে কলকাতায় কাজ সুরু হয় এবং ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের পানিপুকুরে (দমদম) নিজবাড়ীতে একটি দ্বিতীয় কারখানা স্থাপিত হয়। দেখতে দেখতে এখানকার কারখানাটিও ঢাকার কারখানার ন্যায়ই সুবৃহৎ হয়ে ওঠে। পাকিস্তানে এক্ষণে এই আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়ের শাখা-সংস্থা রয়েছে ১১টি। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ কেন, ভারতের সর্বত্রই এর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে। 'সাধনা'র প্রতিটি শাখায় রয়েছে অভিজ্ঞ কবিরাজ বা বৈদ্য, বিনা পারিশ্রমিকে উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র দেওয়াই যাঁদের নিয়মিত কাজ। সকলের উপর দেখতে পাওয়া যাবে ডাঃ ঘোষের সজাগ-দৃষ্টি ও সক্রিয় প্রভাব—প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতির চাবিকাঠি আজও আসলে তাঁরই হাতে বাঁধা।

বললে অত্যুক্তি হবে না নিশ্চয়ই, চিকিৎসা-জগতে (আয়ুর্বেদীয়) 'সাধনা'র ওষুধপত্রের মান ও মূল্য স্বীকৃত হয়েছে বহুদিন। রাষ্ট্রীয়

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ

সহায়তা ও অনুমোদন না জুটলেও এর জয়যাত্রা আটকে রাখতে পারেনি কেউ। মানব-সেবার যে আদর্শটি সাধনা ঔষধালয় সেই থেকে বরণ করে আসছেন, সে মহৎ আদর্শ আজও তার অটুট আছে, এইটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আবারও বলতে হয়, এ সকল কিছুরই মূলে রয়েছে এই অক্লান্ত সাধকের—অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্রের অপূর্ব প্রয়াস ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। তাঁরই কর্ম্ম-জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতায় ঢাকা ও দমদম উভয় স্থলের কারখানাই বেশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। অবশ্য দমদমের কারখানাটি প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করছেন যোগেশচন্দ্রেরই সুযোগ্য সন্তান ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম-বি (ক্যাল), আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে 'সাধনা'কে দৃঢ়ভিত্তিতে দাঁড় করাতে এঁর অবদানও কিছুমাত্র সামান্য নয়। পিতা-পুত্রের মিলিত প্রচেষ্টা ও সক্রিয় দেখাশুনায় 'সাধনা'র দুইটি কারখানাতে ৮ শতের মতো বিভিন্ন ওষুধ তৈরী হচ্ছে আজকের দিনে। আয়ুর্ব্বেদের পুনরুজ্জীবন ও জনপ্রিয়তা এযাবৎ যে পর্য্যায়ে সম্ভবপর হয়েছে, এর জন্যে 'সাধনা' নিশ্চয়ই অনেকখানি দায়ী।

শুধু আয়ুর্ব্বেদ-বিশেষজ্ঞ কেন, শিক্ষাব্রতী হিসাবেও যোগেশচন্দ্র প্রভূত সুনামের অধিকারী হন। ১৯১৪ সালে ঢাকায় আয়ুর্ব্বেদীয় গবেষণালয় স্থাপনের সাথে সাথে জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনার কাজও চালিয়ে যান তিনি। জগন্নাথ কলেজে তাঁর জীবনের মূল্যবান কয়েক দশকই কেটে যায়, ১৯৪৮ সালে মাত্র এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষকতার জীবন থেকে অবসর নেওয়ার অর্থ কিন্তু তাঁর কর্ম্ম-জীবনের সমাপ্তি নয়। সেই সময় থেকে তিনি আয়ুর্ব্বেদ—যে ক্ষেত্রটি তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়, তাতেই পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। গোড়াতেই বলা হলো আজও 'সাধনা'র সঙ্গে যোগেশচন্দ্রের কর্ম্ম ও চিন্তার অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে। তাঁর আপন হাতে গড়া ও চিন্তা-সম্পদে সমৃদ্ধ কীর্ত্তিস্তম্ভের চেয়েও তিনি বুঝি বড়—তাই সহসা কেউ তাঁকে ভুলতে পারবে না।

শ্রীঅশোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-এ-এস্

(আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কনট্রোলার)

প্রচারের চেয়ে কাজটিকেই ইনি বরাবর সমধিক বড় বলে মনে করেন। একটু আলাপেই বুঝতে পারা গেলো—মানুষটির জীবন-ধর্ম্ম কী, বিশেষ ঝোঁক কোন্ দিকটায়। একদিকে পর্য্যাপ্ত যোগ্যতা, অন্যদিকে গঠনাত্মক কাজ করার জন্যে বিপুল আগ্রহ রয়েছে বলেই মর্য্যাদা পেয়ে এসেছেন ইনি প্রতিক্ষেত্রে। আজও শ্রীঅশোকনাথ (বন্দ্যোপাধ্যায়) সরকারী আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কনট্রোলারের দায়িত্বশীল আসনটিতে যে অধিষ্ঠিত আছেন, তার মূল খুঁজলেও বুঝি দেখতে পাওয়া যাবে ঐ একই জিনিস।

বাংলার একটি অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কৃতী সন্তান এই অশোকনাথ। পূজ্যপাদ পিতা ৺শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সে আমলে মজঃফরপুরের (বিহার) নামকরা ব্যবহারজীবী আর স্বনামধন্যা সাহিত্যিকা অনুরূপা দেবী এঁর পরমারাধ্যা জননী। এই পরিবারটির শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহুদিনকার—হুগলীর উত্তরপাড়ার একটি বনেদি বংশের উত্তরপুরুষ তাঁরা। অশোকনাথ অবশ্য জন্মগ্রহণ করেন বারাণসীতে মাতুলালয়ে (১৯১৭ সালের ডিসেম্বর)। মজঃফরপুরে পিতৃসান্নিধ্যে তাঁর প্রাথমিক পড়াশুনো হয়, আর কলেজের পড়া চলে পাটনায়। কি স্কুল, কি কলেজ সর্ব্বত্র বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন তিনি, এ-ও লক্ষ্য করবার।

অশোকনাথ পাটনা থেকেই পদার্থবিদ্যায় অনার্স সহ বি-এস-সি পাশ করেন ১৯৩৬ সালে। অনার্স বিষয়ে (পদার্থ বিদ্যা) সেবারে তিনিই প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন, এ গৌরবের বৈকি!

শ্রীঅশোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তারপরই চলে আসেন তিনি পাটনা থেকে কলকাতায়—বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজ থেকে ১৯৪০ সালে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন আর সে-ও প্রথম শ্রেণীতে। বলতে কি, ছাত্র-জীবনের প্রতিটি ধাপেই চাতুর্য্য ও দক্ষতার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে এই মানুষটির।

এর পরেই অশোকনাথের বৃহত্তর কর্ম্মজীবনের সূচনা—যে-জীবন চলেছে এখনও অবিরাম ধারায় এবং ক্রমেই বহন করে আনছে অধিকতর গৌরব। প্রথম ধাপে (১৯৪১) তিনি যোগদান করেন সেনাবিভাগে—যোগ্যতাবলে পদমর্য্যাদায় মেজর পর্য্যন্ত হতে পেরেছিলেন তিনি। এলো ঐতিহাসিক ১৯৪৭ সাল—দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আয়োজন সব ততক্ষণে ঠিক। এমনি মুহূর্ত্তে সেনাবিভাগ ছেড়ে অশোকনাথ চলে আসেন ভারতীয় এডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসে। একটির পর একটি নতুন দায়িত্ব ন্যস্ত হতে থাকলো তাঁর ওপর। কিন্তু লক্ষণীয় যে, তিনি যে একজন যোগ্যতম কর্ম্মী, প্রমাণ পেতে বিলম্ব হলো না কোথাও।

আই, এ, এস. হয়ে অশোকনাথ সর্ব্বপ্রথমে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মেদিনীপুরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের। তারপর ক্রমে ডায়মণ্ডহারবারের মহকুমা হাকিম, বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মালদহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি দায়িত্ববহুল পদে তিনি অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫২ সালে ভারত-পাকিস্তান ছাড়পত্র প্রথা যখন চালু হলো, সে সময় ভারত সরকারের হয়ে তিনি যান ঢাকায়। নতুন ব্যবস্থাটি সুশৃঙ্খলভাবে চালু করার দায়িত্বভার তাঁকেই বহন করতে দেখা গেছে সেদিন। বছর দেড়েক পর ঢাকা থেকে আবার তিনি চলে আসেন—এবারে নির্দ্দিষ্ট হলো তাঁর জন্যে হাওড়ার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের আসন। তারপর পুনরায় দেখা গেলো মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্বটি তাঁর হাতে ন্যস্ত হয়েছে।

ইত্যবসরে অশোকনাথের যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য সরকারী মহলে

সুবিদিত হয়ে যায়। রাজ্য সরকার তাঁকে নিয়ে আসেন রাইটার্স বিল্ডিংস-এ এবং অর্থ বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারীর দায়িত্বভার তাঁর হাতে ন্যস্ত করা হয়। ঐ বছরই দুর্গাপুর ষ্টিল প্রোজেক্টের কাজ সুরু হলে দেখা গেলো ভারত সরকার তাঁকে ডেকেছেন—প্রোজেক্টের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের পদ নির্দ্দিষ্ট হলো তাঁর জন্যে। এক নাগারে ৪ বছর এই বৃহৎ ব্যাপার নিয়ে তিনি ব্যাপৃত থাকেন। দুর্গাপুরে আজ যে ইস্পাত কারখানাটি গড়ে উঠেছে, এর নির্ম্মাণকল্পে আগাগোড়া এই মানুষটির সক্রিয় দৃষ্টি ছিল, এ সামান্য ব্যাপার নয়। কারখানার প্রথম ব্লাষ্ট-ফার্ণেস চালু যখন হলো, সেই সময় দুর্গাপুর থেকে বিদায় নিয়ে তিনি যান রাঁচীতে। এবারে (১৯৬০) অশোকনাথের ওপর বুঝি সমধিক গুরুদায়িত্ব পড়লো—তিনি নিযুক্ত হলেন হিন্দুস্থান ষ্টিল-এর সেক্রেটারী। দুর্গাপুর, রুড়কেল্লা, ভিলাই—এই তিনটি নব-প্রতিষ্ঠিত ইস্পাত কারখানার তদারকী তাঁকে তখন করতে হয়। অবশ্য একটি বছর মাত্র এই উচ্চাসনে তিনি অধিষ্ঠিত থাকেন—এর ভেতর তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে বহুদূর। ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকার তাঁকে কলকাতায় আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কন্ট্রোলারের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন—যে আসনটি তিনি অলঙ্কৃত করে আছেন আজও অবধি। অশোকনাথের দেহ ও মনে ক্লান্তির ছাপ নেই, কাজ করার আনন্দে যতই তিনি নিমগ্ন ততই বুঝি সুন্দর!

ডাক্তার শ্রীউমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(কলিকাতা শিশুস্বাস্থ্য-নিকেতনের ডিরেক্টর)

"Child is the father of man"—বলেছেন রোমাণ্টিক কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ। মানবজাতির ভবিষ্যৎ পিতা স্বর্গীয়-শিশুকে লালন পালনের জন্য যেমন তাহার পিতা-মাতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দেখা যায়—তেমনি তাহাকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ রাখার জন্য প্রয়োজনবোধে শিশু-স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ সুচিকিৎসকের প্রয়োজনও আছে। "ইনষ্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ"-এর নব নিযুক্ত ডিরেক্টর ডাক্তার শ্রীউমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত কথায় কথায় জানিতে পারি যে, শিশুকে 'প্রকৃত মানব' হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিশুর মনের কথা ও ব্যথা প্রথমে আয়ত্ত করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়।

ছয় ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে উমেশ চন্দ্র প্রথম সন্তান হিসাবে কুমিল্লায় ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺বৃন্দাবন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কুমিল্লা শহরে ওকালতী করিয়া স্বদেশ-হিতৈষীরূপে গৃহে বহু ছাত্রকে প্রতিপালিত করিতেন ও একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন। দশ বৎসরের উমেশ চন্দ্র পিতাকে চিরকালের জন্য হারানর পর মা শ্রীমতী গিরিবালা দেবী ছয়টি সন্তানসহ গ্রামের বাড়ী ফুলতলীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মানুষ করিতে থাকেন। উমেশ চন্দ্র তখন ৺মহেশ ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত 'ঈশ্বর পাঠশালা'র (পূর্ব্বতন ভিক্টোরিয়া স্কুল) সপ্তম শ্রেণীতে পড়িতেন। ১৯২২-২৩ সালের জাতীয় আন্দোলনের সময় তিনি "ন্যাশান্যাল স্কুল-এ এক বৎসর পড়িয়া পুনরায় নিজ বিদ্যালয় হইতে বিভাগীয় বৃত্তি সহ ১৯২৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হিসাবে আই, এস, সি, পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন ও তথা হইতে সসম্মানে মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট হন।

তিনি ১৯৩৪ সালে কর্ণেল এণ্ডারসন ও পরে পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট 'হাউস সার্জ্জেন' থাকিয়া কিছুদিনের জন্য এ্যানাটমীর ডিমনষ্ট্রেটর ছিলেন। ১৯৩৫ সালে কলিকাতায় প্রথম ও ভারতে দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠিত F.R.C.S. (ENG) Part 1 পরীক্ষায় পাশ করিয়া তিনি নিজ কলেজে সার্জিক্যাল রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছিয়া সেণ্ট বার্থোলোমিউ এবং মিডলসেক্স হাসপাতালদ্বয়ে কাজ করিয়া F.R.C.S (ENG)-এর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর গ্রেট বিটেনের বহু চিকিৎসালয়ে, প্যারিস হাসপাতাল এবং বুডাপেষ্টের (Budapest) সেণ্ট জন চিকিৎসালয়ে তিন মাস UROLOGY ট্রেণিং সমাপ্ত করিয়া তিনি ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

১৯৪০ সালের জুন মাসে ডঃ চক্রবর্ত্তীকে মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়ার ভিজিটিং সার্জ্জেন নিযুক্ত করা হয়—তথায় ১৯৪৩ সালে সিনিয়ার সার্জ্জেন হন—১৯৪৭ সালের মে মাসে জেনারেল সার্জ্জারী বিভাগের শিশু-নিবাসের ভারপ্রাপ্ত হইয়া ১৯৫৭ সালের জুন পর্য্যন্ত সিনিয়র সার্জ্জেন হিসাবে তথায় অবস্থান করেন। উক্ত বৎসরের জুলাই মাসে মেডিক্যাল কলেজ হইতে পদত্যাগ করিয়া তিনি Institute of Child Health-এ যোগদান করেন।

ডাক্তার চক্রবর্ত্তী গত ১৪।১৫ বৎসর কাল শিশু-স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নানা গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। ১৯৫৭ সালের ভিজাগাপট্টমে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত পেডিয়াট্রিক সম্মেলনে এবং নয়াদিল্লীতে আয়োজিত প্রথম নিখিল এশিয়া পেডিয়াট্রিক কংগ্রেসের সার্জ্জিক্যাল বিভাগে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ইহাছাড়া তিনি বি, সি, রায় পলিও-ক্লিনিক হাসপাতালের ডিরেক্টর, মেয়ো হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট, ১৯৫৩ সাল হইতে সিনেটের সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর মেডিসিন কলেজের অধ্যাপক ও এস, এস, কে, এম, হাসপাতালের ভিজিটিং অধ্যাপক রহিয়াছেন।

ডঃ চক্রবর্ত্তী ছাত্রজীবন হইতে সঙ্গীতের অনুরাগী ও এস্রাজ বাজাইতে দক্ষ। তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোকগত রমেশচন্দ্র ভৌমিকের কন্যা সুগায়িকা শ্রীমতী ছবি দেবী।

ধর্ম্মপ্রাণ উমেশচন্দ্র "ঠাকুর সীতারাম ওঙ্কারনাথে"র অনুরক্ত
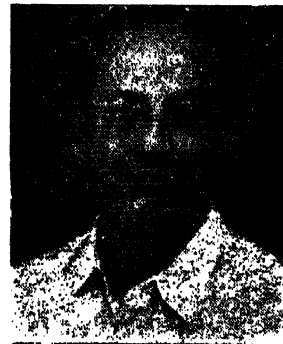
ডাক্তার শ্রীউমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সাক্ষাৎ শিষ্য। দেশ-বিভাগের পর তিনি বাস্তুহারাদের মধ্যে মানবিক আবেদনে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করিতেন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় ডা: চক্রবর্ত্তী নির্য্যাতিত ও গুপ্ত (underground) রাজনৈতিক কর্ম্মীদের চিকিৎসা করিবার সময় জানিতে পারেন যে সম্প্রতি লোকান্তরিত বিমল সিংহ মহাশয় উক্ত কর্ম্মীদের নিয়মিত ও নিঃস্বার্থভাবে প্রচুর আর্থিক সাহায্য করিতেন।

রায়বাহাদুর অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়

[মধ্যপ্রদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী]

রায়বাহাদুর অমৃতবাবুর নাম শোনেননি মধ্য প্রদেশের শিক্ষিত সমাজে বোধ হয় আজ কেউ নেই। ৫০ বছর ধরে মধ্য-প্রদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের এই একটি বাঙ্গালী যে অপূর্ব্ব নিষ্ঠা ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের চিহ্ন রেখে এসেছেন, তা যে-কোন শিক্ষক-সমাজের গৌরবের বস্তু। "আজকাল স্কুলে আর পড়ানো তেমন হয় না"—এই একটি চলতি প্রবাদবাক্যকে অন্তত: রায়বাহাদুর অমৃতলাল তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা মিথ্যা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন এবং যখনই যে বিদ্যালয়ে তিনি গিয়েছেন, দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর দরদভরা শিক্ষকতার গুণে পিছিয়ে থাকা ছাত্ররাও পরীক্ষার কত ভাল ফলই না দেখাতে পারেন। একজন আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তিনি আজ মধ্য-প্রদেশের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। রায়বাহাদুর অমৃতলাল বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানার পলাশডাঙ্গা গ্রামে ১২৯২ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১০ বৎসর যখন তাঁর বয়স, পিতা রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে আসেন এবং সেই থেকেই মধ্যপ্রদেশের তিনি প্রবাসী বাঙ্গালী, জব্বলপুরের রবার্টসন কলেজ থেকেই তিনি বি, এস, সি পাস করেন এবং ১৯১২ সালে স্পেন্‌স্ ট্রেনিং কলেজ থেকে তিনি এল, টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মধ্যপ্রদেশের তিনিই প্রথম এল, টি। শিক্ষালাভের পর বিদ্যানুরাগী অমৃতবাবু শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং বিভিন্ন শিক্ষাসংস্থায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১২ সালেই তাঁকে মডেল হাইস্কুলের বিজ্ঞান-শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তারপর ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত মধ্যপ্রদেশের বেলেঘাটা, গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকতা করেন। একজন দক্ষ, ছাত্রবৎসল ও অক্লান্ত কর্ম্মী শিক্ষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি এই সময় সারা মধ্যপ্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে আহ্বান আসতে থাকে তাঁর কাছে। একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই তিনি তাঁর শিক্ষকতার প্রতিভা আবদ্ধ রাখতে চাননি—এই প্রতিভা যত বেশী ছাত্রের মধ্যে বিকীর্ণ হয়, ততই দেশের মঙ্গল—একথা স্মরণ করেই তিনি একটির পর একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে যান। মডেল হাইস্কুলের পর বেলেঘাটা, বেলেঘাটার পর সাগোর, সাগোরের পর আবার বেলেঘাটা মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক—এইভাবে তাঁর শিক্ষকতা চলতে থাকে। ১৯:২ সাল থেকে সুরু করে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি ঐকান্তিক দরদ দিয়ে হাজার হাজার ছাত্রকে যেভাবে সুশিক্ষিত করিতে সক্ষম হলেন, তাতে তাঁর খ্যাতি সারা মধ্যপ্রদেশে ছড়িয়ে পড়লো। তদানীন্তন ইংরেজ সরকার ১৯৩৮ সালে তাঁকে রায়সাহেব উপাধিতে ভূষিত করলেন, তারপর ১৯৪০ সালে তিনি রায়বাহাদুর সম্মানে ভূষিত হলেন। মধ্যপ্রদেশ সরকারের উচ্চপদে আসীন অসংখ্য কর্ম্মচারী এবং আজকালের সমাজে যাঁরা এখন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন, তাঁদের অনেকেই এক সময় রায়বাহাদুর অমৃতবাবুর পায়ের তলায় বসে শিক্ষালাভ করে গেছেন।

রায়বাহাদুর অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়

১৯২৫ সাল থেকে অবসর গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি মধ্যপ্রদেশ হাইস্কুল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ষ্টাডিজেরও তিনি সদস্য ছিলেন। তাঁর শিক্ষকতায় বোধ হয় সবচেয়ে কৃতিত্ব মধ্যপ্রদেশের যখন যে বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, সেই বিদ্যালয়ই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় সেইবার সবচেয়ে ভাল ফল প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে।

তাঁর ৪টি সন্তানও আজ এক একজন কৃতী বাঙ্গালী। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীধর নাথ বরোদার এম টি টি কলেজের অধ্যক্ষ এবং ডীন অফ দি ফ্যাকাল্টি অফ এডুকেশন। তিনি বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটেরও একজন সদস্য। দ্বিতীয় পুত্র মধ্যপ্রদেশ সরকারের ডিষ্ট্রীক্ট লাইভ ষ্টক অফিসার। তৃতীয় পুত্র অধ্যাপক সুকুমার মুখোপাধ্যায় বোম্বাইএর গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজের বায়োকেমিষ্ট্রীর রিডার। চতুর্থ পুত্র সুনীল কুমার মধ্যপ্রদেশ ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার।

বয়সে বৃদ্ধ হলেও রায়বাহাদুর অমৃতবাবুর দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন দেহ ও পৌরুষের দিকে তাকিয়ে মনেই হয় না যে, তাঁর মনের বা শরীরের ওপর কোন বার্দ্ধক্যের রেখা পড়েছে। এই বাঙ্গালী পরিবারটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শুধু শিক্ষিতই নয়—এদের সকলের লম্বা চওড়া চেহারা। এই দৈহিক গড়নই আর পাঁচজনের মাঝে এঁদের অপূর্ব্ব স্বাতন্ত্র্য রচনা করেছে।

৭৬ বৎসর বয়স্ক রায়বাহাদুর অমৃতবাবুর কর্ম্ম তৎপরতা এখনও স্তিমিত হয় নি; এখনও তিনি আর্ত্তজনগণের সেবা করে চলেছেন। অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি যে চিকিৎসা-বিদ্যা অর্জ্জন করেছেন, তাই দিয়ে তিনি এখন বিনামূল্যে রোগী দেখেন, তাদের চিকিৎসার জন্য বিনামূল্যে ওষুধ দেন, আর অবসর সময়ে বিনামূল্যে লেখাপড়া শিখিয়ে এখনও অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর কল্যাণব্রতে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তাই আজও মধ্যপ্রদেশের বাঙ্গালী অবাঙ্গালী যে কোন সমাজের তিনি নমস্য।

জগদ্ধাত্রী পূজা

কৃষ্ণনগর—চন্দননগর

অরুণকুমার রায়

পশ্চিমবঙ্গে জগদ্ধাত্রী পূজার কথা বলতে গেলে প্রথমেই কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরের কথা উল্লেখ করতে হয়। কলিকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার কোন কোন স্থানে জগদ্ধাত্রী পূজা হয়ে থাকে বটে, তবে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর এবং হুগলী জেলার চন্দননগরের মত এমন স্বতঃস্ফূর্ত সর্বজনীন উৎসব বাংলাদেশের আর অন্য কোথায়ও দেখা যায় না। কৃষ্ণনগর এবং চন্দননগরের এই উৎসব আজ একটি উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক সর্বজনীন উৎসবরূপে পরিগণিত।

বাংলাদেশে কৃষ্ণনগর জগদ্ধাত্রী পূজার আদি পীঠস্থান ব'লে কথিত। তন্ত্রে জগদ্ধাত্রী পূজার কথা উল্লেখ থাকলেও, বাংলাদেশে পূর্বে ব্যাপকভাবে এই পূজার কথা শোনা যায় না। অনেকের মতে কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই পূজার প্রথম প্রচলন করেন। এই সম্পর্কে বলা হয় যে, বকেয়া রাজস্বের দায়ে কোন এক সময় নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে বাংলাদেশের তৎকালীন নবাব আলিবর্দী মুর্শিদাবাদে তলব করেন। রাজকার্য সেরে স্বদেশে ফেরার পথে স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজা করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র মহারাজ গিরিশচন্দ্র কর্তৃক এই পূজা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। সে যাই হোক, তবে কৃষ্ণনগর থেকে ক্রমেই যে এই পূজা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত হয়, এবিষয়ে অনেকেই একমত। সেই হিসাবে বিচার ক'রলে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রাচীনত্ব আড়াই'শ' থেকে তিন'শ' বছরের বেশী হয় না।

চন্দননগরের তুলনায় কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পূজার সংখ্যা অনেক বেশী। কৃষ্ণনগরে ছোট বড় বহু পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণনগরের প্রায় প্রতিটি পল্লীতে জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। এর মধ্যে কতকগুলি যেমন পারিবারিক পূজা আছে, তেমন অনেকগুলি সর্বজনীন পূজাও আছে। রাজবাড়ী, মালোপাড়া, চাষীপাড়া, বালকেশ্বরী, তেই বাজার, প্রভৃতি অঞ্চলের পূজাগুলি প্রাচীন এবং উল্লেখযোগ্য। চাষীপাড়ায় দেবীর পূজার নির্দিষ্ট মন্দির পাকা মণ্ডপ আছে এবং এ বছরের মূর্তিটি বৃহৎ ও ডাকের সাজের গহনায় সজ্জিত করা হ'য়ে ছিল। কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীট তেমাথায় উকিল পাড়ায়, আমিন বাজারে, দত্ত কম্পানীতে এবং পাত্র বাজারে এ বছর বিশেষ আড়ম্বরের সহিত জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সকল পূজাগুলিও কমপক্ষে পঁচিশ-ত্রিশ বছরের প্রাচীন বলে জানলাম। এছাড়া কৃষ্ণনগরে এবছর আট-দশটি নূতন বারোয়ারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় লোকের ধারণা—এ বছরের পূজায় আড়ম্বর এবং জনসমাগম হয়েছে প্রচুর।

কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পূজা মাত্র একদিনের। প্রতি বছর শারদীয়া নবমীর পরবর্তী শুক্লা নবমী তিথিতে দেবীর সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী কল্পাদি পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরের দিন দশমী পূজার শেষে সাড়ম্বরে বিসর্জন উৎসব পালিত হয়। বিজয়ার দিন প্রতিমা বিসর্জন দেখবার জন্য আশে পাশের গ্রাম ও নিকটবর্তী জেলা থেকে বহু লোকজন আসে। এবছরেও বিকালে রাস্তার দু'ধারে বহু নর-নারীর সমাগম হয় এবং মনোমোহন ঘোষ রোড ও হাইষ্ট্রীটের সংযোগ-স্থল থেকে রাস্তার দু'ধারে খাবার, মনিহারী, প্লাস্টিকের খেলনা, বাঁশের বাঁশী প্রভৃতির কতকগুলি দোকান পাট বসে। গভীর রাত্র পর্যন্ত এই বিজয়া উৎসব চলে। জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলি এমন কি অফিস আদালতও বন্ধ থাকে।

কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পূজা দেখতে গিয়ে প্রথমেই যে বস্তুর উপর লক্ষ্য পড়ে তা' হচ্ছে বিভিন্ন পূজামণ্ডপে দেবীর বিভিন্নরূপ মূর্তি। দেবী অবশ্য সর্বস্থানেই চতুর্ভুজা; তবে কোন স্থলে বাহন সিংহের পদতলে হস্তী, কোন স্থলে সিংহের পদতলে ব্যাঘ্র, কোন স্থলে কেবলমাত্রই সিংহ, আবার কোন স্থানে দেবী প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান, এবং তাঁহার দুই ধারে দুইটি সিংহমূর্তি। কোন স্থানে দেবী সিংহের গায়ে হেলান দিয়ে দণ্ডায়মান। আবার ষ্টেশন থেকে আসার পথে একটি পূজামণ্ডপে দেখলাম দেবীর অসুর-বিনাশী মূর্তি।

বিভিন্ন পূজামণ্ডপে ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালাম রাজবাড়ীর গেটে। এখানে একটা কথা অকপটে স্বীকার করছি, আশা করি কেহ ত্রুটি গ্রহণ করবেন না। কেন জানিনা, রাজবাড়ীর জগদ্ধাত্রী পূজা উৎসব সম্পর্কে আমার ধারণাটা ছিল একটু অন্য রকম। উৎসবের সঙ্গে 'রাজবাড়ী' কথাটার যোগ থাকায় জন্যই বোধহয়। কিন্তু সেরকম কিছু দেখতে পেলাম না। সুবিশাল চণ্ডীমণ্ডপের শেষপ্রান্তে একটি ছোট মূর্তি বসানো। সামনে প্রতিষ্ঠিত একটি ঘটের চারপাশে কতকগুলি ফুল-বিল্বপত্র ছড়ানো, আর কাঠের বারকোসে কিছু নৈবেদ্য। পূজার বিরাট প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ, জনশূন্য। মণ্ডপের একধারে একটি ছোট ন্যাংটা শিশু ঘুমচ্ছে আর তারি পাশে বসে দু' তিনটে ছোট ছেলে মেয়ে খেলা করছে। অপরাহ্ণে শীতের রোদ এসে পড়েছে ছেলেমেয়েগুলির গায়ে। নিরলঙ্কারা দেবী, অনাড়ম্বর পূজার আয়োজন। সেকথা যাক, রাজবাড়ীর জগদ্ধাত্রী মূর্তিটির কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম। জগদ্ধাত্রী সিংহবাহিনী নন, শ্বেত অশ্ব বাহিনী। দেবী ঘোড়ার উপর আড়াআড়িভাবে বসেননি, সোজাসুজি ঘোড়সওয়ারের মত বসেছেন। ঘোড়ার মুখ সামনের দিকে। দেবীর চার হাতে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, তীর ও ধনুক। রাজবাড়ীর মূর্তি নির্মাণে এই চিরাচরিত রীতি। স্বপ্নে ঠিক এমনটি দেখেছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। তাই কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী মূর্তির রূপান্তর হ'লেও, রাজবাড়ীর মূর্তির কোন রূপান্তর ঘটেনি। শুনলাম রাজবাড়ীতে নাকি হাতীর দাঁতে নির্মিত দেবী-মূর্তির একটি মডেল রক্ষিত আছে। এই মডেল দেখেই প্রতি বছর রাজবাড়ীর জগদ্ধাত্রী মূর্তি নির্মাণ করা হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ঢাকা থেকে শিল্পী আনিয়ে নির্মাণ করিয়েছিলেন স্বপ্নাদিষ্ট দেবী-মূর্তির মডেল।

কৃষ্ণনগরের মত চন্দননগরেও জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা কিন্তু চারদিন ধরিয়া চলে। অর্থাৎ শারদীয়া উৎসবের পরবর্তী শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিথিতে যথারীতি পূজার্চনা এবং দশমী পূজান্তে দেবী মূর্তির বিসর্জন।

আগেই বলেছি, চন্দননগরের তুলনায় কৃষ্ণনগরের পূজার সংখ্যা বেশী হলেও চন্দননগরের পূজার জাঁকজমক ও আড়ম্বর বরং কৃষ্ণনগরের তুলনায় কিছু বেশী বলেই মনে হয়। বিশেষ করে চন্দননগরে যেরূপ বিশাল দেবীমূর্তি নির্মাণ করা হয়, অতবড় বিশাল মূর্তি আমি কৃষ্ণনগরের কোথায়ও দেখিনি। চন্দননগরের হোগলা দিয়ে তৈরী সুউচ্চ প্যাণ্ডেলে পনর-কুড়ি হাত দীর্ঘ দেবী মূর্তি নির্মিত হয় এবং প্রতিটি জগদ্ধাত্রী মূর্তির গড়নের বৈশিষ্ট্য প্রায় একই। সেই সাবেকী ধরণের কানটানা চোখ, একটু লম্বা ধরণের মুখাকৃতি। চতুর্ভুজা দেবী সর্বত্রই সিংহবাহিনী। এছাড়া চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী মূর্তির একটি বিশেষ আকর্ষণ দেবীর ডাকের সাজের গহনা এবং মূর্তির পিছনেকার বিরাট চালচিত্র; মালাকার শিল্পীদের সোলার অপূর্ব নিখুঁত কাজ। সোলার তৈরী বস্ত্রে, ওড়নায়, অলঙ্কারে, মুকুটে—দেবী মূর্তি এক অপূর্ব সৌন্দর্য্য মণ্ডিত হয়ে উঠে।

এবছরে চন্দননগরের উল্লেখযোগ্য জগদ্ধাত্রী পূজাগুলি যথাক্রমে—দীঘিরধার, পালপাড়া, নাড়ুয়া, গোস্বামীঘাট, বিদ্যালঙ্কার কাপড়েপটি, নীচেপটী, বাজার, লক্ষ্মীগঞ্জ চৌমাথা, বাগবাজার, বাগবাজার দিনুগুড়ীর মোড়, কটকগোড়া, খালিমানী, হালদার পাড়া বেশোহাট, বাবুরবাজার, ভদ্রেশ্বর তেঁতুলতলা, চন্দ্রবাবুর বাজার, তেলেনী পাড়া, লিচুতলা, বারাসত তেমাথা, চারমন্দির তলা, মোরন রোড, মনসাতলা, বারাসত গড়ের ধার হাটখোলা, চাউলপটী ইত্যাদি। চন্দননগরের অধিকাংশ জগদ্ধাত্রী পূজাই বারোয়ারী এবং এর মধ্যে হালদার পাড়া, লিচুতলা, কাপড়ে পটী এবং বাগবাজার দিনুগুড়ীর মোড়ের উৎসবগুলি প্রাচীন। লিচুতলা এবং দিনুগুড়ী মোড়ের উৎসবটি যথাক্রমে ১৫০ এবং ১১৭ বছরের প্রাচীন বলে দাবী করা হয়।

পূজার তিন দিন প্রতিটি পূজামণ্ডপে হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভীড় হয়। এই সকল যাত্রী প্রধানতঃ হুগলী জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, হাওড়া এবং কলিকাতা থেকে এসে থাকেন। এ বছর নবমীর দিন এই ভীড় প্রচুর দেখা যায়। এই দিন প্রতিটি পূজা-মণ্ডপে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বহু নর-নারীর সমাগম হয়। এই উপলক্ষে রাস্তার আশে পাশে কিছু কিছু দোকান পাট বসে। চাউল-পটীর পাকা মণ্ডপের পাশে একটি ছোটখাটো মেলার মত বসে। দশমীর দিন গঙ্গার পাড়ে এবং শহরের প্রধান রাস্তাগুলির দুই পাশে, গৃহের ছাদ ও অলিন্দে বিসর্জন-উৎসব প্রত্যক্ষ করবার জন্য বহু সহস্র নর-নারীর সমাগম হয়। বিজয়া উৎসবের দিন চন্দননগরের বাদ্যভাণ্ড এবং হাজার লোকের হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে লরী চেপে গঙ্গার ঘাটের দিকে এগিয়ে চলে এক একটি প্রতিষ্ঠানের বিশাল বিশাল দেবী মূর্তি। কোন কোন প্রতিষ্ঠান আবার এরই মধ্যে প্রদর্শনী বার করেন লরীর উপর সাজান নানারকম মডেল। এ বছর চাউলপটী প্রদর্শনী বার করেছিলেন পার্থসারথি, শিবাজী, অকালবোধন এবং অন্নপূর্ণা মূর্তির এবং লক্ষ্মীগঞ্জ চৌমাথা বার করেছিলেন বেলুড়মঠ, কালীপূজারত রামকৃষ্ণদেব এবং বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি। এই শোভাযাত্রা বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ করার মত।

তুমি মোরে দেবে

আইভি রাহা

প্রত্যাশায় দিন গুণি, তুমি মোরে দেবে—
গেল দিন, এই কথা ভেবে—শুধু ভেবে।
অভিশাপ! অবসন্ন মন,
আদিগন্ত আবরিত ক্ষণ;
রয় দীর্ঘ বেদনার ভার,
ব্যর্থ মোর সব অভিসার!
অনাহুত অনুরাগ যন্ত্রণা গভীর
আস নাই, দেখ নাই সে ব্যথা নিবিড়!
তুমি যেন প্রখর কঠিন
অবসন্ন, উদ্বেগবিহীন।
স্বপ্ন সাধ অভিলাষ মোর
শোণিতে নিহিত তৃষ্ণা ঘোর;
দুরাশা এ জানি; কিছু—কিছু মোর রবে,
তবু ভাবি তুমি দেবে—তুমি মোরে দেবে।

একটি প্রেমের গান

(রাইনের মারিয়া রিলকে)

কেমন ক'রে হৃদয় আমার বাঁধবো, বলো,
যে বাজবে না তোমাতে? একে কেমন ক'রে
তোমাকে পেরিয়ে অন্য কারো দিকে নেবো?
ভালো হ'তো, যদি অন্য কোথাও রাখতে পারতেম;
তোমার গভীরে আমার স্পন্দন যেমন ক'রে কাঁপে,
তাই'লে হয়তো অন্ধকারে হারিয়ে গিয়ে সে
কোনো অদেখা শান্ত দেশে কেঁপে উঠতোনা, থাকতো
স্থির, অবিচল ও নিষ্কম্প।
তবু যা-কিছু আমাদের ছুঁয়ে থাকে, তাই তোমাকে আর আমাকে
কাছে টেনে আনে: দুটো তারের উপর যেন
একই ছড়ের তান ফুটিয়ে তোলে সুর।
কোন বাজনায় তায় আমরা? আর কোন গুণীর গুণে ধন্য?
হায়, কী মধুর গান, ওই ত্যাখো, ছড়িয়ে পড়লো।

অনুবাদ: ভবানীপ্রসাদ ঘোষ

কিম্ভূত

—সুব্রত পত্রনবীশ

সরকারী দপ্তর (গ্যাংটক)

—গোবিন্দনারায়ণ কণ্ডু

লক্ষ্ণৌ পশুশালায়

—তপতী বন্দ্যোপাধ্যায়

—অজিত দাস

—দীপ্তিকণা পাল

॥ শিশু-মহল ॥

—হরিপদ সরকার

—সুকুমার দাস

রোমাঞ্চ

—দিলীপ সরকার

এ্যালিফ্যাণ্ট ফলস্ (শিলং)

—ডি, সোনা

বাঁশুরিয়া

—সত্যরঞ্জন ঘোষ

মধুকৈটভ —সুব্রত পত্রনবীশ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অবিনাশ সাহা

৮

চরধল্লার চরে গেছুর সংসার বেশ জমে উঠেছে। রহিমার হাতের লাউমাচা আর পুঁইমাচাও উঠেছে ফনফনিয়ে। বাড়ি ঘর দোরের শ্রী এসেছে। উঠোন, মেঝে, রোয়াক তকতক ঝকঝক করছে। গেছুর নিজেরও একটু একটু করে হাল পালটাচ্ছে। রহিমার চেষ্টায় গাঁজার খরচ এখন এক রকম বন্ধ। সময় সময় নেশার ঝোঁক প্রবল হলেও তাল সামলাতে পারে ও। রহিমার পরামর্শ মতো অন্যের ওপর জোর জুলুমও তেমন করছে না। সাধ্য মতো গতরে খেটেই পয়সা উপায় করছে। অন্য কিছু না জুটলে নিজেই গঞ্জের বাজারে এটা-সেটা নিয়ে বসে যায়। পুঁজি রাখালের দেওয়া পাঁচ টাকা। সংসার যে রহিমা কি ভাবে চালাচ্ছে ও তা টেরই পায় না। আগে নুন ভাত নয়তো সামান্য তরকারি ছাড়া কিছু জুটতো না। এখন প্রায় রোজই মাছ রান্না হচ্ছে। জলজ্যান্ত ধলেশ্বরীর মাছ। রহিমা নিজেই পাড়ন পেতে ধরছে সে মাছ। ছেলেগুলো এই মাছের জন্য সে সময় কি কান্নাই না কেঁদেছে। এখন এক একদিন এতো মাছ ধরা পড়ে যে খাবার লোক নেই। শরীরের হালও সকলের ফিরতে শুরু করেছে। গাছপালাগুলো বড়ো হলে আরো অনেক সুবিধে হবে। কলা ফলতে কদিনই বা আর লাগবে। হাতে পয়সা এলে প্রথম সুযোগেই হাঁস মুরগী কিনবে রহিমা। এগুলো পালতে কোন খরচ নেই। অথচ হাঁস আর মুরগী বেচে সংসারের আয় বাড়বে যথেষ্ট। এক একটা ডিম থেকে কম করেও পাওয়া যাবে এক একটা পয়সা। আবার মুখ পালটাবার জন্য নিজেদেরও মাঝে মধ্যে খাওয়া চলবে। গরুর দাম অবশ্য অনেক। কিন্তু ছাগল একটা সহজেই পয়দা করা সম্ভব। ছাগলের দুধেও পুষ্টি কম নয়। ছোটটা তো দুধের অভাবে দিন দিনই শুকিয়ে যাচ্ছে। ছাগল একটাও দেখেশুনে কিনতে হবেই।...রহিমা স্বপ্ন দেখে আর রাত দিন কাজ করে। এক মুহূর্তও বসে থাকে না। গেছুও না। রহিমা যেন ওকে জাদুই করেছে। যেন প্রজাপতি স্বয়ং ব্রহ্মাই দস্যু রত্নাকরের কানে রাম নাম দিয়েছে। রহিমার মতো গেছুও স্বপ্ন দেখে।

গেছুর ঘর সংসার দেখবার জন্য রাখাল প্রায়ই চরে আসে। কাজের ঠেকায় এক নাগাড়ে দু'পাঁচদিন না আসতে পারলে গেছুকে কাছারিতে ডেকে পাঠায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নেয়। সল্লা দেয় কোথায় কি ভাবে এগুতে হবে। জলে টান ধরবে কার্তিক মাসে। সুতরাং আবাদী জমি দখলের প্রশ্ন আপাতত নেই। এখন এগুতে হবে বসত বাড়ির সীমানা ধরে। রাখাল তাল বুঝে ওকে সেই ফুসমন্ত্রই দেয়।

নবী আর নবীর বংশধররা কালক্রমে উৎসন্নে গেছে। কাশিমপুরের দখলে এসেছে ওর ঘরবাড়ি। রাখল নিজে তার ভাগ্যবিধাতা। আর অন্য দিকে পলান বেপারির সব কিছু গ্রাস করে নিতাই। নিতাইর ছেলে শ্রীশ। এখন আবার নবীন চৌধুরী। নবীন চৌধুরীকে সরাসরি হটাবার ক্ষমতা কাশিমপুরের নেই। রাখাল তাই জাল ফেলে দুমুখো। এক মুখে গেছুকে বসিয়ে কতকটা ও নিশ্চিন্ত। আর এক মুখ নিয়ে সল্লা চলেছে গঞ্জের স্থানীয় জমিদার যশোদা মজুমদারের সঙ্গে। শুধু সল্লা কেন এক রকম রফাই হয়ে গেছে। যে কোন ভাবেই হোক, গঞ্জের পুরো জমিদারী স্বত্ব মজুমদারের হাতে তুলে দেবে ও। কিন্তু বিনিময়ে ওর চাই, চরধল্লার ঐ চর। পলান বেপারির আবাদী জমির সবটুকুই নিষ্কর সর্তে ওকে ছেড়ে দিতে হবে।

যশোদা মজুমদার এ সর্ত খোলাখুলি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ওঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মানবেন্দ্রনাথকে বোঝা যাচ্ছে না। বেটা মহা ফেরেববাজ। কথায় কথায় মানুষ খুন করতেও ওর আটকায় না। পুলিশ ওর সহায়। মনে মনে কি শয়তানী এঁটেছে কে জানে? চরেও নাকি ওকে মাঝে মধ্যে ঘোরা ফেরা করতে দেখা যায়। সঙ্গে নাকি হীরু সর্দারও থাকে। হীরু শক্তিশালী লাঠিয়াল। তবে গেছুর মতো এতটা বেপরোয়া হীরু নয়। হুকুম দিলে গেছু যে কোন লোকের মাথা নির্দ্বিধায় এনে দিতে পারে। কিন্তু হীরুকে দিয়ে তা হবে না। ও লাঠি ঘুরিয়ে বড় জোর বিশ পঞ্চাশ জনের মোড় নেবে তার বেশী নয়। অবশ্য এক্ষেত্রে গেছু হীরুর পরস্পর মিত্র ভাবেই লড়বার কথা। এবং তা যদি লড়ে তা'হলে নবীন চৌধুরীর টাকা ঢালাই সার হয়েছে। দখল আর পাচ্ছে না আইন আদালতের বিচার সুদূর পরাহত। তদ্দিনে চর দশবার ভাঙবে দশবার জাগবে। দখল নিয়ে একবার বসতে পারলে কার সাধ্য হটায়।...

চিন্তায় চিন্তায় খেই হারিয়ে ফেলে রাখাল। জমিদারী স্বত্ব পাবার পরেও যদি মানবেন্দ্র ভোগ-স্বত্বের দিকে হাত বাড়ায় তাহলে ওকে কি দিয়ে রোখা হবে। একা গেছুর পক্ষে কি প্রতিরোধ করা

সম্ভব। অবশ্য জোর জুলুম ছাড়া আইনত মজুমদারদের কিছু করার নেই। আবার জোর জুলুমেরও কিছুটা সুযোগ থাকা দরকার। এক্ষেত্রে নবীর ঘর বাড়ী জমি সব আমাদের দখলে। আমরা সহজেই এখান থেকে পলান বেপারির জমির দিকে বিজয় অভিযান চালাতে পারি। কিন্তু মজুমদারদের সে সুযোগ নেই। আশ পাশের কোথাও কোন জমি ওদের দখলে নেই। এক হতে পারে নবীন চৌধুরীকে বশে এনে ওর হয়ে এগিয়ে আসা। কিন্তু তা কখনও সম্ভব নয়। চৌধুরীদের এখন জোয়ার চলেছে। ওরা কারো অধীনস্থ হতে যাবে না। কিন্তু যদি যায়? রাজনীতিতে তো অসম্ভব বলে কিছু নেই। এমনও হো হতে পারে মাথায় মতলব রেখে পালান বেপারির সম্পূর্ণ জমিই—মানবেন্দ্রকে হস্তান্তর করে দিল নবীন চৌধুরী। সঙ্গে মোটা রকমের ঋণও দিল লাট কিস্তি প্রভৃতি শোধের জন্য। মানবেন্দ্র রসদ আর রসিদ হাতে পেয়ে মার মুখো হয়ে আমাদের সঙ্গে লড়তে লাগলো। লড়ে লড়ে এক সময় হয়তো দুপক্ষই আমরা কাবু হয়ে পড়লাম। আর ঠিক সেই সময়েই নবীনচন্দ্র সুযোগ বুঝে রণক্ষেত্রে এসে হাজির। টাকার জন্য সৃষ্টি করলো অসম্ভব রকমের চাপ। সে চাপ সহ্য করা আমাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। নবীনচন্দ্র যদিও বা কিছুটা শান্ত সরল কিন্তু রাজেন দত্ত তার বিপরীত। প্যাঁচ কষতে ওর জুড়ি নেই।···

কিন্তু মানবেন্দ্র কি এতটা ভুল করবে। ও কি বুঝতে পারবে না, একা ওর পক্ষে সম্ভব নয় নবীনচন্দ্রকে ঘায়েল করা? ভাগ্য লক্ষ্মী এখন চৌধুরীদের করায়ত্ব। লক্ষ্মীর সেই বরমাল্যকে ছিনিয়ে আনতে হলে আমাদের উভয়েরই উচিত মিলিত ভাবে সংগ্রাম করা। তাছাড়া ওদের রুখবার আর কোন পথ নেই।···

আবার এমনও তো হতে পারে, গেহুকে বশ করেই হাত সাফাইয়ের খেলা খেলতে চাচ্ছে মানবেন্দ্র। ঠিক তাই হবে। নয়তো চরে ও ঘোরাঘুরি করবে কেন? আর গেহুকেইবা দলিল দস্তাবেজের জন্য এতটা উতলা দেখা যাচ্ছে কেন? রোজ একবার করে কাছারিতে আসছে আর দানপত্রের জন্য তাগাদা দিচ্ছে। নিশ্চয় এ মানবেন্দ্রর চাল। ও হয়তো ভেবেছে, গেহুকে আমরা বাড়ি আর জমি দানপত্র করে দিলেই কৌশলে ও সে দান নিজে গ্রহণ করবে। এবং সেই সূত্র ধরেই শনৈ শনৈ এগুবে। কিন্তু সেটি হচ্ছে না চাঁদ সন্ধি অনুযায়ী যদি কাজ করো ভাল, নয়তো কার অদৃষ্টে কি আছে তা অন্তর্যামীই জানেন।···

তামাক টানতে টানতে ইতস্তত ভাবছিল রাখাল সহসা পাশে এসে রাজেন দত্ত দাঁড়ায়।. চুপি চুপি চোরের মতো।

রাখাল আঁতকে ওঠে।

রাজেন সহাস্য প্রশ্ন করে, কি গো গোস্বামী মশায়, বলি তামাক টানছিলে না মালা জপছিলে?

অভাবিত ব্যাপার। রাখাল এ প্রশ্নের সহসা কোন উত্তর খুঁজে পায় না। মনে মনেই ভাবে, এও কি সম্ভব! নবদ্বীপের বিজয়ের পরেও কি ওর এখানে কোন প্রয়োজন থাকতে পারে?

রাখালকে বিব্রত দেখে রাজেনই আবার মুখ খোলে, তুমি কেমন তর ভদ্রলোক হে গোসাঁই দোরে অতিথি অথচ কোন সমাদর নেই!

বসো দত্ত। তারপর, কি মনে করে?—শুষ্ক কণ্ঠেই অভ্যর্থনা জানায় রাখাল। ঠোঁটের কোণে কিঞ্চিৎ হাসি টানতেও চেষ্টা করে।

রাজেনও হেসে হেসেই উত্তর দেয়, না, এমন কিছু মনে করে নয়। জানই তো নবদ্বীপ গিয়েছিলাম। সেখান থেকে কিছুটা মহাপ্রভুর চরণ-রজ এনেছি। তুমি বন্ধুজন—তাতে আবার পরম বৈষ্ণব। তাই ভাবলাম, তীর্থ ফলের কিছুটা অংশ তোমাকে দেওয়া উচিত।

শুধু মহাপ্রভুর চরণরজ দিতেই এসেছ দত্ত। রাখালের কণ্ঠে শ্লেষের আভাস।

সমতা রেখে রাজেন বলে, নয়তো কি? তোমার মতো ভক্তজনকে হতভাগ্য রাজেন দত্ত আর কি দিতে পারে?

নবদ্বীপে গিয়ে তুমি দেখছি বৈষ্ণব চূড়ামণি বনে গেছো হে রাজেন। তোমার মতো বন্ধু লাভ সত্যি সৌভাগ্যের কথা।

ঠাট্টা করছো করো। কিন্তু সত্যি বলছি, আজ আমি তোমার অকপট বন্ধু হয়েই এখানে এসেছি।

বলো কি! বসো বসো তামাক খাও, অট্টহাসি হাসতে থাকে রাখাল।

ঠাট্টা করো না গোঁসাই। তোমার সঙ্গে জরুরি কাজের কথা আছে।

জানি, কি তোমার জরুরি কথা।

কি জানো শুনি?

চৌধুরিদের গোলামি করতে বলবে এই তো।

তুমি যাকে গোলামি বলছো আমি তাকে পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি। শোন গোসাঁই, সংসারে অহেতুক ভাবালুতার কোন দাম নেই। ভেবে দেখো, তোমার আমার মতো লোকের চাকরি ছাড়া আর কি পথ আছে।

তুমি দেখছি স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করে বসে আছ হে।

হ্যাঁ, তাই আছি। চাকরি যদি তুমি একান্তই করতে না চাও তাহলে অন্য ব্যবস্থাও করা যায়। শোন, মোটা কিছু প্রণামীর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। নায়েবগিরি তো অনেক দিনই করলে এবার বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করো।

বটে! আমি বৃন্দাবনে যাই আর তোমরা জেঁকে বসো।

সে তুমি না গেলেও আমাদের আটকাবে না।

তবে আমাকে তোষামোদ করতে এসেছ কেন?

এসেছি তোমার ভালর জন্যেই। মশা মেরে হাত কালো করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

রাজেন, গর্জে ওঠে রাখাল।

কি, গলা ধাক্কা দেবে এই তো? কিন্তু শোন গোসাঁই, ফুটো নৌকো নিয়ে কখনো সাগর পাড়ি দেওয়া যায় না। তোমার আর তোমার রমেন্দ্রনারায়ণ বাবুর ডোবা ছাড়া ভাসার কোন উপায় নেই। চৌধুরী মশায় একটু ধর্মভীরু লোক। তবু তোমাকে উনি আদৌ পরোয়া করেন না। তবে তোমার কাঁধের ঐ সুতো ক'গাছাকে আজো কিছুটা সমীহ করেন। শুধু ঐ সুতো ক'গাছার জন্যেই তোমাকে উনি নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজী ছিলেন। কিন্তু আমি দেখছি, লোকে যে বলে শুয়রের কপালে সিঁদুর লাগে না, তোমার হয়েছে তাই।

মুখ সামলে কথা বলো দত্ত।

তুমিও মাথা সামলে চলো গোসাঁই।

কি বললি হারামজাদা—। হরে—এই হরে—

আর চেঁচিয়ো না। সামান্য চাকরের মাইনে দিতে পারো না তার আবার 'হরে—এই হরে'। পারতো নিজেই নিজের মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করো।

বেরো—বেরো তুই কাছারি থেকে, হরির বিলম্ব দেখে রাখাল নিজেই চেঁচিয়ে যায়।

রাজেন বলে, তা যাচ্ছি। তবে যাবার আগে বলে যাচ্ছি, দিন কয়েকের মধ্যেই আবার আমাদের দেখা হবে। কিন্তু সেদিন যেন ঐ সুতো ক'গাছা দেখিয়ে কান্নাকাটি করো না। সেদিন আর বাঁচাতে পারবো না, বলতে বলতে দ্রুত বেরিয়ে যায় রাজেন।

রাখাল থর থর করে কাঁপতে থাকে। হয়তো রাগে আর নয়তো ভয়ে।

৯

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কাছারি থেকে উঠে দোতলার অলিন্দে এসে বসেন যশোদা মজুমদার। একাকী একটা ডেক-চেয়ারে। ভৃত্য হলধর গড়গড়া নিয়ে হাজির হয়। মজুমদার হাত বাড়িয়ে নলটা টেনে নেন। মৃদু মৃদু টানতে থাকেন। হলধর শুরু করে পা টিপতে। খুব চিন্তাক্লিষ্ট দেখায় মজুমদারকে। রাখালের ভাবনাই মগজে পাক খায়। মজুমদার ভাবেন, রাখাল পাকা খেলোয়াড়। চৌধুরীদের সঙ্গে মজুমদারদের লাগিয়ে দিয়ে নিজের কোলে ঝোল টানাই ওর উদ্দেশ্য। লড়াইয়ে উভয় পক্ষ কাবু হলে একা ও গঞ্জে অপ্রতিহত শক্তিতে জেঁকে বসবে। কাশিমপুরের উন্নতি এখন আর ওর কাম্য নয়। ও চাচ্ছে ওর নিজের পথ পরিষ্কার করতে। রমেন্দ্রনারায়ণ তো শিখণ্ডী ছাড়া আর কেউ নন। দিনও ওঁর ফুরিয়ে এসেছে। শুধু চোখ বোজার অপেক্ষা।

জাল বেশ ভালই ফেলেছে রাখাল; কিন্তু ও তো জানে না, আগুন নিয়ে খেলা করছে ও।···ভাবতে ভাবতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যশোদা মজুমদার। মুখ থেকে নলটা বার করে হলধরকে নির্দেশ দেন মানবেন্দ্রকে ডেকে দিতে।

হুকুম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হলধর পা টেপা বন্ধ রেখে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। মানবেন্দ্রনাথ নিজের ঘরেই ছিল। খাটের ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে একটা গোয়েন্দা কাহিনী পড়ছিল। হলধরের মুখে বার্তা পেয়ে বই বন্ধ করে বার বাড়ির অলিন্দে চলে আসে। চোখ মুখ আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

যশোদা মজুমদার গড়গড়া টানছিলেন আর ভাবছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ পাশে দাঁড়িয়ে বিনয়ের সঙ্গে শুধোয়, আমাকে ডেকেছেন কাকাবাবু?

সহসা আঁৎকে ওঠেন যশোদা মজুমদার। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেন, হ্যাঁ বসো। তোমার সঙ্গে জরুরী পরামর্শ আছে। হলধর, কলকেটা পালটে দে।

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে হলধর গড়গড়ার মাথা থেকে কলকেটা উঠিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

মানবেন্দ্র মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসে।

মজুমদার আরম্ভ করেন, শুনেছ বোধ হয়, রাখাল আজ সকালেও আর একবার এসেছিল।

হেসে মানবেন্দ্র উত্তর দেয়, আসতেই হবে। গরজ বড়ো বালাই।

কিন্তু ওর প্রস্তাব সম্বন্ধে তুমি কি ভাবলে?

গোসাঁই ঝানু মতলব বাজ। আমার মনে হয়, এক ঢিলে তিন পাখী মারবার ফন্দী এঁটেছে ও।

কি রকম?

এক নম্বর, ও রমেন্দ্রনারায়ণকে মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে গঞ্জের সম্পূর্ণ জমিদারী আমাদের নামে হস্তান্তরিত করতে চায়। উদ্দেশ্য, কৌশলে রমেন্দ্রনারায়ণের আওতা থেকে বেরিয়ে আসা।

দুই নম্বর, আমাদের সাহায্যে নবীন চৌধুরীকে ঘায়েল করা। সেও নিজের আখের গুছাতেই।

তিন নম্বর, গেছু সেখকে রেখেছে আমাদের দিকে তাক করে।

কি বলছো তুমি মানু! মজুমদার সোজা হয়ে বসেন।

আমি যথার্থই বলছি কাকাবাবু। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। গোসাঁইকে আমি বুঝিয়ে দেবো, ফানুসের আয়ু বায়ুস্তরের মধ্যেই সীমিত। তার বেশী বাড়লে—

কথা শেষ করতে পারে না মানবেন্দ্র, মজুমদার গর্জে ওঠেন, হ্যাঁ, শালাকে আজ রাত্রেই জ্যান্ত পুঁতে ফেলো।

দরকার হলে নিশ্চয় তা করতে হবে। তবে আপাতত তার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

বেশ, তুমি যা ভাল মনে করো—করো। কিন্তু গেছু সেখকে যেন তুচ্ছ মনে করো না। শালা, জ্যান্ত কালকেউটের বাচ্চা। ফাঁক পেলেই ছোবল মারবে।

ভাল বাঁশি বাজাতে পারলে কাল কেউটেকেও বশে আনা সম্ভব কাকাবাবু।

মানবেন্দ্রর ওষ্ঠে হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

যথার্থ বলেছ তুমি।

হ্যাঁ, আমি জানি, গেছু শক্তিধর। ওর অধীনে শ'খানেক ভাল লাঠিয়াল আছে। ওরা কেউ কেউ আবার বল্লম ছুঁড়তেও ওস্তাদ। সুতরাং বধ না করে কৌশলে ওকে আমাদের মধ্যে টানতে পারলে আশাতীত শক্তি বৃদ্ধি হবে আমাদের।

কিন্তু—

এতে কোন কিন্তু নেই। বাঘকে জ্যান্ত খোঁয়াড়ে পুরতে পারলে ভাল সার্কাস দেখানো যায়। অন্যথায় বুলেট তো আছেই।

অতো বড় একটা দলের বিরুদ্ধে বুলেট চালানো কি সম্ভব?

বুলেট আমরা চালাবো কেন? প্রয়োজন হলে শান্তি রক্ষক পুলিশই তা চালাবে।

পুলিশ চালাবে!

যাতে চালায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কি জানি বাবা, আমি সব ভাল বুঝতে পারছিনে। যা করার তুমিই করো। কথা শেষ করে কিছুটা হাল্কা বোধ করেন যশোদা মজুমদার।

একটু পরেই দেয়াল ঘড়ীতে ঢং ঢং করে ন'টা বাজে।

মজুমদারকে খুব বিচলিত মনে হয়।

মানবেন্দ্রনাথের ওষ্ঠে ফুটে ওঠে কিঞ্চিৎ চাপা হাসি। বিনয়ের সঙ্গেই আবার শুধোয়, আমি তা হলে এখন আসি কাকাবাবু?

হ্যাঁ এসো। কিন্তু খুব হুঁসিয়ার হয়ে—

আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্বাস করুন, মুখ টিপে হাসতে হাসতেই বেরিয়ে যায় মানবেন্দ্রনাথ।

মজুমদার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে উঠে হন্তদন্ত হয়ে হাঁক ডাক শুরু করেন, কইরে, কোথায় গেলি—ও হলধর !

হলধর গড়গড়া নিয়ে যথারীতি তৈরীই ছিল। এতক্ষণ প্রবেশ করেনি শুধু দু'জনকে গোপনে সল্লা করতে দেখে। তাই আর দেরী করে না। কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করে।

মজুমদার খেঁকিয়ে ওঠেন. তামাক তোর কাছে কে চাইলো? বুড়ো হয়ে মরতে চললি ঘটে যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে।

ধমক খেয়ে গড়গড়া এক পাশে নামিয়ে রেখে আবার অন্তঃপুরে ছুট দেয় হলধর। এক লহমায়ই আবার ফিরে আসে একপ্রস্ত কোঁচানো ধুতি, চাদর আর পাঞ্জাবি নিয়ে। তাড়াতাড়ি চাবি দিয়ে পাশের ঘর খুলে দেয়। মজুমদারের নিজস্ব প্রসাধন কক্ষ। আলো জ্বেলে দেয় ফতুয়ার পকেট থেকে দেশলাই বার করে।

মজুমদার বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁচা পাকা চুলের ওপর চিরুণী বুলিয়ে নেন। তারপর পড়েন পোশাকী জামা কাপড়। সর্বশেষ কানে গোঁজেন আতর-তুলো। মনোহারী গোলাপী গন্ধ চারদিকে ভুর ভুর করতে থাকে।

দোরের সামনে হলধর ফুল তোলা ভার্নিস জুতো, রূপো বাঁধানো ছড়ি ও গুপ্তি-লণ্ঠন নিয়ে প্রস্তুত।

প্রসাধন শেষ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন যশোদা মজুমদার। হলধরের হাত থেকে বাঁ হাতে লণ্ঠন ও ডান হাতে ছড়িটি নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন। যেন স্বয়ং ব্রজরাজই চললেন শ্রীমতীর লীলাকুঞ্জে।

রোজ রাত্রে নির্দিষ্ট সময়ে রওনা হন মজুমদার। ফেরেন পরদিন সকালে। দশ বছর এ যাতায়াত চলেছে। কোথায় যান এবং কোথা থেকে ফেরেন বাড়ির সকলেই তা জানে। কিন্তু ইদানীং আর তা নিয়ে কারো কোন প্রশ্ন নেই। বাড়ির বাইরের কেউও কোন রকম মন্তব্য করতে সাহস পায় না। সাহস পায় না এ জন্ত যে কারো কাঁধে একটির বেশী দুটি মাথা নেই। কিছু বলেছ কি গর্দান যাবে। থানা পুলিশ সব মজুমদারদের হাতে।

মন্তব্য অন্য কেউ না করলেও এক সময় একজন করতেন। শুধু মন্তব্যই করতেন না—রীতিমতো প্রতিবাদ করতেন। মান অভিমানও বাদ যেত না। এমন কি আত্মঘাতিনী হবার ভয়ও দেখিয়েছেন। কিন্তু ফল কিছু হয়নি। প্রতিবাদের প্রতিষেধক মজুমদারের ভালই জানা। গিন্নী আছো পরম নিশ্চিন্তে ঘর গৃহস্থালী করো—পুরুষের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না। আসলে মুস্কিল আছে। ঘোড়ার পিঠের চাবুক ছেলের জননীর পিঠে পড়তেও কোন বাধা নেই এবং দু' পাঁচ বার তা পড়েছেও। সুতরাং বাইরের পাঁচজনের মতো মজুমদার গিন্নীও ইদানীং মূক হয়ে আছেন। নাতি নাতনী নিয়ে এক রকম সুখেই আছেন।

মানবেন্দ্রর সঙ্গে কথায় কথায় আজ অনেকটা দেরী হয়ে গেছে মজুমদারের। হিসেব মতো এতক্ষণে ওদের শুয়ে পড়বার কথা। চাঁপালতা নিশ্চয় গাল ফুলিয়ে আছে। সত্যিই তো, কতক্ষণে বেচারা

খাবে আর কতক্ষণে ঘুমোবে। কিন্তু ওকে তো অনেকদিন বলেছেন, দেরী হলে ও যেন খেয়ে নেয়। সেরেস্তায় কাজ, কখন কি ঝামেলা বাধে তার কি কোন ঠিক ঠিকানা আছে। কিন্তু ও কিছুতেই তা খায় না। কি মুস্কিল যা হোক!···ভাবতে ভাবতে দ্রুত পা চালিয়ে দেয় যশোদা মজুমদার। পুরো আধ ঘণ্টার পথ বিশ মিনিটে পাড়ি দেন। তালপুকুরে পৌছোন কাঁটায় কাঁটায় পৌনে দশটায়।

যা আশংকা করেছিলেন ঠিক তাই ঘটে। একবারের জায়গায় দশবার ডেকেও কোন সাড়া পান না চাঁপালতার। ঘরের খিল বন্ধ। মহা ফাঁপরে পড়েন মজুমদার। আদরের ডাক অনেক করে ডাকেন। লতা—চাঁপালতা—লতু। কিন্তু কিছুতেই রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হয় না। মজুমদারের সঙ্গে ঝি দাসুর মাও অনেক অনুনয় বিনয় করে। কিন্তু না, চাঁপালতা বোধ হয় আজ মনের অর্গল বন্ধ করেই বসে আছে। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে কি চাঁপালতা? মনের দুঃখে বিষ খেলো না তো? মজুমদার আর স্থির থাকতে পারেন না। জমিদারী রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। দোরে পদাঘাত করতেই উদ্যত হন। কিন্তু রাগের বদলে আজ ওঁর হাসিই পায়। সহসা কেন যেন অতীতের স্মৃতি উঁকি দেয়। ওঁর মনে পড়ে সেদিনের সেই নৌকোডুবির কথা।

··· চৈত্রের ধলেশ্বরী—এক গাছি শীতল পাটির মতোই শান্ত। স্রোত নেই, ঢেউ নেই, আবর্ত নেই। চাঁপালতা স্বামীর সঙ্গে চলেছে অষ্টমী-স্নানে—লাঙ্গলবন্ধে। আগে আরো দু'বার গিয়েছে। নৌকো করেই গিয়েছে। বড়ো ভাল লেগেছে ওর নৌ-বিহার। জ্যোৎস্নাসিক্ত বসন্ত যামিনী। ধলেশ্বরীর তীরে তীরে স্বপ্ন-মায়া। ধলেশ্বরী পেরিয়ে শীতলক্ষা তার পর ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্রের জলে এই দিনটিতে ডুব দিলে নাকি জীবনের সকল কলুষ দূর হয়। কিন্তু চাঁপালতার জীবনে তো কোন কলুষ নেই। তাই পুণ্যস্নান অপেক্ষা স্বচ্ছন্দ নৌ-বিহারই ওর কাম্য। প্রিয়জনের সঙ্গে ও সেই নৌ-বিহারেই চলেছে।

দশ বছর ওদের বিয়ে হয়েছে। তিনটি মানিকও কোলে এসেছে। দুটি মেয়ে একটি ছেলে। বড় মেয়ের বয়েস সাত ছোটর দুই মাঝখানে ছেলে। স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে সুখের সংসার। কোন ঝামেলা নেই। স্বামী মহেন্দ্রকুমার এন্‌ট্রান্স পাশ। কলকাতায় সওদাগরী অফিসে চাকরী করে। বেতন ভাল। সখ সৌখীনতায় আটকায় না। কলকাতাতেই বাসা ভাড়া করে থাকে ওরা। গত আটাশে ফাল্গুন ওদের দশম বার্ষিক বিবাহ উৎসব গেছে। সেই উপলক্ষেই সকলে মিলে স্বগ্রামে এসেছে। ফি বছরই এসে থাকে। গ্রামে ওদের বিয়ে হয়েছিল তাই গ্রামে এসেই এ দিনটিকে উপভোগ করে। গঞ্জ থেকে সাত মাইল দূরে ওদের গ্রাম। নাম ধামরাই। গঞ্জ হয়েই যেতে হয়—বংশীর ওপর দিয়ে।

নৌ-বিহার চাঁপালতার চিরদিনের সখ। নৌকোয় রান্না, নৌকোয় খাওয়া, নৌকোয় ঘুমোনো। জল কেটে কেটে পথ চলতে সত্যি খুব ভাল লাগে ওর। এবারও সেই নৌ-বিহারকে মাথায় রেখে ঘর থেকে বেরিয়েছে। যাত্রা তিরিশে ফাল্গুন। লাঙ্গলবন্ধে পৌঁছবে পয়লা চৈত্র। আর বাড়ি ফিরবে আরও দু'দিন পরে। পাঁচ ছটা দিন কি আনন্দেই না কাটবে ওর।··চাঁপালতা খুশীতে ডগমগ।

খুশী মহেন্দ্রও। চাঁপাকে আজ আবার নিবিড়ভাবে বুকে পাচ্ছে। নদীর অনন্ত জলরাশির সঙ্গে ওদের অনন্ত জীবন-লীলাও যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। চির নতুন—অনন্ত ভাবময়। চাঁপা আজ আর চাঁপা নয়। সম্পূর্ণ ব্যক্ত জীবনের উৎসই চাঁপা।···মহেন্দ্রর চোখেও স্বপ্ন-মায়া।

আকাশে সপ্তমীর বাঁকা চাঁদ। স্বচ্ছ-সুনির্মল। ঝির-ঝির করে বইছে মিষ্টি মলয় হাওয়া। নৌকো চলেছে পাল তুলে। সময় সময় দাঁড়ও টানছে মাঝিরা; মনের আনন্দে গান গাইছে। উদাস প্রাণঢালা সুর। পাকা সোনালী শস্যের সমারোহ ধলেশ্বরীর কূলে কূলে। চাঁপার দু' চোখ জুড়োয়। শহরের বদ্ধ আবহাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠেছিল আজ আবার, বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়।

সারা রাত নৌকো চলবে। ভোর ভোর পৌঁছবে লাঙ্গলবন্ধে—ঠিক স্নানের শুভ মুহূর্তে। কোন রকম ভয় ভাবনা নেই। সারা রাতই দু'জনে জেগে কাটাবে। যেমন করে কাটিয়ে ছিল বাসর ঘরে।

ছেলে মেয়েদের চাঁপা মায়ের কাছে রেখে এসেছে। সুতরাং এদিক থেকেও নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্ত জীবনের সকল রকম বন্ধন থেকে।

রাত দশটার কাছাকাছি নৌকো গাঙের বরাবর এসে পড়ে। আকাশের চাঁদ তিথির শাসনে হারিয়ে গেছে। তারাগুলোরও কেন যেন কোন পাত্তা নেই, বাতাস বন্ধ। থম থম করছে ধলেশ্বরী। চারদিক কালোয় কালো। চাঁপার এরূপও ভাল লাগে। মহেন্দ্র ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে। আঙুল চালিয়ে যাচ্ছে ও ওর চুলে। আদর খাচ্ছে। আমেজে মুদিত দুচোখ মহেন্দ্রর। আবার সময় সময় উন্মিলিতও হচ্ছে। আকাশের চাঁদ কখন হারিয়ে গেছে ও তা জানে না। কিন্তু ওর চাঁদ তো নির্নিমেষ চেয়ে আছে ওর চোখে চোখে রেখে। অভিভূত ও—অভিভূত চাঁপা। বাইরের জগতের কোন খবর ওরা কেউ রাখে না এখন।

আকাশের হাল দেখে হালের মাঝি দাঁড়ের মাঝিকে হাঁক দিয়ে বলে, ওরে জাফর, বাদামডা থুইলা ফ্যাল। আগাশের অবস্থা ভাল না ঝড় উটব !···

ঝড় উটবে!—মাঝির হাঁকে চমকে ওঠে মহেন্দ্র। চাঁপা ভয়ে অতটুকু হয়ে যায়। সর্বনাশ, নৌকো যে মাঝ নদীতে চলেছে। ও মাঝি, নৌকো পাড়ে ভিড়াও—শীগ গির নোঙর ফেলো,—ভয়ার্ত কণ্ঠ মহেন্দ্রর।

উত্তরে হালের মাঝি জয়নুদ্দি বলে, ইহানে নাও বাধন যাইব না কত্তা বৈরাগীর খালে ঢুকবার পারলেই রক্ষা নইলে আর—

কথা শেষ করতে পারে না জয়নুদ্দি দমকা হাওয়া শুরু হয়—ঠাণ্ডা ধুলো বালি মেশানো। দেখতে দেখতে গর্জে ওঠে ধলেশ্বরী। সোঁ সোঁ সাঁই শব্দ। নাগিনীর মতোই ফণা তুলে ধেয়ে আসছে ঢেউয়ের পর ঢেউ। জয়নুদ্দি শক্ত করে হাল ধরে—প্রাণপণ শক্তিতে যুঝতে থাকে। চেঁচিয়ে বলে, কত্তাবাবু, গিন্নীমাকে শক্ত কইরা চাইপা ধরেন। তুফানের লাগে দেও ছুটছে। আল্লা—মেহেরবান, রক্ষা কর—রক্ষা কর।···

জয়নুদ্দির নির্দেশ মতোই কাজ করে মহেন্দ্র। চাঁপাকে বুকের সঙ্গে লেপটে ধরে। চোখ মেলে চাইতে পারে না চাঁপা। ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে।

ঝড়ের সঙ্গে শুরু হয় প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি। বাতাস চলাচলের জন্য

নৌকোর দুদিকের দরজা রাখা হয়েছে খোলা। নয়তো উল্টে যাবে নৌকো। তাই তীরের মতোই এক একটা ফোঁটা গায়ে এসে বিঁধছে। ছইয়ের ভেতরে থেকেও রক্ষা নেই। মহেন্দ্র নিরুপায়। নিরুপায় হয়েই মনে মনে ইষ্টনাম জপতে থাকে।

শিলাপাত বন্ধ হয়েছে কিন্তু ঝড় আর বৃষ্টির বেগ গিয়েছে আরো বেড়ে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাতও হচ্ছে মাঝে মাঝে। চারদিক জুড়ে নিরন্ধ্র অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যেই জয়দুদ্দি আবার চেঁচায়, কর্তাবাবু, হুঁশিয়ার। সামনেই তেমোনা—খুব হুঁশিয়ার। তেমোনারে পাশ কাটাইবার না পারলে আর রক্ষা নাই—হুঁশিয়ার।···

জয়দুদ্দির মুখের কথা মুখেই থাকে। প্রচণ্ড একটা বাতাসের ধাক্কায় দাঁড়ের মাঝি ছিটকে গিয়ে জলে পড়ে। জয়দুদ্দিও তাল সামলাতে পারে না। হাল সুদ্ধ উড়িয়ে নিয়ে যায়। মাথার ওপরের ছই সাফ। চাঁপাকে প্রাণপণ শক্তিতে বুকের মধ্যে ধরে রাখতে চেষ্টা করে মহেন্দ্র। সাধ্য মতো নিজেও চেষ্টা করে চাঁপা। কিন্তু কে যেন আঁচল ধরে টেনে নিয়ে যায় ওকে জলের মধ্যে।

চাঁপার সঙ্গে মহেন্দ্রও লাফ দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। পা ওর নৌকোর আড়কাঠে আটকে গেছে। চোখের পলকে উল্টে যায় নৌকো।

চাঁপালতার অভিমানে আরো জোরে হাসি পায় যশোদা মজুমদারের, ওর আরো মনে পড়ে, মহাল থেকে নদীপথেই সেদিন ও ফিরছিল—নিজের পান্‌সি। সঙ্গে ছিল দেহরক্ষী বিশু সর্দার, ভৃত্য হলধর আর আটজন জোয়ান মাঝি। ঝড়ের তোড়ে পান্‌সীর অবস্থাও সঙ্গীন। প্রাণ হাতে করে জানালায় দাঁড়িয়েছিল ও। পান্‌সীতে থেকেই শেষ চেষ্টা করবে। না না, পানসীতে থাকাই নিরাপদ। ঝড়ের বেগ এখন কিছুটা প্রশমিত। হয়তো রেহাই পাওয়া যাবে।··· ইষ্টমন্ত্র জপতে জপতে অপেক্ষাই করছিল, সহসা বিদ্যুৎ চমকায়। নজর পড়ে অদূরবর্তী জলের উপর। ওখানে হাবুডুবু খাচ্ছে কি এক বিপন্না নারী। ঢেউয়ের মাথায় একবার জাগছে আবার ডুবছে। হাতের টর্চ টিপে ভাল করে দেখে। দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে বিশুও।

ভাল সাঁতার জানতো চাঁপা। দু'পায়ে শাড়ী জড়িয়ে না গেলে হয়তো নিজের চেষ্টাতেই ও তীরে উঠতে পারতো। কিন্তু অবস্থা এমন বেসামাল ছিল, যে আর কিছুটা দেরী হলে রাক্ষুসী ধলেশ্বরীর গর্ভে চিরদিনের মতোই ও চাপা পড়তো। জল অনেকটাই খেয়েছিল। তবু ওদের দু'জনের মিলিত চেষ্টায় শেষ রক্ষা হয়।

বিবস্ত্র অর্ধ-অচেতন চাঁপাকে ধরাধরি করে পানসীতে তোলা হয়। নরম তুলতুলে একটা রবারের বেলুন যেন। কিন্তু তবু সে-সময় মনে কোন রেখাপাত করে না। ওকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলতেই সকলের দৌড়-ঝাঁপ সুরু হয়।

ভগবানকে ধন্যবাদ। অতি অল্পক্ষণের চেষ্টাতেই সুস্থ হয়ে ওঠে চাঁপা। চোখ মেলে তাকিয়েই আর্তনাদ করে ওঠে, ও—ও কোথায়।···

পানসী তখনো বেশীদূর এগোয়নি। অবাক হয়েই পাল্টা প্রশ্ন করেন, কার কথা বলছেন? আপনার স্বামীর কথা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোথায় গেলেন ন?—উঠে দাঁড়াতে যায় চাঁপা।

বাধা দিয়ে বলেন, উঠবেন না আপনি—শরীর অত্যন্ত দুর্বল। আমরা দেখছি।

ঝড় তখন নেই বললেই হয়। বৃষ্টির ধকলও কমে এসেছে। পানসী আবার ঘোরানো হয়। তিনটে টর্চের আলোতে সাধ্যমতো সন্ধানকার্য চালান। কিন্তু কোথাও কিছু নজরে পড়ে না। ঘণ্টা খানেকের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। চাঁপা বুক চাপড়ে চাপড়ে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

স্মৃতির জাবর কাটতে কাটতে এতক্ষণ পর্যন্ত হাসছিলেন মজুমদার, এবার স্থির হয়ে দাঁড়ান। বোধ হয় বেদনাসিক্ত হৃদয়েই পরেরটুকু ভাবতে থাকেন। অভিসার রজনী বিষাদ-ঘন হয়ে ওঠে। মজুমদারের মনে হয়, চাঁপালতা কি দোরে খিল দিয়ে আজো সেদিনের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে? কাঁদছে কি ওর প্রিয়তম পতির জন্যে? না থাক, আজ আর ওকে বিরক্ত করে কাজ নেই। একটা রাত বই তো নয়।···সদরদে বাড়ির পথেই পা বাড়ান মজুমদার।

দাসুর মা পেছু ডাকে, যাইবেন না বাবু, খাড়ন। মায়রে আমি ডাইকা দিতেছি। ও মা, খিল খোল না বাছা! বাবু না চইলা যায়। হুদাহুদি কি যে তোমার রাগ!···মজুমদারকে অনুরোধ জানিয়ে চাঁপার দরজায় কড়া নাড়তে থাকে দাসুর মা।

কিন্তু খিল চাঁপা খোলে না। ভেতর থেকেই ঝাঁঝ-মেশানো কণ্ঠে উত্তর দেয়, তুই ওঁকে যেতে দে। যেখানে এতক্ষণ ছিলেন সেখানেই। বাকি রাতটুকু কাটান গিয়ে। আমার কোন দরকার নেই।···

দাসুর মাকে আর কোন কিছু বলতে হয় না। মজুমদার স্বকর্ণেই সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনেন। শুনে খুশীর হাসি হাসেন। ভাবেন, চাঁপার তা হলে আমার ওপরেই অভিমান! তা বেশ—বেশ।···

দাসুর মাকে সরিয়ে দিয়ে মজুমদার নিজেই এবার দোর ধরে দাঁড়ান। মৃদু মৃদু কড়া নাড়েন আর অনুনয় জানান, লক্ষ্মী লতু, দোরটা খোল। আর কোনদিন দেরী হবে না। মাথার দিব্যি—খোল শীগগির।

চাঁপার অভিমান এতক্ষণ পরে হয়তো বা কিছুটা প্রশমিত হয়। মুখে কোন উত্তর দেয় না। রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে খাঁ করে দোরটা খুলে দিয়ে আবার বিছানায় লুটিয়ে পড়ে।

মজুমদার কাছে গিয়ে পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে সোহাগ জানান, লক্ষ্মীটি, আমার কিন্তু বড্ডো খিদে পেয়েছে। বলছি তো, আর কোনদিন দেরী হবে না।

চাঁপা এবার চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে। ঠোঁট ফুলিয়েই ঝংকার দেয়, বাবারে বাবা, আমার যেন আর ঘুম বলে কিছু নেই। কি দরকার ছিল আলাতে আসার। এই দাসুর মা, বলি হাত মুখ ধোবার জল দিবি না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সঙ দেখবি।

ঝংকার শুনে দাসুর মা দৌড়ে আসে। কাঁপা গলায় বলে, গাড়ু, গামছা, সাবান সবই ত দিছি মা। বাবুরে কত বার সাদলাম। তা তুমি না কইলে কি আর আমার কতা কেউ কানে তোলে।···

চুপ করো। কে কতো কাজের সবাইকেই আমার জানা আছে, চাঁপা আবার ঝংকার দেয়।

হেসে মজুমদার বলেন, সত্যি ওর কোন দোষ নেই লতু। তুমি পারস করো আমি এক্ষুণি হাত মুখ ধুয়ে আসছি, বলতে বলতে গলার চাদর, হাতের ছড়ি আর গায়ের জামা খুলে স্নানাগারে চলে যান।

আজ রাধাগোবিন্দজীকে পিঠা পরমান্ন ভোগ দিয়েছে চাঁপা। নিজের হাতে সব তৈরী করেছে। শ্বেত পাথরের থালা, গ্লাস, বাটিতে সেই ভোগই পরিবেশন করে। খুশী মনে খেতে বসেন মজুমদার। খেতে খেতে ভাবেন, এতো যত্নে চাঁপা এসব তৈরী করেছে ওর তো রাগ হবার কথাই। কাল ও অনেক করে বলে দিয়েছিল একটু সকাল সকাল আসতে। কিন্তু সকাল তো দূরের কথা আজ আরো দেরী হয়ে গেছে।···ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে যান মজুমদার।

চাঁপা গর্জে ওঠে, কি, মুখে বুঝি রুচছে না?

ছি ছি ছি, কি যে তুমি বলো লতু। রাধাগোবিন্দজী সত্যি আজ পরম তৃপ্তিতে সেবা করেছেন। আচ্ছা, এতো তুমি শিখলে কার কাছে?

চাঁপার গলার সুর এবার পাল্টায়। গদ গদ হয়েই শুধোয়, সত্যি ভাল হয়েছে?

সত্যি—অপূর্ব। তুমিও বসে পড়ো।

চাঁপা তাই বসে। খেয়ে দেয়ে যথা নিয়মে ঘুমিয়েও পড়ে। কিন্তু মজুমদারের চোখে ঘুম নেই। বিছানায় অনেকক্ষণ ছটফট করে উঠে বসেন। টেবিলে রাখা হারিকেনটা উসকিয়ে দেন। স্তিমিত ঘর আলোয় ঝলমল করে ওঠে। চাঁপা অকাতরে ঘুমোচ্ছে কনক চাঁপাই যেন। এতোটা বয়সেও কি অপরূপ রূপ লাবণ্য ওর। দশ বছর ও কাছে আছে। কিন্তু তবু যেন ও অতৃপ্ত বহ্নিবক্তা।

···ভাবাবেগে ঘুমন্ত চাঁপার ললাটে সোহাগ চিহ্ন এঁকে দেন মজুমদার। চাবাবেগেই তাকিয়ে থাকেন ওর অনুপম মুখের দিকে। আকাশের চাঁদই যেন ধরা পড়ে ওর চোখের তারায়। দেখে দেখে অভিভূত হয়ে যান। অভিভূত হয়েই আবার ভাবেন, একদা সাগর মন্থন করে দেবতারা অমৃতকুম্ভ পেয়েছিলেন। তিনিও ধলেশ্বরী মন্থন করে চাঁপাকে পেয়েছেন। অমৃতের কি স্বাদ তা তিনি জানেন না। কিন্তু চাঁপার তনুর তনিমাকে মর্তের সেরা সুধা বলেই জানেন। চাঁপা নয়নের মণি—গলার হার—হৃদয়ের হৃদয়। না না, তিনি তো চাঁপাকে জোর করে আটকে রাখেননি। চাঁপা স্বেচ্ছায় ওঁকে ধরা দিয়েছে। প্রথম দিনের ঘটনা নিতান্ত পুরুষকার ছাড়া আর কিছু নয়।

ধলেশ্বরীর ঝড়ে চাঁপাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন মজুমদার আজ সহসা আবার হৃদয়ের ঝড়ে বুঝিবা ওকে হারান। চাঁপার রূপ দেখতে দেখতে সহসা কেন যেন ভূত দেখার মতো আঁতকে ওঠেন। কেন যেন চাঁপার মুখ সহসা কুহকিনীর মুখ বলে ভ্রম হয়। ছলনাময়ী যেন পলে পলে ওর জীবন সত্তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে।···

তাকিয়ে ছিলেন মজুমদার উঠে গিয়ে হারিকেনটা নিভিয়ে দেন। আস্তে করে খিল খুলে বারবাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়ান। সমস্ত তালপুকুর অঞ্চল নিস্তব্ধ। কৃষ্ণপক্ষের ঘন অন্ধকার চারদিকে খাঁ খাঁ করছে। রাধা গোবিন্দজীর মন্দিরের দরজা বন্ধ। তিন পুরুষের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। পূজারি কৃষ্ণদাস পর্যটনে বার হবেন। ছুটির জন্য আঁকু-পাঁকু করছিলেন। বদলি লোকের অভাবে যেতে পারছিলেন না। এমন সময় চাঁপার আবির্ভাব। ব্রাহ্মণের বিধবা। দেব সেবায় অধিকার নিশ্চয় আছে। স্ত্রীলোক আর বয়েস অল্প বলে বাড়ির অনেকেই আপত্তি করেছিল। কিন্তু সে আপত্তি টেঁকেনি। মন্দির গাত্রেই চাঁপার জন্য নতুন করে ঘর ওঠে। পুত্র কন্যার হাত ধরে ও সেই ঘরে এসে ওঠে। হয়তো জীবিকার তাগিদেই ওঠে। তাই মন দেয় ভগবৎ সেবায়। আবার সেই ভগবৎ সেবা করতে করতেই এক সময় মানুষের সেবায়ও ডুবে যায়। এখন তো ও মজুমদার বাড়ির অন্তঃপুরিকাগণেরই একজন মন্ত্র পড়া না হলেও ঠিক তাই।

সত্যি, এতোটা মনের বল চাঁপা কোত্থেকে পেলো তা চাঁপাই জানে। ও বলেছিল, মন্ত্রতন্ত্রের আর দরকার কি মজুমদার। তোমার মনের কথা তুমি নিজেই ভাল জানো। লোকাচার আমি পছন্দ করিনে। তাছাড়া তোমার মাথাও অকারণ হেঁট হবে।

চাঁপা যা চায় না তিনিও আর তার জন্য পেড়াপীড়ি করেন না। তাঁর চাওয়া তো ওরই জন্যে। ও খুশী হলেই তিনি খুশী। এই তো বেশ—নহ মাতা নহ কন্যা, নহ বধূ। তালপুকুর কুঞ্জবনে চাঁপা তো নন্দনবাসিনী হয়েই আছে। এবং আজীবন তাই থাক না ও···

রাধা গোবিন্দজীর সেবিকা বলে গঞ্জের মানুষ ওকে শ্রদ্ধা করে। যে শ্রদ্ধা করতে না পারে সে অন্তত ভয়। চাঁপার সামাজিক জীবনও অবহেলিত নয়।

না না, চাঁপা কুহকিনী নয়—প্রেমময়ী। চাঁপা আছে বলেই উনি আছেন। চাঁপা প্রেরণা যোগাচ্ছে বলেই উনি শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়তে পারছেন। চাঁপা ওঁর—উনি চাঁপার। মাঝখানের কয়েকটা দিনের ইতিহাস নিয়মের ব্যতিক্রম ছাড়া কিছু নয়।···সহসা অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন মজুমদার আবার চাঙা হয়ে ওঠেন। বারান্দা থেকে ঘরে ফিরে আসেন। নির্ভাবনায় শুয়ে পড়েন চাঁপার পাশে।

সমাপ্ত

শ্রীকিরণেন্দু বাগচী

মাদ্রাজে খবর পৌছান মাত্র সেখানকার ইংরাজ দরবার কলকাতা উদ্ধারে কর্ণেল ক্লাইভ এবং ওয়াটসনকে কলকাতায় পাঠাল। ক্লাইভ এলেন সেনাপতির পদ নিয়ে। সঙ্গে ৯০০ গোরা এবং ১,৫০০ ভারতীয় সৈন্য। জাহাজ ভেসে চলল কলকাতার দিকে।

ক'লকাতা থেকে ফেরার পর একমাস যেতে না যেতেই পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা পিতৃব্যপুত্র সওকত জঙ্গের সঙ্গে সহসা সিরাজকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হ'ল। কলকাতা অবরোধের পরই দিল্লীর সম্রাটের রাজস্ব পাঠাতে সিরাজেরও বিশেষ শৈথিল্য এসে যায়। বাদশাহ খুবই অসন্তুষ্ট হলেন; পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা নিয়মিত রাজস্ব পাঠানোতে বাদশাহ্ তাকে এক সনদ দিয়ে বসলেন, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ওপর প্রভুত্ব করবার জন্যে, বাংলার মন্ত্রিসভা সিরাজকে কোনমতেই সহ্য করতে পারছেন না। সওকত জঙ্গকে এই সুযোগে বাংলার গদীতে বসাবার অভিপ্রায়ে তাঁরা নিজেদের চক্রান্তের পথ আরও যেন খানিকটা প্রশস্ত করে তুলেছেন। সিরাজ হতবাক হ'য়ে লুৎফার কাছে ছুটে যান। ধৈর্যশীলা লুৎফুন্নেসা নবাবকে সান্ত্বনা দেয়।

…"জাঁহাপনা কেন এমন মুহ্যমান হচ্ছেন। ধৈর্য ধরুন। পুরুষের পরিচয় বীরত্বে। ধমনীতে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। পূর্বেই বলেছিলাম মোহনলালই এই বিষোদ্‌গারের প্রধান লক্ষ্য হ'বে। রাজবল্লভের স্বার্থেও আঘাত হেনেছেন আপনি কম নয়। ধৈর্য আপনাকে ধরতেই হবে। হ্যাঁ আর একটা অনুরোধ, গোলাম হোসেনকে সঙ্গে নিতে ভুলবেন না। এখন দেখছি সেই আমাদের একমাত্র সহায়।

পূর্ণিয়া প্রদেশের বীরনগরের ফৌজদার নিযুক্ত করলেন নবাব, রাসবিহারীকে। প্রস্তুত হলেন এবার পূর্ণিয়ার দিকে পা বাড়াবার জন্যে। সওকত জঙ্গকে দ্বিধাহীন চিত্তে এক যুক্তিপূর্ণ পত্রও দিলেন। সওকত দিলেন তার পাল্টা জবাব। "…আমি দিল্লী সম্রাটের সনদে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হ'য়েছি। পরম আত্মীয় তুমি। তোমাকে আমি প্রাণে মারতে চাই না। এখনও সময় আছে। পূর্ববঙ্গের কোন পল্লীতে গিয়ে আত্মগোপন কর। যাতে তোমার কষ্ট না হয়, গ্রাসাচ্ছাদনের সে ব্যবস্থাও আমি করে দেব। কিন্তু সাবধান, রাজভাণ্ডারের এক কপর্দকেও যেন হাত না পড়ে। অযথা কালহরণে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। সৈন্য প্রস্তুত। তোমার পত্রের উত্তরের যেটুকু বিলম্ব।"

সওকত জঙ্গের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্রখানি সিরাজদ্দৌলা নিজ দরবারে উপস্থিত করলেন। সভাসদেরা সুযোগ বুঝে নবাবকে নানা ভাবে অপদস্থ করবার চেষ্টা করলেন। মীরজাফর বললেন, "শুনছি নাকি বেগম সাহেবা প্রধান অমাত্যের কার্যভার গ্রহণ করেছেন? এতবড় সাম্রাজ্য পরিচালনা যদি একজন স্ত্রীলোকের দ্বারাই সম্ভব হয়, তবে আমাদের নিয়ে এমন উপহাস করাটা কি হুজুরের বুদ্ধিকুশলতার পরিচায়ক নয়।"…জাফর আলী খাঁর কথার রেশ টেনে জগৎশেঠ বললেন, "কি বলুন আলীসাহেব, সওকত জঙ্গ যখন বাদশাহী সনদের অধিকারী, আর সিরাজদ্দৌলার যখন সে সব কিছু নিদর্শন পাচ্ছি না তখন কে যে সত্যিকারের নবাব তা তো বোঝাই যাচ্ছে। এখন উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ বিচার করে দেখুন।"

বিপ্লবের মেঘ যে অতি ঘনীভূত, এ ব্যাপারের পর সিরাজ তা প্রত্যক্ষ করলেন। ক্রোধান্ধ সিরাজ জগৎশেঠকে বন্দী করে সভা ভঙ্গ করলেন। পরম আত্মীয়জ্ঞানে মীরজাফরকে প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারলেন না।

কালবিলম্বে সমূহ বিপদের আশঙ্কায় সিরাজদ্দৌলা যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশ করলেন। জগৎশেঠকে বন্দী করায় মীরজাফর খাঁ স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন সিরাজদ্দৌলার পক্ষে তিনি কিছুতেই অস্ত্র ধারণ করবেন না।

কালবৈশাখীর প্রলয়ঙ্কর মূর্তি গভীর কালকূট গায়ে মেখেছে দেখে শেঠজীকে কারামুক্ত করে নবাব মীরজাফর খাঁকে সঙ্গে নিলেন। এমতাবস্থায় সাহস করলেন না সেনাপতি মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদে রেখে যেতে।

মণিহারীতে সিরাজদ্দৌলার সৈন্য এসে ঘাঁটি স্থাপন করল। নবাবের সৈন্য পরিচালনা করছেন মহারাজ মোহনলাল, শেখ দীন মহম্মদ, দোস্ত মহম্মদ খাঁ, মীরজাফর খাঁ আর আজিমাবাদের সুবাদার রাজা রামনারায়ণ।

সওকত জঙ্গের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলেন শেখ জাহা ইয়ার, মীর মোরাদ আলী ও কার গুজার খাঁ বকসী। সওকত জঙ্গের শিবির সন্নিবেশিত হ'ল নবাবগঞ্জের দু'মাইল দূরে।

দ্বিতীয় দিন যুদ্ধের গতিবেগ ভীষণ আকার ধারণ করেছে। সওকত জঙ্গ যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত। সহসা সেনাপতি দোস্ত মহম্মদের বন্দুকের গুলি সওকতের ললাট বিদ্ধ করল। সওকতের রক্তাক্ত দেহ ধরণীর বুকে লুটিয়ে পড়ল। তবুও তার সৈন্যদল লড়ে চলেছে। সিরাজ সৈন্যের সাঁড়াশী অভিযানে অপর পক্ষের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। অসহায় সওকত সৈন্য এইবার পশ্চাদপসরণ করল। পূর্ণিয়া প্রদেশে নবাব সিরাজদ্দৌলার বিজয় কেতন উড়ল। পূর্ণিয়ার পথে আকবর নগরেই শুনতে পেলেন সিরাজ, নবাবের জয়ডঙ্কার মন মাতান উল্লাস। সসম্মানে অভিবাদন জানালেন সিরাজ সওকত জননীকে। নিয়ে এলেন মাতৃসম্মানে মনসুরগঞ্জের হারেমে। জননী আমিনার পাশে।

লুৎফুন্নেসার সেবা ও বুদ্ধিকুশলতায় পুত্রহারা সওকত জননীর ক্রোধাগ্নি কিছুটা প্রশমিত হল

মহারাজ মোহনলাল সওকতের সকল ঐশ্বর্য হস্তগত করে নিজপুত্রকে পূর্ণিয়ার ফৌজদারের পদে অধিষ্ঠিত ক'রে ফিরে এলেন সদলবলে মুর্শিদাবাদে।

সিরাজের পূর্ণিয়া জয়ের পর মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মাণিকচাঁদ প্রভৃতি বিশেষ শঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

সহসা কুচক্রীদের আশাকুঞ্জে আবার ভ্রমরের গুঞ্জন শোনা গেল। কর্ণেল ক্লাইভ পৌঁছে গেছেন গঙ্গাসাগরের সঙ্গমে। মেজর কিলপ্যাট্রিক ইতিমধ্যে জগৎশেঠকে হাতের পুতুল করে ফেলেছে। সিরাজ যাকে বিশ্বাস করে ক'লকাতা রক্ষার ভার দিয়ে এসেছিলেন, সেই বিভীষণ মাণিকচাঁদ ষড়যন্ত্র করে দুর্গ প্রাচীরে কতগুলো অব্যবহার্য কামান সাজিয়ে ঠাট বজায় করলেন মাত্র। হলওয়েল সাহেবকে খবর পাঠাল উমিচাঁদ, "ক'লকাতা দুর্গের বুরুজ অকর্মণ্য', 'হুগলী দুর্গে পঞ্চাশ জন আর 'টানার দুর্গে' দু'শ জন মাত্র সিপাহী আছে। খোজা বাজিদ এবং অপর সওদাগরেরা এখন ইংরাজপক্ষ সমর্থনে প্রস্তুত।"

চুঁচুড়া থেকে পাদরী সাহেব বেণ্ট সেনাপতি ক্লাইভকে পলতার বন্দরে খবর পাঠালেন নির্ভাবনায় ক'লকাতায় জাহাজ ভেড়াতে।

বঙ্গের উপকূলে এডমিরাল ওয়াট্‌সন ও সেনাপতি ক্লাইভের জাহাজ নোঙ্গর ফেলল। মাদ্রাজ থেকে ক'লকাতার পথে এই দুই ইংরাজ দস্যু প্রায় ১৫,০০০,০০৲ টাকা লুঠ করে এনেছিলেন।

জাহাজে বসেই ক্লাইভ সিরাজদ্দৌলার কাছে সন্ধিপত্র পাঠালেন। নবাব নিজের ওজন বুঝে ক্লাইভের এই প্রস্তাবে রাজি হলেন মাত্র। ক্লাইভ পলতায় পা দিয়েই স্থানীয় ইংরাজদের কাছে খবর পেলেন—নবাব বিনা যুদ্ধেই ইংরাজদের বাণিজ্যাধিকার দিয়েছেন।

নবাবের কাছে সাফাই থাকবার জন্যে বজবজ যুদ্ধে ইংরাজদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে মাণিকচাঁদ মুর্শিদাবাদে পলায়ন করলেন। ২রা জানুয়ারী (১৭৫৭) আবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পতাকা উড়ল ক'লকাতা দুর্গে (ফোর্ট উইলিয়মে)।

এইবার ঐ লুটের ১৫,০০০,০০৲ টাকা ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে ক্লাইভ আর ওয়াটসনের ভেতর ভীষণ এক কলহের সৃষ্টি হল।

ড্রেক সাহেব এলেন ক'লকাতায় ইংরাজদের শাসনের ভার পেয়ে। তিনি এই কলহের নিষ্পত্তি করলেন।

ক'লকাতায় কোম্পানীর আধিপত্য ছড়িয়ে পড়ল। ইংরাজদের কামানের গোলায় হুগলী দুর্গ ধূলিসাৎ হল।

সিরাজদ্দৌলা এসে পৌঁছালেন ক'লকাতার উপকণ্ঠে, কিরটিবাগে সৈন্য সমাবেশ করলেন ইংরাজদের গতিরোধ করবার জন্যে; কিন্তু ভাগ্যের এমনই বিপর্যয়, তা আর হয়ে উঠল না। ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৭৫৭) ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে নবাব রাজধানীতে ফিরে এলেন।

গুপ্তচররা রাষ্ট্রীয় প্রধানদের সকল প্রকার কার্যকলাপই সময়কালে নবাবের কানে পৌঁছে দিয়েছে।

বিশ্বাসঘাতক মাণিকচাঁদকে দরবারে হাজির করে কারারুদ্ধ করলেন নবাব। মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁকে মীর বক্সীর (প্রধান সেনাপতির) পদ থেকে অপসারিত করে খাজে হাদি আলিকে করলেন সেনাপতি।

ক্ষিপ্ত শার্দূলের লোল জিহ্বা লক লক করে জেগে উঠেছে দেখে জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, রাজবল্লভ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এদিকে সেদিকে গা ঢাকা দিলেন।

বহু কান্নাকাটির পর দশ লক্ষ মুদ্রা অর্থদণ্ডের বিনিময়ে মাণিকচাঁদ মুক্তি পেলেন।

এইবার সিরাজ বধের আয়োজন সুরু হল—পূর্বোক্তমে অথচ খুব গোপনে। ইংরাজদের সাহায্যে মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাবার আয়োজনে মেতে উঠলেন প্রধান অমাত্যেরা। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকেও দলে টানলেন কুলাঙ্গারের দল। কুচক্রীদের বিষ বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে—বাংলার মসনদের বিপর্যয়ের কথা খোলাখুলি লিখে বেগম লুৎফুন্নেসা নাটোরের রাণী ভবানীর কাছে দূত পাঠালেন।

রাণী ভবানী বিশেষ চেষ্টা করেও কৃষ্ণচন্দ্রকে নবাবের পক্ষ সমর্থন করাতে পারলেন না।

নতুন রাজ্যাভিষেকের পর সামান্য একটা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মহাপ্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য সুরু হল বাংলার বুকে।

ক্লাইভ এগিয়ে এলেন মীরজাফরের কাছে নতুন এক সর্তের আবেদন নিয়ে, দৌত্যের কাজে নিযুক্ত হল উমিচাঁদ অর্থের প্রলোভনে।

মীরজাফর ক্লাইভের কাছে পাঠালেন দ্বাদশ সর্ত সম্বলিত এক চুক্তিপত্র: আরও লেখা হল—"এর পর ইংরাজরা যদি সিরাজকে পরাস্ত করে, আমার মস্তকে মুর্শিদাবাদের রাজমুকুট পরিয়ে দিতে পারেন, সিংহাসনে বসে পরম অনুগতের মতই মেনে চলব কোম্পানীর আদেশ; আর এই চুক্তির প্রতিটি সর্ত।" কর্ণেল ক্লাইভ, এডমিরাল ওয়াট্‌সন মীরজাফরের চুক্তিতে রাজি হয়ে গেলেন, এখন তাদের কাজ গুছান নিয়ে কথা। পরিষ্কার ভাবে চুক্তিপত্র লেখা হল: (১) নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত যে সন্ধিপত্র স্থিরীকৃত হইয়াছে, সমস্ত সর্ত আমি (মীরজাফর) পালন করিতে সম্মত। (২) দেশীয় অথবা ইউরোপীয় যে কেহ ইংরাজের শত্রু সে আমারও শত্রু। (৩) স্বর্গের পুষ্প (জিন্নেৎ-উল-বেলাৎ) এই বঙ্গভূমিতে এবং বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে ফরাসীদিগের যে সকল কুঠি ও সম্পত্তি আছে তাহা ইংরাজদিগের অধীনে আসিবে। (৪) সিরাজদ্দৌলার কলিকাতা অধিকার ও লুণ্ঠন করিবার জন্য ইংরাজদিগের যাহা ক্ষতি হইয়াছে এবং সৈন্যের নিমিত্ত যে ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছে তাহা পূরণের জন্য আমি ইংরাজদিগকে এক কোটি টাকা দিব। (৫) কলিকাতাবাসী ইংরাজদিগের যে সকল দ্রব্য লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে আমি ৫০ লক্ষ মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইতেছি। (৬) দেশীয়গণের লুণ্ঠিত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ করিতে ২০ লক্ষ মুদ্রা দেওয়া হইবে। (৭) আরমানীয়দের ক্ষতিপূরণ হেতু ৭ লক্ষ টাকা দিব। ইংরাজ এবং দেশীয় ব্যক্তিদিগের ভিতর কাহাকে কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে ওয়াট্‌সন, ক্লাইভ, ড্রেক, ওয়াটস ও কিলপ্যাট্রিক বিচার করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। (৮) খাত বেষ্টিত কলিকাতার ভিতর জমিদারগণের যে জমি রহিয়াছে ঐ সকল জমি এবং খাতের বাহিরের ছয়শত গজ জমি ইংরাজ কোম্পানীকে দান করিব। (৯) কলিকাতার দক্ষিণে কুল্পী পর্যন্ত স্থান ইংরাজ কোম্পানীর জমিদারী হইবে। তথাকার সমস্ত কর্মচারী কোম্পানীর অধীন হইবে এবং কোম্পানীও অপরাপর জমিদারদিগের

বিশুদ্ধ, কোমল
লাক্স এবার
৪টি রামধনু-
রঙে
আর আপনার প্রিয় সাদাটিও রয়েছে!
LUX
সবুজ
LUX
নীল
LUX
গোলাপী
LUX
হলুদ
'রঙগুলো এতই সুন্দর,
মনে হয়
সবই আমার চাই'
বৈজয়ন্তীমালা বলেন-
দেখুন! লাক্স এবার চমৎকার কত সব রঙে আর মানানসই
ক—সাদাটিও রয়েছে। প্রতিটিই আপনার বিশুদ্ধ লাক্স—লাবণ্য
যে সাবান চিরদিনই আপনি চেয়েছেন।
LUX
চিত্রতারকার
বিশুদ্ধ, কোমল
সৌন্দর্য্য-সাবান
LTS. 86A-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী
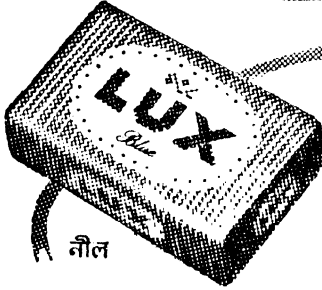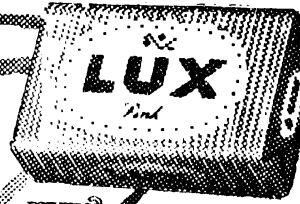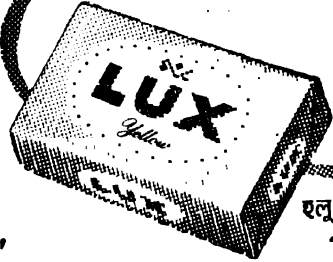
তাঁর রাজকর দিবেন। (১০) যখন আমি ইংরাজ সৈন্যের সাহায্য চাহিব তখন তাহাদের ব্যয়ভার আমি বহন করিব। (১১) হুগলীর দক্ষিণে কোন স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিব না। (১২) আমি এই তিন প্রদেশের রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেই উল্লিখিত সমস্ত টাকা দিব।" (ফরাসী ভাষায় লিখিত আসল চুক্তিপত্রের বঙ্গানুবাদ)।

কর্ণেল ক্লাইভ প্রভৃতি ইংরাজ কর্মচারী মীরজাফর খাঁর পত্রের অনুমোদন জানালেন অনুরূপ এক প্রতিলিপিতে। (১) মীরজাফর খাঁ বাহাদুর উল্লিখিত সর্ত সকল শপথপূর্বক স্বীকার করিলে নিম্নস্বাক্ষরকারী আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ঈশ্বর ও ধর্মপুস্তকের শপথ করিয়া স্বীকার করিতেছি যে আমরা আমাদের সমগ্র সৈন্য সহ তাঁহার বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদারী পাইবার যথাসাধ্য সাহায্য করিব। তিনি নবাব হইয়া উল্লিখিত সর্ত পালন করিলে তাঁহার যে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যে কোন সময় তাঁহার প্রয়োজন হইবে প্রাণপণ সহায়তা করিব। (রিয়াজ-উস-সালাতিন-৩৫৬ পৃঃ। ফরাসী ভাষায় লিখিত আসল পত্রের বঙ্গানুবাদ)। চুক্তিপত্র উভয় পক্ষের স্বাক্ষরিত হল।

উমিচাঁদ দেখলে মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধি প্রস্তাব স্থির হয়ে গেল, কিন্তু তার নিজের সুবিধে কিছুই হল না। ভয় দেখালে উমিচাঁদ ক্লাইভকে—ত্রিশ লক্ষ টাকা না পেলে সব কথাই সে নবাবের কাছে ফাঁস করে দেবে।

ক্লাইভ বললেন, "ও তো সামান্য টাকা, ওর জন্যে তুমি চিন্তা ক'র না—আরও প্রচুর দেব বন্ধু—ভারতের থেকে ইংলণ্ডে তোমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। দুটি কাগজে দুটি চুক্তিপত্র তৈরী হল বোকাটাকে ঠকাবার জন্যে···একটা সাদা কাগজে আর একখানা লাল কাগজে। লাল কাগজের চুক্তিটাই হল জাল—তাতে আর একটি সর্ত বেশী লেখা হয়। এতেই থাকল উমিচাঁদের বখরার অঙ্কের স্বীকৃতি। ওয়াটসনকে ঐ লাল কাগজটিতে সহি দিতে অনুরোধ জানালেন ক্লাইভ। ওয়াটসন জাল কাগজে সহি দিতে রাজি হলেন না। লুসিংটন নামে আর একজন কর্মচারীকে দিয়ে জাল চুক্তিতে কর্ণেল ওয়াটসনের স্বাক্ষর জাল করালেন।

(একমাত্র ক্লাইভের দ্বারাই এই সব হীন কাজ সংঘটিত হতে পেরেছিল। তখন বৃটিশ আইনে জালিয়াতের শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড—কিন্তু জালিয়াতির দ্বারা এত বড় কাজ উদ্ধার হওয়াতে ইংরাজরা বসালেন ক্লাইভকে লর্ড সভায় ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের আসনে। সেনাপতি ক্লাইভের নাম হল "লর্ড ক্লাইভ", তাই বলি ধন্য রাজনীতি—স্বার্থের খাতিরে রাজদরবারের কায়েমী করা আইনও পাল্টে যায়। পার্লামেন্টের বিচারকেরা ক্লাইভের প্রশংসাই করলেন। শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা)।

লাল কাগজে চুক্তি সহি ক'রে গর্দভ উমিচাঁদ আহ্লাদে নেচে উঠল। ক্লাইভ তার পিঠে দুটো চাপড় দিয়ে হাসি মুখে বললেন, "শুধু টাকা কেন বন্ধু, আরও কত কি দেব দেখবে,—আগে রাজ্যটা হাতে পাই।"

বৃটিশের রণডঙ্কা বেজে উঠল। ছুটে চলেছে ইংরাজ সৈন্য মুর্শিদাবাদের রাজভাণ্ডারের লোভে। কর্ণেল ক্লাইভ প্রধান সেনাপতি। কাউকে তিনি বিশ্বাস করেন না। এমন কি আপনজনকেও না। ১৭ই জুন (১৭৫৭) ইংরাজ সৈন্য কাটোয়া দুর্গ অবরোধ করে বিশেষ চঞ্চল হয়ে পড়ল, কেবল মীরজাফর খাঁর সামান্য ইঙ্গিতের অপেক্ষায়··· ঐ বুঝি পত্রবাহক আসে।

তোপখানার অধ্যক্ষ মীরমদন ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন নবাবের কাছে···"কোম্পানীর ফৌজ দরজায় হানা দিয়েছে, এখনও সামান্য কিছু সময় আছে—শেষ করে দিন জ'াহাপনা মীরজাফরটাকে—টুকরো টুকরো করে কেটে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ান—ক্লাইভকে পথ ওই দেখিয়েছে।"

হতবাক নবাব ধীরে উত্তর দেন, "সব বুঝেছি মীরমদন। মীরজাফরের চালচলন অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছি, কিন্তু তুমি কি বোঝ না মীরমদন বাংলার ঘরে ঘরে আজ পিশাচের নৃত্য শুরু হয়েছে। ঘরে, বাইরে যেদিকে তাকাও শত্রুর ঐ লাল চোখ দুটো সকলকে জিভটা বার করে যেন আমাকে গিলতে আসছে—কত জনকে শাস্তি দেবে তুমি বন্ধু। আমি যাই, চুনখালি থেকে সৈন্য নিয়ে যতদূর পারি এগিয়ে গিয়ে কোম্পানীর ফৌজের টুঁটি চেপে ধরি। তুমি তোপখানার একটা ব্যবস্থা ক'রে পরে এস।"

বহরমপুরের অদূরে মনকরা প্রান্তরে নবাব ছাউনি ফেললেন।

মীরজাফর ক্লাইভের কাছে গুপ্তচর পাঠালেন, খুব সাবধানে সে লুকিয়ে নিয়েছে মীরজাফরের অনুজ্ঞাপত্র: "নবাব কাশিমবাজারের ছ' মাইল দক্ষিণে শিবির সন্নিবেশ করেছেন, ইংরাজ সেনাকে এখান থেকে বাধা দেবেন, সম্মুখে বিশাল পরিখা খনন করা হচ্ছে, কাজেই অপর রাস্তায় এসে আচম্বিতে নবাব শিবির আক্রমণ করাই যুক্তিযুক্ত।"

ক্লাইভের জবাব আসে,—"নবাবসৈন্য নিয়ে জাফর আলি খাঁর অবিলম্বে পলাশী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে আসা প্রয়োজন। কিন্তু খাঁ বাহাদুর যদি পলাশীতে তাঁর সঙ্গে দেখা না করেন তিনি নিশ্চিত নবাবের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করবেন।"

নবাবসৈন্য আবার এগিয়ে চলে, পলাশী ময়দানের অদূরে দাউদপুরে এসে ছাউনী ফেলে।

২২শে জুন (১৭৫৭) রাতের অন্ধকারে কোম্পানীর ফৌজ চুপি চুপি নদী পার হয়ে আসে,—মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে, ইংরাজদের পলাশী পৌঁছুতে কিছুটা দেরী হয়ে গেল, তারা এগিয়ে এসে লক্ষবাগ আম্রকাননের ফাঁকে সৈন্য সমাবেশ করলে, তারই উত্তর প্রান্তে ইংরাজদের ব্যূহ রচনা হল।

পরদিন ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার (১১৭০ হিজরী ৫ সাওয়াল রোজ পঞ্চসোম্বা) সকাল আটটায় সিরাজদ্দৌলা আদেশ দিলেন, প্রধান সেনাপতি মীরজাফর খাঁ ও আরও দুজন সেনাপতি দুর্লভ রায় ও ইয়ার লতিফকে "লক্ষবাগ" ঘিরে ফেলতে। বিশ্বাসঘাতকেরা নবাবের আদেশে কর্ণপাতও করলে না।

যুদ্ধ বেধে উঠল, ইংরাজ পক্ষে মেজর কিলপ্যাট্রিক, মেজর কূট, মেজর গ্রাণ্ট ও ক্যাপ্টেন গপ সৈন্য (39th Regiment) পরিচালনা করে।

এ বিপর্যয়ে নবাবের কয়েকজন সেনাপতি—নিমকের প্রকৃত দাম দিতে ভোলে নি। গোলন্দাজ সেনাপতি বীর মীরমদন প্রবল বিক্রমে ইংরাজ সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর এক পাশে বাঙ্গালী বীর মোহনলাল, অপর পাশে ফরাসী বীর সিনফ্রে বিপুল শক্তিতে কোম্পানীর ফৌজকে ঘিরে ধরলে। ইংরাজেরা

পালাবার চেষ্টা করলে। পিছু হেঁটে 'লক্ষবাগের' ভেতর গা ঢাকা দিলে।

হতবাক ক্লাইভ। "কি এখন উপায়—কোথায় মীরজাফর? আমার সঙ্গে এতখানি চাতুরী করলে?"

মধ্যগগনের দিনমণি কৃষ্ণমেঘের বোরখা পরে কোথায় যেন আকাশের মাঝে গা লুকাল। প্রবল বারিবর্ষণ সুরু হয়ে গেল।

মীরমদন মাথায় হাত দিয়ে বসলেন: "ধাঃ, বারুদগুলো সবই ভিজে গেল! তবুও ছাড়ব না। দেখি আরও খানিকটা এগিয়ে যাই।"

বোঝা গেল চোখের আড়ালে থেকে ভগবান যেন সাহায্য করছেন ইংরাজদের।

মীরমদন তোপের মধ্যে বারুদ ঠাসলেন, তাও খানিকটা ভেজা। সেনাপতির মাথায় খুন চেপে গেছে—নিজেই কামান চালাচ্ছেন—হঠাৎ কামানের পেছনটা গেল ফেটে। অগ্নিদগ্ধ গোলাটা এসে ঢুকল মীরমদনের উরুতে।

সিরাজ শিবিরে মীরমদন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

···"খোদা এ তুমি কি করলে—আর তো আমার নিস্তার নেই।" সিরাজ মীরমদনের প্রাণহীন দেহটার ওপর আছড়ে পড়লেন।

—"বৃথা আফশোষ করছেন জাঁহাপনা—এখন প্রস্তুত হ'ন,"··· মীরজাফরের ডাকে সিরাজ চমকে উঠলেন।

···"বন্ধু, বাংলার তেজোদীপ্ত মুকুট তোমারই চরণে দিলাম··· গ্রহণ করতে ইতস্তত কেন? তবুও বাঁচাও 'মীরবক্সী' দেশের ঐতিহ্যকে, স্বাধীনতাটাকে তুলে দিও না ঐ গৃধ্নদের হাতে।

টস্‌টস্‌ করে সিরাজের চোখের জল ঝরে পড়ে মীরমদনের নশ্বর দেহটার ওপর।

নবাবের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সেনাপতিপ্রধান আদেশ দিলেন সেদিনের মত যুদ্ধ স্থগিত রাখবার।

এতক্ষণ মহারাজ মোহনলাল সিংহগর্জনে কোম্পানীর ফৌজকে পিষে মারবার উপক্রম করে তুলেছে—

প্রধান সেনাপতি আদেশ দিলেন, আজ আর নয় সেনাপতি মোহনলাল, অস্ত্র সম্বরণ কর—কাল প্রত্যূষে আবার দেখা যাবে।

—"কি বলছেন প্রধান সেনাপতি, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আদেশ প্রত্যাহার করুন। আর বেশীক্ষণ নয়—প্রায় ওদের শ্বাসরোধ ক'রে এনেছি।" মোহনলালের স্থির দৃষ্টি মীরজাফরের উত্তরের আশায়।

—"নবাবের আদেশ—যুদ্ধ আজ হবে না।" মীরজাফর প্রস্থান করলেন।

ক্ষুব্ধ মর্মাহত মোহনলাল শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এই তো সুযোগ। মীরজাফরের কাজ হাসিল হয়েছে। চিঠি গেল ক্লাইভের কাছে: "মীরমদন আর বেঁচে নেই, কৌশলে যুদ্ধ বন্ধ করেছি—এখনই অথবা রাত্রি তিনটের সময় নবাব শিবির আক্রমণ করুন।"

নবাবসৈন্য নিদ্রিত। যামিনী তৃতীয় প্রহর ঘোষণা করেছে। আচম্বিতে কোম্পানীর ফৌজ ঝাঁপিয়ে পড়ল নবাব শিবিরের ওপর।

মোহনলাল, সিনফ্রেঁ সৈন্য সাজিয়ে উঠতে পারলেন না, শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হল।

বিশ্বাসঘাতকতার কথা চিন্তা ক'রে মোহনলালের বুক ভেসে যায় চোখের জলে। সিনফ্রেঁ দাঁতে দাঁত চেপে কেবল মীরজাফরকে কাছে পেতে চায়—ছিঁড়ে তাকে টুকরো করে ফেলবে।

বৃথা আস্ফালন সিনফ্রেঁর। মীরজাফর এখন ক্লাইভের শিবিরে।

জীগ্‌গির পালান নবাব, বিলম্বে জানটুকুও থাকবে না। দেখছেন না, লালমুখগুলো কি ভাবে এগিয়ে আসছে। যদি পারেন রাজধানী রক্ষার চেষ্টা দেখুন। রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ শিবিরে আসেন নবাবকে পরামর্শ দিতে।

ক্ষীণ আশায় ভর করে শেষ চেষ্টার অভিপ্রায়ে নবাব হাতীর পিঠে উঠলেন। অদূরে পলাশী গ্রামে কোথাও বা তখন গোধূলির শাঁকের আওয়াজ শোনা যায়। দ্রুত এগিয়ে চলেন সিরাজদ্দৌলা, সঙ্গে কয়েকটি উট এবং দু হাজার অশ্বারোহী সেনা নিয়ে রাজধানীর দিকে—মুর্শিদাবাদে।

দু পক্ষের প্রধান, মীরজাফর আলি খাঁ আর কর্ণেল ক্লাইভকে একত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখতে পেয়ে ইংরাজ-সৈন্য বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠে। বৃটিশের জয়বাদ্য রণাঙ্গনকে কাঁপিয়ে তোলে।

মুর্শিদাবাদের দ্বারে দ্বারে অসহায় নবাব ঘুরে ফেরেন, পাত্র-মিত্র কেউ ফিরে চায় না, দু হাতে নবাব টাকা ছেটান, ধন-দৌলত আজ যেন মাটিতে মিশে গেছে। সুযোগ বুঝে যে যার মত ভবিষ্যতের কিছু আখের করে নিয়ে সরে পড়ে। নবাবের পরম হিতৈষী শ্বশুর মশায় মহম্মদ ইরিচ খাঁ সৈন্য সংগ্রহের নামে জামাতা বাবাজীর কল্যাণে বেশ মোটা কিছু আত্মসাৎ করে গা ঢাকা দিলেন।

—"লুৎফা! চল পালাই। আর দেরী করলে তোমাকেও হয়তো কেউ আমার মসনদের মতই বুক থেকে ছিনিয়ে নেবে!"

—"কোথায় যাবেন প্রভু!"

—"বিহারে। দেখি সেখানে গিয়ে যদি মসনদের কিছু উপায় করতে পারি; ফরাসী বীর মসিয় ল'নলকে পাটনায় খবর পাঠিয়েছি।"

—"জহুরাকে কোথায় রেখে যাবেন জনাব!"

—"দুলারী বড় আদরের মেয়ে আমার। ওকে কি আমি শত্রুপুরীর ভেতর ফেলে যেতে পারি! বড় কচি বয়স—পথে কত কষ্টই না হবে বেচারার!"

—"কে? প্রতিহারী গোলাম হোসেন! তুমিও এসেছ! কত আসরাফি দিলে আমাকে মুক্তি দেবে বন্ধু? বিহার যুদ্ধে তুমিই একদিন জানকীরামের হাত থেকে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে না? আজ তাই শেষের দিনে বুঝি তার পারিশ্রমিক আদায় করতে এসেছ? ভাণ্ডারের দরজাগুলো সব খুলে দিয়েছি, যত পার লুটে নাও!"

—"খোদাবন্দ! গোলাম হোসেনের বড় সাধ হয় নবাব বাহাদুরের পোষাকটা একবার গায়ে চাপিয়ে দেখতে কেমন তাকে মানায়!"

—"এতেই তুমি খুসী? সিংহাসনই যখন গিয়েছে এতে আর নবাবের প্রয়োজন কি? খুলে নাও বন্ধু!"

—"গোলাম হোসেন হুজুরের সেই বান্দাই আছে জনাব!"

—"এখনও দাঁড়িয়ে কেন?"

—"মতির মালাটা!"

—"এটিও তোমায় দিতে হবে? নিয়ে যাও। একদিন অনেক উপকার করেছিলে!"

—"এখনও পথ রোধ করছ গোলাম হোসেন! তুমি কেন যাবে আমার সঙ্গে। নবাবের দুর্দিনে সবাই তো সরে গেছে! একলা তুমি আমার কতটুকু সাহায্য করতে পার?"

—"পারব খোদাবন্দ—নিশ্চয় পারব!"

—"ভুল, ভুল, মস্ত ভুল করছ, গোলাম হোসেন!"

—"তবুও আমি যাব জনাব। শেষ দিনে আল্লার দরবারে ঐ টুকুই যা কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্যে সঞ্চয় করব প্রভু! পাল্কি প্রস্তুত জনাব। ভগবানগোলা মালদা হয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। শত্রুপুরীতে আর দেরী করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। চলুন, আর দেরী করলেই বিপদ।"

গোলাম হোসেন জহুরাকে কোলে তুলে নেয়।

—"কর্ণেল ক্লাইভ! যুদ্ধক্ষেত্রে আনন্দ করবার সময় এখন নয়। শত্রু আর রোগের শেষ রাখতে নেই বন্ধু। কুবেরের ভাণ্ডার হয়তো সিরাজ সব লুটে নিয়ে গেল! আমি এগিয়ে চললাম। জামাতা মীরকাসেমকে সিরাজের পিছু নেওয়ার জন্যে সংবাদ পাঠিয়েছি। আজ ২৫শে জুন। আপনি আসুন ২৯শে; কোম্পানীর মালিকের অভ্যর্থনার আয়োজন সব ঠিক থাকবে 'মনসুর গঞ্জে'।" ক্লাইভ তাঁর দক্ষিণ হস্তখানি এগিয়ে দিলেন। করমর্দন পরে মীরজাফর খাঁ ঘোড়ায় উঠলেন।

মহারাজ মোহনলাল ছুটলেন ঘোড়া নিয়ে ভগবানগোলার পথে সিরাজের সাহায্যের জন্যে, পলাশী ময়দান থেকে বেশী দূর এগোবার আগেই মীরজাফরের গুপ্তচরের হাতে বন্দী হলেন।

কারাগারে নিয়ে যাওয়া হল মোহনলালকে, রাজ ঐশ্বর্য তাঁর, সবই হস্তগত করলেন মীরজাফর।

—"গোলাম হোসেন। কি ভীষণ অন্ধকার! চারদিকটা কেমন খাঁ খাঁ করছে দেখতে পাচ্ছ। রাক্ষসগুলো যেন মুখ বাড়িয়ে আমাদের খেতে আসছে—গাদা বন্দুক নিয়ে গোরাগুলো পিছু নিয়েছে—দেখ, দেখ, মীরজাফর ওদের মশাল দেখিয়ে নিয়ে আসছে!"

—"ও আপনার মনের ভুল জনাব।"

—"তুমি সত্যি বলছ গোলাম হোসেন? ওরা আমাকে ধরতে আসছে না তো! কতদূর এলাম আমরা গোলাম হোসেন!"

—"মালদা কেবল মাত্র পেরিয়ে এসেছি!"

—"কার যেন কথা শুনলাম!"

—"ও জেলেদের নৌকা! সংবাদ ভাল নয় জনাব! নাজেরপুরের মোহনা বন্ধ—রাজমহলের পথ ছাড়া আর উপায় নেই। রাতের অন্ধকারেই যদি রাজমহল পেরিয়ে যেতে পারতাম! ভোরও হয়ে এল!"

—"ঐ যে দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে।···দুলারি ক্ষিধের ছট ফট করছে—দু ফোঁটা দুধ পেলে হয়তো মেয়েটার জানটা বাঁচত গোলাম হোসেন।"

'বখরাবরহাল', ছোট্ট একটা গ্রাম—রাজমহলের কাছে, সিরাজের নৌকার নোঙ্গর পড়ল।

গোলাম হোসেন বেরোয় সুখের সন্ধানে। বান্দা নবাবকে সাবধান করে দিয়ে যায়। ক্ষুধার তাড়না অসহ্য। সিরাজ গ্রামের পথে এক পা দু' পা করে এগিয়ে চলেন। কাছেই একটা মসজেদ।

—"এত ভোরে কোথা থেকে আসছ আগন্তুক? চেহারা দেখে তো ভিখারী বলে মনে হচ্ছে না।"

—"আমাকে কিছু খেতে দেবে?"

—ফকির নিরীক্ষণ করে বলে, "নবাবের জুতো তুমি নিশ্চয় চুরি করেছ? নাঃ, তুমিই নবাব। 'দানেশ'কে মনে পড়ে? তুমিই না একদিন দানেশের এই দশা করেছিলে?" ফকির মুখের কাপড়টা খুলে ফেলে। "আমার দিকে তাকিয়ে দেখ নবাব! সেই থেকে এই মসজেদে মুখ লুকিয়ে দিন গুণছি। আল্লার নাম করি আর তোমার নিষ্ঠুরতার কথা ভাবি। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌলা সাহ কুলি খাঁ বাহাদুর আজ কিনা একটা ভিখারীর কাছে ভিক্ষা চায়। ওঃ খোদার বিচার কি সুন্দর—কি অপূর্ব! ও বেটার বিচারের মাপকাঠিতে কারুর রেহাই নেই জনাব। রোস, আকবর নগরের ফৌজদার মীরজাফর আলি খাঁর ভাই মীর দাউদ আলি খাঁকে এখুনি খবর পাঠাচ্ছি; সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সে রাজমহলেই আছে। কাল রাত্রিতে খবর পেয়েছি, মীরকাশেমও এসে পৌঁছেছে। তুমি আমার একদিন অত উপকার করেছ আর আজ তোমাকে ভুলে যাব?"

ফরাসী বীর মঁসিয়ে রেঁনল সিরাজদ্দৌলার সাহায্যে বিহার থেকে ছুটে আসছেন, তখনও রাজমহল প্রায় তিরিশ মাইল দূরে।

মীর দাউদের সৈন্যরা সপরিবারে সিরাজদ্দৌলাকে বন্দী করে ফেলল। সঙ্গে যারা ছিল তারাও বাদ গেল না।

মীরকাশেম এক এক করে লুৎফুন্নেসার গহনাগুলো ছিনিয়ে নিলে, ছিনিয়ে নিলে সিরাজকে লুৎফার বুক থেকে। লুৎফুন্নেসা কত আকুলি-বিকুলি করে। কেউ শোনে না তার কথা। শাহ্জাদীকে শৃঙ্খলিত করা হয় বেগমের সম্মুখে।

—"বেগম সাহেবার কিছু বলবার থাকে সেরে ফেলুন, সময় অতি অল্প। অনেক দিন তো সুখেই কাটালেন; আমাদের কাছে গেলেও আপনার তেমন কিছু অসুবিধে হবে না বোধ করি।" কটাক্ষ করে মীরকাশেম।

ভুজঙ্গিনী গর্জে ওঠে। উত্তর দেন লুৎফা, "যে এতদিন গজারোহণে অভ্যস্ত সে কি করে গর্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করবে বেল্লিক!"

নবাবও উপযুক্ত জবাব দিতে চান, কিন্তু পারেন না। জল্লাদরা টেনে নিয়ে যায় সিরাজকে লুৎফার চোখের বাইরে।

২৯শে জুন (১৭৫৭) মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে ক্লাইভ মীরমহম্মদ জাফর আলি খাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে কোম্পানীর তরফ থেকে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রাদি নজরানা দিয়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদার বলে অভিবাদন জানালেন।

কর্ণেল ক্লাইভের সেক্রেটারী ওয়াল্‌স নবাবের ধনাগারে ২৩,০০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা, ১৭,৬০,০০০ খানি রৌপ্যমুদ্রা, আট কোটি অন্যান্য মুদ্রা, এ ছাড়া মণি-মাণিক্যাদি প্রচুর দেখতে

মোহনলাল, সিনফ্রে' সৈন্য সাজিয়ে উঠতে পারলেন না, শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হল।

বিশ্বাসঘাতকতার কথা চিন্তা ক'রে মোহনলালের বুক ভেসে যায় চোখের জলে। সিনফ্রে' দাঁতে দাঁত চেপে কেবল মীরজাফরকে কাছে পেতে চায়—ছিঁড়ে তাকে টুকরো করে ফেলবে।

বৃথা আস্ফালন সিনফ্রে'র। মীরজাফর এখন ক্লাইভের শিবিরে।

শীগ্‌গির পালান নবাব, বিলম্বে জানটুকুও থাকবে না। দেখছেন না, লালমুখগুলো কি ভাবে এগিয়ে আসছে। যদি পারেন রাজধানী রক্ষার চেষ্টা দেখুন। রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ শিবিরে আসেন নবাবকে পরামর্শ দিতে।

ক্ষীণ আশায় ভর করে শেষ চেষ্টার অভিপ্রায়ে নবাব হাতীর পিঠে উঠলেন। অদূরে পলাশী গ্রামে কোথাও বা তখন গোধূলির শাঁকের আওয়াজ শোনা যায়। দ্রুত এগিয়ে চলেন সিরাজদ্দৌলা, সঙ্গে কয়েকটি উট এবং দু হাজার অশ্বারোহী সেনা নিয়ে রাজধানীর দিকে—মুর্শিদাবাদে।

দু পক্ষের প্রধান, মীরজাফর আলি খাঁ আর কর্ণেল ক্লাইভকে একত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখতে পেয়ে ইংরাজ-সৈন্য বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠে। বৃটিশের জয়বাদ্য রণাঙ্গনকে কাঁপিয়ে তোলে।

মুর্শিদাবাদের দ্বারে দ্বারে অসহায় নবাব ঘুরে ফেরেন, পাত্র-মিত্র কেউ ফিরে চায় না, দু হাতে নবাব টাকা ছেটান, ধন-দৌলত আজ যেন মাটিতে মিশে গেছে। সুযোগ বুঝে যে যার মত ভবিষ্যতের কিছু আখের করে নিয়ে সরে পড়ে। নবাবের পরম হিতৈষী শ্বশুর মশায় মহম্মদ ইরিচ খাঁ সৈন্য সংগ্রহের নামে জামাতা বাবাজীর কল্যাণে বেশ মোটা কিছু আত্মসাৎ করে গা ঢাকা দিলেন।

—"লুৎফা! চল পালাই। আর দেরী করলে তোমাকেও হয়তো কেউ আমার মসনদের মতই বুক থেকে ছিনিয়ে নেবে!"

—"কোথায় যাবেন প্রভু!"

—"বিহারে। দেখি সেখানে গিয়ে যদি মসনদের কিছু উপায় করতে পারি; ফরাসী বীর মসিয় ল'নলকে পাটনায় খবর পাঠিয়েছি।"

—"জহুরাকে কোথায় রেখে যাবেন জনাব!"

—"দুলারী বড় আদরের মেয়ে আমার। ওকে কি আমি শত্রুপুরীর ভেতর ফেলে যেতে পারি! বড় কচি বয়স—পথে কত কষ্টই না হবে বেচারার!"

—"কে? প্রতিহারী গোলাম হোসেন! তুমিও এসেছ! কত আসরাফি দিলে আমাকে মুক্তি দেবে বন্ধু? বিহার যুদ্ধে তুমিই একদিন জানকীরামের হাত থেকে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে না? আজ তাই শেষের দিনে বুঝি তার পারিশ্রমিক আদায় করতে এসেছ? ভাণ্ডারের দরজাগুলো সব খুলে দিয়েছি, যত পার লুটে নাও!"

—"খোদাবন্দ! গোলাম হোসেনের বড় সাধ হয় নবাব বাহাদুরের পোষাকটা একবার গায়ে চাপিয়ে দেখতে কেমন তাকে মানায়!"

—"এতেই তুমি খুসী? সিংহাসনই যখন গিয়েছে এতে আর নবাবের প্রয়োজন কি? খুলে নাও বন্ধু!"

—"গোলাম হোসেন হুজুরের সেই বান্দাই আছে জনাব!"

—"এখনও দাঁড়িয়ে কেন?"

—"মতির মালাটা!"

—"এটিও তোমায় দিতে হবে? নিয়ে যাও। একদিন অনেক উপকার করেছিলে!"

—"এখনও পথ রোধ করছ গোলাম হোসেন! তুমি কেন যাবে আমার সঙ্গে। নবাবের দুর্দিনে সবাই তো সরে গেছে! একলা তুমি আমার কতটুকু সাহায্য করতে পার?"

—"পারব খোদাবন্দ—নিশ্চয় পারব!"

—"ভুল, ভুল, মস্ত ভুল করছ, গোলাম হোসেন!"

—"তবুও আমি যাব জনাব। শেষ দিনে আল্লার দরবারে ঐ টুকুই যা কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্যে সঞ্চয় করব প্রভু! পাল্কি প্রস্তুত জনাব। ভগবানগোলা মালদা হয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। শত্রুপুরীতে আর দেরী করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। চলুন, আর দেরী করলেই বিপদ।"

গোলাম হোসেন জহুরাকে কোলে তুলে নেয়।

—"কর্ণেল ক্লাইভ! যুদ্ধক্ষেত্রে আনন্দ করবার সময় এখন নয়। শত্রু আর রোগের শেষ রাখতে নেই বন্ধু। কুবেরের ভাণ্ডার হয়তো সিরাজ সব লুটে নিয়ে গেল! আমি এগিয়ে চললাম। জামাতা মীরকাসেমকে সিরাজের পিছু নেওয়ার জন্যে সংবাদ পাঠিয়েছি। আজ ২৫শে জুন। আপনি আসুন ২৯শে; কোম্পানীর মালিকের অভ্যর্থনার আয়োজন সব ঠিক থাকবে 'মনসুর গঞ্জে'।" ক্লাইভ তাঁর দক্ষিণ হস্তখানি এগিয়ে দিলেন। করমর্দন পরে মীরজাফর খাঁ ঘোড়ায় উঠলেন।

মহারাজ মোহনলাল ছুটলেন ঘোড়া নিয়ে ভগবানগোলার পথে সিরাজের সাহায্যের জন্যে, পলাশী ময়দান থেকে বেশী দূর এগোবার আগেই মীরজাফরের গুপ্তচরের হাতে বন্দী হলেন।

কারাগারে নিয়ে যাওয়া হল মোহনলালকে, রাজ ঐশ্বর্য তাঁর, সবই হস্তগত করলেন মীরজাফর।

—"গোলাম হোসেন। কি ভীষণ অন্ধকার! চারদিকটা কেমন খাঁ খাঁ করছে দেখতে পাচ্ছ। রাক্ষসগুলো যেন মুখ বাড়িয়ে আমাদের খেতে আসছে—গাদা বন্দুক নিয়ে গোরাগুলো পিছু নিয়েছে—দেখ, দেখ, মীরজাফর ওদের মশাল দেখিয়ে নিয়ে আসছে!"

—"ও আপনার মনের ভুল জনাব।"

—"তুমি সত্যি বলছ গোলাম হোসেন? ওরা আমাকে ধরতে আসছে না তো! কতদূর এলাম আমরা গোলাম হোসেন!"

—"মালদা কেবল মাত্র পেরিয়ে এসেছি!"

—"কার যেন কথা শুনলাম।"

—"ও জেলেদের নৌকা! সংবাদ ভাল নয় জনাব! নাজেরপুরের মোহনা বন্ধ—রাজমহলের পথ ছাড়া আর উপায় নেই। রাতের অন্ধকারেই যদি রাজমহল পেরিয়ে যেতে পারতাম! ভোরও হয়ে এল।"

—"ঐ যে দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে।···দুলারি ক্ষিধেয় ছট ফট করছে—দু কোঁটা দুধ পেলে হয়তো মেয়েটার জানটা বাঁচত গোলাম হোসেন।"

'বখরাবরহাল', ছোট্ট একটা গ্রাম—রাজমহলের কাছে, সিরাজের নৌকার নোঙ্গর পড়ল।

গোলাম হোসেন বেরোয় দুধের সন্ধানে। বান্দা নবাবকে সাবধান করে দিয়ে যায়। ক্ষুধার তাড়না অসহ্য। সিরাজ গ্রামের পথে এক পা দু' পা করে এগিয়ে চলেন। কাছেই একটা মসজেদ।

—"এত ভোরে কোথা থেকে আসছ আগন্তুক? চেহারা দেখে তো ভিখারী বলে মনে হচ্ছে না।"

—"আমাকে কিছু খেতে দেবে?"

—ফকির নিরীক্ষণ করে বলে, "নবাবের জুতো তুমি নিশ্চয় চুরি করেছ? নাঃ, তুমিই নবাব। 'দানেশ'কে মনে পড়ে? তুমিই না একদিন দানেশের এই দশা করেছিলে?" ফকির মুখের কাপড়টা খুলে ফেলে। "আমার দিকে তাকিয়ে দেখ নবাব! সেই থেকে এই মসজেদে মুখ লুকিয়ে দিন গুণছি। আল্লার নাম করি আর তোমার নিষ্ঠুরতার কথা ভাবি। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌলা সাহ কুলি খাঁ বাহাদুর আজ কিনা একটা ভিখারীর কাছে ভিক্ষা চায়। ওঃ খোদার বিচার কি সুন্দর—কি অপূর্ব! ও বেটার বিচারের মাপকাঠিতে কারুর রেহাই নেই জনাব। দোস্, আকবর নগরের ফৌজদার মীরজাফর আলি খাঁর ভাই মীর দাউদ আলি খাঁকে এখুনি খবর পাঠাচ্ছি; সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সে রাজমহলেই আছে। কাল রাত্রিতে খবর পেয়েছি, মীরকাশেমও এসে পৌঁছেছে। তুমি আমার একদিন অত উপকার করেছ আর আজ তোমাকে ভুলে যাব?"

ফরাসী বীর মঁসিয়ে রেঁনল সিরাজদ্দৌলার সাহায্যে বিহার থেকে ছুটে আসছেন, তখনও রাজমহল প্রায় তিরিশ মাইল দূরে।

মীর দাউদের সৈন্যরা সপরিবারে সিরাজদ্দৌলাকে বন্দী করে ফেলল। সঙ্গে যারা ছিল তারাও বাদ গেল না।

মীরকাশেম এক এক করে লুৎফুন্নেসার গহনাগুলো ছিনিয়ে নিলে, ছিনিয়ে নিলে সিরাজকে লুৎফার বুক থেকে। লুৎফুন্নেসা কত আকুলি-বিকুলি করে। কেউ শোনে না তার কথা। শার্দূলকে শৃঙ্খলিত করা হয় বেগমের সম্মুখে।

—"বেগম সাহেবার কিছু বলবার থাকে সেরে ফেলুন, সময় অতি অল্প। অনেক দিন তো সুখেই কাটালেন; আমাদের কাছে গেলেও আপনার তেমন কিছু অসুবিধে হবে না বোধ করি।" কটাক্ষ করে মীরকাশেম।

ভুজঙ্গিনী গর্জে ওঠে। উত্তর দেন লুৎফা, "যে এতদিন গজারোহণে অভ্যস্ত সে কি করে গর্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করবে বেল্লিক!"

নবাবও উপযুক্ত জবাব দিতে চান, কিন্তু পারেন না। অক্ষরা টেনে নিয়ে যায় সিরাজকে লুৎফার চোখের বাইরে।

২৯শে জুন (১৭৫৭) মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে ক্লাইভ মীরমহম্মদ জাফর আলি খাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে কোম্পানীর তরফ থেকে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রাদি নজরানা দিয়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদার বলে অভিবাদন জানালেন।

কর্ণেল ক্লাইভের সেক্রেটারী ওয়াল্স নবাবের ধনাগারে ২৩,০০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা, ১৭,৬০,০০০ খানি রৌপ্যমুদ্রা, আট কোটি অন্যান্য মুদ্রা, এ ছাড়া মণি-মাণিক্যাদি প্রচুর দেখতে

পেয়ে কোম্পানীর নামে তার বেশীর ভাগই হস্তগত করলে, মীরজাফরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে।

১৭৫৭র ৩রা জুলাই (১৫ই সাওয়াল ১১৭০ হিজরী অব্দ) হৃতসর্বস্ব শৃঙ্খলিত সিরাজকে তাঁর সাধের হীরাঝিল প্রাসাদে মীরজাফরের দরবারে হাজির করা হল। আত্মভৃত্যবর্গের অমানুষিক বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহ সিরাজের।

ক্ষীণ কণ্ঠে সিরাজ মিনতি জানান, "পরদেশীর হাতে মসনদ তুলে দিও না বন্ধুগণ"—

—"দাম্ভিক কুত্তা, এখনও নবাবী করতে চাও? দেখছ মসনদের অধিকারী কে? মরণ তোমাকে হাতছানি দিচ্ছে, তবুও···লে যাও··· 'জফরাগঞ্জ'।"

জগৎ শেঠ ইন্ধন জোগায়, "আর নয়—শেষ করে দাও।"

চতুর্দ্দিকে নিষ্ঠুর উল্লাস। ভাগীরথীর পূর্বতীরে মীরজাফরের জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের বধ্যভূমিতে সিরাজের অর্ধমৃত দেহটাকে এনে ফেলা হয়।

মীরজাফরপুত্র মীরণ (সাদেক আলি খাঁ) আদেশ দেয়—"মহম্মদী বেগ, তুমি সিরাজদ্দৌলার অনেক নিমক খেয়েছিলে না? শেষ কাজটা তাই তোমাকেই সারতে হবে।"

মহম্মদী বেগের হাত একটুও কাঁপে না—দেয় সে তার প্রভুর বুকে ছুরি বসিয়ে।

সিরাজের আকুল আর্তনাদে ধরিত্রীও কেঁপে ওঠে।

—"কেন? কেন? কেন? মহম্মদী বেগ? কেন আমাকে খুন করলে? এই কি তোমার দেশরক্ষার চরম নিদর্শন! এরা কি জন্মভূমির কোলে আমার এক মুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারলে না!··না না না আমার বাঁচা অসম্ভব, এরা আমাকে বাঁচতে দিতে পারে না। অন্য কোন অপরাধে না হোক, হোসেন কুলি, তোমাকে যে হত্যা করেছি। ফৈজি, তোমারই বা কি এমন অপরাধ ছিল? আজ এই দেহ তার শাস্তি ভোগ করুক।"

···শূন্য দৃষ্টিতে মহম্মদী বেগকে বলেন: "থাম—থাম, একটু থাম, অন্তিম কালে খোদার পায়ে একবার শেষ আত্মনিবেদন করে নিই।"

উন্মত্ত, রুধিরপিপাসু মহম্মদী বেগের ছুরি আর থামে না—আরও যেন মাতাল হয়ে ওঠে।

যথেষ্ট! যথেষ্ট! সিরাজদরবার, এই বার পরিতৃপ্ত হও। সিরাজের জড়িত কণ্ঠস্বর শূন্যে মিলিয়ে যায়। ধরিত্রী কেঁদে ওঠে, মুষলধারে বারিবর্ষণ সুরু হয়।

পিশাচের দল তাণ্ডবনৃত্য সুরু করে। এ দানবীয় হত্যাকাণ্ডেও পরিতৃপ্ত হয় না। সিরাজের দেহের টুকরোগুলো হাতীর পিঠে নিয়ে মহোল্লাসে বেরোয় নগর পরিক্রমায়। এ দৃশ্যে নারীরা অনেকেই মূর্ছা যায়। অসহায় পুরুষের দল বুক চাপড়ে কেঁদে ওঠে। পুত্রশোকাতুরা জননী 'আমিনা' লজ্জা-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে হাতীর সামনে এসে লুটিয়ে পড়েন। সসম্ভ্রমে হাতী জননীর সম্মুখে বসে পড়ে শুঁড় উত্তোলন করে রাজমাতাকে তার শ্রদ্ধা জানায়।

জননী পুত্রের খণ্ডিত দেহ বক্ষে ধারণ ক'রে হায় হায় করতে থাকেন।

মীরণের আদেশে সিরাজ-জননীকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় কারাগারে। আমিনা অভিশাপ দেন মীরণকে, "অচিরকাল মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হবে তোর মাথায়।"

সিরাজের খণ্ডিত দেহের টুকরোগুলোকে নিয়ে গিয়ে অবশেষে খোসবাগ সমাধি-মন্দিরে··মাতামহ আলিবর্দীর সমাধির পূর্বপার্শ্বে শত্রুপক্ষ কবর দেয়।

মীরজাফরের আদেশে রায়দুর্লভ বড় নৃশংসভাবে হত্যা করান মোহনলালকে। উল্লাস রজনীর শেষ হল।

—"কর্ণেল ক্লাইভ! এখন আমার বুদ্ধির তারিফ করুন সাহেব। কি ভাবে খাল কেটে কুমীর নিয়ে এলাম দেখলেন তো!"

—"নিশ্চয়! সব দেখলাম উমিচাঁদ। বেইমানিতে তোমার জুড়ি মেলা কঠিন। হাঁ, এখন কি করবে মনস্থ করেছ?"

—"মোট তিরিশ লক্ষ টাকা আপনার কাছ থেকে পেলেই দিব্যি কেটে যাবে শেষ জীবনটা। আর মাঝে-সাঝে একটু আল্লার নাম-টাম করব। বয়সও তো এদিকে হয়ে এল।"

—"তবে মক্কায় গেলেই ভাল করতে।"

—"আমার টাকাটা?"

—"কিসের টাকা তোমার? হায় রে মূর্খ, ও দলিল যে জাল, তাও জান না? মুর্শিদাবাদে আর এক মুহূর্ত নয়, সরে পড়। না গেলে বিপদের আশঙ্কা আছে।"

দেড় বছর পরে ছিন্নবাস উন্মাদ উমিচাঁদ ফিরে আসে মুর্শিদাবাদ, ক্ষেপা শূন্যদৃষ্টিতে মাঝে মাঝে প্রাসাদগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। ঘোলাটে চোখ দুটো তার পথের ধূলোয় কি যেন খুঁজে ফেরে।

ছেলের দল পেছনে লাগে,—"কি খুঁজছিস পাগলা?"

—"চুপ, চেঁচাস নে। দেখছিস না টাকা খুঁজছি!—অনেক টাকা—এখানকার মাটিই সব খেয়ে ফেলেছে! একটা দুটো করে কুড়িয়ে অনেক ভর্তি করেছি ঝোলাতে!" পাগল কেবল মাটি হাতড়ায়। ঝুলি ভর্তি হয় খোলা খুঁটিয়ে।

অবশেষে একদিন পাগলার ধূলামাখা দেহটা রাস্তার ধারে এক গাছতলায় চিরদিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ে।

সিরাজ হত্যার দেড় বছর পর ১৭৫৮র ডিসেম্বরে নবাব মীরজাফর খাঁ, লুৎফুন্নেসা, সিরাজের চারবছরের শিশুকন্যা জহুরা, আমিনা, ঘেসেটি বেগম আর সরফউন্নেসাকে ঢাকায় নির্বাসন দিলেন।

সিরাজ পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য মাসে মাত্র ৬০০৲ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা হল। তাও আবার প্রতিমাসে পাওয়াও দুষ্কর হল। অসহায় সিরাজ পরিবারের দুঃখের আর অবধি থাকল না।

সুযোগ বুঝে কেউ বা পূর্ণযৌবনা সুন্দরী লুৎফুন্নেসাকে পরামর্শ দেয় পুনঃ পতি নির্বাচনে।

উন্নতচরিত্রা লুৎফা 'সারমেয়' সম্বোধনে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

* * * *

মীরণের অন্তরে সর্বদাই দাবানল জ্বলতে থাকে, কি উপায়ে সিরাজ পরিবারকে জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন করা যায়। সাদেক আলি খাঁ (মীরণ) পিতার কাছ থেকে আদেশ আনিয়ে নেয়। বার বার

ঢাকায় হুকুম পাঠান হয়, সেরে দাও, সিরাজের শেষ অঙ্কুরটির চিহ্ন যেন পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যায়।

ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদের বাড়ীগুলোও সব একে একে ভাঙা সুরু হয়ে গেছে। মীরজাফর যেন ক্লাইভের হাতের পুতুল, এরা তাই অতীতের কোন ঐতিহ্যই রাখতে দিতে চায় না মুর্শিদাবাদে।

মূর্খ মীরণ কিছুই বোঝে না, তার ঐ এক নেশা।

জাহাঙ্গীর নগরের ফৌজদার জাসারত খাঁ এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করে—এতখানি বেইমানি সে করতে পারে না। কেন এই অবলাদের প্রতি এমন কঠোর শাস্তিবিধান! এরা তো কোন অপরাধ করেনি—কে যেন অন্তরের আড়াল থেকে ফৌজদারকে হুঁসিয়ার করে দেয়।

সাদেক আলি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, বন্ধু বাখর খাঁ জমাদারকে একশত অশ্বারোহী সেনা দিয়ে ঢাকায় রওনা করে দেয়। সঙ্গে থাকে তার নবাব মীরজাফর আলি খাঁর কঠোর আদেশপত্র।

চমকে ওঠে জাসারত খাঁ।

বাখর খাঁ টেনে নিয়ে যায় ঘেসেটি আর আমিনাকে বুড়ীগঙ্গার তীরে। কাড়া-নাকাড়া বেজে ওঠে, উল্লসিত সৈন্যদল অসহায় নারী-দেহ দুটিকে শৃঙ্খলিত করে মাঝদরিয়ায় নিক্ষেপ করে।

নারীর নিষ্ফল ক্রন্দন বুড়ীগঙ্গার বুকে মিলিয়ে যায়,—কেবল আমিনার মুখে সেই অভিসম্পাত: "বজ্রাঘাতে মৃত্যু তোর অবশ্যম্ভাবী পাষণ্ড মীরণ!"

"আল্লা! এ কি কঠোর শাস্তি দিলে খোদা! মীরণকে কেন বজ্রাঘাতে মারলে প্রভু!" মীরজাফর হাহাকার করে কেঁদে ওঠে। ···আমিনার প্রেতাত্মার অট্টহাসি জাফর আলিকে যেন আরও বিভ্রান্ত করে তোলে।···"চরম প্রতিহিংসার আগুনের গলিত রক্ত-প্রবাহ এখনও আমার অন্তরের তপ্ত কটাহে টপ টপ করে ঝরে পড়ছে দেখতে পাচ্ছিস মীরজাফর! সিরাজকে এমনি ভাবেই না একদিন আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলি? শয়তান। এতেও তোর তৃপ্তি হয়নি। তাই আজ দিনমানে বুড়ীগঙ্গার জলে আমাকেও ডুবিয়ে মারলি—তবুও শান্তি পেলি না। গায়ে তোর ওগুলো কি বেরিয়েছে? কুষ্ঠ বুঝি? কি সুন্দর! আল্লার কাছ থেকে বুঝি বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার পেয়েছিস? পাবি—পাবি—আরও পাবি!"

মীরজাফর বিভীষিকা দেখে। জ্ঞানশূন্য দেহটা তার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

১৭৬৫ সালের ডিসেম্বরে আলিবর্দী বেগম সরফুন্নেসা, সিরাজমহিষী লুৎফুন্নেসা, কন্যা জহুরাকে নিয়ে ফিরে এলেন মুর্শিদাবাদে। এতদিনে লর্ড ক্লাইভ এই তিনজন রমণীর কারাযন্ত্রণা মকুব করেছেন।

লুৎফুন্নেসা ইংরাজ কর্তৃপক্ষের নিকট মর্মস্পর্শী ভাষায় এক আবেদন-পত্র পাঠালেন নিজেদের উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থার জন্তে। (এই পত্রে সরফুন্নেসা, লুৎফুন্নেসা ও জহুরার শীলমোহরের ছাপ আছে—Calender of Persian Correspondence, 452. Letter No, 2761, Received by the Governor General on 10th December 1765.) সুরাহা একটা হল বটে, তবে সম্রাজ্ঞবংশীয়ের পক্ষে যৎসামান্য। লুৎফুন্নেসা ও জহুরার ভরণপোষণের জন্য মাসিক ছ'শো টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা হল কোম্পানীর তরফ থেকে।

জহুরা বড় হয়ে উঠেছে। মীর আসাদ আলির বিয়ে হল জহুরার সঙ্গে সামান্য এক পরিবেশের মধ্যে।

বিয়ের পর কয়েকটা বছর মাত্র কাটল। আসাদ আলিও মারা গেল। এতেও খোদার তৃপ্তি নেই—আলিয়ে-পুড়িয়ে রাজকুঁয়ারকে খাঁটি সোনা বুঝি করতে চায়। আবার চায় জহুরাকে। ১৭৭৪-এ লুৎফুন্নেসার দরজায় খোদার তাঞ্জাম এসে হাজির হয় জহুরার নামে আমন্ত্রণপত্র নিয়ে। স্বর্গের অপ্সরার বুঝি অভাব হল; তাই মর্ত্যের ডাকসাইটে সুন্দরী রাজকুঁয়ারের কন্যায় ডাক পড়ল। যৌবনমদগরবিণী কন্যাকে নিজ হাতেই জননীর দিতে হল সাজিয়ে দেবদাসীর বেশে। কি সুন্দর সে মূর্তি, কি সে বেশ-বিন্যাস! জহুরার শিশুকন্যারা সরফ্উন্নেসা, আসমৎউন্নেসা, সাকিনা আর আম্মতুল-মাহেদী একে একে নতজানু হয়ে জননীর পদধূলি থেকে আশীর্বাদ কুড়ায়। তাঞ্জাম ওঠে বাহকের স্কন্ধে। শুভ্র পুষ্পস্তবকে জননী লুৎফুন্নেসা কন্যাকে আশীর্বাদ দেয়। জহুরার ফেলে যাওয়া 'পারিজাত' চারটিকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে স্থির নেত্রে তাঞ্জামের পানে চেয়ে থাকে লুৎফা। পাষাণের বুক চিরে নেমে আসে ধীরে মাত্র কয়েক বিন্দু অশ্রু।

জহুরার পরলোকপ্রাপ্তির পর ইংরাজ কর্তারা পূর্ব ব্যবস্থাকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে এক শ' টাকা লুৎফুন্নেসা আর বাকি পাঁচ শ' জহুরার কন্যাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

কায়ক্লেশে দিন চলতে থাকে। দৌহিত্রীরাও একে একে যৌবনের দরজায় এসে পা বাড়ায়। অনাথা বালিকাদের বিবাহের বয়স সাড়ম্বরে এসে পড়েছে দেখে অর্থচিন্তায় লুৎফা উন্মাদিনীপ্রায় হয়ে পড়লেন। এখন উপায়? কোথায় টাকা। লাঞ্ছিতা অনাথাকে এ বিপদে কে সাহায্য করবে? ভগবান, আর যে সহ্য হয় না—এর থেকে মৃত্যুও যে ভাল ছিল।

আজ ভিখারিণী হলেও বাংলার সম্রাজ্ঞীরই হাতের চিঠি যায় ১৭৮৭র মার্চে বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিসের কাছে:—"নবাব সিরাজদ্দৌলার মৃত্যু এবং তাঁহার আত্মীয়বর্গের, বিশেষতঃ আমার জহরৎ, অলঙ্কার ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠনের সময় হইতে আমি শোক-দুঃখের নিষ্ঠুর ঘাত-প্রতিঘাতে কূল-হীন সমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়াছি। আমি আমার দুঃখ-কাহিনী পুনর্বিবৃত করিতে বিরত হইলাম, কেন না ইহা আমার কষ্ট বাড়াইবে মাত্র এবং উদারনৈতিক শ্রোতাদিগের অন্তরেও যে দুঃখ দিবে তাহাতে আমি নিঃসন্দেহ। অতএব সংক্ষেপে আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি—নবাব সিরাজদ্দৌলার মৃত্যুর পর মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ আমার ছয় শত টাকা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া আমাকে জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকায়) পাঠাইলেন। (মুঈন উদ্দৌলা মুজাফফর জং মুহম্মদ রেজা খাঁ ঢাকার শাসনকর্তা হইয়া আসিবার পর সিরাজ পরিবারের যাহা সামান্য বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল তাহা তাঁহারা নিয়মিতভাবে পাঠাইতে লাগিলেন)। কোম্পানী দেশের সাক্ষাৎ শাসনভার গ্রহণ করিলে আমি জাহাঙ্গীরনগর হইতে ফিরিয়া আসিলাম। কিছুদিন পর আমার কন্যা পরলোকগমন করে। তারপর সেই ৬০০৲ টাকার বৃত্তি এইরূপে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল—তাঁহার চারি কন্যা (আমার দৌহিত্রীরা) ৫০০৲ টাকা পাইবে, আর ১০০৲ টাকা আমার অংশে পড়িবে। আমার সহচরী এবং দাসীগণের

মধ্যে প্রায় সকলেই স্বর্গীয় নবাবের আমল হইতে আমার কাছে আছে, অতএব আমি এখন তাহাদের বরখাস্ত করিতে পারি না। তাহা ছাড়া সংসারের সম্মান বজায় রাখিয়া চলিতে পরিচারকবর্গের একান্ত প্রয়োজন। আমার কোন জায়গীর নাই অথবা এমন কোন উপায় নাই যাহা হইতে এই সকল ব্যয় নির্বাহ করিতে পারি। চারি দৌহিত্রীর মধ্যে দুইজনের বিবাহ হইয়াছে, অতএব তাহাদের খরচ বাড়িয়াছে। অপর দুইজন অবিবাহিতা। ইহার অর্থ ইহাদের গুরুভার উত্তোলন করিতে হইবে, ইহা আমার বর্তমান অবস্থা ও ক্ষমতার অতীত। ইহা চিরদিনের নিয়ম এবং ন্যায্য বিচারে ইহা দাবী করা যায়, যদি কোন সর্দার কোন অপরাধে অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হন তাহা হইলে তাঁহার পত্নী ও সন্তানদের তজ্জন্য দায়ী করা হয় না। অন্যায় ও অনুপযুক্ত ব্যবহারের জন্য দোষী এইরূপ প্রত্যেক সর্দারের পক্ষে কোম্পানীরও ইহাই রীতি, অর্থাৎ অপরাধীকে তাহার অন্যায় কার্যের জন্য শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, আর তাহার সন্তান ও পোষ্যগণের ভরণ-পোষণের জন্য বৃত্তি নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু আমার বেলায় নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত আমি কোন বৃত্তি পাই নাই যাহাতে আমি অন্ততঃ বাহ্যিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও দিন অতিবাহিত করিতে পারি। আমি আপনার নিকট এই আবেদনপত্র পাঠাইতেছি, কারণ আপনার অপেক্ষা অধিকতর সদয় ন্যায়বান এবং উদার শাসক ইহার পূর্বে এদেশে আসেন নাই এবং প্রার্থনা করি, অনুগ্রহ করিয়া আমার একটা বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, যাহাতে আমার অবশিষ্ট দিনগুলি সসম্মানে কাটাইতে পারি।" (Petition of Lutfu-un-nisa R. B. P. 14th June 1774. No 20 (Bengal Govt. Record) Letter to Richard Barwell Esqr. Chief etca Provincial Council of Revenue of Dacca, dated Fort William 14th June 1774. Ibid P. 5248. Original Receipts 1787. No. 176,—প্রকাশ ১৯২৫ খৃঃ নভেম্বর মাসে লাহোর ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের কিয়দংশের অনুবাদ)।

নিগৃহীতের আবেদন, মর্মস্পর্শী হা-হুতাশ কিছুই যেন পিচ্ছিল শিলাখণ্ডে আশ্রয় করতে পারে না। এই বণিক দলই না একদিন বণিকের মানদণ্ড ফেলে রাজদণ্ড ছিনিয়ে নিয়েছিল লুৎফুন্নেসা তোমারই স্বামীর হাত থেকে? তবে কেন তার কাছে এত ক্রন্দন? কে তোমার দীর্ঘনিঃশ্বাসের অংশ গ্রহণ করবে, কে তোমার চোখের জল মোছাবে? হায়রে অভাগী!

লর্ড কর্ণওয়ালিসের কাছ থেকে উত্তর আসে: "আর কিছু হবে না।"

লুৎফুন্নেসার ক্ষতবিক্ষত হৃৎপিণ্ডটা যেন ছিঁড়ে আরও টুকরো টুকরো হয়ে যায়। উন্মাদিনী হয়ে ওঠে চিন্তাধারা। এখন উপায়? অনাথার মনোবল সর্পিল ফণা বিস্তার করে গর্জে ওঠে। একদিন তুমিই না লুৎফুন্নেসা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেবীরূপে সহস্র সহস্র লোকের কুর্ণিশ কুড়িয়েছিলে? আর আজ দুঃসর্বস্ব অনাথিনীর চোখের জল ছাড়া কিছুই সম্বল নেই। হে গরবিণী নারী, কোথায় গেল তোমার সাধের স্বপ্নরাজ্য? চিন্তায় এর পথ খুঁজে পাবে না। সর্বংসহা ধরিত্রীর মত সকল ঝঞ্ঝার গতিবেগ তোমাকে এখন বক্ষে ধারণ করতে হবে।

এখনও বেঁচে থেকে স্বামীর কবরে রোজ দুটো ফুল দিতে পারছ, তার জন্যে দু'হাত তুলে খোদাকে সেলাম জানাও। দেবতাজ্ঞানে স্বামীকে পূজা করছ, এই তো তোমার স্বর্গ। নিপুণ শিল্পীর হস্তে স্বামীর বেদীটি প্রতিদিন কতরূপেই না বিন্যাস করছ। পবিত্র বেদীমূলে শুভ্র পুষ্পের পরশন—তোমারই হাতের ছোঁয়া লেগে তোমার অন্তরটাকে কি অনাবিল করে না? তবে কিসের চিন্তা লুৎফুন্নেসা?

লর্ড ক্লাইভ, কত চাতুরী তো করলে, ইংলণ্ডের দরবারের শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েও কিছুই পেলে না। জালিয়াতির শাস্তি তোমার অন্তরকে কি পেতে হয়নি? বড় আশায় বুক বেঁধে স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলে। কিন্তু আপামর সাধারণের থুৎকারে নিজের জীবনটা কি বিষিয়ে ওঠে নি? তবে কেন নিজের রিভলবারের গুলীতে জীবনের যবনিকার পর্দা টেনে দিলে?

হেষ্টিংস সাহেব, তোমাকেও জিজ্ঞেস করি—তুমিও তো ইংলণ্ডের রাজদরবারের কাছ থেকে বাহবা পাওয়ার জন্যে বাংলার নবাবের সিংহাসনখানাও বুকে করে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে; কিন্তু বিনিময়ে কি পেয়েছিলে তার? ভারতবাসীর ওপর অত্যাচারের কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্যে কি ইংলণ্ডের আদালতে দীর্ঘ সাত সাতটা বছর অপরাধীর কাঠগড়ায় হাজির হতে হয়নি তোমাকে? হিন্দুস্থানের জলে পুষ্ট তোমার সেই নধর কান্তি এই সাত বছরে প্রশ্নের কষাঘাতে কি কঙ্কালসার হয়নি?

মুর্শিদাবাদে ফিরে আসার পর থেকেই খোসবাগ সমাধি-মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লুৎফুন্নেসার ওপরই ন্যস্ত ছিল। নিজের বাসস্থানটুকুও তিনি এর ভেতরেই করে নেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এইখানেই তাঁর কেটে যায়। নবাব আলিবর্দী খাঁর সময়ের সেই ৩০৫, টাকাই মাসিক বরাদ্দ লুৎফুন্নেসাকে দেওয়া হত সমাধি-মন্দিরের খরচ চালানর জন্যে; আর তার সঙ্গে তাঁর ভাতা বাদে আরও ১০০৲ টাকা। "কাবেরী" (কোরান পাঠকের মাহিনা) এবং লঙ্গরখানার খরচ, এ ছাড়া আনুষঙ্গিক সকল খরচই ঐ ৩০৫৲ টাকার ভেতরই ধার্য ছিল।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বেগম লুৎফুন্নেসার দুঃখের জীবন চিরশান্তির কোলে আশ্রয় পেল। লুৎফুন্নেসার ছেড়ে যাওয়া পবিত্র দেহটাকে খোসবাগে নবাব সিরাজদ্দৌলার সমাধির বামপার্শ্বে অতি সাধারণভাবেই সমাহিত করা হয়।

জানি না লুৎফুন্নেসা তুমি কার কন্যা, কোন্ মহান বংশোদ্ভূতা তুমি। ইতিহাস বুঝি এখনও সে সাক্ষ্য দিতে লজ্জাবোধ করে!··সে সত্য-মিথ্যার বিচার করতে পাঠক চায় না। তবে এটি সত্য যে, তুমি স্বয়ংসিদ্ধা—হিন্দুস্থানের কন্যা তুমি—এই পরিচয়ই তোমার অনেক হবে। কালের করাল ভ্রূকুটি তোমার যৌবনের কাছে একদিন না নতি স্বীকার করেছিল? সতী, সাবিত্রী-দময়ন্তীর কাছে তো তুমি হার স্বীকার করনি কোন দিন! একনিষ্ঠা স্বামীপ্রেমে পাগলিনী তুমি পুণ্যশ্লোকা!—রমণীর মুকুটমণি তুমি!

প্রায় দু শ' বছরের ঘাত-প্রতিঘাতে তোমাকে আমরা সবাই একে একে ভুলেছি। শত্রু-মিত্র কেউ তোমার খোঁজ করে না। তবে ভোলেনি কেবল খোসবাগ। খোসবাগ সমাধি-মন্দির এখনও তোমার স্মৃতিচিহ্নটুকু বুকে নিয়ে পড়ে আছে ভাগীরথীর পারে। বাংলার মসনদের শেষ সম্রাজ্ঞীর কি এই চরম নিদর্শন?

চোদ্দ

তখনই সম্ভব না হোক, জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ বম্বে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারল দীপংকর। অফিসের কাজটা হাল্কা আছে একটু, এই ফাঁকে জীবেন গুপ্তর ওপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে সপ্তাহ তিনেকের ছুটি যোগাড় করে ফেলল। মতলব ছিল দিদির কাছে ক'দিন কাটিয়ে নিজেরা এধার-ওধার একটু ঘুরে আসবে। কার্যক্ষেত্রে মুখ ফুটে বলতেই পারল না কথাটা, তবে প্রয়োজনও ছিল না কোন। বেড়ানো হ'ল প্রচুর, কল্যাণীর আদর-যত্নে দিনগুলো ভালই কাটল।

কলকাতার চিঠিতে জেনেছে, দেবাশীষ কলকাতায় নেই। দীপংকররা যখন এল তখনও সে যথাপূর্ব উন্মত্ত হয়ে ছিল তার সংঘ নিয়ে। মনে মনে মতলব ভাঁজছিল কোন্ সময় ঠিক সুযোগ বুঝে বাবার কাছে কিছুদিনের ছুটির আর্জি পেশ করা যায়। সদলবলে গ্রামোন্নয়ন কি ঐ ধরণের অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া যায় তাহলে। কিন্তু সে সুযোগ খুঁজে নেবার আগেই ছুটি এল অমরনাথেরই কাছ থেকে। কারণটা দেবাশীষের সংঘের প্রতি সমবেদনাপ্রসূত নয় অবশ্যই। বরং গম্ভীরকণ্ঠে জানালেন, বিশেষ কাজে দেবাশীষকে বিলাসপুরে রওনা হতে হবে যত শীঘ্র সম্ভব, সংঘ নিয়ে মাতামাতিটা কিছুদিন স্থগিত রাখা প্রয়োজন আপাততঃ।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই—বিলাসপুরে অমরনাথের এক জ্ঞাতি কাকা থাকেন। বিপত্নীক, নিঃসন্তান ভদ্রলোক। গভর্ণমেণ্ট অফিসে সামান্য একটা কাজ করতেন, কলকাতায় ছিলেন অনেকদিন, তারপর বদলি হয়ে যান বিলাসপুরে। রিটায়ার করেও ওখানেই আছেন। কলকাতায় ছিলেন যখন অমরনাথের সংগে অন্তরের যোগ ছিল, সম্পর্কটা দূরের যদিও। দেবাশীষ ছোট তখন, তার মায়ায় সময়ে-অসময়ে ছুটে আসতেন তিনি শ্যামবাজারে। চলে গেছেন, সেও অনেক দিন হ'ল।···চলে যেতে প্রথম কিছুদিন হয়তো দেবাশীষেরও মন কেমন করেছিল অসমবয়সী খেলার সাথীটির জন্য, আজ আর মনেও পড়ে না। দিনে দিনে তার পৃথিবীর গণ্ডী বড় হয়ে গেছে অনেক। মাঝে মাঝে চিঠি দিতেন তিনি, দেবাশীষও উত্তর দিয়েছে··ক্রমে কেমন করে যেন পত্রবিনিময়ও বন্ধ হয়ে এসেছে।···নন্দিতার বিয়েতে নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও আসেন নি, আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন চিঠিতে, তাতেই লিখেছিলেন শরীরটা ভাল নেই।···হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছেন অমরনাথ—দেবাশীষকে একবার শেষ দেখা দেখতে চান, তারই সনির্বন্ধ অনুরোধ।

দেবাশীষকে বিলাসপুরে যেতে হ'ল। প্রসন্ন মনে যায় নি। চারপাশ ঘিরে বিস্তৃততর জগতের আহ্বান, তার মাঝে ছেলেবেলায় নিজেই লজেন্স-চকোলেট ঘস দিয়ে তার দৌরাত্ম্য সইতেন যে মানুষটি তাঁর স্থান ছিল না কোথাও।··গিয়ে মত বদলালো। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে যথেষ্ট, সমাজ-সংসারের কোথাও তাঁর প্রাণের মূল্য এত বেশী নয় যে, মারা গেলে আফশোষ করবে কেউ। অসুখটাও বার্ধক্যজনিত। এই পরিণত বয়সে মারা গেলে দুঃখ করবার সংগত কারণও নেই কোন।··তবু নিঃসংগ একটি বৃদ্ধ মানুষের তিল তিল মৃত্যু, সে বড় মর্মান্তিক। আর তাঁর ভালবাসার বাঁধনটাও শক্ত বড়। এতদিন পরে দেবাশীষকে দেখে যেন হাতে চাঁদ পেলেন। এক কথায় এত তাড়াতাড়ি আসবে, বোধহয় ভাবেন নি।

একবার দেখা করে আসবার কথা ছিল, সে কথা উহ্যই থেকে গেল। বাড়ীতে খবর দিয়ে দিল দেবাশীষ, দাদুর কাছে থেকে গেল কিছুদিন।··সুষমার মন খারাপ একটু হলই। জ্ঞাতি খুড়শ্বশুরের প্রতি সমবেদনা যতই থাক, এটা একটু বাড়াবাড়ি মনে হ'ল। অমরনাথের স্বভাব জানেন, বারণ ক'রে লাভ হবে না। তবু ঘুরিয়ে বলেছিলেন, দেবু না থাকলে একা অমরনাথের অফিসের কাজে অসুবিধে হবে বড়··তার চেয়ে কাকাবাবুকে এখানে নিয়ে এলেই তো হয়।

মনোগত ভাবটা তবু ধরা পড়তে দেরী হয়নি অমরনাথের কাছে, তবে ভাঙেন নি।

হাসি চেপে গম্ভীরভাবে বলেছেন, "সে অবস্থা থাকলে তো!" একটু চুপ করে থেকে মন্তব্য করেছেন আবার, "ছেলের সম্বন্ধে ধারণা তোমার খুব উঁচু দেখছি! তা ভাল! এমনই অকর্মণ্য হয়ে পড়েছি যে, তোমার ছেলে না থাকলে আমার অফিসই চলবে না! হ্যাঁগো, এই তো সেদিন ঢোকালাম ওকে, তার আগে কি খেতে পেতে না?"

সুষমা দুর্বলকণ্ঠে বলতে চেষ্টা করেছিলেন তবু, "না, তা কি আর বলছি! বলছি যে—"

—"যা বলছ তা বুঝতেই পারছি··হ'ত একটা শাঁসাল আত্মীয়—মরবার সময় ছেলেকে তোমার মোটা অংকের দিয়ে যেতে পারত কিছু—'

আর দাঁড়ান নি সুষমা। দৃষ্টিতে অগ্নিবর্ষণ করে বেরিয়ে গেছেন। অমরনাথ সকৌতুকে হেসে উঠছিলেন, সুষমাকে জব্দ করায় আনন্দে।···

সম্প্রতি দেবাশীষ লিখেছে, ফিরতে ওর একটু দেরীই হবে। দাদু আগের চেয়ে একটু ভাল আছেন, নাড়ানাড়ি করবার মত অবস্থা হলে তাঁকে নিয়েই ফিরবে কলকাতায়।

অমরনাথ সানন্দে মত দিয়েছেন।

দীপংকররা ফিরল যখন, কল্যাণী তাঁর দুটি মেয়েকে নিয়ে সংগে এলেন। বহুকাল আসেননি কলকাতায়। পাঞ্জাব থেকে ইচ্ছে হলেই চলে আসা সম্ভবও নয়, তার ওপর সংসারের ঝঞ্ঝাট। এবার ভাই-ভাজের সংগে চলে আসার সুযোগটা ছাড়লেন না, একরকম জোর করেই বেরিয়ে পড়লেন। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে এখন, সেদিক দিয়ে অনেকটাই নিশ্চিন্ত। বড় মেয়েকে রেখে এসেছেন সংসার তদারকিতে। মাসখানেকের ছুটি, কথা আছে, ছেলে এসে নিয়ে যাবে।

বড় ননদ সংগে আসায় নন্দিতার এই ক'মাসের জীবনধারার বদলালো অনেক। কল্যাণী মানুষটি মোটামুটি ভালই, অল্প দিনেই আপন করে নিতে জানেন।···তবু ভায়ের সংসারে এসেছেন প্রথম, আপ্যায়নের দায়িত্বটা সম্পূর্ণই নন্দিতার। পাছে কর্তব্যের ত্রুটি ঘটে, একটা ভয় লেগেই রইল মনে।

এই এক মাসে দেখা-সাক্ষাৎ, বাজার ইত্যাদি বহুবিধ কাজের ফর্দ আছে কল্যাণীর, সে সবের মধ্যেও নন্দিতাকে টানেন। বিশেষতঃ বাজার করতে নন্দিতাকে না হলে তাঁর চলেই না। নন্দিতার নিজের সময় বলতে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। শ্যামবাজারে কোনদিন গেলেও সে কল্যাণীদের নিয়ে। সুষমা নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছেন সবাইকে একাধিক দিন, নন্দিতা অনেকক্ষণ থেকেও এসেছে, তবু আজ অবধি বম্বাই ভ্রমণের গল্প করবারও সুযোগ পায়নি মা'র সংগে।···শর্মিষ্ঠার সংগেও দেখা-সাক্ষাৎ নেই বললেই চলে। একদিন এসেছিল দেখা করতে, আর আসেনি তারপর। নন্দিতা তো পারেই না যেতে। শর্মিষ্ঠা আসেনি বলে রাগ করতেও পারে না তার নিজেরই তো বসবার ফুরসৎ নেই।

বাইরের দায়িত্বটা বাঁধছে যত, ভেতরে-ভেতরে অস্ত চিন্তার আলোড়নে মনটা ততই চঞ্চল হয়ে উঠছে। বিষয়বস্তুটা নতুন নয়। বম্বাই যাবার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই একটা সন্দেহ মনের মধ্যে ঘূর্ণির মত পাক খেয়ে যাচ্ছে বার বার। তখন চেষ্টাও করেছে অনেক, শক্ত লক্ষ্য রেখেও বুঝতে পারেনি সন্দেহটা সত্যি কিনা। সংশয় থেকেই গেছে, সঠিক প্রমাণ পাবার উপায় খুঁজে পায়নি।

শুভজিতের আচার-আচরণে যে আপাত-অর্থহীন প্রহেলিকা দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, কিছুদিন থেকে তার মধ্যে কি একটা কার্য-কারণের আভাস পেয়েছে নন্দিতা। প্রমাণের অভাবে স্পষ্ট করে বলা চলে না কিছু, বিশেষতঃ শুভজিতের কার্যকলাপ এমন বিভিন্ন খাতে বয়, নিজের সিদ্ধান্তে নিজেরই আস্থা থাকে না। প্রকাশ করে বলতেও দ্বিধা তাই। বলি-বলি করেও বাধে কোথায়, থেমে যায় বার বার।···তবু মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠেছে ক্রমেই।··· বিদেশ-যাত্রার প্রস্তুতি-পর্বে একা ঘরে নানা কাজের ব্যস্ততার মধ্যে এই সমস্তা নিয়ে তোলপাড় করেছে অনেক।···মনস্থির করে ফেলেছিল দীপংকরকে খুলে বলতে হবে সব, আর না বললেই নয়। প্রমাণ তার হাতে কিছুই নেই অবশ্য। তবু দু'একটি অসতর্ক মুহূর্তে শুভজিতের চোখে যে আলোর ক্ষণিক প্রকাশ দেখেছে, তার জাতটা ধরা পড়েছে বলেই মনে হয়। দীপংকরকে জানান দরকার। না হলে সে নিজে হতে দেখতে পাবে, এমন ভরসা নেই। জেগে ঘুমোয় [illegible]

কাজেই তার চোখে কবে পড়বে, সেই আশায় চুপ করে বসে থাকা নয়, একটা কিছু করা দরকার।··পাথরের নির্লিপ্ততা দেখেছিল শুভজিতের মধ্যে। তারপর হয়তো পরিবর্তন এসেছে মনে, কঠিন পাথর চিড় খেয়েছে কোথাও।··শুধুই আন্দাজ অবশ্য, যাচাই করবার সুযোগ ঘটেনি। সংশয় কাটে না তাই।··না হলে অনেকদিন বলে ফেলত।

নন্দিতার দোষ নেই, শুভজিৎকে বোঝাই শক্ত।

শুভজিতের ভাবনার স্রোত মনের মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে মরে গুহার আঁধারে অবরুদ্ধ নির্ঝরের মত। বেরোবার পথ খুঁজে পায় না।

শুভজিৎ নিঃসংগ, শুভজিৎ একা।

যতদিন বিহারে ছিল, এই নিঃসংগতাই সংগী হয়ে ফিরত পাশে-পাশে। কলকাতায় এসে সে জীবনটা ঘুচেছে অবশ্য, তবে সেটা বাহ্যিক। হাসপাতাল আর চেম্বারের কর্মমুখর ব্যস্ততায়, দেবাশীষদের সংগে হাসি-গল্পে ভরা অবকাশে সময়টা ভালই কাটে, এই পর্যন্ত। অন্তরের নাগাল পায় না কেউ। কোনদিন তাই ওকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখে বিস্মিত হয় দেবাশীষরা, নন্দিতার মনের প্রশ্নগুলো জবাব খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ হয়।

একমাত্র দীপংকর। দীপংকর চেনে শুভজিৎকে। কলেজে সহপাঠী হিসেবে পরিচয়, সৌহার্দ্যের বাঁধন দৃঢ় হয়েছে ক্রমে। এই একটিমাত্র লোক, যার কাছে নিজের কথা বলে শুভজিৎ। আজও বলে, তেমন নির্জন অবকাশ পেলে। মানে নন্দিতাও অপাংক্তেয়।

নন্দিতা জানে তা। জানে বলেই নিজের বুদ্ধি-বিবেচনায় সন্দিহান।

দীপংকরকে আভাসেও কিছু বলেনি শুভজিৎ, এটা সুস্পষ্ট। তাহলে এতটা নির্লিপ্ত সে থাকত না নিশ্চয়ই। কিন্তু নন্দিতা যদি বলে, বিশ্বাস করবে কি? হয়তো হো হো করে হেসে উঠে একেবারে উড়িয়ে দেবে কথাটা! এটুকুতে শেষ হলেও বা কথা ছিল। যা বন্ধুপ্রীতির ঘটা দেখা হলেই সবিস্তারে শোনাতে বসবে।···হয়তো সম্পূর্ণ ভুল ধারণা নন্দিতার, হয়তো শুভজিতের মনে কোন রেখাই পড়েনি। তখন আর লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না। হয়তো সকৌতুকে হাসবে শুভজিৎ, হয়তো বা আহত হবে।···আর যদি সত্যিই হয়, নন্দিতা কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারে? কোন প্রতিবিধানের নিশ্চয়তা? না, তা পারে না। শুধু যে সংশয় আছে এমন নয়, কোন সম্ভাবনাই আছে কিনা সন্দেহ। সহজ যুক্তিতে সহজ সমাধান চোখের সামনে ভাসে, সুমধুর কল্পনায় মনটা খুসী হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু চোখের সামনে যা দেখে, তাতে ভরসা পায় না।

তবু কলকাতায় থাকত যদি, দীপংকরকে বলেই ফেলত কোনদিন। কিন্তু বম্বেতে অনেকের মধ্যে হৈ-হৈ করে দিনগুলো কেটে গেল। বলা হয়ে ওঠেনি। কলকাতায় ফিরেছে হৈ-হৈ-এর রেশ সংগে নিয়ে।···অনেক কথা ভেবে ভেবে এখন অবশ্য বলার বাসনাটাও ঘুচেছে।···ফিরে এসে সন্দেহটা ঘনীভূতই হয়েছে আরও, সেই সংগে বলার দ্বিধাটাও বেড়েছে একদিক থেকে। বলেনি তাই। এ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময়ও পাচ্ছে না বড়। কলকাতায় ফিরে অবধি কর্তব্য সম্পাদনে সবিশেষ ব্যস্ত। অন্য দিকে মনোযোগ দেবার সুযোগ জোটে না।

বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা
কোলে
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০
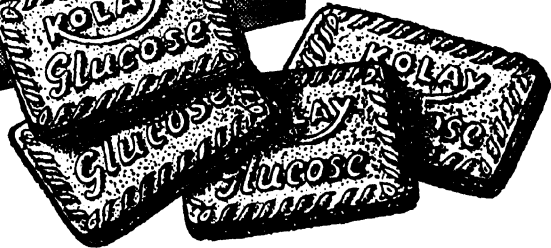
শ্বশুরবাড়ীর কোন নিকট আত্মীয় পরিবারে দেখা করতে গিয়েছিলেন কল্যাণী সকন্যা। কয়েকদিন পরে তাঁরা ওঁদের নিমন্ত্রণ করলেন রাত্রে খাবার। নন্দিতাদের না বলায় তাঁদের ভদ্রতাবোধের প্রতি সন্দেহ জন্মেছে কল্যাণীর, অনেকবার দুঃখ প্রকাশ করলেন।··· নন্দিতা কিন্তু মনে মনে খুসী, একবেলার ছুটি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

আগের দিন কল্যাণীর কাছে শুনল, তাড়াতাড়ি যাবার অনুরোধ আছে, কল্যাণী বিকেলেই যাবেন। শুনেই মনে মনে একটা মতলব ঠিক করে ফেলল।

দীপংকর অফিস থেকে ফিরেছে তখন সবে।

নন্দিতা এল, "কাল একটু সকাল-সকাল ফিরবে?"

দীপংকর ভ্রূকুঞ্চিত করল, "তুমিও শুরু করলে তা হলে! রোজ সকালে দিদির তো এ প্রশ্নটি কম্পালসরি, তারপরই কোথাও নিয়ে যাওয়ার বায়না। কাল যদি বা তার হাত থেকে রেহাই পাবার সম্ভাবনা ঘটল—"

নন্দিতা সশব্যস্তে বাধা দিল, "ক'দিনই বা থাকবেন দিদি! ও রকম করে বলো!"

—"আরে বাবা, বলি কি আর সাধ করে! একে তো এসে অবধি অফিসের ঝামেলা। গুণধর পার্টনারটি যেন তাক করে ছিল। তার ওপর বাড়ীতে রোজই একটা না একটা লেগেই আছে।···তুমি তো হিতোপদেশ দিচ্ছ! বলে শুভোর সংগে একদিন দেখা করার সময় হচ্ছে না আমার। কোথায় যে গেল হতভাগা, তার পাত্তাই নেই!"

মেজাজের মাত্রা দেখে নন্দিতা হাসতে লাগল। নিজে এই প্রসংগ নিয়েই এসেছে। শুভজিতের জন্য দীপংকরের মনটা অসহিষ্ণু হয়ে আছে, নন্দিতা ত্রিসন্ধ্যা আঁচ পায় তার। কলকাতায় এসে অবধি কোন যোগাযোগই নেই প্রায় শুভজিতের সংগে। না থাকার কারণও সে-ই। বম্বেতে নিয়মিত চিঠির উত্তর দিত, কোন ব্যতিক্রম অনুভব করেনি ওরা। ফেরার দিন ষ্টেশনে যায়নি। সেটা স্বাভাবিক, কাজের সময়। দীপংকর অফিসে যায়নি সেদিন, শুভজিৎ সন্ধ্যাবেলাও দেখা করতে আসেনি বাড়ীতে। পরদিন অফিসে গিয়ে শুনল, শুভজিৎ কাল ফোন করেছিল। ভেবেছিল চেম্বারে ফোন করবে তাকে আরও পরে। চেম্বার-আওয়ার্সের দেরী ছিল তখনও। তার অনেক আগেই শুভজিৎ এল, চেম্বারে যাওয়ার পথে।···খুব বেশীক্ষণ রইল না। চেম্বারের যদিও বা দেরী ছিল, দীপংকরের কাজের তাড়া ছিল তারও বেশী। অনেকদিন পরে সেদিনই প্রথম কাজে বসেছে, গল্প করবার সময় ছিল না। কথাবার্তা, কুশল বিনিময়েই সীমাবদ্ধ রইল প্রায়। বলতে হ'ল না, শুভজিৎ নিজেই বলে গেল বেলেঘাটায় যাবে নন্দিতার সংগে দেখা করতে।

এসেছিল দু'-একদিনের মধ্যেই। বাড়ীতে কেউ নেই দেখে ফিরে গেছে। আর আসেনি এই ক'দিনের মধ্যে। কোন খোঁজ খবরও নেই। দীপংকর বার কয়েক চেষ্টা করেও ফোনে ধরতে পারেনি। আর কল্যাণীর জন্য অফিসের পর সময় পায় না মোটেই। কলকাতার রাস্তা তিনি চেনেন না এবং নন্দিতা খানিকটা চিনলেও তার ভরসায় ট্যাক্সিতে উঠতে নারাজ। কলকাতার দুর্বৃত্ত-গোষ্ঠীর বিভীষিকা দেখছেন সর্বদা চারদিকে, কাজেই বেরোতে হলে দীপংকরকে তাঁর একান্ত প্রয়োজন। দীপংকরকে যেতেই হয়। দিদি দূরের মানুষ হয়ে গেছেন, সম্পর্কটায় ভদ্রতাবোধের প্রশ্ন এসে পড়েছে।

ক'দিন আগে সময় করে শুভজিতের মেসে গিয়েছিল দীপংকর। সেখানে নতুন সংবাদ—শুভজিৎ মেস ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন এবং কোথায় গেছে জানে না কেউ। দীপংকরও জানে না শুনে মেসশুদ্ধ লোক অবাক। না জেনে যেন সে-ই অপরাধী! অপ্রস্তুত হয়ে চলে এল তাড়াতাড়ি।

অকূল বিস্ময়। হিসেব করে যা বোঝা যাচ্ছে, ওরা বম্বে যাবার ক'দিনের মধ্যেই মেস ছেড়ে দিয়েছে শুভজিৎ। অথচ জানায়নি কিছু। চিঠিতে নয়, সেদিন অফিসেও নয়।···কি যে হ'ল তাও বোঝা যাচ্ছে না।···এতদিন থাকতে থাকতে হঠাৎ খারাপ লাগল মেসটা?··· মনোমালিন্য হয়েছে কারো সংগে? না কি কোথাও ভাল ঘর পেয়েছে? ডাঃ ব্যানার্জি জোর করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন না তো? আগে বলেছিলেন বহুবার, দীপংকর জানে তা। শুভজিৎ তখন রাজী হয়নি কিছুতেই।···হাজার প্রশ্ন ঘুরছে মনে।

রেগে গিয়ে ক'দিন খোঁজ করেনি, ক্রমে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ভাবছিল কাল শুভজিতের চেম্বারে গিয়ে তাকে ধরবেই।

নন্দিতাও সেই প্রস্তাব করল, "সেইজন্যই তো জিগেস করছি, কাল যেতে পারবে কিনা। দিদির ফিরতে রাত হবে অনেক—আমিও শর্মির বাড়ী যাব, তুমিও যেও ডাঃ চৌধুরীর কাছে।"

দীপংকর এতক্ষণে হৃষ্টচিত্তে হাসল। নাটকীয় ভংগীতে দু'হাত নাড়ল তারপর, "হে ক্ষুদ্রবুদ্ধি শুভজিৎ, তোমার জন্য কি মহৎ আত্মত্যাগে উদ্যত হয়েছি আমরা অবলোকন কর। কোথায় দিদির অনুপস্থিতির সুযোগে ত্রয়োদশীর চন্দ্রালোকে উভয়ের সংগসুখে বিভোর হয়ে থাকব, তা নয়—"

সহাস্যে বাধা দিল নন্দিতা, "তোমার বন্ধু এতক্ষণে বলেছেন, ওহে কল্পনাবিলাসী দীপংকর, ক্ষান্ত হও। স্মরণ রাখ, কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশীর চন্দ্রে আলোকের একান্তই অভাব। তার ওপর নির্জন অন্ধকারে গল্প শুরু করার প্রারম্ভেই তোমার ওপর নিদ্রাদেবী ভর করেন।"

প্রতিবাদটা কতটা তীব্র হলে যথাযোগ্য হয়, বিবেচনা করতে সময় লেগেছিল বোধ হয়, নন্দিতা অদৃশ্য ততক্ষণে।

কাছাকাছি কল্যাণীর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

কনভেন্ট রোডে যখন এল নন্দিতা, তখনও সন্ধ্যা নামেনি। খবর দিয়ে আসেনি, গ্যারেজে গাড়ী আছে দেখে নিশ্চিন্ত। যাক, বেরিয়ে যায়নি।

ভেবেছিল দক্ষিণের বারান্দায় কি লাইব্রেরীতে পাবে, কোথাও নেই। বসবার ঘরেও না। অবশেষে শোবার ঘরে সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। ঘরের একপাশে খোলা জানালার কাছে শ্বেতপাথরের গোল টেবিল একটা। সেই টেবিলে আড়াআড়ি করে রাখা হাত দুটোর ওপর মুখ রেখে শর্মিষ্ঠা চুপ করে বসে আছে। আকাশের দিকে চেয়ে ভাবছে কি, অন্যমনস্ক। পড়ন্ত বেলার বিষণ্ণ আলো এসে পড়েছে মুখে-চোখে, অবিন্যস্ত খোলা চুলে।···সামনে টেবিলের ওপর খোলা একখানা বই। কতক্ষণ থেকে অমনি খোলা পড়ে আছে কে জানে, পাতাগুলো তার আপনমনে এদিক-ওদিক ওলটাচ্ছে মৃদু বাতাসে।

নন্দিতা ঘরে ঢুকতেও টের পায়নি। কাছে এসে দাঁড়াতে সচমকে মুখ তুলে তাকাল। মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে, হু'চোখ বিস্ময়-বিস্ফারিত; "তুই. কি ব্যাপার!"

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল নন্দিতা। নীরব পর্যবেক্ষণ স্বল্পক্ষণ, "প্রশ্নটা তো আমারই করবার কথা। কোন্ ভাবরাজ্যে বিচরণ করছিলি—সন্ধ্যে হতে চলল, চুল বাঁধিস নি, কিচ্ছু না! কি ব্যাপার?"

—"ব্যাপার আবার কি? মাঝে মাঝে এ-রকম অনিয়ম মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর খুব, জানিস না!" খোলা চুলটা হাতে জড়িয়ে নিয়ে শর্মিষ্ঠা হাসল।···

ঘরের কোণে টুকুনের কয়েকটা খেলনা। এলোমেলো, ছড়ানো··খেলতে খেলতে টুকুন উঠে গেছে বোঝা যায়।

সেই দিকে তাকিয়ে নন্দিতা বলল, "টুকুন কোথায় রে শর্মি? দেখলাম না যা।"

—"ওকে আর বুনো ক নিয়ে ভুবনদা পার্কে গেছে।"

—"ভাল আছে এখন বেশ?"

—"হ্যাঁ, জ্বর-টর অনেক কমে গেছে।"

একটুক্ষণ চুপচাপ গল।

শর্মিষ্ঠা কিছু বলবে ভেবে অপেক্ষা করল নন্দিতা। বিরক্ত হয়ে বলল তারপর, "কি রে, আমার সংগে কথা বলার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছিস না? বল্ তাহলে, চলে যাই।"

—"আরে, চটিস কেন? গল্প তো সব তোর ষ্টকে।"

—"আজ্ঞে না। আগের দিন আমি বেড়ানোর গল্প করেছি শুধু, তোর কথা কিছুই শুনিনি। কেমন ছিলি বল? দেখে মনে হচ্ছে যেন কি ঘটেছে।"

—"ঘটবে না কেন বন্ধু, ঘটনার অভাব! সখি, তবে কর অবধান।" নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে গলা ঝাড়া দিল, নাটকীয় প্রস্তুতিতে নিজেকে মুখর করে তোলার প্রয়াস, "হ্যাঁ, কি প্রশ্ন যেন তোমার—কেমন ছিলাম আমি?—তা ভালই ছিলাম। বন্ধুর বোম্বাই-যাত্রার পর স্বভাবতই খারাপ লেগেছিল একটু, তবে বন্ধুর দাদা খুব কনসিডারেট, দিন চার-পাঁচ সংঘের অতি প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম ছেড়ে একটু বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন আমার প্রতি। তারপর অবশ্য কাজের চাপে আর পেরে ওঠেন নি। কলকাতায় থাকলেও বা ক্বচিৎ-কদাচিৎ দেখা মিলত যদি, তো তিনি চলে গেলেন বিলাসপুর।"

থামল একটু। মনোযোগ দিয়ে শোনার ভংগীতে বসে নন্দিতা হাসছে মৃদু মৃদু।

একটা নিশ্বাস ফেলে হেলান দিয়ে বসে শুরু করল আবার, 'তারপর দিনগুলো কাটতে লাগল আনন্দে। এর মূলে ছিলেন শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মৈত্র, তাঁর ঋণ শোধ করবার নয়। হয়তো বিকেল বেলা তৈরী হয়ে বেড়াতে বেরোচ্ছি টুকুনকে নিয়ে, বুনো হয়তো গাড়ীতে গিয়েই বসেছে, এমন সময় তাঁর সদয় আবির্ভাব। বিকেল থেকে রাত্রি অবধি বন্ধ ঘরের শান্ত আবহাওয়ায় ভালই কাটত সরস আলোচনায়।"

—"অতীন্দ্র ঘোষালের খবর কি?"

—"ধৈর্য ধর বন্ধু, অতীন্দ্র ঘোষাল সম্বন্ধে দুঃসংবাদ আছে একটা।"

—"সত্যি? যাঃ!' বিশ্বাস যে করেছে, এমন নয়, বুঝছে ঠাট্টা। তবু শর্মিষ্ঠার গম্ভীর ভাব দেখে একটু সংশয়ের সুরও মিশল কণ্ঠে।

—"সত্যি বলছি" শর্মিষ্ঠা তেমনই গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল।—"মুখবন্ধ সেরে নিই তাহলে। এর মধ্যে আমার পূজ্যপাদ জ্যাঠামশায়ের সংগে অতীন্দ্র ঘোষাল এসেছিল বারকয়েক।

—"তাই নাকি? বলতে হয় এতক্ষণ! তারপর?"

—"তারপর আর কি? সেই পুরোনো দৃশ্য। বারাসাতের যে দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছিলাম, তারই পুনরাবৃত্তি প্রতিদিন।···পিসেমশায়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুণ্ঠিত প্রবেশ, তাঁরই পাশে উপবেশন ও গৃহতল অবলোকন, কিছু পরে চিরকালীন প্রথায় সুযোগদানার্থে বিশেষ বৈষয়িক কাজে পিসেমশায়ের কিছুক্ষণের নিমিত্ত বহির্গমন, আরক্তিম কর্ণমূলে ঘর্মাপ্লুত অবস্থায় বলির পশুবৎ অতীন্দ্রের সকরুণ অবস্থান এবং সহসা অতিথি জ্ঞান হারালে কি করবে তারই চিন্তায় শর্মিষ্ঠার কালাতিপাত।"

নন্দিতা হাসছিল বলল, "সে কি রে, তুইও কথা বলতিস না?"

—"বলি অতীন্দ্র ঘোষাল কি কচি ছেলে যে, এক নাগাড়ে রূপকথা বলে ভোলাব? না কি একাই দু'জনের হয়ে কথা বলে যাব?"

—"যাই হোক, জ্যাঠামশাই তোদের প্রেম করিয়ে বিয়ে দেওয়াচ্ছেন, তবু বলিস প্রাচীনপন্থী, এটা অন্যায়।···এখন কি অবস্থা চলছে? উন্নতি হল একটু?"

—"হায়, হায়! তাহলে প্রথমেই বললাম কেন দুঃসংবাদ আছে! পিসেমশাইয়ের এত চেষ্টা এত শিক্ষা সব বিফলে গেল। জ্যাঠামশাই কবে যেন শেষ এসেছিলেন—সেদিন বলে গেলেন পরদিন অতীন্দ্র ঘোষাল আসবে তার মাকে নিয়ে। আমার গল্প শুনে ভদ্রমহিলার নাকি বড় বাসনা আমায় একবার দেখেন! জ্যাঠামশাই আসতে পারবেন না, কাজ আছে। তারপর অনেকগুলো পরদিন কাটল, আসেনি। 'হীরের টুকরো'ও বোধহয় বিদ্রোহ করল শেষে। জ্যাঠামশাইও আর আসেন নি।"

—"তাহলে তো সত্যি দুঃসংবাদ। বিকেল বেলা আলুলায়িত কুন্তলে বসে সেই কথাই ভাবছিলি বুঝি?"

—নিশ্চয়ই। আমায় বিয়ে করবার নামেই লোকে যদি পালিয়ে যায়, সেটা কি সুখকর ঠেকবে আমার কাছে! ভাবনা হবে না?"

—"আহা, তাই তো!···শর্মি, প্রতুল অধিকারীকে মনে আছে, দাদার বন্ধু? সেই যে রে আসামে বিরাট এষ্টেট! দাদাকে অনুরোধ করেছিলেন তোকে তাঁর হয়ে প্রোপোজ করতে! এঁকেও না হয় সেই পরামর্শ দিয়ে আলাপ করিয়ে দে দাদার সংগে।"

—"সে আশা নেই ভাই, নাহলে এর তো পিসেমশাই রয়েছেন! ··নন্দা, প্রতুল অধিকারী কিন্তু নিজে শেষ পর্যন্ত এগিয়েছিলেন।"

—"তা বটে। তুই ই বিভ্রাট বাধালি। দাদার সংগে অবধি বন্ধু-বিচ্ছেদ করে ফেললেন ভদ্রলোক, এখনও দাদা তোকে দায়ী করে! ওকে নাকি আসামে শিকারে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন।"

শর্মিষ্ঠা হেসে সমর্থন করল। প্রসংগ পরিবর্তন করল হঠাৎ, "যেতে দে ওসব কথা। আসল গল্পটাই বাকি এখনও।"

—"কিসের, অতীন্দ্র ঘোষালের?"

—"না, না, ওটা শেষ—ইতি সমাপ্ত অতীন্দ্র-পর্ব। এটা আনকোরা নতুন, চিঠিতেও লিখিনি। করবী হালদারকে মনে আছে? ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে পড়ত আমার সংগে?"

মনে আছে নন্দিতার। এক কলেজে পড়ত না, তবু দেখেছে তাকে অনেকবার। গল্প শুনেছে আরও বেশী। লেক এভিনিউ-এ বাড়ী, মস্ত বড়লোকের মেয়ে। চালবাজ ছিল না একটুও, বরং একটু বোকা ভালমানুষ গোছের। সব সময় দাদার গল্প করত, তার দাদার মত জ্ঞানী-গুণী ছেলে নাকি হয় না। শর্মিষ্ঠা নিরীহ মুখে শুনত, তারপর নন্দিতার কাছে নকল দেখাত। অবস্থাটা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, করবীর সংগে দেখা হলে হেসে ফেলবার ভয়ে শর্মিষ্ঠার সংগে চোখাচোখি করত না নন্দিতা।

—"সেই বিখ্যাত দাদা—কল্যাণ হালদার—সম্প্রতি বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে এসেছেন।"

—"তিনি কাহিনীর নায়ক?"

—"অবশ্যই, শোন্। দেবু বিলাসপুর গেল যেদিন, তার পরদিন এলিটে ছ'টার শো'য়ে সিনেমা দেখতে গেলাম একা। ইন্টারভ্যাল হতেই একটি মেয়ে কাছে এসে ডাকল, চেয়ে দেখি করবী। বোধহয় ঢুকেই যখন তখনই দেখেছিল আমায়। যাই হোক, দেখলাম বেশ উন্নতি হয়েছে, মাঞ্জা দিয়েছে খুব, ভালমানুষ ভাবটাও কাটিয়ে উঠেছে। আমায় দেখে ওর আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে করছে-টরছে অনেক কিছু বলে গেল সরু গলায়। বললে, আমার দাদার সংগে ইনট্রোডিউস করিয়ে দিই। দিলে। শো' ভাঙতে দেখতে পেয়েছিলাম ওদের দূর থেকে, ওরা বোধহয় দেখতেই পায়নি আমায়, মনে হ'ল যেন খুঁজছে। বাড়ী চলে এলাম, পরদিন সন্ধ্যেবেলা দুই ভাই-বোনে এসে হাজির। করবী বললে, কাল একটুও কথা বলা গেল না, আজ তাই দাদাকে অবধি জোর করে ধরে এনেছে। মনে মনে ভাবলাম, "কি তুমি দুগ্ধপোষ্য শিশু যে আসতে হ'লে দাদাকে চাই!···টেলিফোন ডাইরেক্টরী দেখে ঠিকানা খুঁজে তো এসেছ, সে তো ড্রাইভারই পারত।"

—"অর্থাৎ বুঝলি, দাদাই স্বেচ্ছায় এসেছেন?"

—"তা একটু-একটু বুঝলাম বই কি।···সন্ধ্যেটা ওদের সংগে কাটল। আগের দিন করবীকে অন্যরকম লেগেছিল, সেদিন দেখলাম অনেকটা বদলেছে বটে—বোধহয় দাদা বিলেত যাওয়ায় কলকাতায় থেকেই ওর ওপর একটা এ্যাংলো প্রভাব পড়া দরকার বলে মনে করেছিল তাই, নইলে এমন মেয়েটা বেশ ভালই।···কদিন খুব ফোন-টোন করল, ওদের সংগে বেড়াতে গেলাম ক'বার, সিনেমা দেখালাম একদিন। করবীর বিয়ের ঠিক হয়ে আছে, ভদ্রলোকের সংগে আলাপও হল, আমার অবশ্য ভাল লাগেনি বিশেষ।"

—"দূত্তোর, কত আর এসব শুনব? ভদ্রলোকের ভাবী শ্যালকের কথা বল একটু।···এই কল্যাণ হালদারের কথাই নিশ্চয় বাবা বলছিলেন সেদিন, অল্পদিনেই বেশ পসার হয়েছে—তোর কেমন লাগল বল্ ভদ্রলোককে।"

শর্মিষ্ঠা হাসল, "ভালই। সদালাপী লোক, সুন্দর গল্প করেন—বিলেতের, কোর্টের। সব দিকেই কেতাদুরস্ত।···একদিন ওঁদের বাড়ী গিয়েছিলাম, ভদ্রলোকের বাবা-মার সংগে পরিচয় হ'ল।··· তারপর দিন তিনেক আগে করবীর জন্মদিনে নেমন্তন্ন ছিল আমার। বিরাট ঘটার জন্মদিন—প্রচুর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সাজসজ্জা।

করবীর পিসিমা, কাকীমা—সবাই আমার এমন দ্রষ্টব্য বস্তু ঠাওরালেন আর এমন যত্ন করতে লাগলেন যে সে এক অস্বস্তি ! ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।"

নন্দিতা হাসতে লাগল, "তারপর ?"

—"তারপর আর কি ? গতকল্য সন্ধ্যায় নাটিকার যবনিকাপাত। তুই এলে দেখতে পেতিস।"

—"অর্থাৎ ?"

শর্মিষ্ঠার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। চেয়ারের পিঠে মাথাটা হেলিয়ে দিয়েছে। নন্দিতাকে দেখল চুপচাপ কয়েক মুহূর্ত—"কাল সন্ধ্যেবেলা কল্যাণ হালদার একা এসেছিল—"

—"উঁ ! বলিস কি ?" নন্দিতা সোজা হয়ে বসল, উত্তেজিত., "কি বললে ?"

—"যা ভাবছিস তাই।" নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি। "প্রপোজ করলে।"

—"তারপর ? থামছিস কেন ?"

—"তারপর আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম।"

নন্দিতা ভ্রু কোঁচকাল. "কি বললি ?"

—"কি আবার বলব ? কাব্যি করে বললাম আর কি, আমার হৃদয় অন্যত্র বাঁধা পড়েছে—বললাম, ক্ষমা করবেন।"

—"ভদ্রলোক কি বললেন ?"

—"ব্যারিষ্টারের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এ এক কাচ্চা জেরার মুখে পড়লাম তো ! কি আর বলবেন ? বুঝলেন বিদায় গ্রহণ ছাড়া গতি নেই।"

—"হুঁ !" চিন্তিত মন্তব্য।

নীরব কিছুক্ষণ।—"ভাল কথা, শর্মি, দাদার চিঠি পেয়েছিস ? ডাঃ চৌধুরী যে মেস ছেড়ে দিয়েছেন, সে কথা দাদা জানে কিনা জানিস ?"

—"তোমার দাদার কথা আর বোল না ভাই। অনেকদিন চিঠি দেয়নি, তারপর হঠাৎ এক চিঠি এল, ডাঃ চৌধুরী অন্য জায়গায় চলে গেছেন আমায় জানাওনি কেন ? কি মুশকিল রে বাবা ! আমি জানলে তো ! আমি তো জানলাম ওর চিঠিতেই প্রথম।"

—"তুই জানিস তো বলিসনি কেন ? আমরা তো এই সবে পরশু শুনলাম। বন্ধুর খোঁজ-খবর নেই দেখে খবর নিতে মেসে গিয়ে—"

কণ্ঠে কৈফিয়ৎ তলবের সুর। শর্মিষ্ঠা হেসে উঠল, "বাবা ! তোদের সংগে দেখা আর হ'ল কবে ? প্রাণের বন্ধুর খবর জানেন না ইঞ্জিনিয়ার সায়েব, তাই বা কি করে জানব আমি ?"

—"দাদা জানল কার কাছে ?"

—"ভক্তের কাছে। শ্রীমান অঞ্জন যে হ্যারিসন রোডের মেসে থাকে, ভুলে গেলি ?"

উত্তরটা কাণে গেল কি গেল না। অন্যমনস্ক হয়ে নন্দিতা ভাবছে কি। মনে মনে কিসের প্রস্তুতি।···"শর্মি, কটা বাজল রে ?"

খাটের পাশের ব্র্যাকেটে টাইম-পিস্‌টার দিকে তাকাল শর্মিষ্ঠা, —"সাতটা দশ।"

—"ওঃ, সময় আছে এখনও।" নিশ্চিন্ত।—"তোর সংগে সিরিয়স কথা আছে আমার। শোন্ মন দিয়ে।"···

অতঃপর যখন নন্দিতাকে বেলেঘাটায় পৌঁছে দিল, তখন বোধহয় পৌণে দশটা। রাত হয়েছে অবশ্যই। তবুও নিশ্চিন্ত ছিল নন্দিতা। কল্যাণীর ফিরতে দেরী হবে জানেই, আর দীপংকর গেছে শুভজিতের কাছে, তাড়াতাড়ি ফেরবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

বাড়ী ফিরেই অক্ষয়ের কাছে শুনল দীপংকর ফিরেছে একটু আগে এবং আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে।

শরীর খারাপ ?···অক্ষয় জানে না তা। জিজ্ঞেস্ করতে দাদাবাবু তাকে ধমকে থামিয়েছেন।

নন্দিতা ওপরে উঠে এল।

দীপংকর বিছানায় শায়িত।

রাস্তার আলো আসছে জানালা দিয়ে, ঘরে আবছা আলো।··· নন্দিতা বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল।

সাড়া পেয়ে চোখের ওপর থেকে হাত সরালো দীপংকর, "এসে গেছ। শর্মিষ্ঠার খবর ভাল ?"

কণ্ঠস্বরে অক্ষয়-বর্ণিত রাগের আভাস নেই, স্বরটা ভারিই তবু। প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা স্থগিত রইল।—"শুয়ে পড়েছ কেন ? শরীর খারাপ ?"

—"আরে না, না, এমনি—এইমাত্র তো ফিরলাম।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বিছানার একপাশে বসে পড়ল নন্দিতা, "বন্ধুর সংগে দেখা হল ? কোথায় ধরলে ?"

—"চেম্বারে।"

—"কোথায় আছেন এখন ? গেলে সেখানে ?"

—"না, আমরা রেস কোর্সের ধারে গিয়ে বসেছিলাম।···ও আছে কাশীপুরে একটা পুরোণো বাড়ীতে—কি ক'খানা মুদি-টুদির দোকান আছে, তারই গায়ে একটা গলি, সেইটে রাস্তা। বাস-ডিপোর কাছাকাছি। জেনে রাখলাম, যদি দরকার হয় কিছু।"

—"কিন্তু কেন গেলেন ? বলেন নি অবধি এতদিনেও।"

—"বললে, বলতে গেলেই তো তুই চেঁচাবি প্রথমেই, বলতাম পরে।···কেন গেছে কে জানে ! জায়গাটা খুব সুন্দর বুঝি।"

—"বাবা, এমন সুন্দর জায়গা আবিষ্কার করলেন যে এখানে একবার আসতেও পারেন না ! তুমি বললে না ?"

—"বলিনি আবার ! বললে, দিদিকে নিয়ে ব্যস্ত রয়েছিস তোরা, যাব'খন।"

নন্দিতা ব্যংগভরে হাসল, "আহা ! কি দরদ ! আমরা ব্যস্ত সে আমরা বুঝব ! ওঁর তাতে কি ?···কাল চেম্বার থেকে ধরে এন দেখি।"

দীপংকর নিরাসক্ত তবু, "কি দরকার, সময় মত নিজেই আসবে।"

নন্দিতা আয়েস করে পা ছড়িয়ে বসেছিল। অকৃত্রিম বিস্ময়ে বালিশের হেলান ছেড়ে সোজা হয়ে বসল।—"কি হ'ল গো তোমার ? বন্ধুর সংগে রাগারাগি !"

—"না, না।"

—"তবে ? এত উদাস ভাব ?"

—"মনটা খারাপ।"

—"সে তো বুঝতেই পারছি ! কেন শুনতে পাইনে ?"

—"না, মানে—শুভোকে কি রকম যেন লাগল, কি রকম যেন অন্যমনস্ক, এমন অনেকদিন দেখিনি।"

নন্দিতা অবহিত হ'ল একটু, "কিছু বললে না ?"

—"না। বারবারই মনে হ'ল কিছু বলবে যেন, জোর করে বসিয়েও রাখলে অনেকক্ষণ, শেষ অবধি তো বললে না কিছুই।"

—"কি রকম দেখলে ? খুব গম্ভীর ?"

—"হ্যাঁ, তা গম্ভীর বইকি !"

দীপংকর অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছে কি ! নন্দিতাও প্রশ্ন করেনি আর। অপেক্ষা করছে। দেখবে দীপংকর কি বলে।

—"ওতো গম্ভীর চিরদিনই•••আই-এসসি দেবার পরই ওর মা যখন মারা গেলেন তখন যে কি ভীষণ চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল কি বলব ! এই ক'বছর শুধু শুধু বাইরে কাটালে, সবটাই খেয়াল ! কলকাতায় এসে অবধি বেশ খুসী ছিল—তোমরা সবাই ছিলে বলেই—হঠাৎ আবার কি যে হয়েছে।"

দীপংকরের কণ্ঠে বেদনার আভাস। নন্দিতা কিন্তু হাসল, "হুঁ, তোমার চোখেও পড়ল তাহলে ?"

—"তার মানে ? তুমি জানতে ?" দীপংকর সচকিত।

—"অনেকদিন।"

আগ্রহে বিছানায় উঠে বসল দীপংকর।—"কারণটাও জান ?"

—"অন্ততঃ আন্দাজ করতে পারি।" দীপংকরের সপ্রশ্ন-মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল একটুক্ষণ। গম্ভীর ভাব, "বলতে পারি, একটিমাত্র সর্ত্তে, কাউকে বলতে পারবে না তুমি, কাউকে না।"

—"আচ্ছা, তাই।"

খাটের ওপর গুছিয়ে বসল নন্দিতা পা মুড়ে।•••বলবার সময় হ'ল না কিন্তু।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, কল্যাণীরা ফিরলেন।

নন্দিতা লাফিয়ে উঠল, "এই রে,—কি যে কর তুমি, ঘরটা অবধি অন্ধকার—" আলোটা জ্বেলে দিয়ে চকিতে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল নন্দিতা।

দীপংকরের মনটা একেবারেই অন্যদিকে ছিল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনেও নি। নন্দিতার অভিযোগ শুনে কারণটা অনুধাবন করতে চেষ্টা করছিল মনে মনে, হঠাৎ চোখে আলো লাগায় চমকে উঠল।

[ক্রমশঃ।

মেয়েরা কি চায় ?

আজকের দিনে নানা কারণেই সমাজ-জীবনের ভিত্তিমূলে একটা প্রকাণ্ড নাড়া লেগেছে, যার ফলে পুরোনো সহজ সুরে বাঁধা দৈনন্দিন জীবন-ছন্দটি গেছে হারিয়ে। এই পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ ঘটেছে মেয়েদের জীবনেই, ঘরের কোণ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা বা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন বৃহত্তর জগতের মুখোমুখি হওয়ার জন্য। কিছুদিন আগে অবধি যেন-তেন-প্রকারেণ একটি বিয়ে হয়ে গেলেই অধিকাংশ মেয়েই মনে মনে একটা প্রকাণ্ড হাঁপ ছেড়ে বাঁচতেন, অর্থাৎ গৃহের সীমিত পরিধিতেই বেশ আত্মনিমগ্ন অবস্থায় দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারতেন তাঁরা; কিন্তু আজ সে দিন বিগত। পর পর দুটি মহাযুদ্ধের ফলে বিপর্য্যস্ত সমাজ-জীবনে সেই নিশ্চিন্ত গৃহরচনার অবকাশ কোথায় ? জীবনের চেয়ে জীবিকার প্রশ্ন এখন বড়, আর প্রধানতঃ সেজন্যই স্বামী সন্তান-পরিবৃত সংসারের স্নেহচ্ছায়ায় দিন কাটানো সম্ভব হয়ে ওঠে না এ যুগের সীমন্তিনীদের। ট্রামে-বাসে, অফিসে-আদালতে সর্ব্বত্রই তাই ধুতি পাঞ্জাবী স্যুট-বুটের সঙ্গে শাড়ী-ব্লাউজকে হাত মিলিয়ে চলতে দেখা যাচ্ছে এবং এ নিয়ে অনুযোগ-অভিযোগ, এমন কি সময় সময় দুর্য্যোগেরও অন্ত নেই। এখন প্রশ্ন এই যে, পরিবর্ত্তিত জীবনধারাকে মেয়েরা কি সানন্দ স্বাগত জানিয়েছেন, অর্থাৎ স্বাধীনা স্বাবলম্বিনীর জীবনই কি তাঁদের অধিকতর কাম্য ? মনে হয় অধিকাংশ মেয়েই নেতিবাচক উত্তর দেবেন। প্রকৃতিতে মেয়েরা পরনির্ভরশীলা। লতার সার্থকতা যেমন বৃক্ষাশ্রয়ে, পুরুষের দেওয়া আশ্রয়েই তেমনি নারীপ্রকৃতির স্বভাবজ প্রবণতা ও সার্থকতা। গৃহের কোণ যদি সুখের হয়, তাহলে তা ফেলে বাইরে ছুটবেন কম মেয়েই। তবুও যে আজ বাইরের জগতে তাঁদের ভিড়, সে কেবল জীবিকার তাগিদে। মধ্যবিত্ত গড়পড়তা সংসারে পুরুষের একক আয় সব প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয় না আর আজকের দিনে, আর সেজন্যই আজকের স্ত্রী শুধু সহধর্ম্মিণী নন, "সহকর্ম্মিণীও"।

কিছুদিন আগে অবধি মেয়েদের জীবিকা বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রেই কেবল সম্ভবপর হত, কিন্তু এখন জীবিকার প্রায় সমস্ত দরজাই তাঁদের জন্য খুলে গেছে, অফিস, আদালত, বিপণি, এমন কি কারিগরী এলাকায়ও তাঁরা কাজ করছেন পুরুষের সঙ্গে সমান তালে, অফিস টাইমে ট্রাম-বাসের ভিড়ে পুরুষের সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করছেন সবলে, ঘরে ঘরে এখন দাদাবাবুদের মত দিদিমণিরাও সকাল নয়টার মধ্যে অফিসের ভাত তৈরী না পেলে হাঁকডাক সুরু করে দেন স্বচ্ছন্দেই।

রবীন্দ্রনাথ এক সময় নাকি দুঃখপ্রকাশ করেন যে, মেয়েদের কর্ম্মশক্তির সম্যক্ বিকাশ না ঘটায় সমাজ ও সংসার নানাভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে। প্রসঙ্গতঃ মেয়েদের দ্বৈপ্রহরিক নিদ্রার উল্লেখ করতেন তিনি প্রায়শঃ। আজ জীবিত থাকলে এই ক্ষোভটা অন্ততঃ গুরুদেবের মিটত ; হায়, কোথায় গেছে সে মধুর ঘুম ! কাজকর্ম্মের শেষে আহারান্তে একটি মাসিক পত্রিকা হাতে মেঝের বা চৌকীতে লম্বমান হওয়ার রোমাঞ্চকর মুহূর্ত্ত আর আজ কজন গৃহিণীরই বা অদৃষ্টে আসে ? অসংখ্য ফাইলের স্তূপ বা টাইপরাইটিং মেশিনের কী-বোর্ডে তো তা চিরতরে অবলুপ্ত।

নারী আজ আর পুরুষের ভার নয়, বরং ভরসা—এই পরিবর্ত্তিত জীবনধারাকে সহজেই গ্রহণ করলেও একথা বোধ হয় স্বচ্ছন্দেই বলা যায় যে বহির্জ্জগতে বিকশিত হওয়াতেই নারীপ্রকৃতির সফলতা নয় ; মূলতঃ সে প্রকৃতি অন্তর্মুখী আর তাই তার সার্থকতা পুরুষের দয়িতারূপে, সন্তানের জননীরূপে। যে মেয়ে জীবনে এই দুটি বস্তুর আস্বাদ পায়নি, সে সত্যই দুর্ভাগিনী।

বাহির জগতের শত সহস্র কর্ম্মের ডোরে বাঁধা পড়েও মেয়েদের মন তাই ভরে ওঠে না সম্পূর্ণতার আনন্দে কখনই, যতক্ষণ না সে পায় তার সংসারজীবনের সাফল্য।

মুক্ত করো হে বন্ধ
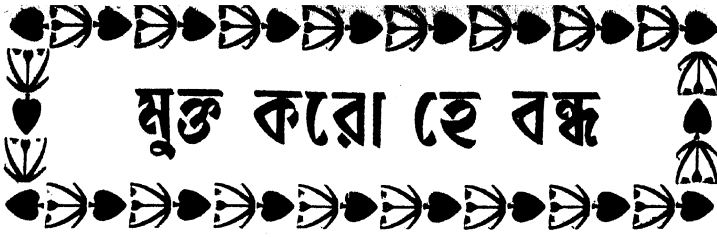
শ্রীঅবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় জীবন ও চিন্তার মূল সূত্র হচ্ছে মোক্ষবাদ। তা সত্ত্বেও আমাদের পরাধীনতা এসেছিল। অবিশ্বাস্য, দুর্দৈব, পরিতাপের বিষয়। কিন্তু এসেছিল। ব্রিটিশ আমলে আমাদের টুঁ শব্দ করবার জো ছিল না। বন্ধন ছিল, গ্লানি ছিল, দুঃখ ছিল। আর ছিল ভয়। অক্টোপাসের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে প্রাণটা যে বেঁচেছে তা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এটা তাৎকালিক মুক্তি। আশীর্বাদ নিশ্চয়ই, কিন্তু জপ করবার মত কিছু নয়। পা ভাঙলে অষ্টপ্রহর আমরা পায়ের কথা ভাবি। সেরে উঠলে কথাটা ভুলে যাই। বার্নার্ড শ'র মতে ভাঙা পা পরাধীনতা, জোড়া পা স্বাধীনতা। পা ঠিক হলে আমরা কাজে বেরুই বা মানসতীর্থের দিকে যাত্রা করি, 'ওহে মোর সুস্থ পদ', বলে কবিতা লিখি না। জানি, অনেকে লেখেন। লিখছেনও—আজাদী ক্যা ধাম হৈ, জাননা তেরা কাম হৈ। কিন্তু স্বাধীনতার সার্থকতা স্বাধীন চিন্তায়, মুক্ত জীবনের আনন্দে, পঙ্কজবিভূষণত্বে নয়। রাষ্ট্রনেতারা অনেক সময় শ্লোগান বর্জন করতে উপদেশ দেন। শ্লোগানের সবটা খারাপ নয়। কর্মক্ষেত্রে 'নাড়া' লাগাবার প্রয়োজন আছে। 'মজদুর ভাইয়া হেইয়' বললে কাজ এগোয়। চিন্তাক্ষেত্রে 'ভাইয়াজী কী জয়' শুধুই বিড়ম্বনা। আজাদীর পর এ বিড়ম্বনা সমাজ ও জীবনে এক নূতন বন্ধন সৃষ্টি করছে; স্বাধীন চিন্তার স্থান নিচ্ছে বেকন-কথিত কতকগুলো 'আইডল'। এ সম্বন্ধে আমাদের জাগ্রত হওয়া দরকার।

ব্রহ্মজাল সূত্রে বুদ্ধদেব তাৎকালিক সমাজে প্রচলিত বাষট্টিটি বিরোধী দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ করেছেন। চিন্তাক্ষেত্রে এই সজীবতা ছিল বলেই সিদ্ধার্থের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল এবং পরে সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, স্থাপত্য, চারুকলা ইত্যাদির মাধ্যমে সদ্ধর্মের প্রচার ও প্রতিপত্তি দেশে ও বিদেশে এক মহত্তর জীবনের সন্ধান দিয়েছিল। আজকে যদি কেউ গান্ধীবাদের খোঁজে দেশভ্রমণে বেরোন তবে তাকে পাবেন তিনি একটি মাত্র জায়গায়—যাদুঘরে! খোঁজার পথে অনেক কিছু নূতন জিনিস চোখে পড়বে, যেমন ভিলাইর কারখানা, দামোদরের বাঁধ, ইত্যাদি। বিস্ময়কর অবদান, সন্দেহ নেই। কিন্তু মাথা ঠোকা উচিত হবে কি? রাষ্ট্রধুরন্ধররা ডি-ভি-সির বাঁধকে 'মন্দির' আখ্যা দিচ্ছেন এবং বাঁধের দিকে ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর অগ্রগতিকে মহতী 'তীর্থযাত্রা' বলে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এই মনোবৃত্তি সম্বন্ধে আচার্য টয়নবির মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "to idolize these pieces of social machinery is to court disaster," মানে এজাতীয় মূর্তিপুজোর পরিণাম ভয়ঙ্কর। অবশ্য আমরা ফুল-বেলপাতা চড়াই নি। কিন্তু এহ বাহ্য। ধূপ-ধুনো জ্বালানর চাইতে মারাত্মক পুজো হচ্ছে চৈতসিক মূল্যায়ন। গাছ-পাথরকে পুজো করলে বিপদের আশঙ্কা তেমন কিছু থাকে না এজন্য যে, সাধারণ পূজারীর কাছেও গাছ-পাথর শুধু প্রতীক, দেবতা নয়। কিন্তু ডি-ভি-সির বাঁধ প্রতীক নয় বলেই সাংঘাতিক। কারণ, পুজারী ঠাকুর দেবতাজ্ঞানে যাকে বরণ করছেন সে দেবতা নয়, অপদেবতা। টয়নবি বলেন, ভক্তি হচ্ছে "a beneficent creative power when directed through the channels of a Civitas Dei to God Himself"; এই ভক্তি অপদেবতার পুজোতে লাগালে সে হয় সর্বনেশে—"a destructive force when diverted from its original object and offered to idols made by human hands"; এই সর্বনেশে পুজোর আধুনিক দৃষ্টান্ত হিটলারের জার্মানী।

ঘরের এক কোণে মাইক বাজিয়ে অপদেবতার আরতি চললে অন্য কোণে দেবতার আরাধনা সম্ভব নয়। কিছুদিন পূর্বে পি, ই, এন, ক্লাবের ভুবনেশ্বর সম্মেলনে নেহরুজী উপদেশ দিয়েছিলেন, বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার মাহাত্ম্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখকরা যেন নবসাহিত্য রচনা করেন। অর্থাৎ যদি কেউ কবিযশঃপ্রার্থী হন তাঁর লেখা উচিত—

কারখানাতে যাচ্ছি মোরা
তাক ডুমাডুম ডুম।
আনন্দেতে করব কাজ
গদি যেমে ঘুম।।

অনেক রাষ্ট্রনেতাই ফতোয়া জারি করে বায়না মাফিক সাহিত্য রচনার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হননি। রেলগাড়ী, রেফ্রিজারেটর, রেডিও সেট, এমন কি এরোপ্লেনের উপরও কোন ভাল কাব্য কেউ লিখেছেন বলে শুনিনি। বরং উল্টো নজির আছে, যথা—Satanic mills বা সয়তানের কারখানার বিরুদ্ধে ব্লেইকএর বিখ্যাত কবিতা 'মিলটন'। ভারতীয় লেখকরা প্রধানত: ভারতীয়দের বিজ্ঞানচর্চার কথাই ভাববেন। কিন্তু আচার্য জে বি এস হলডেইন স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা কিরূপ হচ্ছে সে সম্বন্ধে যা মন্তব্য করেছেন তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। তিনি কাগজে লিখেছিলেন, বিজ্ঞানের অধ্যাপকরা মন্ত্রীদের অভ্যর্থনা ও ভাষণাদির ব্যবস্থা নিয়ে এত ব্যস্ত ও মত্ত থাকেন যে, লেবরেটরীতে ঢুঁ মারবার সময় তাঁদের হয় না। সুতরাং তাঁরা ছাত্র গবেষকদের মাল নিজের বলে চালান, আর ছাত্ররা আখেরের ভাবনায় চোরা কিল হজম করেন। হলডেইন সাহেব আক্ষেপ করে বলেছেন, বিশ্বামিত্র-দুর্বাসার বংশধরদের কি হীন প্রবৃত্তি ও শোচনীয় পরিণাম। এই পরিস্থিতিতে নেহরুজীর উপদেশের তাৎপর্য কি হবে? হয়তো ইঙ্গিতটা হচ্ছে এই যে, লেখকদের উচিত Dunciad বা "গবায়ন"এর মত ব্যঙ্গরসাত্মক কাব্য রচনা করা।

মনে হয় এই ইঙ্গিত ধরতে পেরেই পি, ই, এন-এর সভ্যবৃন্দ চুপ করে ছিলেন।

বস্তুতঃ মাইক ও শ্লোগানই বর্তমান জগতের একচ্ছত্র সম্রাট। এককালে লেখকরা জাতিবিভাগ মানতেন না। সব কাব্যকৃতির একটি মাত্র জাত ছিল, তার নাম সাহিত্য। এখন জাত নিয়ে দস্তুরমত হানাহানি চলছে। দৃষ্টান্ত পাস্তের্নাক-বিতর্ক। যে হেতু ভদ্রলোক কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে কিছু লিখেছেন, সুতরাং পাশ্চাত্যদের মতে তিনি নোবেল প্রাইজ পাবার যোগ্য এবং রাশিয়ার চোখে নজরবন্দী, কৃপার পাত্র, অপাঙক্তেয়। কিছুদিন আগে প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক সোনভার ভারতে এসেছিলেন; বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আগে সাহিত্য রচনা হত রসানুভূতিকে আশ্রয় করে, এখন সাহিত্যের উপজীব্য হচ্ছে কোনও 'ইজম' বা মতবাদ। ফলে সাহিত্যে জাতিবিভাগ ঢুকেছে। আমাদের দেশেও। যথা, কম্যুনিষ্ট সাহিত্য, গণ সাহিত্য, সাত্রেবাদী বা সত্তাবাদী সাহিত্য, বাস্তু সাহিত্য, প্রতিক্রিয়াশীল বা খাদি সাহিত্য, ইত্যাদি। জাতিহীন, নিছক সাহিত্যের দিন শেষ হয়ে গেছে। আছে শুধু খবরের কাগজস্থানীয় Pamphletening বা 'ইজম'পন্থা লেখা। অর্থাৎ অপদেবতার পুজো।

আমরা ভারতীয়, চিরদিনই মূর্তি পুজো করে এসেছি। পুজোর জন্য মূর্তি গড়েছি, পুজো শেষ হলে তাকে বিসর্জন করেছি। মূর্তি সম্বন্ধে মোহগ্রস্ত বড় একটা হইনি। একেবারে যে হইনি তা নয়। মাঝে মাঝে জাতীয় জীবনে "সোমনাথের মন্দির" দেখা দিয়েছে। কিন্তু ইতিহাস ছেড়ে কথা বলেনি, মুশল পাঠিয়ে মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছে। তবে সাধারণতঃ আমরা একথা বলি নি যে, এই মূর্তিই শেষ পয়গম্বর। বর্তমান সমাজ, রাষ্ট্র ও সাহিত্যে আমাদের চিরাগত ঐতিহ্য, আমাদের চিন্তার মূলসূত্র মোক্ষবাদ যেন ক্ষীয়মান হয়ে আসছে। মননের স্থান নিচ্ছে শ্লোগান, অনুভূতির স্থান নিচ্ছে 'ইজম', অনুধাবনের স্থান নিচ্ছে "হুজুগ"। ভয়ের কথা, কারণ আবার "সোমনাথের মন্দির" দেখা দিতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিষ্কের মত আমাদিগকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁর স্বাধীন চিন্তার অকুতোভয়তা, মুক্ত জীবনের আনন্দ-হিল্লোল ও শুদ্ধ সাহিত্যের অনাবিল রস আমাদিগকে সুস্থ করে, সমৃদ্ধ করে, সম্যক দিঠি দিয়ে স্বাধীন ভারতের স্বস্থ নাগরিক করে তুলতে পারে। শতবার্ষিকী উৎসবের এটাই সমূহ প্রয়োজন, এখানেই প্রকৃত সার্থকতা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রার্থনা জানাই, "যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত করো হে বন্ধ"।

কি হবে আগুন জ্বেলে

সমীরণ মুখোপাধ্যায়

পায়ে পায়ে পথ হাঁটে আরণ্য-প্রকৃতি নিয়ে সময়-শকুন।

হাওয়া কোথা? হাওয়া নেই, চারিদিকে বিষাক্ত-নিশ্বাস,
শকুনের লুব্ধদৃষ্টি, মাংসগন্ধে-আত্মহারা মন
পাশবিক অত্যাচারে হত্যা করে। হায় যুদ্ধ, হায় অকরুণ!
"শান্তির ললিত বাণী"—সে কি শুধু ব্যঙ্গ-পরিহাস?

হাওয়া খুঁজি—হাওয়া নেই। হিংস্রতা ঘিরেছে এখন।
হিংস্রতা ঘিরেছে এখন। প্রবীণ সূর্য্যকে ঘিরে
যদিও পৃথিবী চলে কক্ষপথ জুড়ে;—এক-ই ছন্দ সুরে।
মানবতা লুপ্ত তবু। বিকৃত মানব-প্রেম:—প্রেমের গভীরে
আহত বিকৃত মুখ, আদিম-অরণ্যমুখ নাচে ঘুরে ঘুরে।

নাচে ঘুরে ঘুরে বর্বর হিংস্র মুখ—অরণ্য আদিম,
কান্না শুনি পচে ওঠা মাংস-হাড়ে—হাড়ের শ্মশানে—
তবু, আমি হাওয়া খুঁজি; হাওয়া কোথা বাষ্প-রুদ্ধ-প্রাণে?
অতীতের কান্না শুনি: কান্নার অরণ্যে নামে যন্ত্রণার হিম।
ইতিহাস কিছু নয়—সে ত শুধু অতীতের বিকীর্ণ অঙ্গার।

এদিনের এই হিংসা—শিশু হিংসা কোনদিন হ'লে সাবালক
বিপরীত রক্তস্রোতে স্নাতা হবে বসুন্ধরা সেদিন আবার;
শবের শ্মশানে শুধু ঠাঁই নেবে সময়ের অতি-বৃদ্ধ বক।

মানবতা লুপ্ত ক'রে
কি হবে কবর খুঁড়ে—কোটি কোটি মানুষের জীবন্ত কবর?
বিকৃত মানব প্রেমে
কি হবে আগুন জ্বেলে পৃথিবীর প্রতি অক্ষরেখার উপর?

অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স

হর্মোন কথা—

মানবদেহের আভ্যন্তরীণ স্থিতিসাম্য রক্ষায় কিডনি-সংলগ্ন এই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিদ্বয়ের ভূমিকা অসামান্য। দেহাভ্যন্তরের আকস্মিক আপৎকালে এই গ্রন্থির ক্ষরিত রস দেহকে যেমন আসন্ন সঙ্কট থেকে রক্ষা করে, তেমনি বহিরঙ্গিক পরিবেশের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার শক্তি যোগায়।

অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি দুটি প্রথম আবিষ্কার করেন য়্যুস্টাকিয়াস্ নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। কিন্তু এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্রন্থিদ্বয়ের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তিনি কোন আভাস দেননি। এর কয়েক শতাব্দী পরে অ্যাডিসন (Addison) পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করেন যে, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির অভাবে প্রাণিশরীরে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। এই বিশেষ লক্ষণ সমষ্টিকে "অ্যাডিশন-বর্ণিত রোগ" (Addison's Disease) বলা হয়ে থাকে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ব্রাউন-সিকোয়ার্ড (Brown-Sequard) প্রমাণ করেন যে, অ্যাড্রিনাল-গ্রন্থির উভয়-পার্শ্বিক (Bilateral) অপসারণ দ্রুত জীবনঘাতী। কিয়ৎকাল পরে অলিভার ও শেফার এই গ্রন্থি থেকে এক প্রকার রস নিষ্কাশিত করেন এবং এই নিষ্কাশের (Extract) শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অ্যাবেল ও ক্রফোর্ড নামা বিজ্ঞানীদ্বয় যুগ্মভাবে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির কেন্দ্রীয় বা মজ্জাংশ থেকে (Medulla) অ্যাড্রিনালিন নিষ্কাশিত করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ল্যাঙলে সমব্যথী স্নায়ুতন্ত্রের (Sympathetic Nervous System) সঙ্গে অ্যাড্রিনালিনের ক্রিয়াগত সৌসাদৃশ্য ব্যাখ্যাত করেন। অতঃপর বহু বৈজ্ঞানিকগোষ্ঠীর অক্লান্ত, ক্লান্তিহীন গবেষণার ফলে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির গঠন ও ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে অজস্র বিচিত্র তথ্য জানা গেছে। অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স (Adrenal Cortex) এবং এর ক্ষরিত হর্মোন সম্বন্ধীয় গবেষণার ক্ষেত্রে কেণ্ডাল (Kendall) এবং তৎসহযোগিগণের অবদান অবিস্মরণীয়।

অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির দুটি প্রধান । গ্রন্থির কেন্দ্রভাগে অবস্থিত অংশকে বলা হয় "মেডালা" বা মজ্জাংশ (Medulla);—এই মজ্জাংশ থেকে ক্ষরিত হয় অমিত-ক্রিয়াশীল হর্মোন অ্যাড্রিনালিন যাকে গুণমুগ্ধ শারীরবিদ্গণ দেহের "আপৎকালীন প্রতিরক্ষক" বলে অভিনন্দিত করেছেন। মজ্জাংশকে বেষ্টন করে রয়েছে গ্রন্থির বহিরংশ বা কর্টেক্স (Adrenal Cortex)। উৎপত্তি, আণুবীক্ষণিক গঠন, শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া—সকল দিক দিয়েই বহিরংশ মজ্জাংশ থেকে স্বতন্ত্র। বস্তুতঃ, মজ্জাংশটি সমব্যথী স্নায়ুতন্ত্রেরই একটি অংশ; উৎপত্তিগত কোন অব্যাখ্যেয় কারণে স্বস্থানভ্রষ্ট হয়ে কর্টেক্সের কেন্দ্রস্থলে আশ্রয় নিয়েছে। তথাপি সে নিজের ক্রিয়াগত স্বকীয়তা রক্ষা করে চলেছে। সমব্যথী স্নায়ুর উদ্দীপনের ফলে শরীরে যে সব পরিবর্তনের সূচনা হয়, অ্যাড্রিনালিনের ক্ষরণও ঠিক সেইসব পরিবর্তন ঘটায়। এজন্য শারীরবিদ্গণ অ্যাড্রিনালিনকে "সমব্যথী-অনুকারী" (Sympathomimetic) হর্মোন আখ্যা দিয়েছেন। অ্যাড্রিনালিন-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আগামী কোন প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হয়ে থাক। আজ অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স-এর হর্মোন-সমূহ নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করবো। কারণ, সাম্প্রতিককালের চিকিৎসা জগতে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের হর্মোনগুলি যুগান্তর এনেছে বলা চলে। অ্যান্টিবায়োটিক্স্ এবং সাল্‌ফা-

গোষ্ঠীর ভেষজের পর যদি তৃতীয় কোন ভেষজগোষ্ঠীর নাম করতে হয় তাহলে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স-ক্ষরিত হর্মোনসমূহের কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়।

অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সকে কৌষিক গঠনের তারতম্য অনুযায়ী কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা হয়। বিভিন্ন স্তরের আণুবীক্ষণিক এবং রাসায়নিক গঠন পৃথক এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তর থেকে ভিন্ন ভিন্ন হর্মোন নিঃসৃত হয়। তবে বর্তমান প্রবন্ধে আণুবীক্ষণিক গঠনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ অপরিহার্য নয়।

অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে নিঃসৃত হর্মোনসমূহকে বলা হয় কর্টিকয়েড (Corticoid)। এই গ্রন্থির সামগ্রিক নিষ্কাশকে (Whole Extract) কেউ-কেউ "কর্টিন" নামে অভিহিত করে থাকেন। এই কর্টিন-নিষ্কাশকে বিশ্লেষিত করে পঞ্চাশাধিক সক্রিয় রসোপাদান পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। রাসায়নিক বিচারে এই সব হর্মোনের অধিকাংশই ষ্টেরল জাতীয় (Steroid)। এ জন্য এই সব হর্মোনের গোত্রনাম দেওয়া হয়েছে "কর্টিকোষ্টেরয়েড"। অনেকে এগুলিকে সংক্ষেপে "কর্টিকয়েড" (Corticoid) নামে অভিহিত করেন। শারীরবৃত্তিক ক্রিয়া-বৈষম্যের ভিত্তিতে কর্টিকয়েডগুলিকে মূলত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে; যথা—

(১) গ্লুকোকর্টিকয়েড (Glucocorticoid)।
(২) মিনারালো কর্টিকয়েড (Mineralo-corticoid)।
(৩) যৌন-হর্মোন (Sex Hormone)।

গ্লুকোকর্টিকয়েড শ্রেণীভুক্ত হর্মোনগুলি প্রধানতঃ গ্লুকোজ প্রভৃতি শর্করা জাতীয় পদার্থের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। অধিকন্তু প্রোটীন ও স্নেহ পদার্থের বিপাকক্রিয়ার (Metabolism) ওপরও এই শ্রেণীর হর্মোনের প্রভাব অপরিসীম। এজন্য এগুলিকে প্রায়শঃই বিপাকক্রিয়া-উদ্দীপক কর্টিকয়েড (Metabolo-corticoid) আখ্যা দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কর্টিকোষ্টেরন, ডি-হাইড্রো-কর্টিকোষ্টেরন প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেহের জল এবং অজৈব ধাতব পদার্থের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে যে সব হর্মোন তাদের বলা হয় মিনারালো-কর্টিকয়েড। ডি-অক্সি-কর্টিকোষ্টেরন এই শ্রেণীভুক্ত। অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে বিভিন্ন যৌন-হর্মোনও স্বল্প পরিমাণে ক্ষরিত হয়। এগুলির মধ্যে প্রোজেষ্টেরন এবং অ্যাণ্ড্রোষ্টেরন প্রধান। এই যৌন-হর্মোনগুলি ওভারী এবং টেষ্টিস থেকে নিঃসৃত যৌন-হর্মোনের পরিপূরক। অধিকন্তু অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে নিষ্কাশিত কর্টিল্যাক্টিন (Cortilactin) নামক হর্মোনটি পিটুইটারী-ক্ষরিত প্রোল্যাক্টিনের সঙ্গে একযোগে স্তন্যক্ষরণ বৃদ্ধি করে।

অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সে কর্টিকয়েড হর্মোন সংশ্লেষণ সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানা যায় নি। সম্ভবতঃ কর্টেক্সের কোষগুলি কোলেষ্টেরল নামক

স্টেরল জাতীয় পদার্থ থেকে কর্টিকয়েড হর্মোন প্রস্তুত করে। কর্টেক্সে অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড বা ভিটামিন 'সি' (Vit. C)এর প্রাচুর্য থেকে অনুমান করা যায় যে, এই ভিটামিনটি হর্মোন-সংশ্লেষণে অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন মানবেতর প্রাণীর ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিতে অহরহই কর্টিকয়েড হর্মোন সংশ্লেষিত হচ্ছে এবং প্রস্তুত হর্মোন ন্যূনাধিক পরিমাণে সদা-সর্বদাই রক্তপ্রবাহে মিশছে। এই হর্মোনগুলি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দানার আকারে গ্রন্থিকোষে সঞ্চিত থাকে এবং সঞ্চিত দানারাশির কিয়দংশ বিশেষ বিশেষ এনজাইমের প্রভাবে দ্রবীভূত হয়ে রক্তস্রোতে শরীরের নানা স্থানে নীত হয়।

অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের ক্ষরণ-ক্রিয়া স্নায়বিক প্রেরণার ওপর নির্ভরশীল নয়। এই গ্রন্থির মূল নিয়ামক হ'ল পিটুইটারী গ্রন্থির "অ্যাড্রিনাল-কর্টেক্স-উদ্দীপক" হর্মোন (Adreno-corticotrophic Hormone)। পিটুইটারী গ্রন্থি এই হর্মোনের সহায়তায় অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের গঠনগত অখণ্ডতা এবং ক্রিয়াগত সামঞ্জস্য রক্ষা করে। দেহ থেকে পিটুইটারী গ্রন্থি উৎসাদন করলে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের ক্ষরণশীল কোষগুলিতে ক্ষয়বিকৃতির সূচনা হয় এবং হর্মোন-ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। ঈদৃশ অবস্থায় পিটুইটারী-নিষ্কাশ (Pituitary Extract) অথবা কর্টেক্স-উদ্দীপক হর্মোনের (A C T H) যথাযথ প্রয়োগ বিকৃতিগ্রস্ত কোষগুলিকে পুনশ্চ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। আবার স্বাভাবিক গতিতে বর্ধনশীল প্রাণীর দেহে পিটুইটারী নিঃসৃত কর্টেক্স-উদ্দীপক হর্মোন প্রয়োগ করে দেখা যায় যে, কর্টেক্সের ভিতরের স্তরের কোষগুলি আকার ও আয়তনে দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ক্ষরণ-ক্রিয়াও অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এইসব পর্যবেক্ষণ থেকে পিটুইটারী ও অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের সুনিবিড় এবং পারস্পরিক সম্পর্কই সপ্রমাণ হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, "হাইপোথ্যালামাস" (Hypothalamus) নামক মস্তিষ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুকেন্দ্র পিটুইটারী এবং অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের পারস্পরিক সম্পর্কের সুমিতি রক্ষা করছে। অপর পক্ষে, রক্তে কর্টিকয়েড হর্মোনের মাত্রা হাইপোথ্যালামাসের মাধ্যমে কর্টেক্স-উদ্দীপক হর্মোনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করছে। রক্তস্রোতে কর্টিকয়েড-এর মাত্রা যখনই হ্রাস পায়, হাইপোথ্যালামাসের স্নায়ুকোষগুলি তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়ে ওঠে এবং এই উদ্দীপনার ফলে স্নায়ুকোষ থেকে "নিউরো-হিউমার" (Neuro-Humor) নামক একটি স্নায়বিক হর্মোন নিঃসৃত হয়। এই স্নায়ুরস "হাইপো-থ্যালামো-হাইপোফিসিয়াল" রক্তধারায় মিশে হাইপোফিসিস অর্থাৎ পিটুইটারী গ্রন্থিতে পৌঁছায় এবং পিটুইটারীর পুরোভাগকে উত্তেজিত ক'রে বর্ধিত মাত্রায় কর্টেক্স-উদ্দীপক হর্মোনের ক্ষরণ ঘটায়। কর্টেক্স-উদ্দীপক হর্মোন তখন স্বকীয় ভূমিকা গ্রহণ ক'রে কর্টিকয়েড-হর্মোন- ক্ষরণ বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে, রক্তে কর্টিকয়েড হর্মোনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে উপরিবর্ণিত ঘটনাক্রমের ঠিক বিপরীতগুলিই পরিদৃষ্ট হয়। এই ভাবে "পিটুইটারী-হাইপোথ্যালামাস-অ্যাড্রিনাল-চক্রে"র পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের ক্ষরণ-ক্রিয়ার সুষমা রক্ষিত হয়। কিন্তু অ্যালডো-স্টেরন বা ইলেকট্রোকর্টিন (Aldosterone, or, Electrocortin) নামক অজৈব ধাতব পদার্থ এবং জলের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী হর্মোনটির ওপর কর্টেক্স-উদ্দীপক হর্মোনের প্রভাব একান্তই অকিঞ্চিৎকর। এই হর্মোনটির নিয়ন্ত্রণতার সম্ভবতঃ অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের স্বায়ত্তশাসনে এবং রক্তের অ্যালডোস্টেরনের মাত্রারও কিঞ্চিৎ প্রভাব আছে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায়। অ্যাড্রিনাল-গ্রন্থির মজ্জাংশ থেকে নিঃসৃত অ্যাড্রিনালিনও হাইপোথ্যালামাসকে উদ্দীপিত ক'রে প্রত্যক্ষভাবে কর্টেক্স-উদ্দীপক হর্মোন এবং পরোক্ষভাবে কর্টিকয়েড হর্মোনের ক্ষরণক্রিয়া বিবর্ধিত করে।

বেঁচে থাকার পক্ষে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স একান্ত অপরিহার্য। প্রাণিদেহ থেকে উভয় অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির বহিরংশ সমূলে অপসারণ করলে কয়েকদিনের মধ্যেই উক্ত প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু মুমূর্ষু অবস্থায় উক্ত প্রাণীর দেহে যদি যথেষ্ট মাত্রায় কর্টেক্স-নিষ্কাশ প্রয়োগ করা হয়, তাহলে পরীক্ষাধীন প্রাণীটি ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে ওঠে। উভয় পার্শ্বের অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স উচ্ছেদের ফলে পরীক্ষাধীন প্রাণীর শরীরে নানাবিধ অবাঞ্ছিত পরিবর্তনের সূচনা হয়। প্রথম দিকে মূত্রে অস্বাভাবিক পরিমাণে সোডিয়ম (Sodium) নিঃসৃত হতে থাকে। ফলতঃ, রক্তে সোডিয়ামের আপেক্ষিক (Relative) এবং পরম (Absolute) উভয় মাত্রাই কমে যায়। এই সোডিয়াম বিচিত্র আকর্ষণী শক্তিবলে রক্তে জল ধারণ করে রাখে এবং এই ভাবে রক্তের মোট পরিমাপ এবং স্বাভাবিক তারল্য রক্ষা করে। এজন্য অ্যাড্রিনাল উৎসাদনের পরে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা স্বাভাবিকের অনেক নীচে নেমে যাওয়ার ফলে রক্ত থেকে জল বেরিয়ে যায়। ফলে রক্ত অস্বাভাবিকরূপে ঘন হয়ে পড়ে এবং দেহের মোট রক্তের পরিমাণও যথেষ্ট হ্রাস পায়। ক্রমশঃ কিডনির কার্যক্ষমতা লোপ পায়, রক্তে ইউরিয়া, ক্রিয়াটিনিন, ফসফেট প্রভৃতি ক্ষতিকর পদার্থ ক্রমবর্ধমান পরিমাণে সঞ্চিত হতে থাকে। এই সব কারণে দেহে আত্যন্তিক অবসাদের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। রক্তচাপ দ্রুত হ্রাস পায়। ক্ষুধা থাকে না। স্নেহ এবং শর্করা জাতীয় পদার্থের শোষণ আশানুরূপ হয় না, পেশীগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে নেমে যায়।

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টতঃ এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স শরীরের এমন কতকগুলি ক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, যেগুলি বাঁচবার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। প্রথমতঃ, অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স আমিষ শর্করা এবং স্নেহপদার্থের বিপাকক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ কর্টেক্স-ক্ষরিত হর্মোনের প্রভাবে প্রোটিন শর্করা স্নেহপদার্থ যথোপযুক্তরূপে শোষিত এবং দেহকোষে সুষ্ঠুরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। ফলে শরীরের সুসমঞ্জস পুষ্টিসাধন হয়। সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতব পদার্থ এবং জলের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কর্টেক্স দেহের নানা অত্যাবশ্যক ক্রিয়াকলাপের স্বাভাবিকত্ব রক্ষা করে। কিডনির যথাযথ ক্রিয়া এবং রক্তের পরিমাণের সমতা রক্ষার পক্ষে এই কার্যটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আগেই বলেছি, কর্টেক্সবিহীন প্রাণীর রক্ত থেকে সোডিয়াম এবং জল দ্রুত মূত্রমাধ্যমে বহিষ্কৃত হয়ে যায় বলে রক্তের পরিমাণ কমে আসে এবং ঘনত্ব অনভীপ্সিতরূপে বৃদ্ধি পায়। রক্তের এই পরিবর্তনের ফলে দেহে যেসব অনভিপ্রেত উপসর্গের আবির্ভাব ঘটে তা ইতিপূর্বেই বর্ণনা করেছি।

অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে দেহের আকস্মিক এবং আত্যন্তরীণ সঙ্কটকালে। এই আত্যন্তরীণ সঙ্কট ঘটতে পারে নানা বাহ্য কারণে। যথা, আকস্মিক দৈহিক আঘাত, অত্যধিক

রক্তপাত কিংবা দুঃসহ শীত। আবার দেহের অন্দরমহলের নানা বিশৃঙ্খলাও ঘটাতে পারে এই সঙ্কট, যথা আভ্যন্তরীণ রক্তপাত, বিষক্রিয়া, রক্তের কোন ক্ষতিকর পরিবর্তন অথবা দুর্দমনীয় মানসিক উদ্বেগ। এই সমস্ত আপৎকালে দেহের কোষে কোষে কর্টিকয়েড হর্মোনের ব্যবহার অত্যধিক বেড়ে যায়, রক্তে কটিকয়েড হর্মোনের মান কমে আসে, আরও অধিক কর্টিকয়েড হর্মোনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। প্রথমে হাইপোথ্যালামাস উদ্দীপিত হয় এবং পিটুইটারীর মাধ্যমে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে আরও বর্ধিত পরিমাণে হর্মোন ক্ষরণ করতে থাকে। কর্টেক্সের হর্মোনগুলি দেহকে বিসদৃশ অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করবার শক্তি যোগায়। কিন্তু হর্মোনগুলির এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যপদ্ধতির মূল উৎস সম্পর্কে এখনও অনেক মতভেদ রয়েছে। তবে দেহের সঙ্কট প্রতিরোধে কর্টেক্সের অবদান অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত। দেখা গেছে, এই সকল সঙ্কটকালে অ্যাড্রিনাল-কর্টেক্সের সর্বস্তরে বৈচিত্র্যপূর্ণ গঠনগত পরিবর্তন ঘটে। অপিচ, যে প্রাণীর দেহ থেকে কর্টেক্স অপসারিত হয়েছে তাকে যদি অত্যধিক ঠাণ্ডার সংস্পর্শে আনা যায়, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় কর্টেক্সের স্বল্পক্ষরণজনিত রোগেও মানবদেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে অথবা একেবারে লোপ পায়।

এতদ্ভিন্ন অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির বহিরংশটি যৌনজীবনকেও কথঞ্চিৎ প্রভাবিত করে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কর্টেক্স থেকে প্রোজেষ্টেরন, অ্যাণ্ড্রোষ্টেরন প্রভৃতি যৌন-হর্মোন ক্ষরিত হয়। এগুলি ওভারী এবং টেষ্টিস থেকে নিঃসৃত যৌন হর্মোনগুলির সগোত্র এবং পরিপূরক। স্বাভাবিক যৌনজীবনে কর্টেক্স ক্ষরিত যৌন হর্মোনের প্রভাব যদিও নিতান্তই গৌণ, কিন্তু নানা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এই হর্মোনগুলির অতিক্ষরণ দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের ক্রম-বর্ধিষ্ণু স্ফীতি বা টিউমার অথবা ক্ষরণশীল কোষগুলির অতিসক্রিয়তার ফলে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে যৌন-হর্মোন—এই যৌন হর্মোন স্ত্রীজাতীয় হতে পারে, আবার পুংজাতীয়ও হতে পারে। পুংজাতীয় হর্মোনের ক্রিয়াধিক্যের ফলে নারীদেহে পুরুষসুলভ পরিবর্তনের সূচনা হয়। কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়, শরীরের নানাস্থানে কেশোদ্গম হয় এবং মাসিক ঋতুঘটিত বিবিধ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

শ্রাবণ সংখ্যা (১৩৬৮) বসুমতীতে প্রকাশিত "হর্মোন বিভ্রাট" প্রবন্ধে অ্যাড্রিনাল কার্টেক্সের হর্মোনক্ষরণজনিত বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো। কর্টেক্সের অতিক্ষরণঘটিত উপসর্গের মধ্যে "কুশিং বর্ণিত রোগ"ই (Cushing's Syndrome) প্রধান। এই ব্যাধিতে শরীরে অত্যধিক মেদবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু এই মেদসঞ্চয় সমানুপাতিক কিংবা সুসমঞ্জস নয়। অর্থাৎ দেহের সর্বত্র সমান ভাবে মেদ জমে না। কেবল কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থানে সমধিক পরিমাণে চর্বি জমে। মুখখানি হয় মেদবহুল, স্ফীত এবং গোলাকৃতি! অনেক সময় এই ধরণের মুখমণ্ডলকে পরিহাস করে "চাঁদমুখ" (Moon Face) বলা হয়। এই চন্দ্রসদৃশ গোলাকার মুখ কিন্তু মোটেই কাব্যে বর্ণিত "চন্দ্রনিভ-আননে"র মত আহা-মরি নয়, বরং বেশ একটু দৃষ্টিকটুই; ফোলা ফোলা চোখের পাতা, ছোট ছোট কুৎকুতে চোখ, মাছের মত মুখ, চর্বিভরা লাবণ্যহীন গণ্ডদেশ—মুখশ্রীকে একেবারে ম্লান ক'রে দেয়। গ্রীবাদেশের পশ্চাতে একরাশ চর্বি জমে থাকে উটের কুঁজের মত। অথচ চামড়া হয় পাতলা, অনেক সময় রক্তপ্রণালীগুলো সুপ্রকট হয়ে ওঠে ত্বকের মধ্য দিয়ে। মুখ, বুক এবং উদরদেশে অস্বাভাবিক কেশের আবির্ভাব হয়। ক্যালসিয়াম এবং প্রোটীন বেরিয়ে যাওয়ার অস্থিগুলি ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। কুশিং-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ অধিক বয়সে প্রায়শঃই ডায়াবেটিস বা মধুমেহ রোগে আক্রান্ত হন; কেউ কেউ আবার রক্তচাপের আধিক্যেও ভুগে থাকেন। এতদ্ভিন্ন, পুরুষত্বহীনতা, বন্ধ্যাত্ব, ঋতুবন্ধ প্রভৃতিও ক্ষেত্রবিশেষে দেখা গেছে।

অ্যাড্রিনাল অতিক্ষরণে কুশিং কথিত উপসর্গ ব্যতীত যৌন-ক্রিয়াগত নানা বিসদৃশ অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে। বয়সভেদে এই সব উপসর্গের প্রকারভেদ হয়। শৈশবে কর্টেক্সের অতিরিক্ত ক্ষরণ অল্পবয়স্ক বালকের দেহে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটিয়ে তাকে সাবালকের মত করে গড়ে তোলে। এই সব বালকের যৌন গ্রন্থি এবং সহকারী যৌনযন্ত্রসমূহ অকালেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং কৈশোরের সীমানা না পেরুতেই এদের মধ্যে আনুষঙ্গিক যৌনচরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হয়। এই ধরণের অকালপক্ক বালকদের অনেক সময় "শিশু হারকুলিস" আখ্যা দেওয়া হয়। বালিকাদের দেহেও অনুরূপ অকালপক্কতার লক্ষণ ফুটে উঠতে পারে। বালিকার যৌনাঙ্গ এবং স্তন অস্বাভাবিক রূপে বেড়ে যায়। অনুদ্ভিন্নযৌবনা গৌরী বালিকাও রজস্বলা হয়। এমন কি, দু'বছর বয়সের বালিকাকেও ঋতুমুখী হতে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে।

যৌবন-প্রাপ্তির পরে যদি এই অতিক্ষরণ সুরু হয় তাহলে কিন্তু উপসর্গের প্রকাশ ভিন্ন প্রকারে ঘটে। তখন নারীদেহে নানা পুরুষোচিত বিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের মুখে পুরুষজনোচিত কেশোদ্গম হয়, কণ্ঠস্বর পুরুষালি হয়, স্তনের ক্ষয়বিকৃতি ঘটে। মাসিক ঋতুস্রাব কষ্টসাধ্য এবং অনিয়মিত হয়ে ওঠে। কখন কখন বন্ধ্যাত্বও দেখা দেয়। পক্ষান্তরে, পুরুষদেহে রমণীসুলভ পেলবতার সঞ্চার হয়, কণ্ঠস্বর মেয়েলি হয়, স্তন বাড়তে থাকে মেয়েদের মত, কামেচ্ছা লুপ্ত হয়।

অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির স্বল্পক্ষরণের ফলে অ্যাডিসন-বর্ণিত রোগের আবির্ভাব ঘটে। ক্রমবর্ধমান অবসাদ, পেশীদৌর্বল্য, পেশীক্ষয় প্রভৃতি এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ। রোগসূচনায় মুখে কালো কালো দাগের সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ ঐ কালো দাগ গলদেশ, বাহুযুগল, লিঙ্গ, অণ্ডস্থলী, যোনিপ্রদেশ, স্তনবৃন্ত, নাভি প্রভৃতি সমস্ত স্থানেই ছড়িয়ে পড়ে।

ইদানীন্তন চিকিৎসাজগতে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে কর্টিসোন, হাইড্রো-কর্টিসোন, অ্যালডোষ্টেরন প্রভৃতি কর্টিকোষ্টেরয়েড ব্যাপক ভাবে এবং প্রশংসনীয় সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। হাঁপানি, রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস প্রভৃতি রোগে কর্টিসোন নাটকীয় ভাবে সুফল দেয়। হজকিনের রোগ, লিম্ফোসারকোমা, লিউকিমিয়া প্রভৃতি ব্যাধিতেও কর্টিসোন সুফলপ্রদ। এতদ্ভিন্ন নানাবিধ অ্যালার্জি সংক্রান্ত উপসর্গের চিকিৎসাতেও কর্টিসোন, হাইড্রো-কর্টিসোন প্রভৃতি সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা-বিদ্যার ইতিহাসে কর্টিকোষ্টেরয়েডগুলি একটি স্বতন্ত্র এবং গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে একথা বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না।

—সুব্রতকুমার পাল।

প্রশান্ত চৌধুরী

১২

সতের বছরের যুবতী মেনকা এক বুক ছমছমানি নিয়ে একলাটি দাঁড়িয়ে রইল সেই বাড়ির দোতলার দালানে, যে-বাড়ির উঠানের মাঝখানে পাথরের ফোয়ারা···ফোয়ারার চারিদিকে শ্বেত পাথরের তৈরি ন্যাংটো মচ্ছকন্যে আর দাড়িওলা-শিংওলা রাক্কস···রাক্কসগুলোর মোটা মোটা হাত মচ্ছকন্যেদের সরু কোমরের থাঁজে···তাদের হাতের চাপে যন্তন্নায় চোখ থেকে জল পড়ে মচ্ছকন্যেদের···সেই চোখের জলে ফোয়ারা হয়···বাহার হয়···শোভা হয়···বড়মানুষী হয়।

থঁড়শের পুবমুখো দেউড়িওয়ালা সেই বিখ্যাত বাড়ির দোতলার দালানে মেনকাকে দাঁড় করিয়ে রেখে একটা ঘরের ভিতর দিয়ে আরেকটা ঘর, তার ভিতর দিয়ে আরো একটা ঘরের মধ্যে চলে গেল শশিকান্ত।

শুধু শশিকান্তই নয়;—সতের বছরের ভরা-যৌবনের মেনকাকে একলাটি তেমনি অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে বাহাত্তরে বুড়ি ঠানদিকেও অতীত থেকে ফিরে আসতে হল বর্তমানকালে।

দোকানে খদ্দের এসেছে।

নিজের গোটা জীবনটাকে একটানা এক নাগাড়ে নিশ্চিন্তে খতিয়ে যাচিয়ে দেখবার কি জো আছে ঠানদির? হয় আছে খদ্দের, না হয় আছে এ-অঞ্চলের কেউ না কেউ। অতীতের মিছিলের রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে ওরা ঠানদিকে বর্তমানের কাঠগড়ায় টেনে এনে জেরা করে,—

কে তুমি?

আমি ঠানদি। এখানকার সবাই আমায় ঠানদি বলে ডাকে।

কতদিন আছ এখানে?

মনে নেই ঠিক। সে কি আজ?

দোকান থেকে আয় তো দিব্যি হয়।

তা' শত্তুর-মুখে ছাই দিয়ে হয় বৈকি।

খেতে কে? তিনকুলে তো নেই কেউ।

কেউ না।

তবে দোকান থেকে এত টাকা যে লাভ হয়;—তা' করো কি সে-টাকাগুলো নিয়ে?

একটা মেয়েকে পালন করতে চেয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, যা কিছু জমাচ্ছি, সব তাকেই দিয়ে যাব।

নাম কি তার?

মুখপুড়ী।

ও আবার নাম নাকি? ও তো গালাগাল।

ঐ নামেই যে ডাকত তাকে তার মা। তার নামটাও মনে আছে গো আজও। লক্ষীমণি। ইষ্টিমারের পুরোনো যে টিকিট-ঘরে এখন কলেরা-বসন্তর টিকে দেওয়া হয়, তারই সামনের চাতালে কিছুদিনের তরে সংসার পেতেছিল ঐ লক্ষীমণি। ফেলে-দেওয়া চট্ আর ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে পরিপাটি শয্যে রচনা করত। তারপর পুঁটলি-পাঁটলার ভিতর থেকে অ্যালুমিনিয়মের তোবড়ানো গামলাটা বের ক'রে সাতজায়গার কুড়োনো ভাত-তরকা'র চটকে মেখে খেত মেয়েটাকে পাশে নিয়ে। খেয়ে-দেয়ে গামলা-ঘটি ধুয়ে-মেজে পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে ঘুমিয়ে পড়ত সেই অপরূপ শয্যেয়। সকালে উঠে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়ত,—ভিক্ষে করতে আর ভাত কুড়োতে।

গনগনে উনুনের আঁচে এক নাগাড়ে আট-দশ ঘণ্টা রান্না করলে হালুইকর বামুনদের মুখ যেমনধারা হয়ে ওঠে, লক্ষীমণির মুখ সব সময়েই দেখাত যেন তেমনধারা। শয্যে থেকে সুরু ক'রে ওর সংসারের যাবতীয় তৈজসপত্রাদি পর্যন্ত পুঁটলি-বন্দী হয়ে পথে পথে ঘুরত ওর সঙ্গে। পুঁটলি বাঁধার সে কী নিপুণ নিখুঁত পরিপাটি ভঙ্গি ছিল লক্ষীমণির! জমজমাট একটা বেরহৎ সংসারের বড়গিন্নি হওয়ার সব কটা গুণপণা ছিল যার, চোখের মাথা-খাওয়া বিধেতা তাকেই কিনা ঘুরিয়ে মারলেন পথে পথে! সাগর যে বলে ভগবান বলে কিচ্ছুটি নেই, মাঝে মাঝে মনে হয় সেই কথাটাই বোধহয় খাঁটি গো, সেই কথাটাই খাঁটি।

লক্ষীমণি তার পুরো সংসারটাকে পুঁটলি-বাঁধা করে ঘুরত যখন

ন্যাশনাল এণ্ড গ্রীণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

যুক্তরাজ্যে সঙ্ঘবদ্ধ। সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ

কলিকাতাস্থিত শাখাসমূহ : ১৯ নেতাজী সুভাষ রোড, ২৯ নেতাজী সুভাষ রোড (লয়েডস শাখা), ৩১ চৌরঙ্গী রোড, ৪১ চৌরঙ্গী রোড, (লয়েডস্ শাখা), ১৭ ব্রাবোর্ণ রোড, ৬ চার্চ্চ লেন।

পথে পথে, ওর সেই বাচ্ছা কচি মেয়েটাও বাঁধা থাকত ওর সঙ্গে। নিজের কোমরের সঙ্গে মস্ত একটা শক্ত দড়ি বেঁধে তার আরেক মুখে বেঁধে রাখত সেই মুখপুড়ীকে। আর, পথ চলতে চলতে সারাক্ষণই গাল দিত মেয়েটাকে বিড়বিড় ক'রে। সে-গালাগালের আদ্ধেক যদি বা বোঝা যেত, আদ্ধেক একেবারে বোঝাই যেত না একরত্তি।

কুমারীব্রত জান তো? কুমারী মেয়েকে নতুন কোরা শাড়ি পরিয়ে, মাথা ঘষে দিয়ে, চুলে গন্ধ-তেল মাখিয়ে, চুল বেঁধে দিয়ে, পিঁড়িতে বসিয়ে কচুরি, জিলিপি, সিঙ্গাড়া, নিমকি, সব খাবার খাইয়ে হাতে একটা নতুন চকচকে টাকা গুঁজে দিতে হয়।

তা' ঐ সেই লক্ষ্মীমণির মেয়েটাকে কুমারী করেছিলুম গো আমি একবার। শুধু নতুন কোরা শাড়িটা পরাবার সময় একটি বারের জন্যে কোমরের দড়ির বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়েছিল লক্ষ্মীমণি তার মেয়েকে। তারপরেই বেঁধে দিয়েছিল আবার। আমি শুধিয়েছিলুম,—'শয়নে-স্বপনে আহারে-বিহারে অষ্টপ্রহর মেয়েটাকে নিজের সঙ্গে অমন দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ কেন বাছা?' লক্ষ্মীমণি বলেছিল,—'এর আগে আমার আরো সাতটা ছেল গো, ঠাকরুণ! সব কটাকে একে একে কেড়ে নিয়েছে যমে। এটাকে আর কাড়তে দিচ্ছিনে।' আমি বলেছিলুম,—তাই যদি, তাহলে মেয়েটাকে অমন সদাসর্বদা গাল পাড়ো কেন বাছা অকারণে?' লক্ষ্মীমণি জবাব দিয়েছিল,—'আগের সাতটাকে অনেক আদর করেছিলুম গো ঠাকরুণ, কোনোদিন ভুলেও কটুকাটব্য করিনি একটাও। কিন্তু এসব হচ্ছে শত্তুরের শত্তুর। আদর দিয়েছি কি কাঁচকলা দেখিয়েছে!'

ঐ লক্ষ্মীমণিকে ব্যামোয় ধরল যখন, সকলে মেয়েটার বাঁধন খুলে দিতে গেছল। লক্ষ্মীমণি খুলতে দেয়নি কিছুতেই। শেষ দিকে বিকারের ঘোরেও অবিরাম গাল পেড়েছে মেয়েটাকে, আর কেবল বলেছে,—'বাঁধন যেন খুলো না গো কেউ, বাঁধন যেন খুলো না। খুললেই ও' পালাবে।'

লক্ষ্মীমণির দেহটাকে তুলে নিয়ে যাবার সময় আমি খুলে দিয়েছিলুম মেয়েটার বাঁধন। মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলুম আমার দোকান-ঘরে। ভেবেছিলুম, বড় হলে আমিই ওর বিয়ে দেব ঘটা কোরে। পোয়াতী হলে ওর সাধ-পঞ্চামৃত দেব এয়োদের নেমন্তন্ন খাইয়ে। তারপর একদিন ওর ছেলেমেয়েগুলো গল্প শুনবে আমাকে ঘিরে ব'সে। তা' আর হল কৈ? লক্ষ্মীমণির বাঁধন-কাটা মেয়েটা দেড় বছরের মধ্যেই পালিয়ে গেল ওপারে। সেই থেকে আবার একলা।

কিন্তু ওসব কথা থাক্ গো এখন।—সতের বছরের মেনকাকে যে আমি একলা দাঁড় করিয়ে এসেছি বঁড়শের বাবুদের বাড়ির দোতলার দালানে;—তার দিকে এবার একটু নজর ফেলতে দাও গো আমাকে। তার কথা ভাবতে দাও। সেই যুবতী মেয়েটাকে সতের বছরের নতুন ঘাট থেকে বাহাত্তর বছরের ভাঙ্গা ঘাটে ভেসে আসতে দাও গো তোমরা। আমাকে একটু গুটিয়ে সুটিয়ে একলা হয়ে থাকতে দাও আজকের দিনটা।

দেবে না।

ঠানদিকে ওরা কিছুতেই এক নাগাড়ে নিজের জীবনের ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা ভাবতে দেবে না।

ওদের কারুর পান চাই, কারুর ডাব চাই, কারুর পেতলের ঘটি চাই, কারুর চাই লোহার চাবি।

কিন্তু ঠানদি তো এর আগে আর কোনোদিন এমন কোরে মেনকার হাত ধোরে অতীতের পথে পা বাড়ায়নি। আজ ঐ মাদারডাঙার বিখ্যাত গোঁসাই বংশের একশো দশ বছরের পুণ্যাত্মা মানুষটা শ্মশান আলো করতে এসে যদি ঠানদির অতীত জীবনের অন্ধকার পথটাতে আলো একটু ফেলেই থাকে হঠাৎ, তাহলে মেনকার হাত ধোরে দাও না বাপু আজ ঠানদিকে একটু হেঁটে বেড়াতে। আজ না হয় থাকলই বন্ধ ঠানদির ঘুপ্‌সি দোকানঘরটা। আজ না হয় না-ই হল বেচাকেনা। যে মানুষটা রোজ গঙ্গায় ডুব দেয়, আজ তাকে দাও না একটু অতীতে ডুব দিতে।

অসময়ে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে ঠানদি অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল,—যদি খুঁজে পাওয়া যায় আবার সেই সতের বছরের যুবতী মেনকাকে।

পাওয়া গেল।

তিনখানা ঘরের গোলকধাঁধা পেরিয়ে ফিরে এসে শশিকান্ত তখন হাত ধরেছে মেনকার।

—আয়।

মেনকা তখন সেই দালানে একলাটি দাঁড়িয়ে দেয়ালে ঝোলানো শিংওলা মস্ত হরিণের প্রকাণ্ড মুখের বড় বড় কাঁচের চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখছিল একমনে। ওর যেন মনে হচ্ছিল, কাঁদছে হরিণটা।

বলল,—কোথায় যাব?

শশিকান্ত বলল,—আয়ই না।

মেনকা বলল—এ আবার কেমনধারা গয়নার দোকান?

চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে শশিকান্ত আবছা-গলায় বলল,—বলেছি তো তোকে, এখানে বন্ধকী কারবার হয়। এখানে কিছুদিন চাকরি করবি। মনিবের মন যদি পেতে পারিস তা হলে গয়নায় গা তোর বোঝাই হয়ে যাবে দেখবি।

মেনকা চোখ বড় বড় করে বলল,—চাকরি!

শশিকান্ত ওকে আদর করে বলল,—হ্যাঁ রে। সুখের চাকরি। মনিবের একটু ফাই-ফরমাশ খাটা, একটু হয়ত পানের ডিবেটা এগিয়ে দেওয়া, গেলাসে একটু সরবৎ ঢেলে দেওয়া, পাকা চুলে কলপ লাগিয়ে দেওয়া,—এমনিধারা ছোটখাটো কাজ। মাস ছয়েক কর, গা-ভর্তি গয়না করে নে, তারপর আমি একদিন এসে নিয়ে যাব আবার তোকে।

শুনে মেনকার চোখ দুটোও যেন দেয়ালে লটকানো হরিণের চোখের মতোই জলে ভিজে গেল। মেনকা বলল,—একলা থাকতে পারব না আমি।

শশিকান্ত ভরসা দিয়ে আর, সেই আলো-ফট্‌ফট্ দিনের বেলাতেই মেনকার গালে একটা চুমো দিয়ে বলল,—একলা কেন রে? বাবুর সরকারমশাই, বিষ্টুবাবু আছেন, বড় ভাল লোক। মন খারাপ লাগলেই বলবি। তিনি সব ঠিক করে দেবেন। তারপর আমি তো আছিই। আসবখন মাঝে মাঝে।

—আমার গয়না চাই না। চল্ ফিরে যাই।

—কিন্তু আমি যে তোকে এক-গা গয়নায় মোড়া রাজরাজেশ্বরী বেশে দেখতে চাই রে মেনকা। না হলে যে আমার সারা জীবনের আফশোস্ মিটবে না। আমার জন্যেই যে তোর গায়ের গয়নাগুলো খোয়া গেছে, এ যে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আয়, চল্।

—তুই কোথায় থাকবি? কে তোকে বেঁধে দেবে? তোর জামাকাপড় কেচে দেবে? কি করে দিন কাটবে তোর?

—তোকে পাওয়ার আগে যে ভাবে কাটত। কিন্তু দেরি নয় আর, চল্।

মেনকার হাত ধরে সেই অনেক ঘরের গোলকধাঁধার মধ্যে ঢুকে পড়ল শশিকান্ত। ঘরে ঢোকার আগে কেন কে জানে দরজার বাইরের দেয়ালে লট্‌কানো মরা-হরিণের চোখ দুটোর দিকে শেষবারের মত তাকাল আরেকবার মেনকা।

সে-চোখে তখন যেন আরো কান্নার জল।

শশিকান্তর পিছু পিছু গুটিগুটি গিয়ে মেনকা অনেক ঘর ঘুঁড়ে যে-ঘরে গিয়ে থেমে দাঁড়াল, সে-ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে কাঁচে বাঁধানো বড় বড় অক্ষরের লেখা টাঙানো রয়েছে কত। বড় বড় আর ছাপার হরফ বলেই পড়তে পারল মেনকা কোনরকমে।

সদা সত্যকথা বলিবে।
বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।
জীবন নশ্বর, ধর্ম অবিনশ্বর।
দীনতারিণী তারা।
হরের্নামৈব কেবলম্।
গুরু-শ্রীচরণ ভরসা।
কামিনী-কাঞ্চন কোরো না যাচন।
এ-জীবন নিশার স্বপন।

ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকমের সব লেখা। আরেক দিকে আছে মাদারডাঙার বিখ্যাত কেশব গোঁসাইয়ের বংশতালিকা। মহারাজ আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য কান্যকুব্জ থেকে আগত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণ থেকে সুরু কোরে একেবারে হাল-আমলের আড়াই বছরের শিশুর নামটি পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে সেই সুদীর্ঘ তালিকায়।

সেই ঘরের কালো-সাদা চৌখুপি পাথরের মেঝের মাঝখানে পাতা পুরু নরম গদির ওপর বড় বড় দুটো তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ব'সে গড়গড়া টানছিলেন একজন ধবধবে ফর্সা রঙের মোটাসোটা মানুষ। খালি গা। ধবধবে সাদা মোটা একগাছা পৈতে। মানুষটার না আছে মুখে দাড়িগোঁফ, না আছে বুকে একগাছি লোম। নরম চকচকে মাংসালো চেহারা। মস্ত একটা খোকা যেন বসে আছে গদির ওপর।

সেই মানুষটিকে ঘিরে জনা-তিন চার লোক বসে ছিলেন। আরেকজন দাঁড়িয়ে ছিলেন জানালার ধারে। তিনি সহসা জানলা ছেড়ে এসে বললেন,—বাবু, দত্তদের বাড়ির নতুন ডানাকাটা পরী বৌটা ভিজে-কাপড়ে ছাদে উঠেছে বড়ি দিতে। দেখলে চোখ যেন ঝল্‌সে যায়।

রাস্তা দিয়ে বাজনা-বাদ্যি বাজিয়ে কোনো শোভাযাত্রা গেলে কচি কচি ছেলেরা যেমন দেখবার জন্যে অস্থির হন্তে হয়ে ওঠে,—ঠিক তেমনি হন্তে হয়ে সেই মোটাসোটা কর্তা মানুষটি গড়গড়ার নল ফেলে দুহাত ওপরে তুলে দিয়ে বলে উঠলেন,—ওরে, ধর ধর, শীগগির ধরে তোল্ আমাকে কেউ। আমাকে দাঁড় করিয়ে দে আগে।
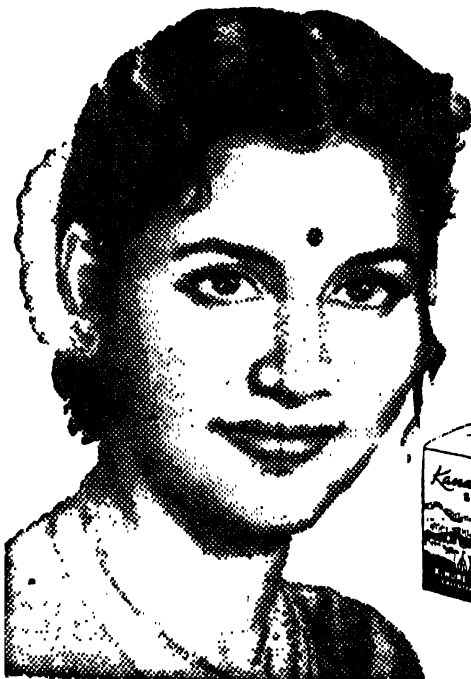
তাড়াতাড়ি ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন দুজনে। তৃতীয় ব্যক্তি একটা দূরবীন্ ধরলেন কর্তার চোখের সামনে। দূরবীনের কাঁচ দুটো দত্তদের বাড়ির ছাতের দিকে তাগ্ করা।

মেনকা অবাক হয়ে দেখল, কর্তার পা দুটো প্যাঁচ-পা-ওয়ালা গোরুর পিঠের পায়ের মতন সরু, লটপটে, আর নিতান্তই অকেজো। দু'পাশের দুটো মানুষের কাঁধে ভর না দিয়ে কুঁজবুড়ো মানুষটার দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই।

কাঁচের মধ্যে দিয়ে দত্তদের বাড়ির ডানাকোটা পরী বৌকে কিছুক্ষণ দেখবার পর পাশের লোক দুটির সাহায্যেই বসে পড়লেন কর্তা গদির ওপরে। গঙ্গার ধারের কুস্তিগীরগুলো কুস্তি-লড়াইয়ের পর যেমন করে হাঁপায়, তেমনি করে হাঁপাতে লাগলেন কর্তা, আর মিনমিন্ করে ঘামতে লাগলেন।

মেনকা এতক্ষণে শশিকান্তর দিকে ফিরে তাকে কিছু বলতে গিয়ে দেখল, শশিকান্ত নেই;—তার জায়গায় কখন এসে দাঁড়িয়েছে শুঁড় তুলে টেরিকাটা রোগা ডিগ্‌ডিগে এক মানুষ। লোকটার মাথার চুল, মোম দেওয়া গোঁফজোড়া, গলায় পাকানো চাদর থেকে সুরু করে পায়ের জুতোজোড়া পর্যন্ত সবই শুঁড়তোলা।

সেই শুঁড়তোলা মানুষটি এক হাতে মেনকার চিবুক ধোরে বলে উঠলেন,—এদিক পানে একটিবার তাকাতে আজ্ঞা হয় বাবু!

কর্তা তাকালেন।

শুঁড়তোলা মানুষটি বললেন,—ক্ষুদিরামের যাত্রাদলের শশিকান্ত বাজনদার,—সেই রেখে গেল।

কর্তা হাসলেন এবার।

পানের ছোপ-ধরা ক্ষয়া-ক্ষয়া কুৎসিত দুপাটি দাঁত!

আজ এত বছর বাদেও সেই দাঁত-দুপাটি চোখের সামনে যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ঠানদি। এত কালের পরেও সেই বিখ্যাত মানুষটির নামটাও দিব্যি মনে পড়ছে ঠানদির। মাদারডাঙ্গার বিখ্যাত গুরুবংশের তিনি ছিলেন রঙ্গলাল শর্মা।

আজ তেতাল্লিশ জনের কাঁধে চেপে তিনিই এসেছেন শ্মশান আলো করতে!

ঠানদি আজ চোখ বুজলেই যেন দেখতে পাচ্ছে মানুষটাকে। তাঁর পিঠের জড়ুল, কানের তিল, উরুতের কাটার দাগ, কষি-আঁটা কোমরের খাঁজের ঘায়ের লম্বা দাগটা পর্যন্ত।

'শিষ্যের বুকে পা রাখলে ডবল নিমুনিয়া পর্যন্ত ভাল হয়ে যায়, এমনি হল গিয়ে দৈবী ক্ষ্যামতা।'

তারাচরণের কথাটা মনে ক'রে পেট গুলিয়ে আজ হাসি এল ঠানদির।

সেদিন কিন্তু কান্নাই পেয়েছিল মেনকার। আঁধার দেখেছিল চারদিকে। অভিসম্পাত দিয়েছিল মনে মনে শশিকান্তকে।

নাঃ! উঠতে হল ঠানদিকে। এতদিন বেঁচে থেকে মানুষটা আজ যখন মরে শক্ত হয়ে গিয়ে ঠানদির নাগালের মধ্যে এসে হাজির হয়েছে,—তখন দেখেই আসুক ঠানদি শেষ দেখা।

দোকানের পিছনের ছোট্ট পাল্লাটা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল ঠানদি। তারপর গুটিগুটি গিয়ে হাজির হল শ্মশানে।

তখনও পালিশ করা ঝকঝকে পালঙ্কখাটে শুয়ে আছেন রঙ্গলাল শর্মা। চিতা সাজানো হয়নি তখনো। নরম গদি, সাটিনের ঝালর-দেওয়া নরম বালিশ, চারদিকে ভুর ভুর সেণ্টের গন্ধ। খালি গায়ে ধবধবে মোটা পৈতে নিয়ে শুয়ে আছেন একশো দশ বছরের রঙ্গলাল শর্মা। দেখলে, সত্যিই মনে হয় বড় জোর ষাট-পঁয়ষট্টি। গোঁফ-দাড়ি না গজালে মানুষের বয়েস বাড়ে না যেন!—রোমহীন প্রকাণ্ড নরম মাংসালো বুক। সারা বুকে চন্দনের ছাপ। কোমর থেকে পা পর্যন্ত গরদের একটা চাদরে ঢাকা। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অর্ধাঙ্গ ঢাকা দিয়ে রেখেছে আত্মীয়-স্বজনেরা। কিন্তু ঢাকা তো থাকবে না শেষ পর্যন্ত। চিতায় তোলা হবে যখন, তখন কিছুই তো চাপা দেওয়া চলবে না। বেরিয়ে পড়বে সরু একজোড়া অসহায় নির্জীব পা!

অসহায়, নির্জীব!

নিম্নাঙ্গের সমস্ত নির্জীবতাকে রঙ্গলাল শর্মা কড়ায়-গণ্ডায় পুষিয়ে নিতে চেয়েছিলেন উর্ধ্বাঙ্গের অতিরিক্ত সজীবতা দিয়ে। তবু আশ মিটত না। কিসের অস্থিরতায় ছটফট্ করতেন সমস্ত দিন। আর, ঠানদির আজও মনে পড়ে, মাঝরাত্তিরে একা শুয়ে শুয়ে মানুষটা কিসের কষ্টে যেন কাঁদত গুমিয়ে-গুমিয়ে।

মানুষটার প্রতি মেনকার ঘৃণা যদি ছিল পনেরো আনা,—মায়াও বোধ হয় ছিল চার পয়সার। কিন্তু সেই শুঁড়তোলা মানুষটা? তার কথা ভাবলে আজো ঠানদির বুড়ো মাথার দুর্বল শিরাগুলো রাগে দপদপ করে ওঠে!

সেদিন মেনকা ক্ষমাও তো করেনি তাকে। তাকে খুন করেই তো জেলে গিয়েছিল মেনকা। চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

থেকে থেকে আজ কেবলই হাসি পাচ্ছে ঠানদির। মনে হচ্ছে, পালঙ্কখাটে ঘুমন্ত ঐ মানুষটার কানের কাছে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে,—কী গো বাবু, চোখ খুলে একবার ছাখ তো চিনতে পার কি না। আমি সেই মেনকা গো। সেই মেনকা, যাকে তুমি তোমার খেয়াল মতো ওঠাতে বসাতে শোয়াতে দাঁড় করাতে আর দূরবীনের মতো দুটো চোখ দিয়ে দেখতে। বিচ্ছিরি অশ্লীল গান বেঁধে সেই গান গাওয়াতে যাকে দিয়ে, আমি সেই মেনকারাণী গো। চোখ মেলে ছাখ তো আজ চিনতে পার নাকি?

[ক্রমশঃ।

ক্যাংকাকীতে সাত সপ্তাহ

শ্রীবিদ্যার্থী

কলেজে প'ড়িবার সময় ১৯৫২ সালে গরমের বন্ধে কাজ করিবার জন্য শিকাগোর প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণে ক্যাংকাকী সহরে গিয়াছিলাম। সেখানে বোধ হয় সাত সপ্তাহ ছিলাম। কাজ না পাইয়া কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের Foreign Students' Advisor-দের নিকট চিঠি লিখিলাম আমি বিদেশী ছাত্র, তাঁহারা যদি দয়া করিয়া কাজের সন্ধান দেন। এ প্রকার সাহায্য করিবার কথা নয়, কারণ আমি তাঁহাদের ছাত্র নই। তবুও দেখিয়াছি, সকল স্তরের ভদ্র আমেরিকান বিদেশীর প্রতি দয়ালু। তাঁহারা নগদ টাকা দিয়া কোথায়ও কাহাকেও সাহায্য করিবেন না—শুধু 'গির্জায় এ বিষয়ে ব্যতিক্রম—কিন্তু যোগাযোগ করিয়া দিলে যদি কাহারও কোন উপকার হয় তবে সে প্রকার কাজ তাঁহারা সব সময়ই করিতে রাজী। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের Foreign Students' Advisor লিখিলেন যে তিনি তাঁহার ছাত্রগণকে কাজ দিতে পারিতেছেন না, অন্যকে কেমন করিয়া কাজ দিবেন। University of Illinois-এর Foreign Students' Advisor দিন পনের কুড়ি পরে এক দীর্ঘ চিঠি লিখিলেন। তিনি জানাইলেন যে এতদিন তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন কোন কাজ আমাকে দিতে পারেন কিনা। কিন্তু কি কেরাণীগিরির কাজ, কি গতর খাটাইয়া কাজ, কিছুই আমাকে দিতে পারেন না। ভদ্রলোক বড়ই ভাল। পর বছর তাঁহার সাথে দেখা করিয়াছিলাম। সাধারণ অবস্থায় এই সময় প্রচুর কাজ পাওয়া যায়। কারখানা ও অপিসে সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা কাজ; শনি রবি সাধারণতঃ ছুটির দিন। সবেতনে বছরে মাত্র ১৫ দিন ছুটি পাওয়া যায়। অসুখ-বিসুখ প্রায়ই হয় না বলিয়া কর্মীরা ঐ ১৫ দিন ছুটি গরমের সময় দেশ ভ্রমণ করিয়া কাটাইয়া দেয়। প্রত্যেক পরিবারে মোটর গাড়ী আছে। এই পনের দিনে হয়ত পাঁচ হাজার মাইল ঘুরিয়া আসিল। এই সময় অনেক কলকারখানা যন্ত্রপাতি ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য ১৫ দিন বন্ধ দেয়। কিন্তু গরমের বাকী আড়াই মাস কাজ চলে। মোট কথা, জুন হইতে আগষ্ট পর্যন্ত অস্থায়ী কাজের অভাব হয় না। কিন্তু ইস্পাত সরবরাহের উপর নির্ভরশীল কাজকর্ম সবই তখন বন্ধ, কারণ ইস্পাত মিলগুলিতে ধর্মঘট। এইজন্য আমার উপযোগী কাজ কেহই দিতে পারিলেন না। দাবী আদায় করিবার জন্য কারখানাগুলিতে গরমের তিন মাসে মাঝে মাঝে ধর্মঘট হয়। এক সাথে রথ দেখা কলা বেচা এই দুই কাজ চলে। স্থায়ী কর্মীরা তখন দেশ ভ্রমণ করিয়া সময় কাটান যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে অন্য দেশেও ঘোরা চলে

ক্যাংকাকীতে Y. M. C. A-তে থাকিতাম। এক যুবকের সাথে আলাপ হইল। তিনি রাস্তা তৈয়ারীর কাজ করেন, ঘণ্টায় আর দুই ডলার। সে কাজ পারিব না। ঐ সহরে ভুট্টার গুদামে কাজ ছিল। দুই তিন মণী বস্তা নিয়া নাড়াচাড়া করিতে হইবে। একটা ছেলে পরামর্শ দিল, ভয় পাইবার দরকার নাই, কাজ করিতে রাজী হও, তারপর একটা কিছু হিল্লে হইবেই। আমি আর chance লইতে রাজী হইলাম না।

মে মাসে কারবন ডেল সহরের Baptist Foundation-এর অধ্যাপক হল আমাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার পরিচিত একজন ধার্মিক Baptist চাষী গরমের তিন মাস একজন সাহায্যকারী চান; খাওয়া থাকা ও সপ্তাহে নগদ তিরিশ ডলারের বেশী দিতে পারিবেন না। আমি বেশী লাভের আশায় সে কাজে রাজী হই নাই। আমেরিকায় চাকরবাকরকে servant বলে না; help বলে। মনিব তাহাদের প্রতি সব সময়ই সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেন। ইহা গণতন্ত্রের একটা শুভলক্ষণ। আবার এই প্রকার কাজের উমেদারও কম।

বেকার আছি বটে, কিন্তু একেবারে হতাশ হই নাই। অধ্যাপক হলকে লিখিলাম যে চাষী মহাশয় যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন তাহার চাইতে সামান্য বেশী দিলে কাজ করিতে রাজী আছি। তিনি উত্তরে লিখিলেন যে বেশী পাওয়া যাইবে না। অধ্যাপক হল বড় ভাল লোক। তাঁহার নিকট বাইবেল বুঝিতে যাইতাম। তিনি ধর্ম শিক্ষা দেন। তাঁহার ব্যবহার ও শিক্ষাপ্রণালী আমাকে খৃষ্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে।

হতাশ হই নাই, হাতে কিছু টাকা ছিল। সকালে এবং বিকালে দোকানে না খাইয়া রুটি, পনীর এবং নানাবিধ ফল কিনিয়া ঘরে খাইতাম। পঁচাত্তর সেণ্ট (এক সেণ্ট আমাদের তিন পয়সা) খরচ করিয়া ভাল খাবার পাওয়া যাইত। অবসর সময়ে দেশে চিঠি লিখিতাম। আমার ভূতপূর্ব শিক্ষক শ্রদ্ধেয় তনয়েন্দ্র বাবুকে এইখানে থাকিতে চিঠি লিখিয়াছিলাম। তিনিও পরে উত্তর দিয়াছিলেন। কোন কোম্পানীর মাইনর স্কুলে ১৯৪৭-৪৮ সালে চাকরী করিবার সময় এক মাসের বেতন পাওনা ছিল। বহু লেখালেখি করিয়াও প্রাপ্য পাই নাই। পুরান চিঠিপত্রের নকল করিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির (তিনি আবার প্রধান মন্ত্রীও বটেন) নিকট নূতন দিল্লীর যথাযথ ঠিকানায় আবেদন করিলাম। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে এইখানে বসিয়া লিখিতাম। Spring Term-এর যে টার্ম পেপারটি বাকী

ছিল তাহাও এইখানে লিখিয়া সম্পূর্ণ করিলাম। Y. M. C. A অফিসের টাইপরাইটার মেশিন এই কাজে ধার পাইয়াছিলাম। তাঁহারা সদয় হইয়া আমার নিকট হইতে কোন পয়সা নেন নাই। এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার আগে জানাইয়া রাখি যে কংগ্রেসের সভাপতির নিকট লিখিবার ফলে পাওনা প্রায় সব টাকাই কোম্পানী আমাকে দিয়াছিল।

লোহার কারখানায় কাজ না হওয়ায় অন্য কাজের চেষ্টা করিলাম। একটি মুদীখানার দোকান সবেমাত্র খুলিয়াছে। জিনিষপত্র গুছাইবার জন্য কয়েক ঘণ্টার কাজ পাইলাম তারপর আবার বেকার। ওখানে একটা সিনেমা হলের পুরানো চেয়ার সারাইবার কাজ জুটিল। দুই দিন প্রায় সারারাত রাবটা হইতে সকাল সাতটা পর্যন্ত কাজ চলিয়াছিল। এই কাজ করিবার পর গায়ে কিছু ব্যথা হইয়াছিল। আবার বেকার। Micro-biology-র গবেষক ডক্টর বালাজী মুণ্ডকরের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি তখন অনেক দূরে অন্য একটি রাজ্যে গবেষণা করিতেছিলেন। তাঁহাকে নিজের দুরবস্থার কথা জানাইলাম। উত্তরে তিনি হতাশ হইতে নিষেধ করিয়া এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখাইতে বলিলেন। বিশেষ দরকার হইলে গির্জার পাদ্রীদের সঙ্গে দেখা করিতে পরামর্শ দিলেন।

চিঠি পাইবার পর আমার হোটেলের অতি নিকটে এক গির্জায় গেলাম। পাদ্রীর সাথে দেখা করিয়া সব কথা বলিলাম। তিনি পরের রবিবার গির্জায় আসিতে বলিলেন। গিয়া দেখি যে অনেক আবালবৃদ্ধবনিতা আসিয়াছেন। আমি যাইতেই সকলেই হাসিমুখে তাঁহাদের মধ্যে বসিতে বলিলেন। আমি বসিলাম। তাঁহারাও উপাসনা করিতে লাগিলেন। আমি বিধর্মী ও বিজাতি। কিন্তু সেজন্য আমাকে দূরে বসিতে হইল না। উপাসনা শেষ হইলে পাদ্রী মহাশয় আমার উদ্দেশ্য সকলের নিকট ব্যক্ত করিলেন। আমার নিকটে যাঁহারা কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন তাঁহাদিগকে পাশের ঘরে আসিতে বলিলেন। তিনি আমাকে নিয়া সেখানে গেলেন। মাত্র দশ পনের জন আসিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করিলেন। আমিও উপযুক্ত জবাব দিলাম। আমাদের দেশ শান্তিতে বিশ্বাসী। যদিও পাকিস্তানের চাইতে আমাদের দেশ বেশী শক্তিশালী তবুও এই নীতির জন্য কাশ্মীরের এক অংশ দখল করা সত্ত্বেও আমাদের দেশ পাকিস্তানকে আক্রমণ করে নাই। এখানেও হিন্দুরা গরুকে কেন পূজা করে সেই কথা উঠিল। উত্তরে বলিলাম যে শৈশবে ও বার্ধক্যে মানুষ গরুর দুধ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। মরিবার পর গরুর দেহের বিভিন্ন অংশ মানুষের কত কাজে আসে। এই প্রকার উপকারী গরুকে কৃতজ্ঞতার জন্য হিন্দুরা দেবতার আসন দিয়াছেন। এমন কি কোন জড় পদার্থ থেকেও যদি উপকার পাওয়া যায় তাহাকেও হিন্দুরা সম্মানের শ্রেষ্ঠ আসন দেন। নারিকেল মানুষের কত কাজে আসে। ইহার গাছ-পাতাও সংসারে বহু কাজে আসে। এইজন্য হিন্দুরা জীবিত নারিকেল গাছ কাটেন না, কাটিলে তাহা পাপ কাজ বলিয়া মনে করা হয়। আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির কথা উঠিল। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী দেশের তুলনায় এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলি অতি সামান্য সাহায্য পাইতেছে বলিয়া অনুযোগ করিলাম। তারপর কিছু চাঁদা উঠিল। মোট ৫১৭ ডলারের বেশী হইল না। ইঁহাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত অল্প লোক বাদ দিলে বাকী সকলেরই আমাদের মত অনগ্রসর দেশের লোকের উপর একটা তাচ্ছিল্য ভাব আছে। আমাদের মত লোকের নিকট হইতে বিশেষতঃ যাহারা সাহায্য চাহিতে আসিয়াছে, কৃপার ভিখারী—তাহাদের নিকট হইতে অপ্রিয় সত্য শুনিতে অনেকেই প্রস্তুত নয়। সুতরাং স্বভাবতঃই টাকা কম উঠিবে। তবে একটা গুণ এই যে, তাঁহাদের বিষয়ে অপ্রিয় সত্য বলিলে আমেরিকানরা চটেন না। এই গুণটি আমাদের অনেকের মধ্যেই নাই।

বৃথা সময় নষ্ট করি নাই। ওখানে একটি লাইব্রেরী ছিল। মিউনিসিপ্যালিটির লাইব্রেরী। সেখানে গিয়া পাঠ্য বিষয় সংক্রান্ত বই পড়িতাম। ঐ সাথে থিসিস লিখিবার এবং Spring Term-এর term paper শেষ করিবার মালমসলা সংগ্রহ করিতাম। সঞ্জীববাবু 'পালামৌ' ভ্রমণ কাহিনীতে লিখিয়াছেন, "নিত্য লাতেহার পাহাড়ে যাইতাম।" আমিও নিত্যই ক্যাংকাকী লাইব্রেরীতে যাইতাম। তবে সঞ্জীববাবুর আকর্ষণ এবং আমার আকর্ষণ পৃথক। পড়াশুনা করিবার জন্য তো যাইতাম; উপরন্তু লাইব্রেরী দালানটি ছিল শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। জুন, জুলাই মাসে ইলিনয় রাজ্যে আমাদের দেশের মতই ভীষণ গরম পড়ে। গা হইতে ঘাম বাহির হয়। কিন্তু দেশের আবহাওয়ার এমনই একটা গুণ যে দিনের বেলায় যতই গরম পড়ুক না কেন, রাত্রের শেষে বেশ শীত পড়ে এবং কম্বল গায়ে দিতে হয়। আবহাওয়াবিদগণ ইহার কারণ ভালই জানেন, আমি জানি না। লাইব্রেরী সকাল দশটা কি এগোরোটায় খুলিত এবং বিকাল চারটা কি পাঁচটায় বন্ধ হইত। প্রায় সব সময়ই ঐখানে থাকিয়া পড়াশুনা করিতাম। শুধু খাবার সময় বাহির হইতাম, আর মাঝে মাঝে Employment Exchange-এ গিয়া চাকুরীর খোঁজ করিতাম।

এই চাকুরীটির খোঁজ করার ব্যাপারে ঐ অফিসের এক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হইয়াছিল। তিনি আমার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি একদিন খবর দিলেন যে Freeport নামক জায়গায় কারখানায় কুলীগিরির চাকুরী খালি আছে: আমি যদি কাজ করিতে রাজী হই, তবে তিনি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। তিনি একটু সতর্ক করিয়া বলিলেন যে, আগে কয়েকজনকে কাজের জন্য ঐ কারখানায় পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা সকলেই চলিয়া আসিয়াছে। থাকিবার জায়গা নাকি বড়ই অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন। বিদেশে আসিয়াছি; যে আরাম শুধু কল্পনায়ই করিতে পারি, তাহা ভোগ করিয়াছি এবং আমেরিকায় থাকিলে আরো যথেষ্ট আরাম ভোগ করিব। আমার এখন টাকার দরকার, কাজ নাই, অপরিষ্কার দেখিলে চলিবে না। তারপর যখন সব কিছুর অভিজ্ঞতা লইতেছি, তখন অপরিচ্ছন্নতারও অভিজ্ঞতা না হয় লই আমি কাজ করিতে রাজী হইলাম। ভদ্রলোক কয়েকদিন পরে আমাকে জানাইলেন যে, সেখান হইতে কোন উত্তর পান নাই। পরে ভাবিয়া কারণ খুঁজিয়া পাইলাম। ঐ কারখানার নাম আমি আগেই শুনিয়াছিলাম। ক্যাংকাকীতে আসিবার আগে ঐ ঠিকানায় আমার শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ দিয়া চাকুরীর দরখাস্ত করিয়াছিলাম। আমি জানিতাম না যে আমাদের মত সাধারণ লেখাপড়া জানা বিদেশীকে কুলীর কাজ ছাড়া অন্য কাজ কারখানার কর্তৃপক্ষ দিতে চান না। কারণ অন্য কাজ দিতে গেলে কিছু training দিতে হয়। আমাদের মত কালা আদমীকে খুব কম শ্বেতকায় training দিতে রাজী হইবে। আর মেহনতীর কাজে

কোন training-এর দরকার নাই ; দেখিয়া কাজ করিলেই হইল। আবার, কেরাণীর কাজে সাধারণতঃ বেশী বেতন নয়। কেরাণীর কাজ সাধারণতঃ মেয়েরাই করে এবং তাহাদিগকে কম বেতন দেওয়া যায়। কিন্তু বেশী খাটুনীর কাজে মেয়েরা আসিবে না। সেখানে পুরুষের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য কারখানার কর্তৃপক্ষ আমাকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, আমার উপযুক্ত কোন কাজ তাঁহারা দিতে পারিবেন না। গরমের বন্ধের আগে আমি বহু জায়গায়ই আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা জানাইয়া চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলাম ; যেমন দেশে থাকিতে চাকুরী খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমরা দরখাস্ত করি। কিন্তু অধিকাংশ জায়গা হইতে চিঠির উত্তর আসে নাই। কোন কোন জায়গা হইতে জবাব পাইয়াছিলাম যে, আমার জন্য কোন কাজ তাঁহাদের নাই। চেষ্টা করিলে পশ্চিম অঞ্চলে বন পাহারা দিবার কাজ পাইতাম। সংরক্ষিত বহু বন আছে। গরমকালে আগুন লাগিয়া বহু বন একেবারে উজাড় হইয়া যায়। এইজন্য পাহারাদারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বহুদূর বলিয়া চেষ্টা করি নাই। তারপর, কাজটিও বিপজ্জনক। হয়তো আগুনের কবলে নিজের প্রাণটিও গেল। ক্যালিফোর্ণিয়ায় যাইবার ইচ্ছা ছিল। সেখানে গিয়া কাজ করিব, আবার ক্যালিফোর্ণিয়াও দেখিব—এই মতলব মাথায় আসিয়াছিল। আমাদের দেশের রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বেদান্ত সোসাইটিতে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কাজ খুঁজিয়া দিবার অনুরোধ জানাইয়া চিঠি দিয়াছিলাম। তাঁহারা জবাব দিলেন যে, ক্যালিফোর্ণিয়ায় কাজ পাওয়া বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ বিদেশীর পক্ষে কাজ পাওয়া দিন দিন কঠিন হইতেছে। তবে এ ভরসাও দিলেন যে, অনেকে আসিয়া কাজ পান, এবং আমি যদি সেখানে যাই তবে, তাহাদের সাথে দেখা করি। অফিসের জনৈকা বিবাহিতা মহিলা কর্মচারী চিঠিখানি লিখিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে। কিন্তু আমি যাইতে সাহস করি নাই। আমার বয়স বেশী হইয়া পড়িয়াছে। আর পাঁচ বছর আগে যদি আসিতাম, তখন কঠিন পরিশ্রমের কাজ করিতে সাহসী হইতাম। যৌবনে বাড়ীতে কোদাল চালাইয়া কৃষি করিয়াছি। বাড়ীতে কাজ করিবার মজুরদের সাথে অনেক সময় কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া সমানে কাজ করিয়াছি। তাহারা তাহাদের "বড়বাবু"কে হারাইতে পারে নাই। বরং তাহারা মনে মনে বিরক্ত হইয়াছে যে "বড়বাবু" কেন তাহাদের সাথে কাজ করেন।

খবর পাইয়া সহরের একটা হোটেলে গেলাম। সেখানে রান্না ঘরের প্রধান বাবুর্চির একটি সহকারী চাই। আমি গিয়া কাজ চাহিতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন, "Do you want to be a big cook ?" (তুমি একজন উঁচুদরের পাচক হইতে চাও ?)। আমিও তখন কিছুটা চটপটে হইয়া গিয়াছি। দ্বিধা না করিয়া জবাব দিলাম, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।" তারপর আলাপ-পরিচয় আরম্ভ হইল। তাঁহার পরিচয় জানিলাম যে, তিনি গ্রীস হইতে আসিয়াছেন ; এখন আমেরিকারই বাসিন্দা। আমার ঐতিহাসিক জ্ঞান জাহির করিবার সুযোগ ছাড়িলাম না। আমি বলিলাম যে, মাতৃভাষায় তাঁহারা তাঁহাদের দেশকে হেলাস বলেন। আরো বলিলাম যে, তাঁহাদের দেশ ইউরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি। সক্রেটিস, হেকাটিউস, থুকিডিডিস, জেনোফোন তো তাঁহাদের দেশেরই লোক। একটু সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলাম যে, এই গরীয়সী দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য আমার বড়ই দুঃখ হয়। তিনি একগাল হাসিলেন, আমার কথাবার্তায় বড়ই খুশী হইলেন বলিয়া মনে হইল। কাজের সময়, দুপুর বারটা হইতে রাত আটটা পর্যন্ত। বেতন আপাততঃ কুড়ি ডলার এবং দুপুর ও রাতের খাওয়ার জন্য কোন পয়সা লাগিবে না। আমি কিছু বেতন বেশী চাহিতেই বলিলেন যে, আগে কাজ শেখো, তারপর বেশী বেতন চাহিও। তিনি যখন এই চাকুরীতে ঢুকিয়াছিলেন তখন তাঁহার বেতন আরও কম ছিল। আমি অবশ্য বলিতে পারিতাম যে তখন জিনিসপত্রের দাম অনেক কম ছিল। ভাবিয়া দেখিবার জন্য একদিন সময় চাহিয়া লইলাম।

সেই দিন খবর পাইলাম যে, ঐ সহরের ক্যাফেটেরিয়ার কাজ খালি আছে। ম্যানেজারের সাথে এর আগে দেখা করিয়া নাম-ঠিকানা দিয়া আসিয়াছিলাম ; এখন কাজ খালি হওয়াতে খবর পাঠাইয়াছেন। গিয়া শুনি, আমাকে রাত বারটা থেকে সকাল নটা পর্যন্ত কাজ করিতে হইবে। ঘরের মেঝে পরিষ্কার, কাঁচের দেওয়াল ও জানালা সাফাই, বাসনপত্র ঘষামাজা, এই প্রকার বিভিন্ন কাজ। ম্যানেজার মহিলা এবং বিবাহিতা। মালিকের সাথে পরিচয় হইল। বন্দোবস্ত হইল যে আমি সপ্তাহে ২৩ ডলার নগদ বেতন ও সকালের খাবার এবং দুপুর বা রাত্রের যে কোন এক বেলা বিনা পয়সায় খাইতে পারিব। ঐ কাজ করিবার জন্য একজন পুরানো লোক আছে ; তাহার নাম জন, জন নাকি এখানে আর কাজ করিবে না। সেই জন্য মালিক তাহার জায়গায় আর একজন লোক খুঁজিতেছেন। আমাকে কয়েক রাত জনের সাথে থাকিয়া কাজ শিখিয়া লইতে হইবে। যদিও বেতন কম, তবুও আমি রাজী হইলাম। কারণ মালিককে ভালোমানুষ মনে হইল পরে বুঝিয়াছিলাম যে, তাঁহার ভালমানুষী শুধু কাজ উদ্ধার করিবার জন্য। হোটেলের কাজ করিব না ঠিক করিলাম। কারণ, তাহাতে লাইব্রেরীতে গিয়া পড়াশুনার কাজ করিবার সময় বড়ই কম হইবে। তাই পরদিন সন্ধ্যাবেলায় গিয়া হোটেলের প্রধান বাবুর্চিকে জানাইলাম যে, আমি হোটেলের কাজ করিতে পারিব না, তাঁহার মুখ অন্ধকার হইল।

রাত্রি বারটার সময় ঐ ক্যাফেটেরিয়ায় গেলাম। যাইয়া দেখি লোকজন বাড়ীতে যাইবার জন্য তৈয়ারী হইতেছে। সেখানে তিন শিফটে কাজ হয়। প্রথম শিফট সকাল ৮টায় আরম্ভ হইয়া বিকাল

৪টা পর্যন্ত চলে, দ্বিতীয় শিফট ৪টায় আরম্ভ হইয়া রাত ১২টা পর্যন্ত চলে। তৃতীয় শিফট রাত ১২টায় আরম্ভ হইয়া সকাল ৮টা পর্যন্ত চলে। সকাল ৮টা হইতে রাত ১২টা পর্যন্ত খরিদ্দারগণকে খাওয়ানো হয়। রাত ১২টা হইতে সকাল ৮টা পর্যন্ত শুধু ঝাড়াই, মোছাই, সাফাই-এর কাজ চলে। আমেরিকানরা বড়ই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাঁহারা যেখানে খাইবেন, বিশ্রাম করিবেন, থাকিবেন, শুইবেন, এমন কি যে পায়খানা ব্যবহার করিবেন, তাহা সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তকতকে রাখিবেন। সেইজন্য একটা ছোট দোকান পরিষ্কার করিবার জন্য একটা লোক আট ঘণ্টা খাটিবে।

তিন শিফটের কর্মচারীদের মধ্যে প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক। শুধু আমি, জন এবং উনুনের পাশে দাঁড়াইয়া যে লোকটি ভাজার কাজ (Grill) করে সে, এই তিন জন মাত্র পুরুষ লোক। বোধ হয় আর একটি লোক ছিল। আমি যাইতে ম্যানেজার আমার পরিচয় দিলেন। তখন তাঁহারা কিছু কিছু আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। বোধ হয় সেই শহরে তখন আমিই একমাত্র বিদেশী। ছোট শহর। রাস্তাঘাটে ঘুরিতাম। চেহারাখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করিত বলিয়া যেখানেই গিয়াছি সেখানেই বহু লোক আমার খবর নিয়াছেন। আমি যে একজন গ্র্যাজুয়েট ষ্টুডেণ্ট তাহাও ইঁহারা জানেন। আমার কাজ ব্রাস দিয়া ঘষামাজা। ব্রাসের মাথায় লম্বা হাতল থাকিত। দাঁড়াইয়া সেই হাতল দিয়া সহজেই ব্রাস করা যায়। একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল, "I am for you" (আমি তোমার পক্ষে)। এই বলিয়া সে ঘরের মেঝে কিছুটা ব্রাস করিয়া দিল। তারপর বলিল, "I dont like you do this job" (তুমি যে এই কাজ কর, তা আমি পছন্দ করি না)। এই প্রকার সহানুভূতিতে আমার মন নাচিয়া উঠিল। মনে মনে মেয়েটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। আমি বিদেশী, কালা আদমী, সাধারণত: আমার মত লোক ইহাদের নিকট সহানুভূতি পায় না। আমি যখন কাজ করিব, তখন সে বাড়ীতে থাকিবে। দুইজনের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ খুব কমই হইবে। তারপর জানে যে, আমি শুধু এই গরমের বন্ধে অল্প কিছুদিন ক্যাংকাকীতে থাকিব। আমি তাহাকে যে কিছু দিতে পারিব ইহার সম্ভাবনাও নাই। তাহার এই যে সহানুভূতি ইহার পিছনে কোন উদ্দেশ্য নাই, মানুষের মনে যে সহজাত সহৃদয়তা আছে, এই সহানুভূতি তাহারই প্রকাশ বলিয়া মনে হইল।

জনের সাথে কাজ করিতাম। তিন ঘণ্টা কাজ করিয়া এক ঘণ্টা শুইবার জন্য ছুটি পাইতাম। আমি শুইতাম, কিন্তু জনকে শুইতে দেখিতাম না। জনের আমি খোসামোদ করিতাম। বলিতাম, "জনি, তুমি যেও না। আমরা দু'জন এক সাথে কাজ করব।" জন কোন কথা বলিত না। শুনিলাম, তাহার সংসার নাই, আমারই মত বয়স বোধ হয় হইবে। কিন্তু চেহারায় প্রৌঢ়ত্বের ছাপ আসিয়াছে। বোধ হয়, মদ খাইয়া তাহার এমন অবস্থা। দেশটায় মাতালের সংখ্যা বড় বেশী। মদ খাইয়া যে মানুষ গড়াগড়ি করিতে পারে, তাহা ভাবিতে পারি নাই। ১৯৫৩ সালে নিউইয়র্কে থাকিতে জাহাজঘাটার দিকে যাইতে এক মাতালকে দেখিলাম যে, বমি করিয়া রাস্তার এক পাশে শুইয়া আছে। দেখিয়া অবাক হইলাম। ভাবিতেও পারি নাই যে, কোন আমেরিকান ভালো বিছানা বালিশ ছাড়া ঐ ভাবে রাস্তায় শুইতে পারে। "বিলাত দেশটা মাটির"—এদেশেও সব মানুষের স্বভাবের মধ্যে অসাধারণত্ব নাই। দোষটা যে শুধু আমাদের দেশেরই একচেটিয়া, ইহা যে শুধু মিথ্যা তাহা নয়, এই প্রকার চিন্তা করা অন্যায়ও বটে। "স্বদেশের নিন্দা পাপ [সংশোধনের উদ্দেশ্য যদি না থাকে], স্বদেশের মিথ্যা নিন্দা মহাপাপ।"

প্রথম দিকে ঘর দরজা জানালা মেঝে ঝাড়িতে-মুছিতে হইত। ঘমাইবার পর বাসনকোসন ধুইতে হইত। এত শীঘ্র শীঘ্র কাজ শেষ হইত না। সকালবেলা আমাকে আলুর খোসা ছাড়াইতে হইত। খোসা ছাড়াইবার এক যন্ত্র ছিল। তাহা আলু উপর ঘসিলেই খোসা উঠিয়া যাইত। সকালবেলায় মালিক এব তাঁহার স্ত্রী দুইজনে আসিয়া কিছু কিছু কাজ করিতেন। তারপর সকালে খাওয়াদাওয়া সারিয়া চলিয়া যাইতেন। আমিও সকাল আটটা পর খাওয়াদাওয়া সারিয়া আমার হোটেলে গিয়া শুইয়া পড়িতাম আর বেলা প্রায় একটার সময় উঠিতাম। দুপুরে খাওয়াদাওয়া সারিয় লাইব্রেরীতে গিয়া পড়িতাম।

কয়েকদিন পরে ম্যানেজার বলিলেন যে, জন থাকিবে; সে আ যাইবে না। সুতরাং আমার কোন প্রয়োজন নাই। বোধ হয় এ সপ্তাহ কি দুই সপ্তাহ কাজ করিয়াছিলাম; তাহা আমার ঠি মনে নাই। আবার যেন অথৈ জলে পড়িলাম। তবে এব আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। কিছু একটা হইবে তাহাতে সন্দে থাকিল না। ইহার মাঝে ওখানকার একটা ক্লাবে বক্তৃতা দিলাম বক্তৃতার বিষয় ছিল, অনুন্নত দেশে আমেরিকার সাহায্য ও তাহা পররাষ্ট্র নীতি। আমি বক্তৃতা করিলাম আর একজন মহিলা স সঙ্গে তাহা লিখিয়া লইলেন। বক্তৃতা শেষে কয়েক ড পাইয়াছিলাম। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মতো সাম্রাজ্যবাদী ও ধনী দে দুইটিকে আমেরিকা অঢেল টাকা দিতেছে আর তাহার তুলন অনুন্নত দেশগুলি ছিটেফোঁটা পাইতেছে। সুতরাং সামান্য সাহা করিয়া আমেরিকা তাহাদের মন জয় কিছুতেই করিতে পারিবে না ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। পরের দিন স্থানীয় দৈনিকে আম বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাহির হইয়াছিল।

কয়েকদিন পরে আবার সেই ক্যাফেটেরিয়া হইতে ড আসিল। এবার কাজ ছিল বিকাল চারটা হইতে রাত বারটা পর্য এবার ম্যানেজারের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কাজ করিব। তি আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। নাম বলিলাম; কিন্তু বলিলেন "ওসব পোষাকী নাম চাই না। তোমার ডাকনাম কি?" জবাব দি যে, আমার কোন ডাকনাম নাই। উত্তরে বলিলেন যে, একটা ডা নাম অবশ্যই রাখিতে হইবে। তিনি আমার নাম দিলেন "Del অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে পরিচয় করাইয়া দিলেন। যিনি উনু সামনে থাকিয়া ভাজাভুজি করেন তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত শক্ত ক করিতে হয়। সুতরাং তিনি পুরুষ। আর পরিবেশন যাঁহারা ক তাঁহারা সবাই মেয়ে। আমাকে ভাজাভুজির কাজ দেখাইয়া দিলে আমি প্রথম দুই একদিন এই কাজ করিয়াছিলাম। ইলেক্‌ উনুনের উপর একটা তাওয়া থাকে। তাহার উপর গোলাকার মাংসের দলা রাখিয়া চওড়া হাতা দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়। খা বাদে উল্টাইয়া আর এক পিঠ চাপিয়া ধরিতে হয়। মাংস

হইয়া যায়, কোন চর্বির দরকার হয় না। কারণ মাংস হইতে রস বাহির হইয়া চর্বির কাজ করে। তারপর রুটির টুকরা অল্প সেঁকিয়া লেটুসের পাতার উপর মাংস রাখিয়া আর এক টুকরা সেঁকা রুটি চাপাইয়া খরিদ্দারকে দিতে হয়। খরিদ্দারের রুচি অনুযায়ী উহার মধ্যে টমেটো ভরিয়া দিতে হয়। এই স্যাণ্ডউইচ জাতীয় খাদ্যের নাম হ্যামবারগার, কোথাও বা নাম বীফবারগার, কোথাও বা লেটুসবারগার আবার কোথাও বা টমেটোবারগার। এই মাংস হয় শূকরের, নয় গরুর। এই জাতীয় খাবারের দোকানে রান্না করা খাবার প্রায়ই তৈয়ারী করা হয় না। এই প্রকার স্যাণ্ডউইচ, কফি ও দুধজাত খাদ্য পাওয়া যায়। দুধজাত খাদ্যের মধ্যে milkshake এবং Icecream বেশী দেখা যায়। স্যাণ্ডউইচের মধ্যে পনীর ঢোকাইলে তাহার নাম হইবে "চীজবার্গার"। দুধ এবং আইসক্রীম দিয়া মিল্কশেক তৈয়ারী হয়। দুপুরের লাঞ্চ অথবা পথে চলিতে চলিতে ক্ষুধা পাইলে লোকে এই জাতীয় দোকানে খাওয়া-দাওয়া করে। দোকানে বেতন বড়ই কম। কিন্তু যাঁহারা পরিবেশন করেন, তাঁহারা বকশীস পান বলিয়া পোষাইয়া যায়। বকশীসের রেট মোট দামের শতকরা দশ ভাগ। এই জাতীয় বকশীস প্রায় সর্বত্র।

এইবারে মোট দুই সপ্তাহ কাজ করিয়াছিলাম। বেতন ঠিক হইয়াছিল বোধ হয় পঁচিশ কি ছাব্বিশ ডলার। তারপর একবেলা পুরা খাওয়া তো আছেই। মালিকের সাথে রাস্তায় একদিন দেখা হইয়াছিল। তিনি এর আগে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে এ দেশে আমি স্থায়ীভাবে থাকিতে চাই কিনা। আমি সম্মতিসূচক উত্তর দিয়াছিলাম। দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছি এবং কাজ কেমন লাগে। বলিয়াছিলাম, বড়ই খাটুনী। উত্তরে তিনি বলিলেন, "Deb, তুমি এখন আমেরিকান। এদেশের লোক খুব খাটে এবং স্বচ্ছন্দেও থাকে। আমেরিকানরা কখনো খাটুনীকে ভয় করে না। তুমি কেন করিবে?" কিন্তু সপ্তাহের শেষে যখন বেতন দিতেন তখন চুক্তি হইতে দুই এক ডলার কম বেতন দিতেন। প্রতিবাদ করিলেও গায়ে মাখিতেন না। আমি নিরুপায়, তাই মানিয়া লইতাম। এইখানে কাজ করিবার সময় রান্নাঘরের নানাবিধ যান্ত্রিক প্রয়োগের সাথে পরিচিত হইলাম। বক্সের আকারে মেশিনের মধ্যে গেলাস, কাপ ও প্লেট রাখিয়া কল টিপিলে গরম সাবান জল ও ব্রাস দ্বারা সব পরিষ্কার হইয়া চলিয়া আসে। দোকান ছোট, যন্ত্রও ছোট। ভাবিতাম, আহা, আমার মামীদের যদি এই রকম একটা যন্ত্র থাকে, তবে তাঁহাদের খাটুনী কত কমে! এ প্রায় আট-দশ বছর আগের কথা; এখন অবশ্য মামীদের নিজ হাতে বাসন ধুইতে হয় না।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

থিরবিজুলী চম্পা

অরুণাচল বসু

ভেজা গাছের সঙ্গে যখন কালো মেঘের মৈত্রী
দিগন্তরী শ্রাবণ হাওয়া ঘনায় মদির চিত্র :
প্রাণের আঁধার কক্ষপুটে গবাক্ষ যায় চমকে
কঙ্কনে কি সপ্তস্বরা হঠাৎ পেলো স্পর্শ !

তালতমালি দূরমিতালী, দরবারীতে মূর্ছা,
বিধুর পবন নীপ দুলিয়ে নীল জলে হয় লগ্ন,
উপল চড়াই পাষাণ ছুঁয়ে জলাঞ্চলার নৃত্য,
পেখম তোলে শিল্পনিপুণ পূর্বীকারুলেখ্য।

বিশশতকী এই নাগরী কল্পলতার ভোজ্যে
স্বল্প রুচি; ত্রিমাত্রিকের তুলকিতে নয় তুষ্ট;
স্বতস্পৃহ বিস্বাদনায় ফিল্মী চড়া পর্দা
স্পর্ধিত চায় সে-লৌকিকী সুরের অপমৃত্যু।

হায় কী গমক রক্তে তব, বাদর পুরবৈয়া—
দ্যুলোক ধ্যানের দর্পে টলায় মৌন যুগের মূল্যে,
কপাট তোলে অসম্ভাবীর, সে আস্তিকীর রক্ষী
জাগর মানস-হর্ম্যে চারণ চলতি নতুন পর্বে।

ওড়না ওড়ায় দিগঙ্গনা, জলাঙ্গী যায় লাস্যে—
সমন্বিতা উত্তোরিতা নীলাদ্রিতে সখ্যে,
নবীন মেঘের সুরের পবন অচল কালের পক্ষে
চৌরাশী ক্রোশ ভুবন ডাঙ্গায় থিরবিজুলী চম্পা।

প্রথম খেয়া

রত্নেশ্বর হাজরা

সহযাত্রী যারা ছিল আত্মরক্ষা করেছে আড়ালে
নিরীশ্বরবাদীরাও কানে কানে ডেকেছে ঈশ্বর
তটের শাসন তুচ্ছ প্রত্যহিংসা অতল পাতালে
কেবল নিশ্চিন্তে তুমি আত্মতুষ্ট করেছ নির্ভর,
অনভিজ্ঞ হাতে হাল যৌবনের ঝোড়ো হাওয়া পালে।

পুণ্যের সঞ্চয় নেই মগ্নতরী আমার বিপণি
নাস্তিকের ক্ষমা নেই ওরা বলে অনুশোচনার
সংকীর্ণ খেয়ার নায়ে সর্বনাশা সান্ধ্য বৈতরণী
প্রথম ধরেছি পাড়ি ছেদহীন ঐকান্তিকতার;
তাই তো নির্ভর করো (আমাতে যৌবন তোলে ধ্বনি)।

যৌবন বিলাস নয়, তুমি জানো, আমার স্মরণে
এ-সত্য রেখেছি বেঁধে আস্তিকের তর্কহীন প্রেম
যেমন বিশ্বাসে বলী তেমনি কারণে অকারণে
অস্তিত্বে বিশ্বাস রেখে এই হাত তোমায় দিলেম
যদিও রাত্রির খেয়া এবং নাবিক আমি প্রথম জীবনে।

সহযাত্রী যত পাল কোথায় হারিয়ে গেছে উত্তর দক্ষিণ
মন্দীভূত উষ্ণ বায়ু বর্ষণাঙ্কে আনত আকাশ
হঠাৎ বিদ্যুতে দৃষ্টি—দৃষ্টির সীমান্তে সম্মুখীন
দু'বাহু বাড়িয়ে মাটি যৌবনের সফল আশ্বাস;
অবাক সমুদ্র পিছে, এমন খেয়ার ভার বুকে
সে সহেনি কোনদিন।

৪টা পর্যন্ত চলে, দ্বিতীয় শিফট ৪টায় আরম্ভ হইয়া রাত ১২টা পর্যন্ত চলে। তৃতীয় শিফট রাত ১২টায় আরম্ভ হইয়া সকাল ৮টা পর্যন্ত চলে। সকাল ৮টা হইতে রাত ১২টা পর্যন্ত খরিদ্দারগণকে খাওয়ানো হয়। রাত ১২টা হইতে সকাল ৮টা পর্যন্ত শুধু ঝাড়াই, মোছাই, সাফাই-এর কাজ চলে। আমেরিকানরা বড়ই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাঁহারা যেখানে খাইবেন, বিশ্রাম করিবেন, থাকিবেন, শুইবেন, এমন কি যে পায়খানা ব্যবহার করিবেন, তাহা সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তকতকে রাখিবেন। সেইজন্য একটা ছোট দোকান পরিষ্কার করিবার জন্য একটা লোক আট ঘণ্টা খাটিবে।

তিন শিফটের কর্মচারীদের মধ্যে প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক। শুধু আমি, জন এবং উনুনের পাশে দাঁড়াইয়া যে লোকটি ভাজার কাজ (Grill) করে সে, এই তিন জন মাত্র পুরুষ লোক। বোধ হয় আর একটি লোক ছিল। আমি যাইতে ম্যানেজার আমার পরিচয় দিলেন। তখন তাঁহারা কিছু কিছু আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। বোধ হয় সেই শহরে তখন আমিই একমাত্র বিদেশী। ছোট শহর। রাস্তাঘাটে ঘুরিতাম। চেহারাখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করিত বলিয়া যেখানেই গিয়াছি সেখানেই বহু লোক আমার খবর নিয়াছেন। আমি যে একজন গ্র্যাজুয়েট ষ্টুডেণ্ট তাহাও ইঁহারা জানেন। আমার কাজ গ্রাস দিয়া ঘষামাজা। গ্রাসের মাথায় লম্বা হাতল থাকিত। দাঁড়াইয়া সেই হাতল দিয়া সহজেই গ্রাস করা যায়। একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল, "I am for you" (আমি তোমার পক্ষে)। এই বলিয়া সে ঘরের মেঝে কিছুটা গ্রাস করিয়া দিল। তারপর বলিল, "I dont like you do this job" (তুমি যে এই কাজ কর, তা আমি পছন্দ করি না)। এই প্রকার সহানুভূতিতে আমার মন নাচিয়া উঠিল। মনে মনে মেয়েটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। আমি বিদেশী, কালা আদমী, সাধারণতঃ আমার মত লোক ইহাদের নিকট সহানুভূতি পায় না। আমি যখন কাজ করিব, তখন সে বাড়ীতে থাকিবে। দুইজনের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ খুব কমই হইবে। তারপর জানে যে, আমি শুধু এই গরমের বন্ধে অল্প কিছুদিন ক্যাংকাকীতে থাকিব। আমি তাহাকে যে কিছু দিতে পারিব ইহার সম্ভাবনাও নাই। তাহার এই যে সহানুভূতি ইহার পিছনে কোন উদ্দেশ্য নাই, মানুষের মনে যে সহজাত সহৃদয়তা আছে, এই সহানুভূতি তাহারই প্রকাশ বলিয়া মনে হইল।

জনের সাথে কাজ করিতাম। তিন ঘণ্টা কাজ করিয়া এক ঘণ্টা শুইবার জন্য ছুটি পাইতাম। আমি শুইতাম, কিন্তু জনকে শুইতে দেখিতাম না। জনের আমি খোসামোদ করিতাম। বলিতাম, "জনি, তুমি যেও না। আমরা দু'জন এক সাথে কাজ করব।" জন কোন কথা বলিত না। শুনিলাম, তাহার সংসার নাই, আমারই মত বয়স বোধ হয় হইবে। কিন্তু চেহারায় প্রৌঢ়ত্বের ছাপ আসিয়াছে। বোধ হয়, মদ খাইয়া তাহার এমন অবস্থা। দেশটায় মাতালের সংখ্যা বড় বেশী। মদ খাইয়া যে মানুষ গড়াগড়ি করিতে পারে, তাহা ভাবিতে পারি নাই। ১৯৫৩ সালে নিউইয়র্কে থাকিতে জাহাজঘাটার দিকে যাইতে এক মাতালকে দেখিলাম যে, বমি করিয়া রাস্তার এক পাশে শুইয়া আছে। দেখিয়া অবাক হইলাম। ভাবিতেও পারি নাই যে, কোন আমেরিকান ভালো বিছানা বালিশ ছাড়া ঐ ভাবে রাস্তায় শুইতে পারে। "বিলাত দেশটা মাটির"—এদেশেও সব মানুষের স্বভাবের মধ্যে অসাধারণত্ব নাই। দোষটা যে শুধু আমাদের দেশেরই একচেটিয়া, ইহা যে শুধু মিথ্যা তাহা নয়, এই প্রকার চিন্তা করা অন্যায়ও বটে। "স্বদেশের নিন্দা পাপ [সংশোধনের উদ্দেশ্য যদি না থাকে], স্বদেশের মিথ্যা নিন্দা মহাপাপ।"

প্রথম দিকে ঘর দরজা জানালা মেঝে ঝাড়িতে-মুছিতে হইত। ঘমাইবার পর বাসনকোসন ধুইতে হইত। এত শীঘ্র শীঘ্র কাজ শেষ হইত না। সকালবেলা আমাকে আলুর খোসা ছাড়াইতে হইত। খোসা ছাড়াইবার এক যন্ত্র ছিল। তাহা আলুর উপর ঘসিলেই খোসা উঠিয়া যাইত। সকালবেলায় মালিক এবং তাঁহার স্ত্রী দুইজনে আসিয়া কিছু কিছু কাজ করিতেন। তারপর সকালে খাওয়াদাওয়া সারিয়া চলিয়া যাইতেন। আমিও সকাল আটটার পর খাওয়াদাওয়া সারিয়া আমার হোটেলে গিয়া শুইয়া পড়িতাম। আর বেলা প্রায় একটার সময় উঠিতাম। দুপুরে খাওয়াদাওয়া সারিয়া লাইব্রেরীতে গিয়া পড়িতাম।

কয়েকদিন পরে ম্যানেজার বলিলেন যে, জন থাকিবে; সে আর যাইবে না। সুতরাং আমার কোন প্রয়োজন নাই। বোধ হয় এক সপ্তাহ কি দুই সপ্তাহ কাজ করিয়াছিলাম; তাহা আমার ঠিক মনে নাই। আবার যেন অথৈ জলে পড়িলাম। তবে এবার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। কিছু একটা হইবে তাহাতে সন্দেহ থাকিল না। ইহার মাঝে ওখানকার একটা ক্লাবে বক্তৃতা দিলাম। বক্তৃতার বিষয় ছিল, অনুন্নত দেশে আমেরিকার সাহায্য ও তাহার পররাষ্ট্র নীতি। আমি বক্তৃতা করিলাম আর একজন মহিলা সঙ্গে সঙ্গে তাহা লিখিয়া লইলেন। বক্তৃতা শেষে কয়েক ডলার পাইয়াছিলাম। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মতো সাম্রাজ্যবাদী ও ধনী দেশ দুইটিকে আমেরিকা অঢেল টাকা দিতেছে আর তাহার তুলনায় অনুন্নত দেশগুলি ছিটেফোঁটা পাইতেছে। সুতরাং সামান্য সাহায্য করিয়া আমেরিকা তাহাদের মন জয় কিছুতেই করিতে পারিবে না—ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। পরের দিন স্থানীয় দৈনিকে আমার বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাহির হইয়াছিল।

কয়েকদিন পরে আবার সেই ক্যাফেটেরিয়া হইতে ডাক আসিল। এবার কাজ ছিল বিকাল চারটা হইতে রাত বারটা পর্যন্ত। এবার ম্যানেজারের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কাজ করিব। তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। নাম বলিলাম; কিন্তু বলিলেন যে "ওসব পোষাকী নাম চাই না। তোমার ডাকনাম কি?" জবাব দিলাম যে, আমার কোন ডাকনাম নাই। উত্তরে বলিলেন যে, একটা ডাক-নাম অবশ্যই রাখিতে হইবে। তিনি আমার নাম দিলেন, "Deb". অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে পরিচয় করাইয়া দিলেন। যিনি উনুনের সামনে থাকিয়া ভাজাভুজি করেন তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত শক্ত কাজ করিতে হয়। সুতরাং তিনি পুরুষ। আর পরিবেশন যাঁহারা করেন তাঁহারা সবাই মেয়ে। আমাকে ভাজাভুজির কাজ দেখাইয়া দিলেন। আমি প্রথম দুই একদিন এই কাজ করিয়াছিলাম। ইলেকট্রিক উনুনের উপর একটা তাওয়া থাকে। তাহার উপর গোলাকার কিমা মাংসের দলা রাখিয়া চওড়া হাতা দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়। খানিক-বাদে উল্টাইয়া আর এক পিঠ চাপিয়া ধরিতে হয়। মাংস ভাজা

হইয়া যায়, কোন চর্বির দরকার হয় না। কারণ মাংস হইতে রস বাহির হইয়া চর্বির কাজ করে। তারপর রুটির টুকরা অল্প সেঁকিয়া লেটুসের পাতার উপর মাংস রাখিয়া আর এক টুকরা সেঁকা রুটি চাপাইয়া খরিদ্দারকে দিতে হয়। খরিদ্দারের রুচি অনুযায়ী উহার মধ্যে টমেটো ভরিয়া দিতে হয়। এই স্যাণ্ডউইচ জাতীয় খাদ্যের নাম হ্যামবারগার, কোথাও বা নাম বীফবারগার, কোথাও বা লেটুসবারগার আবার কোথাও বা টমেটোবারগার। এই মাংস হয় শূকরের, নয় গরুর। এই জাতীয় খাবারের দোকানে রান্না করা খাবার প্রায়ই তৈয়ারী করা হয় না। এই প্রকার স্যাণ্ডউইচ, কফি ও দুধজাত খাদ্য পাওয়া যায়। দুধজাত খাদ্যের মধ্যে milkshake এবং Icecream বেশী দেখা যায়। স্যাণ্ডউইচের মধ্যে পনীর ঢোকাইলে তাহার নাম হইবে "চীজবার্গার"। দুধ এবং আইসক্রীম দিয়া মিল্কশেক তৈয়ারী হয়। দুপুরের লাঞ্চ অথবা পথে চলিতে চলিতে ক্ষুধা পাইলে লোকে এই জাতীয় দোকানে খাওয়া-দাওয়া করে। দোকানে বেতন বড়ই কম। কিন্তু যাঁহারা পরিবেশন করেন, তাঁহারা বকশীস পান বলিয়া পোষাইয়া যায়। বকশীসের রেট মোট দামের শতকরা দশ ভাগ। এই জাতীয় বকশীস প্রায় সর্বত্র।

এইবারে মোট দুই সপ্তাহ কাজ করিয়াছিলাম। বেতন ঠিক হইয়াছিল বোধ হয় পঁচিশ কি ছাব্বিশ ডলার। তারপর একবেলা পুরা খাওয়া তো আছেই। মালিকের সাথে রাস্তায় একদিন দেখা হইয়াছিল। তিনি এর আগে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে এ দেশে আমি স্থায়ীভাবে থাকিতে চাই কিনা। আমি সম্মতিসূচক উত্তর দিয়াছিলাম। দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছি এবং কাজ কেমন লাগে। বলিয়াছিলাম, বড়ই খাটুনী। উত্তরে তিনি বলিলেন, "Deb, তুমি এখন আমেরিকান। এদেশের লোক খুব খাটে এবং স্বচ্ছন্দেও থাকে। আমেরিকানরা কখনো খাটুনীকে ভয় করে না। তুমি কেন করিবে?" কিন্তু সপ্তাহের শেষে যখন বেতন দিতেন তখন চুক্তি হইতে দুই এক ডলার কম বেতন দিতেন। প্রতিবাদ করিলেও গায়ে মাখিতেন না। আমি নিরুপায়, তাই মানিয়া লইতাম। এইখানে কাজ করিবার সময় রান্নাঘরের নানাবিধ যান্ত্রিক প্রয়োগের সাথে পরিচিত হইলাম। বক্সের আকারে মেশিনের মধ্যে গেলাস, কাপ ও প্লেট রাখিয়া কল টিপিলে গরম সাবান জল ও ব্রাস দ্বারা সব পরিষ্কার হইয়া চলিয়া আসে। দোকান ছোট, যন্ত্রও ছোট। ভাবিতাম, আহা, আমার মামীদের যদি এই রকম একটা যন্ত্র থাকে, তবে তাঁহাদের খাটুনী কত কমে! এ প্রায় আট-দশ বছর আগের কথা; এখন অবশ্য মামীদের নিজ হাতে বাসন ধুইতে হয় না।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

থিরবিজুলী চম্পা

অরুণাচল বসু

ভেজা গাছের সঙ্গে যখন কালো মেঘের মৈত্রী
দিগন্তরী শ্রাবণ হাওয়া ঘনায় মদির চিত্র:
প্রাণের আঁধার কক্ষপুটে গবাক্ষ যায় চমকে
কঙ্কনে কি সপ্তস্বরা হঠাৎ পেলো স্পর্শ!

তালতমালি দূরমিতালী, দরবারীতে মূর্ছা,
বিধুর পবন নীপ দুলিয়ে নীল জলে হয় লগ্ন,
উপল চড়াই পাষাণ ছুঁয়ে জলাঞ্চলার নৃত্য,
পেখম তোলে শিল্পনিপুণ পূর্বীকারুলেখ্য।

বিশশতকী এই নাগরী কল্পলতার ভোজ্যে
স্বল্প রুচি; ত্রিমাত্রিকের ভুলকিতে নয় তুষ্ট;
স্বতস্পৃহ বিস্বাদনায় ফিল্মী চড়া পর্দা
স্পর্ধিত চায় সে-লৌকিকী সুরের অপমৃত্যু।

হায় কী গমক রক্তে তবু, বাদর পুরবৈয়া—
দ্যুলোক ধ্যানের দর্পে টলায় মৌন যুগের মূল্যে,
কপাট তোলে অসম্ভাবীর, সে আস্তিকীর রক্ষী
জাগর মানস-হর্ম্যে চারণ চলতি নতুন পর্বে।

ওড়না ওড়ায় দিগঙ্গনা, জলাঙ্গী যায় লাস্যে—
সমন্বিতা উত্তোরিতা নীলাদ্রিতে সখ্যে,
নবীন মেঘের সুরের পবন অচল কালের পক্ষে
চৌরাশী ক্রোশ ভুবন ডাঙ্গায় থিরবিজুলী চম্পা।

প্রথম খেয়া

রত্নেশ্বর হাজরা

সহযাত্রী যারা ছিল আত্মরক্ষা করেছে আড়ালে
নিরীশ্বরবাদীরাও কানে কানে ডেকেছে ঈশ্বর
তটের শাসন তুচ্ছ প্রত্যুহিংসা অতল পাতালে
কেবল নিশ্চিন্তে তুমি আত্মতুষ্ট করেছ নির্ভর,
অনভিজ্ঞ হাতে হাল যৌবনের ঝোড়ো হাওয়া পালে।

পুণ্যের সঞ্চয় নেই মগ্নতরী আমার বিপণি
নাস্তিকের ক্ষমা নেই ওরা বলে অনুশোচনায়
সংকীর্ণ খেয়ার নায়ে সর্বনাশা সান্ধ্য বৈতরণী
প্রথম ধরেছি পাড়ি ছেদহীন ঐকান্তিকতায়;
তাই তো নির্ভর করো (আমাতে যৌবন তোলে ধ্বনি)।

যৌবন বিলাস নয়, তুমি জানো, আমার স্মরণে
এ-সত্য রেখেছি বেঁধে আস্তিকের তর্কহীন প্রেম
যেমন বিশ্বাসে বলী তেমনি কারণে অকারণে
অস্তিত্বে বিশ্বাস রেখে এই হাত তোমায় দিলেম
যদিও রাত্রির খেয়া এবং নাবিক আমি প্রথম জীবনে।

সহযাত্রী যত পাল কোথায় হারিয়ে গেছে উত্তর দক্ষিণ
মন্দীভূত উষ্ণ বায়ু বর্ষণান্তে আনত আকাশ
হঠাৎ বিদ্যুতে দৃষ্টি—দৃষ্টির সীমান্তে সম্মুখীন
দু'বাহু বাড়িয়ে মাটি যৌবনের সফল আশ্বাস;
অবাক সমুদ্র পিছে, এমন খেয়ার ভার বুকে
সে সহেনি কোনদিন।

শিক্ষা—শিক্ষণ—অর্থোপায়

সাধারণ নিয়মে ছাত্র-জীবনের পরই আসে কর্ম্ম-জীবন অর্থাৎ অর্থ-রোজগারের পালা। চাকরিই হোক, কি স্বাধীন ব্যবসাই হোক, ভালোভাবে করতে চাইলে আগে প্রয়োজন অন্ততঃ কাজ চলার মতো শিক্ষা বা ট্রেনিং। শিক্ষা ও শিক্ষণ চলতে থাকার অবস্থাতেও অর্থোপায় হয়ে থাকে; কিন্তু সেটি সকল ক্ষেত্রে নয়, সকলের জন্যেই সে সুযোগ হয় না।

ছাত্র পড়িয়ে টাকা রোজগার করে নিজেও পড়ছে, এ দেশে এমন তরুণের সংখ্যা অবশ্য কম নয়। পড়বার তাগিদে গরীব ছেলে অন্য কোন কাজ করছে, এ-ও বহুল দেখা যায়। বাড়ি বাড়ি কাগজ ফিরি করে, ঠোঙা বিক্রী করে কিংবা আরও কোন ছোটখাট কাজ করে লেখাপড়া শিখতে চাইছে, এমন পড়ুয়ার সংখ্যাও নেহাৎ কম হবে না। সোজা কথায়, বহু বালক ও যুবক ছাত্রজীবনেই অর্থ রোজগার করে থাকে, পরিমাণ তার যা-ই হোক না কেন।

ছাত্র-জীবন ও কর্ম্ম-জীবন প্রায় একই সময়ে সুরু হয়ে গেছে—সমাজের এই একটি চিত্র লক্ষ্য করবার। আবার বৃত্তি পেয়ে, সরকারী সাহায্য পেয়েও শিক্ষা ও শিক্ষণের সুযোগ অনেকে গ্রহণ করেছে, এ-ও দেখা যায়। ছাত্রকে গোড়া থেকেই স্বাবলম্বী হতে হবে, নিজের অর্থ নিজে যোগাতে হবে—এই দাবীর একটি মূল্য স্বীকার্য্য। তবে অর্থ রোজগারের প্রথম উপায়টি ধরে দিতে হবে সমাজকে, সরকারকে। যে পথ ধরে পরবর্ত্তী জীবনে শিক্ষার্থী অর্থোপায় করতে পারবে, তার শিক্ষা ও শিক্ষণ ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হতে হবে সেইটি কেন্দ্র করেই।

আমেরিকা প্রভৃতি অগ্রসর রাষ্ট্রগুলোতে ছাত্রদের বেশ কতকগুলো ক্ষেত্রে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ রোজগারেরও সুযোগ করে দেওয়া হয়। স্বাধীন আমলে ভারত সরকার এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলোও নানা ধরণের কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন—যাতে শিক্ষা, শিক্ষণ ও অর্থোপায় একই সঙ্গে হয়ে চলতে পারে। শিক্ষানবীশ থাকাকালীন অবস্থাতেও কিছু কিছু অর্থ রোজগার যাতে হয়, কতক কতক ক্ষেত্রে সে ব্যবস্থাটি চালু দেখতে পাওয়া যায়।

সহায়-সম্বলহীন ছেলেমেয়েদের জীবনে দাঁড়াবার ভিৎ এই ভাবে তৈরী করে দেওয়া নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যেরই একটি অঙ্গ। প্রয়োজনের তুলনায়, বিপুল চাহিদার তুলনায় এখনও এই দেশে এর কতটুকু ব্যবস্থা হয়েছে, সে প্রশ্ন না উঠে পারে না। আমেরিকার নিউইয়র্কে একটি সমবায় শিক্ষণ-ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে—যে ব্যবস্থায় একদিকে ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন সাধারণ পড়াশুনো করবে, তেমনি সিলেবাসের অঙ্গ হিসাবেই তারা গ্রহণ করবে কারিগরী শিক্ষা। যার যে-দিকটিতে 'ন্যাক' আছে, সেই বৃত্তিমূলক শিক্ষাই তার জন্যে নির্দ্ধারণ করা হয় এবং কাজ করে সংশ্লিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রীর আনুপাতিক অর্থোপায়ও হয়ে থাকে। সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষণ দুই-ই শেষ হয়ে গেলে কোন যুবক-যুবতীর বেকার হয়ে থাকার আশঙ্কা থাকে না। এ দেশেও সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষা-শিক্ষণ-অর্থোপায়—এই কর্ম্মসূচীকে সমধিক কার্য্যকরী করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে সরকার তথা রাষ্ট্রনেতাদের দায়িত্ব অনেকখানি—তাঁরা জীবন সংগঠনের উপযোগী সুযোগ সৃষ্টি করলে, সেই সুযোগ গ্রহণের জন্যে লোকের অভাব হবে না।

এদেশে বেকার-সমস্যা এখনও তীব্রতর। দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ হয়ে গেছে, তৃতীয় পরিকল্পনার কাজও চলেছে বটে; কিন্তু বেকার-সমস্যা থাকবে না, এ গ্যারাণ্টি পাওয়া যায় নি। বরং এর উল্টোটি প্রায়ই শোনা যায়। এই অবস্থায় কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা হওয়া দরকার এবং শিক্ষাকালেই শিক্ষার্থী যুবক-যুবতীরা যাতে অর্থোপায় করতে পারে, সরকারকেই সেভাবে উদ্যোগী না হলে নয়।

মানুষের ত্বক্—কয়েকটি কথা

মানবদেহের ওপরটি জুড়ে যে ত্বক বা চামড়া রয়েছে, এ-ও দেহেরই একটি অঙ্গ। শুধু অঙ্গ বললেই বোধ হয় ঠিক হলো না—একটি প্রধান দেহযন্ত্র। একে সুস্থ ও সবল রাখার জন্যেও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, অথচ সাধারণ অবস্থায় সে দিকে আদৌ নজর থাকে কোথায়?

অন্য জীব-জন্তুর চামড়ার সঙ্গে তুলনায় মানুষের ত্বক তেমনটা পুরু নয়, এটি অমনি লক্ষ্য পড়ে। দেখা গেছে, প্রাপ্তবয়স্ক একটি মানুষের শরীরে যে ত্বক্‌ভাগ রয়েছে, এর আয়তন তিন হাজার বর্গ ইঞ্চির ওপর। ওজনে এ প্রায় ৬ পাউণ্ডের মতো অর্থাৎ যকৃৎ বা মস্তিষ্কের ওজনের চেয়ে দ্বিগুণ ভারী। শরীরের অভ্যন্তরে অবিরাম যে রক্ত চলাচল হয়ে থাকে, চামড়ার ভাগটিতেই পড়ে তার এক-তৃতীয়াংশ।

অমনি চোখে চামড়ার যে মসৃণতা পরিলক্ষিত হয়, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তেমনটি দেখা যায় না। বরং দেহের এই ত্বক্‌ভাগের এখানে-সেখানে

উঁচু-নীচু কত কি অবস্থা বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য করে থাকেন। শরীরের অন্যান্য অংশের চামড়ার সঙ্গে হাত ও পায়ের তলাকার চামড়ার বিভিন্নতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন। বাইরের হাওয়া বেশি রকম তপ্ত হয়ে উঠলে শরীর থেকে ঘাম বের হয়—চামড়া এই ব্যবস্থাতেই সে সময় ঠাণ্ডা থাকে। শুনলে অবাক হতে হয় যে, মানুষের এই দেহাবরণে ঘর্মগ্রন্থি রয়েছে প্রায় ২০ লক্ষ—হাতের তালু ও পায়ের তলায় অন্যান্য অংশের তুলনায় এই গ্রন্থি সংখ্যা অনেক বেশি।

মানুষের ত্বক্ সাধারণতঃ নরম—শরীরে সকল অংশে এ একই রকম পুরু নয়। চোখের পাতায় যে চামড়া রয়েছে, তা এক ইঞ্চিরও ৫০ ভাগের এক ভাগ মাত্র পুরু। অপর দিকে হাত ও পায়ের তলাকার চামড়া চোখের পাতার ওপরকার ত্বকের চেয়ে বেশ কিছুটা স্থূল বলতে হবে। যৌবনের দিনগুলোতে চামড়ার যে চাকচিক্য থাকে, বয়স আরও বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তা ম্লান হয়ে চলে—শেষ অবধি কুঁচকে যায়, এবড়ো-খেবড়ো হয়ে যায়, এমন কি, অতিবৃদ্ধ বয়সে ত্বকভাগ প্রায় ঝুলে পড়ে।

মোটের ওপর, শৈশব থেকেই দেহ-ত্বকের যত্ন লওয়ার দাবী চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞরা রেখে এসেছেন। শরীরের অভ্যন্তরে বাইরের কতকগুলো জীবাণু ঢুকতে প্রথম বাধা এই চামড়া। সুতরাং যে-কোন চর্ম্মরোগ হওয়ামাত্র সারিয়ে ফেলতে হবে তাড়াতাড়ি—চামড়াকে সুস্থ-সবল রাখা চাই সর্ব্বক্ষণ, এই হতে হবে লক্ষ্য। চামড়ার রূপ ও প্রকৃতি দেখেও চিকিৎসকরা বহু রোগ নির্ণয় করে থাকেন। নিয়মিত তেল মাখা ত্বক্ সুন্দর ও স্বাভাবিক রাখবার একটি প্রধান উপায়। মর্দনের ফলে রক্ত চলাচল ভাল হয় আর এ ভালোভাবে হলে শরীর সুস্থ থাকবে, আশা করা চলে। রোদ, বাতাস—এসবও দেহত্বক্ সতেজ রাখবার জন্যে, বলতে কি শরীর নিরাময় রাখবার জন্যেই নিয়মিত চাই। স্নান করার সময় অন্ততঃ মাঝে মাঝে সাবান ব্যবহারের নিয়মটিও খুব ভালো—এতে চামড়ার ছিদ্রপথগুলো পরিষ্কার থাকে, ওপরকার ময়লা সব, যা থাকলে অসুখ ঘটাতে পারে, ধুয়ে-মুছে যায়। চামড়ার কোনরকম অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ্য করলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ব্যবস্থাপত্র নেওয়া এবং নির্ভরযোগ্য ঔষধাদি ব্যবহারও সমীচীন বলতে হবে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে আজকের দিনে সব রোগেরই বলতে গেলে যেমন ওষুধ আছে, চর্ম্মরোগেরও ওষুধের অভাব নেই। প্রয়োজন হলো সজাগ থাকা, সময় থাকতে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করা। আগেই বলা হলো, চিকিৎসক তথা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে এটি করতে হবে।

কাঁচা ফিল্ম শিল্প

চলচ্চিত্র ও স্থিরচিত্রের জন্যে সর্ব্বপ্রথমেই চাই ফিল্ম; কিন্তু আভ্যন্তরীণ এমন ব্যবস্থা এখনও হয়নি, যাতে ফিল্মের চাহিদা মিটে গেছে বলে দাবী রাখা যায়। হিসাব জুড়ে দেখা গেছে আলোকচিত্র শিল্পের জন্যে কাঁচা মাল যা বাইরে থেকে রপ্তানী করতে হয়, তাতে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়িত হয়ে যায় বছরে ৫ কোটি টাকার মতো।

এই বিশেষ প্রয়োজনের দিকটিতে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, এইটুকু বলতে হবে। তাই তৃতীয় পরিকল্পনায় নতুন শিল্পোদ্যোগের জন্যে একটি কাঁচা ফিল্ম উৎপাদন কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবটি সংযোজিত দেখতে পাওয়া যায়। শুধু পরিকল্পনাই নয়, কাজটি যাতে তৃতীয় যোজনার প্রথম পাদেই শেষ হতে পারে, তার জন্যেও সরকারী উদ্যোগ চলেছে। কারখানাটির জন্যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে দক্ষিণ ভারতের উতকামণ্ডের সন্নিহিত একটি জায়গায়। ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫০ একর জমির ওপর এই কারখানাটি তৈরী হতে চলেছে। সরকার দাবী রাখছেন, এর কাজ শেষ হয়ে গেলেই আলোকচিত্র শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় বেশীর ভাগ কাঁচা মালই পাওয়া যাবে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায়।

ভারতে এক্স-রে ফিল্ম-এর চাহিদাও আগের তুলনায় বেড়ে গেছে অনেক। অথচ চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা দেশের অভ্যন্তর থেকে এখনই হতে পারছে না। তৃতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী উতকামণ্ডে যে কাঁচা ফিল্ম শিল্পের কারখানাটি তৈরী হয়ে চলেছে, সরকারী দাবী—ঐ কারখানায় এক্স-রে ফিল্মও উৎপাদিত হবে এবং সেই ফিল্মের সাহায্যে দেশের মোট চাহিদা মিটিয়ে বাহিরেও ফিল্ম রপ্তানী চলবে। এ সকলই আশার কথা, আনন্দের কথা, সন্দেহ নেই।

সেল্‌সম্যানের কাজের প্রসঙ্গ

কেনাকাটার বাজারে সেলসম্যানের ভূমিকাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ক্রেতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন এই সেলসম্যানই। কাজেই এই সেলসম্যান বিশেষ দক্ষ, কর্ম্মক্ষম, পরিশ্রমী না হলে চলতে পারে না।

সেলসম্যানের দায়িত্ব কত দিক থেকে বলবার নয়। দোকান কর্ম্মচারী হিসাবে দোকান মালিকের স্বার্থরক্ষা তাঁর একটি প্রাথমিক দায়িত্ব। ক্রেতার হাতে তাঁকেই পছন্দসই পণ্য তুলে দিতে হবে এবং সেইটি বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে। তাঁর কথাবার্ত্তায় মিষ্টত্ব থাকা চাই, গ্রাহকের মনে তাঁর বক্তব্যে আস্থা সৃষ্টি হওয়া চাই। লক্ষ্য রাখতে হবে জিনিস পছন্দ হলো না বলে কেউ যেন ফিরে না যায়। সেলসম্যান সব সময়ই তৎপর হবেন—ক্রেতার সঙ্গে আচরণে কোনরূপ বিরক্তি বা রুষ্টভাব যেন কখনই দেখানো না হয়।

দোকানে-বাজারে ঘুরলেই দেখা যাবে—এমনও ঘটছে, জিনিস ঠিক পছন্দ হলো না, তবু কেনা হয়ে গেলো। এইখানে জানতে হবে সেলসম্যানের বাহাদুরি ও দক্ষতা। পাকা সেলসম্যান যিনি হবেন, ক্রেতার মন এমনি ঘুরিয়ে দিতে পারেন। প্রথমেই তাঁর কাজ হবে ক্রেতা বা গ্রাহকের অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি করা, ক্রেতার মনে যে-জিনিসটি আছে, সেইটি টেনে নিয়ে কথা বলা। ক্রেতার সঙ্গে তখনকার মতো একাত্মভাব ঘটিয়ে দেওয়াই হতে হবে তাঁর লক্ষ্য। এমনি দাবী রাখা দরকার যে, ক্রেতা কোন জিনিস কিনতে এসে না কিনলেও দোকান বা শিল্পসংস্থা সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা নিয়ে না যেতে পারেন। আজ ফিরে গেলেও কাল সেই লোকের আসবার পথ করে দিতে হবে আলাপে ও আচরণে। সোজা কথায়, সেলসম্যানের কাজটি হলো একটি মস্ত আর্ট। এর জন্যেও উপযুক্ত ট্রেনিং প্রয়োজন—হাতে-কলমে কাজ শিখে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন দরকার। যে-কোন শিল্প-সংস্থা বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের গুড্‌উইল বা সুনামের পিছনে সেলসম্যানের অবদানই অনেকখানি, একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

গীতা কাপুরের আত্মহত্যা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

"তারপর—"

"সেবারে এবং তারপর থেকে যখনি আমি কলকাতায় আসতাম চিঠিতে খবর পেয়ে মেয়েটি এসে আমার সঙ্গে দেখা করতো, গল্প করতো এবং আমরা একসঙ্গে বেড়াতাম। বেশির ভাগই শহরের বাইরে ঘুরতে যেতাম—কখনো ডায়মণ্ড হারবার, কখনো গান্ধী ঘাট, কখনো বা ট্রেণে করে মেয়েটির নাম ভালো-লাগা কোনো এক ষ্টেশনে নেমে সম্পূর্ণ অজানা এক গ্রামে! এই ভাবেই ক্রমশ পরস্পরের প্রতি আমরা আকৃষ্ট হতে লাগলাম এবং প্রতি মাসে আমার কলকাতা-প্রবাস দু'তিন দিন থেকে বাড়তে বাড়তে দশ-বারো দিন হয়ে যেতে লাগল এবং তারপর বিয়ে।"

"বিয়ের প্রস্তাবটা কে করে?"

"আমিই। শুনে ও কেঁদে ফেলে। অজান্তে ওকে কোনো দুঃখ দিয়েছি বা অপমান করেছি মনে ক'রে আমি প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু পরে বুঝলাম সে-অশ্রুবর্ষণ আনন্দের। কিন্তু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েও ও বিয়েতে প্রথমে রাজী হ'তে চায় না এবং আমার অনেক মিনতি ও সাধ্যসাধনার পর তবে রাজী হয়।"

"দেওয়ালির দিন শুক্লা সাহেবের কোয়ার্টার থেকে আপনি কখন বেরিয়েছিলেন?"

"মনে করে বলা মুস্কিল, তবে সাড়ে দশটা-এগারোটা হবে।"

"আপনার বিয়ের একজন সাক্ষী—আপনার স্ত্রীর বন্ধু মিসেস মিনতি সরকারের সঙ্গে আপনার প্রথম কবে পরিচয় হয়?"

"বিয়ের তিন চার দিন আগে। বহরমপুরে থাকতে ওর সঙ্গে গীতার প্রথম আলাপ হয় এবং কলকাতায় এসে নাকি গীতা প্রথমে ওর ওখানেই ওঠে।"

"মিসেস সরকারের কলকাতার বাড়িতে আপনি কোনোদিন গিয়েছেন বা মিষ্টার সরকারের সঙ্গে আলাপ করেছেন?"

"না। কানপুর থেকে পরের বার এসে একদিন সন্ধ্যেয় সস্ত্রীক যাবার জন্য বিয়ের দিন রাতে মিসেস সরকার বলে গিয়েছিলেন, সে-আর হয়ে উঠল না।"

"সেই বিয়ের রাতের পর মিসেস সরকারের সঙ্গে আর দেখা হয়নি আপনার?"

"না—"

"টেলিগ্রাম পাঠানোর পর আপনি কলকাতা পৌঁছেছেন কি না কোনো খবর নেয়নি?"

"হ্যাঁ, হোটেলে ফোন করেছিল আজ সকালে, কিন্তু আমি তখন শুক্লার ওখানে—"

"সকালের পর আর ফোন করেনি?"

"না"—

"ওর কলকাতার ঠিকানা আপনি জানেন?"

"যে ঠিকানা জানতাম সে ঠিকানায় সে থাকে না—"

"কোন্ ঠিকানা?"

"—নং ডায়মণ্ড হারবার রোড—"

"ঐ ঠিকানায় বোধ হয় কোনো বাড়িই নেই?"

"না, আছে এবং মিনতির মা সেখানে বাসও করেন। মিনতিও

আগে বাস করত এবং গীতাও বহরমপুর থেকে এসে ওখানে উঠেছিল খবর পেলাম—"

"কখন গিয়েছিলেন আপনি? কাল সন্ধ্যেবেলা?"

"হ্যাঁ—"

"মিনতি এখন কোথায় থাকে?"

"জানি না। ওর মা বলতে পারলেন না—"

"বলতে পারলেন না, না, বললেন না?"

"আমার তো মনে হয় পারলেন না। আপনারা মিনতির সন্ধানে ওঁর কাছে গিয়েছিলেন সে-কথা যখন বললেন, গীতার সঙ্গে একজন অবাঙ্গালী ধনীর বিয়ের খবর দেখলাম জানেন এবং সেই ব্যক্তি যে আমি শুনে আমার যত্ন খাতির করবার চেষ্টাও যখন করলেন এবং মিনতির ছেলেটি যে ওর কাছেই থাকত এবং হঠাৎ বাড়াবাড়ি অসুখ করাতে মিনতি এসে তাকে নিয়ে যাওয়াতে বাড়িতে একেবারে একলা এবং নাতির জন্যে বিশেষ চিন্তায় রয়েছেন—এ-সব কথাও যখন বললেন, তখন জানা থাকলে ঠিকানাটাও নিশ্চয়ই আমায় বলতেন!"

"কিন্তু তিনি জামাই বা মেয়ের শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা জানেন না, এটা কি সম্ভব? একা থাকেন বলছেন—সময়-অসময়ের বিপদ-আপদও তো আছে?"

"ওঁর কথা শুনে মনে হ'ল মিনতি শ্বশুরবাড়িতে আছে এবং সাত-দশ দিনে এসে ওঁর খবর নিয়ে যায়, খরচ দিয়ে যায় এবং ছেলেকে দেখে যায়!"

"আমরা মিনতির সন্ধানে গিয়েছিলাম এ-কথা যখন বলেছেন তখন কী জানতে এবং কবে সে-কথাও নিশ্চয়ই বলেছেন?"

"—হ্যাঁ—"

"কী বলেছেন?"

"গতকাল রাতে আপনাদের কেউ গিয়েছিলেন এবং মিনতি কবে এসে ছেলেকে নিয়ে গিয়েছে এবং কোথায় গিয়েছে এই সব খবর করেছেন!"

"পুলিশ বলে আমাদের লোককে মহিলা যদি চিনতে পেরে থাকেন তা হলে আপনার মুখ থেকে ফাঁস হবার ভয়ে হয়তো সত্যি কথাটা আপনাকেও না বলে থাকতে পারেন?"

"কাল রাতের অচেনা আগন্তুক যে আপনাদের লোক এটা আমার অনুমান—ওঁর নয়!"

"মিনতি কবে এসে ছেলেকে নিয়ে গেছে শুনলেন?"

"আপনাদেরকে যা বলেছেন সত্যি কথাটাও তাই। দিনটা ওঁর গুলিয়ে গিয়েছে, তবে আঠারো-উনিশে সন্ধ্যের পর—"

"মিনতি সরকার আপনাকে নিশ্চয়ই আবার ফোন করবে। তখন তাঁর বর্তমান ঠিকানাটা জেনে রাখবেন কি?"

"যদি তার বলতে আপত্তি না থাকে—"

"তাঁকে বলবেন আজ হোক, দু'দিন বাদে হোক, পুলিশ তাঁকে খুঁজে বার করবেই, তবে নিজে থেকে পুলিশের কাছে এলে তাঁর প্রতি সন্দেহটা অনেক কম হবে।"

"মিনতি সরকারকেও আপনারা সন্দেহ করছেন?"

"এবং আপনাকেও!"

"সেটা আমার প্রতি আপনাদের নজর ও হাজারো প্রশ্নে অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি!"

"এমনিতেই না-বোঝার কিছু নেই, তার উপর আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি!"

"আর কোনো প্রশ্ন আছে?"

"না, কাল সকাল সাড়ে আটটার আগে আর কোনো প্রশ্ন নেই।"

"তা হলে বিনা প্রশ্নেই একটা কথা আপনাদেরকে জানাবার আছে আমার।"

"বলুন—"

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল শুভ্রভায়া, চলে আসতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

"যে নার্সটি আজ আমার স্ত্রীকে সেবা করেছে—তাকে যেন কোথাও দেখেছি আমি আগে। কোথায় দেখেছি এবং কবে, ঠিক মনে করতে না পারলেও নার্সের পোশাকে যে দেখিনি সেটা নিশ্চিত!"

"হাটে বাজারে কোথাও দেখে থাকবেন। নার্সরা সব সময়ে কিছু ঐ পোশাক পরে থাকে না!"

বলে দীর্ঘ পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শুভ্রভায়া উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম আমি—শুভ্রভায়াকে আসতে দেখে আগেই বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলাম আমি।

আর বেরিয়ে এসেই দেখেছিলাম হোটেলের কাউণ্টারে দেখা সেই ম্যানেজারকে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে। আড়ি পেতে এতক্ষণ কথা শুনছিল, না সেই মুহূর্তে এসে ঢুকতে যাচ্ছিল ঘরে—বুঝতে

পারলাম না ঠিক। আমরা বেরিয়ে আসতেই দরজার করাঘাত ক'রে ভিতর থেকে সাড়া পেয়ে ঢুকতে যাচ্ছিল ঘরে, কিন্তু গুপ্তভায়া ডেকে থামাল তাকে, "এক মিনিট!"

শুনে ঘুরে দাঁড়াল ম্যানেজার, "আমায় বলছেন?"

"হ্যাঁ। ভয় নেই, টেলিফোনের পয়সা ফেরৎ চাইছি না, শুধু জানতে চাইছি এই হোটেলের সার্ভিসই কি এই রকম না শর্মার প্রতি বিশেষ খাতিরের নমুনা?"

শুনে গম্ভীর হয়ে গেল ম্যানেজার, "মিষ্টার শর্মার যেমন বলা ছিল সেইমত করা বা আপনাকে বলা হয়েছে!"

"এ-হোটেলের সার্ভিসই তাহলে এই রকম!"

"মালিকের প্রতি সব হোটেলের, সব প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার তো এই রকমই হওয়া উচিত।"

"মালিক?"

"মিষ্টার শর্মাই এখন এই হোটেলের মালিক!"

"এখন মানে কবে থেকে?"

"গত তেসরা থেকে!"

"আগের মালিকের নামটা?"

"ডেভিড আব্রাহাম মুসালিয়া!"

"অর্থাৎ আপনি?"

একটু যেন ইতস্তত করলো ম্যানেজার উত্তর দিতে, তারপর বলল "হ্যাঁ। এ-হোটেলের পূর্বতন মালিক ও বর্তমান ম্যানেজার—আমিই সেই ব্যক্তি!"

প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে কেমন যেন থমকে গিয়েছিল গুপ্তভায়া, একটু আনমনা হয়ে বলল, "মিষ্টার মুসালিয়া, আপনাকে আর আটকাবো না—"

"ধন্যবাদ!" বলে দরজা ঠেলে শর্মার ঘরে ঢুকে গেল ম্যানেজার। ঘরের দরজা ফের বন্ধ হয়ে যেতেই তাড়াতাড়ি আমার সন্দেহ জানালাম গুপ্তভায়াকে, "লোকটা বোধ হয় আড়ি পেতে কথা শুনছিল ভিতরের!"

"এ্যাঁ?" কী যেন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল গুপ্তভায়া, ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, চলো—"

হোটেল থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গীর এক পানের দোকানের সামনে জীপ দাঁড় করিয়ে নিজে থেকেই কথা বলল গুপ্তভায়া। দোকানীকে চেঁচিয়ে এক ডজন পানের কথা বলে পকেট থেকে গোল্ড ফ্লেকের একটা প্যাকেট বার করল গুপ্তভায়া এবং আমার দিকে ফিরে বলল, "আমার সামনে না খেলেও সিগারেট নিশ্চয়ই তুমি খাও?"

"এই অল্পসল্প—" একটু কুণ্ঠিত হয়ে জবাব দিলাম।

"কী ক'রে খাও বলতে পারো?" বলে বিরক্ত মুখে প্যাকেটটা আমার কোলে ছুঁড়ে দিল গুপ্তভায়া। "দু'দিন ধরে প্যাকেটটা পকেটে ক'রে ঘুরছি—দুটোর বেশি খেয়ে উঠতে পারলাম না!"

"আপনি সিগারেট ধরবার চেষ্টা করছেন? এই বুড়ো বয়সে?"

"চেষ্টা করেছিলাম সিগারেট ধরতে নয়, সিগারেটের সাহায্যে পানটা ছাড়বার! এখন বুঝছি পান থেকে চুণ খসানোর মত মুখ থেকে পান খসানোটা বলতে যতটা সোজা জিভে সওয়ানো ততটা শক্ত!"

গুপ্তভায়া বলতে এতক্ষণে খেয়াল হ'ল,—সত্যিই ত' আজ সারাদিনে একবারও পান মুখে দিতে দেখিনি গুপ্তভায়াকে। আর পান খায়নি বলেই বোধ হয় ঐ পরিমাণ খেতে পেরেছে ঘণ্টাখানেক আগে!

জর্দা সমভিব্যাহারে ছ'টি পান একসঙ্গে মুখে পুরে মেজাজটা বোধ হয় মোলায়েম হ'য়ে এল গুপ্তভায়ার, জীপ ছেড়ে দিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করল, "কেমন বুঝছো ব্যাপারটা?"

এই প্রশ্নেরই অপেক্ষায় এতক্ষণ ছিলাম আমি, ব্যস্ত হ'য়ে বললাম, "শর্মাকে আসল প্রশ্নটাই তো আপনি করলেন না!"

"কী প্রশ্ন?"

"ওর স্ত্রীর মিসেস গীতা কাপুর পরিচয়টা শর্মা কার কাছে জেনেছে?"

"হুঁ, কাল সকালে এলে মনে ক'রে জিগ্যেস করতে হবে! ব্যাপারটা কী হয়েছে জানো, আজ দু'দিন ধরে পান না চিবিয়ে জিভটা অসাড় হয়ে গিয়েছে। কী যে বলছি আর কেন—কিছুই ভালো ক'রে জানি না!"

শুনে বুঝতে অসুবিধা হ'ল না, যে চিন্তা গুপ্তভায়ার মাথায় এখন ঘুরছে, আমার প্রশ্নটা তার মাইল দু'চারের মধ্যে নয় এবং তাই এ-রকম বে-তালা বে-সুরো জবাব আসছে ওর কাছ থেকে। অপ্রস্তুত হয়ে আমি চুপ করে যেতেই কিন্তু আবার আমায় খোঁচা দিয়ে উঠল গুপ্তভায়া, "বেহালা যাওয়া দরকার মনে হয় আর?"

"ইতিমধ্যে সেখানে যে ঘুরে এসেছেন আপনারা কেউ সেটা আর আমি জানবো কী ক'রে?" আহত-অভিমানের সুরে বলে উঠলাম আমি, "আপনার মুখেও শুনিনি আর সরকারের রিপোর্টেও নেই!"

"তা যা বলেছো! অন্তর্যামী তো আর তুমি নও!" গম্ভীর মুখে আমায় যেন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল গুপ্তভায়া, "তাহলে এবার বাড়ি ফেরা যাক, কী বলো?"

"রাত গভীর করে সমস্যার সমাধান যখন কিছু করা যাবে না, তখন সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হয়!"

অভিমানটা তখনো যায়নি আমার। চুপ ক'রে গাড়ি চালাতে লাগল গুপ্তভায়াও আমার কথার কোনো উত্তর না করে এবং পার্ক ষ্ট্রীটের কাছাকাছি এসে হঠাৎ বাঁয়ে ঢুকে পড়ল কীড ষ্ট্রীটে এবং তারপর চলতে লাগল অতি মন্থরগতিতে এবং রাস্তার দু'ধারে শ্যেনদৃষ্টি মেলে।

দূর থেকে একটি গেটের সামনে একটি লাল পাগড়িকে পাহারা দিতে দেখে আমি তাড়াতাড়ি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম গুপ্তভায়ার, "ঐ যে।"

গুপ্তভায়া মুখ না ফিরিয়েই বলল, "তুমি আমার চাকরিটা খাবে দেখছি—"

"কেন? কী হোলো?" বুঝতে না পেরে বোকার মত জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"ওটা পুলিশ কমিশনারের বাড়ি। এই এত রাতে ওখানে গিয়ে হামলা করলে আর দেখতে হবে না!"

পুলিশ কমিশনারের বাড়ির গেট ছাড়িয়ে জীপের গতি বুঝি আরো মন্থর হয়ে এল এবং ডানদিকে একটি বড় ম্যানসন বাড়ির পাশে মিসেস ওয়ার্ডের দোতলা হোটেল-বাড়ি দেখা গেল। গেটের এক পাল্লা দরজা বন্ধ আর খোলা অন্য পাল্লার ভিতরে টুল নিয়ে একটি নেপালী দরোয়ান বসে রয়েছে। দরজার ঐ ফাঁক দিয়ে বাড়ির ভিতরকার যে-টুকু আলো দেখা যাচ্ছে, নইলে অধিকাংশ

জানালাই বন্ধ আর দোতলায় যে একটা-দুটো খোলা সেগুলি সব অন্ধকার।

বাড়িটা ভালো করে লক্ষ্য করল গুপ্তভায়া, কিন্তু জীপ থামাল না! বাড়িটা ছাড়িয়ে এগিয়ে এসে বাঁ দিকের ফুটপাথে একটি রিক্সাগাড়ি পেরিয়ে জীপটা একবার রাখল গুপ্তভায়া এবং পিছন ফিরে বারবার এমনভাবে তাকাতে লাগল যে, রিক্সাওয়ালা রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠল এবং এগিয়ে এসে প্রশ্ন ক'রে বসল, পুলিশ সাহেবের কিছু প্রয়োজন আছে কি না?

'হ্যাঁ, তোমার মাথা!" বেশ খানদানি হিন্দিতে জবাব দিল গুপ্তভায়া এবং দিয়ে আর অপেক্ষা করল করল না, জীপ নিয়ে সোজা ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে এসে পড়ল এবং তারপর মোড় ফিরে আবার পার্ক স্ট্রীটের দিকে চালিয়ে দিলে গাড়ি।

"কী দেখছিলেন হোস্টেলটার বাইরে থেকে?" পার্ক স্ট্রীটে পড়ে জীপ যখন আমার বাড়িমুখো রওনা হয়েছে তখন প্রশ্ন করলাম গুপ্তভায়াকে।

"দেখছিলাম বাড়ির চেহারা দেখে বোঝা যায় কি না, মাত্র চার দিন আগে যে বেঁচে-বর্তে ছিল এই বাড়িতে সে আজ মারা গিয়েছে এবং সে-খবর এ-বাড়ি জানে কী না।—পেয়েছে কি না এখনো?"

"কী বুঝলেন দেখে?"

এখনো পায়নি। পেলে এতো তাড়াতাড়ি সকলে শুয়ে পড়তে পারত না এবং যদি বা পারত, ঘর অন্ধকার করে কখনই নয়!"

বাড়ির সামনে এসে যখন নামলাম তখন বারোটা বাজতে আর বিশেষ দেরি নেই। গাড়িতে স্টার্ট রেখেই গুপ্তভায়া বলল, "তা হলে কাল কী করছ?"

বললাম, "সাড়ে আটটার আগে কিছুই না; কেন না আজ উঠেছি ভোরে এবং ফিরছি এই রাতে। এখন একবার গিয়ে শুলে আটটা সাড়ে আটটার আগে আর এ-দেহে প্রাণ সঞ্চার করা যাবে না!"

"তাহলে মোমিনপুর ফেরৎ সাড়ে দশটা নাগাদ তুলে নিয়ে যাবো তোমায়। এখন মিঃ সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা হবে না আমার। তাঁকে বলে দিও কৃতকর্মের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত!"

মিঃ সমাদ্দার মানে আমার ছোটকাকা—আমার অভিভাবক এবং প্রতিপালকও বটে। পদাধিকারে পাবলিক প্রসিকিউটার এবং তাঁর সূত্রেই গুপ্তভায়ার সঙ্গে একদা আলাপ আমার। তাঁর প্রতি গুপ্তভায়ার হঠাৎ দুঃখ প্রকাশে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। "কৃতকর্মটা কী তিনি যদি জিগ্যেস করেন?"

"করবেন না—দেখছো না, এখনো বাড়িই ফেরেননি!" বলে জীপ ছেড়ে দিল গুপ্তভায়া, আর আমি গ্যারেজের পাল্লা ফাঁক ক'রে দেখলাম সত্যিই বাড়ির মালিক আমার খুল্লতাতের গাড়িই ফেরেনি! বাড়িতে ঢুকে নিজের ঘরেতে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়তে বিশেষ দেরি হল না, কিন্তু সমস্ত দিনের ক্লান্তির পরও ঘুম যেন কিছুতেই আসতে চায় না। গীতা কাপুরের মামলার এ-যাবৎ জানা, দেখা বা শোনা ঘটনাগুলি ফিরে ফিরে বারবার ভাসতে লাগল চোখের সামনে, পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল মনের মধ্যে এবং সেই আলোড়নে আধেক তন্দ্রায় হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার, কবে, কোথায়, কী পরিস্থিতিতে লেঃ কর্ণেল শুক্লাকে প্রথম দেখেছি আমি।

বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের এক চীনে-দোকানে বছর দুয়েক আগে এক সন্ধ্যায় জুতো কিনতে গিয়েছিলাম আমি। একটা 'মোকাসিন'-এর দাম করছি এবং ছত্রিশ টাকা থেকে বাইশে নামিয়ে ফেলে চেষ্টা করছি আঠারোয় আনবার, এমন সময় একটা গাড়ি থেকে নেমে গটগট করে এসে দোকানে ঢুকল জাঁদরেল চেহারার এই শুক্লা এবং তার সঙ্গে খুট খুট ক'রে একটি সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনী একটি লিজার্ডের চামড়া নিয়ে। শুক্লার জন্য এক জোড়া সু এবং
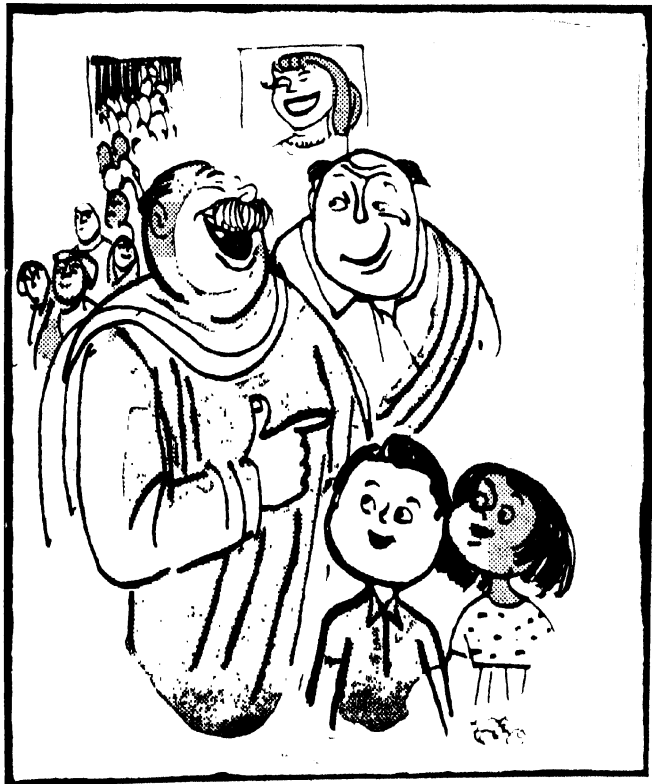
—বইটাতে 'লভ-সিন'গুলো কী সুন্দর, বিশেষ ক'রে ঐ ন্যাকামিগুলো আরো সুন্দর!

—শিল্পী শ্রীশৈল চক্রবর্তী

শ্বেতাঙ্গিনীর জন্য একটি ভ্যানিটি ব্যাগ অর্ডার হয়ে গেল এবং কলহাস্যের মধ্যে তারা প্রস্থান করল, কিন্তু দোকানের ঐ আধকাঁচা চামড়ার গন্ধের মধ্যে গন্ধ, বৃষ ও শব্দের এমন একটা উন্মত্ত সৌরভ রেখে গেল যে তার প্রতিক্রিয়ায় তখনি দোকান থেকে বেরিয়ে রিক্রুটিং আপিসে ছোটবার বাসনা হয়েছিল আমার। শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি বাড়িতেই ফিরেছিলাম আঠারো টাকার সওদা সকলকে দেখাবার জন্য এবং কাকার এক মক্কেল সকালে হরিণের মাংস পাঠিয়েছে মনে পড়ে যাওয়ায়।

সকালে চায়ের টেবিলে যেতেই খবর পেলাম ছোটকাকা আমায় স্মরণ করেছেন। চায়ে চুমুক দিয়ে নীচের বৈঠকখানায় যেতেই টেবিলের উপর রাখা নথিপত্র থেকে আমার দিকে চোখ ফেরালেন ছোটকাকা।

"কাল গুপ্তভায়ার সঙ্গে হোটেল'—'এ গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ—"

"এগারো নম্বর ঘরে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু—"

"শর্মার কাছে?"

"আপনি জানলেন কী ক'রে?"

"গুপ্তভায়ার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। তাকে বোলো রাত-বিরাতে স্থানে-অস্থানে বড্ড বাজে বকে সে।"

"এবং কাজের কথা বলতে ভুলে যায়। কাল রাত্তে আমায় নামিয়ে যাবার সময় তোমাকে বলতে বলে গিয়েছে, সে অত্যন্ত দুঃখিত!"

"এ্যাঁ!" শুনে যেন চমকে উঠলেন কাকা, অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠলেন, "আস্ত শয়তান!"

গুপ্তভায়ার সঙ্গে কাকার এই হঠাৎ মনোমালিন্যের কারণটা ঠিক ধরতে পারলাম না এবং ভালোও লাগল না। জিজ্ঞাসা করলাম, "কী করেছেন মিঃ গুপ্তভায়া?"

"সেটা ওকেই জিগ্যেস ক'রো। ও-ই ভালো জানবে। আর বোলো ঐ শর্মাটি একটি বাস্তুঘুঘু! আর আমায় যেন এর মধ্যে গুপ্তভায়া না জড়ায়!"

বলে মুখ ফিরিয়ে আবার নথিপত্রে মনোনিবেশ করলেন কাকা এবং অগত্যা গুটি গুটি ঘর থেকে চলে আসতে হ'ল আমায়!

সাড়ে দশটা ত ঠিক সাড়ে দশটাই! গুপ্তভায়ার জীপে নতুন লাগানো পিলে চমকানো হর্ণ শুনে তাড়াতাড়ি নেমে এসে জীপে উঠলাম গুপ্তভায়ার। পাশে বসতে বসতেই লক্ষ্য করলাম মুখখানা রীতিমত গম্ভীর।

জীপ চলতে শুরু করল এবং আমিও একটু একটু ক'রে বলতে শুরু করলাম কাকার কথা। শুনতে শুনতে হাসি ফুটে উঠল গুপ্তভায়ার মুখে।

"কিন্তু ব্যাপারটা কী?" রহস্যটা বুঝতে না পেরে সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম গুপ্তভায়াকে।

"তোমার কাকাকে কাল ঠাণ্ডি গারদে পুরেছিলাম!"

"কাকাকে?" বিস্ময়ে হকচকিয়ে গেলাম আমি, "কেন?"

"কাল শুক্লার ঘরে যখন আমরা ঢুকি তখন তোমার কাকা ছিলেন ঘরে এবং আমার গলা শুনে আশ্রয় নিয়েছিলেন বাথ-রুমে।"

"কিন্তু কেন?"

"কী প্রয়োজনে শুক্লা ওঁকে ডেকেছে না জেনেই তোমার কাকা ওঁর কাছে গিয়েছিলেন—বোধ হয় লেঃ-কর্ণেল শুক্লার অনুরোধে। তারপর শুক্লার কথাবার্তা শুনে যখন শুক্লার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে উঠেছেন ঠিক সেই সময়ে আমরা গিয়ে যদি উপস্থিত হই তো বাথ-রুমে লুকনো ছাড়া উপায় কী থাকে বলো?"

"কিন্তু কাকা যে ওখানে রয়েছেন আপনি জানলেন কী ক'রে?"

"একজন কেউ ছিল বুঝতে পেরেছিলাম কফির কাপ দেখে এবং সে একজন যে শুক্লা নয় বুঝতে অসুবিধে হয়নি, কেন না শুক্লা কফি খেয়ে তার দামী নেশা নষ্ট করবে না। তা ছাড়া হোটেলের সামনে শুক্লার গাড়িও ছিল না—উল্টোদিকের ফুটপাথে যে গাড়িটা ছিল সেটা তোমার কাকার—তুমি লক্ষ্য করোনি। তারপর ফোনে শুক্লার গলার জায়গায় তোমার কাকার গলা চিনতেও অসুবিধে হয়নি আমার!"

"কাকার কাছে তো তাহলে শুক্লার সম্বন্ধে জানতে পারা যাবে অনেক কথা?" বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে হঠাৎ উপলব্ধি করি আমি।

"কিন্তু বলবেন না আমাদের!"

"কেন?"

"বলা উচিত নয় বলে! উকিল হিসেবে উনি গিয়েছিলেন পরামর্শ দিতে। মক্কেলকে বিমর্ষ করেছেন বলে তার গোপন কথাটাও আমাদের বলে দেওয়াটা তাঁর ন্যায়ও হবে না, ধর্মও নয়।"

"কিন্তু জানতে পারলে এ-মামলার একটা তাড়াতাড়ি ফয়সালা হয়ে যেতে পারতো—"

"তা হয়তো পারতো এবং সেইটাই ট্র্যাজেডি, কেন না আজ সকাল থেকে যে-ভাবে ঘটনা সব মোড় নিতে শুরু করেছে তাতে ফয়সালা যে কবে হবে এবং কী ভাবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।"

"কেন, কী হয়েছে?"

"তা হলে শোনো", বলতে শুরু করি। সকাল সাতটায় গিয়েছিলাম বেহালায় মিনতি সরকারের সেই ঠিকানায়। শর্মা যা বলেছে মোটামুটি মিলল, কিন্তু মিনতি সরকারের কোনো ছবি পাওয়া গেল না এবং মিনতির ছেলের অসুখের বিবরণ শুনে মনে হ'ল খারাপ টাইপের টাইফয়েড। মিনতির মা বলল যে শর্মা খোঁজ করার পর মিনতি আর আসেনি এবং শর্মার খোঁজের খবরও তার জানবার কথা নয়।"

"সওয়া আটটায় পৌঁছলাম দপ্তরে এবং কাল রাতে যে রিক্সাওয়ালাকে কীড স্ট্রীটে দেখেছিলে সে আসলে আমাদের চর এবং তার কাছ থেকে জানতে পারলাম কাল রাত পৌণে বারোটায় তার ফ্ল্যাটে ফিরেছে ডাক্তার তৌফিক এবং ভোর রাতে আবার বেরিয়ে গিয়েছে। মিসেস ওয়ার্ড বের হয়নি হোষ্টেল থেকে এবং রাত্তে সর্বসাকুল্যে পাঁচটি মেয়ে ফিরেছে হোষ্টেলে। দু'জন একসঙ্গে আটটায়, একজন সওয়া আটটায় আর দু'জন বারোটার পর—আলাদা আলাদা ট্যাক্সিতে এবং ট্যাক্সি দু'টির নম্বর। ভোরের দিকে'—' এয়ারলাইন্‌স্‌-এর গাড়ি এসে তুলে নিয়ে গিয়েছে একটি মেয়েকে এবং দু'টি মেয়ে—রাতের দু'টি মেয়ে নয়, স্যুটকেশ হাতে হোষ্টেল থেকে বেরিয়ে ঐ রিক্সাওয়ালার রিক্সা চেপেই মোড় অবধি গিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে চলে গিয়েছে চৌরঙ্গীর দিকে।" [ক্রমশঃ

শ্বশুরবাড়ী

কণা বসু

সুস্তার বুক ফেটে কান্না পেল। ওর মায়ের কথা মনে পড়ল; কিন্তু ও কাঁদল না। হয়ত কাঁদতে পারল না বলে। ভাবল, মাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেবে সব কথা। কিন্তু না, ও একাই কাঁদবে। একাই জ্বলে পুড়ে থাক্ হয়ে যাক। মাকে আর সে শাস্তি নাই বা দিল। আত্মহত্যা করবে? উঁহু—মহাপাপ। ও তো কাপুরুষ নয়। ও দেখবে এর শেষ কোথায়। বাঁ হাতখানা মেলে ধরল সুস্তা। চোখ বুলোল রেখাগুলোর 'পরে। কোথায় গেল সেই ভাগ্যরেখা? চিরোর বই পড়ত এক বন্ধু। ভাল হাত দেখতে জানত। বলেছিল, তুমি রাজরাণী হবে সুস্তা। রাজরাণী! নিজের কণ্ঠকে ব্যঙ্গ করল সুস্তা। খালি ঘরে কেউ শুনতে পেল না সে কথা। ওসব হাতের রেখা-টেখাকে বিশ্বাস করে না ও। তবে একদিন করত। অবশ্য একেবারে অবিশ্বাস বলে উড়িয়েও দিতে পারে না। সত্যি তো, এদের বাড়ীর বাইরের প্রাচুর্য্য নেহাৎ কম নয়। রাজবাড়ী না বললেও ঐ ধরণের কিছু একটা মন্তব্য করবে অনেকেই: গাড়ী আছে, বাড়ী আছে, আর কি চাই? আজকালকার দিনে এই যথেষ্ট।

অনেক বেছে বেছে ওর বাবাকে নাজেহাল হতে হ'ল। এটা পছন্দ হয় তো ওটা হয় না। এর বাড়ী নেই, গাড়ী নেই। ওর রূপ নেই। হাবি জাবি আরও কত কি। এখনও সেকেলে ভাব যায়নি ওঁদের। প্রেজুডিসের দোহাই প্রতি পদে। অনেক দেখে-শুনে শেষ পর্য্যন্ত মিলেছিল এই সম্বন্ধটা। রবিবাসরীয় যুগান্তরের পাতায় এঁরা দিয়েছিলেন বিজ্ঞাপন। বাবার তো ঐ এক কাজই ছিল, রোববারের খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া। একটা নীল পেন্সিল হাতে নিয়ে বসতেন। দাগ দিয়ে রাখতেন ভাল ভাল সম্বন্ধগুলোর নীচে; আর একতাড়া পোষ্ট কার্ড ছাড়তেন প্রজাপতি অফিসে।

এক সপ্তাহের মধ্যেই বিয়ের ঠিক হয়ে গেল সুস্তার। বাড়ীর প্রত্যেকটি লোকের পছন্দ। দাদুভাই ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন, এখানেই প্রস্তাব তোলা হোক। বাবাও খোঁজ-খবর নিয়ে বললেন, ফ্যামিলি নাকি ভাল। সুস্তার উপযুক্ত এরাই। ওরা পর্দ্দানসীন নয়! ছেলে নিজেই আসবে তার দাদার সঙ্গে মেয়ে দেখতে। আজকালকার ছেলেদের নিজে দেখে-শুনে বিয়ে করাই তো ভাল। বাড়ীর ছোট ছেলে। সুতরাং সুস্তার কপাল ভাল।

প্রথম দিন দেখতে এসে ভাবী শ্বশুরমশাই প্রায় কোলে তুলে নেন, এমনি অবস্থা। একশো বার করে শুনিয়ে গেলেন, বি, এ পরীক্ষাটা আমি তোমায় দেওয়াবই। এম, এ পর্য্যন্তও ইচ্ছে করলে পড়তে পার। ওঁর ছেলেমানুষী কাণ্ড দেখে সুস্তা হেসেই অস্থির। প্রশংসা করেছিল মায়ের কাছে, এমনটি আর হয় না মা। একেবারে আত্মভোলা মানুষ। মা খুসি হ'য়ে বাবাকে বললেন, ওগো! বাছা আমার সুখী হবে দেখো।

পরের সপ্তাহে দেখতে এলেন, ছেলে স্বয়ং আর তাঁর দাদা। ঠাকুমা ঠাট্টা করে কানে কানে বলে দিলেন, ভাশুর ঠাকুর তোর, পেন্নাম করিস। আমার নাতজামাইটিকেও করতে ভুলিসনে দিদি। সুস্তা গ্রাহ্য করেনি সে কথা। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মাথা নোওয়ানো ওর অসহ্য। বিয়ের পরে প্রণাম, সে আলাদা কথা। এখন ওরা কোথাকার কে? হাত জোড় করে বলেছিল, নমস্কার। চমকে উঠেছিল সুস্তা, ভাশুরকে দেখে নয়। আর একজন গোবেচারা ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে। অপূর্ব্ব চেহারা। নামের সঙ্গে খুঁজে পেল সার্থকতা। রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়। চোখ জুড়িয়ে যায় তার রূপে। সুস্তা যেন এরই প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিল। কিছুই জিজ্ঞেস করেননি ওঁরা। শুধু প্রশ্ন করেছিলেন, কি Combination আপনার? ভদ্র ব্যবহার। সুস্তার ভাল লাগল। সারা জীবন কাটবে একটা অপরিচিত পরিবারে। ভাবতেও অবাক লাগে। কেমন লোকগুলো? সুস্তা কি পারবে তাদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে? নিশ্চয় পারতে হবে। নইলে ধিক্ তার শিক্ষা, দীক্ষা। বিদ্বান স্বামী—এঞ্জিনিয়ার। রূপে, গুণে খাসা। সুস্তা তার তুলনায় কিছুই নয়। এত কপাল করে এসেছিল সুস্তা! বিশ্বাস করতে পারছে না যে ভাগ্যকে।

বিয়ের পর, প্রথম প্রথম কি আদরের ঘটা। সারাক্ষণ তোলা তোলা করে রাখে সকলে। শ্বশুর তো দিশেহারা, কোথায় যে বসাই আমার মা-লক্ষ্মীকে? সুস্তাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত, যেন ভীষণ একটা প্রয়োজনীয় সামগ্রী। যত্ন করে না রাখলে হারিয়ে যাবে। এত আনন্দ রাখবে কোথায় সুস্তা? প্রতিটি অণু পরমাণুতে যে থরে থরে সাজানো হ'য়ে গেল। এতটা কি আশা করেছিল ও? কৈ না তো। ও হাঁটলেও যেন এদের ব্যথা লাগে। হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসে সকলে, এ কি বউ। তুমি ঘুরছো কেন? বিশের মা গেল কোথায়?

"না, না, আমি এমনিই একটু দেখছি।"

"দেখবেই তো মা, তোমারই তো সংসার। আস্তে আস্তে তো হাতে তুলে নিতে হবে সবই। আমি আর ক'দিন বল? তারপর তুমি আর বড় বৌই তো দেখবে শুনবে।"

সুস্তার কি ভালই লাগে শাশুড়ীর ব্যবহার। খানিকক্ষণ পর পরই ছুটে ছুটে আসে বিশের মা—এটা ওটা কখন কি দরকার হয়। বড় জা কাজ করেন। সুস্তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। অস্বস্তি লাগে অন্যের কাজ দেখতে। কিছু একটা করার জন্য

হাত বাড়ায়। বড় জা কেড়ে নেন হাতের কাজ। "হয়েছে, হয়েছে ক'দিন না হয় নতুনই রইলে—এরপর দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে নোর।" একগাল হাসি বড় জা-এর। ননদ ছোট বউদি বলতে অজ্ঞান। কলেজ যাবার সময় রোজ বলে যায়, বউদি ভাই! আজ তাড়াতাড়ি ফিরে অনেক গল্প হবে, কেমন? তারপর কোনদিন ফিরতে একটু দেরী হলে, বিনে কৈফিয়তেই লিষ্ট দেখায়। অমুক বন্ধু নিয়ে গেল রেষ্টুরেন্টে। কাটলেটে কামড় দিতে দিতে মনে পড়ছিল তোমায়। জলযোগের ভাল চানাচুর এনেছি—নেবে? কে বলে, ননদিনী—রায়বাঘিনী? সুস্তা ভাবে।

আসবার সময় মা বলে দিয়েছিলেন কতকগুলো কথা। সব মায়েরাই শ্বশুরবাড়ী পাঠানোর বেলায় মেয়েদের যে সব উপদেশ দিয়ে থাকেন। মা বলেছিলেন, চুপ করে থেকো। হড়বড় করে কক্ষণো কাউকে কিছু বলে ফেলবে না। মায়ের এ নিষেধের পেছনে একটা কারণও ছিল; সুস্তা চাপা নয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে হয়—এক সাধু ওকে দেখেই বলেছিলেন: "বেটি, তুমহারা ভাত হজম হতে হায়, লেকিন বাত নেহি হজম হোতা হায়।" অবশ্য সুস্তা এখন বড় হয়েছে। কাকে কি বলতে হয় তা সে জানে। শ্বশুরবাড়ীতে ও কথাই বলে কম। মনে-প্রাণে নতুন বউ; লোকে তো বলে। শ্বশুর, শাশুড়ীকে যত্ন করতে বলেছেন মা। সুস্তার নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাকে তো ভাবতে হয় না কিছুই। কোন দায়িত্ব নেই, ঝামেলা নেই। এমনি করে দিন কাটবে না। সুস্তা সব দায়িত্ব মাথা পেতে নেবে। তারও তো একটা কর্ত্তব্য আছে? শুধু পেয়েই যাবে নাকি এক তরফ থেকে? মোট কথা, সব দিক থেকে নতুন পরিবেশটি মন্দ লাগছিল না। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছে, বাপের বাড়ী যেতে দেওয়া এদের অপছন্দ। অথচ কাছেই তো, ডোভার লেনে। বিয়ের পর একবারই গেছিল মাত্র। মাকে মনে পড়ে। দাদাভাই এখনও কি ফিরতে রাত বারোটা করে? বাবার ব্রিজ খেলার আসর জমে কি আগের মত? এখন তো সুস্তা নেই। জানতে ইচ্ছে করে সব কথা। কি করবে, যেতে তো আর পারে না? ও জোরও করে না বাপের বাড়ী যাবার জন্য। চেষ্টা করে এ বাড়ীর সঙ্গে পুরোপুরিই খাপ খাইয়ে নিতে। বেশ আব্রু আছে শ্বশুরবাড়ীর। বিয়ের আগে শুনেছিল, কোন ব্যাপারেই প্রেজুডিস্ নেই এঁদের। এখন দেখতে পাচ্ছে, ঠিক তার উল্টো।

সেদিন বিরক্তই হয়েছিল সুস্তা। সামান্য একটা ঘটনা। কিন্তু তাতেই খুলে গেল শ্বশুরবাড়ীর মুখোশ! আশঙ্কায় ওর বুক দুরু দুরু করছিল। শ্বশুরবাড়ীর নগ্ন রূপ আর নোংরামিতে ও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। একটি মেয়ে এসেছিল কলেজের, এমনি দেখা করতে। তাছাড়া কি একটা বই রয়ে গিয়েছিল সুস্তার কাছে—সেইটে নিতে। ও কিছুক্ষণ গল্প করেছিল তার সাথে। সময়টা একটু বেশিই লেগেছিল মেয়েটিকে বিদায় দিতে। কি করবে সে যদি নিজে না ওঠে, তাকে তো তাড়িয়ে দেওয়া যায় না? মেয়েটিরও তো চোখে পর্দ্দা আছে। সেও তো যেতে পারে না স্বার্থসিদ্ধি সেরেই? খানিকক্ষণ বসতে হয় বৈকি। সুস্তা আশা করেছিল হয়ত শাশুড়ী বলবেন, বন্ধুকে খাবার আনিয়ে দাও, বৌমা। মুখ ফুটে তিনি বললেনও না সে কথা। তিনি না হয় খেয়াল করলেন না, বড় জাও তো বলতে পারত? অবশ্য ওঁদের মাথাব্যথার দরকারই বা কি! সুস্তার বন্ধু, সুস্তার কাছে এসেছে। সুতরাং গরজটা তারই। তবু এঁদের তো একটা আক্কেল আছে—নতুন বউএর বন্ধু। আতিথেয়তা না করলে শ্বশুরবাড়ীরই বদনাম। সুস্তা খেতে দেবেই। তবু এদের মুখ থেকে কথাটা শুনলে ভাল লাগত। তুচ্ছ একটা মুখের কথা বৈ তো নয়। বন্ধুটি চলে গেল। শাশুড়ীর মুখখানা গম্ভীর গম্ভীর মনে হ'ল। স্পষ্টই খোঁচা মেরে বললেন, ঘরের বউ-এর অতিরিক্ত কথা বলা দৃষ্টিকটু। প্রথম হোঁচট খেলো সুস্তা। মনটা ভারী হ'য়ে এল। রাজকুমার এলে অভিমান করে বলেছিল, তোমরা বুঝি কথা গুণে বল?

"কেন বলত?"

"না এমনিই বলছি।"

রাজকুমার গুণগুণ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলে গেল ঘর থেকে। সুস্তার চোখের কোণে টলমল করল এক ফোঁটা জল। রান্নাঘরে সবাই খেতে বসেছিল। সুস্তা পরে খায় শাশুড়ি আর জায়ের সঙ্গে। শ্বশুরমশাই তো সন্ধ্যেবেলায় খেয়ে শুয়ে পড়েন। সুস্তা বসে থাকে ওঁর খাবার সময়। মা বলে দিয়েছিলেন, সকলের খাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। পরিবেশন করবে। কিন্তু শাশুড়ী বারণ করে দিয়েছিলেন প্রথমদিনই, ভাশুরের সামনে বেশি বেরিও না বউমা। আমরা যেমন করে চলেছি, মেনেছি, তোমরাও করবে তেমনটি। ওতে সংসারের কল্যাণ হয়। খাবার টেবিলে রোজই গোল মিটিং বসে, খেতে বসে। আজও বসেছে। এ ঘর থেকেও ভেসে আসছে ও ঘরের গুঞ্জন, হাসি। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সুস্তা শুনতে পেল ননদ বলছে, "রাণীসাহেবাকে কিছু বলেছ নাকি মা?"

"রাণীসাহেবা? সে কে?"

"মানে নতুন বউদির কথা বলছিলাম!"

"কৈ না তো।"

"কিচ্ছু বলনি? দাদার কাছে সাত-পাঁচ কত কি লাগাল। আমি পাশের ঘর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলাম।"

চাপা গর্জ্জন করলেন ভাশুরঠাকুর, "চুপ। আস্তে। শুনতে পাবে।"

ওঁর ভদ্রতাবোধ আছে তাও।

"শুনতে পেল তো বয়ে গেল।" ননদ ব্যঙ্গ করল।

শাশুড়ী একেবারে আঁৎকে উঠলেন, "হায়রে! দুধ কলা দিয়ে কি কাল সাপ পুষছি? আমার খোকার মাতা (মাথা) খেয়ে বসবে যে ঐ সর্ব্বনাশী রাক্কুসি।"

সুস্তা কেঁপে উঠল একবার। দু'কান চেপে ধরল। শুনতে চায় না এসব কথা। দেখতে চায় না এ বাড়ীর বীভৎস রূপ। ছুটে পালাবে নাকি? কিন্তু কোথায়? আর একজনও তো ওখানে উপস্থিত। সেও কি প্রতিবাদ করতে পারছে না? সুস্তা কান পেতে রইল। রাজকুমার নিশ্চয় কিছু একটা বলবে। মিথ্যে ওর ভাবা, ওর একটা কথাও শুনল না ও। ও কি ভীরু, দুর্ব্বল। স্ত্রীকে অপমান করছে, ও কি করে সহ্য করছে? যদিও জানে সুস্তা, ও কেন তর্ক করতে যাবে? ওরই মা, বোন। রক্তের সম্বন্ধ রয়েছে যে। সুস্তা ওর কে? কেউ নয়। পরের বাড়ীর মেয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এ সংসারে। সুস্তা শুয়ে

পড়ল লেপমুড়ি দিয়ে। রাজকুমার ঘরে এসে বলেছিল, খেতে যাও। সাড়া-শব্দ নেই সুস্তার। ও জেগে আছে। ঘুমের ভাণ করে পড়ে রইল। ও কি প্রত্যাশা করেছিল? একটু আদর, সহানুভূতি। রাজকুমার ওর কাছেও ঘেঁষল না। ও অন্যমনস্কভাবে অফিসের ফাইল টেনে নিয়ে বসেছিল। দ্বিতীয়বার অনুরোধও করেনি। ঝি ডাকতে এসেছিল একবার। তখনও হুঁ, না, কোন জবাবই দেয়নি সুস্তা। সে রাত উপোসেই কাটল। বাড়ীর আর একটি প্রাণীও এলো না খোঁজ নিতে। ও শুনতে পেল, ভাশুর ডাকছেন কুকুরটাকে, "পম্পা, আয় তু, তু। ভাতগুলো খেয়ে যা। দেখেছ মা, কুকুরটার কাণ্ড? ব্যাটা, ক্ষিধেয় ধুঁকছে, তাও খাবে না। মাছ নেই কিনা। ডিম দিয়ে খাবেন না তিনি। আয় পম্পা, তু, তু, তু। এত বড় শীতের রাত কাটাবে কী করে?" সুস্তা ভাবল, পম্পার অভিমানেরও মূল্য আছে। ওর বাবাকে মনে পড়ল। একদিন খাব না বললে আর রক্ষে থাকত না। সোনা মা, লক্ষ্মী মা, কত সাধাসাধি। প্রশ্নের পর প্রশ্নে মাকে জর্জরিত করে তুলতেন। কেন ও খাবে না বল? নিশ্চয়ই কেউ বকেছে। মা কতদিন বকুনি খেয়েছেন তার জন্যে। সুস্তার কানে আসছে পাশের ঘরের নাকডাকার শব্দ। স্বামীও ঘুমিয়ে পড়ল একটু পরে। বেশ নিশ্চিন্ত ঘুম ওর। পাশের বেডে এই যে একজন ঘুম না আসা রুগী উসখুস করছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই ওর। সুস্তার চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়ছিল। রাগে নয়, দুঃখে নয়, বেদনায়। নিঝুম রাতে সুস্তা নিজেকে অসহায় বোধ করল। মনে পড়ল বিয়ের রাতের কথা, ছাদনাতলার কথা। একেই তো সুন্দর। তার পর আবার সেদিনের চাকচিক্যময় পরিবেশে রাজকুমার রাজপুত্র হয়ে উঠেছিল। কতজন বলেছিল, আহা! যেমন ক'নে, তেমন বর। কি চোখজুড়োন রূপ গা! এ যে সোনার কেষ্ট ঠাকুর। আনন্দে ঝলমল করে উঠেছিল সুস্তার মন। আড়চোখে চেয়ে দেখেছিল ঘোমটার আড়াল থেকে। জোড় পরা, পৈতে গলায় রাজকুমারকে ভাবতেও ভাল লাগছিল তার স্বামী বলে। গর্ব হচ্ছিল বৈকি।

আজকের নিশুতি রাতে আর একবার তাকাল ওপাশের খাটে। ও পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিল ওর ঘুমন্ত মুখখানা। এ রূপে চোখ ভরে হয়ত, মন ভরে না। এ রূপে আছে মোহ, নেই প্রেম। ছিঃ ছিঃ, এসব কি ভাবছে ও? স্বামী, দেবতা। মহাপাপ। হোক। ও তো জিভ দিয়ে উচ্চারণ করেনি? শুধু মনে মনে অনুভব করেছে। জ্বালা করে উঠল সারা শরীরটা। মাথাটা টন্ টন্ কচ্ছে। ও পাশ ফিরে শোয়। তবু ঘুম নেই। খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করল। নাঃ। ভয়ানক রাগ হয় নিজের ওপরেই। উঠে যায় বাথরুমে। ঘাড়ে মাথায় খানিকটা জল ছিটিয়ে আসে। এবারে যদি ঘুম পায়। এ অভ্যেসটা ওর বরাবর। বিয়ের আগেও, যখনই ঘুম না পেত তখনি এই কায়দাটা খাটাত ও। কিন্তু এখানেও ওর পরাজয়। চোখের পাতা বোজে, মন বোজে না। কান দুটো গরম হ'য়ে উঠেছে। ঢং একটা বাজল। দুটো—তিনটে। বড় ওয়ালক্লকে তার সঙ্কেত। এই বার ওর ঘুম নেমে এল চোখে। ও ঘুমে নেতিয়ে পড়ল।

পরদিন। যখন ঘুম ভাঙল, সকাল সাতটা তখন। ওপাশের খাট শূন্য। রাজকুমার উঠে গেছে। ও ধড়ফড় করে উঠে বসল। চোখ রগড়ে ব্রাশ হাতে করে চলে গেল বাথরুমে। প্রস্তুত হ'ল কথা শোনার জন্য। আশ্চর্য! কেউ কিছুই বলল না। এত বেলা হওয়ায় কোন কৈফিয়ৎও দিতে হ'ল না সুস্তাকে। সবাই যে যাকে নিয়ে ব্যস্ত। ইস্, যদি কেউ জিজ্ঞেস করত বেঁচে যেত সুস্তা। শোবার ঘরে টিপয়ের ওপরে কে রেখে গেছে চা, রুটি, টোষ্ট? এক রাতের মধ্যে এ বাড়ীর এত পরিবর্তন? লোকগুলো যেন বেমালুম বদলে গেছে। শেষ পর্যন্ত এ ধরণের ব্যবহার ও আশা করেনি। প্রত্যেকে রান্নাঘরে গিয়েই খেয়ে আসে। এমন কি শ্বশুর মশাই নিজেও। এই তো কালও সুস্তার ডাক পড়েছিল রান্নাঘরে। ননদ, জা সবাই মিলে ফুর্তি করে শেষ করেছিল চায়ের পর্ব। সুস্তা হারিয়ে গেল অনেক ভাবনায়। কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে চায়ের ধোঁয়াগুলো উড়ে গেল। ঠাণ্ডা জল হ'য়ে গেল চা-টা। সুস্তা জানলা দিয়ে ফেলতে চাইল ওটা। পেয়ালাটা আটকে গেল গরাদের ফাঁকে। চা গড়িয়ে সারা ঘরময় ছড়িয়ে গেল। সুস্তা তাড়াতাড়ি মুছে ফেলল পাপোশটা দিয়ে। গলায় আটকে গেল শুকনো রুটি টোষ্ট। মুখ লাল হ'য়ে উঠল'। গিলতে পেরেছিল অনেক কষ্টে। না খেয়ে আর কতক্ষণ থাকা যায়? এমনি করে আর দিন কুলোবে না। পড়াশুনোই ওর সঙ্গী। আবার কলেজ যেতে আরম্ভ করবে। মনে হয়, এঁরা তাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হবেন না। নাই বা হলেন, ক্ষতি কি? ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে ও দেবে না—কিছুতেই নয়। এ বাড়ীর আকাশ যতই খসে পড়ুক না কেন। সুস্তা গেল শ্বশুরের ঘরে। তার আগে চায়ের কাপ-ডিসগুলো নিজেই ধুয়ে রেখে এসেছে রান্নাঘরে। আজ আর বিশের মা ছুটে আসেনি। শাশুড়ীও ককিয়ে ওঠেননি, কি করছ, কি করছ বলে। এখন আর ও আনকোরা নয়। ভাঁজ ভাঙা হ'য়েছে—এইবার হবে ব্যবহার। সুস্তা শ্বশুরের পাঞ্জাবীটা গুছিয়ে রাখল। জুতোটা ব্রাশ করতে বসল।

"একি বৌমা! তুমি কেন? মণ্টু কোথায়? ওরে মণ্টু! তুই কি নবাবের ব্যাটা, গোঁপে তেল দিয়ে আড্ডা মারবি, আর ঘরের লক্ষ্মী বসবে জুতোর ধুলো ঝাড়তে, কেমন?" বাড়ীর মধ্যে এই একটা লোকই আছেন আগের মত। তাঁর পরিবর্তন হয়নি এখনও। বিশ্বাস করতে পারে না সুস্তা এঁকেও। শাশুড়ী ছুটে এলেন। ননদ, জা সবাই। "হয়েছে কি, ঘরে কি ডাকাত পড়েছে নাকি? জজসাহেবের নাতনী যায় কেন সব কাজে নাক গলাতে? তাকে হুকুম করেছে কে?" সুস্তার মাথা লজ্জায় নুয়ে আসে। আমতা, আমতা করে—"না, বলেনি কেউ। মণ্টু রোজই করে। আমি না হয় আজ করলুমই।"

বিদ্রূপ করলেন বড় জা। "দেখো বাপু! বাপের বাড়ী গিয়ে আবার উল্টো গীত গেয়ো না।" কি বেয়াড়া, অসভ্য! শ্বশুরকেও তোয়াক্কা করেন না বড় জা।

সুস্তা আশ্চর্য হ'য়ে গেছে। এক বাড়ীরই দু' বউ। বড়র কি দুর্জয় প্রতাপ আর ছোটর নিষ্ঠুর অদৃষ্ট! কি এমন অপরাধ করেছে সে? তবু ওর মুখে কথাটি নেই। শ্বশুরমশাই সত্যিই আলাদা এঁদের থেকে। তবে একটা দোষ, বড় বাতিকগ্রস্ত। যাক গে, বুড়ো মানুষ; অমন একটু আধটু দোষ থাকবেই।

এ বাড়ীর বিভিন্ন খুঁটিনাটি কাজের সঙ্গে ও জড়িয়ে গেল। তাকে ছাড়া সংসার অচল। সামান্য ত্রুটিতেও কথা শুনতে হয় বৈকি। শ্বশুরবাড়ীর পাঁচজনকে সুখী করাই মেয়েদের ধর্ম্ম। ঠাকুমা বারে বারে বলে দিয়েছেন সে কথা। এঁদের সুখী করতে গিয়ে সুস্তা হাঁপিয়ে উঠেছে। প্রশংসার লোভ তার নেই। মুক্তি চায়? এত সহজেই! উঠতে-বসতে কথা শুনতে হয়, জজসাহেবের নাতনী। কথাটা ঠিকই। ঠাকুর্দা ওর এখনও জজ। কোন্ স্পর্দ্ধায় এনেছিল তাকে? ও গুমরে কেঁদে মরে। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। কলেজে আর ভর্ত্তি হওয়া হ'ল কৈ।

ঘরে গা পুড়ে যাচ্ছে। থার্ম্মোমিটারটা আবার গেলো কোথায়? থার্ম্মোমিটারের পারাটা মুখে পুরল সুস্তা। ধুৎত্তেরিকা! সময় কোথায় এত? বিরক্ত হ'য়ে সরিয়ে দিল মুখ থেকে। সত্যনারায়ণ পুজোর যোগাড় করতে হবে এখন। শ্বশুরমশাই তাগাদার পর তাগাদায় ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন, "বৌমা, তাড়াতাড়ি কর। পুরুত ঠাকুর এই এলেন বলে।" ও ঘরে বড় জা ওঁর ছেলেকে দোলনা দোলাতে ব্যস্ত। ননদ অর্গান বাজাচ্ছে—তার পুরুষ বন্ধুরা এসেছে। বাড়ীর গিন্নী গল্প করছেন পাশের বাড়ীর ভদ্রমহিলার সাথে। ওঁর পান চিবুনোর শব্দ আর কথা কওয়া একাকার হয়ে গেল সুস্তার কানে—"আর বলো না গা, আমার কি কম অশান্তি? ছেলেদের বিয়ে দিয়ে ভাবলুম, এবারে আমার লম্বা ছুটী।· চল্লিশটি বচর (বছর) তো এ সংসারের ঘানি ঠেললুম। স্রেফ কপাল। বুঝলে দিদি? ছোট বউ আমার বড় ঘরের মেয়ে। রান্নাঘরে তাকে হাঁড়ি ধরতে দিই কেমন করে? অমন সোনার মত টুকটুকে রং—কালো হয়ে যাবে যে। বড্ড মায়া হয় আমার। আমিও তো মা। শাশুড়ীও যে, মাও সে। এক মায়ের কাছ থেকে না হয় আর এক মায়ের কাছেই এসেচে (এসেছে), কি বল?"

"হ্যাঁ, তা তো ঠিকই দিদি।" ও বাড়ীর গিন্নী সায় দিলেন।

"তাই তো বলি দিদি, আমার তিরিশ দিনের রুটীন যা, রইল তাই। ছোট আর করতে পারলুম কৈ।"

ও ভদ্রমহিলা মন্তব্য করলেন, "বউ-এর ভাগ্য ভাল দিদি। তোমার মতন শাশুড়ীর হাতে পড়েছিল।"

সুস্তার ইচ্ছে করে, সামনের দরজাটা মুখের ওপর বন্ধ করে দিতে। সরেও যেতে পারছে না ওখান থেকে। পুজোর যোগাড় করছে যে। বানিয়ে বানিয়ে কি মিথ্যে কথাটাই না বললেন শাশুড়ী। অথচ আজও দুপুরে সুস্তা শুধু রাঁধেইনি, পরিবেশনও করেছে। অনভ্যাসের ফলে হাতের আঙুলগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে জলে। তরকারী কাটতে গিয়ে কতদিন হাত কেটে গেছে। ভাতের ফ্যান ঝরাতে গিয়ে ফোস্কা পড়েছে। বার্ণল লাগাবারও সময় হয়নি ওর।

শাশুড়ী টেনে টেনে বলতে লাগলেন, বড় বউ আর কি করবে বল? সে তো নাকের জলে চোখের জলে এক হ'ল। বেচারা ছেলেমানুষ। বয়েসের তো আর গাছ-পাথর নয়?

হায়রে! দুঃখেও হাসি পেল সুস্তার। চল্লিশ বছরের জাও ছেলেমানুষ ওঁর চোখে। আর সে একেবারে বুড়িয়ে গেল। বড় জায়ের প্রতি শাশুড়ীর এত পক্ষপাতিত্ব কেন, জানে সুস্তা।

তাঁর শাবাল জিভের বচনে। সংসার বড় কঠিন জায়গা। এখানে সেই জিতবে, যে একচোট শুনিয়ে যেতে পারবে। সুস্তা তো সে শিক্ষা পায়নি মায়ের কাছে। সুতরাং এখানে তাকে প্রতি পদক্ষেপে হারাতেই হবে সন্দেহ নেই। এ বাড়ীর গোঁড়ামীগুলো জায়গা বিশেষে। বাইরের ঝি, চাকর, ঠাকুরের হাতের রান্না এঁরা পছন্দ করেন না। দুটোমাত্র ঝি দিয়ে কি এতবড় বাড়ীর এতগুলো লোকের কাজ চলে? কাজেই সুস্তার ঘাড়েই পড়ে বাদবাকী কাজগুলো। পুজো শেষ হয়ে গেল। সব গুছিয়ে রেখে ও যখন ঘরে এল, তখন বেলা দুটো। ওকি! খাটে শুয়ে আছেন ননদ আর ভাশুরঝি। রাবে এখানেও এঁরা। যাক্—ওঁদেরই রাজত্ব। সুস্তা ভেতরের বাগানের নির্জন ছায়ায় এসে বসল। ও খুব হাঁপাচ্ছে। সারাদিন শরীরের ওপর দিয়ে কি ঝড়ই না গেল। বেঁচেছে সুস্তা। এখানে কোন কথা নেই। বেশ নিরিবিলি। নিজেকে একটু একলা পাবে ও।

হ্যাঁ, এখানেও কথা। ওকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলবে নাকি এরা? বড় জা বললেন দেখতে পেয়ে, "আ মলো যা। লোকে বলবে কি গো—চাটুজ্জে বাড়ীর বউ, হাঁ করে চেয়ে আছে পথে!" সুস্তার ঠোঁট কাঁপছে থর থর করে—রাগে। এটা তো ভেতরের দিকের বাগান। ওদিকে তো বিরাট পাঁচিল। পথ আবার কোথায়? চুপ করেই গেল। বোবার শত্রু নেই।

কাল কাজকর্ম্ম সেরে সবে ঘরে গেছে সুস্তা। বাড়ীর সবাই ঘুমে কাতর। খালি ননদ রাত জেগে পরীক্ষার পড়া তৈরী করছে। সুস্তাও শুয়ে পড়ল। ঠিক তক্ষুণি ননদ পাশের ঘর থেকে হুকুম করল, "ছোট বউদি ফ্ল্যাস্কে চা করে রাখো তো। আমার ঘুম পায় পড়তে বসে।" সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছে সুস্তা। বড্ড ক্লান্ত শরীরটা। উঠতে একটু দেরীই হ'য়ে গেল। ননদ আগেই হিটারে প্লাগ্ লাগিয়েছে। আশ্চর্য্য! মজা দেখবার জন্য কি তাকে ডাকা হ'য়েছিল? এ সব প্রশ্ন অবান্তর। আর চুপ করে থাকা যায় না। তবু চেপে যেতে হয় ওকে। করুণা করে ননদ বললে, "থাক্ বউদি। তুমি শুয়ে পড়গে। তুমি তো এতক্ষণ করেছ। এটুকু আমিই করছি।" ঘুমে চোখ ঢুলু ঢুলু। সুস্তা আর দাঁড়াতে পারল না। মনে মনে ননদকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছিল তার এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্য। ওর ঘুম ভেঙে গেল শাশুড়ির চীৎকারে। "বৌমা! অ, বৌমা! নিত্য তিরিশ দিন তোমায় বলে বলে হার মেনে গেলুম। মেয়ে কলেজ করবে, লেখাপড়া করবে, আবার নিজের চাটুকুও তৈরী করে খাবে নাকি?" কথা শুনলে হাড়-পিত্তি জ্বলে যায়। শ্বশুরবাড়ী। এখানে উপদেশ দেবার লোক আছে—উদাহরণ দেবার নেই একজনও। বড় জা দিব্যি ঘুমুচ্ছেন। যত দায় তারই যেন। বুঝতে পারল সব—ওটা ননদের সহানুভূতি নয়, ছলনা। পাশের খাট থেকে পতিদেবতাটি মন্তব্য করলেন, "নিশুতি রাতে এ সব ঝামেলা কি ভাল লাগে? যাও না, মা কি বলছেন শোনো গে।" সুস্তা আকাশ থেকে পড়ল স্বামীর আচরণে। ও বুঝতে পেরেছে, স্বামী ওকে ভালবাসেন নি। আসলে এরা জানেই না সে পদার্থটিকে। কেন এনেছিল ওকে? কোন অধিকার নেই ওদের—পরের বাড়ীর একটা মেয়েকে এনে, তিলে তিলে টিপে টিপে মারার। এটা সেকাল নয়। একাল। বিংশ শতাব্দী। এরা যেন ভুলেই গেছে সে কথা। ইচ্ছে করলে কোর্টে গিয়ে ডিভোর্স কেস্ করতে পারে ও। কিন্তু এত নীচ রুচি সুস্তার হতে যাবে কেন?

ওর মনে কোন অপূর্ণতাই থাকত না, যদি স্বামীকে মনের মতনটি করে পেত। নিজের প্রাপ্যটুকু আদায় করতে জানে কড়ায়-গণ্ডায়, দিতে জানে না এক ফোঁটা।

নিজের সর্ব্বস্ব খুইয়ে দিল সুস্তা। নিঃশ্বাস ফেলবার সময়ও তার নেই। এরই নাম শ্বশুরবাড়ী। খোকাকে ভেড়া করে ফেলবে ছোট বউ—এই অপবাদই সে পেয়ে এসেছে। সুস্তাদের মত মেয়েরাই নাকি আসে শ্বশুরবাড়ীর ঘর ভাঙতে। এ-সব কথা শুনতে শুনতে সুস্তার কান পচে গেল। অথচ স্বামীকে হাতের মুঠোয় আনা তো দূরের কথা, তার টিকিটিও দেখতে পায় না ও।

বেলা দশটা বেজে গেল। রাজকুমারের অফিস যাবার তাড়া নেই তবু। দিব্যি আড্ডা মারছে বাইরের রকে। এ সব রকবাজি করা বরদাস্ত করতে পারে না সুস্তা। এদিকে নাকি শিক্ষিত। এই তার রুচি? বাইরে ষ্টাইলের তো অন্ত নেই। সুস্তা কী করবে? সে তো মূল্যহীন এ পরিবারে। স্বামীকেও কিছু বলার অধিকার তার নেই। সহধর্ম্মিণীর দাবীও নেই তার। একদিন অফিস কামাই গেলে মাইনে কাটে। গত মাসেও চার দিন ফ্যাক্টরীতে যায়নি বলে পুরো মাইনেটা পায় নি। শাশুড়ী গজর গজর কচ্ছিলেন। সুস্তাকেই তার জন্য কথা শুনতে হ'ল। সে তো টাকা ক'টি মায়ের হাতে দিয়েই খালাস। রাজকুমারকে কেউ কিছু বললে সহ্য করতে পারে না ও। যতই হোক স্বামী তো! বিয়ের রাতে বৈদিক মন্ত্র পড়ার পর এক আশ্চর্য্য বাঁধন উপলব্ধি করেছিল ও। তাই তো হাজার চেষ্টা করেও ও পারল না গ্রন্থি ঢিলে করতে। শাশুড়ী বললেন, "বৌ-মা, দেখো তো, খোকা কি অফিস যাবে না আজ?" ও বিরক্ত হ'য়ে বেরিয়ে এল ঘোমটা টেনে। আর কেউই নেই রকে। চলে গেছে যে যার কাজে। কেবল অলস রাজকুমার হাঁ করে চেয়ে আছে সামনের দোতলার ছাদে। সে গ্রাহ্যও করল না সুস্তার উপস্থিতি। সুস্তার গরজটা যেন নিতান্ত হাস্যাস্পদ, বেমানান। সুস্তার খেয়াল হ'ল এতক্ষণে। সামনের ছাদে এক সর্ব্বনাশী এলোকেশী মুখ টিপে টিপে হাসছে। ক্ষমাহীন রুক্ষ স্বরে বলল সুস্তা, "এ কি করছ?"

গাঢস্বরে রাজকুমার বলল, "দ্যাখো দ্যাখো, মিষ্টার সিনোহার ওয়াইফের কি অপূর্ব্ব হাসি।" কটমট করে চাইল সুস্তা ও বাড়ীর ছাদে।

সে অন্তর্দ্ধান হয়েছে তখন। রাজকুমারের কণ্ঠ বিষাক্ত, "আঃ, বিরক্ত করতে এলে কেন? বড্ড বে-রসিক তুমি।"

সুস্তা শিউরে উঠল।

তালপাতার পুঁথি

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

তিন

[ক]

সুলোচনা ভবানীচরণ বা তাঁর স্ত্রীর কোন অনুরোধেই কাণ দিল না।

এবং ভবানীচরণ যখন দেখলেন সুলোচনা হরনাথের কাছেই কলকাতায় যাবার জন্য একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কারো কোন কথাতেই সে কান দেবে না, তখন ভবানীচরণ আর কোন আপত্তি তুললেন না। বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, তবে তাই হোক।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ও যখন থাকবেই না, যাবেই বলে প্রতিজ্ঞা করেচে—যাক। স্বামীর কাছেই যাক।

বিন্ধ্যবাসিনা বলে, কিন্তু কাজটা কি ভাল হচ্ছে। সেই কলকাতায় যাওয়া অবধি ঠাকুর জামাই একটা খবর পর্যন্ত নেয়নি আজ পর্যন্ত—

সে তো আছেই—আমি বিশেষ করে ভাবচি হরনাথের বর্তমান পক্ষ অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের কথা। সে কি ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখবে?

আমি না হয় আর একবার বুঝিয়ে বলি ঠাকুরঝিকে—

কোন ফল হবে না। ওকে আমি চিনি। মনে মনে একবার যখন ও সেখানে যাওয়াই স্থির করেচে, কারো সাধ্য নেই ওকে নিবৃত্ত করে।

যাই হোক ভবানীচরণই সুলোচনাকে কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

যাত্রার দিনও পুরোহিত মশাই পঞ্জিকা দেখে নির্দিষ্ট করে দিলেন।

ব্যবস্থা হলো গৃহ সরকার বৃদ্ধ রমাপ্রসন্ন সুলোচনাকে নিয়ে গিয়ে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

যাত্রার দিন সকালে, নদীর ঘাটে নৌকা প্রস্তুত।

গুরুজনদের প্রণাম করে এবং বয়ঃকনিষ্ঠদের আশীর্বাদ করে প্রস্তুত হয়েচে সুলোচনা। সেই সময় বিন্ধ্যবাসিনী আবার বলে, অজ্ঞানত বা জ্ঞানতও কোন অন্যায় আচরণ তোমার প্রতি করে থাকি ঠাকুরঝি—ছোট বোন বলেও কি ক্ষমা করতে পার না?

ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলো না বৌঠান। মহাপাপ হবে আমার; একে তো গতজন্মের না জানি কি গুরুপাপে এ জন্মে এই ফল ভোগ করচি, তার উপরে আর যেন পাপের ভাগী না হই। তোমাদের স্নেহের কথা কি জীবনে ভোলবার। এ অভাগিনীকে যে স্নেহ দিয়েচ তোমরা।

তবে? তবে কেন চলে যাচ্ছো ভাই? কেন সাধ করে এ বয়েসে সতীনের ঘর করতে চলেচো।

সুলোচনা মৃদু হেসে বলে, সতীনের ঘর তো আমার নতুন নয় বৌঠান। শ্বশুরগৃহেও তো সতীন নিয়েই বাস করে এসেচি। তোমার মত ভাগ্যবতী এ সংসারে কয়জন স্ত্রীলোক। চেয়ে দেখো তো, কার ঘরে আজকের দিনে সতীন নেই। না বৌঠান—সে জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। তাছাড়া এ তো আমার স্বেচ্ছাকৃত। এ বিষ তো আমি নিজে স্বেচ্ছায় কণ্ঠে ধারণ করেচি। এখন বিষের জ্বালায় ব্যাকুল হলে চলবে কেন!

কথাটা বলতে বলতে সুলোচনার দুটি চক্ষু বাষ্পাকুল হ'য়ে ওঠে।

উদ্‌গত অশ্রু অঞ্চলপ্রান্তে মুছে সুলোচনা আবার বলে, বয়েসে না হলেও সম্পর্কে তুমি আমার বড় বৌঠান। আশীর্বাদ করো শুধু যেন স্বামীর পায়ে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস নিতে পারি। এ জীবনে আর কিছু আকাঙ্ক্ষা নেই, আর কিছু নেই—

বিন্ধ্যবাসিনী আর কি বলবে, চুপ করে থাকে।

ভ্রাতৃবধূর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভবানীচরণের কক্ষে এসে প্রবেশ করে সুলোচনা।

জ্যেষ্ঠের পদধূলি নিয়ে বলে, তবে চলি দাদা—

এসো একটা কথা শুধু মনে রাখিস সুলোচনা।

কি দাদা?

যদি কোনদিন প্রয়োজন বোধ করিস তো এখানে সোজা চলে আসতে বা খবর দিতে যেন কোন দ্বিধা করিস না। জানবি, পৃথিবীর সব দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও তোর জন্য তোর দাদার গৃহের দরজা চিরদিন খোলা থাকবে—

তা কি আমি জানি না দাদা। প্রয়োজন হলে আসবো বৈকি! নিশ্চয়ই আসবো। আসবো—আসবো।

চোখে অঞ্চল দিয়ে সুলোচনা ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

দীর্ঘ দুই দিন ও দুই রাত্রির পথ নৌকায় পাড়ি দিয়ে সুলোচনা অপরাহ্ণ টালার নালায় এসে সুন্দরমের নোঙর করা নৌকারই খান দুই নৌকা পরে নোঙর ফেলল।

সুলোচনা একটা ভারী চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত করে নৌকার ছইয়ের মধ্যে বসে ছিল, বৃদ্ধ সরকার মশাই গলা বাড়িয়ে বললেন, কলকাতায়

পৌঁছলাম পিসিমা। তাহ'লে আপনি একটু বসেন, আমি ডাঙায় গিয়ে মিশ্র মশাইয়ের গৃহটা খোঁজ করে এসে আপনাকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবো—

তাই যান।

সরকার মশাই মাঝিদের সাবধানে থাকতে বলে নৌকা থেকে নেমে গেলেন।

ভবানীচরণ বলে দিয়েছিলেন সরকার মশাইকে, সুধামাধবের আড়তে খোঁজ করলেই হরনাথের গৃহের সন্ধান সেই দিতে পারবে।

সুধামাধবের চালের আড়তটা সরকার মশাইয়ের অপরিচিত নয়।

সরকার মশাই সেই আড়তের দিকেই দ্রুত পা চালালেন।

সুলোচনা মুখ ফুটে বলতে পারেনি কত বড় মর্মান্তিক দুঃখ আর লজ্জায় তাকে ভবানীচরণের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে চলে আসতে হলো।

বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয় সুলোচনার মৃন্ময়ীকে বুকে আঁকড়ে ধরে অনেক দিন পরে বুঝি তার গোপালকে হারানোর যে দুঃখটা তার হৃদয়ের মধ্যে জমাট বেঁধেছিল সেই দুঃখের সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিল। মৃন্ময়ীও তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছিল।

কিন্তু সেই মৃন্ময়ীকেই যখন অকস্মাৎ সে রাত্রে ডাকাত এসে তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, সুলোচনার পক্ষে সে আঘাতটা সত্যিই মর্মান্তিক হয়েছিল।

সুলোচনার কাছে সমস্ত জগৎটাই যেন অন্ধকার হ'য়ে যায়।

সব যেন তার কাছে মিথ্যা হয়ে যায়।

তাই তার পক্ষে মৃন্ময়ীর শত-স্মৃতি বিজড়িত ভবানীচরণের গৃহে আর একটা দিনও থাকা সম্ভবপর হয়নি।

কোন মতে যে ভাবেই হোক, ভবানীচরণের গৃহ ছেড়ে চলে যাবার জন্য যেন সুলোচনা পাগল হ'য়ে উঠেছিল।

শুধু কি মৃন্ময়ীকে বুক থেকে হারানোর দুঃখ? ভবানীচরণ ও তার স্ত্রীর মুখের দিকেও যেন সুলোচনা তাকাতে পারছিল না আর।

মুখে না বললেও মনের মধ্যে কি তাদের একবারও উদয় হয়নি, তার বুক থেকেই তাদের আদরিণী কন্যা মৃন্ময়ীকে ডাকাতে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে?

আরো একটা চিন্তা কিছুকাল যাবৎই সুলোচনার মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল। তার স্বামীর কথা। আজ জীবনের প্রায় প্রান্তসীমায় এসে কেন যেন বার বার মনে হচ্ছিল সুলোচনার, প্রথম জীবনে সেদিন সে ভাল করেনি। সন্তানের ব্যাপার নিয়ে স্ত্রী হ'য়ে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করাটার মধ্যে সেদিন সত্যিই তার কোন যুক্তি ছিল না। অভিমানে অন্ধ হয়ে সেদিন সে স্বামীর প্রতি সুবিচার করতে পারেনি। শুধুই কি অভিমান? প্রচণ্ড একটা অহংকারও তার সমস্ত শুভবুদ্ধিকে বুঝি সেদিন আচ্ছন্ন করেছিল। নইলে স্ত্রীলোক হ'য়ে এত বড় কথাটা সে স্বামীর মুখের 'পরে বলতে কেমন করে দুঃসাহসী হয়েছিল!

ইহকাল-পরকালের যিনি একমাত্র দেবতা, তাঁর সঙ্গে সে সম্পর্ক রাখবে না, কথাটা নিছক প্রলাপোক্তি ছাড়া কি, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে?

ছিঃ ছিঃ, এত বড় দুর্মতি তার কেমন করে হলো! কত বড় গর্হিত পাপই না সে করেছে।

মন বলেছে—সুলোচনা, এখনো যা। স্বামীর পায়ে পড়ে গিয়ে মাথা কুটে ক্ষমা চা।

সেই ক্ষমা। সেই ক্ষমারও যে আজ তার প্রয়োজন। মৃন্ময়ী তার বন্ধন কেটে দিয়ে গিয়ে যেন সেই কথাটাই তাকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

কলকাতায় ছুটে আসার সে-ও একটা কারণ বৈকি। ক্ষমা।

স্বামীর পায়ে ধরে যে সে ক্ষমা তাকে চেয়ে নিতেই হবে।

অন্যমনস্ক সুলোচনা নৌকার পাটাতনে বসে অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। অপরাহ্ণের ম্লান আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। চারিদিকে গিস্ গিস্ করছে শুধু ছোট বড় নানা আকারের নৌকা আর নৌকা। পাড়ে মানুষজনের যাতায়াত। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর কানে যেতেই চমকে ফিরে তাকায় সুলোচনা। কালো কষ্টিপাথরে গড়া যেন এক বলিষ্ঠ পেশলদেহী তরুণ। পরিধানে পর্তুগীজ নাবিকের পোষাক। কোন এক নৌকার মাঝিকে তরুণ সম্বোধন করে বলছে, এই মাঝি, নৌকা সরে গিয়ে ভেড়া।

একজন নৌকার মাঝি বিনীত কণ্ঠে জবাব দেয়, সুন্দর সাহেব, মাঝি ডাঙায় গেছে, সে ফিরে এলেই নাও আমাদের ছেড়ে দেবো।

সুন্দর সাহেব মানে সুন্দরম।

ছেড়ে দেবো নয়, এখুনি সরিয়ে নৌকা লাগাও, না হলে নৌকা ডুবিয়ে দেবো।

সুন্দরম সাহেবের কথা যে মিথ্যে আস্ফালন নয়, নৌকার মাঝিরা সকলেই জানে এবং জানে, লোকটার মুখে এবং কাজে এক।

তবু মাঝি কাকুতি করে বলে, গোঁসা করছো কেন সুন্দর সাহেব? একটু পরেই তো আমরা চলে যাবো।

না, না—এখুনি সরিয়ে নিয়ে যাও নৌকা তোমাদের।

মাঝি আর দ্বিরুক্তি করে না। হাঁটুর 'পরে কাপড় গুটিয়ে নিয়ে জলে নেমে পড়ে নৌকাটা ঠেলে সরিয়ে নেবার জন্যই।

নিজের নৌকার পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে থাকে সুন্দরম কোমরে হাত রেখে। অপরাহ্ণের সূর্যালোক তার কালো কষ্টিপাথরের মত মুখখানার ওপরে পড়ে চক্ চক্ করছে যেন। কালো প্যাণ্ট ও লাল সোনালী জরি বসানো ভেলভেটের কুর্তা গায়ে। কোমরবন্ধে ঝুলছে এক পাশে খাপে ভরা ছোরাটা, অন্য পাশে গাদা পিস্তলটা। মাথায় ঘন কুঞ্চিত কালো কেশ। রুক্ষ, এলোমেলো।

সুলোচনার থেকে সুন্দরমের ব্যবধান মাত্র হাত দশেকের। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সুন্দরমকে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সুলোচনা যেন সুন্দরমের মুখের দিকে। কত পরিচিত, কত পরিচিত যেন ঐ মুখখানি। পরিচয় যেন আছে সুলোচনার কতকালের ঐ কালো কষ্টিপাথরের মত মুখটার প্রতিটি রেখার সঙ্গে। বুকের মধ্যে যেন দাগ কেটে কেটে বসে আছে।

সুলোচনা যেন সব ভুলে বুভুক্ষিত তৃষিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুন্দরমের মুখখানার দিকে। বুকটার মধ্যে যেন কি একটা বিচিত্র আকর্ষণ মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে।

কে! কে?

হঠাৎ ঐ সময় নৌকাটা দুলে উঠলো। সুলোচনা চমকে চেয়ে দেখে সরকার মশাই নৌকায় এসে উঠছেন।

সন্ধান পেয়েছি পিসিমা।

কার সন্ধান? অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করে সুলোচনা।

মিশ্র মশাইয়ের—

সুলোচনা কথা বলে, কিন্তু তার দৃষ্টি তখনো স্থিরনিবদ্ধ সুন্দরমের মুখের 'পরে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। ঐ মুখটাই তো দেখেছিল সুলোচনা সে রাত্রে তার ঘরে। সেই ডাকাতটা না? যে ডাকাতটা সে রাত্রে মৃন্ময়ীকে তার বুক থেকে চুরি করে এনেছিল? ঠিক। সেই, সেই মুখই তো। সেই ডাকাতটাই তো।

কিন্তু যে লোকটা ডাকাত, দস্যু, ঘৃণ্য, একটা মহাপাপী, যে মানুষটা তার এত বড় ক্ষতি করেছে তার প্রতি কোন বিদ্বেষ ভাবই তো সুলোচনা এই মুহূর্তে মনের মধ্যে কোথায়ও অনুভব করছে না।

বরং—বরং বিচিত্র একটা অনুভূতিতে বুকের ভেতরটা তার কাঁপছে। কিসের এ অনুভূতি, কেনই বা এ অনুভূতি?

বুকটার ভিতরে যেন কি একটা টন্‌টন্ করছে।

পিসিমা!

সরকার মশাইয়ের কণ্ঠস্বরে দ্বিতীয়বার যেন চমক ভাঙ্গলো সুলোচনার।

মিশ্র মশাইয়ের গৃহ এখান থেকে একটু দূরই হবে। একটা ডুলি কি নিয়ে আসবো, না পদব্রজেই—

আমি হেঁটেই যাবো সরকার মশাই। চলুন—

সুন্দরমকে তখন আর দেখা যাচ্ছে না। সে নৌকার ভিতরের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করেছে।

অপরাহ্নকাল, দিক্-দেশাগত চাউলের ব্যাপারীদের আনাগোনা ও মিশ্র কলগুঞ্জনে আশপাশের সমস্ত স্থানটা তখন যেন রম্ রম্ করছিল।

নিম্নকণ্ঠে সুলোচনা সরকার মশাইকে শুধাল, কোন মেলা বসেচে নাকি এখানে সরকার মশাই?

না পিসিমা, মেলা নয়—শহরের এই অঞ্চলটা চাউলের ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ। এরা সব চালের ব্যাপারী।

গঞ্জ?

তা বলতে পারেন।

মায়ের মন্দির এখান থেকে কতদূর সরকার মশাই?

ঐ যে মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে—হাত তুলে অদূরে কালীমাতার মন্দিরচূড়া দেখালেন সরকার মশাই।

হাত জোড় করে প্রণাম জানাল সুলোচনা।

পথের চারিপাশে আবর্জনা এখানে-ওখানে স্তূপাকার হয়ে আছে। একধারে কাঁচা প্রণালী—কর্দম ও আবর্জনায় ভর্তি। মাছি ভন্ ভন্ করছে। এখানে-ওখানে মানুষ মলত্যাগ করে রেখে গিয়েছে। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ বাতাসে ছড়াচ্ছে। নাকে কাপড় তুলে দেয় সুলোচনা দুর্গন্ধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। নানা জাতের মানুষের ভীড়। গায়ের ওপর দিয়ে যেন সব ঠেলে চলে যায়।

কোনমতে তাদের স্পর্শ বাঁচিয়ে এগিয়ে চলে সুলোচনা সরকার মশাইয়ের পিছনে পিছনে।

সরকার মশাইয়ের পিছনে পিছনে এসে সুলোচনা সংকীর্ণ এক গলির মধ্যে অবস্থিত জীর্ণ একতলা একটি গৃহের সামনে দাঁড়ালো। দুয়ার বন্ধ।

সরকার মশাই বললেন, এই মিশ্র মশাইয়ের গৃহ।

সুলোচনা মাথার গুণ্ঠন একটু টেনে দেয় সঙ্গে সঙ্গে।

ইতিপূর্বে এসে সরকার মশাই গৃহটি কেবল চিনে গিয়েছিলেন, গৃহস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। বন্ধ দুয়ারে করাঘাত করে উচ্চকণ্ঠে সরকার মশাই ডাকলেন, মিশ্র মশাই, গৃহে আছেন নাকি? মিশ্র ঠাকুর—

বার দুই দুয়ারে আঘাত করবার পরই একটি অল্পবয়স্কা শ্যামাঙ্গিনী দাসী এসে গৃহদ্বার খুলে দিলো।

কাকে চাই গা?

মিশ্র ঠাকুর গৃহে আছেন?

না। তিনি তো এ সময় গৃহে থাকেন না।

কোথায় তিনি?

আড়তে পাবেন তাঁকে।

গৃহে আর কেউ নেই?

আছে।

কে?

তাঁর কন্যা।

সুলোচনাই এবারে প্রশ্ন করে, কেন, তাঁর স্ত্রী? তিনি নেই?

তিনি তো দিন পনের হলো মারা গেছেন।

মিশ্র মশাইয়ের স্ত্রী গত হয়েছেন?

হাঁ।

[ক্রমশঃ।

কবি শেখ সাদীর গল্প

শ্রীদীপঙ্কর নন্দী

শেখ সাদী পারস্য দেশের কবি। তাঁর লেখা 'গুলিস্তাঁ' (গোলাপের বাগান), বোস্তাঁ (ফুলের বাগান) শুধু পারস্য-সাহিত্য নয়, বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ। এই দুখানি কাব্যগ্রন্থ প্রায় পৃথিবীর সকল দেশের সকল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সকল দেশই গুলিস্তাঁর 'গুল' সৌরভে আমোদিত। এই দুখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে কবি শেখ সাদী বিশ্বজনীন কবিখ্যাতি অর্জন করেছেন।

স্বদেশে নিজ জীবদ্দশায় কবি শেখ সাদী 'মহাকবি'রূপে সম্মানিত ছিলেন। এত নাম-যশ থাকা সত্ত্বেও তিনি সাধারণভাবে জীবন-যাপন করতেন। তাঁর জীবনে জাঁকজমক বা আড়ম্বর ছিল না এতটুকু। তিনি অতি সাধারণ পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। আর তাই পরেই কখনও তিনি যেতেন রাজপ্রাসাদে রাজসমীপে, আবার কখনও বা দীন-দরিদ্র দরবেশের পর্ণকুটীরে। বেশভূষা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এজন্য তাঁকে অনেক সময় অনেক বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে। একবার এক কাজীর বাড়ীতে বিচার সভায় অতি সাধারণ পোষাক পরিধান করে গিয়ে তাঁকে কি বিড়ম্বনাই না ভোগ করতে হয়েছিল! সেই গল্পটাই এখানে তোমাদের বলব।

সে আজ প্রায় ন'শো বছর আগের কথা। পারস্য দেশের এক কাজী কি একটা সমস্যার সমাধান করতে পারছিলেন না। দিবারাত্রি অনেক ভাবলেন, অনেক চিন্তা করলেন, কিন্তু কিছুতেই তার কোন কূল-কিনারা করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি ডেকে পাঠালেন দেশের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতদের। ইচ্ছা, সমস্যাটি তাঁদের সম্মুখে তুলে ধরবেন। তাঁদের মধ্যে কেউ না কেউ নিশ্চয় সমাধান করতে সক্ষম হবেন, এই আশা।

দেশের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত মনীষীরা কাজীর বাড়ীতে এসেছেন। তাঁদের বসতে দেওয়া হয়েছে দামী মখমলের আসনে। পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য অনুসারে তাঁদের বসতে দেওয়া হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতরা প্রথম সারিতে, দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতরা দ্বিতীয় সারিতে, তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতরা তৃতীয় সারিতে বসেছেন। পণ্ডিতরা সব আসর আলো করে বসে আছেন।

কাজী সাহেব আসরে এসে উপস্থিত হলেন। মাথা নীচু করে হাত নেড়ে কুর্নিশ করলে সকলে। কাজী সাহেব সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীকে অভিবাদন করে নিজের আসনে বসলেন।

প্রথমেই কাজী সাহেবের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতদের উপর। সকলেই এসেছেন একটু সেজেগুজে বেশবিন্যাস করে। কেনই বা আসবেন না! তাঁরা তো আর যার-তার বাড়ী আসেননি। এসেছেন স্বয়ং কাজী সাহেবের বাড়ী। এ রাজ্যের যিনি দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

কবি শেখ সাদীও এই বিচার সভায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি এসেছেন অতি দীন বেশে—অতি সাধারণ পোষাক পরিধান করে। যেমন পোষাক-পরিচ্ছদ তিনি পরিধান করে থাকেন তেমনি।

কাজী সাহেবের মুখের চেহারা কিন্তু পাল্টে গেল কবি শেখ সাদীর পোষাক-পরিচ্ছদের অবস্থা দেখে। তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন। তাঁর সম্মানেও কি একটু বেশবিন্যাস করে আসতে নেই? তিনি ভুলে গেলেন স্থান-কাল-পাত্র। আদেশ দিলেন প্রহরীকে প্রথম শ্রেণীর আসন থেকে কবিকে সরিয়ে দিতে। যাঁর পোষাক-পরিচ্ছদের ওই রকম অবস্থা, তিনি প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতদের সঙ্গে একাসনে বসার উপযুক্ত নন। ওঁকে প্রথম শ্রেণীর আসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক।

প্রহরী গিয়ে কাজীর আদেশ পালন করলো।

কি আর করেন কবি, যেখানে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে গেল, সেইখানেই তিনি ম্লানমুখে বসে রইলেন। না করলেন একটু রাগ, না জানালেন একটু প্রতিবাদ।

সভার কাজ শুরু হলো। কাজী সাহেব সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সমস্যার কথা উত্থাপন করলেন।

পণ্ডিতরা সকলে শুনলেন, চিন্তা করতে লাগলেন, শেষে একে একে নিজের মতামত প্রকাশ করলেন। সকলেই বললেন, তিনি যা বলেছেন তাই ঠিক। তাঁর মতবাদটিই যুক্তিযুক্ত—নির্ভুল। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হলো না; হলো শুধু চীৎকার আর হট্টগোল।

সকলে যখন ম্লানমুখে হতাশ হয়ে চুপ করে বসে আছেন, তখন ঘরের শেষ প্রান্ত থেকে একটি আবেদন ভেসে এলো। আবেদন করেছেন কবি শেখ সাদী। তাঁর আবেদন, তাঁকে কিছু বলতে দেওয়া হোক, তিনি একটু চেষ্টা করে দেখলে সমস্যার সমাধান করতে পারেন কিনা!

কবির স্পর্ধা দেখে কাজী সাহেব তো রেগেই আগুন। বলে কি! সহরের সেরা সেরা পণ্ডিতরা যার মীমাংসা করতে হিমসিম খেয়ে গেল, সেই সমস্যার সমাধান করবে ওই? রাগে ঘৃণায় তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

কাজী সাহেবের পারিষদবর্গ তো হেসেই খুন। মজা দেখবার জন্য তারা কাজীকে অনুরোধ করলো তাঁকে কিছু বলতে দেওয়ার জন্য।

পারিষদবর্গের অনুরোধ ফেলতে পারলেন না কাজী। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিলেন কবিকে কিছু বলার জন্য।

কবি শেখ সাদী অল্প সময়ের মধ্যে সামান্য কয়েকটি কথায়, অতি সুন্দরভাবে সুযুক্তি দিয়ে সমস্যার সমাধান করে দিলেন।

এক নিমেষে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সভাশুদ্ধ লোক তো বিস্ময়ে হতবাক। যারা মজা দেখার অপেক্ষায় ছিল তাদের চোখ

এবার কপালে উঠলো। স্বপ্নেও কেউ ভাবেনি এত সহজে সমস্যার সমাধান হবে। আর সমাধান করবে ও-ই!

পরক্ষণে কবির নামে জয়ধ্বনি পড়ে গেল। কাজী সাহেব সব ভুলে ধন্য ধন্য করে উঠলেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি নিজের মাথার বহুমূল্য রেশমী পাগড়ীটি কবির মাথায় পরিয়ে দিতে গেলেন। কিন্তু কবি মাথা ঘুরিয়ে নিলেন, পাগড়ী গ্রহণ করলেন না। তিনি কাজীকে কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্য বললেন, "মানুষের যা কিছু জ্ঞান-বুদ্ধি, তা থাকে তার মাথায়। শতহস্ত পরিমিত দামী রেশমী পাগড়ীতে কিম্বা পোষাক-পরিচ্ছদে নয়। গাধার মাথায় যদি ওই দামী পাগড়ী পরান হয়, তবে গাধা গাধাই থাকবে। গাধা পণ্ডিত হয়ে উঠবে না। সুতরাং ওই দামী পাগড়ী বা দামী পোষাক-পরিচ্ছদের কোন মূল্য নেই আমার কাছে। আমি গরীব লোক, দামী পাগড়ীতে আমার প্রয়োজন নেই।

এই বলে কবি শেখ সাদী বিচার-সভা ত্যাগ করে চলে আসেন।—

এতক্ষণে সকলের চমক্‌ ভাঙলো। কাজী সাহেব বুঝতে পারলেন কাকে তিনি অপমান করেছেন। দুঃখে-শোকে তিনি অনুতাপ করতে লাগলেন।

সাপে-নেউলে যুদ্ধ

শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ

বিষধর সাপকে সকলে ভয় পায়। কিন্তু বিষধর সাপও ভয় পায়, এমন জীবও আছে। সে হল নেউল বা বেজি। সাপ আর বেজিতে সাক্ষাৎ হলে দুজনের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ বাধে এবং সে যুদ্ধে বেজিই জেতে। কদাচিৎ সাপকে জিততে দেখা যায়।

বেজি তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। বেজি ছোট মাংসাশী প্রাণী। বাড়িতে অনেকে বেজি পুষেও থাকে।

এখন প্রশ্ন হল, বেজির পক্ষে বিষধর সাপকে লড়াইয়ে কেমন করে ঘায়েল করা সম্ভব হয়?

অনেকের ধারণা, বেজির রক্তে এমন কিছু আছে যাতে বিষধর সাপের ছোবলেও তার কিছু হয় না। সাপের বিষ বেজির রক্তে মিশলেও তার কোন ক্রিয়া হয় না। একথা কিন্তু ঠিক নয়। বেজির গায়ে সাপ যদি ঠিকমত ছোবল মারতে পারে, তা' হলে বেজিও মারা যায়। অবশ্য বেজির গা মোটা লোমে ঢাকা থাকায় সহজে সাপ ঠিকমত ছোবল দিতে পারে না।

অনেকের আবার ধারণা, বেজি লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে এসে গাছ-বিশেষের শিকড় খেয়ে যায়। এই শিকড় খাওয়াতে নাকি সাপে কামড়ালেও তার বিষে বেজির কিছু হয় না। একথাও ঠিক নয়। কোনও শিকড়েই সাপের বিষ নষ্ট করতে পারে না। অন্ততঃ আজ পর্যন্ত এরূপ কোন শিকড়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

তবে বেজি বিষধর সাপকে হারায় কেমন করে?

বেজির অস্ত্র হল তার ধারাল দাঁত, তীক্ষ্ণ নখ আর ক্ষিপ্র গতি।

গোখরো ও কেউটে সাপের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এ দুটি সাপ মারাত্মক বিষধর। এদের ফণা আছে। সেজন্যে এ দুটি সাপকে ফণাধারী সাপ বলে। এরা ফণা তুলে অতি দ্রুত ছোবল দিতে পারে। কিন্তু বেজির গতি তার চেয়েও দ্রুত ···ক্ষিপ্র। সেজন্যে গোখরো ও কেউটে বেজির সঙ্গে পেরে ওঠে না।

বেজি সাধারণতঃ গোড়ার দিকে সোজাসুজি সাপকে আক্রমণ না করে তাকে আক্রমণের ভাণ করতে থাকে—আর সাপের ছোবলের পাশ কাটিয়ে যেতে থাকে। এ ভাবে বার বার ব্যর্থ ছোবল মেরে সাপ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন বেজি তাকে আক্রমণ করে ঘাড় কামড়ে ধরে। ধারাল দাঁত দিয়ে ঘাড় কামড়ে ধরার ফলে বিষধর সাপও কিছু করতে পারে না।

আমাদের কেমন একটা ধারণা আছে, সাপ দেখলেই বুঝি সহজেই বেজি তাকে আক্রমণ করে। এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। সব জাতের সাপকে বেজি সহজেই আক্রমণ করে না।

আমাদের দেশে চন্দ্রবোড়া নামে একরকম সাপ আছে। গোখরো ও কেউটে সাপের মত চন্দ্রবোড়াও মারাত্মক বিষধর সাপ। এ সাপের ফণা নেই। সেজন্যে এ সাপকে ফণাহীন সাপ বলা হয়।

চন্দ্রবোড়া সাপ স্বভাবতঃই খুব অলস প্রকৃতির। গদাই-লস্করী চালে চলা-ফেরা করে। সহজে কাউকে কামড়ায়ও না। কিন্তু যদি কামড়ায়, অতি দ্রুত কামড়ায়—এমন কি ফণাধারী গোখরো ও কেউটে সাপের চেয়েও দ্রুত কামড়ায়।

চন্দ্রবোড়া সাপ খুব দ্রুত কামড়ায় বলে ক্ষিপ্রগতি বেজিও ওর সঙ্গে পেরে ওঠে না। সেজন্যে সহজে সে এ সাপকে আক্রমণও করে না।

গোখরো ও কেউটের সঙ্গে লড়াইয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেজিই জেতে। কিন্তু চন্দ্রবোড়ার সঙ্গে লড়াইয়ে সাধারণতঃ বেজিই হেরে যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, সাপ ও বেজির লড়াইয়ে দু'জনেই মারা যায়। এ কেমন করে সম্ভব হয়?

ধর, লড়াইয়ের মাঝে বিষধর সাপ বেজিকে ছোবল মেরেছে। কিন্তু তার বিষ-ক্রিয়া বেজিকে সম্পূর্ণরূপ অবশ করবার আগেই বেজি দিয়েছে সাপের ঘাড়ে মরণ কামড়। এ ভাবেই শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, সাপ ও বেজি দু'জনেই মরে পড়ে আছে।

আফিংখোর ও চার রাক্ষস

[বর্মার লোকসাহিত্য হইতে অনূদিত]

শ্রীমতী জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

এক গ্রামে একটা অতিথিশালা ছিল। একবার চার রাক্ষস সেই অতিথিশালায় এসে সমস্ত পথিকদের খেয়ে ফেলেছিল। সেই থেকে অতিথিশালার এমন দুর্নাম হয়ে যায় যে, কেউই আর সাহস করে সেখানে রাত্রিবাস করে না।

সেই গ্রামে এক আফিংখোর ছিল। সে কোন কাজকর্ম করত না—আফিং খেয়ে রাতদিন ঝিমুত। সর্বদাই আধ-ঘুমন্ত। কথা বলতো ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে, পথ চলতো ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে, তাই তাকে দেখে মনে হত সে দারুণ অলস ও কাপুরুষ।

একদিন তার আফিং ফুরিয়ে গেছে। একটু যে কিনবে তার মত পয়সাও হাতে নেই। তখন সে কি করলো জান? সারা গ্রামে ঘুরে ঘুরে বলতে লাগল, "আমার মত সাহসী আর একটিও এই গ্রামে নেই।"

সারাদিন একই কথা শুনে শুনে গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠলো। ছেলেরা তাকে ডেকে বললো—বড়ো যে সাহসী সাহসী করছো—অতিথিশালায় গিয়ে রাত কাটাতে পারো ?

মাথা হেলিয়ে পরম তৃপ্তির সুরে আফিংখোর বললো, "নিশ্চয় পারি, কিন্তু আমায় কৌটা ভতি আফিং দিতে হবে, আর দিতে হবে রাতের খাবার।"

ওকে জব্দ করতে পারবে ভেবে ছেলেরা মহানন্দে তাতেই রাজি। তাকে ছেলেরা এক কৌটো আফিং দিলো আর রাতে খাবার জন্য দিলো চিংড়ি মাছ ভাজা, ডিম সিদ্ধ, বাঁশের চোঙায় ভাত আর চালের বড়া। দারুণ উৎসাহে ছেলেরা তাকে সংগে করে নিয়ে গিয়ে সেই অতিথিশালায় পৌছে দিয়ে এলো।

চারিদিক নিঃশব্দ নিঝুম—দেখতে দেখতে রাত গভীর হয়ে এলো। আফিংখোর আফিং-এর নেশায় মশগুল। চোখ বন্ধ করে পরম শান্তিতে নিজের মনে খেয়ে চলেছে। এদিকে গভীর রাতে সেই চারজন রাক্ষস এসে উপস্থিত। আশ্চর্য হয়ে দেখল আর বলল, "আরে! এখানে যে একটা মানুষ!" আফিংখোর কিন্তু রাক্ষসদের উপস্থিতির কথা কিছুই জানতে পারলো না; সে তখন অন্য রাজ্যে বাস করছে।

এদিকে রাক্ষসেরা চারিদিকে ঘিরে বসে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোন ফল হলো না। কারণ আফিংএর মৌতাতে সে তখন ভরপুর হয়ে রয়েছে। এই দেখে রাক্ষসদের ভয় হলো, এতগুলো রাক্ষসকে একটুও ভয় করে না। তারা আরও মনোযোগে তাকে দেখতে লাগল; দেখে যে তার মুখে আগুন। এবার তারা সত্যই খুব ভয় পেয়ে গেল। ভাবলো—একে ত খাওয়া চলবেই না—এবার মানে মানে প্রাণ নিয়ে পালান যাক। ঠিক এই সময় আফিংখোরের খাবার ইচ্ছা হল; খেতে গিয়ে পাছে মৌতাত নষ্ট হয়ে যায় তাই চোখ বন্ধ রেখেই খাবারের পুঁটলিটা খুলে ফেলল। হাতড়াতে হাতড়াতে চিংড়ি মাছ হাতে উঠতে দারুণ খুশি হয়ে নিজের মনেই বলে উঠল,—"ওঃ হো দেড়ো তুমি এখানে; আমি খুব খুশি হয়েছি তোমাকে এখানে পেয়ে।"

দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাক্ষসদের একজনের নাম ছিল 'দেড়ো'। সে ত' ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

পরে হাতে ডিম উঠতে খুশির সংগে বলে উঠলো, "আরে টেকো-মশাই, তুমিও যে রয়েছ দেখছি।"

দ্বিতীয় রাক্ষসের মাথায় চুল ছিল না। সমস্ত মাথা জোড়া টাক্। সে মহা ভয় পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো।

এবার হাত পড়লো বাঁশের চোঙার ভাতে। আনন্দের সংগে বলে উঠল, "আরে এদের মধ্যে লম্বাও রয়েছে দেখছি। আমি খুব খুশি হয়েছি তোমায় পেয়ে।—"

তৃতীয় রাক্ষস লম্বা ও রোগা। সে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। তারপর চালের বড়া উঠতে বললো, "গোলমশাই, তুমিও এসেছ। ওঃ, আমি কি ভাগ্যবান। বেশ, এবার তোমাদের একে-একে খেতে আরম্ভ করি। প্রথমে খাবো দেড়োকে—তারপর টেকোকে—তারপর লম্বাকে—তারপর খাওয়া শেষ করবো গোলকে খেয়ে।"

এই না শুনে রাক্ষসেরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আফিংখোরের পা জড়িয়ে ধরল; বলল, "আমাদের বাঁচাও, আর কখনও এমন কাজ করবো না। এবারের মত প্রাণ ভিক্ষা দাও।"

আফিংখোরের চোখ বন্ধ ছিল। ভাবলো কেউ বুঝি খাবার চাইতে এসেছে। পাছে নেশার ঘোর কেটে যায় সেইজন্য চোখ না খুলেই জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল,—"না না, আমি দিতে পারব না; আমাকে সব খেতে হবে।" তখন রাক্ষসেরা প্রাণভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে বলল, "দয়া করে এবারের মত আমাদের প্রাণ বাঁচাও—আমরা তোমায় সাত কলসী মোহর দেবো।"

মোহরের নামে আফিংখোরের নেশা কেটে গেল। চোখ খুলে দেখলো চারজন রাক্ষস তাকে ঘিরে হাতজোড় করে বসে রয়েছে। অবস্থাটা বুঝে নিয়ে নিজেকে সামলে নিল। বুঝতে পারল এরা প্রাণ-ভিক্ষা চাইছে। এখন কোনমতেই দুর্বলতা প্রকাশ করা চলবে না। তাহলেই মহা বিপদ। গম্ভীর হয়ে বসে হুকুমের সুরে বলল—"কোথায় আছে তোমাদের সাত কলসী মোহর। শীঘ্র নিয়ে এসো।"

রাক্ষসেরা অনেকদিন ধরে ওই মোহরগুলি জমা করে ঘরের নীচে পুঁতে রেখেছিল। এখন ছাড়া পেয়ে নীচের দিকে দৌড়ল। মেঝে খুঁড়ে মোহরগুলি তুলে এনে আফিংখোরের সামনে রাখলো। মোহর দেখে গম্ভীর স্বরে আফিংখোর বলল, "আচ্ছা, এবার ছেড়ে দিলাম, যাও। আর কখনও এসো না।"

এরপর আফিংখোরের ভাগ্য ফিরে গেল। গ্রামের মধ্যে সে সবচেয়ে বড়লোক হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল।

পালোয়ান

শ্রীশৈলেনকুমার দত্ত

ধরোই যদি মনুমেণ্টটা হাতেয় তুলে নিয়ে
কিংবা দূরের পাহাড়টাকে—
আটকে নিয়ে হাতের ফাঁকে
সাগর জলে ডুব কবি ডুব দিয়ে ?
কিংবা যদি আকাশ পানে মাথাটা ঠিক রেখে
জাহাজগুলোর হেঁকে বলি
আমি আপন মনেই চলি,
তোমরা বাপু চলবে একটু বেঁকে।
কিন্তু যদি হঠাৎ নি হায় আমার পায়ের ফাঁকে
পিঁপড়েগুলো যুক্তি করে
কামড়েই দেয় কুটুস করে
তখন আমি ধরবই ঠিক মা'কে।

গল্প হলেও সত্যি

রণজিৎ বসু

শুধু প্রতিভাই নয়—তার সাথে ছিল বিরামহীন সাধনা, অটল সঙ্কল্প এবং অসীম ধৈর্য্য। সাধনার পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। বিশ্বের প্রশংসাধন্য তিনি। আমি ইতালীর এক অমর সঙ্গীতশিল্পীর কথা তোমাদের শোনাচ্ছি। ইনি বেশীদিন বাঁচেননি। মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন। সেদিন সারা

ইতালী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল ; কারণ সে রকম মধুর কণ্ঠস্বর আর কেউ কখনো শুনতে পাবে কিনা সন্দেহ।

শুনলে আশ্চর্য্য হবে, প্রথম প্রথম এঁর কণ্ঠস্বর এতই হাল্কা ছিল যে জনৈক সঙ্গীতশিক্ষক তাঁকে বলেছিলেন—"বাপু হে, তোমার পক্ষে গান গাওয়া নিছক পাগলামী। ধরতে গেলে তোমার কোন গলাই নেই।" অথচ এই সঙ্গীতশিল্পীই হয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত।

দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তিনি উঁচু পর্দ্দায় গাইতে পারতেন না। খুব কষ্ট হোত। স্বরভঙ্গ ঘটতো। ফলে শ্রোতাদের অবিরাম ঠাট্টা-বিদ্রূপে গান বন্ধ করতে বাধ্য হতেন। ধীরে ধীরে তাঁর ভাগ্যের মোড় ঘুরলো। একদিন তিনি খ্যাতির শিখরে উঠলেন। তখন পিছনের বিড়ম্বিত দিনগুলির কথা স্মরণ করে তাঁর চোখ দুটি ছলছল করে উঠতো।

মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি মাকে হারান। সেই মায়ের প্রতিকৃতি নিয়ে সারাজীবন তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। মা ছিলেন ইতালীয় কৃষক রমণী। একুশটি সন্তানের মাতা ছিলেন তিনি। শৈশবেই আঠারোটি সন্তান মারা যায়। অবশিষ্ট তিনটির মধ্যে একটি এই সঙ্গীতশিল্পী। সারাজীবন তাঁর মা দুঃখ পেয়ে গেছেন। কিন্তু এত দুঃখের মাঝেও তাঁর সান্ত্বনা ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই সন্তানের মাঝে প্রতিভার আগুন লুকিয়ে আছে। সেই প্রতিভা যাতে বিকশিত হয়ে পথ খুঁজে পায় সেজন্য কোন কষ্টকেই তিনি কষ্ট বলে মনে করেন নি। মায়ের কথা বলতে বলতে এই সঙ্গীতশিল্পী কেঁদে ফেলতেন।

যখন মাত্র দশ বছর বয়স, পিতা তাঁকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে কারখানায় ঢুকিয়ে দেন। অবসর সময়ে দশ বছরের বালক সঙ্গীত-চর্চ্চা করতে থাকে।

প্রথম প্রথম কোন কাফেতে গান গাইবার সুযোগ পেলে তিনি আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে যেতেন। অবশেষে একদিন সুযোগ উপস্থিত হোল অপেরাতে গান গাইবার। কিন্তু রিহার্সেলের সময় তিনি এতই ভীত হয়ে পড়েন যে গান গাওয়া তাঁর পক্ষে এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। বার বার বিফলমনোরথ হওয়ায় তিনি কেঁদে ফেলেন এবং থিয়েটার থেকে পালিয়ে চলে যান।

একদিন যখন তাঁর অর্ধমাতাল অবস্থা, তখন তিনি এক থিয়েটারে গান গাইবার সুযোগ পান ; কিন্তু শ্রোতাদের চিৎকারে ও বিদ্রূপবাণে তাঁর কণ্ঠস্বর ডুবে যায়। অবশেষে আত্মহত্যার চিন্তা মাথায় আসে।

সারাদিন অনাহার। মাত্র এক লির পকেটে। এক বোতল মদের দাম। তিনি মদ্যপান করতে করতে ভাবতে থাকেন কি ভাবে আত্মহত্যা করা যায়। যেখানে বসে তিনি মদ্যপান করছিলেন সেখানে আকস্মিকভাবে জনৈক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। সেই ব্যক্তি এক থিয়েটারের লোক।

সে চিৎকার করে ওঠে—"শুনুন মশাই, আপনাকে এক্ষুণি আমার সঙ্গে থিয়েটারে যেতে হবে। সেখানে আপনাকে গাইতে হবে। সবাই আপনার গান শোনবার জন্য অপেক্ষা করছে।"

—"আমার গান শোনবার জন্য! কি বাজে কথা বলছেন? অসম্ভব, অসম্ভব, এ হতেই পারে না। আমার নাম কেউ জানে না"—অবিশ্বাসভরা কণ্ঠে তিনি বললেন।

—"নিশ্চয়ই জানে। সবাই বলছে সেই মাতালটাকে নিয়ে আসুন।"

মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রচুর অর্থ রোজগার করে গেছেন, অথচ যৌবনে অভাবের তাড়নায় কি কষ্টই না পেয়েছেন।

এঁর অনেক কুসংস্কার ছিল। জ্যোতিষের পরামর্শ না নিয়ে তিনি কখনো সমুদ্রযাত্রা করতেন না। মইয়ের নীচে চলাফেরা করতেন না। শুক্রবারে নতুন স্যুট কখনো পরতেন না বা নতুন কোন কাজে হাত দিতেন না।

সর্ব্বদা তিনি ফিট্‌ফাট থাকতে ভালোবাসতেন। যখনই বাড়ী ফিরতেন তখনই পোষাক পরিবর্ত্তন করতেন।

চেষ্টার দ্বারা তিনি দুর্লভ মনমাতানো কণ্ঠের অধিকারী হয়েছিলেন। প্রচুর ধূমপানে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। দর্শক-সাধারণের সামনে উপস্থিত হবার পূর্ব্বে তিনি কিঞ্চিৎ হুইস্কির সাথে সোডা মিশিয়ে পান করতেন। এতে তাঁর কণ্ঠস্বর বেশ পরিষ্কার ও সতেজ থাকতো।

মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি স্কুল পরিত্যাগ করেন এবং তারপর তিনি বিশেষ কোন বই পড়েন নি। পড়াশুনার পরিবর্ত্তে তিনি ডাক টিকিট সংগ্রহ এবং দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা সংগ্রহ করতে ভালোবাসতেন।

তিনি নেপলসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে একবার গান গাইবার সময় তিনি শ্রোতাদের কাছে কোন সমাদর পান না এবং সংবাদপত্রগুলি তাঁর গানের বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। এতে তিনি অন্তরে এতো গভীর আঘাত পান যে সেখানকার শ্রোতাদের কোনদিন ক্ষমা করেননি। যখন খ্যাতির উচ্চশিখরে তখন নেপলসে একবার তিনি গিয়েছিলেন ; কিন্তু শত অনুরোধেও সেখানে আর গান করেননি।

নিজের মেয়ে গ্লোরিয়াকে তিনি খুব ভালবাসতেন। তিনি বারে-বারে স্ত্রীকে বলতেন, কবে এই মেয়ে বড় হয়ে একদিন আমার ষ্টুডিওর দরজা খুলবে সেদিনের প্রতীক্ষায় আমি আছি। মেয়ের মুখপানে চেয়ে সেদিন তাঁর দুচোখ জলে ভরে উঠতো। এই ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি মারা যান।

ইনি কে জানো? ইনি হচ্ছেন ইতালীর অমর কণ্ঠশিল্পী এনরিকো কেরুসো।

বাঁশবনের ছড়া

শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁশবনেতে হাওয়া লেগে, কাঁপে বাঁশের পাতা,
কাঠবেড়ালী তাইতো ভয়ে, লুকিয়ে ফেলে মাথা।
বুনো পাখির আরাম লাগে, ডাকে কিচির মিচির,
বাঁশবনেরি শুকনো পাতা পড়ছে ঝির ঝির।

হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া, শেয়াল বনে ডাকে,
ডাক শুনে সে শালিখ পাখি পালায় ঝাঁকে ঝাঁকে।
বাঁশবনেতে হাওয়া লেগে, দুলছে যত বাঁশ,
তাইতো ভয়ে পালায় ছুটে, শতেক বুনো হাঁস।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পরিমল গোস্বামী

৬

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পর্কে আরও কিছু খবর দেব প্রতিশ্রুত ছিলাম।

াপালদাকেই বলেছিলাম তাঁর নতুন গবেষণার প্রেরণা কি, ত। তিনি আমাকে যে চিঠিখানা দিয়েছেন তা এখানে করি।

বসু বিজ্ঞান মন্দির
কলিকাতা ৯
১৪. ১১. ৬১

াজনেষু,

রিমল বাবু, পিঁপড়ে নিয়ে অনেক দিন ধ'রে কাজ করছিলাম। ব বোস রিসার্চ ইনস্টিটুটের অধ্যক্ষ ডক্টর ডি এম বোস আমাকে া, অ্যামেরিকায় একটি নতুন জিনিস দেখা যাচ্ছে। পেনিসিলিন মাইসিন কারখানার পরিত্যক্ত ফেলে দেওয়া অংশ মুরগী ও খেয়ে ওজনে খুব ভারী হয়ে উঠছে। এই পরীক্ষা পিঁপড়েদের চালিয়ে দেখুন না, ও রকম কিছু হয় কি না। তদনুসারে দিনের চেষ্টায় পিঁপড়েদের পেনিসিলিন খাইয়ে দেখা গেল তাদের থেকে যে সব কর্মী পিঁপড়ে জন্মাচ্ছে তারা আকৃতিতে সাধারণ র চেয়ে ছোট হয়ে পড়ছে শতকরা প্রায় ৬০ ছোট। পিঁপড়ের ফল হল ঠিক বিপরীত! ঐ একই সময়ে পরিবেশ অনুযায়ী দৈহিক দল হয় কি না দেখবার জন্য বিভিন্ন কাঁচের ট্যাঙ্কে অনেকগুলি ; (Rana tigrina) রেখেছিলাম। একটি জলাধারে লিন মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পিঁপড়ের উপর পরীক্ষায় ত ফল না পাওয়াতেই ব্যাঙাচির উপর পরীক্ষার বাসনা হয়। শক পরে দেখা গেল যে-ট্যাঙ্কে পেনিসিলিন দেওয়া ছিল তার ার ব্যাঙাচিরা একই রকম আছে, হ্রাস-বৃদ্ধি কিছুই ঘটেনি। অন্যান্য ট্যাঙ্কের ব্যাঙাচিরা অধিকাংশই ব্যাঙাচিত্ব ঘুচিয়ে ব্যাঙ াছে এবং জলে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। তাদের অবশ্য বাইরে যাবার উপায় ছিল না।

ভাবতই কৌতূহল বেড়ে গেল। ব্যাপারটা কি? অপেক্ষা বসে রইলাম। আরও পনেরো দিন কেটে গেল—কিন্তু সিলিনের ব্যাঙাচির সেই একই অবস্থা, কোনো পরিবর্তন নেই।

ব্যাপারটা ভাল ক'রে বোঝবার জন্য আবার কয়েক ব্যাচ ব্যাঙাচি নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলাম। এবারেও ঐ একই ফল। অবশ্য পেনিসিলিনের ব্যাঙাচিও কয়েকটা ব্যাঙ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সংখ্যায় খুবই কম। কনট্রোলের (পেনিসিলিনহীন ট্যাঙ্কের) ব্যাঙাচি কিন্তু দশ থেকে কুড়ি দিনের মধ্যে সবই ব্যাঙ হয়ে গেল। এর মধ্যে উভয় ক্ষেত্রেই কিছু কিছু ব্যাঙাচি মারাও পড়েছিল। পেনিসিলিনের পরিমাণ ঠিক করতে অনেক পরীক্ষা করতে হয়েছিল।

অনেক বিদেশী বিজ্ঞানীই এই পরীক্ষাটি দেখতে এসেছেন। একজন বলেছিলেন ভাইটামিন বি-১২ দিয়ে দেখুন তো কি ফল হয়। তদনুযায়ী, আট মাস ধরে ব্যাঙাচি অবস্থাতেই আছে, এই রকম কতগুলি ব্যাঙাচির উপর ভাইটামিন বি-১২ প্রয়োগ করা হল এবং তার ফলে (বারো-তেরো দিন পরে) দেখা গেল দু' তিনটি বাদে সবাই ব্যাঙ হয়ে গেছে।

তার পর পাঁচ মাস থেকে আট মাস ধ'রে ব্যাঙাচি জীবন যাপন করছে এমন কতগুলির উপর থাইরক্সিন প্রয়োগ করা হল। দেখা গেল, অধিকাংশ ব্যাঙাচিই চার পাঁচদিনের মধ্যে ব্যাঙ হয়ে লাফাচ্ছে।

এ সব পরীক্ষা চলবার সময় ডক্টর চেন (পেনিসিলিনম্যান) একবার এখানে এসেছিলেন। তিনি সব কিছু দেখে বললেন, এই ব্যাপারটা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। কারণ পেনিসিলিন স্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ হয় সূক্ষ্ম জীবাণুর উপর। স্থূল প্রাণীর উপর এর ক্রিয়া কি ভাবে হয় বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা, আপনারা এর ইনটেসটিন্যাল ফ্লোরা নিয়ে পরীক্ষা করুন, হয় তো কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

কিছুদিন পরে এঁর নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষা আরম্ভ হল। সাদা জলের ব্যাঙাচি ও পেনিসিলিনের জলের ব্যাঙাচি উভয়েরই অন্ত্র কেটে বের করা হ'ল। ভিতরকার ফ্লোরা (অর্থাৎ মধ্যকার প্রাপ্ত বস্তু) কালচার করে পাওয়া গেল, সাদা জলের ব্যাঙাচির অন্ত্রে অন্তত দু রকমের কক্কাস জাতীয় জীবাণু আছে। এরা ভাইটামিন বি-১২ উৎপাদন করে। পেনিসিলিনের জলের ব্যাঙাচির অন্ত্রের মধ্যে সে রকমের কোনো জীবাণু পাওয়া গেল না। স্বভাবতই এ থেকে মনে হয় —ভাইটামিন বি-১২ই থাইরক্সিন উৎপাদনের পরোক্ষ কারণ। এই নিয়ে এখনও আবার পরীক্ষা করা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবার জন্য।

প্রসঙ্গত বলা দরকার পেনিসিলিনের মতো ষ্ট্রেপটোমাইসিন দিয়ে পরীক্ষা করেও প্রায় একই রকম ফল পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার দেখা গেছে এই যে, সম্পূর্ণ অনাহার বা অল্পাহারেও ব্যাঙাচিদের রূপান্তর গ্রহণের (অর্থাৎ ব্যাঙ হওয়ার) কাল যথেষ্ট বিলম্বিত হয়।

আরও কয়েকটি ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে। পেনিসিলিনের মাত্রার তারতম্যে নানা রকম দৈহিক বিকৃতি ঘটে। মাঝে মাঝে থাইরক্সিন প্রয়োগে তিনখানা মাত্র পা বেরিয়েছে, চতুর্থ পা আদৌ বেরোয়নি।

এই প্রসঙ্গে ২৮শে অক্টোবর (১৯৫৭) তারিখে হেগ থেকে রয়টার প্রচারিত যে খবরটি নিয়ে আপনি ২২শে ডিসেম্বর (১৯৫৭) তারিখের ইত্তেফাকে সচিত্র মন্তব্য করেছিলেন, সেই খবরটিও এখানে উদ্ধৃত করি—

FROGS WITH 20 LEGS FOUND

The Hague, Oct. 18—Scientists do not know whether radioactive waste was responsible for monstrons deformities in frogs found in an Amsterdam ditch, the Dutch Minister of Health said here today.

The Minister confirmed in Parliament today that deformed frogs—with upto 20 legs—had been found in the ditch, which was, used as a dumping ground for nuclear waste by the Amsterdam nuclear institute.

But in a carefully worded reply to a question, he said that "one could not decide with certainty in the present state of scientific knowledge whether a direct relationship" existed between these two facts —Reuter

দেখা যাচ্ছে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রতিক্রিয়াতেও নবজাতদের দৈহিক বিকৃতি ঘটছে। উভয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে কি না তা বহু পরীক্ষায় নির্ধারিত না হলে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত ভাবে কিছু বলেন না, যদিও ব্যাপারটিতে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। আমাদের পরীক্ষায় থাইরক্সিনে ৩টি ঘটল।

থাইরক্সিনের ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, এ জিনিসটির ক্ষরণ বা secretion না হলে, অথবা অভাব ঘটলে মোটেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুস্থ বৃদ্ধি ঘটে না, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথক হয় না, differentiation ঘটে না। এটা বহু পূর্ব থেকেই জানা আছে। থাইরক্সিন একটি হরমোন। এবং বি-১২ হচ্ছে ভাইটামিন। এ দুটি রাসায়নিক ভাবে পৃথক, অথচ ব্যাঙাচির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপায়ণে এদের একই ক্রিয়া, শুধু সময়ের কিছু ব্যবধান মাত্র। এর অর্থ কি? ইনটেনসিভ্যাল জোরার আরও পরীক্ষা থেকে এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছানো যেতে পারে।

এখানে আর একটা বলা দরকার। থাইরক্সিনের সাহায্যে অকালে, অর্থাৎ স্বাভাবিক differentiation বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পৃথক চেহারা পাওয়ার আগে, থাইরক্সিন প্রয়োগে রূপান্তর ঘটানো যায়, কিন্তু ব্যাঙাচির চার পা বেরোলেও তারা দু' তিন দিনের বেশি বাঁচে না। কিন্তু ব্যাঙাচিদের অপরিণত অবস্থায়—অর্থাৎ ডিম থেকে বের হবার পাঁচ-সাত দিন পরে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করলে এবং পাঁচ-ছয় মাস পরে থাইরক্সিন প্রয়োগ করলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাদের চার পা বেরিয়েছে সত্য, কিন্তু ল্যাজ লোপ পায়নি, বরং চার পা ও ল্যাজ নিয়েই তারা জলের নিচে জল-টিকটিকির মতো ঘুরে বেড়ায়। আবার তাদের আর সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন ঘটলেও অন্ত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ব্যাঙাচি অবস্থায় অন্ত্র যেমন ছিল তেমনি থেকে যায়। এমন অবস্থায় কেজীন ও ভাইটামিন বি-১২ খাইয়ে প্রায় এক মাস পর্যন্ত ল্যাজওয়ালা ব্যাঙ (অর্থাৎ ল্যাজ অথচ পুরো ব্যাঙ) হিসাবেই জীবিত রাখা সম্ভব হয়েছে।

এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন আছে। সেটি এই যে, অভিব্যক্তির ফলে যে সব পরিবর্তন স্থায়ী ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, এক প্রাণী ধীরে ধীরে অন্য প্রাণীর আকৃতি নেয়, এ ক্ষেত্রেও সেই রকম কিছু হয় কি না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রায় অনুরূপ একটি জীবের কথা বলা যায়।

মেক্সিকোতে আকসোলট্‌ল (Axolotl) নামে এক রকম জলচর প্রাণী দেখা যায় (একটি হ্রদের জলে)। বহুদিন যাবৎ জীব-বিজ্ঞানীদের মধ্যে ধারণা ছিল এটি একটি বিশেষ ধরনের প্রাণী। কিন্তু একবার সামান্য পরিমাণ থাইরক্সিন প্রয়োগে দিন কয়েকের মধ্যেই দেখা গেল সেটি স্থলচর স্যালামাণ্ডারে (land salamander) পরিবর্তিত হয়েছে। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এরা 'লারভা' বা শূক অবস্থাতেই বংশ বৃদ্ধি করে আসছে। ইতি—

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

এই চিঠিখানা থেকে জৈব বিজ্ঞানের কণিকামাত্র স্বাদ পাওয়া যাবে। প্রকৃতিতে কখন কি অবস্থায় কিসের ছোঁয়া লেগে এক একটা প্রাণী অন্য প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং কেন অনেকে যেমন-যেমন ছিল তেমনি আছে অথবা কি ভাবে জড় পদার্থ জৈব পদার্থে রূপান্তরিত হল এ সব প্রশ্নের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা, এই জগতে যাঁরা প্রবেশ করেছেন তাঁরা এই নিয়ে মেতে আছেন, এবং আমরা এ জগতের বাইরে থেকেও যে খুব দুঃখে আছি মনে হয় না। বাইরের জগতেও বহু প্রশ্নোত্তর আছে। অবশ্য প্রশ্ন বেশি, এবং উত্তর কম ঠিক ঐ সব বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত জগতের মতোই। তাঁদের প্রশ্নের নমুনা কিছু দেওয়া গেল এই উপলক্ষে। আমাদের বাইরের জগতে বহু প্রশ্নের সঙ্গে আমরা প্রতিদিন পরিচিত। আপাতত আমাদের প্রধান প্রশ্ন দৈনন্দিন জিনিসের দাম কমবে কবে, এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রেরা আমাদের সীমানা বেদখল করছে কেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

১৯৪৭এর মাঝামাঝি সময়ে গোপালদার কাছ থেকে জানা গেল, তাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান প্রচারের জন্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রেরণায় একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আয়োজন করছেন, এবং আমাকেও তার মধ্যে থাকতে হবে। এই আয়োজনের সব চেয়ে উৎসাহী কর্মী ডক্টর সুবোধনাথ বাগচী। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুকে পুরোধা ক'রেই এই প্রতিষ্ঠান গড়া হবে। এঁদের দলে সবাই

বিজ্ঞানী, এবং উচ্চস্তরের বিজ্ঞানী। আমার পূর্ব পরিচিত ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ীও একজন উৎসাহী কর্মী। সবাই বিজ্ঞানের সেবক, তার মধ্যে আমি অনধিকার প্রবেশ করব এ কথা ভেবে সঙ্কুচিত হয়েছিলাম। কিন্তু গোপালদা ভরসা দিলেন। শেষে ভেবে দেখলাম বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিজ্ঞানের না হলেও বাংলা ভাষার পক্ষ নিয়ে হয়তো কিছু কাজ করতে পারব, অতএব গোপালদার কথায় সহজেই প্রলুব্ধ হলাম। তাঁর হাতে বিজ্ঞান সমর্থিত কোনো বশীকরণ কবচ বাঁধা ছিল কি না জানি না।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয় ১৮ই অক্টোবর ১১৪৭ তারিখে। সভা হয় সাকুলার রোডের বিজ্ঞান কলেজে। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু সভাপতিত্ব করেন। সভাতে "বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ" এই নামটি গ্রহণ করা হয়, এবং ঘোষণা করা হয় ১৩৪৮ সালের ২৫শে জানুয়ারি তারিখে এই প্রতিষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপিত হবে। যে যে উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপিত হবে তা লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পরবর্তী আবেদন-পত্রে তা ছাপা হয়ে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়।

এই উপলক্ষে যে সার্কুলারটি ছাপা হয়েছিল সেটি এই—

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

১২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১

বর্তমান জগতে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই আমাদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হচ্ছে, অথচ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদীক্ষা এমন ভাবে চালিত হচ্ছে না যাতে আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্ভার জীবনের দৈনন্দিন কাজে সুচিন্তিত ভাবে ব্যবহার করতে পারি। এর প্রধান অন্তরায় ছিল বিদেশী ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা। আজ ভারতে নব পটভূমিকার সৃষ্টি হয়েছে—চারিদিকে নতুন আশা ও আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। এই নতুন পরিবেশে জীবনকে সমগ্রভাবে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে এই প্রধান বাধা দূর ক'রে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের বহুল প্রচার ও প্রসার দ্বারা তাঁদের সহজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বিজ্ঞানীদেরই।

গত ১৮ই অক্টোবর (১১৫৭) অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুপ্রেরণায়, এই প্রচেষ্টার প্রথম সোপান হিসাবে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' স্থাপনা করবার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পরিষদের উদ্দেশ্য প্রথমতঃ জনগণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।

দ্বিতীয়তঃ স্কুল ও কলেজের পাঠ্যবস্তু সহজ ও সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক যথাযথতা অক্ষুণ্ণ রেখে বিভিন্ন পরিবেশে সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক ক'রে প্রকাশ করা।

তৃতীয়তঃ স্কুল ও কলেজের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তক, বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু সংক্রান্ত প্রমাণ্য গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ করা।

চতুর্থতঃ লোকসাহিত্য ও শিশুসাহিত্য সর্বপ্রকারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধিশালী ক'রে তোলা।

পঞ্চমতঃ বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য ও তার পথের বাধাবিপত্তি দূর করবার জন্য বাৎসরিক সম্মিলন আহ্বান করা এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষামূলক অথচ জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর প্রদর্শনী ও তৎসংক্রান্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা করা।

আমাদের স্বল্প ক্ষমতার কথা জেনেও আমরা আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এগিয়ে এসেছি এই গুরু দায়িত্ব বহন করবার জন্য। সুধীবৃন্দের সহানুভূতি, সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা পেলেই এই জাতীয় কর্তব্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আমাদের একান্ত বিশ্বাস এ বিষয়ে আমরা সবারই অকৃপণ সাহায্য পাব। বিশেষতঃ আমরা আশা করি কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য, কারণ আমরা সবাই এই মহান্ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের ছাত্র বা শিক্ষক। আমরা আশা করি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহযোগিতা। আমরা আশা করি বিশ্বভারতীর সহানুভূতি, কারণ আমাদের প্রধান অগ্রণীর (সত্যেন্দ্রনাথ বসুর) হাতেই রবীন্দ্রনাথ তুলে দিয়েছিলেন তাঁর প্রথম বিজ্ঞানের বই 'বিশ্বপরিচয়।'

আমাদের সঙ্কল্পকে রূপদান করবার জন্য স্থির হয়েছে আগামী ২৫শে জানুয়ারি, ১১৪৮ এই প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক ক্রমে স্থাপনা হবে। সুধীবৃন্দের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ, এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাঁদা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের মূল সভ্য হয়ে তাঁরা যেন এই অধিবেশনে যোগ দেন এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতায় আমাদের উদ্দেশ্য সফল করে তোলেন।

নাম ও ঠিকানা সহ চাঁদা (বাৎসরিক ১০ টাকা) পাঠাবার স্থান: ডঃ সুবোধনাথ বাগচী, কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ১২ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা ১।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু	দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
সুবোধনাথ বাগচী	গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
জগন্নাথ গুপ্ত	পরিমল গোস্বামী
জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী	অমিয়কুমার ঘোষ
সর্বাণীসহায় গুহ সরকার	সুধাময় মুখোপাধ্যায়
সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
সুনীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী	বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

যতদূর মনে মনে পড়ে, এই প্রচারপত্রটি ডঃ সুবোধনাথ বাগচী রচনা করেছিলেন। ১৮ই অক্টোবর (১১৪৭) যে প্রাথমিক সভা হয় তাতে নিম্নলিখিতরূপ কমিটি গঠিত হয়—

সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কর্মসচিব ডক্টর সুবোধনাথ বাগচী, যুগ্ম-কর্মসচিব শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত।

সদস্যবর্গ: ডক্টর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ-সরকার, ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, পরিমল গোস্বামী ও শ্রীসুধাময় মুখোপাধ্যায়।

পরিষদ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগে আমাদের সাপ্তাহিক অধিবেশন বসত। প্রতি শুক্রবার। তারপর ২৫শে জানুয়ারির (১১৪৮) পর ৩০শে জানুয়ারি (১১৪৮) শুক্রবার বিজ্ঞান কলেজে যথারীতি আমাদের অধিবেশন বসেছে, এমন সময় তখন সন্ধ্যা প্রায় ৫॥টা, কে একজন খুব উত্তেজিত ভাবে এসে খবর দিলেন গান্ধীজি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। এ খবরে হঠাৎ যেন সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অবিশ্বাস্য কথা। গুজব নয় তো? সভা আর চলল না। সবাই বেরিয়ে এলাম। নীরবে। আমি কৈলাস বসু স্ট্রীটে প্রবেশ করতেই শুনতে পেলাম সবার মুখে ঐ একই কথা। মনে কেবলই এক প্রশ্ন, এর পর কি?

মনে হল যেন গোটা ভারতবর্ষকেই কে যেন গুলিবিদ্ধ করে মেরে ফেলেছে। এমন শত্রু কে ছিল গান্ধীজির? একেবারে মেরে ফেলতে হল!

তারপর রেডিওতে শুনলাম সব। সন্ধ্যা পাঁচটায় গান্ধীজি আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন।...

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ইতিমধ্যে আরও অনেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানসেবীর সহযোগিতা লাভ করেছে এবং একটি বিশিষ্ট সভারূপে সমগ্র রাজ্যে পরিচিত হয়েছে। এরপর ২১শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) তারিখে বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়নের প্রশস্ত বক্তৃতাগৃহে যে বৃহৎ অধিবেশন বসে তার খবর ২৫শে ফেব্রুয়ারির যুগান্তরে এই ভাবে বেরিয়েছিল—

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪॥টায় সায়েন্স কলেজের ফলিত রসায়নের বক্তৃতাগৃহে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। বাঙলার প্রায় দুই শত বিজ্ঞান অনুরাগী ও সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতির নির্দেশে সমবেত সভ্যগণ এক মিনিট নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অতঃপর পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে কর্ম-সচিব সমাগত সভ্যদিগকে অভ্যর্থনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কোষাধ্যক্ষমণ্ডলী আয়ব্যয়ের হিসাব দাখিল করেন। ভবিষ্যকালের জন্য গৃহীত পরিষদের নিয়মাবলীর খসড়াটি বিবেচনা ও সংশোধনের জন্য অধ্যক্ষ পঞ্চানন নিয়োগীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। তাহার পর বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার শতাধিক ব্যক্তি লইয়া একটি মন্ত্রণাপরিষদ ও কার্যকর সমিতি গঠিত হয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসকে পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্বাচন করা হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্যকর সমিতির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন :—

সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, সহকারী সভাপতি—শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যচরণ লাহা ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মিত্র। কর্ম-সচিব—শ্রীসুবোধনাথ বাগচী, সহকারী কর্ম-সচিব—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত।

সদস্য : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীপরিমল গোস্বামী, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, শ্রীসুকুমার বসু, শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীজীবনময় রায়, শ্রীসত্যব্রত সেন, শ্রীসুনীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

অমৃতবাজার পত্রিকা (২৪-২-৪৮) এই প্রসঙ্গে অতিরিক্ত খবর আরও দিয়েছেন—উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—অধ্যক্ষ পঞ্চানন নিয়োগী, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডক্টর বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বীরেশচন্দ্র গুহ, অধ্যক্ষ জিতেন্দ্রমোহন সেন, ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী, ডক্টর কানাইলাল... রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, শ্রীঅমূল্য গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য, ডক্টর কুমুদবিহারী সেন, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র সেনগুপ্ত, জনাব আমীর হোসেন চৌধুরী ও অন্যান্য।

আজ ১২ই ডিসেম্বর ১৯৬১ তারিখে পুরনো দিনের এই সব খবর লিখছি, আজই কাগজে দেখলাম রাইটার্স বিল্ডিঙে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (বর্তমানে জাতীয় অধ্যাপক) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রস্তাবিত ভবন নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি সাক্ষাৎ করেছেন।

চোদ্দ বছর পরে

প্রায় চোদ্দ বছর পরে বিজ্ঞান পরিষদ নিজস্ব স্থায়ী একটি ভবন নির্মাণের কল্পনা রূপায়িত করতে চলেছে, এটি অবশ্য সুসংবাদ। অনেক আগেই হতে পারত, কিন্তু এদেশে বিজ্ঞানের ন্যূনতম জ্ঞানের প্রসার ব্যবস্থা কিছুই ছিল না, কারো মনে কৌতূহলও নেই, এর জন্য কোনো দাবীও নেই। সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে কৌতূহল জাগাবার ব্যবস্থা এদেশে হতে অনেক দেরি আছে। কোনও কৌতূহলী ছাত্র ঘরে বসে পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন বিষয়ে কিছু কিছু প্রাথমিক পরীক্ষা করতে চাইলে সে ইচ্ছা তার পূরণ হবে না। সে এখন সম্পূর্ণ নিরুপায়। আগে বাজারে ছোট ছোট ল্যাবরেটরি কিনতে পাওয়া যেত। পাঁচ টাকা, দশ টাকা, পঁচিশ টাকা বা আরও বেশি দামে তৈরি প্রাথমিক পরীক্ষার ল্যাবরেটরি। যদিও কজন এদেশী ছাত্র তা কিনেছে তা আমার অজ্ঞাত।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম প্রচারপত্রে যে সব উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছিল, তার কোনোটাই আজও সম্পূর্ণ সার্থক হতে পারেনি, এমন কি আংশিক সার্থকতাও লাভ করেনি। এ দেশে বিজ্ঞান প্রচার, বিশেষ ক'রে সাধারণের মধ্যে, অথবা তাদের মধ্যে বিজ্ঞানের মনোভাব গড়ে তোলা, এ সব মনে হয় প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে পরিষদের পক্ষ থেকে আরও একটি সংখ্যা যোগ করা উচিত ছিল। সে হচ্ছে এদেশের শিক্ষাবিভাগে যে সব জ্ঞানবিজ্ঞানের বই প্রচলিত আছে এবং ছাত্ররা যে সব বই পড়তে বাধ্য হয়, সেই বই সম্বন্ধে খবরদারি করা, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন শিক্ষা বিভাগের পথে পথে চৌকিদারি করা।

এ কথা বলছি এই কারণে যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (১৯৪৮) প্রতিষ্ঠিত হবার ঠিক ১ বছর পরে, ১৯৫৮ সালে, দায়ে পড়ে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কিছুদিন এ কাজ করতে হয়েছিল। আমি সামান্য চেষ্টাতে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে অতি মারাত্মক একটি চেহারা দেখেছিলাম তা আজও ভাবলে আতঙ্কিত হয়ে উঠি।

আমি কয়েকখানি অনুমোদিত এবং বহু সংস্করণের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত ছ একখানা বই থেকে তার কিছু নমুনা উদ্ধৃত করছি। একখানা বইয়ের পরিচয় স্বরূপ লেখক নিজে লিখে দিয়েছেন, "পশ্চিম বাংলার যে কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় একমাত্র নির্ভরশীল পুস্তক।" বইখানা তখন ২৭৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ছিল এবং তার নবম সংস্করণ চলছিল।

১। স্বাভাবিক অবস্থায় একজন সুস্থ মানুষ মিনিটে ১ থেকে ১৮ বার নিশ্বাস নেয়।

২। নিশ্বাসের সঙ্গে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি তা ফুসফুসের সাহায্যে রক্তের সঙ্গে মিশে যায় এবং শরীর থেকে অক্সিজেন বাহিত ক্ষতিকর যবক্ষারযান ফুসফুসের সাহায্যেই বের করে দেয়।

৩। একটি স্নেহপোষক কার্বন-হাইড্রেট।

৪। আবহাওয়া মন্দির থেকে যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্প সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেশময় প্রচারিত হয়। 'পূর্বভাষ' কথাটির পাশে ইংরেজীতে (forecast) কথাটিও দেওয়া আছে।

আর একখানি বহু বিজ্ঞাপিত এবং চতুর্দশ সংস্করণের গৌরবপ্রাপ্ত (১৯৫৮) বই থেকে কিছু নমুনা উদ্ধৃত করি।

১। চিল শকুন প্রভৃতি পাখীরা পাখনা না নেড়ে কি করে আকাশে উড়ে বেড়ায় ? ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, ঐ সমস্ত পাখীর সাধারণতঃ যে উচ্চস্তরে উড়ে বেড়ায়, সেখানে বায়ুর চাপ খুব বেশি, দ্বিতীয়ত ওদের ডানাও খুব মজবুত। ওরা তাই সেখানে পৌঁছয় শুধু হাওয়ায় ভর করে, পাখা দুটো মেলেই হাওয়ার ঢেউয়ে ভেসে বেড়ায়।

এই সময়েই প্রচলিত অন্য একখানি বইতে আরও একটি নতুন জ্ঞান পরিবেশন করা হয়েছে—আকাশে উঠে পাখীদের সর্বদা ডানা নাড়তে হয়, নইলে নিচে পড়ে যায়।

পূর্ব বইখানায় সমুদ্রের নিচের হাজার হাজার মাইলের নিচে অবস্থিত জীবদের খবর দেওয়া হয়েছে। এ রকম অদ্ভুত বিজ্ঞানের খবরে ভরা এ সব বই সমস্ত বাংলা দেশকে শেখাবার ভার নিয়েছে, এবং এই বই হারভার্ড ও বার্লিনের বিজ্ঞানের উপাধিধারী অধ্যাপক পড়ে, ভূমিকায় বলছেন এমন উৎকৃষ্ট বই আর হয় না, তিনি নিজে এ বই পড়ে এ কথা বলছেন। এমনি অবস্থায় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য সফল হতে অনেক দেরি হবে। আমি একা চৌকিদারির যেটুকু চেষ্টা করেছি তা অতি সামান্য।

বিজ্ঞান পরিষদেরই এই ভার নেওয়া দরকার। পরিষদ এ জন্য প্রথমত আক্রমণমূলক অভিযান চালান। এবং যে পাঠ্যপুস্তকে প্রাণীবিশেষের পরিচয়ে "ইহাদের মাথা সম্মুখ দিকেই অবস্থিত" লেখা থাকে সে জাতীয় বই নিয়ে দেশে তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলুন। এমন কি পরিষদে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ কর্মীদের মুখে, "বিজ্ঞান শিক্ষায় ভাঁড়ামি চলবে না চলবে না" ধ্বনি দিয়ে তাদের পথে বার করারও আমি পক্ষপাতী। এবং "সাধারণ জ্ঞান" নামক শিক্ষার বীভৎস বিকার অবিলম্বে শিক্ষাবিভাগ থেকে বাতিল করার দাবী তোলা হোক, এই আমার ইচ্ছা।

এতক্ষণ অনধিকারীর হাতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রশ্রয় এবং প্রশ্রয়দাতাদের কথা বলা হল। কিন্তু বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের সদিচ্ছার বারো বছর পরেও অনেক বিজ্ঞানশিক্ষকদের মধ্যেও বিজ্ঞানের মনোভাব গড়ে ওঠেনি এও প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে বলছি। কিছুদিন আগে রেডিওতে "বিজ্ঞানের জয়যাত্রা" পর্যায়ের কতগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল, তার অনেকগুলি আমি শুনেছি। বক্তাদের মধ্যে "ডক্টরেট" ছিলেন অনেকে তাঁদের কারো কারো মুখে একই নিশ্বাসে পারমাণবিক এবং আণবিক—এই দুটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হতে শুনেছি।

বিজ্ঞানের শিক্ষার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহুদিন ধরে অ্যাটম ও মোলিকিউল—এই দুটি নাম মৌলিক পদার্থের আদিতম গঠন উপাদানের সম্পর্কে প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের পরিচয়রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই দুটি মূল বস্তুসত্তার বাংলা নাম পরমাণু ও অণু। এ নাম বদলের প্রশ্ন ওঠেনি। পরমাণু যে কোনো বস্তুর সূক্ষ্মতম উপাদান, এবং যে উপাদানের ঊর্ধ্বে আর কোনো বস্তুসত্তার অস্তিত্ব নেই। পরমাণুর অবশ্য নিজের একটি গঠন-বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থাৎ তার একটি কেন্দ্র আছে এবং তার চতুর্দিকে ঘূর্ণমান এক বা একাধিক কণিকা আছে যার নাম ইলেকট্রন। এই পরমাণু, অ্যাটমের প্রতিশব্দরূপে বাংলা ভাষায় বহুদিন স্বীকৃত। এবং মোলিকিউলের বাংলা অণু। সুতরাং ইংরেজীতে যেমন অ্যাটম বম এবং মোলিকিউল বম নামক দুটি শব্দ নষ্ট, কেন না অ্যাটম বম কখনও মোলিকিউল বম হতে পারে না, তেমনি বাংলাতেও পরমাণু বোমা কখনও অণু বোমা বা আণবিক বোমা হতে পারে না। বিজ্ঞানে যার সামান্য জ্ঞান আছে সেও ঐ দুটি কথা যে এক অর্থে ব্যবহৃত হয় না, তা জানে। কিন্তু দেশে অনেক বিজ্ঞানশিক্ষিত ডক্টরেট'ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব নেই, সেজন্য তাঁরা ও দুটি একই অর্থে একই নিশ্বাসে ব্যবহার করতে বিবেকের কোনো বাধা অনুভব করেন না।

এইখানেই বিজ্ঞান পরিষদের ব্যর্থতা। অবশ্য আপাত ব্যর্থতা। এ দেশকে বিজ্ঞান শেখানো খুবই কঠিন হয়ে উঠছে। কঠিন আরও এ জন্য যে, এই সব ভুল প্রচারের পিছনে রয়েছে শিক্ষা বিভাগ অথবা সরকারী অন্য প্রতিষ্ঠান। যেমন ১১ই অক্টোবর, ১৯৫৯ বেতারে একটি প্রচারমূলক নাটিকার একটি বালক-চরিত্র জগদীশচন্দ্র বসুর নাম শুনেছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে বলল—শুনেছে। তিনি গাছের প্রাণ আছে আবিষ্কার করেছিলেন। এ উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তা খুশি হয়ে তাকে একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে নিলেন।

এই ভুল তথ্য প্রচার নিয়ে একটুখানি খোঁচা দিতে গিয়ে দেশের ছোট বড়, ছাত্র-অছাত্র বিজ্ঞানের ছাত্র, অনেক আমাকে আক্রমণ করলেন। অর্থাৎ জগদীশচন্দ্র যদি গাছের প্রাণ আবিষ্কার না করে থাকেন তবে কে করেছেন ?

মিথ্যা তথ্য দেশের মধ্যে কি ভাবে প্রচারিত হয়েছে, এ থেকে তা বোঝা যাবে। আক্রমণকারীদের ভুল বিশ্বাস ছাড়ানো ভয়ানক শক্ত। আমি খুব ঘোরা পথ অবলম্বন করেছিলাম কৌতুক সৃষ্টির জন্য। তাতে আরও জটিলতা বেড়েছিল। শেষে ডক্টর তারকমোহন দাস একটি প্রবন্ধ পাঠালেন আমাকে, তাতে অত্যন্ত সরল ভাষায় গোড়াতেই বললেন, জগদীশচন্দ্র বসু গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেননি। সে চেষ্টাও তিনি করেননি, ইত্যাদি।

এই প্রবন্ধ পড়ার পর পাঠকেরা কিছু শান্ত হলেন। এ সব মজার কাহিনী ইতস্ততঃতে বেরিয়েছিল ১৯৫৯-এর ২৫শে অক্টোবর থেকে।

তাই আমার মনে হয়, বিজ্ঞান পরিষদ বাংলা ভাষায় (জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার সাহায্যে) যেটুকু বিজ্ঞান প্রচার করছেন তার সঙ্গে তাঁদের আরও একটা বিভাগ খোলা উচিত। সে বিভাগটি, করপোরেশনের বাসের অযোগ্য বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে ফেলার জন্য যে একটি সক্রিয় বিভাগ আছে, তার মতো হবে। দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট এই সব মিথ্যা জ্ঞানের বিপজ্জনক যন্ত্রগুলি তাঁরা ভাঙবার ব্যবস্থা করুন। এবং আমি আবার বলছি, "সাধারণ জ্ঞান" জাতীয় অপাঠ্য অস্পৃশ্য অপ্রয়োজনীয় এবং সর্বক্ষেত্রে ক্ষতিকর সব বই শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অবিলম্বে বিদায় করা দরকার, নইলে বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য আরও বহুকাল অসিদ্ধ থেকে যাবে।

আবার ভাগলপুরে—বিজয়রত্ন বসুর সঙ্গে

১৯৪৮, ২৮শে এপ্রিল। কিছুদিন সর্দিজ্বরে ভুগছিলাম। সামান্য জ্বর গায়ে লেগেই থাকত, এবং তাকে অগ্রাহ্য করেই চলছিলাম।

এমন সময় উপরে উল্লেখিত ২৮শে এপ্রিল তারিখে সকাল নটার সময় ভাগলপুরের বিজয়রত্ন বসু (রায় সাহেব) এসে হাজির। তিনি ছিলেন ভাগলপুর জলকলের সুপারিনটেনডেণ্ট। অদ্ভুত চরিত্র, অদ্ভুত সদাশয়তা। এঁর চরিত্রের কমিক দিকটা আমি স্মৃতিচিত্রণে বিস্তারিত বলেছি। ইনি অন্যের হিতার্থে কিছু করবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, এবং কাজ হোক না হোক, ব্যস্ততাটাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠত, এবং তার সঙ্গে তাঁর আন্তরিকতা।

তিনি কলকাতা এলে আমার সঙ্গে দেখা করতেন। সেদিন আমার ঐ রকম অসুস্থ অবস্থা দেখেই বললেন, ভাগলপুর চলুন, আমি আজই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি, রাত্রে যাব।

আমি বাধা দিতে যাচ্ছিলাম এবং তাঁকে বলছিলাম নানাবিধ কারণে এখন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি তখন ম্যাট্রিকুলেশনের পরীক্ষক, কয়েক দিন পরেই খাতা নিয়ে বসে যেতে হবে এবং সেইটিই সবচেয়ে বড় বাধা।

কিন্তু বিজয়দার চরিত্রের কথা আগেই বলেছি, তিনি ব্যস্ত হতে পারলে আর কিছুই চান না এবং ব্যস্ত হওয়ার কোনো সুযোগই ছাড়েন না। তাই আমি আমার না যাওয়ার সমর্থনে যতগুলো কথা বলছিলাম, সে সব কথাকে ঢেকে তার উপরে নিজের কথাগুলি তিনি তাঁর কণ্ঠ আমার কণ্ঠের চতুর্গুণ চড়িয়ে সুপার-ইম্পোজ ক'রে যাচ্ছিলেন। কাজেই আমার কথা তাঁর কানে একটিও প্রবেশ করেনি, এবং কোনোমতেই করবার উপায় ছিল না। অবশেষে আমি ক্লান্ত হয়ে তাঁর কথায় রাজি হলাম। তাঁর গলার জোর ছিল অনেক বেশি এবং তাতে সেদিন পাড়ার লোক আকৃষ্ট হয়েছিল।

তাঁর কথা শেষ হলে অবশেষে আমি সামান্য একটা শর্ত আরোপ করলাম। বললাম, আপনার কথায় রাজি হয়েছি শুধু একটা কথা ভেবে, আমার ভাগলপুরে উপস্থিতির কথা বলাই (বনফুল) যেন কোনোমতেই টের না পায়। টের পেলে আপনার ওখানে আমার থাকা হবে না, এবং ভাগলপুর গেলে সেখানে এখানকার মতো অবসরহীন মুহূর্তগুলির ঠিক বিপরীত অবস্থা পেতে চাই। মানে, কয়েকদিন সম্পূর্ণ চুপচাপ পড়ে পড়ে ঘুমোতে চাই। আপনার বাড়িটি শহর থেকে দূরে এবং গঙ্গার পাড়ের উপর, অতএব যদি কেউ টের না পায় তা হলে আমি যা চাই তা পেতে আমার আর কোনোই বাধা নেই। আপনি সারাদিন কলের কাছে থাকেন, আমি সারাদিন জলের কাছে থাকব। ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে চলমান নদী আর নৌকো ষ্টীমার দেখব, অথবা ঘুমোব।

বিজয়দা আমার কথা শেষ হবার বহু আগেই সমস্ত শর্তে খুব জোরের সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। বললেন নটার সময় তৈরি থাকবেন, আপনাকে তুলে নিয়ে যাব শিয়ালদ'ষ্টেশনে।

এ পর্যন্ত তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন। তার পর যা যা হল, সে এক পৃথক কাহিনী। [ক্রমশঃ।

সেদিনের রামধনু দেখে

[ওয়ার্ডসওয়ার্থের My Heart Leaps Up When I Behold

কবিতা পড়ার পর]

রামধনু দেখে কেন মন আমার খুসি হয়ে ওঠে,
প্রথম যেদিন আমি পৃথিবীর আলো-মাটি-মন
দুচোখে দেখেছি ; সেদিনও কি আকাশের রাঙা ঐ ঠোঁটে,
রামধনু উঠেছিল একফালি হাসির মতন।

হাঁটি-হাঁটি পা-পা সেই শিশু বড় হয়ে গেছি,
আজ-কাল-পরশুকে পার হয়ে পৃথিবীর মত বড়ি হব।
তারপর একদিন চলে যাব কবরে মাটির কাছাকাছি,
সেখানেও আকাশেতে চোখ তুলে আমি রোজ রামধনু দেখব।

রামধনুরেখা তুমি গল্প হয়ে—বাঁচ চিরকাল,
দিন-মাস-বছর পেরিয়ে শিশুরা শিশুর পিতা হবে।
আর আমার দিনগুলো ফুল হয়ে ফুটেছে রঙিন,
তোমরা তার মালা গেঁথে প্রকৃতির নৈবেদ্য সাজাবে।

অনুবাদক—শ্রীজয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুধ্যান

বিদ্যুৎকুমার দে রায়

সুষুপ্ত মনের পটে ছায়াহীন সমুদ্রের পাশে
তাল সুপারির ছায়া ক্লান্তির সুষমা মেখে দেহে
আকাশে মুহ্যমান অথবা সে নিথর আবেগে
বিগলিত পৃথিবীরে ক্ষমা করে ফিরেছে সন্দেহে।

মাধুর্য মাখানো ছিল বাতাসের অণুতে অণুতে
কোনো গোপনের মন্ত্র অবিচ্ছেদ্য কামনার পাশে ;
মুহ্যমান হয়ে কাঁদে বিচিত্র স্বপ্নের লক্ষ্য নিয়ে
দুপুরের মিঠামনে ক্রন্দসী মেয়ের মুখ ভাসে।

বুভুক্ষু অনামী গন্ধ সুবিস্তৃত ঐশ্বর্যের কূলে
বিকৃত চিত্তের রূপে স্থাপিত হয়েছে নবমেঘ ;
বর্ণগন্ধ রূপ রসে সঞ্চিত রয়েছে অনুভূতি
জেগে ওঠে সুষুপ্তির অন্তরের সহস্র আবেগ।

অবজ্ঞাত সংবাদের তির্যক রশ্মির অন্ধকার
ঘুরেছে মনের ক্ষুধা রাত্রির গভীর প্রান্তদেশে,
উদ্‌ভ্রান্ত সূর্যের মত বরষার সুতীব্র স্বননে
কোনো প্রশান্তির ঢেউ নৈর্ব্যক্তিক হয়েছে আবেশে।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

কে তুমি আমায় ডাকো

সতীদেবী মুখোপাধ্যায়

অফিস থেকে ফিরে টাইয়ের ফাঁস আলগা করতে করতে নিজের ঘরে প্রবেশ করবার মুখে টেলিফোনটা বেজে উঠতে বিরক্তিতে জয়ন্তর মুখ কুঁচকে উঠলো। রিসিভার তুলে হ্যালো বলবার সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তির স্থলে বিস্ময় ফুটে উঠলো। ওধার থেকে মিষ্টি মেয়েলি কণ্ঠে প্রশ্ন হোল, জয়বাবু আছেন?

জয়ন্তকে অনেকে জয় বলে ডাকেন। তাই জয়ন্ত আমতা আমতা করে বললে—আমি জয় কথা বলছি।

খিল খিল করে হেসে মেয়েটি বললে—চিনতে পারছেন না তো? আচ্ছা, লক্ষ্ণৌয়ের পেন-ফ্রেণ্ডকে মনে আছে নিশ্চয়? আমি সুজাতা কথা বলছি। ক'দিন হোল কলকাতায় এসেছি। বাবার একটা কেস আছে ক'লকাতার হাইকোর্টে, তাই আমরাও চলে এলুম। ভাগ্যি আপনি আপনার শেষের চিঠিতে আপনার ফোন নম্বর দিয়েছিলেন।

জয়ন্ত এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে নম্বর ভুল হয়েছে, কিন্তু নামের মিলের জন্তে গোড়াতেই ভুল শোধরানো সম্ভব হয়নি। একটু থেমে মেয়েটি আবার বলে, কিন্তু এই দেখুন না, আপনার নম্বর লিখে আনতে ভুলে গেছি, তবে মনে আছে ঠিক—48-3785. জয়ন্ত বুঝলে, ডায়াল করবার সময় 48-এর স্থলে 47 হয়ে এই বিপত্তি।

জয়ন্ত বললে—তা একটু অবাক হয়েছি, সেটা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। আপনার কণ্ঠস্বর শোনার সৌভাগ্য যে আমার হবে, এ ধারণা আমার কোনদিন ছিল না।

—কোন নম্বর দিলে এ সৌভাগ্য ধারণার বাইরে হবে কেন?

জয়ন্ত হেসে বললে—আপনি যদি উকিল হন তাহলে জবরদস্ত

সুজাতা হাসতে হাসতে বললে—আমি উকিল না হলেও রীতিমত বাঘা ব্যারিষ্টারের মেয়ে, সে কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন?

একটু ইতস্তত করে জয়ন্ত বললে—হঠাৎ লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায়?

কেন, কলকাতা আর লক্ষ্ণৌয়ের মাঝে কি অমরনাথের মত দুর্গম পাহাড় আছে, না হিংলাজের মত ধু-ধু মরুভূমি আছে যে আসতে পারবো না? যাক্ এখন বলুন আমাদের এখানে কবে আসবেন?

—আপনাদের ওখানে? মানে··· জয়ন্ত হঠাৎ তোতলা হয়ে গেল।

ঈষৎ অভিমানের সুরে বললে সুজাতা—থাক্, আপনাকে আর বিশদভাবে মানে বোঝাতে হবে না। বাংলার বাইরে বাস করলেও বাংলা ভাষা বেশ ভাল রকমই জানি এবং বুঝি।

ওর অভিমান ভরা কথা ভাল লাগে জয়ন্তর বলে—বাঃ, অমনি রাগ হয়ে গেল?

সুজাতা বললে—আপনি যে বাক্যবীর তা আমি খুব ভাল রকম জানি। যাই হোক, আবার বলি, পেন-ফ্রেণ্ডকে এত ভয় পাবেন না। বাইরের মানুষ, তাই নিশ্চয় আপনার এখানে আসতে ভয় হচ্ছে। মাভৈঃ, নির্ভয়ে চলে আসুন।

আবার সুজাতা তাকে নীরব দেখে তাড়া দিয়ে উঠলো—কি হ'ল আপনার? ঘুমিয়ে পড়লেন না কি?

জয়ন্ত বলে ফেললে—নাঃ। কাল বিকেলে যাবো।

—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনাকে যেন ফাঁসির মঞ্চে আমন্ত্রণ জানান গেল।

—না, তা নয়, আমি বলতে চেয়েছি, আপনার সঙ্গে চিঠিতে মাত্র পরিচয়, এখন সামনা-সামনি আমাকে কি ভাবে নেবেন—কেমন লাগবে—

বাধা দিয়ে সুজাতা ঈষৎ তীক্ষ্ণ স্বরে বললে—বাপরে বাপ, আপনাদের এই সব আদব-কায়দার জ্বালায় প্রাণ আমার যাই যাই করছে, সেদিকে আপনার খেয়াল নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের আলাপ পরিচয় এই ভাবেই তো হয়, ঘরে বসে পরিচিত হওয়া যায় না। এখানে আসতে অসুবিধা থাকলে বলে ফেলুন, আর আসতে অনুরোধ কোরবো না।

জয়ন্ত আস্তে আস্তে বললে—আপনি বড়··· এত সেন্টিমেন্টাল হলে বাস্তব জগতে ধাক্কা খেতে হয়।

সুজাতা বললে—আপনি ধাঁধার মত কথা বললে সেন্টিমেন্টে আঘাত লাগবেই এক সময়।

—আপনি আমার অপরাধ কিছুতেই ভুলতে পারছেন না, কি করলে ভুলবেন বলুন তো?

—সহজভাবে কথা বললে।

জয়ন্ত বললে—দেবী, আপনার ক্রোধ সম্বরণ করে নির্দেশ দিন, এ অধম কোন ঠিকানায় উপস্থিত হবে?

সুজাতা হেসে বললে—এই বুঝি সহজভাবে কথা বলা আপনার? যাক, আপনি নম্বর লিখে নিন···লেক য়্যাভেনিউ।

জয়ন্ত বললে—এতক্ষণ ধরে যদি কোন অপরাধ করে থাকি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সুজাতা বললে—ক্ষমা করা হবে তখন, যখন এ বাড়ীতে সশরীরে উপস্থিত হবেন। তার আগে ক্ষমা করা সম্ভব হচ্ছে না।

—কারণ আপনার কথায় আস্থা রাখতে পারছি না। সমস্ত রাগ আমার জমা করা রইলো। যদি না আসেন, তখন বুঝবেন তার ধাক্কা। তারপর একটু থেমে বলে—আচ্ছা, এবার চলি।

• • • •

কোন ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াতে ছোট বোন সুমিতা কাছে এসে বললে—মেয়েটি কে দাদা?

জয়ন্ত বললে—বলছি। ছোটবেলার পড়ার বইয়ে নিশ্চয় পড়েছিলি, না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, কিন্তু না বলিয়া অপরের কথা শুনিলে কি হয়?

—ভুল নম্বর হয়েছিল বুঝি? তা তুমি ভুলটা শুধরে দিলে না কেন?

—ভুলটা গোড়াতেই বুঝলে তবে তো শোধরাবো। যখন বুঝলুম—

মিতা টীকা কাটে—বিশেষ কোরে তিনি যদি মহিলা হন। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি?

জয়ন্ত ঘুরে বসে বললে—আসল-নকল কিছু নয়। 48 ডায়াল করতে গিয়ে 47-এ ডায়াল হয়ে এই বিভ্রাট হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, সেই ভদ্রলোকের নামও জয়।

পশ্চিমবঙ্গ 'ফরেষ্ট-স্কুল'—কার্শিয়াং

শ্রীমতী বনানী সেন

"ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে বাধাবন্ধহারা"···—কবিগুরুর বিখ্যাত "বৈশাখ" কবিতার লাইনটি বারে বারে মনে পড়ছিল বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে। শুধু বুঝি এইটুকুই তফাৎ—পুঞ্জ মেঘ নয়, ঘন পুঞ্জ কুয়াশা। জায়গাটা কার্শিয়াং আর আমিও বসে আছি কার্শিয়াং শহরের মাথিতে, অর্থাৎ ডাউ-হিলের (Dow-Hill) ফরেষ্ট বাংলোর একখানা ঘরে। ডাউ-হিল জায়গাটা এত উঁচু যে, স্থানীয় জনসাধারণ এর নামকরণ করেছেন 'মাথি'। দার্জ্জিলিং-এর পার্ব্বত্য এলাকা সম্বন্ধে যাঁদের এতটুকু জ্ঞান আছে তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন কথাটার সহজ তাৎপর্য্যটুকু—উচ্চতায় ডাউহিল 'ঘুমের' প্রায় সমপর্য্যায়ে পড়ে। কিন্তু সে কথা থাক—আজ আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিষয়ের উত্থাপন করতে চাই তার সঙ্গে ঐ তত্ত্বের বিশেষ কোন যোগ নেই।

গত ফাল্গুন সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে হঠাৎ সেদিন চোখে পড়লো শ্রীঅখিলরঞ্জন ঘোষাল মহাশয়ের জলদাপাড়া গেম-স্যাংচুয়ারী পরিদর্শনের কথা। সঙ্গে সঙ্গে মনের কোণে সাড়া জাগাল এক অদ্ভুত ইচ্ছা। আমি লেখিকা নই, লেখনীর উপরও নেই আমার সহজ দখল। তবু ইচ্ছা জাগলো মনে—আপনাদের সকলের মাঝে আমার জানাকেও জানিয়ে দিই না কেন? আর সেই ইচ্ছার তাগিদেই আজকের এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত বা গিয়েছেন দার্জ্জিলিং। টাইগার-হিল থেকে দেখেছেন তুষার-শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার বুকে সূর্য্যালোকের সাতরঙা বিচিত্র সমারোহ, প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশির বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে এই দার্জ্জিলিং-এ। তাই বুঝি মানুষের কর্ম্মক্লান্ত সৌন্দর্য্যপিপাসু মন অনেক ছুটির অবসর যাপনের আগ্রহে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসে এই দার্জ্জিলিং-এ। আমিও বহুবার অনুভব করেছি মনের এই তাগিদ। তাই ওখানে আমি ঘর না বাঁধলেও দার্জ্জিলিং-এ আমি ঘরোয়া হয়ে উঠেছি। কিন্তু যাক সে কথাও। শিলিগুড়ি বা বাগডোগরা থেকে ট্রেণ, বাস অথবা ট্যাক্সিতে হিল-কার্ট রোড ধরে দার্জ্জিলিং আসার পথে আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত দু'চার ঘণ্টার জন্য (অবশ্য দু'চার দিন হলেই বা ক্ষতি কি?) থেমেছেন এসে এই কার্শিয়াং-এ। আশেপাশে বেড়িয়ে ঘুরে দেখে নিয়েছেন শহরটা, সামান্য অবকাশটুকুর মধ্যে যতটা দেখে নেওয়া সম্ভব, ঠিক ততটাই। দেখেছেন, ট্রেণের শুধুই ঘরগুলো, ট্রেণ থেকে বেরিয়েই কর্ম্মব্যস্ত ছোট্ট শহরটিকে দেখে যেমন অবাক হয়েছেন, তেমনি কলকাতা থেকে এখানকার জীবনযাত্রা-ধারার বিরাট পার্থক্য মনে মনে অনুভব করেছেন। "হঠাৎ আলোর ঝলকানির"—'মত আপনার নূতন দেখা চোখও অবাক দৃষ্টি মেলে চেয়ে থেকেছে এই বিচিত্র জনসমাবেশের দিকে। আপেল-রাঙা-গাল যে ভুটিয়া মেয়েটি বিরাট বোঝা পিঠে নিয়ে সামনের উঁচু পথে ক্রমশ: অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আপনার ব্যাকুল চাহনি বারে বারে পিছনে পড়বে তারই ফেলে যাওয়া পথের 'পরে। আলখাল্লা পরিহিত লামার দল হয়ত বা আপনারই পাশ দিয়ে বিচিত্র সুরের বোল তুলিয়ে হেঁটে যাবে। দুষ্ট-মিষ্টি বাচ্চার দল রুক্ষ চুলে উঁচু করে ফিতে বেঁধে, সাহেবী ধারায় পোষাক পরে যানবাহনের উদ্যত শাসনকে অগ্রাহ্য করেই বারে বারে ছুটে এসে ছিটকে পড়বে ঠিক আপনি রাস্তার যেখান দিয়ে সন্তর্পণে হেঁটে চলেছেন, সেইখানে। চলন্ত কোন গাড়ীর ড্রাইভার হয়ত বা জোরে ব্রেক কষবে, আর অজান্তেই আপনার কণ্ঠ চিরে বেরুবে ভয়ার্ত আর্ত্তনাদ। খিল খিল করে হেসে উঠবে ওরা।

কিন্তু আপনারা ত শহর পরিক্রমা শেষ করেননি। তাই দ্রুত আপনি এগিয়ে চলেছেন ট্রেণের পাশের রাস্তাটি ধরে—থেমেছেন এসে রামকৃষ্ণ মিশনের ছোট্ট বাংলোটির কাছে। সেখান থেকে বেরিয়ে সামনেই পাবেন ক্রমশ: উঁচু হয়ে ওঠা খাড়া-সোজা রাস্তাটি। কোথায় গিয়েছে ওটা? কত উঁচুতে? মাথার লোক-গুলোকে যে একেবারেই ছোট ছোট দেখাচ্ছে। মনে মনে শঙ্কিত প্রশ্ন জাগবে—তবু উপায় নেই, ঐ রাস্তা ধরেই উপরে উঠতে হবে আপনাকে —নইলে যে ন্যাসপাতি গাছ কেমন দেখাই হবে না আপনার, আর দার্জ্জিলিং পাড়ি জমাতেও দেরী আছে। কাজেই প্রথম ছুটো ছোট্ট বাঁক পর্য্যন্ত কষ্ট করেই উঠবেন আপনি। তবু শুধু ন্যাসপাতি গাছই নয়, লতানে আঙুরের গুচ্ছ আর সেই সঙ্গে ফুলের বিচিত্র সমাবেশ দেখে ঝলমল করে উঠবে আপনার ঝিমিয়ে পড়া নিস্তেজ মনটা। কিন্তু এখান থেকেই না হয় নাই ফিরলেন। আপনার হাতে তো এখনও তিন-চার ঘণ্টা সময় আছে। ঐ সোজা পথের পাকা রাস্তাটা ধরেই সোজা আপনি উপরে উঠে আসুন না। হাঁ, উঁচুতে—আরও একটু সোজা উপরের দিকে। হয়ত কষ্টই হবে আপনার এই পথটা পায়ে চলে আসতে। তবু আসবেন, কারণ জঙ্গলের অপরূপ সৌন্দর্য্য যদি আপনি উপলব্ধি করতে চান তবে আপনাকে কার্শিয়াং-এর এই মাটীতে আসতেই হবে। এখানে এলে আপনি দেখবেন 'চিমনী'—যেখান থেকে বহু নীচের প্রায় বিলীয়মান সমতলভূমির অপার সৌন্দর্য্য

আপনাকে বিমুগ্ধ করে দেবে। কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র রূপের ঝালর ঝুলবে আপনার মুগ্ধ চোখের সামনে, আর চারি পাশের ঝাউয়ের (স্থানীয় নাম 'ধুবি') জঙ্গলের মর্ম্মর ধ্বনি আপনার প্রাণে জাগাবে অপূর্ব্ব এক তন্ময়তা। কে বলতে পারে এরই ছোঁয়াচ লেগে বাদশাহী কবি ওমর খৈয়মের মতই না আপনারও মনে বাদশাহী সাধ জেগে ওঠে—

"সেই নিরালা পাতায় ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়ে,
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।"

সাধ জাগলে ক্ষতি কি ? কিন্তু আপনার যে তাড়া রয়েছে, তাই যত "সাধ ছিল সাধ্য ছিল না" গোছের একটা মনোভাব নিয়ে এবার আবার আপনি নেমে আসুন ফরেষ্ট-স্কুলের রাস্তা ধরে। যতটা অবাক হয়ে যাচ্ছেন ফরেষ্ট-স্কুলের নাম শুনে, ঠিক ততটা অবাক হবার কিছুই নেই এতে। সত্যিই, আপনার মতই জনসাধারণের এক বিরাট অংশ পশ্চিমবঙ্গের এই ফরেষ্ট-স্কুলের নাম পর্য্যন্ত শোনেনি আজও। অথচ কার্শিয়াং-এর ডাউ-হিলে এ স্কুল আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চলে আসছে। ১৯০৭ খৃঃ এর প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময় বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি রাজ্য থেকেও ছাত্ররা এখানে Training-এর জন্য প্রেরিত হতেন।

যুগটা ছিল ইংরেজের ; তাই এখানকার ভাবধারাটাও অনেকটা ইংরেজী-ঘেঁষা। প্রথমে স্কুল যখন প্রতিষ্ঠা হয় তখন এখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল অল্প, সম্ভবতঃ একুশজন মাত্র। তাই একজন Instructor ও একজন Directorই (ইনি একজন Deputy Conservator) ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার পক্ষে যথেষ্ট। বর্ত্তমানে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির (৪৫ জন) সঙ্গে সঙ্গে একজন অতিরিক্ত Instructor নিযুক্ত করা হয়েছে। স্কুলটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন বিভাগীয় ডাইরেক্টর জেনারেলের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে ঠিক স্কুল পর্য্যায়ে না ফেলে Professional School বললে বোধ হয় ঠিক হবে, কারণ বন বিভাগে যে সকল কর্ম্মচারী বিট্ অফিসাররূপে (Beat Officer) নির্ব্বাচিত হন, তাঁদেরই ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয় এই স্কুলে। অবশ্য চাকরী প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যে কর্ম্মচারীরা এখানে ট্রেনিং-এর জন্য প্রেরিত হন, তা নয়। ষ্টুডেণ্ট বা ছাত্ররূপে এখানে যাঁরা আসেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কার্য্যকাল ইতিমধ্যেই চার-পাঁচ বছর হয়ে গিয়েছে, দেখা যায়। তবে এখান থেকে ট্রেনিং-এ পাশ করে বেরিয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত সাধারণতঃ কার্য্যে স্থায়িত্ব পাওয়া যায় না বা চাকুরির ভাষায় Conformed হওয়া যায় না। Training period প্রায় এক বছর। এই সময়ের মধ্যে ছাত্রদের জঙ্গল সম্বন্ধীয় সমস্ত কাজকর্ম্ম হাতে-কলমে শিক্ষা করতে হয়। এই এক বছর সময়ের মধ্যে ছয়মাস ছাত্ররা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে এক একজন শিক্ষকের (Instructor) অধীনে থেকে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের জঙ্গল পরিক্রমা করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকেন। সুকনা, রাজাভাতখাওয়া, বামনপুকুরী, কালিম্পং, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অঞ্চলের জঙ্গলগুলি প্রধানতঃ এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আওতায় পড়ে। বর্ত্তমান Instructor-এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে এই পরিক্রমা পর্ব্বে যোগদানের সুযোগ আমারও হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা একজন বাঙ্গালী [illegible] ... নিকট ... জন্য বিচিত্র। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন আছে নব নব বৈচিত্র্যের রোমাঞ্চকর অনুভূতি, অন্যদিকে ঘর বেঁধে ভেঙ্গে ফেলার অদ্ভুত অবস্থিতি। এখানকার ছাত্ররাই হচ্ছেন সরকারের বন বিভাগের স্তম্ভস্বরূপ, তাই এঁদের শিক্ষার ব্যাপারে সরকার এতটুকু কার্পণ্য করেন না। শিক্ষানবিশ থাকাকালীন এঁরা মাস-মাহিনা ছাড়াও দিন প্রতি মাগগী ভাতা পেয়ে থাকেন। ছাত্রদের ইউনিফর্ম্ম-পোষাক ও ছোটখাট আরও কতকগুলি জিনিষ সরকার সেসন আরম্ভের সুরুতেই দিয়ে থাকেন। ইনষ্ট্রাকটারদের জন্যও নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহে Rest house অথবা Tent house-এর ব্যবস্থা আছে। এঁরা পরিবার সঙ্গে করেই সাধারণতঃ টুর করে থাকেন। কারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের পক্ষে প্রতি বছর একটানা ছয় সাত মাস স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের স্থানান্তরে প্রেরণ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এ ছাড়া এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সামর্থ্য বিবেচনার প্রশ্নও ওঠে। তবে সর্ব্বক্ষণের জন্য একজন আর্দ্দালী সঙ্গে থাকায় এঁদের পরিবার-পরিজন ছোটখাট সাংসারিক ঝামেলার হাত থেকে কিছুটা রেহাই পেয়ে থাকেন। অপ্রাসঙ্গিক নয় বোধে এখানে আরও একটা বিষয়ের উল্লেখ করছি। যদিও ডাউ-হিলের Instructorদের জন্য সুন্দর সরকারী কোয়ার্টার রয়েছে, তবু টুরের এই সুদীর্ঘ সময় তাঁদের পরিবারবর্গের পক্ষে এখানে অবস্থান প্রায় একরকমের অসম্ভব হয়ে পড়ে। পুরুষ অভিভাবকের অভাবে এঁদের এই সময়টা অন্ততঃ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই এখানকার কর্ম্মচারীবর্গের উপর নির্ভর করতে হয়। অথচ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু অনায়াসেই বলতে পারি, প্রয়োজনের সময় সামান্য একটু সাহায্যও এঁদের কাছে প্রত্যাশা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সরকার থেকে Instructorদের জন্য আর্দ্দালীর ব্যবস্থা রয়েছে, তাই এখানকার চৌকিদার, মালি (দু'জন), ডাকওয়ালা প্রভৃতির দ্বারা সামান্য কাজের সুবিধাটুকু চাওয়াও নাকি অন্যায়—এমন কথাও শুনতে হয়েছে বহুবার। এই অবস্থার প্রতিকার করে সরকার থেকে ছোটখাট নির্দ্দেশ প্রচার করার প্রয়োজন রয়েছে, কেন না দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিশ্চিন্ততার অবকাশ মানুষের মনেও আনে সহজ নির্ভরতার স্বাচ্ছন্দ্য—সেটা এখানকার নিঃসঙ্গ জীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য। ভুক্তভোগীমাত্রেই এই কথাটার আন্তরিক তাৎপর্য্যটুকু উপলব্ধি করবেন সহজেই। শুধু মাত্র এই কারণেই স্কুলের কর্ম্মকর্ত্তাদের এ বিষয়ে সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। যাক সে কথা, Director বা স্কুলের Principalকেও টুরের সময়টা ছাত্রদের কোন এক গ্রুপের সঙ্গে থাকতে হয়। তবে 1st class অফিসাররূপে এঁরা 1st class রেষ্ট হাউস্ ও গাড়ীর সুবিধা পেয়ে থাকেন মাত্র। স্কুল কম্পাউণ্ডের কাছে এসে আপনি দেখতে পাবেন, অজস্র ফুলের কেয়ারি সাজিয়ে অদ্ভুত সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে এটিকে। কম্পাউণ্ডের মাঝখানে চারিদিকে কাচের জানালা ঘেরা স্কুলঘর। এই দোতালা স্কুলঘরটির সজ্জা-পারিপাট্য মনকে মুগ্ধ করে। নীচের বড় তলটি ছাত্রদের ক্লাস ঘর বা লেকচার রুম আর উপরের তলায় মিউজিয়াম। এ স্কুলঘর ও মিউজিয়াম কার্শিয়াং-এর একটি দ্রষ্টব্য স্থানবিশেষ। স্কুলঘরের একটু নীচেই ছাত্রদের খেলার জন্য ভলি গ্রাউণ্ড রয়েছে। সকাল ড্রিল আর বিকেলে বর্ষায় ফুটবল এবং অন্য ঋতুতে ভলি অনিবার্য ভাবে প্রতিদিন ছাত্রদের খেলতেই হয়। এ ছাড়াও রয়েছে নানা রকমের ইন্‌ডোর গেমস্ আর বেশ বড় ধরণের একটা বইয়ের লাইব্রেরী। মোট কথা,

দেহ ও মনে ছাত্ররা যাতে সুস্থ ও সবল থাকেন তার জন্ত প্রায় সমস্ত রকমেরই ব্যবস্থা রয়েছে এই ফরেষ্ট-স্কুলে। মাঝে মাঝে আবার বিভিন্ন প্রকারের অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের সুযোগ ও স্বাধীনতা দিয়ে ছাত্রদের উৎসাহিত করা হয়। এই ত গত ১২ই মে ছাত্ররা এখানে মহা-সমারোহের সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছেন।

তাই ত বলছিলাম, আপনার স্বল্প অবকাশের মাঝেও একবার দেখে যাবেন পশ্চিমবঙ্গ ফরেষ্ট-স্কুলের কর্ম্মব্যস্ত বিচিত্র জীবনযাত্রাকে। নইলে হয়ত কবির মত আপনাকেও একদিন আক্ষেপ করতে শুনবো"—

"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া,
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"

আকাশের রঙ

সংযুক্তা মিত্র

দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান সেরে বাসায় ফিরছিলাম। গোধূলিয়া হতে গৌরীবাগের দিকে। বড় গীর্জ্জাওলা মোড়টার মাথায় রিক্সা আটকে গেল। বিরাট প্রশেসান চলেছে। সম্ভবতঃ কোনো আখড়ার দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো মহান্ত বাবাজির আগমন উপলক্ষে নগর পরিক্রমা। মস্ত ঝালর দেওয়া মখমলের পর্দ্দা মাথায় ঝুলিয়ে সবার পুরোভাগে চলেছে গোটা তিন চার হাতি। গলায় বাঁধা মস্ত মস্ত ঘণ্টা চলার তালে তালে দুলে দুলে বাজছে টং-টং ঢং ঢং। পিঠে জটাজুটধারী বিভূতি ভূষণ সাধুজী বসে আছেন সুদৃশ্য সৌখীন হাওদায়। রং দেখে মনে হয় সোনারই হবে বুঝি। হাতির সারির পিছনে উটের দল। তারপর ঘোড়া, তারপর এক ঝাঁক লরী আর মোটর ট্রাক বোঝাই শিষ্য-সামন্ত, লোক-লস্কর, পরিচারক-পরিজন। ভারে ভারে মাধুকরী। সে এক এলাহি ব্যাপার। গোটা মোড়টা থই থই করতে লাগল লোকের ভিড়ে। ট্রাফিক পুলিশ রাস্তার গাড়ি আর ভিড়ের জনতা কণ্ট্রোল করছে। কতক্ষণে ক্লীয়ার পাব কে জানে? বিরক্ত হয়ে বসে থাকি। বসে থেকে অপেক্ষা করা আর নিস্পৃহ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া যখন অন্ত কোনো গতি নেই।

হঠাৎ পাশের আর একখানা অপেক্ষমান রিক্সার দিকে চোখ পড়তে অবাক হয়ে যাই। সে রিক্সা হতে একজোড়া চোখ আমারই উপর দৃষ্টিবদ্ধ। অনেকখানি প্রশ্ন, কুণ্ঠা ও সরমজড়িত তার ভাষা। বুকের মধ্যে হঠাৎ এক আঁজলা রক্ত চলকে ওঠে। কান, মাথা গরম হয়ে যায়। স্মৃতির ঢেউ উথাল-পাথাল করে মনের মধ্যে।

—কতক্ষণ হতে তোর দিকে চেয়ে আছি। ভুলে গেছিস নাকি?
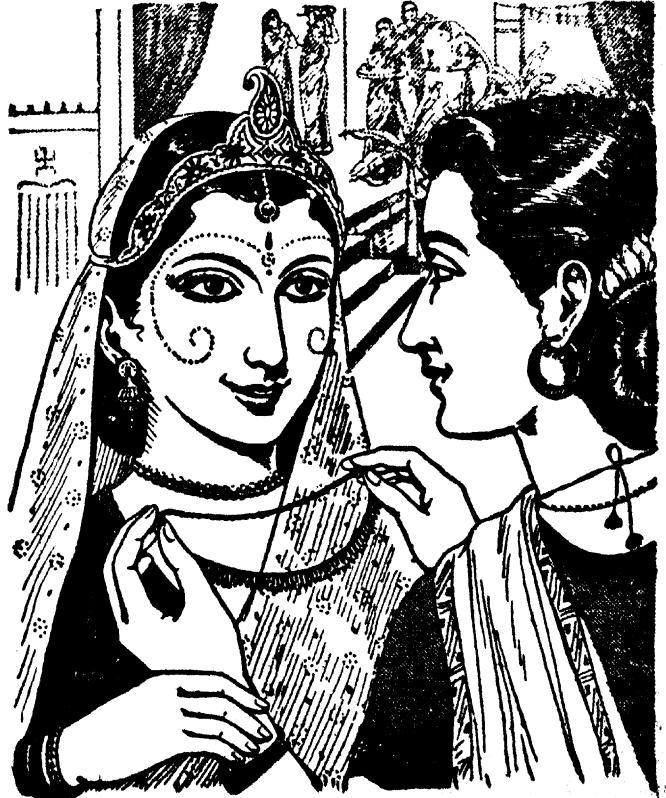
চিনতে পারছিস না ?—পরিচিত বহুদিনের একটি অন্তরঙ্গ কণ্ঠস্বর কানের উপরে হঠাৎ বেজে ওঠে। আজো তেমনি সুরেলা, মধুময়! আশ্চর্য্য! প্রতিজ্ঞা ছিল জীবনে ওর মুখ আর দেখব না। অথচ আজ অপলকে চেয়েই রইলাম। পণ করেছিলাম আর কোনদিন ওর সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইব না। কিন্তু তবু, নিজেকেই চমকে দিয়ে বলে উঠলাম—তোকে ভুলে যাব মল্লিকা? কি যে বলিস! কিন্তু, তুই এখানে?

প্রশেসানের শেষ প্রান্তটুকু ততক্ষণে মোড়ের মাথা ছাড়িয়ে অনেকদূরে চলে গেছে। দূর থেকে শুধু মানুষের কালো কালো মাথার জোয়ারে উদ্ধত শাখায় রক্তকরবীর গুচ্ছের মত, দেখা যায় তাদের লাল ঝাণ্ডার ডগাগুলো। হেলছে, দুলছে, বাতাসে উড়ছে। পুলিশ আবার পথ ছেড়েছে। এতক্ষণের প্রতীক্ষমান লরী, বাস, সাইকেল-রিক্সা আর টাঙার ভেঁপু, ক্রিং ক্রিং, টুং-টাং শব্দে কান ঝালাপালা। সচল হয়েছে তারা। সেই ভীড়ের ধাক্কায় মল্লিকার রিক্সাখানা উল্টো দিকে ছিটকে না গিয়ে আমার কাছেই এগিয়ে এল চাপের চোটে।

মুক্তোর মত দাঁতের সারিতে হাসি ঝরে পড়ল,—কোথায় চলেছিস ইভা? তুই-ই বা এখানে কী করে?

আমি একটা কাজে সপ্তাহখানেক হোল এসেছি। চলেছি হোটেলে। আজই ফিরব যে। তা দেখ না রাস্তার ভীড়ের কাণ্ড।

—আজই ফিরবি? কোথায়? কলকাতায়? মল্লিকাকে কেমন যেন দীপনেভা সলতের মত দেখায়।

—কেন বল ত? তোর কি এখনও কলকাতার কথা মনে পড়ে নাকি?—খানিকটা আঘাত দেওয়ার লোভ যেন সামলাতে পারি না। এক মস্ত নাটকীয় ঘটনার নেপথ্য-নায়িকা আজ এই দূর প্রবাসের কোলাহলমুখর পথের প্রান্তে আমারই চোখের সামনে।

যার ছায়া আর কখনো মাড়াব না বলে একদা কামনা করেছিলাম, তারই হাতের মৌনকাতর সঙ্কেতে আমাদের দুজনেরই রিক্সা ফুটপাথের পাশ ঘেঁসে দাঁড়াল। তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদের মত বিশীর্ণ হাসি হেসে মল্লিকা বলল—ঠাট্টা করিস কর ভাই। কলার মুখ সত্যিই ত সেদিন রাখিনি। তবে যদি রাগ না করিস, একটা অনুরোধ রাখবি?

কি?—আশ্চর্য্য। রাগ নয়, বিদ্রূপ নয়, ওর দিকে চেয়ে কেমন একটা মমতায় যেন আমার মন ভরে এল। বললাম,—কি অনুরোধ? তোর বাসায় যেতে হবে? কিন্তু—

একটা খুশির আভা ছড়িয়ে পড়ল মল্লিকার মুখে। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সাগ্রহে সে বলল,—চল্ না ভাই একটিবার। কতদিন পর দেখা।

—কিন্তু হোটেলে তো ভাত নিয়ে বসে থাকবে না। আমার আবার টুকিটাকি কাজও আছে যে। আজই ট্রেণ ধরব।—একটু ইতস্ততঃ করি।

মল্লিকা বলে,—সে হবেখন। আর আমার বাসার পাশের দোকানে ফোন আছে, তুই বরং একটা ফোন করে দে ম্যানেজারকে।

মল্লিকার পাতলা পাতলা রাঙা ঠোঁটদুটো আবেগে, আগ্রহে থরথর করে কেঁপে উঠল। আর কোনো দ্বিধা বা সংশয় রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। ওর সঙ্গে সঙ্গে অন্ত ব্যবস্থা সেরে ওর বাসায় এসে উঠলাম। বাঙালীটোলার মধ্যে সঙ্কীর্ণ এক গলির একটি পাশে বিরাট পাথরের বাড়ির পায়রার খুপরীর মত ছোট ছোট এক একখানা ঘরে এক এক পরিবার। অধিকাংশই অল্পবয়সী মেয়ে। বিধবা কি কুমারী বুঝলাম না। আর কিছু নিরাশ্রয়, নিঃসহায় বৃদ্ধ। ঐ ঘরেরই একটার তালা খুলে ঢুকে মল্লিকা মাদুর বিছিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করল,—আয় বোস ভাই, এই আমার ঘর আর এই আমার সংসার।

মনে পড়ল, মল্লিকাদের মস্ত কেয়ারি-করা লনের পাশে হালক্যাসানের জয়পুরী ষ্টাইলের চমৎকার বাড়িখানার কথা। ওদের এক একটা মালি আর চাকরের ঘরই মল্লিকার এই বর্ত্তমান ঘরখানার চাইতে বড়। মাদুরের উপর বসে পড়ে মনে পড়ল ওদের ড্রইংরুমের সোফা-সেটির আর ঘর সাজানো সৌখীন আসবাবপত্র আর টুকিটাকির ছবি। কোথায় নেমেছে মল্লিকা! একটা প্রচণ্ড ধিক্কারে মনটা যেন আবার গুটিয়ে এল। বললাম,—তাহলে মল্লি, এটা তোর নাটকের কোন্ অঙ্ক? চতুর্থ না পঞ্চম? সঞ্জয় কই? তার কি খবর?

সঞ্জয়?—এক টুকরো অতি করুণ হাসি মল্লিকার ঠোঁটের উপর মিলিয়ে এল।—তার কথা আর কেন? তা ছাড়া, কোন কথাই বা কেন? কতদিন পর দেখা। দু' দণ্ড কাছে থাক। আর কিছু নয়। শুধু সেইটুকুর জন্যই তোকে ডেকে এনেছি। বিশ্বাস কর ভাই। দু' ফোঁটা জলের ধারা ওর চোখ ছাপিয়ে গাল বেয়ে নেমে এল।

লজ্জিত হলাম। অপ্রতিভ ভাবে বললাম,—আচ্ছা, বেশ ত। না হয় তাই। যা তুই রান্নার জোগাড় কর। কোন কথায় দরকার নেই। আমি বরং একটু ঘুমিয়ে নিই।

সেদিন সারা দুপুর সত্যিই আর বিশেষ কোনো কথা হোল না। দুপুরের পরই হঠাৎ যেন ছায়া ঘনিয়ে এল বাঙালীটোলার মস্ত বাড়িখানার কোটরে কোটরে। মল্লিকা আর আমি দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে এলাম। বাইরে তখনো ঝকমকে আলো। দুজনে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসলাম পাথর-বাঁধানো পাড়ে একটা বাঁধানো ছাতার নীচে। গঙ্গার নীল জলের চওড়া বুকের বালুর আঁচল ওপারে বহুদূর প্রসারিত। তারপর শ্যামরেখা। বাগান আর বসতির। মন উদাস করা পরিবেশ। কানে ভেসে আসছে শীতলা মন্দিরের সুমধুর নহবৎ রাগিণীর করুণ বিলাপ। বহুদূর হতে ভেসে আসছে শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দ। নিস্তরঙ্গ গঙ্গার বুকে পালতোলা নৌকা চলেছে ভেসে। মেঘে-রৌদ্রে মেশামিশি বৈরাগী অপরাহ্ণ।

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে কাটল। সময়ের বুকে অনেকগুলি প্রহরের ঝরা বকুল খসে খসে পড়ল। তারপর মল্লিকা হঠাৎ বলে উঠল,—তুই কি কিছু জানিস না ইভা? সঞ্জয় ফিরে গেছে।

হঠাৎ ধাক্কা খেলেও বোধ হয় এতটা চম্‌কে উঠতাম না। বিস্ময় সামলাতেও খানিক সময় কাটল। তারপর থম্‌কে থাকা ওর আনত মুখের দিকে চেয়ে বললাম—ফিরে গেছে? সঞ্জয়? আর তুই?

তেমনি নতচোখে জলের দিকে চেয়ে মল্লিকা বলল,—কেন যাবে না? তার জন্য সংসারের সব পথই যে খোলা রে।—নিজের কথা সে চেপে গেল।

আবার কাটল কয়েকটা নির্ব্বাক প্রহর। অতীতের একখানা কালো পর্দা ধীরে ধীরে দুলে দুলে পিছনে সরে যেতে লাগল। তার ওপারে অনেকখানি দিগন্ত। অনেক সোনায়-সবুজে, আগুনে-কালোয় গাঁথা যার ইতিহাস।

নিস্তব্ধতা ভাঙল মল্লিকাই।—পোড়া মন মেয়েমানুষের।

ভুলেও কেন ভুলাতে পারে না বলতে পারিস?—কম্পিত কণ্ঠস্বরে তার মৃদু উত্তেজনার তাপ।

এ কথার কোনো জবাব এল না মুখে। মল্লিকা আবার একটু হেসে বলল,—সত্যি, তোর সঙ্গে আবার এমন করে দেখা হয়ে যাবে কখনো কি ভেবেছি? শেষ দেখা হয়েছিল সেই পুরীর সমুদ্র ধারে। মনে আছে?—হঠাৎ কি মনে পড়ে একটা সলজ্জ রক্তিম আভা ওর মুখে, চোখের পাতায়, ঠোঁটের ভাঁজে ছড়িয়ে পড়ল।

যে পর্দাখানা এতক্ষণ দুলে দুলে পিছনে সরে যাচ্ছিল, একটা হ্যাঁচকা টানে কে যেন তাকে বহুদূর ঠেলে দিল। মনে পড়ল পুরীর সমুদ্রসৈকতের ক'টি মধুমাখা দিন। আর তার মাঝে দুর্য্যোগের ঘন মেঘের এক টুকরো কালো ছায়া।

সেবার তিন বন্ধু মিলে পুজোর ছুটির অবকাশে এসে উঠেছি পুরী হোটেলে। সামনেই সমুদ্র—অপার, অনন্ত জলধারায় বিচিত্রের মর্ম্মপ্রকাশে চঞ্চল। প্রহরে প্রহরে তার সাজের ঘটা, নাচের মাতন, আর শুভ্র ফেনার হাসির কলধ্বনি চোখে পড়ে। বেলা কাটে উচ্ছল আনন্দে। হোটেল ভর্ত্তি লোক। সকালে সন্ধ্যায় আমরা সমুদ্রতীরে ছুটে ছুটে যাই। কখনো ছেলেমানুষের মত ছুটোপাটি করে সাগর-রেখায় পা ভিজিয়ে ভিজিয়ে ঝিনুক কড়ি খুঁজতে। কখনো কোন স্তব্ধ প্রহরে শুধুই অকারণ বসে থেকে থেকে অসীমের বাণী শুনতে। মালবিকা আমাদের মধ্যে স্বভাবে সব চাইতে উচ্ছ্বসিত ও মুখর। সে কখনো গান গেয়ে ওঠে,—'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে। দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।'

পরিপূর্ণ নিটোল রসে রঙে ভরপুর এক একটা দিন। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করি আমরা তিনটি কর্ম্মক্লান্ত বান্ধবী। ছুটির দিনগুলিতে পথচলার কিছু পাথেয় সঞ্চয় করে নেবার জন্যই আমাদের আসা।

সেদিন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে ধ্বক্ ধ্বক্ করে ধূর্জ্জটির মাথার সাপের ফণার মত ধেয়ে ধেয়ে আসছে সাদা সফেন সমুদ্রের ঢেউ। সৈকত প্রায় জনশূন্য। এমন সময় মালবিকা হঠাৎ আমাদের গা টিপে ইঙ্গিতে নীরব করে দিয়ে ফিস ফিস করে বলে উঠল,—এই, চুপ, চুপ। ভাখ 'কপোত কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে'—

শ্যামলীও তেমনি চাপা গলায় বলে উঠল,—আরে! এরা দু'জনও পাশের সী ভিউ হোটেলে এসেছে। প্রায়ই দেখি। রোম্যান্টিক কাপ্‌ল্।

আমি কিছু বলার চেষ্টা করতেই আবার ওরা নিঃশব্দ ইঙ্গিতে আমাকে থামিয়ে দিল।

দুটি ছায়ামূর্ত্তি ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে গেল। যেন দুটি কমলকলিকা রসের সায়রে ভাসতে ভাসতে চলে গেল উৎসুক দৃষ্টির উপর দিয়ে।

আমাদের কাছাকাছি আসার পর শুনতে পেলাম, পুরুষ কণ্ঠ বলে উঠল,—'সেদিন চৈত্রমাস। তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্ব্বনাশ।'

ওরা দুজন বেশ কিছু দূর চলে যাবার পর মালবিকা আর শ্যামলী একসঙ্গে বলে উঠেছিল—আরে বাসরে।

কিন্তু চমকে উঠল ওরা আমার কথায়। এদের কিন্তু আমি চিনি, জানলি?

ওরা প্রচণ্ড কৌতূহলে ফেটে পড়ে—তাই নাকি? কি রকম?

বলতে হোল,—আরে মেয়েটি যে মল্লিকা আর সঙ্গে বোধ হয় ওর বর।

—ওমা! মেয়েটি সত্যি তোর চেনা?—শ্যামলী গালে হাত দেয়।

—বা রে! চিনব না? ও যে আমার ক্লাশফ্রেণ্ড ছিল এককালে। একসঙ্গে বছর দুই পড়েছি একই কলেজে। কি সুন্দর দেখতে দেখলি ত। ও আমাদের কলেজের সোস্যালে সব সময় নায়িকার পার্ট নিত। মালিনী, নূরজাহান, শ্রীমতী—অনেক পার্ট করেছিল। খুব ভাল নাচতে আর গাইতে পারে। মস্ত বড়লোকের মেয়ে কিনা। সেই সময় দুই-একবার ওদের বাড়িতেও গেছি।

—তারপর?—মালবিকার চোখ দুটো আগ্রহে চক্‌চক্ করে।

—তারপর আর কি? শুনেছিলাম বিয়ে হয়েছে। বর নাকি বয়সে একটু বেশ বড়ই ছিল ওর চেয়ে। তারপর জানি না। আর আজ এই। কিন্তু বরকে ওর প্রায় সমবয়সীই মনে হোল, না রে?

কথা সেই পর্য্যন্তই। তারপরও কয়েকটি সন্ধ্যায় এই ছায়ামূর্ত্তি-যুগলের নিঃশব্দ সঞ্চরণ আমরা দেখেছি। দেখেছি ওদের এই বিমুগ্ধ তন্ময়তা অনেকেরই চোখে পড়েছে। সরস আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে। কিন্তু ইচ্ছাসত্ত্বেও আলাপ ঝালিয়ে নিতে ওর কাছে যাই নি।

কিন্তু তবুও হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে আলাপ হয়ে গেল। এবার ওরা আমাদের চোখে না পড়ে বরং আমরাই যেন ওদের চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। মল্লিকা ঠিকই চিনেছে। হাসিমুখে এগিয়ে এসে সে-ই আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। তিন বান্ধবীর সঙ্গেই সঞ্জয়ের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। ওর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আমরা ঠেলতে পারিনি। পরদিন যথাসময়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম ওদের হোটেলে। হাসিতে, গল্পে, গানে, কবিতায়, আনন্দে কোন্‌দিক দিয়ে যে ঘণ্টা দুই কেটে গিয়েছিল বুঝতেও পারি নি। মিষ্টি আপ্যায়নে ওরা আমাদের চা, নিমকী, গজা খাইয়েছিল।

ফেরার পথে আমরা সঞ্জয়-মল্লিকার অপূর্ব্ব জুটির প্রশংসা করেছিলাম মুক্তকণ্ঠে। সত্যি এমন মিল ভাগ্যে হয়! যেমন এ, তেমনি ও। যেন মণি কাঞ্চন।

কিন্তু এমনই পরিহাস! ঘটনাটা ঘটল ঠিক তার পরদিন।

সকালে সেদিন আর সমুদ্রস্নানে যাই নি। ঘরে শুয়ে শুয়ে দুই-একটা পূজা-বার্ষিকী নাড়াচাড়া করছি। শ্যামলী মালবিকাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে কিছু মার্কেটিং করতে। সমুদ্রের রঙীন সৌখীন কড়ি, শঙ্খমালা আর মোষের শিং-এর সারসপাখী ইত্যাদি। হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ার দমকার মত দরজা খুলে ওরা দুজন রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এল ঘরে।

—কি রে? ব্যাপার কি? অবাক হয়ে উঠে বসেছি ততক্ষণে। কি হয়েছে রে?

ওদের মুখ প্রচণ্ড বিস্ময়ের আক্রমণে ফ্যাকাসে। অতিকষ্টে স্বর ফুটিয়ে শ্যামলী বলে—পুলিশ! সী ভিউ হোটেলে। ওদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

—মানে? বলছিস কি?—হঠাৎ বজ্রপাতেও বোধহয় এতটা চমকে যেতাম না।

একরকম ছুটতে ছুটতে তিনজনে ভীড়ের একপাশে এসে দাঁড়াই। একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার। জন চারেক লালপাগড়ি পুলিশ। একটা কালো ভ্যান। আর গাড়ি।

সমবেত জনতার ছি:-ছি:কারের মধ্যে সঞ্জয় আর মল্লিকা নতমুখে রক্তশূন্য নিষ্প্রাণ মোমের পুতুলের মত পুলিশ অফিসারের সঙ্গে এসে গাড়িতে উঠল। স্তম্ভিত নির্ব্বাক হয়ে গেলাম আমরা। কোন প্রশ্ন এল না মুখে। মনে হোল একটা দেবী প্রতিমা কারা যেন কালি ছিটিয়ে, দু'পায়ে মাড়িয়ে চুরমার করে দলে পিষে ফেলল চোখের সামনে।

সেদিন সমুদ্রগর্জ্জন বড় বেশি কর্কশ লেগেছিল। মনে হয়েছিল অতল জলের বুকে যেন আজ বেশি করে কাজল মাখান।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

চলন্তিকার পথে

আভা পাকড়াশী

যে শোনে সেই অবাক হয়ে বলে—ওমা, এইটুকু সব ছেলেদের নিয়ে ঐ দুর্গম পথ কি করে পাড়ি দেবে? তারপর উপদেশ বর্ষণ শুরু হয়, অমন কাজও কোর না, গোঁয়ার্ত্তুমি করতে গিয়ে শেষে বেঘোরে প্রাণটি যাবে। কেন, এখন কি তীর্থে যাবার বয়েস?

না, বয়স আমাদের সত্যিই হয়নি তীর্থে যাবার। তবে মন থেকে যেন দুর্ব্বার এক আকর্ষণ অনুভব করছিলাম এ-দুর্গমকে জয় করবার। কেমন যেন একটা ভয় মিশ্রিত আনন্দ আমাদের ঠেলে দিচ্ছিল ঐ মহাপ্রস্থানের পথে। কবির ভাষায় বলি—

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দু'ধারে আছে মোর দেবালয়।

এক আগুন-ঝরা মে মাসের দুপুরে কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌগামী ট্রেনে চড়ে বসলাম। উদ্দেশ্য, সেখান থেকে শ্রীশ্রীহরির অনুমতিক্রমে তাঁর দ্বার পেরিয়ে, মহাপ্রস্থানের বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে, শ্রীকেদারনাথ ও বদ্রীনাথ দর্শনের জন্ম গমন করা।

হরিদ্বার পৌঁছে সেখান থেকে হৃষীকেশ যাবার জন্ম ছোট লাইনের গাড়ীতে চড়ে বসলাম। সঙ্গে আছেন স্বামী ও দুই পুত্র। একজনের বয়েস এগার, অন্যটির মাত্র ছয়। ঐ গাড়ীতেই একজন পূর্ব্ববঙ্গীয়া বৃদ্ধার সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল। কি জানি কেন আমাকে তাঁর মরা মেয়ের মত মনে হতে লাগল। ভীষণ সাদৃশ্য আছে নাকি আমার সেই মরা মেয়েটির সঙ্গে। সুতরাং আমি একবার যেন তাঁকে মা বলে ডেকে তাঁর বুকটা একটু জুড়োবার চেষ্টা করি।

খাবার বের করলাম, ছেলেদের দেব। ভোরে নেমেছি হরিদ্বার ষ্টেশনে। কেউ খায়নি। আবার এই ট্রেন থেকে নেমেই কোন্ দিকে গতি হবে কে জানে। এখন তো আমরা মুসাফির। একটানা শুধু চলতেই হবে। আমার অনাহুত মা বললেন—"কাল রাত হতি প্যাটে যেন আগুন জ্বলতি আছে। সব যায়, কিন্তু ভগবানের দেওয়া এই পোড়া প্যাটের যেন আর জ্বলুনির শ্যাষ নাই।" দিলাম খাবার। খাচ্ছেন, এমন সময় টিকিট চেকার উঠল। মা আমার খাবার ফেলে বাথরুমে ঢুকলেন। একটু আগেই কিন্তু বলছিলেন, বিধান রায় ওঁর বোনপো হন—তিনিই ওঁকে তীর্থে যাবার ব্যবস্থা করে পাস লিখে দিয়েছেন; আর ডা: নলিনীরঞ্জন সেন ওঁর ভাসুরপো নাকি কিছু হবেন, তিনি ওঁকে অনেক দরকারি ওষুধ সঙ্গে দিয়েছেন। সেই ওষুধের সুবিধে অবশ্য আমিও নিতে পারি, কেন না আমার সঙ্গে পোলাপান আছে।

হৃষীকেশ পৌঁছেই ওকে বললাম, শীগগির একটা টাঙ্গা বা রিক্সা ধর, নাহলে এক্ষুনি আমার মা এসে আমাকে ধরে ফেলবেন। ইতিমধ্যেই তাঁর—"ট্যাহার থলি কনে থুইছি, পাইত্যাছি না তো, এই বলে আমার কাছ থেকে পাঁচটাকা ধার চেয়েছেন—ঐ চলার পথেই শুইধ্যা দিমু অনের কড়ারে।" তিন টাকা দিয়ে পরিত্রাণ পেয়েছি। এঁরা এভাবেই তীর্থ করেন। পুণ্যও হয় নিশ্চয়ই, কারণ কলির মাহাত্ম্যই এই। পুরাণে আছে—হেলায় ফেলায় আমার নাম কর, দর্শন কর, তাহলেই তরে যাবি, উদ্ধার পাবি।

লছমন ঝোলার ওপর দিয়ে এলাম গঙ্গার ধারে। নীচে পুরনো দড়ির পুলটি টাঙ্গান রয়েছে। এখান থেকেই আমাদের সঙ্গের সাথী হবেন কলনাদিনী অলকানন্দা। বাসের টিকিট আগেই করে বেরুনো হয়েছে। যাত্রির ভীড়ে যদি পরে স্থানাভাব হয় তাই।

গঙ্গার ওপারে গীতাভবন। নৌকো করে যেতে হয়। এখানে বেশ কয়েকটি মন্দির আছে। তার মধ্যে লক্ষ্মণ আর ধ্রুবর মন্দিরই প্রধান। লক্ষ্মণ নাকি এখানে এসে মেঘনাদ বধের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। বড় সুন্দর মনোরম স্থান এই হৃষীকেশ।

ফিরে এসে সেই বাসটি কিন্তু আর ধরতে পারলাম না। দেরী হয়ে গিয়েছিল আমাদের। পরে এই বাসটিই রুদ্রপ্রয়াগের পথে যাত্রী সমেত খাদে পড়ে গিয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অথচ ঐটিতেই যাবার জন্ম আমাদের ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। কারণ উদ্দেশ্য ছিল বেলা থাকতে দেবপ্রয়াগে পৌঁছব। নাহলে অচেনা জায়গায় রাতের অন্ধকারে ছেলে দুটি নিয়ে কি বা বিপদে পড়ব। কম বকুনি খাইনি ওঁর কাছে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে দেরী করার জন্ম। কিন্তু এই যে অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামী পুত্র নিয়ে বেঁচে গেলাম, এতে বিদ্যুচ্চমকের মত কোন এক মহান শক্তির একটুখানি আভাস মনে যেন চকিতে দোলা দিয়ে গেল। শুধু এই নয়, ঐ দুর্গম পথ পাড়ি দিতে বারবার কত যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তার ঠিক নেই। অথচ ঠিক এমনি অপ্রত্যাশিতভাবেই আবার পরিত্রাণ পেয়েছি সেই বিপদ থেকে। না জানি কোন্ ত্রাণকর্ত্তা রক্ষা করেছিলেন। কিংবা হয়ত এই পথের অলৌকিক মাহাত্ম্যই এই।

হৃষীকেশ থেকে আমাদের বাস ছাড়লো বেলা তিনটেয়। ড্রাইভার জয় কেদারনাথজী কি জয় বলে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। ঐ শব্দে ভরসার চেয়ে ভয়ই জাগালো যাত্রীদের মনে। দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দেবার সুরুতে এ যেন তারস্বরে চিৎকার করে ব্যোম "ভোলানাথ কেদারনাথকে স্মরণ করান হল, তোমার কাছেই যখন যাচ্ছি বাবা, তখন তুমিই যে এখন আমাদের রক্ষাকর্ত্তা এটা যেন ভুল না।

বাস চলেছে। সে যে কি চলা, যে ঐ পার্ব্বত্য পথে কখনও বাসে চড়েনি তাকে বোঝান সহজ নয়। একবার হু হু করে ওপরে উঠছে, আবার সাঁ সাঁ করে নীচে নামছে। যখন মনে হচ্ছে সামনে তো শুধু পাহাড়'রাস্তা যে বন্ধ, তক্ষুণি অদ্ভুত কৌশলে ড্রাইভার ঘুরিয়ে

নিচ্ছে গাড়ীখানা। আর এই মোড়গুলি কি একটুখানি? যদি বিরাট বড় করে ইংরেজীর ইউ অক্ষরটি লেখা যায়, তবে বোধহয় একটু অনুমান করা যায়। ওরকম ইউয়ের বেশ আসছে বোধহয় প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর। মাঝখানে গভীর খাদ। বাস যখন বাঁক নিচ্ছে তখন চাকার দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। চাকার থেকে রাস্তার কিনারার বোধহয় দশ-বার ইঞ্চির মাত্র তফাৎ। মনে হচ্ছে এই গেল বুঝি সবশুদ্ধ অতলে তলিয়ে। অনেকেই বমি করছে। এইভাবে সন্ধ্যে হল। বেশী রাত্রে বাস চলে না—এই সর্ব্বরক্ষে। সেদিনের মত সাড়ে বত্রিশ ভাড়া করে আমাদের হৃষীকেশ থেকে পনের মাইল দূরে দেবপ্রয়াগে নিয়ে এসে নামিয়ে দিল। কাল ভোরে আবার বাস ছাড়বে।

ভাবছি এ আবার কোথায় এলাম। এর মধ্যেই চারদিকে ঘন অন্ধকার নেমেছে। কেমন যেন একটা ঘর্ঘর ঘর্ঘর শব্দ শুনছি। কুলিরা টেনেটুনে বাসের মাথা থেকে মালপত্র নামিয়ে এক জায়গায় জড়ো করেছে। ছেলে দুটি ক্ষিধে-তেষ্টায় কাতর। এখন চাই রাতের মত একটা আশ্রয়। সঙ্গে বেতের বাসকেটে কেরোসিন ষ্টোভ, গুঁড়ো মশলা, সুজি, চিনি, রান্নার সরঞ্জাম কিছু আছে। তবে ঐ প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে আমার তখন গা মাথা টলছে। তৈরী করবে কে? এই অবস্থায় একটি বাঙালী পাণ্ডা এসে আমাদের উদ্ধার করল।

পাণ্ডার বাড়ীও কম দূর নয়। অনেক ঘুরে নীচে নামতে হল। এখান থেকে গঙ্গাদেবী নাম নিয়েছেন অলকানন্দা। ভাগীরথীর সঙ্গে অলকানন্দার সম্মিশ্রণে এই দেবপ্রয়াগ সঙ্গমের সৃষ্টি হয়েছে। কী শব্দ ঐ জলোচ্ছ্বাসের? আবার এরই ওপর দিয়ে একটি পুল পেরিয়ে যেতে হবে পাণ্ডার বাড়ি। সিমেন্টের বাঁধান পুল তো আর নয়; দড়ি দিয়ে বাঁধা তক্তার সাঁকো। মনে হচ্ছে এইবার সপরিবারে সলিল-সমাধি হল বুঝি বা। তাছাড়া ভক্তি বিশ্বাস উড়ে গিয়ে মনে জেগেছে ভয়। লণ্ঠনের আলোয় পাণ্ডা লোকটিকে ভাল করে চোখেও দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং তার হাতের ঐ আলোকবর্ত্তিকা আমাদের কোন্ পথে নিয়ে চলেছে? আলোর দিকে, না আরও অন্ধকারে?

যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত আশ্রয় মিলল। গঙ্গার ধারে পাণ্ডার ঘরটি ভাল। গরম গরম পুরী আর জিলিপি সেই এনে দিল। এবার নিশ্চিন্ত মনে তার বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নালোকিত গঙ্গার দিকে চেয়ে আবৃত্তি করলাম—

গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর
জীবন জুড়ালে তুমি।

পরের দিন আবার যাত্রা হল শুরু। এবার ড্রাইভার গঙ্গামাঈয়া কি জয় বলে ষ্টার্ট দিল গাড়ীতে। অনুমতি নিয়ে রাখল গঙ্গাদেবীর; কারণ এই পথে আছে কয়েকটি মারাত্মক পুল। আর তা ছাড়া এই রুদ্রপ্রয়াগের পথেই আমাদের সেই আগের বাসটি পড়ে গিয়ে ছাতু হয়ে গিয়েছে।

এসে গেল রুদ্রপ্রয়াগ। এখানেও সেই অলকানন্দার ঘর্ঘর ঘর্ঘর ধ্বনি। মনে যেন কেমন একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার বিকাশ এনে দেয়। এখানে অলকানন্দার সঙ্গে মিশেছে মন্দাকিনী। তবে মোটেই মন্দাক্রান্তা ছন্দে নয়। পাড়ের কাছে জলের তোড়ে সাদা ফেনা জমে যাচ্ছে। বড় বড় পাথর গড়িয়ে চলেছে জলের সঙ্গে। দারুণ স্রোত। বরফ গলা জল বরফের মতই ঠাণ্ডা। কার সাধ্য বেশীক্ষণ দাঁড়ায় ঐ জলে। পাড়ে দাঁড়িয়ে কোন রকমে স্নান সারলাম। সঙ্গম ঘাটের ওপরেই গঙ্গাদেবীর মন্দির। অনেকগুলি সিঁড় ভাঙতে হয়। তাই কাশীর অহল্যা বাঈএর ঘাটের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

কালীকম্বলিআলার ধরমশালা এই মন্দিরের সঙ্গে লাগান। এঁর এই জনসেবার ব্যবস্থা যে কোথায় নেই! এঁর শক্তির কথা ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে। দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে মানুষ যখন পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে একটু আশ্রয়ের জন্য, আচ্ছাদনের জন্য হা-পিত্যেশ করে, ঠিক তক্ষুণি খুঁজে পাওয়া যায় এই মহাত্মার তৈরী যাত্রী নিবাস। অথচ এঁর নিজের সম্বল ছিল মাত্র একখানি কালো কম্বল। আমরা এই ধরমশালাতে আশ্রয় নিলাম।

এই দুর্গম রাস্তায় একটি সুবিধে এই আছে যে, কোন দোকান থেকে চালডাল কিনলে বাসন আর শোবার জায়গার বন্দোবস্ত তারাই করে দেয়। খেতে পেলে শুতে চায় বলে যে প্রবাদ-বাক্য আছে। এখানে তা ব্যর্থ। এরা তাতে বিরক্ত না হয়ে বরং তার জন্য জেদাজেদি করে। নীচে ছোট ছোট দোকান আর ওপরে শোবার জায়গা। কোথাও বা নীচেই দোকানের সঙ্গে লাগান ঘর। কাঠের তক্তার ওপর মাটি জমিয়ে দোতলা করেছে। লম্বা ফালি মত ঘরে সার সার উনুন করা। জিনিষপত্র কেনো, রাঁধ-বাড় খাও। বাসনগুলি আবার পরিষ্কার করে মেজে এদের ফেরত দাও। অন্য যাত্রীদের কাজে লাগবে। এ পথে এই নিয়ম। এরই নাম চটি।

এই ধরমশালাটি কিন্তু পাকা। তবে রান্নাঘরের অবস্থা অবর্ণনীয়। উনুনগুলো সব ছাইভরা। চারদিকে এঁটো ছড়ান। ওরই মধ্যে একজন বিরাট বপু মাড়োয়ারী ভদ্রমহিলা স্বামীর জন্য বাঁ হাতে রান্না করছেন। অসুস্থ স্বামীর আরোগ্য কামনায় ডান হাতটি ঠাকুরের চরণে বাঁধা রেখেছেন। কেদারে পৌঁছে পুজো দিলে মুক্ত হবে। এঁর মেয়ে, ছেলে, পুত্রবধূ সব সঙ্গে আছে। বিরাট দল।

ওঁদেরই এক পাশে ষ্টোভ জ্বালিয়ে কোনমতে একটু খিচুড়ি ফোটাতে বসি। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে যেই ঘরে ঢুকেছি একটু বিশ্রামের আশায়, অমনি লাগলো তুমুল ঝগড়া সেই মাড়োয়ারী ভদ্রমহিলার সঙ্গে ডাণ্ডিবালার। ডাণ্ডি একটা চেয়ারের মত, তলা দিয়ে লম্বা বাঁশ লাগান। চারজনে বয়ে নিয়ে যায়।

ওঁরা একটি ডাণ্ডি করেছেন কর্ত্তা রুগ্ন তাই। তবে গিন্নীর মনোগত ইচ্ছে ছিল অন্য। সেটা আগে প্রকাশ করেন নি, বোধহয় ভয়ে। পাছে ওরা বিগড়ে যায় ওঁর বিরাট বপুখানি দেখে। এখন খেয়ে দেয়ে উঠে মনে হচ্ছে, হাঁটাটা প্রাণান্তকর। তাই ওদের কাছে প্রস্তাব তুলেছেন তাঁকে আগে কিছুদূর নিয়ে যেতে হবে বয়ে তারপর স্বামী মহাশয় না হয় আরোহী হবেন। কিন্তু ওরা ওই আড়াই মণি গিন্নীর চেয়ে রুগ্ন নেংটি ইঁদুর স্বামীটিকেই পছন্দ করছে বেশী এবং বিবাদটা সেখানেই।

আমাদের ভাগ্য ভাল, রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আরও দশ মাইল অগস্ত্যমুনি পর্য্যন্ত বাস পাওয়া গেল। অগস্ত্য মুনি এখান থেকেই অগস্ত্য যাত্রা করেছিলেন। এখানে অগস্ত্যমুনির একটি মন্দিরও রয়েছে। একটি স্কুল বাড়ীতে একজন মাষ্টার মশাই-এর সৌজন্যে রাত্রের আশ্রয় মিলল। চারদিকে তক্তা ঘেরা, মাটির মেঝে, ছোট এই স্কুল বাড়ী। ছেলেরা ছুটিতে বাড়ী গেছে। তাই আমাদের স্থান হল। রাতে উঠলো দারুণ ঝড়, সুরু হল বর্ষণ। আমাদের মনে হচ্ছিল এইবার এই তক্তা চাপা পড়েই মারা যাব বোধ হয়। [ক্রমশঃ।

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

২৬। গুরুজনদের আদেশ পালন করবেন, অঙ্গীকার করলেন বধূরাজি। বিরুদ্ধভাব যখন থাকে না, তখন দোষের হয় না সামান্য তরলতা। বৃন্দাবনে ফুল তুলতে যাবেন, এতে কেন বাধা দিতে যাবেন শাশুড়ীরা? অতএব সেই থেকে প্রতিদিন বধূরাজি পরমানন্দে বেরোতে আরম্ভ করলেন···ফুল তুলতে। প্রত্যেকেই যেন এক একটি বৈকুণ্ঠের নানা-বিগ্রহ-ধারিণী রমাদেবী। স্বামীদের তিরস্কার খণ্ডিয়ে, গুরুজনদের পুরস্কার কুড়িয়ে, এমন কি তাঁদের সামনে দিয়েই তাঁরা স-পরিজন বেরিয়ে যেতে লাগলেন। মনোরথের সাত্ত্বিক আবেগে যেন রথের বেগকেও হার মানিয়ে তাঁরা বেরিয়ে যেতেন; যেতেন বৃন্দাবনের মাঝখানটিতে; ফুল তুলতেন; আর আকুল চোখে দেখতে চাইতেন তাঁদের রাখালকে, বৃন্দাবন-বিহারী তাঁদের ভগবান কৃষ্ণকে। অসীম কৌতুকের দ্বার ভেঙ্গেই কি আসে অসীম আনন্দ?

২৭। তারপরে একদিন।

সেদিন ভোরে ফুল তুলতে বেরিয়ে গেছেন বধূরা, আর ঘরে পড়ে রয়েছেন কুমারিকার দল। তাঁদেরও হাজার হৃদয়ে হাজার ভাবা। আসল ভাবাটি হচ্ছে,—

"আর তো অপেক্ষা করা যায় না···তাঁর আশ্বাস-বাণীর। উনি ধৈর্য্য-নাশ করেন দেখছি,···অতি-ভালবাসানোর অস্ত্র দিয়ে।"

উৎকণ্ঠায় ভারী হয়ে গেল তাঁদের কণ্ঠ, কুটকুট করতে লাগল মন, একটু যেন বেশী ম্লান হয়ে গেল তাঁদের মুখ; ঘরেই রইলেন।

কুলমর্য্যাদাভিমানিনী জননীরা আপন আপন কন্যাদের ঐ হেন ম্লান-ম্লান মুখ দেখে একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন। নিজেদের সাম্‌লিয়ে নিয়ে বক্তৃতা দিলেন,—

"বলি ও মেয়েরা, হিত করবার জন্যে তো দেবীটির সঙ্গে এমন ব্রহ্মাণ্ড-জন্জানো পরিচয় করলেন আপনারা,···তা হিতের বিহিতটা কি হোলো?"

সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের ধাত্রী···তরঙ্গবতী। তিনি বলে উঠলেন,—

২৮। "পরিচয় তো কবেই হয়ে গেছে। দিনও পেরিয়ে গেছে অনেক। তা আপনারা গৃহেশ্বরীরা জিজ্ঞাসাবাদ না করলে এঁরাই বা মুখ খুলবেন কোন লজ্জায়? কুলের মেয়েদের এইটেই তো হওয়া উচিত। এখন অনুমতি পেলেন, এবার বলবেন,···যাঁর যেমনটি জ্ঞান। আর যদি অনুমতি করেন, আমিও তো কাছেই ছিলুম, আমিও বলতে পারি।···অবশ্য সুনয় অবলম্বন করেই বলব।

হ্যাঁ, দেবী যোগমায়া আরাধিতা হয়েছেন। আর বড় বড় বিখ্যাত দেবতাদেরও অগম্য যাঁর গতিবিধি, মা, সেই তিনিও দেশ-কাল ভেবে কিছু প্রত্যাদেশও করেছেন।

২৯। প্রত্যাদেশটি এই:—"মহামহিমান্বিত একটি প্রভাবী পুরুষ অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আপনাদের গোচর হবেন। তাঁর প্রভা-তরঙ্গের কাছে অন্য সমস্ত জ্যোতিঃ তুচ্ছ। এমন কি আমারো তিনি অগোচর। সেই মহান্ লীলাময় আপনাদের স্বামী হবেন,···পদ্মিনীদের যেমন সূর্য্য, মহা-ভ্রমর যেমন ভ্রমরীদের। তাঁর সঙ্গলাভ করে হে পরমাসুন্দরীগণ, লক্ষ্মীর প্রতাপের চেয়েও অধিক হবে আপনাদের সৌভাগ্য-ভাস্করের প্রতাপ। আপনারা সুখী হবেন। কিন্তু এই পতিকামনা ব্রতের একটি উত্তর-ক্রিয়া রয়েছে। সেই ক্রিয়াটিই সর্ব্বাপেক্ষা জীবনময়ী। ক্ষোভহীনা হয়ে এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করে সেই ক্রিয়ানুষ্ঠান আপনাদের কর্ত্তব্য।"

৩০। সত্যিই মা, আপনাদের মেয়েরা তো কাণ্ড দেখে-শুনে অবাক। আমি বুদ্ধি খেলিয়ে তাঁদের জাগিয়ে দিতে, তবেই তাঁরা দেবীকে নিবেদন করেন শ্রদ্ধাঞ্জলি। বাণী আসে,—

"বৃন্দা-নামে এখানে একটি বৃন্দাবনদেবতা রয়েছেন। তিনি অনুপম গুণবৃন্দা এবং দানে অমন্দা। মৎ-স্বরূপিণী এবং স্বরূপে তিনি করুণাময়ী। তাঁর কৃপাতেই সফল হবে আপনাদের মনস্কামনা।"

তাই বলছি মা, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে আপনাদের মেয়েদের বৃন্দাবন যাওয়া···স্থগিত রাখা উচিত নয়।

৩১। অনেক তপস্যার ফলে এমন সিদ্ধ-বন মেলে; আর এমন বনের ফল খেলে তো সব কামনাই মিটে যায়। এখন আর অন্য কথাটি না বলে এঁদের অনুমতি দিন; নগর থেকে বেরিয়ে বনের ঠিক মাঝখানটিতে পৌঁছে এঁদের সমাধা করতে দিন উত্তর-ক্রিয়া।"

৩২। ধাত্রীর হাসি-মুখের কথা শুনে, জননীরা একটু ঠোঁট উল্টিয়ে হাসলেন। হাসিটিই অনুমতি। মতের কোথাও গরমিল নেই, কন্যারাও ধন্য হয়ে গেলেন। মায়েদের এমন রীতিনীতি দেখলে কোন্ কন্যাই না ধন্য হন!

সেই থেকে কন্যাদের পরিষ্কার হয়ে গেল···বৃন্দাবন-পরিসরে পরিভ্রমণের পথ।

৩৩। বিবাহিতা ও অবিবাহিতা···দুটি দলই কিছু অনভিজ্ঞা বা মূঢ়া নন। দুদলেরই বৃন্দাবনচারী কৌতুক যখন সৌন্দর্য্যে ও চাতুর্য্যে তুরীয় হয়ে উঠেছে, তখন এক সময় শীত ঋতুর পতন হল এবং দেখা দিলেন রসময় ঋতু বসন্ত।

ঋতু-সন্ধির এই সময়টি বড় বিচিত্র। এই সময়টিতে যদি প্রথমে মনে করেন, জরাগ্রস্ত শীতহস্তীর খসে পড়ে গেছে কুন্দ-শুভ্র দন্ত, তাহলে সহসা পরেই আপনার মনে হবে, ঐ বুঝি রে বসন্ত সিংহশিশুর দাঁত উঠছে, কেশর গজাচ্ছে। তখন হিমেল হাওয়াটি বন্ধ হয়েছে কি, বইতে লেগে যাবেন দক্ষিণ মরুৎ।···আর মহাকালের নাসায় ঘটে যাবে নিঃশ্বাস-বায়ুর ব্যত্যয়।

এই-সময়টি সেই সময়, যখন সময় হলেও ফুল ফোটাতে পারেন না

সর্দি-কাশি থেকে সত্যিকার উপশম পেতে হ'লে
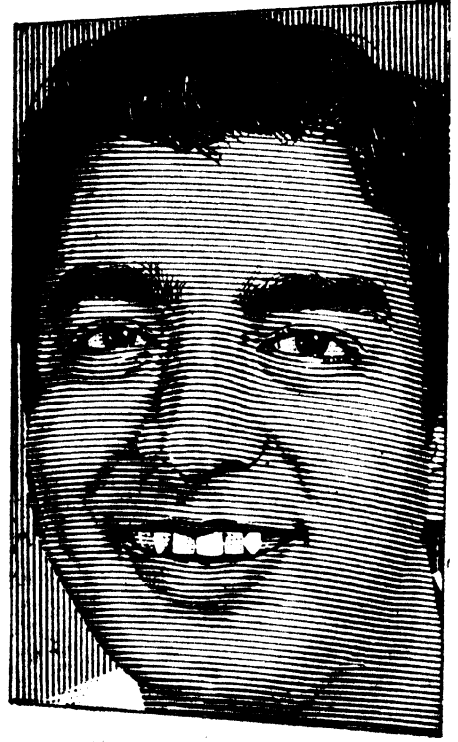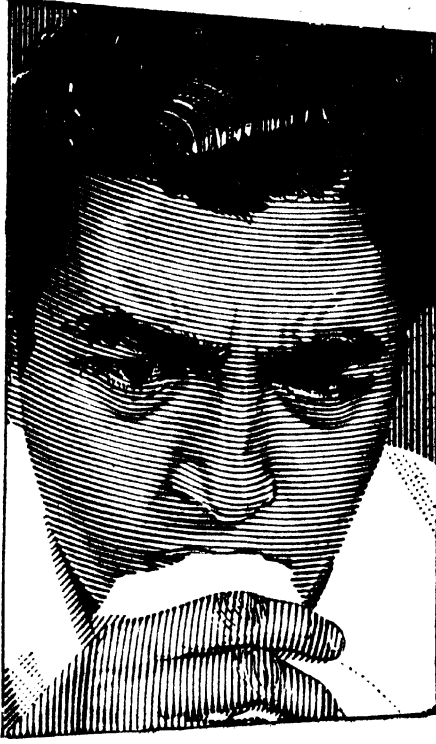
সিরোলিন 'রোশ' খান

সর্দি-কাশি কখনো অবহেলা করবেন না— নিরাপদে, তাড়াতাড়ি সত্যিকারের উপশমের জন্যে সিরোলিন খান। সিরোলিন যে কেবল আপনার কাশি বন্ধ করে তা নয়— যে সব অনিষ্টকর জীবাণুর দরুণ আপনার কাশি হয়, সেগুলিকেও ধ্বংস করে। সিরোলিন দ্রুত ও আরামের সঙ্গে গলার কষ্ট সারায়, শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে সাহায্য করে ও দুর্দমনীয় কাশিও আরাম করে। নিরাপদ, উপকারী এবং খেতে সুস্বাদু ব'লে সিরোলিন বাড়ীশুদ্ধ সকলের কাছেই প্রিয়। ছেলেমেয়েদের তো কথাই-নেই।

বাড়ীতে হাতের কাছেই সিরোলিন রাখতে ভুলবেন না

'রোশ' এর তৈরী **একমাত্র পরিবেশক : ভলটাস লিমিটেড**

JWTVT 2400

লতালী ; কণ্ঠে সুর এলেও কুহু-ধ্বনি তুলতে পারেন না কোকিল ; এবং উত্তরে পা চালালেও মলয় পাহাড় ছাড়তে চান না বাতাস ; সবাই যেন একসঙ্গে প্রতীক্ষা করেন হিম-ঋতুর বিদায়।

আর এই সময়টিতে, লতায় লতায় কুসুম-ফোটার সময় বুঝে মিত্র-পত্নী ভ্রমরীরা ছুটে আসেন. আর গুণ-গুণিয়ে প্রশ্ন করেন বারবার···"কেমন আছিস্ সই ?"

এমন কি, এই সময়টিতেই আম্রশাখায় আশ্রয় নিয়ে বসে থাকেন মঞ্জরী-সন্ধানী কোকিল। না জানি তাঁকে কি আশ্বাসই না দিয়ে গেছেন নব মঞ্জরী-সুরভি সমীরণ! তিনি কুহু কুহু ডাক দিয়ে আলাপ জমাতে যান, আর ব্যস্, গলা আটকিয়ে থেমে যান। কেমন যেন ভয় হয়। কুহু-ধ্বনি টেনে আনবে না তো কুহু-রজনীকে ? ও হরি, অমাবস্যায় যে বোল ফোটে না আমের! তাই তখন বেরোতে থাকে—কোকিলের কুহু, ছাড়া ছাড়া, শোনায়—কু··উ··উ··উ।

৩৪। অতঃপর ফুলগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে যখন সত্যই শুভাগমন করলেন সুরভিমাস এবং ফুলের গন্ধ গায়ে মেখে যখন দিবসও বুঝে ফেললেন, আজ-নয়-কাল শয হতে বসেছে শীতের মহিমা, তখন যেন··· গন্ধ-স্নান করে উঠলেন বৃন্দা-বিপিন ; উল্লসিত হয়ে উঠলেন তরুরাজি, এবং যেন গা মাজতে বসে গেলেন লতিকারা। বিহগদের কণ্ঠে সে কি উৎকণ্ঠার গান! দিগ্‌বধূদের মুখে সে কি আনন্দিত হাসি! চন্দ্রিকা-চন্দনে অনুলিপ্ত হয়ে গেল শর্ব্বরী-শরীর। যেন পায়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল পরিমল। দল বাঁধতে লাগল মধুকর। পুলকিত হল মাকন্দ। জেগে উঠল মাধবী। বেশী কি, শ্রীমনসিজও যেন বদলিয়ে ফেললেন নিজের দেহ-রূপ।

৩৫। যদিও ষড়ঋতুর ছটি অংশই নিত্য-কমনীয় করে রাখেন শ্রীবৃন্দাবন, তবুও যেন শ্রীভগবানের ক্রীড়া সময়ের সময়োপযোগী হবেন বলেই সেই ঋতুগুলিরও অনুবৃত্তি ঘটতে থাকে,···কোথাও যথাক্রমে, কোথাও ক্রম-ব্যত্যয়ে, কোথাও বা নব নব ভাবে।

৩৬। ঋতুরাজ শ্রীবসন্তের শুভাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই নিখিল সৌভাগ্যবান ভগবান শ্রীব্রজরাজ-যুবরাজেরও হৃদয়খানি অধিকৃত হয়ে গেল অনির্ব্বচনীয় একটি প্রমোদ-রসে। এই রসেরই রসিকতায় কি চোখ ফেটে আনন্দের অশ্রু ঝরে প্রণয়ীদের ? তিনি স্থির করলেন, এমন কয়েকটি অতি বলিষ্ঠ বসন্তোৎসবলীলা রচনা করবেন, যাতে করে প্রথম দিন থেকেই···বিখ্যাত ভাবে যাঁরা অনুরাগিণী সেই সব গোকুল-কুললননাদের···পরিপূর্ণ হয়ে যাবে নিখিল বাসনা।

এই আশয়টি প্রণিধান করে বনদেবতারাও আগ্রহান্বিতা হয়ে উঠলেন এবং নব-বসন্তের আনন্দ-গন্ধে বনখানি সুরভিত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা নিজের নিজের নৈপুণ্য ফলিয়ে মহাশিল্প-কল্পনার নানাবিধ অপূর্ব্ব সুন্দর উপচারে নতুন করে সাজিয়ে তুলতে লাগলেন, বনখানিকে। একটি স্থানেই যেন জমা হয়ে যেতে লাগল সর্ব্বত্রের সৌন্দর্য্য।

চিন্ময়ী চমরীরা এলেন, লাঙ্গুল বুলিয়ে তাঁরা পরিমার্জ্জিত করে দিয়ে গেলেন বনতল। চিন্ময়ী কস্তুরী-হরিণীরা এলেন, মদগন্ধে সুবাসিত করে তুললেন বন-বাতাস। চিন্ময় বৃক্ষদের কাজ হল, বিন্দু বিন্দু ফুলের মধু ঝরিয়ে মৃত্তিকা সিক্ত রাখা। চিন্ময় অলিদল পরিবেশন করলেন সঙ্গীত, চিন্ময়ী লতিকারা··লাস্য।

এমন সময় বৃন্দাবনের পথে পথে উদ্‌ঘোষিত হল,—

"অদ্য প্রাগ-মধুবাসরে অনুষ্ঠিত হবে বসন্তোৎসব-লীলা প্রযোজনা করবেন শ্রীশ্যামরায়। মধুমদ ক্রীড়াবিশেষে তাঁর সম্প্রা আলস্য ঘটেছে। অতএব, তিনি অদ্য তাঁর সুদূরব্যাপী তেজোরাশি আপ্যায়নে দিগবধূদের শ্যামায়মানা করতে করতে স্বীয় তনু মাধুর্য্যামৃতের শীকর-বর্ষণে বিস্তার করবেন বর্ষাভ্রম। এবং সেই বিস্তা মুখেই বিধান করবেন মূর্ত্ত বসন্তোৎসব।" গোকুলের পথে পথে এ ঘোষণা হর্ষের বর্ষণ করে গেল জনতার শ্রবণে নয়নে এবং চিত্তে আর সঙ্গে সঙ্গে, গোকুলের চন্দ্রাননাদের দল, যাঁদের অন্তস্তল সহজে আকুল হয়ে ওঠে সাত্ত্বিক অনুরাগের আবেগে, তাঁদেরও চিত্ত যে উৎকণ্ঠায় কাঁপতে কাঁপতে ঘাড় উঁচু করে দাঁড়াল।

পরিজনদের নিয়ে চন্দ্রাবলী, নিজস্ব সখীদের নিয়ে রাধা এব আত্মহিতৈষিণী সহচরীদের নিয়ে শ্যামাদেবীও,···জাগ্রত মধুমদ-ক্রীড়া মত্ততায় তাঁদের সকলেরি তখন কেটে গেছে লজ্জার বাধা,·· বসন্তোৎসবের রসগ্রহণ ও শিল্পকলা-সন্দর্শনের লোভে উন্মুখী হয়ে পৌঁছে গেলেন উদ্যানে।

তাঁদের আসতে দেখে বৃন্দাদি বনদেবীরাও দ্রুত চরণে সেখানে এসে গেলেন। মহাপ্রীতিভরে তাঁদের সাজিয়ে দিলেন ষোড়শ প্রকারের বেশবাসে, এবং ভূষিতা করে দিলেন দ্বাদশ প্রকারের আভরণে। বাদ পড়ল না ফুলের গেরুয়া, পুষ্পাঞ্জন, এমন কি ফুলের ছড়িটিও।

৩৭। শ্রীকৃষ্ণ ইতঃপূর্ব্বে একদিন তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন,—

"হে প্রমদাগণ, আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে আপনাদের যাপন করতে হবে আগামিনী রজনীগুলি।"

সেই থেকে যে সকল কুমারীরা অনন্ত অভিলাষে আকুল হয়ে প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তকে অযুত কল্প বলে মনে করছিলেন, তাঁরাও সাধ্বসে স্খলিত-চরণে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন। যেন একে একে পায়ে পায়ে হেঁটে এলেন কাঞ্চনময়ী লতিকার কতকগুলি অপূর্ব্ব উদ্যান। তাঁদের আসা দেখে ঐ উপমাটিই মনে পড়ল বনদেবীদের, চন্দ্রাবলী দেবীদেরও। তাঁরা আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। আদর-ভরা ভালবাসায় বনদেবীরা তাঁদেরও সাজিয়ে দিলেন উৎসব-সাজে। সকলকে এত সাজে সাজিয়েও মন উঠল না বনদেবীদের। শেষে বৃন্দাদেবী স্বয়ং রাধাকে সাজাতে বসলেন ফুল-সাজে।

তাঁর কেশের বন্যায় তিনি ভাসিয়ে দিলেন···রাজচম্পক ; অলকাবলীতে বসিয়ে দিলেন···বকুলের বহু মুকুল ; আর সিঁথির সীমানায় দুলিয়ে দিলেন··অশোক। তারপরে সহকারের আধ-ফোটা কলিগুলি তাঁর শ্রবণে সাজিয়ে দিয়ে যখন স্তনাগ্রে পরিয়ে দিলেন বাসন্তী ফুলের মালা, তখন পুষ্প-ভূষণা রাধাকে দেখে দ্রুত রোমাঞ্চিতা হয়ে উঠলেন বৃন্দাদেবী স্বয়ং।

অন্য বনদেবীরাও তখন···'আমি এঁকে, আমি ওঁকে সাজাবো'··· বলতে বলতে অলঙ্কৃতা করতে লাগলেন চন্দ্রাবলী প্রভৃতি অন্য ব্রজাঙ্গনাদের। 'মধুমদ'-মহোৎসবের মহিমায় ব্রজাঙ্গনাদের প্রত্যেকেরই চিত্ত তখনও ছিল প্র-মুহ্যমান ; তাই বনদেবীরা প্রথমেই তাঁদের প্রত্যেকের অবয়বেই মাখিয়ে দিলেন গন্ধ-প্রণয়ি পুষ্পসার। তারপরে ঘোর কেটে গেলে, যে-সাজে তাঁদের সাজালেন সেই ফুল-সাজের প্রত্যেক কল্পনায় ভেসে উঠল তাঁদের রুচির রচনার মোহন পরিচয়।

এমন কি স-কল্পলতিকা কল্পদ্রুমেরাও তাঁদের জন্যে স্বচ্ছন্দে সৃষ্টি করে বসলেন,—রত্নালঙ্কার, কাঞ্চনময়ী শাটী, অতিবিচিত্রিত অতি-কোমল সূক্ষ্ম চীনাংশুকের উত্তরীয়-সমেত কঞ্চুলিকা, তাম্বূল, অনুলেপন এবং নানাবিধ গন্ধিনী পৌষ্পী মাল্লিকা।

এত সৃষ্টি করেও যেন তাঁদের মন ভরল না। তাই তাঁরা যেন আরো অজস্র সৃষ্টি করে বসলেন···ফিন্‌ফিনে ঝকমকে গালার কৌটোয় ভরা নানান রঙের বিলাসচূর্ণ, কস্তূরীজ পঙ্ক, ফুলের ধনুক, ফুলের বাণ, ফুলের গোলা, রত্নের পিচকারী।

এমন কি বৃন্দাদেবীর ইচ্ছাতেই, যেন কল্পবৃক্ষ-দ্বারমুখেই সানন্দে প্রাদুর্ভূতা হয়ে গেলেন সঙ্গীতক-নিগমকলা-কৌশলাচার্য্যশ্রেষ্ঠা বরণীয়া মাতঙ্গী দেবী। সঙ্গিনীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন, নানা বীণায় যাঁরা প্রবীণা, প্রণয়িজনের যাঁরা সহচরী। তিনি এলেন আর যেন তাঁর কৃপাতেই স্ত্রীবেশে প্রকট হলেন···মূর্ত্তিমান রাগ-বসন্ত, সরিগমপধনি সপ্তস্বর এবং দ্বাবিংশতি শ্রুতি।

৩৮। এসেই মাতঙ্গী দেবী সাদরে ও সসঙ্কোচে এগিয়ে গেলেন বৃষভানুনন্দিনীর অভিমুখে। তাঁর পদ্মজয়ী মুখের পানে চেয়ে আনন্দের আনুগত্যে তারপর যেই কিঞ্চিৎ প্রকাশ করতে যাবেন তাঁর প্রসিদ্ধ বাগ্মিতা, অমনি বনদেবী বৃন্দা বলে উঠলেন,—

"রাধে, বিশ্বাস স্থাপন করুন এঁর সঙ্গীতশিল্পে। এঁর নাম মাতঙ্গী। কিন্নরীদের ইনি অধ্যাপিকা। সঙ্গীতশাস্ত্র এবং গমকের চাতুরীতে ইনি তুরীয়া।

বসন্তোৎসবের এই যে আনন্দকৌতুক, এবং যেখানে আপনার মত আর্য্যা রয়েছেন উপস্থিত, কে না তাতে যোগ দিতে চায়? তাই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-সামগ্রী সংগ্রহ করে আপনার মনোরঞ্জনের আশায় ইনি এখানে এসেছেন। আর এঁরা এঁর সহচরী। এঁদের মত বীণায় হাত···বিরল। আর ইনি, ঐ যাঁর কেশের পুঞ্জে কাঁপছে ময়ূর-পাখার চূড়া, যিনি আম্রমঞ্জরীর সেবা দিয়ে পুষ্ট করছেন কোকিলকে, স্বভাবতঃই ঈষৎ মত্ত হলেও যিনি মেঘ-নীল, এবং স্ত্রীবেশে ঐ যিনি আপনার নিকটে এসে দাঁড়িয়েছেন—ইনি শ্রীবসন্তরাগ।"

৩৯। মেঘ-নীল কৃষ্ণাকার শুনেই বৃষভানুনন্দিনীর নয়নে জাগল দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। বেশ বুঝতে পারা গেল তাঁর অক্ষয় আনন্দের অঙ্গে লেগেছে কৌতুকের বাতাস। সরল চোখের বাঁকা কোণ দিয়ে তিনি তাঁর দিকে চাইলেন। অমনি যেন ধন্য বিগলিত হয়ে গেলেন বসন্তরাগ···অনির্ব্বচনীয় এক অন্তরেরও অগোচর কৃতার্থতায়।

[ক্রমশঃ।

ফুটফুটে বরের বায়না ভালো নয়

বিশেষজ্ঞদের মতে সুন্দর স্বামী নাকি মেয়েদের পক্ষে খুব নিরাপদ নয়। অবশ্য ফুটফুটে বরটি হোক, এ কামনা তো মেয়ে মাত্রেরই; কিন্তু পুরুষের অধিক সৌন্দর্য্য নাকি সুখী ও সফল দাম্পত্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নয়। এই মতের পরিপোষণে অভিজ্ঞজনেরা নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করে থাকেন; তার মধ্যে প্রধান হল সাতটি, প্রথম—সুপুরুষেরা সাধারণতঃ গর্ব্বী বা মদোদ্ধত হয়ে থাকেন। তাঁরা গড়পড়তা আর পাঁচজনের চেয়ে নিজেদের বেশভূষা ও প্রসাধনে অধিকতর সময় ও অর্থ ব্যয় করে থাকেন, সামগ্রিকভাবে যা সংসারের ক্ষতিকর। দ্বিতীয়তঃ—সুপুরুষ স্বামীর স্ত্রী কখনই নিশ্চিন্ত হতে পারেন না সম্পূর্ণভাবে। স্বামী একান্ত পত্নীব্রত হলেও মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি নাকি পত্নীর থেকেই যায়; কারণ আর পাঁচজন মহিলার মুগ্ধদৃষ্টি যে তাঁর নিজস্ব মানুষটিকে অনুসরণ করে ফিরছে অনুক্ষণ, এই চিন্তা তাঁকে সর্ব্বদাই পীড়ন করে, সন্দেহের একটা ছোট্ট কাঁটা তাই থেকে থেকেই খচ্‌খচ্ করতে থাকে তাঁর মনের মাঝটিতে। তৃতীয়তঃ—সুদর্শন পুরুষ নাকি কর্ম্মক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম সাফল্যের অধিকারী হয়ে থাকেন। 'সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র' এই প্রবাদ-বাক্যে একটু বেশীরকম আস্থাবান হওয়ার ফলে সুপুরুষ বা কার্ত্তিকেরা সচরাচর জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে একটু ঢিলেপনারই প্রশ্রয় দেন, পরিণামে যা সাফল্যের উচ্চচূড়ে আরোহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। চতুর্থতঃ—অনেক মানুষই দর্শনধারী চেহারার প্রতি স্বতঃপ্রণোদিতরূপেই একটা বিরূপতা পোষণ করে থাকেন নেহাৎ অকারণেই তাঁদের ভাবটা—ও কার্ত্তিকের মত চেহারা শুধু দেখাতেই যা আহা-মরি, আসল কাজের কেরামতি নাকি তাদের একেবারেই নেই। কর্ম্মক্ষেত্রে উপর-ওয়ালার যদি এই ধরণের কোন প্রেজুডিস বা সংস্কার থাকে, সুপুরুষ বেচারার উন্নতির আশা তো তখন একেবারেই মুখ থুবড়ে পড়ল, সত্যকার কর্ম্মক্ষমতা থাকলেও তার ভবিষ্যৎ তখন অন্ধকার। পঞ্চমতঃ—সুপুরুষের গৃহিণী সর্ব্বদাই নিজেকে খানিকটা পশ্চাদপটে অনুভব করেন, স্ত্রী ও স্ত্রীলোক হিসাবে যা তাঁর পক্ষে খুব তৃপ্তিপ্রদ নয়। সামাজিক মিলনক্ষেত্রেই হোক বা অপর কোন স্থানেই হোক, স্বামীর উপস্থিতিতে স্ত্রী সর্ব্বদাই ম্লান বলে প্রতীয়মানা হন, যা তাঁর আত্মপ্রসাদে বেশ বড় রকম একটি ছিদ্র করে ও যা তাঁর সুস্থ মানসিকতার পক্ষে খুব অনুকূল নয়। ষষ্ঠতঃ—সুপুরুষ ব্যক্তিমাত্রই মেয়েদের মনোযোগ বা প্রশংসার অধিকারী হয় এত মাত্রাতিরিক্তরূপেই যা তাকে নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে খানিকটা অমনোযোগী করে তোলে সচরাচর। সমাজের শোভনা ও শ্রীমতী মেয়েদের সাহচর্য্য না চাইতেই সে পেয়ে থাকে বরাবর, আর তারই ফলে নিজের স্ত্রী সম্পর্কে তার দৃষ্টি হয় নিরপেক্ষ সমালোচকের, প্রেমমুগ্ধ পুরুষের নয়, যা তার স্ত্রীর জীবনকে অনেক সময়ই দুর্ব্বহ করে তোলে। সপ্তমতঃ—সুদর্শন পুরুষ স্বভাবতঃ চারিত্রিক মানদণ্ডের দিক থেকে কিছু দুর্ব্বল হয়ে থাকে, এর কারণ রূপের মোহে মানুষমাত্রই, বিশেষতঃ মেয়েরা একটু অধিক মাত্রায়ই অভিভূত হয়ে পড়ে। মেয়েদের সহজে অধিকার করার নেশা তাই সুদর্শন ব্যক্তির অস্থিমজ্জায় জড়িত হয়ে পরে তার স্বভাবজ প্রবণতায় দাঁড়িয়ে যায়, বিবাহের পরেও তাই সে নিজেকে সংযত করতে পারে না চট্ করে; হয়ত বা চায়ও না, আর অনেক সময় তার থেকেই তার দাম্পত্য জীবনের সোনালী আকাশে দেখা দেয় অশান্তির কাল মেঘ, সতর্ক না হলে যার থেকে ঘটতে পারে চরম বিপর্য্যয়। অতএব ফুটফুটে বরটি শুনতে ভালো, দেখতেও ভালো,—কেবল ঘরকন্না করার পক্ষে বিশেষ ভালো নয়। দাম্পত্য জীবনতরীটি শান্তিতে বাইতে হলে কন্দর্পকান্তির চেয়ে সাদামাটা আটপৌরে বরটিই আমাদের ভালো। কাজেই দরকার কি বাবা ফুটফুটে বরের বায়না ধরে? তার যে মেলা ঝামেলা! সে সব ঝক্কি নেবেন না—নেবেন না—নেবেন না, যদি সোয়াস্তিতে থাকতে চান।

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বই

রবীন্দ্র আলোকে রবীন্দ্র পরিচয়

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে, আলোচ্য গ্রন্থটিও তাদেরই অন্যতম; কিন্তু নানা কারণেই কেবলমাত্র স্মারক গ্রন্থ হিসাবেই এর মূল্য ধার্য করলে চলবে না. রবীন্দ্র দর্শনের অন্তর্নিহিত বিশেষ সুরটির ব্যঞ্জনায় এই রচনা আগাগোড়া অনুপ্রাণিত, আর সেটাই এর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্র প্রতিভার আলোকে তাঁর যে পরিচয় সেটাই বিশদ ভাবে দেখানোর উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের অবতারণা। লেখক নিজের ব্যক্তিগত জীবনে বেশ কিছুদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথের সামীপ্য ভোগ করেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতাই এই রচনাটির উৎসমূল এবং এজন্যই তিনি যেটুকু বলেছেন তা আন্তরিকতায় অকৃত্রিম হয়ে উঠতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ভাবে একক ও অনন্য হলেও সর্বমানবীয় মিলনের ক্ষেত্রে যে কতটা উন্মুক্ত ও উদার ছিলেন, তারও একটা সংহত পরিচয় মেলে আলোচ্য রচনাটির মধ্যে। অসংখ্য নদী নালা খাল বিল প্রভৃতির মূল উদ্দেশ্য যেমন এক, যথা সমুদ্রাভিসারী, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার রচনা ও আলোচনারও শেষ পরিণতি সেই একের মধ্যে আত্মবিসর্জন দেওয়ায়, আর সেটুকু যথাযথ বজায় থাকাতেই তাদের প্রধান সার্থকতা। আলোচ্য গ্রন্থখানি যে সার্থক ভাবেই সেই সফল পরিণতির অধিকারী এটাই সবচেয়ে আনন্দের বিষয়। আমরা বইটি পড়ে খুসী হয়েছি একথা সানন্দেই স্বীকার করি। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। লেখক সুধীরচন্দ্র কর। পরিবেশক—ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ভেঙেছে দুয়ার

আলোচ্য উপন্যাসখানি স্বর্গত লেখকের সর্বশেষ প্রকাশিত রচনা। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে মনে হয় চিত্রনাট্যের দাবীকে সামনে রেখেই এটি রচিত, ঘটনা সংস্থানে নাটকীয়তার আভাস পাওয়া যায়, চরিত্র সৃষ্টিতেও তাই। অনাথ আশ্রমে পালিতা মাধুরী গভর্ণেসের কাজ নিয়ে এল এক খেয়ালী জমিদারের গৃহে, বাড়ীর ভেতর কত রকম রহস্যের ছায়ার আভাসে চঞ্চল হয়ে ওঠে মাধুরীর মন; কিন্তু কি এক অদৃশ্য শাসনের ইঙ্গিতে মনের কৌতূহল মনেই থাকে তার। যে ভাবে ধাপে ধাপে লেখক রহস্যের জাল বুনে গেছেন তাতে এই রচনাটিকে রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনীর পর্যায়ে ফেলাও বোধহয় অসঙ্গত নয়, অন্ততঃ পাঠকের মনে সেই ধরণের প্রত্যাশারই সঞ্চার হয়। উপন্যাসের একেবারে অন্তে সমস্ত রহস্যের গ্রন্থিমোচন করা হয়েছে, এটাও রহস্যকাহিনীরই ধারা মাফিক। পাঠকের ঔৎসুক্য টেনে রাখবার ক্ষমতা কাহিনীটি রাখে এবং এটাই তার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। লেখকের ভাষা সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। পরিশেষে একটা কথা উল্লেখ্য, কোন বিখ্যাত বিদেশী উপন্যাসের ছায়া যে বর্তমান উপন্যাসখানিকে আগাগোড়া অনুসরণ করে ফিরেছে একথা বোদ্ধা পাঠকমাত্রেরই পক্ষে অনুভব করা স্বাভাবিক। প্রচ্ছদ শোভন, অপরাপর আঙ্গিক যথাযথ। লেখক—জ্যোতির্ময় রায়. প্রকাশক—গ্রন্থপীঠ, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, দাম—দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

হিন্দুর শ্রেষ্ঠতম ধর্ম গ্রন্থ 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা,' এ যাবৎ গীতার অসংখ্য অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলোচ্য গ্রন্থখানি তার মাঝে নানা কারণেই বিশিষ্ট। শঙ্করাচার্য কৃত সটীক গীতার ভাষ্য অবলম্বনে ভক্ত চূড়ামণি রামানুজ যে বিস্তৃততর ভাষ্য প্রণয়ন করেন মূলতঃ তাহাই অনুসরণ করিয়া আলোচ্য অনুবাদখানি প্রণীত হয়েছে। গ্রন্থকার মূল গ্রন্থের ধারানুযায়ী ভাষ্যটির প্রকৃতি প্রায় অবিকৃত রাখিয়াই এই দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেছেন, শুধু ভাবান্তরিত করার জন্য যেটুকু রদবদল করা অবশ্য প্রয়োজনীয় সেটুকুই বদল করেছেন। মূল শ্লোকগুলি অবিকৃত অবস্থায় উদ্ধৃত করে পাশাপাশি তার বঙ্গানুবাদ ও সমাপ্তিতে সরলার্থ প্রকাশ করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষিত লোকমাত্রেরই অনুভবগম্য ভাষায় এই অনুবাদ কর্মটি সম্পাদিত হওয়ায় এ গ্রন্থ ধর্মজিজ্ঞাসু মাত্রেরই তৃপ্তি সাধন করবে। হিন্দুর হৃদয়রত্ন এই অমূল্য গ্রন্থের এ ধরণের একটি সহজ ও বিশদ অনুবাদ পাঠক সমাজে বিশেষ ভাবে আদৃত হবে বলেই আমরা আশা করি। গ্রন্থটির পরিচ্ছন্ন ও মূল্যবান অঙ্গসজ্জা এর মূল্য বৃদ্ধি করে তোলে। লেখক—আচার্য্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস। প্রকাশক—শ্রীবলরাম ধর্মসোপান ও শ্রীহয়গ্রীব রামানুজ দাস, খড়দহ, ২৪ পরগণা। দাম—সাড়ে সাত টাকা।

Tagore as a Humorist

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অগণ্য রচনারণ্যের ভিড়ে আলোচ্য রচনাটি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই, নানান কারণেই এই গ্রন্থটি উল্লেখ্য। কবির প্রকৃতিগত সরস বৈদগ্ধ্যই এর মূল বিষয়বস্তু। এই সরসতা বা কৌতুক-প্রবণতা কবির রচনায় ছড়িয়ে আছে প্রায় সর্বত্রই, আলোচ্য পুস্তকে অবশ্য তাঁর বিশেষ ভাবে চিহ্নিত সরস নাটিকা ও উপন্যাসাদিই আলোচিত হয়েছে। কবির প্রহসনমূলক রচনাগুলির বেশ একটা সুসম্বদ্ধ পরিচয় দিয়েছেন লেখক। সংক্ষেপে একটা ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন আখ্যানভাগ ও চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে। লেখক বাঙালী নন, তাঁর রচনাও আত্মপ্রকাশ করেছে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ যে সত্যই বিশ্বমানবতায় মূর্ত প্রতীক

মধুলোভী

—বিমল হোড়

প্রকৃতি

পার্ব্বত্য

—সুব্রত পত্রনবীশ

তাজমহল

—নারায়ণ সাহা

জল-প্রাসাদ (উদয়পুর

—চঞ্চল মিত্র

নাগা-যুবক
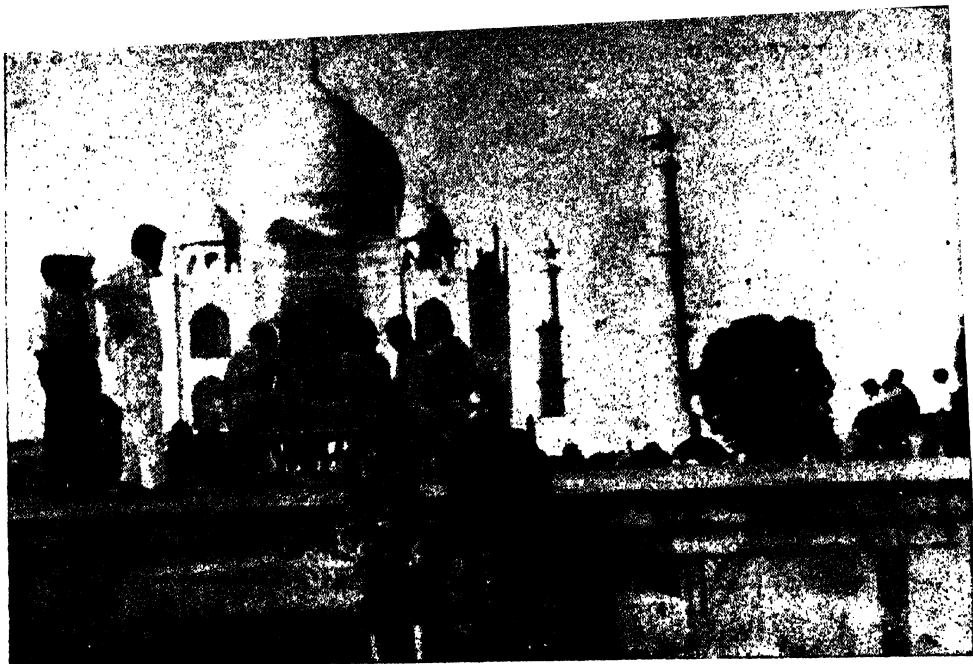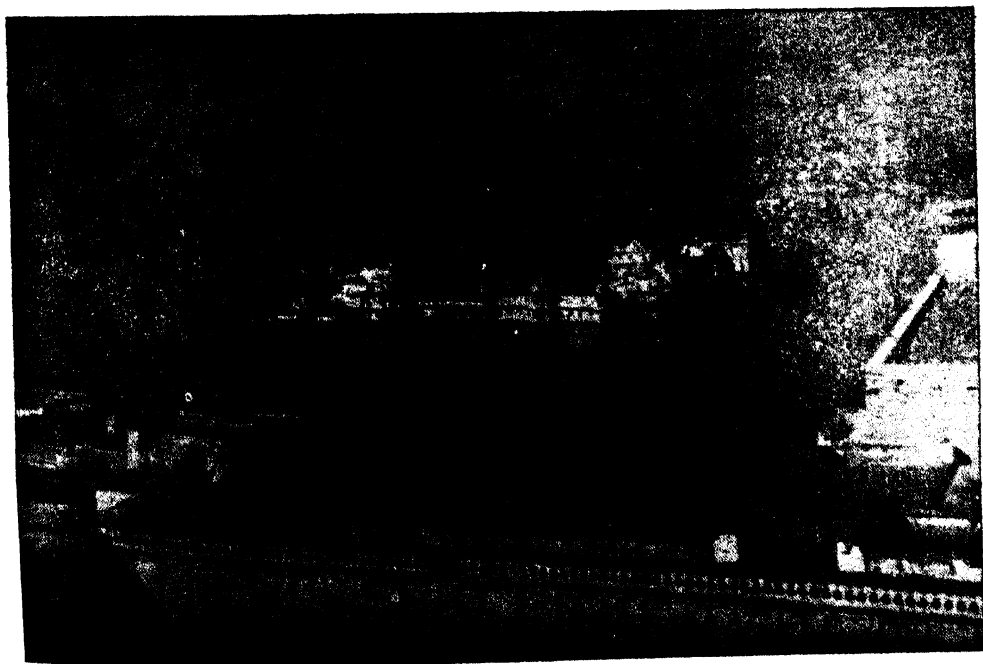
ছিলেন, এ ধরণের রচনা ও আলোচনাদি দ্বারা সেটাই যেন বিশেষ করে উপলব্ধিগোচর হয়। গ্রন্থটির আঙ্গিকও ত্রুটিহীন। লেখক—আর. এন. লাখোটিয়া, প্রকাশক—আশা পাবলিশিং হাউস, আমেদাবাদ—১৪। দাম—তিন টাকা।

রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়

বিশ্বকবির পুণ্য জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যে সব রবীন্দ্র স্মারক ও বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থাদি প্রকাশ লাভ করেছে আলোচ্য পুস্তকটি তাদেরই অন্যতম। গ্রন্থকার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুতীক্ষ্ণ মননশীলতার সঙ্গে রবীন্দ্র প্রতিভার একটা সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিক পরিচয় দিতে প্রয়াসী হয়েছেন আলোচ্য রচনার মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন ও কালজয়ী প্রতিভার ইতিহাস বিবৃত করতে বসে লেখক যে কোথাও মাত্রাবোধ হারা হননি এটাই বোধ করি তাঁর রচনার স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় বলবার কথা। অতিশয় পরিমিতি বোধের সঙ্গে তিনি রবীন্দ্র প্রতিভার জন্মকাল থেকে তার ধাপে ধাপে ক্রমবিকাশের অধ্যায়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, রবীন্দ্র-মানসের ক্রমবিবর্তনকেও তিনি মননশীলতায় উজ্জ্বল করেই আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও জীবনদর্শনকে সম্যক উপলব্ধিগোচর করেই তিনি কবি প্রতিভাকে কালবাহিত হয়েও কালাতিক্রমীর পর্যায়ভুক্ত করে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃতপক্ষে গভীর জীবনবোধসম্পন্নমাত্রই ছিলেন একথাও লেখক বলেননি। তিনি তাঁকে জীবন ও অরূপের সাম্যসিক্ত কথাকার হিসাবেই বর্ণনা করেছেন, বস্তুতঃ সেটাই রবীন্দ্রকাব্যের মূল কথা। পার্থিবকে আশ্রয় করে অপার্থিবকে প্রকাশ করাই রবীন্দ্র দর্শনের মূল উদ্দেশ্য, আর ভাবা ও ছন্দের মায়াবেষ্টনীতে এই বন্ধনের মধ্য হতে অবন্ধনের ব্যাকুলতাই রবীন্দ্ররচনার মূল সত্তা। রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় দিতে বসে এই মুখ্য সূত্রটিকে লেখক কোথাও বিস্মৃত হননি, আর সেজন্যই তাঁর রচনা সহজেই প্রামাণ্য বলে পরিচিতি দেওয়ার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটির আঙ্গিক সমৃদ্ধ, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—ক্ষুদিরাম দাস, প্রকাশক—বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬, মূল্য—দশ টাকা।

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সাধনায় ক্রমেই অধিকতর সংখ্যক জিজ্ঞাসু ও শিক্ষার্থীর অবস্থিতির পরিচয় পাওয়া গেলেও এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকাদির সংখ্যা মোটেই আশাপ্রদ নয়। ইংরাজী পুস্তকই এই বিদ্যা শিক্ষার পক্ষে এখনও একমাত্র না হলেও, প্রধান সম্বল, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে এ ধরণের একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থের আবির্ভাবকে কল্যাণপ্রদ বলতেই হবে। একেবারে পূর্ণাঙ্গ না হলেও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই যথাযথ ভাবে আলোচিত হয়েছে, যেমন পুস্তক নির্বাচন, গ্রন্থাগার সংগঠন এবং পরিচালনা, ক্যাটালগিং প্রভৃতি প্রাথমিক শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সবই বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। কয়েকটি ছবি ও ছক সন্নিবেশিত হওয়ায় বিষয়বস্তু আরও আকর্ষণীয় বলে প্রতিভাত হয়। দু'একটি ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বাদ দিলে বর্তমান গ্রন্থটিকে তার ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দেই পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য বলে আখ্যা দেওয়া যায়। কোন বিজ্ঞান পুস্তক বাংলাভাষায় প্রকাশ করতে হলে যে ধরণের সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়, লেখককেও তা হতে হয়েছে ; তবে তার জন্য তাঁর রচনার গতি বা প্রকৃতি বিশেষ ব্যাহত হয়নি। আমরা গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্যকামী। ছাপা, বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক মোটামুটি ভাল। লেখক—শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ, ডিপ, লিব প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—নয় টাকা।

শিক্ষা বিচিত্রা

সুপরিচিত শিক্ষাবিদ লেখকের এই সাম্প্রতিক রচনা নানা কারণেই উল্লেখ্য। শিক্ষাজগতে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী অভিজ্ঞতাকেই লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি এই গ্রন্থে। দুই জগদ্বরেণ্য শিক্ষাচার্য দার্শনিক প্লেটো ও মার্কিণ সুধী জন ডিউই সম্বন্ধীয় আলোচনার দ্বারা গ্রন্থটির সূত্রপাত করা হয়েছে। নানাবিধ সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী, যেমন শিক্ষা ও মনের মুক্তি, শিক্ষা সৃজনধর্মী, শিল্প শিক্ষার বুনিয়াদ, শিক্ষকের সামাজিক মান, স্কুল পরিদর্শকের ভূমিকা, কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রভৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে এতে। এছাড়া বিদেশের পাঠাগার ও প্রগতি এবং শিশুসাহিত্য সম্বন্ধীয় মূল্যবান রচনা ও জনসাহিত্যের সংজ্ঞা ইত্যাদি কয়েকটি আলোচনাও আছে যা সত্যই মূল্যবান। লোকশিক্ষার প্রয়োজনে বর্তমান গ্রন্থটি প্রামাণ্য বলেই গৃহীত হওয়ার যোগ্য। প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক মূল্যবান সংযোজন। অঙ্গসজ্জা রুচিস্নিগ্ধ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

চন্দ্র চকোর

আলোচ্য উপন্যাসখানির লেখক সাম্প্রতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে অচেনা নন, তাঁর সর্বাধুনিক এই রচনা নানা কারণেই বিশিষ্ট। অত্যন্ত সহজ ও মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে বলা কাহিনীটি সহজেই পাঠকের মনে স্থান করে নেয়। কাহিনীর নায়ক এক ফিল্মষ্টার, যশ ও অর্থে মণ্ডিত যার জীবন, অসংখ্য রোমান্সের যে একচ্ছত্র নায়ক রূপালী পর্দার এপারে ও ওপারে—সেই জীবনে দেখা দিল একটি সাধারণ মেয়ে। একদিন হঠাৎই ভালবাসল সে জনগণনন্দিত নায়ককে, সহজ অকৃত্রিমতায় দোলা লাগাল তার আপাত কঠিন চিত্তেও। অত্যন্ত মধুর একটি প্রেম কাহিনী গড়ে উঠেছে উপরোক্ত আখ্যানটুকুকে অবলম্বন করে। মানব হৃদয়ের চিরন্তন দুর্বলতা প্রেম, আর তাই তাকে ঘিরেই চলে মানুষের শত সহস্র স্বপ্নের জালবোনা বুঝি নিজেরও অজ্ঞাতসারে। পাপিয়ার তরুণ জীবনেও তাই দেখা গেল সব কিছু হিসাব নিকেশ সব কিছু বিচার বুদ্ধি, বিপর্যস্ত হয়ে গেল এই একটি বস্তুর মুখোমুখি হয়ে গিয়ে। তার হৃদয়ে প্রেমের দীপ জ্বললো সংগোপনে, আর সমস্ত জীবন সেই দীপটি অনির্বাণ জ্বালিয়ে রাখার ব্রতকেই শিরোধার্য করে নিল সে। কাহিনীর মধুর বিয়োগান্ত পরিণতির যে ইঙ্গিত দিয়ে লেখক পরিসমাপ্তির রেখা টেনেছেন তাতে সামগ্রিক ভাবেই তাঁর রচনার মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে। অত্যন্ত সহজ ও সময়োচিত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে লেখক নরনারীর চিরপুরাতন হৃদয়বৃত্তির যে নিপুণ ছবিটি এঁকেছেন তা সত্যই বড় মনোহর বড় হৃদয়গ্রাহী। সহজ সুরে গভীর কথা বলতে পারাটাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা কঠিন, বর্তমান কাহিনীর রচয়িতা তাতে অপারগ

অনন্য হয়ে উঠতে পেরেছে। গ্রন্থটির ছাপা বাঁধাই ও প্রচ্ছদ ত্রুটিহীন। লেখক—বারীন্দ্রনাথ দাশ, প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—চার টাকা।

অনন্যা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সাম্প্রতিক উপন্যাস অনন্যা। লেখক স্বনামধন্য সাহিত্যিক, তাঁর শৈলী বা শক্তি সম্বন্ধে নূতন করে কোন পরিচয় দিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র, শুধু এটুকুই বলা চলে যে তাঁর বিস্ময়কর রূপে আকর্ষণীয় লেখনীর অপরাজেয় মহিমা বর্তমান উপন্যাসটিতেও সম্পূর্ণ বজায় রয়েছে। অচিন্ত্যকুমারের যা প্রধানতম বৈশিষ্ট্য সেই দীপ্তোজ্জ্বল সংলাপই আলোচ্য গ্রন্থখানিরও সর্বোত্তম সম্পদ। বাচন ভঙ্গীর যাদুতেই লেখক পাঠকের মন এমন ভাবে কেড়ে নেন যে, আর সবই তার কাছে গৌণ হয়ে প্রতিভাত হয়। নারী মনের সহজ ও সর্বগ্রাসী আকাঙ্খার সফল পরিণতি বড় মধুর হয়েই ফুটে উঠেছে। নায়িকা বীথির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মসমর্পণ এই দুটি বস্তুই আলোচ্য কাহিনীর প্রধান বক্তব্য এবং সেটা লেখকের নিপুণ চয়নে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আন্তরিকতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটি আকারে ছোট হলেও প্রকারে বৃহৎ, গভীর ও নিটোল এক তৃপ্তির স্বাদ সহজেই এনে দেয় পাঠক মননে। আমরা পুস্তকটিকে সানন্দ স্বাগত জানাই। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। প্রকাশক, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—আড়াই টাকা।

সে তো আজকে নয়

আলোচ্য কাহিনীটি একটি স্মৃতিচিত্র, প্রায় অর্ধশতাব্দী আগের থেকে পরবর্তী দশ পনেরোটা বছর ব্যাপী লেখকের ব্যক্তিগত জীবনে যে সব ঘটনা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল তারই এক মালা গেঁথে সাজিয়েছেন তিনি। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জীবন চিত্র হলেও নিপুণ গ্রন্থন কৃতিত্বে আখ্যানভাগ কৌতূহলোদ্দীপক; মাঝে-মাঝে প্রাতঃস্মরণীয় কয়েকজন মানুষের দেখা মেলে, সেও লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসূত্রে, তবুও সে সব অংশগুলি বেশ আকর্ষণীয়। লেখকের ভঙ্গী বৈঠকী, কিন্তু কষ্টকল্পিত রসিকতার ধারা অবিরাম অনুসরণ করায় মাঝে মাঝে তাঁর বক্তব্য বড়ই ক্লান্তিকর বা বোরিং হয়ে ওঠে। দীর্ঘ প্রবাস জীবনের যে সব বর্ণনা আছে তাও অতি নাটকীয় ভাবে দুষ্ট, তা না হলে দু একটি স্থান বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিলো। পুস্তকটির প্রথমাংশে লেখকের ছবি দেওয়ার কোন সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম হল না, যদিও ছবি দুটির ছাপা ভালই। প্রচ্ছদ শোভন, অপরাপর আঙ্গিক ভাল। লেখক—এস, জি, মজুমদার। প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ভারতীয় সঙ্গীতের কথা

ভারতীয় সঙ্গীতের এই ক্রমবর্ধমান বিকাশের দিনে সে সম্বন্ধে প্রামাণ্য কোন পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করে থাকেন। বিক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকটি রচনার দেখা মিললেও একখানি গ্রন্থের মাধ্যমে তার প্রতি সম্যক পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস বোধ হয় এই প্রথম, এইদিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থখানির রচয়িতা সত্যই ধন্যবাদার্হ। বর্তমান গ্রন্থে ভারতীয় সঙ্গীতের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, বাংলা ভাষায় লিখিত বলে বিশেষ করে বাঙালী পাঠকের সুবিধার্থে বাংলা সঙ্গীত ও সঙ্গীতকারগণ এতে প্রধান ভূমিকার অধিকারী। অবশ্য এই একদেশদর্শিতার একটি মহৎ সুফলও লক্ষণীয়; তা হল বাঙালীর সঙ্গীতানুরাগ ও সে-ক্ষেত্রে তার পারদর্শিতার পরিচয় সম্পর্কে পাঠক সমাজকে যথোচিত রূপে অবহিত করে তোলা। গ্রন্থকারের ভাষা সহজ ও বক্তব্য আন্তরিক হওয়ায় তাঁর রচনা সহজেই হৃদ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। কেবলমাত্র রাগসঙ্গীত বা তদাশ্রয়ী সঙ্গীতের কথাই আলোচিত হয়নি, বাংলার লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কেও গ্রন্থশেষে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে যা এই গ্রন্থের মূল্যমান বর্ধিত করে। সঙ্গীত শিক্ষার্থী ও সঙ্গীতজিজ্ঞাসু এই উভয়বিধ পাঠকের কাছেই বর্তমান গ্রন্থটি সমাদর লাভ করবে বলেই আমরা আশা করি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—প্রভাতকুমার গোস্বামী, প্রকাশক—বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

উপন্যাস বিচিত্রা

আলোচ্য গ্রন্থটি এক উপন্যাস সংকলন, তিনটি বিভিন্ন উপন্যাস গ্রথিত হয়েছে এতে। প্রথমভাগে যে উপন্যাসটি স্থান পেয়েছে আকারে সেটিই দীর্ঘতম, পূব বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী। বৈষ্ণবী আখড়ায় নতুন মোহান্ত এল নিতু গোঁসাই। সেই গ্রামেরই আরো পাঁচটা আখড়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নিজের আখড়াকে স্থানীয় অধিবাসীদের চোখে বড় করে তুলতে মত্ত হয়ে উঠল সে, আর কিয়দংশে সফলও হোল। এমন সময় পড়শিনী ললিতা এলো তার জীবনে, মধুর ভাবের সাধক নিতু গোঁসাই বুঝি পেল সত্যকার মধুর রসের আস্বাদ, ললিতা হল তার ললিতা সখী। মন দেওয়া-নেওয়ার খেলায় মেতে উঠল সে। কিন্তু ললিতা যেদিন অশ্রুরুদ্ধ চোখে এসে তাকে জানালো যে সে অন্তঃসত্বা তখনই গোঁসাইয়ের ভাবের ঘোর কেটে গেল, অনুগতা প্রেমিকাকে বর্জন করে চোরের মতই মুখ লুকিয়ে পালিয়ে গেল সে রাতের অন্ধকারে। নর-নারীর অবৈধ আসঙ্গলিপ্সার স্বাভাবিক পরিণতিটুকুই দেখাতে চেয়েছেন লেখক এই কাব্যধর্মী কাহিনীটির মাধ্যমে এবং তাঁর সে প্রয়াস একান্ত নিষ্ফলও নয়। চরিত্রগুলি স্পষ্ট ও স্বাভাবিক; কিন্তু কোন পরিপূর্ণতার আভাস নেই তাদের মধ্যে। লেখকের শৈলী সহজ ও সরল যা এই অত্যন্ত সাধারণ বিষয়বস্তুকেও একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। এর পরের উপন্যাস দুটিরই বিষয়বস্তু প্রেম, তবে শেষেরটি যেমন অতি রোমান্টিজমের ভারে ভারাক্রান্ত প্রথমটি তা নয়। বাচনভঙ্গীর বলিষ্ঠতায় দুটিই সুপাঠ্য, তাদের গতিও নাটকীয়তায় ভরা। অবসর বিনোদনের জন্য দুটিই রমণীয় বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য, তাছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্যই এদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা এই উপন্যাস সংকলনটির সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখকবৃন্দ—ভারতপুত্রম্, এ ডি বাদশা ও মুসাফির। পরিবেশক—ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা।

কয়েকটি অধ্যাত্মমূলক রচনা একত্র সংগৃহীত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান গ্রন্থখানি। লেখিকা সাহিত্যে নবাগতা নন, এর আগে তাঁর কয়েকটি গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাসাদি প্রকাশিত হয়েছে এবং তা পাঠকের স্বীকৃতিও আদায় করে নিয়েছে। দিব্য বা সাধু-সন্তদের জীবন ও জীবনবেদ সম্বন্ধে যেটুকু অভিজ্ঞতা তিনি নিজের জীবনে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, আলোচ্য পুস্তকে তাই বর্ণিত হয়েছে। তাঁর রচনারীতি আন্তরিক ও সাবলীল, জীবনকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখার এক প্রামাণ্য দলিল। দুর্ভাগ্য ও দুঃখের ছায়া যে মানুষের আন্তর উপলব্ধিকে তীক্ষ্ণতর করে তোলে, সত্য সুন্দর শিবের প্রতি তাকে চালিত করে, তারই মধুর ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনায় তাঁর রচনাটি অনুরণিত। আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। লেখিকা—জ্যোতির্ময়ী দেবী। প্রকাশক—ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

রবীন্দ্র প্রবাহ

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী স্মারক সংকলন গ্রন্থগুলির মধ্যে আলোচ্য পুস্তকটি নানা কারণেই বিশিষ্ট। এর প্রধানতম বৈচিত্র্য এই যে, বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী এই ত্রিবিধ ভাষাতে রচিত রচনাই স্থান লাভ করেছে এতে। বাংলা বিভাগের উল্লেখ্য রচয়িতাদের মধ্যে আছেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অসিতকুমার হালদার, ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বাসব ঠাকুর প্রভৃতি। এঁরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথের বিশাল প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। ইংরাজী বিভাগটির সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অংশ সুনীলকুমার বসু লিখিত, "রবীন্দ্রনাথ এ্যাণ্ড হিউম্যানিজম" নামীয় প্রবন্ধ, রবীন্দ্র জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাঁর রচনার অনুবাদ প্রভৃতিও এই বিভাগের অন্যতম আকর্ষণ। হিন্দী বিভাগে উল্লেখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন ডা: হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, সুমিত্রানন্দন পন্থ, বিশম্ভরনাথ পাণ্ডে, মন্মথনাথ গুপ্ত এবং শান্তা পাণ্ডে। এছাড়া এতে আছে রবীন্দ্র রচনার অনুবাদ ও রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে লেখা, কয়েকটি কবিতা। সংকলনটি সর্বতোভাবেই সার্থক, সম্পাদন কৃতিত্বের পরিচয়ে সমুজ্জ্বল। এরূপ একটি গ্রন্থের মূল্য এত অল্প হওয়া সত্যই এক আনন্দপ্রদ বিষয়। প্রচ্ছদ ও অপরাপর আঙ্গিক মোটামুটি ভাল। সম্পাদক —তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী, প্রকাশক—রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন সমিতি, হুইলারস্ বিল্ডিং, ১৫, এলগিন রোড, এলাহাবাদ। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

রমণীয় ক্রিকেট

শীতরসিক এবং ক্রিকেট-রসিকদের নিকট সুসংবাদ—ক্রিকেট সম্বন্ধে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর দ্বিতীয় গ্রন্থ—'রমণীয় ক্রিকেট'। 'রমণীয় ক্রিকেটের' মধ্যে ক্রিকেটের মহিমা নিয়ে নানা সরস ও তাত্ত্বিক আলোচনা আছে (যেমন 'চায়ের পেয়ালায় ক্রিকেট', 'খেলার রাজা' ইত্যাদি) যার বৈদগ্ধ্য পাঠককে মুগ্ধ করবেই, তেমনি আকৃষ্ট করবে ক্রিকেটের নানা সংবাদ ও সমস্যার বিবরণ এবং ক্রিকেটের মধ্যে জাতীয় চরিত্রের বিকাশের উপাদেয় ও তথ্যপূর্ণ বর্ণনা (যথা ক্রিকেট-কাহিনীতে সমৃদ্ধ এই পুস্তকে বাংলার ক্রিকেট রচনার পরিচয়পূর্ণ একটি চমৎকার লেখা আছে। বইটির অতীব আনন্দদায়ক অংশ হোল খেলার মাঠে মেয়েদের অংশ নিয়ে লেখা কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা— 'রমণীয় ক্রিকেট', 'নাতি রমণীয় ক্রিকেট', 'ক্রিকেটারের বউ'। ক্রিকেট লেখা যে রসের কোন্ স্তরে উঠতে পারে এ লেখাগুলি তারই দৃষ্টান্ত। এ ছাড়া গ্রন্থের সর্বশেষ অংশে মিলবে ক্রিকেটের অতিশয় রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা—১৯৬০ সালের অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্রিসবেন টেস্টের কথা—যে টেস্টকে অবিসংবাদিতরূপে 'গ্রেটেস্ট টেস্ট' বলে স্বীকার করা হয়েছে। এক কথায় 'রমণীয় ক্রিকেট' বাংলার ক্রিকেটের আশ্চর্যজনক গ্রন্থ, যা বাংলা সাহিত্যের বিষয়-পরিধিকে বিস্তৃত ক'রে দিয়েছে। 'রমণীয় ক্রিকেট'—শঙ্করীপ্রসাদ বসু। করুণা প্রকাশনী: ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—পাঁচ টাকা।

কাঁচা মাটি পাকা পথ

আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠাকে মূলধন করে সাহিত্য-সেবার পুণ্যকর্মে যাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করেছেন ঔপন্যাসিক শ্রীদীপেন রায় তাঁদেরই একজন। এবং তাঁদের মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখের অধিকারী। আলোচ্য উপন্যাসটিই লেখক সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণার সত্যতা প্রমাণ করে। শিক্ষা ও আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীভুক্তদের তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে সত্যি সত্যিই বঞ্চিত করা যায় কি না, লেখক সেই প্রশ্নই এখানে সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন, কয়েকটি ঘটনা ও চরিত্রের মাধ্যমে। লেখকের রচনাশৈলী বর্ণনভঙ্গী এবং চরিত্রবিন্যাস যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। লেখকের সংলাপ যোজনা, ঘটনা সৃষ্টি, এবং বিন্যাস চাতুর্য নৈপুণ্যের পরিচয়বাহী। লেখকের বলিষ্ঠ দৃষ্টি ভঙ্গী, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি দৃঢ়তা এবং সুক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি সাধুবাদের দাবী রাখে। লেখকের ভাষা মনোরম, তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট, রচনার গতি কোথাও শ্লথ নয় বা কোথাও পাঠকের মন বাধাপ্রাপ্ত হয় না। সর্বোপরি গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে লেখকের পরম দরদী সহানুভূতিশীল মনোভাবটিই ফুটে উঠেছে। প্রকাশিকা, শ্রীমতী অমিতা বসু, ৩১, হরিনাথ দে রোড (স্যুট ডি-৩১), কলকাতা—৯। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

রূপকথার সাজি

আলোচ্য বইটি ছোটদের এক গল্প সংগ্রহ, রূপকথা জাতীয় মোট নয়টি গল্প একত্র গ্রথিত করে ছোট ছোট পাঠক-পাঠিকার সামনে এক মনোরম সাজি সাজিয়ে এনেছেন লেখিকা। গল্পগুলি সুন্দর, প্লট শিশুমনোহারী, অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে বিবৃত কাহিনী শুধু এর ক্ষুদে ক্ষুদে শ্রোতাদেরই মুগ্ধ করবে না, বয়স্করাও যথেষ্ট আনন্দ পাবেন পড়ে। বিশুদ্ধ গদ্যরীতি অনুসৃত হয়েছে ভাষার ক্ষেত্রে, মনে হয় চলিত ভাষায় লেখা হলে এগুলির আবেদন আরও বৃদ্ধি পেতো। বইটির প্রচ্ছদ সুন্দর, অপরাপর আঙ্গিক যথাযথ। লেখিকা—সুনন্দা ঘোষ, প্রকাশক—ভারতজ্যোতি প্রকাশনী, ৩০ রাখালদাস আঢ্য রোড, কলিকাতা-২৭। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষবাবু আশা করেছিলেন, তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে বাইরে থেকে ভারত আক্রমণ করলে ভারতের জনগণ, বিশেষতঃ তাঁর ভক্ত লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে, একটা বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থান ঘটবে, এবং এইভাবে তাঁর বিপ্লব প্রচেষ্টা সফল হবে। কিন্তু বৈপ্লবিক সংগঠনও ছিল না, আর আগষ্ট বিপ্লবের দেশজোড়া অসংগঠিত লড়াইয়ে প্রচণ্ড মার খেয়ে জনগণ তখন হাঁপাচ্ছিল। তার ওপর গান্ধী-কংগ্রেস, বিপ্লবী দাদারা, কমিউনিষ্ট দল, —সকলে একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এবং বিপ্লবের বিরুদ্ধে দেশজোড়া প্রচার চালাচ্ছিলেন। তারও ওপর ছিল তাঁর আজগুবী ঘোলা আইডিয়া,—গান্ধী-কংগ্রেসের ওপর ভক্তি এবং তার প্রচার,—যার নিদর্শন আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম নেহরু ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড প্রভৃতি।

তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বহরও কম ছিল না,—তিনি নাকি জাপানী সৈন্য নিয়ে ভারত আক্রমণ করতে আসছেন,—এবং দেশটাকে জাপানের হাতে তুলে দিয়ে ফ্রান্সের পেতাঁর মতন জাপানীদের তাঁবেদার-রূপে ভারতের বুকে ফ্যাসিষ্ট শাসন কায়েম করতে আসছেন। তাই কমিউনিষ্টরা তাঁকে ট্রেটর বোস আখ্যা দিয়েছিল।

কিন্তু বিপ্লবী দাদাদের তাঁর বিরোধিতা করার কোন সঙ্গত অজুহাতই ছিল না। নিজেদের বিপ্লব-বিরোধী গান্ধীপন্থী আদর্শই তার মূল। আজ "বিপ্লবী মহানায়ক" বলে যে রাসবিহারী বসুর স্মৃতি-দিবসে তাঁরা বক্তৃতা করে জনগণকে বুঝিয়ে দেন, তাঁরাই সেই বিপ্লবী মহানায়কের আদি ও অকৃত্রিম সগোত্র,—সেই বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুই যে ছিলেন সুভাষবাবুর friend, philosopher and guide, একথাটা যেন চাপা পড়ে গেছে।

আজ এ কথাটাও সকলেই জানে যে সুভাষবাবু জাপানী ফৌজের ভারতে প্রবেশের বিরোধীই ছিলেন এবং তাঁর পিছনে জাপানী ফৌজ ভারতে প্রবেশ করেনি। এ বিষয়েও যে রাসবিহারী বসু ছিলেন তাঁর সমর্থক এবং পরামর্শদাতা, এটাও বোঝা কঠিন নয়। অনেকে বলে থাকেন, এই কারণেই জাপান তাঁকে পুরোপুরি সাহায্য দেয়নি। প্রকৃত কথা, ভারতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আশা তিনিও করেছিলেন, সুভাষবাবুর ইতিহাস এবং বিশ্বাস থেকেই। সুতরাং আর যে-ই সুভাষবাবুর বিরোধিতা করুক,—রাসবিহারীর আদি সগোত্র বিপ্লবী দাদাদের বিরোধিতার কোন সঙ্গত বা প্রশংসনীয় কারণই ছিল না।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিপ্লবী দাদারা আমাদের শত্রুর শত্রুর কাছে সাহায্য নিতে গিয়েছিলেন,—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সুভাষবাবুও সেই চেষ্টাই করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়,—বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্যে, বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লব প্রচারের জন্যে, এমন কি তুর্কী সুলতানের জেহাদী ফতোয়ার সুযোগ নিতেও ভারতীয় বিপ্লবীরা পিছপাও হননি,—আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সুভাষবাবু ও রাসবিহারী বসু একটা আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতে সফল হয়েছেন। যাদুদা তাঁর বইয়ে (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি) বলেছেন, তাঁরা জার্মাণ ফৌজ ভারতে আমদানী করতে চাননি,—সুভাষবাবুও জাপানী ফৌজ ভারতে আমদানী করতে চাননি তিনি অপরাধটা করলেন কোথায়?

আসলে বিপ্লবী দাদাদের মতিগতির পরিবর্তনই যে তাঁদের বিরোধিতার কারণ,—সে পরিচয়ও ঐ বইটাতেই পাওয়া যাবে। তিনি ঐ বইয়ে তাঁর বিপ্লবের চতুরঙ্গ বাহিনীর প্ল্যানের কথা বহুবার বিজ্ঞাপিত করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত বলেছেন,—তাঁদের বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কারণ, তাঁদের পিছনে সংগঠিত গণশক্তি ছিল না। চমৎকার কথা। কিন্তু তারপরে তিনি বলেছেন, গান্ধী-কংগ্রেসের কৃপায় যখন জনগণ স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, তখন বিপ্লব এবার সফল হবেই,—সনাতন বিপ্লবীদের কাজ এখন শুধু গান্ধী-কংগ্রেসের পিছনে দাঁড়ানো। তাই তিনি আগষ্ট-বিপ্লবকে উচ্ছসিত ভাষায় অভিনন্দিত করেছেন। গান্ধী—কংগ্রেসের সমর্থনে সেই বিপ্লবের আদর্শ আর তার পরিণতির কথা আজ সর্বজনবিদিত ইতিহাস। কিন্তু সে বিপ্লবে এটা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে, ভারতের জনগণের সংগ্রামী-প্রকৃতি, শক্তি, মনোবল, সবই ছিল সন্দেহাতীতরূপে সুপরিণত,—শুধু সংগঠিত বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাবে সেই বৈপ্লবিক গণশক্তির অভ্যুত্থান বিপ্লব-বিরোধী গান্ধী-কংগ্রেসের সমর্থনে একটা বিরাট অন্ধ গণবিক্ষোভমাত্রে পর্যবসিত হল এবং বৃটিশ সরকারের অবাধ, বেপরোয়া বিপুল নির্যাতনে ব্যর্থ হল।

মহাত্মাজী সম্বন্ধে যাদুদার আইডিয়াটাও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর ঐ বইয়ে লিখছেন: "১৯২১ সালে তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা কয়েছিলাম। তিনি বৃটিশ-সম্পর্কবিহীন পূর্ণ-স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করতে রাজী হননি। তিনি চাইতেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন...১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী পাশ হয়। মহাত্মাজী ১৯৩০ সালে স্বাধীনতা আনার আন্দোলন করেন। কিন্তু ১৯৩১-৩২ সালে বিলাতে গোল-টেবিল বৈঠকে গিয়ে চেয়ে বসলেন

পূর্ণ-স্বাধীনতার সারাংশ (Substance of independence.)। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় যুদ্ধ বাধলে তিনি বিনাসর্তে ইংরেজকে সাহায্য করার পক্ষে ছিলেন। ১৯৪২ সালে মার্চ মাসে ক্রীপস্ যে প্রস্তাব আনেন তা দেখেই প্রত্যাখ্যান করেন।······

"(বর্মা দখলের পর) বলতে গেলে বলা যায় জাপানীরা ভারতের একদম দ্বারদেশে উপস্থিত। ভারত আক্রমণ তার পক্ষে আর কল্পনার বিষয় নয়। মহাত্মা গান্ধী এইবার শুভক্ষণ বুঝে "ভারত ছাড়ো" রব তুললেন।···ইংরেজ রাজত্ব ভারত থেকে যায় যায়। "ভারত ছাড়ো" রব এ অবস্থায় তাঁর সারাজীবনের সাধনের প্রয়োজনে হৃদয়ের মধ্যস্থল হতে উত্থিত হল।"·····

"মহাত্মাজীকে আমি বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে তুলনা করি।···রাজা হরিশ্চন্দ্র এক সময়ে উদরী রোগে আক্রান্ত হন। বরুণ দেবকে তুষ্ট করতে পারলে তবে তিনি রোগমুক্ত হবেন।···এই বিপদে পড়ে তিনি বরুণের উদ্দেশে নিজের পুত্রকে অর্ঘ দেবেন সঙ্কল্প করেন। কিন্তু পুত্র-বাৎসল্যে নিজের কথা রক্ষা করতে পারলেন না।···তাই তিনি পরের একটি ছেলে বিশ্বামিত্র-শিষ্য দেবরাতকে এনে নরমেধ যজ্ঞ করেন। বিশ্বমিত্র···রাজাকে যথোচিত শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত রাজ্যহীন, স্ত্রী-পুত্র থেকে বিচ্যুত ও নগরান্তবাসীর ভৃত্য—শ্মশানচারী করে ছাড়লেন। রাজ্যে কিন্তু তাঁর লোভ ছিল না, স্পৃহাও ছিল না।···তাই হরিশ্চন্দ্রকে শুধরে তাঁরই হাতে রাজ্য পুনঃসমর্পণ করে নিজ শান্তিপূর্ণ দীন আশ্রমে ফিরে এলেন।

"গান্ধীজীও ইংরেজকে শোধরাতে চাইছিলেন। তাকে সত্যই তাড়ানো তাঁর কাছে প্রাণের জিনিস হতে পারে না। কিন্তু ইংরেজেরা শোধরাবার পথে যাচ্ছিল না বলেই "ভারত ছাড়ো" বলতে হয়েছিল।···"

বাঁচা গেল। যাদুদার স্বচ্ছ বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় পাওয়া গেল, এবং বহু-বড়ায়িত "কুইট ইণ্ডিয়া" মন্ত্রশক্তির একটা বৈপ্লবিক বিশ্লেষণও পাওয়া গেল। "গান্ধীবাদের বৈপ্লবিক ভূমিকা"!

তারপরে '৪৪ সালে মহাত্মাজীর বিনাসর্তে মুক্তির পর দেখা গেল, একদিকে ইংরেজ কোহিমা থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজকে হটাচ্ছে ভারতবাসীর সহায়তার জোরে এবং বার্মা থেকে জাপানীদের হটিয়ে নিজেরা আবার গিয়ে চেপে বসছে বর্মীদেরই সাহায্যে,—আর এক দিকে মহাত্মাজী সারা দেশ জুড়ে প্রচার করছেন, আগষ্ট বিপ্লব আমার কাজও নয়, কংগ্রেসের কাজও নয়, ওর জন্যে দায়ী সরকারী নির্যাতন,—এবং সঙ্গে সঙ্গে সুগ্রীবদোসর (জয়প্রকাশ নারায়ণ) প্রচার করছেন, এখন দেশ আর বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত নয়। সুতরাং এটা বেশ বোঝা যায় যে মহাত্মাজীকে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়ার পিছনে ইংরেজের প্ল্যান ছিল- বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ন্যূনতম সম্ভাব্যতাকেও বানচাল করার জন্যে বিপ্লব-বিরোধী শক্তিকে কাজে লাগানো। সে কাজ হাসিল হল গান্ধী-জয়প্রকাশ-বিপ্লবীদল-কমিউনিষ্ট জোটের কল্যাণে।

* * * *

এখন আমার নিজের অবস্থার কথা। আমার ব্যবসায়ী জীবনের দৌড়ের কিছু পরিচয় আপনারা ইতিপূর্বে পেয়েছেন। এবারকার ব্যবসায়ের দৌড়ও প্রায় তথৈবচ। ব্যবসা চলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। বিনা-মিস্ত্রীতে পুরানো ফার্নিচারের ব্যবসা—নিজেই নিলামে মাল খরিদ করি, নিজেই ছুতোর মিস্ত্রী, পালিসওয়ালা, এমন কি চেয়ারের গদী-মিস্ত্রী পর্য্যন্ত। দু'বছর কাজ চালাবার পর প্রথম মিস্ত্রী রেখেছি। মাল বিক্রীর জন্যে বড়লোকের বাড়ী বা অফিসে না ঘুরলে ব্যবসা চলে না, অথচ আমার এই ক্যানভাসিং-এর বিদ্যে একেবারেই নেই—না আছে প্রবৃত্তি, না আছে সময়।

সকালে উঠে রাস্তা থেকে খোট্টাদের পিতলের ঘড়ার চা—দু'আনায় প্রায় এক গ্লাস—এনে খেয়ে কাজে লাগি—কাজের নেশায় মেতে এক একদিন সারাদিন এক নাগাড়ে কাজ করি—মাঝে দুপুর বেলা একবার হাত ধুয়ে দু'আনার একখানা বড় পাঁউরুটি গুড় দিয়ে খেয়ে নিই। একদিন এক ডেটিনিউ বন্ধু—অনন্ত ভট্টাচার্য—সকালে এসেছেন একটু আড্ডা দিতে,—এবং আমার কাজ দেখে জমে গিয়েছেন। দুপুর পর্য্যন্ত দেখে গিয়ে দেখবার জন্যেই আবার বিকেলে এসেছেন। আমি ইতিমধ্যে অনেক কাজ সেরে ফেলেছি দেখে তিনি বললেন,—এ এক নতুন ব্যাপার—এমন আর কখনো কোথাও দেখিনি। আমার নিরানন্দ মনে একটু আনন্দ হল।

কলকাতায় যখন বোমা পড়ে এবং সহর খালি করে লোক পালায়, তখন আমি নীলামে ফার্নিচার ডীলারদের বলতুম,—যেখান থেকে যত পার টাকা সংগ্রহ করে ফার্নিচার কিনে গুদামে রেখে একটা বছর বসে বসে ভাড়া গুণে যাও,—তারপর নীলামে দিয়ে বেচলেও চারগুণ টাকা উশুল হবে। তখন নীলামে মালের যেমন ভিড়, তেমনি দাম সস্তা। দু'একজন বিক্রীওয়ালা ঠিক এই ভাবেই কাজ করে আমার চোখের সামনে বড় দোকানদার হয়ে গেল—আমি এ অবস্থায় কোনো সুযোগ নিতে পারিনি—টাকা নেই।

নীলামে সুযোগ পেলে সস্তায় ২।৪টে আর্ট-কিউরিওর জিনিস কিনতুম, যা বড়লোকদের কাছে বেচতে পারলে মোটা লাভ পেতে পারতুম—কিন্তু তা-ও কখনো হয়নি। ২।৪ জন সচ্ছল গৃহস্থ বন্ধু বান্ধব নিয়েই ছিল আমার কারবার,—তাদেরই কারো কাছে অল্প লাভ নিয়ে সেগুলো বেচতে পারলেই এই মনে করে সান্ত্বনা পেতুম যে, সস্তায় একটা ভাল জিনিস যখন বেচতেই হবে, তখন সেটা বন্ধু-বান্ধবদের বেচতে পারাই ভাল।

এই রকমের ব্যবসার মধ্যে কিন্তু প্রাণপণে কাগজ পড়ি, ইউরোপ এবং ভারতের লড়াই সম্বন্ধে যথাসম্ভব ওয়াকিবহাল থাকার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করি। কাগজ কিনে পড়া সম্ভব নয় বলে কয়েকটা জায়গায় রোজ যাই বিভিন্ন কাগজ পড়ার জন্যে। এর মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির বইয়ের দোকান ন্যাশান্যাল বুক এজেন্সিতে এক গাড়ী পুরাণো "মস্কো নিউজ" এসে পড়লো এবং ওরা তা থেকে কতকগুলো সিরিয়্যাল সেট তৈরী করে বেচতে লাগলো। আমি তার এক সেট কিনে ফেললুম,—এবং তারপর "মস্কো নিউজের" গ্রাহক হয়ে গেলুম।

তখন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এমন জটিল যে তার সম্ভাব্য পরিণতির কথা আন্দাজ করা সহজ ছিল না,—এবং সব বুঝে উঠতেও পারতুম না। ভরসাটা সব দিক থেকে সরে এসে কমিউনিষ্ট পার্টির ওপরই সংহত হচ্ছিল, অথচ তারা যে রিফর্মিষ্ট পথেই চলছে, এটাও মনে হত এবং হতাশ হতুম। তবুও মনে মনে কল্পনা করতুম, একটা সত্যিকারের বিপ্লব যদি কোনো দিন ঘটে, তা'হলে

আর একবার দুর্গা বলে ঝুলে পড়বো—অক্ষম নিরুপায়ের সান্ত্বনা—যাকে বাঙ্গালরা বলে "আজাইয়্যা কথা।"

সর্বত্রই যুদ্ধের কথা—যেখানে যাই, যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু কথা না হয়ে অন্য কথা হয় না। আমি বলতুম, জার্মেনী যুদ্ধে হারবে। যে শুনতো, সেই মনে করতো লোকটা Pro-British—জার্মেনীর বিরুদ্ধে কথা বলাটা তখন যেন ভারতবাসীর পক্ষে unpatriotic কাজ। রুশিয়া পিছু হটছে, scorched earth policy অনুসারে সব কিছু ভেঙ্গে দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে পালাচ্ছে, নাজী সৈন্য লেনিনগ্রাড-ষ্টেলিনগ্রাড-মস্কোর দরজায় উপস্থিত,—মস্কো থেকে রাজধানী সরে গেল কাজানে,—তখনও বলি, জার্মাণরা সহরগুলো দখল করতে পারবে না, এবং যদি পারেও, তবু শেষ পর্যন্ত জার্মেনী হারবে। লোকে ভাবতো, এটা আমার অন্ধ রুশভক্তির কথা।

সিটি কলেজের প্রোফেসর হরিদাস ভদ্রের সঙ্গে নীলামে আলাপ হয়েছিল—তিনি সে সময়ে সস্তায় কিছু ভাল ফার্ণিচার সংগ্রহ করে ফেলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলেও যুদ্ধের কথা হ'ত। একদিন তিনি বললেন, "কাগজ দেখেছেন? ষ্টেলিনগ্রাড তো গেল!" আমি বললুম,—"কাগজে তার লক্ষণ তো দেখলুম না!" তিনি বললেন,—"কাল, না হয় পরশুই দেখতে পাবেন, ষ্টেলিনগ্রাডের পতন হয়েছে।" আমি বললুম,—"তাহলে আসুন, একটা বাজি রাখা যাক—পরশু বিকেলে হয় আপনি আমাকে রসগোল্লা খাওয়াবেন, না হয় আমি আপনাকে খাওয়াবো!"

তা-ই ঠিক হল, এবং "পরশু" বিকেলে বাজি জিতে তাঁকে ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে "ভূপতির দোকানে" রসগোল্লা খেয়ে ছাড়লুম। তাঁর সঙ্গে আলাপটা আরো জমে গেল।

জাপান যে ভারত আক্রমণ করতে পারে না, এ কথাও বলতুম এবং কেউ মানতো না। কলকাতায় বোমা ফেলে গেল, আর বলে কিনা জাপান আক্রমণ করবে না! আমি বলতুম, বৃটেন-আমেরিকার সামরিক শক্তি আর চীন ও ভারতের জনবল এবং মাল-মশলা একসঙ্গে যুক্ত হচ্ছে—এ অবস্থায় জাপান যতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে এবং ছড়িয়েছে তার পরে ভারত আক্রমণের মতন বড় অ্যাডভেঞ্চার তারা কখনই করবে না। যদি ইন্দোচীন-মালয়-বার্মায় সে তার শক্তি সংহত করতে না পারে, তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য।

বৌবাজারে উইলিয়মস্ লেনে পাইকারী কাঁচ-আয়নার দোকানে আমার কাগজ পড়ার একটা আড্ডা ছিল, কাজেই যুদ্ধের কথাও চলতো। তিনি বলেছিলেন, আপনার কথা ঠিক হলে আপনাকে রসগোল্লা খাওয়াবো। যখন আমার কথা ঠিক দেখা গেল, তখন বললেন, লড়াই শেষ হলে খাওয়াবো। সেটা আর ঘটে ওঠেনি। কিন্তু আমার পাল্লায় পড়ে তিনি এক সেট "মস্কো নিউজ" কিনে ফেলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বুঝলুম, কাঁচের ব্যবসাটার ভবিষ্যৎ কি রকম, তাই বোঝার জন্যেই তিনি লড়াইয়ের গতি ও পরিণতি বুঝতে চাইতেন।

ইতিমধ্যে আমার ঘরে নীলামে কেনা কিছু কুচো জিনিস এবং আর্ট-কিউরিও জমে গিয়েছিল এবং সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মার্কেটে একটা ঘর পেয়ে ঐসব জিনিস দিয়ে সাজিয়ে এক দোকান খুলে আমার ছোট ভাগ্নেকে বসিয়ে দিয়েছিলুম—রাত্রে আমিও যেতুম। আগষ্ট হাঙ্গামার সময় কলকাতায় আমেরিকান সৈন্য এসেছে, অনেকে মার্কেটে আসতো টুকটাক কিউরিও শ্রেণীর মাল সংগ্রহের জন্যে। একটা দল—৫।৭ জন প্রায় রোজ আসতো। আমার সঙ্গে তাদের আলাপ হয়ে গিয়েছিল। একদিন একজন দল ছেড়ে পিছনে পড়ে আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, আমি কিছু জিনিস কিনতে পারি কি না। কি জিনিস,—জিজ্ঞাসা করতে সে বললে, "যা চাও, সবই দিতে পারি।" ইসারায় বুঝিয়ে দিলে সব রকমের small arms তারা দিতে পারে,—যত চাই।

একটু কৌতূহল হল,—কিন্তু সামলে নিয়ে বললুম, "আমি গরীব মানুষ, আমার কি টাকাকড়ি আছে!" তারপর বললুম,—"আমি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি, আর কেউ কিনতে পারে কিনা।" সে বললে, "বেশ, কয়েক দিন পরে আমাকে বোলো।"

ভেবে-চিন্তে কয়েক দিন ধরে আগষ্ট হাঙ্গামার গা-ঢাকা কংগ্রেসী-মহলে এবং কমিউনিষ্ট মহলে খুব সন্তর্পণে খোঁজ নিয়ে দেখলুম, এ সুযোগ নিতে কেউই রাজী নয়। দুত্তোর বলে হাল ছেড়ে দিলুম, এবং আমেরিকান বন্ধুকে নিরাশ করে বিদায় করলুম।

আগষ্ট-বিপ্লবীরা যে সশস্ত্র বিপ্লব করতেও পারে, এ বিশ্বাস অবশ্য আমার ছিল না। কিন্তু ২।৪ জন ছুটকো বিপ্লবী আগষ্ট হাঙ্গামার সুযোগে বৈপ্লবিক কণ্ডূয়ন মেটাবার জন্যে কোন কোন স্থানে গোপনে হাঙ্গামার নেতৃত্ব দিতে ছুটেছিলেন, জানতুম। সরকারী অত্যাচারের কিছু সশস্ত্র জবাব দেওয়ার কাজ তাঁরা হয়ত করতে পারেন ভেবেছিলুম। সম্ভবত তাদের সম্পর্কেই হীরেন বাবু তাঁর বইয়ে লিখেছিলেন—"There was the inevitable handful of fifth columnists and political irresponsibles who wanted

to fish in troubled waters." কিন্তু আমার লোভ হয়েছিল এই জন্তে যে প্রচুর অস্ত্র কেনার সুযোগ একটা দুর্লভ ব্যাপার,—যে কেউ যদি কিনে রাখতে পারে, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

কমিউনিষ্টরা কিনলেও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রয়োজনের জন্তেই কিনতো। কিন্তু তাদের সে রকম মৎলবও ছিল না,—আর টাকার সংস্থানও তো থাকার কথা নয়! আর সংগঠনের সময় তো তারা পায়নি—মীরাট মামলার জের মেটার পর অল-ইণ্ডিয়া সংগঠন করতে না করতেই বে-আইনী হল,—লড়াইয়ের সময় গা-ঢাকা অবস্থায়, বিশেষত কংগ্রেসের প্রভাবেই যখন জনগণ প্রধানত প্রভাবিত,—কমিউনিষ্ট আদর্শে গণ-সংগঠনই বা কতটা করা সম্ভব? তাই তারা সম্ভবত তখনকার অবস্থা অনুসারে, এবং যোশীর গান্ধীভক্তির ফলেও বটে—কংগ্রেসেরই পোঁ ধরে ঐ রিফর্মিষ্ট পন্থাই অবলম্বন করে চলছিল। এই সব কথা ভেবেই আমি তাদের নীতির মনে মনে সমালোচনা করেও তাদের দিকেই ঝুঁকতুম,—কারণ কমিউনিজম ছাড়া আর কোন আশা ভরসাই আমার ছিল না। তাছাড়া, কেমন করে কি হবে, সমগ্র বিরাট জটিল অবস্থাটার কি পরিণতির ভেতর দিয়ে পথ কেটে কমিউনিষ্ট আন্দোলন অগ্রসর হবে, তা ভেবেও তো কোন কূল-কিনারা দেখতুম না। শুধু এইটুকুই নিশ্চিত বুঝেছিলুম যে, বিপ্লবের অবস্থা এবং সুযোগ এসেছিল, জনগণও প্রস্তুত ছিল,—শুধু নেতৃত্ব ও সংগঠনের অভাবে কিছুই হল না। '৪৪ সালের কোহিমা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর বিপ্লবের নামগন্ধও মুছে গেল।

আমি ইতিমধ্যেই Pat Sloan এর How the Soviet State is run বইখানা পড়েছিলুম এবং খুব ভাল লেগেছিল বলে প্রায় নিষ্কামভাবেই—কারণ প্রকাশের কোন সম্ভাবনাই ভাবতে পারিনি—বইটার মর্মানুবাদ লিখে ফেলেছিলুম। শেষ পর্যন্ত বইটা বুক এম্পোরিয়াম কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল '৪৫ সালে "সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার কাঠামো" নামে। এদিকে বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি চলেছে অভাবনীয় ধারায়। ষ্টেলিনগ্রাড সহরটা সম্পূর্ণ ধ্বংস করার পরও নাজী সেনাপতি মার্শাল পলাস আড়াই লাখ সৈন্য সহ লাল ফৌজ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে হাজার হাজার নাজী সৈন্য বলি দিয়েও শেষ পর্যন্ত সসৈন্যে বন্দী হয়েছেন,—এবং সেই যে লাল ফৌজের পাল্টা মার শুরু হয়েছে, শেষপর্যন্ত বার্লিনের পতনে তার শেষ হয়েছে। তিন বছর অবরোধের পর লেনিনগ্রাড মুক্ত হয়েছে, এবং তার পর একে একে বল্টিক ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোও মুক্ত হয়েছে।

স্বয়ং চার্চিলের মুখে উচ্চারিত হয়েছে "গ্রেট ষ্টেলিন"—সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ ষ্টেলিনগ্রাডের বীরদের সম্মানচিহ্নরূপে এক তরবারি উপহার দিয়েছেন। কিন্তু এই '৪৪ সাল পর্যন্ত ইউরোপের লড়াইয়ে একা রুশিয়াকে হিটলারের সমগ্র শক্তির সঙ্গে লড়তে হয়েছে! '৪২ সালেই পশ্চিম ইউরোপে বৃটেন-আমেরিকা কর্তৃক দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার যে চুক্তি তারা রুশিয়ার সঙ্গে করেছিল,—চার্চিলের বিশ্বাসঘাতকতায় সেটা '৪৪ সালের আগে কার্যকরী হয়নি—হিটলারের নিশ্চিত পতনের শেষ অধ্যায়ে যখন লালফৌজের হাতে বার্লিনের পতন অবশ্যম্ভাবী বলে বোঝা গেল, তার আগে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হয়নি।

এদিকে জাপানীদের যথেচ্ছাচারে জর্জরিত বর্মীদেরও ভুল ভেঙেছে, এবং বর্মী অ্যাণ্টি-ফ্যাসিষ্ট অংসানের নেতৃত্বে বর্মীদের সহযোগিতা পেয়ে বৃটেন জাপানকে তাড়িয়ে আবার বার্মায় জেঁকে বসেছে। উ বা পে প্রভৃতি বৃটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী বর্মী নেতাদের পরে বৃটেন ফাঁসিতে লটকেছে।

'৪৫ সালের গোড়ায় হিটলারের পতনের সঙ্গে ইউরোপের লড়াই শেষ হওয়ার কয়েক মাস পরে জাপানের পিছু হটাও সম্পূর্ণ হল। মালয়-ইন্দোচীনও জাপানী কবল থেকে মুক্ত হল। ওদিকে বিজয়ী লাল ফৌজ মাঞ্চুরিয়ায় আক্রমণ শুরু করলো। জাপান সাইবিরিয়ার মেরিটাইম প্রভিন্স অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগর সংলগ্ন প্রদেশ দখলের উপযোগী তোড়জোড় মাঞ্চুরিয়ায় তৈরী রেখেছিল,—ভাবেনি যে রুশিয়া কোনদিন আক্রমণ করতে পারবে, এবং তাই ডিফেন্সিভ লড়াইয়ের ব্যবস্থা করেনি। ফলে রুশ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মুখে তৃণের মতন তার সামরিক শক্তি উড়ে গেল।

কয়েকটা দিনের মধ্যে রুশিয়া কোরিয়ার সীমান্তে এবং মাঞ্চুরিয়ার বন্দর ডাইরেনে পৌঁছে গেল। অবস্থা এত কাহিল হওয়া সত্ত্বেও তোজো আত্মসমর্পণে রাজী নয়, হাজারে হাজারে জাপানী জীবন বলি দিয়েও লড়াই চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া যখন জান বাঁচানোর আর কোন উপায় নেই,—তখন আমেরিকা কোরিয়ার ধারে পৌঁছতে পারেনি, অথচ কোরিয়াও লাল ফৌজের হাতে পড়ার আসন্ন সম্ভাবনা দেখে নাগাসাকি এবং হিরোসিমায় অ্যাটম বোমা ফেলে জাপানীদের আত্মসমর্পণ ত্বরান্বিত করে।

জাপানীদের আত্মসমর্পণের পর উত্তর কোরিয়ায় লাল ফৌজ এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় আমেরিকান বাহিনী প্রবেশ করলো। এদিকে মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর চীনে মাও সেতুংয়ের চীনা লাল ফৌজ জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়ছিল এবং জাপানীদের আত্মসমর্পণের পর তারা মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনে জাপানী সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে শুরু করে দিলে। দক্ষিণ থেকে সেনাপতি চিয়াং কাইশেক হুকুম দিলেন, তাঁর প্রতিনিধিরাই জাপানীদের নিরস্ত্র করবে, কমিউনিষ্টরা অস্ত্র সংগ্রহ বন্ধ করুক। আমেরিকা জাহাজ ও বিমান দিয়ে চিয়াংএর দলকে উত্তর অঞ্চলে পৌঁছে দিলে। লাগলো গৃহযুদ্ধ, চিয়াং এবং কমিউনিষ্টদের মধ্যে। সেই যুদ্ধের শেষ পরিণতি হল চীন থেকে চিয়াং এবং আমেরিকার বিতাড়ন এবং ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে নয়াচীনের প্রতিষ্ঠা।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণতি ও স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে এই ব্যাপারগুলোর প্রভাব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত,—যেটা পরে বোঝা যাবে,—তাই এ ব্যাপারগুলো আমাদের জেনে রাখা এবং মনে রাখা প্রয়োজন।

'৪৩ সালেও জিন্না কংগ্রেসকে বলছেন, এস দু'দলে একটা আপোষ করে একযোগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রাম করি, পাকিস্তানের মূল নীতিটা মেনে নাও, যাতে সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমানের দাবীর সঙ্গে ইংরেজকে মোকাবিলা করতে হয়,—তখন কংগ্রেস বলছে, ঐ পাকিস্তানের মূল নীতিটা এমন ঘোলা এবং অস্পষ্ট যে, ওটাকে আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।

তার জবাবে রাজাগোপালাচারী কংগ্রেসকে বলছেন, বেশ তো, যদি পাকিস্থানের মূলনীতিটা ঘোলাই হয়, তাহলে ওটাকেই তার

[illegible] পরে নাও না কেন? সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমানের দাবীর জোরে বৃটেনকে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করার পর যখন আমাদের শাসন-ব্যবস্থা গড়বার সময় আসবে, তখনই তো ঐ ঘোলা অস্পষ্টগুলোর ফয়শালা করা সহজ হবে। কংগ্রেস সে কথা মানছে না।।

তারপর জাপান ভারতের দ্বারদেশে উপস্থিত দেখে মহাত্মাজী আরো টাইট হলেন—কুইট ইণ্ডিয়া সংগ্রাম হল এবং ইংরেজ সেটাকেও অবহেলে ম্যানেজ করে ফেললে। তারপর আজাদ হিন্দ ফৌজের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করার জন্যে সরকার যখন মহাত্মাজীকে বিনা সর্তে মুক্তি দিলে, এবং বিপ্লব প্রচেষ্টার যুগই শেষ হয়ে গেল, তখন,—'৪৪ সালের শেষে, নতুন বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের কাছে মহাত্মাজী আর একবার দরবার করলেন,—হয় আমাকে জেলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরামর্শ করতে দিন, না হয় আপনার সঙ্গেই সাক্ষাতের অনুমতি দিন আলোচনার জন্যে। চিঠিতে একটা প্রস্তাবও লিখে পাঠালেন, যদি যুদ্ধ শেষে আমাদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়, এবং বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী একটা জাতীয় সরকার গঠন করতে দেওয়া হয়, তাহলে আমি যুদ্ধশেষ পর্য্যন্ত আপনাদের যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য এবং পূর্ণ সহযোগিতার জন্যে ওয়ার্কিং কমিটীকে পরামর্শ দোব। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ত্তমান ব্যবস্থা চলবে, শুধু এইটুকু আপনাদের দেখতে হবে যে, যুদ্ধের ব্যয়রূপে ভারতের ঘাড়ে আর ঋণের বোঝা না চাপে।

লর্ড ওয়াভেল সটান মহাত্মার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলে দিলেন, আপনার প্রস্তাব কোনো আলাপ-আলোচনার ভিত্তিরূপেও গ্রহণ করার যোগ্য নয়।

অথচ অচল অবস্থার অবসানের জন্য চেষ্টা করতে করতে মহাত্মাজী হাঁপিয়ে উঠেছেন। সুতরাং তিনি শেষ পর্যন্ত রাজাজীর ফরমুলা নিয়ে ভারতের কোনো কোনো এলাকায় মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার বিষয়ে জিন্নার সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব করলেন। ভারতবাসীদের আর যার যতই আনন্দ হোক বা না হোক, কমিউনিষ্ট পার্টি উল্লাসে নেচে উঠলো, কারণ তারা কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের মধ্যেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার শক্তি দেখতো।

শুধু তাই নয়। তাদের মতে, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে বরাবরই একটা মুসলমানী ধারাও আছে, ভারতের কোন কোন এলাকায় নিঃসন্দেহরূপে "মুসলমান জাতির" বাস আছে,—পাকিস্তানের দাবীর মধ্যে "মুসলমান জাতির" স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা একটা মূল কথা। লীগের নেতৃত্বের মধ্যে যদিও কিছু প্রতিক্রিয়াশীল লোক আছে (কংগ্রেসের গুষ্টিতে ও পাপ সয় না!) তবুও বর্ত্তমানে তার একটা ব্যাপক গণভিত্তি গড়ে উঠেছে, কংগ্রেস এবং খিলাফৎ আন্দোলনের অনেক নেতা ও কর্মী লীগে যোগ দিয়েছে, লীগ-বিরোধী জামিয়ৎ-উল-উলেমা এবং আজাদ মুসলিম বোর্ডও মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী সমর্থন করে, এবং জিন্নাকে বর্জন করার অর্থ মুসলমান জনগণ থেকে কংগ্রেসের বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং একটা রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতা।

যাই হোক, তিন সপ্তাহ ধরে দুই নেতার মধ্যে আলাপ-আলোচনা চললো, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মতৈক্য হল না, আলোচনা ভেঙ্গে গেল। কমিউনিষ্ট নেতা যোশী লিখলেন,—"দুই নেতাই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র চান, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, গান্ধীজিও জিন্নার দাবীর পিছনে স্বাধীনতা দেখতে পেলেন না এবং জিন্নাও গান্ধীজির সর্তের মধ্যে গণতন্ত্র দেখতে পেলেন না।"

গান্ধীজির সর্ত ছিল—মুসলমান প্রদেশগুলোকে ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক হওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে,—যদি ভারতের হিন্দু-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ গণভোটে সেটা সমর্থিত হয়, আর যদি বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা, যানবাহন-যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাণিজ্য ও শুল্ক সম্পর্কে নতুন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আগে থেকেই একটা চুক্তির বন্দোবস্ত করা হয়। এই সর্তে জিন্না রাজী হননি।

মহাত্মাজীর এই সর্তের কথাগুলো মনে রাখলেই আপনারা '৪৭ সালের একটা বিরাট রগড় বুঝতে পারবেন—মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যানের ভারত বিভাগের ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার সময় মহাত্মাজী গণভোটের কথা কখনো তোলেননি—নিজেরাই দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে জনগণকে ম্যানেজ করে নিয়েছেন। স্বামী যমকে দেওয়া যায়, কিন্তু সতীনকে দেওয়া যায় না।

যাই হোক, যুদ্ধ শেষ হলে ভারতে আবার একটা নতুন নির্বাচনের বন্দোবস্তের কথা উঠলো। কংগ্রেস এবং মোসলেম লীগের সমান সমান প্রতিনিধিত্ব নতুন ব্যবস্থাপক সভায় থাকবে বলে দুই পার্টির মতৈক্য হল। এ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্যে লর্ড ওয়াভেল বিলাত ঘুরে এলেন। তারপর '৪৫ সালের জুন-জুলাইয়ে ওয়াভেল প্ল্যান নিয়ে এক সম্মেলন বসলো। দেখা গেল বিলাতের পরামর্শে লর্ড ওয়াভেল প্ল্যান করেছেন, ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস-লীগের সমান প্রতিনিধিত্বের বদলে হিন্দু-মুসলমানের সমান প্রতিনিধিত্বের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। দুই দলই এই টোপ গিললো। কংগ্রেস মনে করলে, তারা সমস্ত হিন্দু সিট তো পাবেই, উপরন্তু মুসলমান সিটেরও কিছু পাবে কংগ্রেসী-মুসলমানদের মারফৎ,—আর লীগ মনে করলে, সকল মুসলমান সিটই

লীগ পাবে, কংগ্রেস একটাও মুসলমান সিট পাবে না। ফলত এই নিয়ে ওয়াভেল প্ল্যানও ফেঁসে গেল। বৃটেন সাধু সেজে কংগ্রেস-লীগের দুই জাতের অনৈক্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করলো।

তখন কংগ্রেস নেতারা কারামুক্ত হয়েছেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সৈন্যদের দিল্লীর-লাল কেল্লায়-সামরিক আদালত বসিয়ে বিচারের ব্যবস্থা হয়েছে,—আর সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ বন্দীদের মুক্তির দাবীতে দেশ উদ্বেল হয়ে উঠেছে—কলকাতায় নভেম্বর মাসে তিন দিন ধরে জনসমাবেশ, সভা, বিক্ষোভ মিছিল চলেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও অশ্বারোহী পুলিশের তাণ্ডবও চলছে। ধর্মতলায় এক মিছিল আটকে রেখে গুলি চালিয়েও পুলিশ মিছিল ভাঙ্গতে পারলো না। ছাত্রদলের রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের গুলিতে নিহত হল,—তার পরও দুদিন ধরে অশ্বারোহী পুলিশের ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়েও মিছিলকারীরা রাস্তায় বসে থাকলো। ট্রাম-বাস বন্ধ হল, রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড করে জনসাধারণ পুলিশের সঙ্গে লড়তে লাগলো,—অনেক লোক জখম হল, শেষ পর্যন্ত গণবিক্ষোভ দমিত হল। শ্রীনেহরু ব্যারিষ্টার বেশে সজ্জিত হয়ে লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ বন্দীদের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়ে বিক্ষুব্ধ জনগণকে কিছু সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করলেন।

ওদিকে অশান্ত ভারতকে শান্ত করে বাগ মানানোর জন্যে বিলাতের লেবার পার্টি নির্বাচনে জিতে লেবার গভর্ণমেণ্ট তৈরী করলে। একদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে বিরাটকায় দৈত্যের মত সাম্রাজ্যবাদীদের হৃৎকম্প উদ্রেককারী তার বিপুল শক্তি ও সম্মান নিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখে ভারতের চাষা-মজুর উৎসাহিত, সংঘবদ্ধ ও জঙ্গী হয়ে উঠেছে,—যুদ্ধের সময়ের সাম্রাজ্যবাদীদের "ফোর ফ্রীডম"এর প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করে দাবী তুলেছে—লে আও স্বাধীনতা,—আর একদিকে কংগ্রেস এবং লীগও লেবার গভর্ণমেণ্টের কল্যাণে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশায় উল্লসিত হয়ে উঠেছে। আর কমিউনিষ্ট পার্টি নিজেদের তৃতীয় বৃহত্তম পার্টি বলে দাবী করে ধুয়ো তুলেছে,—কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিষ্ট এক হও—তাদের সভা-সমাবেশে তিন পার্টির তিন পতাকা এক সঙ্গে ওড়ে—দুপাশে তেরঙ্গা ও চাঁদ-তারা মাঝখানে—একটু নীচে—লালঝাণ্ডা।

এমনি এক সময়ে হঠাৎ মহাত্মাজী মেদিনীপুর পরিদর্শনে এলেন। '৪২ সালে আগষ্ট বিপ্লবে মেদিনীপুরবাসীরা যেমন লড়েছিল, তেমনি সরকারী নির্যাতনে পিষ্ট হয়েছিল। নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ মিছিল গিয়েছিল থানা দখল করতে—সামনে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা নিয়ে চলেছিলেন গ্রাম্য রমণী মাতঙ্গিনী হাজরা। পুলিশ গুলি চালিয়ে মিছিল ভেঙ্গে দিলে,—কিন্তু মাতঙ্গিনী হাজরা পিছু হটেননি এবং পুলিশের হাতে নিহত হয়েও ঝাণ্ডা ছাড়েন নি। গ্রামে গ্রামে পুলিস অভিযান,—ক্ষেত-খামার-গৃহ লণ্ডভণ্ড করে আগুন লাগিয়ে গ্রামকে গ্রাম ছারখার করে দিয়েছিল। তারপর '৪৩ সালের অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ,—যে দেশজোড়া দুর্ভিক্ষে বাংলার ৩৫ লক্ষ মানুষ মরেছিল। মেদিনীপুরবাসীরা একবার মহাত্মাজীর দর্শন ভিক্ষা করছিল।

মহাত্মাজী মুক্ত হয়েছেন '৪৪ সালে। এতদিন পরে তাঁর মেদিনীপুর পরিদর্শনের সময় হল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন,—সদ্দার প্যাটেলের কি-একটা ব্যামো ছিল,—মহাত্মাজী তার "নেচার কিওর" ব্যস্ত ছিলেন। অতবড় নেচার কিওর করতে সময় লাগে তো।

কিন্তু এই উপলক্ষে আর একটা বৃহৎ ব্যাপারও ঘটে গেল। তিনি সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে এসে উঠেছিলেন, এবং সেখান থেকে গভর্ণর কেসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। লোকে মনে করেছিল একটা Courtesy visit মাত্র—রাজনীতিতে বিপক্ষ হলেও, সামাজিক হিসাবে বন্ধু তো। কিন্তু দেখা গেল, দেড়ঘণ্টা দুই বন্ধুতে আলাপ হল দরজা বন্ধ করে,—এবং তার পরদিন মহাত্মাজী আবার গেলেন। তারপর উপর্যুপরি ছয় দিন এমনি গোপন আলোচনা চললো,—তৃতীয় কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পায়নি।

এত দীর্ঘ গোপন পরামর্শ কিসের? লোকে বলতে লাগলো, একটা কিছু বৃহৎ ব্যাপার ঘটবেই। কিন্তু দেখা গেল, ছয় দিন গোপন পরামর্শের পর কলকাতায় হঠাৎ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটার মিটিং হল,—এবং সেখানে প্রধান যে দুটি প্রস্তাব পাশ হল,—তার একটি হল কংগ্রেসের অহিংসা-নীতির পুনর্ঘোষণা,—আর একটি হল,—ধর্মতলায় পুলিসের গুলিচালনা এবং রামেশ্বর হত্যা সম্পর্কে "জুডিসিয়্যাল এনকোয়ারীর" দাবী। তার পরই সপ্তম দিন গান্ধী-কেসী গোপন আলোচনা হল, এ পর্ব সমাপ্ত হল।

তার পর থেকেই কংগ্রেস নেতারা ধুয়ো তুললেন, Independence knocking at the door—স্বাধীনতা ভারতের দরজা ঠেলাঠেলি করছে। লোকে বুঝলো, গান্ধী-কেসী আলোচনা ভারতের স্বাধীনতারই আলোচনা। আমার চোখে কাণ্ডটা আর একটু ঘোরালো লাগলো। এ যেন একটা ষড়যন্ত্র—ভারতবাসীর চোখে ধুলো দিয়ে স্বাধীনতার নামে একটা বাজে মাল চালাবার ষড়যন্ত্র। ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ও প্রস্তাবেই আমার সেটা মালুম হল।

ইলেকশন একটা আসন্ন,—সুতরাং কংগ্রেস নেতাদের মুখপাত্র শ্রীনেহরু বালিয়ায় গিয়ে আগষ্ট বিপ্লবীদের বাহাদুর বলে পিঠ চাপড়ে এসেছেন, এবং আজাদ হিন্দ বন্দীদের মুক্তি দাবী করেছেন। সুতরাং বৃটিশ সরকার ভুল বুঝতে পারে যে, হয়ত বা কংগ্রেসের মতিগতি অহিংসার পথ ত্যাগ করার দিকেই ঝুঁকছে। ওয়ার্কিং কমিটার প্রথম প্রস্তাবটা বৃটিশ সরকারের সেই সম্ভাব্য ভুল ভাঙ্গার জন্যে।

আর রামেশ্বর হত্যা সম্পর্কে সকল দলের সভা-সমাবেশ থেকেই দাবী উঠেছিল বে-সরকারী প্রকাশ্য তদন্তের। সেটা বানচাল করে সরকারের মুখরক্ষার জন্যে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে বিরাট হুঙ্কারের ঢংয়ে দ্বিতীয় প্রস্তাব পাশ করা হল,—জুডিসিয়্যাল এনকোয়ারী চাই।

বিপ্লব প্রচেষ্টার ব্যর্থতা আমি যেমন মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করে এসেছি,—এখন বিপ্লব-বিরোধিতার সাফল্য দেখার জন্যে তেমনি মনোযোগ সহকারে ঘটনা ও বাণী লক্ষ্য করতে লাগলুম,—এবং এটাও অবশ্যই পরিষ্কার লক্ষ্য করলুম যে, ওয়ার্কিং কমিটার "জুডিসিয়্যাল এনকোয়ারীর" দাবীর প্রতিবাদও কেউ করলে না, এবং পাবলিক এনকোয়ারীর কথাও কেউ আর মুখেও আনলে না। আর স্বাধীনতার হঠাৎ এমন গরজ কেন হল যে, সে ভারতের দরজা ঠেলাঠেলি সুরু করে দিলে, এ প্রশ্নও কারো মনে জাগলো বলে বোঝা গেল না। আমার ধারণা দেখলুম একান্তই আমার একার, নিজস্ব। আমি স্বাধীনতারও একটা রকম-ফের দেখার আশায় রইলুম।

স্বাধীনতা যে ভারতের দরজা ঠেলাঠেলি করছে, তার লক্ষণও দেখা যেতে লাগলো। ওয়াভেল আর একবার বিলেতে গিয়ে লেবার গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করে ফিরে এসে বললেন, ইলেকশনের

নব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করার পরে ছাড়া হিজ ম্যাজেষ্টির গভর্ণমেন্ট ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত করতে পারবেন না।

তারপর ৪ঠা ডিসেম্বর নূতন ভারত-সচিব ভারতে এক "পার্লামেন্টারী কমিশন" পাঠাবার বন্দোবস্ত করে ঘোষণা করলেন যে, তাঁদের লক্ষ্য ভারতকে "পূর্ণ-স্বায়ত্তশাসনাধিকার,"—দান, যাতে ভারত "বৃটিশ কমনওয়েলথের এক স্বাধীন অংশীদারিত্বের পূর্ণ অধিকার" লাভ করে। লেবার-ইম্পিরিয়ালিজমের মতিগতিও বোঝা গেল।

তখন এযুগের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা রাষ্ট্রসংঘ সংগঠিত হয়েছে, যাতে আর কখনো যুদ্ধ না বাধে, যাতে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রসংঘের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল সানফ্রান্সিসকো সহরে। সেখানে নতুন পোল্যাণ্ডের সদস্যপদের জন্যে সোভিয়েত রুশিয়া প্রস্তাব করলে বৃটিশ প্রতিনিধিরা তার বিরোধিতা করে। তারা বলে, নতুন পোল সরকার পোল্যাণ্ডের বৈধ সরকার নয়।

তার জবাবে রুশ পররাষ্ট্র-সচিব মলোটভ বলেন,—যারা নাজীদের বিরুদ্ধে লড়েছে, মরেছে এবং তাদের হাত থেকে পোল্যাণ্ডকে মুক্ত করেছে, তারা পোল্যাণ্ডের বৈধ সরকার হতে পারে না,—অথচ বৃটেন তার মাইনে-করা একজন ভারতবাসীকে এনে এখানে বসিয়ে বলছে, ইনি ভারতের প্রতিনিধি। কিন্তু এ চালাকি বেশী দিন চলবে না—শীঘ্রই এমন দিন আসবে, যখন এই আসনে সত্যিকারের স্বাধীন ভারতের একজন প্রতিনিধি এসে বসবে।

সেটা '৪৫ সালের মে-জুনের কথা। তখনও বিলেতে চার্চিলের রাজত্ব চলছে। বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব ইডেন মুখ বুজে মলোটভের টিটকারী শুনে নিঃসাড়ে উঠে গেছেন। বেশ বোঝা যায়, রাষ্ট্রসংঘে "স্বাধীন ভারতের একজন প্রতিনিধি" না বসালে ইংরেজের মুখ রক্ষা হয় না—আর ভারতের একজন কংগ্রেস নেতাকে এনে বসাতে পারলেই ইংরেজের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।" সুতরাং কংগ্রেসের সঙ্গে এমন একটা বন্দোবস্ত করা দরকার, যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে—বৃটিশ স্বার্থ আর স্বাধীন ভারত এক সূত্রে গাঁথা থাকে। ভারতের জঙ্গী গণবিক্ষোভ প্রশমিত করাও দরকার,—আর মহাত্মা গান্ধীই তো বারবার বলেছেন এবং বলছেন—Only Corgress can deliver the goods.

[ক্রমশঃ।

মনে জোর আনুন

অনেকেই জানেন মাঝে মাঝে অকারণেই কেমন যেন একটা ক্লান্তিতে ছেয়ে ওঠে সমস্ত শরীর-মন যার ফলে সহজতম কাজকেও দুঃসাধ্য বলে বোধ হয়। এই ক্লান্তি বা অবসাদ সহস্র বিশ্রামেও হয় না অপসারিত, সিন্ধবাদের পিঠের প্রবাদোক্ত বৃদ্ধের মতই আঁকড়ে ধরে যেন কঠিন মুষ্টিতে। সচরাচর পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই বেশী আক্রান্ত হন এ ধরণের ব্যাধিতে। কাজ-কর্ম, আনন্দ, খেলাধূলা, দৈনন্দিন জীবন-যাপনের কোন প্রক্রিয়াই আর সাড়া জাগাতে পারে না তাঁদের অবসাদিত স্নায়ুমণ্ডলীতে তেমন করে। এ ধরণের অবসাদ স্থায়ী হয়ে উঠতে দেওয়া উচিত নয় তাই কারুর পক্ষেই। ঔষধাদি সেবনে সাময়িক রোগমুক্তি হয়তো ঘটতে পারে, কিন্তু তাতে আশু উপকার ঘটলেও ধোপে টেঁকে না বেশীক্ষণ, পুনরাক্রমণের আশঙ্কা রয়ে যায় অবারিত। সুতরাং এ ধরণের শারীরিক বা মানসিক অবসাদের সূচনামাত্রই তার প্রকৃত হেতু অন্বেষণ করতে হবে রোগীকে নিজেই। একই কাজ একজনের পক্ষে যা সুসাধ্য, অপরের কাছে তা দুঃসাধ্য ঠেকতে পারে অনায়াসেই; কারণ সকলের শক্তির মাপকাঠি এক নয়, আর এজন্যই একজনের কর্মশক্তি অপরের অপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর হলে অপরের তাতে দমে যাওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। দৈহিক ক্ষমতা ও মানসিক ক্ষমতা, এ দুটোই আপেক্ষিক বস্তু, পাত্রভেদে এর বিভিন্ন ধরণের প্রকাশ, সুতরাং তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে সকলেরই আপন আপন শক্তির সীমায় সীমিত থাকাতেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। অনেক সময় বিভিন্ন অভ্যাসের ফলেও একে অপরের সঙ্গে পৃথক কর্মশক্তির পরিচয় দিয়ে থাকে। যেমন কোন প্রত্যূষবিলাসীর পক্ষে সকাল বেলাটাই কর্মে নিয়োজিত হওয়ার প্রকৃষ্টতম সময়; কিন্তু যে মানুষ চিরদিনই সূর্যোদয় দেখে আসছে কেবলমাত্র স্বপ্নযোগেই, তাকে যদি ভোর হতে না হতেই কাজে লাগার জন্য তাড়া দেওয়া হয়, তবে তার নিদ্রালস দেহ-মন একযোগে প্রতিবাদ সুরু করে দেবে না কি? তারস্বরে বলবে না কি "এ আবার কি জ্বালা রে বাপু?" মানুষকে জোর করে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজে নিয়োজিত করার প্রয়াস তাই শুধু অন্যায়ই নয়, অসমীচীনও বটে। এই প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্ম করার গ্লানি অনেক সময়ই সামগ্রিকভাবে মানুষের শরীর-মনকে ভরে তোলে ক্লান্তিতে, যার হাত থেকে রেহাই পায় না সে সহজে, দিনান্তর ক্লান্তি সঞ্চারিত হয় নৈশ বিশ্রামেও ফলে দিন রাত ক্লান্তিই তার ভরে ওঠে এক অজানা অস্বস্তিতে। দেহের ক্লান্তি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানসিক বৈকল্য থেকে দেখা দেয়, সেজন্য মনকে সুস্থ সুন্দর রাখতে পারলে দেহও সহজে বিকল হয় না, আর মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখাটা সর্বাংশে না হলেও অনেকটাই মানুষের নিজের হাতে। মনকে সবল ও সুন্দর করে গড়ে নিতে পারলে মানুষ সহজেই বিপরীত পরিবেশেও খানিকটা শান্তি পেতে পারে বা অনুকূল পরিবেশ সৃজন করে নিতে পারে। মনের প্রশান্তিই একমাত্র বস্তু অবসাদ বা ক্লান্তিকে যে শতহস্ত দূরে রেখে দেহকে বাঁচায়, উদ্দীপনা জোগায় কর্মশক্তির, বিকশিত করে তোলে প্রত্যেককে আপন আপন স্বাধিকারের গণ্ডীর মাঝেই। অতএব দিনের পর দিন ক্লান্তি বা অবসাদের ছায়ায় ভেঙ্গে না পড়ে, তার মূলোচ্ছেদ করুন একাগ্র অনুসন্ধানে।

গীতিকার রবীন্দ্রনাথ

অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাসিত স্বর সুরেলা ছন্দ-মাধুর্যের আলায় বাঙময় হোয়ে উঠেছিল যে সুরস্রষ্টার কণ্ঠে, সে স্রষ্টার অমর প্রদীপশিখা আজ বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত। সে আলোকোজ্জ্বলিত শিখার স্নিগ্ধ মধুর ছটায় জগৎ আজ সুরস্নাত—গীতস্নাত। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর একটি গৌরব। যিনি অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন গান। গান আর গান। যাঁর গানের বাণী যাঁর হৃদয় মথিত করা ঐন্দ্রজালিক সুর মর্ত্যলোকে বয়ে এনেছে সুরের মন্দাকিনী। আজীবন মানুষকে শুনিয়েছেন ভালোবাসার গান। যে গানের মর্মবাণী বহুকে করেছে এক। দূরকে করেছে নিকট। তিনি ছিলেন সঙ্গীতের সপ্তসুরে মাতাল। সে সুরপাগল রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব আজো দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সর্বত্রই বইছে শ্রদ্ধার নম্রমধুর বাতাস। সে বাতাস বিংশ শতাব্দীর আবহাওয়াকে করেছে মধুর ও শ্রদ্ধাবন।

রবীন্দ্রনাথ একটি জ্বলন্ত, দীপ্ত এবং চিরস্মরণীয় নাম। চিরস্মরণীয় নাম। যে নামের দীপচ্ছটা প্রাণের আবেগে গীত হোয়ে ঝরে পড়ছে ধূলার ধরণীতে। যাঁর গানের সুরে প্রকাশ পেয়েছে অনন্ত গীতিকারের অন্তহীন রূপ। সে সঙ্গীতের যাদুকর রবীন্দ্রনাথের গীত-সভায় কারা বাদ গেছেন? প্রাণের আকুল ধারা নিয়ে স্তব্ধ হোয়ে গেছে বর্ষাস্নাতা পৃথিবী। সুরের স্রোতে এসে মিশেছে বর্ষার মধুময় স্রোত। শরতের শিশিরস্নাত—গন্ধময় ঝলমলে পৃথিবী তাঁকে দিয়েছে ভাবের ঐশ্বর্য। জ্যোৎস্নাস্নাত ঘননীল আকাশ তাঁকে দিয়েছে উদাবতাস ভাষা। হৈমন্তিকা বঁধু এসেছে নবান্নের পাত্র হাতে। বনমর্মরে আম্রমুকুলের গন্ধ ছড়িয়ে—পাতাঝরা ক্রন্দসী তরুর কান্নাকে বুকে চেপে, শীত এসেছে শীর্ণবক্ষে কুয়াশার আবেষ্টনী রচনা করে। বসন্ত এসেছে প্রেমের স্পর্শ মেলে—যৌবন-তটিনীর মুক্তাকাশে শুভ্র বলাকা উড়িয়ে—তরুপল্লবে নবজন্মের শাশ্বত সুষমা ছড়িয়ে। তাপক্লিষ্ট জন্মলগ্ন এসেছে কঠোর বাস্তবে ধৈর্য আর তিতিক্ষার বার্তাকে বহন করে। আর নব নব স্বপ্নমাধুরীতে ভরে অপরূপা প্রকৃতি এসেছে রূপের পশরা সাজিয়ে। আকাশ—চাঁদ—সূর্য—ফুলফল প্রভৃতি তাঁকে দিয়েছে অপার্থিব সৌন্দর্যের উপাদান। মানুষ দিয়েছে পার্থিব সৌন্দর্যের লীলাচঞ্চলতা। এরা সবই তাঁর ছন্দের বাণী—বাস্তবের জীবন-তৃষ্ণা। এদের অন্তরের রসেই তাঁর অন্তর ভরপুর। সে নিঙড়ানো রসের সিঞ্চনই তাঁর সংগীতের রূপ-রস-গন্ধ-সুর। এদের আপন করে নিতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বরণীয় এবং স্মরণীয় গীতিকার।

রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠতম গীতিকার। আমার মনে হয় এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠতম পরিচিতি। বিশ্বের দরবারে এই পরিচিতিতেই তিনি পরিচিত।

সঙ্গীত রচনা তিনিই করতে পারেন যিনি সৌন্দর্যের পূজারী, যিনি প্রেমের পূজারী। এ দুয়ের মিলনেই সঙ্গীত সুধার উৎস। অন্তরে এ দুটির মিলন ঘটলে সঙ্গীত বাণীরূপে—ছন্দরূপে অন্তরের প্রত্যন্ত থেকে নিঃসৃত হোয়ে আসে। সঙ্গীত হলো প্রাণের আবেগ। সে আবেগ-তটিনী বিপুলা হোয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্য থেকে। তিনি গীতিকার, তিনি সুরকার। ভাবের আবেগে লিখেছেন—প্রাণের আবেগে গেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ আশৈশব সঙ্গীতানুরাগী। তার প্রমাণ মেলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী থেকে। জ্যোতিবাবু এক জায়গায় লিখেছেন, 'আমার সরোজিনী নাটকে রাজপুত মহিলাদের চিতা প্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন সেই স্থানটা পড়িয়া প্রুফ দেখা হইতেছিল তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিল। গদ্য রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় না বুঝিয়া কিশোর কবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন, এখানে পদ্য রচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। কারণ, প্রথম হইতেই আমার মনটা কেমন খুঁত খুঁত করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ? আমি সময়ের কথা উত্থাপন করিলে রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই—

জ্বল জ্বল চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা,
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখুনি প্রাণের জ্বালা।...

এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।...সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইলাম। এখন হইতে সঙ্গীতও সাহিত্যচর্চাতে আমরা হইলাম তিনজন—অক্ষয় চৌধুরী, রবি ও আমি। আমার দুইপাশে অক্ষয় ও রবি কাগজ পেনসিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটা সুর রচনা করিলাম, অমনি ইহারা সেই সুরের তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন।' (জীবনস্মৃতি)

এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সঙ্গীতজগতে প্রবেশ করলেন।

তবে কোন সঙ্গীত রচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর গান রচনার প্রথম হাতে-খড়ি তা ঠিক বলা যায় না। তবে বলা চলে—

গগনের মাঝে রবি-চন্দ্র-দীপক জ্বলে
তারকা মণ্ডল চমকে মোতিরে।
ধূপ-মলয়ানিল পবন চামর করে
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতিরে।
কেমনে আরতি ভবখণ্ডন, তব আরতি—
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরীরে।...

এই গানটি তাঁর ১২৮১ সালের স্বাধীন রচনা। 'জ্বল জ্বল চিতা' গানটি তাঁর ১২৮২ সালের রচনা। 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানটি ১২৮৬ সালের রচনা।

এই সময় তিনি অনুবাদের কাজেও হস্তক্ষেপ করেন। কবি এই সময় Thomas Moore'এর 'Irish Melodies' গ্রন্থের 'Loves Young Dream' কবিতাটির প্রথম ও শেষ দুটি স্তবক অনুবাদ করেন। Loves Young Dream এর প্রথম স্তবকে ছিল—

Oh! the days are gone, when beauty bright
My heart's chain wove;
When my dream of life, from morn till night
Was love, still love
New hope may bloom
And days may come
Of milder calmer beam.
But there's nothing half so sweet in life
As love's young dream:
No there's nothing half so sweet in life
As love's young dream.

কবি অনুবাদ করলেন—

গিয়াছে সেদিন যেদিন হৃদয় রূপেরই মোহনে আছিল মাতি
প্রাণের স্বপন আছিল যখন—'প্রেম' 'প্রেম' শুধু দিবস রাতি।
শান্তিময়ী আশা ফুটেছে এখন হৃদয় আকাশ পটে,
জীবন আমার কোমল বিভায় বিমল হয়েছে বটে;
বালককালের প্রেমের স্বপন মধুর যেমন উজল যেমন
তেমন কিছুই আসিবে না—তেমন কিছুই আসিবে না।

এটা 'ভারতী'র ১২৮৬ সালের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কবিগুরু তাঁর প্রথম গান-রচনা প্রসংগে জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, "এই শাহিবাগের প্রাসাদের চূড়ার উপর একটি ছোট ঘরে আমার আশ্রয় ছিল।...শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর (সবরমতী) দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়েই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্ব প্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে, 'বলি ও আমার গোলাপবালা' এখন আমার কাব্যগ্রন্থে আসন রাখিয়াছে।" (জীবনস্মৃতি। আমেদাবাদ)

জীবনস্মৃতিতে তিনি আরো বলেছেন, "শুক্লপক্ষের কত নিস্তব্ধ রাত্রি আমি সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটায় একলা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এইরূপ একটা রাত্রে আমি যেন থামী-ভাংগা ছন্দে একটা গান তৈরী করিয়াছিলাম। তাহার প্রথম চারিটি লাইন উদ্ধৃত করিতেছি—

নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো।
ঘুমঘোর ভরাগান বিভাবরী গায়
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো।

ইহার বাকি অংশ পরে ভদ্রছন্দে বাঁধিয়া পরিবর্তিত করিয়া তখনকার গানের বহিতে (রবিচ্ছায়া) ছাপাইয়া ছিলাম। কিন্তু সেই পরিবর্তনের মধ্যে সেই সবরমতী নদীতীরের সেই ক্ষিপ্ত বালকের নিদ্রাহারা গ্রীষ্মরজনীর কিছুই ছিল না।...'শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি' ও 'আঁধার শাখা উজল করি'—প্রভৃতি আমার ছেলেবেলাকার অনেক গান এইখানেই লেখা।"...

সম্ভবতঃ 'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়' গানটি তাঁর সর্বপ্রথম রচনা। কারণ কৈশোরের অনেক ছাপ যেন গানটির প্রতিটি ছন্দে লুকিয়ে আছে।

জ্যোতিদাদার সাহচর্যে এসেই তাঁর সঙ্গীত রচনার হাতে-খড়ি বলা চলে। তাঁর সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি থেকেও যেমন যা যতটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি, কবিগুরুর জীবন-স্মৃতি থেকেও ততটা আন্দাজ করে নিতে পারি। গানের শিক্ষানবীশী প্রসংগে তিনি বলেছেন, "এক সময় জ্যোতিদা পিয়ানো বাজাইয়া নতন নতন সুর তৈরী করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সংগে সংগে সুর বর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সে সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবীশী এইরূপেই আমার আরম্ভ হইয়াছিল।" (জীবন-স্মৃতি, গীত চর্চা)

কবিদের বাড়িতে 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি সভা বসতো মাঝে মাঝে তখনকার বিদগ্ধজনেরা সে'সভায় আহূত হতেন। এই গুণীজনের সান্নিধ্যে এসেই কবি 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্য দুটি রচনা করেন। সে রচনা প্রসংগে তিনি বলেছেন, 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম, সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। এই দুটি গ্রন্থে আমার সে সময়ের একটা সঙ্গীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। (জীবনস্মৃতি। বাল্মীকি প্রতিভা)

এই তো গেল কবিগুরুর সঙ্গীত-জীবনের প্রথম প্রভাতের অরুণোদয়ের পূর্বমুহূর্তের কথা। তারপর? তারপর জলন্ত সূর্যের গৌরব-দীপ্তচ্ছটা ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র আকাশব্যাপী—বিশ্বব্যাপী। প্রথম রবির প্রথম আলোকরাগে উষার মুখে ফুটলো লাজারুণ হাসি। তারপর উষা হোয়ে উঠলো মধুময়। মধুক্ষণ। রবির বন্দনা-সঙ্গীতে মুখর হোয়ে উঠলো ভোরের পাখী। হাসলো বৈশাখের খরতাপদগ্ধ আকাশ। বিদগ্ধ পৃথিবীর বুকে স্নিগ্ধতার মধুরতা বয়ে আনলো বাতাস। দিনে দিনে প্রাণবন্ত গীতিকার হোয়ে উঠলো সেদিনের নাম-না-জানা শিশু। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনে। দিগন্ত দিশারী সঙ্গীতের হিল্লোল বয়ে গেল তাঁর মনের মর্মমুকুরে। তাঁর মুখে শুনলাম—সজনি, সজনি রাধিকা গো, দেখ অবহুঁ চাহিয়া,

মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুম-হার পিনহ নীল আঙিয়া
সুন্দরি, সিন্দুর সিঁথি করহ রাঙিয়া।
সহচরি সব নাচ নাচ মিলন গীতি গাওরে
চঞ্চল মঞ্জীররাব কুঞ্জ-গগন ছাও রে।
সজনি, সব উজার মন্দির কনকদীপ জ্বালিয়া,
সুরভি করহ কুঞ্জবন গন্ধ-সলিল ঢালিয়া॥

* * *

বসন্ত আওল রে।
মধুকর গুন গুন, অমুয়া মঞ্জরী কানন ছাওলরে
শুন শুন সজনী, হৃদয় প্রাণমন হরখে আকুল ভেল,
জর জর রিঝসে দুখ দহন সব দূর দূর চলি গেল।......

ভানুসিংহের পদাবলীর ভেতর দিয়ে এক অপূর্ব সঙ্গীতের জন্ম দিলেন কবি। সন্ধ্যা-সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত প্রভৃতি রচনা করে কবি যেন আরো আত্মস্থ হোয়ে গেলেন সুন্দরের মধ্যে। প্রাণের সমুদ্র-তটের বেলা ভূমিতে মুহূর্তে মুহূর্তে যেন আছাড় খেয়ে পড়ছে সঙ্গীতের ঊর্মিমালা। লেখনী হোয়ে উঠলো দুর্বার। সৃষ্টির অপার্থিব সৌন্দর্যে মন গেল তাঁর ভরে। হৃদয় খুলে গেল। সে হৃদয়ের মধ্যে যেন জগতের অস্তিত্বকে তিনি অনুভব করলেন।

স্তরে স্তরে কবির সমগ্র সত্তা যেন পরম সঙ্গীতের রূপ-রস-গন্ধ-গানে সমাচ্ছন্ন হোয়ে গেল। তারপর গীত-ছন্দের মধুরতায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে নবরূপে নবরঙে ভরিয়ে তুললেন। অসংখ্য সঙ্গীতের জন্ম দিলেন কবি, যা উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাতে গেলে নতুন একটি রামায়ণ সৃষ্টি করতে হয়। ব্রাহ্ম সঙ্গীত, স্বদেশী সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, অধ্যাত্ম সঙ্গীত প্রভৃতি রচনাতে কবি যেন দুর্বার হোয়ে উঠলেন। সঙ্গীত-বৈভবে পূর্ণ করলেন বাংলার তথা ভারতের সঙ্গীত ভাণ্ডারকে।

প্রত্যেকটি ঋতুকে কেন্দ্র করে তাঁর রচনা ফল্গু প্রবাহের মতো ছুটে চলেছিল, যা ভাবতে গেল বিস্মিত হোয়ে যেতে হয়। ব্রাহ্ম সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে তাঁকে দেখেছি অন্তরের সমস্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধাকে বিশ্বপ্রেমিকের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

আরো নম্রমধুর-ভক্তিস্নাত আত্মপ্রত্যয়-প্রবুদ্ধ অন্তরের সদা জাগ্রত ভাবোচ্ছ্বাসকে দেখেছি তাঁর রচনায়—

আমায় যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি
আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী,
আমার চোখে চেয়ে দেখা আমার কানে শোনা
আমার হাতে নিপুণ সেবা আমার আনাগোনা
আমায় বলে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার করে দেবো, তখন তারা আমার হবে।

কবির এই উদার ভাবাবেগের সঙ্গে মীরা কবির ভাবাবেগ লক্ষণীয়—

প্যারে দরশন দিজ্যো আয়, তুম বিনা রহ্যো ন জায়।
জল বিন কবঁল, চন্দ বিন রজনী, ঐসে তুম দেখ্যা বিন সজনী।
আকুল-ব্যাকুল ফিরুঁ রৈণ-দিন, বিরহ কলেজো খায়।
দিবস ন ভুখ, নীঁদ নহী রৈণা, মুখসুঁ কথন ন আবৈ বৈণা।
কহা কহুঁ কুছ কহত ন আবৈ মিলকর তপত বুঝায়।
কুঁ তরসা বো অন্তরযামী, আয় মিলো কিরপা কর স্বামী।
মীরাদাসী জনম-জনমকী, পরী তুমহারে পায়।

তাঁর অধ্যাত্ম-সচেতন মনে আত্মপ্রত্যয়ের আসন ছিল সুদৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই তাঁর অনেক সঙ্গীতের মধ্যে সে ভাব সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অন্তরের ভক্তিমিশ্রিত একনিষ্ঠ বিশ্বাসভাজনের মতো তাঁকে বলতে দেখেছি উদাস কণ্ঠে—

জীবনে যত পূজা হলো না সারা
জানি হে জানি তা-ও হয়নি হারা
যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে
যে নদী মরু পথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

অধ্যাত্ম সচেতন সঙ্গীতে কবি-প্রতিভা বিকশিত হোয়েছে শত ধারায়। বিরাট এক উপলব্ধির জগতে তাঁর মন ও মানস অবস্থিত। সাবলীল অথচ অন্তঃনিগূঢ় রসের ভেতর দিয়ে তিনি অজস্র গান রচনা করেছেন। সেই পরম প্রাপ্তির আনন্দে তাঁকে বলতে শুনেছি—

যা দিয়েছ আমার এ প্রাণ ভরি
খেদ রবে না এখন যদি মরি।

প্রেমের ভুবনে এসেও কবির মধ্যে ছিল সৃষ্টির সে অবিচলিত নিষ্ঠা যে নিষ্ঠা সঙ্গীত-জগতে তাঁকে অমর করে রেখেছে। জাতীয় সঙ্গীত রচনার কথা বলতে গেলে সেই একই কথা প্রযোজ্য। 'জন-গণ-মন অধিনায়ক জয় হে'—জাতীয় সঙ্গীতটি আজ ভারতের আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে রেখেছে। মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেছে অবর্ণনীয় পুলক 'ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণু রাশি—' গানটির মধ্যে পরাধীন ভারতের দুঃখময় দুর্দশাকে অভিব্যক্ত করেছেন কবি। কখনো রূপময়ী ভারতেশ্বরীর চরণ প্রান্তে তাঁকে দেখেছি ভক্তির নির্মাল্য হাতে—

হে ভারত, আজি তোমারি সভায় শুন এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হরষে এনেছি পূজার দান।

জীবনের নানা স্তরে, নানা পর্বে, নানা ভাবে তিনি একটির পর একটি সঙ্গীত রচনা করে গেছেন। এতো বিরাট প্রতিভার উত্তরাধিকারী হয়েও তাঁকে বলতে শুনেছি, "...আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনায় জিনিষ ভুরি ভুরি আছে, তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জনাকে বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে, আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটিই স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগতকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, সে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে।"

এই মহান বাণীর অভিব্যক্তি যাঁর মধ্যে থেকে, তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর সঙ্গীত, তাঁর সুর আনন্দ প্রকৃতির বাণী নিকেতনে বিরাজমান। মানুষের অন্তরে বিরাজমান। তবু, মনে হয় সে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হোয়ে তিনি সহস্র সহস্র গীত রচনা করেছেন, মানুষ সেদিকে বড়ো একটা নজর দেয় নি। তাই তাঁকে দুঃখ করে বলতে শুনেছি মৈত্রেয়ী দেবীকে—

"কত গান লিখেছি? হাজার হাজার গান, গানের সমুদ্র—সেদিকটা বিশেষ কেউ লক্ষ্য করে না গো,·বাংলাদেশকে গানে ভাসিয়ে দিয়েছি। আমাকে ভুলতে পারো, আমার গান ভুলবে কি করে?"

—সুধাংশু চৌধুরী।

আমার কথা (৮১)

মায়া সেন

[বর্ত্তমান কালে রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারা সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান সর্বজনবিদিত, তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী মায়া সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী। সঙ্গীত ভবন থেকে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের ডিপ্লোমা লাভ করেছেন। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীত আকাদমীর তিনি অধ্যাপিকা। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের গায়িকা এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়িকা হিসেবে তিনি প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছেন। শান্তি-নিকেতনের সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শান্তিদেব ঘোষ, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত বিশারদদের শ্রীমতী সেন প্রিয় ছাত্রী। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুগায়িকা হিসেবে তিনি এর ভিতরেই প্রচুর সুনাম ও খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন।—সম্পাদক।]

ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাড়ীতে গানের চর্চ্চা ও পরিবেশ ছিল। আমার মা সুগায়িকা ছিলেন এবং গান-বাজনা করতেন। এস্রাজেও তাঁর হাত ছিল খুব মিষ্টি। আমাদের বাড়ীতে প্রতি বছরই জলসা হতো। আমার বাবাও গান বাজনা ভালবাসতেন। তাই বাল্যকাল থেকেই গান-বাজনার প্রতি আমার আকর্ষণ সহজাত এবং তাই আজও আমার চলছে সঙ্গীতের সাধনা। বেনারসে ও কলকাতায় আমি বহু গুণী, জ্ঞানী ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও এস্রাজ, তানপুরা শিখেছি এবং আজও শিক্ষা গ্রহণ করতে পিছিয়ে নেই। বর্ত্তমানে সঙ্গীতাচার্য্য রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রচুর উপদেশ গ্রহণ করে থাকি। সারা জীবনটাই হচ্ছে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র। অধ্যাপিকার কাজ গ্রহণ করলেও সঙ্গীতের চর্চ্চা আমি এখনও নিয়মিত করে থাকি এবং যতদিন বেঁচে থাকবো সঙ্গীত সাধনা করে যাবো—এই হচ্ছে আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

বর্ত্তমানে পূর্ব্ব পাকিস্তানের ঢাকা জিলায় আমাদের আদি বাড়ী। আমার বাবা রেলের ডাক্তার ছিলেন। আমার কাকা স্বর্গীয় বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবিসর্জ্জন করেন। আমাদের পরিবারের অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে কারাবরণ করেন। তাই বাল্যকাল থেকেই আমাদের পরিবারের মধ্যে স্বাদেশিকতার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই আমরা স্বদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করে এসেছি।

১৯৪৫ সালে ঢাকা সহর থেকেই আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। তারপর এসে ভর্ত্তি হই সাউথ ক্যালকাটা গার্লস্ কলেজে। সেখান থেকেই আই-এ এবং বি-এ পাশ করি। বি-এ ডিগ্রীলাভের পর আমি পুরোপুরি সঙ্গীত সাধনায় আত্মনিয়োগ করি।

এরপর শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ভবনে প্রবেশ করি এবং সেখানে চার বছরের কোর্স শেষ করে ডিপ্লোমা লাভ করি। বিশ্বভারতী

শ্রীমতী মায়া সেন

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪ সালে আমি বাংলায় এম-এ পাশ করি। শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত, সেতার, এস্রাজ প্রভৃতিতে আমি শুধু ডিপ্লোমাই পাইনি, প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। ১৯৫৪ সালে বেনারসে ডাগর ব্রাদার্স-এর কাছে ধ্রুপদ গান শিক্ষা করি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিক্ষালাভ করি শ্রীভি, ডি, ওয়াজেলওয়ারের কাছ থেকে। সেতার ও এস্রাজের শিক্ষা গ্রহণ করি অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। এঁদের সকলের কাছেই আমি প্রভূত ঋণী।

আমার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাঁরা ইতোমধ্যে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে বমানী ঘোষ, স্নিগ্ধা বসু, শুভ্রতা বসু, আলপনা রায়, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী সেন জানালেন যে প্রকৃত রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে হলে তানপুরার সঙ্গেই গাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

বাধক্যে

বারানসী

নীলকণ্ঠ

সতেরো

বিধবা, ষাঁড়, সিঁড়ি এবং সন্ন্যাসীর কবল থেকে রক্ষা পেলে তবেই আসল কাশীর সাক্ষাৎ পাবেন আপনি, এমন কথা কেবল কাশীতে যাদের বাস, নানা বিধিনিষেধের কারণে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে তিনশো দিনের ওপর যাদের কখনও দুবেলা, কখনও একবেলা উপবাস, তাদের মুখেই না, যারা কাশীমুখো হয়নি কখনও এ জীবনে তাদের শ্রীমুখেও কাশীর কথা তুলে দেখবেন, ওই এক জবাব বাঁধা। কিন্তু তারপরেও যদি জিজ্ঞেস করেন আসল কাশী বলতে বক্তা কি বোঝেন তাহলে তার আর উত্তর নেই। লোকসভায় বেকায়দা প্রশ্নের সম্মুখে গত্যন্তরবিহীন মন্ত্রী মহোদয়কে বাঁচাবার জন্যে 'নোটিশ চাই'-এর কবচ অথবা স্পিকারের নাকচ করে দেবার ক্ষমতা প্রয়োগের রক্ষাকবচহীন আসল কাশীর টিকাকারকে কাজ আছে, পরে হবে'র ছুতোয় আশু প্রস্থানের উদ্যোগ করতে দেখবেন অতঃপর। কাশী অথবা পৃথিবীর যে কোনও জায়গা বললেই যাঁরা কেবল ধর্ম, ব্রহ্মচর্য, মালা জপা বোঝেন তাঁরা আসল থেকে ততদূরে থাকেন যতদূরে রামকৃষ্ণ মিশান নয় রামকৃষ্ণ থেকে। কাশী বলো, হরিদ্বার বলো, বলো নির্জনাত্মা হিমালয়, যে কেবল কৈবল্যের আশায় এসব জায়গায় জীবনভোর যাওয়া-আসায় কাটিয়ে দিলো তার মন বৈকল্য ছাড়া আর কি পেলো।

গাইড দেখে দেখে যে কেবল কাশীর ঘাটে ইতিহাস আর কাশীর মন্দিরে কিংবদন্তীর মরীচিকায় মুখ থুবড়ে মোলো সেই মিসগাইডেড হতভাগ্য মিস করলো জীবন্ত কাশীকে; পাপে-পুণ্যে গলাগলির অসংখ্য গলি আর তার চেয়েও সংখ্যায় বেশি বিধবা, ষাঁড়, সিঁড়ি এবং সন্ন্যাসীর কাশীকে। বিশ্বনাথের আবাস যেখানে বিশ্বের যত পিতৃপরিচয়হীন অনাথের আবাসে সেই আসল কাশী গাইডে নেই; নেই এক টাকায় বারো কি ষোলোখানা ছবির পোস্টকার্ডে। ট্যুরিস্ট-ক্যামেরার লেন্স আছে; তার চোখ নেই। কাশীখণ্ডে কিংবদন্তীর রোমাঞ্চ আছে; নেই কেবল সেই মুহূর্তের মধ্যে মূর্ত রক্তমাংসের কাশীর এই মুহূর্তের বিচিত্র বিস্ময়। যার ভগবান কেবল আকাশে বিরাজ করেন তাঁর সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছেন 'শ'। যার বিশ্বনাথ কেবল কাশীর বিশ্বনাথের গলিতে বাস করেন তার সম্বন্ধে সাবধান হতে বলি শতবার। বিশ্বের যত অনাথের গলি যে দেখেনি তার বিশ্বনাথের গলি দেখা হয়েছে হয়ত, কিন্তু বিশ্বনাথদর্শন আজও অসমাপ্ত সেই ভাগ্যানিহতের; সেই দুর্ভাগ্যপীড়িতের।

এই বিশ্বের যিনি নাথ তিনি নিঃস্বেরও নাথ; ঈশ্বর তিনিই যিনি বিশ্বের, যিনি নিঃস্বের; নিঃস্বেশ্বর যিনি তিনিই বিশ্বেশ্বর।

কোনও জায়গায় নবাগত কেউ যেমন স্টেশানে পা দিয়েই প্রশ্ন করে, এখানে কোনও ভালো হোটেল-টোটেল আছে? তেমনই কাশীতে তার চেয়েও ক্যাসুয়ালি জিজ্ঞেস করে: কাশীতে এখন ভালো সাধু-টাধু আছে? যেন, গাড়ি বাড়ি, গয়না, শাড়ি, ভালো খাবার, কি ফ্রিজ, না কি রেডিও, রেডিওগ্রাম, অথবা ট্রানসিস্টারের মতো সাধু-ও কোনও কমোডিটি, হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। এরাই, এই সব অন্তঃসারশূন্য, দম্ভে পরিপূর্ণ অর্বাচীন-প্রবীণরাই কেউ যে-কোনও সাধু গায়ে ছাই মেখে বা গেরুয়া পরে বসে থাকলেই তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেয় ভণ্ড বলে। ডাক্তার হবার আগেই মেডিক্যাল স্টুডেন্ট স্টেথিসকোপ ঝোলায়, কোর্টে যায় দাবা খেলতে যে ব্রিফলেস ব্যবহারজীবী, সে-ও যায় গায়ে কালো কোট চাপিয়ে। লোকে কখনও অবাক হয় না: কারণ এটাই ওই দুই পেশার 'রিডিকুলাস' জীবন-সঙ্গত; সাংঘাতিক রকমে স্বাভাবিক। কিন্তু ছাইমাখা সন্ন্যাসী দেখলে, ছাই উড়িয়ে দিয়ে দেখবার সময় নেই কারুর, অমূল্য রতন মেলে কি না; কিন্তু বলবার পাণ্ডিত্য-মূঢ়তা আছে 'দূর ছাই'!

ডাক্তারের কাছে যেতে হলে টেলিফোন করে, রেকমেণ্ডেশান জোগাড় করে, ধর্ণা দিয়ে, কিউ-তে অপেক্ষা করে দেখা পায় কখনও; কখনও পায় না। উকীলের কাছেও তাই। কিন্তু সাধুর বেলায় উল্টো; কাশীর বেলায় আলাদা। কাশীতে পা দিয়েই তাই আশা, সাধু-সন্ন্যাসী সব সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আগন্তুকের জন্যে; প্রত্যেকের গায়ে সাঁটা থাকবে তার দাম কত এবং সেইটে ফেলে দিলেই সাধুর সঙ্গে সঙ্গে সুড় সুড় করে যেতে হবে ক্রেতার পেছন-পেছন। না গেলেই ক্রেতার অনিবার্য সিদ্ধান্ত, কাশীতে আর 'সাধু-টাধু' নেই; সব ভণ্ড; সবাই সেই পাগলা মেহের আলীর মতো সমবেত সোচ্চার মুহূর্তে: 'সব ঝুট হায়! সব ঝুট হায়!'

এই 'সাধু-টাধু' খোঁজার দল জানে না আজও যে পৃথিবীতে রাজা, পণ্ডিত, ব্যবসাদার, দরিদ্র, সবাই আজ অথবা কাল বিক্রীত হবার অপেক্ষায়। পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত যা অবিক্রীত তা হচ্ছে মা এবং মাতৃসাধক।

কে চিনবে, সাধুকে? সাধু কে, কে অসাধু একথা বলবে কে? ভক্ত ছাড়া ভগবান আর কার? ভক্ত ছাড়া ভাগ্যবান কে আর? এবং ভক্তকে, ভক্ত কে একথা ভগবান ছাড়া বলবে আর কে?

একজন গেছে হরিসভায়;—আরেকজন,—বাঈজী-আলয়। হরিসভায় যে গেছে তার কান হরিনামে সাড়া দিলেও প্রাণ পড়ে আছে বাঈজী-আলয়ে। বন্ধু কেমন মজা লুটছে সেখানে, আর, আমি পড়ে আছি শুষ্ক ধর্মতত্ত্বের মরুভূমিতে; মরাভূমে। আর সুরসভায়

সুরাশোভায় বিচ্ছুরিত রক্তিমবদন বাঈজীর গানে কান আছে আরেকজনের; কিন্তু তার প্রাণ পড়ে আছে হরিসভায়। তার অনুতাপ হচ্ছে কেন সে মরতে এল এই মরুভূমের প্রেতনৃত্যের আসরে অমরভূমের নিত্যবাসর ত্যাগ করে। তার বন্ধুর মতো সেও কেন গেল না ক্ষুরের ধারের চেয়েও দুর্গম সেই বন্ধুর পথে,—যে পথ চলে গেছে নশ্বর থেকে ঈশ্বরের দিকে; যে পথ নরলোককে মরলোক পার করে পৌঁছে দিয়েছে অমরলোকে; যে পথ রাগে নয় নয় বিরাগে রাঙানো; অনুরাগে রাঙা মাটির যে পথ অনিত্যের মরু-পর্বত, কান্তার-পারাবার পার হয়ে নিত্যকালের উৎসবলোকে নিয়ে গেছে; যেখানে নব নব আলোকে আলোকে অবিনশ্বরের আরতির জ্বলছে অনির্বাণ জ্যোতিশিখা।

এই দুজনের মধ্যে কে পাবে হরিকে? হরিদ্বারে যে আছে জপের মালা হাতে লোভের থালার দিকে তাকিয়ে সে নয়; হরিদ্বার থেকে দূরে আছে যে, কিন্তু খুলে গেছে যার অন্তর্দ্বার সে পাবে তাঁকে যাকে জ্ঞান পায়নি, বিজ্ঞান চায়নি; ধর্ম যাকে খুঁজছে; তত্ত্ব ঢুঁড়ছে যাঁকে আদিকাল থেকে; অনাদিকাল থেকে যিনি তাকিয়ে আছেন তার দিকে যে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই চায়নি, চেয়েছে কেবল তাঁকে। অক্ষৌহিণীর বদলে চেয়ে অক্ষয়কে; অসংখ্যের বিনিময়ে সেই শঙ্খকে যাঁর মুখে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীহরি স্বয়ং বলেছেন: ত্যাগ করো অধর্মকে; তারপরে পরিত্যাগ করো ধর্মকেও। স্মরণ করো আমাকে; বিস্মরণ করো সব অকর্ম, সব কর্মকে। জীবন মরণ সব আমি; শরণ নাও আমার!

তাই শ্বাস নয়; বিশ্বাস! তাই রণ নয়; চরণ! মরণ নয়, শ্রীহরি স্মরণ। তাঁর দুপায় পড়া ছাড়া তাঁকে পাবার আর উপায় কি? বোধি কেমন করে পাবে তাঁকে যাঁর অবধি নেই, নদী যেমন করে পায় সমুদ্রকে, তেমন করে ছাড়া?

কে বলবে তাই বিশ্বনাথ বন্দী হয়ে আছেন কেবল বিশ্বনাথের গলিতে? কে বলবে, তিনি নেই মধুলোভী অলিতে; তিনি আছেন কেবল প্রসাদলোভী অঞ্জলিতে? কে বলবে, 'মরা'-র মুখে যিনি অমরার বাণী, মারের স্বমুখে রামের মূর্তি ফোটান, কলসীর কানায় যখন রক্তধারা গা বেয়ে পড়ছে তখনও ভালোবাসায় অন্ধ যিনি রাগে অচৈতন্য-কে চৈতন্য দিচ্ছেন, কে বলবে তিনি কোথায় আছেন আর কোথায় নেই?

নারদ এসে প্রশ্ন করলো শ্রীভগবানকে: মুমুক্ষু জিজ্ঞেস করেছে তার মুক্তির দেরী কত আর? শ্রীভগবান উত্তর দিয়েছেন তার প্রশ্ন করে: আর আমার ভক্ত তার কথা তুমিও ভুলে গেলে? নারদের মনে পড়ে; স্বাগত-স্বরে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কর্তা অবিনাশী সত্তাকে তিনি বলেন: হ্যাঁ, আরেকজনও আমাকে প্রশ্ন করেছিল বটে, জিজ্ঞেস করেছিল কতদিনে সে পাবে তোমার দেখা? কিন্তু সে তোমার নাম করেনি; গাল দিয়েছিল তোমায়! সে হল তোমার ভক্ত? শ্রীভগবান হরি বললেন: দুজনকেই গিয়ে বল, আমার হাতে অনেক কাজ, উত্তর দেবার সময় নেই এখন; তারপর তারা কি বলে তা শুনেও যদি বুঝতে না পারো আমি কার ভক্ত, তবে এসো আবার আমার কাছে।'

নারদ গিয়ে মুমুক্ষুকে বললেন আর বললেন শ্রীহরিনিন্দককে, দুজনকেই জানালেন ভাগবৎবার্তা। প্রথমজন নিরাশ হল; দ্বিতীয়জন গালাগালের রাশ আলগা করল আবার, একগাল, একরাশ গালাগালের পর অতঃপর বলল: 'তুমিও যেমন বিটলে, সে-ও তেমনই! যাঁর দৃষ্টিপাতে কোটি কোটি ভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ঘটার ব্যাঘাত নেই, তার কাজের ঘটা দেখ একবার! যাও যাও, নিজের কাজে যাও এখন। বুঝেছি, আমার সময় হয়নি এখনও—।'

বুঝলেন নারদও। বুঝলেন, কার দুঃসময়ের ধারা ফুরোতে দেরী আছে আর কার 'সময়' হয়েছে সন্নিকট। আর, বুঝলেন, আরও বুঝলেন মুনিশ্রেষ্ঠ, যে, কেন অসময়ে ডাকলে সাড়া দেন না শ্রীহরি, আর সময় হলে কেন তিনি এসে দাঁড়ান নিজে থেকেই, সময়ের অতীত যিনি সব সময়েই।
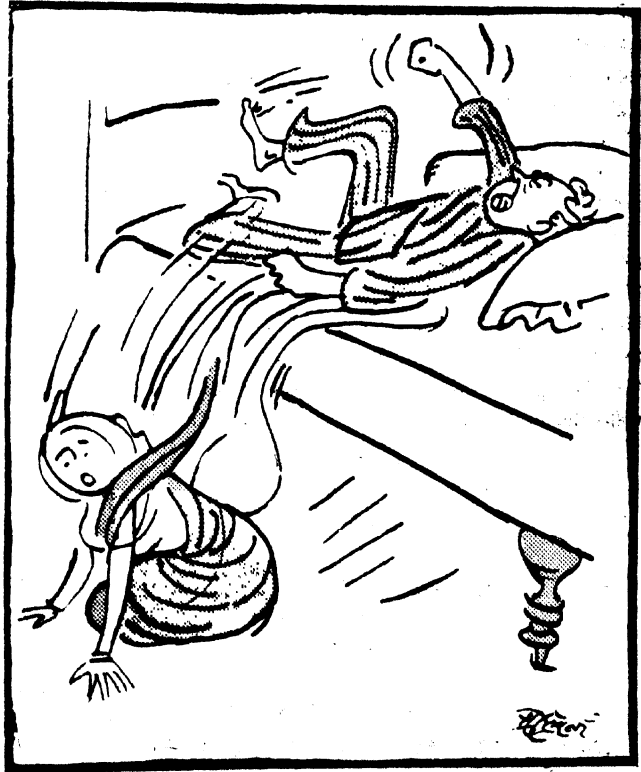
(ঘুমের ঘোরে) বিজ্ঞাপন ম্যানেজার—হ্যাঁ, দু'কলম space আমার চাই-ই-চাই।
—শিল্পী শৈল চক্রবর্তী

রাগের স্বর নয়, বৈরাগ্যের সুর নয়, অনুরাগের শর যাঁকে স্পর্শ করে তিনিই ঈশ্বর। ঊর্ধ্বে বা অধে নয়; নয় উত্তরে কিংবা দক্ষিণে; জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ধর্মতত্ত্বে নয়; কিছুতেই নয় উপবাসে; নয় সমাজের বিধিনিষেধে নয় বিধির নিষেধ; ভক্তের ভালোবাসা যাঁর সব চেয়ে ভালো বাসা, তিনিই ভগবান।

হরণ 'করতে করতে কোন সময়ে তাই রত্নাকর মনোহরণ করেছিলেন শ্রীহরির; মরা মরা বলতে বলতে রাম রাম বলে উঠেছিলেন তিনি, রত্নাকর থেকে যিনি বাল্মীকি হ'য়ে উঠেছিলেন একদা। স্ত্রীকে ভালোবেসে ভালোবেসে ছিলেন আরেকজন রমণীমোহনকে। এই স্ত্রীতেই তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন সেই 'সংকট মোচনের'। সেই 'আরেকজনের' নাম সাধু তুলসীদাস; যাঁর সম্বন্ধে মধুসূদন সরস্বতীর মুখে স্বয়ং সরস্বতীই যেন বলেছেন:

আনন্দকাননেহস্মিন্ জঙ্গমঃ তুলসী তরুঃ।
কবিতা মঞ্জরী যস্য রাম-ভ্রমর-ভূষিতাঃ ।।

কথাটা তাই'সত্য। কাশী হচ্ছে সেই নিত্যানন্দের কানন যেখানে জেগে আছে জীবন্ত তুলসী যাঁর কাব্যমঞ্জরী সেই ভ্রমরভূষিত যে ভ্রমরের নাম রাম। প্রথম যৌবনে রামনাম নয়, যে নাম তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল সে তাঁর স্ত্রীর নাম রত্না। বাল্মীকির মতো তিনিও ছিলেন রত্নাকর সেদিন। পথিকের ধনরত্ন অপহরণ করত যে একদা সেই আরেকদিন মানবচরিত্ররত্নের শ্রেষ্ঠ আকর যে রাম তাঁরই জীবনকাব্য রচনায় ভাষাকে দিলেন ছন্দ। মরা মরা বলতে উচ্চারণ করলেন, রাম, রাম। আর রমণীরত্ন থেকে আরেকজন রমণীয়তর রত্নের অন্বেষণে নিক্রান্ত হয়ে রচনা করলেন রামচরিত। রত্না রত্না করতে তিনি শরণ নিলেন রত্নাকর রামের। স্ত্রীনাম নয়; শ্রীরাম হল তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

হিমাদ্রিশৃঙ্গে আসন্ন হয়ে এলে আষাঢ়, মহানদ ব্রহ্মপুত্র ক্ষিপ্ত ধূর্জটির মতো আপনার তীর উপকূল খুঁজতে উন্মত্ত হলে তমসাচ্ছন্নতম অরণ্যে শরাহত ক্রৌঞ্চ মিথুনের বিচ্ছেদে বাল্মীকির বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে জন্ম নিল ছন্দ। ভূচর ভাষার অঙ্গে যুক্ত হল খেচর পক্ষ। সেই ছন্দে কার বন্দনা গাইবেন প্রশ্ন করলেন গুরুকবি; নারদ যাঁর নাম করলেন তিনি শুধু বীর নন, তিনি রঘুবীর। এমনই অন্ধকারাচ্ছন্ন এক রাতে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে খুঁজে পেলেন না স্ত্রৈণ তুলসীদাস। ঝড়, জল, অন্ধকার উপেক্ষা করে শ্বশুরালয়ে গিয়ে পেলেন স্ত্রী, রত্নাকে। ক্ষণিক অদর্শনে অস্থির স্বামীকে শান্ত করতে ভর্ৎসনার সুর ধ্বনিত হল সে ধনী মানিনীর মুখে:

'লাজ না লাগত আপুকো,
ধীরে আয়েহু সাথ।
ধিক ধিক আয় সে প্রেমকো,
কহা কহোঁ যে নাথ ।।
অস্থিচর্মময় দেহ মম—
তামো জৈসী প্রীতি।
তৈসী জো শ্রীরামমহ—
হোত ন তব্ব ভবভীতি ।।

[সাধক-জীবনী: শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

যৌবনস্বপ্নে আচ্ছন্ন তুলসীদাসের আকাশে মদিরাক্ষীর তীব্র তিরস্কারের অগ্নিআখরে ফুটে উঠল স্ত্রীনাম নয়; শ্রীরাম। লালাবাবুর কানে এসে বেজেছিল মেছুনির মুখে না জেনে উচ্চারিত সতর্কবাণী: 'বেলা যায়।' জীবনের অপরাহ্ন বেলায় সেই বাণী বুকে এসে বিঁধেছিল। বাণী নয়; মোহপাশ ছিন্ন করবার সেই বাণই যেন বলেছিল আরেক কবির, জগতের সকল কালের সকল দেশের শ্রেষ্ঠ কবির কথায়:

'আরও বড় হবে না কি যবে অবহেলে
ধরার ধূলার হাট হেসে যাবে ফেলে

সংসারে যে ছিল সং সেজে, বেরিয়ে গেল সে 'সার' খুঁজতে। প্রস্তুতি ছিল লালাবাবুর, বহু জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা ছিল পাথর চাপা। খুলে গেল মুহূর্তে তার মুখ। মেছুনির ডাক তার নিমিত্ত মাত্র; তার বেশি কিছু নয়। মন প্রস্তুত ছিল তুলসীদাসেরও। তাই স্ত্রী রত্না যখন তাকে বলল যে, স্ত্রীনামে তোমার যে আগ্রহ তার কণামাত্র যদি হত শ্রীরামে, তাহলে চলে যেত কাম, সেখানে জেগে উঠত নবদূর্বাদল শ্যাম। স্ত্রীর সেই ক'টি কথায়, কোটি কথায় যা ঘটে না, ঘটে গেল সেই অঘটন। স্বধর্ম-বিস্মৃত নদী দাঁড়িয়েছিল হ্রদগুের জন্তে ডোবা-র ছদ্মবেশে; তার কানে এসে পৌঁছল সমুদ্রের ডাক। রাধার কানে এল কৃষ্ণের বাঁশী। অন্তহীন দূরের। অনন্তের অভিসারে জীবন নদী যখন বেরোয় সিন্ধুর উদ্দেশে, তখন তার দুর্বার দুর্নিবার গতিরোধ করে এমন সাধ্য কার! স্ত্রীনামও আর পথ আটকে দাঁড়াতে পারল না শ্রীরাম-ভক্তের। স্ত্রীনামের দেয়াল দিয়ে ঘেরা সং পিছনে পড়ে রইল; শুরু হল শ্রীরাম সার নবজীবনের। স্ত্রীনামের অসার অভিমান থেকে জাত হল শ্রীরাম-অভিসার; শ্রীরাম-অভিযান।

বরুণা থেকে অসি; ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর। পাথরে নিষ্ফল মাথা কোটে। শ্রীনাম ধ্যান করে, শ্রীনাম জ্ঞান। কিন্তু শ্রীরাম কোথায়? শাস্ত্রজ্ঞ সনাতন দাসের কাছে গিয়ে পড়েন শাস্ত্রে অজ্ঞ তুলসীদাস। কিন্তু শাস্ত্রে সে সান্ত্বনা পাবে কোথায় শাস্ত্রের অতীত অবাঙমানসগোচরকে যে চাইছে জানতে। বিদ্যা তাকে কি দেবে যে খুঁজে বেড়াচ্ছে বিদ্যা যে দেয় তাকেই। দর্শন না হলে দর্শন পড়ে কি হবে লাভ। টোল থেকে দূরে অনন্ত নিভৃতে, মধুকরগুঞ্জরণে যেখানে কাঁপছে ছায়াতল সেখানে চলে শ্রীনাম জপ; শ্রীরামধ্যান। জ্যোতির্ময় সূর্যের আলো এসে পড়ে পায়ের কাছে তৃণাসনের ওপর তির্যকরেখায় রাত্রির তিমির অন্তে। ভঙ্গ হয় না তখনও নবদূর্বাদলশ্যাম সেই ধ্যান। কত সূর্যোদয়ে, কত সূর্যাস্তে অধীর অপেক্ষা ব্যর্থ হয় বুঝি অসীম উপেক্ষায়। নয়নের সম্মুখে কেন সে এসে দাঁড়ায় না নয়নের মাঝখানে যে নিয়েছে ঠাঁই। শ্যামল যে শ্যামল সেই নব-দূর্বাদলশ্যাম কেন এসে দাঁড়ায় না একবার, ধনুর্বাণ হাতে সেই ধনুর্ধর!

তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপে জ্বলে সেই জিজ্ঞাসা: পূর্ণচন্দ্র তুমি কি জানো শ্রীরামচন্দ্র কোথায়?

সকালবেলায় রোজ জল ঢালেন এক বৃক্ষমূলে তুলসীদাস। সেই বৃক্ষে এক অতৃপ্ত আত্মার বাস। বুক জ্বলে যায় তার তৃষ্ণায়; তুলসীর দেওয়া জলে গলে যায় তৃষ্ণার পাষাণ রোজ। অসীম কৃতজ্ঞতায় সে একদিন শ্রীরামদর্শনলাভের নিশানা দেয় শ্রীরামাভিলাষীকে। তার নির্দেশমতো, দশাশ্বমেধ ঘাটের ধারে রামায়ণ-কথার আসর শেষ হয়ে গেলে অনুসরণ করে তুলসীদাস কুষ্ঠের বেশে আবির্ভূত মহাবীর রঘুবীরভক্ত স্বয়ং হনুমানকে।

নিভৃততম একস্থানে তাঁর পায়ে পড়ে জানতে চান তুলসী শ্রীরামদর্শনের উপায়। কুষ্ঠের বেশ পরিত্যাগ করে বীরের বেশে আত্মপ্রকাশ করেন রঘুবীরভক্ত পবনরাজ মারুতি। শ্রীরামভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় 'শ্রীরামভক্তি'র।

[ক্রমশঃ।

সি, কে, সেনের
নূতন অবদান
বসন্ত মালতী
কেশ তৈল
চুলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে
কেশ প্রসাধনে শতবর্ষের অভিজ্ঞতা
সি, কে, সেন এণ্ড
কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা-১২

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৮

পর পর ক'টা রাত ধীরাপদর ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে। পার্টিশনের ওধারে মানুকের নাকের ঘড়ঘড়ানি বিরক্তিকর লেগেছে। সকাল হলেই ওকে অন্যত্র সরতে বলবে ভেবেছে। কিন্তু রাতের স্নায়ু-তাতানো ভাবনা সকালের আলোয় কমই টেকে। নিজের দুর্বলতা চোখে পড়ে, ভুল ধরা পড়ে। হঠাৎ ঘুমের ওপর ওর এমন দাবি কেন? সকাল হলে নিজেকেই পাশ কাটিয়ে চলে সে। থাক্, ক'টা দিন আর, বড়সাহেব এলে তো চলেই যাবে এখান থেকে। এখনো ফিরছেন না কেন, আশ্চর্য। ফেরার সময় হয়ে গেছে।

মাঝ-রাতে সিঁড়ির ওধারে দাঁড়িয়ে অমিতাভ ঘোষের ঘরে আলোর আভাস দেখেছে। ও-ঘরে যে আলো জ্বলে এখন সেটা ভোগের আলো নয়। ওই তন্ময়তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে বেখাপ্পা লাগে নিজেকে, ভিতরটা কুঁকড়ে যায়। পা এগোয় না, নিজের ঘরে ফিরে আসে আবার। নিজেকে ভোলায়, ভাবে, কি দরকার একজনের নিবিষ্টতা পণ্ড করে। কিন্তু ক'দিন ভোলাবে? অনাবৃত সত্যের মুখ ক'দিন চাপা দেবে সে? আসলে ধীরাপদ চক্রবর্তী তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ। ওই মানুষকে তোমার মুখ দেখাতে সঙ্কোচ। ওই জন্যেই তোমার ঘুমের দাবি, ওই জন্যেই তোমার মানুকের নাকের ডাক শুনে বিরক্তি, ওই জন্যেই এখন সুলতান কুঠিতে পালানোর বাসনা। সুলতান কুঠির অত নিঃসঙ্গতার মধ্যেও তোমার একটা আশ্রয় আছে ভাবো। গ্লানি আড়াল করতে পারার মত আশ্রয়।

নাড়া-চাড়া খেয়ে সজাগ হয়ে ওঠে ধীরাপদ। এই অনুভূতিটাকেই বিধ্বস্ত করে ফেলতে চায় সে, নির্মূল করে দিতে চায়। কিসের আবার সঙ্কোচ? কিসের গ্লানি? হিমাংশুবাবুর মনোভাব বলতে গিয়ে পরোক্ষে অমিতাভ ঘোষের সম্পর্কেও লাবণ্যকে ভুল বুঝিয়ে এসেছে বলে? বেশ করেছে। মন যা চেয়েছে তাই করেছে। শুনলে চারুদি এই প্রথম ওর কাজে খুশি হবেন বোধহয়...আর শুনলে তাঁর থেকেও বেশি খুশি হওয়ার কথা পার্বতীর।

ফ্যাক্টরী আঙিনায় ঢুকে সদর্পে সেদিন প্রথমেই ওয়ার্কশপের দিকে চলল। অমিতাভ ঘোষ নেই। সেখানে জীবন সোম ইতিমধ্যে মোটামুটি দখল নিয়েছেন। কর্মচারীরাও অখুশি নয় তাঁর ওপর। এই লোকের সঙ্গে তাঁদের স্বার্থের ফারাক কম, নিজেদের মত করেই এঁকে তারা অনেকটা বুঝতে পারে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জায়গায় আধ ঘণ্টা মিটার দেখলে বা দু'ঘণ্টার জায়গায় দেড় ঘণ্টা 'হিট' দিয়ে আধঘণ্টার ফুরসত রোজগারের চেষ্টা করলে ঘাড় থেকে মাথা ওড়ার দাখিল হয় না।

জীবন সোমের আপ্যায়ন এড়িয়ে ধীরাপদ মেন্ বিল্ডিংয়ের দিকে চলল। অমিত ঘোষকে মুখ দেখানোর তাগিদ। হয় অ্যানালিটিক্যালে নয়ত লাইব্রেরীতে আছে। আর না হলে খরগোশ নিয়ে পড়েছে। এই ক'টা দিনে গোটা তিনেক খরগোশের প্রাণান্ত হয়েছে। চীফ কেমিষ্টের এই নতুন তন্ময়তা ধীরাপদ দূর থেকে লক্ষ্য করেছে।

অনুমান মিথ্যে নয়। ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় পাশে একটা খরগোশ একতাল জড় স্তূপের মত পড়ে আছে। তার কান থেকে রক্ত টেনে রক্তের হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা চলছে। ধীরাপদ পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল। সমজদারের মতই চেয়ে চেয়ে দেখল খানিক।

আপনার আগের রোগী কেমন?

অমিতাভ ঘোষ মুখ তুলে তাকালো। দৃষ্টিটা ওর মুখের ওপর এক চক্কর ঘুরে আবার কাজের দিকে ফিরল। এটুকু অসহিষ্ণুতা থেকেই বোঝা গেল আগের রোগী অর্থাৎ আগের জীবটিরও ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। ধীরাপদ শোকের মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের কতদূর কি হল?

বাতাস থেকে ঝগড়া টানার সুর। ধীরাপদর সরে থাকার চেষ্টা, সে আমি কি জানি, কথা-বার্তা তো মামার সঙ্গে হয়েছে আপনার—

উষ্ণ ব্যঙ্গ ঝরল এক পশলা, আপনি তো মামার ঘড়ির চেন এখন, জানতে চেষ্টা করুন। ওটা তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার।

ক'দিন বাদে সামনাসামনি এসে দাঁড়ানোর ফলে ধীরাপদর ভালো লাগছে। গম্ভীর মুখে তার দরকার আর নিজের কদর দুই-ই স্বীকার করে নিল যেন। বলল, তাহলে আপনি এ-সব কি করছেন না করছেন সব ভালো করে বোঝান আমাকে, আবেদন করুন, তদ্বির করুন তারপর বিবেচনা করব।

জবাবে হ্যাঁচকা টানে নিশ্চেতন খরগোশটার কান ধরে সামনে নিয়ে এলো সে। ধীরাপদ আর দাঁড়ালে এটারও পরমায়ু এক্ষুনি শেষ হবে বোধ হয়। সহজ মুখ করেই বলল, চলি, এখনো ঘরে ঢুকিনি—আপনার হাতের কাজ শেষ হলে আসবেন নয়তো ডেকে পাঠাবেন। আপনার তো দেখা পাওয়াই দায়।

ভুরু কুঁচকে খরগোশ পর্যবেক্ষণে রত। ধীরাপদ হলের ভিতর দিয়ে অদূরের দরজার দিকে এগোলো। কাছে এসে দাঁড়ানো গেছে, মুখ দেখানো হয়েছে। নিজের ওপর দখল বেড়েছে।

শুনুন—

ধীরাপদ ফিরে দাঁড়াল। কাছে আসার আগেই ঈষৎ তিক্ত গাম্ভীর্যে অমিতাভ ঘোষ বলল, আপনাদের ওই গণু বাবু না গণেশ বাবুকে আমার কাছে ঘোরাঘুরি করতে বারণ করে দেবেন, আমার দ্বারা কিছু হবে না।

ধীরাপদ অবাক। অতর্কিত প্রসঙ্গটার তলকূল পেল না হঠাৎ। ···গণুবাবু মানে উমার বাবা গণুদা···তার অগোচরে এর কাছে ঘোরাঘুরি করছে! কিন্তু কেন? আরো কি আশা? গণুদা আত্মীয় নয়, কিন্তু তারই মারফৎ এই লোকের সঙ্গে যোগাযোগ বলে সম্মানে লাগলও একটু।

তিনি আবার আপনার কাছে ঘোরাঘুরি করছেন কেন?

অমিতাভ ঘোষ কাজে মন দিতে যাচ্ছিল, বিরক্ত হয়ে মুখ তুলল। কিন্তু ধীরাপদর মুখের দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি গেল। কিছু জানে না বলেই মনে হল হয়ত। বলল, তার চাকরি গেছে। পুরনো কর্মচারী বলে বরখাস্ত করার আগে অফিস তাকে তিন চারটে ওয়ার্নিং দিয়েছে, চুরি জোচ্চুরি কিছু বাকি রাখেনি সে—খোঁজ নিতে গিয়ে আমি অপ্রস্তুত।

পায়ের নিচে সত্যিই কি মাটি দুলছে ধীরাপদর? কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল আরো খেয়াল নেই। কখন নিজের ঘরে এসে বসেছে তা-ও না। মূর্তির মত বসেই আছে।···গণুদার চাকরি গেছে। কিন্তু গণুদার কথা একবারও ভাবছে না ধীরাপদ। সোনাবউদির সংসার-চিত্রটা চোখে ভাসছে শুধু। সোনাবউদির মুখ, উমার মুখ, ছোট ছোট ছেলে দুটোর মুখ। শেষে সকলকে ছাড়িয়ে শুধু সোনাবউদিরই মুখ। যে সোনাবউদি সংসারের অনটন সত্ত্বেও অন্যের দেওয়া বাড়তি টাকা সরিয়ে রেখে কুকার কেনার নাম করে ফিরিয়ে দেয়। যে সোনাবউদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়ের উপোস দেখবে তবু হাত পাতবে না।

এই মুহূর্তে ধীরাপদর সুলতান কুঠিতে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে। গিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, সোনাবউদি তুমি কিছু ভেবো না, আমি তো আছি। রমু হলে তাই করত, তাই বলত। কিন্তু এই এক ব্যাপারে সোনাবউদি রমুর থেকে অনেক তফাৎ করে দেখবে ওকে, অনেক নির্মম তফাতে ঠেলে দেবে।

তবু নিশ্চেষ্ট বসে থাকা গেল না একেবারে। বিকেলের দিকে গণুদার কাগজের অফিসে এলো খোঁজ-খবর নিতে। কি হয়েছে, কেন হয়েছে, কবে হয়েছে, জানা দরকার। কিন্তু খবর করতে এসে ধীরাপদ পালাতে পারলে বাঁচে। হেন সহকর্মী নেই যার কাছে গণুদা দু-দশ-বিশ টাকা ধারে না। এমন কি দীর্ঘদিনের চেনা ওপরঅলাদের অনেকের কাছ থেকেও গণুদা ভাঁওতা দিয়ে টাকা ধার করেছে নাকি। সে টাকায় জুয়া খেলেছে, রেস খেলেছে। কাজ-কর্ম ফাঁকির ওপর চলছিল। কিন্তু এটুকু অপরাধে কাগজের অফিসের চাকরি যায় না। লেখা ছাপা, খবর ছাপার প্রতিশ্রুতি

দিয়ে প্রত্যাশী লোকের কাছ থেকে টাকা খেতে শুরু করেছিল গণুদা। পুরনো লোক, তাই ওপরঅলারা ডেকে অনেকবার সাবধান করেছেন। কিন্তু এমন মতিচ্ছন্ন হলে কে আর তাকে বাঁচাবে? শুধু চাকরি খুইয়ে বেঁচেছে এই ঢের। চাকরি গেছে তাও দশ বারো দিন হয়ে গেল।

গণুদা কেন তাকে ডিঙিয়ে সোজা অমিতাভ ঘোষকে ধরেছিল বোঝা গেল! সেখান থেকে নিরাশ হয়ে এবারে হয়ত তার কাছে আসবে। এলে শুধু নিরাশ হওয়া নয়, কপালে আরো কিছু দুর্ভোগ আছে। এর থেকে গণুদার মৃত্যু-সংবাদ পেলেও ধীরাপদ এত অসহায় পঙ্গু বোধ করত না নিজেকে। কাগজের অফিস থেকে বেরিয়ে সুলতান কুঠির দিকেই এসেছে। কিন্তু সুলতান কুঠি পর্যন্ত পা চলেনি। দূরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে। কি করতে যাবে সে, কি বলতে, কি দেখতে···। কিছু করা যাবে না, কিছু বলা যাবে না। দেখার যা সেটা না গিয়েও দেখতে পাচ্ছে। এক পরিবারের অনশনের পরিপূর্ণ চিত্রর ওপর সোনাবউদির শুষ্ক কঠিন মুখখানা সারাক্ষণই দেখতে পাচ্ছে। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আজ কেন জানি ভয়ই করছে ধীরাপদর। সে ফিরে গেছে।

একে একে তিন চারটে দিন গেল, গণুদা আসেনি। এসে ফল হবে না বুঝেছে বোধহয়। কিংবা রমণী পণ্ডিত হয়ত আর কোনো লোভের রাস্তা দেখিয়েছেন তাকে। মানুষের কাঁধে শনি ভর করে শুনেছে। গণুদার কাঁধে রমণী পণ্ডিত শনি। কিছু কাল আগের সোনাবউদির একটা কথা বুকের তলায় খচখচিয়ে উঠল, বাতাস শুষে নিতে লাগল। যেদিন জয়েন্ট লাইফ ইনসিওরেন্স হয়েছিল দুজনার আর তারপরে আগের মত একসঙ্গে খাওয়ার কথা বলতে এসে গণুদা ওর তাড়া খেয়ে পালিয়েছিল—কথাটা সেইদিন বলেছিল সোনাবউদি। ধীরাপদ কৈফিয়তই চেয়েছিল, গণুদার চাকরির উন্নতি হয়েছে বলে তার ওপর রাগ কেন। সোনাবউদি প্রথমে ঠাট্টা করেছিল, পরে অন্যমনস্কের মত বলেছিল, রাগ নয়, কি জানি কি ভয় একটা···অনেক লোভে শেষ পর্যন্ত অনেক ক্ষতি, বোধ হয় সেই ভয়।

অনেক লোভে সেই অনেক ক্ষতিই হয়ে গেল শেষ পর্য্যন্ত।

বড়সাহেবের ফেরার অপেক্ষা। ধীরাপদ উদগ্রীব হয়েই প্রতীক্ষা করছে। তিনি এলে ওর সুলতান কুঠিতে ফিরে যাওয়া কিছুটা সহজ হবে। কাজের তাগিদে ঘর ছাড়তে হয়েছিল, কাজ শেষ হতে ঘরে ফিরেছে। কারো কিছু বলারও নেই, ভাবারও নেই। দু'চার ঘণ্টার জন্য গিয়ে ফিরে আসার থেকে সেটাই অনেক ভালো। কিন্তু সাত-আট দিন হয়ে গেল বড়সাহেবের ফেরার লক্ষণ নেই। সেখানকার অনুষ্ঠান কবে শেষ হয়েছে। কাগজে তারও বিবরণ বেরিয়েছে। এক শিল্প বাণিজ্য সাপ্তাহিকে সপ্রশংস মন্তব্য সহ বড়সাহেবের স্পীচ গোটাগুটি ছাপা হয়েছে। একটা মেডিক্যাল জার্ণালে মিঃ মিত্রর আশা-সঞ্চারী আলোকপাত প্রতিফলিত হয়েছে। বড়সাহেবের চিঠি না পেলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে ভাবত ধীরাপদ। লিখেছেন, খুব ভালো আছেন, ফিরতে দিন কতক দেরি হতে পারে। ··যতটা সম্ভব আগামী নির্বাচনের জমি নিড়িয়ে আসছেন হয়ত, নইলে দেরি হওয়ার কারণ নেই।

কিন্তু আছে কারণ। সেটা ধীরাপদকে কেউ চোখে খোঁচা দিয়ে দেখিয়ে না দিলে জানা হত না। দেখিয়ে দিল পার্বতী।

টেলিফোনে হঠাৎ গলার স্বর ঠাওর করতে পারেনি ধীরাপদ, অনেকটা সোনাবউদির মত ঠাণ্ডা গলা।···মামাবাবু সুবিধেমত একবার এলে ভালো হয়, তার দুই একটা কথা ছিল।

ধীরাপদ বিকেলে যাবে বলেছে। টেলিফোন নামিয়ে রেখে অবাক হয়েছে। কৌতূহল সত্ত্বেও টেলিফোনে কি জানি কেন কিছুই জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারেনি। টেলিফোনটা চারুদিই করালেন কিনা বুঝতে পারছে না, নইলে পার্বতীর কি কথা থাকতে পারে তার সঙ্গে?

পার্বতী বাইরের ঘরেই বসেছিল। তার অপেক্ষাতেই ছিল হয়ত। পায়ের শব্দে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল না, বলল, বসুন—

এই মেয়ের মুখ দেখে কোনদিনই কিছু বোঝার উপায় নেই। ধীরাপদ বলল, কি ব্যাপার, চারুদির শরীর ভালো তো?

পার্বতী কথা খরচ না করে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ ভালো। শান্ত মন্থর গতিতে ভিতরের দরজার দিকে এগোলো।

শোনো—। ধীরাপদর খটকা লাগল কেমন, বলল, আমি চা-টা কিছু খাব না কিন্তু, খেয়ে এসেছি।···চারুদি বাড়ি নেই?

পার্বতী দরজার কাছেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। চোখ দুটো তাঁর মুখের ওপর স্থির হল একটু। মাথা নাড়ল আবারও। বাড়ি নেই। পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল আবার।

কর্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাকে ডেকে আনার দরুন ধীরাপদ বিব্রত না হলেও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে।—বোসো, কি কথা আছে বলছিলে?

পার্বতী বসল। সোফায় ঠেস দিয়ে নয়, দাঁড়িয়ে থাকার মতই স্থির ঋজু। দ্বিধাশূন্য দৃষ্টিটা ধীরাপদর মুখের ওপরে এসে থামল। বলল, সেদিন আমাকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে আপনার কিছু কথা হয়ে থাকবে।···কি কথা, আমার জানার একটু দরকার হয়েছে।

ভিতরে ভিতরে ধীরাপদ নাড়াচাড়া খেয়ে উঠল একপ্রস্থ।—তিনি কোনরকম দুর্ব্যবহার করেছেন তোমার সঙ্গে?

না। মাথা নাড়ল, ভালো ব্যবহার করেছেন। আমার সেটা আরো খারাপ লেগেছে।

হয়ত বলতে চায় মায়ের ব্যবহার এরপরে আরো কৃত্রিম লেগেছে। বিব্রত ভাবটা হাসি-চাপা দিতে চেষ্টা করল ধীরাপদ, বলল, তোমার খারাপ লাগার মতই আমি তাঁকে কিছু বলতে পারি মনে করো নাকি?

এও কৃত্রিম কথাই যেন কিছু। পার্বতী চুপচাপ অপেক্ষা করল একটু, তারপর আবার বলল, আপনার সঙ্গে মায়ের কি কথা হয়েছে জানতে পেলে ভালো হত।

সেদিনও আর একজন ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বড়সাহেবের সঙ্গে তার কি কথা হয়েছে জানতে পেলে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিতে সুবিধে হত। লাবণ্যর সঙ্গে পার্বতীর এই জানতে চাওয়ার সুরে তফাত নেই খুব, কিন্তু তবু কোথায় যেন অনেক তফাত। জেনে সেই একজন বুঝে চলবে, আর এই একজন যেন সব বোঝাবুঝির অবসান করে দেবে। কি হয়েছে ধীরাপদ জানে না, কিন্তু ওই নিরুত্তাপ মুখের দিকে চেয়ে অন্তস্তলের দাহ অনুভব করতে পারে। কিছু না জেনেও ধীরাপদ সেটুকু মুছে দেবার জন্যে ব্যগ্র। হাসিমুখেই বলল, তাহলে চারুদি আসুক, আমি অপেক্ষা করছি—তাঁর সামনেই শুনো কি কথা হয়েছে।

পার্বতী বলল, মা এখানে নেই। কানপুরে গেছেন।

ধীরাপদর বোকার মতই বিস্ময়, সে কি। বড়সাহেবের সঙ্গে? প্রশ্নটা করে ফেলে নিজেই অপ্রস্তুত একটু। সেদিন অমন ধাক্কা খাওয়ার পর চারুদি অনেকক্ষণ চুপচাপ কি ভেবেছিলেন মনে পড়ল, তারপর বড়সাহেব কবে যাচ্ছেন খোঁজ নিয়েছিলেন।

মুখের দিকে চেয়ে থেকে পার্বতী তেমনি নির্লিপ্ত স্পষ্ট গলায় আবার বলল, যাবার আগে তিনি বাড়ির দলিল আর ব্যাঙ্কের বইগুলো সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। আর টেলিফোনে বড়সাহেবকে তাঁর নামের ব্যবসায়ের কি সব কাগজ-পত্র সঙ্গে নিতে বলেছেন শুনেছি। আমাকে শাসিয়ে গেছেন, আমি মরলেও তোর কোনো ভাবনা নেই।

কথাবার্তায় পার্বতীর এই যান্ত্রিক মিতব্যয়িতার নিগূঢ় তাৎপর্য ধীরাপদ আর একদিনও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে গিয়েছিল। আজও কি বলবে ভেবে না পেয়ে শেষে হাসতেই চেষ্টা করল।—তাহলে ভাবছ কেন?

মা অন্যায় কিছু প্রস্তাব করবেন আর বড়সাহেবকে দিয়ে অন্যায় কিছু স্বীকার করিয়ে নেবেন। নইলে বাড়ির দলিল নিতেন না। ব্যবসায়ের কাগজপত্রও সঙ্গে নিতে বলতেন না।

ধীরাপদই যেন কানাগলির দেয়ালে পিঠ দিয়েছে। বলল, অন্যায় মনে হলে বড়সাহেব তা করবেন কেন?

মা কাছে থাকলে করবেন। মা করাতে পারেন।

কানের কাছটা হঠাৎ গরম ঠেকতে ধীরাপদ বিব্রত বোধ করতে লাগল। রমণীর জোরের এই অনাবৃত দিকটার দিকে নিভৃতের দুচোখ ধাওয়া করতে চাইছে। সেই চোখ দুটো জোর করেই সামনের দিকে ফেরালো সে। পার্বতী নির্বিকার তেমনি। যন্ত্রের মুখ দিয়ে দুটো নির্ভুল যান্ত্রিক কথা নির্গত হয়েছে শুধু, তার বেশি কিছু নয় যেন।

স্বল্পক্ষণের নীরবতাও ভারী ঠেকছে। ধীরাপদ আস্তে আস্তে বলল, সেদিন চারুদির সঙ্গে আমার এ প্রসঙ্গে একটি কথাও হয়নি। নিজের ভুল শুধরে তিনি তোমাকে কাছে পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন হয়ত। তুমি সেটা অন্যায় ভাবছ কেন?

আমি কাছেই আছি, তিনি আমাকে তাড়াবার রাস্তা করছেন। আপনি দয়া করে এ-সব বন্ধ করুন। সম্পত্তি দিয়ে আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করলে আরো ভুল হবে। তাঁর আমাকে কিছু দেবার নেই আমি জানি। সে-জন্যে আমি তাঁকে কখনো দুষিনি।

এতগুলি কথা একসঙ্গে বলেনি পার্বতী। একটা একটা করে বলেছে। একটা ছেড়ে আর একটা বলেছে। ধীরাপদ অনেকক্ষণ ধরে শুনেছে যেন। অনেকক্ষণ ধরে কানে লেগে আছে। পার্বতীকে আর কিছু বোঝাতে চেষ্টা করেনি সে, কোনরকম আশ্বাসও দিয়ে আসেনি। এতখানি স্পষ্টতার মধ্যে কথা শুধু শব্দ হয়ে কানে বাজবে। চারুদি ওকে টোপের মত একজনের সামনে ঠেলে দিতে চেয়েছেন, সেইখানেই ওর আপত্তি, সেই জন্যেই বিরোধ। নইলে চারুদি কোথায় রিক্ত সে জানে। তাঁকে পার্বতী দুষবে কেন?

না, ধীরাপদ ঠিক এভাবে ভাবেনি বটে কখনো। অভিযোগ পার্বতীর একজনের 'পরেই থাকা সম্ভব। সে অমিতাভ ঘোষ। যে মানুষটা তার জীবনের আঙিনায় বার বার এগিয়ে এসেও আর এক দুর্বল পিছু টানে ফিরে ফিরে যাচ্ছে। আর সকলে অতি তুচ্ছ পার্বতীর কাছে।

দায়ে পড়ে চারুদি সেদিন বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, অতীতের কোনো দাগ লেগে নেই ওর গায়ে। পার্বতীর আজকের পরিচয়টাই সব। কথাটা যে কত যথার্থ ধীরাপদ আজ উপলব্ধি করছে। অনেক বিস্ময় সত্ত্বেও আর চারুদির নিরুপায় সুপারিশ সত্ত্বেও স্বাভাবিক সামাজিক জীবনে এই পাহাড়ী মেয়েকে সেদিন অমিতাভ ঘোষের যোগ্য দোসর ভাবতে পারেনি সে। দোসর আজও ভাবছে কিনা জানে না। কিন্তু যোগ্যতার প্রশ্নটা মন থেকে নিঃশেষেই মুছে গেছে।

পথ চলতে চলতে ধীরাপদর কেমন মনে হল, অমিতাভ ঘোষের পিছুটানের ওই দুর্বল সুতোটাও ইচ্ছে করলে পার্বতী অনায়াসে ছিঁড়ে দিতে পারে। তা না দিয়ে সে শুধু দেখছে চেয়ে চেয়ে। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের টানা-পোড়েন দেখছে। এই দেখাটা নির্লিপ্ত বিদ্রূপের মত। পুরুষ-চিত্ত একটু বিচলিত করে তোলার মত। হয়ত বা ঈষৎ উগ্র করে তোলার মতও। [ক্রমশঃ।

বীক্ষণী

সুকুমার ঘোষ

এ এক আশ্চর্য্য যোগ
পৃথিবীকে ভুলে থাকবার।
হয়তো আলোর নাম অন্ধকার;
অন্ধকারে আমরা প্রবাসী।

একটি আশ্চর্য্য কথা—
মায়ের মাধুর্য্যে থেকে থেকে
এখনো মানুষদের অন্ধকারে দেখে—
পরিচিত জনমনা, রাশি।

সবকে দেখবার আগে
অভিশপ্ত দরজা দাও খুলে,
এবং রাত্রির মতো,—অন্ধকারে, আলোকিত
পৃথিবীকে ভুলে।

দ্বিতীয় টেষ্টেরও এক অবস্থা

এই সেই গ্রীণপার্ক। যেখানে পরাজয় আর অমীমাংসার গড্ডালিকায় একবার ছেদ পড়েছিল—ভারতের ক্রিকেট-কাঙাল একবারের জন্য অন্তত স্বর্গ দর্শন করেছিল। ১৯৫২ সালের ভারতীয় ক্রিকেটের মণিকোঠার মণি এই গ্রীণপার্কের গলায় ঝোলান।

এম, সি, সির সঙ্গে ভারতের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা কাণপুরের এই গ্রীণপার্কে। বোম্বাইয়ে প্রথম টেষ্টের বিরক্তিমূলক অমীমাংসার পরে খেলোয়াড়দের মতিগতি ও খেলার ধারা ভুলে ১৯৫২ সালের কথা স্মরণ ক'রে অন্তত কাণপুরের দ্বিতীয় টেষ্ট সম্বন্ধে সকলে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু মাঠ দেখে সকলেই স্তম্ভিত। এ মাঠে তো নিষ্পত্তি পাঁচদিন কেন দ্বিগুণ সময়েও করার আশা বৃথা।

শোনা গেল ভারতের এক প্রান্ত থেকে পিচের মাটি এসেছে, এক প্রান্ত থেকে ঘাস এসেছে, আর এক প্রান্ত থেকে মালি এসেছে—সাত মণ তেল পুড়েছে, শ্রীরাধার নৃত্য দেখার জন্ত ক্রিকেটরসিকরা কাণপুর গিয়ে তাজ্জব। পিচের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘাসের চিহ্ন মাত্র নেই। নামেই "গ্রীণ" কাজে সবুজের আভাও কোথাও দেখা যায় না। সিমেণ্টের মেঝের মত "পিচে" পাঁচদিন ধরে ক্রিকেট খেলা হলে যা হবার তাই শেষ পর্যন্ত হয়েছে।

তবু তৃতীয় দিন কিছুক্ষণের জন্ত অন্তত খেলার আবহাওয়া বদলে ছিল। ভারতের অনুকূলে হাওয়া এসেছিল। ৮ উইকেটে ৪৬৭ রাণ তুলে ভারত প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলে ইংলণ্ড তৃতীয় দিনের শেষে ৮ উইকেট হারিয়ে করে মাত্র ১৬৫ রাণ। সুভাষ গুপ্তে রহস্যময় "ফ্লাইট" ও "স্পিনে"র সাহায্যে ৬৭ রাণে ইংলণ্ড দলের ৫ জন বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানকে ধরাশায়ী করেন। বোরদের সামনেও ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা দাঁড়াতে পারেন নি। তিনি ২৮ রাণে ৩টি উইকেট দখল করেন।

তবে কি "পিচে" প্রাণ ফিরে এসেছিল? মোটেই না। ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা "লেগ স্পিনে" একেই কাতর—তার প্রমাণ রিচি বিনাউডের মারাত্মক সাফল্য—তার ওপর তাঁদের কারো "ফুটওয়ার্ক" বা "ফ্লাইট" বল এর বিরুদ্ধে খেলতে গেলে যা একান্ত প্রয়োজন তা মোটেই নেই।

২৪৫ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে "ফলো অনে" বাধ্য হয়ে তাঁরা নিজেদের ত্রুটি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে সকলেই গুপ্তের বল এগিয়ে গিয়ে খেললেন ফলও পেলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ৪৯৭ রাণ তুললে খেলার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

তবে কি গুপ্তে বা বোড়ের বলে মোটেই ধার ছিল না? এক্ষেত্রে বোলার অপেক্ষা "পিচই" সম্পূর্ণ দায়ী। এই "পিচে" যাদুকরেরও কোন কিছু করা অসম্ভব।

এইবার অধিনায়ক ডেক্সটারের কথা। ভারত যেই "টসে" জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলে অমনি তিনি নিজের সব "আপ্তবাক্য" ভুলে এমন রক্ষণমূলক ফিল্ডিং সাজালেন যা প্রত্যেকের দৃষ্টিকটু লেগেছিল। প্রথম থেকেই এই জাতীয় রীতি নেতিমূলক নিষ্পত্তিরই পরিচয় বহণ করে।

এই দিক দিয়ে ভারতের অধিনায়ক কন্‌ট্রাক্টরের প্রশংসা করা চলে। তাঁর আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং সাজান, ঠিক সময়ে ঠিক বোলার পরিবর্তন সকলের প্রশংসা অর্জন করে। ভারতের ফিল্ডিংও এই খেলায় অত্যন্ত উচ্চমানের হয়।

এইবার ব্যক্তিগত ভাবে ভারতের প্রথম ইনিংসে জয়সীমা ও মাঞ্জরেকরের দৃঢ়তা সকলের প্রশংসা লাভ করে। জয়সীমা ৭০ ও মাঞ্জরেকর ৯৬ রাণে আউট হন। প্রবীণ উম্রীগড় ব্যাটিংয়ে আজও যে ভারতীয় দলে অতুলনীয় তা তাঁর ১৪৭ রাণে অপরাজিত থাকাই প্রমাণ করে। এটা তাঁর ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় শতরাণ।

ইংলণ্ড দলে প্রথম ইনিংসে কারও খেলা উল্লেখযোগ্য হয় না। তবে শেষ সময় লক ও বারবারের দৃঢ়তা প্রশংসনীয়। লক ৪৯ রাণে আউট হন আর বারবার ৬৯ রাণে অপরাজিত থাকেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড দলের ৩ জন ব্যাটসম্যান শতরাণ লাভ করেন। এর মধ্যে ব্যারিংটনের উপর্যুপরি তৃতীয় শতরাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৭২ রাণে আউট হন। এ ছাড়া পুলারের ১১৯ রাণ ও ডেক্সটারের অপরাজিত ১২৬ রাণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যাই হোক দ্বিতীয় টেষ্টে ভারত জিততে না পারলেও খেলার অধিকাংশ গৌরব লাভ করে। ইংলণ্ড দলকে ভারতের বিরুদ্ধে শুধু মাত্র প্রথম "ফলো অনে"র দীনতা স্বীকার করতেই হয় না, ভারতের বিরুদ্ধে এরকম কোণঠাসা অবস্থায়ও ইংলণ্ডকে কোনদিন পড়তে হয় নি।

সংক্ষিপ্ত রাণ সংখ্যা—ভারত ১ম ইনিংস—৪৬৭ (৮ উইঃ ডিঃ) (উম্রীগড় নট আউট ১৪৭, মাঞ্জরেকর ৯৬, জয়সীমা ৭০, ডুরাণী ৩৭, ইঞ্জিনীয়র ৩৩, সরদেশাই ২৮; লক ৯৩ রাণে ৩ উইঃ, নাইট ৮০ রাণে ২ উইঃ, ডেক্সটার ৮৪ রাণে ২ উইঃ)।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস ২৪৪ (রিচার্ডসন ২২, পুলার ৪৬, ব্যারিংটন ২১, বারবার নট আউট ৬৯, লক ৪৯; গুপ্তে ৯০ রাণে ৫ উইঃ, বোড়ে ৫৯ রাণে ৩ উইঃ)

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস ৪৯৭ (৫ উইকেটে) (রিচার্ডসন ৪৮, পুলার ১১৯, ব্যারিংটন ১৭২, ডেক্সটার ১২৬)।

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ অমীমাংসিত

দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠে অনুষ্ঠিত তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচও অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। বৃষ্টির জন্য পিচ এবং সমগ্র মাঠ ভিজা থাকায় চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে একেবারেই খেলা আরম্ভ করা সম্ভবপর হয় নি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫২ সালে ওভাল মাঠে বৃষ্টিপাতের ফলে ভারত ও ইংলণ্ডের টেষ্ট খেলা মাঝ পথে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তবে দিল্লীর ইতিহাসে এই অভিজ্ঞতা প্রথম। বৃষ্টি না হলেও এই খেলার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি একই হতো। ভারতের প্রথম ইনিংসের ৪৬৬ রাণের প্রত্যুত্তরে তৃতীয় দিন ইংলণ্ড তিন উইকেটের বিনিময়ে ২৫৬ রাণ তুলে যোগ্য প্রত্যুত্তর দেয়।

এই খেলার ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে ভারতের বিজয় মাঞ্জরেকার ও জয়সীমার ব্যাটিংয়ের কথা স্মরণ করার মতন। মাঞ্জরেকার এই খেলায় ১৮৯ রাণে অপরাজিত থেকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলায় ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসাবে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ সংখ্যক রাণ লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৯৫২ সালে লর্ডস মাঠে ১৮৪ রাণ করে মানকড় ছিলেন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে পূর্বতন সর্বোচ্চ সংখ্যক রাণের অধিকারী। জয়সীমা এই খেলায় ১২৭ রাণ করেন। টেষ্ট খেলায় এটাই তাঁর প্রথম শত রাণ লাভ। ইংলণ্ডের ব্যারিংটনের ব্যাটিং সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। তিনি ১১৩ রাণে অপরাজিত থাকেন। ব্যারিংটন এবার নিয়ে উপর্যুপরি চতুর্থ বার শত রাণের কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেষ্টে ও ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি টেষ্টেই শত রাণ করেন। পুলার এই খেলায় ৮৯ রাণ করে আউট হন।

রাণ সংখ্যা

ভারত—১ম ইনিংস ৪৬৬ (মাঞ্জরেকার নট আউট ১৮৯, জয়সীমা ১২৭, চান্দু বোড়ে ৪৫, কণ্ট্রাক্টর ৩১ ; ডি. এলেন ৮৭ রাণে ৪ উই: ও লাশিট ৭২ রাণে ২ উই:)।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস (৩ উই:) ২৫৬ (ব্যারিংটন নট আউট ১১৩, পুলার ৮৯, ডেক্সটার নট আউট ৪৫)।

রুশ ফুটবল দলের ভারত সফর

ভারতীয় সেনাদলের আমন্ত্রণে ভারত সফরের উদ্দেশ্যে রুশ সেনা বাহিনীর ফুটবল দল সম্প্রতি এসেছিল। ইতিপূর্বে রাশিয়ার জাতীয় ফুটবল দলের ভারত সফরের কথা আজ বোধ হয় তাদের উন্নত ক্রীড়া চাতুর্য্যের নিদর্শন হিসাবে ভারতবাসীর মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাই স্বভাবতঃই রুশ সেনাদলের ভারত সফরের কথায় সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন।

রুশ দল দিল্লীতে দুটি, বোম্বাইতে দুটি ও পাটনায় একটি প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করে।

তাদের প্রথম খেলা হয় দিল্লীতে ডুরাণ্ড বিজয়ী অন্ধ্র পুলিশ একাদশের সঙ্গে।

প্রথম আবির্ভাবেই তাঁরা জনগণের চিত্ত জয়ে সমর্থ হন। তাঁদের আচরণে দৃঢ়তা তৎপরতা আর বিজ্ঞানসম্মত ক্রীড়াধারা সত্যই নয়নাভিরাম হয়। এই খেলায় প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বিপক্ষ দলের সঙ্গে "হেসে খেলা" করেন। অন্ধ্র পুলিশকে দ্বিতীয়ার্দ্ধে তো একদম বেদম হয়ে পড়তে দেখা যায়। এই খেলায় শেষ পর্য্যন্ত রুশ দল ৫-০ গোলে জয়লাভ করে।

দিল্লীতে রুশ দলের দ্বিতীয় প্রদর্শনী খেলা হয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর একাদশের বিরুদ্ধে। এইদিনের খেলা দেখে মনে হয় রুশ সেনাদল যেন একটি ফুটবল দল নয় এগারোটি অংশ সঠিকভাবে গ্রথিত একটি সচল যন্ত্র যেন মাঠে আবির্ভূত হয়েছে। তাদের অকস্মাৎ স্থান পরিবর্তনও অননুকরণীয় হয়। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর একাদশ সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে পড়ে। আগন্তুক দল এই খেলায় ৬-০ গোলে জয়লাভ করে। বিজয়ী দলের পলকারেভ 'হ্যাট ট্রিকের' গৌরব লাভ করেন।

এবার বোম্বাই। রুশ দল এখানে দুটি খেলায় অংশ গ্রহণ করে। প্রথম খেলায় স্থানীয় লীগ বিজয়ী টাটা স্পোর্টস শোচনীয়ভাবে ১১-১ গোলে রুশ দলের কাছে পরাজিত হয়।

বোম্বাইতে রুশ দলের দ্বিতীয় খেলা হয় সম্মিলিত ভারতীয় সেনাদলের সঙ্গে। এই খেলায় কিন্তু রুশ দলকে কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। ভারতীয় সেনাদল বিশেষ করে মধ্যমাঠে প্রায় সমান সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালায়। গোলমুখে তাদের ব্যর্থতার জন্যে তারা অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত রুশ দলের কাছে ৩-০ গোলে পরাজয় বরণ করে।

এরপর পাটনায় কলকাতার জনপ্রিয় মোহনবাগান দলের সঙ্গে হয় তাদের সফরের শেষ খেলা। এই খেলাটি বিহার বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমার্দ্ধে রুশ দল ২-০ গোলে অগ্রগামী থাকে। অবশ্য এর মধ্যে একটি গোল কেম্পিয়ার আত্মঘাতী। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিজয়ী দল আরও দুটি গোল দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত ৪-০ গোলে জয়লাভ করে।

আগন্তুক দলের ভারত সফরের ফলে ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়রা কি পরিমাণ সম্পদ আহরণ করতে সমর্থ হলেন তার মানের ওপরই নির্ভর করবে এ জাতীয় সফরের সার্থকতা।

রুশ জিমন্যাষ্ট দলের ভারত সফর

দূরকে নিকট ও পরকে আপন করবার প্রশস্ত ক্ষেত্র হচ্ছে ক্রীড়াঙ্গন। অনেক রাজনীতির কোলাহল, বিদ্বেষের হলাহল পার হয়ে মানুষ এই শিক্ষা লাভ করেছে আজ। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চলেছে বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ। ভারতও এদিক দিয়ে পিছিয়ে নেই। বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়রা বহুবার এসে কিছু দিয়ে গেছে, কিছু নিয়ে গেছে আর মনোজগতে মিলনের এক সেতু রচনা করে গেছে।

রাশিয়ার অন্তর্গত আর্মেনিয়া অঞ্চল থেকে দশজনের এক জিমন্যাষ্ট দল ভারতে ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করতে সম্প্রতি এসেছিলো। দলের অধিনায়ক আজারিয়ান ৭ বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ও ২ বার অলিম্পিকে স্বর্ণ পদকের অধিকারী। আর তাছাড়া এই দলের প্রায় সকলেই আগামী অলিম্পিকে রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। এ হেন একটি দলের সঙ্গে ভারতের জিমন্যাষ্টদের এক ক্রীড়াঙ্গনে মিলিত হওয়া যথেষ্ট আকর্ষণের দাবী রাখে।

রাশিয়ান দলটি কলকাতাতেও তাঁদের ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করে। এর আগে তারা পাতিয়ালায় ভারতের সঙ্গে এক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। দিল্লীতে হয় তাদের দ্বিতীয়

প্রতিযোগিতা ; আর ক'লকাতায় তৃতীয় ও শেষ প্রতিযোগিতা পাতিয়ালা ও দিল্লীতে রাশিয়ান দল অল্প পয়েন্টের ব্যবধানে জয়ী হওয়ায় কলকাতার প্রতিযোগিতা স্বভাবতই বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

ক'লকাতার প্রতিযোগিতার বিষয়াবলী হ'ল গ্রাউণ্ড জিমন্যাষ্টিকস, পোমেল হর্স, হোরাইজন্টাল বার, লংহর্স, প্যারালাল বার ও রিং। প্রতিযোগিতা শেষে উভয় দল কয়েকটি ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করে।

প্রথম দিনের প্রতিযোগিতা শেষে গ্রাউণ্ড জিমন্যাষ্টিকসে ভারত সংগ্রহ করে ৫২'২ পয়েন্ট ও রাশিয়ান দল ৪৬'৭ পয়েন্ট। অবশ্য রাশিয়ান দলে মাত্র পাঁচ জন ব্যায়ামকুশলী যোগদান করেন। পমেল হর্সে রাশিয়ার হয় ৫২'৮ পয়েন্ট আর ভারতের হয় ৫৪'১ পয়েন্ট। হোরাইজন্টাল বারে রাশিয়া ৫৫'৩ পয়েন্ট ও ভারত ৫১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে। এই অবস্থায় দ্বিতীয় দিনের প্রতিযোগিতার আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়।

দ্বিতীয় দিনের সর্বাপেক্ষা নয়নাভিরাম ব্যায়াম-কৌশল দেখবার সৌভাগ্য ঘটে কলিকাতাবাসীদের। এই দিন রোমান রিংয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ও অলিম্পিক বিজয়ী আজারিয়ান অনায়াস ভঙ্গীতে যে সব ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শন করেন, তা ভারতবাসী অনেক দিন মনে রাখবে। রোমান রিং-এ রাশিয়ার হয় ৪৭'৫ পয়েন্ট আর ভারতের হয় ৪৭'৮ পয়েন্ট। অবশ্য রাশিয়ান দলে ৫ জন প্রতিযোগী ছিলেন। লং হর্সে রাশিয়া সংগ্রহ করে ৫৬'২ পয়েন্ট ও ভারত অর্জন করে ৪২'১ পয়েন্ট। প্যারালাল বারে রাশিয়ার হয় ৫৪'১ পয়েন্ট ও ভারতের হয় ৪৬'৮ পয়েন্ট।

শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়া মোট ২৭৮ পয়েন্ট পেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। ভারতের হয়, ২৫২'৪ পয়েন্ট।

৫৬'৮ পয়েন্ট লাভ করে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী হন রাশিয়ার আজমা-তোরিয়ান।

অল্প পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজয় বরণ করলেও বিশ্বজয়ী রাশিয়ান দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় জিমন্যাষ্ট দল যে ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তাতে আমরা গর্ববোধ করি আর তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করি।

জাপানী ভলিবল দলের কলিকাতা সফর

এই মাসে ক'লকাতা ময়দানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিদেশী সরকারী দল হচ্ছে জাপানী কুরিনাকাই ভলিবল দল। পশ্চিম বাঙলা ভলিবল এসোসিয়েশনের বিশেষ আমন্ত্রণে এই দল ক'লকাতায় দুটি প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করে।

পশ্চিম-বাঙলার বিরুদ্ধে জাপানী দল জোরালো "স্ম্যাসিং" ও সুন্দর সংগত বোঝাপড়ার পরিচয় দিয়ে ৩—১ খেলায় জয়লাভ করেন। এই খেলায় পশ্চিমবাঙলা দলের সকলকেই এক আশ্চর্য পরাজিতের মনোভাব আচ্ছন্ন করে রাখে। টোকিও দলটি বিশেষ শক্তিশালী না হলেও তাদের এই প্রথম পরিচয় সকলের যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয় খেলায় জাপানী দল সর্বভারতীয় ভলিবল দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই খেলায় সর্বভারতীয় দল ৩—২ সেটে পরাজিত হয়। ভারতীয় দলের পক্ষে বলা যায় তারা তৃতীয় ও চতুর্থ সেটে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে সমর্থ হয়। দলীয় সংহতির অভাবে তারা শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য পরাজয় বরণ করে।

আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা

'৬২ সালের জানুয়ারী মাসে আমেদাবাদে যে আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে, তাতে এ পর্য্যন্ত ন'টি দেশের নাম পাওয়া গেছে—হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, মালয়, জার্মাণী ও ভারত। পাকিস্তানের কাছ হ'তেও শীঘ্র আবেদনপত্র পাওয়ার আশা করছেন ব্যবস্থাপক মণ্ডল।

স্থানীয় পুলিশ মাঠে পঁচিশ হাজার দর্শকের উপযুক্ত নতুন ষ্টেডিয়ামের কাজ শেষ হয়েছে। প্রায় তিন শ' যোগদানকারীর আহার বাসস্থানের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ। স্বল্পমূল্যে খেলাগুলি দেখবার জন্যে ছাত্ররা যাতে বিশেষ ব্যবস্থা পায়, তার জন্যে কর্তৃপক্ষ বিশেষ চেষ্টা করছেন।

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর গৌরব লাভ করে সার্ভিসেস দল। মোট এগারটির মধ্যে দশটি বিষয়েই তারা জয়ী হয়। রেল দল রাণার্স আপ আখ্যা লাভ করে। বাঙলা মাত্র ১ পয়েন্ট পেয়েছে।

এই প্রতিযোগিতা শেষে ভারতীয় অপেশাদার মুষ্টিযুদ্ধ সংস্থার কার্য্যকরী সমিতি ঠিক করেন '৬২ সালের প্রতিযোগিতাও এই জব্বলপুরেই অনুষ্ঠিত হবে।

এবারের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দলের পয়েন্টের খতিয়ান হ'ল, সার্ভিসেস-৪৮ ; রেলওয়ে-২৫ ; মহীশূর-৯ ; মধ্যপ্রদেশ-৫ ; পাঞ্জাব-৩ ; বিহার-২ ; মহারাষ্ট্র-২ ; অন্ধ্রপ্রদেশ-১ ; পশ্চিমবাঙলা-১ ; গুজরাট-০।

বিশ্ব হেভি ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ

টোরোন্টোতে বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ানশিপের লড়াই হয়ে গেল। বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান ফ্লয়েড প্যাটার্স'ন প্রতিদ্বন্দ্বী টম ম্যাকিনলেকে চতুর্থ রাউণ্ডে নক আউটে পরাজিত করে নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। এই লড়াইয়ে রেফারীর কাজ করেন ভূতপূর্ব বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান জো ওয়ালকট। লড়াইয়ের শেষে প্যাটার্স'ন প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাকিনলের সাহসিকতা ও শ্রমসহিষ্ণুতার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। প্যাটার্স'নের পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী এখনও স্থির হয়নি।

এই সংখ্যায় বাঙলার পার্বত্য অঞ্চলের দুই খাসিয়া মজদুরণীর আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্রটি শ্রীচঞ্চল মিত্র গৃহীত।

মধুরেণ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বিনতা রায়

Sc 11.

সকাল। কৃষ্ণবিহারী চৌধুরীর এলগিন রোডের বিরাট বাড়ী। দোতলার চওড়া বারান্দা। টেবিলের ওপর ছোট একটা রিভলভার রাখা। তুলো, ঝাড়ন, ব্রাসোর কৌটো। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণবিহারী মস্ত বন্দুকটা নিয়ে পরিষ্কার করছে মনোযোগ দিয়ে। ভগিনী সুলতা এসে দাঁড়ালো।

সুলতা। দাদা দাদা—

কৃষ্ণবিহারীর মনোযোগ ব্যাহত হয় না। একমনে নিজের কাজ করে চলে।

Cont. দাদা, ও দাদা—

কৃষ্ণ। কি দাদা দাদা—কাজের সময় খামোখা ব্যাঘাত করিস কেন?

সুলতা। হ্যাঁ, এমন একখানা কাজে ব্যস্ত তুমি—যে ব্যাঘাত করলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে। ও কাজটা রেখে আমার কথা শোনো।

কৃষ্ণ। (কাজ করতে করতে) কি?

সুলতা। তোমার ওই রাইফেল আর বন্দুক আমি থানায় জমা দিতে চাই?

কৃষ্ণ। (ধপ কোরে হাতের কাজ ফেলে দিয়ে রক্তচক্ষু হ'য়ে) কি—কি বললি?

সুলতা। তুমি অত রাগ করলে আমার কিছুই বলা হবে না। আচ্ছা দাদা, মিলিটারীতে যারা কাজ করে এসেছে সবাই কি এই রকম যাচ্ছেতাই মেজাজের লোক?

কৃষ্ণ। (ক্ষিপ্ত কণ্ঠে) মেজাজ! টেবিলের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘুষি মারে। (টেবিলের জিনিষগুলো ঝন্ ঝন্ ক'রে ওঠে) মেজাজ দেখলি কোথায়?

সুলতা। (দুটো হাত তুলে থামানোর ভঙ্গিতে খুব শান্ত ভাবে) না না, মেজাজ ঠিক নয়—আর সত্যি তো তোমার মেজাজটা ভাল না থাকলে কি আর তুমি আমার কথা শুনতে?

কৃষ্ণ। (বন্দুকটা বেশ ভাল পরিষ্কার হচ্ছে কিনা উল্টে পাল্টে দেখে নিজের বেশ খুশীর ভাব নিয়ে) হ্যাঁ তবেই বল্—মেজাজ আমার খুবই ঠাণ্ডা—তা কি বলতে চাস শুনি—

চেয়ারে ঠাণ্ডা হ'য়ে বসে। সুলতা এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণবিহারীর মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে যতদূর সম্ভব তাকে খুশী করার চেষ্টায় নিজে যতদূর রোষ চেপে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে।

সুলতা। আজ সকাল থেকে যে তুমি বড় একলা দাদা? ডাক্তার বিরূপাক্ষ তো এখনও এলেন না!

কৃষ্ণ। (নরম কণ্ঠে একটু হেসে) আসবে আসবে। তার যা ডিউটি-জ্ঞান—মেয়েটাকে সে মুহূর্তের জন্যেও অবহেলা করে না। ডাক্তারের পেছনে টাকা খরচ করা সহজ, কিন্তু এমন কর্তব্যবোধ ক'জনার থাকে। মাকে আমার সুস্থ ক'রে তবে তার শান্তি।

সুলতা। কিন্তু তার শান্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অম্বুর চির শান্তি না ঘটে—এই বিষয়ে তোমাকে কিছু বলতে চাই।

কৃষ্ণ। কি যে হেঁয়ালি ক'রে তোরা কথা বলিস! যা বলবি সোজাসুজি বল না বাপু। (বন্দুকটা তুলে নেয় হাতে)

সুলতা। (একটু সরে গিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে) হ্যাঁ সোজাসুজিই বলবো বলেই ঠিক করেছি। শোনো, অম্বুর কিছু হয়নি। মাঝে মাঝে মাথা ধরা, বুক ধড়ফড় করা, এগুলো কোনো অসুখই না—প্রত্যেকের হয়।

কৃষ্ণ। কই আমার তো হয় না! বন্দুকটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে।

সুলতা। (হতাশার ভঙ্গিতে) উঃ কি মুস্কিল। তোমার টাকা আছে, তুমি মুঠো ক'রে ছড়াও আমার বলবার কিছু নেই। কিন্তু আজ ছ'টা মাস ধ'রে এই বয়সের একটা মেয়েকে রুগী বানিয়ে রাখা হয়েছে, ওষুধের পর ওষুধ গেলানো হচ্ছে। ইনজেকসন দেওয়া হচ্ছে। চুপ ক'রে অনেক সয়েছি আর সইবো না আজ তোমাকে শেষ কথা বলে যাচ্ছি—অম্বুর যদি কিছু হয় তো আমি নিজে যাবো কোর্টে। কেস করবো তোমার ওই হাতুড়ে ডাক্তারের নামে!

কৃষ্ণ। হাতুড়ে মানে, যুদ্ধের সময় রীতিমতো কাজ করেছে সে।

সুলতা। ঘাট হয়েছে দাদা—তোমার মত নিয়ে তুমি থাকো—আমার যা বলবার তা বলে গেলুম।

রাগে গর গর করতে করতে বেরোতে যায় সুলতা, বিরূপাক্ষ ঢোকে।

বিরূ। এই যে পিসীমা, কেমন আছেন?

সুলতা। তোমার ওষুধের দরকার এখনও হয়নি বাবা, যেদিন চিতেয় উঠবো, সেদিন দিও। (দুম দাম পা ফেলে চলে যায়।)

বিরূ। এই এই ভাখো—পিসীমা আবার আমার ওপর রাগ করলেন কেন? (মুখটা কাঁচুমাচু করে।

কৃষ্ণ। (বন্দুকে চোখ রেখে ঘোরাতে ঘোরাতে সোজা বিরূপাক্ষর বুক তাক করে) ছেড়ে দাও ও-সব মেয়েদের কথা।

বিরূ। (বুকে হাত রেখে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে) তা না হয় ছাড়লাম কিন্তু প্রাণটা আপনার হাতে ছেড়ে দিই কেমন করে, বন্দুকটা দয়া কোরে একটু নামাবেন?

বিরূপাক্ষর কথার ভঙ্গিতে হাঃ হাঃ করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠে বন্দুকটা নামিয়ে নেয় কৃষ্ণবিহারী।

কৃষ্ণ। বোসো বোসো।

। (গম্ভীর হ'য়ে বোসতে বোসতে) হ্যাঁ বসবো তো বটেই। একটা অত্যন্ত ভয়ের কারণ ঘটেছে স্যর।

কৃষ্ণ। ভয়! ভয় আবার কি।

বিরূ। কাল রাত্রে মিস চৌধুরীকে আমি চৌরঙ্গীতে দেখেছি, একটা গুণ্ডামতো লোকের সঙ্গে। আপনি কি এ বিষয়ে কিছু জানেন?

কৃষ্ণ। what! অনু বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল? (চিৎকার ক'রে ডাকে) সুদাম, সুদাম—

ভৃত্য সুদাম ছুটে এসে ঘরে ঢোকে।

Cont. দিদিমণিকে ডাক।

সুদাম। নীচে ডাক্তারবাবুকে দেখেই খবর দিতে গিয়েছিলুম, বললেন, ডাক্তারবাবু এত সকালে উঠতে বারণ ক'রেছেন। তাঁর কথা না শুনলে অসুখ যদি আবার বেড়ে যায়।

কৃষ্ণ। শুনছো তো ডাক্তার, তোমার কথা কি রকম মানে সে—

বিরূ। (মাথা চুলকে) সে ঠিক। কিন্তু কাল রাতে—

কৃষ্ণ। (ভৃত্যকে) আচ্ছা ঠিক আছে, তুই বল্ গিয়ে আমি ডাকছি।

ভৃত্য চলে যায়। একটু পরেই অনুসূয়া সেখানে এসে দাঁড়ায় চোখ মুখ করুণ কোরে। চুলগুলো এলোমেলো।

অনু। আমায় ডাকছো বাপী?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ মা—কাল রাতে তুমি নাকি চৌরঙ্গীর দিকে গিয়েছিলে?

অনু। আমি! চৌরঙ্গী! আমি বাইরে যাবো কি করে? আমার সব সময় এত weak লাগে। এই যে উঠে এসেছি এতেই কেমন দুর্বল লাগছে।

বিরূ। (উঠে দাঁড়িয়ে) আপনি। আপনি কাল বাড়ীর বাইরে যাননি?

অনু। আমি বেরোবো কি করে? সে শক্তি কি আমার আছে?

বিরূ। তবে কি আমি ভুল দেখলুম?

অনু। দেখুন তো আমার পালসটা—কেমন যেন সব ঝাপসা হ'য়ে আসছে।

অনুসূয়া একটা বড় কৌচে বসে ঢলে পড়ে।

কৃষ্ণ। (চেয়ার ছেড়ে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে) এ কি, অনু যে অজ্ঞান হ'য়ে গেল।

বিরূ। (নাড়ীটা ধ'রে) তাইতো দেখছি।

কৃষ্ণ। সুদাম—সুদাম—

ছুটে আসে সুদাম

Cont.—স্মেলিং সল্ট, হট ব্যাগ—

সুদাম ছুটে বেরোতে যায়।

Cont.—আমার বন্দুক—

সুদাম টেবিলের ওপর থেকে বন্দুকটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

বিরূ। (অনুসূয়াকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে) বো—বো—বন্দুক কি হবে—

কৃষ্ণ। তুমকো হাম গুলি করেগা—

বিরূ। (কাঁপতে থাকে) ও বাবা—পিসী—মা—

ছুটে আসে সুলতা। পুরো পরিস্থিতিটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কৃষ্ণর হাত থেকে বন্দুকটা নামিয়ে রেখে দিতে দিতে বলে—

সুলতা। তোমরা দয়া কোরে একটু যাও তো এখান থেকে—মেয়েটাকে না মেরে ছাড়বে না, একটু একলা থাকতে দাও।

কৃষ্ণবিহারী আর বিরূপাক্ষ দুজনে একবার পরস্পরের দিকে তাকায়, তারপর বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। Cut

Sc 12.

বারান্দা। কৃষ্ণবিহারী আর বিরূপাক্ষ বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়।

কৃষ্ণ। ওর উইকনেসটা কাটছে না কেন? পয়সা তো আমি কম খরচ করছি না।

বিরূ। দেখুন। মেলানকলিয়া ব্যাপারটা ঠিক অত সহজে সারে না। রোগীর মনস্তত্ত্ব বুঝে বুঝে তাকে ট্রিট ক'রতে হয়।

কৃষ্ণ। ও কি করতে হয় টয় শুনবো না। আর তিনমাস সময় দিলাম, এর মধ্যে অনুকে কমপ্লিটলি কিওর করা চাই।

বিরূ। তাই হবে স্যর, আমি এখন যাই।

কৃষ্ণ। যাও—

বিরূপাক্ষ কাচুমাচু মুখে চলে যায়। কৃষ্ণ ভেতরে ঢুকে যায়। Cut

Sc 13.

অনুসূয়ার ঘর। অনুসূয়া ঘরে ঢুকে সোজা তার আলমারীর কাছে গিয়ে টেনে পাল্লাটা খুলে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে নিজের মনে বলে—

অনু। আজকেও বেরোবো। দেখি ডাক্তার বিরূপাক্ষ কেমন আমাকে বন্দী ক'রে রাখতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা একটানা কলিং বেলের আওয়াজ পেয়ে এগিয়ে যায়। জানলার কাছে ঝুঁকে পড়ে দেখে। Cut

Sc 14.

রণদীপ বেল টিপে ধরে রয়েছে, তার হাতে অনুসূয়ার ব্যাগ। Cut

Sc 15.

অনুসূয়ার ঘর।

তাড়াতাড়ি জানালা থেকে সরে এসে বুড়ো আঙুলটা দাঁতের ফাঁকে কামড়ে ধরে ভাবে কি করবে, ইতিমধ্যে কুকুর জিমির প্রচণ্ড তর্জন-গর্জন কানে আসতেই ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। Cut

Sc 16.

সিঁড়ি। ছুটে নামছে অনুসূয়া। পেছনে বারান্দা পার হ'য়ে বাঁ পাশে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে কৃষ্ণবিহারী, হাতে বন্দুক। Mix

Sc 17.

অনুসূয়া দরজা খুলে দিয়ে রণধীপের ভেতরে আসার যায়গা ছেড়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে জিমি লাফিয়ে উঠে সামনের দুটো পা তুলে দেয় রণধীপের কাঁধের ওপর। চোখ দুটো বুজে ফেলে রণধীপ। কপালে ঘাম জমে ওঠে, সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে ঠক ঠক ক'রে।

অনু। (টেনে ধরে জিমির গলার বকলসটা) জিমি!

জিমি মালিকের ধমক খেয়ে পা দুটো নামিয়ে নিয়ে অনুসূয়ার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে থাকে। কিন্তু রণধীপের দিকে তাকিয়ে আরও বার দুয়েক ঘেউ ঘেউ করে ওঠে।

Cont.—আসুন, চলে আসুন, ও কিছু বলবে না।

রণ। (পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে নিয়ে) বলবার যা তা তো গলা ছেড়েই বলছে, কিছু না করলেই হয়।

বলতে বলতে ঘরে এসে ঢোকে।

অনু। বসুন। (একটা কোচ দেখিয়ে দেয়)

ইতিমধ্যেই পেছনে কৃষ্ণবিহারী এসে দাঁড়িয়েছে। অপরিচিত রণধীপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। রণধীপ বসে না। একবার কুকুরটার দিকে তাকায়, একবার বন্দুকটার দিকে, তাকে বেশ কাহিল দেখায়। তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে পেছন ফিরে বাবাকে দেখে মুহূর্তের জন্যে থমকে যায়, কিন্তু সামলে নিতেও সময় নেয় না।

Cont.—বাপী, আমার বন্ধু মণি মণিকা—তার দাদা—

কৃষ্ণ। (গম্ভীর কণ্ঠে) নাম কি?

বিব্রত হয় অনুসূয়া, ফিরে রণধীপের দিকে তাকায়।

রণ। (চট ক'রে) রণধীপ।

কৃষ্ণ। হ'ল না, পুরো নাম বল।

অনু। (চট করে) সেন, মানে রণধীপ সেন। মণি পাঠিয়েছে আমি কেমন আছি জানতে।

কৃষ্ণ। (একই রকম গম্ভীর কণ্ঠে) হুম, তা আজকাল তোমাদের ইয়ংম্যানদের বুঝি লেডিজ ব্যাগ ব্যবহার করা ফ্যাসান হয়েছে?

রণ। (হাতের ব্যাগের কথা ভুলে চট করে জবাব দেয়) আজ্ঞে না।

অনু। (ধমকের দৃষ্টিতে রণধীপের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে) না, মানে ওটা অনেক দিন আগে মণির ওখানে ফেলে এসেছিলাম—

কৃষ্ণ। কই, কাল যে তোর টেবিলে ঠিক ওই রকম একটা ব্যাগ বিকেলে দেখলাম।

অনু। আরে মণির বাড়ীতে ওটা ফেলে এসেই ভুলে গিয়েছিলাম, পরে ঠিক ওই রকম আর একটা কিনে আনলাম যে। এই ভুলে যাওয়াই তো আমার আর এক রোগ হয়েছে। আজ মণি ফোন ক'রে বললো ওর দাদাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে, তাতেই না মনে পড়লো—(কণ্ঠস্বর করুণ করে) জানেন রণধীপ বাবু, আজ সকালেও অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

কৃষ্ণ। (গলে জল হয়ে এগিয়ে গিয়ে মেয়ের মাথায় হাত রাখে) আহা ভাবিসনে মা, শিগগিরই ভাল হয়ে যাবি। এখানে যদি না হয়, তোকে আমি বিলেত নিয়ে যাবো, কিচ্ছু ভাবিসনে।

বসো হে, বসো, একটু গল্প-স্বল্প করো তোমরা। আমি ঘুরে আসি বাইরে থেকে।

কৃষ্ণবিহারী চলে যায়। তার হাতের বন্দুকের সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঘোরে রণধীপের। তারপর সে ফিরে তাকায় কুকুরটার দিকে।

অনু। কই, বসুন—

রণ। বন্দুকের হাত থেকে বেঁচেছি, এখন দয়া কোরে ওনাকে —(কুকুরটা দেখায়)—

অনু। (খিল খিল করে হেসে ওঠে) এত ভয় আপনার? সুদাম, সুদাম—

ভৃত্য এসে ঘরে ঢোকে।

Cont.—জিমিকে নিয়ে যা, আর চা ক'রে আন্।

ভৃত্য কুকুর নিয়ে চলে যায়।

রণ। (বুকটা চেপে ধরে এক হাতে, বসতে বসতে) উঃ হার্টটা কতখানি স্ট্রং, আজ তার একটা প্রমাণ হ'য়ে গেল। (ব্যাগটা সামনের টেবিলে রেখে দিয়ে) গাড়ীতে ফেলে এসেছিলেন।

অনু। উঃ, কি বিপদেই ফেলেছিলেন।

রণ। আমি যে কি বিপদের মধ্যে পা ফেলেছিলাম, তা কি এই বাড়ীতে পা ফেলার আগে আমিই ভাবতে পেরেছিলাম।

অনু। সেদিন আপনি আমাকে বাঁচিয়েছিলেন, আজ আমি আপনাকে বাঁচালাম। শোধবোধ হ'য়ে গেল।

রণ। (মুহূর্ত্তকাল অনুসূয়ার দিকে চেয়ে থেকে) এ ভাবে বঞ্চিত করলেন?

অনু। (ভ্রূটা তোলে) কি রকম?

রণ। ক্ষেত্রবিশেষে ঋণী থাকতেও যে ভাল লাগে।

অনুসূয়া চোখ নামিয়ে নেয়। ভৃত্য চা নিয়ে ঢুকে টেবিলে রেখে চলে যায়। অনুসূয়া চা ঢালতে থাকে। Desolves.

Sc 18.

রাত্রি। রণধীপ বাড়ীর কম্পাউণ্ডে গাড়ী রেখে, লাফ দিয়ে নেমে শিষ দিতে দিতে অত্যন্ত খুশী মনে নীচের তলার বারান্দা দিয়ে যেতে গিয়ে ঘনশ্যামের বন্ধ দরজা পেরোতেই থমকে দাঁড়ায়। শুনতে পায়—

O. C. ঘন কণ্ঠ। রণধীপের নাম তুমি আমার সামনে উচ্চারণ করবে না, বলে দিলাম—হ্যাঁ। Cut.

Sc 19.

ঘনশ্যামের ঘরের ভেতর। খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে জাঁতি দিয়ে সুপুরি কেটে চলেছে বনলতা সামনে দাঁড়িয়ে ভড়পাচ্ছে ঘনশ্যাম।

বনলতা। (শান্ত কণ্ঠে) একশ'বার বলব। রণধীপবাবুর মতো ভালমানুষ আর একখানা দেখাও তো। অতবড় মন আর দেখেছো?

ঘনশ্যাম। অত কথা শুনতে চাই না—কাল রাত আটটায় তোমার তার ঘরে কি দরকার পড়েছিল আমি জানতে চাই।

জাঁতিটা বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে ঝটকা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় বনলতা। Cut

Sc 20.

বাইরে রণধীপ। জিভ কেটে ওঠে, নিজে নিজে বলে ওঠে—

রণ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ— Cut

Sc 21.

ঘরের ভেতর। ঘনশ্যাম ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে আছে বনলতার দিকে। বনলতা আঁচলের চাবী দিয়ে আলমারী খুলে কাপড়ের নীচে থেকে বার ক'রে পাঁচটা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দেয় ঘনশ্যামের দিকে।

ঘন। (তাড়াতাড়ি নোটগুলো কুড়িয়ে গোণে) এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। (চোখ দুটো বড় বড় হ'য়ে ওঠে) মানে!

বন। মাথায় কিছু থাকলে তো মানে বুঝবে? মাসে ক'টা টাকা উপায় করো? এই দুর্দিনে ওই টাকায় দু বেলা গেলা সম্ভব? তিন, তিন মাস ভাড়া দাওনি, তার ওপর হাতটা খালি বলতে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলে—(কোমরে হাত দিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে খেঁকিয়ে ওঠে) বলি মানে বুঝলে কিছু, না এখনও মাথায় ঢোকেনি?

ঘন। (একেবারে গ'লে যায়) বলো, সত্যি, চাইতেই দিয়ে দিলো?

বন। হ্যাঁ, তা বলে তুমি যেন ঘন ঘন চেয়ে বসো না।

ঘন। (কণ্ঠে বিনয়ের অবতার) না না, আমি কেন, আমি কেন—না। লোকটা তাহলে ভালই, কি বল?

বন। অত্যন্ত ভাল। অমন লোক হয় না।

ঘনশ্যাম বনলতাকে ধ'রে আদর ক'রে খাটে বসিয়ে খুব একটা নরম ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে।

ঘন। ভাখো, আমি তো ভাল বলছিই, কিন্তু তুমি অমন সমানে ভাল ভাল বলো না, কেমন? ছোকরা বয়স, সুন্দর চেহারা—বুঝলে তো, মানে তোমার মুখে ভাল, ভাল—ওটা—মানে ঠিক ভাল শোনায় না আর কি—কে-মন?

বন। মরণ—(ঝামটা দিয়ে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে খুক খুক ক'রে হাসতে থাকে)। Desolves

Sc 22.

কৃষ্ণবিহারীর বাড়ী। অনুসূয়ার ঘর। অনুসূয়া ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আঁচলটা ঠিক করতে করতে গুনগুন করে গান ধরে। গানটা একটু স্পষ্ট হয়। ঘুরে ফিরে বড় আয়নায় নিজেকে ভাল ক'রে দেখে নিয়ে একটা ফুলদানের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। ফুলদানের পাশে একগোছা রজনীগন্ধা, আর একটা কাঁচি রাখা। গান গাইতে গাইতে রজনীগন্ধার গুচ্ছটা হাতে তুলে নিয়ে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে—ছাঁটা অংশটা ঘরের কোণে ওয়েষ্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে আসে। ড্রয়ার টেনে কাঁচি রাখে। একটা একটা ক'রে ফুলের ডাঁটি সাজাতে সাজাতে গান গাইতে থাকে সে। Cut.

Sc 23.

অনুসূয়ার ঘরের বাইরের বারান্দা ও সিঁড়ির মুখ। সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে গান শুনে মুহূর্ত্তের জন্যে থমকে দাঁড়ায় রণধীপ। তারপর নিঃশব্দে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় অনুসূয়ার দরজার পাশে। একটু উঁকি দিয়ে দেখে ঘরের ভেতরটা। Cut.

Sc 24.

অনুসূয়ার ঘর। গানের শেষ কলিটি গাইতে গাইতে রজনীগন্ধার গুচ্ছে মুখ লোকায় অনুসূয়া। নিঃশব্দে ঘরে এসে পেছনে স্মিত হাসিমুখে চেয়ে থাকে রণধীপ।

গান শেষে ঠোঁটের কোণে খুশীর হাসি নিয়ে ধীরে ধীরে মুখ তুলতেই চোখে পড়ে রণধীপ স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

চট করে একটু স'রে গিয়ে সহজভাবে তুলে অমুদুয়া বলে—

অমু। এটা মোটেই ভদ্রতা নয়।

রণ। (হাসিমুখে) কোন্টা?

অমু। এ ভাবে সাড়া না দিয়ে ঘরে ঢোকা।

রণ। (একটু এগিয়ে গিয়ে) কিন্তু সাড়া দিলে যে অমন গানটা শোনা হ'ত না!

অমু। (ঠোঁট উল্টে) আহা আপনি গানের বোঝেন ভারী—

রণ। (একটা কৌচে বসতে বসতে) তা হয়তো নাও বুঝতে পারি, কিন্তু আপনি এমন চমৎকার গান, অনুরোধ করলেই গাইবেন এ তো আর জানা ছিল না, তাই অমন চুরি ক'রে শোনা।

অমু। (মাথা ঝাঁকিয়ে বেণীটা পেছন দিকে ঠেলে) দুদিনের পরিচয়ে অত কথা জানা যায় না।

রণ। পরিচয়টা দুদিনেরই ক'রে রাখতে হবে, এরই বা কি মানে আছে?

অমু। দাঁড়ান চা আনতে বলি। (সঙ্কোচটা গোপন করতেই যেন ছুটে বেরিয়ে যায়।)　　　　Cut.

Sc 25.

সিঁড়ি। মাঝপথ। কৃষ্ণবিহারী আর বিরূপাক্ষ উঠছে সিঁড়ি দিয়ে।

কৃষ্ণ। (দাঁড়িয়ে পড়ে) কোনো কথা আর আমি শুনছি না, যে সময় দিয়েছি তার মধ্যে অমুকে ভাল করে তোলা চাই।

বিরূ। কিন্তু, আমি বলছিলাম কি—ওঁর পক্ষে একটা change হ'লে এ সময় খুব উপকার হতো।

কৃষ্ণ। change? বেশ। হাজারিবাগে জীমূতদের বাড়ীটা তো খালিই পড়ে আছে, আমি ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তুমি কথা দিচ্ছ—তাতে তার উপকার হবে?

বিরূ। নিশ্চয়ই। দেখুন না আপনি, একটা change ওঁর পক্ষে এখন কতখানি কাজে দেবে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, তাই যাবো—

উঠতে থাকে সিঁড়ি দিয়ে, সঙ্গে ওঠে বিরূপাক্ষ।　　　　Cut

Sc 26.

অমুদুয়ার ঘর। অমুদুয়া আর রণধীপ বসে চা খাচ্ছে।

অমু। (কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে) উঃ এখনই আবার ডাক্তার আসবে জ্বালাতে।

রণ। ডাক্তার! ওহো—সেই যার হাত থেকে পালাতে আপনি আমার গাড়ীটাকে আশ্রয় করেছিলেন

অমু। হ্যাঁ।

রণ। সর্বনাশ! আমাকে এখানে দেখলে—

বাইরে থেকে কৃষ্ণবিহারীর কণ্ঠ শোনা যায়।

O. C. U. কৃষ্ণ। অমু—অমু মা—

ডাকতে ডাকতে কৃষ্ণবিহারী আর বিরূপাক্ষ ঘরে এসে ঢোকে। দরজার দিকে পেছন ফিরে কৌচে রণধীপ বসেছিল তাই বিরূপাক্ষ প্রথমটা তাকে দেখতে পায় না। অমু উঠে দাঁড়ায়।

বিরূ। আজ কেমন আছেন?

অমু। ভাল আছি। আপনার এ ওষুধটায় মনে হচ্ছে খুব কাজ হচ্ছে।

ধীরে ধীরে রণধীপ উঠে [illegible]। বিরূপাক্ষ তাকে দেখে প্রথমটা হাঁ হ'য়ে যায়। তারপর বলে—

বিরূ। আপনি।

কৃষ্ণ। ও হোচ্ছে—

বিরূ। ওকে আমি চিনি—

কৃষ্ণ। আরে না না, ওকে তুমি চিনবে কেমন ক'রে? ও হোচ্ছে—

বিরূ। আমি ওকে খুব ভাল রকম জানি—

কৃষ্ণ। কি মুস্কিল, তুমি কিছু ভুল করছো, ও হোচ্ছে—

বিরূ। ভুল আমি করছি না, আপনি করছেন—ওকে আমার চেয়ে ভাল কেউ চেনে না।

কৃষ্ণ। ফের মুখে মুখে তর্ক করবে—সুদাম। সুদাম—

ছুটে আসে সুদাম।

Cont. আমার বন্দুক—

ছুটে চলে যায়।

বিরূ। আসুন বন্দুক আমি ভয় পাইনে। ওই হচ্ছে সেই গুণ্ডা ছেলেটা যার সঙ্গে সেদিন মিস চৌধুরীকে আমি চৌরঙ্গীতে দেখেছি।

কৃষ্ণ। দেখেছো তো দেখেছো, ইডিয়েট কোথাকার, গুণ্ডার এ রকম চেহারা হয়? (হঠাৎ খেয়াল হয়) এ্যাঁ কি বললে সেদিন অমুকে তুমি এই ছোকরার গাড়ীতে দেখেছো?
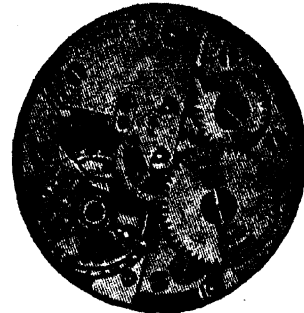
জুদাম এসে বন্দুক ধরিয়ে দেয় কৃষ্ণর হাতে।

Cont. তুমকো হাম গুলি করেগা।

রণধীপ ছুটে গিয়ে অনুসূয়ার পেছনে লুকায়।

Cont. সরে যা অনু, তুই সরে যা সামনে থেকে—

কৃষ্ণ ঘুরতে থাকে, রণধীপও অনুসূয়াকে সামনে ঢালের মতো রেখে ঘুরতে ঘুরতে বলতে চেষ্টা করে—

রণ। দেখুন, মানে—ঘটনাটা শুনবেন তো?

কৃষ্ণ। কিচ্ছু শুনবো না, আমার নিজের গাড়ী থাকতে তুমি তোমার গাড়ীতে অনুকে চড়াবে কেন?

বিরূ। (বাধা দেয়) দেখুন পয়েন্ট সেটা নয়।

কৃষ্ণ। চোপরাও—পয়েন্ট বুঝিও না আমাকে—

ঠিক এমনি সময় জিমি লাফাতে লাফাতে ঘরে এসে ঢুকে এইরকম পরিস্থিতি দেখে ছুটে যায় রণধীপের দিকে ঘেউ ঘেউ করে। রণধীপ লাফিয়ে অনুসূয়ার বিছানার ওপর উঠে পড়ে, জিমিও লাফিয়ে ওঠে বিছানায়। রণধীপ এদিক-ওদিক তাকায় অসহায় ভাবে। কৃষ্ণবিহারীর বন্দুকটা তাক ক'রে আছে তার বুক বরাবর।

অনু। জিমি, বাপী—জিমি, বাপী একটু শোনো—

অনুর ডাকে জিমি বিছানা থেকে লাফিয়ে নামতেই রণধীপ কৌচের হাতলগুলোর ওপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। জিমি প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। সুলতা ছুটে এসে ঘরে ঢোকে।

সুলতা। (কৌচের হাতলের ওপর রণধীপকে দাঁড়িয়ে কাঁপতে দেখে, কৃষ্ণের হাতে বন্দুক দেখে প্রথমটা অবাক হ'য়ে যায়) ব্যাপার কি, বাড়ীটাও কি তোমার যুদ্ধক্ষেত্র দাদা? নামাও তোমার বন্দুক।

অনু ততক্ষণে টেনে ধরেছে জিমির বকলসটা রণধীপ এই সব কথাবার্তার মাঝখানে আস্তে নেমে গিয়ে সুলতার পেছনে দাঁড়িয়ে অনুসূয়াকে ইসারা করে, 'আমি পালাই'—অনুসূয়াও চোখ টিপে তাকে পালাতেই ইসারা করে।

বিরূপাক্ষ চেয়ে থাকে কটমট ক'রে। রণধীপ তার পাশ দিয়ে পেছন ফিরে আস্তে আস্তে সরতে সরতে ফিস ফিস করে বলে।

রণ। বন্দুক আর জিমি বাদ দিয়ে একলা দেখা হবে।

বলতে বলতে প্রায় দরজার কাছ পর্যন্ত পৌঁছে পেছন ফিরে রুদ্ধশ্বাসে ছুট দেয়। অনু ক্লান্ত হ'য়ে বসে পড়ে বিছানায়। ছুটে আসে ডাক্তার।

বিরূ। শরীর খারাপ লাগছে?

অনু। খুব।

কৃষ্ণ। কি, কি হ'ল?

বিরূ। ভাববেন না, একটা ইনজেকসন দিয়ে দিচ্ছি—

সুলতা। হ্যাঁ দাও, তাই দাও। (ব্যঙ্গের সুর গলায়)

অনু। (ক্লান্ত স্বরে) ইনজেকসন আমি নেব না—

বিরূ। এই রে, পাগলামি সুরু হ'ল। শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন মিস চৌধুরী।

কৃষ্ণ। (তাড়াতাড়ি বন্দুক রেখে হাত বাড়িয়ে দেয় মেয়ের দিকে) এসো মা, শুয়ে পড়ো অবাধ্যতা করে না—একটা ইনজেকসন দিলেই ভাল হ'য়ে যাবে।

অনুসূয়া আর প্রতিবাদ করতে পারেনা একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। ডাক্তার ব্যাগ থেকে ইনজেকসন বার করে। সুলতা মুখ বেঁকিয়ে বেরিয়ে যায়। **Mix**

Sc 27.

সন্ধ্যা। কৃষ্ণবিহারীর বসবার ঘর। কৃষ্ণ কৌচে বসে কাগজ পড়ছে। মুখে মূল্যবান ব্রায়ার পাইপ। অদূরে একটা কৌচে বসে উল বুনছে সুলতা। জিমি লম্বা হ'য়ে শুয়ে আছে পায়ের কাছে। ঘরে এসে ঢোকে জীমূতবাহন।

সুলতা। (বোনা রেখে খুসী হ'য়ে) আরে এসো এসো জীমূত, কেমন আছ?

জীমূত। (এগিয়ে এসে) ভাল, আপনি ভাল আছেন কাকাবাবু?

কৃষ্ণ। (কাগজ নামিয়ে) হ্যাঁ। তোমাকেই একটা ফোন করবো ভাবছিলাম। তোমাদের হাজারিবাগের বাড়ীটা খালি আছে না।

জীমূত। হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

কৃষ্ণ। অনুর স্বাস্থ্যটা ভাল যাচ্ছে না, ওকে নিয়ে Change-এ যেতে চাই।

জীমূত। সে তো খুব ভাল কথা পূজোর ছুটিটা সবাই মিলে খুব আনন্দে কাটিয়ে আসা যাবে। আমি আগে গিয়ে সব ঠিক করিয়ে রাখবো, আপনারা কবে আসবেন Wire করবেন। অনু কোথায়?

সুলতা। ওর ঘরেই আছে, যাও না তুমি। জীমূত চলে যায়।

Cut

Sc 28.

অনুসূয়ার ঘর। একটা কৌচে আধশোয়া অবস্থায় বই পড়ছে অনুসূয়া। জীমূত এসে ঘরে ঢোকে। সোজা এগিয়ে গিয়ে বইটা টেনে নিয়ে ধপ করে বন্ধ করে পাশের টেবিলে রাখে। হাসিমুখে উঠে বসে অনুসূয়া।

অনু। আরে, জীমূতদা!

জীমূত। (একটা সিগারেট ধরায়) যাক চিনতে পেরেছো?

অনু। বারে, না পারার কি কারণ?

জীমূত। (এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে) তোমাকে কিন্তু আর কোথাও দেখলে আমি চিনতে পারতাম না।

অনু। কেন?

জীমূত। (চোখে মুগ্ধভাব এনে) একেবারে বদলে গেছ, অদ্ভুত সুন্দর হ'য়েছো।

অনু। তা বদলাবো না? সাত বছর পর দেখছো।

জীমূত। সে ঠিক।

ঘরের কোণে ফোনটা বেজে ওঠে ক্রিং ক্রিং ক'রে। অনুসূয়া উঠে গিয়ে ফোনটা ধরে।

অনু। হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলুন।—

Cut

Sc 29.

রণধীপের ঘর। চেয়ারে একটা পা তুলে ঝুঁকে তারই ওপর কনুয়ের ভর রেখে ফোন ধরে আছে রণধীপ।

রণ। আমি আর আপনাদের বাড়ী যাবো না।

Cut

Sc 30.

অনুসূয়ার ঘর। অনু ফোন ধরে আছে। জীমূত সেই দিকে চেয়ে সিগারেট টানছে।

অনু। ঠিকই, আমিও এই কথাই ভাবছিলাম, যা বিভ্রাটে পড়তে হয় আপনাকে—　　Cut

Sc 31.

রণধীপের ঘর।

রণ। (ফোনে) একটা অনুরোধ করছি, কাল সন্ধ্যায় আপনি আসুন না, আমার এখানে—　　Cut

Sc 32.

অনুসূয়ার ঘর।

অনু। (ফোন ধরে) কিন্তু ঠিকানাটা? আচ্ছা—হুঁ,—আচ্ছা ঠিক আছে, রাখছি।

ফোন রেখে এগিয়ে আসে অনুসূয়া।

জীমূত। কে?

অনু। আমার এক বন্ধু।

জীমূত। বন্ধু? বান্ধবী নয়?

অনু। (হেসে) না বান্ধবী নয়, বন্ধুই।

জীমূত সাড়ম্বরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে হতাশার ভাণ করে। অনুসূয়া হেসে ফেলে।

Cont. কি হল?

জীমূত। বুকের ভেতরটা কেমন যেন খচ খচ ক'রে উঠলো। ভাবছি ডুয়েলে ডাকবো কি না।

অনু। (চোখ বড় করে) খবরদার, ও ধারেও যেও না, ভাল বক্সার। (হেসে) অবশ্যি শুনেছি, পরিচয় পাইনি।

জীমূত। ও বাস বাস, তা হলেই ঠিক আছে। মেয়েদের কাছে অমন সব বলতে হয়।

দুজনেই হেসে ওঠে।

Cont. আচ্ছা, চলি আজ—

এগিয়ে গিয়ে অনুসূয়ার বেণীটা পেছনে টেনে ধরে। অনুসূয়ার মাথাটা একটু কাত হয় পেছন দিকে। তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মৃদু হেসে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় জীমূত।　　Desolves

Sc 33.

দোতলার চওড়া বারান্দায় একটা মোড়ায় বসে চোখে চশমা এঁটে লম্বা মতো খাতায় হিসেব জুড়ছে সুলতা। বেরোনোর পোষাকে অনুসূয়া এসে ঝুঁকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে।

অনু। পিসীমা, আমি একটু বেরোচ্ছি।

পিসী। (চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে) বেরো, বেরো—তোর বাড়ীতে বসে থাকা দেখে দেখে আমারই হাঁফ ধরে যায়। তা যাচ্ছিস কোথায়?

অনু। মণিদের ওখানে যাবো, সেখান থেকে একটু বেরোবো।

পিসী। রাত করিস না।

অনু। (আঁচলটা ঠিক ক'রে ঘড়িটা দেখে নিয়ে) না, না, বাপী বাড়ী ফেরার আগেই ফিরব।

চলে যায় অনুসূয়া, আবার চোখে চশমা আঁটে সুলতা।　　Desolves

Sc 34. রণধীপের বাড়ীর গেট। একটু দূরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। গেটের কাছে এগিয়ে এসে নেম প্লেটটা দেখে নিয়ে ফিরে যায় অনুসূয়া ট্যাক্সির কাছে। ব্যাগ খুলে মিটার দেখে ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে আবার ঘুরে গিয়ে গেটের ভেতর ঢুকে পড়ে। একটা ব্যাগ নিয়ে বৃন্দ গেটের দিকে আসছিল, অনুসূয়াকে দেখে চোখ বড় করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

অনু। এখানে রণধীপ বাবু থাকেন?

বৃন্দ। (এক গাল হেসে) থাকেন তো নিশ্চয়ই থাকেন, এটা তো তাঁরই বাড়ী হেঁ হেঁ, আসুন আপনি আসুন—

বলেই আর মুহূর্ত অপেক্ষা করে না অনুসূয়াকে পথটা দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সে খেয়ালও তার থাকে না। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যায় ভেতরের দিকে　　Cut

Sc 35.

রণধীপের বাড়ীর নীচেতলার বারান্দা। বৃন্দ ছুটে চলেছে।　　Cut

Sc 36.

সিঁড়ি। পড়ি মরি ক'রে ওপরে উঠছে বৃন্দ।　　Cut

Sc 37.

নীচের বারান্দা। অনুসূয়া এগিয়ে যেতে যেতে এদিক ওদিক তাকায়। ঘনশ্যামের ঘরের সামনে দিয়ে ধীর পায় এগিয়ে যায়।　　Cut

Sc 38.

মেঝেয় মাদুরে বসে কাগজ পড়তে পড়তে চা খাচ্ছে ঘনশ্যাম। দরজায় ছায়া পড়তেই চোখ তুলে অনুসূয়াকে দেখেই চোখদুটো ছানাবড়া হ'য়ে ওঠে। লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে প্রথমে দরজা দিয়ে উঁকি দেয়, তারপর চট ক'রে ফিরে এসে গেঞ্জীটা গায়ে দিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায় দরজা দিয়ে।　　Cut

Sc 39.

রণধীপের ঘর। রণধীপ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জামার বোতাম আটকাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে ঘরে এসে ঢোকে বৃন্দ।

বৃন্দ। দাবাবু!

হাঁপাতে থাকে।

রণ। কিরে, তোর হ'ল কি—অমন হাঁপাচ্ছিস কেন?

বৃন্দ। (একটা বড় দম নিয়ে) দি-দি ম-ণি—

রণ। (ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে) তাই নাকি—এসেছে? যা যা পথ দেখিয়ে নিয়ে আয়।

বৃন্দ যেমন এসেছিল, এ্যাবাউট টার্ণ ক'রে ঠিক তেমনি ভাবেই ছুটে আবার বেরিয়ে গেল।　　Cut

[ক্রমশঃ।

মহৎ লেখকগণ কেবল যে সমাজের আনন্দবেদনাকে রূপ দেন, সমাজ-প্রগতির আগে আগে চলেন, তাই নয়—তাঁরা সমাজের ক্রমবিকাশের ধারাকে প্রভাবিত করেন। এবং তা করতে পারেন তাঁদের গভীর সহানুভূতি এবং স্বচ্ছ ভবিষ্যৎ দৃষ্টির সাহায্যে। —বঙ্কিমচন্দ্র।

বাঙলায় কনট্র্যাক্ট ব্রীজ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

খেলা (Play-out)

অনেক সময়ে মন্তব্য শোনা যায় যে অমুক লোক খুব ভাল খেলেন বা অমুক ব্যক্তির ডাক খুব ভাল। এরূপ মন্তব্যের কোন অর্থই হয় না। একের সঙ্গে অপরটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, বিশেষতঃ ভাল খেলতে না পারলে ভাল ডাক দেওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্যই বলা হয় "Bidding is nothing but playing out the hand mentally—ব্রীজ খেলায় ডাকটি মনে মনে খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরস্পর ডাক বিনিময় দ্বারা উঁচুতাস ও পিঠ জয়ের ক্ষমতা ঠিকমত বুঝতে পারলে তবেই ত' গেম বা শ্লাম ডেকে মোটা অঙ্কের বোনাস অর্জ্জন করা সম্ভব। আন্দাজে আর ক'দান চলে, বড় জোর শতকরা ৪।৫ দান আর বাকী সবগুলিতেই খেসারৎ দিতে হয়। খেলার প্রধান অংশ দুটি—১। ডাকে জয়ী দলের ডাকের খেলা (Declarer's play), ২। বিপক্ষদলের খেলা (Defenders, play)। ডাকদারের চেষ্টা হ'বে কিভাবে খেলাটি পরিচালিত ক'রে চুক্তি অনুযায়ী বা বেশী পিঠ জয় করা যায় আর বিপক্ষ দলের চেষ্টা হবে কিভাবে খেলে চুক্তির খেলা বন্ধ করা যায়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই এই খেলার একটি বিশেষ আকর্ষণীয় অঙ্গ। প্রত্যেক দল নিজ নিজ ব্যূহ রচনা করেন—একদল আক্রমণাত্মক ও অপর দল প্রতি-আক্রমণাত্মক বা প্রতিরোধের।

প্রথমে ধরা যাক ডাকের খেলা করা। বলা নিষ্প্রয়োজন যে প্রথমে খেলবার সুযোগ পান বিপক্ষ দল এবং এই সুযোগে প্রথমেই ন্যায্য পিঠগুলি জয় ক'রে অন্য পিঠ জয়ের রাস্তা পরিষ্কার করবার সুবিধা পেয়ে থাকেন তাঁরাই। সুতরাং প্রথম তাস খেলা হ'বার পর খেঁড়ীর তাস টেবিলে পড়বার সাথে সাথেই ডাকদারকে দেখে নিতে হবে যে দুটি হাতের সমষ্টিগত শক্তিতে কতগুলি পিঠ সোজাসুজি জয় করা যায় এবং কতগুলি পিঠ বিপক্ষ দল পেতে পারেন। যদি গুণে দেখা যায় যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পিঠ অপেক্ষা কম পিঠ হচ্ছে তখন চিন্তা করতে হবে কি উপায়ে খেলাটি নিয়ন্ত্রিত করলে প্রয়োজনীয় সংখ্যার পিঠ বাড়ান সম্ভব। এরূপ পিঠ বাড়াবার উপায় প্রধানতঃ তিনটি কোনও রংয়ের ডাকের খেলায়।

১। খেঁড়ীর হাতে তুরুপ করিয়ে।

২। রং ধরে নিয়ে খেঁড়ীর হাতের কোনও রংয়ের তাসের ফেরাই করে নিয়ে।

৩। ফিনেস্ (finesse) ক'রে।

এ ছাড়াও আছে বিভাগের বিশেষত্ব লক্ষ্য করে তদনুসারে খেলাটিকে পরিচালনা করা—বিপক্ষ দল ডাকে প্রবেশ করলে এ বিষয়ে যথেষ্ট সুবিধা হয়; বিপক্ষ দলের কোনও হাতে শেষ ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে খেলতে বাধ্য করে পিঠ বাড়ান (End-play)। বিপক্ষ দলকে ফাঁকি দিয়েও সময়ে সময়ে একটি পিঠ বাড়ান যায়। আর শেষ অস্ত্র হ'ল বিপক্ষ দলকে প্রয়োজনীয় তাসের মধ্যে একখানিকে ফেলতে বাধ্য করান (Squeeze play)। পাঠক-পাঠিকাগণ নিয়মিত চর্চ্চা ও ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলেও আলোচনার মাধ্যমে ক্রমশঃ সবগুলিতে পারদর্শী হ'তে সক্ষম হবেন। বলতে বাধা নেই যে এই খেলাটি এতই জটিল ও কঠিন যে কাম্য উৎকর্ষ লাভের জন্য প্রয়োজন কতকগুলি গুণ যেমন নিয়মিত অভ্যাস ও সাধনা, সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি ও উৎপন্নমতিত্ব ও বিশেষভাবে প্রয়োজন বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ।

রংয়ে খেলা অপেক্ষা নো-ট্রাম্পে খেলা কঠিন কারণ সে সময়ে তুরুপের সুযোগ পাওয়া ত' যায়ই না উপরন্তু বিপক্ষ দল প্রথম খেলবার সুযোগে নিজেদের তাস ফেরাই করে নেওয়ার সুবিধা পান। সুতরাং এক্ষেত্রে ডাকদারকে অগ্রসর হতে হবে অত্যন্ত সুবিবেচনার স'হত কারণ যদি বিপক্ষ দলের রংয়ে আর রোখবার তাস না থাকে তাহ'লে ফেরাইগুলি টেনে নিয়ে অনেক খেসারৎ আদায় করে নিতে সক্ষম হবে। যদিও নো-ট্রাম্প ডাকে একটি কম পিঠে গেম হয় তৎসত্ত্বেও সকল দিক বিচার ক'রে যতটা সম্ভব রংয়ে খেলাই অপেক্ষাকৃত সহজ এবং ঝুঁকিও কম। অনেক সময় দেখা যায় যে ডাকদার চুক্তির খেলা করতে গিয়ে ফিনেস নেন এমন সময়ে যখন বিপক্ষ দলের নিকট তিন চারখানি ফেরাই তাস বর্ত্তমান অথচ ফিনেস না নিলে হয়ত মাত্র একটি খেসারৎ দিতে হ'ত। এরূপ পরিস্থিতিতে ফিনেস না নিয়ে একটি খেসারৎ দিয়ে সন্তুষ্ট থাকা বা ঐরূপ পরিস্থিতি ঘটবার পূর্ব্বেই ফিনেস নিয়ে রাখা ভাল, সম্ভব হ'লে। মনে করুন যে আপনি ডাক দিয়েছেন নো-ট্রাম্প-৩ ভালনারেবল্ অবস্থায় এবং বিপক্ষ দল ডবল দিয়েছেন ঐ ডাকে। ডবলের পর বিপক্ষ দল কোনও একটি রংয়ের আপনার রোখবার তাস তাড়িয়ে দিয়ে চারখানি তাস ফেরাই ক'রে নিয়েছেন এবং ইতিমধ্যে পিঠ জয় করেছেন তাঁরা দুটি। এ অবস্থায় ফিনেস নিতে গিয়ে অকৃতকার্য্য হ'লে আপনি সবশুদ্ধ লোকসান করছেন সাতপিঠ (২+১+৪) অর্থাৎ খেসারৎ দিতে হচ্ছে ৮০০ পয়েন্ট এবং ফিনেসটি কৃতকার্য্য হ'লে অর্জ্জন করছেন মোট ৭৫০ পয়েন্ট। সুতরাং লাভের চেয়ে লোকসানের অঙ্ক বেশী হওয়ায় এরূপ ঝুঁকি না নিয়ে সোজাসুজি আট পিঠ নিয়ে একটি মাত্র খেসারৎ দেওয়াই ভাল মনে হয়।

ডাকদারকে চুক্তির খেলা সম্পাদনে কতকগুলি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে খেলা পরিচালনা করতে হয়। যথা :—

১। উদ্বোধনী তাসটি খেলা হ'লে প্রতিপক্ষ দলের উক্ত তাস খেলবার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ ও উক্ত তাস উপলক্ষ ক'রে তার তাসের বিভাগ এবং তদনুসারে বিপক্ষ দলের অপর খেলোয়াড়ের বিভাগ সম্বন্ধে প্রাথমিক আন্দাজ করা।

২। দুটি হাতের, নিজের ও খেঁড়ীর, সমষ্টিগত পিঠ জয়ের ক্ষমতা পরীক্ষা ও বাড়তি প্রয়োজনীয় পিঠ অর্জ্জনের উপায় নির্দ্ধারণ।

৩। প্রাথমিক আন্দাজ ঠিক না হ'লে নূতনভাবে বদলী খেলার উপায় নির্দ্ধারণ।

৪। ফিনেস্ না নিয়ে অন্য কোনও উপায়ে খেলাটি করা সম্ভব কি না দেখা—উপায় না থাকলে ফিনেস্ শেষ অস্ত্ররূপে প্রয়োগ।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল :—

উদাহরণ ১। ডাক বিনিময়ে ডাক হ'য়েছে নো-ট্রাম্প-৩ এবং বিপক্ষ দলের পশ্চিমের খেলোয়াড় প্রথম উদ্বোধন করেন চি-৭ এবং আপনার ও খেঁড়ীর তাস নিম্নরূপ :—

ই-বি, ৯, ২
হ-গো, ১০, ২
রু-টে, গো, ৭, ৫, ৩
চি-বি, ৫

উ

প্রথম খেলেন চি-৭ প পূ

দ

ই-টে, গো, ১০, ৩
হ-টে, ৮, ৫
রু-সা, ১০, ২
চি-সা, ৮, ৩

প্রথমে চিন্তা করতে হ'বে তাসটি প্রথম খেললেন কেন? প্রাথমিক আন্দাজ করলেন যে তাসটি চতুর্থ বড় তাস (fourth best)। এই আন্দাজ ঠিক হ'লে দেখা যায় যে পূর্ব্বে অবস্থিত খেলোয়াড়ের নিকট উক্ত ৭এর বড় মাত্র একখানি তাস বর্ত্তমান (উদ্বোধনী ১১র ধারা অনুযায়ী—Rule of eleven)। অর্থাৎ ১১ থেকে ৭ বাদ দিলে বাকী থাকে ৪। উক্ত ৪খানির মধ্যে উ-দ'র কাছে ৩ খানি বর্ত্তমান ; পূর্ব্বে অবস্থিত খেলোয়াড়ের ৭এর উর্দ্ধে মাত্র ১ খানি তাসই থাকার সম্ভাবনা এবং সেখানি টেক্কা হ'তে পারে না কারণ পশ্চিমের খেলোয়াড় গো, ১০, ৯, ৭ থেকে গোলামই প্রথম খেলতেন ৭'র বদলে। সুতরাং প্রথমে এর ওপর বিবি মারতে হ'বে। এবং চি-সা টি বাঁচাবার উদ্দেশ্যে খেলাতে হবে ছোট একখানি রুহিতন এবং তার ওপর মারতে হবে রু-১০ কারণ উক্ত রংয়ের বিবি পুবের খেলোয়াড়ের কাছে থাকলে তিনি পিঠ পেয়েই চিড়িতন খেলে দিলেই দক্ষিণের সাহেবটি ধরা পড়ে ত' যাবেই উপরন্তু ডাকের খেলায় নিশ্চিত খেসারৎ দিতে হবে—চিড়িতন পাঁচখানি থেকে প্রথম খেলা হ'য়ে থাকলে। রু-১০ পিঠ জয় করলে নো-ট্রাম্প-৩ খেলা করার কোনই অসুবিধা নেই—পিঠ হ'বে রুহিতনে পাঁচখানি, পরে খেলবেন ই-১ এবং উক্ত রংয়ের সাহেব পূর্ব্বে অবস্থিত খেলোয়াড়ের কাছে থাকলে নিশ্চিত পিঠ হবে তিনখানি (৪ খানিও হ'তে পারে) ও হরতনের টেক্কা। সুতরাং মোট পিঠ হবে ১০টি (চি-১, রু-৫, ই-৩ ও হ-১)। আর যদি ইস্কাবনের সাহেবটি পশ্চিমের খেলোয়াড়ের কাছে থাকে তাহলে ৯ খানি পিঠ ত' হবেই উপরন্তু আর একটি বাড়তি পিঠ চি-সা এরও হতে পারে। অপর পক্ষে রু-বি পশ্চিমের খেলোয়াড়ের কাছে থাকলে তখনও চি-সা রক্ষিত অবস্থায় থাকার খেলা করার সম্ভাবনা খুবই বেশী, নির্ভর করে ই-সা-ওপর। এটিও পশ্চিমের খেলোয়াড়ের কাছে থাকলে উপায় নেই।

আবার দেখুন রু-টে পুবের খেলোয়াড়ের কাছে থাকলে তখন বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হ'তে হবে, দেখতে হবে যে ৭'র বড় তাস তার হাত থেকে আর পড়ে কি না। যদি পড়ে তখন বুঝতে হবে যে পশ্চিমের খেলোয়াড় উক্ত তাসটি খেলেছেন নিজের সুবিধার জন্য নয়, খেঁড়ীর সুবিধার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর নিজের স্বার্থ নিহিত অপর রংয়ে। সুতরাং এক দান ছেড়ে তৃতীয় চক্রে সাহেব দিয়ে পিঠ নিয়ে রু-বি পশ্চিমের হাতে ধরে নিয়ে অগ্রসর হতে হ'বে। এই বিবিটি পূর্ব্বে অবস্থিত খেলোয়াড়ের নিকট থাকলে খেসারৎ দিতে হবে—কোনও উপায় নেই।

উদাহরণ ২। নিম্নলিখিত তাসে ডাক হয়েছে হ-৬ এবং পশ্চিমের খেলোয়াড় প্রথম খেলেন রু-সা। চুক্তির খেলা করতে গেলে কিভাবে খেলা উচিত?

ই-সা, ৫
হ-সা, গো, ৯, ৮, ৫
রু-টে, গো, ৭
চি-৭, ৪, ২

উ

প্রথম খেলা—রু-সা প পূ

দ

ই-টে, ৩, ২
হ-টে, বি, ১০, ৭, ৪, ২
রু-২
চি-টে, বি, ৩

প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে দুটি সম্মিলিত হাতে ১০টি পিঠ জয় করা যায়। সুতরাং ২টি পিঠ বাড়াতে হ'বে চুক্তির খেলা করতে। ১টি পিঠ বাড়ান যায় তৃতীয় ইস্কাবনখানি ডামিতে তুরূপ করে আর অপর পিঠটি বাড়ান যায় যদি চিড়িতনের সাহেব পূর্ব্বে অবস্থিত খেলোয়াড়ের কাছে থাকে। কিন্তু যদি না থাকে তবে খেসারৎ দিতে হবে ১টি কারণ বিবির ওপর সাহেব মেরে চিড়িতন খেলে দিলে অপর একটি চিড়িতনের পিঠ না দিয়ে উপায় নেই। আগেই বলা হয়েছে যে ফিনেস্ (Finesse) ব্যবহৃত হবে শেষ অস্ত্ররূপে অর্থাৎ যখন আর কোনওরূপ উপায় থাকে না। ডাকদারকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হ'বে আর কোনও উপায় আছে কি না? একটু মনোযোগ দিয়ে পর্য্যালোচনা করলেই দেখা যায় যে ফিনেস্ না নিয়েও খেলার রাস্তা অপেক্ষাকৃত সহজ—পশ্চিমের হাতে ঢুকিয়ে দিয়ে, যথা :—

		উ	দ
১ম চক্র	...	রু-টে	রু-২
২য় চক্র	...	হ-৫	হ-টে দু'হাত থেকে ১খানি করে রং পড়ে যাওয়াই সম্ভব
৩য় চক্র	...	ই-সা	ই-২
৪র্থ চক্র	...	রু-৭	হ-বি
৫ম চক্র	...	ই-৫	ই-টে
৬ষ্ঠ চক্র	...	হ-৮	ই-৩
৭ম চক্র	...	রু-গো	চি-৩ স্বাভাবিকতঃ পশ্চিমের কাছে পিঠটি যাবে রু-বি তে

৭ পিঠ খেলা হ'য়ে যাবার পর তখন উ-দ এর তাস পড়ে থাকবে নিম্নরূপ :—

উ
ই-×
হ-সা, গো, ৯
রু-×
চি-৭, ৪, ২

দ
ই-×
হ-বি, ১০, ৭, ৪
রু-×
চি-টে, বি

পিঠ নিয়ে পশ্চিমের খেলোয়াড় কি খেলবেন। চিড়িতন খেললে কোন প্রশ্নই ওঠে না আর ইস্কাবন বা রুহিতন খেললে ডামি থেকে তুরুপ ক'রে চি-বি টি পাসিয়ে দেবেন। সাধারণত দেখা যায় যে বিশেষ অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ছাড়া বাকী সবলেই চিন্তাধারা প্রসারিত না ক'রে প্রথমেই চিড়িতনে ফিনেস্ নিয়ে এক পিঠ খেসারৎ দিয়ে ভাগ্যের ওপর দোষারোপ করে থাকেন অথচ সামান্য চিন্তা করলেই দেখা যায় যে খেলাটি খুবই সহজ ; শুধু ব্যস্তবাগীশের মত আগে থেকেই হতাশ না হ'য়ে তাসের পরিস্থিতি, বিভাগ ইত্যাদি চিন্তা ক'রে অগ্রসর হওয়াই এই খেলার বিশেষত্ব।

কোনও কোনও সময়ে এমন কতকগুলি তাস এসে পড়ে যাতে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় বাধ্য হন প্রয়োজনীয় রোখবার তাস পাসাতে (Squeeze)। নীচে এরূপ একটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল। বন্টন ক'রে নিম্নলিখিত তাসে ডাক উদ্বোধন ক'রেছেন চি—১ :—

ই-১০, ২
হ-সা, ৫
রু-টে, ৩, ২
চি-টে, বি, গো, ৯, ৮, ৪

এবং ডাক চলে নিম্নরূপ :—

	দ	প	উ	পূ
প্রথম চক্র	......চি-১	ডবল্	ই-১	পাস
২য় ,,	......চি-২	পাস	হ-২	পাস
৩য় ,,	......নো-ট্রা-২	পাস	নো-ট্রা-৩	পাস
৪র্থ ,,	......পাস	ডবল্		

ডবলের পর পশ্চিমের খেলোয়াড় প্রথম খেলেন রু-বি এবং উত্তর তাস দেন :—

ই-টে, গো, ৯, ৮, ৩
হ-বি, ৯, ৮, ৬,
রু-সা, ৯, ৮
চি-৭

প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে প্রথমে খেলবার সুযোগে রুহিতনের একখানি রোখবার তাস তাড়িয়ে দিয়েছেন বিপক্ষ দল এবং চিড়িতনের সাহেবের পর বাকি খান তাড়িয়ে দিয়ে ফেরাই ক'রে রাখবেন বাকী তিনখানি এবং হরতনে টেক্কার পিঠ ধরতে পারলে একটি পিঠ খেসারৎ দিতেই হবে কারণ সর্বসমেত আটখানি পিঠ জয় করা সম্ভব উক্তরূপ পরিস্থিতিতে—চি-পাঁচখানি, রু-দুখানি ও ই-একখানি। বাকী পিঠ জয় করা যায় কি উপায়ে ? সামান্য একটু চিন্তা করলে এবং ডাক পর্য্যালোচনা করলেই বোঝা যায় যে অদেখা সব ছবি তাসগুলি পড়ছে পশ্চিমের খেলোয়াড়ের কাছে। যদি তাই হয় তা হ'লে ত' তাকে একখানি প্রয়োজনীয় তাস ফেলতে বাধ্য করলেই ডাকের খেলা করা সম্ভব। হতাশ না হ'য়ে এরূপ চিন্তা ক'রে অগ্রসর হ'লেই দেখা যায় যে অষ্টম চক্র খেলবার ফলে বিপদে পড়ে যাবেন পশ্চিমের খেলোয়াড়। তাঁর তাস ছিল :—

ই-সা, বি, ৭,
হ-টে, গো, ১০
রু-বি, গো, ১০, ৭, ৫,
চি সা, ৩

প্রথমে বিবির ওপর সাহেব মেরে উত্তরের হাত থেকে চি-৭ খেলে তার ওপর বিবি মারেন দক্ষিণের খেলোয়াড়। সাহেব দিয়ে পিঠ নিয়ে রু-টে তাড়িয়ে বাকী তিনখানি ফেরাই করেন। দক্ষিণের খেলোয়াড় পিঠ নিয়ে চিড়িতন টানতে থাকেন। তৃতীয় চিড়িতন থেকেই বিপদ আরম্ভ হয় পশ্চিমের, কারণ একখানি ইস্কাবন ছাড়া বাকী সকল তাসই তার প্রয়োজনীয় (Busy) তাস। সুতরাং উক্ত ইস্কাবনখানি ফেলতে পারেন এই চক্রে। চতুর্থ চিড়িতন খেলবার পর বিপদ আরও ঘনীভূত হয়, সে সময়ে প্রয়োজনীয় তাস থেকে একখানি বা ফেরাই তাস একখানি পাসাতে বাধ্য হন তিনি। সে সময়ে তাসের অবস্থিতি নিম্নরূপ :—

উ
ই-টে, গো, ৯, ৮
হ-বি, ৯, ৮
রু-৮
চি-×

প
ই-সা, বি
হ-টে, গো, ১০
রু-১০, ৭, ৫
চি-×

পূ (অপ্রয়োজনীয়)

দ
ই-১০, ২
হ-সা, ৫
রু-২
চি-৯, ৮, ৪

এরূপ অবস্থায় দক্ষিণের খেলোয়াড় খেলেছেন চি-৯। পশ্চিম পাসালেন হ-১০, উত্তর রু-৮। দক্ষিণ আবার খেললেন চি-৮, পশ্চিম দিলেন হ-গো এবং উত্তর ই-৮। অতঃপর দক্ষিণ যখন চি-৪ খেললেন তখন পশ্চিমের পক্ষে রুহিতনের ফেরাই পিঠ ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই কারণ ইস্কাবন ফেলতে পারে না, হরতনের টেক্কাও ফেলা যায় না। সুতরাং সেই সময়ে হ-সা খেললে নো-ট্রা-৩ খেলা মুঠোর মধ্যে কারণ পশ্চিমের খেলোয়াড় তখন পিঠ পাচ্ছেন মোট চারখানি—চিড়িতনে-১, রুহিতনে-২ এবং হরতনে-১।

আবার এরকম তাসও মাঝে মাঝে এসে পড়ে যাতে বিপক্ষ দলের দুটি হাতকেই প্রয়োজনীয় তাস ফেলতে বাধ্য করিয়ে পিঠ বাড়ান সম্ভব হয় ; তবে সে সময়ে দরকার হয় পরস্পর হাতে প্রবেশের তাস।
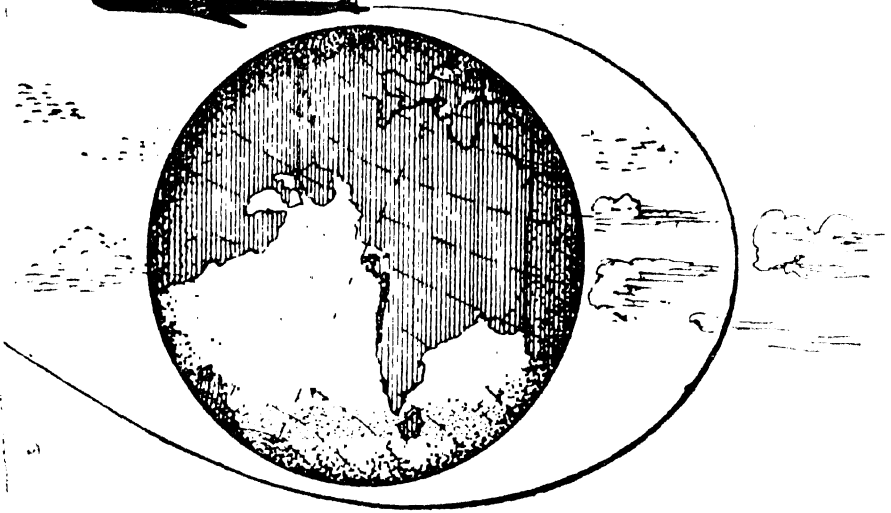
Bath Coup

বিপক্ষ দলের উদ্বোধনী বা অপর সময়ের একটি পিঠ ছেড়ে দিতে হয় সময়ে সময়ে, উদ্দেশ্য উক্ত রংয়ে একটি পিঠ বাড়ান বা অপর রংয়ে প্রয়োজনীয় একটি রোখবার তাস বের করে দেওয়া। এইরূপ খেলবার প্রথার নাম Bath Coup (বাথ কুপ)। যেমন মনে করুন ডাক দিয়েছেন নো ট্রাম্প-৩ এবং বিপক্ষ দল প্রথম খেলেছেন ই-সা এবং আপনার ও খেঁড়ীর তাস নিম্নরূপ :—

খেঁড়ীর তাস	আপনার তাস
ই-৭, ৩, ২	ই-টে, গো, ৫
হ-গো, ৭	ই-টে, বি, ১, ২
রু-টে, ৭, ২	রু-বি, গো, ৩
চি-টে, বি, ১০, ৬, ৩	চি-গো, ৯, ২

দুটি হাতের সমষ্টিগত পিঠ জয়ের লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে চুক্তির খেলা করতে হ'লে চিড়িতনে ফিনেস্ প্রয়োজন উপরন্তু খেলবার ভার বাঁয়ে অবস্থিত খেলোয়াড়ের নিকট থাকলে তিনি রুহিতন বা অন্য যে কোনও রংয়ের তাস খেলুন না কেন তাতে নয় এক পিঠ বেড়ে যাবে নয় ত' একটি প্রয়োজনীয় বড় রোখবার তাস বেরিয়ে যাবে যা চুক্তির খেলা করার পক্ষে সাহায্যকারীই হবে। সুতরাং একটি পিঠ ছেড়ে দিয়ে নিজেদের একটি পিঠ বাড়িয়ে নেবার প্রচেষ্টাই Bath-Coup এর অন্তর্গত।

Deochapelles Coup

নিজ হাতের একটি উঁচু তাস বলিদান দিয়ে খেঁড়ীর হাতে প্রবেশের পথ পরিষ্কার করাই এই প্রথার বিশেষত্ব। 'বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, সাধারণতঃ বিপক্ষদলের নো-ট্রাম্প ডাকের খেলায়, যে খেঁড়ীর হাতে দু-তিনখান ফেরাই তাস থাকা সত্ত্বেও হাতে প্রবেশের পথ না থাকায় সেগুলির সদ্ব্যবহার করা যায় না। সে সময়ে নিজ হাতের একখানি নিশ্চিন্ত পিঠ বলিদান (Surrender) দিয়ে খেঁড়ীর হাতে প্রবেশের পথ সৃষ্টি ক'রতে পারলে ঐ ফেরাইগুলির পিঠ টানা সম্ভবপর হয়। এইরূপ অবস্থা সচরাচর ঘটে বিপক্ষ দলের ডাকে বাধাদানের সময়ে।

গ্রাণ্ড-কুপ (Grand Coup)

বিপক্ষ দলের একটি বড় রংয়ের তাস ধরবার উদ্দেশ্যে নিজের হাতের রংয়ের সংখ্যা কমিয়ে ফেলতে হয় অনেক সময়ে একখানি বা দু'খানি। কমিয়ে ফেলতে হয় ডানদিকের খেলোয়াড়ের সমসংখ্যক করবার জন্য। সে সময়ে খেঁড়ীর পিঠের ওপরও তুরূপ দরকার হতে পারে। অগ্রসর হতে হয় খুব সুবিবেচনার সঙ্গে যেন ডানদিকের খেলোয়াড় কোনোক্রমে এরূপ তাস পাসাবার অবকাশ না পায় যাতে করে খেঁড়ীর হাতে শেষ প্রবেশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। যাই হোক, বলা নিষ্প্রয়োজন যে এরূপ খেলা সম্ভব কেবলমাত্র বিশেষ পারদর্শী ও দক্ষ খেলোয়াড়ের পক্ষে এবং খেলাটিও হয়ে পড়ে বিশেষ উপভোগ্য। উপরন্তু এরূপ একটি খেলায় কৃতকার্য্য হ'লে ডাকদারও প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। মনে করুন ডাক দিয়েছেন হ-৪ নিম্নলিখিত তাসে :—

ই-৭
হ-টে, গো, ১০, ৮, ৩, ২
রু-টে, গো, ৬
চি-গো, ১০, ৩

এবং খেঁড়ীর তাস নিম্নরূপ :—

ই-টে, সা, বি, ১০
হ-বি, ৯
রু-সা, বি, ১০
চি-৮, ৬, ৫, ২

বিপক্ষ দল তিনটি চিড়িতনের পিঠ টেনে নিয়ে একখানি ইস্কাবন খেলেন। হাত দুটি পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে হরতনের সাহেব ফিনেস্ কৃতকার্য্য না হ'লে চুক্তির খেলা করা সম্ভব নয়। সুতরাং খেঁড়ীর হাত থেকে হ-বি খেলেন ও পিঠটি পেয়ে হ-৯ খেলে ফিনেস্ ক'রে দেখেন যে বাঁয়ে অবস্থিত খেলোয়াড়ের কাছে আর রং নেই অর্থাৎ ডানদিকের খেলোয়াড়ের কাছে চারখানিতে সাহেব বর্ত্তমান। সুতরাং ঐ সাহেবটি ধরা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার মনে ক'রে সাধারণ স্তরের খেলোয়াড়গণ হাল ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যের ওপর দোষারোপ ক'রে হৃষ্টচিত্তে একটি খেসারৎ দেবেন, হৃষ্টচিত্তে, কারণ তিনি তখন মনে করবেন যে অপর ঘরে বিপক্ষ দলও ঐরূপ ডাক দিয়ে একটি খেসারৎ দিতে বাধ্য হবেন (আমি ডুপ্লিকেট খেলার বিষয় উল্লেখ করছি)। অপর ঘরে আপনি অপেক্ষাকৃত দক্ষ খেলোয়াড় হ'লে কি করবেন? কি ক'রে সাহেবটি ধরা সম্ভব সেই উপায় নির্দ্ধারণ ক'রে অর্থাৎ Grand Coup-এ খেলাটি করতে সক্ষম হবেন। উপরোক্ত ছয় পিঠ খেলা হয়ে যাবার পর তাস থাকবে নিম্নরূপ :—

ই-সা,বি, ১০
হ-×
রু-সা, বি, ১০
চি-৮

খেঁড়ী

বাঁ ডা

নিজ

ই-×
হ-টে, গো, ১০, ৮
রু-টে, গো, ৬
চি-×

ডাইনের খেলোয়াড়ের দু'খানিতে সাহেবটি ধরতে গেলে রং কমান প্রয়োজন দু'খানি অর্থাৎ সমসংখ্যক ক'রে খেলাটি খেঁড়ীর হাতে রাখতে পারলেই ত' খেলাটি করা খুবই সঙ্গত এই চিন্তা মাথায় এলে চুক্তির খেলা করা অসম্ভব নয়। তখন ই-১০ খেলা তুরূপ ক'রে রু-১০ এ ডামির হাতে প্রবেশ ক'রে ই-বিও তুরূপ করতে হবে। এই উপায়ে রং দুটি কমিয়ে ডামির হাতে রু-বিতে প্রবেশ ক'রে ই-সা খেললে ডাইনের খেলোয়াড় ফাঁদে পড়ে যাবে। তুরূপ করলে ত' কোনও কথাই নেই, সেই তুরূপের ওপর বড় তুরূপ ক'রে রং ধরে নিয়ে বাকী রুহিতনের টেক্কার পিঠ জয় করবেন আর যদি তুরূপ নাই করেন ত' আপনি রু-টে পাসিয়ে দিয়ে বাকী রংয়ের টেক্কা ও গোলামের পিঠ নিশ্চিত জয় করবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময়ে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হ'লেও উপায় উদ্ভাবন করলে খেলা করা একেবারে অসম্ভব নয়। এই খানেই তফাৎ সাধারণ ও দক্ষ খেলোয়াড়ের মধ্যে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

গোয়ার মুক্তি—

অবশেষে গোয়া মুক্ত হইয়াছে। সাড়ে চারি শত বৎসরের পর্ত্তুগীজ শাসন উচ্ছেদ করিতে সাড়ে ছাব্বিশ ঘণ্টার বেশী লাগে নাই। ভারত বিভক্ত হইয়া ১৯৪৭ সালে লাভ করিবার পর হইতে ভারতবাসী গোয়ার মুক্তির জন্ত উদ্যোগী হইতে ভারত সরকারের নিকট দাবী করিয়া আসিতেছে। কিন্তু গোয়া মুক্তির অব্যর্থ পন্থা গ্রহণ করিতে ভারত সরকারের ১৪ বৎসর ৪ মাস সময় লাগিয়াছে। পর্ত্তুগাল ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সন্ধান না পাওয়া গেলে এই দীর্ঘ সময় পরেও ভারত সরকার ত্বরিৎ গতিতে গোয়ার মুক্তির জন্ত ব্যবস্থা করিতেন কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে! এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা প্রায় একমাস পূর্ব্বে ভারত সরকার জানিতে পারেন এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত তদন্ত করা হয়। তদন্তের ফলে যাহা জানা গেল তাহা নিশ্চিন্ত হইবার মত তো নহেই বরং ভয়ানক উদ্বেগজনক। ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ অবশ্য আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে যেটুকু জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, পর্ত্তুগীজ সরকার গোয়ায় পাকিস্তানকে এমন কতগুলি সুবিধা দেওয়ার কথা বিবেচনা করিতেছিলেন যে-গুলি ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিত। পর্ত্তুগীজ সরকার ইতিপূর্ব্বেই পাকিস্তানের সহিত যে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক চুক্তি করিয়াছে তাহাতে পাকিস্তানকে গোয়ায় ব্যবসা সংক্রান্ত কয়েকটি অধিকার দেওয়ার কথা আছে। বৈদেশিক অর্থসাহায্যে পর্ত্তুগীজদের সহিত যৌথভাবে কয়েকটি শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্ত পাকিস্তান পরিকল্পনা করিতেছিল। ইহাই সব নয়। ইহা অপেক্ষাও অত্যন্ত গুরুতর একটি চক্রান্ত গড়িয়া উঠিতেছিল। গোয়ায় যৌথ রক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য পাক সরকারকে আমন্ত্রণ করিতে পর্ত্তুগীজ সরকার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। গোয়ার পাক-পর্ত্তুগীজ যৌথ রক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে গোয়া মুক্ত করাই শুধু দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত না, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষেও অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিত। কাজেই ভারত সরকার বাধ্য হইয়াই গোয়া, দমন ও দিউ হইতে পর্ত্তুগীজদের অপসারিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেও ভারত সরকার সোজাসুজি গোয়ায় সৈন্ত প্রেরণ করেন নাই। শান্তিপূর্ণ ভাবে গোয়া মুক্তির জন্ত শেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই শেষ চেষ্টার গতি দেখিয়া আশঙ্কা জাগিয়াছিল যে, নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনার গোলকধাঁধায় পড়িয়া গোয়ার মুক্তি বুঝি সুদূরপরাহত হইয়া উঠিল। এই আশঙ্কা শেষ পর্য্যন্ত সত্যে পরিণত হয় নাই। পর্ত্তুগীজ সরকার কোন যুক্তি শুনিতে রাজী নহেন। ভারত সরকার অনেক বিলম্বে বুঝিলেন যে, সামরিক অভিযান ছাড়া আর কোন উপায় নাই। তবু গোয়া দখলের জন্ত সৈন্তবাহিনীকে হুকুম দিতে আরও দশদিন কাটিয়া গিয়াছিল।

গোয়ায় ভারতের অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্য পর্ত্তুগীজ সরকার একদিকে যেমন সামরিক আয়োজন-উদ্যোগ করিতেছিলেন, আর একদিকে তেমনি পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহযোগিতায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে ভারতকে গোয়া সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জালে জড়িত করিবার জন্যও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। পর্ত্তুগীজ সরকার গোয়ায় একটি আন্তর্জ্জাতিক কমিশন প্রেরণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বৃটেন বোধহয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিল। গত ১৪ই ডিসেম্বর (১৯৬১) বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে গোয়া সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, কমনওয়েলথের একজন সদস্য এবং বৃটেনের একটি মিত্ররাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় বৃটিশ সরকার খুব ব্যথিত হইয়াছেন এবং যুদ্ধের আশঙ্কা দেখিয়া খুবই চিন্তিত হইয়াছেন। ভারত সরকারের নিকট বৃটিশ সরকার এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে বল প্রয়োগ করা হইবে না। বৃটিশ সরকার এই আশাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, পর্ত্তুগীজ সরকারও সংযত থাকিবেন এবং প্ররোচনামূলক কার্য্যের প্রশ্রয় দিবেন না। গোয়া যাহাতে পর্ত্তুগীজ সরকারের অধীনেই থাকে তাহার জন্ত বৃটিশ সরকারের এই আগ্রহ অবশ্যই লক্ষ্য করিবার বিষয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের উপরেও শুধু পর্ত্তুগালই নয়, কয়েকটি শক্তিশালী পশ্চিমী রাষ্ট্রও চাপ দিয়াছিলেন। এই চাপে পড়িয়াই তিনি গোয়া সম্পর্কে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর নিকট পত্র দিয়াছিলেন। এই পত্রে গোয়া পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা করিবার জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। তিনি পরিস্থিতির বিপদাশঙ্কা সম্পর্কে হুঁসিয়ারী করিয়া পর্ত্তুগীজ সরকারকেও পত্র দিয়াছিলেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। গোয়ায় বলপ্রয়োগ না করিবার জন্য বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই ভারতের উপর কূটনৈতিক চাপ দিয়াছিল। গোয়া সমস্যার সমাধান যাহাতে আলোচনার মাধ্যমে করা হয় তাহার জন্ত ভারতস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ গলব্রেথও সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিল্লীস্থিত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত পর্ত্তুগালের পক্ষ হইতে আপোষ-আলোচনায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। পণ্ডিত নেহরু আপোষ-আলোচনার নাম শুনিলেই নাচিয়া উঠেন। কাজেই পর্ত্তুগালের বন্ধুরা গোয়া মুক্তির জন্ত অভিযান আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে আপোষ-আলোচনার ধুয়া তুলিয়াছিলেন,

ইহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই। তবে আশঙ্কা জাগিয়াছিল, পণ্ডিত নেহরু হয়ত বা আপোষ-আলোচনার প্রস্তাবকারীদের তালে তালে নাচিয়া উঠিবেন। কিন্তু তিনি এবার তাহা করেন নাই। গোয়ার ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে আলোচনা চালাইবার জন্ত পর্ত্তুগালের পক্ষ হইতে যে-অনুরোধ করা হইয়াছিল নিরাপত্তা পরিষদের নিকট এক পত্রে ভারত সরকার তাহা কার্য্যতঃ অগ্রাহ্য করেন।

গত ১৭ই।১৮ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে ভারতীয় সৈন্তবাহিনী গোয়ায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে এবং ১৯শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকালে গোয়া, দমন এবং দিউ পর্ত্তুগীজ কবল হইতে মুক্তিলাভ করে। ভারতীয় বাহিনীকে প্রতিরোধ করিবার জন্ত পর্ত্তুগীজ সরকার যেরূপ আয়োজন উত্তোগ ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল তাহাতে বিনাযুদ্ধে পর্ত্তুগীজরা আত্মসমর্পণ করিবে, ইহা আশা করা যায় নাই। দুই হাজার শ্বেতকায় সৈন্তসহ পর্ত্তুগীজ সেনাধ্যক্ষ ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর গোয়ার গবর্ণর জেনারেলের বাসভবন হইতে পর্ত্তুগীজ পতাকা নামাইয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভারতের বুক হইতে উপনিবেশের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইল। ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে পর্ত্তুগালই সর্ব্বপ্রথম ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে। পর্ত্তুগাল ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল সকলের শেষে। পর্ত্তুগীজরা স্বেচ্ছায় ভারতস্থ উপনিবেশ ত্যাগ করে নাই। ভারতীয় বাহিনীর অভিযানের সম্মুখে তাহারা ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে বৃটেনের ভারত ত্যাগ অন্তান্ত ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে ভারত ত্যাগের ইঙ্গিত স্বরূপ ছিল, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। এই ইঙ্গিতটা ফ্রান্স বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু পর্ত্তুগাল কিছুতেই বুঝিতে চাহে নাই। তাহাকে বুঝাইতে হইয়াছে সৈন্তবাহিনী প্রেরণ করিয়া। কিন্তু ভারত সরকারও সহজে সৈন্ত প্রেরণ করিতে রাজী হন নাই। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার ১৯৫০ সালে ভারতস্থিত পর্ত্তুগীজ উপনিবেশগুলি হস্তান্তরের উদ্দেশ্তে আলোচনার জন্ত পর্ত্তুগীজ সরকারের নিকট অনুরোধ করেন। কিন্তু এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়। অতঃপর লিসবনাস্থিত ভারতীয় দূতাবাসটি ১৯৫৩ সালে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে গোয়া বিমোচন সমিতির সত্যাগ্রহ অভিযানের কথা বিশেষভাবে আমাদের মনে না পড়িয়া পারে না।

১৯৫৪ সালে ভারত হইতে হাজার হাজার সত্যাগ্রহী গোয়ায় প্রবেশের জন্ত তৈয়ার হন। কিন্তু ভারত সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই। ভারত সরকার ১৯৫৫ সালে পুনরায় পর্ত্তুগীজ সরকারের নিকট আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব করেন। কিন্তু উহাও প্রত্যাখ্যাত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গোয়ার ভিতরে ও বাহিরে আন্দোলন আরম্ভ হয়। ভারত হইতে অহিংস সত্যাগ্রহীরা গোয়ায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন। পর্ত্তুগীজ সরকার নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়াছিলেন। ফলে ২০ জন ভারতীয়ের মৃত্যু হয়। ইহার পর ভারত সরকার কর্ত্তৃক কোন ভারতীয় নাগরিকের গোয়ায় কিম্বা পর্ত্তুগীজ এলাকায় সত্যাগ্রহ করা নিষিদ্ধ করা হয়। অবশ্য সেই সঙ্গে বোম্বাই বন্দরটি পর্ত্তুগীজ জাহাজের পক্ষে নিষিদ্ধ করা হয়। এই প্রসঙ্গে দাদরা ও নগর হাভেলির কথা উল্লেখযোগ্য। এ সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক আদালতের রায়ে ভারতের ভিতর দিয়া ছিটমহলগুলি রক্ষার জন্ত পর্ত্তুগীজ সৈন্তের চলাচল নিষিদ্ধ হয়। এই দুইটি এলাকা পূর্ব্বেই পর্ত্তুগীজ কবল হইতে মুক্ত হয়। গোয়া দমন ও দিউ মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু এই ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমী শক্তিবর্গের যে নগ্ন স্বরূপ নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কে শত্রু, কে মিত্র—

ভারত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কাজেই অন্তান্ত সকল রাষ্ট্রই ভারতের মিত্র, একথা অবশ্যই মনে করা যাইতে পারে। কেহ-ই তাহার শত্রু নয় এ কথাও ধরিয়া লওয়া যায়। রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ বলিয়াছিলেন, প্রকৃত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া কেহ নাই। তাঁহার এই উক্তির তাৎপর্য্য এই হইতে পারে যে, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির কতক পশ্চিম শিবিরের দিকে ঝুঁকিয়া আছে এবং আর কতক ঝুঁকিয়া আছে কম্যুনিষ্ট শিবিরের দিকে। এই উক্তির তাৎপর্য্য লইয়া আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু ভারত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইলেও সকলেই তাহার মিত্র, অমিত্র কেহ নাই—একথা বলা সম্ভব নয়। গোয়া মুক্তির অভিযানের কষ্টিপাথরে ভারতের মিত্র ও অ-মিত্রের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মুখোসও খুলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গোয়া মুক্তির প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়াছে, তাহা লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। আমরা এখানে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করিব মাত্র।

জাপান মধ্যপন্থা গ্রহণ করিয়াছে। জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন, গোয়ায় ভারতের অভিযান সম্পর্কে জাপ সরকার নীরব থাকিবেন। এমন কোন কথা তাঁহারা বলিবেন না বা এমন কিছু করিবেন না, যাহা ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট প্রতিবেশী পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, ভারত নিজের ব্যাপারে এক নীতি এবং অপর সকলের ব্যাপারে অন্ত নীতি অনুসরণ করে। এই অভিযোগ করিয়া তিনি বলেন, ভারতের দুমুখো নীতি এবার পৃথিবীর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। নিউজিল্যাণ্ড এশিয়ায় অবস্থিত হইলেও উহা প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই নয়। উহার প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, নিউজিল্যাণ্ডের ন্তায় যে সকল দেশ ভারতের অহিংস নীতি এবং আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ সমাধানে তাহার শান্তিপূর্ণ প্রয়াসের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে, ভারতের সাম্প্রতিক কার্য্যে তাহারা নিশ্চয়ই ব্যথিত হইবে। গোয়ায় ভারতের মুক্তি অভিযানে রক্ষণশীল বৃটিশ সরকার তো বেদনা অনুভব করিয়াছেন-ই, কতকগুলি বৃটিশ সংবাদপত্রও ভারতের নিন্দা করিয়াছেন। ডেইলী টেলিগ্রাফ লিখিয়াছেন, "শান্তিবাদী হিসাবে নেহরুর খ্যাতি আজ কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত হইল।" বিলাতের টাইমস্ পত্রিকা লিখিয়াছেন, "দেখা যাইতেছে, স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্ত নেহরু বলপ্রয়োগ করিতেও ইচ্ছুক আছেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তিনি যাহাদের নিন্দা করিয়াছেন, তাহারাও তো এই ধরণের একটি যুক্তি খাড়া করিতে পারিত।" ডেইলী এক্সপ্রেস লিখিয়াছেন যে, "গোয়ায় আক্রমণ চালাইতে গিয়া মিঃ নেহরু আর পৃথিবীর স্বাধীন মানব সমাজে নির্ব্বান্ধব হইলেন।" মার্কিণ সংবাদপত্র

'নিউইয়র্ক টাইমস' লিখিয়াছেন, "বিশ্বে শান্তির দূত হিসাবে ভারতের যে খ্যাতি আছে তাহা আজ গভীর কলঙ্কে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।"

ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোয়া প্রবেশের সংবাদ পাইয়াই মার্কিণ রাষ্ট্র-সচিব মিঃ ডীন রাস্ক গভীর রাত্রিতেই তাঁহার সহকর্মীদের এক জরুরী বৈঠক ডাকেন। বৈঠক হইতে বাহিরে আসিয়া জনৈক ঊর্দ্ধতম কর্মচারী বলেন যে, পরিষ্কারভাবেই একথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতের এই কাজের নিন্দা করে। তিনি আরও বলেন, "নিরপেক্ষ রাষ্ট্রজোটের সর্ব্বাধিক নীতিবাগীশ বলিয়া যে দেশ পরিচিত সেই দেশই পররাষ্ট্র আক্রমণের চিরাচরিত নীতি অনুসরণ করিয়া সেনাবাহিনী প্রেরণ করিল।" মার্কিণ সরকারী মহল হইতে আরও বলা হয় যে গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে বরাবরই এই অনুরোধ জানাইয়াছে যে, গোয়ার ব্যাপারে যেন বলপ্রয়োগ করা না হয়। মার্কিণ সরকারের মতে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার দ্বারাই সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারিত। গোয়ার ভারতের মুক্তি অভিযান সম্পর্কে ফরাসী পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেন, "সকলেই জানেন, আমরা বলপ্রয়োগের বিরোধী।" আজ যাঁহারা হঠাৎ বলপ্রয়োগের নীতির বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের যথার্থ স্বরূপ কাহারও অজানা নয়। কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বেনামীতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। কিউবায় কাস্ত্রোর পতন ঘটাইবার জন্ম মার্কিণ সাহায্যপুষ্ট অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। বৃটেন ও ফ্রান্স মিলিতভাবে সুয়েজখাল আক্রমণ করিয়াছিল। ফ্রান্স আলজেরিয়ায় বহু নরহত্যা করিয়াছে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের ভগ্নাবশেষ রক্ষা করিবার জন্ম। আজ তাঁহারাই ভারতের গোয়া অভিযানকে পররাষ্ট্র আক্রমণের সহিত তুলনা করিতেছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত স্বাধীন বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ এই ব্যাপারে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু গোয়ার পর্ত্তুগীজ অধিকার রক্ষার জন্ম নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিল তাহাতে তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির নগ্নরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

নিউইয়র্কে একদল সাংবাদিক গোয়ার ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া ভারতের দেশরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমেননের প্রতি অত্যন্ত অভদ্র আচরণ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণমেননের নিকট হইতেও তাঁহারা উপযুক্ত জবাব পাইয়াছেন। একজন মার্কিণ সাংবাদিকের অতিরিক্ত বাঁদরামীতে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে, "If you talk to me like that you will be kicked out."

উপনিবেশবাদের নগ্নরূপ—

পর্ত্তুগাল ভারতকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্ম, ভারতকে যুদ্ধ-বিরতি এবং পর্ত্তুগীজ অধিকৃত ভারত হইতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে অপসারণ করিবার নির্দ্দেশ দিবার জন্ম নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে আবেদন জানাইয়াছিল। এই আবেদন অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। এই অধিবেশনে বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং তুরস্ক মিলিতভাবে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল তাহা পর্ত্তুগালের অভিযোগের প্রতিধ্বনিমাত্র। রাশিয়া যদি এই প্রস্তাবে ভেটো না দিত, তাহা হইলে নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধ-বিরতি এবং গোয়া, দমন ও দিউ হইতে ভারতীয় সৈন্য অপসারণের জন্ম ভারতকে নির্দ্দেশ প্রদান করিতেন। তাহা হইলে ভারতের পক্ষে অবস্থা যে কি দাঁড়াইত তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। সোভিয়েট রাশিয়ার ভেটোর নিন্দা আমরা অনেক শুনিয়াছি। ভেটো ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ার দাবীও উঠিয়াছে। গোয়ার ব্যাপারে রাশিয়ার ভেটোর সার্থকতা ভারত বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছে। ভেটো ব্যবস্থা যদি না থাকিত তাহা হইলে ভারতের সমস্যা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিত। রাশিয়ার এই ভেটোর পিছনে নৈতিক সমর্থন ছিল সিংহল, লাইবেরিয়া এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের। নিরাপত্তা পরিষদের এগার জন সদস্যের মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, চীন অর্থাৎ চিয়াং কাইশেকের ফরমোসা এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন এই পাঁচটি রাষ্ট্র স্থায়ী সদস্য। অবশিষ্ট ছয়জন নির্ব্বাচিত সদস্য। বর্ত্তমান নিরাপত্তা পরিষদে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর, চিলি, লাইবেরিয়া, সিংহল ও তুরস্ক এই ছয়টি রাষ্ট্র নির্ব্বাচিত সদস্য।

পর্ত্তুগালের অভিযোগ অগ্রাহ্য করিয়া সিংহল, লাইবেরিয়া এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ জোরিণ এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই অভিযোগ এখানে চলিতে পারে না। দুইশত বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া যে অপরের বুকের উপর বসিয়া রহিয়াছে, তাহার নিকট হইতে এই অভিযোগ শুনিতে আমরা রাজী নহি। সমন পর্ত্তুগালের বিরুদ্ধেই জারি করা উচিত, ভারতের বিরুদ্ধে নহে।" কিন্তু উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার মত রাষ্ট্রের অভাব নিরাপত্তা পরিষদে হয় নাই। সিংহল, লাইবেরিয়া এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায়। ঐ তিনটি দেশ এবং সোভিয়েট রাশিয়া উক্ত প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছিল। যুদ্ধবিরতি ও ভারতীয়

সৈন্য গোয়া হইতে অপসারণের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং তুরস্ক। প্রস্তাবের সমর্থনে প্রথম বক্তা ছিলেন ফ্রান্সের প্রতিনিধি। ভারতের কার্য্যকলাপে তিনি বিস্ময়, দুঃখ এবং গভীর বেদনা প্রকাশ করিয়া ভারতের গোয়া অভিযানকে typical case of military aggression বলিয়া অভিহিত করেন। বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার প্যাট্রিক ডীন বলেন যে, ভারতের কার্য্যে বৃটেন অতিমাত্রায় বিস্মিত ও নিরাশ হইয়াছে। তিনি বলেন, প্রকৃত পন্থা হইল অবিলম্বে শত্রুতার অবসান ঘটাইতে হইবে। উহার পরবর্ত্তী স্তর হইবে অবিলম্বে ভারতীয় সৈন্যের অপসারণ। অতঃপর নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যস্থতায় উভয় দেশকে বিরোধ মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত করাইতে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। পর্ত্তুগালের প্রতিনিধি সেনর গেরিণ গোয়ায় ভারতীয় বাহিনীর অভিযানকে পর্ত্তুগীজ ভারত রাষ্ট্রের উপর ভারতীয় ইউনিয়নের নৃশংস আক্রমণ বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার দৃষ্টিতে পূর্ব্ব পাকিস্তান যেমন পাকিস্তানের অংশ, গোয়াও তেমনি পর্ত্তুগালের অংশ। এই উপমাটি সত্যই খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের কাছে মনে হয়। তাঁহার উক্তির অর্থ কি ইহাই যে, পূর্ব্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের উপনিবেশ? পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা অবশ্যই ভাবিয়া দেখিবেন। পর্ত্তুগালের অভিযোগ সমর্থন করিতে যাইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি মিঃ আদলাই ষ্টিভেনশন বৃটেন, ফ্রান্স এমন কি পর্ত্তুগালকেও হার মানাইয়া দিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার তথাকথিত স্বাধীন বিশ্বের মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া উপনিবেশবাদের বলিষ্ঠ সমর্থকরূপে বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যাহা যথার্থ স্বরূপ তাহাই আমরা মিঃ আদলাই ষ্টিভেনশনের বক্তৃতার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছি।

যে-সকল আক্রমণকারীরা লীগ অব নেশনসের পতন ঘটাইয়াছিল, মিঃ ষ্টিভেনশন তাহাদের সহিত ভারতের তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গোয়ার সংবাদে তাঁহারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, "What is at stake is not colonialism but a cold violation of an article of the charter that said that all members should refrain in their international relations from the threat or use of force in any way inconsistant with the purpose of the U. N." তাঁহার দৃষ্টিতে উপনিবেশবাদ নয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের সমস্যাই বিবেচনার বিষয়। আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা সমাধানে বলপ্রয়োগ সমর্থন করা হইবে কি না, এই দিক হইতে গোয়া অভিযানকে তিনি দেখিতে চাহিয়াছেন। তিনি অবিলম্বে গোয়া হইতে ভারতীয় সৈন্য অপসারণের দাবী করিয়াছেন। আমেরিকার যে তেরটি উপনিবেশ বৃটিশের কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য অতীতে সংগ্রাম করিয়াছিল, সেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধির মুখে উপনিবেশবাদের এই সমর্থনে অনেকেই বিস্মিত হইবেন। কিন্তু বিস্মিত হইবার সত্যই কোন কারণ আছে কি না তাহা সত্যই ভাবিবার বিষয়। গোয়ার পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ রক্ষার জন্য বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পর্ত্তুগালের পক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ যদি জাতিসঙ্ঘের পথেই যায়, তাহা হইলে তাহাদের এই নীতির জন্যই যাইবে। স্বাধীনতার সমর্থক বলিয়া অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল মিঃ ষ্টিভেনশনের বক্তৃতার পর তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। নিরাপত্তা পরিষদের পরবর্ত্তী কোন অধিবেশনে কিম্বা সাধারণ পরিষদে গোয়া প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য দাবী না করাই মিঃ ষ্টিভেনশন সঙ্গত মনে করিয়াছেন। ইহা না করাই যে বুদ্ধিমানের কাজ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। নিরাপত্তা পরিষদে যে-ভাবেই গোয়া সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হউক, সোভিয়েট রাশিয়ার ভেটোর ভয় রহিয়াছে। সাধারণ পরিষদে ১০৪ জন সদস্যের মধ্যে আফ্রো-এশীয় সদস্যরাই দলে ভারী। সেখানে গোয়ার প্রস্তাব তুলিয়া জয়লাভের কোন আশা পশ্চিমী শক্তিবর্গের নাই। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তি আসলে উপনিবেশবাদ রক্ষার প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আমেরিকা মনে করে, উপনিবেশবাদ খুবই খারাপ জিনিষ সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা বিলোপের জন্য বলপ্রয়োগ করা চলিবে না। বলপ্রয়োগ করিলেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ লঙ্ঘিত হইবে। সুতরাং আলাপ-আলোচনার পথে উপনিবেশবাদের অবসান যদি না হয়, তবে উহা চিরস্থায়ী হইয়াই থাকুক, ইহাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিমত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের এরূপ অপব্যাখ্যা আর কিছুই হইতে পারে না।

আইখম্যানের মৃত্যুদণ্ড—

ইহুদী নিধনকারী এডল্‌ফ আইখম্যানের বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ ইস্‌রাইলী আদালতের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ল্যাণ্ডাও গত ১৫ই ডিসেম্বর তাঁহার প্রতি যে মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষণা করেন তাহা অপ্রত্যাশিত ছিল, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। গত ১১ই এপ্রিল আইখম্যানের বিচার আরম্ভ হয় এবং ১৪ই আগষ্ট শুনানী শেষ হয়। রায় লিখিয়া শেষ করিতে বিচারকদের চারি মাস সময় লাগিয়াছে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ইস্‌রাইলের পক্ষ হইতে একশত জনেরও অধিক সাক্ষী উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং দলিল দাখিল করা হইয়াছিল চৌদ্দ শত। ইহার মধ্যে বিচারের পূর্ব্বে যে-সকল প্রশ্নাদি করা হইয়াছিল সেইগুলি ও তাহার উত্তর সম্বলিত কাগজপত্র ছিল ৩৫৫০ পৃষ্ঠা। আইখম্যান নিজেও জবানবন্দী দিয়াছিলেন। তাঁহার জবানবন্দী লইতে প্রায় চারি সপ্তাহ লাগিয়াছিল। আইখম্যানের পক্ষে সাফাই ছিল এই যে, তিনি একজন টেক্‌নেশিয়ান্ এবং চলাচল ব্যবস্থা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন মাত্র। উপরওয়ালাদের নির্দ্দেশ পালন করিতে তিনি বাধ্য ছিলেন। এক লক্ষ শব্দ সম্বলিত রায়ে বিচারপতিগণ তাঁহার সাফাই অগ্রাহ্য করেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যে ১৫ দফা অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল সবগুলিতেই তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। রায়ে তাঁহারা বলেন যে, আইখম্যান অন্যের হাতের ক্রীড়নক ছিলেন না। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, বিন্দুমাত্র দয়া প্রকাশ না করিয়া ইহুদীদিগকে ধ্বংস করিতে হইবে। দণ্ডাদেশ ঘোষণা করিয়া বিচারপতি বলেন: "This court sentence you, Adolf Eichmann, to death for crimes against the Jewish people, crimes against humanity, and war crimes for which you are

convicted. অর্থাৎ এডল্ফ আইখম্যান, ইহুদী জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধ, মানবজাতির বিরুদ্ধে অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধে আপনি অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছেন এবং তজ্জন্য এই আদালত আপনার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করিতেছেন।

আইখ্‌ম্যান একজন প্রাক্তন নাৎসী। তাঁহার বর্তমান বয়স ৫৫ বৎসর। নাৎসী জার্মাণীর গোষ্টাপোর ইহুদী সংক্রান্ত দপ্তরের তিনিই ছিলেন কর্ত্তা। লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে Auschwitz, Buchenwald, Maidanek, Mauthausen, Bergen-Belsen প্রভৃতি মৃত্যুশিবিরে পাঠাইবার জন্য তিনিই দায়ী। নাৎসী জার্মাণীর পতনের পর তিনি মিত্রশক্তিবর্গের ন্যায়দণ্ডের হাত হইতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ১৯৬০ সালের মে মাসে তিনি যখন বুয়েনস আয়ার্সের এক সহরতলীর এক বাস ষ্টপে দাঁড়াইয়া ছিলেন সেই সময় ইস্রাইলের গুপ্তচরেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া ইসরাইলে লইয়া যায়। তিনি দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনায় আত্মগোপন করিয়াও ইহুদী গোয়েন্দা বিভাগের সন্ধানী দৃষ্টি এড়াইতে পারেন নাই এবং যে ইহুদীদের তিনি ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদেরই আদালতে তাঁহার বিচার হইল এবং তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। নিয়তির ইহা যেন এক অখণ্ডনীয় বিধান। মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হওয়ায় তাঁহার বিচারের উপর যবনিকাপাত হইল একথা বলা যায় না। তিনি আপীল করিবেন, আপীলে মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকিবে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। আপীলে মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকিলে তিনি ইসরাইলের রাষ্ট্রপতির নিকট জীবন ভিক্ষাও করিতে পারেন। ইহাতেও মৃত্যুদণ্ড হইতে তিনি রক্ষা পাইবেন, ইহা আশা করা সম্ভব নয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময় তাঁহার নাৎসী সহযোগীরা সমস্ত দোষ তাঁহার ঘাড়েই চাপাইয়া দিয়াছিলেন।

কাটাঙ্গা ও জাতিপুঞ্জ বাহিনী—

১৩ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী কাটাঙ্গার রাজধানী এলিজাবেথভিলের অর্দ্ধাংশ দখল করিয়াছে। শোম্বের সদলবলে রোডেশিয়া সীমান্তের খনি সহর কিপসি অভিমুখে অগ্রসর হওয়ারও সংবাদ প্রকাশিত হয়। সহরের বাহিরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর যে ঘাঁটি আছে ঐ ঘাঁটির সহিত সংযোগ এবং ঘাঁটী হইতে সরবরাহের পথ বন্ধ করিবার জন্য শোম্বের বাহিনী যখন উদ্যোগী হয় তখনই কাটাঙ্গা বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ হয়। এই প্রসঙ্গে ইহা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে কাটাঙ্গা দখলের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী যে আক্রমণ করিয়াছিল তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। ক্ষুদ্র কাটাঙ্গা সামরিক শক্তিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী অপেক্ষাও শক্তিশালী, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। পর্য্যাপ্ত সংখ্যক সৈন্য এবং শক্তিশালী বিমান বহরের কোন ব্যবস্থা না করিয়াই এই আক্রমণ আরম্ভ করা হইয়াছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কর্ত্তৃপক্ষও কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়াও আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কাটাঙ্গা অভিযানে জাতিপুঞ্জ বাহিনীর বিপর্য্যয়ের ইহাই কারণ। অতঃপর কঙ্গোর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টও কাটাঙ্গা দখলের জন্য অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাও ব্যর্থ হয়। শোম্বেকে সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী হইবার জন্য মিঃ হ্যামারশিল্ড যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছিলেন। শোম্বের পশ্চিমী বন্ধুরা এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছে। পশ্চিমী শক্তিবর্গের চাপে পড়িয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী দৃঢ়তার সহিত নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। কাটাঙ্গা সম্পর্কে বৃটেন ও ফ্রান্সের দোমুখো নীতির কথা ডাঃ ও' ব্রয়েন স্পষ্ট ভাষায় জানাইতে দ্বিধা করেন নাই।

পশ্চিমী শক্তিবর্গের শ্রীরাজেশ্বর দয়াল অপসারিত হওয়ার পর ডাঃ ও' ব্রয়েন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। সত্য কথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চাকরীই শুধু তিনি ছাড়েন নাই, আইরিশ পররাষ্ট্র বিভাগ হইতেও তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কাটাঙ্গা হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণ এবং কাটাঙ্গার বিচ্ছিন্নতাকামীদের কার্য্যকলাপ নিরোধের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত প্রস্তাব বৃটেন ও ফ্রান্স সমর্থন করিয়াছে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ঐ প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যকরী না হয় তাহার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে তাহারা চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর আত্মরক্ষার জন্য এক হাজার টনের ২৪টি বোমা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও বৃটেন তাহা রক্ষা করে নাই। অধিকন্তু যুদ্ধ-বিরতির জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলকে অনুরোধ করিয়াছে। ফ্রান্স এই অনুরোধে যোগ না দিলেও তাহার তাঁবেদার চারটি প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব করিয়াছে। পশ্চিমী শক্তিবর্গের অর্থ নৈতিক স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে কাটাঙ্গাকে কঙ্গো হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা এবং সেখানে শোম্বের আধিপত্য রক্ষা করাই যে বৃটেন, ফ্রান্স এবং বেলজিয়মের কাম্য এবং সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই যে দোমুখো নীতি অনুসরণ করা হইতেছে, তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

নিরাপত্তা পরিষদে ১৯৬০ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী প্রেরণ করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পরেই কঙ্গোতে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেয় তাহা দূর করিতে কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু মিঃ হ্যামারশীল্ড পশ্চিমী শক্তিবর্গের চাপে কঙ্গোর আভ্যন্তরীণ রাজনীতির সহিত জড়িত হইয়া পড়িলেন। তাহারই ফলে শোম্বে এ পর্য্যন্ত কাটাঙ্গার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতে পারিয়াছে এবং কঙ্গো পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক সমর্থিত প্রধান মন্ত্রী লুমুম্বা শোম্বে-কাসাভুবু-মবুটু চক্রান্তে নিহত হইয়াছেন। অতঃপর নিরাপত্তা পরিষদে কঙ্গো সম্পর্কে

দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হয় ১৯৬১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী। কাটাঙ্গা সমস্যার সমাধানই ছিল উহার মূল লক্ষ্য। পশ্চিমী শক্তিবর্গের চাপে এই প্রস্তাব সুষ্ঠুভাবে কার্য্যকরী করা হয় নাই এবং শেষ পর্য্যন্ত মিঃ হামারশীল্ডকেই আত্মবলিদান করিতে হইয়াছে। ইহার পর গত ২৪শে নভেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে কঙ্গো সম্পর্কে আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কাটাঙ্গার সৈন্যবাহিনীতে যে-সকল শ্বেতকায় অফিসার আছে তাহাদিগকে অপসারণের জন্য বলপ্রয়োগের ক্ষমতা এই প্রস্তাব দ্বারা জাতিপুঞ্জ বাহিনীকে দেওয়া হয়। বৃটেন ও ফ্রান্স এই প্রস্তাবে ভোট দিতে বিরত ছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ভোট দিয়াছে। উল্লিখিত প্রস্তাবের তিনটি সংশোধন প্রস্তাব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উত্থাপন করিয়াছিল। একটি প্রস্তাবে কঙ্গোর যে-কোন বিদ্রোহ দমনের জন্য জাতিপুঞ্জ বাহিনীকে ক্ষমতা দেওয়ার কথা ছিল। এই সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইলে জাতিপুঞ্জ বাহিনীর অভিযান কাটাঙ্গার বিরুদ্ধে না হইয়া গিজেঙ্গার বিরুদ্ধে হওয়ার আশঙ্কা ছিল। দ্বিতীয় সংশোধন প্রস্তাবে কঙ্গো বাহিনীকে পুনর্গঠন করা এবং সৈন্যদিগকে উপযুক্ত ট্রেনিং দেওয়ার কথা ছিল। এই দুইটি সংশোধন প্রস্তাব সম্পর্কে রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করে। তৃতীয় সংশোধন প্রস্তাবে কঙ্গো সরকার ও কাটাঙ্গার মধ্যে আলোচনা চালাইবার অনুরোধ ছিল। এই সংশোধন প্রস্তাবের পক্ষে সাতটি ভোট না হওয়ায় উহা অগ্রাহ্য হয়।

গত নবেম্বর মাসে কিভুপ্রদেশের কিণ্ডুতে কঙ্গো বাহিনীর দুই হাজার সৈন্য বিদ্রোহ করে এবং তাহারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ১১ জন অসামরিক ইটালীয় বৈমানিককে হত্যা করে। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, কঙ্গোলী সৈন্যরা তাহাদিগকে বেলজিয়ান বলিয়া মনে করিয়াছিল এবং এই ভুলের জন্য তাহারা নিহত হয়। কিন্তু কাটাঙ্গায় শোম্বের সৈন্যরা জানিয়া শুনিয়াই যে-অত্যাচার করিয়াছে তাহা অত্যন্ত গুরুতর। তাহারা এক ডিনার পার্টি হইতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দুই জন অফিসারকে টানিয়া লইয়া যায় এবং প্রহার করে। তাঁহাদের একজনকে সৈন্যশিবিরে লইয়া যাওয়া হয় এবং গুরুতর ভাবে প্রহার করা হয়। আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীর হস্তক্ষেপের ফলে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ঐ দুই জন অফিসারের সন্ধান করিতে যে একটি ভারতীয় সৈন্যদল বাহির হইয়াছিল, তাহাদের একজন নিহত হইয়াছে, আর একজনের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। কাটাঙ্গায় জাতিপুঞ্জ বাহিনীর সৈন্যরা পুনঃপুনঃ আক্রান্ত না হইলে জাতিপুঞ্জ বাহিনী অভিযান করিত কি না সন্দেহ।

সহশিক্ষা সম্বন্ধে দু-এক কথা

লেখাপড়ায় ভালো হতে হলে যে মিশ্রশিক্ষা বা কো-এডুকেশন মঙ্গলকর নয়, একথা আজকের দিনেও অনেকে বলে থাকেন। ছেলে-মেয়েদের ভিতর সহজ ও স্বাভাবিক মৈত্রী বন্ধন যে ঘটতে পারে এই সব নীতিবাগীশের দল সেটা মেনে নিতে সম্পূর্ণ নারাজ, বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের সৌহার্দ্য তাঁদের চোখে একটিমাত্র অর্থ নিয়েই প্রতিভাত হয়। কো-এডুকেশন বা সহশিক্ষার নামে তাই অধিকাংশ মানুষই এদেশে এবং ওদেশে আজও কেমন সন্দেহাকুল হয়ে ওঠেন। তাঁদের মতে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যেন সব এক একটি মডার্ণ বৃন্দাবন, আধুনিক তরুণ-তরুণীর রাসলীলার প্রকৃষ্টতম ক্ষেত্র। কিন্তু সত্যই কি তাই? শিক্ষা বিভাগীয় তদন্তের ফলে কিন্তু উপরোক্ত অভিমত সপ্রমাণিত হওয়ার কোন তথ্য আবিষ্কৃত হয়নি। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের বিদ্যালয়সমূহে সন্ধান করে বরং এই কথাই নির্ভুল ভাবে জানা গিয়েছে যে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিদ্যার্থী বা বিদ্যার্থীনি কারুরই লেখাপড়ায় মনোযোগ বা পারদর্শিতা হ্রাস পায়নি বরং বেড়ে গিয়েছে। বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা পরস্পরের সান্নিধ্যে এলেই যে তাদের নৈতিক বিচ্যুতি ঘটতে বাধ্য একথা কখনই সত্য নয়, বরং মনকে স্বাস্থ্যকর পথে বিকশিত করার জন্য এই সান্নিধ্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্যকর ও সহজ মেলামেশার ফলে বরং ছাত্র-ছাত্রীদের ·· সবল ও সুন্দর হয়ে গড়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশী। দুর্নীতি বা নৈতিক স্খলনের আশঙ্কা যে একেবারেই নেই তা নয় কিন্তু সে তো স্ত্রী-পুরুষ যেখানেই আছে সেখানেই ঘটতে পারে, নর-নারীর আদিম প্রকৃতিই সেজন্য সম্পূর্ণ দায়ী। সহশিক্ষার গণ্ডীর বাইরেও তার ক্ষেত্র অবারিত, সুযোগ অপর্য্যাপ্ত। এ সম্পর্কে তদন্তের ফলে আরও কয়েকটি কথা জানা গিয়েছে। সহশিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার মান নাকি ছাত্রদেরই অধিকতর উন্নতি লাভ করে, বিশেষজ্ঞগণের মতে এ নাকি পুরুষের জন্মগত শিভালরি প্রবণতার ফল। সহপাঠিনীর চোখে উঁচু হওয়ার গোপন ইচ্ছাই নাকি সহশিক্ষার্থী যুবকের জ্ঞানস্পৃহা বর্দ্ধিত করে, যেমন মধ্যযুগীয় নাইটদের বীরত্বস্পৃহা জেগে উঠত সুন্দরী নারীর সংস্পর্শে এসে। মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু সহশিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার মানোন্নয়নে সহায়ক নয়। তদন্তের রিপোর্টে দেখা যায় যে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠরতারা লেখাপড়ায় অপেক্ষাকৃত নিরেস হয়ে থাকে সাধারণতঃ, এর জন্যও বোধ হয় তাদের অন্তর্লীনা নারী প্রকৃতিই দায়ী, পুরুষের চোখে জ্ঞানী বলে প্রমাণিতা হওয়ার চেয়ে মনোরমা প্রতিভাত হতে পারাতেই তাদের সম্যক্ তৃপ্তি। মেয়েমাত্রই ভাবপ্রবণ ও উচ্ছ্বাসপ্রিয়া, প্রেম ও পরিণয়ই তাদের চোখে জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এবং এজন্যই পুরুষের সান্নিধ্যে তারা রোমান্সের কল্পনায় সহজেই মেতে ওঠে। পুরুষকে জয় করার ইচ্ছা তাদের ও স্বভাবগত প্রবণতা ও এই উদ্দেশ্য সফলের জন্য পুরুষকে মননের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের অগ্রাধিকার দেওয়াই যে সমীচীন সেটুকু সহজাত বুদ্ধিতেই তারা বুঝে নেয় ঠিকঠিক। মেয়েরা তাই সহশিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষার মান অনুযায়ী বিচার করতে গেলে মোটেই সফল নয়, কিন্তু আরেকদিক দিয়ে দেখতে গেলে তারা ও ক্ষেত্রেতে নিষ্ফল নয়। পুরুষের সংস্পর্শে তাদের নারীত্ব আরও বিকশিত হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে আরও সৌন্দর্য্যাকুল। নারী ও পুরুষ আপন আপন স্বাভাবিকতায় সুন্দরতর হয়ে ওঠে পরস্পরের সান্নিধ্যে, আর এটাই বোধ হয় সহশিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

সিনেমা ও মানুষের মন

সিনেমা এখন মানুষের জীবনে একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ হয়ে পড়েছে। জনমনের আনন্দ পরিবেশন ক্ষেত্রে এটিকে অপরিহার্যও বলা যেতে পারে। কেন না, স্বল্প ব্যয়ে চিত্তবিনোদন এবং জ্ঞানলাভ আর কোনো কিছুর মাধ্যমেই সম্ভব নয়।

এই জন্যই শহর, শহরতলী ও গ্রাম এবং সুদূর পল্লীতে পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে সিনেমা হাউস, যেখানে দলে দলে যায় লোক এবং কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসে। একদিকে যেমন এই প্রয়োজনের ব্যাপকতা, তেমনি অন্যদিকে দেখি সিনেমা একটি বিরাট শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিনেমা সম্পর্কে নানা বিভাগে কর্মনিরত সহস্র সহস্র লোকের অন্ন সংস্থান হচ্ছে।

এখনকার দিনে আমার মনে হয় এমন একটি লোক পাওয়া অসম্ভব, যিনি সিনেমা সম্পর্কে কোন না কোন বিষয়ে মোটেই আগ্রহান্বিত নন। অবশ্য এমন লোক অনেক আছেন যাঁরা সিনেমা দেখার কুফল সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তাঁরা সহজেই রায় দিয়ে বলেন যে সিনেমা আধুনিক কালের একটি অভিশাপ। নৈতিক মানের অবনতি ঘটানোর কাজে সিনেমার প্রভাবই একমাত্র দায়ী। একদিক থেকে বিচার করলে বহু জিনিষকেই এইভাবে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক—নানা দিক থেকেই যে এটি বিচারের অপেক্ষা রাখে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আমি এখানে সিনেমাকে শুধু একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা করবো। সেটি হচ্ছে মানসিক। যে জিনিষ অবলীলাক্রমে মানব-চিত্তকে জয় করে নিয়েছে—তার সঙ্গে মানব মনের সম্পর্কের যে রহস্য সেইদিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো। যে জিনিষ শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা পৃথিবীতে সর্বদেশে কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার অপরিহার্য সহচর হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেটি একাধারে একটি বিরাট শিল্প অন্য দিকে কলা-সাহিত্য-সঙ্গীতের এক শ্রেষ্ঠ পরিবেশক হয়ে দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে মানব মনের যে একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতা আছে, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। তাই, সিনেমাকে মানব-মনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার চেষ্টা করা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

অনেক সময় দেখা গেছে অর্থাভাবক্লিষ্ট মানুষও সিনেমার জন্য ব্যয় করতে কার্পণ্য করে না। সহস্র বাধা ও অসুবিধার মধ্যেও মানুষ সি... দেখার সময় ও সুযোগ ক... নেয়। দেখা গেছে অনেকে উন্মাদের মত ছোটে ঐ দিকে। এ-স... দেখে কি মনে হয় না যে এর পেছনে একটা বড় রকম কিছু কারণ আছে? সেটা অনুসন্ধান করতে হ'লে একটু গভীরে যেতে হবে। কারণটা কিছু সামাজিক এবং কিছুটা মানসিক।

মানসিক প্রশ্নটাই ধরা যাক। এটিকে একটু খুলে বলবার চেষ্টা করছি। চিত্তবিনোদন ... একটি জিনিষ আছে। দেহের পুষ্টির জন্যে যেমন খাদ্য দরকার, মনের পুষ্টির জন্যেও তেমনি খাদ্য ও টনিক প্রয়োজন। চিত্তবিনোদন এমনি একটি বলবর্দ্ধক টনিক, আর চলচ্চিত্র এই চিত্তবিনোদনের কাজটি করে অতি সুন্দরভাবে।

বাস্তব জীবনে ... মানুষ থাকে না, জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে স্বাদহীন নীরস একঘেয়ে, মানুষ তখন হাঁপিয়ে ওঠে। জীবনযুদ্ধে উৎসাহ হারায়। তখন সে কিছুক্ষণের জন্যে নিজের জীবনের বাস্তব

অবস্থা ভুলে থাকতে চায়। সিনেমা তার এই উদ্দেশ্য কিছুক্ষণের জন্যে সফল করে।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মানুষের মন নতুনত্ব চায়। যাতে সে অভ্যস্ত তাতে তা'র পরিতৃপ্তি নেই। তাই সে ছোটে অনাস্বাদিত নতুনত্বের সন্ধানে। চলচ্চিত্র তাকে ক্ষণস্থায়ী হলেও একটি নতুনত্বের স্বাদ দিতে সমর্থ। শুধু তাই নয়, মানুষের একটা নিরন্তন কৌতূহল অপরের সম্বন্ধে জানবার। সুখ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা প্রভৃতি অনুভূতি ও বিভিন্ন সাংসারিক অবস্থান অন্যের জীবনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এটা সে দেখতে চায়—জানতে চায়। নানা অবস্থার সম্মুখীন হওয়া তার নিজের পক্ষে সম্ভব নয় এবং নানা বিচিত্র সমস্যার সমাধান করাও তার পক্ষে অসম্ভব। তাই তার দুর্বার কৌতূহল, অপরে কিভাবে সেই অবস্থানগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখছে। পর্দার ছবির মাধ্যমে সে এই কৌতূহল চরিতার্থ করে।

বাস্তব জীবনে অনেক কিছুই পাওয়া যায় না। মানব-মন তাই দুর্লভকে কল্পনার সাহায্যে লাভ করার চেষ্টা করে। চলচ্চিত্রের কাহিনী কল্পনা থেকে উদ্ভূত। তাই সেই কাহিনী মানব-মনকে তার কল্পনা পরিতৃপ্তির সুযোগ দেয়।

আরও কারণ আছে। মানব-মনের সহজ আকর্ষণ দু'টি জিনিষে। সৌন্দর্যে ও সঙ্গতিতে। চিত্রকাহিনীতে পরিবেশিত সৌন্দর্য ও সঙ্গতি তাকে তৃপ্ত করে।

রোমাঞ্চকর জীবনের প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে তার প্রভাবেও এক শ্রেণীর দর্শক সিনেমা দেখতে যান।

নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধে এক বিচিত্র কৌতূহল অনেক সময় দর্শকদের উদ্বুদ্ধ করে।

কিছু আবিষ্কার করার তাগিদ মনের একটি বিশেষ বৃত্তি। চলচ্চিত্রের সাহায্যে মানুষ শিল্পীকে আবিষ্কার করে। সাহিত্যিক বা শিল্পীর চিন্তাধারা বা কল্পনা অনেক সময় জীবনকে প্রভাবিত করে।

এগুলি ছাড়া আর একটি ছোটখাটো কারণ হচ্ছে অনেক সময় ইচ্ছা না থাকলেও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পড়ে তাদের অনুরোধে বা

তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেও আমরা অনেক সময় সিনেমামুখী হয়ে পড়ি।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, সিনেমা আর হয়েছে কতদিন। এর জন্ম ত' সেদিন বললেই হয়। এর আগেও ত' মানুষ ছিল, তাদের মনের বৃত্তি সবই ছিল—

উত্তরে বলা যায়, তা ছিল কিন্তু সেদিনে আর এদিনে তফাৎ অনেক। জীবন এখন অনেক জটিলতর হয়ে পড়েছে। দৈনন্দিন কাজের চাপে, সামাজিক, আর্থিক অসঙ্গতির চাপে মানুষের অনেক ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়। ধীরে ধীরে তাই পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে অশান্তি, অতৃপ্তি, tension। এদের চাপ লাঘব করতে, তার উপশম করতে সে ছোটে সিনেমা থিয়েটারের আশ্রয়ে।

এখন দেখতে হবে, মানুষের ইচ্ছা ও বৃত্তিগুলির কি কোন গভীর মূল আছে?

নিশ্চয়ই আছে। মনের ইচ্ছাগুলির উৎস হচ্ছে মনের নির্জ্ঞান স্তর। এই নির্জ্ঞান মনই মানুষকে প্রত্যেক চিন্তায় ও কর্মে প্রভাবিত করে। মনের অশান্তি ও অতৃপ্তি কিভাবে বা কেন উপশম হয় জানতে হলে মনকে বিশ্লেষণ করা দরকার। এই বিষয়ে কিছু বলবো এবার।

মানুষের মনের প্রধান উপাদান ইচ্ছা। কামনা-বাসনাই তার জীবনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। আমাদের জেনে রাখা দরকার যে কামনার পরিতৃপ্তি ছাড়া আনন্দের (pleasure) উৎপত্তি হতে পারে না। কামনার মূলে আছে কামজ ইচ্ছা।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

—ডাঃ অনাদি ঘোষাল।

কানামাছি

এক আকস্মিক ও অনিচ্ছাকৃত বিভ্রান্তিকে কেন্দ্র করে কানামাছির গল্পাংশ গড়ে উঠেছে। ছবির কাহিনী কৌতুক রসের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। কোন বিখ্যাত অফিসের এক কর্মচারী ও ঐ অফিসের কর্ণধারের কন্যার প্রণয় কাহিনীই কাহিনীর উপজীব্য। বিভিন্ন কৌতুককর ঘটনার মধ্যে দিয়ে কাহিনীর গতি এবং শেষ মিলনাত্মক সমাপ্তি।

প্রচুর হাস্য সৃষ্টি আর যথার্থ রস সৃষ্টি এক জিনিস নয়। কষ্টকল্পিত কাহিনীর মধ্যে বাস্তবের অনুমোদন মেলে না। কল্পনার মধ্যে গভীরতার চিহ্নও পাওয়া যায় না। হাস্যরস বাস্তবকে বর্জন করে রূপ নেয় না, বাস্তবের মধ্যেই সে পুষ্টি পায়। রসের পটভূমি ও দুর্বল চিত্রনাট্য সামগ্রিকভাবে ছবিটিতে আরোপ করেছে ব্যর্থতার স্বাক্ষর। এর কাহিনীকার শৈলেশ দে। ভবেন দাসের পরিচালনায় টাস ইউনিট ছবিটি পরিচালনা করেছেন।

ছবির অভিনয়াংশ অতুলনীয়। অনুপকুমার অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর অভিব্যক্তি ও বাচনভঙ্গী সর্বতোভাবে সুন্দর। রাজী সান্যাল, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান তিলকের অভিনয়ও প্রশংসনীয়। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয়ও অকুণ্ঠ সাধুবাদের দাবী রাখে।

শিশু চলচ্চিত্র পর্ষদ

শিশু চলচ্চিত্র পর্ষদ কর্তৃক আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে গত ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্ণে উক্ত সংস্থার সভাপতি শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায় ও সহকারী সভাপতি শ্রীঅসিত চৌধুরী মহাশয়দ্বয় জানান যে পর্ষদ প্রতিমাসে শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে শিশুদের জন্যে তৃতীয় আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের সাফল্যের পর এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। ইতিপূর্বে পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার শিশুচিত্রগুলি সগৌরবে প্রদর্শিত হয়েছে। এবারে জার্মাণ গণতন্ত্রের শিশুদের উপযোগী কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ভার এঁরা গ্রহণ করেছেন। আগামী ৩১শে ডিসেম্বর থেকে ছবিগুলি কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হবে। উৎসবের উদ্বোধন করবেন চিত্র-পরিচালক শ্রীমধু বসু।

সংবাদ-বিচিত্রা

সারা ভারতের জনগণ আজ পরম আনন্দে প্রত্যক্ষ করল যে সুদীর্ঘকাল পরে গোয়া বিদেশী শাসকের কবল থেকে মুক্তিলাভ করেছে। ভারতের অঙ্গীভূত গোয়ার অঙ্গ থেকে শৃঙ্খল খুলে দেওয়া হয়েছে। গোয়া তথা ভারতের আকাশে বাতাসে আজ মুক্তির আনন্দ। সকলেই জানেন বিনা আয়াসে এই মুক্তি আসে নি, পর্তুগীজ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করে এই মুক্তি অর্জন করতে হয়েছে। সেই সংগ্রামকে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন খ্যাতিমান শ্রীআই. এস. জোহর, অভিনেতারূপে ভারতের বাইরেও যাঁর সুনাম পরিব্যাপ্ত। তাঁর পরবর্তী ছবির

'কানামাছি' চিত্রে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

নাম "গোরা"। এই মুক্তি সংগ্রামকে অবলম্বন করেই তাঁর ছবির গল্পাংশ গড়ে উঠেছে। এর চিত্রগ্রহণ আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথমেই শুরু হবে এবং ১৫ই আগষ্ট ছবিটি মুক্তি পেতে পারে বলে আশা করা যায়।

পরিসংখ্যানের সাহায্যে জানা গেছে যে "ফিচার ফিল্ম" নির্মাণের ক্ষেত্রে সংখ্যার দিক দিয়ে এশিয়ার দুটি বিরাট দেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিকে অতিক্রম করে গেছে। এই দুটি বিরাট দেশের নাম—জাপান ও ভারতবর্ষ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এই দুটি দেশই ১৯৬০ সালে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক ফিচার ফিল্ম নির্মাণের গৌরব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। ১৯৬০ সালে জাপান ও ভারত যথাক্রমে চারশ' তেইশটি ও তিনশ' বারোটি ফিচার ফিল্ম সাধারণ্যে উপহার দিয়েছে। ভারতীয় চিত্রামোদীদের এ সংবাদ আশা করি নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিমাণ আনন্দদান করবে।

সম্প্রতি হলিউডে এক সর্বনাশা বিপর্যয় ঘটে গেছে। এক ভয়ঙ্করী অগ্নিকাণ্ড হলিউডকে সাঙ্ঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। হুতাশনের লেলিহান শিখা হলিউডের অনেক ঘর-বাড়ী আসবাবপত্র সাজ সরঞ্জাম ভস্মীভূত করে ফেলেছে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে চিত্ররাজ্য যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। শিল্পীদের বা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে অনেকেই এই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ায় ই ুডিওগুলির দৈনন্দিন কার্যাবলীও সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়। গভর্ণর এডমাণ্ড ব্রাউন বলেছেন যে, এ ধরণের অগ্নিকাণ্ড কচিৎ কোথাও হয়। এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। প্রায় দেড় হাজার কর্মীর প্রাণপণ অগ্নিনির্বাপন প্রচেষ্টাও সফল হয় না। ধ্বংসের হাত থেকে তাতেও নিস্তার পাওয়া যায় নি; তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে ভয়ঙ্করী অগ্নিতাণ্ডব কোন মানুষকে স্পর্শ করে নি, মানুষ এতে আহত হয় নি। হৃতসর্বস্ব হয়েও অক্ষতদেহী। এর ফলে যে সব শিল্পীরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন তাঁদের মধ্যে বার্ট ল্যাঙ্কাষ্টার, সা-সা গেবে, জোই ব্রাউন, জোওন ফণ্টেন, ওয়ালটার ওয়্যাগনার, আর্নেষ্ট টুই, টেন্স উইলিয়ামস, রেবেকা ওয়েলস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

খ্যাতনামা বিদেশী পরিচালক মার্ক রবসন এবার যে ছবিটির নির্মাণ কার্য নিয়ে ব্যাপৃত আছেন সে ছবিটি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় পটভূমিকায় রূপায়িত হচ্ছে। ছবির নামকরণ ভারতীয়, ছবিতে অনেক ভারতীয় শিল্পী আত্মপ্রকাশ করছেন এবং ভারতের নানাস্থান এর চিত্রগ্রহণ কেন্দ্র রূপে নির্বাচিত হয়েছে। ছবিটির নাম স্থির হয়েছে "Nine hours to Rama" তবে আবার শোনা যাচ্ছে যে এর নাম পরিবর্তিত হয়ে "A Day of Darkness" হবে এবং পটভূমিকা রচিত হয়েছে গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডকে ভিত্তি করে। লণ্ডন থেকে বিভিন্ন কলাকুশলীর দল এ ব্যাপারে ভারতে আসতে শুরু করেছেন ষ্ট্যানলি ওলপার্টের উপন্যাসকে কেন্দ্র করেই এই চলচ্চিত্র রূপ নিচ্ছে। বিদেশী শিল্পীদের মধ্যে ভ্যালেরি গ্যারণ, হোর্ষ্ট বাখলজ, রবার্ট মোরলি, ডায়না বেকার, জোসেফেরায় প্রভৃতি এবং ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে অচলা সচদেব, জয়রাজ ডেভিড, ইফতিকার, কুন্দন, রবিকান্ত লালবাহাদুর এবং মনোহর গির প্রভৃতি শিল্পীরা বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করবেন।

চলচ্চিত্রামোদীদের কাছে এ তথ্য সুবিদিত যে আজকের দিনের বিশ্বের চিত্ররসিক সমাজে ভারতীয় ছায়াছবির বিপুল সমাদর। বিশ্বব্যাপী আজ তার বিরাট জয়যাত্রা। আনন্দের সঙ্গে পরিলক্ষণীয় যে এই জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ভারতীয় চিত্র সম্বন্ধে উৎসাহী বিশ্ববাসীর সংখ্যা ক্রমেই ঊর্দ্ধমুখী। ১৯৬০ সালে দেশের বাইরে ছবি প্রদর্শন করে ভারত এক শ' ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা পেয়েছে। এ বছরের প্রথমার্দ্ধের হিসেবও পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে ভারত ঐ ছ মাসে বিদেশে ছবি প্রদর্শন করে পেয়েছে প্রায় তিরানব্বই লক্ষ টাকা।

পরিচালক শ্রী কে, সুব্রহ্মণ্যম্ ঘোষণা করেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের তৃতীয় পরিকল্পনায় শিশুদের উপযোগী চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্যে পঁচিশ লক্ষ টাকা ধার্য করেছেন এবং বিদ্যালয়সমূহে পরিবেশনার ভারও সেই সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। মাদ্রাজে একটি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রী সুব্রহ্মণ্যম্ সর্বসাধারণের অবগতির জন্যে উপরোক্ত বিষয়টি বিবৃত করেন।

সংবাদ পাওয়া গেছে যে ভারত সরকারের ফিল্মস্ ডিভিসনের মুখ্য প্রযোজক শ্রীএজরা মীরের কার্যকাল পূর্ণ হয়েছে। শ্রীমীরের কার্যকাল যথেষ্ট পরিমাণে গৌরবময়। তাঁর কার্য্যকালে ফিল্মস ডিভিসান নানাবিধ উন্নতির সম্মুখীন হয়েছে। তাঁর দ্বারা ফিল্মস ডিভিসনের উৎকর্ষসাধনও নানাভাবে হয়েছে, আশা করি এ সম্পর্কেও কেউ দ্বিমত হবেন না।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

স্বনামধন্য কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "উত্তরায়ণ" উপন্যাসটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন অগ্রদূতগোষ্ঠী। সুর যোজনার ভার নিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন পাহাড়ী সান্যাল, উত্তমকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী প্রভৃতি। • • • কথাশিল্পী প্রশান্ত চৌধুরীর

সত্যজিত রায় পরিচালিত 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চিত্রে—নবাগতা বিদ্যা সিন্হা

'ডেকো নতুন নামে' উপন্যাসটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন খ্যাতনামা পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। অবশ্য কাহিনীর নাম পরিবর্তন করে ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছে "বন্ধন"। বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিচ্ছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, জীবেন বসু, রেণুকা রায়, গীতা দে, সন্ধ্যা রায়, সীমা দেবী প্রভৃতি। রাজেন সরকার সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করছেন। * * * রাজেন তরফদারের আগামী চিত্রের নাম "অগ্নিশিখা"। সুলেখিকা মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের গল্প "একটি প্রেমের জন্ম" অবলম্বনে ছবিটি রূপ নিচ্ছে। রূপায়ণে আছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, বসন্ত চৌধুরী, অমর মল্লিক, অনুপকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজু ভাওয়াল, কণিকা মজুমদার এবং নবাগতা শর্মিষ্ঠা প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। এর সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। * * * ইঙ্গিতের পর তারু মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী ছবি "সংভাই"। কমল মিত্র, অসিতবরণ, অসীমকুমার, অনুপকুমার, জহর রায়, শ্রীমান সুখেন, সরযূবালা দেবী, সন্ধ্যারাণী দেবী, লিলি চক্রবর্তী, দীপিকা দাস প্রমুখ শিল্পীরা বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করবেন। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর সুর যোজনা এই ছবির একটি প্রধান আকর্ষণ। * * * বিমল ঘোষ প্রোডাকসানসের "বধূ" বর্তমানে মুক্তির দিন গুণছে। ভূপেন রায়ের পরিচালনায় এই ছবির বিভিন্ন চরিত্র ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, বসন্ত চৌধুরী, রবীন মজুমদার, অসিতবরণ, বিশ্বজিৎ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অনুভা গুপ্ত, সন্ধ্যা রায়, মঞ্জুলা সরকার, জয়শ্রী সেন প্রভৃতি শিল্পীদের দ্বারা রূপায়িত হয়েছে। এর সুরকার মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং এর কাহিনী শৈলেশ দের লেখনীজাত।

সৌখীন সমাচার

বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" সম্প্রতি মঞ্চস্থ হল সি·ই· এস·সি টেস্টিং ডিপার্টমেন্ট রিক্রিয়েশান ক্লাবের সদস্যদের দ্বারা। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিবদাস চক্রবর্তী, তৃপ্তি দাস, শেফালি দে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

জীবানন্দ ঘোষের ভাঙার খেলা নাটকটি অভিনীত হল রূপদর্শী নাট্যগোষ্ঠীর দ্বারা। চরিত্রগুলির রূপ দেন সুধীর রায়চৌধুরী, দীপ্তি ভট্টাচার্য, প্রভাস বসু, উত্তমকুমার সান্যাল, অশোক ঘোষ, নিখিল চৌধুরী, রজত রুদ্র, জগদানন্দ রায়, দীপক বসু, পুতুল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।

হাওড়া সঙ্ঘ নাট্যকার জোছন দস্তিদারের দুই মহল নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সীতাংশু বিশ্বাস, শিশির মিত্র, কাজল ভট্টাচার্য, বৈদ্যনাথ মিত্র, রজত মিত্র এবং ছন্দা চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি শিল্পিবর্গ।

এল, আই, সি তিন নম্বর শাখার প্রমোদ সংস্থা সলিল সেনের মৌচোর নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন নারায়ণ চক্রবর্তী, হরেন্দ্রচন্দ্র দাস, সত্যচরণ ঘোষ, নির্মল ভট্টাচার্য, অমৃব্রত চট্টোপাধ্যায়, সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যোত চট্টোপাধ্যায়, মনছুর আহমেদ, ফণী ঘোষ, শৈলেন রায়, তপেন্দ্রনাথ বসু, খেলা বন্দ্যোপাধ্যায়, নমিতা দত্ত প্রভৃতি শিল্পিগণ। নাটকটি অভিনীত হয় হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায়।

নৈসর্গিক

বন্দনা বসু

কালের কঠিন তক্তাপোষে
কে রয়েছ
বসে?

আমি ত ছুটেছি দিন-রাত,
সূর্যের চাকার সংঘাত
দৃশ্য থেকে নিয়ে যায় আমাকে অদ্ভুত দৃশ্যান্তরে,
কখনো কান্নার মধ্যে স্বপ্ন জাগে
এ-আত্মায় অতৃপ্ত হরিণ।

ভাঙ্গা ঘরে
যদিও কাটাই কাল আমি চিরদিন,
তবুও নতুন সুরে লিখি যে কবিতা
জেনেছি সবি তা—
চাকার ঘর্ঘর থেকে ছন্দ হয়ে ভোলায় আমাকে
ক্ষণকাল,
তারপর আবার উত্তাল জানি হয়
কী এক গভীর দুঃখে আমার হৃদয়।
কালের কঠিন তক্তাপোষে
তাই তুমি একা থাকো
বসে।

অথচ আমি

সমরেন্দ্র ঘোষাল

তুমি বলেছিলে গোধূলির রং ভালবাসো
অথচ আমি নিমেষে গোধূলি হতে চেয়ে
মধ্যাহ্নের প্রখরতা হয়ে বিষণ্ণ বিস্ময়ে।
আকাশের অস্তিমতায় নিজেকে হারিয়ে
কান্নার তরলতা নিয়ে দ্রবীভূত হয়ে
তোমাকে বিমুখ করলাম।

তুমি চেয়েছিলে উর্মিমুখর জীবন-সাগরের
কল্লোল-ভরা আনন্দ প্রবলতায়
জীবনোজ্জ্বল সঙ্গীতের স্বাদ নিতে,
অথচ আমি নিজের অহংকারকে চুক্তি করে
নিজের সাথে, বিক্রীত করে যৌবনের কাছে
নিজেকে সৌন্দর্য মুখর কোন স্রোতস্বিনী
করে তুলতে গিয়ে কখন যেন অজ্ঞাতে
মরুতে হারানো কোন অন্তর্মুখী নদীর সাথে
কণ্ঠ মিলিয়ে তোমাকে বিমুখ করলাম।

এবার তোমাকে বলি,
তুমি তোমার সম্ভোগের সুর পঞ্চমে তুলে
লীলায়িত সঙ্গীতের সাথে কণ্ঠ মেলাতে
আমাকে ছন্দ দাও, স্পর্শ দাও তোমার প্রাণের।

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৬১)

অন্তর্দেশীয়—

১লা অগ্রহায়ণ (১৭ই নভেম্বর) : আমেরিকা কর্তৃক ভারতকে আরও সাড়ে ৫ কোটি ডলার (২৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা) সাহায্য দানের প্রস্তাব—উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ৪টি চুক্তি সম্পাদনের ঘোষণা।

২য় অগ্রহায়ণ (১৮ই নভেম্বর) : ত্রিপুরা, মণিপুর ও হিমাচল প্রদেশে (কেন্দ্র শাসিত) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্ন—দিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সহিত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলত্রয়ের কর্মকর্তাদের বৈঠক।

৩রা অগ্রহায়ণ (১৯শে নভেম্বর) : পঞ্চদশ বার্ষিক পরিকল্পনা রচনার জন্য ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যম—কলিকাতার আলোচনা-চক্রে পরিকল্পনা কমিশন সদস্য শ্রীমন্ নারায়ণের ঘোষণা।

৪ঠা অগ্রহায়ণ (২০শে নভেম্বর) : আসামের বাঙালী যুব প্রতিনিধিদলের পদব্রজে দিল্লী (রাজধানী) অভিযান—নেতৃবৃন্দের নিকট প্রকৃত পরিস্থিতি উপস্থাপিত করার জন্য দুঃসাহসিক প্রয়াস।

৫ই অগ্রহায়ণ (২১শে নভেম্বর) : কম্যুনিষ্ট পার্টি নেতা শ্রীঅজয় ঘোষ কর্তৃক নূতন চীনা আক্রমণের প্রতিবাদ জ্ঞাপন।

কেরলে কংগ্রেস-পি, এস, পি কোয়ালিশন অব্যাহত—উভয় দলের বিরোধের অবসান।

৬ই অগ্রহায়ণ (২২শে নভেম্বর) : আগামী নির্বাচনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী তালিকার চূড়ান্ত অনুমোদন—দিল্লীতে শ্রীনেহরুর উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির (কংগ্রেস) বৈঠকে সিদ্ধান্ত।

৭ই অগ্রহায়ণ (২৩শে নভেম্বর) : 'বিশ্বশান্তি' রক্ষা ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধান ভারত ও জাপানের সাধারণ লক্ষ্য'—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও ভারত সফরকারী প্রধান মন্ত্রী মিঃ ইকেদার (জাপান) যৌথ ইস্তাহারে ঘোষণা।

৮ই অগ্রহায়ণ (২৪শে নভেম্বর) : কমাণ্ডার নানাবতীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ বহাল—সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক আপীলের আবেদন বাতিল—আহুজার হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত বলিয়া অভিমত দান।

অঞ্জাদেব দ্বীপ (পর্তুগীজ অধিকৃত) হইতে ভারতীয় জাহাজের উপর গুলীবর্ষণ—লোকসভায় শ্রীনেহরুর (প্রধান মন্ত্রী) বিবৃতি।

৯ই অগ্রহায়ণ (২৫শে নভেম্বর) : পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতা বিলোপের জন্য পুলিশী ব্যবস্থা দাবী—বোম্বাই-এ গোয়ান রাজনৈতিক সম্মেলনে শ্রী এম, সি, চাগলার ভাষণ।

১০ই অগ্রহায়ণ (২৬শে নভেম্বর) : ভারতীয় বিমান বাহিনী নির্মিত প্রথম আভ্রো—৭৪৮ বিমানের ('সুব্রত') আকাশ যাত্রা—দিল্লীতে শ্রীনেহরুর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠান সম্পন্ন।

১১ই অগ্রহায়ণ (২৭শে নভেম্বর) : 'উত্তর-সীমান্ত সম্পর্কে ভারতকে সতর্ক থাকিতেই হইবে'—ভারতে চীনা আক্রমণ প্রশ্নে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের বৈঠকে শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

১২ই অগ্রহায়ণ (২৮শে নভেম্বর) : পাঞ্জাবী শিখগণ কর্তৃক দাস কমিশনের উদ্বোধনী অধিবেশন বর্জন।

ভারত-সীমান্তে চীনের আরও তিনটি সামরিক-চৌকি প্রতিষ্ঠা—লোকসভায় উপস্থাপিত ভারত সরকারের শ্বেতপত্রে ঘোষণা।

১৩ই অগ্রহায়ণ (২৯শে নভেম্বর) : রুশিয়ার প্রথম মহাশূন্যচারী মেজর ইয়ুরি গাগারিণের দিল্লী উপস্থিতি—সর্বত্র বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ।

১৪ই অগ্রহায়ণ (৩০শে নভেম্বর) : গোয়ায় পর্তুগীজদের সামরিক প্রস্তুতি ও সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ—লোকসভায় শ্রীনেহরুর বিবৃতি।

১৫ই অগ্রহায়ণ (১লা ডিসেম্বর) : বিশিষ্টা মহিলা সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকারের (৮৬) লোকান্তর।

১৬ই অগ্রহায়ণ (২রা ডিসেম্বর) : কলিকাতার জনসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা—'শান্তিপূর্ণ পন্থায় চীনা অধিকৃত ভারতের অংশ মুক্ত করা সম্ভব না হইলে 'অন্য পন্থা' গ্রহণ করা হইবে।

গঙ্গাটিকুরীতে (বর্দ্ধমান) বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অধিবেশনের অনুষ্ঠান—কেন্দ্রীয় শিক্ষা-সচিব ডাঃ কে, এল, শ্রীমালি কর্তৃক উদ্বোধন।

১৭ই অগ্রহায়ণ (৩রা ডিসেম্বর) : রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে ৭৮তম জন্মদিনে দেড় লক্ষাধিক কাঠা ভূমি (বিহারে সংগৃহীত) অর্পণ—দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে দানোৎসব।

১৮ই অগ্রহায়ণ (৪ঠা ডিসেম্বর) : মহানগরীতে (কলিকাতা) সোভিয়েট গগনচারী গাগারিণের বিপুল সম্বর্দ্ধনা।

১৯শে অগ্রহায়ণ (৫ই ডিসেম্বর) : ভারতীয় এলাকায় পর্তুগীজ বাহিনীর গুলীবর্ষণ—প্রতিব্যবস্থা হিসাবে ভারতীয় বাহিনীকে গোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইবার সরকারী নির্দেশ।

২০শে অগ্রহায়ণ (৬ই ডিসেম্বর) : 'ভারত ও চীনের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে তাহা বিশ্বযুদ্ধের রূপ গ্রহণ করিবে'—ভারতে চীনা অনুপ্রবেশ সম্পর্কে বিতর্কের উত্তরে রাজ্য সভায় শ্রীনেহরুর উক্তি।

স্থানীয় হাঙ্গামার দরুণ কোচবিহার পৌর এলাকায় এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারী।

২১শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর) 'পর্তুগীজদের সহিত মোকাবিলার জন্য ভারত সম্পূর্ণ প্রস্তুত'—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) ঘোষণা।

২২শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর) : গোয়া সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদিকা ডাঃ শ্রীমতী লরা ডি-সুজার গোয়া প্রবেশ—মুক্তি অভিযান কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমতী আসফ আলীরও গোয়া অভিমুখে যাত্রা।

২৩শে অগ্রহায়ণ (৯ই ডিসেম্বর) : সীমান্ত লঙ্ঘনকারী পর্তুগীজ সৈন্যদের সহিত ভারতীয় টহলদারী বাহিনীর সংঘর্ষ—গোয়ায় ডাঃ শ্রীমতী লরা ডি-সুজা সহ অনেকে গ্রেপ্তার।

২৪শে অগ্রহায়ণ (১০ই ডিসেম্বর) : দশজন কিষাণ স্বেচ্ছাসেবক

সহ কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রী এ. কে. গোপালন গ্রেপ্তার—কেরলে কৃষক আন্দোলন দমনে সরকারী কার্য্য-ব্যবস্থা।

২৫শে অগ্রহায়ণ (১১ই ডিসেম্বর): সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতীয় গ্রামে আবার পর্ত্তুগীজ হানা ও গুলীবর্ষণ—ভারত সরকারের তীব্র প্রতিবাদ।

২৬শে অগ্রহায়ণ (১২ই ডিসেম্বর): গোয়ার অভ্যন্তরে মুক্তি ফৌজ ও পর্ত্তুগীজ বাহিনীর তুমুল সংঘর্ষ—দুইটি গ্রামে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন।

২৭শে অগ্রহায়ণ (১৩ই ডিসেম্বর): পাঞ্জাবী সুবা গঠনের জন্য আকালীদের আবার ঐক্যবদ্ধ দাবী—সর্ব্বভারতীয় আকালী সম্মেলনের (দিল্লী) প্রস্তাব—দাশ কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত।

২৮শে অগ্রহায়ণ (১৪ই ডিসেম্বর): গোয়া সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যাধ্যক্ষদের (জেনারেল থাপার, এয়ার মার্শাল ইঞ্জিনীয়ার ও জেনারেল চৌধুরী) গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক—যে-কোন মুহূর্ত্তে গোয়ায় অভিযান আরম্ভের সম্ভাবনা।

২৯শে অগ্রহায়ণ (১৫ই ডিসেম্বর): সোভিয়েট প্রেসিডেণ্ট লিওনিদ ব্রেজনেভের ভারত আগমন—দিল্লীতে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত।

ত্রিবান্দ্রমে ক্ষিপ্ত জনতার উপর পুলিশের লাঠি চার্জ্জ—নাম্বিয়ার প্রমুখ কম্যুনিষ্ট নেতৃবর্গ গ্রেপ্তার।

৩০শে অগ্রহায়ণ (১৬ই ডিসেম্বর): দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও রুশ প্রেসিডেণ্ট ব্রেজনেভের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক—নিরস্ত্রীকরণ, বার্লিন সমস্যা, ঔপনিবেশিকতা প্রভৃতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা।

বহির্দেশীয়—

১লা অগ্রহায়ণ (১৭ই নভেম্বর): দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রতিরক্ষায় আমেরিকা দৃঢ়সঙ্কল্প—মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডীন রাস্কের ঘোষণা।

৩রা অগ্রহায়ণ (১৯শে নভেম্বর): কায়রো-এ আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নাসের ও যুগোশ্লাভ প্রেসিডেণ্ট টিটোর সহিত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর (ভারত) জরুরী বৈঠক—বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে নেতৃত্রয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা।

৪ঠা অগ্রহায়ণ (২০শে নভেম্বর): বিশ্বশান্তির উদ্যম জোরদার কল্পে ১৯৬২ সাল রাষ্ট্রসঙ্ঘ বৎসর ঘোষণার জন্য শ্রীনেহরুর উপস্থাপিত প্রস্তাব—সাধারণ পরিষদের বিষয় নির্ব্বাচনী কমিটিতে সমর্থিত।

৫ই অগ্রহায়ণ (২১শে নভেম্বর): জেনেভায় আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের আলোচনা পুনরারম্ভে রুশিয়ার সম্মতি—ইঙ্গ-মার্কিণ যৌথ প্রস্তাবের উত্তর প্রেরণ।

৭ই অগ্রহায়ণ (২৩শে নভেম্বর): বৃটেন কর্ত্তৃক কেনিয়ার নেতা জমো কেনিয়াটার উপর সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার।

৮ই অগ্রহায়ণ (২৪শে নভেম্বর): সাইবেরিয়া অঞ্চলে রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের সহিত ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট মিঃ কেকোনেনের জরুরী বৈঠক।

কাটাঙ্গাকে কঙ্গোর মধ্যেই থাকিতে হইবে—রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব।

১০ই অগ্রহায়ণ (২৬শে নভেম্বর): রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিরুদ্ধে কাটাঙ্গার সর্বাত্মক যুদ্ধের হুমকী—কাটাঙ্গার প্রেসিডেণ্ট ময়েস সোম্বের আস্ফালন।

১১ই অগ্রহায়ণ (২৭শে নভেম্বর): আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে রুশিয়ার চার দফা নূতন প্রস্তাব পেশ।

প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে (আরব প্রজাতন্ত্র) হত্যার ষড়যন্ত্র—ফরাসী মিশনের ৯ জন কর্ম্মী গ্রেপ্তার।

১৩ই অগ্রহায়ণ (২৯শে নভেম্বর): আমেরিকা কর্ত্তৃক রকেট-যোগে মহাকাশে শিম্পাঞ্জী প্রেরণ—দুইবার পৃথিবী পরিক্রমার পর প্রেরিত শিম্পাঞ্জীর নিরাপদে অবতরণের দাবী।

১৪ই অগ্রহায়ণ (৩০শে নভেম্বর): রাষ্ট্রসংঘে কোয়ায়েতের প্রবেশের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের ভেটো প্রয়োগ—কোয়ায়েত সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র নয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ।

ডোমিনিয়ন প্রজাতন্ত্র প্রেসিডেণ্ট জুয়াকিম বালাগুয়ে কর্ত্তৃক বর্ত্তমান সরকার বাতিল।

১৫ই অগ্রহায়ণ (১লা ডিসেম্বর): এলিজাবেথভিল হইতে গোপনে বিমানযোগে কাটাঙ্গা প্রেসিডেণ্ট সোম্বের ব্রেজভিল উপস্থিতি।

রাষ্ট্রসংঘে কম্যুনিষ্ট চীনকে সদস্য করার প্রশ্নে সাধারণ পরিষদে বিতর্ক আরম্ভ।

১৬ই অগ্রহায়ণ (২রা ডিসেম্বর): এলিজাবেথভিল বিমান ঘাঁটিতে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী ও কাটাঙ্গা সৈন্যদের তুমুল সংঘর্ষ।

লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য প্রিন্সত্রয়ের নিকট রুশিয়ার অনুরোধ।

১৯শে অগ্রহায়ণ (৫ই ডিসেম্বর): 'উত্তর কোরিয়াকে বাদ দিয়া কোরিয়ার প্রসঙ্গে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইলে তাহা প্রত্যাখ্যান করা হইবে'—উত্তর কোরিয় সরকার কর্ত্তৃক রাষ্ট্রসংঘের প্রতি হুঁসিয়ারী।

২০শে অগ্রহায়ণ (৬ই ডিসেম্বর): রাষ্ট্রসংঘ ও কাটাঙ্গার মধ্যে অস্ত্র সম্বরণ চুক্তি বাতিল—ভারতীয় ও সুইডিশ বিমান আক্রান্ত হওয়ায় রাষ্ট্রসংঘের নির্দ্দেশ দান।

২১শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর): চীন পাকিস্তান সীমানা (পাক অধিকৃত কাশ্মীর এলাকা বরাবর) নির্দ্ধারণ ব্যাপারে করাচীতে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের বৈঠক।

২২শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর): গোয়ায় ভারতের বলপ্রয়োগের চেষ্টা চলিয়াছে বলিয়া রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সভাপতির নিকট পর্ত্তুগালের অভিযোগ।

২৪শে অগ্রহায়ণ (১০ই ডিসেম্বর): সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আলবেনিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক কার্য্যতঃ ছিন্ন।

নেপালে জনগণের মৌলিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত—রাজা মহেন্দ্রের বেতার ঘোষণা।

২৬শে অগ্রহায়ণ (১২ই ডিসেম্বর): জাপানের সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যর্থ ষড়যন্ত্র—১৩ জন প্রাক্তন সামরিক অফিসার গ্রেপ্তার।

২৯শে অগ্রহায়ণ (১৫ই ডিসেম্বর): লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে হত্যার অপরাধে আইখম্যানের মৃত্যুদণ্ড—জেরুজালেম আদালতের রায়।

নয়া চীনকে রাষ্ট্রসংঘে গ্রহণের দাবী বাতিল—সাধারণ পরিষদে রুশ প্রস্তাব ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য।

৩০শে অগ্রহায়ণ (১৬ই ডিসেম্বর): এলিজাবেথভিলের অর্দ্ধাংশ রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী কর্ত্তৃক দখল—সদলে প্রেসিডেণ্ট সোম্বের (কাটাঙ্গা) রাজধানী হইতে পলায়ন।

ভাবগত ঐক্য

"মহাপুরুষের জীবনী ও বাণী সম্পর্কে বক্তৃতা শুনিলেই ছাত্র-ছাত্রীরা সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে বলিয়া আমরা মনে করি না। দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণ করেন, তাহা হইতে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষালাভ করে। ছাত্র-ছাত্রীরা বাস্তব অবস্থা একেবারেই দেখিতে পায় না, ইহা ভুল ধারণা। দেশের যাঁহারা জননেতা, বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁহাদেরও দৃষ্টান্ত হইতে ছেলে-মেয়েরা শিক্ষালাভ করে। তাহারা চোখের সম্মুখে যাহা দেখে, তাহারই অনুকরণ করে। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন গড়িয়া তুলিবার আগে বয়স্ক ব্যক্তদের জীবন, মহাপুরুষদের বাণী ও আদর্শ অনুযায়ী গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের জন্ম শপথ গ্রহণের ব্যবস্থার বিরোধী আমরা নই, কিন্তু উহার ফল সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। দেশকে ভালবাসিবার জন্ম শপথ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহারা শপথ রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা শপথ গ্রহণ না করিয়াই দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভারতে এক সময়ে যাঁহারা পাকিস্তানের দাবীদার ও সমর্থক ছিলেন, আজ তাঁহারা সকলেই ভারতকে নিজের দেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন কি? যদি না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে শুধু শপথ গ্রহণ করিলেই ভারতকে নিজের দেশ বলিয়া মানিয়া লইতে পারিবেন কি? হিন্দুরা সকলেই ভারতকে নিজের দেশ বলিয়া মনে করে এবং ভালবাসে। উহার জন্ম শপথ গ্রহণের প্রয়োজন নাই। গুরুজনদের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া ভাল নম্বর পাওয়া, আর গুরুজনদের প্রতি কর্তব্য পালন এক নয়, সে কথা কমিটী ভাবিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সকল ছাত্রের জন্ম এক রকম পোষাক হওয়ার সার্থকতা আমরা বুঝিলাম না। এক রকম পোশাক পরিলেই তাহাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হইবে, ইহা আমরা মনে করি না। তারপর কি ধরণের পোষাক হইবে, তাহাও অত্যন্ত গুরুতর প্রশ্ন। এক রকম পোষাকের প্রশ্নে গুরুতর মতভেদ ঘটিবার সম্ভাবনা। তারপর প্রশ্ন এই পোষাকের খরচ কে দিবে? স্কুলের বেতন, বই ও খাতা পেন্সিলের দাম যোগাইতেই বাপ-মায়ের অবস্থা কাহিল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আরও খরচ বাড়ানো কেন? পোষাকের ব্যয়টা অবশ্য সরকার বহন করিতে পারেন, কিন্তু পোষাকের জন্ম যে ব্যয় হইবে, তাহা শিক্ষার জন্ম ছাত্রদের খাতাপত্র, বই ইত্যাদি দিবার জন্ম ব্যয় করিলে লোকের সত্যকার উপকার হইবে।"

—দৈনিক বসুমতী।

অযত্ন

"বরেণ্য ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্তি স্থাপন করা বস্তুত তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার একটি অনুষ্ঠান। কিন্তু রাজপথের একপাশে এইরূপ প্রতিমূর্তি শুধু স্থাপন করিয়া রাখাই শ্রদ্ধা প্রদর্শনের শেষ কর্তব্য নহে। প্রতিমূর্তির পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিবারও কর্তব্য আছে। পরিতাপের বিষয়, কলিকাতায় রাজপথের প্রকাশ্য স্থানে বরেণ্য ব্যক্তিদিগের যে-সকল প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে, তাহাদের পরিচ্ছন্নতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার দায়িত্ব যেন কাহারও নাই। দৃষ্টান্ত, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের সংযোগস্থলে স্যার আশুতোষের প্রতিমূর্তি। প্রতিমূর্তিটির অবহেলিত এবং আবর্জনাক্রান্ত অবস্থা দর্শকের চোখে পীড়াদায়ক। অন্যান্য প্রতিমূর্তিও এই অবস্থা। প্রশ্ন করিতে পারি, প্রতিমূর্তিগুলিকে পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্ম কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের কি কোন কর্তব্য নাই? পথের ধূলি ও আবর্জনা অপসারণ করা যেখানে নিত্যদিনের নিয়মিত পৌর কর্তব্য, সেখানে প্রতিমূর্তিগুলিকে পরিচ্ছন্ন রাখা নিয়মিত কর্তব্য কেন হইবে না? প্রতিমূর্তিগুলি নিতান্ত বস্তুপিণ্ড নহে এবং উহাদের সৌষ্ঠবের মর্যাদা পথ ও পার্কের সৌষ্ঠবের তুলনায় নিশ্চয় কম নহে। বরং বেশী; উহারা জাতীয় শ্রদ্ধার এক একটি ঐতিহাসিক প্রতীক। পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিমূর্তি পরিচ্ছন্ন রাখিবার একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা আদৌ দুরূহ অথবা দুঃসাধ্য ব্যাপার নহে। আশা করিতেছি পৌর কর্তৃপক্ষ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

নীরব খাদ্য-সচিব

"ভারতে কৃষি সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে ব্যর্থতার জন্ম কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি-সচিব অবশ্যই ক্ষোভ বোধ করিতে পারেন। কেন না, গত দুইটি পরিকল্পনায় কৃষি-গবেষণার ও কৃষি-শিক্ষা প্রসারের জন্ম প্রভূত অর্থ ব্যয় হইয়াছে। ইহার ফলে একদিকে কৃষি-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের সংখ্যা বাড়িয়াছে, অন্যদিকে গবেষণার দ্বারা নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু গবেষণালব্ধ এই তত্ত্বগুলি কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগের যথোচিত চেষ্টা আজও হয় নাই। দেশের বিভিন্ন স্থানে কোন্ জমির উপাদান কি ধরণের, তাহা জানা থাকিলে উহার উপযোগী ফসল চাষের দ্বারা অনেক বেশী ফলন, তথা আয় হইতে পারে। উন্নত দেশগুলিতে জমির উপাদান পরীক্ষা করার কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন কি ছোট ছোট দেশেও কৃষকরা সরকারী কৃষি-বিভাগে মাটি পাঠাইয়া জমির উপাদানগুলি জানিয়া লইতে পারে। কিন্তু এই অত্যাবশ্যক তত্ত্ব ভারতীয় কৃষকদিগকে জানাইবার ব্যবস্থা আজও হয় নাই। আবার সব রকম মাটিতে, কিম্বা সব রকম উদ্ভিদে একই সার চলে না; মাটির এবং ফসলের পার্থক্য অনুসারে সারের অদল-বদল করিতে হয়। কিন্তু এ-দেশে কোন্ জমি কোন্ ফসলের উপযোগী কিম্বা কোন্ সার দিতে হইবে—সে সম্পর্কে তত্ত্বগুলি আজও অজ্ঞাত। উন্নত ধরণের বীজ ও সার সরবরাহের ব্যবস্থা, কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি প্রবর্তন কিম্বা সেচের আয়োজন সম্পর্কে বিজ্ঞাপিত ব্যবস্থাগুলি নিতান্তই সীমাবদ্ধ। অথচ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত এই তত্ত্বগুলি কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যবস্থা হইলে বিঘা-প্রতি ফলন যে বৃদ্ধি পাইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে এই ব্যাপারে ব্যর্থতার জন্ম কেবলমাত্র কৃষি-গবেষকদিগের উপর দায়িত্ব আরোপ করার কারণ নাই। কেন না, কেমন কোন্ বিষয়ে

গবেষণা হইবে, তাহা স্থির করেন কৃষি-দপ্তরের সর্বোচ্চ কর্মচারীরা; আবার গবেষণালব্ধ তত্ত্বগুলি প্রয়োগের দায়িত্ব, তথা ক্ষমতাও তাঁহাদের উপর ন্যস্ত। সুতরাং ব্যর্থতার জন্য তাঁহাদের দায়িত্বই সমধিক। খাদ্য-সচিব কিন্তু সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব।" —যুগান্তর।

দায়িত্ব কাহার

"পুসাতে ভারতীয় কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সমাবর্তন-ভাষণ দান প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস. কে. পাতিল বলেন, ভারতে কৃষির অবস্থায় তাঁহার মনে এক গভীর হতাশার সৃষ্টি হয়। এই হতাশার কারণ সম্পর্কে শ্রীপাতিল বলেন, কৃষি বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বর্ধিত কাজকর্ম সত্ত্বেও ভারত কৃষির দিকেও এক পশ্চাদপদ দেশ থাকিয়া গিয়াছে। ভারতের কৃষির অনুন্নত অবস্থা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রীর বিলাপ যদি আন্তরিক হইত তাহা হইলে সকলে হয়ত কিছুটা সুখী হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার ভাষণে কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রী কৃষির এই অবস্থার জন্য মূলতঃ দায়ী করিয়াছেন দেশের কৃষি-বৈজ্ঞানিকদের। কৃষির এই অবস্থার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, একটি প্রধান কারণ নাকি এই যে বিভিন্ন কৃষি-গবেষণাগারে অর্জিত সাফল্যগুলিকে হাতে-কলমে ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য লইয়া যাওয়া হয় নাই। তাঁহার মতে এই ব্যর্থতার কারণ হইতেছে দেশের অনেক বৈজ্ঞানিক আজিও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গজদন্তমিনারে বাস করিতে এবং বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেই অবলম্বন করিয়া বাস করিতে বেশী পছন্দ করেন। এই ভাবে ভারতে কৃষির অনুন্নত অবস্থার যে ব্যাখ্যা কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী দিয়াছেন তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে ভারতের কৃষির অনগ্রসর অবস্থা স্মরণ করিয়া কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রীর সমস্ত বিলাপ কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ ব্যতীত আর কিছু নয়। কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রী কৃষিশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অনেকগুলি ফাঁকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই ফাঁক থাকিতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন ন্যায়সঙ্গত ভাবেই উঠে যে, কৃষিবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে এই ফাঁকগুলির অস্তিত্বের জন্য দায়িত্ব কাহার? কৃষিবৈজ্ঞানিকদের এবং কৃষিবিজ্ঞানের ছাত্রদের ইহার জন্য দায়িত্ব কতটুকু হইতে পারে? বিবেচনাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির নিকট ইহাই স্বাভাবিক মনে হইবে যে, এই অবস্থার প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত দেশের সরকারের—বর্তমান ভারতে কংগ্রেস সরকারের।" —স্বাধীনতা।

বাঙলার ন্যায্য দাবী

"ব্যয়ের রকমফের সম্পর্কিত এক আপত্তির জন্য এই বাকি ফেলা আরম্ভ হয় ১১৫৮ সাল হইতে। গত সপ্তাহে উহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া বরাদ্দ আদায় ত্বরান্বিত করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ-সচিব শ্রী কে. কে. রায় দিল্লীর কর্তাদের এই দাবীর যৌক্তিকতা প্রমাণের যে চেষ্টা পান তাহার ফলেই এই প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। ইহার উপরে অর্থ কমিশনের সুপারিশ কতখানি অথবা কতটুকু কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিবেন তাহার উপর পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণসাধন পর্ব বহুলাংশে নির্ভরশীল। এই সঙ্গত দাবী পূরণ যদি না হয় তাহা হইলে অত্যন্ত দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত বুঝাপড়ার প্রয়োজন হইবে। তবে ভরসা এই যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায় দৃঢ়চেতা ব্যক্তি এবং ন্যায্যপ্রাপ্য কি করিয়া আদায় করিতে হয় সে বিষয়ে তাঁহার দক্ষতা অপরিসীম। প্রচণ্ড বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা ও অন্যান্য বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি, ফরাক্কা বাঁধ ও হলদিয়া বন্দর সম্পর্কে কেন্দ্রকে সচেতন করা প্রভৃতি প্রায় অসাধ্য ব্যাপার তিনি যেরূপ সাফল্যের সহিত সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন তাহাতে আর্থিক কমিশন বাঙলার প্রতি অবিচারের আংশিক পূরণের জন্য যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা হইতে বিন্দুমাত্র কম করিতে বাধা দিবার জন্য সংগ্রাম করিবেন এবং অন্তিমে জয়ী হইবেন, তাহাতে আমাদের কোনও সংশয় নাই।" —জনসেবক

বদনাম এড়াইবার প্রচেষ্টা

"পুসার ভারতীয় কৃষি গবেষণা মন্দির অনেক দিনের প্রতিষ্ঠান। উহাতে নানা ধরণের গবেষণা হয় এবং তৎসমুদয়ের ফলাফল অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশিত হয়। উহার সমাবর্তন উৎসবে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীএস. কে. পাতিল নিতান্ত আশাহতের মত অনেক কিছু বলিয়াছেন। অবশ্য বলিবার পরিস্থিতিতে না বলিলেও চলিত না। ভারতে কৃষি-বিষয়ক গবেষণার অধিকাংশ প্রচেষ্টা সরকারী ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা বেসরকারী গবেষণায় সুফল পাইলেও কদাচিৎ প্রয়োজনমাফিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বারবয়াঙ্কের মত মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিত এদেশে আছেন। কিন্তু, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী ও বে-সরকারী সহায়তার যে প্রাচুর্য বর্তমান, এখানে তাহা কল্পনাতীত। কৃষি তথা উদ্ভিদ বিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা যদি ভ্রান্তিমূলক পথে পরিচালিত হয় এবং যদি তাহা ব্যাপকভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট দেশের উৎপাদন প্রচেষ্টায় বিপুল ক্ষতি দেখা দেয়। লাইসেঙ্কোর গবেষণায় রুশ কৃষি ব্যবস্থা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতে গবেষণার ফল কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্ত হওয়ার প্রশ্ন নাই। নূতন কোনও পদ্ধতি চালু করিতে বা কোনও উপাদান প্রয়োগ করিতে যথেষ্ট টাকা লাগে। ভারতীয় কৃষকদের মূলধন নাই। সেইজন্য বিজ্ঞানগত কোনও অবদান কাজে লাগাইবার কথা তাহাদের মাথায় আসে না। সর্বশ্রেণীর অর্থকরী প্রচেষ্টায় পুঁজির প্রয়োজন সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু কৃষির বেলায় ভূমির ক্ষীয়মান উৎপাদিকা-শক্তি, জীর্ণ লাঙল, অস্থি-চর্মসার বলদ ও ক্ষীণদেহ কর্ষকের দৈহিক শক্তিই একমাত্র সম্বল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রাম্য কুসীদজীবী মূলধন সরবরাহ করে। সেইজন্য সুদের দায়ে অধমর্ণের সব কিছু বিকাইয়া যায়।" —লোকসেবক।

মন্দিরতলায় মেরামওলী

"ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ ব্যাপিয়া মন্দিরতলার পার্শ্ববর্তী শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে এক কাণ্ড চলিতেছে। জনৈক ব্যক্তির, বাড়ী নাকি জকপুরে, তিনি দৈব ঔষধ বিলি করিতেছেন। একই ঔষধে নাকি যাবতীয় ব্যাধি, তা যতই দুরারোগ্য হউক সারিয়া যাইতেছে। অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, কুব্জ—এর ভীড় পড়িয়া গিয়াছে। এই সুযোগে স্থানীয় কয়েক জন টিকিট বিলি, কিউ সিষ্টেম ইত্যাদির মাধ্যমে মাতব্বরী শুরু করিয়াছেন। রোগীদের নিকট হইতে সওয়া পাঁচ আনা লওয়া হইতেছে। জনতার ও সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্তের ভীড়ে গ্রামবাসীরা অস্থির। অথচ নগররক্ষকরা নির্বিকার। জানিনা তাঁরাও অতি-প্রাকৃত বিশ্বাসী কি না।" —খড়্গপুর সমাচার।

দেশের ছেলে কে?

"করিমপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনয়ন প্রার্থী ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল নদীয়ার করিমপুর থানার খোড়াদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—এই দাবীতে নদীয়ায় মনোনয়ন চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সারাজীবন বহরমপুরে বাস করেছেন ও মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেসের কাজ করেছেন বলে নদীয়া জেলা কংগ্রেস ডাঃ সান্যালের নাম সুপারিশ করেননি। অপর পক্ষে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীঅরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় করিমপুরে না জন্মালেও করিমপুর সহ নদীয়া জেলায় বাস করেছেন ৫০ বছর আর দেশ সেবা করছেন ৩৫ বছর। অর্থাৎ ডাঃ সান্যালের চেয়ে বেশি দিন এই জেলায় জনসেবক।"

—নদীয়া দর্পণ।

বিকল্প সরকার!

"আসন্ন নির্বাচনে যে ছয়টি বামপন্থী দল একত্র জোট বাঁধিয়াছেন তাঁহারা নির্বাচনী বক্তৃতায় এবার একটা নতুন কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা হইতেছে 'বিকল্প সরকার' গঠন করিবার প্রয়াস। কথাটা খুবই মুখরোচক তাহাতে সন্দেহ নাই। বিকল্প সরকার গঠন করিয়া তাঁহারা দেশের লোককে 'দুধে ভাতে' রাখিবেন এই কথাটাই বারে বারে একই সুরে বলিয়া চলিয়াছেন। বলিতে যখন বাধা নাই তখন এই প্রকার চটকদার কথা বলিতে দোষ কি? কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই ষট্‌বাম দল, যাহাদের নীতিগত আদর্শ এক নয়, মতবাদও ভিন্ন তাঁহারা কেমন করিয়া বিকল্প সরকার গঠন করিবেন? প্রথমতঃ এই ষট্‌বামের কোনো একটি দলও এমন সংখ্যক প্রার্থী দিতে পারেন নাই, যাঁহাদের সকলেই নির্বাচিত হইলেও বিকল্প সরকার গঠন করিতে সক্ষম হইবেন। এই দলের বড় ভাগীদার কম্যুনিষ্ট পার্টি ১০০ জন প্রার্থী দিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেই যদি নির্বাচিত হয়েন তাহা হইলেও মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সক্ষম হইবেন না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের আসন সংখ্যা হইতেছে ২৫২, কাজেই অর্দ্ধেকের বেশী আসন পাইতে হইবে। কেবল পশ্চিমবঙ্গের কথা নয়। সারা ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টি বিধান সভায় মাত্র ৫০০ জন প্রার্থী দিয়াছেন এবং লোকসভায় ২৫০ জন প্রার্থী দিয়াছেন। কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করিতে না পারিলে একটা প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া তাঁহারা কি কাজ করিতে পারিবেন? বর্তমান সংবিধান অনুসারে তাঁহাদের চলিতে হইবে। যে সংবিধান অনুসারে প্রতিটি প্রদেশ শাসনকার্য চালাইয়া যাইতেছে সেইভাবেই শাসনকার্য চালাইতে হইবে। কম্যুনিষ্ট পার্টি যে বিকল্প সরকার গঠনের কথা বলিতেছেন সেই ধাঁচে বিকল্প সরকার গঠন করিতে হইলে সর্বাগ্রে সংবিধান সংশোধন করিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতা দখল করিতে হইবে।"

—বর্দ্ধমান বাণী।

রূপনারায়ণের সেতু

"পশ্চিমবঙ্গ একটি সমস্যা সঙ্কুল প্রদেশ। অন্যান্য বহুবিধ সমস্যার কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল নদী সমস্যার কথা আলোচনায় আসা যাউক। বাংলা নদীমাতৃক দেশ। বৃটিশ আমলে রেলওয়ে বিভাগের কল্যাণে আষ্টে পিষ্টে দেওদি বাঁধা হইয়াছে। ফলে দিনের পর দিন নদীগুলিতে চড়া পড়িয়া নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া যাইতেছে। নদীগুলির নাব্যতা একেবারে নষ্ট হইয়াছে। তারপর বর্ষার সময়ের অতিরিক্ত জল ধারণ ও নির্গমনের উপায় না থাকায় নদীগুলির উভয় কূল ছাপাইয়া, ভাঙিয়া, বন্যায় দেশ ভাসাইয়া, বৎসরের পর বৎসর দেশে দুর্ভিক্ষ হাহাকার সৃষ্টি করিতেছে। একদিকে প্রবল বন্যায় দেশের প্লাবন, অপর দিকে নাব্যতা হ্রাস হইয়া পশ্চিমবঙ্গ শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আজ কলিকাতার মত বন্দরে জাহাজ চলাচল করিতে পারে না। তার জন্য হলদিয়াতে বন্দর খোলার জন্য তৎপরতা দেখা দিয়াছে। কিন্তু রূপনারায়ণের অবস্থা দিনে দিনে যাহা হইতেছে, কিছুদিন পরে হলদিয়ার বন্দরও অব্যবহার্য হইয়া পড়িবে। একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না রূপনারায়ণ নদের উপর বর্তমানে অবস্থিত রেলওয়ে ব্রিজ রূপনারায়ণ নদ মজিয়া যাওয়ার এবং সন্নিহিত হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর জেলায় সর্বনাশা বন্যার অন্যতম প্রধান কারণ। এই রেলওয়ে ব্রিজটি থামবিহীন হইলে এই দুরবস্থা হইতে পারিত না। আজ ঘাটালের মত একটি ব্যবসাপ্রধান স্থান অচল হইয়া গিয়াছে। আরামবাগ মহকুমার নৌকা চলাচল হয় না। ছোট বড় সমূহ বন্দর, গঞ্জ আজ অচল, কর্মহীন। নদীর চর উঁচু হইয়া যাওয়ায় বর্ষার সময় মাঠের জল নিকাশ হইতে না পারিয়া মাঠের ফসলগুলিকে নষ্ট করিয়া দেয়। মৎস্যজীবীদের অবস্থা সঙ্কটজনক। তাহারা বর্তমানে আসন্ন মৃত্যুর জন্য সদাশয় সরকারের দিকে চাহিয়া ধুঁকিতেছে।"

—জনমত (ঘাটাল)।

শোক-সংবাদ

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বরেণ্য সুধীবর অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ১১শে অগ্রাণ ৬৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। সাহিত্যসেবী, শিক্ষাব্রতী ও সঙ্গীত সমালোচক হিসেবে একটি শ্রেষ্ঠ সম্মানীয় আসন তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। 'সবুজপত্র' যুগের মনীষিবৃন্দের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে সবুজপত্রে দীর্ঘদিন এক সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেছিলেন। আলিগড় এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। জীবনের একটি বিরাট অংশ প্রবাসে অতিবাহিত হলেও দেশীয় সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীতের অনুশীলন ও কল্যাণ সাধনে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। প্রাবন্ধিক হিসেবেও তিনি বহু জনের শ্রদ্ধার অধিকারী। সাহিত্য, শিল্পসঙ্গীত সংক্রান্ত তাঁর সুচিন্তিত মতামত পণ্ডিতমহলে আলোড়ন জাগিয়েছে। ১৯৫৭ সালে মস্কো ইকনমিক কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে ইনি যোগ দেন। ইণ্ডিয়ান সোসিওলজি কনফারেন্সের ইনিই প্রথম সভাপতি। উত্তর প্রদেশের প্রেস অ্যাডভাইসার রূপেও ইনি কিছুদিন সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কিছুকাল হল্যাণ্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনি গেষ্ট প্রোফেসার ছিলেন। ১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকায় ইন্টারন্যাশনাল সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনে সহকারী সভাপতিরূপে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা ছিল। ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসাবেও তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারী হন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় মনীষার জগৎ এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে হারাল।

সরলাবালা সরকার

বর্ষীয়সী সাহিত্য সাধিকা শ্রদ্ধেয়া সরলাবালা সরকার মহোদয়া গত ১৫ই অগ্রাণ ৮৬ বছর বয়েসে গতায়ু হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু বিগত ও বর্তমান যুগের একটি যোগসূত্রকে ছিন্ন করে দিল। দাক্ষিণ্য, সহানুভূতিশীলতা এবং সুগভীর সাহিত্যপ্রীতির জন্যে সরলাবালা সরকার চিরদিন সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন। সে যুগের খনামধন্যা সাহিত্যসাধিকা রাসসুন্দরী দেবীর পৌত্রী সরলাবালার সাহিত্য সাধনায় হাতেখড়ি মাত্র বারো বছর বয়েসে। তারপর দীর্ঘ চুয়াত্তর বছর ধরে বাঙলা সাহিত্যের সেবায় তিনি নিজেকে নিয়োজিতা করেছিলেন। খ্যাতনামা আইনজ্ঞ কিশোরীলাল সরকার তাঁর পিতৃদেব এবং মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর মাতুল। রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকারের পুত্র স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র সরকারের উনি সহধর্মিণী। শুধু সাহিত্যের মধ্যেই তাঁর অনুরাগ সীমাবদ্ধ ছিল না। বিজ্ঞান ও সমাজনীতির প্রতি তাঁর সুগভীর আসক্তি পরিলক্ষিত হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনে নেপথ্য প্রেরণাদাত্রীরূপেও তিনি দেশজননীর শৃঙ্খল মোচনের কাজে সহায়তা করে গেছেন। ১১৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে গিরিশ অধ্যাপিকা নির্বাচিতা করে সম্মান দেন। কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ গ্রন্থ ও জীবনী গ্রন্থ তিনি রচনা করে গেছেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিদগ্ধ পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী, বিদ্যাবাচস্পতি, গত ২২শে কার্তিক লোকান্তরিত হয়েছেন। ভারতে এবং বহির্ভারতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্যে সুধীসমাজে ক্ষিতীশচন্দ্রের জন্যে একটি শ্রদ্ধার আসন নির্ধারিত ছিল। তাঁর প্রতিভা দেশীয় ও বিদেশীয় গুণী দরবারে যথেষ্ট শ্রদ্ধাও অর্জনে সমর্থ হয়েছে। দীর্ঘ ৩৫ বছর যাবৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাকরণ, বেদ ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। ভাষাবিদ্‌রূপেও ইনি যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা 'মঞ্জুষা'র ইনি সম্পাদক ছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী গত ২৪শে অগ্রাণ ৭০ বছর বয়েসে দেহান্তরিত হয়েছেন। কৃষ্ণনগর কলেজে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকের পদ থেকে কিছুকাল পূর্বে ইনি অবসর নেন। এক পরম পণ্ডিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পিতৃপুরুষের ন্যায় ইনি সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন ও আজীবন শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নমূলক কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন।

রাণী ঘোষ

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের নবনির্বাচিতা সদস্যা ডক্টর রাণী ঘোষ আকস্মিকভাবে গত ২রা অগ্রাণ ৬৩ বছর বয়সে লোকান্তর যাত্রা করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন এবং লণ্ডন থেকে টিচার্স ডিপ্লোমা পান। ১১৫৮ সালে শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি 'ডক্টরেট' পান। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে একজন সুযোগ্যা শিক্ষা-সাধিকার অভাব ঘটল।

বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়

ভারতীয় বাণিজ্য জগতের অন্যতম দিকপাল প্রসিদ্ধ শিল্পপতি স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় গত ৮ই অগ্রাণ ৭৮ বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করেছেন। চকদীঘির বিখ্যাত জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। ১১২১ সালে অ্যাডভোকেট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ঐ বছর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন! ১১৩০ সালে আবগারী ও জনস্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী পদ প্রাপ্ত হন। ১১৩৬ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং ভূমি রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী পদ প্রাপ্ত হন। এর পর ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১১৫২ সালে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর পরলোকগমনে ইনি কলকাতার শেরিফ নিযুক্ত হন। এ ছাড়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ভারতসভা, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অছি, পৌরসভার কাউন্সিলার, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশানের সহকারী সভাপতির দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া অসংখ্য বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। বিশেষভাবে জাহাজ ব্যবসায়ের সঙ্গে তাঁর ওতপ্রোত যোগাযোগ ছিল। তাঁর মৃত্যুতে দেশীয় বাণিজ্যজগতে এক বিশেষ আসন শূন্য হ'ল।

যতীন্দ্রনাথ সরকার

বিখ্যাত সাংবাদিক যতীন্দ্রনাথ সরকার গত ১৩ই অগ্রাণ ৬৪ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি সাংবাদিক জীবন শুরু করেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় সহ-সম্পাদকরূপে ইনি যোগ দেন পরে সহযোগী সম্পাদকের পদে উন্নীত হন। মৃত্যুকালে তিনি সেই আসনেই সমাসীন ছিলেন। ইনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন।

সুবোধচন্দ্র রায়

কলকাতার অন্যতম প্রবীণ ব্যারিষ্টার এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অগ্রজ সুবোধচন্দ্র রায়ের গত ১২ই অগ্রাণ ৮৬ বছর বয়সে প্রাণবিয়োগ ঘটেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজের ইনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বহুকাল ঐ কলেজের সঙ্গে অধ্যাপকরূপেও জড়িত ছিলেন। দেশের রাজনীতি ও বাণিজ্যজগতের সঙ্গেও তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। তাঁর মৃত্যুতে এক বিশিষ্ট ও বর্ষীয়ান নাগরিকের তিরোধান ঘটল।

তুলসী চক্রবর্তী

শক্তিমান অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তীর গত ২৫শে অগ্রাণ ৬৩ বছর বয়সে জীবনাবসান ঘটেছে। জীবনের সুদীর্ঘকাল তাঁর নাট্যকলার সেবায় অতিবাহিত। এই দীর্ঘ নট-জীবনে তিনি রসিক সমাজ থেকে লাভ করেছেন অকুণ্ঠ সমাদর ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা। রঙ্গমঞ্চে ও চলচ্চিত্র উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যরথী স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে ইনি শিক্ষালাভ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঙলা দেশ একজন প্রকৃত গুণী, রূপদক্ষ ও শক্তিমান নটকে হারাল। রঙ্গজগতে এ ক্ষতি অতুলনীয়।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেশিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
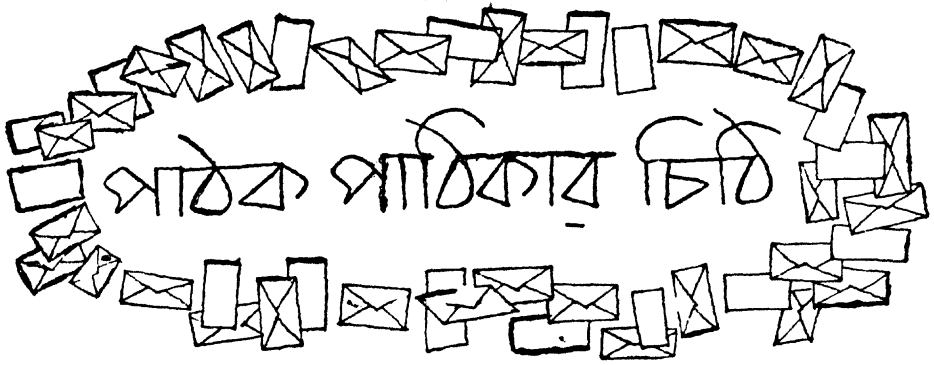
পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত মাসিক বসুমতী কার্ত্তিক—১৩৬৮ সংখ্যাটিতে 'প্রশান্ত চৌধুরী' মহাশয়ের লেখা রম্যরচনা "পায়ে পায়ে কাদা"র একাদশ অধ্যায়টি পড়িতে গিয়া প্রথম পৃষ্ঠাটিতেই (১০০পৃ:) সামান্য একটি ভুল দৃষ্টিগোচর হইল—আশা করি উনি যখন এই রচনাটি সম্পূর্ণ হইলে পুস্তকাকারে বাহির করিবেন—তখন সংশোধন করিয়া লইবেন। ঐ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের সপ্তম সারিতে আছে—"কাশ্মীরি জাফরান কাঠের একটি গহনার বাক্স"। আমার ধারণা—আর ধারণাই বা বলি কেন, ইহা প্রকৃত যে, জাফরাণ-এর কাঠ হয় না। কারণ জাফরাণ অনেকটা পেঁয়াজ বা রশুন জাতীয় উদ্ভিদ। পৃথিবীতে সম্ভবত: দুই স্থানে, যথা—'স্পেন দেশে' এবং কাশ্মীর রাজ্যের "পম্পুর" নামক স্থানে এই ক্ষুদ্র উদ্ভিদের চাষ হয়; যাহা হইতে জাফরাণ ফুলের কেশর সংগ্রহ করা হয় এবং বিখ্যাত মশলা বা রং রূপে ব্যবহৃত হয়। আমার মনে হয়, তিনি কাশ্মীরি "আখরোট কাঠের" গহনার বাক্স লিখিতে চাহিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমি আপনার মাসিক বসুমতীর বহু দিনের পাঠক এবং যদিও সামান্য ভুল মাত্র তবু অনেকে ভুল জিনিষ শিখিবেন ভয়ে ইহা জানাইলাম। আশা করি কিছু মনে করিবেন না। নমস্কারান্তে—ভবদীয় শ্রীঅসিতকুমার সান্যাল ৬৩।১, চড়কডাঙ্গা রোড। কলিকাতা—১০।

মহাশয়,

আপনার সম্পাদিত বহুল প্রচারিত পত্রিকা মাসিক বসুমতীতে ছন্দা রায় ও আরতি রায়ের লেখা পত্রটি পড়িলাম। আমার লেখা যে পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, শুধু তাই নয়, বাংলার বীর কেদার রায়ের বংশের দুইজন ভদ্রমহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে জানিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। বাংলার ইতিহাসের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা রূপকথায় চেয়েও মনোরম। সেই কাহিনীগুলি বাংলার শিশু ও কিশোরদের মধ্যে প্রচারের জন্য রূপকথার আকারে লিখিতেছি, তাহারই একটি (এক যে ছিল রাজা, কেদার রায়) গত শ্রাবণ মাসে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। (ঐ কাহিনীটিই বর্দ্ধিত আকারে দৈনিক বসুমতীর ডাকঘর বিভাগেও প্রকাশিত হয়েছিল।) পত্র লেখিকারা কিছু ভুল ত্রুটি দর্শাইয়াছেন। ভুল ঐতিহাসিক কাহিনী পরিবেশন করা অবশ্যই অন্যায়; এ সম্বন্ধে প্রতিবাদের অধিকার সকলেরই আছে। আমি পত্র লেখিকাদের পারিবারিক পুঁথিকে এতটুকু অশ্রদ্ধা না করিয়া আমার সপক্ষে ঐতিহাসিকদের রচনা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতে চাই—"মানসিংহ ক্রমাগত পশ্চাতে হটিয়া যাইতে লাগিলেন...এমন সময়, মোগল সৈন্যের উচ্চ জয়োল্লাস-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল।...উদ্গ্রীব মানসিংহ সংবাদ লইয়া জানিলেন, মোগলপক্ষের এক জ্বলন্ত গোলা কেদার রায়ের বক্ষস্থলে পতিত হওয়ায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন।...মোগল সৈন্যগণ রক্তাক্ত দেহ, সংজ্ঞাহীন কেদার রায়কে বহন করিয়া মানসিংহের সম্মুখে লইয়া গেল।...দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষুতারকা স্থির হইয়া গেল। (বঙ্গের বীর সন্তান। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এম, এ, পি, এইচ, ডি) বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও বিক্রমপুরের ইতিহাসের লেখক—শ্রদ্ধেয় যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"কেদার রায়ের গোলার আঘাতেই মৃত্যু হয়েছিল।" প্রতাপের মৃত্যু সম্বন্ধে লেখিকারা কিছু বলিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন—"এদিকে প্রতাপ কিছুদিন ঢাকার মোগল কারাগারে অবস্থান করিলেন, তারপর লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া আগ্রায় সম্রাট দরবারে পাঠান হইল। পথে কাশীধাম পৌঁছিলে বিশ্বেশ্বর তাঁহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিলেন। (বঙ্গের বীর সন্তান। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) অবশ্য বিপরীত মতও আছে। যেমন—"বারাণসীতে উপনীত হইলে তাঁহারা প্রভুর নির্দেশানুসারে তাঁহাকে (প্রতাপকে) উগ্র বিষ প্রদান করিলেন। সেই বিষ পান করিয়া প্রতাপ পুণ্যভূমি বারাণসীতে প্রাণত্যাগ করিলেন।"—(বাংলার সংস্কৃতি।—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ) আমার যতদূর মনে হয় বিষাঙ্গুরীয় চুষিয়াছিলেন রাজা সীতারাম রায়। আশা করি আমার কথা সঠিকভাবে বুঝাইতে পারিয়াছি। নমস্কার জানিবেন। পত্রটি প্রকাশিত হইলে বাধিত হইব।—ইতি শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। ৫।২৫, সেবকবৈদ্য ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৯

মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত মাসিকে প্রকাশিত পতিতাবৃত্তি নিবারণের উপায় সম্পর্কে লেখাটি পড়েছি। অন্য লেখাটির সমর্থনে প্রকাশিত চিঠিটিও পড়িলাম। কিন্তু কয়েক জায়গায় দ্বিমত হওয়ার জন্যেই এ চিঠি লিখছি। যদিও এ সম্পর্কে আলোচনা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা (কারণ উনিশ বৎসরের কোন 'ছেলে'র পক্ষে এ অনুচিত)—তবুও লিখছি। যদিও মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-গরিমা অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়েছে, তথাপি [illegible]

যাঁরা আধুনিক যুবক-যুবতীদের মেলামেশাকে ভালভাবে নিতে পারেননি। তার প্রমাণ আপনার পত্রিকার প্রকাশিত লেখাটিতে যুবক-যুবতীদের বিরুদ্ধে খুব একহাত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যুবক-যুবতীদের তথাকথিত 'অবৈধ মেলামেশা' পতিতা সৃষ্টির জন্যে কতখানি দায়ী তার বিচার আপনিই করুন। তা ছাড়া যুবক-যুবতীদের মেলামেশার পেছনে Sex কতটা কাজ করছে তা ভাববার বিষয়। পুরুষ ও নারীর মেলামেশার (সে বৈধ হ'ক আর অবৈধই হ'ক), পিছনে Sexual hunger আজকের নয়। সৃষ্টির আদিকাল থেকে। কিন্তু যেহেতু সমাজ যুবক-যুবতীদের বন্ধুত্বটাকে ভালোর চোখে দেখতে পাচ্ছে না, সেইজন্যে তথাকথিত সমাজ এই ব্যাপারটাকে অবৈধ বলছেন এবং আবিষ্কার করছেন এর পেছনে sex-এর প্রাধান্য এবং তারই জন্যে সমাজ উচ্ছন্নে যাচ্ছে। হৃদয়বাবুকে জিজ্ঞেস করি, যখন যুবক-যুবতীরা বৈধভাবে মিশতেন, তখন কি পতিতা কম ছিল? সত্যি কথা, বর্ত্তমানে জীবনযাত্রা ক্রমশঃ জটিল হচ্ছে। মেয়ে-পুরুষ সময়মত বিয়ে করতে পাচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে যে পতিতাবৃত্তি বেড়ে গেছে—এ-কথা মানতে রাজি নই। আর পতিতা সৃষ্টি যুবক সমাজ করেনি। যারা করেছে অর্থাৎ সমাজের কুতন্ত্র কীট কারা—এ-কথা আশা করি হৃদয়বাবু জানেন। অযথা যুবক-যুবতীদের দোষ দেওয়া অন্যায়। (শ্রীমতী জ্যোৎস্না চক্রবর্ত্তীর চিঠি লক্ষণীয়)। শ্রীমতী চক্রবর্ত্তীর মন্তব্যগুলো হাস্যকর এবং বাস্তবতাবিরোধী। তাছাড়া তিনি কি চান এখনও মেয়েরা বা ছেলেরা ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাক্? (তবে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে আমি তাদের অবৈধ ও গর্হিত কাজগুলোর প্রশংসা করছি বা সপক্ষে বলছি)। আর তিনি যে আশংকা করেছেন অর্থাৎ হিন্দু মেয়েদের মুসলমান বিবাহের দরুণ ভারতবর্ষ পাকিস্তান হয়ে যাবে, তার সম্ভাবনা (অন্ততঃ তিনশ' বছরে অবশ্য যদি মেগাটন বোমায় না মরি) কম। আর যাই হ'ক, হিন্দু ঘরের মেয়েরা এখনও এতটা 'সবলা' হয়নি। শ্রীমতী চক্রবর্ত্তীর মত তারাও সংস্কারের দাসী।

কিন্তু হৃদয়বাবু ও শ্রীমতী চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আমি একমত যে, আমাদের শিক্ষায় ধর্মের স্থান দেওয়া হ'ক। অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ পড়ানো হ'ক। তবে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, ধর্মগ্রন্থগুলো যেন মিথ্যা কুসংস্কার-যুক্ত হয়। কারণ বিজ্ঞান মানুষের মনের জিজ্ঞাসার দ্বার খুলে দিয়েছে। ইতি—'চিকিৎসা বিদ্যার্থী'।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীমতী রেণুকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অবধারক: ডক্টর এস, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় এ, এম, ও, হারমাটি টি এষ্টেট, ডাক—লালুক, আসাম ● ● ● ডাঃ এইচ, পি, ভট্টাচার্য, মেডিক্যাল অফিসার, কাণ্টিলো ডিসপেন্সারী, ডাক—কাণ্টিলো, জেলা—পুরী, উড়িষ্যা ● ● ● শ্রী এস, সি, দাস, কেলিডেন টি এষ্টেট, ডাক—শালানা, নওগাঁও, আসাম ● ● ● মেট্রন, সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে হসপিটাল, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৪৩ ● ● ● শ্রীমতী মীরা দাস, টি-৬০ ব্লিটো ক্যাম্প ট্রেঞ্চ, বোম্বাই-৭৩ ● ● ● শ্রীহরিদাস বণিক, ডাক—পাথরকান্দী, জেলা-কাছাড় ● ● ● শ্রীমতী পার্বতী দাশগুপ্ত, ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইনস, মোবারক মাণ্ডী জম্মু (Tawr), কাশ্মীর ● ● ● শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স অফিস, ডাক—তেজু, নেফা ● ● ● প্রধান শিক্ষক, তুকজোড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল, ডাক—তুকজোড়া, মেদিনীপুর ● ● ● প্রধান শিক্ষক আর, বি,এস, ডি হাই স্কুল, ডাক—দুবরাজপুর, জেলা—বীরভূম ● ● ● মিস এস, ই, টুডু, গ্রাম ও ডাক—হরপাটা, জেলা—গোয়ালপাড়া, আসাম ● ● ● শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার, ডাক—আতাইকোলা, জেলা—পাবনা, পূর্ব পাকিস্তান ● ● ● শ্রীশান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান কাষ্টম লিয়াসন অফিসার, টামাবিল (শ্রীহট্ট), পূর্ব পাকিস্তান, ডাক—ডাউকি, জেলা—কে য্যাণ্ড জে হিলস, আসাম ● ● ● ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার, কাঞ্চনপুর লজাই ট্রাইবাল ডেভেলাপমেণ্ট ব্লক, ডাক—কাঞ্চনপুর, ত্রিপুরা, ● ● ● শ্রীঅহিভূষণ মণ্ডল, ডাক—নবগ্রাম, জেলা—মুর্শিদাবাদ ● ● ● শ্রীমতী এস, কে, চট্টোপাধ্যায়, এ/৩১ নেতাজী নগর, নয়াদিল্লী।

আগামী ছয় মাসের চাঁদা পাঠাইলাম—শ্রীমতী এস, আর বন্দ্যোপাধ্যায়, নিউ দিল্লী।

১৩৬৮ সালের বাকী ছয় মাসের (অর্থাৎ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র অবধি) চাঁদা ৭'৫০ নঃ পঃ পাঠাইলাম।—Miss Minakshi Choudhury, Dhanbad.

Herewith Rs. 7·50 for the second half-year's subscription for Monthly Basumati—Bina Roy, Calcutta.

বর্ত্তমান সনের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসের মাসিক বসুমতীর জন্য ৭'৫০ নঃ পঃ পাঠাইলাম।—শ্রীমাধবীলতা দেবী, জলপাইগুড়ি।

ছয় মাসের টাকা পাঠালাম। পত্রপাঠ বই পাঠিয়ে দেবেন—বেলা দে, আরা।

কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত অর্দ্ধ-বার্ষিকের টাকা পাঠালাম—টুকু চক্রবর্ত্তী, পূর্ণিয়া।

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা ১৫্ টাকা (শ্রাবণ ১৩৬৮ হইতে আষাঢ় ১৩৬৯) পাঠাইলাম—লাবণ্যপ্রভা দে, দিল্লী।

Herewith Rs. 15/- being subscription for a copy of Monthly Basumati—Mrs. Nila Deb.—Shillong, Assam.

ছয় মাসের চাঁদা ৭'৫০ নঃ পঃ পাঠাইলাম। শ্রাবণ হইতে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Mrs. Bharati Mukherjee,—Poona.

Subscription for Monthly Basumati from Kartic '68 B.S. to Chaitra '68 B.S.—Mrs. Bina Nag, Bilaspur.

Sending herewith half-yearly Subscription of Masik Basumati for কার্ত্তিক to চৈত্র 1368 B. S.—Bibhuti Banerjee, Midnapore.

বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম। যথারীতি মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—শ্রীগীতা ভৌমিক, জলপাইগুড়ি।

Sending herewith Rs. 7·50 as the subscription for 6 months from Kartic to Chaitra 1368 B.S. for Monthly Basumati.—Sri Nirupama Dutt—Cachar (Assam).

মাসিক বসুমতী
। পৌষ, ১৩৬৮ ।।

(জলরঙ)

যন্ত্র ও শিল্প

—বাসব ঠাকুর অঙ্কিত

স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
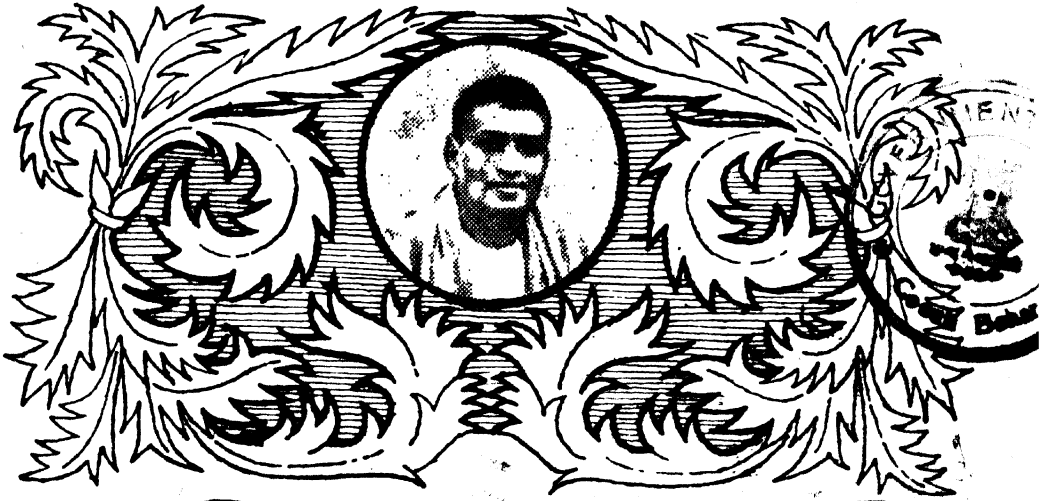
মাসিক বসুমতী

৪০শ বর্ষ—পৌষ, ১৩৬৮] । স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ । [২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

কথামৃত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

এক সাধু লোটা কম্বল লইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে দুষ্ট লোকে মারিয়া সমস্ত কাড়িয়া লইয়া অজ্ঞান অবস্থায় ফেলিয়া যায়। পরদিন কোন দয়াল পথিক এ অবস্থা দেখিয়া স্বগৃহে আনিয়া সেবা করিতে করিতে তাঁহার সংজ্ঞা আসিলে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে আপনার এ দুর্দ্দশা করিল? সাধু ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিকরত: কহিলেন—"যো আজ দুধ পিয়াতা ওহি কাল মারা থা।"

তুমি সাপ হয়ে কামড়াও রোঝা হয়ে ঝাড়।
হাকিম হয়ে হুকুম দাও, পেয়াদা হয়ে মার।

• • • •

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুধু ভক্তি দিতে কাতর হই।
আমার ভক্তি যেবা পায় তারে কেবা পায়,
সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিলোক "জই"। (জয়ী)

• • • •

যে ব্যক্তির আত্মাভিমান, আত্মগরিমা প্রকাশ না পায়, সর্ব্বদাই দাক্ষিণ্যাদির কার্য্য হয়, রিপুগণ প্রবল হইতে না পারে, আহার বিহারে আড়ম্বর কিম্বা হতাদর না থাকে, স্বভাবতঃই ঈশ্বরের প্রতি রতিমতি থাকিতে দেখা যায়, তাহাকে সত্ত্বগুণী বলিয়া পরিগণিত করা হয়। মন আমার—সহজে যা হয় তাই কররে। সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয়।—গীতা।

• • • •

"নামে রুচি জীবে দয়া সাধুর সেবন,
ইহা বিনা ধর্ম্ম নাই, শুন সনাতন।"

• • • •

আপনার ছেলে আপনার ঘর, ইহা মায়া। সকলের প্রতি সমান ভাব, ইহা দয়া।

• • • •

পরনিন্দায় জীবে দুঃখ পায়, নিজের ক্ষতি; যার নিন্দা তার লাভ। বন্ধু কেহ নয় কার বন্ধু আপনিই আপনার।

• • • •

সকলই নারায়ণ, কিন্তু বাঘ-নারায়ণ ও অসৎ লোক হইতে সাবধান থাকিবে। মাহুত-নারায়ণের কথা শুনিতে হয়। গুরু-বাক্য ধ্রুব সত্য।

যে ব্যক্তি যে ভাবে, যে নামে, যেরূপে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর জ্ঞানে সাধন করিবে, তাহার ঈশ্বরলাভ হইবেই হইবে। ইহাই অদ্বৈত

জ্ঞান। ঘণ্টাকর্ণ হইও না। ভাবের ঘরে চুরি করিও না, "চাল ছাড়িও না।" তত্ত্বপ্রকাশিকা দেখ। সরল হইলে ঈশ্বর লাভ হয়।

"তুমি গোপনে গোকুলে এসে শ্যাম সেজেছ।"

• • • •

মুক্তিদাতা একজন। সংসারক্ষেত্রে যাহার যখন বিরাগ জন্মে, অন্তর্য্যামী ভগবান তাহা জানিতে পারেন এবং তিনি সাধকের ইচ্ছাবিশেষে ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঘা শুকাইলে মামৃড়ি আপনিই খসিয়া পড়ে।

• • • •

শিয়ালদহে গ্যাসের ঘর। কত জায়গায় কত রকম আলো জ্বলিতেছে। গ্যাস কোথা হইতে আসিতেছে, কেহ দেখিতে পাইতেছে না। যে কেহ আলো পরিত্যাগ করিয়া কারণ অনুসন্ধান করিবে, সে সেই শিয়ালদহের গ্যাস-ঘরকেই অদ্বিতীয় জানিবে। ঈশ্বর এক; তাঁহার অনন্ত শক্তি। একমেবাদ্বিতীয়ম্।

• • • •

ঠাকুর—আরসোলাকে কাঁচপোকা করে ছাড়বেন। বকল্মা অর্থাৎ ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা সহজ সাধন আর নাই।

• • •

মরবো আমি উড়বে ছাই—তবে আমার গুণ গাই।
মেয়ে হিজ্‌ড়ে পুরুষ খোজা—তবে হবে কর্ত্তাভজা।
সাপের মাথায় ভেকেরে নাচাব—সাপ না গিলিবে তায়।

• • •

শ্রীশ্রীমতী রাধারাণী বলিয়াছেন, ব্রজে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ছাড়া আর পুরুষ কেহ নাই। তিনিই একমাত্র পুরুষ আর সবই প্রকৃতি। গীতা ১১-৩৮।

• • • •

আত্মার লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ নাই—নাম রূপের বাহিরে। সেখানে কাম নাই—প্রেম।

• • • •

দেহটা কি আমি? দেহটা ত খোল—প্রভুর মন্দির। দেহের জন্ম অনিত্যের জন্ম মাকে জানাব?—যে মন তাঁহার চরণকমলে অর্পিত হইয়াছে!

দেহ জানে, দুঃখ জানে—মন তুমি আনন্দে থাক।

মজ্‌লো আমার মনভ্রমরা কালীপদ (শ্রীগুরুপদ) নীলকমলে

• • • •

নীচ যদি উচ্চে ভাবে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে। লোক—পোক্।

ক্ষমার সমান ধর্ম্ম নাই।

• • • •

তুমি যাবে বঙ্গে তোমার কপাল যাবে সঙ্গে। তাঁকে ছাড়িয়া কোথায় পলাবে ভাই? কিকির করে বাঁচবে!

কুস্থানে রত্ন পড়িয়া থাকিলে রত্নের কোন দোষ হয় না। গুরু যাহা করেন, শিষ্যের তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই, তিনি যাহা বলেন তাহাই পালন করা কর্ত্তব্য।

• • • •

প্রেমাভক্তি জননীস্বরূপিণী। যেমন যশোদা বা গোপীভাব; "আমার গোপাল আমার কৃষ্ণ" করিয়া পাগল। এ অহংতো, বন্ধতা ভক্তেরও থাকে। ইহাতে বন্ধন নাই যেমন পোড়া দড়ি। ইহা কর্ত্তৃত্বাভিমান নহে।

• • • •

পাহারাওয়ালার কাছে চোরা-লণ্ঠন থাকে। সে যাহাকে ইচ্ছা দেখিতে পায়। তেমনি ভগবান সকলকে দেখিতেছেন কিন্তু তাঁহার আলো তাঁহার দিকে না ঘুরাইলে, তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না।—সেবক রামচন্দ্র।

• • • •

শ্রীগুরুকৃপায় ভিতরে গেরুয়া হইলে তিনিই স্বেচ্ছায় বাহিরেও গৈরিক দেন—চাহিতে হয় না। আগে ভিতরের চাহ। গৈরিক—"ত্যাগের" বিকাশমাত্র।

• • • •

গুরু এক, কেহ ত ভগবানের নাম ব্যতীত দিবেন না। ভগবান লইয়া কাজ। যদি শান্তি না পাও ঠাকুরের শরণ লও।

• • • •

সখি—যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি। I live to learn.

• • • •

যে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে না চায়, তাহার হবিষ্যান্ন গোমাংস শূকর মাংসবৎ হইয়া যায়, আর যে শূকর গরু ভক্ষণ করিয়া হরি-পাদপদ্ম লাভের জন্য ব্যাকুলিত হইয়া থাকে, তাহার সেই আহার হবিষ্যান্ন ভক্ষণের কার্য্য করে। চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ। মুচী হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরো শুচিঃ।

• • • •

চালাক্ কে?—যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।

যে আহার দ্বারা মন চঞ্চল ও শরীর অসুস্থ না হয়, সেই আহারই বিধি। সাত্ত্বিক আহার। যার যা পেটে সয়। গীতা ১৭-৮।

অমৃতকুণ্ডে যে কোন প্রকারেই হউক, পড়িতে পারিলেই অমর হওয়া যায়—কেউ ঠেলেই দিক্ কিম্বা নিজেই ঝাঁপাইয়া পড়ুক। দুঃখ ও সুখ দু'শালাই সমান; সুখ দুঃখের মুকুট মাথায় লইয়া আসে।

• • • •

সংসার আমার নহে জানিবে। এই সংসার ঈশ্বরের, আমি তাঁহার দাস, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে আসিয়াছি। কাঁঠাল ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে যেমন হস্তে তৈল মাখাইলে উহাতে আর কাঁঠালের আঠা লাগিতে পারে না, তেমনি এই সংসাররূপ কাঁঠাল, জ্ঞানরূপ তৈল লাভ করিয়া সম্ভোগ করিলে আর কামিনী-কাঞ্চন আঠা উহার মনে সংলগ্ন হইতে পারিবে না। শরণাগতিই একমাত্র গতি।

• • • •

A man who thinks woman as his wife, can never perfect be.—Swami Vivekananda.

যাহারা কুমার সন্ন্যাসী, তাহারা নিদাঘী থৈএর তায়। অনাঘ্রাত কুসুম। কৌমার বৈরাগ্য ধন্য। জননী রমণী—রমণী জননী।

মেরু সর্ষপয়োর্যদ্বৎ সূর্য্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্বৎ—তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ।

সন্ন্যাসী ও গৃহীর মধ্যে এত প্রভেদ। ভগবানের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ। ত্যাগ—মনে। ভগবান "মন" দেখেন—বেশভূষা নহে। [ক্রমশঃ।

—স্বামী যোগবিনোদ মহারাজের 'ঠাকুরের কথা' হইতে।

শ্রীচৈতন্যের বিয়োগ

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৩১শে আষাঢ় ১৪৫৫ শকে, (ইংরাজী ১ই জুলাই ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) তাঁর ৪৮ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। ঠাকুর লোচন দাস তাঁর "চৈতন্য মঙ্গলে" লিখেছেন—

"আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিঃশ্বাসে।"

কিন্তু ঠাকুর লোচন দাসের উক্ত উক্তিরও মত-বিরোধ আছে। প্রধান প্রধান ভক্ত ও বৈষ্ণব কবিগণ যথা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি তাঁদের "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত", "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত" প্রভৃতি গ্রন্থে মহাপ্রভুর মৃত্যু সম্বন্ধে কোন স্পষ্টোক্তি করেন নি। তার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁদের ন্যায় গৌর-প্রেমিক মহাপ্রভুর মৃত্যু-কথা সরাসরি লিখতেও বেদনা অনুভব ক'রেছেন। তাঁরা এই মাত্র বলেই থেমে গেছেন যে, মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহে অথবা টোটা গোপীনাথের মূর্ত্তিমধ্যে লীন হ'য়ে গেছেন। কিন্তু এই জড়-জগতে পাঞ্চভৌতিক দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সেই দেহ সহ কোন বিগ্রহ মধ্যে লীন হ'য়ে যাওয়া নির্ভরযোগ্য ঘটনা কি না, তারই কিছুটা সমালোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমরা জানি যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও দৈহিক মৃত্যু ঘটেছিল। বিষ্ণুপুরাণে আছে যে, যদুবংশ ধ্বংস হবার পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে যোগবলে দেহত্যাগ করেন। আবার মহাভারতের মৌষল পর্ব্বে দেখা যায় যে, নারদ, দুর্ব্বাসা ও কণ্বের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ ধ্বংসের পর মহাযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগের উদ্দেশ্যে ভূতলে শয়ন ক'রলে জরা নামক এক ব্যাধ মৃগভ্রমে তাঁর পদতল বিদ্ধ করে। ঐ শরবিদ্ধ হ'য়েই শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয় এবং প্রায় ঐ একই সময়েই শ্রীবলদেবও যোগবলে প্রাণত্যাগ করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব দারুককে হস্তিনা নগরে পাঠিয়ে দেন অর্জ্জুনকে যথা-সম্ভব দ্বারকায় নিয়ে আসবার জন্য। অর্জ্জুন এই নিদারুণ সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই দ্বারকায় চলে আসেন এবং শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতির পারলৌকিক ক্রিয়াদি নিষ্পন্ন করে যান। এগুলির সমস্তই অতি সম্ভবপর, নির্ভরযোগ্য ও সহজ-বোধ্য ঘটনা। কিন্তু মহাপ্রভুর নশ্বর দেহ অকস্মাৎ বিগ্রহ মধ্যে লীন হ'য়ে গেল—অথবা সেই মহা পুণ্যময় দেহের আর কোন অস্তিত্বই রইল না—কিরূপে ইহা সম্ভবে।

প্রভু-পাদ শ্রীহরিদাস গোস্বামী যথার্থই বলেছেন, "মহাপ্রভুর সঙ্গোপন-লীলা দুঃখময়পূর্ণ হইলেও এক্ষণে শিক্ষিত সমাজের তাহার বিশদ বিবরণ জানিতে প্রবল বাসনা দেখিতে পাওয়া যায়।... মহাপ্রভুর সঙ্গোপন লীলারঙ্গ সূক্ষ্মাণু-সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলেই বা ক্ষতি কি?"

প্রধানতঃ ঠাকুর লোচন দাস ও শ্রীজয়ানন্দ তাঁদের "চৈতন্য মঙ্গলে", শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁর "ভক্তি-রত্নাকর" গ্রন্থে, মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ তাঁর "অমিয় নিমাই চরিতে" এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীসুশীল কুমার দে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বৈষ্ণব গ্রন্থে মহাপ্রভুর মৃত্যু সম্বন্ধে খোলাখুলি ভাবে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ ক'রেছেন।

মহাপ্রভুর জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অত্যন্ত প্রেমোন্মাদ অবস্থায় কেটেছিল। মূর্চ্ছা, উদ্দণ্ড নৃত্য, আবেশ, বেপথুমানতা ও উন্মাদনা—এই পঞ্চ লক্ষণ সর্ব্বদাই তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখত। এই সময়ে তিনি কখনও বা গম্ভীরার দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ভ্রমে নিজ মুখ-মণ্ডল ঘর্ষণ করে রক্তাক্ত-কলেবর হ'তেন; কখনও বা চটক পর্ব্বত দর্শনে গিরি গোবর্দ্ধন ভ্রমে আনন্দ-নৃত্য করতেন; কখনও বা যমুনা ভ্রমে সমুদ্র মধ্যে নিমজ্জিত হ'তেন; কখনও বা জগন্নাথ-মন্দিরের তিলঙ্গা গাভীগণের সঙ্গে রাখালভাবে আত্ম-গোপন ক'রে থাকতেন; আবার কখনও বা শ্রীরাধা ভাবে বিভোর হ'য়ে অর্দ্ধস্ফুটভাবে প্রেমতত্ত্ব কীর্ত্তন করতেন। সে সময়ে তাঁর দেহ-বোধ ও বাহ্যজ্ঞান একেবারেই থাকত না বললেই হয়। তখন তাঁর এই অবস্থার মধ্যে স্বরূপ-দামোদর, রায় রামানন্দ ও ভৃত্য গোবিন্দ দিবা রাত্রি তাঁর দেহ-রক্ষীরূপে কাজ করতেন। তাঁকে তখন জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকৃত প্রেম-গীতি-কাব্য শুনালে তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হ'তেন।

এই সময়ে একদিন, সম্ভবতঃ ইহাই তাঁর জীবনের শেষ দিন, (৩১ আষাঢ়, ১৪৫৫ শক) তিনি অকস্মাৎ শ্রীকাশী মিশ্রের গৃহে পরিকরগণ সহ আত্ম-ভোলা হ'য়ে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করতে করতে একেবারে নীরব হ'য়ে গেলেন। তাঁর বদনমণ্ডল বিষণ্ণতার কালিমায় নিষ্প্রভ হ'য়ে উঠল, পিচকারীর বেগে নয়নাশ্রু বইতে লাগল। তিনি বহুক্ষণ যাবৎ ঊর্দ্ধনেত্রে অবস্থান ক'রে গাত্রোত্থান করলেন ও উন্মাদের ন্যায় পথে বাহির হ'লেন; সম্ভবতঃ জগন্নাথ দর্শনে চললেন।

"হেন কালে মহাপ্রভু কাশী মিশ্র ঘরে।
বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে।"—চৈতন্য মঙ্গল।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে—সেদিন মহাপ্রভু মন্দিরের গরুড়স্তম্ভ

থেকে মন্দিরস্থ শ্রীজগন্নাথ দেবকে যেন ঠিক দেখতে পাচ্ছিলেন না, একারণ তিনি ভাবাবেগে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং দৈবক্রমে তখনই মন্দিরের দ্বার আপনা থেকেই বন্ধ হ'য়ে গেল। তিনি দুই বাহু উর্দ্ধে তুলে জগন্নাথ দেবকে গাঢ় আলিঙ্গন করে ব'ললেন—"হে পতিতপাবন, এই কলিহত জীবকে তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় দাও, আর পারি না।" এই আকুতি ও আত্মনিবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দারুব্রহ্ম জগন্নাথ বিগ্রহে লীন হ'য়ে গেলেন।

"এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গনে তুলিল হৃদয়।
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইল আপনে।"—চৈতন্য চরিতামৃত।

উক্ত উক্তি সমর্থন করে আবার লোচনদাস ঠাকুর বলেছেন যে, মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ দেবকে আলিঙ্গন করে তাঁর দারু বিগ্রহমধ্যে লীন হ'লেন, তখন গুণ্ডিচাবাড়ী থেকে এক পাণ্ডাঠাকুর উহা লক্ষ্য করেন। তিনি ইহা কোন ভৌতিক ব্যাপার মনে করে সেখান থেকেই সন্ত্রাসে চীৎকার করতে থাকেন। তাঁর চীৎকারে বাহিরে অপেক্ষমান ভক্তবৃন্দ দ্বার ঠেলে ভেতরে ঢু'ক সাশ্চার্য্যে দেখেন মহাপ্রভু নাই। পাণ্ডাঠাকুরও তখন সাশ্রুনয়নে ব'ললেন—

"ভক্ত ইচ্ছা দেখি কহে পাড়িছা তখন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভু হৈলা অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিনু গৌর, প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥"—চৈতন্য মঙ্গল।

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী আবার তাঁর "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে অনুরূপ লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে, মহাপ্রভু বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় স্নানের জন্য সমুদ্রতীরে গমন করেন। সেখান থেকে ফিরে সোজা শ্রীটোটা গোপীনাথের মন্দিরের দিকে চ'লে যান। শ্রীগদাধর পণ্ডিত তখন গোপীনাথজীর পূজাকার্য্যে নিরত ছিলেন। মহাপ্রভু গদাধরকে ডেকে তাঁর কাণে কাণে কি বললেন ও তৎপরে ছুটে গিয়ে দুই বাহু বেষ্টন করে গোপীনাথজীকে আলিঙ্গন করলেন। আলিঙ্গন করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেই বিগ্রহের মধ্যে অদর্শন হ'য়ে গেলেন। তখন গদাধর পণ্ডিত মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন—তাঁর মূর্চ্ছা আর ভাঙে না। এই সব দৃশ্য শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁদের তৎকালীন কথোপকথনের অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

"ওহে নরোত্তম এইখানে গৌর হরি।
কি জানি কি গদাধরে কহে ধীরি ধীরি॥
ন্যাসী চূড়ামণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার।
অকস্মাৎ পৃথিবী হইল অন্ধকার॥
প্রবেশিয়া এই গোপীনাথ মন্দিরে।
হলো অদর্শন পুনঃ না এলো বাহিরে॥"—ভক্তিরত্নাকর।

মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ অথবা শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহে লীন হওয়ার উক্ত উভয়বিধ মতবাদ ছাড়াও অনেক বৈষ্ণব বলেছেন যে, তিনি সমুদ্রগর্ভে আত্মাহুতি দিয়েছেন। কেন না ইদানীং তিনি প্রেমাবেশে একাধিকবার যমুনাভ্রমে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান ক'রছিলেন ও একবার সারারাত্রি যোগ মূর্চ্ছায় সমুদ্র মধ্যে ডুবে ছিলেন। পরদিন প্রভাতে জেলেদের মাছধরা জালের ভেতরে তাঁর দেহ উঠে এসেছিল। একারণ—এই ধারণা পোষণ করা অসঙ্গত নহে যে, তিনি হয়ত অবশেষে সমুদ্রগর্ভেই বিলীন হ'য়েছিলেন।

কিন্তু শ্রীজয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভুর মৃত্যু সম্বন্ধে একটি নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত ক'রেছেন। তিনি বলেছেন যে ১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসে নীলাচলে যে রথযাত্রা হ'য়েছিল, মহাপ্রভু সেই রথের পুরোভাগে উদ্দণ্ড নৃত্য করেছিলেন এবং গত কয়েক বৎসর যাবৎ সেইরূপ করে আসছিলেন। কিন্তু সেবার নৃত্যকালে তাঁর পদতলে পথের কাঁকর বিদ্ধ হ'য়ে একটি গভীর ক্ষত হয় এবং ঐ ক্ষত থেকে অতিরিক্ত রক্তপাত হ'তে থাকে। কিন্তু তখন সেদিকে মহাপ্রভুর ভ্রূক্ষেপও ছিল না। কেন না, ঐ সময়ে প্রতি বৎসর নবদ্বীপ ও শান্তিপুর থেকে প্রায় তিন শতাধিক ভক্তবৃন্দ আসতেন; সেই সমস্ত স্বজন ও অন্তরঙ্গগণ সহ তিনি আত্মহারা হয়ে' রথাগ্রে উদ্দণ্ড নৃত্য করতেন। রথযাত্রা উপলক্ষে মহাপ্রভু প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ এক শোভাযাত্রা বাহির করতেন। নগর-কীর্ত্তনের ঐ শোভাযাত্রাটি সাতটি ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক বিভাগের পুরোভাগে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, ঠাকুর হরিদাস, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিত, রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীগদাধরকে দিতেন। এই সাতটি বৈষ্ণব-চূড়ামণির নেতৃত্বাধীনে সাত সম্প্রদায়ের অপূর্ব কীর্ত্তন-তরঙ্গ সারা নীলাচল প্রকম্পিত করে তুলত। এই কীর্ত্তন যজ্ঞ কালে মহাপ্রভুর পদতলে কি ক্ষত হল না হল, তাহা তাঁর নিজের অথবা অপর কাহারও লক্ষ্য করা সম্ভবপরও ছিল না। রথযাত্রার কীর্ত্তন ও উৎসব সমাপ্তির পর ভক্তবৃন্দ তাঁর পদতলে ঐ ক্ষত দেখতে পান। ইতিমধ্যেই ঐ ক্ষত 'সবাক্ত হ'য়ে যায় ও সেই সূত্রে তাঁর ভীষণ জ্বরও হয়। ঐ ক্ষতজ্বরেই তাঁর দেহাবসান ঘটে। এটি অতি সাধারণ এবং নর-দেহধারী অবতারেরও লৌকিক মৃত্যুর একটি নির্ভরযোগ্য ঘটনা।

জয়ানন্দের জন্মকাল খৃঃ ১৫১১-১৩ এবং তাঁর "চৈতন্য মঙ্গলের" রচনা কাল ১৬শ শতকের সপ্তম দশক। তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং তিনি মহাপ্রভুর মৃত্যুকালেও যে নীলাচলে ছিলেন, এ প্রমাণও পাওয়া যায়। একারণ জয়ানন্দের উক্তি নির্ভরযোগ্য ঘটনা বলে ধরা যায়। জয়ানন্দের উক্ত উক্তি সমর্থন করে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রী সুশীল কুমার দে এম, এ, ডি, লিট মহাশয় তাঁর "Vaisnava Faith and Movement" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"Sree Caitanya's emotions grew in intensity and became characterised by excess of stupor, trances and frenzied energy verging upon hysteria and dementia...His prolonged emotional experiences of religious rapture must have made extra-ordinary demands on his highly wrought nervous system. Under the increasing strain of madness of divine love (Premonmada) his physical frame broke down and he passed away in Asadha, Saka 1455, June-July 1533 A. D. The piety of his followers has drawn a veil of mystery over the manner of his end. But

various legends exist of his disappearance in the temple and in the image of Jagannatha, as well as of his accidental drowning in the sea and even of assassination in the Gundica Temple. One of the less authoritative biographies records perhaps the actual fact of a less sensational but rather common human death by attributing the end to a wound in the left foot which he received from a stone during one of his usual outbursts of frenzied dancing and which brought on septic fever resulting in an untimely death."

রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনও উক্ত উক্তি সমর্থন করে তাঁর "শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার যুগ" (Chaitanya and His age) নামক গ্রন্থে মহাপ্রভুর শেষ জীবনের দিনগুলির সম্বন্ধে সমালোচনা করেছেন। যাহা হউক, বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থ থেকে আমরা মহাপ্রভুর মৃত্যু সম্বন্ধে নিম্নরূপ পাঁচপ্রকার মতামত পেয়ে থাকি।

১। শ্রীজগন্নাথের রথ-যাত্রাকালে রথাগ্রে উদ্দণ্ড নৃত্যরত অবস্থায় তাঁর পায়ে একটি কাঁকর ফুটে যে বিষাক্ত ক্ষত-খর হয়, তার ফলেই তাঁর মৃত্যু হওয়া।

২। শ্রীজগন্নাথের দারুময় বিগ্রহের মধ্যে অকস্মাৎ লীন হয়ে যাওয়া।

৩। শ্রীটোটা গোপীনাথের মূর্ত্তি মধ্যে অদৃশ্য হওয়া।

৪। যমুনা ভ্রম সমুদ্রগর্ভে আত্মাহুতি দেওয়া।

৫। রাজা প্রতাপরুদ্র রাজকার্য্য পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশে মহাপ্রভুর প্রতি অত্যধিক আনুগত্য করায় ঈর্ষাবশে গুণ্ডিচা মন্দিরের নিকট আততায়ীর হাতে নিহত হওয়া।

উক্ত পাঁচটি মতবাদের মাঝামাঝি আরও একটি মতবাদ আছে, সেটিও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। মতবাদটি এই যে, নীলাচলে মহাপ্রভুর ক্ষত-জ্বরে (জয়ানন্দের মতানুসারে) মৃত্যু হ'লে গুণ্ডিচা-মন্দির অথবা টোটা গোপীনাথের মন্দির সংলগ্ন কোন স্থানে তাঁর নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা হ'য়েছিল। যদি তাহাই হ'য়ে থাকে, তবে তাঁর সমাধি-স্থলটির অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন।

চীনা বাদাম নয় চীনা খাবার

আধুনিক সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার রূপ ও রীতির বহুল পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তারই মধ্যে অন্যতম হল হোটেল-রেস্তোঁরায় ভোজন করার প্রবণতা, আবার বিশেষ করে চীনা হোটেলে খাওয়ার দিকেই যেন সকলের একটা বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়; এর ফলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বড় বড় শহরগুলিতে চীনা রেস্তোঁরা বা ভোজনশালার সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান।

লালমুখো সাহেব ও কালামুখো দেশীয় লোক সকলেরই ভিড়ও জমে ওঠে চীনা হোটেলের বিচিত্র পরিবেশে।

মস্ত লম্বা ভোজন-তালিকা বা মেনুকার্ডের উপর আগ্রহভরে চোখ বোলাতে বোলাতে অনেকেই ঠিক করতে পারেন না "রূপালী সমুদ্রের চাঁদ"কেই খাবেন, না—"মেঘের বুক ছেঁড়া দশ হাজার তীরের" জন্যই হাঁক লাগাবেন; চমক লাগলেও আসলে অবশ্য চমকাবার কিছু নেই; ওগুলো চীনে খাবারেরই নাম, এই ধরণের গালভারি নামের আড়ালেই হয়ত লুকিয়ে আছে সুস্বাদু চমৎকার সব খাবার যা শুধু রসনাকেই তৃপ্ত করে না, মনেও ছড়িয়ে দেয় এক অদ্ভুত ধরণের আবেশ।

বস্তুতঃ এই বৈচিত্র্যই চীনা রেস্তোঁরার প্রসার ও প্রচারের মূল কারণ, চীনে পাচকরা বোধ হয় মহাভারতের বিখ্যাতা দ্রৌপদী দেবীরই বংশজ, তাদের হাতের কারিগরিতে তা নাহলে দুনিয়ার রসনা বিজয় সম্ভবপর হচ্ছে কি করে?

'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' এ নীতি আর যেখানেই খাটুক, চীনা ভোজনালয়ে খাটে না, সেখানে পাচকের সংখ্যা প্রচুর আর তারা প্রত্যেকেই নিজের কেরামতি দেখায় নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারে, যত পদ তত পাচক, এ নীতি বোধ হয় একমাত্র চীনা রেস্তোঁরা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অসংখ্য ও বিচিত্র ভোজ্য বস্তুর মধ্যে কয়েকটি চৈনিক অবদান আজ প্রায় সব সভ্য দেশেরই জাতীয় সম্পত্তি, অর্থাৎ নিজের নিজের দেশের সর্ব্বজনপ্রিয় খাদ্য-তালিকারই অন্তর্গত একান্ত অন্তরঙ্গতায়, যেমন চাও চাও, ফ্রায়েড রাইস, চৌমিন, বার্ড'স নেষ্ট সুপ, ফ্রায়েড প্রন, ইত্যাদি। চীনা রেস্তোঁরার জনপ্রিয়তা শুধু তাদের পাকশাস্ত্রে কুশলতার উপরই নির্ভরশীল নয়, যে কোন খাস ইউরোপীয় রেস্তোঁরার চেয়ে তাদের দর্শনীও অপেক্ষাকৃত সুলভ।

চীনের বিভিন্ন প্রদেশের নানা ধরণের রন্ধন-প্রকরণ এর পরিচয় বিদেশে বহন করে তাদের রেস্তোঁরাগুলিই, ক্যান্টন প্রদেশের রন্ধনশৈলী যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বাহক, একথা চীনা রেস্তোঁরা-রসিক হলে আবিষ্কার করতে আপনার বেশী বিলম্ব হবেন এবং আরও বুঝবেন, দেশ ভেদে প্রকরণগত বিভেদ থাকলেও, ব্যাকরণগত বিভেদ বিশেষ নেই, অর্থাৎ সংস্কৃত অনুশীলনের ছাপ সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট।

চীনা খাবার লালায়িত রসনায় গ্রহণ করলেও চৈনিক আহার-পদ্ধতিটি কিন্তু বিদেশীর পক্ষে অনায়াসসাধ্য কর্ম নয়, হাত বা কাঁটা চামচ এর কোনটিই বিশুদ্ধ চৈনিক আহার পর্ব্বে ব্যবহৃত হয়না, দুখানি চেপ্টা কাঠির সাহায্যে চীনারা আহার্য্য দ্রব্যকে উদরস্থ করে থাকেন, আনাড়ীর চোখে তা প্রায় ইন্দ্রজালেরই সমতুল্য কোন অদ্ভুৎ কর্ম বলে ঠেকলেও, চীনা আবাল বৃদ্ধ বনিতা যেরকম অবলীলা-ক্রমে এগুলি ব্যবহার করেন, তাতে মনে হয় ব্যাপারটি প্রকৃত পক্ষে বোধ হয় বিশেষ রোমাঞ্চকর কিছু নয়।

চীনা রেস্তোঁরার জনপ্রিয়তা দিন দিন যে ভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ঘরোয়া আহার-পর্ব্বেও চীনা রন্ধন-প্রণালী অনুসৃত হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়, হয়ত ভাবী বাঙলা পাক-প্রণালীতে মোচারঘন্ট, শুক্তো, পলতার বড়ার পাশেই ঠাঁই করে নেবে চাউ চাউ, চৌমিন প্রভৃতি একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই। চীনা রেস্তোঁরার এই ব্যাপক প্রসারের মূলে রয়েছে আধুনিক মানুষের বহির্মুখী জীবনধারার প্রভাব, ঘর বলতে আজকের মানুষ নাক সিঁটকোয়, বাহিরই আজকের যুগজীবনে বেশী মূল্যবান, আর এই বহির্মুখী জনতার একটি মধুর আকর্ষণ হল চীনা ভোজনশালার রুচিসিক্ত বিচিত্র পরিবেশে পরিবেশিত নানা স্বাদ ও বর্ণের অত্যুৎকৃষ্ট ভোজ্য ও পেয়

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের সামাজিক উপন্যাসগুলো পাঠে একদিকে যেমন চরিত্র চিত্রণের বিচিত্রতা ও গভীরতা এবং সামাজিক বিবর্তনের বিস্তার সম্পর্কে সচেতন হতে হয়, অন্যদিকে তেমনি বঙ্কিম যুগের মধ্যবিত্ত সমাজ এবং রবীন্দ্রনাথের কালের মধ্যবিত্ত সমাজের কালানুগ পার্থক্যের পরিচয়ও নজর এড়ায় না। বঙ্কিম যুগে মধ্যবিত্ত সমাজের সবে পত্তন হতে শুরু করেছে. বিদেশী বণিকশক্তির বনিয়াদ দৃঢ়তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসন কার্যে সহায়তা করার জন্যে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নিয়োগ অনিবার্য হওয়ার ফলেই সামন্ততন্ত্রের সামাজিক কাঠামোয় ভাঙন এবং নতুন মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা সহজ পথেই অগ্রসর হতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথের কালে দেখা যায়, মধ্যবিত্ত সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুধু যে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই নয় নতুন ও পুরাতন আদর্শের মূল্যায়ন সম্পর্কেও উৎসাহী হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিম যুগে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও এবং নব-বিদ্যালব্ধ চিন্তাধারায় উৎসাহী হলেও, সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শকে একেবারে নির্মূল করা হয়তো তখনো সম্ভব হয়নি। সামন্ত-সমাজ বিলুপ্ত হলেও সে-সমাজের দীর্ঘকালের আচার ও সংস্কার তখন পর্যন্ত কোনো কোনো দিক থেকে শিক্ষিত মনকেও প্রভাবিত ক'রে রেখেছিল। সে সমাজের বিস্মৃতপ্রায় রাজারাজড়াদের বিক্রম ও সংগ্রামের নানা কাহিনী তখন পর্যন্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের প্রাণেও থেকে-থেকেই শৌর্য-বীর্যের অনুরণন সৃষ্টি করায় নতুন ভঙ্গিতে সে সামন্ত-সমাজের মূল আবেদনগুলোর পুনরুদ্ধার উপন্যাসের মধ্য দিয়েও সম্ভব করার চেষ্টা চলেছিল বলতে পারা যায়। ইতিহাস-আশ্রিত উপাখ্যান সমূহের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে রোমান্টিক কবি কল্পনার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা থেকেও এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে। বঙ্কিমের উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস না হয়ে যে ইতিহাস-আশ্রিত আখ্যায়িকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তার কারণ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য বাঙালী সম্প্রদায় ইতিহাস চর্চায় উৎসাহী হলেও তখন পর্যন্ত ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান সম্পূর্ণতা ও সমগ্রতা লাভ করতে পারেনি। ইংরেজি শিক্ষা বাঙালীপ্রাণে জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশ-প্রীতির বিস্তার এবং যুক্তিবাদের বিকাশলাভ ঘটালেও, ঐতিহাসিক জ্ঞান খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ থাকায় রোমান্টিক কবি-কল্পনা ও রোমান্স রস বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানেই ঐতিহাসিক তথ্য অনুপস্থিত এবং ইতিহাসের আলো অস্পষ্ট ও সংশয়াচ্ছন্ন, সেখানেই রোমান্সরসের ব্যাপ্তি নজরে পড়বে। একদিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-জীবনের ভগ্নাবশেষ এবং অন্য দিকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার নবজ্ঞান-লব্ধ ভাবোন্মাদনা, এই দু'জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রোমান্সরসের সাহায্যে শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টাকেই তখন সঙ্গত বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ('অঙ্গুরীয়-বিনিময়'), বঙ্কিমচন্দ্র ('দুর্গেশনন্দিনী', 'রাজসিংহ') এবং রমেশচন্দ্র দত্ত ('বঙ্গ-বিজেতা', 'মাধবীকঙ্কন') ঐতিহাসিক আখ্যায়িকার পটভূমিকায় এই রোমান্সরস পরিবেশনের কাজে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন বলা যেতে পারে।

ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসে চরিত্র-চিত্রণের সুযোগ তেমন পাওয়া যায়নি। সে ক্ষেত্রে লেখকের বিচিত্র ঘটনাবলীর সমাবেশ ও সে সব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের বর্ণনার মাধ্যমে মূল আখ্যানকে এগিয়ে নেবার চেষ্টাই লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র-বর্ণনা, সংলাপ-সংস্থান ও ঘটনাবলী-স্থাপনা এরূপভাবে বিন্যস্ত যে, পাঠকমন অভিভূত না হয়ে পারে না। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এই বর্ণিত চরিত্রগুলো হৃদয়বৃত্তির আলোড়নে উদ্দীপিত নয়, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্বিক্ষোভের বিচিত্রলীলায় উদ্ভাসিত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ও তাঁর সমকালীন লেখক-সম্প্রদায়ের উপন্যাসগুলো সম্পর্কেও বোধ হয় মোটামুটিভাবে এই কথাই বলা চলে। সেক্ষেত্রেও প্রায় সর্বত্রই বাহিরের জগৎ ও বাহিরের জগতের ঘটনাবলীই প্রধানত আখ্যায়িকার চরিত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করছে, বাহিরের ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতেই চরিত্রগুলো নড়েচড়ে উঠছে, ঘটনা-সংস্থানই চরিত্রগুলোর ওপর আলো বিকীর্ণ ক'রে বর্ণিত পাত্রপাত্রীদের পাঠকের চোখের সামনে উপস্থিত করছে।

রবীন্দ্র-উপন্যাসে চরিত্র-চিত্রণের এই পদ্ধতি অনুসৃত হওয়া সম্ভব ছিলনা, কেননা, মধ্যবিত্ত সমাজ ইতিমধ্যেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আত্মস্থ হতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস দুটোতে ('বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' : 'রাজর্ষি') বঙ্কিমযুগের প্রভাব থাকলেও এবং বঙ্কিমী রচনারীতির অনুসারী হলেও, ১৩০৮ সালে প্রকাশিত 'চোখের বালি' উপন্যাস পূর্বযুগের চিন্তাধারা ও রচনারীতির সঙ্গে বহু দিক থেকেই বিচ্ছেদের সূচনা করে। প্রথম দুটো উপন্যাস লেখার পর রবীন্দ্রনাথ যে আর কোনো ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস লেখেননি, এ থেকে বোঝা যায়, লুপ্ত সামন্ত সমাজের শৌর্য-বীর্যের উপাদান কুড়িয়ে অতীতমুখী সাহিত্যসৃষ্টির অবসান তিনি

ঘটাতে চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের নরনারীর ক্রমোবর্দ্ধমান ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উম্মাদনা, তাদের হৃদয়মননজাত নানা চিন্তাধারা ও ভাবুকতার সমাবেশ রবীন্দ্র-উপন্যাসে বিচিত্র শিল্পরূপের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। পূর্ববর্তীকালের উপাখ্যান-সর্বস্ব উপন্যাসধারায় অতএব 'চোখের বালি' নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব সংযোজন এবং এই সময় থেকে বাংলা উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ নতুন ও আধুনিক পর্যায়ের শুরু বলা যেতে পারে।

দুই

বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় 'চোখের বালি'র বরাবরই বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে, যেহেতু এই গ্রন্থেই প্রথম সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি ধরা পড়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'র সূচনায় লিখেছেন :

"আমরা একদা বঙ্গদর্শনে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের রস সম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নবপর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে, কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না।···ঠিক করতে হল, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানাঘরে। শয়তানের হাতে 'বিষবৃক্ষে'র চাষ তখনও হত, এখনও হয় ; তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জার অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না, তখন নামতে হল মানবসংসারের সেই কারখানাঘরে, যেখানে আগুনের জ্বলুনি, হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানববিধাতার এই নির্মম সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় প্রকাশ পায়নি।···সাহিত্যের নব-পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।"

রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত উদ্ধৃতির পট-ভূমিকায় রবীন্দ্র-উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ সম্পর্কেও সঠিক ধারণা করা সহজ হয়। 'সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।' এই উক্তির মধ্যেই রবীন্দ্র-উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণের মূল পদ্ধতির সূত্রানুসন্ধান সম্ভব। প্রকৃত প্রস্তাবে 'চোখের বালি' থেকে শুরু করে 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা' পর্যন্ত সমস্ত উপন্যাসেই চরিত্রচিত্রণের এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। মূল আখ্যানভাগের গতি কোথাও দ্রুত, কোথাও মন্থর, কোথাও সংলাপের ব্যাপকতায় গভীর। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই চরিত্রসৃষ্টিতে আখ্যানভাগের প্রাধান্য নেই। বরং মনে হবে, চরিত্রসৃষ্টির প্রাধান্যের কাছে মূল গল্পের আবেদন গৌণ হয়ে পড়েছে, যদিও সে-কারণে সমগ্রভাবে উপন্যাসের আবেদন গৌণ হয়ে পড়েনি।

'চোখের বালি'র প্রধান চরিত্র বিনোদিনীতে বাংলা দেশের তখনকার সমাজের নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের আলোড়ন সুস্পষ্ট। বিনোদিনীর বিদ্রোহ, বিনোদিনীর ঈর্ষাপরায়ণতা, অন্ধ সংস্কার ও আচারলুপ্ত প্রথার বিরুদ্ধে নির্ভীক ঘোষণা যেভাবে বিমূর্ত হয়েছে, পূর্ববর্তীকালের চরিত্রচিত্রণে তার সমতুল দৃষ্টান্ত খোঁজার চেষ্টাই বাতুলতা। কুন্দনন্দিনী কি রোহিণীচরিত্রের মতো এ চরিত্র লেখকের উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্রমাত্র নয় কিংবা দৈবানুগ অদৃষ্টশক্তির হাতের ক্রীড়নকও নয়, এ চরিত্রের সজীবতা হৃদয়দ্বন্দ্বের বিচিত্র বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। 'বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিল না, কিন্তু তাহার একমাত্র কন্যাকে সে মিশনারি মেম রাখিয়া বহু যত্নে পড়াশুনা ও কারুকার্য শিখাইয়াছিল। কন্যার বিবাহের বয়স ক্রমেই বহিয়া যাইতেছিল, তবু তাহার হুঁশ ছিল না। অবশেষে তাহার মৃত্যুর পরে বিধবা মাতা পাত্র খুঁজিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, টাকাকড়িও নাই, কন্যার বয়সও অধিক।' এরূপ অবস্থায় একগ্রামের মেয়ে রাজলক্ষ্মীর ছেলে মহেন্দ্রর সঙ্গে বিনোদিনীর বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতেই মহেন্দ্র মাকে খুশী করবার জন্যে রাজী হ'লো বটে কিন্তু বিয়ের দিন এগিয়ে আসতেই বিমুখ হয়ে পিছপাও হলো এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধুবর বিহারীর সঙ্গেই বিনোদিনীর বিয়ে যাতে হয় তার জন্যে মাকে দিয়ে বিহারীকে বশে আনার চেষ্টা চললো। বলা বাহুল্য, বিহারীও রাজী হলো না। জোড়হাত ক'রে রাজলক্ষ্মীকে জানালো : 'মা, ওইটে পারিব না। যে মেঠাই তোমার মহেন্দ্র ভাল লাগিল না বলিয়া রাখিয়া দেয়, সে মেঠাই তোমার অনুরোধে পড়িয়া আমি অনেক খাইয়াছি ; কিন্তু কন্যার বেলায় সেটা সহিবে না।' ফলে, বিনোদিনীকে অন্যত্র বারাসতের নিরানন্দ পল্লীভবনে স্বামীর ঘর করতে যেতে হ'লো এবং অল্পকাল পরেই বিধবা হ'য়ে জঙ্গলের মধ্যে একটিমাত্র উদ্যানলতার মতো মুহ্যমানভাবে জীবনযাপন করতে লাগলো।

কিন্তু গ্রামে বেড়াতে এসে বিনোদিনীর সেবায় প্রীত হয়ে রাজলক্ষ্মী তাকে নিয়ে এলেন কলকাতার বাড়িতে। 'সেবা ইহাকেই বলে! মুহূর্তের জন্যে আলস্য নাই। কেমন পরিপাটি কাজ, কেমন সুন্দর রান্না, কেমন সুমিষ্ট কথাবার্তা।' বিহারীকে সঙ্গে করেই রাজলক্ষ্মী বারাসতে এসেছিলেন। নব-বিবাহিত মহেন্দ্র তখন কলকাতার বাড়িতে বালিকাবধূ আশাকে নিয়ে চারুপাঠ পড়াবার ব্যর্থ চেষ্টায় রঙীন প্রহর যাপন করছে। বারাসতের অজ্ঞাত গ্রামে বসে' বিনোদিনীর মন প্রথম ছুঁলে উঠলো যেদিন রাজলক্ষ্মী বিহারীকে লেখা মহেন্দ্রের চিঠি তাকে পড়ে' শোনাতে অনুরোধ করলেন। বিনোদিনী পড়ে' শোনাতে লাগলো। মহেন্দ্র প্রথমে মার কথা লিখেছে। কিন্তু সে অতি সামান্যই। তার পরেই আশার কথা। মহেন্দ্র রঙ্গ রহস্যে আনন্দে যেন মাতাল হয়ে লিখেছে। বিনোদিনী খানিকটা পড়ার পর লজ্জা পেয়ে থামলো, জানালো যা সব লেখা আছে তা' না শোনাই রাজলক্ষ্মীর পক্ষে ভালো। রাজলক্ষ্মী বুঝতে পারলেন ছেলের চিঠিতে মায়ের কথা তেমন কিছুই নেই, বউয়ের কথাই সব। অমনি স্নেহব্যগ্র মুখের ভাব এক মুহূর্তেই পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠলো। চিঠি ফেরৎ না নিয়েই তিনি উঠে পড়লেন। বিনোদিনীও তার ঘরে ফিরে এসে দ্বার রুদ্ধ ক'রে বিছানার ওপর বসে' চিঠিখানা ভালো ক'রে পড়তে লাগলো।

"চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কী রস পাইল, তাহা বিনোদিনীই জানে। তাহা কৌতুকরস নহে। বারবার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।"

তিন

বিনোদিনী তার জোড়া ভুরু ও তীক্ষ্নদৃষ্টি, তার নিখুঁত মুখ ও নিটোল যৌবন নিয়ে কলকাতার বাড়িতে উপস্থিত হবার পর থেকেই বাড়ির আবহাওয়ায় পরিবর্তন ঘটলো। "বিনোদিনী সর্বপ্রকার গৃহকর্মে সুনিপুণ, প্রভুত্ব যেন তাহার পক্ষে নিতান্ত সহজ স্বভাবসিদ্ধ, দাসদাসীদিগকে কর্মে নিয়োগ করিতে, ভর্ৎসনা করিতে ও আদেশ করিতে যে লেশমাত্র কুণ্ঠিত নহে।" বলা বাহুল্য, বালিকাবধূ আশা এই সর্বগুণশালিনীর কাছে নিজেকে নিতান্ত ছোটো মনে করতে লাগলো। আশার পক্ষে অবশ্য সঙ্গিনীর বড়ো দরকার। কারণ, তার ও মহেন্দ্রের ভালোবাসার উৎসবও কেবলমাত্র দুটি লোকের দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না—সুধালাপের মিষ্টান্ন বিতরণের জন্তে বাজে লোকেরও দরকার। এদিকে বিনোদিনীর মধ্যেও অন্ত এক নতুন বিনোদিনী যেন জেগে উঠতে লাগলো।

"কুপিত-স্বদশা বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।" বিনোদিনী জানতে পারলো—একদিন মহেন্দ্রের সঙ্গে তার বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল।

"আশার এই বিছানা, এই খাট একদিন তাহারই জন্ত অপেক্ষা করিয়াছিল। বিনোদিনী এই সুসজ্জিত শয়নঘরের দিকে চায়, আর সেকথা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। এঘরে আজ সে অতিথিমাত্র—আজ স্থান পাইয়াছে, কাল আবার উঠিয়া যাইতে হইবে।" বিনোদিনী অপরূপ নৈপুণ্যের সঙ্গে আশাকে সাজিয়ে স্বামিসম্মেলনে পাঠিয়ে দেয়। "তাহার কল্পনা যেন অবগুণ্ঠিত হইয়া এই সজ্জিতা বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুগ্ধ যুবকের অভিসারে জনহীন কক্ষে গমন করিত।" আশা-মহেন্দ্রের প্রেমবাঞ্ছিত সুখস্বপ্নে ঈর্ষান্বিতা বিনোদিনীর "শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যেদিকে চায়, তাহার চোখে যেন স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতে থাকে। 'এমন সুখের ঘরকন্না! এমন সোহাগের স্বামী! এ ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। তখন কি এ ঘরের এই দশা, এ মানুষের এই ছিরি থাকিত। আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকী, এই খেলার পুতুল।"

বিনোদিনীর ব্যক্তিত্বের কাছে আশা একেবারেই নিষ্প্রভ, তার হাতের খেলার পুতুলমাত্র। তাই আশার চালচলন, কথাবার্তার ভঙ্গির মধ্যে মহেন্দ্র বিনোদিনীর অদৃশ্য হাতের প্রভাব অনুভব করতে পারে। আর সে-কারণেই ক্রমে ক্রমে মহেন্দ্রের বাহুপাশ শিথিল এবং তাহার মুগ্ধ দৃষ্টি যেন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আসতে থাকে। "পূর্বে যে-সকল অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলা তাহার কাছে কৌতুকজনক বোধ হইত, এখন তাহা অল্পে অল্পে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।" আশার সাংসারিক অপটুতায় মহেন্দ্র বিরক্ত হতে থাকে, যদিও মুখে, প্রকাশ করে না। আশাও মনে-মনে অনুভব করতে থাকে নিরবচ্ছিন্ন মিলনে প্রেমের মর্যাদা ম্লান হয়ে এসেছে। আশার মধ্যস্থতায় বিনোদিনী মহেন্দ্র, পরস্পারের নিকটবর্তী হলো, তারপর এমন দিন অনতিবিলম্বে এলো যখন বিনোদিনীর তৈরী পশমের জুতো মহেন্দ্রের পায়ে এবং বিনোদিনীর বোনা পশমের গলাবন্ধ তার গলায় কোমল মানসিক সংস্পর্শের মতো বেষ্টন করতে লাগলো। বিহারী এদিকে যখন উপলব্ধি করলো যে, তার তাকখোঁজ কেউ করছে না, তখন সে নিজেই আশা-মহেন্দ্র-বিনোদিনীর চক্রের মধ্যে নিজের স্থান দখল করতে সচেষ্ট হলো।

মহেন্দ্র বিনোদিনীর দিকে ঝুঁকলেও, বিনোদিনীর পক্ষপাত যে বিহারীর দিকে, এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে কাহিনীর মধ্যে নতুনতর পর্যায়ের সম্ভাবনায় পাঠক-মন সজাগ হয়ে ওঠে। দুর্বলচরিত্র মহেন্দ্রের পাশে দৃঢ়চরিত্র বিবেকবান বিহারীকে বিনোদিনীর আকর্ষণীয় মনে হবে, এটা স্বাভাবিক। বিহারীও দমদমের বাগানবাড়িতে বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের দীপ্তি প্রত্যক্ষ ক'রে হৃদয়ঙ্গম করলো যে, অপরিতৃপ্ত রজরসকৌতুকবিলাসের দহনজ্বালায় এখনও নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হয়ে যায়নি এবং "বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে।"

চার

মহেন্দ্রকে বিনোদিনী যে নানা বাণে বিদ্ধ করেছে, তার কারণ, আশার প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ-যত্ন বিনোদিনীর প্রণয়বঞ্চিত হৃদয়কে ঈর্ষাকাতর ক'রে তুলেছিল। বিনোদিনী তার রক্তমাংসের শরীর নিয়ে উপস্থিত থাকতেও মহেন্দ্র আশার মতো ক্ষীণ-বুদ্ধি দীন-প্রকৃতি বালিকাকে নিয়ে মেতে থাকবে, এটা বিনোদিনীর কাছে সহ্যাতীত ব্যাপার। বিনোদিনী মহেন্দ্রকে ভালোবাসে কি বিদ্বেষ করে, তাকে কঠিন শাস্তি দেবে না তার কাছে হৃদয় সমর্পণ করবে—এটা অনেক দিন পর্যন্ত সে নিজেই বুঝে উঠতে পারেনি। "একটা জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বালাইয়াছে, তাহা হিংসা না প্রেমের, না দুয়েরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না। মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া বলে, 'কোনো নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে? আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।' কিন্তু যে কারণেই বল, দগ্ধ হইতেই হউক বা দগ্ধ করিতেই হউক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার বিষদিগ্ধ অগ্নিবাণ জগতে কোথায় মোচন করিবে? ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিনোদিনী কহিল, 'সে যাইবে কোথায়? সে ফিরিবেই। সে আমার।" কিন্তু বিহারী সম্পর্কে বিনোদিনীর পক্ষে অনুরূপ দৃঢ় ঘোষণা করা সম্ভব হলো না। বিহারী আশার হিতাকাঙ্ক্ষী, আশার জন্তে করুণায় বিহারীর হৃদয় ব্যথিত—এটা জানামাত্রই বিনোদিনীর মুখে হিংসার বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হলো।

আশার কাশীযাত্রার প্রসঙ্গকে কেন্দ্র ক'রে যেদিন মহেন্দ্র বিহারীকে আক্রমণ ক'রে কথার ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়লো, সেদিন থেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে বিনোদিনীর মন বিহারীর কাছেই আত্মসমর্পণের জন্তে প্রস্তুত হতে লাগলো। সেদিন মহেন্দ্র বলেছিল:

"বিহারী, তোমার মনের ভিতর যে কথাটা আছে, তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলো। আমার সঙ্গে অসরলতা করিবার কোনো দরকার দেখি না। আমি জানি, তুমি মনে মনে সন্দেহ করিয়াছ, আমি বিনোদিনীকে ভালোবাসি। মিথ্যা কথা। আমি বাসি না। আমাকে রক্ষা করিবার জন্ত তোমাকে পাহারা দিয়া বেড়াইতে হইবে না। তুমি এখন নিজেকে রক্ষা করো। যদি সরল বন্ধুর

তোমার মনে থাকিত, তবে বহুদিন আগে তুমি আমার কাছে তোমার মনের কথা বলিতে এবং নিজেকে বন্ধুর অন্তঃপুর হইতে বহু দূরে লইয়া যাইতে। আমি তোমার মুখের সামনে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি আশাকে ভালোবাসিয়াছ।"

বিনোদিনী ও আশা পাশের ঘরে থাকলেও, কথাগুলো তাদের কানে যায়নি, একথা বলা যায় না। যেহেতু বিহারী পাংশুমুখে টলতে টলতে ঘর থেকে বের হবার সময় মুহূর্তেই বিনোদিনী ব্যাকুলভাবে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে আর্তকণ্ঠে তাকে জানিয়েছিল, বিহারীর অভিপ্রায় অনুযায়ী সেও আশার সঙ্গে কাশীযাত্রায় প্রস্তুত আছে।

"বিহারী চলিয়া গেল। মহেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ছিল। বিনোদিনী তাহার প্রতি জলন্ত বজ্রের মতো একটা কঠোর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সে ঘরে আশা একান্ত লজ্জায় সংকোচে মরিয়া যাইতেছিল। বিহারী তাহাকে ভালোবাসে, একথা মহেন্দ্রের মুখে শুনিয়া সে আর মুখ তুলিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তাহার উপর বিনোদিনীর আর দয়া হইল না। আশা যদি তখন চোখ তুলিয়া চাহিত, তাহা হইলে সে ভয় পাইত। সমস্ত সংসারের উপর বিনোদিনীর যেন খুন চাপিয়া গেছে। মিথ্যা কথা বটে! বিনোদিনীকে কেহই ভালোবাসেনা বটে! সকলেই ভালোবাসে এই লজ্জাবতী ননীর পুতুলটাকে।..." তারপরেই নজরে পড়ে বিনোদিনীর অন্তর্জ্বালার অনবদ্য বর্ণনা। "ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্রুদ্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্যে প্রস্তুত হইল। সে যাহা চায় তাহাতেই বাধা? কোনো কিছুতেই কি সে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না? সুখ যদি না পাইল, তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত সম্ভবপর সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে পরাস্ত, ধূলিলুণ্ঠিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনের কর্ম সমাধা হইবে।"

আশার অবর্তমানে কলকাতার বাড়িতে বিনোদিনীর আকর্ষণ মহেন্দ্রর পক্ষে ক্রমশই দুর্দমনীয় হয়ে উঠছিল বটে কিন্তু মাঝে-মাঝে বিহারীর উপস্থিতি বিনোদিনীর মনকে তার নিজের প্রকৃত অসহায়তা সম্পর্কে সচেতন করে তুলছিল। মহেন্দ্রের কাছে একদিন অপমানিত হয়ে ফিরে আসবার সময় বিনোদিনী বিহারীকে থামাবার জন্যে তার হাত ধরেছিল বটে কিন্তু পরমুহূর্তেই বিহারী অপরিসীম ঘৃণার সঙ্গে তাকে ঠেলে ফেলতেই মাটিতে পড়ে' গিয়ে বিনোদিনীর হাতের কনুইয়ের কাছে কেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হলো। অপমানিতা বিনোদিনী তারপরেই মহেন্দ্রকে জানাচ্ছে যে, মহেন্দ্রের ভালোবাসা সে তো পায়ে ঠেলবেই না বরং মাথায় ক'রে রাখবে। কেননা, জন্মাবধি ভালোবাসা এতো বেশী পায়নি যে, 'চাইনে' বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বিনোদিনী অনুভব করেছিল মহেন্দ্রের ভালোবাসা লালসারই নামান্তর এবং নিতান্তই দেহাশ্রয়ী। তাই মহেন্দ্র যখন অধীর হয়ে 'বিনোদিনীর কাছে হাতে-হাতে ক্ষমা ও ভালোবাসার একটা নিদর্শন পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল' তখন বিনোদিনী তাকে কঠিন শৃঙ্খলায় হটিয়ে দিয়েছিল। মহেন্দ্র উপলব্ধি করলো: 'বিনোদিনী অহরহ আকর্ষণও করে, অথচ বিনোদিনী এক মুহূর্ত কাছে আসিতেও দেয় না।' রাজলক্ষ্মী দেরীতে হলেও ছেলে বিনোদিনীর কবলিত হয়েছে, জানামাত্র নির্মমভাষায় তাকে অপমান করলেন এবং অপমানিতা বিনোদিনীও মহেন্দ্রকে শাণিত বিদ্রূপবাণে উদ্দীপিত করে রাজলক্ষীর সামনেই কবুল করিয়ে নিলে যে, সে বিনোদিনীর সঙ্গে পালাতে প্রস্তুত।

মহেন্দ্রকে না জানিয়ে বিনোদিনী একো অবশ্য বিহারীর কাছে, উদ্দেশ্য, বিহারীর ভুল ভাঙিয়ে তার কাছে নিজের হৃদয়-রহস্য উদ্ঘাটিত করা। জানালে, মহেন্দ্রকে সে পথভ্রষ্ট করেছে বটে কিন্তু তাকে সে ভালোবাসে না। আরো জানালে, বিহারীই ইচ্ছা করলে তার জীবনের মোড় ফেরাতে পারতো, তার সকল কাঁটা নষ্ট করে জীবনের ফুল ফোটাতে পারতো। ব্যাকুলভাবে বিনোদিনী জানালে: "আমাকে ভালোবাসিতে তোমার কী বাধা ছিল। আমি আজ নির্লজ্জ হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, এবং আমি আজ নির্লজ্জ হইয়াই তোমাকে বলিতেছি—তুমিও আমাকে ভালোবাসিলে না কেন।...যাহার ভালোবাসা পাইলে আমার জীবন সার্থক হইত, তাহার কাছে এই রাত্রে ভয়-লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয়া ছুটিয়া আসিলাম, সে যে কত বড়ো বেদনায় তাহা মনে করিয়া একটু ধৈর্য্য ধরো। আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি যদি আমাকে ভালো না বাসিতে, তবে আমার দ্বারা আজ আশার এমন সর্বনাশ হইত না।"

এক্ষেত্রে বিনোদিনীর উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়। মহেন্দ্র বিনোদিনীর সঙ্গে পালাতে প্রস্তুত হয়েছে—এ সংবাদ পেলে বিহারী যে আশার অমঙ্গল আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে উঠবে, এ অনুমান বিনোদিনীর পক্ষে ক'রে নিতে দেরী হয়নি। পক্ষান্তরে বিহারী বিনোদিনীকে যদি গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়, তাহলেই একমাত্র বিনোদিনী মহেন্দ্রের ঘর জ্বালাবার সংকল্প থেকে বিরত থাকতে পারে। কিন্তু দৃঢ়স্বভাব বিহারীর ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানতে হ'লো বিনোদিনীকে। শেষ পর্যন্ত বিহারীর গলদেশ বেষ্টন ক'রে বললে: 'জীবনসর্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, আজ কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালবাস, তার পরে আমি আমাদের সেই বনে জঙ্গলে চলিয়া যাইব, কাহারও কাছে কিছুই চাহিব না। মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো একটা কিছু দাও।' বলতে বলতে বিনোদিনী তার তপ্ত ওষ্ঠাধর বিহারীর মুখের কাছাকাছি এনেছিল বটে কিন্তু সে রাত্রে সেই ওষ্ঠাধর অচুম্বিত থেকে গেল, প্রধানত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিহারীর সুকঠিন আত্মসংযমের ফলেই। বিনোদিনীকে ফিরে আসতে হলো বারাসতে, জঙ্গলাকীর্ণ স্বামীর ভিটেয়।

পল্লীগ্রামে ফিরে এসে বিনোদিনী যখন মনেপ্রাণে বিহারীকে পেতে চাইছে, দুরাশার গোড়ায় হৃদয়ের রক্তসেচন করে জগতের আর-সমস্ত ছেড়ে কেবল বাঞ্ছিতের শুভাগমন কামনা করছে, সে-সময়ে একদিন তার সন্ধানে মহেন্দ্র হাজির হবামাত্র সঙ্গে-সঙ্গেই বিনোদিনী তাকে দূর ক'রে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ততদিনে গ্রামেও বিনোদিনীর চরিত্রের কুৎসা রটনার ঢেউ এসে পড়েছে। গ্রামের মেয়ে-পুরুষ সবাই এই ভ্রষ্টা বিধবাকে গ্রামে থাকতে দিতেই রাজী নয়। অতএব মহেন্দ্রকে নিয়ে বিনোদিনীকে কলকাতায় ফিরে এসে উঠতে হলো পটলডাঙার বাড়িতে। কিন্তু মহেন্দ্রের লোলুপতা সত্ত্বেও নাটক জমলো না, কেননা—বিনোদিনীর চোখের সামনে বিহারীর ছায়া, তার দিনের চিন্তায় রাতের ভাবনায় বিহারীর স্মৃতি। ফলে, মহেন্দ্রকে ফিরে আসতে হলো নিজের বাড়িতে, স্ত্রী ও জননীর আশ্রয়ে। কিন্তু একদিকে আশা যেমন মহেন্দ্রের মনে তেমন কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারলো না, অন্যদিকে

বিনোদিনীও তেমনি বিহারীর আশ্রয়ের আশায় অপেক্ষা ক'রে শেষ পর্য্যন্ত মহেন্দ্রের সঙ্গেই পশ্চিমে চলে গেল অধিকতর অনিশ্চিত পথেই।

কিন্তু আশ্চর্য বিনোদিনীর ক্ষমতা। কোনো চরম মুহূর্তেও মাত্রাজ্ঞান কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে সে ভুল করবে না, এই তার পণ। তাই বিদেশে শনিগ্রহের মতো সে ঘুরেছে এবং মহেন্দ্রকে ঘুরিয়েছে। রেলগাড়িতে মহেন্দ্র যখন প্রথম শ্রেণীতে চেপেছে তখন সে স্থান সংগ্রহ করেছে ইন্‌টার ক্লাসে, মেয়েদের কামরায়। এরকম ভ্রমণ মহেন্দ্রের কাছে নিশ্চয়ই লোভনীয় হতে পারে না। মহেন্দ্র যখন আহার শেষে ঘুমের চেষ্টা করতো, বিনোদিনী ঘুরে-ঘুরে বেড়াতো। তারপর এই এলাহাবাদেই একদিন রাত্রে জ্যোৎস্নামত্ত মুহূর্তে বিনোদিনীকে নিবিড়-ভাবে পাবার আকাঙ্ক্ষায় তার কাছে এসেই মহেন্দ্র জানতে পারলে বিনোদিনী যাকে চায়, যার জন্তে সেজে থাকে, সে মহেন্দ্র নয়, বিহারী।

মার অসুস্থতার সংবাদ দিতে বিহারী এলাহাবাদে এলো মহেন্দ্রের সন্ধানে। বিনোদিনী সুযোগ পেল এবার তাকে সব কথা খুলে বলবার। "...আমি একেবারেই নষ্ট হইতে পারিতাম—কিন্তু তোমার কী গুণ আছে, তুমি দূরে থাকিয়াও রক্ষা করিতে পার—তোমাকে মনে স্থান দিয়াছি বলিয়াই আমি পবিত্র হইয়াছি—একদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়া নিজের যে পরিচয় দিয়াছ, তোমার সেই কঠিন পরিচয়, কঠিন সোনার মতো, কঠিন মানিকের মতো আমার মনের মধ্যে রহিয়াছে, আমাকে মহামূল্য করিয়াছে। দেব, এই তোমার চরণ ছুঁইয়া বলিতেছি, সে মূল্য নষ্ট হয় নাই।' এমন সময় মহেন্দ্র ঘরের কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাহ্ণের ঘনায়মান অন্ধকারে বিহারীকে দেখে অনুমান করলে বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর পত্রালাপের মাধ্যমেই এই মিলন ঘটেছে। প্রত্যাখ্যাত মহেন্দ্রের গর্বে আঘাত লাগবে, এটা স্বাভাবিক। এতোদিন বিহারী বিমুখ হয়েছিল, এখন যদি সে নিকটে এসে ধরা দেয়, তাহলে বিনোদিনীকে ঠেকাবে কে? ব্যর্থ রোষে তীব্র বিদ্রূপের সুরে সে তখন বিনোদিনীর চরিত্রভ্রষ্টতার উল্লেখ ক'রে আক্রমণ করতেই সেই মুহূর্তে তাকে বাধা দিয়ে বিহারী জানালে যে, সে বিনোদিনীকে বিয়ে করবে, সুতরাং মহেন্দ্র যেন এখন থেকে সংযতভাবে কথা বলে।

পাঁচ

কিন্তু এখানেই চরিত্র বিশ্লেষণের সমাপ্তি নয়। বিহারী উদ্যোগী হতেই বিনোদিনী পিছু হটে এলো। বিহারী যে তাকে ভালোবাসে, এই জানাতেই তার গর্ব ও তৃপ্তি; এই জানাই তার শেষ পুরস্কার; কেননা, বিনোদিনীর বিশ্বাস, এর অতিরিক্ত কিছু চাইতে গেলে 'ধর্ম কখনও তাহা সহ্য করিবেন না।' এবং তার পরেই বিনোদিনীকে বলতে শোনা যায়:

'ছি ছি, একথা মনে করিতেও লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনও হইতেই পারে না।' এবং তার পরেও রয়েছে: 'ছি ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে! তোমার ঔদার্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি একাজ করি, তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি মাথা তুলিতে পারিব না।' শেষ অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া গেল, অন্নপূর্ণার সঙ্গে বিনোদিনীর কাশীযাত্রাই স্থির হয়েছে। 'পল্লীসমাজে' রমার কাশীযাত্রার সঙ্গে বিনোদিনীর এ যাত্রার তুলনা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

বিনোদিনীর চরিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপরূপ কবিত্বময় বিশ্লেষণ পদ্ধতির নিপুণ নিয়োগ করেছেন। কখনো বর্ণনার মাধ্যমে, কখনো সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রের ক্রমোবিকাশ মূর্ত হয়ে উঠেছে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত হৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বকে কোথাও অতিক্রম ক'রে যেতে পারেনি। প্রকৃত প্রস্তাবে বিনোদিনী-চরিত্রের ক্রমোবর্দ্ধমান অন্তর্দ্বন্দ্বই সমগ্রভাবে গল্পের মধ্যে গতি ও ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে। 'চোখের বালি'র ঘটনাবিন্যাসে জমজমাট ভাব নেই; অনেক সময় মনে হবে ঘটনা দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে অত্যন্ত শ্লথগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু বিনোদিনীর চরিত্রদীপ্তি এরূপ ব্যাপকভাবে বিচ্ছুরিত যে, ঘটনাস্থাপনার শৈথিল্য নজরে পড়তে চায় না। এ প্রসঙ্গে একজন সমসাময়িক সমালোচকের কথা উদ্ধৃতিযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে: "বিনোদিনীই 'চোখের বালি'র একমাত্র সত্য: সেই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত গল্পটিকে উদ্দীপ্ত ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার দৃপ্ত যৌবনের উজ্জ্বল দীপ্তিই উপন্যাসটির প্রাণ। সে শয়তানী নয়, সে তাহার অবরুদ্ধ কামনার, অতৃপ্ত যৌন বাসনার আগুনে সংসার পোড়ায় নাই, নিজেকে শুধু সে দীপ্তিমতী করিয়াছে। কোথাও সে পাঠকের শ্রদ্ধাকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করে নাই। ক্ষুরের ধারের মত দুর্গম পথেই সে আনাগোনা করিয়াছে, অথচ কোথাও তাহার পায়ের নীচে এতটুকু ক্ষতচিহ্ন নাই। বিনোদিনী বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণীর স্ফুটতর, স্পষ্টতর, বিস্তৃততর রূপ; বিনোদিনী দামিনী, অভয়া, কিরণময়ীর পূর্বাভাস।" (নীহাররঞ্জন রায়)

বিনোদিনী-চরিত্রের পরিণতিতে যে রকম দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে বিনোদিনীর কথাবার্তা ও আচরণের সামঞ্জস্য নেই বলে কোন কোন সমালোচক অভিযোগ করেছেন। বিনোদিনীর একটিমাত্র অসুবিধে এই ছিল যে, সে বিধবা। অন্যথায় তার যৌবন ছিল, রূপ ছিল, প্রেমে অভিষিক্ত হবার ও নীড় বাঁধবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু বিনোদিনী যে-সমাজের ও যে কালের নারী, সে-সময়ে বিধবা নারীর পক্ষে ঘর বাঁধিবার স্বপ্ন দেখা দুঃসহ স্পর্দ্ধা ও লজ্জাহীনতা বলে বিবেচিত হতো হয়তো। বিনোদিনীচরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে স্ফুরণ গোড়া থেকেই নজরে পড়ে এবং চরিত্র চিত্রণের যে বাস্তব ব্যাখ্যার ওপর যে-চরিত্রকে বরাবর সজ্জিত দেখতে পাওয়া যায়, শেষ অধ্যায়ে সে-চরিত্রে যেন এ দু'টি বস্তুই বিলুপ্তি কতকটা আকস্মিকভাবেই ঘটে এবং বিনোদিনীচরিত্র প্রচলিত সামাজিক সংস্কারের অন্ধ দেবতার কাছেই আনুগত্যের শপথ জানিয়ে নাটকীয়তার সৃষ্টি করে।

তাহলেও বিনোদিনীচরিত্র কালানুক্রম অনুসারে রবীন্দ্র-উপন্যাসে প্রথম সার্থক সংযোজনা, এই সময় থেকেই বাংলাসাহিত্যে আধুনিক উপন্যাসের শুরুও বলতে পারা যায়। যে যুক্তি-নির্ভর বিশ্লেষণ-পদ্ধতি বিনোদিনী-চরিত্রচিত্রণের ভিত্তি, সেই পদ্ধতির অব্যাহত প্রসার রবীন্দ্র-উপন্যাসের পরবর্তী অনেক চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে নজরে পড়বে। বিনোদিনী-চরিত্রচিত্রণের শেষ পর্যায়ে জাতীয় সংস্কারের প্রবলতা জয়ী হলেও পরবর্তী চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধের অঙ্গীকরণ উপন্যাসের পটভূমিতে বিশালতা ও উদারতার আলোর স্ফুরণ ঘটিয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের উদার মানবতাবাদের পটভূমিকায় নারীচরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দীপ্তি পরবর্তীকালের উপন্যাসে অতএব স্বাতন্ত্র্য এনেছে। এই দিক থেকে বিনোদিনী-চরিত্রচিত্রণ বাংলা উপন্যাসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবভারতে শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী তর্কতীর্থ

বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালী জাতির প্রাণে জাগে এক অপূর্ব্ব আত্মবোধ ও মানসবিলাস। ষোড়শ শতাব্দীতে মানবতার যে জয়গান (নরবপুঃ তাঁহার স্বরূপ) দেববাদের বহু ঊর্দ্ধলোকে মানব সত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক মহনীয় দিব্যালোকে সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিল, তাহার বিদ্যুদ্দীপ্ত স্মরণ-বহ্নি শতাব্দী-সঞ্চিত তিমিরলোকে এক মহা প্লাবন আনিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী মনীষাকে এক অব্যক্ত আনন্দ-সংবেদনায় সৃষ্টি-মুখর করিয়া তোলে। নবীনচন্দ্র এই নবজাগ্রত মনীষারই অন্যতম অধিকারী।

আর্য্য-সংস্কৃতির যে রূপান্তর আমরা বর্ত্তমানে চাই, নবীনচন্দ্র প্রায় পাদোন শতাব্দী পূর্ব্বে তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সর্ব্ববিধ কৃষ্টির মূলে রহিয়াছে এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মবোধ, যাহা বিশ্বের যে-কোনো সংস্কৃতির ইতিহাসে সুলভ নহে। নবীনচন্দ্র তাঁহার অনন্যসুলভ কবি-দৃষ্টির সহায়ে এই সত্যটি নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যে ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া উদার ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে সমগ্র দেশবাসীকে এক করিতে না পারিলে জাতীয় আত্মা স্ব-রূপে কখনো প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। দ্রষ্টা কবি সমাজ, ধর্ম্ম ও জীবনের অখণ্ড মহাসমন্বয়ে ভারতবর্ষকে এক মহাজাতির আবাস-ভূমিরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ভাবদৃষ্টি কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর নহে, বিংশ শতাব্দীর তথা মানবতার উত্তর-সাধকগণের অগ্রগতিতেও আলোক-স্তম্ভ-স্বরূপ হইয়া রহিবে।

মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের সৃষ্ট সাহিত্যে কবি-ধর্ম্মের যথার্থ বিকাশ থাকিলেও, জাতীয় জীবনে সর্ব্ব অনর্থ বিলোপে সত্য পন্থা উদ্ভাবনের তেমন কোনো আদর্শরূপ নাই। সমাজ ও ধর্ম্ম-জীবনের চরম সঙ্কট-মুহূর্ত্তে এই কাব্যসমূহ পূর্ণ মনুষ্যত্বের, মহত্তম জীবনাদর্শের রূপ-পরিদর্শনে, সঙ্কট-বন্ধুর পন্থা অতিক্রমণে, পরম শ্রেয়োলাভে সম্পূর্ণ অপারগ। নবীনচন্দ্র এই অভাব পূরণ করিয়াছেন। তিনি, ভারতের জাতীয় আত্মা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূলাধার প্রাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার মহাকাব্যের নায়ক করিয়া মানব-সভ্যতার এক নব জীবনবেদ রচনা করিয়াছেন। এই নব জীবন-বেদিকার পুণ্য-পাদপীঠে কেবল ভারতের জনগণের নহে, বিশ্ব-মানবেরও সকল সমস্যার সমাধান ঘটিতে পারে।

জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সর্ব্বত্রই ইতিহাসের অন্তররূপ অল্প-বিস্তর বিকৃত। জাতীয় জীবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনও অনেকাংশে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়,—ফলে তাহাতে বহু অবান্তর বিষয়ের সহযোগে ঐতিহাসিক সত্য নির্ব্বিকার থাকিতে পারেনা। অথচ যথার্থ ইতিহাসই জাতীয় জীবনধারাকে সজীব রাখে, অনাগত ভবিষ্যতের মর্ম্মবেদিকায় প্রতিফলিত সত্যের গৌরবোন্নতরূপ জাতীয় জীবনকে ছন্দোময় কর্ম্ম-মুখর করিয়া তোলে। নানা রূপক ও সত্যমিথ্যার চাপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ চরিত্ররূপ অর্দ্ধ বিকৃত ও যথা-দৃষ্ট হইয়া সমাজ ও ধর্ম্ম জীবনে বহু অসঙ্গতির কারণ হইয়া উঠে। নবীন চন্দ্র আপনার সত্য দৃষ্টি ও প্রতিভার দিব্যালোকে নিখিল প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ মানব ছবি আর্য্য মানস-লোকে প্রতিষ্ঠা করত আত্মবোধিকে জাগ্রত করিয়া মহতী বিনষ্টি হইতে জাতি তথা সমাজকে বহুলাংশে রক্ষা করিয়াছেন।

মানববুদ্ধির পরিণাম যত সুদূর প্রসারী হউক না কেন, তাহা অবশ্যই পরিমিত। অমানুষিক বা অতিমানুষিক কোন চারিত্রিক আদর্শ—ক্ষণিক বিস্ময়-রসের সৃষ্টি করিলেও, মানসলোকে স্থায়ী রেখাঙ্কনে সক্ষম নহে। পূর্ণমানবত্বই মানবের একমাত্র আদর্শ। এই আদর্শই মানুষ জীবন-রসরূপে সহজ করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। ইহার যথার্থ বিকাশ মানবীয় বৃত্তির সম্যক পরিস্ফুরণে, বৃত্তির সম্পূর্ণতায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনে সমগ্র মানবীয় বৃত্তির পরিপূর্ণ উৎকর্ষ লাভ ঘটিয়াছিল, যাহা আর কাহারো জীবনে ঘটে নাই। শ্রীকৃষ্ণের মহাজীবনাদর্শই মহাকাব্য ত্রয়ে প্রকটিত।

মহামানবতার সম্যক্ উপলব্ধিপথে মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধিই প্রধান অন্তরায়। শ্রীকৃষ্ণ প্রথম জীবনেই জাতিভেদের প্রাচীর উঠাইয়া দিয়া, মানুষে মানুষে মিলনের পথ সুগম করেন। জ্ঞানের উচ্চ আসনে আসীন যিনি, তিনিও সবাইকে আপনার মাঝে আর আপনাকে সবার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট ভেদবোধের স্থান কোথায়? অজ্ঞানেরই ত এই সব সংস্কার! পরিপূর্ণ জ্ঞানালোকে এই অন্ধতা অবশ্যই বিনাশ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

> "একই মানব সব একই শরীর,
> একই শোণিত মাংস ইন্দ্রিয় সকল
> জন্ম মৃত্যু একরূপ, তবে কি কারণ—
> নীচ গোপজাতি আর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ?"

নিখিল মানবে এক আত্মার অনুভব-মাহাত্ম্যের অপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গে তরঙ্গিত—শ্রীকৃষ্ণহৃদয়ে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব মহাসত্যের প্রকাশ হয়। 'সর্ব্বভূতাশয় অনন্তশক্তি নারায়ণের' আবির্ভাব ঘটে,—

> "এক জাতি মানব সকল
> এক বেদ মহাবিশ্ব অনন্ত অসীম,
> একই ব্রাহ্মণ তার মানব হৃদয়
> একমাত্র মহাযজ্ঞ স্বধর্ম্ম সাধন,
> যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ।"

সর্ব্বশক্তিমান নারায়ণই একমাত্র আরাধ্য। যাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে রবি শশী তারা নিয়ন্ত্রিত, অনন্ত প্রকৃতি শাসিত, পরিচালিত। তিনিই মানব সাধারণের একমাত্র কাম্য। সত্য-চৈতন্যময়ত্বই তাঁহার স্বরূপ। চেতন মানব জড়ের উপাসনা কেন করিবে? সত্য চৈতন্যময় নারায়ণের উপাসনাই ত নিখিল মানবজাতির একমাত্র লক্ষ্য,—

> "করিনু প্রচার
> কেবা ইন্দ্র? বর্ষে মেঘ স্বভাবে চালিত
> সঞ্জীবনী সুধারাশি, স্বভাবে চালিত
> ভ্রমে রবি শশী তারা, বহে সমীরণ

স্বভাব নিয়ন্তা এক বিষ্ণু মহেশ্বর,
স্বভাবের অনুবর্ত্তী বিশ্ব চরাচর—"

পরে মানুষের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া আবার বলিতেছেন—

"মানব চেতনাযুক্ত বিবেকী স্বাধীন
জড় ঐ সূর্য্য হতে কত শ্রেষ্ঠতর,
মানব উৎকৃষ্ট সৃষ্ট যে অনন্ত জ্ঞানে
সৃষ্ট ও চালিত এই বিশ্ব চরাচর
পড়েছে সে জ্ঞানছায়া হৃদয়ে যাহার
ছাড়ি সে অনন্ত জ্ঞান অনন্ত শকতি
সে কেন পূজিবে অন্ধ জড় প্রভাকর।"

সমগ্র ভারতবর্ষে অখণ্ড ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন শ্রীকৃষ্ণের প্রধান জীবন-ব্রত। শতধা-বিভক্ত ভারতবর্ষের এক অবিভক্ত ভাবমূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র ধ্যানসম্পৎ। ভারতীয় রাজন্যবর্গের স্বার্থান্ধ লোলুপ দৃষ্টি পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচীনতম বৈদিক সভ্যতার সাম্য-মৈত্রীভাব তামসিক যজ্ঞ প্রভাবে বিনষ্ট হওয়ায় সমগ্র জাতি ব্যক্তিসুখপরায়ণ হইয়া উঠে। হিংসা সঙ্কীর্ণ নীচ আদর্শ জাতিকে দিন দিন ঘৃণ্য ও অবনমিত করিতেছিল। তদানীন্তন ভারতের এই আত্মবিধ্বংসী দুরবস্থার চিত্র নবীনচন্দ্রের দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"প্রত্যেক নৃপতি
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল মত রয়েছে চাহিয়া
নিজ প্রতিবাসী পানে, ভাবিছে সুযোগ,
বজ্রলম্ফে পৃষ্ঠে তার পড়িবে কখন।"

রাজন্যবর্গের এই দুষ্টবুদ্ধি ও হীন দৃষ্টির ফলে জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির চরম দুরবস্থা,—

"দহিয়া দহিয়া এই হিংসার অনলে
কমলার পদা'শ্রত বাণিজ্য কমল,—
জ্ঞানের সহস্রদল ভারতী আশ্রয়
শুকাইছে; পড়িয়াছে হেলিয়া পশ্চিমে
আর্য্য সভ্যতার রবি আর্য্যধর্ম্ম নীতি
প্রীতিময়, প্রেমময়, শান্তিসুধাময়
হইয়াছে পৈশাচিক যজ্ঞে পরিণত।
রাজ্যভেদ গৃহভেদ জাতিভেদ প্রভু,
ভারতের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে হায়!"

বর্ত্তমানে খণ্ডরাজ্যের বিলোপে দ্রষ্টা কবির স্বপ্নদৃষ্ট অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু কবি-কল্পিত 'প্রীতিময়, প্রেমময় শান্তিসুধাময়' রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে এখনো অনেক সময় লাগিবে।

সমাজে ও ধর্ম্মে এই ভেদবুদ্ধি কাহার সৃষ্টি? হীন স্বার্থবুদ্ধির আশ্রয়ে অখণ্ড সত্যবোধের প্রতিবন্ধকতা আনয়ন করিয়া জাতীয় দৃষ্টিকে যাহারা আচ্ছন্ন করিয়াছেন, তাঁহারা মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী'র দল। সরল বৈদিক ধর্ম্মকে পৈশাচিক যজ্ঞে তাঁহারাই ত রূপান্তরিত করিয়াছেন। সকল ভেদবুদ্ধি ত' তাঁহাদেরই। যাহার ফলে এক অখণ্ড জাতি অগণিত জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে,—

'সরল বৈদিক ধর্ম্ম পূজা প্রকৃতির
সারল্য সৌন্দর্য্যমাখা আর্য্য শৈশবের
সে সরল হৃদয়ের তরল প্রবাহ—
পৈশাচিক যজ্ঞে যারা করিছে বিকৃত;
মহর্ষি, বিপ্লবকারী আমি কি তাহারা?
পবিত্র উত্তর-কুরু হইতে যখন
উচ্চারি পবিত্র ঋক্ গাহি সামগান
আসিলা ভারতে সেই পিতৃদেবগণ—
আছিল কি চারি জাতি? লইল যখন
কেহ শস্ত্র, কেহ শাস্ত্র, বাণিজ্য কেহবা
সমাজের হিতব্রতে হইল যখন
কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ বা মস্তক—
আছিল কি জাতিভেদ? কাটিয়া যাহারা
সুন্দর সমাজদেহ, মূরতি প্রীতির—
করিতেছে চারিখণ্ড, প্রতিরোধি' বলে
অঙ্গ হতে অঙ্গান্তরে শোণিত-প্রবাহ,
মহর্ষি বিপ্লবকারী আমি কি তাহারা?'

শৈশব, কৈশোর, যৌবন প্রভৃতি অবস্থান্তর যেমন ব্যক্তিজীবনে সত্য, তেমনি সমাজ জীবনে, রাষ্ট্র-জীবনে, তথা ধর্ম্ম জীবনেও সত্য। কৈশোরের যাগ-যজ্ঞাদি কৈশোরে সত্য হইলেও সমাজের অবস্থাবিশেষে তাহা প্রয়োজনীয় নহে। ক্রমবিবর্ত্তন এখানেও অপরিহার্য্য—

'সমাজ কৈশোরে—
যাগযজ্ঞ নানা ক্রীড়া, যৌবনে তাহার
শৈশবের হাসি ত্রাসে, কৈশোর ক্রীড়ায়
ভরে না হৃদয় আর, তখন মানব
দেখে সেই ইন্দ্র চন্দ্র নিয়মের দাস
কষ্টের শৃঙ্খলে গাঁথা। মানব হৃদয়
হইয়া পিপাসাতুর চাহে বুঝিবারে
সুদর্শন নীতিচক্র, নিয়ন্তা তাহার—
মহান বিজ্ঞান বিশ্ব। আর্য্য সমাজের
শৈশবের সত্যযুগ, ত্রেতা কৈশোরের
হয়েছে অতীত দেব, এবে উপস্থিত
যৌবনের যুগান্তর।'

এই যুগান্তর কে আনয়ন করিবে? মানুষের ব্যক্তিসত্তার মূল্য কতটুকু? কর্ম্মে তাহার স্বাধীনতাই বা কত? অজ্ঞাত অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস মানুষের কত আশা-আকাঙ্ক্ষার সত্য সুখ-স্বপ্নকে মুহূর্ত্তে ধরণীর পাংশু ধূলায় লুটাইয়া দেয়। অ-দৃষ্ট-চালিত পরাধীন মানব তাহার ক্ষুদ্র জ্ঞানবলে একটি জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে কেমন করিয়া সাহস করিবে!

জীবজগতের পরিচালনার মূলে রহিয়াছে অদৃষ্ট ও পুরুষকার। এই দুয়ের অনুশীলন আর্য্যদর্শনে। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষকারের জীবন্ত বিগ্রহ, অদৃষ্টে ও তিনি আস্থাবান। স্বভাবের পরিবর্ত্তন দুঃসাধ্য হইলেও স্ব-ভাব মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন, যে ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ প্রকৃতির বিকার ঘটাইয়া জাতির অগ্রগতি ব্যাহত করে,—তাহার প্রতিরোধে শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধপরিকর। যে নদী মরু-পথে পথ হারাইতে বসিয়াছে, তাহার গতি বাড়াইয়া দিয়া মহাসাগর সঙ্গমে চালাইয়া দেওয়া কি মানবের স্ব-ধর্ম নহে!

'রোধিতে সে স্রোত, শক্তি নহে মানবের।
জাতীয় জীবনস্রোত কিন্তু স্বার্থ বলে

অনন্ত মরুর দিকে লয়েছে ঠেলিয়া
প্রকৃতির গতি দেখ ; করি অবরোধ
করিব নিষ্ফল তাহা, লব ফিরাইয়া
অনন্ত সিন্ধুর দিকে।'

কোনো ব্যক্তিমানব এই অসাধ্য সাধন করিতে পারেন নাই। ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত ইহা নহে। কবি এখানে শ্রীকৃষ্ণে অদ্বৈতরূপের সমন্বয় ঘটাইয়াছেন। খণ্ড-অখণ্ডে সীমা অসীমে ব্যক্তি-নৈর্ব্যক্তিকে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এই সাধনপর্য্যায়ে মানুষ নারায়ণ। ষোড়শ শতাব্দীর মহাবাণী 'নর বপুঃ তাহার স্বরূপ।'—মানুষ ভাগবতী সত্তার অধিকারী,—

'একক, একক আমি নহি ভগবান !
যাহার সহায় স্রষ্টা বিষ্ণু বিশ্বরূপ
নারায়ণ, একক সে নহে কদাচন।
আমি কে মহর্ষি ? আমি, আমরা সকল,
জগৎ তাঁহার অংশ, তাঁর অবতার,—
সোঽহং আমি নারায়ণ। একক ত নহি,
আমি একত্ব তাহার। সর্ব্বভূতময়
আমি, আমি সর্ব্বপ্রাণী, আমি বিশ্বরূপ।

বিশ্বের জীবন আমি আমাতে জীবিত
চরাচর, জন্ম-মৃত্যু স্থিতি রূপান্তর।
নাহি ব্রহ্মা নাহি রুদ্র, আমি ক্রীড়াবান
একমেবাদ্বিতীয়ম্,—আমি ভগবান।'

সর্ব্বভূত হিতসাধনই শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত নবধর্ম্মের একমাত্র ভিত্তি। বিশ্বের অপরাপর সকল ধর্ম্মমতই অল্পবিস্তর সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ রেখায় আবদ্ধ। আপন আপন সম্প্রদায়ের হিত সুখ সাধনই তাহার মূল লক্ষ্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত ধর্ম্মমতই একমাত্র সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম। কেবল বিশ্বমানবের নহে—সর্ব্বভূত হিতসাধনই তাহার মূল ভিত্তি। বিশ্বমানবতার উহাই একমাত্র আশ্রয়, সর্ব্বভূতালয় নারায়ণের অভয় মহামন্ত্র এই বাণীই যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

'ভ্রান্ত নরগণ—
ত্যজি' সর্ব্ব ধর্ম্ম লও আমার শরণ
আমার অনন্ত বিশ্ব ধর্ম্মের মন্দির—
ভিত্তি সর্ব্বভূত হিত ; চূড়া সুদর্শন,
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম, লক্ষ্য নারায়ণ।'

সর্ব্বভূতে নারায়ণ বুঝিতে, নিষ্কাম কর্ম্মযোগে বিশুদ্ধ মানব সত্তা সমাজ গঠনের ভার গ্রহণ করিলে তবেই ধর্ম্মাশ্রয়ে খণ্ড ভারতে অখণ্ড মহাভারত সংস্থাপিত হইবে,—

'নারায়ণে কর্ম্মফল করি সমর্পণ—
বিনাশিয়া স্বার্থজ্ঞান করিলে নিষ্কাম
সাম্রাজ্য সমাজ ধর্ম্ম—হইবে অচিরে
খণ্ড এ ভারতে মহাভারত স্থাপিত।'

কবির মানসচক্ষে ভারতমাতার অখণ্ড রূপ অপূর্ব্ব। মায়ের রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে দেখাইতেছেন,—

'না, না, দেখ বীরবর
উত্তর প্রাচীরোপর
রাজরাজেশ্বরী মাতা সাম্রাজ্যরূপিণী
শিরে শুভ্র সুধাকর
শোভে পঞ্চভূতোপর
জননীর রাজাসন ; দূর রুদ্রধাম
হইয়াছে জননীর অরুণ বরণ
পাদাম্বুজ বসুন্ধরা
দেখ কিবা মনোহর
সাম্রাজ্ঞীর সমরাস্ত্র রাজপ্রহরণ
চারিদিকে চারিভুজে শোভিছে কেমন।
ত্রিকাল ত্রিনেত্রে ভাসি
অধরে প্রীতির হাসি
পার্থ, জগন্মাতা রূপ দেখ নেত্র ভরি—
মহাভারতের চিত্র রাজরাজেশ্বরী।'

জগন্মাতা যে-সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা মহামানব ধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্ম হইতে অভিন্ন। ক্ষেত্র বিশেষে হিংসা অহিংসায় ও অহিংসা হিংসায় রূপান্তরিত হয়। জীবধর্ম্ম রক্ষণে তথা সাম্রাজ্য পরিচালনে ইহা অপরিহার্য্য। সামর্থ্যহীনের ক্লীবত্বপ্রকাশ অহিংসা নহে। সর্ব্বভূত-হিতসাধনের পথে বিঘ্নকারীর বিনাশসাধনে নিষ্কাম অহিংসাব্রতরূপেই গণ্য হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সমরতত্ত্বের উপদেশ দিতেছেন,—

'সমর সর্ব্বত্র পাপ নহে ধনঞ্জয়,
রক্ষিতে দশের ধর্ম্ম
নহে পার্থ পাপকর্ম্ম
একের বিনাশ, পার্থ নিষ্কাম সমর
নাহি ততোঽধিক পুণ্য শ্রেষ্ঠতর।'

সৃষ্টি রক্ষার মূলে রহিয়াছে এই নিষ্কাম সমর। ইহা স্রষ্টারই অমোঘ বিধান। প্রত্যেক ধ্বংসের মূলে নিহিত রহিয়াছে উৎকৃষ্ট সৃষ্টিবীজ। প্রাকৃত রাজ্যেও এই ধ্বংসতত্ত্বের বিরাম নাই, ব্যতিক্রম নাই। এই বিনাশ নবজীবনেরই রূপান্তর—শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

'দেখ সখে সৃষ্টিরাজ্য
স্বয়ং স্রষ্টার কার্য্য
দেখ তাহে ধ্বংসনীতি অসংখ্য কেমন,
সাধিতে সৃষ্টির তত্ত্ব
প্রতিকূল কি অশক্ত
যেই জন, ধ্বংস তার ঘটিছে তখন,
কি রহস্য, মৃত্যু এই জগতজীবন।'

নিষ্কাম সমরের তখনই প্রয়োজন ঘটে, যখন শান্তি স্থাপনের সমস্ত সহজ পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। সেই অহিংস নিষ্কাম সমর বীর সাধক মাত্রেরই তাহা বরণীয়। সাম্রাজ্য ও সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইহার অবশ্যই প্রয়োজন রহিয়াছে—স্বধর্ম্ম রক্ষায়ও মূল ইহাতে—শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

'শিখাব একত্ব মর্ম্ম
এক জাতি এক ধর্ম্ম
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন
সমগ্র মানব প্রজা—রাজা নারায়ণ
পাদাম্বুজে যদি পার্থ
সাধিতে এ পরমার্থ

নাহি পারি, জননীর আছে ধনুঃশর
প্রবেশিব ধর্ম্মরণে নিষ্কাম অন্তর।
যুদ্ধ পাপ ঘোরতর
যতক্ষণ বীরবর
থাকে অন্যপথ ধর্ম্ম করিতে পালন
নিরুপায়ে বীরব্রত পুণ্য প্রস্রবণ।'

সর্ব্ব প্রকার বাসনাশূন্য হইয়া নিখিল জগতের মঙ্গল সাধন নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কখনো বন্ধনের বা অধর্ম্মের কারণ হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন—

'পার্থ সর্ব্বভূত হিত
যাহাতে হয় সাধিত
নিষ্কাম সে কর্ম্ম, ধর্ম্ম পুণ্যফল তার
হয় সর্ব্বভূত-আত্মা বিষ্ণুতে সঞ্চার।'

সর্ব্বভূতে আত্মোপলব্ধি যাহা অদ্বৈত অনুভূতিরই নামান্তর, তাহাতে জীবধর্ম্মের অনিবার্য পরিণাম যে জন্ম-মৃত্যু, তাহাতে বিচলিত হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। সমগ্র বিশ্বই তাঁহার অনন্তরূপ। জলবিন্দু জলেই জন্মে আবার জলেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। যুগ-যুগান্ত ধরিয়া সেই পরমাত্মা পরম পুরুষেই অনন্ত জগৎ জন্মিয়া জন্মিয়া তাহাতেই বিলয়প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। জগতের চিরমঙ্গল সাধনে ব্যক্তি-জীবনাহুতি উত্তমধর্ম্ম সন্দেহ নাই,—

'বিষ্ণু সর্ব্বভূতময়
জন্ম মৃত্যু কিছু নয়
জলবিন্দু জলে জন্মে জলে হয় লয়,
সোঽহং সঙ্গীতে পূর্ণ বিশ্ব সমুদয়।
জগতের সুখ যাহা
আমাদের সুখ তাহা
সকলে জগৎ সুখে সমর্পিলে প্রাণ
হবে ধরাতলে কিবা স্বর্গ অধিষ্ঠান।'

সর্ব্বভূতের হিতসাধন রূপ মহা মানব ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম হইতেও মহত্তর। কারণ, বেদবিহিত ধর্ম্মে কামনার অবকাশ রহিয়াছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

'নহে পূর্ণ ধর্ম্ম যদি না হয় নিষ্কাম
যাগ যজ্ঞ ব্রত ধর্ম্ম জ্ঞানের সোপান।'

তাই, সর্ব্বভূত-হিতসাধন রূপ নিষ্কাম ধর্ম্ম সম্যক অনুষ্ঠিত হইলেই নব-মহাভারত রূপ ধর্ম্মরাজ্য অবশ্যই সংস্থাপিত হইবে—দিব্য প্রেমের আবির্ভাবে সর্ব্ববিধ ভেদবুদ্ধি অপসৃত হইবে—

'এক ধর্ম্ম এক জাতি এক রাজ্য এক নীতি
সকলের এক ভিত্তি সর্ব্বভূতহিত—
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম
একমেবাদ্বিতীয়ং করিব নিশ্চিত
ওই ধর্ম্মরাজ্য মহাভারত স্থাপিত।'

সভ্যতালোকদীপ্ত বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ইহার অপেক্ষা সুন্দরতর মঙ্গলপ্রদ ধর্ম্ম সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা করা যায় বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের অভীপ্সিত নব মহাভারত স্থাপনায় পার্থই তাঁহার বাহুবল, তাহাকে দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে সুভদ্রা-পরিণয়। সর্ব্বভূতময় নারায়ণের পবিত্র আদর্শসা রাজ্যে, সমাজে ও ধর্ম্মে প্রচারণার জন্য রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান। সর্ব্বমানবে প্রেমধর্ম্ম বিতরণও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই শুভ উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রধান অন্তরায় দুর্য্যোধন ও শকুনি প্রভৃতির দুষ্ট বুদ্ধি। কপট দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবের পরাজয় ও বনবাসের ব্যবস্থায় অধর্ম্মের অতি-প্রসারতাই সূচনা করে। শান্তি-প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। সত্যাশ্রয়ী মনীষিবৃন্দেরও এ সময় বুদ্ধি-বিভ্রান্তি ঘটে। সত্যাসত্যের যাথার্থ্য নিরূপণে তাঁহারাও অসমর্থ হন।

'অন্যের কি কথা ভীষ্ম দ্রোণ পূজ্যতম
ভাবেন অধর্ম্মে ধর্ম্ম, কুজ্ঝটিকামত
ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হায় তাঁদেরও নয়ন।'

কুরু ও পাণ্ডব উভয়ের অন্নপুষ্ট ভীষ্ম ও দ্রোণ, অধর্ম্ম-প্রভাবে তাহারাও বুদ্ধিভ্রষ্ট। তাঁহাদের এত কাল ভুক্ত অন্নের অর্দ্ধাংশ যে পাণ্ডবের, একথা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। অন্নদাতার পাপ-বৃত্তির প্রশ্রয়দানকে শ্রীকৃষ্ণ সমর্থন করেন নাই—

'অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হায় কি গভীর
অন্নদাতা হয় যদি পাপে প্রবর্ত্তিত
হইতে হইবে শুধু সহায় তাহার।
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম হায় বলিব ইহারে ?
পাপের প্রশ্রয় দেব ! নহে পাপাচার।
অন্নদাতা হয় যদি পাপে প্রবর্ত্তিত।
নিবারিব যথাসাধ্য করি প্রাণপণ
না পারি রহিব দূরে ব্যথিত অন্তরে,
ইহা কৃতজ্ঞতা, ইহা ধর্ম্ম সনাতন।'

অধর্ম্মের প্রভাব হইতে জাতি ও সংস্কৃতিক রক্ষা করিতে শ্রীকৃষ্ণ আপনার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিলেন। সর্ব্বশেষে দৌত্যবৃত্তি গ্রহণ করিয়াও তিনি সফল হইতে পারিলেন না। অবশেষে অধর্ম্মের শোচনীয় পরিণাম 'ধ্বংসের' পথই উন্মুক্ত হইল। শকুনি-দুর্য্যোধনের —দুষ্টবুদ্ধির ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। কুরুক্ষেত্রে মহাসমরবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আদর্শ শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ। কাহারো প্রতি যেমন তাঁহার শত্রুবুদ্ধি নাই তেমনি নাই তাঁহার আত্মপ্রচারণার ক্ষীণতম প্রয়াস। আপনার সুসজ্জিত নারায়ণী সেনা দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ নিযুক্ত। সর্ব্বত্রই তাঁর সমদৃষ্টি। জন্ম-মৃত্যু, স্থিতি-সংহার—ইহার কোন রূপই শ্রীকৃষ্ণের নিকট পৃথক্ নহে। সর্ব্বত্র এক মহা অদ্বৈততত্ত্বের প্রকাশ। তাই একমাত্র নিম্নোক্ত উক্তি তাঁহার মুখেই শোভা পায়—

'শত্রু যুদ্ধকালে
কৌরবেরা, যুদ্ধ অন্তে ভাই পাণ্ডবের—
ঝটিকায় যে তরঙ্গ উত্তাল ফেনিল
মহাবক্ষে, ঝটিকান্তে অভিন্ন সলিল।'

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বগুণসম্পন্ন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত সন্দেহ নাই। তাঁহার ভগবদৈশ্বর্য্যও অতুলনীয় ও অবর্ণনীয়। কিন্তু নবীনচন্দ্র তাঁহার অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভায় অখিল আত্মার আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের যে সহজ সুন্দর অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় পূর্ণমানবচ্ছবি তাঁহার ঊনবিংশ শতাব্দীর নব-মহাভারতে অঙ্কন করিয়াছেন, বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুত্থান ও সর্ব্বশক্তিমান সমাজ সংগঠনে উহা যুগ-যুগান্ত ধরিয়া আলোকস্তম্ভস্বরূপ হইয়াই রহিবে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষা' শীর্ষক গ্রন্থে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্বন্ধটুকু এক বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। সাতচল্লিশ সালের পূর্বে দেশজোড়া শাসন ছিল ইংরেজের। জেলখানা আর থানিঘরে সর্দারি ক'রে পিটুনি-পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র জবরদস্ত শাসকের ভূমিকাই যে তাঁরা নিয়েছিলেন, তা নয়। ইম্পিরিয়েল সার্ভিসের ১ উর্দি প'রে সরকারী কলেজগুলোর গুরুপদে তাঁরাই বৃত হয়েছিলেন। আর তাঁদের শাসন আর নির্দেশ প্রশাসনিক হাজারো পথ বেয়ে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে যে সহজ স্বাভাবিক সম্বন্ধটুকু গড়ে উঠতে পারত, তা গড়ে উঠবার সুযোগ পায়নি। এই ব্যর্থতার কারণ বিশদভাবে নির্দেশ করতে গিয়ে কবি বলেন যে, ইংরেজ অধ্যাপক যখন এদেশে আসেন, তখন তাঁর সংগে আসে রাজ-শক্তি। তাঁর পতিতোদ্ধারের ব্রতই তাঁর অহংটাকে মাত্রাহীন ভাবে বড় করে দেয়। অধম জাতির সন্তানদের "মানুষ" করবার জন্য এদেশে এসেছি, এই ধারণাটাই সে যুগে বিদেশী শিক্ষকের সংগে ছাত্রের তার স্বাভাবিক মধুর সম্পর্কটুকু দানা বাঁধবার পথে অন্তরায় হ'য়ে দেখা দিত। শিক্ষক হাত বাড়িয়ে ছাত্রদের ডাকতেন না; আর ছাত্ররাও সংকোচে, বিতৃষ্ণায় ইংরেজ শিক্ষকের ত্রিসীমানায় যেতেন না। ছাত্র-শিক্ষকের অবাধ সম্পর্কে কৃত্রিম বাধার বাতাবরণ সৃষ্ট হতো।

ভেদবুদ্ধিটা সংক্রামক। কর্তৃপক্ষস্থানীয় শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকদের আচরণের অনুকরণ করতেন এতদ্দেশীয় অধ্যাপকদের মধ্যে কেউ কেউ। তার ফলে সমস্যাটা আরো বড় হয়ে দেখা দিত। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে এতৎসম্পর্কে আমাদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। স্বাধীনতা-উত্তর কালে এ সমস্যাটা নেই। কিন্তু শিক্ষক-ছাত্রের মধুর সম্পর্কটি তার স্বাভাবিক পরিবেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমন কথাও বলা চলে না। দৈনিক কাগজে গুরুনিগ্রহের খবর প্রায়ই পড়া যায়। অবশ্য গুরুদক্ষিণা দেওয়ার সংবাদ যে একেবারেই পড়া যায় না, তা নয়; তবে এ কথা বললে সত্যের অবমাননা করা হবে না যে, আধুনিককালে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সম্বন্ধটুকু ক্রমেই শিথিল এবং অপ্রাকৃত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থীর অনেক অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে। শিক্ষকেরও অভিযোগের অন্ত নেই। ছাত্র শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে না, সম্মান দেখায় না, শিক্ষক ছাত্রকে স্নেহ করেন না, তার কল্যাণ কামনা করেন না। শিক্ষক আজ অর্থান্বেষী বুদ্ধিজীবী মাত্র। শিক্ষকের সংগে শিক্ষার্থীর সম্বন্ধটুকু আর্থিক লেনদেনের পর্যায়ে নেমে এসেছে। ছাত্র মনে করে সে বিদ্যালয়ে প্রদত্ত বেতনের পরিবর্তে শিক্ষকের নিকট থেকে পাঠ নিচ্ছে। সেখানে শ্রদ্ধা, বিনয়, সম্মানপ্রদর্শন বাহুল্য মাত্র। অথচ আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য একথা অসংশয়িত সত্যরূপে প্রচার করেছে যে, বিদ্বানই বিনীত। 'বিনীত' এবং 'বিদ্বান'—এই দুটি শব্দকে বহু ক্ষেত্রেই সমার্থক বলা হয়েছে।

জ্ঞানলাভ করতে হবে শ্রদ্ধার সঙ্গে। শিক্ষক বুদ্ধিজীবী মাত্র নন। তিনি 'গরিষ্ঠ,' তিনি 'গাতুভিৎ'; শিক্ষককে বেদে 'গাতুভিৎ' বলা হয়েছে। ক্ষুধা, অবিদ্যা এবং অস্বাস্থ্য থেকে মুক্তির পথ তিনি দেখান বলেই তিনি 'গাতুভিৎ'। সংসার অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন। অজ্ঞানতা সব পাপ এবং দুঃখের উৎস। এই অজ্ঞানতাই রোগ এবং অস্বাস্থ্যের আকর। তাই এই অজ্ঞানতা দেশ থেকে দূরীভূত করতে পারলে দেশের লক্ষ-কোটি মানুষ ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পাবে। মানুষের ক্ষুধার নিবারণের জন্য প্রচুর খাদ্য দরকার এবং তার জন্যই করতে হবে উন্নততর প্রণালীতে খাদ্যোৎপাদন। এর জন্য প্রয়োজন বিশেষ জ্ঞানকে: অর্থাৎ যথাযোগ্য টেকনিক বা উৎপাদন-শৈলীতে খাদ্যোৎপাদন করতে হলে তার জন্য নিয়োগ করতে হবে উন্নততর বিজ্ঞানের। এই জ্ঞান দেবেন শিক্ষক; তিনি হবেন কারুকার, তিনি হবেন শিল্পী। জ্ঞানই শক্তি। যিনি পরম 'জ্ঞানী', তিনিই অনন্ত শক্তির অধিকারী। আমাদের দেশে শিক্ষককে 'জ্ঞানী' বলা হয়েছে। তিনি তাই অসীম বলে বলী; জ্ঞানের এই মহতী শক্তি শিক্ষকের আয়ত্তাধীন; তাই তিনি 'গরিষ্ঠ।'

একদিকে রয়েছেন এই গাতুভিৎ শিক্ষকের দল, অন্যদিকে রয়েছে স্ফুটনোন্মুখ তরুণ প্রাণের পদ্মকোরকগুলি। ছাত্ররা বিদ্যালয়ে আসছে দলে দলে তাদের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ-সাধনের জন্য। তারা আসবে সেবার মন্ত্র নিয়ে; তাদের মস্তক নত হয়ে থাকবে গুরুর চরণে; তারা গুরুর সেবার মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজের সেবা করবে। বিনয় হবে তাদের মনের পরম ভূষণ। তারা যখন গুরুগৃহে আসবে, তখন ত্যাগের মন্ত্র নিয়ে আসবে তারা; ভোগটাকে আশ্রমের বাইরে পরিহার করে আসবে। রাজার তনয় ভুলে যাবে যে, সে রাজপুত্র। গুরুর সেবা, দেশের কল্যাণ সাধন, এর মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। গুরুর ব্যক্তিগত কাজকর্মের অবকাশে ছাত্র বৃহত্তর সমাজের কল্যাণমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করবে। সন্ন্যাসীকল্প গুরুর সমিধভার আহরণ ও গোপালন প্রভৃতি কর্মে কতই বা সময় কাটানো যায়। অথচ সকল ছাত্রকেই গুরুর সেবা ক'রে এই সেবার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে হবে। তাই আধুনিক শিক্ষাশাস্ত্রীরা বলেছেন যে, প্রাচীন যুগের এই গুরুসেবা সমাজসেবারই নামান্তর। শিক্ষার্থী যখন গুরুগৃহে শিক্ষার জন্য যেতো, তখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মনে সেবার কথাটাই বড় হয়ে দেখা দিতো। জ্ঞানের কথাটা, শিক্ষার কথাটা উহ্য থাকত। তাইত ঋষি বিশ্বামিত্র যখন তাঁর যজ্ঞাদি রক্ষার জন্য রাম-লক্ষ্মণকে চাইলেন রাজা দশরথের কাছে, তখন সেবার কথাটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। রাম-লক্ষ্মণের শিক্ষার কথাটা একবারও কেউ উচ্চারণ করেননি। রাজর্ষি বশিষ্ঠ রাজা দশরথকে বললেন যে, আপনি রাম-লক্ষ্মণকে ঋষি-মুনিদের সেবায় নিয়োজিত করুন। এই সেবার পথেই তারা জ্ঞানবান্ হবে। এই ভাবে তারা যে জ্ঞান অর্জন করবে, তা অন্য কোন বিদ্যাগৃহ থেকে কখনই তারা লাভ করতে পারবে না। এই সেবাব্রতী শিক্ষার্থীর দল যখন গুরুগৃহে উপস্থিত হতো, তখন গুরু তাদের

১। 'ছাত্রশাসন তন্ত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

স্বাগত জানাতেন সমবায়ী সমাজের কর্মী হিসাবে। তাঁদের পুত্রাধিক স্নেহে গ্রহণ করতেন আপনার মানসপুত্ররূপে। তারা গুরুর চোখে 'অনাবশ্যক', 'অতিরিক্ত' 'বাহুল্য' রূপে প্রতিভাত হতো না।

গুরু ছাত্রকে বিদ্যাদান করেন ; গুরু ছাত্রের সেবাও করেন, যেমন সেবা পিতা করেন তাঁর পুত্রদের। তাইত দেখি ঋষি বিশ্বামিত্র পাতার শয্যা পাতছেন তাঁর শিষ্য রাম ও লক্ষ্মণের জন্য ; তাইত গুরু বিশ্বামিত্রকে দেখি ব্রাহ্মবেলায় তাঁর ছাত্রদের ঘুম ভাঙাচ্ছেন। আশ্রমের নূতন পরিবেশে রাজপুত্রেরা ব্রহ্মচারীর জীবনধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে। এই পারস্পারিক সেবাই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধা এবং প্রীতির সম্পর্কটুকুকে অক্ষয় করে রেখেছিল ; বৈতনিক সম্পর্কের কলুষতা আমাদের প্রাচীন শিক্ষাশ্রমের পবিত্র সম্পর্কটুকুকে কোথাও ব্যাহত করেনি।

সেদিন জীবনও এমন জটিল ছিল না। বিদ্যাশ্রমের স্থলে বিদ্যাদানের কল প্রতিষ্ঠিত হয়নি দেশের শহরে ও গ্রামে। সেদিন শিক্ষাগুরুকে অর্থ দিয়ে ক্রয় করা যেতো না। তারই ঐতিহ্য ত' এই সেদিনও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বুনো রামনাথের জীবনাদর্শে। সে জীবনাদর্শ দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত ; সেই মানুষটি সমস্ত মানুষের হয়ে অহংমণ্ডিত হয়েছিলেন ; সে জ্ঞানময় অহংবোধ সমগ্র মনুষ্যসমাজের পরম ঐশ্বর্য্য। এই অহংকারপটেই ত' বিশ্বকর্মা বিশ্বশিল্প সৃষ্টি করেন। শিক্ষককে যদি শিল্পী বলি, তবে এই অহংকার তাঁর ভূষণ। এই অহংকারই তিনি শিক্ষার্থীর মধ্যে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, অনুস্যূত করে দেন। ছাত্রসমাজে অনুপ্রাণিত হয় নূতন মর্য্যাদাবোধের ধারা। ছাত্রজীবন হল বয়ঃসন্ধির কাল। এই কালটিতে তরুণ প্রাণে আত্মমর্য্যাদাবোধের বীজ উপ্ত হয়। সামান্যতম স্নেহ-ভালবাসার আবেদন হৃদয়কে দুকূলপ্লাবী বন্যায় প্লাবিত করে দেয়। আবার সামান্যতম অবহেলায় ও দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে তারা মুহ্যমান হয়ে পড়ে। শিক্ষক এই সময়টিতে যদি ছাত্রদের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করেন, ছাত্রদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি সহানুভূতির সংগে বিচার করেন, তবে তিনি অনায়াসে ছাত্রদের হৃদয়রাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হবেন। আর ভারতীয় ঐতিহ্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কটুকুকে এই আলোয় ভাস্বর করে রেখেছিল। কোথাও শিক্ষক আপনাকে শিক্ষার্থীর থেকে ভিন্ন করে রাখেননি। তাঁরা একই জগতে বাস করেছেন। পরস্পরের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নায় শিক্ষক-ছাত্রের সমবায়ী জীবনে আলো-ছায়ার নিত্য খেলা চলত। গুরু সস্নেহে, পরম শ্রদ্ধায় ছাত্রকে হাত ধরে আপনার পাশে বসিয়েছেন। তাই ছোট-বড় গুরু-লঘুর প্রশ্নটা ওঠবারই অবকাশ পায়নি। তাই আমাদের দেশের চোদ্দটি ভাষার কোনটিতেই 'To teach' এই ক্রিয়াপদটির মূল প্রতিশব্দ নেই ; আমরা 'শিক্ষা' শব্দটি থেকে কৃত্রিম উপায়ে নিজন্ত ক্রিয়া বানিয়ে নিয়েছি আমাদের সুবিধামত। কিন্তু মূল শব্দ যেটি ভারতীয় ভাষায় পাই, সেটি হচ্ছে শিক্ষা।২ আমরা শিখি, শেখাই না। ভারতীয় শিক্ষক অনুশীলন করেন, শেখেন ; ছাত্র তার অনুসরণে আত্মানুশীলন করে। তাই আমাদের প্রাচীন গুরুগৃহে শিক্ষক এবং ছাত্র স্ব স্ব মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষাশ্রমে শিক্ষক বা গুরুর যেমন প্রয়োজন রয়েছে, ছাত্রদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য, ঠিক তেমনিভাবে গুরুর পক্ষে আত্মোৎকর্ষ সাধনের জন্য ছাত্রদেরও একান্ত প্রয়োজন। ছাত্রদের উপলক্ষ্য করেই ত গুরুর জ্ঞানের তপস্যা অব্যাহত চলে। গুরু যে সাত্ত্বিক। তাঁর জ্ঞানের আলো ছাত্রদের মনের প্রদীপের শিখায় জ্বালিয়ে দিতে না পারলে ত তাঁর জ্ঞানসাধনা সার্থক হল না। তাই ত আমাদের প্রাচীন গুরুগৃহের আদর্শে ছাত্র এবং শিক্ষকের সম্পর্কটুকু মধুর হয়ে গড়ে উঠেছিল অতীত ভারতের ইতিহাসে। আজ তার বড়ই অভাব দেখা যাচ্ছে। বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ছাত্র এবং শিক্ষককুলের চিন্তাধারা। তাঁরা কেন-দেনের দৃষ্টিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পবিত্র সম্পর্কটুকু দেখছেন বলেই যত সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। শিক্ষক মনে করছেন না যে, ছাত্রের চরিত্রগঠনে, তার মনুষ্যত্বের বিকাশসাধনে, তাঁর কোন দায়িত্ব আছে। তিনি নিয়ম মাফিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছেন, আসছেন, ক্লাশ নিচ্ছেন ঘ'ড়ি দেখে। কিন্তু হয়ত দায়িত্বটুকু পুরোপুরি নিচ্ছেন না। তাঁকেও দোষ দিই না। অর্থনৈতিক অবস্থা আজ মধ্যবিত্ত-সমাজকে এমনই এক অবস্থার সম্মুখীন করেছে, যার মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে, মন নামক পদার্থ তিল তিলে তিলে অপমৃত্যু ঘটছে। প্রাণ-মন যেখানে মুমূর্ষু, সেখানে জ্ঞানদান কর্মটা কখনই সুষ্ঠু রূপে সম্পন্ন হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,৩ "জ্ঞানের আদান-প্রদানের ব্যাপারটি সাত্ত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্বোধিত করে। সেই জন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ। এইখানেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সত্য হয়, তবে ইহজীবনে তার বিচ্ছেদ নাই। তাহা পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর।"

শিক্ষক যেখানে জ্ঞানদানের পুণ্যব্রতে ব্রতী, সেখানে সাত্ত্বিক গুণের সমারোহ। সেই আনন্দ-যজ্ঞে গুরু এবং ছাত্র অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ— পিতাপুত্রের চিরায়ত সম্পর্কটুকু গুরু-শিষ্যের সহজ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আজ যখন বিদ্যাগৃহে বণিকবৃত্তি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তখন এই সহজ সম্পর্কটুকুর প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত হয়ে গেছে। টাকা-পয়সার লেনদেনের ওপর গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধটুকু যখন প্রতিষ্ঠিত হল এ যুগের বণিক-সভ্যতায়, তখন যা ছিল একান্ত সহজ এবং স্বাভাবিক, তাই দুর্লভ হয়ে উঠল। ছাত্র শিক্ষকের কাছ থেকে সেই ভালবাসাটুকু পেলো না, যা সে একান্তমনে কামনা করেছিল। তারও হতাশা সীমাহীন। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, জন্মাবধি দারিদ্র্যের সঙ্গে তার পরিচয়। জীবনের কুৎসিত রূপটাকে সে দেখেছে। সে 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে রেশনের চাল আর কেরোসিন এনেছে বাড়ীতে, তুচ্ছতম উপলক্ষ্যে কুৎসিত পারিবারিক কলহ প্রত্যক্ষ করেছে। আধপেটা খেয়ে বিদ্যালয়ে যেতে হয়েছে তাকে ; মাইনে বাকী পড়ার ফলে তার নাম কাটা গেছে ; এই জীবন-নাট্যের সে অসহায় দর্শক মাত্র। দুঃখের আর বেদনার বোঝা যখন বড্ড ভারী হয়ে উঠেছে, তখন সে নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচবার পথ খুঁজতে চেয়েছে। তাইত শহরের সিনেমা-ঘরগুলোর নীচের শ্রেণীর টিকিটগুলো কিনছে আমাদের দেশের কিশোর এবং যুবকরা। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্র। ছবিঘরগুলোর মূলতঃ যৌনবৃত্তির কণ্ডুয়ন হয় ; তাই তারা আস্তে আস্তে সর্বপ্রকার আদর্শবোধ হারিয়ে ফেলেছে। তারা

২ বিনোবাজীর 'Thoughts on Education' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

৩। 'শিক্ষা' গ্রন্থের ২২৩ পাতা দ্রষ্টব্য।

পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করতে ভুলে যাচ্ছে। ভাই বোনকে আর তেমন ভালবাসছে না। শিক্ষকদের সঙ্গে কোন সাত্ত্বিক সম্পর্কের কথা তারা ভাবতেই পারছে না। যুগধর্ম এই সব কিশোর মনকে এমন ভাবে কলুষিত করে দিচ্ছে যে, তারা আর শিক্ষককে গুরুর মর্যাদা দিতে পারছে না। এর জন্য আজকের সমাজের আদর্শভ্রষ্টতা, তার মূল্যবোধের বিকার পুরোপুরি দায়ী। জীবিকার্জন এবং জীবনধারণ এত বড়ো হয়ে উঠেছে যে, আদর্শ-জীবনবোধ আজ আর তার সঙ্গে পেরে উঠছে না। ব্যবহারিক প্রয়োজনের বিন্ধ্যগিরিটা এতই বেড়ে উঠল যে, আদর্শ জীবনবোধের আলো আজ আর তাকে অতিক্রম করে নীচের মানুষগুলোকে প্রাণ দিতে পারছে না। জানিনা কবে আবার এই ব্যবহারিক অগস্ত্যের আবির্ভাব ঘটবে? কবে আবার জীবনবাদের চূড়োটাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে আদর্শ-জীবনবোধের সূর্য্যটিকে আলো বিকীরণ করবার পথ দেবে। অবশ্য সে দিনটা খুব বেশী দূরে নয় বলেই মনে হয়। কেননা, ইতিহাসে এই সত্যের সন্ধান আমরা পাই যে, যখনই কোন প্রয়োজন গণমানসে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে, তখনই তা মেটাবার জন্য চুপি চুপি প্রস্তুতি চলেছে সকল চক্ষুর অন্তরালে। হঠাৎ একদিন বিরাট ওলোট পালটের মধ্য দিয়ে, বিপ্লবের ছদ্মবেশে প্রত্যাশিত পরিবর্তনটুকু এসেছে। আজ যখন আমরা সকলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্বন্ধের আমূল পরিবর্তন কামনা করছি, তখন তা আসবেই। তার জন্য সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তন হবে। দরিদ্র অবহেলিত শিক্ষকের দারিদ্র্য ঘুচবে। স্বচ্ছল জীবনযাত্রার স্বচ্ছন্দ পরিবেশে তিনি আবার তাঁর আদর্শবাদকে আপনার জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ করবেন। শিক্ষককে প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে সমাজ আর কার্পণ্য করবে না; আত্মপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক আবার আপনার চারিপাশে একটা মর্য্যাদাবোধ বিকীর্ণ করবেন। শিক্ষকের মধ্যে অগ্নিদেবের মতই 'স্বাহা' এবং 'স্বধা'র সম্মেলন ঘটবে সেদিন। আত্মত্যাগ এবং আত্মকর্তৃত্ব—এই দুটি গুণের পূর্ণ বিকাশ শিক্ষকের মধ্যে না ঘটলে তিনি গুরুর আসনে বসবার অধিকারী হবেন না। ভারতবাসী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকার ভেদ মেনে নিয়েছে। গুরুর আসনে বসবার অধিকার যাঁরা অর্জন করবেন আপন জীবনচর্চা এবং জীবনসাধনার মধ্য দিয়ে, তাঁদের হাতে জাতির ভবিষ্যৎ গঠনের গুরুভার ন্যস্ত হবে। তাঁরাই আবার ছাত্রদের দু'হাত বাড়িয়ে ডেকে নেবেন। ছাত্রেরাও আবার জড় হবে, ভীড় করবে এই সব ঋষিকল্প গুরুর চারপাশে। এঁরা আবার বিশুখৃষ্টের মত বলবেন—'শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও।' খৃষ্টের মতই এই আদর্শ-শিক্ষকেরা শিশুদের—শিক্ষার্থীদের—শ্রদ্ধা করবেন। কেননা শিশুদের মধ্যে—কিশোরদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা রয়েছে। এই অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ মনুষ্যশিশুর দল তাদের সব মালিন্য এবং হতাশা উত্তীর্ণ হবে এই আদর্শ-গুরুর আহ্বানে। আবার তাদের মধ্যে সেই সাত্ত্বিকসম্পর্কটুকু প্রতিষ্ঠিত হবে ধীরে ধীরে যেমন ক'রে সূর্য-কিরণের করস্পর্শে সূর্যমুখীর প্রস্ফুটন ঘটে। আজকের দিনে যে সমস্যাটি শিক্ষাজগতের অন্যতম প্রধান সমস্যা, তার সমাধান ঘটবে আদর্শ-শিক্ষকের আবির্ভাবে। এদিকে দেশের বিভিন্ন পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য মধ্যবিত্ত সমাজের হতাশা বহুল পরিমাণে দূর করবে। এই অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের সামগ্রিক হতাশা কিছুৎ পরিমাণ দূর করলেও, তার অনুকূল প্রভাব ছাত্রসমাজের মধ্যে দেখা যাবে। আমাদের শিক্ষানীতি বিভিন্ন শিল্পকলা এবং কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ দিচ্ছে। তার সুফলও ক্রমেই দেখা দেবে আমাদের দেশের ছাত্রসমাজের উপর। তারা আবার নিয়মানুগ পথে শৃঙ্খলার সঙ্গে জীবনপথের পথিক হবে। তাদের দলপতি পথ দেখিয়ে চলবেন। এই দলপতি হলেন আগামী যুগের আদর্শ-শিক্ষক, বাণপ্রস্থ আশ্রমের সর্বত্যাগী গৃহস্থ।

কোনার বাঁধ দেখে

শ্রীজনার্দ্দন গোস্বামী

নির্জন পাহাড়ের বুক চিরে
গড়ে ওঠা বাঁধ—
পাহাড়ী নদীর মেয়ের ক্ষীণ জলধারা,
কোনারের চোখে চোখে
অপত্য-স্নেহ—
স্তনপুটে তিলে তিলে সঞ্চিত মধু;
ভবিষ্যৎ আসে ঐ দেহের শোণিতে।
তারপর, প্রসবের আনন্দ বেদনায়
এ মেয়ের নাড়িতে আসবে আবেগ,
জোয়ারের টানেটানে উঠবে তুফান
সায়রে সায়রে—
এ দেহের বাঁধকে আর যাবেনা রোখা।
সন্তানের মুখে মুখে দুধের ভাণ্ডার,
মাটির বক্ষের বুকে আনবে কল্যাণ।
ফসলের অগ্রগতি, জীবনের তারে তারে
নিখিলের জয়গান।

মন্দিরের চাবি

অবিনাশ রায়

Water, water, every where,
Not any drop to drink. (Coleridge)

হাওয়া বইছে বামদিকে, চতুর্দিকে জল—
শুধু জল আর জল কালো কালিন্দীর
কিছুকে রয়েছে মৃত্যু গহন অতল
আমি এক তীর্থযাত্রী, মূর্চ্ছিত শরীর।
আকাশে নিশ্চিহ্ন সূর্য, তবু কৌতূহল
যৌবনের ধূর্ত প্রেমে, এই পৃথিবীর—
সর্বাঙ্গে বৃশ্চিকজ্বালা যন্ত্রণা প্রবল
এ-জীবন দুলছে যেন পদ্মপত্রে নীর।
কোথা সে মঙ্গল শঙ্খ, শুভ্র বরতনু
মন্দিরে মন্দিরে যেথা সুগম্ভীর রব
ভয় অপমান লজ্জা ছাড়ো পুষ্পধনু
দুঃখ-উপচারে হোক শ্রেষ্ঠ উৎসব।
এই জল, এই ঢেউ, অন্ধকারে ভাবি—
বন্দনায় শেষে পাবো মন্দিরের চাবি।

হিন্দু সম্মেলন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডাঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি ধর্মপ্রচারক নহি, কোন ধর্মের কথাও জানি না। তবে আমি এইটুকু জানি যে, ধর্মই একমাত্র আমাদিগকে নৈরাশ্য হইতে রক্ষা করিতে পারে। ধর্ম কেবল একটি চিন্তাধারা নয়, ধর্ম হইতেছে সদাচরণ। "ইহা বিশ্বাসের শক্তি, অন্তরকে কলুষমুক্ত করে।" অপর কথায় ইহাকে বলা হয় সমগ্র মানবসত্তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা। ধর্ম আমাকে দেয় সাহস, দেয় সহনশীলতা। ধর্মের মধ্যে আছে সততা, আছে সত্যবাদিতা, আছে একনিষ্ঠা। আমাদের রাষ্ট্রের আদর্শ সত্য। সেই সত্য কি ধর্মবর্জিত অথবা ধর্ম ছাড়া আলাদা থাকিতে পারে?

ধর্ম ও শৃঙ্খলা

ধর্ম ব্যতীত চরিত্র গঠন হয় না এবং শৃঙ্খলাও অর্জিত হয় না। আজ চারিদিকে যে বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। প্রতিদিন আমরা সংবাদপত্রে শুধু ছাত্রদের নয়, অন্যান্য লোকদেরও বিশৃঙ্খলার সংবাদ পাঠ করি। আসামে ছাত্রদের বিশৃঙ্খলা চরমে উঠিয়াছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও বিশৃঙ্খলার নজির আছে, কিন্তু আসামে বিশৃঙ্খলা যেরূপ চরমে উঠিয়াছে, অন্যত্র কোথাও তেমন হয় নাই। এখানে ছাত্রগণ যে শুধু চেয়ার, টেবিল ও জানলার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়াছে, বিভিন্ন শ্লোগান উচ্চারণ করিয়াছে, অথবা ভাইস চ্যান্সেলারকে সারারাত্রি তাঁহার কক্ষে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই নয়, বরং বলপ্রয়োগ করিয়া কর্তৃপক্ষকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে। জাতির যুবকদের পক্ষে এইরূপ আচরণ গুরুতর নিন্দার যোগ্য। কোন্ জাতি এরূপ যুবকদের সৃষ্টি করে?

কিন্তু এই বিশৃঙ্খলার জন্য তাহাদের অসতর্কভাবে দোষ দেওয়া উচিত হইবে না। তাহাদের অগ্রজদের নিকট হইতে তাহারা বিশৃঙ্খলা শিখিতেছে। যুবকদের সাধুতা ও জাতিগঠনমূলক নিয়মানুবর্তিতায় উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠগণ এই সমস্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করার পরিবর্তে তাহাদিগকে মিথ্যাকথা, দুষ্টাচরণ, অসাধুতা, কপটতা, দুর্নীতি ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি অযথা অনুগ্রহ প্রদর্শন শিক্ষা দিতেছে। আমাদের রাজনৈতিক জীবনও অত্যন্ত কলুষিত হইয়াছে। ইহাও আমাদের যুবকদের বিশৃঙ্খলার জন্য কোন অংশে কম দায়ী নয়। উপযুক্ত শিক্ষা ও চরিত্রবল না থাকিলেও (কেবল তাহাই নয়, জঘন্য দুর্নাম সত্ত্বেও), লোকে আইনসভার সদস্য হইতে সক্ষম হইতেছে, এবং একবার সদস্য হইতে পারিলে সন্দেহজনক উপায়ে তাহারা অর্থ-সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইতেছে; কিছুদিন আগেও যে লোক স্বল্প আয় করিত, তাহাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে ও বিলাসিতায় জীবনযাপন করিতে প্রায়ই দেখা যায়। ছাত্রগণ স্বভাবতই মনে করে যে, শিক্ষালাভে শক্তি অপচয় করার পরিবর্তে তাহারা যদি একটি রাজনৈতিক দলের অনুগ্রহ পাইতে সক্ষম হয়, তবে তাহাদের জীবনের সাফল্য নিশ্চিত হইবে। শিক্ষকরাও ছাত্রদের মত চিন্তা করেন। বৈষয়িক সাফল্যলাভের জন্য তাঁহারা প্রায়ই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্য ভুলিয়া যান এবং একবার এই সকল মূল্য-বোধ নষ্ট হইলে যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এইভাবে বিষাক্ত হইলে যুবকগণ 'সৎ নাগরিক' হিসাবে গড়িয়া উঠিবে ও ভালো জাতি গঠন করিবে, ইহা আশা করা যায় না।

দেশের নেতাদের মধ্যেও বিশৃঙ্খলা সঞ্চারিত হইয়াছে। শ্রীনেহরু বলেন—আমরা দেখিতেছি ক্রমশঃ শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। লোকে একসঙ্গে থাকুক, এক সঙ্গে কাজ করুক এবং পরস্পর দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত না হয়, এরূপ শৃঙ্খলা একান্ত আবশ্যক। ১৯৬০ সালের মধ্যে কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসসেবীদের নিজেদের মধ্যেই যে শুধু অনৈক্য হয় তাহা নয়, তাহারা শ্রীনেহরুর ক্ষমতাকেও অবজ্ঞা করে। ভাষা-বিরোধ মীমাংসার জন্য শ্রীনেহরু যখন আসামে গমন করেন এবং পরে শ্রীনেহরুর নির্দেশে স্বগত পণ্ডিত পন্থ যখন বিরোধ মীমাংসা করিতে গমন করেন, তখন আসামের কংগ্রেসসেবীরা এই নেতাদের কথায় কর্ণপাত করে নাই। শ্রীনেহরুর নিজের প্রদেশ উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস-পার্লামেন্টারী-বোর্ড মন্ত্রিসভার প্রশ্নে তাঁহার উপদেশ মত কাজ করিতে অনিচ্ছুক হয়। এই সেদিনও ডাঃ সি. ডি. দেশমুখ মাদ্রাজে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শাসনকার্যে নৈতিক ও রাজনৈতিক মান অবনত হওয়ায় দুঃখপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মন্ত্রীদের অযোগ্যতাই ইহার জন্য দায়ী।

চরিত্রের একনিষ্ঠতাই গণতন্ত্রের প্রাণ। ভারত গণতান্ত্রিক দেশ। গণতন্ত্র রূপায়ন করা কঠিন কাজ। আত্মনিয়ন্ত্রণ ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের উপর ইহা নির্ভরশীল। অনুশীলন ছাড়া এই গুণগুলি আয়ত্ত করা যায় না এবং ইহা আয়ত্তের জন্য লোকের যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। সেই শিক্ষার প্রায় অভাব আজ। কারণ কি? কারণ—প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা নাই। একমাত্র ধর্মই আমাদিগকে এই জঘন্য অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে পারে।

এই সম্মেলনে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইবে, তন্মধ্যে দেশের প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের যুবকদের শিক্ষাদান অন্যতম বিষয়। কিন্তু আপনাদের সৈন্যবাহিনী কি করিয়া গড়িয়া তুলিবেন, যদি শৃঙ্খলা না থাকে,—ধর্মীয় শিক্ষা না থাকে। নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন যে, এমন কি যুদ্ধের সময়ও শারীরিক বল অপেক্ষা মনোবলের প্রয়োজন দশগুণ বেশী।

সাম্প্রদায়িকতা

'সাম্প্রদায়িক' কথাটির মৌলিক অর্থ যাহাই থাকুক না কেন, দেখা যাইতেছে যে,—কোন জেলায় ধর্ম, ধর্মবিরোধী সম্প্রদায়, সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করে না, এমন একজনও ভারতীয় নাই। যেখানে সামগ্রিকভাবে ভারতের স্বার্থের কথা উঠিবে, সেখানে ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় ভিত্তিতে কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাম্প্রদায়িকতা ভারতের শান্তি ও অখণ্ডতা বিপন্ন করিতেছে। কবে ইহার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে, তাহা বলা কঠিন।

কিন্তু একটি জিনিষ আমি বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি। তাহা হইতেছে এই যে, লর্ড কার্জন বঙ্গবিভাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নামে দুইটি প্রদেশ গঠন করিয়া, ইহাতে শক্তি যোগাইয়াছেন। লর্ড কার্জন মনে করিয়াছিলেন যে, এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহার দেশের মঙ্গল করিতেছেন, কিন্তু তিনি ইহার দ্বারা তাঁহার দেশের কোন মঙ্গল করিতে পারেন নাই। কারণ, ইহা অনিষ্টকর ব্যবস্থা, এবং অন্যায় হইতে কোন শুভ ফল পাওয়া যায় না। তাঁহার অন্যায় নীতিই ৪০ বৎসরের মধ্যে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য অবসানের অন্যতম কারণ। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের বিভক্ত করিয়া বৃটিশ জাতি ভারতে তাহার শাসন-ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করিতে সক্ষম হইবে। এই নীতি অনুসরণ করিয়া বৃটিশ জাতি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ভারত শাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অবসান হইয়াছে।

আমি দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, 'বিভক্ত করিয়া শাসন করার নীতি' যে ভাল নহে, ইহা আমাদের বর্ত্তমান সরকার দেখিতে পাইতেছেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কেরলের নির্ব্বাচনের ব্যাপারটাই ধরা যাউক। কংগ্রেস মুসলিম-লীগের সহিত হাত মিলাইয়াছে। কংগ্রেস কি লাভ করিয়াছে? নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই আঁতাত চিরস্থায়ী হইবে না। কংগ্রেস-সভাপতি এই আঁতাত সম্পর্কে নিজের মত করিয়া একটি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। কিন্তু তাহা কি ভারতবাসীর হৃদয়স্পর্শ করিয়াছে?

হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক, ইহা বলা ঠিক নয়। হিন্দু ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত উদার ও গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিচার করিয়া থাকে। হিন্দু সংস্কৃতি ও জীবন ধারা গ্রহণ করিলে লোকে এক ঈশ্বরে অথবা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করুক না কেন, তাহারা সকলে হিন্দু পরিধির মধ্যে পড়িবে। ইহা আত্মসম্প্রসারণশীল কোন ধর্ম নয়; উদার আধ্যাত্মিকতাই ইহার ভিত্তি।

বর্ত্তমানে ভারতে সাম্প্রদায়িকতা রহিয়াছে, একথা কেহ অস্বীকার করে না; ইহা ভারতের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিতেছে। ইহা দূর করিতেই হইবে। আমরা যদি চিন্তা করি যে, আমরা সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ও তারপর অন্য কিছু, তবে ইহা বিদূরিত হইবে। দেশে এমন লোক আছে যাহারা ভারতভূমিতে বাস করে, তাহার জল পান করে, তাহার খাদ্য আহার করে, তথাপি অন্য দেশের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও ভারতের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর কাজ করে। ইহা আদৌ সঙ্গত নয়। ইহা ভারতকে দাসত্বের দিকে লইয়া যাইবে। সংবিধানের নিয়মগুলি মান্য করিয়া লোকে যদি ভারতে বসবাস করিতে না পারে অথবা অন্য রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়, তবে আমার প্রস্তাব হইতেছে এই যে, তাহারা ভারত পরিত্যাগ করুক এবং যে সকল দেশের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি আছে, তথায় চলিয়া যাউক। কিন্তু কাহাকেও ভারতে বাস করিয়া পঞ্চমবাহিনীর ন্যায় কাজ করিতে দেওয়া হইবে না। সম্প্রতি ভারতীয় দণ্ডবিধি সংশোধন করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি যিনি সাম্প্রদায়িকতা, অথবা শ্রেণীবিদ্বেষ প্রভৃতিতে উৎসাহ দেন অথবা উস্কানি দিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। দল, রাজনৈতিক শ্রেণী, ধর্ম্মমত অথবা অন্য বৈদেশিক প্রশ্ন নির্ব্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে আইন প্রযুক্ত হইবে। আমি জোরের সহিত বলিতে পারি যে, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতির মধ্যে যদি সমানভাবে ভারসাম্য রক্ষিত হয়, তবে ভারতে যে সমস্ত গোলযোগ ঘটিতেছে তাহা আমরা পরিহার করিতে পারি।

খাদ্যাভাব ও ভেজাল মিশ্রণ

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতে ধর্ম্মীয় শিক্ষার অভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। আর একটি প্রধান কারণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য সমানভাবে দায়ী। তাহা হইতেছে খাদ্যাভাব ও খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ।

প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। প্রায় ২৮টি পুঁজিবাদী দেশ আছে কিন্তু ভারতে অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি সর্ব্বাধিক। এই মূল্য বৃদ্ধিতে লাভবান হইতেছে কাহারা? মুষ্টিমেয় মুনাফাবাজ, মজুতদার, ফাটকাবাজ, মহাজন ও যাহারা অবৈধভাবে টাকা রোজগার করিতে পারে, তাহারা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ রহিয়াছে। আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রীর মূল্য হ্রাস করিবার জন্য ভারতে কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। মাঝে মাঝে আমাদের বলা হইয়াছে যে, একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারত খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবে। সময় যাইতেছে, কিন্তু খাদ্য আসিতেছে না। কখনও কখনও আমাদিগকে বলা হইয়া থাকে যে, চাউল অথবা গম পাওয়া না গেলে দুধ অথবা শাক-সব্জি খাও। ইহা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় সেই দেশের কথা—বহুকাল পূর্ব্বে যে দেশের সর্ব্বনাশ হয় ও যেখানে বলা হইয়াছিল যে, লোকে যদি রুটী কিনিতে না পারে, কেক খায় না কেন?

আমরা কি ধরণের খাদ্য পাইতেছি? ভেজাল-মিশ্রিত খাদ্য—যাহা রোগ সৃষ্টি করে। ভেজাল মিশ্রণের জন্য যাহারা অপরাধী, তাহাদের শাস্তি দিবার জন্য কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। যে সকল লোক অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রীর কারবার করে, কেবল তাহাদের বন্ধুগণ ও ধনী ব্যক্তিরা ভেজালবিহীন খাদ্য পায়। কিন্তু আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তাহা পাই না। মূল্যের ঊর্দ্ধগতি মানুষের ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌঁছাইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, লবণের ন্যায় অত্যাবশ্যক জিনিষেও ভেজাল দেওয়া হয়। লোকে লক্ষ্য করিয়াছে যে, লবণের সহিত কোন প্রকার অনিষ্টকর পাউডার মিশ্রিত করা হয়। উহা জলে দ্রবীভূত হয় না, এমন কি লবণের মত স্বাদও নাই। সেদিন একটি শক্তিশালী ইংরাজী দৈনিক পত্রে একটি বিজ্ঞাপন দেখিলাম যে, একটি বিশেষ দোকানে চাউল বিক্রয় হইতেছে—"যাহাতে খারাপ গন্ধ অথবা পাথরকুচি নাই"। ইহা হইতে কি প্রমাণ হয় না যে, বাজারে এমন চাউল বিক্রয় হইতেছে, যাহাতে খারাপ গন্ধ ও পাথরকুচি আছে? খাঁটী দুধ বাজারে পাওয়া যায় না। বাজারে যাহা বিক্রয় হইতেছে, তাহা বিদেশ হইতে আনীত গুঁড়া দুধ, এখানে জলের সহিত মিশান হইতেছে অথবা টাটকা গরুর দুধের সহিত যত অধিক পরিমাণ সম্ভব জল মিশান হইতেছে।

সম্প্রতি কলিকাতায় ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যাপক সমীক্ষা হইয়াছে, তাহাদের স্বাস্থ্যহানির রিপোর্ট পাঠ করিলে কম্পিত হইতে হয়। খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ কবে বন্ধ হইবে, আদৌ হইবে কি না,

আমরা জানি না। যে ধরণের খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, তাহার উপর শারীরিক বল নির্ভর করে এবং যে উচ্ছৃঙ্খলার আমরা এত নিন্দা করি, তাহা অসম খাদ্য গ্রহণের ফল হইতে পারে। অন্য দেশে যাহারা উন্নতি করিয়াছে, তাহাদের দিকে আমাদের দেখিতে হইবে ও তথায় তাহারা কি ধরণের খাদ্য গ্রহণ করে, তাহা দেখিতে হইবে এবং ভারতের জনগণ কিরূপ খাদ্য গ্রহণ করে, তাহার তুলনা করিতে হইবে। লোকে যদি ভালভাবে থাকিতে না পারে, তবে গণতন্ত্র অথবা সমাজতন্ত্রবাদের মতবাদের কোন গুরুত্ব নাই। ভালভাবে থাকিবার জন্য প্রথম প্রয়োজন হইতেছে খাদ্য। খাদ্যই চরম প্রশ্ন, অন্ততঃ অপর কোন কিছু অপেক্ষা কম নয়।

গণতন্ত্র অথবা সমাজতন্ত্রবাদের থিওরিতে কোন কাজ হইবে না, যদি লোকের উন্নতি করিবার ইচ্ছা না থাকে। সমৃদ্ধির মনোভাব বৃদ্ধির প্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে খাদ্য। খাদ্যই প্রধান সমস্যা, অন্ততঃ অন্য কোন কিছু অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্দ্ধাহারী নরনারীর দ্বারা কোন বড় কাজ সম্ভব নয়। ভারতবিভাগ আমাদিগকে সাম্প্রদায়িক শান্তি ও শুভেচ্ছা দেয় নাই; পক্ষান্তরে ভারত বিভাগের ফলে আমাদের বহু খাদ্য-শস্যাগার আমাদের সীমান্তর বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আমরা যদি আমাদের জাতীয় শক্তি ও কর্মক্ষমতা হারাইতে না চাই, তবে আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় খাদ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

বলা হইয়াছে যে, গত কয়েক বৎসরে আমাদের গড় জাতীয় আয় শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই 'গড়' কথাটির অর্থ কি? ইহা একটি ভ্রমজনক কথা। ইহাকে তামাসা বলিতেও কেহ কেহ প্রলুব্ধ হইতে পারে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গড়পড়তা আয় কত, তাহা সমীক্ষা করা হইয়াছে কি এবং সেই আয় কি অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে কি? যুক্তির খাতিরে আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, আমাদের জাতীয় আয় বাড়িয়াছে। কিন্তু জাতীয় আয়ের কতখানি ফটকাবাজ ও মজুতদার প্রভৃতির হাতে চলিয়া গিয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারি কি? বিদেশ হইতে ভারত যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সুদ বাবদ কত টাকা দিতে হইবে? জাতীয় আয় যদি বৃদ্ধি হইয়া থাকে তবে তাহা কলকারখানার মালিক অথবা খাদ্যশস্য-উৎপাদনকারীদের বৃদ্ধি হইয়াছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৃদ্ধি হয় নাই, কারণ, তাহারা নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও অতিরিক্ত করভারে পীড়িত।

জাতীয় আয় মাথা-পিছু বাড়িয়াছে, একথা শুনিয়া আমাদের লাভ নাই। কারণ, আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে বলিতেছি, আমরা মধ্যবিত্ত লোকেরা উপযুক্ত খাদ্য পাই না, উপযুক্ত বস্ত্র পাই না, উপযুক্ত ঔষধ পাই না। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতে পারি না। গড়পড়তা আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ধরিয়া লইয়া বলা হয় যে, জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহাই কি ঠিক? এই বৃদ্ধি কেবল কাগজপত্রেই হইতে পারে কিন্তু আসলে তাহা হয় নাই। মূল্যবৃদ্ধি যে হারে হইয়াছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয় সে হারে বাড়ে নাই। আমাদের জীবনযাত্রার কোন উন্নতি হয় নাই। খাদ্যাভাব ও খাদ্যে ভেজাল নিয়াব বিশৃঙ্খলার উৎস। ক্ষীণস্বাস্থ্য লোকের নিকট হইতে কিরূপ শৃঙ্খলা আশা করা যাইতে পারে?

আমাদিগকে কখনও কখনও দেশের জন্য আত্মত্যাগ করিতে বলা হয়। কি আত্মত্যাগ আমরা করিতে পারি? কি আছে আমাদের?

মাঝে মাঝে আমাদিগকে দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে সাহায্য করিতে বলা হয়। দেশ আমাদের এবং আমরা তাহার অর্থনীতির উন্নয়নের চেষ্টা করিব। সম্প্রতি এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ কলিকাতায় বলিয়াছেন, তিনটি প্রধান বিষয়ের উপর দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন নির্ভর করে:—(১) শাসনকার্য্যে দক্ষতা ও সাধুতা, (২) শিক্ষার প্রসার এবং (৩) দেশের লোকের মধ্যে এইরূপ মনোভাব বিদ্যমান থাকা দরকার যে, উন্নত অর্থনীতির ফল তাঁহারাও ভোগ করিবেন। এই প্রস্তাবগুলি একে একে পরীক্ষা করি আসুন। আজ দক্ষ ও সাধু শাসনকার্য্য আছে কি? চারিদিকে আমরা স্বজন-পোষণ ও দুর্নীতি দেখিতে পাইতেছি না কি? শিক্ষা প্রসার—গত ১৫ বৎসরে এই দিকে বিশেষ অগ্রগতি হয় নাই। ১৯৫০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে আমি কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিলাম যে, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের কৃপণতা করা উচিত নয়।

তৃতীয় প্রশ্নটির কোন উত্তরের প্রয়োজন নাই। ইহা সুস্পষ্ট। জনগণ কি উন্নয়নের ফল ভোগ করিতেছে? বড় বড় পরিকল্পনা পরিকল্পিত ও সমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত লাভের কিছু অংশ আমরা পাইয়াছি কি? পঞ্চাশ বৎসর পরে ইহা ঘটিতে পারে, আমাদের পুত্র-পৌত্রাদি ইহার সুফলভোগ করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে জনগণকে অন্ততঃ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে দিতে হইবে (বিলাসিতার মধ্যে বাস করিবে, এমন কথা আমি বলিতেছি না)। স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যতদূর জানি, এই স্বাধীনতা, মুক্তি, যে নামেই ইহাকে বলি না কেন, জনগণের হৃদয় স্পর্শ করে নাই। গান্ধীজী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর দেশে ভোগবিলাসের প্রাচুর্য্য দেখা দিবে। তাঁহার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত না হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আর একটু কম ক্লেশকর হওয়া উচিত।

আমি খুব জোরের সহিত সরকারকে অনুরোধ করিব যে, গোলযোগ যাহাতে দূর হয় ও সুখ লাভ হয়, তজ্জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক। তখন এবং একমাত্র তখনই দেশের লোক সন্তুষ্ট হইবে এবং ঐক্য, দেশরক্ষা ও অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য কাজ করিতে অত্যন্ত আগ্রহশীল হইবে। উপদেশ-প্রচার অথবা আশা দেওয়া অর্থহীন। লোকে উপদেশ চায় না—নিজেদের পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তু পাইতে চাহে। জীবনের এই মূল সত্যটি উপেক্ষা করা যায় না।

ভারতের পররাষ্ট্র নীতি

'পঞ্চশীল' কথাটির মধ্যে ইহাই নিহিত আছে, ইহা শান্তির নীতি। ইহা যুদ্ধ অথবা এমনকি যুদ্ধের কথাবার্ত্তার উপর গড়িয়া উঠে নাই। শান্তিনীতির উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নীতি গঠিত হইয়াছে। তাঁহার মতে, সকল আন্তর্জাতিক সমস্যা আলোচনা ও আপোষের দ্বারা সমাধান করিতে হইবে। যে কোন

সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের মনোভাব হইবে সৌভ্রাত্রমূলক, ধৈর্য্যশীল এবং বিনয়সম্পন্ন। প্রধানমন্ত্রী বলেন—স্বযুক্তি এবং সহযোগিতার মনোভাব লইয়া আমাদের যে কোন সমস্যাকে বিচার করিতে হইবে।

এই নীতি যত প্রশংসনীয় হউক না কেন, ইহাতে ভারতের বহু বন্ধুত্বলাভ হয় নাই। এই বিনীত নীতিকে অনেকে ভারতের আত্মম্ভরিতা বলিয়া সন্দেহ করিয়াছে। ডাঃ বীচার তাঁহার 'পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফি—নেহরু' গ্রন্থে বলিয়াছেন: 'বাস্তবিক, তাঁহার প্রভাব এরূপ অভিভূত করিয়া ফেলে যে, ভারতের নীতি বলিতে সর্বত্র লোকে পণ্ডিত নেহরুর ব্যক্তিগত নীতি মনে করে। নেহরু মাঝে মাঝে যে নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব প্রকাশ করেন, তাহার ফলে বহু মিত্ররাষ্ট্র—এমনকি ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গেও আমাদের মৈত্রী সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এককালের শক্তিশালী সদস্য ডাঃ বি আর আম্বেদকর প্রধানমন্ত্রীর নীতির সহিত একমত হইতে না পারিয়া বলেন—স্বাধীনতালাভের সময় সকল রাষ্ট্র ভারতের কল্যাণ কামনা করিয়াছিল কিন্তু 'আজ···আমাদের কোন বন্ধু নাই।'

সত্য বটে, আমরা বিদেশ হইতে ঋণ সাহায্য পাইতেছি। বন্ধুত্বের জন্য তাহা দেওয়া হইয়াছে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতের অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়ার মানচিত্রে ভারতই কেন্দ্র-বিন্দু। এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের জন্য ভারতকে তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে দুইটি বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠী পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে কিন্তু তাহার মনোভাব যথোচিতভাবে উপলব্ধি করা হয় না। ভারত যে কাজ করিয়াছে, তজ্জন্য সে অন্তঃসারশূন্য শ্রদ্ধা পাইয়াছে। পঞ্চশীলের জয়ধ্বনি করা হইয়াছে, কিন্তু তদনুযায়ী কোন দেশ কাজ করে নাই।

বিচারশক্তিসম্পন্ন কোন লোক যুদ্ধ সমর্থন করিবে না। যুদ্ধের পরিণতি ভয়াবহ। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে না থাকিলেও জানে যুদ্ধ কিরূপ বিপর্যয় লইয়া আসে। তথাপি যুদ্ধ হইবে। আমি যতদূর জানি, মানবজাতির ইতিহাস যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতাই প্রমাণ করে। গত আড়াই হাজার বৎসরে কত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে? বুদ্ধ শান্তি প্রচার করিয়াছেন; যীশুখৃষ্ট বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবন দান করিয়াছেন। তবুও তাঁহার অনুগামীরা কি করিয়াছে? ইহার উত্তর হইতেছে হিরোসিমা, নাগাসাকি ও তিব্বত। যখন আপোষ-মীমাংসা অথবা আলোচনা ব্যর্থ হয়, তখন আমরা কি করি? আক্রমণকারী সৈন্যদের নিকট আমরা কি দাসরূপে নিজেদের বিক্রয় করি? আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভায় বলিয়াছেন যে, ভারতের খুব ভাল সৈন্যবাহিনী আছে এবং আমেরিকা যদি পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দেয়, তাহা হইলেও তাহার ভয় করিবার কিছু নাই। কিন্তু আমাদের সৈন্যবাহিনী কি রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মত সুসজ্জিত? আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় শান্তির পক্ষে ওকালতি করেন। এমনকি, সম্প্রতি, বেলগ্রেডে তিনি নিরস্ত্রীকরণ-প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নরূপে উত্থাপন করিয়াছেন। মনে করুন নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে একটি চুক্তি সম্পন্ন হইল, তাহা হইতে কি ধরিয়া লওয়া যায় যে, যে দেশগুলি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহারা চুক্তির সর্তাদি বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিবে? নিরস্ত্রীকরণ কেবল বাহ্যিক হইবে না, তাহা নৈতিকভাবেও হওয়া উচিত, অর্থাৎ যেমন মহাত্মা গান্ধী প্রায়ই বলিতেন—হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন। যতদিন মানুষ লোভ ও লালসা দ্বারা পরিচালিত হইবে, ততদিন যুদ্ধ নিবারণ করা অসম্ভব হইবে, বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইবে। জাতিসমূহ কেবল সুযোগের অপেক্ষা করে। বর্ত্তমানের দুইটি বৃহৎ শক্তি রাশিয়া ও আমেরিকা যুদ্ধ করিবে না, কারণ তাহারা জানে যে, তাহারা একে অপরকে একদিনের মধ্যে ধ্বংস করিতে পারে। সেইজন্য যুদ্ধ আপাততঃ নিবারিত হইয়াছে। আজ রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে 'যুদ্ধ না করার' কারণ হইতেছে পরস্পর-বিরোধী দুইটি সমান শক্তির ভারসাম্য। শক্তি-সামঞ্জস্যের ফলে আকাশে তারকা ও গ্রহসমূহ যেমন নিজ নিজ নির্দিষ্ট পথে চালিত হয়, তেমনি মানবজাতির ভাগ্যও শক্তিসামঞ্জস্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে শক্তি বিশ্বকে চালিত করিতেছে, তাহাকে যদি আমরা উপেক্ষা করি, তবে জীবনের মূল তথ্যকে অস্বীকার করিব।

গীতা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে যে, কাপুরুষতাকে সহনশক্তি বলিয়া ভুল করা উচিত নয় এবং নতিস্বীকার দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, আদর্শের অবমাননা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়।

সেই মহাপ্রাণ কি শান্তি স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন নাই? তিনি তাঁহার ক্ষুরধার যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এক লোভী রাজা ও তাঁহার সচ্চরিত্র নিষ্পাপ জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন নাই কি? তিনি কি সফলকাম হইয়াছিলেন? যাহা ভাল, তাহা লাভ করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা করায় কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু আমাদিগকে ভবিষ্যতে যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ধরিয়া লওয়া যাউক যে, দুইজন লোক পরস্পর বিবাদ করিতেছে। সালিশীর জন্য আদালতও আছে। অনেক ভাল লোক আছেন—যাঁহারা বিরোধী পক্ষ দুইটির মধ্যে মীমাংসা দেখিতে চাহেন। কিন্তু সকল বিরোধের কি মীমাংসা হয়? পক্ষগুলির আপেক্ষিক শক্তির উপরই কি শেষ পর্য্যন্ত উহা নির্ভর করে না?

চিরকালের জন্য যুদ্ধ পরিহার করিতে পারা যাইবে কি? ভার্সাই সন্ধির পরে প্রেসিডেন্ট উইলসনের মতাদর্শ অনুযায়ী জাতিসংঘ গঠিত হইলে সকলেই আশা করিয়াছিল যে, বিশ্বে চিরশান্তি বিরাজ করিবে। মনে করা গিয়াছিল যে, যুদ্ধের দ্বারা সকল যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। কিন্তু আসলে কি ঘটিয়াছে? যখন হিটলার বুঝিলেন যে, তিনি অপরের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, তখন তিনি ইউরোপ আক্রমণ করিলেন। একটির পর একটি দেশ পদানত হইল। বলদর্পী হিটলারের এই অভিযান একমাত্র মহান স্যার উইনষ্টন চার্চিলের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও প্রতিভাবলে প্রতিহত হয়।

বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রায় অসম্ভব। আলোচনা, আপোষ অথবা চুক্তির দ্বারা যুদ্ধ কিছুদিনের জন্য নিবারণ করা যাইতে পারে। কিন্তু চিরস্থায়ী শান্তি শুধুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিদ্বয়ের মধ্যে যুক্তি-সঙ্গত সামঞ্জস্যের ফলে প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। ইহার অন্যথা হইলে যুদ্ধ হইবে। শুভেচ্ছা দ্বারা যুদ্ধকে প্রতিহত করা যায় না, ভীতি অথবা স্বার্থই যুদ্ধকে রোধ করিতে পারে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তির জন্য ভারত কি বহু ত্যাগ স্বীকার করে নাই? ভারত কি চীনের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন নয়? তাহারা বলপূর্বক ও কোনরূপ চুক্তি ব্যতীত যে সব অঞ্চল দখল করিয়াছে, তাহা কি ফেরৎ দিয়াছে? এই অঞ্চলগুলি ফেরৎ পাইবার জন্য ভারত কতকাল অপেক্ষা করিবে? অনন্তকাল পর্য্যন্ত কি? এই অঞ্চলগুলি ভারতের নিজস্ব, এই অঞ্চলগুলি ভারতকে ফেরৎ দিবার জন্য চীন অথবা পাকিস্তানের পক্ষ হইতে কোন চেষ্টা নাই। পক্ষান্তরে তাহাদের কথাবার্ত্তা হইতে মনে হয় যে, তাহারা ভারতের আরও বেশী জমি অধিকার করিতে চাহে।

বিশ্বে আজ দুইটি শক্তিগোষ্ঠী রহিয়াছে—প্রত্যেকেই বিশ্বের প্রভুত্ব গ্রহণ করিবার ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। ভুল ধারণা অথবা দুর্ঘটনার ফলে তাহারা যদি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়, ভারত কি নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবে? যদি প্রয়োজন হয়, আমরা কি যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখিব না?

উপসংহার

বন্ধুগণ, আমি আর অধিকক্ষণ আপনাদের আটক রাখিব না। আপনাদের ধৈর্য্য পরীক্ষার জন্য আমি অনেক কথা বলিয়াছি। এই সম্মেলনের আলোচনার পথনির্দেশ করিবার জন্য আমি সামান্য একটুও সাহায্য করিতে পারিয়াছি বলিয়া যদি মনে করিতে পারি, তবে আমি অত্যন্ত সুখী হইব। আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল সদস্যকে আমি অনুরোধ করিব যে, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির ঐক্য ও প্রতিরক্ষার জন্য সকলে কাজ করুন এবং তাহা করিতে যদি আমাদিগকে বলপ্রয়োগ করিতে হয়, তবে তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে—এবং অন্য কোন পথ না থাকিলে সর্বশেষে ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে।

আমি যাহা বলিলাম, তাহার সহিত সকলে একমত হইবেন, এমন আশা আমি করি না। কোন রাজনৈতিক অথবা ব্যক্তিগত চিন্তাধারায় প্রভাবিত না হইয়া আমি যে পথে চলি, তাহারই অনুসরণ করিয়া আমি আমার মতামত ব্যক্ত করিয়াছি। আমি আবার বলিতেছি, যুদ্ধ পাপ। কিন্তু যুদ্ধ যদি আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে উহা আমাদের প্রতিহত করিতে হইবে। আমার আন্তরিক আশা এই যে, আমরা অতীতের ইতিহাস হইতে সযত্নে শিক্ষা গ্রহণ করিব। অতীত হইতে আমরা ভবিষ্যতের জন্য পথনির্দ্দেশ পাইব। অতীতের কয়েকটি ভুলের সংশোধন করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা পাইব এবং বর্ত্তমানের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিব। উপসংহারে আমি ভারতীয় জাতীয়তার জনক সুরেন্দ্রনাথের উদাত্ত বাণী উদ্ধৃত করিতেছি:

"আমরা নিশ্চয়ই অগ্রসর হইয়া যাইব ঈশ্বরের রাজ্যে গতিহীন হইয়া থাকা সম্ভব নয়। আমাদের চলার পথে আমরা শ্রদ্ধার সহিত অতীতকে স্মরণ করিব, বর্ত্তমানের উপর মমতার সহিত তাকাইব এবং ভবিষ্যতের দিকে গভীর প্রশান্তির সঙ্গে দৃষ্টি প্রসারিত রাখিব।"

অনুবাদক—শ্রীশেলী দত্ত

শেষ কান্নার গান

অনাথ চট্টোপাধ্যায়

তিরিশ বছর বয়সে দিলাম
শেষ কান্নার গান
আমার জীবনে এই হোল গিয়ে
সব শেষ অবদান।
এবার ফেরার এসে গেছে দিন
আর বাড়াবো না এতটুকু ঋণ
লুপ্ত স্মৃতির কাফন বিলীন
অজানা সে কোন্ দেশে।
ব্যর্থ কসল ভীড় বাড়াবে না
কাগজের বুকে এসে।
পথের পান্থশালায় তোমরা
অনেকেই দীপ ধরে,
বাঁশির লুপ্ত বুকের গভীরে
সুর দিলে ভরে ভরে।
পেলাম অনেক, হারালাম কিছু
মর্গ-মারীচ ছুটে তার পিছু
সব সন্ধান শেষ হোলনায়
জয়ী আমি হেরে গিয়ে।
তবুও হাজার কাহিনী লিখেছি
তোমাদের কথা দিয়ে।

তিরিশ বছরে তিক্ত দিনের
রিক্ত ফসলগুলি
নীরবে দিলাম, তোমাদের হাতে
উজাড় করিয়া ঝুলি।
চন্দ্রমুখীকে পেয়ে তবু হায়
কাঁদে দেবদাস কিসের ব্যথায়
সেই সে পুরানো উপন্যাসের
ইতিলিপি এতে লিখে;
দিলাম রাতের রহস্যময়ী
সহস্র জোনাকীকে।
যদি পার তবে কাহিনীর শেষে
করুণার নিশ্বাসে
একবার লিখ আমার নামটি
ঠিক তোমাদের পাশে।
কেউ জানবে না, বুঝবে না কেউ
সাগরে ফিরবে সাগরের ঢেউ
কোন ছাপ তার থাকবে না হায়
পৃথিবীর দর্পণে।
শেষ কান্নার গান দিলাম
[illegible] দর্পণে।

বাংলা দেশের মসজিদ, কবর ও দরগা

(জেলাভিত্তিক ইতিবৃত্ত)

পূর্ব প্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক মাখনলাল রায় চৌধুরী এম, এ, ডি,লিট,

লোটন মসজিদ বা লোটন মসজিদ—সুলতান ইয়ুসুফ শাহের একটি নর্তকী বালিকা ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্মাণ করে। এই নর্তকী বালিকাটি গোড়ায় ছিল একজন হিন্দু—নাম ছিল তখন মীরা বাঈ। ইয়ুসুফ শাহ মীরা বাঈকে বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করেন। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাগজপত্রে এই তালুকের নামই হইয়া যায় 'মীরা তালুক'। এই মসজিদের মূল কাঠামো ও প্রাচীরের প্রস্তরাদি হইতে উহা একটি হিন্দু-মন্দির বলিয়াই মনে হয়। ধ্যান-ধারণার দিক হইতে ইহা অপূর্ব্ব, ইহার কারুকার্য্যও চমৎকার, গঠন ও সাজসজ্জা সুচারু। মেজর ফ্রাঙ্কলিন বলেন, "লোটন মসজিদের মতো এত সুন্দর ধরণের মসজিদ উত্তর-হিন্দুস্থান আর নাই।" পূর্ব্বদিকে একটি বড় সমাধি বিদ্যমান। চাঁদনী রাত্রে মসজিদ হইতে চারটি রঙ প্রতিফলিত হয়—সবুজ, নীল, হরিদ্রা ও শাদা। স্থাপত্য-শিল্পের অনুরাগীরা দূর হইতেও এখন অবধি এই মসজিদটি দেখিলে আকৃষ্ট হন।

গুণমন্ত মসজিদ—সুলতান ফতে শাহ ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্মাণ করেন। ভাগীরথী নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। ভাগীরথীর উপকূলে ইহা স্থাপিত এবং গুণমন্ত নাম হইতে ইহার সহিত হিন্দুদের যোগাযোগ অনুমিত হয়। অধিকন্তু খিলান ও গম্বুজ ছাড়া ইহার সবটাই প্রস্তর-নির্ম্মিত। খিলান ও গম্বুজ পরে সংযোগ করা হয় এবং ইটের তৈয়ারী। ইহা স্পষ্টতঃ একটি হিন্দু মন্দির। বকর-ঈদের দিনে ইহা পূর্ব্বেও ব্যবহৃত হইয়াছে, আজও ব্যবহৃত হয়।

বড় সোনা মসজিদ বা বারো দুয়ারী মসজিদ—সোনা মসজিদ নাম হইলেও, উহাতে সোনার নামগন্ধ নেই। খুব সম্ভব এই মসজিদ নির্মাণে যে প্রচুর ব্যয় হয়, তাহা সোনার ওজনে পরিমাপ করা হয়, রূপা বা তামায় নয়। 'বারো দুয়ারী' কথাটি হইতে বুঝা যায় যে, মসজিদটির বারটি বৃহৎ দরজা ছিল। এখনও ইহার এগারোটি দরজা বিদ্যমান আছে। হোসেন শাহ ইহার নির্মাণ শুরু করেন এবং ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে নাসরাত শাহ'র আমলে কাজটি শেষ হয়। দেখিতে ইহা দিল্লীর লোদি ইমারতের অনুরূপ। ইহার বিশেষ গঠন—ইহাতে গম্বুজ আছে ৪৪টি।

ছোট সোনা মসজিদ—কথিত আছে, এই মসজিদটি সোনার চাদরে মোড়া ছিল। আকারে ইহা ছোট, সেইজন্যই ইহাকে বলা হয় **ছোট সোনা মসজিদ**। **বড় সোনা মসজিদ** ও ছোট সোনা মসজিদ—দুই-ই নির্মাণ করেন হোসেন শাহ। ইহার স্থপতি ওয়ালি মহম্মদের মৃতদেহও ইহার পার্শ্বেই কবর দেওয়া আছে। এই মসজিদটিতে যে সব প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখিলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে সেগুলি নেওয়া হয়।

রাজবিবি মসজিদ—স্থানীয় অঞ্চলে যে কথা প্রচলিত—ইহা নাকি জনৈক হিন্দু রাণীর মন্দির ছিল। ইহাকে একটি মসজিদে রূপান্তরিত করা হয় এবং নূতন নাম দেওয়া হয় রাজবিবি (হিন্দু রাণীর) মসজিদ। প্রধান গম্বুজটি এখনও বিদ্যমান আছে।

বেগ মহম্মদ মসজিদ—গুণমন্ত মসজিদ হইতে প্রায় ৫০ ফুট দূরে এই মসজিদটি অবস্থিত। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, সম্পূর্ণ রঙীন ইটের সাহায্যে ইহা নির্ম্মিত হয়।

আখি সিরাজ মসজিদ—খ্যাতনামা মুসলমান ঋষি আখি সিরাজুদ্দীনের সমাধির নিকট এই মসজিদটি স্থাপিত হয়। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহ ইহা নির্ম্মাণ করেন।

দরস্ বাড়ী (পাঠ ভবন)—নাম হইতেই বোঝা যায় যে, ইহা ছিল একটি বিদ্যালয়। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে কামতাপুর বিজয়ের স্মারক হিসাবে হোসেন এই বিদ্যালয়টি নির্ম্মাণ করেন এবং ইহার নিতান্ত পার্শ্বেই রহিয়াছে একটি মসজিদ। আরবী ভাষায় ইহার গাত্রে যাহা লেখা আছে, তাহাতে ইহার নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারা যায়।

পাণ্ডুয়া—বর্ত্তমানে যেখানে মালদহ বিদ্যমান, সেখান হইতে প্রায় ১৬ মাইল দূরে পাণ্ডুয়া নগরীর ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। মালদহের সাত মাইল দূর হইতে দক্ষিণ দিকে পাণ্ডুয়ার প্রান্তদেশ আরম্ভ। ইহা যে একটি হিন্দু নগরী ছিল, তাহা হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি খোদাই করা অসংখ্য পাথর হইতেই বোঝা যায়। হিন্দু মন্দিরগুলি মসজিদে পরিণত হয়। পাণ্ডুয়ার প্রথম প্রবেশ-দ্বারটি সেলামি দরজা নামে অভিহিত। ঋষি প্রতিম শাহ জালাল এই নগরীতে প্রবেশের পূর্ব্বে এখানে একটি পাথরের উপর বিশ্রাম নিয়েছিলেন। দরজার কাঠের উপর এই কথা কয়টি রহিয়াছে—ইয়া আল্লাহ্ ও ইয়া শাহ জালাল। প্রায় ৪০০ গজ পূর্ব্বদিকে সেলামি দরজার পাশেই আছে পীর জালালুদ্দীন মুকদুম শাহের বাড়ি। সেখানে একটি মসজিদ ছিল এবং উহার নাম ছিল বড় দরজা। ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে আলি মুবারক ইহা নির্ম্মাণ করেন। মসজিদের ধ্বংসাবশেষ হইতে বোঝা যায় যে, একটি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপরে ইহা নির্ম্মিত হয়।

ছোট দরগা বা নুর কুতব-উল-আলম-কা-দরগা—রাজা গণেশের সহিত নুর কুতব-উল-আলমেরও খ্যাতি রহিয়াছে। ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে নাসিরউদ্দীন মহম্মদ শাহ'র আমলে লতিফ খান নামক এক ব্যক্তি এই দরগাটি নির্ম্মাণ করে। কুতব-উল-আলমের মৃত্যুর ঘটনাটি একটি বড় ফলকে লেখা আছে এবং সেই সঙ্গে খোদিত আছে ইহার নির্মাতার নামটি।

এই মসজিদ ও দরগা ভালেশ্বরী নামেও অভিহিত। সম্ভবতঃ এই নামীয় কোন মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ছিল ভালেশ্বরী। ভালেশ্বরী নামে একটি তালুকও আছে। এইরূপ হইতে পারে যে, ভালেশ্বরী মন্দিরের ব্যয়ভার বহনের জন্যই ভালেশ্বরী তালুক উৎসর্গীকৃত হয়। পরে মসজিদটি নির্মাণের পর ভালেশ্বরীর আয় ছাড়িয়া দেওয়া হয় ছোট দরগার জন্য।

সেখানে কুমীরের আকৃতি-বিশিষ্ট একটি বড় পাথর ছিল—উহার ভিতর দিয়া বৃষ্টির জল নির্গত হইত। পাথরটি মন্দিরে ছিল বলিয়া মুসলমানরা উহা স্পর্শ করে নাই। কারণ ইসলামের মতে শূকরের ন্যায় কুমীরও হারাম (অপবিত্র)।

কুতব-উল-আলাম মসজিদটি ও মকদুম শাহ জালাল পূর্ব্ব-বঙ্গের তীর্থযাত্রীদের পুণ্যক্ষেত্র।

একলাখি মসজিদ—রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দীন যদুসেন ইহা নির্ম্মাণ করেন। সব দিক হইতেই ইহা একটি সমাধিক্ষেত্র। ইহার আয়তন ১৫ বর্গ গজ—আটটি কোণায় ৮টি থাম আছে এবং একটি আছে গম্বুজ। সমাধিস্থলের ভিতরটা হিন্দু ধরণে সজ্জিত। এইরূপ প্রবাদ, আসলে ইহা ছিল একলক্ষী নামে এক হিন্দু দেবীর মন্দির—ইহার নির্ম্মাতা রাজা গণেশ। তাঁহার পুত্র মন্দিরটি কুতুব-উল-আলমের সম্মানার্থে মসজিদে পরিণত করেন। রাজা গণেশের পুত্রকে ধর্ম্মান্তরিত করার ব্যবস্থা করেন কুতুব-উল-আলম। কানিংহাম বলিয়াছেন যে, মসজিদের অভ্যন্তরভাগে জালালুদ্দীনের নিজেরই সমাধি রহিয়াছে। আর রেভেনশ বলেন যে, ইহা ছিল সুলতান গিয়াসুদ্দীনের সমাধি।

আদিনা মসজিদ—একলাখি মসজিদের দুই মাইল পূর্ব্ব দিকে ইহা অবস্থিত। বাংলা দেশে আদিনা মসজিদই হইল সর্ব্ববৃহৎ মসজিদ—আয়তনে ৫০৭ × ২৮৫ বর্গফুট। এই মসজিদ নির্ম্মাণের জন্য যে সব মাল-মসলা ব্যবহৃত হয়, আদিনাথ নামীয় কোন হিন্দু মন্দির হইতে সে সব নেওয়া হইয়াছে। সুলতান নিজে এই মসজিদে প্রার্থনা করিতেন। মসজিদের ভিতর যে আসনটিতে তিনি বসিতেন, তাহা এখনও বাদশাহী-তক্ত নামেই অভিহিত। এই মসজিদের গম্বুজ ছিল ৩৭৮টি। প্রবেশদ্বারে এখনও একটি বুদ্ধের মূর্ত্তির চিহ্ন আছে। ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে সিকান্দার শাহ ইহা নির্ম্মাণ করেন। পরে অবশ্য অন্যান্য সুলতানদের দ্বারা উহা সম্প্রসারিত হয়। আদিনা মসজিদের ঠিক উত্তর দিকেই সেকেন্দার শাহের সমাধি অবস্থিত। সেখানে হিন্দু মন্দির ও দেব-দেবীর মূর্ত্তি সংখ্যায় এত বেশী ছিল যে, মুসলমানরা অনেক চেষ্টা করিয়াও সবগুলি বিনষ্ট করিতে পারে নাই। মুসলমানরা সেগুলি মসজিদে উপুর করিয়া পাতিয়া রাখে, উহাদের কতকগুলি কসাইদের হাতে ওজন ও পরিমাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার কতকগুলি জুম্মা মসজিদে উঠিবার সিঁড়িতে বাঁধা হয়—উদ্দেশ্য ধার্ম্মিক মুসলমানরা যেন কাফেরদের দেবতাসমূহ পদদলিত করিয়া যাইতে পারেন। মসজিদ ধসিয়া পড়িলে মুসলমানদের কবর, প্রাসাদ ও মূর্ত্তিগুলি আবিষ্কৃত হয়।

(১৬) মেদিনীপুর : মেদিনীপুর সহরের সেন্ট্রাল জেলের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি মুসলমান দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে—ইহার নাম **আবাসগড়**। সেখানে গাজী শাহ মুস্তাফা মাদানির **আস্তানাও** আছে। পীর মুরশিদ আলির **খানকা সরিফ**—এইটি সম্ভবতঃ যতদূর প্রাচীন বলিয়া ধরা হয়, ততটা নয়। এই খানকা সরিফের অনেক আগে হইতেই কাঁসাই নদীর তীরে হজরত পীর লোহানির সমাধি ছিল।

(১৭) মুর্শিদাবাদ : এই জিলার প্রাচীনতম মসজিদের চিহ্ন মহারাজা শশাঙ্কের রাজামাটি এলাকায় দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে পীর তুরকান আলীর মসজিদের ধ্বংসাবশেষও পরিদৃষ্ট হয় এবং তাঁহার সমাধিস্থানটি মোটেই জাঁকালো নহে।

আজিমগঞ্জ হইতে ৫ মাইল দূরে খায়েসাবাদে জনৈক অজ্ঞাতনামা মুসলমানের দরগা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দরগার পাথরগুলি প্রাচীন মহাস্থানগড় নগর হইতে নেওয়া হয়। সুতরাং প্রথম দিকে মুসলমানের অধিকার বিস্তারের সহিত ইহার যোগাযোগ থাকিয়া যাইবে। কেন না, সে যুগে সাধারণতঃ হিন্দু মন্দিরগুলির মাল-মসলাই মসজিদ নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত।

মনিগ্রাম মসজিদ : ইহা ছিল সুবুদ্ধি রায়ের জন্মস্থান। হোসেন শাহ'র বাল্যাবস্থায় সুবুদ্ধি রায় ছিলেন। সে যুগের কাজীর সহিত এই মসজিদটির যোগাযোগ ছিল। স্থানীয় অঞ্চলে মর্ত্তুজানন্দ নামে একজন ফকিরের কথা বিশেষভাবে প্রচলিত। তাঁহার বাবা সৈয়দ হাসান ছিলেন একজন ঋষিতুল্য ব্যক্তি এবং তাঁহার প্রভাবও ছিল প্রচুর। জঙ্গিপুরে অনেক পাথর ও একটি মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদটি নির্ম্মাণ করেন সৈয়দ মার্ত্তজার এক কন্যা।

(১৮) ময়মনসিংহ : ময়মনসিংহে তুর্কো-আফগানরা যে হানা দিয়াছিল, এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু টাঙ্গাইল মহকুমার রোতায়া গ্রামে আফগানদের পনি উপজাতির একটি পারিবারিক মসজিদ ছাড়া কোন মসজিদের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

(১৯) নদীয়া : শান্তিপুরের **তোপখানা** মসজিদ নামে যে মসজিদটি রহিয়াছে, চৈতন্যের আমলে কাজী মসজিদ বলিয়া উহার উল্লেখ আছে। কাজী ও চৈতন্যের কাহিনী ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকের ঘটনা। সে যুগে সাধারণ স্থানে কীর্ত্তন গাহিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রকাশ্য প্রতিরোধ জ্ঞাপন ও মুসলমান আধিপত্য সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ দেওয়ার নূতন পদ্ধতিরই কার্য্যতঃ একটি দৃষ্টান্ত ছিল। তোপখানা নামটি প্রদান করে মহম্মদ আয়ার খান। এই লোকটিই ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মসজিদটি সম্প্রসারিত ও সুশোভিত করে।

(২০) নোয়াখালি—জিলার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মসজিদ বাজরায় স্থাপিত। মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে আমীর শাহ নামে একজন পীর মেঘনায় মোহনায় অবতরণ করে। যেখানে তাহার জলযানটি আসিয়া নোঙর করে, উহাই বাজরা নামে অভিহিত। এই গ্রামের বুনিয়াদী জমিদার পরিবারের জুম্মা মসজিদটি বাজরা মসজিদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সন্দীপ (বারো আওলিয়া) দ্বীপে একটি অত্যন্ত প্রাচীন মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। রোহিণী গ্রামে তুর্কো-আফগান আমলে ইহা নির্ম্মিত হয়।

(২১) পাবনা—সাহাজাদপুরে পীর মাকদুম সাহ্দৌলা সমাধি ও মসজিদের পার্শ্বে সারি সারি মসজিদ আছে। ইহার কয়েকটি তাহার তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের এবং বাকিগুলি যে কয়েকজন আওলিয়া তাহার সহিত আরবের ইয়েমেন হইতে বাংলার মুরসাগরে আসিয়াছিল, তাহাদের নামীয়। এই মসজিদগুলির উন্নয়নের জন্য মুরসাগরে ৭১২ বিঘা নিষ্কর জমি বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হয়।

কাকসাল উপজাতির একজন পাঠান আমীর পাবনা জেলায় চাটমোহর মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধে এই আমীরের খুব খ্যাতি ছিল। মসজিদের গাত্রে যাহা লেখা

আছে, তাহাতে ইহার নির্মাণ সম্পর্কিত পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। কোন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর ইহা নির্মিত হয়। চাটঃ মোহর মসজিদের প্রাচীর-সমূহে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিগুলি এখনও স্পষ্ট দেখা যায়।

রাজসাহী : বারবক্ শাহ'র (১৪৬০--১৪৭৪) নামানুসারে প্রসিদ্ধ সাহী মসজিদের নাম হয়। বর্তমান রাজসাহী কলেজের দক্ষিণ দিকে একটি খুব প্রাচীন মসজিদ আছে। নিকটেই আছে পীর মাকদুম সাহের দরগা—১৫ শতকের শেষভাগে ইহা নির্মিত হইয়া থাকিবে।

পাহাড়পুরের নিকটস্থ **পাঁচ বিবির মসজিদ**। সেখানে হিন্দু ধর্মান্তরিত নিমাই সাহা নামে জনৈক ফকিরের একটি অত্যন্ত প্রাচীন দরগা আছে। বরেন্দ্র গবেষণা সমিতির মতে নিমাই সাহার দরগাটি আসলে একটি বৌদ্ধস্তূপ ছিল।

নাসরাবাদে ইসমাইল গাজীর নামানুসারে গাজী ইসমাইল মসজিদের নামকরণ হয়। নাসারত শাহর আসাম-বিজয়ী প্রধান মুসলমান সেনাপতির নাম। গাজী ইসমাইল নামটি খুবই প্রচলিত। এই ইসমাইল কিন্তু বরবক শাহর আমলের ইসমাইল নয়।

(২১) **রংপুর ঃ** রংপুরের ডোমারে পাজা পীরের মসজিদ—উত্তর-বঙ্গের একটি সবচেয়ে বড় পশু মেলা বসে এই ডোমারে। পাজা পীরের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা পৌষ মাসে এই মেলা হয়।

স্থানীয় অঞ্চলের জনশ্রুতি—পাজাপীর ছিল আসলে একজন বৈষ্ণব, নাম পঙ্কজ। এই লোকটি পশুদের খুব ভালবাসিত। সেইজন্য তাহার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এই ধরণের পশুমেলা হইয়া থাকে।

(২৪) **শ্রীহট্ট :** শ্রীহট্ট সহরের মাঝখানেই রহিয়াছে প্রসিদ্ধ শাহ জালালের মসজিদ। ফকরুদ্দীন মুবারক শাহের (১৩৩১—১৩৫০) অধীনে মুসলমান হানাদার ফৌজের সঙ্গে এই পীর ছিলেন এবং মসজিদটি তাঁহারই ক্রিয়াকলাপের পরিচায়ক। তাঁহার গৃহ (খানকা), প্রার্থনা-স্থান (মসজিদ) ও পবিত্র গোরস্থান (মাকবেরা—ই—মাকাদ্দাস) এখনও পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের শ্রদ্ধার বস্তু। ভারতের এই দুর্গম অংশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের পবিত্র মিশনে যে ৩৬০ জনের মতো পীর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল, তাহাদের প্রায় সমসংখ্যক সমাধি এখানে রহিয়াছে।

অনুগামী পীর আলির গোরস্থানটি শাহ জালালের পার্শ্বেই বিদ্যমান। পীর শাহ জালালের বিজয়-গাথা ইবন বতুতা উল্লেখ করিয়াছেন, ইবন বতুতা ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। ঐ গৃহ এখনও শ্রীহট্টে দেখিতে পাওয়া যায়—যাহার জন্য ইহার অবস্থান ও সময় সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

(২৫) ২৪-পরগণা : কলিকাতা হইতে ১১ মাইল দূরে হাড়োয়ার গোরাচাঁদ মসজিদ বা গোরাইগাজী মসজিদ—পীর গোরাচাঁদের একটি প্রচার-বেদী (আস্তানা) সেখানে আছে। এই পীর গোরাচাঁদ হিন্দুধর্ম হইতে ধর্মান্তরিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দূরবর্তী বসিরহাটের নিকট মাসিক মসজিদ—১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে উলুগ খান, মজলিশ-ই-আজম এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।

ফুরফুরা মসজিদ—কলিকাতা হইতে ২০ মাইল দূরে সিয়াখালায় এই মসজিদটি অবস্থিত। খুব সম্ভব হোসেন শাহ'র আমলে ইহা নির্মিত হইয়াছিল। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফুরফুরার পীর নামে অভিহিত একজন মুসলমান ফকির ইহার পুনর্নির্মাণ করেন।

কলিকাতা হইতে ৮ মাইল দূরবর্তী তারাপুকুরের আজমিরি মসজিদ—মাঘ মাসের (বাংলা) পয়লা তারিখে এখানে একটি বড় মেলা বসে এবং এই মেলা স্থায়ী হয় এক সপ্তাহ। যে পীরের স্মরণার্থে এই মেলা হয়, তিনি ছিলেন দিল্লীর তুর্কো-আফগান আমলের মৈনুদ্দীন চিস্তির শিষ্য। এই হইতে বোঝা যায় যে, তারাপুকুরের পীর বাংলায় মুসলমান-আধিপত্য বিস্তারের প্রথম যুগে এই প্রদেশে আসিয়া থাকিবেন।

ঘুটিয়ারি শরিফ—কলিকাতা হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে পীর গাজী মুবারক আলি সাহেবের দরগা ও মসজিদ আছে। স্থানীয় গাথায় (গাজীর কোদা) জানা যায় যে, মুবারক আলি সুন্দরবন অঞ্চলে প্রথম মুসলমান ধর্ম-প্রচারক ছিলেন। এই পীরের হিন্দু ও মুসলমান অনুরাগীরা তাঁহার কবরের পার্শ্বে বর্তমান মসজিদটি নির্মাণ করে। 'ঘুটিয়ারি শরিফ' নামে পরিচিত এই মসজিদটির নিকট আষাঢ় ও ভাদ্র মাসে প্রতি বৎসর দুইটি মেলা বসে। প্রতাপাদিত্যের বিজয়-গাথায় ঘুটিয়ারি শরিফের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা হইতে ১৪ মাইল দূরবর্তী মল্লিকপুরে ফকির আবদুল্লা আতস মসজিদ অবস্থিত। আবদুল্লা আতস ছিলেন মুসলমান পীরদের নাখোদা সম্প্রদায়ের একজন সদস্য।

মৌলানা রহুল আমিন সাহেবের লিখিত পীরদের ও মসজিদ-সমূহের ইতিহাসে নাখোদা ফকিরদের অনেক অলৌকিক কাহিনী জানিতে পারা যায়। হোসেন শাহ'র সচিব পুরন্দর খান কিংবা গোপীনাথ বসু তাঁহার নিজ গ্রাম মল্লিকপুরের বিপরীত দিকে অবস্থিত মাহিনগরে (ময়নাগড়ে) একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

মুন্সী মৈনুদ্দীন রচিত পুঁথিতে এবং বনবিবির জহুরা-নামা নামে অভিহিত রচনায় দক্ষিণা রায়ের বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল গাথায় দক্ষিণা রায়কে 'গাজী' উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। ধপধপিতে পুরাপুরি সামরিক পোষাক-পরিহিত দক্ষিণা রায়ের মূর্তির নিকটেই 'বরখান গাজী দরগা' নামে একটি বেদী আছে। এখানে প্রত্যেক শুক্রবারই মুসলমানরা নামাজ পড়ে আর হিন্দুরা হিন্দু দেবতাগণের 'মন্ত্র' উচ্চারণ করে। দক্ষিণা রায়ের জন্য পূজার আর কোন পৃথক ব্যবস্থা নাই। প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার লোকেরা বাতের ঔষধের জন্য সেখানে জড় হয়। পয়লা মাঘ হিন্দু ও মুসলমানরা মিলিতভাবে বরখান গাজী ও দক্ষিণা রায়ের পশু মেলায় আনন্দ করিয়া থাকে। ইহা ধপধপির মেলা বলিয়াও অভিহিত। দক্ষিণা রায়ের মেলা ষোড়শ শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে।

লক্ষ্মীকান্তপুর গ্রামে 'মণিবিবির কবর' নামে একটি সমাধি আছে—উহার পার্শ্বেই আছে একটি মসজিদ। সমাধিটি দেখিতে হিন্দু মন্দিরের ন্যায়। মণিবিবি নামটিতে হিন্দু নামের আঁচ পাওয়া যায়। মণিবিবি ছিল একজন হিন্দু মহিলা—এই মতবাদের সমর্থনও এইখানেই মিলে।

কলিকাতা হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে কাজিপাড়া মহল্লায় একদিল সাহেব নামীয় একজন পীরের বেদী আছে। অনেক অলৌকিক কাহিনী এই পীরের নামে আজও চলতি। তিনি মাছি গরু, ছাগল, বাঘ কিংবা হরিণকে ইচ্ছামতো রূপ দিতে পারিতেন। সুন্দরবন এলাকার প্রথম যুগে মুসলমান প্রচারকরা সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ত এই সকল অলৌকিক কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছিল। একদিল সাহেব বেদীর সন্নিকটেই একটি মসজিদ আছে।

গোবরডাঙ্গা রেল-ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে গোবরডাঙ্গা মহল্লায় ওলাবিবির দরগা আছে। ওলা কলেরারই হিন্দু প্রতিশব্দ, আর বিবি একটি মুসলমান শব্দ—ইহার অর্থ সম্মানিতা মহিলা। ওলা বিবি কলেরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব'লয়া অভিহিত। মুসলমানরা—যাহাদের অধিকাংশই হইয়েছে ধর্ম্মান্তরিত, তাহাদের অনেকেই বহু জায়গায় হিন্দুদের দেব-দেবীগুলির পূজা করিয়া থাকে। এইভাবে অনেক স্থলে হিন্দু মন্দির সমূহের পাশাপাশি মসজিদ বা দরগা বা আস্তানা গড়িয়া উঠিয়াছে। নিম্ন বঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাব থাকার বিষয় হিন্দু ও মুসলমানদের রচিত পুঁথি, কেচ্ছা, কাহিনী, পাঁচালী ও অন্তান্ত সাহিত্য সঙ্কলন হইতে জানা যায়।

গোবরডাঙ্গায় চার মাইল দক্ষিণে পীর ঠাকুর বরের বিখ্যাত আস্তানা আছে। এই লোকটি ছিলেন একজন হিন্দু—যিনি ধর্মান্তরিত হওয়ার পরও তাঁহার আদি উপাসনা-ধারা ও রীতি সম্পূর্ণ বর্জন করেন নাই। তাঁহার তিরোভাবের পর মুসলমান সমাধি রক্ষক নিয়মিতভাবে পীর ঠাকুর বরের কবরের উপর ফুল ও বেলপাতা দিত। এই সমাধির সন্নিকটে যে মসজিদটি আছে, উহা সমাধিটির মতই বিখ্যাত নহে। চলতি প্রবাদ আছে, এই পীর ছিলেন মুকুট রায়ের সাত ছেলের অন্যতম। মুকুট রায় সপ্তগ্রাম-বিজয়ী জাফর খানের পুত্র বরখান গাজীর নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। মুকুট রায়ের কনিষ্ঠ সন্তান কামদেব গোবরডাঙ্গার নিকট চরঘাটে পলায়ন করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত মুসলমান হন। তখন তাঁহার নাম হইয়া যায় পীর ঠাকুর বর। তিনি ছিলেন জাফর খানের সম-সাময়িক অর্থাৎ ১৩১০ খৃষ্টাব্দের লোক।

অনুবাদ : অনিলধন ভট্টাচার্য্য

মুহূর্ত

রমেশ মুখোপাধ্যায়

চাঁদটা পালিয়ে গেল
তাকে দেখে লজ্জা পেয়ে।
আমরা বসেছিলাম দু'জনে
শহরের শেষ প্রান্তে
নিওনবাতির জ্বলে-পুড়ে-মরা
হা-পিত্তোস-রূপকে পেছনে রেখে।
সামনে কেঁদে কেঁদে-সারা হওয়া অন্ধকার
কেবলই আমাদের দু'জনকে ডাকছিল
আঁধারকে জড়িয়ে ধরে
তার মধ্যে হারিয়ে যেতে।

আমার পাশে সে বসেছিল কবিতার মতো—
চণ্ডীদাসের পদাবলীর মতো,
কথা না বলে'
সবখানি ভাল-লাগা নিয়ে
শুধু বসেছিল শীতের পায়রার মতো।

আমার ভবিষ্যতের মতো
গভীর কালো তার কুন্তল,
বেণীতে জড়ান কি দুঃসহ রহস্য,
সোনালী রোদের মতো ললাট প্রাঙ্গণে
ছোট ছোট চুলের আগাছা
হাতলার মতো হাত বাড়িয়ে ছিল ;
আর তার চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে
'ড্যাফ্রগপ'-এর জন্ত বিলাপ কোরেছি,
সাদা কাগজের মতো চোখের
কালো গভীরতার অন্তরালে

নির্ভয়ে হারিয়ে যাওয়া যায়
ডুবুরীর মতো।

কথা-না-বলা মুখে
যখনই সে হাসছিল,
মনে মনে কামনা কোরেছি :
এ মুহূর্ত, এ রাত যেন শেষ না হয়—
ভোরের আলোতে ফুলবনের
সব মধুকর যে ছুটে আসবে—
ঠেকে দেবে ক্ষতাবক্ষত কোরবে যে,
লালটুকটুকে একটা স্বপ্ন !

চাঁদ তাকে দেখে লজ্জা আর ঈর্ষায়
পালিয়ে গেল মেঘের আড়ালে।

রোমশ, তৃণগুল্মভরা এ পৃথিবীতে
হঠাৎ যেন আমার পুরোনো ভবিষ্যৎকে
দেখতে পেলাম—
দেখতে পেলাম তার মধ্যে।
চাঁদের চলে-যাওয়া-পথের দিকে
চেয়ে চেয়ে দেখছিল সে—
আর আমি তার মুখের দিকে।

মনে হোল, আমার দিনগুলো
শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করুক
আজ এ রাত্রে—এই মুহূর্তে,
আর মিলন্ত আশাগুলো
জেগে উঠুক তার ঐ
লালটুকটুকে হাসিতে।

ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়

[কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগারের ডিরেক্টর]

সাধনায় যদি থাকে পূর্ণ নিষ্ঠা, লক্ষ্য যদি থাকে গোড়া থেকেই সুস্পষ্ট, তা হলে কার্যক্ষেত্রে সিদ্ধি ও সাফল্য না জুটে পারে না। ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন সর্বসমক্ষে তারই জলন্ত প্রমাণ তুলে ধরেছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একজন পরম সাধক ও নির্ভীক পূজারী ইনি—নিরবচ্ছিন্ন সাধনারই ফল স্বরূপ এযাবৎ শ্রী ও যশঃ মিলছে তাঁর প্রচুর। বিশেষ অধিকার ও গুণবত্তার দরুণ এই চিন্তাশীল কর্মী মানুষটি এক্ষণে লক্ষ্ণৌস্থিত কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগারের ডিরেক্টরের দায়িত্বশীল আসনখানি অলঙ্কৃত করে আছেন।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় কোলকাতার সন্নিহিত বারাকপুরে (২৪ পরগণা) জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৩ সালের ১লা মার্চ (সরকারী বয়সের হিসাবে ১৯০২ সালের ৩০ শে জুন)। পল্লীর বিদ্যালয়ে প্রথম পাঠ শেষ করে তিনি ভর্তি হন এসে শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুলে (কোলকাতা)। সূচনাতেই তাঁর অপূর্ব মেধা ও স্মৃতিশক্তি প্রকাশ পায়—ক্লাশের প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে চলেন। ১৯১৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন আর সে বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে। সরকারী বৃত্তি তো তিনি পেলেনই, তার ওপর বিদ্যালয় থেকেও একটি স্বর্ণপদক (নৃপেন্দ্র-স্মৃতি স্বর্ণপদক) পেলেন। এরপর কোলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্ররূপে তাঁর পড়াশুনা ; ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ স্থান অধিকার করেন, নিজ কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তিনিই হন প্রথম।

এবারে বিষ্ণুপদের মনে কঠিন সঙ্কল্প জাগলো—তাঁকে চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শী হতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে আরও বহুদূর। যেমনি সঙ্কল্প, তেমনি কাজের সূচনা দেখা গেল, এই উদীয়মান যুবক কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে গেলেন। সর্ব্বশেষ এম্ বি পরীক্ষা অবধি তিনি বৃত্তি, পুরস্কার ও পদক পেয়েছেন একাধিক। কিন্তু একটি কথা বলতেই হয়—মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সময়ে তাঁকে ভয়ানক অর্থকষ্ট পেতে হয়েছে—তার জন্যে তিনি সময় করে গৃহ-শিক্ষকতা পর্য্যন্ত করেছেন। অসময়ে পিতৃহারা হয়ে পড়াতেই সহসা দৈন্যের মুখোমুখী হয়ে পড়েছিলেন তিনি—সে অবস্থা কাটিয়ে উঠতে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন তাঁরই একজন সহপাঠী বন্ধু, বর্ত্তমানে তিনি কোলকাতার অন্যতম নামজাদা সার্জ্জন।

ভেষজবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসা বিদ্যায় বিষ্ণুপদ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-বি ডিগ্রী লাভ করেন ১৯২৭ সালে। কোলকাতা মেডিকেল কলেজে সেবারে তিনিই প্রথম স্থানের অধিকারী হন। এর পরই ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের প্রসিদ্ধ ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ ও স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক গ্রীণ আর্মিটেজের অধীনে কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ইডেন হাসপাতালে জুনিয়র হাউস সার্জ্জনরূপে ব্রতী হতে দেখা যায়। একাদিক্রমে দেড় বছর কাল এই পদে তিনি নিযুক্ত থাকেন এবং যথেষ্ট সুনামের অধিকারী হন। অধ্যাপক আর্মিটেজের ইউরোপে চলে যাবার পর বিষ্ণুপদ কোলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর তৎকালীন ভেষজবিদ্যার অধ্যাপক কর্ণেল স্যার রামনাথ চোপরার অধীনে গবেষণা কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

আর্থিক কারণেই ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে সকল আয়োজন করে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় করা হয়ে উঠে না। আধুনিক ভেষজতত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণার জনক কর্ণেল চোপরার সুযোগ্য সহকারী রূপে কর্মনিযুক্ত হয়ে তিনি অল্পসময় মধ্যেই আপন বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা প্রদর্শন করেন। এর পর একে একে বহু নতুন সম্মান জুটতে থাকে তাঁর, বিভিন্ন মহলে উচ্চ আসন পেয়ে চলেন তিনি। ১৯৩০ সালে ভারত সরকারের ভৈষজ্য অনুসন্ধান কমিশনের সহকারী সেক্রেটারীর পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। সে-কাজ সুসম্পন্ন করে তিনি স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ভারতীয় গবেষণা তহবিল সামাজিক দেশীয় ভৈষজ্য-অনুসন্ধান সংস্থায় আবার গবেষণা কার্য্যে লিপ্ত হন। সর্পগন্ধা ও অন্যান্য ভেষজ সম্পর্কে তাঁর সেক্ষিকার মৌলিক গবেষণা সারাষ্ট্র ভেষজ-বিজ্ঞানীদের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে। যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বিভিন্ন সময়ে গ্রাকথ, যাদবজী, ডাঃ চন্দ্র ও রাখালদাস ঘোষ পুরস্কার এবং নীলমণি ব্রহ্মচারী, ম্যাকলিয়ড, বার্কলে, সপ্তম এডওয়ার্ড করোনেশন, মহেন্দ্র গাঙ্গুলী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও কোটস্ স্বর্ণপদক লাভ করেন। চীন, জাপান ও আমেরিকায় উন্নততর ভৈষজ্যবিদ্যা ও উদ্ভিজ্য ভৈষজ সংক্রান্ত জৈব রাসায়নিক তত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য তিনি রকফেলার ফাউণ্ডেশন স্কলারশিপ পান ১৯৩৩ সালে। আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৈষজ্য সংক্রান্ত গবেষণাগারে নিবিড় গবেষণার ফল স্বরূপ তিনি ডি, এস, সি, ডিগ্রীতে ভূষিত হন, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আগে আর কেউ এই সম্মানের অধিকারী হতে পারেন নি।

ফার্মাকোলজি বা ভৈষজ্য-তত্ত্ব সম্পর্কে অধ্যয়ন ও গবেষণা বলতে গেলে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের নিত্যসাথী। আমেরিকা থেকে তিনি যান ইংল্যাণ্ডে—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও হ্যাম্পষ্টেডের জাতীয় ভেষজ-গবেষণাগারে অধ্যয়ন শেষ করেন, এবং এর পর কিছুকাল কাটান মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজি লেবরেটরিতে। ১৯৩৭ সালে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন এবং কোলকাতায় ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব্ হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেল্থ ভবনে অবস্থিত ভারত সরকারের (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়) নব প্রতিষ্ঠিত বায়ো-কেমিক্যাল ষ্ট্যাণ্ডারডাইজেসন গবেষণালয়ে নতুন করে অধ্যাপক চোপরার অধীনে

কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এযাবৎ ভৈষজ্যবিদ্যা ও শারীরতত্ত্ব বিষয়ে কত মৌলিক গবেষণাপূর্ণ মূল্যবান প্রবন্ধ তাঁর হাত দিয়ে বের হয়েছে, হিসাব নেই।

বৈজ্ঞানিক গবেষক হিসাবে ডাঃ মুখোপাধ্যায় বহুক্ষেত্রে দক্ষতা ও নেতৃত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, যার জন্যে দিন দিন তাঁর খ্যাতি বাড়ছে বই কমছে না। আজ যে জাতীয় ভেষজ-গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে, এর পরিকল্পনার মূলে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা স্বীকার্য্য। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টারের পদে তিনি অধিষ্ঠিত রয়েছেন, এ তাঁর প্রাপ্য সম্মান। দেশে কেন্দ্রীয় ভৈষজ্য গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ সংস্থা স্থাপন তাঁর অপর একটি কৃতিত্ব বলা চলে। ভেষজ সংক্রান্ত বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। এবারে কটকে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে ৪১তম অধিবেশন হয়ে গেলো, তাতে মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন তিনিই। আজও তাঁর উদ্যম ও সাধনা ফুরিয়ে যায়নি, দেশ ও জাতি তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক পাবে, এই প্রত্যাশা বুঝি কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি নয়।

কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়

(নির্ভীক কর্ম্মী ও হাওড়ার সুপ্রসিদ্ধ নেতা)

শুধু সুবক্তাই নন, সৎসাহসের সঙ্গে সুস্পষ্ট নীতি নিয়ে যে কোন কাজে এগিয়ে যাওয়ার স্পর্দ্ধা রাখেন হাওড়ার এই সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়। ব্রিটিশ আমলেও দুর্জ্জয় সাহস নিয়ে তিনি অনেক কাজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—ফলে ভোগ করেছেন নির্য্যাতন। আজও নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে সেই সাহস নিয়ে সমাজের কাজে এগিয়ে চলেছেন।

স্বাধীনতার আগে বাংলা দেশের প্রায় প্রতি ছাত্র-আন্দোলনে

কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়

তিনি পুরধা ছিলেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবেও তাঁর প্রশংসা ছিল। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে পদার্থ-বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে তিনি বি-এস-সি পাশ করেন। কিন্তু বাংলার লাট লর্ড লিটনের বিরুদ্ধে বয়কট-আন্দোলন সৃষ্টি করার জন্য তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিভোগী ছাত্র ও একজন মৌলিক গবেষক হিসাবে তিনি স্বীকৃতি পান। ডারউইনের মানবতত্ত্ব অস্বীকার করে তিনি যে থিসিস লেখেন, তা বৈজ্ঞানিক মহলে উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। ১৯৩৬ সালে তিনি আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি বিপ্লবীদল অনুশীলন সমিতির সাথে যুক্ত হন এবং সারা দেশে তরুণ ও ছাত্রদের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন। ১৯২৬ সালে তিনি জেলা ছাত্র-সমিতি গঠন করেন এবং এই সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই সময় থেকেই তিনি বাংলায় ছাত্র-আন্দোলনে নেতৃত্ব করতে থাকেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্যতম সহচর ছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি নিখিলবঙ্গ ছাত্র-সমিতির সভাপতিরূপে ছাত্রদের দিয়ে আইন-অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং কারারুদ্ধ হন। ১৯৩২ সালে লবণ-আইন অমান্য করা এবং বাজেয়াপ্ত বই প্রকাশ্য জনসভায় পাঠ করার অপরাধে পুনরায় কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৫ সালে টাউন হলে বিদ্রোহাত্মক বক্তৃতা করায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৮ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সম্পাদক হন। এই সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। এই সময় হইতে নেতাজীর নেতৃত্বে নেতাজীর আদর্শ অনুসরণ করে প্রতিটি আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। তিনি নেতাজী-প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৪০ সালে হলওয়েল মনুমেণ্ট আন্দোলনকালে গ্রেপ্তার বরণ করেন। পুনরায় ১৯৪২ সালে কারারুদ্ধ হন, ৪ বৎসর কারাবাসের পর শারীরিক কারণে তাঁকে নিজগৃহে নজরবন্দী করা হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে পলায়নে সাহায্য করার অপরাধে বৃটিশ সরকার তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন এবং দীর্ঘকালের জন্য তাঁকে আটক করা হয়।

সাংবাদিক হিসাবেও শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব সর্ব্বজন-বিদিত। তিনি 'ভাবিকাল', 'India To morrow', Science and Engineering প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৮ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক হিসাবে দক্ষতার পরিচয় দেন। সুবক্তা হিসাবেও তিনি অসাধারণ সুনামের অধিকারী।

কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে শ্রীচট্টোপাধ্যায় ১৯৪২ সালে হাওড়া পৌরসভার কমিশনার নির্ব্বাচিত হন, এবং পৌরসভার ট্র্যাফিক কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালেও তিনি পুনরায় হাওড়া পৌরসভায় কংগ্রেস কমিশনার নির্ব্বাচিত হন। শ্রী চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমানে বিধান-পরিষদের সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের যোগাযোগ সচিব।

শ্রমিক কল্যাণের ক্ষেত্রেও শ্রীচট্টোপাধ্যায় স্মরণীয় কৃতিত্বের অধিকারী। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি শ্রমিক আন্দোলনকালে

বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছেন। পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান, বার্ণ মজদুর ইউনিয়ন, গেষ্টকিন্ উইলিয়ামস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ান, রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্মচারী সমিতি, হাওড়া চটকল মজদুর কংগ্রেস প্রভৃতি বহু শ্রমিক-সংস্থার সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র কৃষ্ণবাবু বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত আছেন।

অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী

[জনসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক ও বাগ্মী অধ্যাপক]

শুধু একটি রাজনৈতিক দলের কর্ম্মী বা নেতা হিসাবে নয়,—রাজনীতি, শিক্ষা, ধর্ম্ম, ইতিহাস, দর্শন—যে কোন বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইংরাজী বা বাংলা ভাষায় সারগর্ভ ভাষণ দিয়ে হাজার হাজার শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বাগ্মী অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী। তাই ছাত্রছাত্রী-মহলে হরিপদ বাবুর মত জনপ্রিয় অধ্যাপক খুব কমই দেখা যায়।

ইংরাজী ১৯২০ সালের ১২ই জুন যশোহর সহরে হরিপদ বাবুর জন্ম। আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু শ্রীশ্রীকেশব ভারতীর বংশধর এবং পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গত কেদারনাথ ভারতীর তিনি দ্বিতীয় পুত্র। হরিপদ বাবুর মাতুলালয় মেদিনীপুর জেলায়। বাল্যশিক্ষালাভ করেন যশোহর-সম্মিলনী বিদ্যালয়ে। ১৯৩৬ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি হন এবং দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; শুধু অনার্সই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এম-এ পাশ করেন এবং কয়েক মাস পরেই যশোহর মধুসূদন কলেজে অধ্যাপনা সুরু করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং বর্ত্তমানে তিনি ঐ কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান। তিনি আশুতোষ কলেজের মহিলা-বিভাগেরও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। একজন সুলেখক হিসাবেও তিনি খ্যাতিমান; তাঁর লেখা বহু প্রবন্ধ ও গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দু' বছর যাবৎ হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যাপনা করেন।

হরিপদ বাবুর রাজনৈতিক জীবন সুরু হয় ছাত্র অবস্থাতেই। বিভিন্ন ছাত্র-আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সময় তিনি কংগ্রেসী হিসাবে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি কিছুদিনের জন্ত কারাবরণ করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের প্রতিবাদে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৯৫১ সালে হরিপদ বাবু ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে জনসঙ্ঘে যোগদান করেন এবং শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে কাশ্মীর-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া বাংলা-বিহার সংযুক্তির আন্দোলন, শিক্ষক-আন্দোলন, হিন্দুদের উপর হামলার প্রতিবাদে, চীন কর্ত্তৃক ভারতের অংশ দখলের প্রতিবাদে, আসামে বাঙ্গালী বিতাড়নের প্রতিবাদে, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন দাবীর আন্দোলন প্রভৃতি সব আন্দোলনেই তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'ডিসিপ্লিনারি লিডার্স' আন্দোলনের জন্ত তাঁকে কারাবরণ করতে হয়।

বর্ত্তমানে তিনি জনসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক এবং জনসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। তিনি পূর্ব্ব-ভারত বাস্তহারা সংঘের সহ-সভাপতি। বহু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।
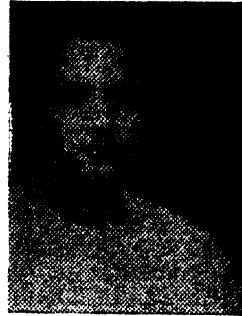
অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী

অসাধারণ বাগ্মিতার জন্ত তাঁর খ্যাতি শুধু বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ নয়—ভারতের বিভিন্ন অংশে তা পরিব্যাপ্ত। দিল্লী, বাঙ্গালোর, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে তিনি সারগর্ভ ভাষণ দিয়ে জনচিত্ত জয় করেছেন। ১৯৪৩ সালে তিনি রায় সাহেব কালীসদয় ঘোষালের কন্যা প্রগতি দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। প্রগতি দেবীও উচ্চ শিক্ষিতা বিদুষী নারী—তিনি শালকিয়া ঊষাঙ্গিনী বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী।

শ্রীযাদবেশ্বর ভট্টাচার্য্য

(বিশিষ্ট আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ও দেশকর্ম্মী)

"দেশ-মাতৃকার মুক্তি-আন্দোলনের একজন পরীক্ষিত সেনানী. শ্রীযাদবেশ্বর ভট্টাচার্য, কবিরত্ন। দুর্গত মানুষের সেবায় নিজেকে যতদূর সম্ভব বিলিয়ে দেওয়া যাক, ছেলেবেলা থেকেই এই তো তাঁর কামনা। চিকিৎসকের জীবন বরণ করে নেওয়ার ভেতরেও সেই দরদী মনটিই বুঝি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর। দেশ ও দশের কল্যাণব্রতে এখন অবধি এই বহুনির্যাতিত মানুষটি এগিয়ে এসে সাড়া দিয়ে থাকেন, এ লক্ষ্য করবার।

অধুনা পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত যশোহর জেলার নড়াইল-আউড়িয়ায় এক বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত বংশে যাদবেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৬ সালে। পিতৃদেব অন্নদাচরণ কাব্যতীর্থ ছিলেন নড়াইল স্কুল এবং কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় নামকরা শিক্ষক। বাল্য বয়সে পুত্রের জীবন গঠনে পিতার শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত প্রভাব অনেকখানি পড়ে। সহায় ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাদবেশ্বর সাফল্যের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেন।

ছাত্রাবস্থাতেই এই মানুষটির অন্তরে প্রবল রাজনৈতিক চেতনা

প্রভাবিত হতে দেখা যায়। পল্লীমঙ্গল সংগঠন, সেবাদল গঠন—এ সকল কাজে অগ্রণীর ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ের তাঁর রাজনৈতিক কর্মবহুল জীবনের সূত্রপাত এভাবেই হয়। রাজনীতির সংস্পর্শে আসতেই দেখা গেলো তিনি বৈপ্লবিক কর্মধারা ও আদর্শেই বেশিটা আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত

শ্রীযাদবেশ্বর ভট্টাচার্য্য

হয়েছেন। সেদিনে যশোহর-খুলনায় যুব-আন্দোলনের সংগঠনে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন তিনি—নিখিল বঙ্গ যুব আন্দোলনেও তিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। আমলাতান্ত্রিক সরকারের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার আগে ১৯২৩ সালে তিনি কোলকাতার সেণ্ট পলস্ কলেজ থেকে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গুপ্ত আন্দোলনে (স্বদেশী) তাঁর বরাবর সক্রিয় অংশ ছিল—রাজদ্রোহিকতার অপরাধে তাঁকে কারাবাসে ও অন্তরীণ অবস্থায় কাটাতে হয়েছে বহুদিন।

বৈপ্লবিক দলের অন্যতম অগ্রণী হিসাবে যাদবেশ্বর ক্রমে মার্কসবাদ ও কম্যুনিষ্ট কর্মপন্থায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এই মতবাদে প্রধানতঃ ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও রেবতীমোহন বর্মণের প্রভাবে তিনি প্রভাবিত হন। সেই থেকেই ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে তাঁকে কাজ করতে দেখা যায়, এমন কি, আজও তিনি এই দলেরই একজন প্রভাবশালী সদস্য। স্বাধীন আমলের প্রথম পাদে ব্যক্তি-স্বাধীনতা আন্দোলন, শান্তি-আন্দোলন ইত্যাদিতেও তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীন আমলেও লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের হাত থেকে তাঁর রেহাই মেলেনি।

যাদবেশ্বরের মাঝে রাজনৈতিক কর্মসূচীময় জীবন ও চিকিৎসক-জীবনের এক সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। অপরিণত বয়সেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে। পরে প্রাচীন-ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তিনি সমধিক পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং 'সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত হন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা আজ সুবিস্তৃত বলতে পারা যায়। এ যাবৎ বহু পীড়িত নর-নারী তাঁর সুচিকিৎসা ও সুচিন্তিত ব্যবস্থাপনায় উপকৃত হয়েছেন। দুর্ভিক্ষের দিনে, দাঙ্গার দিনে বুভুক্ষু ও দুর্গত মানুষের পাশে সেবকের ভূমিকায় তাঁকে দেখতে পাওয়া গেছে কতবার।

আয়ুর্বেদকে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্যে কবিরাজ যাদবেশ্বরের প্রয়াসের অবধি নেই। নিখিল-ভারত আয়ুর্বেদ-কংগ্রেস ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহামণ্ডলের সংগঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি সর্ব্ব-ভারতীয় আয়ুর্বেদ-কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ শাখা-সংস্থার অন্যতম সম্পাদক। কলিকাতার শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের হাসপাতাল, কলেজ ও গবেষণা বিভাগের নানা দায়িত্বপূর্ণ অবৈতনিক পদে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। রসায়নবিদ্যায় তাঁর যে পাণ্ডিত্য, সেই সূত্রে তিনি 'বার্দ্ধক্য-জনিত ব্যাধির চিকিৎসা ও জরার বিরুদ্ধে সংগ্রাম' বিষয়ে জটিল গবেষণায় আজ তিনি লিপ্ত। সংস্কৃত সাহিত্য ও বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনেও বিশেষ অধিকার রয়েছে এই উদ্যমশীল পুরুষটির। তিনি চিরকুমার ও সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। কতকগুলো দিক থেকেই তাঁর জীবন একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

ইসারা

রবীন্দ্র নারায়ণ সরকার

মানুষ-হৃদয়ে আর জড়ে-জীবে মহাশূন্য পথে
সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়ের মহাবার্তা দীপ্ত কণ্ঠে নিয়ে
প্রেমের ও পরিপন্থী বিরহের বাসর শয্যায়
নিরত ভরিয়ে রাখ স্পর্শ তব পৃথিবীকে দিয়ে।

হৃদয়ের অনুভূতি তীব্রতর অন্তকার পথে
নবরসে পারপূর্ণ রূপপট জীবনের গানে,—
ব্যাকুল আমার আঁখি রঙে রঙে, কাহার উদ্দেশে
মহান ওকার ধ্বনি জীবনের স্পন্দ সুরে আনে।

মৃত্যুর মহিম রূপ, নীরবতা, হিমানী প্রপাত,
শূন্য ভেদি' নিত্য ওঠে যে মহান সৃষ্টের আধার ;—
কালজয়ী বার্তা তারো অভ্রভেদী দিনের আকাশে
নিত্য নব ছন্দ নিয়ে চিরজীব অনন্ত প্রাকার।

অনেক ঘুরেছি আমি কল্পনার উদ্ভ্রান্ত হ'তে,
তোমার ও চারুচিত্র অনুক্ষণ রক্তমাংসে গড়া ;—
বেলাভূমি, মরুভূমি, ঢেউ লাগা সাগরের পাড়ে
বলে অনুভব অতীত সে জীবন ইসারা॥

অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ

(শ্রীহরিহর শেঠকে লিখিত)

College of Science, 4th. Feb, 1923

প্রিয় হরিহরবাবু,

এই পত্রবাহক শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র দাস, বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রায় ২০ বৎসর কাজ করিতেছে ও আমার বিশেষ অনুগত এবং আশ্রিত। এ আপনার নিকট যাইতেছে, ইহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর চন্দননগরে গত বৎসর বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গত অগ্রহায়ণ মাসে ইহার ভগ্নীপতির হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। ইহার প্রমুখাৎ উক্ত মৃত ব্যক্তির বিষয়-সম্পত্তির বিষয় অবগত হইবেন। এক্ষণে যাহাতে এই বাল-বিধবার চিরকাল ভরণ পোষণ হয়, তাহার ব্যবস্থা আপনি এবং স্থানীয় ভদ্রলোকেরা করিয়া দিলে আমি বিশেষ বাধিত এবং সুখী হইব।

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়

College of Science, 10.2.23

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমায় ইদানিং সমস্ত বাংলা (খদ্দর প্রচার করে) এমন কি ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। আমি কাল মাত্র আলিগড় হইতে আসিয়াছি, কাল আবার চট্টগ্রাম যাইতেছি। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া নানা স্থানে এবং পরে গুজরাটে যাইতে হইবে। রাশি রাশি পত্র জমা হয়, উত্তর দিয়া উঠা অসাধ্য। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আপনি interest লইতেছেন শুনিয়া সুখী হইলাম।

আপনারা পুরুষানুক্রমে ব্যবসায়ী, সুতরাং আপনার প্রবন্ধগুলি এক সঙ্গে ছাপাইলে সমাজের উপকার হইবে, আমার সহকারে ভূমিকা লিখিয়া দিব।

বিনীত

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়

পুনশ্চ—আপনার "প্রতিভা" পাইয়াছি বলিয়া বোধ হয় না।

প্রঃ চঃ রা

College of Sciences, 26.4.2

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

"বসুমতী"-তে "বাঙালীর সামর্থ্যের অপচয়" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। ক্রমশঃ ইউরোপীয় ও অবাঙালীরা বাঙালীকে সমস্ত কার্য্য-ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিতেছে ও তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে, তাহার প্রধান কারণ আমাদের অলসতা, শ্রমবিমুখতা ইত্যাদি। আপনি আমাদের ব্যাধি প্রকৃত diagnosis করিতে পারিয়াছেন। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের "বসুমতী"-তে "বঙ্গে ও বাংলা" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার আরও সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

বিনীত

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের চিঠি

বিলাত-যাত্রীর দুখানি চিঠি লিখেছি। এখন আমি বিলাতবাসী—তাই প্রবাসীর ছাঁদে লিখিতে বসেছি।

বিলাত কথাটার মানে কেহ কেহ বোধ হয় জানেন না। বিলায়েৎ শব্দে পারসীতে স্বদেশ বা বাড়ি বুঝায়। যাহা ইংরেজের বিলায়েৎ বা দেশ, তাহাকে আমরা বিলাত বা বিলেত বলি। আমি অনেক দেশ-দেশান্তর ঘুরেছি—বিদেশ বোলে কোন কষ্ট কখনও অনুভব করি নাই। কিন্তু এবার সন্ন্যাসীগিরি ঘুচিয়ে দিয়েছে। কেবল আলু-সেদ্ধো আর কপি-সেদ্ধো খেয়ে খেয়ে বিষ হয়ে গেছে। মনে হয়, দেশে ছুটে যাই, আর একটা ঝালঝাল তরকারি ও তেঁতুল-গোলা টক খেয়ে জিভটাকে শানিয়ে নি। একটু সুরা আর মাংস গ্রহণ করিতে এখানকার বন্ধুরা আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করেন কিন্তু আমি যাতি নহি। আর যা করি না করি—[illegible] ইংরেজি পোশাক একান্ত পরিবর্জনীয়। আমার বর্গীয়া [illegible] বলিতেন—ছেলেগুলো লেকচর দিয়ে দিয়ে উচ্ছন্ন গেল। [illegible] উকপারে এসে তিন তিনটে বক্তৃতা দিয়েছি। উচ্ছন্ন ত [illegible] আর এই বক্তৃতার চোটে বঙ্গবাসীতে চিঠি লেখাও হয় নাই—[illegible] মহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন।

এখানে প্রথম দিন রাস্তায় বেরিয়ে মহা বিপদ। ছেলেরা [illegible] দেখ (look look)—বোলে আমার পানে ছুটে আসে—[illegible] মুচকে হাসে—আর মেমসাহেবেরা একটু পিছিয়ে উঠে [illegible] নজরচি-কৌতুকী বিস্তার করে। কেননা আমার [illegible] আমি উজ্জল শ্যামবর্ণ। লোকের ভিড় ঠেলে যাওয়া [illegible]

ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠিতে হয়। তবে মজা যে, বেশী বাড়াবাড়ি করে না—সামনে আঁতকে উঠে বা হাস্যরস ছড়ায়। কিন্তু বেশ বুঝা যায় যে, আমি একটা তাদের কাছে রকমারি জিনিস। আমার পোশাক এখন মন্দ নয়, কারণ শীতের জ্বালায় একটা পা পর্য্যন্ত লম্বা গরম কোট দিয়ে গেরুয়ার ঝকমকানি ঢাকতে হয়েছে। যখন কোন সভায় যাই তখন কোটটা খুলে রাখি। আমি মনে করেছিনু কেবল আমারই এই দুর্দ্দশা। তা নয়। আমার সব দেশী ভায়াকে নজর নিষ্কৃতি আর মৃদুমন্দ হাসি সহিতে হয়। তবে ইংরেজের পুষ্যিপুত্তুর সেজে হ্যাটকোট পরিলে—কতকটা গোজামিল দিলে বেঁচে যাওয়া যায়। কিন্তু একেবারে নিস্তার নাই। যদি রংটা খুব মটরডালবাটার মতন হয় আর খুব পুষ্যিপুত্তুরি করা হয়—তা হোলে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পোশাক যদি অন্যরকম হয়—তা রেশমের জুব্বাই পর আর তাজই মাথায় দাও—একেবারে হৈ হৈ পোড়ে যাবে। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে, যেমন চিড়িয়াখানার জন্তু জানোয়ারদিগকে খোঁচাখুঁচি থেকে বাঁচাবার জন্যে কাঠগড়ার ভিতরে রাখে, তেমনি কোরে—অভিষেক উপলক্ষে সমাগত আমাদের দেশীয় সৈন্যদিগকে এখানে রাখতে হোয়েছিল। তবে বদমাইশি কোরে গাড়ি হাঁকিয়ে গেলে সাত খুন মাপ। ইংরেজ ঐশ্বর্যের কাছে পদানত। কিন্তু একবার আলাপ হোয়ে গেলে এখানকার লোকেরা অতি ভদ্রভাব ধারণ করে—হাসি-টিটকিরি সব ছেড়ে দেয়। কিন্তু যদি আবার একটু মনান্তর হয় ত অমনি **blackie nigger,** অর্থাৎ কালো সম্ভাষণটা অনেক সময় ইংরেজের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে সব ভারতীয় ভায়ারা এই কালো রঙের উপর কটাক্ষের জ্বালায় ত্রস্ত। রাস্তায় একজন ভারতবাসীর সঙ্গে আর একজনের দেখা হোলে এক হাত দূর সাত হাত হয়—পাছে মিল হোলে গোঁজাটা বেরিয়ে পড়ে এবং হাসির পাত্র হোতে হয়। আমাদের দেশে কালোয়-ধলোয় মিল উচ্চ-অঙ্গের মিল—যথা রাধা-কৃষ্ণ—গঙ্গা-যমুনা। কিন্তু সভ্যতার নতুন বাজারে কালোয়-ধলোয় মিল খাবে না, খাবে না। ভ্রাতৃভাবপ্রমত্ত দুচার জন কালো [illegible] সম্পাদককে একবার বিলেতের রাস্তায় হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেই তাঁরা ভাবের বুলি ছেড়ে দেবেন। আর বেশী কিছু করতে হবে না তাঁদের মুখ বন্ধ করাতে। যতদিন সভ্যতার বড়াই ততদিন মিল অসম্ভব।

এখানে একজন দেশী ভাই আছেন—তাঁর স্বদেশের নামে যদি আসে, আর বিলেত এই কথা শুনলেই লাল পড়ে। এর কারণ আছে। সভ্যতার একটা দিক আছে যেটা বড়ই মধুর। এত ছটা আর মাধুরী যে মন একেবারে মুগ্ধ হোয়ে যায়। একে ত প্রকৃতি অযাচিতভাবেই পুরুষকে পেড়ে ফেলেছে, তার উপর আবার রূপ চড়ালে বাঁচা দায়। কলিকাতায় জলের কল দেখে একজন বলেছিল—"কি কল বেনিয়েছে কোম্পানি সাহেব।" বিলেত দেখিলে সেইরকম একটা কিছু বলিতে ইচ্ছা যায়। একবার দোকান সাজান দেখিলে মনে হয় যেন রূপের বাজারে এসেছি। মাছের দোকানে মাছ সাজিয়ে রেখেছে—যেন ফুলের কাতার। খুব নিশ্বাস না টানিলে গন্ধ পাওয়া যায় না। অত কথায় কাজ কি—বড় বড় অখাদ্য মাংস এমনি সাজিয়েছে যে, হিন্দুর ছেলে হোলেও দুচার বার নজর না দিয়ে থাকা বড় মুস্কিল। কি মাছ-মাংসের দোকান—কি শাক-সব্‌জির দোকান—কি ফল-ফুলের দোকান—যা দেখ—যেন চারিদিকে ফুলের মালা গেঁথে রেখেছে। আর শৃঙ্খলার একেবারে চূড়ান্ত। কাতারে কাতার লোক চলছে, একটুও কোলাহল নাই। হাজারে হাজার ঘোড়াগাড়ি দৌড়িতেছে কিন্তু ঠিক যেন কলের পুতুল। একবার যদি পাহারাওয়ালা হাত তোলে ত অমনি সব গাড়ি খাড়া। লণ্ডনের রাস্তায় এত লোক যে মনে হয় বুঝি মেলা বসেছে। তার উপর ট্রাম, অমনিবস, ভদ্রলোকের গাড়ি, ভাড়াটে গাড়ি, বাইসিকল, মটরকার বেগে ধাবমান। এত ভিড় কিন্তু ঠেলাঠেলি নাই—চেঁচামেচি নাই—শৃঙ্খলার বিশেষ পরিণতি না হোলে এরূপ বৃহৎ ব্যাপার অত সুনিয়মে চলে না। আর রাস্তা-ঘাট ঘর-দুয়ার সব এত পরিপাটি যেন ঝকমক করিতেছে। বাড়িগুলি যেন এক-একখানি ছবি। আমাদের কলিকাতার চৌরঙ্গী বা ইংরেজটোলা লণ্ডনের ভাল জায়গার একটি মেকি—কাপি বা অনুকরণ। আর আয়েসের কথা কি বলিব। খাওয়া-দাওয়া-নাওয়া-শোয়া বসা-দাঁড়ান সব কাজে এত আরাম কোরে তুলেছে যে, ইন্দ্রলোকে এর চেয়ে আর কি হোতে পারে তা ত ভেবে পাওয়া যায় না। আমি এখানে দুটি আরাম সম্ভোগ করেছি। স্নান আর ক্ষৌরি। ক্ষৌরির কথাটাই বলি। একটি পাথরের টেবিল—তার উপরে একখানি প্রকাণ্ড আয়না। সম্মুখে একখানি কেদারা। কেদারার পিছনটি স্প্রিং-এ উঠান-নামান যায়। তাহাতে অর্দ্ধেক চিৎপাত হোয়ে ঠেসান দিয়ে বসিতে হয়। তার পরে সাহেব নাপিত "Good-morning" গুডমর্নিং কোরে ঈষদুষ্ণ গরম জলে গোলা সুগন্ধ সাবান বুরুস দিয়ে—দাড়ি ও গোঁফ ঘ'ষে ও মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। পাঁচ-সাত মিনিট ফুলের মতন বুরুস বুলিয়ে ক্ষুর ধরে। ক্ষুর এমনি দাড়ির উপর চালায়—যেন তুলো। তার পরে আবার সাবান ঘষা। আবার উজান কামানো। কামিয়ে একটা নরম স্পঞ্জ গরম ও ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে—ঠাণ্ডা ও গরম জলের কল পাথরের টেবিলে লাগানো আছে—মুখে বুলায় ও সাবান পুছিয়ে দেয়। তার পর এসেন্সের পিচকারি—আবার তার উপর পাউডার। এত কারখানা—আর তুমি মজা কোরে বোসে বোসে আয়নাতে দেখ—সাহেব পরামাণিক কেমন তোমার কেয়ারি করিতেছে। কি যে আয়েস তা বুঝিয়ে উঠা দায়—তবে পিচকারি ও পাউডারের সুখটা আমি ভোগ করি নাই—কেননা ওটা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ। এত বিলাস সুখ এখানে আছে কিন্তু বিবেকের জ্বালায় সে সব অঙ্গীকার করিতে পারি না। বঙ্গবাসীর আর কেহ পত্রলেখক হোলে ভাল হোতো। কত নাচ-তামাসা আহার-পানের মজা। কিন্তু আমার কপালে তা নাই।

উদাম-প্রবৃত্তি যুবকদের প্রথম দৃষ্টিতে মনে হোতে পারে যে ভারতে না জন্মানই ভাল ছিল। তাই দেখা যায় যে, বহু যুবক এখানে আসে—অধিকাংশই সাহেব হোয়ে সাহেবি বিলাসিতায় ডুবে মরে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে মোহ ঘুচে যায়। এখানকার গৃহস্থদের জীবনে শান্তি নাই। এত বেশী জিনিষ-পত্তর দরকার যে তারা কুলিয়ে উঠিতে পারে না। আর দিনকের দিন খুঁটিনাটি বাড়ছে। আমি অতি সামান্য রকমে একটি গৃহস্থের বাটীতে থাকি। তবু আমার বাসাভাড়া ও খাবার জন্যে মাসিক ৬৩৲ দিতে হয়। আমার একটি বসিবার ঘর ও একটি শোবার ঘর। ঘর দুটি ছোট ছোট কিন্তু এমনি সাজান যে কলিকাতার বড় মানুষের বৈঠকখানা হোতে কোনো অংশে কম নয়।

টবিল কেদারা কোচ দেরাজ ও ভাল ভাল ছবিতে বসিবার ঘরটি সুশোভিত। নীচে কারপেট—জানালায় সাপের খোলসের মতন পরদা। শোবার ঘরে স্প্রিং-এর খাট—শুইলেই এক হাত নেবে যায়—তার আবার গদির উপর গদি। একদিন একটা পরদা কি রকম লাগান হয় নাই—তাই গৃহিণী আমার নিকট ক্ষমা চাইতে এসেছিল। আমি মনে করিলাম ভাল রে ভাল—তোমার পরদা কোচ সরিয়ে নিয়ে যাও—আর কিছু ভাড়া কমিয়ে দাও। কিন্তু এখানে এর চেয়ে সস্তা বাসা পাওয়া যায় না। আর যাদের স্ত্রী-পুত্র আছে—তাদের যে কত কি আবশ্যক, তার অবধি নাই। তাই এখানে ভদ্রলোকেরা ব্যস্ততার চক্রে পিষ্ট। জীবন ধরে সুখে চালালে চলে না। যেন কেবলই ভিড় ঠেলে চলিতে হয়। আমাদের দেশেও এইরূপ দুর্দশা দাঁড়িয়েছে। তবে সেখানে একমুষ্টি অন্নের জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় আর এখানে সাপের খোলসের মতন চিকনসই পরদা ও দামী-সুতের নিমন্ত্রণ খাটবার পোশাকের জন্য ছুটাছুটি করিতে হয়। আমাদের যেমন একমুষ্টি অন্ন তেমনি এদের পরদা ও বিলাস বেশ—নহিলে মানসম্ভ্রম একেবারে থাকে না।

আর একটি বড় ভয়ের কথা। এখানকার কর্মজীবী লোকেরা বড়মানুষদের উপর বড় চটা। সেদিন একটি মোকর্দমায় একজন বড় ঘরের মেয়ের ৭৫০ টাকা জরিমানা হোয়ে গেছে। এঁর একটি পাগলাটে কন্যা আছে। ইনি তার প্রতি বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন। তাই বালক-বালিকার প্রতি নিষ্ঠুরতা-নিবারিণী সভা এঁর নামে নালিশ করেছিল। এ আবার বিলাতের এক উদ্ভুট ব্যাপার। মা-বাপ যদি একটু কড়া হন ত অমনি নিষ্ঠুরতা-নিবারিণী সভার হাতে পড়িতে হয়। যা হউক—জজ এই নিষ্ঠুর মাতাকে কেন জেলে দিলেন না—কেবল জরিমানা করলেন—এই নিয়ে একেবারেই হুলুস্থুল পড়ে গেল। কর্মজীবীরা সংবাদ-পত্রে ভয়ানক প্রতিবাদ করিতে লাগিল যে, কেবল বড়মানুষের ঘর বোলে এই অল্প সাজা দেওয়া হয়েছে—আমাদের ঘর হোলে নিশ্চয়ই জেল হোতো। জজকে একেবারে উত্তম মধ্যম কোরে তুলেছিল। ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে, বড়মানুষের আর গরিবের একটা ভয়ানক বিদ্বেষ ভাব দাঁড়াইতেছে। এখানে একটি কর্মজীবীদের বিদ্যালয় আছে। দেশ-বিদেশ হোতে ছুতার রাজমিস্ত্রী কামার দরজি—এইরূপ লোকেরা এসে পড়াশুনা করে। তারা একদিন আমায় নিমন্ত্রণ করেছিল। তাদের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়েছে। কিন্তু তাদের বড়মানুষদের উপর যে রাগ দেখলাম তাতে বড় ভয় হয়। এরা ভাল লোক কিন্তু দায়ে পোড়ে বিদ্বেষভাবাপন্ন হোয়েছে। সভ্যতার বাজারে এত টানাটানি যে, এরা সামলে উঠতে পারে না। তাই এরা বর্তমান সমাজের দ্রোহী হোয়ে উঠিতেছে। আর যাদের তেলা মাথায় তেল—এরা তাদের দেখে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে যায়। আমি ইহাদিগকে আমাদের বর্ণাশ্রমধর্মের কথ, অল্পস্বল্প বলিলাম। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়িয়া কৌলিক কর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা শুনিয়া তারা বিস্মিত হইল কিন্তু ইহা যে শান্তিপ্রদ, তাহা বার বার স্বীকার করিল। ইহারা বেশ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। এই সমাজদ্রোহিতা—সভ্যতার একটি অঙ্গ। ইহাই ধর্মঘট স্থাপন করে এবং ধনী ও কর্মীতে ঝগড়া বাধায়। প্রতিযোগিতায় যার চালাকি আছে সেই খুব মেরে নেয় আর যে বেচারি ভাল মানুষ তার সহস্র সহস্র গুণ থাকিলেও কিছু সুবিধা হয় না। এই সমাজের ভয়ানক অসামঞ্জস্য-ভীতি য়ুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে।

এই ত গেল ভয়ের কথা। সভ্যতার একটি শোচনীয় ব্যাপার আছে। সেটি ভয়ানক দারিদ্র্য। শহরে ভারি শোভা—পূর্ণমাত্রায় আয়েস ঐশ্বর্য—কিন্তু পশ্চাদ্ভাগের গলিতে গলিতে বড়ই দারিদ্র্য। দেখিলে প্রাণ ফেটে যায়। ছোট ছোট পায়রার খোপের মতন ঘর—তাতে স্বামী-স্ত্রী-ছেলেমেয়ের গাদাগাদি। ঘোর শীতে আগ্ন নাই—এখানে ঘরে আগুন নাহলে টিকিবার জো নাই—বস্ত্র নাই, আহার নাই। সকলে কাজ করিবার জন্য লালায়িত কিন্তু শহরে কাজকর্ম পায় না। এমন একজন আধজন নয়—শত শত সহস্র সহস্র। এই অমরাবতীর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কত লোক শীতে ও অনাহারে প্রাণ হারাইতেছে। কী দুঃখের কথা—কী লজ্জার কথা—আবার এমনই চমৎকার আইন যে, ভিক্ষা করিবার হুকুম নাই। রাস্তায় দেখতে পাইবে যে, দীনহীন রমণীরা ছেলে-কোলে শীতে হি-হি কোরে কাঁপছে আর দুই-একটা শুকনো ফুলের তোড়া বা ভাঙ্গা দেশলাইয়ের বাক্স বিক্রি করবার ছল কোরে ভিক্ষা চাহিতেছে। বড় বড় ঘাঘরা—বড় বড় টুপি কিন্তু তাহাদের পানে কেহ ফিরেও চায় না। সেদিন একজন রমণী আমার কাছে কাঁদতে কাঁদিতে ফুলের তোড়া বিক্রি করতে এলো। আমি তার গরীব তবুও তাকে এক শিলিং—বারো আনা দিলাম। কিন্তু অমনি একজন ইংরেজ নারী বোলে উঠল—ছি—কালোমানুষের কাছ থেকে ভিক্ষা নিলি। যাহা হউক, এত ধনের মধ্যে অনাহারে মরে যায়—ইহাই বড় প্রাণে লাগে। সেদিন দুইটি স্ত্রীলোকের কথা শুনে অশ্রুবারি সংবরণ করিতে পারি নাই। তারা দুটি বোন। একজন অনাহারে মরে পড়ে আছে, আর একজন ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষেপে গেছে। পুলিশ এসে মরা ও ক্ষেপা দুজনকে বের করে নিয়ে গেল। এমন সভ্যতার মুখে ছাই। আমি ত দেখে শুনে ধিক্কারে মরি। আমার আলোকে কাজ নাই—আমার রংচং-এ কাজ নাই। আমাদের অসভ্য দেশ অসভ্যই থাক্। শান্তি আমাদেরই ইষ্টদেবতা—ঠেলাঠেলি মারামারিতে আমাদের কাজ নাই। ফিরিঙ্গীর কাড়াকাড়ি হোতে ভগবান রক্ষা কর। হিন্দুসন্তান সভ্যতার প্রবৃত্তিপরায়ণতা হোতে বাঁচুক ও নিষ্কাম হইয়া কুল-ধর্ম পালনে রত হউক।

বিলেতে এসে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা কিছু না বলিলে ভাল দেখায় না। সাংখ্যদর্শনে বলে যে, প্রকৃতি যখন অবগুণ্ঠন খুলে আপনার স্বরূপ জানায় তখন পুরুষের মুক্তি হয়। এখানে প্রকৃতি অবগুণ্ঠিতা নহে। মাঠে ঘাটে হাটে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া রাখে। এখানকার পুরুষেরা তবে সাংখ্যমতে মুক্ত। সাংখ্যমতে হউক আর না হউক, আমাদের বিলাত-প্রবাসী দেশী ভায়াদের মতে সাহেবেরা মুক্ত পুরুষ। কেননা প্রকৃতিকে তারা অবাধে দেখে। এইরূপ মুক্তি দেশে আমদানী করিবার জন্য এরা ব্যস্ত। বাস্তবিক এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা একটা অদ্ভুত কাণ্ড। আমাদের দেশে যে নাই তাহা নয়। ভারতের দাক্ষিণাত্যে স্ত্রীলোকেরা বাহিরে যায়—বাজার করে, ঘুরে ফিরে বেড়ায়। কিন্তু এখানে রকমই আলাদা। দলে দলে স্ত্রীলোকেরা চলেছে—কেহ দৌড়িতেছে—কেহ হাসিতেছে—ভ্রূক্ষেপই নাই। আবার কত স্বামী-স্ত্রী হাতধরাধরি কোরে চলেছে। যুগল মূর্তি দেখিলে আনন্দ হয়। কিন্তু যুগল মূর্তির বিলাস খেলা আবার

সূত্রে চলে—পরিণয়-সূত্রে নহে। প্রায়ই দেখা যায়—কুমার-কুমারীরা বাহুবন্ধনে মিলিত হোয়ে বিহার করিতেছে—কিংবা আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে বা বোসে রয়েছে। আমি একটু নির্জন জায়গা পছন্দ করি। তাই অপরাহ্নে প্রায় ঝোপঝাড় ঘেঁষে বেড়াইতে যাই। বাগানে এ সব ঝোপ তৈয়ারী করা। কিন্তু ক্রমশ: দেখি যে সবগুলিই প্রেমালাপে পরিপূর্ণ। তাই আমাকে এখন সামলে চলতে হয়। কিন্তু এখানকার লোকেরা প্রণয়ের সূতো পাকানকে একটা অবশ্যকর্তব্য মনে করে। যাহাদের বিবাহ স্থির হোয়ে গেছে তারা অত ঘুরাঘুরি করে না। কিন্তু বিবাহ স্থির কি অস্থির—সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্যই পুরুষপ্রকৃতি কুঞ্জপুঞ্জের বিরলতা খোঁজে। ইহা ভাল কি মন্দ—তার বিচার আবশ্যক নাই। তবে আমাদের দেশে এই প্রণয়ের কবপীড়ন বা উৎপীড়ন যাতে না রপ্তানী হয়—সেই দিকে দৃষ্টি থাকলেই ভাল।

আগামী বারে উক্সপারের বিবরণ লিখিব মনে করিতেছি। ইহা একটি অতি পুরাতন বিদ্যালয়ের স্থান। বাইশটা না তেইশটা কালেজ আছে। এক একটা কালেজ পাঁচ-সাত শত বৎসরের। স্থানটি অতি রমণীয়।

উক্সপার

তারিখ ২রা জানুয়ারী, ১৯০৩

দুই

অক্সফর্ড নগরকে সংস্কৃত ভাষায়—উক্সপার শব্দে অভিহিত করিলে মন্দ হয় না। ইংরেজিতে অক্স্ অর্থে উক্ষ—আর ফোর্ড অর্থে পার। তা হোলে অর্থ ত বজায় থাকেই, আর শাব্দিক মিলও কতকটা হয়। নগরটি তিন দিকে দুইটি নদীর দ্বারা বেষ্টিত। নদী দুটি আট-দশ হাত চওড়া হবে। স্রোত অতি মৃদু এবং জল সুনির্মল। নগরের চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। কতকগুলি গোচারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অধিকাংশই ছাত্রদের ক্রিকেট বা ফুটবল বা গল্ফ খেলিবার নিমিত্ত অতি যত্ন ও ব্যয়ে সুরক্ষিত। মাঠের অপর পারে আবার শ্যামলবৃক্ষাচ্ছাদিত ছোট ছোট পাহাড়। নদী মাঠ ও পাহাড়—তিন মিলে স্থানটিকে অতি রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। পুরাকাল হোতে এই জায়গায় বিলাতী সন্ন্যাসীদের (মঙ্ক) বড় বড় মঠ ছিল। সেই মঠের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগের জন্য আয়তন (কালেজ) নির্মিত হইয়াছিল। কালেজ কথাটির ধাতুগত যে অর্থ—আয়তনেরও সেই অর্থ। সংস্কৃতে কালেজকে আয়তন বলে—সেটা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। ধনবান ভক্তেরা ছাত্রদিগের আবাস নির্মাণ করিয়া দিত ও ভরণপোষণের জন্য বিপুল অর্থ দান করিত। এইরূপে উক্সপারে অনেক কালেজ স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে এক ভয়ানক ধর্মবিপ্লব ঘটে। সেই অবধি ইংরেজ জাতির মনে সন্ন্যাস-আশ্রমের উপর বিদ্বেষ জন্মিয়াছে। ইংলণ্ডের রাজা সন্ন্যাসীদিগকে দূর করিয়া দিয়া মঠ সকল ভাঙিয়া দিয়াছেন ও দেবোত্তর সম্পত্তিগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। কাজে কাজেই আয়তনগুলি এখন সরকারি খাসে আসিয়াছে। এই মঠ ভাঙার পর আরও গুটিকয়েক কালেজ হইয়াছে। এখন এখানে সর্বসুদ্ধ তেইশটি কালেজ। প্রত্যেক কালেজেই ছাত্রাবাস আছে। তবে সকল ছাত্রেরই থাকিবার জায়গা হয় না। বাকি ছাত্রেরা বাসা করিয়া থাকে। কিন্তু সেই বাসা সকল কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্দিষ্ট হয় ও কতক পরিমাণে শাসিত হয়। কতকগুলি লোক নিযুক্ত আছে—যাহারা ছাত্রদের বাসায় তত্ত্বাবধান করে এবং রাস্তা-ঘাটে তাহাদের চাল-চলনের উপর নজর রাখে। তবে ছাত্রদের স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা খুব। অধ্যাপকদের সামনে খুব চুরুট টানে ও তামাক (পাইপ) ফোঁকে। তারা থিয়েটারে প্রায়ই যায় ও সেখানে গিয়ে এমনি বেলেল্লাগিরি করে যে, দেখে পিলে চমকে যায়। অধ্যাপক মহাশয়েরা সেই রসরঙ্গের ভিতর ডুবে লুপ্তপ্রায় হোয়ে বসে থাকেন। ছাত্রেরা সুরাপান করে কিন্তু মাতাল হোলেই শাস্তি পায়। তবে কখন কখন নেশাটা একটু গোলাপীরকম হোলে ছাত্রমহাশয় দরজা জানালায় খড়খড় শব্দ কোরে অধ্যাপকদের ভীতি উৎপাদন বা নিদ্রাভঙ্গ করিতেও ছাড়েন না। বিলাতী সভ্যতা এইরূপই।

এখানে শীতকালে আটটার সময় সূর্য উঠে। তবে প্রায়ই উঠে না—মেঘে ঢাকা থাকে। আটটার সময় ছেলেদের গির্জা হয়। বেলা নয়টার সময় আহার। দশটা হইতে একটা পর্যন্ত কালেজ। আবার আহার। তার পর দুটা থেকে চারিটা পর্যন্ত খুব খেলা বা নৌকা-বাহন—যাহার যা ইচ্ছা। পাঁচটার সময় চা পান। আবার তার পর গির্জা। সাতটার সময় শেষ আহার (ডিনার)। এই রাত্রি-ভোজনের পর ছেলেরা প্রায়ই সব বেড়াতে বেরোয় বা থিয়েটারে যায়। রাত বারটার মধ্যে কিন্তু সকলকেই ফিরে আসতে হয়। এখানে খেলা আমোদটা খুব অধিক। পড়াশুনার চাপ বড় বেশী নয়। দুই মাস করিয়া পড়া হয় আর পাঁচ হপ্তা ছুটি। আর গ্রীষ্মকালে একটা মস্ত লম্বা চারি মাসের অবসর। প্রত্যেক কালেজে একজন কোরে অধ্যাপক (Tutor) আছেন—যিনি ছেলেদের অধ্যয়ন-বিষয়ে সাহায্য করেন ও কোন্ কালেজে গিয়ে কোন্ বিষয়ের বক্তৃতা শুনলে ভাল হয়—তাও ঠিক করিয়া দেন। একটা কালেজে হয় ত ইতিহাস ভাল হয় আর একটা কালেজে হয়ত দর্শন বা ন্যায় ভাল। ছেলেরা এ-কালেজ থেকে ও-কালেজে ছুটাছুটি করে আর ভিন্ন ভিন্ন কালেজের অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনে। তেইশটা কালেজ বটে—তবে সর্বশুদ্ধ বোধ হয় দু হাজার ছেলে হবে।

এখানে 'বডলিয়ান লাইব্রেরী' নামে একটি পুস্তকাগার আছে। তাহাতে প্রায় পাঁচ লক্ষ পুস্তক। বেলা দশটা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রত্যেক পাঠককে টেবিল, চেয়ার, দোয়াত, কলম ও কাগজ দেওয়া হয়। একখানি কাগজে পুস্তকের নাম ও নম্বর (তালিকায় সব ঠিক করা আছে) লিখিয়া দিলেই অমনি একজন কর্মচারী পুস্তকখানি দিয়া যায়। এখানে বড় বড় লোকেরা আসিয়া লেখাপড়া করে। অনেকে আসে যায় কিন্তু টুঁ শব্দটি নাই। ইহা সরস্বতী দেবীর একটি পীঠস্থান বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। পড়িবার জন্য একটি কপর্দকও দিতে হয় না। কেবল একজন মেম্বরের দ্বারা উপনীত হইলেই হইল। বাস্তবিক একবার এখানে গেলে আর সহজে ফিরে আসিতে ইচ্ছা করে না।

যারা শ্রমজীবী বা মসীজীবী নয়—তারা সকলে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বেড়াতে যায়। আমিও তার মধ্যে একজন। এখানে একটি সুবৃহৎ উদ্যান আছে। হন্ হন্ কোরে চলিলে পনেরো মিনিটে ঘুরে আসা যায়। ইহা একেবারে নদীর ধারে। মাঝখানে মস্ত মস্ত খেলার মাঠ আর চারিধারে বৃক্ষলতা। এই উদ্যান হইতে একটী সুদীর্ঘ পথ বাহির হইয়াছে। এই পথটির দুইধারে নদী। ছেলেদের

নৌকা যাওয়ার সুবিধার জন্ত কোনখানেক ঘোরে নদীটিকে আটকের দ্বারা ফাঁপিয়ে সদাই জলপূর্ণ কোরে রাখা হয়। তাতে যে জল উপচে উঠে তাহা পরে একটি খালের দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এই খালটি আটকের কাছে গিয়ে আবার নদীতে মিলেছে। নদী ও খালটির মাঝখানে এই পথটি তৈয়ারী। ইহার দুই পার্শ্বে সারি সারি এল্‌ম গাছ। শীতে এখন গাছগুলিতে একটিও পাতা নাই। এই পথটি অতি নিভৃত শান্ত। আমি এই রাস্তায় প্রায় বেড়াইতে যাই। এ রাস্তা ছাড়িয়ে একটা ছোট পাহাড়ে উঠি। আবার পাহাড় থেকে নেমে নিকটস্থ এক পল্লীগ্রামে যাই। যাওয়া-আসাতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগে। পল্লীগ্রামে চারিদিকে ক্ষেত ও বাগান। এমন আধ হাত জায়গা দেখিতে পাওয়া যায় না, যার উপর মানুষের কারিকুরি নাই। গোচারণের মাঠগুলির ঘাসও বেশ কেয়ারী করা। চারদিক একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রকৃতিকে ছেঁটেছুঁটে দোরস্ত কোরে যেন সাজানো হোয়েছে। প্রথমটা দেখিলে বড় ভাল লাগে। তার পরে কিন্তু মনে হয়—খোদার উপর কিছু বেশি মাত্রায় খোদকারী করা হোয়েছে। স্বভাবের স্বাভাবিক শোভাটা লোপ পেয়েছে। আমাদের পাড়াগাঁয়ে কত-না বন-জঙ্গল। কিন্তু তাতে একটা পরমানন্দের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়—যেন সৌন্দর্য্যের মেলা লেগেছে—শ্রীনিবাস যজ্ঞি ফেঁদে বসেছেন—ফেলাফেলি ছড়াছড়ি। আর এখানে যেন হিসাব কোরে গুণে-গেঁথে ফুল-ফল-শস্য-গাছপালা আমদানী করা হোয়েছে।

লোকে বিলাতের শীতের বিষয়ে আমায় বড় ভয় দেখিয়েছিল। আর এখানে আমার সাহেব বন্ধুরা প্রায়ই আমায় দয়াপ্রকাশ কোরে বলেন—শীত সহিতে পারিতেছ ত। আমার কিন্তু মনে হয়—পাঞ্জাবে এখানকার চেয়ে শীত অধিক। এখানে আমি যদি একটু বেড়িয়ে আসি ত অমনি দরদর কোরে ঘাম পড়ে। ঘরে সদাই আগুন জ্বালাতে হয় কিন্তু আমার ত তত আবশ্যক বোধ হয় না। আমি সাতটার সময় উঠি আর একচক্র ঘুরে আসি। তখন অন্ধকার ঠিক যেন আমাদের দেশে পাঁচটা বেজেছে। আর আমার কাপড়-চোপড়ের অবস্থা তথৈবচ। তার উপর আবার মাংস মদিরা খাই না। লোকে বলে তোমার ধাতে গরমি বেশী। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমার মেজাজ একেবারেই গরম নয়। এখানকার শীত আমার বেশ লাগে। আমার শরীর বড় ভাল আছে। বোধ হয় যেন দশ বৎসর পরমায়ু বেড়ে গেছে। তবে পয়সার অভাবে ভাল কোরে দুধ ও ফল খেতে পাই না। তা না হোলে বোধ হয় বিশ বৎসর বেড়ে যেতো। যাক্—বড়াই করিব না। নাহয়ারাৎ পরো রিপুঃ—অহঙ্কার করিলেই পড়িতে হয়। কেবল মনে মনে বড় রাগ হয় যে, এখানে দিনের পর দিন চলে যায়—তবু সূর্য্য উঠে না। আকাশ সদাই মেঘে ঢাকা। যদি একদিন সূর্য্য উঠিল ত লোকের মুখে আর হাসি ধরে না। সূর্য্যের তাপটা কিন্তু কি রকম। বেলা একটার সময় যেন কলিকাতার আটটা বেজেছে। তাই তাদের হাসি দেখে আমার হাসি পায়।

আমার চেহারাটা ক্রমশঃ লাল হয়ে উঠছে। আমি চুনোগলি ছাড়িয়া চৌরঙ্গীর ঘেঁষাঘেঁষি ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে মিশিতে পারি। তবু আমায় দেখে রাস্তায় শিস্কাপ-আঙকাশি-হাসি থামেনি। এখানে একজন ভারতবাসী আছেন। ইনি মনুমনে সংবাদক। ইংরেজদের উপর খুব টান। এঁর রঙটা একেবারে নবজলধর-শ্যাম। কিন্তু আমার কাছে এর বায়নাখ্যা ভাঙেন নাই। সেদিন আমি খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করিলাম। ইনিও আমায় খুলে বললেন যে, মাঝে মাঝে ছেলেদের দল এঁকে তাড়া করে। আমার কপাল ভাল যে, অতটা দুর্দ্দশা এখনও হয় নাই। ইংরেজের উপর বেশি টান বোলেই বুঝি এঁর সঙ্গে এত টানাটানি। ইনি ইংরেজের মতন পোষাক করেন। তবে যেদিন নাইট ক্যাপ (Night-Cap) ছেড়ে কালো রঙের উপর লাল পাগড়ি সেদিন একেবারে—ভ্রান্তি মধুসূদন।

এই বিদ্যার পীঠস্থানে কতকগুলি মহাবিজ্ঞা আছেন—যাঁরা কেবল নূতন খুঁজে বেড়ান। এঁরা ভারতবাসীদের সঙ্গে ভাব করিতে বড় অভিলাষিণী। কেহ প্রবীণা, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ মলয়-কন্যা, কেহ-বা যুবতী। এঁদের চালচলনে শীলের কোন অভাব নাই। কিন্তু দেশের সমাজ বা সমাজ-বন্ধন—এঁদের ভাল লাগে না। ছুটকে বেরুতে পারিলে এঁরা বাঁচেন। আমায় দুই-একবার নিমন্ত্রণ কোরেছিলেন। কথাবার্ত্তা আলাপ-পরিচয় সব হোল কিন্তু আমি বড় ঘেঁষ দিই না। সব সওয়া যায়, কিন্তু যারা নিজের দেশের উপর চটা—যে দেশেরই তারা হোক না কেন—তাহাদিগকে সওয়া যায় না। এরকম পুরুষও অনেক আছে। উক্সফোর্ডে যাঁরা বিদ্বান্‌ ও প্রতিষ্ঠাপন্ন—তাঁরা ভারতের উপর বিশেষ ভক্তিমান্‌ নহেন। তবে গুর্খা ও শিখ ভারি যোদ্ধা আর রাজা-রাজড়ারা রাজভক্ত—এইটুকু স্বীকার করেন।

মাইণ্ড (অর্থাৎ মনঃ) নামক একটি দার্শনিক পত্র আছে। বড় বড় বড় ইংরেজ দার্শনিক—তাঁরা সকলেই ইহাতে লিখেন। হিন্দু ব্রহ্মজ্ঞান—নামক আমার বক্তৃতাটি প্রবন্ধাকারে লিখে মাইণ্ডের সম্পাদকের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি প্রথমে প্রবন্ধটি গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না—কেননা তাঁহার মাসিক পত্রের জন্য এক বৎসরের কপি জমে পোড়ে আছে। কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন; বেদান্তের কথা শুনে হেসে বলিলেন—খুব একটা ব্যাপার বটে, কিন্তু এখনকার কালে ওসব চক্ষুবুজুনি দর্শন আর চলিবে না।—কথা চলিতে লাগিল। কিছু আকৃষ্ট হোলেন। আমায় আর একদিন কথাবার্ত্তার জন্যে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমার প্রবন্ধটা রেখে এলাম। তার পরে যেদিন গেলাম সেদিন তিনি বলিলেন—প্রবন্ধতে নূতন কথা আছে—যে রকম ব্যাখ্যা করা হোয়েছে তাতে বোধ হয়—বেদান্ত পাশ্চাত্ত্য দর্শনের অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত—আমি এ প্রবন্ধ প্রকাশ করিব।—আমার প্রবন্ধে জীব ও জগৎ যে মিথ্যা ও মায়ার রাজ্যে যে কোন স্বাধীনতা নাই—তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর পাশ্চাত্ত্য দর্শনে যে মায়িক অলীকতার প্রতিবাদ আছে, তাহারও খণ্ডন করা হইয়াছে। যাহা হউক, আনন্দের বিষয় যে, আমার প্রবন্ধ মাইণ্ডের মতন সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় বাহির হইবে। আরও আরও অনেক বিদ্বান এখানে আছেন যাঁরা দেশের মাথা—কিন্তু ভারতের দর্শন-জ্ঞান তাঁদের কাছে কোন পুরানো কালের বৃহৎ জন্তুর (ম্যামথের) মত—মিউজিয়মে রেখে দিবার জিনিস। মোক্ষমূলর অনেক দিন উক্সফোর্ডে পরিশ্রম করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁর মত দাঁড়িয়েছে যে, বেদ-মন্ত্র-অসভ্য কৃষকদের গান—উপনিষদ সরল প্রাণের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা মাত্র—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্রাহ্মণদের অত্যাচার—যা কিছু ভারতবর্ষের সার তা বৌদ্ধধর্ম আর জগৎ অলীক—এটা খুব সাহসের কথা বটে, তবে প্রলাপ।

[ক্রমশঃ]

৪২

তারপর এলেন ভুবনেশ্বর। যার আরেক নাম গুপ্তকাশী।

স্নান করলেন বিন্দুসরোবরে। যার আরেক নাম শিবপ্রিয়-সরোবর। সমস্ত তীর্থ থেকে বিন্দু বিন্দু জল এনে যে সরোবর শিব নিজে সৃষ্টি করেছে।

মন্দিরে বিগ্রহের সামনে নাচতে লাগলেন মহাপ্রভু। মত্ত হলেন শিবপ্রেমে। 'শিবপ্রিয় বড় কৃষ্ণ, তাহা বুঝাইতে। নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের অগ্রেতে॥' ভক্তদের নিয়ে করলেন শিবপুজো। যত দেবালয় আছে সে গ্রামে সব দেখলেন ঘুরে ঘুরে।

সেখান থেকে কমলপুর।

এখান থেকে জগন্নাথমন্দিরের ধ্বজা দেখা গেল। প্রভু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: 'দেখ দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে বালগোপাল বসে আছেন। স্মিত সুবদন হাসছেন আমাকে দেখে।'

বিবশ হয়ে লুণ্ঠিত হলেন ভূতলে। কাঁদতে লাগলেন। সে আর্তি অনন্ত জিহ্বায়ও বুঝি বর্ণনা করা যায় না।

ভার্গী নদীতে স্নান করলেন। হাতের দণ্ড নিতাইয়ের কাছে জিম্মা দিয়ে গেলেন কপোতেশ্বরকে দেখতে।

নিতাই সেই-দণ্ড তিন-টুকরো করে জলে ভাসিয়ে দিল।

দণ্ডকে বললে, আমি যাকে হৃদয়ে বহন করছি, সে তোমাকে বয়ে বেড়াবে, এ অসহ্য। যাঁর ভুজযুগলই দুই হেমদণ্ড, তিনি আবার একটা বংশদণ্ড বইবেন কেন?

দণ্ড অস্ত্র ছাড়া আর কী। প্রেমসিন্ধু প্রভু কাকে দণ্ড দেবেন, কার শাসক হবেন? নাম-প্রেমে সকলের চিত্তশুদ্ধি ঘটাবার জন্যেই তাঁর আবির্ভাব, তাঁর দণ্ডের কী প্রয়োজন?

সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডী। বাক্য, দেহ আর চিত্ত—এই তিনকে যে দণ্ড দিয়ে শাসন করে বশীভূত করেছে, সেই যতি, ত্রিদণ্ডী। মৌন হচ্ছে বাক্যের দণ্ড, কাম্যকর্ম-ত্যাগ দেহের দণ্ড আর প্রাণায়ামই চিত্তের দণ্ড। দণ্ড স্মারকচিহ্ন। সর্বদা সন্ন্যাসীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তুমি কায়মনোবাককে সংযত করেছ, তুমি নিজেই নিজের দণ্ডদাতা।

প্রভুর কী দরকার এই স্মরণচিহ্নে? যিনি মায়াতীত সচ্চিদানন্দময়, তাঁর আবার কিসের দণ্ড, কাকে দণ্ড? পড়ুয়া নিন্দুকদের অসুরত্ব দূর করবার জন্যেই তাঁর সন্ন্যাস। আর সে অসুরত্ব দূর হবে দণ্ডে নয়, ক্ষমায়। চিত্তের শোধন হবে শুধু কৃপাবর্ষণে। তাই যিনি কৃপা ঢালবেন মুক্তহস্তে, তিনি বদ্ধমুষ্টি হবেন কী করে, কী করে দণ্ড ধরবেন? দণ্ড নিরর্থক।

মূর্তিমন্ত গৌরকৃপা নিতাই তাই ভেঙে ফেলল দণ্ড। দণ্ড তিন বলে টুকরোও তিন করল। ভাসিয়ে দিল নদীতে।

যিনি আগে বংশী হাতে করে ত্রিজগৎ মোহিত করতেন, তাঁর হাতে এখন তিন পর্বের বংশদণ্ড। বংশীর বদলে বংশ। অসম্ভব। সুতরাং হে দণ্ড, তোমার দণ্ড নাও, ত্রি-ভঙ্গ হয়ে ভেসে যাও নদীস্রোতে।

সেই থেকে ভার্গীনদীর নাম দণ্ডভাঙা নদী।

আরো কি এক গূঢ় কারণ আছে দণ্ডভঙ্গের?

কপোতেশ্বর শিবকে দর্শন করে ভক্তসঙ্গে প্রভু চললেন শ্রীক্ষেত্রের দিকে। তিনক্রোশ পথ, মনে হচ্ছে যেন সহস্র যোজন। সোনার অঙ্গ কখনো ধুলোয় ধুসর হচ্ছে, কখনো বা চোখের জলে ধুলো ধুয়ে গিয়ে ফুটে উঠছে গৌরকান্তি। শরীরে কোনো অস্থি আছে বলে মনে হচ্ছে না। পথে যে দেখে, সেই বলে এ কে নওলকিশোর! কিশোর নারায়ণ!

প্রেমাবেশে পথ চলেছেন, আঠারনালায় এসে বাহ্যজ্ঞানের প্রকাশ হল। নিতাইয়ের দিকে হাত বাড়ালেন প্রভু। বললেন, 'আমার দণ্ড দাও।'

নিতাই চুপ করে রইল।

'সে কি, আমার দণ্ড কোথায়?' প্রভু কি ঈষৎ রুষ্ট হলেন?

'সে দণ্ড ভেঙে গিয়েছে। তিনখণ্ড হয়ে গিয়েছে।'

'সে কি! কী করে ভাঙল?'

'প্রেমাবেশে ভেঙে গিয়েছে।' গাঢ়স্বর নিতাইয়ের। 'তোমার আবেশ হলে আমি তোমাকে ধরলুম। জড়াজড়ি করে পড়লুম একসঙ্গে—সেই দণ্ডের উপর। আর দুজনের ভারে দণ্ড তিন-টুকরো হয়ে গেল। টুকরোগুলো যে কোথায় গেল, কিছুই জানি না।'

তাহলে দণ্ড কি নিতাই স্বহস্তে স্বেচ্ছায় ভাঙেনি? সে কি মিথ্যে কথা বলছে?

আসলে প্রেমাবেশই দণ্ডভঙ্গের মুখ্য কারণ। নিতাই উপলক্ষ্য মাত্র। যার প্রেমাবেশ হয়েছে তার আবার দণ্ড কিসের? প্রেমাবেশেই ভেসে যাবে দণ্ড। দণ্ডের কথা যে এতক্ষণ ভুলে ছিলেন প্রভু, তার মূলেও সেই প্রেমাবেশ। প্রেমাবেশের কাছে দণ্ড অনাবশ্যক। আর যা অনাবশ্যক, তা থাকলেও যা, ভাঙলেও তা। কেন তবে নিষ্ফল ভার বহন?

আর, তাকিয়ে দেখ, নিমাইয়ে নিতাইয়ে জড়াজড়ি। নিমাইয়ের উচ্ছ্বাসে নিতাইয়ের উদ্গম, নিমাইয়ের আবেশেই নিতাইয়ের আবেগ—দণ্ড আর দাঁড়ায় কোথায়?

প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, 'নীলাচলে এনে তোমরা আমার খুব হিত করলে। আর সব গেছে, মাত্র দণ্ডধন ছিল, তাও কেড়ে নিলে, ভেঙে ফেললে। যাও, তোমাদের সঙ্গে আর আমি যাব না। জগন্নাথ দর্শনে হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমি আগে যাই।'

পুরীর কাছাকাছি নদীর উপরে যে পোল আছে, তার নামই আঠারনালা। নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথের মন্দির আর দূরে নয়। কিন্তু প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছেন, একাকী যাবেন, হয় আগে নয় পরে।

মুকুন্দ দত্ত বললে, 'প্রভু, তুমিই আগে যাও, আমরা সকলে পরে যাব।'

এটুকুই বুঝি রহস্য। একা না গেলে বুঝি সার্বভৌম উদ্ধার হয় না।

প্রভুর ইচ্ছাতেই যদি নিতাই দণ্ড ভাঙল, তাহলে প্রভুর ক্রোধ কেন? জীবশিক্ষার জন্যেই এই ক্রোধ। প্রাকৃতজন যেন সন্ন্যাসাশ্রমে থেকে দণ্ড না ভাঙে। নিয়ম না অমান্য করে।

ক্রোধ উপলক্ষ্য করে ভক্তদের পিছনে রেখে প্রভু ছুটলেন তীরবেগে। ছুটলেন মন্দিরের দিকে। 'মত্ত সিংহগতি জিনি চলিলা সত্বর। প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর।' কে তাঁকে রোধ করে! একেবারে জগন্নাথের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ইচ্ছে হল জগন্নাথকে আলিঙ্গন করি। হৃদয়ের মধ্যে নিবিড় করে ধরে রাখি।

ধর ধর মার মার—মন্দিরের প্রহরীরা কোলাহল করে উঠল।

প্রেমাবেশে প্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

'সরে দাঁড়াও। মেরো না।' কে গর্জন করে উঠল সহসা।

প্রহরীরা নিরস্ত হল। এ যে সার্বভৌম বারণ করছে। রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত শুধু নয়, একাধারে গুরু, মন্ত্রী, মীমাংসক। তার কথা না শোনা অর্থ রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা।

নাম বাসুদেব, উপাধি সার্বভৌম। নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র, সর্বশাস্ত্রে, বিশেষ করে ন্যায়ে ও বেদান্তে সুপণ্ডিত। লোকে বলে, বাঙলা দেশে ন্যায়শাস্ত্র ছিল না, বাসুদেব ন্যায় পড়তে গিয়েছিল মিথিলায়। পাঠশেষে ইচ্ছে হল ন্যায়শাস্ত্র নকল করে দেশে নিয়ে আসে। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক তাতে বাধা দেয়। ন্যায় মিথিলা থেকে বেরিয়ে গেলে যে মিথিলার গৌরব ম্লান হয়ে যাবে। তখন বাসুদেব সমগ্র ন্যায় কণ্ঠস্থ করে নিল। আর নকল করার দরকার হল না।

মায়াবাদে বিশ্বাসী বাসুদেব, অদ্বৈত বেদান্তে পারঙ্গম। ন্যায়ের অধ্যাপনা তো করেনই, সন্ন্যাসীদের বেদও পড়ান। কুতর্ক কর্কশ—ভক্তিবাদের ধার ধারেন না, তর্কে ভক্তিবাদের নিরসন করেন।

কিন্তু এ কী, এ কে অপরূপ পুরুষ? এত সৌন্দর্য, এত প্রেমবিকার আগে কখনো দেখেনি সার্বভৌম। পাছে কেউ নির্যাতন করে, সার্বভৌম প্রভুকে আবরণ করে দাঁড়াল। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, তবু প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলনা। এদিক জগন্নাথের ভোগের সময় উপস্থিত। মন্দির তাই বন্ধ হবে এখুনি।

তবে উপায়?

সার্বভৌম বললে, 'এঁকে আমার বাড়িতে বয়ে নিয়ে চলো।'

মন্দিরের ছড়িদাররা অবাক। এ অপরাধীকে আবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া কেন? একে আবার কিসের আপ্যায়ন?

সার্বভৌম বললে, 'ইনি মহাপুরুষ। দেখেই বুঝতে পারছি কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সমস্ত সাত্ত্বিকভাব এঁর দেহে পরিস্ফুট।'

ভক্তিবাদের বিরোধী হলেও কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ কী

তা সার্বভৌমের জানা ছিল। সন্দেহ নেই—এ নবীন সন্ন্যাসী নিত্যসিদ্ধ, তার মধ্যে উদ্দীপ্ত ভাবের প্রকাশ যা একমাত্র কৃষ্ণ-প্রেয়সীদের বৈশিষ্ট্য। সেই মহাভাব এই মর্ত মানুষের মধ্যে সম্ভব কী করে ?

প্রভুকে নিজ বাড়িতে নিয়ে এল সার্বভৌম। পবিত্র স্থানে ও আসনে শুইয়ে দিল। কিন্তু প্রভুর শ্বাস নেই, স্পন্দন নেই, আয়ত নয়ন আধবোজা। নাকের কাছে তুলো ধরে দেখল, না, তুলো অল্প অল্প নড়ছে। ক্ষীণ হলেও শ্বাস আছে, একেবারে নিঃশেষ হয়নি। সন্দেহ নেই, এ প্রলয়-নামক সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ।

কিন্তু কতক্ষণে ফিরে আসবে বাহ্যজ্ঞান ? শিয়রে বসে অপেক্ষা করতে লাগল সার্বভৌম। দেহলক্ষণ নিরীক্ষণ করতে লাগল।

এদিকে নয়নের অদর্শন হতেই অনুগামী ভক্তের দল ছুটল মন্দিরের দিকে। দ্বার-প্রান্তে পৌঁছে ব্যাকুলস্বরে জিগগেস করল,—একজন নবীন সন্ন্যাসীকে এদিকে আসতে দেখেছ ?

মন্দিরে পৌঁছেও জগন্নাথদর্শনের কথা তাদের মনে নেই। আগে প্রভু, পরে বিগ্রহ।

'দেখেছি।'

'দেখেছ ?'

'হ্যাঁ, মন্দিরে ঢুকেই চেয়েছিল জগন্নাথকে কোলে নিতে। মূৰ্ছিত হয়ে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। সার্বভৌম ভটচাজ তখন মন্দিরে ছিলেন, সন্নেসীর জ্ঞান হয় না দেখে তাকে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন।'

চলো যাই, কে সে সার্বভৌম, তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করি।

এমন সময় সেখানে গোপীনাথ আচার্যের আবির্ভাব।

নবদ্বীপের লোক, মুকুন্দর সঙ্গে আগে থেকে জানাশোনা। একি, তুমি কোত্থেকে ? মুকুন্দকে বুকে জড়িয়ে ধরল গোপীনাথ।

নিতাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে মুকুন্দ বললে, 'গোপীনাথ, বিশারদের জামাই, তার মানে সার্বভৌমের ভগ্নীপতি।'

'ও সব পরের কথা। এখন বলো প্রভু কোথায় ?' গোপীনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'তোমাদের বলা হয়নি,' মুকুন্দ বললে, 'গোপীনাথ প্রভুর ভক্ত। শুধু ভক্ত নয়, তত্ত্বজ্ঞ।'

'তবে আর চিন্তা নেই, উনি নিশ্চয়ই সার্বভৌমের বাড়ি জানেন।' বললে নিতাই, 'এখানে লোকমুখে শুনে অনুমান করছি প্রভু সার্বভৌমের বাড়িতে আছেন। সেখানে আমাদের নিয়ে চলুন।'

গোপীনাথ নিয়ে গেল সবাইকে। তাদেরকে বাইরে রেখে দ্রুতপায়ে ঢুকল অন্তঃপুরে। ধূলিধূসর দেহে অচেতন হয়ে দীনবেশে শুয়ে আছেন গৌরহরি। মুখ দেখে সুখ হল বটে, কিন্তু অবস্থা দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হল। কতক্ষণে না-জানি ফিরে আসবে বাহ্যজ্ঞান।

সার্বভৌমকে বললে, 'এ সন্ন্যাসীর সঙ্গের লোকেরা এসেছে। অপেক্ষা করছে বাইরে।'

'নিয়ে এস ভিতরে।'

ভিতরে এসে প্রভুকে দেখে ভক্তবৃন্দ আশ্বস্ত হল। সার্বভৌম প্রভুকে সেবা-যত্ন ঠিকই করছে। খুব বেশি উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই, প্রভুর এই ধ্যানমূর্ছা দীর্ঘ-স্থায়ীই হয়ে থাকে।

নিত্যানন্দকে প্রণাম করল সার্বভৌম। শুনল তাদের এখনো জগন্নাথদর্শন হয়নি। পুত্র চন্দনেশ্বরকে বললে, 'এঁদেরকে দর্শন করিয়ে নিয়ে এস।'

মন্দিরে নিয়ে এসে চন্দনেশ্বর বললে, 'স্থির হয়ে দেখবেন জগন্নাথকে। আপনাদের আরেক গোসাঁই তো আছাড় খেয়ে পড়লেন—'

হাসতে লাগল ভক্তদল। 'আমাদের জন্যে চিন্তা নেই।'

প্রকট পরমানন্দ জগন্নাথকে দেখে আবেশ লাগল সকলের। কাঁদতে লাগল নিত্যানন্দ। মন্দিরের সেবক সকলকে মালা-প্রসাদ এনে দিল। প্রসাদে প্রসন্ন হল সকলে।

চলো এবার তবে মহাপ্রভুর কাছে ফিরে যাই।

গিয়ে দেখল নবদ্বীপচন্দ্র তখনো সমাহিত। সার্বভৌম ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষায় বসে আছে পদতলে। ভক্তদল গৌরহরিকে ঘিরে বসে উচ্চস্বরে নামকীর্তন সুরু করল। তৃতীয় প্রহরে প্রভুর চেতনা ফিরে এল, হরি-হরি বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠে বসলেন। স্থির হয়ে জিগগেস করলেন নিতাইকে, 'এখানে আমি কী করে এলাম ?'

নিতাই বললে, 'জগন্নাথ দেখামাত্র তুমি আনন্দ-আবেশে মূর্ছা গেলে। মন্দিরে সার্বভৌম উপস্থিত ছিল, সে তোমাকে তার ভবনে নিয়ে এসেছে।'

'জগন্নাথকে দেখামাত্রই ইচ্ছে হল তাকে বুকে করি, উন্মত্তের মত বাহু বাড়িয়ে ছুটলাম তাকে ধরতে। তারপর কী হল আর মনে নেই।' বললেন মহাপ্রভু।

'জগন্নাথ দেখি চিত্ত হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষ-মাঝে থুই আপনার ॥
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি ॥'

'দৈবে সেখানে সার্বভৌম ছিল,' নিতাই তাকাল সার্বভৌমের দিকে, 'সে তোমাকে সমস্ত সঙ্কট থেকে রক্ষা করেছে।'

'জগন্নাথের কী কৃপা!' বললেন গৌরহরি, 'সার্বভৌমের সঙ্গে আমার মিলন ঘটাল।'

সার্বভৌম কাছে এল। 'নমো নারায়ণ' বলে প্রণাম করল প্রভুকে।

প্রভু বললেন, 'কৃষ্ণে মতিরস্তু।'

মতি থেকেই রতি জাগবে। আর, আগুন যে আধারে থাকে তাকেও যেমন উত্তপ্ত করে, তেমনি আনন্দস্বরূপা কৃষ্ণরতি যে ভক্তে থাকে, তাকেও আনন্দিত করে রাখে। এমন আনন্দ যে বিচ্ছেদেও কৃষ্ণস্ফূর্তি।

সার্বভৌম বললে, 'এখানেই আপনাদের আজ মধ্যাহ্নকৃত্য হবে। জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আমি আজ ভিক্ষে দেব।'

স্বগণদের নিয়ে প্রভু গেলেন সমুদ্রস্নানে।

স্নানান্তে বসলেন ভোজনে। সোনার থালায় সার্বভৌম পরিবেশন করতে লাগল।

'এত পিঠা-পানা আমি খেতে পারব না।' বললেন মহাপ্রভু, 'এসব আমার সঙ্গীদের দাও। আমাকে কিছু লাফরা তরকারি দিলেই চলবে।'

'তা কী করে হয়?' আপত্তি করল সার্বভৌম। 'এ সমস্তই জগন্নাথকে নিবেদন করা হয়েছে। আপনি আস্বাদ করে দেখুন জগন্নাথের রোচনীয় হবে কি না।'

একে একে সমস্ত রান্না খাওয়াল প্রভুকে।

ভোজনান্তে গোপীনাথকে জিগগেস করল, 'এ কে? কৃষ্ণে মতিরস্তু শুনে মনে হচ্ছে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, কৃষ্ণভক্ত, এর পূর্বাশ্রম কোথায়?'

'নবদ্বীপে।' বললে গোপীনাথ, 'জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র। নীলাম্বর তোমার বাবার সহপাঠী ছিলেন—'

তবে আর কথা কী। যিনি এসেছেন তিনি সার্বভৌমের নিজ জন।

'সহজেই তুমি আমার পূজ্য।' গৌরহরিকে বললে সার্বভৌম, 'আর যেহেতু তুমি সন্ন্যাস নিয়েছ, আমি তোমার দাস ছাড়া কিছু নই।'

গৌরহরি বিষ্ণু স্মরণ করলেন। বললেন, 'সে কী বলছেন? আপনি জগদ্‌গুরু, সর্বলোকের হিতকর্তা। সন্ন্যাসীদেরও বেদান্ত পড়ান আপনি। আমিও সন্ন্যাসী, বালক সন্ন্যাসী, সুতরাং আপনি আমারও গুরু। আপনার সঙ্গ পাবার জন্যেই আমি এখানে এসেছি। মন্দিরে আজ যা বিপদে পড়েছিলাম, আপনি না থাকলে আর নিস্তার ছিল না।'

'তুমি আর একা-একা যেওনা মন্দিরে।' সার্বভৌম সাবধান করে দিল: 'হয় আমাকে সঙ্গে নিও, নচেৎ আমাকে বোলো, আমি লোক দিয়ে দেব।'

'না, আমি মন্দিরের অভ্যন্তরে যাব না, গরুড়স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে দর্শন করব।' প্রভু আশ্বস্ত করলেন।

সার্বভৌম গোপীনাথকে বললে দর্শনকালে প্রভুর সঙ্গী হবে। আরো বললে, আমার মামীর বাড়িটি নির্জন, সেখানে ওর থাকবার বন্দোবস্ত করো। সব প্রয়োজন সব যোগাড় করে দাও।

প্রভু ও তাঁর সঙ্গীরা সার্বভৌমের মামীর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

গোপীনাথ একদিন প্রভুকে শয্যোত্থান দর্শন করিয়ে আনল। জগন্নাথ যখন প্রথম শয্যা থেকে উঠছে, সেই সময়কার দর্শন।

মুকুন্দ দত্ত নিয়ে এল সার্বভৌমের কাছে।

'এ সন্ন্যাসী প্রকৃতি-বিনীত, দেখতে সুপুরুষ। এঁর উপর আমার প্রীতি ক্রমশই বাড়ছে, বেড়ে চলেছে। কোন্ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ইনি? এঁর নাম কী?' গোপীনাথকে লক্ষ্য করল সার্বভৌম।

গোপীনাথ বললে, 'এঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। গুরু কেশব ভারতী।'

'নামটি সর্বোত্তম হয়েছে।' বললে সার্বভৌম, 'কিন্তু সম্প্রদায়টা মধ্যমশ্রেণীর।'

'কিন্তু প্রভুর যে বাহ্যাপেক্ষা নেই।' বললে গোপীনাথ, 'কোন সম্প্রদায় ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা মানী বা অমানী, এ সব বিচার করবার অবকাশ ছিল না। কোনো প্রকারে সংসার ত্যাগ করা উদ্দেশ্য, তাই সন্ন্যাস গ্রহণের সময় সম্প্রদায় নিয়ে মাথা ঘামাননি। মিথ্যে গৌরবের প্রতি মোহ নেই এক বিন্দু।'

'কিন্তু এর ত এখন পূর্ণ যৌবন।' সার্বভৌম চিন্তান্বিত মুখে বললে, 'এ সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা করবে কী করে? চঞ্চল ইন্দ্রিয়কে কী করে শাসনে রাখবে?

তবে এক কাজ করি। ওকে নিরন্তর বেদান্ত পড়াই, বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে নিয়ে যাই।'

অদ্বৈতমার্গ শঙ্করাচার্যের সাধনপথ। কী বলে অদ্বৈত্যমার্গ? বলে—জীবে ব্রহ্মে ভেদ নেই। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম, তেমনি ব্রহ্মের বদলে ভুল করে জগৎ প্রপঞ্চকে দেখছি। ব্রহ্মই বস্তুরূপে প্রতিভাত। আর কী বলে? বলে, ব্রহ্ম নির্বিশেষ, এর কোনো আকার নেই, শক্তি নেই, গুণ নেই, শুধু সে এক বৈচিত্র্যহীন আনন্দসত্তা। আর এই ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্যপ্রাপ্তিই অদ্বৈত্যবাদীর লক্ষ্য।

আর বৈরাগ্য অদ্বৈত্যমার্গ অর্থ, যে অদ্বৈত্যমার্গে বৈরাগ্যের সুরটি সবলে উচ্চারিত।

'আর যদি উনি অনুমতি করেন,' বললে সার্বভৌম, 'ওকে দিয়ে নতুন করে উত্তম সম্প্রদায় থেকে সন্ন্যাস নেওয়াই।'

কথা শুনে গোপীনাথ ও মুকুন্দ দুজনেই বিমর্ষ হল। সার্বভৌম বোধ হয় মনে করেছে—এ একজন সামান্য সন্ন্যাসী, বিচার-বিবেচনা না করেই সন্ন্যাস নিয়ে ফেলেছে; সম্প্রদায়ের তাৎপর্যের ধার ধারেনি।

তখন গোপীনাথ গর্জন করে উঠল। 'ভটচাজ, তুমি এঁর মহিমা কিছুই জানো না, বোঝওনি কিছু। ইনিই ভগবত্তার শেষ সীমা, চরম বিকাশ। ইনিই স্বয়ং ভগবান। তা এ কথা অজ্ঞ লোকে বিশ্বাস করবে না। বিজ্ঞজনেই পারবে অনুভব করতে।'

'কিন্তু কেন?' সার্বভৌমের শিষ্যের দল কোলাহল করে উঠল: 'কেন ওঁকে ঈশ্বর বলবে? প্রমাণ কী?'

'যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁদের অনুভবই প্রমাণ।' বললে গোপীনাথ, 'তাঁরা সাধন দ্বারা অনুভব করেছেন কী ঈশ্বর-লক্ষণ।'

'তার অর্থ, অনুমান করে ঈশ্বরতত্ত্ব স্থাপন করো।' শিষ্যের দল বললে, 'ঘট দেখে যখন কুম্ভকারকে অনুমান করি, তেমনি জগৎ সংসার দেখে এর এক সৃষ্টিকর্তাকে অনুমান করব?'

'এই অনুমানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব হয়তো বা নির্ধারণ করা যেতে পারে, কিন্তু অনুমানে ঈশ্বরকে, ঈশ্বরতত্ত্বকে জানা যায় না। অনুমানে নয়, প্রত্যক্ষজ্ঞানেই ঈশ্বরতত্ত্ব গোচরীভূত। কিন্তু যাই বলো, ঈশ্বরের কৃপা না হলে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব।'

শিষ্য কহে—ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য কহে—অনুমানে নহে ঈশ্বরজ্ঞানে॥
অনুমান-প্রমাণে নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে।
কৃপা বিনে ঈশ্বরতত্ত্ব কেহো নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে।
সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥

যে দুটি চরণকমলের প্রসাদলেশ পেয়েছে, সেই জানতে পারে ঈশ্বরমহিমার স্বরূপ। সেই তো তাঁকে দেখতে পারে চোখ দিয়ে, শুনতে পারে কান দিয়ে, ছুঁতে পারে হাত দিয়ে। নচেৎ একাকী থেকে শুধু যোগাভ্যাসে বা শাস্ত্রালোচনায় বা বিচিত্র বিচারে বা অনুসন্ধানে তাঁর কিছুই নির্ণয় হয় না।

সার্বভৌমকে লক্ষ্য করে গোপীনাথ বললে, 'তুমি শাস্ত্রবেত্তা হতে পারো, কিন্তু তোমাতে ঈশ্বরের কৃপালেশ নেই, তাই সাধ্য কি তুমি ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝো। তোমার শাস্ত্রই তো বলে, শুধু পাণ্ডিত্যে বোঝা যায় না ঈশ্বরতত্ত্ব।'

'কিন্তু তোমাতে তাঁর কৃপা হয়েছে, তারই বা প্রমাণ কী?' সার্বভৌম রুক্ষস্বরে বললে।

'প্রমাণ, আমি বস্তুকে বস্তু বলে জেনেছি। আর তুমি এঁর শরীরে মহাপ্রেমাবেশ দেখেও চিনতে পারছ না। তুমিই বলো, এ মহাপ্রেমাবেশ কি ঈশ্বরলক্ষণ নয়? তাই তো বলি, আমাতে কৃপা আছে, তোমাতে নেই। তোমাতে শুধু মায়া, তুমি মায়াচ্ছন্ন।'

হাসল সার্বভৌম। বললে, 'রুষ্ট হয়ো না। আমি শাস্ত্রদৃষ্টে কথা বলি। তত্ত্বনির্ণয়ের অনুরোধে বিচার-বিতর্ক করতে ভালোবাসি। আমার বক্তব্য বলতে দাও।'

'বলো।'

'শাস্ত্রে আছে, কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নেই। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগেই তাঁর অবতার হয়, তাই তো বিষ্ণুর নাম ত্রিযুগ। সুতরাং তোমার ঐ শ্রীচৈতন্য অবতার হতে পারেন না।' সার্বভৌম গম্ভীর হল। 'তবে তিনি যে মহাভাগবত, তাতে সন্দেহ নেই।'

'তোমার দেখি অভিমানের শেষ নেই। মহাভারত ও ভাগবত—এই দুই মহাশাস্ত্রের কথা কি ভুলে গিয়েছ? তারা বলছে, কলিতে লীলাবতার না হতে পারে, কিন্তু যুগাবতার হতে বাধা নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যুগাবতার নন, তিনি স্বয়ং ভগবান।' গোপীনাথ বিরক্তমুখে বললে, 'তোমাকে কী বোঝাব, ঊষর ভূমিতে বীজ বপন নিষ্ফল। যখন তোমার উপর তাঁর কৃপা হবে, তখন বুঝবে আমার সিদ্ধান্ত ঠিক কি না।'

হাসতে লাগল সার্বভৌম। ক্রমশঃ।

উৎসুক

—রথীন রায়

ব্যাণ্ডেল চার্চে খ্রীষ্টমূর্তি

—অশোককুমার ধর

হাওয়ামহল (জয়পুর

—নারায়ণ সাহা

ভোট ফর কংগ্রেস !

—বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, দ্বিপ্রহর

—বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

দাঁতের বিজ্ঞাপন

—গোরাচাঁদ দত্ত

মাটির মেয়ে —মনু বসাক

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

তিন

[খ]

নয়নতারা নেই।

নয়নতারা মৃত।

সংবাদটা যেন সুলোচনাকে আকস্মিক একটা আঘাত দেয়। কয়েকটা মুহূর্ত তার মুখ দিয়ে কোন বাক্যই সরে না। সে স্তব্ধ অনড় হয়ে দোড়গোড়ায় যেন দাঁড়িয়ে থাকে।

সরকার মশাইও তার পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

অবশেষে দাসী ক্ষীরোদাই প্রশ্ন করে, আপনারা কে গা। কোথা থেকে আসচো!

সরকার মশাই-ই এবারে মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন, আমরা কৃষ্ণনগর থেকে আসছি।

ও। তা ঠাকুর মশাইয়ের আপনারা কেউ হও বুঝি? তা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভিতরে এসো না।

সরকার মশাইও এবারে বলেন, ভিতরে চলুন পিসিমা।

ওরা অন্দরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে সুনয়নার কণ্ঠস্বর শোনা যায়, কে রে ক্ষীরোদা দিদি?

বাইরে এসো না দিদি, কেষ্টনগর থেকে কারা এয়েচেন দেখোসে।

সুনয়না তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হ'য়ে আসে। এবং সুলোচনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায় সুনয়না।

কে আপনারা? মৃদু কণ্ঠে শুধায় সে।

সুলোচনা ততক্ষণে নিজেকে অনেকটা প্রস্তুত করে নিয়েছে। সুনয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমাকে তো তুমি চিনবে না মা। তুমি তো আমাকে কোন দিন দেখনি! আমি—

কে আপনি। আপনি কি কেষ্টনগরের বড়-মা!

হাঁ মা।

বুঝতে পেরেছিলাম। আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম—বলতে বলতে এগিয়ে এসে সুনয়না সুলোচনার পদধূলি নিতেই সুলোচনা আগ্রহে দু'বাহু প্রসারিত করে তাকে বক্ষে টেনে নিয়ে গভীর স্নেহ সিক্ত কণ্ঠে বলে, বেঁচে থাকো মা, সুখে থাকো। রাজ রাজেশ্বরী হও—

মায়ের কাছেই একদিন সুনয়না শুনেছিল তার আরও দু জন মা আছেন। একজন থাকেন নবদ্বীপে, অন্য জন তাঁর ভাইয়ের কাছে কৃষ্ণনগরে।

কৃষ্ণনগরের মা-ই তার পিতার প্রথমা পত্নী।

চলুন মা, ভিতরে চলুন!

সুনয়না হাত ধরে সুলোচনাকে গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে যাবার জন্য উদ্যত হয়।

সরকার মশাই তখন বলেন, আমি তাহলে আসি পিসিমা।

না, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। মা নয়না, সরকার মশাইকে ঐ বারান্দায় একটা আসন পেতে বসতে দাও।

সুনয়না তাড়াতাড়ি গৃহাভ্যন্তরে গিয়ে একটা কম্বলাসন এনে বারান্দায় বিছিয়ে দিল।

সরকার মশাই আসনটির উপর উপবেশন করলেন।

সুনয়নার সঙ্গে সুলোচনা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

ক্ষীরোদা বারান্দার একধারে বসে একটা কুলোয় চাল নিয়ে বাছছিল।

সরকার মশাই তার দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, ওগো মেয়ে শুনচো।

আমাকে বলচো।

হ্যাঁ গা। কি নামটি তোমার।

ক্ষীরোদা—সবাই ক্ষীরি বলে ডাকে।

এ বাড়িতে তামাকের ব্যবস্থা আছে?

তা থাকবে না কেন? তামুক ইচ্ছা করো নাকি?

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধূমপান করি নাই, গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

আপনি কি ব্রাহ্মণ?

না গো মেয়ে কায়েত।

বোস, আসচি—ক্ষীরোদা কুলোটা এক পাশে নামিয়ে রেখে রন্ধনশালার দিকে চলে গেল।

সরকার মশাই সেই শ্যামাঙ্গিনী তরুণীর গমন পথের দিকে তাকিয়ে দেখেন। স্বাস্থ্য ও যৌবন মেয়েটির কালো অঙ্গে যেন টল টল করছে। পরিধানে একটি খাটো শান্তিপুরী ডুরে শাড়ী। কিন্তু পরিষ্কার। উদালা গায়ে শাড়ীর আঁচলটি বেষ্টন করে কটিতে বাঁধা। কটিতে এক ছড়া রূপার গোট। পুরুষ্টু নিতম্বে রূপার চওড়া গোটছড়া বড় চমৎকার মানিয়েছে। হাতের বাজুতে অনন্ত। হাতের মণিবন্ধে একগাছি করে জলতরঙ্গ চুড়ি। সিঁথিতে বা কপালে সিন্দুর নেই। মেয়েটি বিবাহিত নয় বলেই মনে হয়।

একটু পরেই মেয়েটি হুঁকার মাথায় কলিকাটি বসিয়ে ফুঁ দিতে দিতে এগিয়ে এলো, নাও গো।

হাত বাড়িয়ে সরকার মশাই ক্ষীরোদার হাত থেকে হুঁকাটি নিলেন। গুড়ুক গুড়ুক শব্দে তামুক সেবন করতে লাগলেন।

ক্ষীরোদা আবার গিয়ে চাল বাছতে শুরু করে।

ক্ষীরি।

বলেন গো।

এই বাড়ির কাজ কর্ম করো?

হ্যাঁ।

এখানেই থাকো নাকি?

আগে তো থাকতাম না, কিন্তু গিন্নীর কাল হবার পর থেকে এখানেই থাকি। একা এক সোমত্ত মেয়ে বাড়িতে থাকবে তাই ঠাকুর বললে, ক্ষীরো, এবার থেকে তুমি এখানেই থাকো। রয়ে গেলাম।

সরকার মশাই আর কোন কথা বললেন না।

পরিপূর্ণ যৌবনা মেয়েটি তাহলে এখানেই থাকে। কথাটা যেন শুনে সরকার মশাইয়ের কেমন ভাল লাগে না।

সরকার মশাই চিরদিনের অত্যন্ত সাত্ত্বিক ও নির্মল চরিত্রের মানুষ। নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক না করে জলস্পর্শ পর্যন্ত করেন না। কদাচ মিথ্যা কথা বলেন না। সংসারে একটি মাত্র স্ত্রী যদিচ কুলীন কায়স্থ।

সরকার মশাই জানতেন ঐ সময় ঐ অঞ্চলের সামাজিক নীতির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় অন্যান্য তীর্থস্থানের নিকটবর্তী স্থানসমূহের মতই।

অস্থায়ী ভাবে নানা কাজে ও ব্যবসার খাতিরে বহু নর নারী ঐ অঞ্চলে আসা যাওয়া করে। বেশীর ভাগই তাদের মধ্যে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। এবং সেই সব অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকদের ঠকিয়ে উপার্জন করবার নানাবিধ ফন্দি ফিকির সর্বক্ষণ খুঁজচে। আর তাদের ভিড় বেশী যেখানে সেখানেই যত দুশ্চরিত্রা নারী এসে জোটে। ঐ সব দুশ্চরিত্রা নারীরা তাদের ঘরে তীর্থকামী যাত্রীদের বাসা দেয় ও রাত্রে বারাঙ্গনা বৃত্তি অবলম্বন করে। দুই দিক দিয়েই তারা উপার্জন করে।

আবার ঐ সব নারীদেরই যখন রূপ যৌবন গত হয় তখন গৃহস্থের ঘরে দাসীবৃত্তি করে। ক্ষীরোদা যে ঐ শ্রেণীরই একজন, বিচক্ষণ সরকার মশাইয়ের বুঝতে কষ্ট হয় না। ক্ষীরোদার দেহে রূপ ও যৌবন টলমল করছে আর হরনাথ মিশ্রর ঘরে গৃহিণী নেই। বয়েস হয়েছে বটে হরনাথের, কিন্তু সে পুরুষ। কথায় বলে নারী ও পুরুষ, ঘি আর আগুন।

উহুঁ। ব্যাপারটা ভাল নয়।

পিসিমাকে একটু সাবধান করে দিয়ে যেতে হবে।

সরকার মশাইয়ের চিন্তাতে বাধা পড়লো সুলোচনার ডাকে, সরকার মশাই—

এই যে পিসিমা। তাড়াতাড়ি হাতের হুঁকাটা নামিয়ে রাখলেন সরকার মশাই।

আজই আপনার কৃষ্ণনগরে ফেরা হবে না।

কেন? কেন? এদিকে কি কিছু—

[illegible] অন্য একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য বলুন।

টালীর নালায় সুন্দর সাহেব বলে এক ব্যক্তির নৌকা বাঁধা আছে—

সুন্দর সাহেব। কে সে?

সে রাত্রে যে ডাকাত আমাদের ঘরে ঢুকে মৃন্ময়ীকে ডাকাতি করে এনেছিল ঐ সুন্দর সাহেব হুবহু তারই মত দেখতে।

বলেন কি।

হ্যাঁ, সরকার মশাই। আপনাকে তার সমস্ত খবর গোপনে নিতে হবে। লোকটা কে? কি ওর সত্য পরিচয়, এখানে কি করে? সব জেনে আসতে হবে যে ভাবেই হোক।

আপনি ঠিক বলছেন পিসিমা। আপনি লোকটাকে ঠিক চিনতে পেরেছেন?

হ্যাঁ পেরেছি বলেই তো বলছি।

তবে তো একবার কোতোয়ালীতে গিয়ে খবরটা দিতে হয়—

না, না—এখন নয়। আগে আপনি খবরটা সংগ্রহ করুন।

তাহ'লে আমি এখুনি সেখানে যাই?

হ্যাঁ যান।

কিন্তু সুলোচনা জানত না বা ঘূণাক্ষরে বুঝতেও পারেনি, সে যেমন দূর থেকে সুন্দরমকে দেখে চমকে উঠেছিল, সুন্দরম ঠিক তেমনি নৌকার পাটাতনে উপবিষ্টা গুণ্ঠনবতী সুলোচনাকে দেখে চিনতে পেরেই চমকে উঠেছিল।

অজানিত একটা আশঙ্কায় বুকটা তার দুর-দুর করে কেঁপে উঠেছিল।

সর্বনাশ। উনি এখানে কেন?

তবে কি কৃষ্ণনগর থেকে নৌকা করে মৃন্ময়ীর খোঁজেই উনি এখানে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার মধ্যে নানা চিন্তা ঘূরপাক খেতে থাকে। তাই যদি হয় অর্থাৎ ঐ মহিলাটি যদি মৃন্ময়ীর খোঁজেই এখানে এসে থাকে—আর তো এখানে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকা যায় না।

কারণ মহিলাটি যে একদৃষ্টে তারই মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন সুন্দরমের দৃষ্টি সেটা এড়ায় নি। এবং তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখে সুন্দরমের মনে হয় খুব সম্ভবত মহিলাটি তাকে চিনতে পেরেছেন।

কি করা যায়।

কাণা কবিরাজের ঔষধে মৃন্ময়ীর আজ জ্বরের উপশম হয়েছে বটে তবে অন্য এক বিপদ দেখা দিয়েছে।

একদিক অঙ্গ তার অবশ হ'য়ে গিয়েছে। কথাও কিছুটা জড়িয়ে জড়িয়ে অস্পষ্ট ভাবে বলে।

কাণা কবিরাজ অবিশ্যি বলেছে, ভয়ের কোন কারণ নেই মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে রোগের বীজ ছড়িয়েছিল এ তারই ফল।

এখনও কাণা কবিরাজের ঔষধ চলছে এবং তৈল মালিশ চলেছে। এ অবস্থায় কাণা কবিরাজের কাছ থেকে মৃন্ময়ীকে অন্য কোথায়ও সরিয়েও নেওয়া যায় না। হয়তো তাতে হিতে বিপরীতই হবে।

তা কিছুতেই হতে দেবে না সুন্দরম। সুন্দরমের কঠিন প্রতিজ্ঞা যেমন করেই হোক মৃন্ময়ীকে সে সুস্থ করে তুলবেই।

এ কথা মিথ্যা নয় যে মৃন্ময়ীকে রায় বাড়িতে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়েই সুন্দরম সে রাত্রে তার আসল কাজটা ভুলে শেষ পর্যন্ত [illegible] নিয়ে এসেছিল।

উপলক্ষ্য যা-ই হোক না কেন উৎসবে যোগ দিতে গেলে চাই প্রসাধন। আর প্রসাধনের প্রথম এবং শেষ কথাও হচ্ছে কেশবিন্যাস। ঘন, সুকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, সযত্ন পারিপাট্যে উজ্জ্বল, আপনার লাবণ্যের, আপনার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। কেশলাবণ্য বর্দ্ধনে সহায়ক লক্ষ্মীবিলাস শতাব্দির অভিজ্ঞতা আর ঐতিহ্য নিয়ে আপনারই সেবায় নিয়োজিত।

গুণসম্পন্ন, বিশুদ্ধ, শতাব্দির ঐতিহ্য-পুষ্ট

[illegible] কোং প্রাইভেট লিঃ • লক্ষ্মীবিলাস হাউস, • কলিকাতা-৯

মৃন্ময়ীর অসামান্য রূপের আকর্ষণ ব্যতীত সে মুহূর্তে অন্য কোন চিন্তাই সে রাত্রে সুন্দরমের মনে উদয় হয় নি। কিন্তু ক্রমশ তারপর অসুস্থ মৃন্ময়ীর রোগ শয্যার পাশে বসে দিবা রাত্র প্রায় সর্বক্ষণই কাটাতে গেলে তার সেবা শুশ্রূষা করতে করতে সুন্দরমের মনের মধ্যে বিপরীত একটা ভাবের উদয় হয়েছিল।

রূপের আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে গভীর প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছিল।

আজ মৃন্ময়ীকে ছেড়ে দেওয়া সুন্দরমের পক্ষে কেবল দুঃসাধ্যই নয় চিন্তারও অতীত বুঝি। বরং আজ সে মৃন্ময়ীর জন্য বুঝি সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে। মৃন্ময়ী যে আজ তার সমস্ত অন্তর জুড়ে বসেছে।

অসুস্থ মৃন্ময়ীর রোগ শয্যার পাশে বসে আরো একটা কথা যা সুন্দরমের বহুবার মনে হয়েছে, মৃন্ময়ী তাকে ঘৃণা করে। সে ডাকাত দস্যু, মৃন্ময়ী তাই তাকে ঘৃণা করে।

মৃন্ময়ীর সেদিনকার সেই কথাটা: ডাকাত, শয়তান, কেন, কেন—আমাকে ধরে নিয়ে এলে?

কথাটা যেন সুন্দরম কিছুতেই ভুলতে পারে না। তার কানের পাশে বারংবার ধিক্কার দিয়ে দিয়ে ফেরে: সে ডাকাত, সে শয়তান।

সত্যিই তো, সে ডাকাত, শয়তানই তো।

মিথ্যা তো বলে নি মৃন্ময়ী। সে ডাকাত, সে শয়তান।

প্রচণ্ড একটা ধিক্কার যেন তার সমস্ত অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করেছে।

মৃন্ময়ীর মুখের দিকেও যেন সে চাইতে পারেনি।

অবশেষে সুন্দরম মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, আর না, আর সে ডাকাতি করবে না। ডাকাতির জীবনে এইখানেই ইস্তফা।

ডাকাতির এইখানেই ইতি।

নতুন কোন এক জীবন এবার সে বেছে নেবে। সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন এবার থেকে সে যাপন করবে, তবে—তবে তো মৃন্ময়ী আর তাকে ঘৃণা করবে না।

জননী ভায়লা তারও কোন দিন ইচ্ছা ছিল না, এই পথ সে জীবনে নেয়।

বৃদ্ধা কতবার তাকে নিষেধ করেছে কিন্তু ভায়লার কোন কাতর প্রার্থনাতেই সুন্দরম কর্ণপাত করেনি। মৃত্যুকালেও ভায়লা তার হাত ধরে মিনতি জানিয়েছিল, এ পথ ছেড়ে দে বেটা! এ আচ্ছা পথ নেই—

হ্যাঁ, সে জীবনের অন্য পথই এবারে বেছে নেবে, ডাকাতি আর করবে না। কিছু জমানো সোনাদানা, হীরে জহরৎ তার হাতে আছে। কোন একটা ব্যবসাই সে করবে।

হয় চালের ব্যবসা, নয় সুন্দরী কাঠের ব্যবসা।

সেই মতই সে চেতলার একজন পূর্ব পরিচিত ব্যবসায়ী অরিন্দম সরকারের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছে।

অরিন্দম সরকার কলকাতার কায়স্থ সমাজের একজন নামী ব্যক্তি। ধনী, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি। কুমোরটুলীতে তার বিরাট প্রাসাদোপম বাটী।

সুন্দরী কাঠ ও চালের বিরাট ব্যবসা চেতলা এবং কালীঘাট অঞ্চলে। তাছাড়া গোপনে গোপনে সে চোরাই মালেরও বেচা-কেনা করে।

অরিন্দম সরকারের পরিচয় ঘটে এবং ক্রমশ সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

কিন্তু বেচা-কেনার ব্যাপারে লোকটা অত্যন্ত কঠিন বলে ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে সুন্দরম তার সঙ্গে মালের বিশেষ বেচা-কেনা করেনি। ঐ ব্যাপারে বরং মুধামাধবকেই তার বেশী পছন্দ।

যদিও লোকটা কিছু কম দেয় তবু অরিন্দম সরকারের মত একেবারে পথে বসায় না। কিন্তু সে তো পরের কথা, সর্বাগ্রে মৃন্ময়ীকে এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু কোথায়। অসুস্থ মৃন্ময়ীকে এখন সে কোথায় সরাবে রাতারাতি। এমন জায়গায় মৃন্ময়ীকে সরাতে হবে যেখানে রেখে মৃন্ময়ীর চিকিৎসা চালাতে পারে সে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে সুন্দরমের।

কাছেই কুলীর বাজারে একেবারে গঙ্গার তীরে অরিন্দম সরকারের একটা বাগান বাড়ি আছে। মধ্যে মধ্যে অরিন্দম সরকার বাঈজীদের নিয়ে সেই বাগান বাড়িতে দু'চার দিনের জন্য স্ফূর্তি করতে যায়, বাকী সময়টা বাগান বাড়িটা খালিই পড়ে থাকে।

অরিন্দম সরকার যদি সে বাগান বাড়িটা ভাড়া নিয়েও তাকে কিছুদিনের জন্য ছেড়ে দেয় তো অনায়াসেই সেখানে নিয়ে গিয়ে মৃন্ময়ীকে সে তুলতে পারে। আপাতত সেখানে মৃন্ময়ীকে তুলে একটা পাকাপাকি আশ্রয় সে তো খোঁজ করে নিতে পারে। তাহলে সব দিক দিয়েই সুন্দরমের সুবিধা হয়।

ঠিক। তাই সে করবে। কিন্তু তার আগে নৌকাটা এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সুন্দরম আর দেরি করে না। ডাকে, এমামুল্লা!

সাহেব।

এমামুল্লা এগিয়ে এসে সেলাম দেয়।

নৌকা এখনি খোল।

নোঙর তুলবো?

হ্যাঁ।

কোন দিকে যেতে হবে।

বড় গঙ্গার দিকে নৌকা নিয়ে চল।

এমামুল্লা সঙ্গে সঙ্গে মাল্লাদের ডেকে নোঙর তুলে নৌকা ছেড়ে দেয়।

সুন্দরমের নৌকা ভেসে চলে টালীর নালা ছাড়িয়ে বড় গঙ্গার দিকে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে সরকার মশাই যখন এসে টালার নালায় পৌঁছালেন সুন্দরমের নৌকা তখন দৃষ্টির বাইরে অনেক দূর চলে গিয়েছে। আশে পাশের দু'চার জন মাঝি মাল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানালেন কথাটা।

তারা বললে, সাহেবের নৌকা তো অনেকক্ষণ ঘাট ছেড়ে চলে গিয়েছে।

যে কথাটা বললে তাকেই শুধালেন সরকার মশাই, তোমার নামটি কি বাপু।

আজ্ঞে হারাণ।

একটু ঐ ধারে আসবে। তোমার সঙ্গে আমার ওটিকতক কথা আছে।

কি কথা?

হারাণ একটু যেন কৌতূহলী হয়েই এগিয়ে যায়।

একটা বড় অশ্বত্থ গাছের নীচে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দু'জনে এসে দাঁড়ায়। ওপাড়ে একদল শিয়াল হুক্কা হুয়া করে চিৎকার করে ওঠে। কালীর মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে ওঠে।

বলেন কর্তা?

জামার পকেট থেকে প্রথমেই দশটি রৌপ্যমুদ্রা বের করে হারাণের দিকে এগিয়ে ধরেন সরকার মশাই, নাও হে ধর—

কি কর্তা?

নাও না হে!

হারাণ হাত পেতে মুদ্রাগুলো নেয়। ব্যাপারটা কি বলেন তো কর্তা?

আরো কিছু দেবো, ঐ সুন্দর সাহেবটির সমস্ত সংবাদ আমার চাই।

তা আগে বলতে হয়। নেন—কর্তা—নেন—মুদ্রাগুলো এগিয়ে ধরে হারাণ সরকার মশাইয়ের দিকে।

আহা, রাখো রাখো ওগুলো। আরো কিছু চাও দিচ্ছি—

না কর্তা, ওতে আমার কোন প্রয়োজন নেই—

বেশ তো, কত চাও বলই না হে—

না কর্তা, কিছুই চাই না। ওনার খবর কিছুই আমি আপনাকে দিতে পারবো না। শুধু আমি কেন, এ তল্লাটে কেউ কিছু বলবে না ওনার সম্পর্কে। আর আপনাকেও সাবধান করে দিচ্ছি—সাহেবকে আপনি হয়তো চেনেন না। দুম করে গুলি চালাতে ওর এতটুকু দেরি হবে না। সাধ করে পৈতৃক পরাণটা কে দেবে বলেন!

হারাণ।

বলেন—

কোন উপায়ই কি নেই?

কিন্তু ওনার খবরে আপনার প্রয়োজনটা কি বলেন তো কর্তা?

দরকার একটু আছে—

দরকার থাকেও যদি তো চেপে যান। ওর ত্রি-সীমানাতেও ঘেঁষবেন না কর্তা। সাহেব এমনিতে মাটির মানুষ কিন্তু রাগলে কেউটে সাপ। সাক্ষাৎ যম—কেন বেঘোরে প্রাণটা দেবেন।

সরকার মশাই বুঝতে পারেন অন্তত হারাণের কাছ থেকে কোন সুবিধা হবে না। পীড়াপীড়ি করে ওকে কোন লাভ নেই। কাজেই সরকার মশাই আর কোন কথা বললেন না। স্থান ত্যাগ করাই সমীচীন বোধ করলেন। বুঝতে পারলেন যে সুন্দরমের সম্পর্কে মাঝি-মাল্লাদের কাছ থেকে এখানে অন্তত কোন সংবাদ তিনি সংগ্রহ করতে পারবেন না, সরকার মশাই পুনরায় হরনাথ মিশ্রের কুটীরের দিকে অগ্রসর হলেন।

ইতিমধ্যে অন্ধকার চারিদিকে রীতিমত চাপ বেঁধে উঠেছিল। মধ্যে মধ্যে দোকানে দোকানে আলো জ্বলছে বটে কিন্তু পথ তাতে করে আরো দুর্গম মনে হয়। সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগুতে থাকেন সরকার মশাই। সুলোচনাকে অন্তত সংবাদটা তো দিতে হবে।

[ক্রমশঃ]

নিষিদ্ধ এলাকা

কালপুরুষ

৮

রক্তমাংসের দেহের মধ্যে যে একজন বাস করে, তার লীলা বোঝা ভার। মানুষের প্রেম-ভালবাসা মানুষকে পাগল করে, বিপথে নিয়ে যায়। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় প্রেমের আবর্তে দেশ, দেশের মানুষ, দেশের সভ্যতা। আবার সেই মানুষের মধ্যেই জেগে ওঠে শুভবুদ্ধি, কল্যাণকামনা দেশের জন্যে, দশের জন্যে। সেই মানুষই তখন গতিরোধ করে সর্বনাশা চক্রের; ধ্বংসের দেবতার রুদ্র-রোষকে ভয় করে না মোটেই। বিপথের প্রান্ত থেকে সে চালিত হয় পথের দিকে—রাত্রির অন্ধকার দূরে গিয়ে দেখা দেয় পরিচ্ছন্ন প্রভাতের আলো। ক্ষত-বিক্ষত মনের শান্ত চেহারা সমুদ্রের রূপ নেয়। তলদেশে আলোড়ন, উপরে তার চিহ্ন মাত্র নেই। বন্দনা-ও এমনি এক মেয়ে। এখন শান্ত।

বন্দনার নাকি ইতিহাস নেই পিছনে-ফেলে-আসা দিনগুলোর। পুলিশে খুঁজে পায়নি অন্ততঃ। সে বলেছে, তার নেই কেউ। এরপর পুলিশের কর্তব্য হিসাবে যা করণীয়, তাই তাঁরা করেছে। মুক্ত বিচরণ-ক্ষেত্র থেকে কারার অন্তরালে এনে দিয়েছে।

বন্দনা না হাজতী, না মেয়াদী। অর্থাৎ জেলখানায় আছে, অথচ জেল-রেজিষ্টারে যে ছক বাঁধা আছে, তার কোন শ্রেণীর মধ্যে সে পড়ে না আইনতঃ।

কয়েকদিন পর কি মনে করে বন্দনা একটা সংবাদ দিয়েছিল, তার বাবার নামও একটা বলেছিল। ঠিকানাও তার মুখে শোনা গিয়েছিল। কলকাতার কোন এক গলিপথের ঠিকানা।

সেখান থেকে কেমন করে ছিটকে এলো এখানে?—তার উত্তরে আর কিছু বলেনি।

তার প্রদত্ত ঠিকানার সূত্র ধরেই অনুসন্ধান চালাতে গেল পুলিশ। তখনও পুলিশ জানত না যে, মেয়েটি দেখতে ছোট হলে কি হবে, আসলে বুদ্ধিতে ও ধুরন্ধর।

ব্যর্থ হয় পুলিশের পরিশ্রম। বন্দনা-প্রদত্ত ঠিকানা মিলিয়ে দেখা গেল বাড়ীও একটা আছে, সেই নামে ভদ্রলোকও একজন আছেন; কিন্তু কস্মিনকালেও তার ছেলেমেয়ে নেই। তিনি অবিবাহিত।

আবার এল পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জাল ফেলে মুক্তাটুকু তুলতে চাইল। অতল গহ্বরের অন্ধকার থেকে আলো একটু আসুক—পথ দেখিয়ে দিক পুলিশকে।

বন্দনা নীরব।

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর মোলায়েম স্নেহমিশ্রিত কণ্ঠে আবারও বললেন, বলো—কোন ভয় নেই। আমরা তোমাকে সেখানে পৌঁছে দেব।

তবুও কোন কথা নেই।

ইন্সপেক্টর আবারও শুধালেন—বলো, ঘর ছেড়ে, ছেলেমানুষ তুমি, কেন বেরোলে এই অজানা পথে? জানোই তো, পথে পথে কি সর্বনাশা বিপদ ওৎ পেতে আছে, বিশেষতঃ এই বয়সের মেয়েদের জন্যে!

জানি।—ছোট্ট উত্তর বন্দনার।

তবে?—ইন্‌স্পেক্টর উৎসাহিত হয়ে নড়ে চড়ে বসলেন।

বন্দনার উত্তর না পেয়ে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—কৈ, উত্তর দিচ্ছ না যে!

বন্দনা যেন আত্মস্থ হতে চাইছে, কোন উত্তর দিল না। কেউ যেন তাকে অতীতের দিকে তাকাতে বলছে। ফেলে আসা পথ যেন তাকে ফিরে ডাকছে। চুপচাপ বসে ভাবছে বুঝি বন্দনা। হঠাৎ তার চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল।

আমরা হলাম অপ্রস্তুত—সকলেই।

চোখ মুছে নিয়ে কিছুক্ষণ পর বন্দনা নিজেই বলতে সুরু করল।

মফঃস্বলের এক ছোট শহর। সেখানকার এক মাইনর স্কুলে বাবা করতেন টীচারগিরি। তাতে কি আর আয় এমন, বলুন। তবু অতি কষ্টে তাতেই কোন রকমে চারটি প্রাণীর পেট চলত। হাঁ, কিছু জমিজমা-ও ছিল; তার উপস্বত্বও কিছু আসত ঘরে। তবে এদিক থেকে কিছু অসুবিধা-ও ছিল। জমিজমা বিভিন্ন গ্রামে ছড়ানো ছিল। বাবা-ই সে-সব দেখাশুনা করতেন। একদিন বাবা কারো কথা না শুনে জ্বর গায়ে ভিন্ গাঁয়ে ধান আদায়ের জন্য গেলেন। সেই যাওয়াই তাঁর শেষ-যাওয়া। বন্দনার চোখ দুটো আবার ছলছল করে এল। আঁচলে চোখ মুছে হঠাৎ প্রশ্নের ভঙ্গীতে বলল—ঐ যা, একদম ভুলে গিয়েছি! নিজের গীতই গেয়ে যাচ্ছি এক কাহন। আপনাদের কথার জবাব তো দিইনি, তাই না?

ইন্‌স্পেকটর উৎসাহ দেবার ছলে বললেন—তাতে কি হয়েছে! শুনিই না তোমার নিজের কথা একটু। মুখে বললেন বটে; কিন্তু মনে-মনে যে তেমন খুসি হননি, তা বোঝা গেল খানিকক্ষণ পরেই।

বন্দনা বলল, আপনারা জানতে চান—কি করে এবং কেন এখানে এলাম? কিন্তু জেনে কি হবে বলতে পারেন?—বন্দনার চোখে যেন প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল। মুহূর্ত্তকাল ইনস্পেকটর সে-চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের চোখ নামিয়ে নিলেন।

এ ধরণের পাল্টা প্রশ্ন আসতে পারে, ইনস্পেকটর তা বোধ করি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। সুদীর্ঘ কালের পুলিশের চাকরির অভিজ্ঞতা তাঁর; তাই তিনি অত্যন্ত সহজ ও নির্লিপ্ততার সুরে বলতে পারলেন—করতে হয়ত কিছুই পারব না; তবু বলতে পারছ তো,

আমাদের কাজটুকু তো করতে হবে অর্থাৎ জেলে তো তুমি চিরদিন থাকতে পাবে না,—হয় কোন আশ্রম, নয় নিজের বাড়ী,—এই দুটোর একটা তোমাকে বেছে নিতেই হবে। তাই বলছিলাম কি, তোমার বাড়ীর ঠিকানাটা বের করতে পারলে তোমার একটা কিনারা হয় আর কি।

কি করে এখানে এলাম—তার উত্তর, ইচ্ছে করেই এসেছি।

তাই-ত আমাদের জিজ্ঞাস্য।

ইচ্ছে করে নয়ত কি ? কবে কোন্ ছোটবেলায় আমার নাকি বিয়ে হয়েছিল। আমার তা মনেও পড়ে না। বাবাই বিয়েটা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার যখন জ্ঞান হল তখন জানতে পারি বিয়ে আমার একটা হয়েছিল এবং স্বামী নামক দেবতাটি আমার ভাগ্যে বেশিদিন টেঁকেনি।

সেই থেকেই তুমি তাহলে—কথাটা আর শেষ করলেন না ইনস্পেকটর ইচ্ছে করেই।

না, যা মনে করছেন তা নয়। আমি সেই থেকেই বিধবা সেজে বসে নেই। দেখতেই তো পাচ্ছেন। বলে কেমন একটা করুণ ও বিষণ্ণ হাসি হাসল বন্দনা।

মায়ের কিন্তু আর একবার বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বাপের অমতে তিনি আর সে সাহস করতে পারেন নি। শেষে মা এবং বাবা উভয়ের মতভেদ মনোমালিন্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মা বোধ হয় আমার জন্য খুব বেশী চিন্তা করতেন। এইভাবে তিনি কঠিন রোগে পড়েন, আর তাতেই তিনি মারা যান।

মা মারা যাওয়ার পর বাড়ীর পরিবেশ কেমন যেন একটু ঢিলেঢালা হয়ে গেল। বাবা তো প্রায়ই বাড়ী থাকতেন না। দাদা তো বাউণ্ডুলে গোছের। লেখাপড়াও তেমন শেখেনি। দিনরাত কোথায় থাকত, তার কোন ঠিকানা থাকত না। বাবা থাকলেও বা একটু ভয়-ডর করত প্রথম দিকে। শেষের দিকে তাও না। আমাদের তখন দুরবস্থাও চলছিল দিনের পর দিন! অনশনও এক-আধবেলা চলছে মাঝে মাঝে। একদিন সে যে বাবাকে মুখের উপরই বলে দিল—খেতে দিতে পারবে না তো বাবা হয়েছিলে কেন?—শুনে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল লজ্জায়।

অতটা ঘরোয়া কথার মধ্যে ইন্‌স্পেকটরের কোন প্রয়োজন ছিল না। মোড় ফিরাবার উদ্দেশ্যে তাই তিনি বললেন, তোমার কথা বলো। বাবা কি দাদার কথা থাক।

এই দেখুন, মনেই ছিল না একেবারে—মিষ্টি হেসে বলল বন্দনা। কি কথায় কি কথা এসে গিয়েছিল। যাক, শুনুন—

অমূল্য ছিল আমাদেরই ওখানকার ছেলে। ওর বাবার ছিল একটা মুদির দোকান। বাপের বৃদ্ধ বয়সের দরুণ ছেলেই দোকানে বসত। খুব চালু দোকান ছিল। ওদের দোকান থেকে জিনিসপত্র আনতে আমি-ই প্রায় যেতাম। বলা বাহুল্য, প্রায়ই ধারে আসত জিনিসপত্র। বাবার হাতে কিছু এলে, অথবা ওরা ধারে জিনিস দিতে একেবারে বেঁকে বসলে, যা করে হোক কিছু দিতেই হত; মান-সম্মান রক্ষার জন্য নয়, পেটের দায়ে। ঘটি-বাটি বেচেও কখনও কখনও দিতে হয়েছে।

এই অমূল্যর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল। এর পর থেকে আমি ওদের দোকানে যাওয়া এক রকম বন্ধ করে দিয়েছিলাম। অমূল্যকে আমি দেখেছি। যা বুঝেছি, তাতে মনে হয়, তার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়। মায়ের যে ওকে কিজন্যে পছন্দ হয়েছিল, তা বুঝতে পারিনে। হয়ত সে অবস্থার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিল। যাই হোক, মা তো আমার বিয়ের সঙ্কল্প মনে নিয়েই চোখ বুজলেন। তখন বাবার মনের অবস্থা আরও দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠল। তিনি কোন কথাও বলেন না, সংসারের বিষয়ে ভাল-মন্দ কিছু ভাবেন বলেও মনে হয় না। তার কিছুদিন পরেই বাবা মারা যান। দাদা হয় সংসারের কর্ত্তা।

বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ একদিন কোথা থেকে দাদা শ'তিনেক টাকা এনে আমাকে রাখতে বললে। আমি শুধালে উত্তর দিল—আগাম নিয়ে এলাম টাকাটা তোর বিয়ের জন্য।

সে কি ?—আকাশ থেকে পড়লাম আমি। তবু সে-ভাব গোপন রেখে প্রশ্ন করলাম—কি বলছ বুঝতে পারছি না তো।

দাদা এবার সুর চড়ালো। বুঝতে পারছ না—ন্যাকা? অমূল্যর কাছ থেকে টাকা নিয়েছি। আগাম হিসাবে। তোমাকে ওর হাতে দেব বলে। বাবা আমাকে বলে গিয়েছেন।

বলে গিয়েছেন? বাবা? আমারও কেমন যেন রোখ চেপে গেল। বললাম—দাদা, এ টাকা তুমি ফিরিয়ে দাও। বিয়ে আমি করব না।

তীব্র রোষবহ্নি দুচোখে ছড়িয়ে দাদার কণ্ঠস্বর ভেসে এল—বিয়ে তোমাকে করতেই হবে এবং ঐ অমূল্যকেই।

না, না,—এ বিয়ে কখনই হতে পারে না হবে না। নিয়ে যাও তুমি টাকা। বলে টাকাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলাম দাদার গায়ের উপর। বিদ্রূপের হাসির টুকরোর মত দাদাকে বিঁধে নোটগুলো যেন মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল।

কেন নয়?—দাদার কণ্ঠস্বরে কম্পিত আক্রোশ।

সে-ও কি বলে দিতে হবে? জানো না কি?

আমার চোখে চোখ তুলে তাকাল দাদা। তারপরে, আশ্চর্য, কোন কিছু কথা না বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল—নোটগুলো কুড়িয়ে নেবার কথা মনে নেই বা ইচ্ছে করেই ফেলে গেল। আমিই সেগুলো একে একে কুড়িয়ে রাখলাম।

রাত্রিতে কোনরকমে দুটো রান্না করে নিয়ে দাদাকে দিয়ে, আমি না খেয়েই শুয়ে পড়েছিলাম।

গভীর রাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম—সম্পূর্ণ একা, অসহায়। তবে সঙ্গে নিয়েছি আগাম-নেওয়া টাকাটা সম্পূর্ণই। জানিনা সেদিন এত সাহস আমার কোথা থেকে এসে জুটেছিল! সেই প্রথম ও শেষবারের মত সব ধর্ম্ম, সকল লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে দাঁড়ালাম অমূল্যর দোকানঘরের সামনে। জানতাম, সে প্রতি রাত্রে দোকানঘরের মধ্যেই শুয়ে থাকে।

দরজায় টোকা দিতেই ভিতরে নাকডাকা বন্ধ হয়ে গেল। ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে প্রশ্ন হল—কে? আমারও তখন ভয় এসেছে—কি বলা উচিত হবে না হবে, ভাবছি। বোধ হয়, এক মুহূর্ত্ত ভেবেছিলাম। ইতিমধ্যে রূঢ়তর স্বরে প্রশ্ন এল দ্বিতীয়বার—কে, কথা কও না কেন?

আমি মৃদুস্বরে এবার বললাম—চেঁচিও না, দরজা খোল, ভয় নেই।

হারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে উঠল অমূল্য। উঠে দরজার খিল খুলতেই যেন ভূত দেখে চমকে উঠে বলল—তুমি!

আস্তে বললাম—হ্যাঁ আমি। তাতে হয়েছে কি ?

না, মানে—আমতা আমতা করে বলতে লাগল অমূল্য—তুমি এত রাত্রে ! এখানে !

শোন, সময় নেই আমার। দাদা টাকা চেয়েছিল তোমার কাছে ? কেন জানো ?

হ্যাঁ, খুসী হয়ে ঘাড় নাড়ল অমূল্য, এই—এই—আর কি,—তোমার তোমার—ঢোঁক গিলতে লাগল।

আর বলতে হবে না বুঝেছি। এই নাও টাকা। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম টাকার বাণ্ডিলটা তার গায়ে।

বন্ধ করো দরজা। টাকা দিয়ে কিনতে চাও মেয়েদের সতীত্ব ! লজ্জা করে না তোমার !—বলে বেরিয়ে এলাম দ্রুতপায়ে।

শেষ রাত্রির তারা ভরা আকাশের দিকে একবার তাকালাম। ঝির-ঝির করে বাতাস বইছে। পাণ্ডুর চাঁদ রয়েছে আকাশ-কোণে।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম—এবার পথের জীবনের সুরু কোন্ দিক থেকে হবে ? কখন যে অজ্ঞাতে চলতে আরম্ভ করেছি যেন নিজেই বুঝতে পারিনি। কতক্ষণ যে চলেছি জানি না ; হঠাৎ অদূরে আলোর চিহ্ন দেখে বুঝতে পারলাম, ষ্টেশনের কাছে এসে পড়েছি। ভয়-উৎকণ্ঠা-মিশ্রিত মন নিয়ে এসে উঠলাম ষ্টেশনে।

কিছুসংখ্যক কৌতূহলী চোখ যে আমার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল, তা বুঝতে পারলাম অনেক পরে। টিকিট কিনতে গিয়ে দেখলাম কয়েকজন লোক অকারণে একেবারে গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াল। আমি বিরক্তি প্রকাশ করতেই তারা দূরে সরে গেল বটে, তবে চলে গেল না কিছুতেই। টিকিটবাবু একবার শুধালেন—কি হল ? আমি কিছুতেই আসল কথাটা প্রকাশ করতে পারলাম না লজ্জায়। টিকিটবাবু তাঁর কর্ত্তব্য করে চললেন।

কোথাকার টিকিট ?

কলকাতা ছাড়া আর কোন ষ্টেশনের নাম বড় একটা জানতাম না তখন। বলে ফেললাম তাই—দিন, কলকাতার একখানা।

গোল বাধল টাকা দিতে গিয়ে। সঙ্গে নগদ পয়সা বেশি ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে পয়সা এগিয়ে দিয়ে বললাম—এতে যা হয় দিন।

টিকিটবাবু একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে কি যেন দেখলেন। তারপর টিকিট দিলেন।

গাড়ী ছাড়বার মিনিট দুই তিন আগে টিকিটবাবু বেরিয়ে এলেন টিকিট-ঘর ছেড়ে। ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁর উৎসুক চোখের দৃষ্টি। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন—একটু নেমে আসবেন দয়া করে ? কয়েকটি কথা আছে আপনার সঙ্গে। কোন ভয়ের কারণ নেই। গাড়ী আপনার ফেল করাব না।

তাঁর সেই কথাগুলোর মধ্যে কেমন যেন একটা মিনতি মাখানো সুর ছিল—কিছুতেই এড়ানো গেল না তাঁর অনুরোধ। নেমে এলাম। কিন্তু আমার ভয় হতে লাগল, আমাকে না আবার পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয় ভদ্রলোক।

প্রথমেই তিনি শুধালেন—এই ট্রেণে আপনার না গেলেই কি নয় ? একটু ইতস্ততঃ করতে দেখে তাঁর সন্দেহ আরও ঘোরতর হতে লাগল। আমার স্বর কাঁপতে লাগল, ঘাম দেখা দিল বিন্দু বিন্দু মুখে, কপালে ; আমি বেশ বুঝতে পারছি।

ট্রেণ হুইসিল দিল। বিরাট লৌহ-সরীসৃপ একটা ঝাঁকানি দিয়ে উঠল। আমি যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছি উঠবার জন্যে, অমনি তিনি কঠিনতর আদেশের সুরে যেন বলে উঠলেন—দাঁড়ান। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। এইবার বোধ হয় পুলিশ ডাকবে ভদ্রলোক।

ট্রেণ ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করেছে। আমি প্রায় পাগলের মত ছুটতে যাচ্ছিলাম, তিনি গতিরোধ করলেন—অমন কাণ্ড করবেন না। মারা পড়বেন। গাড়ী আরও পাবেন এর পরে।

শুনুন, আপনি মিথ্যা বলবেন না আমার কাছে—বলে তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। আমার আপাদ-মস্তক কি দেখতে লাগলেন। শেষে শুধালেন—সত্যি কি কলকাতা যেতে চান ? কে আছে সেখানে আপনার ?

উত্তর দিতে পারলাম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কি, উত্তর দিচ্ছেন না কেন ? জানি, ও প্রশ্নের উত্তর জানা নেই আপনার। দিন তো টিকিটখানা।

যন্ত্রচালিতের মত টিকিটখানা এগিয়ে দিলাম তাঁর দিকে। কোন কথা, কোন প্রশ্ন এল না মুখে। পায়ের নীচে মাটি দুলে উঠল। মাথাটা ঘুরে উঠল। তারপর আর আমার মনে নেই। জ্ঞান হলে দেখতে পেলাম—আমি শুয়ে আছি টিকিটবাবুর বাসায় রেল-কোয়ার্টারে। মাথার কাছে বসে আমার মাথায় বাতাস করছেন এক বিধবা মহিলা।

ক্ষীণস্বরে আমি শুধালাম—আমি এখানে কি করে এলাম ?

কথা বল না, মা। একটু সুস্থ হও, পরে সব জানতে পারে। বলে ভদ্রমহিলা জল-পটিটার উপর আরও কয়েক ফোঁটা জল দিয়ে সেটা বেশ করে ভিজিয়ে দিলেন আর আরও জোরে জোরে হাওয়া দিতে লাগলেন।

দু'তিন দিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। জানতে পারলাম—ঐ বিধবা মহিলাটি টিকিটবাবুর মা। সংসারে মাত্র ঐ দুটি প্রাণীই।

আমি যখন নিজের পথে যেতে চাইলাম, মা অমিতা দেবী বললেন, কোথায় যাবে মা ? সব কথা তোমার আমি শুনেছি বিশুর কাছে।

বিশু অর্থাৎ বিশ্বেশ্বর তাঁর ছেলের নাম।

চুপ করে আছি দেখে, তিনি এগিয়ে এসে আদর করে একেবারে বুকে চেপে বললেন—কেন যেতে চাও, মা ? এখানে কি তোমার কোন কষ্ট আছে ?

বুকের মধ্যে মুখ-গোঁজা অবস্থায় আমি প্রবল বেগে ঘাড় নাড়তে লাগলাম—না, মা।

তবে ?—জোর করে আমার মুখখানা তুলে ধরে তিনি প্রশ্ন করলেন।

আমি মুহূর্ত্তমাত্র না দাঁড়িয়ে সেই অবস্থায় ছুটে গিয়ে, ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে, বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে, খুব খানিকটা কাঁদলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, টের পাইনি।

কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলেই দেখি—বিশু বাবু। হেসে বললেন তিনি—এত ঘুম যে, বাড়ীতে ডাকাত পড়লেও তা ভাঙবে না ! তা, মা কোথায় ?

তা জানিনে তো। হয়ত পাশের বাড়ীতে কোথাও বা গিয়ে থাকবেন। দেখি—

থাক—বাধা দিলেন তিনি—দেখতে হবে না। তার চেয়ে তুমি বং এক কাপ চা তৈরি করো—শীগগির। আমার কিন্তু বেশি সময় নেই। এইট-সিক্স ডাউন আসবার সময় হল।

আমি যথাসম্ভব বেশ-বাস সংযত ক'রে বেরিয়ে এলাম। এ ক'দিনে সংসারের অনেক কিছু জেনেছিলাম, চিনেছিলাম।

চা তৈরি করছি। আর বিশুবাবুও বসে আছেন উনুনের ধারে। —এই যেমন আপনি বসে আছেন।

ইনস্পেকটর বাবু একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন; সেটা আমি ও বন্দনা বেশ বুঝতে পারলাম। কিন্তু তাঁকে পদোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করে চলতেই হবে এসব ক্ষেত্রে, তাই তিনি এক টিপ নস্যি নিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন—হুঁ, তারপর। সংক্ষেপ করো। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, এসেছি।

সংক্ষেপেই তো বলছি—বন্দনা বলল। তারপর চা তৈরি করে তার হাতে কাপটা যেই এগিয়ে দিয়েছি, অমনি মা এসে ঢুকলেন বাড়ীর ভিতর। পা দিয়েই তিনি বললেন—কিরে বিশু, অসময়ে যে! শরীর ভালো আছে তো? দেখি। কপালে হাত দিয়ে দেখে বললেন—ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করছে যেন গা-টা।

ও কিছু না, মা। এই একটু ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়।

তা বেশ কড়া করে এক কাপ চা খেয়ে নে। চা-টা কড়া করেছ তো মা!—আমাকে লক্ষ্য করেই প্রশ্নটা করলেন তিনি।

উত্তরে আমি শুধু ঘাড় নাড়লাম। মা হেসে বললেন—বেশ, এই না হলে মেয়ের মত। গুছানে লক্ষ্মী মেয়ে আমার বন্দনা।

তিনি কি বলতে চান আমি বুঝতে না পারলেও যেটুকু প্রকাশ করেছেন, তাতেই আমার মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল। আমি মুখ নীচু করে রইলাম।

বিশুবাবু কথাগুলো লক্ষ্য করেননি। তাই মাকে প্রশ্ন করলেন—কি হল? বন্দনা হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে গেল কেন, মা?

কি জানি।

বন্দনা—বিশুবাবু ডাকলেন।

মাষ্টারবাবু আপকো বোলাতা হ্যায়—মূর্ত্তিমান অরসিকের মত ষ্টেশনের একজন পোর্টার এসে জানাল।

যাও, আসছি।—বলে বিশুবাবু তাকে বিদায় করলেন। একটু পরেই চায়ের কাপটা সেখানেই নামিয়ে রেখে চলে গেলেন তিনি ষ্টেশনের দিকে।

আমি আরও দু'এক দিন আমাকে বিদায় দেওয়ার জন্য বলেছি। তাতে বিশুবাবু বলেছেন—কোথায় যাবে সঠিক না বললে ছাড়া হবে না, এমন কি, গেলে পুলিশে খবর দেবেন, তাও বলেছেন।

আর তাঁর মা কিছুতেই ছাড়বেন না আমাকে। এমনভাবে চোখে চোখে রাখতে লাগলেন, পালাবার পর্য্যন্ত পথ পেলাম না।

মাস দু'তিন কেটে গেল। আমি যেন ক্রমশঃই জড়িয়ে পড়ছি ওদের সংসারে। আর যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করছি—বিশুবাবু যেন টানছে অদৃশ্য টানে। প্রতিদিন তাঁর সব কাজ, কাপড়-জামা কাচা, চা তৈরি, রান্না করা থেকে আরম্ভ করে খেতে-দেওয়া পর্য্যন্ত আমার নিজ হাতে না করলে যেন তৃপ্তি হয় না।

বিশুবাবু একদিন শুধালেন—লেখাপড়া কতদূর জানো?

হেসে বললাম—কি দরকার?

আছে, বলই না।

বললাম—বেশিদূর এগোয় নি। তবে টীচারের মেয়ে হিসাবে একেবারে মূর্খ নই।

তিনি এরপর থেকে উঠে পড়ে লাগলেন, আমাকে আরও পড়াশুনা করতে হবে। রাশি রাশি বই আসতে লাগল। দুপুরে তাঁর ঘুম চলে গেল—আমার পিছনে তাঁর সমস্ত অবসরটুকু নিয়োজিত হল।

আমি একদিন বললাম—এতে যে আপনার শরীর খারাপ হবে।

তা হোক—তোমার হাতে পড়লেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

যান—আপনি ভারী ইয়ে—বলেই আমি উঠতে যাব, হঠাৎ তিনি আমার হাত ধরে বসালেন। আমি কি এক অপূর্ব্ব শিহরণ অনুভব করলাম সারা শরীরে। কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না—মুখ নীচু করে বসে রইলাম।

এবার বিশুবাবু আমার চিবুক ধরে সোজা করে তুলে বললেন—কি মিথ্যে কথা বলেছি? আর কোন কথা না বলে আমি ছুটে পালিয়ে গেলাম।

সামনে এক ফালি বারান্দা, তার উপরে টালির ছাদ। সেই বারান্দায় এসে বসলাম।

চোখের সামনে উত্তপ্ত আকাশ মুহুর্মুহুঃ কাঁপছে। মাটি থেকে উঠছে গরম হাওয়া। অনেক উঁচুতে দু'একটি চিল কচিৎ চোখে পড়ছে। ষ্টেশনের দিক থেকে গাড়ী শান্টিং করার শব্দ আসছে।

তারার দ্যুতিতে

সমরেন্দ্র ঘোষাল

তারপর মধ্যরাত্রির বিচ্ছুরিত তারার দ্যুতিতে
অতীতের নৈসর্গিক বেদনার অনুরণন তুলে
স্বার্থময় বিবাদ-মলিন সেই চিন্তার দ্যুতিতে
অপূর্ব্ব আলোচিত পুঞ্জীভূত সমস্যা না ভুলে—

সেই ক্ষণে অবলুপ্ত হব প্রভাতের সৌর স্বপ্নতলে
নিমেষে তোমার ঊর্ণনাভ মণিদীপ হয়ে—
আকাশকে রক্তাক্ত করে আহত চোখের রক্তজলে
বিদীর্ণ বিদগ্ধ প্রয়াসের সব জ্বালা সয়ে।

অবহেলিত আকাংখার সপ্তদীপ সেই বিলম্বিতে
তারার দ্যুতিতে মিশে মহাকাশে জর্জরিত প্রায়
তোমার উদাত্ত কণ্ঠে তখন উদভ্রান্ত ধমনীতে
নূতন প্রত্যাশা তবু জন্ম নেয় নূতন ধারায়।
আমি শুধু মনে মনে তখন তারার দ্যুতিতে
তোমারই স্বপ্নদীপ খেলে চলি তব উপস্থিতে!

গীতা কাপুরের আত্মহত্যা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

"আজকের মধ্যেই মিলিটারী গেজেট দেখে শুক্লা বলতে পারবে ভারতীয় সৈন্যদলে কাপুর বা কাউল বলে কোনো অফিসার আছে কি না। অফিসার ছাড়াও ঐ নাম দুটির কেউ যদি ইষ্টার্ণ কমাণ্ড অর্থাৎ বঙ্গ-বিহার-আসাম-উড়িষ্যায় কর্তব্যরত কোনো সেনাদলে থাকে, তাহলে কালকের মধ্যে সে-খবরও সে জানাতে পারবে। পাঁচ তারিখে তার ক্লাবের সেই পার্টিতে কে কে উপস্থিত ছিল, তাদের নামও কষ্ট ক'রে মনে ক'রে বলল শুক্লা এবং লাঞ্চের পর ফোন ক'রে আবার শর্মার খবর নেবে বলে কেল্লায় ফিরে যাবার জন্তে উঠে পড়ল শুক্লা। শর্মাকে বসিয়ে রেখে শুক্লার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শর্মার হোটেল-কেনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম আমি। শুক্লা দেখা গেল হোটেল কেনার খবর রাখে। কত টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে এবং কেনাটা হঠাৎ তিন তারিখে কেন জিগ্যেস করতে শুক্লা বলল টাকার অঙ্কটা সাত লক্ষ বিশ হাজার বলে সে শুনেছে এবং এ-ও শুনেছে যে কেনা-বেচার কথাবার্তা গত এক বছর ধরেই চলছিল কিন্তু সাত লাখ সত্তরের কমে কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না মালিক কিন্তু তারপর হঠাৎ টাকার দরকার পড়ায় শর্মার দামে অর্থাৎ ঐ সাত-বিশেই তিন তারিখে কেনাবেচা হয়ে যায়। এ সব খবর তিন তারিখ রাতে বিয়ের সাক্ষী হতে গিয়ে জানতে পেরেছে বা শুনতে পেরেছে শুক্লা।

"শুক্লাকে ছেড়ে দিয়েই আমি দাশকে পাঠিয়ে দিলাম শর্মার হোটেলে পাঁচ তারিখ রাতে শর্মার লাকসারি স্যুইটে যে বেয়ারার ডিউটি ছিল খোঁজ ক'রে তাকে দপ্তরে নিয়ে আসবার জন্তে।

"ন'টার সময় সরকারকে ফোন করতে বলে দিয়েছিলাম। ঠিক ন'টায় ফোন করল সরকার এবং বলল যে মোটর ভেহিকল্‌স্‌—এ তার কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে এবং সেই কাজ সেরে দপ্তরে আসবার আগে বাড়ি ফিরে সে একটু পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে কি না? তাকে সাড়ে দশটার মধ্যে দপ্তরে আসতে বলে, শর্মাকে কফি ও একটি ইংরেজি খবরের কাগজ দিয়ে সবে উঠতে যাচ্ছি মো'মনপুরে আসবার জন্তে এমন সময় উপর্যুপরি দু'টি ফোন। প্রথমটি নার্সিং সেণ্টার থেকে এবং দ্বিতীয়টি হাসপাতালের ডক্টর দস্তুরের কাছ থেকে। ফোনের বার্তা দু'টিরই এক—কাল গীতা কাপুরের সেবা করতে আসা দিনের নার্সটি জাল, সে নার্স প্যাট্রিসিয়া জর্জ নয়। আসল এবং অকৃত্রিম প্যাট্রিসিয়া জর্জ ডিউটি দিতে ঠিক সময়েই সকালে হাসপাতালে এসেছিল এবং লিফটে উঠবার মুখে স্যুটপরা এক ভারতীয় ভদ্রলোক তার কাছে জানতে চায় সে নার্সিং সেণ্টার থেকে আসছে কি না? সে 'হ্যাঁ' বলায় ভদ্রলোক তার কাগজ দেখতে চায় এবং নার্সিং-সেণ্টারের পরিচয় পড়ে তাকে তার পারিশ্রমিক ষোলোটা টাকা দিয়ে বলে যে রোগিণী এইমাত্র মারা গিয়েছে এবং তাকে আর প্রয়োজন নেই। বিনা খাটুনিতে টাকাটা পেয়ে গিয়ে এবং মড়ার ঝঞ্ঝাট করার থেকে ছুটি পেয়ে গিয়ে খুশি হয়ে যীশুকে ধন্যবাদ দিতে দিতে সে বাড়ি ফিরে যায়। এদিকে মেট্রনের ফোনে সেই কমপ্লেনের জন্তে নার্সিং-সেণ্টারের সেক্রেটারি কাল রাতেই একটি কড়া চিঠি তাকে পাঠায়। মেট্রনের অভিযোগ যে সর্বৈব মিথ্যা জানাতে সে আজ সকালে সশরীরে এসে সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করে। সব শুনে সেক্রেটারি ফোন করে হাসপাতালের মেট্রনকে

এবং মেট্রন সেক্রেটারিকে বলে আমাদের দপ্তরে ফোন করে জানাতে এবং নিজে ছুটে যায় ডক্টর দত্ত-কে খবর দিতে। ডক্টর দত্ত সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে আমায় কিন্তু দপ্তরের লাইন পেয়েও আমার লাইন পেতে দশ মিনিট অধৈর্য অপেক্ষা করতে হয় তাকে এবং আমার লাইন পাবার পর আমি ইতিমধ্যেই সব জেনে ফেলেছি শুনে রীতিমত দমে যেতে দেখা যায় তাকে!"

"এ-মামলা যে সহজ হবে না গোড়া থেকেই মনে হয়েছিল আমার! কিন্তু একটা কথা, শর্মা নার্সটির সম্বন্ধে যে সন্দেহ কাল প্রকাশ করেছিল সেটা তো শেষ পর্যন্ত সত্যি হ'ল!"

"তাই জাল-নার্স মেয়েটিকে কবে কোথায় এর আগে দেখেছে সেটা মনে করবার জন্যে দপ্তরের এক কোণে চেয়ার দিয়ে বসিয়ে রেখে এসেছি শর্মাকে!"

"এর মধ্যে শর্মার কোনো চালাকি নেই তো?"

"কী রকম?"

"হাসপাতালে নার্সটিকে প্রথম দেখে শর্মা কেমন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল মনে আছে আপনার? শর্মার সেই ভাবান্তর যে লক্ষ্য করেছি আমরা, এটা শর্মা বুঝেছে এবং শেষমেষ নার্সের ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাবে জেনেই হয়ত চেনা মুখ দেখেছে বলে সেই ভাবান্তরটা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছে! গীতা কাপুরকে বিষ দেবার জন্যে যে এই জাল-নার্স শর্মারই ফন্দি ক'রে পাঠানো নয়, সেটা আমরা জানছি কী ক'রে? আসল নার্সকে শর্মাই হয়তো বিদায় ক'রে দিয়েছিল!"

"আসল নার্সটিকে আসতে বলেছি দপ্তরে—শর্মাকে যদি সে সনাক্ত করতে পারে, তাহলে তাই প্রমাণ হবে—যদিও সনাক্ত করতে পারবে বলে আমার ধারণা নয়। শর্মার সঙ্গে জাল-নার্সটির যদি কোনো যোগসাজশ থাকত, তাহলে শর্মা তাকে হাসপাতালে পুরোপুরি না চেনবারই ভান করত!"

"হয়তো বিষ দিয়েই পালিয়ে যাবার কথা ছিল জাল-নার্সটির এবং এখনো পালাতে পারেনি দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল শর্মা? টাকা দেওয়া বা স্ত্রীর কুশল প্রশ্ন করবার ছলে হয়তো চেষ্টা করছিল জাল নার্সটির সঙ্গে কথা বলবার!"

আমার যুক্তি আর খণ্ডন করতে পারল না গুপ্তভায়া, আর তাই চুপ ক'রে রইল।

"মোমিনপুরে কী হলো?"

"কাল একটা ব্যাপারে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল—আজ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল যে, গীতা কাপুর বছর দুই থেকে তিনের মধ্যে কোনোএক সময়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল!"

"শর্মার সঙ্গে তো বিয়ে হয়েছে সেদিন—তার মানে গীতা কাপুরের আগে একটা বিয়ে তাহলে ছিল!"

"কুমারী অবস্থাতেও অন্তঃসত্ত্বা হ'য়ে থাকতে পারে!"

"কিন্তু শর্মার সঙ্গে আলাপের আগে!"

"হ্যাঁ—"

"বাচ্চাও তাহলে হয়েছিল—"

"না। বিশেষজ্ঞের মতে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল কিন্তু প্রসব করেনি—অর্থাৎ গর্ভপাত!"

"অর্থাৎ কুমারী থাকারই বেশি সম্ভাবনা!"

"বিশেষজ্ঞ আরো একটি কথা বলেছেন যে, গীতা কাপুরের পেটে এমন একটি অপারেশন হয়েছে, যাতে অন্তঃসত্ত্বা হবার আর আশঙ্কা ছিল না গীতা কাপুরের!"

"যত শুনছি তত গোলমেলে ঠেকছে গীতা কাপুরের ব্যাপার! গীতার পাকস্থলীতে বিষের ক্রিয়া সম্বন্ধে নতুন কিছু জানতে পারলেন?"

"পেটে ঘা বা ক্ষত না থাকলে সাধারণ সাপের বিষ পেটে গেলে ক্ষতি হয় না মানুষের, কিন্তু গীতার পাকস্থলীতে যে বিষ পাওয়া গিয়েছে, সে বিষটি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্লভ। পাকস্থলীতে ক্ষত সৃষ্টি ক'রে এই বিষটি রক্তে প্রবেশ করে এবং তারপর মৃত্যু ঘটায় মানুষের। পাকস্থলীর জারকরসে এ-বিষটির মারণ-গুণ অন্যান্য সাপের বিষের মত নষ্ট হয়ে যায় না'!"

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে গতি ক্রমশ মন্থর হয়ে এল আমাদের এবং পার্ক স্ট্রীট ডাকঘরের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে পড়ল জীপ এবং গুপ্তভায়া নামতে নামতে বলল, "চলো এখানকার কাজটা সেরে যাই—"।

"কী কাজ?"

"এলেই বুঝতে পারবে?"

অগত্যা, জীপ থেকে গুপ্তভায়ার সঙ্গে ঢুকলাম গিয়ে ডাকঘরে। কাউণ্টারে বাইরের ভিড় পেরিয়ে আমরা গিয়ে ঢুকলাম কাউণ্টারের ভিতরে এবং উপস্থিত হলাম পোষ্টমাষ্টারের কাছে।

"'—' নং কীড স্ট্রীটের গীতা দাশগুপ্তার 'মেল' কোথায় ডেলিভারি হয়?" পোষ্টমাষ্টারকে প্রশ্ন করল গুপ্তভায়া।

"নিশ্চয়ই তার ঠিকানায়!" উত্তর করল পোষ্টমাষ্টার।

"এটা আপনার অনুমান। আপনার দপ্তরে এবং ঐ বীটের পিওনের কাছে একবার সন্ধান ক'রে দেখুন—"

গুপ্তভায়ার বলার ভঙ্গীতে একটু যেন ঘাবড়ে গেল পোষ্টমাষ্টার, তলব করল একজন সহকারীকে এবং সহকারী এসে জানাল যে গীতা দাশগুপ্তা বা মিসেস গীতা কাপুর নামে একটি মহিলা তার হোটেলের ঠিকানায় ডেলিভারি দিলে চিঠিপত্র খোয়া যায় বলে নিজে পোষ্টাপিসে এসে সেগুলি নিয়ে যান।

"শেষ কবে এসেছিলেন?" গুপ্তভায়া প্রশ্ন করল।

সহকারীটি ঘরে এসে জানাল যে ঐ বীটের পিওনটি বেরিয়েছে, তাই সঠিক বলতে তার অসুবিধে হচ্ছে, তবে মনে হয় চার পাঁচ দিন আগে, কেন না মহিলাটির পাঠানো একটি রেজিস্ট্রী চিঠি ঘুরে এসে তাঁর জন্যে পড়ে রয়েছে।

"চিঠিটা একবার দেখতে পারি?"

সহকারীটি চিঠিটা নিয়ে এল। অফিস-খামের উপর ঠিকানাটা দেখে চমকে উঠলাম আমরা দু'জনে। গুপ্তভায়া খামটা নিয়ে ভালো ক'রে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। শর্মার নাম ও কানপুরের ঠিকানা লেখা রেজিস্ট্রী চিঠি, আট তারিখে ছাড়া হয়েছে এবং দশ থেকে উনিশ তারিখ পর্যন্ত কানপুরে শর্মার ঠিকানায় ঘুরেছে এবং তারপর কাল ফিরে এসেছে প্রেরিকার ঠিকানায়!

খামটা হাতে নিয়ে সযত্নে এবং এক রকম সস্নেহেই বুঝি কিছুক্ষণ দেখল গুপ্তভায়া, তারপর পোষ্টমাষ্টারের হাতে ফেরত দিয়ে বলল, "এই চিঠি যে পাঠিয়েছিল সে আর বেঁচে নেই। সন্দেহজনক অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে এবং সে জন্য তদন্ত চলছে। গোয়েন্দা দপ্তর থেকে অফিসিয়াল চিঠি নিয়ে এখনি এখানে লোক আসবে—তার কাছে

ছাড়া এই চিঠি আর কারুকে দেবেন না, গীতা দাশগুপ্তার চিঠি নিয়ে এলেও নয়!"

শুনে ঘাবড়ে গেল পোষ্টমাষ্টার, বলল, "সেটা বে-আইনি হ'বে না তো?"

"পুলিশ থেকে যখন চিঠি নিয়ে যাচ্ছে তখন দায়িত্ব পুলিশের।"

গম্ভীর ভাবে উত্তর করল গুপ্তভায়া, তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, "চলো—"

জীপে এসে বসতে বসতে বললাম, "ঐ চিঠিখানায় মনে হ'চ্ছে এ মামলার সব রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়ে যাবে!"

"সব না হ'লেও কিছু রহস্যের কিনারা হ'বে বলে আশা হয়!" বলে জীপের কোটরে রাখা একটা ঠোঙ্গা থেকে গুটি চারেক পান খেয়ে পুরল গুপ্তভায়া, তারপর ষ্টার্ট দিল গাড়িতে এবং ঘুরিয়ে নিলজীপ।

"আবার কোথায় চললেন?" দপ্তরে যাবার সোজা পথ থেকে ঘুরতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"জাল প্যাট্রিসিয়া জজে'র দেওয়া ঠিকানায়!"

"নাম ভাঁড়িয়ে এসে ঠিকানাটা ঠিক দিয়ে গিয়েছে বলে মনে করেন?"

"ঠিকানাটায় একটা ঢুঁ মেরে যেতে লোকসান নেই!"

ঠিকানায় গিয়ে, খোঁজ নিতে দেখা গেল, নার্স'টি জাল হ'লেও ঠিকানাটা আসল প্যাট্রিসিয়া জর্জে'রই। খবর ক'রে জানা গেল কাল সকালে 'ডিউটি'-তে গিয়েছিল প্যাট্রিসিয়া। রাতে নার্সিং সেণ্টার থেকে একটা চিঠি আসে তার নামে এবং প্যাট্রিসিয়া আজ সকালে গিয়েছে নার্সিং-সেণ্টারে এবং এখনো ফেরেনি।

"আর কোথাও যাবার আছে নাকি?" জীপে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলাম গুপ্তভায়াকে।

"না—এবার সোজা দপ্তরে!" বলে জীপ ছেড়ে দিল গুপ্তভায়া।

দপ্তরে পৌছে বারান্দা দিয়ে ঘরের দিকে এগোতেই গুপ্তভায়াকে দেখে ছুটে এল দাশ। গুপ্তভায়াও বোধহয় সর্বাগ্রে তাকেই খুঁজছিল মনে মনে, বলল "এই যে দাশ, বেয়ারাটি খুঁজে পেয়েছো?"

"হ্যাঁ, স্যর—কোশ্চেনিং-রুমে বসিয়েছি।"

"নার্সিং সেণ্টার থেকে কেউ এসেছে?"

"হ্যাঁ, স্যর। একটি মেয়ে ও একটি মহিলা। আপনার কাছে আসতে বলেছেন শুনে ওদের আপনার ঘরে নিয়ে বসাতে শর্মা চেষ্টা করছিল ওদের সঙ্গে কথা বলবার। আমি বারণ ক'রে দিয়েছি। কী ব্যাপার স্যর? কালকের নার্স'টি শুনছি জাল?"

"কার কাছে শুনলে?"

"শর্মার কথা শুনে মনে হ'ল!"

হ্যাঁ। আমি ডি-সি-কে বলে দিচ্ছি, তুমি ওঁর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে তাড়াতাড়ি পার্ক ষ্ট্রীট ডাক ঘরে যাবে এবং গীতা কাপুরের নামে একটা রেজিষ্ট্রী-চিঠি ওদের সামনে খুলে ওদের দিয়ে সার্টিফাই করিয়ে আনবে।"

"ইয়েস স্যর!"

"সরকার কোথায়?"

"আপনার ঘরে রয়েছে—শর্মাও সেই দুটি মেয়েদের ওপর নজর রাখছে!"

শুনে গুপ্তভায়া ফিরল আমার দিকে, "যাও, তুমি গিয়ে আমার ঘরে বোস, আমি ডি-সি-র ঘর হয়ে আসছি—"আর বলেই দাশকে নিয়ে ঘুরে হন্ হন্ ক'রে চলে গেল বারান্দার উল্টো দিকে। আমিও গুটি গুটি ঢুকলাম গিয়ে গুপ্তভায়ার ঘরে।

জানলার দিকে একটি চেয়ার নিয়ে—জানলার দিকে মুখ করে দেখলাম শর্মা বসে রয়েছে, আমি ঢুকতে পায়ের আওয়াজে মুখ ঘুরিয়ে একবার চেয়ে রইল কিছুক্ষণ—বোধহয় গুপ্তভায়ার দর্শনের জন্য—তারপর আবার জানলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

শর্মার মত গুপ্তভায়ার টেবিলের সামনে বসা—দাশের ভাষায়—একটি মেয়ে ও মহিলা আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল সশঙ্কিত ভাবে কিন্তু আমি গিয়ে তাদের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসতে আবার মুখ ঘুরিয়ে চুপচাপ বসে রইল—আশাহত না আশ্বস্ত হয়ে, ঠিক বোঝা গেল না।

চেয়ারে বসে সরকারের উপর চোখ পড়তেই দেখলাম সে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, আমি তাকাতেই খোশ-মেজাজে মৃদুমন্দ হাসল একটু।

তারপর চেয়ারে চুপচাপ বসে আছি ত' বসেই রয়েছি। স্কার্ট-পরা শ্যামাঙ্গী ইউরেশিয়ান মেয়েটি ও মহিলাটিকে অনেকবার লক্ষ্য ক'রেও যেন আর সময় কাটতে চায় না। মেয়েটির বয়স গোটা পঁচিশ ছাব্বিশ, মহিলাটির চল্লিশের উপরে এবং দু'জনের মধ্যে মেয়েটি নিশ্চয়ই প্যাট্রিসিয়া জর্জ ও অন্যটি নার্সিং সেণ্টারের সেক্রেটারি মিসেস গুরসেল—অনুমান ক'রে ফেলেছি, এমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল গুপ্তভায়ার টেবিলে। সরকার তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ধরল টেলিফোনটা এবং উৎকর্ণ হয়ে শর্মাকে এতক্ষণে দেখলাম আর একবার ঘাড় ফেরাতে।

'সরকারের' ইয়েস স্যর এবং কথাবার্তা শুনে মনে হল গুপ্তভায়াই কথা বলছে। টেলিফোনে কথা বলা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রেখে সরকার শর্মা থেকে শুরু ক'রে আমায় পর্যন্ত সকলকে একবার করে আশ্বস্ত করল গুপ্তভায়া আর দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে বলে আর তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে—বোধহয় গুপ্তভায়ার কাছেই। দশ-পনেরো নয় দশপনেরো মিলে ঠিক পঁচিশ মিনিটের মাথায় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকল গুপ্তভায়া, এসেই প্রথমে ক্ষমা চাইল শর্মার কাছে, তারপর মেয়ে ও মহিলাটিকে বসিয়ে রাখার জন্য দুঃখপ্রকাশ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কতক্ষণ?"

"তা আমার প্রায় চল্লিশ মিনিট হবে। এরা আরো আগে থেকে বসে আছেন!"

"তাহলে এদের কাজটাই আগে সারি"—বলে শর্মার দিকে ফিরল গুপ্তভায়া, শর্মার আপত্তি না থাকলে এই মহিলাদের সঙ্গে আগে কথা বলে নেই?"

"শুধু তার আগে একমিনিট সময় চাই আমি—"অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ বাধা দিয়ে উঠল শর্মা, "জাল-নার্স'টিকে বোধহয় আমি মনে করতে পেরেছি। '——' কোম্পানীতে বোধ হয় গত বছর আমি টাইপিষ্টের কাজ করতে দেখেছি—"

শুনে সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন তুলল গুপ্তভায়া। 'স্যর' 'স্যর' করে কথা বলল; মনে হল, উপরওয়ালা কারুর সঙ্গে এবং ঐ

মায়ের মমতা ও
অষ্টারমিল্কে
প্রতিপালিত
আপনার শিশু অষ্টারমিল্কে প্রতি-
পালিত বলেই এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, সদাই
হাসি খুশী। কারণ অষ্টারমিল্ক ঠিক
মায়ের দুধেরই মতন। অষ্টারমিল্ক খাঁটি দুধ
থেকে শিশুদের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে
তৈরী। সেজন্য সহজেই হজম হয়। শিশুদের
রক্তাল্পতা থেকে বাঁচাবার
জন্য অষ্টারমিল্কে লৌহ আছে। এতে
ভিটামিন 'ডি' ও যোগ করা
হয়েছে, ফলে আপনার শিশুর
দাঁত ও হাড় মজবুত হয়ে
গড়ে উঠবে।
OSTERMILK
...মায়ের দুধেরই মতন
বিনামূল্যে অষ্টারমিল্ক পুস্তিকা (ইংরেজীতে) আধুনিক শিশু
পরিচর্য্যার সবরকম তথ্য সম্বলিত। ডাক খরচের জন্য ৫০ নয়া পয়সার ডাক টিকিট
পাঠান—এই ঠিকানায় 'অষ্টারমিল্ক' পোঃ বক্স নং ২২৫৭ কোলকাতা—১৫
OS. 9-X51-C. BG

মামলার ব্যাপারে আর জন দু'তিন লোক চাইল তাকে সাহায্য করবার জন্য।

কোন সেরে মহিলাটির দিকে ফিরল গুপ্তভায়া "তুমি বোধ করি মিসেস গুরসেল?"

"হ্যা; আমার সঙ্গের ওই মেয়েটি প্যাট্রিসিয়া জর্জ"—মহিলাটি সঙ্গের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল।

"নার্সিং সেণ্টার-এর তুমি সেক্রেটারি?" গুপ্তভায়া মেয়েটির দিকে না তাকিয়ে মহিলাটিকেই প্রশ্ন করল আবার।

"হ্যা?"

"থাকো কোথায়?"

"—নং নিউপার্ক ষ্ট্রীটের ক্রিসেণ্ট কোর্টের তিনতলার ফ্ল্যাটে।"

"নার্সিং সেণ্টারের অপিসটা কোথায়?

"ঐ ঠিকানারই দো-তলা ফ্ল্যাটে।"

"নার্সিং সেণ্টার কি নার্সদের কোনো সমবায় প্রতিষ্ঠান?"

"অনেকটা।"

"সবটা নয় কেন?"

"সেইভাবে রেজিষ্ট্রেশন না হলেও কাজটা সেইভাবেই চলে।"

"তা হলে আইনত এখনো মালিকানা প্রতিষ্ঠান?"

"আইনত তাই বলতে পারো।"

"সেক্রেটারি হিসেবে তুমি কোনো মাইনে পাও?"

"না।"

"বেগার খাটো?"

"না। প্রতিষ্ঠানটি আমিই করেছি। লাভ লোকসান এখন পর্যন্ত আমারই।"

"প্রতিষ্ঠানের কাজ কী ভাবে চলে?"

"নার্সরা আমাদের প্রতিষ্ঠানে তাদের নাম ঠিকানা লিখিয়ে যায় এবং কাজের খবর এলেই আমরা তাদের খবর পাঠিয়ে দেই।"

"সে জন্য কোনো কমিশন নাও না?"

"নেই। নইলে প্রতিষ্ঠানের খরচা চলবে কী ক'রে?"

"কত ক'রে নাও?"

"শতকরা সাড়ে বারো টাকা।"

"মানে বোলো টাকায় দু'টাকা।"

"তার চেয়ে বেশি নাও না?"

"না।"

"যে সব নার্স তোমার প্রতিষ্ঠান পাঠায়, তাদের সম্বন্ধে দায়িত্বও নিশ্চয়ই তুমি নাও?"

"নিতেই হয়। এবং সেইজন্যে আমার প্রতিষ্ঠানে কেউ নাম লেখাতে এলে তার সম্বন্ধে আমি ভালো ক'রে অনুসন্ধান করে নিয়ে থাকি।"

"তারা পাশ-করা নার্স কিনা সেটাও নিশ্চয়ই দেখে নাও?"

"যত অভিজ্ঞতাই থাক, পাশ-করা নার্স ছাড়া আমি কারবার করি না। আর শুধু পাশ-করা হলেও, আমি খুশি নই, তাদের মেজাজ, ব্যবহার, চরিত্র ও সততার সম্বন্ধে ভালো ক'রে জেনে নেই এবং তাই যখন আপনারা ঐ জাল-নার্সটি সম্বন্ধে আমাকে কোনে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তার সম্বন্ধে আমি পুরো দায়িত্ব নিয়েছিলাম"—

"এবং তাই জাল-নার্সটি পালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছে।" বলে বিরক্তভাবে তার দিক থেকে মুখ ফেরাল গুপ্তভায়া, মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি প্যাট্রিসিয়া জর্জ?"

"হ্যা—"সন্ত্রস্ত হয়ে উত্তর করল মেয়েটি।

"কাল হাসপাতালে তুমি কখন গিয়েছিলে?"

"পৌনে আটটার মধ্যে।"

"তারপর কী ঘটে?"

"আমি লিফটের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একজন ভারতীয় ভদ্রলোক—"

"কী রকম চেহারা?"

"বেশ জোয়ান লম্বা, মুখে দাড়ি, চোখে গগ্‌ল্‌স্—"

"মাথায় পাগড়ি?"

"না, পাগড়ি ছিল না।"

"সে প্রথমে তোমার নাম জিগ্যেস করল?"

"হ্যা এবং জিগ্যেস করল আমি নার্সিং সেণ্টার থেকে আসছি কি না?"

"তোমার বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করে নি?"

"ঠিকানা? হ্যা—আমি চলে আসবার সময়। বলেছিল ভবিষ্যতে প্রয়োজন হ'লে আমায় খবর দেবে।

"কিসের প্রয়োজন?"

"তা কিছু বলেনি।"

"তোমার প্রাপ্য টাকা পেতে তুমি আর উপরে না উঠে বাড়ি চলে এলে?"

"হ্যা—"

"আচ্ছা, যাকে দেখেছিলে তার চেহারা দাড়ি গোঁফ চশমা বাদ দিলে এ-ঘরের কারুর সঙ্গে মেলে?"

শুনে মেয়েটি প্রথমে তাকালো আমার দিকে, বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল। তারপর তাকাল শর্মার দিকে, তাকেও কিছুক্ষণ লক্ষ্য করল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "না—"

"আমাকে দেখলে না?"

"তুমি তো পুলিশ অফিসার।"

"তবু—"

"না, তোমার মতও নয়।"

শুনে অত্যন্ত বিরস বদনে গুপ্তভায়া তাকাল মিসেস গুরসেলের দিকে, "আপাতত তোমাদের কাছ থেকে জানবার আর আমার কিছু নেই। পরে দরকার হ'লে—এবং হবেই—তোমাদের খবর দেবো।"

"তাহলে আমরা আসতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে—"

"ধন্যবাদ।" বলে মেয়েটিকে নিয়ে মহিলাটি দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল ঘর থেকে এবং তারা যাবার পরই সরকার এসে ঢুকল ঘরে। গুপ্তভায়া তাড়াতাড়ি একটি কাগজে খসখস ক'রে কী লিখে সরকার এসে দাঁড়ানো-মাত্র হাতে তুলে দিল তার, বলল, "মিষ্টার শর্মা বলছেন এই কোম্পানীতে গতবছর ঐ জাল-নার্স মেয়েটিকে উনি টাইপিষ্টের কাজ করতে দেখেছেন। তুমি যাও—সত্যাসত্য একবার খোঁজ ক'রে দেখে এসো—"

[ক্রমশঃ।

ছবির প্লট

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়।

ঘর আর বারান্দা করছে সলিল। কখনও বা চঞ্চলভাবে পায়চারি করছে; কখনও বা গুম হয়ে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়াচ্ছে। আবার কখনও বা টেবিলের কাছে এসে চেয়ারটায় বসছে। সামনে ড্রয়িং-এর কাগজ—

—নাঃ। কিছুতেই মাথায় আসছে না।

চুরুটটা ধরায়। আবার তা নিভে যায়। আবার কাঠি জ্বালে। তারপর চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দেশলাইয়ের কাঠি, পোড়া চুরুট, আর হিজিবিজি আঁকা কাগজে ঘরের মেঝেটা বিচিত্র রূপ ধরেছে।

—নতুন কিছুর নিকুচি করেছে! কি বোঝে ঐ সম্পাদক—নিকুঞ্জবাবু?

—হ্যাঁ, ছবিটা বেশ যত্ন করেই এঁকেছিল সলিল—দুর্গার ছবি। ছ্যা, নিকুঞ্জবাবুর সে কি দাঁতখিচুনি আর বকাবকি!—ও কি হয়েছে মশাই? এরকম ছবি তো আকছারই হচ্ছে। নতুন কিছু চাই,—নতুন কিছু।

—দুর্গার আবার নতুন কিছু কি করে হবে? সেই তো মামুলি ঢঙ! তবু বৈশিষ্ট্য থাকে সলিলের আঁকা ছবিতে।

নিকুঞ্জবাবুর ঘরে ঢুকলেই শুনতে হয়—ও কি করেছেন মশাই! চার ইঞ্চি ডবল কলমে এটা আসবে কি? চৌদ্দ পয়েন্টে বিশ্রী দেখাবে। হেড-পিস্‌টা ওকি করেছেন?

চুপ করে শুনতে হয়।

—ছ্যাঃ, ছ্যাঃ! এটা যে ডিটেকটিভ গল্প। এ কি করেছেন? প্রেম-পীরিতের ছবি নয়—গোয়েন্দার গল্প। দস্তুরমত গুম খুন! পড়েননি গল্পটি? একটি মাত্র গল্প পড়লেই সব হয়ে যাবে। এঁর একখানি বই পড়েই আমি সব আঁচ করে নিয়েছি। আর পড়তে হয় না। নাম করেছে কি সহজে? করালী ডিটেকটিভের কাহিনী। বুঝলেন না—মেয়েটা গোয়েন্দার প্রেমে পড়ে যাবে।

হো-হো হাসিতে ঘরটা গমগম করে ওঠে।

—বুঝলেন, ডিটেকটিভ করালীভায়া এতগুলো মেয়ে সামলাবে কি করে?—শেষ মুহূর্তে মেয়েটি আত্মহত্যা করবে। একশোখানা বইয়ের এটাই হচ্ছে মোদ্দা কথা।

নিকুঞ্জবাবু বকবক করে চলেন—মনে আছে তো কাল বিষ্যুৎবার—মেকআপের দিন। বিকালের মধ্যেই ব্লক করাতে হবে। নামটা—ওই লেখকের নামটা একটু বিচিত্র হরফে করবেন। নামটাই আসল মশাই। কমার্শিয়েল ভেলু আছে। নামের জোরেই কাটে। মলাট আর নাম,—না, না, মলাট নয় প্রচ্ছদপট। বুঝলেন—তারপর ভল্যুম অর্থাৎ বইয়ের আকার ও ওজন। সবার ওপরে বইয়ের দাম। পাঁচের নীচে হলেই খদ্দের নাক সিঁটকোবে। বুঝলেন—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

নিকুঞ্জবাবুর অপিসে গেলে এ রকম কত কথাই শুনতে হয়। কিন্তু এবার বিপদে ফেলেছেন নিকুঞ্জবাবু।

হ্যারিসন রোডের মেসে একটা ঘরে থাকে সলিল। প্রাণান্ত পরিশ্রম—ছবির পর ছবি আঁকতে হয়। একটা হেড-পিস তিন চার বার আঁকিয়ে নিয়ে হয়ত একটা সিলেক্ট করেন সাময়িকীর সম্পাদক নিকুঞ্জবাবু।

কতই বা পাওয়া যায়। মেসে বাকী পড়ে। তবু দেশের বাড়িতে মাকে টাকা পাঠাতে হয়। দুটি ভাই মায়ের কাছেই থাকে। তাদের পড়াশোনার খরচ যোগাতে হয়। বোনটিও বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। মায়ের কত আশা! গাঁয়ের ছেলেরা গর্ব করে—সলিলদা আর্টিষ্ট। কত কাগজে ওঁর আঁকা ছবি বেরোয়।

আর কাজল! সুরেন কাকার মেয়ে কাজলকে এই অঘ্রাণেই মা ঘরের বউ করে আনতে চান।—মনে মনে রঙিন ছবি আঁকে সলিল।

তাও নিমেষের জন্য। তার মাথাটা বনবন্‌ করে ঘুরছে। এখন কি আর রঙিন স্বপ্ন দেখলে চলে?

ছবি আঁকতে হবে। ছবি?—নিকুঞ্জবাবু বলেছেন,—নতুন কিছু আঁকতে হবে। মায়ের নতুন রূপ দিতে হবে। মামুলি ছবিতে হবে না। ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, সিংহী, অসুর আর দুর্গা—সেই আদম আর ইভের কাল থেকে চলছে। এ জিনিস চলবে না। কি আর্টিষ্ট হয়েছেন মশাই! নতুন কোন আইডিয়া মাথায় আসে না? নতুন কিছু করুন—এ গ্র্যাণ্ড আইডিয়া—মা কি ছিলেন, আর কি হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আইডিয়াটায় হিট করে গেছেন, কিন্তু আজো কেউ তা বাস্তবে ফুটোতে পারলে না—হাঃ হাঃ হাঃ।

চুপ করে নিকুঞ্জবাবুর কথা শুনতে হয়। প্রতিবাদ করলেই মুস্কিল। তবু সলিল বলে,—আপনিই বলুন।

—আমি বলব? আমি? আমার মাথায় আইডিয়াটা খুব পাক খাচ্ছে; কিন্তু তা যদি আপনাকে বলতে পারব, তাহলে আমিই ছবিটা আঁকতে পারতাম—গ্র্যাণ্ড আইডিয়া!—মা কি ছিলেন, আর কি হয়েছেন। ভবিষ্যৎটা থাক মশাই। বর্তমানটাই আঁকুন।

নিকুঞ্জবাবুর কথাগুলো এখনো সলিলের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। কি আঁকবে সে? পাহাড় থেকে দেবী নামছেন? না, না,—ওগুলো

তো বারবার পড়েছে ! দেবতাদের তেজঃপুঞ্জ থেকে দেবীর সৃষ্টি হচ্ছে ! —না, না—আঁকতে হবে—মা কি ছিলেন, আর কি হয়েছেন !—কি আঁকা যায় ! একদিন তো মাত্র সময়।

আবার একটা চুরুট নিয়ে ধরায় সলিল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘরে ঘুরপাক খায়।—নাঃ কিছুতেই মাথায় আসছে না। রাস্তায় হৈ-চৈ শোনা যায়।

জ্বালালে আর কি ? চুপ করে চিন্তা করবারও উপায় নেই। বাইরে হল্লা শোনা যায়। ভোঁস-ভাস মোটরের আওয়াজ। ট্রাম গাড়িগুলো অনবরত ঘণ্টি বাজাচ্ছে।

—কি হল ? অ্যাক্‌সিডেণ্ট ?

বাইরে বেরিয়ে এল সলিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে লোকে লোকারণ্য। ওপাশের লাল বাড়িটার সামনে দারুণ ভিড়—ওস্তাদ খাঁ-সাহেব শুনেছিল অসুস্থ। তাঁর আবার কোন কিছু হল নাকি ?

ওই যে ক্যাডিল্যাক মোটর একখানা এগিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে পথ করে দিচ্ছে। গাড়িতে একজন পুরুষ আর একজন নারী।

বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—ঐ যে খাঁ-সাহেবের বাড়ির দরজায় গাড়িটা থামল। তাঁরা নামছেন,—কি ঠেলাঠেলি। থামাতে পারছে না পুলিশ।

হাসিমুখে নামলেন মহিলা। কি অপূর্ব শ্রী !—কে ইনি ?

—চিনতে পারছেন না মশাই ! চিত্রতারকা বিন্ধ্যবাসিনী দেবী।

—পেছনে কখন যে এসে দাঁড়িয়েছেন বসন্তবাবু, সলিল তা বুঝতেই পারেনি।

ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে ব্যঙ্গ হাসি ফুটিয়ে বসন্তবাবু বললেন—এঁদেরই যুগ মশাই ! এখন এঁদেরই যুগ ! বিন্দি হয়েছেন বিন্ধ্যবাসিনী ! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বসন্তবাবু টিপ্পনি কাটেন,—বুঝলে ভায়া ! ছবি আঁকা ছেড়ে দাও, সিনেমায় নেমে পড়। তারকা হতে পারলে কোন চিন্তা নেই। তোমার যা সুঠাম গড়ন।

সলিল চুপ করে থাকে।

—আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ, জানো না ভায়া ও হচ্ছে বিন্দি। ওই পুব পাড়ায় ঘুঁটের ঝাঁকা মাথায় করে ঘুরে বেড়াত ওর মা। কে না জানে ? রোগা, শুঁটকী মেয়েটা মায়ের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াত। তারপরে এল জোয়ার,—চোখে পড়ল কোন এক ডিরেক্‌টারের। কয়েক বছর পরেই দেখি বিন্দি বিন্ধ্যবাসিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—তোমরা তো সেদিনের ছেলে। কমসে কম ছেচল্লিশ বছর এই মেসে আছি। সবই চিনি ভায়া, কলকাতার নাড়ীনক্ষত্র সবই জানি। কঙ্কা, প্রভা—এরা তো সেদিনের মেয়ে। বড় সুশীলা, ছোট সুশীলা—নীহারবালা—কত নাম, কত জনাকেই দেখেছি। এমন কি তারাসুন্দরীকে দেখবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল।

এবার হেঁ-হেঁ করে হেসে ওঠেন বসন্তবাবু।

—এদেরই যুগ ভায়া ! এদেরই যুগ। এখন ঘরের বউ-ঝি না খেতে পেয়ে দিন দিন শুঁটকী হচ্ছেন,—এগারো হাত শাড়ি আর ব্লাউজ সায়া জামাতে হাড্ডি ঢেকে রাখতে পারছে না। আর বিন্দিরাই আজ মা বিন্ধ্যবাসিনী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

সলিলের কানে বসন্তবাবুর মন্তব্য বিশ্রী ঠেকে। সে প্রতিবাদ করে—না, না, ও কি বলছেন ? ইনি শিক্ষিতা।

—ঠিকই বলছি, হয়ত দু'একজন লেখাপড়া জানা ওদের মধ্যেও আছেন। কিন্তু ভায়া আর সব ফুঁকর্কাক। তালিমে কি না হয়,—সবই অভিনয় ভায়া সবই অভিনয়। আমাদের দেবদেউল হয়েছে এখন রঙ্গমঞ্চ।

—রঙ্গমঞ্চ ?

—হ্যাঁ, দেশটা কি ছিল, আর কি হয়েছে দেখতে পাচ্ছ না ? তুমি তো আর্টিষ্ট। কি ছবি আঁকো ? এ ছবি আঁকতে পারবে ? —যাই আমার আবার আপিসের সময় হয়ে এল কি না।

চলে গেলেন বসন্তবাবু।

সলিলের মাথায় তখন বসন্তবাবুর কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে—দেশটা কি ছিল, আর কি হয়েছে। বসন্তবাবু বলেছেন—ঘর ছেড়ে, ঘোমটা ছেড়ে মায়েরা বেরিয়েছেন দশভুজা হয়ে দশদিকে—স্কুলে, কলেজে, নাচে, গানে, রঙ্গমঞ্চে, হোটেলে, অপিসে, আদালতে, ফেরিওয়ালী সেজে, এজেণ্ট সেজে—কত রূপে। বিন্দি হয়েছেন বিন্ধ্যবাসিনী।

হ্যাঁ—এবার আঁকতে পারবে। আইডিয়া মাথায় এসে গেছে।

তুলি নিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল সলিল—দশভুজা—দুর্গা !—নাচে, গানে, রঙ্গমঞ্চে, সিনেমার পর্দায়—।

—মা কি ছিলেন আর কি হয়েছেন।—এ গ্র্যাণ্ড আইডিয়া।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বিনতা রায়

Sc 40.

নীচের বারান্দা। অনুসূয়া এগিয়ে যাচ্ছে। পুরোনো আমলের বাড়ীটার ধনাঢ্যিক্যের পরিচয় থাকলেও বিভিন্ন ধরণের মানুষের ভীড় যথেষ্ট অপরিচ্ছন্ন। ঘনশ্যাম পেছনে আসতে আসতে একটু কাশে। অনুসূয়া ফিরে তাকায়। ঘনশ্যাম একমুখ হেসে দু'হাত কচলে সবিনয়ে প্রশ্ন করে—

ঘন। কাকে চান?

অনু। রণদীপবাবু কোন্ দিকে থাকেন?

ঘন। (গদগদ কণ্ঠে) কে, রণদীপ! রণদীপ বাবুকে চান?— চলুন, আমি আপনাকে পৌছে দিচ্ছি। ঠিক এমনি সময় ছুটে এগিয়ে আসে বৃন্দ।

বৃন্দ। (বিনয়বিগলিত কণ্ঠে) আসুন, আসুন—

অনুসূয়া একবার বৃন্দ, একবার ঘনশ্যামের দিকে তাকায়।

ঘন। (সাদরে) চলুন, চলুন—

বৃন্দ। ও কে, ও কেউ না—আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

পা বাড়াবার আগে মুখের হাসি মুছে ফেলে একবার তাকায় ঘনশ্যামের দিকে। ঘনশ্যাম কট্‌মট্ ক'রে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিস। অনুসূয়া এগোতেই সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকে।

ইতিমধ্যে আরও দু'চারটে ঘর থেকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে ভাড়াটেরা বেরিয়ে আসতে থাকে। এক একজন বেরিয়ে আসে, ঘনশ্যামের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায় আর ঘনশ্যাম ঝুলিয়ে রাখা হাতের ইসারায় সবাইকে সঙ্গে আসতে বলে। Mix

Sc 41.

অনুসূয়া সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। পেছনে প্রায় পুরো একটা রেজিমেণ্ট। Mix

Sc 42.

দোতলার বারান্দা। প্রথম ঘরটা পার হয় অনুসূয়া। পেছনে ভাড়াটের দল। প্রথম ঘরের ভেতর থেকে এক নম্বর ভাড়াটেটি বড় বড় চোখ করে বেরিয়ে আসতেই ঘরের ভেতর থেকে তার স্ত্রীও বেরিয়ে এসে অনুসূয়াকে দেখে নাক কোঁচকায়, তারপর হ্যাঁচকা টানে হাত ধরে স্বামীকে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে যায়।

বারান্দার প্রান্তে রণদীপের ঘরের দরজার বাইরে রণদীপ এসে দাঁড়ায় অনুসূয়াকে অভ্যর্থনা করার জন্যে। রণদীপ দেখে সামনে বীরদর্পে হেঁটে আসছে বৃন্দ, পেছনে অনুসূয়া, মুখে-চোখে বেশ একটা অস্বস্তির ভাব। রণদীপকে দেখে তার মুখে হাসি ফোটে

রণ। (এগিয়ে আসতে আসতে) বাব্বাঃ, একেবারে ফুল রেজিমেণ্ট নিয়ে! লড়াই করতে আসছেন নাকি?

অনু। (অসহায়ভাবে) আমি কি করবো?

ঘন। (সবাইকে ঠেলেঠুলে এগিয়ে এসে) দাদা, মানে—উনি আপনার ঘর কোন্‌টা জিজ্ঞেস করলেন আমাকে, তাই সঙ্গে ক'রে পৌছে দিলাম (গদগদভাবে তাকায় অনুসূয়ার দিকে সমর্থন প্রত্যাশা ক'রে)।

অনুসূয়া ঘনশ্যামের দিকে চেয়ে সমর্থনসূচকভাবে ঘাড় নেড়ে জানায়, সে ঠিকই বলেছে। তেড়ে আসে বৃন্দ।

বৃন্দ। হুঁ, উনি নিয়ে এলেন, আমি ছিলাম কি করতে? রণদীপ অনুসূয়াকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। Cut

Sc 43.

রণদীপের ঘর। রণদীপ আর অনুসূয়া ঘরে ঢোকে।

রণ। বসুন।

অনুসূয়া একটা দম ফেলে পাখার দিকে তাকায়। রণদীপ তাড়াতাড়ি ফ্যানটা চালিয়ে দেয়। দু'জনে বসে মুখোমুখি।

অনু। এটা আপনার বাড়ী না?

রণ। হ্যাঁ।

অনু। এরা কারা? আমি তো রীতিমতো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম।

রণ। (হেসে) ব্যাপারটা কি জানেন? বাবা এই বাড়ীটা ছাড়া আর কিছুই আমার জন্যে রাখা দরকার মনে করলেন না, হয়তো ভেবেছিলেন ছেলে তাঁর মহা কৃতী হ'য়ে নিজেই প্রচুর উপায় করবে সুতরাং, সম্পত্তি যা ছিল, সব চালালেন ঘোড়ার পেছনে। এবং তাতেই গেলেন ফতুর হ'য়ে।

অনু। ঘোড়া, মানে রেস!

রণ। হ্যাঁ। আর দেখতেই তো পাচ্ছেন, ছেলে তাঁর মোটেই কোনো কাজের হ'ল না। এম-এ'টা কোনো রকমে পাশ ক'রে চাকরি দু-চারটে চেষ্টা করলাম। সত্যি বলতে কি ধাতে সইলো না। আর একা মানুষ এত বড় বাড়ীটা নিয়ে করবোই বা কি? তাই ভাড়া দিয়ে দিলা'ম।

অনু। বাঃ, সত্যিই কাজের লোকই বটে! Cut

Sc 43.

বাইরের বারান্দা। কৌতূহলী ভীড়টা তখনও গুঞ্জন করছে।

বন। (বুদ্ধকে) আচ্ছা, তুমি অমন চট্ ক'রে রেগে যাও কেন বলতো?

বুদ্ধ। (খোস মেজাজে) না না—চটবো কেন? কি বলছিলে বল না—

বন। বলছিলাম কি—যে, যে যা করবে নাকি?

বুদ্ধ। (উদাসভাবে) তা করলেও করতে পারে, বাবা, কত মস্ত বিরাট লোকের মেয়ে!

দু'তিন জন। কার মেয়ে, কার মেয়ে?

বুদ্ধ। (জবাবটা এড়াতে) উরি : বাস্‌রে! যুক্ত কর কপালে ঠেকায়।

২য় ভাড়াটে। তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাই কইবে, না একটু চা-মিষ্টি খাওয়াবে?

বুদ্ধ। (ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে) ঠিক বলেছেন দাদা! আমি যাই ব্যবস্থা দেখিগে।

বুদ্ধ দ্রুত রওনা হয়, পেছন থেকে বনমালী চেঁচিয়ে বলে—

বন। মোড়ের দোকানটায় চলে যেও, ভাল মিষ্টি পাবে। Cut

Sc 44.

রণবীরের ঘর। রণবীর আর অনুসূয়া বসে আছে।

রণ। বাড়ীতে এভাবে বন্দী থাকেন, চলুন একটা লং ড্রাইভ দিয়ে আসি, ভাল লাগবে।

অনু। উঃ, খুব ভাল লাগবে, চলুন।

দু'জনে উঠে পড়ে। রণবীর একটুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে কি ভেবে নিয়ে বলে—

রণ। দেখুন, ওই সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে না, আবার পড়তে হবে ওদের পাল্লায়. তার চেয়ে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাই।

অনু। (হেসে) সেই ভাল, চলুন—

দু'জনে ঘরের ভেতরের দিকে যায়। Cut

Sc 45.

রান্নাঘর। বুদ্ধ খাবারের ঠোঙা নিয়ে ঘরে ঢুকে আলমারীর মাথার ওপর সেটা রেখে, স্টোভে জল বসিয়ে দেয়। গুন্ গুন্ ক'রে গান গাইতে থাকে। Cut

Sc 46.

দোতলার বাড়ীর পেছন দিকের ফালি বারান্দা। ঘোরানো সিঁড়ি নেমে গেছে। রণবীর আর অনুসূয়া একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে সেখানে।

রণ। (দু'ধাপ নেমে) আসুন।

অনু। (সিঁড়ির রেলিংটা চেপে ধরে) উঃ, নীচের দিকে চাইলে মাথা ঘোরে।

রণ। (একধাপ উঠে হাত বাড়িয়ে অনুসূয়ার একটা হাত ধরে) আসুন, আস্তে আস্তে।

এইভাবে দু'জন নাবতে থাকে। Cut.

Sc 47.

রান্নাঘরের পেছনের দিকের জানালা। বুদ্ধ একটা বিড়ি ধরাতে জানালার কাছে যায়, গুন্-গুন্ করে গান গাইছে সঙ্গে। বাইরের দিকে চাইতেই গান তার থেমে যায়, দেশলাই-এর কাঠি হাত থেকে পড়ে যায়, না জ্বালা বিড়িটাই মুঠো করে ধ'রে সমানে টানতে থাকে। Cut.

Sc 48.

স্পাইরাল সিঁড়ি দিয়ে রণবীর হাত ধরে নাবাচ্ছে অনুসূয়াকে। Cut.

Sc 49,

রান্নাঘর। বুদ্ধ হঠাৎ খুসীতে এক পাক ঘুরে নেয়। দুটো প্লেট নাবায়, ট্রে নাবায়, দুই প্লেটে খাবার সাজায়, তারপর সেগুলো ট্রের ওপর রেখে ট্রেটা বসায় একটা জলচৌকির ওপর। আর একটা জলচৌকি টেনে নেয় তার সামনে, তারপর একবার এ প্লেট, একবার ও প্লেট থেকে খাবার তুলে নিয়ে খেতে থাকে। Desolves.

Sc 50.

এসপ্লানেডের রাস্তা দিয়ে রণবীরের গাড়ী চলেছে। রণবীর চালাচ্ছে গাড়ী, পাশে বসে আছে অনুসূয়া। গাড়ী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের রাস্তায় পড়তেই ট্রানজিস্টার-এর নবটা ঘুরিয়ে অন করে দেয়। পুরুষকণ্ঠে একটি খুবই মধুর প্রেম সঙ্গীত চলতে থাকে। গানের কথায় যেখানে নিবিড়তার আভাস থাকে অনুসূয়া আর রণবীর স্মিত দৃষ্টি বিনিময় করে। Mix.

Sc 51.

গঙ্গার ধার দিয়ে ধীরগতিতে গাড়ী চলছে। ভেতরে পূর্বোক্ত সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে। Desolves.

Sc 52.

অনুসূয়ার বাড়ীর গেটের সামনে এসে থামে রণবীরের গাড়ী। অনুসূয়া নেমে ঘুরে এসে দাঁড়ায় রণবীরের দরজার পাশে। রণবীর হাতটা বাড়িয়ে দেয়। অনুসূয়া ধরে সে হাতটা।

রণ। তা হলে দেখা হচ্ছে এক মাস পরে?

অনু। তাই তো দেখছি। পরশু আমরা রওনা হচ্ছি।

রণ। ভুলে যাবেন তো?

অনু। আমরা এত সহজে ভুলি না, ওটা আপনাদেরই একচেটে।

রণ। দেখা যাক্।

ঠিক এমনি সময় জিমি ঘেউ ঘেউ করতে করতে গেটের কাছে ছুটে আসে।

রণ। বাপস্—পালাবার নোটিস। চলি—

হেসে অনুসূয়ার হাতে একটা ছোট ঝাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যায় গাড়ী নিয়ে। অনুসূয়া চেয়ে থাকে তার গমনপথের দিকে। Mix

Sc 53.

রণবীরের ঘর। খুসী-পায়ে ঘরে ঢুকে রণবীর হাঁক দেয়।

রণ। বুদ্ধ, বুদ্ধ-উ—

ছুটে আসে বুদ্ধ।

বুদ্ধ। কি, কি হ'ল কি, অমন ক'রে চেঁচাও কেন, জানো না আমার হার্টটা দুর্বল? (বুকে হাত দেয়)

রণ। হ্যাঁ, সেইজন্যেই যাবো, তৈরী হও এক্ষুণি।

বুদ্ধ। ও কি, এক্ষুণি বললেই এক্ষুণি যাওয়া যায় নাকি! গোছগাছ নেই?

GOVERNMENT LIBRARY

রণ। সেই গোড়াগোড়িই শুরু করতে বলছি।

বৃন্দ। অত হুড়োহুড়ি করো না বাবু, আমার মাথাটা এবার যাবে।

রণ। (চোখ কপালে তুলে) ব্যাপার কি? তোর বাড়ি, নার্ভ সব এমন গণ্ডগোল করতে শুরু করলো কবে থেকে?

বৃন্দ। যবে থেকে তুমি এই বাড়ী তাড়া দিতে শুরু করেছো।

রণ। কেন, সকালে তো বেশ সব গুছিয়ে ফেলেছিলি।

বৃন্দ। আরে দূর, আর বোলো না, গণ্ডগোল লাগে ওই বাড়ী-ভাড়াটি চাইতে যাবার বেলায়। মেরে-কেটে সাড়ে সাতশ' আদায় করেছি। আরও চারশ' তিন বাকী রইল। তা যাবে তো, যদি মেসো-খুড়ো কেউ আছে সেখানে? কোথায় গিয়ে উঠবে?

রণ। মেসো-খুড়ো থাকলেই ওঠা মুস্কিল হতো। উঠবো ডাক বাংলোয়। Desolves

Sc 54.

হাজারিবাগ। সকাল। ডাক বাংলোর বারান্দায় বেতের চারটি চেয়ার ফেলা, মাঝখানে বেতের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। রণধীপ চা খাচ্ছে, বৃন্দ দাঁড়িয়ে বাইরের শোভা দেখছে। এমন সময় বিচ্ছু—জীমূতের ছোট ভাই জীমূতের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে দাঁড়ায় সিঁড়ির সামনে, বিচ্ছুর হাতে তীর-ধনুক। রণধীপ তাড়াতাড়ি উঠে যায়।

জীমূত। দেখুন, এই কাছেই আমার বাড়ী। আমার এই ভাইটি গিয়ে সংবাদ দিল, ডাক বাংলোয় নতুন লোক এসেছেন, তাই আলাপ করতে এলাম।

রণ। আরে আসুন, আসুন—

জীমূত আর বিচ্ছু উঠে গিয়ে দুটো চেয়ারে বসে।

Cont. খুব আনন্দের কথা—আপনার নামটা—

জীমূত। জীমূতবাহন মিত্র। আর এঁর ডাক নামটাই বলি (ভাইকে দেখায়) বিচ্ছু—নামে, কাজে গরমিল নেই। আপনি—

রণ। (জীমূতের কথায় হাসে) আমি রণধীপ সেন। বৃন্দ, চা নিয়ে আয়।

বিচ্ছু। আমার জন্যে হরলিক্স্‌, আমি চা খাই না।

বৃন্দ, একবার আড়চোখে তাকিয়ে নেয় বিচ্ছুর দিকে।

জীমূত। (একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে) ছেলেমানুষ তো?

রণ। আরে রেখে দিন মশাই, ওর সঙ্গে আমার জমবে ভাল।

Sc 55.

বিচ্ছু। আচ্ছা রণুদা, সামনে ওই গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে, ওটা কি তোমার?

রণ। হ্যাঁ ভাই, মোটরেই এলাম কলকাতা থেকে।

বিচ্ছু। আমাকে গাড়ী চালানো শেখাবে?

রণ। বেশ তো, সময় পেলেই শেখাবো।

বিচ্ছু। বেড়াতে তো এসেছো, সময়ের আবার অভাব কি?

রণ। না—মানে—কেউ—ধরো, চেনাশোনা লোকজন কলকাতা থেকে এসে পড়লে—

বিচ্ছু উঠে গিয়ে গাড়ীর কাচ তাক করে তার নিশানা করে। রণধীপ কাঠ হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

জীমূত। কলকাতা থেকে কেউ আসছে নাকি?

রণ। না, হ্যাঁ—মানে—ঠিক সেই কিছু।

জীমূত। আমার বাড়ীতে আসছেন কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী আর তাঁর মেয়ে অনুস্বরা।

রণ। (একটু অবাক হয়) আপনার বাড়ীতে উঠছেন?

বৃন্দ চা-বিস্কুট-হরলিক্স নিয়ে আসে।

বিচ্ছু। (দু' বার ফুঁ দিয়ে এক টানে খেয়ে নিয়ে) বাঃ, বেশ বেঁধেছো হরলিক্স্‌টা।

চা-বিস্কুট খেয়ে উঠে দাঁড়ায় জীমূত

রণ। চললেন?

জীমূত। দেখুন, আপনারা তো দুটি মানুষ—চলুন না আজ দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাবেন। আমার বোন আছে, লোকজনও রয়েছে, কোনো অসুবিধা হবে না।

রণধীপ বৃন্দর দিকে তাকায়।

বৃন্দ। তা সেটা খুব খারাপ হয় না—প্রথম দিনটা বাজার-টাজার ক'রে রাঁধতে আজ অনেক দেরী হ'য়ে যেতো।

জীমূত। আপনারা স্নান-টান সেরে নিন, বিচ্ছু একটু পরে এসে নিয়ে যাবে। Mix

Sc 56.

জীমূতের বাড়ীর ড্রইংরুম। বিচ্ছু রণধীপের হাত ধরে টেনে এনে একটা কৌচে বসিয়ে দেয়। জীমূত ঘরে ঢুকেই ডাকে—

জীমূত। কুশলা, কুশী!

একটি ছিপছিপে সুন্দর মেয়ে ঘরে এসে ঢোকে।

cont. এই আমার বোন—কুশলা—আর ইনি হ'লেন বিচ্ছুর রণুদা—

রণধীপ ও কুশলা নমস্কার বিনিময় করে।

কুশলা। আচ্ছা, আপনারা বসুন, আমি একটু রান্নার দিকটা দেখি কতদূর হল।

চলে যায় কুশলা। বিচ্ছু ইতিমধ্যে বাইরে চলে গিয়েছিল, একটা টেলিগ্রাম হাতে নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকে জীমূতের হাতে দেয়।

জীমূত। (সেটা পড়ে নিয়ে) কাল সকালে ওরা পৌঁছবেন। ওরাও কারেই আসছেন। বাড়ী পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা দশটা হবে। Mix.

Sc 57.

সন্ধ্যা। পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে জীমূত, রণধীপ, কুশলা আর বিচ্ছু।

বিচ্ছু কুশলার হাত ধরে আগে আগে চলেছে সমানে বকতে বকতে। পেছনে রণধীপ আর জীমূত।

রণ। (একটু চিন্তিতভাবে) যাঁরা আসছেন, তাঁরা কি আপনার কোনো আত্মীয় হন?

জীমূত। (একটু হাসে) এখনও হন না, ভবিষ্যতে হবেন। মিঃ চৌধুরীকে আমরা কাকাবাবু বলি। শেয়ার মার্কেটে ভয়ানক মার খেয়ে আমাকে পড়ানো, বিলেত পাঠিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং দেওয়া বাবার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখন এই কাকাবাবুই পুরো দায়িত্ব নেন আর বললেন, বিলেতে গিয়ে ব'সে না থেকে, আর ঠিকমতো পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারলে অনুকে আমার হাতে তুলে দেবেন। সাত বছর পর সেদিন ফেরলাম,—মি ইজ কোয়াইট ম্যাচার

উঠ নো। তার পর শুনেছি তাল মান লয়। আসুক, আপনাকে শোনাবো।

জোরে জোরে খুশীর হাসি হাসতে থাকে জীমূত। আর চিন্তার একটা কালো ছায়া পড়ে রণধীরের মুখে। Mix

Sc 58

চারজনে এসে থামে রণধীরের বাড়ীর সিঁড়ির কাছে।

কুশলা। কালও দুপুরে খাবার নেমন্তন্ন রইল। আরও অতিথি সব আসছেন।

রণ। কাল দুপুরটা মাপ করুন—আবার হবে'খন আর একদিন।

কুশলা। বেশ, কাল দুপুর থাক, সকালে মর্নিং ওয়াক ক'রে চা'টা আমাদের ওখানে খেয়ে আসবেন।

জীমূত। ঠিক বলেছিস—তাহলে ওই কথা রইলো রণধীরবাবু।

রণ। আচ্ছা।

এদিকে কিন্তু ততক্ষণে তেরপল সরিয়ে গাড়ীর কেরিয়ার খুলে ফেলেছে। সামনে দিয়ে ঘুরে গিয়ে ইঞ্জিনটা খোলার চেষ্টা করছে।

রণধীরের নজর পড়ে বাড়ীর পাশের দিককার খোলা জায়গাটায় কোমরে হাত দিয়ে একদৃষ্টে বুক চেয়ে আছে বিচ্ছুর দিকে।

কুশলা। (বিচ্ছুকে টেনে নেয়) কি হচ্ছে দুষ্টু ছেলে, চল বাড়ী যাই।

তিনজন চলে যায়। রণধীর এগিয়ে যায় গাড়ীর কাছে। ক্যারিয়ার বন্ধ করে তেরপলটা ভাল করে ঢেকে দিয়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে। Cut.

Sc 59.

ঘরের ভেতর টেবিলের ওপর জ্বলছে কেরোসিন ল্যাম্প। একটা ইজিচেয়ারে এসে বসে রণধীর চোখের ওপর আড়াআড়ি করে হাত রেখে। Slow Mix

Sc 60.

সকাল। জীমূতের ড্রইংরুম। রণধীর আর কুশলা বসে আছে, সামনে চায়ের ট্রে। রণধীর হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে—

রণ। জীমূতবাবু তো এখনও ফিরলেন না, আর আপনাদের অতিথিদেরও আসার সময় হল। আমি এখন উঠি।

রণধীর উঠতে যাবে ঠিক এমনি সময় মুখে একটা মুখোস এঁটে বিচ্ছু ঘরে এসে ঢোকে।

Cont. কি হে বিচ্ছুকুমার, মুখোসধারী যে—

বিচ্ছু। (সদর্পে) আমি দস্যু মোহন।

রণ। ওরে বাপরে। আমি কিন্তু তোমার সহকারী, শত্রু নই।

বিচ্ছু। না না, আপনি কেন আমার শত্রু হবেন? (মুখোস খুলে রণধীরকে পরাতে যায়) এটা আপনাকে পরতে হবে, দেখুন না কি মজা হবে।

বাইরে গাড়ীর হর্ণ শোনা যায়। রণধীর ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে।

রণ। না না—আমি মুখোস পরবো কি, যাঃ—সরো আমি এখন বাড়ী যাবো।

বিচ্ছু ছাড়বার পাত্র নয়, সোফার ওপর উঠে প'ড়ে জোর করে মুখোস পরিয়ে পেছনে বেঁধে দেয়। কুশলা প্রশ্রয়ের হাসি হাসতে থাকে। ঘরে এসে ঢোকে চৌধুরী, বিরূপাক্ষ আর অমৃতা আর মণিকা। বিব্রত রণধীর কি করবে ভেবে পায় না, চট করে চায়ের ট্রেটা হাতে তুলে নিয়ে রওনা হয় ভেতর দিকে। সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকে সেদিকে।

কুশলা। (এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে কৃষ্ণবিহারীকে) আসুন কাকাবাবু। বসুন আপনারা। আর অনু—এই বুঝি—

অনু। হ্যাঁ, আমার বন্ধু মণিকা। জোর ক'রে ধ'রে আনলাম—কিছুদিন খুব হৈ হৈ করা যাবে।

কুশলা। (অনুকে ছেড়ে মণিকার হাত ধরে) আসুন ভাই, খুব খুসী হলাম। আচ্ছা, আপনারা একটু বিশ্রাম করুন—আমি স্নানের ব্যবস্থা করি।

ব্যস্ত পায়ে চলে যায় কুশলা। ঘরে এসে ঢোকে জীমূত।

জীমূত। এই যে, আপনারা এসে গেছেন—আমি বলছি অমৃতা, জায়গাটা তোমার খুব উপকার করবে। তাই না, ডাঃ বোস?

বিরূ। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—সেই জন্যেই তো আসা। Desolves

Sc 61.

সকাল। জীমূতদের বাড়ীর বারান্দায় বন্দুক, রিভলভার সব নিয়ে পরিষ্কার করছে কৃষ্ণবিহারী। পাশেই উবু হয়ে গালে হাত দিয়ে একমনে বড় বড় চোখে লক্ষ্য করছে বিচ্ছু। তার পাশে তার তীর-ধনুক রাখল। জীমূত গেট ঠেলে এগিয়ে আসে।

কৃষ্ণ। (মুখ না তুলেই) শিকারে যাবো হে জীমূত—পুরোনো অভ্যেসগুলো মাঝে মাঝে ঝালিয়ে না নিলে মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তুমি যাবে নাকি?

জীমূত। ওরে বাবা, আমি! শিকারে!

কৃষ্ণ। (হা হা ক'রে হেসে উঠে) কেন, ভয় পাও নাকি?

জীমূত। (ঢোক গিলে) না, মানে—ভয় ঠিক নয়, আপনি বললে যাবো বই কি।

কৃষ্ণ। এ অঞ্চলে বাঘটাঘ কেমন?

জীমূত। বছর দশেক আগেও তো যথেষ্ট ছিল, এখন আর ঠিক তেমন নেই। তা পাখী, হরিণ প্রচুর পাবেন।

কৃষ্ণ। অগত্যা! পাখীই মারবো।

বিচ্ছু। (সভয়ে) আমি যাবো কাকাবাবু?

কৃষ্ণ। নিশ্চয়ই, good, এই তো চাই।

বিচ্ছুর পিঠে মস্ত থাবার একটা চড় বসায়। বিচ্ছু কুঁকড়ে কঁকিয়ে ওঠে। Desolves

[ক্রমশঃ।

এ সত্য আমরা ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষ কোনও কাম্যবস্তু একমাত্র কামনার বলে লাভ করতে পারে না, যদি না তার পিছনে সাধনার বল থাকে,—আর সাধনার অর্থ হচ্ছে বাধা অতিক্রম করবার উপায় ও শক্তি, শিক্ষা ও দক্ষতা।

—প্রমথ চৌধুরী

ক্যাংকাকীতে সাত সপ্তাহ

শ্রীবিত্তার্থী

বেকার যখন থাকিতাম, তখন অন্ত কাজের খোঁজ করিতাম। আবার বেকার যখন না থাকিতাম, তখনও অন্ত কাজের খোঁজ করিতাম। স্থানীয় দৈনিক কাগজে আমার বিস্তারিত বিবরণ না দিয়া শুধু বিদেশী ছাত্রের উল্লেখ করিয়া এক কর্ম চাই বিজ্ঞাপন দিলাম। টেলিফোনে খোঁজ আসিল। প্রশ্নকর্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি ফরাসী ভাষায় কথাবার্তা বলিতে পারি কি-না। তিনি পরিচয় দিলেন যে, ফ্রান্সের লিলি শহরে তাঁহার ঘর ছিল। এখানে বিবাহ করিয়া এখন আমেরিকান হইয়াছেন। মাতৃভাষায় কথা বলিবার লোক চান। আমি বলিলাম যে, আমি শুধু পড়িবার মত ফরাসী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু কথা বলিতে এখনও রপ্ত হইতে পারি নাই। সে কাজ আর হইল না।

এ শহরের একটা বড় বিভাগীয়-বিপণিতে (Departmental Stores) চাকুরী খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি আমার পরিচয় পাইয়া খুবই খুসী হইলেন। আমাদের মত ছাত্রগণকে যে কঠোর নির্বাচন পরীক্ষার মারফৎ আমেরিকায় যাইতে হয়, তাহা তিনি নিজেই বলিলেন। তারপর বলিলেন যে, যদিও আমি লেখ্য-ইংরাজী ভাষা ভাল জানি, কিন্তু কথ্য ইংরাজী ভাষা ভাল জানি না। তিনি আমাকে মেহনতীর কাজ দিতে চান না এবং খালিও নাই। খরিদ্দারের নিকট জিনিষপত্র বিক্রী করিবার কাজ খালি আছে। কিন্তু আমার কথার উচ্চারণ এবং টানের জন্ত খরিদ্দারের নিকট বিশেষ কিছুই সুবিধা করিতে পারিব না। আমিও সে কথা স্বীকার করিলাম। আমি হয়তো তাঁহার সামনে মিনিট পনেরো ছিলাম। লক্ষ্য করিলাম যে, এই পনেরো মিনিটের মধ্যে বোধ হয় বার পাঁচ-ছয় তাঁহার টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করিয়া বাজিয়া উঠিল। তিনিও প্রত্যেকবারেই টেলিফোনে কথাবার্তা বলিলেন। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। আমাকে কাজ দিতে পারিলেন না। কিন্তু আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিতেও চাহিলেন না। তাঁহার মাসিক আয় হু'চার হাজার ডলার হইবে। কুলীর কাজ করিতে আসিয়াছি ; বিধর্মী, বিজাতি এবং কালা আদমী। কিন্তু আমাকে যথাযোগ্য সম্মান দিলেন। বসিতে চেয়ার পাইয়াছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, আমেরিকায় প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক থাকিলেও ভৃত্য প্রভুর সামনে বসিবার চেয়ার পায়। ভৃত্য যদি শিক্ষিত থাকে তবে সে তো পাইবেই, যদি অশিক্ষিত হয় তবুও পাইবে। ম্যানেজার মহাশয় একজন আদর্শ আমেরিকান ভদ্রলোক। বিদায় লইলাম।

এই শহরে থাকিতে জুতা মেরামত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এক মুচীর দোকানে গেলাম। কিন্তু দামে পোষাইল না। মনে হইল যে, দোকানদারের চরিত্রগত ভদ্রতা বা খরিদ্দারের মন যোগাইয়া চলার ক্ষমতা মুচী মহাশয়ের মধ্যে নাই। চলিয়া আসিলাম। কিছুদিন মেরামত না করিয়া জুতা পরিলাম। কিন্তু মেরামত করিতেই হইল। সুতরাং আর এক দোকানে গেলাম। ঢুকিয়া দেখিলাম যে, লেখা আছে, "We Trust in Christ." (আমরা যীশুখৃষ্টে বিশ্বাস রাখি) মুচী মহাশয় ছিলেন না, তাঁহার স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার কথাবার্তা ভাল বলিয়া মনে হইল। তিনিও ঐ সামান্ত মেরামত করিতে আগেকার মুচীর মতই দাম হাঁকিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই সামান্ত মেরামত করিতে এত দাম কেন? জবাব দিলেন যে, মেরামত করিবার মালমশলা সাত হাত ঘুরিয়া তাঁহাদের নিকট আসে। খুচরা পড়তা বেশী পড়ে। কথা প্রসঙ্গে বলিলাম যে, আগেকার মুচীও ঐ একই দাম চাহিয়াছিলেন। তখন তিনি আমাকে বলিলেন যে, ঐ লোকটি মাতাল ; ফলে তাঁহার স্ত্রীর দুঃখ-দুর্দশার সীমা নাই। সুতরাং আমি যেন তাঁহার সঙ্গে সাবধানে কাজ করি। আমি শুনিয়া ফিরিয়া সেই মুচীর নিকট গিয়া জুতা দিলাম। মেরামত করিবার পর দাম দিয়া বিদায় লইলাম।

এইখানে থাকিতে একদিন শিকাগো গিয়াছিলাম। সকাল বেলায় বাসে গিয়া রাত্রিবেলা ট্রেণে ফিরিয়াছিলাম। বাসগুলি অতিকায়। দক্ষিণ অঞ্চল হইতে দুই তিন হাজার মাইল দৌড়াইয়া শিকাগো পর্যন্ত যায়। লম্বায় বোধ হয় রেলগাড়ীর একটা বগীর সমান হইবে। প্রতি বেঞ্চে গদী মোড়া আসন। দুইজন বসিতে পারে—আমাদের কলিকাতার নূতন বাস, ট্রামগুলির মত। কিন্তু কণ্ডাক্টার নাই। ড্রাইভারের পাশেই দরজা। টিকিট তাঁহার নিকট কাটিতে হয়। তিনি একাধারে ড্রাইভার এবং কণ্ডাক্টার। টিকিট কাটিয়া চেঞ্জ দিয়াছি, ইসারা করিয়া তিনি আমাকে পিছনে বসিতে বলিলেন। দক্ষিণ-অঞ্চলে যে সকল বাস যাতায়াত করে, সেগুলিতে কালা আদমীকে পিছনে থাকিতে হয়।

চশমা পাল্টাইবার জন্ত শিকাগোতে গিয়াছিলাম। একটা কোম্পানী কাগজে খুব বিজ্ঞাপন দিত। চোখ দেখিবার জন্ত কোন টাকা-পয়সা লাগিত না ; ফ্রেমসহ চশমার দাম মাত্র দশ-বার ডলার। ক্যাংকাকীতে চশমার দোকানে ঐ দামে চশমা পাওয়া যাইত না। কারণ জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন যে, শিকাগোর ঐ কোম্পানী আমেরিকান অপটিক্যাল কোম্পানীর কাচ বহু পরিমাণে কিনে বলিয়া সস্তায় পায়। সে জন্ত তাহাদের চার্জ কম। শিকাগোতে গিয়া চোখ

দেখাইলাম। যিনি দেখিলেন, তাঁহার বয়স কম। কিন্তু তাঁহার কথা খুবই পরিষ্কার। এত পরিষ্কার যে কোনো বাঙালী বুঝি ইংরাজীতে কথা বলিতেছেন। এত পরিষ্কার কথা কোন আমেরিকানকে বলিতে শুনি নাই।

একদিন এক খাবারের দোকানে খাইতে গিয়াছিলাম। পরিবেশনকারিণী দুই বোন। তাঁহাদের বাবা দোকানের মালিক। খাদ্যের দামের শতকরা দশভাগ (কমপক্ষে ১০ সেন্ট) বখশিস দিতে হয়। ঐ বখশিস হাতে হাতে না দিয়া খাওয়ার শেষে প্লেটের নীচে রাখিতে হয়। দেখি যে একজন লোক, বয়স নিশ্চয়ই পঞ্চাশের বেশী, বড় বোনের হাতে দিতে যাইতেছেন। তখন বড় বোন লইতে অস্বীকার করিলেন। লোকটি বারবার লইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু পরিবেশনকারিণী লইলেন না। মনে হইল লোকটি মাতাল। কোন সাধারণ খাবারের দোকানের পরিবেশনকারিণী হাতে হাতে বখশিস লইবেন না, ইহা সকলেরই জানিবার কথা। তবে মাতালদের কথা আলাদা। আমার সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহার বাবা গ্রীস দেশ হইতে আসিয়াছেন। এখন তাঁহারা আমেরিকার নাগরিক। বড় বোন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দেশটি আমার কেমন লাগে এবং লোকজন আমাকে কি ভাবে নেয়। আমি বলিলাম যে, দেশটি ভালই লাগে, তবে অনেক লোকের মনে বর্ণ বিদ্বেষ আছে। আমার সঙ্গে খানিক গল্প করিলেন। তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়েন। এই গরমের বন্ধে বাবার দোকানে কাজ করিয়া খানিকটা আয় করিতেছেন। তাঁহার দোকানে আমি আরও দুই একবার গিয়াছিলাম।

আর একদিন ওখানকার রোটারী ক্লাবে আমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা দিয়াছিলাম। আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল। এসব ক্ষেত্রে বক্তাই বক্তৃতার বিষয় ঠিক করেন। এখানেও আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিলাম। বক্তৃতাটি সেখানকার দৈনিক কাগজে পরদিন ছাপা হইয়াছিল। এখানেও পাঁচ ডলার পাইলাম। যিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তিনি বক্তৃতার শেষে একান্তে ডাকিয়া আমাকে বলিলেন যে, আমার উচ্চারণ সকলের পক্ষে বোধগম্য নয়। ইহার কারণ বিদেশীদের ইংরাজী বলিবার ভঙ্গী অনেক ক্ষেত্রে পৃথক। অভ্যাস না থাকিলে সাধারণ আমেরিকানের পক্ষে বিদেশীদের বক্তৃতা বুঝিতে কষ্ট হয়। তারপর বক্তৃতা যদি শ্রোতাদের মনঃপূত না হয়, তবে টাকা দিবার ইচ্ছা বেশী হয় না। যে মহিলা আমার বক্তৃতা লিখিয়া লইতেছেন তিনি অনেকবার বিদেশীদের বক্তৃতা শুনিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার লিখিতে কোনই অসুবিধা হয় নাই।

ইহার পর তিনি ক্লাবের সভ্যগণকে মোবাইল ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিবার 'জন্য প্রস্তাব করিলেন'। পরদিন রাস্তার নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ী আসিবে। যাঁহারা রক্ত দিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন সেখানে গিয়া রক্ত দেন। আমি বিদেশী। এদেশের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং আমারও কর্তব্য পালন করা উচিত, ইহা মনে করিয়া আমিও রক্ত দিতে চাহিলাম। আরও বলিলাম যে, ১৯৪১ সাল হইতে আমি দেশে কুড়ি-পঁচিশ বার রক্ত দিয়াছি। তিনি ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, আমাকে রক্ত দিতে হইবে না। কি ভাবিয়া তিনি নিষেধ করিলেন, তাহা বুঝিলাম না। হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, আমার টাকার দরকার, সাধারণ ব্লাড-ব্যাঙ্কে রক্ত দিলে আমি টাকা

পাইব কেনই বা এখানে রক্ত দিব? তিনি জানিতেন না যে, দেশে কুড়ি-পঁচিশ বারেরও বেশী রক্ত দিয়াছিলাম, তাহার জন্য এক পয়সাও পাই নাই—তখন Blood Bank-এ বিনা পয়সায় রক্ত দিবার নিয়ম ছিল। এই সময় কোরিয়ায় যুদ্ধ চলিতেছিল। প্রত্যেক দিন বহু আমেরিকান আহত ও নিহত হইতেছিলেন। তাঁহাদের জন্য রক্তের দরকার। এই জন্য অসংখ্য আমেরিকান স্বেচ্ছায় বিনা পয়সায় রক্ত দান করিতেন। স্কুল, কলেজ, ক্লাব প্রভৃতি সাধারণের প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ত সংগ্রহের ব্যাপারে অগ্রণী ছিল। তাহাদের নিকট যাইয়া Mobile Blood Bankগুলি রক্ত লইত। গরমের ছুটির পর আমাদের কলেজ খুলিলে একবার আমাদের কলেজে ব্যাঙ্ক-এর গাড়ী আসিয়াছিল। অনেক আমেরিকান ছাত্রছাত্রী রক্ত দিয়াছিলেন। আমিও। আমাদের দেশে সাধারণতঃ আড়াই শ' সি· সি· রক্ত লওয়া হয়। আর আমেরিকায় প্রত্যেকের শরীর হইতে পাঁচ শ' সি· সি· রক্ত লওয়া হয়। রক্ত দিবার ব্যাপারে আমিও দিন দিন একজন বিশেষজ্ঞ ও প্রবীণ হইতেছি। কারণ দেশে ফিরিয়া বছরে একাধিক বার রক্ত দান করি। নূতন নিয়ম অনুসারে প্রতিবার দশ টাকা পাই।

আর একদিন একটি নরম পনীরের দোকানে চাকুরী খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া শহরতলী অঞ্চলে গিয়াছিলাম। আমার পরিচয় শুনিয়া মালিক মুখ নীচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন যে, সে কাজের লোক পাওয়া গিয়াছে। আমার সন্দেহ হইল যে, আমার গায়ের চামড়ার জন্য কাজটি হইল না। খোঁজ পাইয়া একটি কারখানার Personnel Officer-এর নিকট গেলাম। তিনি মহিলা। দুঃখিতভাবে জানাইলেন যে, যে কয়টি দরকার তাহা আগেই লওয়া হইয়াছে। সুতরাং কাজ আর খালি নাই। তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি দেশে স্কুলে ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পড়াইতাম শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "মিঃ··, ইতিহাস বড়ই চিত্তাকর্ষক বিষয়। আমিও ইস্কুলে ইতিহাস পড়াইতাম। আপনি দেশে ফিরিয়া ইতিহাস পড়াইবেন।" আমি মনে মনে বলিলাম, "ভদ্রে, এই উপদেশটি আপনার না দিলেও চলিত। আমার এখন চাই কাজ। কাজ কি দিতে পারেন?"

ক্যাংকাকী শহরে চিঠিপত্র রাখিবার পুরু কাগজের ফাইল তৈয়ারী করিবার একটি বিরাট কারখানা ছিল, নাম Amberg File & Index Co. সেখানে জুলাই মাসের শেষ দুই সপ্তাহ কাজ করিয়াছিলাম। প্রথম কয়েক দিন আমি একজন শ্রমিকের সহকারী ছিলাম। তিনি স্থানীয় কলেজে ধর্মে ব্যাচিলর ডিগ্রী পাইবার জন্য পড়িতেন। তাঁহার বাড়ী ছিল আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলে। এই কারখানায় কাজ করিয়া তাঁহার পড়ার খরচ চালাইতেন। আর কয়েক দিনের মধ্যে তিনি ডিগ্রী পাইবেন। সুতরাং তাঁহার জায়গায় লোকের দরকার। তিনি আমাকে দেখাইয়া দিলেন যে, কিভাবে মেশিনের কাজকর্ম চলে। রোটারী মেশিনে চালাইবার জন্য খবরের কাগজের যে প্রকার বিরাট বিরাট "রোল" (কাঠের কাঠামোতে জড়ানো কয়েক মাইল লম্বা কাগজ), তেমনি বিরাট "রোল"; ওজনে বার শ'—তের শ' পাউণ্ড হইবে। তাহা গড়াইয়া কারখানার মেঝের এক পাশে এক মেশিনে চাপাইতে হয়। তার পর ঐ রোল হইতে কাগজের অগ্রভাগ টানিয়া ফাইলের সাইজ তৈয়ারী করিবার মেশিনের মধ্যে ঢুকাইতে হয়। তখন অটোমেটিক মেশিনে কাগজ কাটিয়া ফাইল তৈয়ারী হয়। ওই অটোমেটিক মেশিনে আবার অটোমেটিক মাপ মেশিন থাকে। কতগুলি ফাইলের কাগজ-কাটা হইল তাহা দেখি জানা যায়। মেশিনের পাশে আমাকে বসিয়া থাকিতে হইত। মাঝে মাঝে কাটা বন্ধ হইত। তখন রোলের অগ্রভাগ আবার মেশিনের মধ্যে ঢুকাইতে হইত। অনভ্যাসের জন্য রোলটিকে আমি ঠেলি পারিতাম না। আমার সহকর্মীকেই এই কাজটি করিতে বলিতাম। তিনি একদিন পরে হাসিয়া বলিলেন, "আমাকেই যখন ভবিষ্যতে কাজটি করিতে হইবে, তখন এখন কেন আমি কাজটি শিখিয়া লইতে না?" আমি মনে মনে বলিতাম, "ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে।" কয়েক দিন পর তিনি বিদায় লইলেন। কারখানায় দুই শিফ্‌টে কাজ চলিত। আমি বিকালের শিফ্‌টে কাজ করিতাম। একজন আমেরিকান শ্রমিকের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। তিনি প্রত্যেক দিন বিকালে (দ্বিতীয় শিফ্‌ট বিকাল ৪টা-৫টায় আরম্ভ হইত।) আমাকে তাঁহার গাড়ীতে করিয়া হোস্টেল হইতে লইয়া যাইতেন আবার কাজ শেষ হইলে তাঁহার গাড়ীতে করিয়া হোস্টেলের দরজায় নামাইয়া দিতেন। কোন আমেরিকান যদি কাহাকেও অপছন্দ না করেন, তবে এই প্রকার ছোট-খাটো উপকার সব সময়ই করিবেন; ইহার জন্য তিনি কোন পয়সা লইবেন না। তাঁহার বয়স বোধ হয় ২৭।২৮-এর বেশী হইবে না। কিন্তু বয়স দশ বছর বেশী দেখাইত। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি নৌ সৈন্য বিভাগে কাজ করিতেন। আত্মঘাতী জাপানী বিমান টর্পেডো লইয়া তাঁহাদের জাহাজের উপর পড়িয়াছিল; লোকজন হয় নিহত, না হয় আহত হইয়াছিল। তিনি আহত হইয়াছিলেন ও শক পাইয়াছিলেন তাহার চাইতে অনেক বেশী। সেই জন্য বাঁচিয়াও আগের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান নাই। তিনি খুব ভদ্র। যদিও ডিগ্রী পান নাই তবুও নানা বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান গভীর।

এ কাজে আয় ভালো ছিল। কিন্তু দক্ষ শ্রমিক যে পরিমাণ ফাইলের কাগজ কাটিতে পারিত, আমি তাহা পারিতাম না। আমার মেশিনে প্রথম শিফ্‌টে যিনি কাজ করিতেন, তিনি একজন মহিলা। অথচ তিনি আমার চাইতে অনেক বেশী ফাইলের কাগজ কাটিতে পারিতেন। তিনি তাঁহার নির্দিষ্ট সময় অন্ততঃ দশ পনেরো মিনিট মেশিন চালাইতেন; বোধ হয় আমি নূতন মানুষ, আমাকে সাহায্য করিতে চান। তাহাতে কয়েক শ' কাগজ কাটা হইত। আমি মোটেই চালাক ছিলাম না। আমি যখন কাজ আরম্ভ করিতাম তখন নাম্বারিং মেশিন ঘুরাইয়া শূন্য সংখ্যায় আনিতাম। তাহা যদি না করিতাম, তবে আট ঘণ্টা কাজ করিবার পর ঐ মহিলা কর্মীর কাটা কয়েক শ' কাগজ আমার কাজের সঙ্গে যোগ হইত। কিন্তু আমার বুদ্ধি হইয়াছিল যে, ঐ প্রকাণ্ড রোল ঠেলা। দক্ষ শ্রমিকের যেখানে তিন মিনিট লাগিত, সেখানে আমার লাগিত পনেরো মিনিট। তারপর কাগজ একবার ছিঁড়িয়া গেলে বা বন্ধ হইলে, চালু করিতে আমার সময় অনেক বেশী লাগিত। আমার ফোরম্যান ভাল লোক ছিলেন। এক সপ্তাহ কাজের পর যখন দেখিলেন যে, আমাকে দিয়া আশানুরূপ কাজ হইতেছে না, তখন আমাকে তিনি বিদায় করিতে চাহিলেন। আমি অনুনয় করিয়া বলিলাম যে, আমাকে আর এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হউক, কারণ, খোঁজ পাইয়াছিলাম যে, আগস্টের প্রথম সপ্তাহ হইতে মিলফোর্ড গ্রামে ভুট্টা প্যাকিং করিবার কাজ

আরম্ভ হইবে। সেখানে আমার কাজ পাইবার খুব সম্ভাবনা। সময় পাইলাম, থাকিয়া গেলাম।

ফোরম্যানের নাম হ্যারল্ড। তিনি বিবাহিত। বোধ হয় রাত্রি আটটার সময় ডিনার খাইবার জন্য আধঘণ্টা ছুটি দেওয়া হইত। তিনি প্রায়ই বাড়ী গিয়া খাইতেন। আমরা—অন্যান্য শ্রমিকরা—সঙ্গে আনা খাবার একটা ঘরে বসিয়া খাইতাম। একদিন তিনি আমাদের খাবার ঘরে আসিলেন। আর একজন আমাকে দেখাইয়া তাঁহাকে বলিল যে, কলম্বাস আমাদের দেশ আবিষ্কার করিতে রওনা হইয়া এই আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি একটু আশ্চর্য হইলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্থানীয় কোন গীর্জায় কয়েক দিন আগে বক্তৃতা দিতে গিয়াছিলাম কি না। উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি কেমন করিয়া তাহা জানিলেন। তখন বলিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী সেদিন গীর্জায় ছিলেন। আমি তাঁহাকে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতাম। কারণ সে দেশে যাঁহার প্রত্যক্ষ অধীনে কাজ করা হয়—লোকে সাধারণতঃ তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকেন। তিনিও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের নাম ধরিয়া ডাকেন। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক তিক্ত নয়। আর শ্রমের কাজকে ছোট মনে করা হয় না। মেহনতীর কাজ যাহারা করে, তাহাদিগকে 'Help' বলে। প্রতি রবিবারের কাগজে এই প্রকার Help-এর বিজ্ঞাপন বহু থাকে, কিন্তু বুঝিয়া-শুনিয়া কাজ করিতে হয়। আমার মত বিদেশীর পক্ষে, সে যতই বিদ্বান ও বয়স্ক হোক না কেন, উপরিওয়ালার নিকট থেকে সাড়া না আসিলে নরম হইয়া থাকা উচিত। তাঁহার পদবী ধরিয়া মিষ্টার বলিয়া ডাকা উচিত ছিল। যদি তিনি তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিতেন, আমার প্রথম নাম ধরিয়াই তুমি ডাকিও, সে ক্ষেত্রে আমার তাহাই করা উচিত।

দুই সপ্তাহ পরে ফোরম্যান হ্যারল্ড আমার চাকুরীতে জবাব দিলেন। কারণ আমার কাজের উন্নতি সন্তোষজনক নয়। আমার একটু লজ্জা হইল। প্রাণপণে খাটিয়াছি। অতিকায় কাগজের রোল ঠেলিয়াছি। প্রথম সপ্তাহে গা-ব্যথা ছিল। প্রথম শিফট-এর যে মহিলার স্থানে কাজ করিতাম, তাঁহার সঙ্গে তুলনায় আমি অক্ষম প্রমাণিত হইলাম। কিন্তু সান্ত্বনাও পাইলাম। মহিলা হইলেও তাঁহার চেহারা অসুরের মত, ইংরাজীতে Amazon বলা যায়। তিনি অনেক দিন কাজ করিয়াছেন, আর আমি তো একেবারে নূতন। রোল ঠেলিতেই আমার অনেক সময় যাইত। তবু দুই সপ্তাহের শেষে কাজে তাঁহার প্রায় সমকক্ষ হইয়াছিলাম। এবার জবাব পাইয়া আর কোন অনুরোধ করিলাম না। মিলফোর্ডের ভুট্টা প্যাকিং করিবার কারখানায় কাজ প্রায় ঠিক হইয়াছে। আগষ্টের দুই বা তিন তারিখ হইতে প্যাকিং-এর কাজ আরম্ভ হইবে।

এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের পরিচিত ভদ্রলোক কারখানার ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, আমার মত বিদেশীকে কাজ দিবেন কিনা। তিনি জবাবে বলিয়াছিলেন যে, স্থানীয় লোকদের কাজ দিবার পরও যদি খালি থাকে তবে আমি কাজ পাইব। মিলফোর্ডে একটিমাত্র হোটেল। ম্যানেজারকে আমার পরিচয় জানাইয়া লিখিলাম যে, আমি সেখানে মাসখানেক কাজ করিব, তিনি আমাকে থাকিতে দিতে রাজী আছেন কি না? পরিচয় আগেই না দিলে কালা আদমী দেখিলে বহু জায়গায় রাখিতে অস্বীকার করে। রাজ্যের আইন কালা আদমীর পক্ষে থাকিতে পারে, কিন্তু আইন সব জায়গায় সব ক্ষেত্রে খাটানো সম্ভব নয়। ম্যানেজার একজন মহিলা, তিনি মালিকও বটেন। থাকিবার রেট জানাইয়া তিনি চিঠি দিলেন। যে মজুর ভদ্রলোক আমাকে তাঁহার গাড়ীতে স্থান দিতেন, ফোরম্যানের আদেশ পাইয়া তাঁহাকে সে কথা জানাইলাম। তিনি মন্তব্য করিলেন, "This is not the only place to work." এই নিশ্চিন্ততা আমেরিকার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। কাজের শেষ দিন তাঁহাকে জানাইলাম যে, আমি মিলফোর্ডে কাজ করিতে যাইতেছি। তিনি শুভেচ্ছা জানাইলেন। চমৎকার ভদ্রলোক। আমার কাছে দেশের তৈয়ারী কিছু শিল্পদ্রব্যের নমুনা ছিল। আমি তাঁহাকে একটি সিগারেটের ছাইদান ও কয়েকটি আগরবাতি ধূপ দিলাম। তিনি বড়ই খুশী হইলেন। অবশেষে ক্যাংকাকী হইতে বিদায় লইলাম।

রাজধানী

বটকৃষ্ণ দাস

দুদিকে রঙীন দুঃস্বপ্নের গলি,
অন্ধকারিত এক রাজধানী সমুখে ;
কালি হিজিবিজি ধূমায়িত কুণ্ডলী
কাটিয়ে দিয়েছে বোবা আকাশের বুকে।
'কেউ আছো না কি ?'—বজ্রোবার হেঁকে বলি—
প্রতিধ্বনিরা হেসে ওঠে কৌতুকে ;
উৎকণ্ঠ, ভয়ে শিহরিত রোমাবলী।

এ-শহর যেন বর্তুল কঙ্কাল—
নড়ে না, চড়ে না,—প'ড়ে আছে চিৎ হ'য়ে ;
চারিদিকে শুধু কণ্টকারীর ঝোপ,
রুদ্ধ বাতাস দুর্বহ দুর্গন্ধে।
'কেউ নেই না কি ?'—নিষ্ফল বিক্ষোভ।
সাড়া নেই বহুবিজ্ঞাপিত লোকালয়ে—
জনমানবের চিহ্ন পেয়েছে লোপ।

মসিবর্ণ দিগন্তে সমাসীন
কালের রাখাল তবু একদিন জানি
বিশ্রান্ত বাঁশি বাজাবে বিরতিহীন,
রূপসী রাধিকা হবে এই রাজধানী।
জনসমুদ্রে কূলে কূলে অমলিন
মন্ত্রিত হবে মহাজীবনের বাণী,
মানুষেরা হবে প্রেমিক, মর্মবিদ।

আপনি এলেন অথচ আর ঘণ্টা কয়েক আগে এলে অন্ততঃ···
যাই হোক, উপরে উঠে বাঁ দিকের পাঁচ নম্বর ঘরে এ্যাটেণ্ডিং মেল-নার্স এর কাছে এই কাগজটা দেখালেই ওঁর জিনিষ ক'টা পাবেন। সেগুলো নিয়ে এখানে এসে একটা সই করে দিয়ে যাবেন।

শোকাভিভূত অনিল সরকারের ভাই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। খানিক পর একটা জামা হাতে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলাম—সব মিলেছে তো?

সকাল থেকে কাজের ভীড় ছিল অবিশ্রান্ত। এখন প্রায় খালি। ভদ্রলোককে বসালাম পাশের চেয়ারে। তিনি জামাটার পকেট থেকে রাজ্যের কাগজপত্তর বের করলেন। পাশ পকেট থেকে একটা ভাঙা চিরুণী, একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি আর একটা ছোট্ট চৌকো টিনের কৌটো। খুলে দেখা গেল মুসুরীর ডালের মতো কালো কালো গুলি। ভদ্রলোক নাকের কাছে নিয়ে গেলেন।

—কি বটে?

—না, এমনি। আফিংয়ের ডেলা।

—আপনার দাদা আফিং খেতেন নাকি? কি করতেন উনি?

—ছেলে পড়াতেন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে লোকের বাড়ী বাড়ী। দাদার পদবীটা যে কী তাও অনেকে ভুলে গিয়ে থাকবে, সবাই ওঁকে অনিল মাষ্টার বলেই জানত।

—কি বললেন, অনিল মাষ্টার! আপনি অনিল মাষ্টারের ভাই?

—কেন, আপনি জানতেন দাদাকে, আলাপ ছিল?

—আচ্ছা, উনি কি কাঠোয়ার লাহিড়ী বাড়ীতে অনেক বছর ধরে টিউশনি করতেন?

—হ্যাঁ।

অনিল মাষ্টার। ধনুকের মতো বাঁকা একটি লোক। পরিপাটি করে মাথা আঁচড়ানো। গালের কষ বেয়ে পানের দাগ—নোংরা কিম্ভূত-কিমাকার। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে একমাত্র তাঁর পরিচয়: অনিল মাষ্টার। আলাপ হয়েছিল ঐ লাহিড়ী বাড়ীতেই। অষ্টম শ্রেণীতে পড়া লাহিড়ীর নাতি হিরণকে বাড়ী গিয়ে পড়িয়ে আসতে হবে, এমনিতর খবর পেয়ে কর্তার সাথে দেখা করতেই সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। সন্ধ্যা বেলায় পড়াতে যাই। ছেলেটি বেশ নম্র ও মনোযোগী। পড়াবার ঘরটি পরিষ্কার। নরম তোষকের ওপর সাদা চাদর, দুটো পাশের তাকিয়া। যে ঘরটায় পড়াতে হয়, সেখানে ঢুকতে গেলে আর একটা ঘরের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। প্রথম যেদিন হিরণকে পড়াতে যাই, দেখলাম চৌকির এক কোণে হুমড়ে তালগোল হয়ে একজন লোক বসে রয়েছেন। পড়াশুনা আর সেদিন কিছু হয়নি। আলাপ-পরিচয়েই সময় কেটে গেল। তারপর উঠে চলে আসার জন্য ঘর থেকে বেরোতেই এক নাগাড়ে কোণে কুণ্ডলী পাকানো লোকটি আমার দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করলেন—বহাল দেওয়া হয়ে গেল, মাষ্টার?

এ রকম অদ্ভুত প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিলাম না। রাগে মুখ দিয়ে কোন কথা বের হ'ল না। কী বলি? সামান্য একটু চোখটা খুলে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। বললাম—বলুন, কী বলছেন? খিক্ খিক্ করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক।

—খুব রাগ হয়েছে মনে হচ্ছে। তা বাবাজী, গোটা কয়েক পাশ দিয়েছ বলে খুব গরম, কিন্তু যে লাইনে নাক গলিয়েছ, সেখানে ঐ বিদ্যের গরব থাকলে পস্তাতে হবে।

বলতে কী, ঐ ধরণের কথাবার্তার প্রত্যেক শব্দটাকে আমার নিতান্ত অশ্লীল বলে মনে হচ্ছিল। বললাম—আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ; কিন্তু আপনার পরিচয়টা তো এখনো পেলাম না।

—পরিচয়? আমি এই বাড়ীরই লোক। আমাকে তুমি চেন না। না চিনতে পারো। তোমার বাবা জীবিত আছেন?

—কেন বলুন তো?

—তাঁকে জিজ্ঞেস করো। এই শহরে যদি থাকেন, তো নাম করলে নিশ্চয় চিনবেন। আমি অনিল মাষ্টার।

পরের দিন হিরণের কাছে ওঁর কথা শুনলাম। এই বাড়ীতে উনি অনেক বছর ধরে আছেন। ঐ কোণের চৌকিটাতেই থাকেন। হিরণের ছোট দুটি ভাই ও বোনকে পড়ান। হিরণদের বিরাট পরিবার। ক্রমাগতভাবে অনিল মাষ্টার একের পর এক পড়িয়ে যাচ্ছেন। হিরণও তাঁর কাছে পড়েছে। হিরণের কাকারা, এমন কি বাবাও তাঁর ছাত্র। কথার মাঝেই খটখট করতে করতে অনিল মাষ্টার ঘরে ঢুকলেন। হুকুম হ'ল—এই হিরণে, যা, বল্টে আর টুনিকে ডেকে দে। বল গিয়ে মাষ্টার এসেছে। আর শোন, বৌমাকে বল এক গেলাস, না না, দু'জনের মতো চা পাঠাতে। নতুন মাষ্টারের চা-টা কাপে করে দিতে বলিস।

হিরণ উঠে গেল। অনিল মাষ্টার চাদরটায় মুড়ি দিয়ে এক প্রান্তে বসলেন।

—কেমন লাগছে ছাত্রটিকে? ভারি পাজি। ফাঁকিবাজের শিরোমণি। হবে না, ওর বাবাটাও যে দারুণ পাজি ছিল ঐ বয়সে। হলে কি হয়, ভারী বুদ্ধিমান, কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। এখন তো নাম করা কনট্রাক্টর। হাজার হাজার টাকা ইনকাম। বুঝেছেন—হাজার হাজার টাকা।

বিড় বিড় করে বকতে বকতে উঠে গেলেন পাশের ঘরে। ইতিমধ্যে বল্টে আর টুনি স্লেট-পেনসিল-বই নিয়ে চলে এসেছে। হিরণও এসে বসল আমার কাছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ও-ঘরে তখন বেশ হৈ-চৈ আরম্ভ হয়ে গেছে। জানালার ফাঁক পথে দেখি বল্টে অনিল মাষ্টারের বাক্স হাতড়াবার চেষ্টা করছে আর উনি তার পা ধরে টানাটানি লাগিয়েছে। ফলে হাতাহাতি।

অনিল মাষ্টারের গলা শোনা যাচ্ছে—এই টুনি, কণ্টের পা ছাড়। ঝাঁক কর। নইলে রাত দশটা পর্যন্ত এক ঠ্যাঙকে দাঁড় করিয়ে রাখব।

কিন্তু কে শোনে কার কথা?

হিরণের দাদামশাই ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে সব নিশ্চুপ। গম্ভীর গলায় ধমকালেন টুনি আর কণ্টেকে। বললেন—অনিল, ও দুটোকে সন্ধ্যের সময় একটু থামিয়ে রাখো। একেবারে মহরম লাগিয়েছে। পাশের ঘরে হিরণ। হিরণের মাষ্টারমশাই রয়েছেন। পড়াশুনার বিঘ্ন হবে।

বলে বেরিয়ে চলে গেলেন।

হিরণ এক মনে ট্রানশ্লেশন করছে। পাশের ঘরে টুনি, কণ্ট আর অনিল মাষ্টারের গলা ভেসে আসছে। প্রথমে অনিল মাষ্টারের, তারপর ওদের দু'জন। সাতদশ সাত সাতাত্ত, সাতদশ আট···। সুরে সুর মিলিয়ে বলেই চলেছে। আমি হিরণের খাতা সংশোধন করার জন্ত চেয়ে নিলাম। হিরণ জল খাবার জন্ত ঘরে গেল। একটু বেশ দেরী করেই ফিরল। তাই ওকে বকলাম। ও লজ্জিত হ'ল। অঙ্কের বই খুলতে বলার জন্ত ওর মুখ পানে তাকাতেই দেখি—মুচকি মুচকি হাসছে।

—কি, হাসছ যে?

—আপনি স্যার পাশের ঘরে একবার গিয়ে মজা দেখুন।

—কেন? ওরা নামতা পড়ছে। ওখানে মজার আবার কি হ'ল?

—না স্যার, আপনি একবার দেখে আসুন।

অগত্যা উঠতে হ'ল। দেখে সত্যিই আমারও হাসি পেল। মাঝে আর একটু হলে শব্দ করেই হেসে উঠতাম। দেখি টুনি আর কণ্ট কেউ নেই। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অনিল মাষ্টার ঢুলতে ঢুলতে নিজেই বলে চলেছেন—ত্রিশ কড়ার দশ গণ্ডা, একত্রিশ কড়া দশ গণ্ডা এক কড়া, বিত্রিশ কড়া।·····

সময় হয়ে গিয়েছিল হিরণকে দুটো অঙ্ক কষিয়ে চলে আসছি। আসবার সময় দেখলাম, দুটো দেওয়ালের কোণে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুমুচ্ছে। অনিল মাষ্টার গভীর নিদ্রামগ্ন।

দিন কয়েক হ'ল কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। পশ্চিমে নাকি শিলাবৃষ্টি হয়ে গেছে। গরমের জামা বিশেষ ছিল না। বেশী খরচ করেই তাই একটা লংকোট করতে দিয়েছিলাম। সেইটা গায়ে দিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় বেরিয়েছিলাম। হিরণের পড়া শেষ হ'ল। আমি ঘর থেকে বের হচ্ছি, কোটটায় হঠাৎ একটু টান পড়ল। দাঁড়ালাম।

—তাড়া আছে নাকি?

—এমন কিছু নয়। বসতে অনুরোধ করলেন অনিল মাষ্টার। ছোট একটা কৌটা খুলে টুক করে একটি কালো বড়ি মুখে ফেলে দিয়ে শিবনেত্র হলেন। জিজ্ঞেস করতে হ'ল না। নিজেই বললেন—না খেলে চলে না। সারা দিনরাত ওই এক কথা—একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ। তুমিই বল না—ভালো লাগে? আর মাইনে? বুড়ো আঙুল

গুণে দেখালেন—চার টাকা। লেখাপড়া শেখার কি মতিগতি আছে ছেলে-পিলেদের? মাষ্টার একটা রাখতে হয় রাখে। অথচ আমি পারি না ফাঁকি দিতে। পড়ুক, না পড়ুক, আমাকে বকতেই হয়। তাই আফিম ছাড়া চলে না। এই হাত দিয়েই কত জজ-ম্যাজিষ্টর বেরিয়েছে। সে সব দিন ছিল আলাদা। মাইনে পেতাম কোন বাড়ীতে আট আনা, খুব বড়লোক হলে ষোল আনা। তবু সচ্ছল ছিল অবস্থা। লোকে সম্মান করতো মাষ্টারকে। আমার কথা বাদ দাও। রাস্তায় দেখা হলে পায়ে হাত না দিয়ে প্রণাম করবে এমন ছাত্রই নেই। কিন্তু দেখি তো অন্য সব মাষ্টারদের। সামনে দিয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ছাত্ররা বেমালুম চলে যাচ্ছে। অবশ্য শিক্ষা দিতে হয় ঠিকভাবে। এইটুকুই আমার গর্ব। সেই গর্বের জোরেই এখনও টিকে রয়েছি। রায় সাহেবদের বাড়ীর অনুপমের নাম নিশ্চয় শুনেছ। এখন বিলেতে থাকে—ফ্যামিলি নিয়ে। বিশ্বাস করবে? সেও আমার ছাত্র। কোথায় নেই—বিলেত, জার্মাণী, আমেরিকা—সব জায়গাতেই অনিল মাষ্টারের নিজের হাতে তৈরী করা হীরের কুচির মতো ছাত্র। যতই বিদ্বান হোক, বনেদ আমার হাতে। কি বল?

কী আর বলব? ওঁকে এখন কথা বলায় পেয়ে বসেছে। উঠতে যাচ্ছিলাম। বাধা পড়ল। বসালেন। বললেন—আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। জামাটা নতুন করালে? গরমের, না সুতীর?

—কী মনে হয়?

হাতে করে পরীক্ষা করে দেখে পরম বিরক্তিতে নাক সিঁটকালেন! এর চেয়ে চটের করালেই পারতে, তবু খানিকটা মোলায়েম হতো। কত খরচ পড়ল? গোটা দশ বারোর মতো, না কী?

সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো অকর্মণ্য হয়ে পড়ল তন্মুহূর্তে। এই লংকোটটায় পঁচাত্তর টাকা লেগেছে—আসল সার্জ। কিন্তু সে কথা ওঁর কাছে তুলে লাভ কী? ছেঁড়া গিঁট দেওয়া কাপড়, শতচ্ছিন্ন আলোয়ান আর জবরদস্ত একরাশ জীর্ণ কোট জামার তলায় একটা ভগ্ন শীর্ণ মনকে আর আঘাত করতে মন গেল না। তবু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আপনি নিশ্চয় এর চেয়ে ভাল জামা গায়ে চাপান?

—চাপান মানে, এই তো চাপানো রয়েছে। দেখবে? আজ তিরিশ বছর ধরে পরছি। বলে আলোয়ানের নীচে সুতীর কোট, কোটের নীচে ভূত-কালো তেলচিটে একটা জহর কোটের খানিকটা বের করলেন।—ভাখো, হাত দাও। দিলেই বুঝবে, কাকে বলে কাপড়। তখনকার দিনে নগদ পাঁচ টাকা পড়েছিল। মুখার্জী সাহেবদের বাড়ীতে পড়াতাম। ওঁরাই তৈরী করে দিয়েছিলেন।

হাত দিতে আর প্রবৃত্তি হলো না।

ধীরে ধীরে অতি পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় অনিল মাষ্টারের আচার-আচরণকে ক্লান্তিকর ঠেকত না। ভাবতাম, খারাপ কি? উনি যদি বলে সুখ পান তো আমার শুনতে দোষ কি? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়টা হচ্ছে এই যে, একটা দূরত্বের ব্যবধান উনি সব সময় রক্ষা করে চলতেন। এমনি খুব আলাপী। বয়সের দুস্তর তফাৎ সত্ত্বেও আলোচনায় অন্তরঙ্গ। ছিরুকে পড়িয়ে ফিরবার সময় মাঝে মাঝে কথাবার্তা হত। সেদিনও উঠেছি। উনিই এলেন। বললেন—একটা জিনিষ দেখবে মাষ্টার?

পকেট থেকে কতকগুলো কাগজ বের করে তার মধ্য থেকে একটা ফটো দেখালেন এক মুখ হাসি হাসি ভাব নিয়ে। দেখলাম। শুধালেন—কেমন দেখলে?

মধ্যবয়সী এক সুবেশা মহিলার প্রতিকৃতি। স্নিগ্ধ লাবণ্যময়ী। বললাম—ভাল।

—হেঁ হেঁ, কে বল দেখি? সহধর্মিণী। ভারী সখালো। ছেলেপুলে হয়নি কিনা। স্নো, পাউডার, পমেটস্, রামতেল এই সব নিয়েই আছে। সারাদিন গাধার খাটুনি। দশ বাড়ী ঘুরে ত্রিশ-চল্লিশের বেশী হয় না। যা পাই সব ঐখানে, ঐ ওঁর পায়ে। আমার তো কিছু খরচ নেই। লাহিড়ী-বাড়ীতেই খাই। খাবে? এই নাও।

একটা লজেন্স দিলেন। মুখে পুরলাম।

—আসছিলাম। রায়েদের দোকানে উঠে বয়েম থেকে গোটা কতক তুলে নিলাম। কিছু বলে না। রায়ের নাতিটাকে পড়াই। ভারী ভালবাসে। আমার দোষ হচ্ছে কী জানো, এক কথা থেকে অন্য কথায় চলে আসি। যে কথাটা বলছিলাম: টাকা যা পাই সব মণি-অর্ডার করে পাঠাতে হয়। এই দেখ।

বলে গোটা দুই তিন কুপন দেখালেন।

বাপের বয়েসী লোক। রসিকতা করাও চলে না। অথচ কিছু না বললে হয়ত ক্ষুণ্ণ হবেন। বললাম—তা ওঁকে নিয়ে এখানে বাস করলেই পারেন।

—এখানে, এই শহরে? তাহলেই হয়েছে। শেষে কি পাগল হয়ে যাবো! ওই দেশ গাঁয়েই থেকে যা ভাবন, শহরে এলে তো টকি-থিয়েটার দেখে আমায় পথে বসাবে। সে হাজার ঝঞ্ঝাট। সংসার তো করনি ভায়া। করলে বুঝতে। একবার একটা নাকছাবি চেয়েছিল। গড়িয়ে দিতে সপ্তাহ খানেক দেরী হয়। একমাস চিঠি দেয়নি। অভিমান। সেই জন্যই বুঝলে, ওসব ঝামেলার মধ্যে যেতে আমি রাজী নই। ঝামেলা যদি পোয়াতে পারতাম, তাহলে কি আর আমাকে পরের দুয়ারে পড়ে থাকতে হয়! জায়গা-জমি যা ছিল, দেখে-শুনে খেতে পারলে চলে যেত কোনমতে; কিন্তু সে হাজার ফজিহৎ। আমার ছোট ভাই। তার আবার গো-ভাগ্যি নেই, এটুঁলি-ভাগ্যি খুব। ছেলে নেই, মেয়ে চারটে। লেখাপড়াও শেখেনি আমার মতো। বড় দুটো ধাড়ী ধাড়ী মেয়ের বিয়ে দিতে পারছিল না। মামা রকম কথা শোনা যাচ্ছিল, সেই সময় আমার ভাগটা বিক্রী করে ভাইঝি দুটোকে পার করে দিয়েছি। ল্যাটা চুকে গেছে। আমার আবার অভাব কিসের? বিদ্বান, বনে গেলেও ভাত জুটবে। তবে ভাই আমার ভাল। অকৃতজ্ঞ নয়। বৌদির দেখাশুনা, ছেদ্দা-ভক্তি করে।

—তা আপনি যে জমি-জায়গা ঘুচিয়ে দিলেন, তাতে তিনি কিছু আপত্তি করেননি, মানে আপনার স্ত্রী?

—আপত্তি? আমার কাজে? না, না, তুমি জানো না মাষ্টার। সে অমন মেয়েই নয়। আজকালকার হালফ্যাসানের নয়, একেবারে সাবেকী। ভারি ভক্তিমতী। তবে হ্যাঁ, ভয়ও করে যমের মতো। সে সাহস কোথা যে আপত্তি করবে?

হাসতে থাকেন অনিল মাষ্টার। গালের কষ বেয়ে পানের রস গড়ায়। তালুর ওপর পিঠ দিয়ে মুছে উঠে পড়েন। মনে মনে ভাবলাম, যাক্, তবু একটা সান্ত্বনা আছে।

গায়ে পড়ে গল্প জমাতেও যেমন, আবার হয়তো কোনদিন দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন, কথা বলতে গেছি, সাড়াশব্দ নেই, অর্ধ

তাচ্ছিল্য দেখাতেও তেমনি। ভীষণ খেয়ালী। পড়ানোর শেষে কথাবার্তা যা হয় হিরণের সাথে সবই অনিল মাষ্টারকে নিয়ে। হিরণ বলল—জানেন স্যার, সারাদিন উনি হয় টো টো করে ঘুরে বেড়ান, নয় আফিং খেয়ে ঝিম মেরে বসে থাকেন। আর খাওয়া যদি দেখেন। ভাত, ডাল, তরিতরকারী, মাছ যা দেওয়া হবে, সব একসাথে মেখে ফেলেন মাছটা সরিয়ে রেখে। তারপর ডেলা করে মাত্র এক গ্রাস মুখে ফেলে এক ঘটি জল ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে উঠে পড়েন। বাকী মাখাভাত, মাছ নিয়ে আমাদের পুকুর-পাড়ে একটা রোঁয়া ওঠা মাদী কুকুর আছে, তাকে ডেকে সব খাইয়ে দেন। না খেলে কী মানুষ বাঁচে? কোনদিন দেখবেন, মরে পড়ে আছে ওই কোণের ঘরে।

—আঃ, বলো না হিরণ। ওঁর স্ত্রী রয়েছেন দেশে।

—আপনি পাগল হয়েছেন স্যার? ওঁর সাতকুলে কেউ নেই।

হাসতে হাসতে বলল হিরণ। আমি বললাম—তুমি জানো না। সেদিন আমাকে উনি ওঁর স্ত্রীর ফটো দেখালেন।

—আপনাকেও দেখানো হয়ে গেছে! কাউকে বাদ নেই। পাড়ায় বেপাড়ায় ছোট বড় সবাইকে দেখিয়ে বেড়ান। দাদু বলেন —অনিলের এই স্বভাব না মলে যাবে না।

—তাতে কী হয়েছে? নিজের স্ত্রীর ফটো।

—স্ত্রী না কাঁচকলা।

হিরণের এই উক্তিতে আমি রীতিমতো বিরক্ত হলাম। ভাবলাম, এ প্রসঙ্গ নিয়ে ছাত্রের সাথে আলাপে অগ্রসর না হলেই ভালো হতো। ওকে থামিয়ে দিয়ে পড়ার জন্য বই খুলতে বললাম। তা সত্ত্বেও হিরণ হেসে বলল—আসল ব্যাপারটা কী জানেন স্যার? আমাদের পাড়ায় যে "মিত্র আর্ট ষ্টুডিও" আছে, সেখানে ওঁর খুব যাতায়াত। একবার ধরাও পড়ে গিয়েছিলেন। সে কথা যদি···

—হিরণ, তুমি কি বই খুলবে না?

মুখ কাঁচুমাচু করে থামল। খানিকক্ষণ পড়িয়ে উঠে চলে এলাম, বিশ্রী লাগছিল। কিন্তু তার চেয়ে রাগ হচ্ছিল হিরণের উপর। হতে পারেন পরাশ্রয়ী, তবু তাঁকে নিয়ে এ কী জঘন্য উক্তি!

অনিল মাষ্টারের সাথে ঘনিষ্ঠতার ফলে কখন যে তাঁর প্রতি আমার আগ্রহপূর্ণ সহানুভূতি চলে এসেছে বুঝিনি। ভাবলেই মনটা খিন্ন হয়ে পড়ে। সারাটা জীবন ছেলে পড়াচ্ছেন। সেই একই কথা। একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ আর প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ। দরিদ্র, রুগ্ন, পরমুখাপেক্ষী এক জরাজীর্ণ ভদ্রলোক। ঘরে সতীসাধ্বী স্ত্রী অথচ পাকচক্রে গার্হস্থ্য জীবনের শান্তি থেকে বঞ্চিত।

বাজার করে ফিরছিলাম। ডাক এল একটা চায়ের দোকান থেকে। উঠে এলাম।

—চা খাবে?

—না, একটু কাজ আছে।

—তোমার সাথে একটু কথা ছিল।

—বলুন

—থাক্। কথাটা গোপনীয়। ও বেলায় বরং হিরণকে যখন পড়িয়ে ফিরবে, তখন বলব।

আগ্রহ বেড়ে গেল বলার ভঙ্গী দেখে। অবশ্য উনি সব কিছু একটা নাটকীয়ভাবে বলেন। একটা বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছিলেন।

পাশে বসতে বললেন। চুপ মেরে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। আমি অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম।

—বলুন, কী বলছিলেন।

—তোমাদের সব কিছুতেই তাড়াতাড়ি। সবুর এসো। যদিও ও দোকানে আর কেউ ছিল না, তা সত্ত্বেও অতি সন্তর্পণে কানের কাছে মুখটা নিয়ে এসে শুধালেন —মেয়ে পড়াবে?

—পেলে পড়াব না কেন?

—না না, তোমার দ্বারা হবে না। শেষে কী হাতে হাত-কড়া পড়বে? আচ্ছা, তুমি যাও।

হতভম্ব হয়ে গেলাম। বাজারের থলিটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই হাত ধরে টেনে বসালেন।

—বলি, খুব যে আগ্রহ! মেয়ে পড়ানোর কথা শুনেই একেবারে 'হ্যাঁ'। কেমন মেয়ে, কাদের মেয়ে, কোন্ ক্লাসে পড়ে, এ সব কিছু জানবারই দরকার হলো না। না বাবা, শেষে কি একটা কেলেঙ্কারী ঘটাব? একে চ্যাংড়া বয়েস। যদি পড়াও তবে ক'টি সর্ত মেনে চলতে হবে। রাস্তা-ঘাটে দেখা হলে ফিক্ ফিক্ করে হাসা চলবে না। পড়াবার সময় সিনেমা-থিয়েটার নিয়ে গালগল্প করা চলবে না। পারবে? মাইনে পঞ্চাশ—সময় এক ঘণ্টা।

—থাক্‌গে মাষ্টারমশাই। ওসব কথা ছেড়ে দিন, চলি।

—উচিত কথা বললাম বলে মনে ধরল না। পড়াতে তোমাকে হবেই। আমি তাদেরকে কথা দিয়ে এসেছি। না গেলে আমার কথার খেলাপ হবে। দেখছি কিনা ভায়া। দেখে দেখে চোখ পচে গেল।

বিচিত্র এই মানুষটির অনুরোধ রক্ষা করতে হয়েছিল। প্রথম দিন আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা বড় ঘরের মাঝে চেয়ারে বসতে বললেন। চুপচাপ বসে আছি। খানিক পর অনিল মাষ্টার খুব কর্তা ব্যক্তির মতো ঘরে ঢুকলেন। ডাক দিলেন—চলে এসো মাধবী, কোন লজ্জা ক'রো না। যাঁর কাছে পড়তে হবে তোমাকে, তাঁকে যদি ভয় বা লজ্জা করো, ন্যাকামী করো দূরে দাঁড়িয়ে থেকে, তাহলে আর যাই হোক, পড়াশুনা হবে না।

হলদে ফ্রক পরা বছর বারো বয়েসী একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে।

—ভালো করে দেখ। বুঝে নাও, পারবে তো? যে সব কথা বলেছি, তার যেন নড়চড় না হয়। আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারবে না। আমার কাছেই হাতেখড়ি। ভালো করে পড়াবে—বুঝলে?

—দেখি চেষ্টা করে।

—সে কথা একশো বার। চেষ্টায় কি না হয়? চেষ্টা করে দেখ, পার উত্তম, না পার ছাড়িয়ে দেব।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন অনিল মাষ্টার। ডেকে বললাম—একবার গৃহকর্তার সাথে দেখা করিয়ে দিলে হয় না?

ঘুরে দাঁড়ালেন ভুরু কুঁচকিয়ে—আরে বাবা, আমিই কর্তা, আমিই গিন্নী। কেন? আমাকে তোমার কেয়ার হচ্ছে না? কর্তা কর্তা করেই গেল। তিনি ব্যস্ত বলেই না আমাকে ব্যবস্থা করতে বলেছেন।

কখন যে কী ভাবে থাকেন, তা উনিই জানেন। চলে গেলেন।

আমি কিছু মনে করি না। আমার উপর একটু অভিভাবকত্ব করতে পারলে দেখেছি উনি খুশী হন। বর্তমানে ওঁর আচরণকে মেনে নিয়েছি। কখনও উপদেশ দেন, কখনও ধমকান, কখনও চাকরী ছাড়িয়ে দেবার ভয় দেখান। সব মিশিয়ে দারুণ দুর্বোধ্য মনে হয়। তবে যেহেতু কোন কিছুর প্রতিবাদ করি না, সেজন্য হালে খুব সন্তুষ্ট। সবচেয়ে কষ্ট হয় ওঁকে দেখলে। কেমন একটা হেঁ হেঁ ভাব যেখানে যেখানে পড়াতেন বা পড়ান। কর্তৃত্ব ফলাবার চেষ্টা করেন যদিও তবু সে চেষ্টার মধ্যে এমন এক মন-যোগানো ভিক্ষুকসুলভ অভিব্যক্তি থাকে যে, দেখলে ঘৃণা হয়। অনুকম্পাও হয় বুঝি। একদিন ডেকে বললাম—শরীরটা তো গেছে। মনটাকেও একবারে কেঁচোর মতো মেরুদণ্ডহীন করে তুলছেন কেন? আপনি যে শিক্ষক, এ কথাটা একেবারেই ভুলে গেছেন। একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাধারণের মতোই একটু অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেন না?

শুনে হো হো করে হেসে, বললেন—হাসালে ভায়া! চিতায় পা দিয়ে আছি, ডাকের অপেক্ষায়। পরজন্মে আবার দেখা যাবে। রাস্তা-ঘাটে দেখা হলে অনেক ছাত্রই বলে। এগিয়ে আসে সাধ্য-মতো সাহায্য করতে। আমি ফিরিয়ে দিই। বলি—যা যা, নিজেরা পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। আমি যদি ভাল খাব, ভাল পরবো মনে করি তাহলে কি তোদের কাছে হাত পাততে যাব? আমার কত ছাত্র 'ফরেনে' রয়েছে। চিঠি দিয়ে খোঁজ নেয়। যদি কোন রকমে জানতে পারে যে আমি কষ্টে আছি, তাহলে কী রক্ষে থাকবে? চিঠির পর চিঠি আসবে, চেক্ আসবে। তারা কী আর ছেলে রে, সোনার চাঁদ সব। এসব কথা তোমাকে বলিনি এতদিন। দেখবে সেদিন, যেদিন সব ছেড়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাব। খবরটা একবার পেলে হয়। চতুর্দোলায় তুলে কাঁধে করে ছেলেরাই নিয়ে যাবে মা গঙ্গার কোলে। সে কী শান্তির দিন! চন্দন-কাঠের আগুনে সব জ্বালা জুড়াবে তোমাদের এই অনিল মাষ্টারের। তবে কী জান, যার কপালে যা লেখা আছে তাই হবে। আর অস্তিত্ব বজায়ের কথা বলছ? প্রসঙ্গটা যখন তুললে তখন শোন, শুধু একটা ঘটনা: এই লাহিড়ী মানে হিরণের দাদু, প্রথম যখন এলাম হিরণের বাবাকে পড়াতে সেই তখনকার কথা। মাইনে-পত্তর থাকা-খাওয়া নিয়ে কী সব কথা কাটাকাটি হয়ে গেল প্রথম দিনেই। উনিও বলে ফেললেন—ভারী দেমাক তো! না পোষায় চলে যাও। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না।

—জোয়ান বয়েস। রক্ত টগ বগ করে ফুটছে। বললাম—তা ঠিক হুজুর, তবে ঐ কাকই জুটবে, বড় জোর শালিখ, চড়ুই। চলে আসছিলাম পোঁটলা-পুঁটলি কাঁধে করে। বজ্রনাদ হলো—দাঁড়াও। সামনে এসে বললেন—লাহিড়ী-বাড়ীতে গুণী লোকের ঢোকা সহজ, বের হওয়া শক্ত। তোমার যাওয়া চলবে না। সেই থেকে আজও রয়ে গেলাম। আর কিছু শুনতে চাও? বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে।

উঠে আসছি। অনিল মাষ্টার তাড়াতাড়ি কাছে এলেন। —শোন একটা কথা। এসব কেন আবার হিরণের কাছে গল্প কোর না।

সামান্য বছর খানেকের মধ্যে অনিল মাষ্টারের সাথে যে প্রগাঢ়

পরিচয় গড়ে উঠেছিল, আজ তার ভাইয়ের সামনে বসে সেই সব দিনের কত টুকরো টুকরো স্মৃতি ভেসে উঠছে। আর কী আশ্চর্য। ঘুরে ঘুরে সেই আমার কর্মস্থল এই বর্ধমানের জেলার হাসপাতালে এলেন। অথচ তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো না। ভবিতব্য আর কাকে বলে?

সদয় মাষ্টারের ভাইয়ের দিকে তাকালাম। একটা একটা করে ভাঁজ করা কাগজগুলো খুলে দেখে পুনরায় রেখে দিচ্ছেন। সেইগুলোর মধ্য থেকেই খান কয়েক ফটো বেছে বের করেছেন ভদ্রলোক। ফটোগুলো হাতে নিয়ে গভীরভাবে বিস্ময়কর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছেন। মুখে-চোখে এমন একটা ভাব যেন কূল-কিনারা পাচ্ছেন না। অবশেষে আমার হাতেই ধরিয়ে দিলেন। বললেন—কিছু বুঝছি না। কাঁদের ফটো এগুলো!

হাতে নিলাম। দেখি সব ফটোগুলোই মহিলাদের। বিভিন্ন ধাঁচে তোলা প্রতিকৃতি। হঠাৎ একটা ফটোর ওপর চোখ আটকে গেল। ঠিক। এই ফটোটাই তো লাহিড়ী-বাড়িতে একদিন সন্ধ্যায় অনিল মাষ্টার আমায় দেখিয়েছিলেন। ওঁর ভাইয়ের হাতে দিয়ে বললাম—আপনার বৌদির ফটোটা আলাদা করে রেখে দিন।

ঘাড় নাড়লেন ভদ্রলোক।

—বলেন কী?

—হ্যাঁ, উনি বিয়েই করেন নি।

চকিতে কানের কাছে হিরণের অসমাপ্ত বাক্যটা যেন কথা কয়ে উঠল।

—আশ্চর্য!

মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে গেল। ওঁর ভাই আমায় জিজ্ঞেস করলেন—যা বোঝা যাচ্ছে, আপনার সাথে দাদার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। আচ্ছা, কখন তাঁর সাথে শেষ দেখা হয়?

—শেষ দেখা বলতে গেলে ওই লাহিড়ী-বাড়িতেই। বছর কয়েক আগে একবার গিয়েছিলাম বটে কাটোয়ায়। দেখা হয়নি। লাহিড়ী বাড়িতে গিয়ে দেখি অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। লাহিড়ী মশাই মারা গেছেন। হিরণের সঙ্গে দেখা হলো। হিরণের কাছেই শুনলাম, বাড়িতে আর ছোট ছেলে-পিলে পড়াবার উপযোগী না থাকায় অনিল মাষ্টার চলে গেছেন। কোথায় গেছেন, কেউ বলতে পারল না। হিরণ বলল—কাটোয়া শহরে থাকলে অন্ততঃ তাঁকে দেখা যেত। হিরণের বাবার কাছেও ওঁর কথা তুললাম। তিনি বললেন—আমি তাঁকে বার বার থাকবার জন্য বলেছিলাম। কিন্তু তাঁর সেটা মনঃপূত হয়নি। বলেছিলেন—অপরের অনুগ্রহ নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল। এরপর হঠাৎ একদিন তিনি তাঁর ছোট তোরঙ্গটা নিয়ে উধাও।

ওঁর ভাইকে শুধালাম—আপনি কী করে খবর পেলেন?—এখান থেকে একখানা টেলিগ্রাম যায়—দাদা হঠাৎ ব্লাডপ্রেসার রোগে অসুস্থ। কিন্তু এমনি কপাল যে আমি বাসায় ছিলাম না। মেয়ের বাড়ী গিয়েছিলাম। ফিরে এসে পেলাম। উনি এই বর্ধমানে এসে এখানে-ওখানে ছেলে পড়িয়ে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছিলেন। যেদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন, সেদিন যাঁদের বাড়ীতে পড়াচ্ছিলেন তাঁরাই আমাকে 'তার' করেন। পড়াতে পড়াতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। আমি বর্ধমানে নেমেই তাঁদের ওখানে গিয়েছিলাম। সেখানে সব শুনে এখানে আসছি। কিন্তু এসে কোন লাভই হলো না। ওঁরাই আপনাদের হাসপাতালের 'এমারজেন্সিতে' নিয়ে এসে ভর্তি করিয়ে পরে খবর পাঠান। চোখের দেখাও দেখতে পেলাম না। আপনি জানালেন, নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় দাবীদারহীন মৃতদেহ মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ী নিয়ে গিয়ে সব শেষ করে দিয়েছে। দাদা বড় অভিমানী আর খেয়ালী ছিলেন। তাঁর জন্য কেউ কোন দিন বিব্রত হোক—এ তিনি চাইতেন না। চলে যাবার দিনটিতেও···।

বলতে পারলেন না। গাল বেয়ে টপ টপ করে জলের ফোঁটা পড়ল।

অনিল মাষ্টারের গল্প শেষ হলো।

কোন কোন সময় এক একটি কাঙাল মনের দুরন্ত সাধ এমনি তীব্রভাবে ব্যর্থ হয় যে, বিধাতা পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করলে তাঁকে বড় হিংস্র বলে মনে হয়।

দেবতা

শক্তি মুখোপাধ্যায়

আমার হৃদয়ের যতকিছু ধন
তোমাকে দিয়েছি।

জীবনের নিঃশেষিত অর্ঘ্যপাত্রের
শেষ কণাটুকু
তোমাকে দিয়েছি।

তুমি তাই নিয়ে
তোমার মন্দিরে
উজ্জ্বল আলোর মাঝখানে
আমাকে গ্রহণ করো; আমি
[illegible] এই পৃথিবীতে।

আমার শেষ মিনতি রাখো;
তোমাকে পাওয়ায়
অন্ধকার পথেও যেন
সহস্র দুর্যোগের মাঝে
শক্তি খুঁজে পাই।

আমায় করুণা করো না;
আমি যদিও দুর্বল
তবু আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আজ
পৃথিবীতে চলার পথে
পরম নির্ভরতা
তোমার সঙ্গ যেন পাই।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অবিনাশ সাহা

১০

আশ্বিন মাস। চার তারিখ। দুর্গা পুজো শুরু পাঁচ তারিখ থেকে। গঞ্জ সরগরম। সব মিলিয়ে দশখানি পুজো হয় গঞ্জে। তার মধ্যে উত্তরপাড়া আর দক্ষিণপাড়ায় পুজো বারোয়ারি। উত্তরপাড়ায় মোড়ল নবীন চৌধুরী। দক্ষিণপাড়ায় মোড়ল যশোদা মজুমদার। প্রতি ঘরে ঘরে চাঁদা তুলে পুজো। এখন থেকেই তার জোড়জোড় চলেছে। পয়সার জোর উত্তরপাড়ারই বেশী। চাঁদা যার যেমন খুশি দিক। কোন রকম জোর-জুলুম নেই। যা টান পড়বে নবীনচন্দ্র একা পূরণ করে দেবে। দু'শ' পাঁচশ' সে যাই কেন হোক না। কিন্তু দক্ষিণপাড়ার বেলায় সেটি চলবে না। পুজো আরম্ভ হওয়ার মাসখানেক আগে পঞ্চায়েৎ বসবে। চণ্ডীমণ্ডপ ঝাঁট দিয়ে বিছানো হবে ঘরজোড়া শতরঞ্চি। পাঁচশ' বাতির জুয়েল জ্বালানো হবে। ডাক পড়বে পাড়ার ইতর-ভদ্র সকলের। পরিবারের কর্তা ব্যক্তির। চারদিক জুড়ে বসবে সকলে। মাঝখানে যশোদা মজুমদার। মজুমদারের ডান দিকে রাধারমণ পোদ্দার, বাঁ দিকে গোপীবল্লভ সাধু। পাড়ার দুই উপনেতা। দু'জনেই সল্লা দিয়ে সাহায্য করবে মজুমদারকে।

হাট-বাজারের কাজ মিটলে রাত আটটা নাগাদ বসে পঞ্চায়েৎ। শেষ হয় বারোটা একটায়। আবার প্রয়োজন হলে কোন কোন বার ভোরও হয়ে যায়। শুধু চাঁদার অঙ্কই ধার্য হয় না। আর্জি অপরাধেরও বিচার হয়। বিচারে কারো হয় জরিমানা। কেউ দেয় নাকে-কানে খত। আবার পাঁচ থেকে পঁচিশ জুতোও মারা হয় কাউকে কাউকে।

এবারের পঞ্চায়েতে অনেকগুলো গুরুতর আর্জি পড়েছে। বিচার হবে রাখাল মাঝির, সে ছোট ভাই শ্যাম মাঝির ফলন্ত আম গাছ গোড়া সমেত কেটে রাতারাতি বংশীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। সাক্ষী দুখাই মাঝি। হরিহর রায়ের বিধবা মেয়ের ঘরে শ্যামসুন্দর হানা দিয়েছিল। এ বৈঠকেই তার উপযুক্ত বিচার করতে হবে। মিহিরলাল তার বুড়ো মাকে নিয়মিত ভাত-কাপড় দিচ্ছে না। অথচ বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে নিজেরা দিব্যি আরামে বাস করছে। পঞ্চায়েৎকে এর বিহিতও করতে হবে। ঐ ছাড়া আছে পুজোর মাথট ঠিক করা। খুব হিসেব করে অঙ্ক কষতে হবে এবার। কেন না, এবার শুধু [illegible]

হয়েছে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে মহড়ার কাজ তেমন এগুচ্ছে না। এগুচ্ছে না পাড়ারই জনকয়েকের বেয়াদবির জন্যে। পরিচালকের নির্দেশ নাকি অনেকেই পরোয়া করছে না। এভাবে চললে পুজোয় অভিনয় করা আদৌ সম্ভবপর হবে না। হলেও পাড়ার ইজ্জত যাবে। সুতরাং এই বৈঠকেই এরও উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।...

পাঁচই আশ্বিন। কাজের চাপ প্রচণ্ড থাকায় এবারের বৈঠক সন্ধ্যাবাতি জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই বসে। মজুমদার আজ আর তালপুকুরে যান না। পাড়ার প্রয়োজনে গত রাত্রেই চাঁপালতার কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নিয়েছেন। আশ্বাস দিয়েছেন, রাত থাকে তো চলে আসবেন। চাঁপালতা সে কথা শুনে সোহাগে হেসেছে। হেসেই আব্দার জানিয়েছে, অনর্থক কারো ওপরে যেন জুলুম করা না হয়। শ্যামসুন্দর ওর হাতে-পায়ে ধরে কেঁদেছে। সুতরাং জরিমানা ছাড়া আর যেন কোন শাস্তি ওকে না দেওয়া হয়। পারলে ক্ষমা করলেও আপত্তি নেই।...

পঞ্চায়েৎ বসেছে। পাঁচশ-বাতির জুয়েলের আলোয় আলোকিত চণ্ডীমণ্ডপ। ইতর-ভদ্র পাড়ার সকলেই প্রায় সময় মতো উপস্থিত হয়েছে। বাকী শুধু জনকয়েক। কিন্তু মহারাজ তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। আবার ছোটেন প্রত্যেককে এত্তালা দিতে। ছোটেন নিজের গরজেই। কেন না, মজুমদার পাড়ার মোড়ল হলেও আসর জমাবার প্রাথমিক দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁর। তিনিই নিজের হাতে চণ্ডীমণ্ডপ ঝাঁট দেবেন, পাঁচশ-বাতির জুয়েল জ্বালবেন, শতরঞ্চি বিছাবেন। আবার প্রজারা সকলে একত্র জড় হলে তাদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও করবেন। তাঁর ধারণা, তিনি মহারাজ হরচন্দ্র—দক্ষিণপাড়ার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বাদ বাকী সব তাঁর প্রজা।

প্রজাদের মনোরঞ্জনের কথাই চিন্তা করছিলেন মহারাজ। মজুমদারের জন্য গড়গড়া ঠিক করছিলেন। এমন সময় সভায় বিরোধি রায় বক্রোক্তি করে, কি মহারাজ, আপনি থাকতে আমরা তামাক সেজে খাবো নাকি?

জবাবে মহারাজ শুধু চোখ তুলে এক ঝলক তাকান। কলকের আগুনের মতোই সহসা গনগনে দেখায় তাঁর চোখ-মুখ। হয়তো বা জ্বলেই ওঠেন। কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা সরে না। গড়গড়ার নলটা নিঃশব্দে মজুমদারের হাতে দিয়ে নতুন করে আর দু'টো কলকেতে আগুন দেয়।

কিন্তু বিরোধির তাতে মন ওঠে না। পার্শ্ববর্তী মদনকে ঠেলা মেরে নির্ভয়ে টিপ্পনী কাটে, বুঝলে মদন, এ রাজ্যে ভদ্রতা বলে কোন পদার্থ নেই। সামনের সন সতীশ রায়কেই মহারাজ করতে হবে।...

মুখের কথা শেষ করতে পারে না বিরোধি, মহারাজ তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন, কি বললি বেটা বেইমান, আমি জীবন্ত থাকতে সইতা পাটাকিকে করবি তুই মহারাজ। এত বড়ো আস্পর্ধা তোর!

কিন্তু কি করবো বলুন! যিনি প্রজার সুখ-দুঃখ বোঝেন না, তাঁকে মহারাজ রেখে লাভ কি?—বিরোধি জোরের সঙ্গেই জবাব দেয়।

বটে, এত বড়ো তোর বুকের পাটা! খা বেটা তুই তামাক। এই দু' কলকে তোকে একা গিলতে হবে। না পারিস তো হুঁকোর জল দেবো তোর মাথায় ঢেলে। নে বেটা, ধর!—বলতে বলতে কলকে দুটো হুঁকোর মাথায় বসিয়ে তেড়ে আসেন মহারাজ।

মহারাজের কাণ্ড দেখে মজুমদার হেসে কুটিকুটি হন। বৈঠকের সকলেই। অভিযোগকারী বিরোধি রায়ের অবস্থা শোচনীয়। একবার এ হুঁকোয় টান দেয়, আর একবার ও হুঁকোয়। শেষটায় আর দম নেবার ফুরসৎ পায় না। তর্জনী উঁচিয়েই আছেন মহারাজ। থেমেছে কি মাথায় এক গাট্টা। অবশেষে মজুমদার রাশ টানেন। হাসতে হাসতেই মন্তব্য করেন, থাক মহারাজ, অধম প্রজাকে এবার রেহাই দিন। এই বিরোধি, মহারাজের কাছে ক্ষমা চা।

বিরোধি তাই চায়। দু' হাতের হুঁকো পাশের দু'জনের হাতে দিয়ে নাকে-কানে খত দেয়। কাঁদো-কাঁদো স্বরে দু' হাত দিয়ে মহারাজের পা জড়িয়ে ধরে। বিনিয়ে বিনিয়েই বলতে থাকে, আপনি মূর্খাধিপতি মূর্খ মহারাজ চরচন্দ্র। আপনার রাজত্বে আমরা পরম সুখে বাস করছি। আপনি নিজ হাতে আমাদের তামাক সেজে খাওয়াচ্ছেন। আমার অপরাধ মার্জনা করুন!—বলতে বলতে সজোরে মহারাজের বুড়ো আঙুলের কুশিতে চাপ দেয়।

বেদনায় আচমকা চেঁচিয়ে ওঠেন মহারাজ। তবু দৃঢ় থেকেই শাসাতে থাকেন, পা ছাড় হতভাগা। সভার সকলের কাছে ক্ষমা চা। সকলে ক্ষমা করলেই তোকে ক্ষমা করা হবে।...

কিন্তু বিরোধি তবু পা ছাড়ে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়েই কাঁদতে থাকে। কান্নার ঢং-এ হয়তো বা হেসেই খুন হয়।

এবার পাশের একজন অবস্থার মোড় ঘোরায়, ছি ছি ছি, মহারাজ, এখনো আপনার দয়া হচ্ছে না! দেখুন দেখি কেমন আকুল হয়ে কাঁদছে বেচারা! হাজার হোক আপনার প্রজা তো। না বুঝে অপরাধ না হয় একটা করেই ফেলেছে।...

মহারাজ এর পর আর স্থির থাকতে পারেন না। দু' হাত দিয়ে বিরোধিকে টেনে তোলেন। স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠেই সান্ত্বনা দেন, বোকা কোথাকার, কাঁদিসনে। আমি কি কখনো তোদের ওপর রাগ করতে পারি? শান্ত হ, আমি এক্ষুণি তোকে এক কলকে সুগন্ধি তামাক সেজে খাওয়াচ্ছি।

বিরোধির আশা এবার পূর্ণ হয়। জালে সত্যি এবার মাছ পড়েছে। তাই অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গ চোখ মুছে শান্ত হয়। আড়চোখে পাশের লোকের দিকে চেয়ে ফিক ফিক করে হাসতে থাকে।

কিন্তু মহারাজ তাঁর রাজ-প্রতিজ্ঞা পালন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। মজুমদারের বরাদ্দ তামাক থেকে এক ছিলুম সুগন্ধি তামাক সেজে বিরোধিকে পরিবেশন করেন।

তা দেখে পাশ থেকে মদন মন্তব্য করে, মহারাজের কি পক্ষপাতিত্ব করা চলো না? আমরা কি দোষ করলাম?

উত্তর এবার আর মহারাজকে দিতে হয় না। তাঁর হয়ে মজুমদারই বাধা দেন, চুপ কর মদন। রাজকার্যের তুই কি বুঝিস? মহারাজ, অধমকেও আর এক ছিলুম দিতে আজ্ঞা হয়।

মজুমদারের কথায় আহ্লাদে আটখানা মহারাজ। ভাবখানা, সত্যি যেন উনি পাড়ার একচ্ছত্র অধীশ্বর। আর মজুমদার তাঁর নিয়োজিত শাসনকর্তা। এমন শাসনকর্তা যে, প্রয়োজন মতো তাঁর মান-মর্যাদা রক্ষা করতে জানেন। মজুমদারের জন্যে খুশী মনেই তামাক সাজতে ছোটেন।

মহারাজের বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। অটুট স্বাস্থ্য। গায়ের রং তামাটে। মুখ ভর্তি সোনালী গোঁফ-দাড়ি। শূয়োরের কুচির মতো খাড়া খাড়া বাদামী চুল মাথায়। কিন্তু রূপ আর গুণ'ই কেন থাক না, অতি শৈশবেই পাশের গাঁয়ের এক রূপবতী কন্যার বরমাল্য লাভ করেন। দশ বছরের বিন্দুবাসিনী পিতামাতার নির্বাচনকে হাসিমুখে মেনে নেয়। নতুন শাড়ী, নতুন গয়নার জৌলুসে তার মন ভরপুর। পুতুলের দৃষ্টিতেই শুভদৃষ্টি সম্পন্ন করে।

না, বিন্দুবাসিনীকে ভাগ্যবতীই বলতে হবে। কুঁড়ি থেকে কুসুমে পট পরিবর্তনের আগেই চোখ বোজে সে। পাটরাণী হয়ে পাটে বসার ভাগ্য আর হয় না।

বিন্দুবাসিনী হয়তো মহারাজের অন্তরের অনেকখানি জায়গা দখল করেছিল। তাই আর দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করেননি মহারাজ। আবার এমনও হতে পারে, রাজকার্যের দাপটে সে সুযোগই আর আসেনি। কিংবা কোন মেয়ের বাপ রাজী হয়নি তার মেয়েকে হাত-পা বেঁধে জলে নিক্ষেপ করতে। সে যা'হোক, মোট কথা সংসারে মহারাজের কোন বন্ধন নেই। একমাত্র বন্ধন রাজ্যের প্রজাদের কাছে। তাদের সুখ-দুঃখের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই। সারাদিন তাদের নিয়েই ব্যস্ত। সকালে ঘুম থেকে উঠেই তাঁর প্রাথমিক কাজ হলো খুদে প্রজাদের বিদ্যাদান করা। পাঁচ-সাত থেকে আরম্ভ করে দশ-বারো বয়েসের বিশ-পঁচিশটি ছাত্র-ছাত্রীর উনি গুরুমশায়। চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় খোলা হয়েছে পাঠশালা। যার খুশি এসো, কোন রকম খরচ-খরচা নেই। বিদ্যাদান তো হবেই, লালন-পালনেও ত্রুটি হবে না।...

অনেক মা-বাবাই এ সুযোগ গ্রহণ করে। লেখাপড়া যা হোক তা হোক, ঝামেলার হাত থেকে তো কিছুক্ষণ রেহাই পাওয়া যাবে। মহারাজের কাছে সকলেই তো বেশ থাকে। কাউকে কোলে-পিঠে চড়িয়ে, কাউকে বেত মেরে এবং কাউকে বা পিলে চমকানো ধমক দিয়ে বাধ্য রাখেন উনি। লেখাপড়াও যে একবারে কিছু হয় না তা নয়। সুর করে নামতা পড়া রোজই হয়। বানান করে করে পাঠ পড়তেও অনেককে দেখা যায়। পাঠশালা বেশ ভালোই জমে মহারাজের। আবার খুদেদের দাবী মিটতে না মিটতেই বড়রা এসে হাজির হয়। তাদের আবদার আরো জোরালো। কারো স্বামী হয়তো বিদেশে চাকরি করে। মাস মাস টাকা পাঠিয়েই সে খালাস। হাট-বাজার কে করে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। সকলেই জানে, যার কেউ না আছে তার

আছেন মহারাজ হরচন্দ্র। এমন প্রজাবৎসল মহারাজা ভূভারতে দ্বিতীয় আছেন কিনা সন্দেহ। বাজারের থলে আর টাকা দিলে উনি অম্লান বদনে সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন। একটা পয়সারও অপচয় হবে না। দু'মুণে একটা চালের বস্তা হাট থেকে নিজেই হয়তো ঘাড়ে করে এনে ফেলে দেবেন দোরগোড়ায়। মন্তব্য করবেন, কুলি বেটা চার আনা চেয়েছিল। তা দিয়েছি বেটাকে ভাগিয়ে। পয়সা যেন গাছের গোটা, চাইলেই পাওয়া যায়! কেন, নিজে নিয়ে এসেছি বলে কি আমার মাথাটা কাটা গেলো? নাও, ভাল করে বাছ-বাছ করে ভাঁড়ারে তোল। নিতাইকে লিখে দিয়ো, সে যেন বাড়ির ভাবনা না ভাবে।

সত্যি, মহারাজের রাজত্বে কারো কোন রকম ভাবনা নেই। যার যা কিছু দরকার, কানে শোনার সঙ্গে সঙ্গে উনি নিজে ঘাড়ে করে পৌঁছে দেবেন। বিনিময়ে শুধু প্রাণখোলা একটি ডাক—'মহারাজ'।

মহারাজের বেশভূষাও অতি সাধারণ। মোটা একখানি ধুতি ছাড়া সাধারণতঃ উনি আর কোন অঙ্গাবরণ ব্যবহার করেন না। শীত-গ্রীষ্ম প্রায় সব ঋতুতেই এই ব্যবস্থা। তবে প্রচণ্ড শীতে কোঁচার আঁচলটা কখনো কখনো খুলে গায়ে জড়ান।

বেশভূষার কথা যাই কেন হোক না, ভোজনে কোন রকম ত্রুটি হলে চলবে না ওঁর। দৈনিক প্রাতঃরাশের বরাদ্দ এক বাটি ছাতু—মুড়ী কিংবা দই-চিড়ে। পরিমাণ কম করেও এক সের। দুপুরেও চাই পুরো এক সের চালের অন্ন ও পর্যাপ্ত মাছ-তরকারি। বিকেলে আবার দুধ-ভাত। দুধের পরিমাণ এক সেরের কম হলে বাটিশুদ্ধ ছুঁড়ে মারবেন। রাত্রে আবার মাছ-ভাত। নিজেদের চাষ থাকায় রাজভোগে কোন রকম অন্যথা হয় না। ছোট ভাই গিরিশ অনুজ লক্ষ্মণের মতোই অম্লান বদনে রাজসেবা করে যাচ্ছে। গিরিশ ভাবে, বৌদির বিয়োগ-ব্যথাই দাদার এই মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ। বেচারা, যেমন খুশি দিন কাটান!...

মহারাজকে নিয়ে প্রমোদ-পর্ব শেষ হলে মজুমদার চোখ তুলে তাকান। পঞ্চায়েতের ডাকে সকলেই প্রায় উপস্থিত। বাকী শুধু মতি দেওয়ান আর জন কয়েক। মজুমদার হয়তো মতিকেই খুঁজছিলেন। এমন সময় সে হাজির হয়। অপরাধীর মতোই মজুমদারকে করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে এক কোণে বসতে যায়।

কিন্তু মজুমদার ছাড়েন না। গড়গড়া থেকে মুখ তুলে ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করেন, দেওয়ান বাহাদুরের কি এতক্ষণে সময় হলো?

মতি নির্বোধ নয়। মজুমদারের ইঙ্গিত বোঝে। কিন্তু তবু ব্যাপার গোলমালে যায় না। আসল ঘটনা চেপে নিজের ঘাড়েই দোষ নেয়। সত্যি, নবীনচন্দ্র অহেতুক দেরী করিয়ে না দিলে নিশ্চয় ও সময় মতো পৌঁছতে পারতো। কিন্তু কি আর করা যায়? এ তো সেই গোলমাল অবস্থা—জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ। মতি মাথা হেঁট করেই উত্তর দেয়, আজ্ঞে, ছোট ছেলেটার—

কথা শেষ করতে পারে না মতি, রাধারমণ পোদ্দার হেসে গড়াগড়ি যায়। হাসতে হাসতেই বিদ্রূপ করে, দেওয়ানজীর দেখছি বুড়ো বয়সে ছেলে হয়েছে গলায় মালা।

বা, বলেছ পোদ্দার। [illegible] দেওয়ানজী, পাড়াটাতে আমার শেয়াল-কুকুর আছে। রাধারমণকে সমর্থন করে মজুমদারও হো হো করে হেসে ওঠেন।

সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থ সকলে। সহসা হাসির তুফান ওঠে যেন।

মতি লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছু করার নেই। মাথা নীচু করেই সব হজম করে যায়।

হাসির রোল থামলে মজুমদার গর্জে ওঠেন, শোন দেওয়ানজী, পাড়ায় বাস করতে হলে পঞ্চায়েতের বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।

বিধি-ব্যবস্থার আর কি আছে হুজুর? দেওয়ানজী তো এবার অষ্টমী পুজোর সমস্ত খরচাই দিচ্ছে!—মজুমদারের কথার ওপরে রাধারমণ মন্তব্য করে।

মতি এ কথায় বিরক্তি বোধ করে। পঞ্চায়েতে বসে এরকম অসংলগ্ন কথাবার্তা রীতিবিরুদ্ধ। দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করতেই উদ্যত হয়।

কিন্তু তার আগে মজুমদার মুখর হন, তাই নাকি হে পোদ্দার? কথাটা আগে বলতে হয়! তাহলে তো দেওয়ানজীর সাত খুন মাপ!...

হুজুর!—মতি বিচলিতভাবে বাধা দেয়।

হাসতে হাসতে মজুমদার বলেন, থাক, আর বেশী বিনয় দেখাতে হবে না। ভোগের পাঁটাটা একটু বড়সড় দেখে নিয়ো। মায়ের আশীর্বাদে সংখ্যায় তো আমরা কেউ কম নই।

হুজুর!—মতি আবার ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে।

মজুমদার সে কথায় কান দেন না। রাধারমণকে লক্ষ্য করে বলেন, তারপর পোদ্দার, কার কি নালিশ আছে বলো?

রাধারমণ আদেশ হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। নাকের ডগা থেকে নিকেলের চশমাটা কপালের ওপর তুলে হুঙ্কার ছাড়ে, এই বেটা মিহিরা, ওঠে দাঁড়া না নবাবপুত্তুর!

বেচারা মিহিরলাল। গঞ্জের হাটে সামান্য নুন, লঙ্কা, গুড় বেচে সংসার চালায়। কঠোর পরিশ্রম, রোজগার যৎসামান্য। ছেলেপুলে পাঁচটি। ভাত জোটে তো কাপড় জোটে না। তবু সাধ্যমতো মাকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু মার মন কিছুতেই ভরে না। বউর সঙ্গে অষ্টপ্রহর ঝগড়া লেগেই আছে। মার দাবী—বউকে জন্মের মতো বাপের বাড়ি নির্বাসন দিতে হবে। আর নয়তো তাকে দিতে হবে বৃন্দাবনে থাকার আলাদা খরচা। কিন্তু মিহির-লালের পক্ষে এর কোনটাই মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এই তার অপরাধ।

পোদ্দারের হুঙ্কার কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে করজোড়ে উঠে দাঁড়ায় মিহিরলাল। দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে।

পোদ্দার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ওর মার দেওয়া আর্জি এক-দমে বলে যায়।

মজুমদার কিছু ধরে খানিকক্ষণ শুনে মিহিরলালের উদ্দেশে গর্জে ওঠেন, এই বেটা কলির পরশুরাম, মা গর্ভধারিণী! তাকে তুই না খেতে দিয়ে মেরে ফেলতে চাস! তেত্রিশ কোটি নরকেও তো তোর স্থান হবে না রে গাড়ল।

হুজুর!—মিহির কাঁপতে কাঁপতেই কি যেন বলতে যায়। কিন্তু অবকাশ পায় না।

মজুমদার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা ধমক দেন, চুপ কর নচ্ছার। জুতিয়ে গাল ভেঙে দেবো। প্রতি মাসের সাত তারিখের মধ্যে খোরাকী বাবদ পাঁচ টাকা মাকে দিবি। এর নড়চড় হয়েছে কি মাথায় ঘোল ঢেলে তোকে আমি গ্রাম থেকে বার করে দেবো।

রায় শুনে হয়তো বা ভিরমি খেয়ে পড়ে যায় মিহিরলাল। কষ্ট কোন কথা বলতে ভরসা পায় না।

মজুমদার রায়ের অবশিষ্টটুকু ঘোষণা করেন, মার টাকা বাদে পঞ্চায়েতের জরিমানা নগদ পাঁচ টাকা। কালকেই জমা দিবি।

হুজুর, হাতে একটাও পয়সা নেই। টাকার অভাবে এ হাটে চাল কিনতে পারিনি। দয়া করে সাত দিন সময় দিন।—ছুটে গিয়ে মজুমদারের পা জড়িয়ে ধরে কাতরাতে থাকে মিহিরলাল।

মজুমদার দাঁত খিঁচিয়ে ওঠেন, আচ্ছা, সামনের হাট পর্যন্ত সময় রইলো। এর মধ্যে যদি টাকা জমা না দিস তা হলে তোকে জুতো-পেটা করবো বদমাশ।

সময় পেয়ে আঁচল দিয়ে চোখ মোছে মিহিরলাল। চুপ করে এক কোণে এসে বসে। নিজের মনেই আকুল হয়ে ভাবতে থাকে, এমন মাও মানুষের হয়! ছেলেমেয়েগুলোকে এবারের পুজোয় আর কিছুই কিনে দিতে পারবো না।···

মিহিরলালের বিচার শেষ হলে পোদ্দার শ্যামসুন্দরকে হাঁক দেয়, শ্যামা, এদিকে আয়।

বন্ধকী কারবার শ্যামসুন্দরের। পঞ্চাশ ঊর্ধ বয়েস। দোহারা চেহারা। ডান পায়ে বাত থাকায় জল বাঁধা আছে। মাথা জুড়ে বিরাট টাক। গত ফাল্গুনে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে ঘর-সংসার। অবস্থা মোটামুটি ভাল। তলব হবার সঙ্গে সঙ্গে কোণ থেকে উঠে দাঁড়ায়। কাঁপতে কাঁপতে সমস্ত সভাকে করজোড়ে প্রণাম জানায়।

মজুমদার সেদিকে তাকিয়েই হুংকার দিয়ে ওঠেন, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন হারামজাদা, সামনে আয়।

শ্যামসুন্দর তাই আসে—ডান পা খোঁড়াতে খোঁড়াতে। মাথা নত করে এসে দাঁড়ায়।

মজুমদার আবার গর্জে ওঠেন. কিরে নচ্ছার, হাতীর পাঁচ পা দেখেছিস, না? মা-বোন জ্ঞান নেই হারামজাদা!

হুজুর—

চুপ কর উল্লুক।—মজুমদারের কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে শ্যামসুন্দর। সমস্ত সভা নিস্তব্ধ।

একটু দম নিয়ে রাধারমণ অনুরোধ জানায়, বদমাশটা কি বলতে চায় শুনুন হুজুর।

শ্যামসুন্দর তবু মুখ খুলতে সাহস পায় না। চোখ পিট পিট করে তাকায়।

মজুমদার দাঁত খিঁচোন, বল হারামজাদা, কি তোর বলবার আছে?

শ্যামসুন্দর কাঁপা গলায় আরম্ভ করে, হুজুর, মা চণ্ডীর দিব্যি, আমার কোন দোষ নেই। ঘাটের পথে চারু আমাকে চোখ ইসারা করেছিল। আমি—

চুপ কর শয়তান। চারু যদি তোকে চোখ ইসারাই করবে, তবে সে চেঁচিয়ে লোক জড় করবে কেন? জুতিয়ে তোর মুখ ভেঙে দেবো বজ্জাত।—মজুমদারের গর্জনে সমস্ত চণ্ডীমণ্ডপ গম্‌গম্‌ করতে থাকে।

গোপীবল্লভ সাধু আর ধৈর্য রাখতে পারে না। ধাঁ করে উঠে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় শ্যামসুন্দরের বাঁ গালে। মজুমদারের সঙ্গে সমতা রেখেই তড়পাতে থাকে, হুজুরের কাছে মিথ্যে বলবি তো তোকে মেরে ফেলবো শয়তান।

চড় খেয়ে ঝোঁক সামলাতে পারে না শ্যামসুন্দর। মাথা ঘুরে পড়ে যায়। যন্ত্রণায় গালে হাত দিয়ে কোঁপাতে থাকে।

কিন্তু মজুমদার তাতেও ক্ষান্ত হন না। চীৎকার করেই আদেশ দেন, চড় নয়, জুতোপেটা কর নচ্ছারকে—পঁচিশ জুতো।

জুতোপেটার হুকুম হতেই হরিহর উল্লাসে ফেটে পড়ে। নিজে তেড়ে আসে চটি হাতে। এক ঘা বসিয়েও দেয় শ্যামসুন্দরের পিঠের ওপরে।

দ্বিতীয় ঘা পড়ার আগেই শ্যামসুন্দর ছুটে গিয়ে মজুমদারের দু'পা জড়িয়ে ধরে। আকুল হয়ে কাতরাতে থাকে, হুজুর, আমাকে বাঁচান। আমি কোন দিন আর এমন কাজ করবো না। আমার ছেলের দিব্যি—মা চণ্ডীর দিব্যি।···

মজুমদার হঠাৎ গর্জে উঠেছিলেন, হঠাৎই আবার শান্ত হন। শান্ত হন শ্যামসুন্দরের বুক-ভাঙা কান্নার নয়। সহসা চাঁপার মুখখানি মানসপটে ভেসে ওঠে। মনে পড়ে, চাঁপা বলে দিয়েছে, শ্যামসুন্দরকে যেন বেশী অপদস্থ করা না হয়। দু'শ টাকা জরিমানার মধ্যেই যেন শাস্তি সীমাবদ্ধ থাকে।···মজুমদার শান্তভাবেই আদেশ প্রত্যাহার করেন। বলেন, জুতো মেরে এটাকে ঢিট করা যাবে না পোদ্দার। পয়সার গরমেই বেটার গরম, ওর সেই গরমই ভাঙতে হবে।···

যা বলেছেন হুজুর।—গদগদ হয়ে রাধারমণ পোদ্দার মজুমদারকে সমর্থন করে। রাধারমণের সমর্থন পেয়ে মজুমদার নির্দ্বিধায় রায় দেন, দু'শ টাকা নগদ জরিমানা। প ছাড় বদমাশ।

এতো টাকা আমার নেই হুজুর। দয়া করে কিছু কম করুন।—শ্যামসুন্দর পা ধরেই কাকুতি জানায়।

মজুমদারের গলা আবার চড়ে—ফের কথা বলবি তো—

নচ্ছারকে জুতোপেটা না করলে টাকা বেরুবে না হুজুর।—গোপীবল্লভ মন্তব্য করে।

সে কথার সমর্থনে মজুমদার শুধোন, কিরে, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে, না—

দোহাই হুজুর, একশ টাকা আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি। বাকী একশ'র জন্ত দয়া করে দিন কয়েক সময় দিন।—শ্যামসুন্দর পা জড়িয়েই থাকে।

মজুমদার উত্তর দেবার আগে গোপীবল্লভ বলে, নগদ টাকা না দিতে পারে স্ত্রীর গা'র গয়না জমা দিক। জরিমানার টাকা কিছুতেই বাকী রাখা উচিত হবে না হুজুর।

হ্যাঁ, তাই দিক,—সাধু প্রস্তাব। রাধারমণ গোপীবল্লভকে সমর্থন করে।

শ্যামসুন্দর এবার নিরুপায়। নিরুপায় হয়েই আবার অনুনয় জানায়, হুজুর, বাড়ির লোক কিছুতেই গয়না হাতছাড়া করবে না। সাত দিন না হোক, দয়া করে অন্ততঃ তিনটে দিন আমাকে সময় দিন।

একদিনও নয়—গোপীবল্লভ দৃঢ় থেকেই বাধা দেয়।

মজুমদার কি করবেন স্থির করতে পারেন না।

বয়োবৃদ্ধ ইন্দ্র পাটারি সেদিকে লক্ষ্য করে ফোঁড়ন কাটে, দাও ভাই, দাও। মাত্র তো তিনটে দিন। বুঝতে পারছো না, এখানে জুতো, খেয়ে খেয়ে—বেচারা যায় কোথায়?—বলে খিল খিল করে হাসতে থাকে পাটারি।

পাটারির রসিকতায় সভাস্থ সকলেই হেসে কুটিকুটি হয়। মজুমদার নিজেও।

হাসি থামলে গোপীবল্লভ বলে, বেশ, টাকা কিংবা গয়না যদি না দিতে পারে তা' হলে 'হ্যাণ্ডনোট' লিখে দিক। আমি নগদ টাকা পঞ্চায়েৎকে দিয়ে দিচ্ছি।

সাধু প্রস্তাব। এর পরে আর কোন কথা হতে পারে না হুজুর।—রাধারমণ গোপীবল্লভকে সমর্থন করে।

মজুমদার হয়তো এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তবু মিত্রদের খুশী করতে সমর্থন জানান। গলার স্বর গম্ভীর করে বলেন, বেশ, তাই দিক।

সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে পোদ্দার বুক পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে শ্যামসুন্দরের দিকে এগিয়ে ধরে। সাত দিনের কড়ারে গোপীবল্লভের নামে একশ পঁচিশ টাকার 'হ্যাণ্ডনোট' লিখে দিতে বলে।

শ্যামসুন্দরের চক্ষুস্থির। একশ টাকার সুদ সাত দিনে পঁচিশ টাকা!

ওকে ইতস্ততঃ করতে দেখে রাধারমণ ধমক দেয়, কি ভাবছিস? আমাদের আর কাজ নেই?

শ্যামসুন্দর নিরুপায়। বলির পাঁটার মতোই কাঁপতে কাঁপতে জবাব দেয়, সুদটা বড্ডো বেশী হয়ে যাচ্ছে দাদা। দয়া করে—

সুদের হিসেব বাড়িতে বসে করিস লম্পট। যা বলছি ভালয় ভালয় লিখে দে। নয়তো—

কথা শেষ করতে পারে না রাধারমণ, মজুমদার বাধা দেন, থাক পোদ্দার, ওটা একশ কুড়ি করে নাও।

বেশ, হুজুর যা বলেছেন তাই দে। ফের কথা বলবি তো জুতিয়ে মুখ ভেঙে দেবো।—রাধারমণ আবার গর্জে ওঠে।

কিন্তু শ্যামসুন্দর তবু হিসেবে আসতে পারে না। বলে কি, একশ টাকার সুদ সাত দিনে কুড়ি টাকা! ও যে এক মাসেও কারো কাছ থেকে এরকম সুদ চাইতে পারবে না। তাই মরিয়া হয়ে মজুমদারকে লক্ষ্য করে আবার কাকুতি জানায়, হুজুর—

না না, আর তোর কোন কথা আমি শুনবো না। জলদি 'হ্যাণ্ডনোট' লিখে দে। আমাদের অনেক কাজ আছে।

শ্যামসুন্দর নিরুপায়। এক হাতে চোখের জল মোছে আর এক হাতে কলম ধরে। লিখতে লিখতে মনে মনেই মজুমদারের ওপরে ফেটে পড়ে, গরীবের সব কিছুতেই দোষ। কিন্তু নিজে কি করছো জাহু? দিব্যি তো পরের বউকে ঠাকুরবাড়িতে আটকে রেখে রাসকেলি করছো।...

লেখা হয়ে গেলে গোপীবল্লভ এক নজরে গোটাটা পড়ে নেয়। তারপর ভাঁজ করে পকেটে রাখতে গেলে ইন্দ্র পাটারি ফোঁড়ন কাটে, হুজুর, সাবুজী টাকা একশ নগদ পঞ্চায়েতের সামনে রাখলে কি সভিকারের সাহুকার পরিচয় দিতেন না?

চুপ করো পাটারি। সব সময় হাসি-ঠাট্টা ভাল লাগে না।—পোদ্দার চোখ-মুখ গরম করে বাধা দেয়।

উত্তরে পাটারি বলে, ভাল না লাগে একটু জল মিশিয়ে খাও পোদ্দার।

আঃ, কি হচ্ছে পাটারি! টাকা কি কখনো চোখে দেখনি? গোপীবল্লভ পঞ্চায়েতের মনোনীত কোষাধ্যক্ষ। সব টাকা ওর কাছেই থাকবে। তবে আর এখানে বয়ে আনার প্রয়োজন কি? মজুমদার রাশ টানেন।

পাটারি তবু থামতে চায় না। পোদ্দারও না।

বিরক্ত হয়ে মজুমদার উঠে দাঁড়ান। রাগতস্বরে বলেন, তোমরা যদি এভাবে গোলমাল করো তাহলে আমি চললেম।

গোপীবল্লভ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে। পোদ্দার আর পাটারকে এক ধমকে চুপ করিয়ে দেয়। সমস্ত সভা নিস্তব্ধ।

সকলের মিলিত অনুরোধে আবার আসন গ্রহণ করেন মজুমদার।

পোদ্দার পরের আসামী রাখাল মাঝির নাম ধরে ডাকে।

সিঁড়িতে বসে ছটফট করছিল রাখাল। কি ফ্যাসাদেই না পড়েছে ও। জালে যাবার সময় হলো অথচ কখন ছুটি হবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সহসা পোদ্দারের ডাকে আঁৎকে ওঠে। ভয়ে ভয়েই আসরে গিয়ে দাঁড়ায়। সকলকে হাতজোড় করে দণ্ডবৎ করে।

মজুমদার তার মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই গর্জে ওঠেন, কিরে ব্যাটা, গায়ে খুব তেল হয়েছে, না ?

আইজ্ঞা, না হুজুর। ও গাছ আমিই বুনছিলাম। কিন্তু ফল লইয়া পোলাপানগ লগে রোজ রোজ কগড়া লাগে দেইখা—

চুপ কর জানো'র। ফলন্ত গাছটাকে তাই বলে কেটে ফেলবি ?

আইজ্ঞা অন্যায় হইচে। দয়া কইরা মাপ কইরা দেন।

ওরে আমার গোপাল রে, অন্যায় হয়েছে বললেই যেন সাত খুন মাপ! নাকে-কানে খত দে হারামজাদা।—মজুমদারকে ডিঙিয়ে রাধারমণ ফুঁসে ওঠে।

মজুমদার বলেন, আর কোনদিন যদি তোর নামে কোন নালিশ শুনি তাহলে পাড়া থেকে ঘাড় ধরে বার করে দেবো। দে নাকে-কানে খত।

রাখাল তাই দেয়। ফিরে আবার সমস্ত সভাকে দণ্ডবৎ করে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

মজুমদার রায়ের অবশিষ্টটুকু ঘোষণা করেন, জরিমানা পাঁচ টাকা। সামনের হাটবারের মধ্যেই জমা চাই।

নাকে-কানে খত দিয়ে কতকটা হালকা হয়েই বাড়ি ফিরছিল রাখাল, জরিমানার কথা শুনে মুষড়ে পড়ে। কাঁদ কাঁদ হয়েই বলে, হুজুর, মইরা যামু। দয়া কইরা জরিমানাডা মাপ কইরা দ্যান।

মর না হারামজাদা। গাছ কাটবার সময়ে মনে ছিল না ? পোদ্দার, জরিমানা আদায় হলে দু'টাকা তামাকে দিয়ে দিয়ো। ও মজুর আর একটা কলম কিনে লাগাবে। তারপর কি আছে বলো ?

জরিমানা থেকে রেহাই না পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকে রাখাল। পোদ্দার ধমক দেয়, দূর হ হতভাগা। গাছ কাটার বিষ কেমন বুঝে দেখ।

নিরুপায় রাখাল চোখ মুছতে মুছতেই বিদায় হয়।

পোদ্দার বলে, হুজুর, নাটকের মহড়ায় অনেকেই নাকি ঠিক-মতো আসছে না। জ্ঞান মাষ্টার নালিশ জানিয়েছে।

কে কে আসছে না ?

আজ্ঞে, পঞ্চায়েৎ বসছে শুনে পরশু থেকে সকলেই প্রায় আসতে শুরু করেছে। একমাত্র সতীশ রায় বেগ দিচ্ছে।

কোথায় সে হারামজাদা ?

আজ্ঞে, নন্দার পাঠ আমার ভাল লাগে না। আমাকে দিয়ে ও ভূমিকা হবে না। কোণ থেকে সতীশ উঠে হাত জোড় করে।

আলবৎ হবে। কাল থেকে নিয়মিত মহড়ায় আসবি। আর যেন নালিশ না আসে। আর কোন আর্জি আছে পোদ্দার ?

সতীশ আপন মনেই কি যেন বিড় বিড় করে বলতে বলতে বসে পড়ে।

রাধারমণ বলে, আজ্ঞে, না হুজুর। আর কোন আর্জি নেই। এবার মাথট ঠিক করলেই সভার কাজ শেষ হয়।

তার আগে মহারাজকে একবার তলব করো।

হাসতে হাসতে রাধারমণ বলে, মহারাজ সর্বদাই প্রস্তুত হুজুর। ঐ দেখুন, কলকে আসছে।

তাজা কড়া তামাক পেয়ে মজুমদার আয়েসের সঙ্গে টানতে থাকেন। এরপর এক এক করে সকলেই। পাঁচটা জলভরা নারকেলের হুঁকো হাতে হাতে ফিরতে থাকে। রাশিকৃত ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে খেয়ে ঘরময় ছড়িয়ে যায়। যেন ধুনুচি জেলে দেবী দুর্গার আরতি চলেছে।

তামাক-পর্ব শেষ হলে মাথট-পর্ব শুরু হয়। মতি বরাবর তিন টাকা চাঁদা দিয়ে আসছে, কিন্তু এবার ধরা হয়েছে পাঁচ টাকা। হাতে যথেষ্টই টান যাচ্ছে। হিসেব মতো আপত্তি করাই উচিত ওর। কিন্তু মতি কোন রকম ওজর-আপত্ত করে না। করে না অনেকটা ভেবে-চিন্তেই। যেভাবে ঠাট্টা-তামাসা চলেছিল তাতে সত্যিকারের অষ্টমী পূজোর টাকা চেয়ে বসলেই বা কি করতে পারতো ও ? এ বরং ভালই হলো। মতি হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ওর মতো অনেকেই। শুধু গোল বাধে পিতাম্বর মাষ্টারকে নিয়ে। মাষ্টার কিছুতেই দশ টাকা চাঁদা দিতে রাজী নয়।

শিক্ষক বলে মজুমদার বার কয়েক ধৈর্যের পরীক্ষা দেন। তোষিয়ে তোষিয়েই বশে আনতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেজাজ রাখতে পারেন না। ক্ষিপ্ত হয়েই মন্তব্য করেন, বাড়িতে দালান তুললে, একটার জায়গায় দুটো কারবার খুললে, আর মায়ের নামে সামান্য দশটা টাকা দিতে পারবে না মাষ্টার! তুমি দেখছি আস্ত একটা পিশাচ।

পিশাচ বলে পিশাচ—নিরেট শেওড়া গাছের পিশাচ। হুজুর, মাষ্টারকে তেল মাখিয়ে কিছু হবে না। আসল দাওয়াই দিতে হবে।—মজুমদারের কথায় সায় দেয় গোপীবল্লভ।

বেশ, যেভাবে পারো আদায় করো। দশ টাকায় এক পয়সা কম নেবে না।

কম কি বলছেন হুজুর, দেখুন না কাউও কিছু এসে যাবে। মদন, হীরু, তোরা তোদের কাজ করে আয়। হুজুর, আর এক কলকে তামাক টানুন।—গোপীবল্লভের ইঙ্গিতে মদন-হীরু উঠে যায়। মজুমদার অগত্যা তামাকই টানতে থাকেন।

সভায় কেউ গোপীবল্লভের কথা ঠাওর করতে পারে না। এমন কি মজুমদারও নন। শুধু রাধারমণ মুচকি মুচকি হাসতে থাকে।

পিতাম্বর চিন্তিত হয়ে ওঠে। বাড়ি যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়।

রাধারমণ বাধা দেয়, একটু দাঁড়িয়ে যাও মাষ্টার। রাত বেশী হয়নি।

রাধারমণের কথায় কোন জবাব না দিয়ে মজুমদারকে লক্ষ্য করে বলে পিতাম্বর, মেজবাবু, আমি চললাম।

মেজবাবু! সভায় কেউ তো ওঁকে এভাবে সম্বোধন করে না। মাষ্টারের এত স্পর্ধা কোত্থেকে হলো!···মিনিটখানেক মুখ দিয়ে কোন কথা সরে না মজুমদারের। তার পর ক্রোধমিশ্রিত শ্লেষের সঙ্গে উত্তর দেন, দয়া করে আর একটু থেকেই যান হুজুর। বাড়িতে কেউ সিঁধ দেবে না।

মজুমদারের কথায় পিতাম্বর লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ধ বলে যায় পাশ ফিরে তাকিয়ে। হীরু আর মদন ফিরে আসছে। হীরুর কাঁধে আস্ত একটা সাবসাছের ঢেঁকি। আর মদনের মাথায় সেই ঢেঁকিঘরের দুখানি নতুন ঢেউ-টিন। কিন্তু ওগুলো যে সবই তার নিজের বাড়ির!···পিতাম্বর বুঝি বা মাথা ঘুরে পড়ে যায়।

মদন আর হীরুর কাণ্ড দেখে সভায় নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হয়। যার যেমন খুশি মন্তব্য করে। হেসে লুটিয়ে পড়ে কেউ কেউ। মজুমদার নিজেও। পিতাম্বর কি করবে বুঝতে পারে না। মতি ভূম হয়ে বসে আছে। এ ইতর উল্লাস ওর ভাল লাগে না। ইচ্ছে হয় পিতাম্বরের হয়ে প্রতিবাদ করে। কিন্তু নিরস্ত থাকে পরিণামের কথা ভেবে। বিপদের দিনে কেউ তো সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। নবীনচন্দ্র যদি বিমুখ না হতেন।...

রাগে অপমানে পিতাম্বরও দিশেহারা। সকলে মিলে ওকে যেন বাঁদর নাচ নাচাচ্ছে। না, অসহ্য। কোন ভদ্রলোকের পক্ষে সম্ভব নয় এ অপমান নীরবে সহ্য করা। পিতাম্বর উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে, কাজটা কি উচিত হলো মেজবাবু?

হয়নি নাকি? তাহলে কি করতে হবে বলুন হুজুর।—মজুমদার ব্যঙ্গের হাসিই হাসেন।

পিতাম্বর আর কোন কথা বাড়ায় না। সভা ত্যাগ করতে উদ্যত হয়।

মজুমদার আপন ঢংয়েই শুধোন, হুজুর কি চললেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এটা ভদ্রলোকের সভা নয়। আমি থানায় চললুম।—দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দেয় পিতাম্বর।

মজুমদারের ঠোঁটের হাসি মুহূর্তে উবে যায়। সিংহনাদে গর্জে ওঠেন, কি বললে মাষ্টার?

সভা নিস্তব্ধ। পিতাম্বর থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভয়ে কাঁপতে থাকে থর্ থর্ করে।

মজুমদার বলেই যান, বাড়িতে দু'খানি ইঁট পুঁতে ভাবছ লাট হয়েছ?

অবস্থা সঙ্গীন দেখে ইন্দ্র পাটারি লাফ দিয়ে উঠে আসে। পিতাম্বরকে হাত ধরে বসিয়ে দেয়। নিজেই ক্ষমাপ্রার্থী হয় মজুমদারের কাছে। সবিনয়ে বলে, জানেনই তো হুজুর, মাষ্টার কৃপণ মানুষ। তাই তাল সামলাতে পারেননি।

তাল তাল করে সামলিয়ে দেবো। এর জমাদারি তুলে কথার জলে ডুবিয়ে দিলে কার ক্ষমতা আছে রক্ষা করে? পোদ্দার—

পাটারির মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে ফেটে পড়েন মজুমদার। নিজেও রাগে থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকেন।

পাটারি আবার অনুনয় জানায়, শান্ত হোন হুজুর—শান্ত হোন। মাষ্টার টাকা না দেন, আমি ওঁর হয়ে দেবো। আপনি ওঁকে ক্ষমা করুন।

তুমি চুপ করো পাটারি। থানা-পুলিশ কাকে বলে তা আমি ওকে দেখিয়ে দেবো। পোদ্দার, নীলাম শুরু করো। দেখি মাষ্টারের কোন্ পুলিশ বাধা দেয়।

পিতাম্বর এবার আর চুপ করে থাকতে পারে না। লজ্জানত মুখে উঠে দাঁড়ায়। হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করে, হুজুর, আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। আমার অন্যায় হয়েছে। আপনারা সকলে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এক্ষুনি দশ টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

মাষ্টার, সেই জল খেলে—ঘোলা করে খেলে। হুজুর, মাষ্টার যখন ক্ষমা চাইছে তখন ওকে ক্ষমা করুন।—গোপীবল্লভ অনুরোধ জানায়।

মহারাজ ইতিমধ্যে আর এক কলকে তামাক এনে হাজির করে। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে মজুমদার বলেন, পোদ্দার, মাষ্টারের ঢেঁকি আর টিন জায়গা মতো রেখে আসতে বলো।

রাত প্রায় তিনটেয় সভা ত্যাগ করেন মজুমদার। ভোর হতে এখনো ঘণ্টা তিনেক বাকী। হিসেব মতো তালপুকুর যাওয়াই উচিত। কিন্তু কি জানি কেন বাড়ির পথেই পা বাড়ান মজুমদার। চলতে চলতে পিতাম্বরের কণ্ঠস্বরই কানে অনুরণিত হতে থাকে, মেজবাবু, এ সভা ভদ্রলোকের সভা নয়।

[ক্রমশঃ।

শনিবার

শ্রীলা ঘোষ

কেন্দ্রীয় সরকারী অফিস সেলে,
শনিবার কী নিরানন্দময়?
ঢং ঢং করে দুটো বাজে।
হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ দুলে ওঠে,
স্বভাবতঃ মুক্তি চায় পাখনা মেলতে।
কর্তৃপক্ষ শাসিয়ে ওঠে:
লেজার খুলে 'কিগার' হয় তৈরী,
যেমনে হোক পাঁচটার ভেতর
'বড় সাহেবে'র কাছে পৌঁছান চাই;
বুঝি, শনিবার নেই আর।
সেলের দরজা বন্ধ,
অক্টোপাশ করেছে কুক্ষিগত।
মুহূর্ত্ত কাটে প্রহরের মত,
সবুজ হয় নিঃশোষিত,
তবু পাঁচটা বাজে।
কেরাণী পথে নামে:
ময়দান সবুজ শূন্য,
কলকাতা লাখো প্রাণের মাঝে
স্পন্দনহীন।
এ শারদীয় নীল আকাশ
প্রাণ জাগাতে ব্যর্থ।
শনিবার আজ আর
ফিরে না, আশ্লেষায় ॥

ক্রমবিকাশের ধারায় উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর জন্মকথা

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

পৃথিবীর আদি ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ওটা সূর্যসম এ খানি জলন্ত বাষ্পপিণ্ডস্বরূপ ছিল। সূর্যসম এর নিজস্ব আলোও ছিল প্রচুর। তারপর সেই বাষ্প যুগের সমাপ্তিতে পৃথিবী তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই তরল পিণ্ড অবস্থায় পৃথিবীর আদি ধাতুসমূহ, যেমন লৌহ, নিকেল, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানীজ, দস্তা ঐ পিণ্ডেই একাকার ছিল অর্থাৎ স্বীয় আকৃতি ও স্বীয় বৈষম্য অবিদ্যমান ছিল। তারপর ক্রমবিকাশের ধারায় পৃথিবীপৃষ্ঠ শক্ত পিণ্ডে পরিণত হয় এবং উপরোক্ত আদি ধাতুসমূহও স্বীয় আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমন্বিত হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু উপরোক্ত দুই অবস্থান্তরে পৃথিবীর বহু কোটি বৎসর ব্যয়িত হয়েছে এবং বহু রূপান্তরও সাধিত হয়েছে। পৃথিবীর বাষ্প যুগের শেষ পর্যায়ে পৃথিবীর বাতাসে ছিল হাইড্রোজেন, হিলিয়াম্, কার্বন ও ক্লোরিন গ্যাসসমূহ। সামান্য অক্সিজেন হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় ছিল এবং অধিকাংশ অক্সিজেন উপরোক্ত ধাতুসমূহের অক্সাইড্‌রূপে বিরাজমান ছিল। ঐ সব অক্সাইড্ (ধাতুর) হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাহায্যে পৃথিবীতে প্রথম জল উৎপাদনে সমর্থ হয়। হাইড্রোক্লোরিক এসিডও একদিনে এসিডে পরিণত হয়নি। প্রথমে ক্লোরিন্ গ্যাস হাইড্রোজেন গ্যাসের সংযোগ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড্ গ্যাসের সৃষ্টি করে। উক্ত গ্যাসই ক্রমবিকাশের ধারায় ও অনুকূল পরিবেশে একদিন এসিডে পরিণত হয়। এসিড্ যুগ পৃথিবীর তরল পিণ্ডাকার যুগ। হাইড্রোজেন ক্লোরাইড্ গ্যাস যুগ ছিল তড়িৎ চুম্বকীয় যুগ। পৃথিবী প্রথমে চুম্বকীয় শক্তির অধিকারী হয় এবং তারপর তড়িৎশক্তির অধিকারী হয়। পৃথিবীর উত্তাপ যখন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে ৭৭০° সেণ্টিগ্রেডে পৌঁছল তখন এক মাত্র লৌহ (ধাতু) বাষ্পের সংমিশ্রণে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম চুম্বকশক্তির আবির্ভাব হয়। পৃথিবী যে চুম্বক-শক্তি লাভ করে, তা সূর্যেরই দান। পৃথিবীর আদি অবস্থা হতে সূর্য পৃথিবীকে চুম্বকশক্তি দান করলেও পৃথিবী উপরোক্ত তাপমাত্রায়ই লৌহের সাহায্যে সেই দান প্রথম গ্রহণ করে। পৃথিবীপৃষ্ঠ অত্যধিক চুম্বকশক্তিতে পরিণত হলে পৃথিবীতে তড়িৎশক্তিরও আবির্ভাব হয়। আমরা জানি, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস জলীয় পদার্থের সংমিশ্রণে বিশেষভাবে আয়নিত হয়। উক্ত গ্যাসের এই বৈশিষ্ট্য কেন? কারণ, পৃথিবীর প্রচুর চুম্বকীয় শক্তির সাহায্যে উক্ত গ্যাস বিশেষভাবে আয়নিত হওয়ায় সমগ্র পৃথিবীবক্ষে তড়িৎশক্তির সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। উক্ত গ্যাস যুগে জল শুধু বাষ্পবিন্দুতেই নিহিত ছিল; পরিষ্কার স্বচ্ছ জল তো দূরের কথা, এমন কি লবণাক্ত কিংবা এসিড মিশ্রিত জলেরও তখন সৃষ্টি হয়নি। লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম ও দস্তা প্রভৃতি ধাতুর অক্সাইড সংযোগে হাইড্রোক্লোরিক এসিড সর্বপ্রথম পৃথিবীতে জল আনয়ন করে। সেই আদিযুগের লবণাক্ত এবং এসিড মিশ্রিত অকিঞ্চিৎকর জলরাশি পৃথিবীতে "সহজাত ও স্বাভাবিক তড়িৎ" উৎপাদনে প্রচুর সাহায্য করে পরবর্তী সালফিউরিক এসিড এবং উক্ত এসিড সংযোগে দস্তা, তামা, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি ধাতুর সাহায্যে। সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ধাতুদ্বয় তাদের অক্সাইড এবং হাইড্রোক্সাইডের সাহায্যে এবং পরস্পর মিলনের দ্বারা পৃথিবীতে প্রকৃত জল ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে সমর্থ হয়েছিল। এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, রসায়ন শাস্ত্রবিদগণ পটাসিয়াম ও সোডিয়াম ধাতুদ্বয়কে যে অতি প্রাচীন ধাতুরূপে গণ্য করেছেন, তা স্বীকার করা চলে না; কারণ তড়িৎ-যুগ চৌম্বক যুগের পরবর্তী যুগ; সুতরাং চৌম্বকীয় ধাতুসমূহ, যেমন লৌহ, নিকেল, কোবাল্ট ও ম্যাঙ্গানীজ উক্ত ধাতুদ্বয় অপেক্ষা অধিক প্রাচীন। এমন কি দস্তা, তাম্র, সীসা, ক্রোমিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও লিথিয়াম উক্ত ধাতুদ্বয় অপেক্ষা পুরাতন। তাম্রের কার্যকারিতা দেখা যায় কার্বন-মনোক্সাইড যুগে এবং বাষ্প যুগেও। উক্ত উভয় যুগই পৃথিবীর অতি প্রাচীন যুগ। ধাতুর ক্রমবিকাশের ধারা বিচারে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, পৃথিবী আদি উত্তপ্ত অবস্থা হতে শীতল ও শীতলতর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় কঠিন স্তরে পরিণত হয়েছে। সুতরাং ধাতুর পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic weights) এবং গলনাঙ্ক (Melting points) সীমারেখা এখানে বিচার্য বিষয়। লৌহ, নিকেল, কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম্ ও ম্যাঙ্গানীজ ধাতুসমূহের পারমাণবিক সংখ্যা ও গলনাঙ্কে বিশেষ পার্থক্য নেই এবং এদের প্রত্যেকেরই গলনাঙ্ক ১২৪০° সেণ্টিগ্রেড হতে ১৫৩৩° সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে। অতএব এগুলি নিঃসন্দেহে অতি প্রাচীন ধাতু। অনুরূপভাবে ক্যালসিয়াম্, ম্যাগনেসিয়াম্, এলুমিনিয়াম্, দস্তা, তাম্র ও সীসা পারমাণবিক বৈষম্য সত্ত্বেও গলনাঙ্ক ৩২৭° সেণ্টিগ্রেডের (সীসার গলনাঙ্ক) নিম্নে নয়। তাম্রের গলনাঙ্ক ১৮০৩° সেঃ, দস্তার গলনাঙ্ক—৪১৯° সেঃ, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের গলনাঙ্ক যথাক্রমে ৮০০° সেঃ, ৬৫১° সেঃ। অপরপক্ষে সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের গলনাঙ্ক কেবল মাত্র যথাক্রমে ৯৮° সেঃ ও ৬২° সেঃ। কিন্তু উপরোক্ত ধাতুদ্বয়ের জল ও সহজাত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা অতুলনীয়। পৃথিবী অভূতপূর্ব চুম্বক ও তড়িৎশক্তির অধিকারী হয় পরবর্তী এমোনিয়া যুগে অত্যধিক শৈত্যতাপে স্বল্প চুম্বকীয় ধাতুর (Paramagnetic metals) সাহায্যে এবং ক্লোরিণ গ্যাস সংযোগে পটাসিয়াম্, সোডিয়াম্ ও লিথিয়াম্ ধাতুর সাহায্যে। এমোনিয়া যুগই পৃথিবীকে তড়িৎ-চুম্বকে পরিণত করে, যদিও তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগেও তড়িৎ-চুম্বকের ক্রীড়া পৃথিবীবক্ষে চলেছিল এবং আজও চলেছে। এমোনিয়া-যুগ ছিল পৃথিবীর এক ভয়াবহ তুহীন-শীতল অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ; কারণ, ঐ যুগে ক্লোরিণ গ্যাস—আর্দ্র এমোনিয়া, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম্, সোডিয়াম্, পটাসিয়াম্, লিথিয়াম ইত্যাদি ধাতুর সংযোগে অবিরত বিস্ফোরণ ও প্রজ্বলন দ্বারা পৃথিবীর আকাশ-বাতাস একটি তুলনাহীন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। (আমার বর্ণিত "সৌরজগৎ", ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৬৭ সাল বসুমতীতে এর বিশদ ব্যাখ্যা আছে) আমরা জানি, সালফিউরিক এসিড বাষ্পশোষক (Hygroscope)। এই

বাষ্প শোষকতার কি প্রয়োজন ছিল এবং অন্যান্য এসিডে তা নেই কেন ? কারণ, এই এসিডের পূর্ববর্তী হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্বারা উদ্ভূত অতি নগণ্য জলরাশি বর্ধিত করাই ছিল সালফিউরিক এসিডের প্রধান কাজ। প্রাচীন ধাতুসমূহের অক্সাইড সংযোগে হাইড্রোক্লোরিক এসিড যে অতি সামান্য জল ও জলীয় বাষ্প সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিল এবং জলাশয়ের পার্শ্বদেশে কতিপয় বৃক্ষরাজির জন্মদানে সমর্থ হয়েছিল, সালফিউরিক এসিড সেই সব বৃক্ষপত্র ও শাখা হতে প্রচুর জল সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিল। শুধু কি তাই ? ইক্ষু, বীট ও আলুর অভ্যন্তরস্থ প্রচুর ষ্টার্চ (শ্বেতসার) ও চিনি হতেও জল সংগ্রহ করেছিল। কারণ, তখন জলের অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল। জল তখন কতিপয় বদ্ধ জলাশয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। সে যুগ ছিল কার্বো-হাইড্রেট যুগ (মার্শ গ্যাস, এসিটিলিন, ইথিলিন প্রভৃতি)। এখন প্রশ্ন জাগে, সে যুগে কোন্ কোন্ বৃক্ষের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল ? পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বৃক্ষ ও সর্বপ্রথম প্রাণী ছিল নিঃসন্দেহে জলজ। শ্যাওলা বা শৈবাল জাতীয় বৃক্ষই পৃথিবীর আদি উদ্ভিদ। শৈবাল সমাঙ্গী উদ্ভিদ অর্থাৎ এর মূল, কাণ্ড ও পাতার কোন পার্থক্য নেই। স্পঞ্জ ও কোরাল অনুরূপভাবে সমাঙ্গী প্রাণী। স্থলপ্রাণী কেঁচোও সমাঙ্গী প্রাণী। উক্ত প্রাণীদের মাথা, হাত, পা বৈষম্যহীন। সমাঙ্গী উদ্ভিদ শ্যাওলা উদ্ভিদ হলেও সম্পূর্ণ সচল ছিল এবং আজও সচল। সমাঙ্গী প্রাণী স্পঞ্জ ও কোরাল প্রাণী হলেও সম্পূর্ণ অচল এবং আজও অচল। উপরোক্ত এসিডদ্বয় নানা প্রকার ধাতুর অক্সাইড ও লবণের সাহায্যে যে জল সৃষ্টি করেছিল, সেই জলে প্রথম জন্মলাভ করার সৌভাগ্য ঘটেছিল আজকের বহু উপেক্ষিত শ্যাওলার। তখনও উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতার সৃষ্টি হয় নি। কার্বো-হাইড্রেট যুগের সামান্য সূর্যকিরণ ও জলই এদের জীবন ধারণের সহায়ক ছিল। অবীজ উদ্ভিদই পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ করে জলজ বৃক্ষরূপে। শৈবাল যখন জন্মলাভ করেছিল তখনও পৃথিবীতে (জলে) স্পঞ্জ, কোরাল ইত্যাদি সৃষ্ট হয় নি। জলে এদের খাদ্য তখনও প্রস্তুত হয় নি, কেবল শৈবাল মৃদু-মন্দ বাতাসে আন্দোলিত হয়ে বদ্ধ জলাশয়ের ঘাটে ঘাটে খাদ্য সংগ্রহ করেছে এবং আজও করছে। শ্যাওলা জাতীয় আরও কয়েক প্রকার জলজ উদ্ভিদ জলে বিদ্যমান ছিল। সেই মার্শ গ্যাস যুগেই তারপর আবির্ভূত হয় অবীজ উদ্ভিদ মস্ ও ফার্ণ (Cryptogams)। প্রতি কয়লার খনিতে কয়লার মধ্যে ফার্ণ জাতীয় বৃক্ষের জীবাশ্ম পাওয়া যায়। তারপর এলো পাইন জাতীয় বৃক্ষ। এরা নগ্নবীজ সম্প্রদায়-ভুক্ত অর্থাৎ এদের পাতায় এক প্রকার বীজ জন্মে। সেই কার্বো-হাইড্রেট যুগে কি কেবলমাত্র উপরোক্ত বৃক্ষরাজি বিরাজমান ছিল ? তা নয় ; কালক্রমে জল ও জলীয় বাষ্প বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই যুগেই জন্মলাভ করে তাল, নারিকেল, ইক্ষু এবং সম্ভবতঃ খেজুর। আমরা জানি, বঙ্গোপসাগরের কূলে অর্থাৎ লবণাক্ত মাটিতে তাল ও নারিকেল প্রচুর জন্মে থাকে। সেই আদি কার্বো-হাইড্রেট যুগে উপরোক্ত এসিডদ্বয়, অক্সাইড ও লবণের সাহায্যে যে জল সৃষ্ট হয়েছিল, তা লবণাক্তই ছিল এবং মানুষ ও প্রাণীর ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল (যেমন আজকের সমুদ্র ও উপসাগরের জল)। সুখের বিষয়, তখন মানুষ ও প্রাণী আবির্ভূত হয় নি। এখন বিচার্য বিষয়—বৃক্ষের প্রাণধারণের যে অপরিহার্য ১০টি উপাদান প্রয়োজন তার কয়টি ছিল ? অধিকাংশ উপাদানই ছিল ; ছিল না কেবলমাত্র মুক্ত নাইট্রোজেন, মুক্ত অক্সিজেন ছিল শতকরা ৫ ভাগ কিংবা তদপেক্ষাও কম। মুক্ত নাইট্রোজেনের সম্পূর্ণ অবর্তমানে নাইট্রোজেন নানা ধাতুর লবণের ও মাটির সংযোগে অতি সামান্য মাত্রায় ছিল। এমোনিয়ার তখনও জন্মলাভ হয় নি। নাইট্রেটেরও তদ্রূপ অবস্থা প্রায়। বাকী উপাদানগুলি কার্যকরী ছিল। উপরোক্ত ১০টি উপাদান ব্যতীত বৃক্ষদেহে আরও যে কতকগুলি উপাদান সামান্য মাত্রায় পাওয়া যায়, তারা সম্ভবতঃ নাইট্রোজেন ও নাইট্রেটের স্থলাভিষিক্ত ছিল। ইক্ষু, নারিকেল ও তাল বৃক্ষের দেহে প্রচুর কার্বো-হাইড্রেট আছে ; কারণ এরা কার্বো-হাইড্রেট যুগেরই বৃক্ষ। একটি আখ গাছের কাণ্ডের রস ও ছিবড়া উভয়ই কার্বো-হাইড্রেট। রসে প্রচুর এলবুমিন আছে (খাদ্যের সারাংশ)। সেটা প্রোটিন। আবার নারিকেল গাছের গায়ে প্রচুর সেলুলোজ ও বীজের শাঁসে প্রচুর ফ্যাট (চর্বি ও প্রোটিন) আছে। আবার তাল ও খেজুর বৃক্ষের ফলে (বীজে) প্রচুর খাদ্য সংগৃহীত থাকে বৃক্ষদ্বয়ের জীবন রক্ষার জন্য। তাদের দেহেও কার্বো-হাইড্রেট থাকে। ঐ সব উপরোক্ত বৃক্ষের মূল আম, জাম, কাঁটাল, পেয়ারা, বট ও অশ্বত্থের ন্যায় মাটির নীচে বহুদূর বিস্তৃত ও প্রসারিত নয় ; কারণ, কার্বো-হাইড্রেট যুগে প্রচুর এমোনিয়া, নাইট্রোজেন ও নাইট্রেট সৃষ্ট হয় নি ; নাইট্রোজেন অতি সামান্য মাত্রায় থাকা সম্ভব। সুতরাং লৌহ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ফস্‌ফরাস্ ও সালফার দ্বারা পুষ্ট উপরোক্ত কার্বো-হাইড্রেট যুগের বৃক্ষ সকল তখন পরিষ্কার ও পরিস্ফুট শিকড় গড়নে অসমর্থ ছিল। তজ্জন্য ঐ সব বৃক্ষের শিকড়গুলি ঝাকড়া ঝাকড়া (Fibrous roots) ; নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থের অভাবহেতু ঐ সব বৃক্ষ সুস্থ, সুন্দর ও সুদূরপ্রসারী শিকড় ও বহু পত্র শোভিত শাখা বিস্তারে অসমর্থ ছিল। আজও ঐগুলির অবস্থা তাই। ক্যালসিয়াম্ ধাতু নানা প্রকার লবণ সংযোগে (Calcium Chloride, Calcium Phosphate) সেই কার্বো-হাইড্রেট যুগের নানা প্রকার এসিড ও এসিড জনিত বিষাক্ত পদার্থকে ধ্বংস করে বৃক্ষকে রক্ষা করেছিল এবং তাল, নারিকেল, খেজুর জাতীয় বৃক্ষের ফলনে প্রচুর সাহায্য করেছিল। প্রচুর সবুজ পত্র তখন জন্মান সম্ভব ছিল না এবং উপরোক্ত বৃক্ষসমূহের দেহের গঠনই বৃক্ষের অপরিহার্য প্রয়োজন কার্বো-হাইড্রেট প্রস্তুতির জন্য প্রস্তুত ছিল। কার্বো-হাইড্রেট যুগে সবুজ পত্রের এত প্রয়োজন ছিল না, কারণ বৃক্ষ-দেহের প্রধান খাদ্য কার্বো-হাইড্রেট প্রাপ্তির সংগ্রাম এত তীব্র ছিল না। বৃক্ষ-জগতে মূল এবং মূলপ্রধান বৃক্ষ, যেমন মূলা, বীট, শালগম ও মিঠা আলু জন্মলাভ করে অর্থাৎ জন্মলাভ করার উপযুক্ত উর্বর ভূমি প্রাপ্ত হয় লাল ফস্‌ফরাস ও ব্রোমিন যুগে। সালফিউরিক এসিড, ব্রোমিন্ ও লাল ফস্‌ফরাস একসঙ্গে প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে কার্বো-হাইড্রেট যুগের শেষ পর্বে এবং এরা কার্বো-হাইড্রেট যুগের (এসিটিলিন, ইথিলিন) সমাপ্তি আনয়ন করে। ফলস্বরূপ পৃথিবীতে এমোনিয়া যুগের আবির্ভাব হয়। সম্ভবতঃ লৌহ, লাল ফস্‌ফরাস্, ব্রোমিন ও সালফারই উপরোক্ত মূল জাতীয় বৃক্ষের বিশেষ অবদান, যদিও অন্যান্য উপাদানের অবদান নগণ্য নয়। এমোনিয়াম সালফেট ও এমোনিয়াম ফস্‌ফেট—যা এমোনিয়া যুগের সমাপ্তি পর্বে ভূমির প্রভূত উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য আবির্ভূত হয়—এমোনিয়া গ্যাস পর্বের একটি বিশেষ অবদান।

এমোনিয়া যুগের সমাপ্তিতে ও অক্সি-নাইট্রোজেন পর্বের প্রারম্ভে পৃথিবীবক্ষে আমাদের প্রকৃত খাদ্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হওয়ার উপযুক্ত ভূমি প্রস্তুত হয়ে গেল অর্থাৎ ষ্টার্চ (শ্বেতসার) জাতীয় খাদ্য, যেমন আলু, ধান্য, যব, ভূট্টা ও গম ইত্যাদি—এমোনিয়াম ফসফেট ও এমোনিয়াম সালফেটের সাহায্যে। এমোনিয়াম সালফেট ভগবৎ প্রদত্ত এমন একটি সার যা অবিরত বারিধারা বর্ষণেও মাটির দেহে অবস্থান সম্ভব। এমোনিয়া যুগের সমাপ্তি-পর্বে এমোনিয়া গ্যাস পৃথিবীর জলের সঙ্গে মিশ্রিত সালফিউরিক এসিড সংযোগে এমোনিয়াম সালফেট সৃষ্টি করে এবং এমোনিয়া গ্যাস ফসফরাস ও জলের সংযোগে এমোনিয়াম ফসফেট সৃষ্টি করে—ভবিষ্যৎ প্রাণীকুলের খাদ্য সংগ্রহার্থে। ভূমির এই উর্বরতা-শক্তি নিজস্ব এবং প্রাণীকুলের (স্থলপ্রাণী) জন্মের বহু কোটি বৎসর পূর্বেই ভূমি এই উর্বরতা-শক্তি লাভ করে। সেই যুগে চাষ-আবাদ সম্ভব হলে ফসল উত্তমরূপেই ফলত। রসায়ন শাস্ত্রের নানা ক্রিয়া ও প্রক্রিয়ায় সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কার্বো-হাইড্রেট যুগের শেষ পর্বে লাল ফসফরাস, ব্রোমিন ও সালফিউরিক এসিডের প্রাধান্য পৃথিবীর মাটি ও জলে বিস্তার লাভ করেছিল; তজ্জন্যই ঐ যুগের মূলজাতীয় খাদ্যসমূহ, যেমন মূলা, বীট, শালগম, মিঠা আলু লাল রং ধারণ করেছে। জ্যোতির্বিদগণের সমস্যামূলক ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহদ্বয়ের ক্রোড়ে লাল ফিতার দাগের (Band Spectrum) কারণ নির্ণয় করা চলে। সেটা সম্ভবতঃ লাল ফস্‌ফরাস্, ব্রোমিন ও সালফিউরিক এসিড দ্বারা উদ্ভূত লাল দাগ এবং অদূর ভবিষ্যতে কার্বো-হাইড্রেট যুগের সমাপ্ত ঘোষণাপত্র। ক্যালসিয়াম, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম ও সোডিয়ামের প্রাধান্য ও নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থের অভাব হেতু সবীজ উদ্ভিদের মধ্যে তাল, নারিকেল, ইক্ষু, খেজুর ও সুপারী প্রাধান্য লাভ করে কার্বো-হাইড্রেট যুগে। সুষ্ঠু, সুন্দর মূল উৎপাদনে এরা বিশেষ অসমর্থ ছিল নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থের অভাব হেতু। অনুরূপভাবে প্রচুর সবুজ পত্র হতেও বঞ্চিত ছিল। ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহদ্বয়ে যদিও বৃক্ষাদির প্রয়োজনীয়তা পৃথিবী ও শুক্রগ্রহ অপেক্ষা বহুলাংশে কম, তথাপি উক্ত গ্রহদ্বয়ে মস্, পাইন ও ফার্ণ জাতীয় বৃক্ষের পার্শ্বে কতিপয় তাল, নারিকেল ও ইক্ষু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। শনি ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ে বর্তমানে এমোনিয়া যুগ ও অত্যধিক শৈত্যতাপ। সেই অত্যধিক শৈত্যতাপে কার্বো-হাইড্রেট যুগের বৃক্ষাদি (মস্, পাইন, ফার্ণ, তাল, নারিকেল) মাটির নীচে অবস্থান হেতু কয়লা প্রস্তুতির কার্যে নিয়োজিত, এরূপ আশা করা যায়। পৃথিবীর যে সব কয়লাখনি ভূমিস্তরের অতি সন্নিকটে সেই সব কয়লায় ফার্ণ জাতীয় বৃক্ষের জীবাশ্ম ব্যতীত তাল ও নারিকেল বৃক্ষের জীবাশ্ম আশা করা যায়। লেবু, কমলালেবু, বাতাবীলেবু, আম, জাম, কাঁটাল, পেয়ারা এবং এতজ্জাতীয় সবুজ পত্র সুশোভিত ও ফলফুল সমন্বিত বৃক্ষাদির উপযুক্ত ভূমি প্রস্তুত হয় এমোনিয়া যুগের সমাপ্তি পর্বে অর্থাৎ অক্সি-নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস যুগে। উক্ত গ্যাসদ্বয় যুগে গ্যাসের প্রাবল্যে গ্রহের ক্রোড়ে সূর্যকিরণের প্রবেশ অধিকাংশ সময় নিষিদ্ধ ছিল। বৃক্ষের অতি প্রয়োজনীয় সূর্যকিরণের অভাব বহুলাংশে পূর্ণ করেছিল ম্যাগনেসিয়াম্ অক্সাইড। বৃক্ষাদি সূর্য-কিরণের অভাবে কেবল মাত্র ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের আলোকের সাহায্যে প্রাণ ধারণে সমর্থ ছিল, কিন্তু ফুল ও ফল উৎপাদনে অসমর্থ ছিল। পাতাবাহার গাছ ঐ যুগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ যা আজও ফুল ও ফলদানে বঞ্চিত এবং পত্রাদির রংও সবুজ নয়। আজও যে একমাত্র ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সঙ্গে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বৃক্ষের সবুজ পত্রের অন্তর্গত ক্লোরোফিলে বিদ্যমান তার কারণও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সঙ্গে বৃক্ষদেহের রক্তের অচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য সম্বন্ধ হেতু। কোটি কোটি বৎসর-ব্যাপী (অক্সি-নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড যুগ) সূর্য-কিরণের স্থলাভিষিক্ত ম্যাগনেসিয়াম্ (অক্সাইড্) বৃক্ষদেহে নিগূঢ়-ভাবে জড়িত রয়েছে। দ্বিদলীয় বীজ জাতীয় বৃক্ষের (আম, জাম, কাঁটাল, পেয়ারা) আবির্ভাব হয় একদলীয় বীজ জাতীয় বৃক্ষের (তাল, নারিকেল, খেজুর, ইক্ষু ইত্যাদি) বহু কোটি বৎসর পরে—নাইট্রোজেন এবং উক্ত গ্যাস উদ্ভূত নাইট্রেটের সাহায্যে। নানা প্রকার লতা-গুল্ম অর্থাৎ সবুজ পত্রাদি সুশোভিত ও ফুল-ফল সমন্বিত বৃক্ষাদি উন্নতি লাভ করে নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থের সাহায্যে। ফস্‌ফরাসের যুগ তার গন্ধেই পরিচয় দেয়। অর্থাৎ রসুন, আলু ও শাকআলু সাদা ফস্‌ফরাসের যুগ হতে উদ্ভূত। এবার প্রাণী সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। উদ্ভিদের ন্যায় পৃথিবীর প্রথম প্রাণী নিঃসন্দেহে জলজ ছিল এবং নিঃসন্দেহে সমাজী ছিল। সেইরূপ প্রাণী দেখা যায় স্পঞ্জ ও কোরাল। ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সাহায্যে আরো নানা-প্রকার জলজ প্রাণী, যেমন ঝিনুক, শঙ্খ, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রাণীর উদ্ভব হয়। এমোনিয়া গ্যাস পর্বের পূর্বে যদি কোন প্রাণী জন্মলাভ করে থাকে তা হলে সেই সব জলজ জীবের ধ্বংসাবশেষ হতে আজকের পেট্রোল তৈল সভ্য সমাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থলপ্রাণী অপেক্ষা জলজ প্রাণীর ধ্বংসাবশেষই পেট্রোল প্রস্তুতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক। জলপ্রাণীর পক্ষে নিরাপদে জলে বাস করা সম্ভব হয়েছে এমোনিয়া গ্যাস পর্বের সমাপ্তি যুগে অর্থাৎ ওজন গ্যাস পর্বের প্রারম্ভে। মৎস্যের ওই বীভৎস গন্ধের জন্য মৎস্য দায়ী নয়, দায়ী ওজন গ্যাস। এমোনিয়া গ্যাস যুগের সমাপ্তি পর্বে ওজন গ্যাস পর্বের আবির্ভাবের কারণ, নানা বিষাক্ত গ্যাস (ক্লোরিণ, ফ্লুরিণ ইত্যাদি) ও এসিড দ্বারা কলুষিত পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলকে বিশুদ্ধ ও সংশোধন করা। সুতরাং ওজন গ্যাস পর্ব হতে যে কোন স্থল ও জলজ প্রাণীর পক্ষে জলে ও স্থলে বাস সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল। উদ্ভিদ-জগতের ন্যায় প্রাণী-জগতে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের প্রাধান্য দেখা যায় আদি যুগে। দৃঢ় আবরণ বিশিষ্ট কচ্ছপ, হাঙর ও কুমীর জলে প্রাধান্য বিস্তার করে স্পঞ্জ, কোরাল ও শঙ্খ জাতীয় প্রাণীর পরবর্তী যুগে। ঐ সব জলজ প্রাণী নিরাপদে জলে ও স্থলে সমভাবে বিচরণে সমর্থ ছিল; কারণ কেঁচো ও পিঁপড়া ব্যতীত কোন স্থলপ্রাণী তখনও জন্মলাভ করে নি। সুতরাং স্থলপ্রাণীর দ্বারা জলপ্রাণীর কোনপ্রকার বিপদের আশঙ্কাও ছিল না। আজও যে কচ্ছপ জলে ডিম পাড়ে না এবং স্থলে ডিম পাড়ে তার কারণ কচ্ছপের জন্ম যুগে অন্যান্য জলজীব ছিল এবং ঐ সব জলজীবের দ্বারা কচ্ছপ তার ডিমের ধ্বংস আশঙ্কা করে স্থলভাগে ডিম পাড়াই অধিক নিরাপদ মনে করেছিল। আজও কচ্ছপ পূর্বসংস্কার অনুযায়ী স্থলে ডিম পাড়ে। কুমীরের স্বভাবও কচ্ছপেরই ন্যায়। কুমীর গভীর জলাশয় পরিত্যাগ করে অগভীর ও স্রোতহীন জলেই ডিম

খাবার ও বাচ্চা প্রসবের উপযুক্ত স্থান মনে করে। কচ্ছপ ও কুমীর সেই আদি যুগে স্বচ্ছন্দে জলে ও স্থলে বিচরণে সমর্থ ছিল—নির্ভয়ে ও নিঃশঙ্কচিত্তে। স্থলপ্রাণীর মধ্যে উদ্ভিদের ন্যায় সম্মাজদেহী কেঁচো ফস্‌ফরাস যুগ হতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ফসফেট ও এমোনিয়াম ফসফেট যুগ হতে। মনুষ্য জন্মের বহু কোটি বৎসর পূর্বেই উপরোক্ত জীবসকল পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। অনুরূপভাবে আরসেনিক ও দস্তা ধাতুদ্বয়ের নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সাহায্যে ও অন্যান্য ধাতু, যেমন ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের সাহায্যে কোন এক অশুভ মুহূর্তে পৃথিবীতে সর্পের আবির্ভাব হয়। ডিম হতেই পক্ষী ও সর্পের জন্ম। প্রথম যে ডিমটি হতে পৃথিবীতে পক্ষী ও সর্পের জন্ম হয়, সে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট প্রভৃতি কোন লবণ ঘটিত পদার্থের সংযোগে ক্যালসিয়াম ফসফেটের সহায়তায় প্রথম আবির্ভূত হয়। অনুরূপভাবে ডিম হতেই প্রথম কচ্ছপ ও কুমীরের জন্মলাভ হয়। কিন্তু একদিনেই তারা জন্মলাভ করে নি। ক্রমবিকাশের ধারায় স্পঞ্জ ও কোরালের জন্মের পর শঙ্খ ইত্যাদি জলজ প্রাণী ক্যালসিয়ামের প্রাধান্যে জন্মলাভে সমর্থ হয়। শঙ্খ ও ঝিনুকের জন্মলাভে ক্যালসিয়াম ধাতুই প্রধান সহায়ক ছিল; কারণ জলে ও স্থলে সেই যুগে ক্যালসিয়াম ও ক্যালসিয়ামজনিত লবণের প্রাধান্য দেখা যায়। সর্পের জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেকের জন্মলাভও হয়েছিল, কারণ ওদের সম্বন্ধ খাদ্য ও খাদকের। ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের ধারায় অন্যান্য জীবজন্তু এই পৃথিবীতে জন্মলাভ করে এবং সর্বশেষে আবির্ভূত হয় মানুষ। মানুষের মধ্যে দেবত্ব ও পশুত্ব উভয়ই আছে। পশুর মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে যে দেবত্ব আছে তা কঠিন আবরণে আবৃত; মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে তা অতিশয় হাল্কা আবরণে আবৃত। পূর্বজন্মার্জিত পশুত্বের সংস্কারবশতঃ মানুষের মধ্যে পশুত্ব বিরাজমান এবং অনুরূপভাবে পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলের গুণে মানুষ পশুজন্ম পরিত্যাগ করে মানব জন্ম লাভে সমর্থ হয়। মনুষ্যত্ব হতে দেবত্ব নিকটতম। পশুত্ব হতে দেবত্ব দূরতর। তজ্জন্যই জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, ধ্যানী ও যোগী ভগবানের ইঙ্গিত সহজে উপলব্ধি করে থাকেন। দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যে যে সামান্য সেতুস্বরূপ হাল্কা আবরণ তা কিছু-মাত্র দুর্ভেদ্য ও অভেদ্য নয়। একটি স্বচ্ছ আয়নার উপর স্তূপীকৃত কাদা ও মাটির আবরণের দ্বারা আয়নার স্বরূপ যেরূপ অবোধ্য ও অদৃশ্য থাকে, পশুর পক্ষে দেবত্ব লাভ ততোধিক দুরূহ। আবার সেই স্বচ্ছ আয়না যদি সামান্য বালি কিম্বা অস্বচ্ছ জল দ্বারা আবৃত কিম্বা ধৌত থাকে, তা হলে সেই সামান্য বালি অপসারণ কিম্বা শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দ্বারা লেপনেই আয়নার রূপ পরিস্ফুট হয়। মানবত্ব ও দেবত্বের পার্থক্য শুধু মাত্র সামান্য বালি দ্বারা আবৃত কিম্বা অস্বচ্ছ জল দ্বারা বিধৌত আয়না-খণ্ডের ন্যায়। বহির্মুখী ইন্দ্রিয়সমূহকে ধ্যান-সাধনা দ্বারা অন্তর্মুখী করা সম্ভব হলেই যে কোন মানুষ দেবতার ইসারা-ইঙ্গিত উপলব্ধিতে সমর্থ হয়, এমন কি যোগাযোগ সাধনেও সমর্থ হয়। আমরা সেই দিনের আশায় রইলাম যেদিন মানুষ পূর্বজন্মের সংস্কাররূপ পশুত্ব পরিহার করে দেবত্ব লাভে সমর্থ হবে এবং জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী সাইকেলের কিম্বা মোটরের চাকার ন্যায় অবিশ্রান্ত ভ্রমণান্তে স্বীয় গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে সমর্থ হবে কিম্বা জীবন-জিজ্ঞাসারূপ দুরূহ সমস্যার সমাধান দ্বারা মাটির পৃথিবীকে এক অখণ্ড, অবিভক্ত অনাবিল শান্তির রাজ্যে পরিণত করতে সমর্থ হবে।

আণবিক বোমা প্রথম যেখানে ফাটানো হয়

আজকের দিনে আণবিক বোমার কথা সকলের মুখেই শোনা যায়—পারমাণবিক বিস্ফোরণও ঘটে চলেছে অহরহঃ, অবশ্য পরীক্ষা-মূলকভাবে। কিন্তু তবুও সর্ব্বপ্রথম আণবিক বোমাটি কোথায় ফাটানো হয় এবং সেটি ঠিক কোন্ সময়ে, জানবার কৌতূহল জাগতে পারে বৈ কি!

নিউ মেক্সিকো মরুভূমির একটি দূরবর্ত্তী নির্জ্জন এলাকাই হচ্ছে আণবিক বিস্ফোরণের আদি ক্ষেত্র। বিশ্বের এই প্রথম পরমাণু বিস্ফোরণটি ঘটানো হয় ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই। মরুভূমির বালুকারাশি বিচ্ছুরিত তেজস্ক্রিয় পদার্থে ভর্ত্তি হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। একই ঘটনা থেকে আলামোগরদোর ৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি গভীর খাত সৃষ্টি হয়, যা আজও মিলিয়ে যায় নি। বস্তুতঃ সেই ঐতিহাসিক পরীক্ষাক্ষেত্রটি এখন অবধি সে ভাবেই রয়েছে বটে, কিন্তু তার চতুর্দ্দিকে রয়েছে সর্ব্বক্ষণ কড়া সামরিক প্রহরা ও কাঁটাতারের বেষ্টনী। ছাড়পত্র ছাড়া কারো পক্ষেই এক্ষণে এই স্থানে যাওয়া সম্ভব নয়।

স্থানটি আজকে হলোম্যান বিমান উন্নয়ন কেন্দ্রেরই একটি অঙ্গ—এখানে ক্ষেপণাস্ত্র ও বৈমানিকবিহীন বিমানের উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা চালানো হয়ে থাকে। প্রথম পারমাণবিক বোমাটি ফাটে ৩৭ ফুট উঁচু একটি গম্বুজের উপরিভাগে এবং এ থেকে যে আলোর ঝলক বের হয়, ৪৫০ মাইল দূরে অবধি আকাশ তাতে আলোকিত হয়ে যায়। ১২০ মাইল দূরে থেকে একটি অন্ধ বালিকার দৃষ্টিবিহীন চোখেও ঐ আলোর প্রচণ্ড ঝলকানি নাকি ধরা পড়েছিল, এমনি কথা এখনও চালু আছে।

তেজস্ক্রিয় কত অসংখ্য কাচের টুকরো এখন অবধি সেই মরু অঞ্চলে ছড়ানো দেখতে পাওয়া যায়। এককালে এগুলো হয়ত আণবিক যুগের সূচনার প্রতীক হিসাবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। পর্য্যটকগণ ইচ্ছা করলেই এই চিহ্নিত স্থানটিতে আজ যেতে পারেন না। কারণ, ওটি পড়েছে হলোম্যান, হোয়াইট স্যাণ্ডস ও ফোর্ট ব্লিস—এই তিনটি বিমান ও স্থলবাহিনীর পরীক্ষা-ঘাঁটির মাঝখানে। যুদ্ধের আবহাওয়া বিশ্ব থেকে যদি কখনও বিলীন হয়, তবেই আণবিক বোমা বিস্ফোরণের এই আদি ক্ষেত্রটি অবাধে দেখতে পাবার সম্ভাবনা।

এই পথে চলতে একদিন শর্টকাট করতে গিয়ে পাকদণ্ডিতে নেমে যা বিপদে পড়েছিলাম, তাই একটু বলি। ও আর বড় ছেলে এগিয়ে গেছে অনেকটা। আমি আর ছোট ছেলে পিছিয়ে পড়েছি। অনেকগুলি রাজস্থানী তাদের পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে আসল পথ ছেড়ে নেমে পড়লো নীচে। তাই দেখে আমার ছোট ছেলে বলে—চল মা, আমরাও পাকদণ্ডি দিয়ে গিয়ে বাবা-দাদাকে হারিয়ে দিই। এ রকম আগেও অনেকবার হয়েছে। সত্যি, ঘুরপথ ছেড়ে এমনি পাহাড়ী পথ ধরে আমরা আগেই পৌঁছে গেছি কয়েকবার। এবার পড়লাম বিপদে। নামছি তো নামছি, নেমেই চলেছি। কি বড় বড় এক একটা পাথর ডিঙিয়ে নামতে হচ্ছে। অথচ দেখতে পাচ্ছি, আসল পথটা কিন্তু ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠেছে। দূরে দেখতে পাচ্ছি, পাগড়ীটুপি মাথায় আমার শেঠজী চলেছে। এখন উপায়? পথ হারিয়েছি নিশ্চয়ই। পা আর চলে না, হাঁটতে হাঁটতে থকে গেছি। কি হবে? হতাশ হয়ে বসে পড়ি একটা পাথরের ওপর। ছেলেটাকে বলি, তোর জন্যই এই হল। কেন এখানে নিয়ে এলি আমাকে? ঐ রাজস্থানীরাও আমার আশেপাশে বসে পড়েছে তাদের পোঁটলা-পুঁটলি খুলে। ওর মধ্যেই আছে ওদের রসদ। কিছু ছাতু, গুড় বা চিঁড়ে। আর ছাতু আটা, ঘি সব ওরা সঙ্গেই এনেছে। সুবিধেমত বানিয়ে খায়। এখানে চবেনা চিবিয়ে জলযোগ হচ্ছে। পাশ দিয়ে ছোট্ট একটি ঝরণা বয়ে চলেছে।

পরিবেশটা মনোরম হলে কি হবে? তখন আমার মন-মেজাজ তার অনুকূল নয় মোটেই। ওরা কি বুঝলো, কে জানে? ওদের মধ্যে একজন রসিক বুড়ো হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে ভক্তিআপ্লুত গলায় গাইতে শুরু করল—

"বন চলে রাম রঘুরাই
সাথ চলে সীতা মাঈ
সীতাজীকে পয়ের মুখাই
পরে রামজী লাগে দাওয়াই
বন চলে রাম রঘুরাই।"

আমার তখন বলে ভয়ে-উদ্বেগে প্রাণ বেরুচ্ছে। কি করে ওদের কাছে আবার পৌঁছতে পারব, তাই ভাবছি। ছেলেটাও ঘাবড়ে গেছে। কিন্তু এরা ভরসা দেয়, বলে, ভয় কি মাঈ? আমরা তো আছি। চলো তুমি, হিম্মৎ কর, ঠিক পৌঁছে যাবে রামজীর কাছে। এদের দেওয়া ছাতু-গুড় দিয়ে জল খেয়ে তখন আমরা মা-ছেলে একটু তাজা হয়েছি। বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে এবার উঠতে থাকি ওপরে। সে কি প্রাণান্তকর চড়াই! ঐ পাহাড়ীদেরই উপযুক্ত এই পথ। পাখি

নাকি আমরা ? শুধু ঐ রাজস্থানীরা বলে, মাতাজীর হিম্মৎ আছে বটে। পৌঁছলাম শেষ পর্য্যন্ত ওপরে। দেখি, ওরা দু'জনেও উদ্বেগ-ব্যাকুল দৃষ্টিতে আমাদের খুঁজতে খুঁজতে এদিকেই আসছে। আর কখ্‌খনো দাকদণ্ডিতে যাইনি স্বেচ্ছায়।

সকালে আবার পথ চলেছি। চমৎকার দৃশ্য। এখন ধানক্ষেতভরা উপত্যকাগুলি আর দেখা যাচ্ছে না। তার বদলে দেখা দিয়েছে ঝরণা। আর যে সে ঝরণা নয়, এক একটি জলপ্রপাত যেন। একেবারে উঁচুতে তার মাথার ওপর চৌপরের মত বরফ জমে আছে। তার ওপর সূর্য্যের আলো পড়ে সুন্দর রামধনু রং ধরেছে। আর কুয়াশার ছায়ার চারদিক অদ্ভুত মায়াময় দেখাচ্ছে। বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে তাড়াতাড়ি ওকে ডেকে দেখাই।

এ পথের একটা গুণ এই দেখেছি যে, সারাদিন পথ চলার পর যখন রাত্রে শুতাম, মনে হত শরীরে যেন আর কিছুই নেই। পা দুটো এবার জবাব দিয়েছে। মড়ার মত ঘুমোতাম। আশ্চর্য্য, ভোরে উঠেই আবার অদ্ভুত এনার্জ্জি ফিরে পেতাম। মনে হত, কোনই ক্লান্তি নেই, কখনই ছিল না। অথচ খাওয়া হত শুধু আলুর তরকারী-ভাত। কখন পুরী আর দুধ, জিলিপি। চিঁড়ে, মিছরি আর মেওয়া নিয়ে গিয়েছিলাম অনেক। ছেলেদের দু'পকেটে ভরে দিতাম ওগুলি সকালে বেরুবার আগে। ওরা মনের আনন্দে তাই চিবোতে চিবোতে পথ হাঁটত। সকালে যে চটি ছাড়তাম সেখান থেকে দুধ আর জিলিপি অবশ্য পেট ভরে খেয়ে বেরুন হত। বেশী খেলে হাঁটা যায় না আবার। তাই আমরা দু'জন একটু হাল্কাই খেতাম। বেশীর ভাগ হাঁটা হত সকালের দিকেই। দুপুরে পৌঁছে যেতাম যে চটিতে সেখানে রান্না করে খাওয়া হত। আমার বরাতগুণে চৌভটা গিয়েছিল বিগড়ে, আর তার ওপরে মুস্কিলে পড়েছিলাম কুলিটাকে নিয়ে। সে আবার এত নীচু জাতের ছিল যে, চটিবালারা তাকে চটিতে ঢুকতেই দিত না। অন্যদের কুলিরা বাসন মেজে দেওয়া থেকে রান্নার জন্য উনুন ধরান—এমন অনেক কাজ করে দিত। কিন্তু আমাকে নিজেই নিরুপায় হয়ে সব করতে হত। ভগবান সব বিষয়ে পারজম করে তুলছিলেন আর কি। অমনি সহজেই কি আর তাঁর দর্শন পাওয়া যায় ? কষ্ট না করে কেই বা কেষ্ট পেয়েছে কবে ? অন্য কিছুর জন্য নয়। আসলে কাঠের উনুন কিছুতেই ধরাতে পারতাম না আমি। ঐ স্যাঁৎস্যেঁতে আবহাওয়ায় কাঠগুলো কেমন যেন ভিজে-ভিজে, কিছুতেই ধরতে চাইত না। ভাত ফোটাতে প্রাণান্ত। নাকের জলে চোখের জলে নাকালের একশেষ হতাম। এর ওপর আবার কাঠের কালি তুলে বাসন মাজা। তাই আমাদের ভাত খাওয়াটা ছিল বিরাট পর্ব্ব। অতখানি হেঁটে আবার এতটা পরিশ্রম। সেই জন্য বেশীর ভাগ পুরীই খাওয়া হত। দোকানে বসে ভাল ঘি দিয়ে ভাজান হত। তার সঙ্গে দিত ভাজা আলুর ঝোল।

পরে একটা ব্যবস্থা হয়েছিল। ঠিক করলাম, এগিয়েই থাকে যখন ও, তখন ওই প্রথমে গিয়ে উনুন ধরাবে, আর আমি গিয়ে ভাত চড়াব। আসলে একা পুরুষমানুষ দেখে দোকানদাররা দয়া করে উনুনটা ধরিয়ে দিত। আর আমিও চোখ জ্বালার থেকে রেহাই পেয়ে বাঁচতাম।

পথে অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছিল। চলার পথে কখন তারা এগিয়ে যেত, আমরা পিছিয়ে পড়তাম, আবার কখন ওরা পিছিয়ে পড়ত। সেই আড়াইমণি মাড়োয়ারী গিন্নীর সঙ্গে দেখা হল আবার। কি খুশী আমাদের দেখে, যেন কত পরমাত্মীয় আমরা। এমনিই মনে হত। যেন আমরা একটা বিরাট পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলেছি সেই পরম লক্ষ্যস্থলে। সেখানে গিয়ে আবার আমরা সবাই একত্র মিলে যাব।

পথ চলতে আমাদের নাম হয়েছিল সাহেবদাদা আর মেমদিদি। আমাদের রং-এর জন্য এই নাম দিয়েছিল ওরা। পরে পথের কষ্টে আর রোদে-বরফে পুড়ে এমন কালো হয়েছিলাম আমরা যে, ও-নামে ডাকলে লজ্জাই পেতাম।

এবার গৌরীকুণ্ড চটি। মস্ত বড় চটি। এখানে দুটি কুণ্ড আছে। একটি উষ্ণ কুণ্ড, অন্যটি ঠাণ্ডা। স্বয়ং গৌরী দেবী এই কুণ্ডে এসে নাকি স্নান করেছিলেন। তাই জায়গাটির নাম হয়েছে গৌরীকুণ্ড। এখানে এসে সবাই কুণ্ডে নেমে প্রাণভরে স্নান করে। এখানে কারুর জন্যই কোন আড়াল বা আব্রু নেই। লজ্জা-মান-ভয় সব ত্যাগ করে তবে সেই পরম বাঞ্ছিতকে পেতে হবে। সেই পরীক্ষা তিনি নেন এই দুর্গম কঠিন পথযাত্রায়। পথ হবে যত দুর্গম, বাধা হবে যত দুর্লঙ্ঘনীয়, মন হবে তত আকুল, তবেই মিলবে তাঁর দর্শন। আর সেই দর্শনে মিলবে চরম শান্তি, পরম পরিতৃপ্তি। এই পাবার আশায় ব্যাকুল হয়ে চলেছে সবাই। বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ, যুবক, যুবতী সবাই। এই যাত্রাপথে হয়েছে মহাজাতি সম্মিলন।

আবার এই পথে রেষারেষিরও অন্ত নেই। একটু জল বা একটু আশ্রয়ের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। প্রকাশ হয়ে পড়ে মানুষের মনের সঙ্কীর্ণতা। এই উদার অনন্ত প্রকৃতিও পারে না তাদের শোধন করতে। যেমন সেদিন রাত্রে গৌরীকুণ্ড চটিতে ঝগড়ার চোটে চোখ বুজবে কার সাধ্য। ও গেল দেখতে কি ব্যাপার। নিশ্চয়ই সেই বষ্টুমীর দল।

একটি সধবা বষ্টমী আর তার সঙ্গে আছে এক বুড়ী। এরা খালি দু'জনে দু'জনের সঙ্গে ঝগড়া করে। ঝগড়ার কারণ যদিও তুচ্ছ। যেমন সধবাটি বলে, ঐ বুড়ীকে আমি নিয়ে এসেছিনু আমার সঙ্গীর অভাবে, তবুও কিনা ঐ হতচ্ছাড়ী বুড়ী আমার তামাকপাতা চুরি করবে ? আর একটুও পোঁটলা বইবে না গা ? আবার ওর ওনার দুধ চাই। না দিলে ঠ্যাকার কত ! আজ আবার অমনি কিছু হয়েছে হয়তো। শুনতে পাই ও বলছে, 'তোমরা তীর্থে এসেও যদি অমনি ঝগড়া করতে থাক তা হলে আর তীর্থের ফল তোমরা কি পাবে বল ? আর বুড়ীর মাথায় অত বড় টিকি, তাতে রোজ ফুল দেয়, মালা জপে, আর তুমি খালি ওকে গাল দাও !' হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমিও এখে থোও সাহেবদাদা—(ঐ সঙ্গে হাত-মুখের ভঙ্গীটা মনশ্চক্ষে দেখছি আমি) একে তো মেয়েলোক, তায় আবার চৈতন একেছেন ! ঐ চৈতন নাড়া দিলেই আর ভক্ত হয় না। তুমি যাও ভাই মেমদিদির কাছে, এই কিনী বষ্টুমীকে আর ঘাঁটিও না। বৃথা চেষ্টা। ফিরে এলো ও। খানিক বাদে পথের ক্লান্তিতে আপনিই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। কত দূরে সেই জয়নগর-মজিলপুর, সেখান থেকে এসেছে ওরা। 'র' এরা বলতে পারে না, তা বলে রৈ রৈ করে ঝগড়া করতে ছাড়ে না। [ক্রমশঃ ।

আকাশের রং

সংযুক্তা মিত্র

বৃত্তান্ত শুনলাম বিকেলে। হোটেল ম্যানেজারের মুখে। ওরা বিবাহিতা স্বামী-স্ত্রী নয়। ভদ্রমহিলা দেওরের সঙ্গে নাকি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। আর শোনার প্রবৃত্তি হয় নি। শিউরে উঠেছিলাম তিনজনেই।

হোটেলের ঘর রিজার্ভ করা ছিল দিন দশেকের মত। কিন্তু এই ঘটনার পর কেউ আমরা পুরীতে আর থাকতে পারিনি। কিছু ক্ষতি স্বীকার করেও চলে এসেছিলাম কলকাতায়।

মনের মধ্যে এক অদম্য জিজ্ঞাসা। মল্লিকা, সেই কোটা ফুলের মত মেয়ে মল্লিকা—সে কী করে এমন কাজ করতে পারল? কেন করল?

আমাদের তিনজনেরই চাকরী একই প্রতিষ্ঠানে। কলকাতার বাইরে। সেখানে একই বোর্ডিং-এ থাকি তিনজন। কলকাতায় কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাবার জন্ত যার যার বাড়িতে এলাম। এখানে এসে দেখি, মল্লিকা-সঞ্জয়ের কাহিনী সবাই জানে। সবাই একই-ভাবে মুখ ঘুরিয়ে নেয়—ছিঃ ছিঃ, ওদের কথা আর বলিস না।

ব্যাপার কি? তিন বন্ধুই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। আলোচনা, মন্তব্য ও টিপ্পনির তুফান হতে ছেঁকে ছেঁকে আসল কাহিনীর নির্যাসটুকু তুলে নেবার চেষ্টা করি। অবশেষে টুকরো টুকরো চাপা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের শরাঘাত হতে বাঁচিয়ে উদ্ধার করা অংশগুলো নিয়ে এক এক সন্ধ্যায় জড় হই তিন বন্ধু। হয় পার্কের কোনো ছায়াঘেরা কোণে কিম্বা লেকের তৃণশ্যাম কোনো অংশে।

বাদামের খোসায় চাপ দিয়ে দিয়ে ভেঙে একটা দানা টপ করে মুখে পুরে দিয়ে মালবিকা বলে—বুঝলি, ভেবে দেখলাম, ব্যাপারটার জন্য আসলে কিন্তু পুরোপুরি দায়িত্ব ধনঞ্জয়বাবুর। অর্থাৎ মল্লিকার স্বামীর। প্রথম প্রতারণা ত তাঁরই। কি বলিস?

শ্যামলী বলে—আমিও ভেবে ভেবে দেখেছি। এ ছাড়া অন্য কোনো কারণ থাকতেই পারে না। বাপো! ঐ লোহার বীমের ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের হাতে কি করে যে মল্লিকার মত মেয়েকে ওর বাবা তুলে দিয়েছিলেন! কি লোমশ আর কর্কশ ভদ্রলোক, তোরা যদি দেখতি! কি একটা ব্যবসায়িক মামলার ফয়সালা করতে দাদার কাছে আসতেন। আমি তাঁকে দেখেছি।

আমারও ওদের সঙ্গে সায় আছে। এক ঝাঁক রোয়িং বোট লেকের বুক চিরে চিরে প্রবল প্রতিযোগিতায় এগিয়ে আসছে এদিক পানে। সেই দিকে চেয়ে মনে হয়, এমনিই প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় বুঝি সেদিন নেমেছিলেন ধনঞ্জয় চৌধুরী নিজের ছোট ভাই সঞ্জয় চৌধুরীর সঙ্গে।

প্রবল পুরুষকার আর আত্মশক্তিতে যারা নিজের ভাগ্যের কঠিন চাকা ঘোরাতে চায় আর ঘোরাতে পারে, পারে নিজের হাতে গড়া সুখ-সমৃদ্ধির মসৃণ পথে তাকে চালনা করতে, ধনঞ্জয় চৌধুরী তাদেরই একজন। সংসারে আপন বলতে ঐ ছোট ভাই। মা-বাবা গত হয়েছেন বহুদিন। একদা দুঃখের দিনে যাদের করুণা প্রত্যাশা করেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, ধনঞ্জয় তাদের কারো সঙ্গে কোনো সংযোগই রাখেন না বহুকাল। কাজেই সংসারে তিনি স্বজনহীন, বান্ধবহীন। দৃঢ়মুষ্টিতে দুই হাতে ভাগ্যের বল্‌গা টেনে টেনেই তাঁর পথ চলা। সংসারে এই সংগ্রাম ছাড়াও কিছু আছে কিনা, কোনো গোপন সুধার রসভাণ্ডার, কোনো অধরার অস্ফুট সঙ্কেত—সে কথা কোনোদিন তিনি ভাবেন নি। ভাববার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। দীর্ঘকাল অকৃতদার, কৃতী সফল মানুষ তিনি। কিন্তু তবু সংসারে রসিক বিধাতার রসের বিচার স্বতন্ত্র। তাই সুদীর্ঘ কাল পরে, যৌবনের প্রান্তে পা রেখে হঠাৎ ছন্দোপতন ঘটল। আর ঘটল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পথে।

সঞ্জয় দাদার সম্পূর্ণ বিপরীত। চিরদিন শান্ত ও বাধ্য। দাদার বিশাল বাহুর ছায়ায় সে মানুষ। পড়াশোনা, গান-বাজনা, ছবি আঁকায় তার দিন কাটে। বন্ধু-বান্ধব, আমোদ-প্রমোদ, দেশ ভ্রমণ—এই তার নেশা। দাদার একান্ত অনুগত। খানিকটা স্বভাবে আর বাকিটা অভ্যাসে। কারণ ভাগ্যের চাকা ঘোরাবার হিম্মৎ যিনি রাখেন, তিনি বাধাকে বাধা বলে স্বীকার করতে চান না। বরং বাধা যত প্রবল, তাকে জয় করাতে তাঁর ততই আনন্দ। বাধা দিয়ে তাঁকে কেউ কোনদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি।

কাজেই এম-এ পাশ করার পর দাদা যখন অনুরোধ বা আদেশ করলেন যে, এবার তাকে বিয়ে করে লক্ষ্মীছাড়া সংসারে একটি লক্ষ্মীর আসন পাততে হবে, তখন সঞ্জয় একবারও মুখ ফুটে বলতে পারল না—দাদা, বিলেত থেকে ঘুরে আসার পর করলে হত না?

না, কোনো ওজর-আপত্তি খাটবে না। ধনঞ্জয় পাত্রীর সন্ধান করেছেন পরিচিত ব্যবসায়িক সূত্রের মারফৎ। মল্লিকার বাবাও মস্ত ব্যবসায়ী। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিষ্ট। মেয়েটি নাকি বি-এ পাশ। পরমা সুন্দরী।

মত স্থির করে ধনঞ্জয় নিজেই গেলেন মেয়ে দেখতে। কিন্তু গোল বেধেছিল সেখানেই। ভাইয়ের পাত্রী দেখতে দেখতে তাঁর হঠাৎ মনে হোল, হৃদয়ের দ্বারে কে যেন অতর্কিতে আঘাত হানল। মল্লিকার শাঁখের মত শাদা আর নিটোল হাত দু'খানির রক্তিম করতল নিজের হাতে তুলে নিয়ে কি যেন একটা স্নেহের কথা বলতে চেয়েছিলেন ভাবী ভ্রাতৃজায়াকে। হঠাৎ থেমে গিয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা বেরিয়ে এসেছিলেন পাত্রীপক্ষের এবং স্বয়ং পাত্রীর হতবাক্ দৃষ্টির সামনে থেকে।

সেদিন সারারাত তাঁর বিনিদ্র কাটল। মনে হোল, তাঁর কথা ভাবার কেউ নেই বলেই কি তাঁর নিজেরও নিজের কথা ভাবতে নেই? এমন স্বর্ণকমল কেন তিনি নিজের জন্ত আহরণ করবেন না? সেটা শ্রাবণ মাস। অশান্ত মেঘগর্জন আর প্রবল বর্ষণধারাক্রান্ত প্রহর গুণে গুণে তাঁর রাত ভোর হয়েছিল।

এর পর বাইরে আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন ধনঞ্জয়। সেটা কি কারণে, প্রথমটা সঞ্জয় বোঝেনি। একখানি মাধুর্যের প্রতিমা পরমার স্বপ্নে আর কাব্যে ও সঙ্গীতে ভরতর করে দিন কাটছিল তার। মল্লিকার একটা ছবি সে আগেই দেখেছিল। দাদার ইদানীংকার ভাব দুর্বোধ্য। বৃথা আশা বলে বোঝার চেষ্টাও সে করে না। কিন্তু বুঝল যেদিন, সেদিন সমস্ত পৃথিবীর সবটুকু সবুজ যেন নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল চোখের সামনে থেকে। একটা বোবা বিস্ময়ে শুধু দাদার গম্ভীর মুখের দিকে চেয়েছিল সে। বাধা দেওয়া বৃথা। বাধা দেওয়া দুঃসাধ্যও। কারণ ধনঞ্জয়কে বাধা দিয়ে কেউ কোন দিন আটকে রাখতে পারেনি। নিজের ভাগ্যের চাকা তিনি নিজেই ঘোরান।

বাবা যখন জোর করলেন, তখন সেও ধরে পড়েছিল মায়ের কাছে। তাই সুমিত্রা দেবী অনিচ্ছা সত্বেও এসেছেন।

* * * *

বিকেলে সুজাতাদের বাড়ীতে দাঁড়ায় জয়ন্তের নতুন ভ্যানগার্ডখানা। সুজাতার পরণের হাল্কা নীল রংয়ের শাড়ী তার তন্বী দীর্ঘ দেহটি জড়িয়ে আছে। এনামেলবর্জ্জিত মুখ নিটোল পরিষ্কার। টানা টানা চোখের দৃষ্টি নিবিড় স্নিগ্ধ। আধুনিক কায়দায় কাটা চুলের গুচ্ছ কপালের ওপর ঝুলে নেই অলসভাবে। টান করে আঁচড়ে মোটা বেণী দুলছে পিঠের ওপর।

তার পানে তাকিয়েই জয়ন্ত মুগ্ধ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে তার হৃৎপিণ্ড যেন রুদ্ধ হয়ে গেল।

ওর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে লজ্জা পেলেও সুজাতা সহজভাবে আমন্ত্রণ জানালে—আসুন। ওর সুমিষ্ট কণ্ঠের ডাক জয়ন্তের কানে জলতরঙ্গের মত বেজে উঠলো। টুপিটা গাড়ীতেই রেখে নেমে নমস্কার করতে সুজাতা হাসি চাপতে পারলে না। জয়ন্ত একটু অপ্রস্তুতভাবে হেসে বললে—কি হল? হাসলেন কেন?

—আপনার ব্যবহারে।

—আমার ব্যবহার? কোন কি অপরাধ করেছি? যদি করে থাকি, সেটা না জেনে, কাজেই ক্ষমা পাবার আশা নিশ্চয় করতে পারি।

সুজাতা বললে—আপনি দেখছি বিনয়ের অবতার। আপনার নাম বিজয় না হয়ে বিনয় হওয়া উচিত ছিল।

সুজাতার শেষ কথা জয়ন্তের কানে গেল না। বিজয় নাম শুনেই সে আনমনা হয়ে ভাবলে, সে অনধিকার চর্চ্চা করছে। নিজ পরিচয় লুকিয়ে বিজয়ের পরিচয়ে যে বন্ধুত্ব সে লাভ করেছে, ভবিষ্যতে যখন সুজাতা জানবে, তখন তার কাছে জয়ন্তের একমাত্র পরিচয় জোচ্চোর হবে।

ওকে নীরব দেখে সুজাতা বিস্মিতভাবে বললে—কি হোল? রাগ করলেন নাকি?

জয়ন্ত সজাগ হয়ে বললে—রাগ করবার মত কিছু বলেছেন বলে তো মনে হচ্ছে না।

—ঐ যে নাম বদলানোর কথা বললুম, অথচ আপনি কিছু বললেন না। তাই মনে হোল, রাগ করেছেন বুঝি।

জয়ন্ত বললে—ভাবছিলুম, কলকাতার বন্ধুকে আপনার কেমন লাগবে।

সুজাতা মুখ টিপে হেসে বললে—মন্দ

জয়ন্ত হেসে বললে—যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

—এত ভাবনা মনে ছিল, তা তো জানতুম না! এখন আপনার মতটা বলবেন কি?

জয়ন্ত বললে—আপনার সাথে আলাপ হবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। আমি কোনদিন এ সৌভাগ্যের কথা কল্পনাও করিনি। কোথায় ছিলেন আপনি, আর কোথায় আমি। কি আশ্চর্য্যভাবেই না পরিচয় হয়ে গেল। আমার মনে হচ্ছে, এই পরিচয়, এই বন্ধুত্ব যেন আমাদের বহুকালের।

সুজাতা উত্তর দেবার আগেই সুমিত্রা দেবী ঘরে প্রবেশ করতে জয়ন্ত উঠে দাঁড়ালো। সুজাতা পরিচয় করিয়ে দিলে—আমার মা।

জয়ন্ত এগিয়ে এসে নত হয়ে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে তিনি বিব্রতভাবে বললেন—বসুন। জয়ন্ত চেয়ারে বসতে বসতে বললে—আমাকে আপনি বলে লজ্জা দেবেন না।

জয়ন্তর কথা শুনে সুমিত্রা দেবী হাসলেন। স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন—আজকাল ছেলেমেয়েদের তুমি বলতে ভয় করে। হয়তো মনে করবে অপমান করছি।

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে—সেটা ঠিক। তবে এমনও অনেক আছে—যারা ছোট সাজতে চায়, 'আপনি' বললে রাগ করে।

সুজাতা সকৌতুকে বললে—আপনি নিশ্চয় আপনার মনের কথাটা মায়ের কাছে অপরের নাম করে বলছেন না।

জয়ন্ত হেসে বললে—মায়ের কাছে ছেলেমেয়ে চিরকাল ছোটই থাকে।

—এমনও অনেক ছেলে আছে, মায়ের চেয়ে নিজেকে বড় মনে করে।

—যারা করে তারা অহঙ্কারবশতঃই করে থাকে। মায়ের কাছে কেউ কোন দিন বড় হয়নি। আর হবে বলে মনেও হয় না।

ইতিমধ্যে চা-খাবার দিয়ে গিয়েছিল। সুজাতা জয়ন্তর সাম এগিয়ে দিয়ে বললে—কথা রেখে এবার এদিকে মন দিন।

জয়ন্ত বললে—ওসব কেন? শুধু চা দিন···

সুমিত্রা দেবী বললেন—না বাবা, ওসব চলবে না। প্রথম দিন এলে, কিছু মুখে দিতেই হবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে—কলকাতা কেমন লাগছে?

সুজাতা বললে—একটুও ভাল নয়। যেমনি নোংরা, তেমনি জনবহুল। সহজভাবে পথ চলা দায়। তার উপর আছে ফুটপাথের ঘর-সংসার। পানের দোকান থেকে খাবারের দোকান পর্য্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। আমার জানতে ইচ্ছে যায়, বিদেশীরা কি ধারণা নিয়ে যায়?

জয়ন্ত বললে—যা ধারণা নিয়ে যায়, সেটা আপনি যেমন বুঝছেন, আমিও তেমনি বুঝছি।

সুমিত্রা দেবী বললেন—এইসবের জন্যেই তো এদেশে আসতে ইচ্ছে করে না। এবারে উনি কিছুতেই ছাড়লেন না।

জয়ন্ত হেসে বললে—ভাগ্যে এসেছিলেন, তাই তো আমার বরাতে দেখা হয়ে গেল। না এলে আপনার স্নেহ থেকে আমি বঞ্চিত থেকে যেতুম।

সুমিত্রা দেবী মৃদু হেসে প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করে বললেন—তোমার ক'টি ভাই-বোন?

জয়ন্ত বললে—আমরা চার ভাই-বোন।

সুজাতা বিস্মিতভাবে বললে—তবে যে লিখেছিলেন, আপনার ভাই-বোন নেই—একা!

জয়ন্ত বিষম খেয়ে কেসে উঠলো। সামলে নিয়ে বললে—জয়েণ্ট ফ্যামিলী তো। সেই সব ধরে আর কি।

সুমিত্রা দেবী বললেন—জয়েণ্ট ফ্যামিলীর কথা আজকাল প্রায় শোনাই যায় না।

জয়ন্তর ঠাকুর্দার মস্ত জমিদারী ছিল। কাজেই জয়ন্ত যখন ছোট ছিলো, ঠাকুমার কাছে তাদের দেশের বাড়ীর গল্প শুনেছিল। আজ সেই শোনা গল্প কাজে লাগায়, বললে—আমাদের বাড়ী একেবারে সেকেলে ধরণের। [ক্রমশঃ।

সিক্ত যূথীর মালা

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

পনেরো

হ্যারিসন রোডের মেস ছেড়ে চলে এসেছে শুভজিৎ। এসে আছে কাশীপুরে একটা গলির মধ্যে এক বাগানবাড়ীতে। বাড়ীটা যে বিশেষ বড় তা নয়, নেহাৎই বাগানবাড়ী। খানকয়েক বড় বড় ঘর আছে শুধু। ওদিকে চাকর-বাকরদের জন্ম আউট-হাউস আছে একটা।

বাগানটা বিরাট। এককালে সাজানো ছিল···এখনও এখানে-ওখানে তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। তে-কোণা করে ইঁট গেঁথে নানা আকারের ফুলের কেয়ারি তৈরী হয়েছিল, তার ইঁটে-ঘেরা কেয়ারীর নক্সাটাই অবশিষ্ট আছে শুধু··টুকটুকে লাল রঙের অভাবে শ্যাওলায় সবুজ হয়ে আছে, ফুলের কেয়ারির চিহ্নমাত্রও নেই।··· ফুলের কুঞ্জে, সহস্রমুখী ফোয়ারার পাশে শ্বেতমর্মরের মূর্তি ছিল অনেক—লীলায়িত ভঙ্গিমায় যৌবনোদ্ধত নারীমূর্তি সব, আজ তাদের ভগ্নদশা।···বাড়ীটার চার পাশ ঘিরে বড় বড় গাছ ছায়া বিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রীষ্মের দুপুরেও তাই ঘরগুলো ঠাণ্ডা হয়ে থাকে, উত্তাপের হল্‌কাটা সহজে প্রবেশের পথ পায় না।···বড় বড় ফলের গাছও অনেক আছে সারা বাগান জুড়ে···বিশাল পুকুর আছে একটা, আজও তাতে কাক-চক্ষুর মত জল টল্‌টল্‌ করে।

বিনা কাজে পড়ে আছে সব কিছু, কেউ তদ্বির করে না। একতলা সমান উঁচু পাঁচীল ঘুরে এসেছে সারা কম্পাউণ্ডটা ঘিরে, সামনের কাঠের বিশাল ফটকটা দাঁড়িয়ে আছে আজও অটুট।···যাদের সম্পত্তি, তারা এমন উদাসীন কেন কে জানে! কেন যে এতখানি জায়গা কোন কাজে লাগানো হয়নি আজও, ভাবলে অবাক লাগে। এই বাসস্থান-দুর্ম্ল্যতার দিনে, এই কলকারখানার যুগে পুরোণো দিনের আলস্য নিয়ে পড়ে থাকার সুযোগ কি করে পেয়েছে জায়গাটা, এই আশ্চর্য!···

একটা মালী আছে। থাকে আউট-হাউসে, কোথায় কাজ করতে যায় দুপুর বেলা, অন্য সময় নিজের মনে একা থাকে। এখানে থাকার জন্য নিয়মিত মাইনে পায় বলে মনে হয় না।···হয়তো কেউ নেই···এখানে থাকার জায়গা পেয়েছে, কলাটা-মূলোটা বেচে নিজের ইচ্ছেমত···মালী হয়ে থেকে যেতে তাই হয়তো তার অসুবিধে হয় না কিছু।···

এই বাগানবাড়ীর একখানা ঘরে আস্তানা নিয়েছে শুভজিৎ। ঐ মালীটাই ঘরখানা ভাড়া দিয়েছে তাকে।

হ্যারিসন রোডের মেস থেকে উঠে এসে অবধি এখানেই আছে, মাস দেড়েকের বেশী হয়ে গেল।···

চলে এসেছে হঠাৎই, নিছক খেয়ালের বশে। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে [illegible] ঠিক তার বিপরীত। কিছু একটা করবে ভেবেই করে ফেলাই স্বভাব। জীবনের এতগুলো বছর এমনি করেই কাটল।

একটা স্কলারশিপ পাবার সুযোগ পেয়ে ভিয়েনা যাওয়া স্থির করেছিল দ্বিধামাত্র না করে। ফিরে এসে প্রথম কয়েক মাস কলকাতাতেই ছিল। বড় কোন হাসপাতালে 'ভেকেন্সী' ছিল না সেই মুহূর্তে··ডাঃ ব্যানার্জির চেম্বারে কাজ করত, আর মফঃস্বলের একটা প্রাইভেট হাসপাতালে চোখের ডাক্তারের পোষ্টটা পেয়েছিল।··ভালই ছিল, অসুবিধে ছিল না কোথাও। তবু হঠাৎ একদিন যেই পাটনার কাছাকাছি একটা গ্রামের হাসপাতালের চাকরির কথা শুনল, অমনি নিয়ে ফেলল সেটা। নেবার কারণ ছিল না কোন। বরং কলকাতা ছেড়ে পশ্চিমের গাঁয়ে চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ার মধ্যে কারণহীনতাটাই অতিরিক্ত প্রকট। দীপংকর, ডাঃ ব্যানার্জি, সবার নিষেধ উপেক্ষা করার পিছনেও যুক্তি ছিল না।··তবু গিয়েছিল শুভজিৎ, কেন গিয়েছিল, তা নিজেও জানে না।···বছর তিনেক ছিল। তার পর ডাঃ ব্যানার্জির চিঠিটা হঠাৎই নাড়া দিল মনটাকে, কলকাতায় ফিরতে ইচ্ছে হ'ল।··না হলে দীপংকরের কাছে যতই বলুক, ডাঃ ব্যানার্জির জন্যে আসতে হ'ল তাকে, নিজের মনে ভাল করেই জানে, ফেরার তাগিদ একটা ছিল মনে মনে।···কেন যেন নিঃসংগ একক জীবনটার প্রতি বিতৃষ্ণা এসেছিল, দীপংকরের জন্য ভারি একটা শূন্যতা অনুভব করেছিল অন্তরে।···ওখানে প্রকৃত বন্ধুত্ব হয়নি কারো সংগে, তিনটে বছর প্রায় একা-একাই কাটিয়েছে। মিশেছে যার সংগে যেটুকু, সে নিতান্তই ওপর-ওপর। মিশবে না বলে কোন বিশেষ পণ ছিল যে, তা নয় অবশ্য। যে পরিবেশে ছিল, অন্তরংগতা করবার মত পায়নি কাউকে, এইমাত্র। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একঘেয়ে জীবনটা কত দূরে ক্লান্ত করে ফেলেছে, ডাঃ ব্যানার্জির চিঠি পেয়ে কলকাতায় চলে আসার আগে নিজেও টের পায়নি কোনদিন।···

কলকাতায় এসে বহুদিন পরে জীবনটা এক নতুন রূপ নিল। দীপংকরকে দেখে অদ্ভুত একটা আনন্দের অনুভূতি ছেয়ে ফেলেছিল মনটাকে। দীপংকরের আনন্দ, রাগ, অভিমানে নিজের পরিপূর্ণ সত্তাটাকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিল।··বুভুক্ষু মনটা কেবল দীপংকরের সংগটুকু পেয়েই খুসী হয়ে উঠেছিল, দীপংকর তাকে আরও অনেক বেশী দিল। বৃহত্তর জগতে টেনে এনে ফেলল তাকে।

শুভজিতের ভাল লেগেছিল, দীপংকরের পছন্দে কোথাও কোন ত্রুটি নজরে পড়েনি।··নন্দিতার স্নিগ্ধ দুটি চোখের চাওয়ায় দীপংকরের জন্য একটি শান্ত জীবনের প্রতিশ্রুতির আভাস পেয়েছিল। চপল [illegible] নিজের জোরে স্থান করে নিয়েছিল অন্তরে।

··পরিপূর্ণতার অনুভূতি বিভোর করেছিল শুভজিৎকে।

কিন্তু সে বেশী দিন নয়।··অন্তরের [illegible] যে [illegible]

অনুভূতি আপনাকে নিয়ে ভাঙা-গড়ার খেলা সুরু করেছিল, সে গোপন রইল না বেশী দিন। চেতনা যাকে ভাল-লাগার সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা করতে চাইছিল, তার স্বরূপটা সব বাধা সরিয়ে নিজেকে মেলে ধরল সহজেই। নিজের মনের গতিটাকে চিনে নিতে ভুল হয়নি শুভজিতের। ভুল হয়নি বলেই অস্থির হয়েছে। অন্যায়বোধটা জড়িয়েই ছিল মনে, অস্থির হয়েছে প্রতিকারের কথা ভেবে-ভেবে।

প্রথমটায় নিজের ওপর আস্থা ছিল, দুর্বলতাটুকুকে জয় করে নেবার সাধনায় মেতেছিল তাই। অনুভূতিটাকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়, তবু ভেবেছিল বাইরে কোনদিন প্রকাশ পাবে না। যদি কোন দুর্বল অনুভূতি বাসা বেঁধে থাকে অন্তরের গহন কোণে, কেউ জানবে না তাকে, কেউ না। অন্ধকারের আবরণেই ঢাকা থাকবে সে চিরদিন।··· তারই প্রয়াসে অহোরাত্র নিজের সংগে লড়াই করেছে, তবু অনুভূতিটা ক্রমেই যেন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বসেছে মনে। ক্রমেই উপলব্ধি করেছে চিন্তাটা আর শাসনের বাঁধন মানছে না।

···ঘুরে-ফিরে সেই একই চিন্তা সব অস্পষ্টতার আবরণ সরিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, সেই একই অনুভূতি প্রকট হয়ে ওঠে, সেই একই আকর্ষণ মাতাল করে তোলে।

···সে চিন্তা শর্মিষ্ঠার, সে অনুভূতি শর্মিষ্ঠাকে ঘিরে, সে আকর্ষণ শর্মিষ্ঠার প্রাণ-চাঞ্চল্যের।

···কোন্ দুর্বল মুহূর্তে শুভজিতের সারা অন্তর জুড়ে আঁকা হয়ে গেছে শর্মিষ্ঠার ছবি, শুভজিৎ টের পায়নি তা।···অথবা অনেকদিন ধরে অনেক রঙের অনেক তুলির টানে একটু একটু করে ফুটে উঠেছে শর্মিষ্ঠার প্রতিকৃতি সমস্ত হৃদয় ভরে, শুভজিৎ জানে না তা।···যেদিন অনুভব করল—সবার থেকে পৃথক করে শর্মিষ্ঠা সম্বন্ধে নিজের মনের অনুভূতিটাকে দেখল যাচাই করে, সেদিন প্রকৃতির খেয়ালে মনের ভাঙাগড়ার কাজ অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে।···দিশাহারা চোখ ফেরবার পথ খুঁজে পেল না।

···প্রথমে অবশ্য নিজের কাছেই অস্বীকার করতে চেয়েছিল। দেখল, ওর অস্বীকার করবার শক্তির চেয়ে অনুভূতিটা অনেক বেশী শক্তিশালী।···

···শর্মিষ্ঠা নেশা ধরিয়েছে দেহে-মনে।···দুঃসহ গ্রীষ্মে প্রথম কালবৈশাখী ঝড় যে খুশীর নেশা ধরায়, সেই নেশা।··গাম্ভীর্যটা স্বভাবগত, তার মধ্যে শর্মিষ্ঠা তার সবটুকু প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে কখন, নতুন অনুভূতির প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

···তবু চেতনা হারায় নি পলকের জন্যও, তা সে প্রাণের জলোচ্ছ্বাস যত জোরেই ধা দিক।

দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে ওঠার তাগিদও ছিল তাই।···

অনুভূতির তাড়নায় বিবেকের চেতনা অবলুপ্ত হয়নি বলেই ছিল। ··নিজের চোখে নিজের মনের ছবি দেখে তাই শিউরে উঠেছে শুভজিৎ।···যা হয় না, হতে পারে না, নিজের মনকে তারই দিকে হাত বাড়াতে দেখে বিব্রত বোধ করেছে।

পিছনে তাহলে দুঃখবাদী মনের অস্তিত্ব ছিল না।···

জগতের প্রতি যে উদাসীন, তা নয়।···জীবনের মূল্যবোধও আছে যথেষ্ট।

জয়ের নেশাও আছে তাই।

হারতে শুভজিৎ চায় না। ত্যাগ যাকে করে, স্বেচ্ছায় করে। হয় তো বা অকারণেই, অনেক সময়ই পিছনে যুক্তি থাকে না কোন। তবু সেটা নিছক খেয়ালীপনা। উদাসীনতাও নয়, ভীতিও নয়। হঠাৎ কোন তুচ্ছ বস্তুতেও যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা আভাস পায়, খেয়ালী মনটাই ওকে জোর করে টেনে নিয়ে যায় সেখানে।

এই জয়ের নেশা ছেলেবেলা থেকেই জীবনটাকে নিয়ন্ত্রিত করে এল। স্কুলজীবনটা কেটেছে বোর্ডিংয়ে। পড়াশুনায় মন যতটা দিয়েছে, তাতে উচ্চাভিলাষ প্রকট ছিল না মোটেই, পড়াশুনার প্রতি ভালবাসাও ছিল না তখন। যা ছিল, তা জয়ের আনন্দ। ক্রমে দেখেছে, পড়াশুনা করলে জয়ের আনন্দ ছাড়া আরও লাভ হয় কিছু। পরীক্ষার সুফলের বিনিময়ে আর্থিক যে সুযোগ-সুবিধে পাওয়া যায়, তাতে বিধবা মায়ের গ্রামের স্কুল-টিচারির নামমাত্র আয়ের ওপর ভাগ বসানোর পরিমাণটা কমে।···অবশ্য ম্যাট্রিক পাশ করে বোর্ডিং-জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে টিউশানির সাধারণ পথেই মা'কে অনেকখানি অব্যাহতি দিয়ে আই-এস্‌সি পড়তে ঢুকেছিল। খুসী হয়েছিল নিজের খরচ নিজে চালিয়ে নিতে পেরে।···ইতিমধ্যে মায়ের ভেতরটা যে এমন ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, অনভিজ্ঞ চোখে তা ধরা পড়েনি। আই-এস্‌সি পরীক্ষা দিতে না দিতেই মা মারা গেলেন যখন, আচম্বিতে নিজের সতেরো বছর বয়সের সেই নির্ভরহীন, বাঁধনহীন অস্তিত্বটাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হ'ল।

···ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন ছিল।···

ভাবত, মায়ের চিন্তাক্লিষ্ট মুখে স্বচ্ছন্দতার হাসি ফোটাবে।···

মা অপেক্ষা করেন নি।···সেটা জীবনের 'চ্যালেঞ্জ' বলে মনে হয়েছে।···

তাই হার মানতে রাজী হয়নি। নির্দিষ্ট সময়ে মেডিক্যাল কলেজের ফর্ম 'ফিল্ আপ' করেছে শান্ত মুখে।

অসুবিধের কথা অজ্ঞাত ছিল না। কলেজের ডিউটির সংগে খরচ চালাবার চাকরির সময় নিয়ে সংঘাত বাধবে, এ তো জানা কথা। জেনারেল লাইনে পড়ে এম-এস্‌সি পাশ করে প্রফেসরি বা চাকরির লাইনে যাওয়াটা যে অনেক সহজ হ'ত তা বোঝা শক্ত নয়। মায়ের সংগে আলোচনাও হ'ত এ নিয়ে।···বলা যায় না, মা থাকলে হয়তো ঐ পথেই যেত।

কিন্তু ঘটল অন্যরকম।

জীবনের চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে নিয়ে তাই নতুন করে জয়ের নেশায় মাতলো শুভজিৎ।···ভিয়েনা ঘুরে আসা অবধি এই জয়ের নেশাই বলবতী ছিল।···কর্মজীবন শুরু করে কেমন যেন বিস্বাদ লাগল সব কিছু। পিছনে কোন উদ্দেশ্য নেই, উৎসাহ নেই, কোলাহলমুখরিত কলকাতায় নিজেকে কেমন যেন বেমানান লাগল।···মানসিক অবসাদ একটা, শূন্যতাবোধের অনুভূতি। হয়তো হাতের কাছে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ এলে ঘটনাপ্রবাহ অন্য খাতে বইত। তা আসেনি, ঝোঁকের বশেই হঠাৎ কলকাতা ছেড়েছিল শুভজিৎ।

তিনটে বছর অকারণেই চুপচাপ কাটল।

তবু মন থেকে জয়ের মোহ যায়নি।···কলকাতায় ফেরার মূলে আর সব কিছুর সংগে এটাও বড় কম কার্যকরী ছিল না।···

শর্মিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটল।

যে বাসনাটা দুর্দম হয়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল, শুভজিৎ তাকে কাছে ঘেঁষতে দিল না।··শর্মিষ্ঠার সংগে পার্থক্য আছে জানে। তবু সেটা

কোলে
গ্লুকোস
বিস্কুট
রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দ্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে
KOLAY GLUCOSE BISCUITS
KOLAY Glucose
বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা
কোলে
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-২০

অন্তলস্পর্শী মনে হয়নি যে তার জন্ম আপন মনোভাবটাকে অন্যায়ের পর্যায়ে ফেলতে হবে। বরং তেমন-তেমন বাধার সামনে পড়লেও, মাথায় ঝোঁক চেপে থাকলে সহজে পিছু হটবার পাত্র নয়।··· কিন্তু শর্মিষ্ঠাকে পাবার পিছনে যে বাধা, তাকে অগ্রাহ্য করবার শক্তি নেই তার।

বাধা দেবাশীষ।

দেবাশীষের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে কি শেষে?···সেটা শুধু বন্ধুত্বের অপঘাত নয়, অনধিকার প্রবেশও বটে।···দেবাশীষের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ জমেনি। ভালবাসাও ক্ষুন্ন হয়নি একবিন্দু। সেটা নির্ভেজাল একেবারে। তাতে শুধু বন্ধুত্ব কেন, স্নেহও আছে। দেবাশীষ বয়সে অন্ততঃ বছর পাঁচেকের ছোট।

দেবাশীষকে প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছিল। সেটা এখন ভালবাসার পর্যায়ে।

শর্মিষ্ঠার প্রতি আকর্ষণে তাই এই অপরাধবোধ! তাই নিজের মনটাকে দেখে চমকে উঠেছে। তাই অনুভূতিটা যতই ধীর পদক্ষেপে সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করেছে, ততই কোন অসতর্ক মুহূর্তে ধরা পড়ে যাবার আশংকায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

দিশাহারা ভাবটা কাটিয়ে উঠতে দেরী হয়েছে।···

কি করবে ভেবে না পেয়ে প্রথমে ওদের সংগ ত্যাগ করা অত্যাবশ্যক মনে হয়েছিল। নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসার পথটাই চোখে পড়েছিল সহজে।

ভুল ভাঙতে দেরী হয়নি। এমন করে সরে আসার বিসদৃশতাটুকু নজরে পড়েছিল।

তখন চেষ্টা করল সহজ হতে। গোপন চিন্তাটাকে সবলে দূরে ঠেলে ফেলে সহজভাবে মিশতে। সেই তাগিদে ওরা ডাকলেই গেছে। নিজে উত্তোগী হয়ে কোথাও যাওয়ার প্রস্তাব করেছে, সিনেমা দেখিয়েছে বা, এমনও ঘটেছে এক-আধবার।

তারপর নিজের মেসের ঘরে একা হয়েছে যখন, তখনও মনে মনে সেই একই অনুভূতির প্রাধান্য অনুভব করেছে, বরং শর্মিষ্ঠার হাস্তোজ্জ্বল মূর্তিটা প্রকট আরও। নিজের ওপরই বিরক্তি ধরে গেছে।

···সেই সঙ্গে ভয় একটা, নিজের ওপর অনাস্থা।···হয়তো আবার কিছুদিন ওদের সংগটা সযত্নে পরিহার করতে চেয়েছে।··· মানসিক আলোড়নের ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যবহারটা দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে ক্রমেই। কাজগুলোও সংগতিহীন।

নিজের সংগে লড়াই করে করে অবসাদ এসেছে।···হ্যারিসন রোডের মেসের ওপর বিতস্পৃহ হয়ে উঠেছে অকারণেই।···কাশীপুরের এই বাগানবাড়ীটা চিনত। ইদানীং ছুটির দিন ওদের সবাইকে এড়াতে অনির্দিষ্ট পথের যাত্রী হয়ে বাসে উঠে বসাটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন এসে পড়েছিল এ পথে। ভাল লেগেছিল বাগানবাড়ীটা।···সেই থেকে আসত প্রায়ই। মালীটা সুনজরে দেখেছিল, এলে অভ্যর্থনাই করত। শুভজিৎ ভেতরে ঢুকে বসে থাকত নির্জনে।···ইচ্ছেটা সেই সময়ই হয়েছিল। মালীটার ধর্মবোধটা কিঞ্চিৎ বেশী, আজ অবধি খালি ঘরগুলো ভাড়া দেয়নি। শুভজিতের প্রস্তাবে ভয়ই পেয়েছিল প্রথমে। সাহস দিতে কুণ্ঠিত ভাবে রাজীই হ'ল শেষ পর্যন্ত।

শুভজিৎ হ্যারিসন রোডের মেস ছেড়ে উঠে এল এখানে।

এই দেড়টা-দুটো মাস একেবারেই একা কাটল। দীপংকররা তো অনেকদিন অবধি ছিলই না কলকাতায়। দেবাশীষের বিলাসপুর যাওয়ার খবরও জানত। যাবার আগের দিন মেসে বলে যেতে এসেছিল সে নিজেই, দেখা পায়নি। পরদিন ফোন করে জানিয়েছিল। তখন অবশ্য ক'দিনের মধ্যেই চলে আসবার কথা ছিল। পরে অঞ্জনের সংগে হঠাৎ একদিন বাসে দেখা হয়েছিল, তার কাছে শুনেছে, দেবাশীষ এখনও ফেরেনি।

নির্জন পরিবেশে অনেকদিন অনেক ভেবেছে শুভজিৎ। ভেবে-ভেবে ভবিষ্যৎ কর্তব্য স্থির করেছে। মনের সহজ সুরটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, যে করেই হোক। ওরা ফিরে এলে আগের মতই মিশবে ওদের সংগে, কোন আড়ষ্টতা রাখবে না।

শর্মিষ্ঠা তো অবশ্য কলকাতাতেই আছে। অনেকবার ভেবেছে, হঠাৎ একদিন তার বাড়ী গিয়ে নিজের কাছেই নিজেকে সহজ করে নেবে। অনেকদিন না যাওয়ার সংকোচ বাধা দিয়েছে বারবার। টুকুনকে দেখতে যাওয়ার ছুতোটাও তেমন জোরদার মনে হয়নি।

···যাব-যাব করেও যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি তাই।

দীপংকররা ফিরেছেও অনেকদিন। নন্দিতার সংগে দেখা করে আসা উচিত ছিল এতদিনে। দীপংকরের কাছে কল্যাণীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার বিবরণ শুনে এসেছে সেদিন অফিসে। বেলেঘাটায় যেতে তাই উত্তোগী হয়নি মনটা।···দীপংকর অনেক অভিযোগ করল আজ তা নিয়ে, না জানিয়ে মেস ছেড়ে দেওয়ার জন্যও।

অনেকদিন পরে আজ সন্ধ্যেটা ভারি ভাল কাটল। শুধু সে আর দীপংকর—আর কেউ নেই, নন্দিতাও না। আগের দিনের সুর ভেসে এল যেন।···আগেকার মতই দীপংকর কথা বলে যাচ্ছিল, এতদিনের যা কিছু সংবাদ। বম্বেতে দিদি যত্ন করেছেন খুব। বিনিময়ে এখন তার সময়ের ওপর জুলুম হচ্ছে বড়। কল্যাণীর শ্বশুরবাড়ীর অপরিচিত আত্মীয়দের বাড়ী যাওয়ার বিড়ম্বনা! পার্টনার জীবেন গুপ্তর কার্যকলাপ!

শুভজিৎ শুনতে শুনতে ভাবছিল সাত-পাঁচ। দীপংকরকে সব কথাই বলে। বলার কথা'জমেছেও। বহুবার চেষ্টা করল বলতে। প্রতিবারই ইতস্ততঃ করে থেমে গেল শেষ পর্যন্ত।···দীপংকর অবাক হবে··চমকে উঠবে··তার জন্য দুঃখিত হবে হয়তো বা।

বলা হ'ল না।

না বলেও স্বস্তি নেই। দীপংকরের কাছে লুকোচ্ছে বলেও একটা অস্বস্তিবোধ মনে মনে।···বলা উচিত ছিল।

ফেরার পথে ফাঁকা বাসে বসে বসে এলোমেলো কত কিছু ভাবল। কথাটা পাক খেয়ে ফিরছে মনে··দীপংকরকে কথাটা লুকোনো উচিত হ'ল না।

শেষে স্থির করল, একদিন সুযোগমত জানিয়ে দিতে হবে। আজকের সুযোগটা হাতছাড়া করা অন্যায় হ'ল অবশ্যই।

[ক্রমশঃ।

পোষাক-পরিচ্ছদ—কয়েকটি কথা

সভ্যতার প্রধান অঙ্গই হলো পোষাক-পরিচ্ছদ বা বেশভূষা, এ বলবার অপেক্ষা রাখে না। মানুষ না খেয়েও হয়তো কিছু সময় কাটাতে পারে, কিন্তু নিয়তন পরিধেয় থাকা চাই তার সর্বক্ষণই। অবশ্য আদিম মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদের বালাই ছিল না কোনরকম। কিন্তু অনেক পরে তার অভিজ্ঞান আসে—এভাবে চলে না, একটু হলেও আবরণ চাই। এর পর ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরণের পোষাক সৃষ্টি হতে দেখা যায়, আজকের দিনে বাজারে বাজারে যার প্রত্যেকটিরই বিপুল সমাবেশ।

গোড়ার দিকে প্রয়োজনের নিতান্ত জরুরী তাগিদ থেকেই এক একটি পোষাক বের হয়—ফ্যাসান বা ষ্টাইলের দাবীটি মানুষের সমাজে বড় হয়ে ওঠে অনেক পরে। লজ্জা নিবারণের জন্যে তো বটেই, শীতাতপ ও ঝঞ্ঝা থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত মানুষ কোন আবরণ খোঁজে প্রথমটায়। গাছের ছাল, পশুর চামড়া—এ সব জড়িয়ে কত শত শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা তার কেটেছে, হিসাব কোথায়? সেই মানুষই আজ নিত্য নতুন ডিজাইনের পোষাক সৃষ্টি করছে, পরিচ্ছদের তার অন্ত নেই, এম'ন বলা চলে। একটুতেই নজরে পড়ে যায় যে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিধেয় সামগ্রীরও বিবর্তন হচ্ছে—এটি প্রধানতঃ অবশ্য ফ্যাসানের দিক থেকেই। কিছুদিন আগেও যে ধরণের পোষাক হয় তো বিশেষ চালু ছিল, বাজারে আজ সেটা সেভাবে কাটতে চায় না, নতুন যুগের মানুষের চোখে ও মনে নতুন নতুন চাহিদা ও নতুন রঙ। এ অবস্থাটি মেনে নিয়েই ব্যবসায়ী মহলকে ব্যবসা চালাতে হচ্ছে—পোষাক-পরিচ্ছদের রাজ্যে সত্যি নতুন কিছু বের করবার জন্য এক্ষণে তাঁদের বিশেষ উদ্যম। আর বাজারে পরিধেয়ের অভিনবত্ব হাজির করতে পারলে তা বিকাবেই, এ দীর্ঘদিন পরীক্ষিত। নিছক পুরাণোকে আঁকড়ে ধরে থেকে আজকের দিনে কোন পোষাক ব্যবসায়ীই নিশ্চিন্ত হতে পারেন না, অর্থ খাটিয়ে অর্থ ঘরে আসবে তার তুলনায় নিশ্চয়ই অনেক কম।

ইতিহাসের প্রথম পাদে কিংবা আরও কিছুটা পিছিয়ে গেলেই দেখা যাবে—আত্মরক্ষার জন্যে মানুষ যেমন কোন একটা অস্ত্র হাতে নিয়েছে, তেমনি কোন না কোন ধরণের বস্ত্র বা দেহাবরণও খুঁজে পেতে চেয়েছে সে নিতান্ত ব্যাকুলভাবেই। আজকের দিনে মনুষ্য-দেহের সমস্ত কয়টি অঙ্গ ঢাকবার জন্যেই পোষাক সৃষ্টি হয়েছে—পায়ের মোজা থেকে মাথার টুপি পর্যন্ত। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, সকল মানুষেরই একরকম পরিধেয় নয়—সর্বাগ্রে নারী ও পুরুষের পোষাক-পরিচ্ছদের পার্থক্য স্পষ্ট, আর এইটি দেশ-বিদেশের সর্বত্রই। এ ছাড়া যেটি বিশেষভাবে অহরহঃ চোখে পড়ে—এক এক জাতির পোষাক এক এক রকম। ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। আবার চীনা, জাপানী ও বর্ম্মীদের পোষাক, আফ্রিকান ও আফগানদের পোষাক একে অন্য থেকে স্পষ্টতঃ পৃথক শুধু এই কেন, ভারতীয় উপ-মহাদেশেরই বিভিন্ন রাজ্যের বাসিন্দাদের পরিধেয়ের দিকে তাকালে দেখা যাবে—সবই ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। বিভিন্ন পেশার লোকদের পোষাক-পরিচ্ছদের বিভিন্নতাও প্রতিক্ষণ চোখে পড়ে। অফিস-আদালতের পিয়ন-বেয়ারাদের পোষাক আর বড় বাবু-বড় সাহেবদের পোষাক এক কখনই নয়। সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি, এমন কি সাধারণের সঙ্গে পুলিসের পোষাকের পার্থক্যও স্পষ্ট।

একথা ঠিক, আজকাল বিশ্বে লোকজনদের পারস্পারিক মেলামেশা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি হচ্ছে, আর এর ফলে পোষাক-পরিচ্ছদও কোন নির্দিষ্ট জাতি বা দেশের মধ্যে সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ থাকছে না। আজ ইউরোপীয় পোষাক-পরা অজস্র ভারতবাসীকে দেখতে পাওয়া যায়—এর কারণ ক্রমবর্ধমান মেলামেশা ও সভ্যতার আদান-প্রদান। ভারতীয় নারীর চিরসুন্দর শাড়ীও অন্য জাতির নারীদের অঙ্গে আজকের দিনে কিছু কিছু পরিদৃষ্ট হয়। চাহিদা যত দ্রুত বেড়ে চলেছে, বস্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ হচ্ছে সেই অনুপাতেই, আর এটি সর্বত্র। পোষাক-পরিচ্ছদের কমতি হলে একালে কারোরই চলছে না, ঘর থেকে পা বাড়াতেই কয়েক দফা পরিধেয় চাই, যা অত্যাবশ্যক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশেই পোষাক-পরিচ্ছেদও কিছু না কিছু রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। আগেকার দিনে রাজা-রাজড়াদের যে জাতীয় জাঁকালো বেশভূষা ছিল, পারিপাট্য এক্ষণে বাড়লেও পোষাকের ঢং কিছুটা পাল্টে গেছে। দেশ-বিদেশের রাজ-কারিগরদেরও নতুন নতুন ডিজাইনের কথা ভাবতে হচ্ছে। রাজা-রাণী পর্যায়ের যাঁরা, তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্যে হাজির করতে হচ্ছে এমন সব রাজকীয় পোষাক, আধুনিকত্বে ও অভিনবত্বে যার জুড়ি মিলবে না। সাধারণ লোকের মনোমত পরিধেয় হাজির করার ব্যাপারেও ব্যবসায়ী

পোষাক-পরিচ্ছদের বেচাকেনাই সবচেয়ে অধিক হয়ে থাকে—অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের সুযোগও তখন স্বভাবতঃই বেশি।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সভ্যতার অগ্রগতির একদম গোড়ায় মিশরীয়রাই প্রথম পশুর চামড়া ছেড়ে বয়ন করা বস্ত্র পরিধানের কথা ভাবে। ব্যাবিলিয়নের অধিবাসীরা খাদ্যের জন্যে যে ভেড়ার পাল পোষত, সেগুলোর লোমসমূহ দেহাবরণ হিসাবে ব্যবহার করার উপায়ও ক্রমে বের করে নেয়। বিশ্বে আজকের দিনে পশম বস্ত্রের অভাব নেই, কিন্তু এর সূচনার কাহিনীটি আমাদের কতটুকু জানা? আবহাওয়া পোষাক-পরিচ্ছদ সৃষ্টিতে মানুষকে বেশি রকম বাধ্য করেছে—পরবর্তী যুগে বিজ্ঞান হয়েছে এই সৃষ্টির পরম সহায়ক। ইউরোপে যে পোষাক-পরিচ্ছদ চালু, সেটি সেখানকার ঠাণ্ডা আবহাওয়াভিত্তিক, এ বেশ বোঝা যায়। বাংলা দেশে ধুতি-পাঞ্জাবীর ব্যাপক ব্যবহারও তেমনি স্থানীয় আবহাওয়ার ভিত্তিতেই চালু হয়েছে। খেলোয়াড়দের পোষাক, অশ্বারোহীদের পোষাক, যোদ্ধাদের পোষাক—প্রয়োজন অনুসারেই ভিন্নতর। পুরুষদের সার্ট, কোট, পাঞ্জাবী, টাই, ট্রাউজার্স আর নারীদের শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া, গাউন, কালে-কালেই রকমফের হচ্ছে এ সকলের। কাপড়-চোপড় পরিধানের মধ্যে মানুষের সচেতন মনে না হোক, অবচেতন মনে হলেও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের একটা আগ্রহ লুকিয়ে থাকে। সেই থেকেই সমাজে বিভিন্ন ফ্যাশন বা ষ্টাইলের দাবি বা সূচনা। এই ব্যাপারে পুরুষের চেয়ে নারী-মন একটু বেশিরকম সজাগ বলা যায়, পোষাক-পরিচ্ছদের নিত্য-নতুন আভরণই তার পরিচায়ক।

ফিল্মের জন্যে লেখা

আজকাল ফিল্ম বা চলচ্চিত্র-শিল্পের দারুণ প্রসার হয়ে চলেছে, শুধু বাইরে কেন, এদেশেও। এর অর্থ হলো—ফিল্মের জন্যে লেখার চাহিদাও বেড়ে গেছে আগের তুলনায় অনেক বেশি। নতুন নতুন ছবির প্রয়োজনে নতুন নতুন কাহিনী চাই—বিচিত্র সরস রচনা চাই। দু'একজন লেখকের পক্ষে এই বিশেষ চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী হাজির করতে পারলে নতুন লেখকও এ ক্ষেত্রটিতে স্থান করে নিতে পারেন।

গল্প বা কাহিনীকারের সংখ্যা আজকের দিনে সব দেশেই বেশ বেড়েছে, এটি লক্ষ্য করা যায়। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও বলতে হবে, সকল লেখকের লেখাই পর্দায় ঠিক রূপদানের উপযোগী হয় না। সিনেমার কাহিনী রচনার একটি বিশেষ দিক আছে—এর টেকনিক হুবহু নাটকের কাহিনীর মতো নয়, সংলাপ রচনাতেও পার্থক্য স্পষ্ট। সেজন্যে দেখা যায়, বড় বড় লেখক—যাঁরা হয়তো ফিল্মের জন্যেই গল্প বা কাহিনী লেখেননি, চিত্রনাট্যে সেই সব লেখা রূপদানকালে কোন কোন জিনিস বাদ দিতে হয়, আবার প্রয়োজনানুযায়ী আমদানীও করতে হয় কিছু কিছু। যাঁরা চিত্রকাহিনী ও সংলাপ সরাসরি রচনা করে থাকেন, তাঁদের লেখায় এ ধরণের যোগ-বিয়োগের প্রশ্ন স্বভাবতঃই কম উঠে।

ফিল্মের জন্যে লেখা কিন্তু এ যুগে অর্থ রোজগারের একটি সুন্দর উপায়। তবে এই শ্রেণীর লেখার টেকনিক আলাদা বলে আগে থেকেই সেটির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। বড়দের ছবি ও শিশুদের ছবির কাহিনী একইরূপ হলে চলে না—লেখক তথা চিত্রনাট্যকারকে সেদিকেও দৃষ্টি না রাখলে নয়। মোটের ওপর, একবার সিনেমা কাহিনীকার হিসাবে চিহ্নিত হয়ে পড়তে পারলে বেশ কিছু অর্থ ঘরে আসবে, এরূপ প্রত্যাশা করা চলে। প্রযোজক ও পরিচালকগণ বাজারে সহজ কাটতি হবে, এমন বই পাবার দাবীতেই সব সময় খুঁজে বেড়ান। ঠিক তালমতো লেখককে নিজের রসাত্মক নতুন বইখানি তুলে দিতে হবে তাঁদের হাতে। উপযুক্ত সংলাপ কেন, গান রচনা করে দিতে পারলেও অর্থোপায় করা যায়। অবশ্য এই ব্যাপারে যোগাযোগটাই বড় কথা, আর সেটি আগে থেকেই করে নেওয়া চাই বেশ ভালো রকম।

প্রখ্যাত লেখকের বিখ্যাত বইগুলো পর্দায় রূপায়িত করার সময় বহু ভাবনা নিয়োজিত করার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনের খাতিরে কোথাও কোথাও রদবদল, পরিবর্জন ও সংযোজনা করতে হলেও যথেষ্ট হুঁসিয়ার না হলে চলে না। মূল গল্প যত দীর্ঘই থাকুক, সিনেমার নির্দিষ্ট সময়-কাঠামোতে তাকে নিয়ে আসা একটি বড় প্রশ্ন। সংক্ষেপ করতে যেয়ে গল্পের আসল বিষয়বস্তু হারিয়ে ফেললেই বিপদ। দর্শক-সমাজের কাছে মূল লেখক নিজে হলে কি ভাবে জিনিসটি পরিবেশন করতেন, চিত্রনাট্যকারকে সে দিকে নজর রেখেই কাজ করতে হবে। সংলাপ রচনাকালে লেখকের অল্প কথায় সহজগ্রাহ্য অধিক ভাব প্রকাশের লক্ষ্যটি থাকা চাই। এমনি দেখে-শুনে বই রচিত ও চিত্রায়িত হলে উত্তম সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি—অন্যথা কঠিন সমালোচনা জুটবে, নেশা, পেশা বা অর্থোপায়ের দিক থেকে যা নাকি কাম্য হতে পারে না। সহজ কথায় ফিল্মের জন্যে যিনিই লেখবেন, পর্দার উপযোগী করেই তাঁকে কাহিনী বা সংলাপ রচনা করতে হবে, খাপছাড়া অস্বাভাবিক কিছু হাজির করলে কিছুতেই চলবে না। এ অবস্থায় লিখে অর্থ রোজগারের আশাও হবে স্তিমিত।

লৌহেতর ধাতু ও ভারত

পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের শিল্পায়নের জন্য লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি রকম, এই নিয়ে প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে এটুকুও বলতে হবে যে, লৌহেতর ধাতুসমূহের প্রয়োজনও আজকের ভারতে সামান্য নয়। অথচ এর সবটা চাহিদাই আভ্যন্তরীন ব্যবস্থায় পূরণ হয় না—বাইরে থেকেও বেশ কিছু আমদানীর কথা এখানে থেকে যায়।

তৃতীয় পাঁচসালা যোজনার প্রারম্ভিক কাজগুলো সম্পন্ন করবার জন্যেই যথেষ্ট পরিমিত লৌহেতর ধাতু আবশ্যক। তা ছাড়া, এদেশের শিল্প-কারখানাসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় অ্যালুমিনিয়াম, তামা ও দস্তা প্রভৃতির আমদানী না হলেই চলবে না। জাতীয় সরকারের দৃষ্টি ও মনোযোগ এদিকে রয়েছে, বলতে পারা যায়।

সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে—যাতে করে লৌহেতর ধাতু আমদানীর জন্যে ২ কোটি ডলার (প্রায় ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা) ঋণ পাবে ভারত। ঋণটি দিচ্ছেন মার্কিণ উন্নয়ন ঋণ তহবিল আর এই ঋণ ভারতীয় মুদ্রায় পরিশোধ করা হবে। মার্কিণ মুল্লুক থেকে এভাবে আমদানীকৃত অ্যালুমিনিয়াম, তামা ও দস্তা প্রভৃতি লৌহেতর ধাতুর অধিকাংশই ব্যবহৃত হবে বিদ্যুৎ, পরিবহন ও যোগাযোগ-শিল্পে, যার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

"টাকা জমানোর কথা কখনো কি ভেবেছেন?"

"ভেবেছি বই কি···তবে···ব্যাঙ্কের দরজা মাড়াতেও আমার ভয় করে।"

"ন্যাশানাল অ্যাণ্ড গ্রীণ্ডলেস্ ব্যাঙ্কে আসতে ভাবনার কিছু নেই। এ ব্যাঙ্কে সকলের কাছেই আপনি সৌজন্য আর সাহায্য পাবেন।"

"তা তো হ'লো. কিন্তু টাকাটা···?"

"মাত্র পাঁচ টাকা দিয়েই একটা সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলতে পারেন আর বাৎসরিক শতকরা ৩ টাকা হারে সুদও পেয়ে যাবেন।"

"কিন্তু আমার যে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা পোষায় না···"

"টাকা জমা দিতে বা তুলতে মাত্র দশমিনিট লাগবে আপনার আর টাকা তোলার জন্যে একটি চেকবইও আপনায় দেওয়া হবে।

"বেশ, কিন্তু টাকা তোলার নিয়মটা কিরকম?"

"সপ্তাহে দুবার তুলতে পারেন আর
যেটাকা ব্যাঙ্কে আছে তার
একহাজার টাকা, যা বেশী
তুলতে পারবেন।"

"ও আচ্ছা, নামটা হ'ল নাশ

"হ্যাঁ ন্যাশানাল
জমানো মানে
আর উজ্জ্বল
যাওয়া।"

একাউণ্ট খো
শাখায় আ

বুকের মধ্যে। যেকথা ঠানদি প্রাণপণে ভুলে থাকতে চায়, সেকথা ভুলেই থাকতে দাও তাকে।

বরং জানতে চাও, তার পরে কি হল?

তার পর?

খুন করে জেলে গেল মেনকা। চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

সেখানে কতজনার সঙ্গে আলাপ। কিন্তু তাদের মুখগুলো আজ আর ঠিক স্পষ্ট করে মনে পড়ছে না ঠানদির। জেলখানার ঘূরন্ত জাঁতার মধ্যে সব ছোলা যেমন গুঁড়ো বেসন হয়ে একাকার হয়ে যেত, ঠিক তেমনি জেলখানার সব মুখগুলো মিশিয়ে একাকার হয়ে গেছে। মনে আছে শুধু একজনের কথা। মেয়ে-আসামী মহলের সর্দারণী নীরদা দিদি। মোটাসোটা থপ্‌থপে সেই মানুষটাই তো দোক্তাপাতার সঙ্গে চুণ মিশিয়ে নীচের ঠোঁটের ভাঁজের মধ্যে গুঁজে রাখার নেশাটা দিয়েছিল ধরিয়ে। বাব্বা, আজ ঠানদির ঠোঁটের ভাঁজ থেকে চুণ-দোক্তার ঐ ডেলাটাকে সরিয়ে নিয়ে বলো তো তাকে কোনো কাজ করতে। হাতই চলবে না ঠানদির!

তা' সে জেলখানায় চার চারটে বছর কাটিয়ে মেনকা যেদিন বের হল গেটের বাইরে, সেদিন তাকে নিয়ে যাবার জন্যে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিল দু'জন মানুষ।

একজনের নাম বিরিঞ্চি দাস।—নাপ তিনী না এলে বেটাছেলেদের দিকের যে-নাপিতটা মাঝে-মধ্যে মেয়ে-কয়েদীদের নোখ কাটতে আসত, সেই বিরিঞ্চি দাস। রাজ্যের মানুষজনের চুল-গোঁফ-দাড়ি ছাঁটলেও যে-মানুষটা তার নিজের দু'কানের ঘাসের মতো লম্বা-লম্বা লোমগুলোকে ছাঁটত না সাতজন্মে—সেই বিরিঞ্চি দাস।

আরেকজনের নাম—হ্যাঁ—শশিকান্ত।

শশিকান্ত কথা বলেনি আগে কোনও—শুধু মেনকার হাতের ছোট পুঁটলিটার দিকে বাড়িয়েছিল তার হাত। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ছিট্‌কে উঠেছে মেনকার দু'চোখে।

ওধারে ছায়ার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতের বিড়িতে সুখটান দিতে দিতে চোখ মটকে মুচকি হাসল শুধু বিরিঞ্চি দাস।

মেনকা থমকে দাঁড়াল মাঝপথে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে শশিকান্ত যদি না এসে দাঁড়াত জেলখানার বাইরের রাস্তায়, তা হলে মেনকা হয়তো ঐ বিরিঞ্চিকে এড়িয়ে সোজা চলে যেতে পারত সামনের দিকে, যেদিকে পিচ-ঢালা চওড়া রাস্তায় চলেছে সভ্য ভদ্র ব্যস্ত মানুষের দল। কিন্তু যেতে দিল না ঐ শশিকান্তই। তার প্রতি মেনকার যে ঘৃণা সেই ঘৃণাই যেন মেনকাকে ঠেলে ফেলে দিল বিরিঞ্চি দাসের গায়ের উপর। বিরিঞ্চি বড় আহ্লাদেই সাপ্‌টে নিল মেনকাকে।

সিঁথের সিঁদুর দেবার পর যে মিন্‌সে তার ইস্তিরিকে বন্ধক দেয় বন্ধকী কারবারীর কাছে, তার চেয়ে সে ভাল, যে বলে—'দেশে আমার বৌ-ছেলে আছে; তুই থাকবি আমার কলকাতার বাসার ইয়ে হয়ে। সেও একপ্রকারের বৌ-ই তো রে বাপু। তোর পসন্দ মতো বাজার আনব, দুপুরে রুটি-বিস্কুটওলার কাছ থেকে ঝাল-বিস্কুট কেনবার জন্যে তোর হাতে দু'চার আনা পয়সা দেব, রূপোর গয়না গড়িয়ে দেব। বৌ হওয়ার আর বাকিটা রইল কি?'

বাকিটা ?

সে যে অনেকখানির বাকি গো, অনেকখানির ফাঁক! সিঁথেয় সিঁদুর থাকবে না, ছেলে মা বলে ডাকবে না, মরে গেলে গলায় কাছা লেবে না কেউ।

তা হোক্, তা হোক্—তবু শশিকান্তর চেয়ে ঐ বিরিঞ্চিই ভাল।

বিরিঞ্চি দাসের হাতে মেনকা তার নিজের ছোট্ট পুঁটলিটা তুলে দিতেই শশিকান্ত মাথা নীচু করে বলল—বিশ্বেস কর্ মেনকা, আমি এতটা জানতেম না। বিষ্টু সরকার বলেছিল, বাবুর রাতদিনের দাসী হয়ে থাকবে, আমার জিম্মায় রেখে যা, ভয় নেই তোর কোনও। তাই তোকে অমন করে রেখে দিয়ে গেছিলাম। নোঙরা গান তোকে গাইতে হবে, কর্তাকে চান করিয়ে নিজে হাতে তার সারা গা মুছিয়ে দিতে হবে, এ-অবধি আমি জানতাম যে মেনকা, কিন্তু তার বেশি আর কিছুর শংকা করিনি এক তিল। কর্জ করেছিলুম অনেক টাকা—জেলে যাবার জো হয়েছিল—তোকে ঐ বিষ্টুবাবুর জিম্মায় রেখে টাকা নিয়েছিলাম তাই। অমনটা হতে পারে জানলে, মাইরি মেনকা, কালীঘাটের কালীর দিব্যি, তোকে আমি ওখানে রেখে আসতুম না।

আহা কী কৈফিয়ৎ রে! বিয়ে-করা বৌকে বড়লোকের বাড়িতে গা-মোছার কাজে জুতে দিয়ে এসে ভাতার বলেন কি না—শংকা করিনি এক তিল! মরি মরি বিশ্বাস রে!

মেনকা তাই সেদিন শশিকান্তর সামনেই বিরিঞ্চির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আব্দারের সুরে বলেছিল—তোর ঘরকে যাবার আগে শাঁখারিটোলার বাজার থেকে দু'গাছা শাঁখা কিনে দিতে হবে কিন্তু গো নাপিতের পো। খালি হাত নিয়ে তোর ঘর কোরে তোর তো আর অকল্যেণ ডেকে আনতে পারিনে গো আমি।

শাঁখার দোকানেই মেনকা দেখতে পেল সেই অনেকদিন আগেকার সেই লম্বা-চওড়া দরোয়ান গোছের মানুষটাকে—যে মানুষটা চারিদিক আঁটা একটা ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে তাকে বিদ্যাধরীর বাড়ি থেকে আদিগঙ্গার বাঁকে অশথগাছের তলায় পৌঁছে দিয়ে গেছল।

মানুষটার চুল-গোঁফ পেকে গেলেও মেনকার তাকে চিনতে কিন্তু একটু দেরি হয়নি। বলল—আমাকে চিনতে পার দরোয়ানজী?

তাকাল দরোয়ান। চেষ্টা করল চেনবার। চিনতে পারল না। মেনকা যে অনেক বদলে গেছে। এগারো বছরের মেনকা থেকে সাতাশ বছরের মেনকারাণীতে পৌঁছে গেছে যে তখন সে। দরোয়ান তার নাগাল পাবে কেমন করে?

মেনকা বলল—এখানে কী করতে গো দরোয়ানজী?

দরোয়ান বলল—শাঁখের গুঁড়ো কিনতে। ব্রণর ওষুধ। কিন্তু তুমি কোন্ আছ? মালুম তো হচ্ছে না আমার।

মেনকা বলল—বা-রে, সেই যে আমি গিয়েছিলুম তোমাদের বাড়ি বজরায় চেপে। তখন ছোট আমি। এগারো বছরের মেয়েটি। তোমাদের মা আমাকে একটা প্রজাপতি-বসানো টায়রা দিয়েছিলেন। রূপোর গেলাসে করে তরমুজের শরবৎ খেতে দিয়েছিলেন।—এখনো চিনতে পারছ না আমাকে? তারপর সেদিন তোমাদের বাড়িতে সত্ত্ব বক্‌সি না বিদয় শুঁড়ি কে বুঝি একটা মানুষ·····

নাঃ, চিনতে পারার কোনও লক্ষণই নেই দরোয়ানজীর মুখে। মেনকাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে চট্ করে উঠে পড়ল সে। তাড়াতাড়ি দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল শাঁখের গুঁড়োর কাগজের ঠোঙা হাতে নিয়ে।

মেনকার এই গায়ে পড়ে আলাপ করতে যাওয়াটা গোড়া থেকেই একটুও ভাল লাগছিল না বিরিঞ্চি দাসের। দরোয়ানজী চলে যেতেই সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—আজেবাজে কথায় সময় নষ্ট না করে শাঁখাজোড়া আগে পসন্দ করে নে মেনকা। ঘরে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে যাবে।

বিরিঞ্চির খোলার বস্তির ঘরে এসেও মেনকার মনের মধ্যে সেই দরোয়ান আর তাদের মা সেই অপরূপা বিদ্যাধরীর স্মৃতিটা পাক খেয়ে খেয়ে ফিরতে লাগল। সেদিন বোঝেনি মেনকা, আজ কিন্তু বেশ বুঝতে পারছে, কে ছিল সেই বিদ্যাধরী, কী ছিল সেই বিদ্যাধরী।

মেনকাকে নিয়ে সেই প্রথম ঘর করার দিনটাতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সুখের জোয়ার ঠেলে এসেছিল বিরিঞ্চি নাপিতের বুকে। তাই চার আনার পাঁঠার ঘুগ্‌নি তক্তপোষের তলায় রেখে সন্ধ্যের পর বিরিঞ্চি গেছল একখানা বেলফুলের মালার যোগাড় করতে। মেনকা একলা ছিল ঘরে

এমন সময় রাস্তার টিম্‌টিমে কেরোসিন-বাতির আবছা আলোর পর্দা ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল সেই বিদ্যাধরীর দরোয়ান। বলল—চিনতে পারছ আমাকে?

মেনকা বলল—বা-রে, আমি তো তোমাকে সকালবেলায় সেই শাঁখার দোকানেই চিনতে পেরেছিলুম। তুমিই তো চিনতে পারনি তখন আমায়। সত্ত্ব বক্‌সি আর বিদয় শুঁড়ির নাম শুনেই এমনভাবে উঠে গেলে যে মনে হল, যেন ছারপোকা ছিল দোকানীর তক্তপোষে। তা' হঠাৎ এখন চিনতেই বা পারলে কেমন করে, আর এখানে এসে পৌঁছলেই বা ক্যাম্‌নে?

দরোয়ান বলল—সে সব কথা পরে হবে। মাঈজী বোলায়েছেন তোকে।

—মাঈজী! বিদ্যাধরী! কোথায়? কোথায় তিনি?

—গলির মোড়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে আছেন তিনি। দুটো কথা বলেই ফিরে যাবেন আবার।

বিদ্যাধরী! বিদ্যাধরী স্বয়ং অপেক্ষা করছেন মেনকার জন্যে রাস্তার মোড়ে ঘোড়ার গাড়িতে!—বিদ্যাধরীর অনেকদিন আগেকার সেই কথাটা মনে পড়ে গেল আজ মেনকার—'গেলজন্মে তুমি আমার পেটের মেয়ে ছিলে কিনা।'

মেনকা বলল—চল যাই। কিন্তু এই ঘরদোর? মানুষটা যে ফুলের মালা কিনতে গেছে। তক্তপোষের তলায় চার আনার পাঁঠার ঘুগ্‌নি যে আঢাকা পড়ে থাকবে।

দরোয়ান বলল—আরে, দু'চার মিনিটের মধ্যেই তো বাতচিৎ সব শেষ হয়ে যাবে।

ঘর খোলা রেখেই উঠে গেল মেনকা। এখুনি তো ফিরে আসবে।

কিন্তু বিরিঞ্চি দাসের ঘরে ফিরে আসা আর হয়নি মেনকার। বিরিঞ্চি দাস বেলফুলের মালা কিনে ঘরে ঢুকে দেখেছে, ঘরে মেনকা নেই। তক্তপোষের তলার পাঁঠার ঘুগ্‌নি ছড়িয়ে দিয়ে গেছে পথের কুকুর।

মেনকা তখন চারিদিক আঁটা একটা ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে ঠিক তেমনিধারা বন্দিনী, যেমন বন্দিনী হয়ে এগারো বছর বয়সে সে একদিন বিদ্যাধরীর বাড়ি থেকে নিজেদের বাসায় ফিরেছিল।

ঘর ছেড়ে দরোয়ানের সঙ্গে রাস্তার মোড়ে গিয়ে মেনকা একটা গাড়ি দেখতে পেয়েছিল ঠিকই। দরোয়ান বলেছিল—ভেতরে উঠে গিয়ে কথা বল্ মাঈজীর সঙ্গে।

তা' সে গাড়ির ভেতরে উঠতেই বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল গাড়ির দরজা। অন্ধকার গাড়ি। তার মধ্যে বিদ্যাধরীর চিহ্নও নেই কোনও!—চীৎকার করে উঠেছিল মেনকা। কিন্তু ইট-বিছানো রাস্তা দিয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার গাড়ির ভিতর থেকে চেঁচিয়ে পথিকজনের শ্রবণ আকর্ষণ করবার মতো কণ্ঠস্বর মেনকা কোথায় পাবে?

নিজেকে অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের কোলে সঁপে দিয়ে সেই অন্ধকার ছুটন্ত গাড়ির মধ্যে ঝাঁকুনি খেতে লাগল মেনকা।

সেই ঝাঁকুনিটা অনেকক্ষণ পরে থেমে গেল যখন, আর ঘোড়ার গাড়ির দরজাটা খুলে গেল সহসা—মেনকা সবিস্ময়ে দেখতে পেল, তার সামনে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্বয়ং বিদ্যাধরী!—মেনকার মনে হল, রঙ্গলাল শর্মার বাড়ির দেয়ালে টাঙানো বড় বড় অয়েলপেণ্টিং ছবির মতন কোনো একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি দেখছে সে পর্দা সরিয়ে।

ছবিটা নড়ল। ছবিটা কথা বলল।

বিদ্যাধরী হাত নেড়ে বললেন—এসো।

মন্ত্রমুগ্ধের মত গাড়ি থেকে নেমে বিদ্যাধরীকে অনুসরণ করল মেনকা।

পুরণো সে-বাড়ি নয়। এ নতুন বাড়ি। স্বচ্ছল গেরস্থের বাড়ি যেমন হয়, তেমনি। বিদ্যাধরী মোটা হয়ে গেছেন। মাথার চুলে পাক ধরে গেছে। চোখের চামড়ায় কোঁচ পড়েছে।

মেনকাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বিদ্যাধরী বললেন—সেদিনকার সেই সতু বক্সির খুনের কথাটা তুমি আজও ভুলতে পারনি শুনলুম দরোয়ানের মুখে।

মেনকা বলল—না। সে দৃশ্য যে আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। সেই ঝিলিমিলি-দেওয়া টানা দালান। মেঝেতে লম্বা কার্পেট পাতা। লোহার তৈরি কালো রঙের একটা দাড়িওলা সেপাইয়ের মূর্তির হাত থেকে আলোর কাচের ফানুসটা ছিটকে ভেঙে পড়ে গেছে কার্পেটের ওপর। আর ঠিক তার পাশেই সতু বক্সি নামের টেরি-বাগানো একটা লোক কড়িকাঠের পানে তাকিয়ে স্থির শক্ত হয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে মেঝেয়। মেঝেটা রক্তে লাল!

বিদ্যাধরী বললেন—মিষ্টি নরম গলাতেই বললেন—কিন্তু তোমাকে আমি ঐ ঘটনাটার কথা ভুলে যেতে বলেছিলুম, তাই না? বলেছিলুম, কিছু মনে রেখ না, কিছু বোলো না কারুর কাছে। এ-জীবনে না। তাই না?

মেনকা বলল—বলিনি তো। এ-জীবনে বলিনি তো কাউকেই। শুধু আমাকে চেনাবার জন্যে তোমার দরোয়ানকে বলেছিলুম আজ সকালে।

বিদ্যাধরী বললেন—বলনি বটে; কিন্তু ভুলে তো যাওনি।

মেনকা বলল—না। তা' যাইনি।

—কিন্তু ভুলতে তোমাকে হবে।

বলতে বলতে বিদ্যাধরীর ঘরের পর্দা সরিয়ে ঢুকল যে মানুষটা, মেনকা তাকে এতদিন পরে একটিবার মাত্র দেখেই ঠিক চিনতে পারল। সে বিনয় গুঁড়ি। [ক্রমশঃ।

এই দিন, এই রাত

মেঘলা ঘোষ

এই দিন, এই রাত,
তারও আগে কেটে গেছে আরও কত দিন আর রাত
তবু দু'য়ে কতই তফাৎ।
গেছে কেটে কতদিন, কালের রুটিনে বাঁধা গতি
বিরামবিহীন পথে, নেই কোন ছন্দ-মিল-যতি।
ধূসর এ জীবনের বিষণ্ণ মলিন সূচনায়
গতি হারিয়েছে ছন্দ, মিল কোথা নিয়েছে বিদায়।
নিদাঘের তাপ লয়ে অন্তরে জেগেছে মরুতৃষা
অতৃপ্তি পাথেয় তার, শান্তি সেথা হারায়েছে দিশা।
তবু কেটে গেছে দিন বুকচাপা বেদনায় লীন,
দুঃস্বপ্ন জাগর রাত্রি সুদিনের আশায় বিলীন।
ভুল করিনি ত তবু, ভুলিনি আত্মার অভিমান,
জীবনের পাঁকে তাই জন্ম নিল স্বপ্ন আর গান।
প্রেম দিয়ে, দিয়ে প্রীতি, প্রাণের অপার ভালবাসা
সব চাওয়া তৃপ্ত আজি, নেই কোন দুরাশার আশা।
তোমায় আমায় মিল, তাই বুঝি সবই ছন্দময়,
প্রেমের আলোয় শুভ্র দিন আর রাত্রি জেগে রয়,
সব কান্না হাসিতে বিলীন,
সারারাত. উজ্জ্বল দিন।

গুণীর পরশ

ধরা দেবী

একটি সুরে বাঁধতে ছিলাম
মন বীণার তার।
অন্য তারে পরশ লেগে
উঠিল ঝঙ্কার।

হল না আর সে সুর সাধা,
বারে বারে দেয় গো বাধা,
নতুন করে আবার গাঁথি
ছিন্ন সুরের হার।

তেমন করে মেলে না আর
হয় না গাঁথা হার।
যা আছে তোর তাই দিয়ে আজ
ভরনা সুরের ডালি।
সবাই যেরে নিল ভরে
তোর কি রবে খালি?

নূতন সুরে বেঁধে দিল
পাগল সুরকার।
গুণীর হাতের পরশ পেয়ে
উঠিল ঝঙ্কার।

একশ আট

দীপেন রাহা

আমার ডিউটির সময় ও জায়গার বদল হয়েছে। উত্তর মেরু থেকে যেন দক্ষিণ মেরুতে। পুরণো জগৎ থেকে নতুন জগতে।

নিখিল দেখা হতেই বললে, কী হে, এখন বালিগঞ্জের দিকে ডিউটি পড়েছে তোমার। খুশী তো? উত্তরের ঘিঞ্জি আর কচকচানি সহ্য করতে হবে না। আমরা সেই জব চার্ণকের শহর আগলে আছি। কবে যে ওদিকে বদলি হব জানিনে।

মনে মনে একটু স্বস্তিবোধ করছিলাম। বড়বাজারী ধাক্কা ও মিশ্রিত ভাষার গালাগাল থেকে বেঁচে গিয়েছি। আপাততঃ এই পরম লাভ।

অভিজাত মহল্লায় এসেছি। কিন্তু কাজের রকম ও পদবী সেই একই আছে। এতটুকু পরিবর্তন নেই। তবে আগের চাইতে একটু বেশী ধোপ-দুরস্ত থাকি, এই যা।

জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে ছিল না, তা নয়। ইচ্ছে ছিল, পাইলট হ'ব। শূন্যে বিচরণ করব। বিচরণ ঠিকই করছি, তবে শূন্যে নয়, জমির ওপর। একই এলাকার মধ্যে বার বার যাতায়াত। দিনে আট ঘণ্টা ডিউটি। পাইলটের জাঁকালো পোষাকের পরিবর্তে যে পোষাক গায়ে উঠেছে তা অনেকের চোখে দৃষ্টিকটু। কিন্তু উপায় নেই। পোষাকটা বিদঘুটে হলেও সহ্য হয়, কারণ জুতো জোড়া সহ সবই কোম্পানীর দেওয়া। গায়ে মোটা খসখসে পোষাকে গ্রীষ্মকালে ঘামাচি হয়, ফোস্কাও পড়ে, কিন্তু পা দুটো জখম হয় না। জুতো সেণ্ডেলকে হার মানিয়ে প্রায় সমগোত্রে এসে গেছে। ফিতে নিখোঁজ, প্রয়োজন হয়না বলেই। পা দুটো গলিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হয়, ফিতে আঁটবার ঝক্কি পোহাতে হয় না।

মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার উপায় আছে। কাণ্ডারী—ভবপারের নই, এ পারেরই এবং দিনে হাজার হাজার লোককে পারাপার করি। এ-রাস্তা থেকে ও-রাস্তা। ধর্মতলা থেকে বালিগঞ্জে, গড়িয়াহাট থেকে কালীঘাটে। কাজেই নরনারায়ণের সেবা ও অন্নসংস্থান দু-ই হচ্ছে। চলতি পথে নানা রকম দৃশ্য চোখে পড়ে। জোড়া জোড়া চকা-চকিও বাদ যায় না। তাদের বকবকানিতে কান দুটো ঝালা-পালা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে হাসির টুকরোও ছিটকে কানে আসে। কিন্তু উপভোগ করার উপায় নেই। কখন ওপরওলা এসে ওয়ে বিল চাইবে, কে ভাড়া না দিয়ে নেবে গেল—সব দিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হয়।

এখন বিশ্বাস হয় না, কোন দিন মনে কল্পনা, বিলাস, প্রেম ইত্যাদির ঠাঁই ছিল। ছিল বই কি! ট্রামে-বাসের হাল্কা সাময়িক প্রেম নয়। বেশ দীর্ঘস্থায়ী। আমার আর দেবিকার প্রেম। বন্ধু মহলের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিলাম। মনে মনে নিজেকে হিরো মনে করতাম।

রীতিমত রোমিও। দেবিকাদের বাড়ীর দেওয়াল টপকেছি বার-দশেক, তার খোঁপায় ফুল গুঁজে দিয়েছি, রোমিওর মত হাঁটু ভেঙে বসে প্রেম নিবেদনও করেছি। কথা দিয়েছি, যদি বিয়ে করি, তবে দেবিকাকেই বিয়ে করবো। প্রয়োজন হলে চূড়ান্ত পরিণতির জন্যে তৈরি হবো, দু'জনেই। তৈরি থেকেওছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেস্তে গেল।

দেবিকাকে তার বাবা পাঠিয়ে দিলেন আসামে মামার কাছে। আর আমার বাবা আমাকে পাঠালেন কোলকাতায় ন' মামার কাছে। এ ব্যবস্থা আমাদের শুদ্ধির জন্যে। প্রেম করে কেউ বোধ হয় আমাদের মত মামার বাড়ী দেখেনি। তবে আমার বিশ্বাস, যেখানেই হোক, আমার সঙ্গে জুলিয়েটের দেখা হবেই। সেই বিশ্বাসে বুক বেঁধে আছি। দীর্ঘ বিরহের পর সাক্ষাতের আনন্দ-অনুভূতি কল্পনায় অনুভব করি।

দু'জন দু'জনের কাছ থেকে ছিটকে পড়েছি আজ প্রায় বছর তিনেক হ'ল। কত লোক ওঠা-নামা করে, কই, তাকে তো কোনদিন চোখে পড়ে না। যদি দেখা হয়, ভাবতেই মনে একটা আনন্দের শিহরণ খেলে যায়। মোটা খাকি ডবল পোষাকটাও যেন নিমেষের জন্যে আনন্দে কেঁপে ওঠে।

অসম্ভব নয়, 'বঙাল খেদার' চাপে দেবিকাও হয়ত কোলকাতার দিকে পাড়ি দিয়েছে। তবে কোথায় আছে কে জানে?

দেবিকার পথ চেয়ে আজও কুমার ব্রত পালন করছি। দেবিকাও নিশ্চয়ই কুমারী ব্রত পালন করছে। এরকম প্রতিজ্ঞাই আমরা করেছিলাম ছাড়াছাড়ি হওয়ার দিনে। কী কান্নাই না কেঁদেছিল দেবিকা। বলেছিল, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। একদিনও না। আমি মনে-প্রাণে তোমারই। তোমার জুলিয়েট তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না। একনিঃশ্বাসে যেন বলে যাচ্ছিল দেবিকা। হাঁপিয়ে উঠেছিল সে।

প্রশ্ন করেছিলাম, জীবনে যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে না পারি, সামান্য কাজ করি? তোমার আমার আকাঙ্ক্ষার রূপ দিতে না পারি?

তুমি ভিখিরী হলে আমি তোমার ভিখিরী-রাণী হ'ব।—কথাটা এত ভাল লেগেছিল যে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আনন্দের আতিশয্যে দেবিকাকে বুকে চেপে ধরেছিলাম। কতক্ষণ, ঠিক খেয়াল নেই। বিদায়ের শেষ মুহূর্তে সে আমার কণ্ঠলগ্ন হয়ে বলেছিল, ওগো আমার রোমিও!

এই বিরাট মহানগরীতে দেবিকার রোমিও অসহায়, নগণ্য। আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন মনের মত চাকুরি পেলাম না, তখন

মামার দেওয়া কাজটাই নিতে হল। স্যুট পরে সাহেব সাজা আর হল না। তবে অনেকটা ধার ঘেঁষে গেল। খাকি পায়জামা, মোটা কোট, কালো জুতো পরে কাজে লেগে গেলাম।

ন'মামা বললেন, বরাত ভাল, পেয়ে গেছিস চাকুরিটা।

সেদিন মেসে কথা হচ্ছিল, আমার সুন্দর চেহারা ও স্বাস্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেন বিয়ে করিনি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিন্তু আছে। সগর্বে উত্তর দিয়েছিলাম, আছেই তো। দেবিকা ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।

যদি ফসকে যায়? প্রশ্ন করে নরেন।

আমি টেবিলের ওপর সজোরে চাপড় মেরে বললাম, হতেই পারে না। 'মরদকা বাত হাতীকা দাঁত।' রীতিমত ক্ল্যাপ নিয়ে বেরিয়ে এলাম। অবশ্যি ডিউটির পোষাক পরে, বড় বোতামগুলো আঁটতে আঁটতে।

গড়িয়াহাট ষ্টপেজ আসতেই এক ঝাঁক মহিলা ঠেলাঠেলি করে ওঠে পড়ে। কোন রকমে কোণঠাসা হয়ে আছি। হঠাৎ পেছন থেকে নারীকণ্ঠের আদেশ কানে আসে। কন্‌ডাক্টার, পাশ দাও, সরে দাঁড়াও, যেতে দাও। অনুরোধ নয়, আদেশ।

সন্ত্রস্ত হয়ে অন্য পাশে সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই সেদিক থেকে মন্তব্য আসে, নুইসেন্স।

'সরে দাঁড়াও ও নুইসেন্সের' মন্তব্যকারিণীদ্বয় যাত্রীব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। মহিলা দু'জন সীটে বসতেই যথারীতি টিকেট কাটার জন্যে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দু'জনের মধ্যে একজন দেবিকা, চিনতে ভুল হয়নি, আমার সেই জুলিয়েট। যার অপেক্ষায় দিন গুনছি। মনের ভেতর একটা অপূর্ব শিহরণ দোলা দিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা প্রশ্ন জাগে, কৌতূহল হয়। আমার দৃষ্টিটা পড়ে গিয়ে তার সিঁথির ওপর। সীমন্তে এখনও সিঁদুর ওঠে নি। খুশীতে মনটা ভরে ওঠে। নিশ্চয়ই দেবিকা এখনও আমার পথ চেয়ে বসে আছে। আরো খানিকটা এগিয়ে গেলাম। মুখোমুখী দাঁড়ালাম। সেই চেহারা, সেই মুখ। দেবিকাও ঘন ঘন তাকায় আমার দিকে। আমাদের দৃষ্টি-বিনিময়টা লক্ষ্য করে দেবিকার বান্ধবী। কুশল জিজ্ঞেস করবার জন্যে এগিয়ে যাব স্থির করেছি, এমনি সময় তার বান্ধবীর একটা প্রশ্ন কানে আসে—কন্‌ডাক্টরকে চিনিস নাকি?

উত্তর দিতে গিয়ে দেবিকা খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে। পরে কী একটু ভেবে নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, না। সঙ্গে সঙ্গে একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটে ওঠে তার ঠোঁটের ওপর। প্রমাণ করে দেয়, সত্যিই সে আমাকে চেনে না। উঃ! কী ভয়ানক আত্মপ্রতারণা! দেবিকার প্রতি ঘৃণায় আমার শরীরটা রী-রী করে ওঠে। সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে সামলে নিই। মনে পড়ে আমাদের প্রতিশ্রুতির কথা। কিছুতেই ভুলবো না দু'জন দু'জনকে। কিন্তু এতদিনের জীইয়ে রাখা প্রেমটা পরম মুহূর্তে এক চরম আঘাতে কর্পূরের মত উবে গেল। সব-কিছু অগ্রাহ্য করে প্রেমের মূল্য দিয়েছিলাম বেশী। যে প্রেমকে নিয়ে এত গল্প, এত কাব্য সৃষ্টি।

টিকেট চাইবার সঙ্কোচ-ভাবটা দূর হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। এখন দেবিকা আমার কেউ নয়। সে যাত্রী, আমি কন্‌ডাক্টর, কোম্পানীর কর্মচারী। আর দশজন যাত্রীর সঙ্গে দেবিকার এতটুকু তফাৎ নেই আমার চোখে।

সোজা এগিয়ে গিয়ে টিকেট দেখতে চাইলাম। ভাড়াটা গুণে গুণে দেবিকা আমার হাতে তুলে দেয় আমারই উপহার দেওয়া ভ্যানিটী ব্যাগ থেকে। যথারীতি টিকেট পাঞ্চ করে তুলে দিলাম তার হাতে। এক হাতে টিকেট নিয়ে অন্য হাতে সে তার মাথাটা টিপে ধরে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সুরু হয় তার মিথ্যে অভিনয়ের প্রতিক্রিয়া। পাছে সদ্য উপেক্ষিত দুর্বলতা এসে আমার মনকে আবার কাবু করে ফেলে, সেই আশঙ্কায় আমি সরে এলাম আর এক প্রান্তে। দেবিকার চেহারাটা পড়ে থাকে দৃষ্টির বাইরে, ভীড়ের আড়ালে। পরের ষ্টপেজটা আসতেই নেমে পড়লাম। ইন্‌স্পেক্টরকে বলে আর একজনের সঙ্গে ডিউটি বদল করে নিলাম।

দেবিকার দিকে একবার ফিরেও তাকালাম না। আজ আমি সত্যিই হিরো। হিরো বটে, তবে দেবিকার রোমিও নই, সামান্য কন্‌ডাক্টর মাত্র, ওরফে এক'শ আট নম্বর।

হেথায় ধরণীতে

[ফরাসী কবি Sully Prudhomme রচিত ICI—Bas কবিতার অনুবাদ]

শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায়

হেথায় ধরণীতে লিলির আয়ু ক্ষীণ
নিমেষে থেমে যায় পাখিরও কলতান
আমার স্বপ্ন তো চির বসন্ত, চির অনন্ত
সুচির·····

হেথায় ধরণীতে চুমা মদিরাহীন
ঠোঁটের তাপ, সেও নিথর নিষ্প্রাণ
আমার স্বপ্ন তো অমৃত-চুম্বন, চির অনন্ত
সুচির·····

হেথায় ধরণীতে মানুষ অতি দীন
নিত্য হতাশায় ব্যর্থ বিমলিন
আমার স্বপ্ন তো ঘন-আলিঙ্গন, চির অনন্ত
সুচির·····

আমার দেখা শান্তিনিকেতন

পুলিনবিহারী মণ্ডল

"হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।" প্রায় এক বৎসর ঘুরে এল—সেই মহামানবের সাগরতীর্থ শান্তিনিকেতন দেখে এসেছিলাম। তথাপি কেন জানি না, কিসের একটা দুর্ব্বার আকর্ষণে তার কথা স্মরণ না ক'রে পারছি না। এ বৎসরও পুজাবকাশের সময় এসেছে, তাই বোধ হয় শান্তিনিকেতনের নীরব হাতছানি আমার মনটাকে এমন নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করছে।

তাই লিখছি—রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের শান্তিনিকেতন—ভারতের অরণ্য সভ্যতার প্রতীক—ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক সাধনার পীঠস্থান—বনমর্ম্মর প্রকৃতির সেই লীলানিকেতন কি ভাবে আমার মনের মুকুরে বিচিত্র স্বপ্নের জাল বুনেছিল।

আমরা ছিলাম চারজন। সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ বিছানাপত্র, কিছু আহার্য্য ও একটি সস্তা দরের ক্যামেরা। আর ছিল প্রকৃতির শোভাসৌন্দর্য্যের মধ্যে হারিয়ে ফেলার মত উদাস, আত্মভোলা মন—সৌন্দর্য্যপিপাসু বিভোর দৃষ্টি।

শরৎকাল। শীতের রেশ একটু একটু পড়েছে। উপরে স্বচ্ছ গাঢ় নীল আকাশ, নিম্নে ধরণীতে শিশিরসিক্ত সবুজ ঘাসের উপর প্রাতঃকালীন সূর্য্যের সোনালী রৌদ্র বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এমনি একটি শান্ত সমাহিত সকালবেলা হাওড়া ষ্টেশন হতে আমরা রওনা হলাম। ষ্টেশনে লোকের ভীড়—ট্রেনের অভ্যন্তরের নানা দেশের লোকের কথাবার্ত্তা—সব কিছু ছাড়িয়ে আমাদের মনের শান্ত ভাব এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্লোকে সমাহিত ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের এক সুউচ্চ অসমতল ভূখণ্ডের কয়েক হাজার বর্গমাইল জুড়ে রয়েছে বীরভূম জেলা। এই বীরভূম শুধু বীরের অধিষ্ঠান নয়—এখানে প্রাচীন ভারতের অনেক তান্ত্রিক মহাপুরুষও আধ্যাত্মিকতার সাধনা ক'রে গেছেন। মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও সাধক বামাক্ষ্যাপা ভারতের তান্ত্রিক সাধনায় জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে গেছেন এই বীরভূমের মাটিতে। এখানকার আকাশে-বাতাসে এখনও সেই ধ্যানের পবিত্রতা বিরাজ করছে। যে সমস্ত সংসার-বিরাগী বৈরাগীর দল এই বীরভূমের মৃত্তিকায় উপবেশন করে সাধনা করতো, তাদের স্মৃতির স্মারক হয়ে আছে এদেশের গেরুয়া মৃত্তিকা। ছোট ছোট নদীও আছে—ময়ূরাক্ষী, কাঁসাই। তরঙ্গায়িত ভূমি মাঝে মাঝে সেই নদীর ঢেউয়ের মত হঠাৎ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন হয়ে গেছে যেন কোন মহাবল তান্ত্রিকের অঙ্গুলীসঙ্কেতে—এগুলি ছোটনাগপুরের পাহাড়, মেসাঞ্জোরের পাহাড়, হাজারীবাগের পাহাড়। সেই ছোট-বড় পাহাড়ের উপত্যকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনঝোপ এ দেশের অরণ্য প্রকৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তারই মাঝে আছে সাঁওতাল পল্লী—কালো কুচকুচে দেহ সাঁওতাল—শ্যামল অরণ্য মাঝে তারা কত সুন্দর—স্বাধীন!

বোলপুর রেলওয়ে ষ্টেশন। বেলা দেড়টা। তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম নিউ ইণ্ডিয়া হোটেল থেকে। ম্যানেজার মশায় বলে দিলেন সন্ধ্যা না হতে ফিরতে—এ অঞ্চলে ছোট ছোট বাঘরোলের ভয় আছে বলে। এখান থেকে শান্তিনিকেতন আর দেড় মাইল হবে। সন্ধ্যা সমাগত। তা ছাড়া ট্রেনযাত্রার জন্য সারা দেহে শ্রান্তি নেমে এসেছে—এমন তিক্ত মন নিয়ে কোন ভাল জিনিষ দেখা যায় না। সুতরাং পরদিনেই শান্তিনিকেতন দেখা স্থির ক'রে আমরা বাসায় ফিরলাম সন্ধ্যা সাতটায়।

ভোর পাঁচটায় সান্ধ্য মুহূর্ত্তে সকলে শয্যা ত্যাগ করলাম। হৃদয়-মন পবিত্র ভাবে বিভোর হয়ে আছে—আজ মহাপুরুষের ধ্যানের ভারত প্রত্যক্ষ করবো, সেই আশায়। পূর্ব্ব গগনের উদয়-সূর্য্যের স্বর্ণাভ সোনালী রৌদ্র বীরভূমের পথে-প্রান্তরে, বৃক্ষশাখায়, অরণ্যে, পাহাড়ের মস্তকে গৈরিক রঙের আলপনা এঁকে দিয়েছে। শীতের আমেজ লাগছে—আমরা শান্তিনিকেতনের পথে অগ্রসর হচ্ছি। শরীর-মন ঈষৎ কাঁপছে—এ কি শীতের কম্পন, না আনন্দের শিহরণ!

দূর হতে শান্তিনিকেতন দেখা যাচ্ছে—শ্যামল পত্রপুঞ্জের মাঝখানে একটি পুষ্পিত স্তবক—দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত ভক্তি-অর্ঘ্য। ঐ যে ঊর্দ্ধ গগনে ধূমায়িত শুভ্র কুয়াশা—ও কি পূজারীর ধূপাধারের উৎসারিত গুগ্‌গুল্ নয়? আমরা ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হ'লাম।

নয়নে গভীর দৃষ্টি আর অন্তরে শুদ্ধ ভক্তি নিয়ে আমরা শান্তিনিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। পূজার ছুটির সময়—এখানে ছাত্রের ভিড় নাই, শিক্ষকের সমাগম নেই—বন্ধদ্বার অফিস এবং শিক্ষার্থীর বাসভবন। মাঝে মাঝে দু'একটি ভবন হতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেশ কানে আসছে। মনে হচ্ছে বাইরের প্রাণচঞ্চল মাটির পৃথিবী হতে এ কোন্ শান্ত সমাহিত অলকাপুরীর মধ্যে এসে গেছি। চতুর্দ্দিকে বিস্ময় ছড়ানো। ছোট ছোট লালচে নুড়ি বিছানো প্রশস্ত বনবীথির উপর দিয়ে মচ মচ শব্দ করতে করতে আমরা এগিয়ে চলেছি। দক্ষিণে বামে পথ বিভক্ত হয়ে গেছে। তারই পাশে বিভিন্ন বিভাগের জন্য নির্ম্মিত বিভিন্ন প্রাসাদগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ময়ের মত নীরবে দণ্ডায়মান রয়েছে। এক স্থানে দেখলাম, একটি নাতিবৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে নিস্তব্ধভাবে বসে এক ভদ্রলোক বৃহৎ কি একটা যন্ত্রের পরিচালনা করছেন। অনাহূত ও অবাঞ্ছিতের ন্যায় আমরা তৎক্ষণাৎ সেখানে প্রবেশ করলাম। নমস্কার বিনিময়ের পর ভদ্রলোক জানালেন যে, এটা টেলিফোন রিসিভিং এবং ডেসপ্যাচিং সেণ্টার। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। আমাদের সঙ্গের ক্যামেরাটি লক্ষ্য করে ভদ্রলোক বললেন যে, এখানে ফটো তুলতে হলে পাঁচ টাকা দিয়ে অনুমতি নিতে হয়। তবে তখন

ছুটির সময়। সকল বিভাগই বন্ধ; অতএব আমাদের যদৃচ্ছা করতে পারি। অল্পক্ষণের মধ্যে ভদ্রলোক আমাদের কত ঘনিষ্ঠ ক'রে নিলেন। তাঁর মুখে শুনলাম যে, এখানে শিক্ষা পেতে হ'লে শিশুদিগকে অপরিণত বয়সে ভর্ত্তি করতে হয়, তবে শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ। একজন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য মাসিক প্রায় একশত টাকা খরচ করতে হয়। তবে সেই ছাত্র বা ছাত্রী শিক্ষাশেষে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক মানস সরোবরে স্নান ক'রে পূর্ণ মানবত্বের অধিকারী ও দেহমনে শুচিশুভ্র হয়ে উঠবে।

ভদ্রলোকের কাছ হতে বিদায় নিয়ে আমরা আবার চলতে লাগলাম। একবার বামে, আবার দক্ষিণে ঘুরে অগ্রসর হলাম। আমাদের পথের দু'পাশে বৃহৎ বৃহৎ নাম-না-জানা বিচিত্র বৃক্ষশ্রেণী পথের উপর নুয়ে পড়েছে। আরও অগ্রসর হ'য়ে দেখি একটি ছোট ঝিল—তার মাঝখানে একটু অপ্রশস্ত দ্বীপের মত জায়গা। সেইখানে কয়েকটি ফুলগাছের তলায় চার-পাঁচটা চেয়ার পাতা আছে। দ্বীপটিতে যাওয়ার জন্য কয়েকটি দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ পাথর দিয়ে একটি সেতুর মত ক'রে দেওয়া আছে। চতুর্দ্দিকে শুধু ক্ষুদ্র-বৃহৎ রঙ-বেরঙের ফুলগাছ—সেগুলিতে ফুল ফুটে আছে। একটি সরু রাস্তা দিয়ে আমরা সেখানে প্রবেশ করলাম। দেখি, আরও দু'জন ভদ্রলোক ও একজন প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলাও আমাদের পিছন পিছন প্রবেশ করলেন। আগের দিন ট্রেণ থেকে একসঙ্গে বোলপুর ষ্টেশনে নেমেছিলাম। আমাদের দেখে তাঁরা বেশ খুশী হলেন। বললেন, "আমরা পূর্ব্বদিকে চলেছি উপাচার্য্যের বাসগৃহ দেখতে।" বলে চলে গেলেন। এই স্থানের সৌন্দর্য্য আমাদিগকে নির্ব্বাক করে দিল; স্তব্ধ বিস্ময়ে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। কতক্ষণ পরে জানি না, কয়েকজন সৌম্যদর্শন যুবকের কথাবার্ত্তায় আমাদের চমক ভাঙল। হঠাৎ আমাদের মনে হল, কোন মহর্ষির আশ্রমে আজন্মবর্দ্ধিত ঋষিকুমার। তাঁদের ভাষা শুনে কিছু বুঝা গেল না। কোন্ দেশের ছেলে এঁরা। নিকটে আসতেই ইংরাজীতে জিজ্ঞেস করাতে তাঁদের পরিচয় পেলাম। তাঁরা কেউ কেউ সুদূর সিংহল দ্বীপ হতে আগত, আবার কেহ বা চীন দেশ হতে আগত। এখানকার ছাত্র—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ হতে ভারতের ত্রিবেণীতীর্থে মিলিত হয়েছে। একের মধ্যে বহুর মিলন, ইংরাজীতে যাকে বলে "Unity in Diversity". কবিগুরুর এই সাধনবেদীতে দাঁড়িয়ে আমরা সেই মহাসত্যটি উপলব্ধি করলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হ'লে কিসের এক সুমধুর ঝঙ্কার শোনা গেল। বীণাবাদিনী সরস্বতীর বীণার ঝঙ্কার বোধ হয়। শব্দ আরও স্পষ্টতর হতে লাগল। কোথা হতে ভেসে এল এই সুমধুর নিক্কণ—এমন সুর যদি স্বয়ং সুরভারতীর স্বহস্তচালিত বীণা হতেও ঝঙ্কৃত হ'ত তবে আমরা কিছুমাত্র বিচলিত হতাম না। আমরা এবার বুঝলাম যে, পার্শ্ববর্ত্তী একটি ভবন হতে এই সুরের তরঙ্গ উত্থিত হচ্ছে। পূজার অবকাশে যে সমস্ত বিদেশাগত ছাত্র দেশ-প্রত্যাবর্ত্তন করতে পারেন নি, তাঁদেরই একজন তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের শ্রান্তি বিনোদন করছেন এই স্বরচিত সুরঝঙ্কারে। ভাবলাম, যথার্থ শান্তি যদি কোথাও থেকে থাকে, তা সে এইখানে।

অতঃপর আমরা শান্তিনিকেতন হতে নিষ্ক্রান্ত হ'তে লাগলাম। কতটা গেলে যে এই অলকাপুরীর দ্বার—তা কে জানে? বন্ধুরা দ্রুতপায়ে চলছে; কিন্তু আমার অন্তরে বেদনা উপস্থিত হ'ল। কী দেখলাম? কই, তৃপ্তি হল না তো। যা দেখতে এসেছিলাম, তা কি দেখেছি? মনের গভীর থেকে কে যেন বলে দিল—না, তা দেখনি। যদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখার জন্য এসে থাক, তবে তোমার দার্জ্জিলিং কী দোষ করেছিল? বরং এখানে কৃত্রিমতা আছে, দার্জ্জিলিং-এ তা' নেই—বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তেমন অনন্ত সুন্দর প্রকৃতি আর কী আছে? তবে যা দেখতে এসেছিলে, সে শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নয়। যা দেখলে, এই দেখেই যদি দেখার তৃপ্তি ঘটে তবে আমি বলব যে, তুমি আত্মপ্রবঞ্চক—তোমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে তুমি নিজেকে পীড়িত করেছ শান্তিনিকেতনের বাইরের রূপ দেখে। প্রকৃত রূপ এর অন্তরের গভীর দেশে। সেখানে প্রবেশ করেছে কি বন্ধু? সে রূপ আকর্ষণ করে না—সে রূপ পীড়া দেয় না। সে রূপ দেখলে দেহ-মন শীতল হয়—সংযত হয়, ধৈর্য্য আসে—আসে শান্তি, শুদ্ধি! রবীন্দ্রনাথের মানস সরোবর—সেই আধ্যাত্মিক ভাবরসে ভরপুর। সেই রহস্যময়ী শান্তির পীযুষধারা পান করছে অসীম আকাশের চন্দ্রাতপের নীচে ঐ বিল্ববৃক্ষের তলাকার ধরণীর স্নেহাঞ্চলের ছায়ায় এখানকার ছাত্র ও অধ্যাপক, আর আহ্বান জানাচ্ছেন জগৎ এবং জাতিকে। উদাত্ত সে আহ্বান—"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

বিস্মৃত অতীতে

শ্রীবিবেকজ্যোতি মৈত্র

মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের নাম এখন আমরা অনেকেই ভুলে গেছি। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে বাংলার এই সন্তান নিজের শিল্পী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে স্বদেশে ও বিদেশে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন।

জন্ম ১৮৭৩ সালে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবারে। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দত্তক পুত্র এই প্রদ্যোৎকুমার। মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের নিজের কোন সন্তান ছিল না। তাঁর ছোট ভাই রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের দুই ছেলে, দ্বিতীয়জনকে দত্তক নিলেন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন।

অল্প বয়সেই শিল্পী এবং জ্ঞানবৃদ্ধ বলে পরিচিত হলেন প্রদ্যোৎকুমার। যুবক বয়সেই তিনি ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হলেন। তখন আর্ট স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক শিল্পীই আলোকচিত্র শিল্পের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মহারাজকুমার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরও এই দিকে আকৃষ্ট হলেন। প্রতিভাবান শিল্পী আলোকচিত্র-শিল্পেও বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করলেন। তাঁর সুনাম বিদেশে, অর্থাৎ ইউরোপের অনেক দেশে প্রচারিত হল। বিলাতের রয়াল সোসাইটি তাঁকে এফ. আর. পি. এস. উপাধি দিয়ে সম্মান জানালেন। বাংলা দেশে এই সম্মান এর আগে আর কেউ পাননি। ভারতের অন্য প্রদেশেও এই সম্মান আর কেউ তখন পেয়েছেন বলে জানা যায় না।

আমাদের দেশে আলোকচিত্রের তখন শৈশব অবস্থা। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব তখন। আলোকচিত্র আবিষ্কার হয়েছে ইউরোপে ১৮৩৯ সালে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দেশে তা এসেছে। ক্রমশঃ ইউরোপীয়ানদের হাত থেকে [illegible] এসেছে বাংলার সমাজে

মহলে, পরে তার প্রসার হয়েছে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে। শহরে ত বটেই, গ্রামে গ্রামান্তরেও প্রসার হয়েছে আলোকচিত্রের। মহারাজকুমার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের শিল্প-প্রতিভা যখন রয়াল সোসাইটি স্বীকার করলেন, তখন এদেশে আলোকচিত্র-শিল্পের সবেমাত্র পঞ্চাশ বছর পার হয়েছে।

সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে মহারাজকুমার প্রদ্যোৎকুমার ছিলেন বিশেষ কৃতী। এদেশের বৃটিশ শাসকেরা তাঁর প্রতিভার সমাদর করতেন। ইউরোপে ১৮৯৫ সালে রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কার হয় এবং দুই তিন বছরের মধ্যেই তা ভারতে আসে। লর্ড এলগিনের হাতের আঙুল কোন কারণে এক্সরে করার প্রয়োজন হয়। বড় লাটের অনুরোধে মহারাজকুমার নিজে তাঁর হাতের এক্সরে ছবি তোলেন। স্বদেশে ও বিদেশে যাঁর এত খ্যাতি, তাঁর বয়স তখন পঁচিশ বছরও নয়।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর 'রাজা' উপাধি পেলেন প্রদ্যোৎকুমার। অল্প বয়সে জ্ঞানবৃদ্ধ এই শিল্পী অভিজাত মহলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচিত হলেন তিনি। মিউজিয়মের ট্রাষ্টি' নির্ব্বাচিত হলেন। ১৮৮১ সালে কলকাতায় ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠা হল। ১৮৯০ সাল থেকে প্রদ্যোৎকুমার তার সদস্যপদ অলঙ্কৃত করলেন।

পরবর্ত্তী জীবনে তিনি আরো অনেক সম্মান পেয়েছেন। ইউরোপ ভ্রমণের সময় বিভিন্ন দেশের রাজশক্তি তাঁকে সমাদর জানায়। বৃটিশ শাসকেরাও তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মেঘলা দিনে

লীনা রায়

মেঘলা দিনে মেঘ জমেছে মনের কোণায় কোণায়,
বাহির বিশ্ব আজকে কেবল হাতছানি দেয় আমায়।
যাবার উপায় নাইক কোথাও ঘরে বসে থাকি,
অনেক কথা প'ড়ছে মনে লিখি টুকিটাকি।
'জীবনটা কি এমনি যাবে' বিধাতারে শুধাই,
প্রশ্ন শুধুই ঘুরে মরে উত্তর কোথা পাই ?

অবাক কাণ্ড

শ্রীবীথিকা পাল

অবাক কাণ্ড। এইবারে ভাই হচ্ছে এমন পুজা,
"হাইড্রোজেন" বোম্ হাতে নিয়ে আসেন দশভুজা।
লক্ষ্মীদেবী পদ্ম রেখে রাইফেল নেন হাতে,
কার্ত্তিকেয় ধনুক ফেলে বন্দুক নেন সাথে।
সরস্বতী বীণা রেখে বাজান রণডঙ্কা,
দ্বিগুণ তেজে যোঝে অসুর নাই একটু শঙ্কা।
চারটি হাতে সিদ্ধিদাতা ছোড়েন মেসিনগান,
অসুরে ছেড়ে সিংহী-মামা এরোপ্লেন চালান।
প্যাঁচা, ময়ূর, হাঁস, ইঁদুর রকেট চড়ে ঘোরে,
এ খবরটি পেলাম আজ মহালয়ার ভোরে।

৯-কার কেন ডিগ্‌বাজী খায়

জীবন মুখোপাধ্যায়

৯-কার কেন ডিগবাজী খায়
বলতে পার কেউ ?
ঋষি মশাই বসলে পুজায়
ডিগ্‌বাজী খায় কেউ ?
বলতে পার ৯-কার ভায়া
কষছে নানান প্যাঁচ—
কেমন করে ঋ-এর সাথে
খেলতে পারে ম্যাচ।
বলতে পারো ৯-কার ভায়া
সার্কাসেতে যাবে,
তাই না প্যাঁচের অনুশীলন
কী মজা দেখাবে।
সে সব কথা ভাবলে না কেউ
রটিয়ে দিলে মিছে :
৯-কার ভায়া ডিগ্‌বাজী খায়
ঋ-এর পিছে পিছে।
৯-কার ভায়া বলল আমায়
আসল কথা খাঁটি :
ল্যাজটা শুধু উঁচিয়ে রাখি
মারতে ঋ-কে চাঁটি।
আরও আমায় বলল ডেকে,
বলছি তোমার কাছে—
তোমার দেশে জানি অনেক
জ্ঞানী-গুণী আছে।
ভাষার কাজে আমায় তারা
রাখল কেন বেকার
কাজটা কিছু পেলই না কি
লেখাপড়া শেখার ?
আনার সময় ঢাক পিটিয়ে
বলল আমায় নিতে
এখন কেন নাম রেখেছে
ওয়েটিং লিষ্টিতে ?
মিথ্যে গুজব রটিয়ে দিলে
ডিগ্‌বাজী খাই আমি
ও-অজুহাত টিকবে না আর
যুগ যত দিক্ দামী।
৯-কার ভায়ার পক্ষ থেকে
বলছি আমি আজ,
দোষটা শুধু তোমাদেরই
দাওনি কেন কাজ ?
কাজটা তাকে নাই বা দিলে
মিথ্যে গুজব সয় না,
৯-কার ভায়া বন্ধু আমার
ডিগ্‌বাজী সে খায় না ॥

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৪০। মাতঙ্গীর মত ললিত-গতি-মুদ্রায় এগিয়ে এসে মাতঙ্গীদেবী তখন বললেন,—

"কালিয় নাগের ফণায় ফণায় যিনি সকৌতুকে "বধ"-নৃত্যের অভিনয় করেছিলেন, সেই কৃষ্ণের আপনি প্রিয়া। আপনার চরণ-সেবার উদ্দেশ্যে তাই এখানে উপস্থিত হয়েছেন সপ্ত-স্বরমণ্ডলী···নারী-মূর্ত্তিতে; এবং এসেছেন দ্বাবিংশতি শ্রুতির এই পরিষদ। কিন্নরীদের কণ্ঠে এঁরা কোনোদিন ঘটাননি কোনো রকমের বিভাজন।"

৪১। কথা শুনে রসের আবেশে ললিতাদেবী নিজের প্রশ্নের অক্ষরগুলিতে কিঞ্চিৎ লালিত্য ছিটিয়ে বললেন,—

"সঙ্গীতদেবি! কিন্নররাজের বধূরা তা হলে কণ্ঠ দিয়ে শ্রুতি-বিভাজন করতে পারেন না?"

প্রশ্নটি চমৎকার। তাৎপর্য্যও বিচিত্র। বিচিত্র আনন্দে ভরে উঠল সকলের মন। উত্তর দিলেন মাতঙ্গী,—

"দেখুন, কণ্ঠ যখন কফাদি-দোষে দুষ্ট হয় তখন প্রকাশ হয় না শ্রুতিগুলির। বীণাও দেখুন তাই দুরকমের;—চল আর অচল।"

৪২। বলেই বৃষভানুনন্দিনীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন,—

"চল-বীণা ও অচল-বীণা পরমেষ্ঠীর সৃষ্টি। বাইশটি শ্রুতি নিবদ্ধ থাকেন চল-বীণায়; আর অচল-বীণায় থাকেন সাতটি স্বর। কথায় কাজ কি, পরখ করেই দেখুন। সন্দেহ ভঞ্জন হবে নয়নের। ষড়জের এই শবল-বর্ণা চারটি শ্রুতিকেই দেখুন।···এঁরা শুনতে খুব ভাল, কিন্তু এঁদের গলায় তোলা একেবারেই সহজ নয়।"

৪৩। এই বলে মাতঙ্গীদেবী, অচল-বীণায় আলাপ আরম্ভ করে দিলেন চতুঃশ্রুতিভাস্বর ষড়জ-স্বরটির। আলাপের সময় ষড়জের বনিতাকার ও অ-স্থূল-রমণীয় তনুখানি ধ্বনিত হয়ে উঠল আপনা হতেই। আর তারপরেই যখন তিনি চারটি শ্রুতির স্ব স্ব ভাবটিকে কণ্ঠযোগে বিভক্ত করে তুলে ধরতে গেলেন, তখন কিন্তু সেই শ্রুতিদের একটিরও তনু সবিশেষ সম্বাদবতী হল না।

৪৪। তারপরেই আবার যখন সেই সঙ্গীত প্রবীণাটি ষড়জের চারটি শ্রুতিকেই যথাক্রমে ও যথার্থ-বিক্রমে বাজিয়ে চললেন চল-বীণার তারে তারে, তখন দেখা গেল, যেন দাক্ষিণ্যবশতঃই সদয় হয়ে উঠেছেন উপস্থিত তনুধারিণী শ্রুতিগুলিও,···যথার্থবাদিনী শ্রুতিগুলির মতই।

৪৫। এই সঙ্গীত-বিদ্যাবিনোদে যখন চমৎকৃতা হয়ে উঠেছেন সকলে তখন রাধার একটি সহচরী,—"সঙ্গীতবিদ্যা" তাঁর··নাম,—অন্তের প্রেরণায় পরিহাস ছলেই যেন বলে বসলেন,—

"সঙ্গীতদেবি, এটি আপনার পরম কৌশলের প্রকাশই বলতে হবে যে, একটি স্বর,—অবিকল ও বিকসিত,—চতুর্দ্ধাবিভক্ত হয়ে তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অখণ্ডভাবে উদ্গীত হয়ে গেল। নিষাদকে স্পর্শ করল না একটিও শ্রুতি, ঋষভকেও স্পর্শ করল না। স্বর্গের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই, সেই হেন মানুষদের পক্ষে এই হেন স্বর-পরিচয় যে দুর্লভ, এ কথা মানতেই হবে। কিন্তু আমাদের বৃষভানুনন্দিনীর ঐ যে অতি সুন্দরী নবীনা সখীটিকে দেখছেন, যাঁর নাম ললিতা, কণ্ঠযোগেই তিনি বিভাজন করতে পারেন শ্রুতিদের। যদি ঔৎসুক্য থাকে আদেশ করুন। আশা করি উনি নিজের কৌশলের সাক্ষাৎ পরিচয় দিতে সমর্থ হবেন।

৪৬। কোন্ স্বরটির কে কে শ্রুতি, একত্র-স্বরে সেই সমস্ত শ্রুতিগুলির কোন্‌টি অপরিচিত, কোন্‌টিই বা ছন্ন,—অসাধারণভাবে ঐ বাইশটি শ্রুতির সঙ্গেই ইনি পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেন। কারণ এঁর কণ্ঠে উন্নীতা হয়ে রয়েছেন যে শ্রুতিগুলি তাঁদের প্রতিশ্রুতির সুখ্যাতি বিখ্যাত।"

তাঁর কথা শুনে বনদেবীরা বলে উঠলেন,—"বলি ও সঙ্গীতবিদ্যে মাতঙ্গীদেবী যে সঙ্গীত বিদ্যার ব্যাখ্যা করেছেন সে ব্যাখ্যাটি চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত। এ বিদ্যা আপনাদের শিবঠাকুরের প্রপঞ্চের বাইরে। তাই বলছি উভয় ব্যাখ্যাই নিরবদ্য।"

৪৭। এই সংলাপে কেমন যেন বেদনা বোধ করলেন রাধা। মাতঙ্গীদেবীর মুখেও ফুটে উঠতে লাগল হুঁ-হো-ও-হাঁ ইত্যাদি শব্দ। চিন্ময়-লীলম্বের আনুকূল্যে যিনি সর্ব্বসুখবিধায়িনী, সেই শ্রীরাধারও বেঁকে উঠল চিল্লীলতা। সখী সঙ্গীতবিদ্যার দিকে মুখ তুলে নিজেই বলে উঠলেন,—

"বুদ্ধিটি তোমার দেখছি বেঠিক হয়ে পড়েছে। নিজেই এইমাত্র বললে, 'দেবতাদেরও অসাধ্য···তান দিয়ে শ্রুতিদের খণ্ড খণ্ড করা, শ্রুতিদের ভিন্নার্থ করা।'—তাহলে নতুন মানুষ কি তা কখনও··· পারে? বড্ড বাজে বকিস্ সই। সাক্ষাৎ রমাদেবীরও যেটি করবার ক্ষমতা নেই, সেটি করবেন ললিতা? তবেই হয়েছে।"

এই বলে মাতঙ্গীদেবীকে লক্ষ্য করে শ্রীরাধা বললেন,—

"সঙ্গীত আপনার প্রিয়। সঙ্গীতমূলেই আপনি তুষ্ট করুন বৃন্দাকে, আর তাঁর অধীনস্থ বনদেবীদেরও।"

৪৮। এবার বৃন্দাদেবী বললেন,—

"যতক্ষণ না রতিমান শ্রীকৃষ্ণ এসে নবীন-বসন্ত-গান গেয়ে বিহার করছেন, ততক্ষণ এখানে বসন্ত রাগে গান গাওয়া উচিত হবে না। অন্য রাগে আপনাদের গান চলুক।"

বনদেবী বৃন্দার নির্দ্দেশে অনির্ব্বচনীয় কৌতুকে পূর্ণ হয়ে গেল দেবী মাতঙ্গীর মন। তিনি গাইতে আরম্ভ করে দিলেন রাগ বেলাবলী; রসের সাগর থেকে ছুটে এল যেন জোয়ার-জল।

৪৯। তাঁর অনুগানকারিণীরা তখন বিপঞ্চী-বীণা বাজিয়ে

দিয়ে এমন পঞ্চীভূত করে ফেললেন মহতী, কবিলাসিকা, লাসিকাস্তা, কচ্ছপী ও স্বরমণ্ডলিকা—নাম্নী প্রবীণা বীণাগুলিকে যে, পঞ্চবিধ হলেও এক বলে মনে হতে লাগল কর্ণ-রঞ্জনী শ্রুতিগুলিকে। ষড়জাদি স্বর-বিষয়ে তাঁদের সমুৎকণ্ঠার সঙ্গে মিলিত হয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠল তন্ত্রী ও কণ্ঠের পরমানন্দ। আনন্দের সকল রীতিই যেন নব জন্ম লাভ করল সেই নিনাদে।

৫০। সঙ্গীত-মঙ্গল অবহিত হয়ে শুনতে লাগলেন বৃন্দাদি বনদেবীরা এবং রাধিকাদি ব্রজাঙ্গনারা।

বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, কাংস্য, পণব···প্রত্যেকটির সাজ যদিও পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে দেখা যেতে লাগল, যদিও সমান মুখরতায় বাজতে লাগল প্রত্যেকটি, তবু তাঁরা সকলেই শুনতে পেলেন যেন একটিই উদ্গীর্ণ হচ্ছে ঝঙ্কার। সে ঝঙ্কার এত সম্পূর্ণ লিপ্ত যে, কোনও এক জোড়া কর্ণের শক্তির ছিল না যে বলে—"এটি বীণা, ওটি বেণু, ওটি মৃদঙ্গ।" সে যেন এক আমোদী ঝঙ্কার। সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপে যেমন একটিই মাত্র সুখ এনে দেয় কস্তুরী, কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর আর চন্দনের মহাসুগন্ধিতা, তেমনি এই একটি ঝঙ্কার সুখৈকমূল হয়ে উঠল সমস্ত আনন্দের। এবং দূর থেকে ভেসে আসা তার পরিপাট্যে অভিভূত হয়ে গেলেন সুরলোকেরও সর্ব্বজন।

৫১। মাতঙ্গীদেবীর পরিবেশিত লয়-তালাদি-সমন্বিত সঙ্গীতরস যদিও এক অভূতপূর্ব্ব সুখবৃদ্ধি নিয়ে এল বনদেবীদের, ব্রজাঙ্গনাদের, এমন কি শ্রীরাধারও কর্ণকুহরে, তবুও তাঁদের অন্তঃকরণে কেমন যেন জাগতে লাগল হেলা-লোল একটি অবহেলার ভাব; যেমন জাগে মৃগীদের,···যখন তারা কান খাড়া করে কী যেন শোনবার চেষ্টা করে, কর্ণায়তলোচনে কাঁপতে থাকে কটাক্ষের কমনীয়তা, আর চতুর্দ্দিকে কী যেন তারা খোঁজে

৫২। তার পরে যখন সেই ঝঙ্কারের ধ্বনিপথ বেয়ে অন্তরাগে ছুঁয়ে গেল বসন্তের পঞ্চম, তখনি স্ত্রী-বেশে ধ্বনিত হয়ে উঠলেন "বসন্ত-রাগ।"

৫৩। অমনি বনদেবীরা অনুমান করে বসলেন,—আর বিলম্ব নেই অমিতানন্দ নন্দকিশোরের বসন্তোৎসবে যোগদানের; এবং তাঁদের স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল, এবার অভাবনীয় এক অননুভূতপূর্ব্ব প্রমোদের পরিচয় পাবে ধরাতল। বিভায়—বিহ্বল এক গাঢ় মাধুর্য্যের প্রণায়ক দেহ নিয়ে দূর থেকেই তাঁরা ধীরপদে আসতে দেখতে পেলেন কৃষ্ণকে এবং নবোল্লাসে ঘটা করে বলে উঠলেন,—

"অয়ি বৃষভানুনন্দিনি, কৃষ্ণোৎসব বিনে এই ধরণের এত আনন্দ কখনও চলকে উঠত না তোমার দু'নয়নে, যেমনটি আজ ঐ উঠেছে। ঐ দেখ, ঋতুরাধীপ আসছেন। আনন্দ যাঁর উপাধ্যায়, সেই বসন্তকাল বিদগ্ধ নটের মত বুদ্ধি খেলিয়ে আজ কী উল্লসিতই না করে তুলেছেন কৃষ্ণকে! তিনিও পরেছেন আনন্দের ভূষণ, উল্লাসের সাজ। শ্রীমান চন্দ্রদেবের মত নক্ষত্র-সখাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি আসছেন। মধু-মাতাল মদনের মত উনিই আজ সম্পাদনা করবেন বসন্তোৎসব। খেলার কত না উপকরণ নিয়ে তিনি আসছেন। পরম প্রমোদে মাতোয়ারা করবেন বলে কী সাজেই না আজ তিনি সেজেছেন। বুঝেছি, প্রীতিময়ীদের প্রাণের সেবা আদায় করতেই তিনি চান। ওগো রাই, তোমার কপাল ভাল।"

৫৪। একদল বলে উঠলেন,···"দেখ দেখ, মাথায় কি রকম থিরথির করে একটিমাত্র শিখণ্ড কাঁপছে।···অরুণ-রেণু রা তোড়ায় বসে ঝঙ্কার দিচ্ছে ভোমরা। দেখেছিস, কী কেচ পাগড়িখানা? বাঁকিয়ে বসাবার বাহার বটে। কপালের কেমন যেন অলস হয়ে বসে গেছে।···শ্রীকাণ দুটিতে মণীন্দ্র আস্ফালনের ঘটাটা একবার দেখ। ছিঃ, কুটো বড় হয়ে যে গো কাণের! আবার এক কাণে ঝোলান হয়েছে সম্ভাঙ্গা চূত-আলোর মঞ্জরী কাটছে গালে। ঘাড়ের কোলে ঝুলিয়ে বাঁধা বাবড়ি। আহা···ঐ মাধবী ফুলের মালা!

আর একদল বলে উঠলেন,—কী লীলাভরেই না অঙ্গে প *পীত কঞ্চুক! কঞ্চুকের সারা গায়ে কী মিহি কাজ!* মণির ব *থানীটিকে দেখেছিস্? কাঞ্চীতটের ঐ নটীটিকে আহা কি বিলাস না তিনি ধরে রয়েছেন।···সারসন দুলছে, দুলছে তার মুখ,* করছে জল্পা। কটিতে চমকাচ্ছে কিঙ্কিণীর রণন। উঃ কি মি *শিঞ্জান-মঞ্জীরে ঝঙ্কার উঠছে চরণে।···ঢঙ দেখ।* বাঁ হাতে ে ডান হাতে কুঙ্কুমের গোলা। মুখে এখনও লেগে আছে আবীর সুবল-সখারা গাইছেন বসন্তরাগ, আর মাথাটি দুলিয়ে দুলি নিজে বাড়াচ্ছেন রাগের রস। আবেশে বিহ্বল হয়ে চক্রাকা ঘুরছে চোখ।

···ওমা ঐ দেখ আবার দুটি প্রিয়-সখা দুপাশ থেকে এগিয়ে দিচ্ছে সোনার বরণ পানের দোনা! এত খেলাও জানেন। দুপাটি রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট দিয়ে দুদিক থেকেই লুফে নিচ্ছেন পান···আলতে আলতো···কি কায়দা!···আর ঐ দেখ,—হালকা হাওয়ায় আবীর উড়ছে আকাশে; ভোরের সূয্যির মত রঙ। মহাশয়—মহাশয় গন্ধ! তবু ছুঁতে পারছে না ওঁর মৌলি-তিলক, অলকাবলী আর চোখের পাতা।

···আর সাথীরাও বলিহারি যাই, গাইছেন দুকলি করে হাসির পান চর্চ্চরী। ষড়জ মধ্যম গান্ধার গ্রাম; নিমিশ্র শ্রুতি, সপ্তস্বর, রাগ বসন্ত। শুধু গান নয়, আবার থেকে থেকে ছুঁড়ছেন আবীর, হানছেন ফুলের গোলা। ঐ দেখ তাঁদের খেলা, ঐ দেখ তাঁদের নাচ।

৫৫। আর একদম বললেন,···"ঐ ললিত গীতের মাধুর্য্য এত রুচিকর হয়ে উঠেছে অচেতনদেরও যে, ঐ দেখ, গীতের উল্লাসে বনলতারাও ভাবিনী হয়ে উঠেছে নানান্ ভাবে।

৫৬।···'কৃষ্ণ তাদের দেখেছেন,'···তাই বুঝি আনন্দে নাচ আরম্ভ করে দিয়েছে বল্লরীর দল। রসময়ী নটিনীদের মত তারা নাচছে, গুরু হয়ে উপদেশ দিচ্ছেন আমন্দ চন্দন-সমীর, গানের সুর জোগাচ্ছেন ভ্রমর-মিথুন, আর তারা অভিনয় করে চলেছে নতুন-পাতার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত—

···ঐ দেখ, আর একটি লতার কীর্ত্তি দেখ। ফুল তুলতে কাছে এগিয়ে গেছেন মধুমথন, আর কি আশ্চর্য্য, প্রথমে নবপল্লব-পাণিহিল্লোলেও প্রকাশ করছে সন্ত্রাস, তারপরে ফুলময় হাসি হেসে প্রকাশ করছে খর উৎসাহ, শেষে ভ্রমরময় কটাক্ষ হেনে প্রকাশ করছে রোষ।

···আর ঐ আর একটি লজ্জাবতীর কাণ্ড দেখ। সমীর-কম্পিত একখানি পল্লব-পাণি দিয়ে এধারে যেমন আড়াল করে রাখছেন নিজের স্তবক-পয়োধর, ওধারে আবার আর একখানি পল্লবের হাতছানি দিয়ে যেন সখীকে এস এস বলে আহ্বান করে,···ডাকছেন নিজের কুসুমময় হাসিখানি।

৫৭।...অচেতনদেরই এই, বুদ্ধিমান সচেতনদের আর কেমন করে করে বল ধৈর্য্য !"

৫৮। বনদেবীজের কথা শুনে ও বৃষভানুনন্দিনীর ইঙ্গিত পেয়ে একটি হাসির ঝিলিক হানলেন শ্যামা, বললেন,—"বলি ও বনদেবী দিদি, শ্যামচন্দ্রের প্রতাপেই তো আপনারা রক্ষা করে থাকেন আপনাদের আনন্দ। তাই নয়কি ? তাই বলছি, সুখের ভারে ভরিয়ে তুলুন ঐ ব্যক্তিটির খেলার খেয়াল। আমাদের উস্কিয়ে লাভ কি ? এ রকমটি হলে অন্য রকমটি হওয়ার তো কোন কথাই ওঠে না।

কিন্তু আমরা দেখেছি, আপনাকে পেয়ে বসেছে রসিকতার লোভ। কুলজাদের কিন্তু লজ্জাগৃহের কপাটখানি এতই কঠিন যে, করাল উৎকণ্ঠার কুঠার দিয়েও সেটিকে ভাঙ্গা যায় না।

৬০। অনির্ব্বচনীয়া হৃদয়-ব্যথার আধার হয়েও যে পূজা বাঞ্ছিত কল্যাণটিকে আবৃত করে রাখে, অসাধারণ ধৈর্য্যের ফলেই যে পূজার অনবদ্য অনুষ্ঠান সম্ভব, আজ এই মহোৎসব-বাসরে শিষ্টাচারের মধ্য দিয়ে সেই অনঙ্গ-পূজার অনুষ্ঠান করাই আমাদের বাসনা। দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটবে তাতে। অতএব আপনাদের কাছে মিনতি, এমনভাবে ব্রজরাজ-যুবরাজকে মাতিয়ে রাখুন, যাতে করে আমরা অনায়াসে ফুল তুলতে পাই, আর ফুল তোলবার অবকাশে নয়নভরে তাঁকে দেখি,—যিনি উৎসবের সম্মান, যিনি নিখিল কলা-কলাপের কল্যাণ।"

৬১। শ্যামার সরস ও সমীচীন বাণীতে প্রীতা হয়ে বৃন্দা দেবী শ্রীরাধাকে বললেন,—

"আপনাদের যেমন নাম, আর রূপ, তার উপযুক্তই হয়েছে এই সৌজন্যের প্রকাশ। তাহলে আশা করি, এখন চন্দ্রাবলী আপনার প্রিয় সখী চারুচন্দ্রাকে নিয়ে আম্রকাননে গিয়ে যোগদান করবেন মাতঙ্গীদেবীর সঙ্গীতে। চন্দ্রাবলীর যোগদানের ফলে আরো প্রবল হয়ে উঠবে মহোৎসবের উল্লাস এবং আশা করি, আমাদের চোখের আনন্দ তো বাড়বেই, অধিকন্তু সফল হয়ে উঠবে বসন্ত-রাগের স্বর-প্রক্রিয়ার প্রমোদ এবং মাতঙ্গী দেবীর সঙ্গীত-সুখ।"

৬২। চন্দ্রাবলী যিনি বিবিধ-বীণা-প্রবীণা, তিনি যখন এর পর চারুচন্দ্রাকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে গেলেন আম্রকাননে, তখন বসন্ত-শ্রুতি-সুখদ গীত গাইতে গাইতে তাঁদের সাদরে বরণ করে নিলেন সঙ্গীতদেবী মাতঙ্গী। কল্পদ্রুম থেকে ঝর ঝর করে ঝরে পড়তে লাগল মহোৎসবের যত খেলার উপকরণ, যথা কনক-কমনীয় ও বালারুণবর্ণ বিলাসধূলি, মণিখচিত সুমঞ্জুর পিচকারী। সঙ্গীতের তালে তালে, ঘটতে লাগল আবীর-কুঙ্কুমের ঘনবর্ষণ; কস্তূরিকা ঘনসারের সুখী বিক্ষেপ; স্বর্গ-নর্ত্তিকাদেরও তিরস্কারিণী এমন সহচরীদের দ্রুত মধ্য মন্দ ভেদে নৃত্যাভিনয়। অপার আনন্দে সহচরীদের সঙ্গে নিয়ে যখন কন্দর্প-গজ-প্রেরিতার মত চন্দ্রাবলী আরম্ভ করে দিয়েছেন বসন্ত-ক্রীড়া, তখন অতিমধুর একখানি বিস্ময়ের হাসি পুষ্পিত হয়ে উঠল শ্রীরাধার অধরে। তিনি দেখলেন, —একদিকে গাইছেন কৃষ্ণের দল, অন্যদিকে নাচছেন চন্দ্রাবলীর দল। যেন মনের এককোণে অভয়, অন্যকোণে আনন্দ। অতএব, শ্রীরাধাও তখন কয়েকটি সখী নিয়ে, যেখানে ছিলেন, সেইখানেই রয়ে গেলেন; ঘুরে ফিরে ফুল তুলতে তুলতে নয়ন ভরে দেখতে লাগলেন উৎসবের কৌতুক। [ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা সংগ্রামের অপরূপ কাণ্ড-কারখানা দেখে আমার মনটা যতই অশ্রদ্ধায় ভরে' উঠছিল এবং আমার নিষিদ্ধ পুস্তক "ঐ ভাঁওতার" কথা মনে পড়ছিল,—ততই ভারতীয় জনগণের, চাষা এবং মজুরদেরও ওপরে কংগ্রেস এবং মহাত্মার প্রভাব দুরপনেয় দেখে হতাশ হচ্ছিলুম,—আর সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিষ্টদের দিকে ঝুঁকছিলুম। কারণ ভবিষ্যতের ভরসা তারাই। ভুল করুক,—চাষা-মজুর যথেষ্ট সংগঠিত না হলে তারা কিই-বা করতে পারে!—কিন্তু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শও আছে, এবং একদিন চাষা-মজুর সেই মতাদর্শে সংগঠিত হবেই। তখন আর একটা সংগ্রাম অবশ্যই সুরু হবে। ওরা সেই কাজেই মন দিয়েছে।

সুতরাং ক্রমে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলুম,—তাদের সার্কুলার রোডের অফিসে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাগজ পড়া সুরু করলুম। বিশেষ বিশেষ দোস্তর কাছে তাদের মৃদু সমালোচনাও সুরু করলুম,—কিন্তু বাইরের অপর কোন লোক তাদের বিরুদ্ধে কথা বললে—তাদের সঙ্গে তর্ক করাও অভ্যাস হয়ে গেল।

আমার পূর্বোলিখিত বন্ধু বীরেন ঘোষ এক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসা করেছিলেন। লড়াইয়ের সময় দর্জিপাড়ার শিশির মিত্রের সঙ্গে মিলে ব্যবসা বড় করে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয় ছোট-ছোট মাল তৈরীর কণ্ট্রাক্ট নিতেন। তাঁদের প্রয়োজনীয় ফার্নিচার আমি দিতুম। পরে শিশির বাবু আর এক কোম্পানী গঠন করে নানাবিধ ওয়ার সাপ্লাইয়ের কাজ করতেন—এবং তাঁদের ফার্নিচার এবং নানা প্রকারের "ডেও-ঢাকনা" আমি যোগাড় করে দিতুম। তিনি প্রকাণ্ড বাড়ী সাজাবার জন্যে আর্ট-কিউরিও সংগ্রহ করতেন,—আমার কাছে প্রচুর জিনিস কিনেছিলেন। লড়াইয়ের শেষ দিকে, এবং কিছুদিন পরে পর্যন্ত, আমার ব্যবসা চালু ছিল প্রায় একা তাঁর দৌলতেই।

আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না বলে তিনি আমার পাওনা টাকা থেকে কিছু-কিছু কেটে রেখে এক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করে দিয়েছিলেন আমার নামে, এবং দু'বছরে প্রায় চোদ্দ'শো টাকা তাতে জমেছিল। এ অবস্থায় লোকে "নিরেনব্বইয়ের ধাক্কায়" পড়ে—কিন্তু আমার স্বভাব এবং বুদ্ধিশুদ্ধি তার বিপরীত। '৪৬ সালের জানুয়ারীতে কংগ্রেসী গুণ্ডারা গান্ধী কি জয় ধ্বনি সহকারে যখন কমিউনিষ্ট পার্টির বঙ্গের অফিস এবং প্রকাশালয় আক্রমণ করে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে দিলে, তখন আমি প্রায় ক্ষেপে গেলুম। ওরা তখন এক লাখ টাকা সাহায্যের জন্যে এক পাবলিক আপীল করলো।

এই সময়ে একদিন শিশিরবাবুর বাড়ীর দোতলার হলঘরে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তায় কমিউনিষ্টদের কথা উঠেছে, এবং তিনি তাঁদের লক্ষ্য করে একগাদা অকথা-কুকথা বলেছেন,—এবং আমি প্রতিবাদ ও তর্ক করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলেছি,—সব চেয়ে ভাল কংগ্রেসম্যানের চেয়ে সব চেয়ে খারাপ কমিউনিষ্টটাও ভাল। শিশিরবাবু তাঁর বন্ধুকে সমর্থন করে কথা বলা মাত্র আমি ক্ষেপে গিয়ে এমন চীৎকার করে এক লম্বা লেকচার দিয়েছি যে পাশের ও সামনের বাড়ীর বারাণ্ডায় লোক জমে গেছে।

শিশিরবাবু অপ্রস্তুত হয়ে চেপে গেলেন। আমি বললুম, আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট তুলে দিয়ে আমার টাকা এনে দিন। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে চোদ্দশো টাকা এনে দিলেন। আমি দেখলুম, এ সুযোগ আর আসবে না, তৎক্ষণাৎ পাঁচশো টাকা মোজাফ্‌ফর আহমদের হাতে দিয়ে বললুম, আপনাদের আপীল-ফাণ্ডে জমা করে নিন। তিনি নিঃশব্দে টাকাটা নিয়ে আমার মুখপানে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন।

তারপর ব্যাপারটার গল্প বলে একখানা রসিদ নিলুম, এবং শিশিরবাবুর প্রাণে ব্যথা দেওয়ার জন্যে তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁকে রসিদটা দেখালুম। ব্যথা তিনি পেলেনও,—বললেন এমনি করে নষ্ট করার জন্যে আমি আপনার টাকা জমিয়ে দিয়েছিলুম? আমি একটু দন্তবিকাশ করে চলে এলুম, আমার ব্যবসায় আবার ভাঁটা সুরু হল। এখানে এ গল্প লেখাটা আমার আত্মপ্রচার বলে গণ্য হলেও একথাটা আমার আত্মবিশ্লেষণও বটে—আমি বিপ্লবের সন্ধানী, নিরেনব্বইয়ের ধাক্কা তাই আমার কাছে অচল। পরে আবার যথেষ্ট দুর্দশা ভোগ করেছি, কিন্তু অনুতাপ করিনি। যাক্—

ইতিমধ্যে ডিন অফ ক্যাণ্টারবেরীর Socialist Sixth of the World বইখানা পেয়েছিলুম এবং পড়ে খুব ভাল লেগেছিল—বইটা বাংলায় অনূদিত হওয়া দরকার,—যাতে আমাদের দেশের লোকের রুশিয়া সম্বন্ধে পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা একটু কমে। আমি গোপনে সেটা অবলম্বন করে তার সঙ্গে "মস্কো নিউজ" থেকে '৪৪ সাল পর্যন্ত, কিছু মালমশলা জুড়ে দিয়ে (ডীনের বইটায় ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত খবর ছিল) "সোভিয়েট দুনিয়া" নামে এক বই খাড়া করে ফেললুম, এবং সেটা শেষ পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টির "ন্যাশান্যাল বুক এজেন্সি" কর্তৃক প্রকাশিত হল। আড়াই টাকা দামের বই, তিন হাজার ছাপা হল, রয়েলটি হিসেবে বেশ কিছু টাকাও পেলুম। বইটার খুব সুখ্যাতিও

হয়েছিল এবং হাজার দুই বই হুড়মুড় করে বিক্রীও হয়ে গিয়েছিল।

লড়াইয়ে হিটলার তোজো (মুসোলিনী তো ইটালীর জনগণের হাতে আগেই মারা পড়েছিল) যখন আমাদের নেতাদের বাধিত না করে হেরে গেল এবং ইংরেজ বিজয়ীর গর্বে ভারতের বুকের ওপর আরো জাঁকিয়ে বসলো, এবং যুদ্ধকালের অসহযোগীদের জেল থেকে বার করে নতুন ইলেকশন করে আবার তাদের পুরাণো ছেঁড়া গদীতে বসাবার বন্দোবস্ত করলে। তখন একদিকে নেতারা ওয়াভেলের দরবারে ঘাড় হেঁট করে ধর্ণা দিচ্ছেন, আর একদিকে জনগণ তাদের দাবী নিয়ে সংঘবদ্ধ হচ্ছে এবং সংগ্রাম সুরু করেছে। আবার একদিকে ইংরেজ তাদের ওপর দোর্দণ্ড প্রতাপে লাঠি-গুলী চালাচ্ছে, আর একদিকে নেতারা সেই ডাণ্ডার অনুপান স্বরূপ কোমর বেঁধে প্রোপাগ্যাণ্ডা চালাচ্ছেন, তাদের বিভ্রান্ত করতে এবং সংগ্রামী মনোবল ভাঙ্গতে।

এত বড় চার্জের পক্ষে অন্তত গোটা কয়েক প্রমাণ না দিলে চলে না, তাই আমি এখানে তিন রকমের তিনটে প্রমাণ দিচ্ছি :

(১) মহাত্মাজী এক অভিনব প্রোপাগ্যাণ্ডা মেশিন তৈরী করেছিলেন,—post prayer meeting,—যা দেখলে স্বয়ং গোয়েবলসও লজ্জা পেতো। তিনি রোজ বিকেলে এক প্রকাশ্য গণ-প্রার্থনা সভার ব্যবস্থা করেছিলেন,— যে সভায় সমবেত প্রার্থনার পর তিনি এক বক্তৃতা দিয়ে জনগণের মনোহরণ করতেন, আর সে বক্তৃতা পরদিন সকালের সংবাদপত্রে ছাপা হত। তার একটা নমুনা হচ্ছে, যখন বিলেতের লেবার গভর্ণমেণ্ট ভারতে এক পার্লামেণ্টারী মিশন এবং তারপর এক ক্যাবিনেট মিশন পাঠাবার বন্দোবস্ত করলে, তখন অনেকে ইংরেজের মতলব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। মহাত্মাজী তখন post-prayer meeting এ বলেছিলেন,—"Emphatically it betrays want of foresight to disbelieve British declarations ...Is the official deputation coming to deceive a great nation ? It is neither manly nor womanly to think so."—(Amrita Bazar Patrika—27. 2. 46.)

অর্থাৎ তোমাদের মতন একটা মহান জাতির পক্ষে ইংরেজকে অবিশ্বাস করাটা দূরদৃষ্টির অভাবের পরিচয়—তারা যে তোমাদের ঠকাতে আসছে, একথা মনে করাটা বেটাছেলের উপযুক্ত কাজও নয়, মেয়ে-ছেলের উপযুক্ত কাজও নয় (অর্থাৎ ?—হিজড়ের কাজ !)।

প্রথমে যে পার্লামেণ্টারী মিশন আসে, তার অন্যতম সদস্য সোরেনসেন আগেই এক বক্তৃতায় বলেছিলেন,—"The idealism of Gandhi will save India and the entire mankind. The British Government should be profoundly grateful to him. Every Indian, be he a congress-man or a Moslem Leaguer should appreciate that Gandhi is one of the greatest souls of the day. I do not want my country to be an imperialist power. I want a free India, because it is good for my country so that she should no more dominate in other lands."—(Amrita Bazar Patrika—11. 1. 46).

অর্থাৎ—"গান্ধীর আদর্শ ভারতকে এবং সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচাবে। গান্ধীর প্রতি বৃটিশ সরকারের গভীরভাবে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কি কংগ্রেসী, কি লীগী, প্রত্যেকটি ভারতবাসীরই বোঝা উচিত যে, গান্ধী এ যুগের অন্যতম মহাত্মা। আমি চাইনা যে, আমার দেশ সাম্রাজ্যবাদী হয়। আমি স্বাধীন ভারত চাই এই জন্যে যে, সেটা আমার দেশের পক্ষে ভাল,—যাতে সে আর অন্য দেশের ওপর কর্তৃত্ব না করে।"

অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী হওয়াটা যে ইংরেজের পক্ষে একটা বদ অভ্যাস মাত্র,—যেন তার মধ্যে শোষণের প্রয়োজনের কোন বালাই নেই। আর ভারতবন্ধু সোরেনসেনের এই বক্তৃতার সঙ্গে বৃটিশ বন্ধু মহাত্মাজীর উপরোক্ত কথা টোট্যাল দিলেই একটা সর্বাঙ্গসুন্দর ষড়যন্ত্রের রূপই দেখতে পাওয়া যাবে।

কিন্তু আমেরিকার ডিট্রয়েট ফ্রি প্রেস,—যার এ ষড়যন্ত্রের কোনো গরজ নেই,—তার এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের এক উদ্ধৃতি '৪৬ সালের ৩রা মার্চের "অমৃতবাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত হয়েছিল,—যাতে বলা হয়,—"The hard fact in the way of an Anglo-Indian agreement is that, with India gone, the British empire would be only a skeleton of its former self. 140 millions of Americans can deal with the Philippines as a luxary. 40 millions Britons cannot regard India with its 400 millions and the tremendous natural resources as other than an economic necessity if they are to remain a first class power."

অর্থাৎ—"বৃটিশ-ভারত চুক্তি সম্বন্ধে কঠোর বাস্তব সত্য এই যে, ভারত হাতছাড়া হলে বৃটিশ সাম্রাজ্য একটা কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত হবে। ১৪ কোটির দেশ আমেরিকা ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিয়ে নবাবী করতে পারে,—কিন্তু ৪ কোটির দেশ বৃটেনকে যদি প্রথম শ্রেণীর শক্তি হিসেবে বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে যে দেশে ৪০ কোটি লোকের বাস, এবং যার প্রাকৃতিক সম্পদ বিপুল, সেই ভারত তার পক্ষে একটা অপরিহার্য্য অর্থনৈতিক প্রয়োজনের বিষয় ছাড়া আর কিছু বলে বিবেচিত হতে পারে না।"

এই কথা প্রকাশের পরদিনই ঐ কাগজেই পণ্ডিত নেহরুর কথা প্রকাশিত হল—তাতে তিনি বৃটেনের অর্থনৈতিক প্রয়োজনটাকে হাল্কা করে বললেন,—"They want to know from us if we would give them trade facilities in India."

অর্থাৎ—৪২ সালে ইংরেজ যখন লড়াইয়ে মার খাচ্ছিল, তখন যে আমরা তাদের কুইট ইণ্ডিয়া করতে বলেছিলুম, কিন্তু এতদিন তা কার্যকরী করতে পারিনি,—এখন ইংরেজ লড়াইয়ে জিতে আমাদের বাধিত করার জন্যে কুইট ইণ্ডিয়া তো করছেই,—উপরন্তু ভুখিয়ার মতন আমাদের কাছে ভারতে ব্যবসা করার অধিকার প্রার্থনা করছে !

(২) সংঘবদ্ধ মজুরদের দাবীদাওয়ার ক্রমবর্ধমান সংগ্রামে ভাঙ্গন ধরাবার জন্যে বম্বেতে বিরলা হাউসে কংগ্রেসীরা 'হিন্দুস্থান মজদুর সেবক সংঘ' নামে এক সর্বভারতীয় মজদুর-সংস্থা গঠন করেন, এবং তার বঙ্গীয় শাখার এক সভায় কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী আচার্য কৃপালনী এক বক্তৃতায় বলেন : (৪৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর)—

লাবার জন্তে জমি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত নেহেরু ভারতের নগণকে বলছেন,—"Britain wants to transfer power › India but she does not know whom to give it.. t should be made to the Indian representatives f the constitution making body which will come nto existence after the provincial election."— A B P—4. 3. 46)

অর্থাৎ—"বৃটেন ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে য়,—কিন্তু ঠিক করতে পারছে না, কার হাতে ক্ষমতা দেবে। প্রাদেশিক নির্বাচন শেষ হওয়ার পর যে "সংবিধান প্রস্তুতি সংস্থা" গঠিত হবে,—তার প্রতিনিধিদের হাতেই ক্ষমতা দেওয়া উচিত।"

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে,—সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত যে কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলির কথা নেহেরু বরাবর বলে এসেছেন, এখানে তিনি সে কথা ছেড়ে অত্যল্পসংখ্যক ভোটে নির্বাচিত কনষ্টিটিউশন মেকিং বডির কথা বলছেন। এর কারণ হচ্ছে রীতিমত বৈধ কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি গঠনের ক্ষমতা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দিতে চায়নি। তার বদলে নিজেদের মতলবমত এক "কমিটি" গঠনের ব্যবস্থা করেছে, যারা ভারতের নতুন সংবিধান রচনা করবে।

রয়টারের রাজনৈতিক সাংবাদিক ইতিপূর্বেই ক্যাবিনেট মিশনের নেতা পেথিক লরেন্সের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের রিপোর্টে বলেছেন: (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২১।২।৪৬),—

"Asked if the British Government was prepared to accept sovereign independence of India and if such a constitution was framed,—the minister said—"That has been accepted for a long time."

Question—Was the mission going to India to transfer power or to negotiate transfer of power ?

Answer—Proposal to transfer power had already been made.

Q—would Britain transfer power to the "Constituent Assembly" when it was in being ?

A—Transfer of power would be to the constitutional authority which was devised by the "constitution-making body.

Q—Don't you think that since provincial franchise in India is so limited that the constitution making body would be undemocratic ?

A—You have to begin somewhere.

Q—Has the mission full authority to negotiate freely ?

A—Before the mission goes out the Cabinet will come to certain broad decisions. Within these principal decisions the mission will be free to act.

অর্থাৎ—ভারতের সার্বভৌম স্বাধীনতা বৃটেন মেনে নিয়েছে কি না, বা তদনুযায়ী সংবিধান রচিত হয়েছে কি না,—এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বললেন,—ওটা তো বৃটেন অনেক কাল আগেই মেনে নিয়েছে।

প্রশ্ন—মিশন ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে, না সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবে ?

উত্তর—ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রস্তাব আগেই হয়ে গেছে।

প্রশ্ন—ভারতে "কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি" তৈরী হলে, তার কাছেই কি ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে ?

উত্তর—"কনষ্টিটিউশন-মেকিং বডি" যে বৈধ কর্তৃপক্ষ গঠন করবে, তার হাতেই ক্ষমতা দেওয়া হবে।

প্রশ্ন—ভারতের প্রদেশগুলোতে ভোটাধিকার যে রকম সীমাবদ্ধ,—(শতকরা ১৩ জন)—তাতে কি আপনি মনে করেন না যে "কনষ্টিটিউশন মেকিং বডি"-টা অগণতান্ত্রিক হবে ?

উত্তর—যেখান থেকেই হোক, আরম্ভ তো করতে হবে।

প্রশ্ন—মিশনের কি স্বাধীন ভাবে আলাপ-আলোচনার অধিকার আছে ?

উত্তর—মিশন ভারতে যাওয়ার আগে বৃটিশ মন্ত্রিসভা কতকগুলো মূল সিদ্ধান্ত স্থির করবে,—এবং তার গণ্ডীর মধ্যে মিশন স্বাধীন ভাবেই কাজ করবে।

অর্থাৎ—স্বায়ত্ত-শাসনদানের এই 'আধাখেঁচড়া' বৃটিশ প্ল্যানকে স্বাধীনতার বৈধ ভিত্তি বলে চালাবার জন্তে নেতারা কোরাসে গান ধরেছেন,—বৃটেন ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে বাড়ী চলে যাচ্ছে,—বৃটিশ সাম্রাজ্য একটা অতীতের কথা হতে চলেছে।

প্ল্যানটা ভারতবাসীর দিক থেকে 'আধাখেঁচড়া' হলেও বৃটেনের দিক থেকে আট-ঘাট বাঁধার ত্রুটি নেই। "অমৃতবাজার পত্রিকা"র লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি লিখলেন (৩।৩।৪৬)—"The Government is prepared to go as far as possible even all the way for assuring India of full independence. Defence and the control of external policy are the safe-guards. They wish to reach a position whereby India can be free as other Dominions to decide its foreign policy. This can be achieved only if extremism does not enter into actual control of the Indian Political State."

অর্থাৎ প্রতিরক্ষা আর বৈদেশিক নীতি-নিয়ন্ত্রণ, এই দুটো ব্যাপার বাঁচিয়ে ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া পর্যন্ত যেতেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট রাজী হতে পারে,—এমন কি বৈদেশিক নীতিও ছেড়ে দিতে পারে,—যদি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে চরমপন্থী নীতি না প্রবেশ করে।

যাই হোক,—এই মূলতত্ত্বই সব নয়,—এর সঙ্গে বৃটিশ ক্যাবিনেটের যে সব মূল-সিদ্ধান্তের গণ্ডীর মধ্যে ক্যাবিনেট মিশন কাজ করবে,—তার মধ্যে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কুপল্যাণ্ড প্ল্যান, আর এম্পায়ার ডিফেন্স প্ল্যান অন্যতম,—যে ডিফেন্স প্ল্যানে ভারতকে বৃটেনের প্রাচ্য ঘাঁটি বা ইষ্টার্ণ বেসের অন্তর্ভুক্ত রাখার কথা বলা হয়েছে।

এর পর ইলেকসন হল,—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা দেশের শতকরা এক জন মাত্র,—আর প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা দেশের শতকরা ১৩ জন। পরে এই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা এবং তার সঙ্গে দেশীয়

নৃপতিদের একদল প্রতিনিধি, প্রত্যেক প্রাদেশিক সভার কয়েকজন প্রতিনিধি মিলিয়ে নিং, সরকারী কাগজপত্রে যে "কনষ্টিটিউশন মেকিং বডি" গঠিত হয়েছিল,—দেশী কাগজওয়ালাদের কলমের কল্যাণে কালক্রমে সেটাকেই সরকারী কাগজপত্রেও কনষ্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বলে লেখা শুরু হল।

যাই হোক, ইলেকশনে দেখা গেল, কেন্দ্রে এবং প্রদেশগুলোতে প্রায় সব অ-মুসলমান 'জেনারেল সিট' দখল করলে কংগ্রেস, আর সব মুসলমান সিট দখল করলে মোসলেম লীগ—শুধু "ফ্রন্টিয়ার গান্ধী" আবদুল গফুর খানের দেশ উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশে লীগ হারলো এবং কংগ্রেস জিতলো। তারপরে প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস আবার মন্ত্রিসভা গঠন করলে,—'৩৫ সালের শাসনবিধি অনুসারেই, কিন্তু লাটসাহেবের বিশেষ ক্ষমতার প্রশ্ন না তুলেই।

কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট আবুল কালাম আজাদ এর কারণ ব্যাখ্যা করে বললেন—(ষ্টেটসম্যান—২১।২।৪৬):

"এখন যখন ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে চলেছে, তখন গভর্ণরদের বিশেষ ক্ষমতা ও হস্তক্ষেপের প্রশ্ন না তুলেই কংগ্রেস প্রদেশে মন্ত্রিত্ব নেবে, এবং কেন্দ্রে সরকার গঠনের জন্যে অপেক্ষা করবে। কারণ, এখন ও প্রশ্ন তোলার অর্থ আমাদের বর্তমান সাফল্যকে অস্বীকার করা। এখন যদি কোনো প্রদেশে মন্ত্রিসভার সঙ্গে গভর্ণরের কোনো বিরোধ হয়,—তা হলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে না,—হবে গভর্ণরকে।"

জনগণের কাছে বড়াই করে তাদের বোকা বুঝিয়ে তিনি কিন্তু পাঞ্জাবে ৯৩ ধারার প্রবর্তন এবং গভর্ণরের শাসনের আসন্ন সম্ভাবনা দেখে লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আর ইলেকশনের কল্যাণে, একদিকে কংগ্রেসের ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী, আর একদিকে লীগের পাকিস্থানের দাবী, এই দুই বিরোধী প্রচারের দৌলতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ আরো তীব্র হয়ে উঠলো। ক্যাবিনেট মিশন যথাসাধ্য এই বিরোধকে আরো দৃঢ় করার ব্যবস্থার উপযুক্ত বাণী দিয়ে দুই পক্ষের নেতাদের সঙ্গে পৃথক ভাবে আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত যে রিপোর্ট দিলেন, সেটা ঠিক সুপারিশ নয়, প্রকৃত পক্ষে অ্যাওয়ার্ড বা রোয়েদাদ।

তাতে প্রদেশগুলোকে এ-বি-সি, তিন গ্রুপে ভাগ করা হল—হিন্দু মেজরিটী প্রদেশগুলো এ-গ্রুপ, মুসলমান মেজরিটী প্রদেশগুলো বি-গ্রুপ আর বাংলা ও পাঞ্জাব সি-গ্রুপ, যেখানে হিন্দু মুসলমান প্রায় সমান। এই তিন গ্রুপের শাসন ব্যবস্থা কি রকম পৃথক হবে, সেটা সংবিধান রচয়িতারা ঠিক করবে। আর দেশীয় রাজ্যগুলোর ওপর থেকে বৃটিশ প্যারামাউন্সি বা চূড়ান্ত কর্তৃত্বের ব্যবস্থাটা তুলে নেওয়া হবে, কিন্তু বৃটিশ ভারতের উত্তরাধিকারী সরকারগুলো সে প্যারামাউন্সির উত্তরাধিকারী হতে পারবে না, অর্থাৎ দেশীয় রাজারা আইনত সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে।

এদিকে কমিউনিষ্ট পার্টি যে আগে কংগ্রেসের ভেতর দিয়ে কংগ্রেসে ঢুকেছিল—ইলেকশনের আগে তারা কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এল এবং শ্রমিক কেন্দ্রগুলো থেকে নির্বাচনে দাঁড়ালো। নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেস-লীগ বিরোধ বৃদ্ধির মতন কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী প্রচারে তাদের আগষ্ট বিপ্লবের বিরোধী, লীগের দালাল, দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বলা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের অফিসগুলোর এবং ব্যক্তিগতভাবে তাদের ওপর হামলাও শুরু হয়েছিল। এমন কি কমিউনিষ্ট কর্মীদের বাড়ী এবং আত্মীয়দের ওপরও হামলা চলেছিল। বহু কর্মী, তাদের বাড়ীর মেয়েরা, এমন কি তাদের বুড়ো বাপও গুণ্ডা-কংগ্রেসী এবং হিন্দুস্থান মজদুর সেবক সংঘের গুণ্ডাদের হাতে মার খেয়ে জখম হয়েছে,—তাদের কমিউনিষ্ট পার্টির অফিসে আনা হয়েছে, প্রকাণ্ড হলের মেঝের অনেক জখমী পড়ে আছে, স্বচক্ষে দেখেছি। নিজেকে তাদের দলের লোক বলে মনে করতে শুরু করেছি।

অবশ্য পার্টির সদস্য হইনি, অনেকের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও, কারণ "ইণ্ডিয়ান ট্রেলিন" পি, সি, যোশী এবং তাঁর প্রাদেশিক সেক্রেটারী ভবানী সেনের মতিগতি আমার কখনো ভাল লাগেনি। এমন কি "সোভিয়েট দুনিয়া" প্রকাশ করার পর স্বয়ং মোজাঃফর আহমদ যখন প্রস্তাব করেছিলেন,—বাজে ব্যবসা নিয়ে না থেকে যদি আমি ন্যাশান্যাল এজেন্সিতে তাঁদের বই-এর কাজ নিয়েই থাকি, তাহলে তিনি একটা অ্যালাউন্সের ব্যবস্থাও করে দেবেন, তখন সে প্রস্তাবও আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলুম,—কারণ তাতে আমার স্বাধীন রাজনীতিক মতামত ছাড়তে হবে।

কিন্তু ইলেকশনে তাদের কর্মী হয়ে জগদ্দল কেন্দ্রে গেলুম। কংগ্রেসী নির্মলেন্দু মজুমদারের সঙ্গে কমিউনিষ্ট শ্রমিক চতুরালীর দ্বন্দ্ব-ইলেকশনের ভোটযুদ্ধের একটা চূড়ান্ত নমুনা। সারাদিন ধরে ভোটাভুটির ছড়োছড়ি—মুসলমানরা ভোট দিচ্ছে চতুরালীকে আর হিন্দুরা নির্মলেন্দুকে—একটা রীতিমতন কমিউন্যাল ইলেকশন! মাঝে মাঝে

এক একবার দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়, অতিকষ্টে থামানো হয়। আর ভোট দুপক্ষেরই একধার থেকে জাল ভোট।

যারা ভোট দিচ্ছে, তারা সবাই প্রায়ই ভোটার—বাজে লোকও কিছু আছে। কিন্তু তার চেয়ে মজার কথা হচ্ছে,—পাশাপাশি দু'দলের কর্মী আর ভোটারদের হুড়োহুড়ির মধ্যে কে যে কে, তার ঠিক ঠিকানা নেই—যে-কোনো ভোটার যে-কোনো ভোটারের নাম নিয়ে ব্যালট দিয়ে আসছে।

আমরা বহু কর্মী মিলে ভোটার লিষ্ট দেখে নামে নামে স্লিপ লিখে রেখেছিলুম,—ভোটার এসে নাম বললেই তার নামের স্লিপটা তার হাতে দেওয়া হবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল, তা অসম্ভব—স্লিপ খুঁজে বার করতে হয়রাণ হতে হয়। সুতরাং অপরপক্ষের হুড়োহুড়ির সঙ্গে সমানে পাল্লা দেওয়ার জন্যে আমরা যে-আসে তাকেই একখানা স্লিপ দিয়ে বলে দিই তোমার নাম জান্ মহম্মদ আর তোমার বাবার নাম খোদাবক্স—তাই সই, তারা মুখস্থ করতে করতে গিয়ে ভোট দিয়ে আসে।

মাঝে মাঝে এক একজন মাঝপথ থেকে ফিরে আসে,—বলে কেয়া বোল দিয়া, ভুল গিয়া, এক দফে আউর বাতা দিজিয়ে। আর একবার চীৎকার করে বলে দিই—জান্ মহম্মদ—বাপ খোদা বক্স। একজন একটু তফাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললুম,—খাড়া হায় কাহে? সে একটু মুখ টিপে হেসে বললে, হাম দো দফে দিয়া,—ফের আনেসে পয়চান্ যোগা। দুসরা বরকা (বুথ) শিরিপ দিজিয়ে। বললুম, দুসরা বরকা সামনে যাও। সে চলে গেল।

ইলেকশনে প্রয়োজন মত এ রেওয়াজ চালু হয়ে গেছে। দুই পক্ষই পরস্পর সম্বন্ধে বলে ওরা false vote-এ জিতেছে—কেউ বলে না, কেউ false vote-এ হেরেছে। অর্থাৎ দরকার মতন এ কায়দা সর্বক্ষেত্রেই চালু হয়ে গেছে। এই হচ্ছে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী সিষ্টেমের ইলেকশন। স্বচক্ষে দেখলুম, স্বহস্তে কাজ করলুম,—বিবেকে বাধেনি। কিন্তু ঐ প্রথম, আর ঐ শেষ। কি কর্পোরেশন, কি কাউন্সিল-অ্যাসেম্বলী,—সারা জীবনে আমি কখনো কোনখানেই ভোটার নই,—এবং কর্মীও হইনি।

অনেকে হয়ত নাক সিঁটকে বলবেন, আমি বাহাদুরী করেছি। তাদের স্মরণ করতে বলি, নিজে চেষ্টা করে ভোটার লিষ্টে নাম ঢোকায় ক'টা লোক? সবাইকেই ভোটার লিষ্টভুক্ত করে দেয় কোন না কোন ইণ্টারেষ্টেড পার্টি বা ব্যক্তি,—যারা যাদের ভোটটা পাবার আশা রাখে। আমার কেসে এমন পার্টি বা লোক আজ পর্যন্ত জোটেনি,—যারা মনে করতে পারে, আমি তাদের ভোট দোব। ঝগড়টার মূল এইখানে।

[ক্রমশঃ

শিল্পবোধকে জাগাতে হলে

কোন নিকৃষ্টমানের বস্তুকে জনপ্রিয়তার মজির দেখিয়ে চলতে দেওয়াতেই এই প্রকৃত শিল্পবোধ বা উন্নত রসোপভোগ প্রবৃত্তির অবলুপ্তি ঘটে ধীরে ধীরে।

সাধারণের রুচি বা শিল্পবোধকে উন্নততর করার বদলে কুরুচিপূর্ণ জিনিষের জোগান অবিরত দিয়ে যাওয়াই একশ্রেণীর মানুষের স্বভাব, তাঁদের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে, জনসাধারণের মধ্যে ওই ধরণের বস্তুরই চাহিদা নাকি বেশী অতএব ব্যবসায়িক সাফল্যের ভিত্তিতেই নাকি তাঁরা অপকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টিও পরিবেশন করে থাকেন।

আপাতদৃষ্টিতে ঠিক মনে হলেও এই মনোবৃত্তির ফলেই সাধারণ শিল্পবোধের মান উন্নয়ন করা ক্রমেই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রকৃত রসোত্তীর্ণ বস্তুর আস্বাদ যদি তারা জানতেই না পারে তবে কোন দিনই তো সাধারণ মানুষ তার সমাদর করতে সক্ষম হবে না, সত্যকার আর্ট বা রসোত্তীর্ণ শিল্পকে সাধারণ মানসে আসন দেওয়ানোর ভার তাই শিল্প পরিবেশকেরই।

নিকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি ও তার প্রচার বন্ধ হলে তবেই প্রকৃত সাহিত্যের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া সম্ভব এবং অপরাপর সমস্ত শিল্প সম্বন্ধেও সেই একই কথা একই ভাবে খাটে, সত্যকার সৎ সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি শিল্পকলার প্রসার ও প্রচার যদি চিরদিনই মুষ্টিমেয় একদলের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে তাহলে তাদেরই বা সার্থকতা কি? সামগ্রিক ভাবে গণমানসে যা প্রতিফলিত হতে না পারল সে সৃষ্টি তার অনবদ্য ঐশ্বর্য্য ভার নিয়ে জগতের কোন কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে? যুগের পর যুগ সাধারণ মানুষের রুচির নিম্নগামিতা রোধ করার কোন সংঘবদ্ধ প্রয়াসই লক্ষিত হয়নি, কিন্তু এতদিন হয়নি বলেই যে কোনদিনই তা হবে না বা হওয়া সম্ভব নয়, একথা শ্রদ্ধেয়ও নয় সত্য ও নয়, বরং এর থেকে আজকের দিনে এটুকুই শিক্ষণীয় যে, রুচিবিকারের পথে অবিশ্রাম চলতে দেওয়াটাই সবচেয়ে বড় অন্যায়, মানুষ ভালো চায়না বলেই যে সে মন্দকে আঁকড়ে ধরে তা তো নয় বরং মানুষ হাতের কাছে ভালোটা পায়না বলেই মন্দটাকে গ্রহণ করে এবং সেটাকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ছায়াছবির রাজ্যে কিছুদিন আগে অবধি উন্নতমানের কোন কিছু পরিবেশন করার কথা ভাবতেও পারতেন না আমাদের দেশের প্রযোজক তথা পরিচালকের দল, তৃতীয় শ্রেণীর নাচ গান হৈ হুল্লোড় দিয়ে ছবি ভরে দিতে না পারলে যে তার ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ হওয়া অসম্ভব এটাই ছিল তাঁদের একমাত্র বুলি, কিন্তু একথা যে কতবড় মিথ্যা তা প্রমাণ করে দিলেন সত্যজিৎ রায়। তাঁর পথের পাঁচালী'র চিত্ররূপ দিয়ে। স্বদেশে বিদেশে অসংখ্য অভিনন্দনে নন্দিত পথের পাঁচালী যে শুধু তাঁকে যশের শিখর দেশেই স্থাপিত করল তা নয়, সেই সঙ্গে এনে দিল ব্যবসায়িক সাফল্যও; উন্নতমানের ছবিতেও 'যে আর্থিক সাফল্য বা বক্স অফিস যথাযথ বজায় থাকে "পথের পাঁচালী" তারই উজ্জ্বলতম নিদর্শন। বাঙ্গলা চিত্র জগৎকে রুচিবিকারের পীড়ামুক্ত করলেন সত্যজিৎ রায় চিরতরে, প্রমাণ করলেন যা ভালো তা সব সময় সকলের পক্ষেই ভালো, বংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসে তাঁর প্রতিভা এক নব অধ্যায়ের সূচনা করল।

ঠিক এই ভাবেই সৎসাহিত্য ও অপরাপর শিল্পকলাকেও সাধারণের মধ্যে প্রচার করবার জন্য অদম্য অধ্যবসায়ে এগিয়ে আসতে হবে সাহিত্যিক ও শিল্পীবৃন্দকেও, আর সে উদ্যমে আমাদের অর্থাৎ সাধারণ মানুষকেও হাত মেলাতেই হবে! অপকৃষ্ট সাহিত্য বা শিল্পকে দূরীভূত করার দায়িত্ব সকলেরই, প্রধানতঃ স্রষ্টা অর্থাৎ লেখক বা শিল্পীর হলেও আমরা সকলেই আংশিক ভাবে সে দায়িত্বের অধিকারী, নিকৃষ্টমানের সাহিত্য বা শিল্পকে চিনতে শেখাই আজ তাই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আর এর জন্য রুচিবান ব্যক্তির সহায়তা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

তীর

অশোক মুখোপাধ্যায়

বাঁশের খুঁটির পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল তারা। সার সার তাঁবু। যেন শান্ত জলের আয়নায় এক ঝাঁক শাদা বুদবুদ।

বাংলাদেশই। কিন্তু বন্ধুর, পাথুরে মাটি এখানে। পাথুরে, তবু তার ওপর চাষ করছে মানুষ। রুক্ষতার বুক চিড়ছে। আবাহন করছে সবুজ ফসলের।

ধানক্ষেতের সোনালি সীমা পেরিয়ে যাই। চোখ বাধা পায়না। বহু দূরে দূরে আকাশের বুক ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক একটা ছায়া—ছায়া পাহাড়। ঠিক কতদূরে বোঝা যায় না, বলা যায় না? ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে বল্গাহীন চোখ। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় মুগ্ধতা নিয়ে।

ধানক্ষেত। যতদূর তাকাই, শুধু তাই। মাঝে মাঝে এক একটা অগভীর পুকুর। বুকে তাদের নীল কাঁচের মত টলটলে জল। ওপরে সবুজ পানার ঝালর। পুকুরগুলোকে ঘিরে ঝাঁকড়া শালগাছের জড়াজড়ি, তারই আড়ালে ছোট ছোট সাঁওতাল বস্তি।

বেশ লাগল। প্রথম দেখা থেকেই। গত কয়েকটা মাস ওর স্মৃতিতে কালির আঁচড় হয়ে ফুটে আছে। সেই ঘিঞ্জি সহরতলীটা, ভিড়-ভিড় আর ধোঁয়া-ধোঁয়া। সেখানে পড়েছিল জরীপের কাজ। মন চাইছিল, এখুনি পালাই। কিন্তু মন তো কতই চায়। সবই কি হয়? দীপক তো জানে বাড়িতে দু'টি প্রাণী তারই মুখ চেয়ে বেঁচে আছে। ছোট ভাই কমল, পনেরো বছরের কিশোর। আর বুড়ো, রুগ্ন মা। সারাটা জীবন অভাবের বিষদাঁত তাঁকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে, ক্ষতবিক্ষত করেছে। আজ জীবনের উপান্তে পৌঁছেও তারই জের টেনে চলেছেন। রোগজীর্ণ দেহ নিয়ে শয্যাকেই করেছেন একমাত্র আশ্রয়।

রঙহীন জীবনটা কাটছিল টিকিয়ে টিকিয়ে। একঘেয়ে, বিরক্তিকর। ঠিক এমন সময় ওপর থেকে নির্দ্দেশ এল, তৈরী হয়ে নাও। আসানসোল থেকেও বেশ কয়েক মাইল দূরে এবার আস্তানা।

ওরা এল। বাঁশের খুঁটি দাঁড়াল অজস্র। সার সার তাঁবু পড়ল। আর জায়গাটা ভালোই লাগল দীপকের।

যা ভেবেছিল, সবই মিলল। মাঘের শীতার্ত্ত রাত নামল শালবনের গা বেয়ে। যেন একটা বরফ-গলা জলের স্রোত শিরশির করে বইছে। লেপ-তোষক সব গায়ে চাপল। হ্যারিকেনের সলতেটা বাড়িয়ে দিলে শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু লাভ হল না। মাঝ থেকে চিম্‌নিটা কালো হয়ে গেল। আর তাঁবুর দেয়ালে বাঁকাচোরা ছবি আঁকল।

তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল দীপক। কিন্তু শীত ঘুমোল না। সারারাত ধরে দাঁত ফোটাল সর্ব্বাঙ্গে।

ভোর হয়নি তখনও। ঘুম ভেঙে গেল। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করব? কিন্তু যা ঠাণ্ডা, আর ঘুম হবেনা বোধ হয়। ভাবল দীপক। উঠল। টুথব্রাশটা হাতে নিল তারপর তাঁবুর ফ্ল্যাপ ঠেলে বেরিয়ে এল বাইরে।

এখন বুঝি পাঁচটা। সূর্য্য উঠবে—তারই সমারোহ পুবের আকাশে। কিন্তু ওদিকটা। ওদিকের আকাশেও পলাশের রঙ। একটা উজ্জ্বল লাল আভা। লক লক করছে। কি আলো, কি আলো! এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে রইল ও। অনুভব করল। ভাবল। তারপরই বুঝতে পারল। ওদিকটা বার্ণপুর লৌহনগরীর ব্লাষ্টফার্নেস ফ্লেমের ছটায় লাল করেছে আকাশ।

একটা সুন্দর ছবি দেখলুম। সুন্দর আর ভীষণ। মনের অ্যালবামে এ ছবি বাঁধানো থাকবে চিরকাল।

'কি হে দীপক, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে—একা? ঘুম হল?'

দীপক তন্ময় হয়ে ছিল। ঘোর কাটল। মুখ ফেরাল। 'ও, আপনি,' মৃদুকণ্ঠে বলল। 'হয়েছে এক রকম', উত্তর দিল। একটা হাই তুলল, 'আপনার?'

ভেঙেচুরে বিশ্রী হয়ে গেলেন ভূদেববাবু। গলার স্বরটাও, 'আর ঘুম। শুয়ে শুয়ে শুধু ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপলুম। এতে ঘুম হয় কারুর?' বলতে বলতে গোটা সোটা ভালো মানুষ দেখতে লোকটা কেমন অন্যরকম হয়ে গেলেন, 'তাছাড়া কালকের রাতটা আমার নিরামিষ গেছে। জানই তো, আমি নেশাখোর মানুষ। আর হ্যাঁ, অসচ্চরিত্রও। অমৃত নয় উর্ব্বশী—ছুটোর অন্তত: একটা আমার চাই। না পেলেই মেজাজ খট্টা।' হাসলেন। অপরিচ্ছন্ন হাসি।

দীপকের ভালো লাগল না। তবু চুপ করে রইল। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ। তা ছাড়া ক্যাম্প-ইন্‌-চার্জ্জ। ওপরওয়ালা। ভালো না পারুন, মন্দ করার ক্ষমতা তো আছে!

'যাই, মুখটা ধুয়ে আসি', দীপক বলল। তারপর চলে এল সেখান থেকে।

সারা দিন কাজ হল। বিশ্রামের পালা। চা-জল খাবারের ফাঁকে সারা ক্যাম্পে হুল্লোড়। সন্ধ্যা নামবে। যাই, ঘুরে আসি একটু, দীপক বেরিয়ে পড়ল। কাজ নেই, গতি মন্থর।

অনেকটা দূর চলে এল। একটা সাঁওতাল বস্তি। দূর থেকে একটা জটলা চোখে পড়েছিল। ভেবেছিল হাট। কাছে যেতে ভুল ভাঙল। হাট নয়, শুঁড়িখানা। মত্ত নারীপুরুষের ভিড়। আকণ্ঠ পান করেছে সবাই। অসংবৃত বেশবাস। যেন রক্তজলে শ্লেট পাথরের মূর্ত্তি। প্রদর্শনীতে দেখা ভাস্কর্য্যের কথা মনে পড়ল দীপকের।

আমাকে দেখে বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করছে ওরা, দীপক ভাবল। তারপর বেরিয়ে এল। এখানে থাকার কোন মানে হয় না। বিশেষ করে এ সময়।

ও হাঁটছিল। অন্যমনস্ক। চোখ মাটির দিকে। যখন মুখ তুলল। আর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চল হয়ে গেল পা। ছবি? না ছবির চাইতেও সুন্দর। চারদিকে দিগন্ত জোড়া ধানক্ষেত। তার অনেকটা ওপরে এই কড়াই-শুঁটির ক্ষেতটা। ঘাসে ঢাকা সরু আ'ল। তার ওপর বসে আছে একটি সাঁওতাল মেয়ে। সুঠাম, সুন্দর। শরীরে তার রাত্রির রঙ। মুখে অরণ্যের শান্তি। কেমন যেন রহস্যময়ী, অদ্ভুত। মাঝে মাঝে শুধু নড়ছে একটা হাত। খুঁটে খুঁটে মুখে তুলে দিচ্ছে দু'একটা কাঁচা কড়াই-শুঁটি। কি ভেবে নিজের মনে হাসল একবার। চমকাল। চোখ পড়ল দীপকের দিকে। বিস্ময়ের রেখা কাঁপল মুখে। তারপর দ্রুত পায়ে আড়াল হয়ে গেল ক্ষেতটার ওপাশে।

আরেকটা রূপোলি বিকেল। দীপক থাকতে পারল না ক্যাম্পে। বেরিয়ে পড়ল। তাকে টানছে। সহস্র অদৃশ্য সুতোয় কে টানছে। তার চব্বিশ বছরের যৌবন যা এতদিন ঘুমিয়ে ছিল, আজ মুখর হয়ে উঠেছে।

কড়াইশুঁটির ক্ষেতটা কাছে এল। কলকল করল ওর বুকের রক্ত। কালকের সেই ছবিটা, তেমনি আশ্চর্য্য, তেমনি সুন্দর, যেন আজকের ফ্রেমে বাঁধা হয়ে আছে।

দীপক চায়নি কিন্তু পায়ের কাছের ধানগাছ অবাধ্য। তারা শিরশির করে হাসল। ছবিটা নড়ল। দু'কানের দু'টো ঝুমকো ফুল কাঁপল। আর যেন ঘুম-ভাঙ্গা চোখে তাকাল ও। তারপরই চকিত হল। শাড়ীর আঁচলটা টানল। কালও এসেছিল লোকটা। আজও এসেছে। কেন? কিছু বলবে আমাকে? কি বলবে? এমনি অজস্র কথার ঢেউ উঠছিল পড়ছিল ওর ঠোঁটে। তারপর যেন একটা বাঁশি কথা কয়ে উঠল। বাঁশি, হ্যাঁ, তেমনি চিকণ আর তেমনি সুরেলা, 'বাবু, তোরা রেল বানাবি?'

দীপক থমকাল। সম্বোধনটা শ্রুতিকটু। কিন্তু রাগ করা চলে না। ওদের ভাষার রীতিই এই।

'হুঁ, রেল বানাব।' দীপক উত্তর দিল। ইতস্তত: করল। তুমি বলবে, না তুই? তুমিই বলতে চাইল। কিন্তু মুখ দিয়ে বেরোল অন্যরকম, 'তোর ঘর কোথায়?'

'ঘর?' কালো পাথরের নিটোল হাতটা নড়ল। 'হোথা', বলে ভুঁড়িখানার দিকটা দেখিয়ে দিল।

'তুই হাঁড়িয়া খাসনা?' কৌতুকে চুলবুল হল দীপক।

'হিঁ, খাই।' অসঙ্কোচ স্বীকৃতি। কি সরল ওরা, এই সাঁওতাল লোকগুলো, দীপক মনে মনে ভাবছিল।

'আমাকে এনে দিবি? দাম দেব?' দীপক হঠাৎ বলল। কেন জানে না।

বোধ হয় কথা খুঁজে পাচ্ছিল না তাই।

'ধ্যেৎ, তুই উ খাবি ক্যানে? সাহেব আছিস তো বটে।'

সাহেব, আমি সাহেব? দীপক হাসল। আমার এই কটা-কটা রঙটা দেখছি আমাকে খুব ভোগাবে। ভোগাচ্ছেও। শোনাল নিজেকেই।

'আমি যাই।' উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। যেন একটা ঝর্ণার ছন্দ নাচল ওর সর্বাঙ্গে।

'তোর নাম কি?' দীপক শুধোল আচমকা।

'পারবতী।'

পার্ব্বতী? বাঃ, কি সুন্দর নাম। পর্ব্বত-দুহিতা। সারা অঙ্গ তার লাবণ্যে ঢলোঢলো। দু'চোখে কি নিবিড় প্রশান্তি! যেন একদীঘি কালো জল। ওই স্নিগ্ধতা স্পর্শ করুক আমাকে। আমি হারিয়ে যাই, তলিয়ে যাই। কিন্তু পার্ব্বতী বড় অবুঝ। ও কি কিছুই বোঝে না?

'কাল আসিস, কেমন?'

পার্ব্বতী হাঁটছিল। মুখ ফেরাল। 'ক্যানে?' কি ভাবল। কৌতুকের রামধনু ফোটাল মুখে। 'আইসব', বলল। আর ঘাসে-ঢাকা আ'ল-পথটার বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে গেল।

দুপুর। সূর্য মাথার ওপর চনমন করছে। দীপক ডুবে ছিল কাজে। এই ওর স্বভাব।

সেই ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর ভেঙ্গে কাছে এসে দাঁড়াল কালো মেয়েটি।

'বাবু!' ওর মিষ্টি আর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ দুপুরের রোদে যেন ঢেউ তুলল। দীপক চমকাল। পেছন ফিরল। 'তুই?' ভয়ে ভয়ে দেখল চারদিকটা। না, সহকর্মীরা কেউ নেই ধারে কাছে। চেনম্যানটাও কোথায় জল খেতে গেছে। ওর পুরুষ-দেহের আড়ালে যে মেয়েলী ভীরু সত্তাটা লুকিয়ে আছে, সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

দু'চোখ নেচে উঠল পার্ব্বতীর। হাসলে ঝকঝকে দাঁতে, 'এইলাম।'

'তোর বাড়ির লোক বকবে না? তোর বর?' ঈর্ষ্যায় সামান্য বুঝি বাঁকা হল দীপক।

'বর?' কালো পাথরে রক্তের ছোপ ধরল। 'বিহা হইল না তো বর কুথাকে পাব?' সারা অঙ্গ ফুলে ফুলে উঠল হাসির ধমকে।

'ইটা কি আছে?' যখন হাসি থামল, ওর সসম্ভ্রম দৃষ্টি পড়ল 'লেভেলিং ইনষ্ট্রুমেণ্টটার ওপর।

'এটা লেভেলিং মানে—', দীপক ঢোক গিলল একটা। 'এর মধ্য দিয়ে অনেক দূরের জিনিষ দেখা যায়। দেখবি?'

এগিয়ে এল পার্ব্বতী। দীপকের হাতের ছোঁয়ায় কাঁপল কচি পাতার মত। চোখ রাখল 'আইপিস' এর সামনে। চোখের সামনে ঝলমল করে ফুটে উঠল যেন এক রূপকথার দেশ। কতগুলো ছবি, যারা ওর খালি চোখের সীমানার বাইরে, যেন যন্ত্রের সিঁড়ি বেয়ে এসে দাঁড়াল ওর সামনে। এত সামনে যে, হাত বাড়ালেই বুঝি ছোঁয়া যায়।

ও চোখ তুলল। মন্ত্রমুগ্ধের মত। ওর এই ক্ষুদ্র জীবনের পরিধিতে এত বড় বিস্ময় বুঝি আর কখনও আসেনি। সেই বিস্ময়ের রঙ ফুটল কথায়, 'বাবু, তু জাদু জানিস।'

শুধু চারটি শব্দ। তাতেই দীপক হারাল নিজেকে। এই ভরা দুপুরে যেন নিশিতে পেলে ওকে। একটি অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধে ও মাতাল হল। কেউ তা দেখলে না, শুধু মাঘ মাসের গনগনে সূর্য্য একমাত্র দর্শক হয়ে রইল।

না, আরেক জনও। দীপক জানত না, জানল। দিনের কাজ শেষে ও ফিরছিল। ভূদেববাবু দাঁড়িয়েছিলেন। ডাকলেন। দীপক বিরক্ত হল মনে মনে। আমি চাইনে এ লোকটার সঙ্গ। কথা বলতেও ঘিন্নী লাগে। তবু ছাড়বে না। কি যে জ্বালা!

'কেমন কাজ হচ্ছে দীপক ?' বললেন তিনি। বুকপকেট থেকে একটা চিঠি বার করলেন। এগিয়ে দিলেন। 'আজ এসেছে। জরুরী ভেবে কিনেই দিতে গিয়েছিলাম।'

দীপক সাগ্রহে হাত বাড়াল। 'খুঁজে পাননি বুঝি ? ঘুরঘুট্টির ওদিকটায় ছিলাম। তেঁতুল গাছটার কাছে।'

'জানি'। হাসলেন তিনি। 'গিয়েওছিলাম। কিন্তু দেখলাম তোমরা নিজেদের নিয়েই বিভোর।'

'আমরা ?' দীপকের বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল।

'হ্যাঁ, তুমি আর একটি মেয়ে।' বলতে বলতে একটা লোভের ছবি উঁকি দিল মুখের ভাঁজে ভাঁজে। 'অমন একটা লাভলি সীন, ভেঙে দিতে ইচ্ছে হল না। তাই চুপচাপ সরে পড়লাম।'

দীপক যেন পাথর হয়ে গেছে। মুখটা ফ্যাকাশে। ঘামছে দরদর করে। ছি ছি, সবাই জেনে যাবে এখন। ঠাট্টা করবে, আলোচনা করবে, সে আমি সইতে পারব না। ভাবল ও, আর শিশুর মত অসহায় বোধ করল। ভূদেববাবুর দু'হাত জড়িয়ে ধরল, 'আপনি আর কাউকে বলবেন না যেন। আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না তাহলে।'

'না না, কেন বলব ? আমি তো ছেলেমানুষ নই।' তারপর গলার স্বর নীচু করে আনলেন, 'মেয়েটি কে ? পেলেই বা কোথায় ?'

দীপক নতমুখে উত্তর দিল, 'সাঁওতালদের মেয়ে। কাছেই থাকে। নাম পার্ব্বতী।'

'পার্ব্বতী ? খাসা নাম। আর মেয়েটিও খাসা। চমৎকার স্বাস্থ্য !'

শেষ কথাটা খট্ করে বাজল কানে। কি বিশ্রী ইঙ্গিত ! লোকটার মন বড্ড নোংরা। পার্ব্বতীকে নিষেধ করে দেব, কাজের সময় যেন আর না আসে। ভূদেববাবুর মত মাংসাশী লোকদের দূরে রাখাই ভালো।

তাঁবুতে এসে চিঠিটা পড়ল।

দাদা, মা'র অসুখ হঠাৎ খুব বেড়েছে। বড় ডাক্তার দেখানো দরকার। তোমার হাতে কি কিছু টাকা আছে ? অন্ততঃ গোটা পঞ্চাশ ? পারলে একবার এস। না এলেও যেমন করে হোক টাকাটা পাঠিও।—

দীপকের পুরনো ঠিকানা হয়ে এসেছে চিঠিটা। তাই আসতে এত দেরি। এর মধ্যে কি হয়েছে কে জানে। অস্থির হয়ে উঠল ও। পঞ্চাশ টাকা এখন আমি কোথায় পাই। মাইনে কবে আসবে ঠিক নেই। হাতে যা ছিল এখানে আসার খরচেই ফুরিয়ে গেছে। আমি এখন কি করি ? সহকর্ম্মীদের কাছে ঘুরল। কিন্তু সবার এক অবস্থা। ভূদেব বাবুর কাছে চাইব ? তাঁর মাইনে বেশি, টাকা থাকা সম্ভব। কিন্তু যেসব লোক, মন চায় না।

অন্ধকার নামছে। আলো জ্বালল না তবু। তাঁবুর ফ্ল্যাপ তুলে দিল। ধানক্ষেতের পিঁড়ি উঁচু হয়ে মিলে গেছে দূরের সঙ্গে। তারও ওপারে ব্লাষ্ট ফারনেস-এর লাল আভা। কিন্তু কিছু ভালো লাগছে না। ও বেরিয়ে পড়ল ক্যাম্প থেকে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে পড়ল ! দপ করে আগুন জ্বলল মাথায়। ভূদেববাবু দাঁড়িয়ে আছেন কড়াইশুঁটি ক্ষেতটার আড়ালে। দু'চোখে লোভী নেকড়ের দৃষ্টি। একটু দূরে চুপ করে গালে হাত দিয়ে বসে আছে পার্ব্বতী। স্পষ্টতঃই ভূদেব বাবুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনবহিত।

কি করব, এগোব ? না থাক, চুপি চুপি বরং সরে পড়ি এখান থেকে। আমাকে দেখলে ভীষণ লজ্জা পাবেন।

দীপক ফিরছিল। ভূদেববাবু চোখ তুললেন হঠাৎ। 'এই যে, এসেছ ? এস, শ্রীমতী প্রতীক্ষমানা।'

দীপক আশ্চর্য্য হল। কোথায় ভূদেববাবু পালাতে পথ পাবেন না, কিন্তু এ যে উল্টে তাকেই আক্রমণ !

'আমি যাই তুমি থাক।' হাসলেন ভূদেববাবু, 'গলাটা ভিজিয়ে আসি একটু। যা ঠাণ্ডা···', বললেন। দু'চোখে লেহন করলেন পার্ব্বতীর সর্ব্বাঙ্গ। তারপর হনহন করে হাঁটা দিলেন ঘুরঘুট্টি শুঁড়িখানার দিকে।

আজও চিঠি এল একটা। বুক ঢিপ ঢিপ করছে ভয়ে। দীপক পড়ল এক নিঃশ্বাসে। মা'র বড্ড বাড়াবাড়ি চলছে। চিকিৎসা প্রায় বন্ধ। দীপক এখনও টাকা পাঠাচ্ছে না কেন ?

কেন পাঠাচ্ছি না ? দীপক মনে মনে বলল, যদি জানত, তাহলে রাগ করত না। ছোট ছেলে, জানে না দাদা কত গরীব। কি ওই বা কি করবে। কার কাছে হাত পাতবে। অথচ আমি যে কার কাছে যাই। অনেক ভাবল। কিন্তু ভেবে থৈ পায় না। শেষে মরিয়া হয়ে ঠিক করল ভূদেববাবুর কাছেই চাইবে।

রাত অনেক হয়েছে। দীপক জেগে বসে ছিল। ভূদেববাবু ফিরলেন। দীপক তখুনি গেল তাঁর কাছে।

'এস দীপক, কি খবর তোমার ?' ভূদেববাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। নেশায় বিভোর। টলছেন। দু'চোখ ঢুলঢুলু।

দীপক সব খুলে বলল। তিনি শুনলেন। দীপকের বলা শেষ হল। তিনি হাসলেন। কণ্ঠ উদাত্ত হল। অর্থের মূল্য সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা ফাঁদলেন। শেষে উপদেশামৃত বর্ষণ করলেন, 'ধার ধার দেওয়া অন্যায়, নেওয়াও। আমার প্রিন্সিপল্ এর বাইরে। সুতরাং—'

অনুনয়ে ভেঙে পড়ল দীপক। 'শুধু ক'টা দিনের জন্য। মাইনে এলেই আমি শোধ করে দেব।'

'শোধ !' আকাশ থেকে পড়লেন যেন। 'ধার যদি না নাও তবে শোধ দিতে যাবে কেন ?'

রাগে সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল যেন। উঃ অসহ্য লোকটার ভাঁড়ামো। আর একটা কথা বললে না ও। দুমদাম করে পা ফেলে বেরিয়ে এল বাইরে।

'শোন, শুনে যাও।' পেছন থেকে ডাকলেন তিনি। দীপক থমকে দাঁড়াল। হয়তো নরম হয়েছেন একটু। মনে একটা ক্ষীণ আশার ঢেউ উঠল। ফ্ল্যাপ ঠেলে ভেতরে ঢুকল। এগিয়ে গেল। গলায় যথাসম্ভব কাতরতা ফোটাল, 'দেখুন, সবার কাছে ঘুরেছি। কোথাও পাইনি'—

'ওসব কথা থাক'—তিনি বললেন। মুখে নেশার চিহ্নই নেই এখন।

'টাকার তোমার খুব প্রয়োজন বুঝতে পারছি। বেশ, আমি দেব। কিন্তু তুমিও আমাকে কিছু দেবে, রাজী আছ ?'

স্থাপত্য (দিলওয়ারা)

—নারায়ণ সাহা

—বিমল হোড়

অপত্য

—এস, এম, হায়দার

অবলোকন

—বেবু দাস

চিত্র-বৈচিত্র্য
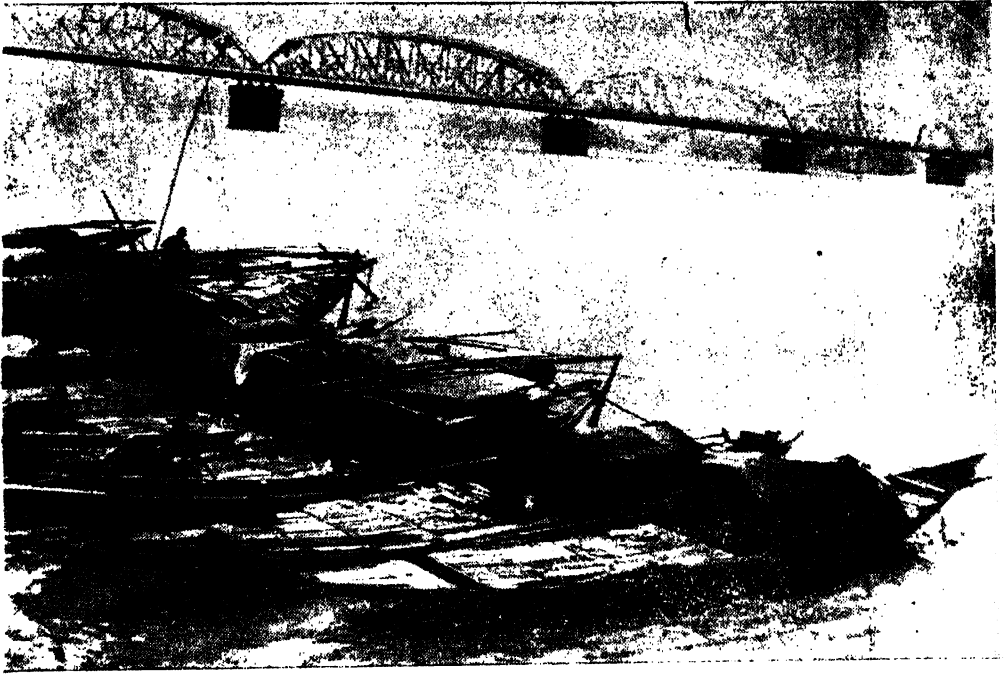
বিবেকানন্দ ব্রীজ —সনৎকুমার রায়চৌধুরী

দুর্গমধ্যে (যোধপুর) —নারায়ণ সাহা

আশ্চর্য্য হল দীপক। 'আমি, আমি কি দেব ?'

ধীরে ধীরে মুখটা কাছে নিয়ে এলেন তিনি। একটা অতিকায় দানবের মত দেখাচ্ছে তাঁকে। ফিস ফিস করে বললেন, 'ঐ মেয়েটা, কি যেন নাম, তাকে এনে দিতে পার ?'

দীপক বিশ্বাস করতে পারছিল না নিজের কান। প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'আপনি—আপনি এ কি বলছেন ?'

'খুব অসঙ্গত কিছু নয়।' ভূদেববাবু স্নিগ্ধ হতে চাইলেন। 'তোমার টাকার দরকার, আমার মেয়ের ! আমার টাকা আছে, তোমার আছে পার্ব্বতী। আমি রাজী, এখন তুমি রাজী হলেই আমরা এগ্রিমেণ্টে আসতে পারি ?'

'নানা এ অসম্ভব।' যেন কেঁদে ফেলবে ও, 'একটা নিষ্পাপ, কিশোরী মেয়ে, তার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আমি কেমন করে এ সর্ব্বনাশ করব—আপনিই বলুন ?'

'তুমি ভেবে দেখ।' তিনি উঠে দাঁড়ালেন। 'পঞ্চাশ নয়, আরও বেশিই দেব। ছুটির ব্যবস্থাও হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। এখানে আর ফিরতেও হবেনা তোমাকে। আর সর্ব্বনাশ কাকে বলছ ? একি তোমার আমার ঘরের মেয়ে। একদিন রাত্রিতে বরং ঘুরে এস ওদের পাড়ায়। কিছুটা অভিজ্ঞতা বাড়বে। হয়তো দেখবে তোমার ঐ পার্ব্বতীও'—

দীপক শুয়ে ছিল। ছটফট করছিল। ঘুম আসছে না। অনেক রাত হল। মাথায় চিন্তার পোকাগুলো কিলবিল করছে। ভেতরে দপ দপ করে আগুন জ্বলছে। মা'র অসুখ···চিঠি···টাকা··· আর ফুলের মত একটি নিষ্পাপ কিশোরী মেয়ে।

আজ আমার শেষ দিন এখানে—সকাল থেকেই মনের মধ্যে গুনগুন করছিল কথাটা। দুপুর এল। উঃ, কি অসহ্য উত্তাপ। রাতের সব তারাগুলো যেন এক একটা সূর্য্য হয়ে উঠেছে। ঝলসে দিচ্ছে বাংলা-বিহার সীমান্তের এই পাথুরে মাটি। দীপক জানে, আজকের বিকেলও তার কাছে এমনি জ্বালাময় হয়ে আসবে।

বেলা পড়ল। দীপক হেঁটে চলল আ'ল-পথ ধরে। লক্ষ্য কড়াইশুঁটি ক্ষেতটা। এখানে ওর অনেকগুলো মধুর সন্ধ্যা কেটেছে।

পার্ব্বতী বসেছিল প্রতীক্ষায়। খুশির ছোঁয়াচ লাগল ওর মুখে। তক্ষুণি আবার অভিমানে রাঙা হল, 'বাবু কাল তু আসিস নাই ক্যানে ?'

কেন আসিনি, কি উত্তর দেব এই কথার। আর কিই বা লাভ হবে তাতে ? অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল,' 'কাজ ছিল।'

পার্ব্বতীর চোখ ছলছল করল। দু'চোখ জলে ভরে উঠল। প্রেমের প্রথম অশ্রু।

দীপক ভাবছিল, কি আশ্চর্য্য, ওর ঐ অমার্জ্জিত দেহেও একটি নারী কি অপূর্ব্ব সুষমায় ফুটে উঠেছে।

অনেকক্ষণ ওরা বসে রইল। চুপচাপ। তারপর হঠাৎ দীপক বলে উঠল, 'পার্ব্বতী, তুই পালাবি আমার সঙ্গে ?'

আঁচল দিয়ে চোখ মুছল ও বললে, 'কুথা ?'

'অনেক দূরে। সেখানে তুই থাকবি আমার সঙ্গে। রাজি ?'

'পালাব।' এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করল না। শুধোল, 'কবে নিবি বল ?'

এত সহজে রাজী হবে, দীপক ভাবেনি। উঠে দাঁড়াল ও, 'আজই রাত্রিবেলা। ক্যাম্পের পেছনে আমি দাঁড়িয়ে থাকব। তুই আসিস কেমন ?'

পার্ব্বতীর দুই চোখ জলজল করছে। কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দিলে, 'আইসব।'

সন্ধ্যা হব হব। দিনের আলো নিভল। ধূপছায়া অন্ধকার নামল শালবনের ফাঁকে ফাঁকে।

দীপক বেরিয়ে পড়ল ক্যাম্প থেকে। সন্তর্পণে। হাতে একটা স্যুটকেস। এদিক-ওদিক তাকাল সন্ধানী চোখে। তারপর হনহন করে হাঁটা দিল। লক্ষ্য হীরাপুর ষ্টেশন। রাতটা আজ ওয়েটিং রুমেই কাটাবে। তারপর কাল ভোরের ট্রেনেই ফিরে যাবে কোলকাতা। সেখানে রুগ্ন মা'র শয্যার পাশে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে তার ছোট ভাই।

কিন্তু পার্ব্বতী ? হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্য থমকে দাঁড়াল দীপক। সেও তো অপেক্ষা করে থাকবে তার প্রথম প্রেমের আনন্দশিহর অনুভূতি বুকে বয়ে—যতক্ষণ না একটা হিংস্র কামনা রাত্রির অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর ? কিন্তু না, ওসব ভাবনা থাক, দীপক জোর করে মনের রাশ টেনে দিল। আর এছাড়া তারও তো কোন উপায় খোলা ছিল না ! পকেটে হাত দিয়ে আর একবার নোটের তাড়াটা অনুভব করল দীপক।

দূরে বার্ণপুর। লৌহনগরীর ব্লাষ্ট ফারনেস রূপের ছটা উড়িয়েছে। আকাশ তাতে লজ্জারুণ। সেদিকে একবার তাকাল দীপক, তারপর পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তাকে এখন এখান থেকে পালাতে হবে।

পকেটমার

সভ্য শান্ত নাগরিক জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল গতিতেই চলে যে অপর একটি জীবন স্রোত, সে জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের। লেখক স্বীয় অভিজ্ঞতা বলে সেই সম্পূর্ণ বিপরীত জীবনধারারই একটি স্পষ্ট ছবি এঁকেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। অপরাধীদের একটা স্বতন্ত্র জগৎ আছে, যার সঙ্গে কর্মসূত্রে লেখকের ঘটেছে এক অন্তরঙ্গ পরিচয়, চোর ডাকাত খুনী পকেটমাররা সেই জগতের মানুষ, তাদের আশা আকাঙ্খার কার্য্য কলাপ সে সবই তো আমাদের প্রচলিত নীতি বোধের বিরোধী, কিন্তু শুধু সেটুকু দেখনোতেই লেখকের বক্তব্য শেষ হয়নি। অপরাধীরাও যে আসলে আমাদেরই মত সাধারণ মানুষ, স্নেহ প্রেম প্রভৃতি স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তিগুলি যে তাদেরও সমভাবেই দোলা দেয়। এই সত্যটাকেই তুলে ধরেছেন তিনি পকেটমার করিম ও বস্তিবাসিনী আমিনার কাহিনীর মাধ্যমে। লেখকের দৃষ্টি অযথা হৃদয়াবেগে আবিল নয়, কিন্তু মানুষকে বিচার করতে বসে ন্যায় অন্যায়ের তুলাদণ্ড টুকুকেই তিনি আঁকড়ে ধরেন নি প্রামাণ্য বলে, আন্তরিক সমবেদনায় তাদের ভাল মন্দ সবটুকুকেই মেনে নিয়েছেন। 'সবার উপর মানুষ সত্য' এটাই তাঁর মূল বক্তব্য। লেখকের ভাষারীতি সামগ্রিক ভাবেই কাহিনীর পরিপূরক, যে জীবনকে পরিস্ফুট করে তুলতে তিনি কলম ধরেছেন তাকে বাস্তবানুগ করার জন্যেই ওই শ্রেণীর ভাষাকে বেছে নিয়েছেন এবং সেজন্যই তাঁর রচনা সত্যনিষ্ঠতায় সার্থক হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। বইটির আঙ্গিক সম্বন্ধেও অনুযোগের কিছু নেই। লেখক—পঞ্চানন ঘোষাল, প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

প্রণব-রহস্য ও যুগ-ধর্ম বা প্রাকৃতিক যোগ-সাধন

আলোচ্য গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু অধ্যাত্মবাদ, ভারতীয় জীবন ও দর্শনে অধ্যাত্মবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী এবং এ বিষয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সংখ্যাও অল্প নয়, সেই হিসাবে এ ধরণের গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তাও আছে। লেখক সহজ বাংলায় বিষয়টি সম্পর্কে এক বিশদ আলোচনা করেছেন, এ সম্বন্ধে দীর্ঘ দিনে তিনি যে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছেন, তাঁর রচনায় তারই ছাপ পড়েছে। ভক্ত ও জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে বর্ত্তমান গ্রন্থটি সমাদর লাভ করবে বলেই আমরা আশা করি। পুস্তকটির ছাপা, বাঁধাই ও অন্যান্য আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন, প্রকাশক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন, ৫৫নং সুবার্বণ স্কুল রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫, মূল্য—দু' টাকা মাত্র।

বিগত বসন্ত

আলোচ্য রচনার মাধ্যমে আজকের মধ্যবিত্ত মেয়েদের জীবনের একটি বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে। ঘরের ছোট গণ্ডীটুকুর মধ্যে জীবন কাটানো আজকের দিনের মেয়েদের পক্ষে আর সম্ভবপর হচ্ছে না প্রধানতঃ সমাজের অর্থ নৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের জন্যই, জীবনের জন্য যত বা নয় জীবিকার জন্যই মেয়েদের বেরুতে হয়েছে, বাইরের জগতের প্রসারিত পরিধির মাঝে। এর ফলে মেয়েরা যে কত রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে বা হতে পারে, বর্ত্তমানে রচনাটি তারই পরিচয়বাহী। লেখিকার কাহিনী গড়ে উঠেছে এই ধরণেরই কয়েকটি মেয়েকে কেন্দ্র করে, তাদের আশা, আকাঙ্খা, সুখ দুঃখ সবই যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কলমের টানে টানে। প্রধানতঃ আন্তরিকতার গুণেই রচনাটি মনে দাগ কাটতে সক্ষম, লেখিকার ভাবরীতি অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ, বক্তব্যকে যা সোজাসুজি প্রকাশ করে। আমরা বইটি পড়ে খুসী হয়েছি। বইটির অঙ্গসজ্জা, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখিকা—সাগরিকা শ্যাম, পরিবেশক—দি নিউ বুক এম্পোরিয়ম, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ মূল্য—দুই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

কালো চোখের তারা

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি রহস্য উপন্যাস। লেখক নবীন হলেও তাঁর রচনাটির কোথাও কাঁচা হাতের ছাপ নেই, যথেষ্ট মুন্সীয়ানার সঙ্গে তিনি কাহিনীটি টেনে নিয়ে গিয়েছেন আগাগোড়া, রোমাঞ্চ কাহিনীর প্রথা অনুযায়ী রহস্য ক্রমেই ঘনতর হয়েছে ও একেবারে সমাপ্তির মুখেই হয়েছে তার রহস্য মোচন। বর্ত্তমান গ্রন্থে লেখক যে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর দিয়েছেন, পরবর্ত্তী কালে তা অধিকতর পরিণতির পথে যাবে বলেই মনে হয়। রহস্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি যে উল্লেখ্য সংযোজন করতে সক্ষম, এ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। গ্রন্থটির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মোটামুটি ভাল। লেখক—কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

গৌড় ও পাণ্ডুয়া

বাংলা দেশের বিস্মৃতপ্রায় দু'টি জনপদ গৌড় ও পাণ্ডুয়া, কালের বিচিত্র খেয়ালে আজকের মানুষের কানে যা অতি সাধারণ দু'টি নাম মাত্র। কিন্তু ইতিহাসের ফেলে আসা দিনগুলির পাতায় খোঁজ করলে এই নাম দু'টিই আর সাধারণ থাকে না, বরং উচ্চারণ মাত্রই হারিয়ে যাওয়া অতীত তার বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য নিয়ে ভেসে ওঠে চোখের সামনে। বাংলার এক গৌরবময় ঐতিহ্যের মূক সাক্ষী হয়ে আজও বর্ত্তমান এই দু'টি জনপদ বাংলার বুকেই। আলোচ্য গ্রন্থে বাংলার এককালীন রাজধানী গৌড় ও পাণ্ডুয়ার গৌরবময় যুগের ঐতিহাসিক পরিচয় দিয়েছেন লেখক। রচনাটি সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান, বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠককে বইটি খুসী করবে বলেই মনে হয়। ইংরাজী ও বাংলা উভয়বিধ ভাষাতেই লিখিত হওয়ায়, অবাঙ্গালী পাঠকের পক্ষেও এর মর্মগ্রহণ করা সম্ভব। আমরা বইটির সাফল্য কামনা করি। ছাপা, বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—শ্রীকালীপদ লাহিড়ী, প্রকাশক—শ্রীকালীপদ লাহিড়ী, পোষ্ট ও জেলা—মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ। মূল্য—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

অঞ্জলি

ভক্তিমূলক কয়েকটি গান যা রচিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও শ্রীসারদাদেবীর উদ্দেশে, একত্র সন্নিবদ্ধ হয়েছে আলোচ্য ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকটিতে। অত্যন্ত সহজ সরল আকারমাত্রিক স্বরলিপি সমেত প্রকাশিত হওয়ায়, প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষেও গানগুলি বিধিমত আয়ত্ত করা আদৌ কঠিন নয়। এতদিন পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু কিছু প্রচার হয়ে থাকলেও, পরমহংসদেব ও জননী সারদামণির সম্পর্কে রচিত গীতগুলির এরকম সুসংবদ্ধ আত্মপ্রকাশ আর হয়নি, সেদিক দিয়ে

দেখলেও গ্রন্থকার সমগ্র ভক্ত-সমাজের ধন্যবাদার্হ। আমরা এই ভক্ত-সঙ্গীত-মালিকাটিকে সাদর অভিনন্দন জানাই। বইখানির আঙ্গিক শোভন। লেখক—শ্রীসতীনাথ চৌধুরী, কথামৃত ভবন, ১৩/২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য—দুই টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

বেগম রিজিয়া

সুলতানা রিজিয়া। ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। রিজিয়া সুলতানা, রিজিয়া সম্রাজ্ঞী, রিজিয়া ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী, কিন্তু সর্বোপরি সে মানবী। তার নারীমন এই জাঁকজমক, আড়ম্বর বিলাসব্যসন চায় নি, চেয়েছিল একটি গৃহকোণ, এক শান্ত শোভন পরিবেশ, আর সুখদুঃখ-ঘাত-প্রতিঘাতের অংশীদার একটি মনের মানুষ। তার জীবনের ইতিবৃত্ত অনুসরণ করলে এই পরম সত্যটিই সন্ধানীর চোখে ধরা পড়ে যায়। এই পটভূমিকে ভিত্তি করে আলোচ্য গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। রিজিয়ার জীবনতৃষ্ণা এবং জীবনের শূন্যতা ও হাহাকারই গ্রন্থের পাতায় স্থান পেয়েছে। সিংহাসনের চেয়ে গৃহকোণই ছিল তার জীবনে অধিকতর কাম্য, সেই সত্যটি লেখকের কাছে অনুদ্‌ঘাটিত নয়, তাই বোধ করি তাঁর গ্রন্থের নামকরণ তিনি "বেগম রিজিয়া"ই করেছেন—সম্রাজ্ঞী বা সুলতানা বিশেষণ সেখানে প্রয়োগ করেন নি। লেখক অমরেন্দ্র দাস ভারত-সম্রাজ্ঞীর জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিকের প্রতি আলোকপাত করে সফলতা অর্জন করেছেন। তাঁর রচনাশৈলী, বর্ণনাভঙ্গী এবং চরিত্র-চিত্রণ প্রশংসার দাবী রাখে। উপন্যাসটির মধ্যে তিনি এক সুগভীর সহানুভূতি ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ভাষা যেমনই বলিষ্ঠ, তেমনই প্রাঞ্জল। বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত সার্থক ইতিহাস-কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির মধ্যে এই গ্রন্থটিকে অন্তর্ভুক্ত করার স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি বিদ্যমান। প্রকাশক—মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা। মূল্য—চার টাকা মাত্র।

কাগজের নৌকা

আলোচ্য বইটি একটি কাব্য-সংকলন। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে যে দুর্বোধ্যতার অখ্যাতি মাঝে মাঝে সোচ্চার হয়ে ওঠে, আলোচ্য কবিতাগুলি তা থেকে বিস্ময়কর রূপেই মুক্ত। কবির স্বচ্ছন্দ মুক্ত মানসটি যেন এদের মাধ্যমে ছোঁয়া যায়। মনে হয় মেঘলা দিনে সত্যই বুঝি তিনি বর্ষার জলে ছোট ছোট কাগজের নৌকা ভাসানোর মতই কথার তৈরী ছোট ছোট ভাবের নৌকা ভাসানোর খেয়াল-খেলায় মেতে উঠেছেন। অথচ এই খেলা সম্পূর্ণ অর্থহীন আনন্দেরও নয়, জীবনের আঁকে-বাঁকে যে সব ছবি নিত্যই ফুটে উঠছে তারই দু' চারটিকে যেন তিনি ধরতে চেয়েছেন এই ছোট ছোট কবিতাগুলির রূপ-রীতির বাঁধনে। জীবন সম্বন্ধে তাঁর বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সুরও এদের অনুরণিত করে তুলেছে সামগ্রিক ভাবেই। কাব্যগ্রন্থটি স্বাদে-গন্ধে সত্যই উপভোগ্য। এর আঙ্গিক শোভন, ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ সাধারণ। লেখক—দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিবেশক—ভারতী লাইব্রেরী, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, মূল্য—দু টাকা।

কেরারী ফৌজ

বাংলার বিপ্লব যুগের এক অধ্যায়ই বর্তমান নাটকখানির মূল উপজীব্য, অগ্নিযুগের সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলি জাতির মর্মমূলে যে কি ধরণের সাড়া জাগিয়েছিল তারই এক পরিচ্ছন্ন ধারণা দিতে প্রয়াসী হয়েছেন নাট্যকার। সেদিনের জীবন হাসি মুখে আত্মাহুতি দিয়েছে, যৌবন চঞ্চল হয়ে উঠেছে অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষায়, এই সত্যটাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন নাট্যকার আলোচ্য নাটকখানির মাধ্যমে, আর সেদিক দিয়ে বিচার করলে একে ঐতিহাসিক বলাই বোধ হয় সমধিক সমুচিত। বাংলার এক যুগসন্ধিক্ষণের পটভূমিতে রচিত নাটকটি নানা কারণেই উল্লেখ্য, নাটকের যা প্রধান সম্পদ সেই প্রাণময়তা এতে পূর্ণরূপেই বর্তমান। গতির দিক থেকেও এর স্বধর্ম যথাযথই বজায় রয়েছে এবং মুখ্যতঃ এই দুটি কারণেই এটি একটি সার্থক নাটক হয়ে উঠতে পেরেছে। নাট্যকারের ভাষা স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, রসগ্রহণে যার আবেদন অনস্বীকার্য্য। এই নাট্যগ্রন্থটির আঙ্গিক সম্বন্ধেও অভিযোগ করার কিছু নেই। লেখক—উৎপল দত্ত, প্রকাশক—গ্রন্থম্‌, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—২'৫০ ন. প.।

ফাল্গুন এলে

কৃতী সোম

অধুনা সুতৃপ্ত আমি। কেননা ফাল্গুন এলো ফিরে
দিবসের রথে চড়ে দ্রুতবেগে ঝড়ের মতন
মদির সঞ্চয় নিয়ে সোনা মেখে প্রমূর্ত শরীরে
অমেয় অঢেল দানে ভরে দিয়ে আকাঙ্ক্ষিত মন।

অনেক ফাল্গুন গেল, ধীরে ধীরে, চূর্ণিত জর্জর
কত ফুল ঝরে গেল, ঝরে গেল স্বপ্নঘন দিন
মিলালো বিবশ ঢেউ, পাখিদের প্রেমার্ত প্রহর
দুঃসহ পিপাসা নিয়ে কেঁদে গেছে হৃদয় রঙীন।

সেদিন এখন শেষ। উবে গেলো মিশকালো রঙ
আমার আকাশ থেকে, আজ শুধু প্রমত্ত মিছিল
ফাল্গুনী রোদের মত গলে গলে যাইনা বরং
শতপুষ্প খুঁজে পাই খুলে দিলে প্রত্যাশার খিল।

অনেক সবুজ মোহে মনের ভ্রমর গুনগুন,

সুপ্রসিদ্ধ হংসেশ্বরী মন্দির

কোথায় বেড়াতে যাবেন ?

সমর চট্টোপাধ্যায়

বংশবাটির বাসুদেব মন্দির

এই প্রশ্নের জবাবে সরাসরি আমি আপনাকে বলবো—চলুন আমাদের বাঙলা দেশের নানান জায়গায় বেড়িয়ে আসি।

এতদিন তো যখনই বেড়াতে যাবার কোন কথা উঠেছে তখুনি আপনি বা আপনার পরিবারের সকলেই প্রায় একবাক্যে বলেছেন—চল যাই মধুপুর, না হয় দেওঘর, নয় কাশী, গয়া, পুরী, রাজগীর, ইত্যাদি; আর বেশী পয়সা থাকলে বলবেন—দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, সিমলা, হরিদ্বার, লছমনঝোলা, কাশ্মীর এমন কি কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত যে কোন স্থান। বেড়াবার জায়গার কি আর শেষ আছে? কিন্তু তবুও মুখ ফুটে কখনও কি একবারও বলেছেন—নাঃ, এবার বাংলাদেশেই বেড়াবো, বাংলাকে দেখবো—বাংলাকে জানবো?

স্বাধীনতা লাভের পর এই দৃষ্টিভঙ্গীই আমাদের হওয়া উচিত ছিল। যদি নিজের দেশকে চিনতেই না পারি, নিজের দেশের মাটির সঙ্গে পরিচিত না হই তাহলে সে স্বাধীনতার সার্থকতা কোথায়?

তাই বলছিলাম, এবার আপনার চোখ ছুটিকে বাংলার বাইরে থেকে বাংলার ঘরের দিকে ফেরান। প্রতি বছরই হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা আমরা দিয়ে আসি অন্য রাজ্যের পকেটে—ভুলে যাই আমাদের রাজ্যের দারিদ্র্যের বাস্তব ও নিষ্ঠুর ছবি। স্বাধীনতার অন্ততঃ ১৫ বছর পর এবার বাংলাদেশের দিকে সত্য সত্য তাকান, বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান আর তীর্থক্ষেত্রগুলো সপরিবারে ঘুরে বেড়ান তাতে মনের ও দেহের খোরাক পাবেন আর আমাদের দেশের গরীব পল্লীবাসীরা আপনার পরোক্ষ কৃপায় নিজেদের একটু সামলে নিতে পারবেন।

প্রথমেই কোথায় যাবেন সেটা আপনিই ঠিক করুন। তবে আমি বলবো কাছাকাছি জায়গাগুলো আগে সারুন। দক্ষিণেশ্বর, তারকেশ্বর—এ সব তীর্থক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আপনি গিয়েছেন, কাজেই ওগুলো এখন থাক। একটু গ্রামের দিকে পা বাড়ান।

কোলকাতার কাছেই আসুন না আজ বাঁশবেড়িয়ায় যাই—মাত্র ৩০ মাইল রাস্তা। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে নেমেও যেতে পারেন—তা না হলে সরাসরি বাঁশবেড়িয়া ষ্টেশনে নামুন। ঐ যে দেখছেন মন্দিরের চূড়াটি—ঐটি সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক হংসেশ্বরী দেবীর তের চূড়ার মন্দির। বাঁশবেড়ে বা বংশবাটির পূর্ব্ব ইতিহাস নিশ্চয়ই আপনার কিছু কিছু জানা আছে। মোগল সম্রাট শাহজাহানের আমলে বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রাঘব রায় এই নগর পত্তন করেন। বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের সঙ্গে এই নগরের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানকার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ দেবাদিত্য দত্ত বঙ্গদেশের রাজা বল্লাল সেনের সমসাময়িক ছিলেন। রাজা রাঘবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা রামেশ্বর নানা দেশ থেকে ৩৬০ ঘর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি হিন্দুদের নিয়ে এসে এই বাঁশবেড়িয়ায় বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। তিনি ৪১টি টোলও খুলে দেন এবং এই সব টোলে কাশী, মিথিলা প্রভৃতি ধর্ম্মস্থান থেকে অধ্যাপক এনে ছাত্রদের স্মৃতি, শ্রুতি, বেদান্ত, ন্যায়, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র—শেখবার উপায় করে দেন। রাজা রামেশ্বর বাঁশবেড়িয়া রাজপ্রাসাদের চারদিকে একটা পরিখা কেটে রাজপ্রাসাদকে বর্গীদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করেন।

আসুন, আগে বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দিরটি দেখে যাই। রাজা রামেশ্বরই এই মন্দিরটি স্থাপন করেন। এই মন্দিরটি ইটের তৈরী—মন্দিরের গায়ে সূক্ষ্ম কাজগুলি লক্ষ্য করুন। ইটের উপর পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি ও কাহিনী কি সুন্দরভাবেই না লিপিবদ্ধ রয়েছে। ২৮৩ বছর আগে তৈরী এই মন্দিরের পোড়ামাটির কারুকার্য্যের নিদর্শন বাংলা দেশে আর কোথাও বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এইবার আসুন হংসেশ্বরী মন্দিরে যাই। রাজা নৃসিংহদেবের পত্নী রাণী শঙ্করী ১৮১৪ সালে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ মন্দিরের ইতিহাস

তো অনেক শুনেছেন, তবু যদি সংক্ষেপে কিছু জানতে চান মন্দিরের বর্তমান সেবাইত রাজা মানবেন্দু দেবরায়ের কাছে শুনতে পাবেন।

ইতিহাসে একথাও শোনা যায় রাজা নৃসিংহদেবেই স্বয়ং ১৭৯১ সালে কাশী থেকে ফিরে হংসেশ্বরী মন্দির পত্তন করেন। মন্দিরের ভিতের গাথা সবে শেষ হয়েছে ১৮০২ সালে তখন রাজা নৃসিংহ দেবের মৃত্যু হয়। স্বামীর অসমাপ্ত কাজ রাণী শঙ্করী গ্রহণ করেন। মন্দির নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করতে ১২ বছর সময় লাগে। প্রায় ৫ লক্ষ টাকা এই মন্দির নির্মাণে খরচ হয়েছে। একটি ত্রিকোণ যন্ত্রের উপর দেবাদিদেব শায়িত; তাঁর নাভিকুণ্ড থেকে যে পদ্ম প্রস্ফুটিত দাক্ষময়ী শক্তি কুলকুণ্ডলিনীর দেবীমূর্তি হংসেশ্বরী তার ওপর বিরাজমানা। প্রকাশরূপে এই হংসেশ্বরী মন্দির নির্মিত। আমাদের শরীরে যেমন ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বজ্রাক্ষ ও চিত্রিনী নামে পাঁচটি নাড়ি আছে এই মন্দিরের সিঁড়িগুলি ঠিক সেই ধাঁচে তৈরী। সিঁড়িগুলি অবশ্য এখন অনেক ভেঙ্গে গিয়েছে এবং শেষ চূড়ায় ওঠাও অসুবিধাজনক। শুধু সিঁড়িগুলি নয় সারা মন্দিরটিও সংস্কার করা দরকার। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের উদ্যোগী হওয়া উচিত। মন্দিরে নিয়মিতভাবে পূজা পাঠ ও ভোগ হয়ে থাকে; ভোগ বিতরণও করা হয়। দূরদূরান্ত থেকে বহু ভক্তিপ্রাণ নরনারী এই মন্দির ও মূর্তি দর্শনে আসেন।

হংসেশ্বরী দর্শন করে ফেরার পথে ত্রিবেণী হয়ে যান। ত্রিবেণীর ইতিহাস বিরাট সংক্ষেপে তা বর্ণনা চলে না। ইতিহাসের যে সব নিদর্শন এখনও এখানে আছে তাই থেকে এটুকু বলা যায় ত্রিবেণী ছিল বাংলাদেশের বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু ও সকল সম্প্রদায়ের অন্যতম তীর্থস্থান। হিন্দু দেবালয়ের মত বৌদ্ধ জৈন মন্দিরও এখানে ছিল। ত্রিবেণী মানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থানে এই ঘাটের পাশে, ছোট ছোট মন্দিরগুলিতে যে গণেশ মূর্তি, ব্রহ্মামূর্তি, হরগৌরী মূর্তি ও গঙ্গা মূর্তি রয়েছে এগুলি সব প্রাচীন, অটুট অবস্থায় এগুলি পাওয়া গেছে। ইতিহাস বলে—এগুলি সেন আমলের মূর্তি—দ্বাদশ শতাব্দীর বেশী প্রাচীন নয়। গঙ্গার তীরে উঁচু স্তূপের ওপর মসজিদটিই হ'ল জাফর খাঁর। সাতটি গম্বুজ বিশিষ্ট ঐ মসজিদের তলায় সমাধিস্থ আছেন জাফর খাঁ, তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ। পশ্চিম দিকের অংশটিতে বড় খাঁ গাজি ও তাঁর পুত্রদের সমাধি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মসজিদে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে প্রায় সবই হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন। মসজিদের চারটি দ্বারেই হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন দরজায় ছোট ছোট মন্দিরে খোদাই করা দেবী মূর্তি, তার পাশে যক্ষ মূর্তি। বাইরে আস্তানায় দেওয়ালে সারি সারি বিষ্ণু মূর্তি, নবগ্রহ মূর্তি। এই থেকেই ঐতিহাসিকদের ধারণা জাফর খাঁর এই আস্তানাটি একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দির। মন্দিরের গায়ে যে লিপিগুলি রয়েছে তা পড়ে ঐতিহাসিকরা এই ত্রিবেণীর ইতিহাসের সন্ধান পেয়েছেন। ঐতিহাসিকরা বলেন জাফর খাঁর আস্তানাটি এক প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির।

এখন ত্রিবেণীর ঘাটের কাছে যে সব দেবালয় গড়ে উঠেছে এগুলি হাল আমলের এবং খুবই সাধারণ। বিষ্ণুমন্দিরের স্থায় বড় বড় মন্দিরগুলি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এবং সেখানে জাফর খাঁর সমাধি মসজিদ নির্মিত হবার পর মুসলমানদের তীর্থ ক্ষেত্র হওয়ায় আর কোন রাজা বা মহারাজা সেখানে ভাল মন্দির আর নির্মাণ করেন নি।

[আগামী সংখ্যায় বীরভূমে চলুন।
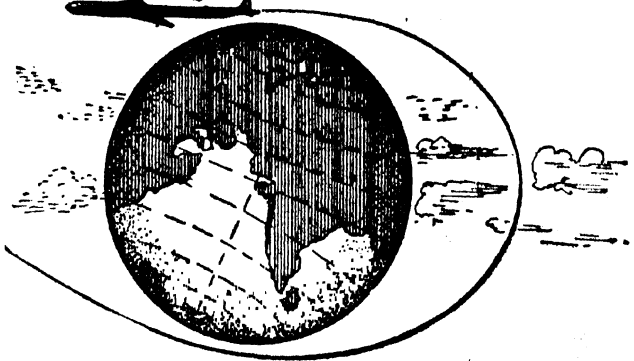
হীরের ফুল

নীলিমা মুখোপাধ্যায়
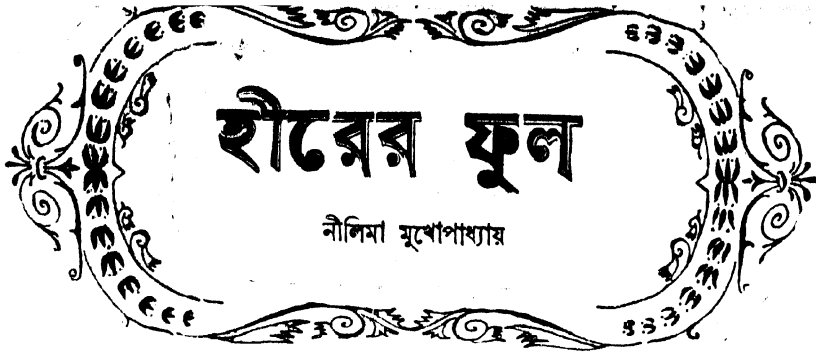
ঘড়ির কাঁটা আস্তে আস্তে এগিয়ে এল রাত পেরিয়ে আসার প্রান্ত সীমায়—আর দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এল প্যাকেটের শেষ সিগারেটটাও—শুধু অবোধ অবাধ্য ঘুমই এল না কিছুতে। অর্দ্ধেক হয়ে আসা সিগারেটটা ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দেয় শিবতোষ। ছাইদানে স্তূপীকৃত হয়ে আছে শেষ হয়ে যাওয়া আধপোড়া সিগারেটের টুকরো আর ছাইয়ের রাশি।

'শুধু যদি গৌরী হীরের ফুল দুটো না পরত।' চাদরটা বুক পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শোয় শিবতোষ। ঘুমুতে একটু যে হবেই। জীবনের কি বিচিত্র খেলা! চোখ দুটি বন্ধ রেখেই অল্প অল্প হাসে শিবতোষ। এই তো সেদিন। পরীক্ষার আগে রাত জাগতে গিয়ে হিমসিম খাওয়া দিনগুলো তো এখনও ভাসছে চোখের ওপর। পরীক্ষা আর ফাঁকি হাত ধরে পাশাপাশি চলন্ত সে জীবনে। আর সেই ফাঁকির ফাঁক মেটাতে গিয়ে পরীক্ষার আগে ঘুমকে বিদায় দিতে গিয়ে কি উত্তেজনায় কাটত রাতের পর রাত! আর আজ? কত অল্প সময়ের ব্যবধানে ঝিমিয়ে পড়ছে জীবন।

গভীর নিশ্চিন্ততায় পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে গৌরী। ওর দিকে পাশ ফিরে না চেয়েও সে কথা জানে শিবতোষ। ওর বড় বড় নিঃশ্বাসের ওঠাপড়ায় আর এলায়িত শ্লথ দেহ-ভঙ্গিমায় অদ্ভুত মায়া সৃষ্টি করে তুলেছে রাত্রির অন্ধকারে। কিন্তু সত্যিই কি এত নিশ্চিন্ত হয়ে আজও ঘুমচ্ছে গৌরী? চোখ বন্ধ করেই আবার ভাবতে চেষ্টা করে শিবতোষ। কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার জন্যেই তো এত চেষ্টার পর তার জীবনে এসেছিল গৌরী—নিশ্চিন্ত হতে তো চেয়েছিল শিবতোষও।

'বিয়ে যদি করতেই হয়, তাহলে সত্যিকার সুন্দরী বউ চাই।'—বিয়ের কথায় অনেক আলোচনার শেষে শেষ মন্তব্য করেছিল শিবতোষ।

'সত্যিকার সুন্দর বউ! অত সুন্দর বউ নিয়ে কি করবে দাদা?' চোখে-মুখে বিদ্যুৎ ঝলকিয়ে হেসে বলেছিল ছোট বোন সুজাতা।

'বউ সুন্দরী না হলে স্বপ্ন জমে না।'

'স্বপ্ন! বিয়ে করে জীবনটাকে শুধু বুঝি স্বপ্ন করে তুলবে ভেবে রেখেছ দাদা? বিয়ে করার পরের দিন থেকেই কাজ দেখতে দেখতে আমরা তো চোখে-কানে অন্য কিছু আর দেখতেই পাইনি। স্বপ্ন দেখার আর সময় আছে নাকি এরপরও?'

কিন্তু সত্যিকারের সুন্দরী বউ শিবতোষের চাই-ই। সংসারের কাজের মধ্যে আছে শ্রী, কিন্তু সে কাজের মধ্যে নেই সৌন্দর্য্যের ছাপ। 'শুধু কাজ আর কাজ করে তোরা সব এক একটা জলজ্যান্ত 'মেশিন' হয়ে উঠেছিস। আমি যাকে বিয়ে করব সে হবে আমার সহচরী—সত্যিকার সঙ্গিনী।' আবেশে ভ'রে ওঠা চোখে কল্পনার জাল বোনে শিবতোষ। 'সারাদিন বুকভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ক্লান্ত দিনের শেষে যখন ঘরে ফিরে আসব তখন ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ক্লান্ত কপাল থেকে কয়েক গোছা চুল সরিয়ে দিতে দিতে সেও এসে বসবে আমার পাশে। সমব্যথায় গভীর হয়ে শুধু দু'জনকে জড়িয়ে থাকবে কতকগুলি ঘনীভূত অখণ্ড মুহূর্ত্ত। সব কাজ শেষ হওয়া দিনের শেষে সে শুধু আমার—উৎকণ্ঠ নয়নে ব্যগ্র প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকা আমারই প্রেয়সী।' অনেকখানি কথা একসঙ্গে বলে এতক্ষণে চোখ তুলে চায় শিবতোষ। অনেকখানি কল্পনার জাল বোনা হল—অনেকটা স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্ন কি সত্যিই সফল হয়ে উঠবে কোনদিন? আচ্ছা, সে দেখতে কেমন হবে? মদালস তন্দ্রালুতায় আবার স্বপ্নময় হয়ে ওঠে মনের মণিকোঠা। কচি শ্যামল ধানের শীষের মতন ছিপছিপে সজীবতা। কপালের ওপর থেকে উলটিয়ে নেওয়া চুলের রাশি গভীর আলস্যে এলিয়ে থাকবে অবিন্যস্ত ভাঙ্গা ভাঙ্গা বেণীবন্ধনে। চিকণ গলায় চিকচিকে একটু সোনার আভাস। কানে পাতলা দুটি হীরের ফুল। হ্যাঁ, হীরে দিয়েই শিবতোষ গড়িয়ে দেবে তার কর্ণাভরণ। ঐ চিকণ সবুজ দেহে ঝকঝকে হীরের দ্যুতি ছাড়া এই মুহূর্ত্তে আর কিছু ভাবতেই পারে না শিবতোষ। পরনের ধানী রঙের শাড়ীখানি কি মিশে থাকবে তার তন্বী দেহখানির বাঁকে বাঁকে। তারপর···কল্পনার রঙিন পাখা যেন আর কূলের সীমা খুঁজে পায় না। এই তার স্ত্রী—তার স্বপ্ন—মনোহারিণী, স্বপনচারিণী। গভীর আবেগে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে শিবতোষের। এত সুর আছে পৃথিবীতে, এত গান! ভাবনায়—শুধু একটু কল্পনায় এত আনন্দ—এত নেশা! ভাবতে পারে না শিবতোষ।

বউ এল। সুন্দরী বউ। শুভদৃষ্টির প্রথম লগ্নে কিন্তু প্রথম চমকালো শিবতোষ। এ ত সেই ছিপছিপে ধানের শীষে ঘেরা সবুজের রং মেশা স্বপ্ন নয়। সুন্দরী বউ চেয়েছিল শিবতোষ। তাই প্রাণপণ শক্তিতে উঠে-পড়ে চারদিকে চারশ' লোক ছুটিয়ে সুন্দরী মেয়েই তো আনা হয়েছে তার জন্যে। সুন্দরী বটে। স্তব্ধ বিস্ময়ে নববধূর দিকে চেয়ে থাকে শিবতোষ। এত রং কি থাকে মানুষের শরীরে! নিটোল দুটি বাহুতে, রাঙা ওড়নার ফাঁকে একটুখানি আভাস দেওয়া গলার একটু অংশে আর অনুপম ছন্দময় সলজ্জ একটু গ্রীবাভঙ্গিতে শত শত বিদ্যুতের রোশনাই যেন ঝিকমিক করে ভেঙ্গে পড়ছে শতখান হয়ে। আগুন রঙ এর বেনারসীর ফাঁকে ফাঁকে ঝিলিক তুলেছে শহরের শ্রেষ্ঠ কারিগরের তিল তিল পরিশ্রমের সার্থক স্বপ্ন। এত সোনা কি পরতে পারে একটা মানুষ! কাজল আর কুমকুম, আলতা আর চন্দন—বর্ণগন্ধের সীমাহীন এমন সমারোহ! শুধু

আস্তে আলতোভাবে চোখ নামিয়ে নেয় শিবতোষ। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসা বুকে অল্প একটু বাতাস টেনে নেয় আরো আস্তে করে।

বউ দেখে কিন্তু হৈ-হৈ করে ওঠে বন্ধুদল। 'ভাগ্য করে জন্মেছিলি বটে বাবা,' 'সুন্দর বউ' চেয়েছিলি বলে কি তোর জন্যে 'স্পেশাল ব্র্যাণ্ড অর্ডার' দেওয়া হয়েছিল রে!' 'আনন্দ করে একপেট খেতে এসে যে একবুক হিংসে নিয়ে বাড়ী ফিরলাম হে।' বিভিন্ন-ভাবে বিভিন্ন ধারায় ছড়িয়ে পড়ে শুধু প্রশংসা আর প্রশংসা।

'কিগো ভীষ্মদেব, প্রতিজ্ঞা সফল হয়েছে তো এতদিনে? দেখো বাপু, সুন্দরী বউ-এর মুখখানির দিকে চেয়ে চেয়েই শুধু দিন কাটিয়ে দিও না যেন তাই বলে।' কোমরে কাপড় জড়িয়ে হিমসিমে কাজে ঘামতে ঘামতেও টিপ্পনি কাটতে ছাড়ে না সুজাতা।

কিন্তু দিন কাটতে থাকে। সুন্দরী বউএর মুখের দিকে চেয়ে চেয়েই নয়—দিনের মুখ চেয়েই দিন কাটে। দিনের সূর্য্য বেলাশেষের শেষ প্রান্তে হেলে পড়ারও অনেক পরে বাড়ী ফেরে নৈমিত্তিকতার রুটিনে বাঁধা শিবতোষ। নিজের হাতে রোজ চা নিয়ে আসে গৌরী। তার আগে আলনা থেকে তুলে আনে ভাঁজ করা লুঙ্গি-গেঞ্জি।

'কি একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লে যে! হাত-মুখ ধোবে না?' হাতে নেওয়া সাবান-তোয়ালে শিবতোষের হাতে তুলে দিতে দিতে প্রশ্ন করে।

গভীর আলস্যে আড়মোড়া ভাঙ্গে শিবতোষ। সন্ধ্যা তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে. কিন্তু সব কাজ ভোলা দিনের শেষে প্রতীক্ষায় কাঁপা দুটি কাজল-কালো চোখ উৎকণ্ঠ আবেগে এতক্ষণ কি জেগেছিল শুধু তারই পথ চেয়ে? অদ্ভুত এক ভয়ে মিষ্টি একটু হাসিতে ঝিকমিকিয়ে ওঠা সমুদ্রের মতন অতল গভীর দুটি চোখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারে না শিবতোষ। কি ছবি সেখানে লেখা আছে—কি ছবি? একটু আশা, একটু উৎকণ্ঠা, একটু অভিমান।

'আমি খুলে দেব জুতোটা?' নীচু হয়ে সামনের দিকে দুপা এগিয়ে আসে গৌরী।

'না-না-না। তুমি জুতো খুলবে কেন?' তড়িৎস্পৃষ্টের মতন চমকে সোজা হয়ে ওঠে শিবতোষ। আর এতক্ষণ পরে ওর শাঁখ-সাদা চাঁপার কলির মতন আঙুলগুলোর দিকে চোখ দুটি থেমে থাকে শুধু। অনেকগুলো আংটি পরেছে গৌরী। কিন্তু তার জন্যে নয়। ওর কানে মস্ত বড় দুটি হীরে ইলেক্‌ট্রিকের কড়া আলোয় নানা রঙের ঝিলিক তুলে যে আবেশ ছড়িয়ে দিচ্ছে সেই দিকে শুধু চোখ মেলে থাকতে পারে না শিবতোষ। পাশে গাঁথা দুটো লাল পাথর। চুণী হবে হয়ত। রঙ মেশাতে জানে বটে মেয়ে। কোন্‌খানে কোন্ রঙটি মানায়, টনটনে জ্ঞান।

'আচ্ছা, প্রথম মুহূর্ত্তে আমাকে দেখে তোমার কি মনে হয়েছিল গৌরী?' টুকটুকে লাল পাথর দুটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ প্রশ্ন করে শিবতোষ।

'কথাটা এই নিয়ে ক'বার হল?' অল্প একটু হেসে উত্তর দেয় গৌরী।

কই কোনদিনই তো এ কথার উত্তর তুমি দাওনি।'

'অর্থহীন কতগুলো শব্দ সমষ্টির উত্তর দিতে যায় কোন্ পাগলে?' তেমনি হাসিভরা মুখে হয়ত কৌতুক করে গৌরী।

'তুমি বার বার শুধুই আমার কথা এড়িয়ে যাও গৌরী।' হঠাৎ অদ্ভুতভাবে গম্ভীর হয়ে ওঠে শিবতোষের কণ্ঠস্বর। সামান্য একটু বিষাদের ছোঁয়াও বুঝি লাগে তাতে।

'কি মুস্কিল!' দু' আঙুলের ছোট খানিকটা কপাল কুটিল হয়ে ওঠে অনেকগুলি ছোট ছোট রেখার ভঙ্গিমায়। 'নিজের স্বামীকে আবার ভালো লাগে না কোন্ মেয়ের বল ত? সে প্রথম দেখাই হোক আর যাই হোক। রোজ রোজ কেন তুমি এ কথাই বল বার বার?' কথা বলতে বলতে কুপিত কটাক্ষে ঘর ছেড়ে চলে যায় গৌরী।

গভীর আলস্যে কেদারায় গা এলিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে শিবতোষ। পাশে আস্তে আস্তে হিম হতে থাকে গৌরীর রেখে যাওয়া চায়ের কাপ। আর আলতো পায়ে খুব আস্তে পাশে এসে বসে ধানের শীষের মতন ছিপছিপে সবুজ একটি মেয়ে। পাখীর পালকের মতন হালকা একটা আঙুলের ডগা দিয়ে ক্লান্ত কপাল ছোঁয়া কয়েক গোছা চুল সরিয়ে দিতে দিতে কাছে—আরো কাছে সরে এসে ঘনিয়ে আসে একেবারে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলা বুকের কাছটি ঘেঁসে। আবছা হয়ে আসা সন্ধ্যার রক্তিম আভায় ঝকঝকে দ্যুতিতে হাসতে থাকে দু'কানে জলজলে পাতলা দুটি হীরের ফুল। তন্বী দেহখানির বাঁকে বাঁকে মিশে যাওয়া ধানী রঙের শাড়ীখানি। চমকে উঠে বসে শিবতোষ। ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি সে এতটুকু সময়ের মধ্যে!

ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে যায় গৌরী। বুকের ভেতরটা শিরশির করে ওঠে ঠাণ্ডা হিম-জামানো একটা শীতশীতে ভাবে। এ কেমন মানুষ! আজ ক'মাস বিয়ে হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কিছুতেই যেন এই মানুষটির তল খুঁজে পায় না গৌরী। কি চায় মানুষটা? কেন স্পষ্ট করে বলে না সব কিছু? সে যা দিতে পারে—যতটুকু তার দেবার আছে সবটুকু তো নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার জন্যে উৎকণ্ঠ হয়ে জেগে আছে দিনরাত। তবুও কেন কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দেয় না সে? নিঃশঙ্ক আবেগে কাছে টেনে নেয় না নিবিড় করে?

'আচ্ছা, আমাকে কি তোমার ঠিক পছন্দ হয়নি?' রাত্রে অনেক দিনকার জমে থাকা কথাটা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলে গৌরী।

চমকে উঠে বসে শিবতোষ। 'কেন এ কথা বলছ গৌরী?'

'আমি যদি দেখতে খুব খারাপ হই'···এতক্ষণে বন্যার মতন নেমে আসে প্রাণপণে আগল দেওয়া জলের ধারা।

'না-না! তা ঠিক নয় গৌরী।' নিবিড় মমতায় আস্তে আস্তে ওকে কাছে টেনে নিতে নিতে বলে শিবতোষ।

'তবে কি, তবে কি?' ওরই বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে গৌরী। নিঃশব্দে ওর মাথায় খুব আস্তে হাত বোলায় শিবতোষ। নিজের নির্মমতায় ক্ষমা করতে পারে না নিজেকেই। ভালবাসে তো সে গৌরীকে। গভীরভাবেই ভালবাসে। নিজের মনের অতলে খুঁজে দেখেও এর বিরুদ্ধে তো সে খুঁজে পায় না একটি কথাও। শুধু যদি সবচেয়ে ক্লান্ত মুহূর্তে সেই ধানের শীষ রঙের মেয়েটি বার বার এসে সব কিছু ভুলিয়ে না দিত। কাঁদছে গৌরী। কিন্তু সব কিছু নিশ্চিহ্ন করে ভুলতে পারত সে। ওর ঐ কান্নাভাঙা দেহের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবে শিবতোষ—শুধু যদি এত সুন্দর আর এত শাঁখ-সাদা গৌরী বার বার ঝিলিক-তোলা ঐ ঝকঝকে হীরের ফুল দুটি আর না পরত।

আধুনিকা

শ্রীসলিল বসু

নাম তার কল্পনা,
করে নাক পড়াশুনা।
করে নাক কোন কাজ,
প্রজাপতি সম সাজ।
ব্যাগ ঝোলে কাঁধে তার,
ফ্যাসনের অবতার।
থিয়েটার, সিনেমার,
ট্যাবল কি জলসার,
মাঠে, ঘাটে, হাটে বাটে,
টো টো করে দিন কাটে।
লিপ্‌ষ্টিকে রাঙা ঠোঁট,
গায়ে দিয়ে সর্ট কোট
চলে যেন ঝোড়ো হাওয়া,
দরকারে তারে পাওয়া
অসম্ভব একেবারে,
আধুনিকা বলে তারে।

আক্ষেপ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পোড়া এ মাটির বুকে
আর যা ছড়াতে চাও দাও—
কবিতা দিও না।
এ মাটির রুক্ষ দেহে
স্নেহের স্পর্শ আর কেঁদে কেঁদে ছড়িয়ে দিও না।
তোমার সুরের তানে যতটুকু রস আছে
ওর তৃষ্ণা তারও বহু বেশী;
বুভুক্ষু কালের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা
শুষে নেবে মুহূর্তের স্বপ্নের স্পন্দন।
তোমার বুকের রসে ওর তৃষ্ণা আরও—
আরও যাবে দাবানল হ'য়ে।

তাই বলি, কবি ওগো,
আগামী দিনের কবি ভাই,
আর যা ছড়াতে চাও দাও—
পোড়া এ মাটির বুকে
কবিতা দিও না।

ধারাবাহিক আত্ম-জীবনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পরিমল গোস্বামী

(৭)

গঙ্গায় এক পয়সা ঃ গঙ্গার পাড়ে তৃণশয্যা

বিজয়দা এক রকম জোর করেই আমাকে রাত দশটার গাড়িতে শিয়ালদহের পথে ভাগলপুরে নিয়ে চললেন। গায়ে সামান্য উত্তাপ লেগেই ছিল। আগে এ রকম হয়েছে অনেক বার। প্রথমে সর্দি দিয়ে আরম্ভ, তারপর কয়েকদিন শুইয়ে রাখা। অথচ শুয়ে থাকা আমার আদৌ ভাল লাগে না। অফিসে যাওয়াটা এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলতে আরম্ভ করলেই মন ছট্‌ফট্ করতে থাকে। সেজন্য অনেক সময়েই চিকিৎসকের উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে তপ্ত দেহকেই অফিসে নিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছি। এ তাপ ঘরে শুয়ে শুয়ে অনুতাপের চেয়ে ভাল। অথচ আশ্চর্য এই, রবিবারে ঘরে থাকতে কোনো অসুবিধা বোধ করি না। সেই নির্বাসিত লোকটার ঠিক বিপরীত। ছোট্ট দ্বীপে কৌটায় রক্ষিত খাদ্য সহ লোকটা বহুদিন একা কাটাচ্ছে। চেহারা দেখে, অন্ততঃ মুখের দাড়ি দেখে, মনে হয় মাস দুই তো হবেই। এমন সময় একটি লোক জাহাজডুবি হয়ে ভাসতে ভাসতে সেখানে এসে হাঁটু জলে দাঁড়িয়েই নির্বাসিত লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, "দাদা, দ্বীপটি বাস করবার পক্ষে কেমন ?" দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে নির্বাসিত লোকটি বলল, "মন্দ নয়, কিন্তু ভাই, রবিবারে বড্ড একা বোধ হয়।"

আমার এর ঠিক উল্টো। আমার রবিবার ভিন্ন অন্য দিন শুয়ে থাকতে কষ্ট বোধ হয়, বড্ড একা-একা লাগে। তাই মনে হ'ল, শুতেই যদি হয়, ভাগলপুরে গঙ্গার পাড়ে শুয়ে থাকাটা মন্দ লাগবে না। অনেকখানি বৈচিত্র্য উপভোগ করা যাবে। আরও একটা অতিরিক্ত সুবিধার কথা মনে হল। মানে, ঐখানেই যদি সব শেষ হয়ে যায়, তা' হলে অন্য কারো বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে না। শ্মশান খুবই কাছে।

ভাগলপুরে আমার সে অবস্থায় একমাত্র ভয় বলাইচাঁদকে। অর্থাৎ ডাক্তাররূপী বলাইচাঁদকে। দেখা হলে সকল নিয়ম উলটে যাবে, খাওয়ার এবং বিরামের। আধুনিক চিকিৎসায় যে-কোনো জ্বরে প্রাচীন কালের মতো উপবাসের ব্যবস্থা নেই, অর্থাৎ ভাত খাওয়া নিষেধ নেই। সব রকম জ্বরের শত্রু হচ্ছে ভাত, এ রকম ধারণা যে যুগে ছিল সে যুগের অভিজ্ঞতা আমার আছে। এ যুগের জ্বরে তাই ভাত মস্ত বড় মুক্তি। আমার পক্ষে সেটি বড় কথা। এখন আর চুরি করে খাওয়ার দরকার হয় না। আর সেজন্য বিদেশে গেলেও অন্যের অসুবিধা ঘটে না পৃথক ব্যবস্থার জন্য। কিন্তু তবু বলাইচাঁদ সুখে হোক বা অসুখে হোক, খাওয়া ব্যাপারে একেবারে কালাপাহাড়। প্রাচীন পথ্য-দেবতার যাবতীয় মন্দির চূর্ণ করে মুদ্গর হাতে বসে আছে সে। তার কাছে গেলে যেমন তার আদর্শে খেতে হবে (তার প্রধান খাদ্য প্রচুর মাংস প্রতিদিন, এবং আরও মাংস এবং আরও), তেমনি সে আমাকে শুয়ে থাকতেও দেবে না। আর ঠিক এই ভয়েই বিজয়দাকে শপথ করিয়ে নিয়েছিলাম: দিন সাতেক অন্ততঃ আমার ভাগলপুরে আসার খবর যেন প্রচার না হয়।

ইণ্টার ক্লাসের টিকিট ছিল। আশ্চর্য ব্যাপার যে বাংকের উপরে আধখানা স্থান খালি পাওয়া গেল। সেইখানে বিছানা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারও বিস্তার করলাম। নীচের আসনেও খুব ভিড় হল না। আমার মনে হয়, গাড়িখানা ইঞ্জিনের কাছে বলেই অনেকে হয় তো এদিকে আসে নি। এরা দুঃখবাদীর দল।

গাড়ি ছাড়ল নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক পাঁচ মিনিট পরে। আমি নেমে পড়লাম উপর থেকে। মনে তখন এক নতুন উত্তেজনা। এতদিন 'এক চাকাতেই বাঁধা' ছিলাম, এবারে এক শ' চাকার উপরে পেলাম সেই বাঁধন থেকে মুক্তি। দীর্ঘ দুই বছর পরে।

বিজয়দার পাশে এসে বসলাম। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। ব'সে ব'সে ঘুমনো তাঁর পক্ষে খুবই সহজ, এবং গাড়িতে উঠেই ঘুম, এই দু'টি তুচ্ছ জিনিসকেও সেদিন কত ভাল লাগল। কিন্তু পরে জেনেছি, তাঁর ঘুম খুব তুচ্ছ জিনিস নয়। রেলগাড়িতে এ বিষয়ে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা এটা। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ লাভ হয়েছে ভাগলপুর থেকে ফেরবার মুখে। শেষ অভিজ্ঞতাটা তুলনাহীন। সে কথা পরে বলছি।

গাড়ির মধ্যে আমি উপর থেকে নেমে যে আসনটিতে এসে বসলাম, সেখানে আমার পাশে একটি যুবক বসেছিল। দেখলাম, সেও নিদ্রাসিদ্ধ। গাড়ি কিছুদূর যেতেই সে পকেটে (নিজের পকেটেই !) হাত দিল এবং একটি পয়সা বা'র ক'রে হাতের মুঠোয় রাখল। তার পর আমাকে বলল, সে এখন ঘুমোচ্ছে, দক্ষিণেশ্বর ব্রিজের কাছে এলে তাকে যেন আমি জাগিয়ে দিই।

জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল, সে গঙ্গা পার হবার সময় একটা পয়সা জলে ফেলবে।

এ বয়সের এক তরুণ যুবক পয়সা গঙ্গায় ফেলবে, এই ব্যাপারটায় বেশ কৌতূহল জাগল আমার মনে। এ রকম পয়সা ফেলার কাজ আমার কল্পনায় বয়স্ক ধর্মপ্রাণেরাই করে থাকেন, এ বয়সে কেউ করতে পারে, এমন ধারণা আমার ছিল না। অতএব এ নিয়ে তার সঙ্গে আমার কিছু প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হল। ফলে আমি আমার দৌর্বল্য ভুললাম, এবং সে তার নিদ্রা ভুলল। আমার তর্কের মাঝখানে সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ সে আমাকে অতি উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করতে লাগল। জলে একটা পয়সা ফেলা মানে সে পয়সাটা নষ্ট করা, একটা গরীব মানুষকে দিলে ঐ এক পয়সায় তার এক বেলার খাওয়া চলে যায়। এমন কি সম্প্রদায় বিশেষ ভোর বেলা যাঁড়কে এক পয়সার জিলিপি খাওয়ায় ঐ একই উদ্দেশ্যে। সস্তায় পুণ্য হয়। এভাবে দেশের যে কত পয়সা নষ্ট হচ্ছে তার হিসাব নেই। ইত্যাদি বহু কথা সে বলল। তার যুক্তিগুলো এতক্ষণ যেন একটা কঠিন আবরণে ঢাকা পড়ে ছিল, আমার কথায় সেই ঢাকা খুলে গেল। আমি আরাম বোধ করলাম খুবই, এবং তার ফলে সাময়িক উত্তেজনায় ভুলে থাকা দুর্বলতাটাও আবার বেশ অনুভব করতে লাগলাম। আর নিচে বসে থাকা সম্ভব হল না, আমি আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু তবু ব্রিজ পার হবার সময় পয়সাটা জলেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং যুবকটি নিজের যুক্তিকে অতি সহজেই খণ্ডিত করতে পারল দেখে আমি পুলকিত চিত্তে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোর বেলা ২১শে এপ্রিলের ভাগলপুরী শীত ও ধারালো হাওয়ার মধ্যে গিয়ে নামলাম প্ল্যাটফর্মে। ভাগলপুরে আমি অনেকবার গিয়েছি, এবং কোনো বারেই প্রায় রাত্রি ভিন্ন যাতায়াত হয়নি। মাত্র একবার দিনে এসেছি মনে পড়ে। টেলিস্কোপ হবার ভয় তখন আজকের (১৯৬১) মতো অতটা মনে আসত না, এবং সেজন্য এঞ্জিনের কাছের গাড়িতেই আমি অধিকাংশ সময় গিয়েছি। এবারেও তাই। সেই দীর্ঘ ট্রেনের মাথার কাছে ঘন জনতার মধ্যে নেমে দাঁড়ানোমাত্র বিজয়দা বহুদূরের কা'কে যেন চিনতে পেরে ছুটে গেলেন সে দিকে, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন, খুব সুবিধা হয়ে গেল, কেশবমোহনবাবু এই গাড়িতে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর মোটরেই যাব ঠিক ক'রে এলাম।

কেশবমোহন ঠাকুর আমার পূর্ব পরিচিত, স্থানীয় একজন জমিদার। নানা জাতীয় ক্যামেরার অধিকারী। কলকাতাতেও ফোটোগ্রাফি সরঞ্জামের দোকানে অনেকবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে ধর্মতলা স্ট্রীটে। অতএব তাঁর সঙ্গে যাওয়া খুব অস্বস্তিকর মনে হয় নি। তাঁর বাড়ি জলকলের অনেকটা কাছে।

লক্ষ্যে পৌঁছে আরামের নিশ্বাস ফেললাম। উদার আকাশের নিচে এমন উদার অভ্যর্থনা বহুদিন পাইনি। রোদের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। নদীর ওপারের বিস্তীর্ণ বালুচর তার সামান্য দু'চার-জন জলপিয়াসী নর-নারীকে নিয়ে যে ছবি রচনা করেছে তা এপার থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাদের চলন্ত মূর্তিগুলি পুতুলের মতো ছোট দেখাচ্ছে।

জলকলের এলাকায় সেই পরিচিত অশ্বত্থ গাছ, সুদীর্ঘ চাঁপা ফুলের গাছ, আম গাছ, তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। গাছের হনুমান পরিবার একটুখানি চঞ্চল হয়ে উঠল আমাকে দেখে। তাদের চোখে আমি তখন সাস্পেক্ট। অত্যন্ত সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে হয়তো বা "এ সপ্তাহ কেমন যাবে" না জেনে এসেছি ব'লে আমাকে তারা ঐভাবে বিদ্রূপ করছিল।

এমন মনোহর নির্বাসন আমি বহুদিন মনে মনে কামনা করেছি। কাজের ফাঁকে বছরে দু'চারটি দিন অন্তত: এমনি প্রশস্ত জীবন্ত নদীর নিরাপদ উঁচু পাড়ে ঝাঁকড়া আম গাছের ছায়ায় মাটিতে সর্বাঙ্গ বিছিয়ে দিয়ে পড়ে থাকা বড় সৌভাগ্যের পরিচয় ব'লে মনে হয়। কিন্তু বছরে দূরের কথা, সমস্ত জীবনে এ সৌভাগ্য আর একটি বারও পাব কি না জানি না। পেলেও হয় তো তখন অঙ্গে বাক্য কবে, তুমি রবে নিরুত্তর।

এত আরাম লাগছিল নতুন পরিবেশে। দিন সাতেক কাউকে জানাব না। পরে বলাই যখন জানবে তখন কিছু হিংস্র হয়ে উঠতেও পারে, এমন আশঙ্কা মনে জেগেছিল, কিন্তু কয়েকটা দিন একা চুপচাপ পড়ে থাকার লোভটা দেহ এবং মন দুইয়েরই দাবীতে এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, সে ঝুঁকি নিয়েই নদীর পাড়ে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু সাবধান, পকেটমার নিকটেই আছে! এটিও অভিজ্ঞ লোকের কথা। তা ভিন্ন ঈসপের গল্পের একচক্ষু হরিণের গল্পটাও বহু প্রাচীন জ্ঞানীর উক্তি।

আমি এর কোনোটাই মনে আনিনি এবং সেজন্য আমার সব পরিকল্পনাই মাটি হল। খানিকটা একচক্ষু হরিণের মতোই, আমার একটা চোখ নদীর দিকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম, জমির দিকে ফেরাইনি। হরিণ তার একটি চোখ রেখেছিল জমির দিকে। তার মৃত্যু এসেছিল নদীর দিক থেকে, আমার এলো জমির দিক থেকে। হরিণ নদীর দিকে রেখেছিল তার কাণা চোখটা, আমি রেখেছিলাম সুস্থ চোখটা (মাইনাস্ ১·৫০ লেন্সের চশমাসহ)। জমির দিকের চোখটা আমার সব সময়েই কাণা।

বিপদ যে কার কোন্ দিক থেকে আসবে তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জানা যায় না। প্রায় তিন ঘণ্টা নদীর পাড়ে কাটিয়ে ঘরে ফিরেছি, তখন বেলা প্রায় ১১টা, এমন সময় ভোলানাথ হন্তদন্ত হয়ে তার গাড়ি নিয়ে ছুটে এসেছে আমার সন্ধানে। সে বলাইয়ের অনুজ, জলকল থেকে আধ মাইল দূরে অবস্থিত বরারি হাসপাতালের ডাক্তার। এর কথা স্মৃতিচিত্রণে বলেছি।

আমার ভাগলপুরে আসার খবরটা কেশবমোহন ঠাকুর ভোলানাথের সঙ্গে দেখা হতেই বলে দিয়েছেন। দু'জনের যে দেখা হওয়ায় সম্ভাবনা খুব বেশি, এ কথাটা আমার একেবারেই মনে আসেনি।

ভোলানাথ সংবাদ শুনে চলে গেছে বলাইয়ের কাছে। মাইল চার দূরে তার বাড়ি। তার ধারণা, ভাগলপুরে এলে অবশ্যই বলাইয়ের বাড়িতে উঠব। ধারণা মিথ্যা ছিল না, কিন্তু এবারে যে তার ব্যতিক্রম তা সে জানবে কি ক'রে? বলাই শুনে বলল, না, দু' তিন দিন আগে তার চিঠি পেয়েছি, এখানে আসবার কথা ছিল না তাতে। তখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। বিজয়দার সঙ্গে এসেছি, অতএব সেখানেই উঠেছি। অতএব ভোলানাথ আবার ছুটে এসেছে জলকলে।

ধরা পড়ে গেলাম। প্ল্যান ভেঙে পড়ার মুখে। ভোলাকে বোঝাতে হবে না কিছু, কেন না জলকল তার বাড়ির কাছে হওয়াতে

আমাদের প্রতিদিন দেখা হওয়ার বাধা নেই। কিন্তু বলাই শুনে ফেলেছে কথাটা। তাই ভয়ে ভয়ে তার প্রতীক্ষায় কাটাতে লাগলাম। গঙ্গার ধারে শুয়ে থাকার আরামের মধ্যে আতঙ্ক ঢুকল। থেকে থেকে চমকে চমকে উঠছি।

অনিবার্যকে সত্যিই রোধ করা গেল না।

পরদিনই বলাই-দম্পতি গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। বলল, এখুনি চল।

অবশেষে অনেক বুঝিয়ে দিন তিনেক সময় চেয়ে নিলাম। স্বাস্থ্য যথাপূর্বং। শুয়ে থাকা হল না।

বলাইয়ের বাড়িতে দিন তিনেক কাটিয়ে এবং ক্রমাগত কথা ব'লে, এবং এক মুহূর্ত বিশ্রাম না ক'রে আবার ফিরে গেলাম জলকলের বাড়িতে। কিন্তু ইতিমধ্যে মনের মধ্যে সব শান্তভাব প্রবল ঝাঁকানি খেয়ে বিধ্বস্ত, তাই বিশ্রামে আর মন বসল না।—সকল পরিকল্পনা মারা গেছে, তবু ফিরে এসে যমের হাত থেকে তার একটুখানি অংশ কেড়ে নিয়ে, গঙ্গার পাড়ের তৃণশয্যায় শুয়ে শুয়ে দু'চার দিন তাকে উপভোগ করার চেষ্টা করেছিলাম মাত্র।

বিজয়দার ঘুম : মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া বন্ধ

প্রতিশ্রুত বিজয়দার ঘুমের শেষের পর্যায়গুলির কথা এই বারে বলা দরকার। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বারান্দায় ব'সে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়তেন। তাঁকে তখন তোলে কার সাধ্য?

বাল্যকালে বাবার কাছে শুনেছিলাম, তিনি যখন পাবনা জিলা স্কুলে পড়তেন তখন এক শিক্ষক ব্ল্যাক বোর্ডে রেখা টানতে গিয়ে অর্ধসমাপ্ত রেখায় চক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেন। কিন্তু বিজয়দার যে ঘুম আমি প্রত্যক্ষ করেছি তার সঙ্গে কোনো ঘুমেরই তুলনা হয় না।

আমি যেদিন কলকাতা ফিরব, সেদিন রাত দশটায় কিংবা কিছু আগে বিজয়দার ব্যবস্থা মতো একখানা টু-সীটার এক্কা গাড়ি এসে হাজির। তাইতে আমার হোলড-অল এবং আমি বসতেই সবটা স্থান দখল হয়ে গেল। বিজয়দা তার উপর উঠে বসলেন এবং গাড়িখানা জলকল সীমানা পার হতেই সেই হোলড-অলের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পৃথিবীতে বহু রকম আশ্চর্য ঘটনা ঘটে জানি, অনেক মিরাক্‌লও ঘটে শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস হয় না সে সব। কিন্তু সেদিন বিশ্বাস করেছি। কারণ সেদিন সেই এক্কার উপরে বিজয়দার নিদ্রা-পদ্ধতির যে চেহারা আমি দেখেছি তাতে ভয় পেয়েছিলাম, না রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম তা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।

বিজয়দা হোলড-অলের উপর চিৎ হয়ে পড়ে ঘুমন্ত অবস্থায় দুখানা পা বাইরে ছড়িয়ে দিলেন, এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তাঁর নাক ডাকার শব্দ শোনা যেতে লাগল। এক্কার ঝাঁকানিতে সে ঘুমের কোনো ক্ষতি হল না। আমি তাঁকে ঠেলা দিয়ে একটু জাগিয়ে বললাম, "বিজয়দা, প'ড়ে যাবেন, এভাবে ঘুমোবেন না।" তিনি জড়িত স্বরে সংক্ষেপে বললেন, "অভ্যাস আছে।" এবং তার পরেই যথাপূর্বং।

এক্কার ধাক্কায় ধাক্কায় বিজয়দার দুখানা পা ক্রমে বাইরে বেরিয়ে যেতে লাগল। আমি আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সে দিকে চেয়ে আছি, মাঝে মাঝে ডেকে তাঁকে সতর্ক করার চেষ্টা করছি। কিন্তু তিনি প্রত্যেকবার ঐ একই ভঙ্গিতে জড়িত স্বরে শুধু উচ্চারণ করছেন, "অভ্যাস আছে।"—ঐ কথাটি যেন একটি নিরেট পদার্থ, ধাক্কা মারলে নিশ্বাসের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে আসে বাইরে। কিন্তু তার পর "অভ্যাস আছে" কথাটাও এমন জড়িয়ে জড়িয়ে যেতে লাগল যে, তাঁকে আর তখন নিরেট পদার্থ বলে মনে করা গেল না। কিন্তু ততক্ষণে দেখি তাঁর দেহের নিম্নাংশ প্রায় কোমর অবধি বাইরে বেরিয়ে পড়েছে।

সম্মোহন বিদ্যার সাহায্যে মানুষকে এ রকম শক্ত করা যায় শুনেছি। কিন্তু বিনা সম্মোহনেও যে বিজয়দার মতো কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ব্যক্তি এক্কা গাড়ির সঙ্কীর্ণ পরিসরে হোলড-অলের উপরে শুধু পিঠখানা রেখে দুখানা পা সহ অর্ধদেহ বাইরে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারেন তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হত।

শেষে তাঁকে বাঁচাবার জন্ম একটি ঘোরাপথ অবলম্বন করলাম। তাঁকে ধাক্কা মেরে মেরে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম, "বিজয়দা, এ বাড়িটা কবে হ'ল, এটাকে তো আগে দেখিনি?"

বিজয়দা বললেন, "বিজ্‌ক্রর্‌র্‌ জ্‌জ্‌র্‌স্‌স।"

কিন্তু জাগলেন না, এবং পড়েও গেলেন না। আমি তাঁর পড়ে যাওয়াটাই নিশ্চিত আশঙ্কা করেছিলাম। এবং এ আশঙ্কা শুধু তাঁর জন্ম নয়, আমার জন্মও। কারণ যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, আমার যাওয়া বন্ধ হবে, এবং শুধু তাই নয়, অত রাত্রে আহত (এবং সম্ভবতঃ অচেতন) বিজয়দাকে হাসপাতালে পাঠানো ইত্যাদির ঝঞ্ঝাটে সমস্ত রাত কাটবে সেই অসুস্থ দেহে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভয় যাওয়া স্থগিত রাখা। তখন কোনো মতেই আর যাত্রাভঙ্গের কথা ভাবা যায় না। কিন্তু এ যে একেবারে অলৌকিক কাণ্ড!

"বিজয়দা, ষ্টেশনের কাছে এসে পড়েছি, উঠবেন না?"

বিজয়দা অভয়মন্ত্র উচ্চারণ করেন, "ব্র র্‌ র্‌ র্‌ জ্‌ জ্‌ জ্‌ স্‌ স স্‌"

এবং কোমর আরও একটু শূন্যে ঠেলে দেন।

কোমরসুদ্ধ দুখানা পা এক্কার বাইরে প্রলম্বিত, এবং এক্কা যত এগিয়ে যাচ্ছে, তিনিও তত বেরিয়ে যাচ্ছেন, এবং তাঁর পায়ের ডগা থেকে কোমর অবধি মাধ্যাকর্ষণের শক্তি একেবারে নেই, এ এক নতুন দৃশ্য।

অবশেষে ষ্টেশন। এক্কা ষ্টেশনের আঙিনায় প্রবেশ করতে না করতে বিজয়দা উঠে বসলেন এক ঝাঁকানি মেরে। দেখে-শুনে আমি স্তম্ভিত। ঘুমের সঙ্গেই যে মানুষের সকল চেতনা এবং বোধ সব সময় নষ্ট হয় না, এবং কোনো কোনো মানুষের দুই-ই সমান্তরাল-ভাবে চলে, তার চরম দৃষ্টান্ত দেখলাম বিজয়দার মধ্যে। বিজয়দা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি হেসে, যেন কিছুই হয় নি, যেন তিনি এতক্ষণ ঘুমোন নি, এমনিভাবে এক লাফে এক্কা থেকে নেমে আমার মোট বহনের ব্যবস্থা করে ফেললেন, এবং টিকিট কেনা থেকে আরম্ভ করে আমাকে গাড়িতে তুলে শোবার ব্যবস্থা পাকা ক'রে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলেন। এবং শুধু তাই নয়, সেই গাড়িতে তাঁর এক উত্তর প্রদেশীয় বন্ধু যাচ্ছিলেন, তাঁকে বার বার অনুরোধ জানালেন, আমাকে তিনি যেন একটু দেখা-শোনা করেন।

পশ্চিম হিমালয়ে : দুরাকাঙ্ক্ষার বৃথা ভ্রমণ

ল্যানসডাউনবাসী এক অন্তরঙ্গ বাঙালী পরিবারের নিমন্ত্রণ পেয়ে পর বছর (১৯৪৯) ১৫ই জুন শিল্পী কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদারকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে ল্যানসডাউন ও দিন পাঁচেক পরে সেখানে থাকতে সিমলা থেকে আর এক অন্তরঙ্গ (১৯৫১ মডেল) পরিবারের প্রধান কর্ম সচিবের এক জরুরি চিঠি পেয়েই সিমলার পথে রওনা হয়ে গেলাম।

দ্বিতীয় চিঠিখানার লেখক কিরণ রায়। ১৯২০ থেকে অন্তরঙ্গ। (যাবতীয় ভ্রমণ কথা বিস্তারিতভাবে 'পথে পথে' বইতে লেখা আছে। কিরণের নামটি বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ করছি এই কারণে যে, সে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় আরম্ভ থেকে সাহিত্য-ত্যাগী এবং ১৯৫১-এর গোড়া থেকে সাহিত্যিক ত্যাগী। তাই ১৯৪৯-মডেলের উল্লেখ। এখন অন্তরঙ্গের রঙ্গ-অংশটা উঠে গেছে।)

যাই হোক, এবারের ছুটি ভ্রমণেই একমাত্র জমির বিস্তার দেখা ভিন্ন আর কোনো দিক দিয়ে খুব বেশি কিছু লাভ হয়নি। ল্যান্স-ডাউনে কাম্য ছিল ছায়া, সিমলায় কাম্য রোদ। এক এক সময় এমন বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা যে, তখন ঘরে শুয়ে থাকায়ই আরাম বোধ হয়েছে। অবশ্য দুপুরে খুবই গরম।

ভ্রমণের আরম্ভ থেকেই প্রায় প্রত্যেকটা জিনিস প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল। প্রথমত: আবহাওয়ার উত্তাপ। জুন মাসে ও-পথে কেউ ইচ্ছে ক'রে যায় না। মেঘহীন খোলা তামাটে আকাশের নিচে ১১২ ডিগ্রী ফারেনহাইটের আগুন। এরই ভিতর দিয়ে শত শত মাইল অতিক্রম করা প্রাণান্তকর ব্যাপার। তারপর ল্যানসডাউন শহরের ৬০০০ ফুট উচ্চতায় বাংলা দেশের গ্রীষ্ম। তারপর এই শহরের যেসব ঝোপঝাড়-বেষ্টিত স্থানকে অত্যন্ত নির্জন ব'লে মনে হয়েছে, সেখানেই আমি ক্যামেরা, ও কালীকিঙ্কর রং তুলি স্কেচ বুক নিয়ে প্রবেশ ক'রে দেখি সৈন্যরা সেই সব স্থানে যুদ্ধের নানা কৌশল অভ্যাস করছে। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ স্থান মনে ক'রে যেখানে বসেছি, হঠাৎ দেখি একদল সৈন্য কুচকাওয়াজ করতে করতে কোন্ অদৃশ্য স্থান থেকে বেরিয়ে এলো।

আর শুধু তাই নয়, এ শহরে আমাদের মতো নিরীহ এবং শান্তিকামী দুজন অতিথির উদ্দেশ্যহীন চলাফেরায় ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন কিনা, সে সন্ধানও চলছিল গোপনে গোপনে। কানে এসেছিল সে কথা। সেই পাহাড়ী ওঠা-নামার পথে সারাদিন ঘুরে বেদনাহত পা নিয়ে আমাদের নিজেদের নিরাপত্তা যে সেখানে কি পরিমাণ বিপন্ন হয়েছিল, তা দেখবার বিশেষ কেউ ছিল না। ওখান থেকে তাই না পালানো পর্যন্ত বড়ই অস্বস্তিবোধ করছিলাম। এমনি অবস্থায় সিমলা থেকে কিরণের চিঠি। সিমলা, ল্যান্সডাউন থেকে প্রায় দু হাজার ফুট উঁচু, তাই মনে হয়েছিল দেবতারা বর্তমানে ঐখানেই আছেন। হয়তো তাঁরা কিরণকে এজেন্ট বানিয়ে তার উপর ভর করে ঐ চিঠিখানা আমাদের উদ্দেশে লিখিয়েছেন।

আর দেবতারা সাহারানপুর ষ্টেশনে আরও একজনকে এজেন্ট বানিয়ে ওয়েটিং রুমে আমাদের দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন। তার নাম ফকিরচাঁদ। কিন্তু তার একার সাধ্য কি একটি মাত্র প্রথম শ্রেণীর ডালভাতের ভোজ খাইয়ে সেই আগুনের হাত থেকে আমাদের বাঁচায়। সূর্যের এমন প্রচণ্ড নির্দয় মূর্তি আগে কখনো দেখিনি। প্রায় চল্লিশ বছর আগে প্রখর গ্রীষ্মে ভাগলপুরে পুরো একমাস কাটিয়েছিলাম। সে আগুনের কথা ভাবলে এখনো গায়ে ফোস্কা পড়ে। কিন্তু ১৯৪৯ সালের উত্তরপ্রদেশের আগুন সম্ভবত: সূর্য-দেহের সমান উত্তাপের স্বাদ দেবার জন্যই আমাদের মাথায় এসে নেমেছিল। সে যে কি, তা শুধু গভীর প্রেমের মতো উপলব্ধি করা যায়। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

গরমের এই দুর্ভোগ আমরা অন্তত শতকরা দশ কমাতে পারতাম যদি ল্যানসডাউনে কেউ বলতে পারত সিমলা যাওয়া কোন্ গাড়িতে সুবিধাজনক। কিন্তু কেউ পারেনি বলতে। তাই সমস্ত রাত নজিবাবাদ ওয়েটিং রুমে ব'সে কাটিয়ে পরদিন সকালে সাহারান-পুরগামী এক গাড়িতে উঠে বসলাম। আমাদের এবারের যাওয়া দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর মিশ্রণে। (ইংরেজ আমলের ইণ্টার ক্লাস ও দ্বিতীয় শ্রেণী।) কিন্তু তখনকার এই দুই শ্রেণী যুদ্ধের আগে এর চেয়ে বেশি আরামজনক ছিল। অতএব এবারে নামমাত্র উচ্চশ্রেণীর উচ্চমূল্যের টিকিট কিনে টিকিটহীন প্রায়-উলঙ্গ নোংরা কয়েকটি ছোকরার সঙ্গে চললাম কালকার পথে। (এই অসুবিধাটা দেবতারা কল্পনা করেননি।) অতএব তারা স্বাধীন ভাবে আম খেতে খেতে এবং আমের রস ও খোসায় গাড়িটিকে যথাসম্ভব স্বদেশী চরিত্রে রূপায়িত ক'রে আমাদের সহযাত্রী হয়ে চলতে লাগল।

পরদিন বৈকালে সিমলা। কিন্তু ইতিমধ্যে টিকিটহীন যাত্রীদের ভিড়ের চাপে, প্রায় অনাহারে ও সম্পূর্ণ অনিদ্রায় এবং আমাদের চোখে ঘৃণ্য আচরণের, ও আমাদের সান্নিধ্য যাদের পছন্দ নয় এমন সহযাত্রীদের সঙ্গে চরম মানসিক অস্বস্তি নিয়ে চলতে চলতে নতুন দেশ দেখার সমস্ত প্রবৃত্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এর উপর আবার কোনো ষ্টেশনে দেশের নিরাপত্তা রক্ষকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়। অন্য দিকটা অনুকূল হলে এই ব্যাপারটিতে বিরক্তি জাগত না, কিন্তু সবই যেখানে প্রতিকূল, সেখানে সামান্য অসুবিধাও অত্যন্ত অসহ হয়ে ওঠে।

তারপর সিমলা। এখানেও ষ্টেশনে নেমে কিরণের অফিসের কাছে যখন বিছানার বোঝা ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে ক্লান্তভাবে কিরণের প্রতীক্ষায় বসে আছি, সেই সময় এক অতি অবাঞ্ছিত লোক এসে ক্রমাগত বলতে লাগল সে শহর দেখাবার ভার নেবে, আমাদের কিছু ভাবতে হবে না, ইত্যাদি। ছাড়তে চায় না সহজে।

কালীকিঙ্কর কিরণের অফিসে গিয়ে তাকে ডেকে আনল, তাকে আগেই খবর দেওয়া ছিল। কিন্তু এখানকার বৈচিত্র্যহীন পাহাড়ের পর পাহাড়ের শুধু সহ-অবস্থান। দার্জিলিঙের মতো আমাদের মাথার শিয়রে তুষার-ঢাকা কোনো পাহাড়ের মাথা নেই, পথ চলা মানে আকাশে ওঠা আর পাতালে নামার পুনরাবৃত্তি। ক্লান্ত চরণ, অবসন্ন দেহ-মন। শুধু কাইথুর দুর্গা ভিলার উষ্ণ পরিবেশ ভিন্ন আর কোথাও বিশেষ কোনো তৃপ্তি ছিল না। যদিও সেখান থেকে চলে আসার পর দুই প্রতারক দু'খানা চিঠি লিখে আমাদের সান্ত্বনা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। এই দুইয়ের একজন কিরণ, সে সিমলায় টানবার জন্য তার অপরূপ শোভার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে কার্ড পাঠিয়েছিল। দ্বিতীয় জনও দুর্গা ভিলাবাসী, নাম কমী চাটুজ্জে, এবং ছুটি পাবাই এক পালকের।

আমরা চলে আসার পর কিরণ লিখছে (সিমলা, ১০, ৭, ৪১)
পরিমল দা,

তুমি এসেছিলে। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলে আমার যৌবনের দিন। "কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি।" আসলে আমরা incorrigibly romantic. বহু চেষ্টা করেও matter of fact হওয়া গেল না।···

তার পর তোমরা বাইরে যাবার পরই যে কাণ্ড করেছেন সিমলা-সুন্দরী! আর একটা সপ্তাহ যদি থাকতে! দেখি আর আপশোষ হয়।

যখন যেমনটি হওয়া উচিত, পৃথিবীর বস্তু-স্রোত তাতে বাধা দেয়। ইতিহাস তাই রক্তপাতের পৃষ্ঠা। মধ্যে মধ্যে আসেন হেগেল-শোপেনহাউয়ার। বলেন, নিয়মটা ব্যতিক্রম, এবং ব্যতিক্রমটাই নিয়ম। নেপথ্যে হাসেন বস্তু-বিধি। কত কার্ল মার্কস এলো গেলো। কত না বুদ্ধ-গান্ধী। বস্তু-বিধি সমান পদাঘাত করে চলেছে সব। আজ যেটা বিধান, কাল সেটা নিষেধ।···

হাসছো? বলছো এত কথা আসছে কেন?···তা নয়, তুমি যে যৌবনের দিনগুলো সামনে ফেলে গিয়েছিলে, এ তারই sequel। ভাবছিলাম, জীবনে কি পেলাম, আর কি হারালাম। এর মধ্যে এলো তোমার চিঠি।···

কুষ্টিয়ার পরিত্যক্ত নীলকুঠির বিরাট ভ্যাটগুলোর সামনে আট-নয় বছর বয়সে চীৎকার করে শুনতাম তার প্রতিধ্বনি। সে নীলকুঠি গোড়াই নদীর গর্ভে গেছে, কিন্তু আমি আছি, আজও প্রতিধ্বনি শুনছি।···　　ইতি—কিরণকুমার

সিমলা থেকে ফিরে যে চিঠি লিখেছিলাম, এ তারই উত্তর। নানা ছলে নৈরাশ্য ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা। শেষ পর্যন্ত দার্শনিকপনার মধ্যে নিক্ষেপ করার চতুর চেষ্টা।

দ্বিতীয় প্রত্যায়কের চিঠিখানারও অংশ বিশেষ প্রকাশ করছি। ফণী চাটুজ্জে লিখছে (সিমলা ৫-৭-৪১)—
পরিমলবাবু—

আপনার চিঠি পেয়ে প্রায় অভিভূত হলাম। কিছুদিন থেকে একটা ধারণা জন্মাচ্ছে যে, আমার মধ্যে একটা পাকা ভণ্ড আছে, যে নিজের আসল রঙটা লুকিয়ে রাখে, জাতি-ধর্ম-রুচি নির্বিচারে অপরের রঙের সঙ্গে রঙ মেলায় এবং আদরের toll আদায় ক'রে ছাড়ে। যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে আপনার কাছে করলাম। আপনার সঙ্গে রুচির কিছু মিল আছে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের অফিসের পাঠান যুবক মোতিরাম খিওড়া, রাম-জোচ্চোর হনুসুরাজ হুরা, বুনো অ্যাকাউন্টস অফিসার দক্ষিণী 'রাও,' এবং স্বদেশী-বিদেশী আরও অনেকে? সকলের ডার্লিং হয়ে উঠি কি কৌশলে? আত্মবিশ্লেষণ আমার পেশা নয়, কিন্তু যখনই এ রকম un-earned income জোটে, তখনই প্রশ্ন জাগে জোচ্চোরিটা কোথায়?···

কেউ না ঠকালেও আপনারা যে ঠকেছেন তাতে সন্দেহ নেই। আপনারা যাবার ক'দিন পর থেকেই সিমলা পাহাড় রূপময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার বর্ণনা কোনো কলমেরই সাধ্য নয়, আমার তো নয়ই। প্রতি মুহূর্তে যে নতুন নতুন কাণ্ড ঘটছে তার প্রতিরূপ দেওয়া তুলিতেই সম্ভব, এবং তাও যার তার তুলি নয়। কালীকিঙ্করবাবু কি করতেন জানি না। হয় তো ক্ষেপেই যেতেন। পাহাড়ের নানা শেডে-এর সবুজ, আকাশের স্বর্গীয় নীল, মেঘের কাজল এবং অমল শাদা মিলে কি অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার যে ঘটছে তা যদি দেখতে পেতেন! সূর্যাস্তগুলি তো প্রত্যেকখানি super-Turner।
—ফণী।

ফণী ও কিরণ—এই দু'জনের চিঠিতেই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা আছে, এবং কিঞ্চিৎ নিষ্ঠুরতাও আছে, কেন না সেখানে আবার যে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, এ কথা নিশ্চয় তাদের মন জানত, কিন্তু তবু এই প্রলোভন কেন?

সর্বশেষ রেলওয়ের নিষ্ঠুরতা। ট্রেনে ঘুমনোর জন্য চল্লিশটি টাকা অতিরিক্ত নিয়ে ঘুমনোর কোনা ব্যবস্থাই করেনি। পরে চিঠি দিয়ে তার জবাব পাইনি। এসব কথা 'পথে পথে' বইতে সবিস্তারে বলা আছে। অর্থাৎ ছাপার অক্ষরে প্রথমে প্রবাসীতে ও পরে বইতে প্রকাশিত হয়েছে। সে তো অনেকদিনের কথা। আজও রেলের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সে টাকা ফেরৎ দেওয়া অথবা সেজন্ত ক্ষমা চাওয়া—এরকম বিপ্লবকারী কোনো ঘটনাই অদ্যাবধি ঘটেনি। সম্ভবত: এই কারণেই ও পথে বিনা ভাড়ায় হাজার হাজার যাত্রী সুখ-ভ্রমণ ক'রে এই জাতীয় উচ্চস্তরের উদাসীনতার শোধ তুলছে।

এই দীর্ঘপথের অভিজ্ঞতার পর আর কলকাতা ছেড়ে ২৫ মাইলের উর্ধ্বে যাইনি, যদিও দ্বিতীয় এবং প্রথম শ্রেণীতে এর মধ্যেও বিনাভাড়ার যাত্রীদের পেষণ সহ্য করেছি বহুবার। এখন শুনছি যত ভাড়া বাড়ছে, তত বিনা টিকিটের যাত্রী বাড়ছে।

দ্বিতীয় স্মৃতি মন্থন

একথা স্মৃতিচিত্রণে বলেছি—স্মৃতির এক একটা অংশ সম্পূর্ণ নিবে গেছে, কোনো আকস্মিক মুহূর্তে তার মধ্যে কখন কোন্‌টা আলোকিত হয়ে উঠবে তা আগে থাকতে বলা যায় না। এমনি কত হারিয়ে যাওয়া মুহূর্ত এখন মনের মধ্যে নতুন ক'রে ভেসে উঠছে মাঝে মাঝে। অবাক হয়ে ভাবছি, কেন এতদিন মনে পড়েনি।

হঠাৎ ফিরে পাওয়া একটি আনন্দের স্মৃতি, বাল্যকালের পড়া ছেলেদের রামায়ণ ও ছোটদের মহাভারত। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা এ দু'খানি বইয়ের প্রথমখানি আমার সবচেয়ে প্রিয় বই ছিল স্কুল জীবনে। উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদিত 'সন্দেশ'ও আমি নিয়মিত পড়েছি যখন প্রথম বেরোয়। এ সব কথা ভুলে যাওয়া অমার্জনীয়। 'সন্দেশ' কাগজখানা নতুন আকারে সম্প্রতি প্রকাশিত হতে দেখে সবই মনে পড়ে গেল। ১৯১৭ কি ১৮ হবে মনে নেই, সুকুমার রায়ের বক্তৃতা শুনেছি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে। তাঁর চেহারাটাও স্পষ্ট মনে পড়ছে।

পুরনো চিঠির সঞ্চয় ঘাঁটতে গিয়ে অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। বছর ত্রিশেক পরে এক বন্ধুর একখানা চিঠি আবিষ্কার করলাম। বহু চিঠির মধ্যে লুকিয়ে ছিল। চিঠিখানার লেখক গিরিজা মুখোপাধ্যায়। লেখা হয়েছে বিলেত যাওয়ার পথে, ওরিয়েন্ট লাইনের 'অরমণ্ড' জাহাজ থেকে। চিঠিতে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অনেক কথা ছিল, তা বাদ দিয়ে বাকী অংশ উদ্ধৃত করছি। চিঠির তারিখ ৮ই অক্টোবর, ১৮৩১।

প্রিয় পরিমলবাবু,

অত্যন্ত অকস্মাৎ দেশ ছেড়েছি। কাজেই আসবার দিন

হাফ-আখরাই, কবিলড়াই, রেনেটি, মনহরসাই, গরহাটি, টপ, গাজনের গান-বাজনা, সহজিয়ার গান প্রচলন আছে, এই সকলের মধ্যে আছে সেই লোকায়ত ধারার সুস্পষ্ট পরিচয়।

বীরভূমের রায়বেঁশেদের নাচ আর গান, জেলায় জেলায় গ্রাম্যলাঠিয়ালগণের নাচের ধরণে, ডফলা, সাঁওতাল, কোল, হো, মুণ্ডারী, গারো, কোচ, খাসিয়া, বাহে, বাউড়ী, রবিদাস, শতনামী, দোসাদ, খাসী, লালবেগী, ঘমুসাহারা, পান, পাশী, তুরী, লেট, বাইতী, বেদিয়া, বেলদার, ভুঁইমালী, ভুঁইয়া, নায়েক, খাটিক, কোনাই, কোনার, কোটাল, লোহার, মাহার, মাল, মাল্লা, মুনিয়া, পলিয়া, পাটনী, পোদ বা পৌণ্ড, শিয়র, ভোগতা, চৌপাল, তীয়র, ভাংগী, নাট, ভুটিয়া, শেরপা, কাম্বর, টোটো, ডুকপা, কাগটে, ইয়োলমো, চাকমা, গারো, হাজং, লেপচা, মগ, মাহালী, মেচ, নাগেশিয়া, রাভা, বাইগা, বানজারা, বাথুড়ী, বিনঝিয়া, বীরহোর, চেরো, চিকবরাইক, গোন্দ, গোড়াইত, কারমালী, খারওয়ার, খোন্দ, কিষাণ, কোড়া, মাল্লী, পাড়হাইয়া, ভকত, ধীবর, নাগবংশী, সর্দার, বুনো, আকা, আবর, মিরি, মিশমী, কছারী, লালুং, টিপুরা, নাগা, লাখার, লুসাই, হ্মাড়াও, পোই, সান, সংস্কৃত অসম হইতে অসমতল পার্বত্য ভূমির অসমীয়া, বলোচি, পুস্তু, গুরুং, কুই খারিয়া, কেরোওয়া, কুরকু, লিম্বু, মানংগারী, সাভারা, তামিল, তেলেগু, তুরী, ভুটিয়া প্রভৃতি সমাজ থেকে অনুন্নত ও পরে বর্তমান কালে যে সুর আর তালের ছন্দে, যে ভাব আর ভংগী আজকাল দেখতে বা শুনতে পাওয়া যায় তার মধ্যে বেয়ে চলেছে সেই একই প্রাচীন লোকায়ত ধারা, এই ধারাসকল একালেও দেখা যায় নানা ব্রত-উপাসনায়, মংগলকাব্যে, পাঁচালীতে আর মঙ্গলানুষ্ঠানে।

ভুটিয়া ভাষায় লিখিত তাঞ্জুর গ্রন্থ যে কেবলমাত্র গৌড়ীয় ধর্মমতের জ্ঞান পাওয়া যাবে এমন নয়, বংগজ সাহিত্যেরও একটি ধারা ইতিহাস পাওয়া যাবে। গৌড়জনের পূর্বপুরুষের কথা, থেরভগনাবলী কিছুই সংগ্রহ করতে একালে আমরা পারিনি। কিন্তু তাঁদের ছাত্র-শিষ্য ভুটিয়া সমাজ বিশেষ যত্ন করে এই সকল গ্রন্থ রক্ষা করছেন, আর রাখছেন পূর্বপুরুষগণের বিশেষ গৌরব।

লণ্ডনের হরনিমান মিউজিয়মের কিউরেটর শ্রীমতী Jean Jenkin তাঁর সেণ্ট্রাল এশিয়া ভ্রমণ ও সংগীত টেপরেকর্ডিং সংগ্রহ সম্বন্ধে বলেছেন: The Origin of the harp is still obscure, "but you find it on rock carving a thousand years old in India, even though it doesn't exist there today, The Burmese still use one, a very elegant instrument with silk string and silk tassels, gileded and decorated with mica. And the Afganis of Afganistan sti l use a very primitive bowharp. I found parts of the missing link in Samarkand. I discovered a first-century fresco of a woman harp-player, and at Airtam also in Uzbekistan, a stone frieze, two thousand years old, showing three musicians, one of whom is playing a harp. I also saw illuminated manuscripts from the time of Tamerlane – the fourteenth century that show that the harp was carried along the trade routs to the outskirts of Tamerlane's empire in both directions, east in Chinese Turkistan and as far west as the Caucasus And in the Caucasus it was still played untill hundred years ago Other musical instruments which were Kizak, a two-stringed horse hair fiddle played by the Kirghiz and the Kazaks as well as by the Mongolians Instead of pressing the string on the neck of the instrument, as with the violine. The player touches the string from underneath with the base of the fingernails At a wedding breakfast in Taskent she recorded the seven-foot-long trumpets similar to the Tibetan trumpets once used in battle but now used only at wedding ceremonies, and always together with pottery drum. Another instrument was the Yangin one of more than thirty musical instruments used by the Uighur peoples.

উত্তর কলিকাতায় শ্যামপুকুরে বাঙলার তথা ভারতের ব্যবসায় জগতের দিকপাল স্বর্গত ভবতোষ ঘটকের স্মৃতি উদযাপনার্থে আয়োজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন, ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশ্যামাতোষ ঘটক, শ্রীঅজিতেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখ অভ্যাগতদের দেখা যাচ্ছে।

In the Horniman there was a harp from the late century from as far west as the Caucaseas.

গান-বাজনার মাধ্যমে প্রাক-বৌদ্ধযুগ থেকে আদিবাসী কোমদের অনেক ব্রত উৎসব চলে আসছে। আর্যপূর্ব নরনারীগণ কালক্রমে আর্যব্রাহ্মণ্য-সমাজে স্থান পেয়ে পেয়ে অনেক ব্রত-অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্য ধর্মে মিশে গিয়েছে যেমন রথযাত্রা, দোলযাত্রা, সত্যনারায়ণের পাঁচালী প্রভৃতি। মালদহের গম্ভীরাগান বা শিবের গাজন চরক অনুষ্ঠানেরই অংগ। বিহার উড়িষ্যা আসাম বাংলা প্রভৃতি রাজ্যে মনসাদেবীর আরাধনা প্রচলন আছে, মনসার সাথে নাম করা যায় জাংগুলী দেবীর। এই দেবী বীণাবাদনে অভিজ্ঞ এবং মনসার মত সাপের বিষ শোধন করে দিতে পারেন, স্মরণ রাখা দরকার বৈদিক সরস্বতীও কয়েকটি স্থানের মধ্যে সাপের বিষ কাটাতে পারতেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি শবর-কন্যা।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

আমার কথা (৮২)

সঙ্গীতাচার্য্য শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

যে সমস্ত প্রতিভাধর বিভিন্ন ধরণের প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্যের জন্ম চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন রাণাঘাটের পরলোকগত সঙ্গীতাচার্য্য নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইনি রাণাঘাটের সঙ্গীত জগতের সকলেরই গুরু। নগেনবাবুর প্রচেষ্টায় তখনকার সঙ্গীত যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। এঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভা কেবলমাত্র যে রাণাঘাটকেই মহিমান্বিত করিয়াছিল তাহা নহে, পরন্তু ইহা সমগ্র বঙ্গদেশকে সাঙ্গীতিক অবদানে সুসমৃদ্ধ করিয়াছিল। আজ যাঁর সঙ্গীত প্রতিভার কথা আলোচনা করিতে যাইতেছি তিনি হইতেছেন সঙ্গীতাচার্য্য নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সুযোগ্য শিষ্য সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। নগেন্দ্রনাথের বহু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছাত্র ছিলেন বটে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের মত সঙ্গীতের বিভিন্ন দিকের পারদর্শিতা ও প্রগাঢ় প্রজ্ঞা আর কাহারও মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। সঙ্গীতের বিভিন্ন দিকের গুণের সমন্বয়ের ফলেই তিনি ভারতের গুণীদের মধ্যে অন্যতম। শচীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র ১০ বৎসর, তখন হইতেই ইনি সঙ্গীত সাধনা আরম্ভ করেন। রাত্রির বিদায়ক্ষণে প্রভাতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভট্টাচার্য্য গৃহের একটি নির্দ্দিষ্ট কক্ষ সুরের মূর্চ্ছনায় ভরপুর হইয়া উঠিত। সঙ্গীত ভট্টাচার্য্য বংশের একরূপ বংশগত। শচীন্দ্রনাথের আরও তিন ভ্রাতা আছেন শচীন্দ্রনাথ চারি ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয়। অন্য তিনজন সর্ব্বশ্রী অবনীন্দ্রনাথ, শিবনাথ ও নির্ম্মলচন্দ্র। ইঁহারা সকলেই সঙ্গীতানুরাগী ও সঙ্গীতে উল্লিখিত তিন ভায়েরই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা আছে। এই বংশের সঙ্গীতানুরাগের অন্যতম পুরোধা হইতেছেন সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের পিতা পরলোকগত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (কথক চূড়ামণি)। ইনি ছিলেন সঙ্গীতের পরম পৃষ্ঠপোষক ও সঙ্গীতজ্ঞ। ইনি ছিলেন বৰ্দ্ধমান মহারাজের কথক, ইহা ছাড়া সুকণ্ঠের অধিকারী। সেতারেও ইঁহার দক্ষতা ছিল।

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের শৈশবকাল হইতেই সঙ্গীতের প্রতি প্রবল নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসা ছিল। সেই অনুসন্ধিৎসা ও নিষ্ঠা আজ সুদীর্ঘ ৩৮ বৎসর পরেও সমানভাবে বর্ত্তমান। তিনি সঙ্গীতাচার্য্য ৺নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন ও পরে ইনি তৎকালীন বিখ্যাত লয়দার সঙ্গীতাচার্য্য ৺রামকিষেণ মিশ্রের (বেনারস) নিকট দীর্ঘদিন সঙ্গীতে শিক্ষালাভ করেন। এঁরই শিক্ষাধীনে থাকিবার কালে শচীন্দ্রনাথ ইংরাজী ১৯৩৫ সালে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় খেয়ালে কঠিন রাগ শ্রীরাগ গাহিয়া প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য অনেক প্রতিযোগিতায় তিনি সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে জনৈক ডাক্তারবাবুর সহায়তায় শচীনবাবু মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদ কাদের বক্স সাহেবের সহিত পরিচিত হন। প্রথম সাক্ষাতেই শচীনবাবুর কয়েকটি প্রশ্নে ওস্তাদজী বিহ্বল হইয়া পড়েন ও মন্তব্য করেন যে, "য়্যায়সা মাফিক লেড়কা হাম কভি নাই দেখা।" আজ সুদীর্ঘ ১৮ বৎসরের অধিককাল শচীন্দ্রনাথ ওস্তাদজীর নিকট হইতে সঙ্গীত পাঠ লইতেছেন। বর্ত্তমানে শচীনবাবুই ওস্তাদজীর সুযোগ্য ও প্রিয়তম ছাত্র। শচীনবাবুর মত অনুসন্ধিৎসু ছাত্র খুবই বিরল। তিনি আজীবন সঙ্গীতের সাধক। জীবনে কোনদিন তিনি সঙ্গীতকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। শচীনবাবুর সঙ্গীত প্রতিভার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহার লিখিত পুস্তক "সঙ্গীত অনুসন্ধিৎসা" এই পুস্তকে তিনি তাঁহার সঙ্গীত জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা উদার মন লইয়া আলোচনা করিয়া দেশকল্যাণকামী মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইনি বাংলা খেয়াল ও ঠুংরি রচনায় ও সঙ্গীতের বিভিন্ন তথ্যের গবেষণায় নিমগ্ন আছেন। বিগত ইংরাজী ১৯৫৩ ও ১৯৫৫ সালে হাওড়া জেলা সঙ্গীত সম্মেলনে ইনি কণ্ঠ সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করেন।

কণ্ঠ সঙ্গীতে শচীনবাবুর দরাজ কণ্ঠ ভাবতন্ময়তা—বিভিন্ন ধরণের তান মাধুর্য্য সুরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ জনমনে যথেষ্ট রেখাপাত করে। সঙ্গীত পরিবেশনের সময়ে তাঁহাকে যেন এক ভাবমগ্ন সাধক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইনি প্রচলিত ও অপ্রচলিত এই উভয়বিধ রাগ পরিবেশনে সমান পারদর্শী। ইনি কি কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশনে, কি বাংলা খেয়াল ও ঠুংরী রচনায়, কি সঙ্গীত প্রবন্ধ রচনায়, কি পুস্তক প্রণয়নে, কি লয়দারীতে সমান রূপে পারদর্শী। ইনি সার্থক শিল্পী।

ইনি সঙ্গীতে স্বর সমূহের উৎপত্তির তথ্য বাহির করিয়াছেন যাহা প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীত জগতে এক বিরাট আলোড়নের শুভ সূচনা হইবে বলিয়া আমরা আশা রাখি।

[শ্রীদামোদর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত

নীলকণ্ঠ

আঠারো

মহাবীর রঘুবীর ভক্ত পবননন্দন বললেন, তুলসীদাসকে চিত্রকূট পাহাড়ে যেতে। শ্রীরামপদস্পর্শে পবিত্র চিত্রকূট ; সাধনার বিচিত্র কূট রহস্য অবগত হবার উপযুক্ত পরিবেশধন্য স্থান। সেইখানে সাধনাসনে অবস্থান করতে করতেই তুলসীর স্থূলদৃষ্টির সামনে আবির্ভূত হবেন পরমসাধ্য পদ্মলোচন সীতাপতি ; রঘুপতি রাঘব রাজারাম। চিত্রকূট পর্বতের দিকে চললেন সাধক-কবি গোস্বামী তুলসীদাস। পথ চলেন রাম নাম করতে করতে ; শ্রীরাম প্রণাম করতে করতে চলেন কবিকুলচূড়ামণি। শ্রীরাম নামে, শ্রীরাম প্রণামে মধু ক্ষরিত হতে থাকে আকাশে বাতাসে। মধুময় হয় দ্যুলোক, ভূলোক। কত সূর্যোদয়, কত সূর্যাস্ত রাম নামে রাঙা হয় সেই ভক্ত কবির কঙ্কণ রঙীন পথ।

চিত্রকূট পর্বতে পৌঁছন সাধক ; শ্রীরামসিন্ধুর সন্নিকট হয় শ্রীতুলসী নদ।

চিত্রকূট পর্বতের এক কোণে তপস্যায় আসীন হলেন তুলসীদাস। একদিন চন্দন ঘষছেন ভক্ত, এমন সময় এক দুর্নিবার আকর্ষণযুক্ত দুরন্ত বালক এসে দাঁড়ায় দ্বারপ্রান্তে। প্রভাতের প্রথম আলো এসে পড়েছে পায়ের কাছে। সেই আলোয় যেন এসে দাঁড়িয়েছে আলোর চেয়েও আলোকময় এক শতদল। কি আশ্চর্য বরতনু সেই বালকের। দিব্য বিভায় জ্যোতির্দীপ্ত সেই আনন। কমলফুল বলে ভুল করে যে মুখে এসে বসছে মধুলোভাতুর অসংখ্য অলি। কি চায় এই নবদূর্বাদলশ্যামাঙ্গ ? তুলসী তাকান : 'কি চাও তুমি, বাচ্চা ?' হাসিতে ভুবন আলো করে বালক হাত বাড়ায় চন্দনের থালার দিকে। তড়িৎগতিতে থালা সরান তুলসী। শ্রীরামথাল্য থেকে চন্দন তুলে নিতে চায়, এ কে। তড়িতালোকে স্মৃতির আকাশ থেকে অপসারিত হয় বিস্মৃতির যবনিকা। মনে পড়ে যায় এমনই একবার তাঁর আরাধ্য দেবতা রঘুপতি রাঘব রাজারাম তাঁকে দেখা দিয়েও দেখা দেননি। ভক্ত হনুমান সেবারে বলেছিলেন, যে রামনবমীর পুণ্য তিথিতে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং দেখা দেবেন শ্রীরামভক্তকে।

সেই পুণ্য রামনবমীতে যখন শ্রীরামচন্দ্রের দেখা না পেয়ে নিভৃত কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তুলসীদাস তখন তাঁর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল একদল যাযাবর। বাঁদর নাচ দেখাবে তারা সাধককে। ক্রুদ্ধ, কুপিত কবি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বেদের দলকে। তার পর পবননন্দন ভুল ভেঙে দিয়েছিলেন তুলসীর। তাঁরাই গিয়েছিলেন বেদের বেশ ধরে,—শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ এবং হনুমান সেদিন ভক্তের কুটিরদ্বারে। সেই ছলনার কথা আজ আবার মনে পড়ে তুলসীর। তুলসীতলায় জ্বলে ওঠে জীবনদেবতার দীপ। সেই দীপালোকে চিনতে পারেন যেন বালককে ; এই সেই নবদূর্বাদলশ্যাম রাম। সেই চেনার আলোকে অচেনার আরতি করেন কবি :

> বালক শুনহু বিনয় মম এহু।
> তুম্ শ্রীরামচন্দ্র কি দুসর কেহু ?

কমল আঁখির কোণে অমরাবতীর হাসি ছড়িয়ে পড়ে ; বাঁধ ভেঙে উছলে পড়ে আলো : সকল শ্রীরাম অবতারা ! বালক বিদায় নিলে ধ্যানাবিষ্ট তুলসী লিখলেন চোখের জলে :

> চিত্রকূট কে ঘাট পর ভাই সন্তন কী ভীড়।
> তুলসী দাস চন্দন ঘসৈ তিলক দেই রঘুবীর।

[—ভারতের সাধক : তৃতীয় খণ্ড]

সাধক তুলসীদাসের রামায়ণ, রামচরিতমানস,—সেই শ্রীরাম-দর্শন !

চিত্রকূট থেকে বৃন্দাবনের পথে পা বাড়ালেন কবি। বৃন্দাবনে মদনগোপালের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে রামদর্শনাভিলাষী তুলসীদাস যুক্ত করে নিবেদন করেন :

> কহা কহোঁ ছবি আজকী ভালে বনে হো নাথ।
> তুলসী মস্তক তব নোয়ে ধনুষ বাণ লেও হাত।।

হে মুরলী-মুকুটরাজ মদনগোপাল, তুমি একবার ধনুর্বাণ হাতে দাঁড়াও আর একটি নমস্কারে তুলসীদাসের নরদেহ লুটিয়ে পড়ুক অমরদেহর পায়ে !

বাঁশী ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মদনগোপাল ; হাতে তুলে নিয়েছিলেন তীরধনুক ! শ্রীরামপাদপদ্মে চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল 'তুলসী'-পত্র !

বৃন্দাবন থেকে অযোধ্যায়। শ্রীনাম ধ্যান থেকে তখন জন্ম নিয়েছে শ্রীরাম-গান ; শ্রীরামচরিত মানস।

> দয়া ধরমকি মূল হৈ
> নরক মূল অভিমান।
> তুলসী মৎ ছোড়িয়ে দয়া
> যব্ কণ্ঠাগত প্রাণ।।

তুলসীর দোঁহা তখন উত্তর ভারতের পথে প্রান্তে বিকীরণ করছে আশ্চর্য আলো। সেই আলোয় নিদ্রিত হৃদয়ের কলুষ মোচন হচ্ছে ; জেগে উঠছে ভক্তির দলের পর দল মেলে ভক্ত শতদল। সেই ভক্তদের দেওয়া মূলবান দান অপহরণ করতে এসেছে একদিন একজন তস্কর। রৌপ্যনির্মিত পাত্রের দিকে হাত বাড়াবার আগেই, নবদূর্বাদলশ্যাম একজন ধনুর্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান ; নিত্যপ্রহরায় নিযুক্ত। তুলসীদাসকে প্রভাতে সেই তস্কর সাধু সেজে এসে জিজ্ঞেস করে

ধনুর্ধারীর পরিচয়। সেই চোরের মুখে ধনুর্ধারীর রূপের কথা শুনে তুলসী বলেন: আমি যাঁর দর্শন পাইনি আজও, তুমি পেয়েছ তাঁর রূপের সাক্ষাৎ। সেই অপরূপের দর্শনধন্য কে তুমি ভাগ্যবান জানি না ভাই; তোমার আলিঙ্গনে আজ আমাকে পূত কর, পবিত্র কর, যোগ্য করো, তাঁকে দর্শনের যোগ্য; যোগে অথবা যজ্ঞে যিনি নেই।

তুলসীদাসের আলিংগন-বাক্যে দস্যু রত্নাকর মুহূর্তে স্বীকার করে নিজের অপরাধ; আর ভিক্ষা করে মার্জনা। তুলসীর মন তখন চলে গেছে অনেক দূরে। তাঁর সামান্য বিত্তের রক্ষণাবেক্ষণ করতে স্বয়ং প্রভু রামচন্দ্রকে পাহারা দিতে হয় সারা রাত জেগে,—এ দুঃখ তুলসী রাখবেন কোথায়। 'জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই; ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে'। যতক্ষণ রাম ছাড়া আরও কোনও উপকরণের আছে প্রয়োজন, ততক্ষণ দেখা দেবে কেন সেই ধনুর্ধারী? যতক্ষণ সামান্য বাঁকাচোরাও ঘরেতে আছে পোরা ততক্ষণ পোরাবে কেন মনোবাঞ্ছা সেই ধনুর্ধর? দ্রৌপদী যতক্ষণ কাপড়ের খুঁট চেপে ধরে, ততক্ষণ কৃষ্ণের দেখা নেই। যখন সম্পূর্ণ নিঃসহায় দ্রৌপদী হাত তুলে দিলেন শূন্যে, হা কৃষ্ণ তুমি কোথায় বলে, তখনই শূন্যকে পূর্ণ করে দেখা দিলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মভূষণ। যে সব ত্যাগ করেছে, সর্বত্যাগী যে সেই পায় গীতার পুরুষোত্তমকে। কুন্তীকে বর দিতে স্বীকৃত শ্রীকৃষ্ণ যখন জানতে চাইলেন কুন্তী কি চায়, তখন কুন্তী বললেন: আমার জীবনাকাশ থেকে কখনও দুঃখের কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দূর কোরো না তুমি। কারণ দুঃখ দূর হলেই, দুঃখহরণও হন দূর হবেন। আরাম হারাম হায়। আরাম ত্যাগ করে, হারাম জ্ঞানে পরিত্যাগ করে আরামের উপকরণ। 'হা রাম' বলে শ্রীরাম সর্বস্ব হলে তবেই দর্শন দেন, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।

তুলসী বিলিয়ে দিলেন সব সঞ্চয়। শুধু হাতে-লেখা রামচরিত-মানসের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত হলো তুলসীর বন্ধু-গৃহে। তুলসীতলায় শ্রীরামশঙ্খে ফুঁ পড়ল এতদিনে; জীবনতুলসী মুঞ্জরিত হবার শুভ মুহূর্ত হলো সমাগতপ্রায়।

সিদ্ধবাক শ্রীরামসাধক তুলসীর কাছে এলো এক অমোচনীয় পাপ-দাহের অন্তর্জালায় অহরহ দগ্ধ একজন। ব্রাহ্মণবধের পাপ তার কোন্ প্রায়শ্চিত্তে হবে নির্মূল। তুলসী বললেন: শ্রীরাম নাম নাও। সব পাপ হবে পুণ্য; সব পূর্ণ হবে শূন্য। সমাজ আর শাস্ত্র, পুঁথি আর পণ্ডিত বললে: রামনামের যদি এত জোর, এত জাদু যদি রামপ্রণামে তবে মন্দিরের মধ্যে রয়েছে এই যে পাথরের ষাঁড়,— এ গ্রহণ করুক রাম নাম উচ্চারণে পাপমুক্ত এই পাতকের হাত থেকে তৃণগুল্ম। তুলসী বললেন: তবে তাই হোক। রাম নামে প্রকম্পিত মন্দির-প্রাংগণে চৈতন্য লাভ করলো খুলচক্ষে জড়,—সেই বৃষ। প্রকম্পিত হলো তার প্রস্তর-কলেবর। পাথরের বুক বিদীর্ণ ক'রে বইল কৃপার জাগ্রত নদী; বসুধার বুক বিদীর্ণ করে যেমন উচ্ছ্বসিত হয় সুধার ঝর্ণাধারা। অহল্যার পাষাণে যদি প্রাণ সঞ্চার হয় শ্রীরামচন্দ্রের পদস্পর্শে, তবে কেন শিলায় শিলায়, বৃষস্কন্ধে তার শিরায় শিরায় বইবে না রাম নামে, রামপ্রণামে প্রবল প্রাণবন্যা? রৌদ্রতপ্ত শাস্ত্রের অকূপার, কণ্ঠলগ্ন শাস্তির অকরুণায় জীবন যখন শুধায়ে যায়, তখনই যদি না তুমি, 'করুণাধারায় এস' তবে তুমি কেমন ভক্তের ভগবান?

রঘুবীরজনক এমনই কোনও পাপের দুঃসহ জ্বালা জুড়োতে গিয়েছিলেন, জানতে গিয়েছিলেন ত্রিকালজ্ঞ ঋষির কাছে প্রায়শ্চিত্তের উপায়। শ্রীরাম নাম করতে বলেছিলেন ঋষির অবর্তমানে ঋষিপুত্র সেদিন। তিনবার রাম নাম করলেই, শ্রীরামচন্দ্রের পিতার সব কলুষ মুক্ত হবে,—এই অমৃতবাণী দশরথের মৃত উৎসাহে আশার সঞ্চার করলেন। ফিরে গেলেন হৃষ্টচিত্তে ঋষির আলয় থেকে রাজালয়ে। ঋষি আশ্রমে ফিরে শুনলেন তাঁর পুত্র তিনবার রাম নামে কলুষমুক্তির সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের কথা। প্রসন্নচিত্ত, সৌম্যদর্শন ঋষিচিত্ত জ্বলে উঠল দাবানলের মত; ঋষির আনন আদিত্যবর্ণ ধারণ করল ক্রোধে। তিনি বললেন, যে নাম একবার করলে একাধিক জন্মের সমস্ত পাপ অবসান হয় চক্ষে পলক পড়বার পূর্বেই, সেই পুণ্য, পবিত্র, পূর্ণতার প্রতীক রাম নাম তিনবার করতে বলে যে অন্যায় করেছেন তাঁর আত্মজ তার জন্যে পিতা হয়ে তিনি দিচ্ছেন পুত্রকে অভিশাপ।

রাম নামে যদি মুক্তি না আসে, ভগীরথ প্রণামে যদি না নামে শিবের জটামুক্ত হয়ে জাহ্নবীর মুক্তধারা, ভগবানের পায় যদি না থাকে অমৃতের উপায় তবে ভক্ত নিরুপায়।

দিল্লীশ্বর সাজাহান যোগী তুলসীর সম্বন্ধে প্রচলিত বহু উপাখ্যানে আকৃষ্ট হয়ে ডেকে পাঠান তুলসীকে; বলেন, অলৌকিক শক্তি দেখাতে। জগদীশ্বরের সেবক দিল্লীশ্বরের কথায় অলৌকিক ক্ষমতার অপব্যবহার করতে অসম্মত হন। সম্রাট তাঁকে কারাগারে বন্দী করেন। শ্রীরামভক্ত বন্দী হলে, দিল্লী জুড়ে শুরু হয়ে যায় হনুমানের লংকাকাণ্ড। জগতের যিনি সম্রাট তিনি যাঁকে পাঠিয়েছেন মুক্তপুরুষ করে সে পুরুষকে দিল্লীর সম্রাট বন্দী করবে কেমন করে। অবিলম্বে সভাসদদের সুপরামর্শে, হনুমানের আবির্ভাবে ভীত প্রজাদের আর্তনাদে অশুভের আশংকায় সাজাহান মুক্ত করে দেন শ্রীরামভক্তকে।

এই তুলসীদাসই আবার সামান্য লোকের, অতি সাধারণ স্ত্রীলোকের দুঃখে তাদের শত অনুরোধ উপরোধ এড়াতে না পেরে অলৌকিক শক্তিপ্রয়োগ করতে বাধ্য হতেন। যেমন সেবার মণিকর্ণিকার ঘাটে সদ্যবিধবার প্রণামের উত্তরে আশীর্বাদ করেন: পতিপুত্রবতী হয়ে সৌভাগ্যসুখ ভোগ কর। স্বামীর শবের দিকে সাধকের দৃষ্টি পড়া মাত্র, শবের ওপর আরম্ভ হয় আবার জীবনের উজ্জ্বল উৎসব।

এমনই হয়; এমনই হবার কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি বলেন তবে একই গাছের একই ডালে সাদা এবং লাল দুই রং-এর, দুই রূপের, দুই অপরূপ ফুল ফুটবে। প্রকৃতির নিয়ম পালটে যাবে পরমা প্রকৃতির নির্দেশে।

তুলসীর কাব্য-জীবনের বাণী: দয়া ধরমকি মূল হৈ, তুলসীর জীবন-কাব্যের বাণীও নিঃসংশয়ে।

কাশীর অতি দীন-ব্রাহ্মণ এসে কেঁদে পড়ে তুলসীর দু'পায়; উদ্দেশ্য দাঁড়াবার, মাথা গোঁজবার জন্যে তার এক টুকরো জমির উপায়। রাম নামে রত তুলসীদাস গঙ্গাকে বলেন নিরুপায়ের উপায় হতে। গঙ্গা সরে যান তীর থেকে। মুক্ত জমি পায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ সাধকেরই সাহায্যে। এই একবার নয়; বার-বার। চিত্রকূটেও তাঁর দেওয়া দারিদ্র্য-হর কবচে এক চিরদরিদ্রের দুঃখ মোচন হয় অচিরেই।

[ভারতের সাধক : তৃতীয় খণ্ড]।

তীর্থকাব্য এবং কাব্যজীবনের সাধনায় অভিন্ন অপরাজিত তুলসীদাসের রামায়ণকে না জানলে কাশীকে জানা যাবে না। রামায়ণ যার মহাভারতের দেশ এই ভারতবর্ষ, তার আত্মার মূলমূর্তি এই কাশী। ভোর থেকে নেমেই কানে আসবে পূজাধ্বনির; শঙ্খ-ঘণ্টা নিনাদের। তার অলিতে-গলিতে, গংগার ঘাটে-ঘাটে চলেছে রামায়ণ-পাঠ; রামায়ণ কথা। সেই রামায়ণ-পাঠের উচ্চারণ শাস্ত্রসম্মত কি না জানি না; আর ব্যাখ্যা পণ্ডিত সংগত কি না, তা-ও না। শুধু জানি, তুলসীদাস অনাদিকালের ভারত-জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসার উত্তর জ্ঞানে নেই; নেই বিজ্ঞানে। আছে। রাম-গানে। এই গানের সুর তুলসীদাসের অন্তরকে বলে বার-বার: সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। বিদেশী পর্যটকও বিস্মৃত হননি সে বার্তা:

'You may spend hours on the ghats and in the streets and temples watching the old-world customs and the simple faith of the common people, who, however misguided, show an earnestness and deep religious feeling which many conventional christians might study with advantage.'

[Benares, the sacred city : E. B. Havell.]

এই কাশী সেই কাশী যেখানে 'অন্বেষণের' পালা আজও শেষ হয় নি; 'অশেষ'কে অন্বেষণের।

[ক্রমশঃ।

পুরাতনী রহস্যময়ী ভেনিস

স্বপ্নপুরী বিচিত্র নগরী ভেনিস, পৃথিবীর এক অতি পুরাতন সভ্যতার স্মৃতিসৌরভ চলে আজও তার আকাশে বাতাসে।

ইটালীর এই বিখ্যাত সহরটি আজও অতীতকে যেন মূর্ত্ত করে তোলে পরিব্রাজকের চোখে।

বহুদিনের সখ ছিল এই বিচিত্র সহরটিকে একবার দেখবার, কাজেই বিভাগে ছুটির ঘণ্টা যেদিন বাজলো, তল্পি-তল্পা গুছিয়ে নিতে আর দেরী করলুম না।

রাতের আঁধারেই প্রথম পরিচয় ঘটলো মোহময়ী ভেনিসের সাথে, ষ্টেশনে নামার সঙ্গে সঙ্গে একদল ইটালিয়ান ঘিরে দাঁড়াল আমাদের। অনর্গল কলকলানির ভেতর থেকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী শব্দগুলি জুড়ে নিয়ে বুঝলাম এরা স্বপ্ননগরীর হোটেল-দালাল, প্রত্যেকেই তারস্বরে বোঝাতে চায় যে, তার জানা হোটেলটিই একমাত্র উত্তম, বাকিগুলি অধম।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল দেশের কথা, পাণ্ডা নামক জীবটি বোধহয় দুনিয়ার সর্ব্বত্রই ছড়ানো, দেশভেদে শুধু তার রূপটাই আলাদা হয় রীতি সেই এক সনাতন। ভেনিসের বৈশিষ্ট্য তার প্রায় সব পথই জলপথ, সহরের প্রধানতম পথটিকে বলা হয় গ্র্যাণ্ড ক্যানাল, এর বহুতর শাখা প্রশাখা বাহুর মতই প্রসারিত হয়ে সব জলপথগুলিতে সংযোগ রক্ষা করে।

গণ্ডোলা বা একজাতীয় ডিঙ্গি নৌকাই ভেনিসের সর্ব্বজনপ্রিয় যান, রাস্তা বলতে যেখানে খাল, যানবাহন বলতেও তাই জলযান ছাড়া আর কি হবে? গণ্ডোলা ইটালী তথা ভেনিসের বহু পুরাতন বৈশিষ্ট্য হলেও আধুনিক যুগে ভেনিসের জল-রাজপথে মোটরলঞ্চও চলে থাকে। ভাড়ার দিক থেকে শেষোক্ত জলযানেই মানুষের সুবিধা বেশী, অবশ্য প্রথম দিন বৈচিত্র্যের খাতিরে আমি ও আমার সহযাত্রী বান্ধব, একটা গণ্ডোলারই সওয়ার হয়েছিলাম।

গণ্ডোলিয়ার (গণ্ডোলার চালক) নিয়ে চলল আমাদের নির্দ্দিষ্ট হোটেলটির উদ্দেশে; রাতের আঁধারে গ্র্যাণ্ডক্যানালের কালো জলের উপর দু পাশের অট্টালিকা থেকে নানা রংএর আলোর ছটা লেগে সৃষ্টি হয়েছে যেন এক বিচিত্র রামধনুর, বিশেষতঃ বড় বড় দোকান ও রেস্তোঁরাগুলির বর্ণোজ্জ্বল সুষমা জলের বুকে যেন ইন্দ্রজাল রচনা করে। ভেনিসের বাড়ীগুলিও বহু পুরাতন স্থাপত্য রীতিতে তৈরী, আধুনিক যুগের স্কাইস্ক্রেপার আজও দৃশ্যমান নয় সেখানে। গথিক পদ্ধতিতে তৈরী বিশাল বিশাল প্রাসাদগুলির মাঝ দিয়ে [illegible] সেতু দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে দুধারের অট্টালিকা সমূহকে। সেই রকম একটি বাঁকা সেতুর তলায় এসে হঠাৎ মনে হোল, রোমিও জুলিয়েট কি একদিন এখানেই অভিসার করেন নি? সত্য বলতে কি রোমিও জুলিয়েটের কালে যা ছিল আজকের ভেনিসের বাহ্য রূপে অন্ততঃ তার চেয়ে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি, আর আমাদের চোখে প্রায় প্রত্যেক ইটালীয়ন তরুণীই জুলিয়েট, প্রত্যেক যুবকই রোমিও।

রূপের দিক দিয়ে ইউরোপের অন্যান্য জাতির চেয়ে ইটালীয়ানরা অনেক শ্রেষ্ঠ, অন্ততঃ আমাদের ভারতীয় চক্ষুতে, কারণ সাদা রংএর উগ্রতা তাদের মধ্যে একেবারেই নেই, কেমন যেন স্বর্ণাভ বর্ণ, তার সঙ্গে চোখ ও চুল কালো, সত্যই অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত তাদের রূপ, দেখে দেখে যেন আশ মেটে না।

যাক্‌গে রূপ দর্শনে তৃপ্ত হিয়া একটা বিরাট চমক খেলো, গণ্ডোলিয়ারের দাবী শুনে, বেশ কয়েক শত লীরা (ইটালীয়ান মুদ্রা) তার হাতে দর্শনী দিয়ে সেতুপথে হোটেলে পাড়ি জমানো গেল।

ভেনিসের হোটেল রেস্তোরাগুলির দক্ষিণা অত্যন্ত অধিক, সেজন্যই ইটালীয়ানরা সচরাচর দোকান থেকে খাদ্য দ্রব্যগুলি কিনে নিয়ে বাইরেই খাওয়া দাওয়া সেরে নেয়, বলা বাহুল্য যে কদিন ছিলাম আমরাও মহাজনের পথ অবলম্বন করতে দ্বিধা করিনি।

গ্রীষ্মে ভেনিস যথোচিত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, সে সময় সমুদ্র স্নানও বেশ লোভনীয় এক প্রমোদ, মূল সহরের কয়েক মাইলের মধ্যে অবস্থিত লিডোই এই প্রমোদের কেন্দ্র, উপকূলবর্ত্তী এই ছোট্ট দ্বীপটি গরমের দিনে সরগরম হয়ে ওঠে স্নানার্থী ও সন্তরণ পিপাসুদের ভিড়ে।

ভেনিসে এক খাঁটি ভেনিসীয়ান বিবাহ দেখবার দুর্লভ সুযোগও ঘটেছিল আমাদের একদিন, সে সত্যই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য; গণ্ডোলায় গণ্ডোলায় ভজনালয়ের সামনের জলপথটি ভরে গিয়েছিল, রঙীন বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত নিমন্ত্রিতেরা শোভা পাচ্ছিলেন, নানা রংএর জলজ কুসুমের মতই, তারই মধ্যবর্ত্তী হয়ে এল বর-কনের পুষ্পশোভিত গণ্ডোলাখানি, ফুলে ফুলে ঢেকে গেল সঙ্কীর্ণ সেতুপথটিও, তার উপর দিয়ে বর কনের মিছিল প্রবেশ করল ভজনালয়ে।

সামান্য কটি দিনের ছুটি ফুরিয়ে এল, স্মৃতি সমাকীর্ণ হৃদয়ে একদিন বিদায় জানালাম ভেনিসকে, ফিরে চললাম ইট কাঠ লোহের যান্ত্রিক সভ্যতার জগতে—পিছনে পড়ে রইল; হারানো যুগের রঙীন অবশেষ, বিচিত্রা, মোহময়ী, স্বপ্নময়ী ভেনিস।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সবে সন্ধ্যে তখন। এরই মধ্যে বাড়ি ফিরলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা বা মানুকের কচকচি শোনা ছাড়া আর কাজ নেই। দু' দুটো কাজের তাড়া মিটে যেতে অফিস ছুটির পরে অখণ্ড অবকাশ। কিন্তু আজ এক্ষুনি বাড়ি ফিরে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেও সময় ভালো কাটবে, সময় কাটানোর কিছু রসদ পার্বতী দিয়েছে। তবু এক্ষুনি ফেরার ইচ্ছে নেই ধীরাপদর, কারণ, ওই রসদ ঠুকরে ঠুকরে শেষে এক দুর্বল আসক্তির বন্ধ দরজায় নিজের শুকনো ঠোঁট ঘষার ইচ্ছে নেই। ওতে লোভের ইশারা আছে, সে ইশারা কত প্রবল কিছুদিন আগেও ধীরাপদ এতটা উপলব্ধি করেনি। তার অন্দরমহলের নিরাসক্ত দর্শকটি কবে নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে। তাই যে-কোনো অজুহাতে যখন-তখন সেই নিভৃতে গিয়ে হানা দিতেও দ্বিধা এখন।

ধীরাপদ সরাসরি মেডিক্যাল হোমে এসে উপস্থিত। আর একদিনের মতই রমেন হালদারকে বাইরে ডেকে নেবে, তারপর বসবে কোথাও। তার কথা শোনা দরকার, শুনতে শুনতে তার মুখখানা বেশ ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার, আর সব শেষে তাকে কিছু বলাও দরকার। এলো বটে, কিন্তু আসার তাগিদটা তেমন আর অনুভব করছিল না। বলার আছে কি, কাঞ্চন যাকে ভাবছে সে কাচ ছাড়া আর কিছু নয়—তাই বোঝাবে বসে বসে?

দোকানে সান্ধ্য ভিড় লেগেছে। খদ্দেরের ভিড় আর লাবণ্যর রোগীর ভিড়। কিন্তু দোকানে ঢুকে এক নজর তাকিয়েই বুঝল পার্টিসন-ঘরের ওপারে লাবণ্য অনুপস্থিত। অবশ্য তার আসার সময় উত্তরে যায়নি এখনো। মনে মনে ধীরাপদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা, তার সঙ্গে এখানে দেখা না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় ছিল কেন জানি।

কাউন্টারে রমেন হালদারকেও দেখা গেল না। এদিক-ওদিক কোথাও না। ভিতরে থাকতে পারে। ধীরাপদ ভিতরে ঢুকে পড়বে কি-না ভাবল, কাঞ্চন কেমন কাজ করছে দেখে গেলে হয়। কিন্তু তার আগে ভিড়ের ফাঁকে ম্যানেজারের চোখ পড়েছে তার ওপর। ঈষৎ ব্যস্ততায় কাউন্টারের ও-পাশ ঘুরে বেরিয়ে আসছেন তিনি। আজও ওকে দেখলে ভদ্রলোক বিব্রত বোধ করেন বেশ।

মিনিট পাঁচ সাত দোকানে ছিল, তারপর বাড়ির দিকে পা বাড়াতে হয়েছে। রমেন আসেনি। ম্যানেজারের দ্বিধাগ্রস্ত দুই গোল চোখে ছেলেটার পরে অভিযোগের আভাস ছিল। ধীরাপদর নরম আচরণে ভরসা পেয়ে ভদ্রলোক সেটুকু ব্যক্ত করেছেন। প্রয়োজনে ওদের ডিউটি উল্টে পাল্টে দিয়েছেন তিনি, রমেনের আর ওই কাঞ্চন মেয়েটির। মেয়েটির দশটা-পাঁচটা ডিউটি করেছেন, তা সে-ও আজ বাড়িতে জরুরী কাজের কথা জানিয়ে ছুটোর সময় ছুটি নিয়ে চলে গেছে। রমেনের তিনটে থেকে দশটা ডিউটি এখনো আসেনি যখন আর আসবেও না। কোনো খবরও দেয়নি আগে দু'দশ মিনিটের ছুটি দরকার হলেও বলে রাখত, বলে যেত এখন দু-ঘণ্টা এদিক-ওদিক হলেও বলা দরকার মনে করে না জিজ্ঞাসা করলে চুপ করে থাকে। শুধু জেনারাল সুপার ভাইঝি নয়, এখানকারও অনেকে ছেলেটাকে ভালবাসে। কিন্তু কিছুদিন হল ছেলেটার মতিগতি বদলাচ্ছে, বিশেষ করে ওই মেয়েটি এখানে চাকরিতে ঢোকার পর থেকে।

মুহূর্তের জন্য ধীরাপদ তেতে উঠেছিল, ওপরতলার উঁচু মেজাজে বলেছিল, আপনি রিপোর্ট করেন না কেন? বলেই মনে পড়ল রিপোর্ট উনি করেছেন, লাবণ্য সরকার ম্যানেজারের নাম করে এ প্রসঙ্গে তাকে দুই এক-কথা বলেছিল। ভদ্রলোকও সে-কথাই জানালেন—রিপোর্ট করা হয়েছিল, শুনে মিস সরকার চুপ করে ছিলেন।

ম্যানেজার মুখে না বলুন মনে মনে তিনি শুধু ওই মেয়েটিকেই দায়ী করেন নি নিশ্চয়। একজনের পরিপুষ্ট প্রশ্রয় না থাকলে ছেলেটার চাল-চলন এ-ভাবে বদলায় কি করে?···খুব মিথ্যেও নয় বোধহয়। না, আর প্রশ্রয় দেবে না ধীরাপদ, এর বিহিত করবে, কড়া কৈফিয়ত নেবে। কিন্তু বাড়ি পৌঁছুবার আগেই মত সংকল্পটা কখন এক বিপরীত বিশ্লেষণের মধ্যে নিরর্থক হয়ে গেল নিজেও ভালো করে টের পায়নি। কৈফিয়তই বা কি নেবে, বিহিতই বা কি করবে। প্রবৃত্তির এ অমোঘ সম্মোহন থেকে কে কবে অব্যাহতি পেল? ও বস্তুটিকে লাগামের মুখে বাঁধার জন্যে মহাপুরুষদেরও কি কম চাবুক চালাতে হয়, কম ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়? ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরও সত্তার কণায় কণায় কামনার কাঁপন লাগে কেন? চোখ কে কাকে রাঙাবে, নিয়মের রাস্তা খোলা না থাকলে অনিয়মের রাস্তায় না হেঁটে করবে কি রমেন হালদার?

ধীরাপদর হাসি পাচ্ছে, রমণী নাকি অবলা, দুর্বল। কিন্তু ওটুকুই বোধহয় বিধাতার [illegible]

…মা দিয়ে পাঠিয়েছে বিধাতা? কাউকে খোলস দি… …খদন্ত দিয়েছে, কাউকে বাকল দিয়েছে। রমণীকে অবলার …দিস দিয়েছে—ওটা খোলস। ওর আড়ালে সৃষ্টির আর বিপর্যয়ের শক্তি। খানিক আগে চারুদির অন্যায় কিছু প্রস্তাব করা বা বড় সাহেবকে দিয়ে অন্যায় কিছু স্বীকার করিয়ে নেওয়ার কথা বলছিল পার্বতী, আর ধীরাপদ বলেছিল, অন্যায় মনে হলে বড় সাহেব তা করবেন কেন। পার্বতী জবাব দিয়েছে, মা কাছে থাকলে করবেন। মা করাতে পারেন'।

ধীরাপদর মনে হল, শুধু চারুদি নয়, পারে সকলেই—নারী মাত্রেই। চারুদি পারে, পার্বতী পারে লাবণ্য সরকার পারে, সোনাবউদি পারে, রমণী পণ্ডিতের মেয়ে কুমু পারে, কারখানার শ্রমিক তানিস সর্দারের বউটা পারে আর পথের অপুষ্ট যৌবন-পসারিণী কাঞ্চনও পারে। আওতার মধ্যে পেলে সকলেই পারে।

কানের কাছটা গরম ঠেকতে ধীরাপদ আত্মস্থ হল। যে-কারণে নিজের অন্দরমহলে হানা দিতে দ্বিধা আজকাল, নিঃশব্দে সেদিকেই পদসঞ্চার ঘটছে অনুভব করা মাত্র চিন্তা-বিস্মৃতির ঝোঁক কাটল। মন ছেড়ে চারুদির পারা আর কাঞ্চনের পাগাব নিভৃতে ভিতরটা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, সেদিক থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এলো কাউকে॥

ঘরে ঢুকে জামার বোতাম খোলা হয়নি তখনো, মানুকের আগমন ঘটল। তার দিকে এক নজর চেয়েই ধীরাপদর মনে হল সংবাদ আছে। অন্যথায় তার সদা ক্রুদ্ধ মুখে নিস্পৃহ স্বাভাবিক অভিব্যক্তি বড় দেখা যায় না। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, বাবু খাবেন নাকি কিছু?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, এ-সময়ে কিছু খাবে না।

এই জবাব মানুকের জানাই ছিল, কর্তব্য বোধে খোঁজ নিয়ে গেল, এবারে ফিরলেই হয়। যাবার জন্য পা বাড়িয়েও ঘুরল আবার, এই রকমই রীতি তার। কথায় কথায় বলল, ছোট সাহেবের শরীর বেশ খারাপ হয়েছে বোধ হয় বাবু, সেই বিকেল থেকে শুয়ে আছেন। কেয়ারটেক্ বাবু শুধাতে বললেন শরীর ভালো না। এখনো শুয়ে আছেন, ঘরে বড় আলোটাও জ্বালেন নি, সবুজ আলো জ্বলছে।

চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে ধীরাপদ অপেক্ষা করল একটু। মানুকের ভীরু হাবভাব আর চোঁক গেলা দেখেই বোঝা যায় তার সমাচার শোনানো শেষ হয়নি। বলবে কি বলবে না সেই দ্বিধা, তারপর বলেই ফেলল, মেমডাক্তারও খপর পেয়েই দেখতে এয়েছেন বোধহয়—

জামার বোতাম খোলা হল না ধীরাপদর, হাতটা আপনি নেমে এলো। জিজ্ঞাসা করল, কখন এসেছেন?

এই তিন পো ঘণ্টা হবে।

বাইরে কোন গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই মনে হতে আবারও জিজ্ঞাসা করল, চলে গেছেন?

না, এখনো আছেন। যাই, ভাত চড়িয়ে এসেছি অনেকক্ষণ—

মানুকের চকিত প্রস্থান। ধীরাপদ বিছানায় বসল, ভিতরে ওটা কিসের প্রতিক্রিয়া বোঝা দরকার। কিন্তু বোঝা হল না, ভিতর থেকে কি একটা তাগিদ ঠেলে আবার তাকে দাঁড় করিয়ে দিতে চাইছে।···ছোট সাহেবের অসুস্থ হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়, তিন-কোয়ার্টার ঘণ্টা সময় ডুবেছে আর ছোট সাহেবের ঘরে সবুজ আলো জ্বলছে।

না, যে তাগিদটা অন্ধের মত ভিতর থেকে ঠেলেছে তাকে তা সে করবে না, কোনো ভদ্রলোকের তা করা উচিত নয়। তবু উঠে পায়ে পায়ে হল-ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল সে। ধীরাপদ আসেনি, তার আসার ইচ্ছেও নেই—যে পতঙ্গ একদিন শিখা দেখেছিল সে-ই ঠেলে নিয়ে এলো তাকে। ওটা আবার যেন শিখার আঁচ পেয়েছে।

ধীরাপদ নিজেকে চোখ রাঙাল, ঘরের দিকে গলা ধাক্কা দিতে চেষ্টা করল বার-কতক, তারপর সিঁড়ি ধরে উঠতে লাগল। ঘরে এসে রাবার স্লিপার পরেছিল, শব্দ নেই। নিজের পায়ের শব্দ কানে এলেও হয়ত সচেতন হতে পারত, থামতে পারত। সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে আরো দ্রুত উঠতে লাগল, পাছে দহন-লোভী পতঙ্গটা ওর চোখ-রাঙানি দেখে ভয় পায়, হার মানে। কি হবে? মানুকের মুখে অসুস্থতার খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি দেখতে এসেছে, বড় সাহেবের অনুপস্থিতিতে দেখতে আসাটা কর্তব্য ভেবেছে। মানুকের চাকরি যাবে? চাকরি এখন কে কত নিতে পারে তার জানা আছে।

সিঁড়ির ডাইনের ঘরটায় শাদা আলো জ্বলছে। তারপর বড় সাহেবের ঘরটা অন্ধকার। তার ওধারে ছোট সাহেবের ঘর। বড় সাহেবের অন্ধকার ঘরের মাঝামাঝি এসে পা দুটো স্থাণুর মত মাটির সঙ্গে আটকে থাকল খানিক, ছোট সাহেবের ঘরে সবুজ আলোই জ্বলছে এখনো, পুরু পরদার ফাঁকে সবুজ আলোর রেশ।

ধীরাপদ কখন এগিয়ে এসেছে জানে না, পরদাটা ক' আঙুল সরাতে পেরেছিল তাও না। আড়ষ্ট আঙুলের ফাঁক দিয়ে পরদাটা খসে গিয়ে আবার স্থির হয়েছে।···ঘরের দু'জন পরদা নড়েছিল দেখেনি, পরদা দুলেছিল দেখেনি। দেখার কথাও নয়।

ধীরাপদ যা দেখেছে, তাও দেখবে ভাবেনি।

একটা পিঠ-বিহীন চার-পায়া কুশনে স্থির মূর্তির মত বসে আছে লাবণ্য সরকার—কোনদিকে দৃষ্টি নেই তার। আর মেঝেতে জানু পেতে বসে ছোট ছেলের মত দু'হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে কোলে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ছোটসাহেব সিতাংশু মিত্র। আহত ভূ-লুণ্ঠিতের মত সমর্পণের আকৃতি দিয়ে দু'হাতে সবলে তার কটি বেষ্টন করে কোলে মুখ গুঁজে আছে। মনে হয়, যা তাকে বোঝানো হয়েছে তা সে বুঝছে না বা বুঝতে চাইছে না। লাবণ্যের হাত দুটো তার মাথার ওপর।··বিরূপ নয় হয়ত, কিন্তু সঙ্কল্পবদ্ধ।

সম্বিত ফিরতে ধীরাপদ চোরের মত নিঃশব্দে পালিয়ে এলো। নিজের ঘরে—একেবারে বিছানায়। নিজের বুকের ধপধপানি শুনতে পাচ্ছে। আড়ষ্ট নিস্পন্দের মত কতক্ষণ বসেছিল ঠিক নেই।

হঠাৎই শয্যা ছেড়ে নেমে এলো আবার, হল-ঘরের বাইরে অত দূরের সিঁড়ি ধরে কারো নেমে আসার পায়ের শব্দ কানে আসেনি নিশ্চয়। কিন্তু আশ্চর্য, মন বলল নেমে আসছে কেউ, লাবণ্য সরকার ফিরে চলল। ধীরাপদ বাইরের দিকের জানালাটার কাছে এসে দাঁড়াল। মিথ্যে নয়, লাবণ্য সরকারই। আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না, ধীর মন্থর পায়ে হেঁটে চলেছে। কিন্তু ধীরাপদর চোখে অস্পষ্ট কিছু নেই, নিজের অগোচরে দু চোখ ধকধকিয়ে উঠেছে—এই

ফিরে এসে এতক্ষণে ঘরের আলো জ্বালল ধীরাপদ। টেবিলের সামনের চেয়ারটায় এসে বসল, টেবিলল্যাম্পটাও খট করে জ্বেলে দিল। টেবিলে পড়ার মত বই নেই একটাও—নেই বলে বিরক্ত। মাসিক আছে দুই একটা, হাতের কাছে টেনে নিয়েও ওগুলোকে জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু মনে হল না। অফিসের ফাইলও আছে একটা, জরুরী নয়, সময় কাটানোর জন্তেই আনা—দেখে রাখতে ক্ষতি কি।

তাও বেশিক্ষণ পারা গেল না, অনুপস্থিত দৃষ্টি যে নিভৃতে বিচরণ করছে আর যে চিত্র কেন্দ্র করছে সেখানে এই আলো নেই, এই টেবিল চেয়ার নেই, ফাইল নেই—কিচ্ছু নেই। সেই ঘরে সবুজ আলো, কুশনে মূর্তিমতী যৌবন, মেঝেতে হাঁটু মুড়ে সেই যৌবনের কোলে মাথা খুঁড়ছে এক পুরুষ। ধীরাপদ দেখছে···রমণীর দেহতটে দুই বাহুর নিবিড় বেষ্টন দেখছে···দুই হাতের দশ আঙুলের আকৃতি চোখে লেগে আছে।

চকিতে ধীরাপদ আর এক দফা টেনে তুলল নিজেকে, চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। মানুকেটা সেই থেকে কি করছে, তাকে পেলেও হত—দুটো বাজে কথা বলা যেত আর দু'শ বাজে কথা শোনা যেত। একবার কেয়ার-টেক বাবুর নামটা কানে তুলে দিলে আধ-ঘণ্টার নিশ্চিন্তি।

মানুকের খোঁজে বাইরে আসতে সিঁড়ির ওধারে চোখ গেল। অমিতাভ ঘোষ ফিরেছে, সামনের বড় ঘরটায় আলোর আভাস। তখন ফিরল আবার। ওই বিস্মৃতির মধ্যে ধীরাপদ কতক্ষণ তলিয়েছিল? মানুকেকে বাতিল করে তাড়াতাড়ি ওদিকেই পা বাড়াল, একেবারে বিপরীত কিছুর মধ্যেই গিয়ে পড়া দরকার। মানুকের থেকেও এই লোকের সঙ্গে লেগে সহজ হওয়া সহজ। উত্ত্যক্ত হয়ে অমিতাভ তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেও একটুও আপত্তি হবে না, একটু ক্ষুব্ধ হবে না সে।

যা ভেবেছিল তাই—গবেষণা চর্চায় বসে গেছে। বিছানার চতুর্দিকে ছড়ানো সেই বই আর চার্ট আর রেকর্ড। কিন্তু মেজাজ অপ্রসন্ন মনে হল না, হৃষ্টচিত্তে সিগারেট টানছে আর একটা প্রায়োগ বাঁকাচোরা নক্সা দেখছে। সবে শুরু হয়ত, এখনো ভালো করে মন বসেনি—মন বসলে ভিন্ন মূর্তি।

কতক্ষণ এসেছেন? প্রথমেই এ প্রশ্নটা কেন বেরুল মুখ দিয়ে তা শুধু ধীরাপদই জানে।

এই তো। বসুন, কি খবর···

এক মুহূর্ত থমকালো ধীরাপদ, খবরটা দেবে নাকি? সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূকুটি-শাসনে সংযত করল নিজেকে, সামনের চেয়ারটার বইয়ের স্তূপ খানিকটা সরিয়ে বাকি আধখানায় বসল। তার পর গম্ভীর মুখে জবাব দিল, খবর ভালো! আজকের খরগোশটা প্রাণে বেঁচেছে, হিমোগ্লাবিন আশাপ্রদ, ব্লাডপ্রেসার উঠতির দিকে, বিহেভিয়ারও ভালো, পাগলামো কম করছে—

অমিতাভ ঘোষ হা-হা শব্দে হেসে উঠল, জবাবটা এত হাসির খোরাক হবে ভাবে নি। তেমনি গম্ভীর মুখে ধীরাপদ আবারও বলল, আচ্ছা, মরে গেলে ওগুলোকে কি করেন, ফেলে দেন? খাওয়া যায় না? টাটকাই তো···
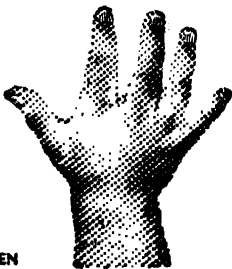
সিগারেট মুখে অমিতাভ ঘোষ তার দিকে ঘুরে বসল।—পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে, এরপর ইঁদুর, গিনিপিগ, বেড়াল, বাঁদর অনেক কিছু লাগবে, সেগুলোও পাঠিয়ে দেব'খন। তরল ভ্রূকুটি গিয়ে কণ্ঠস্বর চঞ্চল, খাওয়াচ্ছি ভালো করে, ভালো চান তো মামাকে বলে আমার সব ব্যবস্থা চট করে করে দিন।

মামাকে দিয়ে হবে না—। ব্যবস্থা একটা চট করেই করা দরকার সেটা সে-ও অনুমোদন করল যেন, বলল, কালই 'সি-এস্-পি-সি-এ'কে (পশু-নির্যাতন নিবারণী প্রতিষ্ঠান) একটা খবর দেব ভাবছি।

এবারেও রাগতে দেখা গেল না, হাসি মুখেই বড় করে চোখ পাকালো, বলল, ওদের ছেড়ে আপনার ওপর হাত পাকাতে ইচ্ছে করছে। লঘু টিপ্পনী, কি হচ্ছে বুঝলে আপনি হয়ত সেধেই আত্মোৎসর্গ করতে আসবেন—

ধীরাপদর ভালো লাগছে, স্বস্থ বোধ করছে। কিন্তু অপর দিকে পুঞ্জীভূত উদ্দীপনার উৎসটাতেই হঠাৎ নাড়া পড়ল যেন। সাগ্রহ বিপরীত উক্তি শোনা গেল মুখে, বোঝার ইচ্ছে থাকলে না বোঝারই বা কি আছে, আসলে কোনো ব্যাপারে ফ্যাক্টরীর কারো কোনো কৌতূহলই নেই—সেই ছকে-বাঁধা সব কিছুতে গা ঢেলে বসে আছে, আর যেন কিছু করারও নেই ভাবারও নেই। আজই নাকি ধীরাপদর কথা ভাবছিল সে, আলোচনা করার কথা ভাবছিল—অনেক রকম রিসার্চের প্ল্যান মাথায় আছে তার, একটাও অসম্ভব কিছু নয়, তার মধ্যে সব-প্রথম যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে সেটা হল চিলেটেড আয়রণ—

এবারে ধীরাপদ ভিতরে ভিতরে ঘাবড়েছে একটু। জলের মত সহজ বস্তুটা লোহার মতই তার গলায় আটকানোর দাখিল। ওদিকে উৎসাহের আতিশয্যে মোটা মোটা দু'তিনটে বই খোলা হয়ে গেল, খানিকটা করে পড়া হয়ে গেল, জার্ণালে টান পড়ল, রেকর্ড আর চার্ট আর তথ্যের ফাইলে টান পড়ল। একাগ্র মনোযোগেই বুঝতে না হোক শুনতে চেষ্টা করছে ধীরাপদ, আর মোটা কথাটা একেবারে যে না বুঝছে তাও না। আসল বক্তব্য, ওই ভেষজ পদার্থটি দেহগত নানা সমস্যার একটা বড় সমাধান, বিশেষ করে রক্তাল্পতার ব্যাপারে। দেশে বিদেশে সর্বত্র খুব চালু ওটা এখন, কিন্তু এ-পর্যন্ত ওটা মুখেই খেতে দেওয়া হচ্ছে—চীফ কেমিষ্টের ধারণা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওই দিয়ে ইনট্রাম্যাসকুলার ইনজেকশন বার করতে পারলে তাতে অনেক বেশি সুফল হবে, আর কোম্পানীর দিক থেকে একটা মস্ত কাজও করা হবে।

—একবার লেগে গেলে কি ব্যাপার আপনি জানেন না। আশা-জমজমে মন্তব্য।

ধীরাপদ না জানুক, শুনতে ভালো লাগছে, আর আশাটা দুরাশা নয় উদ্দীপনা দেখে তাও ভাবতে ভালো লাগছে। সানন্দে সিগারেটের প্যাকেট খুলল অমিতাভ ঘোষ। সব বোঝাতে পারার তুষ্টি, সেই সঙ্গে পরিকল্পনায় মনের মত একজন দোসর লাভের তুষ্টিও বোধ হয়। —ভাবলে এ-রকম আরো কত কি করার আছে, কিন্তু গোটা-গুটি একটা রিসার্চ ডিপার্টমেণ্ট না হলে কি করে কি হবে? শুধুমুদু দেরি হয়ে যাচ্ছে, কেউ তো আর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকছে না—মামা এতদিন ধরে বাইরে কি করছে? কবে ফিরবে?

যে গ্রহের বক্র প্রভাব, চেষ্টা করে তাকে সোজা রাস্তায় চালানো সহজ নয়। নিজের অগোচরে হঠাৎ সে উকিল কি দিয়ে বসে। ফস করে ধীরাপদ যা বলে বসল, এই আলোচনা আর এই উদ্দীপনার মুখে তা না বললেও চলত।

বলল, চারুদির পাল্লায় পড়েছেন, ফিরতে দেরি হতে পারে।

পুরু কাচের ওধারে অমিতাভর দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর থমকালো একটু।—চারু মাসি কি করেছে?

না···ধীরাপদ ঢোঁক গিলল, তিনিও সঙ্গে গেছেন তো।

মামার সঙ্গে? পাটনায়?

বিস্ময়ের ধাক্কায় ধীরাপদ বিব্রত বোধ করছে, মুখের কথা খসলে ফেরে না, তবু আগের আলোচনার সুতো ধরে ফেরাতে চেষ্টা করল। জবাবে মাথা নাড়ল কি নাড়ল না। বলল, তা আপনার কি প্ল্যান কি স্কীম একটু খুলে বলুন না শুনি—

লোকটার সমস্ত আগ্রহে যেন আচমকা ছেদ পড়ে গেছে সেই উদ্দীপনার মধ্যে ফেরার চেষ্টাও প্রায় ব্যর্থই। জানালো, অনেকবার অনেকরকম ভাবে প্ল্যান আর স্কীম ছকা হয়ে গেছে তার। কাগজ-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে তারই দুই একটা খুঁজল। কিন্তু মুখের দিকে এক নজর তাকালেই বোঝা যায়, খুঁজছে শুধু হাতদুটো—আসল মানুষটা আর কোথাও উধাও।

চারুমাসি একা গেছে?

প্রশ্ন এটা নয়, চারুদির সঙ্গে পার্বতীও গেছে কিনা আসল প্রশ্ন সেটা। এই মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ একটু উতলা বোধ করছে কেন ধীরাপদ নিজের কাছেও স্পষ্ট নয় খুব। কবে যেন দেখেছিল··· এই মুখ আর এই বেপরোয়া প্রত্যাশাভরা চোখ। নিরুপায়ের মত মাথা নাড়ল একটু, অর্থাৎ একাই—।

মনে পড়ল কবে দেখেছিল। মনে পড়ছে। এই মুখের দিকে আরো খানিক চেয়ে থাকলে আরো অনেক কিছু মনে পড়বে। কিন্তু ধীরাপদ মনে করতে চায় না···অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে যেদিন চারুদির বাড়ি গিয়েছিল···সেদিনও চারুদি বাড়ি ছিল না, শুধু পার্বতী ছিল···এই মুখ আর এই চোখ সেদিন দেখেছিল। পার্বতী বিপন্নের মত সেদিন তাকে ধরে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু লোকটা প্রকারান্তরে তাকে বিদায় করতে চেয়েছিল। বিদায় করেও ছিল···কিন্তু না না! ধীরাপদ এ সব কিছু মনে রাখতে চায় না।

অমিতাভর হাতে বিজ্ঞানের বই উঠে এলো, একটা, উদ্গত তাড়নার ওপর কৃত্রিম লাগাম কষল যেন। অর্থাৎ আজও প্রকারান্তরে তাকে যেতেই বলছে, বিদেয় হতে বলছে। কিন্তু এই বলাটুকুও যথেষ্ট নয়। মুখেই বলল, আচ্ছা, পরে একদিন আপনার সঙ্গে আলোচনা করব'খন, আজ থাক।

ব্যস, আর বসে থাকা চলে না। ধীরাপদ সেদিন যেভাবে চারুদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল আজও যেন তেমনি করেই বেরিয়ে এলো। অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত। কিন্তু সেদিন তারপর কি হয়েছিল ধীরাপদ ভাববে না, তারপরেও না। ঠাণ্ডার মধ্যে সুলতানকুঠির কুয়োতলায় শুবশুবিয়ে জল ঢেলে উঠেছিল, ঠাণ্ডা মাটিতে রাত কাটিয়েছিল, ঠাণ্ডা লাগিয়ে অসুখ বাঁধিয়েছিল। কিন্তু এসব ধীরাপদ কিছুই করেনি, আর কেউ তার কাঁধে চেপে বসেছিল, আর কেউ তাকে দিয়ে করিয়েছিল। তার ওপর ধীরাপদর হাত ছিল না।

হাত আজও নেই। হাত ছাড়িয়ে ভ্রূকুটি ছাড়িয়ে শাসন ছাড়িয়ে

সেই আর কেউ তার ওপর অধিকার বিস্তারে উদ্যত। এধারের ঘরে এসে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল সে।

দশ মিনিট না যেতেই বিষম চমক আবার। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে সেই আর কেউ যেন খলখলিয়ে ব্যঙ্গ করে উঠল তাকে। অত চমকাবার কি আছে? তুমি তো এরই প্রতীক্ষায় ছিলে, এই শব্দটার জন্যেই উৎকর্ণ হয়ে কান পেতে ছিলে!

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করার শব্দ। অমিতাভ ঘোষের পুরনো গাড়ির পরিচিত ঘর-ঘর শব্দ। কারো হাতের চাবুক খেয়ে যেন গোঁ গোঁ করতে করতে সবেগে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। ধীরাপদ জানালার কাছে এসে দাঁড়াল একটু, শব্দটা দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। জানালা ছেড়ে দরজার কাছে এলো—সিঁড়ির ওধারের ঘরটা অন্ধকার।

সেদিন পার্বতীর প্রচ্ছন্ন নিষেধ সত্ত্বেও অমিতাভ ঘোষকে রেখে উঠে আসার মুহূর্তে ধীরাপদ তার চোখে নীরব ভর্ৎসনা দেখেছিল। আজ পার্বতী কি ভাববে? কার কাছ থেকে তার একলা থাকার হদিস পেয়ে দুরন্ত দস্যুর মত লোকটা ছুটে গেল? কে ইন্ধন জোগালো?

কিন্তু পার্বতী কি ভাববে না ভাববে ধীরাপদ আর ভাবতে রাজি নয়। গায়ের জামাটা এখন পর্যন্ত খোলা হয়ে ওঠেনি, আর হলও না। আলোটা সহ্য হচ্ছে না, ভালো লাগছে না—খট করে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে সটান বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। এমন হাস্যকর যোঝা ধীরাপদ নিজের সঙ্গে আর একটুও যুঝবে না। সেই আর কেউ ওর ওপর দখল নিতে আসছে—আসুক। সেদিনের থেকেও অনেক জোরালো অনেক অবুঝ আর কেউ। আসুক, সে বাধা দেবে না।

এই বিকেল থেকে যা সে শুনেছে আর যা দেখেছে—প্রায় স্বেচ্ছায় সেই আবর্তের মধ্যেই তলিয়ে গেল কখন।···পার্বতী বলছিল, চারুদি কাছে থাকলে অনেক অন্যায়ও বড় সাহেব করতে পারেন, চারুদি তা করাতে পারে। কোন জোরে পারে? ম্যানেজার বলছিল, ওই কাঞ্চন মেয়েটা চাকরিতে ঢোকার পর থেকে রমেন ছেলেটার মতিগতি বদলেছে। কেন বদলালো? ঘরের আলো নিবিয়ে অন্ধকার দেখছে না ধীরাপদ, একটা পর্দা সরিয়ে সবুজ আলো দেখছে। দু'হাতে আঁকড়ে ধরে লাবণ্যর কোলে মুখ গুঁজে আছে সিতাংশু মিত্র···এক মুহূর্তের দেখায় একটা অনন্ত কালের দেখা বাঁধা পড়ে গেছে। ভুলতে চাইলেই ভোলা যায়। সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা অদেখা দৃশ্যের পরদা সরানোর তাগিদ, যেখানে এক রমণীর একার নিভৃতে আর এক দুরন্ত দুর্বার পুরুষের পদার্পণ। সেই দৃশ্যটাই বা কেমন?

শুয়ে থাকা গেল না, একটা অশান্ত শূন্যতার যাতনা যেন হাড়-পাঁজর-মজ্জার মধ্যে গিয়ে গিয়ে ঢুকছে। শুধু যাতনা নয়, জ্বালাও। শিখার চারধারের অবরোধে পতঙ্গের মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে আসার জ্বালা—নিঃশেষে জ্বলতে না পারার জ্বালা।

উঠল। একটু বাদেই মানকে খাবার তাগিদ দিতে আসবে। ভাবতেও বিরক্তি। এত বড় ঘরের সব বাতাস যেন নিঃশেষে টেনে নিয়েছে কে, বুকের ভিতরটা ধকধক করছে। অন্ধকারে জুতোটা পায়ে গলিয়ে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল সে। বাইরে থেকে একেবারে রাস্তায়।

কিন্তু যতটা বাতাস ধীরাপদর দরকার ততটা যেন এখানেও নেই—একটা ছোট গুমট ছেড়ে অনেক বড় গুমটের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে শুধু। হেড লাইট জ্বালিয়ে একটা ট্যাক্সি ধেয়ে আসছে···খালি ট্যাক্সি। ধীরাপদ যন্ত্র-চালিতের মতই হাত দেখিয়েছে, তারপর সেই হাত বুক-পকেটটা ছুঁয়ে দেখেছে। মানি-ব্যাগটা আছে, শুয়ে ছিল যখন অলক্ষ্যে বিছানায় পড়ে থাকতেও পারত। পড়েনি, ষড়যন্ত্রে ফাঁক নেই। কিসের ষড়যন্ত্র ধীরাপদ জানে না, কিন্তু অমোঘ কিছু একটা বটেই। আগে পকেটে কিছুই থাকত না প্রায়, থাকলেও দু'চার আনা থাকত। এখন দু'চারশও থাকে ওটাতে, কেন থাকে কে জানে! খরচ করার দরকার হয় না তবু থাকে, না থাকলে ভালো লাগে না।

ট্যাক্সিটা থামল। ধীরাপদ উঠল। কোন নির্দেশ না পেয়ে ট্যাক্সিটা যেদিকে যাচ্ছিল সেই পথেই ছুটল আবার। কিন্তু না, বাতাস আজ আর নেই-ই।

কতক্ষণ বাদে কোথায় নামল ধীরাপদর সঠিক হুঁশ নেই। কিন্তু নেমেছে ঠিকই। ওই আকাশ, ওই বাতাস আর চেতনার অন্তরালে ষড়যন্ত্রে যারা মেতেছে তারা ওকে ঠিক জায়গাটিতেই নামিয়েছে। ট্যাক্সি বিদায় করে ধীরাপদ এগিয়ে চলল, সামনের অপরিসর রাস্তাগুলো এঁকে বেঁকে কোনটা কোনদিকে মিশেছে ঠাওর করা শক্ত। সে চেষ্টাও করেনি। অদৃশ্য কারো হাত ধরে যেন একটা গোলক-ধাঁধার মধ্যে ঘুরে বেড়াল খানিকক্ষণ। প্রায় নিয়তির মতই কালো।

এখানকার রাত যত না স্পষ্ট তার থেকে অনেক বেশি রহস্যে ভরা, গোপন ইশারায় ভরা। দূরে দূরে এক-একটা পানের দোকান, পানওয়ালারা সোজাসুজি দেখছে না তাকে, বক্র দৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছে। এদিক ওদিকে রাতের বুকে প্রেতের মত লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে একজন দু জন—পরনে আধময়লা পায়জামা, গায়ে শার্ট। তাদের চাউনিগুলিই বিশেষ করে বিঁধছে ধীরাপদর গায়ে পিঠে।

বাবু—

ধীরাপদ চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, পিছনে চাপা গলায় ডাকছে কেউ। তাকেই ডাকছে। লোকটা আরো কাছে এসে তেমনি নিচু গলায় বলল, ভালো জায়গা আছে, যাবেন?

ধীরাপদ জবাব দেয়নি, জবাব দিতে পারেনি। হন হনিয়ে হেঁটে এগিয়ে গেছে বেশ খানিকটা। আর একটা রাস্তার মোড় ঘুরে তারপর দাঁড়িয়েছে। ঘোর কেটেছে খানিকটা, চারদিকে তাকালো একবার। এ-সব রাস্তায় কখনো এসেছে কিনা মনে পড়ে না, কিন্তু অবচেতন মনের কেউ এসেছে দেখেছে, চিনেছে। নইলে এলো কেমন করে? না, ঘর ছেড়ে কেউ দরজায় এসে দাঁড়িয়ে নেই। তারা কোথাও না কোথাও আত্মগোপন করে আছে। দেশের আইন বদলেছে, প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিলে আইনের কলে পড়তে হবে। তাদের হয়ে লোক ঘুরছে—তাদের জন্যে কারা ঘুরছে দেখলেই যারা বুঝতে পারে, সেই লোক।

আগের মূর্তির মতই আর একজন গুটিগুটি এগিয়ে আসছে তার দিকে। ধীরাপদ আবারও দ্রুত পা চালালো। কিসের ভয় জানে না, শুধু জানে না বলেই ভয়। অপেক্ষাকৃত একটা বড় রাস্তায় পা দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অদূরে মোড়ের মাথায় দু'টো লোক চেঁচামিচি জুড়ে দিয়েছে। দু'জন নয়, চেঁচামিচি একজনই করছে, আর একজন অশ্লীল কটূক্তি করতে করতে তাকে ঠেলে একটা রিকশয় তুলে দিতে চেষ্টা করছে। লোকটা বদ্ধ মাতাল, হাত ছাড়িয়ে ঘাড় মুখ গুঁজে মাটি আঁকড়ে ধরতে চাইছে। এই রাতের মত হয়ত তার ফুটপাথেই কাটানোর ইচ্ছে, কিন্তু অন্য লোকটার তাতে আপত্তি। ফুটপাথে লোক পড়ে থাকলে বা চেঁচামেচি হলে পুলিসের ভয়, শিকার ফসকানোর ভয়।

কোনদিকে না তাকিয়ে ধীরাপদ রিকশটার ওধার দিয়ে দ্রুত পাশ কাটাতে গেল।

অ ধীরু—ধীরু ভাই—!

ম্যাড়িংস্পাটের মত পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল। ধীরাপদ স্বপ্ন দেখছে না নিশির ডাক শুনছে? ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবে না কাছে এসে দেখবে?

দেখলে দূর থেকেও না চেনার কথা নয়। এ-রকম আর্তনাদ না শুনুক, কণ্ঠস্বর অতি পরিচিত।

গণুদা। স্বপ্ন নয়, বিভ্রম নয়, নিশির ডাক নয়—গণুদা। গণুদা ডাকছে তাকে।

ধীরাপদ স্তব্ধ, স্তম্ভিত। গণুদার গায়ে আধময়লা গলাবন্ধ ছিটের কোট, পরনের ধুতিটা ফুটপাথের ধুলো-মাটিতে বিবর্ণ। সমস্ত মুখ অস্বাভাবিক লাল, দু' চোখ ঘোলাটে শাদা।

কাঁদ-কাঁদ গলায় গণুদা বলে উঠল, ধীরু ভাই আমাকে বাঁচাও, এরা আমাকে গুমখুন করতে নিয়ে যাচ্ছে—আমার ছেলেমেয়ে আছে, বউ আছে, ওরা বড় কাঁদবে, তোমার বউদি কাঁদবে।

নিজের অগোচরে ধীরাপদ দুই-এক পা সরে দাঁড়িয়েছে, নাকে একটা উগ্রগন্ধের ঝাপটা লেগেছে। অস্পষ্ট জড়ানো কান্নার সুরে কথাগুলো বলতে বলতে গণুদা ফুটপাথে সটান শুয়ে পড়ে চোখ বুজল। আপনজন পেয়ে নিশ্চিন্ত। যে-লোকটা তাকে রিকশয় তোলার জন্য ধস্তাধস্তি করছিল সে হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে ধীরাপদকেই দেখছিল। চোখোচোখি হতে অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বলল, একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে, রিকশয় তুলে দিচ্ছিলাম।

রিকশওয়ালাটা এখানে এ ধরণের সোয়ারী টেনে অভ্যস্ত বোধ হয়, নির্লিপ্ত দর্শকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। ধীরাপদ ইশারায় কাছে ডাকল তাকে। ঘোর এতক্ষণে সম্পূর্ণই কেটেছে, তার ষড়যন্ত্রকারীরা কে কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে মিশে গেছে যেন। কেবল একটু শ্রান্তির মত লাগছে, অবসন্ন লাগছে, তা ছাড়া অফিসের সুস্থ মস্তিষ্ক ধীরাপদ চক্রবর্তীর সঙ্গে খুব তফাৎ নেই।

রিকশওয়ালার সাহায্যে গণুদাকে টেনে তোলা হল। অন্য লোকটা সরে গেছে। গণুদা চোখ টান করে তাকাতে চেষ্টা করল একবার, ধীরাপদকে দেখেই হয়ত রিকশয় উঠতে আপত্তি করল না। বিড় বিড় করে দুই-এক কথা বলল কি, তারপর রিকশয় আর ধীরাপদর কাঁধে গা এলিয়ে দিল।

রিকশ চলল। কিন্তু ভয়ানক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে ধীরাপদ, গা-টা ঘুলোচ্ছে কেমন। গণুদার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধটা যেন তার নাকের ভিতর দিয়ে পেটের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। কম করে আধ ঘণ্টার পথ হবে এখান থেকে সুলতানকুঠি। আধ ঘণ্টা এ ভাবে এই লোকের সঙ্গে লেপ্টে চলা প্রায় আধ বছর ধরে চলার মতই। ভাবতেও অসহ্য লাগছে।

খানিকটা এগিয়ে সামনে আর একটা রিক্শ দেখে এটা থামিয়ে সেটাকে ডাকল। নেমে গণুদার অবশ দেহ আর মাথাটা ঠেলে ঠুলে ঠিক করে দিল। তার পর নিজে অন্য রিকশয় উঠল। গণুদার রিক্শ আগে আগে চলল, তারটা পিছনে। ধীরাপদ সুস্থ বোধ করছে একটু।

ঠুন-ঠুনিয়ে রিকশ চলেছে, পথে লোক চলাচল নেই বললেই হয়। একজন দু'জন যারা আসছে যাচ্ছে, তারা এক আধবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। তাকে দেখছে, গণুদাকে দেখছে। গোপনতার রহস্যে ভরা এই রাতটাও যেন তার দিকে চেয়ে মিটি-মিটি হাসছে। রাত কত এখন? ঘড়ি দেখল, মোটে সাড়ে দশটা। মনে হয় মাঝ রাত। প্রায় এগারোটা হবে সুলতানকুঠিতে পৌঁছুতে—সেটা সেখানকার মাঝ-রাতই।

সে সুলতান কুঠিতে যাচ্ছে এই গণুদাকে নিয়ে, যেখানে সোনাবউদি আছে। সোনাবউদির কাছেই যাচ্ছে। ভাবতে শুরু করলে আর যাওয়া হবে না বোধ হয়, অথচ, যা ভাবতে চাইছে এখন—ভাবা যাচ্ছে, যা চাইছে না—তাও। সব ভাবনা-চিন্তা থেকে মাথাটাকে ইচ্ছে মত ছুটি দেওয়া যায় না?

ধীরাপদ সেই চেষ্টাই করছে। [ক্রমশঃ।

"স্বদেশের ইতিহাসে যিনি আলোক পান না, তিনি অন্ধ—"

"জানি মা আমার তিলোত্তমা নহেন, তবু তিনি আমার মা।"

—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম "রাবার" লাভ

বহু দিনের বহু আকাঙ্খিত, বহু অভীপ্সিত, বহুজনের বহু সাধনার ফল এবার বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ভারতের সুদীর্ঘ ক্রিকেট-ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারত সর্ব্বপ্রথম "রাবার" লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। ভারতের বিজয়বার্ত্তা দিকে দিকে ঘোষিত হয়। বিশ্বের ক্রিকেট-ক্ষেত্রে ভারতের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজ সহরে এবার আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। এইরূপ উন্মাদনা ও উদ্দীপনা এই সহরে বহুদিন দেখা যায়নি। শুধু মাদ্রাজে নয়—সারা ভারতেই আনন্দোচ্ছাস প্রতিফলিত হয়।

এই সেই মাদ্রাজ। এখানেই ভারত ১৯৫১-৫২ সালে ইংলণ্ড দলকে প্রথম পরাজিত করেছিল। তবে শুধু মাঠের ব্যতিক্রম। সেবার খেলা হয়েছিল "চিপক" মাঠে আর ভারত জয়ী হয় এক ইনিংস ও ৮ রাণে; আর এবার কর্পোরেশন ষ্টেডিয়াম, এইখানে ভারত ১২৮ রাণে জয়ী হয়।

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম হলেও ভারতের এই সম্মান প্রথম নয়। এর পূর্ব্বে ১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এবং ১৯৫২-৫৩ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে "রাবার" লাভ করেছিল।

ভারতের এটা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি দ্বিতীয় ও মোট তৃতীয় সাফল্য। এবারই কলকাতার চতুর্থ টেষ্টে ভারত ইংলণ্ড দলকে পরাজিত করেছিল। ভারতের টেষ্ট খেলায় এটা অষ্টম জয়লাভ। বর্ত্তমান টেষ্ট পর্য্যায়ে ভারত ২-০ খেলায় জয়ী হয়। প্রথম তিনটি টেষ্ট অমীমাংসিত থাকে। পঞ্চম খেলার পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড দলের ভারত সফর শেষ হয়।

ভারতের পঞ্চম টেষ্টে সাফল্যের মূলে পাতৌদির নবাব কণ্ট্রাক্টর মাঞ্জরেকার, নাদকার্ণি, ইঞ্জিনিয়ার, চান্দু বোড়ে ও সেলিম দুরাণীর অবদান ছিল যথেষ্ট। ইংলণ্ড দলের মাইক স্মিথ, মিলম্যান, এলেন, ব্যারিংটন, নাইট ও লক দলের সম্মান রক্ষার জন্য বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই খেলায় ইংলণ্ড পরাজিত হলেও, খেলোয়াড়দের মধ্যে সব সময় সংগ্রামশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে। এই খেলার ধারা প্রতিদিনই পরিবর্ত্তন হওয়ায় খেলার আকর্ষণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। মাদ্রাজ ও কলকাতায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করলেন তাহা বহুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রাণ সংখ্যা

ভারত-১ম ইনিংস—৪২৮

(পাতৌদির নবাব ১০৩, কণ্ট্রাক্টর ৮৬, ইঞ্জিনিয়ার ৬৫, নাদকার্ণি ৬৩; এলেন ১১৬ রাণে ৩ উইঃ, নাইট ৬২ রাণে ২ উইঃ, বারবার ৭০ রাণে ২ উইঃ)।

ইংলণ্ড-১ম ইনিংস—২৮১

(মাইক স্মিথ ৭৩, এলেন ৩৪, ডি আর স্মিথ ৩৪ মিলম্যান নট আউট ৩২; দুরাণী ১০৫ রাণে ৬ উইঃ, চান্দু বোড়ে ৫৮ রাণে ২ উইঃ ও নাদকার্ণি ০ রাণে ১ উইঃ)।

ভারত-২য় ইনিংস—১৯০

(মাঞ্জরেকার ৮৫, লক ৬৫ রাণে ৬ উইঃ)।

ইংলণ্ড-২য় ইনিংস—২০৯

(ব্যারিংটন ৪৮, প্যারফিট ৩৩, নাইট ৩৩; সেলিম দুরাণী ৭২ রাণে ৪ উইঃ ও চান্দু বোড়ে ৫৯ রাণে ৩ উইঃ)।

ভারতের টেষ্ট খেলার খতিয়ান

ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, নিউজিল্যাণ্ড ও পাকিস্তানের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত মোট ৭৭টি অফিসিয়াল টেষ্ট খেলায় ভারতের জয়ের সংখ্যা মাত্র আট। মোট ২৯টি খেলায় ভারত হেরেছে, আর অমীমাংসিত থেকে গেছে ২০টি টেষ্টের ফলাফল। নিম্নে ভারতের টেষ্টের খতিয়ান দেওয়া হ'লো :—

ভারত : ইংলণ্ড

	খেলা	জয়	পরা	ড্র
১৯৩২ ইংলণ্ডে—	১	০	১	০
১৯৩৩-৩৪ ভারতে—	৩	০	২	১
১৯৩৬ ইংলণ্ডে—	৩	০	২	১
১৯৪৬ ইংলণ্ডে—	৩	০	১	২
১৯৫১-৫২ ভারতে—	৫	১	১	৩
১৯৫২ ইংলণ্ডে—	৪	০	৩	১
১৯৫৯ ইংলণ্ডে—	৫	০	৫	০
১৯৬১-৬২ ভারতে—	৫	২	০	৩
	২৯	৩	১৫	১১

ভারত : নিউজিল্যাণ্ড

	খেলা	জয়	পরা	ড্র
১৯৫৫-৫৬ ভারতে—	৫	২	০	৩

ভারত : পাকিস্তান

	খেলা	জয়	পরা	ড্র
১৯৫২-৫৩ ভারতে—	৫	২	১	২
১৯৫৪-৫৫ পাকিস্তানে—	৫	০	০	৫
১৯৬০-৬১ ভারতে—	৫	০	০	৫
	১৫	২	১	১২

ভারত : ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

	খেলা	জয়	পরা	ড্র
১৯৪৮-৪৯ ভারতে—	৫	০	১	৪
১৯৫২-৫৩ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে—	৫	০	১	৪
১৯৫৮-৫৯ ভারতে—	৫	০	৩	২
	১৫	০	৫	১০

ভারত : অষ্ট্রেলিয়া

	খেলা	জয়	পরা	ড্র
১৯৪৭-৪৮ অষ্ট্রেলিয়া—	৫	০	৪	১
১৯৫৬ ভারতে—	৩	০	২	১
১৯৫৯-৬০ ভারতে—	৫	১	২	২
	১৩	১	৮	৪

[মোট খেলা—৭৭ : মোট জয়—৮ : মোট পরাজয় ২৯ : মোট ড্র ৪০]।

আন্তর্জ্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতের সাফল্য

আমেদাবাদে এবার বিশ্ব হকি খেলার আসর বসে। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান পাকিস্তান ও খ্যাতনামা দল ইংলণ্ড ছাড়া প্রায় বিশ্বের দশটি দেশ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। লীগ প্রথায় খেলার ব্যবস্থা হয়। ভারত নয়টি খেলাতেই জয়ী হয়ে এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জ্জন করে। ভারতের এই সাফল্য তাদের হৃত অলিম্পিক-গৌরব পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপ বলা চলে। ভারতীয় দলের খেলায় এবার যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ভারত এবার রেকর্ড সংখ্যা ৫১টি গোল করেছে। তাদের বিরুদ্ধে কোন গোল হয়নি। এটা সত্যই কৃতিত্বের পরিচায়ক।

আগামী অলিম্পিকের জন্য ভারতের এখন থেকেই তোড়জোড় করা দরকার। ভারত হকিতে তাদের বিশ্ব-শ্রেষ্ঠত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠা করুক—এটাই সকলে কামনা করেন।

এবারকার আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী অপর দলের মধ্যে জার্ম্মাণীর খেলা সকলের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা ১৪ পয়েণ্ট পেয়ে লীগ-তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পায়। মালয়ের খেলাও বেশ ভাল হয়।

লীগ তালিকা

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	প
ভারত	৯	৯	০	০	৫১	০	১৮
জার্ম্মাণী	৯	৬	২	১	৩	৩১	১৪
অষ্ট্রেলিয়া	৯	৬	১	২	৩০	৯	১৩
হল্যাণ্ড	৯	৫	২	২	১২	১৫	১২
মালয়	৯	৩	৩	৩	১৪	১২	৯
নিউজিল্যাণ্ড	৯	২	৪	৩	১৬	৯	৮
জাপান	৯	৩	২	৪	১০	১৮	৮
বেলজিয়াম	৯	৩	০	৬	১১	১৮	৬
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	৯	০	১	৮	৪	৪২	১
ইন্দোনেশিয়া	৯	০	১	৮	২	৫৪	১

সর্ব্বোচ্চ গোলদাতাগণ

দর্শন সিং (ভারত-সেণ্টার ফরওয়ার্ড) ২০ (দুইটি হ্যাটট্রিক), বি, পাতিস (ভারত-লেফট ইন) ১১, (একটি হ্যাটট্রিক), পৃথিপাল সিং (ভারত-রাইট ব্যাক) ৯ (পেনাল্টী কর্ণার থেকে), পরমালিঙ্গম (মালয় সেণ্টার ফরওয়ার্ড) ৯ (একটি হ্যাটট্রিক), গুরুদেব সিং (ভারত রাইট ইন) ৮, সুথার (জার্ম্মাণী রাইট ইন) ৭ (একটি হ্যাটট্রিক), ই, পিয়ার্স (অষ্ট্রেলিয়া-সেণ্টার ফরওয়ার্ড) ৭, ডি, পাইপার (অষ্ট্রেলিয়া লেফট ইন) ৭, কানবি (জাপান-সেণ্টার ফরওয়ার্ড) ৬, ও কিপার (জার্ম্মাণী-সেণ্টার ফরওয়ার্ড) ৫।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফর

৩১শে জানুয়ারী বোম্বাই থেকে বিমানে ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ অভিমুখে রওনা হবে। ৫ই ফেব্রুয়ারী ত্রিনিদাদে তাদের প্রথম খেলা। ত্রিনিদাদে দুটি, জামাইকা, বারবাডোজ ও ব্রিটিশ গায়েনাতে পাঁচদিনব্যাপী পাঁচটি টেষ্ট খেলা হবে।

ভারতীয় দল গঠনের সময় তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড়দের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। টীম মোটামুটি ভাল। নরী কণ্ট্রাক্টর দলের অধিনায়ক ও পাতৌদির নবাব সহকারী অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন। নিম্নে ভারতীয় দলের মনোনীত খেলোয়াড় গণের নাম, প্রদত্ত হলো :—

নরী কণ্ট্রাক্টর (অধিনায়ক), পাতৌদির নবাব (সহকারী অধিনায়ক), জয়সীমা, পলি উম্রীগড়, বিজয় মাঞ্জরেকার চান্দু বোড়ে, সেলিম দুরাণী, 'বাপু' নাদকার্নি রমাকান্ত দেশাই, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার (উইকেটরক্ষক), বসন্ত রঞ্জনে, বি• কে• কুন্দারাম (উইকেটরক্ষক), রুসি মুর্ত্তি, ডি• এন• সারদেশাই, বিজয় মেহেরা ও ই• এ• এস• প্রসন্ন ম্যানেজার—গোলাম আমেদ।

খেলার তালিকা

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেটদলের সফরসূচী নিম্নে প্রদত্ত হলো :—

৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারী ত্রিনিদাদ ভোর্টস।

৯ই, ১০ই, ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী—ত্রিনিদাদ দল।

১৬ই, ১৭ই, ১৯শে, ২০শে ও ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রথম টেষ্ট ত্রিনিদাদে।

২৪শে ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী—জামাইকা কোলটস।

২৮শে, ফেব্রুয়ারী, ১লা, ২রা ও ৩রা মার্চ্চ—জামাইকা দল।

৭ই, ৮ই, ৯ই, ১০ই ও ১২ই মার্চ্চ—দ্বিতীয় টেষ্ট—জামাইকা।

১৬ই, ১৭ই, ১৯শে ও ২০শে মার্চ্চ—বারবাডোজ দল।

২৩শে, ২৪শে, ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে মার্চ্চ—তৃতীয় টেষ্ট—বারবাডোজ।

৩১শে মার্চ্চ, ২রা, ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল—ব্রিটিশ গায়েনা দল।

৭ই, ৯ই, ১০ই, ১১ই ও ১২ই এপ্রিল—চতুর্থ টেষ্ট—ব্রিটিশ গায়নাতে।

১৮ই, ১৯শে, ২১শে, ২৩শে ও ২৪শে এপ্রিল—পঞ্চম টেষ্ট—ত্রিনিদাদ।

২৭শে ও ২৮শে এপ্রিল—সেণ্ট কিটা দ্বীপপুঞ্জে উইড ওয়ার্ডস ও লাওয়ার্ডস দলে।

৩০শে এপ্রিল ভারত অভিমুখে যাত্রা।

কলিকাতায় এশীয় টেনিস প্রতিযোগিতা

ক্যালকাটা সাউথ ক্লাব থেকে জানুয়ারী মাসে এশীয় লং টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৫১ সালে কলকাতায় এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়েছিলো। প্রতিযোগিতার কর্মসূচীর মধ্যে মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস, পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দল অষ্ট্রেলিয়া সরকারীভাবে একটি দল পাঠাবে। এই দলে থাকবেন—রয় এমার্সন, এফ ষ্টোলি, মিস লেসলী টার্ণার এবং মিস ম্যাডানা খট। উহার মধ্যে রয় এমার্সন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়। বর্তমানে তিনি আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন এবং চারিটি বিশ্ব প্রতিযোগিতার মধ্যে দুটিতে জয়লাভের অধিকারী হয়েছেন। অষ্ট্রেলিয়া দলের সরকারীভাবে দল প্রেরণ—ভারতের টেনিস ইতিহাসে নব সূচনা বলা চলে। কারণ এই সর্বপ্রথম একটা বিদেশী দল ভারতের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে। দুজন ডেভিস কাপ খেলোয়াড় ইংলণ্ড দলে যোগদান করে প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বৃদ্ধি করবেন। জাপান, পাকিস্তান, সিংহল, মালয় ও রাশিয়া থেকেও তাদের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় সমন্বয়ে গঠিত সরকারী দল প্রেরণ করার কথা আছে। যে সকল বৈদেশিক খ্যাতনামা খেলোয়াড়গণ এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন—তার মধ্যে আর হিউয়েট (অষ্ট্রেলিয়া), রড লেভার (অষ্ট্রেলিয়া), এন, পেতাঞ্জলী (ইতালী), নীল ফ্রেজার (অষ্ট্রেলিয়া), ওয়ারেন জ্যাকস (অষ্ট্রেলিয়া), জোভানভিক (যুগোশ্লাভিয়া), পিলিক (যুগোশ্লাভিয়া), মিন পি, বোলিংর (ডেনমার্ক) নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণ—রমানাথ কৃষ্ণাণ, জয়দীপ মুখার্জী, প্রেমজিৎ লালও এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবেন।

কলকাতার টেনিস-রসিক ক্রীড়ামোদীরা উচ্চাঙ্গের খেলা দেখার সুযোগ পাবেন, সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মেয়েদের অন্তর্দৃষ্টি

'মেয়েরা স্বভাবতঃই এক সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির অধিকারিণী' এই কথাটি অনেকের মুখেই শোনা যায় সময় সময়, কিন্তু সত্যই কি তাই? এ সম্বন্ধে যে যাই বলুন না কেন, মেয়েরা যে প্রকৃতপক্ষে পুরুষ অপেক্ষা বেশী স্বাভাবিক বোধশক্তিসম্পন্না এ-কথা সর্বথা সত্য নয়। তবে তাঁরা যে ছলনা পটীয়সী এটা অবশ্য স্বীকার্য্য। আর প্রধানতঃ এজন্যই মনের ভাব গোপন করতে তাঁরা পুরুষের অপেক্ষা অনেক পটু এবং তাতেই তাঁদের বোঝা সময় সময় এত কঠিন।

অপর পক্ষে পুরুষ সচরাচর ধরা পড়ে এই পটুতারই অভাবে, কোন কথোপকথন বিরক্তিকর ঠেকলে সে বিরক্তি গোপন করতে পুরুষ জানে না। কোন অপ্রিয় বস্তুকে মুখে হাসি টেনে অভ্যর্থনা করে নিতেও সে অক্ষম। তারই ফলে তার প্রকৃত মনোভাব জানতে বাকি থাকে না জগৎ সংসারে কারোই—যেখানে একটি মেয়ের পেটের কথা কখনই বোঝা যায় না তার বাইরের আচরণ দেখে।

মেয়েরা জন্ম-অভিনেত্রী এ বিষয়ে ধনী-দরিদ্র, বিদুষী-মূর্খে বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না, মনের কথা তাদের মুখের কথা থেকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ উলটো ধরণের হয়, আর এই সহজাত ছলনা পটুত্বের জন্যই তাদের বোঝা একটু কঠিন ঠেকে।

প্রায়ই শোনা যায় যে, মেয়েরা নাকি ছেলেরা হাঁ করলেই তাদের মনোভাব বুঝে ফেলে ঠিকঠাক, কিন্তু কি করে বোঝে? এই বোঝার জন্য বিশেষ কোন অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন আছে কি? ধরুন একটি মেয়ের প্রসঙ্গে কথিত হল, "ওঃ—ও ঠিকই বুঝতে পেরেছে অমুক (কোন হতভাগ্য পুরুষ) ওকে দেখে মজেছে কিনা, মেয়েমানুষের কি আর এ জিনিষ চিনতে দেরী হয়?" এখন উক্ত ভদ্রলোকটি মজেছেন কিনা তা বুঝতে যে বেশী কিছু অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না, এ-কথা তাঁদের বোঝাবে কে?

প্রেমে পড়লে তাঁর আচার-আচরণই যে সোচ্চার হয়ে সে কথা প্রকাশ করে দেয় প্রেমিকার কাছে, তাঁর ভাব-বিহ্বল গদ-গদ, প্রণয় ভাষণ, আর বোকাটে চাহনি বা অবিরত মেয়েটিকে অনুসরণ করে ফেরে সেগুলোই তো যথেষ্ট তাঁর মনোভাবকে জলবৎ তরলং করে প্রকাশ করতে। এজন্য উক্ত সৌভাগ্যবতীর খুব বেশী অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্না হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি?

আবার অবাঞ্ছিতার সঙ্গে ক্লান্ত হয়ে পড়লে যে অন্যমনস্কতা তার আচার-আচরণে প্রকট হয়ে ওঠে সেটুকুও তো সোজাসুজি এক জোড়া চোখ থাকলেই দেখে নেওয়া যায়, তার জন্যই বা গভীর কোন সত্য-দৃষ্টির দরকারটা কি?

আসলে মেয়েরা নিজেদের প্রকৃত মনোভাব গোপনে একান্ত অভ্যস্তা বলেই, তাদের প্রতি আমরা সূক্ষ্ম স্থূল ইত্যাদি নানা রকম দৃষ্টিশক্তি আরোপ করে থাকি, যেখানে পুরুষ অপেক্ষাকৃত সরলস্বভাব হওয়াতে তাকে গণনার মধ্যেই ধরি না।

দৈহিক ব্যথা-বেদনা ক্লান্তি ইত্যাদিকেও চেপে রাখতে মেয়েরাই অধিকতর সক্ষম, পুরুষ যেখানে সহজেই কাতর হয়ে পড়ে, মেয়েরা সেখানে ভিতরের অবস্থা স্বচ্ছন্দে গোপন করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে, আসলে প্রকৃতিগত এই মূল বৈষম্যটিকেই আমরা মেয়েদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি রূপে কল্পনা করে নিই সময় সময়।

আর এজন্যই মেয়েদের তথাকথিত অন্তর্দৃষ্টি পুরুষ ও শিশুদের ক্ষেত্রে (পুরুষকেও শিশুর সঙ্গে সমগোত্রীয় বলেই ধরে থাকেন মেয়েরা হামেশাই) যতটা সফল মেয়েদের স্বক্ষেত্রে তা নয়।

এই অন্তর্দৃষ্টি বা স্বাভাবিক বোধগম্যতা বস্তুটির প্রকৃত সংজ্ঞাই বা কি?

অক্সফোর্ড অভিধানে ইনটুইশন বা স্বভাবজ অন্তর্দৃষ্টির বড় মজার অর্থ করা আছে, তাতে বলা হয়েছে যে 'ইনটুইশন' মানে দেবদূতের মত সহজ ও ত্বরিত বোধশক্তিসম্পন্নতা, মেয়েদের যদি এই বিশেষ শক্তিটির স্বাভাবিক অধিকারিণী বলে স্বীকার করে নিতে হয় তাহলে এটাও কি ধরে নিতে হবে যে, তাঁরা প্রত্যেকেই এক-একটি দেবদূতী বা তাঁদেরই মত ঐশী শক্তিসম্পন্না?

'ইনটুইশন' যে কোন অপার্থিব বা ঐশ্বরিক প্রবণতা এ-কথা আবেগের ক্ষেত্রে মেনে নিলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে তা মানা কোন যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর নয়।

স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি নিয়ে পর্য্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এই 'ইনটুইশন' বা সহজাত অন্তর্দৃষ্টি বস্তুটি স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন মানুষই অর্জন করতে পারে।

কনক-ধুতুরা

পূরবী চক্রবর্ত্তী

ড্রেসিং টেবলের সামনে এসে দাঁড়াল নন্দিনী। ড্রয়ার থেকে বার করে নিল হার্ড রাবারের চিরুণীটে। পলকা, সাধারণ চিরুণী যে তার চুলের বন্যায় থৈ পায় না। নিতান্ত অসময়েই তাদের কাল ফুরিয়ে যায়। প্রতিবিম্বের দিকে একবার ফিরে চাইল সে। এখনই ধারা স্নান করে এসেছে। এখনও উজ্জ্বল তরল মুক্তার ধারা পড়ছে তার মাথা আর মুখ বেয়ে। সিক্ত করে দিচ্ছে তার সর্ব্বাঙ্গ। [illegible] দিক্। চিরুণী চালাল সে দ্রুত হাতে। তারপর মুখ মাথা মুছল না, গায়ে বুকে পাউডার ঢালল না, ক্রীমও মাখল না এতটুকু,—ভিজে গায়েই শুয়ে পড়ল গিয়ে দুধ-সাদা কোমল বিছানার বুকে। একশ' পাওয়ারের আলো জ্বলছে মাথার ওপর। জ্বলুক। আর নেভাতে পারে না সে। উতলা দখিন হাওয়া বাগানের যত রাতজাগা ফুলের সৌরভ নিয়ে খোলা জানালার পথে ঘরে ঢুকে সব কিছু ওলটপালট করে দিতে চাইছে। ফুলফোর্সে পাখা ঘুরছে। তবু যেন কি এক অশান্ত প্রদাহে জ্বলছে। আর ক্লান্তিহীন এক ব্যথার উত্তাপে পুড়ছে তার দেহ মন। এয়ার কণ্ডিশনারও যে এখানে ব্যর্থ হয়ে যায়। শুধু বন্ধ ঘরে থাকার যন্ত্রণা। তার চেয়ে এই ভাল। খোলা বাতাসের মৃদু গুঞ্জনে একাকীত্বের ভীতি বিস্মৃত হওয়া আর আলোর প্লাবনে আঁধারের কালো বিভীষিকাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া—এই ভাল।

শিউরে উঠে সভয়ে মুখ ঢাকল সে উপাধানে। আর তখনই তার বন্ধচোখের অন্ধকারে, তারই হৃদয়ক্ষত থেকে নাকি উৎসারিত হল রক্তের স্রোত! সে রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল তার বেশবাস আর তনুদেহ। ত্রস্তেব্যস্তে উঠে বসল সে শয্যার 'পরে। ভীত ব্যাকুল-নয়নে চেয়ে দেখল আশেপাশে। না, কেউ নেই, কিছু নেই। সে রয়েছে তার আপন ঘরের নিভৃতে। সামনের 'কুক্কু' ক্লকটা শুধু কুহুস্বনে রাত্রি দুটোর সময় জানিয়ে দিল। আবার উঠল সে। জয়পুরী মীনাকরা সুদৃশ্য কুঁজো থেকে কর্পূরবাসিত জল গড়িয়ে খেল। তারপরে জীবনে এই প্রথম, স্বেদার্দ্র জামাটাও টেনে খুলে ফেলল সে। আর আঁচল জড়িয়ে সুদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবারও গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

কত দিন। সে বোধ হয় দু'বছর হবে। আর এক ফাল্গুন দিনের [illegible] অপরাহ্ণ, টেনিস র‍্যাকেট হাতে দোলাতে দোলাতে কি যেন এক গানের সুরে গুনগুন করে, ক্লাবের লনে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল নন্দিনী। [illegible] সেই কোট এপোলোর প্রতিমূর্তি কি প্রাণ পেয়ে পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে তার চোখের সমুখে ধরা দিল নাকি! [illegible] থেকে [illegible] কথার [illegible] হল কি সেই অপূর্ব [illegible]। [illegible] রইল নন্দিনী। তার সঙ্গে কথা বলছিল সঞ্জীব সেন। সে-ই দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল আর ইনট্রোডিউস করিয়ে দিল পরস্পরকে। প্রত্যুম্ন সান্যাল। মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে নমস্কার জানাল সে নন্দিনীকে। আর তখনই যেন আত্মস্থ হয়ে প্রতিনমস্কার করল নন্দিনী। যৌবনকেই বুঝি অভিবাদন জানাল—অভিনন্দিত করল মনে মনে। সেদিন মিক্সড ডাবলসের খেলায় প্রত্যুম্নর অনুরোধে তারই পার্টনার হল নন্দিনী। আর বিজয়ীও হল তারাই। সে রাত্রে তাকে গাড়ীতে লিফট দিয়েছিল প্রত্যুম্ন।

ব্যারিষ্টার পি. কে. স্যানিয়েলের ছেলে প্রত্যুম্ন স্যানিয়েল। ডি. ভি. সি-র এক উঁচু মানের আর উঁচু দামের এঞ্জিনীয়ার। তার গৃহছাড়া মন শুধু ব্যাচেলার্স কোয়ার্টারের কোণাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দুরন্ত গতিতে ড্রাইভ করে কলোনীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, কখনও বা দূরান্তের পথে ছুটে বেড়াত সে। একলা নয়তো স-সঙ্গী। স্পোর্টসের চ্যাম্পিয়ন—রাইডিং, ড্রাইভিং, সুইমিং, কিছুতেই তার জুড়ি মেলা ভার। উচ্ছল, উজ্জ্বল আর প্রাণবন্ত সেই আনন্দমূর্ত্তি মনোহরণ করেছিল সবাকার। এক মাথা এলোমেলো কোঁকড়ান চুলের আগুনবরণ ছেলের সেই দীপ্ত হাসি আর দৃপ্ত ভঙ্গী দেখে কতদিন ভেবেছে নন্দিনী—ও যেন এক উদ্দাম উল্কার মত। মহাশূন্যের বুকে বহ্নিমান রূপে দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়ায়,—আবার কখন গতির অনিবার্য্য আকর্ষণে জ্বলে-পুড়ে যায় সেই আকাশদীপ। বড় নির্ম্মম, বড় সকরুণ যে এই পরিণতি। ভাবনার রাশ টেনে ধরেছে সে সভয়ে—আতঙ্কিতের মত। প্রেমের হাসিতে, প্রেমের কান্নায় কত বার ভেবেছে মর্ত্তের এই আলোকচঞ্চলতা কি জ্বলে না জ্বালায়। আজ সে প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হয়ে গেছে। আকাশ থেকে পৃথিবী আর পৃথিবী থেকে আকাশ—এইটুকুই তো শুধু পার্থক্য। তা ছাড়া এ দুইয়ের মাঝে আর ব্যবধান কোথায়!

প্রথম পরিচয়ের পরে আরো কতগুলো দিন। একমুঠো পাখীর পালকের মত হাল্কা হাওয়ায় তারা উড়ে গেল। এম-এ পরীক্ষার পর ডি-ভি-সি-কর্ম্মী সম্পর্কিত দাদার আবাসে অবকাশ যাপনের সেই কালটুকুই তো শুধু নয়—তারপর আরও কত বার কারণে-অকারণে সেখানে যাওয়া-আসা। আনন্দ, হাসি আর গানের স্রোতে ভাসা। উচ্ছলতা আর বিহ্বলতার মাঝে সেই অযাচ্ছার আত্মসমর্পণ। অসংখ্য পার্টি, পিকনিক আর জয় ট্রিপের মাঝেও এক নিরবচ্ছিন্ন একান্তের অবসর খুঁজে নেওয়া—পরিবেশ ও সমাগতজনের প্রতি সেই বিস্ময়ের অবহেলা। আর সুভাষিত কত বিচিত্র আলাপনের গুঞ্জরণ। কোনো কৌতুকের ইঙ্গিত আর বিদ্রূপের আভাসই তো ব্যাকুল করত [illegible]

পারেনি সেই চলমান প্রসন্ন আবেগবিধুরতাকে। তা ছাড়া, রিসার্চের মোহ ত্যাগ করে, বিদুষী হবার লিপ্সা থেকে প্রেয়সী হবার ঈপ্সার পথে যাত্রা করেছে যে মেয়ে—সে যদি তার সুযোগ্য প্রিয়জনকে প্রতিদিনের সঙ্গী করে নিতে চায়—তাতে ক্ষতি কি। হলই বা বিবাহপূর্ব্ব-কাল—মিলন যেখানে নিরূপিত—সেখানে আজকের প্রগতিশীল সমাজ ঐটুকু সুবিধা দিতে দ্বিধা করে না এতটুকু। তাই পরিবার-পরিজনের সস্নেহ সহৃদয়তা আর প্রচ্ছন্ন-প্রশ্রয়ে নিরুদ্বেগ হয়ে বয়ে চলেছিল তাদের দ্বৈতলীলার দিনগুলি।

রূপ, গুণ, বিদ্যা আর কালচারের সঙ্গে ধনী পিতার একমাত্র আদরিণী কন্যা নন্দিনীর আরও কিছু ছিল। সে তার অপার আত্ম-গরিমা। এই অহমিকার প্ররোচনায় স্তাবক আর অনুরাগী পুরুষের যত নিবেদন আর পরিচর্য্যাকে রাজেন্দ্রাণীর মহিমায় গ্রহণ করত সে। আবার একসময়ে অবহেলার হাসিতে, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের শায়কে তাদের হৃদয়গুলি বিদ্ধ করে, সব মনের কামনাকে তুচ্ছ করে দিয়ে উদ্ধত পদক্ষেপে দূরে চলে যেত অক্লেশে। মেয়েরা তার এই সৌভাগ্যকে ঈর্ষ্যা করত—আর করত ঘৃণা। পুরুষ করেছে প্রত্যাশা—পেয়েছে প্রতিঘাত। এমন করেই মদমত্ত যৌবনের জয়যাত্রায় এগিয়ে চলেছিল সে। অভিভাবকরা তার এই মনোভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন, চিন্তিত হয়েছিলেন। এ মেয়ে কি কোনও দিন তার মনের মানুষকে নিয়ে সুখী গৃহকোণ রচনা করতে পারবে।

সেই আশ্চর্য্যলগ্নে প্রদ্যুম্নর সঙ্গে নন্দিনীর দৃষ্টিবিনিময়—সে যেন তার পরম-পুরুষের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার। সে দিন থেকেই তার জীবনের প্রবাহ ভিন্ন গতি হয়ে গেল। অসীম দুর্ব্বারতায় ঐ প্রিয়লক্ষ্যে উপনীত হওয়া ছাড়া আরাধ্য যে আর কিছুই রইল না। বহুজনবাঞ্ছিত প্রদ্যুম্নর অনুরাগিণীদের বীতরাগ সইতে হল তাকে। অ্যাডমায়ারারদের ক্ষোভের ঝড়ও বইতে হল। কিন্তু দর্পিত-দুর্নিবারতায় সকল কিছুই অগ্রাহ্য করে গেল নন্দিনী। শুভার্থীরা নিশ্চিন্ত হল তার এই অভাবনীয় শুভবুদ্ধির উদয়ে—বিজয়িনীর হাসিতে আত্মগত হল সে। বিরোধীপক্ষ যখন নিজেদের সান্ত্বনা দিল—নিত্যনতুন মনমধুলোভী প্রদ্যুম্নর এ এক নতুন খেয়াল—অপরাজিতা ফুলের সঙ্গে খেলা; নন্দিনী প্রবল আত্মবিশ্বাসে ভাবল সে যে অপরাজেয়া তারই প্রমাণ আরও একবার দেবে ঐ চিত্তগ্রাহী চঞ্চলকে পরাভূত করে, তাকে চিরদিনের মত নিজের করে নিয়ে। আর যারা ভাবতে চাইল দুরভিলষিতার এ অভিনব আর অচিরস্থায়ী মনোবিলাসমাত্র—তাদের কল্পনার দীনতাকে উপহসিত করে দেবার সঙ্কল্প নিল মনে মনে।

কিন্তু এ সবই তো রইল অন্তরের গোপনতায়। স্বাভাবিকতার অন্তরালে থেকে বন্ধুত্বের যে ছায়া অভিনয় করে চলল নন্দিনী লাহিড়ী এঞ্জিনীয়ার ড্যানিয়েলের সঙ্গে, তাতে স্পষ্টত: সন্দেহ করবার কোনও অবকাশ রইল না কারও। তাই সব গুঞ্জনের মুখরতা এক সময়ে স্তব্ধ না হোক, স্তিমিত হয়ে এল। তবু উৎকণ্ঠ ব্যগ্রতায় সকলে অপেক্ষা করতে লাগল। কোনও না কোনও একদিন এই যবনিকা সরে গিয়ে তাদের সম্পর্কের স্বরূপ—যা তারা কল্পনা করেছে—তা' দৃষ্টির গোচর হয়ে যাবেই যাবে।

গোদরেজের বড় মিররে নিজের প্রতিকৃতির দিকে চেয়ে দেখল নন্দিনী। [illegible] লাগছে। এক ছায়াময়ী মায়িকা বলে বোধ হচ্ছে ওই শয্যাশায়িনীকে। চকিতে উঠে বসল সে। চোখের উজ্জ্বলতা কপোল বেয়ে ঝরে পড়ল—আর তখনই দৃশ্যমান হয়ে গেল সব কিছু। শ্বেত মলমলের আবরণে ওই প্রতিরূপ যেন এক শুভ্র মর্ম্মর মূর্ত্তির আকৃতি নিয়েছে। সর্ব্ব অঙ্গে তার উগ্র যৌবনের জ্বালাময়ী মাদকতা। তবু অসীম বিষাদে ভারাক্রান্ত। অশ্রুবিচল দু'নয়নে, বিদ্যুৎ-আলোর বিচ্ছুরণে, হীরকের তীক্ষ্ণ কঠিন প্রখরতা। কেমন যেন অলোকসামান্য মনে হয় নিজেকে। নির্ব্বাক নিশ্চেতনায় স্থির হয়ে থাকে কতক্ষণ। স্মৃতিতে জেগে ওঠে শুধু একটি নাম। ভেনাস। কে প্রথম মুগ্ধ হয়ে ও নামে ডেকেছিল—তা আর আজ মনে নেই। ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল পরিচিতদের মুখে মুখে। সেই হয়ে উঠেছিল তার পরিচয়—প্রাইড। তারপর একদা এক বিশেষ কণ্ঠে অনেক সুধা ছড়িয়ে সঙ্গীতের মতই বেজে উঠেছিল ঐ বন্দনা।

অন্ধকারের মত কালো আর অন্ধ দুই আঁখি নিয়ে ঐ তো শেলফের উপরে রয়েছে সেই গ্রীক দেবীকার এক নিষ্প্রাণ মূর্ত্তি। মূর্ত্তিমতী রিক্ততার মত এই শুক্লবসনা মানবীও যেন বিগত চেতনা। শুধু প্রাণের সাড়া আছে তার আয়তনেত্রের দীপ্তিতে। পাশাপাশি দুটি ষ্ট্যাচু ছিল ওখানে। এপোলো আর ভেনাস। সুন্দরতা আর বীর্য্যের দুই প্রস্তরময় রূপক। কোন অলক্ষ্য শক্তির পরিহাসের ইচ্ছায় একদিন কতকাল আগে নিজের হাতে সাজিয়েছিল সে আপন ঘরের কোণায়। তখনও প্রদ্যুম্ন আসেনি তার জীবনে। তারপর আবার নিজের হাতে ভেঙ্গে ফেলেছে একটি পুতুল—অতর্কিতে।

শেষবার ওখানে যাবার আগের ব্যস্ততাতেই বুঝি। নিঃসঙ্গ হয়ে রয়ে গেছে আর একটি। তারই মত। মানসিক ব্যালান্স হারিয়ে যাচ্ছে। অবিন্যস্ত হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। কাহিনীর ঘটনা পরম্পরায় এ অধ্যায় তো অনেক পরে।

সেই বেদনাবিরহিত, প্রাণোজ্জল সাহচর্য্যের দিনগুলি। তবু তারই মাঝে কতদিন, কতবার এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠেছে সে। পরিপূর্ণ আনন্দের সম্ভারের মাঝেও কি যেন এক অপূর্ণতার, বিচ্যুতির সন্ধান জেনেছে মনে মনে। মুখর পুরুষের মুখে চেয়ে চেয়ে তার অতলান্ত হৃদয়ের রহস্য বুঝতে চেয়েছে বারে বার। অসতর্ক ক্ষণে প্রদ্যুম্নের দৃষ্টিতে কোন অগ্নি ইশারা যেন দেখেছে নন্দিনী—যা ব্যপ্ত হয়ে যেতে পারে তার সব অভীপ্সা আর আকাঙ্ক্ষার রম্যতার উপর—ব্যর্থ করে দিতে পারে তাকে চিরতরে। বাঞ্ছিত প্রিয়সঙ্গও আর লব্ধ হয়নি তখন। কোনো ছলে দূরে সরে গেছে সে। কত রাত্রি বিনিদ্র হয়েছে দুটি জাগরী চোখের অশ্রান্ত বর্ষণে। কোন অকথিত রহস্যের কালোছায়া যে ঘনিয়ে ওঠে মাঝে মাঝে ওই দুরন্তের অভিব্যক্তিতে—যা তার তরুণ জীবনের অরুণ মাধুরীর উপর মুহূর্তে দুর্য্যোগের ঘনঘটা এনে দিতে পারে। কাতর হয় নন্দিনী। আশ্চর্য্য। কেন আজও প্রদ্যুম্ন মুখ ফুটে বলেনা সেই কথাটি—যা সবাই আশা করেছে, নিশ্চিন্তভাবে বিশ্বাস করে বসে আছে। যে যাই ভাবুক, যে যাই বলুক—নন্দিনী তো জানে, প্রদ্যুম্ন আজও বন্ধুত্বের ব্যবহারিক সীমানা ছাড়িয়ে কোনো অধিকারের প্রসঙ্গ নিয়ে আসেনি তার কাছে। এখনও তো প্রপোজ করেনি সে। আরও কতদিন, কতকাল চলবে এমন করে নিজেকে লুকিয়ে চলার পালা।

তার পর এল সেই সন্ধ্যা। ফাল্গুন আবারও এসেছে তার অশোক-কিংশুকের অজস্র সমারোহ নিয়ে। আর দক্ষিণ বাতাসে উদ্ভ্রান্ত করে ফিরছে ঘরে বাইরে। খেলার শেষে ক্লাবের হল-এ গিয়ে জমা হয়েছে সকলে। সেদিনও মিক্সড ডাবলসের খেলায় জয়ী হয়েছে নন্দিনী-প্রদ্যুম্ন। সেই আলোচনাতেই ব্যাপৃত ছিল সবাই। কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্ জানাচ্ছিল তাদের। তারই মাঝে কে যেন একজন সকৌতুক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল,—"সিঙ্গলস্ থেকে ডাবল হচ্ছ কবে তোমরা ?" নন্দিনীর মুখ লাজারুণ হয়ে উঠেছিল হয়ত। চড়া নিওনের নীচে বোঝা যায়নি। কিন্তু হাতের গ্লাসে নত হতে গিয়েই চমকে থেমে গিয়েছিল সে। বিদেশী পানীয় হাতে প্রদ্যুম্নের উচ্চকিত হাসি শুনে। কেমন যেন ধাতব ঝঙ্কারে—বেসামাল রকমের হাসি হাসছিল সে। টেপ সি ! কম পেগ হল ওর। এমন তো কখনও হতে দেখা যায় না ওকে ! অবাক চোখে চাইল সকলে।

আর ধন্দ হেসে হেসে তখনই তো প্রদ্যুম্ন দিল সেই শুভ-সংবাদ। লীভ নিয়ে কদিন পরেই কলকাতায় যাচ্ছে সে। তার ভালবাসার এক মেয়েকে এই ফাল্গুনেরই এক পুষ্পিত সুলগনে, চিরকালের আপন করে নিয়ে—যুগলে ফিরে আসতে। সব কিছু বুঝে নিতে কি খুব বেশী দেরী হয়েছিল নন্দিনীর। তীব্র আলোর নীচে, সেই অনেক চোখের স্তম্ভিত আর বিস্ময়ভরা চাহনিগুলির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে ফেলতে, অব্যক্ত বেদনায় গুমরে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিতে খুবই কি সময় লেগেছিল তার ! আকস্মিকতার এক ক্ষণবিহ্বলতা মাত্র। ভরকরের সেই কালো পর্দা যখন তার মনের সব চেতনায় আলোকে আড়াল করে ঝড় নেমে আসছিল, তখন

কোন অবচেতন প্রেরণায় শেষবারের মতই যেন সমস্ত আবেষ্টনের উপর চেয়ে নিতে চাইল সে। ঐ চোখগুলির বিস্ময় যে এখনই কৌতুক নয়তো বা করুণায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে তাকে উপলক্ষ্য করে—একথা সেই অবস্থাতেও অনুভব করতে পারল। আর তখনই তার আজন্মলালিত অহঙ্কার ও সম্ভ্রমবোধে লাগল বিষম আঘাত। ক্ষণিকে আত্মবিস্মৃতি থেকে নিজেকে সংবৃত করল। সংহত হল সে। ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্পের কৃপায় তার মুখের মৃত্যুবিবর্ণতা আগেই ঢাকা পড়েছিল। এবার আভিজাত্যের শিক্ষাও তাকে সাহায্য করল। ধীর হাতে অরেঞ্জ স্কোয়াশের গ্লাস টেবলের উপর নামিয়ে রেখে—সুন্দর এক হাসির প্রকরণে নিজের মুখটিকে ঝকঝকে করে নিয়ে দৃঢ়পায়ে এগিয়ে গেল প্রদ্যুম্নর দিকে। আর সেই বিস্মিত স্তব্ধতাকে কলকণ্ঠে রেণু-রেণু করে দিয়ে সাগ্রহ অনুমোদন জানাল তাকে, বান্ধবীর সহৃদয়তায়। সবার আগে। জনতার দিকে ফিরে সহাসে বলল,—"প্রদ্যুম্নই প্রথম হল তবে। আমার যোগ্যজনকে খুঁজে পেলাম না এখনও।"

ঘরের সেই নিঃশ্বাস রোধ করা আবহ এক মুহূর্তে সহজ হয়ে গেল। প্রকৃতিস্থ হল সকলে। নিঃসংশয় হল। যারা প্রতিদিন তার বিফলতার প্রার্থনা করে এসেছে—তারাও যেন কেমন খুশী হয়ে উঠল মনে- মনে। তার এই স্বচ্ছন্দ ব্যবহার এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করল সেখানে। আর প্রদ্যুম্ন বড় সাধারণ হয়ে গেল তার পাশে। নন্দিনী লাহিড়ীর জীবনে এঞ্জিনীয়ার সান্যালের ভূমিকা অনেক ছোট। বহুর মাঝে সে এক, বন্ধুমাত্র। নন্দিনী চিরনন্দিতা, তবুও অধরা।

আর প্রদ্যুম্ন ! উপস্থিতজনের সেই আন্তর আনন্দোচ্ছাস যখন নন্দিনীকে অনুসরণ করে তারই উপর এসে অভিনন্দন হয়ে স্তবকে স্তবকে ঝরে পড়তে লাগল, তখন সে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করতে লাগল। স্নেহের হাসি অপ্রতিভ হয়ে আগেই মিলিয়ে গিয়েছিল। এবার আচ্ছন্ন হতে থাকল পরাজয়ের গ্লানিতে। অনেক পরে, প্রচুর হৈ-হুল্লোড় করে, ফ্ল্যাশ খেলে বহু টাকা হেরে, নন্দিনী যখন ক্লাব থেকে বিদায় নিয়ে পথে বেরুল—প্রদ্যুম্নর অ্যামবাসাডর আর তখন কার পার্ক-এ অপেক্ষা করছিল না। নন্দিনীকে ঘিরে অনেক দিন পরে সেই অপরিমিত স্ফূর্তির মাঝে, কখন যেন সবার দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে গিয়েছিল সে কুণ্ঠিত পায়ে। সঞ্জীব সেনের পাশে পাশে কথা বলতে বলতে গাড়ীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল নন্দিনী। এ দৃশ্য দেখে, তাচ্ছিল্যের বাঁকা হাসিতে ধারাল হল সে অন্ধকারের দিকে ফিরে।

বাড়ী ফিরে খাওয়া দাওয়ার পর দাদা বৌদি যখন শুতে চলে গেল, নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে এসে দুয়ার রুদ্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়াল সে একান্তে। গাড়ী থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত সমস্ত সময়টা প্রায় নীরবেই কেটেছে। সন্দেহ নেই ওরা হতচকিত হয়ে গেছে একেবারে। তবু বারে বারে বৌদি মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যে বুঝতে চায় ! মেয়েদের স্বভাবজাত অনুভূতিতে সে কি জানতে পেরেছে তার মনের গোপন কথাটি—ধরতে পেরেছে তার ছলনা ! আর সমবেদনা বোধ করছে তার জন্যে ! "না, না, তা হয়না, হতে পারে না। আমি যদি আমাকে লুকিয়ে রাখি, সাধ্য কি তোমাদের খুঁজে নাও। নন্দিনী লাহিড়ী কারও কৃপার প্রত্যাশী নয়। কারও ব্যঙ্গের খোরাক হয়ে বাঁচতে জানে না, অন্যায়ের কাছে অবনত হয়ে বাঁচতে পারেনা সে।

কোনও প্রদ্যুম্ন সান্যালের ক্ষমতা নেই, জয় করে আর জয়ী হয়ে গিয়ে, তাকে প্রত্যাখ্যানের কলঙ্কে ফেলে রেখে হেসে হেসে দূরে চলে গিয়ে, মনের সুখে সুখী হয়। ব্যুমেরাং-এর মতই তার দেওয়া অভিঘাতকে আমি ফিরিয়ে দিতে জানি। তোমাদের এতদিনের সব ভাবনা এবার মিথ্যা হয়ে যাবে। ভুলিয়ে দেব আমি সব কিছু, আপন মোহের বিস্তারে। তোমরা জানবে নন্দিনী অসাধারণ, তার প্রেম নন্দিত হয়না ঐ সর্ব্বচিত্তহারী পুরুষকে ঘিরে। সখা সে হতে পারে—কিন্তু প্রিয় হবার শুভ-ভাগ্য তার জন্য নয়।" পাতলা ঠোঁট দাঁতে চেপে অসীম দৃঢ়তা আর নিদারুণ বিতৃষ্ণায় যেন হিসহিসিয়ে উঠল নন্দিনী ক্ষুব্ধ এক নাগিনীর মত।

"কিন্তু নিজেকে ভোলাব আমি কি করে!"—নিজের কাছেই যেন প্রশ্ন করল সে। প্রথম প্রীতির ফুল যে চিরদিনের ভুলের জ্বালা হয়ে গেল। প্রদ্যুম্নকে হেয় করে কতটুকু লাভ হবে তার। কি যে দেখল ঐ নিষ্ঠুর প্রাণ সেই মেয়ের মধ্যে, নন্দিনীও তুচ্ছ হয়ে গেল সেখানে। একজনকে ভালবেসেও আর এক মনের ভালবাসাকে অমর্য্যাদা করল সে কেমন করে। ওর ঐ শিক্ষিত, মার্জ্জিত, দীপ্ত, অভিজাত রূপের অন্তরে এমন হীনতার চক্রান্ত। এত ছোট প্রদ্যুম্ন!

চোখের জলের উৎস বুঝি শুকিয়ে গেছে বেদনার দাহে। আতপ্ত দীর্ঘশ্বাস তাই ছড়িয়ে গেল বাতাসে বাতাসে। যন্ত্রণাক্ত আবেগে ছটফট করল সে তন্দ্রাহারা প্রহরগুলি। যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রায় বিস্মৃত হয়েছিল এতদিন—এই চরম দুঃখের ক্ষণে তাঁকেই উদ্দেশ করে আকুল নিবেদন জানাল,—"আমার জীবনকে বঞ্চনায় দীর্ণ করে যে চলে গেছে, অভিশপ্ত হোক্ তার ভাগ্য। তার মিলন-ভিরাশাকে অসার্থক করে দাও, দেবতা।" যুক্ত করে, মুদিত পদ্মে যেন কোন এক কঠিন ব্রতের ধারিণীর মত তন্ময় হয়ে, মন্ত্রের মতই উচ্চারণ করল বারে বার। "না, না, না। এ বিয়ে হবে না, হতে পারে না। যে করে হোক্, যেমন ভাবেই হোক্—।" অস্ফুট কাতরতায় শতধা হয়ে গেল তার নিশীথ শয়নের নিঃসঙ্গতা।

তার পরের কয়েকটি দিন। একাকীত্ব যত অসহ স্মরণে বিদীর্ণ করে দিত তাকে। তাই সঙ্গী আর সঙ্গিনীদের নিয়ে এক উল্লাসের মত্ততায় নিজেকে আকীর্ণ করে রাখতে চাইল সে নিরন্তর। প্রদ্যুম্ন কিন্তু সরে রইল তাদের কাছ থেকে এ কয়দিন। অপরাধবোধের অশান্তি আর পরাভবের বিচলতা সঙ্কুচিত করে রাখল তাকে আপন কর্ম্মের ক্ষেত্রে—অবসরকালে স্বগৃহের অবরোধে তার এই পলায়নী মনোবৃত্তি আরও উত্তেজিত করে তুলল নন্দিনীর বিক্ষুব্ধ স্নায়ুকে। সবার মাঝে তাকে টেনে এনে, মরণপণ এক সর্বনাশা শেষের খেলায় নামতে চাইল তার প্রতিহিংসার উদভ্রান্তি। কি যে সে চেয়েছিল, সঠিক বোঝেনি বুঝি নিজেও।

সেদিন প্রভাতে সদলবলে নায়িকা নন্দিনী যখন প্রদ্যুম্নর বাংলোয় গিয়ে উপস্থিত হল কলরবে চারিদিক মুখরিত করে, প্রদ্যুম্ন তাদের এই রেড-এর জন্য স্বভাবতঃই প্রস্তুত ছিল না। অত্যন্ত বিব্রত হল সে। আর সামনে ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে, এক হাতে সংবাদপত্র ধরে, অপর হাতে যে বস্তুটি নিয়ে সে এতক্ষণ মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছিল—সেটি ঝনঝনিয়ে পড়ল মাটির উপর। সকলে সন্ত্রস্ত হল। অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে, চেয়ার ছেড়ে কুড়িয়ে নিতে অগ্রসর হল প্রদ্যুম্ন। কিন্তু তারও আগে ক্ষিপ্রহাতে তুলে নিল নন্দিনী। ভাঙা কাচের বিকৃতিতে যে সুন্দর-স্মিত তরুণীটিকে দেখা যাচ্ছে—অপলকে চেয়ে রইল তারদিকে অল্পক্ষণ। তারপর উচ্চ হাসির তারল্যে মেলে ধরল সবার সামনে। অপরাধীর মত লজ্জিত, মৌন, নতমুখে দাঁড়িয়েছিল প্রদ্যুম্ন। কাড়াকাড়ির মধ্যে ফটোটি টেবলে ফেলে রেখে তার দিকে এগিয়ে এল সে। "হাউ চার্মিং!" বলল কষ্টকৃত অপরূপ কটাক্ষ করে, উদ্দীপিত আবেগে। আর তার পরেই প্রসঙ্গ বদলে চলে এল আসল বক্তব্যে। "নূতন সঙ্গিনীকে আনবার আগেই, পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে দিচ্ছ নাকি প্রদ্যুম্ন! অন্ততঃ শেষ সঙ্গটাও দিয়ে যাও আমাদের।" মনের তাপ মনে রেখে মৃদু অনুযোগ জানাল সে ললিত অন্তরঙ্গতায়।

বিভ্রান্ত হয়ে চাইল প্রদ্যুম্ন তার দিকে। ছলনাময়ী প্রকৃতিকে চিনে নিতে পারে না কোনো কালের পুরুষচিত্ত। অনিমিষে দেখল সে, এক রুক্ষ-চুল শুভ্রাঞ্চলা সুযৌবনাকে। দাঁড়িয়ে আছে ঋজু দেহে, সাবলীল ভঙ্গিতে,—স্পষ্ট, উজ্জ্বল চোখ মেলে তার উত্তরের উন্মুখতায়। প্রসাধনবর্জ্জিত হয়ে আজ প্রকাশ পেয়ে গেছে তার স্বকীয় বিশিষ্টতা। শুচিতায় ভাস্বর সেই অনিন্দ্য রূপশ্রী। রৌদ্রমাখা মুখে কি অপূর্ব্ব দ্যুতির ব্যঞ্জনা। মূর্তিমতী এক অলোক প্রতিমা যেন—আবিষ্ট হয়ে ভাবল প্রদ্যুম্ন মনে-মনে। ধিক্কার দিল নিজেকে, একটা সামান্য বিষয় নিয়ে এমন করে অস্থির হওয়ার জন্য। কি আসে-যায় নন্দিনীর তার মত মানুষের ভালবাসা পাওয়া না পাওয়ায়। আগাগোড়াই ভুল করেছিল সে। নন্দিনী হয়তো হেসেই আকুল হবে জানলে যে, তাকে নিয়ে খেলতে চেয়েছিল প্রদ্যুম্ন এক মিথ্যা প্রেমের খেলা। হীন করতে চেয়েছিল তাকে লোকচক্ষে অহঙ্কারের স্পর্দ্ধায়।

স্বস্থ হল, স্বস্থ হল সে। ধন্য বোধ করল ঐ রুচিরা কন্যার সহজ সখীত্বের সংস্পর্শে এসে। স্বচ্ছ প্রসন্নতায় সাড়া দিল তাদের আহ্বানে। স্থির হল পিকনিকে যাবে তারা, তার ছুটি শুরু হওয়ার আগের দিন। নির্দিষ্ট জায়গায় আগেই উপস্থিত হবে সকলে। ওদিকেই কিছু কাজ আছে প্রদ্যুম্নর। তাড়াতাড়ি শেষ করে মিলিত হবে সেখানে গিয়ে। সফল হয়ে ফিরল ওরা খুশী মুখে। একজনের নিরুদ্ধ ভাবাবেগ শুধু অজানা রয়ে গেল তার আপাত হর্ষের আড়ালে।

সেই অনুকূল আবহাওয়ার উদার দিনটি। মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিকা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে, এক হয়ে, গানের সুরে, হাসির কথায়, খাওয়া, গল্প, খেলায় মাতামাতি করে, পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে নিয়েছিল ওরা। সব কিছু ভরিয়ে রেখেছিল নন্দিনী আর প্রদ্যুম্ন, তাদের স্বভাবসৌকর্য্যে। বিশেষত: নন্দিনী। সবটুকু বিমর্ষতা টুকরো কাগজের মত উড়িয়ে দিয়েছিল সে খোলা হাওয়ায়। কাউকে এড়িয়ে নয়, সবার মধ্যে থেকে তৃপ্ত হতে চেয়েছিল প্রিয় সান্নিধ্যে। এমন যাত্রা আর তো আসবে না কখনও এ জনমে। তাই স্মৃতির অঞ্জলিতে, যুগ্ম আনন্দের যত সমাপ্তিকালীন ক্ষণমুহূর্তের মণিমাণিক্যগুলি, ধরে রাখছিল সে অন্তরের সঞ্চয় করে—অনন্যমনে। পাশাপাশি উঠেছিল পাহাড়ে। হাত ধরে চলেছিল শ্যামল বনাঞ্চলে, পা ডুবিয়ে পাথরে বসেছিল নদীর জলে, দ্বৈতকণ্ঠে তুলেছিল বসন্তের তান। ধাবমান সময়কে মাঝে মাঝে বন্দী করে নিয়েছিল তার মূল্যবান চিত্রগ্রাহকযন্ত্রে। আর কত ছবিই যে তুলিয়েছিল দুজনে একসঙ্গে।

কত শীঘ্র এসে গেল সেই দিনটি সায়াহ্নের উপান্তে। আর তখন এল সকল কিছু সাঙ্গ করে ঘরে ফেরার পালা। আকাশের কোণে ভারে ভারে মেঘ জমছিল। আর তারই ফাঁক দিয়ে আসা বিদায়ী সূর্য্যের শেষ রশ্মি কেমন যেন রক্তাক্ত ভয়ালতার সূচনা করেছিল। গাড়ীর দরজা ধরে, সেদিকে চেয়ে সন্ত্রস্ত নন্দিনী পড়তে পড়তে রয়ে গেল কোন মতে। মাথাটা তার ঘুরে উঠেছিল। বুঝতে পারেনি কেউ। নিজেদের কার অন্যদের ছেড়ে দিয়ে, প্রদ্যুম্নর ডাকে তারই সঙ্গে ফিরছিল তারা। পাশে বসবার জন্য প্রদ্যুম্নর ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করে ব্যাক-সীটে গিয়ে অবসন্ন দেহভার এলিয়ে দিল নন্দিনী—"বড় ক্লান্ত আমি। আরামে যেতে দাও একটু। ইঞ্জিনের গরম আর সইবে না আমার"—তার এ ওজরে অবিশ্বাস করল না কেউ।

সারা পথ সমস্ত কথাবার্ত্তার মধ্যে একেবারে নীরব আর নিথর হয়ে রইল নন্দিনী। সব উৎসাহ আর উৎসবের যেন ইতি হয়ে গেছে তার অন্তকালের মত। চোখ দুটি বুজিয়ে পড়ে রইল ঘুমের মতই এক মগ্নতার মধ্যে। প্রদ্যুম্নর 'জোক্'গুলি পারল না ওর রহস্যপ্রিয় মনকে উদ্দীপ্ত করতে। মধ্যে মধ্যে কানে আসছিল ওদের ছেঁড়া ছেঁড়া সংলাপ—অট্টহাসির মুখরতা। এক সময়ে উৎকর্ণ হল সে। প্রদ্যুম্নর আসন্ন বিয়ের প্রসঙ্গ আলোচনা হচ্ছিল তখন। আর সেই নিয়ে তাদের বিচিত্র হাস্যপরিহাস। লাভা গলে গলে পড়ল যেন দুই শ্রবণে। মস্তিষ্কের কর্ম্মক্ষমতা লুপ্তপ্রায়। তবু আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে অবিচল রাখল নন্দিনী বাইরের চোখে। আর উচ্ছ্বসিত হয়ে গেল ভিতরে ভিতরে। আক্রোশের দুরূহ উপাসনায় নিবিড় হল বিধাতার পায়ে—"অকস্মাতের কোন ঘটনায় ভবিষ্যতকে তুমি অন্যরকম করে দাও হে ঈশ্বর। প্রেম যদি আমার সত্য হয়, একমাত্র হয়, তবে দৈব হয়ে ইচ্ছার যত শক্তি আমার অন্তরায় হয়ে যাক ওর অন্য-নারী-অভিগমনের পথে।"

ট্রানজিসটর সেটে সেতারে বাজছিল মেঘমল্লার—কলকাতা কেন্দ্র থেকে। নির্দ্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে, রেকর্ডে বুঝি। "বসন্তের ব্যাপ্তির মাঝে বিরহের বিলাপ! সর্ব্বদিকে আজ একি অনাসৃষ্টি—!" বিরক্তিতে স্যুইচ অফ করল প্রদ্যুম্ন। কতকগুলি বিক্ষিপ্ত চিন্তায় বিধৃত হল নন্দিনী। "বসন্ত বিদায়—! অকাল শ্রাবণ নেমে এল এই ভরা মধুমাসে। কলকাতার আকাশের ভাগ্যেও বুঝি এমনই কালো মেঘের আনাগোনা। সেই মেয়ের মনেও কি পড়েছে এর ঘনায়মান ছায়া।" উদাত্ত প্রিয়কণ্ঠের হিন্দোলে তখন দুলে দুলে উঠল বিশ্বপ্রকৃতি আর মিলনমেদুর হয়ে গেল রজনীর ধারাপাতের ছন্দায়িত আলাপ। উত্তরোত্তর স্পীড বাড়াচ্ছে প্রদ্যুম্ন। ভাল লাগে যে নন্দিনীর। কতদিন, কতবার তারা বেড়িয়েছে এমন করে। রেস দিয়েছে অন্য গাড়ীর সঙ্গে। সামনে থাকতে দেয়নি অপর কোন যানবাহন। ভয় করে, তবু ভাল লাগে এই দ্রুততার অভিরুচি—যৌবনের দুঃসাহসিক অগ্রগামিতা। গতি আর সঙ্গীত একাত্ম হয়ে গেছে। সীমা নেই, সমাপ্তি নেই যেন এর। অনন্ত নেমে এসেছে ধরণীর বুকে, অমৃতে পূর্ণ হয়েছে হিয়া।

হেডলাইটের উগ্রতায় খণ্ডিত হল তার সমাহিতির অবসর। জি• টি• রোডের সেই সঙ্কীর্ণ মৃত্যু-বাঁক। রুদ্র প্রচণ্ডতায় সামনে থেকে তাদের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে এক স্তূপাকৃতি মালবাহী লরী। যথারীতি বিনা হর্ণেই এসেছে—সন্দেহ নেই। তবু প্রদ্যুম্ন কি অন্যমনস্ক ছিল! প্রাণপণে হুইল ঘোরাল, গীয়ার চেঞ্জ করল, ব্রেক কষতে চাইল সে। কিন্তু বৃষ্টি-ভিজে সেই মাটিতে চাকা স্লিপ করে ধাক্কা লাগল গিয়ে পাশের বড় গাছটায়। আলো নেভান লরীটা তখনই পাশ কাটিয়ে পালিয়ে গেল নিঃশব্দে। কত সামান্য সময় লাগল এতবড় একটা অঘটন ঘটে যেতে। নিঃসীম আতঙ্ক, অসহ্য ঝাঁকুনি আর তারপরেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কেমন করে যেন হাতের চাপে দরজা খুলে, খোলা মাটিতে ছিটকে পড়েছিল নন্দিনী। ঝিরঝিরে জল চোখেমুখে পরে, চেতনা ফিরে পেল অচিরে। টলায়মান দেহে উঠে ইতি উতি খুঁজল। প্রথমে দেখল না কাউকে। তারপর মেঘনিষিক্ত পূর্ণিমা-চাঁদের আলো আঁধারিতে কি করুণ ভীষণতার সম্মুখীন হল! ড্রাইভিং সীটের দিকের ভেঙ্গে ঝুলে পড়া দ্বারপথের কাছে পথের পঙ্কে কার ও শোণিতাপ্লুত শিথিল দেহ! "প্রদ্যুম্ন!" নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশে গেল ক্ষীণ আর্ত্তনাদ। গত-চেতনা নন্দিনী লুটিয়ে পড়ল তার ক্ষতাক্ত বুকের পাশে।

অনেক পিছিয়ে পড়া সঙ্গীদল সেখানে এসে পৌছিল অবশেষে। দুর্ঘটনার প্রথম চমক সহ্য করে যথাযথ ব্যবস্থা করল তারা। সেই অকূল পরিস্থিতিতে, অটুট মনোবল নিয়ে আর স্থিতধী হয়ে, প্রশংসনীয় ভাবে কর্ত্তব্য করে গেছে সঞ্জীব সেন—প্রদ্যুম্নর অভিন্ন হৃদয় সহকর্মী, আবাল্যের সহচর। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি তার কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ। নন্দিনী শুনেছে, জেনেছে সব কিছু ধীরে ধীরে—এ কয়দিন ধরে, বিভিন্ন সূত্রে। সুদীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা পরে সে যখন জ্ঞান ফিরে পেল, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের এই নার্স-ডাক্তার পরিকীর্ণ প্রাসাদকক্ষে, তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির উপর দুটি উদ্বিগ্ন স্নেহের আগ্রহ তখন ঝুঁকে পড়েছিল।

মা-বাবা থেকে থেকে কাছে ডেকে জড়িয়ে ধরছেন তাকে। একমাত্র সন্তানকে মৃত্যুর প্রসারিত হাত থেকে ফিরে পেয়ে, সেই অসীম করুণাময়ের উদ্দেশে প্রণতির শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করছেন কতবার। শিশুর মতই সতর্ক প্রহরায় দিনে-রাতে ঘিরে রেখেছেন, অসুস্থতার দিনগুলি। তারপর—সুচিকিৎসায় শক্-এর ঘোর থেকে এবার বুঝি আরোগ্যলাভ করেছে সে। দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন তাঁরা।

অর্থবান, মাননীয়ের দুহিতা সম্পর্কে প্রাণহীন লৌকিকতা দেখাতে কত যে আত্মীয়-বন্ধুর অবিরাম আনাগোনা—একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে নন্দিনী। একটু যদি বিরলে থাকতে পেত সে। সেই সাংঘাতিক বিপদ থেকে স্বল্পে রক্ষা পাওয়ায়, তারা এসে খুশী হওয়ার ভাব দেখায়। একথা সেকথায় জানিয়ে যায়, একটিমাত্র পুত্রের শোচনীয় অপমৃত্যুতে শোকাহত প্রদ্যুম্নর পিতামাতা আর তার মনোনীতা বধূটির হতভাগ্যের কথা। আভাবে বোঝাতে চায়,— 'মেয়েদের প্রাণ নাকি জীওল মাছের মত'—তাই সে বেঁচে গেছে। ফ্রন্ট সীটে বসা তার দাদার তো দুটি পা-ই অপারেশন করে বাদ দিতে হয়েছে। অকর্মণ্য হয়ে গেছে সে। একদা ঐ বিশ্রী প্রবাদটি সম্পর্কে কি অসহ্য বিরূপতা পোষণ করত নন্দিনী। কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে এখন। বৌদির দৈহিক আঘাত বেশী নয়। কিন্তু স্বামীর বিপর্য্যয়ের অংশ তো অর্দ্ধাঙ্গিনীকেও সমান করে নিতে হবে। ইঙ্গিতে তারা তাকে দায়ী করে দেয় সব দুর্য্যোগের হেতু উত্তোক্তা বলে। ব্যথিত হয় সে, "ওরা যদি জানত যে মাতৃ-পিতৃহীন অসহায় কিশোরকে লাহিড়ী পরিবারের মমতা কাছে টেনে নিয়ে এত বড়টি করে উন্নতির সোপানে তুলে দিয়েছিল, অগ্রজের অভাব যে আমার ভুলিয়েছিল—সম্পর্কের সূক্ষ্ম বন্ধন ছাড়িয়ে, সুখে দুঃখে সে এ গৃহেরই একজন হয়ে গেছে। তার চিরদিনের সব ভাগ, সব ভারই যে আমাদেরও। আর প্রদ্যুম্ন। সে যে আমার কি,—কতখানি।—আভিজাত্যের কঠিন নির্মোকের মধ্যেও যে আর পাঁচজনের মতই সংবেদনের প্রাণ আছে, তা ওরা বুঝতে পারে না, চায়ও না।"

আজ সন্ধ্যায় সঞ্জীব সেন এসেছিল। এক সময়ে নিরালা ঘরে হাতে তুলে দিয়েছিল, তার ক্যামেরায় ধরা সেই পিকনিকের যত ছবিগুলি। গভীর স্নিগ্ধতায় চেয়েছিল তার দিকে। তারপর বলেছিল মৃদুস্বরে, "আমাকে তোমার সুহৃদ্ বলে জেন। প্রয়োজনে কাছে ডাকতে দ্বিধা কর না কোনও।" সান্ত্বনার নিষেকে তার নিমীলিত চিত্ত নিজেকে সব জড়ত্ব হারিয়ে উদ্বেল হয়ে উঠল এতদিনে—সিক্ত হল বিশুষ্ক অক্ষিপল্লব। রাতের আঁধারে তা-ই এখন অবিরল অশ্রুর রূপ নিয়েছে, নির্জ্জনতার পর্য্যায়ে। সঞ্জীবের না বলা সব কথাই যে জানা হয়ে গেছে, কতদিন আগে। সাধারণ ঘরের এক বিধবা মায়ের একটি ছেলে সে, এত বড় হয়েছে শুধু নিজের চেষ্টা আর অধ্যবসায়ে। কেন সে আজও কুমার রয়েছে। নন্দিনীকে সে হৃদয় দিয়েছিল, প্রতিদানের আশা না করেই। সেই বিফল বাসনার কথা অপ্রকাশ রেখেছিল সযত্নে। তার পর, প্রদ্যুম্নর পথ সুগম করে নির্ব্বিবাদে সরে দাঁড়িয়েছিল দূরে। এই মহৎ মানুষটির সৌজন্যের সম্প্রীতিকে শ্রদ্ধা না করে পারেনি তার কুমারী মনের কোমল প্রবণতা। "তুমি অকলঙ্ক, তুমি অনুপম। কিন্তু, জীবনে-মরণে আমি যে প্রদ্যুম্নের অনুগতা—তাই অনুপায় তোমাকে সুখী করতে। আমার জন্য আছে অপরিণামদর্শী প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত,—অসঙ্গ জীবনের দুশ্চরতা। তবু, তোমাকে ভুলব না কখনও। তোমার সখ্যতার আবাহনকে আমি বিনত হয়ে গ্রহণ করলাম।"

পালঙ্কের উপর আলোকচিত্রগুলিকে ধারাবাহিকক্রমে সাজাচ্ছিল নন্দিনী। সবশেষে ছিল, তার আর প্রদ্যুম্নর একটি একত্র ছবি। দূরাগত কোনও শঙ্খধ্বনি এসে বাজল কানে। আজ সন্ধ্যায়ই না ছিল ওর বিয়ের লগ্ন। কুশণ্ডিকা হচ্ছে হয়তো কোথাও। প্রদ্যুম্ন যে সকলকে রিসেপশনের কার্ড দিয়েছিল। সবিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাকে। ক্লিষ্ট হাসি হাসল সে, "প্রীতির কঠোর চর্য্যায় দেবতার দাক্ষিণ্য পেয়ে গেছি আমি। ললাটে আমার রক্তটিকা পরিয়ে দিয়েছে প্রদ্যুম্ন। এ চিরন্তন মিলনকে বিহত করতে পারেনি তৃতীয় জনের অসঙ্গত আগমন।

চমকিত হল নন্দিনী এক উপলব্ধির দারুণতায়। এই কি সে চেয়েছিল তার চেতনার গভীরে। কনকবরণ ফুলের মত, এ কোন উন্মাদ বিভ্রম তাকে আকর্ষণ করেছিল। অন্তহীন প্রিয়-বিরহ আর অভিঘাত-বৃত্তির অন্তর্দহন যে ধুতুরো বিষের মত আমরণ জরজর করে দেবে—বিস্মরণ হয়ে গিয়েছিল সে কথা। তৃপ্তির অন্তিম রেশটুকুও এমন করে হারিয়ে গেল নিঃশেষে।

বাঙলায় কনট্র্যাক্ট ব্রীজ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

Squeeze (প্রয়োজনীয় তাস পাসাতে বাধ্য করা)

কোনও কোনও সময়ে দেখা যায় যে চুক্তির খেলা করা সম্ভব নয়, সাধারণ উপায়ে, তখন আশ্রয় নিতে হয় এই পদ্ধতিটির। এই প্রণালীটিতে খেলার সাফল্য নির্ভর করে অধিকাংশ সময়ে যখন একের অধিক প্রয়োজনীয় রোখবার তাস একই হাতে সমবেত হয়। যেমন মনে করুন, ডাক বিনিময়ের দ্বারা ডাক উঠে পড়েছে ই-৭, এবং ওঠাটাও খুব অসম্ভব নয়, নিম্নলিখিত তাসে এবং বাঁদিকের খেলোয়াড় প্রথম খেলেন ই-২ :—

থেঁড়ীর তাস	আপনার তাস
ই-টে, সা, ৮, ৭, ৩	ই-৬
হ-৩,২	হ-টে, সা, বি, গো, ১০,৪
রু-বি, ৭, ৩	রু-টে,৫
চি-টে, ৯, ২	চি-সা, বি, ৫, ৩

থেঁড়ীর তাস টেবিলে খেলা হ'লে দেখা যায় যে, দুটি হাতের সমষ্টিগত উচ্চ শক্তিতে পিঠ জয় করা যায়, ১২টি এবং ১৩টি পিঠ জয় করা নির্ভর করে চিড়িতনে সমবিভাগের ওপর। কিন্তু প্রথম খেলা ই-২ অর্থাৎ একক তাস হওয়ায় সাধারণতঃ অপর তাসগুলির অসম বিভাগ সূচিত ক'রে। সুতরাং আর কি উপায় আছে? একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে চারখানি চিড়িতন ও রু-সা বাঁদিকের খেলোয়াড়ের কাছে থাকলে খেলা করা বিশেষ অসুবিধার নয়, যদিই বা এরূপ না হয় তখন চিড়িতন ত' শেষ অস্ত্র রইলই। সম্পূর্ণ তাসগুলি ছিল নিম্নরূপ :—

	উ	
	ই-টে, সা, ৮, ৭, ৩ হ-৩, ২ রু-বি, ৭, ৩ চি-টে, ৯, ২	
ই-২ হ-৯, ৬, ৫ রু-সা,গো, ১০, ২ চি- গো, ১০, ৮, ৭, ৪	প পূ দ	ই-বি, গো, ১০, ৯, ৫, ৪ হ-৮,৭ রু-৯, ৮, ৬, ৪ চি-৬
	ই-৬ হ-টে, সা, বি, গো, ১০, ৪ রু-টে, ৫ চি-সা, বি, ৫, ৩	

ই-২টি-মাত্র একক তাস কি না দেখবার জন্ত থেঁড়ীর হাত থেকে টে দিয়ে পিঠ নিয়ে আর একখানি ছোট ইস্কাবন খেলে বড় একখানি তুরূপ করা হ'লে বাঁয়ের খেলোয়াড় একখানি চিড়িতন পাসান। এর পর বাকী পাঁচখানি রং খেলা হ'লে উক্ত খেলোয়াড় বড়ই বিব্রত হ'য়ে পড়েন কারণ তখন আর চিড়িতন পাসাবার উপায় থাকে না। ষষ্ঠ রংখানি খেলবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাসের অবস্থা নিম্নরূপ :—

	উ	
	ই-সা, ৮ হ-× রু-বি, ৭, ৩ চি-টে, ৯	
ই-× হ-× রু-সা, গো, ১০ চি-গো, ১০, ৮, ৭	প পূ দ	ই-বি, গো, ১০ হ-× রু-৯, ৮, ৬ চি-৬
	ই-× হ-৪ রু-টে, ৫ চি-সা, বি, ৫, ৩	

ষষ্ঠ রং অর্থাৎ হ-৪ এসময়ে খেললে পশ্চিমের খেলোয়াড়কে বাধ্য হয়ে রু-১০ পাসাতে হয়। অতঃপর রু-টে খেলে চি-টেক্কায় থেঁড়ীর হাতে পিঠ নিয়ে উক্ত হাত দেখে ই-সা খেলে রু-৫ পাসাবার পর পশ্চিমের খেলোয়াড়ের হতাশ হ'য়ে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ সে সময়ে একখানি চিড়িতন বা রু-সা বাধ্য হ'য়ে পাসাতে হয়। যেটিই পাসান না কেন, বিপক্ষদলের এক পিঠ বেড়ে ১৩টি পিঠই হ'য়ে যায়।

ডামির হাত খেলিয়ে চুক্তি সম্পাদন

(Dump Reversal)

মাঝে মাঝে এরূপ তাসও এসে পড়ে যখন দুটি হাতের সমষ্টিতে চুক্তির খেলা সম্পাদনে সোজাসুজি একটি পিঠ কম পড়ে অথচ ডামির হাতটি খেলালে নির্দ্ধারিত পিঠ জয় করা সহজ হ'য়ে পড়ে। মনে করুন বণ্টন ক'রে ডাক দিয়েছেন হ-১ এবং ডাক বিনিময়ে শেষ ডাক উঠেছে হ-৪। বিপক্ষদল প্রথম খেলেছেন চি-সা এবং থেঁড়ীর ও আপনার তাস নিম্নরূপ :—

ডামির তাস	ডাকদারের তাস
ই-গো, ৩, ২	ই-১০, ৫, ৬
হ-বি, গো, ৯	হ-টে, সা, ১০,৮,৪
রু-টে, বি, ২	রু-সা, ৯, ৮, ৬
চি-টে, ৪, ৩, ২	চি-৫

দুটি হাতের সমষ্টিতে ৯পিঠ জয় করা যায় সোজাসুজি—হ-৫, রু-৩ এবং চি-১ এবং দশম পিঠ নির্ভর করে রুহিতন রংয়ের বাকী তাসের ৩-৩ বিভাগের উপর। যদি এরূপ বিভাগ না হয় তাহ'লে হতাশ হয়ে একটি খেসারৎ দিতে হবে। কিন্তু রংয়ের বাকী তাসের ৩-২ বিভাগ হ'লে রুহিতনের বিভাগ অসম হলেও কিছু আসে যায় না, দশটি পিঠ অবধারিত নিম্নলিখিত উপায়ে ডামির হাত খেলালে—যথা প্রথম পিঠ চি-টে দিয়ে জয় ক'রে ছোট একখানি চিড়িতন খেলে তুরূপ করবেন টে। একখানি রুহিতন খেলে ডামির হাতে টে দিয়ে ধ'রে আর একখানি চিড়িতন তুরূপ করবেন সা দিয়ে। আবার একখানি রুহিতন খেলে বি দিয়ে ধ'রে চতুর্থ চিড়িতনখানি তুরূপ

করবেন ১০ দিয়ে। পরে খেলে বিপক্ষদলের তিনখানি রং ধরে নিয়ে শেষ পিঠ নেবেন রু-সা। সুতরাং এরূপে খেললে সর্ব্বসমেত পিঠ হবে চি-১ ও তুরুপ-৩, হ-৩ এবং রু-৩ ; মোট-১০।

এবারে একটি ডামির হাত খেলানোর তাস দিচ্ছি যেটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ত' বটেই অপর পক্ষে সমস্যার সামিল। চারটি হাতের তাসই নীচে দেওয়া হ'ল এবং পাঠক-পাঠিকাগণকে অনুরোধ যেন তারা নিজেরাই স্বাধীনভাবে পন্থাটি না দেখে সমাধানের অনুশীলন করেন।

	ই-টে, সা, বি, গো হ-বি, গো, ১০, ৯, ৮, ৭ রু-টে, বি, ৩ চি-×	
ই-৬, ৪, ৩, ২ হ-× রু-সা, গো, ৪, ২ চি-সা, বি, ১০, ৮, ২	উ প পূ দ	ই-× হ-৬, ৫, ৪, ৩, ২ রু-১০, ৯, ৮, ৭, ৬, ৫ চি-গো, ৯
	ই-১০, ৯, ৮, ৭, ৫ হ-টে, সা রু-× চি-টে, ৭, ৬, ৫, ৪, ৩	

উ-দ-এর ডাক উঠে ই-৭ এবং পশ্চিমের খেলোয়াড় প্রথম তাস খেলেন চি-সা। কি উপায়ে খেললে দক্ষিণের খেলোয়াড় চুক্তির খেলা করতে সমর্থ হবেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এ আর শক্ত কি ? কিন্তু তাসগুলি বিছিয়ে চেষ্টা করুন দেখবেন একটু শক্ত বৈ কি ? এক হাত থেকে অন্য হাতে যাতায়াত প্রায় বন্ধ। চেষ্টা করে দেখুন—একবারে না হয় দুঃখ নেই আবার চেষ্টা করুন, রাস্তা যখন আছে তখন বেরুবেই। বলে রাখা প্রয়োজন যে এই তাসটি বিজ্ঞাপনস্বরূপ প্রকাশিত হ'য়েছিল বহু বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে অর্থাৎ এই খেলার জন্মস্থানে এবং আমার যতদূর স্মরণে পড়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান পৌঁছয় নি বিজ্ঞাপনদাতার কাছে, যদিও পিছনে ছিল প্রচুর পুরস্কারের আকর্ষণ। সুতরাং না পারলে বিশেষ লজ্জার কারণ ত' নেই বরং কৃতকার্য্য হ'লে যথেষ্ট পৌরুষ ত' আছেই এবং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে আপনি প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়।

যা'হোক পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যারা চেষ্টা ক'রেও সফল হবেন না তাঁদের অবগতির জন্য সমাধানটি নীচে দেওয়া হ'ল।

প্রথমেই দেখতে হ'বে অসুবিধাটি কোথায় ? এখানে অসুবিধা এই যে রং ধরে নিয়ে হরতনের টে, সা খেলবার পর আর উত্তরের হাতে প্রবেশের পথ নেই। আচ্ছা দেখুন ত' পথ আবিষ্কার করা যায় কিনা, উক্ত টে ও সা দুটিই পাসাবার ? একটি ত' পাসান যায় রু-টে'র ওপর কিন্তু অপরটির কি হবে ? অপরটিও পাসান যায় নিম্নলিখিত উপায়ে খেললে :—

	প	উ	পূ	দ
১ম চক্র—	চি-সা	হ-৭	হ-২	চি-টে
২য় „ —	ই-২	ই-টে	হ-৩	ই-৫
৩য় „ —	রু-২	রু-৩	রু-৫	ই-১০
৪র্থ „ —	ই-৩	ই-সা	রু-৬	ই-৭
৫ম „ —	রু-৪	রু-বি	রু-৭	ই-৯
৬ষ্ঠ „ —	ই-৪	ই-বি	রু-৮	ই-৮
৭ম „ —	ই-৬	ই-গো	হ-৪	হ-টে !
৮ম „ —	রু-গো	রু-টে	রু-৯	হ-সা !!

সুতরাং ৭ম ও ৮ম চক্রে হ-টে ও হ-সা পাসাবার পর বাকী পিঠগুলি হরতনের ফেরাইয়ে জয় করবেন উত্তরের খেলোয়াড়।

ইতিপূর্বে অনেকগুলি প্রণালীরই বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এগুলি ছাড়াও প্রতিপক্ষ দুর্ব্বল হ'লে চতুরতার সঙ্গে ফাঁকির আশ্রয়ও নিতে হয় মাঝে মাঝে চুক্তির খেলা সম্পন্ন ক'রতে এবং বাজে ডাকও দিতে হয় কখনও কখনও বিপক্ষদলকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করবার মানসে। অভিজ্ঞতা লাভের পর আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন সময় ও সুযোগ। অবশ্য মনে রাখবেন প্রবাদবাক্যটি যে, ফাঁকি দিতে গেলে নিজেরই ফাঁদে পড়বার সম্ভাবনা অধিক।

প্রথম বা পরবর্ত্তী খেলার প্রচলিত ধারা

(Conventions re : Leads & Plays)

ডাকের মাধ্যমে যেরূপ নিজ তাসের শক্তি বা পিঠজয়ের ক্ষমতা জানান যায় সেরূপ প্রথম বা পরবর্ত্তী খেলার দ্বারাও উদ্দেশ্য ও শক্তি জানানো সম্ভব প্রচলিত ধারানুযায়ী খেললে। বিপক্ষদলের ডাকে প্রথমে যে তাসখানি খেলা হয় সেটির মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। সেই উদ্দেশ্যটি কিরূপ যদি খেঁড়ী বুঝতে পারেন তবেই ত' তিনি সেই উপযোগী তাস খেলে বা ধ'রে বিপক্ষদলের ডাকের খেলায় বাধাসৃষ্টি করতে সমর্থ হবেন এবং এই উদ্দেশ্য বোঝাবার জন্য কতকগুলি ন্যায়সঙ্গত সঙ্কেত প্রচলিত আছে। সঙ্কেতগুলি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। যথা (১) উচ্চতাস ক্ষমতা দেখাবার সঙ্কেত (২) স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনও রংয়ের চার বা পাঁচ তাসের অবস্থিতি জানাবার সঙ্কেত ও (৩) কোনও রংয়ের কমসংখ্যক তাস দেখাবার সঙ্কেত। এই সঙ্কেতগুলি দেখাবার স্থানও তিনটি ; যেমন প্রথম উদ্বোধনী লীডের (Lead) এর সময়ে ; পিঠ জয় করবার সময়ে এবং খেঁড়ীর বা বিপক্ষদলের পিঠ জয়ের সময়ে।

প্রথমে খেলবার সুযোগ পান বিপক্ষদল, সুতরাং এই সুযোগে স্বভাবতঃই পিঠজয়ের ক্ষমতা বর্ত্তমানে পিঠগুলি টেনে নেন তারা নচেৎ পরবর্ত্তী চক্রে পিঠজয়ের পথ পরিষ্কার করবার চেষ্টা করেন। অনেক সময়ে দেখা যায় বিপক্ষদলের প্রথম খেলার ওপর চুক্তির খেলা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এরূপ পরিস্থিতিতে কোনও কোনও সময়ে স্বাভাবিকভাবে প্রথম তাসটি খেললে হয়ত চুক্তির খেলা হ'য়ে যায় অথচ প্রথম উদ্বোধনী খেলাটি অস্বাভাবিক হ'লে ডাকদার চুক্তির খেলা করতে সক্ষম হন না। এরকম পরিস্থিতি খুব কমই হয় সুতরাং সেগুলি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বিপক্ষদলের ডাক বিশ্লেষণ ক'রে যে তাসটি স্বার্থের অনুকূল সেইটিই প্রথমে খেলাই কর্ত্তব্য।

খেঁড়ীর রংয়ের তাস প্রথম খেলা

(Leads in Partner's Suit)

সাধারণভাবে সর্ব্বোচ্চ তাসখানি প্রথম খেলা উচিৎ কেবলমাত্র ব্যতিক্রম হ'বে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে :—

১। ডান দিকের খেলোয়াড়ের নো-ট্রাম্প ডাকে তিন বা চার তাসে ছবি থাকলে সর্ব্বাপেক্ষা ছোটখানি প্রথম খেলবেন। যেমন সা, ৯, ২ ; বি, ১০, ৫ ; টে, ৭, ৫, ৩ থাকলে যথাক্রমে খেলবেন ২, ৫ এবং ৩ উদ্দেশ্য ডাকদারের একখানি ছবিতাস ধরা সা, বি ও টে দিয়ে।

২। ছবিসমেত পাঁচখানি বা বেশী তাসে চতুর্থ বড়খানি (fourth best) অবস্থাভেদে সর্ব্বাপেক্ষা বড়খানিও খেলা চলে।

বিপক্ষদলের রংয়ের ডাকে কম তাসের লিড

(short-suit lead)

এরূপ লিডের প্রয়োজনীয়তা হ'য়ে পড়ে সময় বিশেষে। উদ্দেশ্য সাধারণতঃ কোনও প্রকারে একখানি পিঠ বাড়িয়ে বিপক্ষদলের ডাকের চুক্তি ভঙ্গ করান তুরূপের সুযোগে। সুতরাং এ রকম কম তাসের লিড দিতে গেলে দরকার হয় রংয়ের প্রথম বা দ্বিতীয় চক্রে রোখবার তাস, নচেৎ লিডের কোনও অর্থই হয় না, অপর পক্ষে বিপক্ষদলের চুক্তির খেলায় সহায়তাই করা হয়। খুব বিবেচনা ক'রে উপায়ান্তর না থাকলে তখনই এরূপ লিড চলে। যা'হোক দু'খানিতে এ রকম লিড দিতে গেলে বড় তাসখানিই প্রথমে খেলা উচিৎ, কিন্তু উক্ত তাসটি গোলামের নীচু তাস হওয়া দরকার, কারণ গোলাম প্রথমে খেললে বিপক্ষদলের পিঠ বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ ক'রে দেওয়া হয়।

ছবি তাস দিয়ে প্রথম উদ্বোধন (Lead of Honour cards)

সাধারণক্ষেত্রে প্রথম ছবি-তাস খেলা যুক্তিযুক্ত নয় কারণ ছবি-তাস বিপক্ষদলের একখানি ছবি-তাসের ওপর পেললে খেঁড়ীর পরবর্ত্তী তাস ফেরাই হ'বার সম্ভাবনা থাকে। পর্য্যায়ক্রমে তিনখানি পরের পর ছবি-তাস, যেমন সা, বি, গো ; বি, গো, ১০ থাকলে, সর্ব্বাপেক্ষা বড় তাসখানি খেলা যেতে পারে। কারণ এরূপ অবস্থায় বিপক্ষদলের উক্ত রংয়ের রোখবার তাস তাড়িয়ে পরবর্ত্তী তাসগুলি ফেরাই করবার সম্ভাবনা থাকে, অথচ লোকসানের ভয় থাকে না। অন্যথায় এবং খেঁড়ীর কোনও ডাক না থাকলে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রংয়ের চতুর্থ বড় তাস খেলা কর্ত্তব্য।

চতুর্থ বড়তাস খেলার তাৎপর্য্য

(Result of fourth-best lead)

ক্রমিক চতুর্থ বড় তাস খেললে ডামির তাস পড়বার পর খেঁড়ীর পক্ষে বিপক্ষদলের অপর খেলোয়াড়ের কাছে বড় তাস আছে কি না এবং থাকলে এরূপ বড় তাস ক'খানি আছে জানতে কোনও রূপ অসুবিধা হয় না। Rule of Eleven প্রয়োগে এরূপ জানা খুবই সহজ। ১১ থেকে যে তাসখানি প্রথমে খেলা হ'য়েছে সেখানি বাদ দিলে বাকি তিন হাতে উক্ত তাস অপেক্ষা বড় তাস কখানি বেরিয়ে পড়ে। যেমন মনে করুন খেঁড়ী প্রথম খেলেছেন কোনও রংয়ের ৭ এবং ডামি ফেলেছেন উক্ত রঙের সা, ১০, ৫ এবং আপনার হাতে আছে টে, ৯, ২। ডামির হাত থেকে একখানি ছোট তাস দিলে আপনিও ছেড়ে দিতে পারেন কারণ Rule of eleven-এর প্রয়োগে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, ডাকদারের কাছে আর বড় তাস নেই। ১১ থেকে প্রথম তাস অর্থাৎ ৭ বাদ দিলে বাকী থাকে ৪। এই ৪ খানি বড় তাস বাকী তিনটি হাতে আছে ; তার মধ্যে ডামির হাতে দেখা যাচ্ছে ২ খানি যথা সা ও ১০ এবং আপনার হাতে দুখানি টে ও ৯ সুতরাং অপর হাতে বড় তাস আর নেই। কেহ কেহ আবার তৃতীয় বড় তাস খেলার পক্ষপাতী। সে সময়ে ১২ থেকে উক্ত লিডের তাসখানি [illegible]

অনেকের হয়ত' মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে চতুর্থ বড় তাস ১১ থেকে বাদ দেওয়া হয় কেন ? খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন। উত্তরটিও অঙ্কশাস্ত্র মতে খুবই সরল। সর্ব্বসমেত প্রতি রংয়ে ১০ খানি তাস বর্ত্তমান, তন্মধ্যে ২ সর্ব্বাপেক্ষা ছোট এবং টে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সংখ্যানুসারে টেক্কার অঙ্ক সুতরাং ১৪। এই চোদ্দ থেকে যে তিনখানি বড় তাস উদ্বোধনকারীর কাছে আছে বাদ দিলে বাকী থাকে ১১ এবং এই ১১ থেকে যে তাসখানি খেলা হ'য়েছে সেটি বাদ দিলেই অপর তিনটি হাতে কখানি বড় তাস আছে বুঝতে পারা যায়। ঐরূপ ভাবে তৃতীয় বড় তাসের নীচের বেলায় ১৪ থেকে দুখানি বড় তাস উদ্বোধনকারীর কাছে আছে, সেই ২টি বাদ দিলেই বাকী থাকে ১২ এবং বার থেকে যে তাসখানি খেলা হ'য়েছে সেখানি বাদ দিলে বেরিয়ে যায় বাকী কখানি বড় তাস অপর তিনটি হাতে আছে।

উদ্বোধনী খেলার সময় যেরূপ পর পর তিনখানির মধ্যে বড়খানি খেলতে হয়, অপর সময়ে খেলবার নিয়ম কিন্তু ঠিক উল্টো অর্থাৎ তখন উক্ত তিনখানির মধ্যে খেলতে হবে সব থেকে ছোটখানি। যেমন কোন রঙের বি, গো, ১০ থাকলে প্রথমে খেলবেন বি কিন্তু খেঁড়ী বা অপর কেহ ঐ রংয়ের তাস খেললে আপনি খেলবেন ১০। এতে সুবিধা এই যে সময় বিশেষে খেঁড়ির পক্ষে জানা সম্ভব হয় যে উক্ত রংয়ের ১০ এর বড় তাস আপনার নিকট আশা করা যেতে পারে।

উৎসাহদানকারী তাস খেলা পাসান

(Come-on or encouraging Play)

কোনও রংয়ের তাসের খেলায় সময়ে স্বার্থ বোঝাবার উদ্দেশ্যে উক্ত রংয়ের একখানি বড় তাস, অন্ততঃ পক্ষে ৭ থেকে ৯ এর মধ্যে এবং পিঠ লোকসানের ভয়ে অবর্ত্তমানে এমন কি গো বা ১০ খেলা উচিৎ। খেঁড়ী উক্ত তাসখানি লক্ষ্য ক'রে এবং সচেতন হ'য়ে পরবর্ত্তী খেলা নিয়ন্ত্রণ করবেন। অন্যথায় স্বাভাবিকভাবে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট তাস দেবেন—২, ৩ ইত্যাদি। ঐরূপ উৎসাহদানকারী বড় তাস দেওয়ার ফলে খেঁড়ী উক্ত রংয়ের তাস আবার খেলতে অনুরোধ জানাচ্ছেন। বিপক্ষ দলের রংয়ের ডাকে খেলায় খেঁড়ী হয়ত' তৃতীয় চক্রে তুরূপ করতে পারেন অথবা ডাকদারকে তুরূপ করতে বাধ্য করিয়ে রংয়ে খাটো ক'রে দেবার উদ্দেশ্যও হ'তে পারে। উক্ত বড় তাসখানি যথার্থ উৎসাহদানকারী বোঝাবার উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী খেলায় বা প্রথম সুযোগেই দিতে হ'বে উক্ত তাস অপেক্ষা ছোট তাস (যেমন ৯, ৪, ৮, ৩ ইত্যাদি)। এইরূপ উঁচু ও পরে নীচু তাস খেলাকে Echoing বলে। বিপক্ষ দলের নো-ট্রাম্প ডাকের খেলায় এরূপ বড় তাস পাসান হয় সাধারণতঃ উক্ত রংয়ের একখানি উচ্চ তাসের উপস্থিতি জানাবার জন্য। বিপক্ষ দলের খেলার সময়ে এইরূপ ভাবে উঁচু-নিচু তাস পাসিয়ে উক্ত রংয়ের কয়খানি তাস বর্ত্তমান জানান অনেক সময়ে প্রয়োজনীয় এবং বিশেষ কার্যকরীও হয় ; যেমন মনে করুন বিপক্ষ দলের নো-ট্রাম্প ডাকের খেলা এবং আপনার ডামির তাস নিম্নরূপ :—

১ নং				২ নং			
	উ				উ		
বি, গো, ১০, ৫, ২	প	পূ		বি, গো, ১০, ৫, ২	প	পূ	
	দ				দ		
	[illegible]				[illegible]		

পূবের খেলোয়াড় খেলেছেন সাহেব। ১ নং তাসে আপনি দেবেন প্রথমে ৮ ও পরে ৩। সুতরাং আপনার খেঁড়ী বুঝতে পারবেন যে, আপনার হাতে উক্ত রংয়ের তাস মাত্র দুখানি এবং প্রয়োজন বোধে পশ্চিমের হাতে প্রবেশের পথ বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় চক্রে ছেড়ে তৃতীয় চক্রে টে মারবেন। কিন্তু ২ নং তাসে প্রথমত ৩ ও পরে ৪ দিলে খেঁড়ী জানতে পারবেন যে আপনার হাতে অন্ততঃ পক্ষে উক্ত রংয়ের তিন খানি তাস বর্ত্তমান। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় চক্রে আর ছেড়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

বিপক্ষ দলের রংয়ের ডাকে অপর কোনও রংয়ের খেলায় তুরুপ করার সময় ঐরূপ উঁচু-নীচু তাসে তুরুপের অর্থ কিন্তু ঠিক বিপরীত। দুখানি রং যথা ৮ ও ৩ থাকলে প্রথমে তুরুপ করবেন ৩ ও পরে ৮। খেঁড়ী বুঝতে পারবেন যে আপনার হাতে তুরুপের তাস আর নেই অপর পক্ষে প্রথমে ৮ ও পরে তুরুপ ক'রে আপনি জানাতে পারেন যে অন্ততঃপক্ষে আর একখানি রংয়ের তাস বর্ত্তমান এবং প্রয়োজনবোধে সেখানিও তুরুপ করাতে পারেন।

পরবর্ত্তী কোন রংয়ের তাস খেলবেন তার সঙ্কেত

(Suit preference Signal)

অনাবশ্যক উঁচু তাস দিয়ে খেঁড়ীকে নির্দ্দেশ দেওয়া চলে তিনি পরবর্ত্তী বা প্রথম সুযোগে কোন রংয়ের তাস খেলবেন। এরূপ বড় তাস খেলার উদ্দেশ্য খেঁড়ীকে অনুরোধ জানান যেন তিনি রংয়ের তাস ছাড়া অপর দুটি রংয়ের মধ্যে যেটির দর বেশী (higher of the two remaining suit) খেলেন। যেমন মনে করুন আপনার খেঁড়ীর রুহিতন ডাকের পর বিপক্ষদলের চুক্তি ই-৪। আপনি প্রথম খেলেছেন রু-সা এবং খেঁড়ী খেলেছেন রু-গো। সুতরাং খেঁড়ী অনাবশ্যক গো খেলে নির্দ্দেশ দিয়েছেন পরবর্ত্তী চক্রে হরতন খেলবার। বিপক্ষদলের খেলার সময়েও নির্দ্দেশ দেওয়া যায় অনুরূপভাবে কেবল সচেতন থাকতে হ'বে যে ঐ তাসটি উৎসাহদানকারী তাসের সহিত গোলমাল না হ'য়ে যায়। ঐ একই উপায়ে উদ্বোধনকারী খেলোয়াড় খেঁড়ীকে নির্দ্দেশ দিতে পারেন যে তিনি পিঠ পেলে কোন রংয়ের তাস প্রথম সুযোগেই খেলবেন। এইরূপ তাস পাসানগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে দেখা যায় অযথা বাকবিতণ্ডায় এইরূপ সূক্ষ্ম সঙ্কেতগুলি নজর এড়াবার ফলে বহু পয়েন্ট মাশুল দিতে হয়। এই সঙ্কেতটিকে ভালভাবে বোঝাবার উদ্দেশ্যে নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

উদাহরণ ১

ই-সা, গো, ২
হ-টে, ৬,
রু-টে, বি, গো, ১, ৮, ৪
চি-৭, ৫

	উ	
ই-বি, ১০, ৭		
হ-বি, ৫, ৩, ২	প পূ	
রু-৬, ৫, ৩	দ	
চি-সা, গো, ৬		

উত্তরের খেলোয়াড়ের উদ্বোধনী রু-১ ডাকের পর পূব'র ডাক উঠেছে হ-৪। দক্ষিণের খেলোয়াড় প্রথম খেলেন রু-সা। উত্তরে অবস্থিত খেলোয়াড় বিশেষ চিন্তা ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে ডামির তাস ও বিভাগ অনুযায়ী পূর্ব্বে অবস্থিত খেলোয়াড়ের তাস ৫-৪-২-২ অর্থাৎ ই-২, হ-৪, রু-২ এবং চি-৫ (টে ও বি সমেত হ'লে) চুক্তির খেলা হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। সুতরাং হ-টে থাকতে থাকতে একটি পিঠ বাড়িয়ে নেওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি ক'রে তিনি রু-সা এর উপর অনাবশ্যক উঁচু তাস অর্থাৎ বি বা গো ফেলে খেঁড়ীকে অপর দুটি রংয়ের মধ্যে বড় রংয়ের তাস খেলতে নির্দ্দেশ দেন। ফলে বিপক্ষদলকে একটি খেসারৎ দিতে হয় কারণ তখন উ-দ পিঠ পান রু-২, ই-১ ও হ-১ মোট ৪ পিঠ।

উদাহরণ ২। বিপক্ষদলের ডাক উঠেছে হ-৫ এবং আপনার ও ডামির তাস নিম্নরূপ :—

	উ	
ই-বি, ১০, ৭, ৩	প	পূ
হ-গো, ১০, ৮		দ
রু-সা, গো, ১, ২	ই-৭, ৫, ৪, ২	
চি-গো, ২	হ-১, ৭	
	রু-×	
	চি টে, সা, ১০, ৮, ৫, ৪, ৩	

আপনি প্রথম খেলেছেন চি-সা, ডামি দিয়েছেন ২ এবং খেঁড়ী দিয়েছেন বিবি। বিবিটি একক এটি বেশ বুঝতে পেরে আপনার খেলা কর্ত্তব্য চি-৩ টেক্কার বদলে। কারণ টেক্কা খেলে তুরুপ করাতে গেলে হয়ত ডামির গোলামের বড় তাস না থাকলে বিপক্ষদলের চুক্তির খেলা করার সম্ভাবনা যথেষ্ট। চি-৩ খেললে খেঁড়ী তুরুপ ক'রে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে, উদ্বোধনকারী রুহিতন খেলা চাইছেন। রুহিতন খেলা পেলে তুরুপ ক'রে চি-টেক্কার পিঠ টেনে নিয়ে একটি খেসারৎ আদায় করতে সক্ষম হবেন।

শ্লামের ডাকে উদ্বোধনকারীর খেঁড়ীর ডবল

(Lead directing double)

বিপক্ষদলের রংয়ে শ্লামের ডাকে ডবল নো-ট্রাম্পে ডবল হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক। নো-ট্রাম্পে ডবল দিয়ে বাঁদিকে অবস্থিত খেলোয়াড়ের ডাকের রং খেলতে নির্দ্দেশ দেওয়া বোঝায় কিন্তু এক্ষেত্রে বোঝায় বিপক্ষদলের ডাক ছাড়া অপর দুটি রংয়ের তাস খেলার নির্দ্দেশ। বাকী দু'টি রংয়ের মধ্যে একটিতে প্রথম চক্রেই তুরুপ করবার সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। সুতরাং উদ্বোধনকারীর বিভাগানুযায়ী রংটিকে বাছাই করার ওপর নির্ভর করে খেসারৎ আদায় করা—খুব বিবেচনার সহিত খেলতে হয় এরূপ ক্ষেত্রে।

যতদূর সম্ভব সকল রকম পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হ'য়েছে এই প্রবন্ধে। যদি কিছু বাদ পড়ে থাকে বা ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষিত হয় জানালে বিশেষ বাধিত হ'ব ও সংশোধন করবার সুবিধা পাব। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাগণের অভিমত জানবার প্রত্যাশায় রইলাম।

সমাপ্ত

যে ক'দিন আছেন, সে ক'দিন এই সব ভূত পেরেতের অত্যোচার সহ্য করতেই হবে।

হাবলার মা এসে ধরে নিয়ে গেলো নেকিকে।

কৃষ্ণার ভাবী শ্বশুরবাড়ীতে যাবে পাল্টা তত্ত্ব। বাড়ীর চাকর চাকরাণীরা সাজগোজ করছে। হাবলার মা সরমাকে বললো—কি গো বৌদি, তোমার নেকি আমাদের লগে যাবে নাকি? বড়লোকের বাড়ী, ভালো মন্দ খেতে পাবে।

—হ্যাঁ যাবে বৈকি। কিন্তু ওর তো ভালো জামা কাপড় নেই! আচ্ছা আমি দিচ্ছি ঠিক করে ওকে।

নিজের আলমারী থেকে একখানা পুরোনো চাঁপা রং-এর সিল্কের শাড়ী আর একটা ব্লাউস একটু ছোট করে সেলাই করে নেকিকে ডেকে দিয়ে বললো সরমা—নে এগুলো ভালো করে গুছিয়ে পড়ে নিগে যা! আর দেখিস্ কুটুম বাড়ী গিয়ে দুষ্টুমি করিস্‌নি যেন।

কাপড় জামা, আনন্দে বুকে চেপে ধরলো নেকি! বার বার নাকের ওপর চেপে ধরে শুঁকলো আলমারীর গন্ধটা, তারপর দৌড়ে চলে গেলো।

সকলের সঙ্গে কৃষ্ণার শ্বশুর বাড়ীতে এসেছে নেকি। দেখছে অবাক হয়ে—ইস্ কি প্রকাণ্ড বাড়ী, কৃষ্ণাদিদিদের বাড়ীর চেয়ে অনেক সুন্দর বাড়ীটা। কত রকমের আলো। ফুলের বাগান। আবার এখানকার চাকররা কেমন কোট প্যান্ট পরা। কোটের বুকে চক্ চক্ করছে সোনার মতো যেন কি সব আঁটা। দাসীরা ঠিক ও বাড়ীর বৌদিদিদের মতো ফিট্ ফাট্!

জিনিষপত্তোর তুলতে তুলতে হাঁক পাড়লেন গিন্নিমা—ও অভিজিৎ! দেখে যা, তোর শ্বশুরবাড়ীর তত্ত্ব!—

ওঁর কথায় বছর উনিশ-কুড়ির একটি স্যুট পরা ছেলে ঘরে এসে দাঁড়ালো, তার পেছনে পেছনে এলো একটা প্রকাণ্ড কুকুর। বামুনের গা টিপে ফিস ফিস করে বললো হাবলার মা—এই আমাদের জামাইবাবু!

নেকিও ফ্যালফেলিয়ে দেখলো কৃষ্ণাদিদির বরকে। কৃষ্ণাদিদির মতো অত ফর্সা নয়, কিন্তু মুখটা কি সুন্দর। ঠিক যেন গঙ্গার ঘাটের সেই বাঁশি হাতে করা কেষ্টঠাকুরের মতো।

কুকুরটাকে বড় ভালো লাগলো নেকির। ওদের গঙ্গার ঘাটে ছিলো একটা নেড়ি কুকুর, তার সঙ্গে খুব ভাব ছিলো ওর। কুকুরটাকে দেখে হাবলার মা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বললো—মাগো ঠিক যেন বাঘের মতো হাঁ করে চেয়ে আছে কুত্তাটা। একটা কুকুর দেখে অমন দজ্জাল মাসী ভয় পেয়েছে দেখে ভারি মজা লাগলো নেকির। নিজের সাহস দেখাবার সাধ গেলো ওর।

টপ করে উঠে গিয়ে নেকি যেই কুকুরের মাথায় হাত দিয়েছে অমনি কুকুরটা লাফিয়ে উঠে হাউ করে ওর হাতটা কামড়ে দিলো। ঘরে উঠলো চেঁচামেচি গোলমাল। তত্ত্ববাহকরা হুড়মুড় করে পালালো ঘর ছেড়ে।

অভিজিৎ ছুটে এসে কুকুরটাকে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে নেকির হাতটা পরীক্ষা করে বললো—ইস দাঁত বসিয়ে দিয়েছে দেখছি। ওর গায়ে হাত দিতে গেলে কেন? এসো ওষুধ লাগিয়ে দিই। ওর হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেলো সে। ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছিলো ওর হাত থেকে। অভিজিৎ রক্তটা মুছিয়ে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলো, একটা ওষুধের বড়ি খাইয়েও দিলো। তারপর ওর দিকে চেয়ে বললো—খুব লেগেছে তো? দুষ্টু মেয়ে।

বেশ সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিলো নেকি—না তো, বেশী লাগেনি। লাগলেও আমার কিছু হয় না। কত মার খাই, গা কেটে যায় আমার কিছু হয় না।

—মার খাও? কে তোমায় মারে।

—সবাই মারে দুষ্টুমি করলে। আমি ভিকিরির মেয়ে তো, ওরা দয়া করে রেখেছে তাই।

ওর কথা শুনে একটু আশ্চর্য্য ভাবেই ওর দিকে চাইলো অভিজিৎ। চেহারাটা তো ঠিক ভিকিরির মেয়ের মতো নয়। জিজ্ঞেস করলো—তোমার নাম কি?

—নেকি।

—নেকি? এমন বিশ্রি নাম কে রেখেছে তোমার? ভালো নাম নেই?

—আমার সেই ভিকিরি মা ছিলো, যে আমাকে রাস্তার জঞ্জাল থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছিলো? সে-ই ঐ নাম দিয়েছে! নিজের মা তো ছিল না তাই ভালো নাম হয়নি!

—তাই নাকি? আচ্ছা আমি তোমাকে একটা খুব ভালো নাম দেব! তোমার নাম দিলাম দেবযানী। কেমন পছন্দ হলো তো? এবারে কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে ঐ নাম বোলো।

দেবযানী! দেবযানী! বার বার নামটা উচ্চারণ করলো নেকি। তারপর বললো এমন ভালো নামটা কি আমায় মানাবে?

—খুব মানাবে! তোমাকে দেখতে তো ঠিক দেবযানীরই মতো! দেবযানী মানে কি জানো? যারা সত্যিকথা বলে, খুব ভালো মেয়ে হয়, তাদেরই বলে দেবযানী! তুমি তো ভালো মেয়ে আছোই আর এই নামটার জন্যে আরো ভালো হবার চেষ্টা করবে কেমন?

—কিন্তু কৃষ্ণাদিদি যে আমায় বলে,—তুই বাঁদরী, শাঁকচুন্নি, পেত্নি! পেঁচি, বোঁদি?

—কৃষ্ণাদিদি কে? জিজ্ঞেস করলো অভিজিৎ।

—চোখ নিচু করে একটু হেসে বললো নেকি,—ঐ যে যার সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে।

—ও! সে তোমাকে হিংসে করে বলে। জবাব দিলো অভিজিৎ।

সেদিন বাড়ী ফিরে এসে সারারাত নেকির চোখে ঘুম এলো না! বিড় বিড় করে আপন মনে বলতে লাগলো, দেবযানী! আমি দেবযানী!

পরদিন সকালে নেকিকে আর পাওয়া গেলো না বাড়ীতে!

মল্লিক-গিন্নী বললেন—কোথায় পালালো ছুঁড়িটা? দেখো আবার কিছু হাতিয়ে নিয়ে গেলো না কি। তখনই বারণ করেছিলাম যে, ওসব পাপ বাড়িতে রেখে কাজ নেই।

খোঁজ করা হলো। না কিছু সে নিয়ে যায়নি, শুধু নিয়ে গেছে কালকে সরমার কাছে পাওয়া শাড়ী-ব্লাউসটা আর তত্ত্বের বিদেয় পাওয়া দুটো টাকা।

কেউ বললে—পুলিশে খবর দাও!

গিন্নী জবাব দিলেন, ঘরের মেয়ে-বৌ তো নয়। রাস্তার জঞ্জালের জন্তে এত হাঙ্গামায় কাজ কি ?

সরমা খালি আড়ালে চোখ মুছলো। প্রার্থনা করলো—ভগবান মেয়েটার তুমি ভালো কোরো।

দেখতে দেখতে আরো ছ'সাত বছর কেটে গেলো। কৃষ্ণা বি, এ, পাশ করেছে তবে তার বিয়ে আজো হয়নি। কারণ অভিজিৎ ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করবার পর জার্মাণী গিয়ে উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এসে এখন বোম্বেতে কাজ করছে। ছুটি বড় কম,—তবে আশা করা যাচ্ছে মাস তিনেক পরেই তার ছুটি মিলবে, তখন বিয়ে হবে।

ঠিক এই সময়ে যেন বজ্রাঘাত হলো বোস বাড়ীতে। অভিজিৎ চিঠিতে জানিয়েছে যে, সে এখানে একটি মারাঠী মেয়েকে বিয়ে করেছে, এখন ওর বাপ-মা যদি এই বিয়েকে সমর্থন করেন, তবে ছুটিতে সে তার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে পারে।

কিছুদিন ধরে খুব কান্নাকাটি করলেন বোস-গিন্নি। কর্ত্তা বললেন, অমন ছেলের তিনি মুখ দেখবেন না—কিন্তু এক মাস যেতে না যেতেই গিন্নির বিরস বদন দেখে কর্ত্তার মন নরম হলো। তিনি বললেন—বড় ছেলে হাত ছাড়া হলেও, ছোটটি তো আছে, ওর বিয়ে স্বখরে দেওয়া যাবে। অভিকে লিখে দাও আসতে, এখানে ওরা এলে পর একটা জাঁকালো গোছের পার্টি দিলেই, সব দোষ চাপা পড়ে যাবে।

মল্লিক-বাড়ীতেও যথা সময়ে খবরটা পাঠানো হয়েছিলো। কৃষ্ণার মা মুখটা বিকৃত করে বললেন—অমন ছেলের মুখে আগুন! আমার মেয়ের রূপ আছে, গুণ আছে, আমার পয়সা আছে। কত সোনার চাঁদ ওর জন্তে আমার দোরে গড়াগড়ি দেবে।

বোস-বাড়ীর পার্টিতে মল্লিক-বাড়ীতেও নেমন্তন্ন হয়ে ছিলো! কেমন বৌ হল, পাওনা থোওনাই বা কি ? জানবার তো কৌতূহল আছে। তাই সরমাকে পাঠালেন গিন্নি নেমন্তন্ন রক্ষা করতে।

আলোর ছটায় ফুলের গন্ধে আর অভিজাত মহিলা পুরুষের কলগুঞ্জনে জম জমাট বোস-বাড়ী। তবে নতুন বৌ সেজে গুজে প্রতিমার মতো সিংহাসনে বসে নেই, নিমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝেই ঘোরা ফেরা করছিলো।

সরমার খুব ভালো লাগলো বৌকে। কৃষ্ণার মতো ফর্সা না হলেও চমৎকার মিষ্টি চেহারা। দামী বেনারসী পরনে, হাতে, গলায় কানে, কমলহীরের গয়না ঝলমল করছে।

বোস-গিন্নী বৌকে ডেকে সরমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সরমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো বৌ।

বোস-গিন্নী বললেন বৌ আমার বড্ড গুণের গো। যেমন মিষ্টি স্বভাব তেমনি নাচ গান সব বিষয়ে তৈরী। কথাকলি নাচে ওর বোম্বেতে খুব নাম হয়েছে, কত মেডেল পেয়েছে। আর এই সব গয়না দেখছো সবই ওর বাপ দিয়েছে, একখানা বাড়ীও দিয়েছে বোম্বেতে।

সরমা বললো—সত্যিই আপনার বৌ চমৎকার হয়েছে মাসীমা! একদিন আসবো ওর নাচ দেখতে।

—আর মা! সখেদে বললেন বোস গিন্নী—সাত দিনের ছুটিতে এসেছে, কালই তো চলে যাবে ওরা। আচ্ছা তোমরা গল্প করো, আমি টেবিল সাজানোটা দেখে আসি।

সরমা নতুন বৌকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি ভাই ?

—দেবযানী। চোখ নত করে জবাব দিলো বৌ। তারপর একটু হেসে সরমার দিকে চেয়ে কৌতুকভরে বললো,—আমাকে চিনতে পারছেন না ছোট বৌদি ? আমি আপনাদের সেই নেকি ?

হঠাৎ সরমার সামনে যদি ছপাৎ করে একটা গোখরো সাপ এসে পড়তো, তাহলেও বোধ হয় এতটা চমকে উঠতো না ও'।

অস্ফুট স্বরে বললো সরমা—তুই··তুমি সেই আমাদের নেকি ? আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! এমন উন্নতি হল কি করে ?

—সেই কথা বলবো বলেই তো আমার আসল পরিচয় দিলাম। অবশ্য আমার স্বামী ছাড়া এ কথা আর কেউ জানেন না, উনি বলতে নিষেধ করেছেন। তবে আপনাকে বলছি, আপনি শুনে খুশি হবেন বলে।

সরমাকে নিয়ে দেবযানী নিজের ঘরের সামনের ঝুল বারান্দায় গিয়ে বসলো। তারপর নিজের কথা সংক্ষেপে বলে গেলো ও'।

এই বাড়ীতেই তত্ত্ববাহকদের সঙ্গে প্রায় সাত বছর আগে এসেছিলো সেদিনের নেকি। আর সেদিনের কুকুরের কামড় থেকেই হলো ওর জীবনের সৌভাগ্যের সূত্রপাত। অভিজিৎ ওর হাতে ওষুধ লাগিয়ে দিতে দিতে ওর নাম দিয়েছিলো দেবযানী, সেই নামটাই যেন ওকে সারারাত বলেছিলো তুমি নেকি নও; তুমি দেবযানী। কি এক আনন্দে সারারাত ওর চোখে জল ঝরেছে। ছোটবেলায় ওর ভিখারী মায়ের সঙ্গে ও রোজ গঙ্গাস্নান করতো, মা গঙ্গার ওপর ওর বড় ভক্তি ছিলো। সেই রাতে ওর মনে হলো, মা গঙ্গা যেন ওকে ডাকছেন। তখনও ভালোভাবে ভোরের আলো ফোটেনি। সরমার দেওয়া সেই চাঁপা রংএর শাড়ী আর ব্লাউসটা পরে, একটা ছেঁড়া শাড়ী আর তত্ত্বে বিদেয় পাওয়া টাকা দুটো নিয়ে নেকি সোজা চলে এলো বড় রাস্তায়। তখন বাস চলাচল সবে সুরু হয়েছে! ও' একট বাসে উঠে বললো যে সে গঙ্গায় যাবে। বাস ড্রাইভার ওকে হাওড়ার পোলের কাছে ছেড়ে দিলো। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে ঘরের ভেতর ভালো জামা কাপড় ছেড়ে,—কাপড়ের আঁচলে টাকা দুটো বেঁধে রেখে, নেকি ছেঁড়া কাপড়টা পরে গঙ্গায় ডুব দিলো। অনেকদিন পরে গঙ্গায় ডুব দিয়ে ওর মন প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেলো,—।

মা গঙ্গাকে প্রণাম করে ও প্রার্থনা জানালো—মা! আমি যেন দেবযানী হতে পারি।

স্নান সেরে উঠে এসে দেখলো নেকি, ওর কাপড় জামা কিছু নেই! ভয়ে ও' কাঁদতে লাগলো! একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা, ওকে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিলেন,—তিনিও স্নান করতে এসেছিলেন ঐ ঘাটে।

তিনি ভাঙা বাংলায় ওকে জিজ্ঞেস করলেন, ও' কেন কাঁদছে।

নেকি কাঁদতে কাঁদতে বললো—আমার জামা কাপড় টাকা পয়সা সব কে নিয়ে গেছে মা।

মহিলাটি ভালো করে ওর মুখখানা দেখলেন—তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বাড়ী কোথায়? কোথায় যাবে? সঙ্গে কে এসেছে?

—বাড়ী আমার কোথাও নেই মা। আমার কেউ নেই—বলে কাঁদতে কাঁদতে নেকি সব কথা বলে গেলো!

সব শুনে মহিলাটি ওকে বললেন—তুমি আমার সঙ্গে যাবে? আমাকে মা বলবে?

নেকি দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বললো—মা! মাগো!

বোম্বের বিখ্যাত বস্ত্র-ব্যবসায়ী মহেশ্বর ভাবে,—কার্য্যোপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন, তাঁর স্ত্রী গঙ্গাবাঈও এসেছিলেন সঙ্গে। গঙ্গাবাঈ নেকিকে সঙ্গে নিয়ে বোম্বে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে নেকি জানলো, ওঁদের ঠিক ওর মত দেখতে একটি মাত্র মেয়ে বছর দুয়েক হলো মারা গেছে। তার নাম ছিলো যমুনাবাঈ। ওকে সেই নাম দিলেন ওর নতুন মা।

ওঁদের একটি মাত্র ছেলে বিয়ের পর বৌ নিয়ে আলাদা থাকে। তাই যমুনাই হলো ওদের এখন একমাত্র অবলম্বন।

এরপর সুরু হলো ওর শিক্ষার ব্যবস্থা।

নাচের মাষ্টার, গানের মাষ্টার, লেখাপড়ার মাষ্টার; আর তার সঙ্গে এলো, দামী দামী শাড়ী, গয়না। যমুনাও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো, মা, বাবাকে।

কথক নাচ আর মণিপুরী নাচে ওর উন্নতি দেখে, নাচের মাষ্টার মশাই বিভিন্ন জলসায় ওর নাচের ব্যবস্থা করলেন। তিন চার বছরের মধ্যেই ওর নাচের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। অনেক মেডেল পেলো ও নাচের জন্য।

বিচিত্র বসনে ভূষণে সজ্জিতা হয়ে বড় বড় জলসায় নাচের সময় ওর মাঝে মাঝে মনে পড়তো কৃষ্ণাদিদির কথা—মনে পড়তো বড় হয়ে ঐ রকম ঘুঙুর, আর ঘাঘরা কিনবে, সেই সব সাধের কথা। চোখে জল আসতো মা গঙ্গার অপার করুণার কথা ভেবে।

মাস দু'য়েক আগে, এই রকম একটি জলসায় ওর নাচ দেখতে এসেছিলো ওর বান্ধবী রুক্মিনী তার স্বামী, আর তার স্বামীর এক বাঙালী বন্ধু। নাচের পর রুক্মিনী ঐ বাঙালী বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো যমুনার। বন্ধুটি ইঞ্জিনিয়ার—নাম অভিজিৎ বসু।

যমুনা ওকে দেখেই চিনলো এ সেই কৃষ্ণাদিদির বর। কিন্তু অভিজিৎ ওকে মোটেই চিনতে পারেনি কারণ সেই নেকিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না এই যমুনাবাঈয়ের ভেতর।

[illegible] সন্ধ্যেবেলার সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতো যমুনা। সেখানে দেখা হয়ে যেতো অভিজিতের সঙ্গে। চওড়া বাঁধটার ওপর বসে ওরা গল্প করতো দু'জনে। আলাপ ক্রমে অন্তরঙ্গতার পরিণত হলো। যমুনা অভিজিতকে বাড়ীতে এনে চা খাওয়ালো, ওর মা, বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। মাঝে মাঝে রুক্মিনী আর তার স্বামী জুহু বীচ-এ মালাবার হিলে, কখনও বা সহরের বাইরে যেতো পিকনিক্ করতে সঙ্গে নিতো অভিজিৎ আর যমুনাকে। ওদের অন্তরঙ্গতা ভালোবাসায় রূপান্তরিত হলো।

মনের মধ্যে কিন্তু যমুনা মাঝে মাঝে অনুভব করতো বিবেকের তিরস্কার। কৃষ্ণা যে ওর অনেক দিনের বাগ্‌দত্তা। সে কথা জেনেও তার প্রতি এই অনুরাগ অন্যায়। এই কথাটা যেন ফুটতো কাঁটার মতো ওর মনের পর্দায়। তাই ও ঠিক করলো—অভিজিতের কাছ থেকে নিজেকে এবারে দূরে রাখবে।

দিন আষ্টেক যমুনা আর গেলো না সমুদ্রের ধারে। একদিন ও পেলো অভির টেলিফোন—তুমি কি অসুস্থ যমুনা? আর আসো না কেন?

—না এমনিই। একটু ব্যস্ত ছিলাম—জবাব দিলো যমুনা।

—আজ একটু এসো, বড় দরকার তোমাকে। বললো অভিজিৎ।

আবার এলো যমুনা কুণ্ঠিত মন নিয়ে। বসলো ওরা পাশাপাশি সমুদ্রের ধারে।

কোনো ভূমিকা না করেই বললো অভিজিৎ—আমি বাঙালী বলে কি তুমি সরে যাচ্ছো আমার কাছ থেকে? চাওনা আমার ভালোবাসা।

বুকের নদীতে জেগেছে ওর কান্নার তুফান। কয়েক মুহূর্ত্ত লাগলো নিজেকে সংযত করতে। তার পর শান্ত চোখ দুটি তুলে জবাব দিলো যমুনা—আমিও বাঙালী!

—বাঙালী? তবে মারাঠীর ঘরে কেন? সবিস্ময়ে প্রশ্ন অভিজিতের কণ্ঠে?

—বলছি সব। তবে অনেক আগেই এসব কথা তোমাকে আমার বলা উচিত ছিলো। আমার সে অপরাধ ক্ষমা কোরো। আচ্ছা তোমার কি মনে পড়ে? বছর সাতেক আগে, তুমি একটি মেয়ের নাম দিয়েছিলে দেবযানী। যার আসল নাম ছিলো নেকি?

একটু ভাবলো অভিজিৎ। তারপর বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে আমার কুকুর সেই মেয়েটির হাতে কামড়ে দিয়েছিলো।

—সেই দাগটা এখনো আছে, বলে যমুনা নিজের হাতটা আলোর দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

ওর হাতখানা ধরে অভিজিৎ দেখলো দাগটা, তারপর আপন মনে বললো—আশ্চর্য্য'। এও কি সম্ভব?

—তোমার দেওয়া দেবযানী নামই যে একান্ত অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, সে কথা যদি বলি, তুমি কি বিশ্বাস করবে? তবে শোন—

অকপটে নিজের সব কাহিনী বললো ওকে যমুনা।

কথার শেষে বললো—তুমি যে কৃষ্ণাদিদির সেই বর, তা আমি তোমাকে প্রথম দিন দেখেই চিনেছিলাম, কিন্তু নিজের পরিচয় দিতে পারিনি। ভেবেছিলাম সে পরিচয় আর কোনদিন কাউকে জানাবো না, কিন্তু আমার বিবেক সায় দেয় না, মনের এই অন্যায় প্রস্তাবে। নিজেকে অনেক বেদনা দুঃখ সইতে হলেও, তোমাকে ঠকাতে পারবো

না, তাই, আজ এসেছি আমার সব কথা তোমাকে জানিয়ে ক্ষমা চাইতে।

গভীর অনুরাগে ওর একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললো অভিজিৎ—তোমাকে যে আমি প্রথম দেখেই বুঝেছিলাম, যে তুমিই সত্যি দেবযানী। তবে একটা কথা জানিয়ে দিচ্ছি যে—আমি তোমার সেই হিংসুটে কৃষ্ণাদিদির বর নই—আমি আমার দেবযানীর বর।

বড় কান্না কেঁদেছিলো সেদিন যমুনাবাঈ। যমুনার মা বাবা শুনলেন ওদের কথা। ওর মা গঙ্গাবাঈ অভিজিতের সব পরিচয় জানলেন। ওকে দেখেও খুব ভালো লেগেছিলো তাঁর। তিনি বললেন—ছুটি সর্ত্তে উনি মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন। প্রথম খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে হবে। দ্বিতীয়—বোম্বেতে ওকে বাস করতে হবে, সেজন্য মেয়েকে ওঁরা, নিজের বাড়ীর কাছেই একখানা বাড়ী দেবেন। রাজি হলো অভিজিৎ। তারও একটি সর্ত্ত যে, যমুনা তার বাড়ীতে এসে হবে দেবযানী।

খুব সমারোহের সঙ্গে ওদের বিয়ে হয়ে গেলো। আত্মকাহিনী শেষ করে আবেগবিহ্বল কণ্ঠে বললো দেবযানী তখন' কি, স্বপ্নেও ধারণা করতে পেরেছি বৌদি—যে আমি আবার মা পাবো, বাপ পাবো,—এমন দেবতার মতো স্বামী পাবো! মা গঙ্গার দয়াতেই আমি সব পেয়েছি! আজ আমার মতো সুখী পৃথিবীতে আর কেউ আছে কিনা জানা নেই আমার। আপনিও আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি এঁদের মর্য্যাদা দিতে পারি আমার জীবন দিয়ে।

চুপ করলো দেবযানী।

ততক্ষণ সরমা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলো কোনো আরব্য রজনীর কাহিনী। এবারে সে দেবযানীকে জড়িয়ে ধরে বললো—তুমি যে বড় ভালো মেয়ে ছিলে! আমি বুঝেছিলাম যে একদিন এই পাঁকের ভেতর থেকেই তুমি পদ্ম হয়ে ফুটে উঠবে।··· তোর সৌভাগ্য দেখে বুকটা আমার আনন্দে ভরে উঠছে রে!

দেবযানী বললো—আপনি একটু বসুন বৌদি।

সে ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো ছোট একটি ভেলভেটের কেস! সেটি সরমার হাতে দিয়ে বললো—এটা আমার খোকন ভাইটিকে দেবেন তার দিদির আশীর্ব্বাদ।

বাক্সটা খুলে—চমকে উঠলো সরমা। তার ভেতর একসেট কমলহীরের বোতাম জল জল করছে!

—একি কাণ্ড রে? এর যে অনেক দাম! বললো সরমা।

—হলেই বা বৌদি—ভাইকেই তো দিচ্ছি। অত সুখের মধ্যে থেকেও খোকনের জন্যে আর আপনার জন্যে আমার যে কি মন কেমন করতো বৌদি। ইচ্ছে ছিলো নিজে গিয়ে খোকনকে দেখে আসবো, আর এটা দিয়ে আসবো। কিন্তু তা তো হবার নয়। আমার পূর্ব্ব পরিচয় জানাতে যে উনি বারণ করেছেন। সকলে এখানে জানেন যে আমি মারাঠী মেয়ে।

একটু হেসে বললো সরমা—তবে আমাকে বললি কেন? তুই এখনো দেখছি সেই নেকিই আছিস।

সততার জ্যোতি বিচ্ছুরিত ছুটি ডাগর চোখ তুলে ওর দিকে চাইলো দেবযানী। তারপর বললো—আমার মা, বাবা, আর স্বামী ছাড়া, শুধু আর একজনকেই সব কথা বলা যায়, যিনি ছিলেন আমার সেই অন্ধকার জীবনের একমাত্র আলো। তাঁকে চিনতে ভুল সেদিনের নেকিও করেনি,—আর আজকের দেবযানীও করবে না।

প্রভাত-সঙ্গীত

(Afanasy Afanasyevich Foeth-এর 'Morning song' কবিতার অনুবাদ)

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

শুভ সন্দেশ বয়ে আনিলাম তোমার কাছে,
কহিতে এলাম আকাশে উঠেছে রবি যে।
উষ্ণ তাহার দীপ্তি মধুর পড়েছে গাছে,
শিশিরে তাহার ফুটেছে চপল ছবি যে॥

বলিতে এলাম—কানন পেয়েছে জাগর-বাণী
লতায়-পাতায় কী পুলক আহা জাগিছে।
প্রতিটি পক্ষী নাচিছে হঠাৎ পক্ষ হানি,
ফাগুন-তৃষ্ণা সেখানে যে পথ মাগিছে॥

মধ্যরাতের সব কিছু প্রেম পুনঃ যে ধরি
প্রভাতে এলাম তোমার তন্দ্রা টুটাতে,
আমার সকল আত্মা যে হায় ব্যাকুল মরি,
তুমি কী পারিবে আশার কুসুম ফুটাতে?

স্বর্গের হাওয়া সবটুকু বুঝি ভাসিয়া আসে,
ভাসিয়া আসে সে আমারে পাগল করিতে।
গানের ভাষা তো হারাইয়া গেছে চিত্তাকাশে
[illegible] জাগে [illegible] জাগে মরিতে॥

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

কেনেডীর বাণী—

মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট কেনেডী গত ১১ই জানুয়ারী (১৯৬২) প্রতিনিধি-পরিষদ এবং সেনেটের যুক্ত অধিবেশনে যে "ষ্টেট অব দি ইউনিয়ন" বাণী প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে "ষ্টেট অব দি ওয়ার্ল্ড" বাণী বলিলেও বোধহয় ভুল হইবে না। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র শুধু পশ্চিমী শক্তিবর্গের নেতাই নহে, অ-কম্যুনিষ্ট বিশ্বেরও নেতা এবং সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্বের আসন তাহার লক্ষ্যস্থল। তা ছাড়া আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তি। যে দুইটি বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তি মানব জাতিকে শান্তি অথবা ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে সমর্থ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের অন্যতম। এইখানেই মার্কিণ-কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর বাণীর গুরুত্ব আমরা বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহার এই বাণীর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। ১৯৬১ সালের ২০শে জানুয়ারী প্রেসিডেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পর ২০শে জানুয়ারী তারিখে তিনি মার্কিণ কংগ্রেসে তাঁহার প্রথম "ষ্টেট অব দি ইউনিয়ন" বাণী প্রদান করেন। ঐ সময় আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ঠাণ্ডাযুদ্ধ ব্যাপকতর এবং তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল। মার্কিণ ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান রাশিয়ায় ভূপাতিত করা, প্যারীতে শীর্ষ সম্মেলনের ভরাডুবী হওয়া ঠাণ্ডাযুদ্ধকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছিল। পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখা সংক্রান্ত আলোচনায় সৃষ্টি হয় অচল অবস্থা। লাওসের গৃহযুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থিত দক্ষিণপন্থী সরকার ক্রমশঃ কোণঠাসা হওয়ার মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিজমের প্রভাব বৃদ্ধি দেখিতে পাইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরেও উৎপাদন হ্রাস, বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছিল। ঘরে বাহিরে এই অবস্থার মধ্যে এক বৎসর পূর্ব্বে মার্কিণ কংগ্রেসে তাঁহার প্রথম বাণীতে প্রেসিডেণ্ট কেনেডী বলিয়াছিলেন, "I speak to day in an hour of national peril and national opportunity" অর্থাৎ "জাতীয় সঙ্কট এবং জাতীয় সুযোগের এই সময়ে আমি বাণী প্রদান করিতেছি।" তাঁহার গত বৎসরের বাণী এবং এবারের বাণীর মধ্যবর্ত্তী এক বৎসরে ঘরে বাহিরে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর গত ১১ই জানুয়ারী তারিখের বাণীতে। তাঁহার ছয় হাজার শব্দ সম্বলিত বাণীতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি প্রায় সমান স্থানই শুধু পায় [illegible] ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—"আমরা যদি এখানে (আমাদের নিজের দেশে) আমাদের নিজের আদর্শগুলি সার্থক করিয়া তুলিতে না পারি, তাহা হইলে অপরে আমাদের আদর্শ গ্রহণ করিবে, ইহা আমরা আশা করিতে পারি না।" সেই সঙ্গে তিনি এই সতর্ক-বাণীও উচ্চারণ করিয়াছেন যে, "বাহির বিশ্বে যে চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা যদি তাহার উত্তর দিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব সময় বহিয়া গিয়াছে।"

প্রেসিডেণ্ট কেনেডী তাঁহার বাণীতে যে সকল সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, সেগুলিকে মোটামুটি ভাবে চারি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ, আভ্যন্তরীণ সমস্যা। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রশক্তিবর্গের সহিত সম্পর্ক সংক্রান্ত সমস্যা। তৃতীয়তঃ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বিরোধের সমস্যা। চতুর্থতঃ পশ্চিম-গোলার্দ্ধের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে জাতীয় অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট কেনেডী কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তাঁহার কার্য্যকালের প্রথম বৎসরে এই সঙ্কট কাটিয়া যাইয়া মার্কিণ জাতীয় অর্থনীতির যে উন্নতি হইয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। মূল্যহ্রাসের ফলে ফেডারেল সরকারের রাজস্ব যখন হ্রাস পাইতেছিল, সেই সময় মূল্যহ্রাস নিরোধের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। তা ছাড়া কেনেডী সরকার দেশরক্ষা খাতে ব্যয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু মার্কিণ অর্থনীতির এই উন্নতি যে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। বার্লিন, কঙ্গো এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা সম্পর্কে পশ্চিম-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যখন মতভেদ চলিতেছে, তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের চ্যালেঞ্জ যে কিরূপ গুরুতর, তাহা প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর মন্তব্য হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি উহাকে "the greatest challenge of all" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের প্রতিক্রিয়া যে শুধু মার্কিণ অর্থনীতির উপরেই হইবে, তাহা নয়, তিনি মনে করেন, ইউরোপীয় এবং মার্কিণ বাজারে যে-সকল মার্কিণ মিত্ররাষ্ট্র পণ্য প্রেরণ করে সেই সকল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার উপরেও উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। বস্তুতঃ ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের প্রতিযোগিতার সম্মুখে মার্কিণ শিল্প বাণিজ্য বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না। এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার জন্য তিনি নূতন বলিষ্ঠ বাণিজ্য-নীতির কথা বলিয়াছেন। তিনি

বাণিজ্য-শুল্ক হ্রাস করিবার প্রস্তাব কংগ্রেসের অনুমোদনের জন্ত উপস্থাপিত করিবেন, তাহা তাঁহার বাণীতে সুস্পষ্ট হইয়াই উঠিয়াছে।

ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির উপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া প্রভাব। কাষ্ট্রোর কিউবা এই প্রভাবের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আরও কোন রাষ্ট্র মার্কিণ প্রভাবের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কা মার্কিণ জনগণের পক্ষে উপেক্ষার বিষয় নয়। কাষ্ট্রোর কিউবাকে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত, সে-বিষয় সম্পর্কে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু অর্থনৈতিক সাহায্য ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী হয়ত আশা করেন যে, উন্নয়নের জন্ত মৈত্রীর কর্ম্মসূচী সাফল্য লাভ করিলে কাষ্ট্রোকে শায়েস্তা করিবার প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে। এই মৈত্রীকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত তিনি তিন শত কোটি ডলার মঞ্জুর করিবার জন্ত কংগ্রেসকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই অর্থমঞ্জুরীর ব্যাপারে কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ হইবে না বলিয়াই মনে হয়। কিউবা হইতে কম্যুনিষ্ট প্রভাব ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্ত দেশে যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে সে সম্পর্কে মার্কিণ কংগ্রেসের সকল সদস্যই অবহিত আছেন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট কেনেডী তাঁহার বাণীতে কিউবার কোন উল্লেখ করেন নাই, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কাষ্ট্রোবিরোধী নীতি সম্পর্কে ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির নিকট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তেমন কোন কার্য্যকরী সমর্থন পাইতেছে না বলিয়াই মনে হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সম্পর্কে বর্ত্তমানে উপনিবেশবাদের প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া যে-সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা লইয়া পশ্চিমী মিত্রবর্গের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মতভেদ দেখা দিয়াছে। এই মতভেদ ঠিক মত বিরোধে পরিণত হইয়াছে, এমন কথা অবশ্যই বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে বিপদের কথা শোনা গিয়েছিল তাহাও উল্লেখযোগ্য। তদানীন্তন সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারশিল্ড সম্পর্কে রাশিয়ার বিরূপ মন্তব্য এবং পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী, নিরপেক্ষ শক্তিগোষ্ঠী এবং কম্যুনিষ্ট শক্তিগোষ্ঠী এই তিন পক্ষ হইতে তিন জনকে সেক্রেটারী জেনারেলের পদে নিয়োগের প্রস্তাবের মধ্যে পশ্চিমী শক্তিবর্গ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিপদ দেখিতে পাইয়াছিলেন। মিঃ হ্যামারশিল্ড নিহত হওয়ার পর মিঃ উ থাণ্ট অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হওয়া সম্ভব হওয়ায় এই বিপদ হয়ত আপাতত কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু দেখা দিয়াছে নূতন সমস্যা। গোয়ার ব্যাপারে পশ্চিমী শক্তিবর্গের কাছে এই সমস্যাটা খুব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। নূতন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হওয়ায় উহার সদস্য সংখ্যা বাড়িয়া শুধু ১০৪-ই হয় নাই, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল দেশ উপনিবেশবাদ উচ্ছেদের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে অস্ত্রহিসাবে ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই বিষয়ে তাহারা রাশিয়ার সমর্থন পাইতেছে। গোয়া সম্পর্কে ভারত যে পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারে নাই। ইহাতে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই উদ্বিগ্ন হইয়াছে। মার্কিণ ও বৃটিশ অফিসিয়ালগণ ওয়াশিংটনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই নূতন সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে উভয় সঙ্কট অবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যেমন পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির উপর তেমনি এশিয়া ও আফ্রিকার অকম্যুনিষ্ট দেশগুলির উপরও তাহার প্রভাব বজায় রাখিতে চায়। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী অবশ্য উভয় কূল বজায় রাখিবার জন্তই চেষ্টা করিতেছেন এবং বাণীর মধ্যে এই চেষ্টা পরিস্ফুট দেখা যায়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এশিয়া ও আফ্রিকার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তাহারা উপনিবেশবাদ উচ্ছেদের জন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে ব্যবহার করিতে উদ্যত হওয়ায় পশ্চিমী শক্তিবর্গের মনে যে আশঙ্কা এবং অস্বস্তি সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্ত প্রেসিডেণ্ট কেনেডী তাঁহাদিগকে অধীর না হওয়ার জন্ত বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "যাঁহারা ত্রুটিযুক্ত বিশ্ব পছন্দ করেন না বলিয়া এই ত্রুটিযুক্ত সংস্থাটিকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন, তাঁহাদের অধৈর্য্যের মধ্যে আমি কোন যুক্তি দেখিতে পাই না।" তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে শক্তি ও আশার স্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বলিয়াছেন, "our strength and our hope is the United Nations." প্রেসিডেণ্ট কেনেডী যে এই ব্যাপারে স্থিরবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গোয়ার ব্যাপারে পশ্চিমীশক্তিবর্গের মত সাম্রাজ্যবাদী রূপ দেখিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি পশ্চিমীশক্তিবর্গের প্রতি আস্থা হারাইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী এই আস্থা ফিরাইয়া আনিতে চান। তাঁহার মনে আরও আশঙ্কা জাগিয়াছে যে, পশ্চিমীশক্তিবর্গ যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে বর্জ্জন করিতে চাহেন এবং বর্জ্জন করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণরূপে রাশিয়ার দিকেই চলিয়া পড়িবে, অকম্যুনিষ্ট দেশগুলির উপর মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রভাব আর থাকিবে না। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী এইরূপ অবস্থা ঘটিতে দিতে অনিচ্ছুক। এইজন্ত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির প্রতি সমর্থন জানাইতেও তিনি ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "যে-সকল নূতন ও দুর্ব্বল রাষ্ট্র তাহাদের ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি অথবা শক্তির স্বল্পতার জন্য মিত্রতার জটিল আবর্ত্ত হইতে দূরে থাকিতেছে তাহাদের স্বাধীনতা আমরা সমর্থন করি: আমরাও বহু বৎসর এমনি দূরে ছিলাম।" নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে কম্যুনিষ্ট বলিয়া মনে করিলে এই সকল নিরপেক্ষ দেশের রাশিয়ার দলে যোগ দেওয়ার আশঙ্কা প্রেসিডেণ্ট কেনেডী উপেক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহাকে উদার মনোভাব গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

গত জুন মাসে নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। আগামী মার্চ্চ মাসে আবার নূতন করিয়া আলোচনা আরম্ভ হইবে। এই সম্মেলন হইবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে আঠারটি রাষ্ট্রের। রাশিয়া চায় সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ। পশ্চিমী শক্তিবর্গ চায় ধাপে ধাপে এবং নিয়ন্ত্রিত ভাবে নিরস্ত্রীকরণ এবং চুক্তি কার্য্যকরী হইতেছে কি না তাহা ইনস্পেকশনের ব্যবস্থা। রাশিয়া নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার সহিত পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে আলোচনা সংযুক্ত করিতে চায়। মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখা সম্পর্কে আলোচনাকে পৃথক রাখিতে চায়। রাশিয়া পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ আরম্ভ করার পর মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রও বায়ুমণ্ডলে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ আরম্ভ করার কথা চিন্তা করিতেছে। পশ্চিমী শিবিরও সোভিয়েট শিবিরের মধ্যে অস্ত্রসজ্জায় প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা এখন

যাইতেছে না। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী অবশ্য তাঁহার বাণীতে এই এই আশাই প্রকাশ করিয়াছেন যে, অস্ত্রপ্রয়োগের বিপজ্জনক পথের পরিবর্ত্তে আইনের বিধান কার্য্যকরী করিবার জন্য একমত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহারা চেষ্টা করিয়া যাইতে থাকিবেন। ঠাণ্ডাযুদ্ধের উত্তাপ এবার কিরূপ হইবে, তাহা নির্ভর করিতেছে বার্লিন-সমস্যা সমাধানের জন্য কোন 'modus vivendi' পাওয়া যায় কিনা, তাহারই চেষ্টার সাফল্যের উপরে। মস্কোতে মার্কিণ রাষ্ট্রদূত টমসন পশ্চিমী শক্তিবর্গের পক্ষে এই 'modus vivendi'-র জন্য আলোচনা চালাইতেছেন। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী তাঁহার বাণীতে বলিয়াছেন যে, বার্লিন সমস্যা সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ এবং উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটি উপায় নির্দ্ধারণের জন্য আমেরিকা চেষ্টা করিবে। বার্লিন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পশ্চিম-ইউরোপের শক্তিবর্গের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে মতভেদ আছে, রাশিয়ার মনোভাব অপেক্ষা তাহাই যে মীমাংসার প্রধান অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে, একথা মনে করিলে বোধহয় ভুল হইবে না।

দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিজমের প্রভাব বৃদ্ধি রোধ করার সমস্যা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একটা বড়রকম মাথাব্যথা হইয়া রহিয়াছে। মার্কিণ সরকার লাওসে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগঠনের নীতি মানিয়া লইয়াছে। মানিয়া না লইলে গোটা লাওস-ই পেথটলাও গরিলাদের দখলে চলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা উপেক্ষার বিষয় ছিল না। উহা রোধ করিতে গেলে রাশিয়া ও কম্যুনিষ্ট-চীনের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিবারও আশঙ্কা ছিল। লাওসে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগঠন নীতিগত-ভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মানিয়া লইলেও উহার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থিত বৌন উম। লাওসের ত্রিপক্ষীয় কোয়ালিশন সরকারের দেশরক্ষা এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীর পদ নিরপেক্ষতাবাদী সুভান্না ফৌমাকে দেওয়া সম্পর্কে আলোচনা করিতেও তিনি অস্বীকার করেন। সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর জানুয়ারী মাসের বেতনের জন্য অর্থসাহায্য দিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যখন অস্বীকার করিল, তখন আলোচনার জন্য রাজী না হইয়া আর বৌন উমের উপায় ছিল না। আলোচনা করিতে তিনি রাজী হইলেও ইহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, দেশরক্ষা-মন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর পদ কিছুতেই তিনি সুভান্না ফৌমাকে দিতে রাজী হইবেন না। কাজেই নিরপেক্ষ সরকার গঠনের কোন সম্ভাবনা এখনও দেখা যাইতেছে না। লাওস সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট কেনেডী বলিয়াছেন যে, লাওসের স্বাধীনতা পরিদর্শনের জন্য যদিও কোন কার্য্যকরী সূত্র উদ্ভাবন করা সম্ভব হয় নাই, তবু যুদ্ধের বিস্তৃতি এবং সমগ্র দেশ কম্যুনিষ্টদের কবলে যাওয়া নিরোধ করা সম্ভব হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বোধ হয় আশা করে যে, লাওসে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে দক্ষিণ-ভিয়েটনামে ভিয়েট এবং গরিলাদিগকে দমন করা অনেক সহজ হইতে পারে। কিন্তু লাওসে নিরপেক্ষ সরকার গঠন করা সত্যই সম্ভব কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে। কোন রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা রক্ষার পক্ষে দেশরক্ষা এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরই অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইটি দপ্তরই কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের পথে অন্তরায় হইয়াছে। বৌন উম এই দুইটি দপ্তর হাতছাড়া করিতে রাজী নহেন। এই দুইটি দপ্তর যদি সুভান্না ফৌমাকে দেওয়া না হয় এবং বৌন উমের হাতেই থাকে, তাহা হইলে লাওসের নিরপেক্ষতা মার্কিণ তাঁবেদারী ছাড়া আর কিছুই হইবে না। সম্প্রতি জেনেভায় লাওস সম্পর্কে চৌদ্দ শক্তির সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, বৃটেন ও রাশিয়া লাওসে শান্তি ও নিরপেক্ষতার অভিভাবক হইবে। কিন্তু তিন পক্ষের সৈন্যবাহিনী কি ভাবে জাতীয় বাহিনীতে পরিণত হইবে, সে-সম্বন্ধে কোন মীমাংসা এখনও হয় নাই।

পশ্চিম ইরিয়ান—

গোয়া মুক্ত হওয়ার পর ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সোয়েকর্ণও হল্যাণ্ডের কবল হইতে ডাচ নিউগিনি বা পশ্চিম-ইরিয়ানকে মুক্ত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। নিউ গিনি দ্বীপটি ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব্ব দিকে এবং অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরে অবস্থিত। উহার পশ্চিম অংশ হল্যাণ্ডের অধীনস্থ এবং পূর্ব্বাংশ অষ্ট্রেলিয়ার শাসনাধীনে। উক্ত দ্বীপের হল্যাণ্ডের অধিকৃত পশ্চিম অংশই পশ্চিম-ইরিয়ান নামে অভিহিত। পশ্চিম-ইরিয়ান সম্পর্কে প্রথমেই ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৯ সালে হেগে যে গোলটেবিল বৈঠক হয়, তাহাতে স্থির হয় যে, এক বৎসরের মধ্যেই পশ্চিম ইরিয়ান হস্তান্তর সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইবে। কিন্তু উহার পর এক যুগ অর্থাৎ ১২ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, হল্যাণ্ড তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার সামান্য মাত্র ইচ্ছাও প্রকাশ করে নাই। বরং পশ্চিম ইরিয়ানকে যাহাতে ইন্দোনেশিয়ার হাতে ছাড়িয়া দিতে না হয়, তাহার জন্য সেখানে ইউরেশিয়ানদের বসবাসের ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ার দাবীতে হল্যাণ্ড ক্রমাগত বাধা দিতে থাকায় গত ১৯৫৭ সালে ইন্দোনেশিয়া সরকার ইন্দোনেশিয়াস্থিত ওলন্দাজদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং ব্যাঙ্ক, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, রবারের বাগান প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। কিন্তু হল্যাণ্ড তাহাতে এতটুকুও বিচলিত হইল না। অতঃপর ইন্দোনেশিয়া সরকার হল্যাণ্ডের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন করিয়া দেয়। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়া সামরিক শক্তি প্রয়োগে পশ্চিম ইরিয়ান মুক্ত করিতে উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করার পর হল্যাণ্ড আলাপ-আলোচনা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।

হল্যাণ্ড অবশ্য পশ্চিম-ইরিয়ানকে হল্যাণ্ডের অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া দাবী করিতেছে না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী কৌশল যথারীতি প্রয়োগ করা হইতেছে। হল্যাণ্ড প্রথমে পশ্চিম ইরিয়ানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে আলোচনা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। পরে অবশ্য হল্যাণ্ডের মতের পরিবর্ত্তন হয়। ডাচ প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আলোচনার জন্য কোনরূপ সর্ত্ত আরোপ করিতে তাঁহারা চান না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে, উহার মধ্যে আপোষের মনোভাবই প্রকটিত রহিয়াছে। কিন্তু উহাও কালহরণের একটা পথ ছাড়া আর কিছু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইন্দোনেশিয় সরকার বলিয়াছেন যে, পশ্চিম ইরিয়ান হইতে ওলন্দাজদের অপসারণের ব্যবস্থাই আলোচনার একমাত্র বিষয় হইতে পারে। হল্যাণ্ড মুখে আপোষ-আলোচনার কথা বলিলেও পশ্চিম ইরিয়ানে তাহার উপনিবেশ রক্ষার জন্য দৃঢ়তার সহিত আয়োজন করিতেছে। সামরিক শক্তিতে ইরিয়ান রক্ষার জন্য হল্যাণ্ড পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ সাহায্য হয়ত পাইবে না, কিন্তু পরোক্ষ সাহায্য

যে পাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পশ্চিম ইরিয়ান রক্ষার জন্ত হল্যাণ্ড ইতিমধ্যেই তাহার জঙ্গী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে। গত ১৫ই জানুয়ারী পশ্চিম ইরিয়ানের দক্ষিণ উপকূলে টহলদার ওলন্দাজ যুদ্ধজাহাজগুলি ইন্দোনেশিয়ার মোটর টর্পেডোবোট সমূহের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে একটি মোটর টর্পেডোবোটে আগুন ধরে এবং একটি ধ্বংস হয়। অন্যান্যগুলি আত্মগোপন করে। ইন্দোনেশিয়ার মোটর টর্পেডোবোটের উপর হল্যাণ্ডের এই প্রথম আক্রমণ যুদ্ধের আরম্ভ সূচনা অবশ্যই করে নাই, কিন্তু হল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে উহা যে প্রথম সশস্ত্র সংঘাত সে কথা অনস্বীকার্য্য। এই আক্রমণ হইতে ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, হল্যাণ্ড বিনা যুদ্ধে পশ্চিম ইরিয়ানের সূচাগ্র ভূমিও ছাড়িবে না।

উল্লিখিত আক্রমণের পর হল্যাণ্ড প্রচার করিতেছে যে, এই সকল টর্পেডোবোট পশ্চিম ইরিয়ানে অভিযাত্রী বাহিনী নামাইয়া দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল এবং পশ্চিম ইরিয়ানের এলাকাভুক্ত সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল। ব্যাপারটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উত্থাপনের কথাও উঠিয়াছে। কূটনৈতিক সূত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা মীমাংসার চেষ্টার কথাও উঠিয়াছিল। ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীনতা দিতে হল্যাণ্ডকে রাজী করানো যে সহজ হয় নাই, সে কথাও স্মরণ করা আবশ্যক। ইন্দোনেশিয়ার দাবী এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির এবং রাশিয়ার সমর্থন লাভ করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে ইতিপূর্ব্বে হল্যাণ্ড এবং ইন্দোনেশিয়াকে আলোচনা টেবিলে মিলিত করিতে চেষ্টা করে নাই তাহা নয়। কিন্তু সে চেষ্টা এ পর্য্যন্ত সাফল্য লাভ করে নাই। পশ্চিম ইরিয়ানের ভূগর্ভে আছে প্রচুর তৈল সম্পদ। এই সম্পদ হল্যাণ্ড যাহাতে ভোগ করিতে পারে তাহার জন্য শান্তিপূর্ণ উপায় পশ্চিমী শক্তিবর্গ গ্রহণ করিতে পারে না তাহাও নয়। কিন্তু উহা যে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না তাহা পশ্চিমী শক্তিবর্গও জানেন। পশ্চিম ইরিয়ান যদি মুক্ত হয়, তাহা হইলে নিউগিনির পূর্ব্বাঞ্চলও আর অষ্ট্রেলিয়ার অছিগিরির অধীনে রাখা সম্ভব হইবে না। উপনিবেশবাদের আয়ু ফুরাইয়া আসিলেও পশ্চিমী শক্তিবর্গ উহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। তাঁহারা এই চেষ্টায় ক্ষান্ত না হইলে উপনিবেশবাদের শেষ অধ্যায় রক্তাক্ষরে লিখিত হইবে।

কঙ্গো কোন পথে—

কঙ্গোতে গত দেড় বৎসর ধরিয়া যাহা ঘটিতেছে তাহা আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য মনে হয় বটে, কিন্তু আসলে দুর্ব্বোধ্য উহার মধ্যে কিছুই না। কাটাঙ্গার শোম্বে এবং তাঁহার সমর্থক পশ্চিমী শক্তিবর্গই কঙ্গোর স্বাধীনতা লাভের পরবর্ত্তী দেড় বৎসরের ঘটনাবলীর জন্য দায়ী। কঙ্গোর স্বাধীনতা লাভের প্রথম মাসেই (জুলাই, ১৯৬০) শোম্বে কাটাঙ্গার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এলিজাবেথভিলে হইতে বিরোধীদিগের তিনি বিতাড়িত করেন এবং Union miniere-র নিকট হইতে ৫ কোটি ২০ লক্ষ ডলার রাজস্ব গ্রহণ করিয়া সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করেন। এই সৈন্যবাহিনীর অফিসারগণ সকলেই শ্বেতাঙ্গ। এই সৈন্যবাহিনী এবং পশ্চিমী শক্তি বর্গের সাহায্য পুষ্ট হইয়া তিনি কঙ্গোর মৌলিক আইন বা অস্থায়ী শাসনতন্ত্রকেও অস্বীকার করেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী কঙ্গোতে শোম্বের শক্তি বৃদ্ধিরই সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। গত দেড়বৎসরের কাহিনী এখানে উল্লেখ করিবার স্থান নাই। নিরাপত্তা পরিষদের কোন নির্দ্দেশই কার্য্যকরী করা হয় নাই। প্রধান মন্ত্রী লুমুম্বাকে হত্যা করা হইয়াছে। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের পরোক্ষ যোগসাজস ছিল, একথা একখানি বৃটিশ পত্রিকা খোলাখুলী ভাবেই বলিয়াছে।

গত ৫ই ডিসেম্বর (১৯৬১) হইতে জাতিপুঞ্জ বাহিনী কাটাঙ্গায় বড় রকম অভিযান আরম্ভ করে। গতিক ভাল নয় বুঝিয়া শোম্বে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডীর শরণাপন্ন হন এবং জানান যে, কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আপোষ করিতে রাজী আছেন। শোম্বের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে প্রেসিডেন্ট কেনেডীর নির্দ্দেশে কঙ্গোর প্রধান মন্ত্রী মিঃ আডুলা এবং শোম্বের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা হয়। কিটোনাতে আঠার ঘণ্টা আলোচনার পর গত ২১শে ডিসেম্বর (১৯৬১) ৮দফা বিশিষ্ট একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু কিটোনায় বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছিয়াই তিনি বলেন যে, এই চুক্তি কাটাঙ্গার জাতীয় পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ। এলিজাবেথভিলে পৌঁছিয়া তিনি বলেন যে, কিটোনায় কোন চুক্তিই হয় নাই। তিনি শুধু আডুলার কথা শুনিয়াছেন মাত্র। কাটাঙ্গার মন্ত্রিসভা বলেন যে, এইরূপ চুক্তি করার অধিকার শোম্বের নাই। কিটোনায় ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে তাঁহাকে বাধ্য করা হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত শোম্বে বলেন যে, আট দফা চুক্তির ছয়টি দফা লইয়া বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না। এই ছয়টির মধ্যে চারিটি এমনভাবে রচিত যে ঐগুলির অন্যরকম ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। এই চারিটি সর্ত্ত কঙ্গোর অখণ্ডতা, জাতীয় সরকারের কর্ত্তৃত্ব, রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা এবং কাটাঙ্গা বাহিনীর উপর প্রেসিডেন্টের কর্ত্তৃত্ব। শোম্বে দুইটি সর্ত্ত পালন করিয়াছেন, একটি কঙ্গো পার্লামেণ্টে কাটাঙ্গার প্রতিনিধি প্রেরণ এবং নূতন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য কমিশনে বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরণ। দুইটি সর্ত্ত সম্পর্কে শোম্বে দৃঢ়তার সহিত আপত্তি জানাইয়াছেন; একটি মৌলিক আইন বা অস্থায়ী শাসনতন্ত্র গ্রহণ এবং আর একটি নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা।

যে শোম্বের জন্য কঙ্গোতে গত দেড় বৎসর ধরিয়া কুরুক্ষেত্র কাণ্ড চলিতেছে সেই শোম্বে আজ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছে তথা আমেরিকার কাছে প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। শোম্বের সমস্যাটা যেন আর সমস্যাই নয়। গিজেঙ্গাই এখন মুখ্যস্থান গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার একমাত্র অপরাধ তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট কাসাভুবু-মবটু চক্রের নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই। আডুলা নিজে ষ্ট্যানলিভিলে যাইয়া গিজেঙ্গাকে সহকারী প্রধানমন্ত্রীর পদগ্রহণে রাজী করাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে লিওপোল্ডভিলে লইয়াও আসিয়াছিলেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে বেলগ্রেডে যে নিরপেক্ষ সম্মেলন হয় তাহাতে গিজেঙ্গা এবং আডুলা একসঙ্গেই যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তার পর হইতে গিজেঙ্গার বিরুদ্ধে একের পর আর অভিযোগ শোনা যাইতে লাগিল। প্রথমে শোনা গেল, তিনি লিওপোল্ডভিলে যাইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন না; তার পর প্রচার করা হইল গত নভেম্বর মাসে কিন্ডু এলাকায় যে বিমানে

হয় তাহার সহিত গিজেঙ্গার যোগসাজস ছিল। বিদ্রোহীদের হাতে ১৭ জন ইটালীয় সৈন্য নিহত হয় বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি উত্তর কাটাঙ্গায় ১৯ জন ইউরোপীয় পাদ্রীকে খুন করা হইয়াছে। গিজেঙ্গার সহযোগিতাতেই নাকি এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই সকল অভিযোগের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য কি তাহা আমরা বৃটিশ শাসনের কল্যাণে ভাল করিয়াই জানি। অভিযোগের পর অভিযোগ পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। অভিযোগ উঠিল, গিজেঙ্গা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন। এই অভিযোগে তাঁহাকে সহকারী প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারণ করা হইল এবং তিনি স্বগৃহে হইলেন বন্দী। তাঁহার পরিণতি লুলুম্বার পথে হইবে কি না তাহা কে জানে। গিজেঙ্গা গত জুলাই মাসে সহকারী প্রধানমন্ত্রী হইয়া ষ্ট্যানলিভিলের স্বাতন্ত্র্যের বিলোপ করিয়া ছিলেন। শোম্বে কাটাঙ্গার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে এবং শ্বেতাঙ্গ ভাড়াটীয়া সৈন্য এবং সমরোপকরণ রোডেশিয়ার পথে কাটাঙ্গায় প্রবেশ করাও রোধ করা হয় নাই।

আলজেরিয়ায় সমস্যা—

আলজেরিয়ার অবস্থা কি কঙ্গো অপেক্ষাও ভয়ানক হইয়া উঠিবে? ঘটনার গতি যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে এইরূপ আশঙ্কা করা খুবই স্বাভাবিক। গত বৎসর এভিয়ানে ফ্রান্স ও জাতীয়তাবাদী আরবদের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছিল তাহা ব্যর্থ হয়। তাহার পর গোপনে যে আলোচনা চলে বলিয়া জানা যায় তাহা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার ইঙ্গিত প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের গত ৩০শে ডিসেম্বরের (১৯৬১) টেলিভিশন বক্তৃতা হইতে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভবিষ্যৎ সহযোগিতা সম্পর্কে স্বাধীন আলজেরিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের চুক্তি সম্পাদিত হইবে। তিনি আরও জানান যে, আগামী বার মাসে ফরাসী-সৈন্য আলজিরিয়া হইতে সরিয়া আসিবে। ফ্রান্স আলজেরিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হইতেও সরিয়া আসিবে বলিয়াও তিনি জানান। তাঁহার এই ঘোষণায় ফরাসী সন্ত্রাসবাদীরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ দিন হইতেই সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ আরম্ভ হয়। দ্য গলের বক্তৃতার পরই ওরানে কয়েক জন ইউরোপীয় যুবক বাস হইতে মুসলমানদের টানিয়া নামাইয়া হত্যা করে। ইউরোপীয় দোকানদাররা ঐ বক্তৃতার প্রতিবাদে দোকান বন্ধ করিয়া দেয়।

গত এপ্রিল মাসে (১৯৬১) আলজেরিয়ায় যে-সামরিক অভ্যুত্থান হইয়াছিল তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। এই বিদ্রোহের অন্যতম অধিনায়ক জেনারেল রৌল সালান আত্মগোপন করেন। এই বিদ্রোহের অভিযোগে তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্যারীতে বিচার হয় এবং তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। আলজেরিয়ায় যে সকল চরমপন্থী ফরাসী আছে তাহাদের বে-আইনী 'সিক্রেট আর্ম্মী অর্গেনিজেশনের' (O. A. S) তিনি অধিনায়ক হইয়াছেন। এই সিক্রেট আর্ম্মী অর্গেনিজেশন আলজিরিয়াকে ফরাসীদের অধিকারে রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর। গত ৮ই জানুয়ারী তাহারা আলজেরিয়ায় সাধারণ ধর্ম্মঘটের ব্যবস্থা করে এবং গত ১২ই জানুয়ারী ঘোষণা করে যে, শীঘ্রই একটা শেষ বুঝাপড়া হইবে। আলজিয়ার্স, ওরান, বোন এবং অন্যান্য সহরে প্রত্যহই মুসলমান ও ইউরোপীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিতেছে। নূতন বৎসরের আরম্ভ হইতে এক পক্ষকালের মধ্যে প্রায় ... জন লোক নিহত হইয়াছে এবং আহত হইয়াছে প্রায় আড়াই শত লোক। উক্ত ও, এ, এস বেতারযোগে আলজিরিয়ার জনগণকে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইবার জন্য এবং দুই মাসের খাদ্য মজুদ রাখিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাহারা নাকি বেতারে আরও ঘোষণা করিয়াছেন যে, "The orange tree will soon bloom again." এই উক্তির তাৎপর্য্য কি ইহাই যে, ও, এ, এস শীঘ্রই একটা অভিযান আরম্ভ করিবে? অনেকে তো ইহাই আশঙ্কা করেন।

ফরাসী সরকার এবং আলজেরীয় মুসলমানদের মধ্যে আলোচনা কোন্ পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে, তাহাও কিছুই বুঝা যাইতেছে না। কোন কোন রিপোর্ট অনুযায়ী বুঝা যায় যে. মোটামুটিভাবে একটা মতৈক্য সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু কি ভাবে উহা কার্য্যকরী করা হইবে তাহার খুঁটিনাটি বিষয়ে অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। অন্য সংবাদে প্রকাশ যে, ও, এ, এস-এর সন্ত্রাসবাদের সম্মুখে প্রেসিডেণ্ট দ্য গল চুক্তি কার্য্যকরী করিতে পারিবেন মুসলমানরা সে-বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদী অস্থায়ী সরকারের এক বৈঠক সম্প্রতি মরক্কোর মহম্মদিয়াতে হইয়াছে। ৩রা জানুয়ারী (১৯৬২ এই বৈঠক শেষ হইয়াছে। চুক্তি সম্পাদিত হইবে বলিয়া আলজেরীয় নেতারা দৃঢ় আশা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে অবশ্য মনে হইতে পারে যে, গোপন আলোচনা শীঘ্রই আরম্ভ হইতে পারে, কিন্তু মতৈক্য হওয়া অদূরবর্ত্তী একথা বলা যায় না। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আলজেরিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই বলা সম্ভব নয়। প্রশ্ন শুধু এই যে, আলজেরিয়ায় কি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, না আলজেরিয়া বিভক্ত হইয়া নূতন আকারে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে? মুসলিম বিদ্রোহীরা ও, এ, এসকে ধ্বংস করিবার জন্য তাড়াতাড়ি একটা মীমাংসায় আসিতে পারে অথবা আলজেরিয়া বিভক্ত হওয়া রোধ করিবার জন্য উপকূলবর্ত্তী সহরগুলিতে সামরিক কার্য্যকলাপ আরম্ভ করিতে পারে। আলজেরিয়ায় নূতন আর একটা বিস্ফোরণ ঘটিলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না।

টাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা—

গত ১০।১১ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে ভারত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত পূর্ব্ব আফ্রিকার টাঙ্গানাইকা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এই দেশটি ছিল জার্ম্মাণীর অধীনস্থ। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ভার্সাই সন্ধি-চুক্তি অনুযায়ী জার্ম্মাণী তাহার বৈদেশিক সাম্রাজ্যের অধিকার ত্যাগ করে। জাতি সঙ্ঘ জার্ম্মাণ পূর্ব্ব আফ্রিকার শাসনভার বৃটেনের হাতে অর্পণ করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হওয়ার পরও এই দেশটি বৃটেনের অছিগিরির অধীনে থাকিয়া যায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সফরকারী মিশন ছয় সপ্তাহ টাঙ্গানিক পরিদর্শন করিয়া এই রিপোর্ট দেন যে, বর্ত্তমান পুরুষেই টাঙ্গানাইকা স্বাধীনতা পাইতে পারে। ১৮৮০ সাল হইতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত এই দেশটি ছিল জার্ম্মাণীর অধীন। অতঃপর স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৃটেনের অধীনে ছিল। আফ্রিকায় নাইজেরিয়ার পরই টাঙ্গানাইকা বৃটেনের বৃহত্তম অঞ্চল। উহার আয়তন ৩,৬১,৮০০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৯২ লক্ষ ৩৮ হাজার। তন্মধ্যে আফ্রিকানদের সংখ্যা ৯১ লক্ষ, এশিয়া বাসীর সংখ্যা ৮১ হাজার, আরবদের সংখ্যা ২৫ হাজার এবং ইউরোপীয়দের সংখ্যা ২২ হাজার। রাজধানীর নাম দার-এস-সালেম। টাঙ্গানাইকা কেনিয়া, উগাণ্ডা এবং জাঞ্জিবারের আগেই স্বাধীনতা লাভ করিল।

সিনেমা ও মানুষের মন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কাম একটি সহজ প্রবৃত্তি (instinct)। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর সে তার বিভিন্ন ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু কামনার বশবর্তী হয়ে সে দেখে তার ইচ্ছা পূরণে অনেক বাধা। সমস্ত পৃথিবী যেন তার শত্রুতা করতে উদ্যত। বিভিন্ন বাধা নিষেধের মধ্যে চালিত হয়ে সে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারে কোন ইচ্ছাটি ভাল, আর কোন ইচ্ছাটি তার পক্ষে অনুচিত। তার ফলে তার মধ্যে জাগ্রত হয় বিচার বোধ। তখন থেকেই আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে অহং বোধের (ego) উন্মেষ। এই অহং বোধই মানুষের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর দুটি দ্যোতনা (drive) আছে—সুখৈষণা (pleasure principle) আর একটি হলো বাস্তব বিচার-বুদ্ধি (reality principle)। এই দুটি দ্যোতনার সার্থক সামঞ্জস্যে অহং বোধের গঠন রূপায়িত হয়।

অবাস্তব ইচ্ছাকে অহং বোধ সজ্ঞান মনে আসতে দেয় না—সেগুলি অবদমিত (repressed) হয়ে নির্বাসিত হয় মনের নির্জ্ঞান স্তরে। যা কিছু দুষ্ট ও অসামাজিক সেই ইচ্ছাগুলি এই ভাবে নির্জ্ঞানে নির্বাসিত হতে থাকে এবং অহং এর যে এক বিশেষ শক্তি এই নির্বাসনে অংশ গ্রহণ করে তাকে আমরা বলতে পারি মনের প্রহরী (ego censor)। শিশুর কাম শক্তি যৌবনে যেভাবে প্রকাশ পায়, তা শৈশবের বহু দশা অতিক্রম করে পরিণতি লাভ করে। প্রথমে সে থাকে বস্তু-নিরপেক্ষ, পরে নিজের দেহের কামোদ্দীপক স্থানগুলি হতে আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করে ও নিজেকে ভাল বাসতে শেখে। পরে তার ভালবাসা অন্য পাত্রের উপর গিয়ে পড়ে।

বালকের মাতা এবং বালিকার পিতাই তার প্রথম ইতর কামপাত্র বা কামপাত্রী। পরে কামজ অংশ অবদমিত হয়ে সেই ভালবাসা পিতামাতার প্রতি ভক্তিতে পরিণত হয়। মানসিক অগ্রগতির পথে এই দশা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একে ইডিপাল (oedepal) অবস্থা বলে। ভবিষ্যত জীবনের ভালবাসার পাত্র বা পাত্রী—এই ইডিপাল অবস্থার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। প্রণয়পাত্র বা প্রণয়পাত্রীর প্রতি যথার্থ ভালবাসা এই ইডিপাল অবস্থার সার্থক অবদমনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

মনের পরিণতির পথে অনেক ইচ্ছা অবদমিত হয়, যথা—(১) স্বতঃ কামেচ্ছা (২) স্ব-কামেচ্ছা (৩) সম-কামেচ্ছা (৪) ধর্ষ কামেচ্ছা (৫) মর্ষ কামেচ্ছা (৬) বিলসন কামেচ্ছা (৭) ঈক্ষণ কামেচ্ছা প্রভৃতি। এই ইচ্ছাগুলি শিশুকে কোন না কোনো সময় আনন্দের উৎসরূপে কাজ করেছিল, কিন্তু মানসিক অগ্রগতির পথে এই অসামাজিক ইচ্ছাগুলি অবদমিত হয়ে থাকে। কিন্তু, যদি এর কোনো একটি পরিণত বয়স পর্যন্ত টিকে থাকে, তাহলে কাম-বিকার দেখা দেয়। সুতরাং দেখা যায় যে, শিশুর মনে কাম-বিকারের সব কিছু অঙ্কুরই বিদ্যমান। এই জন্য শিশুকে বলা যায় বহুমুখকামী (polymorpho-perverse)। সার্থক অহং (ego) মানুষকে বাস্তব ও সমাজের ভিতর থেকেই আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করতে বাধ্য করে। কিন্তু এই অসামাজিক ইচ্ছাগুলি যদিও নির্জ্ঞানে থাকে তাহলেও তাদের শক্তি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় না তারা অবিরত পরিতৃপ্তির পথ খুঁজতে থাকে, কিন্তু মনের প্রহরী তাদের কিছুতেই সজ্ঞান মনে আসতে দেয় না। ফলে তারা মনের প্রহরীকে ঠকাবার জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করে। তারা মনের একটি বিশেষ ক্ষমতার সাহায্যে নিজেদের

চেহারা সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করে সামাজিক মঙ্গল উপকরণের রূপ গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়াটির নাম উদ্গমন (sublimation)।

অসামাজিক ইচ্ছাগুলি উদ্গতি লাভ করে কলাশিল্প বা Art-এর সৃষ্টি করে। এই কলা বা শিল্পকে অসামাজিক বলে ধরবার ক্ষমতা অহং-এর (ego) নেই। ফলে তা সজ্ঞান মনে আসতে পারে ও সাহিত্য, সঙ্গীত, অঙ্কন প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সিনেমাও হচ্ছে এইরূপ একটি শিল্প। এই শিল্পের ভিতর দিয়েই আমাদের অতৃপ্ত ইচ্ছা পরিতৃপ্তির পথ খোঁজে। মাটির পৃথিবীতে যা পাওয়া গেল না রূপালি পর্দায় তা পাওয়া যায়।

দর্শক নিজেকে পর্দার নায়ক বা নায়িকার সঙ্গে একাত্মবোধ স্থাপন করে(identification)। ফলে নায়কের হাসি-কান্না তার নিজেরই হাসি-কান্নার সামিল হয়। সে নায়িকার সহিত প্রণয়ে আনন্দবোধ করে।

নায়ক-নায়িকার প্রভাব প্রতিপত্তি দর্শকের শৈশবের মাতাপিতার বিরুদ্ধে ক্ষমতা অর্জনের স্পৃহা সূচিত করে। পরিণত বয়সের প্রভুত্ব ক্ষমতালাভের ইচ্ছারও উৎপত্তি হল এই শৈশবের বাসনা থেকে।

দর্শক নায়ক-নায়িকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শন করে নিজের অবলোকন-কামের ইচ্ছা পূরণ করে। অশোভন চিত্রের প্রতি আকর্ষণ এই কামেরই একটি লক্ষণ। গুরুজনদের যৌন আচরণ ছোটদের কৌতূহলী করে তোলে ও অবলোকন-কামের সৃষ্টি করে।

ফ্যাশান (fashion), ষ্টাইল (style), সাজসজ্জা (dress) এই সবের ভিত্তি হলো ঈক্ষণ-লিপ্সার ওপরে। নিজেকে অনাবৃত করে অপরকে দেখানো। সিনেমায় দর্শক তার এই অবদমিত বাসনা পূরণ করে নায়ক-নায়িকার সঙ্গে একাত্মভূত হয়ে।

এগুলি ছাড়াও আরো কতকগুলি বৃত্তি আছে যার প্ররোচনায় লোকে সিনেমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং বলা যায়, যে চলচ্চিত্র আমাদের অবদমিত ও অতৃপ্ত বহু কামনার পরিতৃপ্তির সন্ধান দেয়, ক্ষণস্থায়ী হলেও মনের অশান্তি দূর করে, এবং আমাদের মনের অন্তর্নিহিত কোন না কোন ইচ্ছার পূর্ণতা সাধনের সহায় হয়।

—ডাঃ অনাদি ঘোষাল

সরি ম্যাডাম

বোম্বাই ছবির নির্লজ্জ অনুকরণ করে বাঙলা ছবিকে কতখানি বিকৃত করা যায় এবং ছবিতে কতখানি কুরুচি যুক্ত করা যায় তারই জলন্ত দৃষ্টান্ত সরি ম্যাডাম (শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করলে 'সরি মাদাম')। বাঙলা ছবির মান নিম্নগামী করে তুলতে এই জাতীয় ছবি যে কতখানি সহায়তা করে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এক মামুলি প্রেমোপাখ্যান এই ছবির উপজীব্য। ছবিটির মধ্যে কোথাও কোনপ্রকার বৈশিষ্ট্য বা বলিষ্ঠতার সন্ধান মেলে না, বরং সারা ছবিটিতে কষ্টকল্পনা ও অসঙ্গতির ছাপ পাওয়া যায়। কোন কোন অধ্যায়কে অযথা দীর্ঘ করা হয়েছে। একেবারে শেষাংশ ছাড়া ছবিটির মধ্যে এমন কোন বস্তু নেই যা রুচিবান দর্শকের মনে রেখাপাত করতে পারে। আজকের দিনে যেখানে সারা বিশ্বে বাঙলা ছবির ব্যাপক জয়যাত্রা, আন্তর্জাতিক সমাদরে যে দেশের ছায়াছবি বিভূষিত যেখানে যুগোপযোগী নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে, সেখানে এই জাতীয় অন্তঃসারশূন্য কুরুচিযুক্ত বৈশিষ্ট্যবিহীন ছবির কল্পনা কি করে মস্তিষ্কে আসতে পারে, তা আমরা ভেবে পাই না।

ছবির কাহিনীকার দিলীপকুমার বসু। পরিচালকও তিনিই। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বোম্বাইয়ের বেদপাল। আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন বিভূতি চক্রবর্তী। তাঁর কাজ প্রশংসনীয়। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় যথাক্রমে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায় যেমনই চরিত্র তেমনই অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, রথীন ঘোষ, অপর্ণা দেবী, কেতকী দত্ত, অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনয় করেছেন।

রঙমহল

পাঠকপাঠিকার অজানা নয় যে অল্প কাল আগে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চের নিয়মিত অভিনয় বন্ধ করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করেই এই পরিস্থিতির সূত্রপাত। বর্তমানে আমরা জেনে আনন্দলাভ করেছি যে, এই অবস্থার অবসান ঘটেছে এবং রঙমহলের নিয়মিত অভিনয়ও যথারীতি শুরু হয়েছে। এই ঘটনা সারা দেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং বহু গুণীজনের তথা সমগ্র জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সুতরাং রঙমহলের নিয়মিত অভিনয় পুনরায় যথারীতি শুরু হওয়ার সংবাদ সকলকেই যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দ দেবে। রঙ্গমঞ্চ জাতির প্রাণ। জাতীয় জীবনের গঠন কর্মে এর অবদান কম নয়। জাতির মর্মবাণী প্রকাশের রঙ্গমঞ্চও অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তাই রঙ্গমঞ্চের অচলাবস্থা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। রঙমহলের দুয়ারের পুনরুন্মোচনের দিনে আমরা কর্তৃপক্ষ ও শিল্পী তথা কর্মিবৃন্দকে অভিনন্দন জানাই। আমরা এই প্রসঙ্গে ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায়কেও অভিনন্দন জানাই।

সংবাদ-বিচিত্রা

রাশিয়ায় নৌকাডুবির চিত্ররূপদান

ভারতীয় চিত্রামোদীদের দরবারে পরম আনন্দের সঙ্গে একটি সংবাদ পরিবেশন করি। এ সংবাদটি তাঁদের যথেষ্টই আনন্দদান করবে। উজবেক ফিল্ম ষ্টুডিও টেলিভিসন ফিচার ফিল্মের মাধ্যমে সাধারণ্যে 'ডটার অফ দ্য গ্যাঞ্জেস' প্রদর্শন করছেন। আমাদের আনন্দলাভের কারণ ডটার অফ দ্য গ্যাঞ্জেস রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবির রুশ সংস্করণ। বলা বাহুল্য সোভিয়েট রাশিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির মতই চিরদিনই তার শ্রেষ্ঠ প্রণামটি উৎসর্গ করে আসছে বর্তমান কালের এই সর্বশ্রেষ্ঠ যুগমানবটির উদ্দেশে।

ভারতের আগামী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সমারোহ

আশা করা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষের তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সমারোহ অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছরে অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের বর্তমান কর্ণধারগণ কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার দপ্তরের সচিব শ্রীনবাব সিংকে এই বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব জানিয়েছেন, সেগুলি সরকার কর্তৃক যদি গৃহীত হয় তবে এই সমারোহ অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ এই প্রস্তাবগুলির সরকারী স্বীকৃতির পিছনেই সমারোহের উদযাপন নির্ভর করছে।

তারাশঙ্কর রচিত 'উত্তরায়ণ'-এর একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

ফিল্ম ফেডারেশান অফ ইণ্ডিয়ার নতুন সভাপতি

ভারতের চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম খ্যাতনামা কর্ণধার শ্রী কে, এম, মোদী ফিল্ম ফেডারেশান অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীমোদী চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে বহুকাল ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। এ জগতে একটি বিরাট সম্মানের আসন তাঁর জন্যে সংরক্ষিত। ফেডারেশানের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদের নামতালিকায় তিনজন বাঙালীর

নাম পাওয়া গেল। স্ব স্ব ক্ষেত্রে এঁরা তিনজনেই স্বনামধন্য এঁদের নাম সর্বশ্রী সুশীল মজুমদার, প্রকাশচন্দ্র নান এবং সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার।

অভিনেতার নামে মহাবিদ্যালয়ের নামকরণ

দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা নাগেশ্বর রাও শুধু অভিনেতা হিসেবেই প্রসিদ্ধ নন, সমাজসেবী এবং শিক্ষাবিস্তারের একজন প্রধান সহায়ক হিসেবেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তার অধিকারী। সম্প্রতি কৃষ্ণা জেলায় তাঁর নামানুসারে একটি মহাবিদ্যালয়ের নামকরণ হয়েছে। মহাবিদ্যালয়টির নব ভবনের উদ্বোধন করেন অন্ধ্রের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এস, বি, পট্টভিরামরাও। মহাবিদ্যালয়ের অর্থভাণ্ডারে শ্রীনাগেশ্বর রাও এক লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন। এই মহান কর্মের জন্যে শিল্পী নাগেশ্বর রাও সারা দেশবাসীর আন্তরিক অভিনন্দন পাবেন এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

ক্যামুর রচনার চিত্ররূপ

ফ্রান্সের আধুনিক যুগের অন্যতম সাহিত্য দিকপাল নোবেল পুরস্কার বিজয়ী স্বর্গত আলবেয়ার কাম্যুর বিশ্ববিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে 'লো স্ট্রেনজারো' (দি স্ট্রেঞ্জার) অন্যতম। চিত্র পরিচালক দিনো ডু লরেন্তিস এই কাহিনীর চিত্ররূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। ইতালীয় প্রযোজক ইতিমধ্যেই এর চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন।

টলষ্টয়ের প্রপৌত্র

ড্যারিল এফ জ্যানুকেসের নবতম চিত্রোপহার 'দি লঙ্গেষ্ট ডে' বর্তমানে নির্মাণের পথে। এর শিল্পি-তালিকায় অনেকগুলি আকর্ষণীয় নামের সঙ্গে এমন একটি নাম যুক্ত হয়েছে যার পিছনে ভিন্নধর্মী এক আকর্ষণ বিদ্যমান। এই নামটি সার্জ টলষ্টয়। ছবিটিতে ইনি একজন জার্মাণ সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সার্জ বর্তমানে ফ্রান্সের অধিবাসী, এই সার্জের প্রসঙ্গে যে কথাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এঁরই প্রপিতামহ রাশিয়ার সাহিত্যের আকাশে এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে বিরাজিত। রুশ সাহিত্যের অন্যতম নবজন্মদাতা রূপে তিনি সম্পূজিত। এই মনস্বী সাহিত্য-নায়কের অবিস্মরণীয় নাম কাউণ্ট লিও টলস্টয়।

এরল ফ্লিনের সম্পত্তির মূল্যায়ন

স্বর্গত শিল্পী এরল ফ্লিনের রেখে যাওয়া বিষয় সম্পত্তির সম্পর্কে সম্প্রতি একটি বিবরণী প্রচারিত হয়েছে। এই বিবরণীর মাধ্যমে জানা যাচ্ছে যে—যে বিপুল সম্পত্তি রেখে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক শিল্পী দেহান্তরিত হয়েছেন তার মূল্য সর্বসমেত পঁচাশি লক্ষ টাকা। জানা গেছে যে ক্যানাডা, জেনেভা, জামাইকা এবং হলিউড প্রভৃতি স্থানে তাঁর সম্পত্তি বিদ্যমান। নিউ ইয়র্কের সুপ্রীম কোর্ট থেকে এই তথ্য প্রচারিত হয়েছে।

অভিনেত্রী দণ্ডিত: ছুরিকাঘাতের অভিযোগ

এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেছে। অবিশ্বাস্য তবু সত্য। ঘটেছে এখানে নয়, অনেক—অনেক দূরে—সমুদ্রের ওপারে—খাস লণ্ডন শহরে। সংবাদ এল—পঞ্চাশ বছর বয়স্ক পরিচালক পল বোথাকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। কে ছুরিকাঘাত করল, কেনই বা করল? এরও উত্তর এল‥তেত্রিশ বছর বয়স্কা অভিনেত্রী কনষ্টান্স স্মিথ—কারণ অজ্ঞাত। জামীন তাঁকে দেওয়া হয়নি আর এই আচরণের জন্যে লণ্ডনের ম্যানসন কোর্ট তাঁর জন্যে শাস্তিস্বরূপ সাতদিনের সেলবাস নির্ধারিত করলেন।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

'সাগরিকা' চিত্রের প্রযোজক সংস্থা বর্তমানে যে ছবিটির নির্মাণকার্যে ব্যাপৃত তার নাম কাঁটা ও কেয়া। সাহিত্যিক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়-এর কাহিনীকার। চিত্রনাট্য রচনা করছেন মণি বর্মা। চিত্ত বসু নিয়েছেন পরিচালনার ভার। ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অরুণ মুখোপাধ্যায়, গীতা দে ও সন্ধ্যা রায় প্রমুখ শিল্পিবর্গ বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন।

দেবী চিত্রণ সংস্থার 'ওরা কারা' ছবিটির চিত্রগ্রহণ মোটামুটি শেষ হয়েছে। ছবিটির পরিচালক বীরেশ্বর বসু। অসীমকুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গত তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অনুরাধা গুহ, নবাগতা নন্দিতা দে প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন।

ভক্তিমূলক পৌরাণিক ছবি "তরণীসেন বধ"এর আখ্যানভাগ রচিত হয়েছে রামায়ণ অবলম্বনে। পরিচালনা করেছেন চিত্রসারথি গোষ্ঠী। সুরারোপ করেছেন অনিল বাগচী, রূপায়ণে আছেন নীতীশ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, প্রবীরকুমার, সুনীত মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সুনন্দা দেবী, সন্ধ্যারাণী দেবী প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।

পরশমণি-দীপচাঁদ প্রযোজিত 'উত্তরায়ণ'-এর এক দৃশ্যে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চৌধুরী

সৌখীন সমাচার

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে নাট্যে রূপান্তরিত করে যথেষ্ট প্রশংসার অধিকারী হয়েছেন অচলায়তন গোষ্ঠী। এই রূপান্তরণের দায়িত্বভার পালন করেন প্রভাত বক্সী, নাটকটি পরিচালনাও তিনিই করেন। অভিনয়াংশে ছিলেন পিনাকী বসু, দেবু ভট্টাচার্য্য, সন্ধ্যা কাপুর, রীণা সরকার, জয়শ্রী কর, মীরা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

স্বর্গত নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'বাঙলার মেয়ে' নাটকটি সংগৌরবে অভিনীত হল আনন্দকুমার রায়ের পরিচালনায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন গৌরীপতি ভট্টাচার্য, সরিতবিন্দু ঘোষ, কৌশিকীব্রত দত্ত, দেবকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু দত্ত, সরোজমুকুল বসু, কমলকমার মুখোপাধ্যায়, অনিল মণ্ডল, শেফালি বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়, নমিতা দত্ত, শ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মালতী চৌধুরী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বীরু মুখোপাধ্যায়ের লেখনীজাত 'সংক্রান্তি' নাটকটি অভিনয় করলেন খেয়ালী সম্প্রদায়। রূপায়ণে ছিলেন মৃণাল রায়, রঞ্জিত ভট্টাচার্য্য, সুনীল কুণ্ডু, প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র ঘোষ, দীপেন ভৌমিক, উমানাথ রায়, মৃণাল গোস্বামী, নন্দগোপাল চক্রবর্ত্তী, আনন্দ ভট্টাচার্য্য, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর রায়, মোহন সান্যাল, মাধব নন্দী, মানসী বন্দ্যোপাধ্যায় ও মায়া ঘোষ প্রভৃতি। নাটকটি পরিচালনা করেন ভক্তেন রায়।

মৌনী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে অভিনীত হল 'ফিঙ্গার প্রিণ্ট' নাটকটি। এই নাটকের রচয়িতা নবীন নাট্যকার পার্থপ্রতিম চৌধুরী। রাখাল গুহের পরিচালনায় নাটকের চরিত্রগুলির রূপ দিলেন সমীর গুপ্ত, সুকোমল রায়, কল্যাণ মজুমদার, ফণী চৌধুরী, শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ননী চক্রবর্ত্তী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রীতা বসু, বাসবী নন্দী ইত্যাদি।

আগন্তুক গোষ্ঠী সুনীল বসুর 'আর কত ?' নাটকটি সম্প্রতি মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন প্রবীর মুখোপাধ্যায়, সুনীল বসু, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বাতী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। নাটকটির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়।

চিত্রযুগ নিবেদিত

'কাঁচের স্বর্গ'

চিত্রে

কাজল গুপ্ত

পৌষ, ১৩৬৮ (ডিসেম্বর, '৬১-জানুয়ারী, '৬২)

অন্তর্দেশীয়—

১লা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর) : মধ্য রাত্রিতে গোয়ায় ভারতীয় সৈন্য ও বিমান বাহিনীর বহু প্রতীক্ষিত অভিযান সুরু—সর্ব্বাধিনায়ক পদে লেঃ জেনারেল শ্রীজে, এন, চৌধুরী।

গোয়া হইতে গভর্ণর জেনারেল ও পর্ত্তুগীজ অফিসারদের পলায়নের সংবাদ।

২রা পৌষ (১৮ই ডিসেম্বর) : গোয়ার রাজধানী পাঞ্জিমের পতন আসন্ন—ভারতীয় ফৌজ কর্ত্তৃক দমন, দিউ ও অঞ্জাদেব দ্বীপ অধিকার।

রাশিয়া ও বিশ্বের অপর বহু দেশ কর্ত্তৃক ভারতের গোয়া অভিযান সমর্থন।

৩রা পৌষ (১৯শে ডিসেম্বর) : ২৬ ঘণ্টার মধ্যেই গোয়া মুক্তি অভিযানের সফল সমাপ্তি—পর্ত্তুগীজ সৈন্যদলের আত্মসমর্পণ—গোয়া, দমন ও দিউ-এ ভারতীয় পতাকা উত্তোলন—মেজর জেনারেল ক্যাণ্ডেথ গোয়ার সামরিক গভর্ণর নিযুক্ত—গোয়ার মুক্তিতে ভারতের সর্ব্বত্র আনন্দ উল্লাস।

৪ঠা পৌষ (২০শে ডিসেম্বর) : কলিকাতা মহানগরীতে সোভিয়েট প্রেসিডেণ্ট লিওনিদ ব্রেজনেভের বিপুল সম্বর্দ্ধনা।

৫ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) : মুক্ত গোয়া, দমন ও দিউতে নিয়মিত প্রশাসন কার্য্য সুরু।

দিল্লীতে ঘন কুয়াশায় বিমান, ট্রেণ ও মোটরবাস চলাচল ব্যাহত—কলিকাতা মহানগরীতেও প্রবল শৈত্য।

৬ই পৌষ (২২শে ডিসেম্বর) : ভারতের সহিত গোয়া, দমন ও দিউ'র অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিত করার উদ্যম—কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন।

৭ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর) : কলিকাতায় মহর্ষি ভবনে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৭তম অধিবেশনের সাড়ম্বর অনুষ্ঠান—মূল সভাপতিপদে কবিশেখর কালিদাস রায়।

৮ই পৌষ (২৪শে ডিসেম্বর) : 'দেশবাসীর মধ্যে সৌভ্রাত্র গড়িয়া তোলাই শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা'—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সমাবর্ত্তন ভাষণ।

৯ই পৌষ (২৫শে ডিসেম্বর) : বিপ্লবী ও চিন্তানায়ক ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (৮২) লোকান্তর।

১০ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর) : মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশের (মহাভারতের অনুবাদক) ৮৬ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ।

১১ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর) : 'গোয়া অভিযানে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্ত্তন হয় নাই'—লালকেল্লায় ব্রেজনেভের (রুশ প্রেসিডেণ্ট) সম্বর্দ্ধনাকালে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

১২ই পৌষ (২৮শে ডিসেম্বর) : উত্তর প্রদেশ ও বিহারে শৈত্য-প্রবাহে এ যাবত প্রায় ৮শত নর-নারী ও শিশুর জীবনাবসান।

১৩ই পৌষ (২৯শে ডিসেম্বর) : পক্ষকাল ব্যাপী রাষ্ট্রীয় সফরের পর সোভিয়েট প্রেসিডেণ্ট ব্রেজনেভের ভারতভূমি ত্যাগ।

১৪ই পৌষ (৩০শে ডিসেম্বর) : 'গোয়া অভিযানের ফলে ভারতের শান্তি নীতি পরিত্যক্ত হয় নাই'—বারাণসীর জনসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

১৫ই পৌষ (৩১শে ডিসেম্বর) : তৃতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যে ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হইবে—কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক সচিব অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের উক্তি।

১৬ই পৌষ (১লা জানুয়ারী, ১৯৬২) : প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক গৌহাটির নুণ-মাটি রাষ্ট্রীয় তৈল শোধনাগারের উদ্বোধন।

১৭ই পৌষ (২রা জানুয়ারী) : কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় পে-কমিটির মূল সুপারিশ রাজ্য সরকারের (পশ্চিমবঙ্গ) সিদ্ধান্ত প্রকাশ।

দ্বিতীয় সোভিয়েট মহাকাশচারী মেজর টিটভের ইন্দোনেশিয়ার পথে দিল্লী উপস্থিতি।

১৮ই পৌষ (৩রা জানুয়ারী) : কটকে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৯তম অধিবেশনের সূচনা—মূল সভাপতিপদে ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়।

১৯শে পৌষ (৪ঠা জানুয়ারী) : কলিকাতার ইডেন উদ্যানে ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের জয়লাভ।

২০শে পৌষ (৫ই জানুয়ারী) : শ্রীকৃষ্ণপুরীতে (পাটনা) জনতার উচ্ছৃঙ্খলতায় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনও পণ্ড।

কংগ্রেসের ৬৭তম অধিবেশনে (পাটনা) সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীর অভিভাষণ দান।

২১শে পৌষ (৬ই জানুয়ারী) : 'ভারত কাশ্মীরকে কিছুতেই পাকিস্তানের হাতে ছাড়িয়া দিবে না'—শ্রীকৃষ্ণপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণে শ্রীনেহরুর দৃঢ় উক্তি।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুব্ধ প্রাথমিক শিক্ষকদের (৮২ হাজার) প্রতিবাদ দিবস পালন—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের (মুখ্য মন্ত্রী) নিকট স্মারকলিপিপেশ।

২২শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী) : কেরলে কর্ষক সঙ্ঘের ৪৯দিন ব্যাপী আন্দোলন প্রত্যাহার।

২৩শে পৌষ (৮ই জানুয়ারী) : চীন কর্ত্তৃক গিলগিট এলাকায় পাক্ অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চলভুক্ত ৪ হাজার বর্গমাইল স্থান দাবী করার সংবাদ।

২৪শে পৌষ (৯ই জানুয়ারী) : রাজা মহেন্দ্রের বিরুদ্ধে নেপালে গণ-অভ্যুত্থান—পূর্ব নেপালের কারকটি অঞ্চলে কারফিউ জারী।

২৫শে পৌষ (১০ই জানুয়ারী) : কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত।

২৬শে পৌষ (১১ই জানুয়ারী) : দিল্লীতে বিজ্ঞান-ভবনে দ্বিতীয় কমনওয়েলথ শিক্ষা সম্মেলনের অনুষ্ঠান—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর উদ্বোধনী ভাষণে দাবী : সহনশীলতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়াই বিভিন্ন জাতির একমাত্র পথ।

তারমণ্ডহারবারের অনতিদূরে গঙ্গাসাগরগামী যাত্রী বোঝাই নৌকা নিমজ্জিত—লঞ্চের সহিত সংঘর্ষের জের।

২৭শে পৌষ (১২ই জানুয়ারী): গোয়া, দমন ও দিউ সংবিধান অনুসারেই ভারতের অঙ্গ—অন্তর্ভুক্তির জন্ম স্বতন্ত্র বিধানের প্রয়োজন নাই'—দিল্লীর সরকারী মহলের সর্বশেষ অভিমত।

পশ্চিমবঙ্গে ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬২) ভোটগ্রহণের দিন ধার্য্য—মহানগরীতে (কলিকাতা) নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ২৫শে ফেব্রুয়ারী।

২৮শে পৌষ (১৩ই জানুয়ারী): দিল্লীতে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষের (৫৩) জীবনাবসান।

রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী শঙ্করানন্দজীর (৮২) লোকান্তর।

২৯শে পৌষ (১৪ই জানুয়ারী): সুশৃঙ্খলভাবে গোয়া অভিযানে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর দক্ষতা—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

বহির্দেশীয়—

১লা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর): কাটাঙ্গায় অবিলম্বে যুদ্ধাবসানের জন্ম শোম্বের ব্যাকুলতা—কেনেডির (মার্কিণ প্রেসিডেন্ট) নিকট কাটাঙ্গা প্রেসিডেন্টের জরুরী তার।

৩রা পৌষ (১৯শে ডিসেম্বর): রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদে গোয়া প্রসঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী চক্র কর্তৃক আনীত প্রস্তাবে রুশিয়ার ভেটো প্রয়োগ।

পশ্চিম নিউগিনির (ওলন্দাজ অধিকৃত) মুক্তির জন্ম সমস্ত শক্তি সমাবেশের নির্দেশ—ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুয়েকার্ণোর ঘোষণা।

৪ঠা পৌষ (২০শে ডিসেম্বর): কিটোনায় কাটাঙ্গা প্রেসিডেন্ট শোম্বে ও ও কঙ্গোলী প্রধানমন্ত্রী আদোলার মধ্যে বৈঠক—রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সুরু।

৫ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর): গোয়ার মুক্তি অর্জ্জনের জন্ম ভারতের অনুসৃত কর্ম্মনীতিতে রুশ প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভের সমর্থন—শ্রীনেহরুর (প্রধান মন্ত্রী) নিকট অভিনন্দন বাণী প্রেরণ।

কাটাঙ্গার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলোপ সাধনে শোম্বের সম্মতি—কঙ্গোলী প্রধান মন্ত্রী আদোলার সহিত চুক্তি স্বাক্ষর।

৬ই পৌষ (২২শে ডিসেম্বর): বিশ্ব পরিস্থিত সম্পর্কে বারমুডায় মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডি ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ম্যাকমিলানের বৈঠক।

৭ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর): পশ্চিম ইরিয়ানের প্রশ্ন মীমাংসার্থে ইন্দোনেশিয়ার সহিত আলোচনায় ডাচ সরকারের আগ্রহ—রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের নিকট জরুরী তার।

৯ই পৌষ (২৫শে ডিসেম্বর): 'লিওপোল্ডভিলে পার্লামেণ্টের বৈঠকে কাটাঙ্গার প্রতিনিধি দল প্রেরিত হইবে'—প্রেসিডেন্ট শোম্বে ও জাতীয় পরিষদ সভাপতির ঘোষণা।

১০ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর): পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তির জন্ম ইন্দোনেশীয় প্রেঃ সুয়েকার্ণো কর্ত্তৃক সামরিক অভিযান কমিটিগঠিত।

১২ই পৌষ (২৮শে ডিসেম্বর): কঙ্গোলী পার্লামেণ্টে অধিবেশনে শেষ পর্য্যন্ত একদল কাটাঙ্গা প্রতিনিধির যোগদান।

১৩ই পৌষ (২৯শে ডিসেম্বর): লাওসে প্রিন্সত্রয়ের মধ্যে কোয়ালিশান সরকার গঠন সংক্রান্ত আলোচনার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত

কাটাঙ্গায় রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী ও কাটাঙ্গী সৈন্যদের মধ্যে পুনরায় লড়াই

১৪ই পৌষ (৩০শে ডিসেম্বর): গোয়া হাত ছাড়া হওয়া পর্ত্তুগালের শোক—বড়দিনের ন্যায় নববর্ষের উৎসব অনুষ্ঠানও বর্জ্জন

১৬ই পৌষ (১লা জানুয়ারী, ১৯৬২): 'রুশ-মার্কিণ সম্পর্কে উপর বিশ্বশান্তি নির্ভরশীল'—ক্রুশ্চেভ ও কেনেডির মধ্যে বাণী বিনিময়

১৮ই পৌষ (৩রা জানুয়ারী): গোয়ার ব্যাপারে পর্ত্তুগা কর্ত্তৃক রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগের হুমকী—গোয়ায় ভারতের কর্ত্তৃত্ব মানিয় লইতে আপত্তি প্রকাশ।

ওলন্দাজ কবলিত পশ্চিম ইরিয়ানকে (নিউগিনি) ইন্দোনেশী প্রদেশ বলিয়া ঘোষিত।

১৯শে পৌষ (৪ঠা জানুয়ারী): জেনেভায় প্রাচ্য-প্রতীচ্য নিরস্ত্রীকর আলোচনা পুনরারম্ভের জন্ম ১৪ই মার্চ্চ (১৯৬২) তারিখ নির্দ্ধারিত

ব্রহ্মে কারেন বিদ্রোহীদের সহিত বর্ম্মী সৈন্যদের ছয় ঘণ্টা ব্যা লড়াই—উভয় পক্ষে ৫৪ জন হতাহত।

২১শে পৌষ (৬ই জানুয়ারী): পশ্চিম নিউগিনির উপ ইন্দোনেশিয়ার সার্ব্বভৌম অধিকার মানিয়া লওয়ার দাবী—রাষ্ট্রসঙ্ঘ সেক্রেটারী জেনারেলের (উ থান্ট) নিকট সুয়েকার্ণোর বক্তব্য পেশ।

২৩শে পৌষ (৮ই জানুয়ারী): ম্যাকাসারে সুয়েকার্ণোকে (ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্ট) হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা।

সোভিয়েট জঙ্গী বিমান কর্ত্তৃক বেলজিয়াম যাত্রী বিমান আটক—রুশ আকাশ সীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ।

২৪শে পৌষ (৯ই জানুয়ারী): পশ্চিম ইরিয়ান সংক্রান্ত বিরো মীমাংসাকালে নেদারল্যাণ্ডকে ইন্দোনেশিয়ার দশ দিন সময় দান—প্রেসিডেন্ট সুয়েকার্ণোর সর্ব্বশেষ চেষ্টা।

২৫শে পৌষ (১০ই জানুয়ারী): মিঃ গিজেঙ্গা (কঙ্গো বামপন্থী সহকারী প্রধান মন্ত্রী) ষ্ট্যানলিভিল হইতে লিওপোল্ডভিলে ফিরিয়া যাইতে নারাজ—কঙ্গোলী পার্লামেণ্টের নির্দেশ উপেক্ষা।

২৬শে পৌষ (১১ই জানুয়ারী): পেরুতে তুষার প্রবাহে প্রা ৪ হাজার লোকের প্রাণহানির সংবাদ।

বিরাট নগরে (নেপাল) ডিনামাইট যোগে ট্রেজারী ধ্বংসের চেষ্টা

২৮শে পৌষ (১৩ই জানুয়ারী): কেন্দ্রীয় কঙ্গোলী সরকার কর্ত্তৃ বিরুদ্ধবাদী সহকারী প্রধান মন্ত্রী গিজেঙ্গাকে (ষ্ট্যানলিভিলে অবস্থানকারী গ্রেপ্তারের নির্দ্দেশ।

পশ্চিম ইরিয়ান মুক্তি অভিযানের সর্ব্বাধিনায়কপদে ইন্দোনেশিয় কর্ত্তৃক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সুহরতকে নিয়োগ।

২৯শে পৌষ (১৪ই জানুয়ারী): ষ্ট্যানলিভিলে কঙ্গোলী জেনারে লুণ্ডুলার বাহিনীর সহিত গিজেঙ্গার অনুগত সৈন্যদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ।

এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটে জনৈকা বাঙালী কন্যার আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্রশিল্পী শ্রীপি. সাহানা কর্ত্তৃক গৃহীত।

আগামী নির্ব্বাচন

"ভারতের নির্ব্বাচন কমিশনার শ্রীসুন্দরম জানাইয়াছেন,—১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে সাধারণ নির্ব্বাচন সুরু হইবে এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার আগে কোন কেন্দ্রের নির্ব্বাচনের ফলাফলই প্রকাশ করা যাইবে না। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে ব্যবস্থা ছিল অন্যরূপ। নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পরেই ফলাফল ঘোষণা করা হইত। এই ব্যবস্থার ফলে এক কেন্দ্রের নির্ব্বাচনের ফল অন্য কেন্দ্রের নির্ব্বাচনে ভোটদাতাদের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবারকার ব্যবস্থা সেই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই করা হইয়াছে। নূতন ব্যবস্থা যে গতবারের ব্যবস্থার চেয়ে ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নির্ব্বাচকমণ্ডলীর উপর শেষ মুহূর্ত্তে প্রভাব বিস্তারের পরোক্ষ চেষ্টা না থাকিলে গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ়তরই হইবে।"

—দৈনিক বসুমতী।

ষ্টেটবাসের দৌরাত্ম্য

"ষ্টেটবাসে চাপা পড়িয়া, এক বুধবার দিনেই দুইজন নিহত এবং দুইজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। ঘটনাস্থল কাশীপুর এবং টালা পার্ক অঞ্চল। যদি বলি যে, পরিবহন-সমস্যার তীব্রতাকে হ্রাস করিতে গিয়া এখানকার ষ্টেটবাসগুলিই একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বাড়াইয়া বলা হইবে না। দুর্ঘটনার সংখ্যা যেভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে পথে বাহির হইতে ভয় হয়। আশঙ্কা হয়, বাঘমার্কা এই উৎপাতগুলি হঠাৎ ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িবে। এত দুর্ঘটনা ঘটিবার কারণ কী? ভিড়ের চাপ? পথ চলিবার নিয়মকানুন সম্পর্কে জনসাধারণের অজ্ঞতা? কিন্তু, ইহাই যদি একমাত্র কারণ হইত, তবে নিশ্চয়ই ফুটপাথের উপরে মানুষ চাপা পড়িত না। সন্দেহ করিবার কারণ ঘটিয়াছে যে, বাসগুলির যান্ত্রিক গোলযোগও দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধির একটা প্রধান হেতু হইতে পারে। সম্প্রতি পত্রান্তরে যে খবর বাহির হইয়াছে, তাহাতে অন্তত সেই রকমই মনে হয়। অভিযোগ উঠিয়াছে, ব্রেক, গিয়ার এবং অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যে বিস্তর ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অনেক ষ্টেটবাসকে নাকি পথে বাহির করা হয়; ড্রাইভারদের আপত্তিতে কর্ণপাত করা হয় না। শুধু তাই নয়, যান্ত্রিক গোলযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার 'অপরাধে' ড্রাইভারদের নাকি কয়েক ক্ষেত্রে শাস্তিভোগও করিতে হইয়াছে। ইহার কারণ কী? ডিপো-ম্যানেজারদের খামখেয়ালি নহে ত? আসল কারণ যা-ই হোক, এ সম্পর্কে একটা কঠোর তদন্তের ব্যবস্থা করা দরকার। এবং তাহা করা দরকার অবিলম্বে। মানুষের নিরাপত্তা যেখানে বিঘ্নিত, কোনও রকমের আত্মতুষ্ট মনোভাবকেই সেখানে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

রেলপথ ভ্রমণ

"ইষ্টার্ণ রেলওয়ের বেলঘরিয়া ষ্টেশনে দুইদল যাত্রীর মধ্যে মারামারির ফলে কয়েকজন আহত হয় এবং এই উপলক্ষে দমদম হইতে ব্যারাকপুর পর্য্যন্ত ১নং মেন লাইনে দুই ঘণ্টার উপর ট্রেণ চলাচল ব্যাহত হয়। এই ধরণের ঘটনাও অহরহই ঘটিতেছে। দুইজন বা দুইদল যাত্রীর মধ্যে বিরোধ অনেক কারণেই ঘটিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে যাঁহারা বিরোধের মধ্যে নাই, তাঁহারাই বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং তাহাতে বিরোধ থামাইয়া দেওয়া বা মিটাইয়া দেওয়া কঠিন হয় না। কিন্তু ঘন ঘন এইরূপ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ঘটনার সংবাদে মনে হয়, মানুষের উত্তাপ-উত্তেজনার মাত্রা যেমন বাড়িয়াছে, তেমনি নিরপেক্ষ ব্যক্তিরাও উহা থামাইয়া দিতে অগ্রসর হন না। ফলে বাদবিসম্বাদ প্রবল হইয়া উঠে, বিশৃঙ্খলা প্রশ্রয় পাইতে থাকে। যাঁহারা শান্তিপ্রিয় তাঁহাদের এই ধরণের ঘটনায় নিষ্ক্রিয়তা বা নিশ্চেষ্টতাও দুশ্চিন্তার বিষয়। যাঁহারা মারামারি করেন, তাঁহারা ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ত হনই, রেলপথের অন্য যাত্রীরাও উহাতে বিপন্ন হইয়া পড়েন। ট্রেণ চলাচল দুই ঘণ্টার উপরে ব্যাহত হইলে সকলেরই বিশেষ ক্ষতি হয়। কথায় বলে—খলেরা দুষ্কার্য করে, উহার কুফল ভোগ করিতে হয় সাধু বা সজ্জনদের। কতকগুলি এলাকায় এইরূপ অবস্থাই ক্রমাগত চলিতেছে। নিঃসন্দেহে ইহা শোচনীয়।"

—যুগান্তর।

সঙ্কট সমাধান

"রাজ্য সরকার চোখ বুজিয়া আছেন, আর রক্তপিপাসু মুনাফাখোরের দল যাহা খুশী করিয়া চলিয়াছে। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন-সমস্যা লইয়া এইরূপ ছিনিমিনি খেলা কোনও সভ্য দেশে চলে কিনা সন্দেহ। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস-সমর্থক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'ও মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,—"কেন্দ্রে, রাজ্যে সরকার আছে, তাহাদের ঠাটপাটেরও অন্ত নাই। কিন্তু সাধারণ মানুষের নিত্য-আহার্য্যের বস্তু লইয়া এই জুয়াখেলা বন্ধ করিবার মত ক্ষমতা বা ইচ্ছা কেন্দ্রে বা রাজ্যে কি কাহারও নাই?" আমরা বলি—তাঁহাদের ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে, তবে ইচ্ছাটি নাই। কংগ্রেস সরকার চাহেন, মুনাফাখোরেরা সাধারণ মানুষের রক্ত শোষণ করুক এবং কংগ্রেসী তহবিলে চাঁদা দিক। মুনাফালোলুপতা সংযত করার নীতি কংগ্রেস সরকার বহুদিন পরিহার করিয়াছে। তাই তো জনসাধারণের এত দুর্গতি। হৃদয়হীন ও বৃহৎ পুঁজির সেবক কংগ্রেস-নেতাদের কাছে আবেদন-নিবেদনে কিছু হইবে না। ইহাদের গদিচ্যুত করিতে পারিলেই তবে সংকট সমাধানের পথ উন্মুক্ত হইবে।" —স্বাধীনতা।

বিতর্ক সভা

"আমরা যে এখনও গণতন্ত্রী ঐতিহ্যে পুরাপুরি অভ্যস্ত হইতে পারি নাই, তাহার প্রকাশ হয় মঙ্গলবার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে আয়োজিত এক বিতর্ক-সভায়। নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট বক্তাদের ভাষণে এই অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় বোধ হইয়াছিল বহু চিন্তাশীল বিদগ্ধজনের নিকট। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে একটি বিশেষ দলের সমর্থকদের ঐ সভাকে নির্বাচনী সভায় রূপান্তরিত করিবার

অপচেষ্টায় কার্যতঃ বিতর্ক সভাটির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। শান্ত পরিবেশে বিভিন্ন দলের বক্তব্য শুনিবার আশায় গিয়াছিলেন বহু ব্যক্তি, তাঁহারা অবশ্যই হতাশ হইয়াছেন।" —লোকসেবক।

জয়ের প্রতিক্রিয়া

"ইংলণ্ড-ভারতের টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতের বিজয়গৌরবকে কিছুটা ম্লান করিবার জন্ত বিলাতের এবং ভারতের কেহ কেহ এবং কোন কোন সংবাদপত্র ভারত সফরে ইংলণ্ডের প্রথম শ্রেণীর শক্তিশালী দল আসেন নাই বলিয়া যে নিতান্ত বাজে মন্তব্য করিয়াছিলেন—আমরা দুঃখের সহিত উহার প্রতিবাদ করিতেছি। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, এম-সি-সি'র প্রেসিডেণ্ট স্যার উইলিয়াম ওয়ারসুন্নে—এমন বাজে যুক্তির স্পষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইংলণ্ডের প্রথম শ্রেণীর শক্তিশালী দলই ভারতে টেষ্ট খেলিতে আসিয়াছিল। ভারতের ক্রিকেট-খেলোয়াড়দের প্রশংসনীয় খেলার জন্তই তাঁহাদের প্রাধান্ত ঘটিয়াছে এবং ইংলণ্ড দল পরাজিত হইয়াছেন।" —জনসজ্ঞ।

গোয়ার জের

"এতদিনে নেহরু একটি কাজের কথা বলিয়াছেন। কংগ্রেসের গোয়া প্রস্তাবের ব্যাখ্যায় তিনি জানাইয়াছেন, "রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে সব সময় অহিংসা আঁকড়াইয়া থাকা সম্ভব নয় এবং মহাত্মা গান্ধী আজ বাঁচিয়া থাকিলে (গোয়ার) ভারতের কাজ সমর্থন করিতেন।" নেহরুর পুলিশ ও মিলিটারী দেশের নিরস্ত্র লোকের উপর গুলীবর্ষণের দাপট স্বাধীনতার পর হইতেই দেখাইয়া আসিয়াছে, অহিংসা নীতি সে গুলী বর্ষণ আটকাইতে পারে নাই। শুধু বিদেশীর সম্মুখেই তাঁর মিলিটারীর বন্দুক কাঁধ হইতে নামিয়া আসে। পাকিস্তানী হানা, চীনা হানা ইহারই প্রমাণ। আজ যে কথা তিনি বলিলেন, ১৪ বৎসর পূর্ব্বে এই একটিমাত্র উক্তি তিনি করিয়া রাখিলে গোয়ার পর সারা দুনিয়ায় আজিকার টিট্‌কারী উঠিতে পারিত না। ১৯৫৫ সালে এই নেহরুই বলিয়াছিলেন—"গোয়া সম্বন্ধে আমাদের পলিসির মূল কথাগুলি কি? প্রথম, উপায় অবশ্যই শান্তিপূর্ণ হইতে হইবে। ইহাই সর্ব্বপ্রধান কথা যদি না আমরা আমাদের সকল পলিসির, সকল ব্যবহারের মূলোচ্ছেদ করিতে চাই।...যেসব উপায় শান্তিপূর্ণ নয়, তাহা আমরা কোনক্রমেই অবলম্বন করিব না।" (We rule out nonpeaceful methods entirely.) গোয়ার ব্যাপারে ভারতের হাস্যাস্পদ হইবার কারণ দুইটি—প্রথম, অহিংসা নীতির বাড়াবাড়ি এবং অকস্মাৎ খাপছাড়া ভাবে ঐ নীতি বিসর্জ্জন; দ্বিতীয়, এই নীতি পরিবর্ত্তনের কারণ কৃষ্ণমেননের ইলেকসন। অহিংসা নীতির বিসর্জ্জন যদি আর দুই মাস পরে হইত, নির্ব্বাচনের শেষে যদি গোয়া অভিযান হইত তাহা হইলেও বিশ্বসমাজে ভারতবাসী এতখানি হাস্যাস্পদ হইত না। নেহরুও আসলে রাজনৈতিক সুবিধাবাদী, এই তিরস্কার তিনিই ডাকিয়া আনিয়া মাথায় তুলিয়া নিলেন। গত সংখ্যায় প্রকাশিত তায়া জিঙ্কিনের প্রবন্ধ এবং কিসিঙ্গারের তিরস্কার তাহারই নিদর্শন। আমরা বলিয়া ছিলাম—গোয়া অভিযানে সম্ভবতঃ আমেরিকার গোপন সম্মতি ছিল। ডীন রাস্কের উক্তি তাহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। সম্ভবতঃ নেহরুর দুর্ব্বলতা বুঝিয়াই চীন এবার গিলগিটের অংশ দাবী করিয়া নেহরুকে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ দিয়াছে। এতদিনে নেহরুর বাস্তব রাজনীতির সম্মুখীন হইবার সময় আসিতেছে।" —যুগবাণী।

কংগ্রেস সাবধান

"পুলিশের বারবার তিন বার লাঠি খাইবার পর জনতার সম্বিৎ ফিরিয়া আসার পর কংগ্রেসের অধিবেশন কোন প্রকারে সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সে প্রদেশে শিষ্টাচার বলিয়া কিছু আছে আমাদের মনে হয় না, যেখানে মানুষ এখনও আইন শৃঙ্খলা মানিয়া কাজ করিতে শিখে নাই সেই সমস্ত স্থানে কংগ্রেসের এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল বলিয়া মনে হয় এবং আমরা আশা করি ভবিষ্যতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যাহাতে ইহার পুনরাভিনয় না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কংগ্রেস অধিবেশনের স্থান মনোনীত করিবেন। আমরা এইরূপ দুষ্কৃতকারিগণের কৃতকার্যের জন্ত দেশবাসীর পক্ষে অনুতপ্ত, স্তম্ভিত ও লজ্জিত। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সকলেরই, কাজেই কংগ্রেসের অধিবেশনে যা সভায় যোগদানের সকলেরই অধিকার আছে, তাই বলিয়া কি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া তাহা পণ্ড করিতে হইবে? ইহা কোন্ শিষ্টাচারসম্মত বা গণতান্ত্রিক ব্যবহার? আজ দেশবাসীকে এই কথাই চিন্তা করিতে হইবে, নিখিল ভারত কংগ্রেসকেও এ বিষয়ে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, ইহাই আমাদের মনে উদ্রেক হয়।" —সেবা (সিউড়ী)

ডাকঘরে দুরবস্থা

"এই সব পোষ্টম্যানকে দৈনিক ১০ হইতে ১২ হাজার চিঠি নানা ভাষায় বাছাই করিতে হয় এবং প্রায় দুই লক্ষ অধ্যুষিত স্থানে বিলি করিতে হয়। দৈনিক ১৫০ শত পার্শ্বেল বা প্যাকেট ও ৪০০ শত মণিঅর্ডার ইহার উপর আছে। সোমবার দিন কাজের চাপ এত অধিক যে প্রায় সবই ডবল হইয়া যায়, অর্থাৎ সোমবারের ডাকে প্রায় ২০।২২ হাজার চিঠি বাছাই ও বিলি করিতে হয়। উদয়াস্ত পরিশ্রম করিতে করিতে এই সব ডাক কর্ম্মচারীরা সন্ধ্যার সময় অবসন্ন হইয়া পড়ে। ইহার উপর অল্প বেতনভুক কর্ম্মচারীদের নানা সমস্যা আছে—ছেলেদের পড়াশুনার ব্যয়, মেয়ের বিবাহ, রোগের চিকিৎসা, ঘরভাড়া (তাও সে ঘর মনুষ্যবাসের উপযোগী নহে)। এইভাবে দিনের পর দিন অমানুষিক পরিশ্রমে এবং অসীম দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাইয়া ডাক কর্ম্মচারীদের শরীর এবং মন উভয়ই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ১২৫ জন কর্ম্মচারীদের মধ্যে যদি ১৫ জন যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে তবে ইহার চেয়ে ভয়াবহ, সেই সঙ্গে বেদনাদায়ক কি অবস্থা ঘটিতে পারে। অথচ এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণের কোন উপায়ই ডাক কর্ম্মচারীদের নাই।"

—জি, টি, রোড।

জনসাধারণের দুর্ভোগ

"তমলুকে রেলওয়ে আউট এজেন্সীটি বন্ধ হওয়ায় জনসাধারণের যে যথেষ্ট অসুবিধা হইতেছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তখনও আশা ছিল যে ঐ বন্ধ সাময়িক মাত্র; হিসাব নিকাশ মিটিয়া যাইলেই উহা আবার খুলিবে। কিন্তু এখন শুনিতেছি যে আউট এজেন্টস্ তমলুক-পাঁশকুড়া মোটর এসোসিয়েশন চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ সাপেক্ষে দাবিকৃত সমূহ প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার টাকা জমা দিলেও পূর্ব্ব দক্ষিণ রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ নরম হন নাই, বরং দেখিতেছি যে তাঁহারা এই আউট এজেন্টদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতঃ তাঁহাদের সমূহ জিনিষপত্র এমন কি সাইনবোর্ডটি পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন। ফলে,

এখানে উক্ত আউট এজেন্সী সম্বন্ধে একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ এখানে ঐরূপ আউট এজেন্সী যে কত দরকার এবং উহা যে রেলওয়ের পক্ষেও লাভজনক ছিল, তাহা সকলেই জানেন। অতএব উক্তরূপ আউট এজেন্সী এখানে অবিলম্বে খুলার জন্ম আমরা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী করি। মোটর এসোসিয়েশনকে তাঁহাদের পছন্দ না হয়, অন্য অনেক যোগ্য সংস্থা আছে। তাঁহাদের কাহাকে দিয়াও আউট এজেন্সী খুলানো যাইতে পারে। মোটের উপর এবিষয়ে আর বিলম্ব করা উচিত নয়।" —প্রদীপ (তমলুক)।

মহানায়কের জন্মদিনে

"আর দুই দিন পরেই আগামী ২৩শে জানুয়ারী মহানায়ক মহান নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। কালের আবর্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই দিন ফিরিয়া আসিতেছে ও একটি একটি করিয়া জীবনের দল খসিয়া পড়িতেছে—মানুষের মন ক্ষণিকের জন্য উদ্দীপ্ত হইয়া আবার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইতেছে। ধীরে ধীরে প্রবীণ যাঁহারা তাঁহারা বিস্মৃতির আলো হইতে স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া সেই স্মৃতি রোমন্থন করিতেছেন, কিন্তু নবীন শুধু শুনিয়াছে আর সেই শ্রবণের মাধ্যমে কল্পনাকে অবলোকন করিতেছে। কিন্তু সে কল্পনা যেন বারে বারে কাঁপিয়া উঠিতেছে; সে নেতৃত্ব কই, যা এই কল্পনায় আঁকা শাশ্বত মহানকে আজিকার যুবমনে স্থির প্রত্যয়ে গাঁথিয়া দিতে পারে? যুবমনে নতুনের প্রেরণা আসুক সেই মহাপ্রাণের কার্যধারা, আদর্শ ও কথা। কিন্তু যদিও সে কথা ভোলার নয় তবু আজ চতুর্দিকে অন্ধকারের প্লাবনে বিস্মৃতি ঘটাইবার অপচেষ্টা যা ব্যর্থ করার দায়িত্ব নূতন নেতৃত্বের, যুব জনতার। অন্ধকার ব্যথাহত ভারতের মাঝে মূর্ত আলোর বন্যা নেতাজী। অধঃপতিত, স্বার্থান্বেষী, দীনতা ও হীনতায় ভরা জাতির প্রাণে শিহরণের যে আবেগ দোদুল্যমান, তার হোতা ও বিকাশের পথ-প্রদর্শক বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ নেতাজী। নেতাজী শুধুমাত্র গতানুগতিক "নেতা" শব্দের ধারক নহেন। তিনি মহান্ বিপ্লবী নেতা।" —বীরভূম বার্তা।

দায়িত্ব কাহার?

"চলন্ত ট্রেণের কামরায় দস্যুতা ও নরহত্যা প্রায়ই ঘটিতেছে, কিন্তু তাহার কোনো কূল কিনারা হয় না। সম্প্রতি গয়ার পথে 'তুন-এক্সপ্রেস' হইতে পাঁচ জন যাত্রী বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়া চারজন প্রাণ হারাইয়াছেন। একজন শ্রীগোপেশচন্দ্র দাস অজ্ঞান অবস্থায় কলিকাতার হাসপাতালে রহিয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি করিমগঞ্জের লোক। তাঁহার স্ত্রী ও একজন আত্মীয় সত্যরঞ্জন দাস মারা গিয়াছেন। আরো দুইজন স্বামি-স্ত্রী ছিলেন মহারাষ্ট্রের। তাঁহারাও নিহত হইয়াছেন। এই ভয়াবহ ব্যাপারে শুনিতেছি আমাদের সরকার ও রেল কর্তৃপক্ষ নাকি সচকিত হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু ফল কিছু হইবে কি। পুলিশ ত হতবুদ্ধি। দায়িত্ব যে কোন্ দলের এখনও তাহা স্থির হয় নাই। পুলিশ যে সন্দেহভাজন দুর্বৃত্তদের গতিবিধির খবর রাখিতে পারে না, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। সমাজ জীবনে নীতির বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই চোরের এখন ধরা পড়ার কথা নহে। সাধুদের অপেক্ষা অসাধুদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। রাজত্ব এখন দস্যুদের হাতেই চলিয়া যাইবে। গণতন্ত্রে সংখ্যা গুরুদেরই ত' শাসনের অধিকার।" —জনশক্তি (শিলচর)।

শোক-সংবাদ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পরম ভক্তিভাজন স্বামী শঙ্করানন্দ গত ২৭এ পৌষ ৮২ বছর বয়েসে নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। সংসারাশ্রমে এঁর নাম ছিল অমৃতলাল সেনগুপ্ত। ১৯০২ সালে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন ছেড়ে ইনি মঠে যোগ দেন ও ১৯০৬ সালে রাখাল মহারাজের কাছে দীক্ষা লাভ করেন। ১৯৫১ সালে ইনি মিশনের অধ্যক্ষের আসনে সমাসীন হন। মিশনের সেবামূলক কার্যসমূহে এঁর নিবিড় যোগ এবং সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। এই দিকপাল কর্ণধারের অভাবে মিশন বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। জনসেবায় ঠাকুর ও স্বামীজীর পবিত্র ভাবধারা প্রচারের ক্ষেত্রে এঁর নেতৃত্বে মিশনের ঐতিহ্য আরও পুষ্টিলাভ করে।

* * * *

দেবী ভারতীর একনিষ্ঠ সেবক, নীরব ও নিস্পৃহ জ্ঞানতপস্বী, সুপ্রবীণ মনস্বী মহামহোপাধ্যায় হরিদাস ভট্টাচার্য সিদ্ধান্তবাগীশের গত ১০ই পৌষ ৮৬ বছর বয়েসে গৌরবময় জীবনের অবসান ঘটেছে। মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে জাতীয় মহামূল্য রত্নাগারে এঁর অবদান অতুলনীয়। যে কাজের জন্যে বহু অর্থব্যয়ে বহু পণ্ডিত নিয়োগ এবং বহু বছর সময়ের প্রয়োজন—সেই কাজে একক প্রচেষ্টায় কেবলমাত্র নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও ধৈর্য মূলধন করে হস্তক্ষেপ করা যে কি দুরূহ প্রচেষ্টা, তা কল্পনাতেও আনা যায় না। সেই অসম্ভবকেই পরিপূর্ণ সম্ভব করে সুধী সমাজের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয়। একশো উনষাটটি খণ্ডে এই পরম মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা, দর্শন ও সাহিত্যে ছিল তাঁর অসামান্য দক্ষতা। সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি নাটকও তিনি রচনা করেন এ ছাড়া ঐ ভাষায় প্রায় তেত্রিশটি সারগর্ভ, কাব্য, নাটক, টীকাগ্রন্থ রচনা করে আপন ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রাখেন। সিদ্ধান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায়, ভারতাচার্য, শব্দাচার্য, মহোপদেশক প্রমুখ এগারোটি উপাধি দ্বারা তিনি সম্মানিত। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মানের দ্বারা তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ও ১৯৬১ সালে সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয় রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় তথা প্রাচ্য মনীষার আকাশে এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন ঘটল।

* * *

স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ, বিদগ্ধ মনীষী ও বরেণ্য বিপ্লবনায়ক ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গত ১ই পৌষ ৮২ বছর বয়েসে লোকান্তরিত হয়েছেন। ১৯০৩ সালে ইনি বৈপ্লবিক আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন ও ১৯০৭ সালে যুগান্তর সম্পাদকরূপে রাজরোষে পতিত হন ও এক বছরের জন্যে কারাদণ্ডলাভ করেন। কারামুক্তির পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন ও সেখান থেকে এম, এ উপাধি অর্জন করেন ও ১৯২৫ সালে ভারতে ফিরে আসেন। ভারতে মার্কসীয় দর্শনের প্রথম প্রচারের গৌরব তাঁরই। তিনি শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৮ সালে দিল্লীতে নিখিল ভারত প্রাক্তন বিপ্লবী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তা ছাড়া বহু জ্ঞানগর্ভ মূল্যবান গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। তাঁর গ্রন্থগুলি তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্যেরই পরিচায়ক। তাঁর লোকান্তরযাত্রায় দেশের পণ্ডিতসমাজে একটি বিরাট আসন শূন্য হয়ে গেল।

ভারতবিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর শিশিরকুমার মৈত্র গত ১৩ই পৌষ ৭৬ বছর বয়সে কাশীলাভ করেছেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ইনি আগে প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। একবার তিনি নিখিল ভারত দর্শন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। সংস্কৃতজ্ঞ, সুধী ও চিন্তাশীল শিক্ষাব্রতী হিসেবে মনীষীমহলে ইনি যথেষ্ট সমাদরের অধিকারী ছিলেন।

* * * *

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত গত ৩রা পৌষ ৬৮ বছর বয়েসে আকস্মিক ভাবে গতায়ু হয়েছেন। এঁর ছাত্রজীবন ছিল গৌরবের আলোয় উজ্জ্বল। ১৯২২ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হিসেবে এঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত। ১৯২৩ সালে রীডার হিসেবে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন, ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। শেষ আঠারো বছর তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ আর্টসের ডীন ছিলেন। ১৯৫৫ থেকে ৬০ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি উপাচার্য ছিলেন। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' দিয়ে সম্মান জানান।

* * * *

স্বনামধন্য শিক্ষাবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক অনাথনাথ বসুর গত ১০ই পৌষ ৭২ বছর বয়েসে অকস্মাৎ প্রাণবিয়োগ ঘটেছে। সাহিত্যের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ও আসক্তি ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের ইনি অধ্যক্ষ ছিলেন, পরে দিল্লীর সেন্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশানের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। শান্তিনিকেতনেও কিছুকাল ইনি অধ্যাপনা করেন। শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি তথ্যপূর্ণ ও সারবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন।

* * * *

প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী অনন্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থের গত ১৭ই পৌষ ৬৩ বছর বয়েসে তিরোধান ঘটেছে। ইনি সংস্কৃত কলেজের ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এবং ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বিদগ্ধমণ্ডলীর বিপুল শ্রদ্ধা আহরণ করেছে। কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ এঁর গভীর বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। এঁর মৃত্যুতে বাঙলার শিক্ষা-জগতে একজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের অভাব ঘটল।

* * * *

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ গত ২৮এ পৌষ ৫৩ বছর বয়েসে দেহান্তরিত হয়েছেন। রসায়নশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে ইনি বি-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম-এস-সি পড়ার সময় গ্রেপ্তার হওয়ায় অধ্যয়নে ছেদ পড়ে এবং সেই থেকে তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবন শুরু। ১৯৩৪ সালে পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কয়েকটি গ্রন্থও তাঁর দ্বারা রচিত হয়েছে।

* * * *

প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক শিক্ষাবিদ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম গত ৩রা পৌষ ৬৪ বছর বয়েসে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষের আসনও এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। গ্রন্থকার হিসেবে ইনি সুনামের অধিকারী।

প্রখ্যাতনামা জ্যোতিষী রায়বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব গত ১২ই পৌষ ৮১ বছর বয়েসে লোকান্তর যাত্রা করেছেন। জ্যোতির্বিদ হিসেবে ইনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন এবং বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জনে ইনি সমর্থ হন। ১৯৩৭ সালে ইনি রায়বাহাদুর উপাধি লাভ করেন।

* * * *

রাজস্ব বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য ও সচিব সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৮ই পৌষ ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। ভারতীয় সিভিলিয়ানদের মধ্যে আপন কর্মদক্ষতার ও যোগ্যতার দ্বারা যাঁরা যুগপৎ সম্মান ও যশ অর্জন করেছেন, ইনি তাঁদেরই অন্যতম। কর্মজীবনে বহু দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদ গ্রহণ করে নিষ্ঠা ও কর্মক্ষমতার দ্বারা কর্তব্যভার পালন করে নিজের শক্তির পরিচয় দেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল, ম্যালোমেনিয়াম করপোরেশন ও রেমন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের ইনি অন্যতম পরিচালক ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সভাপতি ছিলেন ও ১৯৬২-৬৩ সালের সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন। বৃটিশ সরকার এঁকে সি, আই, ই উপাধি দেন।

* * * *

শ্রীঅতুল্য ঘোষের জননী হেমহরিণী দেবী (ঘোষ) গত ১৩ই পৌষ ৭১ বছর বয়েসে পরলোকগমন করেছেন। ইনি স্বর্গীয় কার্তিকচন্দ্র ঘোষের সহধর্মিণী ও সাহিত্যরথী স্বর্গত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কন্যা ছিলেন।

* * * *

বাঙলার প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গত ১৩ই পৌষ ৮৪ বছর বয়েসে দেহরক্ষা করেছেন। দেশের মুক্তি আন্দোলনে ইনি আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং দেশ ও সমাজ সেবার মাধ্যমে সর্বজনের শ্রদ্ধাভাজন হন। সাংগঠনিক কর্মাদিতে এঁর উৎসাহ ও সহযোগিতা ছিল অসাধারণ। ইনি হুগলী জেলা কংগ্রেসের দীর্ঘকাল সভাপতি ছিলেন।

* * * *

প্রখ্যাত সাহিত্যিক অমরেন্দ্র ঘোষ গত ২১এ পৌষ ৫৫ বছর বয়েসে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। হিন্দু মুসলমানদের জীবন কেন্দ্র করে গ্রন্থ রচনায় ইনি সাধারণ্যে যশস্বী হন। এঁর রচিত বহু গ্রন্থ পাঠকসমাজে যথে সমাদর লাভ করেছে। চরকাসেম, পদ্মদীঘির বেদেনী, ভাঙছে শুধু ভাঙছে, একটি সঙ্গীতের জন্মকাহিনী, দক্ষিণের বিল, প্রমুখ গ্রন্থগুলি এঁর সৃজনীপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে।

* * * *

বিখ্যাত চিত্র-পরিবেশক ও প্রযোজক হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ২৪শে পৌষ প্রাণত্যাগ করেছেন। এইচ-এন-সি প্রোডাকসানের মাধ্যমে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক ছবি ইনি দর্শকসমাজে নিবেদন করেছেন। চিত্রমহলে একটি বিশেষ আসন এঁর জন্যে নির্দিষ্ট ছিল।

* * * *

কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের ডেপুটি কমিশনার জ্ঞানদাস দত্ত গত ২৬এ পৌষ ৫৪ বছর বয়েসে লোকান্তরিত হয়েছেন। আগে তিনি ট্রাফিক বিভাগের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। ১৯৪১ সালে ইনি ভারতীয় পুলিশ পদক লাভ করেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেশিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
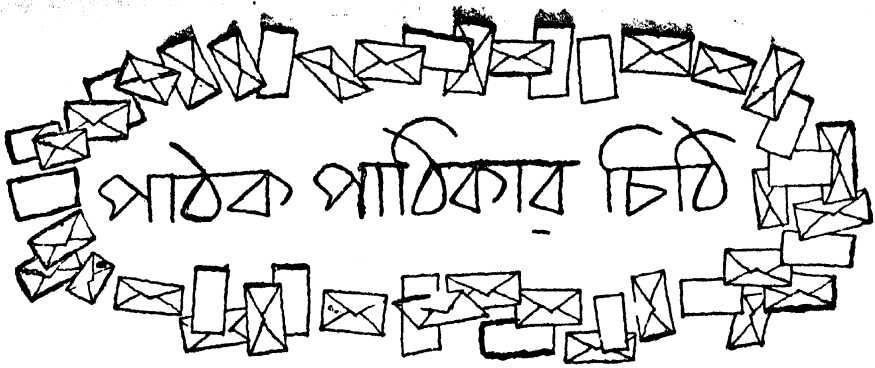
পত্রিকা সমালোচনা

পতিতাবৃত্তির প্রতিকার

আমি মাসিক বসুমতীর একজন সাধারণ পাঠকমাত্র। আলোচ্যমান প্রবন্ধটি পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। কয়েকমাস পূর্বে আধুনিক প্রেমের ট্রাজেডি পড়েছিলাম। তাতে করে দুটো প্রবন্ধই আজকের যুগে যা নিয়তই ঘটছে তারই অগ্নিস্বরূপ প্রমাণ। শ্রীহৃদয়রঞ্জনবাবু যে অকাট্য প্রমাণগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন, আজকের সমাজ, যুবক ও যুবতীদের, কি শিক্ষিত-শিক্ষিতা, কি অশিক্ষিত-অশিক্ষিতা, এমন কি অভিভাবকেরও তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারবে, যে আমরা চলেছি কোথায়? মন্তব্যগুলি সত্যসত্যই মর্মান্তিক কিন্তু নিরর্থক নয়। এর জন্য লেখক প্রশংসনীয়। কথা হচ্ছে, "বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?" এর মাধ্যমে যদি এক দশমাংশ কার্য্যকরী হয় তাহলেই এর সার্থকতা, নচেৎ যে বিষ প্রবাহিত হ'য়েছে দেশের তথা জাতির ভবিষ্যতে আসবে তার করাল বিভীষিকার ছায়া। পতিতাবৃত্তি করে কেন? কেনর উত্তর নেই। পণপ্রথা, না অন্যকিছু রহস্য আছে। আমার যতদূর মনে হয় তা নয়। পণপ্রথা পূর্বেও ছিল, কিন্তু এমনটি ছিল কি? এর জন্য "আধুনিক প্রেমের ট্রাজেডি" পড়লেই সম্যক জ্ঞান পাওয়া যাবে। আধুনিকাদের শেষ পরিণাম কি? নারী শিক্ষার প্রসারতা লাভ করেছে খুবই আনন্দের কথা, কিন্তু আমার মনে হয় শিক্ষার অপব্যবহার করা হয়েছে। কারণ যে শিক্ষা নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে না সে শিক্ষার কোন মূল্যই নেই। শিক্ষা যেটাকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বলব, সেটা যদি শুধু চাকুরী ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য বা সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে আমার বলবার কিছু নেই। শিক্ষাও শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয় আর যে রাখতে পারে তাকেই বুদ্ধিমান বলব, তার অপব্যবহার কখনই সমর্থন যোগ্য নয়। পতিতাবৃত্তি পূর্বেও ছিল তা আজও আছে, কোন ব্যতিক্রম নেই। গত মহাযুদ্ধের পর থেকে যে দ্রুতহারে বর্ধিত হ'য়েছে তা শুধু অর্থের প্রলোভনে আর বর্তমানে অর্থাভাব ও স্বেচ্ছাচারিতা কারণে এই স্বেচ্ছাচারিতা একমাত্র রোধ করা যায় অভিভাবকদের কঠোর ও তীক্ষ্নদৃষ্টিতে। জ্যোৎস্না চক্রবর্ত্তীর সমালোচনা পড়ে এইটুকু বলা যেতে পারে একধারে তিনি যেমন লেখককে প্রশংসাদানে কুণ্ঠিত নন, তেমনি অন্যধারে অতি সত্য কথা বলতে গিয়েও এড়িয়ে গিয়েছেন—শুধু চেয়েছেন অভিভাবকের উপায় কি? এখানে হাত পা ছেড়ে ঈশ্বরকে ডাকলেই কি মীমাংসা হবে। সমবেত প্রচেষ্টা ও উত্তম দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে তবে যদি সমাজবিরোধী কার্য্যের প্রতিরোধ করা যায়। যৌনলিপ্সা আছে এবং বিবাহে বিলম্ব হলে তাকে যে সমাজ বিগর্হিত কাজ করতে হবে, এমন কোন যুক্তি নেই। অতি জঘন্য বিজ্ঞাপন, সিনেমাপত্রিকাগুলির নায়ক ও নায়িকার ছবি এবং তার প্রশ্নোত্তর বিভাগগুলি এইগুলি যদি ঠিক বিচার করা যায়, তাহলে কেমন হয়। কিন্তু কে এর প্রতিবাদ করছে। তার হয়ত যথেষ্ট কারণ আছে। ধরা যাক একটি যুবতী কোন একটি যুবককে নিয়ে পালিয়ে গেল, বিবাহও হলো কিছুদিন বাদে, যুবকটি উক্ত স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্যত্র পালিয়ে গেল তাহলে মেয়েটির অবস্থা কি হবে? যত কিছু দুঃখের পসরা তার মাথায় পড়ল এবং দিনাতিপাত করবার জন্য দেহ বিক্রী করে জীবন নির্বাহ করতে হবে আর এও পতিতাবৃত্তির নিদর্শন। এক কথায় বলা যায় অবাধ মেলামেশার দরুণ তার প্রতিক্রিয়া। জুজুর ভয়ের দিন চলে গেছে। অতএব একে এমন শিক্ষার ভিতর দিয়ে গড়তে হবে যাতে করে তারা সব সময়ে স্মরণে রাখতে পারে। গর্ভরোধ বটিকার দ্বারা সব সময়ে পাপ লুকানো থাকে না। আর পাপ খণ্ডন করবার জন্য যদি সাময়িক ভাবে কোন চিকিৎসক সাহায্য করে থাকে তাতে করে আমি চিকিৎসককে দায়ী করব না। প্রতিটি জিনিষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করতে হলে অতিরকমের ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে এবং এটা একটা পঞ্জিকার নির্ঘণ্ট হবে। ছাত্রজীবনে যুবক ও যুবতীরা স্কুল ছেড়ে যখন কলেজে শিক্ষালাভের জন্য গেল কিছুদিন বাদে সেখানে দেখা গেল—"গাছে না উঠতে উঠতেই এক কাঁদি" এমন কাজ করে বসল (ঘটনাও বলতে পারেন বা দুর্ঘটনা)। যার আর বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহলে ভাবতে হবে শেষ পরিণাম কি? তা অতি সহজেই অনুমেয়। উক্ত প্রবন্ধের সহিত আমি একমত। হিন্দু সমাজ ও আইন কানুন পতিতাবৃত্তির জন্য দায়ী, ঠিক তাৎপর্য্য বুঝলাম না। হিন্দু সমাজ বহুকাল থেকে চলে আসছে তখন ত এমন ছিল না আজই বা তার ব্যতিক্রম হলো কেন? আমার মনে হয় উত্তর দেওয়া খুব সহজ হবে না। বিবাহিত কি অবিবাহিত এ প্রশ্ন আজ নয়। প্রশ্ন হচ্ছে অবাধ মেলামেশা থাকলে গণ্ডগোল বাধবেই—আর স্বেচ্ছাবিহার ঐ একই জিনিষ। এইগুলি বন্ধ হলেই কুফলের আশঙ্কা থাকবে না বলেই মনে হয়। সীতা সাবিত্রীর দেশ এ কথা আজ সকলে ভুলতে বসেছে। আর খুবই [illegible]

কথা কারোর মুখে আজ এ কথা শোনা যায় না। আধুনিক যুগে সবই হয়ত অচল হয়ে যাবে এবং কুসংস্কারের সামিল হবে। পূর্বে এবং এখনও কুমারী মেয়েরা শিবপূজা করে আসছে হয়ত এর কারণও আছে। দুঃখের বিষয় এই যে শিক্ষিতার মধ্যে এটা অতি নগণ্য। কোন যুবককে ভালবেসে তাকে পাবার জন্য যে আকুলতা থাকে তার এককণাও যদি ঈশ্বরের প্রতি থাক্‌তো তাহলে কি হতো বলা যায় না। যদি ভালবাসার জিনিষ না পেলো তাহলে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা এ ছাড়া পথ কি? তা যদি না হয় বাইরের পথই হবে আশ্রয়। এ পথের কাঁটা অপসারণের জন্ত চাই বর্তমানে যুবক যুবতীদের ঐকান্তিকতা, গালভর্তি বুলি দিয়ে নয়। শিক্ষার ভিতর দিয়ে যদি ধর্মে অনুরাগ, ঈশ্বর বিশ্বাস ও সীতা সাবিত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার নির্দেশ থাকে এবং বিদেশী আধুনিকের অনুকরণ না থাকে তাহলে বলতে পারি আগামী দিনের সাফল্য অর্জন করতে পারে নচেৎ কোন যুক্তিই আজ খাটবে না।—ইতি শ্রীঅমিয়কুমার দে সরকার। উলুবেড়িয়া, হাওড়া।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Dr. R. B. Banerjee, 864 Eloise Drive cleveland-12, Ohio, U.S.A. * * * শ্রীশুকদেব দাস, গ্রাম ও পোঃ—হোদল, নারায়ণপুর, জেলা—বাঁকুড়া * * * শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী, য়্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেণ্ট আই, এস, ডব্লিউ, জি, লিমিটেড, জামসেদপুর-৮ * * * শ্রীপি, সি, আচার্য, কেলিডেন টি এষ্টেট, ডাক—শাপ্লানা, নওগাঁও, আসাম * * * শ্রীমতী স্নিগ্ধা সান্যাল, অবধারক—শ্রীএ, কে, সান্যাল, প্লট নং ৪, মোরে ভবন বিল্ডিং, মাউণ্ট রোড এক্সটেনসান, নাগপুর-১ * * * শ্রীপ্রিয়লাল রায়, অবধারক—বি, ও, সি, এজেণ্টস্‌, কাঠিয়াডি, ময়মনসিংহ, পূর্ব পাকিস্তান * * শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, ডাক-সেগুা-জায়্যার (রঘুনাথগঞ্জ হয়ে), মুর্শিদাবাদ * * * প্রধান শিক্ষক, রমাপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডাক, হাসনাবাদ-রমাপুর, জেলা ২৪-পরগণা * * * সচিব, বেলাস বিশ্বেশ্বর সুহৃদ গ্রন্থাগার, ডাক আগ্রাহাটি, বর্ধমান * * * শ্রীমাগারাম ঘোষ, ডাঙ্গাল, ডাক বাঁকাটি, বর্ধমান * * * শ্রীসুপ্রকাশ ঘোষ, গভর্ণমেণ্ট ট্যানারিস, পোষ্ট বক্স নং ৪৬, জম্মু তাউই, কাশ্মীর * * * শ্রীমতী অণিমা দে, ১১২ মিশন ষ্ট্রীট, পণ্ডিচেরী মাদ্রাজ * * * প্রধান শিক্ষক, ডি, পি, এম, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডাক, রাজনওয়াগড়, জেলা—পুরুলিয়া * * * শ্রীমতী পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অবধারক শ্রী এ, কে, বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিপো ম্যানেজার, এম, বি, রোডওয়েস, গুণা, উত্তর প্রদেশ * * * অধ্যক্ষ, গয়াক লেজ, গয়া * * * Mr. Amitava Das-gupta B. E. Chembre No. 34, Towering Hotel, 26, Avenue Alsace Lorrane, Grinoble (Isera), France. * * * শ্রী কে কে, ঘোষ, অবধারক—আই, বি, এম, ওয়ার্ড ট্রেড করপোরেশন, ভালকান ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, বীর নরিম্যান রোড; বোম্বাই—১

অগ্রহায়ণ মাস হইতে ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠাইলাম—বাসনা মজুমদার (সিংভূম) বিহার।

Remitting herewith the sum of Rs. 7·50 towards my half yearly subscription of Monthly Basumati —Chameli Devi, Jalpaiguri.

কার্ত্তিক ১৩৬৮ হইতে চৈত্র ১৩৬৮ পর্য্যন্ত ৬ মাসের চাঁদা পাঠাইলাম—বীণা দত্ত, Balasore.

মাসিক বসুমতী পত্রিকার ষাণ্মাসিক চাঁদা বাবদ ৭·৫০ নঃ পঃ পাঠাইলাম।—শ্রীমতী সতী দেবী, চম্পারণ।

মাসিক বসুমতীর '৬৮—'৬৯ সনের বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। Sm. Anima Chakravarty, Udaipur, (Rajasthan).

আগামী বছরের মাসিক বসুমতীর জন্য ১৫৲ টাকা চাঁদা পাঠালাম—মলিনা সেন, ত্রিবেণী, হুগলী।

Sending herewith Rs 15/-as my annual subscription—Indira Halder, Giridhi.

কার্ত্তিক মাস হইতে ছয় মাসের চাঁদা বাবদ ৭·৫০ নঃ পঃ পাঠাইলাম—গৌরী গুপ্তা ধানবাদ।

আমার আগামী ১২ মাসের মাসিক বসুমতীর চাঁদা স্বরূপ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী মমতা ঘোষ, পাটনা।

কার্ত্তিক হইতে আমার ৬ মাসের চাঁদা বাবদ ৭·৫০ পাঠাইলাম।—শ্রীমতী আলো চ্যাটার্জ্জী, এলাহাবাদ।

মণি অর্ডারযোগে সাড়ে সাত টাকা পাঠাইলাম। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত।—শ্রীসুষমা চৌধুরী, বোলপুর।

I send herewith Rs. 7·50 for the subscription from Kartick to Chaitra—Bina Sircar, Jalpaiguri.

কার্ত্তিক মাস হইতে এক বৎসরের জন্য মাসিক বসুমতীর গ্রাহক-মূল্য পাঠাইলাম।—মিলন চৌধুরী, আগ্রা।

মাসিক বসুমতীর আগামী ৬ মাসের চাঁদা (কার্ত্তিক-চৈত্র, ১৩৬৮) ৭॥০ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী প্রতিমা মুখার্জ্জী, ধানবাদ।

Herewith six monthly (Kartick—Chaitra) subscription for Masik Basumati—Usha Bhadury, Lucknow.

Please receive annual subscription of Rs. 15/- —Dolly Dutta, Dibrugarh.

যদি আপনাদের কার্ত্তিক সংখ্যা থাকে তাহলে আমায় কার্ত্তিক মাস হইতে অন্যথায় বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে গ্রাহিকা করিয়া লইবেন।—স্নিগ্ধা সান্যাল, নাগপুর।

পুনরায় ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। ১৩৬৮ সালের পৌষ মাস হইতে নিয়মিত ভাবে এক বৎসরের মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী ভ্রমর বসু, কলিকাতা।

বাৎসরিক চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠালাম।—দেবী ব্যানার্জ্জী, যোধপুর, (রাজস্থান)।

৭·৫০ নঃ পঃ পাঠাইলাম। আশ্বিন মাস হইতে মাসিক বসুমতী যথারীতি পাঠাইবেন।—স্বাগতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারভাঙা।

গত কার্ত্তিক মাস থেকে এক বছরের জন্য গ্রাহক কোরে নেবেন। ১৫৲ টাকা পাঠালাম।—কল্যাণকুমার ঘোষ, বোম্বাই।

আমার ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী ইরা দেবী, মথুরা।

অদ্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। অগ্রহায়ণ হইতে আরও এক বৎসরের জন্য গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্তা করিয়া লইবেন।—Geeta Roy, W. Dinajpur.

আপনার বাৎসরিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠালাম।—প্রতিভা দত্ত, ঝিলুয়া।
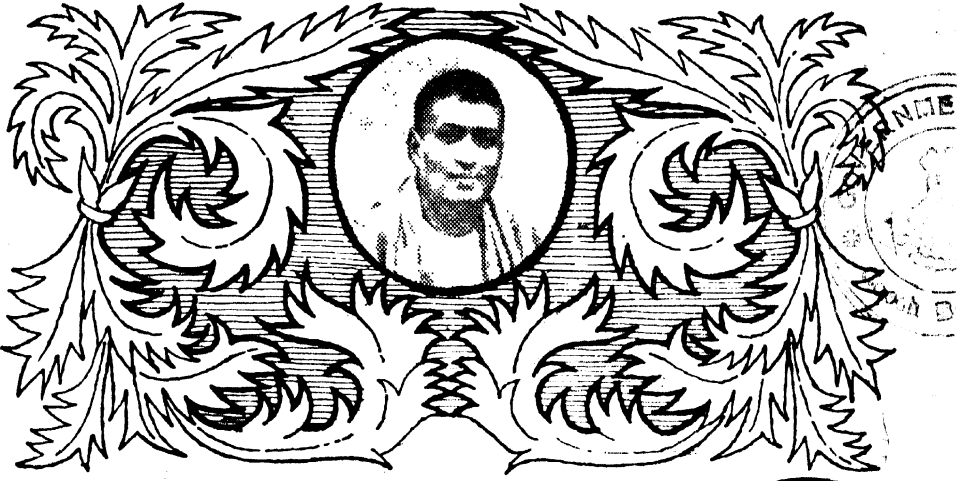
স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

৪০শ বর্ষ—মাঘ, ১৩৬৮] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

কথামৃত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

An ordinary man idealises the real thing, whereas an extraordinary man realises the ideal thing—hence I admire Ramkrishna.
—Swami Vivekananda.

* * * *

হে গৃহী, অতিশয় সাবধান ! কামিনী-কাঞ্চনকে বিশ্বাস করিও না। তাহারা অতি গুপ্তভাবে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া লয়।

সাবাস্ দক্ষিণেকালী ভুবন ভেল্কি লাগিয়ে দিলি।

* * * *

মন প্রথমে পূর্ণ থাকে, তাহার বিদ্যাশিক্ষায় দুই আনা, স্ত্রীতে আট আনা, পুত্রকন্যায় চারি আনা এবং বিষয়ে দুই আনা ; কালে কাহারও আর নিজ মন থাকে না ও সকল বিষয়ে পরের মনে কার্য্য করিয়া থাকে। গীতা ৬—৪৬।

* * * *

যাঁহারা পূর্ণ যৌবনে দ্বাদশ বৎসর বীর্য্যধারণ করেন, তাঁহাদের মেধা নাম্নী একটি নাড়ী জন্মে। ব্রহ্মচর্য্যে ঊর্দ্ধরেতা হয়, ঊর্দ্ধরেতা হইলে দেবত্ব লাভ হয়, বীর্য্যপাতে মরণ, ধারণে জীবন। বীর্য্য-ত্যাগে ক্ষণিক আপাতঃ সুখ, পরিণাম জরা বা দুঃখ। তাহার রক্ষণে নিত্য আনন্দ—চির যৌবন।

* * * *

অনিত্য দেহের মোহে না পড়ে, ভগবানের প্রীতিতে মত্ত—দেহ, মন, প্রাণ সর্ব্বস্ব অর্পণ কর। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।

বীর্য্যই ওজঃ তেজ বা শক্তি। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। বীর্য্যহীন বা পুরুষত্বহীন ব্যক্তির খবরের কাগজ পড়িতে মাথা ঘোরে। পূর্ণ মস্তিষ্ক না হইলে জ্ঞান আসিবে কোথা হইতে? পশুরাজ সিংহ দ্বাদশ বৎসরে একবার রমণ করে। সংযমই মনুষ্যত্ব—তাই সৎসঙ্গ আবশ্যক। প্রলোভন হইতে দূরে থাকাই মঙ্গল।

Let the Vedanta-Lion roar. ওঁ তৎ সৎ ওঁ। Thou art That.

* * * *

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। শ্রীশ্রীচণ্ডী।

স্ত্রীলোকমাত্রেই ভগবতীর অংশ। শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের চরণে

দৃষ্টি রাখিবে। সর্প দেখিলে যেমন বলিতে হয় "মা মনসা, প্রণাম করি, ল্যাজটি দেখিয়ে মুখটি লুকাও।"

* * * *

অনেকে কামিনীত্যাগী হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাকে প্রকৃত ত্যাগী বলা যায় না। যে জনশূন্য মাঠের মধ্যস্থলে ষোড়শী যুবতীকে মা বলিয়া চলিয়া যাইতে পারে, তাহাকেই প্রকৃত ত্যাগী বলা যায়।

* * * *

সকলই নারায়ণ, নারায়ণ ছাড়া কিছুই নাই। গীতা ৭—১১। অবিদ্যাই হউক আর বিদ্যাই হউক, সকলকেই মা আনন্দরূপিণী বলিয়া জানিতে হইবে। জয় মা আনন্দময়ী! সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।

* * * *

ভগবানের পাদপদ্মে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেই জীব বাঁচিয়া যায়। গীতা ৮—১৬; ১২—৬, ৭; ১৮—৬২, ৬৬।

* * * *

যাহারা সাধন করিয়া তাঁহাকে পাইতে চায়, তাহাদের জন্য সাধন এবং শক্তিহীন অধম পতিতদিগের জন্য তিনি পতিতপাবন। অন্ধকারের জন্যই আলোক।

* * * *

ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গাজললবকণিকা পীতা।

সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চ্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চ্চাম্। শঙ্করাচার্য্য।

রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা সকলেই মানুষ; মানুষ না হইলে মানুষের ধারণা সম্পাদন করা যায় না। গীতা ৪—৭, ৮; ৯—১১, ১২।

* * * *

যখন যিনি অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার আদিষ্টমতে পরিচালিত হইলে আশু মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা। ফলে সকলেই মঙ্গলেচ্ছায় বাধ্য হইয়া থাকে। তাঁর দায়। বাদসাহী আমলের টাকা এ কালে চলে না।

* * * *

গুরু কৃপাহি কেবলম্। কাহারও ভাব ভাঙ্গিও না। গীতা ৩—২৬।

* * * *

বংশরক্ষার বেলায় তুমি আর ভরণপোষণের বেলা ওপাড়ার বামুন! কেবলমাত্র বংশবর্দ্ধনের যন্ত্রবিশেষ ও পাশববৃত্তি চরিতার্থের জন্য স্ত্রীজাতি সৃষ্ট হয় নাই। বংশ কার? বংশ নয়—বাঁশ! জয় রামকৃষ্ণ।

থিসৃকা লাঠি উসৃকা বোঝা।

* * * *

পরচর্চ্চা যত অল্প করিবে, ততই আপনার মঙ্গল হইবে। পরচর্চ্চায় পরমাত্মচর্চ্চা ভুল হয়। পরনিন্দায় নিজেরই অনিষ্ট হয়।

* * * *

যেমন গেড়ে ডোবায় দল বাঁধে, তেমনি যাহাদের সঙ্কীর্ণভাব, তাহারাই অপরকে নিন্দা করে এবং আপনার ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে। স্রোতস্বতী নদীতে কখন দল বাঁধিতে পারে না; তেমনি বিশুদ্ধ ঈশ্বরভাবে দলাদলি নাই। যেমন কূপের ভেক ও সমুদ্রের ভেক।

* * * *

মামলা-মোকদ্দমা মহাপাপ।

ভাইয়ে ভাইয়ে জমী ভাগ করছ, আকাশকে ত পার না; মা রক্ষা কর।

* * * *

"যে কেহ ধর্ম্মানুসন্ধায়ী হন, তিনি ধর্ম্ম এবং অর্থ উভয়ই লাভ ক'রে থাকেন এবং যিনি অর্থের জন্য লালায়িত, তিনি অর্থ এবং ধর্ম্ম উভয়েই বঞ্চিত হন" Man makes money, never money made a man—Vivekananda.

সৎ হইলে ধর্ম্ম অর্থ কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। সত্যের শরণ লও। "Honesty is the best policy." *

* * * *

পর্ব্বতগহ্বরে বসিয়াও সত্য চিন্তা করিলে, উহা পর্ব্বত ভেদ করতঃ দিগ্ দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিবে।

উকিল ও ডাক্তারের ধর্ম্ম হয়, যদি মক্কেল ও রোগী প্রার্থনা না করে, যাদ পেষা না হয়।

* * * *

সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। যে সয় সেই রয়। 'স' তিনটা —শ, ষ, স। যখন যেমন তখন তেমন।

ফোঁস্ রাখিও—কামড়াইও না।

* * * *

সংসারের সার হরি; অসার কামিনী-কাঞ্চন। হরিই নিত্য—তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন; কামিনী-কাঞ্চন ছিল না, থাকৃচেও না, এবং থাকিবে না। "এই আছে—আর তখনি নাই।"

* * * *

"Oh Lord! I implore Thee to bliss all mankind and grant them Thy Sraddha and Bhakti so that they dwell with Thee."

* * * *

সাধু কাহারা? যাহারা প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অতীত।

সিদ্ধ মহাপুরুষ কেমন? যেমন আলু পটোল সিদ্ধ হইলে নরম।

যে একবার প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিবে তাহার প্রতি ভগবানের দয়া হইবেই হইবে। মাগো মা! মা—মা এমন মধুর নাম আর নাই।

"মা মা মা বলে ডাকিলে পরাণ গলে—
কত আশা উথলে মা, তাকি তুমি জাননা!"

জয় মা ব্রহ্মময়ী!—সেবক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

* * * *

তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ—
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি তরে মা এ বীণা বাজিবে
এ হৃদি তোমারি গাহিবে গান।—রবীন্দ্রনাথ।

* * * *

রাখে রাম—মারে কে?

যে রাম, যে কৃষ্ণ—সেই এবে রামকৃষ্ণ। গীতা ৪—৭, ৮; ৯—১১, ১২। যার শেষ জন্ম সেই আমাকে পায়। গীতা ৮—১৬।

—স্বামী যোগবিনোদ মহারাজের 'ঠাকুরের কথা' হইতে

পরমহংসের আবির্ভাবের পূর্বাভাষ

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাইতি

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে (১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে) প্রেমাবতার গৌরাঙ্গদেব ভারতে প্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়ে চিরবাঞ্ছিত ধামে তিরোহিত হয়েছেন। তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রম-ধর্মের মূল-সূত্র এবং নীতি লুপ্ত হয়ে গিয়ে ছুঁৎমার্গের মাধ্যমে পৌরোহিত্য-ধর্ম আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। দেশ দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতায় ভরে উঠেছে। স্নেহ, মমতা, ভালবাসা এবং দরদ দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেন্দ্রীয় শাসক মুঘল সম্রাটগণ দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিকে দিকে সামন্তাধিপতিগণ কেন্দ্রীয় শাসকের অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং দেশটাকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিয়েছেন। বিদেশী বণিকদের মধ্যে পর্তুগীজ, ফরাসী এবং ইংরাজ এদেশে বাণিজ্য করবার অজুহাতে স্ব স্ব উপনিবেশ স্থাপন করে বসেছে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কেরী সাহেবের মিশনারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বুকে ফোর্ট-উইলিয়ম্ কলেজ স্থাপিত হয়েছে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বৃটিশ পার্লিয়ামেন্ট থেকে যে সনদ পেয়েছিল, তাতে ভারতের প্রজাবৃন্দের সাহিত্য চর্চা ও পণ্ডিতদের উৎসাহ দেবার জন্য এবং বিজ্ঞানশিক্ষা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে রেভিনিউ থেকে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মিশনারী কর্ত্তৃক শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে উপরোক্ত এক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হওয়ার স্কীম প্রণয়নের জন্য 'কমিটি অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন্' নামে একটি পরিষদ গঠিত হয়েছে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়েছে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনার জন্য ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে শিক্ষা এবং শিল্প প্রসার কল্পে দশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হবে স্থিরীকৃত হয়েছে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেকলে উপরোক্ত 'কমিটি অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকসনে'র সভাপতিপদ লাভ করবার ফলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ৭ই মার্চ্চ তারিখে লর্ড বেণ্টিঙ্ক-এর মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে যে—গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী টাকায় ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।

আর এদিকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ডাফ্ সদলবলে ভারতে এসে এদেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে খৃষ্টধর্মের বাণী প্রচার করে তাদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে আরম্ভ করেছেন এবং এদের মন প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ফলে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশ চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে দেশের বুকে এক নূতন আদর্শের সৃষ্টি করেছে—দেশে এক নূতন প্রেরণা এনে দিয়েছে। প্রায় দশলক্ষ ভারতবাসী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে হিন্দুধর্মের উপর আত্মজিজ্ঞাসা সৃষ্টি করেছে। হিন্দুধর্মের উপর একটা দ্বিধাভাব এবং অনাস্থার সৃষ্টি করেছে—একটা সঙ্কোচ এনে দিয়েছে। আর যিশুভক্তগণ পবিত্র দেবালয়ে এবং হিন্দুদের বাড়ীতে রাত্রির অন্ধকারে গোপনে গোমাংস ছড়াতে আরম্ভ করেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় এতই বিভ্রান্ত এবং পাশ্চাত্য সভ্যতায় এতই মুগ্ধ যে তারা এই অনাচারের বিরুদ্ধে বিশেষ কোনও প্রতিবাদ করেছিল বলে মনে হয় না। ফলে হিন্দুধর্ম যেন আর রক্ষা হয় না।

ব্রহ্ম এখন স্থির নহেন। তিনি চঞ্চল হয়েছেন। তাঁর চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির আধারভূতা মাতৃশক্তি মহামায়া আবির্ভূতা হয়েছেন।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং
বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায়
সম্ভবামি যুগে যুগে।"

সাধুগণকে পরিত্রাণ করবার জন্য, দুষ্কৃতকারীদিগকে বিনাশ করবার জন্য এবং যুগে যুগে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আমি প্রকাশিত হই।

"যদা যদা হি ধর্মস্য
গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য
তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।"

যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের প্রবলতা ঘটে, তখনই আমি ধর্ম অভ্যুত্থানের জন্য নিজেকে আর নিরাকার নির্গুণ অব্যক্ত রাখি না, সগুণ সাকারে, রক্ত-মাংসের শরীর ধারণ করে, মানুষের সমস্ত গুণ

ও বৃত্তি নিয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হই। মানুষ কর্ম জানে না; কর্ম কিরূপে করিলে ধর্ম পরিণত হয় তা জানে না; সেজন্য নূতনভাবে হিন্দু-ধর্ম শিক্ষাদান ও রক্ষার জন্য আমাকে সর্বভূতানুকম্পী হয়ে অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হতে হবে। জন্ম জন্মান্তরের উচ্চতম কর্মফলের শক্তি-তরঙ্গে যে আত্মাটি তাঁর কাছে এগিয়ে এসেছেন, এমন একটি আত্মাকে নিয়ে ঠাকুর ব্রহ্ম দিগন্ত নীলিমা আগারে বসে তাঁতে রূপ দিতে বসেছেন। পাশে অনন্ত ধাতুসমূহ স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে।

তিনি সেই উচ্চতম আত্মায় প্রথম ধাতু সংযোগ করলেন—'দারিদ্র্য'। তুমি দরিদ্র ধর্মপ্রাণ পিতা এবং দরিদ্রা ধর্মপ্রাণা মাতার পুত্ররূপে ধরাধামে আবির্ভূত হবে। সাধু গৃহীরা, সাধু সন্ন্যাসীরাই-ত দারিদ্র্য বরণ করে নেয়। সেইজন্যই-ত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা জগতে স্মরণীয় এবং বরণীয় হয়ে আসছে—শ্রেষ্ঠ আসন পেয়ে আসছে। আর—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং
যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং
যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।"

অনন্যচিত্তে যারা আমাকে স্মরণ করতে করতে ভজনা করে এবং আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকে, আমি তার শরীর রক্ষার এবং ভরণপোষণের সমস্ত দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করি।

তারপর ঠাকুর ব্রহ্ম সেই উচ্চতম আত্মায় দ্বিতীয় ধাতু সংযোগ করলেন—'নিরক্ষর'। তুমি আক্ষরিক ভাষায় উচ্চশিক্ষিত-এর অতীত হয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হবে।

"যাবানর্থ উদপানে
সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু
ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।"

সকল স্থান জলে প্লাবিত হ'লে যেমন কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের কোনও প্রয়োজন থাকে না, তেমনি যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, অর্থাৎ যিনি আমাকে জেনেছেন—যিনি মদ্গতচিত্ত, তাঁর আর বেদে কোনও প্রয়োজন থাকে না। আর—

"শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে
যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিঃ
তদা যোগমবাপ্স্যসি।"

শাস্ত্রপাঠে বিক্ষিপ্ত এবং বিভ্রান্ত বুদ্ধি যখন একাগ্রতায় স্থির এবং অচঞ্চল হয়, তখনই আমার সহিত যোগীর যোগসূত্র আরম্ভ হয়—অর্থাৎ কর্মযোগ আরম্ভ হয়। আর—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্।"

বাগাড়ম্বর দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না, বেদ অধ্যয়নের দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না, মেধা বা প্রভূত শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না। যিনি আত্মকাম হয়ে আত্মাকে বরণ করেন, তিনিই আমাকে লাভ করেন এবং আমিও তাঁর নিকট নিজস্বরূপ প্রকাশ করি।

বই আর শাস্ত্র—বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, সাংখ্য, ন্যায়, মীমাংসা আমার কাছে পৌঁছবার পথ দেখিয়ে দিতে পারে বটে; কিন্তু এর পরের কাজ ত নিজেকেই করতে হয়। তখন ত বই আর শাস্ত্রের আবশ্যক হয় না। তাই তোমাকে আমি নিরক্ষর করে পাঠালাম। তুমি আমার জ্ঞানে অনাদি, অনন্ত হয়ে থাকবে। তুমি হবে জ্ঞানাতীত। তুমি নিরক্ষরদের ভাষায় বেদ, বেদান্তের মূল সূত্রগুলি জগতে প্রচার করে আসবে।

তারপর ঠাকুর ব্রহ্ম সেই উচ্চতম আত্মায় তৃতীয় ধাতু সংযোগ করলেন—"আজন্মব্রহ্মচারী"। তুমি হবে আজন্মব্রহ্মচারী। আত্মার কোনও লিঙ্গ নাই; কেবল দেহসম্বন্ধে নরনারী ভেদ। এই অনুভূতি নিয়ে তুমি ধরাধামে অবতীর্ণ হবে। স্ত্রী, পুরুষকে তুমি সমভাবে, আত্মভাবে দর্শন করবে। তোমার মনে পার্থিব ভোগ-বাসনা কখনও স্থান পাবে না। লিঙ্গ গুহ্য নাভি-সাধনা অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনের অনুভূতি তোমার মনে স্থান পাবে না। তুমি কেবল বক্ষ, কণ্ঠ, কপোল, ব্রহ্ম—এই চার সাধনায় দিন অতিবাহিত করবে। আত্মার দেহ বাধ চলে গিয়ে সর্বদাই সমাধিতে মগ্ন থাকবে। আর সবার উপরে হবে তুমি মাতৃভাবের সাধক। তোমার ত্যাগ, বিজ্ঞান এবং বৈরাগ্য স্ত্রীজাতির সামনে অক্ষুণ্ণ থাকবে। আমি যেমন অনাদি, অনন্ত, আনন্দস্বরূপ এবং লিঙ্গরহিত, কেবল দেহ সম্বন্ধে নরনারী ভেদ, তেমনি তুমিও এ আনন্দ অনুভব করবে—এবং তোমার মধ্য দিয়ে এ আনন্দ প্রকাশিত এবং প্রচারিত হবে।

"সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।"

বিনাশশীল সর্বভূতের মধ্যে অবিনাশী আমাকে যিনি সমভাবে অবস্থিত দেখেন, তিনি যথার্থই আমাকে দর্শন করেন। কারণ আমাকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখে তিনি আত্মার দ্বারা আত্মার হিংসা করেন না। সুতরাং তিনি পরমগতি লাভ করেন।

তারপর তিনি সেই উচ্চতম আত্মায় চতুর্থ ধাতুসংযোগ করলেন—"মায়ামুক্ত"। তুমি হবে মায়ামুক্ত। আমার শক্তির তিন গুণ—আমার প্রকাশিত অবস্থায় মায়া। তুমি হবে অনন্তের সাধক—সেইখানেই ত চিত্তের চরম আশ্রয়, পরম আনন্দ।

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি"। আমারই প্রশাসনে হে গার্গি, নিমেষ, মুহূর্ত, অহোরাত্র, অর্ধমাস, ঋতু, সংবৎসর সকল বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। এই চলার মধ্যে—এই অনন্ত গতির মধ্যে তুমি আমারই স্থিতি দেখতে পাবে। একদিকে আমি বদ্ধ—নাহলে আমার প্রকাশ হয় না; আর একদিকে আমি মুক্ত, নাহলে আমার অনন্তের প্রকাশ হইতেই পারে না। এই সত্যই হবে তোমার সাথী—পথপ্রদর্শক।

তোমার দেশকাল বা নামরূপের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি থাকবে না। নামরূপের দৃঢ়-পিঞ্জর ভেদ করে তুমি সর্বদাই আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ডুবে থাকবে। মায়ার মধ্যে থাকবে তুমি—কিন্তু মায়াতে তুমি বদ্ধ হবে না। তার মধ্যে করবে তুমি খেলা—যে কোনও মুহূর্তে

ছেড়ে দেবে সেই খেলা। তোমার মন হবে জীবাত্মার হাতের যন্ত্র। তুমি সংসারে থাকবে, কিন্তু সংসার তোমাতে থাকবে না।

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং
হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি
যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"

আমি সকলের মধ্যে অবস্থান করছি। কিন্তু মানুষ সংসার ঘানি, মায়া ঠুলি, মনরূপ বলদ নিয়ে সংসারে ঘোরপাক খাচ্ছে। আর তুমি থাকবে জলের উপর নৌকার ন্যায়, কিন্তু তাতে জল উঠবে না। তুমি থাকবে কাদার মধ্যে পাঁকাল মাছ, কিন্তু গায়ে কাদা লাগবে না। তুমি একদিকে হবে যোগী, আর একদিকে হবে জ্ঞানী; একদিকে হবে কর্মী, আর একদিকে হবে ভক্ত; একদিকে হবে বদ্ধ, আর একদিকে হবে মুক্ত; তোমার হবে সাম্যবুদ্ধি তোমার হবে শুদ্ধ বুদ্ধি, তোমার হবে শুদ্ধ বাসনা, তোমার হবে শুদ্ধ আচরণ।

তারপর তিনি সেই উচ্চতম আত্মায় পঞ্চম ধাতু সংযোগ করলেন—"ভাবসমাধি।" বাহ্যবিষয়ের প্রতি তোমার কোনও ভ্রূক্ষেপ থাকবে না। সাংসারিক কোনও চাঞ্চল্য তোমায় চঞ্চল করতে পারবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের ঊর্দ্ধে হবে তোমার স্থান। বিধি-বিধান, আচার-অনুষ্ঠান, কর্ম, কর্মবন্ধন সব খসে পড়বে। তোমার অনুভূতি হবে—প্রত্যক্ষানুভূতি।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।"

তুমি হবে আমার অতি নিকটতম,—অতি দূরবর্ত্তী। সকলদিকের নদীনালার জল যেমন সমুদ্রের জলকে বৃদ্ধি করতে পারে না বা সমুদ্রের জলের যেমন হ্রাস নাই—তেমনি কোনও সাংসারিক কামনা তোমাকে চঞ্চল করতে পারবে না। তুমি সর্বদাই আমারই ভাবে থাকবে। শুচি-অশুচি, জ্ঞান-অজ্ঞান, ধর্ম-অধর্ম, লজ্জা-সরম, পাপ-পুণ্য কোনও বোধ তোমার থাকবে না।

"আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামাঃ যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিং আপ্নোতি ন কামকামী।।"

তুমি সর্বদাই চরম এবং পরম শান্তিতে দিন অতিবাহিত করবে।

তারপর ঠাকুর ব্রহ্ম সেই উচ্চতম আত্মায় ষষ্ঠ ধাতু সংযোগ করলেন—"শিশুর সারল্য।" তুমি হবে শিশুর ন্যায় সরল। তুমি আমাকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন করবে। শিশুর মত তুমি আমার কাছে আবদার করবে—আমার সঙ্গে খেলা করবে। বালভাবস্তথা ভাবো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে। বালকের ন্যায় ভাব হলো, বালকের ন্যায় নিশ্চিন্ত হলে যোগ পরিপক্ক হয়। এইভাবের যতই বৃদ্ধি হয়, পাটোয়ারি বুদ্ধি ততই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাই তুমি বাক্য ও মনের অগোচর আমাতে লীন হয়ে থাকবে।

"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।"

শিশুর মত সরলতার জন্য সর্ববিষয়ে তোমার সমদর্শন হবে। কোনও জিনিষে তোমার ঘৃণাবোধ থাকবে না। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" আর—

"যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।"

তারপর ঠাকুর ব্রহ্ম সেই উচ্চতম আত্মায় সপ্তমধাতু সংযোগ করলেন—"ব্যাকুলতা"। তোমার এই ব্যাকুলতা দেখে মানুষ মনে করবে তুমি পাগল। কিন্তু তুমি ত পাগল নও। তোমার অবস্থা মহাভাবের অবস্থা। তোমার বিশ্বাস, তোমার ব্যাকুলতা প্রশংসনীয় ব্যাকুলতা। তাই ত তোমার ব্যাকুলতার টান হবে মানুষকে বা কোনও প্রাণীকে জলে ডুবিয়ে রাখলে সে বাঁচবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়—বিষয়ী বিষয়ের জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সতী পতির জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, মা পুত্রের জন্য যেমন ব্যাকুল হয়—সেই পর্যায়ে গভীর এবং প্রাণস্পর্শী।

তারপর ঠাকুর ব্রহ্ম সেই উচ্চতম আত্মায় অষ্টমধাতু সংযোগ করলেন—"তন্ময়তা"। তুমি সর্বদাই মদগতপ্রাণ হয়ে থাকবে। আমারই চিন্তায় তন্ময় হয়ে থাকবে। এই তন্ময়তা আমারই এবং তা আমি তোমায় দিলাম। তোমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিকশিত হবে। এ বিকাশের মাঝে কোনও ছেদ নেই, কোনও বিরাম নেই, কোন চাঞ্চল্য নেই, কোনও দ্বিধা বা সংশয় নেই। ইহা চিরন্তন, শাশ্বত, সত্য। এ তন্ময়তা শাস্ত্রপাঠলব্ধ নয়, উগ্র তপস্যায় অর্জিত নয়, সাংখ্য, কর্ম জ্ঞান, কর্মসন্ন্যাস ধ্যান, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্রহ্ম বাক্যগুহ্য, বিভূতি; মোক্ষসন্ন্যাস প্রভৃতি যোগদ্বারা বা অষ্টসিদ্ধির দ্বারা লব্ধ নয়। এ তন্ময়তা সমস্ত যোগের অতীত। এই তন্ময়তায় তোমার চিন্তাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, অনুভবশক্তি লুপ্ত হবে, আমার সান্নিধ্য লাভ করবে—আমায় দর্শন করবে। এর মধ্যে কোনও বাহুল্য নেই, কোনও অবাস্তবতা নেই, কোনও অপ্রাকৃতিক বা কোনও অবৈজ্ঞানিক অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ বা বিকাশ নেই। তোমার এই দর্শন আমার সঙ্গে বা আমার মধ্যে লীন হওয়া নয়—জন্ম-জন্মান্তরের পরিসমাপ্তি নয়—তুমিই সে আমি। তুমি ত আমারই প্রকাশ—আমারই বিকাশ। আমার বহু ও অনন্ত শক্তির বিকাশ। তোমার শ্রীঅঙ্গে ফুটে উঠবে এই অনন্তশক্তি। এ তন্ময়তা এতই অসীম, এতই বিচিত্র যে তাকে কেউই সীমার মধ্যে, কল্পনার মধ্যে আনতে পারবে না। এত বড় শক্তির আধার হয়েও তুমি হবে স্থির, ধীর, বাহ্যিক প্রকাশহীন সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। তাই দেখে কি দার্শনিক, কি সাহিত্যিক, কি বৈজ্ঞানিক, কি চিকিৎসক, কি ব্যবসায়ী, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কি যোগী, কি ভোগী, কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে তোমার প্রতি যে শুধু আকৃষ্ট হবে তা নয়—তারা পরিষ্কার ভাবতে শিখবে—দৃশ্যমান তোমার ভিতরে ও বাইরে, আর একটি জগৎ আছে—আমি রয়েছি—যাকে শুধু তন্ময়তা-যোগেই পাওয়া যায়। তারা তোমাকে দেখে ভাবতে শিখবে—তোমার সগুণ, সাকারের পিছনে তোমার নির্গুণ, নিরাকারের খেলা রয়েছে। তারা উপলব্ধি করবে—তোমায় দর্শন—আমায় দর্শন। তোমায় দর্শনে জগতে অদ্বৈতবাদ প্রচারিত হবে—জগৎ ধন্য হবে—এই নূতন আলোকে।

ঠাকুর ব্রহ্ম এই অষ্টধাতু সংযুক্ত আত্মাটিকে সামনে রেখে পরীক্ষা করতে লাগলেন। আমি বড় যত্নে, বড় স্নেহে, বড় আদরে তোমায় আমার রূপ প্রদান করলাম। তুমিই আমাকে জগতে প্রকট করে আসতে পারবে। আমি অনাদি, অনন্ত। তাইতো যেন অনাদি,

অনন্ত। তা আমারই জ্ঞানরাশি। কখনও তা সৃষ্ট হয় না—অনাদি অনন্তকাল থেকে তা রয়েছে। মুনি-ঋষিরা তা প্রত্যক্ষ করেছেন মাত্র। তাঁরা আমার ভাবরাশির দ্রষ্টামাত্র। কিন্তু তাঁরা বেদ এবং বেদান্তকে এত শক্ত, এত কঠিন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে—তা জনসাধারণের সামনে, জনসাধারণের মনে জটিল হয়ে রয়েছে। তুমি আমার অনাদি, অনন্ত জ্ঞানরাশি নিরক্ষরের ভাষায়, জনসাধারণের ভাষায় সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জলগতি ভঙ্গিমায় সর্বসাধারণের সামনে পৌঁছে দিতে পারবে। তাই তো তোমায় নিরক্ষর করে পাঠালাম। তোমার জ্ঞানরাশি, তোমার মতবাদ হবে কোনও ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়—কোনও সম্প্রদায়গত নয়—কোনও জাতির জন্য নয়। তোমার ব্যাখ্যা হবে আমার মূলতত্ত্ব এবং সূত্রের ব্যাখ্যা—অনাদি, অনন্ত, চিরন্তন, শাশ্বত সত্যের ব্যাখ্যা। তাই তো তোমায় মায়ামুক্ত করে দিলাম। তুমি সর্বধর্মসমন্বয়ের ব্যাখ্যা করে আসতে পারবে। তুমি একদিকে হবে ঘোর দ্বৈতবাদী, আর একদিকে হবে ঘোর অদ্বৈতবাদী। একদিকে হবে তুমি পরমভক্ত আর একদিকে হবে তুমি মহাজ্ঞানী, মহাযোগী। যাও, তুমি হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে ধর্মপ্রাণ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং ধর্মপ্রাণা চন্দ্রা দেবী ওরফে চন্দ্রমণি দেবীর সন্তান-রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হও। এই কথাগুলি শুনে মহামায়া মহাশক্তি আনন্দে, স্মিতহাস্যে অন্তর্হিতা হলেন। আর আমরা সেই মহান আত্মাকে ১২৪২ সালে ৬ই ফাল্গুন, ইংরাজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে গদাধর (রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব) নামে অবতারকে ধরাধামে অবতীর্ণ হতে দেখলাম। উপনিষদের ভাবধারাগুলি প্রকৃতপক্ষে মানবরূপ ধারণ করে ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন। ঠাকুর, তোমাকে দর্শনই ত—"বেদান্তদর্শন"। তোমায় প্রণাম করি। ওঁ ইতি ব্রহ্ম।

এখন দেখো

মৃত্যুঞ্জয় সেন

এখন দেখো, কোলকাতা কত কঙ্কাল
বুকে ইভের যাতনা, উল্কি আঁকা
বেদনার চিহ্ন,
যেন ভাঙ্গা রঙ্গমঞ্চে ক্লান্ত, উন্মাদ অভিনেতা

চৌরঙ্গী পাড়ায় বিকেলে, টয়লেটের স্বপ্নগুলো,
সাহেবপাড়ার চত্বরে দেখা,
জ্যাকের চিঠির বাক্স বা ইংলিশ রোমিও জুলিয়েট
আর কতকগুলো অসংলগ্ন আজগুবি কথা,
"চিঠি দিও, চলি, দেখা হবে, আচ্ছা"

কিংবা,
বনেদী রক্ত মেশানো, ওদের বাড়ীর পাশ দিয়ে
সব সময়ে চলাফেরা, অফিসে, বাজারে···
জীবনের ঘড়িতে ফাঁকি দেওয়া অনেকগুলো ঘণ্টা,

অথবা
হারিয়ে যাওয়া হেমন্তের ঝড়, কলেজের দিনগুলো,
সুন্দর সুন্দর মুখের মত, বা
চুপি চুপি আড়ালে বসার অনুভূতিগুলো;
অনেকক্ষণ হোল, হারিয়েছি;
তুমিও তাই,
হায় হায়!

বা কুমারেশ কেতকীর বাড়ীতে নেমন্তন্ন···
রাতে ফেরা ট্যাক্সি ক'রে।
মাসের প্রথমেই গেলো মাইনেটা।
এখন দেখো, কোলকাতা কত নিঃস্ব।

আকাশের সীমা

অজয়কুমার সিংহ রায়

সবুজের সঞ্চয় মোর দুটি চোখে
অন্তরে প্রান্তরে নবীন আলোকে।
মাঠের এ-কোল হতে ওই কূল অবধি
মনে মনে আকাশের সীমা মাপি যদি,
মনে হয় এটুকু যে বড়ো আপনার—
নিঃশেষ হয় নাকো এর অধিকার।
সীমার বাঁধন নেই, নেই কোলাহল,
ব্যাহত চোখের আলো নিভেনা কেবল।
ফসলের গন্ধে আনে সুদৃঢ় প্রত্যয়,
আশ্বাস নভের নীলে জীবনের জয়
গায় পাখী কলতানে হেথা অবিরত,
অধিকার অবারিত চির শাশ্বত।

এটুকু আকাশপটে ফোটে রাত্রি দিবা
তুলির নিপুণ টানে অন্তরের বিভা—
বর্ণের সমারোহে মধুর উজল,
নির্বাক সে ছবিতে আশ্বাস, বল
ফিরে পাই বসুধার অবিরল স্নেহ,
সবুজের সজীবতা ভরে মন দেহ।

আকাশের এই সীমা যেটুকু মেপেছি,
ফসলের শিহরণে যে মনে কেঁপেছি,
মনে হয় তারা যেন আমারই কেবল—
সবুজের আলপনা—বলাকার দল!

প্যালেস্টাইনের মহিলা কবি ফাদোয়া

রেজাউল করীম

কয়েক বছর আগে একটি বীণা ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু সে বীণার তারে এখনও মৃদু কম্পন হচ্ছে। বীণা হচ্ছে প্যালেস্টাইন— আর শেষ তার হচ্ছে প্যালেস্টাইনের মহিলা কবি ফাদোয়া।

আরবী ভাষায় "ফাদোয়া" শব্দের অর্থ ত্যাগ। প্যালেস্টাইনের মহিলা কবির নামটি খুব সার্থক বলতে হ'বে। তিনি প্যালেস্টাইনের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আজ উক্ত দেশের আরবদের উপর দুর্যোগের অন্ধকার ঝাপিয়ে পড়েছে। তাদের অনেকে আজ গৃহহারা উদ্বাস্তু। তাদেরই ব্যথা-বেদনার কাহিনী যিনি অপরূপ কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁর "ফাদোয়া" নাম সার্থক হয়েছে।

প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত "নাবলাস" (Nablus) তাঁর জন্মস্থান। তাঁর ভাই ইব্রাহিম তোকিনও একজন নাম-করা কবি। এই ভাই-ই ফাদোয়ার কবিত্ব-শক্তি প্রথম আবিষ্কার করেন। কাব্য-সাধনা করবার জন্য বোনকে তিনি সর্ব্বদাই দিতেন উৎসাহ। কিন্তু তিনি বোনের কবি-খ্যাতি প্রকাশিত হবার পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ভায়ের মৃত্যুর পর ফাদোয়ার কবিত্বশক্তি নানাভাবে বিকশিত হতে লাগল। ইব্রাহিম বোনকে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু ১৯৪১ সালের ২রা মে আরবী কাব্য-কানন থেকে এই নূতন ফুলটি ঝরে গেল। ধরাবক্ষ থেকে প্যালেস্টাইনের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার দৃশ্য দেখবার ব্যথা ইব্রাহিমকে পেতে হ'ল না। প্রিয় ভ্রাতার অকাল মৃত্যু ফাদোয়াকে দিল প্রচণ্ড ধাক্কা। আর অন্যদিকে তিনি স্বচক্ষে দেখলেন তাঁর প্রিয় স্বদেশ মানচিত্রের পৃষ্ঠা থেকে একেবারে মুছে গেল। ভাই চলে গেলেন, স্বদেশের চিহ্ন হ'ল বিলুপ্ত। তবে আর থাকলো কি? থাকলো শুধু প্রিয় ভ্রাতার অল্প বয়স্ক বিধবা পত্নী আর দুটি অপোগণ্ড শিশু—জাফর এবং উরাইব প্রথমটি পুত্র, অপরটি কন্যা। ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর ফাদোয়ার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি ভায়ের উপর একটি দীর্ঘ শোকগাথা রচনা করলেন। তার কিয়দংশের নমুনা দেওয়া গেল—এ থেকে তাঁর কবিত্ব-শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাবে :—

"হে আমার ভাই! আমার মর্ম্মজ্বালা কত তীব্র!
মৃত্যু কেমন নিষ্ঠুরভাবে যৌবনের অলঙ্কার কেড়ে নিল!
হায় কোথায় আছেন আমার সেই ভাই?
কি জন্যই বা তিনি আমাদেরকে ত্যাগ করে চলে গেলেন?
আলোর বদলে আমার হৃদয়ে আছে আগুন—
এ আগুন দীর্ঘদিনেও নিভে যাবে না।
আমি ভেবেই পাই না কার জন্য দুঃখ করব!
দুঃখ করব তোমার অনুপস্থিতির জন্য?
অথবা তোমার শিশুদের জন্য?
অথবা আমার দুর্ভাগ্যের জন্য?
অথবা তোমার শিশুদের মায়ের জন্য?
সেও তো আমার মত তোমার অভাবে মর্ম্মপীড়িতা।
তাই সে অহরহ: দীর্ঘশ্বাস ও দুঃখে দিন কাটাচ্ছে।
তার অশ্রুধারা হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে নির্গত হ'চ্ছে
তার দীর্ণ-বিদীর্ণ ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ের জন্য
আমার আজ কত দুঃখ!
আর তোমার উপরও আমার দুঃখের অন্ত নেই—
আমার ক্রন্দনেরও অন্ত নেই—।
লোকে আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসে—হে আমার আত্মার অংশ।
কি এমন বস্তু আছে যা' আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারে?
হে আমার ভাই,
তোমার পাশে আমার জন্য স্থান করে দাও,
আর আমার জন্য অপেক্ষা কর,
সত্যই আমি তোমার দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছি।"

ফাদোয়া যে তাঁর ভাই-এর জন্য এত করুণ সুরে রোদন করেছেন, তাতে বিস্মিত হ'বার কিছু নেই। এই ভাইই ত তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রেরণার উৎস ছিলেন। এই ভাইই ছিলেন তাঁর শিক্ষক, পরামর্শ-দাতা ও বন্ধু। সুতরাং এমন পরম সুহৃদ ভাইকে হারিয়ে তিনি সর্ব্বহারা হ'য়ে পড়লেন। আর কিছু ত তাঁর অবশিষ্ট রইল না। তবে রইল কেবল কবিতা। কবিতাই পৃথিবীতে তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। তাঁর স্বদেশ প্যালেস্টাইন ত হারিয়ে গেছে, এখন তাঁর একমাত্র সম্পদ বাকি রইল কবিতা, যার জন্য তিনি আজও বেঁচে আছেন। বস্তুত: কবিতার মাধ্যমে ফাদোয়া অভিযোগ করেছেন, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা থেকে বিচ্যুত একটা অপ্রীতিকর আবহাওয়ার বিরুদ্ধে।

ফাদোয়া প্রাচীন আরবী সাহিত্য প্রচুর পড়াশুনা করেছেন। আখানি, আমালী, আলবাইয়ান, ওয়াত তাবেইন এবং কামিল— এই সব ক্লাসিক লেখকদের অমূল্য গ্রন্থাবলী পাঠ করে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ ক'রেছেন। তাছাড়া তিনি আধুনিক যুগের সমসাময়িক আরবী সাহিত্য পরম নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করেছেন। তিনি

বিশেষভাবে সিম্বিয়ো-আমেরিকার শিল্পরীতির প্রতি আকৃষ্ট। তার কারণ এই দলের সাহিত্য হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে দুর্নিবার বেগে নির্গত হয়। এই নূতন সাহিত্য আক্ষরিক অনুকরণ-দোষ থেকে মুক্ত আধুনিক যুগে আরব-জগতে আর একজন মহিলা-কবি আছেন, তাঁর নাম "নাজিক আল মালাএকা"। নাজিকের মত ফাদোয়া ইংরাজি সাহিত্য ভালবাসেন। ফাদোয়া বৃটিশ কবিদের মধ্যে শেলী, কীটস এবং বাইরণের কবিতাই বেশী ভালবাসেন। কিন্তু আরব-জগতের এই দুই মহিলা কবির মধ্যে সাদৃশ্য যেমন আছে, তেমনি আছে পার্থক্য। সাহিত্য-সমালোচনায় নাজিক অধিকতর নিপুণা। দুজনেই একই রোমান্টিক স্কুলের অন্তর্গত। কিন্তু শেষের দিকে নাজিক রোমান্টিকতা থেকে সরে এসেছেন। "স্ফুলিঙ্গ এবং ভস্ম" কাব্য-গ্রন্থখানি প্রকাশিত হবার পর থেকে নাজিকের সুর একেবারে বদলে গেছে। নাজিকের কাব্যরীতির এত দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে যে, আজ তিনি রোমান্টিকতার নাম শুনতে পারেন না। শুধু তাই নয়—তাঁর রোমান্টিক উচ্ছ্বাসপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ "আশেকাতুল লায়েল" রচনার জন্য নাজিক দুঃখিত। বস্তুতঃ তাঁর এই কাব্যটি—রোমান্টিক স্কুলের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। আজ যদি কেহ নাজিককে তাঁর 'আশেকাতুল লায়েলের' কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তবে তিনি তাতে অত্যন্ত বিরক্ত হ'ন। তাঁর পরবর্ত্তী কাব্যগ্রন্থে তিনি রোমান্টিকতাকে একেবারে বর্জ্জন করেছেন। আর সেজন্য গর্ব্ববোধ করেন। তাঁর সাম্প্রতিক কবিতাগুলি পাকা হাতের লেখা। তিনি বহু নতুন বিষয়বস্তু ও ছন্দের অবতারণা করেছেন। নাজিক অবশ্য রোমান্টিক কবিতা লিখেই কাব্য-সাধনা আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু পরে সে পদ্ধতি একেবারেই বর্জ্জন করেছেন। কিন্তু ফাদোয়া বরাবরই রোমান্টিক। ফাদোয়ার প্রেমের কবিতায় তিন প্রকার ইমোশন বা আবেগের পরিচয় পাওয়া যায়—(১) ভ্রাতৃবিয়োগজনিত দুঃখ ও আবেগ, (২) স্বদেশবিভাগজনিত মর্ম্মবেদনা, (৩) বর্ত্তমান যুগের শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ার মধ্যে তাঁর মনে জেগেছে অসহ্য যন্ত্রণা—এই আবহাওয়ার মধ্যে তিনি অহরহঃ ছটফট করছেন। এসব অনুভূতি তাঁর কাব্যের অন্যতম উপাদান। তাঁর একটি কবিতার নাম "আমার কামনার কুলঙ্গি"। এই কবিতাটি ফাদোয়ার উক্ত তিন প্রকার ইমোশনের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কবিতাটির কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ দেওয়া গেল :—

"এইটাই তোমার স্থান,
এইটাই আমার প্রেম ও কামনার কুলঙ্গি বা তাক।
কতবার আমি অশ্রুভরা চোখে এখানে এসেছি,
আনন্দের অশ্রু আমার চোখের পাপড়িতে ঝুলছে।
কতবার এসেছি আমি অতীতের স্মৃতি নিয়ে,—
সেই স্মৃতি যা আমার অন্তর থেকে স্রোতের মত এসেছে।
এই সেই স্মৃতি যা আমার চারিদিকে ছায়া বিস্তার করবে,
এবং প্রত্যেক নির্দ্দেশে লাফিয়ে উঠবে।
এইটাই তোমার স্থান—কতবার আমি মধ্যরাত্রে এখানে এসেছি।
ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যায়—
যখন আমি এখানে থাকি তখন তা বুঝতে পারি না।
আমার যে আত্মা স্মৃতির ক্রন্দন শুনতে আগ্রহশীল,
তা অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে,
যখন প্রিয়তম বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলে
এবং জাগিয়ে দেয় আমার স্বপ্নকে।
এইটাই তোমার স্থান—এত আমার আত্মার মত,
তাই এর আছে দুঃখের অনুভূতি।
এ আগ্রহ সহকারে অতীতকে কামনা ক'রে
হাঁ, অতি প্রিয় বিগত কালকে।
আমার মনের কুলঙ্গি স্পন্দন করিকে চাচ্ছে—
যার ভালবাসা হ'চ্ছে অদ্ভুত স্বপ্ন—
কতবার তারা কবিতা দিয়ে—
তাদের আবহাওয়াকে মাতাল করে তুলেছে—
সেই কবিতা যা দুর্ব্বল করা অনুরাগ বিস্তার করছে।
এইটাই তোমার স্থান—তুমি কোথায় আছ,
কোথায় আছে তোমার অপচ্ছায়ার কুহক?
কারণ শূন্য আরাম-কেদারার আরামের হাতল
তোমায় কামনা করছে।
আমি যখন শান্তভাবে কাঁদি
তখন অতীব দুঃখে এই আরাম-কেদারা
আমাকে লক্ষ্য ক'রে দেখে
আর আমার অনুরাগ পাগলের মত বেপরোয়া হ'য়ে জ্বলে উঠে।
যে পাপ তোমার নির্দ্দয় হৃদয়কে উত্তেজিত করেছিল
আমি চোখের অশ্রুতে, দুঃখের দ্বারা, ক্রন্দন দ্বারা
তাকে মুছে দিয়েছি।
তুমি আমার যে সব অবমাননা দেখেছ
আমি করছি তার প্রায়শ্চিত্ত—
আর আমার চরম অহঙ্কারকে
পায়ের তলায় দলে দিয়েছি।
হৃদয় আমার আজ কাঁদছে, বেদনায় ছটফট করছে।
এবং বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞেস করছে—
কেন সে ফিরে আসে না?
প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কেহই
আমার প্রশ্নের উত্তর দেয় না—
"কেন সে ফিরে আসে না?"
কণ্ঠে আমার কবিতা, আর হাতে আমার বীণা—
আমি কবিতা লিখে যাচ্ছি—আর ভর্ৎসনা করছি ভাগ্যকে
আর সেই অবস্থাকে যা আমাদেরকে পৃথক করেছে—
আর ভর্ৎসনা করছি এই আমার অস্তিত্বকে।
কেন তুমি ফিরে আসনা—আমি এখানে একাকী।
আমার স্মৃতির তপোবনে সত্যই আমি একাকী।
কিন্তু অনুভব করছি তোমাকে
আমার রক্তে আর অনুভূতিতে।
আমি তোমার কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি—
আমার অন্তরের গভীরে
তোমার সুরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।
এবং আমি দেখছি তোমাকে আমার পাশে
আমার মধ্যে, এবং জীবনের চতুর্দ্দিকে
অনবরত দেখছি, আমি তোমাকে।

উপরে যে কবিতাটি উদ্ধৃত হ'ল তা রোমান্টিক উচ্ছ্বাসে পূর্ণ—তা অতি পরিচিত সুর বলে মনে হচ্ছে। ফাদোয়ার এই উচ্ছ্বাস, ইংরাজি সাহিত্যের অপর একজন মহিলা কবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—তিনি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং। তবে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, ফাদোয়া ইংলণ্ডের মহিলা কবিদের কবিতা খুবই কম পড়েছেন। তবে কেমন করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দুইজন কবির ভাবধারা একই প্রকারের হ'য়ে গেল? উত্তরে বলব যে, অনেক সময় পরস্পরকে না জেনেও দুজন কবি একই প্রকার ভাব ও আবেগ ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের কাব্যে। তাঁরা পৃথক পরিবেশের মধ্যেও একইভাবে অনুভব করেছেন। এই দুজন মহিলা কবির মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। প্রাচ্যদেশের কবিদের মধ্যে ফাদোয়া রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসেন। তিনি বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি তাঁর অন্তরে গভীর প্রতিধ্বনি তুলেছে। যদিও কবিতার প্রতি ফাদোয়ার প্রধান আকর্ষণ, তবুও তিনি আরও বহু বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন। মনস্তত্ত্ব, দর্শন ক্লাসিকাল উপন্যাস, ইতিহাস—এসব বিষয়ে তাঁর অগাধ পড়াশুনা আছে। শুধু কবি হিসাবেই নয়, একজন বিদুষী মহিলা হিসাবেও আরব জগতে তিনি বিশেষভাবে সমাদৃতা। প্যালেষ্টাইনের এক অংশে ইহুদী রাজ্য "ইজরাইল" প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সেখানকার আরবদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত নেই। প্রায় দশ লক্ষ আরব সন্তান ইহুদীদের অত্যাচারে আজ বাস্তুহারা হ'য়ে যাযাবর জাতির মত যত্র তত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরবদের এই দুর্দ্দশা ফাদোয়ার অন্তরকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে। তিনি নানা কবিতায় তাদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে মানুষের কাছে সুবিচার দাবী করেছেন। তাঁর এই ধরণের একটি কবিতার নাম "রোকেয়া" প্যালেস্টাইনের একটি বিধ্বস্ত আরব পরিবারের দুর্দ্দশার কাহিনী এই কবিতার বিষয়-বস্তু। ফাদোয়ার কবিতায় আছে বিষাদের করুণ সুর। তিনি কবি-জীবনে আনন্দজনক কিছুই পাননি। তিনি এমন দেশে জন্মেছেন যেখানে রক্ত অশ্রু আর দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নেই। সুতরাং তাঁর কবিতায় করুণ রাগিণী ছাড়া আর কি থাকতে পারে? কেউ কি অশ্রুভরা চোখ থেকে আনন্দ আশা করতে পারে? মৃত্যুর হাহা-ধ্বনির মধ্যে কি কখনও হাস্যরস উৎসারিত হ'তে পারে? তাই ফাদোয়ার কবিতায় দেখি অশ্রু ব্যথা ও বেদনার আর্ত্তনাদ। ইমোশনের দিক দিয়ে ফাদোয়া একেবারে খাঁটি কবি। প্যালেষ্টাইনের ইতিহাসটা সত্যই অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সেখানকার নিরীহ অসহায় আরবদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার অবিচার তিনি তাঁর নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন, সেখানকার বহু ভাগ্যাহত পরিবারের দুঃখের জীবনকে করুণ ভাষায় রূপ দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় আছে একটা এপিক গাম্ভীর্য্য ও বিষাদের করুণ সুর। প্যালেষ্টাইনের ঘটনাবলীকে নিয়ে তিনি বহু কবিতা রচনা করেছেন। তন্মধ্যে "রোকেয়া" বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সভ্য জগতের সম্মুখে পাশ্চাত্য জাতির উৎসাহে ও প্রশ্রয়ে প্যালেষ্টাইনের ভূমিতে যে সব নিদারুণ ঘটনা ঘটে গেল, "রোকেয়া" কবিতায় আছে তারই বাস্তব চিত্র। এই কবিতার কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ থেকে পাঠকবর্গ বুঝবেন, কি নিদারুণ ব্যথায় ব্যথিত হয়ে তিনি এটা রচনা করেছেন—

"আগুনের পাহাড়, অমরতার যমজ ভাই,
সেই আগুন আবির্ভূত হল তার আদিম অনন্ত আগ্রহ নিয়ে।
সেখানে একটি গুহায় ভাগ্য-তাড়িত হ'য়ে
বাস করত রোকেয়া।
তার সঙ্গে ছিল ডানা-ভাঙ্গা
একটা ছোট্ট শিশু মোরগ—
সে রোকেয়ার কম্পমান দুর্ব্বল বুকের উপর
মাথা রেখে আরামে বিশ্রাম করত।
রোকেয়া তার একটা হাত মোরগের মাথায় রাখত
আর অপর হাত দিয়ে তার ছোট্ট দেহকে
জড়িয়ে রাখত।
যদি সম্ভব হ'ত তবে রোকেয়া
ওকে রাখত তার বুকের ভিতর
এবং ওকে আবৃত করে রাখত তার অন্তর দিয়ে
আর নিজের স্নেহের উত্তাপ দিয়ে
ওকে অনবরত রক্ষা করত,
সেই সন্ধ্যার ভীষণ শীততাপ থেকে।
মোরগ-শিশুটাও তাকে আলিঙ্গন করল
আর তার তপ্ত নিঃশ্বাস-ধ্বনি
কান পেতে শুনতে লাগল।
সারারাত ধরে মোরগ শিশুর দুটি চোখ জ্বলছিল,
তার ঐ শান্ত বুকে,
ঠিক দুটি বিশ্রাম-রত তারার মত
ওর চোখ দুটি তার হৃদয়ের আঁধার গুহায় জ্বলছিল—
জ্বলছিল উজ্জ্বলভাবে
যেন তার অন্তর আগুনের মত দপদপ করতে লাগল।
মোরগ-শিশুটি অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো, "মা"!
আর ওর হাত একটু ঘুরে গেল—
যেন খেলাচ্ছলে ও তার স্কন্ধ ও বুক স্পর্শ করল
আর রোকেয়া শিশুটির উপর শক্তভাবে ঝুঁকে পড়ল—
একটুখানি লুকালো ওকে
তার সর্ব্বশেষ নিঃশ্বাস পাবার জন্য।"

তারপর ফাদোয়া সেই হতভাগিনী বিধবা নারীর প্রাণের গভীর অনুভূতির বর্ণনা দিলেন এই কবিতায়। তাঁর চিন্তাকে নিয়ে গেলেন সেই সব অতীতের স্মৃতির দিকে—যা মনকে সব সময় চঞ্চল করে তুলে। সে স্মৃতির রথে চড়ে অতীত যুগের এক রোমান্টিক পরিবেশের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যখন রোকেয়ার তরুণ শক্তিশালী স্বামী বেঁচেছিলেন, তখন সে পেয়েছিল তাঁর ভালবাসা। ফাদোয়া এই কবিতায় অনেক কিছুই বলেছেন—কেমন করে তার সেই শক্ত সুঠাম তরুণ স্বামী বন্দুক হাতে নিয়ে অত্যাচারী আক্রমণ-কারীর বিরুদ্ধে তার ঘরবাড়ী রক্ষা করবার জন্য বীর-বিক্রমে ঘর থেকে বের হ'য়ে গেল। সে আমত তেজে যুদ্ধ করল। কিন্তু অবশেষে শহীদের মৃত্যু বরণ করল। হায়, বৃথায় তার মৃত্যু হ'ল। এ জীবনে আর তার প্রতিশোধ লওয়া হ'ল না। দেশের স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষা করতে সে পারল না। ইহুদীদের হাতে বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নিহত হ'ল, বহু লোক হ'ল দণ্ডিত, বহু নারী হ'ল বিধবা ও অসহায়। তারপর ফাদোয়া উক্ত কবিতার শেষের দিকে বলেছেন :—

"কখন দেওয়া হ'বে এই সব অত্যাচারের প্রতিশোধ ?
হায় শহীদ মানুষ !
এত সব পবিত্র রক্ত কি বৃথাই পাত করা হ'ল ?
আজ খাপের ভিতর তলোয়ার ঢেকে রেখে দেওয়া হ'ল—
কিন্তু তাবান অধিকার পুন: প্রতিষ্ঠিত হ'ল না !"

—হায়, হতভাগিনী রোকেয়া এই সব কথা ভাবছে,—আর সেই সময় সেই মোরগ ছানাটি তার কোলে বসে তার চিবুক স্পর্শ করল। তখন রোকেয়া ওকে স্পর্শ করল, আলিঙ্গন করল, চঞ্চলভাবে—উত্তেজিতভাবে ওকে আলিঙ্গন করল।

"রোকেয়া ওর দিকে তাকাল—
তখন তার বক্ষ প্রবল আবেগেপূর্ণ—
তার বক্ষের ভিতরকার ঘৃণার আগুন দিয়ে
সে যেন মোরগছানাটিকে স্তন দিতে লাগল।
হাঁ, রোকেয়া তার শত্রুতার জলন্ত শিখা দিয়ে
মোরগ-ছানাকে যেন স্তন দিতে লাগল।
এবং তার হৃদয়াবেগের বিষ ঢেলে দিতে লাগল
একেবারে ছানাটির পেটের ভিতর।"

বস্তুত: প্যালেস্টাইনের গৃহ-বিতাড়িত আরবদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী ফাদোয়ার কবিতায় বাস্তব-মূর্ত্তি নিয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি এই ধরণের আরও বহু কবিতা লিখেছেন। তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে "আলওয়াতাকুল মবতু" অর্থাৎ শুষ্ক ঝর্ণা।

এর অধিকাংশ কবিতাই তাঁর ভাই এবং প্যালেষ্টাইনের শহীদদের নিয়ে লেখা। তাঁর দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থের নাম "আশওয়াকুল হায়াৎ" বা "জীবনের কামনা"—এই কাব্যগ্রন্থটি কতকগুলি সেনটিমেনটাল কবিতা সংগ্রহ। বর্তমানে আরব দেশের বিভিন্ন দৈনিক ও মাসিক পত্রিকাতে তাঁর বহু কবিতা প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। তিনি এখন মিসরে বসবাস করছেন।

ভারত-সঙ্গীত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি,
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী,
বিবিধ মানবজাতিরে লয়ে।

মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।—

হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।

মধ্যস্থলে হেথা, আজন্মপূজিতা
চির বীর্য্যবতী, বীর প্রসবিতা,
অনন্তযৌবনা যুনানীমণ্ডলী,
মহিমা ছটাতে জগৎ উজলি,
সাগর ছেঁচিয়া মরু গিরি দলি,
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়।

আরবা মিসর, পারস্য তুরকী,
তাতার, তিব্বত—অন্য কব কি ?
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে, করে হেয়জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

বাজ রে শিঙ্গা, বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন, এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী
গাহিতে লাগিল জনেক যুবা।

আয়ত লোচন, উন্নত ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী
নয়ন-জ্যোতিতে হানিল বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারতভূমি যবনের দাস,
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা!

আর্য্যাবর্ত্ত-জয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা!

ধিক্ হিন্দুকুলে! বীরধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু করতলে,
সোনার ভারত করিতে ছার! ...

উড়িষ্যার লোকশিল্প

আশীষ বসু

পৃথিবীর সব দেশেই লোকশিল্পগুলির বিকাশ ঘটেছে মোটামুটি একইভাবে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে তার ভগবানদত্ত দু'খানি হাতই তার প্রথম হাতিয়ার। সেই হাত দিয়েই সে মাটি খুঁড়েছে, জমি চাষ করে ফসল ফলিয়েছে, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচেছে, ঘর বানিয়েছে, নিজেকে রক্ষা করেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে, মুক্ত করেছে ভয়াবহ জানোয়ারের কবল থেকে।
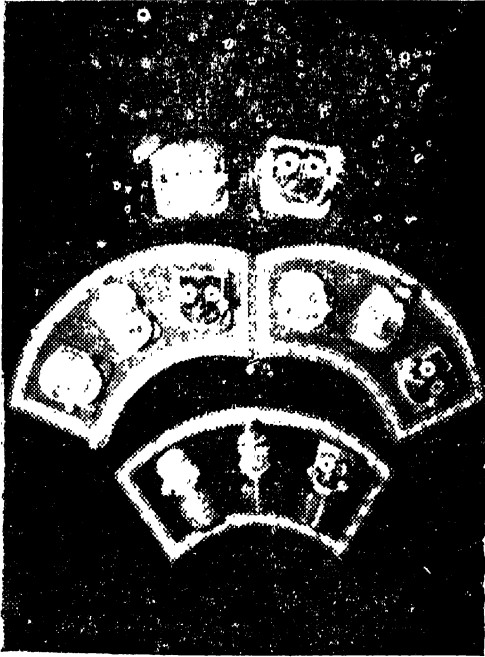
উড়িষ্যার লোকশিল্পের অন্যতম বিশেষত্ব তার নানারকমের মুখোস

যতদূর জানা যায়, পাথরের সঙ্গে পাথর ঘষে সেই পাথরের ফলাকে তীক্ষ্ণ করেই মানুষ বানিয়েছে তার সবচেয়ে পুরোনো অস্ত্রগুলো, যা আজকের যে কোনও যাদুঘরে গেলেই আমাদের চোখে পড়বে।

ইতিহাস বলছে, মানুষের মধ্যে শিল্পের প্রেরণা এসেছে প্রয়োজন থেকে। প্রয়োজনের তাগিদই মানুষকে শিল্পমুখী করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে লোকশিল্পের কথা। শিল্পী আপন খেয়ালে পাথরের বাটি তৈরী করতে গিয়ে তার গায়ে এঁকেছে লতাপাতা, সামাজিক কোনও আচার-অনুষ্ঠানের ছবি, কি সমাজের কোনও অবস্থার প্রতিকৃতি। এমনভাবেই পৃথিবীর আদিমতম শিল্পপ্রেরণাগুলি রূপ নিয়েছে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, পৃথিবীর আর আর সব দেশের মতো ভারতবর্ষেও বড় বড় প্রাচীন সহরগুলি ঘিরেই নানা শিল্পপদ্ধতির বিকাশ হয়েছে, যেমন জয়পুর-আগ্রা-ফতেপুর সিক্রি, হায়দ্রাবাদ-মহীশূর, বেনারস-লক্ষ্ণৌ-মোরাদাবাদ-খুর্জা, ঢাকা-গৌড়-মুর্শিদাবাদ-পাটনা ইত্যাদি। আজকে আমরা যে হস্তশিল্পগুলি নিয়ে আবার নতুন করে চিন্তা করতে বসেছি, তার শিল্পচেতনার গোড়ায় মোটামুটি দু'টি ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ধারাটি হল উপজাতি শিল্প-চেতনা, আর অন্যটি শ্রেণীজাত শিল্প-নৈপুণ্য বা গোষ্ঠী-শিল্পচেতনা। পশ্চিমবাংলায় এই দুইপ্রকার শিল্পকাজেরই নিদর্শন পাওয়া যায়। বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম প্রভৃতি অঞ্চলেও মোটামুটি সেই একই অবস্থা। বিষয়টি বোধ হয় আরও একটু সহজ করে বলা প্রয়োজন। উপজাতি শিল্পচেতনা মোটামুটিভাবে শিল্পীর নিজের চিন্তাধারা থেকে আহরিত আর গোষ্ঠী-শিল্পচেতনা প্রায়ই তার উপজীবিকা-সর্বস্ব অর্থাৎ শিল্পীর স্থান সেখানে পরে, জীবিকা আহরণের তাগিদ আগে। যেমন কলকাতার কুমোরটুলির পটুয়া, কি মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের কারিগর ভাস্কর উপাধিধারী শিল্পিগণ। তাদের শিল্পনৈপুণ্য অসামান্য, কিন্তু আসলে এই শিল্পই তার উপজীবিকা, অর্থাৎ সমাজ তাকে এই শিল্পের মাধ্যমেই জীবিকা সংস্থানের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু ধরুন, বাঁকুড়ার ডোকরা কামারদের কি পাঁচমুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া বানায় যারা তাদের শিল্পপদ্ধতি একেবারেই অন্যরূপ। ডিজাইন-ফর্ম ইত্যাদির সঙ্গে অন্যদের আকাশ-পাতাল তফাৎ। বাঁশের কাজকেই যদি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন জ্যামিতিক শিল্পপদ্ধতির নমুনা হিসাবে মেনে নেওয়া যায় তো বীরভূমের লোকপুরের চাল-মাপবার কুনকের গায়ের কাজে যে সেই জ্যামিতিক শিল্পপদ্ধতিরই আভাস রয়েছে, একথা কে না স্বীকার করবেন? অবশ্য অনেকের মতে এই কাজগুলির মধ্যে মিশরের শিল্পকলার ছাপ পরিস্ফুট। অসম্ভব নয়, তবে তা একান্তই বাইরের ফর্মে বা ডিজাইনে।

উড়িষ্যার কথাই বলি। আগেই বলেছি, ভারতবর্ষের প্রাচীন সহরগুলি ঘিরেই আমাদের এই জাতীয় শিল্পকর্মগুলির বিকাশ লাভ ঘটেছে। উড়িষ্যার ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। লোকশিল্পের সবচেয়ে বড় আর ভালো নিদর্শনগুলি ছড়িয়ে আছে উড়িষ্যার

কটকের জাইথাড়ি নামে একরকম কাঠির তৈরী নানারকম ঝাঁপি

নানাভাগে, কিন্তু পুরীতেই যেন তার সবচেয়ে বেশী ভীড়। তার কারণ দ্বৈত। এক—ধর্মস্থান হিসাবে তার খ্যাতি, দুই—বাণিজ্যস্থান হিসাবে তার পরিচয়, সর্বোপরি পুরীর মহারাজ-পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা, ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর আর আর সব জায়গাতেও রাজা বা জমিদারবর্গ বেশীর ভাগ সময়েই শিল্পকলা, সঙ্গীত ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন এবং তার ফলে সেই সব স্থানে শিল্পের সমূহ উন্নতি সম্ভব হয়েছে। বাঙলায় যেমন রাজনগর, বিষ্ণুপুর, বহরমপুর, ঢাকা, উড়িষ্যার তেমনি কটক, ময়ূরভঞ্জ, পুরী, পারলেখামুণ্ডী, ভঞ্জনগর ইত্যাদি। পুরীতেই কিন্তু সবচেয়ে বেশী শিল্প-কাজের দেখা পাওয়া যাবে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির থেকে বেরোলেই সামনে পাওয়া যাবে চওড়া রাস্তা আর তার দুপাশে শতাধিক দোকান বসে গেছে হাজারো রকমের সওদা নিয়ে। পেতলের নানা আকারের ছোট ছোট নটরাজ, নাড়ুগোপাল, অন্যান্য দেবীমূর্তি ও কাগজ-মণ্ডের মুখোস, খেলনার জানোয়ার, কাপড়ের ওপরে আঁকা পটচিত্র, নক্সা তাস, নরম পাথরের তৈরী নানা মূর্তি, বেলে পাথরের কাজ, বাঁশ-কাঁটা ঘাস কি জ্যাটথাডীর তৈরী ব্যাগ, সামুদ্রিক ঝিনুকের বাহারে কাজ, মোষের শিংয়ের তৈরী ঘর সাজানোর জন্য বক, মাছ কি অন্যান্য পশুপক্ষীর মূর্তি, মাথা নাড়ানো পেতলের মাছ, সংসারের আবশ্যকীয় বাসন-কোসন, সম্বলপুরের ছাপা কাপড় আর ব্লাউজের ছিট, রেশম-বস্ত্র, সূতির চাদর থেকে ধুতি-শাড়ী ইত্যাদি সব।

কটক উড়িষ্যার সবচেয়ে বড় সহর। এখানে হাইকোর্ট, সরকারী নানা অফিস, তবু ভুবনেশ্বরই রাজধানী, ছবির মতো করে সাজানো নতুন নতুন আধুনিক ডিজাইনের বাড়ীর সমারোহ। কটকের রয়েছে রূপোর নক্সা কাজ। সারা ভারতবর্ষে এর খ্যাতি। উড়িষ্যার ফিলিগিরি বা রূপোর তারের কাজের বাহার সর্বজনবিদিত। কানের রিঙ, হাতের বালা, গলার হার, নেকলেস থেকে কাগজ কাটা ছুরি অবধি রূপোর নক্সা তারের কাজ সবেতেই সম্ভব। ফিলিগিরির তৈরী টেবিল ল্যাম্প হাজার টাকা দামেও বিক্রি হতে পারে। কটকের মোষের শিংয়ের কাজও খুব বিখ্যাত।

মোষের শিংয়ের আর কাজ হয় গঞ্জামের পারলেখামুণ্ডীতে। পারলেখামুণ্ডী চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা গঞ্জামের ছোট একটি সহর। বেহারামপুর থেকে প্রায় সত্তর ও সমুদ্র তীরবর্তী গোপালপুর থেকে প্রায় আশী মাইল দূরে। শুধু পারলেখামুণ্ডী নয়, গঞ্জামের অন্যান্য অনেক স্থানও শিল্পকাজের জন্য বিখ্যাত, যেমন ভঞ্জনগর, বেলোগুন্থা। ভঞ্জনগরের কাঁসা-পেতলের কাজ আর বেলোগুন্থার মাথা-নাড়ানো পেতলের মাছ শিল্পকাজের জন্য খুবই বিখ্যাত।

উড়িষ্যার সম্বলপুরের টাই এ্যাণ্ড ডাই বা বাঁধনী রঙের কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য বালেশ্বরের নিকটের বলগড়িয়ার পাথরের কাজ, গড়মধুপুর, কুজং প্রভৃতির গোল্ডেন গ্রাস বা সোনালী রঙে কাঁটা ঘাসের চাটাই, টেবল রানার ইত্যাদি।

প্রদেশটিতে কেন জানি না বড় শিল্পের বিস্তার একেবারে হয় নি বললেই হয়। অথচ প্রদেশটিতে মজুরী অতি সস্তা, সমুদ্রতীরবর্তী

গঞ্জামের পেতলের মাথানাড়ানো মাছ
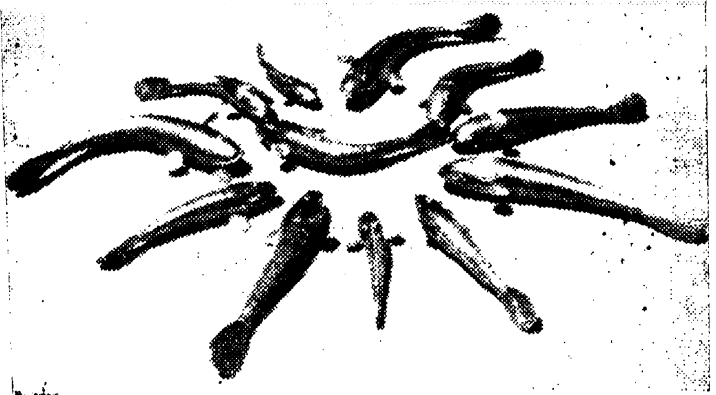
হওয়াতে এর অনেকগুলি বন্দরের সঙ্গে সোজাসুজি সংযোগ সাধন হতে পারেতো, কিন্তু কয়লাও পাওয়া যায় তালচেরে। আর বড় শিল্পের বিকাশ হয়নি বলেই বোধ হয় উড়িষ্যার জনসাধারণ আজও বেশীর ভাগই কাঁসার থালায় ভাত খায়, তাঁতের কাপড় পরে, মাদুরের চাটাইতে শোয়। অর্থাৎ দেশের হস্তশিল্পগুলির এখনও চাহিদা আছে সেখানে।

পুরীর জুতো—হরিণের, শম্বরের ময়াল সাপ ইত্যাদির

রবীন্দ্রনাথের জাতীয় শিল্প-চিন্তা

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয় সংগঠনে তাঁর কবিমানসের অনুভূতি সম্পর্কে আলোচনা করলে আমরা দেখি যে, কবি স্বদেশী-সমাজ-চিন্তায় জাতীয় শিল্পের উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যে মানবতার সার্বভৌমিক আদর্শবাদ নানাভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। কবির কল্পলোকে আমরা আবার দেখি—তিনি নিজের দেশ, সমাজ, জাতি এবং জাতীয় অর্থনীতি ও স্বাদেশিক শিল্প বিষয়ের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের উপর চিন্তার আলোকপাত করেছেন। এখানে কবিকে আমরা দেশনায়কের ভূমিকায় দেখতে পাই, মন আনন্দে উদ্বেলিত হয় যখন কবি দেশের অতিবাস্তব প্রয়োজনে মানুষের অত কাছাকাছি এসেছেন। কবি স্বদেশের পূর্ণাঙ্গরূপটি তাই তুলে ধরে বললেন—

"দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃণ্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয়, তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা, সুফলা মলয়জ-শীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব, ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে; প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা' নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হ'ল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্য কথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরী নয়। দেশ মানুষে তৈরী।"

দেশের ভৌগোলিক রূপের অন্তরালে দেশের একটা আত্মিক রূপ আছে—এ আত্মিক রূপটি হলো জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। কবিগুরু দেশের সে আত্মিক রূপটিকেই তাঁর 'স্বদেশী-চিন্তা'য় আবিষ্কার করেছেন। কবির স্বদেশী-চিন্তা কোন বিশেষ রাজনৈতিক চিন্তার আবেগ নয়। কবি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে যেমন প্রাধান্য দান করলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্প ও সমাজ-সংগঠনের উপরও গুরুত্ব দিলেন। কবি তাই ইউরোপীয় আদর্শে স্বাদেশিকতা ও মানবতার আদর্শবাদ ভারতের পথ নয় ঘোষণা করে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধে বললেন—

"আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনৈতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁচে 'নেশন' গড়িয়া তোলাই আমাদের সভ্যতার একটি প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব। কারণ 'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর করিতে শিখিয়াছি; অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই।"

মানুষের আত্মবিকাশের পথে স্বদেশানুভূতি ও মানবতাবোধের ব্যাপ্তিতেই সামাজিকতা ও স্বাদেশিকতা বিকাশ লাভ করে। কবির জীবনচরিতে আমরা দেখতে পাই, কবির স্বদেশী চিন্তার মূলে কেবল ঐতিহ্যগত ও সংস্কৃতিগত চিন্তাচেতনা প্রভাব বিস্তার করেনি, কবি জাতীয় শিল্প সংগঠন এবং পল্লীগ্রামে সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির পথে জাতীয় সমৃদ্ধি লাভে দেশবাসীকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছেন। কবি তাই দেশবাসীকে আহ্বান করে বলেন—

'নিজ হস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে, তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও তাতে নিজ হাতে, লজ্জা যন ঘুচে।'

দেশের শিল্পের প্রতি কবির অনুরাগের পরিচয় আমরা পাই 'শ্রীনিকেতন'কে ভিত্তি করে পল্লী-সংগঠন আন্দোলনে। কবির এ আন্দোলন স্বদেশ-নিষ্ঠার পরিচয়ের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। কবি এখানে জাতীয় শিল্প জাগরণের প্রেরণা সঞ্চার করেন। দেশ ও জাতি শিল্পের সংগঠনের পথে যাতে আত্মবিকাশ করতে পারে, সেজন্য তিনি শিল্প-উন্নয়ন ও শিল্প-বিস্তারের কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্ররূপে শ্রীনিকেতনকে গঠন করলেন। শ্রীনিকেতন এদিক থেকে জাতীয় শিল্প-আন্দোলনের ইতিহাসের পথিপ্রদর্শক বলা চলে। কবির জীবনব্যাপী সাধনায় 'স্বদেশী সমাজে'র একটি সুন্দর রূপ আমরা এখানে দেখি—কবি এখানে গ্রামজীবনে তথা জাতীয় সংগঠন ব্রতে নতুন চিন্তার প্রবর্তক। কবি সব সময় দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গলের কথা ভেবেছেন, পরনির্ভরতার ফলে জাতীয়জীবনে যে মানসিক পরাধীনতা, তা থেকে মানুষকে আত্মরক্ষা করতে সর্বদা আহ্বান জানিয়েছেন। কবির আদর্শবাদ স্বাদেশিকতায়। কবি তাই বলেন—

"বহুদিন ধরে আমাদের পলিটিকাল নেতারা ইংরাজিপড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান নি; কেন না, তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজী ইতিহাস-পড়া একটা পুঁথিগত দেশ। সে দেশ ইংরেজী ভাষার বাষ্পরচিত একটি মরীচিকা; তাতে বার্ক, গ্লাডস্টোন, ম্যাটসীনি, গ্যারিবাল্ডির অস্পষ্ট মূর্তি ভেসে বেড়াত। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায়নি।"

দেশের মানুষের প্রতি 'পলিটিক্যাল' দরদ ইউরোপীয় শিক্ষার পরিণাম। দেশের মানুষকে কতভাবে এ পলিটিক্যাল-দরদ প্রতারণা

করেছে, কবি তার সন্ধান রাখতেন। কবি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন—

—"সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব, নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব। সে দিন যখন আসিবে, তখন পৃথিবীর যে সভায় ইচ্ছা প্রবেশ করিব—ছদ্মবেশ, ছদ্মনাম, ছদ্ম ব্যবহার এবং যাচিয়া মান, কাঁদিয়া সোহাগের কোন প্রয়োজন থাকিবে না।··· আজ আমরা মনে করিতেছি ইংরেজের নিকট কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। ভিক্ষাস্বরূপে সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব, তখন দেখিব অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না—বরং যতদিন না পাইতেছি, ততদিন যে সান্ত্বনাটুকু ছিল, সে সান্ত্বনাও আর থাকিবে না। ইংরেজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই—আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাই গৌরব। অন্যের নিকট ফাঁকি দিয়া আদায় করিয়া কিছু পাওয়া যায় না। প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত ত্যাগ-স্বীকারেই প্রকৃত কার্য্যসিদ্ধ। স্বাধীনতা সম্ভোগের পূর্ব্বে বাহুবলে উহা আমাদের অর্জ্জন করিতে হইবে; ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।"

রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিড়ম্বনা জাতির মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ উদ্বোধন করতে পারে না—যদি রাজনীতি জাতীয় ঐতিহ্য, আদর্শ ও সংস্কৃতি-ভিত্তিক না হয়ে কেবল অনুকরণাত্মক হয় পড়ে। কবি জাতীয় অধিকার ও স্বাধীনতা সাধনায় এমন একটি আদর্শবাদ তুলে ধরলেন—যার প্রকৃত রূপটি হলো আত্মমর্য্যাদায় জাতীয় আত্মার উদ্বোধন, স্বদেশ-চৈতন্যে জাতির আত্মবিকাশ। কবির জীবনে এ স্বদেশ-চৈতন্য আদর্শবাদেই বিকাশলাভ করে। কবি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখছেন—

"আমাদের পরিবারের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল; তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।"

"স্বদেশাভিমান" শব্দটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। কবিজীবনের প্রত্যেক পর্ব্বে এ 'স্বদেশাভিমান' কবিকে ইউরোপীয় পলিটিক্যাল প্রভাবের ফলে দেশে যে বিজাতীয় ভাবধারা বিস্তার করছিল তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শক্তি জোগায়েছে। বিজাতীয় বঞ্চনার ফলে দেশের জনমানসে জাতীয়তার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা যে অকল্যাণের আবির্ভাব, তা থেকে আত্মরক্ষা করে নবজীবন চিন্তায় প্রেরণা জেগায়েছেন কবি। কবি তাই বলেন—

"নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না—অতএব বরঞ্চ অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো, তথাপি মূঢ়ভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছুই নহে।"

পল্লীসমাজের স্বদেশী-স্বরাজের অনুভূতি কবির এ স্বাদেশিকতা-বোধ থেকেই জেগে উঠে। কবি এখানে কেবল ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামাজিকতা নয়—শান্তিপূর্ণ গ্রাম্য-জীবন নয়, মানুষের সার্ব্বজনীন কল্যাণ নয়—কবি পল্লীসমাজে চাইলেন—"স্বদেশ-শিল্পজাত দ্রব প্রবল এবং তাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প উন্নতির চেষ্টা।"

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-চিন্তার পটভূমিকায় স্বদেশী-শিল্পের উন্নতির কথা কবির ভাবাতেই উপস্থাপিত করলাম। ভারতের জাতীয় পুনরুত্থানের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের এ স্বদেশী-চিন্তা তাঁকে জাতীয় জীবনে পুরোধার স্থানে বৃত করেছে, এখানে তিনি ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথিকৃৎ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যেমন নবযুগের প্রবর্ত্তক—স্বদেশী ও স্বদেশী শিল্পের উন্নতির আন্দোলনের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথকে আমরা অগ্রদূত বলে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে কৃতার্থ বোধ করি। কবি পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলির পেছনে কোনদিন থাকতে চান নি—তাঁর জীবনের একটা বিশেষ দিক ছিল স্বাদেশিকতার আত্মবোধে চিরদীপ্ত এবং তেজোময় শক্তিমন্ত্র প্রচার—জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনে এবং জাতীয় উন্নতিতে। কবি তাই ডাকিয়েছেন—

'আগে চল্, আগে চল্ ভাই।
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল ভাই।'

রাত্রি শেষের গান

(Alice Meynell's—Song of the night at daybreak)

তারা সব চলে মোরে ছাড়ি'
প্রভাতী পবনে কাঁপি আমি
আশ্রয় ল'ব কাহার দুয়ারে?

শৈলচূড়া বা পাইন শাখে
কিংবা অন্ধ মানব চোখে
আশ্রয় ল'ব কিনা ভাবি।

দিন শেষে রবি ডুবিবার তরে
নিজেরে আঁধারে গোপন ক'রে
লুটিতে হবে মোরে কোথায়?

নয়তো কাহার ললাটে
স্মৃতি তার তারাকান্তে
তার 'পরে অবনত রাখি।

অনুবাদ—রথীন্দ্রমোহন সান্যাল

কুস্তিগীর শিল্পী

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যায়ামে, কুস্তিতে, লেখাপড়ায়—এমন কি, সঙ্গীতেও বাগবাজারের গুহ-পরিবারের দান অতুলনীয়। বিশ্ব-বিখ্যাত কুস্তিগীর গোবরবাবু জন্মগ্রহণ না করলেও, বাংলার ব্যায়াম-চর্চা ও কুস্তির ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকতো গুহ-পরিবারের বিস্ময়কর অবদান। ঊনবিংশ শতকের পূর্বার্ধে ও উত্তরার্ধে গোবরবাবু ছাড়া এ বংশে আরো যে কয়জন কৃতী ও বলী দেখা দিয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন অম্বিকাচরণ, ক্ষেত্রচরণ, রামচরণ, রতন, মানিক ও জহর। বাংলাদেশের যে কোন পরিবার এতগুলি শক্তিধরকে লাভ করতে পারলে চিরস্মরণীয় হ'তে পারতো।

তিনি ছিলেন জগদ্বিখ্যাত কুস্তিগীর অথচ সাহিত্যরস ও সুরের রস নিয়েও কারবার করতেন অবসর কালে। কিন্তু প্রথম প্রথম যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েও তিনি ভেতো বাঙালী বলে আখড়ার দরজা খোলা পাননি। কোন বিখ্যাত কুস্তিগীর ও পাঞ্জাবী পালোয়ানী মহল তাঁকে কল্‌কে দিতে রাজি হয়নি। অবশেষে তাঁর কপাল ফিরলো। ১৯১২ সালে সাগরপাড়ি দিয়ে ইংল্যাণ্ডের গ্লাস্‌গো শহরে ৩০শে আগষ্ট ওলন্দাজ মল্লবীর জিমি ক্যাম্বেল্‌-কে হারিয়ে লাভ করেন 'স্কটিস্‌-চ্যাম্পিয়ানশিপ' (Scottish Championship)। এডিনবরা শহরের 'অলিম্পিয়া ষ্টেডিয়ামে' ৩রা সেপ্টেম্বর তৎকালীন অপরাজেয় মল্ল জিমি এসেন-কে হারিয়ে 'যুক্ত-রাজ্য-প্রাধান্য' (Chmpion of the United Kingdom) আখ্যা লাভ করেন। সেখান থেকে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে গিয়ে পরাস্ত করেন দিগ্বিজয়ী জার্মাণ মল্ল কার্ল সাফ্‌ট (Karl Saft)-কে। বিদেশ থেকে বিজয়-গৌরবে বিভূষিত হয়ে ১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশের ছেলে ফিরে আসেন দেশের মাটিতে। কিন্তু তবুও ভারত-বিখ্যাত কুস্তিগীররূপে গোবরবাবু পাঞ্জাবী-মহলে জাতে উঠতে পারলেন না, ভেতো-বাঙালীর দুর্নাম-ও বেশীদিন টিক্‌লো না।

প্রায় বছর পাঁচেক পর আবার এক সুযোগ উপস্থিত হয়। ১৯২০ সালে অক্টোবর মাসে কাগজে খবর পাওয়া গেল, আবার তিনি যাত্রা করেছেন সাগরপারের দেশে। তবে, এবার ইউরোপে নয়, গেলেন আটলান্টিকের পরপারে আমেরিকা মহাদেশে। সেখানে হারালেন বোহেমিয়ার 'অজেয়-মল্ল জোসেফ স্মালজ-কে, আর হারালেন হল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্ল টমি ড্রাক্‌-কে।

এই টমি ড্রাকের পতনই হোলো গোবরবাবুর পক্ষে বিশ্ব-প্রাধান্য-প্রতিযোগিতায় প্রবেশ-পত্রের মত। ১৯২১ সালের ২৪শে আগষ্ট সান্‌ফ্রান্সিস্কোর কলোসিয়ামে পরাস্ত করলেন জগদ্বিখ্যাত জার্মান মল্ল ও বলী অ্যাড-সাণ্টেল কে, লাভ করলেন 'বিশ্বের লাইট-হেভী-ওজন-মল্ল-প্রাধান্য' (Light Heavy-Weight Wrestling Chamiplonship of the World)। এ ভাবে দীর্ঘ দু'বছর আমেরিকায় ভেতো বাঙালীর শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে গোবরবাবু ১৯২৬ সালের শেষভাগে স্বদেশে ফিরে এলেন যশের মুকুট পরে।

ছেলেবেলা থেকেই আখড়ার মাটি আর ব্যায়ামের মুগুরের সাথে যাঁর সম্পর্ক, তিনি যে সাহিত্যের আর 'বীণা'-র অনুরাগী হবেন, এতো আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। যতদূর জানা গেছে, ভারতীয় কুস্তিগীরদের মধ্যে একমাত্র গোবরবাবুই উচ্চশিক্ষালাভ করেছেন। ডন্‌-কুস্তি করে করে আর মাটি গায়ে মেখে লাভ করেছিলেন ইস্পাতের মতন অনমনীয় শক্তি, হয়েছিলেন পুরোপুরি পালোয়ান, কিন্তু সেই শক্তির পেছনেও তাঁর লুকানো ছিল আর একটি কোমল মন—সে হলো সুরেলা-মন। মাটির টানে তিনি যেমন ভুলে যেতেন নিজেকে, বীণার সুরেও মুগ্ধ হ'তেন তেমনি। তাঁর নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনতেন বড় বড় ওস্তাদ শিল্পীদের। আসতেন বিখ্যাত গায়ক জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেব, অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, তবলচি দর্শন শিং আর আসতেন বিখ্যাত বীণকার করমতুল্লা খাঁ সাহেব। প্রায় প্রতি রাতেই বসতো গানের আসর—চলতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে খেয়াল, ঠুংরি টপ্পা, গজল আর ভজন—আর মধ্যরাতে চলতো করমতুল্লা খাঁ-র সরোদ। সুর-তরঙ্গের মাঝে ফুলের মতো ভেসে উঠতো নবরসের সব রস। সুরের মোহিনী মায়ায় ডুবে যেতেন বিশ্বজয়ী কুস্তিগীর।

নিজে যেমন শিল্পী, শিল্পীর কদরও তিনি বুঝতেন। জহুরীই জহর চেনে। বিখ্যাত সাহিত্যিক না হয়েও সাহিত্য-সাধনাতেও তিনি অন্য অনেক পালোয়ানের অনেক ঊর্দ্ধে। বড় বড় সাহিত্যিকদের সাদরে আহ্বান জানাতেন নিজের বাড়ীতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাতেন তাঁদের সাথে সাহিত্য আলোচনা করে। আসতেন বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, ধীরেন বসু, অজয় বসু প্রভৃতি।

ভারতবিখ্যাত বীণকার করমতুল্লা খাঁর কাছে বহু বছর তিনি নিয়মিতভাবে সেতার শিখে বাজাতে পারতেন। গোবরবাবুর বৈঠকখানায় জমীরুদ্দীন খাঁ, দর্শন সিং, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও করমতুল্লা খাঁ-কে নিয়ে গান-বাজনার যে বৈঠক বসতো, তার বৈঠকধারীও ছিলেন গোবরবাবু নিজে। অবসর সময়ে তাস খেলা ও পাখী

শিকারেও কম উৎসাহী ছিলেন না। শুনেছি, 'ব্রীজ' খেলাতেও তিনি বিশেষভাবে পটু ছিলেন।

বিশ্ববিখ্যাত কুস্তিগীর গোবরবাবুর কাছে যাঁরা শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বনমালী ঘোষ, দাশরথি ঘোষ, কৃষ্ণলাল চাটার্জী ও মানিকলাল গুহ-ই বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মানিকলাল গোবরবাবুর মেজো ছেলে। ১৯৫২ সালে তিনি হেলসিঙ্কিতে বিশ্ব-অলিম্পিক কুস্তি ফেডারেশনের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর আগে আর কোন ভারতীয় এই সম্মান লাভ করতে পারেননি।

গোবরবাবুর সমসাময়িক বাঙালী কুস্তিগীরদের মধ্যে একমাত্র ভীম ভবানীর নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অসাধারণ মল্ল হয়েও ভীমভবানী বেশী ঝোঁক দিয়েছিলেন ব্যায়াম-চর্চায় আর সার্কাসের শক্তির খেলায়। তাঁর খ্যাতির ভিত্তিও ঐ দুই বিভাগেই। বিখ্যাত 'কুস্তিগীর'-রূপে তাঁকে চেনে কম লোকই।

অনেকদিন আগেকার কথা। ভীমভবানী তখনো সার্কাস দলে যোগ দেননি। আর গোবরবাবুও 'বিশ্ব-প্রাধান্য' তখনো লাভ করেননি। সে সময় গোবরবাবু ভীমভবানী প্রভৃতি আরো কয়েকজন কুস্তিগীর ও ব্যায়ামী-কে নিয়ে একটি 'টাগ-অব-ওয়ার' দলও গঠন করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম ছিল প্রতিযোগিতার মূল কেন্দ্র। এ ছাড়া অন্যত্রও মাঝে মাঝে স্পোর্টস্-এর অঙ্গ হিসাবে এই খেলাটি খেলা হোতো। গোবরবাবুর এই দল পর পর পাঁচ বছর অপরাজেয় আখ্যা নিয়ে এ্যাথলেটিক্স্-চর্চার আদিপর্বে বাংলাদেশে এক বিশিষ্ট আসন দখল করেছিল। পরে নানা কারণে দলটি ভেঙে যায়। ভীমভবানী চলে যান সার্কাস দলে আর গোবরবাবু চলে যান সাগরপারের দেশে অক্সফোর্ডে উচ্চ-শিক্ষা ও ইউরোপীয়-কুস্তি শিক্ষা লাভের জন্যে। ১৯১৫ সালে অক্সফোর্ড থেকে বি-এ ডিগ্রী লাভ করে আর দেশী-বিদেশী কুস্তির একজন বড় বিশেষজ্ঞ হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

গোবরবাবুর পিতা স্বর্গীয় রামচরণ গুহ, জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় ক্ষেত্রচরণ গুহ (ক্ষেতুবাবু) আর পিতামহ স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ গুহ (অম্বুবাবু)—এই তিন পুরুষ সেকালের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কুস্তিগীর ছিলেন। অম্বুবাবু ও ক্ষেতুবাবুর খ্যাতি ভারতের শেষপ্রান্তে পাঞ্জাবেও ছড়িয়ে ছিল। ভারত-বিখ্যাত পাঞ্জাবী পালোয়ানেরাও তাঁদের কাছে সসম্ভ্রমে মাথা নত করত। এমন কি, কলকাতায় এলেই 'ক্ষেতুবাবুর আখড়া'-য় এসে মাঝে মাঝে নতুন নতুন প্যাঁচ-ও শিখে যেতো। ক্ষেতুবাবুর আখড়াই ছিল সে-সময় বাংলা দেশের মধ্যে সর্বপ্রধান।

কুস্তি ও মল্ল-সংগীতের প্রতি গোবরবাবু যে অনুরক্ত হয়েছেন, সে অনুরাগও উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার কাছ থেকেই পেয়েছেন। গোবরবাবুর পিতৃব্য ক্ষেতুবাবুও একজন নামকরা গুণী ব্যক্তি ছিলেন। কুস্তি ছাড়াও ক্ষেতুবাবুর বক্সিং লড়াই, লাঠি খেলার ও গানবাজনার সখ ছিল। জয়পুরের এক লাঠিয়ালকে তিনি ওস্তাদরূপে বরণ করে লাঠিখেলায় হাত পাকিয়েছিলেন। বক্সিং শিখেছিলেন ফোর্ট উইলিয়মের গোরাদের কাছে, আর নাড়া বেঁধেছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গীয় রামকথাকর কাছে। তাছাড়া রজনী ভট্টাচার্য্য ও বারাণসী-নিবাসী বিখ্যাত ধ্রুপদী অঘোর চক্রবর্তীর কাছেও কিছুদিন তিনি তালিম নিয়েছেন। ক্ষেতুবাবুর বাবা অম্বুবাবুরও কুস্তি ছাড়া একটি সখ ছিল—তা হলো সংগীত-চর্চা। তখনকার দিনের আরও অনেক বড়লোকের মতই গুহপরিবারেও গান-বাজনার রেওয়াজ ছিল। অম্বুবাবু নিজে সেতার শিখতেন ভারত-বিখ্যাত খেয়ালী মহম্মদ খাঁ-র কাছে। সেকালের বিখ্যাত ওস্তাদ বেণী তৈরী হয়েছিলেন এই মহম্মদ খাঁ-র কাছেই। বাংলা থিয়েটারে মার্গ-সংগীতের ঢঙ যাঁরা চালু করে গিয়েছেন, বেণী ওস্তাদ তাঁদের-ই একজন। তবে সংগীত-চর্চার বাতিক থাকলেও কুস্তি করার অভ্যাসটাই গুহ-পরিবারকে উগ্র নেশার মতই পেয়ে বসেছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গুহ-পরিবারের প্রায় তিন-পুরুষ কুস্তি কুস্তি করেই কাটিয়েছেন।

বাংলাদেশের মল্ল-ক্রীড়ার ইতিহাসে গুহদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। গুহদের কুস্তির আখড়া আজ থেকে একশো বছরেরও আগে ১৮৫৭ সালে কলকাতার মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অনেক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, গুহদের এখন আর সেদিন নেই, কিন্তু গুহ-পরিবারের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস আজও স্তিমিত হয়নি। এই একশো বছর ধরে গুহরা যেমন মল্ল-চর্চা করেছেন, তেমনি সংগীত-চর্চাও করে আসছেন। আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে গোবরবাবুর পিতামহ অম্বুবাবু সেতার-এর যে-সুর তুলেছিলেন, সে-সুর আজো সেখানে শোনা যায়।

ভাগ্যচক্রে আখড়ার আয়তন ও বিত্তের পরিমাণ কম হয়ে গেলেও, গুহদের রুচি ও ঐতিহ্য আজো রয়েছে। অম্বুবাবুর সখের কুস্তি ও সেতার তাঁর পৌত্র গোবর গুহ-এর হাতে আজো তার সুর হারায়নি।

বিশ্ববরেণ্য যতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবরবাবু) বর্তমানে কলকাতার গোয়াবাগানের 'গোবর গুহ জিম্‌ন্যাসিয়াম ক্লাবে'র কর্ণধার। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত যে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ, তা প্রবীণ মল্ল গোবরবাবুকে দেখলে বেশ বোঝা যায়। বাঙালীর মধ্যে সর্বপ্রথম ইনিই দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে ভারতের বাইরে যান, তারপরই ভীম ভবানী।

যতীন্দ্রচরণ গুহ মল্ল-জগতে 'গোবরবাবু' নামে পরিচিত হলেও তিনি প্রবন্ধকার ও যন্ত্র-শিল্পীও বটে। তাঁর জন্ম কলকাতায় ১৮৯২ সালে। কিশোর বয়স থেকেই পিতামহ অম্বুবাবুর উৎসাহে ব্যায়াম-চর্চা ও কুস্তী-লড়তে সুরু করেন। ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে খ্যাতনামা মল্লবীরদের এনে নিজেদের আখড়াতেই কুস্তির মহড়া দিতেন। তিনি কুস্তি-সাধনায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন—কুস্তিগীরদের অকৃত্রিম দরদী বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী হিসেবেও তাঁর প্রতিষ্ঠা কম নয়। ১৯১০ সালে শরৎকুমার মিত্র ও গোবরবাবুর চেষ্টায় ও অর্থব্যয়েই বড় গামা, ইমাম্ বখশ, বিদ্যাধর পাণ্ডে ও গোবরবাবু নিজে লণ্ডন যান। সে বছরেই বড়গামা আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মল্ল ডক্টর রোলার ও পোল্যাণ্ডের বিশ্বশ্রুত মল্ল ষ্ট্যানিস্‌লস্ বিস্কো-কে পরাস্ত করে ইউরোপীয় মল্ল-সমিতি কর্তৃক 'বিশ্ববিজয়ী মল্ল' আখ্যা লাভ করেন। সেবার কোন কারণ বশতঃ গোবরবাবুকে দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল বলে তিনি কোন কুস্তি-প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেননি। ছাত্রবৎসল ও ছাত্র-প্রিয় মল্ল-শিক্ষক হয়ে তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—আদর্শ ছাত্র তৈরী করা। তাঁর মতে—ছাত্ররাই তাঁর গৌরব। এ শুধু তাঁর মনের কথা নয়—তাঁর ছাত্র হবার সৌভাগ্য যাঁরা অর্জন করেছেন, তাঁদেরই কথা, তাঁরা তা জানেন, তাঁরা তা অনুভব করেন।

গোবরবাবু একদিকে যেমন ভারতীয় কুস্তির [illegible]

কলাকৌশল বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন, অন্যদিকে তেমনি আবার দীর্ঘকাল ইউরোপ ও আমেরিকায় পৃথিবীর নানা দেশীয় শত শত শ্রেষ্ঠ মল্লের সংস্পর্শে গিয়ে সেইসব দেশের বিভিন্ন কুস্তির নানা কলাকৌশল বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশী মূল্যবান তাঁর উদার ও সদাশয় মনোভাব—যার প্রেরণায় তিনি জাতিধর্ম-ব্যক্তি-নির্বিশেষে বাঙালী অ-বাঙালী সকলকেই শরীর-চর্চা ও মল্ল-শিক্ষা দানে ব্রতী হয়েছেন। এদিক থেকে বিচার করলে গোবরবাবু বড়গামা প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত ব্যায়ামবীর ও কুস্তিগীরদের অনেক ওপরে।

গোবরবাবুর জীবনেতিহাস ঠিক তিনটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ। প্রথম অধ্যায়ে তিনি বিশ্ব-বিজয়ী কুস্তিগীর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে মল্ল-জগতের এক বিশ্ববিশ্রুত কুস্তি-বিশেষজ্ঞরূপে অভিনন্দিত, আর শেষ অধ্যায়ে জীবন-সন্ধ্যায় তিনি অভিজ্ঞ ও দরদী ব্যায়াম ও কুস্তি-শিক্ষক রূপে স্মরণীয়।

ছেলেবেলা থেকেই গোবরবাবুর মনোবল ছিল অসমসাহসী। কোন শক্ত কাজেই তিনি জীবনে কোনদিন পেছপাও হতেন না। তিনি ছিলেন বাগবাজারের বিখ্যাত গুহ-পরিবারের সন্তান। উত্তরাধিকার-সূত্রেই গোবরবাবুর মনোজগতে কুস্তি-অনুরাগ ও শিল্পানুরাগ দানা বেঁধে উঠেছিল। তাঁর সমসাময়িক ভারতীয় মল্লবীরদের মধ্যে ছোট গামা, ইমাম্ বখশ, হামিদ, ভীমভবানী প্রমুখ বিখ্যাত মল্লবীরই উল্লেখযোগ্য। এতো সব ভারতবিখ্যাত মল্লবীরের ভীড়েও তিনি সেদিন হারিয়ে যাননি, বরং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এমনই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন যে, আজো সে জ্যোতি একেবারে ম্লান হয়ে যায়নি।

ব্যক্তিগত জীবনে পড়াশুনা গোবরবাবুর একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সারাদিন আখড়ার ছাত্রদের ব্যায়াম ও কুস্তি শেখানোর পর তাঁর মন চায় জ্ঞানের রাজ্যে পরিভ্রমণ করতে। সাহিত্যিকের ও ব্যায়ামীদের কীর্তি-মিছিল তাঁকে ঘিরে ধরে আর সেই মিছিল-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েন যতীন্দ্রচরণ গুহ। যুগান্তর, আনন্দবাজার আর 'দেশ' পত্রিকা অবশ্য পঠিত। তা ছাড়া অজয় বোস, ধীরেন বসু, সমর বোস, খেলোয়াড় প্রমুখ লেখকদের রচনাও গোবরবাবুকে আকৃষ্ট করে।

আজকের দিনের বাংলা দেশ ও তার মল্লক্রীড়া সম্বন্ধে ও বর্তমান দিনের পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে,—আজকাল কুস্তিগীরদের আর্থিক লাভ হচ্ছে বটে, কিন্তু কুস্তির মান অনেকখানি নেমে গেছে, বিশেষ করে বিজ্ঞান-সম্মত প্যাঁচের দিক থেকে উঁচু-দরের কুস্তিগীরের আজ একটা বিরাট অভাব। গোবরবাবু সকলবিষয়েই 'সিরিয়াস্'-ভাব পছন্দ করেন; কোন জিনিস নিয়ে ছেলেখেলা আদৌ পছন্দ করেন না।

বর্তমান শতকের প্রথম দিকে মল্ল-জগতে নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ভারতীয় মল্লদের আগ্রহ যায় বেড়ে। তারই ফলে তাঁরা বেরিয়ে পড়েন দেশ থেকে দেশান্তরে। শুরু হোলো তাঁদের বিজয় অভিযান। শুধু আভ্যন্তরীণ চ্যাম্পিয়ানই তখন ভারতীয় পালোয়ানেরা ক্ষান্ত থাকেননি। ১৯০০ থেকে ১৯৩৫-৩৬ খৃঃ পর্যন্ত সরাসরিভাবে স্বীকৃত না হলেও, অজস্র লড়াই-এর মধ্য দিয়ে ভারতীয় পালোয়ানেরা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, মল্লজগতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন একমাত্র তাঁরাই। ভারতীয় কুস্তিগীরদের মধ্যে একমাত্র গোবরবাবুই সরাসরিভাবে 'বিশ্ব-প্রাধান্য' লাভ করেন। বিদেশীরাও মনে প্রাণে ভারতীয় পালোয়ানদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছিলেন।

মল্ল-মঞ্চে সংঘটিত ঐতিহাসিক কুস্তিগুলি বা সাধারণ ভেতো-বাঙালী-ঘরের ছেলেদের দিয়ে কুস্তিগীর তৈরী করার মধ্যে দিয়েই পাওয়া যায় গোবরবাবুর প্রতিভার জীবন্ত সাক্ষর। জনপ্রিয়তার ও বংশ-গৌরবের শীর্ষে উঠেও গোবরবাবু বড় গামা প্রভৃতি কীর্তিমান মল্লদের শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন। মল্লক্ষেত্র থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন অনেক আগে। কিন্তু যতদিন আগেই তিনি অবসর নিয়ে থাকুন না কেন, বাঙলার তথা ভারতের কুস্তির ইতিহাসে গোবরবাবুর নাম চিরদিন অম্লান হয়েই থাকবে। গোবরবাবুর জন্ম তারিখ ১৩ই মার্চ, ১৮৯২ সাল।

॥ বাঙলার প্রথম সনেট ॥

অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায়, সনেটও মধুসূদন সর্বপ্রথম বাংলায় প্রবর্ত্তন করেন; "চতুর্দ্দশপদী" নামও তাঁহারই দেওয়া। ১৮৬০ খৃঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্র লেখেন :—

..I want to introduce the sonnet into our language and, some morning ago, made the following :—

কবি—মাতৃভাষা

মিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন;
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ?"

What say you to this my good friend ! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian..

I am just now reading Tasso in the original, —an Italian gentleman having presented me with a copy. Oh ! what luscious poetry..

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

নয়

সুধাংশু শেখর ঘোষ

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—Sorrow follows in the wake of joy. বাংলায় যাকে বলে: যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শর্মা। কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু একেবারে সঠিক নয়। এককালে এর গুরুত্ব থাকলেও আজ আর তা' নেই। আগের মত এখনকার দিনে কেউই হাসি-কান্নার মধ্যে সমতা রাখতে চান না। বরং কান্নাকে এতই ভালোবাসেন যে, হাসি-কান্নার সম্পর্কটা অনেকটা আশমান্ জমিন ফারাক-এর পর্যায়ে এসে গেছে। কেনই-বা আসবে না? আজকাল তো আর সেই গোপাল ভাঁড় বা বীরবলের দেখা মেলে না, কিংবা ছোট্ট খোকা-খুকুরাও হটমালার গল্প শোনার জন্যে দিদার কাছে বায়না করে না। সত্যি বলতে কি, কান্নারই যুগ এটা। চারিদিকে আজ কান্নারই জয়ঢাক বাজছে: বাড়ীতে বলুন, পথে-ঘাটে বলুন, স্কুলে-কলেজে বলুন—সর্বত্রই!

তাই বলে হাসিটা যে একেবারে মহাপ্রস্থানে গেছে, এমন কথা বলছি না। হাসিটা আছে বটে কিন্তু মাত্রাটা কমে গেছে। জানেন তো, 'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় না মহীতে'। সে ভাবে বলা যেতে পারে, না কাঁদিয়া কেহ কভু পারে না হাসিতে। কয়েকবার যদি কাঁদেন, একবার হাসবেন—নিশ্চয়ই হাসবেন! কিন্তু বাড়াবাড়ি করবেন না যেন, তাহলেই হাসিটা আবার কান্নায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে—মানে এটা চক্রবৃদ্ধিহারে চলতে থাকবে—। অর্থাৎ চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।

মনে রাখবেন, কাঁদতে না জানলে হাসা যায় না। মেয়েরা সামান্য কারণে কাঁদে, আর সামান্য কারণেই হাসে। যদিও অপরকে কাঁদাবার বা হাসাবার ক্ষমতাটা তাদের নেহাৎ কম নয়! ধনীদের চেয়ে গরীবেরা কাঁদে বেশী; তাই তারা হাসেও অনেক বেশী। বড়সাহেবকে কাঁদতে দেখেছেন কি? দেখেননি তো! দেখবেন কি করে? হাসিটাই যদি ডুমুরের ফুল হয়ে থাকে, কান্নাটাও কি তবে কাঁঠালের আমসত্ত্ব হতে পারে না? অথচ দশটা-পাঁচটার কেরাণীবাবু কি স্কুলমাষ্টারদের দিকে দৃকপাত করুন, দেখবেন—তাদের চোখে জল—সর্বদাই জল! কখনও কান্নায়, কখনও হাসির।

কান্না নানারকমের হয়ে থাকে! যেমন, ছেঁড়া কান্না, জোড়া কান্না, হেটো কান্না, মেঠো কান্না; শহুরে কান্না গেঁয়ো কান্না—ইত্যাদি…ইত্যাদি। বয়েসের তারতম্যানুসারে কান্নারও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আপনার কথাই বলি না কেন আপনি ছেলেবেলায়—মানে শৈশবে কেঁদেছেন ট্যাঁ-ট্যাঁ করে, বাল্যে ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে, কৈশোরে ঘ্যান্-ঘ্যান্ করে, তারপর যৌবনে ফিস্-ফিস্ করে; এমনকি এখনও এর হাত থেকে রেহাই পাননি। পাবেন না! কক্ষনো না! যতই বয়েস বাড়বে, ততই কাঁদবেন;—কাঁদবেন—বোবাকান্না! বিস্মৃতির কান্না!! বুক-চাপা-কান্না!!!

কান্নার অনেক কারণ থাকতে পারে। কেউ কাঁদে দুঃখে, কেউ সুখে; কেউ বা সখ করে। আর গিন্নীর নাক-ঝামটা, চাওয়া পাওয়ার ব্যর্থতা, পরীক্ষায় ডাব্বা মারা—এ সবের কথা না হয় নাই বললাম। আমাদের পাড়ার জগাদাকে চেনেন তো! চেনেন না বুঝি? না চিনলেও ক্ষতি নেই! তবে এটুকু জেনে রাখুন যে আমাদের জগাদা ওরফে জগন্নাথদা হচ্ছেন একশ' বিয়াল্লিশ টাকা আট আনার Purely temporary post-এর একজন কেরাণী—ক্ষুদে কেরাণী মানে L. D. আর কি! লোকটি ছা-পোষা মানুষ। সংসারে পাঁচটি প্রাণী ওঁরা। একটি চতুষ্পদী, একটি ত্রিপদী, বাকী তিনটি দ্বিপদী! প্রথমটি কোলের ছেলে—সবে হামাগুড়ি দিতে শিখেছে আর কি! দ্বিতীয় ছেলেটি এককালে ঘুলকাটা টো-টো কোম্পানির ম্যানেজার ছিল, একক্ষণে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে, একটি চরণ হারিয়ে গোঁফ-খেজুরের মত বাড়িতে বসে আছে। অবিশ্যি ক্র্যাচ্-এর দয়ায় ত্রিচরণ হয়েছে বটে, তবুও উণপাঁজুরে অবস্থা কাটেনি এখনও। তৃতীয়টি তাঁর মেয়ে—কলেজে পড়া, অত্যাধুনিকা, মানে অ্যালট্রা মডার্ণ কলেজ-গার্ল। যার চলন দেখে ওরিয়েণ্টাল ড্যান্সিং পার্টির লেটেষ্ট মডেল বল্লেও ভুল হয় না। চতুর্থটি হলেন জগাদার ইয়ে—মানে সহধর্মিণী। যিনি পয়লা নম্বরের চালিয়াৎ, ক্যাসানভূরত্ব আর ষ্টাইলিস্, যিনি ফ্যান দিয়ে ভাত খেয়ে গল্পে দই মারতে দ্বিধা করেন না, এবং যিনি চৈপরদিন গায়ে ফুঁ দিয়ে পাড়াজুড়ো সই-এর বাড়ি বাড়ি লক্ষ্মীর বরযাত্রীর মত ঘুরে বেড়ান। বাকী রইলেন জগাদা। জগাদা হচ্ছেন পাড়ার 'রকপালিশ' ক্লাবের ভূতপূর্ব মেম্বর—কিছুদিন আগে প্রেসিডেণ্টের পদও লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু ইদানিং নিজের ট্যাঁক সামলাবার জন্যে তা'তে "রেজিগ্‌নেশান্" দিয়েছেন।

কিন্তু এই হালফ্যাসানে জগাদার বাড়ীটাই দিনরাত "টিয়ার গ্যাসে" ভরপুর থাকে। শিশুটি কাঁদে খাবার জন্তে, ছেলেটি নিজের অপরিণামদর্শিতার জন্তে এবং মেয়েটি নাইলন শাটী, লেডিজ হাওয়াই কিংবা ভেনিটি ব্যাগের জন্তে। আর তাঁর স্ত্রী কাঁদেন নেশার জন্তে; নেশা—আজকালকার তামাডোলের বাজারে শতকরা নব্বই জনের যেটা থাকে সেই সর্বনাশা ম্যানিয়া আর কি! কোথায় কোন ফাংশন হবে, কবে অমুককুমার-অভিনীত সিনেমাটা কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরাতে শুরু করবে, কখন কোন হোটেলে তুমুক-কুমারীর ড্যান্সের আসর বসবে—এসব তাঁর নখদর্পণে। আর জগাদা কাঁদেন আপিসের পিকনিক পার্টিতে যোগ দিতে না পারা, গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ কেনার অক্ষমতা কিংবা বন্ধুদের-রক-আড্ডায় গরহাজিরা ইত্যাদি কারণে। কাজেই কেউ কাঁদে স্বভাবে, কেউ দুঃখে; কেউ কাঁদে অভাবে, কেউ-বা সখ করে। অথচ মাসের প্রথমদিকে জগাদার এই জগাখিচুড়ি পাকানো সংসারেই এমন হাসির হাট বসে যায় যে শুনলে, আপনি থ হয়ে যাবেন—আর শুধু থ কেন? দস্তুরমত স্ত-তাজ্জবও বনে যাবেন, মনে হবে 'হাসির অ্যাটম বোম্' বার্স্ট করেছে কিংবা 'লাফিংগ্যাস' ছোঁড়া হয়েছে। তাইতো বলি: আগে কান্না পরে হাসি, বলতো মোদের পুঁটি মাসি!

এবারে আপনার কথায় আসা যাক। আচ্ছা, আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি: হাসি ভালো না কান্না ভালো? আপনি হয়ত বলবেন, আগেরটা। তাই না? কেননা আপনি নিজে হাসতে পারেন, আর জানেন: হাসিমুখ সবাই ভালোবাসে, হাসির দ্বারা অপরকে আমড়াগাছি করা সহজ হয়; হাসাতে পারলে বন্ধু মহলে কেউ-কেটা হওয়া যায়, সিনেমায় অ্যাক্টিং করা যায়, তদুপরি ব্ল্যাকমার্কেটিং-এর যুগে হাঁওমারা কিংবা বড়বাবুর নেকনজরে পড়াও অসম্ভব নয়। স্বীকার করি। কিন্তু কান্নাটাকেই-বা অবজ্ঞা করবেন কেন?—কোন্ যুক্তিতে-? বলুন দিকি, রোজ ক'বার কাঁদেন আর ক'বার হাসেন? ক'জনকে কাঁদাতে পারেন আর ক'জনকে হাসাতে পারেন? ক'জনকে কাঁদতে দেখেছেন আর ক'জনকে হাসতে দেখেছেন?

শুনেছেন তো! "রামগরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা—হাসির কথা শুনলে বলে, হাসবো না-না-না"। তা'বলে আপনাকে রামগরুড়ের ছানা হ'তে বা একেবারে উপবাসী থাকতেও বলছি না মোটেই। তবে কি জানেন! কাঁদবেন—যতটা হাসবেন ততটা, কি তার চেয়েও বেশী; কিন্তু সাবধান, এক চোখো হবেন না—কিছুতেই না। তা ছাড়া এর জন্যে আর কোন ট্যাক্স্ লাগে না তো! অবিশ্যি পরিকল্পনিক যুগে সব কিছুর মত হাসি-কান্নার ওপরেও করের বোঝা চাপালে এই মাগগীগণ্ডার দিনে রামরাজত্বের কিছুটা সুরাহা হ'ত বটে! কিন্তু সে সুবুদ্ধি—কি দুর্বুদ্ধি যাই বলুন না কেন, মাথাওলাদের মাথায় যতদিন না আসছে ততদিন এ অমূল্য-সম্পদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে লাভ কি? তাই বলছিলাম—কাঁদবেন, একশ'বার কাঁদবেন, হাজারবার কাঁদবেন!

উপরন্তু ভগবানও তো আমাদের কাঁদতেই পাঠিয়েছেন! আপনিই বলুন না মশাই, প্রথম জগতের আলো দেখে মানুষ কাঁদে, না হাসে? আর শেষ আলো দেখার সময়ও কি কান্নার অবতারণা হয় না? ধর্মজীবনেও কি কান্নার প্রভাব নেই? বিয়ের আসরে হাসির তুবড়িতে কান্নার ফুলকি থাকে না কি? ঠাকুর-ঘরে মা-দিদিমারা হাসেন না কাঁদেন? অতো কেন! পরীক্ষার হলে গিয়ে পড়ুয়ারা মনে মনে হাসে না কাঁদে? আর পরীক্ষার ফলাফলে, মানে "হাসিকান্না"-নাটকে কমেডির চেয়ে ট্রাজেডির অংশই বেশী থাকে না কি? বলুনতো, যেদিন ইটালিয়ান মিষ্টিকদের Mistake এর ফলে প্রলয়ের কথা ছিল অর্থাৎ আর ফুল ফুটতো না,···পাখী ডাকতো না, কলমহাতে একশ ন' ডিগ্রী গরমে কিংবা পাঁচ সেণ্টিমিটার বৃষ্টিতে, পচতে হত না,···বন্ধুদের সঙ্গে মহরম মহরম করা যেত না,···তাপটা হঠাৎ Below the freezing point হয়ে যেত আর আপনিও ক্রমশ: শীতল হতে শীতলতর হতে হতে অবশেষে বরফে পরিণত হয়ে যেতেন···সেদিন আপনি কেঁদেছিলেন না হেসেছিলেন? আরে বলবেন কি মশাই! যা অব্যক্ত তা কি বলা যায়?

আজকাল যেন সব কিছুতেই কান্নাটা কেমন একচেটিয়া হয়ে গেছে! সব জায়গাতেই এর প্রভাব রয়েছে! পথে-ঘাটে যেখানেই যান সেখানেই কান্না; হয় ভিখিরীর, নয় উদ্বাস্তুর! রেডিও খুলুন; তাতেও কান্না। সামাজিক নাটক আর আধুনিক গান—এরা কি কান্নারই সগোত্র নয়? খবরের-কাগজ পড়ুন। তবুও এর হাত থেকে রেহাই নেই। অমুক রাষ্ট্রের গুপ্তচরবৃত্তি,···অমুক নেতার হুমকী,···এখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামার আন্দোলন··· ওখানে ভূমিকম্প, -বন্যা মহামারী···এসব দেখে কার চোখে জল না আসে! আর বাড়িতে তো কথাই নেই! সেখানে কান্না একেবারে গাঁটছড়ায় বাঁধা!

তবে হ্যাঁ, কান্নাতে সুবিধে আছে অনেক! রাস্তায় গিয়ে কাঁদতে থাকুন। নিমেষেই ভিড় জমে যাবে। সবাই আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবে। চাই কি, দুচার পয়সা incomeও করতে পারবেন। কিন্তু beware, হাসবেন না যেন! তা'হলে Gaol বা Lunatic Asylum—একটাকে বেছে নিতে হবে। ট্রামে উঠেছেন? পয়সা নেই? ভয় কি! কান্না শুরু করুন। বলুন: পকেট মেরেছে। ব্যস! সকলে আহা! উঁহু! করতে থাকবে! টিকিটবাবু টিকিটের 'ট'-ও উচ্চারণ করতে পারবেন না, আর আপনিও নির্বিঘ্নে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবেন। কিন্তু হুঁশিয়ার, হাসলেই বিপদ! তাহলে সোজা নেমে যেতে হবে। কেউ বলবে—গেট আউট, কেউ বলবে—নিকালো; কেউ বা পুলিশ ডাকতে চাইবে। ভাড়া বাকী পড়েছে? কুছ পরোয়া নেহি! দরজা বন্ধ ক'রে কাঁদতে থাকুন, প্রাণপণে চীৎকার করুন! খাবেন না, শোবেন না, আফিসে যাবেন না। বলুন, চাকরী খতম; টাকা নেই। দেখবেন সবকিছু ফর্সা হয়ে যাবে। আপনিও বেশ হেসে খেলে বেড়াতে পারবেন।

কাজেই বুঝলেন তো, কেঁদে কত লাভ, কত সুবিধে! তাইতো বলি: কাঁদুন, মশাই কাঁদুন—দিনরাত শুধু কাঁদুন—পাড়া মাৎ ক'রে কাঁদুন—নিজে কাঁদুন, অপরকেও কাঁদতে বলুন!

প্রথম ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

গত ৮ই জুন (১৯৬১) তারিখে অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর রজত-জয়ন্তী হয়ে গেল। ১৯৫৭ সালে ভারতীয় বেতারের ত্রিশ বৎসর সম্পূর্তির উৎসবও হয়ে গেছে; কারণ 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'—এই নামকরণটা ১৯৩৬ সালে হলেও এবং ভারত সরকার এখানকার বেতারকে চালাবার ভার ১৯৩০ সালে নিলেও, ভারতবর্ষে নিয়মিতভাবে বেতারানুষ্ঠান প্রচার আরম্ভ হয় ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি কাল থেকে। কলকাতার বেতার-প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয় ১৯২৭ সালের ২৬শে আগষ্ট থেকে। বোম্বাই ষ্টেশনটি খোলা হয় এর ৫।৬ সপ্তাহ আগে। যে প্রতিষ্ঠান এই বেতারের পত্তন করেন, তাঁদের নাম ছিল ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী—সংক্ষেপে IBC.

১৯২৪ খৃষ্টাব্দ থেকেই এখানে বিভিন্ন আমেচার রেডিও ক্লাবের উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু বেতার অনুষ্ঠান প্রচারের চেষ্টা যে হয়নি তা নয়, কিন্তু বেতারানুষ্ঠান প্রচারের ইতিহাসের দিক থেকে সে প্রচেষ্টা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

ইংলণ্ডের BBC এবং আমেরিকার NBC ইত্যাদি ইউরোপ-আমেরিকার সমস্ত বেতার-প্রতিষ্ঠানেরই জন্মতারিখগুলো—সবই পড়ে ১ম মহাযুদ্ধের পরের যুগে।

জগতের প্রথম ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস কিন্তু এতটা অর্বাচীন কালের প্রতিষ্ঠান নয়। শুনতে আজ হয়ত অনেকের বিস্ময় জাগতে পারে যে, আজকের বেতার ব্রডকাষ্ট পদ্ধতির সৃষ্টি হবার অনেক আগেই পৃথিবীতে একটি ব্রডকাষ্টিং প্রতিষ্ঠান ছিল এবং সেটি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বত্রিশ বছর কাল তার শ্রোতাদের নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান প্রচার করে শুনিয়েছে। প্রথম কয়েক বছর এই প্রতিষ্ঠান প্রত্যহ প্রতি আধঘণ্টা অন্তর নানাস্থানের টাট্‌কা খবরগুলি তার শ্রোতাদের শোনাতো। কয়েক বছর পর থেকে সঙ্গীতজাতীয় কিছু কিছু আমোদ-প্রমোদ পরিবেশনের ব্যবস্থাও হয়েছিল—অপেরা হাউস ও কনসার্ট-হল থেকে সেসব আমোদ-প্রমোদ রীলে করা হোত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বেতারে বার্তা প্রচারের ব্যবস্থা না থাকলেও, তারে সংবাদ প্রেরণের উপায় লোকের অজ্ঞাত ছিল না। সেই সময়ে হাঙ্গারীর একজন ইঞ্জিনীয়ার তারের সাহায্যে বার্তা প্রচারের (ব্রডকাষ্ট করার) পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরই উৎসাহে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গারীর রাজধানী বুডাপেষ্ট শহরে সতার ব্রডকাষ্টিং সার্ভিসের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল Telefon Hirmondo। সমগ্র জগতের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্রডকাষ্টিং প্রতিষ্ঠানের জন্যে তাই আজ একমাত্র বুডাপেষ্ট শহরই গৌরব দাবী করতে পারে।

আজকাল লোকে যেমন বাড়িতে টেলিফোন রাখে এবং সেজন্যে টেলিফোন-প্রতিষ্ঠানকে টাকা দেয়, সে-সময়ে ওখানে ওই রকম লোকে তারে ঘোষিত বার্তা শোনবার জন্যে বাড়িতে যন্ত্র রাখতো এবং সেজন্যে টাকা দিত। এই যন্ত্র বাড়িতে রেখে লোকে একটি হেডফোন কানে দিয়ে প্রতি অর্ধঘণ্টা অন্তর নানা স্থানের টাটকা খবরগুলি শুনতে পেতো। কয়েকবছর পরে এই সতার ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস (Telefon Hirmondo) মারফৎ শ্রোতাদের সংবাদ ছাড়া কিছু কিছু সঙ্গীতজাতীয় অনুষ্ঠান পরিবেশনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। তখন ওখানকার রয়্যাল হাঙ্গেরীয়ান অপেরা হাউস এবং অন্য অনেক কনসার্ট-হল থেকে এইসব প্রমোদ-অনুষ্ঠান রীলে করা হোত। এইভাবে বত্রিশবছর কাল (১৮৯৩—১৯২৫) ওখানে এই সতার ব্রডকাষ্টিং-এর প্রতিপত্তি ছিল। তারপর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ওখানে সতারের পরিবর্তে বেতার ব্রডকাষ্টিং-এর প্রতিষ্ঠা হয়।

বেতার ব্রডকাষ্টিং-এর আগে পর্যন্ত বুডাপেষ্ট-এর রয়্যাল অপেরা-হাউসে বত্রিশটি মাইক্রোফোন ছিল। এই মাইক্রোফোন মারফৎ শ্রোতাদের বাড়ি বাড়ি তারযোগে সঙ্গীতাদি রীলে করার ব্যবস্থা ছিল।

জগতের এই প্রথম ব্রডকাষ্টিং (স-তার) প্রতিষ্ঠানের একজন অনুষ্ঠান-ঘোষকের সম্বন্ধে দুচারটি কথার উল্লেখ বোধ হয় এখানে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভদ্রলোকের নাম মিঃ এডওয়ার্ড ফন্ শের্ৎস (Edward Von Scherz)। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ওখানকার ঘোষক নিযুক্ত হন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গারীতে বেতার ব্রডকাষ্টিং প্রতিষ্ঠিত হলে তাতেও তিনি ঘোষক নিযুক্ত হন। তারপর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে গলায় অপারেশন করানোর পর কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে মাইক্রোফোনের সামনে থেকে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

এক বনেদী জমিদার-সন্তান এই মিঃ শের্ৎস ভিয়েনা শহর থেকে অল্পদূরে ডানিয়ুব নদীতীরবর্তী অনুপম সুন্দর 'প্রেসবার্গ' শহরে (জার্মাণ নাম প্রেসবার্গ, চেকোশ্লোভাকিয়ান নাম ব্রাটিসলাভা এবং হাঙ্গেরীয়ান নাম 'পোশঝানি') জন্মগ্রহণ করেন।

অতি শৈশবকাল থেকেই তিনি বিভিন্ন দেশের নানা ভাষা শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। ফলে তিনি অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাতৃভাষা হাঙ্গেরিয়ান ছাড়া ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান ভাষাও একেবারে বিশুদ্ধভাবে শিক্ষা করেছিলেন।

তারপর বড় হয়ে একদিন মণ্টি-কার্লোতে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার ক্যাসিনোর মোহময় আবেষ্টনীর কবলে পড়ে জুয়া খেলে তিনি প্রথমে তাঁর সঙ্গের সমস্ত অর্থ এবং পরে তাঁর বিপুল সম্পত্তির সমস্তই খুইয়ে একেবারে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ে চক্ষুলজ্জাবশতঃ সে অবস্থায় বাড়িতে আর না ফিরে বুডাপেষ্ট শহরে চলে যান এবং অল্পকাল মধ্যে 'যুবানিয়া' নামক স্থানীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে লেকচারার-এর কাজ পান। এখান থেকেই আবার অল্পকালমধ্যে তিনি ওখানকার (এবং পৃথিবীরও) একমাত্র সতার ব্রডকাষ্টিং প্রতিষ্ঠান ওই Telefon Hirmondo-তে ঘোষকের পদ পেয়ে গেলেন। কারণ ঠিক ওই সময়েই ওখানকার ডিরেক্টর একজন সুকণ্ঠ ঘোষকের অনুসন্ধান করছিলেন। তাঁর অনুরোধেই শের্ৎস্ কাজটি নিয়ে নিলেন। ফ্রেঞ্চ এবং জার্মাণ ভাষার জ্ঞান তাঁকে এই কাজে খুবই সাহায্য করলে।

সুতরাং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ থেকেই এডওয়ার্ড ফন শেং'স্ ওখানকার ব্রডকাষ্টিং-এ প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর টাটকা খবরগুলি মাইক্রোফোনের সম্মুখে পাঠ করতে এবং প্রত্যহ সন্ধ্যায় রয়্যাল হাঙ্গেরিয়ান অপেরা-হাউসের সঙ্গীতাদির রীলে ঘোষণা করতে আরম্ভ করলেন।

আজকালকার বেতারের ঘোষক মহাশয়দের কাজ যত কঠিনই হোক, মিঃ শেং'স্-এর কাজের তুলনায় তা অনেক সহজ। শুধু সংবাদ পাঠ এবং সঙ্গীতাদি ঘোষণা করেই তাঁর কাজ শেষ হোত না। ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশন-সম্পর্কিত আরও নানা বিষয়ে তাঁকে নজর রাখতে হোত।

১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে ওখানে একবার প্রচণ্ড ঝড় হয়। সেই ঝড়ে স্থানীয় বহু ক্ষতির সঙ্গে ওখানকার টেলিফোন সিষ্টেমের সমস্ত তার ছিঁড়ে উড়ে গিয়ে সব লণ্ডভণ্ড একাকার হয়ে যায়।

মিঃ শেং'স্ তখন জনকয়েক লোক নিয়ে এবং নিজেও তাদের সঙ্গে থেকে ছাদে ছাদে উঠে সমানে কঠোর পরিশ্রম ক'রে সাত দিনের মধ্যে আবার সমস্ত মেরামত ক'রে ফেলেন।

তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় মুহূর্তটি এসেছিল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের একটি দিন।

সেদিন সেরাজিভো নগরবাসী তাঁর এক বন্ধু তাঁকে অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান ক্রাউন-প্রিন্সের হত্যা-সংবাদ দেন (যে হত্যার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়)।

বন্ধুটি ছিলেন তাঁর খুবই বিশ্বস্ত। তাই এ-সংবাদ যে সত্য, সে-বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহই ছিল না। অল্পক্ষণ বাদেই তাঁর সংবাদ প্রচার করার কথা। সে-সময়ে এতবড় এই সংবাদটি প্রচার করার জন্যে তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। কিন্তু এইরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি সংবাদ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই ব্রডকাষ্ট করার পথেও বাধা। অথচ অনুমোদনের অপেক্ষা করতে গেলে এমন একটা সংবাদ আগে থেকে পেয়েও তার প্রচারে অযথা বিলম্ব হয়ে যায়!

শেষে তিনি তাঁর স্বভাব অনুযায়ী সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধেই নিয়ে ঝোঁকের মাথায় সংবাদটি ব্রডকাষ্ট করে দিলেন।

কিন্তু সংবাদের যাথার্থ্য নিরূপণের জন্যে অপেক্ষা না করে বিনানুমোদনে এই হত্যা-সংবাদ সাধারণের গোচর করার জন্যে মন্ত্রিসভার কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের তরফ থেকে তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ তলব করা হোলো।

অবশেষে ঠিক হোলো যে, সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে তাঁকে সম্মানিত করা হবে ; কিন্তু মিথ্যা হলে তাঁকে এর জন্যে গুরুদণ্ড গ্রহণ করতে হবে। ঘণ্টাখানেক খুব উদ্বেগের সঙ্গে কাটল। তারপর সরকারী বিজ্ঞপ্তির সাহায্যে খবরটি যথার্থ বলে প্রমাণিত হল। মিঃ শেং'স্-এর বিপদ কাটল। উপরন্তু সত্বর ব্রডকাষ্টিং-এর সাহায্যে সংবাদটি অত্যল্পকালের মধ্যে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল বলে 'Telefon Hirmondo'র গৌরব বেড়ে গেল।

যাই হোক, এর পর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো এবং তাঁকেও যুদ্ধে যেতে হল। যুদ্ধের পরে কিছুকালের জন্যে মিঃ শেং'স্‌কে ব্রডকাষ্টিং-এর বুক-কিপিং বিভাগে কাজ করতে হয়। তারপরে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গেরীতে বেতার ব্রডকাষ্টিং প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি আবার মাইক্রোফোনের সামনে ফিরে আসেন।

মাইক্রোফোনের সামনে ফিরে আসবার পর আবার তাঁর মধুর কণ্ঠস্বর হাঙ্গেরীর ঘরে ঘরে ধ্বনিত হতে থাকে এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আগের চেয়েও বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বেতারের মারফৎ হাঙ্গেরীর ছেলেমহলেও তিনি 'শেং'স্-খুড়ো' নামে খুব খ্যাতি, সম্ভ্রম আর জনপ্রিয়তা লাভ করেন। কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে গলা অপারেশনের পর কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়ে যাওয়াতে মাইক্রোফোনে ঘোষণা করা যখন আর সম্ভব হোল না, তখন জনসাধারণের সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁকে হাঙ্গেরিয়ান ব্রডকাষ্টিং-এর লাইব্রেরীয়ান পদ গ্রহণ করতে হয়।

মন্থনের বিষে অঙ্গ জ্বলে

রাধামোহন মহান্ত

কোন্ দূর শতাব্দীর অন্ধকার হতে
তারার আলোয়
ভেসে এলো পরাধীন মানুষের জাগরণ-গীতি
পূর্ব এ ভারতের শ্যামল অঙ্গনে
—লেখা হলো ইতিহাস অলক্ত রেখায়!
জাগিল প্রভাত-সূর্য্য!—
জড়-জন-জীবনের নিদ্রা হতে নবীন ভারত
অফুরন্ত প্রাণের বন্যায়
উদ্বেলিত ভাগীরথী গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী
—রুদ্ধ জন-জীবনের বদ্ধতটে জাগিল জোয়ার!
মনে ছিল শিবাজীর তন্দ্রাহীন আশা—
খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত
বাঁধা হবে মিলনের সোনালী সূতায়
প্রতি অঙ্গ একসাথে অভ্যুদয়ে মিলিবে আবার
—অখণ্ড ঐতিহ্যময় আমাদের ধ্যানের ভারত!

প্রাণোচ্ছল সে আশা-কুসুম
মায়াচ্ছন্ন নীলিমায় নভ-লগ্ন ভ্রূণ-নীহারিকা
শুভ জন্মলগ্নে কেন আরণ্য-আশ্লেষে
চূর্ণ হয়ে আকাশে ছড়াল
—ধূমকেতু দিকে দিকে অশিবের ওড়ায় কেতন!
'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গভরা'—
কিশলয়ে প্রাণের উৎসার
শুচি-শুভ্র কল্যাণের উচ্চকিত মনের প্রাঙ্গণে
দধীচিরা স্বপ্ন দেখে রুচিময়ী রজনীগন্ধার
—স্বাধীনতা প্রেয়সীর বাঁকা চোখে বিভ্রম-বিলাস!
তাই বুঝি ভারতের অঙ্গলগ্না পূর্ব-পার্বতীর
রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনৈক্যের বিষ
আদিম সন্ধ্যার বন্য পাশব উল্লাস
মহাভারতীরে করে লজ্জাহীন তীব্র অসম্মান
—নির্বিকার নীলকণ্ঠ : মন্থনের বিষে অঙ্গ জ্বলে!

৪৩

প্রভু সব শুনলেন। তাঁর নামটি ভালো, কিন্তু সম্প্রদায় ভালো নয়। বয়স অল্প, ইন্দ্রিয়দমন অসাধ্য। ভালো একজন সন্ন্যাসী ডাকিয়ে নতুন করে তাঁর সংস্কার করে নেবে। শুধু তাই নয়, সার্বভৌম নিজে ক্লেশ করে তাঁকে বেদ পড়াবেন, ঢুকিয়ে দেবেন অদ্বৈতমার্গে।

প্রভু খুব খুশি, বললেন,—'ভট্টাচার্যের অসীম অনুগ্রহ।'

'অনুগ্রহ?' রেগে উঠল মুকুন্দ। 'অবজ্ঞা—এ অবজ্ঞা ছাড়া কিছু নয়।'

'না, না, অবজ্ঞা কেন হবে? ভট্টাচার্য আমার মঙ্গল চান, আমার সন্ন্যাস-রক্ষা করবার জন্যেই তাঁর এই করুণা।'

মন্দিরে প্রভুকে নিয়ে এল সার্বভৌম। বললে,—'তুমি সন্ন্যাসী, তুমি সর্বদা বেদান্ত পড়বে, বেদান্ত শুনবে। তাই সন্ন্যাসীর বিধি, সন্ন্যাসীর ধর্ম।'

'আপনি যা বলবেন, তাই হবে। তাই করব।' বিনয়ে বললেন গৌরহরি।

সার্বভৌম বেদান্ত পড়াতে বসল।

ছাত্র কী গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে। কথাটি কইছে না।

সাত-সাত দিন পড়ানো হচ্ছে, একটিও কথা নেই ছাত্রের মুখে। সামান্য একটা প্রশ্নও নয়। সন্ন্যাসী কি তবে বদ্ধ পাগল, না, নির্বোধ? ভালো-মন্দ কিছুই তবে বলছে না কেন? তবে কি দাম্ভিক? তাও তো মনে হবার নয়। অমন নম্র ও লাজুক ছাত্র দেখা যায় না।

'সাত দিন ধরে পড়ছ, হাঁ-না কিছুই বলছ না কেন?' প্রায় বিরক্ত হয়েই জিগগেস করল সার্বভৌম। 'বুঝছ কি বুঝছ না, অন্তত তাও বুঝতে দেবে তো?'

'আমার শোনবার কথা, আমি শুনে যাচ্ছি।' বললেন গৌরহরি।

'আর আমি যে ব্যাখ্যা করছি, সঙ্গে-সঙ্গে তা বুঝছ?'

'আমি মূর্খ, আমার পড়াশোনাও কিছু নেই, তাই বুঝছি না কিছুই।'

'না বুঝলে জিগগেস করতে হয় তো?' ভট্টাচার্য মুখ-চোখ রুক্ষ করে উঠলেন: 'চুপচাপ বসে থাকলে চলে কী করে?'

বিনম্র মুখে প্রভু বললেন, 'বেদান্তসূত্রের অর্থ তো নির্মল, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যাই মেঘাচ্ছন্ন।'

বলে কী সন্ন্যাসী? নিশ্চল পাথর হয়ে গেল সার্বভৌম।

'সূত্রের অর্থ স্পষ্ট, কিন্তু শঙ্করাচার্য কল্পনাবলে অন্যরকম ভাষ্য করেছেন, আর আপনার ব্যাখ্যা শঙ্করভাষ্যের অনুযায়ী।' নম্র অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন গৌরহরি। 'যতক্ষণ শঙ্করভাষ্য থাকবে, ততক্ষণ ঠিক-ঠিক অর্থবোধ হবে না।'

শঙ্করভাষ্যে বলা হয়েছে, একমাত্র নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মই শ্রুতিসিদ্ধ। ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ, সর্বোপাধি-বর্জিত। আর এই ব্রহ্মবস্তুই একমাত্র জ্ঞানগম্য। সুতরাং ভক্তি-উপাসনা অর্থহীন।

এ একরকমের নাস্তিক্য। সার্বভৌম ভট্টাচার্য এই মতের পরিপোষক।

খণ্ডন করতে বসলেন গৌরহরি।

ব্রহ্ম-র অর্থ কী? যিনি বড়, বৃহদ্‌বস্তু, তিনিই

ব্রহ্ম। আবার যিনি অন্যকে বড় করেন, তিনিও ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্মে শক্তি বর্তমান, শক্তি না থাকলে বড় করেন কী করে? সুতরাং ব্রহ্ম শক্তিমান। আবার যিনি বড়, তিনি সব বিষয়ে বড়, তিনি সর্ববৃহত্তম। আর বৃহত্তমতা গুণ ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং তিনি সবিশেষ। আর সবিশেষ হলেই সাকার। শক্তি আছে বলেই তাঁর বৈভব আছে, প্রকাশবৈচিত্রী আছে, আর এই প্রকাশবৈচিত্রীই তাঁর ঐশ্বর্য। সুতরাং ব্রহ্ম সর্বৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ ভগবান। 'সর্বৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান। তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান?'

শ্রুতি ব্রহ্মকে নিরাকার বলেও ধরে রাখতে পারেনি নিরাকারে। ব্রহ্মের হাত নেই, পা নেই, চোখ নেই বলেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার বলেছে, তিনি গ্রহণ করেন, তিনি চলেন, তিনি দেখেন। হাত না থাকলে ধরেন কী করে? পা না থাকলে চলেন কী করে? চোখ না থাকলে দেখেন কী করে? নিরিন্দ্রিয় হলে ইন্দ্রিয়ের কাজ থাকে কেন? আরো দেখুন। বলছে, এই আত্মা বহু অধ্যয়নে পাওয়া যায় না, না বা মেধায়, না বা বহুবেদ-শ্রবণে, এই আত্মা যাকে বরণ করেন, কৃপা করেন, একমাত্র তারই কাছে ইনি স্বীয় তনু বা স্বরূপকে প্রকাশ করেন। তাহলে আত্মার তনু আছে, মানে শরীর আছে। যদি তিনি অশরীরী, তবে আবার তিনি সতনু হন কী করে? এর সমাধান কী? এর সমাধান হচ্ছে এই ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীর নেই, প্রাকৃত আকার নেই, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নেই। ব্রহ্মের দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়, চিন্ময়, অপ্রাকৃত। 'তাঁহার বিভূতি দেহ—সব চিদাকার।' সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত, অনন্তগুণসমন্বিত ও পূর্ণানন্দঘনমূর্তি।

শঙ্কর যে ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলতে চেয়েছে, তাতে তার দোষ নেই, কেননা, ভগবানের আদেশেই সে ও-রকম অর্থ করেছে। কিন্তু তাই বলে তুমি যেন ভগবানের নিন্দা শুনো না। তুমি যেন বোলো না ভগবানের ঐশ্বর্য নেই, ধাম নেই, লীলা নেই, লীলা-পরিকর নেই। তাঁর বিগ্রহও সচ্চিদানন্দাকার। ঈশ্বরের অপ্রাকৃত দেহ বা বিগ্রহ যে না মানে, সে দর্শন-স্পর্শনের অযোগ্য। ভগবানের নিন্দা শুনলে যে স্থানত্যাগ করে উঠে না যায়, সে তার সমস্ত সুকৃতি থেকে বিচ্যুত হয়।

ঈশ্বরই জগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। বলতে পারো, জগৎ যদি ব্রহ্মের পরিণাম হয়, তবে তো ঈশ্বর বিকারী হলেন। না, নিজের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত হয়েও অবিকৃত থাকেন। স্যমন্তক-মণি সোনার ভার প্রসব করে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার ক্ষয় বা বিকার ঘটে না। জগৎ ভ্রম নয়, মিথ্যা নয়, শুধু জীবদেহে আত্মবুদ্ধিই মিথ্যা। অদ্বৈতবাদীরা যে ভ্রম বলে, সেটাই ভ্রম। যা চোখের সামনে, চারদিকে দেখছি, তার অস্তিত্ব আদৌ নেই, এ হতে পারে না। অস্তিত্ব আছে, তবে এ নশ্বর, বিনাশশীল। অস্তিত্বই যদি না থাকে, তবে সৃষ্টি কী, ধ্বংসই বা কার?

প্রণবই ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ব্রহ্মঃ। পরিদৃশ্যমান জগৎই ওঙ্কার। ওঙ্কারই সর্বাশ্রয়, সর্বব্যাপক। যেহেতু প্রণব ব্রহ্মের স্বরূপ, সমস্ত বিশ্ব প্রণবের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রণবই বৃহত্তম বাক্য, আর সকল বাক্য প্রণবের চেয়ে ক্ষুদ্র। অথচ অদ্বৈতবাদী বলে, 'তত্ত্বমসি'-ই মহাবাক্য। প্রণব তো ঈশ্বরকেও বোঝায়, কিন্তু তত্ত্বমসি তা বোঝায় না। সুতরাং 'তত্ত্বমসি' প্রণবের চেয়ে ছোট। তত্ত্বমসি তাই মহাবাক্য হতে পারে না। অংশ কি কখনো পূর্ণের চেয়ে বড় হয়?

তত্ত্বমসি-র মানে কী? শঙ্কর জীবে-ব্রহ্মে অভেদ করতে চেয়েছিল, তাই সে মনে করেছে, তুমি জীব, তুমিই সেই ব্রহ্ম। কিন্তু ও-কথার আরেক অর্থও বিধেয়। শোনো। তস্য ত্বম্—তত্ত্বম্। অর্থাৎ তাহার তুমি। আর, অসি অর্থ হও। সর্বসাকুল্যে অর্থ হচ্ছে, হে জীব, তুমি ব্রহ্মের হও। তুমি ব্রহ্মের আছ। তুমি ব্রহ্ম নও, তুমি ব্রহ্মের একজন। তুমি তাঁর দাস, দাসানুদাস। আর এ অর্থই ভক্তিমার্গের।

এতক্ষণে তবে এসে গেল ভক্তির কথা। সম্বন্ধ বা প্রতিপাদ্য বিষয় হল ভগবান, অভিধেয় বা জীবের কর্তব্য হল সাধন-ভক্তি, আর প্রয়োজন হল ভগবৎ-প্রেম। এই সম্বন্ধ, অভিধেয় আর প্রয়োজন—তিন বস্তুই বেদের বর্ণনীয় ব্যাপার।

কী রকম ভগবান? মধুর, মধুর, মধুর হতে মধুর—এর বেশি আর কে কী বলতে পারে? আর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ, সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। আর, ভক্তের প্রীতি-রস-আস্বাদনেই ভগবান আনন্দিত। সাযুজ্য-মুক্তিতে নির্বিশেষ ব্রহ্মে আনন্দ কই? সেখানে কোথায় তাঁর প্রেমবশ্যতার অবকাশ? কোথায় মাধুর্যের তরঙ্গ-লীলা?

কী রকম অভিধেয় ? অভীষ্টকে পাবার জন্যে যে উপায়, তাই অভিধেয়। ভগবানকে কী করে জানা যায়, কী করে দেখা যায় ? ভগবানকে জানলে আর ভয় থাকে না। সমস্ত পাশ-ক্লেশ নষ্ট হয়, জন্ম-মৃত্যুতে ছেদ পড়ে। আর দেখলেও তাই। হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূরে যায়, কর্মের ক্ষয় হয়ে সংসার-গতাগতির উপশম ঘটে। কিন্তু উপায় কোথায় ? উপায় উপাসনায়।

যোগমার্গে সকলের অধিকার নেই। যে মনকে বশীভূত করতে পারে, সেই যোগের যোগ্য। যোগের জন্যে শুচি দেশ ও সুখাসনের দরকার। যোগ তাই অন্য-নিরপেক্ষ নয়। জ্ঞান সম্বন্ধেও তাই। জ্ঞানও ফলবস্তু হতে ভক্তির অপেক্ষা রাখে। জ্ঞানও অধিকার-ভেদের প্রশ্ন তোলে। শুধু শুদ্ধচিত্ত লোকই জ্ঞান-সাধনের অধিকারী।

সুতরাং যোগ বা জ্ঞান অভিধেয় হলেও, শ্রেষ্ঠ অভিধেয় নয়।

শ্রেষ্ঠ অভিধেয় ভক্তি। ভক্তি স্বতন্ত্র, অন্যনিরপেক্ষ। সার্বত্রিক। সমস্ত অবস্থায়, সমস্ত স্থানে, সমস্ত সময়ে। সমস্ত নিয়ম-নিষেধের নাগালের বাইরে। ভক্তি সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে স্বাভাবিক, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য।

আর প্রয়োজন—কিসের প্রয়োজন ?

যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে উপাসনা, তাই প্রয়োজন। উপাসনায় কী চাই ? সংসারভয় থেকে, ত্রিতাপজ্বালার থেকে উদ্ধার চাই। কিন্তু কে উদ্ধার চায়, যদি সে বোঝে যে জন্ম-জন্ম হৃদয়ের মধু দিয়ে পরমমধুরের সেবা করতে পারবে ? নৃসিংহকে কী বলেছিল প্রহ্লাদ ? বলেছিল, কর্মফলে আবার হাজার-হাজার জন্ম ঘুরে বেড়াতে হবে, কিন্তু যে-জন্মে যেখানেই থাকি না কেন, তোমাতে আমার ভক্তি যেন অবিচ্যুত থাকে। ইন্দ্রিয়ভোগবিষয়ে অবিবেকীর যেমন অবিচ্ছিন্ন প্রীতি, তেমনি আমার হৃদয়ে যেন তোমার প্রতি সে রকম রতি থাকে, আর সেই রতিতেই তোমাকে স্মরণ করি অহর্নিশ। রসস্বরূপকে পাওয়া অর্থই সেব্যরূপে পাওয়া। আর এই সেবা-বাসনাকে উদ্বোধিত করবার জন্যেই উপাসনা। আর যখন সেবা থেকে আনন্দ, সেই আনন্দই প্রেম। প্রেমই পরম প্রয়োজন।

এই তিন বস্তু,—সম্বন্ধ, অভিধেয় আর প্রয়োজন ছাড়া আর যা-যা শঙ্করাচার্য বলেছে, সমস্তই কল্পনাবলে। শঙ্করাচার্য মহাদেবের অবতার। মহাদেব হয়ে শঙ্কর বেদের কল্পিত অর্থ কেন করবেন ? ঈশ্বরের আদেশে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন শিবকে, তুমি আগমশাস্ত্রদ্বারা সকলকে আমার থেকে বিমুখ করো আর আমাকেও গোপন করে রাখো, যাতে সকলে বিষয়সুখে মত্ত হয়ে প্রজাবৃদ্ধিরই চেষ্টা করবে। 'আচার্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল। অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল ॥'

সমস্ত শুনে সার্বভৌম জড়বৎ নিশ্চল।

নির্বিশেষবাদ খণ্ডন হল। স্থাপন হল সবিশেষবাদ। সম্বন্ধ ভগবান, অভিধেয় ভক্তি, প্রয়োজন প্রেম, সাব্যস্ত হল নতুন তত্ত্ব। সার্বভৌমের মুখে কথা সরে না। একেই আমি কিনা অর্বাচীন বালক ভেবেছিলাম।

সার্বভৌমের বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করলেন গৌরহরি। বললেন, 'এতে বিস্ময়ের কী আছে ? ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ।'

পুরুষার্থ চারটি। ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ। পঞ্চম বা পরম পুরুষার্থই ভক্তি বা ভগবৎপ্রেম। এই প্রেম ব্রহ্মানন্দের চেয়েও লোভনীয়। এই প্রেম মহাধন। এই প্রেম কৃষ্ণের মাধুর্যরসের আস্বাদন করায়।

'প্রভু কহে—ভট্টাচার্য ! না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি—পরম পুরুষার্থ হয় ॥'

যারা আত্মারাম অর্থাৎ যারা আত্মাতে রমণ করে, অর্থাৎ যারা মায়ামুক্ত, যারা নির্গ্রন্থ অর্থাৎ যারা অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য, তারাও শ্রীহরিতে অহেতুকী ভক্তি করে থাকে। জানবে এমনই শ্রীহরির গুণ।

'দয়া করে এই শ্লোকটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করুন।' সার্বভৌম হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠল।

কেন এই চাঞ্চল্য ? সার্বভৌমও কি ভক্তির কথা শুনতে চায় ?

প্রভু বললেন, 'তুমি আগে ব্যাখ্যা করো।'

বিবিধ রকম অর্থ করল সার্বভৌম।

'তুমি বৃহস্পতি। এমন কেউ নেই তোমার মত শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু তুমি নয় রকম অর্থ করলে বটে, কিন্তু আমার মনে হয় এদের বাইরে আরো অর্থ নিহিত আছে।'

আঠারো রকম অর্থ করলেন প্রভু। সার্বভৌমের নয় অর্থের একটা অর্থও না ছুঁয়ে।

এই নবীন সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই মানুষ নয়। সার্বভৌমের চিত্তে দৈন্য উপস্থিত হল, ধূলো হয়ে গেল পাণ্ডিত্যের অভিমান। জাগল আত্মধিক্কার।

অমনি প্রভু কৃপা করলেন। সার্বভৌমের তখনি উপলব্ধি হল, এ সন্ন্যাসী কৃষ্ণ ছাড়া কেউ নন। পাণ্ডিত্যগর্বে প্রথমেই চিনতে পারিনি।

গর্ব নষ্ট হতেই সার্বভৌমের চিত্তে ভগবৎ-তত্ত্ব স্ফুরিত হল। দৃষ্টিতে লাগল দিব্যস্পর্শ।

দেখল, প্রভু তার সামনে ষড়ভুজমূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

পদতলে লুটিয়ে পড়ল সার্বভৌম। সর্বদেহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল। কাঁদতে লাগল দীনহীনের মত।

খবর পেয়ে ছুটে এল গোপীনাথ। কী ভীষণ কথা, সার্বভৌম নাচছে।

'সেই ভট্টাচার্যের এই গতি সম্ভব হল?' প্রভুকে লক্ষ্য করল গোপীনাথ। 'সেই শুষ্কজ্ঞানী তার্কিক পণ্ডিত ভক্তিরসের ভাবুক বনে গিয়েছে।'

'সে একমাত্র তোমারই সঙ্গগুণে।' বললেন প্রভু, 'তুমি ভক্ত, তোমার সান্নিধ্যহেতুই জগন্নাথ একে কৃপা করলেন।'

ভট্টাচার্য প্রভুর স্তুতি করতে লাগল। নির্মম লৌহপিণ্ডকে তুমি নবনীতে পরিণত করলে। রজ্জু ছাড়াই বাঁধলে বন্যহস্তীকে। জলসেক ছাড়াই জুড়িয়ে দিলে হৃদয়দাহ। কঠিন বজ্র অমৃতসরস হয়ে উঠল।

'জগৎ নিস্তারিলে তুমি—সেহ অল্পকার্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি—যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥'

একদিন কী হল, প্রভু অতি প্রত্যূষে মন্দিরে গিয়ে শয্যোত্থান দর্শন করলেন। পূজারী মালা আর প্রসাদ দিল প্রভুকে। মালা আর প্রসাদ প্রভু বাঁধলেন আঁচলে। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলেন। বেগে চললেন রাস্তা দিয়ে।

তখনো সূর্যোদয় হয়নি। সার্বভৌমের ঘরে এসে পৌঁছুলেন।

তখুনি সার্বভৌমের ঘুম ভাঙল। আর ঘুম ভাঙতেই সার্বভৌম বলে উঠল,—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ!

কখনো ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণনাম বলিনি তো! এ কেমন হল?

সার্বভৌম তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বেরিয়েই সামনে দেখতে পেল প্রভুকে। পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল।

আঁচল থেকে প্রসাদান্ন খুলে প্রভু দিলেন সার্বভৌমকে। সার্বভৌমের প্রাতঃকৃত্য হয়নি, স্নান-সন্ধ্যা হয়নি, মুখধোয়া হয়নি, তবু সেই আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইতস্তত না করে নিমেষে খেয়ে ফেলল প্রসাদান্ন। চৈতন্যপ্রসাদে তার সমস্ত জাড্য, সমস্ত বিমুখতা চলে গিয়েছে।

প্রসাদ সাধারণ অন্ন নয়, চিন্ময়বস্তু। তাই সে শুকনো হোক, বাসি হোক, দূরদেশ থেকে আনা হোক, কালহরণ না করেই তা ভোজন করবে। প্রসাদের সাক্ষাতে কোনো সময়ের বিচার করবে না। দিনে-রাত্রে যখনই তা উপস্থিত হবে, তখনই তা ভক্ষণ করবে সানন্দে।

অন্ন-প্রসাদ মহাপ্রসাদ। আর তা কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট বলেই মহাপ্রসাদ। 'কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।' মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য কেন? যেহেতু নিবেদিত বস্তুতে কৃষ্ণের অধরামৃতের স্পর্শ লাগে। 'এই দ্রব্যে এত স্বাদু কাঁহা হৈতে আইল। কৃষ্ণের অধরামৃত ইহাঁ সঞ্চারিল॥'

প্রসাদে সার্বভৌমের শ্রদ্ধা দেখে প্রভু সার্বভৌমকে প্রেমাবেশে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'আজ আমার ত্রিভুবন জয় হল, আজ আমি বৈকুণ্ঠে আরোহণ করলাম। সার্বভৌমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হয়েছে।'

দুজনে নাচতে লাগল বাহুবদ্ধ হয়ে।

'আজ তুমি নিষ্কপটে কৃষ্ণাশ্রয় হলে।' বললেন গৌরহরি, 'আর কৃষ্ণও তোমাকে নিষ্কপটে দান করলেন প্রেমভক্তি।' আরো বললেন, 'তোমার দেহে আত্মবুদ্ধি দূর হল, দূর হল মায়াবন্ধন। তুমি কৃষ্ণপ্রাপ্তির যোগ্য হলে। আর কথা কী! বেদধর্ম লঙ্ঘন করে তুমি প্রসাদভক্ষণ করেছ।'

সার্বভৌমকে নাচতে দেখে গোপীনাথ পরিহাস করে উঠল। 'সে কী, তুমি নাচছ কী বলে? আর এ কি নাচ হচ্ছে, না, লাফ দিচ্ছ পাগলের মত? তোমার পড়ুয়ারা কী বলবে? জগজ্জনে কী বলবে?'

সার্বভৌম বললে, 'যার যা খুশি বলুক, নিন্দে করুক, আমরা বিচার করব না। হরিরসের মদিরা পান করেছি, এখন আমরা নাচব, লাফাব, মাটিতে পড়ব, ধুলোয় গড়াগড়ি দেব—কে আমাদের বাধা দেয়।'

সার্বভৌমের সমস্ত অভিমানের খণ্ডন হল। চৈতন্যচরণ বিনা যার আশ্রয় নেই, ভক্তি ছাড়া আর নেই শাস্ত্রব্যাখ্যা।

জগন্নাথদর্শনে বেরিয়ে সার্বভৌম চলে এল প্রভুর কাছে। বললে, 'সাধনভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী তাই জানতে এসেছি।'

প্রভু বললেন,—'নামসংকীর্তন। হরিনাম ছাড়া কলিতে আর গতি নেই। শুধু হরিনাম করো। হরিনামই কলির সাধন। ধ্যান যোগ তপস্যা কলিকালের নয়। কলিকালে নামই পরম উপায়।'

জগন্নাথ দর্শন করে সার্বভৌম ঘরে ফিরল। সঙ্গে দামোদর আর জগদানন্দ। একটি তালপাতায় প্রভুর উদ্দেশে দুটি শ্লোক লিখল। মহাপ্রসাদ আর সেই তালপাতা জগদানন্দের হাতে দিল। বললে, 'যাও, প্রভুকে দিয়ে এস।'

জগদানন্দের হাত থেকে তালপাতা নিয়ে আগে পড়ল মুকুন্দ। নিজে কণ্ঠস্থ তো করলই, বাইরে প্রাচীরগাত্রে সেই শ্লোক দুটি লিখে রাখল।

প্রভুকে সেই তালপাতা দিতেই পড়ে ছিঁড়ে ফেললেন। নিজের স্তুতি চাননা শুনতে।

ভক্তকণ্ঠের রত্নহার সেই শ্লোক দুটো কী?

বৈরাগ্যবিদ্যা আর ভক্তিযোগ শেখাবার জন্যে করুণাসিন্ধু পুরাণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন—আমি তাঁর শরণ নিলাম।

যে ভক্তিযোগ কালপ্রভাবে নষ্ট হতে বসেছিল, তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধেয় যিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর চরণকমলে আমার চিত্তভৃঙ্গ প্রগাঢ়রূপে আসক্ত হোক।

আরেকদিন এসেছে সার্বভৌম। ভাগবতের ব্রহ্মস্তব পড়ছে।

'কবে ভগবানের কৃপা হবে—এই প্রতীক্ষায় জাগ্রত থেকে স্বকৃত কর্মফল ভোগ করতে-করতে যে কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্কার করে জীবন ধারণ করে, সেই ভক্তিপদে দায়ভাগী থাকে।'

প্রভু বললেন, 'কথাটা তো 'মুক্তিপদে' আছে, তুমি 'ভক্তিপদে' বলছ কেন?'

'ফল মুক্তি নয়, ফল ভক্তি।' বললে সার্বভৌম। 'মুক্তি তো দণ্ড বিশেষ। মুক্তি হলে ভগবৎ-সেবাসুখ থেকে বঞ্চিত হতে হল। যাতে সুখ নেই, তা দণ্ড ছাড়া আর কী?'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'পাঠ বদলাবার কী দরকার। মুক্তিপদ অর্থাৎ মুক্তি পদে যাঁর, সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে বোঝায়। কিন্তু তোমার মুক্তি-শব্দেই ঘৃণা আর ত্রাস, আর ভক্তি-শব্দে পরমানন্দ।'

যে শুধু মায়াবাদ পড়ত আর পড়াত, তার মুখে এখন ভক্তিছাড়া কিছু নেই। এ চৈতন্যপ্রসাদ ছাড়া আর কী। লোহাকে ছুঁয়ে যতক্ষণ না তাকে সোনা করা যায়, ততক্ষণ মণিকে কেউ স্পর্শমণি বলে না। সার্বভৌমের বৈষ্ণবতা দেখে এ আর কারু সন্দেহ রইল না যে, যে তাকে ছুঁয়েছে সে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন।

[ক্রমশঃ।

শরীর-বিজ্ঞানে বেদনাবোধের মূল্য

ব্যথা-বেদনাহীন মানুষ, কথাটা শুনতে বিস্ময়কর মনে হলেও সত্যি। কিছুদিন আগেই পাশ্চাত্যের এক দেশে এমন একটি মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে দৈহিক বেদনাবোধ যার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। নিউইয়র্কের হাসপাতালে সেদিন এক বাইশ বৎসর বয়স্ক যুবককে আনা হয়েছিল, যার কোন বেদনাবোধ নেই এবং সেটাই বোধ হয় তার ব্যাধি।

কিছুদিন মাত্র পূর্ব্বেই তার বাঁ হাতটি অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায়, সে সময়ে হাতের চামড়া পুড়ে গিয়ে মাংস বেরিয়ে পড়লেও নাকি যুবকটি সামান্য একটু সুড়সুড়ি ছাড়া আর কোন ব্যথা বোধ করে না।

এখন বক্তব্য এই যে, উক্ত যুবকটি কি আমাদের অর্থাৎ সাধারণ মানুষদের ঈর্ষার পাত্র?

এ কথায় উত্তর—না, কেন এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে, বেদনাবোধ একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক শারীরবৃত্তি তার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি শরীরের পক্ষে কল্যাণপ্রদ নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বেদনাবোধের অনস্তিত্বের ফলে ওই যুবকটি অকালে তিনটি দাঁত খোয়াতে বাধ্য হয়েছে, দন্তশূল টের না পাওয়ায় সে সময়মত চিকিৎসা করতে পারেনি, ডাক্তারের কাছে নিয়মমাফিক যাওয়ার অভ্যাস থাকাতেই ব্যাপারটা ধরা পড়ে আরও বেশী কিছু ঘটবার আগেই। যে কোন ব্যাধির পদক্ষেপেরই সূচনা আমরা অনুভব করি এই বেদনাবোধের মাধ্যমে, শরীরকে চরম বিপর্য্যয়ের হাত থেকে রক্ষাও আমরা করতে সচেষ্ট হই এরই সময়োচিত আবির্ভাবে, সুতরাং বুঝতেই পারা যাচ্ছে যে, শারীর-বিজ্ঞানে বেদনাবোধ শুধু অপরিহার্য্যই নয়, অবশ্য প্রয়োজনীয়ও। বেদনাবোধ-হীন জীব তাই আমাদের ঈর্ষার পাত্র না হয়ে বরং দয়ারই।

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ গুহ মজুমদার

[নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপালের অধ্যক্ষ এবং সুপারিন্টেনডেন্ট]

মানুষের জীবনে সাফল্য অর্জ্জনের জন্যে যা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, তা হচ্ছে—উদ্যম, অধ্যবসায়, কর্ম্মনিষ্ঠা ও সততা। এই মূলধন থাকলে, যত প্রতিকূল অবস্থাই থাকুক, মানুষকে কখনই পিছিয়ে দিতে পারে না; সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সম্ভব হয়ে ওঠে তার নিশ্চিত উন্নতি ও অগ্রগতি। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই বর্ত্তমান কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেডিকেল শিক্ষায়তন ও হাসপাতাল নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও সুপারিন্টেনডেন্ট ডাঃ রবীন্দ্রনাথ গুহ মজুমদারের জীবনে। ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের (বর্ত্তমানে পূর্ব্ব-পাকিস্তান) এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তারপর নিজের অধ্যবসায়, কর্ম্মনিষ্ঠা ও সততায় আজ উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-বি ডিগ্রীলাভের পর মাত্র পঞ্চাশ টাকা বেতনে সুরু হয় তাঁর কর্ম্মজীবন।

ডাঃ গুহ মজুমদার যাঁদের সাহায্যে ও অর্থানুকূল্যে সাফল্যময় জীবনপথে অগ্রসর হ'তে সমর্থ হ'য়েছেন, আজও কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি তাঁদের নাম উল্লেখ করতে বিস্মৃত হন না। প্রথমেই উল্লেখ করলেন তাঁর মাতুল কুচবিহারের এডভোকেট স্বর্গত সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদারের কথা। তাঁর গৃহেই তাঁর কলেজী জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। তারপর কলকাতা কারমাইকেল (বর্ত্তমানে আর, জি, কর মেডিকেল) কলেজে অধ্যয়নের সময় তিনি সন্তোষের (ময়মনসিংহ) জমিদার হেমেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরীর কাছ থেকে সাহায্য পান। তারপর সাহায্য পান তাঁর শ্বশুর ময়মনসিংহের স্বর্গত করুণামোহন ঘোষের নিকট থেকে। সর্ব্বশেষ আর্থিক আনুকূল্য লাভ করেন ইংলণ্ডে যাবার সময় কুচবিহারের বর্ত্তমান মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের কাছ থেকে। এ থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় ডাঃ গুহ মজুমদারের মনুষ্যত্ব-বোধ কত উঁচু ধরণের।

১৯০৭ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর ডাঃ রবীন্দ্রনাথ গুহ মজুমদার জন্ম গ্রহণ করেন কুচবিহারে তাঁর মাতুল স্বর্গত সুরেন্দ্র কান্ত বসু মজুমদারের গৃহে। তাঁর পিতা শ্রীতেজেন্দ্রনাথ গুহ মজুমদার পূর্ব্ব-পাকিস্তানের মানিকগঞ্জের আইন-ব্যবসায়ী। বর্ত্তমানে তাঁর বয়স ৮২ বৎসর। তিনি ২৪পরগণা জিলার গরিয়ায় বসবাস করছেন।

মানিকগঞ্জ হাইস্কুলে ডাঃ গুহ মজুমদারের শিক্ষা সুরু হয় এবং সেখান থেকেই ১৯২৩ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন প্রথম বিভাগে। অঙ্ক এবং সংস্কৃত বিষয়ে তিনি "লেটার" পান। তারপর এসে ভর্ত্তি হলেন কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে। সেখান থেকে ১৯২৫ সালে প্রথম বিভাগে আই, এস, সি এবং ১৯২৭ সালে সসম্মানে বি, এস, সি ডিগ্রী লাভ করেন। ডাঃ গুহ মজুমদারের ইচ্ছে ছিল তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন কিন্তু অর্থের স্বচ্ছলতা না থাকায় তাঁর সে সঙ্কল্প ফলবতী হয়নি। ১৯২৭ সালে বি-এস-সি ডিগ্রীলাভের পর তিনি কারমাইকেল (বর্ত্তমানে আর, জি, কর) মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৯৩৩ সালে এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং চক্ষু চিকিৎসা বিষয়ে মেডল পান। তারপর ১৯৪৮ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এফ, আর, সি, এস (F. R. C. S.) এবং গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এফ, আর, এফ, পি এণ্ড এস (F. R. F. P & S.) হন।

১৯৩৩ সালে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ডাঃ গুহ মজুমদার একবছর কারমাইকেল (বর্ত্তমানে আর, জি, কর) মেডিকেল কলেজে প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক ডাঃ কেদারনাথ ঘোষের অধীনে হাউস সার্জ্জেনের কাজ করেন। তারপর কিছুদিন চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনে ডাঃ সুবোধ মিত্রের অধীনে হাউস সার্জ্জন ছিলেন এবং পরে তিনি যান কুচবিহারে ১৯৩৬ সালে। কুচবিহার রাজ্যের সদর হাসপাতালে মাত্র ৫০্ টাকা ভাতা গ্রহণ করে অবৈতনিক 'ফিজিসিয়ান' হিসেবে কাজে যোগ দেন। এইভাবে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত চলে। ১৯৩৯ সালে কুচবিহারের মেকলিগঞ্জের হাসপাতালে একশত টাকা বেতনে হাউস সার্জ্জন নিযুক্ত হন। ১৯৪০ সালে এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন হন। তারপর তিনি ধাপে ধাপে উন্নতি করতে

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ গুহ মজুমদার

থাকেন। ১৯৪৬ সালে সিভিল সার্জ্জেনের কাজ করেন এবং ১৯৫১ সালে স্থায়িভাবে সিভিল সার্জ্জন পদে উন্নীত হ'ন। ১৯৫১ সালে কুচবিহার রাজ্য যখন পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন ডাঃ গুহ মজুমদারও রাজ্যসরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে সিভিল সার্জ্জন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হ'ন। ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি সিভিল সার্জ্জন হিসেবে কুচবিহারে ছিলেন। তারপর ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে দার্জ্জিলিং-এর সিভিল সার্জ্জন হ'য়ে বদলি হন। ১৯৫৭ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি ২৪-পরগণার সিভিল সার্জ্জন হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদানের পর ১৯৫৯ সালের জুন মাসে তিনি নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও সুপার হিসেবে যোগদান করেন এবং অদ্যাবধি তিনি সেখানেই সুনামের সঙ্গে কাজ করে আসছেন।

ডাঃ গুহ মজুমদার বহু জনহিতকর ও শিক্ষা-সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটর, একাডেমী কাউন্সিলের, ফেকাল্টি অফ ভেটানারী সার্ভিসেস, আণ্ডার গ্রাজুয়েট বোর্ড অফ মেডিসিনের, সার্জ্জারী বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল, ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি প্রভৃতি সংস্থার সদস্য।

ডাঃ গুহ মজুমদার ১৯২৯ সালে করুণামোহন ঘোষের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী যুথিকাকে বিবাহ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ভারতী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, বি, টি, দ্বিতীয়া কন্যা চৈতা এবারে এম-এ, পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীমান সৌরীন্দ্রনাথ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। ব্যক্তিগত জীবনে ডাঃ গুহ মজুমদার অমায়িক, নিরহঙ্কার এবং সর্ব্বদাই জনকল্যাণকর কাজ করার জন্য আগ্রহশীল। নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে ছাত্রদের এবং হাসপাতালের সুপার হিসেবে রোগীদের এবং হাসপাতালের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তিনি সর্ব্বদাই জনকল্যাণকর নতুন কিছু গঠন করার জন্যে উদগ্রীব। তিনি আরও বহুদিন বেঁচে থেকে দেশের ও জনগণের—বিশেষভাবে আর্ত্ত ও রোগীদের—কল্যাণকার্য্যে ব্রতী থাকুন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

রণেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত

(ভারতীয় পাটকল সমিতির উপদেষ্টা)

বড় হ'তে গেলে, জীবনে খ্যাতি ও মর্য্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে হলে যতগুলি গুণ থাকা দরকার, তার কোনটিরই অভাব ঘটেনি ভারতীয় পাটকল-সমিতির উপদেষ্টা, নিরলস কর্ম্মী, আজীবন উদ্যমশীল মানুষ শ্রীরণেন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের মধ্যে। বাংলাদেশে যাত্রামোহন সেনের নাম শোনেননি এমন লোক বোধ হয় কেউ নেই। রাজা না হয়েও, দান-ধ্যান প্রীতি-ভালবাসা-সেবা প্রভৃতি গুণের মধ্যে দিয়ে যাত্রামোহন বাবু জনগণের রাজা হয়েছিলেন, লোকে তাঁকে দু'বেলা পুজো করতো। বাংলা দেশে তখন বোধহয় খুব কম লোকই ছিল, যারা যাত্রামোহন বাবুর কাছ থেকে কোন না কোনভাবে উপকার না পেয়েছেন।

রণেন্দ্র মোহন এই সুপ্রসিদ্ধ পরিবারেরই সন্তান, যাত্রামোহন বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র এবং দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যাত্রামোহন বাবুর ৮টি পুত্র ও ৬টি কন্যা; তার মধ্যে বর্ত্তমানে রণেন্দ্র মোহন-ই একমাত্র জীবিত।

ইংরাজী ১৯০৬ সালের ২২শে মে চট্টগ্রামে রণেন বাবুর জন্ম। জন্মলাভের অব্যবহিত পরেই রণেন বাবুর মা মারা যান; তাঁর জাঠতুতো বোন বরমা গ্রামে নিয়ে এসে তাঁকে লালন পালন করেন।

রণেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত

১৯০৯ সালে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা দেশপ্রিয় জে, এম, সেনগুপ্ত শ্রীমতী নেলী গ্রেকে বিবাহ করে বিলেত থেকে ফিরে এসে কোলকাতায় বসবাস করতে থাকেন; তখন রণেন্দ্র মোহনও তাঁর দাদার বাসায় কোলকাতায় চলে আসেন। যখন তাঁর ৫ বছর বয়স তখন তিনি ডায়সেসন্ গার্লস স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৯১৪ সালে যখন তাঁর ৮বছর মাত্র বয়স তখন তিনি শান্তিনিকেতনে চলে আসেন এবং শিশু-বিভাগে ভর্ত্তি হন। শান্তিনিকেতনে থাকা কালীন তাঁর জীবনের সব চেয়ে গৌরবময় অধ্যায় রচিত হয়। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর সরাসরি শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হয়েছে। দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে শিখিয়েছেন গান, জগদানন্দ রায় তাঁকে শিখিয়েছেন বিজ্ঞানের কথা, পণ্ডিত ক্ষিতি মোহন সেনের কাছে তিনি পেয়েছেন সংস্কৃত শিক্ষা আর শিল্পী অসিত হালদারের কাছে হয়েছে তাঁর শিল্প-কলার হাতে-খড়ি। দীনবন্ধু এ্যাণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন—এদের কাছে শিখেছেন নির্ভুল ইংরাজী। রণেন বাবুর জীবনের বনিয়াদ এই শান্তিনিকেতনেই তৈরী হয়েছে; ভারতীয় কৃষ্টির মূল আদর্শের সঙ্গে এইখানেই তিনি পরিচিত হন। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় কোলকাতায় যেদিন প্রথম "ফাল্গুনী" নাটকের অভিনয় হয়, রণেন্দ্র মোহনের সেই নাটকে অংশ গ্রহণ করারও সৌভাগ্য হয়েছিল।

১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কোলকাতার বিশপ স্কুলে এসে ভর্ত্তি হন, এবং ১৯২৩ সালে এইখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ সালে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ থেকে আই, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বিলাত যান এবং ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। ১৯২৮ সালে ঐ

বিশ্ব-বিত্তালয় থেকেই বি, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর স্বদেশে ফিরে এসে তিনি "এ্যাডভান্স" পত্রিকার ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ঐ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কাজেও সহায়তা করেন। ১১৩৪ সালে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ব্বাচিত কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবুনালের এসেসর নিযুক্ত হন। ১১৩৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে আসীন ছিলেন। এই সময় তিনি দক্ষিণ-ভারতের প্রসিদ্ধ লেখিকা পদ্মিনী সত্যনাথনের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। ১১৩১ সালে রণেন্দ্র মোহন টাটায় চাকুরি গ্রহণ করেন এবং দু'বছর এখানে চাকুরি করার পর ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের লেবার-অফিসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিজের বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ও কর্ম্মশক্তির দ্বারা তিনি ঐ সমিতির শ্রম-উপদেষ্টা পদে উন্নীত হন এবং আজও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি ঐ পদের গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

শ্রী সেনগুপ্ত ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট-অফ পার্সোনাল ম্যানেজমেণ্টের সভাপতি, ভারতের সেফটি-ফার্ষ্ট এসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ-শাখার সহ-সভাপতি, ব্যারাকপুরের হরিজন বিত্তালয়ের সভাপতি, কর্ম্মচারী রাজ্যবীমা কর্পোরেশনের আঞ্চলিক পর্ষদেরও তিনি সদস্য। এ ছাড়া আরও বহু সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত। ১১২৫ সালে মহাত্মা গান্ধী চট্টগ্রাম সফরে গিয়ে—যাত্রামোহন সেনের বাড়ীতে যখন আতিথ্য গ্রহণ করেন, সেই সময় রণেন্দ্র মোহন তাঁর পরিচর্য্যার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং গণ্যমান্য সকল মনীষীদের সংস্পর্শে আসার তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে পাটকল-শিল্পে প্রায় দু'লক্ষ শ্রমিক আছেন। এই সব শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে যাতে সৌহার্দের বন্ধন গড়ে ওঠে, যাতে উভয়ের মধ্যে বলিষ্ঠ বোঝাপড়ার মাধ্যমে পাটকল একটি আদর্শ শিল্পে পরিণত হয়, তার জন্মে শ্রীসেনগুপ্ত গত ২০ বছর যাবৎ আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি মনে করেন, পাটকল শ্রমিকরা যেদিন সুসংগঠিত হবে, সেদিন পাটশিল্পে এক নব অধ্যায় রচিত হবে, রাজনৈতিক প্ররোচনা গঠনের হাত থেকে দু'লক্ষ শ্রমিক শুধু রক্ষাই সেদিন পাবে না, আর্থিক অবস্থারও তাদের উন্নতি হবে, সত্যিকারের কল্যাণ তাদের জীবনে নেমে আসবে। পাটশিল্পে সে সুদিন তিনি যেন দেখে যেতে পায়েন, শান্ত, নম্র, সুমিষ্টভাষী কর্ম্মদক্ষ কৃতী রণেন্দ্র মোহন মনে প্রাণে ইহাই কামনা করেন।

অনিল কুমার চন্দ

[বিশিষ্ট-শিক্ষাবিদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী]

বাংলাদেশে বা বাংলার বাহিরে জ্ঞানী গুণী বাঙ্গালীর অভাব নাই; কিন্তু একই পরিবারে বহু গুণীর সমাবেশ খুব কমই দেখা যায়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল কুমার চন্দ এই রকম একটি পরিবারের সন্তান। ১১০৬ সনে আসামের শিলচরে অনিলবাবুর জন্ম। পৈতৃক নিবাস শ্রীহট্টের ছাতি-আইন গ্রামে। পিতা কামিনী কুমার চন্দ ছিলেন সে যুগের একজন নামকরা দেশহিতব্রতী।

অনিলবাবুর শিক্ষা শান্তিনিকেতন, ঢাকা ও লণ্ডনে। শান্তি-নিকেতনে বিশ্বকবির আদর্শে তিনি কিছুকাল মানুষ হন; তারপর ঢাকা বিশ্ববিত্তালয়ের থেকে বি-কম ডিগ্রী লাভ করে বিলাত যান। লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে শেষ ডিগ্রী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং শান্তিনিকেতনে বিশ্বকবির একান্ত-সচিব হিসাবে কাজ করেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধী, শ্রীনেহরু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ শুধু নয়, পৃথিবীর বহু মনীষীর সংস্পর্শে আসার তাঁর সৌভাগ্য হয়।

১১৩৮ সালে তিনি বিশ্বভারতীর ডিগ্রী-কলেজ শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১১৫২ সাল পর্য্যন্ত ঐ পদে কাজ করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসাবে এই সময় তাঁর খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর আহ্বান আসতে থাকে, কিন্তু তিনি বিশ্বকবির শান্তিনিকেতন ছেড়ে পয়সার লোভে অন্য কোথাও যেতে চাইলেন না। তবে তিনি বাংলাদেশের বহু শিক্ষা-সংস্থার সঙ্গে সদস্য হিসাবে জড়িত হলেন। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন তিনি গ্রামোন্নয়নের কাজে মন দেন। শ্রীনিকেতন এবং কাছাকাছি অনেক গ্রামের কল্যাণমূলক কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

হাসি ঠাট্টা, প্রাণচঞ্চল জীবনের মধ্যে দিয়ে তাঁর শান্তিনিকেতনের জীবন কাটিয়ে আসছেন। জীবনে অনেক কিছুই ঘটে কিন্তু সব কি আর কারুর মনে থাকে? শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন মনীষী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর অনেক সময় এমন কথাবার্ত্তা হয়েছে, যেগুলি তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্মৃতিপটে সেগুলি এখনও পরিষ্কার ধরা আছে।

কোণারকের বারাণ্ডায় একসময় সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে তাঁর গল্পগুজব হচ্ছিল। শ্রীমতী নাইডু রসিকতার ছলে অনিল বাবুকে বললেন—'তুমি কিচ্ছু নও, একেবারে হোপলেস্! দেখো দিকি রাণীর (অনিলচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী) কত নাম!' অনিলবাবুও

অনিল কুমার চন্দ

ছাড়বার পাত্র নন, তিনিও রসিকতার ছলে জবাব দিলেন—'হাঁ মা, আমি যে মিঃ সরোজিনী নাইডু'।

একবার বিশ্বকবি অনিলবাবুকে ডেকে বললেন—একটা নাটক হবে, তোকে একটা পার্ট নিতে হবে। অনিলবাবু সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন। রিহার্সাল সুরু হল। 'বল্ আকাশে মেঘ করেছে'। অনিলবাবু বললেন—'আকাশে ম্যাঘ করেছে।' 'ম্যাঘ' আর কিছুতেই 'মেঘ' হল না। রবীন্দ্রনাথ রেগে গিয়ে বললেন —'বাঙ্গালকে নিয়ে আর পারিনা'। কিন্তু তা সত্তেও তিনি অনিলবাবুকে দিয়ে ঐ পার্টই করালেন; শুধু 'মেঘে'র পরিবর্ত্তে 'কুয়াশা' শব্দ যুক্ত হল অনিলবাবুর সুবিধার জন্য।

১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনে বীরভূম লোকসভার আসনে কংগ্রেসী প্রার্থী হিসাবে তিনি বিপুল ভোটে নির্ব্বাচিত হন। লোকসভা চলাকালীন তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু তাঁকে তাঁর সহকারী হিসাবে পররাষ্ট্র-দপ্তরের উপমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেন। এই সময় ভারতের প্রতিনিধি হয়ে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে টিউনিসার ওপর তাঁর ভাষণ বিশ্বের কূটনৈতিক মহলে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করে। তিনি নেপালে ও ইরাকে রাজার অভিষেক-অনুষ্ঠানে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যোগ দেন এবং রুশিয়া ও চীনেও পরপর দুটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব করেন। ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচনেও প্রথমবারের চেয়ে আরও বেশী ভোট পেয়ে লোকসভায় নির্ব্বাচিত হন। এইবার শ্রীনেহেরুর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পূর্ত্ত, গৃহ নির্ম্মাণ ও সরবরাহ-দপ্তরের উপমন্ত্রী নিযুক্ত হন। জন-প্রতিনিধিরূপে শ্রীচন্দ শুধু ভারতের নয় বাংলাদেশেরও অনেক কাজ করেছেন বা করবার চেষ্টা করেছেন। বর্দ্ধমান জেলার সিঙ্গী গ্রামে কবি কাশীরাম দাসের স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠা শ্রীচন্দের অন্যতম কীর্ত্তি। বহু গ্রামে হাসপাতাল, স্কুল ও গ্রন্থাগার স্থাপনে তাঁর উদ্যোগ ও সাহায্য আজ সুবিদিত। আসামে বাঙ্গালী বিতাড়ন পর্ব্ব ও শিলচরে গুলি চালনার পরে ঐ রাজ্যে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়, তার অবসানকল্পে ও আসামের ভাষা-সমস্যার সমাধানে তিনি সেই সময় বাঙ্গালীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ফরমূলা প্রস্তুতের ব্যাপারে তাঁর অনেক হাত ছিল।

শ্রীচন্দ একজন সুলেখক এবং ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় তাঁর দখল প্রশংসনীয়। "একেসিয়া" ছদ্মনামে লিখিত তাঁর ইংরেজী রচনাবলী সাহিত্যিক মহলে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে। শিল্পী ও লেখিকা শ্রীমতী রাণী চন্দ শ্রীচন্দের সহধর্ম্মিণী। অনিলবাবুর অপর তিন ভাইও দেশের এক একজন কৃতী সন্তান এবং জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। জ্যেষ্ঠভ্রাতা অপূর্ব্ব চন্দ ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ, মধ্যম ভ্রাতা অরুণ চন্দ ছিলেন শিলচর জিসি কলেজের অধ্যক্ষ এবং মেজদাদা অশোককুমার চন্দ অর্থ-কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন।

তিন ভাইয়ের মত অফুরন্ত জ্ঞানের অধিকারী অনিলবাবুও। চায়ের টেবিলেই বলুন, আর যে কোন আলোচনা-সভায় বা বৈঠকেই বলুন, যে কোন বিষয়ের ওপর বলিষ্ঠ যুক্তির অবতারণা করে দীর্ঘ সময় ধরে বিতর্ক করার প্রতিভা রাখেন অনিলবাবু। কথার চেয়ে কাজই তাঁর কাছে কিন্তু বড় কথা।

শ্রীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

(মধ্যপ্রদেশের স্বনামধন্য ব্যক্তি)

লোকের মুখে এই ভদ্রলোকের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলাম। তাই একদিন তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু সুস্থকায়, সবল ও সন্ন্যাসীপ্রতিম ব্যক্তিটির সাথে প্রথম পরিচয়ের আগে বিশ্বাস হয়নি যে, তিনি আশীর উর্দ্ধে বয়স অতিক্রম করেছেন। তিনি হলেন জব্বলপুর-নিবাসী চুরাশী বৎসর বয়স্ক শ্রীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

খড়দহ (২৪ পরগণা) নিবাসী ৺রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ডাকবিভাগে চাকুরী লইয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইউ, পি,তে আসিয়া সি, পি,র হোসাঙ্গাবাদ জিলায় ৪০৲ টাকা মাসিক মাহিনায় পোষ্টমাষ্টার হন। তখন ২ পয়সায় আড়াইসের দুধের রাবড়ী তিনি প্রত্যহ খাইতেন। কিন্তু প্রাতে গো ও ব্রাহ্মণকে না খাওয়াইয়া তিনি স্বয়ং আহার্য্য গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার পুত্র ৺মোহনচাঁদ চট্টোপাধ্যায় উর্দু, পারশী ও ইংরাজীভাষা বিশেষজ্ঞরূপে সামান্য সরকারী চাকুরি হইতে Extra Assistant কমিশনার হিসাবে

শ্রীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

অবসর গ্রহণ করেন। মোহনচাঁদ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন শ্রীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠ হলেন শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইঁহাদের মাতা ৺মোক্ষদা দেবীর পিতৃগৃহ শ্রীরামপুর চাতরায়।

মনোরঞ্জন প্রথমে দামো (Damoh) হিন্দী বিদ্যালয় ও পরে জব্বলপুর হইতে ছাত্রবৃত্তি, এণ্ট্রান্স, এফ্-এ, ও বি-এ পাশ করেন।

১৯১০ সালে এলাহাবাদ হইতে আইন গ্র্যাজুয়েট হইয়া জব্বলপুর কোর্টে ব্যবসায় সুরু করেন। ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯৪০ সালে তিনি উহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

পূর্ব হইতেই তিনি নিজেকে নানারূপ জনহিতকর কাজে লিপ্ত করেন। আদালত-প্রাঙ্গণ ছাড়িবার পর হইতে আজ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন জনসেবা-প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত রহিয়াছেন।

১৮৯৩ সালে ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীরা জব্বলপুরে বাঙালী মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় খুলেন। কিন্তু ঠিকমত প্রয়োজন না মিটানর জন্য শ্রী চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বরাট, অধ্যাপক বক্সী, কিরণচন্দ্র মিত্র ও দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৬ সালের ১লা নভেম্বর বেসরকারী বেঙ্গলী গার্লস স্কুল স্থাপনা করেন। ১৯৩১ সালে মনোরঞ্জনবাবু মাতা ৺মোক্ষদা দেবীর স্মৃতিপূত বিদ্যালয়-ভবন প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন। ইতিপূর্বে ১৯২৫ সালে তাঁহার পিতার নামে সহরের কেন্দ্রস্থলে "মোহন-ভবন" নির্মাণ করাইয়া তিনি "সিটী বেঙ্গলী ক্লাব"কে লাইব্রেরী স্থাপনে সাহায্য করেন।

প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারের মেয়েদের বাঙ্গলাভাষা সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করা প্রয়োজন বিধায়—মোক্ষদা দেবী বালিকা-বিদ্যালয়ের পত্তন হয় এবং তৎসংলগ্ন বাঙ্গালা পুস্তকের গ্রন্থাগার—আজ জব্বলপুরের বাঙ্গালীদের চাহিদা প্রায় পূর্ণভাবে মিটাইতে সক্ষম হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রকাশিত বিশিষ্ট গ্রন্থরাজি উহাতে নিয়মিত রক্ষিত হয়। প্রথম জীবন হইতে মনোরঞ্জনবাবু কৃষিকর্মের প্রতি আগ্রহী হন এবং এখনও নিয়মিত নিজ খামারে উহা তদারক করিয়া থাকেন। এলাহাবাদ নিবাসী ৺আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণবালা দেবীর সহিত শ্রী চট্টোপাধ্যায় বিবাহসূত্রে আবদ্ধ। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীগিরিশচন্দ্র জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষা বিভাগের ডীন, দ্বিতীয় শ্রীসন্তোষচন্দ্র মধ্য রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং কনিষ্ঠ শ্রীঈশান চন্দ্র জব্বলপুর করপোরেশনের বিদ্যালয়-সমূহের সুপারিন্টেনডেন্ট। মনোরঞ্জনবাবুর পিতৃদেব-লিখিত ডায়েরী হইতে প্রায় শতবর্ষ পূর্বের বাঙ্গালা ও মধ্যপ্রদেশের তদানীন্তন সামাজিক পরিবেশের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। তৎসঙ্গে ইঁহাদের পারিবারিক ইতিহাসও রহিয়াছে।

মধ্যপ্রদেশে এই নিষ্ঠাবান ব্যক্তিটি যে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র—তাহা শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরিচয়ে পরিস্ফুট হয়।

॥ শিক্ষার্থী বঙ্কিমচন্দ্র ॥

বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী অবশ্যপাঠ্য বিষয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে শেক্সপীয়রের *Macbeth*, ড্রাইডেনের *Cymon and Iphigenia*, অ্যাডিসনের *Essays* প্রভৃতি পড়িতে হইয়াছিল। বাংলায় পাঠ্য ছিল—মহাভারত (প্রথম তিন পর্ব্ব), 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'পুরুষপরীক্ষা'। বি-এ পরীক্ষার বিষয়গুলি, পরীক্ষকবর্গের নাম সমেত নিম্নে দেওয়া হইল :—

English, Greek and Latin—W. Grapel, Esq. M.A., Presidency College.

Sanscrit, Bengali, Hindee and Oorya—Pundit Isserchunder Bidyasagar, Principal, Sanscrit College.

History and Geography—E. B. Cowell, Esq., M. A., Professor, Presidency College.

Mathematics and Natnral Philosophy—The Revd. T. Smith, Professor, Free Chnrch Institution.

Natural History and Physical Sciency—H. S. Smith, Esq., B. A., Professor, Civil Engineering College.

Mental and Moral Sciences—The Revd. A. Duff, D. D.

—University of Calcutta. Minutes for the Year 1857. P. 125.

১১ ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখের সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে ভাইস-চ্যান্সেলার তাঁহার বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করিলে পর, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসুকে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করেন। তৎপরে উভয়কেই বি-এ উপাধি প্রদত্ত হয়।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বি-এ পরীক্ষা দিবার পর বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে লাগিলেন। কলেজের হাজিরা-বইয়ে প্রকাশ, তিনি "3rd year Law Student" হিসাবে পরবর্ত্তী ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত কলেজে হাজিরা দিয়াছিলেন। ইহার পর বঙ্কিমের আর কলেজে উপস্থিত হইতে হয় নাই; তিনি যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর হইয়াছিলেন।

চাকরি করিতে করিতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

বি-এল পরীক্ষায় কি কি বিষয়ে প্রশ্নপত্র ছিল, তাহার একটি তালিকা পরীক্ষকদিগের নাম সমেত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের ক্যালেণ্ডার হইতে উদ্ধৃত করা হইল :—

Jurisprudence	Mr. C. J. Wilkinson
Personal Rights and Status	do.
The Law of Contracts	do.
Rights of Property	Mr. W. Jardine, M. A., LL. M.
Procedure and Evidence	do.
Criminal Law	do.

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চিঠি

কল্যাণীয়েষু,

মণিলাল, আমি "শিশু"র গোটাকতক কবিতা তর্জ্জমা করেছি, সেগুলো এঁদের খুব ভাল লেগেছে। Rothenstein এর ইচ্ছা অবন কিম্বা নন্দলাল যদি গোটা তিন চার ছবি করে দিতে পারেন তাহলে একটি ছোট বই করে ছাপতে দেন। অবনের হাত থেকে চটপট ছবি বের করা শক্ত, অতএব নন্দলাল যদি শীঘ্র গোটাকয়েক ছবি করে পাঠাতে পারেন তবে ভাল হয়। অক্টোবরের মধ্যে আমাদের পাওয়া চাই। Reproduction খুবই ভাল হবে। নিম্নলিখিত কবিতাগুলি তর্জ্জমা করা হয়েছে :—১ জগৎ পারাবারের তীরে, ২ জন্মকথা, ৩ খোকা, ৪ অপযশ, ৫ বিচার, ৬ চাকুরী, ৭ নির্লিপ্ত, ৮ কেন মধুর, ৯ ভিতরে ও বাহিরে, ১০ প্রশ্ন, ১১ সমব্যথী ১২ বিজ্ঞ, ১৩ ব্যাকুল, ১৪ সমালোচক, ১৫ বীরপুরুষ, ১৬ রাজার বাড়ি, ১৭ নৌকাযাত্রা, ১৮ জ্যোতিষশাস্ত্র, ১৯ মাতৃবৎসল, ২০ লুকাচুরি, ২১ বিদায়, ২২ কাগজের নৌকা,। এর মধ্যে থেকে যে কটা খুসি চেষ্টা করে দেখতে বোলো। গগন যদি করতে পারেন তা তাহলে আমি আরো খুসি হই। যদি চেষ্টা করতে গিয়ে একবার তার হাত খুলে যায় তাহলেই ভাল হয়—সবগুলো শেষ করে পাঠাতে হলে দেরী হবে। তোমাদের চারিদিকে ষষ্ঠীর প্রসাদে খোকাখুকির ত অভাব নেই, অতএব ছবির জন্য আদর্শ খুঁজতে হবে না।

আমি তর্জ্জমার কাজে লেগেই আছি। এদের সকলেরই খুব ভাল লাগচে। আমার ইংরেজি যে কোনো সভ্য দেশে চলতে পারে, সে কথা আমি মনেও করতে পারতুম না কিন্তু দেখা যাচ্চে একেবারে হুহুঃ শব্দে চলচে। ক্রমশ তার পরিচয় পাবে। চিত্রাঙ্গদা আমি সেরে ফেলেছি। আরো অনেকগুলো শেষ হয়ে গেছে।

সত্যেন্দ্রকে বোলো সে যদি আমার কতকগুলো লেখা ইংরেজি গদ্যে (পদ্যে নয়) তর্জ্জমা করে দিতে পারে আমি খুব খুসি হব। সে অনেকের কবিতা বাংলায় তর্জ্জমা করেছে কিন্তু আমার কবিতা বাংলায় তর্জ্জমা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেই আমি বঞ্চিত হয়েছি, একবার ইংরেজিতে চেষ্টা করে দেখতে বোলো।

শনিবারে লণ্ডনে যাচ্চি। অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত তোমরা যেদিন ইচ্ছা কর সেখানে এলে আমার সঙ্গে দেখা হবে। ইতি ৫ই ভাদ্র ১৩১৯

তোমার রবিদাদা

508 W High Street
Urbana. Hinois

কল্যাণীয়েষু,

মণিলাল—বেশ দেখা যাচ্চে এই জগৎ সংসারে ডাকঘর বিভাগের কর্ত্তা মনোযোগপূর্ব্বক কাজ দেখেন না। আমার শুভ পরিণয়ের খবর এবং নিমন্ত্রণ পত্র যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা ধন্য—কিন্তু বর এখনো পান নি—এবং যদি বধূ কেউ থাকেন তাহলে তাঁরও হস্তগত হয় নি। সুতরাং আমার নাৎনী এবং নাৎজামাইদের এখনো সম্পূর্ণ হতাশ হবার সময় আসে নি। একটা কাজ করতে পার—যাঁরা আগেভাগে সংবাদ পেয়েছেন, তাঁদের জানাতে পার যে, তাঁরা যদি এই ঠিকানায় আইবুড়-ভাত পাঠান, তাহলে সেটা একেবারে নষ্ট হবে না।

তোমার বইগুলি পেয়েছি। এখনো দেখতে সময় পাই নি—শীঘ্র যে সময় পাব, তারও সম্ভাবনা নেই।

Yeats ডাকঘর পড়ে খুব খুসি হয়েছেন—তিনি লিখেছেন most beautifull !! কাল Rothenstein এর চিঠি পেয়েছি, তাতে তিনি জানিয়েছেন Yeats thinks the Post Office a masterpiece and would like the Dublin Theatre people to produce it. He is talking the matter over with the Irish Theatre people.

আমি ত ভেবে পাইনে ডাকঘরের দইওয়ালা, ঠাকুরদাদা, মোড়ল প্রভৃতি ব্যাপার এদেশের লোকের কেমন করে ভাল লাগবে। সম্ভবত আগামী গ্রীষ্মের সময় ওটার অভিনয় হবে, তখন আমরা ইংলণ্ডে গিয়ে হয়ত দেখতে পাব।

জীবনস্মৃতির বাঁধানো বই এখনো আমার হাতে আসে নি। আলগা অবস্থায় যখন এসেছিল তখনই ওর ছবিগুলো দেখেছি। যাঁরা দেখেছেন, সকলেরই খুব ভাল লেগেছে। এখানকার একজন অধ্যাপককে দেখাচ্ছিলুম, তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। গগনের এই ছবিগুলি যে আমার জীবনস্মৃতির সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে জড়িত হয়ে রইল, এতে আমি ভারি আনন্দ বোধ করচি। চিত্রপত্রটা সাধারণ পাঠকদের কি রকম লাগচে? আমার ভয় পাচ্ছে ওটাকে নিয়ে কেউ কোনরূপ বিদ্রূপ করে। করা খুব সহজ—কেননা ওটা অত্যন্ত ঘরের জিনিষ—নিষ্ঠুরতায় অনেকের বিশেষ আনন্দ আছে। তোমার ঝাঁপি নিশ্চয় পেয়েছি—পড়েওছি—ওগুলি ত প্রায় সবই পড়া ছিল। তোমার এই রেশমের উপরে ফিকে রঙের জাপানী তুলির কাজ—

র একটা বিশেষ বাহার আছে—এ যেন দিবানিদ্রার তীরে বসে গন্ধি অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া দিয়ে গড়ে তুলেছ। ইতি ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩১১

তোমার রবিদাদা

Santiniketan
Bolpur
July 8 1914

কল্যাণীয়েষু,

ভাই মণিলাল, বিহারীকে দিয়ে যদি পাঠিয়ে থাক তবে নিশ্চয় এখানে সবুজপত্র পেয়েছে। ডাকে আসেনি দেখে মনে করেছিলুম ওরা পায় নি। আমাকে খানপাঁচেক গীতিমাল্য পাঠিয়ো—বিলাতে পাঠাতে হবে।

বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হতে সম্মত হয়েছি আশা করি এমনতর অদ্ভুত গুজব তোমরা বিশ্বাস কর নি।···

গল্প লিখতে বসেছি কিন্তু লেখবার বাধা এখানে বড় বেশি। মন দেওয়া অসম্ভব। অথচ গল্প লেখার পক্ষে মন দেওয়াটা বোধ হয় বিশেষ দরকার। যখন রামগড়ে ছিলুম তখন যদি ১২ মাসের জন্তে বারোটা গল্প লিখে আনতুম তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

আশা করি বাংলাসাহিত্যসেবীরা তোমাদের সবুজপত্রের মাথা মুড়িয়ে খাচ্চে। সবুজপত্রের গুণ এই যে জীবেরা যতই তাকে মুড়বে ততই আরো বেশি তেজের সঙ্গে সে বেড়ে উঠবে। কিন্তু প্রমথ লোকের কথায় বড় বেশি টলে। তাকে উৎসাহিত রেখো। তার ভারতবর্ষের ঐক্য লেখাটা আমার ত খুব ভাল লাগল। লোকে কি বলছে!

রবিদাদা

বাইরের থেকে লেখা যোগাড় করতে পারচ?

রথীকে বোলো আমার নাম করে যামিনীকে দিয়ে বাবামশায়ের ছবি কপি করিয়ে নেবার জন্তে চেষ্টা করে।

যাই বল মন থেকে থেকে উদাসী হয়—কলমের খোঁটা উপড়ে ফেলে কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়া একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে দৌড় দিতে চায়। তোমাদের সম্পাদকী আস্তাবলে আর কতকাল তাকে বেঁধে রাখবে?

[পারিবারিক পরিচয়ে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২১) অবনীন্দ্রনাথের জামাতা। বিভিন্ন ধরণের রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল। বড়দের জন্তে যেমন, ছোটদের জন্তেও তেমনি তিনি অনেক রচনা করেছেন। তার লিখিত নাটক এককালে সাধারণ রঙ্গালয়ে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। 'ভারতী' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন (১৩২২-৩০)। পত্রগুলি প্রকাশের জন্ত বিশ্বভারতী ও শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্য স্বীকার করি।]

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের চিঠি

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

বেদান্তের মহাবাক্য—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ও যেমন রজ্জু ভ্রমবশত সর্পরূপে প্রতিভাত হয় তেমনিই ব্রহ্মই অবিদ্যাপ্রভাবে দ্বৈত-প্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত—এই সার কথা কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বুঝিয়াছেন কি না—সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ। যে সন্ন্যাস-পারম্পর্য ধরিয়া এই অদ্বৈতজ্ঞান চলিয়া আসিতেছে, তাহার সঙ্গ না করিলে বেদান্ত-বোধ সুদুর্লভ।

যাঁহারা সমাজদ্রোহী নহেন—প্রতিষ্ঠাবান সুধী—তাঁহারা যদি হিন্দু-দর্শন-চিন্তার সমাদর করেন, তবে সুফল ফলিবে। কিন্তু এ সফলতা হুড়্দুমের কাজ নয়। ইংরেজ সহজে ভেজে না। তুড়ি দিয়ে যে উড়িয়ে দেবে—তা হবে না। আর আমার মত সামান্ত লোকের দ্বারা ত কিছু হবেই না।

আমার বিশ্বাস যে ভারত জ্ঞানবলে বিশ্ববিজয়ী হইবে। এই বিশ্ববিজয়ী ইংরেজকে অগ্রে জ্ঞানযোগে জয় করিয়া আমাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ লওয়া চাই। ইতি—

১ই জানুয়ারি, ১৯০৩

তিন

আমি গতবারে লিখিয়াছি যে, পঞ্জাবে এখানের চেয়ে শীতের প্রকোপ অধিক। তিন চারি দিন থেকে আর তাহা বলা চলে না। একেবারে হাড়ভাঙা শীত পড়েছে। গত সপ্তাহে দু তিনদিন বৃষ্টি হয়। সেই জন্ত নদী উপচে উঠায় তটস্থ মাঠগুলি জলময় হোয়েছিল। শীতের চোটে মাঠের জল সব জমে বরফ হোয়ে গেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষারাবৃত ভূমিখণ্ড সূর্যকিরণে রঞ্জিত হোয়ে, অপ্সরাদের নর্তন প্রাঙ্গণের ন্যায় দেখাইতেছে। যথার্থই এখানে নৃত্য হয়। চক্রবিশিষ্ট কাষ্ঠ বা লৌহ-পাদুকার সাহায্যে নরনারী এই বরফের উপর দিয়া রথের মত ঘর্ঘর শব্দে অতিবেগে ছুটিয়া বেড়ায় বা ঘুরপাক খায়। নদী ছুটি প্রায় জমে এসেছে। আর দু-এক দিন এই রকম ঠাণ্ডা থাকিলেই চলে পারাপার হওয়া যাবে। কাল সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বরফের বড় বড় থান নিয়ে নদীর মাঝখানে ছুড়িয়া ফেলিলাম। সব চুরমার হোয়ে গেল—কেননা মাঝখানেও জল পাথরের মত জমে গেছে। আমার খুব স্ফূর্তি। শীত বেশ মিঠাকড়া লাগল। আর আমি একেশ্বর রাজার মত বিহার করিতে করিতে আনন্দে ডুবে গেলাম। একেশ্বর—কেন না, ঠাণ্ডায় লোকজন অতি অল্পই সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে বেড়াতে এসেছিল। ইংরেজেরা ভারি শীতকাতুরে। মদ খায়, মাংস খায়—তবু হি হি হি করে; আর আগুনের কাছে বসিতে পারিলে বাঁচে। আমার শীতসহিষ্ণুতা দেখে এরা বিস্মিত হয়। গতকল্য দু-জন ইংরেজ থিওসফিস্টের সঙ্গে খুব আলাপ-পরিচয় হইল। আমায় শীতে কাবু করিতে পারে না দেখে একজন আভাস দিলে যে, আমার বোধ হয় যোগবল আছে। আমি যদি কথাটাতে সায় দিয়ে একটু গম্ভীর ভাবে যোগমাহাত্ম্য বর্ণন করিতাম, তা হোলে খাতিরটা বোধ হয় একটু জমিত। অমনিতেই যথেষ্ট হোয়েছিল, তাই আর ভান করিবার প্রয়োজন ছিল না।

গেল সোমবারে এখানকার একজন অধ্যাপক আমায় গাড়ী কোরে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার মাথায় মলিদার টুপি ও গায়ে পীতবর্ণের বনাত ছিল। রাস্তায় বড় বাহার হোয়েছিল—লোকে

হাঁ করে দেখিতে লাগিল। গোটাকতক ছোঁড়া হো হো করে হেসেও উঠিল। আর আমি ফর্ ফর্ করে ইংরেজি কথা কহিতেছি দেখে মেম-সাহেবেরা একেবারে অবাক্। এইরূপ ধবলশ্যাম যুগলমূর্ত্তি অশ্বযানে অতি দ্রুতবেগে চলিলাম। দেড় ক্রোশ দূরে লিটল্‌-মোর নামক এক গ্রামে আমরা উপনীত হইলাম। এই গ্রাম ইংলণ্ডের ইতিহাসে চিরকালই প্রসিদ্ধ থাকিবে। এখানে স্বর্গীয় নিউম্যান বাস করিতেন। ইনি একজন ধর্ম্মবীর। ইংলণ্ডে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিন্তার গতি—বিশ্বাস ও ভক্তির দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। যে গৃহে তিনি বাস করিতেন, সেই গৃহে আমরা গেলাম। সেখানে এখন আর একজন অধ্যাপক বাস করেন। ভিতরে গিয়া দেখি যে, মল্লিখিত এক ইংরেজী প্রবন্ধ মেজে খোলা রহিয়াছে ও পাতায় পাতায় পেন্সিলের আলোচনা ঘন-সন্নিবিষ্ট। অধ্যাপক আসিয়া উহা সম্ভাষণ করিয়া আমার সহিত মায়াবাদ সম্বন্ধে আলাপ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমার তখন বেড়াবার শখ চেপেছে। আমি তাঁকে আর একদিন আসিবার অঙ্গীকার করিয়া বিদায় লইলাম। প্রবন্ধে মায়ার বিষয়ই লেখা ছিল। মায়া কথাটা শুনিলে ইংরেজ চমকিত ও স্তম্ভিত হয়। আমরা দীন হীন জাতি—আমাদের মরাবাঁচা শালগ্রামের শোয়া-বসার মতন দুই সমান। জগৎকে মায়াময় মিথ্যা বলিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি কিন্তু ইংরেজের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। তাই জগৎ মিথ্যা—ইহা একেবারেই মিথ্যা কথা মনে হয়। অনেক মারপেঁচ কোরে বুঝাতে হয়। সহজে তারা ঘাড় পাতে না। কিন্তু অবশেষে ঘাড় পাতিতেই হবে। আমাদিগকে পরাজয় কোরে তারা সম্রাট হয়েছে। ঐ সাম্রাজ্য মায়ার ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই নয়—এই স্বীকার কোরে একদিন তাহাদিগকে হিন্দুস্থানের পদানত হোতে হবে ও জ্ঞানের জয় ও বলের পরাজয় ঘোষণা করতে হবে। ইংলণ্ডে অল্পস্বল্প বেদান্তের কথা রটেছে কিন্তু যাঁরা রটান তাঁরা মায়ার বাঁধে এমনি আটকেছেন যে, মায়াবাদে আর পঁহুছিতে পারেন না। পুরুষেরা অবিদ্যাকে সত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আর অবিদ্যারা পুরুষকে তুচ্ছ করিয়া মাথায় চড়িয়া বসিয়াছেন। কাজেই একটা কিম্ভূতকিমাকার গাউন-পরানো বেদান্ত দাঁড়িয়ে উঠেছে। তবে রক্ষে যে বিলাতি-মার্কা মায়াবাদের বা মায়াসাধের প্রাদুর্ভাব অতি কম।

যাহা হউক, সেই গ্রাম ছাড়িয়ে আমরা গ্রামান্তরে গেলাম। চাষাভুষা দেখে মনে ধারণা হয় যে, ইংরেজেরা আমাদের মতনই মানুষ। সেই চাষ করে, মরাই বাঁধে, গরু চরায়। তবে চারি কোটি না পাঁচ কোটি লোক ধরাখানাকে সরা কোরে তুলেছে কেমন কোরে? ঐক্য ও পুরুষকারের জোরে। সমস্ত ইংরেজজাতির মধ্যে একটা বাঁধন আছে—সেটা কিছুতেই ছেঁড়ে না। এত ভয়ানক দলাদলি ও রাগা-রাগি যে তার সিকির সিকিও আমাদের দেশে নাই। অনেকেই ত রাজমন্ত্রীদিগকে ও গভর্ণমেণ্টকে গাল দিয়া ভূত ভাগায়। কিন্তু বিধিপূর্ব্বক আইন পাস হইলেই সব ঠাণ্ডা। অনেকেই প্রতিবাদ করে কিন্তু বিধি কিছুতেই লঙ্ঘন করে না। ইংরেজের নিজের জাতির উপর ভারি টান। বুয়র যুদ্ধে স্বদেশীয়ের রক্তপাত হোয়েছে শুনে গভর্ণমেণ্টের শত্রুরা সব মিত্র হোয়ে গেল; আর বুয়র পরাজয়ে এক-প্রাণ হয়ে উঠে পড়ে লাগল। এই ত গেল একতা। ভাল কোরে পর্য্যবেক্ষণ কোরে দেখলে বুঝা যায় যে, ইংরেজের—তা কৃষকই হউক বা বণিকই হউক বা অধ্যাপকই হউক—চোখে মুখে পুরুষকার মাখান। প্রকৃতিকে ব্যবহারক্ষেত্রে জয় করিতে সবাই বদ্ধপরিকর। এইরূপ প্রকৃতিজয়ে বেশ একটা নিষ্কাম ভাব আছে। যদি ইংরেজ মনে করে যে, অমুক তারিখে কোন তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ গিরিশিখরে ধ্বজা গাড়িবে—তাহা হইলে সেই দিনে সেই দুরারোহ স্থানে কেশরী-চিহ্নিত নিশান পত-পত করিয়া উড়িবেই উড়িবে। উত্তর কেন্দ্রের অপর পারে কি আছে দেখিব—প্রাণ যায় বা থাক। কত জাহাজ তুষারগর্ভে বিলীন হইল—কত লোক মরিল—তথাপি আবিষ্কার করিবার পণ ভঙ্গ হইবে না। কোন আর্থিক লাভ নাই—কেবল একটা জয়ের আনন্দ—ঈশ্বরত্বের আত্মতুষ্টি—এই জিগীষাকে জাগাইয়া রাখে। কিন্তু এই নিষ্কাম ভাব লোপ পাইয়া যাইতেছে। লালসার বহ্নিতে সমগ্র জাতিটা জ্বলিতেছে।

আমাদের সংস্কারকেরা ইংরেজের ঈশ্বরত্ব দেখিয়া স্বদেশকে ধিক্কার দেন ও মনে করেন যে, কি কুক্ষণে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুর প্রকৃতি-জয়ের কথা বড় একটা বুঝেন না ও বুঝিতে চান না।

হিন্দুর মুখ্য আদর্শ—নিবৃত্তি। প্রকৃতিকে জয় করিয়া নিষ্কাম হওয়া—ঈশ্বরত্ব সম্পন্ন হওয়া—হিন্দুর পরম সাধনা। ঈশ্বর হইতে গেলে ঐশ্বর্য্যশালী হইতে হয়। যাহার প্রয়োজনীয় বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নাই, সে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী নহে। কিন্তু যিনি স্বাধিকারের প্রাচুর্য্য ও বাহুল্যগুণে প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়াছেন, তিনিই প্রভু—তিনিই ঈশ্বর—ঐশ্বর্য্যের স্বামী। রাজা নিজভুজবলে মৃগয়া করিতে সমর্থ—তথাপি অস্ত্রধারী অনুচরেরা তাঁহাকে অনুসরণ করে। অনুচরের তাঁহার প্রয়োজন নাই। তাহারা কেবল বাহুল্যমাত্র। মৃগয়াপক্ষে তাহাদের থাকা না থাকা সমান কথা। রাজার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহারা ঐশ্বর্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে মাত্র। কিন্তু যে ভীরু বা কাপুরুষ শত বা সহস্র রক্ষী বিনা আত্মরক্ষা করিতে পারে না, তাহারই অনুচরবর্গের যথার্থই প্রয়োজন আছে। অনুচরেরা তাহার যেমন দাস সেও তদ্রূপ তাহাদিগের দাস। সে প্রয়োজনের বশগামী। অনুচরবর্গ সত্ত্বেও ঈশ্বরত্ব তাহার নাই।

প্রকৃতিকে ব্যবহার-ক্ষেত্রে জয় করিয়া—তাহাকে সেবাদাসী করিয়া কি ফল যদি তাহার সঙ্গ ব্যতিরেকে শান্তিভঙ্গ হয়। এরূপ জয়—জয় নহে কিন্তু পরাজয়—কেবল দাসানুদাসত্ব স্বীকার করা। আমি যদি বিদ্যুৎকে ধরিয়া আনিয়া আমার দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি কিন্তু তাহার ক্ষিপ্র সংবাদ বহন বিনা রাত্রিতে আমার নিদ্রা না হয়, তাহা হইলে ধরিতে গিয়া কেবল ধরা পড়া হয় মাত্র। যদি কামানের গোলা বর্ষণ করিয়া নররক্ত পাত করিয়া মরুভূমির গর্ভ হইতে স্বর্ণ আহরণ করি—আর সেই স্বর্ণ লইয়া স্বার্থের সহিত স্বার্থের ঘোর সংঘর্ষ ঘটে—সেই কাঞ্চন লইয়া মারামারি পড়িয়া যায়—সেই হেমপ্রভা বিচ্যুত হইলে আমার শয্যাকণ্টকী পীড়া হয়, তাহা হইলে পুরুষকার আর গোলামিতে কি প্রভেদ।

হিন্দুর প্রকৃতি-জয় ওরূপ নহে। প্রকৃতির বিবিধ উপকরণ দিয়া বাসনার নেশার মাত্রাটা চড়ানো হিন্দুস্বভাব-সুলভ নহে। হিন্দু নিঃসঙ্গভাবে প্রকৃতির সহিত ব্যবহার করা অভ্যাস করে। হিন্দুর নিকট তিনিই নরশ্রেষ্ঠ যিনি ভূমা অনন্ত সর্ব্বময় একত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নামরূপময় বহুত্বের মধ্যে ঈশ্বররূপে বিচরণ করেন। প্রকৃতি তাঁহার সেবা করে বটে কিন্তু প্রকৃতির সম্বন্ধে তিনি

বদ্ধ নহেন। তিনি সকল সম্ভোগ সকল ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করিয়া আত্মস্থিত হইয়া বিরাজ করিতে পারেন। প্রকৃতির ঐশ্বর্য তাঁহার নিকট কেবল বাহুল্যমাত্র। উহার থাকা না-থাকা তাঁহার পক্ষে দুইই সমান। হিন্দু একত্বের ভিতর দিয়া বহুত্বকে দেখে—তাই সম্ভোগবিজড়িত বহুলতার প্রয়োজন তাহার চক্ষে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হয়। যেখানে পূর্ণ আত্মস্থিতি, সেখানে অনাত্ম বস্তুর প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। নিষ্কাম ঈশ্বরত্বলাভ হিন্দুর আদর্শ।

আজ হিন্দু জাতি এই উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। তথাপি পূর্ব সাধনার লক্ষণ এখনও বর্তমান। হিন্দু গৃহস্থের ঘরে প্রকৃতির সঙ্গে অতি অল্পই প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। তাহার আচার-ব্যবহার আদানপ্রদান কঠোর সংযম দ্বারা নিয়মিত। সংসারের ভোগৈশ্বর্যকে লাঞ্ছিত করিয়া যেন তাহার দৈনিক কার্যের সমাধান হয়। গৃহস্থ ছাড়িয়া নৃপতির প্রাসাদে যাও—দেখিবে ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি—মণি-মুক্তা হীরা-জহরৎ শালদোশালা কিংখাবে প্রকোষ্ঠ সকল সমাকুল। সেই সকল ধনরত্ন বসনভূষণ কিন্তু বাহুল্যরূপে বিরাজিত। রাজা উদাসীন, অধীন নহেন। সে সকল কখন ব্যবহার করেন, কখন পরিহার করেন। ঐশ্বর্যের আধিক্যে প্রয়োজন কোথায় পলায়ন করিয়াছে। রাজার মহিমা-বর্ধনের জন্যই মণি-মাণিক্যাদির কেবল প্রয়োজন—অভাব পূরণের জন্য নহে। হিন্দুর হয় সম্ভোগসামগ্রীর অল্পতা—সাধাসিধে চালচলন—নয় ত ছড়াছড়ি বাড়াবাড়ি বাহুল্য আড়ম্বর। প্রয়োজনের সুদীর্ঘ পরম্পরার নিগড় হিন্দুকে বাঁধিয়া রাখে না।

কিন্তু য়ুরোপে ইহার বিপরীত ভাব। য়ুরোপীয় গৃহস্থের ঘরে খুঁটিনাটি সামগ্রীর আদি-অন্ত নাই—সসাগরা পৃথিবী সেই ক্ষুদ্র নরদেবতাকে যেন করপ্রদান করিয়াছে। কিন্তু সেই সকল সামগ্রী গৃহস্বামীকে প্রয়োজনের রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া রাখে। যা না ব্যবহার করিলেও চলে, এমন বস্তু বড় একটা দেখা যায় না। সমস্তই কাজের তালিকায় লেখা। তথায় বাহুল্যের হিসাবে পেটিকায় পুঁজি করিবার অবসর অতি অল্পই আছে। য়ুরোপীয়ের ঘরে দেবাসুর-বিজয়ী পঞ্চভূত অশেষ প্রকার রূপ ধরিয়া দাসত্ব করে বটে কিন্তু প্রবৃত্তির কোষাগার হইতে তাহাদের পাওনা-গণ্ডা সুদে-আসলে আদায় করিয়া লইতে ছাড়ে না। প্রকৃতি যেমন ইংরেজের দাস, আসলে সাহেবও তদ্রূপ প্রকৃতির দাস।

ধান ভানিতে শিবের গীত গেয়ে ফেলেছি। ঘণ্টা দুই বেড়িয়ে আমরা শহরে ফিরে এলাম। গ্রামগুলি দেখে কেবল আমার মনে হোতে লাগিল যে, এখানে একটা বাঙ্গালীর আড্ডা করিলে মন্দ হয় না। ছাত্রেরা গ্রাম থেকে অনায়াসেই উষ্কপারে পড়িতে আসিতে পারে—কেনন', বড় বড় ঘোড়ার গাড়ি সদাই যাতায়াত করিতেছে। ব্যবসায়ীরাও থাকিতে পারেন। লণ্ডন ও এখান হইতে বারমিংহাম দেড় ঘণ্টার পথ। একটি ছোট গ্রামের মতন হোলে ইংরেজের মুখোমুখি দাঁড়ান যায়।

সেদিন একটি ছেলে নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করিতেছিল। গানের সঙ্গে সঙ্গে একর্ডিয়ন বাজাইতেছিল। বোধ হোলো বৈষ্ণবের ছেলে যেন গাহিতেছে। বড় মিষ্টি সুর। আহা—তার নাকে যদি একটি তিলক থাকিত তা হোলে সোনায় সোহাগা হোতো। এখানে শুধু ভিক্ষা করিবার যো নাই। তবে গান গেয়ে বা বাদ্য বাজিয়ে ভিক্ষা করিতে পারা যায়। একজন অন্ধ একটি ছোট মেয়ের হাত ধোরে রাস্তা দিয়ে গাহিতে গাহিতে যায়। পাড়া একবারে মাতিয়ে তুলে। ইংরেজের সুরে কেমন একটা ধুপধাপের ভাব আছে কিন্তু এর গলাটি এমনি মোলায়েম যে একেবারে মুগ্ধ হোয়ে যেতে হয়।

আমার দ্বিতীয় বক্তৃতার পর তৃতীয় বক্তৃতাটি অতি বিলম্বে হইয়াছিল। সভাপতি ডাঃ কেয়ার্ডের সময় ছিল না বলিয়া তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। আর বক্তৃতার সময় ছিল না। কলেজ সব বন্ধ হোয়ে গেল। পাঁচ হপ্তা পরে আবার খুলিবে। তখন বক্তৃতা আরম্ভ করা যাবে। বারমিংহামে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছি। বক্তৃতা ১৫ই ফেব্রুয়ারি হইবে।

উষ্কপার, ১৬ই জানুয়ারি

প্রদোষবেলায়

মেঘলা ঘোষ

পড়ে মনে কবে এক প্রদোষবেলায়
কালের বালুকাতটে তোমায় আমায়
হয়েছে প্রথম দেখা ?
তার সেই রক্তরাগ-রেখা
ভুলতে গিয়েই ভুলে ভরেছে হৃদয়,
তোমায় আমার সেই শেষ পরিচয়।

তখন দক্ষিণ বায় হয়েছে উতল
মদনের পঞ্চবাণে হয়ে চিতলোল
বিহ্বল করেছে মোর অবদ্ধ চিকুর ;
তুমি মোর পাশে বসে, তবু কত দূর,
বিরহী যক্ষের মত হয়ে অন্যমন
আবেশ-উদাস নেত্রে চেয়েছো যখন,
মোর লাজনম্র আঁখি কোরকের মত
অনিমিখে চেয়েছিলো হয়ে তদ্গত।

বিলম্বিত সেইক্ষণে প্রত্যাশার আশা
হয়েছিলো স্বপ্নে লীন, মূক ভালবাসা।
তারপর ? পূর্ণযতি। নেই কোন মিল,
বিষাদ-পাণ্ডুর মন বেদনায় নীল।
প্রেমের সে জন্মক্ষণে নিয়েছো বিদায়—
রক্তরাগে রাঙা সেই প্রদোষ বেলায় !
বলেছিলে—"ভুলে যেও, কোন ক্ষতি নেই,
তুমি দিতে চেয়েছিলে লাভ মোর সেই।
না পাওয়ার বেদনাও যাক্ মুছে যাক্
শুধু অক্ষয় অম্লান তব স্মৃতিটুকু থাক
মনের গহনে।" জানিনা ভুলেছ কিনা ;—
তবু সেই সুরে মোর স্তব্ধ মনোবীণা।

কাল তার ছন্দে স্থির, আমি শুধু নিয়েছি বিদায় ;
তুমি আজ কত দূরে ? আমি সেই প্রদোষবেলায়।

মুক্তি-আন্দোলনের পথিকৃৎ হিন্দু-মেলা

ললিত হাজরা

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতীয় রাজনীতিতে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দেয়। অবশ্য সে যুগে এই পরিবর্তনকে "গুরুতর" বিশেষণে ভূষিত করিতে হয়, কারণ, বর্তমান যুগে যাহা সহজসাধ্য বলিয়া মনে হইতে পারে, তৎকালে তাহা ছিল অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই অবগত আছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্য কাল পর্য্যন্ত যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা অব্যাহত ছিল, তাহার গতি শতাব্দীর শেষার্ধে ব্যাহত হইয়া অন্যদিকে প্রবাহিত হয়। আর এই রাজনৈতিক গতিপথে এক নূতন জাতীয় ভাবধারা প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং ইহাকে আমরা অনায়াসে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারার ক্রমবিকাশও বলিতে পারি। এই নূতন প্রবাহে আমাদের মানসলোক এবং সাহিত্যাদর্শের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহা অবশ্যই গুরুতর। কোন দেশের সমাজে নবীন চিন্তা ও ভাবের উন্মাদনায় যখন নবজীবনের আহ্বান আসে, তখনই তাহার ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সংগীত, নাটক, কবিতা প্রভৃতি সাহিত্যের প্রতিটি বিভাগই এই নব জীবনের আদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়া নবাদর্শে রূপায়িত হয়। ইতিহাসের ইহাই অমোঘ নীতি। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের জীবনে ইতিহাসের এই সনাতন নীতির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। ইয়ংবেঙ্গল বা নব্য বাংলার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুগের কোন কোন নেতৃবৃন্দ এই নবীন ভাবধারার উদ্বোধক এবং ইঁহাদের প্রথম অবদান হিন্দু-মেলা বা জাতীয় মেলা। এই মেলাই ভারতীয় জাতীয় জীবনে এক মহান্ চেতনার সৃষ্টি করে। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন: "ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম।" ("জীবন-স্মৃতি"—পৃ: ৭৮)। ভারতীয় জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে হিন্দু-মেলা বা জাতীয় মেলা পথিকৃৎ কি না, সে সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইল।

হিন্দু মেলা বা জাতীয় মেলার সৃষ্টি আকস্মিক ঘটনা নয়। ইহার পিছনে বিশেষ ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসের বিশ্লেষণ না করিলে কর্তব্য সম্পাদন হইবে না। এই বিশ্লেষণ আর একটি কারণে অপরিহার্য, কারণ, বর্তমানকে জানিতে হইলে অতীতকে ভাল করিয়া জানিতে হইবে। অতীতের সহিত বর্তমানের সম্পর্ক এত নিবিড় যে, একটি পরিত্যাগ করিলে অন্যটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা এ দেশের যুবকগণ পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন এবং ইতিহাসের মারফতে আয়ত্ত করেন। সর্বোপরি "ফরাসি-বিপ্লবের আন্দোলনের তরঙ্গসকল ভারতক্ষেত্রেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ১৮২৮ সালে যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ও যে যে কবি ও গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী অধীত হইত, সেই সকল শিক্ষকের মনও উক্ত গ্রন্থাবলী ফরাসিবিপ্লবজনিত স্বাধীনতা-প্রবৃত্তিতে সিক্ত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গীয় যুবকগণ যখন ঐ সকল শিক্ষকের চরণে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন, এবং ঐ সকল গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের মনে এক নব আকাঙ্ক্ষা জাগিতে লাগিল। সর্বপ্রকার কুসংস্কার, উপধর্ম এবং প্রাচীন প্রথা ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। * * * ফরাসি-বিপ্লবের এই আবেগ বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গ-সমাজে কার্য্য করিয়াছে; তাহার প্রভাব এই সুদূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য করা গিয়াছে।" (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—"রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ"—পৃ: ৯৫-৯৬)। এই "বঙ্গীয় যুবকগণ" হিন্দু কলেজে ভারতপ্রেমিক ফিরিঙ্গী-সন্তান ডিরোজিও'র নিকট শিক্ষালাভ করেন। এই সুশিক্ষিত যুবকগণই ইয়ংবেঙ্গল বা নব্য বাংলার নেতৃবৃন্দ। ইঁহারাই ছিলেন ভাবী ভারতের স্বাদেশিকতাবাদের পূর্ব-পুরুষ। শাস্ত্রী মহাশয় তৎপ্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" পুস্তকে ইয়ংবেঙ্গল বা নব্য বাংলাকে তিনটি যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম যুগের কাল ১৮১৩ খৃ: হইতে ১৮৫৭ খৃ: অব্দ; দ্বিতীয় যুগ—১৮৫৮ খৃ: হইতে ১৮৮০ খৃ: এবং তৃতীয় যুগের কাল ১৮৮১ খৃ: হইতে ১৯০০ খৃ:।

নব্য বাংলার প্রথম যুগে এই দেশের শিক্ষিত সমাজের ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সভ্যতা সম্পর্কে গভীর মোহ ছিল। থাকিবে না কেন? এই যুগে ইংরাজ শাসক ভারতের অফুরন্ত ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিবার জন্য যতগুলি বীভৎস প্রক্রিয়া গ্রহণ করা সম্ভব ছিল, সমস্তগুলিই অবলম্বন করিয়াছিল। এই লুণ্ঠনকার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য স্বীয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরাজ শাসক এই দেশে তাঁহাদের পুঁজিবাদী সভ্যতার কয়েকটি উপকরণ আমদানি করিতে লাগিল। এই নব্য-শিক্ষিত যুবকগণ সকলেই ছিলেন বেনিয়াণ, মুৎসুদ্দি বা ইংরাজ শাসকের প্রসাদ-পুষ্ট বড় ও মাঝারী ধনিকের সন্তান। স্বভাবতঃই পাশ্চাত্য শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পে জ্ঞানার্জন করিয়া আমদানীকৃত উপাদানগুলিকে স্বদেশের উন্নতি বিধানে নিয়োগ করিতে উক্ত যুবকগণ বদ্ধপরিকর হইলেন। এই কর্মের প্রাথমিক পর্য্যায়ে বিভিন্ন কুসংস্কার, সামাজিক অত্যাচার প্রভৃতির নিরোধকল্পে ইয়ংবেঙ্গলের নেতৃবৃন্দের সহিত তদানীন্তন শাসকমণ্ডলী সহযোগিতা করিয়াছিল। "বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধাংশে বৃটিশ শাসকশ্রেণীকে বস্তুতই এক প্রগতিশীল ভূমিকায় দেখা যায়। বহু ক্ষেত্রেই তাহারা ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীল অংশ ও সামন্ত-তান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন।···এই যুগ দুঃসাহসিক সমাজ-সংস্কারেরও যুগ। ভারতীয় সমাজের প্রগতিশীল অংশের সহযোগিতায় সতীদাহ-প্রথার উচ্ছেদ ঘটে। দাসপ্রথা, সন্তান-বিসর্জন, ও ঠগ দস্যুদের উচ্ছেদও এই আমলের ঘটনা। আবার এই যুগেই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রচলন হয়। তৎকালীন বৃটিশ শাসকদের দৃষ্টি-ভঙ্গী ছিল আপোস-বিমুখ। ভারতীয় ঐতিহ্যের যে দিকগুলি জরাজীর্ণ ও পশ্চাৎপদ-সেইগুলির প্রতি তাঁহাদের কোনরূপ সহানুভূতি ছিল না।···" (রজনী পাম দত্ত—"আজিকার ভারত" দ্বিতীয় ভাগ—পৃ: ১২৪-১২৫)। এতদ্ব্যতীত কঠোর ব্যবস্থায় দেশের মধ্যে চোর, ডাকাত প্রভৃতি দুষ্কৃতকারীদের দমন—আদালতের বিচারে দেশীয় ধনী ও নির্ধন, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, প্রবল ও দুর্বল—সকলকেই একই শ্রেণীভুক্তকরণ

প্রভৃতি ইংরাজ শাসকের কার্য্যবলী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য-বাংলার নেতৃবৃন্দ এবং পল্লী-বাংলার সাধারণ মানুষকে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। ফলে ভয়েই হউক আর ভক্তিতেই হউক, তদানীন্তন বঙ্গ-সমাজ ইংরাজ শাসককে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেন না। নব্য-বাংলার নেতৃবৃন্দের মধ্যে ইংরাজ শাসক সম্পর্কে যথেষ্ট মোহ ছিল। "দেশের নূতন ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজের ভাবের ভাবুক হইয়া, ইংরাজের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাবশতঃ তাহার নিকট স্বল্প-বিস্তর আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ সত্যকাম ও সত্যবাক্, এ ধারণাটা তাঁহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। ইংরাজ যে মিছা কথা কহিতে পারে, পঞ্চাশ ষাট্ বৎসর পূর্ব্বেকার শিক্ষিত বাঙ্গালী ইহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। এই জন্য ইংরাজ এ দেশের সম্বন্ধে যখন যাহা কহিত, তাহাকেই তাঁহারা বেদ-বাক্যরূপে মানিয়া লইতেন।" (বিপিনচন্দ্র পাল—"নবযুগের বাংলা"—পৃঃ ১৫৯)। এই মোহ এত গভীর ছিল যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই এক শত বৎসরের মধ্যে সারা ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, সাঁওতাল-বিদ্রোহ, ওয়াহাবী-বিদ্রোহ, সিপাহী-বিদ্রোহ প্রভৃতি বিভিন্ন সংগ্রাম দেখা দিয়াছিল। কখনও দেশীয় নৃপতি এবং কখনও বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ছোট বড় অভ্যুত্থানগুলি দেখা দিয়াছিল। ইয়ং বেঙ্গলের নেতৃবৃন্দ এইগুলির কোনটিতেই অংশ গ্রহণ করেন নাই। সিপাহী-বিদ্রোহ সমগ্র ভারতবর্ষ আলোড়িত করিয়াছিল, কিন্তু বাংলায় সিপাহী মহলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিবামাত্র নিভিয়া গিয়াছিল। শিক্ষিত সমাজ এই বিদ্রোহের ধারে-কাছেও যান নাই। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইয়ং বেঙ্গলের কোন কোন নেতা প্রকাশ্যে ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই যুগের নেতৃবৃন্দের ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করিয়া হুতোম লিখিয়াছিলেন—"লখ্‌নৌয়ের বাদশাকে কেল্লায় পোরা হল, গোরারা সময় পেয়ে দু-চার বড় বড় ঘরে লুট তরাজ আরম্ভ কল্লে, মার্শাল ল' জারি হল, যে ছাপা যন্ত্রের কল্যাণে হুতোম নির্ভয়ে এত কথা অক্লেশে কইতে পাচ্ছেন, সে ছাপাযন্ত্র কি রাজা কি প্রজা কি সেপাই পাহারা—কি খোলার ঘর, সকলকে এক রকম ত্যাখে, ব্রিটিশ কুলের সেই চিরপরিচিত ছাপা যন্ত্রের স্বাধীনতা মিউটিনি উপলক্ষে কিছুকাল শিকলি পরলেন। বাঙালীরা ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে, 'যদিও একশ' বছর হ'য়ে গেল, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙ্গালীই আছেন—বহুদিন ব্রিটিশ সহবাসে, ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্রিটিশ ব্যবহারেও আমেরিক্যানদের মত হতে পারেননি।...রোগ, শোক ও বিপদে যেমন লোকে পতিগত স্ত্রীর মূল্য জানতে পারে, সেইরূপ মিউটিনী উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টও বাঙালী শব্দের কথঞ্চিৎ পদার্থ জানতে অবসর পেলেন।" ('হুতোম প্যাঁচার নকসা'—পৃঃ ১২-১৩)। গত এক শত বৎসরের মধ্যে যতগুলি বিদ্রোহ হইয়াছিল, তাহাতে নব্য বাংলার নেতৃবৃন্দের অসহযোগিতা করিবার আরও কারণ আছে। অবশ্য এই কারণকে আমরা মুখ্য কারণ বলিতে পারি। এই নেতৃবৃন্দের শ্রেণীগত চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহারা প্রায় সকলেই মুৎসুদ্দি শ্রেণীর পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পরিবারগুলি অর্থোপার্জনের জন্য পরিপূর্ণরূপে কোম্পানী ও জমিদার শ্রেণীর উপর নির্ভর করিতেন। সুতরাং বিদেশী শাসনের প্রতিরোধ-সংগ্রামে এবং বিদেশী শাসনের পক্ষপুটে আশ্রয়প্রাপ্ত জমিদার শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করা তাঁহাদের শ্রেণীগত চরিত্রের পরিপন্থী ছিল। এই কারণেই তাঁহারা বিভিন্ন বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিতেন না এবং সমাজের নীচের তলার সংগ্রামী মানুষের সহিত কোন সম্পর্কই রাখিতেন না। এই যুগেও নানা নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামও দেখা দিয়াছে, কিন্তু লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, নিয়মতান্ত্রিকতার পথে সম্মান ফিরিয়া পাইবার জন্য কিছু কিছু সংগ্রাম করিলেও এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কখনও কোন সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নাই। নেতৃত্বের পদে সমাসীন থাকিতেন তৎকালীন রাজা ও জমিদার। নেতৃবৃন্দের এই দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইয়ং বেঙ্গলের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দ প্রগতিশীল ছিলেন।

১৮৫৭ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সভ্যতার উপর ইয়ংবেঙ্গল বা নব্য বাংলার নেতৃবৃন্দের গভীর মোহের যুগ গিয়াছে। দ্বিতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দের ন্যায় সুবোধ বালকের মত ইংরাজ শাসনের সবই ভাল—এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতে রাজী হইলেন না। তাঁহাদের সুর বেশ কিছু উল্টা হইল। সিপাহী-বিদ্রোহের পরেই নেতৃবৃন্দ নূতন পথ ধরিলেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে—যে ইংরাজ শাসনের এবং ভাবধারার উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল, তাহার উপর আমাদের হঠাৎ অবিশ্বাস জন্মিল কেন? শাসক শ্রেণী সিপাহী-বিদ্রোহের সময় আমাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। উভয়েরই পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস একদিনে জন্মে নাই বা আকস্মিক ঘটনাও ইহা নয়। ঐতিহাসিক নিয়মেই এই অবিশ্বাস ও সন্দেহ জন্মিয়াছে। বৃটেনের পুঁজি-সভ্যতা প্রথম দিকে প্রগতিশীল ছিল, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ক্রমশঃ এই প্রগতিশীল নীতি শাসন-পদ্ধতি হইতে নির্বাসিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি প্রকট হইয়াছে। শিক্ষা-নীতিতেই তাহার প্রথম প্রকাশ হয়। যুগ-পুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সরকারী চাকুরীতে ইস্তফাদান ইহারই মূলতঃ সাক্ষ্য। যাহা হউক—পুঁজিতন্ত্র যতই প্রতিক্রিয়াশীল হইয়াছে, বৃটেন তাহার শোষণের মৃগয়াক্ষেত্র ভারতবর্ষে ততই প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-পদ্ধতির চালু করিয়াছে। সিপাহী-বিদ্রোহের পর বৃটিশ পুঁজিতন্ত্রের নীতি এবং শাসন-পদ্ধতির এক বিরাট রূপান্তর ঘটে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রথম দিকে প্রগতিশীল নীতির জন্য বৃটিশ পুঁজিতন্ত্র ভারতবর্ষের সমাজের রক্ষণশীল অংশ এবং সমাজতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের পর দেখা গেল—ইংরাজ শাসক ভারতবর্ষে তাঁহাদের শাসন কায়েম করিবার জন্য ভেদ-নীতি চালু করিলেন। প্রথম দিকে যে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিলেন, এই সময় হইতেই অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই এই সমস্ত শক্তিকে ইংরেজ কাছে টানিয়া নিলেন। সম্ভবতঃ এই যুগেই নেতৃবৃন্দের সহিত ইংরাজ শাসকের মনোমালিন্য আরম্ভ হয় এবং বিরোধের ভাবও দেখা দিল। যাহা হউক, এই সময়ে ভারতে এক নূতন শক্তিরও আবির্ভাব হইল। এই নূতন শক্তি উপলব্ধি করিল যে, সর্ববিষয়ে ইংরাজ শাসকের উপর নির্ভর করা সমীচীন নহে। অন্ততঃ শিল্পবাণিজ্যে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে

বোম্বাই শহরে একটি সূতাকল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নব প্রতিষ্ঠিত সূতাকলটি সারা দেশে স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনার প্রেরণা দিল। সারা দেশে স্বাজাত্যাভিমান প্রবল হইয়া উঠিল। ইয়ং বেঙ্গলের দ্বিতীয় যুগের বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করিলেন যে, ইংরাজ তাহার সম্মোহিনী শক্তি দ্বারা তাহাদিগকে প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া মূঢ় করিয়া রাখিয়াছে। এই সত্য গোপন করিবার কোন প্রয়াস দেখা দিল না। বিভিন্ন বক্তৃতা, রচনা, পত্রিকা মারফত দেশের নরনারীর অন্তরে স্বাদেশিকতা জাগ্রত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজই বিদেশী শাসকের শঠতা সর্বাগ্রে ধরিয়া ফেলে। তাই কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার বক্তৃতায় দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রথম চেষ্টা করেন। এই নূতন জাতীয় ভাবধারার উদ্বোধক হিসাবে ব্রাহ্মসভার দাবী অগ্রগণ্য।

এই নূতন জাতীয় ভাবধারায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব প্রতিফলিত হয়। ইংরাজ শাসকের প্রতি বিদ্বেষভাব হইতেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবের জন্ম হয়। এই নূতন জাতীয় ভাবধারা আমাদের চিন্তারাজ্যে ব্যাপকভাবে স্থান অধিকার করিয়া লয়। প্রথমেই আমাদের সাহিত্যে ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়। বাংলা দেশে সিপাহী-বিদ্রোহের অগ্নিকাণ্ড না ঘটিলেও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে দেশের কৃষক-সমাজের মধ্যে আসন্ন নীল-বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হইতেছিল। ইংরাজ নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-কাহিনী শিক্ষিত সমাজকে প্রথম দিকে আলোড়িত করে নাই। কিন্তু নূতন জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইবার পর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অত্যাচার নিরোধকল্পে আইন জারী করিবার দাবীও জানাইতে লাগিলেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বীয় সম্পাদিত "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকায় নিয়মিতভাবে নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন। "সেই লেখনী আবার নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। নীলকর অত্যাচার নিবারণ হরিশের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। এই কার্যে তিনি দেহ, মন, অর্থ, সামর্থ্য সকলি নিয়োগ করিয়াছিলেন।" (শিবনাথ শাস্ত্রী—"রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ"—পৃঃ ১১১)। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া "উপদ্রব নিবারণের উদ্দেশে" ইংরাজ শাসক আইন জারী করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু বিপরীত ফল ফলিয়া গেল। নীলকর সাহেবগণ আইনের ফাঁকটি ব্যবহার করিয়া অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিলেন। অবস্থা এমন সঙ্গীন হইয়া উঠিল যে, ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে লক্ষ লক্ষ নীল প্রজা ধর্মঘট করিয়া নীলকর সাহেবদিগকে জানাইয়া দিল যে, তাহারা কোনমতেই নীলের কোন দাদন লইবে না এবং নীলের আবাদও করিবে না। কৃষকদের প্রস্তাবিত ধর্মঘটের সংবাদ পাইয়া নীলকর সাহেবগণ অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিলেন। এই সময়েই হরিশ্চন্দ্র লক্ষ লক্ষ অত্যাচারিত কৃষকের পক্ষ অবলম্বন করিয়া "পেট্রিয়ট্" পত্রিকায় লেখনী ধারণ করিলেন। তাঁহার সেই অগ্নি-গর্ভ ভাষা শাসকমণ্ডলীর অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিল। ইহারই ফলে ১৮৬০ খৃঃ অব্দে "ইণ্ডিগো কমিশন" বসে। এই কমিশনের সমক্ষে হরিশ্চন্দ্র সাক্ষ্য দিলেন। এই বৎসরেই প্রকাশিত হইল দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটক। নাট্যকার নীলকর সাহেবদের বর্বরোচিত অত্যাচার-কাহিনীর অবিকল চিত্র এই নাটকে অংকন করেন। সমগ্র সমাজ যখন নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-কাহিনী লইয়া আলোড়িত, ঠিক সেই সময়েই ইহার আবির্ভাব অগ্নিকুণ্ডে যেন ঘৃতাহুতি দিল। সমগ্র দেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমাদের প্রাচীন নাট্য-রীতি এই নাটকে অনুসৃত না হইলেও এবং নাটকের সংলাপে শিক্ষিত সমাজের ভাষা ব্যবহৃত না হইলেও, "ইহা লইয়া কেহ ইহার দোষগুণের বিচার করিল না। নাটকের বিষয়বস্তু এবং নাটকীয় চরিত্রের সজীবতা দেশের মানুষকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ-ক্ষেত্রে উল্কাপাত হইল; এ নাটক কোথা হইতে কে প্রকাশ করিল, কিছুই জানা গেল না। এ নাটক প্রাচীন নাটকের চিরাবলম্বিত রীতি রক্ষা করিল কি না, সে বিচার করিবার সময় রহিল না; ঘটনা সকল সত্য কি না, অনুসন্ধান করিবার সময় পাওয়া গেল না; 'নীলদর্পণ' আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল; তোরাপ আমাদের ভালবাসা কাড়িয়া লইল; ক্ষেত্রমণির দুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল; মনে হইতে লাগিল—রোগ সাহেবকে যদি একবার পাই, অস্ত্র অস্ত্র না পাইলেও যেন দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারি।" (শিবনাথ শাস্ত্রী "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ"—পৃঃ ২২৪)। এই নাটকের মাধ্যমে দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যে নব ভাব এবং নব জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালীর মনে এক নবশক্তির সঞ্চার করিলেন। ইতি-পূর্বে বাংলা দেশে এত শক্তিশালী নাটকের আবির্ভাব ঘটে নাই। একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, দীনবন্ধু মিত্রই নাটকের মাধ্যমে বাংলায় মানসলোকে নব উন্মেষিত জাতীয়তাবোধ তীব্রতর করিবার প্রথম প্রয়াস পাইলেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন: "নীলদর্পণে, গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া, নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্যগুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীলদর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই।" ("বঙ্কিম রচনাবলী"—দ্বিতীয় খণ্ড—পৃঃ ৮৩৫)। বঙ্কিমের ভাষায় জানিতে পারা যাইতেছে যে, নাটকের সাফল্যের মূলে ছিল নাট্যকারের বিষয়বস্তুর প্রতি পূর্ণ "সহানুভূতি" এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে "অভিজ্ঞতা"।

উল্লিখিত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নূতন ধরণের জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সূত্রপাত হইল এবং ইহার প্রথম পরিণতিরূপে দেখা দিল হিন্দু-মেলা বা জাতীয় মেলা। ঋষি রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, গণেন্দ্র নাথ ঠাকুর, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই মেলার প্রতিষ্ঠাতা। বাংলা ১২৭৩ সাল এবং ইংরাজী ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের চৈত্র সংক্রান্তিতে হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশন হয়। "বঙ্গ সমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা; কারণ, সেই যে বাঙ্গালীর মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে, তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।" (শিবনাথ শাস্ত্রী "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন..." পৃঃ ২৩০)। ঠাকুর পরিবারের মধ্যেই ইহার সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন: "আমাদের বাড়ীর সাহায্যে হিন্দু-মেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল।...এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প, ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত। (জীবন-স্মৃতি" পৃঃ ৭৮)।

মেলার কর্মসূচী নিম্নরূপ ছিল:—

(১) স্বদেশী শিল্পের উন্নতি সাধন,

২) শারীরিক ব্যায়াম চর্চা

(৩) স্বদেশী সাহিত্যের উন্নতিবিধান

(৪) বিদেশী দ্রব্য পরিহার

(৫) স্বদেশী পণ্য প্রদর্শন

(৬) স্বাদেশিকতা উদ্বুদ্ধ করিবার উপযোগী স্বদেশী সংগীত, নাটক, সাহিত্য রচনা এবং (৭) যোগ্যব্যক্তিদিগকে পুরস্কার দান।

বৎসরে একবার করিয়া মেলা বসিত। প্রথম বৎসরেই গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নবগোপাল মিত্র যথাক্রমে ইহার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, কাশীশ্বর মিত্র, দুর্গাচরণ লাহা, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, ঋষি রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্ক-পঞ্চানন, পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ এই মেলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ১৮৬৮ খৃ: অব্দে মহাসমারোহে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুপ্রসিদ্ধ জাতীয় সংগীত "গাও ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়—" গীত হয়। মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া ঘোষণা করিলেন: "ভারতবর্ষে এই একটি প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কার্যেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি। ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন, আমরা কি মনুষ্য নহি? * * * * * অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।" পরাধীনতার শৃংখল মোচন করিবার আকাংখাও এই সময়ে অনুভূত হইতে লাগিল। এই মেলায় মনোমোহন ঘোষ তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন: "সারল্য আর নির্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহতাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে, যখন জাতি-গৌরবরূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকসিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারত-ভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে 'স্বাধীনতা' নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে।" এই সময় হইতেই স্বদেশের আর্থিক দাসত্ব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক দুর্গতির পরিণতি সম্পর্কে সামাজিক চেতনা জাগ্রত হইতে থাকে। ঋষি রাজনারায়ণ বসুর রচনায় এই চেতনা সুস্পষ্ট। তিনি লিখিলেন: "বস্তুত: জগৎসুদ্ধ লোক কি কখনও কেরাণী অথবা স্কুল-মাষ্টার অথবা উকীল হইতে পারে? শিল্প বাণিজ্যের দিক দিয়া কেহ পথ চলে না।···শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগ জন্য দিন দিন আমরা দীন হইয়া পড়িতেছি, ইংলণ্ডের উপর আমাদিগের নির্ভর দিন দিন বাড়িতেছে। কাপড় পরিতে হইবে, ইংলণ্ড হইতে কাপড় না আইলে আমরা পরিতে পাই না। ছুরি, কাঁচি ব্যবহার করিতে হইলে, বিলাত হইতে প্রস্তুত না হইয়া আসিলে আমরা তাহা ব্যবহার করিতে পাই না। এমন কি, বিলাত হইতে লবণ না আসিলে আমরা আহার করিতে পাই না। দেশলাইটি পর্য্যন্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে আমরা আগুন জ্বালিতে পাই না।" ("সে কাল আর এ কাল"—পৃ: ৬৬)।

মনোমোহন ঘোষ ইংরাজ শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত আইন আদালত সম্পর্কেও দাবী উত্থাপন করেন। বিচার ও শাসন বিভাগকে স্বতন্ত্র করণের দাবী তিনি প্রথম উত্থাপন করেন।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, হিন্দু মেলায় অর্থনৈতিক পরাধীনতা, দেশের স্বাধীনতা, আইনের পরিবর্তন, সাহিত্যে নূতন ভাবধারা—প্রভৃতি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ বিষয়ের ইংগীত দেওয়া হয়। আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হইবে, তাঁহারও সুস্পষ্ট নির্দেশ এই মেলা হইতেই আসিল। ইহার প্রভাব আমাদের চিন্তাধারা ও সাহিত্যের উপর অধিক পরিমাণে পড়িয়াছিল।

শেষোক্ত বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্বে এই মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র মহাশয় সম্পর্কে কিছু বলিতে হইবে। অন্যথায় কর্তব্যে অবহেলা করা হইবে। নবগোপাল মিত্র মহাশয় ছিলেন তীব্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং কি উপায়ে ভারতবর্ষের পরাধীনতা-শৃংখল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবনে তিনি ধ্যানমগ্ন থাকিতেন বলা চলে। তাঁহার সম্পাদিত "ন্যাশানাল পেপার" (National Paper) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে তিনি স্বদেশিকতার আদর্শটি তুলিয়া ধরিতেন। তাঁহার রচনাবলী, হিন্দুমেলার প্রদর্শনীর জন্য সারা বৎসর পরিশ্রম এবং বাহুবলের জন্য ব্যায়ামাগার স্থাপন তাঁহাকে এত জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি ন্যাশানাল মিত্র নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল নবগোপাল মিত্র সম্পর্কে লিখিয়াছেন:—"এই জন্য বাংলার নবযুগের ইতিহাসে নবগোপাল মিত্র মহাশয় এবং তাঁহার হিন্দু মেলাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না।" ("নবযুগের বাংলা" পৃ: ১৫০)। এই মন্তব্যের প্রতিটি অক্ষরই সত্য।

হিন্দুমেলার প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক পড়ে সাহিত্যের উপর। এই যুগেই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করিলেন, তখন পুঁজিবাদী ইউরোপের সভ্যতার প্রকৃত রূপটি এদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এ দেশীয় বুদ্ধিজীবিগণ ইতিমধ্যেই মনে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ইউরোপের পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রগতিশীল রূপটি একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং এই সভ্যতার মারফতে ইউরোপীয় পুঁজিবাদ সমগ্র পৃথিবী করায়ত্ত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র দেশকে জাতীয় ভাবধারায় দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় দেশপ্রীতি সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, ইউরোপীয় দেশ-প্রীতির মূল কথা পরস্বাপহরণ। ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সভ্যতা এবং স্বদেশিকতা সম্পর্কে মোহগ্রস্ত দেশবাসীকে সহজ সরল ভাষায় জানাইয়া দিলেন: "ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পর সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতি সকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর যেন ভারতবর্ষের কপালে এরূপ দেশ বাৎসল্য ধর্ম্ম না লিখেন।" (বঙ্কিম রচনাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড—পৃ: ৬৬১)।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতানুসারে স্বদেশ-প্রীতিই মানব-জীবনের প্রধানতম

র্শ। "ফরাসী বিপ্লবের পরে ইউরোপে যে গণতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ ফুটিয়া উঠে, বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই আদর্শ সার্ব্বজনীন।..." (বিপিনচন্দ্র পাল—"নবযুগের বাংলা"—পৃঃ ২৩১)। ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া তিনি লিখিয়াছিলেন "দেবী চৌধুরাণী" এবং ইহারই মারফত তিনি জানাইয়াছিলেন—বাংলা দেশে বীর সন্তানের আবশ্যকতা। "মৃণালিনী" উপন্যাসে যে জাতীয় ভাবধারার অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিপূর্ণ রূপদান করিলেন "আনন্দ-মঠে।"

বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক স্থাপিত ও সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" এই মোহভঙ্গের শক্তিধর অস্ত্র ছিল। বঙ্গদর্শনই সাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করে। ইতিপূর্বে ইংরাজী-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সংস্কৃত শব্দে ভারাক্রান্ত বাংলা-সাহিত্য পাঠে বিরত থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যকে সংস্কৃত শব্দের নাগপাশ হইতে মুক্ত করেন। ফলে "বঙ্গদর্শন"-এর ভাষা সহজবোধ্য হয় এবং সকলের প্রিয়বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। ইহার মূলে ছিল জাতীয় ভাবধারা এবং এই ভাবধারায় স্নাত রচনাবলী। স্বাদেশিকতা জাগ্রত করিতে বঙ্গদর্শনের দান অতুলনীয়।

কবিতা ও সংগীতে স্বাধীনতার ভাবটি মুখরিত হইয়া উঠে। গোবিন্দচন্দ্র রায়ের—

"কতকাল পরে, বল ভারতরে
দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হবে?"

এবং

"নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে—ও।"

গান দুইখানি নব্য বাংলার মুক্তি-সাধকদের জপমন্ত্র ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। "A real B.A." হেমচন্দ্রের কবিতাগুলি এই যুগের রাজনৈতিক চিন্তাধারা কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত।

যাহা হউক, হিন্দু-মেলার রাজনৈতিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতসভা। অবশেষে জাতীয় কংগ্রেস। উপসংহারে পুনরায় বলিতেছি, ভারতীয় জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের পথিকৃৎ হিন্দু-মেলা বা জাতীয় মেলা। প্রবন্ধে যে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহার সহিত সম্ভবতঃ অনেকেই একমত হইতে পারিবেন না আশংকা হয়। সমালোচনার যোগ্য হইলে সমালোচনাই কাম্য বলিয়া মনে করি।

মহাভারত অনুবাদের ইতিকথা

১৭৮০ শকে সংকীর্ত্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া এক জন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালা-ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আট বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপিতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য সেই চিরসঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপনস্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্ব্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম।...অনুবাদসময়ে মূল মহাভারতের কোন স্থলই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই সন্নিবেশিত হয় নাই; অথচ বাঙ্গালাভাষার প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সেগুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।

বহু দিবস সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক্ পরিচালনার বিলক্ষণ অসদ্ভাব হওয়াতে আপাতত মূল মহাভারতের হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায়ের পরস্পর এ প্রকার বৈলক্ষণ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ২১৪ খানি গ্রন্থ একত্র করিলে পরস্পরের শ্লোক, অধ্যায় ও প্রস্তাবঘটিত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তন্নিবন্ধন অনুবাদকালে সবিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমি বহুযত্নে আসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত এবং সভাবাজারের রাজবাটীর, মৃত বাবু আশুতোষ দেবের ও শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয়স্থিত, তথা আমার প্রপিতামহ দেওয়ান ৺শান্তিরাম সিংহ-বাহাদুরের কাশী হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায় একত্রিত করিয়া বহুস্থলের বিরুদ্ধভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক অনুবাদ করিয়াছি। এই বিষয়ে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আমারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।...

আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়দ্ভাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সরলহৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন। ফলত বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না।...সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুবাদিত ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকারে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমারে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।

যে সকল মহাত্মারা সময়ে সময়ে আমার সদস্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের ব্যাকরণের অধ্যাপক ও সংস্কৃত রঘুবংশের বাঙ্গালা অনুবাদক ৺চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, ৺কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, ৺ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরমাত্মীয় ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও ৺অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্য-প্রভৃতি ১০ জন অনুবাদশেষের পূর্ব্বেই অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সকল মহাত্মাদিগের নিমিত্ত আমারে চিরজীবন যার পর নাই দুঃখিত থাকিতে হইবে।

এক্ষণকার বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রামসেবক বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সদস্যদিগকে মনের সহিত সকৃতজ্ঞচিত্তে বার বার নমস্কার করিতেছি। এই সমস্ত সুবিচক্ষণ কর্ণধারদিগের কৃপাবলেই আমি অনায়াসেই মহাভারত-স্বরূপ সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম।...

—কালীপ্রসন্ন সিংহ

আলোকচিত্র

—বিমল হোড়

চাষীভাই

ইলিশমাছ —সবিতা মিত্র

সাঁকো —পান্না সেন

যুগলনৃত্য

—চিত্ত নন্দী গৃহীত

বাঁদর নাচ

(Alibi অবলম্বনে)

ড্যাফ্‌নে ডু মরিয়ের
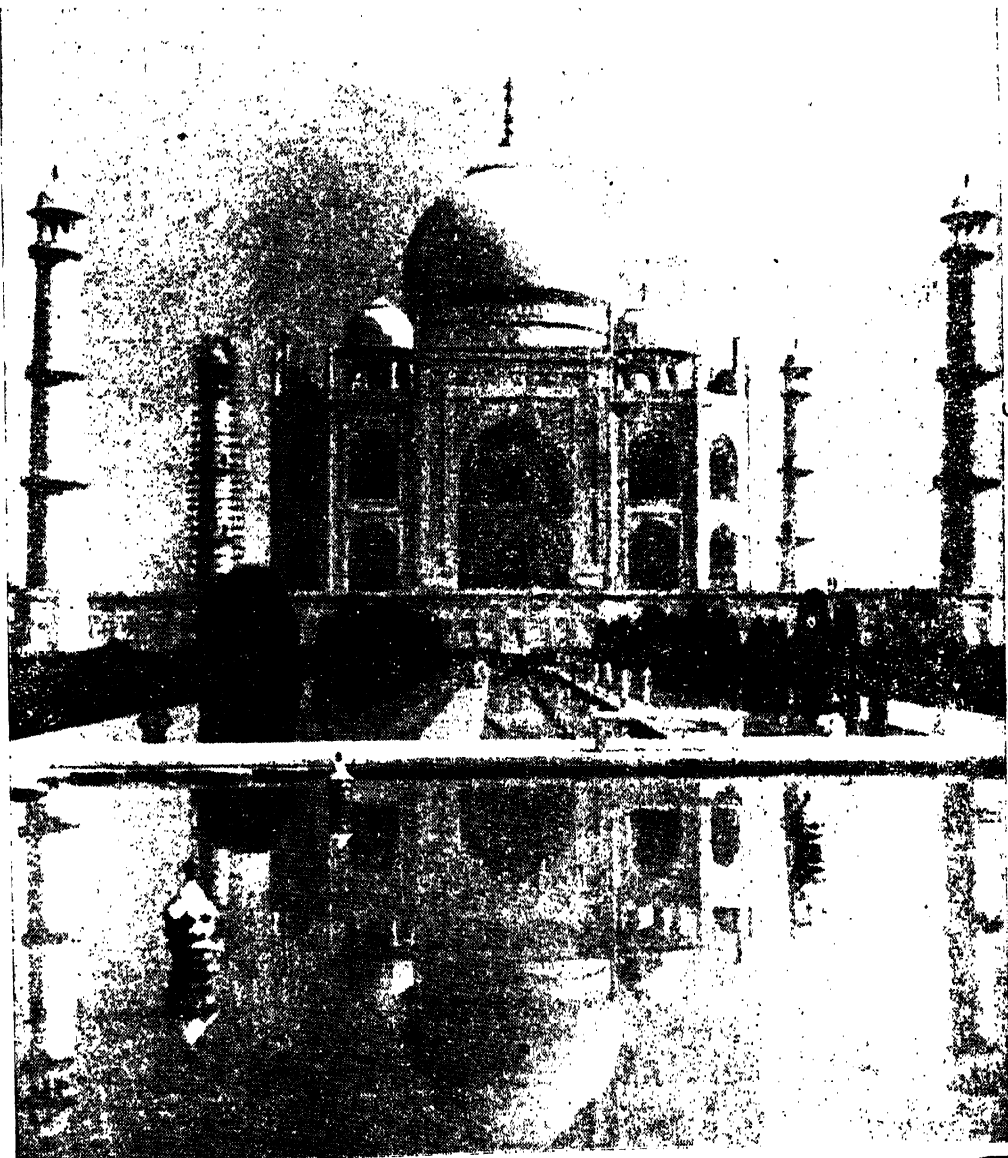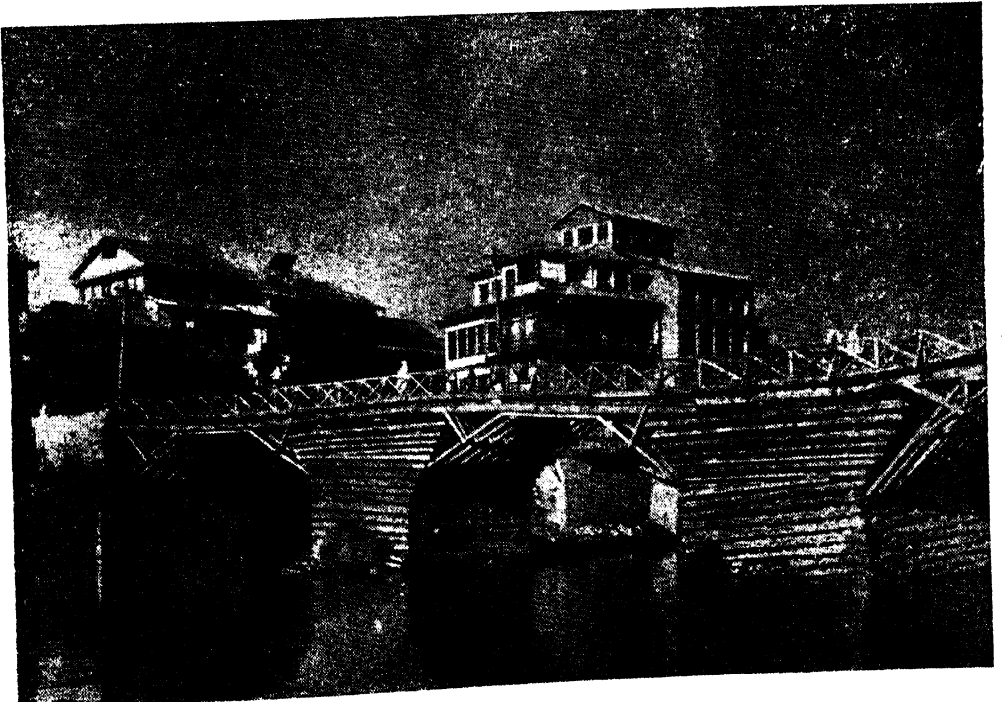
প্রতি রবিবারের মতো আজও ফেন্‌টন্‌ দম্পতি নদীর ধারে বেড়াতে এসেছে। বরাবরের মতো আজও এল্‌বার্ট ব্রিজ পর্যন্ত এসে থামল ওরা, পুল পেরিয়ে বাগানের দিকেই যাবে, না হাউস্‌বোটগুলোর পাশ কাটিয়ে যেমন হাঁটছিল, তেমনি বরাবর এগিয়ে যাবে—এই ভাবছে, হঠাৎ স্বামীর অজ্ঞাত কোন চিন্তাসূত্র ধরে ফেন্‌টন্‌ পত্নী আচম্‌কা বলে বসে, "ভাগ্যিস মনে পড়ে গেল, বাড়ি ফিরে আলহুসুন্‌দের টেলিফোন করে আজ সন্ধ্যেবেলা আড্ডা দিতে আসতে বলব। এবার ও'দের আসার পালা।"

আশেপাশে পথচারীদের প্রতি দৃক্‌পাত না করেই ফেন্‌টন্‌ হেঁটে চলেছে। পুলের ওপর দিয়ে বড্ড জোরে একটা লরী এগিয়ে আসছে, দারুণ শব্দ করে' ছোট গাড়িটা ছুটে বেরিয়ে গেল, চক্‌মকে পোষাক পরা একটি নার্স বাচ্চা-ঠেলা গাড়ি ঠেলে পুল পেরিয়ে ব্যাটারসি'র দিকে মোড় নিল। ঠেলার মধ্যে ডাচ পনিরের মতো গোল গোল মুখওয়ালা যমজ দু'টি বাচ্চা

"এবার কোন দিকে?" স্ত্রীর প্রশ্ন শুনে ফেন্‌টন্‌ তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে, হঠাৎ তার কেমন খটকা লাগে, যেন তার স্ত্রী আর বাঁধের ওপর পুলের ওপরের সব মানুষগুলো সুতোয় ঝোলানো ছোট্ট ছোট্ট পুতুল। তাদের পা ফেলার রকম সকম পর্যন্ত কেমন যেন হ্যাঁচকা টান মারা একপাশে হেলে পড়া। বাস্তবিক যা' হওয়ার কথা তার বিশ্রী অনুকরণ মাত্র। নীল চোখ আর গাঢ় রং করা ঠোঁট, মাথায় তেরছা করে নতুন টুপি পরা স্ত্রীর মুখখানা যেন দক্ষ শিল্পীর তাড়াহুড়োর মাথায় আঁকা মুখোশ মাত্র। দেশলাই কাঠির কাঠ দিয়ে তৈরী প্রাণহীন অসংখ্য ছোট ছোট পুতুল নাচের পুতুলকে শিল্পী যেন হাতে করে' ধরে আছেন। চট করে স্ত্রীর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে পায়ের নীচের চৌকো পাথরের রেখার ওপর দিয়ে হাতের লাঠিটা বোলাতে থাকে, পাথরের মাঝখানে কিসের যেন একটা ছোপ, লাঠির ডগা দিয়ে সে জায়গাটা ঘষে নেয়। তারপর নিজের কানে নিজেকে বলতে শোনে, "আমি আর পারি না।"

স্ত্রী তো অবাক,—"কি হ'ল আবার? বুকের পাশের ব্যথাটা বাড়ল নাকি?"

ফেন্‌টন্‌ বুঝল তাকে ভেবে-চিন্তে উত্তর দিতে হবে। যা' তা' একটা জবাব দেবার চেষ্টা করলেই ঐ বড় বড় দুটি চোখে বিব্রত ভাব ফুটে উঠবে, আরও নানান প্রশ্ন জাগবে, আবার ঐ বিশ্রী বাঁধটার ওপর দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। এবার তবু যা'হোক বাতাসটা পেছন থেকেই বইছে। এর পরে, জাহাজঘাটার দুর্গন্ধ কাদার মধ্যে যেমন কাঠের গুঁড়ি আর খালি বাক্সগুলোকে জোয়ারে ঠেলে নিয়ে যায় তেমনি ঘড়ির ঘণ্টাগুলো অবধারিত মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

স্ত্রীকে আশ্বস্ত করার আশায় এবার সে বেশ গুছিয়েই জবাব দেয়, "আমি বলছিলাম যে, এই হাউসবোটগুলোর পরে আর আমরা এগোতে পারি না, কারণ পথ এখানেই শেষ হয়েছে। তা'ছাড়া তোমার জুতোর গোড়ালিটা সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা আছে, ব্যাটারসি পর্যন্ত হেঁটে যাবার মতো অবস্থা ওর নেই। আমি শরীরটাকে আরেকটু সচল করার প্রয়োজন বোধ করছি, তুমি তাল রাখতে পারবে কেন? বাড়ি ফিরে যাও। তা'ছাড়া আজ বিকেলটাও তেমন কিছু অপূর্ব ঠেকছে না।"

ঘন মেঘে ঢাকা ঘোর রং-এর আকাশের দিকে স্ত্রী চোখ তুলে চায়, ঠিক সেই মুহূর্তে এক দমকা বাতাস এসে তার হাল্‌কা কোটটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়, বেচারী তাড়াতাড়ি হাত তুলে বসন্ত-বাহার টুপিখানা মাথার ওপর চেপে ধরে। "হয়তো আমার এবার ফিরে যাওয়াই উচিত।" ঈষৎ সন্দেহভরে স্বামীর দিকে দেখে নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে, "তুমি ঠিক বলছ, তোমার সেই ব্যথাটা বাড়ে নি? মুখখানা কেমন যেন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।"

"না, আমার কিছু হয়নি, আমি একটু পা চালিয়ে হাঁটতে চাই শুধু।" ফেন্‌টন্‌ জবাব দেয়, ঠিক সেই সময়ে একখানা ট্যাক্সি দেখে ছড়ি নেড়ে সেটিকে থামিয়ে স্ত্রীকে বলে, "উঠে পড়, ঠাণ্ডা লাগাবার কোন মানে হয় না।" স্ত্রীকে মুখ খোলার সময় না দিয়ে দরজা খুলে ধরে এবং ড্রাইভারকে ঠিকানা বলে দেয়। তর্ক করবার অবসরটুকুও মিলল না। ট্যাক্সি ছেড়ে দেবার পর ফেন্‌টন-পত্নী বন্ধ জানালার ভেতর দিয়ে চেঁচিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা এবং আলহুসুন্‌দের আসার কথা মনে করিয়ে দিল। ট্যাক্সিটা বাঁধ পেরিয়ে অদৃশ্য হ'ল, যেন তার জীবনের এক অধ্যায় চিরকালের মতো দৃষ্টির অন্তরালে সরে গেল।

পালিয়ে গা ঢাকা দেবার কথা আগে কখনও মনে হয়নি। স্ত্রী আলহুসুন্‌দের কথা তুলতে হঠাৎ-ই তার মাথার ভেতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের মতো কি যেন খেলে যায়। "বাড়ি ফিরে আলহুসুন্‌দের টেলিফোন করার কথা মনে করিয়ে দিও—এবার ওদের আসার পালা।" ডুবন্ত লোকের চোখের ওপর দিয়ে ধারাবাহিক জীবনের ছবি ভেসে যায়, তার একটা মানে পাওয়া যায়। সদরে ঘণ্টা বাজার শব্দ, আলহুসন্‌দের খুশি-খুশি কণ্ঠস্বর, সাইড্‌বোর্ডের ওপর বিশেষ করে সাজানো পানীয় ও পানপাত্রগুলি, মিনিটখানেক উঠে দাঁড়ানো, তার পরেই বসে পড়া—এ যেন তার জীবন-ভোর বন্দীদশার ছবিতে ঠাসা নক্সাকাটা দেওয়ালসজ্জা। প্রতিদিন ঘুম ভেঙে জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়ে ভোরের চা খাওয়া, খবর কাগজ খুলে বসা, গ্যাসের নীলচে আলোজ্বলা ছোট্ট খাবার ঘরে বসে প্রাতরাশের পর্ব সমাধা করা (খরচ বাঁচাবার জন্য আঁচটাকে কমিয়ে রাখা), পাতালপথে শহর অভিমুখে যাত্রা, ধারাবাহিক কাজের ছকে ফেলা ঘড়ির ঘণ্টাগুলো আবার পাতাল পথে বাড়ি ফেরার ভীড়ের মধ্যে সন্ধ্যের কাগজখানা খুলে নিজেকে ডুবিয়ে

রাখা, বাড়ি ফিরে হ্যাট, কোট, ছাতা খ লিয়ে রাখা, বসার ঘরে টেলিভিসনের শব্দের সঙ্গে টেলিফোনে আড্ডা দেওয়া স্ত্রীর কণ্ঠস্বর। শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ, বসন্ত ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বসার ঘরে চেয়ার আর সোফা ঢাকাগুলোর রং বদলে যায়; একপ্রস্থ ধোয়ানো হয়, আরেক প্রস্থ পরানো হয়, বাইরে গাছেরা পাতার সাজ পরে, বা ছাড়ে।

"এবার তাদের আসার পালা"—আলছসুনরা নিজের নিজের সুতোর আগায় ঝুলতে ঝুলতে আসে, নমস্কার করে, অদৃশ্য হয়ে যায়, গৃহকর্তা তাদের অভ্যর্থনা করে, এরা আবার নিজেদের বেলায় মুখভঙ্গী করতে করতে সেকেলে ঢং-এ জোড়ায় জোড়ায় নাচতে নাচতে আসে।

এলবার্ট ব্রিজের ওপর এড্‌নার মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎই যেন কালের চাকা স্থির হয়ে যায়; কিম্বা হয়তো স্ত্রীর বেলায়, বা আলছসুন্‌ সংজ্ঞাধারী টেলিফোনে উত্তর দেওয়া পুতুল নাচের বিপরীত দলটির পক্ষেও সময় তার গতিপথে ঠিকই চলেছে, শুধু তারই বেলায় সব ওলটপালট হয়ে গেছে। নিজের ভেতর কি যেন এক শক্তি অনুভব করে, নিজের ওপর পূর্ণ দখল তার আছে। আর এড্‌না, বেচারী এড্‌না, ট্যাক্সি করে ফিরে বাকে পানীয় বের করে সাজাতে হবে, কুশনগুলো নেড়েচেড়ে ঠিক করতে হবে, টিনের ভেতর থেকে নোনতা বাদাম বের করতে হবে, সে বেচারীর কোন ধারণাই নেই যে, তার স্বামী সব বন্ধনমুক্ত হয়ে হঠাৎ এমন একটা নতুন রূপ লাভ করেছে।

রবিবারের বৈরাগ্য পথে-ঘাটে চেপে বসে আছে। বাড়িঘর বন্ধ। সে ভাবে,—"ওরা জানে না, ঐ ভেতরের মানুষগুলো জানে না, এই মুহূর্তে আমার একটি ইঙ্গিতে দুনিয়া ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। দরজায় একটা টোকা দিলে কেউ সাড়া দেবে, হাই তুলতে তুলতে কোন মহিলা দরজা খুলতে আসবে, কার্পেটের জুতো পায়ে কোন বুড়ো, কিম্বা উত্যক্ত হয়ে কোন বাপ-মা হয়তো একটা বাচ্চাকে পাঠিয়ে দেবে। শুধু আমার ইচ্ছার ওপরে, আমার সিদ্ধান্তের ওপরে তাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। মুখগুলো সব থেঁতলে যাবে। হঠাৎ খুন, চুরি, আগুন। এসব তো অতি সহজ ব্যাপার!"

সে একবার হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিল। সাড়ে তিনটে গণিতের সংখ্যা ধরেই তাকে কাজ করতে হবে। আরও তিনটি রাস্তা ধরে সে হাঁটতে থাকবে, তারপর তৃতীয় রাস্তার নামের অক্ষর গুণে নিয়ে তার গন্তব্যের নম্বর বেছে নেবে।

ক্রমেই উৎসাহ বেড়ে চলেছে, পা চালিয়ে দিল সে। আপন মনে আওড়ে নিল, কোন ফাঁক সে রাখবে না। সব ফ্ল্যাট বাড়ি বা দুধ সরবরাহের দোকান, সংখ্যা মিলিয়ে বা মিলবে তাই। তৃতীয় রাস্তাটা ছিল লম্বা টানা, দুপাশ দিয়ে সেকেলে ভিক্টোরিয়ার আমলের বাংলো বাড়িতে ঠাসা, এককালে হয়তো কিছু জেল্লা ছিল, বর্তমানে ফ্ল্যাট বা সস্তা ভাড়া বাড়িতে পরিণত হয়েছে। রাস্তার নাম বোণ্টিং স্ট্রীট। আটটি শব্দ অর্থাৎ আট নম্বর। পরম আত্মবিশ্বাসে এগিয়ে চলে,—সোজা সদর রাস্তাগুলোর ওপর নজর রেখে। প্রত্যেক বাংলোর সামনে খাড়া পাথরের সিঁড়ি, রং চটা ফটক, নীচু নীচু ভিত, দারিদ্র্য-জীর্ণ চেহারা, নিজেদের বিজেন্দি স্কোয়ারের চকচকে সদর দরজা-জানালা থেকে কতো তফাৎ, কিন্তু তাতে কিই বা এসে যায়?

আশেপাশের বাড়ির সঙ্গে আট নম্বরের কোন তফাৎ নেই। ফটকটা বরং একটু বেশী নড়বড়ে, লম্বা টানা জবড় নীচের তলাকার পরদাগুলো আরেকটু বেশী জ্যালজেলে। ফ্যাকাশে মুখ, ফ্যাকাশে চোখওয়ালা একটা তিন বছরের বাচ্চা ছেলেকে প্রথম ধাপটাতে পাপোষের সঙ্গে এমনভাবে বেঁধে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সে নড়তে চড়তে পারছে না। সদর দরজা খোলা।

জেমস্‌ ফেন্টন্‌ সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘণ্টার খোঁজে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে—"ব্যবহারের অযোগ্য" একটা কাগজে এই দু'টি কথা লিখে কে যেন ঘণ্টার গায়ে সেঁটে রেখেছে। তার নীচে সেকেলে ঢং-এ ঘণ্টা বাজানো দড়ি ঝুলছে। বাচ্চাটাকে দড়ি থেকে খুলে বগলদাবাই করে' খেয়াল মাফিক ছেড়ে দিয়ে আসতে ক'মিনিটই বা লাগবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন নৃশংস কিছু করতে মেজাজ উঠছে না। ঠিক এ জিনিসটা নয়, তেমন শক্তি পেলে মুক্তির অবকাশটা আরও একটু বেশী হওয়া দরকার।

ঘণ্টার দড়িতে টান দিয়ে দেখা যাক্‌। অন্ধকার ঘরের ভেতর দিয়ে ক্ষীণ শব্দ ভেসে গেল। ছেলেটা নির্বিকারভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ফেন্টন্‌ দরজা ছেড়ে রাস্তার দিকে চোখ ফেরায়। ফুটপাথের ধারের গাছটায় নতুন পাতা গজাচ্ছে, গাছের ছালটা গাঢ় খয়েরির, মাঝে মাঝে হলুদের ছোপ। গাছের গোড়ায় একটা বেড়াল বসে বসে ঘা'ওয়ালা থাবাটা চাটছে। অনিশ্চিতের মাঝে দাঁড়িয়ে সময়টাকে সে বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে নিল।

পেছনে দরজা খোলার শব্দ, তারপরেই বিদেশী টানে বামাকণ্ঠে ধ্বনিত হয়,—"আপনার জন্য কি করতে পারি।"

ফেন্টন্‌ টুপিটা খুলে হাতে নিল। মনের ভেতর কে যেন চীৎকার করে উঠল,—"আমি তোমায় খুন করতে এসেছি, তোমায় আর তোমার বাচ্চাকে। তোমার ওপর আমার কোন হিংসা নেই, ভবিতব্য আমায় দিয়ে এ-কাজ করিয়ে নিচ্ছে।" বাইরে শুধু একটু হাসল। সিঁড়ির ধাপে-বসা ছেলেটার মতোই স্ত্রীলোকটিরও চেহারা ফ্যাকাশে, চাউনি বোকা-বোকা, তেমনি মাথায় ওটিকয় চুল। পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে যে কোন একটা বয়স হতে পারে। শরীরের তুলনায় মস্ত ঢলঢলে একটা পশমের সোয়েটার গায়ে, কালো-কোঁচকানো হাঁটু অবধি স্কার্ট পরে' কেমন যেন থ্যাবড়া দেখাচ্ছে। ফেন্টন্‌ জিজ্ঞেস করে,—"ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে?"

নির্বোধ চোখ দু'টোয় সামান্য আলো খেলে যায়, একটু যেন আশার আভাস। মনে হয় এই একটা প্রশ্ন একদিন কেউ করবে বহুদিন ধরে যেন এ ধরণের আশা করে করে, শেষ অবধি কেউ আসবে না, এই বিশ্বাস স্ত্রীলোকটির মনে বদ্ধমূল হয়েছে। চোখের সেই আলোটা হঠাৎ-ই আবার দপ করে নিভে গিয়ে আগের ফ্যাল-ফ্যালে ভাব ফিরে এল।—"বাড়িটা আমার নয়, এক সময়ে বাড়িওয়ালা ঘর-ভাড়া দিত, কিন্তু শুনেছি—বাড়িটা এ-দিকের আর সব বাড়ির সঙ্গেই ভেঙ্গে ফেলা হবে—এ জায়গায় ফ্ল্যাট-বাড়ি উঠবে।"

আগের কথার জের টেনেই সে বলল,—"তুমি বলতে চাও যে, বাড়িওয়ালা আর ঘর ভাড়া দেয় না?"

"না"—উত্তর এল,—"বাড়িওয়ালা আমায় বলেছে, বাড়ি ভেঙ্গে ফেলার হুকুম যে কোনদিন আসতে পারে, এ অবস্থায় ঘর ভাড়া দেওয়া চলে না। যতদিন না ভাঙার কাজ শুরু হয়, ততদিন দেখাশোনা করার জন্য আমায় সামান্য কিছু দেয়। আমি নীচে থাকি।"

"তাই নাকি ?"—ফেন্‌টন্‌ সাড়া দেয়।

কথাবার্তা এখানেই শেষ হ'তে পারত, কিন্তু ফেন্‌টন্‌ তবু কেন দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটি বা স্ত্রীলোকটি তাকে এড়িয়ে বাচ্চাটাকে চুপ করতে বলে—যদিও বাচ্চাটা আদপেই কোন শব্দ করেনি।

ফেন্‌টন্‌ প্রস্তাব করে, "নীচের একখানা ঘর আমায় ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়—না? যতদিন তুমি আছ, ততদিন আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয় তো হ'তে পারে। বাড়িওয়ালা আপত্তি করতে পারে না।"

মনে হ'ল স্ত্রীলোকটি ভাববার চেষ্টা করছে। এ ধরণের এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে এমন ধরণের প্রস্তাব খুবই আশ্চর্য ঠেকছে। ঠিকমত বিশ্বাসও হচ্ছে না। হকচকিয়ে দিতে পারলে ঐখানেই অর্ধেক কাজ হাসিল হয়ে যায়। সুযোগ বুঝে ফেন্‌টন্‌ বলে,—"আমি শুধু একটা ঘর চাই, দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টার জন্য মাত্র, এখানে আমি শোব না।"

লণ্ডনের উপযুক্ত টুইডের স্যুট, হ্যাট, ছড়ি, চমৎকার উজ্জ্বল গায়ের রং, পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বয়স—সব মিলিয়ে লোকটাকে বিশ্বাস করা খুব কষ্টকর। ফেন্‌টন্‌ দেখল তার চেহারা আর অদ্ভুত প্রস্তাবের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে বের করতে গিয়ে মেয়েটির বোকা-বোকা চোখ দুটি ছানাবড়া হয়ে যাচ্ছে। সন্দেহভরে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, "ঘর নিয়ে আপনার কি হবে?"

এইখানেই তো গলদ। তোমাকে আর তোমার ছানাটাকে মেরে মেঝের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখতে চাই। না, এখনও না। চট্‌পট্‌ একটা উত্তর মুখে যুগিয়ে গেল,—"বোঝানো বড় শক্ত। আমি ব্যবসা করি, অনেক ঘণ্টা খাটুনি আমার। কিন্তু সম্প্রতি কিছু গোলমাল বেধেছে, কাজেই আমি এমন একটা ঘর খুঁজছি যেখানে নিরিবিলিতে কয়েক ঘণ্টা কাটানো যায়। ঠিকমতো জায়গা পেতে হাড় কালি হয়ে যাচ্ছে। এ জায়গা আমার মনের মতো হবে বলে বোধ হচ্ছে।" ফাঁকা বাড়ি থেকে শুরু করে বাচ্চাটা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল,—"যেমন ঘর তোমার এই খোকা। ভারি সুন্দর বয়স এটা। ও আমায় কিচ্ছু জ্বালাতন করবে না।"

মেয়েটির মুখের ওপর দিয়ে হাসির মতো কি এক ভাব খেলে গেল, "ও! জনি আমার খুব শান্ত ছেলে। ঐখানটাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। ও কিচ্ছু করবে না।" হাসি মিলিয়ে আবার সন্দেহের মেঘ নেমে এল,—"কি বলব বুঝতে পারছি না, আমরা রান্নাঘর আর তার লাগোয়া একটা শোবার ঘর নিয়ে আছি। পেছনে একটা ঘরে আমার কিছু আসবাব ঠাসা আছে। কিন্তু আপনার সেটা পছন্দ হবে না বলেই মনে হয়। অবশ্য আপনি ঘরটাকে কি কাজে লাগাবেন, তার ওপর সব নির্ভর করে।"

গলার স্বর মিলিয়ে এল। তার দিক থেকে আগ্রহের অভাবটাই দরকার ছিল। মনে হ'ল মেয়েটা খুব গভীর ঘুমোয় কিম্বা হয়তো নেশা করে। চোখের নীচে গভীর কালো দাগ থেকে নেশার কথাটাই প্রমাণ হয়ে যায়। ভালই হ'ল। বিদেশিনীও বটে। শহরে আজকাল এদের সংখ্যা বড্ড বেড়ে গেছে।

মুখে বলে,—"ঘরটা যদি একবার দেখতে পাই, তবে বুঝতে পারব।"

আশ্চর্য। মেয়েটি পেছন ফিরে সরু স্যাঁৎস্যাঁতে ঘরের ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। নীচের সিঁড়ির মাথায় আলোটা জেলে সমানেই বিড় বিড় করে মাপ চাইতে চাইতে ফেন্‌টন্‌কে নিয়ে চলেছে। বোঝাই যাচ্ছে, ভিক্টোরিয়ার আমলের বাড়ির এদিকটা চাকর-বাকরদের আস্তানা ছিল। রান্না, ভাঁড়ার, বাসন মাজার ঘরগুলো মেয়েটি ব্যবহার করছে। বিশ্রী পাইপ, নষ্ট হয়ে যাওয়া গরম জলের বয়লার, সেকেলে রান্নার উনুন, হয়তো সুন্দর সাদা রং আর পালিশের দৌলতে জবরদস্ত গেরস্থালির পরিচয় দিত। একদিকে এক দেওয়াল-আলমারি, পঞ্চাশ বছর আগের বুকভরা চকচকে সসপ্যান আর ভালো ভালো নক্সাকাটা ডিনার সেটের কথা মনে করিয়ে দিতে আজও দেওয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে করিয়ে দেয়, হাতে ফুলতোলা জোব্বা গায়ে প্রধান রাঁধুনি ছুটোছুটি করে কাজ গোছাচ্ছে আর থেকে থেকে অধস্তন চাকর-বাকরদের ওপর হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। বর্তমানে সেই রং-এর পলেস্তারা বিবর্ণ হয়ে জায়গায় জায়গায় ঝুলে আছে, পুরনো লিনোলিয়মটা ছিঁড়ে গেছে, শূন্য দেওয়াল-আলমারির মধ্যে খানিকটা তার সমেত একটা ওয়ারলেস্‌-সেট, পুরনো পত্র-পত্রিকা, আধবোনা সেলাই, ভাঙ্গা খেলনা, কেকের টুকরো, দাঁত মাজা বুরুশ, কয়েক জোড়া জুতো—এই রকম ছন্নছাড়া এটা ওটা পড়ে আছে। মেয়েটি অসহায়ভাবে চার পাশে চোখ বুলিয়ে নেয়। মুখে বলে,—"বাচ্চা নিয়ে এক ঝামেলা, সারাক্ষণ পরিষ্কার করতে হয়।"

দেখেই বোঝা যায় যে, কখনো পরিষ্কার করার চেষ্টাও সে করেনি, নিজের জীবন-সমস্যার মতো হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। ফেন্‌টন্‌ জবাব না দিয়ে শুধু মুচকি হাসে। আধখোলা দরজার ভেতর দিয়ে না-গোটানো বিছানার এতটুকু চোখে পড়ে। বোঝা যায় ঘণ্টার শব্দে ঘুমকাতুরে মেয়ের ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে। কিন্তু ফেন্‌টনের নজর ওদিকে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি দরজাটা টেনে দেয়। সোয়েটারের বোতামগুলো লাগিয়ে, চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে।

প্রশ্ন হ'ল, "যে ঘরখানা তুমি ব্যবহার করো না, সেটা কোন্‌টা?"

মেয়েটির হুঁশ হয়,—"ওঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।" অনিশ্চিত, অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে সে এতক্ষণে ভুলেই গেছে—কেন এ লোকটিকে নীচের তলায় টেনে আনা হয়েছে। সরুগলি মতো জায়গা পেরিয়ে, কয়লা রাখার গর্তের পাশ দিয়ে গিয়ে, বাথরুমের খোলা দরজার পাশে রাখা বাচ্চার পট আর ছেঁড়া "ডেলি মিরর" পার হয়ে একটি ঘরের নিশানা পাওয়া গেল, তার দরজা বন্ধ।

হতাশ সুরে বলে মেয়েটি,—"আমার মনে হয় না এতে আপনার কাজ চলবে।" ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে দরজা খুলে ফ্যালে, যুদ্ধের আমলে ব্ল্যাক-আউটের জন্য একরকম সস্তা কালো কাপড় পাওয়া যেত—সেই কাপড়ের পরদা টেনে সরিয়ে দেয়। নদীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ যেমন কুয়াশা ধাক্কা মারে, তেমনি স্যাঁৎস্যাঁতে পুরনো একটা দম আটকানো গ্যাসের গন্ধে দুজনেই একসঙ্গে হেঁচে ওঠে। নেহাৎ ফেন্‌টনের এখন অসীম শক্তি ও বিরাট উদ্দেশ্য—নইলে আর কারুর পক্ষে এ জায়গায় থাকা সম্ভব নয়।

মেয়েটি নিরুপায়ভাবে বলে, "বাস্তবিক ভারি বিশ্রী, মিস্ত্রীদের আসার কথা, কিন্তু ওরা কখনই আসে না।"

বাতাস আমদানি করতে যেই মেয়েটি পরদা সরিয়েছে, অমনি পরদা টাঙ্গানো ছড়টা হুড়মুড় করে সবশুদ্ধ ভেঙ্গে পড়ল, আর একটু আগে ফেন্‌টন্‌ গাছতলায় থাবায় নখওয়ালা যে বেড়ালটাকে বসে

থাকতে দেখেছিল, সেটা ভাঙ্গা জানালার সার্সি গলিয়ে লাফিয়ে পড়ল। মেয়েটির হুস্‌হুস্‌ শব্দে তার বিশেষ কিছু এসে গেল না, পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকার দরুণ বেড়ালটা এক কোণে রাখা প্যাকিং কেসের বাক্সের মধ্যে ঢুকে গিয়ে দিব্যি গুটিয়ে শুলো। ফেন্‌টন্‌ আর মেয়েটি তাদের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

অন্ধকার দেওয়াল, অদ্ভুত 'এল্‌'-ধরণের আকৃতি আর নীচু ছাত অগ্রাহ্য করেই সে বলে উঠল,—"এতেই আমার বেশ হবে। আরে, একটা বাগানও তো চোখে পড়ছে।" মাটির নীচেকার ঘর বলে তার মাথা বরাবর কিছুটা ফাঁকা জায়গা জানালা দিয়ে চোখে পড়ে। ইঁট-পাথর ছাড়া কিছু নেই সেখানে—হয় তো বা কোনকালে পথের ধারের কেয়ারি করা বাগান ছিল।

"হ্যাঁ, এদিকটা বাগান,"—বলতে বলতে এগিয়ে এসে মেয়েটি তার পাশে দাঁড়িয়ে যে উটকো জায়গাটাকে তারা দুজনেই এমন একটা মিথ্যে গৌরব দেবার চেষ্টা করছে—সেদিকে তাকিয়ে ভাখে। তারপর দুই কাঁধে সামান্য ঝাঁকি দিয়ে বলে,—"দেখতেই পাচ্ছেন—জায়গাটা নিরিবিলি, কিন্তু উত্তর দিক বলে আলো পায় না।"

বেশী গর্ত না করেও চোখের সামনের এই দেহটা সমাধিস্থ করার মতো যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যাবে বলে মনে মনে হিসাব করে নিয়ে, অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয়,—"আমি উত্তুরে ঘর পছন্দ করি।"

তার দিকে ফিরে সেই জীর্ণ দেহের লম্বা চওড়া আন্দাজ নেবার সময় মনে হ'ল মেয়েটি কি যেন ধরে ফেলেছে, চট করে হেসে ফেলে তাকে ভরসা দেয়।

মেয়েটি প্রশ্ন করে, "আপনি কি শিল্পী? তারাই তো উত্তুরে আলো চায়, তাই না?"

আঃ, কি অপার মুক্তি! শিল্পী। তাই তো, বটেই তো। এমনি একটা অছিলারই তো দরকার ছিল। সব মুস্কিলের আসান তো এইখানে।

ধূর্তের মত জবাব দিল সে, "এই যা! তুমি তো আমায় ঠিক চিনে ফেলেছ দেখছি। কথাটা বলে এমন হো-হো করে হেসে ওঠে যে, নিজের কানেই কেমন আশ্চর্য রকম সত্যি বলে খট্‌কা লাগল। হড়বড়িয়ে বলে গেল, "অবসর সময়ে মাত্র। মোট কয়েক ঘণ্টা আমি ছুটি পাই। সকালটা ব্যবসা নিয়ে থাকি, কিন্তু দিনের শেষের দিকটা আমার হাত খালি থাকে। তার পরেই শুরু হয় আমার আসল কাজ। শুধু সখ নয়, নেশায় দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা। এই বছরের শেষের দিকে একটা প্রদর্শনী করার ইচ্ছে আছে। কাজেই বুঝতে পারছ এমনি একটা জায়গার আমার কি ভয়ানক দরকার।"

চারিদিকে চেয়ে এমনভাবে সে হাত নাড়ল, যার একমাত্র লক্ষ্য বেড়ালটা। এমন পূর্ণ বিশ্বাসে কথাগুলি উচ্চারিত হ'ল যে মেয়েটির এ পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত মন থেকে সন্দেহের শেষ রেখাটুকুও মুছে গেল।

উল্টে সে প্রশ্ন করল, "চেল্‌সিতে অনেক শিল্পী, তাই না? লোকে তো বলে, আমি জানি না। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, আলো পাওয়ার জন্য ষ্টুডিওগুলো খুব উঁচুতে হওয়া দরকার।"

ফেন্‌টন্‌ উত্তর দিল, "ঠিক তা' নয়, তেমন খুঁতখুঁতি আমার নেই এবং দিনের শেষে আলো তো এমনিতেই যাবে। ইলেক্‌ট্রিক আলো আছে নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ," মেয়েটি সরে গিয়ে একটা সুইচ টিপে দিল। ছাদ থেকে ঝোলানো শুধু একটা বাল্‌ব রাজ্যের ধুলোর ভেতর দিয়ে দপ করে জ্বলে উঠল।

"চমৎকার"—বলে সে, "আর কিছু আমার চাই না।" বোকা-বোকা দুঃখী মুখের দিকে চোখ ফেরায় সে। বেচারা ঘুমোতে পারলে কত খুশি হ'ত। বেড়ালটার মতো ঠিক। দুঃখ ঘোচাবার জন্যে এতটুকু করুণার প্রয়োজন আছে। আবার প্রশ্ন করে সে—"কাল থেকে আসতে পারি?"

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রথম যখন ঘরের খোঁজ করে, তখন মেয়েটির মুখে যেন আশার আভাস ফুটে উঠেছিল, কিন্তু তারপর—এবার কেমন অস্বস্তির ভাব দেখা যাচ্ছে কেন?

শেষ অবধি বলেই ফ্যালে মেয়েটি, "আপনি তো ঘরভাড়া কত জিজ্ঞেস করলেন না।"

জবাব দিতে দেরী হয় না,—"তোমার যা খুশি"—হাত দিয়ে এমন এক ভঙ্গী করে যেন টাকাটা কোন কথাই নয়।

কি বলবে ভেবে না পেয়ে মেয়েটি ঢোঁক গেলে, তারপর ফ্যাকাশে মুখে ঈষৎ রং-এর ছোঁয়া লাগে,—"আমি বাড়িওয়ালাকে এ বিষয়ে কিছুই বলব না, শুধু বলব, আপনি আমার বন্ধু। যা উচিত মনে করেন, তেমনি আমায় হপ্তায় একটা কি দুটো পাউণ্ড ঠেকিয়ে দেবেন।"

উদ্বেগভরে চেয়ে আছে মেয়েটি। নিশ্চয়ই এর ভেতর তৃতীয় ব্যক্তিকে আনা কোনমতেই ঠিক হবে না। এটুকু মনে মনে স্থির করে নেয় সে। তাহলে সব ভেস্তে যাবে। মুখে বলে, "কাল থেকে তুমি প্রতি হপ্তায় পাঁচ পাউণ্ড করে পাবে।"—পার্স থেকে সে করকরে নতুন নোট বের করে। যতক্ষণ সে নোট গুণতে থাকে, মেয়েটির চোখে যেন পলক পড়ে না।

সে বলে,—"বাড়িওয়ালার কানে যেন না যায়। যদি কোন প্রশ্ন ওঠে, বলবে আমার এক শিল্পী আত্মীয় এসেছে।"

এই প্রথম মেয়েটি মুখ তুলে চেয়ে হাসল—যেন নোটগুলো নেওয়ার মধ্যে এ লোকটির সঙ্গে তার একটা সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে।

মেয়েটি এতক্ষণে মুখ খোলে,—"আপনাকে দেখে না আমার আত্মীয়, না শিল্পী—কোনটাই মনে হয় না। নাম কি আপনার?"

"সিমস্‌"—চট করে উত্তর এল,—"মার্কাস সিমস।" কি আশ্চর্য, নিজের মৃত শ্বশুর, সলিসিটর ভদ্রলোক, দুচোখে কোন দিন যাকে দেখতে পারে নি—কি করে তার নামটা মুখ দিয়ে বেফস্‌কা বেরিয়ে গেছে।

মেয়েটি বলে,—"ধন্যবাদ মিঃ সিমস্‌। আমি কাল নিজে হাতে আপনার ঘরটাকে সাফ করে রাখব।"—তারপর এই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রথম নিদর্শনস্বরূপ বেড়ালটাকে প্যাকিং বাক্স থেকে বের করে জানালা দিয়ে ভাগিয়ে দিল।

"কাল বিকেলে আপনার মালপত্তর এনে ফেলবেন তো?" মেয়েটি শুধোয়।

"আমার মালপত্তর?" অবাক হ'ল সে।

মেয়েটি বলে, "আপনার কাজের জিনিসের কথা বলছি। রং তুলি সব।"

"ও: হ্যাঁ···নিশ্চয়ই।" সে জবাব দেয়, "আমার জিনিস সব আন্‌ব বৈকি।"

আরেকবার ঘরের মধ্যে চোখ বুলিয়ে নেয়। কিন্তু কশাইপনার প্রশ্নটা কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। নাঃ, রক্তটক্ত নয়। কোন নোংরামি নয়। মা ও শিশু দুজনকেই ঘুমের মধ্যে শেষ করতে হবে। সেইটাই সবচেয়ে ভাল হবে।

মেয়েটি জানায়,—"রং এর জন্য আপনাকে বেশী দূরে যেতে হবে না। কিংস্ রোডে ছবির সরঞ্জামের অনেক দোকান আছে। আমি বাজার করতে গিয়ে দেখেছি। জানালায় ছবি আঁকার বোর্ড আর ইজেল দেখেছি।"

হাসি চাপার জন্যে মুখে হাত দিতে হয়। কি রকম নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করেছে মেয়েটি, ভাবলেও মায়া হয়। কত দূর বিশ্বাস আর ভরসা করছে তাকে, বেশ সেটুকু বোঝা যায়।

সরু গলি পথ দিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে হলঘরে ফিরে এল তারা। "এ ব্যবস্থা আমার খুব মনের মতো হয়েছে।"—বলে সে,—"কি বলব তোমায়, আমি একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ছিলাম।"

মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে ফিরে মৃদু হেসে জবাব দেয় —"আমিও, আপনি না এলে আমি কি করতাম জানি না।" সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল, কি আশ্চর্য! তার এই হঠাৎ আসার মধ্যে ঈশ্বরের হাত আছে। অবাক্‌ভাবে সে মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল—তারপর জিজ্ঞেস করল—"তুমি বুঝি কোন বিপদে পড়েছিলে?"

"বিপদ?"—হাতের ভঙ্গী করল মেয়েটি। তার মুখে আবার সেই পরম নৈরাশ্য। আর বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে উঠল—"এদেশে বিদেশিনী হওয়াই যথেষ্ট ঝকমারি। তারপর আমার ছেলের বাপ টাকা-পয়সা না দিয়ে না-পাত্তা হয়ে গেল, কোথায় যাব আমি? মিঃ সিমস—আজ আপনি না এলে"···বাক্য সম্পূর্ণ হল না, পাপোষে বাঁধা বাচ্চাটার দিকে চেয়ে বলল,—"বেচারা জনি, তোমার কোন দোষ নেই।"

ফেন্‌টন্ সায় দিল,—"বেচারা জনিই বটে—আর তুমিও বেচারী। যাক্, তোমার দুঃখ ঘোচাবার চেষ্টা করব বলে আমি কথা দিচ্ছি।"

"আপনি মহৎ। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানবেন।"

"বরং উল্টো। আমারই ধন্যবাদ দেওয়ার কথা।" ঈষৎ মাথা নীচু করে অভিবাদনের ভঙ্গী করে। তারপর বাচ্চাটার মাথায় হাত দিয়ে বলে,—"জনি, আজ তবে আসি, কাল দেখা হবে।" বেচারা বাচ্চাটা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। "বিদায় মিসেস্··· মিসেস···?"

"কোফম্যান। আমার নাম এ্যানা কোফম্যান।"

সিঁড়ি ভেঙ্গে ফটক দিয়ে ভদ্রলোক চলে যাওয়া পর্যন্ত মেয়েটি দাঁড়িয়ে দেখল। বিতাড়িত বেড়ালটা ভাঙ্গা জানালায় ফিরতি পথে তার পা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। মেয়েটি, বাচ্চাটা, বেড়ালটা, ঐ বোবা বাক্সে বাড়িটার সব কিছুকে ফেন্‌টন্ টুপি নেড়ে বিদায় জানিয়ে গেল। "কাল দেখা হবে।" তারপর মস্ত এক রহস্যের স্বাদ পেয়েছে—এইভাবে ধুপধাপ করে পা ফেলে বোশ্‌টিং স্ট্রীট দিয়ে এগিয়ে গেল।

নিজের বাড়ির দরজায় এসেও তার উৎসাহ নিভল না। গা-তালা খুলে বাড়ি ঢুকে ত্রিশ বছরের পুরনো একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। চিরদিনের মতো আজও এড্‌না টেলিফোন ধরে আছে। দুই মহিলার অনর্গল কথাবার্তা কানে এসে ঘা দিল। বসার ঘরের ছোট্ট টেবিলের ওপর পানীয়ের বোতলগুলো সাজানো আছে। নোন্‌তা বাদাম আর ককটেল বিস্কুট বের করা হয়েছে। বাড়তি গেলাসগুলো নিমন্ত্রিতদের জন্য। এডনা হাত দিয়ে টেলিফোনের মুখ ঢেকে জানিয়ে দেয়—"আলছসন্‌রা আসছে, আমি রাত্রে ওদের খেতে বলেছি।"

স্বামী মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। গত একটি ঘণ্টায় জীবনকে নতুন করে উপভোগ করার তৃপ্তিতে সময়ের অনেক আগেই নিজের গেলাসে এতটুকু শেরি ঢেলে নিল। টেলিফোনের আলোচনা বন্ধ হ'ল। এড্‌না অবাক হয়,—"তোমায় অনেকটা ভাল দেখাচ্ছে। হাঁটলে তোমার উপকার হয় সত্যি।" বেচারীর অজ্ঞতায় এত মজা লাগে যে, বিষম খেতে খেতে কোনমতে বেঁচে যায়।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—কল্পনা রায়

অপরাজিতা

বাণী সিংহ

বাসরের মালা ম্লান হয়ে গেছে কবরী-মূলে,
আঁখির কাজলে রটে কলঙ্ক গণ্ডতটে,
গাঢ় নিপীড়নে ব্যথিত অধর শিহরি ওঠে;
তৃতীয়ার শশী আঁকিলো কে গিরি-শিখরে ভুলে!

তবু মৃদু হাসি ওঠে ওই ভাসি আঁখির কোণে,
যবে প্রিয় সখী সুধায় বারতা সঙ্গোপনে।
বিগত নিশার রসোৎসবে,
শ্রবণের তটে অধর রাখিয়া কহে গুঞ্জনে ভ্রমর-রবে॥

আসঙ্গ স্মৃধা অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো আছে,
আহত পরাণ তাই বার বার রণ যে যাচে;
রতির আরতি বিরতি না চায়,
ফুলধনু ত্যজি অতনু পলায়,
চুরি গেছে তার তূণ ভরা সেই
পাঁচটি শর
মন্মথ রাগে পরাভব তাই জুড়িয়া কর।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অবিনাশ সাহা

১১

উৎসবমুখর গঞ্জ। তার ঘরে আনন্দের বান ডেকেছে। আজ থেকে দুর্গাপুজা শুরু। মহা সপ্তমী আজ। মণ্ডপে মণ্ডপে ঢাক বাজছে। সে বাজনায় ছোটরা নেচে বেড়াচ্ছে। তাদের প্রত্যেকের পরনে নতুন জামা, জুতো। বড়রাও বাদ যায়নি। আর কিছু না জুটলেও নতুন কাপড় একখানি সকলেই কিনেছে। যে কিনতে পারেনি সে পেয়েছে উপহার—নয়তো বকশিস। হাসি আজ সকলের মুখেই। এতো শুধু মন্ত্রতন্ত্রের পুজো নয়। এ হচ্ছে বাঙালীর জাতীয় উৎসব। এ উৎসবকে কেন্দ্র করে দূরের জন কাছে আসবে। পর হবে আপন। পরস্পর পরস্পরকে দেবে কোল।

কবে কোন্ সাধক শরৎকে বোধন-কাল জেনে আগমনী গেয়েছিলেন তা মা শারদীয়াই জানেন। কিন্তু বাংলার এমন মন-মাতানো শ্যামশ্রী কোন ঋতুতেই চোখে পড়ে না। মেঘ-মুক্ত সুনীল আকাশ, সোনা-ঝরা ধানক্ষেত, শিশির-স্নাত প্রান্তর, শতদল শোভিত সরোবর, কাকলী-মুখর বন-বীথি, ভরা মাঠ, ভরা নদী—এ শুধু শরৎ ঋতুতেই সম্ভব। তাই শরৎ কবির ধ্যানে রাণী—উৎসবচঞ্চলা।

গঞ্জে সেই উৎসবই চলেছে। বাড়ির পুজো পারিবারিক পুজো। কিন্তু বারোয়ারি পুজো পাড়ার সকলের। সকলেই এর অংশীদার। সকলেই একত্রে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দেবে, পংক্তি-ভোজনে বসে প্রসাদ পাবে, যুক্তকরে আরতি দেখবে। বাড়ির পুজোর চেয়ে এ পুজোয় জাঁক বেশী।

ধুম এবার দক্ষিণপাড়াতেই বেশী। পুজো তো হচ্ছেই, তার সঙ্গে হচ্ছে নাটকাভিনয়। মণ্ডপের চত্বরে পাকা মঞ্চ রয়েছে। একমাত্র বৈদ্যুতিক আলো ছাড়া আর সব ব্যবস্থাই শহরের মতো। সেই রকম সাজ-ঘর, পোষাক-পরিচ্ছদ ও দৃশ্যাবলী। গঞ্জের থিয়েটারের নামে আশপাশের সকল গ্রামের লোক পাগল। যাদের নিমন্ত্রণ করা হয় তারা তো আসেই, তাছাড়া রবাহূত হয়েও অনেকে আসে। কেউ ওঠে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি। আবার কেউ বা গঞ্জের বাজারে চিঁড়ে দই মিষ্টি খেয়েই সারা রাত জেগে অভিনয় দেখে। মুগ্ধ হয়ে কেউ কেউ পদক পর্যন্ত ঘোষণা করে। বছরে কম করেও দু'বার এ সুযোগ প্রত্যেকেই পায়। একবার উত্তরপাড়ার কাছ থেকে আর একবার দক্ষিণপাড়ার কাছ থেকে। উত্তরপাড়ার দল এবার পুজোয় অভিনয় করতে পারবে না। 'কর্ণার্জুন' বইটি ধরেছিল তারা। মাসখানেক নিয়মিত মহড়াও দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে হয়েছে নায়ক ব্রজেন গোস্বামীর অসুস্থতার জন্যেই। দিন দিন বাতে পঙ্গু হয়ে চলেছেন ব্রজেন গোস্বামী। ডান পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেই পারছেন না। শরৎ কবিরাজের অব্যর্থ 'বাতচিন্তামণি'তে কোন ফলই ফলে না। কবিরাজ হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কবিরাজের সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার মোড়ল নবীনচন্দ্রকেও হাল ছাড়তে হয়। কেন না, ব্রজেন ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই কর্ণের ভূমিকায় নামে। থাকলেও এত সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। ব্রজেন ছাড়া আর এক সমস্যাও আছে। সে সমস্যা কালা রমেশকে নিয়ে। শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় রাখা হয়েছিল ওকে। এছাড়া নাচগান শেখানোর ভার বরাবর যে রকম ওর ওপর থাকে তা তো ছিলই। কিন্তু ও নাকি এবার কিছুতেই পুজোর সময় ছুটি পাবে না। অফিসের কাজে বাইরে যেতে হবে ওকে। সুতরাং এবার পুজোয় কিছুতেই অভিনয় হতে পারে না। যা তা করে লোক হাসানোর চেয়ে না করা ঢের ভাল। নবীনচন্দ্র অনেক ভেবে-চিন্তে অভিনয় স্থগিত রাখাই স্থির করে। লজ্জার হলেও এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

দক্ষিণপাড়া এবার একক মঞ্চে নামছে। এতে সুবিধে অসুবিধে দুই-ই আছে। সুবিধে, পাশাপাশি কেউ তুলনা করবার অবকাশ পাবে না। আর অসুবিধে, ভীড় হবে অত্যধিক। আশপাশের গ্রাম ভেঙে পড়বে অভিনয় দেখবার জন্যে। জায়গা দেওয়া কষ্টকর হবে। তা হোক, তবু তো ওরা উত্তরপাড়ার মতো বিপাকে পড়েনি। দক্ষিণপাড়ার মোড়ল থেকে মহারাজ সকলেই খুশীতে গদগদ। সকলেই যে যার মতো কাজে লেগে যায়।

মহাসপ্তমীর দিন প্রথম অভিনয় রজনী। এদিন বাইরের কাকেও নিমন্ত্রণ করা হবে না। পাড়ার লোকই সজাগ হয়ে দেখবে। দেখে মন্তব্য করবে। যদি কোথাও কোন সংশোধনের প্রয়োজন হয় তবে তা সংশোধন করে হবে দ্বিতীয় অভিনয়। মহা অষ্টমীর দিন ক্ষান্তি দিয়ে মহা নবমী তিথি এর জন্যে স্থির হয়েছে। দ্বিতীয় অভিনয়ে পাড়ার লোকের সঙ্গে গঞ্জের অন্যান্য বিশিষ্ট-জনেরা দেখবেন। দ্বিতীয় দিনেই নিমন্ত্রণ করা হবে উত্তরপাড়াকে। এ অভিনয়েও কোন খুঁত দেখা গেলে তা শুধরে নিয়ে হবে তৃতীয় অভিনয়। তৃতীয় অভিনয়ের দর্শক হবে একমাত্র ভিন গাঁয়ের নিমন্ত্রিত অতিথিরা। কোজাগরী পূর্ণিমার পরের দিন এর জন্য ধার্য হয়েছে।

ঘোষণায় জানানো হয়েছে, প্রথম অভিনয় শুরু হবে রাত্রি আট ঘটিকায়। সন্ধ্যারতি হয়ে যাবার পরেই। কিন্তু লোক জমতে শুরু করেছে ছ'টা না বাজতেই। বিছানা দেওয়া হয়নি, তবু তার জন্যে কেউ অপেক্ষা করছে না। যে যেভাবে পারছে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গিয়ে জায়গা দখল করছে। ভাবখানা, বিছানা দেওয়ামাত্র ব'সে পড়বে।

সন্ধ্যারতি সাতটার মধ্যে শেষ হয়। মণ্ডপ চত্বর লোকে গিজগিজ করছে। ঘড়ির কাঁটা আটটার কোঠা ছোঁয় ছোঁয়। ড্রপ ওঠা তো দূরের কথা, এখনো শতরঞ্চি বিছানোই হলো না। আসরে মৃদু গুঞ্জরণ ওঠে। পাড়ার লোক হয়েও কেউ কেউ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে ছাড়ে না। অতি উৎসাহী দু'পাঁচজন জড়-করা শতরঞ্চিগুলো টেনে নিয়ে নিজেরাই বিছাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার আগেই মহারাজ হরচন্দ্র সদলবলে এসে আসরে নামেন। বিদ্রোহী জনতাকে হটিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যের ভারসাম্য রক্ষা করেন।

মণ্ডপ ঘড়িতে ন'টা, শতরঞ্চি বিছানো শেষ হয়। কিন্তু হৈচৈ তবু থামে না। যারা না বুঝে মঞ্চের সামনাসামনি বসেছিল তাদের নিয়ে গোল বাধে। কারো সঙ্গে হাতাহাতি হবারও উপক্রম হয়। রাগে দুঃখে কেউ কেউ আবার কেঁদেও ফেলে। কিন্তু না উঠে কেউ নিস্তার পায় না। মহারাজের কড়া হুকুম, ইচ্ছে হয় পেছনে বসে দেখো। আর নয়তো সোজা বাড়ি চলে যাও। পাড়ার লোক হয়ে মোড়লদের জায়গায় বসলে, লজ্জা করে না!···

কয়েক মিনিটের ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ফাঁকা হয়ে যায় সামনের দিক। শতরঞ্চির ওপর এবার বিছানো হয় ধপধপে ফরাশ। ফরাশের ওপর দেওয়া হয় গোটা কয়েক তাকিয়া। মজুমদারের গড়গড়াটিও বাদ যায় না। সামনের দুদিকের দেয়াল ঘেঁষে খানকয়েক কাঠের চেয়ারও দেওয়া হয়। থানার দারোগা এবং অন্যান্য অফিসাররা এখানে বসবেন।

কাঁটায় কাঁটায় দশটা, প্রথম 'বেল' বাজে। আসরে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হয়। যারা ঝিমিয়ে পড়েছিল তারা চাঙা হয়ে ওঠে। কেউ বিড়ি সিগারেট ধরায়। কেউ বা পাশের লোককে জায়গা রাখতে বলে চা-পানি খেতে উঠে যায়। ছোটরা নড়েচড়ে বসে। মিনিট পনেরো পরে উত্তেজনার মধ্যেই বাজে দ্বিতীয় 'বেল'। তারও মিনিট দশেক পরে তৃতীয় 'বেল'। এবার শুরু হয় কনসার্ট। পিয়ানো, হারমোনিয়াম, ঢোলক, বাঁশি, মন্দিরা একযোগে বাজতে থাকে। সুন্দর—সুললিত ঐকতান। শ্রোতারা তালে তালে দুলছে। সকলেই জানে, কনসার্ট থামলেই তিনবার জয়ধ্বনি দিয়ে ড্রপ উঠবে। তারপর মিনিট খানিকের নীরবতা। এবং সেই নীরবতার মধ্যেই জ্বলে উঠবে পাদপ্রদীপ। শুরু হবে অভিনয়। কিন্তু একি কাণ্ড! একের পর এক কনসার্ট যে বেজেই চলেছে। জয়ধ্বনিও পড়ছে না, ড্রপও উঠছে না!—শ্রোতারা একে একে সকলেই আবার হাঁপিয়ে ওঠে। কেউ কেউ ধৈর্য হারিয়ে হানা দেয় সাজঘরের দরজায়। বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয়। না না, আর দেরী নেই, ঐ তো মহাদেব বাবা সেজেগুজে বসে আছেন। বসে বসে দিব্যি সিগারেট ফুঁকছেন। গিরিরাজ দক্ষও প্রস্তুত। শুধু সতীর সাজই এখনো কিছু হয়নি। ভগীরথ শীল সবে তার গালে ক্ষুর ধরেছে। আহা-হা, কি বাহারের গোঁফ জোড়াই না সুন্দর রমেশের। সতীর পাঠ করতে এসে বেচারাকে সেই গোঁফ জোড়াই আজ জলাঞ্জলি দিতে হচ্ছে। কিন্তু কি আর করা যায়! দাড়ি-গোঁফ নিয়ে তো আর সতীর পাঠ হতে পারে না! তা একটু তাড়াতাড়ি করো না বাপু। মানুষ কতক্ষণ আর তোমাদের আশায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে?

সাজঘর থেকে একে একে সকলেই আবার যার যার জায়গায় ফিরে আসে। মিনিট কয়েকের বিরতির পর আবার শুরু হয় কনসার্ট। এবার আসরে এসে বসেন যশোদা মজুমদার! সঙ্গে জন কয়েক ইয়ার বন্ধু। মহারাজ হরচন্দ্র গড়গড়ার মাথায় কলকে বসিয়ে দেন। আর দেন রূপোর ডিসের এক ডিস খিলি পান। মানবেন্দ্রনাথ বসেন রমণী দারোগা ও অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে চেয়ারের ওপরে। শ্রোতাদের মধ্যে যারা অভিজ্ঞ তারা সকলেই বোঝে, ড্রপ উঠতে আর দেরী নেই।

ঘড়িতে সাড়ে দশটা, কনসার্ট থামে। ভেতর থেকে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি পড়ে, বীণাপাণি মাইকি—জয়। বীণাপাণি নাট্য সমাজ কি—জয়। দক্ষিণ পাড়া কি—জয়।

জয়ধ্বনি শেষ হতে হতেই হুইসল বাজে। জ্বলে ওঠে পাদ-প্রদীপ। সঙ্গে সঙ্গে ড্রপ ওঠে। ড্রপের পর স্ক্রীণ। দর্শককুল মুগ্ধ। মুগ্ধ নয়নাভিরাম দৃশ্যে। সমস্ত মঞ্চ জুড়ে শতদল শোভিত নীল সরোবর। সরোবরে পা রেখে শ্বেতবরণী দেবী বীণাপাণি সমাসীনা। তাঁর যুগল চরণ-তলে শ্বেত মরাল। হাতে মধুর বীণা। কণ্ঠে গজমতি হার। দেবী প্রসন্না। সরোবরের ধারে সারবন্দী হয়ে আবহসঙ্গীত গাইছে চারণ-চারণীগণ। এ দৃশ্য মূল নাটকের অংশবিশেষ নয়। জ্ঞান মাষ্টারের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তাবনা হিসেবে এটি সংযোজিত হয়েছে। বীণাপাণি নাট্য সমাজের অভিনয় সর্ব-বিদ্যায় অধীশ্বরী বীণাপাণির বন্দনা দিয়েই শুরু হবে।

ফাউ এ পাওনাটুকু সকলেরই ভাল লাগে। সকলেই উপভোগ করে চারণ-চারণীদের উদাত্ত সঙ্গীত। সঙ্গীত শেষ হলে স্ক্রীণ পড়ে। মিনিটখানেক পরেই আবার তা অপসারিত হয়। শুরু হয় মূল অভিনয়। মোটামুটি প্রত্যেকেই উৎরে যায়। দর্শকগণ মুগ্ধ। গুরুতর কোন ত্রুটি কারো চোখে পড়ে না। বীণাপাণি নাট্য সমাজ তার ঐতিহ্য রেখেছে। নির্দ্বিধায় এবার দশজন জ্ঞানীগুণীকে নিমন্ত্রণ করে দেখানো যায়। সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছে সুন্দর রমেশ। রমণী দারোগা হালে গঞ্জের থানায় বদলি হয়ে এসেছেন। এখানকার থিয়েটার সম্বন্ধে তাই তাঁর কোন ধারণা নেই। উনি তো বিশ্বাসই করতে পারেন নি গোঁফ-দাড়ি চেঁচে কেউ এমন নিখুঁত স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে। যেমন মন-মাতানো চেহারা, তেমনি কণ্ঠস্বর। কলকাতায় পেশাদারী মঞ্চেও সচরাচর এমন অভিনয় হয় না। মানবেন্দ্রনাথ ওঁর কৌতূহল আরো চারিয়ে দিয়েছিলেন। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, গঞ্জের কোন এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে সতীর ভূমিকায় অভিনয় করছে। মেয়েটি এবার বি-এ দেবে। চলুন সাজ-ঘরে, আলাপ করবেন।···

রমণী দারোগা তাই বিশ্বাস করেছিলেন। হয়তো সাজ-ঘরেও যেতেন। কিন্তু তৃতীয় অংকে ড্রপ পড়লে জ্ঞান মাষ্টারের ঘোষণায় ভ্রম কাটে। খুশীতে গদগদ হয়ে ঘোষণা করেন জ্ঞান মাষ্টার, সতীর ভূমিকায় চরিত্রানুগ অভিনয়ের জন্য ষ্টাওর্ড ড্যাকুয়ার্‌ কোম্পানীর

এজেন্ট মিষ্টার গজাচরণ সওদাগর এই রৌপ্যপদকটি শ্রীরমেশচন্দ্র রায়কে ওরফে সুন্দর রমেশকে উপহার দিলেম।...

জ্ঞান মাষ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে সুন্দর রমেশ পদকটি গ্রহণ করে। শ্রোতাদের উদ্দেশে হাত জোড় করে নমস্কার জানায়।

রমণী দারোগা হতবাক। মানবেন্দ্রনাথের দিকে মুখ ঘুরিয়ে হেসে কুটি কুটি হন। সকলের সঙ্গে নিজেও সুন্দর রমেশকে তারিফ করেন। মহাদেবের ভূমিকার জন্ত রাধারমণ পোদ্দারকে এবং দক্ষের ভূমিকার জন্ত গোপীবল্লভ সাধুকেও সাধুবাদ জানান।

অষ্টমীর দিন মহোৎসব। পাড়ার সকলেই এদিন এক পংক্তিতে বসে মায়ের প্রসাদ পাবে। যে আসতে পারবে না তাকে দেওয়া হবে মালসা ভোগ। সব নিরামিষ ব্যবস্থা। সুগন্ধি চালের অন্ন, দু'রকমের ডাল, লাবড়া, অম্বল, মিষ্টান্ন। কোন কোন বার আবার অন্নের বদলে খিচুড়ি ভোগও হয়। অষ্টমীর দিন গভীর রাত পর্যন্ত চলে প্রসাদ বিতরণ। সুতরাং এদিন আর অভিনয় করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া উপর্যুপরি দু'রাত জাগতে গেলে অভিনয়ের মানও নষ্ট হতে পারে। সব দিক ভেবে নবমী পুজোর দিনই দ্বিতীয় অভিনয়ের তারিখ ধার্য হয়। উত্তরপাড়াকে জানানো হয় সাদর আমন্ত্রণ।

দ্বিতীয় দিন আর এক মিনিটও দেরী হয় না। কাঁটায় কাঁটায় আটটা—ড্রপ ওঠে। রমণী দারোগা আজও না এসে পারেন নি। মানবেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরোধে আজ যুগলে এসেছেন। অবশ্য পাড়াগাঁয়ের রীতি অনুযায়ী শ্রীমতী অন্যান্ত মেয়েদের সঙ্গে চিকের ভেতরেই বসেছেন। ওঁর সঙ্গে একাসনে বসেছেন মজুমদার-গিন্নী, চাপালতা ও জন কয়েক সম্ভ্রান্ত মহিলা। তার মধ্যে আছেন নবীন-চন্দ্রের গৃহিণী, সরকারী ডাক্তারের স্ত্রী, হেডমাষ্টার, পোষ্ট মাষ্টার, ষ্টেশন মাষ্টার, পুলিশ ইন্সপেক্টর, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ও সার্কেল অফিসারের সহধর্মিণীগণ। পর্দানসিন সাবরেজিষ্ট্রার সাহেবের বিবি সাহেবাও বাদ যাননি। সকলেই হাসিখুশী। সকলেই সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত।

চিকের আড়ালের দেবীগণের দেবগণও প্রায় সকলেই এসেছেন। সকলেই বসেছেন চেয়ারের ওপরে। মানবেন্দ্রনাথ স্বয়ং ওঁদের আদর-আপ্যায়ন করছেন। পান, সিগারেট, চা পরিবেশিত হচ্ছে দফায় দফায়। নবীনচন্দ্রের বাসনা, ওঁদের সঙ্গে চেয়ারে বসেন। কিন্তু যশোদা মজুমদার ওঁকে নিজের পাশে এনে বসান। ওঁর সহচর সকলকেই। খুব খুশী হতে না পারলেও রাগ করতে পারেন না নবীনচন্দ্র। কেন না, স্বয়ং মজুমদার ওঁদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। বসতেও দিয়েছেন বিশিষ্ট আসনে—ফরাশ পাতা বিছানায়। পান, সিগারেট, চা পরিবেশনেও ত্রুটি নেই। তা ছাড়া চেয়ারের মর্যাদা যাই কেন থাক না, অভিনয় দেখার পক্ষে ফরাশ বিছানো জায়গাটিই উত্তম। মনের মেঘ সহজেই কাটিয়ে ওঠেন নবীনচন্দ্র। মজুমদারের সঙ্গে সহজ হয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন।

আজও যথানিয়মে বাণী বন্দনার পর অভিনয় শুরু হয়। সার্বজনী

গতিতে দৃশ্যের পর দৃশ্য এগিয়ে চলে। কোন খুঁতই ধরা পড়ে না উত্তরপাড়ার চোখে। সকলেই বরং অভিভূত। মহাদেবের ভূমিকার জন্য স্বর্ণপদক ঘোষণা করেন নবীনচন্দ্র। যেমন খাসা চেহারা, তেমনি অভিনয়-চাতুর্য। স্বয়ং ভোলা মহেশ্বরই যেন কৈলাস থেকে মর্তে নেমে এসেছেন। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করলে স্বর্ণপদক পাওয়া উচিত ছিল সুন্দর রমেশের। নবীনচন্দ্র রাজনৈতিক চাল চাললেন? যশোদা মজুমদার এক কাঁকে ভ্রূ কোঁচকান। কিন্তু নিজেই আবার সংশয়ে পড়েন তারকবাবুর রায় শুনে। নিমন্ত্রণ পেয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম বিজলিয়া থেকে অভিনয় দেখতে এসেছেন তারকবাবু। অঞ্চলের সেরা নাট্যরসিক। তাঁর বিচার-বিবেচনাকে নস্যাৎ করার উপায় নেই। পোদ্দারই তাঁর মতে সেরা নট। ওলটানো চোখ আবার সোজা হয় মজুমদারের। নিজেও হাততালি দিয়ে পোদ্দারকে অভিনন্দন জানান।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। এই দৃশ্যের ওপরেই নির্ভর করছে মহাদেব চরিত্রাভিনয়ের চরম সার্থকতা। পোদ্দারকে এখানেই দেখাতে হবে আসল শিল্প-চাতুর্য। দৃশ্যপটে দেখা যাবে, পতি নিন্দায় সতী স্বলুণ্ঠিতা। জীবনাহুতিই দিয়েছেন দক্ষ-তনয়া, ভোলা মহেশ্বর তা দেখে ক্ষিপ্তপ্রায় মহা-ভৈরব। রোষ-বহ্নিতে ধরাকে বুঝি বা রসাতলে পাঠান। মৃত পত্নীর দেহ কাঁধে তুলে নিয়ে শুরু হবে প্রলয় নাচন। সে নাচনে দক্ষ-ভূমি শ্মশানে পরিণত হবে।

পোদ্দার এ পর্যন্ত ঠিকই চালিয়ে গেলেন। এবার প্রয়োজন প্রলয় আয়ুধ। আয়ুধের জন্যেই গর্জে ওঠে পোদ্দার, "নন্দী, কোথা নন্দী, ত্বরা করি আন মোর ডমরু ত্রিশূল।"

নন্দীরূপী সতীশ রায় 'উইংস্'এর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আহ্বান শুনেও কোন সাড়া দিচ্ছে না।

পোদ্দার মহা ফাঁপরে পড়ে। সব ভাব বুঝি বা মাঠে মারা যায়। পায়ে পায়ে 'উইংস'এর ধারে গিয়ে চুপি চুপি আহ্বান জানায়, এই সতীশ, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ত্রিশূল হাতে চলে আয়। দেরী হয়ে যাচ্ছে যে!...

কিন্তু সতীশ তবু ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

জ্ঞান মাষ্টার ছুটে এসে ধাক্কা দেন, যা, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? মাত্র তো দুটো কথা।

সতীশের বিলম্ব দেখে পোদ্দার ভারসাম্য রক্ষা করতে চেষ্টা করে। বার কয়েক ক্ষিপ্র-পদচারণা করে বানিয়ে বানিয়ে বলতে থাকে, "আন, আন রে নন্দী, ত্বরা করি আন মোর প্রলয় বিষাণ। আজি ভব"—

মুখের কথা শেষ করতে পারে না পোদ্দার। ত্রিশূল হাতে সতীশ রায় মঞ্চে প্রবেশ করে। কোন রকম দ্বিধা না করে সরাসরি বলে যায়, "এই নিন পোদ্দার মশায়, আপনার ত্রিশূল। আমি না আগেই বলেছিলাম, এ সব নন্দী ফন্দী আমার দ্বারা হবে না। তবু যত সব বাজে ঝামেলা। এই রইলো অপনার ত্রিশূল। আমি চললেম।"—বলতে বলতে মাথার জটা টান মেরে খুলে ফেলে দর্শকের দিকে ঘুরে দাঁড়ায় সতীশ।

ভাবমত্ত দর্শক এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সতীশের কথায় হাসির বান ডাকে। উত্তরপাড়ার মধু দত্ত গলা ফাটানো চীৎকারে টিপ্পনী কাটে, তোফা, তোফা। বেঁচে থাক বাবা পোদ্দারের ষাঁড়!...

মধু দত্তর সঙ্গে সঙ্গে আসরময় হৈ-হল্লোড় আরম্ভ হয়। কেউ শিষ দেয়, কেউ ছোঁড়ে ছেঁড়া জুতো। নবীনচন্দ্রও মজুমদারের পাশ ঘেঁষে হাসির দমকে গড়িয়ে পড়েন। দারোগা পুলিশ কেউ কোন পাত্তা পায় না। এক ফাঁকে কে যেন সামিয়ানার কোন কেটে দেয়। ফলে আসরশুদ্ধ লোক চাপা পড়বার উপক্রম হয়। মঞ্চের বদলে আসরেই শুরু হয় দক্ষযজ্ঞ।

বেগতিক দেখে জ্ঞান মাষ্টার ড্রপ ফেলে ইজ্জৎ বাঁচাবার চেষ্টা করেন। যশোদা মজুমদার নিজে তেড়ে যান সতীশের খোঁজে। কিন্তু পাখী ততক্ষণে হাওয়া। কোথা দিয়ে কেমন করে যে সতীশ ছুটে পালিয়েছে, কেউ টেরও পায় না। রাগে থর থর করে কাঁপতে থাকেন মজুমদার। রমণী দারোগা এবং মানবেন্দ্রনাথের প্রাণপণ চেষ্টায় কিছুক্ষণ পরে কোলাহল থামে বটে, কিন্তু বাকী অংশের অভিনয় করা আর সম্ভব হয় না। উত্তরপাড়ার কোন দর্শকই আসরে নেই। সামিয়ানা ছিন্নভিন্ন।

অভিনয় বন্ধ হওয়ায় দক্ষিণপাড়ার মোড়লরা সব একত্র জড় হয়। সাজ-পোষাক খুলে রেখে মঞ্চ থেকে নেমে আসে গোপীবল্লভ সাধু, রাধারমণ পোদ্দার ও আরো অনেকে।

রমণী দারোগাকে লক্ষ্য করে যশোদা মজুমদার ফেটে পড়েন, দেখলেন তো দারোগাবাবু, কুত্তার বাচ্চাদের কাণ্ড! দশজনের সখ আহ্লাদ অকারণে মাটি করলে শালারা। আপনাকে বলে রাখছি, এ অপমানের প্রতিশোধ আমি নেবো।

রমণী দারোগা উত্তর দেবার আগে গোপীবল্লভ ইন্ধন যোগায়, কিন্তু তার আগে ঘরের শত্রু বিভীষণকে শায়েস্তা করা দরকার হুজুর।

দরকার তো বুঝলাম। কিন্তু কেউ কি সে হারামজাদাকে রুখতে পেরেছিলে? এতগুলো লোকের সুমুখ দিয়ে কি করে সে নচ্ছার ভাগে?

আমরা কেউ এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না হুজুর। মদন, মহারাজ, কেসব ছুটেছে। যে ভাবেই হোক, ওকে ধরে আনবেই।—রাধারমণ পোদ্দার সান্ত্বনা দেয়।

মজুমদার আবার হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, ছাই আনবে। তোমরা সব অপদার্থ।

আমি আজ সকালে সতীশকে নবীনবাবুর সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করতে দেখেছিলাম হুজুর।—পাশ থেকে যজ্ঞেশ্বর ফোড়ন কাটে।

মজুমদার এবারও খেঁকিয়ে ওঠেন, দেখেছিলি তো আগে বলিসনি কেন?

মাথা চুলকিয়ে যজ্ঞেশ্বর বলে, সতীশ যে এ রকম শয়তানি করবে তা আমি ভাবতে পারিনি হুজুর।

ভাবতে পারিসনি তো দূর হ এখান থেকে।—কি পোদ্দার, মঞ্চে তো ত্রিশূল পেলে না। এখন পারবে সে ত্রিশূল চালাতে?

আদেশ করুন, কি করতে হবে।

যাও, এই মুহূর্তে সতের ভিটেবাড়ি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে এসো।

ও তো মিশেই আছে হুজুর। ঘর-বাড়ির কি আছে ওর! এতক্ষণ নীরব থাকার পর গোপীবল্লভ উত্তর দেয়।

তা বটে। মশা মেরে হাত কালি করা হবে। বেশ, আমার বন্দুক আনাবার ব্যবস্থা করো। মালুকে ডাকো।

ডাকতে আর হয় না, মানবেন্দ্রনাথ নিজেই ছুটে আসেন। এ

ধীরভাবে সান্ত্বনা দেন, আপনি শান্ত হোন কাকাবাবু। এ অপমান কেউ আমরা নীরবে সহ্য করবো না।

আর করবে কি করবে? বেটা মুদীর পো, হাতে দুটো পয়সা পেয়ে ভেবেছে যা খুশি তাই করবে আর আমি নীরবে তাই সহ্য করে যাবো! ওকে আজ রাতেই বুঝিয়ে দেবো—ঘাড়ে ওর ক'টা মাথা আছে।...

আপনি উত্তেজিত হবেন না মিঃ মজুমদার। আজকের রাতটা আমাদের ভেবে দেখবার সময় দিন। কালই আমরা এর যথারীতি ব্যবস্থা করবো। প্লিজ—রমণী দারোগা মানবেন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়ে বুঝাতে থাকেন।

যশোদা মজুমদার তবু গজরাতে থাকেন, ভেবে আর আপনারা কি করবেন দারোগাবাবু, ছোটলোকের বাচ্চারা তো আপনাদের নাকের ডগাতেই যা খুশি করে গেলো।

উত্তরে রমণী দারোগা অধোবদন হয়েই বলেন, এতটা গড়াবে আমরা তো ভাবতে পারিনি। আপনি আজকের রাতটা ধৈর্য ধরুন—প্লিজ।

বেশ, দেখি কাল আপনারা কি করেন। তারপর যা করবার আমিই করবো।

তাই হবে। আজ আপনি সকলকে বাড়ি যাবার আদেশ দিন।

গোপীবল্লভ, সকলকে বাড়ি যেতে বলো। তবে মনে রেখো, কাল বিজয়া—আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

আমরা সর্বদাই প্রস্তুত হুজুর। কালও আমাদের হাতে বৈঠা থাকবে, রাধারমণ পোদ্দার উত্তর দেয়।

মজুমদার সে কথায় সায় দেন, হ্যাঁ, তাই থাকে যেন। প্রয়োজন হলে কাল নৌ-যুদ্ধ হবে।

সে যুদ্ধে উত্তরপাড়াকে দেখে নেবো, গোপীবল্লভ ফুঁসে ওঠে।

ভ্রূ কুঁচকে মজুমদার বাধা দেন, মুখে তরপানো আমি পছন্দ করিনে সাধু। মুদীর বাচ্চার মাথাটা এনে দিতে পারলে উপযুক্ত পুরস্কার পাবে। আজকের মতো বাড়ি যাও।

সকলেই তাই যায়। মজুমদার নিজেও।

[ক্রমশঃ।

বস্ত্রারম্ভে

চিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

ইদানিং দেখি যারা
শিখিয়াছ' বড় বেশী বলতে,
সকলের আগে তারা
পারো না ত' কথা মত চলতে!
বাড়ালেই গলা যদি বলা হয়,
খোকা বলে মন্দ কি মরমর
হাঁটি হাঁটি পা—পা,
মা—মা টল্‌তে সে চল্‌তে!

হাত নাড়া ভঙ্গীতে
ঠোঁট নাড়া কথা নাহি মানবে,
বলাটা সহজ যত
কাজটা কঠিন তত জানবে।
বলিলেই যদি কাজ হ'ত ভাই
ফিরিত এ দুনিয়াটা বলিয়াই,
কাজের জগতে তা'র
সুরটারে কণ্ঠে না টানবে।

বড় কথা বলিলে কি
হওয়া যায় বড় উপদেষ্টা?
কথা দিয়ে গাঁথা যায়
বড় জোর কথামালা শেষটা।
ঠোঁট নাড়া ভঙ্গীতে করি সোর
হাত তালি পেতে পারো বড় জোর,
জীবনের পিছে তা'তে
হয় না সফল সেই চেষ্টা।

আমি বলি তার চেয়ে
কম কথা বড় ভালো নয় কি?
যাহা বলা তাহা কাজ—
তাতে কিছু আছে ক্ষতি-ভয় কি?
ততটুকু বলো—তার বেশী নয়
যতটুকু হবে কাজ নিশ্চয়,
মনে-মুখে এক হ'তে
পারো যদি তোমাদের ভয় কি?

কাজের যা এতটুকু
তার দাম এ জগতে হয় না,
অকাজের খুব বেশী
কোনদিন এ জগৎ সয় না।
আর নয় সত্যের অপলাপ,
মিথ্যার জঞ্জাল করো ছাপ,
জীবনের যাত্রায়
ফাঁকা বোল যেন মন লয় না।

মার্কো পোলোর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ

সুনীলকুমার নাগ

ভেনিস নগরীর পোলো পরিবারের দুটি ভাই নিকলো এবং ম্যাফেও একসঙ্গেই ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। মার্কো পোলো ছিলেন বড় ভাই নিকলোর ছেলে। ব্যবসা উপলক্ষে ভেনিস থেকে বেরিয়ে পড়ে ঘুরতে ঘুরতে একবার ওঁরা দুই ভাই এসে পড়েন ক্রিমিয়াতে। এটা ১২৬০ খৃঃ অব্দের কথা। মার্কো পোলো তখন পাঁচ-ছ' বছরের বালক মাত্র। উনি দেশেই রইলেন মা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের কাছে।

নিকলো এবং ম্যাফেও ক্রিমিয়াতে এসে পৌঁছলেন বটে এবং ব্যবসা চালিয়ে প্রচুর লাভও করলেন, কিন্তু মুস্কিল দেখা দিল স্বদেশে ফেরবার সময়। যে পথে দেশে ফিরতে হবে সেদিকে তখন তাতারদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। কাজেই দেশে ফেরবার পথ মোটেই নিরাপদ নয়। কি করা যায় এবার? দু'জনে মহা চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন।

কিছুদিন ওঁরা ভেবে ভেবেই কাটালেন, তারপর ঠিক করলেন যে, এক জায়গায় বসে না থেকে এগিয়ে চলবেন ওঁরা। মাসের পর মাস দু' ভাই মিলে নানা বিপদের মধ্য দিয়েও এগিয়ে চলতে লাগলেন। প্রথম তিনটে বছর ওঁরা অনির্দিষ্ট ভাবেই চলতে লাগলেন। তারপর ঠিক করলেন ওঁরা কুবলাই খাঁর দরবারে যাবেন। ওঁরা তখন বোখারায়। কুবলাই খাঁর রাজধানী সাঙটু, (পিকিং-এর সন্নিকটে) বলতে গেলে উত্তর-পূর্ব এশিয়ার প্রান্তসীমায়। কিন্তু এ দূরত্বের কথা ভেবে অস্থির হ'লেন না ওঁরা। প্রায় অবিশ্রান্ত ভাবে চলতে চলতে এক বছর পরে কুবলাই খাঁর দরবারে এসে পৌঁছলেন ওঁরা! শোনা যায় কুবলাই খাঁ ওঁদের সাদরেই গ্রহণ করেছিলেন।

কুবলাই খাঁর বাসনা ছিল যে, তাঁর প্রজাপুঞ্জকে তিনি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করবেন। তাই পোলো ভ্রাতৃদ্বয়কে তিনি ভেনিসে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন পোপের নামে একখানা চিঠি দিয়ে। কুবলাই খাঁ অনুরোধ জানালেন পোপকে, যাতে অবিলম্বে অন্তত: একশ' জন খৃষ্টধর্ম প্রচারক তিনি ওঁদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। ১২৬৯ খৃঃ অব্দে নিকলো এবং ম্যাফেও ভেনিসে ফিরে এলেন কুবলাই খাঁর চিঠি নিয়ে। এদিকে তখন পোপ মারা গিয়েছেন। মার্কো পোলোর বয়স তখন বছর পনেরোর বেশী নয়। নিকলো এবং ম্যাফেও অপেক্ষা করতে লাগলেন নতুন পোপের নির্বাচনের জন্য। বছর দুই আড়াই ওঁদের এইভাবেই কাটলো। শেষ পর্যন্ত নতুন পোপ যদিও একজন নির্বাচিত হলেন কিন্তু একশ' জন প্রচারক তিনি জোগাড় করতে পারলেন না। অনেক বলে কয়ে দু'জনকে যদিও বা তিনি রাজী করালেন কিন্তু সে দু'জনও আর্মেনিয়া পর্যন্ত গিয়ে পথের বিপদ আপদ দৈব-দুর্বিপাক এবং যুদ্ধ বিগ্রহের ভয়ে ফিরে এলেন। নিকলো এবং ম্যাফেও এবার মার্কো পোলোকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন ভেনিস থেকে যাত্রা করবার সময়। ধর্মপ্রচারক দু'জন যদিও দেশের দিকে ফিরলেন, কিন্তু ওঁরা তিনজন এগিয়ে যেতে লাগলেন।

ভেনিস থেকে রওনা হবার প্রায় সাড়ে তিন বছর পর ১২৭৫ খৃঃ অব্দের মাঝামাঝি বাবা এবং কাকার সঙ্গে মার্কো পোলো কুবলাই খাঁর রাজধানী সাঙটুতে এসে পৌঁছলেন। মার্কো পোলোর বয়স তখন ঠিক একুশ বছর। কুবলাই খাঁ অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন ওকে দেখে। তাতারদের চাল-চলন, বেশভূষা এবং আদপ-কায়দা ত নকল করেছিলেনই, এমন কি ওদের ভাষাও বেশ শিখে ফেলেছিলেন যুবক মার্কো পোলো। সাড়ে তিন বছর পদযাত্রার ফাঁকে ফাঁকেই এ সব উনি আয়ত্ত করেছিলেন।

কুবলাই খাঁ মার্কো পোলোকে অবিলম্বে কাজে নিয়োগ করলেন। ওর বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে এমন অনেক দেশ ছিল যেগুলি যোগ্য লোকের অভাবে ঠিকমত শাসন করা হ'তো না। রাজকার্য উপলক্ষে এক একবার পূব এবং দক্ষিণে বহু দূর দূর দেশে চলে যেতেন মার্কো পোলো। এই রকম ভাবেই একবার চীনের উপকূলভাগ ধরে জাহাজ চালাতে চালাতে উনি ভারতবর্ষে এসে পড়েছিলেন। মার্কো পোলো যখন যে দেশে গিয়েছেন অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সে দেশের রাজনীতি, ধর্ম, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝবার চেষ্টা করেছেন। ওঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত হ'লেও অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

মার্কো পোলো প্রধানত: দক্ষিণ ভারতই পরিদর্শন করেছিলেন। প্রথমে উনি আসেন যে অঞ্চলে বর্তমান যুগে সেটা হ'লো তামিল ভাষাভাষীদের দেশ, অর্থাৎ আজকের মাদ্রাজ রাজ্য। মার্কো পোলোর মতে সে সময়কার তামিলনাদ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী দেশ ছিল। মোট চারজন রাজা মিলে তামিলনাদ শাসন করতেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রধান শাসক। সমুদ্র থেকে মাছ ধরার সুবন্দোবস্ত ছিল এ দেশে, তা ছাড়া ছিল সমুদ্রের তলা থেকে নানা রকম মণিমুক্তা তুলবার জন্য সুদক্ষ ডুবুরীর দল। একেবারে ছেলে বেলা থেকে ডুবুরীদের শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত ছিল। ওরা প্রায় সকলেই দু' মিনিট থাকতে পারতো সমুদ্রে জলের তলায়। কেউ কেউ তার বেশীও পারতো।

সে সময় এ দেশে বস্ত্রের প্রচলন তত ছিল না। মণিমুক্তা প্রায় সকলেই কমবেশী ব্যবহার করতো। রাজাদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি এক শ' চারটি মুক্তা দিয়ে তৈরী মালা পরতেন। তা' ছাড়া আঙুলে আংটি, হাতে এমন কি পায়েও নানারকম সোনার তৈরী মণি-মুক্তা বসানো গহনা পরতেন। রাজারা তাঁদের রাজ্যের বাইরের কোন জিনিস বড় একটা ব্যবহার করতেন না। মার্কো পোলো যখন

তামিলনাদে এসেছিলেন তখন ওখানকার এক একজন রাজার বহু স্ত্রী এবং উপপত্নী থাকতো। প্রধান রাজার বিবাহিতা স্ত্রী এবং উপপত্নীর সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। বস্ত্রের প্রচলন যে কম তার একটা কারণ মার্কো পোলো মনে করতেন এ অঞ্চলের উত্তপ্ত আবহাওয়া। সতীদাহ প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার বিরুদ্ধে কোন সামাজিক প্রতিবন্ধক ছিল না। এ অঞ্চলে যে সময় ধান উৎপন্ন হ'তো প্রচুর পরিমাণে। তবে অন্য কিছুর চাষ বড় একটা হ'তো না। জলবায়ু প্রতিকূল হবার জন্য অনেক জীব-জন্তুই তখন বাঁচতে পারতো না এ অঞ্চলে। যেমন ঘোড়া। রাজার ব্যবহারের জন্য অনেক ঘোড়ার প্রয়োজন হ'তো। এবং তা সবই আনা হ'তো বিদেশ থেকে। বাইরের সঙ্গে যথেষ্ট আদান প্রদান ছিল যদিও কিন্তু এ দেশের লোকেরা নিজেরা বাইরে যেত খুব কমই—জলপথে ত আদৌ যেতে চাইতো না। সে সময়ে এ দেশের কেউ যদি কোন মারাত্মক অপরাধ করতো এবং বিচারে তাকে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হ'তো তা হ'লে তাকে মরতে হ'তো নিজের হাতেই। তার উপাস্য দেব বা দেবীর জন্য সে নিজের জীবন উৎসর্গ করছে বলে প্রচার করা হ'তো। এবং সাধারণতঃ সেই দেব বা দেবীর সামনে অপরাধী নিজেই নিজের সর্ব্বাঙ্গে ধারালো ছুরি বসিয়ে দিতো।

এখানকার অধিবাসীদের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত খুবই সাধারণ। প্রধান খাদ্য ভাত, সঙ্গে মাছ, আর সম্ভব ক্ষেত্রে দুধ থাকে। মাংস এরা তেমন পছন্দ করে না। গো-হত্যা এরা মহাপাপ মনে করে। অন্ততঃ দু'বার স্নান এরা সবাই করে। কেউ কেউ তার বেশীও করে থাকে। এরা অনেকেই মদ খায়, তবে খুব বেশী নয়। এবং আঙুরের রসে তৈরী মদ এদের খাওয়া বারণ।

বলতে গেলে গোটা তামিলনাদবাসীর মধ্যেই নানা কুসংস্কার এবং মন্ত্র তন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস দেখা যায়। সে সময়কার পৃথিবীর কোন অংশই মন্ত্র তন্ত্রে বিশ্বাসের ঊর্দ্ধে উঠতে পারেনি। কিন্তু এ অঞ্চলে মন্ত্র তন্ত্রে যতটা লোকের বিশ্বাস এতটাও অন্য কোথাও কদাচিৎ দেখা যায়। নারী এবং পুরুষ উভয় রকমের দেব-দেবীই আছে। এবং সাধারণ মানুষ এক কথায় বলতে গেলে ধর্মপ্রাণ। এ দেশে প্রায় প্রত্যেক মন্দিরেই দেবতাকে উৎসর্গ করা তরুণীদের দেখতে পাওয়া যায়। এরাই দেবদাসী বলে পরিচিত। এই দেশেই সন্ত টমাস দেহত্যাগ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ একান্ত শান্তিপ্রিয় এবং যুদ্ধ বিগ্রহের ঘোর বিরোধী। দেশের প্রচলিত আইন কানুনের প্রতি প্রায় প্রত্যেকের অপরিসীম শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায়।

এ দেশের সাধারণ মানুষ ধার দেনা করা মোটেই পছন্দ করে না। এবং দেনাদার সম্পর্কে এ দেশের আইন অত্যন্ত কঠোর। এ আইন ধনী দরিদ্র সকলের প্রতি সমান ভাবে প্রযোজ্য। মার্কো পোলো স্বচক্ষে দেখেছিলেন এ দেশের এক রাজার দুরবস্থা। রাজা এক বিদেশী বণিকের কাছে কিছু টাকা ধারতেন। কয়েকবার তাগাদা করেও বণিক যখন তার প্রাপ্য টাকা ফেরৎ পাচ্ছিলো না, তখন সে আইন প্রয়োগ করলো। গণ্ডী দিয়ে বন্দী করলো রাজাকে। রাজা তখন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছিলেন। বণিক গণ্ডী দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোড়া থামাতে বাধ্য হ'লেন, কারণ রাজা নিজেও আইন অমান্য করতে

মাহসী হ'য় না। অবশেষে রাজা বাধ্য হ'লেন বণিকের সঙ্গে একটা বোঝা পড়া করতে।

তামিলনাদের উত্তরে তেলেগু ভাষাভাষীদের স্বাধীন রাজ্য। এর প্রধান বন্দর মাসুলিপট্টম। এ দেশের জনসাধারণও মূর্তি পূজা করে। প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ এবং ফল। এরা মাংসও খায়। এ দেশে প্রচুর পরিমাণে হীরে পাওয়া যায়। দেশের সর্বত্রই প্রায় ছোটবড় পাহাড়। এবং বর্ষাকালে পাহাড়ী নদী এবং অসংখ্য নালা দিয়ে তীব্র গতিতে জল নেমে আসতে থাকে পাহাড় থেকে। আর সেই সময় স্রোতের জল থেকে হীরে সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে এ দেশের সাধারণ মানুষ। হীরে সংগ্রহের আরো একটি পদ্ধতির কথা বলেছেন মার্কো পোলো। পাহাড়ের যতটা সম্ভব উপরে উঠে মাংসের টুকরো ফেলে দেয় হীরে সন্ধানীরা, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঈগল পাখী এসে সেই মাংসের টুকরো নিয়ে পাহাড়ের আরো উপরে উঠে গিয়ে বসে। তারপর লোকজন সেই উপরে উঠে গিয়ে ঈগলটিকে তাড়িয়ে দেয়। মাংসের টুকরোর গায় তখন দেখা যায় হীরক-রেণু লেগে আছে। মাসুলিপট্টমে তখন এতো মিহি সুতোর কাপড় তৈরী হ'তো যা ভারতবর্ষের আর কোথাও হতো না।

মার্কো পোলো প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতই ভ্রমণ করেছিলেন। এবং ভারতবর্ষের একেবারে দক্ষিণাংশের জনগণের নৈতিক চরিত্র খুব ভালো নয় বলেই পোলোর ধারণা হয়েছিল। এখানকার জনসাধারণ অত্যন্ত কামুক। রক্তের সম্বন্ধ আছে এ রকম ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়েতে কোন বাধা নেই। এবং বিধবা ভাই-বৌ ও শাশুড়ীকে বিয়েতেও বাধা নেই।

মালাবারেও এসেছিলেন মার্কো পোলো। সে সময়কার মালাবারে যে জাতীয় তুলো উৎপন্ন হ'তো, সে রকম পৃথিবীর আর কোথাও হ'তো না। মালাবারও একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। মালাবারের উপকূলে জলদস্যুর ভয়ানক উপদ্রব ছিল। জলদস্যুরা ওদের স্ত্রী পুত্র নিয়েই সমুদ্রের বুকে কাটাতো। এক এক দলে দশ-পনেরো এমন কি বিশখানা জাহাজও থাকতো ওদের। মালাবারে সুপারী এবং আদার ফলনও হ'তো প্রচুর। তখনকার মালাবার পুব আর পশ্চিমের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি কেন্দ্র ছিল। চীন থেকে মালাবারে আসতো সোনা, রুপো, তামা এবং সিল্ক। এবং তারপর মালাবার থেকে সে-সব এডেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া হ'য়ে ইউরোপের বাজারে ছড়িয়ে পড়তো। মালাবারের ভাষা এবং ওদের লিপি খুবই উন্নত ছিল।

গুজরাটের তুলো আর চামড়ার ব্যবসার কথা বিশেষ ভাবে বলেছেন মার্কো পোলো। ছাগল, মোষ, গণ্ডার প্রভৃতির চামড়া জাহাজ বোঝাই হ'য়ে রপ্তানী হ'তো আরব দেশে। চামড়ার উপর সোনা এবং রূপোর জরির কারুকার্য করা অনেক সুন্দর এবং মূল্যবান পোশাক তৈরী হ'তো। সূচীশিল্পের দিকেও গুজরাট তখন খুব উন্নত ছিল।

সোমনাথের স্বর্ণমন্দিরের কথাও বলেছেন মার্কো পোলো। এখানকার পুরোহিতরা নাকি ভয়ানক হিংস্র প্রকৃতির ছিল। একাদশ শতাব্দীতে এই মন্দির লুণ্ঠিত হবার পর থেকেই বিশেষ করে এখানকার পুরোহিতরা এবং কাথিয়াবাড়ের জনসাধারণ এই রকম ভয়ঙ্কর হ'য়ে ওঠে।

এ রাজ্যগুলি ছাড়াও আরো অনেক জায়গার কথা বলেছেন মার্কো পোলো। তবে সে সব দেশ উনি নিজে ভ্রমণ করেন নি, অপরের মুখে শুনেছেন। বাংলা দেশে উনি কখনো আসেন নি। তবে বাংলার পূর্বসীমা পর্যন্ত সমুদ্র ব্রহ্মদেশের কয়েক জায়গায় উনি কিছুদিন কাটিয়ে গেছেন। সে সময়কার বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল এবং জনসংখ্যাও ছিল প্রচুর। হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ আক্রমণ করে এঁটে উঠতে পারতো না। ধান, তুলো, আদা, চিনি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। এত হ'তো যে দেশের প্রয়োজন মেটাবার পরও আরো বাইরে রপ্তানী হ'তো। এবং তখনকার বাংলা দেশের বহির্বাণিজ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রাজ্য থেকেই বণিকেরা আসতো বাংলা দেশে।

বাংলা দেশের পূর্ব সীমায় কাছাড়। কাছাড়ের স্বর্ণখনি সে যুগে প্রসিদ্ধ ছিল। তা ছাড়া অনেক রকম ঔষধও তৈরী হ'তো এ রাজ্যে। কাছাড় রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল না। এখানকার জঙ্গলে অনেক হাতী পাওয়া যেত। অধিবাসীদের মধ্যে উল্কি দেওয়ার খুবই প্রচলন ছিল। লোকের সৌন্দর্য বিচার হ'তো উল্কির নমুনা থেকে।

কাশ্মীরে এসেছিলেন মার্কো পোলো। কাশ্মীরের জলবায়ুর কথা বিশেষভাবে বলেছেন উনি। অধিবাসীরা বেশীর ভাগই হিন্দু ছিল সে যুগে। যাদুবিদ্যার খুবই প্রচলন ছিল। কাশ্মীরের সঙ্গে যদিও কোন সমুদ্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, কিন্তু তবু নদীপথে দূর সমুদ্র থেকে কাশ্মীরে বিদেশ থেকে নানা পণ্য আমদানী হ'তো রপ্তানীও হ'তো ঐ ভাবেই। সে সময়কার কাশ্মীর ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। কাশ্মীরে সাধু-সন্ন্যাসীর সংখ্যাবাহুল্যের কথাও বলেছেন মার্কো পোলো। সাধু-সন্ন্যাসীদের অনেকে আবার সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় বছরের পর বছর জপতপে কাটিয়ে দেন। জনসাধারণ এঁদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। এখানকার সাধারণ মানুষ পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় বেশী সভ্য।

দেশ ভ্রমণ করেন অনেকেই, কিন্তু দেখার মতো দেখা ক'জনে দেখেন? মার্কো পোলো ভারতবর্ষে এসেছিলেন সাড়ে ছ'শ বছরেরও আগে। আসতে তাঁর কি কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল, কতো বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কী দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে তাকে প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে হয়েছিল, কোনো ভাষাতেই তার যথাযথ উল্লেখ সম্ভব নয়। মার্কো পোলো, ভারতবর্ষকে যে দৃষ্টি দিয়ে দেখে গেছেন তা আজকের দিনেও অনেক ইয়োরোপীয় দেখতে পারেন না। অপরকে দেখতে হ'লে এবং দেখে বুঝবার জন্য যে বিরাট মনের প্রয়োজন হয়, মার্কো পোলোর মত তাই বা ক'জনের মধ্যে দেখা যায়?

পোলো ভারতবর্ষকে দেখে গেছেন নানা বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে। কিন্তু ঐ বৈচিত্রের মধ্যেও যে কোথাও একটা যোগসূত্র আছে তা তাঁর চোখ এড়াতে পারেনি।

বহু যুগ ধরেই ভারতবর্ষ বিশ্ববাসীর কৌতূহল উদ্রেক করে এসেছে এবং আজও এর শেষ নেই। প্রকৃতই অসাধারণ ব্যক্তি ছাড়া এ দেশকে দেখলেও সহসা কেউ বুঝতে পারে না, কারণ আমাদের দেশ নানাদিক দিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে, সত্যি একটা অসাধারণ দেশ। মার্কো পোলো নিজে একজন আশ্চর্য ব্যক্তি ছিলেন বলেই আমাদের এই অসাধারণ দেশকে দেখে যা সত্যি, তা বুঝতে পেরেছিলেন।

গীতা কাপুরের আত্মহত্যা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

হাতের কাগজটা পড়ে নিয়ে 'ইয়েস স্যর' বলে সরকার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই গুপ্তভায়া ফিরল শর্মার দিকে।

"এদিকে এসে বসুন মিষ্টার শর্মা—"

"আশা করি লাঞ্চ খাবার জন্যে এবার কিছুক্ষণের জন্যে ছুটি পাবেন আমায়?" বলতে বলতে জানলার ধারের চেয়ার থেকে গুপ্তভায়ার টেবিলের ধারে এসে বসল শর্মা, "ঠিক বারোটায় লাঞ্চ খাওয়া অভ্যেস আমার।"

"পুলিশের কাজ আমরাও খালি পেটে করি না মিষ্টার শর্মা, তবে আপনার স্ত্রী এখন কোন জগতে কী রকম লাঞ্চ খাচ্ছেন বিবেচনা ক'রে আমাকে-আপনাকে দু'জনেরই একটু ধৈর্য ধরতে হবে!"

শুনে শুধু চুপ হ'য়ে নয়, যেন কিছুটা চুপসেও গেল শর্মা, নীচু করল মাথা।

"আপনার স্ত্রীর দেহ আজ বিকেলে আপনি সংকারের জন্য পাবেন।"

উত্তরে চোখ তুলে তাকাল শর্মা, কিন্তু রা কাড়ল না মুখে।

"মিষ্টার শর্মা, আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছেন যে তদন্ত করতে করতে এ দু'দিনেই আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর ব্যাপারে একটা ষড়যন্ত্রের আভাষ আমরা পেয়েছি এ ষড়যন্ত্রের নায়ক কে এবং কী তার উদ্দেশ্য, আমরা কিছুটা আন্দাজ করেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ রহস্য এখনো সমাধান করতে পারিনি। এখন আবার আপনাকে আবার কতগুলি প্রশ্ন করব যেগুলির—আপনার নিজের মঙ্গলের জন্যে হয় সত্যি উত্তর দেবেন, না হয় উত্তর দিতে অস্বীকার করবেন। ইচ্ছে না হলে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর না দেবার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু কিছু চেপে কিছু ঢেকে, বাথরুমে উকিল লুকিয়ে রাখার মত কিছু গোপন করে উত্তর দেবার চেষ্টা অনুগ্রহ করে করবেন না!"

শুনতে শুনতে মুখ তুলেছিল শর্মা, বলতেও বুঝি যাচ্ছিল কিছু কিন্তু গুপ্তভায়ার শেষের কথাগুলি শুনে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল।

"প্রশ্নগুলি একের পর এক করে যাচ্ছি। প্রত্যেকটি প্রশ্নের পর পনেরো সেকেণ্ড সময় পাবেন আপনি উত্তর দেওয়া শুরু করার। আপনি চুপ ক'রে থাকলে আমি পরের প্রশ্নটি করব।

"আমার প্রথম প্রশ্ন, পাঁচ তারিখ ক্লাবের নেমন্তন্ন থেকে হোটেলে ফিরে আসার পর কোন টেলিফোন এসেছিল আপনার বা আপনার স্ত্রীর?"

পনেরোর জায়গায় পঁচিশ সেকেণ্ডেও জবাব দিল না শর্মা।

"সেই ফোনে আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনো গোপন বা আপনার না জানা কথা কেউ আপনাকে কিছু বলে?"

শর্মা নিরুত্তর।

"সেই গোপন বা না-জানা কথা তারপর আপনি যাচাই করবার জন্যে আপনার স্ত্রীকে জিগ্যেস করেন?"

শর্মা চুপ।

"আপনার স্ত্রী যে উত্তর দেন তাতে সন্তুষ্ট হ'তে পারেন না আপনি?"

শর্মা নীরব।

"সন্তুষ্ট হতে না পেরে তখন নানারকম প্রশ্ন আপনি আপনার স্ত্রীকে করতে থাকেন এবং যার উত্তরে শেষ পর্যন্ত আপনার স্ত্রী কাঁদতে থাকেন?"

শর্মা অবাক।

"আপনি শেষ পর্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে একটা ব্যাগে আপনার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং রাতটা হোটেলের অন্য একটি ঘরে জেগে কাটান?"

শর্মা হতবাক।

"ভোরের দিকে স্ত্রীর সঙ্গে আর দেখা না ক'রেই আপনি হোটেল ছেড়ে চলে যান এবং যাবার আগে স্ত্রীর জন্যে একটা চিঠি রেখে যান?"

শর্মা চঞ্চল।

"সেই চিঠিতে আপনি ফৈজাবাদে যাচ্ছেন বলে আপনি জানান না এবং কবে ফিরবেন তাও না?"

শর্মা চিন্তিত।

"কানপুরে পৌঁছে আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো চিঠিই আপনি পাননি। টেলিগ্রামটা সত্যি, কিন্তু সঙ্গের চিঠির কথাটা মিথ্যে?"

শর্মা ভীত।

ভীত শঙ্কিত শর্মাকে সচকিত করবার জন্যই বুঝি টেবিলের টেলিফোনটি হঠাৎ ঝনঝন করে উঠল। গুপ্তভায়া সাড়া দিল এবং ফোনে 'আসছি' বলে তাড়াতাড়ি উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ফিরল মিনিট দশেক পরে হাতে ডাকঘরে দেখে-আসা সেই খামের মতই একটা বড় খাম নিয়ে কিন্তু এই সময় ব্যবধানের মধ্যে একবারও একটুকু নড়তে দেখলাম না শর্মাকে। এক চুল স'রে বসেনি চেয়ারে, হাত সরায়নি হাতল থেকে। টেলিফোনের আওয়াজে সেই যে চমকে উঠে তার পর মাথা নীচু ক'রে বসেছিল ঠিক তেমনিভাবেই বসে রইল মাঝখানের সময়টুকু পাথরে-গড়া মূর্তির মত।

আবার তার মুখোমুখি এসে বসল গুপ্তভায়া, আবার বলতে শুরু করল।

"আপনার স্ত্রীর মিসেস কাপুর পরিচয়টা আপনি পরে নয়, বিয়ের অনেক আগে থেকেই জানতেন?"

শর্মা ত্রস্ত।

"তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় আপনার গীতা কাপুর নামেই এবং সে-পরিচয়টা যে মিথ্যে সেটা একটু ঘনিষ্ঠ হ'তেই আপনি জানতে পারেন?"

শর্মা পীত।

"আপনার স্ত্রীর মিসেস কাপুর নামের যে-ব্যাখ্যা আপনি আমাদের বলেছেন সেটা তখনই আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে শুনেছেন এবং অবিশ্বাস করার কোনো কারণ পান নি?"

শর্মা স্তব্ধ।

"পাঁচ তারিখ রাতে টেলিফোনে আপনার স্ত্রীর মিসেস কাপুর পরিচয়ের অন্য একটি ব্যাখ্যা আপনি জানতে পারেন?"

শর্মা নির্বাক।

"সেই ব্যাখ্যা জানতে পেরে আপনি শঙ্কিত হয়ে ওঠেন কেন না হোটেল '—'টা ইতিমধ্যে আপনি আপনার স্ত্রীর নামে কিনে ফেলেছেন?"

শর্মা মূক।

"সেই কেনাটা আপনার বিয়ের তারিখেই?"

শর্মা বধির।

"দেখুন তো, সেই কেনার দলিল এটা কি না?"

শর্মা অন্ধ।

"হাসপাতালে দিয়ে-আসা আপনার মিষ্টির বাক্সটা পরীক্ষা ক'রে তার মধ্যে আপনার স্ত্রীর মৃত্যু যাতে হয়েছে—সেই একই বিষ পাওয়া গিয়েছে। বিষ দিয়ে আপনার স্ত্রীকে হত্যা করার অপরাধে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম!"

শর্মা অজ্ঞান।

পরণের দামী স্যুটের কোটটা অর্ধেক ভিজিয়ে দিয়ে দু'গেলাস জল ছিটিয়ে তবে জ্ঞান ফিরে এল শর্মার। তারপর এক গেলাস কফি নিঃশেষ ক'রে একটু চাঙ্গা হতে গুপ্তভায়া অভয় দিল শর্মাকে, "ভয় নেই, আপাতত আর কোনো প্রশ্ন নেই আপনাকে। শুক্লাসাহেব এখনি ফোন করবেন এবং নিশ্চয়ই আপনার জামিনের ব্যবস্থা করবেন।"

হ্যাঁ-না, কিছুই আর শোনা গেল না শর্মার মুখ থেকে, চুপ ক'রে বসে শুধু ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল সে।

ঠিক একটার সময় বেজে উঠল টেবিলের টেলিফোন, গুপ্তভায়া সাড়া দিয়ে কথা বলতে শুরু করল শুক্লার সঙ্গে। এ-যাবৎ প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণাদির কারণে গীতা কাপুরকে হত্যার অপরাধে শর্মাকে গ্রেপ্তার করতে যে সে বাধ্য হয়েছে এ-বার্তা বলতে শুনলাম গুপ্তভায়াকে এবং সেই সঙ্গে অবিলম্বে শর্মার জন্য জামিনের কী ব্যবস্থা করা যায় বলতে শুনলাম শুক্লার প্রশ্নের উত্তরে। শর্মাকে কাল সকাল পর্যন্ত আটকে রাখার কোনো ইচ্ছে গুপ্তভায়ার নেই এবং এখনি শর্মাকে আদালতে উপস্থিত করতেও তাই কোনো আপত্তি নেই গুপ্তভায়ার। শুক্লা যদি এখনি আদালতে চলে আসে তবে গুপ্তভায়াও শর্মাকে নিয়ে রওনা হয়ে যাবে এবং টিফিনের মধ্যেই ম্যাজিস্ট্রেট-এর ঘরে গিয়ে কাজ সেরে নেওয়া যেতে পারে।

ফোন রেখে উঠে দাঁড়াল গুপ্তভায়া, শর্মার দিকে তাকিয়ে বলল, "মিষ্টার শর্মা, তাহলে চলুন"—

শুনে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে বেশ সময় লাগল শর্মার, তারপর ধীরে ধীরে কম্পিত পদক্ষেপে গুপ্তভায়ার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

গুপ্তভায়া ডাকল না আমায়, পিছু নিতে বলল না। চলে যেতে বলে গেল না, ফিরতে কত দেরি হবে সে-কথাও না। এ অবস্থায় কী করা উচিত ভেবে স্থির করতে পারলাম না। এক একবার মনে হ'তে লাগল উঠে চলে আসি, আবার তখনি মনে হ'তে লাগল চলে গেলে হয়ত গীতা কাপুর হত্যা নাটকের কোনো চমকপ্রদ দৃশ্যই ফাঁকি পড়ে যাবে। এমনিতেই শর্মাকে প্রশ্ন ক'রে কয়েকটি খবর সম্বন্ধে গুপ্তভায়া তাকে যতখানি নাজেহাল করেছে—সেগুলি শুনে প্রায় ততখানিই কৌতূহলে কাহিল হয়ে পড়েছি আমিও। কোথা থেকে খবরগুলি সংগ্রহ করল গুপ্তভায়া কখন? গীতা কাপুরের সেই রেজিষ্ট্রি চিঠিটাই কি এতগুলি খবরের উৎস? ভাবতে ভাবতে বোধ হয় বেশ মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠতে, দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম দুটো বেজে গিয়েছে। ঘরে লোক নেই সত্যি, কিন্তু ও টেলিফোনটা আমার ধরা উচিত হবে কি না ভাবছি এমন সময় একটি সিপাই ঘরে ছুটে এসে ঢুকল এবং সাড়া দিয়েই তাড়াতাড়ি আমার দিকে এগিয়ে দিল রিসিভারটা।

মায়ের মমতা ও
অষ্টারমিল্কে
প্রতিপালিত
আপনার শিশু অষ্টারমিল্কে প্রতিপালিত বলেই এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, সদাই হাসি খুশী। কারণ অষ্টারমিল্ক ঠিক মায়ের দুধেরই মতন। অষ্টারমিল্ক খাঁটি দুধ থেকে শিশুদের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী। সেজন্য সহজেই হজম হয়। শিশুদের রক্তাল্পতা থেকে বাঁচাবার জন্য অষ্টারমিল্কে লৌহ আছে। এতে ভিটামিন 'ডি' ও যোগ করা হয়েছে, ফলে আপনার শিশুর দাঁত ও হাড় মজবুত হয়ে গড়ে উঠবে।
OSTERMILK
মায়ের দুধেরই মতন
বিনামূল্যে অষ্টারমিল্ক পুস্তিকা (ইংরেজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্যার সবরকম তথ্য সম্বলিত। ডাক খরচের জন্য ৫০ নয়া পয়সার ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায় 'অষ্টারমিল্ক' পোঃ বক্স নং ২২৫৭ কোলকাতা—১
OS. 9-X51-C. BG

"হ্যালো, বলুন ?"

"চ্যাং-ওয়ায় চলে এসো"—গুপ্তভায়ার গলা শুনতে পেলাম।

"চ্যাং-ওয়া ?"

"হ্যাঁ, আর দেরি কোরো না। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—"বলে লাইন কেটে দিল গুপ্তভায়া।

খিদেও পেয়েছিল এবং খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে শুনে একটা ট্যাকসি ধরে চলে এলাম চ্যাং-ওয়ায়। চ্যাং-ওয়ার সামনে গুপ্তভায়ার জীপ দেখে নিশ্চিন্ত-মনে ঢুকলাম ভিতরে। দু'তিনটে কেবিনে উঁকি মেরে শেষে একটা কেবিনে ঢুকে দেখলাম গুপ্তভায়া আর লেঃ কর্নেল শুক্লা বসে রয়েছে মুখোমুখি। শুক্লার সামনে গেলাশ ও সোডার খালি বোতল এবং গুপ্তভায়ার সামনে স্পর্শ না করা খাবারের দুটো প্লেট।

শুক্লা বোধ হয় কিছু বলছিল গুপ্তভায়াকে, আমাকে দেখেই হঠাৎ চুপ ক'রে গেল এবং হঠাৎ কথার মাঝখানে ঢুকে পড়ে আমিও অপ্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এক চুমুকে গেলাশের অবশিষ্ট পানীয়টুকু শেষ ক'রে উঠে দাঁড়াল শুক্লা করমর্দনের উদ্দেশ্যে গুপ্তভায়ার দিকে ডানহাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "তা হ'লে ঐ কথাই রইল। আমি এখন চললাম"—

শুক্লা বেরিয়ে যেতে ওর পরিত্যক্ত চেয়ারটা দখল ক'রে আমি ব্যস্ত হ'য়ে জিগ্যেস করলাম, "শর্মা কোথায় ?"

"ওকে ওর হোটেলে নামিয়ে দিয়ে এসেছি। এখন কী খাবে, বলো"—

"তা হলে জামিন পেয়েছে ?"

"ভাগ্যিস তোমার কাকা ছিলেন না। ওঁর সহকারী আর আমার উপর কথা বলল না"—বলে টেবিলের উপর ঘণ্টা বাজাতে লাগল গুপ্তভায়া।

"তার মানে ?"

"শর্মার উকিল জামিন চাইতে আমরা আর আপত্তি করলাম না"—

"আপত্তিই যদি না করবেন তা হলে খামোকা গ্রেপ্তারই বা করতে গেলেন কেন ?"

"গ্রেপ্তার করা উচিত এবং প্রয়োজন বলে এবং জামিনে ছাড়া থাকলে আমাদের তদন্তের কোনো অসুবিধে হবে না জেনেই আর আপত্তি করিনি জামিনের প্রস্তাবে"—বলে কেবিনে ঢোকা বেয়ারার দিকে ফিরলে গুপ্তভায়া, টেবিলের উপর প্লেট দুটো তার দিকে ঠেলে দিতে দিতে বলল, "চা আর চীনে খাবার—ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলে একদম বরদাস্ত করতে পারি না আমি। নাও, এখন বলো, কী খাবে ?"

আমার খাবার হুকুম করতে দশ সেকেণ্ডও লাগল না কিন্তু গুপ্তভায়া দশ মিনিটের উপর লাগিয়ে দিল শুধু খাবার হুকুম করতেই। ফিরিস্তি লম্বা হ'তে গোলমালের ভয়ে বেয়ারা গিয়ে এক চীনেকে ডেকে নিয়ে এল এবং সে চীনে ভাষায় একটা কাগজে নানা কারিকুরি ক'রে নিয়ে চলে গেল এবং তারা প্রস্থান করতে আবার মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব হ'ল গুপ্তভায়ার।

"শুক্লার সঙ্গে কী কথা বলছিলেন ?"

"শুক্লা বলছিল—আমি শুনছিলাম !"

"শুক্লার এক বন্ধু। ডেভিড মুখার্জি—টেবিলে তেরো জন হতে যে উঠে গিয়েছিল !"

"সে ?"

"হ্যাঁ—"

"কী বলেছিল ফোন ক'রে ?"

"ফোন ক'রে প্রথম জানতে চেয়েছিল শর্মা জানে কি না তার স্ত্রী মিসেস কাপুর বলে পরিচিত। শর্মা 'হ্যাঁ' বলায় জানতে চেয়েছিল সেই মিথ্যে পরিচয়ের কারণ শর্মা জানে কি না। শর্মা আবার 'হ্যাঁ' বলায় তখন মিথ্যে পরিচয়ের কারণটা সে শর্মাকে বলে এবং শর্মার জানিত কারণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে বলে। শর্মা সে-কারণ মিথ্যে বলাতে—প্রমাণ স্বরূপ একজন লোকের নাম তখন মুখার্জি করে এবং সে লোককে তার স্ত্রী চেনে কি না জিগ্যেস করতে বলে শর্মাকে !"

"মিথ্যে পরিচয়ের কী কারণ বলে মুখার্জি ?"

"ব্ল্যাকমেল ! ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা !"

"ঠিক বুঝলাম না—"

"মনে করো স্বামী সৈন্যদলে এবং সেই কারণে অনুপস্থিত জেনে কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে—স্ত্রীর সম্মতিতেই—কোনো নষ্টামো শুরু করে, দুয়েকটা অসাবধান চিঠিও লিখে ফেলে সেই স্ত্রীটিকে এবং একদিন অসতর্ক মুহূর্তে দু'জনে মিলে ধরা পড়ে যায় বে-কায়দা অবস্থায় সেই অনুপস্থিত জানা স্বামীর কাছে। বিক্ষুব্ধ স্বামী তখন হয় পিস্তল বার ক'রে মারতে যায় স্বামীকে কিম্বা পুলিশ ডাকতে চায় কিম্বা পরস্ত্রীকাতরতার জন্যে সামান্য 'কেস' করতে চায় কিন্তু শেষপর্য্যন্ত কয়েক হাজার টাকা নগদ পেয়ে তবে ক্ষান্ত হয় এবং অপরাধীকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান ক'রে স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে নিয়ে রঙ্গস্থল ত্যাগ করে। মুখার্জির এক অন্তরঙ্গ বন্ধু এইরকম আক্কেল-সেলামী দিয়েছিল এবং এমন অবস্থায় টাকাটা দিতে হয়েছিল যখন টাকা না দিয়ে অকুস্থল থেকে বেরুবার উপায় নেই অথচ অত টাকাও নেই সঙ্গে। ঐ অবস্থায় বাড়িতে বা আত্মীয়-স্বজনকেও টাকা নিয়ে আসার কথা বলা চলে না। ফলে হতবুদ্ধি সেই বন্ধু ফোন করে মুখার্জিকে এবং মুখার্জি টাকা নিয়ে গিয়ে বন্ধুকে ঐ বিপদ থেকে উদ্ধার করে। রঙ্গস্থলে সেই সময় নায়িকা হিসেবে সে গীতা কাপুরকে দেখতে পায় এবং গীতা কাপুরের স্বামী বলে কথিত একজন সৈনিকসুলভ চেহারার ব্যক্তিকেও।"

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, বললাম, "তাহলে গীতা কাপুরের মিষ্টার কাপুর একজন সত্যিই রয়েছে।"

"হ্যাঁ কিন্তু স্বামী বোধহয় সে আসলে নয়।"

"কেন ?"

"স্ত্রীকে দিয়ে খোলাখুলি বেশ্যাবৃত্তি করানো স্বামীর দৃষ্টান্ত অনেক আছে কিন্তু 'ব্ল্যাক মেল'-এর ক্ষেত্রে বেশির ভাগই দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীটি নকল !"

"শুক্লা কখন এই ফোনের কথা জানতে পারে ?"

"ফোনটা ওর সামনেই শর্মাকে করেছিল মুখার্জি। শর্মার হোটেলের পাত্তা শুক্লাই বলে দেয় মুখার্জিকে—"

"[illegible] ও শর্মার মধ্যে [illegible] আত্মীয় ?"

শেষ পর্যন্ত মুখার্জি নাকি টেলিফোন করেছিল সেই রাতেই ক্লাব থেকে—"

"শুক্লাকে কখন কথাটা জানায় মুখার্জি ? শর্মারা চলে আসার পর ?"

"হ্যাঁ যদিও প্রথম আলাপেই গীতা কাপুরকে চিনতে পেরেছিল সে এবং যেটুকু বা সন্দেহ ছিল সেটুকুও নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছিল মুখার্জি শর্মার স্ত্রীর ব্যবহারে। সে সরে গেলে বা চলে গেলে টেবিল থেকে হয়তো শর্মার স্ত্রী খেতে আসবে মনে করেই সে নাকি বার-এ গিয়ে বসেছিল এবং সেখানে অতিরিক্ত দু'পাত্র গলাধঃকরণ করার পর এ-আবিষ্কারের কথা শুক্লাকে না বলে পারেনি। শুক্লাও শুকনো ছিল না, ফলে প্রথমে প্রতিবাদ, তারপর প্রত্যাহার করার দাবী এবং সর্বশেষে বাজী রেখে মুখার্জিকে তার কথা প্রমাণ করতে আহ্বান করে।"

"শুক্লা এ-কথা আপনাকে আগে জানায় নি কেন ?"

"আগে মানে কাল সন্ধেয় বা আজ সকালে ?"

"হ্যাঁ, দুবার তার দেখা হয়েছিল আপনার সঙ্গে, দু'বার সে সুযোগ পেয়েছিল কথা বলবার !"

"বলবে কি না শুক্লা ভাবছিল। এমনিতেই মুখার্জিকে দিয়ে ফোন করিয়ে সে মরমে মরে ছিল। অপ্রয়োজনে বন্ধু-স্ত্রী সম্বন্ধে এই নোংরা কথাটা আবার সকলকে জানানো উচিত নয় বলেই তার মনে হয়েছিল, কিন্তু আজ শর্মাকে গ্রেপ্তার করতে শর্মা সম্বন্ধে চিন্তিত হ'য়ে খবরটা সে আমাকে নিজে থেকেই বলেছে।"

"আপনার কি মনে হয় শর্মাকে 'ব্ল্যাকমেল' করবার চেষ্টা করছিল গীতা কাপুর ?"

"বিবাহিত পুরুষকে লোক জানাজানি বা জেলের ভয় দেখিয়ে কিম্বা অবিবাহিত পুরুষকে ঐ জেলের ভয় বা বিয়ে করবার জন্ম জোর ক'রে ব্ল্যাকমেল করা যায়—বিয়ে ক'রে 'ব্ল্যাকমেল' করা যায় না।"

"বিয়েটাই হয়তো ব্ল্যাকমেল।"

"স্ত্রীর নামে হোটেল কেনাটা ?"

"ওটা আপনি কোত্থেকে জানলেন ? গীতা শর্মার সেই ফিরে আসা রেজেস্ট্রী চিঠি থেকে ?"

"হ্যাঁ। ঐ খামে করে হোটেল কেনার দলিলটা শর্মার স্ত্রী পাঠিয়ে দিয়েছিল শর্মাকে এবং সঙ্গে একটা 'এফিডেবিট' যার মূল বক্তব্য যে মিসেস গীতা কাপুর নামে পরিচিত হলেও আসলে তার নাম গীতা দাশগুপ্তা এবং শর্মার সঙ্গে ছাড়া তার আর কোনো বিয়ে হয়নি। শর্মার বেনামদার হয়ে বিয়ের দিনই তার কুমারী নামে হোটেলটা সে কিনেছে, আসলে টাকা দিয়েছে শর্মা এবং মালিকও সে—ই ?"

"শুধু এই দুটো দলিল ? আর কিছু ছিল না সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ, একটা চিঠি। আট তারিখে লেখা হলেও এটাকে শেষ চিঠি বলা যেতে পারে শর্মার স্ত্রীর—" বলে পকেট থেকে খামটা বার করে তার থেকে চিঠিটা বেছে নিয়ে এগিয়ে দিল গুপ্তভায়া, "পড়ে ভাখো—"

চিঠিটা খুললাম।

—আমি জানিনা তোমাকে কী নামে সম্বোধন করব। বিয়ের আগে করতাম 'প্রিয়তম হৃদয়েশ্বর' বলে, বিয়ের পর ভেবেছিলাম

চিঠি লেখবার যদি প্রয়োজন হয় তাহলে 'আমার একমাত্র ঈশ্বর' বলে সম্বোধন করব কিন্তু সে সাহস সে অধিকার আর আমার নেই। সে অধিকার যে চুরি করে পাওয়া যায় না সেটা বড় দেরি ক'রে বুঝতে পারলাম।

ঐ নামে সম্বোধন করতে না পারলেও আজ সত্যিই তুমি 'আমার একমাত্র ঈশ্বর'। অন্য ঈশ্বর আমার নেই, ছেলেবেলা ছিল কিন্তু আমার সহজ আনুগত্য অযাচিতভাবে পেয়ে সেই ঈশ্বর আর আমার কথা চিন্তা করবার প্রয়োজন বোধ করেননি।

কিম্বা বোধ হয় ঈশ্বর কথাটার সঙ্গেই আমার রাশিচক্রগত কোনো বিবাদ রয়েছে। যে মুহূর্তে তোমাকে 'আমার একমাত্র ঈশ্বর' বলে জানলাম সেই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘনিয়ে এল। সে-জন্য কিন্তু একবারও আমি তোমায় দোষারোপ করছি না। ঈশ্বরকে দোষ দেব, অভিশাপ দেব কিন্তু 'আমার একমাত্র ঈশ্বর'কে কখনো নয়। তুমি যে আমায় অনেক দিতে চেয়েছিলে! আমি আর দশজন মেয়ের মত সংসার করতে চেয়েছিলাম, তুমি সেই সংসারের সঙ্গে আশাতিরিক্ত অনেক সুখ, অনেক সম্মান আমায় দিতে নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে এসেছিলে আর তার পরিবর্তে পেলে বঞ্চনা ও অসম্মান। এক একবার মনে হয় তোমার কপাল বোধ হয় আমার চেয়েও খারাপ।

আজ আর তোমায় আমি বিশ্বাস করাতে পারব না যে, তোমায় আমি ঠকাতে চাইনি। অনেক মিথ্যে তোমায় বলেছিলাম, কিন্তু সে তোমায় ঠকাবার জন্যে নয় নিজে বাঁচবার জন্য? অতীতের দুঃস্বপ্ন ভুলে তোমায় ঘিরে আমার স্বপ্ন-ভবিষ্যৎ তৈরি করব বলে। কিন্তু অতীত দেখছি মোছা যায় না নিজে ভুললেও ভোলা যায় কিন্তু অন্যদের ভোলানো যায় না। মানুষ মরে গেলেও যখন তার কর্মফল তাকে ধাওয়া করে তখন এ জীবনের মধ্যেই জন্মান্তর ঘটাতে চেয়ে আমি তার হাত থেকে রেহাই পাবো কী করে?

তোমার মনে যে আঘাত আমি দিয়েছি তার জন্য ক্ষমা চাইব না কেন না সে—অপরাধের ক্ষমা নেই। তবে তোমার টাকা বা ঐ হোটেলের উপর আমার যে কোনো লোভ ছিল না এবং এখনো নেই সঙ্গের দুটো দলিল দেখেই তা বুঝতে পারবে। তোমার এটর্নীর কাছে ইচ্ছে ক'রেই যাইনি—তোমার মুখ ছোটো হয়ে যাবে বলে। ছ' তারিখ বিকেলে হোটেলের দলিলটা তিনিই নিজে এসে হোটেলে দিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে এবং দলিলটা হাতে পাওয়ার পর কর্তব্য স্থির করতে আর ভাবতে হয়নি আমাকে।

ভালো এটর্নীকে দিয়েই এবং তার পরামর্শে এক্সিডেকিটের দলিলটা তৈরি করিয়েছি এবং আশা করি ঠিকমতই সব লেখা হয়েছে। যদি কোনো ত্রুটি থাকে ত' আমায় অবিলম্বে জানিও এবং আঠারো তারিখের আগে, কেন না তারপর আর কিছু করবার ক্ষমতা থাকবে না আমার!

গত বছর ঐ আঠারো তারিখেই প্রথম প্রণয়ের আভাষ পেয়েছিলাম তোমার ব্যবহারে, নতুন জীবনের আহ্বানে সেই প্রথম অসম্ভব আশায় দুলে উঠেছিল আমার মন। আগামী আঠারোই আমার মনের সেই সাধ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব স্থির করেছি—তোমায় জড়িয়ে নয়, তোমায় মুক্তি দিয়ে।

আর মাত্র দশটি দিন! তারপর হে 'আমার একমাত্র' ঈশ্বর, জলের উপর লেখার মতই মুছে যাবো, মিলিয়ে যাবো আমি এ জগৎ থেকে, আর সেই সঙ্গে একটি দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে তুমি। তারপর একদিন সেই দুঃস্বপ্নের কথা ভুলে যাবে তুমি। দুঃস্বপ্ন, দুঃখকর অভিজ্ঞতা মানুষ একটু বুঝি তাড়াতাড়ি ভোলে।

আর আমার মিথ্যে বলবার প্রয়োজন নেই। কোনো কারণও নেই তোমার চোখে ধুলো দেবার। তাই আর বাধা নেই স্বীকার করতে যে হ্যাঁ, আমি অধঃপতিত এবং পতিতারও অধম। কিন্তু সে ছিল আমার অসহায় জীবনের অনন্যোপায় বৃত্তি—মনোবৃত্তি নয় আর সেই বৃত্ত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলাম 'আমার একমাত্র দেবতার অহেতুক করুণায়। সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলে হয়ত এই অধঃপতিতার কাছে তুমি এমন কিছু পেতে পারতে যা কোনো স্বর্গ দুহিতাও দিতে পারত না তোমায়। একদিকে তোমায় ঠকিয়েছি বলে অন্যদিকে তোমায় ভরিয়ে দেবার জন্য। কৃতকৃতার্থ কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করবার জন্য তোমাকেই উৎসর্গ করেছিলাম আমার ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরপ্রেম, ঈশ্বর বিশ্বাস। আত্মার শেষগতি শেষ নির্ভর—তুমিই হয়েছিলে আমার জীবনের ভজনের সেই 'রামরতনধন'! মানুষ যাদের ঘৃণা করে তাদের করুণা কেন করতে পারে না, বলতে পারো? ঘৃণিত হবার সঙ্গে সঙ্গে করুণার অধিকার কি তাদের জন্মায় না?

—গীতা

(যাকে ক'দিন আগেও তুমি বলতে গীতম্)।

[ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বিনতা রায়

Sc. 62.

রাত্রি। শোবার ঘর। অনুসূয়া আর মণিকার জন্যে একটা বড় বিছানা পাতা হয়েছে। অনুসূয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলে খাটে উঠে বসে। মণিকা ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বেণী বাঁধা শেষ করতে করতে বলে—

মণি। অমন ফোঁস ফোঁস ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কি হবে? দরজাটা বন্ধ ক'রে দিচ্ছি, আমার নতুন দাদাটির কাছে একখানা চিঠি লেখ। আমি নিজে গিয়ে কাল পোষ্টাপিসে ফেলে দিয়ে আসবো।

অনু। তা লিখবো, কিন্তু আমার ভাই কান্না পাচ্ছে।

মণি। (খাটে এসে বসে) কেন?

অনু। জীমূতবাবুটা ধরেই নিয়েছে ওকে আমি বিয়ে করবো। সারাদিন অমন পেছন পেছন ঘূরলে কেমন লাগে বলতো!

মণি। (গালে আঙুল টিপে ধ'রে চিন্তিত মুখে) সত্যি এটা একটা সমস্যাই হ'ল। দেখি, ভেবে চিন্তে একটা বুদ্ধি বের করতে হবে। cut

Sc. 63.

রাত্রি। রণধীপের বাড়ী। পিয়ানোতে বসে অন্যমনস্ক ভাবে রীডগুলোর ওপর আঙুল চালিয়ে যাচ্ছে রণধীপ। এটুকুতেই বোঝা যায়, এই যন্ত্রটির ওপর তার বেশ দখল আছে। একটা থলে হাতে বুদ্ধ এসে ঘরে ঢোকে। বাজানো বন্ধ ক'রে রণধীপ বলে—

রণ। কোথায় গিয়েছিলি?

বুদ্ধ। (নাকের সামনে থলেটা তুলে ধরে) আজ হাটবার ছিল। কালকের বাজারটা ক'রে নিয়ে এলাম।

রণ। ফেলে দে।

আবার টুং-টাং ক'রে রীডগুলো টিপতে থাকে। বুদ্ধ হাঁ ক'রে তার দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

বুদ্ধ। তার মানে?

রণ। কালই ফিরে যাবো কলকাতায়।

বুদ্ধ। (থলেটা সাবধানে কৌচের ওপর বসিয়ে কোমরে হাত দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে) বলি, তোমার তো মাথার ঠিক নেই [illegible]

বুদ্ধ। না ব্যস্ নয়। এই পিয়োনো হারমোনিয়াম থেকে মাল গাড়ীতে চাপিয়ে গোটা সংসারটা তুলে আনলে এতগুলো টাকা গুণগার দিয়ে। রাতারাতি এই সব চট মোড়া ক'রে কালই ছুটবো, এও কি সম্ভব?

রণ। (উঠে পড়ে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে পায়চারী করতে করতে) আসা যখন সম্ভব হয়েছে, যাওয়াও সম্ভব হবে।

বুদ্ধ। (থলেটা তুলে নেয় হাতে) কি যে দরকার ছিল আসার—(গজ গজ করে আপন মনে) বুঝতেই তো পারছি মনটা তোমার আন্‌চান করছে।

রণ। (দাঁড়িয়ে পড়ে) কি বললি?

বুদ্ধ। বলি, ঠিকানাপত্তর জানা আছে, না না?

রণ। কার?

বুদ্ধ। ওই যে সেই সুন্দর মতো দিদিমণির গো। চিঠি-পত্তর লেখো, মন ভাল থাকবে। এলে একটা জায়গায়—একটু বেড়াও চেড়াও, না যতো সব খেয়ালীপনা।

দুমদাম করে পা ফেলে চলে যায় ভেতরে। রণধীপের ঠোঁটে ফুটে ওঠে ম্লান হাসি। আবার সে ধীরে ধীরে পায়চারী সুরু করে। Cut

Sc. 64.

অনুসূয়া আর মণিকার শোবার ঘর। খাটের ওপর প্যাড নিয়ে ঝুঁকে পড়ে চিঠি লিখছে অনুসূয়া।

মণি। (মস্ত হাই তুলতে তুলতে) ও বাবা, চিঠি লিখতে বলে কি ফ্যাসাদেই পড়লাম। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, বাতি নেভাবি না?

অনু। এই যে হয়ে গেল—

চিঠি লেখা শেষ ক'রে, একবার মনে মনে পড়ে নিতে থাকে।

Desolves.

Sc. 65.

সকাল। অনুসূয়া আর মণিকা বেরোনোর পোষাকে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

অনু। বিচ্ছুটা গেল কোথায়? বিচ্ছু, এই বিচ্ছু—

বিচ্ছু ছুটে আসে একটা পেয়ারায় কামড় দিতে দিতে।

মণি। বাঃ, এই সকালেই পেয়ারা খেতে সুরু করেছ?

বিচ্ছু। চলো, আর কি করি, কাকাবাবু আজ দাদাকে জোর ক'রে শিকারে ধরে নিয়ে গেলেন, আমাকে নিলেন না। বললেন, তুই বড্ড বিরক্ত করিস।

মণি। জীমূতবাবু বেরিয়েছেন?

বিচ্ছু। হ্যাঁ, বললাম তো।

অনুসূয়া আর মণিকা দৃষ্টি বিনিময় করে একটু হাসে।

অনু। দিদি কি করছে?

বিচ্ছু। (পেয়ারা চিবোতে চিবোতে) দিদির যা কাজ, গিন্নিপনা।

অনু। একটু ডেকে আনো তো—

বিচ্ছু ছুটে চলে যায়।

মণি। যাক্, জীমূতবাবু বেরিয়ে যাওয়ায়, খুব সুবিধে হ'ল। না হ'লে ওঁকে এড়ানো বেশ কঠিন হতো।

বিচ্ছু কুশলার হাত ধ'রে টানতে টানতে হাজির করে।

Cont. তুমি তো ভাই সারাদিনই ব্যস্ত। অনুকে নিয়ে বিচ্ছুর সঙ্গে আমি একটু ঘুরে আসি, পোষ্ট অফিসে যাবো। বাড়ীতে একটা টেলিগ্রাম করা দরকার।

কুশলা। তা যাও না তোমরা, কিন্তু দাদা যে বেরিয়ে গেল, বিচ্ছু, পারবি তো ঠিক নিয়ে যেতে?

বিচ্ছু দুই হাত কোমরে রেখে কটমট ক'রে একবার তাকালো কুশলার দিকে, তারপর অ্যাবাউট টার্ণ ক'রে কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে অনুসূয়া আর মণিকাকে বুড়ো আঙুল দিয়ে ইসারা করে সঙ্গে আসতে। নিজে হাঁটতে থাকে গট্‌মট্ ক'রে। হাসতে হাসতে সঙ্গে এগোয় অনুসূয়া আর মণিকা। **Mix**

Sc. 66.

পাহাড়ী পথ ধ'রে চলেছে মণিকা, অনুসূয়া আর বিচ্ছু। বিচ্ছু চলেছে আগে আগে। হঠাৎ তর তর ক'রে নেবে সোজা রাস্তা ধ'রে একটা দারুণ ছুট দেয় বিচ্ছু।

মণি। বিচ্ছু তো বিচ্ছুই।

মণিকা আর অনুসূয়া পা চালিয়ে হাঁটতে থাকে। **Mix**

Sc. 67.

মণিকা আর অনুসূয়া পাহাড় থেকে সাবধানে নেবে সমান রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে অনুসূয়া থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে।

মণি। ব্যাপার কি?

অনু। (অদূরে দাঁড়ানো গাড়ীটার দিকে চেয়ে) গাড়ীটা চেনা মনে হচ্ছে।

মণি। তা দাঁড়ালি কেন, চল্ গিয়ে দেখি—

দুজনে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় একটা গাড়ীর সামনে। ইঞ্জিনের ভেতর অর্ধেকটা শরীর ঢুকিয়ে একটা লোক কি করছে, বিচ্ছু কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে সমানে কথা বলছে।

বিচ্ছু। এমন বাজে গাড়ী কেন কিনেছ?

লোকটি। (ভেতরে মাথা রেখেই) খুব ভাল গাড়ী।

বিচ্ছু। ছাই, ভাল গাড়ী আবার বিগড়োয় নাকি? তোমার এ গাড়ীতে আমি চালানো শিখবো না।

লোকটি। (একই ভাবে) কি মুস্কিল! ভাল মানুষরা এক এক সময় বিগড়ে যায় শোনোনি? সেই রকম ভাল গাড়ীও—

সামনে অনুসূয়াকে আর একটি তরুণীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে থেমে যায়। অনুসূয়াকে দেখে মুখখানা বিষণ্ন হয়ে ওঠে। বিচ্ছু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—

বিচ্ছু। রুণুদা, এই হচ্ছে অনুদি, আর এ মণিকাদি। অনুদি, ইনি হচ্ছেন রণধীপবাবু। আমার রুণুদা।

রণধীপ অপরিচিতের মতো দু হাত তুলে নমস্কার করে অনুসূয়াকে, অনুসূয়াও তার এই রকম অপরিচিতের ভাব দেখে অবাক হয়, গম্ভীর ভাবে দুহাত তোলে। মণিকা পরিস্থিতিটা সহজ করতে বলে ওঠে।

মণি। (বিচ্ছুর মাথাটা নেড়ে দেয়) তোমার রুণুদা যে আমার নিজের দাদা, সেটা জানো না বুঝি? (খুব সহজ ভাবে) কবে এলে দাদা, কিচ্ছু তো বলে আসো নি?

রণ। না, হঠাৎ ইচ্ছে হল, রওনা হয়ে পড়লাম—তা তুই এলি করে সঙ্গে?

বিচ্ছু। কি মজা! রুণুদা, বুদ্ধ্‌দাকে চা দিতে বলি?

রণ। হ্যাঁ যাও—

বিচ্ছু ছুটে চলে যায়।

Cont. দেখুন, এই ক্ষুদে শয়তানটিকে আমি বেশ ভয় পাই, সুতরাং একটু সাবধানেই চলতে হবে।

মণি। ঠিক আছে, ঠিক আছে। অনুর দৌলতে এমন একটি দাদা পেলাম, এটা কি কম কথা?

রণ। আমারও বোন ছিল না, বোন পেলাম। দয়া কোরে ভেতরে চলুন, একটু চা খান। আর আমিও পোষাকটা বদলে ফেলি। গাড়ীর ড্রাইভার, মেকানিক, সবই এই অধম। কি অবস্থা হয়েছে দেখছেন তো? (পোষাকটা দেখায়)।

কথা বলতে বলতে তিনজনেই গিয়ে ওঠে বারান্দায়।

Cont. বসুন আপনারা। আমি আসছি দু' মিনিটের মধ্যে।

রণধীপ ব্যস্ত পায়ে চলে যায়। মণিকা বসে একটা চেয়ারে। অনুসূয়া দাঁড়িয়ে থেকেই ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে রণধীপের নির্গম পথের দিকে, তারপর হঠাৎ মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বলে—

অনু। চল্ চলে যাই।

মণি। কেন?

অনু। আমার সঙ্গে কেমন অচেনার মতো ব্যবহার করছে, একটা কথাও বললো না!

মণি। বোস্ বোস, অভিমানী মেয়ে, এমন চট্ ক'রে অধৈর্য হ'লে চলে? তুই হাজারিবাগ আসছিস শুনে রাতারাতি ছুটে এসে হাজির হ'ল। মনে প্রশ্ন উঠলে সোজাসুজি জিজ্ঞেস ক'রে ফয়সালা করেনে, এমন ভাবে চলে যাবি কেন?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুসূয়া বসে। **Cut**

Sc. 68.

রণধীপের ঘর। রণধীপ আর বুদ্ধ্। চাপা গলায় রণধীপ বুদ্ধকে বলছে।

রণ। বাইরে তিন কাপ চা দে, আর ওই যে নতুন মেয়েটি রয়েছে, সে আমার বোন—

বুদ্ধ্। (বাধা দিয়ে) বললেই হ'ল? যা তা বোঝাবে আমাকে? তোমার বোন, কে—কোথায় আমি বরং চেনাতে পারি তোমায়, তুমি

রণ। ধ্যেৎ, চেঁচাচ্ছিস কেন? বলছি উনি আমার বোন হ'লে একটু সুবিধে হয়। সকলের কাছে তাই বলবি, নাম মণিকা।

বুদ্ধু। (অর্থপূর্ণ ভাবে এক গাল হেসে) ও, বোন হ'লে সুবিধে হয়? তা বেশ তো বোনই, নিশ্চয়ই বোন—

রণ। নাও, এখন বোন বোন জপতে সুরু করলো। যা, চা দে তাড়াতাড়ি।

বুদ্ধু। এই যে যাই।

একটা মজার ভাব নিয়ে চলে যায়। Cut

Sc. 69.

বাইরের বারান্দা। মণিকা আর অনুসূয়া বসে আছে, একটা মস্ত গেলাস ভর্তি হরলিক্‌স্ এ চুমুক দিতে দিতে বিচ্ছু এসে দাঁড়ায়।

বিচ্ছু। বুদ্ধুদা খুব ভাল হরলিক্‌স্ রাঁধে, এই এত এত চিনি দেয়।

মণি। বুদ্ধু কে?

বিচ্ছু। রুণুদার সহকারী। রুণুদা চাকর বলা পছন্দ করেন না, বলেন সহকারী।

এমনি সময় ট্রেতে চা আর কেক সাজিয়ে নিয়ে বুদ্ধু বারান্দায় এসে টেবিলে রাখে। মণির দিকে চেয়ে একগাল হেসে বলে—

বুদ্ধু। কবে এলে গো দিমণি, আমি তো দা'বাবুকে নিয়ে আগেই চলে এলুম। নাও চা ঢেলে খাও। এসো গো খোকাবাবু তুমি আমার সঙ্গে, বিস্কুট দেবো।

বিচ্ছু। আমি খোকা নই বিচ্ছু—

বুদ্ধু। সে আর বলতে! একেবারে কাঠ—চল চল।

বিচ্ছুকে নিয়ে বুদ্ধু ভেতরে পা বাড়াতেই রণদীপ বেরিয়ে আসে পরিচ্ছন্ন পোষাকে।

রণ। (একবার অনুসূয়ার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে, চেষ্টাকৃত হাসির সঙ্গে মণিকাকে) কই সুরু করেন নি?

মণি। (চা ঢালতে সুরু করে) এই তো, আপনি এলেন, এইবার সুরু করি।

রণদীপ আর একবার তাকায়ে অনুসূয়ার দিকে। বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে অনুসূয়া। রণদীপের মুখের ভাব আবার ম্লান হ'য়ে ওঠে। মণিকা চা ঢেলে তিনজনের সামনে দেয়। রণদীপ বিশেষ ভাবে অনুসূয়াকে লক্ষ্য করে বলে—

রণ। চা খান মিস চৌধুরী।

অনুসূয়া নিজেকে যথাসাধ্য সামলে নিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রেখে দেয়। মণিকা চা'টা ইতিমধ্যে খেয়ে ফেলে ব্যাগ খুলে একটা চিঠি বার ক'রে রণদীপের দিকে বাড়িয়ে দিতে যায়। অনুসূয়া ঝপ্ ক'রে তার হাতটা চেপে ধরে।

অনু। না।

রণ। ব্যাপার কি?

মণি। কাল রাতে কলকাতার ঠিকানায় এই চিঠি লিখেছিল, সেইটাই পোষ্ট করতে বেরিয়েছিলাম। আপনার দেখা পেয়ে ভাবলাম এটা আপনার হাতেই দিই—তা উনি বাধা দিচ্ছেন, কি করি?

রণ। বাঃ আমার জিনিষ, আমি পাবো না? (ম্লান হেসে) অবশ্যি যদি সে অধিকার আর আমার নেই বোধহয়—

অনু। (ভ্রূ তুলে) তার মানে?

মণি। আপনার জিনিষে আপনার অধিকারের প্রশ্ন ওঠে কি করে?

রণ। (মাথা নীচু করে কি একটু ভাবে, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে) জীমূতবাবুকে দেখছি না?

অনু। (ক্ষেপে গিয়ে) কেন, তাঁরই প্রতীক্ষা করছিলেন বুঝি?

রণ। না, তা ঠিক নয়, তবে গতকাল তাঁর মুখে শুনলাম কিনা—যে, মানে, আপনাদের বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছে। তাই ভাবছিলাম একসঙ্গেই দেখবো।

মণিকা এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝে মুখ টিপে একটু হাসে, অনুসূয়ার রাগ এত সহজে যায় না।

অনু। আমার বিয়ের কথা অন্যের কাছে শুনে আপনি বিশ্বাস করলেন কেন?

রণ। দেখুন, অবিশ্বাসের কি আছে, পাত্র হিসেবেও তো উনি যথেষ্টই—

অনু। থামুন—(উঠে দাঁড়ায়) আপনাকে আমার ঘটকালী করতে হবে না।

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে যায়। মণিকাও একটু হেসে উঠে দাঁড়ায়। অসহায় ভাবে রণদীপ বলে ওঠে—

রণ। আ—আপনি আমার—আমার ওপর খামোখাই রাগ করছেন।

মণি। (সিঁড়ি দিয়ে নাবতে নাবতে গলা চেপে) আপনারা পুরুষরা এক নম্বরের বোকা। চলুন, চলুন।

রণদীপ আর কিছু ভাববার অবসর পায় না। মণিকার সঙ্গে দ্রুত রওনা হয়।

বেশ কিছুটা আগে আগে হেঁটে চলেছে অনুসূয়া। ধীরে ধীরে গম্ভীর বিরক্তভাব কেটে গিয়ে তার মুখভাব সহজ হ'য়ে আসে, ঘটনাটা পুরো বুঝতে পেয়ে একটু হাসিও ফুটে ওঠে ঠোঁটের কোণে।

মণি। যান, রাগ ভাঙান। আমি বাড়ী যাই।

রণ। না, না আপনি যাবেন না।

মণি। বা রে আমি থেকে কি করবো?

রণ। না, মানে চলুন না তিনজনে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি—

মণি। (হেসে) বেশ এগিয়ে যান, প্রস্তাব ক'রে দেখুন।

রণদীপ দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে যায় অনুসূয়ার কাছে।

রণ। শুনুন।

অনুসূয়া দাঁড়ায়। মুখ ফেরায় না।

Cont.—আপনি আমার ওপর এত রাগ করলেন, কিন্তু এমন একটা কথা শুনে আমার মনের অবস্থা কি হতে পারে একবারও বুঝতে চেষ্টা করলেন না। আপনার দেখা না পেলে, আজই আমি কলকাতা চলে যেতাম।

অনু। (ফেরানো মুখে) তাই যাওয়াই আপনার দরকার ছিল। যার নিজের ওপর, আর একজনের ওপর কোনো ভরসা নেই। যার তার কথা শুনে বিশ্বাস করে বসে থাকে, তার গুরুতর শাস্তি হওয়া উচিত।

গম্ভীর ভাবে কথা ক'টা শেষ করে মুখ টিপে হাসে অনুসূয়া। রণদীপ মুহূর্তের জন্য সে দিকে তাকিয়ে, পথের ওপরেই নাটকীয় ভঙ্গীতে হাঁটু মুড়ে বসে প'ড়ে অনুসূয়ার একটা হাত চেপে ধরে।

অ কা শ

বারীন্দ্রনাথ দাশ

জনাকীর্ণ শহরকেন্দ্র ছাড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে মোড় ঘুরে ট্রাম এসে পড়লো দক্ষিণ-পুর্বের জনবিরল অভিজাত শহরতলিতে। পথ ঘাট ফাঁকা, ট্রামও ফাঁকা। ভিড় শুধু উল্টোদিকের ট্রামে, যে ট্রাম যাচ্ছে শহরকেন্দ্রের অফিস পাড়ায়। এদিকে পথের দুপাশে ছবির মতো সুন্দর সব বাড়ি, প্রায় বাড়ির সামনেই ছোটো বড়ো বাগান, বারান্দায় ফুলের টব। কমলার খুব ভালো লাগে এদিকে অফিস করতে আসবার সময়। সে থাকে বৌবাজার অঞ্চলে, সেখানে সরু নোংরা গলির দুপাশে ঠাসাঠাসি পুরোনো নোনাধরা বাড়ি, তাতে আলো আসে না, বাতাস আসে না, দিনের বেশির ভাগ সময়ই আধো-অন্ধকার, সেখানে শুধু অতি পরিমিত আয়ের মধ্যে দীর্ঘ দিন মাস বছর গুজরানোর কঠিন জীবন সংগ্রাম। ওখান থেকে বেরিয়ে এসে কমলা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এ পাড়ায় একটি ছোটো ডাকঘরে তার চাকরি, কাজের চাপ খুব, কিন্তু অফিস করতে আসবার সময় যে তাকে ভিড় ঠেলাঠেলি করতে হয় না, তাতেই সে খুশী। বাড়ি ফেরার সময় ট্রাম ফাঁকা পায়, তখনও যা কিছু ভিড় ডেলহাউসি-ফেরত ট্রামে। ফাঁকা পথে ফাঁকা ট্রাম যখন অতি দ্রুতগতিতে ছুটে যায়, তখন যে ঝিরঝির করে হাওয়া আসে জানলা দিয়ে বিপর্যস্ত করে তোলে তার সামনের চুলগুলো আর শাড়ির আঁচল, তাইতেই যেন অপনীত হয় সারাদিনের ক্লান্তি। আজ চার বছর ধরে চাকরি করছে সে, তবু যে এখনও সে আগের দিনের মতোই স্নিগ্ধ সতেজ দেখতে, বুড়িয়ে যায়নি তার প্রতিবেশিনী অন্যান্য দুচার জন চাকুরে মেয়ের মতো, সে বোধ হয় এজন্যেই যে সে অফিস করতে আসে আর অফিস ফেরত বাড়ি ফেরে ফাঁকা ট্রামে চড়ে।

পাশের বাড়ির অতসী সেদিন রোব্বার দুপুরে তক্তপোশের উপর বসে সামনের তেতলাবাড়ির ছাতের আলশের ওপারে একফালি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছিলো,—কতোদিন কলকাতার আকাশ দেখিনি, ভুলেই গেছি আকাশের রং। কমলা একটু হেসে ছিলো। অতসীর ভাইবোনেরা স্কুলে পড়ে, অতসীকে সকাল বেলা রান্না করতে হয় তাদের জন্যে। তারপরেই চান করে নাকে মুখে দুটো গুঁজে অফিসে যাওয়ার তাড়া। ছুটতে ছুটতে গিয়ে ডেলহাউসির বাস কি ট্রাম ধরতে হয় বড়ো রাস্তার মোড়ে। সারাদিন মুখ গুঁজে থাকতে হয় টাইপমেশিনের উপর। একতলার পেছনদিকে অতসীর অফিস, সারাদিন সেখানে আলো জ্বলে। কাজের শেষে বেরোতে বেরোতে সেই সন্ধ্যে, আবার সেই ভিড় ঠেলাঠেলি করে ট্রামে কি বাসে ওঠা বাড়ির কাছের স্টপে ভিড় ঠেলে কোনো রকমে বেরিয়ে আসা, তারপর বাড়ি, আবার সেই রান্নাঘর, সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুমুতে যেতে এগারোটা সাড়ে এগারোটা বাজে। একদা কারো সঙ্গে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছিলো, কিন্তু সে মারা গেল টি-বিতে। ভালো করে চিকিৎসা করানোর সংস্থান ছিলো না তার বাড়ির লোকের, নিজের রোজগার থেকে বাঁচিয়ে কিছু কিছু টাকা দিতো অতসী, কিন্তু তাতে হোতো না কিছুই। সে মারা যাওয়ার পর অতসী আর বিয়ে করেনি। ছুটির দিনে দুপুরবেলা গল্পের বই নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে থাকে তক্তপোষের উপর, কখনো কখনো কমলা কি ও-বাড়ির চামেলী কি সামনের বাড়ির মঞ্জুকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যায়। আর হয়তো বা কোনো একদিন এক অলস মূহূর্তে আকাশের দিকে চোখ পড়লে দীর্ঘ নিশ্বাস চেপে হাল্কা সুরে বলে, ইস্, কদ্দিন কলকাতার আকাশ চোখে দেখিনি, একেবারে ভুলে গেছি আকাশের রং।

এদিক থেকে কমলার বরাত ভালো, ফাঁকা আকাশ সে কিছুক্ষণের জন্যে দেখতে পায় প্রত্যেক দিনই,—অফিসে যাওয়ার সময়, অফিস থেকে ফেরার সময়। এ আকাশ এত নীল, এ আকাশ তো আমার নয়, মাঝে মাঝে ভাবতো কমলা, আমাদের পাড়ার আকাশ তো অন্য রকম, যেটুকুও বা দেখা যায়, তার রং ধূসর। তবু সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে জানলার ফাঁক দিয়ে, আকাশের আলোয় ঝলমল করে তার মুখ। মাঝে মাঝে মনে পড়ে অতসীর কথা,—কতো দিন আকাশ দেখিনি,—একটু হাসে, অতসীর সঙ্গে তার শুধু এটুকুই অমিল। আর তফাৎ কোথায়? সেও তো একদিন একজনকে নিয়ে ঘর করবার স্বপ্ন দেখেছিলো। হ্যাঁ, তার টি-বিও হয়নি, মরেও যায়নি, কিন্তু সরে চলে তো গেছে! তার বেদনার বোঝাও কি অতসীর চাইতে কম? সংসারের বোঝাও কম নয়। তার বাবার সামান্য পেনশান, শুধু তাতে সংসার চলে না, ছোটো ভাই-বোন আছে, তার রোজগার সংসারের প্রধান অবলম্বন আজকাল।

তবু সে দু' বেলা কিছুক্ষণ আকাশ দেখতে পায়, এটুকুই তার সান্ত্বনা।

ফাঁকা পথে ট্রাম ছুটে যাচ্ছিলো খুব জোর। ডাইনে বাঁয়ে বাঁকে

মাঝে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলো হাল আমলের ঝকঝকে গাড়ি। কমলা আকাশের দিকে তাকালো। এখন শ্রাবণ মাস। মেঘ করেছে আকাশ জুড়ে। এক কোণে মেঘের ফাঁক দিয়ে আসছে সকালবেলার ম্লান রোদ্দুরের একটুখানি রেখা। বৃষ্টি হবে বলে মনে হয় না। তবে মেঘলা থাকবে সারাদিন। বৃষ্টি হলে ভালোই হয়। বেশী লোক আসবে না ডাকঘরে।

কমলা উঠে দাঁড়ালো। পরের ষ্টপে নামতে হবে তাকে।

ছোটো ডাকঘর, কিন্তু ভিড় হয় খুব। ধারে-কাছে তিনটি স্কুল ও কলেজ আছে, দুটো ব্যাঙ্ক আছে, কিছুদূরে একটি ফ্যাক্টরি আছে, একটি সরকারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট আছে। কমলা পেছন দিকের গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে দেখলো দশটা বেজে দশ মিনিট হয়ে গেছে। বুড়ো পিওন বনমালী রাউণ্ডে বেরোচ্ছিলো, বললো,—দিদি, একটু দেরী করে ফেলেছেন, ওদিকে রেজিষ্টারি কাউণ্টারে লোক জমে গেছে, বড্ড চেঁচামেচি করছে। কমলা একটু হেসে পোষ্টমাষ্টারের টেবিলে গিয়ে হাজিরা খাতা সই করে দেরাজের চাবি নিয়ে রেজিষ্ট্রি কাউণ্টারের সামনে নিজের চেয়ারে এসে বসলো। কাউণ্টারের ওধারে আট দশজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। অধৈর্য হয়ে উঠেছে তার প্রতীক্ষায়। তাদের টুকরো টুকরো মন্তব্য কমলার কানে এলো।

—দশটায় চিঠি রেজিষ্ট্রি সুরু হওয়ার কথা, আর এদিকে কারো দেখা নেই·····

—বলে আর কী হবে দাদা, সরকারী অফিস, এদের কারবারই আলাদা·····

—দিদিমণির তো এতক্ষণে আসবার সময় হোলো। অফিসে মেয়েছেলে বসালে কাজ আর হবে কি করে·····

—দেখুন, এই চিঠিটা ওজন করে একটু বলে দিন দয়া করে, কতো টিকিট লাগবে·····

—একটা একনলেজমেণ্ট ফর্ম দেবেন তো·····

এ ধরণের মন্তব্য কমলার গা-সওয়া হয়ে গেছে। সে কানে তোলে না আজকাল। ফাঁকের ভেতর দিয়ে একজন একটা লম্বা খাম ঠেলে দিলো।

কমলা রসিদ বই খুলে পাতার নীচে কার্বন-পেপার ঢোকালো। সুরু হোলো তার দৈনন্দিন রুটিন, এখন বিকেল চারটে পর্যন্ত চলবে। এক নাগাড়ে একটার পর একটা রেজিষ্ট্রির লেবেল লাগাও, রশিদ লেখো, তাতে ডাক মোহর লাগাও, চিঠির ডাকটিকিটে ছাপ মারো, সেগুলো একটি বড়ো শক্ত খামে ঢোকাও, ডেসপ্যাচের ব্যবস্থা করে দাও। এ সব কাজ করতে আর মনকে সজাগ রাখতে হয় না। শুধু হাত দুটোই তার অভ্যেস মতো কাজ করে চলে প্রত্যেক দিনকার রুটিনে। মন পালিয়ে যায় অন্য দিকে, এ কথা ভাবে, সে কথা ভাবে।

কাল অমলের স্কুলের মাইনে দিতে হবে। বাবা খুব কাশছেন আজকাল, ডাক্তার দেখাতে হবে। একটা নতুন বাংলা ছবি এসেছে, রোববার সেটা দেখতে হবে। অঞ্জলি চিঠি লিখেছে ধানবাদ থেকে,

ওর আগের চিঠিগুলোর উত্তর দেওয়া হয়নি, এবার সময় করে তাকে চিঠি লিখতেই হবে। পেটিকোট একটিতে এসে ঠেকেছে, দুটো নতুন পেটিকোট না কিনলে আর চলছে না।······

—একটু তাড়াতাড়ি হাত চালান দিদি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের যে পায়ে ব্যথা ধরে গেল·····

কাউন্টারের ও পাশে লম্বা কিউ হয়েছে, তর সইছে না কারো। কমলা আর কি করবে, এর চাইতে তাড়াতাড়ি হয় না। সে তো মেশিন নয়।

সেভিংস্-ব্যাঙ্কের হিসেবের চার্জে আছে অমল মজুমদার। শ্যামলা, ছিমছাম ছেলে, বেশী বয়স নয়, খুব হাসিখুশী, হৈ চৈ করে জমিয়ে রাখে অফিসের সবাইকে। সবাই পছন্দ করে তাকে, বুড়ো পোষ্টমাষ্টার মশাই মাঝে মাঝে রাগ করেন বটে, কিন্তু বেশী কিছু বলেন না। তাঁর দুটি অনূঢ়া কন্যা আছে, সুতরাং নজর আছে অমলের উপর।

সে এসে দাঁড়ালো কমলার কাছে। কমলা কাজ করে যাচ্ছিলো নিজের মনে, সে বললো, "শুনছি কয়েক দিনের মধ্যেই পে-কমিশনের রিপোর্ট বেরোবে। আমাদের বিশেষ কিছু লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না।"

"আমাদের মাইনে কিছু বাড়বে?" কমলা মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলো।

ধুস্-শালা, আমাদের পায়ে ব্যথা ধরে গেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে,—কাউন্টারের ওধারে একজন মন্তব্য করলো,—কাজ করবার গরজ নেই, মাইনে বাড়বে কিনা তার চর্চা হচ্ছে।···

—এদিকে একটু নজর দেবেন দিদি?·····

কমলা আর অমল গা করলো না। অমল উত্তর দিলো, "বাড়লে পাঁচ সাত টাকা বাড়বে। মরুভূমিতে দু-ফোঁটা জল, কী আর লাভ হবে বলুন···"

—একটু হাত চালিয়ে দিদিমণি···

কমলা একটা রশিদ কেটে কাউন্টারের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিলো।

অমল জিজ্ঞেস করলো, "বাবার শরীর কি রকম?"

"ভালো না, কাশিটা বাড়ছে।"

"ডাক্তার দেখিয়ে দিন না।"

কমলা পেন্সিল রেখে একটু এদিকে ফিরলো। জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, আপনি বলছিলেন না, আপনার মামাতো না পিসতুতো ভাই একজন মেডিকেল কলেজে হাউস সার্জন···"

—নাও ঠ্যালা, বাবুরা এবার সংসারের কথায় মজে গেছেন, আমরা যে ঘণ্টাখানেক ধরে দাঁড়িয়ে আছি সেদিকে একটুও নজর নেই···

—বলে আর কী হবে ভাই সব সরকারী অফিসের ওই একই হাল···

অমল উত্তর দিলো, "আপনি যদি বলেন তো ওকে বলে একদিন আপনার বাবাকে ডাক্তার দেখিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো।"

বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করছিলো অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু এত ভীড় বলে এতক্ষণ ওঠা যাচ্ছিলো না। কমলা হঠাৎ অমলকে বললো, "আপনি একটু এদিকটা দেখবেন? আমি আসছি এক্ষুণি।"

চেয়ার ছেড়ে ভেতরে পেছন দিকে চলে গেল কমলা। অমল চেয়ার টেনে বসলো। কর্তার অনুমতি ছাড়া সে রশিদ কাটতে পারে না। কিন্তু যে সব চিঠির ডাক টিকিটে ছাপ মারা হয়নি, সেগুলো করে দেওয়া যায়, যারা কতোর ষ্ট্যাম্প লাগবে বলে চিঠি ওজন করাচ্ছে এনেছে, তাদেরটা ওজন করে দেখা যায়। যারা চিঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, ওরা গজগজ করতে লাগলো।

হরিপদ পিওন এসে বললো, "বড়বাবু ডাকছেন আপনাকে।"

"যাই—।"

কমলা ফিরে আসতে অমল চলে গেল তার নিজের কাজে।

অমল যে মাঝে মাঝে তার কাছে এসে এমনি গল্প করে এটা অফিসে লক্ষ্য করে সবাই। নিজেদের মধ্যে একটু ঠাট্টা মস্করাও করে, তবে বেশী মাথা ঘামায় না, কারণ সবাই জানে অমল ছেলেটি ভালো।

এই বয়েসে ওরকম একটু চঞ্চল সবাই থাকে, বলাবলি করে পরস্পরের মধ্যে। বরং এটা যে পোষ্টমাষ্টার মশাই পছন্দ করে না, তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে একটু হাসাহাসি করে। বিয়ে থা হলে এসব দুর্বলতা কেটে যাবে, একজন বলে আরেকজনকে, ও-বয়েস তো ভাই আমাদেরও একদিন ছিলো।

যেদিন সে-বয়েস ছিলো, সেদিন অফিসে মেয়ে সহকর্মিণী ছিলো না, কিন্তু পাশের বাড়ির অমুক মাসীর বোন-ঝি কি তমুক বৌদির ননদ তো ছিলো,—হয়তো বা একথা কারো কারো মনে পড়ে, আনমনা হয়ে যায় নিজের কাজ করতে করতে।

কমলাকেও স্নেহ করে সবাই। বড়ো ভালো, বড়ো শান্ত এই মেয়ে, অফিসে আসে, চুপচাপ নিজের কাজ করে যায়, বাড়ি ফিরে যায়। কাজ করে তো বাপের সংসার চালাচ্ছে এই বয়েসে। বিয়ে করলে বাপের সংসার অচল হয়ে পড়বে, এই কথা ভেবে বিয়ে করছে না। অফিসে সবাই সবার বাড়ির অবস্থা জানে, প্রত্যেকের নিজস্ব ছোটো গণ্ডির মধ্যে যার যার নিজের জীবন-সংগ্রাম, দুঃখ, বেদনা আর ছোটো বড়ো ত্যাগ ও সেবার খোঁজ রাখে, শ্রদ্ধা করে পরস্পর পরস্পরকে। নিজেদের ছোটোখাটো ঝগড়া-বিবাদ ঈর্ষা যে নেই তা নয়, কিন্তু সেগুলো সাময়িক, কেউ মনে রাখে না।

কমলাও বোঝে অমল তার কাছে কেন আসে। অমল বেশী বলে, দু-চার কথায় নিজের সংসারের খবর জানিয়ে দিয়েছে কমলাকে। সে আর তার মা, সংসারে এই দুটি লোক। দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, বড়ো ভাই বিদেশে চাকরি করে, সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। সংসারে কোনো ঝামেলা নেই।

—"একদিন যাবেন আমাদের বাড়ি? মাকে সেদিন বলছিলাম আপনার কথা। বলেছেন, আপনাকে একদিন আসবার জন্যে বলতে।"

অমলের কথা শুনে কমলার কান একটু লাল হয়েছিলো। অমল বললে এমনি একদিন যাওয়া যেতো, ওর মা তাকে দেখতে চেয়েছেন, এর পর খুব সহজ মন নিয়ে যাওয়া যায় কি করে?

একটু হেসে সে বলেছিলো,—"আচ্ছা, একদিন যাবো।"

সে বুঝলো যে অমল আশা করেছিলো, কমলা তাকে একদিন নিজেদের বাড়িতে আসতে বলবে। কিন্তু কমলা বললো না সেকথা।

অমল একদিন কয়েকটি পাটিসাপ্টা নিয়ে এলো কমলার জন্যে। বললো, "মা নিজে তৈরী করে পাঠিয়েছেন আপনার জন্যে।"

কমলা একটু অপ্রস্তুত বোধ করেছিলো। ফিরিয়েও দেওয়া যায় না, নিতেও বাধে। একটি খেলো চুপচাপ, তারপর বললো, "আমি সব কিছু খেতে পারি। একটু অম্বলের ধাত আছে কিনা, তাই খুব মেপে হিসেব করে খেতে হয়।"

অমল কমলার আমন্ত্রণের প্রত্যাশায় থাকেনি, নিজেই একদিন উপস্থিত হয়েছিলো তাদের বাড়ি। খুব আমুদে মিশুক ছেলে, অল্পক্ষণের মধ্যেই জমিয়ে নিয়েছিলো তার মায়ের সঙ্গে।

আচ্ছা চালাক তো!—কমলা ভেবেছিলো মনে মনে।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখলো অমল তাদের বাড়িতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কমলার বোন মিনতি ক্লাসের পরীক্ষায় প্রমোশন পায়নি অঙ্কে কম নম্বর পেয়েছিলো বলে, অমল কি করে যেন ধরলো স্কুলের সেক্রেটারিকে। সে ভদ্রলোক কর্পোরেশানের ইলেকশানে দাঁড়াবার মতলবে আছেন, অমলের পরিচিত একটি ছেলে সেই ওয়ার্ডের সমস্ত ক্লাব মজলিশের একজন পাণ্ডা,—মিনতির প্রমোশন হয়ে গেল। কমলার ভাই অরুণের ফুটবলের নেশা খুব, চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট জোগাড় করে দিলো অমল। কমলার মায়ের তারকেশ্বর যাওয়ার ইচ্ছে খুব, সঙ্গে যাওয়ার ফুরসত হচ্ছিলো না অরুণের, অমল তাঁকে নিয়ে একদিন তারকেশ্বর বেরিয়ে এলো। কমলার বাবার চশমার ফ্রেমটা ভেঙে গিয়েছিল, অমল একদিন তার এক চেনা দোকান থেকে সস্তায় নতুন ফ্রেম করিয়ে এনে দিলো।

প্রায়ই মা কি বাবা একজন কেউ বলতো,—"কাল অমলকে একবার আসতে বলিস তো। একটু দরকার আছে। আমি বলেছি বলবি।"

রাগ হতো কমলার। তবে সে চাপা মেয়ে, মুখে কিছু প্রকাশ করতো না। অমলকেও কিছু বলার উপায় ছিলো না। তার ব্যবহার খুব ভদ্র এবং সংযত, খুব সহজ হলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা সে বলতো না। সাধ্য মতো সবার কাজে লাগবার চেষ্টা করত।

কমলা বুঝতো তার কী প্রত্যাশা। সেটা মুখে প্রকাশ না পাক, চোখে গভীর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকাশ পেতো। তার রাগ হোতো কিন্তু সে রাগ প্রকাশ করবার উপায় ছিলো না। মাঝে মাঝে তার দুঃখ হোতো অমলের জন্যে, তার নিজের জন্যে,—কিন্তু সে দুঃখও কাউকে বোঝাবার মতো নয়।

অমল তো জানে না কমলার জীবনের গভীরতম ব্যথাটা কোথায়। এখন তো তার সেই মন নেই যে নতুন করে কোনো স্বপ্ন দেখবে। কমলার ব্যথা যে তার একান্ত আপনার গোপন ব্যথা।

কাজ করতে করতে সে কথা মাঝে মাঝে কমলার মনে পড়তো কাজ করতে করতে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করতো সে। তবু ফিরে ফিরে পুরোনো দিনের ওপার থেকে সেই দিনগুলো ভেসে আসতো। যন্ত্রের মতো ভাবলেশহীন মুখে কাজ করে যেতো সে। কাউন্টারের এপারে দাঁড়িয়ে যে চিঠি রেজিস্ট্রি করাচ্ছে, ভাবতেই পারতো না ওই মনে বাজছে একটা বেদনার সুর, তার ট্র্যাজেডি কোনো পুরোনো দিনের লোক-গাঁথার নায়িকার ট্র্যাজেডির চাইতে কম নয়।

বছর চার আগে সেদিনও ছিলো শ্রাবণ মাস। তখন কমলা আই-এ পাশ করে বি-এ-তে সবে ভর্তি হয়েছে।

স্কুল থেকেই তার সহপাঠিনী ছিলো অরুন্ধতী, খুব বন্ধুত্ব দু'জনের মধ্যে। অরুন্ধতীর বাড়িতে আলাপ হোলো তার দিদির দেওর হিমাদ্রির সঙ্গে। সে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র, সুন্দর, সুদর্শন, পড়াশুনোয় ভালো।

সেই আলাপ ক্রমে পরিণত হয়েছিলো অন্তরঙ্গতায়। মধ্যবিত্ত বাড়িতে কড়াকড়ি খুব, বাড়িতে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াতো তার সঙ্গে। তাদের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ায় সহায়তা করতো অরুন্ধতী। কী মধুর স্বপ্নের মতো দিনগুলো কেটেছে, কখনো গঙ্গার পাড়ে, কখনো দক্ষিণেশ্বরে, কখনো বটানিক্যাল গার্ডেনে। রূঢ় বাস্তব-জীবনের সঙ্গে পরিচয় ছিলো না। মনে হোতো দিনগুলো এমনিই কেটে যাবে হাত ধরে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, তারপর একদিন হিমাদ্রি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরিয়ে এসে ভালো চাকরি পাবে, তখন মিলনান্ত উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মতো তাদের বিয়ে হয়ে যাবে।

কমলার বাবা তখনো রিটায়ার করেন নি, বাড়িতে তাঁর কড়া শাসন। মেয়েকে বেশী পড়ানোর ইচ্ছে নেই, ভালো ছেলের খোঁজ করছেন।

সেই শ্রাবণ মাসের একটি সন্ধ্যের কথা কমলার এখনো মনে আছে। সেদিন সে আর হিমাদ্রি গঙ্গার ধারে বসে গল্প করেছিলো অনেকক্ষণ।

তারপর বাড়ি ফিরে শুনলো, এক জায়গায় তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। হয়তো এখানেই কথাবার্তা পাকাপাকি হবে। তিন-চারদিন পরে তাকে দেখতে আসবে ওদের বাড়ি থেকে।

এ-কথা শুনে কমলা খুব কান্নাকাটি করলো, ঝগড়া করলো মায়ের সঙ্গে। মা মেয়ের হয়ে একটু বোঝাতে গেল কমলার বাবাকে, কিন্তু দু'টো ধমক খেয়ে চুপ করে গেল।

তারপর দিন কমলা কলেজ কামাই করে যাদবপুরে গেল হিমাদ্রির সঙ্গে দেখা করতে। হঠাৎ তাকে দেখে হিমাদ্রি অবাক। ওরা দুজনে চলে গেল গড়িয়ার দিকে। একটি ধান ক্ষেতের কাছে গাছের ছায়ায় বসলো পাশাপাশি। কমলা হিমাদ্রিকে বললো যে, তার বিয়ের কথা প্রায় পাকা হতে চলেছে।

"এখন উপায়?" হিমাদ্রি মাথায় হাত দিয়ে বললো।

"উপায় আবার কি! আমি শুধু তোমাকেই ভালো বেসেছি, আর কাউকে আমি বিয়ে করতে পারবো মনে করো? এখন তুমি আমায় না বাঁচালে কে বাঁচাবে বলো?"

"আমি কি করতে পারি," খুব বিষণ্ণ হয়ে বললো হিমাদ্রি।

"চলো, আমরা লুকিয়ে বিয়ে করে ফেলি।"

"সে কি করে হয়!" হিমাদ্রি ইতস্ততঃ করলো, "তার চাইতে এক কাজ করো। যে করেই হোক তুমি অপেক্ষা করো দেড়টা বছর, আমি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোই, তারপর—"

"অপেক্ষা করা সম্ভব নয়," বললো কমলা, "বাবা কারো কোনো কথা শুনবেন না।"

"আমি এখন বিয়ে করলে আমাদের চলবে কি করে?"

"আমি চাকরি করবো। তুমি পড়বে। তুমি যদ্দিন পাশ না করো আমি তোমাদের বাড়ি যাবো না। তোমায় তো আর আমাকে খাওয়াতে হবে না।"

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো হিমাদ্রি। "সে হয়না কমলা। আমার বাবাও খুব কড়া লোক আমি যদ্দিন নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে না পারছি, তদ্দিন বাবার কোনো কথা অমান্য করা শক্ত।"

কমলা একটু অবাক হয়ে হিমাদ্রির দিকে তাকালো। এই হিমাদ্রি, যে তাকে সেদিনও বলেছে তার জন্য সে সব কিছু ছাড়তে পারে?

"এখন বিয়ে করলে বাবা আমার বাড়ি থেকে বার করে দেবেন," বললো হিমাদ্রি।

কমলা একটু চুপ করে থেকে বললো, "না হয় দিলেনই বা। তুমি আমি দুজনে মিলে আমাদের দু' মুঠো ভাত যোগাড় করে নিতে পারবো না? না হয় তুমি চাকরি করবে, আমিও করবো।"

"আমার পড়াশুনো?" হিমাদ্রি একটু কাতর হয়ে বললো।

"তোমার পড়াশুনো আমার ভবিষ্যতের চাইতে বড়ো?"

হিমাদ্রি কোনো উত্তর দিতে পারলো না। সে পড়াশুনোয় ভালো ছেলে, ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করলে ওর বাবা ওকে বিলেত পাঠাবে। আজ একজন সাধারণ মেয়েকে ও কথার উত্তর দিতে হলে যে মনের জোর থাকতে হয়, সেটা অনেকেরই থাকে না, হিমাদ্রিরও ছিলো না।

আর কিছু বলার প্রয়োজন ছিলো না। কমলা আর কোনো কথা শুনতে চাইলোও না। সে বসলো না আর এক মুহূর্তও। সোজা বাড়ি ফিরে এলো।

ওর মা দেখলো, মেয়ে অনেক শান্ত হয়ে গেছে। ভেতরের কথা বুঝলো না, খুশি মনে ওর বিয়ের আলোচনা করতে লাগলো স্বামীর সঙ্গে, অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে।

নির্দিষ্ট দিনে ওকে দেখতে এলো। সেও বেশ ভালো সাজ পোশাক করে ব্রীড়াবনত মুখে অভ্যাগতদের সামনে গিয়ে বসলো। শুনলো ছেলে ভালো, বি-কম পাস, ব্যাঙ্কে চাকরি করে।

ভাবলো—ভালোই, এর চাইতে বেশী আমার মতো মেয়ে কি আর আশা করতে পারে, এখানে যদি হয়ে যায় তো আমার কপাল ভালো, আমার বাবারও কপাল ভালো।

কিন্তু হোলো না। দু'দিন পরে শুনলো, ওদের মেয়ে পছন্দ হয়নি।

কমলা শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। কলেজে গেল না সেদিন।

তিন চার দিন পরে অরুন্ধতী এলো খুব হাসি মুখে। বললো, "তোর বিয়ের কথাবার্তা ভেঙে গেছে বলে যে কী খুশী হয়েছি বলার নয়। এই তো চাইছিলি তুই। হিমাদ্রিও শুনে খুব খুশী হয়েছে। সে কাল আসছে আমাদের বাড়ি। তোকে খবর দিতে বলেছে।"

"না," কঠিন মুখ করে বললো কমলা।

অরুন্ধতী অবাক হোলো, "সে কি রে? হিমাদ্রির সঙ্গে দেখা করবি না?"

"না।"

"কেন?"

"আমার খুশী।"

অরুন্ধতী অনেক সাধাসাধি করলো; কমলা কোনো কথা বললো না। অরুন্ধতী রাগ করে চলে গেল।

পরদিন কমলার মা জিজ্ঞেস করলো, "কি রে? কলেজে যাবি না?"

"না।"

"কেন?"

"আর পড়বো না।"

"তা হলে?"

"চাকরি করবো।"

ওর বাবা খুব রাগারাগি করেছিলেন। কিন্তু কমলা কারো কথাই শুনলো না। জি-পি-ও'তে চাকরি পেয়ে গেল কিছুদিন চেষ্টা করবার পর। তারপর একদিন বদলি হোলো এই ডাকঘরে।

ওর বাবা প্রথম দিকে ওর বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সে রাজী হয়নি। তারপর পেনশান নেওয়ার পর যখন মেয়ের রোজগারই সংসারের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ালো, তখন বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেটা মৌখিক ভাবে প্রকাশ করলেও আর আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করতে পারতেন না।

কিন্তু এদ্দিন পরে গণ্ডগোল বাধালো অমল মজুমদার।

ওর মা একদিন কথায় কথায় অমলকে বলেছিলো কমলার জন্যে একটি ভালো ছেলে দেখে দিতে। ও মুখ নীচু করে বসেছিলো কিছুক্ষণ, তারপর বলেছিলো,—আচ্ছা চেষ্টা করে দেখবো।

পরশু এসে দেখা করেছিলো ওর মায়ের সঙ্গে। ওরা কমলাকে কেউ কিছু বলেনি বটে, কিন্তু ছোটো বোনের মারফতে জানতে পেরেছিলো যে অমল একটা ভালো বিয়ের সম্বন্ধ এনেছে। ছেলে বম্বেতে চাকরি করে, বেশ ভালো চাকরি।

শুনে কমলার মেজাজ সপ্তমে চড়েছিলো।

আজ দুদিন ধরে মা-বাবার মুখ খুব গম্ভীর। কমলার বুঝতে অসুবিধে হয়নি। এরকম ভালো ছেলে হাতছাড়া করা যায় না, মেয়ের বিয়ে তো দিতেই হবে একদিন না একদিন। কিন্তু মেয়ে যদি বিয়ে করে বম্বে চলে যায়, সংসার চলবে কি করে?

কাজ করতে করতে কমলা একবার মুখ তুলে তাকালো। এতক্ষণ ধরে কাজ করছে কিন্তু লাইন যেমন ছিলো তেমনই আছে। মুখ ফিরিয়ে একবার তাকালো। দেখলো, অমল কাজ করছে নিজের জায়গায় বসে।

একটু করুণাও বোধ করলো তার জন্যে। নিজের মনের কথা বলবার সাহস নেই, নিজেকে নিজের কাছে বড়ো করবার জন্যে এখন গায়ে পড়ে তার জন্যে ছেলে ঠিক করা হচ্ছে। বেচারা! ভাগ্যিস তার বলবার সাহস নেই, তা নইলে কমলার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আরো ব্যথা পেতো।

যা হবার ওই হিমাদ্রির সঙ্গেই হয়েছে এবং ওই একবারই হয়েছে। আর হবে না।

এ ব্যাপারে কমলা মনঃস্থির করে ফেলেছে বহু আগেই। এর আর নড়চড় হবার উপায় নেই, রূপকথার রাজপুত্তুর এলেও নয়।

দিন গড়িয়ে গেল। ঘড়িতে দেখলো, দুটো প্রায় বাজে। লোকজন কমে এসেছে। চিঠি রেজিস্ট্রি করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে আর মোটে দু-তিনজন।

ডাকটিকিটে মোহরের ছাপ দিতে দিতে কমলা ভাবছিলো, বাবাকে ডাক্তার দেখাবার জন্যে অমলের সাহায্য নেওয়া উচিত হবে কিনা। কী দরকার ভদ্রলোককে সব ব্যাপারে বিরক্ত করে!

হঠাৎ কাউণ্টারের ওদিক থেকে একটি চেনা গলা শুনলো।

"তুমি?"

কে জানে কে কাকে বলছে। কমলা মুখ তুললো না। মনে হোলো চেনা গলা, মনে হতে হাসি পেলো। এতক্ষণ আবোল-তাবোল একথা-সেকথা ভাবতে ভাবতে এখন ভুল শুনতে শুরু করেছে বোধ হয়। এমন ভুলও হয়!

"কমলা না?"

এবার কমলা একটু শিউরে উঠলো। তাকালো চোখ তুলে।

না, সে ভুল শোনেনি। গলাটা সত্যি চেনা।

হিমাদ্রি দাঁড়িয়ে আছে কাউন্টারের ওধারে। হাতে একটা চিঠি। সেটি রেজিষ্ট্রি করাতে এসেছে সে।

একটু মোটা, ফরসা ও ভারিক্কী হয়েছে দেখতে। একটা দামী স্যুট পরনে, বেশ ফিটফাট দেখাচ্ছে।

ওর খবর যে কমলা একেবারে রাখতো না তা নয়। শুনেছিলো সে বিলেত গেছে।

"কমলা না?"

সাড়া না দেওয়াটা অভদ্রতা হয়। কমলা একটু হাসলো।

"এখানে চাকরি করো বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"এসো বাইরে এসো, কদ্দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা।"

কমলা মাথা নাড়লো। "এখন ডিউটিতে আছি।"

"আমি মাস দুয়েক হোলো বিলেত থেকে ফিরেছি। রবার্টসন এ্যাণ্ড ব্রাউনে যোগ দিয়েছি ফ্যাক্টরী-ম্যানেজার হয়ে। তোমার খোঁজ করেছি এসেই। কেউ তোমার কোনো খবর দিতে পারেনি। কে জানতো যে হঠাৎ এভাবে দেখা হয়ে যাবে।"

কমলা মুখ নীচু করলো। তার চোখে জল এসে পড়লো হঠাৎ। অতি কষ্টে সে সামলে নিলো নিজেকে। ভাবলো, কেন, কী দরকার আমার খোঁজ নিয়ে। তোমার জীবন একটা খাতে বয়ে চলে গেছে, আমার জীবন অন্য খাতে। দেখা না হলে কী ক্ষতি হোতো?

সে মুখ নীচু করেই ছিলো শুনলো হিমাদ্রি জিজ্ঞেস করছে, "তোমার ছুটি কখন?"

"পাঁচটায়।"

"আচ্ছা, আমি পাঁচটায় ফিরে আসবো।"

কমলা কোনো উত্তর দিলো না। অনুভব করলো তার হৃৎপিণ্ড খুব দ্রুত চলতে সুরু করেছে।

এমন সময় আরেকটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো হিমাদ্রির কাছে। ফরসা চেহারা, ঠোঁটে লিপষ্টিক। খাটো চুল অড্রে-হেপবার্ণের মতো করে ছাঁটা। ইংরেজি চালে বাংলায় বললো,—"হিমাদ্রি, আমি গাড়িতে বসে বসে একেবারে বোরড হয়ে যাচ্ছি। তোমার কতক্ষণ লাগবে।"

হিমাদ্রির মুখ দেখে মনে হোলো যেন একটু বিব্রত বোধ করছে। বললো, "চিঠিটা রেজিষ্ট্রি করিয়ে এক্ষুণি আসছি। তুমি গাড়িতে গিয়ে বোসো।"

সে চলে গেল।

কমলার মুখ একটু কঠিন হোলো। চুপ করে থাকতে চেয়েও চুপ করে থাকতে পারলো না। চিরন্তন নারীর কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার বৌ বুঝি?"

হিমাদ্রি খুব অপ্রস্তুত হয়ে বললো, "না, আমার বৌ নয়। ওর বিয়ে হয়নি। ওর বাবা হলেন হৃদয় চৌধুরী, আমাদের কোম্পানির একজন ডিরেক্টার। তাই এসব একটু সহ্য করতে হচ্ছে, বুঝলে না, সব আমাদের গার্জিয়ানদের ব্যাপার, এই আর কি। বিলেত ঘুরে এসে একটু ভালো চাকরি-বাকরি করলে এসব দুর্ভোগ সইতে হয়।"

"ও—," একটু বাঁকা হাসি হাসলো কমলা।
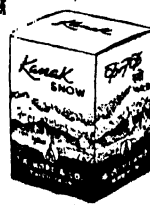
"পাঁচটা নাগাদ আমি এসে পড়বো। আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো কিন্তু।"

রেজিস্ট্রির রসিদ নিয়ে হিমাদ্রি চলে গেল।

তারপর প্রায় তিন ঘণ্টা যে কি করে কেটে গেল, কমলা বুঝতেই পারলো না। কলের পুতুলের মতো কাজ করে গেল সে। ভাবছিলো না কিছুই, হিমাদ্রির কথা নয়, কারো কথা নয়। খুব ঝড়ের রাতে ছোট্টো পাখী যেমনি চোখ বুজে বসে থাকে নিজের বাসায়, ঠিক তেমনি নিশ্চল হয়ে রইলো কমলার মন।

পাঁচটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগেই সে উঠে পড়লো। অন্যান্য দিন কাজ শেষ করে উঠতে প্রায় ছ'টা বাজে। আজ পোষ্টমাষ্টার মশাইকে বলে একটু আগেই বেরিয়ে যাচ্ছিলো, হঠাৎ অমল উঠে পড়ে তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ফটক পর্যন্ত এলো।

বাইরে এসে বললো, "একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।"

"বলুন।"

"একটা খুব অন্যায় করে ফেলেছি।"

"অন্যায়?" কমলা একটু ফ্যাকাসে হাসি হাসলো।

"হ্যাঁ। আপনি বোধ হয় জানেন না, আপনার মা আমায় একটি ভালো ছেলের খোঁজ দিতে বলেছিলেন। আমি দিয়েওছিলাম। কাল সন্ধ্যেবেলা আপনার মা আর বাবার অন্ধকার মুখ দেখে মনে হোলো যেন এত ভালো সম্বন্ধ না আনলেই ভালো হোতো। আমি তো অতো ভেবে কিছু করিনি, যা করেছি সরল মনেই করেছি। আপনাকে বললাম এ জন্যে যে, আপনি যেন আমায় অপরাধী না ভাবেন।"

কমলা হেসে ফেললো। বললো, "না, আমি কিছু ভাববো না।" সে চলে যাচ্ছিলো, হঠাৎ কি ভেবে ফিরে দাঁড়ালো। বললো, "আজ সন্ধ্যেবেলা আপনি একবার বাড়িতে আসবেন।"

"কেন?"

"আসবেন, দরকার আছে। মায়ের সঙ্গে একটু দেখা করতে হবে আপনাকে।"

"আচ্ছা।"

বাইরে পোষ্ট-অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালো কমলা। ঘড়িতে দেখলো পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী।

হিমাদ্রি আসবে বলেছে পাঁচটার সময়। আসবে যখন বলেছে, তখন আসবে নিশ্চয়ই।

কমলা দাঁড়ালো না। একটি ট্রাম আসছে। রাস্তা পার হয়ে ট্রাম ষ্টপে এসে অপেক্ষা করলো ট্রামের জন্যে। ট্রাম আসতেই ট্রামে উঠে পড়লো।

ফাঁকা পথ, ট্রামও ফাঁকা, ঝির-ঝির করে হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মাথার সামনের দিকের চুল। আকাশের এখানে কিছু মেঘ, ওখানে কিছু স্নিগ্ধ নীলিমা।

কমলা নিঃশ্বাস নিলো প্রাণ ভরে। সে মনঃস্থির করে ফেলেছে। হিমাদ্রিকে কোনো একদিন ভালোবাসতাম বলে জীবনে বিয়ে করবো না, এতখানি মস্তো বড়ো মানুষ সে আমার কাছে নয়,—ভাবলো কমলা, —সে যদি আমাকে দেখে আমায় জানতে না পেরে চুপ চাপ চলে যেতো, আমি সারাজীবন এমনিই কাটিয়ে দিতাম, কিন্তু সে আমায় ডেকে কথা বলতে গেল কেন? কেন সে পাঁচটার সময় আমার সঙ্গে এসে দেখা করতে চাইলো? নিজেকে এত খেলো করলো কেন সে? বোধ হয় অতটুকুই ওর দাম। ওর ডিরেক্টারের মেয়েই ওর জন্যে ভালো। আমার কাছে জীবনের দাম অনেক অনেক বেশী।

ট্রাম ছুটছে ফাঁকা পথ দিয়ে। আকাশ দেখতে দেখতে চললো কমলা। সে জানে সে আজ মাকে গিয়ে কি বলবে। সে বলবে, —তুমি ভেবো না মা, যাকে বিয়ে করতে হলে চাকরি ছাড়তে হয়, তোমাদের ফেলে বম্বে চলে যেতে হয়, তাকে আমি বিয়ে করতে পারবো। বিয়ে যদি নেহাত দেবেই, ছেলে তোমাদের চোখের সামনেই আছে। সে আজ আসবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। যা বলবার ওকেই বোলো, আমাকে আর কিছু বলবার দরকার হবে না।

খ্রীষ্ট স্তোত্র

বন্দে সচ্চিদানন্দম্
ভোগিলাঞ্ছিত-যোগিবাঞ্ছিত চরমপদম্
পরমপুরাণপরাৎপরম্
পূর্ণম্ অখণ্ডপরাবরম্
ত্রিসঙ্গশুদ্ধম্ অসঙ্গবুদ্ধদুর্বেদম্ ॥
পিতৃসবিতৃপরমেশম্ অজম্
ভববৃক্ষবীজম্ অবীজম্
অখিল-কারণম্ ঈক্ষণস্রজন-গোবিন্দম্ ॥
অনাহতশব্দম্ অনন্তম্
প্রসূত-পুরুষসুমহান্তম্
পিতৃস্বরূপ-চিন্ময়রূপ-সুমুকুন্দম্ ॥
সচ্চিদো মেলনসরণম্
শুভ শ্বসিতানন্দ ঘনম্।
পাবনজবন-বাণীবদন-জীবনদম্ ॥

আধুনিক পরিবারে অভিনব সার্ফ...
'ঘরের নতুন শোভা দেখতে চান ?'
নয়াদিল্লীর বাসিন্দে,
সেক্রেটারী শ্রীমতী চন্দর মোহিনী শারীন জিজ্ঞেস করেন
'...তাহলে রোজই নতুন জিনিষ খুঁজে বেড়াতে হবে। আমারতো তাই অভ্যেস'—শ্রীমতী শারীন বলেন, 'খুব ভাল ভাবেই সার্ফের পরখ নিয়েছি। কাপড় এতে ধব্‌ধবে ঝলমলে ফরসা হয়...।' 'সার্ফে' দেদার শক্তিশালী ফেনা! আমি আমার বাড়ীর সব কাপড়জামা, সার্ট, প্যান্ট, ব্লাউজ, শাড়ী, ফ্রক, জামা সবই সার্ফে কাচি।' নিজেই একবারটি সার্ফে কেচে দেখুন না!
Surf
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE CLEANEST WASH EVER!
সার্ফে কাপড়জামা
সবচেয়ে
ফরসা
করে কাচে
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী
SU. 10-X52 BG

পায়ে পায়ে কাদা

প্রশান্ত চৌধুরী

১৪

রিদয় শুঁড়িকে এমন আচমকা নাটকীয়ভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে বিদ্যাধরী ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে একটু চেঁচিয়েই বলল,—আঃ, আমাদের দু'জনের মধ্যে তোমাকে কে আসতে বললে? যাও ঘর থেকে।'

—কিন্তু…

—কোনো কিন্তু নেই। যাও এখান থেকে।

ঘর থকে বেরিয়ে গেল রিদয় শুঁড়ি। ঠিক যেন পোষমানা একটা বাধ্য কুকুরের মতন।

মেনকার মনে পড়ে গেল অনেক দিন আগেকার কথা। সেদিন এগারো বছরের মেনকার সামনে প্রথম যখন আবির্ভূত হয়েছিল সতু বক্‌সি আর রিদয় শুঁড়ি, তখনও ঠিক এমনি করেই ধমকে উঠেছিল বিদ্যাধরী,—"আঃ, এখানে কেন? এখন কেন? যাও বলছি ঘর থেকে। কচি মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছ না?"

সেদিনের সেই একরত্তি কচি মেয়েটা আজ অনেক বড় হয়ে উঠেছে। এ-সংসারের অনেক হাটে ঘরে অনেক কড়ি খেসারৎ দিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা কিনেছে। বিদ্যাধরী আজ আর তার কাছে স্বপ্নলোকের পরীর রাণী নয়,—স্বপ্নের মায়াজাল ছিঁড়ে গিয়ে বিদ্যাধরী আজ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সত্যিই সেই মায়াজালের সবখানি ছিঁড়েছে কি?

ছোটবেলায় মোক্ষদাপিসির কাছ থেকে শোনা একটা গল্প, সেই মুহূর্তে সবখানি মনে পড়ে গেল মেনকার।—

জোচ্ছনায় ফিনিক্ ফুটছে। সোনার একটা মাকড়সা আকাশ থেকে পৃথিবীর মাটি পর্যন্ত জাল বুনতে লাগল একটা। তারপর সেই অপরূপ জালের একটা প্রান্ত ধরে ঝুলতে ঝুলতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। মাকড়সা অদৃশ্য হয়ে যেতেই আকাশের অনেক উঁচু থেকে মিষ্টি হাসি ছলকে দিতে দিতে সেই জালের সিঁড়ি বেয়ে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এল একদল পরী। সে কী রূপ তাদের! জোচ্ছনাও যেন ম্যাড়মেড়ে ময়লা মনে হয় তাদের রূপের কাছে!—সেই পরীরা পৃথিবীর ফুল-ফোটা বনে সরোবরের ধারে তাদের পিঠের ডানা খুলে রেখে চান করতে নামল জলে। কত খেলা, কত রঙ্গ-তামাসা, কত জল-ছোঁড়াছুঁড়ি!—ভোরের আলো যখন ফুটি-ফুটি করছে, তখন তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে পিঠে ডানা লাগিয়ে তারা আবার সেই জালের সিঁড়ি বেয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই জালটাও গেল অদৃশ্য হয়ে!…এমনি প্রতি জ্যোৎস্নায় তারা আসে, আর চলে যায়। একদিন কিন্তু তাদের মধ্যে একজনের আর ফিরে যাওয়া হল না। এক রাখাল কেমন করে বুঝি এসে পড়েছিল সেই বনে। সে লুকিয়ে লুকিয়ে একটি পরীর ডানা জোড়া তুলে নিয়ে লুকিয়ে রাখল। ব্যস্, ডানা-হারা সেই স্বর্গের পরী, সেই স্বপ্নের পরীকে সেই থেকে রয়ে যেতে হল পৃথিবীর এই ধূলোমাটির মধ্যে ঐ রাখালের কাছেই। রাখালের কাছে সে বাঁধা হয়ে রইল। বাঁধা হয়ে রইল বটে, কিন্তু তার মন পড়ে রইল সেই স্বর্গের দিকে, স্বপ্নলোকের দিকে। ডানাজোড়া আবার যদি সে কোনোরকমে ফিরে পায়, তা হলে সেই মুহূর্তেই ফিরে যায় সেই স্বপ্নের দেশে। হয়ত আবার কোনোদিন সেই ডানাজোড়া ফিরে পাবে, এই আশা বুকে নিয়ে সে রাখালের ঘরে বাঁধা হয়ে থাকে। সে-আশা দিনে দিনে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়।—তবু সেই ক্ষীণ এতটুকু আশা নিয়েও সে বাধ্য হয়েই রাখালের কালিমাখা কালো হাঁড়িতে ভাত রাঁধে, তার কুচোচিংড়ির চচ্চড়িতে লঙ্কার ফোড়ন দেয়!

মেনকার মনে হল, সেই দুঃখিনী পরী আর এই বিদ্যাধরী যেন এক, অভিন্ন। রিদয় শুঁড়ির কাছে কোথাও নিশ্চয়ই লুকানো আছে তার ডানাজোড়া। তাই বাধ্য হয়েই পরীর মতন রূপবতী বিদ্যাধরী ঐ রিদয় শুঁড়ির মতন একটা বেঢপ মানুষের কাছে বাঁধা হয়ে আছে। না হলে এমনটা হয় কেন? এমনটা হচ্ছে কি করে? ' এমনটা—

বিদ্যাধরী বলল,—কী দেখছ গো এমন করে আমার মুখের দিকে!

মেনকা তাড়াতাড়ি বিদ্যাধরীর দিক থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে, —নাঃ, কিছু না, কিছু না তো, এমনি।

বিদ্যাধরী বলল,—আমাদের দরোয়ান শাঁখার দোকানে তোমাকে দেখে চিনতে পারেনি মোটেই। তোমার মুখে সেই সতু বক্সির নাম শুনেই চিনতে পেরেছে। ও চুপিচুপি তোমাদের পিছু নিয়ে তোমাদের বাসা দেখে এসেছিল সকালবেলাতেই। সন্ধ্যেবেলাতে গিয়ে নিয়ে এসেছে তোমায়।

—তুমিই বুঝি আমাকে ধরে আনতে হুকুম দিয়েছিলে?

—না। ওর বাবু। আমি বাধা দিইনি। বাধা দিলে অন্য বিপত্তি হতে পারত।

—কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, সেদিনের সেই খুনের কথা আমি কোনোদিন কাউকে বলিনি। কাউকে বলবও না। আর, এতদিন পরে সেকথা বললেই বা ভয়ের কী আছে?

মেনকার প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বিদ্যাধরী বাঁশীর মতো মিষ্টি গলায় বলল,—ছেলেপুলে এসেছে কোলে?

—না।

—বর করে কি?

—এখন কি করে তা' তো জানি না। তবে আগে যাত্রাদলে বাঁশী বাজাত।

—তবে যে দরোয়ান বলল, নাপিতগিরি করে।

—নাপিতগিরি করে যে মানুষটা, সে আমার বর নয়।

—তবে সে কে? কে তোমার?

মেনকার একবার মনে হল, বিদ্যাধরীর মুখের ওপর সে চীৎকার করে বলে,—'বিদয় শুঁড়ি তোমার যা, নাপতে আমার তাই।'

কিন্তু বিদ্যাধরীর মুখের দিকে তাকালে আর যে ওসব কথা মুখে আনতে পারে না। আজো তার সেই সেদিনকার মতনই কনকচাঁপার মতন গায়ের রঙ, মাখনের মতন নরম হাতের আঙুল, টানা টানা চোখ, ছোট্ট কপাল, ছোট্ট হাঁ-মুখ, একটু চাপা হলেও কেমন পল-তোলা ধারালো নাক, আর সামনের দিকে কিছু কিছু পাক ধরলেও পিঠ ছাপানো একরাশ কোঁকড়া চুল।—মোক্ষদাপিসির গল্পের সেই পরীও রাখালের ঘরে থাকতে থাকতে বয়েসকালে এমনি দেখতে হয়েছিল নিশ্চয়ই। সেই দুঃখিনী বন্দিনী পরীর মুখের ওপর কি কড়া কথা বলা যায়? তার মনে কি ব্যথা দেওয়া যায়? —যায় না। বিদ্যাধরীর মুখের ওপরেও তাই ঐ কুচ্ছিৎ কথাটা বলতে পারল না মেনকা। কিছুতেই পারল না।

মেনকা তাই কাঁদল শেষ অবধি। কেঁদে ফেলল হঠাৎ। আর, কাঁদতে কাঁদতে যেই অনুভব করল যে, মোমের মতন নরম একটি হাত তার মাথায় এসে ছুঁয়েছে, পল-তোলা ধারালো একটি নাকের স্নেহমাখানো নিশ্বাস তার গালে এসে লেগেছে,—অমনি মেনকা গড়গড় করে নিজের বুক খালি করে বলে গেল নিজের জীবনের সকল দুর্ভাগ্যের কথা, একেবারে গোড়া থেকে আজকের দিনটির ঘটনা পর্যন্ত।

—হুঁ।

মেনকাকে ছেড়ে বিদ্যাধরী দাঁড়াল গিয়ে জানালায়; আকাশের মুখোমুখি হয়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে মনে মনে কার সঙ্গে কী যে বোঝাপড়া করল কে জানে, ফিরে এসে বলল,—তোর সেই বিয়ে করা বরটাকে যদি খুঁজে এনে একটা দোকান করে বসিয়ে দিই, ঘর করতে রাজি আছিস তার সঙ্গে?

মেনকা বলল,—না।

—কেন?

—নিজের বিয়ে-করা মাগকে যে-ভাতার বন্ধক দিয়ে আসে, তার ঘর করার চেয়ে গঙ্গায় ডুবে মরা ভাল।

—কিন্তু ঐ নাপিতের ঘর করা মানে যে আগুনে পুড়ে মরা। সে যে আরো জ্বালা, আরো কষ্ট।

আবার জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বিদ্যাধরী। অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে দিয়ে নিজেকে দু'খানা করে ফেলে—সেই দুই'জনে মিলে কী বুঝি বোঝাপড়া করে নিল। তারপর বলল,—কাশী যাবি? বাবা বিশ্বনাথের রাজত্বে?

ঠানদি আজও আফশোস ক'রে ভাবে, সেদিন যদি বিদ্যাধরীর কথায় কাশী-বিশ্বনাথে যেতে রাজি হত ঠানদি! আঃ, আবার ভুল, ঠানদি নয়, ঠানদি নয়, মেনকা—মেনকা।—ঠানদি যে মেনকা ছিল তখনও। সেই মেনকা যদি সেদিন রাজি হত কাশী-বিশ্বনাথে যেতে, তাহলে সেই চরম দুর্ঘটনাটা ঘটত না কোনোদিন।

আজও সেকথা মনে হলে কান্না পায় ঠানদির।

মেনকা কাশী না গিয়ে থাকতে চাইল বিদ্যাধরীরই কাছে। বলল,—তোমার কাছে থাকতে দাও। তোমার ফাই-ফরমাস খাটব, তোমার সেবা করব,—দুটো খেতে-পরতে দিও শুধু।

বিদ্যাধরী বলল,—শুধু এই? এত অল্পেতেই খুশি?

তা ছাড়া আর কি? আর কী চাইতে পারে একটা কুমোরের মেয়ে? চোদ্দ-পুরুষ ধরে তারা আর কী চেয়েছে? আর কী চাইবার কথা ভাবতে পেরেছে? আর কী চাইবার অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছে? এ-ছাড়া আর কীই বা চেয়েছে মেনকার মা, তার মা, তার মা, তার মা?

মাথা গোঁজবার ঘর, পরণের দুখানা কাপড়, বড়জোর দুটো রূপোর গয়না, দু-বেলা পেট ভরাবার খাবার, সিঁথের সিঁদুর, দুটো কচি-কাচার হুটোপাটি, সোয়ামীর পায়ে মাথা রেখে মরণ। ব্যস্‌, এই তো জীবনের চরম চাওয়া, চরম পাওয়া।

সিঁথির সিঁদুর!—সে তো মেনকার আছেই। যতদিন মা শশিকান্তর ভাল-মন্দ কিছুর খবর আসছে, ততদিন এয়োতির ঐ লাল চিহ্নটা তো আছেই মেনকার চুলের ফাঁকে লেপ্‌টে। সোয়ামী? —সে তো আর দু'বার হবার নয়। কচি-কাচা?—এ-জন্মে হবার আর উপায় রইল কোথায়? বাকি শুধু মাথা গোঁজবার ঘর, পরণের দুখানা কাপড়, আর দু-বেলা পেট ভরাবার ভাত।—শুধু সেইটুকুই দিক মেনকাকে বিদ্যাধরী। আর দিক সেই আশ্বাস, সেই ভরসা,—বাবুতে নাপিতে কামারে স্যাকরাতে তার দেহটাকে নিয়ে যেন ছোঁড়াছুঁড়ি করতে না পায়।

বিদ্যাধরী দিল সেই ভরসা।

তবু ঠানদি আজও ভাবে, বিদ্যাধরীর কথায় সেদিন যদি সে কাশী-বিশ্বনাথে যেতে রাজি হত, তা হলে·····

তা হলে কী?

তা হলে কী ?

তা হলে কী ?

তা হলে সেই চরম দুর্ঘটনাটা ঘটত না কোনোদিন।

মেনকার জীবনের আরো সাতটা বছর তখন পার হয়ে গেছে বিদ্যাধরীর কাছে। এই সাতটা বছরে কী আশ্চর্য দ্রুততায় কত যে পরিবর্তন ঘটে গেছে বিদ্যাধরীর জীবনে। তার চুলে ধরেছে আরো পাক, তার চোখের চামড়ায় ধরেছে কুঞ্চন, তার নিটোল হাতের চামড়া পড়েছে ঝুলে।

ডানা হারিয়ে-যাওয়া সেই স্বর্গের পরীরও এমনি হয়েছিল কিনা মোক্ষদাপিসি সেকথা বলেনি। সেকথা বলবার আগেই গল্প থেমে গিয়েছিল মোক্ষদাপিসির। যদি না থামত, তা হলে নিশ্চয়ই সেই স্বর্গের পরীরও এমনি দশাই হতো। কিন্তু, এমনি দশা হবার পর থেকে সেই রাখাল কি পরীকে নির্যাতন করত ? তাকে গাল দিত অকথ্য ভাষায় ? হাত তুলত তার গায়ে ?

রিদয় শুঁড়ি করত তাই।

মেনকা তো নিজের চোখেই দেখেছে, রিদয় শুঁড়িকে কী না দিয়েছে বিদ্যাধরী, কী না করেছে তার জন্যে! বিদ্যাধরীর সিন্দুকের গয়নাগুলো একে একে চলে গেছে যে, সে তো ঐ রিদয় শুঁড়ির জন্যেই। আর, এও তো দেখেছে যে, বিদ্যাধরীর কথায় ওঠ-বোস করেছে ঐ রিদয় শুঁড়ি।

রিদয় শুঁড়িদের পৈত্রিক মদের দোকানের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে যতদিন মামলা চলেছে তার ভাইয়ের সঙ্গে, ততদিন তার গয়না ভাঙিয়ে উকীল-ব্যারিষ্টারের খরচ চালিয়েছে রিদয় শুঁড়ি, তা কি জানে না মেনকা?

কিন্তু তারপর ?

তারপর একদিন কঠিন-ব্যামোয় প'ড়ে কর্পূরের মতন উপে গেল বিদ্যাধরীর রূপ। পেটে তলায় না কিছুই। যা খায় বমি হয়ে যায় সবই। চোখের কোলে তার কালি পড়ল। গায়ের চামড়া কুঁচকে গেল। আর, ঠিক সেই দুঃসময়ের দিনেই অনেকদিনের মামলার রায় বের হতে দেখা গেল, রিদয় শুঁড়ি জিতে নিয়েছে তাদের পৈত্রিক মদের দোকানের ঢালাও কারবার।

আর তারপর থেকেই উল্টে গেল সব কিছু। বিদ্যাধরীর অনেককালের সেই বিশ্বাসী দরোয়ানকে মিথ্যে-চুরির অপবাদ দিয়ে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিল রিদয় শুঁড়ি ;—বাসন-মাজা আর ঘর ঝাঁট দেওয়ার দাসীকে তাড়িয়ে মেনকাকে ভার দিল সেই কাজের।

তাতেও অসহ্য লাগেনি মেনকার। অসহ্য লাগল বিদ্যাধরীর প্রতি রিদয় শুঁড়ির অমানুষিক ব্যবহারে। বিদ্যাধরীর জন্যে বড় কবিরাজের কাছ থেকে যে ওষুধ আসত, তা' বন্ধ হয়ে গিয়ে আসতে লাগল হেতুড়ে বদ্যির ছ'পয়সা দামের ওষুধ। কথায় কথায় গাল দিতে লাগল বিদ্যাধরীকে। বিদ্যাধরীর সিন্দুকের চাবি নিজের পকেটে পুরে ফেলল রিদয় শুঁড়ি।

বিদ্যাধরী কাঁদত ;—মেনকা দেখেছে। বিদ্যাধরী রোগের যাতনায় ছটফট করত ;—মেনকা দেখেছে।

তাই তো মেনকা গয়লানী বুড়ির সঙ্গে সড় কোরে আনিয়েছিল তাদের দেশের কড়া বিষ, জলের সঙ্গে যে-বিষ এক ফোঁটা পেটে গেলেই অসহ্য যাতনায় ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যেই মরণ নিশ্চিত।

রিদয় শুঁড়ি মরলে বিদ্যাধরীর সিন্দুকের চাবি খুলে মেনকা আবার তার জন্যে বড় কবিরাজের কাছ থেকে ভাল ওষুধ আনবে। আবার তার যন্ত্রণা দূর করবে। আবার তার মুখে হাসি ফোটাবে।—এই ছিল মেনকার স্বপ্ন।

কিন্তু মেনকার জীবনের সকল সাধ, সকল স্বপ্নের মতই এটাও চুরমার করে ভেঙে দিলেন চোখের মাথা-খাওয়া নিষ্ঠুর বিধাতা।

সেদিন ছিল ঝড়-বাদলের দিন। আপ্টনিবাগানের নীচু রাস্তায় কাদা জমেছে। জোড়া-গির্জের মাথায় একটা বাজ পড়েছে। কেক-পাঁউরুটির প্রকাণ্ড টিনের বাক্স মাথায় নিয়ে পথ চলতে চলতে বাজের ছোঁয়া লেগে পথের মধ্যেই মরেছে ছলিমুদ্দিন বুড়ো।

সেই দুর্যোগের দিনেও অসুখ-শরীরে মুর্গির মাংস রাঁধতে হয়েছে বিদ্যাধরীকে।—রিদয় শুঁড়ির হুকুম হয়েছে, রাত্রে আজ এখানে এসে মদের সঙ্গে মুরগীর ঠ্যাং চিবোবেন তিনি।

বছির মিঞা কেটেকুটে পালখ ছাড়িয়ে মুরগী রেখে গিয়েছে কলাইয়ের গামলায়। মেনকা উনুন ধরিয়ে দিয়েছে, বাটনা বেটে দিয়েছে, পেঁয়াজ কুচিয়ে দিয়েছে, বিদ্যাধরীর হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েছে রান্নার এটা-ওটা।

আর, তারপর ?

সন্ধ্যেবেলায় রিদয় শুঁড়ির খাবারের টেবিলে সাজিয়ে রেখেছে মদের বোতল, সোডার বোতল ; আর কাচের গ্লাসে সেই জল, যে-জলের সঙ্গে মেশানো আছে গয়লানী বুড়ির দেওয়া তাদের দেশের সেই বিষ, যে-বিষ গলা দিয়ে নামলেই অসহ্য যাতনায় রিদয় শুঁড়ির মরণ নিশ্চিত।

বৃষ্টিটা ধরি ধরি করেও ধরছে না, পড়ছে তখনও টিপ টিপ করে। রাস্তা জল-কাদায় থৈ থৈ। পথে জন-মনিষ্যি কম। রিদয় শুঁড়িরও দেরি হচ্ছে আসতে। ওর ফিটনগাড়ির ঘোড়াটা বুড়ো। জলে ভিজলে অসুখ করবার ভয়। তাই বোধ হয় দেরি হচ্ছে রিদয় শুঁড়ির।

বেশ তো, নিজের ঘোড়াকে ভেজাতে না চায়, ভাড়া গাড়ি চেপেও তো আসতে পারে মানুষটা। এই ঝড়-বাদলের দিনে অসুখ-শরীরে বিদ্যাধরী আর কত রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে বসে থাকবে তার জন্যে ?

একতলার সিঁড়ির নীচে গুড়িসুড়ি হয়ে অপেক্ষা করছে মেনকা ;—কড়া নাড়ার শব্দ পেলেই দোর খুলতে একটুও যেন না বিলম্ব হয়। হাতের কাছে কুঁচোনো শুকনো ধুতি আর পিরাণও রেখেছে ;—এসেই যেন চটপট্ কাপড় ছেড়ে মানুষটা খাবার ঘরে ঢুকে যায়। ওদিকে কাঠকয়লার মরা-আঁচে দমে চড়ানো আছে মুরগীর মাংস, প্লেটও বসানো আছে টেবিলের ওপর। রিদয় শুঁড়ি এলেই গরম মাংস ঢেলে দেওয়া হবে প্লেটে। সেই গরম মাংস খেতে খেতে একটু চুমুক দেবে রিদয় শুঁড়ি জলের গ্লাসে। ঐ তার অভ্যেস। আর, চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গেই······

চেয়ারটা উল্টে পড়ার শব্দ···একটু অস্ফুট আর্তনাদের মতো···হ্যাঁ, আর্তনাদই তো!

মেনকা পড়ি কি মরি করে ছুটল দোতলার সিঁড়ি বেয়ে। মেনকা হাঁপাচ্ছে, মেনকা নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবে।

মেনকা পৌঁছল সেই খাবারের ঘরে। দেখল, টেবিলের ওপরে-রাখা কেরোসিনের বাতিটা উল্টে গিয়ে সমস্ত ঘরটা আলোছায়ায় কেমন

রহস্যময় হয়ে উঠেছে, আর সেই রহস্যময় ঘরের মেঝেয় পড়ে যাতনায় ছটফট্ করছে বিদ্যাধরী।

বিদ্যাধরীর গলা জড়িয়ে ধরে মেনকা চীৎকার করে কেঁদে উঠল,—ও গেলাসের জল তুমি খেতে গেলে কেন-ও-ও-ও-ও-ও ? আমি যে ওতে বিষ মিশিয়েছিলুম রিদয় শুঁড়িকে মেরে ফেলব বলে।

কথাটা শুনে সেই অত যন্ত্রণার ছটফটানির মধ্যেও একটুক্ষণের জন্যে থেমে একবার যেন চমকে উঠল বিদ্যাধরী। অবাক হয়ে তাকাল মেনকার মুখের দিকে। তারপর দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট দুটো কামড়ে কী একটাকে যেন ঠেলে নীচের দিকে নামাতে নামাতে ক্ষণিক বিদ্যুৎ-চমকের মত হাসল একটুখানি।

ওধারে কোথায় আবার বুঝি বাজ পড়ল একটা।

গয়লানী বুড়ি বলেছিল, অসহ্য যাতনায় ছটফট্ করতে করতে মরে যাবে মানুষ। কিন্তু তা হয়নি। ঘণ্টাখানেক যাতনায় ছটফট্ করবার পর কেমন শান্ত হয়ে গেল বিদ্যাধরী। যে-মৃত্যুটা বেত মারছিল এক ঘণ্টা আগে, এখন যেন সেই-মৃত্যু তাকে আদর করে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে জামা-কাপড় পরিয়ে সাজাচ্ছে।

মেনকা হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আর বিদ্যাধরীর পায়ে মাথা কুটতে কুটতে বলল,—আমি তোমায় নিজে হাতে খুন করলুম মাগো,—সব্বনাশী আমি।

শান্ত ক্লান্ত আচ্ছন্ন বিদ্যাধরী হাতের ইঙ্গিতে মেনকাকে কাছে ডেকে নিয়ে তার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল,—কাঁদছিস কেন বোকা মেয়ে ? এতদিনে আমি আমার ডানা ফিরে পেয়েছি। তুই-ই তো আমার ডানা খুঁজে দিলি।

সেই গল্প। সেই মোক্ষদাপিসির গল্প। কোন্ দুর্বল মুহূর্তে সেই গল্প মেনকা করেছিল বিদ্যাধরীর কাছে। আজ সেই পরীর গল্পের শেষটুকু বলে দিল বিদ্যাধরী। বলল,—কাঁদিসনে বাছা মিছি-মিছি। আজ তো জ্যোচ্ছনা নেই, তাই সোনার মাকড়সার জালটা দেখতে পাচ্ছিস না তুই। আমি কিন্তু পাচ্ছি। জাল নেমে এসেছে আকাশ থেকে। তুই খুঁজে এনে দিয়েছিস আমার ডানা। আজ আমার কত আনন্দ বল্ দিকি ?

মেনকা তবু কাঁদতে লাগল।

বিদ্যাধরী বলল,—ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবদুল আসবে বাবর পাঁউরুটি দিতে। তাকে বলবি আমার দরোয়ানের বাড়িতে তোকে পৌঁছে দিতে। সে মানুষটার খুব দয়া। তোকে স্নেহও করত। সে তোকে নিশ্চয়ই লুকিয়ে রাখবে পুলিশের হাত থেকে। আমার হাতের চুড়িগুলো আর গলার হারটা খুলে নে এইবেলা। কাজে লাগবে তোর।

মেনকা হু-হু করে কাঁদতে লাগল আর মাথা নেড়ে বলতে লাগল,—না, না, না, সে আমি পারব না, পারব না, পারব না।

বিদ্যাধরীর কথা এবার জড়িয়ে আসতে লাগল, বুকের মধ্যে কিসের তোলপাড় হতে লাগল, নিশ্বাস ঘনঘন পড়তে লাগল। সেই অবস্থাতেও বিদ্যাধরী কোনক্রমে আবার বলল,—আবদুলের সঙ্গে পালিয়ে যাস, আমার দিব্যি রইল। না যাস যদি, পরলোকে গিয়েও শান্তি পাব না আমি একটুও।

বিদ্যাধরী থামল। একেবারেই থামল। চিরকালের মত থামল। আকাশে ভোরের আলো তখন ফুটিফুটি করছে।

বল হরি, হরিবোল !

মুখাগ্নি হচ্ছে মাদারডাঙ্গার বিখ্যাত কেশব গোঁসাই-এর বংশের একশো দশ বছরের রঙ্গলাল শর্মার।

রঙ্গলাল শর্মার আত্মীয়-স্বজন, শিষ্য-প্রশিষ্যদের সমস্বর হরিধ্বনির সঙ্গে ঠানদিও মিশিয়ে দিল তার ক্ষীণকণ্ঠের অস্ফুট ধ্বনি,—বল হরি, হরিবোল।

একটু পরেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠল চিতা। খাঁটি ঘি আর চন্দনকাঠের গন্ধ ছড়িয়ে দিল চিতার ধোঁয়া। গঙ্গার ধারের বাতাস সেই গন্ধে ভারি হয়ে থমকে পড়ল।

থমকে পড়ল ঠানদির অতীত-রোমন্থন। তারপর আবার সুরু ;—

বিদ্যাধরীর বাড়ি থেকে পালাল মেনকা। না, বিদ্যাধরীর গা থেকে একটা গয়নাও সে খুলে নেয়নি। সে রাতে ঝড়-বাদলে রিদয় শুঁড়ি আসেনি। পরের দিন তাই সকালেই সে একবার এসেছিল নিশ্চয়ই। তারপর কী হয়েছিল ? সেকথা মেনকা জানে না। তার জানবার কথা নয়। সে তখন বিদ্যাধরীর নির্দেশ মত পালিয়ে গেছে পাঁউরুটি-ওলা আবদুলের সঙ্গে।

না, দরোয়ানের বাড়িতে পৌঁছানো ঘটেনি তার বরাতে। দরোয়ানের বাড়িতে পৌঁছে না দিয়ে আবদুল তাকে নিয়ে গিয়েছিল তিলজলার মাঠের ধারে একটা নোঙরা মাটকোঠায়।

তারপর ?

আবার সব গুলিয়ে যাচ্ছে ঠানদির। রঙ্গলাল শর্মার দেহটা চিতায় ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সব খেই হারিয়ে যাচ্ছে, উল্টোপাল্টা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আবদুলের মুখের সঙ্গে বেমালুম জড়িয়ে যাচ্ছে শ্যামনগরের বাগানবাড়ির ভূতিবাবুর মুখ,—শিবমন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার সঙ্গে গুলিয়ে যাচ্ছে শোভানবাবুর বৈঠকখানার জরি-বাঁধানো মোরাদাবাদী ফরসিটা !

ঠানদি আর পরিষ্কার করে গুছিয়ে-সুছিয়ে ভাবতে পারছে না কিছু,—পর পর সাজিয়ে মনে করতে পারছে না আর অতীতের ঘটনাগুলো।

যতদিন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলা সম্বরণ করেননি, ততদিন অর্জ্জুন অনায়াসে গুণ টেনেছে গাণ্ডীব-ধনুকে। আর, যেই তাঁর লীলা অবসান হল, অমনি গাণ্ডীব তুলে ধরবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত রইল না আর অর্জ্জুনের। ঠানদিরও তেমনি হল বুঝি। যতক্ষণ রঙ্গলাল শর্মার দেহটা চিতায় ওঠেনি, ততক্ষণ গড়গড় করে সব মনে পড়ে গেছে ঠানদির। আর, যেই রঙ্গলালের দেহ আগুনে পুড়ল, অমনি আবার সব গুলিয়ে-মিশিয়ে একাকার হয়ে গেল ঠানদির। আর কিচ্ছুটি মনে করতে পারছে না।

আবদুলের পরে কে? আবদুলের পরে কী? আবদুলের পরে কোথায় মেনকা?

ভূত্তি গায়েন, ত্রিলোকী সিং, শোভানবাবু—এদের মধ্যে কে আগে, কে পরে? শ্যামনগরের বাগানবাড়ি, মেটেবুরুজের দর্জ্জিখানা, ভূকৈলাসের শিবমন্দির,—কোথায় প্রথমে, কোথায় শেষে? কোথা থেকে ঠানদি এসে বসল এখানকার এই ঘুপসি দোকান ঘরটিতে?

মনে পড়বে না, মনে পড়বে না;—আজকে আর হাজার মাথা খুঁড়লেও কিছু মনে পড়বে না ঠানদির। আবার, কবে হয়ত কিসের একটুখানি নাড়া পেয়ে সব মনে পড়ে যাবে,—অনেকদিনের মুখস্থকরা ব্রতকথার গল্পের মতন। আজ থাক্।

রঙ্গলাল পুড়ছেন। একশো দশ বছর ধরে লীলাখেলা করে রঙ্গলাল একটু একটু করে পুড়ে ছাই হচ্ছেন।

যে পালঙ্কখাটে চেপে এসেছিলেন রঙ্গলাল, সে-খাট আগুনে পোড়ায়নি ওরা। নরম গদি আর সাটিনের ঝালর দেওয়া নরম বালিস সমেত বিরুয়া ডোম পেয়েছে সেই খাট। কালই বেচে দিবে বিরুয়া শোভাবাজারের কানাইবাবুর ফার্ণিচারের দোকানে। শুধু আজকের রাতটুকু খাটটা থাকবে তাদের কাছে। বিরুয়ার ছেলে রঘুয়ার সাধটা হয়ত মিটবে আজ। আজকের রাতটা সে তার বিয়ে-করা নতুন বৌটাকে নিয়ে শুতে পারবে ঐ খাটে। কিন্তু রাতেরই আর বাকি আছে কতটুকুই বা?

রঙ্গলাল আরো পুড়লেন।

ক্যামেরাবাবু দুলাল সাহা শবদেহের যে দুখানা ফোটো তুলেছিলেন, ভাগ্নে নফরচন্দ্রকে নিয়ে তিনি ডার্করুমে ঢুকেছেন সেগুলো ডেভেলপ্ প্রিণ্ট করতে। ঘটি-গঙ্গাজলের সঙ্গে একই সঙ্গে ফোটোগুলো কিনে ঘরে নিয়ে যাবেন রঙ্গলালের আত্মীয়-স্বজনেরা।

রঙ্গলালের চিতা আরো জ্বলছে।

কালীকিঙ্কর পাগলা পেয়েছে রঙ্গলালের খাটের ওপরকার ফুল আর মালা আর সাদা গোলাপের তোড়া। দু'পাশে দুই তোড়া নিয়ে মালা গলায় দিয়ে মালগাড়ির রেললাইনের ঠিক মাঝখানটিতে বসে দুলে দুলে মহানন্দে চেঁচাচ্ছে,—'কই গো, আমার কনে কই গো?'

রঙ্গলালের চিতা গুটিয়ে ছোট হয়ে আসছে।

মড়িপোড়া বামুন তারাচরণ শর্মা নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে আবার গিয়ে ঢুকে পড়েছে জটাউলী বুড়ির দরমার অন্ধকার আস্তানায়। ছোট কল্কেতে দপ্‌দপ্ আগুনের ফুলকি উঠতে শুরু করেছে আবার সেখানে।

রঙ্গলাল তাঁর কতো রঙ্গের পর এবার ফুরিয়ে যাচ্ছেন একটু একটু করে।

রঙ্গলালের সেই ফুরিয়ে যাওয়ার দিকে চোখ রেখে ঠানদি কাঁপা বেসুরো গলায় অস্ফুটস্বরে নিজের মনেই গেয়ে উঠল,—

'এ মায়া প্রপঞ্চময়
ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে।
রঙ্গের নট নটবর হরি
যারে যা সাজান সেই তা সাজে।'

গাইতে গাইতে সহসা বুকের মধ্যেটায় 'কেমন যেন করে উঠল ঠানদির। কী যেন একটা ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল বুকের জীর্ণ পাঁজরের মধ্যে। ঠানদি উঠে পড়ল শ্মশান ছেড়ে।

শ্মশানযাত্রীর দল এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। ভাড়াটে শববাহীর দল এক জায়গায় জড়ো হয়ে গাঁজায় দম দিয়েছে মৌজসে; বিশ্রামভবনের বেঞ্চে গামছা পেতে শুয়ে কেউ কেউ আবোল-তাবোল ভাবছে কত কী। গঙ্গার গোডেনঘাটে বসে কেউ গঙ্গায় জোয়ার আসার শব্দ শুনছে আনমনে। রেললাইনের খাঁজে খাঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে ভিখিরির দল। কালীকিঙ্কর পাগলা কনের জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে নাক ডাকাচ্ছে রেললাইনে মাথা দিয়ে শুয়ে। রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে বটে, কিন্তু এক-একটা মানুষ যেমন চোখ চেয়ে ঘুমোয়, মনে হচ্ছে ওরাও যেন তেমনি চোখ চেয়ে ঘুমোচ্ছে সবাই। চিতার ফটফট্ শব্দ, পথের কুকুরদের নিঃশব্দ ছুটোছুটি, মানুষজনের ফিস্‌ফাস্, চায়ের খালি ভাঁড় ছুঁড়ে ফেলার 'আওয়াজ, কাঠের দোকানে কাঠ বোঝাইয়ের হাঁকডাক—সবকিছু সত্ত্বেও মনে হচ্ছে এ-অঞ্চলটা গভীর ঘুমের প্রকাণ্ড একটা চাদর মুড়ি দিয়ে মাঝে মাঝে যেন একটু-আধটু উসখুস করছে শুধু।

শ্মশান থেকে উঠে সেই ঘুমন্ত পথ পেরিয়ে ঠানদি একলা চলতে লাগল নিশি-পাওয়া আচ্ছন্ন মানুষের মত। না, দোকানে ফিরে গেল না ঠানদি। নিজের দোকান বন্ধ থাকায় পাশের হিন্দুস্থানীর পানের দোকানটায় জোর খদ্দের লেগেছে দেখেও না। ঠানদি একলা অন্ধকারে গঙ্গার সেই কিনারের দিকে নেমে গেল, যেখানে বাজপড়া শুকনো নিমগাছটা পাতাটাতা সব খুইয়ে একলা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।

অন্ধকারে সেই নেড়া নিমগাছের কাছে একলা গিয়ে দাঁড়াল ঠানদি। ছুটে চলেছে গঙ্গার জল কলকল শব্দ তুলে। সারারাত আকাশে পাহারা দিয়ে নক্ষত্রগুলোর ঘুম এসে গেছে তখন, মিট্‌মিট্ করে ঢুলতে সুরু করে দিয়েছে তারা।

চুপ করে সেইখানে অন্ধকারে মাথা পেতে দাঁড়িয়ে রইল ঠানদি বেশ কিছুক্ষণ। তারপর সেই বাজপড়া নেড়া নিমগাছের গোড়ায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগল বারবার।

পেল খুঁজে অবশেষে।

পাশাপাশি খোদাই-করা দুটি নাম। 'শশিকান্ত' আর 'মেনকা'।

সেই খোদাই-করা নাম দুটির উপর হাত রেখে ঠানদি নীরবে বসে রইল মাথা নীচু করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠানদির জীর্ণ বুকের মধ্যে শোনা যেতে লাগল দূরাগত রথের ঘর্ঘর!

আসছে, আসছে, অতীত ফিরে আসছে। অতীত ফিরে আসছে আবার। বিস্মৃতির জমাট কুয়াশার ভিতর থেকে অতীত হেঁটে আসছে গুটিগুটি। কুয়াশা ভেদ করে আসতে কষ্ট হচ্ছে তার। ক্লান্ত মন্থর তার গতি।

শীতের সকাল। চারিদিক কুয়াশায় ছাওয়া। ষ্টিমারের ভোঁ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না তার মোটেই। শুধু ভোঁ-এর শব্দে আর পাড়ের মাটিতে জলের ঢেউ এসে লাগার শব্দে আন্দাজ করা যাচ্ছে কোন্‌মুখো চলেছে সে।

মেনকা চুপচাপ বসেছিল তার দোকানটিতে। শোভানবাবুর বুড়ো সরকার মশাইয়ের দয়ায় মেনকা যখন গঙ্গার ধারের এই দোকানটি সুরু করেছিল, তখনও সে ঠানদি হয়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু খুড়ি জ্যেঠাই পিসি মাসিদের কোঠায় পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বের চৌকাঠে। যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বের এই চৌকাঠে এসে পৌঁছবার মাঝখানের দীর্ঘ পথে যা ছিল তা মিশিয়ে আছে দমদমার বাগানবাড়ি, চিৎপুরের থিয়েটার, সার্কাসের তাঁবু, আর শোভানবাবুর মজলিসখানায়। যারা ছিল, তারা জট পাকিয়ে গেছে আবদুল, ভুতি গায়েন, ত্রিলোকী সিং, ভিক্টর কেশবম্‌, শোভানবাবু এবং আরো অনেকের ভিড়ের মধ্যে।

দোকান পেতে এখানে বসল যখন মেনকা, তখন এখানকার সবাই বলত মাসি, বলত মাসির দোকান। সেই মাসির দোকান ঠানদির দোকান হয়ে ওঠার মধ্যে গঙ্গার ধারের এই অঞ্চলটা কত ওলোট-পালোটই না হয়ে গেল।

তা' সেই ঠানদির দোকানের ঠানদি হয়ে শীতের সকালে গুড়িসুড়ি হয়ে বসে আছে মেনকা, এমন সময় কুয়াশার মধ্যে থেকে ক্লান্ত পায়ে গুটিগুটি এগিয়ে এল একজন। এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল ঠানদির দোকান থেকে অনেকটা দূরে।

এক মুখ পাকা দাড়ি-গোঁফ, ছেঁড়া একটা নোংরা চট জড়ানো গায়ে, বুনো বুনো ঘোলা ঘোলা চোখ, গায়ের চামড়ায় সাতপুরু ময়লা, ফেটে ছাল উঠে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাওয়া একজোড়া খালি পা।

অতকাল পরেও চিনতে মেনকার একটুও দেরী হল না।—শশিকান্ত।

মেনকা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিল ফেরায়।

মিনিট দশেক পর মেনকা ঝাঁপের পাল্লা একটুকু ফাঁক করে চোখ রেখে দেখল, শশিকান্ত চুপচাপ গিয়ে বসেছে গঙ্গার কিনারের নিমগাছটার তলায়।

সেখান থেকে আর ওঠে না।—একদিন দু'দিন তিনদিন কেটে গেল, মানুষটা সেই নোংরা চট চাপা দিয়ে ঐ গাছতলায় শুয়ে বসে থাকে। না কাড়ে রা, না যায় কোনো চুলোয়।

বাধ্য হয়েই মেনকা শেষকালে চার-দিনের দিন খানিকটা ভাত ঢেলে দিয়ে এল সেই হতভাগাটার চটা-ওঠা কলাইয়ের গামলায়। নৈলে মানুষটা কি শেষকালে না খেয়ে মরবে নাকি এখানে?

কোথা থেকে এল হতভাগাটা, কোথা থেকে মেনকাকে খুঁজে বের করল, কি বৃত্তান্ত,—কিছুই তাকে শুধাল না ঠানদি। রোজ শুধু মুখ ঘুরিয়ে দুবেলা ভাত ঢেলে দিয়ে আসতে লাগল, আর সেও তাই খেয়ে চুপচাপ পড়ে রইল ঐ গাছতলায়।

তারপর একটা ছুতোর জলে ডুবে মল, মানুষটা সেই যন্ত্রপাতি নিয়ে খেলনা গড়ল, আলমারি গড়ল,···মেনকাকে দিতে চাইল···মেনকা নিল না···মেনকার কলেরা হল···অ্যাম্বুলেন্স এসে নিয়ে গেল হাসপাতালে। চোর এল ঠানদির দোকানে নিশুতি রাতে···মানুষটা চোর আটকাতে গিয়ে মরে গেল ছোরা খেয়ে।

ন্যাড়া নিমগাছের গোড়ায় সেই হতভাগা মানুষটার নিজের হাতে খোদাই করা দুটি নামের ওপর হাত রেখে এতদিন পরে আজ এই শেষরাতে একলা ব'সে ঠানদির কেমন যেন কান্না পেতে লাগল।

এমনি সময় মস্ত এক জওয়ান গলার হাঁক,—বেড়ে আছ ঠানদি, বাঃ! আমি ব্যাটা শ্মশানে খাটিয়া নামিয়ে রেখে খুঁজছি তোমাকে, আর তুমি কি না দোকান-টোকান বন্ধ রেখে এই শেষরাতের ঠাণ্ডায় এইখানে একলাটি ঘাপটি মেরে বসে আছে? বেড়ে লোক তুমি যা হোক;—জল খাব না? পান খাব না?

অতীতের পর্দা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বর্তমান সশরীরে বুক ফুলিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঠানদি মুখ ঘুরিয়ে দেখল, যা ভেবেছে তাই,—সাগর।

সাগরকে সঙ্গে নিয়ে ঠানদি আবার নিজের দোকানমুখো এগিয়ে চলল গুটিগুটি।

[ক্রমশঃ।

বেদনার কথা ও কাহিনী

সুব্রতকুমার পাল

আমাদের দৈনন্দিন জীবন অজস্র বেদনা দিয়ে ভরা। মায়ের গর্ভবেদনার মধ্য দিয়ে আমাদের জন্ম। নানা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক বেদনার ভিতর দিয়ে আমাদের জীবনের পথ-পরিক্রমা। এই বেদনা হতে পারে নিছক মানসিক, হতে পারে শারীরিক কিংবা উভয়ই। বলা বাহুল্য, শারীরিক বেদনাই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

শারীর বৃত্তের দৃষ্টিকোণ থেকে স্পর্শবোধ (Touch), উষ্মাবোধ (Temperature) প্রভৃতির মত বেদনাবোধও একটা বিশিষ্ট বোধ। অবশ্য কোনো কোনো শারীরবিদ মনে করেন যে, স্পর্শ, উষ্মা প্রভৃতি যখন একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে, তখনই বেদনার উদ্রেক হয়। অর্থাৎ বেদনা কোনো বিশেষ বা স্বতন্ত্র বোধ নয়, উষ্মা এবং স্পর্শবোধেরই অতিরঞ্জিত এবং পরিবর্তিত রূপ মাত্র। অধিকাংশ আধুনিক শারীরবিদই এই মতের বিপক্ষে। কারণ, দেখা গেছে, শরীরের কয়েকটি বিশেষ স্থানে স্পর্শ বা উষ্মাবোধ নেই, কিন্তু বেদনাবোধ আছে। অক্ষিগোলকের শ্বেত মণ্ডলে বা কর্ণিয়ায় (Cornea) কোনো স্পর্শ বা উষ্মা সংবেদী স্নায়ুপ্রান্ত নেই। তবু কর্ণিয়ায় সামান্যতম উদ্দীপনও শুধু বেদনা জাগিয়ে দেয়। পুনশ্চ বিশেষ বিশেষ স্নায়বিক ব্যাধিতে বেদনাবোধ অবলুপ্ত হয়, কিন্তু অন্যান্য বোধ অক্ষত থাকে। এই ধরণের রোগে রোগীর শরীরের কোনো 'অবেদনিক' অর্থাৎ বেদনা-বোধহীন অংশে ছুঁচের খোঁচা দিয়ে রোগী বুঝতে পারে যে, খোঁচা দেওয়া হ'ল কিন্তু সে কোনো ব্যথা অনুভব করে না। এই সব তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বেদনাবোধও একটি স্বতন্ত্রবোধ।

এবার বেদনাবোধের মৌলিক চরিত্রগুলি বর্ণনা করবো। পরীক্ষায় দেখা গেছে, সাধারণতঃ যে সব বহিঃস্থ উদ্দীপনায় দেহের কোনও প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা, সেগুলোই বেদনা-সংগ্রাহী স্নায়ুপ্রান্তগুলিকে উদ্দীপিত করে থাকে। এমন কি, দেহের পক্ষে বিরক্তিকর বা অবসাদকর ব্যাপারও বেদনাবোধ উদ্রিক্ত করে। যেমন অত্যধিক উষ্ণতা বা শৈত্য, বিভিন্ন অনিষ্টকর রাসায়নিক পদার্থ, এতদ্ভিন্ন আকস্মিক দুর্ঘটনা-ঘটিত দৈহিক আঘাতের বেদনা তো রয়েছেই। যখন দেহের কোন অংশে কোন বেদনা-উত্তেজক উদ্দীপনা আরোপিত হয়, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানের বেদনা-সংবেদী স্নায়ু প্রান্তগুলি উদ্দীপিত হয় এবং বেদনাবোধক অন্তর্মুখী প্রেরণা স্রোত স্নায়ু-সূত্র বেয়ে অবিরাম বয়ে যেতে থাকে। বেদনাবাহী স্নায়ুসূত্র প্রধানতঃ দ্বিবিধ—সূক্ষ্ম এবং স্থূল। সূক্ষ্ম সূত্র বেয়ে বেদনা, স্রোত অত্যন্ত মন্থর গতিতে কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্রের (Central Nerve System) দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। কিন্তু স্থূল স্নায়ুপথে বেদনা প্রবাহের গতি অতিশয় ক্ষিপ্র।

তীক্ষ্ণতার তারতম্য অনুসারে বেদনাবোধকেও সূক্ষ্ম এবং স্থূল দু ভাগে ভাগ করা চলে। সূক্ষ্ম বেদনাকে মস্তিষ্ক অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে ধারণা করতে পারে কিন্তু স্থূল বেদনা মস্তিষ্কে একটা ধোঁয়াটে বা অনির্দেশ্য রকম বোধ সৃষ্টি করে। সূক্ষ্ম বেদনার যথার্থ ধারণা হয় মস্তিষ্কের উর্দ্ধতর কেন্দ্র সমূহের সক্রিয় সহায়তার ফলে, কিন্তু স্থূল বেদনা মস্তিষ্কের নিম্নস্তরেই সীমিত থাকে। শারীরবৃত্তের (Physiology) ভাষায় সূক্ষ্ম বেদনাকে 'বিলক্ষ্য' (Epicritic) এবং স্থূল বেদনাকে 'অবিলক্ষ্য' (Protopathic) বিশেষণে বিশেষিত করা হয়।

বেদনার শারীরিক ভিত্তিও বিচিত্র। বেদনাবোধ একটি কাল্পনিক অনুভূতিমাত্র নয়, এরজন্য একটি স্বতন্ত্র স্নায়বিক প্রকরণ রয়েছে। ত্বক একটি অতি সংবেদনশীল বেদনাগ্রাহী অঞ্চল। শারীরবিদগণের মতে, স্পর্শকণিকা এবং উষ্মাকণিকার মত ত্বকে ব্যথনবিন্দুও (Pain Spot) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। এই ব্যথাবিন্দুগুলিতেই বেদনার প্রথম অনুভূতি জাগে। এই ব্যথনবিন্দুর ঠিক তলায় থাকে বেদনা-সংবেদী (Pain Sensitive) মুক্ত স্নায়ুপ্রান্ত (Free Nerve Ending); এই স্নায়ুপ্রান্তগুলি প্রকৃত ত্বক (Dermis) এবং অধিত্বকের (Epidermis) বিভিন্ন কোষ-স্তর ভেদ করে বাইরের দিকে উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে। এই মুক্ত নার্ভ-প্রান্তগুলি বেদনাবোধের প্রান্তাঙ্গ (Endorgan) বা বিশেষ গ্রাহক (Receptor)।

বেদনার স্নায়ুপথ অতিশয় জটিল। ত্বগিন্দ্রিয় এবং অন্যান্য নানাসূত্র থেকে বেদনাবোধ স্নায়ুসূত্র বেয়ে সুষুম্না কাণ্ডে (Spinal Cord) পৌঁছয়। অতঃপর সুষুম্নাকাণ্ডে অবস্থিত "স্পাইনো-থ্যালামিক স্নায়ুপথ" (Spinothalamic Tract) ধরে এই অন্তর্মুখী বেদনানুভূতি "থ্যালামাস" (Thalamus) নামক গুরুত্বপূর্ণ ধূসর অঞ্চলে পৌঁছায়। এখানে অবস্থিত বেদনাকেন্দ্রের সাহায্যে স্থূল বেদনার অনুভূতি ঘটে। সূক্ষ্ম বেদনাবোধ থ্যামালাস থেকে আরেকটি নতুন পথ অবলম্বন ক'রে গুরুমস্তিষ্কের বহিঃস্থ ধূসর স্তরে (Cerebral Cortex) অবস্থিত উচ্চতর অনুভূতি-কেন্দ্রে উপনীত হয়।

অতএব মস্তিষ্কের বেদনা-সংগ্রাহী অঞ্চল প্রধানতঃ দুইটি। একটি উচ্চতর কেন্দ্র, যেটা মহামস্তিষ্কের বহিঃস্থ ধূসর স্তর বা কর্টেক্সে (Cortex) অবস্থিত। এখানে বেদনাবোধের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ঘটে থাকে। এই কেন্দ্রের সাহায্যে বেদনার বিশিষ্ট প্রকৃতি, যথাযথ উৎপত্তি স্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। নিম্নতর কেন্দ্রটির নাম থ্যালামাস (Thalamus) এখানে স্থূল বেদনার অবধারণা হয়।

বেদনার বহিঃপ্রকাশ-বৈচিত্র্যও লক্ষ্যণীয়। বহু দৈহিক রোগই বেদনা-সংযুক্ত। বিজ্ঞানী সেলসাসের (Celsus) মতে প্রদাহজাত রোগেই অন্যতম মৌল লক্ষণ 'বেদনা'। রস-সঞ্চয়-জনিত স্ফীতি, ফোঁড়া, ঘা, প্রভৃতিতেও আত্যন্তিক বেদনা দেখা যায়। কারণ এই সব স্ফীতি সংবেদনশীল স্নায়ুপ্রান্তকে উত্তেজিত ক'রে বেদনাবোধ জাগায়। তবে ক্যান্সার জাতীয় দুরারোগ্য ব্যাধিগুলি সুরু হয় বেদনাবিহীন ভাবে। তাই এই সব রোগ প্রারম্ভিক অবস্থায় ধরা পড়ে না। এই সব রোগ যেন চুপিচুপি আসে। বেদনার রীতি ও প্রকৃতি কত বিচিত্র। কখনো তা কন্‌কনে, কখনো টন্‌টনে। কখনো মনে হয় যেন কিছু কামড়ে দিচ্ছে, কখনো মনে হয় কেউ যেন

সূঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। কখনো সে বেদনা একটি সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ আবার কখনো বা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ব্যাপ্ত। কখনো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কখনো তীব্র ও সুপ্রকট, কখনো বা মৃদু অনির্দেশ্য। কোনো ব্যথা মৃদু উত্তাপ বা চাপ পেলে কমে, আবার কোনো ব্যথা তাপ পেলে বাড়ে। পায়ের ডিমে (Calf) এক অদ্ভুত ধরণের বেদনাদায়ক খিঁচুনী রোগ হয়। কিছুক্ষণ হাঁটলে এই রোগে তীব্র বেদনার আবির্ভাব হয়, কিন্তু বিশ্রাম করলে কমে যায়। একে "ইণ্টারমিটেণ্ট ক্লডিকেশন" বলা হয় (Intermitent Claudication); এই ধরণের বেদনা "বার্জারের রোগে"র (Buerger's Disease) অথবা "থ্রম্বো-এনজাইটিস অবলিটারেন্স" (Thrombo-angitis obliterans) রোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বেদনা-তত্ত্বের আরো একটি জটিল অধ্যায় হল অন্যত্র-আরোপিত বেদনা বা রেফার্ডপেন (Referred pain)। অর্থাৎ বেদনার মূল কারণ থাকে একস্থানে কিন্তু বেদনা অনুভূত হয় অন্য এক স্থানে। অথচ উল্লিখিত দুই স্থানের মধ্যবর্তী অংশে কোন বেদনা থাকে না। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ (Appendicitis) রোগে প্রথম ব্যথার সূচনা হয় নাভির চতুষ্পার্শে অথচ অ্যাপেণ্ডিক্স্ (Appendix) থাকে তলপেটের একেবারে ডানদিকে। পিত্ত-স্থলী প্রদাহের (Cholecystitis) বেদনা স্কন্ধপ্রদেশে হামেশাই অনুভূত হয়ে থাকে। আপাত দৃষ্টিতে এই দুই স্থানের মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই কিন্তু শারীর-সংস্থান (Anatomy) অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে গভীর স্নায়বিক যোগাযোগ বিদ্যমান। এই অন্যত্র-আরোপিত বেদনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্নায়ুতত্ত্ববিদ্ বিবিধ তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। কিন্তু কোনো তত্ত্বই সার্বজনীন স্বীকৃতি পায়নি।

ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, পাকস্থলী, লিভার, কিডনি প্রভৃতি আন্তর যন্ত্র স্বভাবতঃ বেদনা-বোধহীন। কিন্তু কোনো ব্যাধিতে যখন এগুলি অতিশয় স্ফীত হয়ে ওঠে অথবা এদের দেয়ালগুলিতে চাপের অত্যধিক বৃদ্ধি বশতঃ স্নায়ু গুলিতে অতিশয় টান পড়তে থাকে, তখন বেদনা-উৎপত্তি ঘটে। এই ধরণের বেদনাকে "আন্তর্যন্ত্রীয়" (Visceral) বেদনা বলা হয়। আন্তর্যন্ত্রীয় বেদনারও অসংখ্য স্নায়ুতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে।

দেহের উপরিতলে যা সাধারণ বেদনা রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অতিশয় গূঢ় হতে পারে। এমনি একটি বেদনা হ'ল শিরোবেদনা। মাথা থাকলেই মাথাব্যথা হয়—' এই ধরণের কথা ব'লে আমরা শিরোবেদনার গুরুত্বকে হামেশাই লঘু করে ফেলি। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, একাধিক দুশ্চিকিৎস্য রোগ শিরোবেদনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তেমনি বুকে ব্যথা'র সঙ্গে রক্ত-সংবহন-তন্ত্র এবং শ্বাসতন্ত্রঘটিত নানা জটিল ব্যাধির নিবিড় সম্পর্ক। পেটে ব্যথার অন্তর্নিহিত কারণও একাধিক।

কবিরা যদিও কোনো কোনো বেদনাকে মধুর বলে বর্ণনা করেন, কিন্তু শারীরবিদের দৃষ্টিতে সমস্ত বেদনাই অস্বস্তিকর। কবি-কথিত "অনির্দেশ্য" বা অকারণ বেদনাও দুর্লভ নয়। অবশ্য বিজ্ঞানীর কাছে এগুলি অকারণ নয়, অজ্ঞাত-কারণ (Idio Pathic)।

যুগে যুগে মানুষ যেমন বেদনা পেয়েছে, তেমনি বেদনা দূরীকরণের উপায়ও চিন্তা ক'রে এসেছে। সুশ্রুতে ও চরক-সংহিতায় শল্য প্রয়োগ কালে বিভিন্ন বেদনাহর (Analgesic) ভেষজের ব্যবস্থা আছে। পুরাণে কথিত আছে, দেবতারা বেদনা-অপনোদনের জন্যে সোমরস পান করতেন। এযুগে মানুষের বেদনা যত বেড়েছে, সেই সঙ্গে বেদনা হননের ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। বেদনা প্রধানতঃ দুই ভাবে দূর করা যায়—(১) বেদনার কারণ দূর করে এবং (২) বেদনা-বোধকে স্তিমিত ক'রে। মস্তিষ্কের বেদনা-গ্রাহী অঞ্চলকে অচেতন করে ফেলতে পারলে বেদনার্ত ব্যক্তি বেদনা থেকে সাময়িক মুক্তি পায়। শল্য প্রয়োগ কালে সংজ্ঞাহারক ভেষজ প্রয়োগ করে রোগীকে সংজ্ঞাহীন করে রাখা হয়। আর যে সব ভেষজ সংজ্ঞালোপ না ঘটিয়েই বেদনাবিনাশ করে, তাদের বলা হয় "বেদনাহর" ঔষধ (Analgesic)। বিভিন্ন ভেষজ বিভিন্ন উপায়ে বেদনা দূর ক'রে। মর্ফিন আফিম প্রভৃতির ক্রিয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এই সব ভেষজ বেদনার স্নায়ুপথে কৃত্রিম অবরোধ সৃষ্টি করে। ফলে বেদনা মস্তিষ্কের সজ্ঞানস্তরে পৌঁছতে পারেনা। সুতরাং দেহে বেদনার অস্তিত্ব থাকলেও আমরা ব্যথা অনুভব করি না। অধিকন্তু, মর্ফিন, আফিম প্রভৃতি (১) বেদনাবাহী স্নায়ুপথকে অবদমিত করে অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতাকে স্তিমিত করে দেয়। (২) কর্টেক্সের অনুভূতি-শীলতা হ্রাস করে। (৩) বেদনা-সংগ্রাহক কেন্দ্রগুলিকে বেদনাবোধের অবমমান (Threshold value) বাড়িয়ে দেয়। (৪) এদের প্রভাবে বেদনা বোধের প্রতি মস্তিষ্কের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া পরিবর্তিত হয়ে যায়। অন্যান্য বেদনাহর ভেষজের মধ্যে অ্যাসপিরিন, ফেনাসিটিন, ফিনাইল, ব্যুটাজোন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহাকাশযাত্রী য়ুরি গ্যাগারিন

মহাকাশচারী য়ুরি গ্যাগারিন অবশেষে ভারতবর্ষে এলেন। আগেই তাঁর আসার কথা ছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছিল।

বিজ্ঞান দিন দিন মানুষকে নতুন করে বিস্মিত করছে। মহাকাশচারণ বিজ্ঞানের নবতম বিস্ময়, সে বিস্ময়ে আজও আমরা বিমূঢ়। সেই সঙ্গে একটি নাম পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ধ্বনিত হচ্ছে—য়ুরি গ্যাগারিন।

ভোর বেলাকার সূর্যের আলো এসে পড়েছে, তবু একটি মানুষ শান্তভাবে নিস্তব্ধ ঘরে ঘুমুচ্ছেন। চিকিৎসক ঘরে এসে বললেন— "এবার উঠে পড়ুন, সময় হয়ে এসেছে।" মহাকাশযাত্রী য়ুরি গ্যাগারিন হাসি হাসি মুখে চোখ মেললেন। সবাই তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত— কেবল তিনি নিজে নন, তিনি তাঁর দৈনন্দিন ব্যায়াম সেরে নিলেন, তারপর তাঁকে মহাকাশযাত্রার বিশেষ ধরণের পোষাক পরানো হল। তার পর বাসে করে সঙ্গীদের সঙ্গে মহাকাশ বন্দরে চললেন।

সেখানে লিফ্‌টে করে অনেক উঁচুতে রকেটের মাথায় উঠলেন— যেখানে মহাকাশচারীর কেবিন। ঢুকবার আগে একবার তিনি ফিরে দাঁড়ালেন—বন্ধু ও সঙ্গীদের দিকে হাত নাড়লেন।···রকেট নক্ষত্রবেগে ছুটে চলল—সঙ্গে সঙ্গে সূচনা হল এক নতুন যুগের।

দিনটি হচ্ছে গত বছরের ১২ এপ্রিল।

য়ুরি গ্যাগারিন মহাকাশে কি দেখলেন? তাঁর ভাষাতেই বলা যাক। দিনের পৃথিবী খুব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল মহাদেশ ও দ্বীপপুঞ্জের তটরেখা, বড় বড় নদী, বিশাল জলাশয়, ভূমির সমোন্নতি রেখা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল।

"উড্ডয়নকালে আমিই প্রথম স্বচক্ষে পৃথিবীর গোলাকার রূপ দেখতে সক্ষম হয়েছি। দিকচক্রবাল থেকে এমনিই দেখায়।

"দিগন্তের ছবিটি ছিল অপূর্ব, পৃথিবীর আলোকোদ্ভাসিত দিক থেকে নিকষ কালো দিকে রূপান্তর এক অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য।··· পৃথিবীর ছায়া থেকে বের হয়ে আসবার সময় দিগন্তকে দেখাচ্ছিল ভিন্ন রকমের তখন দেখা গেল উজ্জ্বল কমলা রঙের একটা বেড়। সে রঙ প্রথমে নীল রঙে তারপর ঘোর কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত হলো।

"আমি চাঁদ দেখতে পাইনি, পৃথিবী থেকে সূর্য যেমন উজ্জ্বল দেখায়, তা থেকে বহুগুণ উজ্জ্বল দেখায় মহাকাশ থেকে। তারা গুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। পৃথিবী থেকে যেমন দেখায়, থেকে ভিন্ন রূপ ছিল মহাকাশের ছবিটি।"

"ভার-শূন্য অবস্থায় আমি পানাহার করেছি। পৃথিবীতে যেমন চলে ঠিক তেমনি চলেছে।

"ভার-শূন্য অবস্থায় আমি কাজও করেছি, লিখেছি, আমার মন্তব্য নোট করেছি। আমার হাতের লেখা একই রকম ছিল। যদিও আমার হাতের কোন ওজন ছিল না, নোট-বইটি আমাকে ধরে রাখতে হ'য়েছে, নইলে ভেসে যেতো। সংবাদ পাঠাবার উদ্দেশ্যে আমি সংবাদ পাঠাবার বিভিন্ন ব্যবস্থা ব্যবহার করেছি।

"আমার দৃঢ় মত, ভারশূন্যতা কোন ক্রমেই মানুষের কর্মদক্ষতা নষ্ট করে না। ভারশূন্য অবস্থা থেকে অতি বর্ধক্ষেত্রে রূপান্তর সহজ ভাবেই ঘটেছে।"

মস্কোর পশ্চিমে পুরানো স্মোলেনস্ক রোডের ওপর গজাৎস্ক শহরের কাছাকাছি এক গ্রামে যৌথ খামারী আলেকসি গ্যাগারিনের পরিবারে ১৯৩৪ সালে যুরি গ্যাগারিনের জন্ম হয়, ছোট বেলায় স্কুলের পড়াশুনা ঐ অঞ্চলে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের ফলে যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু তারপর তিনি আবার স্কুলে ভর্তি হলেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়বার সময় বিমানের মডেল তৈরীর কাজে তাঁর দক্ষতা সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল। ছাত্র হিসেরে তিনি ভাল ছিলেন। তা ছাড়া সাঁতার কাটা, মাছ ধরা, ফুটবল খেলা ইত্যাদি তাঁর খুব প্রিয় ছিল।

১৯৪১ সালে তিনি ফাউণ্ড মোল্ডারের কাজে বিশেষজ্ঞ হবার জন্য একটি বৃত্তি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানকার ছাত্ররা তাঁকে মনিটর নির্বাচিত করল। সেখানেও তিনি শ্রেষ্ঠ ছাত্র, অধ্যবসায়ী ও দক্ষ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি সহজ সরল ভাবে সকলের সঙ্গে মিশতেন। সোভিয়েতের বেশীর ভাগ শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য সন্ধ্যাকালীন বিদ্যালয় আছে, নিয়মিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মতোই সেখানে পড়াশুনা হয়। বৃত্তি বিদ্যালয়ের ক্লাসে ছুটি হয়ে গেলেই তিনি এই রকম একটি স্কুলে ছুটতেন। একসঙ্গে দুটি বিদ্যালয় থেকেই তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করলেন। তারপর তিনি চাকরী না নিয়ে ঢালাইয়ের কাজে আরও জ্ঞানলাভের জন্য সারাতোফ বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরী বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন।

সেই সময়ে সারাতোফ বিমান ক্লাবে তিনি ভর্তি হলেন। আর এতেই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল। কারিগরী বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা পেয়েও তিনি ওদিকে আর গেলেন না। তাঁর মন জুড়ে রয়েছে অন্য বিষয়ে—আকাশ ও উড্ডয়ন। কারিগরী বিদ্যালয় থেকে পাস করতে না করতেই তাই ওরেনবুর্গ বিমান-বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। বিমান-বিদ্যা ছাড়াও তিনি গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যায়ও ভাল ভাবে শিক্ষালাভ করেন।···আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে উপগ্রহ মহাকাশ-যানের যাত্রী হলেন য়ুরি গ্যাগারিণ। মহাকাশচারী গ্যাগারিণ এখানেই থেমে থাকতে চান না, তিনি শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহে যেতে চান। তাঁর সমস্ত জীবন, সমস্ত কাজ, সমস্ত চিন্তা-ভাবনা নিয়োজিত করতে চান মহাকাশ বিজয়ের নব্য বিজ্ঞানে, আমরা তাঁর আশা-আকাঙ্খার সাফল্য কামনা করি। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সাগ্রহে অপেক্ষা করছে মহাকাশ বিজয়ের পরবর্তী অধ্যায় কি, তা দেখবার জন্য।

—গোপাল ভট্টাচার্য্য
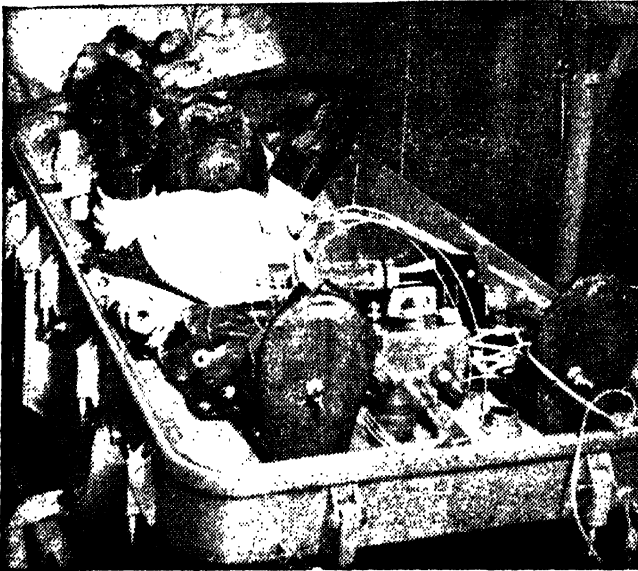
মহাকাশ যাত্রার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট মহাশূন্যযানে একটি শিম্পাঞ্জীকে সরঞ্জামদ্বারা ঠিকভাবে সাজানো-বসানো হচ্ছে। এইটি একটি মার্কিণ উদ্যম। ভাগ্যবান শিম্পাঞ্জীটির নাম হচ্ছে ইনোস।

বনস্পতি আমাদের খাদ্যের পুষ্টিকারিতা বাড়ায়

স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হলে স্নেহপদার্থের একান্ত প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে আমাদের দৈনন্দিন **খাবারে অন্ততঃ ২ আউন্স** পরিমাণ স্নেহপদার্থ **থাকা চাই। কিন্তু আমাদের দেশে আবহমান কাল ধরে প্রচলিত** খাদ্যস্নেহ, যেমন ঘি এবং **কয়েকটি উদ্ভিজ্জ** তেল এত কম পাওয়া যায় যে **একটি** লোক দৈনিক মাত্র আধ আউন্স পরিমাণ **খাদ্যস্নেহ** পেতে পারে।

আমাদের প্রচলিত স্নেহপদার্থগুলি পাওয়া যায় **অল্প**, তার ওপর এগুলোর দামও বেশী। **ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ** লোককে এমন খাবার খেয়ে **জীবনধারণ** করতে হয় যাতে যথেষ্ট স্নেহপদার্থ **থাকে** না, যা খেয়ে জীবনীশক্তির অবনতি ঘটে।

স্নেহপদার্থের যোগান কেমন করে বাড়ানো সম্ভব? এর একমাত্র উপায় চিনাবাদামের উৎপাদন বাড়ানো, এতে প্রতি একর জমি থেকে সর্বাধিক পরিমাণ তেল পাওয়া যায়; এছাড়া আমাদের অপর্যাপ্ত তুলাবীজ থেকেও তেল বার করতে হবে। তারপর হাইড্রোজেনেশন প্রক্রিয়ায় জমিয়ে এসব তেলকে খাদ্যোপযোগী স্নেহপদার্থ **বনস্পতিতে** পরিণত **করতে হবে।** ফলে, আমাদের সীমিত আবাদী জমি থেকে আরও বেশী খাদ্যস্নেহ পাবার সহায়তা হবে।

বিশ্বব্যাপী বনস্পতির ব্যবহার

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি **অগ্রসর দেশেই দেখা যায় যে প্রচলিত খাদ্যস্নেহ** দেশের প্রয়োজনের তুলনায় **ক্রমেই কম পড়ে যাচ্ছে।** তাই হাইড্রোজেনেশন **প্রক্রিয়ায় খাবার তেলকে** জমিয়ে প্রচুর বনস্পতি তৈরী করা হয় আর তাই দিয়ে এই ঘাটতি পূরণ করা হয়—বিভিন্ন দেশে এই জমাট স্নেহ শর্টনিং, **ভেজিটেবল ঘি** ও মার্গারিন প্রভৃতি নামে পরিচিত।

স্বাস্থ্য ও জীবনমানের দিক থেকে উন্নত **অধিকাংশ** দেশের লোকই কিভাবে বনস্পতি-**জাতীয় এবং** চিরপ্রচলিত স্নেহ ব্যবহার ক'রে **তাদের খাদ্যে স্নেহ-প্রাচুর্য বজায় রাখে নিম্নের তালিকাটি থেকে তা বোঝা যাবে:**

১৯৫৯ সালে মাথাপিছু খাদ্যস্নেহ ব্যবহারের পরিমাণ (পাউণ্ডে)

দেশ	প্রচলিত স্নেহপদার্থ (মাখন, ঘি ইত্যাদি)	বনস্পতিজাতীয় স্নেহপদার্থ (শর্টনিং, মার্গারিণ ইত্যাদি)	মোট
কানাডা	১৮.১	৮.৭	২৬.৮
ডেনমার্ক*	২৩ ৬	৪১.৪	৬৫.০
ফিনল্যাণ্ড	৩২.৪	১৪.৬	৪৭.০
ফ্রান্স	২২.৫	৫.৩	২৭.৮
ভারত	৯.৮	১.৭	১১.৫
নেদারল্যাণ্ডস্*	৯.০	৪৪.৮	৫৩.৮
নরওয়ে	৮ ৪	৫৩.১	৬১.৫
ইংল্যাণ্ড*	১৮.৫	১৯.৯	৩৮ ৪
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র*	৮.০	২০.৬	২৮.৬
পশ্চিম জার্মানী*	১৭.২	২৭.১	৪৪.৩

তারকাচিহ্নিত (*) দেশগুলিতে অপর্যাপ্ত মাখন হয়, কিন্তু সে সব দেশেও মাখনের চেয়ে বনস্পতিজাতীয় জমানো স্নেহপদার্থই বেশী খাওয়া হয়। অন্যান্য দেশের জমাট স্নেহপদার্থ ব্যবহারকারীদের ন্যায় ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীও বনস্পতির ওপর নির্ভর করেন, যাতে এই বিশুদ্ধ, পুষ্টিকর ও কমদামী খাদ্য-স্নেহ তাঁদের খাবার আরও পুষ্টিকর ক'রে তোলে।

বনস্পতিজাতীয় স্নেহপদার্থ পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহার করা হয়

আলবেনিয়া, আলজিরিয়া, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলেশিয়া, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ব্রেজিল, ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকা, বুলগেরিয়া, ব্রহ্মদেশ, কানাডা, মধ্য আফ্রিকান ফেডারেশন, ডেনমার্ক, চেকোস্লোভাকিয়া, ইথিওপিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, গ্রীস, হাঙ্গেরি, ভারত, ইরান, ইরাক, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইস্রায়েল, ইটালি, জাপান, লিবিয়া, মালয়, মেক্সিকো, মরক্কো, নেদারল্যাণ্ডস্, নাইজিরিয়া, নরওয়ে, পাকিস্তান, পোল্যাণ্ড, পর্তুগাল, রুমানিয়া, সৌদী আরব, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, সোভিয়েট রাশিয়া, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ইয়েমেন, যুগোস্লাভিয়া।

PWT/VMA-2909

বিস্তারিত বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় লিখুন: **দি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া**
ইণ্ডিয়া হাউস, কোর্ট ষ্ট্রীট, বোম্বাই

সিন্ধু যূথীর মালা

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

ষোল

রবিবার। বিকেল হয়ে এসেছে প্রায়।

শর্মিষ্ঠা কাশীপুরে এসে পৌছোল।

নিজেই ড্রাইভ করে এসেছে। সংগে বুনো।

রাস্তা খুঁজে পেতে কষ্ট হয়নি খুব। মুদির দোকান আর বাস-ষ্টপেজের নিশানা সহজেই মিলেছে।

তবু খানিকটা ভেতরে ঢুকে পথে ক্রীড়ারত গুটিকয়েক ছেলে দেখে গাড়ী থামাল। নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে তারা অনেকেই তাকে আর বুনোকে নিরীক্ষণ করছে।

একজনকে কাছে ডাকল, "এ রাস্তায় কোন বড় বাগান-বাড়ী আছে?"

—"হ্যাঁ, বেঁটে হরিহরের বাগান-বাড়ী তো? সামনেই মস্ত বড় কাঠের ফটক আছে দেখবেন।"

শর্মিষ্ঠার হাসি পেল। বাগান-বাড়ীর মালিক সম্বন্ধে কোনই ধারণা নেই।···তবু এ পথে বাগান-বাড়ী একটা আছে যখন ভরসা করে এগোনো যেতে পারে। পথের নিশানা তো মিলছে, এই গলিতে কি আর সারি সারি বাগান-বাড়ী থাকবে।

আরও খানিকটা এগোতে কাঠের ফটক নজরে পড়ল ডানহাতি।···বাঁদিকটায় ঝোপঝাড় শুধু, বসতি নেই।

গেটটা টান করে খোলা। শর্মিষ্ঠা গাড়ী নিয়েই ঢুকল। ঢুকেই বাঁদিকটায় ফাঁকা খানিকটা জায়গা, কোন এক কালে হয়তো গাড়ী পার্ক করবার জন্তই রাখা হয়েছিল।

সেখানেই রাখল গাড়ী। নামতেই বুনোও নামল সংগে।

নেমে দাঁড়িয়ে শর্মিষ্ঠা চারপাশটা দেখল ভাল করে।···কিছু দূরে দেখা যাচ্ছে বাড়ীটা, গেট থেকে তার ব্যবধান খুব সামান্ত নয়।···এগিয়ে চলল।···দুপুরের আমেজ ছড়ানো চারপাশে···এদিকে-ওদিকে নানা অচেনা পাখীর ডাক···কেউ কোথাও নেই।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে চওড়া রক, তার কোলে ঘর।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল।···মনুষ্য-অস্তিত্বের কোন নিদর্শন নেই কোনদিকে।

থেমেই যাচ্ছিল প্রায়, হঠাৎ মনে হ'ল ঘরের ভেতরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া ভাল। বাসিন্দা অনুপস্থিত হলেও বসবাসের চিহ্ন থাকবে। পা টিপে টিপে এগোল···সংশয় জড়িত চরণ।

সংশয় নিরসন কয়েক পা এগোতেই। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

তক্তপোশের বিছানায় শুভজিৎ শুয়ে। দরজার দিকেই মাথা, বালিশের ওপর অবিন্যস্ত চুলে ভরা মাথাটাই চোখে পড়ছে বেশী।···নিবিষ্টচিত্তে বই পড়ছে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শর্মিষ্ঠা। হাত বাড়িয়ে দরজার খোলা কাঠের পাল্লায় টোকা দিল তারপর।

এখানে সাড়া দিয়ে ঘরে ঢোকার লোকের একান্তই অভাব নিশ্চয়, শুভজিৎ খেয়ালও করল না।

দ্বিতীয়বারের শব্দটা কানে যেতে তেমনি করে শুয়ে শুয়েই নিস্পৃহভাবে মাথাটা একটু ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল··· ভ্রূযুগল কুঞ্চিত।

নিমেষ মাত্র। পরক্ষণেই সোজা দাঁড়িয়ে পড়েছে বিছানা ছেড়ে বোধ হয় নিজের চোখকেও বিশ্বাস করেনি তখনও··· ভাল করে তাকিয়েছে দ্বারপ্রান্তে।

শর্মিষ্ঠা নীরবে দাঁড়িয়ে।···লক্ষ্য করে দেখলে একটু হাসির আভাস ওষ্ঠপ্রান্তে ধরা পড়বে হয়তো।

শুভজিৎকে কে যেন ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা করে দিল, "আরে, আপনি কোথা থেকে! আসুন, আসুন।"

শর্মিষ্ঠা ঘরে ঢুকল। বুনোও। লেজ নেড়ে আপন মনের খুসীটাকে প্রকাশ করে দিল—অনেকদিন পরে দেখা হ'ল একজন চেনা লোকের সংগে, এমনি ভাব। একটু শিস দিয়ে ডাকার অপেক্ষামাত্র, ঝাঁপিয়ে পড়ল শুভজিতের ঘাড়ে।

শর্মিষ্ঠা দাঁড়িয়ে আছে। খেয়াল হতে বুনোকে ছেড়ে বিব্রত ভাবে এদিক-ওদিক তাকাল শুভজিৎ। ঘরের একটিমাত্র চেয়ারে একগোছা ড্রাই-ক্লিনিং-ফেরৎ কাপড়-জামা রাখা। কাল বাড়ী ফেরার সময় এনেছে, এখনও স্বস্থানে পৌছোয়নি তারা।

সেগুলো তুলে নিয়ে বিছানায় রেখে শর্মিষ্ঠার দিকে তাকাল, "বসুন।"

শর্মিষ্ঠা বসতে নিজে বিছানায় বসে পড়ল।···ধাঁধায় পড়েছে, বিমূঢ়ও কিঞ্চিৎ। হঠাৎ এ আগমনের কারণ বোঝা যাচ্ছে না। ঠিকানা জানল কি করে, সেও আশ্চর্য্য।···দীপংকর একমাত্র বলে থাকতে পারে। তাহলেই বা আসার উদ্দেশ্য কি?

চুপ করে থাকা অনুচিত সে জ্ঞান আছে, "কি ব্যাপার। দীপু পাঠালো?"

মাথা নেড়ে অস্বীকার করল শর্মিষ্ঠা, "উঁহু। তিনি তো বন্ধুর ঠিকানাটাও জানেন না। বন্দা যেটুকু বলতে পারলে, হসপিটালের দরওয়ানজীর চেয়ে কোন অংশেই ভাল নয়!"

বিস্মিত প্রশ্ন করতে গিয়েও শুভজিৎ সামলে নিল। মনে পড়ে গেছে। একদিন কি একটা দরকারী কাগজ ফেলে গিয়ে দারবানকে সংগে নিয়ে এসেছিল তার হাতে দিয়ে যেতে বলে। তাই সে চেনে বাড়ীটা। কিন্তু তার সংগে শর্মিষ্ঠার দেখা হয়ে

থাকতে পারে কি করে এবং কোথায়, জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও কি ভেবে থেমে গেল।

শর্মিষ্ঠা নিজে হতেই বলল, "দেবু চিঠির ওপর চিঠি দিচ্ছে, আপনার ঠিকানা চাই তার। তাই জেনে নিতে এলাম।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল শুভজিৎ···বিচিত্র অনুভূতি!···

—"ঠিকানা···মানে নম্বর তো আমিও জানি না, গেটের পাশে লেখা আছে কিনা লক্ষ্যও করিনি কোনদিন। বোধ হয় নেই···মালী বলতে পারবে নিশ্চয়। আসুক সে।"

—"মালী কে? বেঁটে হরিহর?"

শর্মিষ্ঠার মুখে চাপা হাসি।

তার দিকে তাকিয়ে শুভজিৎও হাসল, "হ্যাঁ সে-ই। আপনি তার নাম জানলেন কি করে? স্থানীয় বিশেষণটা অবধি!"

—"স্থানীয় ছেলেরাই বললে, এ রাস্তায় বাগান-বাড়ী আছে কিনা খোঁজ করাতে। বললে, বেঁটে হরিহরের বাগান-বাড়ী এই রাস্তাতেই।

—"ছেলেগুলো বাগানে ঢুকলেই মালীটা তাড়া করে, তাই ক্ষ্যাপায় ওরা।"

—"শুধু মালী কেন, মালিকও তো। আপনাকে ঘর ভাড়া দিয়েছে যখন?"

শুভজিৎ হাসতে লাগল।

—"হাসছেন যে! জানেন না বে-আইনী কাজের সহায়তা করাও সমান অন্যায়।"

—"জায়গাটা কিন্তু চমৎকার, মনেই থাকে না কলকাতায় আছি। এর জন্যে একটু বে-আইনী কাজ করা চলতে পারে।"

—"কলকাতায় নেই এই ধরণের একটা ভাব আনয়নের সাধনায় লিপ্ত আছেন নাকি আপাততঃ?"

—"না তা নয়। মানে, এখানে থাকলে মনে হয় যেন চেঞ্জে এসেছি।"

প্রসংগটা এমনই, অস্বস্তি লাগছিল শুভজিতের, পরবর্তী প্রশ্নে প্রায় চমকে উঠতে হ'ল।

—"মানসিক স্বাস্থ্য উদ্ধারের ভরসা দিচ্ছে তো জায়গাটা?"

ভাগ্য ভাল, উত্তর দিতে হ'ল না। শর্মিষ্ঠা প্রসংগ পরিবর্তন করে ফেলেছে হঠাৎ, "ঐ বুঝি বেঁটে হরিহর?"

শুভজিৎ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কাকতালীয়বৎ প্রশ্নগুলো এমন দাঁড়াচ্ছে, উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল না মনটা। মুখ বাড়িয়ে দেখল হরিহরই বটে। কিছু দূর দিয়ে যাচ্ছে কোথায় ওদিকে।

—"ডাকব?"

—"বাঃ, ডাকবেন না! আপনি না হয় আর টুকুন কেমন আছে'ও জিগেস করেন না, কিন্তু আমায় তো তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে! সে কালুর কাছে আছে—ভুবনদা বেরিয়েছে!"

শুভজিৎ ব্যস্ত হয়ে হরিহরকে ডাকতে যাচ্ছিল প্রায়, শর্মিষ্ঠার কথায় অপ্রতিভ ভাবে ফিরে দাঁড়াল, "সত্যি, কেমন আছে টুকুন?"

শর্মিষ্ঠার মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি। টুকুনের স্বাস্থ্য সংবাদ দিল।

হরিহর ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

শুভজিৎ স্লিপার পায়ে দিল, "ডেকে আনছি।"

শুনে বিস্ময়ে চোখ টান করল শর্মিষ্ঠা, "সে কি আর এ দিক দিয়ে ফিরবে না নাকি?"

—"হ্যাঁ, তা ফিরবে। আচ্ছা, আসুক তাহলে।" শুভজিৎ ফিরে এসে বিছানায় বসল আবার।

কিছুক্ষণ গেল।

শর্মিষ্ঠা ঘরের চারদিকে চোখ বোলাচ্ছে। মস্ত বড় ঘরখানা, ছোট-খাট একখানা হল বলা চলে। বড় বড় জানালা, লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে কচি সবুজ পাতায় ভরা ডাল ঢুকে এসেছে ভেতরে। ···ঝিরঝিরে বাতাসে ফুলের মৃদু সুগন্ধ।

পরিবেশটা মনোরম সন্দেহ নেই। কিন্তু ভেতরের অবস্থাটা শোচনীয়।··তবু জিনিসপত্র যৎসামান্য, তাই বোধহয় বাসযোগ্য আছে এখনও। কোন জিনিষটা গোছানো নয়। বিছানায় বইপত্র, কলম, রিষ্টওয়াচ, সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই—সব ছত্রাকার হয়ে আছে, এইমাত্র এক গোছা জামা-কাপড়ও স্থান পেল। এক পাশে পালিশহীন টেবিল একটা, সেখানে সাবান, বিস্কুটের টিন, কাচের গেলাসের সংগে তোয়ালে, সার্ট, ট্রাউজার, বর্ষাতির স্তূপ!

শর্মিষ্ঠা দেখছে চেয়ে চেয়ে।

তা লক্ষ্য করে শুভজিৎ হাসল, "কি দেখছেন, ঘর নোংরা! কি কি করব, এখানে ফার্নিচার নেই একেবারে। হরিহর একটা দড়ি টাঙিয়ে দিয়েছিল, তাতে ক্রমশঃ এত জামাকাপড় চাপালাম যে একদিন মাথার ওপর ছিঁড়ে পড়ল। তারপর ঐ টেবিলেই রেখেছি।"

—"এবং টেবিলের জিনিষগুলো ক্রমশঃ বিছানায় এনে জড়ো করছেন। মেঝেটা পরিষ্কারের দায়িত্ব আশা করি আপনার ওপর নেই।"

—"না হরিহরই করে দেয় স্বেচ্ছায়।"

—"তাই একটু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। খাওয়া?"

—"না, সেটা ওর কাছে নয়, হোটেলে। অবশ্য একটা বৃষ্টির দিনে হরিহর আমায় খিচুড়ি রেঁধে খাইয়েছিল।"

—"এখানকার হোটেলে?" ভ্রু শর্মিষ্ঠার অজান্তেই কুঁচকোনো।

—"না, কাছাকাছি নেইও বোধ হয়। কলকাতাতেই যাই।"

—"দুপুরে না হয় বুঝলাম। রাত্রে? সকালে?"

—"রাত্রেরটা ম্যানেজ করে নিতে হয়, একটু তাড়াতাড়ি একেবারে খেয়ে নিয়ে ফিরি আর সকালের জন্যে—চায়ের দোকান অবশ্য একটা আছে, কিন্তু চা'টা অখাদ্য। এখন নিজেই চা করে নিই, আর ঐ যে বিস্কুটের টিন।"

—"আচ্ছা, ডাক্তারদের হাসপাতালের মাইনে কমিয়ে দেবার কোন স্কীম করেছে গভর্ণমেণ্ট?"

শুভজিৎ সিগারেট ধরাচ্ছিল, অভিনব প্রশ্নে বিস্মৃত নেত্রে চাইল।

—"একটা চাকর রাখার পেছনে অর্থনৈতিক কোন বাধা আছে কিনা তাই জানতে চাইছিলাম, অবশ্য কিছু যদি না মনে করেন।"

ইংগিতটা অস্পষ্ট নেই আর। শুভজিৎ হাসল, অপ্রতিভও একটু।

—"দেখুন, বিহারে চাকর আমি অনেকবার রেখেছি, আমার কপালে চাকর টেঁকে না। এক তো থাকলে কোন সুবিধে যে হয় প্রথমে দু'তিন দিনের পর তা আর টের পাই না, তার অস্তিত্বই ভুলে যাই মাঝে মাঝে, তারপর যেদিন সে ফাইন্যালি পালায় সেদিন থেকে কিছুদিন পর্য্যন্ত অনেক জিনিষ খুঁজে পাইনা। তার চেয়ে ঘরে চাবি দিয়ে বেরোলাম, নিশ্চিন্ত—জিনিষপত্র ছড়ানো থাকলেও ক্ষতি নেই।··আর এখানে তো কাউকে চিনি না··হরিহরও রয়েছে—"

শর্মিষ্ঠা অন্যমনস্ক গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ছে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে

পড়ল হঠাৎ, "ওহো! আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে, খেয়াল নেই আমার। হরিহরের পাত্তাই নেই, দাঁড়ান ডেকে আনি।"

রক পার হয়ে নামতে যাবে দেখল হরিহর আসছে, হাতে একখানা দা। যেতে হল না আর, ডাক দিয়ে ফিরে এল।

অতঃপর হরিহরের প্রবেশ, হাতে দা'খানি।

বুনো ঘরের মেঝেয় শুয়ে ছিল নিশ্চিন্তে। হরিহরের আগমনের আভাস পাওয়া মাত্র ধড়মড় করে উঠে পড়তে সে বেচারি সভয়ে পিছু হটল।

পর মুহূর্তে শুভজিৎ ক্ষিপ্রহাতে ধরে ফেলেছে বকলসটা, মাথায় হাত বুলিয়ে কাছে টেনে নিয়েছে।

হরিহর সাহস পেয়ে এবার হেসে বলতে যাচ্ছিল কি, বোধহয় বুনোর আয়তন সম্বন্ধেই মন্তব্য কোন, শর্মিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি পড়তে দরজার কাছেই থমকে দাঁড়াল।

এই দেড়-দু'মাসে শুভজিতের কাছে জনপ্রাণীও আসতে দেখেনি। হাসপাতালের দ্বারবান যেদিন এসেছিল সেদিন ও অনুপস্থিত ছিল। আজ অবশ্য মোটর দেখে অনুমান করেছিল কেউ এসে থাকবেন দাদাবাবুর কাছে, তবে তিনি যে মহিলা হতে পারেন, কল্পনাও করেনি। হাসি সংযত মুহূর্তেই।

শুভজিৎ কি বলবে ভাবছিল।

শর্মিষ্ঠা সহাস্তে হরিহরকে সম্বোধন করেছে ততক্ষণে, "এই যে হরিহরি, এস ভাই। তোমাদের বাড়ী এলাম আর তুমিই বাড়ী নেই—এসে অবধি খুঁজছি। ভাল আছ তো?"

শুভজিৎ সবিস্ময়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

শর্মিষ্ঠা হাসিমুখে চেয়ে আছে হরিহরের দিকে। দৃষ্টিটা আপনা হতেই ঘুরে গিয়ে তার মুখে পড়ল।

···মেঘ কেটে গিয়ে রৌদ্র উঁকি দিয়েছে সেখানে।···

ঘরে ঢুকে চৌ-কাঠের ওপর বসল হরিহর, "আজ্ঞে দিদিমণি, আপনার ছিচরণ আশীর্বাদে ভালই আছি। তা আমার সংবাদ আপনি পেলেন কোথা'কে?"

—"এই তো এঁর কাছেই কত গল্প শুনি তোমার।" বিনা দ্বিধায় শর্মিষ্ঠা শুভজিৎকে দেখিয়ে দিল ইংগিতে।

চোখোচোখি হয়ে যাবার সুযোগ রাখেনি, সমস্ত মনোযোগ হরিহরে নিবদ্ধ।

—"তুমি তো খুব যত্ন কর শুনি—ঘর-টর পরিষ্কার করে দাও, খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াও।"

হরিহর বিগলিত। যৌবন-দৃপ্ত উজ্জ্বল হাসিতে দেবতা ভোলেন, এতো তুচ্ছ মানব সন্তান। তদুপরি এই প্রশংসা-বাণী, এই অন্তরংগ আলাপ!

দা'খানা দেখিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করল শর্মিষ্ঠা, "কাটারি নিয়ে বাগানে গিয়েছিলে, শুধু হাতে ফিরলে যে হরিহর! এত বড় বাগান, সব দায়িত্ব নিয়ে পাহারা দাও, তবু আনাজ-পাতিও কিনে খাও নাকি!"

এমন সমব্যথী হরিহর জীবনে পায়নি, দুঃখের কথা আর শুধাবেন না দিদিমণি! একটি ছাঁচিকুমড়ো ফলেছিল, সেইটি কাটতে গিয়েছিনু। তা থাকতে দিয়েছে!—ইয়েগুলো! এমন ছোটনোকের জায়গা নয়। বল যদি কিছু তবেই তুমি বড় মন্দ—তুমি বেঁটে হরিহর, তুমি টেকো বুড়ো, তুমি চিমড়ে শয়তান।"

মন দিয়ে শুনছিল শর্মিষ্ঠা, মাথা নাড়ল সমবেদনার ভংগীতে। ভ্রূ কুঞ্চিত করে এ ধরণের অভদ্রতার বিরুদ্ধে মন্তব্যও করল।

শুভজিৎ অখণ্ড মনোযোগে বুনোকে আদর করছে। হাসছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, মাথা নীচু।

শর্মিষ্ঠা কিন্তু গম্ভীর, হঠাৎ মনে পড়ে গেল যেন এই ভাবে নতুন প্রসংগের অবতারণা করল, "ভাল কথা হরিহর, এ বাড়ীর ঠিকানাটা তুমি বলতে পারবে? আমার বিশেষ দরকার।"

হরিহরের মুখ দেখে মনে হ'ল ঠিকানাটা জানা তার অবশ্য কর্তব্য। রাস্তার নামটা বলল প্রথমেই সাড়ম্বরে। অবশ্য সেটা শুভজিৎও জানত।···অনেক ভেবে বাড়ীর নম্বরও একটা বলল, বার দুই মাথা নেড়ে নিজেই আবার বদলালো। সংশয়াতীত কণ্ঠে তৃতীয় নম্বরটা ঘোষণা করল অবশেষে।

শর্মিষ্ঠা উঠে পড়ল। সৌজন্য বশে শুভজিৎও উঠল, গাড়ী অবধি পৌঁছে দেবে।

দাদাবাবুর ব্যবহারে আতিথেয়তার অভাব দেখে হরিহর মনঃক্ষুণ্ণ।

নিজেই হাল ধরল শেষে, "সে কি দিদিমণি। চা অবধি না খেয়ে কি যায়?"

শর্মিষ্ঠা সহাস্তে শুভজিতের দিকে তাকাল, "অতিথিপরায়ণতা কাকে বলে দেখুন!" হরিহরকে বলল, "ছোট্ট ভাইঝিকে একা রেখে এসেছি, আজ যাই—অন্যদিন খাব।"

বর্ষণ মুখরিত সন্ধ্যা।

শুভজিৎ ভেবে রেখেছিল কলকাতা থেকে ফিরে স্নান সেরে পুকুর-ঘাটে গিয়ে বসবে, হ'ল না। ঘরে বসেই সময় কাটল।

বৃষ্টি নেমেছে জোরে। জানালাগুলো অবধি বন্ধ করতেই হয়েছে, ঝাপ টায় ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল।

খানিকক্ষণ পড়াশুনার চেষ্টা করেছিল। খোলা বইয়ের পাতায় মন তো নয়ই, চোখ দুটোও আটকে থাকতে চাইছে না।···বিরক্ত হয়ে বই ঠেলে সরিয়ে রেখেছে একপাশে।

টেবিলের স্তূপীকৃত জিনিষের মধ্যে থেকে বাঁশীটা উদ্ধার করে আনল।

সারাদিন কাজের ভীড়ে সময় কেটেছে একরকম। এখন এই নির্জন ঘরে একেবারে একা···বাইরে ঝমঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে··· জগতের সংগে সব সম্পর্ক ছিন্ন।

বাঁশীটা খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে রেখে দিল আবার।···অন্য মনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির একটানা শব্দ শুনল খানিকক্ষণ।···আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

সারাদিনের ক্লান্তিমাখা দেহটা খুসীই হ'ল বিশ্রাম পেয়ে। অন্ধকারের সুযোগে ভাবনাগুলো ঝাঁপিয়ে এল একসংগে। আনাগোনা চলছিলই, প্রকট হয়ে উঠল এবার।···

কাল রাত্রি থেকে মনের মধ্যে ঘুরছে শর্মিষ্ঠার কথা।

···সহস্র ধারায় আবর্তিত হয়েছে চিন্তাস্রোত···সহস্র প্রশ্ন মুখর হয়ে উঠেছে।···

গতকাল শর্মিষ্ঠার আগমন অপ্রত্যাশিত ছিল। প্রাথমিক বিস্ময় কাটতেই বুঝেছে ঠিকানার খোঁজ করাটা অজুহাত মাত্র।

চেম্বার, হাসপাতাল, দীপংকরের বাড়ী—যে কোন ঠিকানায় স্বচ্ছন্দে চিঠি দিতে পারে দেবাশীষ।···সত্যই দেবাশীষ জিজ্ঞাসা করেছে কিনা তাই বা কে জানে! আসল কথা, হঠাৎ কোন রকমে শুভজিতের ঠিকানার সন্ধান পেয়ে থাকবে, তাই এসেছিল খোঁজ নিতে। অবশ্য সন্ধান পেল কি করে, আশ্চর্য বটে দীপংকরের কাছে প্রথম জেনেছে বলে তো মনে হ'ল না। বলছিল, নন্দা-প্রদত্ত সমাচার হাসপাতালের দ্বারবানেরটার চেয়ে ভাল 'নয় কোন অংশেই। অর্থাৎ, মিলিয়ে দেখেছে। তার মানে এই দাঁড়ায়, হাসপাতালের দ্বারবানের কাছে খোঁজ করেছিল ঠিকানা। গিয়েই নিশ্চয়, নাহলে কেউ কাউকে চেনে না, হঠাৎ দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা কোথায়।···দৈবাৎ কোনদিন তার হাসপাতালের সামনে দিয়ে চলে যেতে যেতে হয়তো কিছু মনে হয়ে থাকবে, হয় তো দেবাশীষ সত্যিই ঠিকানা জানতে চেয়েছে—গাড়ী থামিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছে দ্বারবানের কাছে। এখানে আসার ব্যাপারেও ঐ দৈবই বলবান। এখানে আসবে বলেই হয়তো বেরোয়নি, গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়াই মুখ্য ছিল।···কাছাকাছি এসে পড়ে মনে হয়েছে হয়তো শু'নছিল শুভজিৎ এখানেই কোথাও থাকে, অমনি অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই মোড় নিয়েছে।

সবই সম্ভব।···কিছু বাধে না শর্মিষ্ঠার, কিছুতেই এসে যায় না কিছু।

চলে গেল যখন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দুপুর থেকেই মেঘ জমছিল, একটু তাড়াতাড়িই সন্ধ্যা নেমেছিল বোধহয়।

শর্মিষ্ঠা একেবারে একা এসেছিল।···আকাশের অবস্থা চিন্তাপ্রদ দে'।

শুভজিৎ না বলে পারেনি, সাবধানে চালাবেন···ভীষণ মেঘ করেছে বৃষ্টি এল বলে! বি, টি রোডে যা বাস লরির ভীড়—"

—"আর যা বেপরোয়া চালায়—রাত্রে তো' কথাই নেই। তবে রাস্তাটা এখন দ্বিগুণ চওড়া হয়ে গেছে। এই বর্ষায় অবশ্য আবার খারাপও হয়েছে বেশ কয়েক জায়গায়—"

বলে মোটরে ষ্টার্ট দিল।

শুভজিৎ উদ্বিগ্ন বোধ করছিল। এখন বোধ হয় পুরুষের চোখ মেয়েদের ড্রাইভারের আসনে দেখতে অভ্যস্ত হয়নি পুরোপুরি। মুসলধারে বৃষ্টি হলে গাড় হঠাৎ বগড়োয়ই যদি।

লেও ফেলল, "আকাশের যা অবস্থা দেখছি, এক্ষুণি বৃষ্টি আসবে, সংগে যাব?"

শর্মিষ্ঠা হেসেছিল শুনে, "তারপর এই বৃষ্টি বাদল মাথায় করে ফিরবেন? নাকি সৌজন্য বোধে পৌঁছে দিতে আমিই আসব? অভদ্রতা তো ছুটি নিয়েছে।"

গাড়ী গেট পার হয়ে গেছে তারপর।

···শুভজিৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে।···

শর্মিষ্ঠার উদ্দাম প্রকৃতিটাকে কাল আবার তুন করে আবিষ্কার করেছে। ঐ বেপরোয়া ংগী আর উজ্জ্বল হাসি মনটাকে নাড়া য়েছে নতুন করে। ভুলতে পারছে না কিছুতেই।···ঐ কালো চোখের প্রাণ চঞ্চলতা পাগল করেছে তাকে।

বছর কয়েক আগেও শর্মিষ্ঠার সংগে পরিচয় হয়েছিল। আজ মনে করে দেখে তখনও এমনিই ছিল শর্মিষ্ঠা, হয়তো বা আরও একটু চঞ্চল ছিল। অবশ্য কতটুকুই বা দেখেছে, রোগী দেখতে গিয়ে দেখতে পেত তাকে সে ঘরে, এই যা।

নিত্যই দেখেছে তাকে, তবু বিশ্লেষণ করে দেখেনি কোনদিন। চেনবার সুযোগও ছিল না, সে চেষ্টাও করেনি।

মনটা বিক্ষিপ্ত ছিল, বদ্ধমুষ্টিতে কোন কিছুকে আঁকড়ে ধরবার স্পৃহা ছিল না।···নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখতো তাকিয়ে চারদিক, আপন করার তাগিদ ছিল না।···ডাক্তারি করার ফাঁকে একটি প্রাণোচ্ছল মেয়ে চোখে পড়ে থাকে যদি, মনের কোন কোণে কোন ছায়া ফেলে থাকে কোনদিন, শুভজিৎ নিজেও টের পায়নি তা।···হয়তো মনে ছিল কিছুদিন, হয়তো বিহারে থাকতে প্রথম দিকে নির্জন সন্ধ্যায় একা বসে মনেও পড়েছে তার কথা।···স্বাভাবিক নিয়মেই ভাবনাটায় প্রলেপ পড়েছে তারপর।

কলকাতায় এসে নতুন করে যোগাযোগ হওয়াটা আকস্মিক।

কে জানে কোন ছায়া ছিল কিনা মনের কোণে লুকিয়ে! কে জানে প্রথমদিন অমরনাথের ড্রইংরুমে শর্মিষ্ঠাকে ঢুকতে দেখে খুসী হওয়ার পিছনে অপ্রত্যাশিতভাবে পরিচিতের সংগে দেখা হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন কারণ ছিল কিনা!···শুভজিৎ ভেবে দেখেনি।

মিলেছে সবার সংগে, ভাল লেগেছে। ভাল লাগার পিছনে কোন বিশেষ কারণ জন্ম নিচ্ছে কিনা খেয়াল করেনি।

দিন কেটেছে।···তারপর একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করেছে নিজেকে। সবার সংগে বেড়িয়ে ফিরে রাত্রিবেলা মেসের ঘরে একলা বসে বসে সিগারেটের পর সিগারেট টেনেছে যখন, মনের পর্দায় একখানি যৌবন-দীপ্ত মুখ বড় বেশী উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে।···আউটডোরে কোন রোগীর চোখে আলো ফেলে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাবার নির্দেশ দিতে দিতে অকারণেই একটি বিশেষ হাতের চঞ্চল ভংগী মনে পড়ে গেছে।

···অনেকক্ষণ মেডিক্যাল জার্ণাল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে খেয়াল হয়েছে একসময় সম্পূর্ণ মেডিক্যাল জার্ণাল-বহির্ভূত বিষয়ে মনটা বাঁধা পড়ে আছে।···

সে ভাবনার গোপন মাধুর্য্যটুকু হয়তো উপভোগ করেছিল কিছুদিন। বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করে তারপর মুক্ত করতে চেয়েছে নিজেকে।

ভেবেছিল এ ক'মাসে দুর্বলতা নিশ্চয়ই কেটেছে। কার্য্যক্ষেত্রে সন্দেহ হচ্ছে।

কাল শর্মিষ্ঠা এসেছিল, ঘটনাটা আশাতীত।

আজ অবধি সেই চিন্তা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

চেম্বারে সে আজকাল প্রায় একাই কাজ করে। ডাঃ ব্যানার্জী হয়তো নামলেনই না ওপর থেকে, এমনও হয়।

রোগীর ভিড় বাড়ছে ক্রমশঃ, ব্যস্ত থাকতে হয়। চেম্বার আওয়ার্সে নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পায় না।

বেয়ারা-টেয়ারার পরোয়া করে না বিশেষ। টাইম এ্যাপয়েন্ট করে রোগীরা আসেন। পাশাপাশি দুটো ঘরের একটায় চেম্বার, অন্যটা রোগীদের বসবার ঘর। সামনের দরজায় বেয়ারা আছে। অনেক দিনের পুরোনো লোক, একেবারে বুড়ো। ছোট টেবিলের ওপর ছোট পেতলের ট্রেতে ছাপানো শ্লিপ আর পেনসিল নিয়ে বসে থাকে টুলের ওপর। পেসেন্ট এসে সেই শ্লিপে নাম-ধাম লিখে দিয়ে বসবার ঘরে গিয়ে বসে।

বেয়ারা শ্লিপ পৌঁছে দেয় চেম্বারে।

নির্দ্ধারিত নিয়মে শ্লিপ দেখে শুভজিৎ নিজেই ডেকে আনে এক এক করে। যাবার সময় নিজেই দরজা খুলে দেয়।···আজ সারা দিনের ব্যস্ততার মধ্যেও শর্মিষ্ঠার কথা ঘুরেছে মাথায় সারাক্ষণ। একজনকে বিদায় দিয়ে পরবর্তী শ্লিপটা টেনে নেওয়ার ফাঁকে মনে পড়েছে কিছু, রেকর্ড-বুক থেকে পুরোনো কোন পেসেন্টের আগেকার রিপোর্টগুলো খুঁজতে খুঁজতে কালকের কোন কথা ভেবেছে হয়তো বা। কাল গম্ভীর মুখে হরিহরের সংগে অনেক গল্প করে এল শর্মিষ্ঠা—তারই কোনটা মনে করে হাসির আভাস ফুটেছে ওষ্ঠপ্রান্তে।···আপ্যায়নের ঘটায় হরিহর তো গলে জল একেবারে! আর কিছু না জানুক, যে মেয়ে নিজে গাড়ী চালিয়ে আসে তার সম্বন্ধে হরিহরের ধারণা প্রায় স্বর্গীয় স্তরের। আপ্যায়িত হয়ে তাই সৌভাগ্যবান বিবেচনা করেছে নিজেকে।···আজ সকালে বাসনাও ছিল দিদিমণির কথা একটু আলোচনা করে। তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। তাতেই অব্যাহতি পাবে এমন ভরসা না করেই অবশ্য।···সন্ধ্যের মধ্যে হরিহরের মুগ্ধ ভাব কাটবে কি!···

শর্মিষ্ঠার দুষ্টুবুদ্ধিগুলোয় পুরুষালি ভাব আছে একটা, দেবাশীষের প্রভাবটা স্পষ্ট বেশ।···টুকুনের জন্য ব্যস্ত হয়ে চলে গেল···ভুবন বাড়ী নেই, কালুর কাছে রেখে এসেছে—ভাবছিল তাই।···শর্মিষ্ঠার এই মাতৃরূপটি বড় ভাল লাগে শুভজিতের।···শর্মিষ্ঠা চঞ্চল, উদ্দাম, দুঃসাহসী। তারই মাঝে টুকুনের ওপর স্নেহটা তার ভারি মধুর।··· কতদিন বেড়িয়ে ফিরে সবাই হয়তো শর্মিষ্ঠার বাড়ী এসেছে, অথবা শ্যামবাজারে—হয়তো সুষমার কাছেই টুকুনকে রেখে গিয়েছিল শর্মিষ্ঠা—সাড়া পেয়ে অসংলগ্ন পদক্ষেপে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে টুকুন শর্মিষ্ঠার প্রসারিত বাহুর মধ্যে···শর্মিষ্ঠার মুখের তখনকার সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু শুভজিৎ ভুলতে পারে না।

সারাদিনে অনেকবার মনে হয়েছে শর্মিষ্ঠাকে একটা ফোন করা উচিত।···কাল চলে যেতে না যেতে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল, আজ একটা খবর নেওয়া ভদ্রতা।

শেষ অবধি করেনি।···

বৃষ্টি কমেছে বোধ হয় একটু···এখনও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন-ঘন। ···মাথার কাছের জানালাটা খুলে দিয়েছে শুভজিৎ। ঘরখানা বিদ্যুতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে থেকে থেকে।

···উঠে পড়েছে বিছানা ছেড়ে।···অশান্ত মনে বার কয়েক পায়চারি করল সারা ঘরটায়।

মনটা বিচলিত।···ফোন না করা অন্যায় হয়েছে।

···এটুকু মনের জোর থাকা উচিত ছিল অবশ্যই।···

কিছুই ভাবতো না শর্মিষ্ঠা, কখনই ব্যাপারটা বিসদৃশ হ'ত না।···

···বরং ফোন না করাই অশোভন হ'ল।···মেজাজ খারাপ লাগছে!

[ক্রমশঃ।

শ্যামলী রায়

তোমার জীবনে যত রাত
সমস্ত রাত ভরে কী তুমি চেয়েছ—মনে পড়ে?
আমার জীবনে যত ভোর
সব ভোর পিপাসা করেছে জড়ো এনেছে ঝড়ে।

গভীর নীলের মাঝে বিলুপ্ত ঐ অখণ্ড-আকাশ
নিত্য মর্ত্ত্য যন্ত্রণার বুকে
বুক দিয়ে পড়ে থাকে—
এর নাম সংসারের কাজের খাতায় টোকা নেই
প্রয়োজন প্রহার করে, খুঁজি তোমাকেই।

তুমি দূর, এত দূর, আকাশের কোন আলো সেথা
পৌঁছে না। পৌঁছে না বারতা—
আমি মধ্যবিত্ত; ক্ষুধিত বিষণ্ণ চিত্ত,
ভোরের সুষমা ফেলে রাতকেই ডাকি,—
হে মৌনী, হে প্রিয় মোর,
এ কোন ভোরের দিকে চলেছ একাকী।

এক বাদশাহ্‌র সাত বেগম

শিবানী ঘোষ

কোন আরব্যোপন্যাস অথবা রূপকথার কাহিনী লিখতে বসেছি এমন ভ্রান্ত ধারণা যেন কারও মনে না হয় এই রচনার শিরোনামা পাঠ করে। আরব্যোপন্যাস অথবা রূপকথার কাহিনী তো দূরের কথা, কোন কাল্পনিক আখ্যায়িকা রচনার প্রচেষ্টাও বিন্দুমাত্র নেই এর মধ্যে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এক বাদশাহের সাতটি বেগমের যথাযথ কাহিনী এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়। এর মধ্যে কল্পনার কোন স্থান নেই। তবে এ কথাও ঠিক বাদশাহদের কাহিনী ইতিহাসে যত সঠিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে আছে, বেগমদের কা হনী ঠিক ততখানি আবরণ মুক্ত নয়। তাঁদের কাহিনীর মধ্যে আছে অনেক অনুমান, অনেক সন্দেহ। এর প্রধান কারণ সে যুগের বেগম-মহল সাধারণতঃ ছিল পর্দানসীনা। তবু বাদশাহদের সাথে চলাফেরার কাজে কর্মে আভাসে ইংগিতে তাঁদের যেটুকু সঠিক কাহিনী ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে তাই একত্র করেছি এই নিবন্ধে।

যে বাদশাহের সপ্ত-মহিষীর কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ করছি তিনি হলেন মোগল সম্রাট বাবরের পুত্র এবং আকবরের পিতা সম্রাট হুমায়ুন।

হুমায়ুনের প্রথমা মহিষীর নাম বেগা বেগম। অনেক ক্ষেত্রে তিনি হাজী বেগম নামেও পরিচিতা। হুমায়ুন এবং বেগা বেগমের প্রথম সন্তান অল্-অমনের জন্ম হয় বদখাসানে ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে। তবে ঐ শিশুটি শৈশবাবস্থাতেই মারা যায়।

বাবরের মৃত্যুর পর ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেগা বেগম ভারতে আসেন। আগ্রা সহরে ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁর দ্বিতীয় কন্যা-সন্তান আকিকার জন্ম হয়।

শের খাঁর নিকট হুমায়ুন পরাজিত হলে বেগা বেগম তাঁর হাতে বন্দিনী হন। এই ঘটনাটি ঘটে চৌসা সহরে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে। এই সময় বেগা বেগম তাঁর শিশু সন্তান আকিকাকে হারান। বন্দিনী হওয়ার পর শের খাঁ তাঁর অধিনায়ক খাওয়াস খাঁয়ের তত্ত্বাবধানে হুমায়ুন জায়াকে পাঠিয়ে দেন তাঁর স্বামীর কাছে।

বিমাতা হলেও আকবর তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখতেন। বেগা বেগম ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে মক্কায় গমন করেন এবং পরে তিনি হাজী বেগম নাম নিয়ে ফিরে আসেন। দিল্লীতে হুমায়ুনের যে সমাধি মন্দির রয়েছে তা বেগা বেগমই নির্মাণ করেন। হুমায়ুনের এই প্রথমা মহিষীর মৃত্যু হয় ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে।

হুমায়ুনের দ্বিতীয়া মহিষীর নাম মেওয়াজান। ইনি প্রথমে ছিলেন হুমায়ুনের মাতা মাহাম বেগমের দাসী। মেওয়াজান ছিলেন অত্যন্ত রূপবতী। বাবরের মৃত্যুর পর মাহাম বেগম হুমায়ুনকে বলেন মেওয়াজানকে তাঁর কাজে গ্রহণ করতে। হুমায়ুন তাকে বিবাহ করে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করেন। এই সময় বেগা বেগম অন্তঃসত্ত্বা হন। মেওয়াজান বলেন তিনিও গর্ভবতী হয়েছেন। তখন মাহাম বেগম অস্ত্রশস্ত্র এবং সোনা-রূপার দ্রব্যাদি প্রস্তুত রেখে বলেন, যার পুত্র-সন্তান হবে তাকেই তিনি ঐ বস্তুগুলি দান করবেন। ইতিমধ্যে বেগা বেগমের কন্যা-সন্তান আকিকার জন্ম হয়। মাহাম বেগম তখন দৃষ্টি রাখেন মেওয়াজানের প্রতি। এদিকে দশ মাস গেল। এগার মাসও পার হয়ে গেল। তখন মেওয়াজান বললেন,

তাঁর এক মাসীমার বারো মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তাঁরও হয়ত তাই হবে। কাজেই সন্তানের প্রত্যাশায় তাঁরা দিন গুণতে লাগলেন। কিন্তু পরে প্রত্যেকে জানলেন মেওয়াজান ছলনা করছেন। গর্ভবতী হওয়ার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। এঁর আর অন্য কোন কাহিনী ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

হুমায়ুনের তৃতীয়া মহিষী হলেন গুলবার্গ বেগম। তিনি ছিলেন বাবরের খলিফা নিজামুদ্দিনের কন্যা। গুলবার্গ বেগম প্রথমে বিবাহ করেন মীর শাহ হোসেন নামক এক ব্যক্তিকে। কিন্তু ঐ মিলন সুখের হয়নি। তাই তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। এই বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে হুমায়ুন বিবাহ করেন গুলবার্গ বেগমকে। তাঁদের বিবাহ-তারিখটা ঠিক মতো জানা না গেলেও চৌসা অবরোধের কিছু পূর্বেই এটি অনুষ্ঠিত হয়। গুলবার্গ বেগমের কোন সন্তানের সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। খুব সম্ভবতঃ তিনি অপুত্রক ছিলেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তিনি একবার মক্কায় গিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর তাকে দিল্লীতেই সমাহিত করা হয়।

হুমায়ুনের চতুর্থ মহিষীর নাম গুনওয়ার বিবি। এঁদের মিলনে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে একটি কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় বক্সিবানু বেগম। গুনওয়ার বিবির সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আর কোন সংবাদই পাওয়া যায় না ইতিহাসের মধ্যে।

হুমায়ুনের পঞ্চম এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য মহিষী হলেন হামিদাবানু বেগম। হামিদাবানুর নাম উল্লেখযোগ্য এই হিসেবে যে, তিনি হচ্ছেন আকবরের জননী। ঐ সুযোগ্য পুত্রের মাতা হওয়ার জন্য তাঁর কাহিনী কিছুটা বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতায়।

হামিদাবানু বেগমের বিবাহ-কাহিনী কতকটা গল্পকথার মতো। হুমায়ুনের ভগিনী গুলবদন বেগম তা সুন্দরভাবে বর্ণনা করে গেছেন তাঁর 'হুমায়ুন-নামা' পুস্তকে।

শের খাঁর নিকট পরাজিত হয়ে হুমায়ুন ভারত ছেড়ে পলায়ন

করেন আফগানিস্তানে। সেখানে তাঁরা পট-নগরে কিছুদিন অবস্থান করেন। এই অবস্থানের সময় স্থানীয় বাসিন্দারা সম্মানী দিতে আসে সম্রাটকে। এই সময় হামিদাবানুও আসেন তাদের সাথে। মেয়েটির রূপ দেখে হুমায়ুন মুগ্ধ হন। তিনি তাঁর কর্মচারীদের মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন, তিনি মীর বাবা দোস্তের মেয়ে। তখন তিনি হামিদাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করেন। হুমায়ুনের ভ্রাতা হিন্দোল এই প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি জানান। তিনি বলেন, মীর বাবা-দোস্তের সাথে তাঁদের আত্মীয়তা রয়েছে এবং হামিদাবানু তাঁদের বোনের মতো। এ অবস্থায় এই বিবাহ-প্রস্তাব অত্যন্ত অসঙ্গত। হুমায়ুন তাঁর ভ্রাতার এই নির্দেশ মানতে রাজী হন না। তিনি তাঁর বিমাতা দিলদর বেগমকে বলেন মেয়েটিকে ডেকে পাঠানোর জন্য। দিলদর বেগম হামিদাকে ডেকে পাঠালে তিনি আপত্তি জানান। তিনি বলে পাঠান সম্রাটকে সম্মানী তিনি একবার দিয়ে এসেছেন তাই দ্বিতীয় বার যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করছেন না। আসল কথা, হামিদাবানু ইতি-মধ্যেই শুনেছেন হুমায়ুন তাঁকে বিবাহ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তাঁকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে ব্যক্তিগতভাবে আপত্তি ছিল হামিদাবানুর। আপত্তির কারণ, হামিদা যেখানে চৌদ্দ বৎসরের কিশোরী, সেখানে হুমায়ুনের বয়স তেত্রিশ। তা ছাড়া হুমায়ুন ইতিমধ্যেই চারজনের পাণিগ্রহণ করেছেন। কিন্তু আপত্তি থাকলেও হুমায়ুনের বিশেষ পীড়াপীড়িতে তাঁর মাতা দিলদর বেগম আসেন হামিদার কাছে এবং তাঁকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন তাঁর পুত্রকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে। অনেক বাদানুবাদের পর হামিদাবানু রাজী হন হুমায়ুনকে বিবাহ করতে।

১৫৪১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পট-নগরে হুমায়ুন বিবাহ করেন হামিদাবানুকে। বিবাহের পর তাঁরা সিন্ধু প্রদেশে কিছুকাল অবস্থান করেন। তারপর মরুভূমির কষ্টসাধ্য পথে তাঁরা গমন করেন অমরকোটে। ঐ স্থানেই জন্ম হয় আকবরের। হুমায়ুনের এই প্রথম পুত্রের জন্ম-তারিখ হল ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর।

ঐ বৎসরেই ডিসেম্বর মাসে শিশুপুত্র আকবরকে সঙ্গে নিয়ে হামিদাবানু দীর্ঘ দশ-বারো দিনের পথ অতিক্রম করে জান-শিবিরে গমন করেন। ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুনের যখন দ্রুত পলায়নের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন হামিদাবানুও তাঁর সঙ্গিনী হন। শিশুপুত্র আকবরকে রেখেই তাঁদের চলে যেতে হয় পারস্যের পথে। সেখানে শাহ তামাস তাঁদের বিশেষ যত্ন করেন।

১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে সাবজাওয়ার-শিবিরে হামিদাবানুর একটি কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পরে শাহ তামাস তাঁদের পারস্য হতে কান্দাহারে প্রেরণ করেন বিশেষ সৈন্য দিয়ে। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে হামিদাবানুর সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হয় শিশুপুত্র আকবরের।

১৫৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে হামিদাবানু স্বামী পুত্র-সহ যাত্রা করেন তালিকানে। পরে সেখান হতে চলে যান কাবুলে। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন যখন হিন্দুস্থানের পথে যাত্রা করেন তখন হামিদা কাবুলেই থাকেন।

এরপর মৃত্যু ঘটে হুমায়ুনের। চৌদ্দ বৎসরের বালক আকবর হিন্দুস্থানের সম্রাট হলেন। আকবরের দ্বি-বার্ষিক রাজত্বকালে হামিদাবানু এবং রাজপরিবারের অন্যান্য মহিষীরা হিন্দুস্থানে এসে সাক্ষাৎ করেন কিশোর-সম্রাট আকবরের সাথে। হামিদাবানু ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাত্তর বৎসর।

হুমায়ুনের ষষ্ঠ মহিষীর নাম মাহচুচাক বেগম। তাঁদের বিবাহ হয় ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে। তাঁর দুই পুত্রের নাম মহম্মদ হাকিম ও ফারুখফাল। মাহচুচাকের চারিটি কন্যার নাম বখতুন্নিসা, সকিনাবানু, আমিনাবানু ও ফখরুন্নিসা।

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন হিন্দুস্থান যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলে মাহচুচাকের তিন বৎসরের পুত্র মহম্মদ হাকিমকে তিনি কাবুলের শাসনভার দিয়ে যান। অবশ্য তার কর্তৃত্ব দিয়ে যান মুনিম খাঁর ওপর। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে মুনিম খাঁ এই কর্তৃত্বভার দিয়ে যান তাঁর পুত্র ঘানির প্রতি। কিন্তু ঘানির সে-রকম কর্তব্যবোধ অথবা তার আচরণে সে রকম কোমলতা না থাকায় মাহচুচাক বেগম তাকে কাবুল থেকে বিতাড়িত করে পুত্রের কর্তৃত্বভার নিজেই গ্রহণ করেন। অবশ্য কাজের সহায়তার জন্য তিনি তিন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। খুব অল্পদিনের মধ্যেই মাহচুচাক বেগমের নির্দেশে ঐ তিন ব্যক্তির দুজনকে হত্যা করা হয়। বেগম সাহেবার এই আচরণে আকবর এবং রাজপরিবারের অন্যান্য মহিলারা অত্যন্ত বিস্মিত হন। আকবর তখন এই ঘটনাটি আলোচনার জন্য মুনিম খাঁকে পাঠান। জালালাবাদে মাহচুচাক বেগম সাক্ষাৎ করেন মুনিম খাঁর সাথে। সেখানে তিনি মুনিম খাঁকে তর্কে পরাজিত করে ফিরে যান কাবুলে। এরপর বেগম সাহেবা সেই তৃতীয় ব্যক্তিকে হত্যা করে হায়দার কাসিম নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। হায়দার কাসিমের সাথে মাহচুচাকের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তবে তিনি তাঁকে বিবাহ করেছিলেন কিনা সে-সংবাদ অবশ্য সঠিক ভাবে পাওয়া যায় না ইতিহাসের মধ্যে। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে আবুল মালি নামক এক ব্যক্তি মাহচুচাক বেগম এবং হায়দার কাসিমকে হত্যা করে। হুমায়ুনের এই একমাত্র মহিষী যিনি ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

হুমায়ুনের সপ্তম মহিষীর নাম খানিস বেগম। খানিস বেগমের ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৯শে এপ্রিল তারিখে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। ঐ তারিখেই মাহচুচাকের পুত্র মহম্মদ হাকিমও ভূমিষ্ঠ হয়। খানিস বেগমের পুত্রের নাম রাখা হয় ইব্রাহিম। ছেলেটি শৈশবাবস্থাতেই মারা যায়।

চলন্তিকার পথে

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

আভা পাকড়াশী

যত কেদারনাথ কাছে আসছেন। যাত্রীর ভীড় যেন ততই বাড়ছে। জায়গা পাওয়াও মুস্কিল হয়ে পড়ছে। কত লোক রাস্তায় কম্বল মুড়ি দিয়ে সারারাত গুড়ের নাগরির মত বসে বসেই কাটিয়ে দিচ্ছে। মাথার ওপর তাদের একটু আচ্ছাদনও জুটছে না। তুঙ্গনাথ ও ত্রিযুগীনারায়ণের পথে কিছু যাত্রী ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এখন তারাও এসে পড়েছে। পথ যত ওপরে উঠছে, জিনিষপত্রের দাম তত আগুন হচ্ছে। আজই আমরা কেদারনাথের শেষ চটিতে পৌঁছে যাব। সব

যাত্রীরাই উৎফুল্ল। এইবার—এইবার তারা দেখতে পাবে তাদের ধ্যানের দেবতা প্রাণের ঠাকুরকে। চলার পথে মাঝে মাঝে সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ হয়ে পড়লেও আসলে এদের বৈষম্য ঘুচে গেছে। একত্রে থাকতে থাকতে গরীব বড়লোকে আর কোন ভেদাভেদ নেই। এখন সবাই সেই একেশ্বরের উপাসক সকলের বীজমন্ত্রই এক, জয় কেদারনাথজী কি জয়। ঐ কেদারনাথজী কি জয় বলে তারা দম নিচ্ছে, প্রাণান্তকর চড়াই ভাঙতে ভাঙতে। আবার একে অপরকে সম্ভাষণও করছে—জয় কেদারনাথজী কি বলে। যারা দর্শন করে ফিরছে পরম তৃপ্তি নিয়ে, তাদের আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করছে এই যাত্রীরা—কি বল? পারব তো আমরা পৌঁছতে তাঁর কাছে। পাব তো তাঁকে দেখতে? কেমন পথ পাড়ি দিতে পারব তো শেষ পর্য্যন্ত? অভয় দিচ্ছে ফিরতি পথের যাত্রীরা কেন পারবে না? আমরা কি করে পারলাম—যাও ভাই, এগিয়ে যাও, এবার তো পথ শেষ করে এনেছ তোমরা, আর তিনি দূরে নেই। কোন ভয় নেই বল, জয় কেদারনাথজী কি জয়! সমস্বরে সকলে বলে ওঠে 'জয় কেদারনাথজী কি জয়।' এইভাবের আদান প্রদানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সখ্যতা বেড়ে উঠছে। আসছে একের বাক্যের উপর অন্যের বল, ভরসা, বিশ্বাস। বুকে বল পাচ্ছে তারা। জোর কদমে চলেছে এগিয়ে।

এইবার রাস্তায় এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে বরফের চাপ। রোদের তাপও অনেক কম। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে আমার পায়ের অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। খুব ইচ্ছে ছিল বরাবর পায়ে হেঁটে গিয়ে দর্শন করব তাঁকে। সে আশা ভঙ্গ হল। ঘোড়ায় চড়তেই হল শেষ পর্য্যন্ত। বললাম, তাহলে চারটে ঘোড়া নাও, আমিই বা একা একা চড়ি কেন? কিন্তু পাওয়াই গেল না আর। মাত্র একটি ঘোড়া পাওয়া গেল। সেটি সত্যিই ঘোড়া, অশ্বতর নয়। আর ঘোড়াওয়ালার নাম অমর সিং। শক্ত সমর্থ পাহাড়ী যুবা। ও একটু হেসে বলে, একা একা এগিয়ে যাবে, সাবধান কিন্তু। ছেলেদের অলক্ষ্যে চোখ রাঙিয়ে ওকে বলি এই পথেও এই মনের অবস্থা? মন উদার কর। আমার সমস্যা হল ঘোড়ায় চড়ব কি করে? শাড়ী পরে ঘোড়ায় চড়লে অনেকখানি পা বেরিয়ে থাকে। বিশ্রী লাগে আমার। আমার উচিত ছিল এক স্যুট শালোয়ার কামিজ সঙ্গে আনা। এমনি পথে ওর মত উপকারি পোষাক আর নেই। কি আর করি, ওর একটা চুড়িদার পাজামা পরে তার ওপর লালপাড় গরদের শাড়ী পরলাম। কালো শালটা বেশ করে জড়িয়ে নিয়ে একটা উঁচু পাথরের ওপর থেকে পা বাড়িয়ে ঘোড়ায় উঠে পড়লাম। ছেলেরা হৈ হৈ করে উঠলো, মা তোমাকে ঠিক ঝাঁসীর রাণীর মত দেখাচ্ছে মা, শুধু কোমরে তলোয়ারটাই যা নেই। দেখি ওরও চোখে ফুটে উঠেছে সপ্রশংস দৃষ্টি। আমার কিন্তু তখন গর্ব্ব আনন্দ উড়ে গিয়ে মনে জেগেছে ভীষণ ভয়। ঐটুকু সরু রাস্তা দিয়ে টগবগিয়ে চলেছে সাদা রংএর বিশাল দেহ ঘোড়া। মনে হচ্ছে এই বুঝি ঘোড়াসুদ্ধ তলিয়ে গেলাম খাদে। নীচে নামবার সময়ে অমর সিং বলে, সিধা হোকে বৈঠিয়ে

হেফেনজী। আমি চোখ বুজে সোজা হয়ে বসি। আবার চড়াই উঠার সময় ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে মিশে ঝুঁকে থাকতে হয়। ব্যাস এই প্রথম দিনই যা ভয় করেছিল, তারপর আর করেনি। তবে ভয় পেয়ে ঝাঁসীর রাণীর নামে অপবাদ দেবার মত অশোভন কোন কাণ্ড ঘটেনি ঠিকই।

ঘোড়ায় চড়ে রোদের মধ্যে দিয়ে চলেছি তাও বেশ শীত করছে। বরফও পড়ে আসছে। গাছের পাতায় ঝরনার জল জমে আছে চাপচাপ বরফ। এই বরফের ওপর পড়েছে বিদায়ী সূর্য্যের তাম্রাভ রোদ। সূর্য্যদেব তাঁর সূর্য্যকান্ত মণির ছোঁয়ায় যেন সোনা করে দিয়েছেন সব কিছু। বড় বড় দেওদার শ্রেণী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ওপর থেকে দেখলে মনে হয় সারা উপত্যকা জুড়ে ঐ গাছগুলি কেউ সাজিয়ে দিয়েছে। এই অপরূপ শোভায় মন ভরপুর হয়ে ওঠে, মনে পড়ে ওর কথা, বলে, এ পথে একা না চললে এই প্রকৃতির রূপ ঠিক মত অনুভব করা যায় না। সত্যিই তাই, আজ এমনি করে একেবারে একা না এলে আজও আমি এই প্রকৃতির অপূর্ব্ব প্রকাশ থেকে বঞ্চিতই থাকতাম। রোজ থাকে কোনরকমে পথটা শেষ করার তাগিদ। আবার পথের শেষে আছে পেটের তাগিদের জোগাড় দেবার প্রাণান্ত পরিশ্রম। এটা মনে করতেই মনের শোভা আস্বাদন করার শক্তি লোপ পায়। তাছাড়া আমরা কি নিজেকে ভুলতে পারি? কখন চড়াই উঠতে হাঁপ ধরছে, পরক্ষণেই আবার উৎরাইতে নামতে পায়ের ফোস্কায় ভীষণ লাগছে। এই হয়ত তেষ্টা পাচ্ছে, তাহলে আর শোভা দেখব কখন? তবে এই কৃচ্ছ্রসাধনেও একটা অহঙ্কার আছে। শক্ত সমর্থ মেয়ে পুরুষকে যখন ডাণ্ডি চড়ে, মাথার রঙীন ছাতা খুলে বই পড়তে পড়তে যেতে দেখেছি বা কোন ত্রিচসপরা পনিটেল বাঁধা মেয়েকে প্যান্টপরা সঙ্গীর সঙ্গে সমানতালে ঘোড়া ছোটাতে দেখেছি তখন অনুকম্পাই জেগেছে তাদের প্রতি। মনে হয়েছে কেন এরা এসেছে এখানে? এভাবে কি তীর্থ করা হয়? হাঁটুক দেখি আমাদের মত, বুঝবে তখন।

আমার খুব গর্ব ছিল আমি আগাগোড়া হেঁটেই চলেছি আর শেষ পর্য্যন্ত হাঁটব। কিন্তু এটুকু গর্বও আমার থাকল না। সেই দর্পহারী মধুসূদন আমার দর্প চূর্ণ করে দিলেন। কিন্তু পথচলার কষ্ট না থাকায় আজ সত্যিই নিজেকে ভুলে গিয়ে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করলাম তাঁর এই উন্মুক্ত প্রকাশকে। আজ আর আমাকে পেছনের ছুটন্ত ঘোড়াকে পথ দেবার জন্য পাহাড়ের খাঁজে সরে যেতে হল না, আজ আমিও তাদের সহযাত্রিণী। এই জুড়িটি এসেছে হানিমুনে হাইকিং করতে এদের বিসদৃশ বিশ্রম্ভালাপ অনেক যাত্রীরই চোখে পড়েছে। তাদের নাসিকার কুঞ্চন কিন্তু ওরা গ্রাহ্যও করেনি। আজ কিন্তু এদের আমার ভালই লাগছে। মনে হচ্ছে নাইবা থাকল এদের পথ হাঁটার অহঙ্কার, ঐ পথের কষ্টে ওদের উচ্ছল প্রাণশক্তি তো নষ্ট হয়নি?

আজ রাত্রের আশ্রয় জোগাড় করার ভার পড়েছে আমার ওপর। কেন না ঘোড়ায় চড়ে আমি এগিয়ে এসেছি আজ। যাত্রীতে ভরে গেছে রামওয়ারা চটি। কোথাও ঘর পাইনা খুঁজে কি হবে? কালি কম্বলি ওয়ালার ধরমশালাও একেবারে ভরে গেছে। অতিরিক্ত বরফ আর বৃষ্টিতে রাস্তা দু'দিন বন্ধ ছিল তাই এত লোক জমেছে। চটি

বাইরে শনশন্ করে হিম ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ছেলেদের নিয়ে কি শেষ কালে বাইরে এই বরফের প্রান্তরে পড়ে থাকতে হবে নাকি? শেষে অমর সিং একটি দরওয়ানকে নিয়ে এল সঙ্গে করে। সে আমার করুণ কাতর আবেদন শুনে তার নিজের ঘরে শেষ পর্য্যন্ত ঠাঁই দিল আমাদের। ঐ ধরমশালারই দরওয়ান সে। সরু এক ফালি স্যাঁত স্যাঁতে অন্ধকার ঘর তার। ওপর থেকে ঝুর ঝুর করে মাটি ঝরে পড়ছে'—তা হোক তবু তো একটা আশ্রয় জুটলো। বাইরে দাঁড়াবে কার সাধ্য, ঠাণ্ডায় হাত পা জমে যাচ্ছে। পথের ধারে একটা দোকানে ঢুকে চা নিয়ে বসলাম। বৃষ্টি আছে সামনে, কখন ওরা আসবে? এত ভীড়েও নিজেকে এখন যেন বড় নিঃসঙ্গ আর একা মনে হচ্ছে। ভাবনা হচ্ছে ছেলেদের জন্যে। কত কষ্ট হচ্ছে বেচারাদের আর আমি কেমন আরামে বসে আছি। এসে পড়লো ওরা। এই বিপুল যাত্রীতে ভরা চটিতেও আমি ঘরের জোগাড় করেছি জেনে ও খুশী হয়ে বাহবা দেয় আমাকে। পেট ভরে পুরী জিলিপি খেয়ে রাত্রের মত আমরা সেই উপর কুঠুরিতে আশ্রয় নিলাম। দরওয়ান আমাদের ঘর বিছানা দেখে দয়া করে মেঝেতে খান কতক চট বিছিয়ে দিয়েছে। আর দিয়েছে তার কাচ-ভাঙ্গা লণ্ঠনটি। বিছানা পাততে পাততেই সেটি নিভে গেল দপদপ করে। এবার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ছেলেরা একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো। শতছিদ্র দরজার মধ্যে দিয়ে আসছে বাইরের চাঁদনী রাতের আভাস।

তখন রাত একটা হবে। হঠাৎ ওর ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কম্বলটা জড়িয়ে ওর সঙ্গে বাইরে আসতেই মনে হল যেন কোন রূপ কথার রাজ্যে কিম্বা কোন দেবভূমিতে হয়ত এসে পড়েছি। চারি দিকে সে কি অপরূপ অবর্ণনীয় শোভা। পরিষ্কার নীল আকাশে হাসছে পূর্ণিমার নিটোল চন্দ্রমা। চারিদিকের সাদা বরফের স্তূপের ওপর পড়েছে সেই জ্যোৎস্নার আলো। মনে হচ্ছে চর্তুদিকে কেউ রূপো গলিয়ে ঢেলে দিয়েছে। একটি নির্ঝরিণী বরফ গলা জলের ধারা নিয়ে কুল কুল শব্দে বয়ে চলেছে। বরফের টুকরোগুলো জলের মধ্যে হীরের কুচির মত জ্বলছে। চর্তুদিক নিস্তব্ধ, নিথর। এটা যেন প্রকৃতি রাণীর খেলাঘর। ঐ হীরে, মুক্তো, চুণি, পান্না এই সব তাঁর খেলার উপকরণ। গাছের পাতায়, শাখায় বরফ জমে মরকত মণির মত দ্যুতি বিকিরণ করছে। রাত্রি নিশীথিনী তার রূপোলী জরির কাপড়খানি পরে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রকৃতিরাণীর এই খেলায় বিভোর। তার মাঝে আমরা দু জন অতর্কিতে হঠাৎই এসে পড়েছি যেন। এই নীরব রাত্রের মায়াময় রূপ জীবনে ভুলব না।

সকালে অমর সিং ঘোড়া নিয়ে হাজির। সমস্ত চটি কোলাহলে ভরে উঠেছে। রাত্রের সেই অপূর্ব্ব শোভা অলীক মায়ার মত কোথায় মিলিয়ে গেছে। ছোট ছেলে গোরা বড় চঞ্চল। এই বিপদসঙ্কুল বরফের পথে কোথায় তলিয়ে যাবে সেই ভয়ে ওকে একটা কাণ্ডিতে চড়িয়ে দিলাম। যদিও তাতে ওর মহা আপত্তি হেঁটেই যাবে সে, তবু কোন লোকের ঘাড়ে চড়বে না। ওটা একজন লোকেই বয়। দেখতে ঝুড়ির মত। এবার বড় ছেলে শঙ্করকে তার বাপীর জিম্মায় সঁপে দিয়ে ঘোড়ায় চড়লাম আমি। কালকের সেই পোষাকই পরেছি। ঐ বরফ গলা ঝরণার জলেই কোন রকমে শুদ্ধ হয়েও নিয়েছি একটু। এখান থেকে কেদারনাথ পুরো পাঁচ মাইল। আর

চড়াই এমন ভাবে উঠেছে—মহাভারতে সেই যে ছবিটা আছে পঞ্চপাণ্ডবের স্বর্গারোহণ। যুধিষ্ঠিরেরা পাঁচ ভাই দ্রৌপদী আর কুকুরকে নিয়ে স্বর্গে উঠছেন—তারপর দ্রৌপদী পড়ে গেলেন যেখানে। অবিকল সেই রকম চড়াই। থাকে থাকে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে ওপরে। এখানের লোকেরা বলে কৈঁচি কি চড়াই।

কি ঠাণ্ডা. আগাপাশতলা মুড়ি দিয়েও ঠক ঠক করে কাঁপছি ঘোড়ার পিঠে। লাগাম ধরা হাত দুটো অবশ হয়ে শিথিল হয়ে আসছে। বার বার সাবধান করছে অমর সিং, বহেনজী শক্ত কর লাগাম ধর। বেশ খানিকটা ওপরে উঠেছি। দোকানের চালে গাছের গায় বরফের পুরু আস্তরণ। ও আর শঙ্কর এসে গেল। গোবার কাণ্ডিওয়ালাও এসে গেছে। এই শেষ দোকান, এরপরই পেরুতে হবে বরফের চড়াই। এখানেও ঘোড়ার পায়ের নীচে রয়েছে বরফের চাঁই। জোর করে চা খাওয়াল ও। বলল, জান ত' পণ্ডিত পরম গুরু, আমি যখন বলছি ওতে কোন দোষ নেই, খেয়ে নাও, না হলে ঠাণ্ডায় জমে যাবে যে। হঠাৎ দূরের বরফে ঢাকা সাদা চূড়োর আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একফালি সূর্য্যরশ্মি। এই নতুন প্রভাতের রবি করোজ্জ্বল হঠাৎই মনে পড়িয়ে দিল রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।' হৃদয়ের গভীর কন্দরে, অন্তরের অন্তস্তলে যেন ঐ কবিতার নিগূঢ় মর্ম্মবাণী উৎসারিত হয়ে উঠলো :

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান
না জানি কেনরে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ
ওরে উথলি উঠেছে বারি
প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

ক্ষণিক বিশ্রাম শেষ হল। আবার যাত্রা হল সুরু।

[ক্রমশঃ।

চৈত্র-মেলা

শ্রীমতী আশালতা দেবী

সিপাহী-বিদ্রোহ চলে ১৮৫৭ সালের মার্চ থেকে ১৮৫৮ সালের জুন পর্য্যন্ত। নভেম্বর মাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা বন্ধ করে দিলেন এবং ভারতের শাসনভার নিজে গ্রহণ করলেন। এই দেশের নরনারীদের শান্ত করবার জন্য তিনি ঘোষণা করলেন, "ইংরেজরা ভারতে আর রাজ্য বাড়াবে না, দেশীয় রাজাদের সঙ্গে যেসব সন্ধি করা আছে, তা মেনে চলা হবে, এদেশের ধর্ম ও সমাজের আচার-ব্যবহারে ইংরেজরা হস্তক্ষেপ করবে না, সরকারের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে সকল যোগ্য ব্যক্তিকেই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে গ্রহণ করা হবে।"

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উক্ত ঘোষণাবাণী প্রচারিত হল ভারতের সর্বত্র। ভারতের শাসন-ব্যবস্থা কোম্পানীর হাত থেকে মহারাণী নিজের হাতে গ্রহণ করার ফলে সারা দেশটা ইংরেজ পার্লামেণ্টের অধীন হল। এর পর একটা শান্তি বা মোহতে জাতি হ'য়ে পড়ে নিদ্রিত। কিন্তু বাঙ্গালীরা মহারাণীর ঘোষণায় নিশ্চিন্ত হতে পারল না।

সারা ভারতে বাঙ্গালীই প্রথম ভাবতে আরম্ভ করে—কোম্পানীই হোক আর পার্লামেণ্টই হোক, সেই বিদেশী শাসক ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা রইল; শাসন ও শোষণ পূর্বের মতই রইল। তাই প্রথমে ইংরেজদের তাড়াতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতবাসীদের ভেতর ইংরেজ-বিরোধী ভাব জাগাতে হবে।

এই জন্যই সর্বপ্রথমে আবশ্যক সমস্ত ভারতীয় নরনারীদের মধ্যে ঐক্যবোধের সৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, সমাজ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প ইত্যাদির উন্নতি। যদি প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য সব সময়ে বিদেশীদের ওপর নির্ভর করতে হয়, তবে দেশের সমস্ত অর্থ চলে যায় বিদেশীদের হাতে, জাতি হয়ে পড়ে দরিদ্র এবং যুদ্ধকালীন সময়ে আমদানী বন্ধ হলে পরনির্ভরশীল জাতিকে বিপদে পড়তে হয়। জাতি দরিদ্র ও অপরের উপর নির্ভরশীল হলে পেটের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা করতে পারে না, স্বজাতি ও স্বদেশের উন্নতির চেষ্টা করবার সুযোগ পায় না।

এই উদ্দেশ্যে এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য বাঙ্গালীরা এক নতুন উপায় সৃষ্টি করল এবং তা হল চৈত্র-মেলা। নবগোপাল মিত্র এবং কবি মনোমোহন বসু ছিলেন এই মেলার প্রাণ। ১৮৬৭ সালের চৈত্র মাসে এই মেলা প্রথম বসে। প্রতি বছরই সভার প্রারম্ভে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত গানটি গাওয়া হ'ত—

"মিলে সব ভারত-সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান,
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান? কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী, শতখনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়, গাও ভারতের জয়।" ইত্যাদি

এই গানটির উদ্দেশ্য ছিল ভারতমাতার অতীত গৌরবের কাহিনীর প্রতি, জন্মভূমির সকল রকম উন্নতির প্রতি ও সমস্ত ভারতবাসীর এক মন এক প্রাণ হওয়ার প্রতি জনগণের মন আকর্ষণ করা।

ভারতকে বৈদেশিক শাসন হতে মুক্ত করা ও ভারতবাসীদের আত্মনির্ভরশীল করা এই মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও, সাহিত্য ও কাব্যই যে ঐক্য, সাম্য ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাণশক্তি যোগায়, চৈত্র-মেলার প্রস্তাবরা এইটি ভাল করে উপলব্ধি করেছিলেন। রাজনৈতিক দলের লোকদের রাশি রাশি বক্তৃতার চেয়ে একটা কবিতা, একটা গানের শক্তি যে অনেক বেশী, চৈত্র-মেলার উদ্যোক্তারা এই ধারণাই পোষণ করতেন এবং এই জন্যই গান ও কবিতার মারফৎ জাতির প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনতে তাঁরা যত্নবান হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৮ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর গেয়েছিলেন—

"দেখ দেখ জননীর দশা একবার,
কৃশজীর্ণ কলেবর অস্থিচর্ম সার—
অধীনতা অজ্ঞানতা রাক্ষস দুর্জ্জয়,
শুষেছে শোণিত তার বিদরি হৃদয়।"

তিনিই আবার পরবর্তীকালে রচনা করেছিলেন ঐক্যের মহাসঙ্গীত—

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন,
আসুক সহস্র বাধা বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।"

চৈত্র-মেলায় বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সাহিত্যের বিভাগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল খুব বেশী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তখন বালক, কিন্তু লেখক ও কবি হিসেবে তিনিও তখন জাতির প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। ভারতের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে পর্য্যন্ত এই চৈত্র-মেলাই রাষ্ট্রীয় চেতনার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও জাতির মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও ঐক্যবোধের সৃষ্টি করত এবং পরবর্তী যুগে চৈত্র-মেলার সঙ্গীত ও কবিতা এই দেশবাসীদের মুক্তি-সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে।

স্বপ্ন

শ্রীলীলা ঘোষ

প্রিয়তম আজ কতদূরে
কহ বন্ধু আজি মোরে।

খুঁজি আমি তোমারে, আলোকে, আঁধারে
পথে প্রান্তরে গিরি গুহা বনে
নদী কলতানে মোর ভ্রম হয় মনে
বুঝি প্রেমগাথা প্রিয় তুমি শুনাইতেছ মোরে।

একদা নিশীথে হেরি স্বপন মাঝারে
তব মুরতিখানি মোর নয়ন সম্মুখে
তুমি কহিতেছ মোরে, প্রিয়া হের গো আমারে
তব প্রিয়তম আজি দাঁড়ায়ে তোমারি দুয়ারে।

অধীর সমীরে আসিয়াছি ভেসে, শুধু ক্ষণিকের তরে,
প্রিয়া তোমারে হেরিতে
মোর চঞ্চল অঞ্চলখানি, পড়িল ধুলায় লুটায়ে
ছুটিয়া গেলাম আমি মোর দু'বাহু বাড়ায়ে
লভিতে তোমারে মোর ক্ষুধিত বক্ষ মাঝারে।

বিজলীরে হেরি নভে ক্ষণিকের তরে
তেমতি মিলাল বন্ধু মোর আঁধারের রথে।
মিলনা সে ধরা মোরে, চলে গেল দূরে, অজানা আলোকে
কোন গিরি ছায়াপথে।

স্বপন ভাঙ্গিল মোর অশ্রু-সলিলে
প্রভাত ডাকিল মোরে, সখী চাহ আঁখি মেলে
তব দুয়ারে দাঁড়ায়ে আমি, হের মোর পানে
সখী ছুটেছিলে রজনীতে আলেয়ার পিছে।

নহে আত্মা মানবের ধন, তারে ডাকিতেছ মিছে
হেরি পথে যায় কুলবধূ জল ভরিবারে
কোমল কক্ষে কলসী লয়ে কাবেরীর কূলে।

কে তুমি আমায় ডাকো

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সতীদেবী মুখোপাধ্যায়

একটু পরে জয়ন্ত উঠে দাঁড়ালো। সুমিত্রা দেবীর কাছে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে ওঠবার সময় সুজাতাকে বললে—একটা অনুরোধ করবো?

—একটা কেন? যতগুলি ইচ্ছে করুন।

জয়ন্ত হেসে বললে—আজ মাত্র একটাই অনুরোধ করবো। বাকীগুলি অন্যদিনের জন্যে তোলা থাক।

সুজাতা হেসে উঠলো, বললে—বাপরে, আপনি দেখছি ভীষণ ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করেন।

রহস্য করে জয়ন্ত বললে—ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করতে পারছি কোথায়? ভবিষ্যৎ ভাবলে আজ এখানে আসাই হোত না আমার। ও কথা থাক, এখন বলুন, ফোন করলে কি বিরক্ত হবেন আপনি?

সুজাতা গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেললে। বললো,—আচ্ছা, আপনি কি কিছুতেই সহজভাবে কথা বলতে পারেন না? আপনি ফোন করলে বিরক্ত হবো, এ কথাই বা মনে হচ্ছে কেন?

জয়ন্ত বললে—ঢালা হুকুম পেয়ে যদি যখন তখন ফোন করি, রাগ করবেন তো?

—সময়ের মাত্রাজ্ঞান থাকলে রাগ না হবারই কথা।

সুজাতার কথা শেষ হতে জয়ন্ত নোট বুকখানা খুলে তার সামনে ধরে বললে—এতে আপনার নম্বরটা লিখে দিন।

—না না, আপনি নিজে লিখে নিন।

মিনতি জানিয়ে জয়ন্ত বললে—Please—

স্থিরচক্ষে একবার তাকিয়ে সুজাতা নোটবুকে নম্বর লিখে জয়ন্তর হাতে ফেরত দিতে জয়ন্ত সেটা পকেটে রেখে বললে—আমার বাড়ী ফেরার ঠিক সময় থাকে না, কাজেই আপনি আমাকে ফোন করবেন না। আমি করবো আপনাকে। সকাল বিকাল যখন হয়। আজ চলি—

পরদিন সুজাতা সমস্ত দিন জয়ন্তর ফোনের প্রতীক্ষায় কাটাল। ফোন এল না। এমনি প্রতীক্ষায় আরও দুদিন চলে গেল।

হাজার হোক সুজাতার বন্ধু যখন, তখন সুজাতারও উচিত একবার খবর নেওয়া তার।

নানা ভাবে নিজেকে বুঝিয়ে তৃতীয় দিনে সুজাতা জয়ন্তকে ফোন করতে বোসলো। ডায়াল করতে ওপাশ থেকে মেঠো গলায় কে বললে,—প্রীতি রেষ্টুরেণ্ট।

শুনেই সুজাতা তাড়াতাড়ি রিসিভার নামিয়ে রাখলে। ভাবলে ব্যস্ত হয়ে ডায়াল করতে গিয়ে ভুল নাম্বার হয়ে গেছে। আবার ধীরে ধীরে ডায়াল করে সেই একই কথা—'প্রীতি রেষ্টুরেণ্ট'।

বিরক্ত হয়ে সে ফোন ত্যাগ করে।

* * * *

এই ক'দিন জয়ন্ত সমানে নিজেকে বোঝাতে চেয়েছে এ বন্ধুত্ব তার প্রাপ্য নয়। এমন ভাবে ভুল পরিচয়ে পরিচিত হওয়া অপরাধ। এক মিথ্যা গোপন করতে ক্রমাগত মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু এই তিন দিনে সে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও সুজাতাকে ভুলতে পারেনি। সব শেষে ভাবলে, আমি তো ওর কোন ক্ষতি করছি না।

যে ক'দিন ওরা কলকাতায় থাকবে, মাত্র সেই ক'দিন তারপর লক্ষ্ণৌ চলে গেলেই সব শেষ। মাত্র স্মৃতিটুকু অক্ষয় হয়ে থাকবে জয়ন্তর—তবে কেন এই ভাবে নিজেকে বঞ্চিত করা।

জয়ন্ত প্রায় লাফিয়ে উঠে ফোন তোলে।

মিতা কোথায় ছিল, দাদাকে ফোনের কাছে দেখে হাসিমুখে কাছে এসে দাঁড়ালো।

দুষ্টু হাসির সঙ্গে বললে—কাকে ফোন কোরছো দাদা?

নম্বর ঘোরাতে ঘোরাতে জয়ন্ত বললে—এক বন্ধুকে।

মিটি মিটি হেসে মিতা বললে—কে বন্ধু দাদা? সেদিনের সেই রং নাম্বার?

জয়ন্ত তাড়া দিয়ে উঠলো—ভারি ফাজিল হয়েছিস। যা পালা এখান থেকে।

মিতার ইচ্ছে ছিল, দাদাকে আরও কিছুক্ষণ জ্বালাতন করবার, কিন্তু মায়ের ডাকে আপাতত সে ইচ্ছা স্থগিত রেখে সে চলে গেল।

ওদিকে সুজাতা ফোন তুলে বললে—হ্যালো কে?

জয়ন্ত বললে বেশ কবিত্বের সঙ্গে—ভীত শিহরিত তনু মন প্রাণ জয় বলছি।

সুজাতা রাগ করতে ভুলে গিয়ে হেসে বললে—একেবারে ভীত শিহরিত! ভয়টা কিসের জন্যে? আমার ভয়ে নাকি?

জয়ন্ত বললে—ভয় আপনাকে নয়। ভয় সেই দিনটিকে। আমাকে তো এখনও আপনার সবটুকু জানা হয়নি। অজানাকে জানার, অসীমকে সসীমে আনার; দূরকে নিকট করার প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। কাজেই···

বাধা দিয়ে সুজাতা বললে—অজানাকে বহুদিন আগে জানা হয়ে গেছে, কাজেই কৈফিয়ৎ খাটলো না। সত্যি কথাটা এবার বলুন তো? ঘটা কোরে—নম্বর নিয়ে ফোন করেন নি কেন? মনে ছিল না নিশ্চয়?

জয়ন্ত কোন চিন্তা না করে বললে—আপনিও তো একবার ফোন করে খবর নিতে পারেন নি।

সুজাতা বেগের সঙ্গে বললে—সে কথা আর হবে না। দুবার ফোন করলুম, দুবারই ভুল নম্বর হোল। প্রীতি রেষ্টুরেন্ট বললে। বলুন তো আপনার নম্বর কত?

জয়ন্ত বললে তাড়াতাড়ি—ফোন নম্বর ঠিক মনে আছে।

সুজাতা প্রশ্ন করে—তা হলে?

জয়ন্ত নিরাশ হয়ে বলে ফেলে—কি কোরে আপনাকে বোঝাই?

সুজাতা বললে—বুদ্ধি কি আমার এতই মোটা যে আপনার কথা বুঝতে পারবো না, এতদিনের পরিচয়ের পর আমাকে এই সার্টিফিকেট দিচ্ছেন?

জয়ন্ত বললে—আপনার বুদ্ধি যদি মোটা হয়, তাহলে আমি বোধ হয় নিরেট পাথর।

সুজাতা হেসে বললে—আপনি সেদিন নিজেই তো বললেন যে, আপনার নিঃখুত মাথাতে বুদ্ধি নামক পদার্থের বড় অভাব।

সুজাতার কথা শুনতে শুনতে জয়ন্তর মন হাল্কা স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো। পুলকিত হয়ে বললে—কথাটা নিঃসন্দেহে সত্যি।

সুজাতা বললে—আমার কিন্তু তাতে সন্দেহ আছে।

জয়ন্ত—কারণ?

সুজাতা—বুদ্ধির যদি এত অভাব তবে আপনার বাবা আপনাকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছেন কেন?

শুনতে শুনতে জয়ন্ত দিশাহারা হয়ে বললে—কিসের দায়িত্ব।

সুজাতা তাড়া দিয়ে উঠলো—আপনার মনটা আজ কোথায় আছে বলুন তো? কোন কথা বললে, বুঝতে পারছেন না। আপনি আমাকে লিখেছিলেন, আপনাদের য়্যালুমিনিয়াম কারখানায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনার ওপর। মনে নেই?

জয়ন্ত সামলে নিয়ে বললে—ওঃ এই কথা? এতে আর এমন কি বুদ্ধির প্রয়োজন?

সুজাতা হেসে বললে—তাই নাকি? আমার ধারণা ছিলো কোন একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকলে, বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয়।

জয়ন্ত বললে—তাই কি? আমার মনে হয় ব্যাকিংয়ের জোর থাকলে কিছুই আটকায় না। যত অপদার্থই হোক না কেন, খুঁটির জোরে সব বাধাবিঘ্ন ডিঙিয়ে বড় বড় পদে অতি সহজে বসা যায়। গুণের বিচার বিদ্যার বিচার আজকাল কে করে?

সুজাতা বললে—অন্য লোকের কথা থাক, এখানে আপনার কথা বলুন।

জয়ন্ত বললে—আমার কথা বোলবো? ভাবনা হয়, বলতে বসলে হয়তো কোন আগল থাকবে না।

সুজাতা কৃত্রিম ভাবনার সুরে বললে—ইস! সত্যিই তো, কি ভীষণ ভাবনার কথা।

জয়ন্ত—বেশী ভাবাটাই দার্শনিকের লক্ষণ।

সুজাতা বললে—ওরে বাবা, একেবারে দার্শনিক!

জয়ন্ত কানে সুজাতার কথা শুনছে, কিন্তু চোখ আছে মিতার হাতে ধরা রিষ্টওয়াচের দিকে।

মিতা আস্তে বললে—অফিস যাবে না?

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে—নাই বা গেলুম আজ।

সুজাতার হঠাৎ কানে এল: নাই বা গেলুম আজ।

রীতিমত অবাক হয়ে সে বললে—কি ব্যাপার! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলছেন নাকি?

জয়ন্ত ব্যস্ত ভাবে বললে—ঘুম! কেন কি হোল?

সুজাতা—তবে এলোমেলো কি বলছেন?

জয়ন্ত বললে—জীবনটাই তো এলোমেলো।

সুজাতা বললে—আপনি দেখছি সত্যিই আজ বেজায় দার্শনিক হয়ে পড়েছেন।

—দার্শনিক কি সাধে হয়েছি। ঠেলা খেয়ে হতে হয়েছে।

সুজাতা সকৌতুহলে প্রশ্ন করলে—কার কাছে ঠেলা খেলেন? শ্রীমতীর কাছে নাকি?

জয়ন্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কৃত্রিম দুঃখের সঙ্গে বললে—অধীনের জীবনে এখনও শ্রীমতীর শুভাগমন হয়নি। ঠেলা অন্যত্র খেয়েছি।

সুজাতা দুঃখ জানিয়ে বললে—আহা! কি কষ্ট! গুরুজনরা আপনার দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করছেন না? তাঁদের তো উচিত এর প্রতিকার করা।

জয়ন্ত বললে—তাঁরা প্রতিকারের যথেষ্ট চেষ্টা করছেন, আমি ঠেলা খাবার ভয়ে ঠেলে রেখেছি।

ক্রমশঃ।

নারীধর্ম সম্বন্ধে প্রাচীন ভাষ্য

রবিদাস সাহা রায়

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, পতির আদেশ পালন করাই পত্নীর একমাত্র ধর্ম। যে গৃহে পতি ও পত্নী পরস্পর পরস্পারের প্রতি অনুকূল থাকেন, কেহ কাহার প্রতিকূলাচরণ না করেন, সে গৃহে ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের বৃদ্ধি হয়।

শকুন্তলা যখন শ্বশুরালয়ে গমন করেন, তখন তাঁর প্রতিপালক পিতা মহর্ষি কণ্ব তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন—শ্বশুর ও শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের সেবা করিও, যদি কদাচিৎ তোমার পতি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে ভর্ৎসনা করেন, তবু তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়ো না। পরিজনের সঙ্গে, দাসদাসীদের সঙ্গে সরল ও উদার ব্যবহার করিও। সৌভাগ্য সমৃদ্ধি হলে কদাচ গর্বিত হবে না। এরূপ উপদেশমত কাজ করলেই প্রশংসনীয়া গৃহিণীর পদ প্রাপ্ত হতে পারবে।

মহর্ষি দক্ষ বলেছেন, পত্নীই গৃহস্থাশ্রমের মূল দেবতা। পত্নী যদি পতির বশবর্তিনী হন, তবে গৃহস্থাশ্রমের মত পরম সুখকর স্থান আর কোথাও নাই। স্ত্রী যদি যথেচ্ছাচারিণী হয়ে পড়ে এবং পতি যদি অতি-স্ত্রৈণতা ও অতি-প্রীতি বশতঃ স্ত্রীকে নিবারণ না করে, তা হলে স্ত্রী উপেক্ষিত রোগের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ অবাধ্য হয়ে মহাক্লেশদায়িনী হয়। যে স্ত্রী সর্বদা পতির অনুকূল আচরণ করেন, যিনি সদা মধুরভাষিণী হন, স্বধর্ম রক্ষায় নিয়ত ব্যাপৃতা থাকেন, এবং পতির প্রতি অকপট ভক্তি প্রদর্শন করেন, তিনি নারী নহেন, তিনি দেবী।

'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' অর্থাৎ স্ত্রী জাতি রত্নবিশেষ বলে অপেক্ষাকৃত নীচ কুল হতেও উহা গ্রহণ করা যেতে পারে। স্ত্রীজাতির উৎকৃষ্টতা ও পবিত্রতা প্রতিপাদন করবার জন্যই শাস্ত্র এরূপ কথা বলেছেন।

হীরক-মুক্তা-মাণিক্যাদি রত্ন যেমন লোকে অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করে, সেইরূপ নারীকেও সুসজ্জিত স্বাস্থ্যকর উৎস স্থানে রাখা উচিত। নারীরা যেস্থানে বাস করে তার নাম অন্তঃপুর অপর নাম শুদ্ধান্ত। সে স্থান শুদ্ধ এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত থাকে বলেই তাকে শুদ্ধান্ত ও অন্তঃপুর বলা হয়।

প্রাচীন মহর্ষিগণ মহিলাদিগকে লজ্জাশীলা হবার জন্য এবং গৃহে থেকে গৃহকার্যে ব্যাপৃতা হবার জন্য অনেক উপদেশ দিয়েছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, গৃহবধূ সর্বদা গৃহের উপকরণ ও গৃহস্থিত বস্তুগুলিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবে। রন্ধনাদি কার্যে সুনিপুণা হবে। সর্বদা হৃষ্টচিত্তে ও হাস্যমুখে দিন যাপন করবে। প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করবে না। প্রতিদিন শ্বশুর ও শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর চরণে প্রণাম করবে ও পতির বশবর্তিনী হয়ে সমস্ত কাজ করবে। যে নারী পতির প্রিয় ও হিতকর কাজে সর্বদা ব্যাপৃতা, সদাচারসম্পন্না এবং জিতেন্দ্রিয়া, তিনি ইহকালে সুযশ ও পরকালে উত্তম গতি লাভ করেন।

মহর্ষি দক্ষ বলেছেন, যে পুরুষের পত্নী অনুকূলা ও বশ্যা, তার ইহলোকেই স্বর্গসুখভোগ হয় এবং যার পত্নী প্রতিকূলা ও অবশ্যা, তার ইহলোকেই নরকভোগ হয়। সুখভোগের নিমিত্তই লোকে গৃহস্থাশ্রমে বাস করে। গৃহস্থাশ্রমে পত্নীই সুখের মূল কারণ। যে পত্নী বিনীতা, স্বামীর চিত্তানুবর্তিনী, সুখশান্তিদায়িনী এবং বশ্যা, তিনিই যথার্থ পত্নী পদবাচ্য হয়ে থাকেন।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, পত্নী কদাপি পতিবাক্য লঙ্ঘন করবে না। পতিবাক্য পালনই পত্নীর পরম ধর্ম, একমাত্র ব্রত এবং একমাত্র দেবার্চনা। পতির সেবা করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। পতির সেবা করলে গঙ্গাস্নান, তীর্থদর্শন, দেবালয়ে গমন ও পুরাণ-পাঠ শ্রবণাদি পুণ্যকার্যের ফললাভ হয়। পতির আজ্ঞা বিনা যে নারী কোন ব্রত ও উপবাস করে, সে নারী পতির আয়ুক্ষয় করে এবং মরণান্তে নরকে গমন করে। পতিব্রতা নারী গৃহে ঘৃত, লবণ, তৈল, তণ্ডুল, ইন্ধন প্রভৃতি বস্তু ফুরিয়ে যাবার পূর্বেই সেই সেই বস্তুর অভাব পতিকে জানাবে। কোন নারী নিজের উত্তম বস্ত্র ও অলঙ্কারের সৌন্দর্য দেখাবার জন্য আমোদ প্রমোদ উপলক্ষে অথবা নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে পরগৃহে গমন করবে না। ভদ্রবংশীয়া নারী লজ্জাজনক অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করবে না।

ব্যাস সংহিতায় লিখিত আছে, নারী উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবে না, কারুর প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করবে না। স্বামীকে অপ্রিয় বাক্য বলবে না, কারুর সহিত বিবাদ করবে না। কারুর সম্মুখে বিলাপ, শোক বা অনুতাপ করবে না। অধিক কথা বলবে না। বিলাপ বা শোক-অনুতাপাদির কারণ উপস্থিত হলে নিজের মনে মনেই করবে। অতি ব্যয়শীলা হবে না, কৃপণাও হবে না। স্বামী কোন ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানে উদ্যত হলে তাতে বাধা দেবে না। প্রমাদ, উন্মাদ, ক্রোধ, খলতা, হিংসা, পরদোষচর্চা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ধূর্ততা, নাস্তিক্য, অতি সাহস এবং চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ করবে। কাকেও বঞ্চনা করবে না। আমার স্বামী, আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা, আমার পিতা অতিশয় রূপবান, গুণবান ও ধনবান এইরূপ বলে কারও নিকট গর্ব প্রকাশ করবে না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, নারী বাল্যকালে পিতার অধীন, বিবাহের পর পতির অধীন এবং বার্ধক্য অবস্থায় পুত্রদের রক্ষণাবেক্ষণে থাকবে।

সেই মতবাদের সমর্থনে মনু বলেন, পিতা, পতি ও পুত্রগণ হতে পৃথক হয়ে স্ত্রীলোক কখনো কোন স্থানে বাস করবে না।

তাদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে বাস করলে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলে নিন্দা হয়।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলে লিখিত আছে, পতিকুলে পতির নিকট দাস্যবৃত্তি করে কষ্টে দিনযাপন করাও ভাল, কিন্তু পতি পরিত্যাগ করে পিতৃকুলে, মাতুলকুলে কিংবা অন্য আত্মীয়কুলে সাম্রাজ্ঞীস্বরূপা হয়েও জীবন নির্বাহ করা পাপানুষ্ঠান বলে গণ্য।

প্রাচীন নীতিশাস্ত্র নারীদের স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে, কিন্তু নারীর শিক্ষাদীক্ষাকে খর্ব করে নাই। সুশিক্ষা লাভ করলে কন্যারা শ্বশুরালয়ে যে কোন প্রকার কষ্টভোগ করেও পতিকে সন্তুষ্ট রেখে পরমানন্দে দিন যাপন করতে পারে, এই ধারণা প্রাচীন কালেও ছিল। ভারতবর্ষের আর্যমহিলাগণ প্রাচীন কালে কিরূপ সুশিক্ষা লাভ করতেন, ইতিহাস, পুরাণ, সংহিতা ও কাব্য নাটকাদি পাঠ করলেই জানা যায়।

যারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, তারা তাদের সনাতন বেদের বিরোধী। তারা আর্যসন্তান বলে অভিমান করে, কিন্তু তারা জানে না যে তাদের অমূল্য বেদের বহু মন্ত্র তাদের দেশের কতিপয় মহিলা কর্তৃক সংকলিত হয়েছে। তাদের সংকলিত মন্ত্র পাঠ করে ও উচ্চৈঃস্বরে গান করে কত শত পুরুষ মহর্ষি ধন্য হয়ে গিয়েছে।

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র হেমাদ্রি গ্রন্থে আছে, যে কুমারী বিদ্যালাভ করে, সেই কুমারীই উভয় কুলের কল্যাণদায়িনী হতে পারে। যখন ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রে কুমারী সুশিক্ষিতা হবে, তখন এক বিদ্বান বরের হস্তে তাকে সম্প্রদান করবে। যে কুমারী পতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হবে তা জানে না, কিরূপে পতির মর্যাদারক্ষা করতে হয় তা শেখেনি, পতিকে কিরূপে সেবা করতে হয় তা পড়ে নি, এমন কন্যাকে তার পিতা কখনো বিবাহ দেবে না।

মহানির্বাণ তন্ত্র বলেছেন, কন্যার লালন পালন করা যেমন পিতার অবশ্য কর্তব্য কর্ম, সেইরূপ অতিশয় যত্নপূর্বক কন্যাকে শিক্ষা দেওয়াও পিতার অত্যন্ত উচিত কার্য।

তাই অতি প্রাচীনকালে ভারতের আর্য মহিলাগণের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও শিক্ষা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। প্রাচীন কালের মহিলাজাতির আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, ধর্মনিষ্ঠা, তপস্যা, দয়া, দান, পরাক্রম ও সমৃদ্ধির পরিচয় বহু প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে। মুসলমানদের ভারত আক্রমণকালেও ভারতীয় মহিলার অসাধারণ বীরত্ব ও সতীত্বের দৃষ্টান্ত সমগ্র জগতকে স্তম্ভিত করেছিল।

নারীর স্বাধীনতা খর্ব করলেও প্রাচীন শাস্ত্র নারীর সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। শাস্ত্রকারগণ বলেছেন, যে কুলে নারী মনের সুখে দিন যাপন করে, সদা আপ্যায়িত থাকে, সেই কুল শীঘ্র সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। যে গৃহে নারী উৎপীড়িত হয়ে দুঃখ পায়, কষ্টে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে, সে বংশের শীঘ্র ধ্বংস হয়। নারীই গৃহের দেবতা। যেমন দেবতাকে পুষ্পচন্দন, মাল্য, ধূপ, বস্ত্র, অলঙ্কার ও নৈবেদ্যদ্বারা পূজা করতে হয়, সেইরূপ উত্তম বস্ত্র, অলঙ্কার, খাদ্য ও গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা দেবতারূপিণী নারীকেও পূজা করতে হয়। ইহা স্ত্রৈণদের কথা নয়, চির ব্রহ্মচারী মহর্ষিগণের কথা।
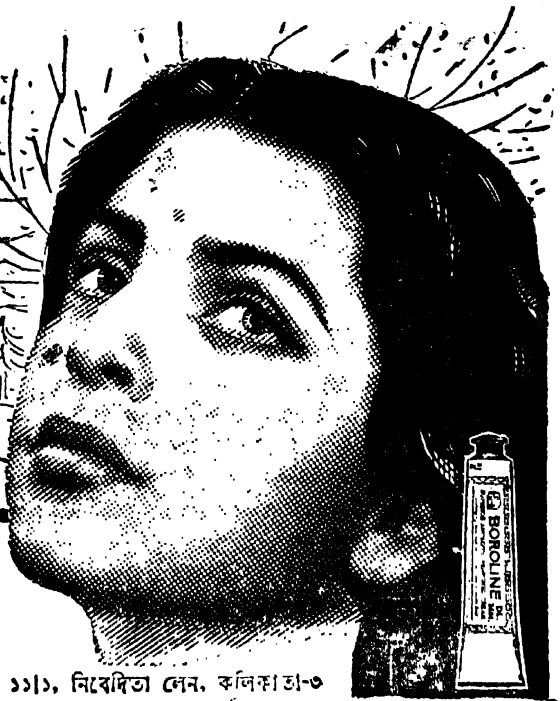
নীহাররঞ্জন গুপ্ত

তিন

॥ গ ॥

সাধারণত হরনাথের গৃহে প্রত্যাগমন করতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যেতো, কিন্তু সেদিন ফিরতে তার একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল।

ঘরের মধ্যে সুলোচনা সুনয়নার সঙ্গে বসে গল্প করছিল। অন্যান্য দিন সুনয়নাই রান্না করতো, আজো সে-ই রান্না করতে চেয়েছিল, কিন্তু সুলোচনা দেয়নি তাকে রন্ধনশালায় ঢুকতে।

নিজেই রান্না করেছিল।

হরনাথ সন্ধ্যার আগেই গৃহে প্রত্যাগমন করে সুনয়না বলেছিল, কিন্তু সেদিন ফিরতে বিলম্ব দেখে কেবল ভাতটা চড়ায়নি, বাকী রান্না সব বাদিও হয়ে গিয়েছিল!

ইচ্ছা ছিল হরনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করলে উনুনে ভাতটা চড়িয়ে দেবে। ভাতের হাঁড়িতে জল দিয়ে উনুনের 'পরে বসিয়ে রেখে সুনয়নার সঙ্গে গল্প করছিল সুলোচনা ঘরের মধ্যে বসে।

ক্ষীরোদা বাইরের দাওয়ায় অন্ধকারে একাকী বসেছিল। ক্ষীরোদার মনটা প্রসন্ন ছিল না। সুলোচনার চোখের দৃষ্টিটা যেন আদৌ তার ভাল লাগেনি।

সুলোচনা অবিশ্যি ক্ষীরোদাকে বিশেষ কোন কথা বলেনি, কেবল বলেছিল, আমি যখন এসে পড়েছি, আজ থেকে আর রাত্রে তোমার এখানে থাকবার দরকার নেই। রাত্রে খাওয়া হয়ে গেলে বাড়ি চলে যেও।

সুলোচনা কথাটা বলে কোন প্রকার জবাবের প্রত্যাশায় দাঁড়ায়নি। এবং কথাটা যে কেবলমাত্র কথা নয়, হুকুম, সেটা তার কণ্ঠস্বর ও বলবার ভঙ্গি থেকেই স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল। ক্ষীরোদাও অবিশ্যি কোন জবাব দেয়নি কথাটার। কিন্তু জবাব না দিলেও রাগে তার যেন পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল। এবং মনে মনে সুলোচনার মুণ্ডুপাত করছিল তখন থেকে।

দিব্যি আসর জাঁকিয়ে বসেছিল সে, কোথা থেকে আবার ঐ আপদ এসে জুটলো। যাই হোক, যাও বললেই সে যাচ্ছে আর কি। কেন, কেন যাবে!

আসুক কর্তাবাবু, সেও জানে তার জোর কোথায় এবং কতখানি।

সদর দরজায় ঐ সময় করাঘাত শোনা গেল, ও হরনাথের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, ক্ষীরো দরজাটা খোল।

ক্ষীরোদা তড়িৎপদে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল।

ফিরতে একটু রাত হ'য়ে গেল রে। একটু তামাক সেজে দে তো তাড়াতাড়ি—আঙিনায় পা দিতে দিতে হরনাথ বলে।

যে আক্রোশে আর অভিমানে এতক্ষণ মনে মনে ফুঁসছিল ক্ষীরোদা সেটা আর চাপা থাকে না। কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেয়ে যায় অকস্মাৎই যেন। বলে, আর আমাকে কেন, তামাক সেজে দেবার তো লোক নিয়েই এসেচো—তাকেই বল তামাক সেজে দিতে।

মানে। তামাক সেজে দেবার লোক এসে গিয়েছে, কি বলছিস কি?

ন্যাকামী আর কেন ঠাকুর!

বলি, কি হলো কি? কি বলছিস মাথামুণ্ডু—

ভিতরে যাও না, ভিতরে গেলেই তো দেখতে পাবে।

আঃ, তবু ঘেনর ঘেনর করে, বলি বলবি তো কথাটা স্পষ্ট করে!

স্পষ্ট করে চোখ মেলে নিজেই ঘরে গিয়ে দেখো না। কথাটা বলে ক্ষীরোদা আর দাঁড়াল না। অন্ধকারে দুপদাপ করে পা ফেলে আঙিনার অন্য প্রান্তে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে উপবিষ্টা সুলোচনার প্রত্যেকটি কথা কানের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করছিল। মেয়ে সুনয়নার সামনে বসে লজ্জায় যেন সে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে থাকে।

সুনয়নাও মাথা নীচু করেছিল। এতক্ষণ ধরে এই ভয়টাই সে করছিল বুঝি। বয়স সুনয়নার এমন কিছু কম নয় যে সে তার বাপ ও দাসী ক্ষীরোদার সম্পর্কটা বুঝতে পারত না। কিন্তু সে সব দেখে এবং শুনেও মুখ ও চোখ বুজে না শোনবার ও না দেখবার ভাণ করতো কিছুটা দুঃখে, কিছুটা অভিমান ও কিছুটা লজ্জায় বাপের 'পরে।

এদিকে হরনাথও ক্ষীরোদার কথাবার্তা ও আচরণে একটু যেন বিস্মিত হয়েই কিছুক্ষণ অন্ধকার আঙিনায় দাঁড়িয়ে থাকে। কে আবার তার গৃহে এলো! আর কেই বা আসতে পারে।

অবশেষে কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই যেন হরনাথ পায়ে পায়ে

কন্যার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে ডাকে, নয়ন—

সুনয়নার সাড়া পাওয়া গেল না—এবং পরমুহূর্তেই হরনাথের সামনে ঘর থেকে বের হয়ে এসে দাঁড়াল গুণ্ঠনবতী সুলোচনা।

কে ?

সুলোচনা কোন সাড়া না দিয়ে এগিয়ে এসে গলায় আঁচল দিয়ে হরনাথের পায়ের সামনে প্রণাম করে।

কে !

উঠে দাঁড়িয়েচে সুলোচনা তখন এবং হাত দিয়ে মাথার গুণ্ঠন একটু পিছনে সরিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল।

ঘরের আলো বারান্দায় বৎসামান্য এসে পড়েছে।

আলো ছায়ার একটা অস্পষ্টতা।

কে ! বিস্ময়ের ঘোরটা যেন কাটেনি এমনি ভাবেই প্রশ্নটা করে হরনাথ পুনর্বার।

আমি।

যতকাল পরেই হোক সুলোচনার কণ্ঠস্বর চিনে নিতে মুহূর্তও দেরি হয় না এবারে বুঝি হরনাথের। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই যেন তার কণ্ঠ থেকে অর্ধোচ্চারিত হয় কথাটা।

সুলোচনা ! তু-তুমি !

হ্যাঁ, আমি।

হঠাৎ যেন বোবা হয়ে যায় হরনাথ। কণ্ঠ হতে তার আর কোন শব্দ উচ্চারিত হয় না। তারপর এক সময় বলে, তু-তুমি কখন এলে ?

আজ বিকেলে—

একা, একা—এলে নাকি ?

না। সরকার মশাই সঙ্গে এসেছেন—

ওঃ তিনি কোথায় ?

বাইরে বের হয়েছেন একটু—

কিন্তু—এ—এ-গৃহে খুঁজে পেলে কি করে ?

খুঁজে পেয়েছি যে দেখতেই তো পাচ্ছো, মৃদু হেসে বলে সুলোচনা, নচেৎ এলাম আর কি করে।

তা বটে—

সুনয়নাকে একা নিয়ে বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলে, কেষ্টনগরে আমাকে একটা খবর পাঠাওনি কেন ?

খবর।

এতকাল যে নিঃসম্পর্কের মতো পরস্পর পরস্পর থেকে দূরে ছিল সে সব যেন কিছুই নয়, সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠেই কথা বলতে থাকে যেন সুলোচনা—হ্যাঁ একটা খবর কাউকে দিয়ে পাঠালেও তো পারতে।

কিন্তু তুমি কি খবর পাঠালে আসতে ?

খবর পাঠিয়ে দেখলেই পারতে, তা ছাড়া—

কি সুলোচনা ?

কেমন করে ভাবতে পারলে, যে তুমি খবর পাঠালে আমি আসবো না !

হরনাথের ইচ্ছা হলো প্রত্যুত্তরে বলে, সে অধিকার থেকে তো তুমিই স্বেচ্ছায় একদিন আমাকে বহু কাল আগেই বঞ্চিত করেছো সুলোচনা।

কিন্তু কোন কথাই বলে না হরনাথ। চুপ করে থাকে।

যাক্ গে—কথা বলবার সময় অনেক আছে। সারা দিনের পর পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছো, জামা কাপড় ছাড়ো, হাত মুখ ধোও, আমি তামাক সেজে এনে দি—ঐ দিকে জল তোলা আছে—সুলোচনা আর দাঁড়াল না। পাশের ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

ঐ সময় সুনয়না ঘর থেকে বের হয়ে এলো, বাবা—

কে। ও নয়ন ?

আপনি তো কোন দিন আমাকে বলেন নি বাবা যে আমার বড় মা, মেজ মা আছে ? বড় মা এসেছেন মেজ মাকেও আপনি নবদ্বীপ থেকে নিয়ে আসুন বাবা।

হ্যাঁ, আনবো, আনতে হবে বৈকি ! সকলকেই আনবো। সকলকেই আনবো—কথাটা কতকটা যেন স্খলিত কণ্ঠে বলে হরনাথ একটু যেন দ্রুতপদেই নিজের শয়ন ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। বস্তুত মেয়ের সামনে যেন সে আর দাঁড়িয়েও থাকতে পারছিল না।

অপরিসীম একটা লজ্জায় যেন সে নিজেকে শুধু মাত্র মেয়ে সুনয়নাই নয় পৃথিবীর সকলের নয়ন থেকেই ঐ মুহূর্তে পালিয়ে আড়াল করতে পারলে বাঁচে।

দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল হরনাথ।

ঘরের মধ্যে ইতিপূর্বেই সুনয়না সেজ বাতিটা জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু বাতির শিখাটা ঈষৎ কমানো ছিল। ঘরের মধ্যে একটা আবছা আলো-আঁধারি বিরাজ করছিল।

কিছুক্ষণ ঘরে প্রবেশ করবার পর ভূতগ্রস্তের মতই যেন স্তব্ধ অনড় দাঁড়িয়ে থাকে হরনাথ। সমস্ত চিন্তা, যুক্তি তর্ক যেন ঐ মুহূর্তে একেবারে ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।

সুলোচনা আবার কোনদিন এ জীবনে স্বেচ্ছায় তার কাছে ফিরে আসবে এ শুধু অসম্ভবই নয়, চিন্তার অতীতও বুঝি ছিল !

খুব কম দিন নয়, বিবাহের পর ঘনিষ্ঠ ভাবে সুদীর্ঘ আট বৎসর সুলোচনাকে নিয়ে ঘর করেছিল হরনাথ। এবং সেই সময়েই সুলোচনাকে সে চিনতে পেরেছিল।

ইস্পাতের মতই ঋজু ও কঠিন প্রকৃতির ঐ সুলোচনা। বুক ভরা তার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ ও ভালবাসা থাকলেও কোনদিন কোন কারণেই সে কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেনি।

ছায়ার মতই একদা সে স্বামীর অনুবর্তিনী ছিল সত্য কিন্তু আপন সত্তাকে সে কোনদিন কোন কারণেই ছোট হতে দেয় নি।

স্বামীর কোন কথাতেই কখনো সে প্রতিবাদ করেনি বটে কিন্তু নিজের বুদ্ধি ও বিচারে যা সে অন্যায় বলে একবার মনে করেছে কোন যুক্তির বা উপরোধের কাছেই সে নতি স্বীকার করে নি।

এবং সেই কারণেই বুঝি গোপালকে সাগরে বিসর্জন দিয়ে ফিরে আসার পর ধর্মের ও শাস্ত্রের অন্ধ গোঁড়ামী ও অনুশাসনকে তার মিথ্যা মনে হওয়ায়, স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরে যাবার পর হরনাথের হাজার অনুরোধেও আর সে মুখ ফেরায়নি তার দিকে।

এবং নিজের হাতেই একদিন পৃথিবীতে তার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিবাহের রাত্রে নিজের হাতে বরবেশে সাজিয়ে দিয়েছিল।

সেই সুলোচনা আজ আবার স্বেচ্ছায় এতকাল পরে তার গৃহে ফিরে এসেছে। সত্য, সুলোচনার কাছ থেকে এতকাল সে

যতদূরেই থাকুক না কেন সুলোচনাকে একটি মুহূর্তের জন্যও সে মন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি।

তার শয়নে স্বপনে, জাগ্রতে সর্ব কাজের মধ্যেই এবং সর্বক্ষণ সুলোচনা এতকাল তার সমস্ত মনটা জুড়ে ছিল।

কিন্তু কই। তবু তো এই মুহূর্তে কোন অনাস্বাদিত পুলকে তার মনটা শিহরিত হচ্ছে না। অনাবিল কোন প্রসন্নতায় সুলোচনার এই প্রত্যাগমন তাকে পুলকিত বা রোমাঞ্চিত করছে না।

ধীরে ধীরে এক সময় হরনাথ এসে ঘরের এক ধারে পালঙ্কের 'পরে বিস্তৃত শয্যার 'পরে উপবেশন করল।

নিজের মনের সবটা সুলোচনার স্মৃতিতে সর্বক্ষণ ভরে থাকলেও বাইরে কখনো সে কথা কাউকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয় নি হরনাথ।

অবিশ্যি মুখে প্রকাশ না করলেও নারী হয়ে নয়নতারার কাছে সেটা আদৌ অবিদিত ছিল না, নয়নতারার চোখকে হরনাথ ফাঁকি দিতে পারে নি।

নয়নতারা বুঝতে পেরেছিল অল্প দিনেই স্বামীর মনের মধ্যে আর যারই হোক এজীবনে দ্বিতীয় কোন নারীরই আর জায়গা হবে না।

তার প্রথমা স্ত্রী সুলোচনাই আজও তার স্বামীর সমস্ত মনটা জুড়ে রয়েছে। একচ্ছত্র সাম্রাজ্ঞীর মতই আজ সেই নারী হরনাথের সমস্ত সত্তাকে আড়াল করে রেখেছে।

সে কারণে প্রথম প্রথম অবিশ্যি নয়নতারার মনে স্বাভাবিক ভাবেই হিংসার অন্ত ছিল না। কিন্তু যত দিন অতিবাহিত হয়েছে ক্রমে তার সেই হিংসা একটু একটু করে যেন তার মন থেকে মুছে গিয়েছে।

মনে হয়েছে কার উপরে সে হিংসা পোষণ করছে আর কেনই বা করছে। সে তো সামনা সামনি এসে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নি। সামনা সামনি আসা দূরে থাক, একটি সংবাদ পর্যন্ত কখনো নেয় না বা নেবার চেষ্টাও করে না, মনে হয়েছে তাই কেমন সে মেয়ে মানুষ! যে এমনি করে স্বামীকে ত্যাগ করতে পারে। অবশেষে তাই একদিন রাত্রে সুলোচনার কথা হরনাথকে না জিজ্ঞাসা করে আর পারেনি নয়নতারা, বলেছিল সে, তার কথা জানতে বড় ইচ্ছা করে?

কার কথা! গভীর বিস্ময়ে তাকিয়েছিল সেদিন হরনাথ নয়নতারার মুখের দিকে।

দিদির কথা।

হঠাৎ একথা বলছো কেন নয়ন?

কেন?

হ্যাঁ।

একটু হেসে জবাব দিয়েছিল নয়নতারা, জানতে ইচ্ছা করে না বুঝি ছোট বোন হয়ে বড় বোনের কথা। তাছাড়া এতে অন্যায়ই বা কি আছে। বল না গো!

কি বলবো!

বাঃ ঐ যে বললাম দিদির কথা। দিদি তো নবদ্বীপেই আছেন।

হ্যাঁ।

হাজার হোক স্ত্রী—শুধু স্ত্রী নয় প্রথমা স্ত্রী। কর্তব্য হিসাবে [illegible]

তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই নয়ন।

কথাটা যেন অতঃপর চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল হরনাথ। কিন্তু নয়নতারা কথাটা চাপা দিতে দেয়নি। আবার বলেছিল, কি যে বলো স্বামি-স্ত্রী—কথায় বলে জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক।

তার কথা থাক নয়ন। অসম্ভব গম্ভীর কণ্ঠে কথাটা বলে যেন ঐ প্রসঙ্গকে ঐখানেই ইতি করে দিয়েছিল হরনাথ।

সামান্য যেটুকু ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট ছিল সেটুকুও বুঝি সেদিন দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল নয়নতারার কাছে। কারণ সেই রাত্রে পাশাপাশি এক শয্যায় শুয়েও দুজনার একজনও ঘুমাতে পারেনি। এবং পরস্পর সে রাত্রে আর কেউ কারো সঙ্গে কথা আর না বললেও পার্শ্বে শায়িত স্বামীর বার দুই দীর্ঘশ্বাস মোচনের মধ্য দিয়েই নয়নতারার কাছে সব কিছু বুঝি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়বার আর কোন দিন ঐ প্রসঙ্গের উত্থাপন করেনি নয়নতারা স্বামীর কাছে। কিন্তু উত্থাপন না করলেও চাপা একটু বুক ভাঙ্গা বেদনার হাহাকার তার সমস্ত বুকখানিকে যেন ভরিয়ে রেখেছিল।

বস্তুত হরনাথের কাছেও ব্যাপারটা অবিদিত ছিল না শেষের দিকে। বুঝতে সে পেরেছিল বইকি সব কিছু।

সহসা সুলোচনার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে হরনাথ। কি হলো বসে কেন এখনো। রাত অনেক হলো যে, হাত মুখ ধোবে কখন?

য়্যাঁ। হ্যাঁ—এই যাই।

হরনাথ উঠে দাঁড়ায়। হাত মুখ ধুয়ে বস্ত্রাদি পরিবর্তন করে, আহ্নিক সেরে হরনাথ ঘরের বাইরে আসতেই দেখতে পেল ঠাঁই হয়ে গিয়েছে। হরনাথ ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে আসনের 'পরে উপবেশন করল। হরনাথ কিন্তু পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করতে পারল না। দু'এক গ্রাস মুখে দিল তারপর কিছুক্ষণ আহার্য বস্তু নিয়ে নাড়া চাড়া করে এক সময় ঢক-ঢক করে সমস্ত জলটুকু খেয়ে উঠে পড়লো।

ওকি! কিছুই যে খেলে না। রান্না ভাল হয়নি বুঝি? সুলোচনা শুধায়।

না, না—বেশ হয়েছে।

তবে খেলে না যে?

কেন। খেলাম তো।

হাত মুখ ধুয়ে হরনাথ ঘরে এসে বসতেই হুঁকার মাথায় কল্কি চাপিয়ে ফুঁ দিতে দিতে সুলোচনা এসে ঘরে প্রবেশ করল। এবং স্বামীর হাতে হুঁকাটা তুলে দিয়ে ঘর থেকে সে বের হয়ে গেল। কিন্তু সে রাত্রে হুঁকাতে দু' একটা টান দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে পালঙ্কের একপাশে হুঁকাটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে গিয়ে ঘরের সেজ বাতিটা নিভিয়ে দিল হরনাথ। অন্ধকারে ঘর ভরে গেল।

কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। শুধু অন্ধকার।

অন্ধকারেই শয্যার 'পরে একসময় গা এলিয়ে দিল হরনাথ।

সমস্ত বাড়িটা যেন অদ্ভুত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, কোথায়ও কোন সাড়া শব্দ পর্যন্ত নেই।

সমস্ত দিনের ক্লান্তি। অন্যান্য দিন কর্মক্লান্তির পর রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, আহারাদির পর শয্যায় শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই দু চক্ষুতে গভীর নিদ্রা নেমে আসে, কিন্তু আজ হরনাথের চক্ষু থেকে নিদ্রা যেন কোথায় পালিয়ে গিয়েছে।

'...তবে নিশ্চয়ই আপনি ভুল করবেন'—বোম্বের শ্রীমতী আর. আর প্রভু বলেন। 'কাপড় জামার বেলাতেও কি উঁনি কম খুঁতখুঁতে ...।'
'এখন অবশ্য আমি ওঁর জামা কাপড় সবই সানলাইটে কাচি—প্রচুর ফেনা হয় বলে এতে কাচাও সহজ আর কাপড়ও ধবধবে ফরসা হয়।...উঁনিও খুশী !'
'কাপড় জামা যা-ই কাচি সবই ধবধবে আর ঝলমলে ফরসা—সানলাইট ছাড়া অন্য কোন সাবানই আমার চাই না'

গৃহিণীদের অভিজ্ঞতায় খাঁটি, কোমল সানলাইটের মতো কাপড়ের এত ভাল যত্ন আর কোন সাবানেই নিতে পারে না। আপনিও তা-ই বলবেন।

সানলাইট

কাপড় জামার সঠিক যত্ন নেয়!

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

S. 30-X52 BO

যতদূরেই থাকুক না কেন সুলোচনাকে একটি মুহূর্তের জন্যও সে মন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি।

তার শয়নে স্বপনে, জাগ্রতে সর্ব কাজের মধ্যেই এবং সর্বক্ষণ সুলোচনা এতকাল তার সমস্ত মনটা জুড়ে ছিল।

কিন্তু কই। তবু তো এই মুহূর্তে কোন অনাস্বাদিত পুলকে তার মনটা শিহরিত হচ্ছে না। অনাবিল কোন প্রসন্নতায় সুলোচনার এই প্রত্যাগমন তাকে পুলকিত বা রোমাঞ্চিত করছে না।

ধীরে ধীরে এক সময় হরনাথ এসে ঘরের এক ধারে পালঙ্কের 'পরে বিস্তৃত শয্যার 'পরে উপবেশন করল।

নিজের মনের সবটা সুলোচনার স্মৃতিতে সর্বক্ষণ ভরে থাকলেও বাইরে কখনো সে কথা কাউকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয় নি হরনাথ।

অবিশ্যি মুখে প্রকাশ না করলেও নারী হয়ে নয়নতারার কাছে সেটা আদৌ অবিদিত ছিল না, নয়নতারার চোখকে হরনাথ ফাঁকি দিতে পারে নি।

নয়নতারা বুঝতে পেরেছিল অল্প দিনেই স্বামীর মনের মধ্যে আর যারই হোক এজীবনে দ্বিতীয় কোন নারীরই আর জায়গা হবে না।

তার প্রথমা স্ত্রী সুলোচনাই আজও তার স্বামীর সমস্ত মনটা জুড়ে রয়েছে। একচ্ছত্র সাম্রাজ্ঞীর মতই আজ সেই নারী হরনাথের সমস্ত সত্তাকে আড়াল করে রেখেছে।

সে কারণে প্রথম প্রথম অবিশ্যি নয়নতারার মনে স্বাভাবিক ভাবেই হিংসার অন্ত ছিল না। কিন্তু যত দিন অতিবাহিত হয়েছে ক্রমে তার সেই হিংসা একটু একটু করে যেন তার মন থেকে মুছে গিয়েছে।

মনে হয়েছে কার উপরে সে হিংসা পোষণ করছে আর কেনই বা করছে। সে তো সামনা সামনি এসে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নি। সামনা সামনি আসা দূরে থাক, একটি সংবাদ পর্যন্ত কখনো নেয় না বা নেবার চেষ্টাও করে না, মনে হয়েছে তাই কেমন সে মেয়ে মানুষ! যে এমনি করে স্বামীকে ত্যাগ করতে পারে। অবশেষে তাই একদিন রাত্রে সুলোচনার কথা হরনাথকে না জিজ্ঞাসা করে আর পারেনি নয়নতারা, বলেছিল সে, তার কথা জানতে বড় ইচ্ছা করে?

কার কথা! গভীর বিস্ময়ে তাকিয়েছিল সেদিন হরনাথ নয়নতারার মুখের দিকে।

দিদির কথা।

হঠাৎ একথা বলছো কেন নয়ন?

কেন?

হ্যাঁ।

একটু হেসে জবাব দিয়েছিল নয়নতারা, জানতে ইচ্ছা করে না বুঝি ছোট বোন হয়ে বড় বোনের কথা। তাছাড়া এতে অন্যায়ই বা কি আছে। বল না গো!

কি বলবো!

বাঃ ঐ যে বললাম দিদির কথা। দিদি তো নবদ্বীপেই আছেন।

হ্যাঁ।

হাজার হোক স্ত্রী—শুধু স্ত্রী নয় প্রথমা স্ত্রী। কর্তব্য হিসাবে একটা খোঁজ খবরও তো নেওয়া উচিত।

তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই নয়ন।

কথাটা যেন অতঃপর চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল হরনাথ। কিন্তু নয়নতারা কথাটা চাপা দিতে দেয়নি। আবার বলেছিল, কি যে বলো স্বামি-স্ত্রী—কথায় বলে জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক।

তার কথা থাক নয়ন। অসম্ভব গম্ভীর কণ্ঠে কথাটা বলে যেন ঐ প্রসঙ্গকে ঐখানেই ইতি করে দিয়েছিল হরনাথ।

সামান্য যেটুকু ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট ছিল সেটুকুও বুঝি সেদিন দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল নয়নতারার কাছে। কারণ সেই রাত্রে পাশাপাশি এক শয্যায় শুয়েও দুজনার একজনও ঘুমাতে পারেনি। এবং পরস্পর সে রাত্রে আর কেউ কারো সঙ্গে কথা আর না বললেও পার্শ্বে শায়িত স্বামীর বার দুই দীর্ঘশ্বাস মোচনের মধ্য দিয়েই নয়নতারার কাছে সব কিছু বুঝি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়বার আর কোন দিন ঐ প্রসঙ্গের উত্থাপন করেনি নয়নতারা স্বামীর কাছে। কিন্তু উত্থাপন না করলেও চাপা একটু বুক ভাঙ্গা বেদনার হাহাকার তার সমস্ত বুকখানিকে যেন ভরিয়ে রেখেছিল।

বস্তুত হরনাথের কাছেও ব্যাপারটা অবিদিত ছিল না শেষের দিকে। বুঝতে সে পেরেছিল বইকি সব কিছু।

সহসা সুলোচনার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে হরনাথ। কি হলো বসে কেন এখনো। রাত অনেক হলো যে, হাত মুখ ধোবে কখন?

য়্যাঁ। হ্যাঁ—এই যাই।

হরনাথ উঠে দাঁড়ায়। হাত মুখ ধুয়ে বস্ত্রাদি পরিবর্তন করে, আহ্নিক সেরে হরনাথ ঘরের বাইরে আসতেই দেখতে পেল ঠাঁই হয়ে গিয়েছে। হরনাথ ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে আসনের 'পরে উপবেশন করল। হরনাথ কিন্তু পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করতে পারল না। দু'এক গ্রাস মুখে দিল তারপর কিছুক্ষণ আহার্য বস্তু নিয়ে নাড়া চাড়া করে এক সময় ঢক-ঢক করে সমস্ত জলটুকু খেয়ে উঠে পড়লো।

ওকি! কিছুই যে খেলে না। রান্না ভাল হয়নি বুঝি? সুলোচনা শুধায়।

না, না—বেশ হয়েছে।

তবে খেলে না যে?

কেন। খেলাম তো।

হাত মুখ ধুয়ে হরনাথ ঘরে এসে বসতেই হুঁকার মাথায় কল্কি চাপিয়ে ফুঁ দিতে দিতে সুলোচনা এসে ঘরে প্রবেশ করল। এবং স্বামীর হাতে হুঁকাটা তুলে দিয়ে ঘর থেকে সে বের হয়ে গেল। কিন্তু সে রাত্রে হুঁকাতে দু' একটা টান দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে পালঙ্কের একপাশে হুঁকাটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে গিয়ে ঘরের সেজ বাতিটা নিভিয়ে দিল হরনাথ। অন্ধকারে ঘর ভরে গেল।

কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। শুধু অন্ধকার।

অন্ধকারেই শয্যার 'পরে একসময় গা এলিয়ে দিল হরনাথ।

সমস্ত বাড়িটা যেন অদ্ভুত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, কোথায়ও কোন সাড়া শব্দ পর্যন্ত নেই।

সমস্ত দিনের ক্লান্তি। অনান্য দিন কর্মক্লান্তির পর রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, আহারাদির পর শয্যায় শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই দু চক্ষুতে গভীর নিদ্রা নেমে আসে, কিন্তু আজ হরনাথের চক্ষু থেকে নিদ্রা যেন কোথায় পালিয়ে গিয়েছে।

‘...তবে নিশ্চয়ই আপনি ভুল করবেন’—বোম্বের শ্রীমতী আর. আর প্রভু বলেন। ‘কাপড় জামার বেলাতেও কি উনি কম খুঁতখুঁতে...!’ ‘এখন অবশ্য আমি ওঁর জামা কাপড় সবই সানলাইটে কাচি—প্রচুর ফেনা হয় বলে এতে কাচাও সহজ আর কাপড়ও ধবধবে ফরসা হয়।...উনিও খুশী!’ ‘কাপড় জামা যা-ই কাচি সবই ধবধবে আর ঝালমলে ফরসা—সানলাইট ছাড়া অন্য কোন সাবানই আমার চাই না’

গৃহিণীদের অভিজ্ঞতায় খাঁটি, কোমল সানলাইটের মতো কাপড়ের এত ভাল যত্ন আর কোন সাবানেই নিতে পারে না। আপনিও তা-ই বলবেন।

সানলাইট

কাপড়জামার সঠিক যত্ন নেয়!

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

S. 30-X52 BO

অন্ধকার ঘরের মধ্যে একাকী দুই চক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকে হরনাথ।

নবদ্বীপ থেকে সুলোচনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভবানীচরণ তাকে কৃষ্ণনগরে নিজগৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন। এতদিন সুলোচনা সেখানেই ছিল, হঠাৎ সেখান থেকে চলে এলো কেন?

ভবানীচরণ কি কোন রূপ অসম্মানজনক ব্যবহার করেছেন ভগিনীর প্রতি। সুলোচনা যে রকম প্রচণ্ড আত্মাভিমানিনী হয়ত তাই চলে এসেছে সেই গৃহ থেকে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয়, ভবানীচরণ তো সে প্রকৃতির নন।

প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন ভগিনীকে।

তবে, তবে সুলোচনা এভাবে হঠাৎ চলে এলো কেন! এতকাল যে তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক পর্যন্ত রাখে নি, হঠাৎ সে এ ভাবে চলে এলো কেন!

আর সে এলো এমন একটা সময় যখন জীবনটা তার শেষ প্রান্তেই এসে দাঁড়ায়নি—অসংখ্য জটিলতায় সে নিজেও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে।

হৃদয়ের নিভৃত পূজা বেদীতে যে নারীকে সে এতকাল পরম শ্রদ্ধায় বসিয়ে রেখেছিল, কেন সে আবার সংসারের কুটিল আবর্তের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ একটা চাপা কান্নার শব্দে হরনাথের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল। ত্রস্তে অন্ধকারে হরনাথ উঠে বসে, কে?

কোন সাড়া নেই, শুধু চাপা কান্নার শব্দ।

কে?

অন্ধকারে পায়ের সামনে এসে কে যেন লুটিয়ে পড়লো কাঁদতে কাঁদতে। একরাশ চুল হরনাথের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

কে?

কিছুতেই আমি কোন কথা শুনবো না ঠাকুর, ওকে এখান থেকে এই মুহূর্তে সড়িয়ে দিতে হবে।

ক্ষীরোদা। ক্ষীরোদা দু'হাতে হরনাথের দু'পা জড়িয়ে ধরেছে।

কয়েকটা মুহূর্ত, তারপরই রুক্ষ চাপা কণ্ঠে ডাকে হরনাথ, ক্ষীরোদা—

তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও ওকে। তুমি না পারো আমি ঝাঁটা মেরে—

কিন্তু ক্ষীরোদার মুখের কথা শেষ হলো না, উপবিষ্ট অবস্থাতেই প্রচণ্ড একটা লাথি বসিয়ে দিল হরনাথ ক্ষীরোদার মুখের 'পরে।

সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাকাতর একটা শব্দ করে অদূরে পানের বাটাটার উপর গিয়ে ছিটকে পড়লো ক্ষীরোদা। ঝন ঝন করে একটা শব্দ তুলে পানের বাটাটা মেঝেতে ছিটকে পড়লো।

হারামজাদী, বেরো—বেরো—আমার বাড়ি থেকে।

গর্জন করে ওঠে হরনাথ।

বাইরের বারান্দায়, অন্ধকারে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সুলোচনা। সেও শুতে যায় নি।

সুনয়নাকে শয্যায় শুইয়ে সে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

ঝন ঝন শব্দে ও হরনাথের চাপা গর্জনে প্রথমটায় সঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি সুলোচনা, কিন্তু হরনাথের শেষ কথাগুলো তার কানে যেতেই সে দ্রুতপদে ঘরে এসে ঢুকলো।

ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা তখন।

থমকে দাঁড়ায় ঘরের মধ্যে ঢুকে অন্ধকারে সুলোচনা। একটি শব্দও তার কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হয় না।

হরনাথ ততক্ষণে সেজবাতিটা আবার জ্বেলে ফেলেছে। এবং কোন কথা বলবার আগেই সেজবাতির আলোয় অদূরে ঠিক দরজার সামনে পাষাণ প্রতিমার মত দণ্ডায়মানা সুলোচনার প্রতি নজর পড়তেই সে যেন একেবারে পাথর হয়ে যায়। [ক্রমশঃ।

উপনিষদ নির্মাল্য

(বৃহদারণ্যক হইতে)

পুষ্প দেবী

আমায় তুমি অনেক দিলে হে মোর দয়াময়
এত পাবার যোগ্যতা মোর কণাটুকু নয়
তবু তোমায় কর জুড়ি
একটি কথা জিগেস করি
কি লাভ বলো এসব পেয়ে নিত্য যাহা ক্ষয়
এসব পেয়ে ভুলি তোমায় এমনি যে হয় ভয়।

অনেক দিলে দয়াল আমায়, ধন্য তাহা পেয়ে
স্মরি তাহা অশ্রু ঝরে আমার নয়ন বেয়ে
কেমন করে ভরবে এ বুক
পাওয়ার সাথেই হারাব যে সুখ
তোমার দানে ভরলো না বুক তাই ত তোমায় চাই
নিত্য যাহা সত্য যাহা শ্রেষ্ঠ যাহা তাই।

কামনা

শেফালী গুহ

ও পাখি, তুই পাখনা দুটো
ছড়িয়ে দে।
আকাশ থেকে আলোর গান
ছড়িয়ে দে॥
শূন্য মনের দুঃখ গ্লানি,
হতাশার এই ভুবনখানি
আশার আলোয় ভরিয়ে দে।
একতারা এই বেসুর প্রাণের,
উদাস করা আকুল গানের
বাউল সুরে ঝড়িয়ে দে।
সবুজ ঘাসে, নতুন পাতার
খুশির চমক উছলে উঠার
আনন্দে প্রাণ জুড়িয়ে দে।
ও পাখ, তোর ডানা দুটো
ছড়িয়ে দে।
ছড়িয়ে দে॥

ক্লোরেলা ও এর ব্যবহারিক মূল্য

আজকের দিনে প্রধানতঃ বিজ্ঞানী মহলে ক্লোরেলার কথা বেশিরকম শুনতে পাওয়া যায়—এর খ্যাতি আজ প্রচুর। কিন্তু এই ক্লোরেলা আসলে এক প্রকার এক কোষী জলজ উদ্ভিদ ছাড়া কিছু নয়। দেখতে এ অনেকটা পানারই মতো—জলাশয়ের ধারে কিংবা সাগর পারে অর্থাৎ জলের নিতান্ত কাছাকাছি জায়গায় এর উৎপত্তি। এমনি দেখতে যতই ক্ষুদে হোক, এর মূল্য ও উপযোগিতা আজ প্রশ্নাতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্যাওলা জাতীয় এই সামুদ্রিক আগাছার আকার-প্রকার সত্যি অদ্ভুত। মানুষ চোখে হয়তো একে দেখতে পেয়েছে বহু বছর আগেই কিন্তু দেখেও তখন পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিগত শতকের শেষের দিকে মাত্র ক্লোরেলা যথার্থ আবিষ্কৃত হয়—একদিন এ এতটা সমাদৃত হবে, সেটুকু ছিল তখনও কল্পনার বাইরে। ঐ জলজ আগাছা এক মুঠো যদি তুলে নেওয়া যায়, দেখা যাবে হাতের তালুতে হালকা সবুজ রঙের খানিকটা তরল পদার্থ ছড়িয়ে আছে। অথচ এই জলটির প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে রয়েছে কোটি কোটি ক্লোরেলা—যেগুলো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক একটি গোলক। নিবিড় গবেষণা-আলোচনা সুরু হয়ে যায় এ নিয়ে সেই থেকেই।

পরীক্ষা করেই দেখা গেছে—মানুষের নিঃশ্বাসের সঙ্গে পরিত্যক্ত কার্ব্বন-ডাই অক্সাইড দ্রুত শুষে নিয়ে ক্লোরেলা অক্সিজেন ছাড়ে আর বিস্ময়কর দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি ঘটায়। এর ভিটামিন পরিমাণ লেবুর সমান আর অ্যালবুমেন বা চর্ব্বির পরিমাণ করে তোলা যায় ৮০ শতাংশ পর্য্যন্ত। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, এই জলদ উদ্ভিদ মানুষ পশুর পক্ষে এক অতীব মূল্যবান পুষ্টিকর খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার হতে পারে। খাদ্য হিসাবে এ এতখানি উপযোগী এই জন্যেই যে এর মধ্যে প্রোটিন আছে শুঁটির চেয়ে ঢের বেশি প্রায় দ্বিগুণ আর ভিটামিন সি আছে লেবুর সমান, যে কথা পূর্ব্বেই বলা হলো।

আমিষ জাতীয়, শর্করা জাতীয় ও চর্ব্বিজাতীয় আহার্য্যের এক অতিরিক্ত উৎস হিসেবে ক্লোরেলার ব্যবস্থায় বেশিরকম গুরুত্বলাভ করছে ক্রমেই। এর উৎপাদনের হার বাড়াবার জন্যে এক্ষণে সক্রিয় উদ্যম চলেছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, যেমন সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, জাপান, ও আমেরিকায়। কোথাও কোথাও মানুষ ও পশুর খাদ্যের একটি সুন্দর পরিপূরক হিসেবে ক্লোরেলার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। জানা গেছে—লেনিনগ্রাডের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে ঘরের ভেতরে ক্লোরেলা উৎপাদনের এক সফল পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। আলোচ্য পদ্ধতিতে জলের উপরিভাগে প্রতি ১ বর্গমিটারে যে পরিমাণ ক্লোরেলা পাওয়া যায়, তার থেকে প্রত্যহ ৭০ গ্রামেরও অধিক শুকনো ক্লোরেলাজাত দ্রব্য উৎপাদন করা যাচ্ছে। লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা ভবনের পরিচালনাধীনেও একটি উদ্যানের ভেতর ব্যাপক চাষ চলেছে এই অমূল্য জলজ উদ্ভিদের।

ক্লোরেলা ও ক্লোরেলার ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে গবেষণা এখনই শেষ হয়ে যায় নি। পরীক্ষায় নির্ণীত হয়েছে—এই জলজ আগাছা আকস্মিক চাপ-পরিবর্ত্তন ও অত্যধিক ত্বরণ সহ্য করতে পারে। আর এরই জন্যে ভবিষ্যতে গ্রহান্তর যাত্রায় ক্লোরেলায় প্রয়োজন হবে অপরিহার্য্য। দূরপাল্লার মহাশূন্যাভিযানে মহাশূন্যচারীদের নিশ্বাসের বাতাস ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা একটি মস্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু বিজ্ঞানীরা দাবী রাখছেন—এই সমস্যাটির সমাধান করে দেবে ক্ষুদ্রাকৃতি ক্লোরেলা। একটি সহজ যন্ত্রসজ্জার সহায়তায় মহাশূন্যচারীদের নিঃসৃত কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড এ টেনে নেবে আর গগনচারীদের পক্ষে অত্যাবশ্যক অক্সিজেন ছেড়ে দেবে। পক্ষান্তরে ক্লোরেলা তাদের প্রোটিন ও ভিটামিনের চাহিদাও মেটাতে পারবে বলে বিজ্ঞানীরা আস্থা রেখেছেন। নির্দ্ধারিত নিয়ম ও ব্যবস্থা অনুসারে ক্লোরেলা শুকিয়ে নিয়ে গুঁড়ো করা হবে আর এই পাউডারই মেশানো থাকবে মহাকাশযাত্রীদের খাদ্যের সঙ্গে। ক্লোরেলার উৎপাদন যত ব্যাপকতর করা যাবে, ততই হবে এ মানুষের সহজলভ্য। সেজন্য অগ্রসর দেশগুলোর সরকারগণ এদিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করছেন। বেশ বুঝতে পারা যায়, ভাবী মহাশূন্যযাত্রায় এই অভিনব জলজ উদ্ভিদ বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করবে। স্বল্পতম পরিমাণ খাদ্যের মধ্যে প্রচুরতম পুষ্টিকারিতার ব্যবস্থা এতে নিশ্চিতরূপে হতে পারছে বলেই ক্লোরেলার দাম ও আদর বাড়বে বই কমবে না।

চুইং-গাম

লজেন্স, চকোলেট এসবের পাশাপাশি চুইং-গামের নামটিও করা চলে। আজকের দিনে এটি সকল দেশেই প্রায় চালু—ছেলে-বুড়ো সব মহলেই সময় বিশেষে বেশ আদরণীয়। একই কাজের মাঝে দীর্ঘ

সময় কাটাতে গেলে অনেকেরই সাথী হতে দেখা যায় এই চুইং-গাম। গানের আসরে ও খেলার মাঠে বিশেষভাবে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা দেখতে যেয়ে কত লোকেরই না এটি চাই। চুইং-গাম চিবিয়ে একঘেয়েমি ও ক্লান্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা হয়—এর সুবিধা লজেন্স বা চকোলেটের মতো এ দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায় না। যে দাবীটি চলতি—ক্রীড়ামোদীরা একে মুখে রেখে খানিকটা স্বচ্ছন্দভাবে দীর্ঘ সময়ব্যাপী খেলার আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।

বিভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ বৃটেন ও আমেরিকায় চুইং-গাম একটি বড় শিল্প ও বাণিজ্য পণ্য হয়েই দাঁড়িয়েছে। যতদূর দেখতে পাওয়া যায়—ভারতেও এর ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়ছে বই কমছে না। কিন্তু এই শিল্পের প্রথম সূচনা হয় কোথায় আর সেটি কখন কি ভাবে, আজ এসব খুঁজে-দেখে জানবার জিনিস। যতদূর তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, পৃথিবীতে চুইং-গামের ব্যবহার সুরু হয়েছে, সে প্রায় এক শতাব্দী আগেকার ব্যাপার। মেক্সিকোর তৎকালীন পদচ্যুত ডিক্টেটর জে: এণ্টোনিও লোপেজ দ্য সাণ্টা আন্না ষ্টাটেন দ্বীপে আত্মগোপন করে থাকা অবস্থায় চুইং-গাম জাতীয় জিনিসটি আবিষ্কার করেন। রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা-ই ক্রমে আজকের সুন্দর চুইং-গামের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

জানা যায় যে, গোড়াতে যে-শ্রেণীর চুইং-গাম চলতি ছিল, তার কোন স্বাদ ছিল না, গন্ধও ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে ক্লীভল্যাণ্ডের উইলিয়াম জে-হোয়াইট বিশেষ ধরণের সিরাপ মিশিয়ে একে মনোমত করে তোলেন, আর তখন থেকেই এটি এক নতুন শিল্পে পরিগণিত হয়। চুইং-গাম ব্যবসায়কে ব্যাপকতর করার ব্যাপারে মার্কিণ নাগরিক উইলিয়াম রিগলিরও অবদান কম নয়। আজও পৃথিবীর অন্যান্য স্থান থেকে আমেরিকায় এই জিনিষটির ব্যবহার অধিকতর, তথ্যাদি থেকেই এ কথা জানতে পারা যায়।

চুইং-গাম তৈরীতে খুব বেশি উপাদান প্রয়োজন হয় না। মূল গাম জাতীয় পদার্থটি ছাড়া বেশিটা চাই চিনি, তারপর চাই বিশেষ শ্রেণীর সিরাপ। বিগত যুদ্ধের বাজারে এই জিনিষের বিক্রী বেড়েছিল অতিমাত্রায়। আমেরিকায় বছরে সে সময়ে মাথা পিছু চুইং-গাম চলতো ৬২০টি। শান্তিপূর্ণ সময়েও এর ভালো বাজার যাতে পাওয়া যায়, সেজন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী মহল বিশেষ নজর রাখছেন, এ নিশ্চয়।

সালফিউরিক এসিড উৎপাদন

স্বাধীনোত্তর ভারতে সালফিউরিক এসিডের চাহিদা আগের তুলনায় বেড়ে গেছে অনেক। এই বিপুল চাহিদা পূরণ করতে হলে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় গন্ধক উৎপাদনের উত্তম সুরু না করলে চলবে না। তার কারণ, এদেশে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সালফিউরিক এসিড তৈরী হয় গন্ধক থেকে। পক্ষান্তরে এই গন্ধকের জন্য ভারতকে বিদেশের ওপরই নির্ভর করতে হয়। অল্পদিন আগে সরকার পক্ষ থেকে একটি হিসাব বের হয়েছে, যাতে জানা যায়—প্রয়োজনীয় সালফিউরিক এসিড উৎপাদনকল্পে ১৯৬৫-৬৬ সালে গন্ধক আমদানী করতে হবে প্রায় ৪ লক্ষ টন।

ভারতীয় খনি সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা চালিয়ে একটি বিবরণ দিয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে যে, ভারতে আজমোর পাইরাইট থেকে সালফিউরিক এসিড প্রস্তুত করা সম্ভবপর হবে। বিহারের আজমোর পাইরাইট নিয়মিতভাবে সংগ্রহের ব্যবস্থা হলে নরওয়ে ওর্কালো পদ্ধতিতে আলোচ্য এসিড উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটবে না, এ-ও তাঁরা বলেছেন। খনি সংস্থার পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে আরও বহু তথ্য ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। দাবী রেখেছেন তাঁরা—পোড়ানো পাইরাইট ইস্পাত কারখানাতেও লৌহপিণ্ড ও ইস্পাত নির্ম্মাণের কাজে ব্যবহার করা চলবে।

ভারতের প্রধান গন্ধক সম্পদই হলো এই আজমোর পাইরাইট। বিহারের ঐ নির্দ্দিষ্ট—অঞ্চলটির প্রায় ৪৮ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে ৩৮৪ কোটি টন সালফাইড পিণ্ড জমা আছে। পরীক্ষায় জানা যায়—প্রায় ৭৮ কোটি টন সালফাইড পিণ্ডের মধ্যে গন্ধক রয়েছে শতকরা ৪০ ভাগ। আজমোরকে কেন্দ্র করে দুই শত মাইল এলাকায় একটি পাইরাইট রাসায়নিক কারখানাও গড়ে উঠবে, কর্ত্তৃপক্ষ এমনি প্রস্তাব করেছেন।

জীবনযাত্রা ও বাজেট

বস্তুবাদীদের দাবী—জীবনটা ভোগ করবার জন্যে, নেতিবাদ একটি অর্থহীন জিনিস। 'খাও, দাও, আনন্দ কর'—এই হলো সহজ নীতি। কিন্তু কার্য্যতঃ এ নীতি সকলের পক্ষেই কি অনুসরণ করা সম্ভব? এখনও তা নয়, নিশ্চয়ই—জীবনযাত্রার মান ইচ্ছে করলেই বাড়ানো চলে না, সব দিক দেখে শুনে বাজেট কষে চলতে হয় সংসারী মানুষকে।

পাশাপাশি দুইটি কথাই চলতি—'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' আর আয় বুঝে ব্যয় কর।' সাধারণ মানুষের কাছে এ বেশ খানিকটা হেঁয়ালিস্বরূপ বা বিভ্রান্তিকর। একটু ভালোভাবে থাকতে কে না চায়? কিন্তু চাওয়া এক জিনিষ আর সেই চাওয়াকে পাওয়া করে তোলা ভিন্ন ব্যাপার। সমাজ বা রাষ্ট্রীয় কাঠামো এমন এখনও হয়নি, যেখানে জীবনযাত্রা ইচ্ছাধীন। নিতান্ত সীমাবদ্ধ আয়ের ভেতর থেকে প্রতিটি খরচের বেলাতেই পূর্ব্বাপর ভাবতেই হবে। যেমনি আয়, তেমনি ব্যয়—এই নীতিই বোধ হয় সর্ব্বাবস্থায় শ্রেয়: ও গ্রাহ্য। অবশ্য আয়ের সীমাবদ্ধতার মধ্যে জীবনসম্ভোগ কতটা কি ভাবে বেশি হতে পারে, তা দেখতে হবে বৈ কি!

এই প্রসঙ্গে পারিবারিক বাজেটের গুরুত্বটি আপনি হাজির হয় সামনে। গোড়া থেকেই বাজেট করে যে গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রী চলতে পারেন, অভাব ও বিপদের আশঙ্কা তুলনায় কম থাকে তাঁর। আয় না বাড়িয়ে যদৃচ্ছা ব্যয় করে চললে, চলতি পথে অসুবিধা দেখা দেওয়া খুব স্বাভাবিক। জীবন ধারণের মানটি আয়ের সঙ্গে মিলিয়েই নির্ণীত হতে হবে—আগে চাই আয়, পিছু ব্যয়। অপরিহার্য্য অবস্থায় না পড়লে ব্যয়ের মাত্রা কখনই আয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে যেন না যায়, সেদিকে হুঁসিয়ার থাকতে হবে।

শুধু তা-ই কেন? আয় ও ব্যয়ের প্রশ্ন ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে আর একটি প্রশ্ন থাকে, সেটা সঞ্চয়ের প্রশ্ন। হঠাৎ কোন খরচের ঝুঁকি নিতে হলে সঞ্চিত অর্থ চাই, তা না হলেই আবদ্ধ হতে হবে ঋণের দায়ে। ঋণ করাটা একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের ধর্ম্ম হতে পারে না। কিন্তু তবুও দরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত আয়ের লোকদের এ অনেক সময় হয়ে থাকে—বাজেট করে জীবনযাত্রা তাদের প্রায় হয়ে ওঠে না। এ একটি সবচেয়ে জটিল অর্থনৈতিক প্রশ্ন—যার মীমাংসা না হলে নয়।

ভারতের যন্ত্র-শিল্প

আজ থেকে বার বৎসর আগে ভারতের যন্ত্রশিল্প (Machine Manufacturing Industry) শৈশব অবস্থায় ছিল। তখন ঐ শিল্পের অবদান আদৌ উল্লেখযোগ্য ছিল না। সর্ব্বসাকুল্যে ১৬০ কোটি টাকার যন্ত্র প্রস্তুত হইত। ঐ সময় শিল্পক্ষেত্রে প্রচুর অগ্রগতি ছিল, কিন্তু ঐ অগ্রগতির দাবী মিটাইতে যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত। নিম্নে ১৯৫১, ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালের যন্ত্র আমদানীর হিসাব দেওয়া গেল—

সাল	বিদেশ হইতে যন্ত্র আমদানীর মূল্য
১৯৫১	২৬৬·৬ কোটি টাকা
১৯৫৮	২৪৮·৪ "
১৯৫৯	৩০৮·৮ "

১৯৫৯ সালে যন্ত্রকার্য্যে সহায়ক তৈজসপত্র (Machine Tools) যানবাহনের যন্ত্র এবং সঞ্চালন যন্ত্র যথাক্রমে নিম্নলিখিত হারে আমদানী করা হয়—

সাল		দ্রব্য	টাকা (কোটি টাকা)
১৯৫৯		যন্ত্রকার্য্যে সহায়ক তৈজসপত্র	১১৮·১
		রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারী যন্ত্র (যথা সার, ক্ষার ইত্যাদি)	১০·৯
	উৎপাদনশিল্প-কার্য্যে সহায়ক যন্ত্রাদি	লৌহ শিল্প সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদি	৩৭·৩
		বস্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদি	১৬·৭
		নকল রেশম শিল্প সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদি	১৪·৩
	ব্যবহারিকশিল্প কার্য্যে সহায়ক যন্ত্রাদি	Machine for producing Consumer Group of Industries	১·৩

যন্ত্র-উৎপাদন কার্য্যে ভারতবর্ষ ঠিক করিয়াছে যে, আগামী তিন বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৬৫ সালের মধ্যে, ৬২০ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্র দেশে উৎপাদন করা হইবে। এই কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সফল করাইবার জন্য একটি Development Council স্থাপন করা হইয়াছে।

ভারতকে গড়িয়া উঠিতে হইলে যন্ত্রশিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে। (Build Machine, Build India),

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বস্তুতঃ ভারতের "ভারী শিল্প-সম্ভার (Heavy Industries) প্রসারের পরিকল্পনা। এই কারণ সরকারী ও বে-সরকারী তরফে বিবিধ যন্ত্র ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হইবে।

যন্ত্রপ্রস্তুতির প্রয়োজন নিম্নলিখিত তিনটি বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায় :—

(১) বর্ত্তমানে দেশে শিল্পকার্য্যে নিয়োজিত যে সকল যন্ত্রাদি আছে সেইগুলির সংরক্ষণ, সংস্কার, পরিবর্ত্তন ও উন্নতি।

(২) বর্ত্তমান শিল্পের ব্যাপক উন্নতি এবং তৎপ্রসঙ্গে নূতন নূতন যন্ত্র উৎপাদন।

(৩) শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে চালান দিবার জন্য যন্ত্রশিল্পের প্রসার ও যন্ত্রের উদ্ভাবন।

যন্ত্র বাঁচাও, ভারতকেই ভারতবর্ষের নবজন্ম লাভ হইবে।

—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

এমারসনস' জ্বালানি উনুন

বাঙালীর উদ্ভাবনীশক্তি নেই, এ কথা যারা বলে তাদের বাতুল আখ্যা দেওয়া যায়। বাঙালী শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পকার্য ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অনেকের কাছেই স্মরণীয় হয়ে আছে। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষে বৈদ্যুতিক পরীক্ষা এ নিরীক্ষার আন্দোলন বিস্তৃত হয়। বিদ্যুতের নানা প্রকার ব্যবহার ও প্রয়োগ আমাদের গৃহস্থালী এবং যন্ত্রশিল্প ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকে। আমাদের আলোচ্য জনৈক বাঙালী আবিষ্কর্তার রন্ধনকার্য্যের জন্যে একটি বৈদ্যুতিক জ্বালানি উনুন। এই উনুনটির পেটেন্ট নম্বর 68278—সাধারণ গৃহস্থের একান্ত উপযোগী। উত্তাপ বেশী হওয়ায় রান্নার কাজ তাড়াতাড়ি হয়। জল বা অন্য কোন জলীয় পদার্থ উনুনে উপচে পড়লেও কারেন্ট লাগার সম্ভাবনা নেই। টোষ্ট, কেক এবং পুডিং তৈয়ারীর পৃথক ব্যবস্থা আছে। ব্যবহারের তাপ পরিবর্তনের ব্যবস্থা ব্যবহারকারীরা নিজেরাই করতে পারবেন। আদপেই সময়সাপেক্ষ নয়। মাটির সঙ্গে সংযোগ বা 'EARTH'-এর যোগাযোগ থাকায় কথায় কথায় 'শক' খেয়ে অজ্ঞান হতে হয় না। দেখতে সুশ্রী। দাম—সাধারণের সাধ্যের বাইরে নয়। এই বিশেষ উনুনটির আবিষ্কারের গৌরব শ্রীনির্মল রায়ের প্রাপ্য। প্রাপ্তিস্থান—মেসার্স সি, সি, সাহা লিমিটেড, ৪৫, মতি শীল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

ছবিতে মাননীয় ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় একটি এমারসনস' উনুন সাগ্রহে দেখছেন।

কে বলতে পারে?

গী দ্য মোপাসাঁ

হায় ভগবান! হায় ভগবান! যা'ক শেষ অবধি তা হ'লে আমি লিখতে বসেছি সেই ঘটনার কথা যা' আমার জীবনে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তা' কি আমি পেরে উঠব? আমি কি তা' লিখতে সাহস করব? সেই ঘটনা এত আশ্চর্য, এত অবোধ্য, এত অব্যাখ্য ও এত বিকৃতিকর!

আমার চোখ যা দেখেছিল তা'তে যদি আমার আস্থা না থাকত, যদি আমি এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হতুম যে আমার বিচার বুদ্ধি নির্ভুল, যে আমার দেখার মধ্যে কোন ভুল ছিল না, যে আমার সত্য নির্ধারণের ব্যাপারে কোন ফাঁকি ছিল না, তা হ'লে আমি নিজেকে পাগলা গারদের অধিবাসীদের পর্যায়ে ফেলতুম ও ভাবতুম এ সমস্তই আমার উদ্ভট কল্পনার খেলা। এ'সব সত্ত্বেও, কেই বা বলতে পারে?

আজ আমি একটা উন্মাদ আশ্রমের বাসিন্দা, কিন্তু আমি এখানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসেছি ভয়ে এবং সাবধানতার জন্যে। শুধু একজন মাত্র জীবিত ব্যক্তি আমার গল্প জানেন। তিনি হলেন এখানের চিকিৎসক। আমি গল্পটি লিখে ফেলতে বসেছি। কেন? তা'র স্পষ্ট ধারণা আমারও নেই। হয়ত এর হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায়, কারণ এটাকে আমি আমার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মত অনুভব করছি।

গল্পটি এইরূপ।

চিরকালই আমি একটু বৈরাগী প্রকৃতির মানুষ, নিজের স্বপ্নে বিভোর থাকি, এক ধরণের ভাল মানুষ, সঙ্গিহীন দার্শনিকের মতন লোক যে স্বল্পে সন্তুষ্ট। মানুষের প্রতি আমার ক্ষোভ নেই, ঈশ্বরের প্রতিও আমার কোন বিদ্বেষ নেই। আমি চিরদিনই একলা থেকেছি কারণ লোকজন আমি ঠিক সহ্য করতে পারি না। কি করে এটা আমি বোঝাই? আমি ঠিক বুঝিয়ে উঠতে পারি না। সংসার থেকে যে আমি সম্পূর্ণ বিচ্যুত নই, আমার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কথা বার্তা বলতে বা খাওয়া দাওয়া করতেও আমি অরাজি নই, কিন্তু তাদের আসবার কিছুক্ষণ পর থেকেই, আমার নিকটতম বা প্রিয়তম বন্ধু হলেও, তাদের আর আমার ভাল লাগে না, আমার বুক যেন দমে যায় এবং আমার মনে এক ক্রমবর্ধমান কাতর চিন্তার উদয় হয় যে নয় ওরা চলে যা'ক, নয়ত আমি ওদের সান্নিধ্য থেকে দূরে চলে যাই।

এই আকাঙ্ক্ষা যে একটা উদ্ভট খেয়াল মাত্র তা নয়, এটা একটা অনন্য প্রয়োজন, এবং যদি আমার কাছে যাঁরা এসেছেন তাঁরা বেশীক্ষণ থেকে যান বা আমি তাঁদের আলাপ আলোচনা বহুক্ষণ ধরে শুনতে বাধ্য হই, তা হ'লে নিঃসন্দেহে কোন না কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমি পড়বোই। কি ধরণের দুর্ঘটনা? হায়! কে বলতে পারে? হয়ত আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ব! হ্যাঁ হয়ত তাই।

একলা থাকতে আমি এত ভালবাসি যে আমার বাড়ীতে কেউ ঘুমোলেও তা আমি সহ্য করতে পারি না। আমি প্যারিসে থাকতে পারি না কারণ আমার পক্ষে সে এক অশেষ যন্ত্রণা। আমার যেন এক নৈতিক মৃত্যু হয়, আমার সর্বাঙ্গে ও স্নায়ুতে এক অসীম যন্ত্রণার নিষ্পেষণ চলে যখন মনে হয় ওই অত লোক আমার চার পাশে কিলবিল করছে, বসবাস করছে, এমন কি তারা ঘুমুলেও আমার অমন মনে হয়। হায়! অন্যদের কথা বার্তার চেয়ে তাদের নিদ্রা আমার পক্ষে যেন অধিক যন্ত্রণাদায়ক। যখন আমি জানতে পারি, যখন আমি অনুভব করি যে একটা দেওয়াল মাত্রের ব্যবধানেই এমন অনেক জীব রয়েছে যা'দের চিন্তাসূত্র এমন নিয়মিত বিচার-বুদ্ধির ফলে ছিন্ন হয়ে যায়, আমি কোন শান্তি পাই না।

আমার কেন এমন হয়? কে বলতে পারে? হয়ত এর কারণ অত্যন্ত সরল যে আমার ব্যক্তি-সত্তার বাইরের কোন জিনিসই আমার সহ্য হয় না। তবে আমার মত প্রকৃতির লোক বহু আছে।

এই জগতে আমাদের দু'রকম জাত আছে। এক ধরণের লোক আছে যারা মানুষ ভালবাসে, যারা অন্য লোকের সঙ্গ ভালবাসে, তাদের সান্নিধ্যে থাকলে তাদের মন হাল্কা হয় ও তারা শান্তি লাভ করে এবং একাকিত্ব তাদের শান্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তাদের প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে ও তারা যেন পিষ্ট হয়ে যায় যদি তাদের একলা থাকতে হয়। কোন ভয়ঙ্কর গ্লেসিয়ারে (বরফের নদী) আরোহণ করলে বা মরুভূমি পার হতে হলে যে অবস্থা হয় একলা থাকলে তাদের সেই রকম অবস্থা হয়। এবং অন্য এক ধরণের লোক আছে যাদের পক্ষে পরের সান্নিধ্য বা সঙ্গ বিরক্তিকর। ক্লান্তিজনক, শ্রান্তি উৎপাদক, অসহ্য এবং মৃত্যুতুল্য কিন্তু একলা থাকলে তারা শান্তি পায় ও নবজীবন লাভ করে এবং নিজেদের স্বাধীন স্বপ্নরাজ্যে তারা পরম আরাম উপভোগ করে।

এক কথায় বলতে গেলে এতে একটা স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার আছে। কিছু লোক বহির্মুখী জীবন যাপনের জন্য ও কিছু লোক অন্তর্মুখী জীবন যাপনের জন্য জন্মগ্রহণ করেছে। আমি বাহিরের বস্তুর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করি না, যদি বা করি তা' ক্ষণস্থায়ী এবং তা' দ্রুত অবসিত হয়। আবার যখন তা' সীমায় গিয়ে উপনীত হয় তখন আমার শারীরিক ও মানসিক চেতনায় আমি এক প্রকার অসহ্য দুরবস্থা অনুভব করি। এর ফলে আমার মনে অচেতন পদার্থের ওপর একটা গভীর মমতাবোধ হয় বা হো'ত। আমার চোখে তা'রা জীবন্ত বস্তুর সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ত এবং আমার বাড়ী আমার কাছে মনে হ'ত বা হয় যেন একটা জগৎ যেখানে আমি চেয়ার, টেবিল, অন্যান্য বস্তু ও পরিচিত দ্রব্যের মাঝখানে একক ও কর্মব্যস্ত জীবন যাপন করতাম বা করি। ওই বস্তুগুলি আমার মনে হ'ত যেন মানুষের মুখের মতনই সহানুভূতিপূর্ণ। আমি কিছু কিছু করে এই দ্রব্যগুলি যোগাড় করে আমার বাড়ী ভরিয়ে ফেলেছিলুম, আর বাড়ীটিকে সুন্দর করে সাজিয়েছিলুম এবং বাড়ীর মধ্যে আমি
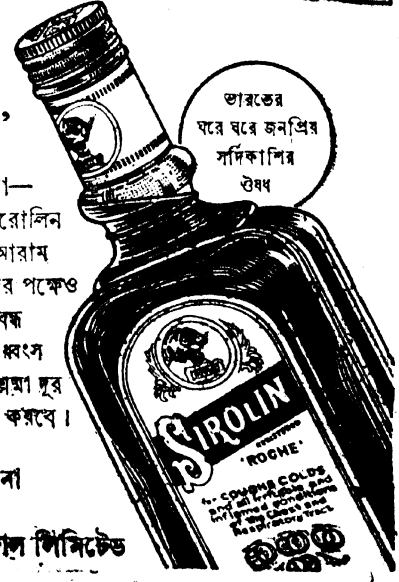
শান্তি ও সন্তুষ্টি অনুভব করতুম। আমি খুব সুখেই ছিলুম, যেমন কোন প্রিয় নারীর বাহুবন্ধনে অভ্যস্ত আদর আমাদের জীবনের একটা শান্ত ও কোমল অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

রাজপথ থেকে দূরে একটি সুন্দর উদ্যানের মধ্যে আমি বাড়ীটি তৈরী করেছিলুম, কিন্তু সেটি ছিল সহরের ফটকের কাছেই, যা'তে ইচ্ছে হলেই আমি সমাজে মেলামেশা করতে পারি। কারণ কখনো কখনো আমার মনে সে রকম ভাবের উদয় হ'ত। উঁচু দেয়াল ঘেরা আমার সব্জী বাগানের শেষ প্রান্তে আমার চাকরবাকরদের বাসগৃহ ছিল। রাত্রির আঁধারে ঢাকা বিশাল মহীরুহগুলির পাতার ছায়ায় ডুবে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, গুপ্ত আমার বাড়ীর নীরবতা আমার এত শান্তিপ্রদ ও কৃতজ্ঞ মনে হ'ত যে আমি কয়েক ঘণ্টা বিছানায় শুতে যেতুম না, যা'তে আমি আরও বহুক্ষণ সেই আনন্দ অনুভব করতে পারি।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা সহরের অপেরা হাউসে "সিগুর্ড" নাটকের অভিনয় ছিল। সেদিন প্রথম আমি সেই সুন্দর ভাবময় নাটকটি দেখেছিলুম ও প্রচুর আনন্দলাভ করেছিলুম।

আমি বেশ পা' চালিয়ে হেঁটে বাড়ী ফিরলুম। নাটকের ভালো ভালো কথাগুলি আমার কানে গুঞ্জরণ তুলছিল ও সুন্দর দৃশ্যগুলি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। চারিদিকে ছিল অন্ধকার, ভীষণ অন্ধকার, এত অন্ধকার যে আমি সামনের রাস্তা দেখতে পাচ্ছিলুম না এবং কয়েকবার আমি নর্দ্দমায় পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিলুম। আমার বাড়ীর ফটকের কাছের "চুঙ্গী" থেকে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় আধ মাইল রাস্তা, হয়ত কিছু বেশীও হতে পারে, ধরুন আস্তে হাঁটলে মিনিট কুড়ির রাস্তা। রাত্রি একটা কি দেড়টা বেজেছিল। আমার সামনের আকাশ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল একফালি চাঁদের ক্ষীণালোকে। শুক্লপক্ষের চাঁদের ফালি যা' বিকেল চারটে পাঁচটার সময় উদয় হয় তাতে থাকে ঔজ্জ্বল্য, আনন্দ ও রূপালি ঝলমলে ভাব কিন্তু যে চাঁদ ওঠে মধ্যরাত্রির পর সে হয় লালচে গোমরা ও নিরুৎসাহ—সে যেন সারা সপ্তাহ পরিশ্রমের পর একদিনের ছুটি পাওয়া চাঁদের ফালি। প্রত্যেক নিশাচর ব্যক্তি এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন। শুক্লপক্ষের সুতোর মতন ক্ষীণ চাঁদ থেকে যে আলো বিকীর্ণ হয় তাতে থাকে হ্লাদিনী শক্তি ও সেই আলোতে স্পষ্ট হয়ে ছায়াগুলো মাটিতে পড়ে, কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ফালির আলো এত নিস্তেজ ও প্রাণহীন, যে তাতে ছায়াও মাটিতে পড়ে না।

আমি দূরে আমার বাগানের তালগোল পাকানো ছায়াময় রূপ দেখতে পেলুম, কিন্তু জানি না কোথা থেকে আমার মনে তাতে প্রবেশ করবার অনিচ্ছার ভাব উদয় হলো। আমি ধীর পদবিক্ষেপে চলতে লাগলুম। রাত্রিটি ছিল শান্তিপ্রদায়িনী। বিশাল বৃক্ষগুলি মনে হচ্ছিল যেন কোন কবরস্থান, যার মধ্যে আমার বাড়ীটি প্রথিত রয়েছে।

ফটক খুলে আমি দেবদারুগাছের সারি লাগানো লম্বা পথ দিয়ে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলুম। দেবদারুগুলির মাথা ছুঁয়ে থাকায় মনে হচ্ছিল যেন আমি "টানেলের" মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি। ঘন অন্ধকার। ছোটছোট গাছপালাগুলির মধ্য দিয়ে পথ করে আমি যেতে লাগলুম আমার "লনের" পাশ কাটিয়ে যেখানে আলো-আঁধারিতে ফুলের কেয়ারিগুলি অস্পষ্ট রংয়ের ছোপের মতন মনে হচ্ছিল।

যখন বাড়ীর কাছে গিয়ে পৌঁছলুম আমার মনে এক আজব গণ্ডগোল এসে উপস্থিত হলো। আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। কোন কিছু শ্রুতিগোচর হচ্ছিল না। গাছের পাতা নাড়াবার মতনও এক কোঁটা হাওয়া ছিল না। আমি ভাবলুম "আমার কি হয়েছে?" দশ বছর ধরে আমি এই রকম ভাবে বাড়ী ফিরেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমি কখনও কোন অস্বস্তি বোধ করিনি। আমি ভয় পাইনি। আমি রাত্রে কখনও ভয় পাইনি। যদি কোন বদমাইস কিম্বা ডাকাতকে দেখতাম তো তাতে আমার ক্রোধোদ্রেক হ'ত আর তার সঙ্গে এক হাত লড়তে আমি পেছপা হতুম না। তা ছাড়া আমি সশস্ত্র ছিলুম। আমার কাছে রিভলভার ছিল। যাই হোক তা'তে আমি হাত লাগাইনি, কারণ আমার মধ্যে যে ভয়ের সঞ্চার হচ্ছিল সেটাকে প্রতিরোধ করবার ইচ্ছে প্রবল হচ্ছিল।

তবে সেটা কি ছিল? একটা পূর্ব্বাভাষ? একটা রহস্যময় পূর্ব্বাভাষ যা' মানুষের মনকে পেয়ে বসে যখন সে দেখতে পায় অজানার পদক্ষেপ? হয় ত তাই। কে বলতে পারে?

আমি যত অগ্রসর হচ্ছিলুম তত আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল, আর যখন আমি গিয়ে আমার জানালা বন্ধ বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন আমার মনে হলো যে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকবার আগে আমায় কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। তাই আমার খাস-কামরার জানালাগুলোর সামনের একটা বেঞ্চির ওপর আমি বসে পড়লুম। আমি সেখানে বসলুম, আমার শরীর কাঁপছিল একটু একটু। আমার মাথাটা দেওয়ালে ঠেস দেওয়া ছিল ও আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ছায়াময় গাছপালাগুলির দিকে। প্রথম কয়েক মিনিট আমার চারপাশে কোন কিছুই লক্ষ্যগোচর হয়নি। আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল কিন্তু সে রকম প্রা[illegible] হ'ত। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যেন রেলগাড়ী যাচ্ছে কিম্বা [illegible] ধ্বনি হচ্ছে কিম্বা যেন একদল সৈনিক চলে যাচ্ছে।

তারপর সেই ঝাঁ-ঝাঁ আওয়াজ আরও অধিক স্পষ্ট হলো, পরিষ্কার ভাবে বোঝা যেতে লাগলো যে সেটা কিসের শব্দ। আমি নিজেকে প্রতারণা করেছিলুম। সেই শব্দ যা' আমার কানে এসে ধ্বনিত হচ্ছিল সেটা আমার ধমনীর স্বাভাবিক গতি সঞ্জাত ছিল না, কিন্তু সেই সঙ্গে সেটা ছিল একটা গোলমেলে আওয়াজ যেটা নিঃসন্দেহে আমার বাড়ীর অন্দর থেকে আসছিল।

আমি দেওয়ালের মধ্যে দিয়েও সেই সমানতালের বাধাহীন কোলাহলটা আলাদা ভাবে বুঝতে পারছিলুম। সেটাকে আওয়াজ না বলে একটা কাঁপুনি বললেই বোধহয় ঠিক হবে। অনেকগুলো জিনিষের উদ্দেশ্যহীন ভাবে নড়াচড়ার আওয়াজ। ঐ রকম মনে হচ্ছিল যেন আমার সমস্ত আসবাবপত্র, আমার চেয়ার টেবিল যেন নড়ানো হয়েছে, তা'দের নিজের জায়গা থেকে সরানো হয়েছে ও এধার ওধার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

উঃ! আমি বেশ কিছুক্ষণ নিজেকে প্রশ্ন করলুম যে আমার স্মৃতিশক্তি বিশ্বাসযোগ্য রয়েছে কি-না, কিন্তু জানালার কপাটে কান লাগিয়ে আমার বাড়ীর ভেতরেই এই সব আজগুবি গণ্ডগোলের একটা স্পষ্ট ধারণা করে আমি সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হলুম যে আমার বাড়ীর মধ্যে কিছু একটা অস্বাভাবিক ও অবোধ্য ব্যাপার ঘটে চলেছে। আমি ভীত হইনি, তবে আমি কি করে সেটা বোঝাব? আমি এত অবাক হয়ে গিয়েছিলুম যে আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হচ্ছিল না। আমি

রিভলভার বার করিনি, কারণ আমি জানতুম যে সেটা ব্যবহার করবার সুযোগ হবে না। আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলুম।

অতঃপর আমি আমার কাপুরুষতার জন্য লজ্জানুভব করে আমার চাবির গোছা থেকে যে চাবিটা দরকার সেটা বেছে নিয়ে তালাতে লাগালুম। দু'বার সেটা ঘুরিয়ে আমার যত শক্তি আছে তা' দিয়ে দরজাটা এত জোরে ঠেললুম যে পাল্লা দু'টো গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেলে! আওয়াজটা ঠিক বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজের মতন হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার বাড়ীর ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত সেই আওয়াজের জবাবে এক ভয়াবহ গোলমাল উত্থিত হ'ল। সেটা এতই অভাবনীয়, এত ভয়ঙ্কর ও এত কর্ণপটাহ-বিদারী যে, আমি কয়েক পা পিছিয়ে এলুম এবং যদিও আমি ভাল করে জানতুম যে কত অনাবশ্যক সেই প্রচেষ্টা, তবুও আমি খাপ থেকে আমার রিভলভারটা বার করলুম।

আমি আবার প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। উঃ! যদিও তা' শুধু একটু মাত্র সময়ের জন্য। এবার আমি শুনতে পেলুম একটা আজব খট্‌-খট্‌ আওয়াজ, যেটা আমার সিঁড়ির পৈঁঠার ওপর দিয়ে, কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে ও গালিচার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল—তবে সে আওয়াজটা মানুষের জুতোর কিম্বা অন্য কোন পদত্রাণের নয়, যেটা হচ্ছিল "ক্রাচের" শব্দ, কাঠের তৈরী "ক্রাচের"। আর একরকম শব্দ হচ্ছিল যেমন হয় খঞ্জনী বাজালে। কি আশ্চর্য! আমার দরজার মুখে হঠাৎ আমি দেখতে পেলুম আমার বড় পড়বার চেয়ারটা খট্‌-খট্‌ করতে করতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। সেটা বাগানের মধ্যে দিয়ে চলে গেল। বৈঠকখানার চেয়ারগুলো প্রথমে গেল, তারপর গেল নীচু সোফাগুলো। ঠিক কুমীরের মতন ছোট ছোট পা ফেলে তারা চলে গেল। তাদের পর আমার অন্য সব চেয়ারগুলো ছাগলের মতন লাফাতে লাফাতে ও পাদানীগুলো খরগোশের মতন খুট খুট করতে করতে চলে গেল।

উঃ কি অভিজ্ঞতা! আমি একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লুম ও সেখানে গুঁড়ি মেরে বসে বসে আমার জিনিষপত্রের পালানো দেখছিলুম, কারণ তারা সকলেই একে একে যাচ্ছিল, কেউ বা আস্তে আস্তে, কেউ বা তাড়াতাড়ি, যা'র যেমন আকার বা ভার, সেই অনুসারে। আমার বড় পিয়ানোটা ঠিক ক্ষেপা ঘোড়ার মতন লাফাতে লাফাতে চলে যাচ্ছিল ও তার থেকে বাজনার একটা ক্ষীণ মরমর ধ্বনি ভেসে আসছিল এবং ছোট ছোট দ্রব্য-সামগ্রীগুলি যথা বুরুষ, কাঁচের গেলাস, পেয়ালা ইত্যাদিগুলি পিপীলিকাশ্রেণীর মত বালির ওপর দিয়ে সার বেঁধে যাচ্ছিল আর সেগুলির ওপর চাঁদের আলো পড়াতে মনে হচ্ছিল যেন জোনাকি জ্বলছে। সিল্কের ও পশমের কাপড়-চাদরগুলি বুক পেচনা দিয়ে যাচ্ছিল ও সামুদ্রিক বিকট জীবদের মতন চওড়া হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছিল, মনে হচ্ছিল যেন অক্টোপাস ও ডানমাছেরা যাচ্ছে। আমি দেখতে পেলুম যে আমার ডেস্কোটি এগিয়ে আসছে, যেটি গত শতাব্দীর একটি দুর্লভ সামগ্রী, যাতে ছিল আজ অবধি আমার পাওয়া সব চিঠিগুলি। যেগুলিতে আমার হৃদয়ের সমস্ত ইতিহাস সঞ্চিত ছিল—একটি পুরাতন ইতিহাস, যা আমার এত দুঃখের কারণ ছিল। আর ওরই মধ্যে ছিল সব ফোটোগুলিও।

হঠাৎ আমার ভয় অপসারিত হ'ল। আমি দৌড়ে গিয়ে ডেস্কটি ধরে ফেললুম যেমন করে আমরা ডাকাতকে ধরি। যেমন করে আমরা কোন রমণীকে ধরি—যে আমাদের কাছ থেকে পালাতে চাচ্ছে, কিন্তু সেটা একটুও না থেমে চলতেই থাকলো এবং আমার চেষ্টা ও রাগ সত্বেও আমি তার গতিরোধ করতে অসমর্থ হলুম। আমি পাগলের মতন সেই ভয়ঙ্কর শক্তিকে পেছন থেকে টেনে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করলুম কিন্তু তার সঙ্গে দ্বন্দ্বে আমি ভূপাতিত হলুম ও সেটা আমায় টেনে-হিঁচড়ে সেই বালির রাস্তা দিয়ে নিয়ে চললো এবং যে সমস্ত আসবাবপত্রগুলো ওর পেছন পেছন আসছিল, সেগুলো আমার ঘাড়ের ওপর পড়ছিল, আমার পা মাড়িয়ে জখম করে দিচ্ছিল। যখন আমি সেটাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলুম, অন্যগুলো আমার শরীরের ওপর দিয়ে চলে গেল, যেমন করে একদল ঘোড়সওয়ার মাটিতে পড়ে যাওয়া তাদের সঙ্গী ঘোড়সওয়ারকে পিষে চলে যায়।

ভয়ে উন্মাদপ্রায় হয়ে শেষ অবধি আমি কোন রকমে তাদের যাবার রাস্তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এলুম এবং আবার গাছের আড়ালে লুকিয়ে এবার আমি আমার খুচরো ছোটখাট দ্রব্যগুলির অপসরণ দেখতে লাগলুম। এই সমস্ত দ্রব্যগুলির অস্তিত্বও আমার নিকট অজ্ঞাত ছিল।

অতঃপর দূরে আমার বাড়ীটা থেকে খালি বাড়ীর ফাঁকা আওয়াজ ভেসে এল। আমি শুনতে পেলুম, দমাদম করে দরজা বন্ধ হবার শ্রুতিকটু আওয়াজ। ওপর থেকে নীচের তলার অবধি সব দরজা বন্ধ করবার আওয়াজ হতে হতে বাড়ীর সদর দরজাটাও, যেটাকে আমি বোকার মতন খুলে দিয়ে এদের পালাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলুম, বন্ধ হয়ে গেল সবশেষে।

আমি তৎক্ষণাৎ সহরের দিকে দৌড়তে লাগলুম এবং যখন আমি সহরের রাস্তায় পড়ে অধিক রাত্রের গৃহাভিমুখী লোকজনদের দেখতে পেলুম, তখন আমার আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেলুম। আমি পরিচিত একটা হোটেলে গেলুম ও ঘণ্টা বাজালুম। কাপড়-চোপড় থেকে ধুলোবালি হাত দিয়ে ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে নিয়েছিলুম এবং তাদের বললুম যে, আমি চাবির গোছা হারিয়ে ফেলেছি আর তার মধ্যেই আমার চাকরদের বাগানের চাবিটাও ছিল। এই বাগানে তারা ঘুমোয় আলাদা বাড়ীতে। এই বাগানটার চারিদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আছে, যাতে আমার ফলমূল ও শাকসব্জি চোরের উপদ্রব থেকে রক্ষা পায়।

আমায় যে বিছানাটা তারা দিলে, তাতে আমি চোখ পর্যন্ত ঢেকে শুয়ে পড়লুম কিন্তু ঘুমোতে পারলুম না এবং সকাল অবধি শুয়ে শুয়ে নিজের বুকের ঢিপঢিপানি শুনতে শুনতে সময় অতিবাহিত করলুম। আমি আদেশ দিয়েছিলুম যে, ভোরবেলাতেই যেন আমার চাকরদের খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয় যে আমি এখানে আছি এবং সকাল সাতটায় আমার খাস বেয়ারা এসে আমার দরজায় টোকা দিল। তার মুখে ভয়ের চিহ্ন সুপরিস্ফুট ছিল। সে বললে, "হুজুর, গতকাল রাত্রে একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।"

"কি হয়েছে?"

"হুজুরের সমস্ত আসবাবপত্র চুরি হয়ে গেছে; এমন কি, অতি সামান্য জিনিষপত্রও বাদ যায় নি।"

এই খবর জানতে পেরে আমার আনন্দ হলো। কেন? কে বলতে পারে? এরূপ হওয়াতে আমি আমার আত্মকর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলুম, এর থেকে আমি স্বরূপ গোপনের সুযোগ লাভ করলুম। আমি

যা' যাচকে প্রত্যক্ষ করেছিলুম তা' আর আমায় কাউকে বলতে হবে না, তা' গোপন করতে পারব—এই কথাটি আমি মনের মণিকোঠায় একটি ভয়াবহ গোপন রহস্যের মত চিরতরে প্রোথিত করে রাখতে পারব। আমি তাকে এইরূপ উত্তর দিলুম।

—"তা'হলে মনে হচ্ছে যে এরা সেই দলেরই লোক যারা আমার চাবি চুরি করেছে। পুলিসকে এখনি খবর দেওয়া দরকার। আমি এখনি উঠবো ও একটু পরেই তোমাদের কাছে যাব।

পাঁচ মাস ধরে তদন্ত চললো। কোন কিছুই আবিষ্কৃত হ'ল না। ডাকাতদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। আমার জিনিষপত্রের এক টুকরোও পাওয়া গেল না। কিন্তু যদি আমি যা' জানতুম তা' বলতুম, তা' হলে ওরা আমায় জেলখানায় বন্ধ করে রাখত—আমাকেই বন্ধ করে রাখত, চোরদের নয়—কারণ, আমি এ' রকম লোক যে এই ধরণের জিনিষ দেখেছি।

ওঃ! আমি এটা ভাল করেই জানতুম যে, আমার মুখ চুপ করে রাখতে হবে। যাই হো'ক, বাড়ীকে পুনর্বার সাজাইনি। তা' করে আর লাভ হ'ত না, কারণ সেই একই জিনিষ আবার ঘটতো। আমার সেখানে ফেরারও আর ইচ্ছে ছিল না। ফিরেও যাইনি। কখনও আর সে বাড়ী চোখে দেখিনি।

সেখান থেকে চলে গিয়ে প্যারিসে বসবাস করতে আরম্ভ করলুম একটি হোটেলে। আমার স্নায়বিক অবস্থার বিষয়ে ডাক্তারদের পরামর্শ গ্রহণ করা আরম্ভ করলুম, কারণ সেই অশুভ রাত্রির পর থেকেই আমি সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলুম। তাঁরা আমার দেশেবিদেশে ভ্রমণের পরামর্শ দিলেন। আমি তাঁদের পরামর্শ শিরোধার্য করলুম।

২

আমি প্রথম গেলুম ইটালিতে। সূর্য্যালোক আমার পক্ষে উপকারী হয়েছিল। আমি ছ'মাস ধরে জেনোয়া থেকে ভেনিস, ভেনিস থেকে ফ্লোরেন্স, ফ্লোরেন্স থেকে রোম, রোম থেকে নেপলস করে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। তারপর সিসিলী দ্বীপ ঘুরলুম। সেই দেশের স্বাভাবিক সৌন্দর্য, তার পর্বতমালা, গ্রীক ও নর্ম্যানদের তৈরী স্থাপত্য শিল্পগুলি সেখানের বিশেষ আকর্ষণ। সেখান থেকে পাড়ি দিলুম আফ্রিকায়। সেখানে বেশীর ভাগ রাত্রি বেলায় কোন রকম বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন না হয়েই আমি উট, গেজেল ও বেদুইন আরব অধ্যুষিত সেই হলুদবর্ণ মরুভূমি পার করলুম যেখানের স্বচ্ছ আবহাওয়ায় কোন ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হয় না।

আমি মার্সেলেস হয়ে ফ্রান্সে পুনঃ প্রবেশ করলুম এবং প্রোভেন্সের অধিবাসীদের হৈ-হুল্লোড় সত্ত্বেও ওই প্রদেশের ক্ষীণাভ আলো আমার মনে নিয়ে এলো বিষাদ। কন্টিনেন্টে ফিরে আসতেই আমার সেই রোগীর মত অবস্থা হ'ল যার বিশ্বাস যে সে সেরে গেছে কিন্তু একটা ফিক ব্যথায় যার মনে আবার সন্দেহ হয় যে তার অসুখের জের এখনও মেটেনি।

অতঃপর আমি প্যারিসে ফিরে এলুম। এক মাস যেতেই জীবনে বিরক্ত হয়ে উঠলুম। এই সময়টা ছিল হেমন্তকাল। আমার মনে একটা ইচ্ছার উদয় হ'ল যে শীত পড়বার আগেই নরম্যাণ্ডী প্রদেশটা এক চক্কর ঘুরে আসা যাক, কারণ এ দেশটার সঙ্গে আমার পরিচয় [illegible] না।

আমি রুঁয়ে থেকে যাত্রা শুরু করলুম গতানুগতিক ভাবে সপ্তাহ খানেক ধরে এই মধ্যযুগীয় সহরের রাস্তায় রাস্তায় উচ্ছ আনন্দোচ্ছ্বাসে ঘুরে বেড়ালুম। এই সহরটিকে আশ্চর্য গথিক স্থাপত্যে মিউজিয়ামও বলা চলতে পারে।

একদিন বিকেল প্রায় চারটের সময় যখন আমি "ইউ ড রোবেক' নামে কালীর মত কালো জলধারা দ্বারা দ্বিখণ্ডিত এক বিচিত্র রাস্তা ধরে হাঁটছিলুম ও পথিপার্শ্বের উদ্ভট ও বহু প্রাচীন ধরণের বাড়ীগুলি কথা ভাবছিলুম তখন সহসা আমার দৃষ্টি পাশাপাশি অবস্থিত একসারি পুরাতন দ্রব্য বিক্রেতার দোকান ঘরগুলির প্রতি আকর্ষিত হ'ল।

আঃ। এই সব পুরাতন ফক্কিকারী দ্রব্যের নোংরা কারবারীর বেশ ভাল জায়গাই বেছে নিয়েছে। এই বিচিত্র অপ্রশস্ত রাস্তায় এই ঘৃণিত জলপথের ওপরে এই সব টালি বা স্লেটপাথরের চূড়াওয়ালা বাড়ীগুলির নীচের তলায় যেগুলির ওপর পুরাতন ধরণের আবহাওয়াজ্ঞাপক মোরগগুলো বায়ুর গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করে উঠছিল।

অন্ধকার দোকানঘরের মধ্যে গাদা করা অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল নক্সা কাটা সিন্দুক, রুঁয়ে, নেভার্স ও মুষ্টিয়েরসের মাটির বাসন ও খেলনা, ওক কাঠের তৈরী রং করা প্রতিমূর্তি, খৃষ্টের, কুমারী মেরীর ও সন্তদের প্রতিকৃতি, যাজকদের অলঙ্কার, গাত্রাবরণ, মাথার টুপি, এমনকি পবিত্র বৃহৎ পাত্রাদি এবং একটি প্রাচীন সোনার জলে রং করা কাঠের তৈরী দেবপূজার তাঁবু—যাতে কোন দেবতা আর বিরাজমান ছিলেন না। ও! এই সমস্ত সুউচ্চ বাড়ীগুলির আশ্চর্য গভীর প্রশস্ত গুহার মত ঘরগুলিতে, কড়িকাঠ থেকে তলঘর অবধি ঠাসা ছিল হরেক রকমের জিনিষপত্র—যেগুলো মনে হচ্ছিল যেন ব্যবহারের অতীত হয়ে গেছে কিন্তু যেগুলো নিজেদের আসল মালিকদের, নিজেদের যুগের, নিজেদের সময়ের, নিজেদের রীতির মৃত্যুর পরও বেঁচে আছে পরবর্তী কালের নতুন মানুষদের দ্বারা ক্রীত ও প্রাচীন দ্রষ্টব্য সামগ্রীরূপে ব্যবহৃত হবার জন্য।

এই পুরাতাত্ত্বিক অঞ্চলে এসে আমার প্রাচীন বিচিত্র জিনিষপত্র কেনার শখ পুনরুজ্জীবিত হ'ল। দুর্গন্ধময় 'ইউ ড রোবেকের' ওপর চারটে পচা পাটাতনের পোল দুই লাফে পেরিয়ে আমি এক দোকান থেকে অন্য দোকানে গেলুম।

হায়! হায়! আমার কি অবস্থাই না হয়েছিল! পুরাতন আসবাবপত্রের কবরখানার মতন হরেকরকমের জিনিষপত্র ঠাসা একটা তলঘরে ঢোকবার মুখেই আমার চোখে পড়লো আমারই উত্তম শেলফগুলির একটা। আমি কাঁপতে কাঁপতে সেটার কাছে গেলুম। আমি এত অধিকমাত্রায় কাঁপছিলুম যে, সেটাকে স্পর্শ করতে সাহস করলুম না। সেটাকে স্পর্শ করবার জন্যে হাত প্রসারিত করলুম কিন্তু ইতস্ততঃ করে হাত সরিয়ে নিলুম।

সেট যে আমার সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। সেটা ছিল ত্রয়োদশ লুই এর সময়ের অদ্বিতীয় শেলফ, যেটাকে একবার দেখলে পরে চিনতেও আর কোনই কষ্ট হয় না। হঠাৎ দৃষ্টি আরও একটু প্রসারিত করে ওই তলঘরের স্তিমিত আলোকিত অংশে আমি দেখতে পেলুম মিহি সেলাই করা ঢাকা সমেত আমার তিনটি আরাম-কেদারা এবং আরও একটু তফাতে দ্বিতীয় হেনরীর আমলের আমার দু'টি টেবিলও রয়েছে, যে সমস্ত দুর্লভ বস্তুগুলি একবার

মাত্র দেখবার জন্তে লোকে প্যারিস থেকে আসতো। ভাবুন! শুধু ভেবে দেখুন, আমার মনের অবস্থা তখন কি রকম হয়ে থাকবে।

আমি এগিয়ে যেতে লাগলুম। ভাবাবেশে আমার শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল ও আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। তবুও আমি এগুলুম—কারণ আমি সাহসী—আমি এগুলুম যেমন করে মধ্যযুগের একজন 'নাইট' যাদুকরদের আড্ডায় গিয়ে প্রবেশ করত। আমি যত এগিয়ে যেতে লাগলুম আমার সমস্ত জিনিষপত্রই সেখানে দেখতে পেলুম—আমার ঝাড়বাতিগুলি, বইপত্র, ছবিগুলি। আমার সিল্কের ও পশমের জিনিষগুলি, আমার অস্ত্রাদি—সবগুলিই দেখতে পেলুম, কিন্তু পেলুম না সেই ডেস্কটি যাতে আমার চিঠি-পত্রগুলি থাকত। সেটির কোন চিহ্ন কোনখানে পেলুম না।

আমি অন্ধকার হলঘরগুলিতে নেমে নেমে দেখতে লাগলুম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওপরে বেরিয়ে আসতে লাগলুম। আমি একলা ছিলুম। আমি ডাকলুম কিন্তু কোন সাড়া পেলুম না? আমি ছিলুম সম্পূর্ণ একলা। সেইবিরাট বাড়ীর গোলোক ধাঁধার মতন চলন-পথগুলিতে একটি প্রাণীও ছিল না।

রাত্রি ঘনিয়ে এল। আমি কিছুতেই যাব না বলে সেই অন্ধকারের মধ্যে আমার আমারই একটা চেয়ারে বসে পড়তে হলো। মাঝে মাঝে আমি চীৎকার করছিলুম—"হ্যালো! কেউ আছেন?"

সেখানে প্রায় এক ঘন্টারও অধিক সময় বসে থাকবার পর পদধ্বনি শুনতে পেলুম। কোমল ও ধীর পদক্ষেপের শব্দ কিন্তু কোথা থেকে সেই শব্দ আসছিল, তা বুঝতে পারছিলুম না। প্রায় পালাবার যোগাড় করছিলুম, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে আমি আবার চীৎকার করলুম এবং পাশের কামরায় একটা আলো দেখতে পেলুম।

"ওখানে কে?" একটা আওয়াজ এ'ল।

"এক জন খরিদ্দার", আমি উত্তর দিলুম।

জবাব এল, "এই ভাবে দোকানে ঢোকার সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে।"

আমি বললুম,—"আমি আপনার জন্ত এক ঘন্টারও বেশী সময় অপেক্ষা করে আছি।"

"আপনি আবার আগামী কাল আসতে পারেন"—দোকানদার বলল।

আমি,—"কাল আমি ফ্রাঁস ছেড়ে চলে যা'ব।"

আমি এগুতে সাহস করলুম না এবং সেও আমার কাছে এল না। তখনও তার প্রদীপের আলো দেখতে পাচ্ছিলুম। আলোটা এসে পড়েছিল একটা পরদার কাপড়ে, যেটার ওপর একটা ছবি আঁকা ছিল। সেই ছবিটার বিষয় ছিল, "একটা রণক্ষেত্রে মৃতদের ওপর দু'জন দেবদূত উড়ে বেড়াচ্ছেন।" সেটাও ছিল আমার সম্পত্তি।

প্রশ্ন করলুম, "কি আপনি আসছেন না কি?"

জবাব এল, "আমি এখানে আপনার জন্তে অপেক্ষা করছি।"

উঠে তাঁ'র দিকে গেলুম। একটা প্রকাণ্ড ঘরের মাঝখানে একটি

ছোটখাট ব্যক্তি বসে ছিল। খুবই ছোটখাট ও খুব মোটা, এত মোটা যে আমার তাকে দেখে ঘৃণা বোধ হচ্ছিল। তাঁর পাতলা দাড়িটি ছিল কয়েক গাছি অসমান, হলদেটে রংয়ের চুলের সমষ্টি এবং মাথায় একগাছিও কেশ ছিল না। এক গাছিও না! যখন সে মোমবাতিটা এক হাত দূরে তুলে ধরে আমাকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করছিল, তখন পুরাতন আসবাবপত্রে বোঝাই সেই বিরাট কক্ষে তার মাথাটি আমার মনে হচ্ছিল যেন একটি ছোট চাঁদ। তার মুখমণ্ডল ফোলা ও তার চর্ম কুঞ্চিত ছিল, ও চোখ দু'টি দেখা যাচ্ছিল না।

আমারই সম্পত্তি তিনটি কেদারার দর করলুম ও তার জন্য মোটা টাকা নগদ দিলুম। হোটেলে আমার কামরার নম্বর দিলুম, সেগুলি পরদিন সকাল নয়টার আগে সেখানে পৌঁছে দেবার জন্য। অতঃপর আমি চলে এলুম। সে আমায় খুব ভদ্রতা করে বাইরের দরজা পর্যন্ত দিয়ে গেল।

এরপর আমি সহরের পুলিশ কমিশনারের সহিত দেখা করলুম এবং তাঁকে আমার আসবাবপত্র চুরির পরে সেগুলি আবিষ্কার পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলুম। তিনি তৎক্ষণাৎ যে পাবলিক প্রসিকিউটার ডাকাতির তদন্ত করেছিলেন, তাঁর কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সমস্ত ব্যাপারের খুঁটিনাটি জানতে চাইলেন ও আমায় সেই তারের উত্তর না পাওয়া অবধি অপেক্ষা করতে বললেন। এক ঘন্টার মধ্যেই তিনি জবাব পেলেন এবং সে উত্তর সর্বাংশে আমারই অনুকূল।

তিনি আমায় বললেন, "আমি এক্ষুণি এই লোকটাকে বন্দী করব ও পরীক্ষা করে দেখব, কারণ তার সন্দেহ হতে পারে, ও সে আপনার আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করতে পারে। আপনি বরং স্নান ও খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরে আসুন। ইতিমধ্যে আমি তাকে এইখানে ডেকে পাঠাচ্ছি এবং আপনি ফিরে এলে পরে আপনার সামনে তাকে আর এক দফা পরীক্ষা করব।"

আমি বললাম, "আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, আমি আপনার কথামত কাজই করব।"

আমি হোটেলে ফিরে খেতে বসে বেশ মনের সুখে খেলুম। এতটা আমি আশা করতে পারিনি। অবস্থার শুভ পরিবর্তনে আমার মনে খুব আনন্দ হয়েছিল। যাক, লোকটা ত গারদে আছে। ঘন্টা দুই পরে আমি পুলিশ সাহেবের কাছে ফিরে গেলুম। তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই তিনি বললেন, "শুনুন মশাই! আমরা আপনার লোককে খুঁজে পাইনি। আমার লোকেরা তাকে ধরতে পারেনি।"

আঃ! আমার মনটা যেন ভীষণ দমে গেলো। "কিন্তু আপনি তার বাড়ীটা ত খুঁজে পেয়েছিলেন?"—আমি প্রশ্ন করলুম।

"নিশ্চয়। আমরা পাহারা বসিয়ে দোব ওই বাড়ীটার ওপর। ও যত দিন না আসে ততদিন খোঁজ করব। লোকটা কিন্তু সরে পড়েছে।"

"সরে পড়েছে?"

"সরে পড়েছে। সে সাধারণতঃ তার প্রতিবেশিনী, বিধবা বিদোইনের বাড়ীতে সন্ধ্যেবেলা আড্ডা দেয়। এই প্রতিবেশিনীটিও পুরাতন জিনিষ পত্রের দোকান করে ও মিথ্যা ভাগ্যগণনাও করে থাকে। সে তাকে আজ সন্ধ্যেবেলা দেখতে পায়নি এবং তার কোন খবরও দিতে পারে নি। আমাদের আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

আমি চলে এলুম। ওঃ! কি ভয়ঙ্কর, কি ভূতে পাওয়া ও ভীতিজনক রুঁয়ের রাস্তাগুলি আমার মনে হচ্ছিল সেদিন রাত্রে!

আমার ভালো ঘুম হয়নি। একটু একটু তন্দ্রার মধ্যে আমি প্রতিবারই ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠছিলুম। আমি যে অত্যধিক চিন্তিত কিম্বা অধীর হয়ে উঠিনি, এটা দেখাবার জন্যে পরের দিন সকাল দশটা অবধি অপেক্ষা করে আমি থানায় গেলুম।

কারবারীর আর বিশেষ কোনই খবর পাওয়া যায়নি। তার দোকান বন্ধই ছিল। পুলিস সাহেব আমায় বললেন, "আমি সব দরকারী ব্যবস্থাই করেছি। পাবলিক প্রসিকিউটারকে মামলার সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা হয়েছে। আমরা সকলে মিলে দোকানে যাব ও দোকান খোলাব এবং আপনি নিজের সম্পত্তিগুলি দেখিয়ে দেবেন।"

একটা ঘোড়ার গাড়ী করে আমরা সেখানে গেলুম। দোকানের সামনে একদল পুলিস ও একজন চাবিওয়ালা দাঁড়িয়েছিল। দোকানের দরজা খুলতে বেশী দেরি হ'ল না।

যখন আমরা ভেতরে প্রবেশ করলুম আমি আমার শেলফ, আরাম কেদারা বা টেবিলের কোন চিহ্নই দেখতে পেলুম না। আমার বাড়ীর কোন আসবাবপত্রই সেখানে ছিল না, যদিও আগের দিন রাত্রে আমি প্রতি পদে পদে সেগুলি দেখতে পাচ্ছিলুম। পুলিস সাহেব ঘাবড়ে গিয়ে প্রথমে আমার দিকে অবিশ্বাসের সঙ্গে দেখতে লাগলেন।

আমি বললুম, "কিন্তু মশাই, আমার আসবাবপত্রের সঙ্গে সঙ্গে দোকানদারের অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে একটা আশ্চর্য মিল রয়েছে।"

তিনি হাসলেন, "সেটা সত্যি কাল আপনার জিনিষ কিনে দাম দেওয়াটা ভুল হয়ে গেছে। হাইতে ও সাবধান হয়ে গেছে।"

আমি বললুম, "যে কথাটা আমি বুঝতে পারছি না সেটা এই, যে জায়গাতে আমার আসবাবপত্রগুলো ছিল, সে জায়গায় অন্য জিনিষ কি করে ভরে দিল।"

"ওঃ!" পুলিস সাহেব বললেন, "সারা রাত্রি ওর হাতে ছিল ও সাঙ্গোপাঙ্গও নিশ্চয়ই ছিল। তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই বাড়ীর সঙ্গে পাশের বাড়ীগুলোর নিশ্চয়ই যোগ আছে। ভয় পাবেন না মশাই, আমি এই বিষয়ে তদন্ত করব। বদমাইশটা বেশী সময় আমাদের হাত ছাড়া হয়ে থাকতে পারবে না, কারণ প্রবেশপথে আমরা পাহারা বসিয়ে রেখেছি।"

আহো! আমার বুকের সে কি ঢিপঢিপানি!

আমি রুঁয়েতে দিন পনের রইলুম। সে লোকটা ফিরে এলো না। ও যে ধরণের লোক তাকে ধরতে পারার আশা কে করতে পারে বা তাঁর পরিকল্পনায় কে বাধা দিতে পারে!

ষোল দিনের দিন সকাল বেলা আমি আমার মালির কাছ থেকে এই বিচিত্র চিঠিখানি পেলুম। এই মালিকে আমি আমার আসবাবপত্র-অপহৃত খালি বাড়ীর তদারকের কাজে নিযুক্ত করে ছিলুম। চিঠিটি এই রূপ:—

মহাশয়!

সসম্মানে আপনাকে একটি ঘটনার কথা যা' কাল রাত্রে ঘটেছে, জানাচ্ছি। সে ঘটনা আমাদের কিম্বা পুলিসদের কারো বোধগম্য হয়নি! সমস্ত আসবাবপত্র ফেরৎ দিয়ে গেছে।

কোন কিছুই বাদ নেই। ডাকাতি হবার আগের দিন অবধি বাড়ী যেমন ছিল, তেমন হয়েছে। যা হয়েছে তা'তে যে কোন লোকের মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। শুক্রবার রাত্রে এই ঘটনা হয়েছে। সমস্ত রাস্তার মাটি কেটে গেছে যেন প্রতিটি জিনিষকে টেনে হিঁচড়ে আনা হয়েছে। যেদিন জিনিষগুলি অন্তর্হিত হয়েছিল সেদিনও এমনি হয়েছিল।

আমরা আপনার আগমনের অপেক্ষা করছি। ইতি

আপনার বিনীত সেবক

ফিলিপ রোডিন।

ও:—না! ও:—না! ও:—না! আমি সেখানে ফিরে যাব না। আমি চিঠিটা রুঁয়ের পুলিস সাহেবের কাছে নিয়ে গেলাম।

তিনি বল্লেন, "এ ত খুব চতুর ভাবে ফেরৎ দিয়েছে। আমাদের দেখাতে হবে যেন আমরা কিছুই জানি না এবং চুপচাপ থাকতে হবে। কিছু দিনের মধ্যেই লোকটাকে ধরতে হবে।"

কিন্তু তাকে ধরা যায়নি। না, তাঁরা তাকে ধরতে পারেন নি এবং এখন তাকে আমি আমার পেছনে লেলিয়ে দেওয়া জংলী জানোয়ারের মতন ভয় করি।

তাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব! সেই পূর্ণচন্দ্রের মতন টাকওয়ালা মাথার দানবকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব! তাকে কখনও ধরা যাবে না। সে কোনও দিন নিজের বাড়ীতে ফিরে আসবে না। তা'র তা'তে কিইবা আসে যায়। আমার সঙ্গে দেখা হওয়াকেই শুধু সে ভয় পায় এবং আমিও দেখা করব না।

না! না! না!

আর যদি সে ফিরেও আসে এবং দোকান অধিকার করে তখন কে প্রমাণ করতে পারবে যে তা'র কাছে আমার আসবাবপত্র ছিল। এক আমার সাক্ষ্য তা'র বিরুদ্ধে এবং আমার মনে হয় তা' সকলে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে।

আ:! কিন্তু না! ওই রকম ভাবে জীবন যাপন করা আর চলতে পারে না। আর তা' হলে আমি যা' দেখেছিলুম তা' আর গোপন রাখা অসম্ভব হবে। সেই রকম আবার হতে পারে এই ভয় নিয়ে আমার পক্ষে সাধারণ লোকের মতন জীবন যাপন করা সম্ভব নয়।

আমি এই উন্মাদ আশ্রমের ডাক্তারবাবুর কাছে এসে সব কথা বলেছি।

আমায় অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে তিনি বললেন, "আপনি কি এখানে কিছুদিনের জন্য থাকতে রাজি হবেন

"আনন্দের সঙ্গে।"

"আপনার সঙ্গতি আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে।"

"আপনি কি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে চান?"

"না মশাই, কোন লোকের সঙ্গেও না। সেই রুঁয়ের লোকটা হয়ত প্রতিশোধ নেবার জন্য এখানে ধাওয়া করতে পারে।"

এবং সেই হেতু আমি একেবারে একলা এখানে আছি প্রায় তিন মাস হ'ল। আমার মন বেশ শান্ত রয়েছে। আমার শুধু একটি জিনিষকে ভয়—যদি সেই প্রাচীন দ্রব্য বিক্রেতারও মাথা খারাপ হয় ও তাকেও যদি এই আশ্রমে আনা হয়—এখানকার কোন বন্দীই আমার পক্ষে নিরাপদ নয়।

অনুবাদক—অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

বীর রাজা বেওলফ্

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

অনেক দিন আগে ডেন জাতির এক রাজা ছিলেন। নাম ছিল তাঁর রথগার। রথগার খুব সদাশয় রাজা ছিলেন। লোকের দুঃখ-অভাবের দিকে তাঁর খুব নজর ছিল। তাই যাতে বাড়ীর অভাবে লোকেরা শীতে না দুঃখ ভোগ করে, তারই তরে রাজা সাগরের ধারে একটা বিরাট বাড়ী তৈরী করে তাতে বিরাট এক ভোজের আর নাচ গানের আসর বসালেন। দেশের সব লোক সেই নাচগান আর ভোজের আসরে এসে আমোদ করতে লাগলো। হলে হবে কি, একটা অঘটন ঘটলো হঠাৎ! সাগরের জলের তলায় দানব থাকতো। গভীর রাতে যখন রাজপুরী নিঝুম, তখন সেই দানব উঠে এসে রাজার এক অনুচরকে ধরে নিয়ে গেল। তার নাম ছিল ডেল খুব ভয়ানক জানোয়ার। সারা গা তার ইয়া বড় বড় কাঁটায় ভরা! আর চোখ দুটো দিয়ে সব সময়েই আগুন বের হতো! তার কাছে এগুবার সাহস ছিল না কারো। তাই রাজা করলেন কি—অত বড় রাজপুরী ছেড়ে দিয়ে একটা পাহাড়ে গিয়ে বাস করতে লাগলেন তাঁর অনুচরদের সংগে নিয়ে।

এমনি করে বহুদিন কেটে গেল। খবরটা দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। সুইডেনের 'হাইগেলাক' দেশে একজন বলবান রাজা বাস করতেন। তাঁর কাছেও সংবাদটা গেল। তিনি একটা জলদানবের এমনি ধারা সাহসের কথা শুনে ছুটে এলেন রাজা রথগারের কাছে। তারই নাম 'বীর' বেওলফ। রথগারকে বললেন তিনি, "আমি মারবো ওই শয়তানটাকে! আজই মারবো! আপনি কিছু ভাববেন না!"

—"তুমি পারবে কি? ভীষণ বদ ওটা!"

—"পারবো বই কি! না, পারি মরবো।"

—"বুঝতে পারছি, তুমিই পারবে—খাওয়া দাওয়া করে জিরিয়ে নাও—ভোর রাতে সেই দানবটা আসবে রাজপুরীতে মানুষ খেতে। সাবধান!"

—"দেখুন কি করি—বেটাকে মজা দেখিয়ে ছাড়বো না!"

—"ভগবান তোমাকে সাহস দিন।"

রাজা রথগার অনুচরদের নিয়ে খাওয়া দাওয়া নাচগানের পর পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন আর রাজা বেওলফ সেই রাজপুরীতে জেগে রইলেন। একটা ধারালো তরোয়াল হাতে তৈরী হয়ে রইলেন। গভীর রাতে সেই দানবটা এলো। তাকে দেখেই রাজার তো চোখ একেবারে ছানাবড়া—ওরে বাবা! অতো বড় জানোয়ার তো তিনি তাঁর বাবার জন্মেও দেখেন নাই! যাই হোক এখন ভয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না। দানবটার একখানা হাতে মারলেন তিনি তাঁর তরোয়ালটা—আর সংগে সংগে তার হাতখানা কেটে পড়ে গেল। ভীষণ রেগে গেল দানবটা—সে এবার রাজা বেওলফকে টেনে নিয়ে চললো সাগরের তলায়। বেওলফ আবার সেই দানবটার মাথায় মারল তরোয়ালের আর এক ঘা। আর সংগে সংগে সেই আঘাতে দানবটা মরে গেল! ভোর হয়ে এসেছিল। রথগারের লোকেরা জেগে উঠেছিল, তারা বীর রাজা বেওলফের জয়গান গেয়ে উঠলো। বুড়োরাজা রথগার তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দেশে আবার সুখ ঐশ্বর্য ফিরে এলো। সেদিন খুব নাচগান আর ভোজের আয়োজন করলেন রাজা রথগার। আর সারারাত ধরে নাচগান হৈচৈ চললো।

হলে হবে কি, আবার অঘটন ঘটলো। ডেনের বুড়ো মা ছিল সাগরের জলের তলায়। সে উঠে এলো আর রাজা রথগারের এক অনুচর এসচেয়ারকে ধরে নিয়ে সাগরের তলায় চলে গেল। বেওলফও ছাড়বার পাত্র নন, তিনিও সাগরের তলায় ডুবলেন আর বুড়ীটাকে ধরে বেদম মার দিলেন। এসচেয়ারকে ছেড়ে সেই দানবী এবার রাজা বেওলফকে ধরতে এলো—আর জলে তাদের দু'জনের মাঝে ভীষণ লড়াই হলো। এদিকে দেশের সব লোক সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে 'হায়' 'হায়' করতে সুরু করলো। তারা ভাবলো বীর বেওলফ মারা পড়েছেন, তা না হলে সাগরের জলটা এতো লাল হোয়ে উঠলো কেন? আর তা ছাড়া একটা গোটা দিন চলে গেল, বীর রাজা তো উঠলেন না জলের তলা থেকে! কি আর করা যায়—তারা কাঁদতে কাঁদতে রাজা রথগারের সংগে রাজপুরীতে ফিরে গেল।

দানবীটাকে মেরে তিন দিন অবিরাম লড়াইয়ের পর বেওলফ জলের তলা ছেড়ে উঠে এলেন। আবার রাজপুরীতে 'জয়জয়'কার পড়ে গেল। রাজা যেন হারানো ধন ফিরে পেলেন। তিনি বীর রাজা বেওলফকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ভগবান তোমাকে বাঁচালেন। তুমি আমাদের বাঁচালে; ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।"

রাজা রথগারের রাজপুরী এবার বিপদহীন হোলো। বেওলফ দেশে ফিরলেন। হোলে হবে কি, এখানেও এক বিপদ দেখা দিল হঠাৎ। এই দেশের পুবদিকের পাহাড়ের গুহায় একটা বিদঘুটে জানোয়ার বাস করতো। অনেক ধনরত্নের মালিক ছিল সে। একদিন কে যেন তার ধনের খানিকটা অংশ চুরি করে নিয়ে গেল। আর যায় কোথায়? সে ভাবলে, এ ধন রাজা বেওলফই নিয়েছেন চুরি করে, তাই ভীষণ রেগে গিয়ে সে রাজা বেওলফকে মারতে ছুটলো। তাদের দু'জনের মাঝে ভীষণ এক লড়াই হোলো। রাজা বুড়ো হোয়ে পড়েছেন। তবু জীবন পণ করে লড়াই করতে লাগলেন তিনি। এবং অবশেষে সেই জানোয়ারটাকে মেরেও ফেললেন তিনি। মরবার আগে সেই জানোয়ারটা রাজার দেহে ফুটিয়ে দিয়ে গেল 'বিষভরা' নখগুলো। রাজার আর বাঁচার আশা রইল না। দেশের সব লোক রাজার কাছে এলো। চোখের জল ফেলতে ফেলতে তারা রাজার

জয়গান গাইলো। রাজা বেণ্ডলফ তাদের ডেকে বললেন, মানুষ চিরদিন বাঁচে না—তাছাড়া বীর আমি বীরের মতই মরছি, এতে চোখের জল ফেলবার দরকার নেই। এই জানোয়ারের সব ধনরাশি তোমরা নিজেদের মাঝে সমান ভাগে ভাগ করে নিয়ে সুখে আরামে বসবাস করো। মানুষ একদিন মরবেই। আমার সময় হয়েছে। আমি চললুম। তোমরা বাড়ী যাও।

বীর রাজা বেণ্ডলফ মারা গেলেন। দেশের লোকেরা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ী ফিরলেন।*

* 'বীর রাজা বেণ্ডলফ' গল্পটি আকাশবাণী কলিকাতার শিশুমহল হইতে প্রচারিত ও লীলা মজুমদারের সৌজন্যে বসুমতীতে প্রকাশিত হইল।

তোমরাই মানবে

শ্রীকমল গোস্বামী

শিবাজীর অপূর্ব্ব মহত্বের অনেক কাহিনী তোমরা জানো, তাই তাঁকে তোমরা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো। তাঁর আদর্শ নিয়ে জীবন গঠন করতে চেষ্টা করো। আজ তোমাদের তাঁকে নিয়েই গড়া এক সুন্দর কাহিনী বলবো।

তোমরা ইতিহাসের পাতায় রিজিয়া, দুর্গাবতী, অহল্যাবাঈ, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর অপূর্ব্ব বীরত্বের গল্প জানো। তবু তোমরা জানো না, এঁদেরি মত একজনের পরিচয়, যাঁর গৌরব এঁদের চেয়ে কোন অংশে হীন নয়। শুধু তোমরা কেন, তোমাদের মত অনেকেই ইতিহাসের এই অবহেলিত, ছেঁড়া, ময়লা, পাতাগুলিতে নজর দিতে ভুলে যায়, ভুলে যায় সেখানেই 'বেলভাডীর' সাবিত্রী বাঈ-এর নাম অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

কিছুদিন আগে শিবাজীর অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে। মহা ধুম-ধাম করে, জাঁকজমক করে, এই উৎসব পালিত হয়েছে। উৎসবের শেষে দেখা গেলো কোষাগার শূন্য প্রায়। অভিষেক উপলক্ষে কত খরচ হলো জানো? পঞ্চাশ লাখ টাকা প্রায়। ছত্রপতি মনস্থ করলেন দলবল নিয়ে বেরুবার। স্থির হলো যে প্রথমে জয় করবেন ছোট খাট রাজ্যগুলি, তারপর একটা বড় অভিযান অর্থাৎ মাদ্রাজের শস্যশ্যামলা সোনার দেশ কর্ণাটকের দিকে হাত বাড়াবেন।

কিছুদিনের মধ্য পড়লেনও বেরিয়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। ছোট ছোট অনেক রাজ্য জয় করে এগিয়ে গেলেন কর্ণাটকের দিকে। সুদক্ষ সৈনিকেরা অল্প চেষ্টাতেই সাফল্য লাভ করলেন। এবার দেখলেন তাঁরা প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করেছেন। ফেরাই মনস্থ করলেন তাঁরা। ফেরবার পথে খাদ্যাদি কমে এলো। পথে 'বেলভাডী' গ্রামে তাঁরা রসদ যোগাড়ে মন দিলেন। এই বেলভাডীতে একটা ছোট দুর্গ ছিল সাবিত্রী বাঈ-এর অধীনে। সাবিত্রী বাঈ মারাঠাদের তাঁর রাজ্যের ওপর দিয়ে অপহৃত ধন রত্ন ও রসদ নিয়ে যেতে দেখে বেজায় রেগে গেলেন। তাঁরই রাজ্য থেকে বিনা অনুমতিতে তাঁরই সামনে বুক ফুলিয়ে যাওয়া। "যাও, নিজের জোর দেখিয়ে শাস্তি দিয়ে এসো!"—ক্রুদ্ধ স্বরে সেনাপতিকে ডেকে আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণ পরে দুর্গে ঘড়া ঘড়া মণি মুক্তা বয়ে নিয়ে এলো সাবিত্রী বাঈ-এর সৈনিক ও অনুচরেরা। শিবাজী স্তব্ধ হয়ে শুনলেন ঘটনাটা। প্রিয় বন্ধু দাদাজী রঘুনাথকে আদেশ দিলেন, "দাদাজী রঘুনাথ, মোগল পর্য্যন্ত যাকে সমীহ করে চলে সেই মারাঠাকে অপমান করা: ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দাও দুর্গটা—আর লোকজনদের পায়ের নীচে।"

মুখে খুব বড় বড় কথা বলে শিবাজীকে আশ্বাস দিলেও রঘুনাথকে শীঘ্রই বুঝতে হলো—কাজ বড় সহজ নয়। তিনি যতবারই দুর্গ তোরণে প্রবেশ করতে গেলেন, অসংখ্য সৈন্য ক্ষয় করেও মাথা নত করে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। সাবিত্রী বাঈয়ের খোলা তলোয়ারের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য!

দাদাজী রঘুনাথ অভিজ্ঞ সৈনিক। তিনি বুঝলেন কৌশলে মানরক্ষা করা ভিন্ন উপায় নেই। কিন্তু কি কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে? ক্ষুদ্র বেলভাডীতে মাথা নত করবেন—অসম্ভব! তিনি তাঁর সৈন্যদের দুর্গের চার পাশে ঘেরাও করে তাঁবু ফেলতে বললেন। আর দুর্গদ্বারে রাখলেন শিবাজীর সহায় সম্পদ যমদূতপ্রায় দুর্দ্ধর্ষ মাওয়ালী সৈন্য। বাইরে না বেরুতে পারলে ভেতরের সৈন্যরা নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণ করবে।

দিনের পর দিন চলে যায়। এক মাসও অতীত হয়ে গেল। রঘুনাথ ছটফট করে বেড়াচ্ছেন, এত দিনেও সাড়াশব্দ না পেয়ে। কিন্তু তোমাদের আগেই বলেছি এরা মারাঠার রসদ লুণ্ঠন করে ছিলো, তাতেই এত দীর্ঘদিন থাকা সম্ভব হলো।

আর ও দিন পঁচিশেকের পর একদিন খুব ভোরে যখন মারাঠারা সুপ্তিমগ্ন তখন সশস্ত্র সৈনিকদের নিয়ে সাবিত্রী বাঈ ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুদের ওপর। সুরু হয়ে গেলো রণতাণ্ডব। প্রথমে, তোমরা ঠিক বিশ্বাস করবে না, সমানে মারাঠা নিধন যজ্ঞ চলতে লাগলো। পরে মারাঠারাও প্রস্তুত হয়ে নিলো। মাঝে মাঝে শোনা যায় হুঙ্কার সাবিত্রী বাঈ-এর মারো খতম করো, মান রাখো। কিন্তু মারাঠারা সংখ্যায় অনেক বেশী। একজন মরলে দশজন দাঁড়ায়। এমনি করে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চললো যুদ্ধ। তখন সাবিত্রী বাঈ-এর সৈন্য ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু সাবিত্রী বাঈ-এর রূপ মা কালীর ন্যায়। তাঁর তলোয়ার ঘুরছে বন্‌বন্ করে। দৃষ্টি শত্রুর ওপরে। মারাঠারা তাঁকে মারবার উপায় না দেখে চারদিকে ঘিরে ফেললো। আর জনৈক মারাঠা সৈন্য পেছন দিক থেকে এসে তাঁর ডান হাত কেটে ফেলে নিজেদের ভীরুতার উদাহরণ দিয়ে মারাঠাজাতির সুনামে কলঙ্ক স্থাপন করলো! তাঁকে বন্দী হতে হলো। এমন সময় সাখুজী গাইকোয়াড় নামে একজন সৈন্য সাবিত্রী বাঈকে অশ্লীল গালি-গালাজ দেয়।

কোলাপুরের রাজসভা গম-গম করছে উত্তেজনায়। সবার মুখেই এক কথা 'সাবিত্রী বাঈ-এর বিচারে আজ কি হবে?' মারাঠার এত অপমান ও লাঞ্ছনা বোধ হয় পূর্ব্বে আর কেউ করে নি।

শিবাজী রাজসভায় এসে সিংহাসনে বসলেন না। দাঁড়ালেন শৃঙ্খলিতা, অবনতমুখী, নির্ভীকা সাবিত্রী বাঈ-এর সামনে শিবাজী কি ইসারা করতেই একজন তাঁকে শৃঙ্খলমুক্ত করে দিয়ে গেলো।

"মা তুমি নির্ভয়ে তোমার রাজ্যে ফিরে যাও। আজ তোমার বীরত্বে দেখে যে আমার শিক্ষা হলো।" গাঢ় স্বরে বলেন শিবাজী।

সাবিত্রী বাঈ বিস্মিত। মুগ্ধ সভাসদ্। ধ্বনিত, হলো "সাধু, সাধু, সাধু।"

তারপর শিবাজী আদরের ডাক দিলেন, "বাবা সাথুজী, এসো; তোমার পুরস্কার গ্রহণ না করলে আমি যে ঋণী হবো তোমার কাছে।"

পুরস্কারের আশা নিয়ে অভিবাদন করলো সাথুজী। মনে মনে ভাবছে যে তাকে হয়তো শিবাজী কোন একটা ছোট রাজ্যের অধিকারী করে দেবেন।

কিন্তু শুনতে পেলো সাথুজী শিবাজীর ক্রুদ্ধস্বর, "অন্ধকার কারাগারই তোমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।"

ইতিহাসের সে সব দিন অতীত হয়ে গেছে। আজ সাবিত্রী বাঈ-এর বীরত্ব ইতিহাসের পরিত্যাজ্য পাতায় আশ্রয় পেয়েছে। তবু তোমরা কি আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইতিহাসের অবহেলিত এমনি পাতা উদ্ধারে মন দেবে না? সাবিত্রী বাঈ-এর বীরত্ব আর শিবাজীর মহত্ব নিয়ে জীবন গঠন করতে চেষ্টা করবে না?

কে বলো তো?

শ্রীশিবু গুপ্ত

গঙ্গার ধারে ওই মন্দিরে আজ অত ভীড় কেন? তা বুঝি জান না। আজ ওই বাঙ্গালী বীর সন্ন্যাসীর জন্মদিন, তাই তো অত ভীড় হয়েছে মন্দিরেতে। দুশো বৎসর পরাধীনতার পরে গত ১৯৪৭ সালে, ১৫ই আগষ্ট আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। সারা দেশ যখন মেতে উঠেছে পরাধীন ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচন করতে; বাঙ্গালার স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন ধীরে ধীরে ভীষণ রূপ ধারণ করছে। ঠিক সেই সময়ে এই বাঙ্গালী বীর সন্ন্যাসী হিন্দু ধর্ম্ম নিয়ে এক আলোড়ন জাগিয়ে তুললেন। ছোট বেলা থেকেই তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি অদ্ভুত বিচারশক্তি এবং তারি সাথে সাথে প্রবল জ্ঞান পিপাসা ছিল। সাধু বা মহাপুরুষ দেখলে ছুটে তাঁর কাছে যেতেন এবং একটি প্রশ্ন ছাড়া আর কোন প্রশ্ন করতেন না—"আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন কি?" এই একটি প্রশ্নই তাঁর মনে প্রবল ভাবে ঘোরাঘরি করতো। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরটি সঠিক ভাবে না পাওয়াতে তিনি যত সাধু বা মহাপুরুষ দেখতেন, তারই পিছু পিছু ছুটতেন। এমনি এক মহাপুরুষের কাছে ছুটে গেলেন তিনি এবং সেই প্রশ্ন করলেন, "আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন কি?" তাঁর এইরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে সেই মহাপুরুষ মৃদু হাসতে হাসতে বললেন, "সে কি রে! খালি দেখেছি, তোর সঙ্গে যেমন কথা বলি—তাঁর সঙ্গেও ঠিক এমনি ভাবে কথা বলি যে—তুই দেখতে চাস, তো তোকেও দেখাতে পারি!" এই কথা কটি শুনে তিনি অবাক! যে প্রশ্নের উত্তরের জন্তে এত ছোটাছুটি তারই মীমাংসা! তিনি আর থাকতে না পেরে ওই মহাপুরুষের পা দুটি ধরে বসলেন। "আমি আপনার শিষ্য হ'ব আর আপনি আমার গুরু হন"—মহাপুরুষ আবার সেই হাসি হেসে বলেন—"ওরে তোকেই আমার প্রধান শিষ্য করে নেবো রে।" দিনের পর দিন যায় রাতের পর দিন আসে তিনি সেই মহাপুরুষের কাছে দীক্ষা মন্ত্র নিয়ে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করে বসলেন।

তখন সারা ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের অধীনে—এই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রথম মাথা তুলে দাঁড়াত। তাই বাঙ্গালীরা তাদের কাছে ঘৃণার বস্তু ছিল। তা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের কোন মানুষকে মানুষ বলে মনে করতো না। ঠিক সেই সময়ে আমেরিকার চিকাগো সহরে একটি বিরাট ধর্ম্ম মহাসভার আয়োজন হয়। ঐ সভায় পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণকে নিমন্ত্রিত করা হয়ে ছিল। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের কোন প্রতিনিধিকে নিমন্ত্রিত করা হয় নাই। তিনি কিন্তু তা সহ্য করতে না পেরে বিনা নিমন্ত্রণে আমেরিকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। বড় বড় পণ্ডিতরা নিজ নিজ ধর্ম্মের বিষয় বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তিনি এক কোণে বসে তাঁদের বক্তৃতা শুনছিলেন। সকলের শেষে তিনি আবেদন করলেন যে তাঁকে এই ধর্ম্ম সভায় কিছু বলতে দেওয়া হোক। সেই সময়েই অনেকেই তাঁর এই আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি করলেন যে, বিনা-নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে এই সভায় বক্তৃতা দিতে দেওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া ও কালা আদমী অর্থাৎ ভারতীয়। কিন্তু তিনি কিছুতেই পিছু হটবার লোক নন, যুক্তি দ্বারা সকলকে দেখালেন, যে হিন্দু ধর্ম্ম বলে একটি ধর্ম্ম আছে, সুতরাং সেই ধর্ম্মের বিষয় কিছু আজ এই বিরাট ধর্ম্ম সভাতে বলা প্রয়োজন। পরিশেষে তাঁর আবেদন মঞ্জুর হ'লো, তবে মাত্র তিন মিনিটের জন্তে। তাঁকে হিন্দু ধর্ম্মের বিষয় কিছু বলতে বক্তৃতা মঞ্চে আহ্বান জানান হলো। গুরুর নাম স্মরণ করে গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসী বক্তৃতা দিতে মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন। এবং বক্তৃতার প্রথমেই বলে উঠলেন—"ও আমার আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ" তখন আর যায় কোথায়, শ্রোতাদের মধ্যে তুমুল করতালি ও আনন্দ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে সমগ্র আমেরিকা কেঁপে উঠিল। এতেই প্রায় দশ মিনিট সময়েরও বেশী সময় চলে গেল—সকলে অবাক এমন মধুর বাণী তাঁরা কখনো শোনেন নাই। অজ্ঞাত অপরিচিতের পরম আত্মীয় সুরে আহ্বানের কথা—যেখানে তাঁকে তিন মিনিটের জন্ত বক্তৃতা দিতে বলা হয়েছিল সেখানে পরে কর্ত্তৃপক্ষগণ বাধ্য হয়ে তিন মিনিটের পরিবর্ত্তে তিন ঘণ্টা, সময় দিয়ে ছিলেন। তাঁর বক্তৃতার শেষে সমগ্র আমেরিকাবাসী তাঁর জয়ধ্বনি করে উঠলেন—সমগ্র জগতের মাঝে হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো।

তিনিই প্রথম সমগ্র বিশ্ববাসীকে স্মরণ করে দিলেন যে, বাঙ্গালীর সন্তান ভারতের সন্তান বিশ্বের যে কোন দেশের সন্তানদের তুলনায় কম নয়। আজ তিনি নেই আমাদের মধ্যে, একদিন তিনি ধ্যানস্থ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কে বলো তো এই বাঙ্গালী বীর সন্ন্যাসীটি—?

তোমরা নিশ্চয় আমার কথা শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছ, কিন্তু ভাই আশ্চর্য্য হবার তো কিছু নাই,—অতীতের সেই বাঙ্গালী আজ আর নাই—আজ বাঙ্গালী মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছে। তাই তো আজ আমাদের এই অবস্থা ভাই।

গল্প হলেও সত্যি

রণজিৎ বসু

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাত। সুষুপ্তির ঘোর তখনও ভালো করে কাটেনি। এমনি সময়ে হঠাৎ পিস্তলের গুলীর শব্দে প্রভাতী নিস্তব্ধতা খান্‌-খান্‌ হয়ে ভেঙে পড়লো। উদ্দেশ্যহীন ভাবে এ গুলী নিক্ষিপ্ত হয়নি। যাঁকে লক্ষ্য করে এগুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তিনি হচ্ছেন, মহাশক্তিশালী অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের অভিষিক্ত যুবরাজ।

ঘটনাটি ঘটে যাবার পর যুবরাজের বন্ধুরা উত্তেজিত ভাবে তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করে যা দেখতে পেলেন, তা যেমনি ভয়াবহ, তেমনি মর্মান্তিক! ঘরে যেন মহাপ্রলয় হয়ে গেছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কক্ষের চতুষ্পার্শ্বে পড়ে আছে মূল্যবান ওক্‌-কাঠের চেয়ার, সুরার বোতল এবং মাথার বালিশ। তাতে রক্তের ছাপ পরিস্ফুট। শিকারীর পোষাক পরিহিত যুবরাজ শয্যায় আড়াআড়িভাবে শায়িত। পিস্তলের গুলীতে মস্তক তাঁর বিদীর্ণ। পার্শ্বে শায়িত অনিন্দ্যসুন্দরী একটি নারী। সম্পূর্ণ নগ্ন। যুবরাজের প্রণয়িনী। আততায়ীর গুলীতে দুজনেই নিহত।

সুদূর অষ্ট্রীয়ায় এই শোকাবহ ঘটনা ঘটেছিল বহুদিন পূর্ব্বে।

হত্যার কারণ কি রাজনৈতিক, না অবৈধ প্রণয়? অথবা আত্মহত্যা? সব যেন রহস্যে ঢাকা পড়েছে। সমাধান হয়নি।

যেদিন এ ঘটনা সংঘটিত হয় সেদিন তাঁর দুই বন্ধু যুবরাজের প্রাসাদেই অবস্থান করছিলেন। বন্ধু দুজনের একজন হচ্ছেন কোবার্গের যুবরাজ ফিলিপ এবং অপরজন হচ্ছেন কাউণ্ট হয়েস্। তাঁদের ধারণা এটা আত্মহত্যা। নিহত যুবরাজের বিবাহিত জীবন যে সুখের ছিল না সে সংবাদ তাঁরা রাখতেন এবং তা জানতো ভিয়েনার প্রত্যেকেই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি বেলজিয়ান-রাজকন্যা ষ্টেফাইনকে বিবাহ করেন। নামেই শুধু বিবাহ হয়েছিল—কিন্তু পরস্পর পরস্পরকে কোনদিনই ভালবাসতে পারেননি। কোন রাজনৈতিক কারণে এ বিবাহ যুবরাজের অমতে তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

যুবরাজ বহু দেশ পর্য্যটন করেছিলেন এবং দশটি ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারতেন। এ ছাড়া তিনি কতকগুলি বইও লিখেছিলেন।

মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি ব্যারনেস মেরী ভেটসেরা নাম্নী এক পরম রূপবতী তরুণীর প্রেমে আকৃষ্ট হন। তরুণীর বয়স তখন মাত্র উনিশ এবং যুবরাজের বয়স উনত্রিশ।

এই প্রেম কাহিনী গরম খবরের মতো ভিয়েনার চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যুবরাজের পিতা সম্রাট ফ্রাঞ্জ জোসেপের কানে এ খবর যেতেই তিনি পুত্রকে ডেকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন, এসব প্রেমের ব্যাপার তিনি কখনও বরদাস্ত করবেন না। তাঁকে অবিলম্বে সেই তরুণীর সান্নিধ্য ত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু যুবরাজের পক্ষে মেরীকে ত্যাগ করা সম্ভব না হওয়ায় তিনি পিতার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পিতা ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হলেন। কোন উপরোধ, অনুরোধে যুবরাজ বিচলিত হলেন না।

ভিয়েনা হতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে পাইন গাছ পরিবেষ্টিত প্রাসাদে যুবরাজ মেরীর সাথে মিলিত হতে লাগলেন।

জানুয়ারী মাসে একদিন তাঁরা সেই নির্দ্দিষ্ট প্রাসাদে এসে মিলিত হলেন চিরাচরিত প্রথা মতো। হঠাৎ পিস্তলের গুলীর শব্দে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত হয়ে উঠলো।

যেদিন এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে সেদিন সকালে তাঁর শিকারে যাবার কথা। কিন্তু দিনটি ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন ও ভীষণ ঠাণ্ডা। যুবরাজ সেই হেতু শিকার বন্ধ রেখে ভিয়েনার পথে যাত্রা করলেন। ভাগ্যের বিধান কি অমোঘ!

সর্ব্বশেষ যে ব্যক্তি যুবরাজকে জীবিত দেখেছিল সে হচ্ছে তাঁর প্রিয় ভৃত্য। তার কথা অনুযায়ী ঘটনার দিন সকালে যুবরাজ খুব প্রফুল্ল ছিলেন। যুবরাজ এবং তাঁর প্রণয়িনীকে যে হত্যা করা হয়েছে সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ ছিল।

কারো কারো মতে এ হচ্ছে নিছক আত্মহত্যা। কিন্তু কেন? অর্থ, জনপ্রিয়তা, যৌবন, প্রেম এবং যশ সব কিছুই তো যুবরাজের করায়ত্ত ছিল। এ সব বিচার করলে আত্মহত্যার যুক্তি টেঁকে না। এ মৃত্যু শুধু রহস্যেই ঢাকা পড়েছে। সমাধান হয়নি।

যুবরাজের মৃতদেহ খুব জাঁকজমক সহকারে হ্যাপসবার্গের প্রাচীন সমাধিস্থলে সমাধিস্থ করা হয়।

আর মেরী? গভীর রাতে ঘন পাইন বনের নিস্তব্ধতার মাঝে তাঁর মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। সেখানে ছিল না কোন মানুষের ক্রন্দনরোল, শুধু ছিল নির্জ্জনতার হাহাকার এবং পাইন গাছের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস।

নিহত ব্যক্তিটি কে জানো? তিনি ছিলেন অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের অভিষিক্ত যুবরাজ রুডল্‌ফ।

বসন্ত

শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বনে বনে ডাকছে কোকিল
বাতাস বহে ধীরে,
মাঠভরা ইক্ষু-কলাই
নদীর দুই তীরে।
বনে বনে লাগছে কাঁপন
শুধু খুশীর দোল,
রঙ লাগে শিমুল শাখায়
আমের শাখে বোল।
ফুল-বনে ফুটলরে ফুল
মৌমাছি দেয় হানা,
মধু-মাস আসছে জানায়
পাখির যত ছানা।

শিক্ষা

রমাপ্রসাদ দে

বাক্‌ কুম্‌কুম্‌ পায়রা আমার
ঘুমোয় বসে শোয় না—
দুয়ার থেকে ধান খুঁটে খায়
মুখ তবু সে ধোয় না।
জল এনে তার কাছে রাখি
পায় যদি জলতেষ্টা,
সেই জলেতে মুখ ধোবে যে
নেই তো তেমন চেষ্টা।
এত করে বোঝাই তাকে
হয় না তবু দীক্ষা—
ইস্কুলেতে ভর্ত্তি করে
দেব কি দেব শিক্ষা?

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৬৩। আর বলিহারি যাই ব্রজরাজ-যুবরাজের যুবসহচরের টির। খেলতে খেলতে, যেন খেলার সুখ দোহন করতে করতে, য়ে পায়ে তাঁরাও আশ্চর্য্যি, উপস্থিত হয়ে গেলেন সেইখানে যেখানে পন মনে ফুল তুলছিলেন শ্রীরাধা। কৃষ্ণের প্রিয়-বয়স্য ভর আগেই সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন। কাঁধের উপর···ঘাড়ের র···রম্য হার নাচিয়ে নাচিয়ে, সে কী তাঁর ভণ্ড-নৃত্যের ভঙ্গী! ও বাড়ে আর হাস্যের সিঁড়ি বেয়ে গর্ব্বও চড়ে। এসেই তিনি তে পেলেন···নাদ! দিগ্বিদিকে ছুটিয়ে দিলেন চোখ, এবং খের দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কাণে এসে ঢুকল,···উৎসবে মাতোয়ারা চন্দ্রা ও চন্দ্রাবলীর গান; ললিত বলয়ের লয়ে লয় মিলিয়ে অনেক নক বধূর মধুর মধুর করতালি; মুরজ-মৃদঙ্গ-বীণার বিদগ্ধ-মুগ্ধ সঙ্গতী-ন; এবং বিলাসিকা ও লাসিকাদের নৃত্য-চপল চরণের ঝুমুর র মণিমঞ্জীরের অনিন্দ্য নিক্কণ···সব মিলিয়ে সেই নাদ!

৬৪। শুনেই তিনি উর্দ্ধ্ব রোমাঞ্চিত-ভাবের একটি অভিনয় র বসলেন। তারপরে হঠাৎ উৎকণ্ঠিতের মত কণ্ঠ বাড়িয়ে কৃষ্ণকে বললেন,—

"প্রিয় বয়স্য, আমাদের প্রত্যেকের কাণে কি সঙ্গীত-শাস্ত্রের তগুলি ছুটে এসে লাগছেন, না, আমাদের প্রত্যক্ষ পরাস্ত করে কেউ আজ এই মহোৎসবে, সৃষ্টি করছেন ঐ সঙ্গীত-কলকল-নাদ? তাহলে তো বেশ একবার ভাল করেই জানতে হয় পারখানা।"

বয়স্যের কথা শুনে মুকুটের মণিখানিকে ঈষৎ দোলাতে দোলাতে কিশোর বললেন,—

"বাদিত্রের এই ধ্বনি কিন্তু অঙ্গের বলে ঠেকছে। তা, হে তিথির্থাম-মহাশয়, এখন যত শীঘ্র হয় দেখুন, দ্রুত-লয়ে কোথায় ছে ঐ বীণা ইত্যাদির অন্তরধ্বনি।"

৬৫। বলার সঙ্গে সঙ্গেই পরমোল্লাসে বিরাট লম্ফ প্রদান লন অতিপটু শ্রীবটু। পা চালিয়ে এগোতেই প্রথমেই তিনি স্তে পেলেন বৃষভানুনন্দিনীকে। লক্ষ্মীজয়ী রূপ! থমকে গেলেন ড়য়ে। দেখলেন, যিনি রমণী-সমাজের মুকুটমণি, যাঁর করচরণ-ব টলটল করছে জবাফুলের হাসি, ঘুরে ঘুরে তিনি কিনা পাতার ধরে চয়ন করছেন মাধবী ফুল! এ যেন ধরায়-নেমে-আসা স্থিরা এক বাসন্তী লক্ষ্মীর প্রতিমা। আর তাঁর কাছেই ঘুর ঘুর ছন লালিত্য ও কল্যাণে পুষ্টা ললিতা ও শ্যামা, এবং অদূর র-বাটিকায় বসে রয়েছেন সসখী চারুচন্দ্রা আর চন্দ্রাবলী। মহানন্দে সকলেই যেন আত্মহারা।

৬৬। দেখেই তিনি ঝপ করে ললিতাকে বলে বসলেন,—

এত গর্ব্ব বেড়ে গেছে যে এত বড় একটা অপরাধ করতেও দ্বিধা করছেন না আপনারা? আজ নববসন্তের উৎসব। আমার মহানুভব বয়স্যের এই নবযৌবনা মাধবী থেকে কেউ গ্রহণ করতে সাহস পান না একটিও ফুল, আর আপনারা কিনা সেই অতিপ্রিয় মাধবীটিকে পল্লবহীন কুসুমহীন করছেন? এত দর্প আপনাদের? দর্প-কন্দর্প কলাহারী আমার বয়স্যটির ভুজ-ভুজঙ্গের ফণা-দর্পটিকে বোধহয় আপনারা সঠিক জানেন না। এখনি আশা করি জানতে পারবেন। এই আমি চললুম। ব্যাপারটি নিবেদনীয়।"

যথা ভাষা তথা আসা। শ্রীকৃষ্ণকে বটু বললেন,—

"বয়স্য, আপনি মহোদয় ব্যক্তি; সম্প্রতি আপনার বসন্তোৎসব যে প্রমাণ-সিদ্ধ হতে চলেছে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। যে হেতু, বসন্তলক্ষ্মী স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হয়ে এসেছেন; আর নিজের অঙ্গিনী বিভূতিগুলিকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন; আর বিবিধ-বিধানে সাক্ষাৎ জাঁকিয়ে তুলেছেন বসন্তোৎসব। স্থানটিও এখান থেকে দূরে নয়।

আ-হা-হা বন্ধু, অমন সঙ্গতী-বাজনার সাজানি দেখিনি কোথাও ···পৃথিবীতে। উঃ কী গানের চাল! স্বর্গীয় সঙ্গীত নিয়ে যাঁরা মেতে থাকেন তাঁদেরও ক্ষমতা নেই ও চালের উপর হাত চালান। আর আ-হা-হা-হা, উৎসবের যে সব সামগ্রী দেখলুম, ব্রহ্ম শিল্পেও বাবা অমনটি নেই। ওরে আমার চোখ রে, কী খেলাই না দেখলি রে!

৬৭। সত্যি বলছি রাজকুমার, তোমার খেলাটা অত বাহারীও নয়, অত জোরালোও নয়।"

৬৮। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন সখারা, বললেন,—

"কুসুমাসব, তোমাকে আর শত্রুপক্ষের অত গুণ ব্যাখান করতে হবে না। নিজের জিনিবেরি দাম বেশী হয়, এটি জেনে রেখো। অধুনা আপনি কিঞ্চিৎ মধুনা মাতাল হয়ে পড়েছেন।"

৬৯। উত্তর দিলেন বটু,—"আর আপনারা জেনে রাখবেন, কুসুমাসব নিজে মাতাল হয়ে ওঠে না, মাতাল করে তোলে সকলকে। আর আমিও সেই কুসুমাসব নই যাকে পান করলেই মাতাল হবে সকলে। অথচ আশ্চর্য্য, আমার একটি শব্দের জোরেই দেখছি মত্ত হয়ে উঠেছেন সকলেই।"

৭০। শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—"সাধু বয়স্য সাধু। কোতুক-মুক্ত হয়ে কিন্তু তোমার মত সাধু ব্যক্তির এখনি উৎসব-ভূমিটি পুনর্দর্শন করে আসা প্রয়োজন। তারপরে তো আমরা আছি-ই।"

৭১। শ্রীকৃষ্ণের উক্তিটি বড় সরস বলে মনে হল শ্রীবটুর। তিনি লাফিয়ে উঠলেন। এবং পুনর্ব্বার উপস্থিত হয়ে গেলেন সেখানে যেখানে ঘুরঘুর করছিলেন কৌতুক-রসিকা ললিতা। পৌঁছেই প্রচণ্ড আস্ফালন হাঁকড়ে বলে উঠলেন,—

" ··· [illegible] ···এবং

ভুল। আমাদের এই মাধবী-পুষ্প অপহরণ করবেন না। যদি রন, প্রতিফল পাবেন।"

ললিতার উত্তর এল,—

"বটু না একটা কপট-পটু। বড্ড সাহস দেখছি যে আপনার। চকগুলো অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করে নিজের সৌজন্যের মাথাই টাচ্ছেন। বলি, এ রীতিটা কে না জানে যে, অনুকূল এই যমুনা-লে, এই রক্তাশোক-তরুমূলে, নববসন্তের উৎসব দিনে, অনুরাগের রতম্য অনুসারে, আবহমান কাল ধরে চলে আসছে শ্রীমদনের অর্চনা? অর্চনা করতে আসেন অনিন্দ্যনীয়া বধূগণ? আমরাও সছি; এবং নায়ক-মণির মত মহাকুলবতী আমাদের প্রিয় সখী রাধা, তিনিও নিজের প্রভুত্ব-গর্ব তুচ্ছ করে ফুল তুলতে এসেছেন মাদের সঙ্গে।···উন্মাদের মত এখানে এসে প্রলাপ বক্‌বেন না।"

১২। বটু বললেন,—

"আরে আরে সে কি কথা! তা আমাদের হরি ছাড়া আবার মদনটি আছে কে? যিনি সকলকে উন্মাদ করেন, হর্ষের চেয়ে দকতার চেয়ে যিনি কোমল, তিনিই তো মদন। তিনি যেখানে ক্ষাৎ বর্তমান, পরোক্ষ সেখানে ঐ আপনাদের মদন। তেনার বার পুজোই বা কি, আরতিই বা কি? অতএব আমার শ্রীমুখ কে শুনে রাখুন,···আপনারাই উন্মত্তা। অতএব আপনাদের তের জন্যে প্রথমেই আমায় পৌরোহিত্য করতে হবে, এবং তৎপর পূর্ব-কমনীয় ভাবে স্বস্তিবাচন-পূর্বক আপনাদের দিয়ে উৎসবের মুষ্ঠান করাতে হবে। অতএব আসুন চলুন, তাঁর কাছেই আমরা ই।"

১৩। শ্রীরাধা বললেন,—

"আহা, বটুটি সত্যিই তো পরম পটু, সত্যিই আমাদের পুজনীয়। মাদের হিত করবেন, অতএব এই পুরোহিত ঠাকুরটিকে যথা-জে আগেই পুজা করা আমাদের প্রয়োজন। আশা করি লিতা দেবী এই মর্মে অনুরোধ করবেন চারুচন্দ্রা আর চন্দ্রাবলীকে।"

মুখ থেকে কথা খসতে না খসতেই, চারুচন্দ্রা ও চন্দ্রাবলী তখনি সে জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন বটু কুসুমাসবকে। মহোৎসবের নন্দে তাঁরা দু'জনেই তখন অন্ধ। নানান্ রঙের আবীরে, গুলালে, ন্দনকে তিতিয়ে ভিজিয়ে একেবারে যখন তাঁরা তঁকে ভূতোত্তম রে ছাড়লেন তখন আক্রোশে ক্রোশগামী স্বরে চীৎকার দিয়ে ঠলেন বটু—

"বাসন্তী খেলায় পাগলী হয়ে গেছেন গয়লা-কুলের মেয়েরা। দুর মাখিয়েছে, চন্দনে চুবিয়েছে, আরে ছো: ছো: আবীরে কুঙ্কুমে কী করে দিয়েছে। উঃ কী শীত। এখান থেকে এক পাও পালাতে রছি না। বয়স্য—গো বয়স্য, খুন হয়ে যাচ্ছি। প্রিয় সখাকে চাও। এখানে যেন ব্রহ্মহত্যা না হয়।"

১৪। দূর থেকে শ্রীকৃষ্ণ শুনতে পেলেন কুসুমাসবের ভীম ৎকার। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না,···অবলাদের কৌতুক-সরল ণাঘাতে কুসুমাসবের মত একটা প্রতিভার খণ্ডিত হতে চলেছে দি। "আচ্ছা রগড় যা হোক"···বলতে বলতে, ভাবতে ভাবতে লেন তিনি। সহচরেরাও ছুটলেন। তাঁদেরও ঝোঁক চেপে গেল। বেগে সবাই পৌঁছে গেলেন সেখানে।

১৫। শ্রীকৃষ্ণ এসেই দেখলেন, তাঁর অপটু বটুটি মুখের হাসি ছলে ঠায় বসে রয়েছেন। পরক্ষণেই দেখলেন, মহীয়সী হলেও ব্রজসুন্দরীরা কিন্তু নয়নে নয়নে আদর ভয় ও লজ্জার পান মিশিয়ে তাঁকেই দেখছেন। নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলে তাঁর মনে হল। কৃত্রিম অসন্তোষ ও ক্রোধের ভান ফলিয়ে তখন বললেন,—

"কি আশ্চর্য, আমার মমতার পাত্র এই নিরপরাধ বটুটিকে রাগান্ধ হয়ে আপনারা দুর্বাক্য বলতে, অধিকন্তু অপমান করতেও এতটুকু দ্বিধা করলেন না? অধম হওয়াই যদি মুখ্য অপরাধ হয়, তা হলে সময়ে সহ্য করতেও হয় উপযুক্ত প্রতিফল।"

এই বলে তিনি সহচরদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

দৃষ্টিপাতও করলেন, আর সহচরেরাও তাঁর শ্রীহস্তে তুলে দিলেন গুচ্ছ গুচ্ছ অশোক মঞ্জরীর কন্দুক। অকস্মাৎ এক সঙ্গে একই সময়ে এমন ভাবে সেই ফুলের গেরুয়াগুলি নিক্ষেপ করলেন শ্রীকৃষ্ণ, যে সেই অত্যাশ্চর্য পুষ্পাঘাতে সমস্ত কুলবধূদের বিক্ষোভিত হয়ে গেল বক্ষঃস্থল একত্রে। অদ্ভুত কাণ্ড দেখে শ্রীকৃষ্ণকে সাধুবাদ-সহ পুজা না করে থাকতে পারলেন না অমর-বরনারীরাও।

১৬। দেখতে দেখতে উভয় সেনাদলের মধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল ভীষণ ক্রীড়া-যুদ্ধ। দুপক্ষই কিন্তু মেনে চললেন অনীতির রাহিত্য। পদ্মরাগ-মণির জৌলুষ কাটতে লাগল অরুণ বরণ ফাগুয়া। ফাগুয়ার উত্তরে ছুটে আসতে লাগল ফাগুয়া কন্দুকের পিঠে ভীম পড়তে লাগল কন্দুক। "বারুণাস্ত্রের মত পুষ্পশস্ত্রর পিচকারী থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে লাগল কাশ্মীরীয় কুসুমবারির সুগন্ধি রক্তবৃষ্টি।

১৭। উভয় পক্ষের বল-সাম্য নিরীক্ষণ করে সাধু সাধু বলে চীৎকার দিয়ে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন দেবলোকের সুরবধূরা।
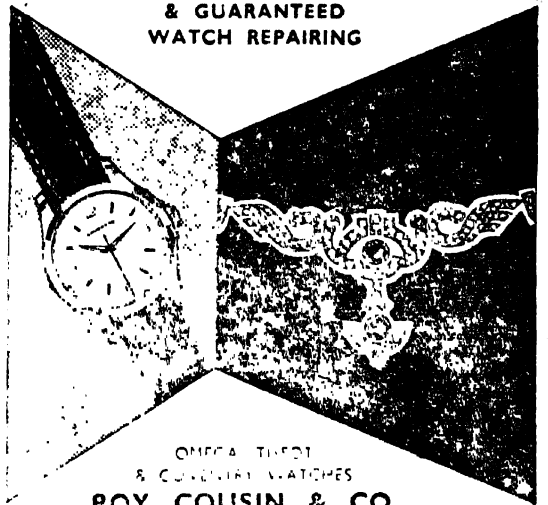
সেনাদলের নিঃশঙ্ক-নিক্ষিপ্ত গন্ধ-চূর্ণের রেণুতে রেণুতে ক্রীড়া সমর ক্ষেত্রে ঘনিয়ে উঠল অতি-গাঢ় অন্ধকার। এমন সময় অকস্মাৎ এক টাঙ্ক সাহসের পরিচয় দিয়ে বসলেন শ্রীহরি। মনসিজ প্রণোদিত হেই যেন তিনি প্রবেশ করলেন শত্রু চক্রের অভ্যন্তরে।

হালকা হাওয়ায় তখনও আকাশে উড়ছে গন্ধ-ধূলি, ঝরে পড়েনি টিতে, প্রতি মুহূর্তে গাঢ়তর হচ্ছে অন্ধকার, কোথাও কেউ কারো াচ্ছে না পরিচয়,···এমন সময় সেই পর-চক্রে আনন্দধ্বনি তুলে রণরণ দরে বেজে উঠল কৃষ্ণ-বেণু।

বিক্রমী কৃষ্ণ-বেণু,··পরচক্রে আবিষ্কার করল স্মরত-সমর-ভেরী নাদ। এবং করতেই, দিক্ বিদিকে একই সঙ্গে অঙ্গনাদের নয়ন-ভঙ্গী থকে ধারাবর্ষণ হতে লাগল কটাক্ষ বাণের।

৭৮। দেখতে দেখতে এই লীলা-রণ গ্রহণ করল নৈশযুদ্ধের াঙ্গিক। তখন অকস্মাৎ যুদ্ধ-চণ্ড একক শ্রীকৃষ্ণ, যেন যুদ্ধ স্বাতন্ত্র্য র্পণ করতেই, 'সংপ্রস্বাপন'—মন্ত্রের মত নিজের লীলালোল টাক্ষটিকে ভ্রূকুর ধনুকে চড়িয়ে দিয়ে সন্ধর্শনীয় করে তুললেন স্ত্রী সনিকদের। আর এতক্ষণ যাঁরা অঙ্গন মাতিয়ে লীলাযুদ্ধ করছিলেন সই সব অঙ্গনারা কৃষ্ণের সেই কটাক্ষ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাঙ্গ হয়ে লিয়ে পড়লেন একত্রে; বিনিমীলিত হয়ে গেল তাঁদের নয়ন। ালস্যের হাই উঠতে লাগল বদনে, কণ্ঠে করুণ কূজন। কম্পিত ধরপুট, রণক্ষেত্রে এলিয়ে পড়লেন প্রসুপ্তার মত।

৭৯। চন্দ্রাবলী আর স্থির থাকতে পারলেন না। চমূরু— ন্দ্রমাদের তিনি চমূপতি, নিজের সেনাদলের এই হেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় বস্থা দেখে, কেমন করেই বা স্থির থাকতে পারেন? বহু বিভঙ্গে রঞ্জিত হয়ে উঠল তাঁর ভ্রূভঙ্গি, ছোট্ট ছোট্ট অসংখ্য বাণ হানতে াগল কটাক্ষ; এগিয়ে এসেই তিনি ভুজ-ভুজঙ্গের নিবিড়- াশবন্ধে পলকে আবদ্ধ করে ফেললেন সেই পরাক্রমীকে; মোহাচ্ছন্ন, রলেন মোহনকে।

৮০। কিন্তু এ মোহ ক্ষণিকের। মুহূর্ত্তের মধ্যেই জেগে ঠলেন শ্রীকৃষ্ণ। এবং সেই অতিলঘু অনল্প তিমিরের অবসান টতে না ঘটতেই, যিনি বিশ্বৈকবীর তিনি, লঘুহস্তে বিকীর্ণ করে ালেন তন্বমধ্যাদের ব্যূহ,··মদমত্ত করীন্দ্র যেমন করে আলোড়িত রে দেয় পদ্মিনীদের সজ্ঘ।

৮১। দেখতে দেখতে বিলীন হয়ে গেল পরাগ-জ অন্ধকার, ন্তু তার স্থলে প্রবল হয়ে উঠল রাগ-জ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ধ্য দিয়ে দেখা গেল,—মৃগলোচনাদের বিপুল ব্যূহের মান-চন্দ্রগুলি লায় পড়েছে লুটিয়ে, শোণিতের মত কুঙ্কুম-চূর্ণে রক্তিম হয়ে গেছে থিবী, পুঞ্জ পুঞ্জ কস্তুরী-পঙ্কে ম্লান হয়ে গেছে বনাঙ্গন, পঙ্ক-মদ ণ করছে লক্ষ লক্ষ ভৃঙ্গ, আর চতুর্দ্দিকে বিছিয়ে রয়েছে রাশি রাশি ছিন্ন মত কর-স্খলিত রতন-পিচকারী।

৮২। বধূসেনার এই বিকল বিকার-বিহ্বল অবস্থা দেখে, সুখের তরঙ্গের মত দু-হাত উঁচিয়ে, নাচতে লেগে গেলেন বটু। নাচতে নাচতে কৃষ্ণের কাছে এগিয়ে গিয়ে শোর তুললেন,—

৮৩। "সাধু বয়স্য সাধু। আমার এই এতটি বয়সে এতটা সুখ আগে কখনো হজম করিনি ধরাতলে। বংশীধারীর আমি কিনা সহচর, আর আমাকে কিনা দুর্দ্দশার মইএ চড়িয়ে মজা লুটছিলেন এই নির্বংশিকাদের দল? যেমন কর্ম্ম এখন তার তেমনি পেয়েছেন ফল। আ মরি মরি, ছিড়ে গেছে কাঁচুলী, গুঁড়ো হয়ে গেছে এত সাধের গাঁথা হার, লণ্ড ভণ্ড হয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে উৎসবের সামগ্রী; আর আ-হা-হা রাঙ্গা হয়ে গেছে গাল গলা চোখ বুক খোঁপার ফুল। কপালের চুলগুলো পর্য্যন্ত পলাশ ফুলের মত লাল হয়ে গেছে আবীরে, পেয়েছেন বটে কর্ম্মফল একখানা।

৮৪। কিন্তু বয়স্য সাবধান। এঁরা মহাচতুরা। চতুরাননের সৃষ্টির বাইরে এঁরা বিরাজ করেন। বৃষভানুনন্দিনী ইত্যাদি করে অন্য অসংখ্য শত্রুদের সঙ্গে মিলিতা হয়ে আবার না এঁরা আপনাকে জিতে নেবার চেষ্টা করে বসেন! তাই বলছি আগেভাগেই সরে পড়া ভাল। এঁরা পূর্ণ শত্রু র, রাগ হলে সব করতে পারেন।

৮৫। হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন সখারা। কুসুমাসবকে বললেন,—"স্বভাবে আপনি দুর্ম্মুখ, তাই এত বেশী ভয় পেয়েছেন; অত্যধিক রেগেছেন বলেই টপ করে ঝাঁঝিয়ে উঠেছেন।"

কৃষ্ণের দিকে ফিরে তাঁরা হাসতে হাসতে বললেন,—"সখা, এমন করে এঁকে আশ্বস্ত করুন যাতে বেচারীর প্রাণে এতটুকুও আর খেদ না থাকে।"

৮৬। শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—"কুসুমাসব, যাঁকে তোমার ভয়, অধুনা নির্ভয় হয়ে তাঁকে আমায় দেখাও। আমি থাকতে তোমার আবার ভয়টা কিসের?"

কথা শুনে নিমেষেই যেন খণ্ডিত হয়ে গেল শ্রীবটুর অসংখ্য ভয়। ঝলমল করে উঠলেন উৎকট সৌন্দর্য্যে। এগোতে এগোতে, পাঁয়তাড়া কষতে কষতে, বলতে লাগলেন···"এইদিকে এইদিকে"। আর তারপরে অতিমুক্তা-বাটিকার পরিসরে,—যেখানে ললিতাদি আলি-মালাদের সঙ্গে নিয়ে পুষ্পচয়ন করছিলেন অতীন্দ্রিয়-রূপসী শ্রীরাধিকা— সেখানে তাঁকে দিলেন দেখিয়ে।

৮৭। সময় তখন রসময়। সখীদের লক্ষ লক্ষ কুটিল কটাক্ষ-বাণের লক্ষ্য হওয়া এমন কিছু আশ্চর্য্য নয় শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে। হলেনও তাই। বাণাহত শ্রীহরিও তখন নিজের নয়নে যোজনা করে বসলেন একটি কটাক্ষবাণ। অকস্মাৎ সেই বাণ পড়ল এসে রাধার বুকে, আর হায় হায়, টুকরো টুকরো হয়ে গেল রাধার কবচখানি লজ্জার।

বৃষভানুনন্দিনীও এবার নয়ন তুলে চাইলেন। তাঁর অতি সূক্ষ্ম কাজল-টানা চোখে যেন কৃষ্ণ-বিষের ইঙ্গিত। সেই চোখ হানল তার হাস্তে-শানানো কটাক্ষবাণ। হানাও যেই অমনি এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল শ্রীহরিরও হৃদয়। [ক্রমশঃ।

এই সংখ্যায় কোনারকের সূর্য্য মন্দিরের আলোকচিত্র

তাজমহল

—পীযূষকান্তি ঘোষ

বিধান সৌধ (বাঙ্গালোর)

—সুশান্ত মিত্র

॥ আ লো ক চি ত্র ॥

ভারতীয় স্থাপত্য

—জয়দেব দত্ত

প্রতিবিম্ব —অজিতকুমার মিশ্র
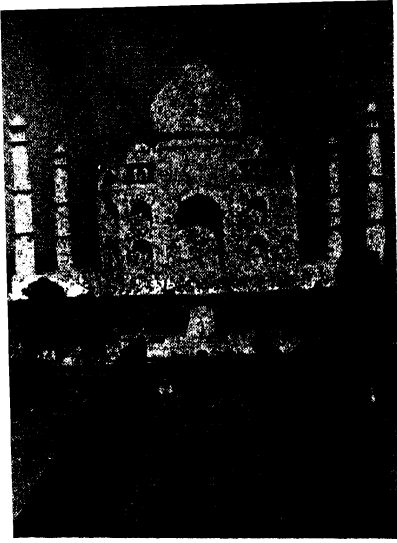
চিন্তা

—কনকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

পথ চলতে

—অলক লাহিড়ী

চেরাপুঞ্জির মেয়ে

—ডি. সোনা

—অনিল ঘোষ
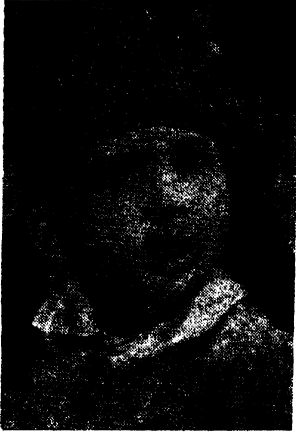
ছেলেবেলা

—মনোজ ঘোষ

—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

—দেবু দাস
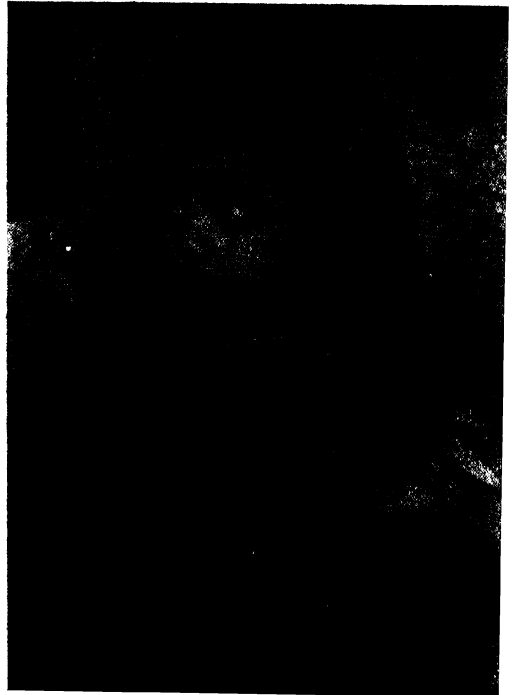
সাহিত্য পরিচয়

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বই

ভারত—আজ ও আগামীকাল

ভারতের প্রধানমন্ত্রী আচার্য জওহরলাল নেহরু কেবলমাত্র একজন রাজনৈতিক নায়কই নন, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ইতিহাসবেত্তা, সাহিত্যিক এবং সমাজবিজ্ঞানী। কেবল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করলে তাঁকে সম্পূর্ণ রূপে দেখা যায় না, বিভিন্ন কোণ থেকে প্রত্যক্ষ করলে তাঁর প্রতিভার একটি পূর্ণ আলেখ্য ধরা পড়ে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশানসের উদ্যোগে পরলোকগত সুধীবর মৌলানা আজাদের সম্মানে যে বক্তৃতামালার আয়োজন হয়, তার উদ্বোধনী ভাষণ দেন শ্রীনেহরু। তাঁর এই ভাষণ সুধীসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে; আপন উৎকর্ষে এই বক্তৃতাটি রীতিমত শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয়। সেই বক্তৃতাটিই 'ইণ্ডিয়া টু-ডে য়্যাণ্ড টুমরো' নামে বিখ্যাত। আলোচ্য গ্রন্থটি ঐ বক্তৃতাটিরই গ্রন্থরূপ। ভারতবর্ষকে এক বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীনেহরু প্রত্যক্ষ করেছেন। ভারতের অনবদ্য ইতিহাস তাঁর মনে এক নবতর চেতনার জন্ম দিয়েছে—ইতিহাসের পট পরিবর্তন—যা যুগে যুগে ঘটে এসেছে (বা এখনও আসছে)—তাঁর মনে এক নতুন ভাষ্যের সৃষ্টি করেছে—আলোচ্য গ্রন্থটিই আমাদের ধারণার প্রমাণ। শ্রীনেহরুর সূক্ষ্ম এবং সন্ধানী দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক এবং সমাজনৈতিক দৃষ্টিতে, আশাবাদী এবং মানব-প্রেমীর দৃষ্টিতে ভারতের ইতিহাসের স্বরূপ এক নতুন ভাষ্য লাভ করেছে। আজকের দিনে পৃথিবীর চরম দুর্যোগপূর্ণ অসহায় হানাহানিমত্ত অবস্থায় শ্রীনেহরু শান্তির পথের নির্দেশ দিয়েছেন। ভারতের বর্তমান রূপে এবং এক ভবিষ্যৎ ভারতের কল্পনায় শ্রীনেহরু গ্রন্থটির পাতাগুলি সুসমৃদ্ধ করেছেন। ভারতের ইতিহাসের স্বরূপ এবং সত্যকে সম্যক রূপ বিশ্লেষণ করে শ্রীনেহরু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সহনশীলতা এবং শ্রমের দ্বারাই ভবিষ্যতকে সুন্দর করে বর্ণনা করা যায়, সেই আকাঙ্খিত সুন্দর ভারতেরই প্রতীক্ষায় আছেন শ্রীনেহরু। গ্রন্থটি তাঁর সুন্দর রচনাশৈলী ও প্রভূত পাণ্ডিত্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ, যথেষ্ট দক্ষতার স্পর্শ এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। বর্ণনভঙ্গী মনোরম। অরুণ মিত্রের অনুবাদ, গ্রন্থের গরিমা বৃদ্ধি করেছে। মুখবন্ধ রচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং স্বনামধন্য সাহিত্যসেবী ডক্টর হুমায়ুন কবির। বলা বাহুল্য, তাঁর রচনা এক বিশেষ আকর্ষণ বহন করে এবং তাঁর বিশ্লেষণ তাঁর শক্তিমত্তার পরিচায়ক। প্রকাশক—প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার। মূল্য—পঁচাত্তর নয়াপয়সা মাত্র।

আশ্রয়

জরাসন্ধ সাহিত্যক্ষেত্রে পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই একদিন যে চমক লাগিয়েছিলেন, তাঁর পরবর্তী রচনাসমূহও তারই স্বাক্ষরবাহী। আলোচ্য উপন্যাসে মানব মনের গহন অতলে যে আর্তি—যে বেদনাঘন আকুতি অতি সংগোপনে সঞ্চিত থাকে তারই এক প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন লেখক। মাতার মৃত্যুর পর অতি শৈশব থেকেই বিমাতার স্নেহলেশহীন অসূয়াপূর্ণ ব্যবহারে ও পিতার ঔদাসীন্যে শুভেন্দুর মনের যে বিকলন দেখা গিয়েছিল, বিবাহের পর পত্নী এষার স্বভাবমাধুর্য্যে তা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে আসে, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাও তার অদৃষ্টে টিকল না বেশীদিন। তারই কনিষ্ঠ চিররুগ্ন বৈমাত্রেয় ভাই দিব্যেন্দুর মৃত্যু ঘটল রহস্যময় পরিস্থিতিতে। স্বামীকে সন্দেহ করল এষা। অভিমানে নিজের নির্দোষিতা সপ্রমাণ করার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করল না শুভেন্দু। এর পর পট উত্তোলিত হল বহু বছর পরে, সশ্রমকারামুক্ত শুভেন্দু ফিরে এল নিজের বাড়ীতে কিন্তু সেখানে তার অস্তিত্বের চিহ্নমাত্রও তখন আর নেই। যেদিকে সে চায় সেইদিকেই মৃত দিব্যেন্দুর স্মৃতিপূজা চলছে মহা সমারোহে, নিজের স্ত্রীর কাছেও হতভাগ্য খুঁজে পেল না সান্ত্বনার এতটুকু আশ্রয়। অবশেষে সব অনিষ্টের মূল যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করতে চাইল সে, কিন্তু তাও সফল হল না তবে সেই প্রচেষ্টায়ই সে আবার ফিরে গেল তার একমাত্র আশ্রয় কারাগারে। শুভেন্দুর জীবনের চরম ট্র্যাজেডি সহজেই পাঠক মননে রেখাপাত করে। দরদী ও মরমী হাতেই সমস্ত কাহিনীটি বয়ন করেছেন, আন্তরিকতায় স্বাক্ষরে তাঁর রচনা সমুজ্জ্বল আর সেটাই পাঠকসমাজে তাঁর আসন কায়েমী হওয়ার মূল কারণ। আমরা উপন্যাসটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্যকামী। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ প্রশংসনীয়। লেখক—জরাসন্ধ, প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলি:—৯ মূল্য—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

একটি প্রেমের কাহিনী

বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যকে আস্বাদন করার প্রধানতম পন্থা অনুবাদ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন, সুখের বিষয় সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধে যথোচিত উদ্যমের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তেলেগু সাহিত্যের অন্যতম সুধী 'গুড়িপাটী ভেঙ্কটচলম', তাঁরই এক বহুল প্রচারিত গ্রন্থের অনুবাদ আলোচ্য গ্রন্থটি। বর্তমান অনুবাদক অল্প দিনেই স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, আলোচ্য অনুবাদকর্মেও তিনি আপন সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁর অনুবাদ এতই সাবলীল যে, মূল কাহিনীর রস সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে; পড়তে পড়তে একবারও মনে হয় না যে, কোন অনুবাদ পাঠ করছি, যে কোন অনুবাদকের পক্ষেই এতটা স্বাচ্ছন্দ্য, এতটা গতিশীল হতে পারা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের পরিচায়ক। কাহিনীটি সেই চিরন্তন ত্রিভুজের সমস্যা আশ্রয়ী, পার্থক্য শুধু এই যে, প্রেমের যে ছবি লেখক এতে এঁকেছেন, তাতে কোন দুর্বলতার ইঙ্গিতমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, এক আশ্চর্য্য প্রেমের

কাহিনী এটি, খাঁটি বস্তুবাদী শরীরনিষ্ঠ প্রেম, বক্তৃতায় যা দুর্ব্বার, স্পর্দ্ধায় যা উগ্র । লেখকের বক্তব্য এতই শক্তিশালী যে, পাঠকমনে তা রীতিমতো দাগ বসায় ; ভাল কি মন্দ—এ মতামত দেওয়ার পরিবর্ত্তে মানবমনের সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ সত্যরূপেই এই রচনা নিজের স্বাক্ষর বসিয়ে দিয়ে যায় । যা সত্য তাই যে শ্রেয়, একথা স্বীকার না করতে চাইলেও তার শক্তিকে কিছুতেই অস্বীকার করা সম্ভব হয় না । অনুবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থখানি যে এক উল্লেখ্য সংযোজন, একথা অনস্বীকার্য্য । গ্রন্থটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি ভাল । অনুবাদক—বোম্মানা বিশ্বনাথম্ । প্রকাশক—মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ । মূল্য—দু' টাকা ।

এই সব আলো প্রেম

বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্ধন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সমতা রেখে পাঠকের রুচিও পরিবর্তিত হয়েছে । কিছু সংখ্যক সুবেদী পাঠককে আজ আর নিছক গল্প পরিবেশন ক'রে খুসী রাখা যাচ্ছে না । তাঁরা নবীন লেখকদের কাছ থেকে গল্প ও উপন্যাস, বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের পরিবর্তনকে সাগ্রহে গ্রহণ করছেন । অসিত গুপ্ত-র কিছু ছোট গল্প এখানে-সেখানে পাঠ করেছি । এই বইটি সম্ভবত তাঁর প্রথম উপন্যাস । এই উপন্যাসের নায়ক উত্তম পুরুষে তার জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়কে বিবৃত করে । একটি নতুন এবং মনোগ্রাহী আঙ্গিকে নায়কের জীবনের এক খণ্ড অংশ বিবৃত করেছেন লেখক । তাঁর নায়ক সুশোভন ঘোষ, মানুষের জীবনে, কোন শ্রেয় বা প্রেয় বস্তু যে চিরস্থায়ী হতে পারে না, সে সম্পর্কে শৈশব থেকেই সচেতন । অথচ তার একটি সুস্পষ্ট আদর্শ আছে, আছে একটি স্বতন্ত্র জীবন-দর্শন । সেইজন্য সে জীবনের চলোর্মি থেকে শুধু ক্ষণিকের আলো আহরণ করে না । তার বঞ্চিতা ললিতাবৌ-কে সে সেইজন্য গ্রহণ করে না, কেন না সে ক্ষণ-সুখ আহরণে বিশ্বাসী নয় । মীনাক্ষীর প্রেম যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, সে সে-আঘাতও সহ্য করে এবং শেষে সে সরস্বতীর আন্তরিকতার কাছে যখন আত্মসমর্পণ করে, সে জানে হয়তো এই প্রেমও তার জীবনে চিরস্থায়ী হবে না । সুশোভন বর্ত্তমান যুগের স্থিতধী, আত্মস্থ একটি প্রতিভূ চরিত্র । গ্রন্থের সব ক'টি চরিত্র-ই সুলিখিত । তাদের ভিত্তি জীবনের অগভীরে নয়, চেতনার গূঢ়োপলব্ধিতে । লেখকের ভাষা ব্যঞ্জনাময়, চিত্রল এবং কোন কোন স্থলে তা বিশেষ রূপকাশ্রিত । লেখকের গভীর মননশীলতার স্বাক্ষর বহন করে উপন্যাসটি । বন্ধু গৌর এবং পিতা মুরারি-র চরিত্র বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসটি একটি বিশেষ সংযোজনরূপে গৃহীত হলে সুখী হব । প্রকাশক—তিনসঙ্গী প্রকাশনী, পরিবেশক—এম্. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট । মূল্য—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র ।

নরক

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ নিয়ে একাধিক উপন্যাস রচিত হয়েছে, আলোচ্য গ্রন্থখানিরও বিষয়বস্তু সেটাই, আদর্শবাদী যুবক গণেশ কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না তার কর্মক্ষেত্র শিক্ষায়তনের অন্তর্নিহিত গলদগুলির সঙ্গে, পদে পদে বিরোধ ঘটে তার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, অসত্য বা অন্যায়কে কিছুতেই মানে না সে, মাথা নোয়ায় না মিথ্যার কৌমূলে । অবশেষে মেঘ কেটে যায়, সত্যের বলিষ্ঠ আশ্রয়ে সুবিধাবাদীর দলবদ্ধ প্রয়াসের বিরুদ্ধেও জয়লাভ করে সে, দুর্ব্বলতা মূঢ়তার নাগপাশ ছিন্ন হয়ে পড়ে যায় নতুন যুগের মনুষ্যত্বের আহ্বানে । লেখকের ভাষা সরল বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকর্ষক, বেশ সহজ ভাবেই নিজ বক্তব্যকে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন তিনি । বইখানির আঙ্গিক সম্বন্ধেও অনুযোগ করার কিছু নেই । লেখক—উমানাথ ভট্টাচার্য, প্রকাশক—'কথকতা' ৩৩ সি, নেপাল ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা—২৬ । মূল্য—তিন টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র ।

মানুষের ছবি

সাহিত্যে অতি বাস্তববাদের ঢেউ লেগেছে । বাস্তবতা ব্যতীত সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি আজকের যুগ মানসে এক অলীক কল্পনা বিলাস বলেই প্রতীয়মান হয়, কিন্তু তাই কি শেষ কথা ? বাস্তববাদের অন্ধ অনুসরণেই কি সাহিত্যের একমাত্র সার্থকতা ? এই প্রশ্ন আজ পাঠক ও সাহিত্যশিল্পী উভয়ের সামনেই বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছে, সার্থক শিল্প যে গভীর জীবনবোধের ভিত্তিতেই শুধু গড়ে উঠতে পারে এ কথা তো অনস্বীকার্য্য রূপেই সত্য, কিন্তু তাই বলে জীবনের যা কিছু বিকৃতি যা কিছু মালিন্য তাকে উদ্‌ঘাটিত করাতেই সাহিত্যিকের দায়িত্ব শেষ, একথা কখনই সত্য নয় । লেখকের শক্তি না থাকলে সাহিত্যে বাস্তববাদ অনেক ক্ষেত্রেই শুধু পাঁক ঘাঁটাতেই পর্য্যবসিত হয়ে থাকে । আলোচ্য রচনাটিও সেই কারণেই ব্যর্থ । মানুষের ছবি আঁকতে গিয়ে লেখক শুধু মাত্র নৈরাশ্যবাদেরই আশ্রয় নিয়েছেন, ফলে তাঁর সাহিত্যকর্ম সত্যনিষ্ঠ হয়ে না উঠে কেমন একধরণের মনোবিকলনকে প্রধান উপজীব্য বলে তারই আশ্রয়ী হয়ে উঠেছে । জীবনবোধের নামে এই গ্লানিকর নেতিবাচক মানসিকতা সাহিত্যের পক্ষে কখনই কল্যাণপ্রদ হতে পারে না । লেখকের ভাষারীতিতেও প্রশংসনীয় কিছু নেই । বইটির ছাপা বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক ভাল । লেখক—সমীর মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—নিউ যুগের বাণী, ৬০ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, মূল্য—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র ।

যুগ পরিক্রমা

বিগত যুগের সাহিত্যকারদের মধ্যে প্রগতিশীল বলে একদা যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছিলেন শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁদেরই অন্যতম । সে যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে অবহিত ব্যক্তিমাত্রই নরেশচন্দ্রের লেখনীর বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে অল্পাধিক পরিচিত । তাঁর উপন্যাসগুলি পড়লে তাঁর গভীর জীবনবোধের ব্যাপ্তি উপলব্ধি করে বিস্মিত হয়ে যেতে হয় । আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধ সংকলিত করা হয়েছে । প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু বিভিন্ন—সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষানীতির প্রত্যেকটি দিক তিনি ভেবেছেন গভীর ভাবে আর শুধু তাতেই ক্ষান্ত থাকেননি—কোথায় এর গলদ, কোন পথে এর কল্যাণ নিহিত, সে দিকেও অবিচল প্রত্যয়ের সঙ্গে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেছেন । চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই প্রবন্ধগুলি পাঠে আনন্দিত ও উপকৃত হবেন । বইটির আঙ্গিক সম্বন্ধেও অনুযোগ করার কিছু নেই । প্রকাশক—সেনগুপ্ত ট্রাষ্ট, ২২।২৬ মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা—২৯ । মূল্য আট টাকা ।

হে ইতিহাস গল্প বলো

সাহিত্যের আসরে বিশেষতঃ শিশু-সাহিত্যের আসরে লেখক এক বিশিষ্ট আসন অধিকার করে রয়েছেন বহুদিন ধরেই, তাঁর এই আধুনিকতম রচনাও আজকের ছেলে মেয়েদেরই উদ্দেশে রচিত। তবে এটি নেহাৎ কাল্পনিক রহস্য রোমাঞ্চ বা বালক বালিকার মনোহারী কোন গালগল্পের পসরার সাজি নয়, বাঙ্গালার অতীত মনোহারী যে সব তথ্য আজও রয়েছে অবলুপ্তির অন্ধকারে, তারই কয়েকটিকে ইতিহাসের কবর খুঁড়ে বার করে এনেছেন তিনি। রাজ্যলিপ্সায় উন্মত্ত হয়ে ভাই ভাইকে হত্যা করেছে হাসতে হাসতে; সন্তান পিতৃদ্রোহী হয়েছে অবলীলাক্রমে, ইতিহাসের সেই রক্তাক্ত স্বাক্ষর লেখার প্রসাদ গুণে উজ্জ্বল হয়েই প্রতিভাত হয় আলোচ্য কাহিনীটি পড়তে পড়তে। রহস্য রোমাঞ্চের মতই আকর্ষণীয়, কিন্তু সত্যসন্ধ এই রচনা বাঙ্গালী বালক-বালিকাকে শুধু আনন্দই দেবে না স্বজাতির স্বদেশের অতীত সম্বন্ধে সম্যক ভাবে অবহিতও করে তুলবে। এই ধরণের প্রামাণ্য অথচ গল্পের মতই মনোহর রচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় বলেই সমাদর লাভ করার যোগ্য। আশা করি বাঙ্গলার কিশোর কিশোরী বর্তমান গ্রন্থটিকে সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবে। বইটির আঙ্গিক সম্বন্ধেও অভিযোগ করার কিছু নেই। লেখক—হেমেন্দ্রকুমার রায়। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭, মূল্য—এক টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

ইতিহাসের রক্তাক্ত প্রান্তরে

প্রায় দু'যুগ ধরে বাংলার শিশুসাহিত্য যাঁদের দানে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক তাঁদেরই অন্যতম। বর্তমান রচনায় তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে রক্তমাখা কয়েকটি কাহিনী উদ্ধার করে উপস্থাপিত করেছেন তাঁর কিশোর পাঠক সমাজের সামনে। রহস্য কাহিনীর চেয়েও উত্তেজক অথচ সত্য ঘটনামূলক এই গল্পগুলি ছেলেবুড়ো সকলকেই যে নির্বিশেষে আকর্ষণ করবে, একথা অনস্বীকার্য্য রূপেই সত্য। অতীত বাংলায় একদিন বর্গী নামে খ্যাত মারাঠা দস্যুরা যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছিল আলোচ্য গ্রন্থে সে সম্পর্কে একটি বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, যা দেশের বালক-বালিকার চিত্ত বিনোদনই শুধু করে না, তাদের স্বদেশের অতীত সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবহিতও করে তোলে। 'হত্যারক নরদানব' শীর্ষক কাহিনীটির বিষয়বস্তু জলদস্যু বা বোম্বেটের অত্যাচার। ঐতিহাসিক বোম্বেটে কালদেড়ে বা এডওয়ার্ড টিচ-এর কাহিনীই এর প্রায় সমস্তটা জুড়ে রয়েছে। এই ভয়ঙ্কর জলদস্যুর ইতিহাস যে কোন কাল্পনিক রোমাঞ্চ কাহিনীর চেয়ে উত্তেজক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, লেখকের জোরালো বর্ণনা ভঙ্গীতে তা যেন আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শিশুসাহিত্যের আসরে বর্তমান গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। ছাপা বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক ভাল। লেখক—হেমেন্দ্রকুমার রায়। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম—দু' টাকা।

খোকা এল বেড়িয়ে

আলোচ্য শিশুপাঠ্য গ্রন্থটির লেখিকা সাহিত্যের আসরে নবাগতা নন, শিশুসাহিত্যের সৃষ্টির প্রাক্ পর্বেই তিনি সেই ক্ষেত্রে নিজের আসন করে নিয়েছিলেন পুরোধাদের মধ্যেই। নতুন করে তাঁর শক্তির পরিচয় দিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র, স্বক্ষেত্রে তাঁর এই পুনরাবির্ভাব সত্যই বড় আনন্দের বিষয়। বাংলার ছেলে ভুলোনো ছড়াকে যে এমন মনোহর গদ্য সাহিত্যের রূপ দেওয়া সম্ভব, আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম গল্পটি না পড়লে, তা ধারণা করা যায় না। আঠারোটি ছোট ছোট গল্প সঙ্কলিত হয়েছে বইখানিতে আর তার প্রত্যেকটিই শিশুজনমনোহারী। গল্পগুলি এতই আকর্ষণীয় যে শিশু ছেড়ে বুড়োরাও যে এগুলি থেকে প্রভূত আনন্দ পাবেন, একথাও জোর করেই বলা যায়। শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক মূল্যবান সঙ্কলন। বইটির অঙ্গসজ্জা সুন্দর, প্রচ্ছদ বিষয়োচিত। লেখিকা—সুখলতা রাও, প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭, মূল্য—দুই টাকা ত্রিশ নয়া পয়সা।

কী হেরিলাম নয়ন মেলে

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি ভ্রমণমূলক রম্য কাহিনী। লেখিকা বিশাল বিচিত্র মহাভারতের দিকে দিকে পদসঞ্চার করে যা উপলব্ধি করেছেন, যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তারই পরিচয়ে তাঁর রচনা প্রোজ্জ্বল। প্রথম পরিচ্ছেদটি তাঁর কাশ্মীর ভ্রমণের স্মৃতিচারণ। ভূস্বর্গ কাশ্মীর সম্পর্কে বহু রচনাদি প্রকাশ হয়েছে অদ্যাবধি, যার ফলে চোখে না দেখেও আমরা কাশ্মীর সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছি। কিন্তু তা সত্বেও আলোচ্য রচনাটির এক পৃথক মূল্য আছে যা তার একান্ত নিজস্ব। লেখিকার স্বচ্ছ মধুর বর্ণনা রীতিতে, তাঁর পরিবেশ রচনার দক্ষতায় সমগ্র বিষয়বস্তুতে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে। পড়তে পড়তে পাঠকের মন উধাও হয়ে চলে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মাটির অমরাবতীর উদ্দেশে, মনে হয় যেন শুধু লেখিকাই নন আমরা সকলেই বেরিয়ে পড়েছি পথ পরিক্রমায়, এই জীবন্ত পরিবেশ সৃষ্টির শক্তি যাঁর কলমে আছে নিঃসন্দেহে তাঁর মধ্যে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর আছে। ছাপা বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন। লেখিকা—মায়া দাস, প্রকাশক—গ্রন্থপীঠ, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬, মূল্য—দুটাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা।

মন্দা নন্দার দেশে

মানুষের মনের গহনে কোথায় যেন লুকিয়ে থাকে এক চিরন্তন যাযাবর, তারই ডাকে মাঝে মাঝে সাড়া দিয়ে ফেলে সে। নিশ্চিন্ত আরাম ঘর গৃহস্থালী সব তুচ্ছ করে বেরিয়ে পড়ে পথে, দেশ থেকে দেশান্তরে চলতে থাকে তার পথ-পরিক্রমা। সেই দূরাভিসারের ডাকেই লেখক একদিন ছেড়ে এসেছিলেন ঘর, দুর্গম তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন শুরু। তুষারমৌলি হিমাচলের বুকে সুবিখ্যাত তীর্থ কেদারবদরী দর্শনে গিয়েছিলেন তিনি। ভ্রমণ কাহিনী যে উপন্যাসের চেয়েও আকর্ষণীয় হতে পারে এর আগে একাধিক গ্রন্থে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ কথা স্বচ্ছন্দেই বলা যেতে পারে যে,

আলোচ্য গ্রন্থখানিও সেই শ্রেণীভুক্ত। অতি রমণীয় ভঙ্গীতে লেখক তাঁর যাত্রাপথ ও পরিবেশকে বর্ণনা করেছেন, খণ্ডচিত্রের মতই তা বর্ণাঢ্য ও আকর্ষণীয়। পথে পথে যে সব বান্ধবের দেখা পেয়েছেন সেই সব যাত্রা সহচর-সহচরীদেরও তিনি অল্পের মধ্যে এক অখণ্ড রূপ দিয়ে দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর আন্তরিকতা সত্যই মনকে অভিভূত করে তোলে। লেখকের ভাষারীতি স্বচ্ছন্দ ও মধুর, বিষয়বস্তুকে উজ্জ্বল করেই ফুটিয়ে তোলে। বইটির আঙ্গিক সম্বন্ধেও অভিযোগ করার কিছু নেই। লেখক—শুভঙ্কর, প্রকাশক—প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ মূল্য—চার টাকা।

নবজীবন (হুগলী জেলা বার্ষিকী)

বাঙলা দেশের হুগলী জেলা সম্বন্ধীয় একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণী গ্রন্থ নবজীবন। এই ধরণের জেলাভিত্তিক স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রামাণ্য বিবরণী গ্রন্থগুলির গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অনুমেয়। গ্রন্থটির মধ্যে সমগ্র হুগলী জেলার অসংখ্য তথ্যকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই গ্রন্থটি ইতিহাসসেবী ও গবেষকমহলে যে কতখানি উপকার করবে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গ্রন্থে হুগলী জেলা পরিচিতি, হুগলীর এবং জেলান্তর্গত স্থানসমূহের ইতিহাস, ভৌগোলিক বিশেষত্ব, হুগলী জেলার প্রসিদ্ধ সন্তানদের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, সাহিত্য, রাজনীতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ব্যবসায়, ক্রীড়া, শরীর চর্চা, বিপ্লবান্দোলন প্রভৃতি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত ও আলোচিত হয়ে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বর্ধন করেছে। এই জাতীয় গ্রন্থ জাতিকে নানাভাবে উপকৃত করে। জাতীয় জীবনে এই জাতীয় গ্রন্থের উপকারিতা অনস্বীকার্য। সমগ্র ভাবে হুগলী জেলাটি এই গ্রন্থে সুচিত্রিত। এক কথায় গ্রন্থটি প্রভূত মূল্যবান তথ্যের আকর বিশেষ। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীঅরবিন্দ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতির জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা এবং তাঁদের জীবনী ও তাঁদের বাণী ও রচনার উদ্ধৃতি গ্রন্থের মর্যাদা বাড়িয়েছে। দর্শনাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী গ্রন্থটির এক অসামান্য সম্পদ। শিল্পাচার্য নন্দলালের স্কেচ বইটির আকর্ষণ অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছে। গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি ছোটগল্প, কবিতা, মহিলা বিভাগ, শিশু বিভাগ সংযুক্ত করে সমগ্র গ্রন্থটিতে বৈচিত্র্য আরোপ করা হয়েছে। গ্রন্থটিকে ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, হরিহর শেঠ, ডক্টর কালিদাস নাগ, বনফুল, সজনীকান্ত দাস, আশাপূর্ণা দেবী, শ্রীনির্মলকুমার বসু, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীভূপতি মজুমদার, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীশান্তিকুমার মিত্র, সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসুকুমার দত্ত প্রভৃতির রচনাদি অলঙ্কৃত করেছে। হুগলী জেলার মত প্রত্যেকটি জেলাকে কেন্দ্র করে এই জাতীয় বিশেষ ভাবে পঠনীয় মূল্যবান গ্রন্থাদি প্রকাশিত হলে বাঙলা রত্নাগার আরও পরিপূর্ণ হবে। আমরা এই গ্রন্থটির জন্যে সম্পাদক শ্রীসুকুমার দত্তকে সর্বাঙ্গীণ অভিনন্দন জানাই। ছাপা, বাঁধাই, অঙ্গসজ্জাও অতি উচ্চ স্তরের। প্রকাশক—নবজীবন কার্যালয়, ১০, ক্লাইভ রো। মূল্য—দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

রাপ্তির ডাক

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি ছোট গল্প সংকলন। লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যে ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত স্বাধিকারের মর্য্যাদায়ই, বর্ত্তমান পুস্তকেও তাঁর সেই মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে বলেই আমরা আশা করি। গল্পগুলি শুধু সুলিখিতই নয় পরিপূর্ণ ভাবেই জীবনধর্মী। লেখকের মানবিক আদর্শ প্রতিটি কাহিনীরই প্রাণসত্তা। পরিপূর্ণ নিটোল সাহিত্যরস জারিত গল্পগুলি তাই নিছট উপভোগ্যই নয় চিন্তাশীলতার খোরাকও এদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই বিরাজিত। সংগ্রহে মোট আটটি গল্প স্থান পেয়েছে, প্রথম গল্পের নামেই গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে, এই গল্পের নায়িকা ললিতা লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি, চরিত্রটির স্বভাবজ প্রাণোচ্ছলতা ও আদর্শবাদ পাঠকমনকে রীতিমত আলোড়নের সৃষ্টি করে। গ্রন্থটি যে পাঠক মহলে সমাদরের সঙ্গেই গৃহীত হবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। এর অঙ্গসজ্জাও মোটামুটি ভাল। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ,, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—চার টাকা।

সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ গল্প

বর্ত্তমান গল্প সংগ্রহের লেখক সাহিত্যরসিক মাত্রেরই পরিচিত, তাঁর সরেস গল্পগুলির এই সংকলন পাঠক সমাজে আন্তরিক অভিনন্দনের সঙ্গেই গৃহীত হবে। লেখক মূলতঃ রসসাহিত্যিক হলেও তাঁর রচনার সত্তা দ্বিবিধ, হাস্যরসের অন্তরালে এক গভীর মমতাপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়ে প্রোজ্জ্বল তাঁর রচনাগুলি, আর এইখানেই বোধ হয় সেগুলির যথার্থ মূল্য নিহিত। চটুল সংলাপ ও রসালো বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে সেই হৃদয়বত্তাই উঁকি দেয় ক্ষণে ক্ষণে, পাঠক মনকে যা এক সরস স্নিগ্ধতা সঞ্চার করে। এই ধরণের গল্পের প্রথম সারিতেই বসার যোগ্য এই গ্রন্থের অন্তর্গত "পাদটীকা" গল্পটি। দেশের ভবিষ্যৎ মানুষ গড়ার যাঁরা কারিকর সেই শিক্ষক শ্রেণীর নিদারুণ দারিদ্র্যই এই কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু; দেশের এই মর্মান্তিক লজ্জাকে সামান্য দু একটি কথার মাধ্যমে লেখক নিপুণ ভাবেই প্রকাশ করেছেন। লেখকের ভাষারীতি যা তাঁর একান্তই নিজস্ব, গল্পগুলিকে এক স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দিয়েছে। আঙ্গিক উচ্চাঙ্গের—প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিঃ—৯, দাম—চার টাকা।

"গুণীর যে গুণ তাহা জানে গুণধর।
অন্যে কভু নাহি জানে সে গুণনিকর॥
মালতী মল্লিকা পুষ্প গন্ধ বিমোহন।
নাসিকাই জানে কভু না জানে লোচন॥"

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কোথায় বেড়াতে যাবেন ?

সমর চট্টোপাধ্যায়

হুগলী জেলার আর সব দর্শনীয় স্থান পরে দেখবেন, আগে চলুন বীরভূমটা ঘুরে আসি। গরম পড়ার আগে—বীরভূমের জায়গাগুলো দেখে নেওয়া দরকার। রোদের প্রচণ্ড তেজ, তার ওপর আগুনে হাওয়া খুবই কষ্টকর। দিনের বেলায় পথেঘাটে বেরুনোই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া স্বাস্থ্যের দিক থেকেও শীত ও বসন্তকালে বীরভূম বেশ ভাল জায়গা—ঘুরে বেড়াতেও ভাল লাগবে।

সিউড়ি হ'ল বীরভূমের হেড-কোয়ার্টার। আমার মনে হয় সিউড়িকে কেন্দ্র করে বীরভূম পরিক্রমা আপনি শুরু করুন।

সিউড়ি যেতে হলে লুপ লাইনের যে কোন ট্রেণে উঠুন—সাঁইথিয়ায় গাড়ী বদল করে সিউড়ির ট্রেণে চাপুন। আর তা না হলে সব চেয়ে ভাল হয় হাওড়া থেকে রাত্রে যে মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ছাড়ে তাতে সাঁইথিয়ার একটি বগি থাকে, ঐ গাড়ীতে চাপলে সরাসরি পরের দিন সকালে সিউড়ি পৌঁছে যাবেন। ষ্টেশন থেকে সহর কাছেই; একটা রিক্সাওয়ালাকে বলুন যে কোন হোটেলে নিয়ে যেতে। অনেক হোটেল আছে, এ ছাড়া বাড়ী ভাড়াও পেয়ে যাবেন।

আচ্ছা, আগে কোথায় যাবেন ? আমার মনে হয় আগে সিউড়ি সহরটা ঘুরে দেখুন। কোলকাতা থেকে প্রায় ১১৫ মাইল দূরে কাঁকর আর লাল মাটির সহর সিউড়ি। বাংলা দেশের অনেক সহর আপনি দেখেছেন বা দেখবেন; কিন্তু সিউড়ি সহরের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার বিষয়। এই সহরের প্রান্তে পাশাপাশি বসবাস করছে হাড়ি, বাউরী, ডোম, ধাঙর, মাল, কেওট সব জাতির লোক সপরিবারে। সহরের অলিতে গলিতে নানা দেব-দেবীরও অসংখ্য মন্দির। বেশীর ভাগ দেব দেবীই হচ্ছেন মনসা, চণ্ডী, কালী, ধর্ম্ম ঠাকুর। মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করবার মত। বীরভূমের চালা ঘরের মডেলেই এই মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হয়েছে। যখন ষ্টেশনের দিকে যাবেন, ঘনুসা-মন্দিরের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দেখে নিন। সিউড়ি সহরটি বেশ ভালই লাগবে আপনার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর, প্রধান রাস্তাগুলিও পিচের, বেড়াবার জায়গা প্রচুর, খাবারের কোন অসুবিধে নেই, জল হাওয়াও চমৎকার। এখানকার সব চেয়ে প্রিয় খাবার হ'ল মোরব্বা; নাম-করা দোকান থেকে কিনে খান, তৃপ্তি পাবেন।

বীরভূমে যতগুলি নামকরা তীর্থক্ষেত্র আছে, বোধহয় বাংলা দেশে আর কোথাও এত নেই। ভারতের ৫১টি পীঠের মধ্যে ৫টি পীঠই হচ্ছে বীরভূমে। এই পীঠগুলি হ'ল বক্রেশ্বর, অট্টহাস বা ফুল্লরা, সাঁইথিয়ার নন্দিকেশ্বরী, নলহাটির ললাটেশ্বরী, বোলপুরের কাছে কঙ্কালীতলার কঙ্কালেশ্বরী। এগুলি ছাড়াও আপনাকে নিয়ে যাবো বামাক্ষ্যাপার সাধনার স্থল তারাপীঠ, কবি জয়দেবের জন্মস্থান কেঁদুলি বা কেন্দুবিল্ব, চণ্ডীদাসের নান্নুর, মুসলমান সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান পাথরচাপুড়ি খুষ্টিকুরি। বোলপুরের শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন এর আগেও বোধহয় আপনি দেখেছেন, তবু বসন্তোৎসবে শান্তিনিকেতনকে আর একবার দেখুন।

প্রথমে কিন্তু আপনাকে নিয়ে যাবো ম্যাসাঞ্জোরে। সিউড়ি
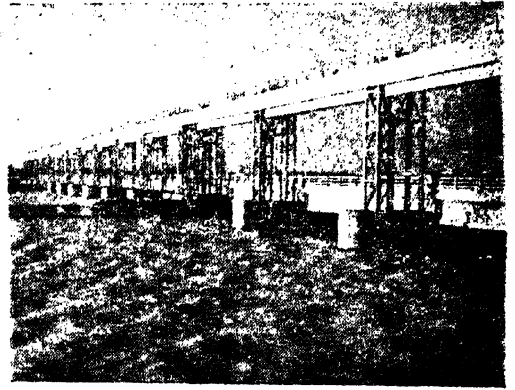
তিলপাড়া ব্যারাজ—স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে নির্ম্মিত এইটেই প্রথম ব্যারাজ।
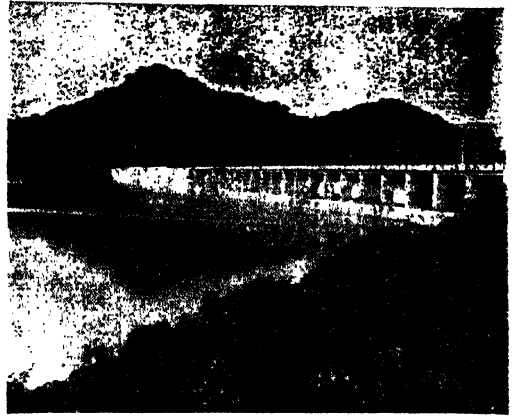
কানাড়া বাঁধ—ময়ূরাক্ষী নদীকে এই বাঁধের সাহায্যে বাধা হয়েছে।

উদয়ন (উত্তরায়ণ) এবং কোনার্কের অংশবিশেষ।

থেকে ২৫ মাইল দূরে দুমকা পাহাড়ের গায়ে ময়ূরাক্ষী নদীকে যেখানে বাঁধ দিয়ে বাঁধা হয়েছে, সেখানে আগে চলুন। যাওয়ার অসুবিধে নেই, বাস পাবেন; ১ মাইল রাস্তা পিচের, বাকী খোয়ার। বাঁধটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় তৈরী হয়েছে। খরচ পড়েছে ২ কোটি ৩১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। এই বাঁধ নির্ম্মাণে ক্যানাডার কাছ থেকে নানাভাবে প্রচুর সাহায্য পাওয়া গেছে বলে বাঁধটির নামকরণ করা হয়েছে ক্যানেডা-বাঁধ। বাঁধের ওপর চওড়া রাস্তা; মাঝখানে দাঁড়িয়ে একদিকে চেয়ে দেখুন—ময়ূরাক্ষীর উত্তাল তরঙ্গরাশি মানুষের হাতে শৃঙ্খলিত হয়ে বিক্ষোভে পাথরের উপর মুহুর্মুহুঃ মাথা খুঁড়েই চলেছে। আর একদিকে বাঁধের ভেতর দিয়ে পেঁজা তুলোর মত ময়ূরাক্ষীর গ্যালন গ্যালন জল শীর্ণ নদীর ওপর আছড়ে পড়ছে। এই জলই সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের ক্ষেতে সেচের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে। বাঁধটির দৈর্ঘ ২১০০ ফুট ও প্রস্থ ১০ ফুট। যেখান দিয়ে জল ছাড়া হচ্ছে, সেখানকার প্রস্থ হল ১২৫ ফুট। নদীর উপরের মাটি থেকে বাঁধটির উচ্চতা হবে ১২৩ ফুট। ময়ূরাক্ষীর বিশাল জলাধারটি ২৭ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে রয়েছে। আশে পাশে যে ঘন জঙ্গল দেখছেন তাতে বন্য পশুপক্ষী কিছু কিছু এখনও আছে। বিশেষ করে নদীর ওপারে যে ঘন বন, সেখানে ভাল্লুক ও চিতাবাঘ আছে শুনেছি। তবে এখানে গুলী করে শিকার করা নিষিদ্ধ।

বাঁধের দক্ষিণদিকে নদীর পাড়ে ঐ উঁচু জায়গায় যে দু'টো জেনারেটর দেখছেন ঐ থেকে ২০০০ কিলোওয়াট জল-বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে। এই বিদ্যুৎ বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ও বিহারের কয়েকটি এলাকায় সাধারণের ব্যবহারের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাঁধের চার দিকে ও আসেপাশে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা থাকায় রাত্রে বেড়ানোরও কোন অসুবিধে হয় না। চার দিকে পাহাড় ঘেরা, জায়গাটিও মনোরম, কাজেই স্বাস্থ্যান্বেষীদের পক্ষে মাসাঞ্জোর খুবই উপযোগী জায়গা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। তবে থাকার পক্ষে একমাত্র ময়ূরাক্ষী-ভবন আর দু'একটি সরকারী ভবন, তাও সকলের জন্যে নয়। এ ছাড়া এখানে আর কোন বাড়ী নেই। আশে পাশে সাঁওতালদের বাস, তারা ভদ্র ও নম্র; যদি তাদের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারেন, গাঁ থেকে ওরা ফল ও সজী সংগ্রহ করে এনে দেবে। পর্ব্বতারোহীদের পক্ষেও জায়গাটি আকর্ষণীয়; অনেকে উঁচু পাহাড়গুলিতে চড়বার জন্যে প্রায়ই আসেন। তবে সব পাহাড়ই ঘন বনজঙ্গলে আচ্ছাদিত ও শ্বাপদ-সঙ্কুল।

হ্যাঁ, ঐ যে পুব দিকে জলাধারের সামনে সুন্দর বাগান ঘেরা বাঙলো প্যাটার্ণের বাড়ীটি দেখছেন ঐটিই হ'ল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ময়ূরাক্ষী-ভবন বা গেষ্ট-হাউস। এতে থাকবার অধিকার পেয়েছেন বা পাবেন রাষ্ট্রীয় অতিথি, বিভাগীয় সেচ ও বিদ্যুৎ কর্ম্মচারী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যান্য কর্ম্মচারী। যখন এঁরা কেউই থাকেন না, তখন বিশেষ অনুমতি-পত্র জোগার করতে পারলে সাধারণকেও সেখানে থাকতে দেওয়া হয়। এই ভবনটিতে মোট ৬টি ঘরে ১৫টি সীট আছে। প্রথম শ্রেণীর হোটেলের মতো এখানে সব সুবিধেই পাওয়া যায়। প্রাতরাশ, মধ্যাহ্ন ভোজ, সান্ধ্যভোজ, চা পানের জন্য দৈনিক খরচ আট টাকা। প্রত্যেকটি সীটের ভাড়া দৈনিক চার টাকা। ম্যাসাঞ্জোর ড্যাম ডিভিসনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে এখানে থাকবার জন্যে আগে থেকে আবেদন করতে হয়। ময়ূরাক্ষী ভবনের পাশে আর একটি বিশ্রামাগারও রয়েছে; সাধারণতঃ স্বল্প বেতনের কর্ম্মচারীদের জন্যে এটা করা হয়েছে। দুটি শোবার ঘরে ৬টি সীট আছে—ভোজনাগার ও বসবার ঘরও আছে,, দৈনিক সীট ভাড়া দু'টাকা। ড্যাম ডিভিসনের এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে এখানে থাকার জন্যে আবেদন করতে হয়।

এ দুটি ছাড়াও ঐ যে বাড়ীটি দেখছেন, ওটি হ'ল ইউথ হোটেল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধার জন্যে ওটি তৈরী করেছেন। ঐটিতে মোট ৫টি ঘর আছে। ছাত্রীদের থাকার জন্যে ১২টি, ছাত্রদের জন্যে ১০টি আর শিক্ষকদের জন্যে ২টি করে সীট ঐ হোটেলটিতে আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাথা পিছু ৪ আনা থেকে ১৲ টাকা পর্য্যন্ত চার্জ্জ। যখন ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ থাকে না, তখন সাধারণের থাকার জন্যেও এটি দেওয়া হয়; ভাড়া লাগে মাথা পিছু দু'টাকা। শিক্ষায়তনের অধিকর্ত্তার মাধ্যমে ড্যাম ডিভিসনের এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে এখানে থাকার জন্যে আবেদন করতে হবে। এগুলি ছাড়াও বিহার সরকারের একটি পরিদর্শন-বাঙলো রয়েছে।

হাঁ, আর একটি কথা আপনাকে জানিয়ে দিই। ময়ূরাক্ষীর জলাধারে আপনি যদি বেড়াতে চান, রাজ্য সরকারের একটি লঞ্চ পাবেন, মাথাপিছু দু'টাকা দিলে ঐ বাঁধের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে আপনাকে ঘুরিয়ে আনবে। তবে আপনি যদি দূরে যেতে চান অর্থাৎ যতদূর পর্য্যন্ত লঞ্চে যাওয়া যায় ততদূর যান, তাহলে কমপক্ষে ২০ টাকা ভাড়া লাগবে।

চলুন, এবার ফেরা যাক। ফেরবার পথে তিলপাড়া ব্যারাজটা একটু দেখে নিন। অবশ্য দেখবার বিশেষ কিছু নেই, তবে স্বাধীনতা-লাভের পর এইটেই পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের প্রথম ব্যারাজ নির্ম্মাণ। ঐ যে ম্যাসেঞ্জোর ড্যামে পাঁজাতুলোর মত জল ময়ূরাক্ষী নদীতে পড়ছে দেখলেন সেই জল এই তিলপাড়া ব্যারাজে নিয়ে এসে কোথায় কি পরিমাণ জল সেচের জন্যে ছাড়া হবে তা এইখানেই স্থির করা হয়। স্লুইস গেটগুলি দিয়ে সেই জল খালে ছেড়ে দেওয়া হয়। এইভাবে লক্ষ লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া হচ্ছে।

বলুন এবারে কোথায় যাবেন? বক্রেশ্বর? বেশ তাই চলুন। রাজগীর গিয়েছেন তো? দেখবেন রাজগীর আর বক্রেশ্বরে খুব বেশী তফাৎ নেই। বরঞ্চ বক্রেশ্বর অনেক দিক থেকে আরও আকর্ষণীয়। বিহার সরকার সজাগ—তাই রাজগীর সহরের মর্য্যাদা পেয়েছে—মানুষের সবকিছু সুখ সুবিধের ব্যবস্থা সেখানে হয়েছে—জনপদ গড়ে উঠেছে—তাই প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষের সেখানে ভীড় জমে। আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনোও প্ল্যানই করে উঠতে পারলেন না কি ক'রে বক্রেশ্বরকে স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত করবেন। রাজগীরে যাঁরা বেড়াতে যাচ্ছেন, তাঁদের বক্রেশ্বরমুখো অনায়াসেই করা যায় যদি রাজ্য সরকার একটু আন্তরিক ভাবে উদ্যোগী হন।

বক্রেশ্বর শুধু পুণ্যলোভাতুরের কাছে নয়, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, পর্যটক—সকলের কাছেই মহাতীর্থ। এখানে ঘটেছে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বস্তুর অপূর্ব্ব সমন্বয়। এখানে ধার্ম্মিক পায় পুণ্যের সন্ধান, বৈজ্ঞানিক পায় গবেষণার, ঐতিহাসিক পায় সভ্যতার উত্থান পতনের আর কর্ম্মক্লান্ত মানুষ পায় শান্তি ও স্বস্তি। এখানে আত্মাশক্তি প্রকাশিত হয়েছেন মহিষমর্দ্দিনীরূপে, মহাদেব হয়েছেন শিব ও রুদ্র

রক্ষক ও সংহারক। তাই এই ধাম একাধারে শৈবের সিদ্ধপীঠ, শাক্তের মহাপীঠ, আর বৈষ্ণবের পরম বৃন্দাবন।

চলুন এবার যাওয়া যাক। হাঁ এই সিউড়ি থেকেই যাওয়া যাবে। ভোর ৬টায় একখানা বাস ছাড়ে আর ছাড়বে বেলা ১টায়। ১২-১৩ মাইল রাস্তা। রাস্তা ভালই। এছাড়া অণ্ডাল-সাঁইথিয়া রুটে দুবরাজপুর ব'লে যে ষ্টেশনটি আছে, সেই ষ্টেশন থেকেও যাওয়া যায়—বক্রেশ্বর মাত্র ৫ মাইল। হাঁটা পথে বা গরুর গাড়ীতে যেতে হবে। সিউড়ি থেকে বাসে ক'রে যেতে ভালই লাগবে। দূরে, বহু দূরে ঐ যে পাহাড়গুলি দেখছেন, ওখানকার হাওয়া এই সব অঞ্চলে বয় বলে এখানকার স্বাস্থ্য ভাল, তাছাড়া জলও শরীরের পক্ষে ভাল।

আসুন, এইখানে নামতে হবে। দেখছেন না সামনে নদী। বাস তো আর নদীর ওপর দিয়ে যেতে পারবে না। তবে নদীর ওপর ঐ যে সেতু তৈরী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন, অনেকদিন ধরেই ওর গাঁথনি চলছে—কবে যে শেষ হবে কে জানে! ভয় নেই—নদী হেঁটেই পেরুতে পারবেন। ওপারে গিয়ে আরও প্রায় আধমাইল রাস্তা হাঁটতে হবে। খুব ফাঁকা জায়গা—বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান।

বীরভূমের ছায়া-সুশীতল, পল্লব-ঘন প্রকৃতির এক নিভৃতান্তরালে এই মহাতীর্থ বক্রেশ্বর। এর আর এক নাম গুপ্তকাশী। সহস্রাধিক বছর আগে কৃষ্টি ও সভ্যতার দিক থেকে বক্রেশ্বর যে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল, তার প্রমাণ এখান থেকে এক মাইল দূরে ডিহি-বক্রেশ্বরে গেলে এখনও পাওয়া যাবে। মধ্যযুগে মুসলমান-বিপ্লবে সে সোনার বক্রেশ্বর ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বর্ত্তমান বক্রেশ্বরধামে নয়া বক্রেশ্বর গড়ে উঠেছে।

বক্রেশ্বরে দেবীর ভ্রূ-মধ্য পড়েছিল; দেবীর নাম মহিষমর্দ্দিনী; ভৈরব বক্রনাথ। মহাশ্মশানের ওপর এই মহাপীঠ। বক্রেশ্বর তীর্থ সম্পর্কে এখানকার সেবায়িতদের কাছ থেকে অনেক কথা শুনতে পাবেন। জনশ্রুতি আছে—পুরাকালে ব্রাহ্মণ-কুলজাত হিরণ্যকশিপু দানবকে ভগবান নৃসিংহদেব হত্যা করেন। ব্রহ্মবধে তাঁর নখে জ্বালা হয়। মহামুনি অষ্টাবক্র নৃসিংহদেবকে জ্বালামুক্ত করবার ইচ্ছায় স্বেচ্ছায় সেই জ্বালা নিজের মাথায় বরণ করে নেন। জ্বালার প্রভাবে অষ্টাবক্র কাতর হ'লে নৃসিংহ দেব অষ্টাবক্রকে বক্রনাথ মহাদেবকে স্পর্শ করতে উপদেশ দেন। গহ্বরে নেমে অষ্টাবক্র বক্রনাথকে স্পর্শ করলে গুহার মধ্যে সর্ব্বতীর্থের জলবিন্দু এসে তাঁকে অভিষিক্ত করে। তিনি জ্বালামুক্ত হন।

বক্রেশ্বর-মন্দিরের দক্ষিণে এই পাপ-হরা নদী আর উত্তর পূর্ব্বে বক্রেশ্বর নদ। পাপহরা নদীতে ঐ যে পাথরের একটি চাই ভেসে আছে দেখছেন, ঐটিই নাকি বৈতরণী। চতুর্দ্দিকে ছোট বড় কত শিবালয় দেখুন, প্রায় ২৫০টি এই রকম শিবালয় আছে। সবগুলিই প্রায় ধ্বংসের দিকে। বক্রেশ্বর দেব যখন যার মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন, তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে এই সব শিবালয় নির্ম্মাণ করে দিয়ে যান। মন্দিরে শিবও প্রতিষ্ঠিত হয়, পূজা-অর্চ্চনাদিরও ব্যবস্থা হয়। কিন্তু স্থায়ী কোন ব্যবস্থা তাঁরা করে যাননি। ফলে পূজা-অর্চ্চনাদি বন্ধ হয়ে গিয়েছে; মন্দিরগুলিও একে একে ধ্বংসের গহ্বরে নেমে যাচ্ছে। রাজ্য সরকার এগুলি যদি সংস্কার ও সংরক্ষণের দায়িত্ব নেন, তাহলে অনেক উপকার হবে।

মন্দিরের দক্ষিণে শ্রেণিবদ্ধভাবে সাতটি গরম ও একটি শীতল জলের প্রস্রবণ বা যোগকুণ্ড আছে। সাধারণের কাছে এই
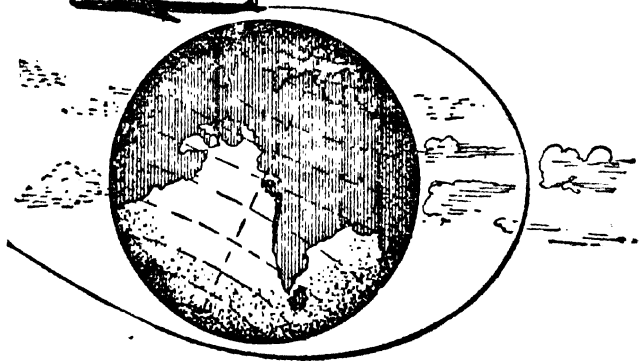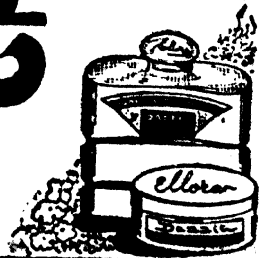
কুণ্ডগুলো আশ্চর্য্যের বিষয়বস্তু। প্রতিটি কুণ্ড বাঁধানো। পাশাপাশি সবগুলি রয়েছে অথচ আশ্চর্য্য দেখুন, প্রত্যেকটি কুণ্ডের জলের তাপ আলাদা। আসুন, প্রথমে ঐ কুণ্ডটি দেখে আসি। এটি হ'ল অগ্নিকুণ্ড—জল কি রকম টগ্‌বগ করে ফুটছে দেখুন, এত গরম জল হাতেই দিতে পারবেন না। ঘাটের সিঁড়িতে দেখুন, অনেকে পরীক্ষা করার জন্যে কিছু চাল ফেলে দিয়েছিল জলে। এত গরম ফুটন্ত জল, অথচ সেই চালগুলি যেমন ছিল, তেমনি এখনও আছে। এই কুণ্ডের জলের তাপমাত্রা ৬৭ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। এখানকার লোকের মুখে শোনা গেল, কিছুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক নাকি এই কুণ্ডের জলের নীচে কি আছে, তা পরীক্ষা করার জন্যে পাইপ পুঁতে দেখছিলেন। ১২৫ ফুট অবধি গিয়ে সে পাইপগুলি নাকি গলে গিয়েছে। এর পরের কুণ্ডটি হল ক্ষারকুণ্ড—জলের উত্তাপ ৬৬ ডিগ্রী। তারপর আছে ভৈরবকুণ্ড—উত্তাপ ৬১°৫ ডিগ্রী, সূর্য্যকুণ্ড—৬১°৫ ডিগ্রী, ব্রহ্মকুণ্ড—৫৮ ডিগ্রী, সৌভাগ্যকুণ্ড—৪৮°৫ ডিগ্রী, জীবৎস বা জীবনকুণ্ডের জলের উত্তাপ ৩৬ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। প্রত্যেকটি কুণ্ড সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনী আছে—মন্দিরের সেবাইত বা পাণ্ডারা তা বিশ্লেষণ করে দেবেন। পাপহরা বা বৈতরণীর জলের উত্তাপ ৪৫°৫ ডিগ্রী। মন্দির-প্রাঙ্গণে এই শ্বেত সরোবরে স্নান করে পুণ্যার্থীরা মন্দিরে পূজা দেন। বক্রেশ্বর তান্ত্রিকদেরও একটি সাধনার স্থল। এখানকার কয়েকটি কুণ্ডে স্নান করলে বাতব্যথা ও অন্যান্য পেটের রোগ আশ্চর্য্যভাবে নিরাময় হয়েছে, এ রকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। বক্রেশ্বরের বহু প্রাচীন মন্দিরটি এখন নেই। এই যে মন্দিরটির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এটি অল্প দিনের। শ্বেতগঙ্গার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ঐ যে বটগাছটা দেখছেন ঐটি সত্যযুগের অক্ষয়বট বলে খ্যাত। মন্দিরের গর্ভগৃহে দেওয়ালের সুপ্রাচীন পাথরের টুকরোগুলি বোধ হয় সাবেক মন্দির থেকে সংগৃহীত হয়েছে। মন্দিরের পিতলমোড়া বড় লিঙ্গটি বক্রেশ্বর ও ছোটটি বক্রনাথ। বক্রেশ্বর দেবের মন্দিরের পিছনেই দেবী মহিষমর্দ্দিনীর দশভূজা মূর্ত্তি সমন্বিত মহাপীঠ। বক্রেশ্বর ধামে অনেক উৎসব হয়ে থাকে, তার মধ্যে শিবরাত্রি উৎসবই সবচেয়ে জঁাকজমকপূর্ণ। এই উৎসব উপলক্ষে এক সপ্তাহ ধরে মেলা বসে।

চলুন এবার ফেরা যাক। এখানে রাত্রিবাসের জন্যে আহার ও বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা এখনও হয়নি। যারা তীর্থ করতে আসেন তাদের কেউ কেউ ঐ ধরমশালাটিতে ওঠেন। ওখানে চারটি ঘরে আট জন থাকার মত জায়গা ও রাঁধবার ব্যবস্থা আছে। নদীর কাছাকাছি সরকার একটি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-নিবাস তৈরীর কাজে হাত দিয়েছেন।

যে বাসে এসেছেন, সেই বাসে যদি ফিরতে চান, তাহলে দু' ঘণ্টার মধ্যে বক্রেশ্বর দেখা আপনাকে সম্পূর্ণ করতে হবে—তা না হলে আরও পাঁচ ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্য আপনি যদি অবস্থাপন্ন হন তাহলে আমি বলবো, সিউড়ি থেকে ট্যাক্সি করে বক্রেশ্বর বেড়িয়ে আসুন।

এবার কোথায় যাবেন? সময় পান তো কাছাকাছির মধ্যে একবার লাভপুর ঘুরে আসুন। এখানে দেবী ফুল্লরার মন্দির আছে। অট্টহাস বা ফুল্লরা একান্নপীঠের অন্যতম। সিউড়ি—কাটোয়া রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। তা না হলে আহমদপুর ষ্টেশনে নেমে ৭ মাইল রাস্তা যেতে হবে, ট্রেনেও যেতে পারেন। এখানে বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীর ওষ্ঠ পড়ে ছিল। একটি ছোট কাননের মধ্যে এই পীঠ—অনেকটা তপোবনের মতো। মন্দিরের সামনে একটি নাটমন্দির আছে—নাটমন্দিরের দক্ষিণে ঘাট-বাঁধানো একটি পুকুর। পীঠের ঈশান কোণে ঐ যে জায়গাটি ঐটি যুদ্ধডাঙ্গা বলে খ্যাত; ঐখানে অসুর বধ হয়েছিল। মন্দিরের দক্ষিণপশ্চিম কোণে একটি গাছের তলায় ভৈরব বিশ্বেশ্বর অধিষ্ঠিত। শিবের ভোগ একটি দর্শনীয় ব্যাপার। এখন কুমারী ভোগ হয়। মাঘী পূর্ণিমায় এই পীঠে মেলা বসে।

এবার চলুন তারাপীঠ—সেখান থেকে নলহাটির ললাটেশ্বরী মন্দির দেখে ফিরে আসবো। তারাপীঠ যেতে হ'লে আগে বাসে ক'রে সাঁইথিয়া চলুন, সেখান থেকে সকালের ট্রেণেই তারাপীঠ যেতে হবে। সাঁইথিয়ায় নেমে যদি দেখেন হাতে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা ট্রেণের সময় আছে তাহলে চট্ করে ষ্টেশনের ওপারে অর্থাৎ পূব দিকে নন্দিকেশ্বরী ঘুরে আসুন। ষ্টেশনের গায়ে বললেই চলে এই পীঠস্থানটি। একান্ন পীঠের এটি অন্যতম। একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের গুঁড়িতে মন্দির, সেই মন্দিরের ভিতর দেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি। এখানে দেবীর গলার হাড় পড়েছিল। দেবীর নাম নন্দিনী ভৈরব নন্দিকেশ্বর। লক্ষ্য করুন বটগাছটির দীর্ঘাকৃতি একটি শাখা—ডালপালায় পাতার যেন ছাতা নিয়ে যুগ যুগ ধরে এই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এই বটের পাতার ছাতার নিচে প্রায় ৫০ গজ দীর্ঘ চত্বর বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। দেবীকে প্রণাম জানিয়ে এই চত্বরে একটু বসুন—শরীর ও মন জুড়িয়ে যাবে।

চলুন, সময় হয়ে গেছে ট্রেণের—এখনই আপের ট্রেন এসে পড়বে। ক'টাই বা ষ্টেশন। তারাপীঠ হল্ট ষ্টেশনেই নামি চলুন না। মাইল তিনেক রাস্তা। রামপুরহাট দিয়েও যেতে পারেন—প্রায় ছ' মাইল রাস্তা, দুর্ব্বল মন নিয়ে কিন্তু তারাপীঠ যাবেন না; কেন না এমন অনেক জিনিষ চোখে পড়বে যা বড় ভয়ঙ্কর; তান্ত্রিকদের সাধন স্থল—বুঝতেই পারছেন কত শক্ত মানুষ তাঁরা!

তারাপীঠ সম্পর্কে অনেক কাহিনী শোনা যায়। একটি কাহিনী হ'ল বশিষ্ঠ মুনি কর্ত্তৃক উগ্র তারার সাধনা করতে আদিষ্ট হন এবং এইখানে তারাকে লাভ করে সিদ্ধিলাভ করেন। যে বৃক্ষের তলায় তিনি এই চৈনিক দেবীর আরাধনা করেন সেই শিমূল গাছটি বর্ত্তমানে নেই; সেইখানেই বশিষ্ঠমন্দির স্থাপিত হয়েছে। উত্তর বাহিনী দ্বারকা নদীর পূর্ব্বতীরে এই তারাপীঠ। নদীর কোলেই শ্মশান, ভয়ঙ্কর এ শ্মশান! অসংখ্য শব এখনও ঐ শ্মশানের মাটি খুঁড়লে পাওয়া যাবে; শবগুলি দাহ করা হয় নি বা হয় না। শুধু শৃগাল শকুনীই নয়—বহু তান্ত্রিক ঐ শ্মশানের মাটির ওপর ঘুরে বেড়ান। অন্ধকার অমানিশার রাত্রেও তান্ত্রিকরা সেখানে আসেন শুনেছি; কিন্তু কোন তান্ত্রিক সাধক এখন আর নেই। ঐ যে শাল্মলী গাছটি দেখছেন—ওরই তলায় বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধাসন রয়েছে। পূবদিকে তারাদেবীর মন্দিরের প্রবেশ পথ। দর্শন করুন তারাদেবীর শিলামূর্ত্তি। বাংলার যেমন চারচালা মন্দির অনেক জায়গায় দেখা যায় এটিও তাই; অনেক ভাঙাগড়ার পর এটি তৈরী হয়েছে। পথের ধারে জঙ্গলের মধ্যেও অনেক সাধুর আশ্রম আছে—সে সব জায়গায় আর না যাওয়াই ভাল। তবে আগ্রহ থাকলে কিছু দূরে আটলা গ্রামটি দেখে যেতে পারেন—এইখানেই সাধক বামাক্ষ্যাপার জন্মস্থান। সাধক বামাক্ষ্যাপা এই তারাপুর বা

তারাপীঠে তারার উপাসনায় আত্মহারা হয়ে যান এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। সাধকরা এখানে সিদ্ধিলাভ করেছেন বলে এটি "সিদ্ধপীঠ" বলে খ্যাত। 'শিবচরিত' গ্রন্থে আবার তারাপীঠকে মহাপীঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সতীর নেত্রাংশ তারা এখানে (চণ্ডীপুরে) পড়েছিল বলে নাম তারাপীঠ। তারাপীঠের দেবী তারিণী; ভৈরব উন্মত্ত।

আশ্বিন মাসে ত্রয়োদশীতে দেবীপুজা উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে তারাপীঠে। চৈত্র মাসে বারুণীতেও মেলা বসে, শিবরাত্রেও ধুমধাম হয়।

রামপুরহাট ষ্টেশনের একটা ষ্টেশন পরেই নলহাটি। ষ্টেশনের পশ্চিমেই নলহাটি গ্রাম। ষ্টেশন থেকে কিছুদূরে একটা ছোটখাট পাহাড়ই বলুন আর টিবিই বলুন—তারই উপর ললাটেশ্বরীর মন্দির। এখানে দেবীর ললাট পড়েছিল। দেবীর নাম ললাটেশ্বরী—ভৈরব যোগীশ। ললাটেশ্বরী পার্ব্বতী হয়েছেন—পাহাড়ে অধিষ্ঠিতা বলে। মন্দিরের ভিতর কোন মূর্ত্তি নেই—ললাটের আকারে ঐ যে পাথরের টুকরোটি রয়েছে ওরই মাধ্যমে দেবীর আরাধনা হয়ে থাকে। দেবী পুজায় রোজ আমিষ ভোগ দিতে হয়। শারদীয়া মহাপুজায় দেবীর বিশেষ পুজা হয়। নলহাটির জল পেটের পক্ষে উপকারী। লক্ষ্য করুন, মন্দিরের একটু দূরে একটি মসজিদ আর তার কাছেই "আগ শহীদ পীরের" সমাধিস্থল। পশ্চিম দিকে ঐ যে একটি ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে ওটি হল একটি ছোট দুর্গ। দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পাহাড়ের নীচে একটি ঝরণাও আছে। নলহাটি কোলকাতা থেকে ১৪৫ মাইল দূরে, আর সিউড়ী থেকে ৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত।

এবার চলুন আবার সিউড়ি ফেরা যাক।

সিউড়ি থেকে আজ রাজনগরের বাসে চাপুন। মাইল ১৬ দূরে এই রাজনগর। বীরভূমের আগে রাজধানী ছিল এই রাজনগর। এক সময় মুসলমান শাসকদের অন্যতম প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল—রাজনগর। জীর্ণ রাজপ্রসাদ, ইমামবাড়া মন্দির ও মসজিদের ধ্বংস-স্তূপ এ সব এখনও অতীতের সাক্ষী বহন করেছে।

রাজনগর যাবার পথে পাথরচাপুড়ি একটু ঘুরে আসতে পারেন। সাধক শাহ মাহবুব ওরফে দাতা সাহেব ১২৯১ বঙ্গাব্দের ১০ই চৈত্র এখানে দেহরক্ষা করেন। তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে প্রবাদ আছে। সামান্য ছাই ও ঘাস দিয়ে বহু দুরারোগ্য জটিল রোগ তিনি সারাতে পারতেন। তাঁর স্মরণে ১০ই চৈত্র এখানে মেলা বসে।

এটি মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি তীর্থক্ষেত্র। মুসলমান সম্প্রদায়ের আর একটি তীর্থক্ষেত্র হ'ল খুষ্টিকুরি। সিউড়ি থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে সিউড়ি সদরে। কথিত আছে, সাধক শাহ আবদুল্লা পাটনার সাধক শাহ আর্জানীর কাছ থেকে একটি চামেলী গাছের দাঁতন-কাঠি উপহার পেয়েছিলেন। শাহ আবদুল্লা সেই দাঁতনকাঠিটি খুষ্টিকুরিতে রোপণ করেন। এখন সেই কাঠিটি একটা বড় গাছে নাকি রূপান্তরিত হয়েছে। ভক্তদের কাছে এটি খুব পবিত্র গাছ। শাহ আবদুল্লা ভাল সাপের মন্ত্র জানতেন। এ অঞ্চলের ওঝারা সাপের মন্ত্র পাঠে আজও শাহ আবদুল্লার নাম স্মরণ করে থাকেন।

এবারে চলুন বোলপুরে যাই। ষ্টেশনের কাছেই ভাল হোটেল আছে। সহরের মধ্যে আরও অনেক হোটেল আছে, যেখানে খুসি থাকতে পারেন। যদি আগে থেকে খবর দিয়ে শান্তিনিকেতনের অতিথিভবনে সিট রিজার্ভ করে রেখে থাকেন, তাহলে তো আরও ভাল।

শান্তিনিকেতন তো বহুবার আপনি দেখেছেন, বারবার দেখেও আশা মিটবে না। তবু বলবো, আর দু'দিন অপেক্ষা করুন; সামনেই ২১শে মার্চ্চ আসছে, ঐদিন বসন্তোৎসব; নূতনরূপে বিশ্বকবির শান্তিনিকেতনকে দেখে যান। তার আগে চলুন সেরে আসি কেঁদুলি। কবি জয়দেবের জন্মস্থান এই কেঁদুলি বা কেন্দুবিল্ব। বোলপুর থেকে ১৮ মাইল পশ্চিমে অজয় নদের তীরে। বোলপুর থেকে বাস পাওয়া যাবে সরাসরি জয়দেব-কেঁদুলি। এই তো সেদিন পৌষ-সংক্রান্তিতে এখানে ঐতিহাসিক মেলা হয়ে গেল। হ্যাঁ, ঐতিহাসিকই আমি বলবো। প্রায় আট শত বছরের প্রাচীন মেলা—বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক এই মেলা—শুধু বাংলার নয়, সারা পৃথিবীতে কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এই মেলার সবচেয়ে আকর্ষণ হ'ল বাউল গান। বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার বাউল একতারা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে এখানে সমবেত হয়। এ ছাড়া দূর-দূরান্তর থেকে কারিগর, শিল্পী ও ব্যবসায়ীরাও মেলাতে আসেন। কেন্দুলীপাটের দক্ষিণ পুব দিকে অজয়ের তীরে এখনও কুশেশ্বর শিব রয়েছেন। সাধারণের বিশ্বাস, জয়দেব এখানে বিশ্রাম করতেন। শিবের কাছেই একখণ্ড পাথরে অষ্টদলপদ্ম আঁকা আছে; এটাকে ভুবনেশ্বরী-যন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। এই যন্ত্রে আরাধনা করে জয়দেব নাকি সিদ্ধিলাভ করেছেন। এই পদ্মাসনই সিদ্ধাসন। ঐ যে দেখছেন সুন্দর মন্দিরটি, ঐটিই হ'ল রাধাবিনোদের মন্দির। মন্দিরটি যেখানে রয়েছে, সেইটেই নাকি জয়দেবের বাস্তুভিটা। মন্দিরের গড়ন নবরত্ন মন্দিরের মত; মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কারুকার্য্য দেখবার মতো। বর্দ্ধমানের মহারাণী নৈরাণী দেবী ১৬১৪ শকাব্দে এই মন্দিরটি স্থাপন করেন। কেন্দুলির পশ্চিমে বিল্বমঙ্গল টিবি, পূর্ব্বে ধর্ম্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ ও লাউসেনের স্মৃতিবিজড়িত ত্রিষষ্ঠীগড় দক্ষিণে অজয়ের অপর পারে। দেবীর নাম শ্যামারূপা। রাধাবিনোদ মন্দিরে যে রাধাবিনোদের বিগ্রহ রয়েছে, তা শ্যামারূপার গড় থেকে আনা হয়েছে। মন্দিরের মোহন্ত বর্দ্ধমানবাসী ব্রজবাসীরা। কবি জয়দেবের সঙ্গে অবশ্য এসবের কোন সম্পর্ক নেই।

এবার চলুন চণ্ডীদাসের স্মৃতি-বিজড়িত নানুর ঘুরে আসি। বীরভূম-পরিক্রমার আমরা প্রায় শেষ পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছি—নানুর যাবার পথে বীরভূমের আর একটি পীঠস্থান দর্শন করে যাই আসুন। বোলপুর থেকে মাইল ৪।৫ হবে, হেঁটে, গরুর গাড়ীতে বা রিক্সাতেও যাওয়া যাবে। উত্তরবাহিনী কোপাই নদীর তীরে একান্ন পীঠের অন্যতম কঙ্কালীতলা। কথিত আছে দেবীর কঙ্কাল এখানে পড়েছিল। দেবীর নাম বেদগর্ভা, ভৈরব রুরু। কোন মন্দির নেই এখানে। একটি উষ্ণ জলের কুণ্ড আছে, জলের তলায় আছে পাথর। এই জলে স্নান করলে বাত-ব্যথা নীরোগ হয় বলে বিশ্বাস। কাছাকাছি কোন গ্রামও নেই। চৈত্র-সংক্রান্তিতে এখানে মেলা বসে।

নানুর বোলপুর থেকে ১২ মাইল। ভাল পিচের রাস্তা—বাসেও যাওয়া যায়; যেতে-আসতে কোন কষ্ট নেই। এখানে থাকার কোন হোটেল বা রেষ্টরেণ্ট নেই; আছে শুধু একটি ডাক্-বাঙলো, তাও জরাজীর্ণ অবস্থা। ঐ যে স্তূপের মতো উঁচু জায়গাটি দেখছেন, ঐখানে চণ্ডীদাস ধর্ম্মসাধনা করতেন। ঐ জায়গাটি এখন সংরক্ষিত এলাকা। ঐ স্তূপের নিচে অনেক কিছু স্মৃতিচিহ্ন এখনও লুপ্ত অবস্থায় আছে বলে অনেকের ধারণা। স্তূপের উপরে ঐ মন্দিরটি বিখ্যাত বাসুলী দেবীর মন্দির। মন্দিরের ভিতর মূর্ত্তিটি লক্ষ্য করুন। দেবাদিদেব মহাদেবের নাভিকুণ্ড থেকে যে পদ্ম বেরিয়েছে, তারই উপর অধিষ্ঠিতা চতুর্ভুজা বাসুলী দেবী। মন্দিরটি নূতন তৈরী। এই মন্দিরের চারদিকে আরও বারশটি শিবমন্দির রয়েছে। বাসুলী দেবীই চণ্ডীদাসের আরাধ্যা দেবী ছিলেন। দেবীকে প্রণাম জানিয়ে আসুন রাস্তার ওপারে একবার যাই। হাঁ, এই সেই বিখ্যাত পুকুর আর ঐ সেই ঐতিহাসিক পাটাতন। পাথরের মত শক্ত ঐ কাঠের পাটাতনে রামী ধোপানী আছড়ে আছড়ে কাপড় কাচতো। কিন্তু প্রেমের বিচিত্রগতি সেখানেও স্তব্ধ হয় নি। চণ্ডীদাসের বিচিত্র জীবনকে কেন্দ্র করে যে রজকিনী-প্রেমের কাহিনী রচিত হয়, তা আজ সাহিত্য ও কাব্যের অমূল্য সম্পদ।

চলুন বেড়াতে বেড়াতে একটু গ্রামের ভেতরে যাই। খুব প্রাচীন গ্রাম হ'ল এই নানুর। বিভিন্ন জায়গায় মাটি খুঁড়ে গুপ্তযুগের নানা সোনার মুদ্রা ও বিষ্ণুমূর্ত্তি এখানে পাওয়া গেছে। শান্ত ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাক্ষেত্র এই নানুরের লোকসংখ্যা প্রায় দু'হাজার। এখানে বড় মেলা বসে। এছাড়া চণ্ডীদাসের ভিটের চৈত্র-সংক্রান্তিতে একটি মেলা হয়। চণ্ডীদাসের ভিটের ঢোকবার আগে ঐ যে তোরণটি দেখছেন, ঐটি হ'ল চণ্ডীদাসের তোরণ আর অপরদিকে রয়েছে রামী তোরণ; সম্প্রতি এ দু'টি তৈরী হয়েছে।

এখান থেকে মাইল ৪।৫ দূরে কীর্ণাহারে চণ্ডীদাসের সমাধি; সমাধির উপর একটি ছোট মন্দিরও আছে।

আসুন বীরভূম-পরিক্রমা এবার শেষ করি। কাল বসন্তোৎসব। শান্তিনিকেতনে এই উৎসব দেখে বাড়ী ফিরবো। এর আগেও আপনি নিশ্চয়ই শান্তিনিকেতনে এসেছেন। যদি না এসে থাকেন, জেনে রাখুন শান্তিনিকেতনে বছরে অনেকগুলি উৎসব হয়ে থাকে, তার মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ হ'ল ৭ই আগষ্ট—গুরুদেব-স্মরণ ও বৃক্ষ-রোপণ উৎসব; ২২শে ডিসেম্বর থেকে ২৫শে ডিসেম্বর—পৌষ-উৎসব; ২১শে মার্চ্চ বসন্তোৎসব, বর্ষাকালে বর্ষামঙ্গল-উৎসব; ২৫শে জানুয়ারী মাঘোৎসব।

বছরের যে-কোন সময় শান্তিনিকেতন বেড়াতে আসা যায়—কিন্তু শীতকাল সবচেয়ে ভাল। শীতকালে তাপমাত্রা সাধারণতঃ ২৮ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড থেকে ১২ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পর্য্যন্ত হয়ে থাকে। গরমের সময় তাপমাত্রা ১১°৪ সেণ্টিগ্রেড থেকে ৩৮ সেণ্টিগ্রেড পর্য্যন্ত।

বিশ্বভারতীর ব্যবস্থাপনায় শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে যে সব অনুষ্ঠান বা উৎসব হয়ে থাকে, তাতে বাইরের আগন্তুকরাও যোগ দিতে পারেন। যদি বিশ্বভারতীর চৌহদ্দির মধ্যে ফটো তুলতে চান, তাহলে ৫৲ টাকা জমা দিতে হবে। ফটো তোলা হয়ে গেলে এক কপি ক'রে ফটো বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষকে দিলে ঐ ৫টি টাকা ফেরত পাবেন।

কেবল কাজের দিনে আগন্তুকদের শান্তিনিকেতনের চত্বরে ঘুরে বেড়াবার অনুমতি দেওয়া হয় এবং নির্দ্দিষ্ট সময় হ'ল শান্তিনিকেতনে গরমকালে বেলা ৩টে থেকে ৫টা আর শীতকালে বেলা ২টা থেকে ৪টা। শ্রীনিকেতনে সকালে ৮টা থেকে ১০টা।

বুধবার পুরো ছুটি থাকে। যাঁরা শান্তিনিকেতনে বেড়াতে আসেন, তাঁরা সাধারণতঃ অতিথিভবনেই ওঠেন। এখানে প্রতিদিন মাথা পিছু থাকা ও খাওয়ার চার্জ্জ ৫৲টাকা থেকে ৮৲টাকা। টাটা গেষ্ট হাউস ও বোলপুর রেলওয়ে রিটায়ারিং রুমেও থাকার ব্যবস্থা আছে। এগুলি ছাড়াও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ডাক-বাঙলো, ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট ইন্সপেকসন্ বাঙলো, ইরিগেসন্ ডিপার্টমেণ্টের ইন্সপেকসন্ বাঙলোতেও বিশেষ অনুমতি নিয়ে থাকার ব্যবস্থা আছে।

এইবার শান্তিনিকেতন ঘুরে ঘুরে আপনি দেখুন। আশ্রমের ছেলেমেয়েদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করুন। বিশ্বকবির যে আদর্শ নিয়ে এরা এখানে মানুষ হচ্ছে, ভবিষ্যৎ ভারত শুধু নয়—সারা বিশ্বও সেইদিকে তাকিয়ে আছে। স্কুল, কলেজ আর বিশ্বভারতীর স্নাতকোত্তর শ্রেণীগুলি ছাড়াও অঙ্কন শিক্ষার জন্যে এখানে রয়েছে কলাভবন, নাচ গান শেখার জন্যে রয়েছে সঙ্গীতভবন, রবীন্দ্রভবনে ও বিচিত্রায় রয়েছে সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে বিশ্বকবির অমূল্য সম্পদরাজী। ফটকে ঢুকেই বাঁ দিকে এই বাড়ীটি হ'ল চীনাভবন—চীনা ও ভারতীয় ছাত্রগণ এখানে পরস্পর দেশের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষালাভ করছে এবং এইভাবেই গড়ে উঠছে মৈত্রীর বন্ধন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্যে রয়েছে এ্যাণ্ড্রুজ মেমোরিয়াল হল আর শিক্ষকদের ট্রেণিংএর জন্যে রয়েছে বিনয়ভবন।

ঐ যে দেখছেন উদয়ন, ঐখানেই কবির জীবনের শেষ কয়েকটি দিন কেটেছে।

ঐ হল ছাতিমতলা, ওদিকে উপাসনা-মন্দির। আসুন, ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় এই আম্রকুঞ্জের তলা দিয়ে যেতে যেতে শান্তিনিকেতন পরিক্রমা শেষ করি।

মাইল দুয়েক দূরে শ্রীনিকেতন একবার দেখে যান। পল্লী পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রীনিকেতন এখানে স্থাপন করা হয়েছে। শ্রীনিকেতনে হাতে তৈরী চামড়া, মাটির বাসন, সূতিবস্ত্রের কাজের বৈশিষ্ট্য সারা বিশ্বে খ্যাত।

ভারতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা বিশ্ববাসীকে দেওয়া আর অপরের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা আহরণ করাই শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর শুধু লক্ষ্যই নয়, কাজও।

[আগামী সংখ্যায় দার্জিলিঙ্ চলুন।

"টাকা জমানোর কথা কখনো কি ভেবেছেন?"

"ভেবেছি বই কি···তবে, সেটা হ'ল আমার গৃহিণীর ব্যাপার।"

"আপনারও কিছু কিছু ব্যাঙ্কে জমানো উচিৎ।"

"ব্যাঙ্কে? ভেবেছেন কি, আমি টাকার কাঁড়ি নিয়ে বসে আছি?"

"মাত্র পাঁচ টাকা হ'লেই তো আপনি ন্যাশানাল এন্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাঙ্কে একটী সেভিংস অ্যাকাউণ্ট খুলতে পারেন আর ৩% টাকা হারে সুদও পেতে পারেন।"

"কিন্তু টাকা জমা দিতে বা তুলতে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"বেশীক্ষণ? মাত্র দশমিনিট লাগবে আপনার!"

"আমি কি কোনো চেকবইও পাবো?"

"নিশ্চয়ই পাবেন। সপ্তাহে দুবার টাকা তুলতে পাবেন আর আপনার যেটাকা ব্যাঙ্কে আছে তার সিকিভাগ বা একহাজার টাকা যা বেশী হয়—সেই পর্যান্ত তুলতে পারেন।"

"ব্যবস্থাটা মন্দ লাগছে না তো!"

"হ্যাঁ ন্যাশানাল এণ্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাঙ্কে টাকা জমানো মানেই আপনার নিশ্চিন্ত থাকার আর উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া।"

অ্যাকাউণ্ট খোলার ফর্মের জন্যে আমাদের যেকোনো শাখায় আসুন বা লিখুন।

ন্যাশনাল এণ্ড গ্রীণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

যুক্তরাজ্যে সংঘবদ্ধ। সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ

কলিকাতাস্থিত শাখাসমূহ: ১৭ নেতাজী সুভাষ রোড, ২৭ নেতাজী সুভাষ রোড (লয়েডস শাখা), ৩১ চৌরঙ্গী রোড, ৪১ চৌরঙ্গী রোড, (লয়েডস্ শাখা), ১১ ব্রাবোর্ণ রোড, ...

[illegible]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সুলতান কুঠি এসে গেল একসময়। আসুক, ধীরাপদ অনেকটা নির্লিপ্ত হতে পেরেছে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ধরে মজা-দিঘির পাশ দিয়ে রিকশ সুলতান কুঠির নিস্তব্ধ আঙিনায় এসে ঢুকল। সোনা-বউদির দাওয়ার সামনে থামল। ধীরাপদ আগে নেমে এসে সোনাবউদির বন্ধ দরজায় মৃদু টোকা দিল গোটাকয়েক।

ভিতরে কেউ জেগেই আছে। তক্ষুনি দরজা খোলার শব্দ হল।

দরজা খুলে আবছা অন্ধকারে প্রথমে ধীরাপদকে দেখেই সোনাবউদি বিষম চমকে উঠল।···আপনি!

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে রিকশছুটোর দিকে চোখ গেল। তারপরেই নির্বাক, পাথর একেবারে।

ধীরাপদ ফিরে এলো। রিকশ থেকে গণুদাকে নামালো। গণুদার হুঁশ নেই একটুও, প্রায় আলগা করেই টেনে হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে আসতে হল তাকে। সোনাবউদি ইতিমধ্যে ঘরের ডীম্‌-করা হারিকেনটা উসকে দিয়েছে। ঘুমন্ত ছেলেমেয়েগুলোর বিছনার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে শক্ত কাঠ হয়ে।

মেঝেটা পরিষ্কারই, ধীরাপদ মেঝেতেই বসিয়ে দিল গণুদাকে। গণুদা বসল না, সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল। ধীরাপদর হাঁপ ধরে গেছে, মদের গন্ধটা সেই ফুটপাথে বা তারপরে খানিকক্ষণ এক রিকশয় বসেও যেন এখনকার মত এতটা উগ্র লাগেনি। ধীরাপদ সোজা হয়ে দাঁড়াল, মুখ তুলল, কিন্তু সোনাবউদির চোখে চোখ রাখা যাচ্ছে না—পাথরের মূর্তির মধ্যে শুধু দুটো চোখ ধকধকিয়ে জ্বলছে। জ্বলছে না, সেই চোখে অজ্ঞাত আশঙ্কাও কি একটা!

রিকশ ভাড়া দিতে হবে, ধীরাপদ তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। নিঃশব্দেই ভাড়া মেটাতে গেল, দেড় টাকা করে তিনটে টাকা গুঁজে দিল একজনের হাতে। কিন্তু কোন্ দুর্বলতার কাজে লেগেছে সেটা ওরা ভালই জানে।· তিন টাকা পেয়ে তিন পয়সা পাওয়া মুখের মত হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে মিলিত গলার প্রতিবাদের সূচনা। তাড়াতাড়ি টাকা তিনটে ফেরত নিয়ে ধীরাপদ ওদের একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বাঁচল। সুলতান কুঠির এই রাত্রিও যেন গোপনতার রাত্রি—ধীরাপদ বচসা দূরে থাক, একটু শব্দও চায় না।

টাকা নিয়ে রিকশ ঘড়ঘড়িয়ে লোক দুটো চলে গেল। যতক্ষণ দেখা গেল তাদের, ধীরাপদ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখল। তারপরেও সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল মিনিট তিন-চার। রাস্তায় সেই ম্যাটমেটে আলো ভালো লাগছিল না, বারবনিতার চোখের মত লাগছিল—অস্ত্র-তন্ত্র অবশ করে দেবার মত। কিন্তু এখানে দ্বিগুণ অস্বস্তি, এখানে যেন ঠিক তেমনি বিপরীত অন্ধকারের উল্কি পড়ানো।

ঘরে যেতে হবে। সোনাবউদির সামনে। পায়ে পায়ে ঘরে এসে ঢুকল। সোনাবউদি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। গণুদা বেহুঁশ, অবস্থার একটু তারতম্য হয়েছে বোধহয়, হাত-পা ছুঁড়ছে আর বিড়বিড় করে বকছে কি। পেটে যা আছে তা উদগীর্ণ হবার লক্ষণ কিনা ধীরাপদ সঠিক বুঝছে না।

সোনাবউদির আগুন-ঢালা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ কানে বিঁধতে ফিরে তাকালো। ঠিকই দেখছে, সোনাবউদি তাকেই যেন ভস্ম করবে। —এখানে এনেছেন কেন? আপনার কি দরকার পড়েছিল এখানে তুলে আনার? আপনার কেন এত আস্পর্ধা—কেন এত দয়া করার সাহস? এক্ষুনি নিয়ে যান আমার চোখের সমুখ থেকে, রাস্তায় রেখে আসুন—যেখানে খুশি রেখে আসুন, নিয়ে যান, যান যান যান বলছি—

ধীরাপদ নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে আছে, চেয়ে আছে। নিয়ে না গেলে, আর একটুও দেরি হলে, যে বলছে সে-ই এক্ষুনি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবে বুঝি, বাইরের ওই অন্ধকারের মধ্যে বরাবরকার মতই মিশে যাবে। গণুদার নেশাও ধাক্কা খেয়েছে একটু, সখেদে বিড় বিড় করে বলছে কি, মাটি আঁকড়ে উঠে বসতে চাইছে হয়ত।

ধীরাপদ হঠাৎ ভয় পেল, ঘাবড়ে গেল। অস্ফুটস্বরে বলল, যাচ্ছি—। চকিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। পকেটে চাবির রিংটা আছে, ওতে পাশের ঘরের দ্বিতীয় চাবিটাও আছে। ঘর খুলল, একটা বন্ধ গুমট বাতাসের ঝাপটা লাগল গায়ে। একটা জানালা খুলে দিল। ফিরতে গিয়ে যথাস্থানে হারিকেনটা আছে মনে হল। আছে—তেলও আছে, দেয়াল-তাকে দেশলাইও। আলো জ্বালল, বিছানাটার দিকে চোখ গেল একবার। অপরিচ্ছন্ন নয়, একটা বেড-কভার দিয়ে ঢাকা। সোনাবউদির তদারকে ত্রুটি নেই।

গণুদা উঠে বসেছে কোনরকমে, কিন্তু দাঁড়ানোর শক্তি নেই। ধীরাপদকে দেখেই হাউ হাউ করে কান্না, জড়িয়ে জড়িয়ে বলে উঠল, আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল্ ধীরুভাই—নিজের পরিবারও পায় ধরতে দিলে না—ক্ষমা চাইতে দিলে না—সরে গেল—আমি আত্মহত্যা করব—আমাকে নিয়ে চল ধীরুভাই—

গণুদাকে টেনে তুলল, একটানা খেদ আর বিলাপ শুনতে শুনতেই তাকে নিয়ে চলল। সোনাবউদির জলন্ত চোখ ধীরাপদর মুখ পিঠ এখনো ঝলসে দিচ্ছে। নিজের ঘরের বিছানায় এনে বসালো গণুদাকে, তার পর জোর করেই শুইয়ে দিল। গায়ের গলাবন্ধ কোটটা খুলে দিলে ভালো হত কিন্তু গণুদা শুয়ে পড়তে আর সে-চেষ্টা করল না।

কিন্তু গণুদার খেদ আর বিলাপ থামল না চট করে। পরিবার যাকে ঘৃণা করে তার বেঁচে সুখ নেই, এ জীবন আর রাখবেই না গণুদা, আত্মহত্যা করবে, এতকালের চাকরিটা গেল তবু একটু মায়াদয়া নেই। না মদ আর গণুদা জীবনে ছোঁবে না, মদ এই ছাড়ল—আর সকাল হলেই আত্মহত্যা করবে। পরক্ষণেই আবার বিপরীত আকৃতি, ধীরু যেন তাকে ছেড়ে না যায়, তাকে ফেলে না যায়, নিজের পরিবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—এখন ধীরু ছাড়া তার আর কে আছে? একটা ভাই ছিল নিজের, দাদার থেকে সে যদিও বউদিকে বেশি ভালবাসত, তবু বেঁচে থাকলে দাদাকে ত্যাগ কখনো করে যেত না—ধীরাপদ ধীরু ধীরুভাই যেন তাকে ছেড়ে না যায়।

চুপচাপ বসে মদের শক্তি দেখেছে ধীরাপদ, লোকটাকে একসঙ্গে দশটা কথা কখনো গুছিয়ে বলতে শোনে নি। তারপর অস্ফুট গলায় ধমকে উঠল, আপনি ঘুমোন চুপ করে!

ধমক খেয়ে গণুদা ফুপিয়ে কেঁদে উঠল একটু, তারপর চুপ খানিকক্ষণ, তারপরেই তার নাকের ডাক শোনা যেতে লাগল। তারও কিছুক্ষণ পরে ধীরাপদ উঠল, হারিকেনটা নিবিয়ে ফেলল প্রথম, কি ভেবে দরজার গায়ে ছিটকিনি তুলে দিল। মাঝ রাতে জেগে উঠে আবার ওঘরে গিয়ে হামলা করবে কিনা কে জানে। মেঝেয় বসে ট্রাঙ্কটায় ঠেস দিল, শেষে মাথাটাও রাখল ট্রাঙ্কের ওপর। শরীর ভেঙে পড়ছে। কিন্তু চোখে ঘুম নেই।

তন্দ্রার মত এসেছিল কখন। পিঠটা ব্যথা করতে তন্দ্রা ছুটল। উঠে বসল। বাইরের অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে, খোলা জানালা দিয়ে বাইরের একফালি আকাশ দেখা যাচ্ছে—ভোরের আলোর আভাস জেগেছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে গণুদা তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। তারও এইমাত্রই ঘুম ছুটেছে বোধহয়, দুই চোখে দুর্বোধ্য বিস্ময়। চোখোচোখি হতেই চোখ বুজে ফেলল, ঘাড় ফিরিয়ে কাত হয়ে শুল।

ধীরাপদ উঠল, দরজার ছিটকানি খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশে তখনো গোটাকতক তারা রয়েছে, একটা দুটো পাখির প্রথম কাকলি কানে আসছে। ওপাশে সোনা বউদির ঘরের দরজা বন্ধ। আর না দাঁড়িয়ে ধীরাপদ সুলতান কুঠির আঙিনা ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল।

ট্যাক্সিটা বাড়ি পর্যন্ত না ঢুকিয়ে রাস্তায়ই নামল। ভাড়া মিটিয়ে ভিতরের দিকে এগোলো। বাইরের দরজাটা খোলা। খোলা কেন অনুমান করা শক্ত নয়। মানকে তার জন্যে অপেক্ষা করেছে, শেষে দরজা খোলা রেখেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘরে ঢুকল। পার্টিশনের ওধারে মানকের নাকের ডাক ততো চড়া নয় এখন। আর খানিক বাদেই ঘুম ভেঙে উঠে বসবে। ধীরাপদ পা-টিপে ঘরে ঢুকেছে, জুতো ছেড়ে গায়ের জামাটাও খুলে ফেলেছে। তারপর বিছানার গা ছেড়ে দিয়েছে। শান্তি। দুনিয়ায় শান্তি···

মানকের ডাকাডাকিতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে হল।—বাবু উঠুন, উঠুন, আর কত ঘুমুবেন? রাতে কোথায় যে উবে গেলেন, আমি অপেক্ষা করে করে শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম। কখন এয়েছেন? রাতে খাওয়াও তো হয়নি, আমাকে ডাকলেন না কেন?

একটা কথারও জবাব না পেয়ে মানকে তার ঘুম ভাঙানোর কারণটা বলল। বাইরে সেই থেকে একজন লোক তার সঙ্গে দেখা করার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, মানকে তাঁকে দোতলার আপিস-ঘরে বসতে বলেছিল, তা তিনি সেই থেকে দাঁড়িয়েই আছেন আর বলছেন জরুরী দরকার, একটু ডেকে দিলে ভালো হত।

ধীরাপদ ভেবে পেল না কে হতে পারে। সেখানেই তাকে পাঠিয়ে দিতে বলে ঘড়ি দেখল, ন'টা বাজে। খুব কম সময় ঘুমোয়নি, কিন্তু মাথাটা ভার ভার এখনো।

মানকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো যাকে তাকে অন্তত ধীরাপদ আদৌ আশা করেনি। গণুদা—। গায়ে সেই গলা-বন্ধ কোট, পরনের কাপড়টা অবশ্য বদলেছে। রাতের ধকল এখনো মুছে যায়নি, শুকনো মূর্তি। ধীরাপদ বিছানায় বসেছিল, বসেই রইল—কোনো সম্ভাষণই নির্গত হল না মুখ দিয়ে।

মানকে টেবিলের সামনের চেয়ারটা টেনে দিতে গণুদা বসল, মানকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে রইল, তারপর ঢোঁক গিলে বলল, ইয়ে—ওটা কোথায় রেখেছ? তোমার বউদির কাছেও দাওনি শুনলাম—

ধীরাপদ দ্বিগুণ অবাক, এখনো লোকটার নেশার ঘোর কাটেনি কিনা বুঝছে না।—কোন্‌টা?

গণুদা হাসতে চেষ্টা করল, বলল, টাকাটা—আমি সাবধানেই রেখেছিলাম, মিছিমিছি ব্যস্ত হবার দরকার ছিল না।

হঠাৎ সমস্ত স্নায়ুগুলো একসঙ্গে নাড়াচাড়া খেল, ধীরাপদ ধমকে উঠল, কি বকছেন আবোল-তাবোল!

গণুদা ঈষৎ অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠল, এতগুলো টাকার ব্যাপার ঠাট্টা ভালো লাগে না, দিয়ে দাও—

কিসের টাকা? হঠাৎ ধীর শান্ত ধীরাপদ।

অতগুলো টাকা কিসের সে-কৈফিয়ত দিতে গণুদার আপত্তি নেই ওর একটি পয়সা অবধি হকের টাকা তার। গতকাল অফিস থেকে তার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর অন্যান্য পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে—চার হাজার পাঁচশ সাতানব্বই টাকা। সাতানব্বই টাকা আলাদা রেখে বাকি সাড়ে চার হাজার টাকা গণুদা গলা-বন্ধ কোটের ভিতরের পকেটে রেখেছিল—একটা খামে ছিল, পঁয়তাল্লিশ খানা একশ টাকার নোট—ধীরাপদর সন্দেহের কোনো কারণ নেই, সবই তার নিজস্ব টাকা—নিজস্ব রোজগারের টাকা।

সততার টাকা যে সেটা প্রমাণ করতে পারলেই যেন আর যন্ত্রণা না দিয়ে ধীরাপদ টাকাটা বার করে দেবে। কিন্তু ধীরাপদর স্তব্ধতা দেখে গণুদার ফর্সা মুখের কালচে ছাপটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

আপনার টাকা আমি নিইনি।

গণুদা সানুনয়ে বলল, তুমি নিয়েছ কে বলছে, ভালোর জন্যে

সরিয়ে রেখেছ, টাকাটা পেলেই আমি তোমার বউদির হাতে দিয়ে দেব।

আপনার টাকা আমি সরাইনি। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে প্রায় চিৎকারই করে উঠল সে। পরক্ষণে ঘুরে গণুদার পিছনের দরজার কাছে মানুকেকে অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজেকে সংযত করল। তার হাতে দু'পেয়ালা চা, কাছে এগোতে ভরসা পাচ্ছে না।

গলা নামিয়ে ধীরাপদ বলল, কাল রাতে যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে যান, দরকার হলে পুলিসের ভয় দেখান, যে-লোকটা আপনাকে রিকশর তোলার জন্য ঠেলাঠেলি করেছিল তাকেও ধরতে পারেন কি না দেখুন, যান—আর বসে থাকবেন না এখানে।

কিন্তু গণুদা বসেই রইল। বলল, টাকা আমার কোটের ভিতরের পকেটেই ছিল—কেউ টের পায়নি। ওই লোকটাকে সেই ভয়েই কাল আমি কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছিলাম না—তখনো ছিল। হঠাৎ ভেঙে পড়ল গণুদা, ধীরু, ওই ক'টা টাকাই শেষ সম্বল আমার, আর ঠাট্টা কোরো না—তুমি নিজেই না হয় তোমার বউদিকে টাকাটা দেবে চলো—

ধীরাপদ কি করবে? মারবে লোকটাকে ধরে?—আপনি যাবেন কি না এখান থেকে! যা বললাম শিগগীর তাই করুন, ও টাকা আপনার গেছে, যান এক্ষুনি!

গণুদাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। টাকা আমার পকেটেই ছিল, তুমি দেবে না তা হলে?

গেট আউট! যান এখান থেকে, গিয়ে খোঁজ করুন! বিছানা ছেড়ে মাটিতে নেমে দাঁড়াল, যান শিগগীর, নয়তো আপনাকে আমি—

রাগে উত্তেজনায় এক-রকম ঠেলতে ঠেলতেই তাকে দরজার দিকে এগিয়ে দিল। বেগতিক দেখে চায়ের কাপ হাতে মানকে প্রস্থান করেছে।

ধীরাপদ এক সময় উঠে চান করেছে, খেয়েছে, অফিসে এসেছে। কিন্তু কখন কি করেছে হুঁশ নেই। অফিসেও কাজ মন বসল না, এক মুহূর্তও ভালো লাগল না। যে-সম্বল খোয়া গেছে সেটা কাণ্ডজ্ঞান শূন্য ওই অপদার্থ লোকটার বলে ভাবতে পারছে না বলেই এমন মর্মান্তিক লাগছে। ওইটুকুও হারিয়ে সোনাবউদি করবে কি এখন? বার বার বলতে ইচ্ছে করছে, সোনাবউদি আর আমাকে ঠেলে সরিয়ে রেখো না, এবারে আমাকে বন্ধু বলে ভাবো।

বলবে। বলার জন্যেই বিকেল না হতে অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা সুলতান কুঠিতে চলে এলো। কিন্তু ততক্ষণে তার সঙ্কল্পের জোর শেষ।

উমা তাকে দেখেও আগের মত লাফিয়ে উঠল না। তার শুকনো মুখে কি একটা ভয়ের ছাপ। ছেলে দুটোকেও শুকনো শুকনো লাগছে। ওদের পুষ্টির রসদে হয়ত ইতিমধ্যেই টান ধরেছে।

সোনাবউদি পাশের খুপরি ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলো। মায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়েরা সরে গেল। ওদের যেন কেউ তাড়া করেছে। সোনাবউদি চুপচাপ সামনে এসে দাঁড়াল। ধীরাপদর মুখ দেখলে কেউ বলবে না, অত বড় এক কোম্পানীর হাজার টাকা মাইনের এই সেই ধীরাপদ চক্রবর্তী।

সহজ হবার চেষ্টায় দেয়ালের কাছ থেকে নিজেই মোড়াটা নিয়ে এসে বসতে বসতে বলল, গণুদার পকেট থেকে অতগুলো টাকা গেছে শুনলাম, উনি ভেবেছিলেন আমিই সাবধান করে সরিয়ে রেখেছি।

সোনাবউদি নীরবে চেয়ে আছে মুখের দিকে।

...পুলিসে একটা খবর দেওয়া উচিত কিনা বুঝছি না, গণুদা একটু খোঁজ টোঁজ করেছিলেন?

সোনাবউদি তেমনি নির্বাক, নিষ্পলক কঠিন। চেয়েই আছে।

আর কি জিজ্ঞাসা করবে ধীরাপদ? মনে হল সব জিজ্ঞাসা আর সব কথা শেষ হয়েছে, এবারে উঠলে হয়।

কিন্তু সোনাবউদি জবাব দিল, গলার স্বর মৃদু হলেও ভয়ানক স্পষ্ট—প্রায় চমকে ওঠার মতই স্পষ্ট। পাল্টা প্রশ্ন করল, কোথায় খোঁজ করবে?

ধীরাপদ তাকালো শুধু একবার, কোথায় খোঁজ করবে বা করা উচিত বলতে পারল না।

খানিক অপেক্ষা করে সোনাবউদি আরো মৃদু অথচ আরো স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কাল তাকে কোথা থেকে তুলে এনেছেন?

রাস্তা থেকে।

কোন্ রাস্তা থেকে? সেটা কেমন এলাকা?

ধীরাপদ নিরুত্তর। এবারে আর তাকাতেও পারল না। হঠাৎই ধমনীর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে যেন।

জবাবের প্রতীক্ষায় সোনাবউদি নীরব কিছুক্ষণ। তারপর নিজে থেকেই আবার বলল, কোন্ রাস্তা কেমন এলাকা সেটা তার টাকার শোক থেকে বোঝা গেছে—টাকার শোকে মাথা এত গরম না হলে বোঝা যেত না।...অত রাতে আপনার ওখানে কি কাজ পড়েছিল?

না, ধীরাপদ এবারেও জবাব দিতে পারেনি, এবারও মুখ তুলে তাকাতে পারেনি। সোনাবউদি আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, আরো কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখেছিল, তারপর কঠিন ব্যবধান রচনা করেই নিঃশব্দে সামনে থেকে সরে গিয়েছিল।

ধীরাপদ দুনিয়ার অলক্ষ্যে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল এখান থেকে। কিন্তু বাইরে তখনো দিনের আলো। ঘুরে পিছন থেকে কে বুঝি তাকে ডেকেওছিল, বোধ হয় রমণী পণ্ডিত। ধীরাপদ শোনেনি, ধীরাপদর শোনার উপায় নেই। এখান থেকে পালিয়ে কোনো অন্ধকারের গহ্বরে বিলীন হয়ে যাওয়ার তাড়া তার। ভদ্রলোক ছুটলেও তাকে ধরতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

বড়সাহেব পাটনা থেকে ফিরলেন পরদিন খুব সকালে। ধীরাপদ বিছানায় শুয়ে শুয়েই টের পেয়েছে। মানুকে আর কেয়ারটেকবাবুর ব্যস্ততা অনুভব করেছে। কিন্তু ধীরাপদ উঠে আসেনি, তেমন উৎসাহও বোধ করেনি। দুদিন আগেও যে-জন্যে তাঁর ফেরার অপেক্ষায় উৎসুক হয়ে ছিল, সেই কারণটার আর যেন অস্তিত্বও নেই।

একটু বেলায় ডাক পড়ল তার। বড়সাহেব প্রথমেই ঠাট্টা করলেন, খুব কষে বিশ্রাম করছ বুঝি, এত বেলা পর্যন্ত ঘুম! কুশল প্রশ্ন করলেন, অফিসের খবর-বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কি সম্প্রতি বর্তমানে ভাগ্নেটির মেজাজ কেমন, তাও। তারপর খুশি মেজাজে নিজের সংবাদ আর কনফারেন্সের সংবাদ দিতে বসলেন। ব্লাড-প্রেসার টেসার পালিয়েছে, খুব ভালো আছেন এখন, আর ওদিকে কনফারেন্সও মাত। কতটা মাত ধীরাপদ তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে

পারছে, তবু বিবরণ শুনতে হল। তাঁর বক্তৃতার পর সকলের প্রতিক্রিয়ার কথাই বললেন বিশেষ করে।

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে বড়সাহেব খেয়াল করে তাকালেন তার দিকে।—এমন মুখ বুজে বসে আছ, শরীর ভালো নেই তোমার ?

ধীরাপদ হাসতে চেষ্টা করল, তাড়াতাড়ি মাথাও নাড়ল। ভালো আছে।

তবু লক্ষ্য করে দেখছেন। ভুরু কোঁচকালেন, মাথাও নাড়লেন, বললেন, ভালো দেখছি না।

ভালো অফিসেরও অন্তরঙ্গ দুই একজন দেখল না। শরীর অসুস্থ কিনা জিজ্ঞাসা করল। ধীরাপদ কাউকে জবাব দিয়েছে কাউকে বা না দিয়ে পাশ কাটিয়েছে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত প্রয়োজনেও কাউকে ডাকেনি। ও-পাশের ঘরে লাবণ্য সরকার কখন এসেছে টের পেয়েছে, কখন চলে গেছে তাও।

পাঁচটার ওপারে এক মিনিটও অফিসে টিকতে পারল না। কিন্তু এবারে করবে কি ? বাড়ি ফিরলেই হিমাংশুবাবু ডাকবেন, সেটা আরো বিরক্তিকর। চারুদির কথা মনে হল, কিন্তু সে-বাড়ির দরজাটা বন্ধ হলে ধীরাপদ নিজেই বাঁচত।···চারুদি টেলিফোনে ডেকে পাঠালে কি করবে ? যাবে ?'

না ধীরাপদ ও নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না, মাথা আর কোন কিছু নিয়েই ঘামাবে না সে। ডাকলে দেখা যাবে।···কিন্তু চারুদি কি পার্বতীকে সম্পত্তি দেবার ব্যবস্থা-পত্র ঠিক করে আনতে পেরেছে ? থাক, ভাববে না।

সামনে সিনেমা হল্ একটা। কোন্ হল কি ছবি জানে না। কিন্তু ধীরাপদ যেন তৃষ্ণার জল হাতের কাছে পেল। টিকিট কেটে ঢুকে পড়ল। বাড়ি ফিরল রাত সাড়ে ন'টারও পরে। ছবিটা শেষ পর্যন্ত দেখা হয়নি—বিলিতি প্রেমের ছবি একটা। নারী-পুরুষের বাঁধ-ভাঙা এক উষ্ণ নিবিড় মুহূর্তে উঠে এসেছে, তারপর এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হেঁটেই ফিরছে। রাতে ঘুম দরকার।

মানকে এগিয়ে এলো। সে যেন তার প্রতীক্ষাতেই ছিল। —বাবু সেই লোকটা আজও এসেছিল—

কোন লোকটা ?

সেই কাল সকালোয় যে এসেছিল, আপনি যাকে ধমকে তাড়ালেন ঘর থেকে। ভাগ্নেবাবুর সঙ্গে দেখা করে গেল—

অর্থাৎ গণুদা এসেছিল। গণুদা অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে দেখা করে গেছে। ভাগ্নেবাবুর দোরে দাঁড়িয়ে মানকের স্বকর্ণে সব কিছু শোনার সাহস হয়নি, কিন্তু তার বিশ্বাস লোকটা ভয়ানক খারাপ, ধীরুবাবুর নামে কি-সব বলছিল—

একটিও কথা না বলে ধীরাপদ অমিতাভর ঘরের দিকে চলল। কিন্তু হল পেরিয়ে তার ঘর পর্য্যন্ত গেল না, দাঁড়িয়ে ভাবল একটু, তার পর আবার ফিরে এলো। ভিতরটা বড় বেশি উগ্র হয়ে আছে নিজেই উপলব্ধি করছে। এতটুকু হালকা কৌতুকও বরদাস্ত হবে না, অকারণে একটা বচসা হয়ে যাবার সম্ভাবনা। স্নায়ু অত তেতে না থাকলে মানকের মুখে আরও কিছু শোনা যেত, গণুদা অনেক কি বলছিল তার কিছু আভাস পেতে পারত।

পেল পরদিন, আর পেল এমন একজনের মুখ থেকে যার ওপর বিগত ক'দিন ধরে ধীরাপদ মনে মনে শাসনের ছড়ি উঁচিয়ে আছে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত নিঃশব্দে নিজের ঘরে কাটিয়ে ফটকের বাইরে আসতে রমেন হালদারের সঙ্গে দেখা। তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল, চোখে চোখ পড়তে হাসতে চেষ্টা করল একটু। জানালো, দাদার সঙ্গে একটু গোপনীয় কথা ছিল তাই ভিতরে না গিয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে।

গোপনীয় কথা শোনার জন্য ধীরাপদ দাঁড়ায়নি—মুখ শুধু গম্ভীর নয়, কঠিনও।···মেডিক্যাল হোম থেকে কারো মুখে কিছু শুনে নিজের সততার কৈফিয়ত নিয়ে ছুটে এসেছে, আর ফাঁক পেলে ম্যানেজারের নামেও উল্টে কিছু লাগিয়ে যাবে নিশ্চয়। কিন্তু সে-ফাঁক ধীরাপদ আজ আর ওকে দেবে না।

তুমি এ-সময়ে এখানে এলে কি করে, কাজে যাওনি ?

রমেন মাথা চুলকে জবাব দিল, ইয়ে—এখান থেকে যাব।

দেরি হবে ম্যানেজারকে বলে এসেছ ?

ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল, গিয়েই বলবে। তারপরেই এ-ভাবে ছুটে আসার তাগিদটা কেন বোঝাবার জন্য হড়বড়িয়ে যা সে বলে গেল—ধীরাপদ বিমূঢ় হঠাৎ।—নিজের কানে কাল যা শুনল তারপর না এসে সে করবে কি, দাদা রাগ করলেও ছুটি-টুটি নেবার কথা তার মনেও হয়নি, দাদার বিরুদ্ধে নোংরা একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে ভেবে কাল প্রায় সমস্ত রাত সে ঘুমুতেও পারেনি—আজ কাঞ্চনই তাকে এক-রকম ঠেলে পাঠিয়েছে এখানে, সব খুলে বলতে পরামর্শ দিয়েছে—বলেছে, দাদা এমন আপন জন তাকে জানাতে ভয়ই বা কি সঙ্কোচই বা কি, না জানালে দাদার যদি বিপদ হয়, তখন ?

ধীরাপদ দাঁড়িয়ে পড়েছিল, চেয়ে ছিল মুখের দিকে।—কি হয়েছে ?

কি হয়েছে সরাসরি বলতে তবু মুখে আটকেছে রমেনের, ভণিতার মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে আর এক দফা।—কতগুলো বিচ্ছিরি কথা কাল তার কানে এসেছে, দাদার কাছে মুখ ফুটে কি করে যে বলবে —অথচ, কাল একজন ওই ছাই-পাঁশ বলে গেল, আর, আর একজন দিব্বি বসে বসে তাই শুনল।

ভিতরটা হঠাৎ অতিরিক্ত দাপাদাপি শুরু করেছে ধীরাপদর, নিজেকে সংযত করার জন্য পায়ে পায়ে আবার এগিয়ে চলল। অস্ফুট বিরক্তি, কথা না বাড়িয়ে কি হয়েছে বলো—

রমেন বলেছে। ধীরাপদ শুনেছে। মানকের বলার সঙ্গে তার বলার অনেক তফাত, কথার বুনট ছাড়ালে সবই স্পষ্ট, নগ্ন।—

মেডিক্যাল হোমে কাল বিকেলে খুব ফর্সা অথচ রস-ছাড়ানো ছিবড়ের মত একজন শুকনো-মূর্তি লোক এসে লাবণ্য সরকারের খোঁজ করেছিল। একটু পরেই বোঝা গেছে সে খদ্দেরও নয়, মিস সরকারের রোগীও নয়। তার শুকনো দিশেহারা হাব-ভাব—রমেনের কেমন যেন লেগেছে। খানিক বাদে বাইরে এসে দেখে লোকটা যায়নি, বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে ইশারায় ডেকেছে তারপর এমন সব কথা বলেছে যে রমেন অবাক। বলেছে, খুব বিপদে পড়ে মিস সরকারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। রোগীর ভীড় কখন কম থাকে, কখন এলে তাকে নিরিবিলিতে পাওয়া যায়, মিস সরকার লোক কেমন রাগী না আলাপী—বার বার নিজের বিপদের কথা বলে এই সবও শুধিয়েছে। তারপর হঠাৎ দাদার কথা তুলেছে সে, দাদা কোম্পানীর কি, কতবড় চাকরি করে, দাদার চাকরিটা বড় না মিস সরকারের, দাদার সঙ্গে মিস সরকারের ভাব কেমন, উনি কিছু বললে দাদা শোনেন কিনা—এই সব।

তখনকার মত লোকটা চলে গিয়েছিল, তারপর সময় বুঝে আবার এসেছিল। মিস সরকারের তখন দুতিন জন মাত্র রোগী বসে। প্রথমে দুই একটা কি কথা হয়েছে লোকটার সঙ্গে রমেন ঠিক জানে না, কিন্তু উনিও যে বেশ অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন খানিক সেটা ঠিক লক্ষ্য করেছে। মিস সরকার শেষ রোগী বিদায় করে তাকে ঘরে ডেকেছেন। দাদা ভালো বলুন আর মন্দ বলুন, রমেন তখন পার্টিশনের পিছনে গিয়ে না দাঁড়িয়ে পারেনি।

এরপর কি শুনবে ধীরাপদ জানে। তবু বাধা দিল না। লাবণ্য সরকারের মন্তব্য শোনার প্রতীক্ষা, নির্বাক একাগ্রতায় কান পেতে আছে আর নিজের অগোচরে পথ ভাঙছে। গণুদা বলেছে, ধীরাপদ সর্বস্বান্ত করেছে তাকে, পরশু রাতে শরীরটা হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, সে তাকে রাস্তা থেকে তুলে রিকশ করে বাড়ি নিয়ে এসেছে, তারপর তার সঙ্গে এক-ঘরে কাটিয়েছে সমস্ত রাত, আর সকাল না হতে উঠে চলে গেছে। সেই সঙ্গে তার গলাবন্ধ কোটের ভিতরের পকেট থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা নিখোঁজ—অথচ, অসুস্থ অবস্থায় রিকশয় ওঠার সময়ও টাকাটা কোটের ভিতরের পকেটে ছিল তার ঠিক মনে আছে। টাকাটা ফিরিয়ে দিতে বলার জন্য লাবণ্য সরকারের কাছে কাকুতি-মিনতি করেছে গণুদা, বলেছে, তার চাকরি গেছে, অফিস থেকে পাওয়া ওই পুঁজিটুকুই শেষ সম্বল, ঘরে ছোট ছোট ছেলেপুলে, টাকাটা না পেলে তার আত্মহত্যা করা ছাড়া পথ নেই।

রমেনের চাপা উত্তেজিত মুখে তপ্ত বিস্ময়, এতখানি শোনার পরেও ভদ্রমহিলার মুখে কটু কথা নেই একটাও, উল্টে টুকটাক কথা-বার্তা শুনে মনে হয়েছে উনি যেন সাহায্যই করবেন তাকে।

ধীরাপদ উৎকর্ণ, চলার গতি শিথিল হয়ে আসছে।

লাবণ্য সরকার সদয়ভাবেই এটা ওটা জিজ্ঞাসা করছে গণুদাকে, তরশু কোথায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, কি হয়েছিল, রাত কত তখন, বাড়ি ফিরেও ধীরুবাবুর ঘরে রাত কাটানো হল কেন, এইসব। রমেনের মতে গণুদার এলোমেলো জবাব থেকেই বোঝা গেছে লোকটা কেমন, আর লাবণ্য সরকার তা বুঝেও ভালমানুষের মত আবার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করছে, পরদিন টাকা নেই শুনে তার স্ত্রী কি বলেন?

ধীরাপদ দাঁড়িয়েই পড়ল।

নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে বাইরের একজনের কানে কেউ এত বিষ ঢালতে পারে রমেনের ধারণা ছিল না। যেন ওই রকম করে বলতে পারলেই নিজের সততার সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না, আর, যে সাহায্যের আশায় আসা তাও পেয়ে যাবে। বলেছে, অমন মন্দ স্বভাবের স্ত্রীলোক আর দুটি হয় না, শুধু তার জন্তেই সব গেছে। এমন কি চাকরিটাও বলতে গেলে তার জন্তেই খুইয়েছে—ঘরে যার এই স্ত্রী আর এমন অশান্তি সুস্থ হয়ে অফিসে বসে সে চাকরি করে কেমন করে!···টাকা গেছে শুনে ওই স্ত্রী আর কি বলবে, গুম হয়ে বসে আছে শুধু। বাইরের একটা লোককে আসকারা দিয়ে মাথায় তুলেছে, বলবে কোন্ মুখে? তারপর সেই স্ত্রীর সঙ্গে দাদাকে জড়িয়ে এমন সব ইঙ্গিত করেছে যে রমেনের ইচ্ছে করছিল তাকে ঘর থেকে টেনে এনে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়।

এতখানি শোনার পর লাবণ্য সরকার আর তেমন আগ্রহ দেখায়নি, উল্টে একটু ঠাণ্ডা-ভাব দেখিয়েই বিদায় করেছে গণুদাকে। এ-ব্যাপারে তার কিছু করার বা বলার নেই জানিয়েছে, আর, মুখ ফুটে এ-কথাও বলেছে, ধীরু বাবু তার টাকা নিয়েছে সেটা বিশ্বাস্য নয়। বলেছে, যদি নিয়েই থাকেন সে-টাকা আপনার স্ত্রীর কাছেই আছে দেখুন গে যান।

মুখ বুজে হাঁটতে হাঁটতে ধীরাপদর খেয়াল হল রমেন আছে পাশে। আত্মস্থ হওয়া দরকার, ঠাণ্ডা মাথায় আগে ওকে বিদায় করা দরকার। ছেলেটা বোকা নয়, এই অশান্ত স্তব্ধতা উপলব্ধি করছে হয়ত। নইলে এত কথা বলার পর চুপ করে থাকত না, কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করত। গোড়ার সেই অনুশাসনের মেজাজ ধীরাপদর আর নেই, তবু ওকে যেতে বলার আগে দাদার গাম্ভীর্যে একটু সমঝে দিতে হবে, দু'চার কথা বলতে হবে। না বললে ওর চোখে দুর্বলতার দিকটাই বড় হয়ে উঠবে।

নৈতিক উক্তি নিজের কানেই বিদ্রূপ বর্ষাবে, ধীরাপদ মাঝামাঝি রাস্তা নিল।—এ-সব বাজে কথায় তুমি একটু মাথা কম ঘামিও এবার থেকে। এখন তোমার ব্যাপারটা কি বলো, সেদিন আমি মেডিক্যাল হোমে গেছলাম শুনেছ?

কৌতূহল আর বিস্ময়ের আবর্ত থেকে বঁড়শী-বেঁধা মাছের মত হ্যাঁচকা টানে শুকনো ডাঙায় টেনে তোলা হল তাকে। মিটমিট করে তাকিয়ে ঢোঁক গিলল, ম্যানেজার লাগিয়েছে বুঝি···

ম্যানেজার মিছিমিছি কারো নামে লাগাতে আসে কিনা সে-কথা তোমার মুখ থেকে আমার শোনার দরকার নেই। চুপচাপ কয়েক পা এগিয়ে আবার বলল, ওই মেয়েটা কোথাকার মেয়ে, কি ছিল, সব জানো?

রমেনের চকিত চাউনি এবারে অতটা ভীতত্রস্ত নয়। হাতে-নাতে ধরা-পড়া অপরাধীর মুখ অন্তত নয়। জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল শুধু, অর্থাৎ জানে। কিন্তু শুধু মাথা নেড়েই সব-জানার পর্ব শেষ করল না। একটু বাদে দ্বিধা জলাঞ্জলি দিয়ে দাদার একটুখানি সুবিবেচনাই দাবি করল যেন। বলল, কাঞ্চনই সব বলেছে দাদা, কি ছিল, কি-ভাবে মরতে বসেছিল, আপনি কত দয়া করে ওকে বাঁচিয়ে এই ভালোর দিকে এগিয়ে দিয়েছেন—সব বলেছে। বলেছে আর কেঁদেছে। সব জেনেও আপনি এতখানি করেছেন বলেই একটা দিনের জন্তেও আমি ওকে খারাপ চোখে দেখিনি দাদা।

ব্যস, এর পরে তর্ক অচল, যুক্তি অচল। 'দাদার ভালোর দিকে এগিয়ে দেওয়াটাই তার প্রীতির চোখে দেখার পরোয়ানা। নিজের উদারতার প্রশংসা শুনে হোক বা ছেলেটার মতিগতি দেখেই হোক, ধীরাপদর ভিতরটা তিক্ত হয়ে উঠল হঠাৎ। রুক্ষ শাসনের সুরেই বলল, ওই মেয়েটার নামে এরপর যদি কোনরকম নালিশ আসে তাহলে তুমিই তার সব থেকে বড় ক্ষতি করবে, ম্যানেজার একটি কথাও বললে তার চাকরি থাকবে না—এখন কি চোখে দেখবে ভাবো গে যাও।

মুখ কালো করে রমেন চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে বা সেই মেয়ে ধীরাপদর মন থেকে মুছে গেল। টাকার শোকে উন্মাদ গণুদা যে কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে, ধীরাপদ সে-জন্যে উতলা নয়। কিন্তু ভিতরটা তবু জ্বলছে থেকে থেকে। টাকা কোন্ চুলোয় গেছে তা নিয়ে লাবণ্য সরকার এক মুহূর্তও মাথা ঘামায়নি, ওর নাম জড়িয়ে গণুদা নিজের স্ত্রীর মুখে যে কালি মাখিয়েছে সে-টুকুই শোনার মত তার—হৃষ্টচিত্তে তাই শুনেছে বসে বসে। আর, একটা ভাবনাও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, যা সে এ ক'দিনের মধ্যে একবারও ভাবেনি। লাবণ্য সরকার গণুদাকে জিজ্ঞাসা করেছে, টাকা চুরি গেছে শুনে তার স্ত্রী কি বলেন···। কি বলে? মুখে না হোক, মনে মনে কি বলছে সোনাবউদি? কি ভাবছে? যে টাকা হারিয়ে গণুদা এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, সেই ক'টা টাকা তো শেষ সম্বল সোনাবউদিরও—এই মানসিক সঙ্কটে তার ভাবনা কোন্ পর্যায়ে গড়িয়েছে? সোনাবউদির চোখে সে তো অনেক নেমেছে। কত নেমেছে ঠিক নেই। সর্বস্ব খুইয়ে সেই সোনাবউদি শুধু টাকার ব্যাপারেই এখনো পরম সাধু ভাবছে তাকে? টাকা যে পকেটেই ছিল সেটা গণুদা তাকে কতভাবে বুঝিয়েছে ঠিক কি! ধীরাপদর এমনও মনে হল, গণুদা এই কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে সোনাবউদির কাছ থেকে কোনো বাধা আসেনি বলে। সোনাবউদি বাধা দিলে গণুদা এমন বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারত না।

পরদিন দুপুরে কারখানায় বড় সাহেবের ঘরে ডাক পড়তে ধীরাপদ গিয়ে দেখে সেখানে সেই উদ্ভ্রান্ত-মূর্তি গণুদা বসে। লাবণ্য সরকারও আছে, নিস্পৃহমুখে অফিসের ফাইল দেখছে একটা। মুহূর্তে আত্মস্থ হল ধীরাপদ, সব ক'টা স্নায়ু সজাগ কঠিন হয়ে উঠল। লাবণ্য সরকার এখানে কেন, বড়সাহেবই তাকে অফিসের কাজে ডেকেছেন কিনা সে-কথা মনে হল না। এই পরিস্থিতিতে লাবণ্য সরকার উপস্থিত এটুকুই যথেষ্ট, কাজ থাক আর না-ই থাক, এই গাম্ভীর্যের আড়ালে বসে মজাই দেখছে শুধু।

শুধু তাকে নয়, এবারে ধীরাপদ সকলকেই মজা দেখাবার জন্য প্রস্তুত।

হালকা বিস্ময়ে বড়সাহেব বললেন, এ কি-সব বলছে সেই থেকে আমি কিছু বুঝছি না, একে চেনো?

জবাব না দিয়ে ধীরাপদ গণুদার দিকে তাকালো, সামান্য মাথা নাড়ল শুধু। সেই দৃষ্টির ঘায়ে হোক বা টাকার তাড়নায় হোক, গণুদা বসে থাকতে পারল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর শুকনো ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করে বলতে চেষ্টা করল, ধীরুভাই, তোমার বউদির মুখ চেয়েও অন্তত—

শেষটুকু মুখেই থেকে গেল। ধীরাপদ দরজার কাছে এসে বেয়ারা তলব করেছে, বেয়ারা শশব্যস্তে ঘরে ঢুকতে গণুদাকে দেখিয়ে আদেশ করেছে বাইরে নিয়ে যেতে। একেবারে ফটকের বাইরে। আর তারই মারফৎ গেটের দরোয়ানের প্রতি নির্দেশ, এই লোক আবার কারখানা এলাকায় ঢুকতে গেলে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

নালিশ যার নামে করতে এসেছিল তারই এমন প্রতাপ দেখে গণুদা হকচকিয়ে গিয়েছিল বোধহয়। কাউকে কিছু বলতে হল না, পাংশু বিবর্ণ মুখে নিজে থেকেই প্রস্থান করল।

লাবণ্যর হাতের ফাইল টেবিলে নেমেছে। বড়সাহেবও প্রায় বিস্ফারিত নেত্রেই চেয়ে আছেন, গণুদার পিছনে বেয়ারা অদৃশ্য হতে ধীরাপদ চুপচাপ ফিরে তাকালো তাঁর দিকে। হিমাংশুবাবুর হাতের পাইপ মুখে উঠল, পাইপ ধরানোটা কৌতুক গোপনের চেষ্টার মত লাগল।

বোসো। আরো একবার দেখে নিলেন।···লোকটার না-হয় টাকা গিয়ে মাথার ঠিক নেই। তোমার কি হয়েছে?

ধীরাপদ বসল না। ঘাড় ফেরালে লাবণ্যর মুখেও প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস দেখবে মনে হল, কিন্তু ফেরানো গেল না। এবারে হালকা জবাবই দিতে হবে, তাই দিল।

—কিছু হয়নি। টেবিলে কাজ ফেলে উঠে এসেছি, আর বলবেন কিছু?

বড়সাহেব সভয়েই তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লেন যেন। ধীরাপদ বেরিয়ে এলো। কিন্তু জ্বালা জুড়োয়নি একটুও। যে জবাব জিভের ডগায় কড়কড়িয়ে উঠতে চেয়েছিল সেটা নির্গত করে আসা গেল না। বলা গেল না, তার কিছু হয়নি, তার মাথা খুব সুস্থ খুব ঠাণ্ডা আছে। তারপর বড়সাহেবকে সচকিত করে লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করা গেল না, ঘরের নীল আলোয় কোলের মধ্যে সেদিন মাথা গুঁজে পড়ে ছিল যে, সেই মাথাটা এখন সুস্থ কিনা, ঠাণ্ডা কিনা—ছোটসাহেব কেমন আছে। বলতে পারলে একসঙ্গে দু'জনকে ঠাণ্ডা করে দেবার মত জবাব হত। জ্বালা জুড়তো।

পাঁচটার বেশ আগেই ধীরাপদ অফিস থেকে বেরিয়েছে। সঙ্গে পোর্টফোলিও ব্যাগটা আছে। দরকার হতে পারে, দরকার যাতে হয় ধীরাপদ সেই সঙ্কল্প নিয়েই চলেছে। দুদিন আগে যে-চিন্তা মনে রেখাপাতও করেনি সেটাই এখন দগদগে ক্ষত সৃষ্টি করেছে একটা। সোনাবউদি কি ভাবছে জানা দরকার, তার গোচরেই গণুদা এমন বেপরোয়া হয়ে উঠল কিনা বোঝা দরকার। এই চিন্তা তার ঘুম কেড়েছে, শান্তি কেড়েছে। যদিও এক একবার মন বলছে, সোনাবউদির নয়, ভাবনাটা তারই একটা ভ্রান্তির আবর্তে পড়ে সঙ্গতিভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু ওই মনের ওপর আর আস্থা নেই, দখল নেই। দখল যার, সে এখন উত্তেজনা খুঁজছে, উল্টো রাস্তা খুঁড়ছে।

সুলতান কুঠিতে আসতে হলে আজকাল আর এখানকার বাসিন্দাদের চোখ এড়ানোর উপায় নেই। কারো না কারো সঙ্গে হবেই দেখা। এবড়ো খেবড়ো পথের মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখে বিগলিত অভ্যর্থনায় ঘুরে দাঁড়ালেন যিনি, তিনি একাদশী শিকদার। ভিতরটা অকারণে উগ্র হয়ে উঠছে, ধীরাপদ নিজেই টের পাচ্ছে।

শিকদার মশাইও বাইরে থেকে ঘরে ফিরছিলেন। কুশল প্রশ্ন করে সখেদে সেই সমাচার শোনালেন। এই বয়সে পা আর চলে না, তবু বিকেলের দিকে একবার অন্তত না বেরিয়ে পারেন না। দু'খানা কাগজ পড়ে পড়ে এমনই অভ্যাস হয়ে গেছে যে শুধু

একখানা না দেখলে সেই দিনটাই যেন আবছা আবছা লাগে। বিশেষ করে গগুবাবুর ঘরের যে-কাগজটা এতকাল ধরে পড়ে এসেছেন, সেটা একবার হাতে করতে না পেলে ভালো লাগে না। চাকরি গিয়ে কাগজওয়ালার ঘরে এখন কাগজ আসা বন্ধ হয়েছে, ফলে তাঁরই দুর্ভোগ। ধীরাপদর অনুগ্রহে একখানা কাগজ ঘরে বসেই পড়তে পাচ্ছেন, কিন্তু ঐ কাগজখানাও একটু নেড়ে চেড়ে দেখার জন্যে না বেরিয়ে পারেন না।

মুখ ফুটে বলার পর ওই আর একখানা কাগজও ঘরে বসেই পড়তে পাবেন আশা করেছিলেন কিনা তিনিই জানেন। কিন্তু অনুগ্রহ যে করতে পারে তার মুখের দিকে চেয়ে শিকদার মশাই কাগজ-প্রসঙ্গ সেখানেই চাপা দিলেন। ধীরাপদ কবে সুলতানকুঠিতে ফিরে আসছে খোঁজ নিলেন, তার অবর্তমানে দিনকে দিন বাড়িটা যে বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে সে-কথা একবাক্যে ঘোষণা করলেন, তার পর আর একটা সংসারের কথা তুলে আক্ষেপ করতে করতে কদম-তলা পর্যন্ত এসে গেলেন। সোনাবউদির সংসারের কথা। সেটাই মনঃপূত হবে ভেবেছেন হয়ত।···বউটি ভালো, এ-বাজারে চাকরিটা গেল, ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে কি করবে, ধীরাপদ আছে মস্ত আপনজন সেটা অবশ্য কম ভরসার কথা নয়।···কিন্তু বউটি বড় অশান্তির মধ্যে আছে, পণ্ডিত বলছিল, প্রায়ই অনেক রাত পর্যন্ত বাইরের দাওয়ায় বসে থাকে চুপচাপ, রাতে ঘুম হয় না বলে মাঝে মাঝে ওই শুকলাল দরোয়ানকে দিয়ে ঘুমের ওষুধ আনিয়ে খায়—পণ্ডিতের তো আবার সবই দেখা চাই, সকলের নাড়ির খবর টেনে বার করা চাই।

ধীরাপদ আর শোনেনি, আর শুনতে চায়নি। আরো শুনলে কদম-তলা পর্যন্ত এসেও হয়ত তাকে ফিরে যেতে হবে। এখনই পায়ের ওপর আর তেমন জোর পাচ্ছে না। দাঁড়াল, শিকদার মশাইকে বলল, তার নামে ওই আর একখানা কাগজও কাল থেকে তিনি রাখতে পারেন।

এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে সোনাবউদির ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। আগের দিনও সাড়া না দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল, আজ পরদার এধারে দাঁড়িয়েই উমাকে ডাকল। উমা দৌড়ে এসেও থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

—তোর মাকে এ-ঘরে একবার আসতে বল্।

নিজের ঘরের দরজা খুলল। ভিতরটা আজো অগোছালো বা অপরিচ্ছন্ন নয়। জুতো খুলে ধীরাপদ ভূমিশয্যায় এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে অস্বস্তি, বসল।

অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, অস্থিরতা বাড়ছে। কেউ আসছে না। হয়ত না এসেই অপমান করবে তাকে। কিন্তু না, প্রায় মিনিট দশেক প্রতীক্ষার পর সোনাবউদি এলো। ঘরের ভিতর থেকে ধীরাপদর দু চোখ সোজা তার মুখের ওপর গিয়ে আটকালো। কতখানি অশান্তির মধ্যে আছে, ক'টা বিনিদ্র রাতের দাগ পড়েছে চোখের কোলে, বোঝা গেল না। দশ মিনিট বাদে এই মন্থর আবির্ভাবে একটা অবজ্ঞাভরা রূঢ়তাই স্পষ্ট শুধু।

—গোটা কতক কথা ছিল, বসলে ভালো হত।

বসলে মাটিতেই বসে সোনাবউদি, বেশিক্ষণ থাকলে সরে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দেয়। বসল না, দাঁড়িয়েই রইল। পলকের রুক্ষ অভিব্যক্তি একটু, বলুন, শুনছি—

অর্থাৎ বসার প্রবৃত্তি নেই, বেশিক্ষণ দাঁড়ানোরও না।

নিজেকে শান্ত সংযত করার চেষ্টায় আরো কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কাটল, তারপর ধীরাপদ বলল, গণুদা সকলের কাছে বলছেন, আমি তাঁর টাকা নিয়েছি, টাকাটা তাঁকে ফেরত দিতে বলার জন্যে তাদের কাছে হাত জোড় করে বেড়াচ্ছেন।

সোনাবউদি চুপচাপ চেয়ে আছে, আরো কিছু বলবে কিনা সেই প্রতীক্ষা। তারপর নিরুত্তাপ প্রশ্ন করল, আমি তার কি করব?

উনি এই করছেন আপনি জানেন?

এবারের জবাবটা আরো নির্লিপ্ত, বীতস্পৃহ।—জানি। খবরটা কাগজে তোলা যায় কিনা এখন সেই চেষ্টায় আছে।

জবাবটা নয়, গণুদা কি করেছে বা করছে তাও নয়, এই প্রীতিশূন্য অবজ্ঞার আঘাত মর্মান্তিক। ধীরাপদ যে-ভাবে তাকালো, এই একজনের দিকে এমন করে আর কখনো তাকায়নি। কিন্তু না, আশা করার মত একটুখানি মরীচিকার সম্বলও ওই মুখে খুঁজে পেল না আর।

আপনি তাঁকে বাধা দেওয়াও দরকার মনে করছেন না বোধহয়?

না। কথা বাড়ানো হচ্ছে বলে বিরাগের আভাস, সে এখন নিজের মতই একজন ভাবছে আপনাকে, দোষ দিই কি করে।

ও···। আপনারও তাহলে সন্দেহ টাকাটা আমিই নিয়ে থাকতে পারি?

সোনাবউদির নিস্পৃহ দৃষ্টিটা স্থির হয়ে তার মুখের ওপর বিঁধে থাকল কয়েক নিমেষ, তার পরেই আবার তেমনি নির্লিপ্ত, নির্বিকার। ঠিক তেমনি নয়, অনুচ্চ কথা ক'টা হৃৎপিণ্ড খুবলে নেওয়ার মতই তাচ্ছিল্যে ভরা। বলল, ভেবে দেখিনি। তবে মানুষকে আর বিশ্বাসই বা কি···

ধীরাপদ আর কথা বাড়াবে না, কথার শেষ হয়েছে। আর যেটুকু বাকি সেটুকু করে ওঁর মতই স্থৈর্য দরকার, সংযম দরকার। সংযমের আচরণটা প্রায় দুর্ভেদ্য করে পোর্টফোলিও ব্যাগ খুলল। চেক বই বার করল, পকেট থেকে কলম নিল।···স্বর্ণময়ী না স্বর্ণবালা? অনেক-কাল আগে রণুর মুখে একদিন শুনেছিল নামটা···স্বর্ণবালাই। নাম লিখল, টাকার অঙ্ক বসাল, নিচে নিজের নাম সই করে ধীরে সুস্থে চেকটা ছিঁড়ল। চেক-বই ব্যাগে ঢুকল, কলম পকেটে উঠল। মুখের দিকে তাকাবে না ভেবেছিল, একটুখানি প্রশ্রয়ের আভাস পেলে যথা-সর্বস্ব তুলে এনে পায়ের কাছে রাখতে পারত যার, সাড়ে চার হাজারের এই সর্বগ্রাসী কাগজটা তার হাতে তুলে দেবার সময় মুখের দিকে তাকানো যাবে না ভেবেছিল। কিন্তু চেকটা বাড়িয়ে দেবার সময় চোখদুটো শাসন মানল না, আর মানল না বলেই সে-চোখ কোনোও গেল না।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্নায়ুতে স্নায়ুতে খুশির তরঙ্গ একটা—এতক্ষণের এই দাহ বিস্মৃত হবার মতই প্রায়। ধীরাপদ ওই মূর্তি চেনে, ওই আগ্নের স্তব্ধতা চেনে। কাজ হয়েছে। দৃষ্টি বদলেছে, নিস্পৃহতার আবরণ খসেছে, অবজ্ঞার বদলে মুখে অপমানের আঁচ ঝলসে উঠেছে।

কিন্তু এও কিছুক্ষণ মাত্র। একটু বাদে ছাই-চাপা আগুনের মত নিরুত্তাপ দেখালো সোনাবউদির গনগনে মুখখানা। চেকটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে নিল আদ্যোপান্ত।

টাকাটা দিয়েই ফেলছেন?

হাঁ। ব্যাগ হাতে ধীরাপদ উঠে দাঁড়াল, চেষ্টা সত্ত্বেও অব্যক্ত রোষে দু চোখ চকচকিয়ে উঠতে চাইছে, সাড়ে চার হাজার টাকা যে এত টাকা জানত না। বলল, গণুদাকেও জানিয়ে দেবেন দিয়ে গেলাম।

জানাবই যদি তা হলে আর আমার নামে লিখলেন কেন···। অল্প মাথা নাড়ল, জানানো ঠিক হবে না—

ধীরাপদ কথা শেষ করেছে, অনেক কিছুই শেষ করেছে। বিছানা থেকে নেমে জুতো পায়ে গলালো।

টাকাটা হাতে পেয়েই যেন সোনাবউদির গলার স্বরও একেবারে খাদে নেমেছে। বলল, সাড়ে চার হাজার টাকা তো এমনি কেউ দেয় না, এর পর কি করতে হবে বলুন—

ধীরাপদর পা থেমে গেল, হঠাৎই কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় সংকিত হয়ে উঠল ভিতরটা।

সোনাবউ প্রতীক্ষা করল একটু ধীর শান্ত সবিনয় প্রতীক্ষার মতই। বলল, যে দুর্যোগের মধ্যে পড়েছি কোন্ দিকে যাব ঠিক নেই।···এ রাস্তাটাই নিই যদি আপনাকেই না-হয় সবার আগে ডাকব, আপনার অনেক টাকা।

ধীরাপদর দিকেই চেয়ে আছে, তার দিকে চেয়েই বলছে কথাগুলো। কিন্তু হাতের চেকটা ততক্ষণে চার টুকরো হয়ে গেছে। আরো কয়েকটা টুকরো করে মেঝেতে ফেলে দিল সেগুলি। বলল, কিন্তু তা যতদিন না ঠিক করে উঠতে পারছি, টাকা পকেটে করে যে জায়গায় ঘোরাঘুরি করছেন আজকাল সেখানেই যান।

আর দাঁড়ায়নি, আর একবারও ফিরে তাকায়নি, সোনাবউদি ঘর ছেড়ে চলে গেছে। ধীরাপদর চোখ দুটো কি দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল তাকে? তার পরেও কি দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল আর? মনে নেই। ট্যাক্সিতে ওঠার পর একবার শুধু মনে হয়েছে ঘরটা খোলা ফেলেই চলে এলো। মনে হতে না হতেই ভুলে গেছে। সব ক'টা স্নায়ু একাগ্র হয়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে কি। অনমুভূত এক অন্ধ আক্রোশে আত্মবিনাশের রাস্তা খুঁজে চলেছে সেই থেকে। যেখানে যেতে বলল সোনাবউদি সদম্ভে এবার সেখানেই যাবে? সেদিনের মত যাওয়া নয়, সেদিন সে যায়নি, একটা বিস্মৃতির ঘোর তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেই যাওয়ার পিছনে একটা গোটা দিনের ষড়যন্ত্র ছিল। আজ নিজে গিয়ে প্রতিশোধ নেবে? সমস্ত আদিম রিপুর উল্লাস একত্র করে সেই পিচ্ছিল মৃত্যুর গহ্বরে নিজেকে বিলীন করে দিতে পারাটাই হয়ত সব থেকে বড় প্রতিশোধ নেওয়া হবে সোনাবউদির ওপর। নিজের ওপরেও।

···কিন্তু ড্রাইভারটাকে হয়ত কিছু একটা নির্দেশ দিয়েছে সে-ই, ট্যাক্সি মিত্তিরবাড়ীর রাস্তায় ছুটেছে। হঠাৎই এক রাশ স্নায়ুর স্তূপ মনে হল নিজেকে। ধীরাপদ গা এলিয়ে দিল।···চেকটা সোনাবউদির হাতে তুলে দেবার সময়ও যে শেষের যবনিকা দেখছিল চোখের সামনে সেটাই নিবিড় কালো দ্বিগুণ অনড় হয়ে সামনে ঝুলছে এখন। এইখানেই শেষ যেন সব। এর ওধারে চোখ চলে না।

[ক্রমশঃ।

বিষ-ফুল

তরুলতা ঘোষ

কখন যে রোগ ধরেছিল
আমি কি তাই জানি!
ভেবেছিলাম ফুলের গোছায়
সাজাব গাছখানি
ফুল ফোটাব, ফল ধরাব,
পড়বে ঝরে মধু—
গাছের গোড়ায় জল ঢেলেছি,
জল ঢেলেছি শুধু।
মনের মিঠে জল ঢেলেছি,
চোখের নোনা জল,
ঠাকুর-থানে ধন্না দিলাম
মানৎ করে ফল।

ঝাপুড়-ঝুপুড় পাতা হোল,
ডাগর-ডাগর ডাল,
দিব্যি গোছায় ফুটলো যে ফুল
সিঁদুর-হেন লাল।
রূপের তখন দেমাক ভারি,
বাস ছিল কাঁচা,
চোখের নেশায় ভেবেছিলাম
[illegible]।

মরণ রোগে ধরেছিল—
কখন বুঝি ভুলে
এলো খোঁপায় পড়েছিলাম
এক খোপা ফুল তুলে।
ওমা, আমার পোড়া কপাল,
এ যে বিষের ফুল—
পেরোর ক্ষেয়ে পুঁতেছি কোন
সর্বনাশের মূল!
বিষের হাওয়ায় জলে গেলাম,
পুড়ে হোলাম ছাই,
বদ্যিরে, তোর শাস্তরে এর
বিধান কিছু নাই?

রাখতে জ্বালা, ফেলতে জ্বালা—
এ কি বিষম 'রাগ!
বুকের মধ্যে অহরহ
তুষানলের ভোগ।
দিব্যি দিলাম, বদ্যি, তোকে—
সব কথা তো জানিস,
রোগ-সারানো ওষুধ-বিষুধ
একটা কিছু আনিস।

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যাবিনেট মিশনের অ্যাওয়ার্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালের মে মাসে। অনেকে অগত্যা তারই মধ্যে স্বাধীনতার বীজ দেখতে পেলেন,—কিন্তু মোটের ওপর সারা দেশ হতাশই হয়েছিল। বিলেতের লিবারেল লীডার ক্লিমেণ্ট ডেভিস হাউস অফ কমন্সে বক্তৃতায় বললেন, "ভারতের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদের শিক্ষিত করে এবং সাহায্য করে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছানোর জন্যে আমরা সব-কিছুই করেছি, যাতে তারা নিজেদের দেশের শাসনকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করে বিশ্বরাষ্ট্রের সভায় গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে—" (ষ্টেটসম্যান ১৭ই মে)।

উদার ভণ্ডামী! সে সময়ে "ন্যাশান্যাল হেরাল্ড" লিখেছিল,—"বৃটিশ রাজনৈতিক ভাষার শব্দগুলো অর্থসম্পদে এত সমৃদ্ধ যে, 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' শব্দটার অর্থ খাঁটী স্বাধীনতাও হতে পারে, মেকি স্বাধীনতাও হতে পারে।"—একথার প্রমাণ পরবর্তীকালে পাওয়া গেছে।

যাই হোক,—বাংলা ও পাঞ্জাব নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে মতভেদ প্রবলতর হল, এবং মোসলেম লীগের পাকিস্থানের দাবীও আবার প্রবলতর হল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের মিটিংয়ে সে দাবীর বিরোধিতাও বাড়তে লাগলো। লীগ তখন ডিরেক্ট অ্যাকশনের ধুয়ো তুললে,—এবং কোনো কোনো লীগনেতা বলতে লাগলেন, আমরা নন ভায়োলেন্স নীতি মানি না, এটা কেউ ভুলে যেও না।

এর ফল দাঁড়ালো এই যে লীগ থেকে যখন ১৬ই আগষ্ট হরতাল ঘোষণা করা হল,—তখন হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেস মিলে ১৪ই আগষ্ট দেশপ্রিয় পার্কে এক বিরাট সভা করে এক প্রস্তাব পাশ করা হল যে,—এ হরতাল কিছুতেই সফল হতে দেওয়া হবে না।—আমরা যদি এর বিরোধিতা না করি, তা হলে প্রকারান্তরে আমাদের ঐ পাকিস্থানের দাবীটা মেনে নেওয়াই হবে।

লীগের তরফ থেকেও বিরাট মিছিল করে ধুয়ো তোলা হল, "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান।" ১৬ই আগষ্ট হরতাল উপলক্ষে যে দাঙ্গার সম্ভাবনা ষোল আনা, এটা সকলেই অনুভব করতে লাগলো এবং দুই পক্ষই তার জন্যে প্রস্তুত হ'ল।

আমি তখন "দৈনিক বসুমতীতে" "স্বাধীনতার ষড়যন্ত্র" নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলুম,—এবং "Indo Soviet Journal"-এ "Indian Independence and Reactions Plans" নামে আর এক প্রবন্ধ লিখেছিলুম। Mercantile Union এর Federation এর Secretaryর সঙ্গে আমার এ বিষয়ে আলাপ আলোচনার কথা হয়েছিল—তিনি হরতালের দিন সকালে আমার বাসায় এসেছেন। কিছু কথাবার্তার পর দুজনে হরতালের অবস্থা দেখতে বেরোলুম। শিয়ালদার সামনে ফুটপাথে বরাবর সর্বত্র কিছু কিছু লোক দাঁড়িয়েছে—হিন্দু এবং মুসলমান দুই-ই আছে—দোকান সবই বন্ধ। শ' দুই খাকী উর্দীপরা ন্যাশন্যাল গার্ডের ভলাণ্টিয়ার নীরবে মার্চ করে চলে গেল উত্তর দিকে—মুসলমানদের সংগঠন।

আমরা হ্যারিসন রোডের মোড়ে গিয়ে শুনলুম। মির্জাপুর-হ্যারিসন রোডের মোড়ে গোলমাল বেধেছে—পুলিসের গাড়ী গেছে। আমরা খানিক এগিয়ে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের মোড়ে যেতে যেতেই দেখি, মোড়ের পরই দক্ষিণ দিকের একটা সরু গলির ভেতর থেকে ইট ছোড়া হচ্ছে, এবং রাস্তায় জমা কিছু মুসলমান সেই ইট নিয়ে আবার গলির ভেতর ছুড়ে মারছে! দেখতে দেখতেই উত্তর দিকের মুসলমানপাড়ার গলি থেকে কিছু লোক লাঠি নিয়ে তর্জন-গর্জন করতে করতে আসছে।

দক্ষিণ দিকের সরু গলিটা একটা বাড়ীর গেটে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা সরু কোল্যাপসিবল গেট আছে,—ইট ছোড়া হচ্ছিল তার ভেতর থেকে। লাঠিধারীরা সেখানে ঢুকতে না পেরে উত্তর দিকের বন্ধ দোকানগুলোর দরজায় লাঠির গুঁতো দিতে লাগলো। এইবার হয়ত দোকান ভেঙে লুটপাট সুরু হবে ভেবে আমরা দুজনে সরে পড়লুম। কিন্তু শিয়ালদার মোড়ে গিয়ে দেখি ব্যরিকের গলিতে লোকের ভিড়,—তারাও মোড়ের দিকে ইট ছুড়ছে এবং মোড়ে মুসলমানদের একটা ছোটোখাটো ভিড় পাল্টা ইট ছুড়ছে।

আমরা আবার বৌবাজার ষ্ট্রীটে ফিরে এসে ফোরডাইস লেনে একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে চা খেয়ে বৌবাজারের মোড় পর্য্যন্ত এক সঙ্গে গেলুম—তখনও কোনো গোলমালের চিহ্ন নেই—তার পর আমার সঙ্গী সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ-এর মোড়ে বিখ্যাত ২৪৯ নম্বর বাড়ীতে ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে চলে গেলেন, আর আমি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ধরে এগোলুম।

ফুটপাথে কিছু কিছু লোক জমেছে,—২।১টা লোকের হাতে লাঠিও আছে। ভীম নাগের দোকানের সামনে গিয়ে পিছনে গোলমাল শুনে ফিরে দেখি একটা সার্ট-পাৎলুনপরা লোককে কয়েকটা

ছোকরা লাঠিখেটা সুরু করেছে,—সে পশ্চিম দিকের রাস্তায় দৌড়ে পালালো, তার পিছনে তাড়া করে লোক ছুটলো। লোকটা কালো ও রোগা,—এই অপরাধে তাকে মুসলমান মনে করা চলতে পারে।

কিন্তু আমার মুখে তখন বেশ ঘন ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি—একজন ভদ্রলোক আমাকে আটকালেন—বললেন, ওদিকে যাবেন না.— —গোলমাল—ফিরে চলুন। গতিক ভাল নয় দেখে তাঁর সঙ্গেই আবার বৌবাজার চৌমাথায় ফিরে এসে পুব দিকে ফিরেছি,—ভদ্রলোক আবার ধরলেন বললেন, ও দিকেও যাবেন না—গোলমাল আছে এই দিকে যান, বলে পশ্চিম দিক দেখিয়ে দিলেন। বুঝলুম, তিনি আমায় মুসলমান মনে করে নিরাপদ রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। সুতরাং আমিও ঐ দিকই নিরাপদ মনে করে ঐ ২৪১ নম্বর বাড়ীতে গিয়েই উঠলুম।

তারপর একে একে কয়েক জন লোক এল এবং খবর দিলে দাঙ্গা সুরু হয়ে গেছে, সুতরাং আমি সেইখানেই আটকে গেলুম। বিকেলে হরতালের মিটিং ভাঙ্গা লোকের ভিড় ঐ চৌরাস্তায় এসে যাওয়ার পর হঠাৎ মোড়ের একটা ভুজাওয়ালার দোকানের ঝাঁপে একটা লোক এক লাঠির গোঁজা দিল। দেখতে দেখতে ঝাঁপটা ভেঙ্গে ছিঁড়ে চাল-ছোলা ভাজার গামলা উল্টে একটা হরির লুটের হল্লা—আর তারপরই আশ-পাশের সব দোকানের ঝাঁপ দরজা ভাঙ্গা সুরু হয়ে গেল। তারপর প্রথমে জিনিস পত্র ভাঙ্গা এবং ক্রমে রীতিমত লুট সুরু হয়ে গেল।

সেদিন শুক্রবার—আমরা ২২ জন লোক, সবই হিন্দু, রবিবার দুপুর পর্যন্ত ঐ বাড়ীতে আটক ছিলুম। বাড়ীর দরজার পাশের রোয়াকে এক বুড়ো মৌলবী সাহেবের তালা চাবির ছোট্ট একটা দোকান ছিল—বাড়ীটার দরজায় তালা লাগিয়ে মৌলবী সাহেব চাবি নিয়ে তিনি দিন পাহারা দিয়েছিল। পোষ্টাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারী বীরেন ঘোষ তাঁর স্ত্রী এবং একটি ছোট মেয়ে নিয়ে ঐ বাড়ীতেই অফিস সংলগ্ন ঘরে থাকতেন,—তাঁরাও আমাদের সঙ্গে আটকে পড়েছিলেন। ইনি ২ নম্বর বীরেন ঘোষ।

শনিবার সারাদিন লুট চলেছিল,—কাচের একটা বাড়ী হয়েছিল লুটের মালের আড়ত। রাত্রে ঐ বাড়ীর সামনে পর্যন্ত মুসলমানদের ভিড় এবং কালী বাড়ীর পূর্ব পর্যন্ত হিন্দুদের ভিড়,—উভয় পক্ষে ইট ছোড়াছুড়ি, লাঠি আস্ফালন এবং খিস্তির লড়াই চলেছিল। ঐ বাড়ীর ছাদ থেকে যত দূর দেখা যায়, একটাও খুনোখুনি দেখা যায়নি। খুন চলছিল ফিয়ার্স লেনে এবং তার দুই মোড়ে বৌবাজার ও সেনট্রাল অ্যাভেনিউ। মৌলবী সাহেব বলেছেন ঐ দিকে "গোলমাল জ্যায়।"

রবিবার সকালে আমাদের ঐ বাড়ীর নীচের একটা দোকানের দরজা ভাঙ্গা হল—বোধ হয় ঐ ২।১টা দোকানই বাকি ছিল—মৌলবী সাহেব খবর দিলেন। বীরেনবাবুর স্ত্রী বললেন, আর আমার এ বাড়ীতে থাকার সাহস হচ্ছে না। ঠিক করলুম, সকলে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হবে। পুলিসের গাড়ী টহল দিচ্ছিল, কিন্তু ওখানে দাঁড়ায় না। আমরা দল বেঁধে তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছিলুম। হঠাৎ এক পুলিসের গাড়ী মোড়ে এসে থামতেই আমরা বেরিয়ে পড়ে রাস্তা পার হয়ে কেণ্ডারডাইন লেনে ঢুকে পড়লুম—হিন্দুস্থানের সীমানার মধ্যে, নিরাপদ এলাকায়।

গোপাল মুখার্জি রেসকিউ ও রিলিফ সেণ্টার খুলেছিল, সকলে সেখানে পৌঁছালুম। বীরেন বাবুদের সঙ্গে লোক দিয়ে তাঁর ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। আর উকীল মন্মথ সরকার আমাকে নিয়ে চললেন শাঁখারীটোলার রাস্তা ধরে। সেখানে রাস্তায় লোকের ভিড়—আমার দাড়ি দেখছে কটমট করে,—কিন্তু আমার মুখে চোরা হাসি—আর সঙ্গীরা ব্যস্ত হয়ে "নারানদা" বলে ডেকে তাড়া কাটাচ্ছে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একজন এসে আমাকে ধরেছে—চোখে মুখে অস্বাভাবিক কঠোরতা—আমার পিলে চমকে উঠেছিল,—কিন্তু মন্মথবাবু ফিরে দেখে একগাল হেসে বললেন,—ঠিক আছে, ঠিক আছে—উনি ব্রাহ্মণ। লোকটা আমার যেন জোর ছেড়ে দিয়ে বললে,—খুব বেঁচে গেছেন,—যান, দাড়িটা কামিয়ে ফেলুন গে।

ক্লীক রোর কাছে এক বাড়ীতে কম্যিউনিষ্টদের এক কমিউন বা মেস ছিল। সেখানে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে ফোনে বাড়ীতে খবর দিলুম—শুনলুম দাড়ি নিয়ে সেখান পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে না। সুতরাং সেইদিন সেইখানে আমার বহুকালের সখের দাড়ি বিসর্জন দিয়ে বাসায় ফিরে এলুম।

পরদিন সকালে উঠে একজন বন্ধুর সঙ্গে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ারে বীভৎস মুসলমান মড়ার গাদা দেখে মনটায় যেন দম আটকে আসতে লাগলো। মুসলমান এলাকায় হিন্দুদের মড়ার গাদা দেখার উপায় ছিল না,—কিন্তু অনেক লোমহর্ষক রিপোর্ট পেলুম। সে সব কথার এখানে প্রয়োজন নেই। কলকাতার জবাবে হল নোয়াখালি,—তার জবাবে হল বিহার, গড়মুক্তেশ্বর,—এমনি অনেকদিন ধরে চলেছিল। '৪৭ সালের গোড়ায় অর্ধেক জুড়েও কলকাতায় হিন্দুস্থান-পাকিস্থান এলাকা ভাগাভাগি ছিল, এবং এক এলাকার লোক অন্য এলাকায় যেতে পারতো না। হঠাৎ মাঝে মাঝে খুনের খবর আসতো,—একতরফা cold blooded murder. মহাত্মাজী বলেছিলেন, আত্মা অবিনশ্বর।

সে সময়ে আমি দাঙ্গা ছন্দে এক কবিতায় লিখেছিলুম,—

অনেক কালের অনেক পাপের পুঞ্জিত পাহাড়ের
বুকে সঞ্চিত বিষবাষ্পের বিস্ফোরণের প্রায়
হঠাৎ এ কি এ মত্ততাণ্ডব উন্মাদ পিশাচের
পরস্পরের টুঁটি কামড়িয়া রক্ত শুষিয়া খায়।

পাপাত্মা দুরাত্মা—হিন্দু মুসলমান
দাঙ্গার হুঙ্কার ছাড়ে
আত্মা অনশ্বর—নশ্বর দেহখান
মহাত্মা ফিলজফি ঝাড়ে।

মুসলমানের মানের কান্না গোলামীর মায়াজাল
সার করিয়াছে পাকিস্থানের মায়া-মরীচিকাটাকে
মানুষে মানুষে যত হানাহানি চলুক না চিরকাল
খণ্ডিত হতে দিব না আমরা ভারতের ম্যাপ-মাকে।

বন্যা সাইক্লোন দুর্ভিক্ষকে কেয়ার করি খুব থোড়া
তার ওপরে দাঙ্গা যেন গোদের ওপর বিষফোড়া
সইছে সবই, সইবে সবই মাটির ছেলে গরীবরাই
অনেক মাথাই ভাঙ্গলো এবার ভাঙ্গবে না কি ভুলটা ভাই?

'৩৫ সালের শাসনবিধি চলছে, বাংলায় লীগ-মন্ত্রীসভা, সুরাবর্দী চীফ মিনিষ্টার,—বারোজ গভর্ণর, বৃটিশ লেবার পার্টির লোক। '৩৫ সালের শাসনবিধি অনুসারে গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্বের যে লিষ্ট ছিল, প্রদেশের শান্তিরক্ষা তার মধ্যে একটা প্রধান দায়িত্ব অর্থাৎ দাঙ্গা থামানোর, দাঙ্গা দমনের দায়িত্ব গভর্ণরের এবং তার উপযুক্ত সর্বপ্রকার বিশেষ ক্ষমতাও ঐ শাসনবিধিতে গভর্ণরকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি বললেন, আমি "constitutional Governor" মাত্র —আমার কিছুই করবার নেই,—চীফ মিনিষ্টারই এ বিষয়ে সর্বেসর্বা। অথচ কংগ্রেসের নেতারা এবং কংগ্রেসী কাগজের সম্পাদকেরা জানেন যে, শাসনবিধি অনুসারে সকল দায়িত্ব গভর্ণরের। কিন্তু সে কথাটা কেউ বললে না বা লিখলে না,—সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধ নেতারা সব দায়িত্ব সুরাবর্দীর ঘাড়ে চাপিয়ে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে ইন্ধন জুগিয়েই চললেন।

কিন্তু মহাত্মাজী দেখছিলেন, যে-স্বাধীনতা ভারতের দরজা ঠেলাঠেলি সুরু করেছিল, দাঙ্গার ধাক্কায় সেটার আর দিশা পাওয়া যায় না। বারোজের কথার আড়ালে একটা চাপা পৈশাচিক উল্লাসও সুপরিস্ফুট। সুতরাং তিনি শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। নোয়াখালীতে পদযাত্রা সুরু হল, কংগ্রেসীরা প্রচুর দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলেন—বিশ্বাসঘাতক জাতিকে এতটা বিশ্বাস করা একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হঠকারিতার সামিল। কিন্তু দেখা গেল,—মুসলমানেরা সর্বত্রই তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলে, তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলে,—শান্তি স্থাপিত হল।

এ লক্ষণ তো ভাল নয়? '৪৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে (২০শে) বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এক বিবৃতিতে বললেন, তাঁরা ঠিক করেছেন,—তাঁরা '৪৮ সালের জুন মাসে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বদ্ধপরিকর (গরজটা তাঁদেরই বেশী!)—যদি ভারতবাসীর এক মিলিত প্রতিষ্ঠান নাও থাকে, তাঁরা যেখানে যাদের প্রাধান্য দেখবেন,—সেখানে তাদের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবেন।

স্বভাবতই এর ফল হল এই যে, আমাদের হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের যেটুকু গরজবোধ বাকি ছিল, তাও উপে গেল, আমাদের পারস্পরিক ক্ষমতার পাল্লা আবার জোরদার হয়ে উঠলো। গান্ধীর দেখাদেখি কলকাতার শচীন মিত্র এবং স্মৃতীশ ব্যানার্জি পার্কসার্কাস অঞ্চলে শান্তিপ্রচারে বেরিয়ে শেষপর্যন্ত একদল মুসলমানের আক্রমণে নিহত হলেন।

মহাত্মাজী কলকাতার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এলেন,—বেলেঘাটায় আড্ডা গাড়লেন,—সুরাবর্দী তাঁর সঙ্গে দেখা ও আলাপ করে তাঁর বিশ্রুত হয়ে গেলেন। মহাত্মাজী বললেন, হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষই শান্তির সদিচ্ছার প্রমাণস্বরূপ তাঁর কাছে অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করুক। তদনুসারে সুরাবর্দীও কিছু অস্ত্র সমর্পণের ব্যবস্থা করলে,—বেলেঘাটার হিন্দুরাও কিছু অস্ত্র সমর্পণ করলে। অন্তত সাময়িকভাবে শান্তি স্থাপিত হল।

আচার্য কৃপালনী পাটনায় এক বক্তৃতায় বললেন,—"অনেক লোক এখনও বলে, শেষ সংগ্রাম আসন্ন। কথাটা হাস্যকর। সাম্রাজ্যবাদ মরেই গেছে,—মরা ঘোড়াকে চাবকানোর কোন প্রয়োজনই নেই।"—

(রয়টার—ষ্টেটসম্যান—১১।২।৪৭)।

সুরাবর্দী বললেন (ষ্টেটসম্যান—২৪।২।৪৭)—"ইতিহাসের প্রারম্ভকাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে সাম্রাজ্যবাদ, সে আজ গতায়ু হল দেখে আমার মন বিপুলভাবে আলোড়িত হচ্ছে। তারিখ বেঁধে দেওয়া হয়েছে,—এখন আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।"

গোবিন্দবল্লভ পন্থ বললেন,—"আমাদের কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তাবের এ এক বিরাট জয়" (হতভাগা!)।

এর আগেই, যখন আমাদের নেতারা আমাদের অসম্বৃত সোনাহেন স্বাধীনতা আমাদের দরজা ঠেলাঠেলি করছে,—তখন অ্যাটলীর সরকার চার্চিলকে বোঝাচ্ছেন—(ষ্টেটসম্যান—২১।১২।৪৬)—"আপনি ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে যে ভাবে কথা বলেন, তাতে মনে হয় যেন আপনি ক্রিপস্ মিশনের কথা ভুলে গেছেন,—যেটা আপনার সরকারেরই তরফ থেকে মিঃ আমেরী ঘোষণা করেছিলেন—আর আমাদের ঘোষণাটা সেই ক্রিপস্ মিশনের ঘোষণাকে একটুও ছাড়িয়ে যায়নি।"

আবার স্বয়ং ক্রিপস্ সাহেব হাউস অব কমন্সে বললেন—(ষ্টেটসম্যান—৬।৩।৪৭)—"ভারতের 'স্বায়ত্ত শাসনের' প্রগতির পথে অবিরাম চলার পর আজ আমরা তার অবধারিত ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছি।"

হাউস অব কমন্সের ঐ অধিবেশনেই চার্চিল ফেব্রুয়ারী-ঘোষণা সম্পর্কে বললেন,—"ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে ১৪ মাস সময় দিয়ে পাকা তারিখ বেঁধে দেওয়ার ফলে ভারতের ঐক্যের সম্ভাবনা একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়েছে,—ক্রিপস্ মিশনের মধ্যে যেটা ছিল এক প্রধান কথা—হিন্দু মুসলমানের ঐক্য হওয়া চাই, যাতে একটামাত্র উত্তরাধিকারী সরকার হয়।" —(ষ্টেটসম্যান ৮।৩।৪৭।

ভারতের ঐক্য সম্বন্ধে চার্চিলের ঐ মাথাব্যথার অর্থ অবশ্য ছিল এই যে,—ঐক্য যাতে না হয়, তাও তাঁরা দেখবেন, এবং ঐক্যের অভাবের অজুহাতে ক্ষমতা হস্তান্তরও স্থগিত করবেন।

কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনের অন্যতম সদস্য আলেকজাণ্ডার বললেন,—"কেউ কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে, উত্তরাধিকারী সরকার যাতে একটা হয়, তা করতে আমরা বাধ্য কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। মিঃ চার্চিলের আমলেই আমেরী বলেছিলেন,—ভারতে উত্তরাধিকারী সরকার একাধিকও হতে পারে—আর আমরা ভারতকে "স্বায়ত্ত শাসন" দেওয়ার ব্যবস্থায় ঠিক ঐ নীতিই অবলম্বন করেছি।

(ষ্টেটসম্যান—ঐ)।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, '৪৭ সালের গোড়াতেই বৃটিশ সরকার ভারত বিভাগের মতলব আঁটছে। অর্থাৎ মহাত্মাজী যে পরে বলেছিলেন, ইংরেজ ভারত বিভাগের জন্যে দায়ী নয়, সে কথা ঠিক নয়, এবং তা তিনি জানতেন।

যাই হোক, তার পর চার্চিল যখন বললেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তর তো করতে যাওয়া হচ্ছে বর্ণহিন্দু নেতাদের হাতে,—তখন অ্যাটলী জবাব দিলেন—"আপনি যা-ই বলুন,—ভারতীয়দের হাত দিয়েই—শিক্ষিত ভারতবাসীর হাত দিয়েই তো আপনাদের ভারত শাসন করতে হবে—After all, you have to govern India through educated Indians."—(ষ্টেটসম্যান—ঐ)।

তারপর চার্চিল যখন বললেন, "ওরা তো—ঐ তথাকথিত

রাজনৈতিক শ্রেণীর লোকগুলো তো বাজে লোক,—men of straw" —তখন মিঃ আলেকজাণ্ডার বললেন,—"ইংরেজরা যেখানে ভারতবাসীর সঙ্গে একটা দীর্ঘমেয়াদী বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে যাচ্ছে,—তখন একজন কর্তৃত্ব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে এই পার্লামেণ্ট ভবনে ভারতীয় নেতাদের সম্বন্ধে এইভাবে কথা বলাটা একটা মারাত্মক অবিবেচনার কাজ।"—(ঐ)।

নিশ্চয়ই! ঐ অবিবেচকের মতন কথার কল্যাণেই তো আজ আমি ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে ইংরেজের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ প্রকাশ করতে পারছি—ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্যে যে ইংরেজের এতখানি গরজ কেন হ'ল, সে-স্বাধীনতা কেমন বস্তু, তা বুঝতে পেরেছি।

ঐ ষড়যন্ত্রের আর একটা দিক প্রকাশ হল ৩০।৫।৪৭ এর ষ্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ Changing Commonwealth মারফৎ। তাতে বলা হল,—"সাম্প্রতিককালের আলোচনাদি থেকে বোঝা যাচ্ছে, কমনওয়েলথের বিকাশের ধারা কোন্‌দিকে চলেছে। ১৯৪৪ সালের ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সের শেষের ঘোষণায় বলা হয়েছিল,—

"আমরা,—বৃটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের রাজার প্রধান মন্ত্রীরা"—ইত্যাদি।

"কিন্তু এখন যখন এই বিভিন্ন জাতির সংযুক্ত কমিটির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সদস্যেরা "ডোমিনিয়ন" কথাটা আর পছন্দ করছেন না,—তখন ভারত কমনওয়েলথে থাকুক বা না থাকুক,—"ভারতের সম্রাট" কথাটা বর্জন করাই ভাল। "বৃটিশ প্রজা" কথাটাও লেখা বন্ধ করাই ভাল। "ডোমিনিয়ন"—এর মতন "প্রজা" কথাটাও শুনতে ভাল নয়। ভবিষ্যতে "কমনওয়েলথের নাগরিক" কথাটা চালু করাই ভাল হবে।"

এদিকে গোপনে ৩রা জুনের ভারত বিভাগের প্ল্যানও তৈরী হতে লাগলো। লর্ড ওয়াভেলের রাংতা খসে গিয়েছিল বলে বৃটিশ রাজপরিবারের আত্মীয় লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে তাঁর স্থলে বড়লাট করে পাঠিয়ে তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যবস্থা হল,—আমাদের নেতারা তাঁর গুণগান প্রচার করতে লাগলেন। দুজন বৃটিশ শাসন বিধি-বিশেষজ্ঞ ক্ষমতা হস্তান্তরের আইন প্রণয়নের জন্যে নিযুক্ত হলেন,—এবং তাঁরা দু' মাসের মধ্যে এক আইন খাড়া করে ফেললেন,—India Independence Act.

ষ্টেটসম্যান আহ্লাদে গদগদ হয়ে লিখলে—"The name is a master stroke—আইনটার নামটা হয়েছে ওস্তাদির চূড়ান্ত"—(অর্থাৎ ঐ নামের গুণেই ভারতবাসী আলুথালু হয়ে পড়বে)।

সত্যিই আইনটার নাম দেখেই আমরা আলুথালু হয়ে পড়লুম। ফলে এটুকু আমাদের নজরে পড়লো না যে, আইনটার ভিত্তি যে '৩৫ সালের শাসন বিধি, একথা বলেই আইন তৈরী সুরু হয়ে ছিল, এবং আইনটার প্রথম কথাই হল,—"The purpose of this Act is to make India an Independent Dominion."

আমরা স্বাভাবিক আর্যরক্তের তেজেই ধরে নিলুম,—আইনটা '৩৫ সালের শাসন বিধির পরিবর্তে অন্তর্বর্তীকালীন শাসন বিধি রূপে চালু হবে,—যতদিন না আমাদের তথাকথিত কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি স্বাধীন ভারতের শাসনবিধি তৈরী শেষ করে।

অর্থাৎ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট চালু হলেই আমরা পাকা ডোমিনিয়নের পর্যায়ে উঠবো,—আর কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলির রচিত শাসনবিধির কল্যাণে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবো। আমাদের নেতারাও আমাদের এই ভাবের ধোঁকা দিয়েই বোকা বুঝিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হল এই যে,—যেহেতু '৩৫ সালের শাসন বিধির কেন্দ্রীয় সরকার সংক্রান্ত ফেডারেশন প্ল্যানটা গঠিত বা কার্যকরী হওয়া তখনো ঘটে ওঠেনি,—তাই ঐ '৩৫ সালের শাসনবিধির ঐ অংশটার সংশোধন করে ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনশীল করাই ঐ আইনটার মোদ্দা কথা। '৩৫ সালের শাসনবিধিই যে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্টের ভিত্তি, একথার প্রকৃত তাৎপর্য এই।

আর কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী যে সংবিধান রচনা করবে, সেটা পূর্ণস্বাধীনতার সংবিধান নয়, পরন্তু ঐ পাকা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডোমিনিয়নের সংবিধান। কথাটা পরিষ্কার বোঝা যাবে পরবর্তী ঘটনাগুলো বিচার করলে।

'৪৭ সালের ৩রা জুন মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যানে ভারত বিভাগের প্রস্তাব প্রকাশ হওয়ার আগে পর্যন্ত নেতারা কথাটা আমাদের কাছে গোপন রেখেছিলেন—যে প্ল্যানটা আগে থেকে তাঁরা দেখে সম্মতি দেওয়ার পরই সেটা প্রকাশ করা হয়েছিল।

শুধু তাই নয়। পাছে ভারতবাসী হঠাৎ ভারত বিভাগের ব্যবস্থা দেখে আঁৎকে ওঠে এবং কোন অবাঞ্ছনীয় অঘটন ঘটিয়ে বসে, তার জন্যে এ ষড়যন্ত্রের মূলপাণ্ডা মহাত্মাজী আগে থেকেই জমি প্রস্তুতেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। ২রা জুন বিকালে দিল্লীতে প্রার্থনাসভার শেষে তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলছেন—(ষ্টেটসম্যান—৪।৬।৪৭)।

"কি হচ্ছে বা হবে, তা বলার সাধ্য আমার নেই। বড়লাট যে বিলাত থেকে কি এনেছেন,—তা নিয়ে আমাদের মতন রাস্তার লোকের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। আমি গতকাল বলেছি, পণ্ডিত জহরলাল কেমন চমৎকার কাজ করছেন। তিনি বিলেতের হ্যারোর স্কুলের ছাত্র,—কেম্‌ব্রিজের গ্রাজুয়েট এবং একজন ব্যারিষ্টার —ইংরেজদের সঙ্গে আলোচনা ও বন্দোবস্তে তিনিই উপযুক্ত লোক। কিন্তু শীঘ্রই এমন দিন আসবে, যেদিন ভারত রিপাবলিক হবে, এবং ভারতবাসীদের সেই রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করতে হবে। একথা ভাবতে আমার পরম আনন্দ হয় যে, একটি সচ্চরিত্র ও দৃঢ়হৃদয় মেথর-মেয়েই আমাদের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হতে পারে। এ একটা অসম্ভব স্বপ্ন নয়।"

সাধুসন্ত যদি রাজনৈতিক নেতা হয়, তাহলে তার ভণ্ডামী হয় অতুলনীয়। জনগণের মনে রিপাবলিকের মনোহারী চিত্র এঁকে দিয়ে '৪৭ সালের ২রা জুন মহাত্মাজী যে "প্যাড" তৈরী করে দিলেন, ঠিক তার পরের দিনই ৩রা জুনের ভারত বিভাগের প্ল্যান তার ওপর বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতন পড়লো এবং ঐ প্যাডের কল্যাণে আমরা সে বিরাট ধাক্কা সামলে নিলুম।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, যে-চার্চিল এই স্বাধীনতার ষড়যন্ত্রটা আগে বুঝতে না পেরে ভেবেছিলেন বুঝি বা বৃটিশ সাম্রাজ্যটাকে অ্যাটলী-ক্রিপসের দল লিকুইডেশনেই দিতে বসেছে,—সেই চার্চিল ব্যাপারটা বুঝে সন্তুষ্ট হয়ে বলছেন,—(ষ্টেটসম্যান—ঐ)—"একথা অবশ্য ঠিকই যে, ভারত বিভাগের ভিত্তিতেই ভারতের বিভিন্ন পার্টির মধ্যে চুক্তি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, যদি এরা সবাই বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যেই থেকে যায়, তাহলে ভারতের ঐক্যও

বজায় থাকবে, আর ভারতের বহু জাতি ও রাজ্য বৃটিশ রাজমুকুটের রহস্যজনক চক্রের মধ্যেই তাদের ঐক্য খুঁজে পাবে।"

পাক-ভারত লড়াইয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে সব রাজনৈতিক পণ্ডিত ও প্যাট্রিয়ট আজ বহু বছর ধরে দিন গুণে আসছেন, তাঁরা আজও বোঝেন না যে, কমনওয়েলথের বন্ধনের ঐক্য ভাঙা যায় না।

এদিকে ৩রা জুনের প্ল্যান প্রকাশের পরই ৫ই জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন দিল্লীতে এক প্রেস কনফারেন্সে বললেন,—"আমি ঠিক করেছি, '৪৮ সালের জুন মাসে যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা আছে,—আমি সেটা এ বছরেই সেরে ফেলবো। আমি ধাপ্পা দিচ্ছি না—I am not bluffing"—(১৫ই আগষ্ট এর প্রস্তুতি)।

'৪৭ সালের ৬ই জুন দিল্লীতে প্রার্থনান্তিক সভায় মহাত্মাজী বললেন, "কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার বর্তমান সরকারের সর্ববিধ চুক্তি ও দায়িত্বের—দেশের আভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিষয়ক চুক্তি ও দায়িত্বের উত্তরাধিকার লাভ করবে।"—(ষ্টেটসম্যান—১।৬।৪৭)।

অর্থাৎ দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে এই স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়ম স্বাধীন হবে,—কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্পর্কিত যে সব ব্যবস্থা ও চুক্তিতে বৃটিশ-ভারতের সরকার বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আবদ্ধ ছিল, সেগুলো এই স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়ম মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। এ বিষয়ে অবশ্যই কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের একটা চুক্তি না হলে মহাত্মাজী উপরোক্ত কথাগুলো মানিয়ে বলতে পারেন না। বস্তুত তেমন চুক্তি যে হয়েছিল,—যদিও ভারতের জনগণের কাছে নেতারা সেটা কখনো প্রকাশ করেননি, তার বহু প্রমাণও আছে। সে দিকে যাতে আমাদের নজর না পড়ে, তার জন্যে নেতারা অবিরাম ভাবে আমাদের শুনিয়ে চলেছিলেন, ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে বাড়ী চলে যাচ্ছে?

প্রথমত ধরুন,—বার্মা স্বাধীন হওয়ার আগে লর্ড লিষ্টওয়েল এক গুড-উইল মিশনের নাম করে বার্মায় গিয়েছিলেন,—এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পর লণ্ডনে এক প্রেস কনফারেন্সে বলেছিলেন,—"As the necessary corollary of the transference of power, a treaty has been made with Burma, the details of which I am not at liberty to divulge at present"—অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের অপরিহার্য্য সর্ত রূপে বার্মার সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে,—যার বিশদ বিবরণ দেওয়ার অধিকার আমার বর্তমানে নেই।

না বোঝার মৎলব না থাকলেই এটা বোঝা যায় যে, যদি বার্মার বেলায় ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা অপরিহার্য্য সর্ত থাকতে পারে, তা হলে ভারতের বেলায়ও তা অবশ্যই থাকবে। বস্তুত তা যে ছিল, এবং তেমন চুক্তি যে হয়েছিল,—তা ফেব্রুয়ারী ঘোষণার আলোচনাকালে হাউস অফ কমন্সে স্বয়ং ক্রিপ্স সুস্পষ্ট ভাবায়ই বলেছিলেন। "Racial and religious minority"র স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে রক্ষণশীল দলের উৎকণ্ঠা নিবারণ করে তিনি বলেন, "proper protection of the minorities was made a condition of transfer of power, as was indeed the negotiating of a treaty as to the condition of transfer. It will make provision for the protection of racial and religious minorities."—অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের সর্তরূপে একটা চুক্তিও হয়েছে, এবং তার মধ্যে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর স্বার্থ রক্ষার সর্তও রাখা হয়েছে।

(ষ্টেটসম্যান—৬।৩।৪৭)।

সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত দৃষ্টি আমাদের, তাই আমরা বুঝলুম, মুসলমানরাই সংখ্যালঘু এবং তাদের জন্যেই চার্চিলের গুষ্টির এত মাথাব্যথা। একথাটা কারো মাথায় ঢুকলো না যে, সব চেয়ে ছোট অথচ সব চেয়ে গুরুতর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, "racial minority হচ্ছে বৃটিশ সম্প্রদায়, এবং তাদের স্বার্থই চার্চিলের গুষ্টির কাছে সব চেয়ে গুরুতর, বিশেষ ব্যবস্থা না রাখলে যাদের স্বার্থের হানি হওয়ার ভয় সব চেয়ে বেশী।

২রা জুন মহাত্মা বললেন, কি হচ্ছে, তিনি কিছু জানেন না—অথচ ৩রা জুনের প্ল্যান প্রকাশ হওয়ার পরই, ৬ই জুন তিনি আমাদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সমস্ত অবশ্যই বললেন, এর অর্থ কি এই নয় যে, সবই তিনি জানতেন? বস্তুত ক'দিন ধরে কেসীর সঙ্গে দরজা বন্ধ ঘরে তাঁর গোপন আলোচনায় সকল অবস্থা ও ব্যবস্থায়, চুক্তি এবং উত্তরাধিকারের, আলোচনা এবং নীতি নির্ধারণ সম্পূর্ণ হয়েছিল। যা কিছু হয়েছে,—"নাটের গুরু" তিনিই। তিনি এটা জানতেন না, ওটা ভাবেননি,—এসব কথা নোংরা মিথ্যা কথা।

৩রা জুনের প্ল্যানের ভারত বিভাগের ব্যবস্থা যখন এ-আই-সি-সির সমর্থন লাভের জন্যে অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়, তখন পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন, কে এম মুন্সী প্রমুখ নেতারা তার প্রতিবাদ করেন এবং সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। সে সভায় পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ বলেন— (ষ্টেটসম্যান—১৫।৮।৪৭)।

"দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার একমাত্র উপায় ৩রা জুনের প্ল্যান গ্রহণ করা। এ প্ল্যান বাতিল করাটা হবে আত্মহত্যার সামিল। ২০শে ফেব্রুয়ারীর বৃটিশ ঘোষণাটা হচ্ছে কংগ্রেসের কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তাবের জয়,—আর ১৫ই আগষ্ট বৃটিশ সরকার ভারত থেকে তার শাসনের শেষ চিহ্নও মুছে দেবে বলে স্থির করেছে। এর অর্থ কংগ্রেসের বিরাট জয়।"

কিন্তু ডজনখানেক সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে সভায় গণ্ডগোল পেকে উঠলো। অবস্থা ঘোরালো দেখে মহাত্মাজীকে আনা হল, যদিও তিনি সদস্য নন। তিনি বললেন, আপনাদের প্রতিনিধি নেতা (নেহেরু) যে চেক কেটেছেন, তা "অনার" করা আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব। অর্থাৎ নেহরু যে-প্ল্যান মেনে এসেছেন, তা মেনে নেওয়াই আপনাদের উচিত—কারণ তা না হলে বৃটেনের কাছে কংগ্রেস নেতাদের কথার মূল্য থাকবে না।

এই ভাবে মহাত্মাজীই এ-আই-সি-সির সমর্থনটা ম্যানেজ করে দিলেন। Gandhi is Congress—Gandhi is India মিছে কথা নয়—সমগ্র নাটের গুরু তিনিই।

যাই হোক উত্তরাধিকারী ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ আই, এল, ওর সদস্যপদ সবই উত্তরাধিকার সূত্রে পেলো,—সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ ভারতের সরকারের সঙ্গে পণ্ডিচেরীর ফরাসী সরকার এবং গোয়ার পর্তুগীজ সরকারের পাশাপাশি শান্তিতে বাস করার জন্যে যে সব ব্যবস্থা ও চুক্তি ছিল,—সেগুলোও স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়ন উত্তরাধিকার সূত্রে পেলো—অর্থাৎ মেনে চলার বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হল।

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট যখন রচিত হয়, তখন ভারত বিভাগের ব্যবস্থাটা বাস্তবে পাকা হয়নি বলে একটামাত্র উত্তরাধিকারী সরকার ধরে নিয়ে আইনটার অন্তর্গত গভর্ণর জেনারেল কথাটা একবচনে লেখা হয়েছিল। কিন্তু ভারত বিভাগের প্ল্যান যখন পাকা হল, তখন তাড়াতাড়ি তার মধ্যে একটা নতুন ধারা জুড়ে দিয়ে বলা হল,—এই আইনে যেখানে গভর্ণর জেনারেল কথাটা আছে সেখানে সেখানেই পড়তে হবে Governors General of the two Dominions.—কারণ দুই স্বাধীন ডোমিনিয়নই এক আইনে স্বাধীন হচ্ছে, এবং তাদের সরকার দুটোও এক রকমেরই হবে।

পাকিস্থান হল একটা নবজাত রাষ্ট্র,—কাজেই সে ভারতের মতন অটোমেটিক উত্তরাধিকারী হল না,—কিন্তু যেহেতু দুটো সরকার এক আইনে একই রকমের হওয়া চাই, অতএব পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে লাইন-আপ করার জন্যে সব চুক্তি নতুন রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিলে, রাষ্ট্রসংঘের নতুন সভ্য হল—ইত্যাদি—

তারপর আভ্যন্তরীণ চুক্তির উত্তরাধিকারের কথা। একটা ব্যাপারেই তার স্বরূপ সুপরিস্ফুট হল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে তখনকার আগা খাঁ কোম্পানীকে যে সাহায্য করেছিল,—তার পুরস্কারস্বরূপ কোম্পানী তাঁকে বছরে চল্লিশ হাজার টাকা পুরুষানুক্রমিক পেনসন দিয়েছিল। এখন উত্তরাধিকারী স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়নের সরকার সেই আগা খাঁর প্রপৌত্র বর্ত্তমান আগা খাঁকে সেই পেনসন দিয়ে চলতে লাগলেন।

আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও চুক্তির উত্তরাধিকারের আর একটা অন্য রকমের উদাহরণও কম মনোহারী নয়। বিদ্রোহের অপরাধে বৃটিশ সরকার বীর সাঁভারকরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। এখন ভারত স্বাধীন হল বলে সাভারকর স্বাধীন ভারতের সরকারের কাছে দাবী করলেন, তাঁর সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হোক। অনেক দিন নানা অজুহাতে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের তরফ থেকে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ জবাব দিলেন পার্লামেণ্ট থেকে,—"আমরা বিশেষজ্ঞ আইনজীবীদের পরামর্শ নিয়ে দেখেছি, সাভারকারের সম্পত্তি প্রত্যর্পণের আইনগত অধিকার এ সরকারের নেই।"

আর একটা দৃষ্টান্ত আই-সি-এস অফিসারদের চাকরী সম্পর্কে, যাকে ভারত সচিবের চাকরী বলা হত। তাতে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার যে স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়নের ছিল না,—এ কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য সর্দার প্যাটেল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলেন যে, তিনি তাদের চাকুরীর সকল সর্ত,—মোটা বেতন ও পেনসন, ছুটী ও অন্যান্য বিশেষ সুবিধা—সব সম্পর্কেই গ্যারাণ্টি দিয়েছেন,—সুতরাং তা নিয়ে গণ্ডগোল করা চলবে না।—ব্যাপারটা যেন সর্দার প্যাটেলের পৈত্রিক জমিদারীর কথা!

ইংরেজদের মোটা মাইনেটাকে দেশের লোক এবং কংগ্রেস নিজেই বরাবর লুট বলেছে, এবং '৩৭ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীরা অল্প বেতন নিয়েছিল, কিন্তু অফিসারদের মোটা মাইনেতে হাত দিতে পারেনি—সেটা ছিল পরাধীনতার বিড়ম্বনা।

এখন জনগণের কাছে স্বাধীনতার বড়াই করতে হবে, অথচ অফিসারদের মোটা মাইনেতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। এ দুর্দশা ঢাকা দেওয়ার উপায় কি? '৩৭ সালের প্রদর্শনীর পুনরভিনয় করতে গেলে এ দশা ঢাকা দেওয়া যায় না। সুতরাং চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে নিজেরাই বৃটিশ লুটের মতন মোটা মাইনে নিয়ে ভারতের নতুন ইজ্জতের কথা বলে আমাদের বোকা বুঝিয়ে ব্যাপারটার কদর্যতা ঢাকা দিলে। আর চক্ষুলজ্জা যখন কেটে গেল, তখন কংগ্রেস নেতারা নবাবীতে ইংরেজদের ওপর টেক্কা মেরে চললো।*

[ক্রমশঃ।

---

* গত সংখ্যায় ভোট যুদ্ধে চতুরালীর প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম অনবধানতাবশত নির্মলেন্দু মজুমদার লেখা হয়েছে—নামটা হবে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। এ ভুলের জন্যে আমি দুঃখিত।

—লেখক

রবার্ট লুইস্ ষ্টিভেনসন্

শ্রীঅসিত মৈত্র

আজও মহাসমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তালে তালে লহরীমালা মহাজীবনের ভীমভৈরব মহাসঙ্গীত গায়। অর্ণবপোতে যেতে যেতে মাঝে মাঝে দিগন্তের কোলে ছেঁড়া ছেঁড়া কালো কালো মেঘের স্থায় ছোট বড় নানা অচেনা দ্বীপ দেখা যায়। আজিও দুঃসাহসী'র বক্ষ অচিন দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের আকর্ষণে উদ্বেল হয়ে ওঠে!

কিন্তু আজ আর মহাসমুদ্রের মহান্ ঐকতানের সুরকার, মানুষের দুঃসাহসিক মনের বলিষ্ঠ আকুলি বিকুলির প্রকাশক কথাশিল্পী, জীবনের জয়গানের উদাত্ত কবি আর, এল, এস্ নেই। প্রায় এক শতাব্দী হতে গেল প্রতিভার এই অম্লান দীপশিখাটি নিভে গেছে। কিন্তু নিভে গেছে বা কি করে বলি? আজও তাঁর অমর কীর্তি মানুষের অন্ধকার হৃদয়কন্দরে শত দেউটি জ্বালাচ্ছে। তাঁর কীর্তি তাঁকে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব দিয়েছে, আজিও তাঁর প্রতিভার দীপ্তি মানুষের ইতিহাসে অম্লান, অক্ষয়!

আর, এল, এস্ অর্থাৎ রবার্ট লুইস্ ষ্টিভেনসন্‌কে ইংরাজী সাহিত্যের একজন অতি প্রসিদ্ধ, জনপ্রিয়, অমর কথাশিল্পী, স্বপ্নসারথি বলে ধরা হয়। ইংরাজী সাহিত্যের বিখ্যাত সমালোচকরা তাঁর অনবদ্য ভাষা এবং অনুপম রচনাশৈলীর জন্যে তাঁকে writer's writer বলে অভিহিত করেন। তিনি ছেলেবুড়ো সকলের জন্যেই লিখেছেন এবং উভয়ের কাছেই সমান প্রিয়। তাঁর লেখা 'অ্যান্ ইনল্যাণ্ড ভয়েজ,' 'ট্রাভেলস্ উইথ এ ডঙ্কি,' 'ফ্যামিলিয়ার ষ্টাডিস্ অফ মেন অ্যাণ্ড বুকস্', 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড', 'কিডন্যাপ্‌ড,' 'দি মাষ্টার অফ ব্যালানট্রি', 'এ চাইল্ডস্ গার্ডেন অফ ভার্স,' 'ব্যালাডস্', 'দি ষ্ট্রেঞ্জ কেস্ অফ ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিষ্টার হাইড', 'দি মেরি মেন' প্রভৃতি পুস্তক বিশ্বসাহিত্যে অতি উল্লেখযোগ্য অবদান। এত সব বই বাদ দিলেও বোধহয় ছোটদের কাছে একমাত্র 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' এবং বড়দের কাছে 'দি ষ্ট্রেঞ্জ কেস্ অফ ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিষ্টার হাইডে'র জন্যে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ষ্টিভেনসন্ মূলতঃ অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী-লেখকই ছিলেন। তাঁর প্রায় সমস্ত গল্প-উপন্যাসে এবং ভ্রমণকাহিনীতেই দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার স্পৃহা এবং দুর্গম, বিপদসঙ্কুল ভ্রমণনেশার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু যে লোকটি এত সব দুঃসাহসভরা গল্প-কাহিনী লিখেছেন, আমাদের ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে, তিনি আজীবনই চিররুগ্ন ছিলেন। তাঁর অ্যাডভেঞ্চার-পিয়াসী জীবনতরী চিরকালই অজানার উদ্দেশ্যে বয়ে চলেছে এবং তাঁর একাধিক পুস্তকে বর্ণিত জলদস্যুর মত মৃত্যু চিরকালই মাঝে মাঝে তাতে হানা দেবার চেষ্টা করেছে এবং অসীম মৃত্যুঞ্জয়ী মানসিক শক্তি বলে তিনি বারবার তাকে হটিয়ে দিয়েছেন।

রবার্ট লুইস্ ষ্টিভেনসন্ ১৩ই নভেম্বর, ১৮৫০ সালে এডিনবরা সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি দারুণ রুগ্ন এবং স্বপ্নবিলাসী ছিলেন। ছোটবেলায় তাঁকে দেখতে ছিল পাগুলি লিকলিকে, কপোত-বক্ষ, হাতের আঙুলগুলি সরু সরু। কিন্তু শুধু আশ্চর্য্য সুন্দর ছিল তাঁর বড় বড় বাদামী রংয়ের চোখ দুটি—যেন পৃথিবীর সমস্ত দুঃসাহসিক স্বপ্ন আর দুর্জয় প্রাণশক্তি শুধু ঐ দুটি চোখেই বাসা বেঁধে আছে! ছোট থেকে জীবনের অধিকাংশ দিন তাঁর বিছানায় রোগশয্যায় শুয়েই কেটেছে, এমন কি, ডাক্তার তাঁকে তখন কথাবার্তা বলতেও নিষেধ করত। অসুখের জন্যে ঠিকমত স্কুলে যাওয়া হত না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিনরাত নানা বই পড়তেন এবং নানা দুঃসাহসিক কল্পনা করতেন। তাঁর কল্পনায় তাঁর ঘরটিই ছিল সুবৃহৎ জগৎ, আর খাটটি ছিল জাহাজ যার ক্যাপ্টেন হয়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন রোমান্স আর অ্যাডভেঞ্চারের রাজ্যে! আবার বিছানায় শুয়ে শুয়ে মাঝে মাঝে বিছানাটাকে মহাসমুদ্র, বালিসগুলি সাজিয়ে বানাতেন জাহাজ, নিজে সাজতেন দুঃসাহসিক ক্যাপ্টেন, অচিন অ্যাডভেঞ্চারের আকর্ষণে সমুদ্রের উত্তাল লহরীমালা অতিক্রম করে চলেছেন। আরেকটা বালিসকে বানাতেন জলদস্যুদের জাহাজ। জাহাজ এগিয়ে চলেছে, এইবার হবে জলদস্যুদের সঙ্গে মহারণ! তাঁর কল্পনার এত প্রাবল্য ছিল যে, এই সব তিনি মানস-নেত্রে সত্যিই প্রত্যক্ষ করতেন এবং সময় সময় উত্তেজনার আতিশয্যে রুগ্নদেহে উঠে বসতেন! মাঝে মাঝে সাজতেন দুর্দান্ত জলদস্যু। প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজের পর জাহাজ, দ্বীপের পর দ্বীপ লুণ্ঠন করে চলেছেন—প্রবল দুর্বৃত্তকে সাজা দিচ্ছেন আর গরীব, অত্যাচারিতদের রক্ষা করছেন। মাঝে মাঝে ভাবতেন, তিনি যেন এক অতি প্রসিদ্ধ সেনাপতি হয়েছেন। দেশের পর দেশ জয় করে বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে মার্চ করে চলেছেন!

যখন তিনি অসুখে ভুগতেন না, তখন অন্যান্য বালকের মতই খেলা ধূলা, দুরন্তপনা করে বেড়াতেন।

অসুখের জন্য মাঝে মাঝে পড়াশুনা বাদ দিয়ে প্রায় ১৭ বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন।

তাঁর বংশ ছিল বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারদের বংশ। তাঁর বাবা,

ঠাকুর্দা প্রত্যেকেই বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। সমুদ্র-বক্ষে লাইট-হাউস নির্মাণ, বন্দর তৈয়ারী ইত্যাদি কর্মে তাঁদের সুখ্যাতি ছিল অসীম। তাঁর বাবা টমাস ষ্টিভেনসন্‌ও তাঁর এক মাত্র ছেলে লুইসকেও ইঞ্জিনীয়ার গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাপের ইচ্ছায় ষ্টিভেনসন্ ইঞ্জিনীয়ারিং ক্লাসে যোগ দিয়েও পড়াশুনা কিছুই করতেন না। তিনি কলেজ পালিয়ে এডিনবরার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন—খুব গরীব ছোটলোক থেকে সুরু করে বিরাট সম্ভ্রান্ত ধনী সকলের সঙ্গে সমান আড্ডা দিয়ে বেড়াতেন। এবং সময় পেলেই সাহিত্য সাধনা করতেন। যা মনে আসত নিয়ে লিখে লিখে খাতার পর খাতা ভরিয়ে ফেলতেন—তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞানই ছিল বিখ্যাত সাহিত্যিক হওয়া। কিন্তু এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপক তাঁকে অনবরতই নিরাশ করতেন। তিনি বলতেন যে, ষ্টিভেনসন্ কোনো দিনই সাহিত্যিক হতে পারবে না! তাঁর বাবা এ সময় তাঁকে একদিন ধরে ফেললেন যে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বার ছেলের একেবারেই মন নেই। একদিন তিনি পুত্রকে কাছে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ষ্টিভেনসন্ সোজাসুজি বললেন যে, সাহিত্যেই তাঁর আসল ঝোঁক, তিনি সাহিত্যিক হতে চান। উত্তরে বাপ তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, সাহিত্য করে পেট ভরে না। অবশেষে বাপের ইচ্ছায় প্রায় তাঁর ২১ বৎসর বয়সে আইন পড়তে লাগলেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি ভালভাবেই আইন পাস করেন। কিন্তু এই সময়ও বরাবরই তাঁর লেখার দিকেই দারুণ ঝোঁক ছিল। ষ্টিভেনসন জন্মগতসূত্রে লেখক ছিলেন না। জীবনে বহু সাধনা করে, কঠোর পরিশ্রম করে, তাঁর স্বপ্নকে সফল করতে হয়েছিল। প্রথমের দিকে বহুদিন ধরে তিনি সফল হননি। অবশেষে তাঁর অদ্ভুত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিবলে সফলকাম হয়েছিলেন।

তাঁর ২৬ বছর বয়সে সর্বপ্রথম কয়েকটি প্রবন্ধ এডিনবরার কয়েকটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সময়েই তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। এই রোগ সারাবার জন্য তিনি ফ্রান্সের অন্তর্গত রৌদ্রকরোজ্জ্বল রিভেরায় চলে যান। কিছুদিন পরে তিনি আবার স্কটল্যাণ্ডে চলে আসেন। এবার ফিরে এসে তিনি কেবলই পড়তে লাগলেন। ডারউইন, ভলটেয়ার, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত চিন্তাশীল লেখকের রচনা পড়ে ফেললেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মনে অনেক সন্দেহ ঢুকে গেল। একদিন তিনি তাঁর ধর্মভীরু পিতার সঙ্গে ধর্ম নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক সুরু করলেন। পিতা পুত্রের ধর্মে সন্দেহ দেখে ঘাবড়িয়ে গেলেন। কিন্তু স্কটল্যাণ্ড তাঁর আর বেশী দিন ভাল লাগল না। কিছুদিন পরে আবার এক বন্ধুর সঙ্গে বেলজিয়ামের পথে বেড়িয়ে পড়লেন। এর পর গাধার পিঠে চেপে একাকী ফ্রান্সের পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

এই ভ্রমণের ফলে তিনি দুটি বিখ্যাত বই লেখেন 'অ্যান্ ইনল্যাণ্ড ভয়েজ' এবং 'ট্রাভেলস্ উইথ এ ডঙ্কি'। এ ছাড়াও আরো কয়েকটি প্রবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকার জন্যে লেখেন। এখন যদিও ধীরে ধীরে সকলেই মেনে নিচ্ছিল যে তিনি একজন প্রতিভাশালী লেখক, কিন্তু অর্থাগম বিশেষ কিছুই হচ্ছিল না।

এই ফ্রান্সে ভ্রমণের সময়েই এক হোটেলে তাঁর সঙ্গে ফ্যানি অসবার্ণ নামে এক আমেরিকান বিবাহিতা ভদ্রমহিলার আলাপ হল। এই আলাপের ফলে দুজনেই দুজনায় প্রেমে পড়েন। ভদ্রমহিলারও এই নম্র, সুন্দর স্বভাববিশিষ্ট, কথাবার্তায় প্রাণোজ্জ্বল যুবকটিকে বড় ভাল লেগে গেল।

এই ভদ্রমহিলা স্বামীকে আমেরিকায় রেখে তাঁর ছোট একটি ছেলে এবং মেয়েকে নিয়ে ফ্রান্সে কিছুদিনের জন্যে অবসর যাপন করতে এসেছিলেন। কিছুদিন পর নির্দিষ্ট সময় ফুরিয়ে যেতে তাঁরা আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়ায় তাঁদের নিজ গৃহ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

ইতিমধ্যে ষ্টিভেনসনের বাবার কানে ওঠে যে, তাঁর পুত্র একজন বিবাহিতা নারীর প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন! তাঁর ধর্মভীরু পিতা ছেলের এই রকম প্রবৃত্তি দেখে অত্যন্ত চটে যান এবং তাঁকে টাকা পয়সা দেওয়া একদম বন্ধ করে দেন।

যাই হোক, এতেও ষ্টিভেনসন বিন্দুমাত্র দমে যাননি, তাঁর প্রেমানল সমানেই জ্বলতে থাকে। ফ্যানিরা চলে যাবার কিছুদিন পরে তিনিও তাদের উদ্দেশ্যে ক্যালিফোর্ণিয়ায় যাত্রা করেন। বাবার টাকা বন্ধ হওয়ায় যদিও টাকা-পয়সা সামান্যই ছিল, স্বাস্থ্যও খুব খারাপ যাচ্ছিল, তবুও প্রেমাস্পদাকে দেখবার ইচ্ছা এত প্রবল হয়ে উঠল যে, তিনি শান্ত থাকতে পারেন নি—যাত্রা করেন। অর্থ অভাবে তখনকার দিনে শরণার্থীদের অ্যামেরিকায় যাওয়ার জন্যে যে কদর্য জাহাজ এবং ট্রেণ ছিল, তাতে ভ্রমণ করে এবং তাদের কুখাদ্য খাওয়ার ফলে পথেই তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়ল। এই অনাচার, অত্যাচারের ফলে ক্যালিফোর্ণিয়ায় পৌঁছেই তাঁর পুরানো রোগ আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। কোনোরকমে ফ্যানির সঙ্গে দেখা হবার পরই তিনি অজ্ঞান হয়ে যান এবং অনবরত রক্তবমন করতে থাকেন। এই সময় ফ্যানির স্বার্থত্যাগের তুলনা হয় না, তিনি জানতে পারলেন যে, ষ্টিভেনসনের বাপ টাকা বন্ধ করেছেন এবং তিনি যক্ষ্মারোগগ্রস্ত, তা' সত্ত্বেও ফ্যানির ভালবাসা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হল না। তিনি আপ্রাণ শুশ্রূষা করে ষ্টিভেনসনকে নিরাময় করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। ফ্যানির আপ্রাণ শুশ্রূষায় তিনি অবশেষে একটু ভাল হয়ে ওঠেন। তিনি ভাল হয়ে উঠবার পর ফ্যানি তাঁর পুর্বতন স্বামীকে ডিভোর্স করে দিয়ে ষ্টিভেনসনকে বিবাহ করেন। বিয়ে হয় সানফ্রান্সিস্কোতে এবং বিয়ের পরও নবদম্পতি ওখানেই বসবাস করতে লাগলেন। এই সময় তাঁদের সময় কাটে বড় দুঃখে, আর্থিক অনটনের মধ্যে। ফ্যানির জমানো কিছু টাকা এবং ষ্টিভেনসনের বই লেখার কিছু টাকায় কষ্টে তাঁদের সংসার চালাতে হয়। কিন্তু এত দুঃখেও ষ্টিভেনসন ভেঙ্গে পড়েন নি। তাঁর মনকে আগের মতই সদাপ্রফুল্ল, কৌতুকপ্রিয়, নম্র এবং বিনয়ী রেখে ছিলেন।

এর কিছুদিন পর ষ্টিভেনসনের এই দারিদ্র্যের কথা অবশেষে তাঁর বাবার কানে ওঠে। আসলে তিনি পুত্রকে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর দুর্দশার কথা শুনে তিনি বিশেষ অভিভূত হয়ে পড়েন এবং এরপর যখন জানতে পারলেন যে, পুত্র সেই মহিলাকে বিবাহ করেছেন, তখন তাঁর রাগ একেবারে পড়ে যায়। আবার তিনি নিয়মিত অর্থাদি পাঠাতে লাগলেন। এরপরেই ষ্টিভেনসন্ তাঁর বাপের সাদর আমন্ত্রণে স্কটল্যাণ্ডে স্বগৃহে তাঁর স্ত্রী এবং সৎপুত্র কন্যাসহ ফিরে আসেন। এইবার ষ্টিভেনসন্ 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' লেখেন। এই বইটি লেখবার পরই তাঁর নাম এবং অর্থাগম দুই-ই বাড়তে থাকে। এরপরে লেখেন 'কিড্‌ন্যাপড্'।

এরপর তিনি ঘুমের ঘোরে একটি দুঃস্বপ্ন দেখে লিখে ফেলেন

'দি ষ্ট্রেঞ্জ কেস্ অফ ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিষ্টার হাইড।' এই বইটিই তাঁকে জগৎজোড়া নাম দেয়।

এদিকে তাঁর যেমন নাম বাড়ছিল, স্বাস্থ্য তদ্রূপ দিন দিন ঘোরতর খারাপের দিকে যাচ্ছিল। ভয়ে মাঝে মাঝে দীর্ঘদিন কথা বলতেন না, কথা বললেই মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ত! কিন্তু লেখনীর বিরাম ছিল না, মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে ওদিকে তিনি অনবরত লিখেই চলেছেন। এমন কি, মাঝে ডাক্তার তাঁকে এক অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে রাখল, তাও তিনি অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে কাগজে 'এ চাইল্ডস্ গার্ডেন অফ ভার্স' নামক বইটি লিখে ফেললেন।

এরপর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এক অ্যামেরিকান পুস্তক প্রকাশক তাঁকে বলেন যে, তিনি যদি প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ ঘুরে বেড়িয়ে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখেন, তা'হলে তাঁকে ৩০০০ পাউণ্ড দেবে। ষ্টিভেনসনের এই কাজ খুব ভাল লাগে। তাঁর চিরকালের দুঃসাহসী মন এই সুদূরের আহ্বানে সাড়া দেয়। তিনি তাঁর পরিবারের সকলকে নিয়ে জাহাজে এই সুদূরে যাত্রা করেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ ঘুরে বেড়াবার পর তিনি অবশেষে সামোয়াতে আসেন এবং এই অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় দ্বীপটি তাঁর এত ভাল লেগে যায় যে, তিনি এখানেই জমিদারী কিনে বাড়ী বানিয়ে জীবনের শেষ কটা দিন এখানেই কাটান।

তাঁর সহজ, সরল, আন্তরিকতাপূর্ণ এবং অহঙ্কারশূন্য মিষ্ট ব্যবহারে এখানকার আদিম অধিবাসীরাও তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতে থাকে এবং নিজেদের লোক বলেই মনে করত।

এখানে এসে তাঁর স্বাস্থ্যও বেশ ভাল হল। কিন্তু সে স্বাস্থ্য রাখতে পারেন নি—অত্যন্ত পরিশ্রমে আবার ভেঙ্গে পড়ে। আবার রক্তবমন হতে লাগল। অবশেষে ১৮৯৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর তাঁর মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে শিশুর মত আনন্দময় এই মানুষটি হঠাৎ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রিয় এই দ্বীপে তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর বাড়ীর অদূরস্থ প্রশান্ত মহাসাগর-তীরস্থ সমুদ্র-মেখলা পরিবেষ্টিত পর্বতের বাত্যাতাড়িত চূড়োপরি তাঁর কবর স্থাপন করা হয়। সমাধিতে লেখা তাঁর নিজের কবিতা—

Under the wide and stormy sky,
Dig the grave and let me lie.
Glad did I live and gladly die,
And I laid me down with a will.
This be the verse you grave for me.
Here he lies where he longed to be,
Home is the sailor, home from the sea,
And the hunter home from the hill.

পোলিও ব্যাধি (শিশু-পক্ষাঘাত) বিরোধী অভিযান—মার্কিণ চিকিৎসাবিদ্ জোসেফ কুচ (বামদিকে) ওয়রাওয়ার নাহার চিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের নিকট পোলিও প্রতিষেধক ইনজেকসনের ক্রিয়াকলাপ পরীক্ষামূলকভাবে দেখাচ্ছেন। ডানদিকের ছবিতে একটি শিশুদেহে জনৈক চিকিৎসককে পোলিও ইনজেকসান প্রয়োগ করতে দেখা যাচ্ছে।

কোলে
গ্লুকোস
বিস্কুট
রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দ্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত
KOLAY Glucose
KOLAY GLUCOSE BISCUITS
KOLAY Glucose
বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা
কোলে
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

বার্ধক্যে

বারাণসী

নীলকণ্ঠ

উনিশ

রামায়ণ আর মহাভারতের দেশ এই ভারতবর্ষ ; কাশী সেই অনাদিকালের ভারতাত্মার প্রাণময় প্রতীক। ট্রেন যত কাশীর কাছাকাছি হয়, তত খসে পড়তে থাকে দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ। মোসাহেবরা তত হ্যাট-কোট-প্যান্ট ছেড়ে শুরু করে দেশী পোষাক পরতে। হ্যাভেল সাহেব তারই ছবি তুলে ধরেছেন তাঁর Benares, the Sacred City গ্রন্থে :

'Europeans, and the great majority of Hindus, now come to Benares by the railway. It is amusing to see sometimes at Mogul Sarai, the Junction for the East Indian line, how the up-to-date Indian arriving from Calcutta, Bombay or some other large Anglo-Indian City, will in an incredibly short time divert himself of his European Environment and transform himself into the orthodox Hindu.'

ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের এই সব সাহেবি পোষাক পরা মোসাহেবের, ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের দল ভারতাত্মা কাশীর পরিচয় পায়নি কোনও দিন। এরা কাশী বলতে কেউ বোঝে বেনারাস ক্যাণ্টনমেণ্ট ; কেউ রাবড়ি, মালাই ; কেউ জর্দা-বেনারসী ; কেউ বাঈজী-বাজনদার ; কেউ স্থাপত্যবিদ্যা, সূক্ষ্ম কারুকার্য পিতলের ওপর। এরা বিশ্বনাথের মন্দিরে যায়, যেখানেই দেখে দেবদেবীর মূর্তি সেখানেই মাথা ঠোকে, পয়সা ছুঁড়ে দেয় বিধবা. প্রত্যাশী বা পাণ্ডার উদ্দেশে. শিবের মাথায় বেলপাতা চাপায়, নিজের কপালে তিলক আঁকে, উন্মুক্ত বক্ষদেশে চন্দন লেপে। কলকাতায় ফিরে এসে ছমাস ধরে এক কথা বলে বেনারাস ঘুরে এলাম ; গ্যাঞ্জেসে ইভনিং-এ বোটে করে ঘোরা, হাউ লাভলি !

আর আসে বিদেশী পর্যটকের দল ; জেট্টিং পাইলট। এক মাসে পৃথিবী ভ্রমণের পথে ভারতবর্ষে নামাতেই হয় একবার উড়ো পা-কে। কারণ ভারতবর্ষ তাদের ছেলেবেলা থেকে কল্পনার চোখে দেখা। সে দৃষ্টিতে এদেশ হচ্ছে সাপুড়ে আর ভোজবাজির দেশ, দরিদ্র, অশিক্ষিত আর বিপুল বিত্তবান বোকা রাজারাজড়ার খামখেয়ালের তুঙ্গস্থান ; এখানে শহরের রাস্তায় দিনের বেলায় বাঘ বেরোয় ; এরা গোরুকে ভগবতী বলে এবং পুতুলপুজো করে প্রায় সবাই। এই ভারতবর্ষ দেখতে আসে এই মন নিয়ে, কাজেই দেখবার নজর চোখ খোলে না এদের। দেখবার পর বইতে যা লেখে, তা ভারতবর্ষ দেখবার আগেই, অনেক আগে থেকেই কল্পনার রংলাগা চোখে যা দেখে আসছে ছেলেবেলা থেকে, তারই পুনরাবৃত্তি হয় ছাপার অক্ষরে :

Time passed. The serpent went on nibbling imperceptibly at the Sun. The Hindus counted their beads and prayed, made ritual gestures, ducked under the sacred slime, drank, and were moved on by police to make room for another instalment of the patient million. We rowed up and down, taking snapshots. West is West.

Inspite of the serpent, the Sun was uncommonly hot on our backs. After a couple of hours on the river, we decided that we had enough, and landed. The narrow lanes that lead from the ghats to the open streets in the centre of the town were lined with beggars, more or less holy. They sat on the ground with their begging bowls. By the end of the day the beggars might, with luck, have accumulated a quare meal. We pushed our way slowly through the thronged alleys. From an archway in front of us emerged a sacred bull. The nearest beggar was dozing at his post—those who eat little, sleep much. The bull lowered its muzzle to the sleeping man's bowl, made a scouring movement with its black tongue and a morning charity had gone. The beggar still dozed. Thoughtfully chewing, the Hindu totem turned back the way it had come and disappeared.'

—Aldous Huxley'

ওয়েষ্ট ইস্ ওয়েষ্ট নেই আর। ওয়েষ্ট এখন Waste-এর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে East-এর দিকে, ইষ্টের প্রতি লক্ষ্য ঘোরাচ্ছে। ইষ্ট ইস নট ইষ্ট আর। EAST এখন নিজের ইষ্টবিস্মৃত ; Waste অভিমুখী চিন্তা গ্রাস করছে EAST-কে, তার ইষ্টকে ক্রমশঃই।

এই দৃষ্টি নয়। এ দৃষ্টি দিয়ে অনাদিকালের এই ভারতবর্ষকে দেখা যায় না ; এ দৃষ্টিতে অদৃশ্য থেকে যায় ভারতাত্মা কাশীর দুঃখ-

দারিদ্র্য, মৃত্যুমহামারী, অশিক্ষা কুসংস্কার-এর অন্ধকার আড়ালে সে ভারত প্রথম এই পৃথিবীর কানে উদাত্ত আশ্চর্যকণ্ঠে বলেছিল : শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ,—সে ভারতকে দেখেছেন বিবেকানন্দ। রুদ্র, দীপ্ত, প্রভঞ্জনের মত বয়ে গেছেন ভারতবর্ষের বুকের ওপর দিয়ে। খাপ খোলা এই বাঁকা তলোয়ার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,—প্রত্যক্ষ করেছেন সেই দৃষ্টিতে, যে দৃষ্টির সামনে দারিদ্র্যের আর ঐশ্বর্যের আবরণ হয়েছে উন্মুক্ত। পাশ্চাত্য দেশে নিয়ে গেছেন অমৃতের বাণী। প্রাচ্যের কানে শুনিয়েছেন আলস্য ত্যাগের আহ্বান। পাশ্চাত্যকে দিয়েছেন ধর্মের, প্রাচ্যকে কর্মের মন্ত্র। দেশকে জেনেছেন বইয়ের পাতায় নয়, মানচিত্রের বিচিত্র রং-এর হিজিবিজিতে নয়। পায়ে হেঁটে, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তর পর্যন্ত মহামানবের সাগরতীরে ঘুরে বেড়িয়েছেন এক মহত্তম মানব। রাজার প্রাসাদ থেকে পর্ণ-কুটীর পর্যন্ত; শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ থেকে অশিক্ষিত ইতরদের মধ্যে; দ্বিজোত্তম থেকে বর্ণাধম,—সকলের কাছে গেছেন ভারতবর্ষকে জানতে। জ্ঞানে জেনেছেন, ধ্যানে জেনেছেন; ধনে জেনেছেন, নির্ধনে জেনেছেন, বিজ্ঞানে জেনেছেন, গানে জেনেছেন; প্রাণে জেনেছেন সুখদা মোক্ষদা মাতৃভূমি মোক্ষভূমি, কবির আর প্রেমীর, ধ্যানী ও কর্মীর, জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর এই ভূমিকে,—কিন্তু সবার উপরে, সবার 'পরে ভূমির নয়।

যে ভারত, ভূমার যে ভারতভূমি তাঁকেই জেনেছেন বিবেকানন্দ। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দুই ভূমিকেই জেনেছেন বলেই, ভারতকে ডেকে বলতে পেরেছেন, হে ভারত ভুলিও না···! ভারতবর্ষকে, অনাদি-কালের ভুবনমনোমোহিনী ভারতবর্ষকে তিনি তার আদর্শ বিস্মৃত হতে বারণ করেছেন। সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীকে না ভুলতে বলেছেন; কারণ তাঁরাই ভারতীয়াদের আদর্শ। পাশ্চাত্য দেশকে নেড়েচেড়ে ঘেঁটেঘুঁটে ওলটপালট করে দেখে এসে বলেছেন বিবেকানন্দ যে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে বর্তমান ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। শঙ্করের চেয়েও অনেক কঠিন এই নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর মধ্যেই, শেষবারের মত, অশেষবারের মত জ্বলে উঠেছে ভারতাত্মার জ্যোতির্দীপ্ত জয়বাণী। ভারতবর্ষের পথ আর পাশ্চাত্যের পাথেয় সম্বল করে হওয়া যায় না পার। কারণ ক্ষুরের চেয়ে দুর্গম এই পথ চলেছে মানুষকে নিয়ে ভূমি থেকে ভূমায়: অন্ধকার থেকে আলোয়। দুঃখের বন্ধুর যে পথে গেছে মৃত্যুহীন আত্মার সারথ্যে মরদেহের রথ যে পথ ধরে গিয়ে পৌঁছেছে মোক্ষের দ্বারপ্রান্তে। এই পথেই বারবার দেখা দিয়েছেন তাঁরা যাঁদের শক্তি সাধনার মধ্যে দিয়ে নিরাসক্তির আরাধনা। বুদ্ধির ক্ষেত্র থেকে বোধির ক্ষেত্রে নিত্য বিরাজ সেই ভগবানের দূতেরা বারবার বলেছেন: ভূমিতে সুখ নেই; সুখ ভূমায়!

বুদ্ধির বিচারে রাম তাই ভিখারী রাঘব; বোধির আলোকে শ্রীরাম হচ্ছেন, 'কে পেয়েছে সবচেয়ে' কে দিয়েছে তাহার অধিক।' স্ত্রী স্বাধীনতার ঝাণ্ডাধারীদের দৃষ্টিতে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী নয় আদর্শ। কারণ তারা স্বামীকে পরিত্যাগ করেনি; আদালতে মামলা রুজু করেনি; বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা! অনায়াসে এ মামলা করা যেত, কারণ নববিবাহিতাকে বনে যেতে বাধ্য করা পিতার কথা রাখতে এর চেয়ে ক্রুয়েলটি আর কি হতে পারে 'উওম্যান ইম্যান-সিপেশানের মানদণ্ডে!' কিন্তু স্ত্রী যে কেবল স্ত্রীলোক মাত্র নয়; সহধর্মিণীও সে,—এ বার্তা ভুলবে কি করে, জন্মমুহূর্তে বলি প্রদত্ত

যে 'ভারত'-এর কাণে এই বিবেক ও আনন্দযুক্ত অবিনশ্বর বাণী স্মরণের অতীত কাল থেকে বারম্বার উচ্চারিত যে, সুখের জন্যে বিবাহ নয়।

বিবেকানন্দ এই চিরন্তন ভারতের বাণী মূর্তি; আর কাশী সেই জন্মমৃত্যুর অতীত ভারতাত্মার স্থূল প্রকাশ।

এক হিসেবে এই কাশীর চেয়ে দুর্গম, কাশীর চেয়ে রহস্যাচ্ছন্ন আর কিছু নেই ভারতভূমিতে। কাশীর বহিরঙ্গে পৌঁছতে, ট্রেণে করে একটা রাত; উড়োজাহাজে গেলে কয়েক ঘণ্টা। কিন্তু কাশীর অন্তরের অন্তঃপুরে পৌঁছতে কোটি বছরও কিছুই না! কোটিকে গোটিক, ভাগ্যবান কেউ কাশীতে সেই ভারতাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে। কাশীর ইতিহাস,—তার ঘাটে, তার আরতির আলোয়, শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনিতে, ধর্মের ষণ্ডের সঙ্গে অধর্মের পাষণ্ডের গলাগলি করা অসংখ্য অন্ধকার গলিতে শুধু লেখা নেই; কাশীর ইতিহাস সেই কোটিকে গোটিক যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন অপ্রত্যক্ষকে, যাঁরা স্পর্শ করেছেন স্পর্শের অতীতকে, অজরা, অমরা অবাঙমানসগোচরের দিব্যানুভূতিতে যাঁরা চিরদীপ্ত তাঁদের ইতিহাসই ভারতাত্মা কাশীর ইতিবৃত্ত।

'কোটিকে গোটিক' এমন একজনের কথাই আজ বলতে বসেছি যাঁর কথা না বললে কাশীকাণ্ড অসম্পূর্ণ থাকে। কাশীর জীবনে তাঁর জীবন এবং তাঁর জীবনে কাশীর জীবনে অবিচ্ছেদ্য যুক্ত। তিনি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বিজয়কৃষ্ণের প্রথম জীবন, রবীন্দ্রনাথের সেই গান: দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে— !

শুধু বিজয়কৃষ্ণ কেন; সব সাধকেরই প্রথম জীবন কেঁদে ওঠে রবীন্দ্রনাথের কথায়: আমার সুরগুলি পায় চরণ আমি পাইনে তোমারে। ঠাকুর কেঁদেছিলেন, রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমাকে দেখা দিবি না মা?—বলে; বালকের বেশে নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীরাম যখন 'সকল শ্রীরাম অবতারা' বলে, প্রভুর জন্যে চন্দন ঘর্ষণরত তুলসীদাসকে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যান তখন তুলসীও কেঁদে ওঠেন; সেই কান্না গাঁথা আছে কাব্যের অক্ষরে; শ্লোকের হীরা পান্নায় তুলসীদাস চন্দন ঘসৈ তিলক দেই রঘুবীর!

অনন্তের জন্যে অন্তের, অসীমের জন্যে সীমার, মুক্তের জন্যে বদ্ধের কান্নাই বিজয়কৃষ্ণের জীবন ও বাণী।

সেই আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে ধরায় এসেছিলেন এই এক মুক্তি পাগল ভক্তিসিন্ধু,—যে আলো আমরার; যে আলো অধরার। লৌকিক জগতে অলৌকিক শক্তিরা আসেন দিব্য কর্তব্যের কারণে। বিজ্ঞান বলে বিরাট পুরুষেরা যখন পৃথিবীর নানা প্রান্তে আসেন তখনই যখন তাঁদের ঐতিহাসিক প্রয়োজন থাকে। বিজয়কৃষ্ণ যখন বঙ্গদেশে আবির্ভূত হন তখন একটি নতুন আন্দোলনের জন্ম ও জয় যাত্রারম্ভ হয়েছে যার নাম ব্রাহ্মধর্ম। উনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণের ঢেউ যখন ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মত করেছে ভারতীয় সাধনাকে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে হিন্দুধর্মের কেতন শূন্যে ওড়াতে নতুন করে। আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন রামমোহন প্রদর্শিত পথে চালনা করছেন ভারতীয় সত্য দর্শনের আর একটি বিজয়রথ যার বাণী হচ্ছে: 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম।'

প্রতীচ্যের সঙ্গে প্রাচ্যের সাক্ষাৎ সংঘর্ষে ধর্মজগতে উন্মাদনা এসেছিল। এসেছিল উন্মত্ততাও। একদল উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষ বিদেশী শিক্ষাগুরুর প্রভাবে মদ্য ও গোমাংস আর ইংরেজিতে কথা

দেখার পথ ধরে গিয়ে উঠল গীর্জায়। তারা হল খৃষ্টান। যা কিছু সাহেবের তাই উত্তম বলে গ্রহণ করল কিছু মোসাহেবের দল। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিলো এমন একজনের যিনি কেবল ৺কালীর কথা শোনাতে পারেন যে তাই নয়, যিনি দর্শন করাবার ক্ষমতা রাখেন ৺কালীকে। সেই এক জনই, দিব্যানুভূতির প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদীপ্ত পুণ্যবান শ্রীরামকৃষ্ণ। এরই মাঝে তরঙ্গ সংঘাতে দুলে উঠলো আর একটি দ্যুতি যার নাম রামমোহন। যাঁর সত্যানুসন্ধান বৃত্তি প্রতিমার মধ্যে খুঁজে পেল না ঈশ্বরকে, কিন্তু বেদান্তের মধ্যে খুঁজে পেল তাঁকে জ্যোতির্ময় নিরাকার যিনিই একমাত্র সৎ; যিনি সত্য।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই আন্দোলনের সব চেয়ে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া।

বিদেশী পর্যটকমাত্রই যে ভারতকে বিকৃত দৃষ্টিতে দেখেছেন, তা নয়। ম্যারিকার সব চেয়ে ম্যারিকান লেখক মার্ক টোয়েন বিদেশী বিকৃতদৃষ্টি পর্যটকদের মধ্যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ভারতবর্ষে এসেছিলেন এই অশ্রুসিক্ত হাস্যরসের অফুরন্ত নির্ঝর; গভীর বেদনার রঙে রাঙা যার সুগভীর আনন্দের রামধনু সাহিত্যের আকাশে চিরন্তন মহিমায় বারে বারে দেখা দিয়েছে সাহিত্যের সেই ট্রাজিক কমিডিকার মার্ক টোয়েন এসেছিলেন মহামানবের সাগরতীরে, পৃথিবী পর্যটনের পথে। তখনকার ইংরেজি কাগজ এই তরবারির চেয়ে তীক্ষ্ণ কলমের অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; ভারতবর্ষ দেখবার পর ভারতবর্ষের কে বা কি তাঁকে আশ্চর্য করেছে, অভিভূত করেছে সব চেয়ে বেশী তারই খবর করতে। বক্তৃতা করতে বদ্ধপরিকর, ঋণগ্রস্ত মার্ক টোয়েন জীবনের অপরাহ্ণে বেরিয়েছেন তখন দেশে দেশে বক্তৃতা দিয়ে উপার্জন করতে; ঋণমুক্ত হতে। ব্যঙ্গের ছদ্মবেশে মানুষের প্রতি সীমাহীন সমবেদনার উৎস এই মানুষটির কাছে নতুন কিছু শোনা যাবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই আশাতেই দৈনিকপত্রের প্রতিনিধি গিয়েছিল যাঁর কাছে তিনি রাজার বিদূষক নন; বিদূষকের রাজা। কৌতুকোচ্ছল বেদনার নীলাঞ্জন ছায়া মাখানো দুটি চোখে সেদিন যা পরমাশ্চর্য বলে মনে হয়েছিল তা ভূস্বর্গ কাশ্মীরের হ্রদে নৌকা বিহার নয়; নয় পাথরের বুকে প্রেমের কবিতা তাজমহল। একটি উলঙ্গ মানুষ,—এই নগ্ন সত্যের উদ্ঘাটনকারী প্রতিভার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল ভারতবর্ষের পরমাশ্চর্য। পরম পবিত্র। পূত এক অভিজ্ঞতা বলে।

সেই আকাশ-গঙ্গার মতো নির্মম নগ্ন পরমাশ্চর্য ভারতীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এই কাশীতেই; যার সন্ন্যাস-নাম: ভাস্করানন্দ সরস্বতী।

আমি আগে বলেছি যে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা না বললে কাশীকাণ্ড অসম্পূর্ণ থাকে; এখন বলছি আরেক জনের কথা যাঁর কথা না বললেও কাশীকাণ্ড সম্পূর্ণ হয় না। তিনিই বিদেশী পর্যটকের বিস্ময়। ভাস্করানন্দ স্বামী। কাশীর কথা অনেকের কথাই; আবার তার মধ্যে বিশেষ যাঁদের কথা এঁরা দুজনই তাঁদের অন্যতম।

এবং কাশীতে এই দুই সিন্ধুগামী নদের সাক্ষাৎ হয়েছে; জন্ম নিয়েছে সেই মুহূর্তে জীবন গঙ্গা-যমুনার প্রয়াগ; যাঁরা সেদিন এই সাক্ষাতের সময়ে উপস্থিত ছিলেন। সেই সৌভাগ্যবানদের প্রয়াগের পুণ্যবারিতে অবগাহন সার্থক হয়েছে তদ্দণ্ডেই।

এই দুজনের কথাই এখন বলব। [ক্রমশঃ

আশা

সুপ্রসন্ন নন্দন

গোলাপের কাঁটা মোরে
বিঁধেছে জীবন ডোরে
বাধা নাহি মানে তোরে
হৃদয়ের ডোর।

কেন তবে আসা-যাওয়া
যবে শুধু পথ চাওয়া
মিছে হলো দেওয়া-নেওয়া
হবে নাকি [illegible]

দিন যায় রাত আসে
আসে রাত দীন ব'সে
অসময়ে অবকাশে
দিন যায় তোর।

তবু কি দেবে না দেখা
শুধু দু'দিনের লেখা
মিছে মোর মেলামেশা
পার মাঝি মোর।

অষ্টগ্রহ

বন্দনা মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীটা ধ্বংস হবেই, সন্দেহ নেই তায়,
আটটা গ্রহ এক হলে কি, আর বাঁচানো যায়।
কোন দেশেতে কি যে ঘটে, শুনছে সবাই দিন,
আসন্ন এক প্রলয় ভয়ে হোল নাড়ী ক্ষীণ।
চাকর বাকর পালায় সবে, মরতে হলে মরবে দেশে,
স্বদেশ ছেড়ে বেঘোরেতে প্রাণটা বুঝি গেল শেষে।
ধর্ণা দিল কেউবা গিয়ে গণৎকারের দোরে,
"উপায় কিছু করো ঠাকুর, বাঁচব কেমন করে।"
"সমস্যা কি যেমন তেমন, খণ্ডাবে কে বিধির বিধান?
যাগযজ্ঞে দাও গিয়ে মন, তুষ্ট হবেন দেবতাগণ।"
এই না শুনে শুরু হোল যাগযজ্ঞের পালা,
ঘণ্টা কাঁসর হরির নামে লাগল কাণে তালা।
যাগযজ্ঞে কেটে গেল গ্রহের মিলন ক্ষণ,
তুষ্ট হলেন দেবতাগণ, ধড়ে এল প্রাণ।
ভয়ের পালা কাটলে পরে ঘি'ওলাটা সেদিন এল,
যজ্ঞে কত পুড়েছে 'ঘি' গন্ধ বেজায় জুড়ে ছিল।
শুধাই হেসে "অষ্টগ্রহে বরাৎটাতো খুলেই ছিল?"
বললে "বাব, কি যে বলেন, এও কি একটা কথা হোল।"

সংগীত ও সমাজ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

জ্যোতির্ময় মৈত্র

পুরাকালের আদিবাসী শবরদের সংগে আরেক বৌদ্ধদেবীর মিল পাওয়া যায়, সেই দেবীর নাম পর্ণশবরী, বাঘের চামড়া আর তরু-বল্কল বা পল্লব অংগে ধারণ করে আর্য্যধর্মে স্থান পেয়ে তিনি হলেন ভগবতী দুর্গা। লোক ধর্মে লক্ষ্মীর বর্ণনা ছড়াগানে পাওয়া যায়, সে লক্ষ্মী হলেন কৃষি-সমাজের মানস-কল্পনার সৃষ্টি, তিনি শস্য-প্রাচুর্য্যের, শ্রম ও সমৃদ্ধির দেবী। এই উপাসনাই ঘটলক্ষ্মীর প্রতীক, শস্যের ছড়া ভরা ছবি আঁকা ঘটের মাধ্যমে পুঞ্জীভূত পণ্যকে শ্রমের মর্য্যাদার পূজা হিসাবে গণ্য করা আর এই সংগে জড়ান রয়েছে সেই সব ব্রতগানের পৌরাণিক কাহিনীর অনুষ্ঠান। কৌমসমাজের গৃহস্থালীতে ঘটলক্ষ্মী আজও অম্লান ঐতিহ্য হয়ে রয়েছে। শারদীয়া পুর্ণিমাতে কোজাগরী লক্ষ্মীর উপাসনা গোড়ায় কৌমসমাজেরই আরাধ্য কল্পনা ছিল।

বৈদিক নিয়মাবলম্বী আর্য্যগণ যখন পঞ্চনদে আগমন করে বসতি স্থাপন করেন, তখন ও তাহার বহুকাল পরেও পৌণ্ড্রসমাজের সংগে তাঁহাদের কোন যোগাযোগ ছিল না এমন কি বৈদিক সুক্তে গৌড়-বংগ-বিহারের সমাজ বর্ণনা পাওয়া যায়নি। পৌণ্ড্রমাগধি সুক্তে প্রকাশিত গীতবিহার অবশ্য তাঁদের গোচরে এসেছিল। এই পুণ্ড্রজাতি উত্তরবংগের প্রাচীন সমাজের প্রবর্তক।

মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালী বিশ্লেষণ করে নৃতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন পোদ বা পৌণ্ড্র একটি বিশিষ্ট জাতি এমন কি পুণ্ড্রদেশের ব্রাহ্মণের সংগে অপর কোন ঘরানা (উচ্চবংশীয়) ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বাংলার কায়স্থ, সদগোপ, কৈবর্ত ইত্যাদির সংগে সম্বন্ধ অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ এবং আর্য্যজাতির আক্রমণের প্রারম্ভেই বাস্তব ও মহান সভ্যতার অধিকারী ছিল। "খোকা-খুকী" ডাক, গৌড়ীয় জনপদের পাটের শাড়ী সিন্দুর ও পান-হলুদ ব্যবহার, কালি-মনসার ব্রত, সিদ্ধ বালাম চাল, মসলা ইত্যাদি আজও সেই প্রাচীন জনজীবনের স্মৃতি বহন করে চলেছে। জাতিভেদ আর্য্যসমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাঁদের বসবাস করবার প্রভাবেই প্রবর্তন হয়েছিল, এর ফলে বংগ, সুহ্ম, শবর, পুলিন্দ, কিরাত প্রভৃতি আদিম অধিবাসিগণ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হয়েছেন। অল্পসংখ্যক পৌণ্ড্র যে ব্রাহ্মণ বলে পরিগণিত হত তা কাল হরিণের চামড়ার উপবীত (কৃষ্ণসারজিন), শর-উপবীত, কার্পাস ও পরে মসলীন উপবীত ধারণ খালি মাথার ও খালি পা'র বিবরণ থেকে বোঝা যায়। কিন্তু আর্য্য ব্রাহ্মণগণ পৌণ্ড্রসমাজের কন্যা বিবাহের সুযোগ পেতেন। এইরূপ বিবাহের ফলেই আর্যপ্রভাব পূর্বভারতে পরিপুষ্টি লাভ করেছে, আদিম অধিবাসীদের ৯৫% শূদ্র জাতিভুক্ত বা বৌদ্ধ ছিলেন। পুণ্ড্রক এবং কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ বরেন্দ্র, পিরালী, রাঢ়ীয়, বৈদিক, শাকদ্বীপী প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছেন? শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরাই সূর্য প্রতিমা ও সূর্য পূজা ভারতবর্ষে প্রবর্তন করেন।

১০৫৯ শকাব্দের (১১৩৭ খৃষ্টাব্দে) গায়ককবি-গংগাধরের প্রশস্তি অনুসারে ভরদ্বাজমুনি, মগ১ বা শাকদ্বীপী২ (শাকলদ্বীপী) বিপ্রদিগের প্রথমা পারশিকদিগের ধর্মের নামান্তর মাগধর্ম, অতএব বিবেচনা হয় মগ বিপ্রেরা উত্তরকালে পারশিক আর্য্য সকল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। 'শাকদ্বীপ ২' ইহা মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত শাকদ্বীপ নয়। ইহা মহাভারতের মদ্রদেশের আপগা নদী তীরস্থ রাজধানী শাকল। এই শাকল দ্বীপ পাঞ্জাবে আছে।

ভরদ্বাজ মুনির বংশে দামোদর জন্মেছিলেন। শ্রীধর দাস কৃত' সদুক্তিকর্ণামৃত গীতবিতানে দামোদর, চক্রপাণি, দশরথ, গংগাধর, মহীধর ও পুরুষোত্তম এই ছয় জন কবির গৌড়ীয় কির্তনাংগ গান বা কবিতা সংকলিত হয়েছে।

প্রাচীন যুগেও দুর্গাপূজাই পূর্বভারতে প্রধান পর্ব ছিল। উমা অর্থাৎ দুর্গার অর্চনা উপলক্ষে বরেন্দ্র জনপদে বিপুল উৎসব হত, শারদীয়া দুর্গা পূজায় বিজয়া দশমীর দিনে "শাবরোৎসব" নামে এক প্রকার নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান ও প্রচলন ছিল। শবরজাতির ন্যায় কেবল মাত্র তরুপল্লব অংগে পরিধান করে সারা গায়ে চন্দনমাটি মেখে চর্মবাদ্যের ছন্দে ছন্দে জনতার কণ্ঠে উপযোগী একটি বিশিষ্ট প্রথায় ও গতিতে শবরী রাগে তাঁদের গানের প্রচলন ছিল ও তদনুরূপ অংগভংগী প্রকাশ করত। কিংবদন্তী ছিল এইরকম না করলে ভগবতী ক্রুদ্ধা হতে পারেন। সেকালে দেবীই সাধারণ মানুষের মনপ্রাণ অধিকার করে থাকত, তিনিই জনপদের প্রধান, নতুন ফসল তাঁকে নিবেদন না করে কেউই গ্রহণ করতেন না। আষাঢ় নবমীতে শাকম্ভরী দেবীর বার্ষিক উৎসবে জনগণ সংগীতোৎসব করতেন যাহা বর্তমান কালেও বর্ধমান জেলায় মাজিগ্রামে লোক উৎসবের কেন্দ্র ভূমিতে বিরাজিত।

হোলাকা—(বর্তমান যুগের হোলি) একটি প্রধান উৎসব হিসাবে পরিগণিত হত, সেকালের হোলি বা হোলক উৎসব আর চড়ক ধর্মপূজা Analysis করলে অনেক উপাদান রূপায়িত হয় যাহা মূলত আর্য্যপূর্ব আদিম নরগোষ্ঠীদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে ছড়া গানে প্রকাশ পেয়েছিল। একালে সেই ছড়াগানের হদিস আর পাওয়া

যাচ্ছে না, তবে আশা করা যায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ভবিষ্যতে যে সকল পুরাকীর্তি খনন করে আলোকপাত করবেন তাহাতে হয়ত আবার সেকালের গৌড়ীয় বা পুণ্ড্রমাগধী কালচারাল পরিবেশের কথা প্রকাশ করতে ব্রতী হতে পারব। আমার মনে প্রশ্ন আছে প্রাক আর্যযুগে স্বরলিপি কেমন ছিল? ষ্টাফ নোটেশন বা শর্টহ্যাণ্ড নোটেশন কি চন্দ্রকেতুগড় আর তাম্রলিপ্ত নগরে প্রথম প্রচলিত হয়? তক্ষশীলায় গ্রেকোরোমান কালচারের গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় সারা জগতের আকর্ষণীয় কেন্দ্র ছিল—প্রভৃতি। বর্তমান যুগে সংগীতশাস্ত্রজ্ঞগণের অনেকে বলেন' যা বহুল প্রচলিত মতে পরিণত হতে চলেছে "গানের দ্বারা সকলকে সর্ব সংকীর্ণ বন্ধন হইতে মুক্ত অর্থাৎ ত্রাণ করে বলিয়াই গানের নাম গায়ত্রী। তাই সর্বজীব এই ত্রাণরূপ মুক্তিরূপ গান অর্থাৎ গায়ত্রীকে গান করে" এই প্রসংগে প্রশ্ন হচ্ছে এই গায়ত্রী গানে' আদি গান কোনটি? এবং কতকাল আগে তা প্রবর্তন হয়েছে? আমার কাছে এই প্রশ্ন আসাতে আমার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব হয়নি তবে পৌণ্ড্র-মাগধী ভাষায় বৌদ্ধযুগের শ্রমণ-ব্রাহ্মণের কিছু গায়ত্রীগান সংগ্রহ আমার সংকলনে নথিবদ্ধ করেছি। যথাসময়ে এই প্রসংগে আলোচনা করবার ও পাঠক সমাজের কাছে নিবেদন করবার ইচ্ছা রইল।

শিক্ষণীয় বিষয় চর্চার দ্বারা লব্ধ জ্ঞানে গৌড়বাসিগণের অনুরাগের সন্ধান অনেক প্রাচীন পুঁথিতেই পাওয়া যায়। গৌড়ীয়গণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপক হিসাবে বিদ্যাভ্যাসে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এবং ভারতবর্ষের বাইরেও পরিক্রমণ করতেন। আর দুঃস্থ লোকদের দুঃখের জীবনে একমাত্র আনন্দ ছিল জনপদের অবস্থাপন্ন লোকজনের আবাসে কণ্ঠস্বরসাধন শ্রবণ ও সমবেতস্বরনিবেদন, সমাজের নানান আদিম কৌমগত যৌথ নাচ-গান আর উপাসনা। চর্যাগীতির অনেক গীতে গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র ও প্রার্থনা প্রকাশ প্রাপ্ত হয়ে রয়েছে। যে সব পাহাড়ী অঞ্চলে শবর-শবরী সমাজের বসবাস ছিল তাঁহাদের উপাসনা গানেও সমাজচিত্র পাওয়া যায়। নাগরিক সমাজের উঁচু কোঠার মেয়েরা নানাপ্রকার কলাবিদ্যাতে ও অধ্যয়নে বিশেষ করে নাচ-গানে তাঁরা পারদর্শিতায় রীতিমত কুশলী ছিলেন। সেকালে অবশ্য প্রথমে দুইস্বর ও পরে বৌদ্ধ, জৈন শ্লোকে ও স্তোত্রে তিন স্বরেই স্বরসাধন করা হত। উত্তর পশ্চিম ভারতে যখন ভারতের বাহির হতে আর্য রাজনৈতিক দলের আগমন হয় তখন তাঁহারা ঋগ্বেদ সংকলন করেন। এই গবেষণাগ্রন্থের পাঠ বলিতে সামগানকেই বুঝি। স্বরের সৃষ্টি ও গতি একটি হইতে ক্রমশঃ বা আর কয়েকটির ক্রমবিকাশের কি করে প্রবর্তন হয়েছে এ সম্বন্ধে বিজ্ঞ সমাজের মতামতও বিশদভাবে পরে চিত্রিত করব।

সেকালেও সংকীর্তনের প্রয়োগ জনসেবায় ও জ্ঞানবিস্তারে প্রধান সহায় হিসাবে শান্তিরক্ষার অংগ ছিল এবং সংকীর্তনের বাণীগুলিকে চর্যাপদ বলা হত। লোক সংগীত পর্যায়ের যে কোন ঢং-এর প্রভাব যাই হোক না কেন, এই সকল চর্যাপদের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় ছিল একথা আজকাল আমাদের জানবার উপায় ও সংগীত শাস্ত্র থেকে গবেষকগণ নিবেদন করছেন। চর্যাগীতি সকল গউড়া, মালশীগউড়া, শবরী, মল্লারী, অরু, গুঞ্জরী, কহ্নু, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, বংগাল, বড়ারী ইত্যাদি রাগাদি এবং ইন্দ্রতাল ছন্দে গাওয়া হত। এই সংগে নানাপ্রকার বীণাবাদন ও সামের এক প্রধান অংগরূপে পরিচিত ছিল, এই সকল বাদ্যযন্ত্রে তখনকার তন্ত্রকার সমাজ চর্যা অধ্যয়নে উদাত্ত এবং অনুদাত্ত স্বরিত (মোট) স্বরলহরীর অনুসরণ ও উপাসনে মনোনিবেশ করতেন লোচন মুদিত রেখে।

মধ্যযুগে এই সকল প্রণালী থেকেই ব্রতচারী, মণিপুরী, ছৌ, গাজন, লেপচা, রণ, পুতুলনাচ প্রভৃতি এবং চারণগীতি, শাক্ত-বাউল-মনসা-মংগলের গান প্রবর্তন হয়েছে। তবে মনসামঙ্গলের ঘটনা নন্দবংশের রাজত্বকালের পূর্বের ঘটনা। সেকালে জনগণের অর্থের অভাব ছিল না, পররাষ্ট্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান প্রদান হত। মুদ্রার নাম ছিল তাম্রপণ, কথায় ছিল ছন্দ আর ছিল পাষাণ শিলায় অংকিত আমাদের কালচার। বর্তমান কালে এমন মূর্তি অনেক মিউজিয়ামে রক্ষিত হয়েছে যাহা থেকে সেকালের গানবাজনার অনেক কিছুর আভাষ মিশ্রিতভাবে অনুমান করা যেতে পারে। এ ছাড়া বর্ধমানের মাজিগ্রামের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আছে নৃত্যরত হস্তিমূর্তির পৃষ্ঠপটের পরিচিত অলংকরণ; আকাশপথে ধাবমান বংশীবাদনরত গন্ধর্বযুগল ইত্যাদি।

আমার কথা (৮৩)

নৃত্যশিল্পী—নরনারায়ণ

১৯৪১ সনের কথা। আমি সে সময় বম্বেস্থানে নৃত্যকলা শিক্ষা করিতেছিলাম। ঐ সময় জাভার নৃত্যবিদ নটরাজ বসিরের কাছে আমি নৃত্যকলা শিক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু মনে মনে অনুভব করিতাম নৃত্যকলা শিক্ষার দ্বারা মানব জীবনে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু কি পাওয়া যাইতে পারে, তাহা আমাকে শিক্ষা করিতে হইবে। এই বিষয় সর্বদাই চিন্তা করিতাম। ক্রমশঃ মন আকুল হইতে লাগিল। নৃত্যকলা কি মানব জীবনে একটা শুধু আনন্দ বিতরণ ও রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠানের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন—আর কিছু কি নাই?

একদিন আমার এক বন্ধুকে আমার মনের কথা খুলিয়া বলিলাম, শুধু কি নাচ শিক্ষা করিয়া আনন্দ বিতরণ করাই আমাদের নৃত্যকলার লক্ষ্যবস্তু—আর কিছু নাই! বন্ধুটি আমার কথা শুনিল এবং একটু চিন্তা করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, এক কাজ কর—চল জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে যাই। সেখানে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আছেন। চল, সেখানে তোমাকে নিয়ে যাই। তিনি তোমার মনের কথা বলে দিতে পারবেন। তাঁর মতন দরদী শিল্পী মানুষ পাওয়া খুব ভার। তুমি আজই চল। আমি বন্ধুর কথায় সম্মত হইলাম।

সকালবেলা। আমার বন্ধুটির সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। প্রকাণ্ড একটি হলঘর। বন্ধুটি বলিল, এ ঘরটিতে সঙ্গীত ও বিচিত্রানুষ্ঠান হইয়া থাকে।

আমরা হলঘর পার হইয়া দক্ষিণ দিকে একটি খোলা ঘরে উপস্থিত হইলাম। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তিনি এই ঘরটিতেই বসিয়াছিলেন এবং কতকগুলি নারিকেলের খুলি, শুকনা গাছের ডাল ও শিকড় দিয়া একমনে বহু ভাবময় নক্সা তৈয়ার করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার কাছে গিয়া পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিলাম। ঠাকুর বন্ধুটির দিকে চাহিয়া বলিলেন—কেমন আছ? বাড়ীর সকল ভাল? সমস্তের কুশল জানাইয়া তারপর বন্ধুটি বলিল, আপনার শরীর কেমন আছে?

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন, গাছ তো বুড়ো হয়েছে—তার আর ভাল মন্দ কি! তারপর কি মনে করে—

আমার বন্ধুটি ঠাকুরের এক আত্মীয়ের পুত্র।

আমার দিকে চাহিয়া ঠাকুর বলিলেন, এ ছেলেটি কে?

বন্ধুটি একটু হাসিয়া বলিল, এ নাচ শিখছে। আপনার একটু আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ ও চায়।

তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, এ তো ভাল কথা। কি নাচ তুমি জানো?

আমি ঠাকুরকে জানাইলাম—জাভার নৃত্যবিদ নটরাজ বসিরের কাছে নাচ শিখছি। কিন্তু আপনার কাছ থেকে কিছু উপদেশ চাই এই নাচের বিষয়।

তিনি বলিলেন, একদিন নাচ দেখাও দেখি, কি শিখেছ।

তাঁর কথায় খুসী হইয়া বলিলাম, এতো আমার সৌভাগ্য—আপনি নাচ দেখবেন। আমি খুব ভালো জানি না।

তিনি বললেন, যা জানো তাই দেখাবে। তারপর তোমায় কি করতে হবে বলে দেব।

একদিন ঠাকুরের কাছে আসিয়া আমার কল্পিত একলব্যের গুরুদক্ষিণা নৃত্যটি দেখাইলাম। তিনি আমার নাচ দেখিয়া খুসী হইলেন। তারপর নৃত্যকলা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলেন। নৃত্যকলা সম্বন্ধে যে কয়টি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছিলেন তাহার কিছু এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম।

তিনি বলিয়াছিলেন, নৃত্যকলা এদেশে একটা প্রধান শিল্প কলা। কিন্তু নৃত্যশিল্পী নৃত্যকে সম্পূর্ণ কল্পনার দৃষ্টিতে চিন্তা করে কিনা এ দেখতে হবে।

ভাবের মধ্যে সুন্দরের সাধনা করাই শিল্পীর জীবনের সার্থকতা ও আনন্দ। সেই সাধনায় মানুষ পায় তাহার জীবনের মধ্যে নূতন রূপের প্রেরণা। সেই তো শিল্পীর সৃষ্টি। সেই সৃষ্টিতে দেশের মানুষ অপর দেশের মানুষকে ভাবের অভিব্যক্তির দ্বারা ভালবাসতে পারে। আকার ইংগীতের দ্বারা মানুষকে মানুষের মনের কথা জানাতে হলে চাই—দেহ, হস্ত, মুখ ভঙ্গিমা। যে কোন কথা বলতে হলে এখনও আমরা হাত নেড়ে বিশ্লেষণ করে দেখাই। ইহাও তাই একটা রূপক মাত্র। সেই রূপককে নূতন করে সাজিয়ে দেন শিল্পী তার কল্পনার চোখে, সর্বপ্রাণী পায় তার আস্বাদন, আনন্দ ও শিক্ষা। অজানা সৃষ্টিকে শিল্পী রূপ দান করে মানস কল্পনার দ্বারা। তাতে জগতের মানুষ পায় আনন্দ, ভালবাসা ও শান্তি। শিল্পীর জীবনে ইহাই হবে প্রধান কর্ত্তব্য।

তোমার নৃত্যের রূপকে ফুটিয়ে তুলতে হলে তোমার কল্পনাকে আগে জাগিয়ে তোল। দেখবে সেই অন্তরের মানসপট হতে শত শত ভাব নৃত্যমূর্ত্তি তোমার চোখে ধরা দিচ্ছে। ঐ তো তোমার আসল নৃত্যের সৃষ্টি। ভাব, রস ও রূপ নিয়ে একাগ্র ভাবে সাধনা করে চলতে থাকো দেখবে, বাইরের নৃত্যের বর্ণনা আর দেওয়া দরকার হবে না। বাইরে একটা বাঁধাধরা শিক্ষা নিয়ে কতটুকু শিখতে পারবে। গুরু হয়তো একজন দরকার। তা শুধু পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথের মনের আসল কথা কেউ জানতো না, জানতে চেষ্টা করতুম। কিন্তু যত চেষ্টা করতুম, খেই হারিয়ে ফেলতুম। ভাবের সমুদ্র পার পেতুম না। তাই ঘরে ফিরে এসে ছবি আঁকতে বসতুম।

নৃত্যকলা খুব ভাল জিনিস—তাই বলি সাধনা কর। বাইরে ঘুরে কি হবে। বাইরে ঘুরে জানবার চেষ্টাতে খুব লাভ হয় না। মন দিয়ে সাধনা করে যেও। আনন্দ পাবে।

আমরা ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ নিয়ে চলে এলাম। ঐদিন তাই আমি বুঝলাম—বাহিরের আবরণটা দিয়ে এতদিন আমার সত্যকারের সাধনা হয় নাই। নৃত্য প্রদর্শনীর দ্বারা নিজের অহঙ্কারই আনয়ন করেছিলাম।

পুরাতন বাঙলা গান

ওরে সুরাপান করিনে আমি,
সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
মন-মাতালে মাতাল করে,
মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরু-দত্ত গুড় ল'য়ে, প্রবৃত্তি-মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান-শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটী,
পান করে মোর মন-মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি ব'লে তারা, মা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা
খেলে' চতুর্ব্বর্গ মেলে।

—রামপ্রসাদ সেন

প্রথম টেষ্টে ভারতের শোচনীয় পরাজয়

বিজয় গৌরবের জয়ধ্বনির রেশ ভারতের আকাশে তখনও বিচিত্র অনুভূতি জাগাচ্ছে। আর সেই গৌরবের মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট দল পাড়ি দিল সুদূর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে নূতন অভিযানে। ভারতবাসীমাত্রই উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল ভারতীয় নওজোয়ানদের আর এক কৃতিত্ব প্রত্যক্ষ করবার আশায়।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেষ্ট খেলা শেষ হয়েছে। প্রশ্ন, ভারতীয় তরুণরা কি ভারতবাসীর সাগ্রহ ঔৎসুক্যের যথাযোগ্য প্রতিদান দিতে সমর্থ হয়েছেন ?

তুইদিনব্যাপী একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলা ও চারদিনব্যাপী একটা প্রথম শ্রেণীর খেলা শেষ করে ভারতীয় দল পোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভালে যখন প্রথম টেষ্ট খেলার জন্যে পৌছল, তখন ভারতীয় তাঁবু রীতিমত হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। খুব অল্পসংখ্যক খেলোয়াড়ই সম্পূর্ণ সুস্থ। বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ই কোন না কোন কারণে অসুস্থ।

শেষ পর্য্যন্ত জয়সীমা ও পতৌদির নবাবের মত তুই পরম নির্ভর-যোগ্য খেলোয়াড় ছাড়াই জোড়াতালি দিয়ে ভারতীয় দল মাঠে নামল।

টসে জয়লাভ ক'রে নরী কন্ট্রাক্টর প্রথম ব্যাটিং-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সকলে উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল এই তরুণ শক্তিশালী ভারতীয় দল হল, ওয়াটসন ও স্টেয়ার্সের মত প্রকৃত "ফার্স্ট" বোলারদের বিরুদ্ধে কি রকম খেলে দেখবার জন্যে। কিন্তু হা হতোস্মি! ভারতীয় ব্যাটিং শক্তি শোচনীয় ব্যর্থতা প্রকাশ করে শেষ পর্য্যন্ত মোটামুটি একটা রাণ সংখ্যা জোগাড় করল ২০৩; অল্প রাণে তিনজন ফাস্ট বোলার ৬টি উইকেট পেলেন। শেষের দিকে ডুরাণী ও সুর্তি কিছুটা দৃঢ়তা প্রদর্শন করায় তবু যা হোক এই মাঝামাঝি রাণ জোগাড় হয়েছিল। তা না হলে অবস্থাটা দ্বিতীয় ইনিংসের মতই হতো।

কিন্তু ভারত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে দ্বিতীয় দিনের শেষে খেলার গতি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মাত্র ১৪৮ রাণে ৬টি উইকেটের পতন ঘটেছিল। ভারতীয় বোলার বিশেষ করে ডুরাণীর সংহার মূর্তির সামনে কোন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ব্যাটসম্যানই দাঁড়াতে পারেননি। ত্রুটিহীন ভারতীয় ফিল্ডিংও দর্শক মণ্ডলীকে তাক লাগিয়ে দেয়।

কিন্তু এই খেলায় যে খেলোয়াড়টির যোগদানের কোন রকম সম্ভাবনই ছিল না সেই আহত জ্যাকি হেণ্ড্রিক্স হাসপাতাল থেকে ব্যাট হাতে উঠে এসে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে নিশ্চিত পতনের হাত থেকে শুধু বাঁচিয়েই গেলেন না জয়ী হ'তেও সাহায্য ক'রে গেলেন। সাবাস হেণ্ড্রিক্স। তাঁর ৬৪ রাণ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজবাসীরা দীর্ঘ দিন মনে রাখবে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল ২৮৯ রাণে। ৮৬ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এগিয়ে রইল।

ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে প্রাথমিক ব্যর্থতার শোচনীয় পুনরাবৃত্তিই প্রকাশ করলো। হল আর সোবার্সের ধারালো অস্ত্রে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা কচু কাটা হ'ল। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'ল ৯৮ রাণে। হল ১১ রাণে ৩ উই: আর সোবার্স ২২ রাণে ৪ উই: লাভ করলেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ব্যাট করতে নেমে কোন উইকেট না হারিয়ে প্রয়োজনীয় রাণ সংগ্রহ করায় ১০ উইকেটে জয়লাভ করল।

প্রশ্ন, ভারতীয় দলের ব্যর্থতা কি ফার্স্ট বোলারের বিরুদ্ধে শুধু? তাহলে সোবার্সের সর্বাধিক উইকেট প্রাপ্তি? এর কোন সদুত্তর কি ভারতীয় দলের কাছে পাওয়া যাবে?

আমরা আশাবাদী, বিশ্বের ক্রিকেট ইতিহাসে সফরকারী দলের প্রথম টেষ্টে ব্যর্থতার ভুরি ভুরি নজীর আছে এবং পরবর্তী টেষ্টগুলিতে দেখা গেছে তাদের বিপুল সাফল্য। আমরা আশা করবো, কল্পিত 'হল-ভীতি' কাটিয়ে নিজেদের ব্যাটিংএর ত্রুটি সংশোধন করে ভারতীয় দল পরবর্তী টেষ্ট খেলাগুলিতে ভাল খেলবে এবং সাফল্য অর্জন করবে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর :—ভারত—১ম ইনিংস ২০৩ (ডুরাণী ৫৬, সুর্তি ৫৭; ষ্টেয়ার্স ৬৫ রাণে ৩ উই:, সোবার্স ২৮ রাণে ২ উই:)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস—২৮৯ (হাণ্ট ৫৮, সোবার্স ৪০, সলোমন ৪৩, হেণ্ড্রিক্স ৬৪, হল নট আউট ৩৭; ডুরাণী ৮২ রাণে ৪ উই:, দেশাই ৪৬ রাণে ২ উই:, উম্রীগড় ১১ রাণে ২ উই:, বোড়ে ৬৫ রাণে ২ উই:)।

ভারত—২য় ইনিংস—৯৮ (বোড়ে ২৭, হল ১১ রাণে ৩ উই:, সোবার্স ২২ রাণে ৪ উই:)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—২য় ইনিংস কোন উইকেট না হারিয়ে ১৩ রাণ।

জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি

জব্বলপুরে চারদিনব্যাপী বিংশতম জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষ হল। বিভিন্ন প্রদেশের এ্যাথলীটরা সারা বছর ধরে অনেক আশা ভরসা নিয়ে উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন এই অনুষ্ঠানটির জন্যে। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি এবারের অনুষ্ঠান এ্যাথলীটদের কাছে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে এর অব্যবস্থার জন্যে। দেখা গেল এত বড় একটা সমাবেশের আয়োজন সম্বন্ধে স্থানীয় উত্তোক্তাদের যথেষ্ট কল্পনার অভাব রয়েছে। ফলে বিভিন্ন প্রতিযোগীকে বেশ কিছু অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে যা তাদের ভাল ফল প্রদর্শন করার

একান্ত পরিপন্থী। ভবিষ্যতে মূল উদ্যোক্তরা এ বিষয়ে সুবিবেচনার পরিচয় দিলে এবং স্থান নির্বাচনে একটু বিজ্ঞতা দেখালে আমরা বাধিত হব।

এবারের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে এ্যাথলীটদের মধ্যে খুব একটা উন্নত মানের পরিচয় পাওয়া যায়নি। মাত্র ১২টি রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বালক বিভাগে ৭টি, পুরুষ বিভাগে ৪টি ও বালিকা বিভাগে ১টি। নিম্নে বিভিন্ন রেকর্ডের খতিয়ান দেওয়া হ'ল।

পুরুষ বিভাগ

লৌহবল নিক্ষেপ :—ফাইন্যাল—দীনশা ইরাণী (মহারাষ্ট্র); দূরত্ব ৫০ ফুট ৮½ ইঞ্চি (নূতন রেকর্ড)। পূর্ব রেকর্ড ইরাণী ৫০ ফুট ৪ ইঞ্চি।

১৫০০ মিটার দৌড় :—ফাইন্যাল—মহীন্দার সিং (সার্ভিসেস); সময়—৫১'৩ সে: (নূতন রেকর্ড)। পূর্ব রেকর্ড—মহীন্দার সিং ৫২' ৬ সে:।

৪×১০০ মিটার রীলে :—ফাইন্যাল—মহারাষ্ট্র; সময় ৪১'৯ সে: (নূতন রেকর্ড)। পূর্ব রেকর্ড ৪২'১ সে:।

ডেকাথলন :—ফাইন্যাল—গুরুবচন সিং (দিল্লী) ৬৭৬৭ পয়েন্ট (নূতন রেকর্ড)।

৪×১০০ মিটার রীলে :—ফাইন্যাল—উত্তর প্রদেশ; সময়—৪৫'৮ সে: (নূতন রেকর্ড)। নিজ পূর্ব রেকর্ড—৪৫'১ সে:।

৪০০ মিটার দৌড় :—ফাইন্যাল—সংগ্রাম সিং (সার্ভিসেস); সময়—৫১'৫ সে: (নূতন রেকর্ড) পূর্ব রেকর্ড রাজন (কেরালা)—৫২'১ সে:।

বালক বিভাগ

দীর্ঘ লম্ফন ফাইন্যাল :—কে, পি, লাম্বা (মহীশূর); দূরত্ব—২৩ ফুট ২½ ইঞ্চি। পূর্ব রেকর্ড ২১ ফুট ১¾ ইঞ্চি।

লৌহবল নিক্ষেপ ফাইন্যাল—গুরমেদ সিং (রাজস্থান); দূরত্ব ৪৮ ফুট ১ ইঞ্চি। পাঞ্জাবের সাধু সিং প্রতিষ্ঠিত পূর্ব রেকর্ড ৪১ ফুট ৬½ ইঞ্চি।

হপ ষ্টেপ এণ্ড জাম্প :—ফাইন্যাল—কে, পি, লাম্বা (মহীশূর); দূরত্ব ৪৪ ফুট ৬¾ ইঞ্চি। নিজ পূর্ব রেকর্ড—৪৬ ফুট।

ডিসকাস ছোড়া :—ফাইন্যাল—গুরমেদ সিং (রাজস্থান); দূরত্ব ১৭০ ফুট ১১ ইঞ্চি। পূর্ব রেকর্ড—প্রীতম সিং (পাঞ্জাব) ১৪০ ফুট ৬ ইঞ্চি।

উচ্চ লম্ফন :—ফাইন্যাল—কে, পি, লাম্বা (মহীশূর); উচ্চতা—৫ ফুট ১১ ইঞ্চি (নূতন রেকর্ড)। পূর্ব রেকর্ড—লাম্বা ও এস, নাগ (বাঙ্গলা) ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি।

বালিকা বিভাগ

লৌহবল নিক্ষেপ ফাইন্যাল—ক্রিষ্টাইন ফোরেজ (মহারাষ্ট্র); দূরত্ব ২৯ ফুট ৬¾ ইঞ্চি।

এশীয় টেনিসে এমার্সনের সাফল্য

সম্প্রতি কলকাতার সাউথ ক্লাব লনে এশীয় টেনিস প্রতিযোগিতা শেষ হ'ল। এই উপলক্ষে বহু বিদেশী খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের সমাবেশ হয়েছিল কলকাতায়।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্যালে গুণীজন স্বীকৃত বর্তমান টেনিসের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় অষ্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন ভারতের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় রমানাথ কৃষ্ণানকে ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত করে সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসার অধিকারী হন।

উইম্বেলডনের কোয়ার্টার ফাইন্যালে এই কৃষ্ণানের কাছেই এমার্সন ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত হন। সেই কথা স্মরণ ক'রে এবং এমার্সনের প্রতিভা হিসাব ক'রে এইদিন বিশেষ দর্শকের সমাবেশ ঘটে উচ্চমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা দেখার আশায়। কিন্তু এইদিন সকলেই হতাশ হন এবং সে হতাশার কারণ ভারতের কৃষ্ণান।

এমার্সনের সমস্ত কোর্ট জুড়ে "পাওয়ার টেনিস" খেলার কাছে; তাঁর সুতীব্র সার্ভিস, ভলি মার এবং সুন্দর "প্লেসিং সর্টের" সামনে কৃষ্ণান প্রায় কোন সময় দাঁড়াতে পারেননি। শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণান ৭-৫, ৬-৪, ও ৬-৩ সেটে পরাজিত হন।

পূর্বদিন পুরুষদের ডাবলসের ফাইন্যালেও ভারতীয় খেলোয়াড়রা পরাজিত হন। অষ্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন ও ফ্রেড ষ্টোলের জুটি ভারতের নরেশকুমার ও কৃষ্ণানকে ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত করেন। একমাত্র শেষ সেটটিতেই কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। এই সেটে অষ্ট্রেলিয়ান জুটি ৯-৭ গেমে ভারতীয় জুটিকে পরাজিত করেন। এইদিন সর্বাপেক্ষা নিরাশ হতে হয় কৃষ্ণানের খেলা দেখে। তাঁকে এইদিন সারাক্ষণ বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করতে দেখা যায়। নরেশকুমার সে তুলনায় যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখান। শেষ পর্য্যন্ত এমার্সন ও ফ্রেড ষ্টোলে ৬-৩, ৬-২, ও ৯-৭ সেটে কৃষ্ণান ও নরেশকুমারকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন অষ্ট্রেলিয়ারই দুই প্রতিযোগিনী। মিস এল টার্ণার ৬-৩ ও ৬-২ সেটে মিস স্যাচকে পরাজিত করেন। অন্যান্য বিভাগেও অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দেরই বিজয়ীর গৌরব অধিকার করতে দেখা যায়।

এক কথায় এবারের এশীয় টেনিস প্রতিযোগিতার সব বিভাগই অষ্ট্রেলিয়ার জয় জয়কারে মুখর হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন বিভাগের ফলাফল নিম্নে দেওয়া হল :—

পুরুষদের সিঙ্গলস

রয় এমার্সন (অষ্ট্রেলিয়া) ৭-৫, ৬-৪ ও ৬-৩ সেটে রমানাথ কৃষ্ণানকে (ভারত) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস

রয় এমার্সন ও ফ্রেড ষ্টোলি (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-২ ও ৯-৭ সেটে আর কৃষ্ণান ও নরেশকুমারকে (ভারত) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস

মিস এল টার্ণার (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-২ সেটে মিস স্যাচকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস

মিস, এল টার্ণার ও মিস এম, স্যাচ (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-১ সেটে মিস পি, বালিং (ডেনমার্ক) ও মিস আপ্লিয়াকে (ভারত) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস

ফ্রেড ষ্টোলে ও মিস টার্ণার (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-১, ৩-৬ ও ৬-১ সেটে রয় এমার্সন ও মিস স্যাচকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ক্রীড়াকৌশলীদিগকে পুরস্কার দানের ব্যবস্থা

জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টিতে ক্রীড়াঙ্গনের অবদান অনাদিকাল হ'তে বিশেষ ভাবে স্বীকৃত। বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন পুরস্কারে এই অঙ্গনের চরিত্রদের উৎসাহিত ক'রে সমাজ-জীবন ও জাতীয় জীবনের সুস্থ সুন্দর উন্নত ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলার প্রয়াস দেখা যায় যুগ যুগ ধরে। এবং তা জন-হৃদয়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও সমর্থনও লাভ করে।

এ রকমই এক আনন্দ সংবাদ সেদিন পাওয়া গেল ভারত সরকারের কাছ হ'তে। সংবাদটি এই রকম।

ভারত সরকার নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের সুপারিশ অনুসারে 'অর্জুন পুরস্কার' নামে বিশেষ পুরস্কার দিয়া ১৯৬১ সালের ক্রীড়া-কৌশলীদিগকে সম্মানিত করার এক পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে সমর্থন করিয়াছেন। মহাভারতখ্যাত ধনুর্বিদ্যাবিদ মহাবীর অর্জুনের নাম অনুসারে এই পুরস্কারের নামকরণ হইয়াছে।

আগামী ১৪ই মার্চ (১৯৬২) রাষ্ট্রপতি ভবনে এক বিশেষ সম্বর্ধনা সভায় ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াকুশলীদিগকে এই পুরস্কার দিবেন।

এই সম্মানদানের জন্য শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াকুশলী নির্বাচনের ভার সম্পূর্ণ ভাবে সংশ্লিষ্ট স্পোর্টস্ ফেডারেশনের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভারত সরকার আগামী ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই মার্চ ক্রীড়াবিদ কংগ্রেসেরও আয়োজন করিতেছেন। সে সময় এদেশের ক্রীড়ার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করা হইবে।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, এ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্য হতে ২০জন শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া-কুশলীকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

ভারতবাসীমাত্রই ভারত সরকারের এ প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ জানাবে। তবে অনুরোধ ক্রীড়াকৌশলী নির্বাচনের ব্যাপারটা যেন যোগ্যতার মাপকাঠি অনুযায়ী হয় এবং তা যেন নিরপেক্ষ হয়। আর একটা কথা, খেলাধূলার যে সমস্ত বিভাগ এই পুরস্কারের আওতায় পড়ল না, তাদের জন্যেও যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন সরকার।

টোকিও অলিম্পিকের এ্যাথলেটিক্সের কর্ম্মসূচী

১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে টোকিওতে পরবর্ত্তী অলিম্পিক অনুষ্ঠান হবে। এখন থেকেই সেখানে রীতিমত তোড়জোড় সুরু হয়ে গেছে। জাপান ট্র্যাক এ্যাণ্ড ফিল্ড ফেডারেশন এ্যাথলেটিক্সের কর্ম্মসূচীর একটা খসড়া প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিক কমিটিতে প্রেরণ করেছে। ইহার একটা অনুলিপি জাপান অলিম্পিক অর্গানাইজিং কমিটির কাছে পাঠান হয়েছে। খসড়া কর্ম্মসূচী অনুসারে ১৫ই অক্টোবর থেকে এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে ২২শে অক্টোবর পরিসমাপ্তি হবে। নিম্নে খসড়াসূচী প্রদত্ত হ'লো :—

১৫ই অক্টোবর—পুরুষ বিভাগ—১০০ মিটার দৌড় (হিটস), ৮০০ মিটার দৌড় (হিটস), ১০,০০০ মিটার দৌড় (ফাইন্যাল), ৪০০ মিটার হার্ডলস (হিটস), ৮০ মিটার হার্ডলস (হিটস ও সেমি-ফাইন্যাল), দীর্ঘ লম্ফন (হিটস ও ফাইন্যাল), সট পাট (হিটস ও ফাইন্যাল)। মহিলা বিভাগ—ডিসকাস নিক্ষেপ (হিটস ও ফাইন্যাল)।

১৬ই অক্টোবর—পুরুষ বিভাগ—১০০ মিটার দৌড় (সেমি-ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল), মধ্য দূরত্ব হার্ডলস (সেমি-ফাইন্যাল), পোল ভল্ট (হিটস) ২০,০০০ মিটার ভ্রমণ। মহিলা বিভাগ—৮০ মিটার হার্ডলস (ফাইন্যাল), বর্শা নিক্ষেপ (ফাইন্যাল)।

১৭ই অক্টোবর—পুরুষ বিভাগ—২০০ মিটার দৌড় (হিটস), ৮০০ মিটার দৌড় (ফাইন্যাল), ৫,০০০ মিটার দৌড় (হিটস), ৪০০ মিটার হার্ডলস (ফাইন্যাল), দীর্ঘ লম্ফন (হিটস ও ফাইন্যাল)। ডিসকাস নিক্ষেপ (হিটস ও ফাইন্যাল) মহিলা বিভাগ—১০০ মিটার দৌড় (সেমি-ফাইন্যাল), ৪০০ মিটার দৌড় (সেমি-ফাইন্যাল), পেণ্টাথলন (সট পাট, উচ্চ লম্ফন ও হার্ডলস)।

১৮ই অক্টোবর—পুরুষ বিভাগ—২০০ মিটার দৌড় (সেমি-ফাইন্যাল), ৪০০ মিটার দৌড় (হিটস), ৩,০০০ মিটার ষ্টিপলচেজ (ফাইন্যাল), পোল-ভল্ট (ফাইন্যাল), হামার নিক্ষেপ (হিটস)। মহিলা বিভাগ—৪০০ মিটার দৌড় (ফাইন্যাল), দীর্ঘ লম্ফন (হিটস ও ফাইন্যাল), পেণ্টাথলন (দীর্ঘ লম্ফন ও ২০০ মিটার দৌড়)।

১৯শে অক্টোবর পুরুষ বিভাগ—৪০০ মিটার দৌড় (সেমি-ফাইন্যাল), ৫,০০০ মিটার দৌড় (হিটস ও ফাইন্যাল), ১১০ মিটার হার্ডলস (সেমি-ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল), হপ ষ্টেপ জ্যাম্প (হিটস ও ফাইন্যাল), হামার নিক্ষেপ (ফাইন্যাল)। মহিলা বিভাগ—২০০ মিটার দৌড় (হিটস), ৮০০ মিটার (হিটস)।

২০শে ফেব্রুয়ারী পুরুষ বিভাগ—৪০০ মিটার দৌড় (ফাইন্যাল), ১,৫০০ মিটার দৌড় (হিটস), বর্শা নিক্ষেপ (ফাইন্যাল), ডেকাথলন (১০০ মিটার দৌড়, সট পাট উচ্চ লম্ফন ও ৪০০ মিটার দৌড়)। মহিলা বিভাগ—২০০ মিটার দৌড় (ফাইন্যাল), ৮০০ মিটার দৌড় (সেমি-ফাইন্যাল)।

২১শে অক্টোবর পুরুষ বিভাগ—১০০ × ৪ মিটার রিলে (হিটস), ৪০০ × ৪ মিটার রিলে (হিটস), ৫০,০০০ মিটার ভ্রমণ (ফাইন্যাল), ডেকাথলন (হাই হার্ডলস, ডিসকাস নিক্ষেপ, পোল ভল্ট, বর্শা নিক্ষেপ ১,৫০০ মিটার দৌড়)। মহিলা বিভাগ—৮০০ মিটার দৌড় (ফাইন্যাল), ১০০ × ৪ মিটার রিলে (হিটস), উচ্চ লম্ফন (হিটস), সট পাট (হিটস ও ফাইন্যাল)।

২২শে অক্টোবর পুরুষ বিভাগ—১,৫০০ মিটার দৌড় (ফাইন্যাল), ১০০ × ৪ মিটার রিলে (সেমি-ফাইন্যাল), ফাইন্যাল), ৪০০ × ৪ মিটার রিলে ফাইন্যাল ও ম্যারাথন রেস। মহিলা বিভাগ—৪০০ × ৪ মিটার রিলে (ফাইন্যাল), উচ্চ লম্ফন (ফাইন্যাল)।

হৃদয়ের উচ্চাসনে বসি অভিলাষ
মানবদিগকে লয়ে ক্রীড়া কর তুমি
কাহারে বা তুলে দাও সিদ্ধির সোপানে
কারে ফেল নৈরাশ্যের নিষ্ঠুর কবলে

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধারাবাহিক আত্ম-জীবনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পরিমল গোস্বামী

(৮)

চিঠির ভাণ্ডার খুলতে গিয়ে এলোমেলো ভাবে অনেক চিঠি সামনে ছড়িয়ে পড়ল। ত্রিশ বছর আগের (১৯৩১) গিরিজা মুখুজ্জের চিঠির কথা বলেছি। এই সঙ্গে আরও আগের একখানা বিগত যুগের ছাপমারা পোষ্টকার্ডের সংক্ষিপ্ত দুটো কথা বলতে ইচ্ছা হল। এই পোষ্টকার্ডে ১৯০৬ সালের ছাপ আছে সপ্তম এডোয়ার্ডের কানের উপর। ভিতরে তারিখ নেই, বাইরের ছাপের তারিখ ১০ এপ্রিল ০৬ পত্র লেখক শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বালিগঞ্জ, রবিবার। আমার পিতাকে লেখা।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া আপ্যায়িত হইলাম। এবার হইতে ভারতীর [লে]খক স্বরূপ আপনার নিকট ভারতী বিনা মূল্যে যাইবে।

নূতন গ্রাহকের জন্য ধন্যবাদ জানিবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় [১০-৪-০৬]

এ চিঠিখানা উল্লেখযোগ্য মাত্র একটি কারণে যে, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উত্তর পুরুষের সঙ্গে আমার পিতা বিহারীলাল গোস্বামীর উত্তর পুরুষের পরিচয় ঘটেছে কিছু বিপরীত ভাবে। অর্থাৎ অতঃপর আমি সম্পাদকরূপে শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা একাধিকবার ছেপেছি, এবং এই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে।

এর পরের দুখানা চিঠি—শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর লেখা। তিনি আমার কাছে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন এই যে, কৃষ্ণনগরের অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মিলনে তিনি কথাসাহিত্য বিভাগের সভানেত্রী রূপে যে অভিভাষণটি লিখবেন তার উপকরণ যেন আমি সংগ্রহ ক'রে দিই। এই প্রস্তাবে আমি রাজি হওয়াতে তিনি যে চিঠিখানা লেখেন সেখানা এই—

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি
৬০-বি মির্জাপুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা
৪-১-৩৮

কল্যাণীয় পরিমল,

...তুমি আমাকে কথাসাহিত্যে অভিভাষণ সম্বন্ধে সাহায্য করবে জেনে আমি যার পর নাই সুখী হয়েছি। আমি জানি তুমি এ সম্বন্ধে যে তথ্য দেবে তা কত মূল্যবান ও সুচিন্তিত হবে। একেই তো এ রকম একটি অভিভাষণ লিখতে গেলে অনেক জানা থাকা দরকার, তা ছাড়া ভাবতেও হবে অনেকখানি। এ সব করতে আমার একেবারেই সময় অভাব। আপাততঃ তুমি বই ঘেঁটে কথা-সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারাটি আমাকে ধরিয়ে দেবে, শেষে নিজের ভাষায় সেটি গেঁথে নেব নানা ভাবে আমি অত ব্যস্ত যে বেশি সময় এর জন্য দিতে পারছি না। অতএব তুমি অভিভাষণটি এক রকম তৈরী করেই দেবে, আমি নিজের ভাষায় গুছিয়ে নেব মাত্র।...

—ইতি
বড়মা

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী সবারই বড়মা ছিলেন সমিতিতে, আমিও ঐ নামেই ডাকতাম। (এখন তিনি পুরী-বাসিনী এবং সেখানেও সবার বড়মা)।

তাঁর অনুরোধ আমি পালন করেছিলাম। এবং সেই উপকরণ কালানুযায়ী সাজিয়ে দিতে আমি তৎকালীন আধুনিক কাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সকল কথা-সাহিত্যিকের যথা অচিন্ত্য-প্রেমেন-শৈলজানন্দ-বনফুল-মানিক প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেছিলাম। এই লিখনটি পাবার পর তিনি যে ভাবে সেটিকে সাজিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আমি আরও কিছু পরিবর্তনের কথা বলেছিলাম। তাঁর লেখাতে তৎকালীন জীবিত কথা-সাহিত্যিকদের নাম তিনি বাদ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি যে চিঠিখানা দিয়েছিলেন তা থেকে তার কারণ বোঝা যাবে। চিঠিখানা এই—

ওঁ

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন
কলিকাতা
৩-২-৩৮

কল্যাণীয় পরিমল,

কাল তোমার চিঠিখানি পেয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছি এবং তোমার নির্দেশ মত স্থানে স্থানে পরিবর্তন করে দিলুম। কাকা মহাশয় (রবীন্দ্রনাথ) পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেছেন এই সব প্রবন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে নাম উল্লেখ করতে, তাই নাম উল্লেখ করতে সাহস

পাই নাই। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বর্তমান সম্মিলনীর জন্য যে অভিভাষণ লিখেছেন তাতে এক জনেরও নাম উল্লেখ করেন নাই, যা বলবার সব সাধারণ ভাবে বলেছেন, আমার প্রবন্ধটা একবার কাকামহাশয়কে দেখিয়ে আনার জন্য আমি শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিচ্ছি—তিনি যা বলেন তাই করি।

আমি এসব বিষয়ে অনেকটা আনাড়ি সবাই তা জানে তবে তাই বলে যা তা লিখতে হবে তা হতে পারে না। কেউ কানে না নিলেও মনে না গ্রহণ করলেও আমাকে অবশ্য সাবধান হ'তেই হবে। তোমার suggestion পেয়ে কাল খানিক খানিক বদলেছি এবং তাতে ভাল হয়েছে! কাকামহাশয় পছন্দ করেন না অনেক নাম উল্লেখ করতে তাই সাহস করলুম না, তবে তাঁরা যে প্রতিভাশালী সে কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছি।...

—বড়মা

অতঃপর অভিভাষণটি কি রূপ নিয়েছিল তা এখন আমার মনে নেই।

চিঠির পর চিঠি সামনে খুলে নিয়েছি, বাছাইয়ের সময় নেই, যেখানা হাতে উঠছে, দেখছি সেখানার সঙ্গেই বহু স্মৃতি বিজড়িত।

সার তারকনাথ পালিতের কন্যা লিলিয়ান পালিত—পরে মিসেস লিলিয়ান মল্লিক ও তারপর মিসেস লীলা সিং। তাঁর সঙ্গে, তাঁর (এবং সম্ভবত কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্যের) একটি বিশেষ প্রয়োজনে সাক্ষাৎ ঘটেছিল ভাগলপুর থাকতে। তিনি ছিলেন দীপনারায়ণ সিং-এর পত্নী। দীপনারায়ণ সিং তার কিছুকাল পূর্বে মারা গেছেন, অতএব লীলা সিং-এর বড়ই ইচ্ছা তাঁর স্বামী সম্পর্কে বাংলা ভাষায় কিছু লেখা হোক। কপিলপ্রসাদ তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে। তিনি আমাকে সামান্য কিছু ইংরেজী কাগজে প্রকাশিত খবর কেটে আমাকে দিলেন, তারই উপর ভিত্তি ক'রে আমাকে বাংলায় লিখতে হবে।

আমি স্বীকৃত হবার পর তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর বিরাট বাড়িখানা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। উদ্দেশ্য, কোন্ পরিবেশে তিনি জীবনের অনেকখানি কাল কাটিয়েছেন তার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা। —ঘটনাটি ১৯৬২ সালের হিসাবে ২৬ বছর আগের।

কলকাতা ফিরে লিখেছিলাম দীপনারায়ণের চরিত্রচিত্র। এবং তা একখানা কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু কোন কাগজে তা আর এখন মনে নেই, সে লেখাটির কোনো কপিও আমার কাছে নেই। অতএব আমার দিক থেকে তার কোনো পরিচয় দিতে পারা গেল না। কিন্তু সে লেখা পড়ে লীলা সিং আমাকে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন, তাতে আমার আনন্দ এবং আত্মতৃপ্তির কারণ ঘটেছিল। কারণ চিঠিখানা নিতান্তই ধন্যবাদ বাহক ছিল না। কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

MANSURGUNJ
Bhagalpur
E.I.R.
The 3rd July, 1936

My dear Parimal Babu,

..Please do not think I am trying to flatter you when I say that I was greatly touched and moved by what you have written. It shows not only the command of language but the insight of a true artist for you to have written as you have done about one whom you did not personally know but only knew through his intimate friends and those who loved him. You have caught such salient points of his character that it seems amazing to me how any one who did not know my husband personally could have done so, much has been written about him since his death but nothing I have read has really moved me as greatly as your article....

With deepest thanks
and kind regards
Believe me, Yours very sincerely
Lila Singh

আরও কয়েকখানি ছোটখাটো চিঠির কথায় পুরনো দিনের কথ[া] মনে জাগছে। নিচে দুখানা পোষ্টকার্ডের সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে দু[ই] লেখকের একজনের গাম্ভীর্য ও অপর জনের ব্যঙ্গপ্রিয়তার পরিচ[য়] মিলবে। প্রথমখানির লেখক মোহিতলাল।

ঢাকা, ৮।১১।'৩৪

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্রের জবাব দিতে পারি নাই—আশা করি সে জ[ন্য] দুঃখিত হইবেন না। আমার বিজয়ার প্রীতি নমস্কার জানিবেন আশা করি কুশলে আছেন।

মাঝে অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম—এজন্য লেখ[া] পাঠাইতে বড় বিলম্ব হইল। আশা করি, এখনও সময় আছে আজ লেখা পাঠাইলাম। শীঘ্র প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন।

অসুস্থতাবশতঃ বঙ্গশ্রীর প্রবন্ধ লিখিয়া উঠিতে পারি নাই— আরম্ভ করিয়াছি কিন্তু এত অল্প সময়ে হইয়া উঠিবে কি না সন্দেহ সজনীবাবুকে বলিবেন। তাঁহার পত্রের প্রতীক্ষায় আছি—না পাই[য়া] উদ্বিগ্ন হইয়াছি। সংবাদ দিবেন। ইতি— আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

দ্বিতীয় চিঠিখানা সজনীকান্তের—

25/2 Mohanbagan Ro[w]
Cal 8-10-35

পরিমলদা,

বিজয়ার প্রীতিনমস্কার। কোথায়ও যাওয়া হইয়া উঠে নাই বর্ধমানেও নয় কারণ বর্ধমান গোটাটাই এখানে উঠিয়া আসিয়াছে বিষম ভীড়— আমি অফিস ঘরে বেঞ্চে রাত্রি যাপন করিতেছি।

আশা করি আপনার মাথা এতদিনে ছাড়িয়াছে—দোহা[ই] ম্যালেরিয়া ধরাইবেন না।

যুদ্ধের খবর যাহা পাইতেছি তাহা সত্য নয়, আপনি যাহা কল্প[না] করিবেন তাহাই সত্য।

শীঘ্র আসিবেন, ডুবাইবেন না। ইতি—সজ[নী]

আমি অল্পদিনের জন্য দেশে গিয়েছিলাম, সেখানে এই চিঠিখানা পাই। এতে যে যুদ্ধের কথা আছে সেটি অ্যাবিসিনিয়ার সঙ্গে ইটালির যুদ্ধ। ৩রা অক্টোবর ১৯৩৫ তারিখে এই দুই দেশের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তার পাঁচ দিন পরে এই চিঠিখানা লেখা।

'অলকা' মাসিকপত্রে থাকাকালে এঞ্জিনিয়ার কবির একখানা কার্ড পেয়েছিলাম।—

9 Pratapaditya Road
Kalighat 8. 8. 39

প্রীতিভাজনেষু,

পরিমলবাবু, আমার যে রচনাটি অলকায় প্রকাশিত করার কথা স্থির হইয়াছে সে সম্বন্ধে আপনার সহিত অল্পক্ষণের জন্য একবার আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। যদি আগামী কাল সন্ধ্যার সময় আমার বাসায় অনুগ্রহপূর্বক একবার আসেন তবে বিশেষ আনন্দিত হইব। রচনাটি নকল করিবার সময় দুই একটি কথা আমার মনে হইল, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

এই চিঠিখানার সঙ্গে যে সব স্মৃতি আজও মনের মধ্যে স্পষ্ট থাকা উচিত ছিল, তা নেই। অনেক চেষ্টা করেও সব কথা মনে আনা গেল না। অলকা আষাঢ় ১৩৪৬ (ইং ১৯৩৯) সংখ্যা থেকে আমি প্রমথ চৌধুরীর সহকারীরূপে নিযুক্ত হই। পরবর্তী শ্রাবণ সংখ্যায় আমি যতীন্দ্রনাথের "বরনারী" কবিতা ছাপি। উপরের চিঠিতে যে রচনার কথা আছে তার নাম "শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত"। প্রবন্ধটি চন্দ্রশেখর প্রতাপ শৈবলিনী চরিত্রের এবং সম্পর্কের মধুর কবিজনোচিত বিশ্লেষণ। কিন্তু দ্বিতীয় স্মৃতির বিশ্বাসঘাতকতায় আমাদের মধ্যে সেদিন কি আলোচনা হয়েছিল তার কোনো আভাস দেওয়া গেল না। এইটুকু শুধু মনে আছে আলোচনা অল্পক্ষণের জন্য হয়নি, ঘণ্টাতিনেক কেটেছিল আলোচনা চা এবং সন্দেশ মিলে!

যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল, যদিও খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় নয়। উপাসনা-মাসিককে কেন্দ্র ক'রেই প্রথম পরিচয় ঘটে, এই কাগজে তিনি নিয়মিত লিখতেন এবং সম্পাদকদের তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

একখানা অতি-সংক্ষিপ্ত, অথচ চরিত্রের আর এক দিক প্রকাশক একখানি কার্ড বেশ মজার লাগছে। আমি লেখা চেয়ে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে একখানা জোড়া কার্ড লিখেছিলাম তাঁর ব্যারাকপুরের ঠিকানায়। সংলগ্ন কার্ডখানায় আমি একটু রসিকতা ক'রে, তিনি তাঁর ঠিকানা তারিখ এবং আমাকে সম্বোধন যা লিখতেন সে সব আমিই লিখে দিয়েছিলাম, যাতে তারপর থেকে তাঁর কথা এবং নাম সই করলেই চলবে।

সেই কার্ডের ঐ অবস্থা দেখে বিভূতিবাবুরও মনে রসিকতার প্রবৃত্তি জেগে থাকবে।

ব্যারাকপুর

৬।১।৪৫

পরিমল বাবু,

আশ্চর্য কথা। বিশ্বাস করুন একখানা চিঠিও পাইনি। মাইরি বলছি। আপনার চিঠি পেয়ে উত্তর দেব না আপনি বিশ্বাস করেন? দিন দশেক অপেক্ষা করুন। নিশ্চয় পাঠাবো।···দেবো। আজই লিখছি।···

ইতি—বিভূতি

পরবর্তী চিঠি দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর। পত্রলেখক রূপে দেবীপ্রসাদ খুব মন খোলা।

Devi Prasad Roy choudhury M. B. E.
Principal
Govt. School of Arts & Crafts, Madras
19. 7. 49

প্রীতিভাজনেষু,

পরিমল বাবু, আপনার চিঠি পেয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ের টানা পোড়েনে পড়ে গিয়েছি। "নিজের কথা" পড়ার পরেও আমার প্রতি আকর্ষণ এসে থাকলে বুঝতে হবে হয় আপনি সুস্থ অবস্থায় নেই, নয় আপনি ডাহা ভদ্রলোক, অথবা নিজেকে ঠকিয়েছেন। আমার সংগুণ যেটুকু আছে তা 'মর‍্যালস'-এর চাপে মারা পড়েছে। আজকের ভিতরকার বস্তু বাইরে জানতে চাইলে গোপনে কোন দিন সুবিধা খুঁজে নেওয়া যাবে।···কালীর [কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদারের] সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ তা প্রায় নাড়ীর টানের। আমার ভাই বোন নেই। উভয়ের অভাব ওকে দিয়ে অনেকটা পূর্ণ হয়, সুতরাং বাড়িয়ে বলা গুণকীর্তনকে প্রশ্রয় দেবেন না।···

এবার দুটো ফুল এবং দুটি লেপার্ড শিকার করেছি। ফুলকে তৃতীয় লেপার্ডের চোখ মনে করে গুলি চালিয়েছিলাম প্রায় ১০৮০ ফুট দূর থেকে, রাত তখন বারোটা হবে। পাগলা হাতী মারবার জন্য সরকার সালেম জেলায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। হাতী পাওয়া গেল না, ছোট বাঘ মেরেই ফিরতে হল। ফুল আর লেপার্ড শিকারের গল্প তো ছাপা চলে না।···

···বাঁচার অবলম্বনে বৃহৎ সহায় হৃদয়। ঐ বস্তুটির সহিত মানুষের যদি কোন যোগ না থাকে তা হলে তাকে চালাক বলা চলে কিন্তু মানুষ বলে স্বীকার করা যায় কি না সন্দেহজনক। যাকে ভাল লাগে তাকে নিঃসঙ্কোচে ভাল বলার বাধা যেখানে উপস্থিত হয় সেখানে বুঝতে হবে ভালকে প্রাণ দিয়ে স্বীকার করা হয়নি।

···চেহারাটা দিনের পর দিন গলদে ভরে উঠছে। নানা পত্রিকায় মুসোলিনি সাহেবের ছবি বার করে তলায় আমার নাম বসিয়ে দিচ্ছে। কয়েক দিন আগেই 'ওরিয়েন্ট' কাগজে এইরূপ একটি যাচ্ছেতাই কাণ্ড দেখলাম। আপনাকে সিটিং দেবার জন্য একটা দিন ছুটিও নিয়ে নিতে পারি।

হরদম ছবি আঁকছি, মূর্তির নতুন কম্পোজিশন ধরেছি, কাজটা যদি মনের মত হয় তা হলে দেশকে কিছু দিয়ে যেতে পারব। বড় কাজ আরম্ভ করলেই কালীর [কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার] কথা মনে পড়ে। ছেলেটা এমন প্রাণ দিয়ে শিখত যে আমারই ওর ছাত্র হয়ে যাবার ইচ্ছা আসত। আমার যতদূর মনে পড়ে ফাইন্যাল ইয়ার এক্জামিনেশন-এ ও প্রথম স্থান অধিকার করে কিন্তু ডিপ্‌লোমা আজও নেয়নি। অধিকন্তু আগের বার পরীক্ষাতেই বসল না পাস করার ভয়ে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছেলেকে বিদায় দিতে হয়। এক বৎসর বেশী শেখবার জন্য ইচ্ছে করে ফেল মেরে গেল

কালীর আঁকা ছবি বার হোক, তার সঙ্গে মানুষটাকেও সাধারণের কাছে চিনিয়ে দেয়া দরকার—ওর জীবন ধারা একটি আদর্শের বস্তু। এ চিঠি আপনি ওকে নিশ্চিন্ত মনে দেখাতে পারেন, ও আমাকে চেনে।

আমরা যা চেষ্টা করছি তা গুণের প্রচার, আধুনিক বীভৎসতার বিরুদ্ধে অভিযান। আমার কাছে যারা শিখেছে তার মধ্যে কালী, পানিকর, ও সুশীল আসল শিল্পী মনের অধিকারী। কালীকে আমার চিত্র বিদ্যার পুঁজিপাটা সব দিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কাছে পেলাম কৈ? মেক্যানিক্যাল বহু জিনিস, বহু ছবি, কষ্ট করে সংগ্রহ করেছিলাম, সেগুলো আমার মৃত্যুর পর কারো কাজে আসবে না, এটা আমার কাছে খুব আনন্দের বিষয় নয়।

অনেক লিখলাম, আমার প্রাণ ভরা ভালবাসা জানবেন।

ইতি—

গুণমুগ্ধ দেবীপ্রসাদ

দীর্ঘ চিঠিখানার একটি অংশ উদ্ধৃত করলাম। চিঠির মধ্যে আপন ক্ষমতা বিষয়ে সন্দেহহীন প্রত্যয়দৃঢ়তা, শিল্পীজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং রচনা এবং সবার উপরে হৃদয়ের স্বীকৃতি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। দেবীপ্রসাদের আরও কয়েকখানা মূল্যবান চিঠি দৈনিক বসুমতীর পূজা সংখ্যায় অন্যান্য অনেক চিঠির সঙ্গে প্রকাশ করেছিলাম।

সজনীকান্তের মৃত্যুসংবাদ

এই পর্যন্ত লিখে রেখেছিলাম কয়েক দিন আগে। ইতিমধ্যে গত ১১ই ফেব্রুয়ারি (১৯৬২) পেলাম সজনীকান্তের মৃত্যু সংবাদ। আমি অপরাহ্নে মতিলাল নেহরু রোডে গিয়েছিলাম এক বন্ধুর বাড়িতে সান্ধ্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। রাত ন'টার পরে বাড়িতে ফিরেই পেলাম দুঃসংবাদ। আমি দুপুরে কিছু বিশ্রাম করি, এবং আমারও হৃদযন্ত্রের যৌবন গত হয়েছে, তাই আমার প্রতি বিবেচনাবশত আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীনির্মলকুমার বসু আমাকে যথাসময়ে সজনীকান্তের মৃত্যু সংবাদ জানাতে নিষেধ করেছিলেন। পরে শ্রীদেবব্রত ভৌমিক যখন আমার বাড়িতে ফোন ক'রে জানান, তখন আমি ছিলাম বালিগঞ্জে। হিমানীশ ফোন ধরেছিল, এবং তখনই চলে গিয়েছিল সেখানে। আমি রাত্রে ফোন ক'রে জানলাম মৃতদেহ বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে।

আমার সমস্ত রাত ঘুম হল না।

সজনীকান্তের যে চিঠিখানা এবারে উদ্ধৃত করেছি, সে চিঠির কথা তাঁর মনে থাকবার কথা নয়, প্রকাশিত হবার পর তিনি দেখবেন এই ছিল আশা। কিন্তু তা আর হল না। ঐ চিঠির সামান্য কয়েকটি ছত্রকে ঘিরে আছে এক বিরাট ইতিহাস।

সজনীকান্ত ও আমি বহুদিন একত্র বাস করেছি, তাঁর দুঃখের দিনের সকল অবস্থার সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম।—আমি ও তাঁর সুহৃদ এবং নীরব কর্মী প্রবোধ নান। শনিবারের চিঠির সমস্ত ভার তিনি আমার উপরে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তিনি তখন বঙ্গশ্রীর সম্পাদক। আমি বারো আনা ভার ছেড়ে দিয়েছিলাম প্রবোধ নানের উপর। আমি দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর সজনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। বঙ্গশ্রীতেও আমি তাঁর সাহায্য করেছি, এবং পরে বেতনসহ নিযুক্তও হয়েছিলাম আংশিক সময়ের জন্য। বঙ্গশ্রীর সম্পাদকীয় তিনি, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও আমি লিখতাম, কখনও সবটাই আমরা লিখতাম সজনীকান্তকে বাদ দিয়ে।

সজনীকান্তের কাজ ছিল গুণী সাহিত্যিক ও শিল্পীকে একত্র করা এবং এ বিষয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল সহজাত। রচনার উৎকর্ষ বিচার তাঁর হাতে যে রকম হতে দেখেছি তা আমার কাছে বিস্ময়কর বোধ হয়েছে। গুণী লোককে চিনে নেওয়া শুধু নয়, তাঁকে কাছে ডেকে এনে বন্ধু বানানো ছিল তাঁর একটি মহৎ গুণ।

চরিত্রে অবশ্য একটু বেশি মাত্রায় পরস্পর বিরোধিতা ছিল এবং শিশুসুলভ চাপল্য ছিল খুবই। আর আমার বিশ্বাস ঠিক এই জন্যই সজনীকান্ত একটি চিত্তাকর্ষক চরিত্র ছিলেন। আমার 'সপ্তপঞ্চ' ও 'পথে পথে' বইতে সে সব দিনের কথা আছে।

এঁর সম্পর্কে স্মৃতিচিত্রণে আরও বিস্তারিত বলেছি। আজ এ মুহূর্তে আর কিছু বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। মাত্র ১৪ দিন আগে ২৮শে জানুয়ারি (১৯৬২) তারিখে শ্রীসুকমল ঘোষের বাগান-বাড়ির বার্ষিক নিমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে দেখা। অনেক কথা হল। তার আগের বছরের একটি অতি বেদনাদায়ক ঘটনার কথা আলোচিত হল। শনিবারের চিঠির প্রথম যুগের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য সেবারে উপস্থিত ছিলেন। আমি মুভি ক্যামেরায় ছবি তুলছিলাম। সজনীকান্ত তাঁকে কাছে ডাকলেন, একত্র ছবি উঠবে, কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। আমি তাঁর এই রূঢ়তা দেখে কিছু অবাক হয়েছিলাম। যেখানে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত—সেখানে ত্রিশ বছর আগের সাহিত্য দ্বন্দ্ব স্মরণ ক'রে তা অস্বীকার করার ব্যাপারটাকে মূঢ়তা ভিন্ন আর কি বলা যায়। এখানে একদিকে দেখলাম উদারতা আর এক দিকে দেখলাম অহেতুক

গৌড়ামি। শনিবারের চিঠির সে যুগে অত যাঁরা আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রবোধকুমার সান্যালের নাম বোধ হয় সবচেয়ে উপরে। কিন্তু তাতে দুজনের বন্ধুত্বের বিশেষ বিশেষ হানি হয়নি।

যাই হোক, এ বিষয়ে আলোচনা বৃথা। চরিত্র বৈচিত্র্য সংসারে থাকবেই।

শিশিরকুমার ভাদুড়ি

কৈলাস বসু স্ট্রীটে থাকতে ১৯৫২ সালে শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে আমার নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হল। তিনি ১৯১৭—১৮ সালে ছিলেন আমার অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজে। ইংরেজী ভাষাতত্ত্ব পড়েছি তাঁর কাছে। এমন চিত্তাকর্ষক চেহারা, ব্যক্তিত্ব, এবং পড়াবার ভঙ্গি—আমার সেই দিনের তরুণ মনে যে ছাপ এঁকেছিল তা যেমন মধুর তেমনি গভীর।

তারপর মুগ্ধ হয়ে দেখেছি তাঁর সীতা অভিনয়। তাঁর যত অভিনয় সবই দেখেছি, কিন্তু প্রথমে সীতা দেখে মনে যে উন্মাদনা জেগেছিল তেমন আর কিছুতে হয়নি। থিয়েটার দেখা আমার ছিল একটা নেশা। ষ্টার, মিনার্ভা, মনোমোহন, অ্যালফ্রেড, নাট্যমন্দির—কোনোটাই বাদ ছিল না। দৃশ্যপটের ম্যাজিক থেকে আরম্ভ করে শিশির কুমারের আধুনিক রুচিসঙ্গত দৃশ্যপরিবেশ—এক এক যুগে এক একটায় মুগ্ধ হয়েছি। ১৯১০ সালে এর আরম্ভ, কিন্তু ১৯২১ থেকে নিয়মিত দেখেছি।

বিদ্যাসাগর হস্টেলে থাকতে শিশিরকুমারের অভিনয় শিক্ষা দেখেছিলাম, কিন্তু তাঁর নিজের অভিনয় আগে দেখেছি সীতাতে। এক্‌জিবিশনের সীতা দেখিনি। নাট্যমন্দিরে যোগেশ চৌধুরীর সীতা দেখে সম্পূর্ণ নতুন একটি আনন্দের স্বাদ পেয়েছিলাম। অভিনয় দেখে অভিভূত হওয়া আমার এই প্রথম। অভিনয় শেষে মনে হয়েছিল হঠাৎ যেন কোন্ এক আদিযুগের গভীরতম আনন্দবেদনার স্বপ্ন-স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে কলকাতার কঠিন রাজপথের পাথরের উপর পতন। কোন্‌টা সত্য? সীতার পাতাল প্রবেশের আকস্মিকতায় আচম্ভ বিভ্রান্ত রামচন্দ্রের আর্তনাদ, না ট্রাম-ঘোড়াগাড়ি ফেরিওয়ালা? সেটি অবশ্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা গেল আসন্ন গাড়ি চাপা পড়ার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ?

প্রথম দিন সীতা অভিনয় দেখে আগের দেখা সকল নাটকের স্মৃতি যেন মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেল। রামচন্দ্র সীতা সীতা ব'লে আর্তনাদ করেছিলেন, দ্বিধাবিভক্ত বধির ধরণীর বুকে আপন কণ্ঠের পুষ্পমাল্য ছিন্নভিন্ন ক'রে নিক্ষেপ করেছিলেন, তার বেদনা মনের মধ্যে গভীর আলোড়ন তুলল। এক একটি দৃশ্য ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের মতো মনের মধ্যে ঝলকিত হয়ে উঠছিল, মনে হচ্ছিল এমন জিনিস তো পূর্বে কোনোদিন দেখিনি। এমন যে হতে পারে তারও কল্পনা করিনি কোনোদিন। বহুযুগের ওপার হতে বহুদিনের ভুলে যাওয়া অতীত যেন সত্যই জীবন্ত হয়ে উঠে আবার কোথায় মিলিয়ে গেল। এমন বেদনার্ত হয়ে উঠল মনটা। একটা অতি দুর্দাম আকর্ষণ অনুভব করছিলাম 'সীতা'র প্রতি। আবার কখন দেখতে পাব সেই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

বার বার দেখলাম। প্রতিদিন নতুন ক'রে ভাল লাগল। নাটকের কথা-অংশ অতি সামান্য এবং তুচ্ছ, এবং ওর কম ভাষা যদি প্রথমে বইতে পড়তাম তা হলে মনে অবশ্য বিতৃষ্ণা জাগত। যেমন একটি ধুলোর কণা দেখে লাগে। কিন্তু সেই কণা ঝিনুকের মধ্যে যখন মুক্তা হয়ে ফুটে ওঠে স্তরের পর স্তরের প্রলেপে, তখন সেই ধূলিকণার সন্ধান কে রাখে? সীতাও তেমনি তুচ্ছ অবলম্বন পেয়ে নিটোল মুক্তা রূপে ফুটে উঠেছিল। একটিমাত্র মানুষের শতমুখী পরিকল্পনার শত বর্ণে রঞ্জিত একখানা ছবি। এর বিষয়টাই এমন যে, এর জন্য দর্শককে নতুন ক'রে প্রস্তুত করতে হয়নি, কিন্তু এর প্রকাশ সম্পূর্ণ নতুন এবং যার জন্য দর্শকের পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। আর এই জন্য এর অনস্বাদিতপূর্ব রসসৌন্দর্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি আঘাত ছিল। সে আঘাত বিভ্রান্ত করেছিল, অভিভূত করেছিল। অপ্রত্যাশিত আনন্দ এমনি ভাবে প্রথমে আঘাতের ভিতর দিয়েই হৃদয়ে প্রবেশ করতে চায়। এমন আনন্দে চিন্তাশক্তি মূর্ছিত হয়। এ আনন্দের ভিতর দিয়ে বার বার উত্তীর্ণ হলে তবে সে মূর্ছা ভাঙে।

শিশুকাল থেকে রামায়ণে রাম ও সীতার দুঃখ আমাদের মনকে ভরে রেখেছে। রামায়ণের চরিত্র, তার পরিবেশ, তার কাহিনী তখন থেকেই সবার মনে একটা বিশেষ ছাপ এঁকে দিয়েছে। এবং সবকিছুকে ছাপিয়ে শিশুমনকে আচ্ছন্ন করেছে রাম ও সীতার ট্র্যাজিডি। হয় তো বা শিশুকালে হনুমানের ল্যাজের দিকে, বা রাবণের দশটি মাথার দিকে, অথবা কুম্ভকর্ণের ঘুমের দিকে কৌতূহলটা বেশি থাকে, এবং হনুমান ল্যাজের আগুনে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে, কিন্তু তবু আমার মনে হয় সেই সব সত্ত্বেও শিশুহৃদয় রাম ও সীতার দুঃখকে বেশি সত্য বলে মানে। এবং রামায়ণের প্রতি তার আকর্ষণের প্রকৃত কারণ সেটাই। মনের স্তরে এই বেদনা আমাদের প্রত্যেকেরই জমা হয়ে আছে, তাই 'সীতা' অভিনয়ের অভিনবত্ব সেই দুঃখকেই আবার বাইরে টেনে আনল।

বলেছি দর্শকদের মুখে কোনো কথা ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল একটি ঘটনা। একদিন বনফুলের সঙ্গে সীতা দেখছিলাম। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে গভীর নীরবতা, অভিনয় চলেছে এমন সময় পিছনে দু-একজন ছোকরা কি যেন মন্তব্য করতে শুরু করল। বনফুল তা শুনে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, মশায় আত্মদর্শনে যান, এখনও টিকিট পাবেন। তাতে ফল হয়েছিল। মিনার্ভায় তখন 'আত্মদর্শন' চলছিল।

'সীতা'র পরিকল্পনা ছিল আমার কল্পনার বাইরে। অধ্যাপক শিশিরকুমারকে আপাতত ভুলে গেলাম, তবে গর্বেরও কারণ হয়ে রইল সেটি, কেন সে কথা বলা বাহুল্য।

সীতা নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শিশিরকুমারের যে শিল্পীজনোচিত মনোযোগ এবং সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া গেল তা যে-কোনো দেশের পক্ষেই গর্বের বিষয়। দূর অতীতকে রূপায়িত করা হচ্ছে, সেজন্য দর্শককে প্রস্তুত করার কৌশলটিও চমকপ্রদ। যেন কোনো রহস্যময়ী মায়াবিনী, ঘননীল আলোকাবরণের ভিতর থেকে অস্পষ্ট অবয়বে, অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে, অতীত-উদ্বোধক মন্ত্র উচ্চারণ করছে। খুব ধীর মধুর সুরে গাওয়া সেই

"কথা কও কথা কও"

নামক রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের উদ্বোধনী কবিতাটির অংশ থেকেই অভিনয়ের চমকপ্রদ সূচনা। একই সঙ্গে

সুন্দর একটি সেন্টিমেন্ট, নাটকের প্রবেশ দ্বার খোলার চাবিকাঠি এবং উচ্চ রুচির পরিচয়, দর্শককে আনন্দে উচ্ছল ক'রে তুলেছিল। দর্শক নীরব, শেষ দৃশ্য পর্যন্ত তার মুখে আর কোনো কথা নেই—তার মন রামের মর্মভেদী বেদনায়, সীতার ধীর স্থির চিত্তে দুর্ভাগ্যবরণের বেদনায়, অভিভূত। সে বেদনায় সমস্ত ভুবন তখন আচ্ছন্ন, সে বেদনায় সমুদ্রের উচ্ছ্বাস, তার অতল গভীরতার মর্মস্থলে, মর্মবেদনাজাত এক অনির্বচনীয় আনন্দ। এর তুলনা হয় না।

আবহ গঠনে যেখানে যত গুণী ছিলেন সবাইকে ডাকা হয়েছিল। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, নৃপেন্দ্র মজুমদার—প্রভৃতি গুণিগণ কেউ বা নেপথ্যে পরামর্শ দিয়ে, কেউ বা সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে, কেউ বা মঞ্চে প্রকাশিত হয়ে সীতাকে সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুললেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখলেন গান ও দিলেন নৃত্য পরিকল্পনা, কৃষ্ণচন্দ্র দে গাইলেন আবহ গীতি, নৃপেন্দ্র মজুমদার বাজালেন ক্লারিওনেট। কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠে অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে গানটি যেন সমস্ত 'সীতা' ট্র্যাজিডির সঙ্গীতরূপ। অভিনয় পরিকল্পনা এবং মঞ্চে শিল্পী সমাবেশ, তাঁদের সবাক অভিনয় শুধু নয়, নির্বাক অভিনয়ের অভিনবত্বও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার রঙ্গমঞ্চে এ কল্পনা পূর্বে কেউ করেননি।

শিশিরকুমার বাংলাদেশকে যা দিলেন তা তাঁর সঙ্গেই চলে গেছে, তা আর ফিরে আসবে না। কিন্তু তাঁর সেই প্রথম যুগে তিনি যে শুধু অভিনয়, অভিনয় শিক্ষা, এবং নাট্য প্রয়োগ ক্ষমতার আশ্চর্য দৃষ্টান্তে বাংলাদেশের হৃদয় হরণ করেছিলেন এ কথাটা এ দেশের নাট্য ইতিহাসেই শুধু থেকে যাবে, আর কোথাও তার কোনো চিহ্ন থাকবে না, এ ভাগ্য আগের যুগের সকল অভিনয়শিল্পীর।

সেদিন বাংলার বিখ্যাত সকল কবি শিল্পী সাহিত্যিক তাঁর অভিনয়ে যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তার কিছু সংকলন হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার" নামক গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে। এ বইটি অত্যন্ত মূল্যবান সেজন্য, শুধু বহু স্থলে তারিখহীনতার ত্রুটি দুঃখের কারণ ঘটিয়েছে। তবু এই বইতে অন্যান্য অভিনন্দনের সঙ্গে তৎকালীন কলেজের ছাত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের যে কবিতাটি সংকলিত হয়েছে তা পড়লে হঠাৎ সে যুগের সীতা অভিনয়ের সমস্ত ছবিটি আবার মনে জেগে ওঠে। কবিতাটি হৃদয় দিয়ে লেখা—হৃদয় স্পর্শ করে।

দীর্ঘ দুই বাহু মেলি আর্তকণ্ঠে ডাক দিলে
সীতা, সীতা সীতা
পলাতকা গোধূলি প্রিয়ারে
বিরহের অস্তাচলে তীর্থযাত্রী চলে গেল ধরিত্রী দুহিতা
অন্তহীন মৌন অন্ধকারে।
যে কান্না কেঁদেছে যক্ষ কলকণ্ঠা
শিপ্রা-রেবা-বেত্রবতী-তীরে
তারে তুমি দিয়েছ যে ভাষা;
নিখিলের সঙ্গীহীন যত দুঃখী খুঁজে ফেরে বৃথা প্রেয়সীরে
তব কণ্ঠে তাদের পিপাসা।
এ বিশ্বের মর্মব্যথা উচ্ছসিছে
ওই তব উদার ক্রন্দনে
ঘুচে গেছে কালের বন্ধন;
তারে ডাকো—ডাকো তারে—যে প্রেয়সী
যুগে যুগে চঞ্চল চরণে
ফেলে যায় ব্যগ্র আলিঙ্গন।
বেদনার বেদ মন্ত্রে বিরহের স্বর্গ লোক
করিলে সৃজন
আদি নাই, নাই তার সীমা।
তুমি শুধু নট নহ, তুমি কবি,
বক্ষে তব প্রত্যুষ স্বপন
চিত্তে তব ধ্যানের মহিমা।

এই আশ্চর্য সুন্দর স্মৃতি জাগানিয়া কবিতাটির জন্য কবি অচিন্ত্যকুমারকে অভিনন্দন জানাই। [ক্রমশঃ।

মাছের দাম চড়া

জগদীশচন্দ্র দাশ

মেছুয়া, মাছের সের কত?
—চার টাকা।
দাম শুনে মোর ঠোঁট বাঁকা,
প্রাণ ওষ্ঠাগত।

বাংলা দেশে আমরা বাঙাল!
মাছের কাঙাল, ভাতের কাঙাল।
তিন পোয়া দেশ
আজ বিদেশ,
এক পোয়া দেশ হলো রে নস্যাৎ;
মাছের শোকে মোদের বুদ্ধি কাত।

বাইরে এখন

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাইরে এখন অন্ধকার: অথৈ কালোপাথার
সৃষ্টিলোক হারিয়ে গেছে, অপার-নীল-নদী,
তোমায় খুঁজে কোথায় পাই, কোথায় দিই সাঁতার
মৃত্যু ধু-ধু ছড়িয়ে আছে—সুদূরে জলধি।

বাইরে ব্যাপক অন্ধকার, হারিয়ে গেলে কোথায়,
তোমায় ডাকি ভয়ে ভয়ে নীলের উদারতায়।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

আলজেরিয়ায় আশার আলো—

আলজেরিয়ার সাত বৎসরব্যাপী রক্তক্ষরী সংগ্রাম কি অবশেষে সত্যই শেষ হইতে চলিল? ফরাসী প্রেসিডেণ্ট জেনারেল দ গল গত ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬২) তারিখের বক্তৃতায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, খুব শীঘ্রই শান্তিপূর্ণ ভাবে আলজেরিয়ার যুদ্ধ শেষ হইবে বলিয়া নিশ্চিত আশার সঞ্চার হইয়াছে। এই আশার মূলে যে সুদৃঢ় ভিত্তি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আলজেরিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য ফ্রান্স এবং আলজেরীয় জাতীয়তাবাদীদের যে গোপন আলোচনা চলিতেছিল তাহাতে জেনারেল দ গলের আশাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া এ সম্পর্কে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। সুইস সীমান্তের নিকটে ফরাসী এলাকায় গত ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬২) উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয় এবং আলোচনা শেষ হইয়াছে ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে। আলজেরিয়ায় যুদ্ধ বিরতির পক্ষে যে সকল সমস্যা বাধা সৃষ্টি করিয়াছে সে-গুলির মধ্যে আলজেরিয়ার দশ লক্ষ ইউরোপীয়দের মর্য্যাদা বা ষ্টেটাস, সাহারার তৈলক্ষেত্র এবং নৌ-বন্দর মার-সা-কবিরই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আলজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করিলে সেখানের ইউরোপীয়দের মর্য্যাদা কি হইবে, এই প্রশ্নই মীমাংসার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। অবশেষে সে-সম্বন্ধেও একটা মতৈক্য সম্ভব হওয়ায় আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু চুক্তির সর্ত্তগুলি প্রকাশ করা হয় নাই। এই চুক্তি ফরাসী সরকার এবং আলজেরীয় অস্থায়ী সরকারের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অনুমোদন সাপেক্ষ। চুক্তিটি আলজেরীয় জাতীয়তাবাদীদের পার্লামেণ্টে এবং আলজেরীয় বিপ্লব পরিষদের নিকটেও পেশ করা হইবে। উভয় পক্ষ চুক্তি অনুমোদন করিলে সরকারীভাবে উহাতে স্বাক্ষর দান করা হইবে। অতঃপর চুক্তিটি ঘোষণা করা হইবে। আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বেই যে চুক্তি অনুমোদিত ও প্রকাশিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। চুক্তি অনুমোদিত হইলে আলজেরিয়ায় একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং আলজেরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পর্কে এই অস্থায়ী সরকার গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা ও পরিচালনা করিবেন। অনেকে মনে করেন যে, এই অস্থায়ী সরকার তিন মাস হইতে পাঁচ মাস কাল স্থায়ী হইবে। এই অস্থায়ী সরকার কি ভাবে গঠিত হইবে এবং কে উহার প্রধান হইবেন সে-সম্বন্ধেও আলোচনাকারিগণ নাকি একমত হইতে পারিয়াছেন। ফরাসী সরকারের বন্দী একজন জাতীয়তাবাদী নাকি অস্থায়ী সরকারের প্রধান হইবেন।

আলোচনায় একমত হওয়া সম্ভব হইলেও উহার শেষ পরিণতি সম্পর্কে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদীদের অস্থায়ী সরকারে এমন অনেক আছেন যাঁহারা ফ্রান্সের সহিত কোন রকম আপোষেরই বিরোধী। কিন্তু তাঁহারা এই চুক্তির বিরোধিতা করিয়া উহাকে বানচাল করিয়া দিতে পারেন, এই ধারণাই উল্লিখিত আশঙ্কার কারণ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, আলজেরিয়ায় সাত বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতার সংগ্রাম চলিতেছে। কাজেই সমগ্র আলজেরিয়ায় যদি একটা ক্লান্তির ভাব দেখা দিয়া থাকে তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। এই অবস্থায় চুক্তি সম্মানজনক ও সন্তোষজনক হইলে তাহা তাহারা গ্রহণ করিবেন না, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। কিন্তু উভয় পক্ষ চুক্তি অনুমোদন করিলেও উহা কার্য্যকরী করিবার পক্ষে আর একটি প্রবল বাধা রহিয়াছে। এই বাধা আসিবে Organisation de l' Armee Secrete অর্থাৎ গুপ্ত সৈন্য সংগঠনের (ও-এ-এস) দিক হইতে। এই গুপ্ত সৈন্যবাহিনীর পরিচালক পলাতক প্রাক্তন জেনারেল রাওল সালাম এবং অন্যান্য প্রাক্তন ফরাসী সামরিক অফিসার। এই সৈন্য সংগঠনের নাম 'গুপ্ত' হইলেও উহার কার্য্যকলাপ প্রকাশ্যেই চলিতেছে। স্বাধীন আলজেরিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া রোধ করাই উহার মূল উদ্দেশ্য। তাহাদের ধ্বনিই হইল, 'আলজেরিয়া ফ্রান্সের,' 'দ গলের ফাঁসী দাও,' 'সালামকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত কর'। ও-এ-এসের প্রধান শত্রু দ গল এবং তাঁহার আলজেরীয় নীতির সমর্থকগণ। সন্ত্রাসবাদ হইল তাহাদের কর্ম্ম কৌশল। হত্যা করিয়া এবং আলজেরিয়ায় ও ফ্রান্সে সামরিক অভ্যুত্থানের হুমকী দিয়া তাহারা কাজ হাসিল করিতে চায়। আলজেরিয়ায় বর্ত্তমানে তিনটি শক্তি ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। একটি ফরাসী শাসন কর্ত্তৃপক্ষ, দ্বিতীয়টি মুসলিম জাতীয়তাবাদ এবং ইউরোপীয় ফ্যাসিজম। শুধু আলজেরিয়াতেই নয় খাস ফ্রান্সেও ও-এ-এসদের যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি হইয়াছে। আলজেরিয়ায় ও-এ-এস দশ হাজার ইউরোপীয়কে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট ইউরোপীয়দের অধিকাংশের পরোক্ষ অথবা সক্রিয় সহানুভূতি তাহাদের প্রতি রহিয়াছে। আলজিয়ার্স, ওরান প্রভৃতি উপকূলবর্ত্তী সহরগুলিতে ইউরোপীয়রাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। গুপ্ত সৈন্যবাহিনীই প্রকৃত পক্ষে এই সহরগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। গুপ্ত সৈন্যবাহিনীর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের প্রতি আক্রমণের ফলে ইংরাজী নূতন বৎসরের প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত ৪২০ জন নিহত এবং ৭৫০ জন আহত হইয়াছে।

খাস ফ্রান্সে অধিকাংশ লোকই ও-এ-এসের বিরোধী। পুরাতন ও নূতন ফ্যাসিষ্টপন্থী আছে প্রায় সাত হাজার। ও-এ-এস ইহাদের সহযোগিতা পাওয়ার আশা করিয়া থাকে। সহযোগিতা যে পাইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। খাস ফ্রান্সে সংখ্যার দিক হইতে ও-এ-এস দুর্ব্বল হইলেও তাহাদের সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ ব্যাহত হইতেছে না। গত বৎসর প্রেসিডেণ্ট দ্য গলকে তাহাদের হত্যার চেষ্টা অল্পের জন্য ব্যর্থ হইয়াছে, একথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। তাহারা ফ্রান্সের প্রধান প্রধান রাজনীতিক ও লেখকদের গৃহে প্লাষ্টিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে গুপ্ত সৈন্যবাহিনী আলজেরিয়ার কতগুলি সামরিক ফাঁড়িতে হানা দিয়া প্রচুর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করিয়াছে। আলজিয়ার্স, ওরান এবং বোনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং ২৪শে জানুয়ারী (১৯৬২) ১৫ মিনিটের জন্য ধর্ম্মঘটের যে-আহ্বান করা হয় সকলেই তাহাতে সাড়া দিয়াছিল। আলজেরিয়ায় ইউরোপীয়দের নেতৃত্ব যে ও-এ-এসের হাতেই চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে মনে করেন ও-এ-এস একরূপ 'শেডো গবর্ণমেণ্টের' (shadow government) মতই কাজ করিতেছে। সুতরাং আলজেরীয় জাতীয়তাবাদীদের সহিত ফরাসী সরকারের চুক্তি হইলেও ঐ চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধ বিরতিকে কার্য্যকরী করা এবং অন্তর্বর্ত্তী সরকার গঠন করিয়া আলজেরিয়ার আশু নিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের কাজ খুব সহজ হইবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। এই চুক্তি কার্য্যকরী করিবার সময় উপস্থিত হইলে শুধু আলজেরিয়াতেই নয়, খাস ফ্রান্সেও ও-এ-এসরা ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটাইবার চেষ্টা করিবে। জেনারেল দ্য গলকে কঠিন শক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। ও-এ-এসের প্রবল বিরোধিতাকে ধ্বংস করিবার জন্য সৈন্য-বাহিনী ও পুলিশবাহিনীই যে হইবে তাঁহার কার্য্যকরী শক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ও-এ-এসের বিরোধিতাকে পরাজিত করিবার জন্য জনসাধারণের সমর্থনই হইবে তাঁহার প্রধান সহায়। 'আলজেরিয়া ফ্রান্সের' এই দাবীর প্রতি সৈন্যবাহিনীর যতই অনুরক্তি থাকুক, তাহারা যদি বুঝিতে পারে সমগ্র ফরাসী জাতি এই দাবী সমর্থন করে না, তাহারা চুক্তি কার্য্যকরী করা ব্যতীত অন্য পন্থা বরদাস্ত করিবে না, তাহা হইলে সৈন্যবাহিনী দ্য গলের অনুগত থাকিয়া চুক্তির বিরোধিতাকে ধ্বংস করিবে। কিন্তু দ্য গলের আলজেরীয় নীতির যাঁহারা সমর্থক দ্য গল তাঁহাদের প্রতিও বিরূপ, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আলজিরিয়া সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে ও-এ-এস-ই যে একমাত্র প্রবল ও শক্তিশালী অন্তরায় তাহা দ্য গল ভাল করিয়াই জানেন। তিনি ইহাও জানেন যে, উহাদের বিরোধিতার জন্যই চুক্তি কার্য্যকরী করা অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে। দ্য গলের আলজেরীয় নীতির যাহারা পরম শত্রু, তাহাদের বিরুদ্ধে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী বামপন্থীদের নেতৃত্বে দশ হাজার লোক প্যারীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় নিরাপত্তা পুলিশের সহিত সংঘর্ষে আটজন নিহত হইয়াছে এবং আহত হইয়াছে প্রায় একশত লোক। এই ঘটনা ঘটে Place de la Bastille-এর প্রশস্ত স্কোয়ারে যেখানে ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল। যাহারা আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের সার্ব্বভৌম অধিকার রক্ষার জন্য হত্যাকাণ্ড, বোমা স্থাপন, ব্যাপক বিদ্রোহ প্রভৃতি কোন কাজেই পিছপাও নয়, তাহাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদিগকে দমন করিবার জন্য দ্য গল কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন কেন, তাহার তাৎপর্য্য বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। একটা জাতির সংগঠিত শক্তিসমূহ বলিতে আমরা বুঝি, রাজনৈতিক দলসমূহ, শ্রমিক ইউনিয়নগুলি, ছাত্র ফেডারেশন, শিক্ষক সমিতি, ছাত্র সমিতি প্রভৃতি। এই সকল সংগঠিত শক্তিই বিক্ষোভে যোগদান করিয়াছিল। গুপ্ত সামরিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ও শক্তিশালী বিরোধিতার সম্মুখে দ্য গল এই সকল সংগঠিত শক্তিসমূহের বিরোধিতা কেন করিলেন? তিনি হয়ত অ-সংহত জনশক্তির আনুগত্যের উপরেই বেশী নির্ভর করিতেছেন। তাঁহার হয়ত দৃঢ় ধারণা আছে যে, ও-এ-এস এবং তাহাদের সমর্থকগণ যদি প্রবল ও ব্যাপক বিদ্রোহ করিয়া তাঁহার শাসনের অবসান ঘটাইতে চেষ্টা করে তাহা হইলে রিপাবলিক রক্ষার জন্য বামপন্থীদের সাহায্য পাওয়া যাইবেই। তাঁহার এই হিসাবে ভুলও হইতে পারে। দমন নীতির ফলে যাহারা চরম বামপন্থী নয় তাহারাও তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিতে পারে। তাঁহাকে এক হাতে বামপন্থীদিগকে আর এক হাতে ও-এ-এসকে রুখিতে হইবে। ফ্রান্সে হয় ত গলিষ্ট রিপাবলিক রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু আলজেরিয়ার অবস্থা কি দাঁড়াইবে, ইহাই প্রশ্ন।

সরকারী ভাবে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত এবং ঘোষিত হওয়ার পর আলজেরিয়ায় কি ঘটিবে তাহা সঠিক ভাবে অনুমান করা খুবই কঠিন। আলজেরীয় মুক্তি ফৌজের ২০ হাজার সৈন্য টিউনিশিয়া এবং মরোক্কোর ঘাঁটিগুলিতে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার প্রতীক্ষা করিতেছে। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত ও ঘোষিত হওয়ার পর আলজেরিয়ায় তাহাদের প্রবেশ করা খুব সহজ হইবে কি? তারের বেড়া, মাইন ফিল্ড, রাডার চালিত অটোমেটিক কামানের বাধা তো আছেই। তাছাড়া আলজেরিয়ার ভিতরে এক হাজার ঘাঁটিতে ফরাসী সৈন্যরা অবস্থান করিতেছে। সাত বৎসর ধরিয়া যাহারা শত্রু ছিল তাহাদিগকে ফরাসী সৈন্যরা কি চক্ষে দেখিবে তাহা বলা কঠিন। এই সকল ঘাঁটিতে ও-এ-এস প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। তাহদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ফরাসী সৈন্যরা যদি এমন কিছু করে যাহাতে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘিত হয়, তাহা হইলে আলজেরিয়া আবার গরিলা যুদ্ধের ব্যাপক ক্ষেত্রে পরিণত হইবে। গুপ্ত সামরিক চক্র এইরূপ অবস্থা সৃষ্ট হওয়ারই যে প্রত্যাশা করিতেছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। তাহাদের এই প্রত্যাশা যদি ব্যর্থও হয় তাহা হইলেই যে সহজে আলজেরিয়ার শান্তি চুক্তি কার্য্যকরী করা সহজ হইবে, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। অন্তর্ব্বর্ত্তী অস্থায়ী সরকারের কাজকর্ম্ম সর্ব্বপ্রকারে ব্যাহত করিবার জন্য ও-এ-এস ত্রুটি করিবে না। এই উদ্দেশ্যে গুপ্ত সামরিক চক্র আলজেরিয়ার অভ্যন্তর ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সশস্ত্র দল সৃষ্টি করিয়াছে। ফরাসী সৈন্যদের সাহায্য পাইলে আলজেরীয় মুক্তিফৌজ এই সকল সশস্ত্র দলকে ধ্বংস করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। ফরাসী সৈন্য ও পুলিস বিভাগে ও-এ-এসের প্রভাবের কথা এক্ষেত্রেও স্মরণ রাখা আবশ্যক। কাজেই যুদ্ধবিরতি হইলেও আলজেরিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না সে-সম্বন্ধে বলা খুব কঠিন। ও-এ-এসের কার্য্যকলাপের ফলে স্বাধীন আলজেরিয়ার অবস্থা কঙ্গো অপেক্ষাও গুরুতর

আক্রান্ত ধারণ করে এবং আলজেরিয়া যদি ইউরোপীয় ও মুসলিম এই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলেও বিস্ময়ের বিষয় হইবে না।

সুহরাবর্দীর গ্রেফ্‌তারে প্রতিক্রিয়া—

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুহরাবর্দীর দেশের ভিতরের এবং বাহিরের পাকিস্তানী বিরোধীদের সহিত প্রকাশ্যে মেলামেশার অভিযোগে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হওয়া অদৃষ্টের যেন এক নিদারুণ পরিহাস। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি কলিকাতায় বৃহৎ হত্যাযজ্ঞের পুরোধা ছিলেন ভাগ্যবিড়ম্বনায় তাঁহার বিরুদ্ধেই পাকিস্তানের ঐক্য ও নিরাপত্তা বিরোধী কার্য্য কলাপের অভিযোগ উঠিয়াছে। আবার এই গ্রেফতারের ফলেই মিঃ সুহরাবর্দী জীবিত অবস্থাতেই পাকিস্তানে শহীদের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন। গত ৩০শে জানুয়ারী পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইন অনুসারে গ্রেফতার হওয়ার পর ১লা ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে ধর্মঘট করেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ স্বয়ং ঐ সময় ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ মনুস্তর কাদের ঢাকায় ছাত্রসভায় যথেষ্ট নাজেহাল হন এবং তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত সরিয়া পড়িতে হয়। নিরাপত্তা আইন অনুসারে মিঃ সুহরাবর্দী এখনও পাকিস্তান বিরোধীদের সহিত প্রকাশ্যে মেলামেশা করিতেছেন বলিয়া সরকার তাঁহাকে গ্রেফতার ও আটক করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ব হইতেই সকলে জানেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য মিঃ সুহরাবর্দী এমন সব কার্য্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন যাহা অত্যন্ত ক্ষতিজনক এবং একথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, ১৯৫৮ সালের শেষার্দ্ধে পাকিস্তান যে সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়াছিল তাহার জন্য আরও কয়েকজনের সহিত তিনি অনেকখানি দায়ী। মিঃ সুহরাবর্দী এবং তাঁহার মত লোকেরা যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে পাকিস্তান গুরুতর বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে বসিয়াছিল এবং উহাই বিপ্লবের কারণ।" উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে, "তাঁহার উচ্চ আশার কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। পাকিস্তানের ঐক্য ও নিরাপত্তা বিরোধী কাজ তিনি করিয়াই যাইতে থাকেন। দেশের ভিতরের এবং বাহিরের পাকিস্তান বিরোধীদের সহিত তিনি সম্পর্ক বজায় রাখেন।"

পাকিস্তান সরকারের উল্লিখিত বিবৃতির মধ্যে নিরাপত্তা আইন অনুসারে মিঃ সুহরাবর্দীকে গ্রেফ্‌তার করার যে কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে কোন অস্পষ্টতা নাই বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, পাকিস্তান সৃষ্টির সময় হইতেই অর্থাৎ ১৪ বৎসর ধরিয়া যিনি রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক কার্য্য করিয়া আসিতেছেন সামরিক শাসনের তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয় নাই কেন?' দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানে শীঘ্রই নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে সামরিক শাসনের বর্ত্তমান রূপের পরিবর্ত্তন হইবে। এই অবস্থায় নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের প্রাক্কালে মিঃ সুহরাবর্দীকে গ্রেফতার করা হইল কেন? এই দুইটি প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় না। তা ছাড়া মিঃ সুহরাবর্দীর বিরুদ্ধে পাকিস্তান-বিরোধীদের সহিত মেলামেশা করার যে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে এই পাকিস্তান-বিরোধী কাহারা তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। পাকিস্তানের সরকারী কর্মচারী মহলে পাকিস্তান বিরোধী বলিতে নাকি ভারতীয়দেরই বুঝাইয়া থাকে। যে-সকল কম্যুনিষ্ট দেশে যাওয়ার জন্য পাকিস্তানী পাশপোর্ট দেওয়া হয় না, পুলিশী ভাষায় সেই সকল দেশও নাকি পাকিস্তান বিরোধী। কিন্তু রাশিয়া ও চীনের সহিত বর্ত্তমানে পাকিস্তানের মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে বলিয়াই তো মনে হয়। খান আবদুল গফুর খান বিনা বিচারে আটক রহিয়াছেন। তিনি ভারতের অনুরাগী ইহা-ই নাকি তাঁহার বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ। মিঃ সুহরাবর্দী ভারতীয়দের সহিত মেলামেশা করিয়া থাকেন ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। তিনি বরং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত অনুরাগী। সম্প্রতি তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিলেন এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে সেখানে অনেকদিন ছিলেন। করাচীস্থিত প্রাক্তন মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ উইলিয়ম রাউণ্ট্রিকে এক বিদায় ভোজে আপ্যায়িত করিবার জন্য তিনি আয়োজন করিয়াছিলেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী এই বিদায় ভোজের দিন স্থির করা হইয়াছিল। কিন্তু ৩০শে জানুয়ারী তারিখেই তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার হওয়ার মাত্র দুই দিন পূর্ব্বে মিঃ সুহরাবর্দী পূর্ব্ব পাকিস্তান ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কোন কোন পাকিস্তানী নাকি মনে করিতেন যে, প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর পূর্ব্ব পাকিস্তান সফরের সময় মিঃ সুহরাবর্দী হয়ত সেখানে একটা বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিবার জন্যই মিঃ সুহরাবর্দীকে গেফতার করা হয়। ইহাই যদি তাঁহাকে গ্রেফতার করার কারণ হয়, তাহা হইলে ফল বরং বিপরীতই হইয়াছে। তাঁহার গ্রেফতারের প্রতিবাদ ছাত্র ধর্মঘট হইতেই আরম্ভ হয় এবং ক্রমে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানেই একটা বিক্ষুব্ধ অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে। পাক-প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ ঢাকায় মিঃ সুহরাবর্দীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন যে, যাহারা পাকিস্তানের বিরোধী তাহাদের নিকট হইতে মিঃ সুহরাবর্দী অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শত্রুদের এজেন্টদের সহিত সহযোগিতায় এই অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে এরূপ লোক আছে পূর্ব পাকিস্তানকে ধ্বংস করাই যাহাদের উদ্দেশ্য। পাক-প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ এমন কথাও বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের হাতে এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে যে, প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানকে এবং পরে অবশিষ্ট দেশকে ধ্বংস করাই মিঃ সুহরাবর্দীর লক্ষ্য। তাঁহার এই উক্তি সম্বন্ধে কোন কথাই বলা সম্ভব নয়। হেবিয়াস কার্পাসের দরখাস্ত করার সময় মিঃ সুহরাবর্দীর ব্যবহারজীবীরা এই যুক্তি উপাপন করেন যে সরকারের হাতে প্রমাণ থাকিলে তাহা উপস্থিত করা হউক এবং উহার উত্তর দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হউক। ঢাকার ছাত্রসভায় পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে নাকি জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, মিঃ সুহরাবর্দীকে মন্ত্রীর পদ দিতে চাওয়া হইয়াছিল কি না। পাক-পররাষ্ট্র মন্ত্রী নাকি উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন।

মহাশূন্যে মার্কিণ নাগরিক—

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬২) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বপ্রথম মহাশূন্যে পৃথিবীর চারিদিকস্থ কক্ষপথে ভ্রমণের জন্য মানুষ প্রেরণ
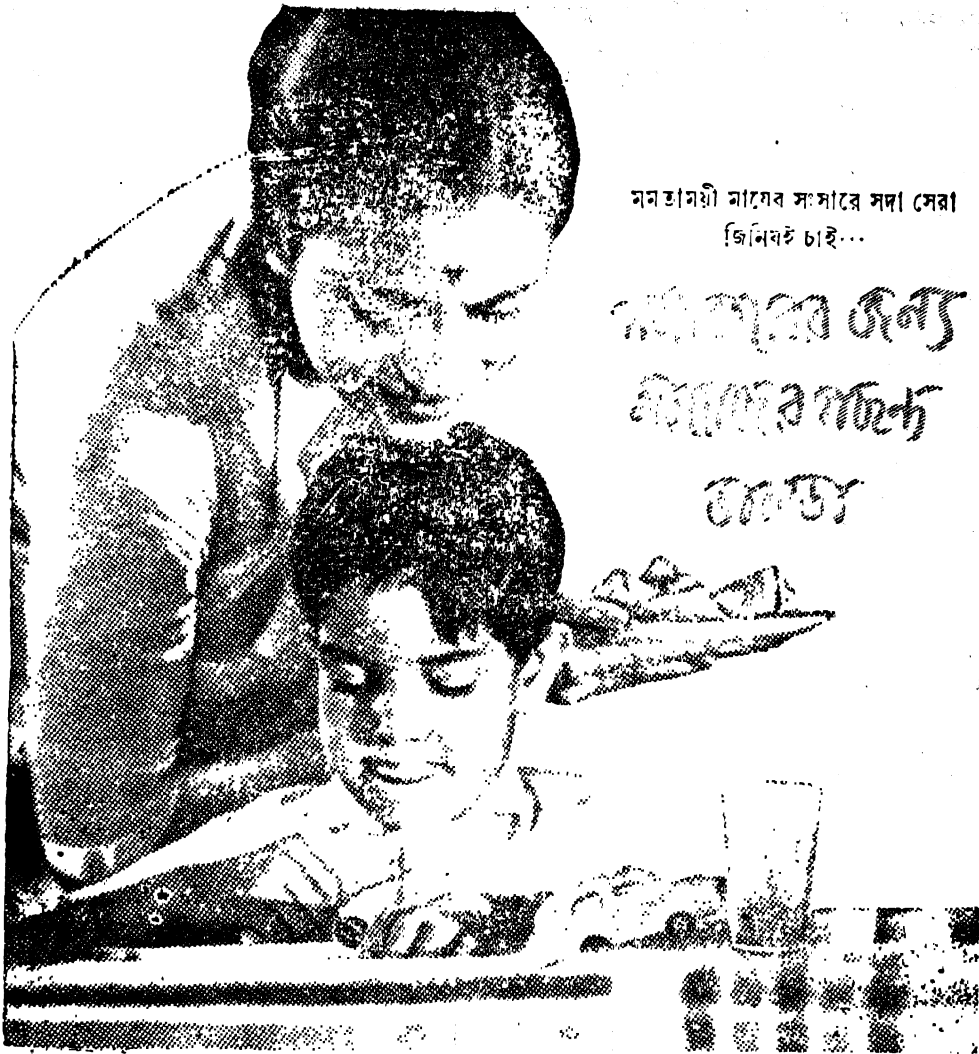
মমতাময়ী মায়ের সংসারে সদা সেরা
জিনিষই চাই…

মায়ের বুকের সবটুকু ভালবাসা দিয়ে, মা তাঁর সন্তানকে গড়ে তোলেন। ভালবাসেন বলেইতো মা কেবল ভাল জিনিষই এদের দিতে চান। সব ব্যাপারেই মা সেরা পথই ভালবাসেন। রান্নার বেলাতেও মায়েদের কেবল ডালডা-ই পছন্দ। ডালডায় রাঁধা ডাল তরকারী খেয়ে সবার তৃপ্তি।… সবচেয়ে সেরা ভেষজ তেল থেকে ডালডা তৈরী। শিশুর দৈহিক পুষ্টি সাধনের প্রয়োজনীয় উপাদান ভিটামিনও এতে রয়েছে। মায়ের হাতের মিষ্টি রান্নায় ডালডা খাবারকে আরও সুস্বাদু করে তোলে। রেঁধে তৃপ্তি, খেয়ে আনন্দ—তাই আপনার বাড়ীতেও আজ থেকে ডালডা-ই চাই।

ডালডা বনস্পতি - রান্নার খাঁটি, সেরা স্নেহপদার্থ

DL. 70A-X52 BQ

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

করিতে সমর্থ হয়। মার্কিণ বৈমানিক কর্ণেল জন গ্লেনকে ২০শে ফেব্রুয়ারী ২টা ৪৭ মিনিটের সময় (ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম রাত্রি ৮টা ১৭ মিঃ) একটি এটলাস রকেটযোগে মহাশূন্যে প্রেরণ করা হয়। তিনি ৪ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে মহাশূন্যে তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মহাকাশ ভ্রমণের তিনিই তৃতীয় যাত্রী, মহাকাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণে সর্ব্বপ্রথম মানুষ প্রেরণ করে রাশিয়া। ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল সোভিয়েট রাশিয়ার কোন অঞ্চল হইতে মস্কো সময় ৯টা ৭ মিনিটের সময় রুশ নাগরিক মেজর ইউরি আলেক্সিভিচ গ্যাগারিণ মহাকাশ যান ভোষ্টকযোগে মহাকাশে প্রেরিত হন। তিনি ১০৮ মিনিট কাল মহাকাশে অবস্থান করিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ কক্ষপথে একবারের কিছু বেশী পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। রাশিয়া মহাকাশে প্রথম মানুষ প্রেরণের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দুইবার মহাকাশে মানুষ প্রেরণ করে। কিন্তু তাঁহারা কেহ-ই মহাকাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারেন নাই। গত ৫ই মে (১৯৬১) কমাণ্ডার এলেন শেফার্ড এবং ২১শে জুলাই তারিখে ক্যাপ্টেন ভার্জিল গ্রিসম মহাকাশে প্রেরিত হন। তাঁহারা উভয়েই মহাশূন্যে পৌছিবার ১৫।১৬ মিনিট পরেই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর মহাশূন্যে মানুষ প্রেরণে রাশিয়া দ্বিতীয়বার সাফল্য লাভ করে। দ্বিতীয়বারের সাফল্য প্রথম বারের সাফল্যকেও বহু দূরে ছাড়াইয়া যায়। গত ৬ই আগষ্ট (১৯৬১) মস্কো সময় সকাল নয়টায় রুশ নাগরিক মেজর গেরম্যান টিটোভকে মহাকাশ যান ২নং ভোষ্টকে করিয়া মহাকাশে প্রেরণ করা হয়। তিনি ২৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিট কাল মহাকাশে থাকিয়া ১৭বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

মহাকাশ বিজয়ে রাশিয়া এখনও অগ্রবর্ত্তী থাকিলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার প্রায় সমকক্ষ হইতে চলিয়াছে। মহাকাশ বিজয়ের জন্ত হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারীকে অভুক্ত, অর্দ্ধনগ্ন, রোগক্লিষ্ট রাখিয়া মহাকাশ জয়ের জন্ত এই যে আয়োজন তাহা বৈজ্ঞানিক বিলাসিতা বলিয়া মনে হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। কিন্তু মহাকাশ জয়ের একটা সামরিক এবং রাজনৈতিক সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা আছে, সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। মহাকাশে মানুষ প্রেরণ করিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণের পর তাহাকে আবার যথাস্থানে ফিরাইয়া আনিতে পারায় বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীর যে-কোন স্থানে অনায়াসে পরমাণু বোমা বর্ষণ করা যাইতে পারে। তাছাড়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাশিয়ার এই অগ্রগতি আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে, প্রমাণিত করিয়াছে কম্যুনিষ্টদেশে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইতে পারে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যে কর্ণেল জন গ্লেনকে রুশ প্রধান মন্ত্রী যে অভিনন্দন জানাইয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের মহাকাশ পরিভ্রমণের শক্তি ও অভিজ্ঞতা একত্রীভূত করিয়া বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও মানব-কল্যাণের জন্ত নিয়োজিত করুক, ঠাণ্ডাযুদ্ধের প্রয়োজনে যেন নিয়োজিত না হয়। রুশ প্রধানমন্ত্রীর এই প্রস্তাব খুবই চমৎকার। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হইলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইবে। এক সময়ে পরমাণু বোমার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ছিল একচেটিয়া অধিকার। রাশিয়া পরমাণু অস্ত্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই একচেটিয়া অধিকারকে বিনষ্ট করিয়াছে। মহাশূন্য পরিক্রমায় এতদিন রাশিয়াই ছিল অগ্রবর্ত্তী। এখন আমেরিকাও রাশিয়ার প্রায় সমকক্ষ হইয়াছে। এখন উভয়ের মিলিত ভাবে এই শক্তিকে যদি মানুষের কল্যাণের জন্ত নিয়োজিত করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা সম্ভব হইবে, ইহা আশা করা স্বাভাবিক।

সিংহলে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ—

গত ২৭শে জানুয়ারী (১৯৬২) গভীর রাত্রে সিংহলে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। সৈন্ত বিভাগ, নৌবিভাগ, এবং পুলিশ বিভাগের বড় বড় অফিসাররাই যে এই ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন তাহা যাঁহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে তাঁহাদের পদমর্য্যাদা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ষড়যন্ত্রকারীরা স্থির করিয়া ছিলেন যে, ২৭শে জানুয়ারী মধ্য রাত্রের পর মন্ত্রিসভার সদস্যগণ এবং অন্যান্ত রাজনৈতিক নেতাদিগকে গ্রেফতার করা হইবে। সেই সঙ্গে ইহাও স্থির করা হয় যে, যে-সকল মন্ত্রী কলম্বোর বাহিরে আছেন তাঁহারা যাহাতে রাজধানীতে ফিরিতে না পারেন তাহার জন্তও ব্যবস্থা করা হইবে। সৌভাগ্যবশতঃ ষড়যন্ত্র কার্য্যকরী করিবার অল্প সময় পূর্ব্বে উহার সংবাদ পাওয়া যায় এবং তড়িৎ-গতিতে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা হয়। প্রতিনিধি পরিষদে অর্থ মন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় গবর্ণর জেনারেল স্যার অলিভার গুণতিলক এবং প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী স্যার জন কোটেলাওয়ালা এবং মিঃ ডাডলী সেনানায়কের মত ব্যক্তিও এই ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত ছিলেন। চরম দক্ষিণ-পন্থীরাই এই ষড়যন্ত্রের মূলে রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ক্যাথলিকদেরও এই ষড়যন্ত্রে হাত আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। ক্যাথলিক স্কুলগুলি সরকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং সরকারের কতগুলি কার্য্যধারা মিশনারীদের অসুবিধা হইয়াছে। ষড়যন্ত্রের নেতা বলিয়া যাঁহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে তাঁহাদের অনেকেই ক্যাথলিক।

শরৎচন্দ্রের আত্মকথা

"যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য; সেখানে সবাই চায় পাস করতে এবং উকীল হতে; এরি মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মধ্যেও বিপর্য্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ; কাব্যে আসক্তি; বাড়ীর মেয়েদের জড় ক'রে তিনি একদিন পড়ে শুনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ।' কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলাম।" —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ইংলণ্ডের একটি নাট্য আন্দোলন

ষোড়শ শতাব্দী থেকে আজ পর্য্যন্ত ইংরেজী নাট্য-সাহিত্যে যত উন্নতি হয়েছে তাতে আইরিশ নাট্য আন্দোলন এবং ইংলণ্ডের বিকেন্দ্রীকরণের (Repertory Movement) দান বড় কম নয়। সেক্সপীয়রের সময় থেকেই ইংরেজী নাটক বলতে শুধু ইংলণ্ডে মঞ্চস্থ নাটককেই বোঝাত। নাট্যকাররা ইংলণ্ডে নাটকের একচেটিয়া অভিনয়কে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতেন। তখন ইংলণ্ডে নাটক মঞ্চস্থ হোত শুধুমাত্র লাভের অঙ্কের দিকে চোখ রেখে।

কিন্তু ডাবলিনের আইরিশ নাট্যশালা থেকে একটা বলিষ্ঠ মতবাদের প্রভাব এসে লণ্ডনের এ একচেটিয়া অভিনয়কে বাধা দেয়। ঠিক এই সময়েই ইংলণ্ডে এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলনে (Repertory Movement) যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে লণ্ডনের মিস হর্নিমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৪ সালে লণ্ডনের এভিনিউ নাট্যমঞ্চে এরই সাহায্যে কিছুদিন ধরে অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে আর্থিক সাফল্য না হলেও এর থেকেই ইবসেন শ' আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। দশ বছর পরে তাঁরই প্রচেষ্টায় ডাবলিন শহরে এ্যাবী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গ্রেটবৃটেনে ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আধুনিক আন্দোলনের নাট্যশালা। প্রায় দশ বার বছর পর্য্যন্ত মিস হর্নিম্যানের এই দলটি আন্দোলনের গতি অব্যাহত রাখেন।

এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য যে শুধুমাত্র অর্থপিশাচদের হাত থেকে নাট্যশালাকে বাঁচানো ছিল, তা নয়; নাট্যসাহিত্যের কতকগুলি নিয়মও এরা প্রচার করেন। প্রথমত: নাটকের প্রাণহীন দীর্ঘ গতি শ্রোতাদের বিরক্ত করে বলে গতিকে সীমাবদ্ধ করা হয়। তারপর নজর দেওয়া হয় অভিনেতা দলের উপর। নির্দিষ্ট অভিনেতা না থাকলে কখনও দলীয় শক্তি বৃদ্ধি পায় না। তৃতীয়ত: অধিক শ্রোতার অভাবে যে ভাল নাটকের অভিনয় বন্ধ ছিল সেটিও চালু করা হয়। এতে আর্থিক লাভের যে ভুল ধারণা ছিল সেটি পরিবর্তিত হয়।

১৯০৪ থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে এই আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয় লণ্ডনের কোর্ট থিয়েটারে অভিনয়ের পর। এই আন্দোলনের কর্ণধার ছিলেন জে, ই, ভেড্রেনি ও গ্র্যানভিল বার্কার। অল্প দিনের মধ্যে এখানে প্রায় বত্রিশটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। এ সাফল্যলাভের মূলে ছিল শ'-এর অত্যধিক জনপ্রিয়তা। এরপর থেকে মানুষের প্রয়োজনের দিকে চোখ রেখে নাটকও বদলাতে থাকে। এ্যাবী ও কোর্ট থিয়েটারের এ প্রভাব এসে ম্যাঞ্চেষ্টারেও ছায়াপাত করে। ১৯০৮ সালে হর্নিম্যান যখন তাঁর আন্দোলন শুরু করেন তখন দেশীয় নাটক পাওয়া যায়নি একটাও। এই কারণেই ১৯১২ সালে ম্যাঞ্চেষ্টারে নাট্যকারদের জন্যে একটি শিক্ষালয় খোলা হয়। এই শিক্ষালয় থেকেই জন্মলাভ করেন আলান মঙ্ক হাউস, হ্যারল্ড ব্রাই হাউস, ষ্ট্যানলী হাউটন প্রমুখ নাট্যকাররা।

এই আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডের প্রতিটি প্রদেশে নাটক ছড়াতে থাকে। বড় বড় শহরে যেমন অসংখ্য নাটক সফলতার সঙ্গে অভিনীত হতে থাকে, গ্রাম-গ্রামান্তরেও তেমনি অপেশাদারী দল দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করতে শুরু করেন। ঠিক এই ভাবেই এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ইংলণ্ড থেকে স্কটল্যাণ্ডে, স্কটল্যাণ্ড থেকে ওয়েলসের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত।

—শৈলেনকুমার দত্ত

বিপাশা

বিচিত্র এই ধরণীর রঙ্গমঞ্চ। নিত্যকাল ধরে তার বুকের উপর চলেছে ভাঙাগড়ার খেলা। কখনো দেখা যায় এক দমকা ঝড়ের বেগে তাসের ঘরের মত সব কিছু খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, কখনো দেখা যায় নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা পরিপূর্ণ সফলতার সম্মুখীন। কখনো দেখা যায় রাহুগ্রাসে আকাশ অন্ধকার, কখনো দেখা যায় স্নিগ্ধ কিরণে আকাশ আর পৃথিবী একাকার হয়ে গেছে। কখনো দেখা যায় কেবল দুঃখ, বেদনা, ব্যথার ত্রিবেণীসঙ্গম, কখনো দেখা যায় আনন্দ, পরিপূর্ণতা, সার্থকতার মিছিল। এইভাবে অনাদিকাল থেকে চলেছে ভাঙাগড়ার লীলা আর এই ভাঙাগড়ার লীলাখেলা থেকেই চিরন্তনের সৌধ গড়ে ওঠে।

'বিপাশা' ছবির গল্পাংশের মধ্যে এই ভাঙাগড়ার লীলাখেলা দেখা যায়। আঘাত, সংঘাত, প্রতিঘাত সবশেষে এক উজ্জ্বল পরিণতি। আঘাত, বেদনা ব্যথাই কাহিনীকে নিয়ে যায় সেই উজ্জ্বল পরিণতির দিকে। দিব্যেন্দু আর বিপাশার মধ্যে দিয়ে জীবনের এক বিচিত্র আলেখ্য ফুটে ওঠে। এক অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে প্রত্যক্ষ করার সাক্ষ্য বিপাশার কাহিনী। বিপাশার কাহিনী রচয়িতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিব্যেন্দু আর বিপাশা দুটি সংঘাতশীল চরিত্র ঘটনাচক্রে দু'জনের দেখা হল, নীরব চাহনির মধ্যে অনেক কিছু বলা হয়ে গেল। তারপর সংঘাত শুরু, শেষে মধুময় পরিণতি। দিব্যেন্দু আর বিপাশার জীবনেতিহাস বলতে গেলে একই ভাষ্য সৃষ্টি করবে। তাদের জীবনের মূলমন্ত্রও পৃথক নয়, "মোদের লগ্ন সপ্তমে ভাই, রবির অট্ট হাসি জন্মতারকা হয়ে গেছে ধূমকেতু"—কথাটি যাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য বোধ করি এরা তাদেরই এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

এই কাহিনীর চিত্ররূপ সাধারণ দর্শককে কতখানি পরিতৃপ্ত করবে সে সম্বন্ধে আমাদের মন সংশয়মুক্ত নয়। ছবিটিকে অযথা দীর্ঘ করে দর্শকের মনের আগ্রহকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি

ঘটনাকে অযথা এত বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যার ফলে ছবিটি ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কষ্ট কল্পনার ছাপ অনেক ভাবে চোখে পড়ে, ছবিটি পরিচালনার দিক দিয়ে কোন বৈশিষ্ট্য বা অভিনবত্ব প্রদর্শন করতে পারে নি। চিত্রনির্মাণের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ছবিতে নিপুণতা বা কুশলতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অগ্রদূত।

অভিনয়াংশে বিপাশার ভূমিকায় সুচিত্রা সেন অনবদ্য অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। উত্তমকুমারের অভিনয়ও সর্বতোভাবে অভিনন্দনীয়। ছবি বিশ্বাসের অভিনয় তুলনাহীন। ছোট ভূমিকায় কমল মিত্র ও নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব সমন্বিত। এঁরা ছাড়া পাহাড়ী সান্যাল, জীবেন বসু, তুলসী চক্রবর্তী, কেতকী দত্ত, লিলি চক্রবর্তী প্রভৃতি শিল্পীরাও আশানুরূপ অভিনয়ই করেছেন।

কাঁচের স্বর্গ

মানুষের গড়া কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি দিয়ে যে আইন তৈরী—সেই আইনই সব কিছুর শেষ নয়। সত্য ও নিষ্ঠার সমন্বয়ে যে মানবতার জন্ম, তার আবেদন অনেক উর্ধ্বে। বাস্তব জগতে সাধারণ মানুষের পক্ষে আইনের নির্দেশকে উপেক্ষা করার উপায় নেই, কিন্তু তা সত্বেও মানবতার গরিমায় এতটুকু ম্লানিমা লাগে না। আনন্দ, হাসি, বিরহ-বেদনার অন্তরালে সব কিছুর উর্ধ্বেই মানবতার অবস্থিতি, তার বাণী অলঙ্ঘ্যনীয়। সেই মানবতার জয়গানই কাঁচের স্বর্গ ছবিটির মধ্যে বিঘোষিত হয়েছে। মানুষের তৈরী বিধি-বিধান, আইন অনুপেক্ষণীয় হলেও হৃদয়ধর্মের আবেদনও যে সর্বতোভাবে অনস্বীকার্য—সেই সার সত্যটিকেই এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মানুষের বিচারের একমাত্র মাপকাঠি কেবলমাত্র একখানি কাগজই নয়, তার বিচারের প্রধান মাপকাঠি তার কর্ম, তার হৃদয়, তার নিষ্ঠা—এই বক্তব্যই প্রচারিত হয়েছে ছবিটির মাধ্যমে।

ছবির কাহিনী রচয়িতা এবং পরিচালক যাত্রিকগোষ্ঠী। এই তরুণ পরিচালকগোষ্ঠী সকল দিক দিয়ে দেশবাসীর অভিনন্দন লাভ করবেন। ছবিটির সকল ক্ষেত্রে প্রতিটি অংশে তাঁরা যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি দৃশ্য গ্রহণের পিছনে তাঁদের যথেষ্ট চিন্তার ছাপ পাওয়া যায়। আঙ্গিকে, বিন্যাসে এবং রূপায়ণে কাঁচের স্বর্গ এক সর্বাঙ্গীণ সফলতার অনবদ্য স্বাক্ষর। ছবিটির মধ্যে কোথাও ফাঁকি নেই, কোথাও ছলনা নেই, কোথাও শূন্যতা নেই। ছবিটিতে পরিচালকগোষ্ঠী বহুল পরিমাণে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আরোপ করেছেন। ছবিটি দর্শককে বিশেষ ভাবে ধরে রাখে, এর আবেদন দর্শকের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করে এবং মনে এক স্থায়ী রেখাপাত করে। এঁদের গল্প বলার ভঙ্গীটি এক কথায় চমৎকার। এক ভাগ্যবিড়ম্বিত চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী তরুণকে কেন্দ্র করে ছবির কাহিনী, ঘটনাচক্রে এক মামলায় সে জড়িয়ে পড়ে। সেই মামলার রায়দান এবং বিচারপতির মন্তব্যে কাহিনীর পরিণতি। বিচারপতির মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে ছবির আসল বক্তব্যটি প্রচারিত হয়েছে। আজকের দিনে যেভাবে ক্রমাগত কুৎসিত, ন্যক্কারজনক ও রুচিবর্জিত ছবি প্রদর্শিত হয়ে চিত্রজগতে তথা সমাজে এক দূষিত আবহাওয়া সৃষ্টি করছে 'কাঁচের স্বর্গ'র মত পরিচ্ছন্ন, সর্বাঙ্গসুন্দর এবং বলিষ্ঠ ছবির প্রদর্শন যদি চলতে থাকে, তাহলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সেই দূষিত আবহাওয়া দূর হবেই।

নায়কের ভূমিকায় অন্যতম 'যাত্রিক' দিলীপ মুখোপাধ্যায় অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করবেন। তাঁর অভিনয় সারা ছবিকে যে কতখানি শ্রীসম্পন্ন করে তুলেছে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এঁর পরেই উল্লেখ করা যায় পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার এবং মঞ্জু দের নাম। একেবারে শেষ অংশে ছবি বিশ্বাস ও অসিতবরণের অভিনয়ও নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যবান। বিকাশ রায়ের অভিনয় অনবদ্য। অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অভিনন্দনীয়। এঁরা ছাড়া অমর মল্লিক, উৎপল দত্ত, সন্তোষ সিংহ, সবিতাব্রত দত্ত, শিশির বটব্যাল, শিশির মিত্র, তমাল লাহিড়ী, দিলীপ রায়চৌধুরী, ধীরাজ দাস, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল মজুমদার, ছায়া দেবী, গীতা দে, মঞ্জুলা সরকার, আরতি দাস প্রভৃতি শিল্পিবর্গ বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ ক'রে সুঅভিনয়ই করেছেন।

সুশীল মজুমদার পরিচালিত "সঞ্চারিণী" ছবির একটি দৃশ্যে বসন্ত চৌধুরী ও কণিকা মজুমদার।

সংবাদ-বিচিত্রা

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' নাটকটির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই। ছায়াছবিতে রূপায়িত হয়েও উল্কার জনপ্রিয়তা বর্ধিতই হয়েছে। তাকে চিত্রে রূপ দিয়েছিলেন স্বয়ং নরেশচন্দ্র মিত্র। বর্তমানে মাদ্রাজের ম্যাজেষ্টিক

ষ্টুডিওতে 'থায়ি কারুলু' নামে যে ছবিটি নির্মীয়মাণ তার চিত্রনাট্য উহাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। রাজকুমার, লীলাবতী, কল্যাণকুমার, বালকৃষ্ণ নরসিংহরাজু প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন। প্রসঙ্গতঃ যে তথ্যটি বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয় যে এই প্রথম একটি বাঙলা গল্পকে অবলম্বন করে একখানি কানাড়ী ছবি রূপ নিচ্ছে। এর আগে কোন কানাড়ী ছবির চিত্রনাট্য কোন বাঙলা কাহিনীকে উপজীব্য করে গড়ে ওঠে নি।

ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় চিত্রতারকা দেব আনন্দ এখন যে ছবিটির প্রযোজনা নিয়ে ব্যস্ত আছেন তাতে নায়কের ভূমিকায়ও তিনিই দেখা দেবেন। তাঁর সঙ্গে নায়িকার ভূমিকায় দর্শকদের অভিবাদন জানাবেন প্রসিদ্ধ চিত্রতারকা নূতন সমর্থ। দেব আনন্দের অনুজ বিজয় আনন্দের পরিচালনায় গৃহীত এই ছবিটির, সম্পর্কে একটি বিশেষ খবর আছে। এই ছবিতে একটি পার্শ্ব চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করবেন একজন বিশিষ্ট ভারতীয় কবি। কবি, গায়ক, অভিনেতা হিসেবে তাঁর সমান দক্ষতা। তিনি স্বনামধন্য হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইংরাজী ভাষায় রচনা করে যে বাঙালী তথা ভারতীয়ের দল যশ অর্জন করেছেন ইনি তাঁদেরই অন্যতম। মনস্বিনী সরোজিনী নাইডু এঁর অগ্রজা।

পাঠক সাধারণ আশা করি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে এ বছর প্রজাতন্ত্রদিবসে বিখ্যাত চিত্রনায়ক অশোককুমার রাষ্ট্রীয় সম্মানে বিভূষিত হয়েছেন। বাঙলার বাইরে জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে যিনি এক অভূতপূর্ব বিস্ময়ের স্রষ্টা সেই সার্থকনামা শিল্পীর সম্মান প্রাপ্তিতে বোম্বাইয়ের ফিল্ম জার্ণালিষ্ট য্যাসোসিয়েশান তাঁকে এক সম্বর্ধনায় অভিনন্দিত করেন। প্রতিভাষণে শিল্পী তাঁর জীবনে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সহায়তা ও সহযোগিতার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন।

আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেল ইউনিয়নের উদ্যোগে চার দিনব্যাপী এক চলচ্চিত্র সমারোহ অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় ৮ই ফেব্রুয়ারী। পূর্ব জার্মাণী, সোভিয়েট রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড এই চারটি দেশের ছবি দেখানো হয়। ছবিগুলি লোটাস প্রেক্ষাগৃহে, আর, জি, কর হোষ্টেলে এবং চেকোশ্লোভাকিয়া প্রতি ভবনে প্রদর্শিত হয়।

ভারত এবং সোভিয়েট রাশিয়ার যৌথ প্রযোজনায় একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে। ছবিটি ভারত এবং সোভিয়েট রাশিয়ার যৌথসৃষ্টি বলে গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে ভারতের অন্যতম প্রখ্যাত চিত্রনির্মাতা ফিল্মালয় এর পক্ষ থেকে রণ মুখোপাধ্যায় চিত্রনাট্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শেষে করে রাশিয়া থেকে ভারতে ফিরে এসেছেন। জুন মাস থেকে এর চিত্রগ্রহণ শুরু হবে, তার আগে আশা করা যায় এ বিষয়ে আরও কথাবার্তার জন্যে উজবেক ষ্টুডিওর প্রতিনিধিদের কেউ কেউ ভারতে একবার আসতে পারেন, এখন শোনা যাচ্ছে যে এই ছবির জন্যে রুশীয় শিল্পীদের নির্বাচন চলছে।

সংবাদ এসেছে যে চেকোশ্লোভাকিয়ায় 'দিল্লী'কে কেন্দ্র করে একটি ছায়াছবি নির্মিত হচ্ছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন জোসেফ স্থবান। ছবিটির মধ্যে ভারতের রাজধানী দিল্লীর গৌরবময় ইতিহাস এবং তার আধুনিক জীবনধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

নির্বাচন যুদ্ধে যবনিকা পড়ল। ভারতের রাষ্ট্রীয় নির্বাচনপর্ব সমাপ্ত হল। এই নির্বাচন সম্পর্কে দক্ষিণ ভারত থেকে একটি সংবাদ এসেছে যেটি চিত্রামোদীদের কাছেও সমান উপভোগ্য। তামিলনাদ কংগ্রেস কমিটি 'ভাক্ রীমায়ি' (ইংরাজীতে এর অর্থ Franchise) নামে একটি ১৩৬৩ ফিট দীর্ঘ ছায়াছবি প্রযোজনা করেছেন। ছবির নামকরণের অর্থ অনুধাবন করলেই তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও আর কোন অস্পষ্টতা থাকে না। নির্বাচন সম্বন্ধে এই প্রচার চিত্রটিতে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অবতরণ ছবিটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। তাঁদের নাম পাণ্ডারীবাঈ, দেবিকা, জি সাবিত্রী, শার্ঙ্গপানী, সুন্দরম্বল প্রভৃতি।

সম্প্রতি সৌন্দর্যময়ী অভিনেত্রী জেন ম্যানস্ফিল্ডের (৩১) সম্বন্ধে এমন একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যা চিত্রামোদীদের মধ্যে যথেষ্ট আশঙ্কার সঞ্চার করেছিল। তাঁর স্বামী মিকি হ্যার্গিটের সঙ্গে নৌকাভ্রমণের সময় তাঁরা নাকি নিখোঁজ হয়ে গেছেন। সহস্র অনুসন্ধান সত্ত্বেও তাঁদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সর্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। দু'একদিনের মধ্যেই সেই আশঙ্কার অবসান ঘটল যখন শোনা গেল যে জেন এবং মিকির সন্ধান পাওয়া গেছে। বাহামায় এই নৌকাডুবি ঘটেছিল এবং নাসাউয়ের পাঁচ মাইল উত্তর পূর্বে রোজ আইল্যাণ্ডে তাঁদের পাওয়া গেল। তাঁদের বিষয় অনেকে অনেক কিছুই ভেবে নিয়েছিলেন বর্তমানে তাঁদের সকলেরই আশঙ্কার অবসান হল।

চিত্রামোদীদের দল জেনে নিশ্চয়ই আনন্দলাভ করবেন যে ভারতের অন্তর্গত মহীশূরের নিকটবর্তী এক বার্ড স্যাঙচুয়ারী টার্জন চিত্রের চিত্র গ্রহণ কেন্দ্র বলে স্থির হয়েছে। টার্জন চিত্রের বিশ্বব্যাপী সমাদরের সম্বন্ধে আজ নতুন করে বলার কিছু নেই। ভারতবর্ষে এবার তার চিত্রগ্রহণ হবে। ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছে "টার্জান গোস টু ইণ্ডিয়া" সুতরাং এই ছবিটিতে ভারতবর্ষ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে নবাগতা সিমি, মোরাদ, জগদীশ রাজ, ফিরোজ খাঁ প্রভৃতিকে এই ছবির শিল্পীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

হলিউডের প্রখ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী পিয়ের এঞ্জেলি (৩০) সম্প্রতি লণ্ডনে ব্যাণ্ড দলের পরিচালক আর্মান্দো ট্রোভাজোলির সঙ্গে

বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি "বধূ"-র অন্যতম নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়।

পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। আর্মান্দো ইতালীর অধিবাসী। এই তাঁর প্রথম বিবাহ। মার্কিণ গায়ক ভিক ডেমন ছিলেন পিয়েরের প্রথম স্বামী।

আসন্ন ছবির গল্পাংশ : অতল জলের আহ্বান

ব্যথিতা জননীর সকরুণ হাহাকার শুধু ব্যর্থতাই বরণ করে চলে। একবার নয় বহুবার—বারংবার। মায়ের মনোবেদনা এতটুকু প্রতিক্রিয়া জাগায় না সাবিত্রীর মনে। সে আপন মনে তার কাজ করে চলে। যে কাজে কোন সংহতি নেই, যার কোন ব্যাখ্যা নেই, যার মধ্যে নেই কোন কার্য-কারণের সংযোগ, সেই কাজেই সাবিত্রী মগ্ন, সেই তার কাজ। পাড়ার ছেলেরা তাকে প্রকাশ্যে 'পাগলী' বলে ক্ষেপায় সেই ব্যঙ্গ মায়ের বুকে শেলের মত বেঁধে, কিন্তু মেয়ে নির্বিকার। সে কখনও এদিক ওদিক উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছুটে বেড়ায়, কখনও হেসে লুটোপুটি, কখনো কেঁদে আকুল।

সাবিত্রীর ছোট বোন সীতা। তার বিয়ে স্থির। আশীর্বাদের দিন সমুপস্থিত। সেদিন সাবিত্রীকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কে জানে—উন্মাদিনী কখন কি করে বসে। কিন্তু মস্তিষ্ক তার বিকৃত হলেও যৌবনে তার কোন বিকৃতি নেই, বুদ্ধিবৃত্তি তার মধ্যে না জাগলেও যৌবন জেগেছে, তার হৃদয়ের আনাচে কানাচে তখন যৌবনের পদধ্বনি শ্রুত হচ্ছে। কোথা থেকে সে হঠাৎ আসরে এসে হাজির, একেবারে স্পষ্ট প্রস্তাব, বলে 'আমি বিয়ে করব।' পাত্রপক্ষ সভা ত্যাগ করেন। মায়ের ধৈর্য্য ও সহ্যের বাঁধ ভেঙে যায়। সীতার এত বড় ক্ষতি তিনি সহ্য করতে পারেন না। সেই রাতেই তিনি সাবিত্রীকে বাড়ী থেকে বার করে দিলেন। বাইরে তখন ঝড়ের প্রলয় নৃত্য চলেছে।

সীমন্ত চৌধুরীর ছেলে জয়ন্ত চৌধুরী। বিপুল বিত্তের অধীশ্বর কৃতী ব্যবসায়ীর এক মাত্র পুত্র জয়ন্ত টেলিফোনে খবর পেল তারই প্রতিষ্ঠানের গাড়ীতে চাপা পড়েছে পরিচয়হীনা এক যুবতী। তাকে হাসপাতালে পাঠাবার নির্দেশ দেয় জয়ন্ত। নির্দেশ দিয়েই সে কর্তব্য পালিত হয়েছে বলে মনে করে না। আহতাকে সে নিজে দেখতে যায়। জ্ঞান ফিরে এল মেয়েটির, কিন্তু স্মৃতি ফিরে এল না। হাতের আংটি থেকে কেবল মাত্র জানা গেল যে মেয়েটির নাম সাবিত্রী। অবশেষে সহায়হীনা ভেবেই জয়ন্ত তাকে নিজের বাড়ীতেই এনে রাখে।

বাবার উপর একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে জয়ন্তর ছিল প্রবল অভিমান আর সে অভিমানের উৎস তার মা। সেই জন্যেই অনুরাধা দেবীকে প্রথমে জয়ন্ত স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি যদিও প্রতিযোগিতায় তিনিই হয়েছেন বিজয়িনী। সীমন্তকে কেন্দ্র করে আপন অতীত জীবনের ব্যর্থতার স্মৃতি মুছে দেওয়ার জন্যেই জয়ন্ত আর নিজের মেয়ে কেটির মধ্যে এক নতুন সেতু গড়ে তুলতে চান অনুরাধা দেবী। এদিকে জয়ন্তর মহিলাহীন বাড়ীতে একটি মাত্র মহিলা সাবিত্রীর অবস্থান চলেছে।

তারপর·······?

ছবিটি পরিচালনা করেছেন অজয় কর। এর কাহিনী রচয়িত্রী স্বনামধন্যা লেখিকা শ্রীমতী প্রতিভা বসু।

আর, ডি, বনশাল প্রযোজিত ও অজয় কর পরিচালিত 'অতল জলের আহ্বান' চিত্রে তন্দ্রা বর্মণ।

সৌখীন সমাচার

চরিত্রহীন

সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্রের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি "চরিত্রহীন" অভিনীত হ'ল কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্সিওরেন্সের কর্মিবৃন্দের উদ্যোগে। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন অজয় বসু, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সারদা চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু রায়, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র চক্রবর্তী, সুনীল চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু পাল, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, রাণু রায়, সবিতা মুখোপাধ্যায়, নমিতা দত্ত প্রভৃতি।

নদ ও নদী

প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যালের 'নদ ও নদী' অভিনয় করলেন সুপ্রসিদ্ধ সানডে ক্লাব। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অভিনয় করেন গণেশ রায়চৌধুরী, সান্তকড়ি দত্ত, ভোলানাথ রায়, ফণী গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দদুলাল দাস, জ্যোতিপ্রকাশ, জিতেন মল্লিক, তারকনাথ দত্ত, শ্যাম মান্না, নন্দ দাস, রূপ ভট্টাচার্য্য, পাঁচুগোপাল দাস, বনানী চৌধুরী, গীতা দে, শীলা পাল, আশা দেবী প্রভৃতি। সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করেন প্রীতি রায়।

মমতাময়ী হাসপাতাল

বিখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়ের জনপ্রিয় নাটক 'মমতাময়ী হাসপাতাল' মঞ্চস্থ করলেন শ্রীরামপুরের খাদ্য এবং সরবরাহ বিভাগের কর্মীরা। রূপদান করেন সুবোধ গড়াই, ইন্দু চৌধুরী, রণজিৎ লাহিড়ী, শম্ভু মুখোপাধ্যায়, মৃণাল লাহিড়ী, শচীন লাহিড়ী প্রভৃতি।

জব চার্ণকের বিবি

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক ডক্টর প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের লেখনীজাত 'জব চার্ণকের বিবি' অভিনীত হল গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এবং এটলাণ্টিস (ইষ্ট) র‍্যাকিট র‍্যাণ্ড

কোলম্যান রিক্রিয়েশান ক্লাবের উদ্যোগে। উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়েছেন মণি দত্ত। রূপায়ণে ছিলেন সুশীল মুখোপাধ্যায়, কালো খাঁ, অসিত বসু, সুনীল চৌধুরী, অসিত পাল, সরোজ গুপ্ত, মিতা চট্টোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, গ্লোরিয়া ডাউংটন প্রভৃতি।

উত্তরা

নাট্যকার-অভিনেতা মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত 'উত্তরা' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন আই, জি, এস, 'রিক্রিয়েশান' ক্লাব। অভিনয় করলেন কান্তিভূষণ দত্ত, সুবোধ পাল, দিলীপ চৌধুরী, খগেন দাস, কমলেশ সরকার, ভবানী বসু, সুশীল রায়, শৈলেশ বসু, ভূপাল ঘোষাল, যতীন বসু, মুরারি ঘোষ, সমর সরকার, ফটিক সিংহ, রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা চক্রবর্তী, গীতা বসু, শ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।

মাটির ঘর

এয়ার স্পোর্টস ক্লাবের উদ্যোগে সম্প্রতি 'মাটির ঘর' নাটকটি অভিনীত হল। পরিচালনা করেন প্রদীপ কর। অভিনয়াংশে ছিলেন বি, এন, করঞ্জাই, অজিত চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস ঘোষ, প্রদীপ কর, ডি, আর, চক্রবর্তী, কেতকী দত্ত, সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপসী গুহ, রেবা চক্রবর্তী। আলোকসম্পাতে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন অনিল সাহা।

কানাগলি

হাওড়া মজলিসের সাম্প্রতিক নাট্যোপহার কানাগলি। নাটকটির রচয়িতা ভানু চট্টোপাধ্যায়। সমরেন্দ্র পাঠক, মণি মিত্র, গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়, কাজল মুখোপাধ্যায়, মনীষা রায় প্রভৃতি রূপদান করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন ভূপেন চট্টোপাধ্যায়।

মৌচোর

রূপারোপের শিল্পীগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক নাট্য নিবেদন সলিল সেনের মৌচোর। নাটকটি অভিনীত হয়েছে হুগলীর ঘুটিয়াবাজারে। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিলেন বালক করি মির্জা মহম্মদ (পরিচালক), সাবিত্রী ঘোষ, মায়া পাল, শ্রীরূপা দত্ত প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।

দিল্লীর দৃশ্যান্তর

অগুাল হোলি রিক্রিয়েশান ক্লাব হিতাংশু চট্টোপাধ্যায়ের দিল্লীর দৃশ্যান্তর নাটকটি পরিবেশন করলেন। ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, ধর্মদাস লাই, পিযূষ বাজপেয়ী, অনিল গোস্বামী, প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দেন। নাট্যকার পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন।

বাকী

ব্যারাকপুর নবদল গোষ্ঠী শ্রীবলাকা রচিত 'বাকী' নাটকটি অভিনয় করলেন। নাটকের চরিত্রগুলির রূপ দেন অমলকুমার মজুমদার, গৌরচন্দ্র কর, স্বপন সাহা, অসীমকুমার পালিত, অঞ্জন সেনগুপ্ত, পাঁচকড়ি কর্মকার, মনোরঞ্জন বণিক, গোপাল দাস, শিবশেখর সান্যাল, উত্তমকুমার সেনগুপ্ত, অশোক রায়, প্রদীপ রায় প্রভৃতি।

দ্বান্দ্বিক

অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বান্দ্বিক নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন পাইকপাড়া কল্যাণ সঙ্ঘ। শিল্পীদের মধ্যে অমলেন্দু চাকী চৌধুরী, রণজিৎ ভট্টাচার্য, মণিলাল ঘোষ, শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু শর্মা, পাঁচুগোপাল কাহার, তরুণকুমার রায়, ইন্দ্রজিৎ চাকী চৌধুরী, মাধবচন্দ্র নন্দী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নাটকটি পরিচালিত হল তপন নিয়োগীর দ্বারা।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে

শ্রীবসন্ত চৌধুরী

শিল্পের মাধ্যমেই শিল্পীর প্রকাশ। চরম বিকাশও বটে। হৃদয়ের সকল অনুভূতিকে একত্রিত করে কোন একটি বিশেষ চরিত্রের মধ্য দিয়ে মহৎ ভাবে নিজেকে বিকশিত করার মধ্যেই শিল্পী-জীবনের আনন্দ। মহত্বও। ব্যক্তিগত সুখ, দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, ঘাত-প্রতিঘাত সব কিছু ভুলে গিয়ে অভিনীত চরিত্রের মধ্যে যিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে রাখার কৌশল আয়ত্ব করেছেন জাতশিল্পী হলেন তিনিই।

শ্রীবসন্ত চৌধুরী হলেন সেই জাতেরই শিল্পী—তাই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কাহিনী ও চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা শোনার জন্যই তাঁর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলাম।

সময়ানুবর্তিতা মানুষের জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ। শিল্পী জীবনের ত বটেই। তারই প্রমাণ পেলাম সেদিন তাঁর বাড়ী গিয়ে। কথা ছিল সকাল সাড়ে আটটায়। গিয়ে দেখি, তিনি প্রস্তুত হয়েই রয়েছেন। যাওয়া মাত্রই তিনি স্মিতহাস্যে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসালেন তাঁর সুসজ্জিত ড্রইংরুমের একটি সোফায়। নিজেও একটি আসন গ্রহণ করলেন। তারপর আমাদের উভয়ের মধ্যে চলল প্রশ্ন এবং উত্তরের পালা।
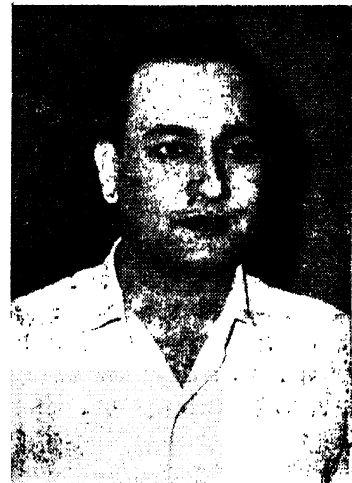
শ্রীবসন্ত চৌধুরী

আমার প্রথম প্রশ্ন হল: কিছুদিন আগে বি, এম, পি, এ-র ছাঁটাই ভাকে একশ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে যে ধর্মঘট হয়ে গেল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আপনাদের কি তার জন্য কোন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে?

হাঁ, হয়েছে বৈকি কিছুটা। শান্ত গলায় উত্তর করলেন শ্রীচৌধুরী।

ভবিষ্যতে চলচ্চিত্রশিল্পে নিয়োজিত অপর এক শ্রেণী অর্থাৎ টেক্নিসিয়ান, সাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার, মেকাপম্যান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যদি এর পুনরাবৃত্তি অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য ঘটে, তাহলে আপনাদের কর্মপন্থা কি হবে, তা কি স্থির করে রেখেছেন?

কিছু কিছু রেখেছি। শ্রীচৌধুরী বললেন, তবে সেটা কি ধরণের তা এখনই বলা উচিত হবে না।

আপনি বাংলা ছবি করেন, কিন্তু দেখেন কি? দেখলে শতকরা কতগুলি?

আমার এ প্রশ্নের জবাবে বসন্তবাবু বললেন, দেখি বৈকি এবং প্রায় সবগুলি। কারণ আমি নিজে যা নয়, আমার দ্বারা রূপায়িত কোন চরিত্র কি রূপ ধারণ করে, তা দেখতে আমার বড় কৌতূহল জাগে।

চলচ্চিত্রে সেটা নয় সম্ভব, কিন্তু থিয়েটারের বেলায় কি করেন? সেখানে নিজের অভিনীত চরিত্র তো আর দেখতে পান না।

ঠিক কথা, একটু হেসে উত্তর করলেন শ্রীচৌধুরী। সেখানে সুবিধা অনেক। দর্শকদের সামনা সামনি সেখানে আমরা পাই। কোন দৃশ্যে আমাদের অভিনয় যদি তাঁদেরকে মুগ্ধ করে, তখন নানারকম expression দ্বারা তাঁরা সেটা জানিয়ে দেন।

তা হলে কি মঞ্চে অভিনয় করতেই আপনি বেশী পছন্দ করেন।

ঠিক তা নয়। শ্রীচৌধুরী বললেন, ভালবাসি দুইই, আনন্দও পাই দুটোতেই, তবে মঞ্চে মাত্রাটা একটু বেশী একথা বলতে পারেন, কারণ সেখানে নিজ অভিনীত চরিত্র সৃষ্টিতে দায়িত্ব নিতে হয় অনেক বেশী। Film এ Technical help এর সুবিধা আছে; এখানে atmosphere সৃষ্টি করতে হয়।

আচ্ছা বেতারে অভিনয় করাটা কি মঞ্চ অথবা পর্দার চেয়ে কঠিন বলে আপনার মনে হয়।

কঠিন কোনটাই নয়। তবে—শ্রীচৌধুরী বলতে লাগলেন, বেতারে দর্শক কেউ নেই, সবাই শ্রোতা, সেই কারণে বেতারে অভিনয়ের সময় বাচনভঙ্গী হওয়া চাই পরিষ্কার আর expression হওয়া উচিত আরো deep যাতে করে শ্রোতৃবৃন্দ অভিনেতার হাসি কান্না, রাগ, অভিমান সহজভাবে উপভোগ করতে পারেন।

এবার আমার প্রশ্ন হল আপনার বিপরীত চরিত্রে নায়িকার ভূমিকায় যখন কোন নতুন মুখকে অভিনয় করতে দেখেন তখন কি আপনার কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়? কিছুটা হয়, তবে সেটা এমন কিছু নয়। আর একটা কথা, নতুন মানেই যে তার অভিনয় ক্ষমতা থাকবে না, তা ঠিক নয়, বরঞ্চ দেখা গেছে প্রথম বইয়ে আত্মপ্রকাশ করেই একজন নতুন যথেষ্ট অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছিলেন।

ভবিষ্যতে পরিচালনা বা বই প্রযোজনা করার কি কোন বাসনা আছে। আমার এই শেষ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচৌধুরী বললেন, বর্ত্তমানে তা নেই, ভবিষ্যতের কথা এখন বলতে পারি না।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শ্রীবসন্ত চৌধুরীর মতামত আপনাদের জানালাম এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি। ছেলেবেলায় অভিনয়ের প্রতি বিশেষ ঝোঁকই তাঁকে ভবিষ্যৎ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। নিজের ঝোঁক ছাড়াও আর একজন যিনি পিছন থেকে তাঁকে কেবলই প্রেরণা যুগিয়ে এসেছেন তিনি হচ্ছেন তাঁরই স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

নিউ থিয়েটার্স এর মহাপ্রস্থানের পথে আর এর হিন্দী রূপায়ন যাত্রিক ছবিতে ১৯৫১ সালে এঁর প্রথম চিত্রাবতরণ। কিন্তু তাঁর জন্য পারিবারিক জীবনে শ্রী চৌধুরীর কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি। সকালে উঠে মুখ হাত ধুয়ে ব্যায়াম করাটা এখন তাঁর দৈনন্দিন কাজের মধ্যে পড়ে গেছে। ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রাচীন শিলালিপি মুদ্রা ইত্যাদি সঞ্চয় করে একদিকে যেমন প্রচুর আনন্দ পেয়ে থাকেন অন্যদিকে তেমন ভালবাসেন টেনিস, বিলিয়ার্ড ইত্যাদি দেখতে।

চলচ্চিত্রে শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের ছেলে মেয়েদের আরো বেশী করে যোগদান করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। কারণ শ্রীচৌধুরী বললেন, *Cinema is the best medium of entertainment.*

বর্ত্তমানের মত ভবিষ্যৎ জীবনও শ্রীচৌধুরী শিল্পী হিসেবে কাটাতে ইচ্ছা করেন বলে মত প্রকাশ করলেন।

আলোচনা করতে করতে বেশ বেলা হয়ে গেল। তাই তাড়াতাড়ি নমস্কার জানিয়ে সেদিনের মত শ্রীচৌধুরীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। —শ্রীজানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্মীয়মান ছবি

অগ্নিশিখা

চিত্রপরিচালক রাজেন তরফদারের আগামী অবদান 'অগ্নিশিখা'। বিভিন্ন ভূমিকার আত্মপ্রকাশ করছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, বসন্ত চৌধুরী, গঙ্গাপদ বসু, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলু ভাওয়াল, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, কণিকা মজুমদার, মঞ্জুলা সরকার এবং নবাগতা শর্মিষ্ঠা। রবীন চট্টোপাধ্যায় এই ছবির সুরকার।

অগ্নিবন্যা

অগ্নিবন্যা ছবিটি পরিচালনা করছেন শ্রীজয়দ্রথ। এই ছবিতে যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁদের মধ্যে কমল মিত্র, অসিতবরণ, বিশ্বজিৎ, তরুণকুমার, অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, মঞ্জু দে, সন্ধ্যা রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আলোকচিত্র এবং সুরযোজনার ভার যথাক্রমে দীনেন গুপ্ত এবং গোপেন মল্লিকের উপর অর্পিত হয়েছে।

আশা শুধু স্বপ্ন

জীবানন্দ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে 'আশা শুধু স্বপ্ন' ছবিটি চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে। পরিচালনা করছেন অভ্যুদয় গোষ্ঠী। চরিত্রগুলি রূপায়িত করছেন ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, নবকুমার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, লিলি চক্রবর্ত্তী, তপতী ঘোষ, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি। সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করছেন কালীপদ সেন।

মাঘ, ১৩৬৮ (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, '৬২) ;

অন্তর্দেশীয়—

১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) : বর্ত্তমান বৎসরের (১৯৬১-৬২) ক্রিকেট টেষ্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড দলকে পরাজিত করিয়া ভারতের 'রাবার' লাভের গৌরব অর্জ্জন।

২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) : সাধারণ নির্ব্বাচনে (১৯৬২) মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কলিকাতার চৌরঙ্গী ও বাঁকুড়ার শালতোড়া—দুইটি বিধানসভা কেন্দ্র হইতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত।

৩রা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) : কলিকাতা মহানগরীতে পুনরায় প্রবল শৈত্যাধিক্য—দিনের সর্ব্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪৭'৭ ডিগ্রী।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) : 'ভারতের জনগণই কাশ্মীরের প্রকৃত 'নিরাপত্তা পরিষদ' ও ভবিষ্যৎ নিয়ামক'—কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের ঘোষণা।

৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) : মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট কেনেডির নিকট শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) পত্র—'গোয়া অভিযানের ফলে ভারতের শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্র নীতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই'।

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) : কলিকাতায় রাজ্যের অধ্যাপক-মণ্ডলীর মৌন শোভাযাত্রা—বেতন বৃদ্ধি, কলেজ কোড প্রবর্ত্তন, ছাঁটাই বন্ধ প্রভৃতির জন্য সম্মিলিত দাবী।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্ব্বাচনে ১৪শতাধিক প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র দাখিল—কলিকাতার ২৬টি বিধান সভা আসনের জন্য ১১১ জন প্রার্থী।

৭ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) : 'ভারতে শতকরা ১৫ জনের হাতে অর্থ পুঞ্জীভূত—সহর এলাকায় শতকরা ৮৫টি পরিবার সঞ্চয়ে অসমর্থ'—জাতীয় বৈষয়িক গবেষণা পরিষদের রিপোর্ট।

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) : 'বাংলা ভাষাকে সর্ব্বভারতীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি দান করা হউক'—সারা ভারত বাংলাভাষী সম্মেলনের (কলিকাতা) গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব।

৯ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) : পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সর্ব্বত্র সাড়ম্বরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ৬৬ তম জন্মজয়ন্তী পালন।

১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) : 'ভারত কখনই পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ বাধাইবে না, তবে পাকিস্তান যুদ্ধ বাধাইলে উপযুক্ত জবাব দিবে'—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) : শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু (পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল) ও শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত—বড়ে গোলাম আলি খান, ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজনের পদ্মভূষণ সম্মান লাভ—সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ২৫ জন 'পদ্মশ্রী' সম্মানে সম্মানিত।

কাশ্মীর ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ আবদুল্লা (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) সহ ২৪ জন আসামী দায়রায় সোপর্দ্দ।

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) : রাজধানী দিল্লী সহ ভারতের রাজ্যে রাজ্যে সাড়ম্বরে সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত—সদ্যমুক্ত গোয়াতেও সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠান।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) : অষ্টগ্রহ সম্মেলন (৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ৫ই ফেব্রুয়ারী) নানা মহলে আলোড়ন সৃষ্টি—বহু স্থান হইতে শান্তিযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সংবাদ।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) : সমারোহ সহকারে যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী কর্ম্মসূচীর উদ্বোধন।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) : 'কাশ্মীরের ব্যাপারে কোন তৃতীয় পক্ষের নাক গলানো চলিবে না'—কেনেডির (মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট) নিকট শ্রীনেহরুর পত্র—সালিশের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ।

১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) : শহীদ দিবসে (গান্ধীজীর তিরোধান দিবস) শহীদদের স্মরণে বেলা ১১টায় দেশব্যাপী দুই মিনিট নীরবতা পালন।

কলিকাতা পৌরসভার ১১ হাজার কর্ম্মীর দুই ঘণ্টা কর্ম্মবিরতি—দাবী অনুযায়ী মহার্ঘ ভাতা বর্দ্ধিত না করার জের।

১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী) : 'নিরাপত্তা পরিষদে পাক্ দাবী অনুযায়ী কাশ্মীর প্রশ্নের আলোচনা দ্বারা অবস্থার প্রতিকার হইবে না'—জম্মুর জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী) : বেতারের মাধ্যমে নির্ব্বাচনী প্রচার চালানোর পরিকল্পনা শেষ পর্য্যন্ত বাতিল—প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতদ্বৈধতার জের।

১৯শে মাঘ (২রা ফেব্রুয়ারী) : 'ভারতের সার্ব্বভৌমত্বের প্রশ্নে তৃতীয় পক্ষের সালিশী মানিব না'—কাশ্মীর প্রসঙ্গ আলোচনাকালে লক্ষ্ণৌ-এর জনসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২০শে মাঘ (৩রা ফেব্রুয়ারী) : অষ্টগ্রহ সম্মেলনের প্রথম দিবস নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত—গ্রহশান্তির জন্য সর্ব্বত্র অব্যাহত যাগযজ্ঞ, হোম ও নামকীর্ত্তন।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত—কলিকাতায় মঃ জুকা ও মিঃ হুমায়ুন কবীরের (যথাক্রমে রুশিয়া ও ভারতের প্রতিনিধি) চুক্তিপত্র স্বাক্ষর।

২১শে মাঘ (৪ঠা ফেব্রুয়ারী) : অষ্টগ্রহ সমাবেশের দ্বিতীয় দিবসও নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত।

২২শে মাঘ (৫ই ফেব্রুয়ারী) : গ্রহ-সম্মেলনের তৃতীয় দিনেও নিরাপদ জীবনযাত্রা—সন্ধ্যায় চন্দ্রের মকররাশি ত্যাগ ও সর্ব্বত্র জনসাধারণের স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ।

২৩শে মাঘ (৬ই ফেব্রুয়ারী) : 'সমাজতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শ ব্যতিরেকে ভারত খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যাইবে'—মাদ্রাজের জনসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২৪শে মাঘ (৭ই ফেব্রুয়ারী) : কয়েকটি দাবী পূরণের দাবীতে আসামে ছাত্র ধর্ম্মঘট।

আসানসোলে নির্ব্বাচনী সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র

রায়ের ঘোষণা—'একমাত্র কংগ্রেসই জাতিকে অগ্রগতির পথে পরিচালনা করিতে সক্ষম'।

২৫শে মাঘ (৮ই ফেব্রুয়ারী): নির্বাচনের মুখে ডাঃ রায়ের (মুখ্যমন্ত্রী) বিরুদ্ধে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে মাধ্যমিক শিক্ষকদের সঙ্কল্পিত প্রচার অভিযান সুরু।

২৬শে মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী): 'শিখদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের প্রমাণ নাই'—ভারত সরকার কর্তৃক দাশ কমিশনের রিপোর্ট অনুমোদিত।

২৭শে মাঘ (১০ই ফেব্রুয়ারী): শিলিগুড়ির শত মাইল দূরে অবস্থিত সৌলমারী আশ্রমের আত্মগোপনকারী সন্ন্যাসী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলিয়া গুজব রটনা।

জব্বলপুরে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

২৮শে মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারী): প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাসের (৬২) লোকান্তর।

২৯শে মাঘ (১২ই ফেব্রুয়ারী): বেগমপুর ষ্টেশনে (হুগলী) বিক্ষুব্ধ যাত্রীদল কর্তৃক লোকাল ট্রেন আটক—হাওড়া—বর্দ্ধমান কর্ড লাইনে ১২ ঘণ্টাকাল ট্রেন চলাচল ব্যাহত।

বহির্দেশীয়—

১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী): ষ্ট্যানলিভিলে বামপন্থী কঙ্গোলী নেতা এণ্টনী গিজেঙ্গা বন্দী—অনুগামী তিনশত সৈন্যেরও আত্মসমর্পণ।

পশ্চিম নিউ-গিনি বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য ইন্দোনেশিয়া ও নেদারল্যাণ্ডের নিকট উ থাণ্টের (রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল) তারবার্ত্তা।

২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী): পাক্ প্রস্তাব অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্নের আলোচনায় ভারতের আপত্তি—পরিষদ সভাপতি স্যার প্যাট্রিক ডীনের নিকট লিপি প্রেরণ।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী): প্রেসিডেণ্ট কেনেডি কর্তৃক মার্কিণ কংগ্রেসে ৯২৫৩ কোটি ডলারের বাজেট পেশ—সামরিক খাতে প্রচুর ব্যয় বৃদ্ধির দাবী।

৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী): ডোমিনিকান রিপাব্লিকে আবার সামরিক অভ্যুত্থান—বিমান বাহিনী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা দখল।

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী): কঙ্গোর পদচ্যুত সহকারী প্রধান মন্ত্রী গিজেঙ্গার লিওপোল্ডভিল উপস্থিতি ও রাষ্ট্রসঙ্ঘে আশ্রয় গ্রহণ।

৭ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী): নেপালে ক্ষিপ্ত কংগ্রেস কর্মীদল কর্তৃক তিনটি পুলিশ ফাঁড়ি দখল—সৈন্যদের সহিত দীর্ঘ লড়াই।

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী): জনকপুরের পথে গাড়ীতে বোমা ছুঁড়িয়া নেপালের রাজা মহেন্দ্রের প্রাণনাশের চেষ্টা।

৯ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী): কাশ্মীর সমস্যা মীমাংসার মধ্যস্থতার প্রস্তাব সহ প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও পাক্ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের নিকট কেনেডির পত্র—মধ্যস্থ হিসাবে বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট ইউজিন ব্ল্যাকের নাম সুপারিশ।

উপনিবেশবাদের অবসানের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে ভারত সহ ১৭টি রাষ্ট্র লইয়া তদারকী কমিটি গঠন।

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী): ইন্দোনেশীয় মন্ত্রিসভা কর্তৃক 'সাধারণ সৈন্য সমাবেশ বিল' অনুমোদন—প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের লইয়া বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা গঠনের উদ্যম।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী): মঃ মলোটভ, ভরোশিলভ, কাগানোভিচ ও ম্যালেনকভ—শীর্ষস্থানীয় এই চার জন সোভিয়েট নেতার নাম রাশিয়া হইতে বিলুপ্তি—সুপ্রীম সোভিয়েটের নির্দ্দেশক্রমে কার্য্য-ব্যবস্থা।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী): সিংহলে সামরিক অভ্যুত্থানের বিরাট ষড়যন্ত্র বানচাল—সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর কতিপয় পদস্থ অফিসার গ্রেপ্তার।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী): সোভিয়েট ও পশ্চিমী পক্ষের মতদ্বৈধতার দরুণ জেনেভা ত্রিশক্তি সামরিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ বৈঠক ব্যর্থ।

কাশ্মীর প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের দৃঢ় দাবী সহ পরিষদ সভাপতি প্যাট্রিক ডীনের নিকট স্যার জাফরুল্লার (পাক্ প্রতিনিধি) দ্বিতীয় দাবী পত্র—পাক্ দাবীতে ভারতের পুনরায় আপত্তি।

১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী): পাক্ নিরাপত্তা আইনে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ এইচ এস সুরাবর্দ্দী করাচীতে গ্রেপ্তার।

আন্তঃ আমেরিকান রাষ্ট্রসংস্থা হইতে কাষ্ট্রোর নেতৃত্বাধীন কিউবা বহিষ্কৃত।

১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী): পাকিস্তানের শত্রুদের সহিত সুরাবর্দ্দীর যোগসাজস আছে বলিয়া ঢাকায় পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের অভিযোগ।

নিরাপত্তা পরিষদে পাক্ দাবী অনুযায়ী কাশ্মীর প্রশ্নে বিতর্ক সুরু।

ইউরোপ ও আমেরিকার বহুস্থানে প্রচণ্ড হিমপ্রবাহ ও তুষারপাত।

১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী): সুরাবর্দ্দীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ঢাকায় প্রবল ছাত্র বিক্ষোভ ও ধর্মঘট—অবিলম্বে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী।

১৯শে মাঘ (২রা ফেব্রুয়ারী): নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সংক্রান্ত বিতর্ক মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত স্থগিত।

২১শে মাঘ (৪ঠা ফেব্রুয়ারী): পশ্চিম ইরিয়ানে ওলন্দাজদের সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ।

২২শে মাঘ (৫ই ফেব্রুয়ারী): সরকারের মজুরী বৃদ্ধি স্থগিত নীতির প্রতিবাদে বৃটেনে ৩০ লক্ষ শ্রমিকের ধর্মঘট।

২৩শে মাঘ (৬ই ফেব্রুয়ারী): ঢাকায় পুলিশ ও বিক্ষুব্ধ ছাত্র দলের মধ্যে সংঘর্ষ—লাঠি চালনায় ৭ জন ছাত্র আহত।

২৫শে মাঘ (৮ই ফেব্রুয়ারী): আণবিক পরীক্ষা বন্ধ সম্পর্কে জেনেভা পররাষ্ট্র সচিব পর্য্যায়ে ১৮ জাতি বৈঠকের প্রস্তাব—রাশিয়ার নিকট ইঙ্গ-মার্কিণ লিপি।

২৬শে মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী): ঢাকায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান গ্রেপ্তার, উত্তরবঙ্গে ছাত্র বিক্ষোভ দমনে সৈন্য প্রেরণ।

২৭শে মাঘ (১০ই ফেব্রুয়ারী): মার্কিণ ইউ-২ জঙ্গী বিমানের চালক পাওয়ার্সের (রাশিয়ায় আটক) মুক্তি লাভ।

২৮শে মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারী): কুমিল্লা ও শ্রীহট্টে ঢাকার ছাত্র বিক্ষোভের বিস্তৃতি—খুলনাতেও বিক্ষুব্ধ ছাত্রদলের শোভাযাত্রা।

২৯শে মাঘ (১২ই ফেব্রুয়ারী): নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গে জেনেভায় ১৮টি রাষ্ট্রের (ভারত সমেত) শীর্ষ বৈঠকের নূতন সোভিয়েট প্রস্তাব—ইঙ্গ-মার্কিণ প্রস্তাবের উত্তরে ক্রুশ্চেভের লিপি।

কেন ?

"কেন এমন হলো ? হলো এই জন্যে যে, এঁরা নেতা নন, এঁরা যে সবাই অভিনেতা সেকথা এখন সাধারণ লোকেও বুঝতে আরম্ভ করেছে ; বাঙালী জনসাধারণও। আসামে বঙ্গনারী নির্যাতিত হলে, বেরুবাড়ীতে বঞ্চিত হলে, কর্ণেল ভট্টাচার্য্য অপহৃত হলে কংগ্রেসীদের মত এই সব অভিনেতারাও যে বাঙ্গালীর হয়ে কিছু করবেন না, এমন কি বিধান সভা থেকে, লোকসভা থেকে সামান্য পদত্যাগ পর্য্যন্ত এঁরা করবেন না একথা বুঝেছে যেই কলকাতা, সেই সুরু হয়েছে অধঃপতন। বামপক্ষীয় নেতারা যদি পদত্যাগ করতেন, আসামী নেতা যদি বলবার ধৃষ্টতা না করত যে ভাষান্দোলনকারীদের প্রতি তাঁদের সমর্থন নেই, তাহলে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ বুঝত যে এঁরা সত্যিই নেতা ; এঁরা চাইছেন কিছু করতে ; কিন্তু যেহেতু এঁরা সংখ্যায় কংগ্রেসের চেয়ে অল্প তাই কিছু করতে পারছেন না। তখন কলকাতায় কংগ্রেসের টিকি খুঁজে পাওয়া যেত না এবং সুদূর মফঃস্বলেও তার প্রতিক্রিয়া ব্যর্থ হত না। বামপক্ষ তার সুযোগ নিতে পারে নি যে তা নয়, নেয় নি। নেয়নি, কারণ এঁরা কেউ নেতা নন, সব অভিনেতা। এঁদের কাছে 'দেশ'-এর চেয়ে 'দল' বড়। ফলে, কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধায় নয়, বামপক্ষের প্রতি অশ্রদ্ধায়, অভিমানে ভোট পড়েছে সেই বাক্সে, যে বাক্সে কলকাতাকে বাঁচাবার কোনও সৎ উদ্দেশ্য পোরা নেই ! আসাম, বেরুবাড়ী, কর্ণেল ভট্টাচার্য্যের পর যাঁর নেতৃত্বের অভাব বাঙালী মর্ম্মে মর্ম্মে আজ অনুভব করছে, তিনি শ্যামাপ্রসাদ। নেহরুর কুষ্টি নেহাৎই জুতের, তাই, আসাম-বেরুবাড়ী-ভট্টাচার্য্য দুর্ঘটনার সময় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ বেঁচে নেই। কংগ্রেস অথবা কম্যুনিষ্টের পথ বাঙালীর বা বাংলার বাঁচবার পথ নয়। বাঙালী একটি স্বতন্ত্র জাতি ; তার পথও স্বতন্ত্র। সেই পথ কি এবং কে তার পথপ্রদর্শক হতে পারে, সেকথা বলবার পুণ্য মুহূর্ত্ত এখন আগত। বাঙালীর এবং বাংলার প্রয়োজন এখন নতুন একটি দল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক নেতৃত্ব। তার জন্যেই বাঙালী অপেক্ষা করে আছে, অপেক্ষা করে থাকবে।"

—দৈনিক বসুমতী।

অস্বাভাবিক

"পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চল হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে চাউলের দর নাকি চড়িতেছে। চুঁচুড়ায় দেখিতেছি বাড়তি দাম প্রায় মণকরা এক টাকা। অন্যত্রও নাকি দরের গতি ঊর্দ্ধমুখী। এমনটা কিন্তু হইবার কথা নয়। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি বাজারে ধানের অভাব কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। কেননা, এ সময় নতুন চাউলের আমদানি হওয়ার ফলে বাজারে প্রাচুর্য্যই দেখা দেয়। দাম তখন বাড়ে না, কমে। এমনই চলে বর্ষা পর্যন্ত। তখন মজুত চাল ফুরাইয়া আসে এবং বাজারে ঘাটতি দেখা দিতে শুরু করে। চালের দাম তখন ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। এমনই চলে যতদিন না নূতন ফসল ওঠে। নূতন ধান বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গে দাম আবার পড়িতে থাকে। কাজেই চালের দামের ওঠা-নামাটা স্বাভাবিক নিয়ম হইলেও যখন-তখন সেটা ঘটিলে তাহাকে অনিয়ম বলিয়া ধরিতে হইবে। ফাল্গুন মাসে চালের দাম হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়া সেই অনিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত। নিয়মবহির্ভূত ঘটনা অস্বাভাবিক বটে, তবে সম্পূর্ণ অকারণ নয়। ফাল্গুন মাসে চাউলের মূল্যবৃদ্ধিকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না ; তবে যখন সেটা ঘটে তখন তাহার একটা হেতু থাকে। যে বৎসর অজন্মা দেখা দেয় সে বৎসর বারো মাসই চাউলের দর চড়া থাকে—কখনও নামে না। আবার অজন্মা না হইলেও যদি যথেষ্ট পরিমাণে চাউল উৎপন্ন না হয় সেক্ষেত্রেও দাম বাড়িবে এবং সেটা নূতন ফসল ওঠার কিছু পরেই হইতে পারে। অকালে চাউলের মূল্যবৃদ্ধি যোগান ও চাহিদার মধ্যে ব্যবধান সূচিত করে। দুইয়ের মধ্যে সমতা থাকিলে এমনটা হইতে পারে না। অবশ্য যোগান ও চাহিদার মধ্যে পার্থক্য সব সময় যে প্রাকৃতিক কারণে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। সেটা কখনও কখনও কৃত্রিমও হইতে পারে। মজুতদারেরা যদি চাল ধরিয়া রাখিয়া একটা সঙ্কটের সৃষ্টি করে, তাহা হইলেও দর বাড়িবে। তবে সত্যই যদি চাউলের উৎপাদনে ঘাটতি না থাকে তাহা হইলে সেটা করা সহজ নয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবও নয়—বিশেষ করিয়া সরকার যদি সজাগ থাকেন।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

কংগ্রেসের কলকাতা

"কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে পথ চলার সময় এত দুর্গন্ধ পাওয়া যায় যে, নাকে কাপড় চাপা দিয়া চলা ছাড়া উপায় থাকে না। পথের পাশে এখন যত আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়া থাকিতে দেখা যায়, পূর্বে তাহা দেখা যাইত না। কর্পোরেশন হইতে সেই পুঞ্জীভূত আবর্জনা যখন সরাইয়া লওয়া হয়, তখনও উহার ছাই-পাশ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয় না। উহার উপর আবর্জনা স্তূপীকৃত হইতে থাকে এবং দুর্গন্ধও স্থায়ী হয়। শুধু তাহাই নহে, মলবাহী নালীগুলি কোন কোন স্থানে ভরিয়া গিয়াছে, যথাযথভাবে উহা পরিষ্কার করার অভাবে এক এক-স্থানে দুর্গন্ধে টেকা দায়। নিম্নে মলবাহী নালীর পচাগন্ধ উপরে আবর্জনার পূতিগন্ধ। ইহার পরে যখন গ্রীষ্ম আসিবে, গরমে পচন বাড়িবে, তখন অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে। কলেরা টাইফয়েড উহার সঙ্গে যুক্ত হইলে কলিকাতার নরককুণ্ডে জনসাধারণের অবস্থা কি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের অনেক ব্যাপারেই অপ্রীতিকর সমালোচনা সহ্য করিতে হয়। এবারে ঝাড়ুদার, মেথর, নালীপরিষ্কারকারী শ্রমিক বাহিনীর নিকটেই আমরা আবেদন করিতে চাই। তাঁহারা কি সহরবাসীর এই দুর্গতি মোচনে অগ্রসর হইবে না ? তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য ইউনিয়ন আছে। সহরবাসীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কি তাঁহাদের সহানুভূতি ও সমবেদনা শুকাইয়া গিয়াছে ?"

—যুগান্তর।

হতাশা ব্যঞ্জক

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ হইতে কলিকাতা এবং ২৪ পরগণা জেলার উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ সুবিধার অবস্থা সম্পর্কে একটি সমীক্ষা কার্য পরিচালিত হয়। বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রম চালু হইবার পর হইতে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার একটি পরিমাপের প্রচেষ্টা করা হয় এই সমীক্ষা মাধ্যমে। কিন্তু সমীক্ষার ফলকে উৎসাহজনক বলা দুরূহ। প্রকাশ এই সমীক্ষা হইতে দেখা যায় যে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই এখনও অবধি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকরী করা হয় নাই। সমীক্ষার রিপোর্টে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহার কয়েকটি যথেষ্ট গুরুতর। যেমন, বিশেষভাবে বালকদের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়সমূহের শতকরা তিরিশটি বিদ্যালয়ে সাধারণ বিজ্ঞানের জন্য কোন পৃথক ল্যাবরেটরী নাই। খুব অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়েই মিউজিয়ামের বন্দোবস্ত আছে। বহুসংখ্যক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী কক্ষটি খুবই ছোট। অনেক ক্ষেত্রে কোন পৃথক গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হয় না এবং সাধারণতঃ কোন একজন শিক্ষক লাইব্রেরীর ভারপ্রাপ্ত হন। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অবস্থা যত শীঘ্র ঘুচানোর ব্যবস্থা হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু এই কাজ হওয়া প্রয়োজন শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থ বরাদ্দর পরিমাণ বাড়াইয়া।" —স্বাধীনতা।

কলিকাতার রায়

"বামপন্থী বন্ধুরা এতাদন জাঁক করিয়া বলিয়া আসিতেছিলেন, কলিকাতা লাল হইয়া গিয়াছে। কথাটা যে কেবল এদেশে ছড়ানো হইয়াছে, তাহা নয়, বিদেশেও প্রচার করা হইয়াছে। ভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন দলের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা উঠিলেই বিদেশী প্রতিনিধিরা কলিকাতার কথাটা বিশেষ করিয়া তুলিয়া থাকেন—"কলিকাতার ব্যাপারটা কি?" বামপন্থীরা অতি-প্রগলভ প্রচারের দ্বারা তাঁহাদের মনে একটা ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে যে, কলিকাতায় বামপন্থীদের একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতাই বাঙলাদেশের মস্তিষ্ক বলিয়া স্বীকৃত। কলিকাতা যখন তাঁহাদের প্রভাবাধীন তখন বাঙলা দেশের মস্তিষ্কটাই তাঁহাদের ইচ্ছায় পরিচালিত হইতেছে—ইহাই তাঁহাদের দাবি। এবারকার সাধারণ নির্ব্বাচনে দেখা গেল বামপন্থীদের এই দাবি একদম ভুয়া। বাঙলাদেশের মস্তিষ্ক তাহার স্বাধীন চিন্তার বৃত্তি হারায় নাই। কমিউনিষ্ট-পরিচালিত বামপন্থীর দল কলিকাতার জনসাধারণের মস্তিষ্কধৌতির যে অপচেষ্টা চালাইতেছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। মহানগরীর ছাত্র ও যুবসমাজ, দেশকর্ম্মীর ও সমাজকর্ম্মীর দল বামপন্থীদের মতলববাজী ও কুমন্ত্রণা কেবল প্রত্যাখ্যান করে নাই, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে।" —জনসেবক।

অসুস্থ চিন্তা

"পশ্চিম বাংলার প্রতিটি উন্নয়ন ব্লকে নাকি একটি করিয়া শিশু-উদ্যান রচিত হইবে। এক একটি ব্লকে কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশখানি গ্রাম থাকে; সুতরাং সরকারী ব্যবস্থাপকেরা নিশ্চয়ই এই ধারণার বশবর্তী যে, গ্রামের বালক-বালিকারা দৈনিক দশ-বিশ মাইল পদব্রজে অতিক্রম করিয়া সুরম্য উদ্যানে আসিবে। এইধরণের চিন্তাধারা নিঃসন্দেহে মস্তিষ্কের অসুস্থতা সপ্রমাণ করে।" —লোকসেবক।

শোক-সংবাদ

সজনীকান্ত দাস

প্রথিতযশা সাহিত্য-সমালোচক, সুকবি একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি এবং 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের গত ২৮এ মাঘ ৬২ বছর বয়সে কর্মবহুল জীবনের অবসান ঘটেছে। ১৩০৭ সালের ৯ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট ১৯০০) সজনীকান্ত দাসের জন্ম। বাঙলা সাহিত্যের দুটি যুগের সন্ধিক্ষণে সজনীকান্তের আবির্ভাব—সে আবির্ভাব যেমনই গুরুত্বপূর্ণ তেমনই তাৎপর্যময়—একদিকে তাঁর লেখনী তীক্ষ্ণ আক্রমণে সাহিত্যের অঙ্গ থেকে আবিলতা দূর করার প্রচেষ্টায় বদ্ধপরিকর অন্যদিকে সেই লেখনী রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণের উপাসনায় মগ্নচিত্ত, সূক্ষ্ম যুক্তি এবং ভাষার বলিষ্ঠতার সমন্বয়ে যে সমালোচনা সাহিত্যের স্রষ্টা সজনীকান্ত তা বাঙলা সাহিত্যের রত্নাগারের এক একটি উজ্জ্বল রত্নবিশেষ। তাঁর 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদনা বাঙলা সাহিত্যে একটি যুগসৃষ্টির গৌরব অনায়াসে দাবী করতে পারে। শুধু সাহিত্য সৃষ্টিতেই সজনীকান্তের শক্তি সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্যিক সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাঁর নির্বাচনশক্তি এবং শক্তিমত্তার পরিচয় নানাভাবে পাওয়া গেছে। বহু কৃতী সাহিত্যিকের প্রথম রচনা প্রকাশ করে সজনীকান্ত তাঁদের পাঠকসমাজে পরিচিত করেন। বাঙলার প্রবন্ধ-সাহিত্যও নানাভাবে তাঁর দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। চোদ্দ বছর বয়সে তিনি লেখনী ধারণ করেন সেই থেকে এই সুদীর্ঘকাল তাঁর লেখনী বাঙলা সাহিত্যের অনলস সেবা করে এসেছে, মধ্যে কোন সময়ে তার বিরতি ঘটেনি। বসুমতীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ, মাসিক এবং শারদীয়া বসুমতীর পৃষ্ঠা নিয়মিত ভরিয়ে তুলেছে তাঁর রচনা। দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকীয় স্তম্ভেও তিনি নিবন্ধ রচনা করতেন। স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ থেকে তিনি বি, এস, সি পাশ করেন। প্রবাসীর সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। বঙ্গশ্রী পত্রিকাটিও তিনি কিছুকাল সম্পাদনা করেন। চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গেও চিত্রনাট্যকার, সংলাপকার ও গীতিকাররূপে তাঁর নিবিড় সংযোগ ছিল। রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্য তাঁর শেষ গ্রন্থ। ইনি মৃত্যুকালে বাঙলা সাহিত্যের একটি ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু সেই রচনা তিনি শেষ করে যেতে পারলেন না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ছিল তাঁর সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক, শুধু সভাপতি হিসাবেই নয় এর নানা দায়িত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করে সজনীকান্ত নানাভাবে এর সেবা করে গেছেন। এ ছাড়া নিখিলবঙ্গ সাময়িকপত্র সঙ্ঘ, সাহিত্য সেবক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি, পরিভাষা সংসদ, য়্যাডাল্ট এডুকেশান কমিটি ও ফিল্ম সেন্সর বোর্ড প্রভৃতির সঙ্গে তিনি সদস্য, সহকারী সভাপতি বা সভাপতিরূপে যুক্ত ছিলেন। সজনীকান্তের প্রয়াণে বাঙলা সাহিত্য হারাল একজন অগ্রণী সাহিত্যনায়ক ও কুশলী স্রষ্টাকে আর সাহিত্যিক গোষ্ঠি হারালেন বন্ধুবৎসল একটি দরদী মানুষকে।

হেমপ্রভা মজুমদার

বর্ষীয়সী দেশনেত্রী হেমপ্রভা মজুমদারের গত ১৭ই মাঘ ৭৪ বছর বয়সে প্রাণবিয়োগ ঘটেছে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অন্যতমা নেত্রী হিসেবে স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসে এঁর নাম অমলিন থাকবে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে ইনি যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেন।

পারিবারিক জীবনে প্রসিদ্ধ নেতা স্বর্গত বসন্তকুমার মজুমদারের ইনি সহধর্মিণী ছিলেন। এঁদের বক্তৃতা শ্রোতৃমহলে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করত, রাজনীতি জগতে এঁদের নানাবিধ দুঃখবরণ, শ্রমস্বীকার স্বার্থত্যাগ ভারতের মুক্তি আন্দোলন সফল ও সার্থক করে তুলেছে। ইনি বহুকাল কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের অল্ডারম্যান ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের দশ বছর কাল সদস্য ছিলেন। প্রখ্যাত অভিনেতা—পরিচালক শ্রীসুশীল মজুমদার এঁর পুত্র।

নিশাপতি মাঝি

পশ্চিমবঙ্গের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নিশাপতি মাঝি গত ১৩ই মাঘ ৫৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। শ্রীনিকেতনের পল্লী সংগঠনের তিনি একজন প্রাক্তন কর্মী ছিলেন। বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগ ছিল এ ছাড়াও বোলপুরের নানাবিধ উন্নয়নের জন্যে তিনি যত্নশীল ছিলেন। কংগ্রেসকর্মী হিসেবেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

দেবেশচন্দ্র ঘোষ

প্রসিদ্ধ শিল্পপতি দেবেশচন্দ্র ঘোষ গত ২৭এ মাঘ ৫১ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। দেশের বাণিজ্যজগতে একটি বিরাট আসন তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁর অক্লান্ত কর্মদক্ষতায় দেশীয় বাণিজ্য নানাভাবে উন্নতিলাভ করেছে। চা শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি এক বিরাট ব্যক্তিত্বের আধার ছিলেন। কেন্দ্রীয় টি বোর্ডের, ভারতীয় টি লাইসেন্সিং কমিটির, ভারতীয় চা সম্প্রসারণ বোর্ডের এবং লণ্ডনের ইণ্টারন্যাশনাল টি কমিটির সদস্য ও ইণ্ডিয়ান টি প্ল্যাণ্টার্স য্যাসোসিয়েশানের এবং টি চেষ্টস য্যাণ্ড প্লাইউড ট্রেডস য্যাসোসিয়েশানের সহকারী সভাপতিরূপে ইনি চা শিল্পের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নিজের শক্তি প্রয়োগ করেন। এ ছাড়া তিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার, কলকাতা পৌরসভার কাউন্সিলার, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের কার্য্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, কলকাতা বন্দরের কমিশনার প্রভৃতি নানা সম্মানজনক আসনে সমাসীন ছিলেন।

প্রকাশচন্দ্র শেঠ

খ্যাতনামা শিল্পপতি ও লিলি শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রকাশচন্দ্র শেঠ গত ১৭ই মাঘ ৫৭ বছর বয়সে লোকান্তর যাত্রা করেছেন। লিলি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আজকের এই বিপুল প্রসার ও ব্যাপক জনপ্রিয়তার পিছনে তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা ও ব্যবসায়সততায় এই প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হয়। পঁচিশ বছর যাবৎ বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে লিলি প্রতিষ্ঠান তার সুদক্ষ কর্ণধার এবং বাঙলার বাণিজ্যজগৎ একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যবসায়ীকে হারাল।

মাসিক বসুমতীর মালিকানা ও অন্যান্য তথ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

২। প্রকাশের সময়—প্রতি মাসে।

৩। প্রকাশক ও মুদ্রাকরের নাম ও ঠিকানা—শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় নাগরিক। গ্রাম-মেড়িয়া। পোঃ—আকনা। জেলা—হুগলী

৪। সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা—প্রাণতোষ ঘটক। ভারতীয় নাগরিক। ১১১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা—৯।

৫। মোট মূলধনের শতকরা এক ভাগের অধিকের অধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা—শ্রীমতী দীপ্তি দেবী। ২৫।৪এ, অনাথ দেব লেন, পাইকপাড়া, কলিকাতা-৩৭। শ্রীমতী ভক্তি দেবী। ১৪১, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। শ্রীমতী আরতি দেবী। ১১১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা—৯। কুমারী প্রণতি দেবী। ২৫।৪এ, অনাথ দেব লেন, পাইকপাড়া, কলিকাতা-৩৭। কুমারী উৎপলা দেবী। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

আমি শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসসম্মত।

স্বাক্ষর

শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

তারিখ

১-৩-১৯৬২।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
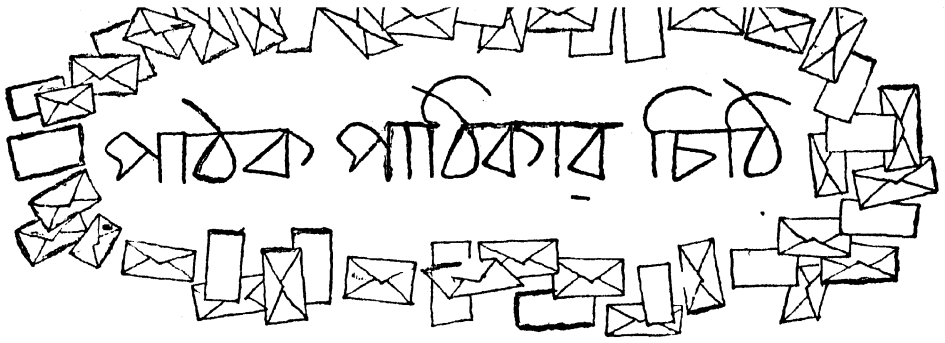
পত্রিকা সমালোচনা

শিশুদের যৌনশিক্ষা প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

গত আশ্বিন মাসের (১৩৬৮) 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত শিশুদের যৌনশিক্ষার ওপর রচিত প্রবন্ধটি পড়লাম। প্রবন্ধটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং বলা বাহুল্য সেটি তাই অসম্পূর্ণ। নিরপেক্ষ পাঠক হিসেবে আমার এই মতামত প্রকাশের প্রগলভ্‌তা ক্ষমা করবেন! প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য লিখতে চেষ্টা ক'রব।·····প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ফ্রয়েডের অনুসরণে বলা যায়, শিশুদের মনে যৌন জিজ্ঞাসা অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। মায়ের স্তন্য পান কালে তাদের মনে যৌন সুখানুভূতি জন্মে ও পরিণত বয়সে তা ভিন্ন লিঙ্গাভিমুখী হয়। সুতরাং শৈশবকাল থেকেই শিশুদের মনের এই যৌন জিজ্ঞাসা ও তার সমাধান কোন পথে সম্ভব—বর্তমানে এ বিষয়ে পরীক্ষার অন্ত নেই। শিশুদের কি ভাবে যৌনশিক্ষা দেওয়া সম্ভব এবং তা দিলে কতটা সফল হওয়া যাবে—এগুলিও আলোচনার অন্যতম বিষয়। এই আলোচনার সমাধান দেখিয়ে যৌনতত্ত্ববিদ Havelock Ellis বলেছেন,—'Do not conceal, but tell them frankly about sex, sexual-side of marriage, sexual copulation and conception and you will find them all right ; শৈশব থেকেই শিশুদের মনে প্রশ্ন জাগে: 'আমরা কোথা থেকে এলাম।' এই প্রশ্নই যৌন জিজ্ঞাসা। এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলেন: 'তোমাদের ভগবান পাঠিয়েছেন।' কথাটি যে কত দূর গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয় সে তর্কের অবতারণা আমি করতে চাই না। কিন্তু এ কথা আমি বলব যে, সন্তানের জনক এবং জননী হিসেবে তাঁরা মারাত্মক ভুল করলেন। কেন না বড় হলে তাদের কাছে সাধারণ জন্মরহস্যের কারণ নিশ্চয়ই অজানা থাকবে না। গ্রীক কমিটি 'knowledge of sex' প্রবন্ধে যে তথ্যের উল্লেখ করেছেন, তা পড়লেই বোঝা যাবে উপযুক্ত যৌন শিক্ষার অভাবে শিশুরা কি ভাবে বিকৃত পথে যায়। ঐ প্রবন্ধের একাংশ: 'Had not these healthy tender aged small school boys admitted the fact of their sexual intercourse with girls could hardly be believed that these nice, mild and good behaved boys had any sexual knowledge or that they could ejaculate semen,'··· এই কারণে যৌনবিজ্ঞানীরা শৈশবাবস্থা থেকেই শিশুদের যৌন-শিক্ষা দেবার স্বপক্ষে মত দেন। এই যৌনশিক্ষা যদি না দেওয়া হয় তাহলে তাদের মন হয় বিষাক্ত এবং নবোদ্ভূত কামনা চরিতার্থের জন্য তারা সঙ্গোপনে অবৈধ রতিজীবন গ্রহণ করে।—তাই মনো-বিজ্ঞানীদের মন্তব্যই সর্বাপেক্ষা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়! তাঁদের বক্তব্য নিঃসন্দেহে সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাজগঠনের সহায়ক! ইতি—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪১, গড়পার রোড, কলিকাতা—৯।

মহাশয়,

কার্তিক সংখ্যার 'পত্রগুচ্ছ': 'পত্র-সাহিত্যে নজরুল' নামক রচনাটির জন্য প্রথমেই আমি শ্রীআবদুল আজীজ আল্-আমান মহাশয়কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, আর এই সুমধুর বিষয়টি মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেওয়ায় আপনার কাছেও আমরা কম ঋণী নই। যদিও এ রচনাটি এই সংখ্যায় অসম্পূর্ণ, তবুও আমি আমার স্বাভাবিক হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করে রাখতে পারলাম না। শ্রদ্ধেয় লেখক নজরুল-প্রতিভার কুয়াশাচ্ছন্ন দিকটিই শুধু আলোকিত করেননি, সেইসঙ্গে রবীন্দ্র-প্রতিভার সশ্রদ্ধ আলোচনায় আমাদের মনকে উদ্ভাসিত ক'রেছেন। বিদ্রোহী কবির ব্যক্তিগত প্রেমিক মনের পরিচয় দিতে যে-চারটি চিঠির উল্লেখ ক'রেছেন সেই প্রসঙ্গে লেখকের ভাষা ও ভাব অতুলনীয়!—'চিঠি তো নয়, যেন চারটি শিশিরসিক্ত নিটোল মুক্তা। চিঠিগুলির হৃদয়াকাশ সায়াহ্ন কোমল গোধূলির রোমাঞ্চ রংয়ে রঙিন। এক নতুন ফরহাদ জন্ম নিয়েছেন এই চিঠিগুলির পৃষ্ঠায়। রূপপাগল মজনু খুঁজে ফিরেছেন তাঁর জীবনের লাইলীকে।'

এই রচনাটির বাকী অংশটুকুর জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি। নমস্কার। বিনীত—প্রশান্তকুমার দাস, ৮বি, আনন্দ পলিত রোড, কলিকাতা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রী বি, হাজারিকা, কেলিডন টি এষ্টেট, ডাক-শালানা, নওগাঁও আসাম * * * Dr. A. K. Dutta, M. B. B. S. (Cal) D. T. M. & H. (Edin) St. Tydfil Hospital, Merthyr Tydfil, Glam, U. K. * * * শ্রীমতী শক্তিরাণী মিত্র, অবধায়ক—শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক, নীলকুঠি ডাঙ্গা, ষ্টেশান রোড, ডাক ও জেলা পুরুলিয়া, (দক্ষিণ পূর্ব রেলপথ) * * * শ্রীএস, এন, গঙ্গোপাধ্যায়, অবধায়ক দি ডি, এ, জি, এম, পি, প্রাচীন নথিপত্র বিভাগ, নাগপুর, মহারাষ্ট্র * * *

এস, এন, গাঙ্গুলী C/o D. A. G. M. P. Old Record Section Nagpur. Maharastra * * * শ্রীমতী প্রতিভা ভট্টাচার্য্য অবধারক এস্‌· আর· ভট্টাচার্য্য পোঃ রায়গড় এস· পি· * * * ডক্টর এস· ডি· বাকচি, আজমগড়, ইউ পি· * * * লাইব্রেরিয়ান্, সেক্রেটারিয়েট্ অফ দি উড়িষ্যা লেজিসলেটিভ এসেমব্লি, ভুবনেশ্বর, পুরী * * * এ· কে· বন্দ্যোপাধ্যায়, এলিক্যাণ্ট স্পেসালিষ্ট, জলপাইগুড়ি * * * ডাক্তার সতীশচন্দ্র ঘোষ, ইণ্ডিয়া ইন্‌সেক্টস কোং ইং, ১১৬ ওয়েষ্ট ইলিওনিস্ ষ্ট্রীট, চিকাগো—১০, ইন্· ইউ· এস· এ· * * * শ্রীমতী শিপ্রা চৌধুরী অবধারক আর· আর চৌধুরী ও· সি টিওক পুলিস ষ্টেশন, পোঃ টিওক, শিবসাগর, আসাম * * * ক্যাপ্টেন এস কে দত্ত সেরুন মিলিটারি হাসপাতাল আলওয়ার, রাজস্থান * * * হরেকৃষ্ণ পৌষ্টি—গ্রাম অলিনগর, সোহডা ভায়া ধামনগর, বালেশ্বর * * * পি· সেনগুপ্ত আমলাই কলিয়ারি পোঃ ধান্‌পুরি, জেলা—সাডোল, এম· পি * * * মনোরঞ্জন দাস পুরকায়স্থ তহশিলদার, সিংরিমারি জমিদারি, কানাইগাঁ দরং, আসাম * * * লাইব্রেরিয়ান্, প্রণবরঞ্জন পরমার্থিক গ্রন্থাগার কল্যাণপুর তমলুক, মেদিনীপুর * * * শ্রীমতী অঞ্জলি বর্মণ অবধারক সাবডিভিসনাল অফিসার, (রোডস) কাঁথি, মেদিনীপুর * * * হেডমাষ্টার এস· ই· রেলওয়ে মিক্সড হাই স্কুল চক্রধরপুর সিংভূম * * * ডাক্তার এন এন রায়, মেডিক্যাল অফিসার, সিভিল হাসপাতাল, মোঙ্গনাই, লয়লেম, সাউদার্ণ সান্ ষ্টেট, বর্মা * * * রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, ক্ষীরগ্রাম, বর্দ্ধমান * * * ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ, বাহাদুরগঞ্জ, পূর্ণিয়া * * * মিস্ সিউলি সেনগুপ্ত, ৪১ জালান বেনাং কাস্ ম্যাক্‌ফারসন্ রোড, সিঙ্গাপুর—১৩ * * * তেজেন্দ্রনাথ নাগ, মোক্তার বড়বন্দর, দিনাজপুর, পূর্ব্ব-পাকিস্থান।

Sending Rs. 7·50 as subscription of monthly Basumati for six months from Kartick 1368 B. S. —Mrs. Amita Sanyal, Jalpaiguri.

I am sending to-day Rs. 7·50 being subscription for six months for monthly Basumati—Sm. Kamala Kar, Darrang, Assam.

বাৎসরিক চাঁদা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া মাসিক বসুমতী যথারীতি পাঠাইবেন।—শ্রীমতী সুকুমারী রায়, জলপাইগুড়ি।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা (আশ্বিন মাস হইতে) পাঠানো হইল—Sree Sree Shovona Santa Asram, Varanashi.

Herewith I am sending Rs. 15/- only being subscription for Monthly Magazine "Basumati" for a period of another one year—R. K. Das. Santi Tea Estate, Assam.

আমার বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। পৌষসংখ্যা হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন—শ্রীহিরণ্ময়ী চৌধুরী, মুর্শিদাবাদ।

Herewith please find Rs. 15/- as the annual subscription for your esteemed Monthly Basumati for the year 1368 B. S.—Sm. Mira Debi. Port Blair (Andamans).

The sum of Rs. 15/- is remitted herewith as annual subscription of Masik Basumati with effect from 'Magh' Sankhya—Promode Library Darjeeling.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭॥০ টাকা পাঠাইলাম। শ্রীঅর্পিতা দাশগুপ্তা, রায়পুর (মধ্যপ্রদেশ)

In advance payment of subscription to Masik Basumati from Ashar 1368 to Jaistha 1369 B. S. —Gaya College, Gaya.

I am sending herewith Rs. 15/- being my yearly subscription of Monthly Basumati—Mr. B. R. Ghose. Dhanbad.

I am remitting Rs. 15/- towards our annual subscription for Monthly Basumati—South West Institute, Chakradharpur.

Sending Rs. 15/- as yearly subscription for 1962 from the month of Magh—Jharna Dasgupta, Jalpaiguri.

Sending herewith Rs. 15/- only being the yearly subscription of Monthly Basumati from Baisakh sankhya—Railway Institute, Lumding.

We remit herewith Rs. 15/- as our annual subscription for your esteemed Monthly Basumati from Agrahayan—S. K. G. W. Shram Kalyan Kendra, Singhbhum, Bihar.

Kindly renew my subscription of your Masik Basumati for another year from Aswin—Sri D. P. Gupta, Dhanbad.

Herewith remitted one year subscription for your Monthly Basumati—Kazal Sengupta, Kalahandi, Orissa.

I am sending herewith Rs. 15/- towards the annual subscription of Monthly Basumati—Sumita Mallick, Bombay.

মাসিক বসুমতী
॥ ফাল্গুন, ১৩৬৮ ॥

(জলরঙ)

রঙীন মাছ
—গোপাল ঘোষ অঙ্কিত

স্বগত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
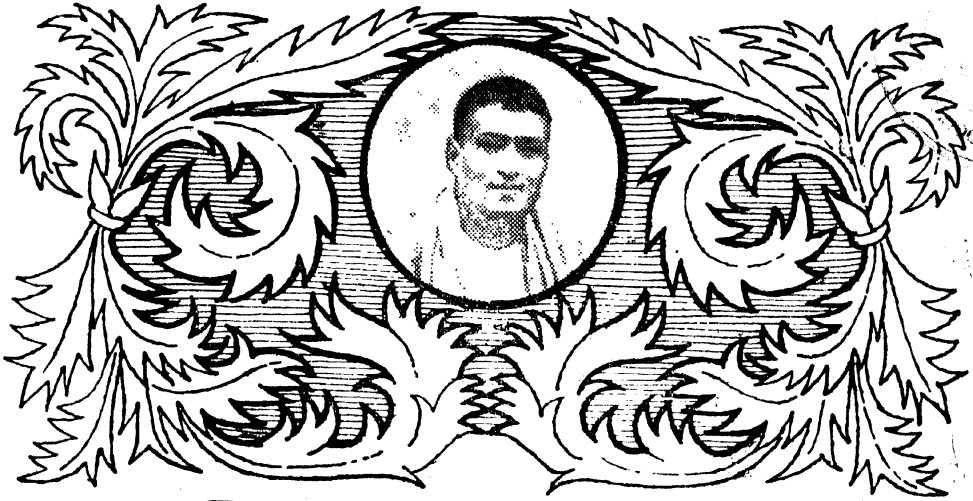
৪০শ বর্ষ—ফাল্গুন, ১৩৬৮] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

কথামৃত

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

ঘটে পটে আবির্ভাব।

নিরৈশ্বর্য্য আসিয়াছ মাধুর্য্য লইয়ে, প্রেমে আঁখি ঝরে,
মানব—মানবমাঝে পরশিতে হিয়ে
অমিশ্রিত মাধুর্য্য অধরে
পাছে নর নাহি আসে ডরে—দীনবেশে ডাক সকাতরে,
হরিবারে মন প্রাণ, কর নাথ আত্মদান—সংসার ভুলাও কণ্ঠস্বরে,
নয়ন-মাধুরী হেরি অভিমান হরে।—গিরিশচন্দ্র।

* * * *

"যেদিন হইতে ঠাকুরের আবির্ভাব, সেই দিন হইতে সত্যযুগের উৎপত্তি।"—Vivekananda.

"Blessed are they—who have not seen but believed."—Bible.

রূপ না দেখে নাম শুনে কানে—
প্রাণ গিয়ে তার লিপ্ত হ'ল।

"তারে চখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি
—মন প্রাণ যা ছিল সব দিয়ে ফেলেছি।"

"আমি আর তোমাদের কি বলিব? আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক!" কল্পতরুভাবে—শ্রীরামকৃষ্ণ।

* * *

Swami Vivekananda looks more like a Warrior than a priest.—The Englishman.

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ। গীতা ২—২, ৩, ৩৭।

Is there any one who can stand in the street yonder and say that he possesses nothing but God and God alone?—Vivekananda.

* * *

মূর্ত্তমহেশ্বরমুজ্জলভাস্বরমিষ্টমমরনরবন্দ্যং।
বন্দেবেদতনুমুজ্ঝিতগর্হিতকাঞ্চনকামিনীবন্ধং ॥

কোটীভানুকরদীপ্তসিংহমহো কটিতটকৌপীনবন্তং ।
অভীরভীহুঙ্কারনাদিতদিঙ্‌মুখপ্রচণ্ডতাণ্ডবনিত্যং ॥
ভুক্তিমুক্তিকৃপাকটাক্ষাপেক্ষণমঘদলবিদলনদক্ষং ।
বালচন্দ্রধরমিন্দুবন্দ্যমিহ নৌমি গুরুবিবেকানন্দং ॥

*　*　*

জয় জয় রামকৃষ্ণ—ব্রহ্মনাম রামকৃষ্ণ ।
ওঁ রামকৃষ্ণ ।

*　*　*

সংগীত ।

গাওরে সুধামাখা—রামকৃষ্ণনাম ।
ঐ নামের গুণে তরে যাবি—অন্তে পাবি মোক্ষধাম ।
(রামকৃষ্ণ নামে)
রামকৃষ্ণ নামের বলে, চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে,
ডাকরে মন প্রাণ খুলে, বলরে নাম অবিরাম ॥
(জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলরে নাম অবিরাম)
শ্রীমুখের অভয়বাণী, বলেছেন রাম গুণমণি,
যত সাধন-ভজন-হীনের, ঐ নামে হবে পূর্ণকাম ॥
(রামকৃষ্ণ নাম নিলে হবে সবে পূর্ণকাম)
গোলোকে (গোপনে) এ নাম ছিল, ধরাধামে কে আনিল,
রামকৃষ্ণ চিনেছিল প্রকাশিল গুরু রাম ।
(পূর্ণব্রহ্ম-চিনেছিল প্রকাশিল গুরু রাম)
দেবের দুর্লভ নাম, বিলাইল দয়াল রাম,
ঐ নামের সহিত বল জয় গুরু জয় রাম ॥
(জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জয় জয় গুরু জয় জয় রাম)

—সেবক কৃষ্ণধন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্র ।

১

জয় জয় রামকৃষ্ণ পতিতপাবন ।
পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর পরম কারণ ॥
যুগে যুগে অবতরি পতিত উদ্ধার ।
দেশ কাল পাত্রভেদ করিয়া বিচার ॥
অগাধ সলিলে প্রভু, মীনরূপ ধরি ।
পরম কৌতুকে বেদ উদ্ধারিলে হরি ॥
কে বুঝিবে তব লীলা, লীলার আধার ।
মেদিনী-উদ্ধার হেতু বরাহ আকার ॥
কূর্ম্মরূপ ধরি হরি ধরণী ধরিলে ।
নৃসিংহ মুরতি ধরি ভক্তে বাঁচাইলে ॥
রাজপুত্র রূপে তুমি ক্ষত্রিয় আলয় ।
রামরূপ ধরি হরি হইলে উদয় ॥
সংসারের পরিণাম কিবা চমৎকার ।
জীবশিক্ষা-হেতু তাহা করিলে বিস্তার ॥
সংসারের সুখ সদা চপলা প্রমাণ ।
বিধিমতে দেখাইলে ওহে সনাতন ॥
অপূর্ব্ব রামনাম ভবে আনি দিলা ।
যে নামে ভাসিল জলে মহাগুরু শিলা ॥
সংসার-জলধিতলে প্রস্তরের প্রায় ।
জীবে মনরূপ শিলা সদা পড়ি রয় ॥
রাম নাম যেই মুখে করে উচ্চারণ ।
তাহার পাষাণ মন ভাসয়ে তখন ॥
কৃষ্ণ-অবতারকালে আশ্চর্য্য মিলন ।
যোগ ভোগ একসূত্রে করিলে বন্ধন ॥
ভাব প্রেম আদি যত ভক্তির বিকাশ ।
সংসার-ভিতরে তাহা করিলে প্রকাশ ॥
কৃষ্ণ নাম দু-অক্ষর যে বলয়ে মুখে ।
দারাদি বেষ্টিত থেকে দিন কাটায় সুখে ॥
বিচিত্র প্রেমের ভাব হৃদয়ে সঞ্চার ।
কৃষ্ণনামে মাহাত্ম্যেতে হয় যে তাহার ॥
পরম প্রেমের খেলা প্রকৃতি সহিত ।
ধারণা করিতে তাহা জীব বিমোহিত ॥
পুরুষ-প্রকৃতি দোঁহে হয়ে একাকার ।
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার হ'লে পুনর্ব্বার ॥
কৃষ্ণনাম সাধনের প্রণালী সুন্দর ।
প্রকাশে জীবের হ'ল কল্যাণ বিস্তর ॥
নামে হয় মহাভাব জীব অগোচর ।
সে ভাব লভিল আহা সংসার ভিতর ॥
এবে নব অবতার রামকৃষ্ণ নাম ।
যে নামে কলির জীব যাবে মোক্ষধাম ॥
নবরূপে নবভাব তরঙ্গ ছুটিল ।
নবপ্রেমে জীবগণ বিহ্বল হইল ॥
আহা, কিবা নব শিক্ষা দিলে ভগবান ।
তোমায় বকল্মা দিলে পাবে পরিত্রাণ ॥
ইহাতে অশক্ত যেবা দুর্ব্বল অন্তর ।
তাহার স্বতন্ত্র বিধি, হ'ল অতঃপর ॥
যাহার যাহাতে রুচি যে নামে ধারণা ।
তাহার তাহাই বিধি তাহার সাধনা ॥
হর হরি কালী রাধা গৌর নিতাই ।
আল্লাতালা ঋষি-খীষ্ট দরবেশ গোঁসাই ॥
ভাবময় নিরঞ্জন ভাবের সাগর ।
যাহার যে ভাবে ইচ্ছা তাহাতে উদ্ধার ॥
আপনি সাধক হয়ে সাধকের হিত ।
বিধিমতে সাধিলেন উল্লসিত চিত ॥
দয়ার মূরতী ধরি অবতীর্ণ ভবে ।
কলির জীবের দুঃখ আর নাহি রবে ॥
রামকৃষ্ণ সারাৎসার, নাহি অন্য গতি আর,
নাম বিনে নাহিরে সাধন ।
জপ নাম বল নাম, অবিরাম অবিশ্রাম,
কর সবে নাম সুধাপান ॥

[ক্রমশঃ ।

—স্বামী সারদানন্দ মহারাজের 'ঠাকুরের কথা' হইতে ।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন ও অশ্লীলতা

শ্রীঅখিলরঞ্জন ঘোষাল

মেঘের অন্তরে যেমন আছে সুশীতল বারিধারা, ভগবানের তেমনি আছে ভক্তের প্রতি অসীম মমতাবোধ। ভক্তের আছে নিষ্কাম ভক্তি, তাই তার একমাত্র সম্বল। সেই সম্বল পাথেয় করে ভক্ত আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে ভগবানের আরাধনা করে। প্রতিনিয়ত কামনা করে সে ভগবানের পরম সান্নিধ্য। ভক্তের আছে আর্তি, বেদনাবোধ, ভগবানেরও তাই আছে। ভক্তের সংগে মিলিত হবার জন্য ভগবানের কম আকুলতা নেই। এই অপার্থিব আকর্ষণের জন্য ভগবান ধরা দেন ভক্তের নিকট। তাঁর রাজসিক মূর্তি ধরা পড়ে ব্রজের রাখাল-বালকে, বংশীধারী কানুবেশে। তিনি হন আমাদের পরম প্রিয়। এখানে তাঁর ঐশ্বর্য থাকে না, আড়ম্বর থাকে না। ভক্তের সংগে দেবতা একাকার হয়ে যান। ব্যবধান নেই, পার্থক্য নেই, আছে শুধু নিশ্ছিদ্র নৈকট্যবোধ। আমি তোমার, তুমি আমার। এই একান্তরূপে নিজের করে পাওয়াই হচ্ছে অমৃত লাভ! আনন্দাস্বাদন। যেখানে ভালবাসার মধ্যে সীমারেখা টানা হয়, সেখানে ভালবাসা যায় মরে। ভালবাসা হবে অসীম, অনন্ত। গাণিতিক পরিমাপে তাকে বিচার করা অন্যায় হবে। ভক্তের চাই ওই অসীম অনন্ত ভালবাসা। আবার ভগবানের চরণে নিবেদনের মুহূর্তে ভালবাসার শুদ্ধির প্রয়োজন। শুদ্ধি কী করে হবে? না, ভক্তিই হচ্ছে গঙ্গাজল। ভক্তির ছাট লাগিয়ে ভালবাসাকে শুদ্ধ করতে হবে। প্রেমকে করতে হবে নৈবেদ্য, উপচারের ফুল। তারপর ভগবানের চরণে হবে নিবেদিত।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন হল ভক্ত চণ্ডীদাসের ভক্তির রাঙাজবা। নির্জন অবসরে অন্তরের পবিত্র ভক্তি দিয়ে তিনি ভগবানের আরাধনা করেছেন। ভগবান এখানে পরমাত্মীয়। ভক্তের সংগে ভগবানের হয়েছে একাত্মতা। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে ভগবানের লীলা অত্যন্ত সহজ, সরল ও মধুর রসেই পরিণতি লাভ করেছে। রাধা এখানে ভক্তের প্রতিমূর্তি আর কৃষ্ণ হলেন ভগবান।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ ভাষা, ছন্দ ও শৈল্পীক রীতিতে যতটা উন্নত ও পরিমার্জিত, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন সেই তুলনায় ম্লান, একথা অনস্বীকার্য। সময় ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে রাধা-কৃষ্ণের লীলাবিষয়ক বহু রচনার ধারা পরিবর্তিত হয়েছে, একথা মেনে নিলে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনকে খুব বেশি দোষী করা চলে না। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডে সুরুচিবোধের অভাব আছে, কিন্তু তাই বলে সামগ্রিক বিচারে এই গ্রন্থটির মূল্য অনেক বেশি। অবশ্য এই নিয়ে বহু সমালোচনা হয়ে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য, যে কবি জন্মখণ্ড ও তাম্বুলখণ্ডে অসাধারণ কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেলেন, তাঁর পক্ষে দেহকেন্দ্রিক চেতনাকে স্পষ্ট ও তীব্র করে চিত্রিত করার বাসনা কী করে সম্ভব হল।

জন্মখণ্ড ও তাম্বুলখণ্ডে চণ্ডীদাস সত্যই এক অনবদ্য শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ছন্দ ও ভাবমাধুর্যে তিনি এমন একটি শাশ্বতিক কাব্যদ্যোতনার ইংগিত দিয়েছেন, যা শুধু তাঁর কালেই নয়, একালেও এক পরম বিস্ময়! তবে এই গ্রন্থ সম্পর্কে আজও সন্দেহের অবকাশ নেই। বিভিন্ন পদ ও ভাষার মধ্যে যথেষ্ট অসামঞ্জস্য দেখা যায়। অনেকের মতে এই গ্রন্থের কতকগুলি পদ প্রক্ষিপ্ত। লেখার রীতির দিক দিয়ে বিচার করলে পার্থক্য আসে বটে, কিন্তু প্রতিটি পদের মধ্যে ভক্তের আকুলতা আছে। এক সময় শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনকে নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে। বহু পদ উদ্ধৃত করে আলোচনা হয়েছে প্রচুর। কিন্তু কোন সমস্যার সমাধান হয়নি। সকল সমালোচকেরা একটা ভাসা-ভাসা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কতক পদ কবি-পরম্পরায় পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। এর একমাত্র কারণ গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অশ্লীলতা সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতি ও জনমতের রুচিবোধ আপন পারিপার্শ্বিক সীমারেখায় আবদ্ধ ছিল। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উত্থান-পতনের সংগে সংগে মানুষের দৃষ্টিভংগিও পরিবর্তিত হল। এই যুগসন্ধিক্ষণের প্রভাব কাব্য ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হল। মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের অশ্লীলতা-দোষ তৎকালীন পরিবেশ-সঞ্জাত। যে পরিবেশকে অস্বীকার করে কবিমন উন্নততর দৃষ্টিভংগির পরিচয় দিতে পারেননি। কিন্তু তবু যা মধুর, যা সুন্দর, তা চিরকালের। তাই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের যেটুকু সুন্দর ও আনন্দ-ঘন, তা অনাদিকালের স্রোতে প্রবহমান।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন প্রাক্-চৈতন্য কালের গ্রন্থ। মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের বহু পদ আস্বাদন করতেন। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের প্রভাবে বৈষ্ণব-সাহিত্য বিশেষভাবে পুষ্টিলাভ করে। পৌরাণিক গ্রন্থে বিষ্ণুর মূর্তি হল শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী দেবতা-মূর্তি। কিন্তু পৌরাণিক যুগের কাঠামো ভেঙে চৈতন্যপূর্ব যুগে আরও একটি মূর্তি প্রচলিত ছিল—তা হল ব্রজের রাখাল-বেশধারী কৃষ্ণমূর্তি। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করে এক অপার্থিব গণ্ডির দ্বারা সীমিত করা হয়েছে। সেখানে তিনি ভগবান, মানুষের ত্রাণকর্তা। মর্ত্যের মানুষের সংগে তাঁর বিরাট ব্যবধান। পরবর্তীযুগে এই ব্যবধান ভেঙে গেল। মানুষের সংগে ভগবানের

সংযোগ নিকটতর হল। মানুষ দেবতাকে নিজের গৃহাংগনের খেলার সাথীরূপে পেল। চণ্ডীদাস হলেন সেই কবি, যিনি মানুষ ও দেবতাকে একাত্ম করে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন আমাদেরই একজন। তাঁর সব ঐশ্বর্য, গাম্ভীর্য এক নিমেষে ধুয়ে-মুছে নরনারায়ণের নিত্য সহচরলীলায় নিবেদিত।

পৌরাণিক ধারা অনুসরণ না করে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রচলিত কাহিনীকে ভিত্তি করে পুরানো কাব্যরীতির মূলে আঘাত করলেন চণ্ডীদাস। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বৈকুণ্ঠলীলায় সমাপ্ত না হয়ে বাস্তব রসে সঞ্জীবিত হয়ে পার্থিবরূপ ধারণ করলো। তাই একদিকে তাঁর কাব্য গভীর তত্ত্ববিষয়ক, অন্যদিকে তেমনি মধুক্ষরা অমৃত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বৈকুণ্ঠধামের সীমারেখা অতিক্রম করে মর্ত্যে নেমে এসেছে। মর্ত্যবাসী একান্ত নিজের করে এই প্রেমরস আস্বাদন করেছে। ফলে, স্বভাবতই এসেছে গ্রাম্যতাদোষ, অশ্লীলতা ও নানাবিধ অসংগতি। অনেক স্থলে রুচিবিগর্হিত শব্দচয়ন গ্রন্থটির রসাস্বাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। অবশ্য সমগ্র গ্রন্থটিতে এই ধরণের রুচিবিকৃতির পরিচয় নেই।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পদগুলির মধ্যে অসামঞ্জস্য থাকায় একক কবির রচনা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। কোন কোন পদ কাব্যোৎকর্ষের দিক দিয়ে নিকৃষ্ট এবং শিল্পগত দৈন্য এত বেশি যে, শ্রেষ্ঠ পদগুলির সহিত তার তুলনা করা যায় না। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিছক দৈহিক ভোগলালসায় নিবদ্ধ; বৈষ্ণব তত্ত্বের সারকথা—'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা' যথাযথভাবে পালন করা হয়নি। কবি এখানে ভগবানের লীলা-কীর্তন থেকে বিচ্যুত হয়ে ইন্দ্রিয়াসক্তির মোহজালে বিভ্রান্ত। তবু শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের অসার অংশটুকু অতিক্রম করে সার অংশের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলে চণ্ডীদাসের শিল্প প্রতিভার অনবদ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। জন্মখণ্ড ও তাম্বুলখণ্ডে চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, কৈশোর-লীলা, রাধার আবির্ভাব এবং বড়াই বুড়ীর কর্মকুশলতা প্রভৃতি ঘটনা আশ্চর্য নিপুণতার সংগে লিপিবদ্ধ করেছেন। রাধার রূপ বর্ণনায় কবি বললেন—'তীন ভুবন-জন-মোহিনী, রতিরস-কাম-দোহিনী।' এইরকম আরো অনেক মধুর শব্দ ও উপমা কবি বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করেছেন—যা এই গ্রন্থটির কাব্যিক মূল্যকে নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করেছে। কবি নানাভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লৌকিক রসে সিঞ্চিত করে আস্বাদনীয় করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের যে অংশটুকু অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট, তার কারণ নির্দ্ধারণের জন্য অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। সাধারণতঃ দেশ কাল অতিক্রম করে কোন কবি নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারেন না। যত শক্তিশালী কবিই হোন, দেশ-কালের অমোঘ প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের কবি ছিলেন দেবী বাশুলীর উপাসক। অনেকের মতে এই দেবী হলেন সমাজের নিম্নস্তরের উপাস্য দেবতা। সুতরাং পূজা, উপাসনা ও ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র করে কবিকে হয়তো নিম্নস্তরের লোকদের সংগে মেলামেশা করতে হত। আর তারই ফলে কবি হয়তো তৎকালীন লৌকিক ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের সংগে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। সেইজন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কাব্যগ্রন্থে এসেছে গ্রাম্যতাদোষ, পল্লীসংস্কার ও রুচিহীন শব্দবিন্যাস। কিন্তু তাই বলে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনকে অপাংক্তেয় ও অশ্লীল বলে দূরে রাখলে নিজেরাই অমৃতকুম্ভ থেকে বঞ্চিত হব।

পুলো জেহাতের অভিশাপ

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

যত রকমের ভয় মানুষের মনকে অভিভূত করে, তাদের মধ্যে সব চেয়ে মারাত্মক হচ্ছে অজানা বিপদের ভয়। যা একান্ত অজানা, যার প্রকৃতি ও কর্ম্মধারা রহস্যময়, সে যে কখন্ কোন দিক থেকে এসে আক্রমণ করবে, তা অনুমান করা দুঃসাধ্য। ইউরোপীয় দেশের লোকেরা অজানা আতঙ্কে বিচলিত হলেও আত্মবিশ্বাস সহজে হারিয়ে ফেলে না, কিন্তু প্রাচ্যদেশবাসীরা স্বভাবতঃ সংস্কারবদ্ধ বলে ঐ সব ক্ষেত্রে একেবারে বিকল হয়ে পড়ে।

অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতিদের মধ্যে আজও এমন সব মায়াবীর কথা শোনা যায় যাদের শক্তি একান্ত দুর্ব্বার। মৃত্যুর পরেও সে শক্তির বিলোপ ঘটে না। ঐরকম অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এক বৃদ্ধ পাওয়াঙ-এর কাহিনী মালয়ে প্রচলিত। মালয়ী ভাষায় মায়াবীকে বলা হয় পাওয়াঙ। ঐ মায়াবীর নাম মেরা। নানারকমের মন্ত্রতন্ত্র নাকি তার জানা ছিল আর সেই সব মন্ত্রের জোরে সে অসাধ্য সাধন করতে পারত। লোকে যেমন তাকে ভক্তি করত, তেমনি আবার ভয়ও করত যথেষ্ট।

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে মেরার জন্ম হয় সিঙ্গাপুরে। তখন সিঙ্গাপুর ছিল ঝোপ-জঙ্গল-ভরা ক্ষুদ্র একটি গ্রাম—চারপাশে জলাভূমি। ওখানে বাস করত জেলেরা—মাছধরার সুবিধার জন্যে। দেড়শো বছরের অগ্রগতির ফলে বর্ত্তমান শতাব্দীতে ঐ জলাভূমি পরিণত হয়েছে জন-কোলাহল-মুখরিত একটি সমৃদ্ধ বন্দরে। কিন্তু এই সমৃদ্ধি স্থানীয় জন-সাধারণের চিন্তাধারার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বহু পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও পুরাতন রীতিনীতি ও বিশ্বাস আজও বর্ত্তমান—পাশ্চাত্য সভ্যতার আঘাতে তাদের মূল আদৌ শিথিল হয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, সমুদ্রের দিক থেকে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় যখন সিঙ্গাপুর বন্দরের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হচ্ছিল, সেই সময় বোঝা গেল স্থানীয় জনসাধারণের মনে প্রাচীন সংস্কার কতখানি প্রবল। সিঙ্গাপুর ও মালয়ের ভূভাগের মধ্যবর্ত্তী জোহর প্রণালীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম মুখে কয়েকটা কামান বসাবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যাতে শত্রুপক্ষের জাহাজ নিকটে এলে তাকে সহজে

ঘায়েল করা যেতে পারে। যে কয়টি স্থান নির্ব্বাচন করা হয়েছিল কামান উপস্থাপনের জন্য তাদের মধ্যে একটি ছিল পাহাড়-জঙ্গল-ভরা ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ। নাম পুলো জোহাত। মালয়ী ভাষায় পুলো জোহাতের অর্থ—দুষ্ট দ্বীপ। এই বর্ণনা যে একান্ত সত্য, তা প্রমাণিত হয় পরবর্ত্তী কয়েকটি ঘটনায়।

বহু বৎসর পূর্ব্বে এই পুলো জেহাতেই আনা হয় মায়াবী মেরার মৃতদেহ কবর দেওয়ার জন্যে। এই দ্বীপটি সিঙ্গাপুর থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে। আয়তনে খুবই ছোট—চওড়ায় আশী গজের বেশী হবে না; গোটা কতক তাল গাছ আর কিছু ঝোপঝাড় আছে সেখানে। আর আছে মেরার কবর—মাটির একটা উঁচু ঢিবি, উপরটা সমতল, গোটাকতক বড় বড় পাথর চাপানো তার উপর।

মালয়ী বা চীনা, কেউই ঐ দ্বীপে যেতে রাজী না হওয়ায় সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ মুস্কিলে পড়লেন। কামান বসাতে গেলে কুলি-মজুর চাই। তাছাড়া ঐ দ্বীপে মালপত্র নামাবার জন্যও বিস্তর লোক দরকার। যে সমস্ত মজুর ঐ জাতীয় কাজে অন্যত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছে, তারা কেউই ঐ অভিশপ্ত দ্বীপে যেতে রাজী হল না। দ্বিগুণ মজুরির লোভ দেখানো হল, কিন্তু তাও ফলপ্রদ হল না। বৃদ্ধ মায়াবীর কবরের কাছে যেতে ভরসা পেল না তারা। কি জানি পাওনাও যদি রুষ্ট হয় শান্তির ব্যাঘাত করার জন্য, তাহলে রক্ষা নেই তাদের। কর্ত্তৃপক্ষকে তারা জানিয়ে দিল,—ঐ দ্বীপে পদার্পণ করলে বিপদ তাদের অনিবার্য্য, কাজেই ওখানে যাওয়া কোনমতেই সম্ভব হবে না তাদের পক্ষে।

সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ দারুণ সমস্যায় পড়লেন। অবশেষে একজন চীনা ঠিকাদার এসে পরামর্শ দিলে, পুলো টেকঙ দ্বীপের বাসিন্দা এক মুসলমান ফকিরের সাহায্য প্রার্থনা করতে। নিরুপায় হয়ে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ঐ মুসলমান ফকিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁদের সমস্যার বিষয় জানালেন। দীর্ঘ আলোচনার পর ফকির সমস্যা সমাধানের একটি উপায় উদ্ভাবন করল। সে বললে, পুলো জেহাতে গিয়ে মেরার বিদেহী আত্মার সঙ্গে সে আলাপ করবে ঐ সম্পর্কে। তার বিশ্বাস, মেরার আত্মাকে সে বুঝিয়ে রাজী করাতে পারবে যাতে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তিভঙ্গকারীদের প্রতি সে রুষ্ট না হয়। অবশ্য একথাও উল্লেখ করতে সে ভুলল না যে, ঐ কাজটি সম্পূর্ণ করতে তাকে বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে আর সে বিপদ এমনি সাংঘাতিক যে, তার তুলনায় তার পাঁচশো ডলার পারিশ্রমিক অতি তুচ্ছ।

উপায়ান্তর না দেখে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ পাঁচশো ডলার অর্থাৎ প্রায় ষাট পাউণ্ড ফকিরকে দিলেন এবং ফকিরও যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। একটা ছোট নৌকায় চড়ে সে ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠল এবং আটচল্লিশ ঘণ্টা মেরার কবরের কাছে বসে রইল তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। ফিরে এসে সে জানাল যে, তার অভিযান ব্যর্থ হয়নি এবং সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ তাদের কাজ শুরু করতে পারেন নির্ভয়ে। তবে তাঁরা যেন কবরের কাছে কাউকে যেতে না দেন এবং এমন কিছু না করেন যাতে মেরার আত্মার অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে।

ফকিরের কথাগুলো কুলিদের জানানো হল, কিন্তু তাদের ভয় ও সঙ্কোচ একেবারে গেল না। তারা কাজ করতে রাজী হল বটে, তবে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে।

প্রতিদিন একদল কুলি ঐ দ্বীপে যেত শাম্পানে চেপে এবং সারাদিন ব্যাপৃত থাকত কামান বসানোর কাজে। ছয় সপ্তাহ পরে কাজটা শেষ হল। এর মধ্যে কোন অশুভ ঘটনা ঘটেনি—কারও জীবন বিপন্ন হয়নি। মনে হল, ফকির টাকাটা ফাঁকি দিয়ে নেয়নি—মেরার আত্মাকে শান্ত করতে পেরেছে।

যে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য যন্ত্রাদি সরবরাহ করেছিল, তাদের স্থানীয় প্রতিনিধিকে এখন আমন্ত্রণ জানানো হল কাজটি পরিদর্শনের জন্য। এই ভদ্রলোকটি প্রায় দশ বছর সুদূর প্রাচ্যে কাটিয়েছেন, স্থানীয় জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও এসেছেন, কিন্তু অলৌকিক ব্যাপারে তাঁর আস্থা ছিল না এতটুকু।

তাঁর চীনা সহকর্ম্মী ট্যান্ এবং জনকয়েক ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে করে চাঙ্গি থেকে পুলো জেহাতের দিকে তিনি যাত্রা করলেন মোটরলঞ্চে। সঙ্গীদের মুখে তিনি শুনলেন বৃদ্ধ মেরার কথা—মেরার আত্মাকে সাময়িকভাবে শান্ত রাখার জন্য সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যে এক মুসলমান ফকিরের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, তাও শোনানো হল তাঁকে। ব্যাপারটা নিতান্ত হাস্যকর মনে হল তাঁর কাছে এবং সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যে অর্থের অপব্যয় করেছিল, একথা বলতে দ্বিধা করলেন না তিনি।

পুলো জেহাতে অবতরণ করা মাত্র ইঞ্জিনিয়ার সঙ্গীদের জানিয়ে দিলেন, অন্য কিছু করার আগে তিনি থুতু ফেলবেন ঐ মায়াবী মেরার কবরের ওপর—যাতে স্থানীয় লোকেদের মন থেকে মেরার সম্বন্ধে ভয়ের ভাবটা চলে যায় একেবারে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সঙ্কল্পের কথা শুনে তাঁর সহকর্ম্মী ট্যান্ রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। মেরার হান্টুকে (প্রেতাত্মা) অনর্থক উত্যক্ত ক'রে শুধু বিপদ ডেকে আনা হবে—একথা সে বোঝাবার চেষ্টা করল ইঞ্জিনিয়ারকে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস-সি ডিগ্রিধারী ট্যান্। মুচকি হেসে ইঞ্জিনিয়ার বললেন, তার মত উচ্চশিক্ষিত যুবকের পক্ষে ঐসব আজগুবি ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করা আদৌ উচিত নয়। ট্যানের সমস্ত যুক্তিতর্ক নিষ্ফল হল। মেরার কবরের কাছে গিয়ে সবার সামনে ইঞ্জিনিয়ার থুতু ফেললেন তার উপর। মেরাকে কেন্দ্র ক'রে যে কুসংস্কার গড়ে উঠেছে শতাব্দীকাল ধরে, তা যে নিতান্ত অর্থহীন ও অজ্ঞতাপ্রসূত, এইটাই প্রমাণ করতে চান তিনি।

সঙ্গে-সঙ্গেই এমন কিছু ঘটল না—যা ঐ দুঃসাহসিক কাজের পরিণতি হিসাবে ধরা যেতে পারে। কোন বিপদে পড়লেন না ইঞ্জিনিয়ার, শারীরিক বা মানসিক কোনরকম বৈলক্ষণ্যও দেখা গেল না তাঁর। বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্রের পর্য্যবেক্ষণের কাজ শুরু করলেন তিনি এবং সে কাজ শেষ হবার পর সহকর্ম্মীকে নিয়ে ফিরে গেলেন সিঙ্গাপুরে।

স্থির করা হল, পরের দিন ঐ যন্ত্রটিকে চালিয়ে পরীক্ষা করা হবে কোথাও কোনো গলদ আছে কিনা। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হাতে যন্ত্রটিকে ছেড়ে দেবার আগে এ-কাজটি করা দরকার। এই পরীক্ষাকার্য্যের তদারক করবেন ইঞ্জিনিয়ার এবং যদি কোন সমস্যার উদ্ভব হয় তিনিই তার সমাধান করবেন।

ডিজেল ইঞ্জিন চালু করা হল এবং নির্বিঘ্নে কাজ চলল পাঁচ মিনিট। তারপরই ঘটল এক অপ্রত্যাশিত বিপদ। একজন চীনা শ্রমিক এক টুকরা কাপড় দিয়ে ডিজেল ইঞ্জিনের উপরিভাগ

পরিষ্কার করছিল। খুব হুঁসিয়ার ও দক্ষ কারিগর বলে সবাই তাকে জানত। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল আর্তস্বরে এবং যন্ত্রণায় নুয়ে পড়ল। ইঞ্জিনের Water-cooler এর ফ্যানে হাতটা আটকে গেছে তার এবং বুড়ো আঙুলটা কেটে ছিটকে পড়েছে দূরে।

তাড়াতাড়ি তাকে পাঠানো হল হাসপাতালে। ভয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল লোকটি। শারীরিক যাতনা তাকে ততটা অভিভূত করতে পারেনি—যতটা করেছিল অজানা বিপদের আতঙ্ক। তার দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল, ইঞ্জিনিয়ার মায়াবী মেরার আত্মার কোপে পড়েছেন এবং সেই কারণেই ঘটল এই দুর্ঘটনা। তাকে যখন লঞ্চে তোলা হচ্ছে ধরাধরি করে, তখন সে শুধু ব্যাকুলভাবে তার সঙ্গীদের বলছিল, তারা যেন অবিলম্বে ঐ দ্বীপ ছেড়ে চলে আসে, নইলে তাদের বিপদ অনিবার্য্য। মেরার হান্টু যখন ক্রুদ্ধ হয়েছে, তখন আর তাদের রক্ষা নেই।

ঐ দ্বীপে চীনাদের মধ্যে একমাত্র ট্যান্ই জানত যে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মেরার কবরকে কলুষিত করেছেন। এখন সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ইঞ্জিনিয়ারের দিকে। ইঞ্জিনিয়ার মৃদু হেসে বললেন, "তুমিও ওদের মত ভাবতে শুরু করেছ নাকি? তুমি শিক্ষিত—নিশ্চয়ই তুমি বিশ্বাস করো না যে, আমার ঐ তামাসার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার কোন যোগাযোগ আছে।"

কোন জবাব দিল না ট্যান্, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার বেশ বুঝতে পারলেন যে, শ্রমিকের ঐ বিপদটা যে আকস্মিক দুর্ঘটনামাত্র, একথা মানতে সে রাজী নয়।

ঐ দুর্ঘটনার জন্য যন্ত্র চালনা বন্ধ হল না, যন্ত্র যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল, কারণ সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি ছিল এই যে, একাদিক্রমে পাঁচ ঘণ্টা চলার পর যন্ত্র স্থাপনের কাজটা অনুমোদন করবেন তাঁরা। ইঞ্জিনিয়ার ফিরে গেলেন বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রে সুইচবোর্ডের রীডিং পর্য্যবেক্ষণ করতে।

দু' ঘণ্টা যন্ত্র ভালভাবেই চলল। তারপর হঠাৎ সুইচবোর্ডের উপরকার সব কটা কাঁটাই ঘুরে গেল শূন্যাঙ্কের (Zero) দিকে এবং বিদ্যুৎ চলাচল গেল বন্ধ হয়ে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রটিকে যে ডিজেল ইঞ্জিন চালিত করছিল তখনও সেটা চলছিল পূর্ব্বের মত, কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছিল না মোটেই।

একজন কুশলী কারিগরকে সঙ্গে করে ইঞ্জিনিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র ও বিদ্যুৎবাহী তারগুলি পরীক্ষা করলেন ভাল ক'রে, কিন্তু কোথাও কোন গলদ দেখতে পেলেন না। মালয়ের নানা জায়গায় ঐ ধরণের পঞ্চাশটি যন্ত্র বসানো হয়েছে এবং প্রত্যেকটিই চলছিল ভালভাবে—কোথাও কোন অসুবিধা দেখা দেয়নি। কাজেই যন্ত্রটির উপর ওখানকার আর্দ্র জলবায়ুর বা অন্য কিছুর প্রভাবের প্রশ্ন একেবারেই উঠতে পারে না।

পরীক্ষার কাজ স্থগিত করা হল এবং ঐ ব্যাপারটা জানানো হল চাঙ্গির রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স এর অফিসারকে। অফিসার সঙ্গে-সঙ্গে তৈরী হলেন পুলো জেহাতে রওনা হবার জন্য—যন্ত্রের কোথায় কী গলদ হয়েছে তার অনুসন্ধানে ওখানকার কর্ম্মীদের সাহায্য করতে।

পরের দিন অফিসার এসে হাজির হলেন পুলো জেহাতে। ডিজেল ইঞ্জিন চালানো হল। সকলে অবাক হয়ে দেখলে, সুইচ বোর্ডের কনট্রোল চালু করার সঙ্গে-সঙ্গেই বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি হল।

অফিসার একটু আশ্চর্য্য হয়ে তাকালেন ইঞ্জিনিয়ারের দিকে। ইঞ্জিনিয়ার একেবারে হতবাক—কেমন করে বিনা আয়াসে সব ঠিক হয়ে গেল তা তিনি বুঝতেই পারলেন না। এ যেন ভোজবাজি! পরীক্ষার কাজ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হল এবার।

একমাস পরে রয়্যাল ইঞ্জিনিয়াররা ঠিক করলেন কামান ছোঁড়ার পরীক্ষাটা সম্পন্ন করবেন পুলো জেহাতে, কিন্তু ঐ পরীক্ষা যে সময়ে সম্পন্ন করবার কথা ঠিক তার কয়েকদিন আগে আবার বিদ্যুৎ চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সন্ধান করে দেখা গেল—এর জন্য দায়ী বিদ্যুৎবাহী তারগুলি যা পাওয়ার-হাউস থেকে কামানের জায়গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তারগুলি খুব ভারী এবং সীসার আবরণে ঢাকা। ঐ তার গিয়েছিল মেরার কবরের পাশ দিয়ে। সবাই লক্ষ্য করলে, তারের সীসার আবরণ খসে গিয়েছে ঠিক কবরের কাছটিতে, অন্যত্র তার অক্ষতই রয়েছে।

তার বদলে দেওয়া হল এবং তারপর যন্ত্রের আর কোন গোলযোগ দেখা গেল না। তবে অন্যত্র এক নতুন রকমের দুর্ঘটনা ঘটল।

যন্ত্র চালু হবার কিছুদিন পরে, একটি ছোট নৌকা একদিন এল পুলো জেহাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার নিয়ে। নৌকাটিকে যখন তীরে বাঁধা হচ্ছে সেই সময় দড়িটা পড়ে যায় জলের মধ্যে। দড়িটা তুলে আনবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে একজন কুলি ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। মাত্র কয়েক গজ দূরে এক ভয়াল হাঙ্গর যে তাকে লক্ষ্য ক'রে দ্রুত এগিয়ে আসছে, তা সে লক্ষ্য করেনি। মুহূর্ত্তের মধ্যে হাঙ্গরটা আক্রমণ করল তাকে। একটা ভয়ার্ত্ত চীৎকারে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল যেন, পরমুহূর্ত্তেই চারিপাশের শুভ্র ফেনময় জল রক্তে লাল হয়ে গেল। হাঙ্গরটা কুলির উরুতে কামড় দিয়ে অনেকখানি মাংস কেটে নিয়ে গেছে।

১৯৪২ সালে জাপানীরা এসে দখল করল সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরের পতনের কয়েকদিন আগে একজন জাপানী বৈমানিক পুলো জেহাতে কামানগুলোকে লক্ষ্য ক'রে বোমা নিক্ষেপ করে। অনেক উঁচু থেকে ডাইভ ক'রে বোমাটা ফেলেছিল সে। কিন্তু বোমাটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, দ্বীপের উপর না পড়ে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ে। বিমানটাও বেগ সামলাতে না পেরে সমুদ্রে পড়ে ধ্বংস হয় এবং সেই সঙ্গে মৃত্যু হয় বৈমানিকের।

জাপানীরা আসবার দুদিন আগে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির পরিদর্শক সেই ইঞ্জিনিয়ার সিঙ্গাপুর ছেড়ে পালিয়ে যান জাভায়। জাভা থেকে দিনকতক পরে তিনি জাহাজে চেপে অষ্ট্রেলিয়ায় উপস্থিত হন এবং সেইখানেই থাকেন যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত।

ইঞ্জিনিয়ার চলে যাওয়ার পর পুলো জেহাতে আর কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। যে ব্যক্তি কবরটি কলুষিত করেছিল, তার প্রস্থানের পরই যেন ঐ দ্বীপটি অভিশাপমুক্ত হল।

দ্বীপের উপর থেকে অভিশাপ সরে গেল বটে, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গ সে ছাড়ল না। মাস কয়েক পরে তাঁর চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে দুর্ব্বল হয়ে এল। চক্ষু-চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিশক্তির পুনরুদ্ধার করতে পারলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেন।

পুলো জেহাতের এই কাহিনী বিবৃত করেছেন ঐ অন্ধ ইঞ্জিনিয়ার নিজেই। নাম তাঁর টমাস ওয়েলবর্ণ।

মধ্য প্রাচ্যের দিনপঞ্জী

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম কায়রোতে আর নয়। আগামী কালই চলে যাব বেরুত।

মেয়াদ ছিল আরও এক হপ্তার। পোর্ট-সৈয়দ যাব, সেখান থেকে আসোয়াল, তারপর ফের কায়রো—মিঃ ইউসুফের নেমন্তন্ন রক্ষা করে তবেই কায়রো থেকে বিদায়। কিন্তু তা আর হবে না দেখছি। মিঃ ইউসুফকে ফোন করলাম।

ওপাশ থেকে ভেসে এল নারী কণ্ঠ। ভাষা আরবী। ইংরাজীতে বললাম: মিঃ ইউসুফ আছেন? আমার নাম চ্যাটার্জী। ইণ্ডিয়া থেকে এসেছি। মিঃ ইউসুফ চিনতে পারবেন আমাকে··যদি কাইণ্ডলি।

আমি লায়লা। ইউসুফের বোন।

সেলাম আলেকুম। আপনার কথা অনেক শুনেছি।

আলেকুম সেলাম। আপনার কথা এই একটু আগেই হচ্ছিল। কবে আসছেন আমাদের বাড়িতে?

ইউসুফ টেলিফোন ধরলেন।

হ্যালো, কী খবর? আজ বিকেলে টেলিফোন করেছিলাম, আপনাদের হোটেলে। কোথায় ছিলেন? খবর শিকারে নাকি?

মৃদু হেসে বললাম: শিকারে নয়, শিকার হতে। মিঃ ইউসুফ। আমি সম্ভবত কালকে বেরুতের প্লেন ধরছি।

সে কি, আপনার প্রোগ্রাম?

বাতিল করলাম, করলাম না হয়ে গেল। মিঃ ইউসুফ, শেষবারের মত আমরা কি দেখা করতে পারি?

হোয়াই নট, আজ রাতে আমার এখানে ডিনারের নেমন্তন্ন রইল আপনার। আমি গাড়ি পাঠাচ্ছি।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই দরজায় নক করার শব্দ। এতক্ষণ ডাইরিটা লিখে নিচ্ছিলাম। দু'দিনের ডাইরি জমে আছে। ভ্রমণের ব্যস্ততার মধ্যে দিনলিপির পাতাগুলি আর খোলা হয়ে ওঠেনি। লিখছিলাম এক অভূতপূর্ব আনন্দ আর পুলক মনের মাঝে নিয়ে কায়রোতে নেমেছিলাম। কিন্তু যাবার সময় বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরতে হচ্ছে। এমন সময় দরজায় নক করার আওয়াজ শুনতে পেলুম।

কাম ইন।

ঘরে ঢুকল একটি তরুণী। মিশর কুমারী। ইওরোপীয় পরিচ্ছদে আগাগোড়া মোড়া। ঠোঁটে লিপস্টিক, মুখে রুজ, পরণে ফ্রক। শুধু ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম দেখে আরব দেশের মেয়ে বলে চেনা যায়।

গুড ইভনিং। আপনিই কি মিঃ চ্যাটার্জী?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আসুন আসুন।

আমি লায়লা।

আন্দাজ করেছিলুম। কি সৌভাগ্য আমার। চলুন প্রস্তুত আমি।

সোলেমান পাশা স্কোয়ার ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ি চলল গার্ডেন সিটির দিকে।

রাতের কায়রোর একটি আলাদা রূপ আছে। চারিদিকে আলোর সমারোহ আর রঙ-বেরঙের পোশাক-পরা মানুষের ভিড়ে দিনের কায়রোর কুশ্রীতা কোথায় চাপা পড়ে যায়। কোথায় সেই আলখাল্লা-পরা বেদুইন ভিখারিদের চিৎকার, আর বুটপালিশ ও ফেরিওয়ালার ভিড়ে ভর্তি ঘিঞ্জি ফুটপাত। মাথার ওপরে সূর্যের দারুণ দাবদাহতো আছেই।

লায়লা বললে: কেমন লাগছে আমাদের দেশ?

আমি বললাম: ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব?

লায়লা। সাংবাদিকেরা কি কোন কথা বলতে ভয় পায়?

আমি হেসে বললাম। না, বরাভয় পেলে পায় না। শুনুন বন্দি, কায়রোর প্রতি আমি এই মুহূর্তে খুবই ক্রুদ্ধ। আজই বিকেলে সোলেমানপাশা-স্কোয়ারে প্রকাশ্য ভিড়ের মধ্যে আমার পাঁচ পাউণ্ড দামের কলমটি হাতাজানি হয়ে গেছে।

লায়লা। আপনি পুলিশে খবর দেননি?

আমি। হ্যাঁ, এই তো দুঘণ্টা ধরে এক থানা থেকে আর এক থানায় ঘুরে বেড়িয়েছি। মিস লায়লা, তোমাদের পুলিশ-দপ্তর আমাদের চেয়ে খুব বেশী উন্নত নয়।

: আমি খুব দুঃখিত মিঃ চ্যাটার্জী।

: আমিও। এবারে হেসে উঠল লায়লা।

বললাম, মিস লায়লা: আপনাদের দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এখনও আসেনি, দেশের দারিদ্র্য এখনও ঘোচেনি, তবু একটা জিনিস, যেটি কোন দেশ গঠনের সবচেয়ে প্রথম, সেটি আপনাদের আয়ত্ত হয়েছে, তা হল জাতীয় চেতনাবোধ। আমরা প্রায় একশ বছর ধরে সংগ্রাম করে যা আয়ত্ত করতে পারিনি, একা পোর্ট-সৈয়দে আপনারা তা আয়ত্ত করেছেন।

লায়লা। পোর্ট-সৈয়দে এ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ এ্যাগ্রেসনের সময় আমি ছিলাম ঐ এলাকায়। বাবা ওখানে প্র্যাকটিশ করতেন। আমি তখন ওখানকার কলেজে পড়ি। আমরা সে সময় দেখেছিলাম, পোর্ট সৈয়দ দ্বিতীয় লেনিনগ্রাদে পরিণত হয়েছিল। আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ চ্যাটার্জী, লেনিনগ্রাদে আমাদের শহীদেরা মৃত্যু বরণ করে জাতিকে বাঁচবার মন্ত্র দিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম মিঃ ইউসুফের বাড়িতে। মোটরের হর্ণের আওয়াজ শুনে নেমে এলেন ইউসুফ।

মিঃ ইউসুফের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল বৃটেনে। কার্বাডফে আমরা একই পাড়াতে থাকতাম। একই সংবাদপত্রে কাজ করতাম। তবে ইউসুফ অনেক আগে থেকে বৃটেনে ছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারের জন্য ওয়েষ্টার্ণ মেল কাগজের সমস্ত কর্মীরাই তাঁকে ভালবাসত।

ইউসুফ পরিবার ইস্রায়েলী আরব উদ্বাস্তু। সমস্ত আরবের মতই ইহুদী-বিদ্বেষী। মনে পড়ে এই ইহুদী-বিদ্বেষ নিয়ে ইউসুফের সঙ্গে তাঁর পেনিনান প্লেসের বাড়িতে রাতের পর রাত তর্ক হোত।

ইস্রায়েলি সৈন্য আরব এলাকায় যে সমস্ত নৃশংস হানা চালিয়েছে, আমি তার প্রবল প্রতিবাদ করি। এগুলি স্বীকৃত সত্য। কিন্তু রাষ্ট্র হিসাবে ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠার পিছনে আরব জনগণের যে প্রবল উষ্মা ও ঈর্ষার প্রকাশ দেখেছি, আমি তাকে সমর্থন করতে পারিনি।

আরব দুনিয়ার কাছে ইস্রায়েলের মানুষ আজ একঘরে হয়ে রয়েছে। মনে পড়ে ফ্লোরেন্সে আলাপ হওয়া সেই ইস্রায়েলি ট্যুরিষ্টটি আমায় দুঃখ করে জানিয়েছিল, ইস্রায়েল থেকে ভারতে আসতে হলে তাকে বিমানপথ দিয়ে আসতে হবে। লেবানন, ইরাক, আরব সাধারণতন্ত্র ও পাকিস্তান—কোন রাষ্ট্রেই তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এমনকি, বিদেশী ট্যুরিষ্টদেরও পাশপোর্টে ইস্রায়েলের ভিসা থাকলে, তাকে উপরোক্ত রাষ্ট্রগুলির ভিসা দেওয়া হবে না। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরব-ইস্রায়েল সম্পর্কের মতই। তবু এই উভয় দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের এরূপ অবনতি আমরা চিন্তা করতে পারি না।

মিঃ ইউসুফ নেহরুর খুব ভক্ত। কায়রোতে ভারতপ্রীতি বা ভারতীয় প্রীতি খুব প্রবল না হলেও ভারতের সঙ্গে আরব সাধারণতন্ত্রের সম্পর্ক খুব নিবিড়। তবে আয়ুব খানও নাসেরের কম বন্ধু নন। নাসের বলেন,—কাশ্মীর-সমস্যা সমাধানের ভার তাঁর ওপর দিলে একদিনের মধ্যেই তা করে দিতে পারেন।

হোটেলে ফিরতে রাত বারোটা বাজল। ফেরার সময়ও এসেছে লায়লা।

নীল নদের ধার দিয়ে গাড়ি চলেছে। কাকচক্ষুর মত নির্মল জল। ব্রিজ পেরিয়ে রাস্তা চলে গেছে শাহারা সিটি আর পিরামিডের দিকে। নদীর জলে বৈদ্যুতিক আলোর প্রতিবিম্ব।

লায়লাকে বললাম: সত্যিই মিশর নীল নদের দান। অন্ততঃ মরুভূমির বুকে যেটুকু সবুজ এখনও বেঁচে আছে, তা এই নীল নদের জন্য।

লায়লা বললে: গাড়ি থামাতে বলি। আসুন না বসা যাক, নদীর ধারে।

রাত্রি বারোটা। তবু কায়রোর রাস্তায় জনতার কমতি নেই। লায়লা আমায় নিয়ে চলল এক নির্জন প্রান্তে।

নিচে নদী। ওপরে শান-বাঁধানো চওড়া ফুটপাথ, তার ওপরে সারি সারি কাঠের বেঞ্চি পাতা।

দেখলাম সেই বেঞ্চিগুলির অধিকাংশই বহু প্রণয়ী-যুগলের অধিকারে।

শেষ পর্যন্ত একটা আসন পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা।

—[illegible] মিঃ চ্যাটার্জী।

—হ্যাঁ, কাল দুপুরেই প্লেন। আমি বললাম।

—দেশে ফিরে চিঠি লিখবেন তো?

উত্তর দিলাম না কথাটির। জানি মিথ্যা এ প্রতিশ্রুতি। পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। উলভার হ্যাম্পটনের এ্যাঞ্জেলা, হামবুর্গের ফিশার, এথেন্সের পেনিলোপি, ডাইরির পাতাগুলি শুধু ঠিকানায় ঠিকানায় ভরে উঠেছে। আমরা সকলেই জানি জীবনের সঙ্গে সমুদ্রে আমরা সবাই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। পথ চলার ধর্মই তো এই। যত প্রাপ্তি তত বিচ্ছেদ। স্মৃতি বুকে করে কেন তবে বেদনার বোঝা বাড়ানো?

—কি, কথা বলছেন না যে? লায়লা তার সুরমা-টানা চোখ দুটি আমার দিকে মেলে ধরল।

—লায়লা, আজকের রাতটা আমাদের জীবনে নীলের জলে হঠাৎ জাগা ঐ বুদ্বুদটার মতই। একবার জেগে উঠে তাকে মিলিয়ে যেতে দাও।

লায়লা আর কোন কথা বলল না। শুধু দূরে কোথায় ষ্টিমারের ভেঁপু বেজে উঠল। আর লিবার্টি-স্কোয়ারের মসজিদ থেকে ঢং ঢং করে প্রহর ঘোষণা করার শব্দ ভেসে এল।

কাষ্টমস্ অফিসারটি বললেন: কী, এত তাড়াতাড়ি ফিরে চললেন! গম্ভীরভাবে জবাব দিলাম: হ্যাঁ, জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে গেল তাই।

এ কথার পিছনে একটু ইতিহাস আছে। কায়রো এয়ারপোর্টে নামতেই, এই কাষ্টমস্ অফিসারটি আমার ওভারকোটের বোতাম নিয়ে টানাটানি সুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, এই বোতামগুলির মধ্যে হয়ত প্লাটিনাম পোরা আছে।

শুধু তাতেই ক্ষান্ত হন নি, ভদ্রলোক স্যুটকেশ খুলে আমার ট্রান্সিষ্টার রেডিওটি হাতে করে বললেন: কী ব্যাপার? প্রেজেন্টেশান না বিক্রির জন্য?

কথাটা বড় গায়ে লেগেছিল। পৃথিবীর এগারটি রাষ্ট্র ঘুরে কাষ্টমস্-এর কাছ থেকে এমন অভদ্র ব্যবহার কখনও পাইনি।

বলেছিলাম। আপনার কি মনে হয়?

—না-না, এমনি জিজ্ঞাসা করছি। তা আপনি দেখছি জার্ণালিষ্ট। কোন বিজনেস্ ট্যুর নাকি?

কাষ্টমস্ অফিসারটি ঠিক মনে করে রেখেছেন আমাকে। ফেরার সময় এই প্রশ্ন করতেই আমি ঐ উত্তর দিয়াছিলাম। ভদ্রলোক আর কথা বলতে পারেননি।

বেরুতের পথে দুজন ভারতীয় সঙ্গী জুটে গেল। একজন কলিকাতা-প্রবাসী শিখ ব্যবসায়ী। অপরজন গৌহাটির অসমীয়া ছাত্র মিঃ শর্মা।

বেরুত মধ্যপ্রাচ্যের প্রবেশ-দ্বার। সমুদ্র-সৈকত বেরুতে ছুটি কাটাতে আসে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ ট্যুরিষ্ট। লেবাননের সমুদ্র সৈকত জুড়ে অসংখ্য ক্যাবারে আছে, আছে ক্যাজিনো, আছে ষ্ট্রিপটিশ নাচের খোলা ব্যবস্থা, আর বারে বারে আছে অফুরন্ত মদ, আর পথে ঘাটে অসংখ্য জিন্, হুরীদের মেলা।

দেড়কোটি লোকের দেশ লেবাননে আজ যে এত শ্বেতাঙ্গর আনা-গোনা, তার অর্থ একেবারে নিছক সৌন্দর্য-পিপাসা বা ভ্রমণ

বিলাস নয়, তার কারণ লেবাননে আছে শ্বেতাঙ্গ ধনিকদের তেলের স্বার্থ। ইরাক পেট্রোলিয়াম অয়েল কোম্পানীর পাইপ-লাইন চলে গেছে লেবাননের মাটির তলা দিয়ে। ত্রিপলি আর সিদনে আছে সে তেলের শোধনাগার। লেবানন, তৈল-ব্যবসায়ীদের পক্ষে মস্ত বড় ষ্ট্র্যাটেজিক বেস।

দেড় কোটি মানুষের দেশ লেবাননে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রবল। দেশের অর্দ্ধেক মানুষ খৃষ্টান, বাকী অর্দ্ধেকের মধ্যে আছে মুসলমান আর দ্রুসেস। আর একমাত্র পবিত্র ইসলামিক রাষ্ট্র ছাড়া মুসলমানরা অন্ত কোথাও নিরাপদ বোধ করেন না। তাই দেশের অর্দ্ধেক খৃষ্টান জনসংখ্যার সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ।

সংবিধানে তাই আসন ভাগাভাগির বিধান দেওয়া আছে। প্রেসিডেণ্ট হবেন খৃষ্টান, আর প্রেসিডেণ্ট একজন মুসলমানকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। তাও কোন্ মুসলমান? লেবাননে শিয়া ও সুন্নীর মধ্যেও প্রবল দ্বন্দ্ব। তবে কনভেনশন হল, প্রধানমন্ত্রী হবেন, সুন্নী মুসলমান। আর স্পীকার হবেন একজন শিয়া।

লেবাননের কথা মনে পড়তেই, মনে পড়ে ১৯৫৮ সালের কথা। লেবাননের খৃষ্টান প্রেসিডেণ্ট চ্যামুন দ্বিতীয়বার প্রেসিডেণ্ট পদ প্রার্থী হলেন। সংবিধান বলছে: কোন প্রেসিডেণ্ট পুনরায় নির্বাচন-প্রার্থী হতে পারবে না। কিন্তু চ্যামুনের পিছনে ছিলেন আইসেনহাওয়ার। চ্যামুন সংবিধান সংশোধনের চেষ্টা করলেন, তার ফলেই বাঁধল সংঘর্ষ। মুসলমান আর দ্রুসেসরা বিগড়ে গেল। এমনকি অনেক খৃষ্টানও।

বেরুতের পথে পথে সুরু হল সশস্ত্র বিদ্রোহ। চ্যামুন বললেন: উস্কানিটা আসলে দিচ্ছে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র। সিরিয়ার সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র আসছে, আর আসছে সিরিয়ার বহু লোকজন। চ্যামুন শরণাপন্ন হলেন আমেরিকার। আইসেনহাওয়ার বললেন: আমি সৈন্য পাঠাচ্ছি। চ্যামুন বেগতিক দেখে বললেন, বেশ, আমি সরে দাঁড়াচ্ছি। কিন্তু দেশের নিরাপত্তার জন্য মার্কিনী সৈন্য থাকবে লেবাননে। তাই হল। প্রেসিডেণ্ট হলেন ফুয়েদ চেহাব। মার্কিনী সৈন্য থেকে গেল।

বেরুতে সেদিন ট্যাক্সি-ধর্মঘট। কাজেই হোটেল থেকে পথে বেরিয়ে পড়লাম। আমি, শর্মা ও মিঃ সিং।

একই হোটেলে আমরা উঠেছি। মিসির এয়ার কোম্পানীর বাস হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেছে। এর মাঝে মিঃ শর্মা চান করে নিয়েছেন। তারপর সুটকেশ থেকে হুইস্কির বোতল বার করে, পেগ দুয়েক পান করেছেন। এতে—তাঁর ভাষায়—শরীরে এনার্জি এসেছে।

মিঃ সিং ভারতীয় ব্যবসায়ী। তাঁর এই নিয়ে ষষ্ঠবার বিদেশ ভ্রমণ। বেরুতে তিনি আগেও এসেছেন। ট্যাক্সির ধর্মঘট দেখে তিনি রাষ্ট্রভাষায় মাঝে মাঝে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তাঁর পরিচিত কোথায় এক নৈশ ক্লাব আছে। সেখানে যাবার জন্য ব্যাকুল।

পথে বার হতেই ছেঁকে ধরল। ছোট ছোট ছেলে।—গুড গার্ল স্যার। ভেরি গুড।

ধমক দিলেও যায় না। পিছনে পিছনে ধাওয়া করে। ট্যাক্সি নেই। বেরুতে ট্রাম আছে। তা দেখলে চড়বার সাধ জাগে না। সরু সরু রাস্তা, ঘিঞ্জি। আরবি হরফে লেখা রাস্তার নাম, সাইনবোর্ড।

খৃষ্টমাস আসছে। দোকানে দোকানে খৃষ্টমাস-ট্রি সাজানো হয়েছে। এবছরে খৃষ্টমাসের প্রস্তুতি দেখে আসছি রোম থেকে। এই তো একমাস আগে দেখেছি সেণ্ট পিটারোতে বৈদ্যুতিক বাল্ব বসানো হচ্ছে। এথেন্সের ডাকঘরে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে কি বিপুল জনসমাগম। কায়রোতে যদিও খৃষ্টমাসের জৌলুষ কিছুটা কম, কিন্তু লেবানন খৃষ্টমাসের আনন্দোৎসবে মুখরিত!

সারাদিন ঘুরে হোটেলে ফিরলাম রাত্রি বারোটায়। তখন হোটেলের ক্যাবারেতে ষ্ট্রীপটিশ নাচের আসর সবে জমে উঠেছে।

আজ খৃষ্টমাস। পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে কয়েকটি কার্ড এসেছে। এর মাঝে পেলিলোপির হাতের গোটাগোটা অক্ষর ক'টিকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। গ্রীসের ষ্ট্যাম্প তার বুকে জ্বল জ্বল করছে।

সকাল ন'টা বাজল। হোটেলের লাউঞ্জে বসে আছি। বাইরে সূর্য উঠেছে। জানালা দিয়ে দূরের পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে। কাল আমি আর নিজামুদ্দিন ঐ পাহাড়টায় পৌঁছতে চেষ্টা করেছিলাম। এখান থেকে কুড়ি মাইল। অথচ দেখলে মনে হয় বুঝি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরা যায় ওটাকে।

কয়েকদিন হল তেহরাণে এসেছি। পারস্যের তেহরাণ। না, হাফেজ, শেখসাদী কিংবা ওমর খৈয়ামের পারস্য নয়—ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী আর বৃটিশ পেট্রোলিয়াম অয়েল কোম্পানীর পারস্য। মোসাদ্দেকের পারস্য নয়, রেজাশাহ পহ্লবীর পারস্য।

তেহরাণকে এই ক'দিন ধরে যতটা পারি দেখেছি। এখনও এক্সপ্যানসান চলছে। নতুন রাস্তা, নতুন বাড়ি। বাকী সেই গতানুগতিক দৃশ্য। ভূমধ্যসাগর পার হলেই যা চোখে পড়ে। অনেক গরীব মানুষ। অনেক ভিখিরি।

এক্ষুনি নিজামুদ্দীন আসবে। নিজামুদ্দীনের খুব ইচ্ছা ছিল আমি সিরাজ আর ইস্পাহান যাই। শেখশাদীর জন্মস্থান দেখে আসি। আমারও ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আর ভাল লাগছে না। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ঘরের দিকে মন টানছে।

কিন্তু ঘরমুখী এ মনের পিছনে কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। দেশে ফিরলেই তো, সেই বৈচিত্র্যহীন পৌনঃপৌনিক জীবন। কলকাতায় সেই ইঁটের পর ইঁটের মাঝে মানুষ-কীট হয়ে বেঁচে থাকা। সহকর্মীর ঈর্ষা, বন্ধুর ভ্রূকুটি, আত্মীয়ের বিদ্বেষ। যেখানে প্রেমের জন্য নিত্য তৃষা।

নিজামুদ্দীনের সঙ্গে পরিচয়টা খুব আকস্মিক নয়—নিজামুদ্দীন তেহরাণে আমার গাইড ছিল।

তেহরাণ এয়ারপোর্টে নামতেই সিকিউরিটি কণ্ট্রোলের জনৈক অফিসার বললেন: আপনি তো জার্ণালিষ্ট। বিদেশী জার্ণালিষ্টদের আমরা আমাদের পাবলিক রিলেশনস্ ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করি। ইট্ মে হেল্প ইয়্যু।

হোটেল একটা খুঁজে নিলাম। তেহরাণে হোটেলের অস্বাভাবিক চার্জ। একটি সাধারণ হোটেল, দু-পাউণ্ডের মত।

হোটেল থেকে ফোন করলাম পি, আর, ডি,তে।

—হ্যালো, ও হ্যাঁ, আপনি মিঃ চ্যাটার্জী? এয়ারপোর্ট থেকে সংবাদ পেয়েছি, আপনি এসেছেন। আপনি একবার আসুন না,

আমাদের অফিসে। কোন্ হোটেলে আছেন? গাড়ি পাঠাচ্ছি আধঘণ্টার মধ্যে।

সাংবাদিকদের প্রতি ইরাণ সরকারের সৌজন্য প্রশংসনীয়। যদিও এ সৌজন্যের পিছনে সিকিউরিটি কর্তৃপক্ষের অনেকখানি দায়িত্বও জড়িয়ে আছে। শুধু ইরাণ কেন, মধ্যপ্রাচ্য ও লৌহযবনিকার অন্তরালবর্তী যে যে দেশগুলিতে আমি ঘুরেছি, সর্বত্রই বিদেশী সাংবাদিকদের ভিসা দান নিয়ে বহু কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। দিনের পর দিন অনুরোধ জানিয়ে আমি চেকোশ্লোভাকিয়া ও ইরাকের ভিসা পাইনি। হাঙ্গেরির ভিসা পেতে লেগেছিল দু'মাস। আর সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের ভিসা পেতে গেলে মুচলেকা দিতে হয়েছিল যে, আমি কোন কালে এই দেশ সম্পর্কে আগে কিছু লিখিনি। তাও মঞ্জুর হয়েছিল বোধ হয় পনের দিনের ভিসা।

যাক সে কথা। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি মোটর এসে দাঁড়িয়েছিল হোটেলের দরজায়। আমি গিয়েছিলাম প্রচার দপ্তরে। ওরা আমার সঙ্গে গাইড দিয়েছিলেন নিজামুদ্দীনকে।

নিজামুদ্দীন ইরাণী তরুণ। আধুনিক মধ্য-প্রাচ্য বললে পুরোপুরি ইউরোপ। আর ইরাণের শাহ তো জীবনের সমস্ত দিক থেকেই পশ্চিম ঘেঁসা। বাগদাদ-প্যাক্ট আর সেন্টোর নাগপাশে বাঁধা শেখ শাদীর দেশ ইরাণ।

ইরাণের সর্বত্র হিজ হাইনেস্ প্রৌঢ় শাহের সঙ্গে তরুণী সম্রাজ্ঞী ফারাদিবার ছবি। কয়েকমাস আগে মা হয়েছেন ফারাদিবা। রাজনৈতিক মহল মনে করেছে, আর একটি রক্তাক্ত ক্যুপের হাত থেকে বেঁচে গেছে ইরাণ। শাহের বৈধ উত্তরাধিকারী এখন মাতৃক্রোড়ে।

ব্যর্থ পিতৃত্বের বোঝা বুকে নিয়ে এতদিন দিন কাটিয়েছেন হিজ হাইনেস রেজা শাহ পহ্লবী। এর আগের দুজন স্ত্রী শাহকে সন্তান দিতে পারেন নি। সে সন্তান দিয়েছেন সম্রাজ্ঞী ফারাদিবা। দিয়েছেন দু'বছরের মধ্যে।

সেদিন তেহরাণে কি বিপুল উৎসব। রাজপ্রাসাদের সামনে অসংখ্য রাজভক্ত জনতা। নব জাতকের নির্বিঘ্ন ভূমিষ্ঠ সংবাদে সে জনতা সোল্লাসে চীৎকার করে উঠেছে। রাজপথে সারারাত ধরে নেচেছে কেউ কেউ। সিরাজির পাত্রে চুমুক দিয়ে গোঁফ চুমরে উল্লাস প্রকাশ করেছেন আমীর ওমরাহরা। মসজিদে মসজিদে উঠেছে আজানের ধ্বনি।

কিন্তু সেই সময়ই মস্কো রেডিও, শাহের উত্তরাধীকারীর জন্মবার্তা ঘোষণা করে নাকি বলেছে: শাহ ইজ ইমপোটেণ্ট। সম্রাজ্ঞীর এই ছেলেটি আর যার হোক, শাহের নয়।

শাহের কথা মনে পড়তেই শাহের পূর্বতন স্ত্রী সুরাইয়ার কথা মনে পড়ল। সুরাইয়া এখন বার্লিনের বাসিন্দা। এ সম্পর্কে এক মজার ঘটনার কথা বলি।

বার্লিনের কুথসতরদামে আমরা একটি রেষ্টুরেণ্টে ডিনারের জন্য ঢুকেছি। আমি, পাকিস্তানের সাংবাদিক বন্ধু ওমর, আর আমাদের গাইড জার্মাণ কন্যা একজন। ফারুকির মাথায় কাশ্মীরী টুপি। আমি পরেছি প্রিন্সকোট। রেষ্টুরেণ্টে ঢুকতেই দেখি আমাদের সম্পর্কে ফিসফাস আলোচনা হচ্ছে। চাপা গুঞ্জন। কিছুক্ষণ উস খুস করার পর জার্মাণ মেয়েটি উঠে গেল। ফিরে এল হাসতে হাসতে। বললে: তোমাদের সঙ্গে আমাকে দেখে ওরা সবাই মনে ভেবেছে আমি সুরাইয়া। তোমরা ইরাণের লোক। পোশাক আর টুপি দেখে ওরা ভড়কে গেছে।

শুনে খুব উপভোগ করেছিলাম।

সকালে নিজামুদ্দীন আসেনি। এই ক'দিন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল নিজামুদ্দীন। তার বদলে এসেছিল রাবেয়া। নিজামুদ্দীনের বান্ধবী। তেহরাণ ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। বলেছিল, জরুরী সরকারী কাজে রাজধানীর বাইরে চলে যেতে হল নিজামুদ্দীনকে।

ইরাণী মেয়ে রাবেয়া। ঠোঁটে রক্ত-গোলাপের রঙ। মাথায় কালো চুল। পরণে ফ্রক। রাবেয়ার সঙ্গে বাজারে গেলাম। টুকিটাকি দু-একটা জিনিস কিনলাম। ও বললে: তোমায় একটা কিছু দিতে চাই।

আমি বললাম: দাও। অঞ্জলি পেতে ধরলাম। ও হেসে হাতটা ধরে ফেলল। বললে: দেব। রাত্রি ন'টা। রাবেয়া বলেছিল আসবে। এলনা। এয়ারপোর্টের গাড়ী এল। আমি উঠে বসলাম।

আজ খৃষ্টমাস। এয়ারপোর্টটাকেও আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। কুলীরা বকশীষ চাইছে। খৃষ্টমাস ট্রিপস্ পকেটে যা ছিল উপুড় করে দিলাম। আজ যে খৃষ্টমাস। প্লেন এসে গেছে। মাইকে এনাউন্সমেণ্ট সুরু হবে এখুনি প্লেনে ওঠবার জন্য। ট্রানজিট লাউঞ্জে তখনও যাইনি। কে আসছে ছুটতে ছুটতে। রাবেয়া। হাতে একগুচ্ছ রক্ত গোলাপ।

—তোমায় কিছু দেব বলেছিলাম। ফুলগুলোকে বুকে করে নিলাম। ইচ্ছা হ'ল এর প্রতিদানে কিছু দেই। ওর ওই রক্ত গোলাপের মত অধরে একটি চুম্বন রেখা। কিন্তু ততক্ষণে প্লেনে উঠবার সংকেত বেজে উঠেছে।

কল্পসুখ

পরিমল চক্রবর্তী

অশান্ত নদীর বুকে ঢেউ ফুলে ওঠে
আমার ইচ্ছার মতো;
আর মল্লিকাফুলেরা সব ফোটে
হৃদয়ের উঠোনে বাগানে;
বুঝি তাই আজো অবিরত
[illegible] বাই স্মৃতির উজানে।

কখনো দুঃখের দাহে
সব কিছু জ্বলে পুড়ে যায়—
কিন্তু তবু মনে হয়: ভালো, ঢের ভালো
সে-আগুনে পুড়ে মরা দুরন্ত প্রবাহে
বাসনার নীল শব মন্থর নদীতে হারায়;
তবু সেই কল্পসুখে দুই চোখে নামে স্নিগ্ধ আলো।

বৈদিক শ্রদ্ধা

সুরেশচন্দ্র নন্দী

বৈদিক যুগে কর্ম্মবাদী ও জ্ঞানবাদী ভেদে দুই শ্রেণীর ঋষি-সাধক ছিলেন। কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় ঋষিগণ গৃহে বাস করিতেন। যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞদেবতা পরমাত্মার উদ্দেশ্যে হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাঁহারা উপাসনা করিতেন। জ্ঞানবাদী ঋষিগণ অরণ্যে বাস করিয়া ভিক্ষান্নে শরীর ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য (ইন্দ্রিয় সংযমাদির দ্বারা) শ্রদ্ধা, সত্য ও তপস্যার সেবায় জীবনপাত করিতেন।

ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিই উভয় সম্প্রদায়ের কাম্য ও মুখ্য লক্ষ্য হইলেও পন্থা কিন্তু বিভিন্ন ছিল। কর্ম্মবাদিগণের বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর-প্রীতি-কামনায় শ্রদ্ধাপূর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। জ্ঞানবাদিগণ এই মতবাদ অস্বীকার করিতেন। তাঁহারা বলিতেন,—ব্রহ্মচর্য্যরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান, শ্রদ্ধা, সত্য ও তপস্যার সেবা দ্বারাই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

জ্ঞানবাদী ঋষি শ্বেতাশ্বতর কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় ঋষিগণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন,—যে স্থলে অরণিদ্বয় ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়, যে স্থলে অগ্নি প্রজ্জ্বালনার্থ অগ্নিকুণ্ডে অথবা প্রাণায়াম দ্বারা শরীরের মধ্যে বায়ু আবদ্ধ করা হয়, যে স্থলে সোমরস বহুল পরিমাণে সংগৃহীত করা হয়, সেই স্থলে জ্ঞানযোগে অপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে।

অগ্নি র্যত্রাভিমথ্যতে বায়ু র্যত্রাভিরুধ্যতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২।৬

বৈদিক ঋষিগণ সর্ব্বাবস্থায় সমস্ত কর্ম্মে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে কিরূপ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মই তাহার সাক্ষ্য দেয়। চারি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদে শ্রদ্ধার মহিমা, গুণ অশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। দশম মণ্ডলের ১৫১ সূক্তের দেবতাই শ্রদ্ধা। এই সূক্তের আদ্যোপান্ত শ্রদ্ধার কথায় পূর্ণ। তিনি দেবীরূপে উপাসিতা হইয়াছেন। এই সূক্তে বলিতেছেন,—শ্রদ্ধা না থাকিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। যজ্ঞকার্য্যে শ্রদ্ধা, দানকর্ম্মে শ্রদ্ধা, ভোজনকার্য্যে শ্রদ্ধা, যুদ্ধকর্ম্মে শ্রদ্ধা; প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্ত সময় পর্য্যন্ত মানব যত কর্ম্ম করে, তাহা শ্রদ্ধার সহিতই সম্পন্ন করিয়া থাকে। এমনকি, মনে কোন সঙ্কল্প জাগিলে, শ্রদ্ধাহীন হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। যজ্ঞ, পূজা, উপাসনা, সমস্ত কর্ম্মেই শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধার অভাব হইলে কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হইবে না। আজ আমরা এই প্রবন্ধে বৈদিক ঋষিগণের হৃদগত শ্রদ্ধা অর্থাৎ বেদোক্ত শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

শ্রদ্ধা মানব হৃদয়ের অন্যতমা বৃত্তি। বৃত্তি লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। বৃত্তিশূন্য মানব নাই। মনই বৃত্তির ধারক। মন, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সমবায়ে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাই অন্তঃকরণ নামে পরিচিত। পঞ্চভূতের মিলিত সাত্ত্বিক অংশ হইতে অন্তঃকরণের জন্ম হইয়াছে, এই অন্তঃকরণই বৃত্তিভেদে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত নামে অভিহিত।

অন্তঃকরণ-মনোবুদ্ধি-চিত্তাহঙ্কারাঃ।

—ত্রিশিখ ব্রাহ্মণোপনিষদ শ্লোক ৩

শ্রুতি বলিতেছেন,—কামনা, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী, ভয়—এই সমস্তই মন। অর্থাৎ মনেরই বৃত্তি—মনোনিষ্ঠ ধর্ম্ম।

কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি-
র্হ্রী র্ধী র্ভী রিত্যেতৎ সর্ব্বং মনঃ এব।

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।৫।৩

সে কিরূপ? শ্রুতি এই কথাই বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিতেছেন, পরমাত্মা নিজের জন্য মন প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। মনের দ্বারাই সর্ব্বলোকে শ্রবণ করে, দর্শন করে। কারণ দেখা যায় সকল মানবই বলিয়া থাকে, আমি অন্যমনা ছিলাম, সেইজন্য দেখি নাই বা শুনি নাই। মনই দর্শন করে, শ্রবণ করে। অতএব দর্শন বা শ্রবণকর্ম্ম মনেরই ক্রিয়া বা মনোনিষ্ঠ ধর্ম্ম। আবার কেহ পৃষ্ঠভাগ স্পর্শ করিলে মনের দ্বারাই মানব তাহা অনুভব করে। অতএব ইহাও মনেরই ক্রিয়াধর্ম্ম। অতএব শ্রদ্ধা প্রভৃতি মন, অর্থাৎ মনেরই বৃত্তি বা মনোনিষ্ঠ ধর্ম্ম।

ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি মনোবাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুত-অন্যত্রমনা অভূবন্নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং না শ্রৌষমিতি মনসা হ্যেব পশ্যতি শৃণোতি। তস্মাদপি উপপৃষ্ঠো মনসা বিজানাতি।

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।৫।৩

মন এবং ইন্দ্রিয় যেমন পরম পুরুষ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইন্দ্রিয়াদির করণরূপ বৃত্তিসমূহও তেমনি ব্রহ্মশক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

ঋষি পিপ্পলাদ বলিয়াছেন,—মন, স্বপ্নে মহিমা অর্থাৎ বিষয় বৈচিত্র্যরূপ বিভূতি অনুভব করেন। যাহা পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা দৃষ্ট বলিয়া দেখেন, শ্রুত বিষয় শ্রুত বলিয়া শ্রবণ করেন এবং নানা দেশ ও দিকে অনুভূত বস্তু পুনঃ পুনঃ অনুভব করেন। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, অনুভূত ও অননুভূত, সৎ অসৎ এই সমস্ত মন দর্শন করেন। মনই সর্ব্ব রূপ হইয়া দর্শন করেন।

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি দৃষ্টঞ্চাদৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চানুভূতঞ্চাননুভূতঞ্চ সচ্চাসচ্চ সর্ব্বং পশ্যতি সর্ব্বঃ পশ্যতি।

—প্রশ্নোপনিষদ—৪।৫

আবার ঋষি দীর্ঘতমা বলিতেছেন,—হে অশ্ব! আমি মনের দ্বারা দূর হইতে তোমাকে দেখিয়া চিনিতে পারি। আমি মনের দ্বারা দেখিতেছি, তোমার মস্তক ধূলিরহিত সুখকর পথে ক্রমে উপরে উঠিতেছে। আত্মানং তে মনসারাদ জানা মবো দিবা পতয়ং তং পতঃ গং। শিরো অপশ্যং পথিভিঃ সুগেভিঃ ররেণুভি র্জেহমানং পতত্রি।

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৬৩ সূক্ত।

ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্তে জগন্মাতা স্বয়ং বলিয়াছেন, মানবের অন্তঃকরণ-বৃত্তি সমূহের অভ্যন্তরে যে গূঢ় চৈতন্য বিরাজমান, উহাই তাঁহার প্রকাশস্থান, অর্থাৎ তিনিই স্বরূপিণী রূপে মানবের অন্তঃকরণবৃত্তির অভ্যন্তরে থাকিয়া চৈতন্য স্ফুরণ করেন বলিয়াই মানবের অন্তঃকরণে শ্রদ্ধা প্রভৃতি বৃত্তির জাগরণ ও বিকাশ হয়। এই জন্যই ঋষি শ্রদ্ধা প্রভৃতিকে মন অর্থাৎ মনেরই বৃত্তি—মনোনিষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়াছেন।

মনের সহিত বৃত্তির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। মন শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। বিষয়-কামনা-শূন্য মনই বিশুদ্ধ, এই কারণে উহার

বৃত্তিগুলিও শুদ্ধ অর্থাৎ সত্ত্বগুণময়। শুদ্ধ মনেই সত্ত্বগুণান্বিকা শ্রদ্ধাবৃত্তির বিকাশ ও জাগরণ হয়।

বাজশ্রবা ঋষির পুত্র সার্থকনামা নচিকেতা স্বভাবতঃ শুদ্ধান্তঃকরণ ছিলেন বলিয়াই যজ্ঞফলাকাঙ্খী পিতার বিশ্বজিৎ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং যজ্ঞদক্ষিণা স্বরূপ সর্বস্ব দানের ফল স্মরণ তাঁহার কিশোর হৃদয়ে শ্রদ্ধারসের সঞ্চার করিয়াছিল। অর্থাৎ তাঁহার শুদ্ধান্তঃকরণ শুভ সঙ্কল্পযুক্ত ছিল।

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধা বিবেশ।

—কাঠোপনিষদ ১।১।২

পক্ষান্তরে তাহার পিতা যজ্ঞাদি কর্ম্মের সাধক হইলেও কর্ম্মে যেমন তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না, তাঁহার মনও তেমন শুভ সঙ্কল্পযুক্ত ছিল না। সেইজন্য তিনি বিত্তশাঠ্য ব্যক্তির মত ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধাহীন দক্ষিণা দান করেন। লৌকিক ধর্ম্মের শ্রদ্ধা হারাইয়া কেবল লোকাচারের অনুরোধে কর্ম্ম করিলে মানবের মনোভাব যেরূপ হয়, বাজশ্রবা ঋষি তাহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অর্থাৎ তাঁহার মন পুত্রের মনের মত শুদ্ধ ছিল না, সেই জন্যই শ্রদ্ধাহীন দান কর্ম্ম তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল। মনকে শুভসঙ্কল্পযুক্ত করিবার জন্য ঋষিগণ প্রার্থনা করিতেন। যে দিব্য শক্তিপূর্ণ মন জাগ্রত এবং নিদ্রিতাবস্থায় দূর দূর ধাবিত হয় এবং যাহা ইন্দ্রিয়রূপী জ্যোতি সমূহের মধ্যে অন্যতম জ্যোতি, আমার সেই মন শুভ সঙ্কল্পযুক্ত হউক।

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্যতথৈটেতি দূরঙ্গমং জ্যোতিষা জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু। যজর্ব্বেদ। ৩৪।১

সকল দেবপূজা—যজ্ঞের মূল উপাদান হৃদয়ের শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই উপাসনার প্রাণ। শ্রদ্ধার অনুশীলন দ্বারা সকল যুগের সকল মানব শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া পরম ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া থাকে। শ্রদ্ধা যেমন সকল শুভকর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রসূতি, তেমনি সকল কর্ম্মের সিদ্ধিদাত্রী। সেই কারণে বৈদিক ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ব্বে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধাদেবীর শরণাগত হইতেন। তাঁহাদিগকে সর্ব্ব কর্ম্মে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে শ্রদ্ধাময় করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাদেবীকে আহ্বান করিতেন।

প্রাতে আমরা শ্রদ্ধাদেবীকে আহ্বান করি। মধ্যাহ্নে আমরা শ্রদ্ধাদেবীকে আহ্বান করি। সূর্য্যাস্ত সময়েও আমরা শ্রদ্ধাদেবীকে আহ্বান করি। অয়ি দেবি! অয়ি শ্রদ্ধে! তুমি আমাদিগকে শ্রদ্ধাময় কর!

শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে শ্রদ্ধাং মধ্যং দিনং পরি।
শ্রদ্ধাং সূর্য্যস্য নিম্রূচি শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহনঃ।

ঋগ্বেদ—১।১৫১।৫

আহ্বান-মন্ত্রে শ্রদ্ধাদেবীকে প্রসন্ন করিয়া বৈদিক ঋষিগণ তাঁহার উপাসনা করিতেন। কি ভাবে কি অবস্থায় তাঁহারা শ্রদ্ধা দেবীর উপাসনা করিতেন? ঋষি বলিতেছেন,—নিয়ত গতিশীল প্রাণ-বায়ুর দ্বারা রক্ষিত হইয়া স্থির মনে উপবেশন করতঃ ধ্যানস্থ হইয়া ঋষিগণ মনের সঙ্কল্প এবং ব্যাকুল হৃদয়ের অনুরাগ দ্বারা শ্রদ্ধাদেবীর উপাসনা করিতেন।

শ্রদ্ধাং দেবযজমানা বায়ু গোপা উপাসতে।
শ্রদ্ধাং হৃদয্যয়া কূত্যা শ্রদ্ধায়া বিদ্যতে বসু।

ঋগ্বেদ—১০।১৫১।২-৪

ঋষিগণ শ্রদ্ধারসে অভিষিক্ত হইয়া পরম দেবতার পূজা—যজ্ঞ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। শ্রদ্ধায় বিগলিত-হৃদয় হইয়া তাঁহারা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেন। অগ্নিতে হবিঃ প্রদান করিতেন। তাই ঋষি বলিতেছেন,—হৃদয়ে শ্রদ্ধার সঞ্চার হইলেই মানব অগ্নি প্রজ্বলিত করে, হৃদয়ে শ্রদ্ধার সঞ্চার হইলেই মানব অগ্নিতে হবি প্রদান করে। অর্থাৎ শ্রদ্ধাময় হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে।

শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ।

ঋগ্বেদ—১০।১৫১।১

এই জন্যই শ্রদ্ধার অধিষ্ঠান স্থান হৃদয়। সম্রাট জনকের বিচার-সভায় ঋষি শাকল্যের প্রশ্নোত্তরে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—হৃদয়ে শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত। কারণ হৃদয় দ্বারাই শ্রদ্ধা অবগত হওয়া যায়।

শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয়··হৃদয়েন হি শ্রদ্ধাং জানাতি। হৃদয়েহ্যেব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা।

বৃহদারণ্যকোপানিষৎ ৩।৯।২১

হৃদয় মানব-দেহের উত্তমাঙ্গ, সৎ-প্রবৃত্তির আধার। হৃদয়ে সতত আত্মানুভূতি বিদ্যমান বলিয়া হৃদয় শ্রেষ্ঠাংশ। জীবের ধর্ম্মানুভূতি—ধর্ম্ম-জ্ঞানের জাগরণ ও প্রকাশ হয় হৃদয়ে। হৃদয়ে আত্মপুরুষ সতত বিরাজমান বলিয়া যেমন শ্রেষ্ঠাংশ, তেমনি আত্মানুভূতি বিদ্যমান বলিয়াও শ্রেষ্ঠাংশ।

এই জন্যই বৈবস্বত যম শিষ্য নচিকেতাকে উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহার (পরমাত্মার) স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে। কেবলমাত্র হৃদয় অর্থাৎ হৃদয়াধিষ্ঠিত শ্রদ্ধার দ্বারাই তিনি প্রকাশিত হন।

নসংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভি ক৯প্তো
য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

কঠোপনিষদ—২।৩।৯

ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ী দেবীকে আত্মতত্ত্ব ও অমৃতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—হৃদয় যেমন সমুদয় বিদ্যার একায়ন অর্থাৎ মিলনস্থল, তদ্রূপ সেই আত্মারও সমুদায়েরই একায়ন।

এবম্ সর্ব্বাষাম্ বিদ্যানাম্ হৃদয়ম্ একায়নম্।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২।৪।১১

এই জন্যই ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ—মন দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে হইবে।

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং—বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪।৪।১৯

বৈবস্বত শিষ্য নচিকেতাকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন,—ইনি মন দ্বারাই প্রাপ্তব্য।

মনসৈবেদমাপ্তব্যম্—কঠোপনিষদ—২।১।১১

এই জন্যই হৃদয়ে শ্রদ্ধার সঞ্চার হইলে ঋষিগণ যেমন যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত করিতেন, অগ্নিতে হবি প্রদান করিতেন, তেমনি দেবোদ্দেশে শ্রদ্ধা-উপহারও নিবেদন করিতেন। দেবদেব পরমাত্মা ভক্তের উপহার যতই সামান্য হউক না কেন, এমনকি ভক্তের শ্রদ্ধা-নিবেদিত উচ্ছিষ্টও গ্রহণ করিতেন। বৈদিক যুগে এইরূপ এক নারী ভক্ত দেবোদ্দেশে নিজ দন্ত-নিঃসারিত সোমলতা-রস শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে নিবেদন করিয়াছিলেন।

ঋষি অত্রির কন্যা অপালা যজ্ঞীয় প্রস্তর-নিঃসারিত প্রচলিত

সোমরসের পরিবর্ত্তে নিজ দন্ত-নিঃসারিত সোমরস ইন্দ্রের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন,—হে শক্তিশালী ইন্দ্র! তুমিই সেই, যিনি প্রত্যেক মানবের গৃহে গৃহে গমন করিয়া তাহাদিগের গৃহ আলোকিত করিয়া থাক। আমার দন্ত দ্বারা অভিষুত সোমলতা-রস তোমাকে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা উপহার রূপে দিতেছি। তুমি উহা পান কর। ইহা ভর্জ্জিত যব এবং ছাতু দ্বারা প্রস্তুত পুরোডাসাদির সহিত স্তোত্র যোগে অর্পণ করিতেছি। তুমি উহা গ্রহণ কর। তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে চাই, কিন্তু তোমাকে বিশেষভাবে বুঝিতে পারিতেছি না। হে স্ফুরণশীল সোমরস, তুমি ইন্দ্রের জন্য স্তোত্র ধারার মত নিঃসৃত হও।

অসৌ য এষি বীর কো গৃহং গৃহং বিচাকশৎ।
ইমং জম্ভসুতং পিব ধানাবন্তং করম্ভিনমপূপবন্তমুকথিং॥
আচন ত্বা চিকিৎসা মোহধিচনত্বা নেমসি।
শনেরিব শনকৈ বিবেন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব।

ঋগ্বেদ—৮।৯১।২-৩

যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে ঋষিগণ যেমন শ্রদ্ধাদেবীর শরণাগত হইতেন, তেমনি যজ্ঞেশ্বর পরমেশ্বরের শরণাগত হইয়া এই ভাবে প্রার্থনা করিতেন,—হে সর্ব্বশক্তিধর পরমাত্মন্! জরাজীর্ণ বৃদ্ধ যেরূপ যষ্টিকে আশ্রয় করিয়া গমন করেন, আমিও সেইরূপ তোমাকে আশ্রয় করিয়াছি—তোমারই শরণাগত। তোমাকে আমি আমার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে চাই।

শস্যক্ষেত্রে ধেনু ও স্বগৃহে মানব যেমন আনন্দে বিচরণ করে, হে পরমাত্মন্! তুমি আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে সেইরূপ রমণ কর।

আ ত্বা রম্ভংনঃ জিবেয়ো ররম্ভাশবসম্পতে।
উশ্মসিত্বা সাধস্থাআ॥ ঋগ্বেদ—৪।৮।২০
সোমরাধন্তি নো হৃদি গাবোন যব সেস্বা।
মর্য্যহব স্বস্ত ক্যে॥ ঋগ্বেদ—১।৯১।১৩

ইহার পর তাহারা পরমাত্মার নিকট যজ্ঞ সম্পাদন বুদ্ধিযোগ প্রার্থনা করিতেন। কারণ তাঁহার কৃপাপ্রদত্ত বুদ্ধিযোগ ব্যতীত যজ্ঞকর্ম্ম সুসিদ্ধ হয় না। তাই ঋষি মেধাতিথি বিশ্বপতির নিকট বুদ্ধিযোগ প্রার্থনা করিতেছেন,—যাঁহার কৃপা ভিন্ন বুদ্ধিমান্ লোকেরও যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না, সেই বিশ্বপতি পরমাত্মা আমাদিগের শ্রদ্ধা-বুদ্ধিকে তাঁহাতে সংযুক্ত করুন।

যস্মাদৃতে ন সিদ্ধতে যজ্ঞোবিপশ্চিতশ্চন। সাধীনং যোগমিম্বতি।

ঋগ্বেদ—১।১৮।৭

পরমাত্ম চরণে নিবেদিত-প্রাণ বৈদিক ঋষি তাই শ্রদ্ধোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতেছেন,—হে পরমাত্মন্! আমরা প্রত্যহ রাত্রিকালে এবং দিবাভাগে শ্রদ্ধাবুদ্ধি এবং কর্ম্ম দ্বারা শ্রদ্ধা উপহারসহ নমস্কার করিতেছি। অর্থাৎ পরমাত্মার অনুগ্রহ-প্রদত্ত বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়া শ্রদ্ধা বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা আমরা তোমাকে লাভ করিব।

উপত্বাহগ্ন দিবে দিবে দোষাবস্তর্দ্ধিয়াবয়ং নমো ভরন্ত এমসি।

ঋগ্বেদ—১।১।৭

জগৎস্রষ্টা এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই সর্ব্বযজ্ঞের ঈশ্বর। তাঁহাকেই জ্ঞানীগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, দিব্য, সুপর্ণ, গরুত্মন্, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুর রথো দিব্যংস সুপর্ণো গরুৎমান্।
একং সদ্বিপ্রাবহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৪৬

যজুর্ব্বেদের ঋষির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া ঋষি শ্বেতাশ্বতরও বলিতেছেন,—তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই দীপ্তিমান নক্ষত্রাদি, তিনিই বায়ু, তিনিই প্রজাপতি।

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদুচন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্মতা আপঃ স প্রজাপাতিঃ॥

যজুর্ব্বেদ—৩২।১
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৪।২

আবার ঋষি বলিতেছেন,—যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি এক হইয়াও সকল দেবতার নাম ধারণ করিয়াছেন, সমগ্র ভুবনের লোক তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করে।

যো নঃ পিতা জানতা যো বিধাতা
ধামনি বেদ ভুবনানি বিশ্ব
যো দেবানাং নামধা একএব
তৎ যং প্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা॥ ঋগ্বেদ—১০।৮২।৩

পুনশ্চ ঋষি বলিতেছেন, এই পক্ষী এক ভিন্ন দুই নহেন, কিন্তু জ্ঞানীগণ বাক্য দ্বারা ইহার বহুরূপ কল্পনা করিয়াছেন।

সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বাচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তে।

ঋগ্বেদ—১০।১১৪।৫

সৃষ্টির নামান্তর যজ্ঞ। পরমাত্মার সৃষ্টি বিচারার্থে আপন মহিমা ও সৃজনী শক্তির দ্বারা যজ্ঞ (সৃষ্টি) কর্ম্ম সম্পন্ন করেন।

যশ্চিদাপো মহিমা পর্য্যাপশ্য দক্ষং দধানো জনয়ন্তী যজ্ঞং।

ঋগ্বেদ—১০।১২১।৮

ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতা তাঁহারই মহিমা-ব্যঞ্জক সৃষ্টি। এই জন্য ঋষিগণ প্রথমে দেবদেব পরমাত্মার উদ্দেশে পরম শ্রদ্ধাভরে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেন।

যিনি দেবতাগণের মধ্যে সকলের শীর্ষস্থানীয় একমাত্র দেবতা পরমাত্মা, সেই বুদ্ধির অগোচর মহান্ দেবতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আমরা তাঁহারই উপাসনা করিব। অর্থাৎ তাঁহারি প্রীতি কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিব।

যো দেবেষ্বধিদেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

ঋগ্বেদ—১০।১২১।৮

পরমাত্মার উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাঁহার মহিমা-ব্যঞ্জক সৃষ্টি—ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে ঋষিগণ নমস্কার-মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, 'যেহেতু নমস্কারই সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু, উহা দ্বারাই তাঁহাদের উপাসনা করিতেছেন: আমি নমস্কারের সেবা করিব। ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশক দেবগণকে নমস্কার! তাঁহারা ভক্তাধীন ভগবানের মত নমস্কারের অধীন। যদি পাপ করিয়া থাকি, নমস্কার দ্বারা সেই পাপকে বিনাশ করিব অর্থাৎ নিষ্পাপ হইব।

নম ইদুগ্রং নম আবিবাসে নমো দাধার পৃথিবী—মুতদ্যাম্।
নমো দেবেভ্যো নম ঈশত্রষাং কৃতং চিদেনোনমসা বিবাসে॥

ঋগ্বেদ—৬।৫১।৭

যজ্ঞ

পরমাত্মার প্রীতি কামনায় অনুষ্ঠিত কর্ম্মই যজ্ঞ। পরমাত্মার নামান্তর যজ্ঞ। জ্ঞানী-ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞস্বরূপ পরমাত্মার পূজা করেন।

যজ্ঞেন যজ্ঞম্ যজন্ত দেবাঃ।

ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৫০

বৈদিকযুগে যজ্ঞানুষ্ঠান যজ্ঞদেবতা পরমাত্মার উপাসনার প্রধান অঙ্গ ছিল। জ্ঞানী ঋষিগণ সর্ব্বাগ্রে বেদমন্ত্ররচনা ও অরণি হইতে অগ্নি উৎপাদন ও দুগ্ধাদি হইতে হবির সৃষ্টি করেন।

যুক্তবাক্যং প্রথম আদিত অগ্নিমাদিৎ হবিরজনয়ন্ত দেবাঃ।

ইহাই পরমাত্মার—যজ্ঞদেবতার অর্চ্চনার প্রধান উপকরণ। বৈদিক যজ্ঞের লক্ষ্য কি? ঋষি অগস্ত্য বলিয়াছেন,—অমর আত্মার সাক্ষাৎ দর্শন লাভই বৈদিক যজ্ঞের প্রকৃত লক্ষ্য।

অমৃতস্য চেতনং যজ্ঞং—

ঋগ্বেদ—১।১৭০।৪

ঋষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন,—জ্ঞানীরা যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা—যজ্ঞস্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা দ্বারা স্বীয় আত্মাকে মহান্ হিংসারহিত, সর্ব্বব্যাপী, পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করেন। যজ্ঞ কর্ম্মদ্বারাই আত্মার অজ্ঞান-অন্ধকার মুক্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হয়।

যুঞ্জন্তি ব্রধ্ন মরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি।

ঋগ্বেদ—১।৬।১

ঋষি অত্রি বলিয়াছেন, মরণধর্ম্মী মানব যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সেই অমর দেবতার—পরমাত্মারই পূজা করে। তিনি প্রত্যেক মানবেরই পূজনীয়।

তমধ্বরেষু স্বতেডে দেবং মর্ত্তা অমর্ত্যম্

যজিষ্ঠং মানুষে জনে।

ঋগ্বেদ ৫।১৪।২

পরমাত্মোপলব্ধির দ্বারা স্বরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাই মানব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকে। তাই ঋষি তাম বলিয়াছেন—পূর শ্রবণকারিগণের মধ্যে সেই মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রদ্ধাময় হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাই যজ্ঞ-দেবতা পরমাত্মার উপাসনা করেন।

যজ্ঞে যজ্ঞে সমর্ত্ত্যো দেবান সপর্য্যতিথঃ

সুম্নৈ দীর্ঘশ্রুতম অবিবা সত্যে শান॥

ঋগ্বেদ ১০।৯৩।২

শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্যই জ্ঞানবান পুরুষ জ্ঞানবতী স্ত্রী পরা বিদ্যার আচার্য্য ও উপদেষ্টাগণই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

অশ্বিনা যজ্ঞং সবিতা সরস্বতীন্দ্রস্যরূপং বরুণোভিষজ্যন্

যজুর্ব্বেদ—১৯।৮০

ঋষি অঙ্গিরা প্রথমে যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করেন; তিনি এবং ঋষি অথর্ব্বন্ প্রথমে অরণি-মধ্যস্থ লুক্কাইত অগ্নি আবিষ্কার করেন। উভয় ঋষির কর্ম্ম একই প্রকার। এই জন্যই বেদে উভয়ের নাম এক শব্দে অথর্ব্বাঙ্গী গ্রথিত হইয়াছে। এই দুই ঋষি যে সমস্ত মন্ত্রের দ্রষ্টা তাহারা "অথর্ব্বাঙ্গীরস" নামে প্রসিদ্ধ।

মনু বাস্থ যজ্ঞের সর্ব্ব প্রথম অনুষ্ঠাতা। "মনুর্হ বা অগ্রে যজ্ঞ নেজতদনুকৃত্যে মা: প্রজাযজন্তি" শতপথ ব্রাহ্মণে ১।৪।২।

মানব যজ্ঞ-দেবতার প্রীতি কামনায় এবং নিজ কল্যাণ প্রাপ্তির আশায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঋষি ভরদ্বাজ বলিয়াছেন—মানব যজ্ঞ-দেবতার প্রীতি কামনায় স্তব-স্তুতিপূর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞ-দেবতার উপাসনা করে।

ত্বাংহি স্মা চর্ষণয়ো যজ্ঞেভি গীর্ভিরীলতে।

ঋগ্বেদ—৬।২।২

বৈদিক যজ্ঞ স্তোত্রাত্মক। ঋষি দেবাপি বলিয়াছেন, আদিম ঋষিগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ স্তোত্রপূর্ণ ছিল। অর্থাৎ স্তোত্রই ছিল যজ্ঞের প্রাণ।

ত্বা পূর্ব্ব ঋষয়ো গীর্ভিরায়ন্ ত্বাম ধ্বরেষু পুরুহুত বিশ্বে।

ঋগ্বেদ—১০।৯৮।১

বৈদিক দেবতাগণ স্তবস্তুতি-প্রিয় ছিলেন, সেইজন্য ঋষিগণ দেবতার প্রীতি প্রসন্নতা কামনা করিয়া সূক্ত বা স্তোত্র রচনা করিয়া তাঁহাদিগের স্তব করিতেন। তাঁহারা মুখে শ্লোক রচনা করিতেন। উহাকে মেঘের ন্যায় বিস্তার করিতেন। উকৃথ স্তুতি বিশিষ্ট গায়ত্রী ছন্দে সূক্ত রচনা করিতেন। গাথাকারেরা সামবেদের বৃহৎ গাথা দ্বারা, আর্কিগণ ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্বারা, বাণীকারেরা যজুর্ব্বেদের বাণী দ্বারা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের স্তুতি করিতেন।

মিমীহি শ্লোক মাস্যে পর্জন্য ইব ততনঃ।

গায় গায়ত্র মুকথ্যং। ঋগ্বেদ—১।৩৮।১৪

ইংন্দ্রমিদ গাথিনো বৃহদিংন্দ্রমর্কেভিরর্বিশঃ।

ইংন্দ্রং বাণীরনুষত। ঋগ্বেদ—১।৭।১

স্তোত্রগুলি রসযুক্ত মধু ঘৃতাদি অপেক্ষা অধিক মধুর—অতিশয় আনন্দদায়ক ছিল। ঋষি এইরূপ একটি মধুর আনন্দদায়ক স্তোত্র রচনায় রুদ্রের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন,—রসযুক্ত মধু-ঘৃতাদি অপেক্ষা মধুরতর অতিশয় আনন্দদায়ক স্তোত্রবাক্য মরুৎগণের পিতা রুদ্রের উদ্দেশে উচ্চারিত করিতেছি। ইহার দ্বারা স্তোতাগণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হন। হে মধুর রহিত রুদ্র! আমাদের ভোগের জন্য পর্য্যাপ্ত অন্ন আমাদিগকে দাও, আমাদিগকে পুত্র-পৌত্রাদি দান কর। সুখী কর।

ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যবতে চ

স্বাদোঃ স্বাদীয়ো রুদ্রায় বর্ধনং।

রাস্বা চ নো অমৃত মর্ত ভোজনং

ত্মনে তোকায় তনয়ায় মৃল।

ঋগ্বেদ—১।১১৪।৬

ঋষি অত্রি এইরূপ মধুর রসপূর্ণ স্তোত্র দ্বারা রুদ্রগণের স্তব করিতেছেন—হে মধুর সোমরসমিশ্রণকারী রুদ্রগণ! আমাদিগের পুষ্টিকারী স্তুতি মধুর রস দ্বারা তোমাদিগের সেবা করিতেছি। তোমরা অন্তরীক্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া যত্নসহকারে আগমন কর। সু-পক্ক হব্য তোমাদিগকে পোষণ করিতেছি।

মধ্ব উষু মধু যুবা রুদ্রাসিষক্তি পিপ্যুষী

যৎ সমুদ্রাতি পর্ষথ পক্কা পৃক্ষোভরং তবাং॥

ঋগ্বেদ ৫।৭৩।৮

স্তোত্রশূন্য যজ্ঞ যজ্ঞনামের যেমন অযোগ্য, তেমনি উহা দেবতাগণেরও অপ্রীতিকর। সেইজন্য ঋষি কুৎস ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—হে ইন্দ্র। আমাদিগের পাপসকল বিনাশ কর। স্তুতি দ্বারা আমরা স্তুতিহীনকে পরাস্ত করিব। স্তুতিশূন্য যজ্ঞ পৃথক বস্তু। তোমার নিকটও উহা প্রীতিপ্রদ হয় না।

[আগামীবারে সমাপ্য

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

শৈশব থেকে বহু মানুষের যাতায়াত জীবনের যাত্রাপথে। বহু মানুষের আনাগোনা হৃদয়ের দুয়ারে। কাউকে বা মনের ক্যামেরা ধরে রাখতে পেরেছে, কেউ বা হারিয়ে গেছে বিস্মরণের অন্তরালে। মানুষের মত মানুষ যাঁরা, তাঁরাই ধরা পড়েছেন মনের ক্যামেরায়। তাঁদের পুণ্যস্মৃতি মনের মৌচাকে সঞ্চয় করে রেখেছে আনন্দের রঙিন মধুমাধুরী। দূরগতদিনের সেই স্মৃতির সৌরভ এখনো মনকে দোলা দেয়, মনকে উতলা করে তোলে। মনে হয় এ স্মৃতির সঞ্চয় কালের বুকে অক্ষয় হয়ে থাক্। আমি একদিন যে আনন্দ লাভ করেছিলাম, তার ভাগ অন্য মানুষকেও কিছু দিতে পারি—এই আশা নিয়েই আজ কলম ধরেছি।

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা। আমি তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের নাম আমাদের কাছে বেশ পরিচিত। বাবার মুখে শুনেছি রবীন্দ্রনাথের কথা। তাঁর সংগে বাবার পরিচয়, বাবার কবিতা তাঁকে দেখানো, রবীন্দ্রনাথকে গান শোনানো, রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে পুরস্কার নেওয়া, এমনি আরো কত কি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের মনিব, আমাদের জমিদার। কিন্তু সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর ছেড়ে দিয়ে শিলাইদহে চলে গেলেন। অবনীন্দ্রনাথ পেলেন এই সম্পত্তি। সেই অবনীন্দ্রনাথ, শিল্পী-গুরু অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভ্রাতৃদ্বয় গগনেন্দ্র নাথ ও সমরেন্দ্র নাথ আসবেন সাজাদপুরে। সহসা এলো এই খবর সাজাদপুরের আকাশ-বাতাসকে চঞ্চল করে। গভীর ঘুম ভাঙিয়ে বাবা বললেন: চোখমুখ ধুয়ে নাও, এখনি গান ঠিক করতে হবে।

আমি বোকা বোকা চোখে তাকিয়েছিলাম। বাবা বল্লেন: অবনী ঠাকুর আসছেন কাল, গান ঠিক করে রাখতে হবে যে।

সহপাঠী নিখিল সিংহের কাছ থেকে কিছুদিন আগেই অবনীন্দ্র-নাথের 'ক্ষীরের পুতুল' বইখানি পড়েছিলাম। আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাইপো। কাজেই অবনীন্দ্রনাথকে দেখবার একটা আকুল আগ্রহ আমার শিশুমনে ছিল বৈ কি।

পর দিন প্রভাতে কুঠিবাড়ির সামনে লোকে লোকারণ্য। খালের পার থেকে জলের মাঝখান পর্যন্ত খানিকটা যায়গা মঞ্চের মত করে গড়ে তোলা হয়েছে। পার থেকে কুঠিবাড়ীর সদর দরজা পর্যন্ত পথের উপর লাল সালু পেতে দেওয়া হয়েছে। দুদিকে লাল নীল হলদে সবুজ কাগজে থামগুলি সুসজ্জিত। থামের সঙ্গে লম্বা দড়িতে বেঁধে দেওয়া হয়েছে দেবদারু ও পাতাবাহারের নানা রঙের পাতা। খালের স্বল্প জলকে আলোড়িত করে অবনীন্দ্রনাথের ষ্টীমারখানা এসে লাগলো কুঠি বাড়ীর ঘাটে।

আমরা উৎসুক আগ্রহে দেখলাম অবতরণের দৃশ্য। গগনেন্দ্র নাথ ও অবনীন্দ্রনাথ নামলেন আগে। তারপরে নামলেন সমরেন্দ্র নাথ। কনকেন্দ্র নাথ এবং আরও কয়েকজন তাঁদেরই সঙ্গী, তাঁদের নাম বা পরিচয় আজ কিছুই মনে নেই। সেলিউটিং গান দিয়ে অভ্যর্থনা করা হল তাঁদের। তাঁরা বরাবর উঠে গেলেন কুঠি-বাড়ীর দোতালায়। এই কুঠিবাড়ীতেই এক সময় রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন করে এসে থাকতেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ গল্প, কবিতা, নাটক লেখা হয়েছে এইখানে বসে। কবিগুরুর প্রিয় ভাইপো এই অবনীন্দ্রনাথ বা 'অবন'। তখন আমরা ছোট, স্কুলের ছাত্র, কুঠিবাড়ীর দোতালায় উঠবার অধিকার আমাদের ছিল না। অবনীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে সেদিন রাজ্যে উঠেছিলাম সেই কুঠিবাড়ীর দোতালায়—আমাদের রূপকথার রাজপুরীতে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখেছিলাম ঘরের আসবাব-পত্র, রবি বর্মার আঁকা বড় বড় অয়েল পেন্টিং। সব চেয়ে আনন্দ হয়েছিল, বাবা যখন বললেন—এই টেবিলে বসে রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখতেন, এই অর্গ্যান বাজিয়ে নূতন গানের সুর দিতেন, আর এই বাথরুমে স্নান করতে করতে সুর করে করে নতুন গান রচনা করতেন।

বিরাট হলঘর জুড়ে ফরাস পাতা হয়েছে। সাজাদপুরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা অনেকেই এসেছেন। বাবার সংগে আমিও সেদিন অবনীন্দ্রনাথের বাণী শুনবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলাম। কিছুক্ষণ পর সুরু হল রেডিয়োর গান। সেই প্রথম রেডিও শুনলাম। তখন বোধ হয় কলকাতায় রেডিও-ষ্টেশন স্থাপিত হয়নি। কাণে যন্ত্র লাগিয়ে এই রেডিও শুনতে হতো। গান বা কথা স্পষ্ট শোনা যেতো না। গ্রাম তো দূরের কথা, বাংলাদেশের মফঃস্বল-সহরগুলিতেও রেডিও ছিল মুষ্টিমেয় লোকের। ইংরেজী গান হচ্ছিল। অস্পষ্ট একটা সুর ভেসে আসছিল কাণে—এই পর্যন্ত। তবুও সেদিন প্রাণ আনন্দে নেচে উঠেছিল এই জন্য যে, একটা নতুন জিনিষ দেখবার এবং শুনবার সৌভাগ্য লাভ হল। সেদিন অনেক রাত্তে বাড়ী ফিরেছিলাম। পরদিন ইউনিয়ন ক্লাবে পদার্পণ করলেন অবনীন্দ্রনাথ। সভার উদ্বোধন হলো আমার গান দিয়ে। বাবার লেখা এবং সুর দেওয়া গান। একটা কলি আজও মনে আছে··'নাচিছে হৃদয় হরষ পুলকে,

কি শুভ বারতা আনে সমীরণ।' গান শেষ করে মালা দিলাম ঠাকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের গলে। অবনীন্দ্রনাথ কাছে ডেকে বসালেন। সভা শেষ হলে সম্মানিত অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য প্রচুর আহার্যের আয়োজন ছিল। অবনীন্দ্রনাথ তারই একটা ডিস আমার হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু আজকের মতো ছিল না তখনকার দিন। আমি ডিসটা হাতে করে বাইরে চলে গেলাম কিন্তু খাওয়া আর হল না।

বাবা এসে বল্লেন: ওটা খেয়োনা, ফকিরচাঁদকে দিয়ে দাও। ফকিরচাঁদ ছিল ঠাকুরষ্টেটের পেয়াদা। তখন নাকি বামুনদের পক্ষে অন্যের ছোঁয়া কোন কোন জিনিষ খাওয়া নিষেধ ছিল। কারণ, রবীন্দ্রনাথের খাস বাবুর্চি কলিমুদ্দির বংশধরেরা ঠাকুরদের রান্না করে খাওয়াচ্ছেন এবং এই সব খাবারও পরিবেশন করেছেন। তখন নীরবে পিতৃআজ্ঞা পালন করেছিলাম কিন্তু আজ বুঝি এই ছোঁয়া ছুঁয়ির বিষ আমাদের সমাজ-দেহকে কতখানি জর্জরিত করে রেখেছিল যার ফলে আজ এমনি একটা বিপ্লব এদেশে সম্ভব হয়েছে।

আর একটি আনন্দমুখর দিন ফুটে উঠলো ধরণীর বুকে। সভা, সমিতি, লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা, যাত্রা থিয়েটারে সমস্ত সাজাদপুর যেন জমজমাট। সেদিন শিল্পী গুরু যাবেন আমাদের স্কুল পরিদর্শনে। বিচিত্র অনুষ্ঠান দিয়ে ছাত্রেরা জানাবে এই মহান শিল্পীর প্রতি তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা। আমরা প্রস্তুত হয়ে সকাল সাতটায় বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে সমবেত হলাম। আটটা থেকে অনুষ্ঠান। এলেন শুধু গগনেন্দ্র নাথ ও সমরেন্দ্র নাথ; অবনীন্দ্র নাথ অসুস্থ।

আমাদের অনুষ্ঠান দেখে যে অতিথিরা খুসী হয়েছিলেন, তা বুঝতে পারলুম তখন যখন আমাদের ডাক পড়লো কুঠিবাড়ীতে আবার বিচিত্র অনুষ্ঠান দেখবার জন্য। ঐদিনের বৈঠক ঘরোয়া বল্লেই চলে। অবনীন্দ্র নাথ খুব খুসী হলেন। 'পাণ্ডব গৌরব' থেকে একটি দৃশ্যের অভিনয় হল এই অনুষ্ঠানে। শ্রীকৃষ্ণের অভিনয়ে বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী অবনীন্দ্র নাথের ভুয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

রাত্রে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয় করলেন সাজাদপুরের প্রবীণ নাট্যসমাজ। চাণক্যের ভূমিকায় সুধীর সেনের অভিনয় এত নিখুঁত হয়েছিল যে, অবনীন্দ্র নাথ তখনই মন্তব্য করেছিলেন—'**He is the Sisir Bhaduri of Muffasil**'.

কয়েকদিনের আনন্দমেলা ভেঙ্গে দিয়ে সেবারের মত অবনীন্দ্র নাথের ষ্টীমার খানা ছেড়ে গেল কুঠীবাড়ীর ঘাট। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ষ্টীমারের ধোঁয়া নীল দিগন্তে।

তারপর কেটে গেল একটি বছর। আমার জীবনের একটা মহা বিবর্তনের বছর সেটা। ত্দিনের জ্বরে বাবা দেহত্যাগ করলেন। দরিদ্র স্কুল-মাষ্টারের সন্তান আমরা যেন অনাথ হলাম। আমার আকাশ থেকে নিভে গেল সমস্ত আনন্দের আলো। আবার ভাদ্রের নির্দিষ্ট দিনটিতে সাজাদপুরে এলেন অবনীন্দ্রনাথ। এবার আর ষ্টীমারে এলেন না, এবার এলেন বাট দাঁড়ের ছিপে। আবার যেন মৃত সুপ্ত সাজাদপুরের ধমনীতে প্রবাহিত হল নতুন রক্তস্রোত। আবার জেগে উঠলো প্রাণের স্পন্দন। এবার কিন্তু স্কুলে বিচিত্র অনুষ্ঠান তেমন জমলো না, কারণ বাবাই ছিলেন এ সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রাণ।

স্কুলে এলেন অবনীন্দ্রনাথ। আমাদের শ্রেণীতেও এলেন। আমাদের সহকারী প্রধান শিক্ষক ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্তভায়া আমার দিকে লক্ষ্য করে অবনীন্দ্রনাথকে বল্লেন: এইটি নবদ্বীপ বাবুর ছেলে নরেশ, যার কথা আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন! অবনীন্দ্রনাথ আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি তাঁর কোন প্রশ্নের উত্তর সেদিন দিতে পারিনি, শুধু পায়ের ধুলো নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলাম, চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে ঝরে পড়েছিল জল। অবনীন্দ্রনাথ বল্লেন: কাল সকালে কুঠিবাড়ীতে আমার সংগে দেখা করো।

এবারেও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আগের বছরের মতই ছিল। এবার অবনীন্দ্রনাথের সংগে এসেছিলেন শিল্পী মনীষী দে। আমরা দুপুর বেলায় গিয়ে মিলতাম কুঠিবাড়ীর পিছনে অশোকতরুর তলে। নানা গল্প হতো মনীষীবাবুর সংগে। তাঁর ছিল খুব ঘোড়ায় চড়ার সখ। সাজাদপুরে তখন ভাল ঘোড়া ছিল না। বোঝাটানা ঘোড়াই তিনি রাইডিং করতেন। তখন মনে পড়লো জন গিলপিনের ঘোড়ায়-চড়ার কথা। আমরা হাসতাম আর হাততালি দিতাম। মনীষীবাবু আমাদের খুব ভালবেসে ফেলেছিলেন, কাজেই তিনি নিজেও আমাদের হাসিতে যোগ দিতেন।

পরদিন সকালে ধীরেনবাবু আমাকে নিয়ে গেলেন কুঠি বাড়ীর দোতলায়। অবনীন্দ্রনাথ কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন, বললেন: একটা গান শোনাবে?

আমি বললুম: হারমনিয়ম বাজাতে জানি না। তখন ঠাকুর-পরিবারেরই একটি ছেলে রবীন্দ্রনাথের সেই অর্গ্যান বাজালেন আর আমি গাইলাম বাবার কাছে শেখা রবীন্দ্রসংগীত "সিংহাসনের আসন থেকে এলে তুমি নেমে, মোর বিজন ঘরের দ্বারের পাশে দাঁড়ালে না থেমে।" রবীন্দ্রসংগীত শুনে সবাই খুব খুসী হয়েছিলেন। কারণ সেটা ছল আঙ্গুরবালা, আশ্চর্যময়ী, কে, মল্লিকের যুগ। "বাঁধনা তরীখানি" অথবা 'হাত ধরে আমায় নিয়ে চল সখা' এই সব গানই জনপ্রিয়। রবীন্দ্র-সংগীতের কোন রেকর্ডই বোধহয় তখন বের হয়নি, অথবা হলেও সহরের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তার প্রচার। এই অজপাড়াগাঁয়ে একটি বালকের কণ্ঠে এই গান শোনবার আশা তাঁরা করেননি। আর আমিও রবীন্দ্রসংগীত হিসেবে সে গানের মূল্য তখন বুঝতে পারিনি।

নানা গল্পের পর অবনীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন "তুমি তো নাইন-এ পড়, এডিশনাল সাবজেক্ট হিসেবে কি কি নিয়েছো।"

আমি বললাম: ইতিহাস ও সংস্কৃত।

তিনি হেসে বলেছিলেন: কর্মজীবনে ও দুটোর কোনটাই কাজে লাগবে না হে। আচ্ছা, ভবিষ্যতে কি হতে চাও তুমি? এপ্রশ্নের জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না, হঠাৎ বলে ফেললাম: শিক্ষক।

অবনীন্দ্রনাথ এবারেও হেসে বললেন: ব্রতটি মহান, কিন্তু দারিদ্র্য ঘুচবে না।

আমি আর কোন কথা বলতে পারিনি।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ক্ষীরের পুতুল' এবং দশটাকার একখানা নোট আমার হাতে দিয়ে বললেন: তোমার আবৃত্তি ও সংগীতে আমি মুগ্ধ হয়েছি, এই তার পুরস্কার।

সেদিন পুরস্কার নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসেছিলাম। বহুদিন অতীত হয়ে গেছে। আমার জীবনের ওপর দিয়েও কৈশোর যৌবনের দুঃখ-সুখের ঢেউ-খেলানো দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে।

যৌবনের সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে আজ হামেশাই স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে অবনীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ-বাণী—"শিক্ষকের ব্রত মহান, কিন্তু দারিদ্র্য ঘুচবে না"। আমার জীবনে ফলে গেছে সেই বাণী। শিক্ষকের ব্রত গ্রহণ করেছি। দারিদ্র্য ঘোচেনি একথা ঠিক, কিন্তু এই যে সহস্র সহস্র ছাত্রছাত্রীর জীবন গঠনের কাজে অংশ গ্রহণ করতে পেরেছি এই তো আমার গৌরব, এই তো সান্ত্বনা।

নিজের কথাটা বড্ড বেশী হয়ে গেল। কি করবো—সেই মহান শিল্পীর সংগ-সুখের স্মৃতি মনে উদয় হলেই যে অনেক বেশী কথা বলে ফেলি।

যাত্রা গান ছিল অবনীন্দ্রনাথের প্রিয়। তাই সাজাদপুরের 'প্রাণবন্ধু অপেরা পার্টি' তাঁকে গান শুনালো।

সে রাতটা আমার বেশ মনে আছে। বিরাট প্যাণ্ডেলের নীচে গান হচ্ছে। লোকে লোকারণ্য। একধারে বসে আছেন অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীগণ। তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়ে বড় বড় তালের পাখা দিয়ে হাওয়া করছে ছাত্ররা। 'আদিশূর' নাটকের অভিনয় হচ্ছে। তক্ষশীলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন নফর ঘোষ। মস্তকে গেরুয়া পাগরী, চোখে চশমা, হাতে ছড়ি। জনতা স্তব্ধ হয়ে শুনছে সেই অপূর্ব অভিনয়। আমরাও অবনীন্দ্রনাথের চেয়ারের পাশেই ফরাসে বসে গান শুনছিলাম। তক্ষশীলের অভিনয় শেষ হলে অংক পড়ে গেল। সুরু হল কনসার্ট।

অবনীন্দ্রনাথ ডেকে পাঠালেন নফর ঘোষকে। নফর বাবু তক্ষশীলের পোশাকেই এসে অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। অবনীন্দ্রনাথ বল্লেন: তোমার অভিনয় অনবদ্য হয়েছে হে নফর। আমার সত্যি খুব ভাল লেগেছে। কাল বিন্ধ্যাবলীতে তোমার বাণীর অভিনয়ও আমার খুব ভাল লেগেছে। এবার গিয়ে আমি তোমার জন্যে একটি রয়্যাল ড্রেস পাঠিয়ে দেবো। হেসে বল্লেন: একটা জিনিষ কিন্তু আমার চোখে খুব খারাপ লাগলো, যে জন্যে তোমায় ডেকেছি।

নফর বাবু সবিস্ময়ে বল্লেন: বলুন স্যার, শুধরে নেবার চেষ্টা করবো।

অবনীন্দ্রনাথ বল্লেন: চশমা কোথায় পেলে হে, আদিশূরের সময় কি চশমার প্রচলন ছিল?

নফর বাবু সলজ্জভাবে বল্লেন: গণেশ অপেরায় উপেন পাণ্ডাকে ঐ পোষাকে অভিনয় করতে দেখেছিলাম।

অবনীন্দ্রনাথ বল্লেন: উপেন পাণ্ডা অবশ্য অভিনেতা উঁচুদরের কিন্তু যখন যে ভূমিকায় অভিনয় করবে, তখন সেই সময়কার পোষাক-পরিচ্ছদ রীতিনীতি বজায় রেখে চলবে।

নফরবাবু মাথা নীচু করে চলে গেলেন। বাকি অংশ তিনি আর চশমা পরে অভিনয় করেননি। অবনীন্দ্রনাথ কলকাতা গিয়েই নফরবাবুকে খুব দামী একটি রাজার পোষাক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পরদিন রাতে মুরাপাড়া জমিদার কাছারীপ্রাঙ্গণে একটি জনসভায় অবনীন্দ্রনাথ ভাষণ দিলেন। এই সভায় আশেপাশে বহু কৃষকপ্রজা উপস্থিত ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বললেন: বন্ধুগণ, আপনারা আমাকে শিল্পী বলে জানেন, কিন্তু এই যে আমার কৃষক প্রজারা আজ আমার সামনে সমবেত হয়েছেন, এঁরা আমার চাইতেও বড় শিল্পী। আমি কাগজের বুকে রং ফলিয়ে মনোরম চিত্র গড়ে তুলি। তাতে মেটে মনের ক্ষুধা। আর আমার কৃষক বন্ধুরা ঊষর মরুভূমির বুকে লাঙল ফলকের তুলি দিয়ে যে শ্যাম শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলেন, ধরণীকে ফুলে ও ফসলে সমৃদ্ধ করে তোলেন, কোটি কোটি নরনারীর ক্ষুধা মিটান, তার মূল্য অনেক বেশী এবং আমার শিল্প কর্মের চাইতে তাদের শিল্প দীর্ঘস্থায়ী।

করতালি-ধ্বনিতে সভাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠলো।

তারপর এলো বিদায়ের দিন। অবনীন্দ্রনাথের যাটদাঁড়ের ছিপখানা দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল দূর নদীর বাঁকে। এরপর আর প্রত্যক্ষদর্শন পাইনি তাঁর, তবে চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে তাঁর স্মৃতি বজায় ছিল বহুদিন এবং আজও পাথেয় হয়ে আছে সেই স্মৃতির সম্পদ।

কলকাতা

শ্রীঅনিল কর্মকার

রোম লণ্ডন থেকে ঝড় ছুটে আসে—হাওয়া—এই কলকাতা
ইন্দ্রপ্রস্থের বুকে পথ হেঁটে কখনো কি পাটলিপুত্রের
দিন পেয়ে চলে যাবে বিজয়নগরী কোনো দূর দিল্লীর
সুর এনে কুয়াশায় রামধনু এঁকে দেবে মানসী নগর।

আনমনা ময়দানে মাথাউঁচু মনুমেণ্ট কোনো বৃষ্টির
স্বাদ নিয়ে দেখবে কি থেমেছে সময় এই জীবন গভীর;
জানবে কি এইখানে মানুষের সব শোক ট্রাম বাস ট্রেণ
ঝরে যাবে একদিন দূর তারাদের ছবি নিয়ে কিনারায়।

ওকে সাইরেন ডাকে জাহাজের পথ কেটে সাগরকে বেয়ে
সেই সংঘমিত্রা নারী সে কি চলে যাবে কোনো সোনালী সিংহলে,
ঘর্ঘর দিন ছেয়ে রাত ঘুমে কলকাতা কখনো কি হবে
কোনো মানুষের সাধ মাধুরী কি মিছিলের সুর সুরধুনী।

গাঙ্গেয় সমতল—বণিকের বিলাসিনী—বিপুল নগর,
উপমহাদেশ ঘিরে এইখানে মাথা তোলে ভারতপুরুষ।

অনুক্ত

শক্তি মুখোপাধ্যায়

ভেবেছিলাম তোমাকেও বলবো না
কিন্তু আমি নিজে;
নিজেকে আঘাত দিয়ে সুষুপ্ত হৃদয়ে
যতোই যন্ত্রণার বীজ পুঁতে রাখি;
তোমাকে বলার ইচ্ছা প্রতিটি মুহূর্ত্তে
সীমার বাঁধন ছিঁড়ে বাইরে আসে।

দ্যাখো আমি কতো ক্ষুদ্র একান্ত বিজনে
তোমাকে পাওয়ার;
সজীব কামনা নিয়ে এগিয়ে যাবো
সে ক্ষমতা নেই।

ভেবেছিলাম তোমাকেও বলবো না
কিন্তু আমি নিজে;
অন্য এক হৃদয়ের শক্ত খুঁটিতে
চিরস্থায়ী বাঁধা পড়ে আছি।

৪৪

নীলাচল ছেড়ে দক্ষিণে যাব এবার। তোমরা অনুমতি দাও সকলে।

'বা, দক্ষিণে কেন?'

'বিশ্বরূপকে খুঁজব।'

বিশ্বরূপ ষোল বছরে সন্ন্যাস নেয়, দু বছর পরেই পাণ্ডুপুরে দেহত্যাগ করে। শচীমাতা ছাড়া এ খবর সকলের জানা। তবে এ ছল কেন?

এ ছল বিনয়ের নামান্তর। দৈন্যের অবতার প্রভু কি বলতে পারেন—আমি জীবোদ্ধার করতে দক্ষিণে যাব? সামান্য দম্ভের কথাও যে তাঁর মুখে আসবে না।

'আমরাও যাব তোমার সঙ্গে।'

'না, আমি একলা যাব।'

সকলের মাথায় যেন বাজ পড়ল। নিত্যানন্দ বললে, 'তা কী করে হয়? একলা যেতে কত কষ্ট। তোমার কষ্ট আমরা সইব কী করে? দক্ষিণের তীর্থপথ সমস্ত আমার জানা, বলো, আমি তোমার সঙ্গী হই।'

'না, কেউ আমার সঙ্গী হবে না।'

'কেন, আমাদের অপরাধ?'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'তোমাদের গাঢ় স্নেহই আমার বিষয়কণ্টক। তোমাদের গাঢ় স্নেহে আমার কর্মভঙ্গ। তোমাদের জন্যে আমি কিছুই ইচ্ছামত করতে পারি না।' তাকালেন নিত্যানন্দের দিকে: 'সন্ন্যাস নিয়ে বৃন্দাবনে যাব স্থির করলাম, তুমি আমাকে শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে নিয়ে এলে। সন্ন্যাসীর প্রধান সহায় যে দণ্ড, তা ভেঙে দিলে নীলাচলে। জানি এ সমস্তই তোমার ভালবাসার প্রকাশ, কিন্তু আমার কার্যহানি। সাধ্য নেই তোমায় মনে, কারু মনে, আমি ব্যথা দিই। যেহেতু আমি নর্তক, তুমি সূত্রধর। যেমন নাচাও আমাকে, আমি তেমনি নাচি।'

জগদানন্দ বললে, 'কিন্তু আমাকে নেবে না কেন? আমার কী অপরাধ?'

'অহর্নিশ তোমার একমাত্র চেষ্টা কী করে আমাকে ভোগে-আরামে রাখবে। কী করে ভালো খাওয়াবে, ভালো পরাবে, শুতে দেবে ভালো বিছানা। কিন্তু আমি কি ওসব নিতে পারি? অথচ তোমার কথায় রাজি না হলে রাগ করে তুমি তিন দিন আমার সঙ্গে কথা বল না।'

'কিন্তু আমার দোষ কী?' জিগগেস করল দামোদর।

'আমি সন্ন্যাসী আর তুমি ব্রহ্মচারী মাত্র। কিন্তু তুমি সর্বক্ষণ আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরে আছ। তুমি আছ শুধু বিধিনিয়ম পালন করাতে, বিধিনিয়মের বাইরে আমাকে দিতে চাও না স্বাধীনতা। কৃষ্ণের জন্যে যে আমি একটু প্রাণ-ভরে কাঁদব, তাতেও বাধা।' প্রভু ডাকলেন মুকুন্দকে: 'আর তুমি? তুমি কিছু বলছ না?'

মুকুন্দ অশ্রুনেত্রে দাঁড়িয়ে রইল নীরবে।

'তোমার দুঃখ দেখে আমার দুঃখ দ্বিগুণাকার হয়। শীতেও আমি তিনবার স্নান করি, মৃত্তিকায় শুই, এ তোমার কাছে অসহ্য। কিন্তু তুমি স্পষ্ট কিছু বল না, অন্তরে দুঃখী হয়ে বিষাদমুখে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি যে নিয়ম পালন করি, তাতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু আমার নিয়ম পালনে মুকুন্দ দুঃখ পাচ্ছে—তাই আমার দুঃখ। ওর মুখের দিকে চাইতেও আমার বুক ফেটে যায়।

যার যা গুণ তাই দোষ বলে কীর্তন করলেন প্রভু। 'দোষারোপচ্ছলে করে গুণ-আস্বাদন।'

'বেশ, তুমি যখন বলছ তুমি একাই যাবে, আমাদের কাউকে নেবেনা সঙ্গে, তখন তাই হবে।' বললে নিতাই, 'আমাদের সুখ-দুঃখ বিচার করব না, তোমার ইচ্ছাকেই শিরোধার্য করব। কিন্তু তোমার কৌপীন, বহির্বাস ও জলপাত্র কে বহন করবে? তোমার দু'হাত তো নাম গণনায় আবদ্ধ থাকবে, তুমি নিজে তো বইতে পারবেনা। তারপর প্রেমাবেশে যখন পথে অচেতন হয়ে পড়বে, তখন কে তোমার বস্ত্র-পাত্র রক্ষা করবে? অন্তত একজনকে সঙ্গে নাও।'

'কার কথা বলছ?' একটু কি নরম হলেন গৌরহরি?

'কৃষ্ণদাসের কথা।. সরল বিনয়ী ব্রাহ্মণ, তোমার পাত্র-বস্ত্র ও বহন করবে আনন্দে।'

বেশ, তাই নেব। এখন চলো সার্বভৌমের সঙ্গে দেখা করি।

সর্বমঙ্গল উপস্থিত তার দুয়ারে, সার্বভৌম নিমাই-নিতাইকে পূজা করে আসন নিবেদন করল।

প্রভু বললেন, 'অনুমতি করো। বিশ্বরূপের খোঁজে দক্ষিণে যাব। তোমার শুভ ইচ্ছায় আবার ফিরে আসব নির্বিঘ্নে।'

শেলের মত বুকে এসে বিঁধল সার্বভৌমের। বললে, 'প্রভু, তোমার বিরহ কি করে সহ্য করব? এর চেয়ে আমার নিজের মৃত্যু, পুত্রের মৃত্যুও সহনীয় ছিল। তুমি স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র, কে তোমাকে নিবৃত্ত করবে? তবু, কোন্ পথে তুমি যাবে, কী করে সইবে পথক্লেশ?'

'কেন কাতর হচ্ছ?' সান্ত্বনা দিলেন প্রভু। 'আমি সেতুবন্ধ পর্যন্ত যাব, আবার ত্বরিত ফিরে আসব। কৃষ্ণ সকলকে কৃপা করবেন।'

'তবে দিন কতক আরো থাকো। প্রাণ ভরে তোমার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করি। ষাঠীর মা, ব্রাহ্মণীকে বলি, তোমাকে ভিক্ষা দেন দিন কতক।'

চারদিন থেকে গেলেন প্রভু। তারপর মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথের কাছে আদেশ প্রার্থনা করলেন। প্রসাদী মালা এনে দিল পূজারী—তাই আজ্ঞামালা। মালা নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন, সমুদ্রতীর ধরে আলালনাথের উদ্দেশে অগ্রসর হলেন।

'তুমি এবার ফিরে যাও।' বললেন সার্বভৌমকে।

'প্রভু, আমার এক নিবেদন আছে।' বললে সার্বভৌম। 'গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে রামানন্দ রায় আছে। সে রাজপ্রতিনিধি, বিষয়ী, জাতিতে কায়স্থ। তাই বলে তাকে উপেক্ষা কোরো না, দয়া করে দর্শন দিও। সে যেমন পণ্ডিত তেমনি ভক্ত। তার সঙ্গে আলাপ করলেই বুঝতে পারবে। তাকে আমি এ যাবৎ 'বৈষ্ণব' বলে পরিহাস করেছি, তার কথা ও আচরণ কোনো কিছুরই মর্ম আমি বুঝিনি। তোমার কৃপায় এবার তার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। তুমি তাকে সম্ভাষণ করলেই বুঝবে তার মহত্ত্ব।'

দেখা দেবেন বলে প্রভু সম্মত হলেন। আলিঙ্গন করে বললেন, 'এবার তবে ঘরে ফিরে কৃষ্ণ ভজন করো। আর আশীর্বাদ করো আমি যেন তোমার প্রসাদে নীলাচলে ফের ফিরে আসি।'

চলে গেলেন প্রভু। সার্বভৌম মূর্ছিত হয়ে পড়ল। তার দিকে প্রভু আর ফিরেও তাকালেন না। 'মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়। 'পুষ্পসম কোমল —কঠিন বজ্রময়॥'

নিত্যানন্দ সার্বভৌমকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

বাকি সকলে যুক্ত হল প্রভুর সঙ্গে। সমুদ্রের ধারে ধারে হেঁটে হেঁটে পৌঁছুল আলালনাথে।

আলালনাথকে প্রণাম করে নৃত্য সুরু করলেন প্রভু। দলে-দলে লোক এসে জড়ো হতে লাগল। চতুর্দিকে রব উঠল হরি-হরি, রব উঠল কৃষ্ণ-গোপাল। অরুণ বসনে মণ্ডিত এমন কাঞ্চনদেহ কেউ দেখেনি, দেখেনি এমন কম্প-স্বেদ, এমন পুলকাশ্রু। যে দেখে সেই চমৎকার গোণে, ফিরে যেতে চায় না। ছেড়ে যেতে চায় না।

প্রভুর তা হলে দুপুরের ভিক্ষা জোটান কঠিন হল।

'তোমরা কেন এত ভিড় করছ?' নিত্যানন্দ চাইল বোঝাতে। 'কথা দিচ্ছি, প্রতি গ্রামে এমনি নৃত্য হবে, তোমরা পাবে এই মহৎ সঙ্গ। এখন সকলে নিরস্ত হও, গাঁয়ে-ঘরে ফিরে যাও।'

কে কার কথা শোনে।

'চলো তোমাকে স্নান করিয়ে নিয়ে আসি।'

সমুদ্রে নিয়ে গেল প্রভুকে, আথালি-পাথালি লোক ছুটল। তাড়াতাড়ি স্নান করিয়ে আবার নিয়ে এল মন্দিরে। আর তক্ষুনি বন্ধ করে দিল দরজা।

গোপীনাথ প্রসাদ নিয়ে এসেছিল, নিমাই-নিতাইকে ভিক্ষা করাল। অবশিষ্ট বাকি সবাই ভাগ করে নিল।

'দরজা খোল। দর্শন করতে দাও আমাদের।' জনতা উত্তাল হয়ে উঠল।

ভক্তদের সাহস হলনা দরজা খোলে। কিন্তু প্রভু কতক্ষণ লোক-আর্তি সহ্য করবেন? বললেন, 'দ্বার মোচন করো।'

সন্ধে পর্যন্ত চলল জনস্রোত। যে দেখল সেই বৈষ্ণব হয়ে গেল। মুখে ধ্বনি ফুটল—হরি-হরি, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ, জয় কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য।

সারারাত কাটল কৃষ্ণকথায়। প্রভাত হলে প্রাতঃস্নানের পর প্রভু ভক্তদের কাছে বিদায় চাইলেন। সকলে আবার হায়-হায় করে উঠল।

কারু দিকে আর ফিরে তাকালেন না। কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হয়ে রাধিকার মত চললেন বিষাদচ্ছবি হয়ে।

মুখে শুধু এক বাক্য: 'রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাম্।' এই বাক্য মুখে নিয়েই চলছেন গৌরহরি, আর যাকেই দেখছেন, বলছেন,—বলো হরি, বলো কৃষ্ণ। আলিঙ্গন করছেন আর সেই সুযোগে শক্তি সঞ্চার করে দিচ্ছেন! আর সে তার গ্রামে ফিরে গিয়ে কৃষ্ণ বলে নাচছে, কাঁদছে আর হাসছে, বৈষ্ণব হয়ে যাচ্ছে। তার পর অন্য গ্রামের লোক যখন তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে, সেও হয়ে উঠছে মহাভাগবত, কৃষ্ণনামের আচার্য

এভাবে সেতুবন্ধ পর্যন্ত সমস্ত দেশ বৈষ্ণব হয়ে গেল।

ক্রমে এসে পৌঁছলেন কূর্মক্ষেত্রে, গঞ্জামে। মন্দিরে কূর্মাবতারের বিগ্রহ দেখে স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচতে লাগলেন প্রেমাবেশে।

এখানেও সেই কৌশল। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে কৃষ্ণাগ্নিসঞ্চার।

'কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম॥
এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল॥'

কূর্ম নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ আছে সেই গ্রামে, প্রভুকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করল। নিজে পা ধুয়ে দিল প্রভুর, সেই জল খেল সবংশে। অনেক স্নেহে ভিক্ষা করাল নানাপ্রকার, সবংশে খেল শেষান্ন। বললে, 'যে পাদপদ্ম ব্রহ্মা ধ্যান করছে, তাই আমার ঘরে উপস্থিত। প্রভু, তোমাকে আর আমি ছাড়ব না, বিষয়তরঙ্গে আমি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছি, আমাকে তুমি সঙ্গে নাও।'

'এসব কথা বলবেনা।' বললেন প্রভু, 'ঘরে বসে নিরন্তর কৃষ্ণনাম নেবে, আর যাকেই দেখবে, তাকেই করবে কৃষ্ণ-উপদেশ। তোমাকে বিষয়তরঙ্গ স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না।'

সর্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ, বাসুদেব রাত্রে শুনতে পেল, কূর্মবিপ্রের ঘরে প্রভু এসেছেন! ভোর হতেই চলে এল তড়িঘড়ি।

'প্রভু কোথায়?'

'এই খানিক আগেই চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন!' মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল বাসুদেব।

জীবনে তার একমাত্র সঙ্গী কুষ্ঠকীট। অঙ্গের ক্ষতস্থান থেকে যদি একটি কীট মাটিতে পড়ে যায়, বাসুদেব আবার তাকে সযত্নে ক্ষতস্থানেই আশ্রয় দেয়। নিজ দেহের প্রতি বিন্দুমাত্র অভিনিবেশ নেই, নিজ দেহ দিয়েই কীটগুলোকে, যেসব কীট দেহ থেকে খসে পড়েছে তাদেরও, সেবা-যত্ন করে, ভরণপোষণ করে। যে ঈশ্বরতন্ময়, কোথায় আর তার দেহবুদ্ধি!

বিলাপ করতে লাগল বাসুদেব।

হঠাৎ তার চোখের সামনে প্রভু এসে দাঁড়ালেন। শুধু দাঁড়ালেন না, তাকে বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। দিলেন তাকে জ্যোতির্ময় নিরাময় স্পর্শ।

মুহূর্তে অভিনব কাণ্ড ঘটে গেল। কুষ্ঠ সেরে গেল বাসুদেবের। তার সর্ব অঙ্গ নিরবদ্য হয়ে উঠল, ধরল সুবর্ণকান্তি।

'এ শুধু তুমিই পারো।' বললে বাসুদেব। এ জীবের পক্ষে অসম্ভব। তুমি ভগবান, জীবনিস্তার তোমার স্বভাব, তাই তোমার মধ্যে উত্তম-অধমের ভেদ নেই, উত্তম-অধম দুইই তোমার সমান প্রিয়। কিন্তু এ আরোগ্য সর্বাংশে আমার পক্ষে শুভ হল কী?'

'কেন এ কথা বলছ?'

'আমার এখন অহঙ্কার না জন্মায়।' দ্রবচিত্তে বললে বাসুদেব, 'আগে আমি সকলের অস্পৃশ্য ছিলাম, আমার গায়ের গন্ধে কেউ আমার কাছে ঘেঁসত না, নিজেকে ভাবতে পারতাম দীনাতিদীন বলে। তুমি এখন আমার দেহকে নিষ্কলঙ্ক করলে, রূপে লাবণ্যে গরীয়ান করলে, এখন আমাতে দেহাভিমান না এসে যায়। আর তুমি তো জানো অভিমানই ভজনের শত্রু।'

'তুমি সর্বদা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো, কৃষ্ণ-ধ্বনিতেই জন্মাবে না অভিমান। কৃষ্ণই তোমাকে আত্মসাৎ করে নেবেন।'

প্রভু চললেন এগিয়ে। নষ্ট-কুষ্ঠ রূপপুষ্ট হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, হয়ে গেল ভক্তিতুষ্ট। প্রভুর নাম হল বাসুদেবামৃতপদ।

জিয়ড়-নৃসিংহের স্থানে পৌঁছলেন তারপর। এই নৃসিংহ প্রহ্লাদের স্থাপনা। দণ্ডবৎ নতি করলেন প্রভু। বহু নৃত্যগীতস্তুতি করলেন। সিংহ যেমন অন্যের সম্পর্কে উগ্র হয়েও নিজের শাবকদের কাছে শান্ত, তেমনি নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুর মত ভক্তদ্রোহীর প্রতি উগ্র হয়েও প্রহ্লাদের মত ভক্তের কাছে স্নেহশীল।

প্রহ্লাদ তার বন্ধুদের বললে, 'তোমরা যদি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান হও, তা হলে শ্রদ্ধা হতেই তোমাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধি উৎপন্ন হবে। আমি বলছি, যাতে ভগবানের অবিচলিত আসক্তি হয়, তাই করো। গুরুশুশ্রূষা করো, সমস্ত লব্ধবস্তু সমর্পণ করো, সাধু ভক্তবৃন্দের সংসর্গ করো, ভগবৎকথায় অনুরাগী হও, সশ্রদ্ধ হও। ধ্যান করো তাঁর পাদপদ্ম। যেখানে তাঁর যত মূর্তি আছে, বহুমূর্ত্যৈকমূর্তি, সমস্ত দর্শন-পূজন করো। ভগবান সর্বভূতে বর্তমান—তাই জেনে সর্বভূতে সাধুদৃষ্টি করো। তাহলেই দেখবে বাসুদেবে আসক্তি আসবে॥ দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, চরিত্র, বহুজ্ঞতা, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত—মুকুন্দের প্রীতি-উৎপাদনে সমর্থ নয়, একমাত্র নির্মল ভক্তিতেই হরি আনন্দিত হন। গোবিন্দে একান্ত ভক্তি আর তাঁকে সর্বত্র নিরীক্ষণ করাই ইহলোকে পুরুষের পরমস্বার্থ। ভক্তি ছাড়া আর সমস্তই বিড়ম্বনা।

পরতত্ত্ববস্তু একেই বহু, আবার বহুতেও এক। তাই যেখানে যত মন্দির পেয়েছেন—ভগবতীর কি ভৈরবীর, বিষ্ণুর কি নৃসিংহের, দর্শন করেছেন প্রভু। আর সর্বত্রই তাঁর প্রেমাবেশ। যদিও কৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনের জন্যেই তাঁর অবতার, সেই আস্বাদনে পূর্ণতা কই যদি অন্য ভগবৎস্বরূপের মাধুর্যও না আস্বাদিত হয়? কোনো ভগবৎস্বরূপই উপেক্ষণীয় নয়। বিভিন্নস্বরূপে ভেদবুদ্ধি করলে অপরাধ। ঈশ্বরত্ব তাই প্রভুর সর্বত্র প্রেমাবেশ।

একরাত সেখানে থেকে আবার চললেন দক্ষিণে। গোদাবরীর তীরে এসে দাঁড়ালেন। এ কি, যমুনা নাকি? আর চারদিকের এই ঘন বন, এই বুঝি ব্রজভূমি। মাতোয়ারা হয়ে নাচতে লাগলেন। আবার এ অঞ্চলও বৈকুণ্ঠায়িত হল।

পার হলেন গোদাবরী। ঘাটে স্নান করে অদূরে বসলেন কৃষ্ণকীর্তন করতে।

হঠাৎ বাজনা বেজে উঠল, দোলায় চড়ে কে আসছে রাজরাজড়া। সঙ্গে বহুতর ভৃত্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ, সৈন্যসামন্ত। অনেক ঠাটবাট। আসছে স্নান করতে, কিন্তু বিষয়-বিলাসের ঘনঘটা কত!

প্রভু জানেন এ কে। এ উৎকলবাসী, বিদ্যানগরের অধিপতি রামানন্দ রায়। বিষয়ে বসবাস করেও নিরাসক্ত। কৃষ্ণপ্রেমে টলমল।

বিধিমত স্নান-তর্পণ করল রামানন্দ। হঠাৎ নজরে পড়ল অদূরে একাকী কে এক সন্ন্যাসী বসে আছে। সন্ন্যাসী সম্বন্ধে রামানন্দ বিশেষ উৎসাহিত নয়, কিন্তু কে এ অপরূপ? অরুণবর্ণ বহির্বাস, কমলচক্ষু, সুবলিত প্রকাণ্ড শরীর, শরীরে শত সূর্যের তেজ। সমস্ত বন-বিটপী আলো করে বসে আছে। শুধু চোখেই চমৎকার লাগলনা, প্রাণেও বাঁশি বেজে উঠল। রামানন্দ এগোল দ্রুত পায়ে, একেবারে দণ্ডবৎ ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করল প্রভুকে।

তাকে আলিঙ্গন করবার জন্যে প্রভুও সতৃষ্ণ হলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—'ওঠো। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো।'

উঠল রামানন্দ। সহর্ষচোখে তাকিয়ে রইল।

'তুমিই রামানন্দ?'

দৈন্যবশে রামানন্দ বললে, 'আমিই সেই মন্দভাগ্য শূদ্রাধম।'

'তুমি?' কতদিনের হারানো বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছেন—সেই উদ্বেল আনন্দে দীর্ঘ দৃঢ় ভুজে রামানন্দকে প্রভু বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন! দুজনেরই স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হল—প্রভুর রাধাভাব, রামানন্দের গোপী-ভাব। পরস্পরকে আলিঙ্গন করে দুজনেই পড়লেন মাটিতে—স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য তো ফুটলই, মুখে ফুটল গদগদ শব্দ—কৃষ্ণ-কৃষ্ণ. কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

এ কী আচরণ! বৈদিক ব্রাহ্মণেরা স্তম্ভিত হল। তেজ পুঞ্জ-কলেবর সন্ন্যাসী, অথচ শূদ্রকে আলিঙ্গন করছে! আর স্বভাবতই গম্ভীর যে রাজপুরুষ, সেই রামানন্দ সন্ন্যাসীস্পর্শে করছে এমন আকুলি-ব্যাকুলি!

বিরোধীয় ভাবের লোক দেখে প্রভু ভাব সম্বরণ করলেন। সুস্থ হয়ে বসলেন রামানন্দকে পাশে নিয়ে। বললেন, 'সার্বভৌম ভটচাজ তোমার কথা বলেছিলেন আমাকে। বলেছিলেন দেখা করতে। ভালোই হল, অনায়াসে তোমার দর্শন পেলাম।'

'আজ আমার মনুষ্যজন্ম সফল হল।' বললে রামানন্দ। 'সার্বভৌমের কৃপায় আমি ভাগ্যবান হলাম, পেলাম চরণদর্শন। তার প্রেমে বশীভূত হয়ে আমার মত অস্পৃশ্যকে তুমি আলিঙ্গন করলে। বেদবিধি ভয় করলেনা, আমার মত বিষয়ী রাজসেবী শূদ্রকেও তোমার বুকে স্থান দিলে। সন্দেহ কী, তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর, জীবের প্রতি কৃপায় নিন্দ্যকর্ম করতেও তোমার বাধেনা।'

'কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম ॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
মোর দরশন তোমা—বেদে নিষেধয় ॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি—কে জানে তোমার মর্ম ॥'

আরো বললে রামানন্দ, 'আমাকে উদ্ধার করতেই তোমার এখানে আসা। তুমি যে পরম দয়ালু, তুমি যে পতিত-পাবন। মহাপুরুষেরা নিজের আশ্রম ছেড়ে অন্যত্র যায় কেন? তাদের নিজের প্রয়োজনে নয়, শুধু পাষণ্ড-উদ্ধারে। যায় কেন তীর্থ-পর্যটনে? শুধু তীর্থকে পবিত্র করতে, আর সেই ছলে সংসারীদের নিস্তার করতে।'

বিদুরকেও তাই বলেছিল যুধিষ্ঠির। বলেছিল, 'আপনার মত কৃষ্ণভক্ত তীর্থের মতই পবিত্র। যাদের অন্তরে গদাধর বিরাজমান, তাদের তীর্থদর্শনে প্রয়োজন কী! শুধু তীর্থের পবিত্রতা বাড়াবার জন্যেই তাদের তীর্থভ্রমণ।'

'দেখ, তোমাকে দেখে আমার অনুচরেরা, ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত দ্রবীভূত হয়েছে।' রামানন্দ আরো বললে, 'কৃষ্ণনাম শুনে সকলের শরীর শিহরিত, চোখ অশ্রুসজল। তোমার আকৃতিতে-প্রকৃতিতে ঈশ্বর-লক্ষণ সুস্ফুট, সামান্য জীবে এ কখনো সম্ভব নয়।'

'কী যে বলো।' বললেন প্রভু, 'তুমি মহাভাগবত, তোমার ভক্তি দেখেই ওদের মন আর্দ্র হয়েছে। অন্যের কথা ছেড়ে দিই, আমি হেন যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তির ধার ধারিনা, আমিও তোমার স্পর্শে ভাসছি কৃষ্ণপ্রেমে। সার্বভৌমই বলে দিলেন, আমার কঠিন চিত্তকে শোধন করবার একমাত্র রসায়ন তুমি, তাই তো এসেছি তোমাকে দেখতে।'

কিন্তু এখানে থাকি কোথায়?

এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ তাঁর ঘরে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন।

প্রভু হাসিমুখে বললেন রামানন্দকে, 'বড় সাধ তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনি। আবার দেখা হবে তো?'

'কিছুদিন এখানে থাকুন।' বললে রামানন্দ, এই দুষ্টচিত্তকে মার্জন করে শোধন করে দিয়ে যান।

[ক্রমশঃ।

ভোরের সংলাপ

[প্যাট্রের নাকের 'Day break' কবিতার অনুবাদ]

নিয়তির সর্বস্ব তুমি ছিলে যে আমার।
তারপর যুদ্ধ এল—এল ধ্বংস মৃত্যুর প্রস্তাব।
বহুদিন বহুদিন তারপরও হয়ে গেল পার;
তোমার সংবাদ নেই। মনোমগ্ন করুণ সংলাপ।
অতিক্রান্ত এই সব বছরের পর
আবার তোমার স্বর উন্মুখর করল আমাকে।
তোমার সত্তার ভাষ্য পড়ে কত রাত্রি কোজাগর
যেন কোনো মূর্ছা থেকে জেগে ওঠা প্রাণের সংরাগে।
মানুষের মধ্যে আমি বেঁচে থাকব—অভীপ্সা আমার
জনতার একজন হয়ে, এই ভোরের উল্লাসে।
সব কিছু ভেঙে চুরে টুকরো টুকরো করতে পারার
প্রস্তুতি রয়েছে, আমি তাদের আনত করতে পারি অনায়াসে।
তরতর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসি—
জীবনে প্রথম যেন এইমাত্র উত্তীর্ণ বাইরে
তুষারে আবিষ্ট এই পথের দুতীরে—
জনশূন্য ফুটপাথ—কঙ্কতার ছায়ার প্রবাসী।
চারিদিকে আলো, গার্হস্থ্যের শান্তি, উঠে পড়ছে নিহিত ঘুমের
অন্তঃপুর থেকে, কারা চা পান করছে, ট্রাম ধরতে ছুটছে ওখানে।
কয়েক মিনিট মাত্র—সময়ের চলিষ্ণু বিজ্ঞানে
তারপর মুখরিত ব্যাপ্ত ছবি যেন এক অন্য নগরের।
আবৃত আচ্ছন্ন ঐ উজ্জ্বল ফটকে
ঝড়ো হাওয়া জাল বোনে ঘন মগ্ন পড়ন্ত তুষারে।
অর্দ্ধভুক্ত খাবার ও অসমাপ্ত চা'র কাপ রেখে একধারে
সময়ের সাথে তারা পাল্লা দেয় বাইরে সড়কে।
তাদের সবার জন্য আমি আজ অনুভব করি
আমিও তাদের সঙ্গে সহজাত সুখের দুঃখের
অংশভাক্, গলিত তুষার হয়ে যেন গলে পড়ি,
হাই তুলে চোখ মুছি—উজ্জ্বল নতুন ভোরের
আলো ছুঁয়ে। নামহীন মানুষেরা, শিশুরা কুনোরা—
আকাশ বৃক্ষ মাটি সকলেই ব্যাপ্ত হয়ে আছে
আমার সত্তার সঙ্গে—, আমি যে বিজিত আজ সকলের কাছে
আমার গৌরব সেই—সে আমার জয়ের পসরা ॥

নচিকেতা ভরদ্বাজ

অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পৃথিবীর অন্যতম সেরা 'শার্লাটান', (Charlatan), ধাপ্পাবাজ 'কাউন্ট ক্যাগলিওস্ট্রো'-কে (Cagliostro) যদি বলা যায় 'ওয়াইফ-মেড ম্যান' (Wife-made man), তাহলে খুব বেশি অত্যুক্তি করা হয় না। দরজি-দুহিতা লোরেনজিয়া ফেলিশিয়ানি-র (পরে ক্যাগলিওস্ট্রো সহধর্মিণী রহস্যময়ী 'সেরাফিনা') সঙ্গে দেখা না হ'লে সাধারণ ঠক, জুয়াচোর জিউসেপ্পি ('বেপ্পো') বলমাসো-র পরিণতি ঘটতো না অসাধারণ রহস্যের মহা কারবারী ইতিহাসে খ্যাত কাউন্ট ক্যাগলিওস্ট্রো রূপে।

বেপ্পো থেকে 'ক্যাগলিওস্ট্রো'—এই পরিবর্তনটা যে শুধুমাত্র নামেরই পরিবর্তন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-স্বরূপেরও হ'লো বিরাট পরিবর্তন। বেপ্পো ছিলো এক মানুষ, ক্যাগলিওস্ট্রো হ'লেন অন্য মানুষ। বেপ্পোর ছিলো তার শিকারদের ঠকিয়ে, তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে তারপর তাদের নাগাল ছাড়িয়ে পালানো। ক্যাগলিওস্ট্রোর কর্মপ্রকরণ হ'লো নিজেকে কেন্দ্র করে একটি ক্রমবর্দ্ধমান ভক্তসম্প্রদায় গঠন করা, রহস্যের আকর্ষণ দিয়ে ভক্তদের আকৃষ্ট করে রাখা। নতুন মহাতন্ত্রের মহা তান্ত্রিক তিনি, তাঁর ভৈরবী রহস্যময়ী সেরাফিনা!

বিভিন্ন রকমের ভেল্কির খেলায় মাথা এবং হাত দুইই পাকা ছিলো ক্যাগলিওস্ট্রোর, আর ছিলো গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে অস্পষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ অল্প কথায় অসামান্য রহস্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি করে ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা আর বিস্ময় সৃষ্টি করবার ক্ষমতা। সেই সঙ্গে ছিলেন মূর্তিমতী রহস্য। সুন্দরী সেরাফিনা—তাঁর দু'চোখে যেন অতলস্পর্শী, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি। মুখের অর্দ্ধস্ফুট হাসিতে যেন কি রহস্যময় ইঙ্গিত।

কোথাও চক্র বৈঠকে ক্যাগলিওস্ট্রো দম্পতির আবাহনে আবির্ভূত হতেন স্বয়ং শয়তান। কোথাও বা ক্যাগলিওস্ট্রোর 'তান্ত্রিক' ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন জিনিষের বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটতো—যেমন পাথরের নুড়ি হয়ে যেতো মুক্তা, অথবা ছাই থেকে হতো রক্তগোলাপ। স্ফটিকের তৈরী একটি গোলক ছিলো তাঁদের, সেই রহস্যময় গোলকটির ভেতরে ফুটে উঠতো নানারকমের দৃশ্য—অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের বিভিন্ন মানুষের ছবি। সে সব ছবি গোলকটির ভেতর ফুটে উঠতো সেটির দিকে বেশ নিবিষ্টভাবে কিছুক্ষণ অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকলে। এ ছাড়া আরো অনেককিছু অদ্ভুত ব্যাপার ক্যাগলিওস্ট্রো দেখাতেন দক্ষিণা বা 'প্রণামী'-র বিনিময়ে। বলা বোধ হয় বাহুল্য এ সবের পিছনে ছিলো ভেল্কিবাজি, যে ভেল্কির ফাঁকি ঢাকা পড়ে থাকতো অলৌকিকতার দক্ষ ভাঁওতায়।

কিন্তু এসব হলো প্রাথমিক স্তর বা পর্যায় মাত্র। যেমন কোনো মেলায় বা কার্নিভালে কোনো ভ্রাম্যমাণ সার্কাসের তাঁবুর বাইরে ছোটখাট অথচ চমৎকার খেলা দেখানো হয়ে থাকে ভেতরের পুরো প্রোগ্রামের বিজ্ঞাপন বা আংশিক নমুনা হিসেবে বাইরের এই খুচরো খেলা দেখে মুগ্ধ এবং লুব্ধ হয়ে বাইরের লোক টিকেট কিনে ভেতরে ঢোকে আরো খেলা, আরো বড়, আরো অদ্ভুত, আরো বিস্ময়কর খেলা দেখবে বলে।

প্রাথমিক পর্যায়ের বিস্ময়গুলো দেখে অভিভূত হয়ে যাঁরা ক্যাগলিওস্ট্রোর নতুন গুপ্ত তান্ত্রিক রহস্যের আরো গভীরে প্রবেশ করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠতেন (কৌশলী ক্যাগলিওস্ট্রোই রহস্যময়ী সেরাফিনার সহযোগিতায় তাঁদের উৎসুক করে তুলতেন), অর্থাৎ যাঁরা ক্যাগলিওস্ট্রোর 'অলৌকিক' ধাপ্পার খপ্পরে পড়ে যেতেন, ক্যাগলিওস্ট্রো তাঁদের পর্যায়ের পর পর্যায়ের ভেতর দিয়ে ক্রমেই রহস্যের আরো গভীরে প্রবেশ করবার 'অধিকার' এবং 'সুযোগ' দিতেন। যাঁরা এই 'অধিকার' এবং 'সুযোগ' পেতেন, তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান এবং ভাগ্যবতী মনে করতেন, কারণ রহস্যময় ক্যাগলিওস্ট্রো এমন ভান করতেন যে, এসব দুর্লভ গুহ্য তত্ত্বে যার তার প্রবেশাধিকার নেই।

গৃহের অভ্যন্তরে যে প্রকোষ্ঠে গুরু গম্ভীর রহস্যময় আবহাওয়ায় প্রাচীন মিশরী কায়দায় নানারকম বিচিত্র তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি হতো, তার প্রবেশদ্বারের ওপর বড় বড় হরফে ক্যাগলিওস্ট্রো লিখে রাখতেন।

OSER
VOULOIR
SE TAIRE

অর্থাৎ সাহস করো।
ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করো।
নীরবতা অবলম্বন করো।

যে প্রকোষ্ঠে ক্যাগলিওস্ট্রো দম্পতির পৌরোহিত্যে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি হতো, তার ছাত, চারধারের দেয়াল এবং মেঝে ঢাকা থাকতো কালো কাপড় দিয়ে। সেই কালো কাপড়ের ওপর বিভিন্ন রঙের সুতো দিয়ে আঁকা থাকতো নানা রকমের সাপের ছবি। তিনটি মিটমিটে আলো জ্বলতো, তারা যে আলো দিত তাকে পুরোদস্তুর আলো না বলে একটুখানি অতিরঞ্জন করে বলা যেতে পারতো হাল্কা অন্ধকার, যেন মিশ কালো অন্ধকারের সঙ্গে একটু আলো মিশিয়ে অন্ধকারটাকে একটু হাল্কা করা হয়েছে।

একটা বেদীর ওপর দেখা যেতো কয়েকটি নরকংকাল। বেদীর দুপাশে গ্রন্থের স্তূপ—সে সব গ্রন্থ নানা গুপ্তবিদ্যা সম্পর্কিত বলেই অনুমিত হোক, এই ছিলো ক্যালিওস্ত্রোর উদ্দেশ্য। এবং সে উদ্দেশ্য সাফল্যও লাভ করতো। এই নবতন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এর প্রতি যারা এতটুকুও বিশ্বাসঘাতকতা করবে, অলৌকিক অশরীরী নির্মম শক্তির হাতে তারা কি ভীষণ শাস্তি পাবে, এদের ভেতর কতকগুলো গ্রন্থে তারও বিবরণ ছিলো। (বলা বোধ হয় বাহুল্য—এই বিবরণ গুলো পড়ে দেখবার 'সুযোগ' পেতেন ক্যালিওস্ত্রোর 'দীক্ষিত' শিকারবৃন্দ, এবং সেগুলো তাঁদের মনের ভেতর ভীষণ ভাবে গেঁথেও যেতো।)

নব দীক্ষিতদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতো সেই নীরব প্রকোষ্ঠের অদ্ভুত রহস্যময় আবহাওয়ায়, নীরবে। যাঁরা আসতেন তাঁরা কল্পনা-প্রবণ, অনুভূতি প্রবণ এবং সহজ বিশ্বাসী (অথবা অত্যন্ত বিশ্বাসেচ্ছুক) হলেই আসতেন। এ হেন পরিবেশে কয়েক ঘণ্টার নীরবতার ফল এঁদের স্নায়ুর—এবং তা থেকে মনের—ওপর কি রকম কাজ করতো সেটা অনুমান করা শক্ত নয়। বিশেষ করে এই নয়া তন্ত্রের গুরু ক্যালিওস্ত্রোর নির্দেশে তাঁরা শুদ্ধচিত্ত, শুদ্ধদেহ হবার জন্য উপবাস করে অবসন্ন প্রায় হয়ে রয়েছেন।

তাছাড়া উপবাসে পবিত্র থাকতে হবে বলে তাঁদের ভোজ্য দেওয়া হয়নি, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয়েছে সুপবিত্র 'কারণ বারি' (অর্থাৎ মদ), সুতরাং পান করে নেশায় চুর হয়ে থাকতে কোনো বাধা নেই।

এ অবস্থায় যদি নানা রহস্যময় মূর্তির রহস্যময় আবির্ভাব এবং তিরোভাব দেখে এঁরা এই মূর্তিদের সত্যিই অপার্থিব, অলৌকিক বলে বিশ্বাস করে নিয়ে বিস্ময়ে মুগ্ধ হন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বলা বাহুল্য এই আবির্ভাব এবং তিরোভাবগুলি মোটেই অলৌকিক ছিলো না, এবং সেই রহস্যময় 'মূর্তি'গুলো যাদুকর ক্যালিওস্ত্রোরই লোক। (পরশুরামের "বিরিঞ্চি বাবা" গল্পে অন্ধকার বৈঠকে মহাদেব মূর্তি আবির্ভাবের ব্যাপারটি এখানে স্মরণীয়।)

এই ধরণের আরো বিবরণ পাওয়া যায়, যা থেকে খানিকটা আভাস মেলে কি কৌশলের যাদুতে ক্যালিওস্ত্রো বহুর মনে রহস্যমুগ্ধতা বদ্ধমূল ক'রে দিয়ে নিজের অসাধারণত্বের কিম্বদন্তী ছড়াতে পেরেছিলেন। ক্রমে সারা ইউরোপে অলৌকিক শক্তি এবং বহু গুপ্তবিদ্যায় অসাধারণ জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠলেন, জীবিতকালেই কিম্বদন্তী হয়ে উঠলেন তিনি।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ক্যালিওস্ত্রো আবির্ভূত হলেন ফরাসী দেশের রাজধানী পারী (Paris) শহরে। আগে থেকেই ক্যালিওস্ত্রোর মহাবিশ্বাসী এবং শ্রদ্ধাবান ভক্ত ছিলেন ফরাসী দেশে বিপুল প্রতিপত্তিশালী কার্ডিন্যাল দ্য রোহান (Cardinal de Rohan)। তাঁর দেহে ছিলো ফরাসী রাজবংশের রক্ত, ঐশ্বর্য ছিলো অগাধ, ঐশ্বর্য এবং প্রতিপত্তির দম্ভও ছিলো কম নয়, অথচ তাঁর স্বভাবটা ছিলো সাদাসিধে নিরীহ ভালোমানুষের। ক্যালিওস্ত্রো এসে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁকে চিঠি লিখে পাঠালেন "আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।" কাউণ্ট ক্যালিওস্ত্রো তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জবাব দিলেন "আপনি যদি অসুস্থ, রোগাক্রান্ত হয়ে থাকেন তাহলে আপনি আমার কাছে আসতে পারেন, আমি আপনাকে রোগমুক্ত করে দেবো। আপনি যদি সুস্থ থাকেন, তাহলে আমাতে আপনার কোনো প্রয়োজন নেই, আপনাতেও আমার কোনো প্রয়োজন নেই।"

যাই হোক, অতি আগ্রহে নাছোড়বান্দা কার্ডিন্যাল দ্য রোহান শেষ পর্যন্ত ক্যালিওস্ত্রোর সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করলেন ক্যালিওস্ত্রোর গৃহের এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে। তিনি এই রহস্যময়, স্বল্পবাক, গম্ভীর লোকটির চেহারায়, চলনে বলনে, চাহনিতে, ব্যক্তিত্বে এমন অসাধারণত্ব দেখতে পেলেন যে ভক্তিতে, শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে, আনন্দে তাঁর মন ভরে উঠলো। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবনতভাবে তাঁর সঙ্গে কথা কইলেন। প্রথম সাক্ষাতে ক্যালিওস্ত্রো বেশিক্ষণ সময় দিলেন না দ্য রোহানকে। অবশ্য এর পরে আরো কয়েকবার তাঁকে 'দর্শন' দিয়ে ধন্য করলেন। এমন ভাবের নিখুঁত অভিনয় করলেন যেন দ্য রোহানের প্রতি তিনি মহা অনুকম্পা করছেন, যেন তাঁর নিজের দিক থেকে দ্য রোহানের সঙ্গে আলাপের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। ক্রমে দ্য রোহান হয়ে পড়লেন ক্যালিওস্ত্রোর ইচ্ছাশক্তির বশংবদ ভৃত্য। ক্যালিওস্ত্রো তাঁর ওপর প্রীত হয়েছেন, এমনি ভাব দেখিয়ে বললেন, "তোমার আত্মা আমার আত্মার আত্মীয়তা লাভের যোগ্য ; যে গুপ্ত মহাবিদ্যা আমি বহু সাধনার ফলে অর্জন করেছি, তার অংশীদার হবার যোগ্যতাও আছে তোমার।"

শুনে দ্য রোহান যেন আনন্দের সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করতে লাগলেন, মনে করলেন তাঁর জীবন ধন্য। তাঁরই সহায়তায় পারী শহরের অভিজাত মহলে অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করলেন ক্যালিওস্ত্রো। ক্যালিওস্ত্রো-ভবনে অলৌকিক যাদুচক্রের বৈঠকে পারী শহরের সেরা সেরা অভিজাত নরনারী এসে ভিড় করতে লাগলেন। ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ফরাসী বিপ্লবের ঠিক আগেকার যুগ তখন শেষ অবস্থায় এসেছে ; অলৌকিক রহস্যের দিকে তখনকার মানুষের ঝোঁক তেমনই অসাধারণ প্রবল, যেমন প্রবল অনাসক্তি এবং তাচ্ছিল্য যথার্থ মূল্যবান সব কিছুর প্রতি। শিক্ষিত, দায়িত্বপূর্ণ মহা সম্ভ্রান্ত হোমরা-চোমরা ব্যক্তিরাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না। সুতরাং ক্যালিওস্ত্রো ফরাসী দেশে পা দিয়েই দেখতে পেলেন তাঁর যাদুর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই আছে। পারী শহরের অভিজাত সমাজ তাঁদের কৌতূহলমুগ্ধ মন দিয়ে দু' হাত বাড়িয়ে সাগ্রহে অভিনন্দন জানালেন ক্যালিওস্ত্রোকে। ক্যালিওস্ত্রো হয়ে উঠলেন তাঁদের গুরু, পথপ্রদর্শক, উপদেষ্টা। ক্যালিওস্ত্রোর অসামান্য সম্মোহনী যাদুতে বহু বিশিষ্ট নরনারী এমন প্রচণ্ড রকম অভিভূত, নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ক্যালিওস্ত্রোর বহু অবিশ্বাস্য, অসম্ভবকে সম্ভব করা 'মিরাকল' (miracle) অর্থাৎ অলৌকিক লীলা (বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বা প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে যাদের ব্যাখ্যা চলে না) "চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছেন" এহেন বিশিষ্ট "প্রত্যক্ষদর্শী"-র সংখ্যা বেড়েই চললো। বেড়ে চললো রহস্যময় ক্যালিওস্ত্রোর ওপর ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, নির্ভর। তাঁর রহস্যময় চক্রবৈঠকে বিশিষ্ট নরনারীর সমাগম হতে লাগলো।

পারী শহরে কাউণ্ট ক্যালিওস্ত্রো অতি লোভ করতে গিয়ে ফরাসী দেশের রাণী মারি আঁতোয়ানেৎ-এর (Marie Antoinette) হীরের নেকলেসের কেলেংকারীর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে পারী শহরের বাস্তিল (Bastille) নামক বিখ্যাত কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। [ক্রমশঃ।
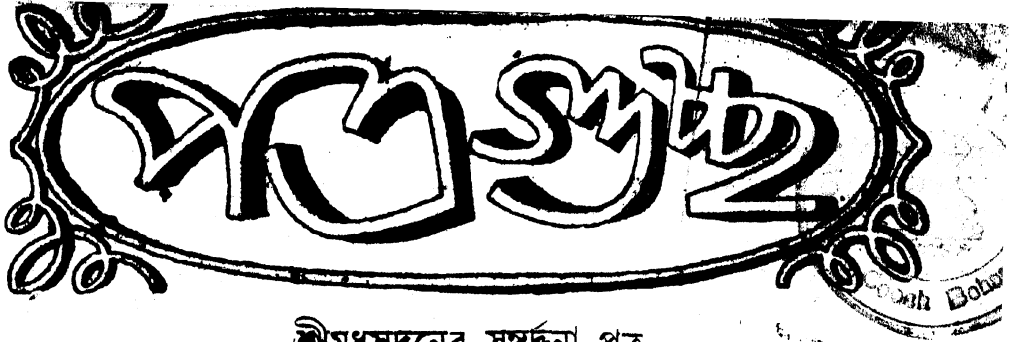
শ্রীমধুসূদনের সম্বর্দ্ধনা পত্র

'মেঘনাদবধ', ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তনের জন্য গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ* তৎ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিবর মধুসূদন দত্তকে সম্বর্দ্ধিত করিবার আয়োজন করেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবার সৌভাগ্য বোধ হয় মধুসূদনের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। ১২ ফেব্রুয়ারী ১৮৬১ তারিখে কালীপ্রসন্ন নিজ গৃহে এই সম্বর্দ্ধনা-সভার অনুষ্ঠান করেন। এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মাইকেলের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমন্ত্রণ-লিপি উদ্ধৃত করিতেছি :—

My dear Sir,

Intending to present Mr. Michael M. S. Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with success the Blank verse into our language, I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at mv house on the occasion of the presentation, in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving, while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better; I shall therefore be obliged, and I have no doubt all will be pleased, by your kind presence at mine on Tuesday next, the 12th Instant at 7 P.M.

Yours truly
Kaly Prussunno Singh
Calcutta the 9th February 1861.

সম্বর্দ্ধনা-সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌরদাস বসাক প্রভৃতি অনেকের সমাগম হইয়াছিল। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একখানি মানপত্র ও একটি মূল্যবান্ সুদৃশ্য রজত-পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন। মাইকেলের চরিতকারগণ বহু অনুসন্ধানেও এই মানপত্র এবং ইহার উত্তরে মধুসূদনের বাংলা বক্তৃতা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সুখের বিষয়, উহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মানপত্রখানি এইরূপ :—

এড়েস।—

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু। কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্ত্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয়সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক, তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম, হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শন জনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন।

---

* যোগীন্দ্রনাথ বসু 'জীবন-চরিতে' (৪র্থ সং, পৃঃ ৪২৩) লিখিয়াছেন :—"মধুসূদন যখন পুলিশ আদালতে কার্য্য করিতেন, কালীপ্রসন্ন বাবুকে তখন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে, মধ্যে মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে হইত। সেই হইতে তাঁহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল।" এই সংবাদ সত্য নহে; কারণ, মধুসূদন যখন বিলাতে, সেই সময় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন প্রথম অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ৪ মে ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—"আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ অনরারী মেজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।"

যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন, বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস-সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান হউন। আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভা ২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দা।	}	বিদ্যোৎসাহিনীসভা সভাবর্গাণাম্

এই মানপত্রের উত্তরে মধুসূদন বাংলায় একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়! তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনাদের সৌজন্য ও সহৃদয়তা।

বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশ উর্ব্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ-প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা—যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সামাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি।—'সোমপ্রকাশ,' ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৬১।

এই প্রসঙ্গে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন :—

You will be pleased to hear that not very long ago the বিদ্যোৎসাহিনী সভা—and the President Kali Prasanna Singh of Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers. Fancy! I was expected to speechify in Bengali!

মধুসূদনের সম্বর্দ্ধনা করিয়াই কালীপ্রসন্ন নিজ কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, 'মেঘনাদবধ কাব্য' বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীর নিকট তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

বাঙ্গালা সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে, বোধ হয় সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।

"—শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!"

হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই—প্রিয় বস্তুর নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্গুণরাজির পরিচয় প্রদান করে; তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি। অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জ্জরিত করে, তখন তাহারে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তজ জীবিত থাকিয়া যত দিন যত কাব্য রচনা করিবেন, তাহাই বাঙ্গলা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধিজল হইতে রত্ন উদ্ধারপূর্ব্বক বহুমানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই; কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদিগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লজ্জিত হইব।—'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', আষাঢ় ১৭৮৩ শক, পৃ, ৫৫-৫৬।

মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম কালীপ্রসন্ন সিংহই অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের গোড়ায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে দুইটি কবিতা আছে।

আশীর্বচন পত্র

শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ,

তুমি যখন নিতান্ত বালক, তখন হইতেই তোমার কবিতায় বাঙ্গালী মুগ্ধ। তোমার যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তোমার প্রতিভা বিকাশ হইতে লাগিল। সে প্রতিভা যেমন একদিকে দেশ হইতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তেমনি সাহিত্যেরও সকল মূর্ত্তিই আরম্ভ করিতে লাগিল। সে প্রতিভা প্রথম প্রথম কবিতায় আবদ্ধ ছিল, ক্রমে গল্প, নাটক, নবেল-রচনা, ছোট গল্প, বড় গল্প, সমালোচনা, রাজনীতি, সমাজনীতি, কর্মনীতি, এইরূপে সমস্ত সাহিত্য-সংসারে ছড়াইয়া পড়িল। তুমি সাহিত্যের যে মূর্ত্তিতেই হাত দিয়াছ, তাহাকে উদ্ভাসিত ও সজীব করিয়া তুলিয়াছ। কারণ, তোমার প্রাণ আছে, সে প্রাণে যেমন মধুরতা আছে, তেমনি তেজ আছে—যেমন মোহিনীশক্তি আছে, তেমনি উন্মাদিনীশক্তি আছে—যেমন সূক্ষ্মদৃষ্টি

…ছে—তেমনি দূরদৃষ্টি আছে। তোমার প্রতিভা যেমন গড়িতে পারে, তেমনিই ভাঙ্গিতে পারে—যেমন মাতাইতে পারে—তেমনই ঠাণ্ডা করিতে পারে—যেমন কাঁদাইতে পারে, তেমনই হাসাইতে পারে। কিমধিকং, তোমার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, সর্ব্বতঃপ্রসারী এবং সর্ব্বতোমুগ্ধকারী। সঙ্গীতের সহিত সাহিত্যের মিলনে তোমার হাতে উভয়েরই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে; তেমোকেও যশোমন্দিরের উচ্চ চূড়ায় তুলিয়া দিয়াছে।

ইংরাজ-রাজত্ব হইয়া অবধি তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ ধনে মানে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, সদ্গুণে সাহসে বাঙ্গালায় অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়া আসিতেছেন। তোমার প্রতিভায় সেই বংশের গৌরব উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর—উজ্জ্বলতম হইয়া উঠিয়াছে। তোমার গুণে বাঙ্গালা ত চিরদিনই মুগ্ধ—ভারত গৌরবান্বিত, এখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম, নূতন ও পুরাতন সকল মহাদেশই তোমার প্রতিভায় উদ্ভাসিত। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সমস্ত পৃথিবী আরও উদ্ভাসিত কর। তোমার বংশই দীর্ঘজীবীর বংশ, তুমি শতায়ু হও, সহস্রায়ু হও। তোমার বয়স যতই পাকিতেছে, অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে, ততই মানুষের ব্যথায় তোমার মন গলিতেছে, তোমার বীণার ঝঙ্কার গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে। মানবের মঙ্গলের জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ যতই বাড়িতেছে, ততই তুমি ব্যাকুল হইয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গলাসনের সমীপবর্ত্তী হইতেছ। তোমার মঙ্গলবাসনা চরিতার্থ হউক, তোমার নাম অক্ষয় হউক, তুমি অমর হইয়া ভারতের মঙ্গলকামনা করিতে থাক। তুমি দিগ্বিজয় করিয়া, বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়া আবার সোনার বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছ; তুমি আমাদের ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও স্নেহের উপহার স্বরূপ এই পুষ্পমালা গ্রহণ কর। বিধাতার সৃষ্টিতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুরভি, সব এই পুষ্পেই আছে। আমাদেরও যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুরভি, তাহা তোমাতেই আছে। আইস, উভয়ের মিলন করিয়া দিয়া আমরা কৃতার্থ হই।—ইতি

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি

বঙ্গ-রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা অভিনন্দন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রদ্ধাস্পদেষু

হে কবীন্দ্র! সুদীর্ঘ প্রবাস হইতে বিদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি বহন করিয়া আপনি নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন—স্বদেশী সাহিত্যের সর্ব্বায়তন এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আপনাকে আজ অভিনন্দন করিতেছে।

পরিষৎ নানা প্রকারে আপনার নিকট ঋণী। পরিষদের শৈশবে আপনি অজস্র স্নেহদানে ইহাকে পোষণ করিয়াছিলেন—পরিষদের কৈশোরে আপনি সহায় হইয়া, ইহার শ্রী ও সম্পদ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন—আজ পরিষদের যৌবনে আপনি ইহার অকৃত্রিম সুহৃৎ সখা। যখনই অমিত্র-নীরদের ঘনঘটায় পরিষদের পক্ষে 'পন্থ বিজন অতি ঘোর' হইয়াছে, তখনই শুভ পথ প্রদর্শন করিয়া, আপনি ইহাকে ঋতমার্গে পরিচালনা করিয়াছেন। সেই জন্য আপনার পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইলে বঙ্গের সাহিত্যিকগণের মুখস্বরূপ এই সাহিত্য-পরিষৎ আপনাকে অভিনন্দন করিয়া বিশ্বপিতার নিকট আপনার শতায়ুঃ কামনা করিয়াছিল।

যাঁহার অর্চ্চনার জন্য সাহিত্যের এই পুণ্যপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হে বরেণ্য! আপনি সেই বাণীর বরপুত্র। যুগ-যুগান্তের সাধনার ফলে দেবী সারদা আপনার চিত্ত-সরোজে তাঁহার রক্তচরণ চিহ্নিত করিয়াছেন। সেই জন্য সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই আপনি বিজয়ী; সেই জন্য আপনি সাহিত্যের যে বিভাগ যখন স্পর্শ করিয়াছেন, স্পর্শমণির করস্পর্শে সেই বিভাগই স্বর্ণময় হইয়াছে। বীণাপাণির সপ্তস্বরার শততন্ত্রীতে যে বিশ্বসংগীত নিয়ত ঝঙ্কৃত হইতেছে, হে মহাকবি! আপনার হৃদয়-বীণায় তাহার প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

মানব অমৃতের পুত্র—অতএব কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে, সে চিরদিন অমৃতত্বের প্রয়াসী। প্রাচীন ভারতের স্নিগ্ধ তপোবনে যে অমৃতের উৎস উৎসারিত হইয়াছিল, সেই পুণ্যপীযূষ পান ভিন্ন কোন মতে তাহার অদম্য ব্রহ্মতৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতে পারে না। এই সত্যের উপলব্ধি করিয়া জীবনের ছায়াময় অপরাহ্ণে মহর্ষি-সন্তান আপনি কুলোচিত ব্রত গ্রহণ করিয়া, জগৎকে সেই অমৃতবারি মুক্তহস্তে পরিবেশন করিতেছেন।

বিদ্যাপক্ষিণীর দুই পক্ষ—দর্শন ও বিজ্ঞান। এই পক্ষদ্বয়ে নির্ভর করিয়া, সে প্রজ্ঞানের পর-ব্যোমে নির্ভয়ে বিহরণ করে। পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে বিজ্ঞান আহরণ করুক; পূর্ব্ব পশ্চিমকে দর্শন বিতরণ করুক। এই আদান প্রদানের পূর্ণতায় যে বিদ্যার প্রপুষ্টি হইবে, সেই বিদ্যার দ্বারাই "বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"। সেই জন্য আপনি "বিশ্ব-ভারতী"র প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে রাখিবন্ধনে সংযুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

হে রবীন্দ্র! আপনি সাহিত্যাকাশের দীপ্ত ভাস্কর—জ্যোতিষাং রবিরংশুমান। যিনি জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, পরম জ্যোতিঃ, যাঁহার উর্জ্জিত বিভূতি আপনাতে দেদীপ্যমান—সেই সত্য শিব সুন্দর আপনাকে জয়যুক্ত করুন। ওঁ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। ১৯ ভাদ্র ১৩২৮ — গুণমুগ্ধ
ভারতী ১৩২৮ আশ্বিন — হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

কবিগুরুর প্রতিভাষণ

য়ুরোপে আমি সমাদর পেয়েচি এবং য়ুরোপকে আমি সমাদর করেচি, কিন্তু হৃদয় আমার উৎকণ্ঠিত ছিল ভারতের জন্যে। শিশুকাল থেকে ভারতের আকাশ দুই চক্ষু ভরিয়ে আমার মনকে যে-আলোক পান করিয়েচে, তার তৃষ্ণা আমার মনে নিয়ত জেগে ছিল; আর যারা আমার আপন দেশের লোক, তাদের কাছ থেকে প্রীতি পাবার যে আকাঙ্ক্ষা, সে কি আমার মিটেচে, কিম্বা কোনোকালে মিটবে? তাই অনেক দিন পরে দেশে ফিরে এসে আপনাদের কাছ থেকে এই যে অভ্যর্থনা লাভ করলেম, এ আমার কাছে উপাদেয়।

আমার বয়স যেদিন পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েছিল, সেদিন আমার যা কিছু সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি সে ত এই বাংলা দেশের সীমানা পার হয়নি। কিন্তু সেদিন এই বাংলা সাহিত্যপরিষদই আমার সম্বর্দ্ধনা করে সম্মানের পরিচয় দিয়েছিলেন। সে কথা আমি ভুলব না। কেন না, সেদিন আমার একমাত্র পরিচয় বাংলা ভাষার মধ্যে বাঙালীর কাছে, অর্থাৎ সে ছিল আত্মীয়ের পরিচয় আত্মীয়ের কাছে। এই অতি-নিকটের পরিচয়ে সকল সময়ে সুবিচারের আশা থাকে না; যে বরমাল্য পাওয়া যায় তাতে কারো কারো ভাগ্যে

ফুলের চেয়ে কাঁটার অংশই বেশি থাকে ; এবং যেহেতু তা আত্মীয়ের হাতের দান—এই জন্মে তার মধ্যে যে পীড়া থাকে তার বেদনা দুঃসহ। তাই সেদিন সাহিত্যপরিষৎ আমাকে উপলক্ষ্য করে যে কবি-প্রশস্তি-সভা ডেকেছিলেন, সে আমার পক্ষে যেমন বিস্ময়ের তেমনি আনন্দের বিষয় হয়েছিল ! সেদিন এই পরিষদের কাণ্ডারী ছিলেন আমার পরমবন্ধু স্বর্গগত রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর বুদ্ধির গভীরতা এবং হৃদয়ের ঔদার্য্য—দুইই ছিল অসামান্য ; সেদিন তিনিই বাঙালীর প্রতিনিধিরূপে এই বরণ-সভা আহ্বান করেছিলেন, এই আনন্দ এবং গৌরব সকলের চেয়ে আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। জনসভার অনেক অংশই আনুষ্ঠানিক ; প্রায় তা কাঠখড়েই তৈরি, একদিন তার সমারোহ, পরদিন তা বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন দেবার যোগ্য। কিন্তু সেই আমার বন্ধুর নির্ম্মল হাস্যে এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় সেদিনকার সভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাঁর প্রীতিস্নিগ্ধ বাণীর মধ্যে আমার পক্ষে এই আশ্বাস ছিল যে, এই প্রীতি বর্ত্তমানের সমস্ত বিরোধ-বিদ্বেষ, সমস্ত কলহ-কলুষের উপরকার জিনিষ, এই প্রীতি সেই ভবিষ্যতের যা বাহির থেকে নিকটের মানুষকে দূরে নিয়ে গিয়ে অন্তরের দিকে তাকে নিকটতর সত্যতর করে। আজ তিনি স্বয়ং শাশ্বতলোকে গমন করেচেন, সেখান হ'তে তাঁর প্রসন্ন হাস্যের অভিনন্দন আমি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করি।

দশ বৎসর হ'য়ে গেল। এখন আমি ষাট উত্তীর্ণ হয়েচি। সাহিত্য-পরিষদে আজ আপনাদের এই অভিভাষণ কিসের উপলক্ষ্যে ? আজ এখানে কেবল স্বাদেশিক আত্মীয়সভার মঙ্গলাচরণ নয়। ভৌগোলিক ভাগ-বিভাগের দ্বারা মানুষের যে আত্মীয়তা খণ্ডিত, আজ সেই আত্মীয়তার চতুঃসীমানার মধ্যে এই সভার অধিবেশন বসেনি। যে আত্মীয়তায় আত্মপরের বিচ্ছেদ, দূর-নিকটের ভেদ-ব্যবধান দূর হয়ে যায়, আজ সেই আত্মীয়তার মাল্য আপনারা আহরণ করেচেন—এই কথাই আমি মনে অনুভব করতে চাই।

আপনারা হয়ত মনে ভাবেন যে, দেশের সাহিত্যকে আমি বিদেশে যশস্বী করে এসেচি, দেশের লোকের কাছে আজ সেই দাবীতেই আমার বিশেষ সম্মান। কিন্তু এই যশকে আপনারা খুব বেশি বড় করে দেখবেন না। আমি নিজে, সকলের চেয়ে যেটিকে আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি, সে এই সাহিত্যের যশ নয়। য়ুরোপে আমার কাছে যারা হৃদয়ের অনুরাগ অকৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ব্যক্ত করেচে তাদের অনেকেই সাহিত্যরস-ব্যবসায়ীদলের কেউ নয়। তারা কেবলমাত্র সাহিত্যের বাজার যাচাই করে আমাকে যশের মূল্য চুকিয়ে দেয়নি, তারা আমাকে প্রীতি দিয়েচে যা সকল মূল্যের বেশি। অর্থাৎ তারা ওস্তাদ বলে আমাকে শিরোপা দিয়ে বিদায় করেনি ; তারা আমাকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করেচে। সেই আত্মীয়তা নিয়ে আত্মশ্লাঘা করা চলে না, তাকে নিয়ে নম্র মনে আনন্দ করাই যায়।

দ্বিজত্ব লাভ করবার একটি তত্ত্ব আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তাতে এই কথা বলে, যে, মানুষের প্রথম জন্ম নিজের অহঙ্কারের ক্ষেত্রে। সেই "আমি"র ক্ষুদ্র সীমার আবরণ ও বন্ধন ভেদ করে মানুষ যখন অধ্যাত্মক্ষেত্রে অসীমের মধ্যে জন্মলাভ করে, তখনই হয় তার দ্বিতীয় জন্ম। যেমন অধ্যাত্মক্ষেত্রে তেমনি সংসারের মধ্যেও মানুষের দুটি জন্ম। একটি হচ্চে নিজের দেশের মধ্যে, আরেকটি সকল দেশে। এই দুটি জন্মের সামঞ্জস্যেই মানুষের সার্থকতা। নিজের হৃদয়ে দেশের সঙ্গে বিশ্বের মিলন সাধন করাতে পারলে তবেই হৃদয়ের মুক্তি।

পঞ্চাশোর্দ্ধে, সংহিতাকার যখন বনব্রজনের ব্যবস্থা করেচেন, সেই সময়ে আমি পশ্চিম মহাদেশে গিয়ে পৌঁছলেম। দেখলেম সেখানে আমার বাসস্থান আছে। দেখলেম সংসারে এই আমার দ্বিতীয় জন্মের মাতৃক্রোড় পূর্ব্ব হতেই প্রসারিত। আপন দেশ থেকে দূরে, যেখানে জন্মগত কোনো দাবী নেই, কর্ম্মগত কোনো দায় নেই, সেইখানে যখন প্রেমের অভ্যর্থনা পাওয়া যায়, তখনি আমরা বিশ্বজননীর সুধাস্পর্শ পেয়ে থাকি। আমার ভাগ্যক্রমে সেই স্পর্শের আশীর্ব্বাদ লাভ করেচি এবং মাতৃভূমিতে বহন করে এনেচি বলেই, আমার রচনার পরে বিশ্ববাণীর প্রসন্নতা লাভ করেচি বলেই, আজ আপনারা আমাকে নিয়ে বিশেষভাবে আনন্দ করচেন।

ভেবে দেখবেন, এই আনন্দের মধ্যে একটি মুক্তির উৎসাহ আছে। দেশ যখন আপনটুকুকে নিয়েই আপনি নিবিষ্ট, তখন সে বিশ্বের অগোচরে থাকে। এই বিশ্বের অগোচরতা একটি মস্ত কারাপ্রাচীর। সঙ্কীর্ণ বাসের অভ্যাসে একথা আমরা অনেক সময়ে ভুলেই থাকি। হঠাৎ যখন একটা বন্ধ দরজা কোনো একটা হাওয়ায় খুলে যায় তখন মন খুশি হয়ে ওঠে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁর যে আবিষ্কার নিয়ে প্রথম বিশ্বসভার আহ্বান পেলেন, তাঁর সে আবিষ্কার যে কি তা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই এখনো স্পষ্ট করে বোঝেনি—কিন্তু দেশের মন হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল। তার কারণ এই যে, একদিকের দরজা খুলে গেল। সহসা অনুভব করলেম যে, আমরা বিশ্বের মানুষ, কেবলমাত্র দেশের মানুষ নই ; আমাদের প্রাণের সঙ্গে বিশ্বের হাওয়ার, মনের সঙ্গে বিশ্বের আলোর সুগভীর যোগ আছে। স্বাদেশিক প্রাচীরের বন্ধ জানালা খোলবামাত্র হঠাৎ সামনে দেখতে পাই সর্ব্বজন-বিধাতার রূপটি। এই রূপটি দেখবার জন্যেই আমাদের মানব-জন্ম।

সাহিত্যের কলা-কৌশল বিচার করে আমার লেখার কি মূল্য, সে কথা দূরে রেখে আজ আমাকে এই গৌরবটুকু ভোগ করতে দিন যে, আমার গানে বা অন্য রচনায় সর্ব্বজন-দেবতার রূপ হয়ত কিছু প্রকাশিত হয়েছে, সেইজন্যেই অন্য দেশের লোকে আমাকে আপন বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। এই নিখিল দেবের সাধন-মন্ত্র ভারতের কবির কানে পৌঁচেছিল কোথা থেকে ? ভারতবর্ষেরই তপস্বীদের কাছ থেকে। তাঁরাই একদিন বলেছিলেন, "এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মামহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"। যিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বজনের হৃদয়বাসী, সেই দেবতাই মহাত্মা ; এবং তিনি বিশ্বকর্ম্মা অর্থাৎ তাঁর সকল কর্ম্মই বিশ্বের কর্ম্ম, ক্ষুদ্র কর্ম্ম নয়।

আজ আপনাদের যে আতিথ্য লাভ করচি, এ আমি একলা নিতে পারব না। কেন না, একলা আমি কোনো আতিথ্য—কোনো সমাদরের যোগ্য নই। আমার রচনায় আমি মহামানবের বাহন, এই বলে যদি আমাকে সমাদর করেন, তবে তাঁর আতিথ্যের জন্য প্রস্তুত থাকুন। তাঁকে ফেরাবেন না ; বলবেন না, আজ আমাদের দুঃসময়, আজ আমাদের দরজা বন্ধ। যখন পশ্চিমে ছিলেম তখন গৌরব করে সকলকে বলেচি, আমি আমার মাতৃভূমির নিমন্ত্রণপত্রের ভার নিয়ে এসেচি। বলেচি, যেখানে মাতার অমৃত অন্নের পরিবেশন হয় সেইখানে এস। এসেছিলে একদিন আমাদের কয়লার খনিতে ; আমাদের পণ্যের হাটে। যা সংগ্রহ ক'রে নিয়ে গেছ তাই নিয়ে তোমাদের পাড়ায় পাড়ায় ঈর্ষার আগুন জ্বলচে। পরস্পরের প্রতি

সন্দেহে তোমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র কাঁটাবনের জঙ্গল হয়ে উঠেছে। আজ এস সেই ভাণ্ডারে, যেখানে অন্ন ভাগ করলে তার ক্ষয় হয় না।

য়ুরোপে শুনে এলেম কত জ্ঞানী গুণী সাধক বলচে তাদের আত্মা ক্ষুধিত। তারা খুঁজছে শোকের সান্ত্বনা, ক্ষতবেদনার শুশ্রূষা। এই সন্ধানে যদি তারা পূর্ব্ব মহাদেশে যাত্রা করে, তবে যেন দেখতে পায় আমাদের দ্বার খোলা আছে। আমরা যেন না বলি, "আমরা নিজের ভাবনায় মরচি, পর আমাদের কাছে আজ অত্যন্ত পর, হৃদয় আমাদের বিমুখ।" এতদিন আমরা পরের দিকে তাকিয়ে ছিলেম ভিক্ষা করবার জন্যে, তাতে লজ্জার পর লজ্জা পেয়েচি, অভাব পূরণ হয়নি। আজ যদি ধিক্কারের সঙ্গে বলতে পারি পরের কাছে ভিক্ষা কর্‌ব না, সে ত ভাল কথা। কিন্তু সেই ক্ষোভে যদি বলি, পরের আতিথ্য করব না, তবে আরো বেশি লজ্জা। ভিক্ষার যে দীনতা, অতিথির প্রত্যাখ্যানে দীনতা তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। ভিক্ষায় যে আত্মাবমাননার অপরাধ, তারও অভিশাপ আছে, আর অতিথির প্রত্যাখ্যানে যে বিশ্বাবমাননা, তারও অভিশাপ কঠিন। আমাদের পিতৃঋণ শোধ হবে কি করে? পিতৃগণের কাছ থেকে আমরা যে উত্তরাধিকার পেয়েচি সে কি কেবল আমাদের নিজেরই জন্য? সে কি আমাদের ন্যস্ত ধন নয়? আমরা যদি বিশ্বের কাছে তার পূর্ণ ব্যবহার না করি তবে তাতে করে আমাদের পিতামহদের অগৌরব।

শকুন্তলা ছিলেন তপোবনের কন্যা। সেই তপোবনের কুটীর-দ্বারে বসে তিনি আপনজনের কথাই ভাবছিলেন, বিশ্বজনের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। ভোলবার কারণ ছিল, কেননা কঠিন দুঃখে তাঁর মন ছিল অভিভূত। এমন সময় অতিথি এল তাঁর দ্বারে, বললে "অয়মহং ভোঃ"। সে ডাক কানে পৌঁছল না। তখন তাঁকে বাইরের শাপ লাগল, অসম্মানিত অতিথির শাপ। সে শাপ এই যে, যে আপনজনের ভাবনায় তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে, সেই আপন জনকেই হারাবে। বিশ্ব যদি আজ আমাদের দ্বারে এসে বলে "অয়মহং ভোঃ", তবে কি আমরা বলতে পারি যে, "আজ নিজের ভাবনা কঠিন হয়ে উঠেছে, অন্যমনস্ক আছি।" এ জবাব খাটবে না। নিজের দুঃখধন্দার তাড়ায় বিশ্বকে যে ফিরিয়েচে, বিশ্বের শাপ তাকে লাগবেই—তার আপনটুকু কেবলি ক্ষীণ হবে, আচ্ছন্ন হবে, নষ্ট হবে। যে-সব জাত বিশ্বের অগোচরে নিজের মধ্যে বদ্ধ তারা নিজেকে হারিয়ে বসে আছে, অথচ এত বড় ক্ষতি অনুভব করবার শক্তি পর্য্যন্ত তার লুপ্ত হয়েচে।

যখন সাহিত্য রচনায় আমি নিবিষ্ট ছিলেম, তখন বাইরের কোনো সহায় আমার দরকার ছিল না। কবির আসন নির্জ্জনে। সেখানে অনাদরে ক্ষতি করে না, বরঞ্চ জনাদর অনেক সময় মত্ত হস্তীর মত সরস্বতীর পদ্মবনের পঙ্ক উন্মথিত করে তোলে। কিন্তু যজ্ঞ ত একলা হয় না। তাতে সর্ব্বলোকের শ্রদ্ধা ও সহায়তা চাই। ঘরে যখন উৎসব তখন বিশ্ব হন অতিথি। এইজন্যে পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই এই কাজকে আপনার কাজ বলেই গ্রহণ করেন। কর্ম্মকর্ত্তা দরিদ্র হলেও সেদিন দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে সকলকে ডেকে ডেকে বলেন, "এস এস।" কিসের জোরে বলেন? সকলের জোরে। দেশের হয়ে আমিও আজ একটি যজ্ঞের ভার নিয়েচি। সত্যের সাধনায় আমাদের সঙ্গে একাসনে বসবার জন্যে। সেইজন্যেই আজ আপনাদের কাছ থেকে আমি যে অভ্যর্থনা পাচ্চি, এঁকে আমি কবির অভ্যর্থনা বলে একলা গ্রহণ করতে পারব না। এই অভ্যর্থনাকে ভারতের নবযুগে অতিথি-সমাগমের প্রথম মঙ্গলাচরণরূপে আমি সকল আগন্তুকের হয়ে গ্রহণ করচি—আপনাদের সকলের সহযোগে মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে বিশ্বচিত্তের একটি মিলনাসন প্রতিষ্ঠিত হোক্‌।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পঠিত
ভারতী ১৩২৮ কার্ত্তিক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘরকে বাঁচাতে হলে

বর্ত্তমান হিন্দুকোড বিলের বিবাহ-বিচ্ছেদ-মূলক আইনটি পাশ হওয়ার সময় আমাদের জাতিমানসে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন ঘটেছিল। প্রাচীনপন্থীদের সমবেত বিরুদ্ধতা সত্বেও বিবাহ-বিচ্ছেদ-মূলক বিলটি পাশ হয়ে যায় এবং আজকের দিনে হিন্দু দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদের দাবীতে বহু মামলা রুজু করার দৃষ্টান্তও বিরল নয়, এবং আমাদের অনভিজ্ঞ মনও ক্রমেই এটাকে সহজ ভাবেই গ্রহণ করতে শিখছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্যের আমদানী এই প্রথাটি সম্বন্ধে এর নিজের জন্মভূমিই আজ যথেষ্ট সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছে।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে, বিশেষতঃ গ্রেট-ব্রিটেনের বাৎসরিক সাল-তামামি থেকে জানা যায় যে, বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা সেখানে উল্লেখযোগ্য ভাবেই হ্রাস পেয়েছে। ব্রিটেনের সংসারগুলির ভাঙ্গন রোধ করার জন্য যেসব সংঘবদ্ধ প্রয়াস লক্ষিত হয়, তার মধ্যে "ম্যারেজ গাইডেন্স কাউন্সিল" নামে প্রতিষ্ঠানটির কৃতিত্ব সর্ব্বাধিক বললে বিশেষ অত্যুক্তি হয়না। প্রায় বিশ বৎসর আগে এই সংস্থাটির জন্ম হয়। সাতশো সদস্য এই সংস্থাটিতে আছেন, এঁদের কাজ হল আবেদন অনুসারে ভেঙ্গে পড়া সংসারগুলিকে বাঁচানোর জন্য পথ দেখিয়ে দেওয়া। মিসেস এলিজাবেথ রস্ এই সংস্থারই অন্যতমা সদস্যা।

শান্তশ্রীমণ্ডিতা স্নিগ্ধহৃদয়া এই মহিলাটি প্রথম দর্শনেই ক্লিষ্ট ব্যথিত মানব হৃদয়ে গভীর ছাপ এঁকে দেন।

প্রতিদিন বহু বিচলিত মানুষ তাঁর কাছে আসে নিজস্ব নালিশ নিয়ে, সবই অবশ্য তাদের দাম্পত্য জীবন সংক্রান্ত। শ্রীমতী রস্ প্রধানতঃ মেয়েদেরই উপদেষ্টা, তিনি বলেন যে, এই সব বিপর্য্যস্ত জীবনগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রথম তিনি যে ভূমিকা নেন, তা ধৈর্য্যশীল শ্রোতার, তারপর সাবধানে চেষ্টা করেন সংশ্লিষ্ট মানুষটির স্বাভাবিক স্থৈর্য্য ফিরিয়ে আনতে—যাতে সমস্ত ব্যাপারটাকে মুক্তদৃষ্টিতে দেখার ক্ষমতা তার হয়, এবং এইভাবেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি সমর্থ হয়েছেন অসংখ্য সংসারকে নিশ্চিত ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করতে। আমাদের দেশে আজ বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা চালু হয়েছে। হিন্দু ধর্ম্মের সুদৃঢ় দাম্পত্যের ভিত্তি আজ শিথিল প্রায়। মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে এদেশেও শ্রীমতী রসের মত সমাজসেবিকার প্রয়োজন হবে ভাঙ্গন-ধরা অসংখ্য ঘরকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

ঘর ভাঙ্গার তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে পশ্চিম আজ যা শিখেছে, প্রাচ্যও অদূর ভবিষ্যতেই তার রসাস্বাদন করবে।

শ্রীমতী বিভা মিত্র

(সুপ্রসিদ্ধ সমাজ-সেবিকা ও নিরলস কর্ম্মসাধিকা)

বিশিষ্ট সমাজ-সেবিকা হিসেবে আজ যে কয়জন বঙ্গনারী বাংলাদেশে ও বাংলার বাহিরে নিজেদের স্থায়ী মর্য্যাদার আসন করে নিয়েছেন, শ্রীমতী বিভা মিত্র তাঁদেরই একজন। আদর্শ সমাজ-সেবিকা হ'তে গেলে যে ধৈর্য্য, ত্যাগ, সহনশীলতা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন, তার কোনটিরই অভাব ঘটেনি শ্রীমতী মিত্রের চরিত্রে। যে কোন অস্বাভাবিক বা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে হাসিমুখে কাজ করে যাবার স্পর্দ্ধা রাখেন শ্রীমতী মিত্র। নিজের বলিষ্ঠ আদর্শ সামনে রেখে—অকুতোভয়ে এগিয়ে যাবার সাহস আছে তাঁর, তাই আজ বহু সংগ্রামে তিনি বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন।

এই নির্ভীক, আদর্শনিষ্ঠা সমাজসেবিকা বিখ্যাত বিপ্লবী ও খ্যাতিমান চিকিৎসক শ্রীশৈলেন্দ্র প্রসাদ মিত্রের স্ত্রী ও মেদিনীপুরের বিপ্লবী শ্রীবিনোদ বিহারী দত্তের কন্যা। শ্রীমতী মিত্রের জন্ম ১৯১৪ সালে মেদিনীপুর সহরে। তাঁর মাতামহ স্বর্গত অতুলচন্দ্র বসু ১৯০৮ সালে পরলোকগত রাজা নরেন্দ্র লাল খাঁ, উপেন্দ্র নাথ মাইতি প্রমুখের সঙ্গে মেদিনীপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হন। তাঁর পিতা বিনোদবাবু শ্রীঅরবিন্দ, বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমারের মাতুল প্রসিদ্ধ বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সহকর্মী ছিলেন। আত্মত্যাগ ও মৃত্যু বরণের মহিমায় উজ্জ্বল মেদিনীপুর, দেশ সাধনায় ঐতিহ্যমণ্ডিত দত্ত পরিবারে শ্রীমতী বিভা ছেলেবেলা থেকেই সেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন।

শ্রীমতী বিভা মিত্র

ছাত্র জীবনেই তিনি মহাত্মাজীর প্রবর্ত্তিত অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন। কলেজ ইউনিয়নের তিনি ছিলেন সম্পাদিকা। ১৯৩২ সালে কোলকাতার এক বিপ্লবী শৈলেন্দ্র প্রসাদ মিত্রের সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, এবং তারপর থেকেই বিপ্লবীদের অন্যতম সহায়করূপে কাজ করেন।

১৯৩৫ সালে জাতীয় সংগ্রাম কিছুটা স্তিমিত হ'লে তিনি কংগ্রেসের জনসংযোগ ও সংগঠন কাজে মনোনিবেশ করেন। শ্রীমতী মিত্র সেই সময় সমাজ সেবা ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি শ্যামনগর আঁতপুর গ্রামে কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মহিলা-উপসমিতির সদস্যা নিযুক্ত হন, এখনও পর্যান্ত সেই সমিতির কাজে ব্রতী আছেন। তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেসের বস্ত্র-উপসমিতিরও সভ্যা। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শ্রীমতী মিত্র একজন বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নানা সাপ্লের ধাউলের ব্যবস্থাপনায় তিনি দুর্ভিক্ষের সময় যেভাবে সাহায্য ও ত্রাণকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তা ভোলবার নয়। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় তিনি সাহায্য ও উদ্ধারের কাজে ব্রতী হন নোয়াখালী পরিক্রমার সময় মহাত্মা গান্ধী তাঁর ক্যাম্পে অবস্থান করেন।

সমাজ সেবিকা, দক্ষিণ কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটি, লোক সেবক সমাজ ও সরোজ নলিনী দত্ত মেমোরিয়াল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদিকা, পশ্চিমবঙ্গ শিশুকল্যাণ পরিষদের প্রাক্তন সংগঠন সম্পাদিকা শ্রীমতী মিত্র এখন জেলা কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেস সমবায় ও কুটীরশিল্প উপসমিতির সম্পাদিকা। তিনি ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটিরও সদস্যা। তিনি কোলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার সহযোগী সদস্যা ও স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির কর্মী। তিনি দিল্লীতে পুনর্বাসন অর্থকমিটির সদস্যা ছিলেন। ৬৪ নং মণ্ডল কংগ্রেসের তিনি সৌর্বজনের সভানেত্রী ও দক্ষিণ কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির তিনি ছিলেন সম্পাদিকা। বর্ত্তমানে ঐ সংস্থার সভানেত্রী। তিনি নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটিরও সদস্যা। এগুলি ছাড়াও তিনি আরও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন।

এবারের সাধারণ নির্বাচনে তিনি কালীঘাট কেন্দ্র থেকে কমিউনিষ্ট প্রার্থী শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেনকে পরাজিত ক'রে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্যা নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর এই নূতন সম্মানের পিছনে রয়েছে তাঁর আদর্শ ও ন্যায়নিষ্ঠার বিপুল জনপ্রিয়তা, দেশগঠনমূলক কাজের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

শ্রীমতী আভা মাইতি

(পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত মন্ত্রী ও নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা)

অল্প বয়সের মধ্যে সর্বভারতীয় সম্মানলাভ যে কয়জন বাঙ্গালী মেয়ের ভাগ্যে সম্ভব হয়েছে, মেদিনীপুরের আভা মাইতি তাঁদের একজন। মাত্র ৩১ বছর তাঁর বয়স, এই বয়সের মধ্যে যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ সংগঠনী ক্ষমতার সোপান বেয়ে উপরতলার নেতৃত্বের মহলে এসে তিনি আজ দাঁড়িয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে নারী-সমাজের গর্বের বস্তু।

১৯২৩ সালে মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থানার অন্তর্গত কলাগাছিয়া গ্রামে এক মধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবারে শ্রীমতী মাইতির জন্ম। মেদিনীপুরের প্রবীণ কংগ্রেসনেতা শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি শ্রীমতী আভার পিতা। ছাত্রী অবস্থাতেই পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। রাজনীতির মধ্যে থেকেও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ ও বি-এল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি উত্তীর্ণ হন। কলেজ-জীবনে লেখাপড়া করা ছাড়াও আর একটি আদর্শকে পাশাপাশি রেখে তিনি নিজের জীবনকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। সেই আদর্শটি হ'ল কংগ্রেস সংগঠন ও কংগ্রেসের আদর্শের ব্যাপক প্রচার। কংগ্রেসের প্রচারের জন্য ছাত্রী-জীবনেই তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, বিশেষ করে পিছিয়ে-পড়া মেয়েদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে তাঁর উদ্যোগ ছিল সবচেয়ে বেশী। তাঁর অপূর্ব কর্মদক্ষতা, সরল নম্র ব্যবহার—কি পুরুষ কি নারী সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। অচিরেই তিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের মহিলা উপ-সমিতির সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সালে শ্রীমতী মাইতি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্যা নির্বাচিত হন। ৫ বৎসর যাবৎ বিধানসভার সদস্য থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ওপর জোরালো ও তীক্ষ্ণ যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করে ভাষণের পর ভাষণ দিয়ে অসামান্য বাগ্মিতার পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৫৫ সালে শ্রীমতী মাইতি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা নির্বাচিত হন এবং ঐ বৎসরই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিরও সদস্যা নির্বাচিত হন। কিছুকাল তিনি মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা হিসাবেও কাজ করেন। ১৯৫৯ সালে শ্রীমতী মাইতি মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালে তিনি নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হয়ে মহিলা সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করেন, এখনও তিনি ঐ পদেই আসীন আছেন। তিনি রাজ্যসভার সদস্যা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

নারী-কল্যাণ ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে শ্রীমতী মাইতির অক্লান্ত ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ভোলবার নয়। তিনি অসংখ্য নারী-কল্যাণ ও স্ত্রীশিক্ষায়তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাছাড়া বহু স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট। তিনি কিছুকাল কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট্ট্রাষ্ট ও অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর গ্রামীণ উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্যা ছিলেন।

এ বৎসর সাধারণ নির্বাচনে তিনি মেদিনীপুরের ভগবানপুর কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটাধিক্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় নির্বাচিত হয়ে তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কাজের কদর বোঝেন। তাই তি তাঁর নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় কাজের মেয়ে শ্রীমতী মাইতি পূর্ণ মন্ত্রিত্বের মর্যাদা দিতে দ্বিধা বোধ করেননি। শ্রীমতী মাইতি উ সাহায্য, পুনর্বাসন ও ত্রাণ দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তিনি আশা রাখেন সকলের সহযোগিতা পেলে তিনি তাঁর কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে নিশ্চয়ই পালন করতে পারবেন।

শ্রীমতী আভা মাইতি

শ্রীমতী ইলা মিত্র

(বিপ্লবী বীরাঙ্গনা ও বিধানসভার সদস্যা)

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, বীর-প্রসবিনী বঙ্গভূমি। যুগে যুগে বাংলাদেশের মাটিতে জন্মলাভ করেছেন যেমন অ বীরপুরুষ, তেমনি এসেছেন বীরাঙ্গনার দল আশ্চর্য সংগঠনের প্রতিভ অদম্য মনের জোর আর দুঃসাহসিকতা জীবন নিয়ে এই বাংল মাটিকে ধন্য করতে। বাংলার মাটিতে যেখানেই অত্যাচারের আ জ্বলে উঠেছিল, সেখানেই শুধু পুরুষরা নয়—সংসার-সমাজের দুঃ বন্ধন ছিন্ন করে নারীরাও দুর্জয় সাহস নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড় সেদিন দ্বিধা করেনি।

ইলা সেন—বর্তমানে ইলা মিত্র—বিংশশতাব্দীর এই রকমই এ দেশপ্রেমিক বীরাঙ্গনা। মাত্র ৩৬ বছর তাঁর বয়স, এই অল্প বয়সে মধ্যে তাঁর জীবনের পাতায় এমন কতকগুলি বিচিত্র অধ্যায় সংযোজি হয়েছে যা শুনলে যে কোন মানুষের ধমনীতে রোমাঞ্চের সঞ্চার হবে পাকিস্থান সরকারের বেয়নেট, বেটন ও বন্দুকের গুলিও আদর্শে কাছে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে—যমের সঙ্গে লড়াই করেও তি ফিরে এসেছেন সদর্পে। তাই ইলা মিত্র আজ বাংলা ও বাঙ্গালী কৃতজ্ঞতার পাত্র।

১৯২৬ সালে ইলা মিত্র এই কোলকাতাতে জন্ম লাভ করেছেন, কোলকাতাতেই বড় হয়েছেন, খেলাধূলা ও শিক্ষালাভ করেছেন এই কোলকাতাতেই। ১৯৪০ সালে বেথুন স্কুল থেকে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; ১৯৪২ সালে বেথুন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৯৪৪ সালে উইমেন্স্ কলেজ থেকে বাংলার অনার্সের সঙ্গে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তখনকার মতো তাঁর কলেজে পড়া শেষ করেন।

ইলা মিত্রের বাবা নগেন্দ্র নাথ সেন প্রথমে এ, জি, বেঙ্গলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন, পরে ডেপুটি একাউণ্টেণ্ট হন; এখন অবসর-জীবন যাপন করছেন। তিন বোন ও তিন ভাইয়ের মধ্যে ইলা সেন সবার বড়। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত মেয়েদের খেলাধূলায় ইলা সেন যে অভূতপূর্ব সম্মান পেয়েছেন, তা আর কারুর ভাগ্যে জুটেছে কিনা সন্দেহ। শুধু এ্যাথলেটিক স্পোর্টসেই নয়, বাস্কেট বল, ব্যাডমিন্টন ও টেনিকোয়েটে তাঁর সমান দখল ছিল। স্পোর্টসে তিনি যে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন, তা বাঙ্গালীর গর্ব্বের বস্তু। আন্তঃস্কুল স্পোর্টস, উইমেনস এ্যাথলেটিক স্পোর্টস, জাতীয় যুব সঙ্ঘ স্পোর্টস, বেঙ্গল এ্যাথলেটিক স্পোর্টস, সিটি এথেলেটিক স্পোর্টস, মোহনবাগান স্পোর্টস, আনন্দ-মেলা, শক্তি-সঙ্ঘ স্পোর্টস, ক্রাউন স্পোর্টস, ক্যালকাটা এথেলেটিক চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রভৃতি সব স্পোর্টসেই হয় তিনি প্রথম না হয় দ্বিতীয় স্থান দখল করেছেন। প্রায় সব জায়গাতেই মেয়েদের বিভাগে তিনি চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছেন। শুধু তাই নয়, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের দৌড়ের রেকর্ডও তিনি ভেঙ্গে দিয়েছেন। ১৯৪০ সালে প্রথম বাঙ্গালী মেয়ে হিসেবে তিনি ভারতীয় অলিম্পিকে প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন। ১৯৪০ ও ৪১ সালে তিনি আন্তঃকলেজ ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেন। ঐ দু'বছর তিনি টেনিকোয়েটেও চ্যাম্পিয়ান হন।

শ্রীমতী ইলা মিত্র

১৯৪৪ সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হন এবং ঐ বছরই মালদহের দেশকর্ম্মী রমেন্দ্র নাথ মিত্রের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৪৬ সালে কোলকাতার দাঙ্গার পরে নোয়াখালিতে দাঙ্গা সুরু হয়। শান্তি ফিরিয়ে আনা ও সেবা করার উদ্দেশ্যে পার্টির পক্ষ থেকে যারা সেদিন নোয়াখালি গিয়েছিলেন, তিনিও তাঁদের অন্যতম। নোয়াখালি থেকে ফিরে এসে ইলা মিত্র মালদহে তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে চলে যান। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে তাঁর শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম রামচন্দ্রপুর সমেত মালদহের নবাবগঞ্জ সাবডিভিসন রাজসাহীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৬ সাল থেকেই ইলা মিত্র এ অঞ্চলে কৃষক ও নারী সংগঠনের কাজ সুরু করেছিলেন। দেশ বিভাগের ফলে তিনি হয়ে পড়েন পাকিস্থানের বধূ। তা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু তাঁর আদর্শ ও সংগঠনের কাজ ত্যাগ করেন নি। ভাগচাষী, ক্ষেত-মজুর আর মেয়েদের নিয়ে তিনি শক্তিশালী সংগঠন তৈরী করতে লাগলেন। কালক্রমে ইলা মিত্রের নেতৃত্বে পাকিস্থানের ঐ অংশে সুরু হল তেভাগা আন্দোলন। সশস্ত্র পুলিস বাহিনী এলো আন্দোলন দমন করতে; কৃষকরা রুখে দাঁড়ালো। ইলা মিত্রের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হ'ল। ইলা মিত্রকে ধরবার জন্যে পুলিশ ও সৈন্য-বাহিনী বিরাট এলাকা ঘিরে ফেললো। কিন্তু শত চেষ্টাতেও তিন বছর ইলা মিত্রকে ধরা গেল না। পুলিশের জাল এড়িয়ে তিনি ঘোরাফেরা করেছেন, কখনও সাঁতার কেটে নদী পার হয়েছেন, কখনও দু'তিন মাইল দৌড়ে কূয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করেছেন। পুরুষের পোষাক পরে বিশ-ত্রিশ মাইল পর্য্যন্ত রাস্তায় তিনি এক একদিন হেঁটেছেন। পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে সন্তান-সম্ভবা ইলা মিত্র সীমান্ত পেরিয়ে কোলকাতাতে চলে এসেছেন। এই কোলকাতাতেই ১৯৪৮ সালের মার্চ্চ মাসে তাঁর একমাত্র সন্তান রণেন ভূমিষ্ঠ হয়। শরীর কিছুটা ভাল হ'তেই তিনি পুত্রকে শাশুড়ীর জিম্মায় রেখে আবার পাকিস্থানে তাঁর কৃষক আন্দোলনের সংগ্রাম-শিবিরে ফিরে যান। তারপর আবার সংগ্রাম সুরু হল। এবার পাকিস্থানী পুলিশ ও সৈন্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে গুলী করতে করতে রাজসাহীর নাচোলের মাঠে এগিয়ে এলো। কৃষকদের গরু, মোষ, ধান লুট হল, গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছারখার হল, স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে কত যে কৃষক প্রাণ হারালো, কত যে গ্রেপ্তার হলো তার কোন হিসেব নেই। বিরাট এলাকাজুড়ে পুলিশ সৈন্যরা যে ব্যূহ রচনা করেছিল, তা ভেদ করে ইলা মিত্র ও তাঁর সহকর্ম্মীরা এবারে আর বেরুতে পারলেন না। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ধরা পড়লেন। তারপর নাচোল থানায় সুরু হল ইলা মিত্রের উপর অমানুষিক অত্যাচার। নারীর মান সম্ভ্রমের প্রতিও সামান্য মর্য্যাদা সেদিন পাকিস্থান সরকার দেন নি। কি অকথ্য পাশবিক নির্য্যাতন—তার বর্ণনা শুনলে শরীর শিউরে ওঠে। তাঁকে যখন রাজসাহী জেলে নিয়ে যাওয়া হল, তখন তিনি প্রায় অর্দ্ধমৃত। তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় এক বছর আদালতে কোন মোকদ্দমাই সুরু করা যায় নি। এই এক বছর তিনি জেলে মৃত্যুর সঙ্গে সমানে লড়াই করেছেন। তারপর আদালতে যখন মামলা উঠলো—কোন আইনজীবী ভয়ে তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে আদালতে এলেন না।

পুলিশের অত্যাচারে হাড়গোড় ভাঙা শরীর নিয়ে ষ্ট্রেচারে করে আদালতে এলেন ইলা মিত্র নিজের পক্ষ সমর্থন করতে। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন দীপান্তরের আদেশ হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে তিনি ঢাকা হাইকোর্টে আপীল করেন। আপীলে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে থাকাকালীন তাঁর মরণাপন্ন অবস্থা হয়, তাই তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি চিকিৎসার জন্যে কোলকাতায় চলে আসেন। বি-এ পাশ করাব ১৪ বছর পর ১৯৫৮ সালে তিনি কোলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে এম-এ পাশ করেন। তারপর সিটি কলেজ সাউথের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। বর্ত্তমানেও তিনি ঐ কলেজেরই অধ্যাপিকা।

এ-বছর সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি কমুনিষ্ট প্রার্থী হিসাবে মাণিকতলা কেন্দ্র থেকে পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায় নির্ব্বাচিত হয়েছেন। এদিকে বাদুড় বাগান ষ্ট্রীটের বাড়ীতে সেদিনকার বিপ্লবী নারী ইলা মিত্র তাঁর স্বামী পুত্র নিয়ে সুখের সংসারও আবার রচনা করেছেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, সেতার, আবৃত্তি, অভিনয়ে আগেও তাঁর দক্ষতা ছিল, এখনও তাই আছে।

শ্রীমতী শান্তিসুধা ঘোষ

(মধ্যপ্রদেশে সুপরিচিতা সমাজসেবিকা)

বহির্বঙ্গে কেবল বঙ্গ-তনয় নয়, বঙ্গ-দুহিতাদের মধ্যেও কেহ কেহ কর্ম্মগুণে নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিতা করিয়া জন-মানসে স্থায়ী চিহ্ন রাখিতে পারিয়াছেন, তাহা মধ্যপ্রদেশের বিশিষ্টা সমাজসেবিকা শ্রীমতী শান্তিসুধা ঘোষের নামোল্লেখে প্রতীয়মান হয়।

অষ্ট ভ্রাতাভগিনীর মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ শান্তিসুধা ১৯১০ সালের মে মাসে আলোয়ার দেশীয় রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ কলিকাতা হাতিবাগান হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া এলাহাবাদ শহরে বসবাস সুরু করেন। পিতা ৺ব্রজেন্দ্রলাল দে ইউ, পির সরকারী দপ্তর হইতে আলোয়ার ষ্টেটে ১৯০৬ সালে "সাময়িক" কর্ম্মব্যপদেশে যাইয়া দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত হন। মাতা ছিলেন পরলোকগতা কুসুমকুমারী দেবী।

শান্তিসুধা এলাহাবাদে পড়াশুনা আরম্ভ করেন ও স্থানীয় ক্রশওয়েট গার্ল'স স্কুলে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়েন। ১৯২৬ সালে মধ্যপ্রদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষের সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের কন্যা ও বধূ হিসাবে তিনি সেবাব্রতের প্রেরণা পান। এইরূপ মনোভাবের পরিচয় পাইয়া শ্রী ঘোষ তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে সমাজসেবার কার্য্যে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করিতে থাকেন। নিজ সংসারের কর্ম্মসমাধার পর শ্রীমতী ঘোষ নিয়মিতভাবে ক্ষুদ্র পরিসরে জনসেবার কার্য্যে লিপ্ত হন। ১৯২৭ সালে স্থাপিত জব্বলপুর নারীমঙ্গল সমিতি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া ১৯৩৫ সালে উহার সম্পাদিকা নির্ব্বাচিত করেন। ১৯৪৭ সাল হইতে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদিকা পদে রহিয়াছেন। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে শ্রীমতী ঘোষ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিণীদের শিক্ষাদান, সঙ্গীত

শ্রীমতী শান্তিসুধা ঘোষ

বিদ্যালয়, সীবনশিক্ষা ও অন্যান্য জনহিতকর বিভাগগুলি সুপরিচালনা করিতেছেন। জব্বলপুরনিবাসী সকল প্রদেশীয় মহিলারা ইহার সভ্যা। শ্রীমতী ঘোষ অন্যান্যদের সহযোগিতায় ইহার নিজস্ব গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে সক্ষম হইয়াছেন।

শ্রীমতী ঘোষের সংগঠন-দক্ষতায় আকৃষ্ট হইয়া প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রী ভাট তাঁহাকে কংগ্রেস-মহিলা-সমিতির সম্পূর্ণ ভারার্পণ করেন। প্রায় পনের বৎসর যাবৎ তিনি ইহাকে সুষ্ঠুভাবে গঠন করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে কখনও পায়ে হাঁটিয়া—কখনও যানবাহনে করিয়া—খাদি-প্রচার, চরকা-প্রচলন, গরীব মেয়েদের তত্ত্বাবধান ও জাতীয়ভাব উদ্দীপিত করিয়া তোলেন। এছাড়া, বয়স্কশিক্ষার, মাতৃমঙ্গলের ও সমাজসেবার কাজ গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া দেন।

ইহার পর প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তিনি কয়েক বৎসর শ্রমিক-সংগঠনে সংযুক্তা থাকেন। সেই সময় শ্রমিক-মঙ্গল, স্বাস্থ্যচর্চ্চা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কাজ শ্রমিকদের মধ্যে তিনি প্রচার করিয়া সফলকাম হন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জব্বলপুর হইতে ভূপালে প্রদেশ কংগ্রেস সমিতির দপ্তর স্থানান্তরিত হইলে শ্রীমতী ঘোষকে তথায় আসিবার জন্য অনুরোধ জানান হয়। কিন্তু কয়েকটি অসুবিধা থাকায় তিনি ঐ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তথাপি এখনও তিনি বহু সমাজসেবার কার্য্যে লিপ্তা আছেন।

শ্রীমতী ঘোষের জীবনের আর একদিক হল তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা। তিনি পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী প্রণবানন্দজীর অনুরক্তা। প্রতি মাসে তাঁহার গৃহে কীর্ত্তনাসর, পূজা ইত্যাদি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং তথায় বহুশ্রোতা উপস্থিত থাকেন।

শেষে শ্রীমতী ঘোষ জানান, "একান্নবর্ত্তী পরিবারে মানুষ হয়েছি ও একান্নবর্ত্তী পরিবারে বধূ হয়েছি—তাই বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রেও বহু-লোককে লইয়া কাজ করেছি এবং আনন্দ পেয়েছি। সেজন্য ব্যয়বাহুল্য না শিখিয়া—economy শিখিতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয়।"

সংস্কৃতকে সহজ বাংলায় রূপদান

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্র-প্রতিভার নানাদিক নানাজনে আলোচনা করেছেন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষাকে বাংলার মত করে প্রকাশ করার যে অপূর্ব্ব দক্ষতা তিনি দেখিয়েছেন, সে সম্বন্ধে কাকেও কোন কথা বলতে শোনা যায়নি। বহু কবিতাতেই তিনি সংস্কৃতকে বাংলায় এনে বাংলার রূপ দিয়েছেন। যার ফলে খাঁটি সংস্কৃত কথা সাধারণের চোখে বাংলা হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা হয়তো ভাবতে পারি যে, যেহেতু সংস্কৃত থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি, সেহেতু কিছু কিছু সংস্কৃত কথা বিক্ষিপ্তভাবে বাংলায় থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাক্যের পর বাক্য, সংস্কৃত কারক-বিভক্তি-সন্ধি-সমাসযুক্ত অবস্থায় সংস্কৃত কথা বাংলার মধ্যে দেখতে পাই, তখন তাকে আকস্মিক বা অনিচ্ছাকৃত মনে করা যায়না। বরং সংস্কৃতের কারক বিভক্তি যথাযথ বজায় রেখেও খাঁটী সংস্কৃতকে কিভাবে কোন্ কৌশলে বিশুদ্ধ বাংলারূপে প্রকাশ করা যায়, তা দেখানই তাঁর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে।

আমরা যদি কেবলমাত্র তাঁর সুপ্রসিদ্ধ জাতীয় সংগীতটিকে নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাবো উহার অধিকাংশই সংস্কৃত কথা। অন্ততঃ ১২।১৪ লাইন যে খাঁটী সংস্কৃত, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত বাংলা মিশে রয়েছে। হে জনগণমনোঽধিনায়ক! ভারত-ভাগ্য-বিধাতা ত্বং জয়—ইহাই প্রথম লাইনের অন্বয়। এখানে ত্বং এই কর্তৃপদটী উহ্য আছে এবং জি-ধাতু লোট্ হি জয় হইয়াছে। এইরূপ জনগণ-মঙ্গলদায়ক, ইত্যাদি স্থলেও। "ঘোর তিমির ঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে", ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদে সপ্তমীর একবচনের রূপ, 'পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা' স্থলে সন্ধির নিয়মে বহুবচনের বিভক্তি লোপ পেয়েছে। যাই হোক, বাংলার মধ্যে এভাবে সংস্কৃতের প্রয়োগবাহুল্য, সংস্কৃতে তাঁর গভীর জ্ঞান ও প্রীতির পরিচায়ক। ক্ষেত্র বিশেষে কখনও কর্ত্তাকে কখনও ক্রিয়াকে উহ্য রেখে কখনও বা সন্ধির নিয়মে বিসর্গের লোপ করে, সমাসের সাহায্যে কিভাবে কি কৌশলে সংস্কৃতকে সহজ সরল বাংলার মত করে প্রকাশ করা যায়—সে বিষয়ে বিশ্বকবি তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তারই ছায়া অবলম্বনে সংস্কৃতকে তার স্বপদে অধিষ্ঠিত রেখেই বিশুদ্ধ বাংলার মত করে প্রকাশ করা সম্ভব। তারই একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

সংস্কৃত রবীন্দ্র বন্দনা

বিশ্ব জন গণ হৃদয় রঞ্জন
জয় হে জনজীবন রস দাতা।
দেবেন্দ্র নন্দন হে প্রিয়দর্শন
জয় হে ভারত গৌরব বিধাতা ॥ ১

গল্পকাব্য গবেষণা প্রবন্ধ রচনা
উপন্যাস প্রহসন ভাবণ কল্পনা
লোকশিক্ষা চণ্ডালিকা চিত্রা চয়নিকা
নীরস জন মানসে রস সঞ্চারিকা ॥ ২

মধুর ভাষণ শান্তি নিকেতন
জয় হে কবীশ কুল বিজেতা।
সমাজ সেবক মনীষি নায়ক
জয় হে জয় শিক্ষক শিক্ষাদাতা ॥ ৩

নাটক নাটিকা অয়ে কথিকা কাহিনী
নীরস জন মানসে রসসঞ্চারিণী।
লিপিকা গীতিকা তব কবিতা জীবনী
নিরাশ হৃদয়ে দেব প্রাণসঞ্চারিণী ॥ ৪

জয় হে কবীন্দ্র বরেণ্য রবীন্দ্র
জয় হে নব নব রস স্রষ্টা।
ঠাকুরবংশজ হে দ্বিজেন্দ্রানুজ
জয় হে জন মানস রূপ স্রষ্টা ॥ ৫

তব লেখা সত্য জ্ঞান শান্তি প্রদায়িণী
তব রেখা চিত্রকলা বিদ্যা প্রকাশিনী।
তব বাণী কর্ণে সদা মধু প্রবর্ষিণী
তব আলোচনা চিত্ত সরস কারিণী ॥ ৬

ভারত গৌরব বর্দ্ধক জয় হে
ভারত কাব্য বিধাতা।
মূঢ় জন তমো হারক জয় হে
বিবিধ জ্ঞান প্রদাতা ॥ ৭

ভক্তিনম্র তীর্থযাত্রী যথা রবিচ্ছায়া দিদৃক্ষুজনতা
সমবেতা কক্ষে তব মহর্ষি ভবনে।
উপহার বিসর্জ্জন কথা ভগ্নহৃদে তব তীব্রব্যথা
জন্মদিনে উদ্ভাসিত মানস গগনে ॥ ৮

দিশি দিশি প্রচলিতা তব কীর্ত্তিগাথা
জয় হে জয় হে জয় গীতাঞ্জলি কর্ত্তা।
আবালবৃদ্ধ বনিতা হৃদয় দেবতা
জয় হে জয় অয়ে শ্রীনিকেতন নেতা ॥ ৯

জয় ধন্য বঙ্গদেশ রবিজন্ম দাতা
জয় হে দেবেন্দ্রনাথ শ্রীরবীন্দ্র পিতা।
জয় হে সারদা দেবি শ্রীরবীন্দ্র মাতা
জয় জয় মৃণালিনী রবিপ্রীতি প্রীতা ॥ ১০

গৃহে গৃহে তব পূজা তব আরাধনা
দেশে দেশে তব কথা তব আলোচনা।
প্রকাশিতা গ্রন্থমালা প্রচারিতা বাণী
শুভক্ষণে জন্ম তব জয়ন্তী জীবনী ॥ ১১

জাতীয় সঙ্গীতে তব কথা তব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সর্ব্বথা
জয় জয় জয় হে জয় কবীশ্বর ভারত কাব্য বিধাতা ॥ ১২

চন্দননগরে ‘সন্ধ্যা-সংগীত’-এর কবি

শ্রীবীরেন নাথ

ঘরে-বাইরে

বালক রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে ছিলো অবরোধ। চারদিকে যেন একটা বেড়াজাল। ঘরে ‘ভৃত্যরাজক তন্ত্র’। বাইরে ইট-কাঠের নিষ্প্রাণ সমাবেশ। বালকের মন তাই উড়ে যেতো আকাশে। সওয়ার হ’তো বাতাসে। বন্ধন ছিলো না সে ভাবের রাজ্যে। মুক্ত বিহংগের মতন ধাবমান ছিলো তার চিত্ত।···‘যে চিত্ত উন্মুক্ত আকাশে পাখীর মত উড়ে যেতে চাইত—তা’ ছিল অবরুদ্ধ। কিন্তু তার ভিতরে ডানা ছিল সে সহজে স্বীকার করেনি এই অবরোধ। দৃষ্টি প্রসারিত করেছে দূর আকাশের দিকে, অজানা মুক্তির আশায়’···(নিখিল বংগীয় সাহিত্য সম্মিলন উদ্‌বোধন প্রসংগে কবির ভাষণ। চন্দননগর। ১৩৪৩)॥

বাইরের আকাশ-বাতাস হাতছানি দিয়ে ডাকে বালককে। বালক তা’ দেখে আর কান পেতে শোনে। জানালার ধারে একমনে বসে থাকে। আর ভাবে, কবে তার বাইরে যাবার সেই পরম লগ্ন আসবে !!

মুক্তির আহ্বান

তখন কোলকাতায় সবে ডেঙ্গুজ্বর এসেছে। আর এসেই দিলে ভেঙ্গে অবরোধের সেই আগড়টা। পেনিটি (পানিহাটি)র বাগানবাড়ীতে এলো বালক ঠাকুর-পরিবারের আর সবাইকার সাথে। গঙ্গার ধারটিতে।···‘তখন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আমার সঞ্চরণ ও স্বাধীন বিহার আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। এই বাঙলার নদী আহ্বান করেছিল বিশ্বপথে। আমার চিত্তের যথার্থ উদ্‌বোধন হ’ল সেই সময়—বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরে। বিশ্বের সুরে সুর বাঁধবার উপলক্ষ পেলাম আমি তখন। যেমন কারাগারে যখন রাজবন্দিগণ বন্দী-জীবন যাপন করে তখন তাদের সমস্ত চিত্ত থাকে অবরুদ্ধ, বেরুতে পারেনা—তেমনই আমার সেতার যন্ত্র ছিল, কিন্তু বিশ্বের সুরে তার সুর বাঁধার উপলক্ষ পাইনি। সেতার পড়ে ছিল, তার বাঁধা হয়নি, সুর ধরা হয়নি। সেই মুক্তি পেয়েছিলাম আমি গঙ্গার তীরে’···(উদ্‌ধৃতি পূর্ববৎ)। বালকের সেই প্রথম উদার আকাশ থেকে ধেয়ে আসা বাইরের বাতাসের সাথে মিতালী॥

চন্দননগরে

আবার গঙ্গাতীরে। পেনিটির পরে এবারে চন্দননগর।···‘সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে। সেই নিস্তব্ধ নিশীথ। সেই জ্যোৎস্নালোক। সেই দুইজনে মিলিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ। সেই মৃদুগম্ভীর স্বরে আলোচনা। সেই দুইজনে স্তব্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা। সেই প্রভাত বাতাস, সেই সন্ধ্যার ছায়া। একদিন সেই ঘনঘোর বর্ষার মেঘ, শ্রাবণের বর্ষণ, বিদ্যাপতির গান···(বিবিধ প্রসংগ। ১২৯০। পৃঃ ১৪০)॥

মাথার উপরে আকাশ। সেখানে নীলের সমারোহ। পায়ের তলায় মাটি। সেখানে সবুজের সমাবেশ। আর সামনে প্রবহমানা গঙ্গা॥ সূর্যোদয় হয় সামনে ওপারে। ঐ দূর দিগন্তে। গাছপালার আড়ালে। আর সূর্য অস্ত যায় পেছনে। সে কোন্ পারে কে জানে !!

দিনের বেলায় সেখানে রোদ আর মেঘ লুকোচুরি খেলে। আর সন্ধ্যাবেলায় তারারা চোখ মেলে। চাঁদ ওঠে দক্ষিণের ঐ বকুলবনে॥

“মুসুরি হইতে ফিরিয়া (১২৮৮। গ্রীষ্মকাল) রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত চন্দননগরে বাস করিতে লাগিলেন।··· এইখানে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর সহিত পরমানন্দে দিনগুলি কাটাইতে লাগিলেন।···জ্যোতিরিন্দ্রনাথরা একবার বাড়ীতে ছিলেন না, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ‘সন্ধ্যাসঙ্গীতে’র কবিতা লিখিতে শুরু করেন—তখন বয়স উনিশ পূর্ণ।···তিনি লিখিয়াছেন, “দুটো একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল—বাঁচিয়া গেলাম। যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।···এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম।···স্বাধীনতা আপনাকে প্রথম প্রচার করিয়া নিয়মকে ভাঙে, তাহার পরে নিয়মকে আপন হাতে সে গড়িয়া তুলে—তখনই সে যথার্থ আপনার অধীন হয়।’ সন্ধ্যাসঙ্গীতে কবিচিত্তে যেমন একটা বেপরোয়াভাব প্রকাশ পাইয়াছে, ছন্দের দিক দিয়াও তেমনি বিহারীলালের অনুকৃতির বাহিরে আসিয়া পড়িবার সহজ গতি দেখা যায়।”—রবীন্দ্রজীবনী। ১ খণ্ড। সন্ধ্যাসঙ্গীতের যুগ। পৃঃ ১১০॥

সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবি সেকালে চন্দননগরে এসে কতোদিন বাস করেছিলেন, তার সঠিক হিসেব জানা যায়না। তা’ছাড়া, তাঁর তৎকালীন রচনাবলীর কথাও অজানা রয়েছে। তবে, কবির স্বীকৃতি অনুযায়ী ‘গান আরম্ভ’ হয়েছিলো এখানেই। এ-কথা তিনি বার বার উল্লেখ ক’রেছেন বিভিন্ন উপলক্ষে ও অনুষ্ঠানে॥

“গঙ্গাতীরে মোরান বাগানবাড়ী হইতে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্র বাবুদের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। চৌরঙ্গি যাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর স্ট্রীটে বাসা লইলেন। এখানে আসিয়া ‘বৌঠাকুরাণীর হাট’ চলে ও সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কবিতাও লেখেন। বোধ

হয় এই সন্ধ্যা-সঙ্গীতের মনোভাব হইতে মুক্তির জন্য আকুতিও বোধ করিতেছিলেন।"—উদ্ধৃতি পূর্ববৎ ॥

এর পরে "বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেলে কলিকাতায় গেলেন। কলিকাতায় থাকিবার সময় চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘের গুরু শ্রীমতিলাল রায় রবীন্দ্রনাথকে তাঁহাদের আশ্রমের মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য আমন্ত্রণ করেন। ১৩৩৪, বৈশাখ ২১এ (1927, May 4) প্রাতে প্রবর্তক সংঘের প্রার্থনা-মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত করেন।'—রবীন্দ্রজীবনী। ২ খণ্ড। পৃঃ ৩২৮ ॥

প্রবর্তক সংঘে অবস্থানকালীন কবি এ কবিতাটি রচনা করেন বলে প্রকাশ:

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে—
শূন্য ঘাটে একা আমি পার করে লও খেয়ার নেয়ে।
ভেঙ্গে এলাম খেলার বাঁশি, চুকিয়ে এলাম কান্নাহাসি,
সন্ধ্যাবায়ে শ্রান্তকায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে।
ওপারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিল রে
আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির'পরে
এস এস শ্রান্তিহরা, এস এস সুপ্তিভরা,
এস এস তুমি এস, এস তোমার তরী বেয়ে ॥

প্রবর্তক সংঘের অনুষ্ঠানান্তে "অপরাহ্ণে চন্দননগরের দানবীর শ্রীহরিহর শেঠ প্রতিষ্ঠিত 'কৃষ্ণভামিনী-বালিকা-বিদ্যালয়' দেখিতে যান (সেখানে কবি এক শিক্ষিকার অটোগ্রাফের খাতায় লিখে দেন: বসন্ত যে লেখা লেখে বনে বনান্তরে। নামুক তাহারি মন্ত্র লেখনীর পরে ॥ লেখক)।

ফরাসী Administrator তাঁহাকে বৈকালে চা-এ নিমন্ত্রণ করেন; সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার সময় (৺অক্ষয়তৃতীয়া উপলক্ষে আয়োজিত) প্রবর্তক প্রদর্শনীতে উপস্থিত হন। শ্রীমতিলাল রায় মহাশয়ের অনুরোধে কবি প্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার পর একটি সুন্দর অভিভাষণে সংঘের আদর্শ ও কর্ম সম্বন্ধে বলেন।

প্রবর্তক সঙ্ঘের কার্য হইয়া গেলে তিনি 'নিত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে' যান। নাগরিকদের তরফ হইতে মেয়র শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে তাঁহাকে অভিনন্দন দেন। (তদুত্তরে কবি যে অভিনন্দন দেন, তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হ'লো: যখন বালক ছিলাম, তখন চন্দননগরে আমার প্রথম আসা। সে আমার জীবনের আরেক যুগ। সেদিন লোকের ভিড়ের বাইরে ছিলেম, কোনো ব্যক্তি বা দল আমাকে অভ্যর্থনা করেনি। কেবল আদর পেয়েছিলেম বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে। ছেলেমানুষের বাঁশি ছেলেমানুষী সুরে সেখানে বাজতো আমার মনে আছে।···লেখক) সভান্তে মেয়র শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে রবীনাথকে বিশ্বভারতীর জন্য হাজার টাকা দান করেন (New Empire, Calcutta 6th May 1927 ও অন্যান্য সাময়িক পত্র দ্রষ্টব্য)। চন্দননগর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলং যান।"—রবীন্দ্রজীবনী। ২ খণ্ড। পৃঃ ৩২৮ ॥

এর পর "প্রতিমা দেবী বিলাতে গিয়াছেন। কবি স্থির করিলেন শ্রীষ্মকালটা নৌকায় থাকিবেন চন্দননগরের কাছে।···দিনগুলি নৌকায় অতিবাহিত হয়।"—রবীন্দ্রজীবনী। ২ খণ্ড। পৃঃ ৪৬৪ ॥

তখন বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস। ১৩৪২ সাল। চন্দননগরের ধারে গঙ্গার উপরে গৃহতরণী 'পদ্মা'য় কবি দিন কাটান আনন্দে। কবিতা রচনা করেন বিবিধ ছন্দে। তখন 'বীথিকা' রচনার কাল। কবির সংগে ছিলেন অধুনা ভারত সরকারের উপমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ এবং তাঁর পত্নী সুলেখিকা শ্রীযুক্তা রাণী চন্দ ॥

পরের বছর (১৩৪৩) বসন্তকালে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বিংশ বংগীয় সাহিত্য সম্মিলন উদ্বোধনকল্পে কবি এখানে আসেন এবং উদ্বোধনী ভাষণে তাঁর বালককালের কথার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: '···উদ্বোধন—এই কথাটি শুনে আমার মনে আর একদিনের কথা এল। সেই সময় এই শহরের এক প্রান্তে একটা জীর্ণ-প্রায় বাড়ী (এ-বাড়ীর সন্ধান অনেক করে ব্যর্থ হ'য়েছি ॥ লেখক) ছিল, সেইখানে আমি আমার দাদার সংগে আশ্রয় নিয়েছিলেম। তারপর মোরান সাহেবের বিখ্যাত হর্ম্যে আমাকে কিন্তু দীর্ঘকাল যাপন করতে হয়েছিল। বস্তুতঃ এই গঙ্গাতীরে এই নগরের এক প্রান্তেই আমার কবি-জীবনের উদ্‌বোধন। সেটা ছিল আমার জীবনের সত্য ও সহজ উদ্‌বোধন।···'

মোরান সাহেবের বাড়ীতে:

কবির 'জীবনস্মৃতি'তে মোরান্ সাহেবের বাগানবাড়ি অক্ষয় হ'য়ে আছে। 'গঙ্গাতীর' শীর্ষক পরিচ্ছেদে তিনি তার অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন:···"আমরা যে বাগানে ছিলাম তাহা মোরান্ সাহেবের বাগান নামে খ্যাত ছিল। গঙ্গা হইতে উঠিয়া ঘাটের সোপানগুলি পাথরে বাঁধানো একটি প্রশস্ত বারান্দায় গিয়া পৌঁছিত। সেই বারান্দাটাই বাড়ির বারান্দা। ঘরগুলি সমতল নহে—কোনো ঘর উচ্চতলে, কোনো ঘর দুই চারি ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সবগুলি ঘর যে সমরেখায়, তাহাও নহে। ঘাটের উপরেই বৈঠকখানা-ঘরে সার্সিগুলিতে রঙিন ছবিওয়ালা কাচ বসানো ছিল। একটি ছবি ছিল—নিবিড় পল্লবে বেষ্টিত গাছের শাখায় একটি দোলা—সেই দোলায় রৌদ্র-ছায়া গঠিত নিভৃত নিকুঞ্জে দুজনে দুলিতেছে। আর একটি ছবি ছিল,—কোনো দুর্গপ্রাকারের সিঁড়ি বাহিয়া উৎসববেশে সজ্জিত নরনারী কেহ বা উঠিতেছে, কেহ বা নামিতেছে। শার্সির উপরে আলো পড়িত এবং সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত।···বাড়ির সর্বোচ্চ তলে চারিদিক খোলা একটি গোলঘর ছিল। সেইখানে আমার কবিতা লিখিবার জায়গা করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে বসিলে ঘনগাছের মাথাগুলি ও খোলা আকাশ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়িত না। তখনো সন্ধ্যা-সংগীতের পালা চলিতেছে—এই ঘরের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছিলাম—

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার—
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।···

মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি আজ আর নেই। সেখানে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা পাটকলের চিমনি।

গঙ্গা তেমনি বয়ে চলেছে। তেমনি সূর্যের উদয় আর অস্ত হ'চ্ছে। তারা ওঠে আকাশে। চাঁদও হাসে। কিন্তু এ-পার ও-পার দু-পারের কলদানবদের তাণ্ডবলীলায় প্রতিধ্বনি ভাসে বাতাসে

রচনা—রাজেন্দ্র যাদব

অনুবাদ—নীলিমা মুখোপাধ্যায়

মিসেস তেজপাল কুলটা।

বিন্নুর মুখ থেকে এ কথা শুনে আমি সত্যই চমকে উঠেছিলাম। আমিতো স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারিনি যে, এমন সুন্দর হাসিখুসি আর শান্তসৌম্য কোন মহিলা কোনদিন কুলটা হতে পারে। কি মিশুক, কি মিষ্টি কথাবার্ত্তা, একেবারে কাছের জনের মতন মেলামেশা। আমি কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিলাম বাস্তবিক উনি কি ছিলেন? দাঁতে যদি মিশি লাগান হত, কাজলের কালো কালো লম্বা টানা চোখের কোলে আরও লম্বা করে টানা থাকত, পাউডার ছড়ান গালে থাকত রুজের লাল স্পর্শ, পানের রসে রক্তিম হয়ে উঠত ঠোঁটের কোণ, পাতাকাটা চুলের নীচে দুলত ইয়ারিং আর কথা বলতেন দুই ভুরুর টানা বেঁকিয়ে—তাহলে তো আর কোন কথাই হ'ত না। প্রথম দর্শনেই আমি বুঝে যেতাম যে, সে কুলটা। কিন্তু এখন বিন্নুর কথা শুনে দুঃখের থেকে আশ্চর্য্যের ভাবই বেশী হয়ে উঠল। স্বীকার করতেই হল যে, মিসেস তেজপাল একজন উঁচুদরের অভিনেত্রী ছিলেন (কলেজ-জীবনে সব অভিনয়ে ওঁকে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বলা হ'ত, সে কথা উনি নিজেই আমাকে একদিন জানিয়েছিলেন), কিন্তু তবুও তো এমন সন্দেহ আমার মনে কোনদিনই হবার সুযোগ হয়নি। যেসব দিনে তাকে ঘিরে আমার মনে সেসব ভাবের আনাগোনা হ'ত তা একেবারেই আলাদা ধরণের। তা সত্ত্বেও বিন্নু আমাকে যে কথা বলল তা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না। সেই এ্যালসেসিয়ান কুকুর···সেই গুলের ফুল··· সেই গানের সুর···সেই সবই মিথ্যে ছিল; আসল কথা বুঝি জানা হল আজই।

এক বছর পরেই যখন কোম্পানি দ্বিতীয়বার ট্রেণিংএর জন্যে কলকাতায় পাঠিয়ে দিল, তখন দুপা যেন নিজে নিজেই 'কফি-হাউসের' দিকে এগিয়ে চলল। আগের বার কলকাতায় বিভিন্ন পাড়ায় চার বছর কাটিয়ে গেছি। কফি-হাউসে খানিকটা না কাটিয়ে সে সময় একটা দিনও যায়নি। অভ্যাসই এমন হয়ে গিয়েছিল যে, সহরের যে-কোন প্রান্তেই থাকি না কেন, রোমের মতন সব পথই আমাকে নিয়ে ফেলত 'কফি-হাউসে'র দরজায়। ওটি একটি 'মিলন-মন্দির' ছিল।

ঢুকতেই দৃষ্টি মেজর তেজপালের ওপর গিয়ে পড়ল। হ্যাঁ, উনিই তো ছিলেন। সামনের থামের দিকে মুখ আর দরজার দিকে পিঠ করে উনি বসেছিলেন। কিন্তু কাপড় জামা সাধারণ নাগরিকের মতনই ছিল। দুইহাতের পাতা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে, দুই কনুই দুদিকে ছড়িয়ে উনি সামনের আয়নার দিকে চেয়ে এমন করে হাসছিলেন—যেন কেউ ওঁর বগলের তলায় কাতাকুতু দিচ্ছে। এক মুহূর্ত্ত আমি ইতস্তত করলাম—হয়ত উনি না—কিন্তু সামনের আয়নায় নিজের ছবির সঙ্গে সঙ্গে যে ফুটে উঠেছিল ওঁর চেহারাও। হ্যাঁ, তেজপালই নিশ্চয়ই হবেন। কিন্তু উনি এই কফি-হাউসে। তাও এমন এলোমেলো হয়ে বসে এমনভাবে হাসিতে ব্যস্ত! মনকে এ চিন্তা থেকে সরিয়ে বিষয়ান্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সারি সারি চেয়ার-টেবিলের দিকে লক্ষ্য ফিরালাম। দুনিয়ার যত নিষ্কর্মা আর ইয়ারবাজের আড্ডা।

আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আর উনি সেই একভাবে আয়নার নিজের চেহারার দিকে চেয়ে চেয়ে হেসে চললেন। সামনের টেবিলের ওপর আধ বাটি কফি আর খালি রেকাবি রাখা ছিল। হ্যাঁ, সেই জাহাঙ্গীর ধাঁচের অল্প অল্প সাদা ছোপ—ধরা নিম্নমুখী জুলপির ধাবা ও টেলিফোনের চোঙ্গার মতন ভারী গোঁফ পাশ থেকেও চোখে পড়ল। আমি ভেবেছিলাম আমাকে দেখা মাত্র উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে দাঁড়াবেন আর দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে খবরাখবর জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু যখন উনি একইভাবে বসে রইলেন, তখন আমিই জিজ্ঞেস করলাম—"আমি কি এখানে বসতে পারি?"

উনি সেই অদ্ভুতভঙ্গিতেই হাসতে থাকলেন। দূরে হাতের থালাটাকে বুকের ওপর চেপে ধরে খুব আস্তে তাতে তাল ঠুকতে ঠুকতে কোমরে লাল বেল্ট বাঁধা বেয়ারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল। হতে পারে এ আমার চেনা তেজপালের মতন চেহারার অন্য কোন লোক। "এই চেয়ারটা কি খালি আছে?"—আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

উনি মাথা না ঘুরিয়েই যেন আয়নাতে আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন—'বস'। সে বলার ভঙ্গি যেন বেয়ারাকে হুকুম করছেন জল আন। বড় খারপ লাগল। মনে হল অন্য কোথাও উঠে যাই। কিন্তু সমস্ত ঘরটা ভর্ত্তি ছিল। টেবিলের ওপর হাতের বইগুলো রাখতে রাখতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আর একবার চেয়ে দেখি, হয়ত উনি এতক্ষণে চিনলেও চিনতে পারেন। কিন্তু উনি সেই একইভাবে আয়নাতে কিছু দেখে হেসে চললেন। না, ইনি মেজর তেজপাল নন। আমি কফি অর্ডার দিলাম। মানুষের চেহারার সাদৃশ্য থেকে এমন ভুল কখনো কখনো হয়ে পড়ে। হঠাৎ টেবিলে রাখা বইটা তুলে নিয়ে একেবারে চোখের সামনে মেলে ধরে উনি এমনভাবে দেখতে লাগলেন যেন বইয়ের পাতার খবর করছে উই পোকা। হাসি এল আমার। কি জানি কেমন করে আমার হাসি উনি বুঝে ফেললেন। একেবারে হঠাৎ আমার দিকে চোখ তুললেন আর চোখাচোখি হতেই আমরা দুজনেই হেসে ফেললাম। বিয়ার খাবার ভঙ্গিতে গেলাসের জলটুকু খেতে খেতে আমি জিজ্ঞেস করলাম: "আপনি কি এ সহরে নতুন এসেছেন?"

উনি বই যেখান থেকে নিয়েছিলেন সেখানেই আবার রেখে দিয়ে গালে হাত বুলিয়ে আয়নাতে আবার এমন ভাবে দৃষ্টি চালালেন যেন দাড়ি কামিয়ে ফেলা উচিৎ কিনা ভাবছিলেন। "এ ধারণা আপনার কেন হল?"—আমার কথার উত্তরে প্রশ্ন করলেন উনি।

"এমনিই মনে হল।" এ প্রশ্নের জবাব আর কি হতে পারত।

"কিন্তু মনে হওয়ার কারণ?" এইবার ওঁর প্রশ্নের রুক্ষতায় আমি

চমকে তাকাই। দুটো চোখ স্থিরভাবে চেয়েছিল আমার দিকে। আর সে দৃষ্টির অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণতায় আমার আপাদমস্তক যেন শিউরে উঠল।

"এমন বিশেষ কারণ তো কিছু নেই"—চেষ্টা করে থেমে থেমে উত্তর দিলাম।

"আপনি আমার মধ্যে এমন বিশেষ কি দেখলেন যে, আমি এখানে নতুন এসেছি বলে মনে হল?"—এবার ওঁর চোখের ব্যাস বড় হয়ে উঠল আর গলার স্বরের তীক্ষ্ণ রুক্ষতায় মনে হল—উত্তর না পেলে এবার ঐ দুটো হাত আমার গলার টুঁটি চেপে ধরবে। আমি নিঃশব্দে বইখাতা গুছিয়ে নিয়ে একটা তক্ষুনি খালি হওয়া চেয়ার দেখে উঠে গেলাম। যেন কিছুই হয়নি—এমনি ভঙ্গিতে উনি আবার মুচকি হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুললেন যেন বলছেন: "উঃ কি সব বোকার দল এসে যে ঝামেলা বাঁধায়।"

হুগলীর পারে সর্দারজির বাসের সঙ্গে ছুটে চলা রেলিংএর ওপারে জাহাজগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে আমি নিজের মনেই বলি: "উনি তো মেজর তেজপাল নিশ্চয়ই ছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য ভদ্রলোক আমাকে চিনতে কেন পারলেন না? এই বছরই আমি কতটা বদলে যেতে পারি? এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই আমিই ওঁকে আমার নামটা অন্তত কেন বলে দিলাম না ভেবে বেশ অশোয়াস্তি হতে লাগল। অন্ততপক্ষে আমার নিজের চেহারাটা তো আয়নায় একবার দেখে নেওয়া উচিৎ ছিল।" একটা আয়নার আগায় এদিক ওদিকে দৃষ্টি দিই আর নামবার সময় গুরু গোবিন্দের হাতে বাজপাখী বসা ছবিটার নিচে আটকানো আয়নায় নিজের চেহারার ওপর দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্ত থেমে যাই। না, বিশেষ বদলেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। চুলের ওপর একবার হাত ফেরাই, একটু মুচকে হাসি, তারপর হঠাৎ পেছনে আর একটা ছায়া দেখে এতক্ষণে মনে হয় আমার এ ভাবও মেজর তেজপালের মতনই হতে চলেছে।

ব্যাপারটা মনের ভেতর তোলপাড় করতে থাকে। বাড়িতে ফিরতে বিনু দেখামাত্র বলে: "কতক্ষণ ধরে পথ চেয়ে বসে আছি। পুলোভারটা দয়া করে একবার পরে দেখ। কতটা বাড়াতে-কমাতে হবে বুঝতে পারি। আমাকে আর নিঃশ্বাস নেবার সময়টুকুও না দিয়ে ও টেবিলের নিচে রাখা প্লাষ্টিকের বালতি থেকে পুলোভার বার করে আমাকে পরাতে সুরু করে দেয়। "হাত উঁচু কর।"··· হুকুম হয়।

'হাণ্ডস আপ' করে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতেই থাকি আর বিনু বোনা নিয়ে কখনো আমার পিঠ আর কখনো বুক মাপতে টেনে টেনে মুগ্ধ চোখে ডিজাইনের ঘর দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করে—বড় খুশি খুশি দেখাচ্ছে। কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল নাকি? কার কার সঙ্গে দেখা হল?

বিনু, আজ কফি-হাউসে হঠাৎ মেজর তেজপালের সঙ্গে দেখা। হঠাৎ বলে ফেলি।

আচ্ছা? মেজর তেজপাল? বিনু বোনার কথা ভুলে যায়। ও তো বলছিল যে সে রাঁচিতে আছে।

রাঁচি? রাঁচিতে কেন?

"তুই জানিস না? আরে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তো ওর।"

"মাথা খারাপ।" আমার আবার কফি-হাউসের কথা মনে পড়ে। কিন্তু এত সত্ত্বেও বিনুর সঙ্গে একটু খুনসুটি না করে পারি না। মিলিটারি লোকদের মাথা খারাপ হয় নাকি? আচ্ছা, কিন্তু কি করে হল?

বিনু রসিকতায় মন না দিয়ে বাইরের বারান্দার দিকে চেয়ে বলে: মানুষজন তো বলে নানারকম ভাই, আমার ঠিক জানা নেই। মিসেস তেজপালের জন্যে ওর মাথাটা বেশ 'ডিষ্টার্বড' * থাকত। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করে: কি বলেছিলেন উনি? উঠেছেন কোথায়? আমি ওকে বলব, উনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে না এলে কি হয়েছে, আমরাই একদিন দেখে আসি। কি রকম হয়ে গেছেন।

এতক্ষণে আমি বললাম যে, উনি তো আমাকে চিনতেই পারেন নি, কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করলাম যে মিসেস তেজপাল এমন কি করে ফেলেছিলেন যে, ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেল, তখন বিনু যেন উদাস হয়ে পড়ল। হাঁটুর ওপর বোনাটা রেখে এখানে ওখানে হাত দিয়ে টেনে দিতে দিতে কিছু ভাবতে থাকে ও, তারপর গভীরভাবে একটা নিশ্বাস টেনে নিয়ে অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে বলে,—"আরে ঐ রকমই তো ছিল ও।"

"তুই তো আগে ওর মস্ত ভক্ত ছিলি আর এখন বলছিস ঐ রকমই ছিল ও।" আমার চোখের সামনে সেই কাঁধ পর্য্যন্ত ছাঁটা চুলে ঘেরা ফর্সা নিটোল চেহারা ভেসে ওঠে। বিনুর বিরক্তির খানিকটা কারণ বুঝি আঁচ করতে পারলাম। সেইজন্যেই ওর এই নিস্পৃহ তিক্ত ভাব। সমস্ত মনটা আরও চঞ্চল হয়ে উঠল।

আমি যেন হঠাৎ ওর কোন গভীর ব্যথার জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছি, এমনি ছটফট করে ও আবার বলে ওঠে: "আমি তখন কি করে জানব যে, ভেতরে ভেতরে ও অমন ছিল? কুলটা কোথাকার!"

অত্যন্ত নতুন ফ্যাশানের ড্রইংরুমে নাইলনের ফিনফিনে শাড়ি পরা কর্নেলের পত্নী বিনুর মুখে এই নিম্ন-মধ্যবিত্ত সুলভ অভিব্যক্তি শুনে আমি না হেসে পারি না।

চাকর এসে জিজ্ঞেস করে: "বাবু, চা এখানে নিয়ে আসব কি?"

ওকে বলি: হ্যাঁ, এখানেই নিয়ে এস। তারপর আবার বিনুকে বলি: "তুমিত যখন কোর্ট-মার্শাল কর তখন সোজাসুজিই গুলি মার। মাঝামাঝি কোনও রাস্তাই কি রাখতে নেই? আমার তো ওর মধ্যে কুলটাপনা কিছুই চোখে পড়েনি।"

চটে ওঠে বিনু। উল-কাঁটা সমেত হাতের বোনা থলিতে রাখতে রাখতে বলে: "তুই কেন দেখতে পাবি? তোর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কথা যে বলত হুগলীতে গিয়ে।"

"তোমরা মেয়েরা সকলেই দেখি একই ধরণের।" আমি ইংরিজিতে বলি। মহিলা শব্দ কটু হয়ে যেত আর মেয়েমানুষ বাজারে ভাব। তোমার রায়ই কি ঠিক?

"আচ্ছা, ঠিক নয় তো নয়, ব্যাস।" মাথা ঝাঁকিয়ে গাল ফুলিয়ে বসে ও।

এ বিনুর এক চিরকেলে স্বভাব। তর্কের কোন কথাতেই

---

* যে কোন কারণেই হোক, হিন্দী সাহিত্যে ইংরিজি কথার খুব বেশী ব্যবহার দেখছি। হিন্দী সাহিত্যে কৌতূহলী পাঠকের জন্যে ইংরেজি শব্দ অনুবাদ না করেই রাখলাম।—অনুবাদিকা।

এমনিভাবে মাথা বেঁকিয়ে বসে পড়ে, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে থাকে আর হঠাৎই ওর এমন কোন কথা মনে পড়ে যায়—যা বলবার জন্যে ঝট করে ঘুরে বসে। তখন মনেই থাকে না যে, এক্ষুনি রাগ করে বসেছিল ও। আমি অপেক্ষা করছিলাম যে, এক্ষুনি ঘুরে বসে ও মেজর তেজপালের কথা জিজ্ঞেস করবে—যা এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু বারান্দাতে ততক্ষণ ঘণ্টা বেজে উঠেছে—ঘনন্ ঘনন্।

আর আমার হঠাৎ মনে হয় এক্ষুনি গোমেজ দরজা খুললেই মিসেস তেজপাল কলকল করে মাথার পেছনে চুল ঝাপটিয়ে এমন ভাবে ঘরে ঢুকে পড়বে যেন কেউ ওকে ধাক্কা দিয়ে সরে গেছে। ওখান থেকেই বলতে বলতে আসবে; "আজ তো বড় মজা হয়েছে মিসেস ধীর।" আর তখুনি সমস্ত ফ্ল্যাটটা এক অদ্ভুত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে উঠবে।

কিন্তু ও নিচের ফ্ল্যাটের বেয়ারা। "মেম-সা'ব' কে 'কর্ণেল-সা'ব' নিচে ডাকছেন। বলেছেন ছোট সায়েব থাকলে তাকেও ডাকতে। সকলে নিচে আছেন।"

আজ নিচে বিলিয়ার্ডের প্রোগ্রাম ছিল আর রণধীরও ওখানেই ছিল।

"আজ ঘোরাঘুরিতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তুই যা বিনু।" বিনুকে বলি আমি।

আসলে আমার সমস্ত মন অদ্ভুতভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। থেকে থেকেই মিসেস তেজপালের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। আশ্চর্য্য, ওকে আমি কেমন করে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম? নিঃশব্দে চা খেতে থাকি। কি বলে বিনু নিচে চলে গেল খেয়ালও করিনি। বিশ্বাস হয়না যে, আমি গোটা একটা বছর বাইরে আছি। আজও মিসেস তেজপালের ছবি উজ্জ্বল হয়ে চোখের ওপর ভেসে উঠছে। ওর নামের সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ছে—লাল চৌক টুকরোর ওপর তৈরী 'বন্দুকের গুলির ফুল' আর নিজের হাতের কব্জিতে চামড়ার ফিতে জড়ান কোমরের থেকে উঁচু এ্যালসেসিয়ান কুকুরের টানে প্রায় ছুটে চলা মিসেস তেজপালের গুনগুনান মূর্ত্তি···সেই থেকে থেকে চুলগুলো গোছা করে পেছন দিকে ছুড়ে দেওয়া···বিনুর কথা মেনে নিতেও মন চায়না, নিজের অন্তরে অন্তরে আমি যে জানি ওর কথায় কোথায় যেন কিছু ভুল আছে···মনে হয় এ বুঝি সেই ফ্ল্যাট, সেইসব মানুষ আর সেই দিন···এই সময়ের মধ্যেই বিনুতো এই ফ্ল্যাটও তো ঐ রকমই নিয়েছে, সব কিছু গুছিয়ে রেখেছে ঠিক তেমনি করে।

এমনিতে তো সমস্ত ব্লকের ভাগ করা অংশগুলো একই ডিজাইনের, কিন্তু প্রথমবার যখন মেজর তেজপালের ফ্ল্যাটে গিয়ে পার্থক্য এত দেখেছিলাম যে, দরজা, বারান্দা, ঘর সব এক ছাঁদের হয়েও সব কিছু আমাদের নিচের ফ্ল্যাটের মত ছিল না।

···ওদের বাড়ি আমাদের যাবার কথা ছিল। আমরা ঘণ্টা বাজাই। আমি, বিনু আর রণধীর। সিঁড়ির ঘষা কাঁচের ওপরে আলো জ্বলে ওঠে আর দরজা খোলে। কিন্তু কেউ আসে না। চাকর ব্যস্ত আছে সম্ভবত। এটাই এমনি তে এখানের নিয়ম। নিচে দূর থেকে দেখা সত্ত্বেও দু-তিন বার ঘণ্টা বাজাতেই হবে। দরজা যে চাকরেই শুধু খুলবে। দ্বিতীয়বার ঘণ্টা বাজানর পর চাকর এসে দরজা খোলে ব্যস্তভাবে। আমি নতুন করে আবার নামের ফলকটা পড়ছিলাম। জিজ্ঞেস করি—ওঁরা আছেন?

'হ্যাঁ, বাবু।' রণধীরকে দেখে ও গোড়ালি জোড়া করে স্যালিউট করে আর নিয়মমত একটু পেছনে সরে যায়। আমরা বারান্দাতে এসে পড়ি। বসবার ঘরে ঢোকা মাত্র যে জিনিসটার ওপর আমার সবচেয়ে আগে দৃষ্টি এসে পড়ে, সে ছিল দরজার ঠিক মাঝখানের জায়গায় ওপর লাগান ফুল। দুটো দরজার ঠিক ওপরে সিংহের দুটো বড় মাথা লাগান ছিল। মাঝখানের ফুলটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে তড়িৎপ্রবাহ খেলে যায় আর সমস্ত মনটা এক অদ্ভুত অনুভূতিতে ভরে ওঠে। তবুও সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকি। ছয় সাড়ে ছয় ইঞ্চি লম্বা বন্দুক আর পিতলের গুলির ছোট ছোট টুকরো জমিয়ে এই ফুলের ডিজাইন তোলা। হলদে হলদে পেতলের দল আর সিলেটি দস্তার পাতা। গুলিতে পালিশও নিশ্চয়ই হয়। ঝকঝকে চমকে তাই উজ্জ্বল। পরিষ্কার ঝকঝকে। কোথাও এতটুকু ময়লা জমে নি। অন্ধকারে আতসবাজির জ্বলন্ত টুকরোর মতন ঐ ফুল আমার চোখের সামনে উজ্জ্বল দ্যুতিতে নাচতে থাকে···ফ্লাওয়ার অফ বুলেটস্···

মেজর তেজপাল উচ্ছ্বসিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। সেই লম্বা চওড়া আট-সাট শরীর আর অল্প অল্প সাদা ছোপ ধরা জাহাঙ্গীর ধাঁচের জুলফি, টেলিফোনের চোঙ্গার মতন গোঁফ।

'হ্যাল্লো, আমি এখুনি ভাবছিলাম যে চাকরকে পাঠাব নাকি। রুদ্রা এখনও এলোনা যে?' বলেন উৎসুক ভাবে।

আমাদের বেশী দেরী তো হয়নি? বিনু ঘড়ি দেখতে দেখতে বলে। ঠিক সময় দেখেই যেন বেরিয়েছিলাম আমরা।

না না। বারান্দার এক কোণে রাখা বেতের চেয়ার দেখিয়ে বলেন—এখানেই বসবেন, না ভেতরে? চলুন, ভেতরেই বসা যাক।

বিনু ভেতরে উঁকি দিয়ে বলে,—যেখানে হোক, মিসেস তেজপাল কোথায়?

"ও কিচেনে আছে। এখুনি আসছে।" ঘরের পর্দা এক দিকে সরিয়ে উনি দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি লক্ষ্য করি দুহাত জড় করে দাঁড়িয়ে থাকা ওঁর অভ্যেস। যেন খুব ঠাণ্ডা লাগছে, অথবা দুহাতের মধ্যে রেখে কিছু ভাঙ্গছেন। আমার হঠাৎ মনে হয় এ অভ্যেস আমি আরও কোথাও দেখেছি। মাথার ভেতর ভরে ওঠে কিন্তু ওখানে তো ততক্ষণ আনাগোনা করতে আরম্ভ করেছে ঝকঝকে 'গুলির ফুল।'

ভেতরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে ধাক্কা লাগে কি যেন। নিচের দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে সজোরে এক ঝাঁকুনিতে সমস্ত শরীর যেন কেঁপে ওঠে। বড় একটা ঘড়ার আকারের বাঘের একটা মুখ প্রকাণ্ড ভঙ্গিতে হাঁ করে ঝকঝকে চোখে আমাদের দিকে চেয়ে আর তার গভীর খয়েরী রঙের ডোরা কাটা সোনালী ছালটা গালিচার ওপর ছড়ান—যেন হাত পা ছড়িয়ে শোওয়া। ওর চারদিকে লাল গালিচার ওপর খয়েরী সোফা-সেটি পাতা। কোণের দিকে টেবিলের ওপর চকচকে নিকেলের ভাঁজ করা ফ্রেমে একদিকে 'ক্যাডেট' মেজর তেজপাল, অন্যদিকে ডিগ্রি হাতে নিয়ে গাউন পরা মিসেস তেজপালের ছবি। গোঁফ—যেন কেউ নাকের নিচে সোজা কোন পেন্সিল রেখে গেছে। রেডিওগ্রামে হাল্কা সুরে কোন 'জ্যাজ' বাজছিল।

[ক্রমশঃ

শিশুদের যৌনশিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ফ্রয়েডের মতানুসরণে বলা যায় শিশুদের মনে যৌনজিজ্ঞাসা অত্যন্ত প্রবল ভাবেই দেখা দেয়। মায়ের স্তন্যপান কালে তাদের মনে যৌন সুখানুভূতি জন্মে এবং পরিণত বয়সে সেই যৌন চেতনাই ভিন্নলিঙ্গাভিমুখী হয়।

সুতরাং শৈশবকাল থেকেই শিশুদের মনের এই যৌনজিজ্ঞাসার সমাধান কোন্ পথে সম্ভব—বর্তমানে এ বিষয়ে পরীক্ষার অন্ত নেই। শিশুদের কি ভাবে যৌনশিক্ষা দেওয়া সম্ভব এবং তা দিলে কতদূর সুফল পাওয়া সম্ভব—এগুলিও আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু। এই আলোচনার সমাধান দেখিয়ে যৌন-তত্ত্ববিদ্ Havelock Ellis বলছেন: "Do not conceal, but tell them frankly about sex, sexual-side of marriage, sexual copulation and conception and you will find them all right."

শিশুদের মনে যৌনচেতনাই যে কেবল প্রবল থাকে তাই নয়। বিভিন্ন তথ্যাদি অনুসন্ধান এবং প্রজ্ঞানের দ্বারা জানা গেছে যে, শিশুরা তাদের যৌনচেতনাকে সুযোগ পেলে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগে দ্বিধা করে না। এলিস্ মহাশয় তাঁর 'Psychology of Sex' নামক গ্রন্থে লিখেছেন: Crucial cases occur in which the child innocently led away by another child or grown up adult who gives assurance that friction will favour the development of penis in size."

ছেলেবেলা থেকেই শিশু অথবা বালকদের মনে একটি অন্যতম প্রশ্ন জাগে: 'আমি এলাম কোথা থেকে?' পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন প্রশ্নটি মোটেই দার্শনিক নয়। বাহ্যত: এবং মূলত: এই প্রশ্নকেই যৌনজিজ্ঞাসা বলা যেতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে আমি অনেক বাবা-মাকে বলতে শুনেছি: 'তোমাকে ভগবান পাঠিয়েছেন!' কথাটি যে কতদূর গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয়, সে তর্কের অবতারণা করতে আমি চাই না। কিন্তু একটা কথা আমি আপনাকে বলব যে, সন্তানের জনক বা জননী হিসেবে আপনি তার কাছে একটি মারাত্মক অপরাধ করলেন। কারণ শৈশব অতিক্রম করে আপনার সন্তান যখন যৌবনে উপনীত হবে, তখনই সে বুঝবে কতবড় মারাত্মক ভুলের শিক্ষায় তাকে আপনি শিক্ষিত করেছেন।

গ্রীক কমিটি 'Knowledge of Sex' নামক প্রবন্ধে যে তথ্য উল্লেখ করেছেন, তা পড়লেই পাঠকগণ বুঝতে পারবেন উপযুক্ত যৌনশিক্ষার অভাবে শিশুরা কেমনভাবে বিকৃত পথে চালিত হয়। ঐ প্রবন্ধের কয়েকটি লাইন: "Had not these healthy tenderaged small schoolboys admitted the fact of their sexual intercourse with girls, could hardly be believed that these nice, mild and good behaved boys had any sexual knowledge or that they could ejaculate semen."

একটি বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করে মনস্তত্ত্ববিদ্ ডা: নগেন্দ্রনাথ দে তাঁর 'গোড়া কেটে আগায় জল' নামক প্রবন্ধে ঐ একই কথা প্রমাণ করেছেন। ঘটনাটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে: "···মেয়েটি সুন্দর দেখতে বলে তার সাত আট বছর বয়স থেকেই তাকে আর কোন ছেলের সঙ্গেই খেলতে দেওয়া হত না। দশ-এগারো বয়স হতেই তার ছাদে ওঠা, জানালায় দাঁড়ানো, স্কুলে যাওয়া প্রভৃতি হ'ল বন্ধ। কারণে অকারণে তাকে মা-বাবার কাছ থেকে শুনতে হতো—তুই প্রেম করছিস্। এমন কি, বাড়ীর চাকরের সঙ্গে কথা বলাও তার হলো বারণ। প্রেম যে কি বস্তু, মেয়েটি তখন বুঝতো না। তবে মা-বাবার ব্যবহারে সে এইটুকু বুঝেছিল যে, প্রেম করতে হয় পুরুষের সঙ্গে। ফলে বার-তেরো বছর বয়সেই দুপুর বেলা মা'র বিশ্রামের সুযোগ নিয়ে তার প্রথম প্রেম শুরু হলো বাড়ীর চাকরের সঙ্গেই। প্রথম আলিঙ্গনে ও চুম্বনে সৃষ্টি হলো তার যৌন-উত্তেজনার। মেয়ে বুঝলো—প্রেম করা কি জিনিস। লখীন্দরের লৌহবাসর হলো ফুটো—মেয়ে খুঁজতে লাগলো পুরুষ। ব্যাপারটা জানাজানি হতেই বাপ-মা হলেন আরও কড়া। মেয়েকে শাস্তি দিয়ে বন্ধ করলেন ঘরের মধ্যে।

প্রেম করার বদনাম আগেই সে তা না করেই পেয়েছে। তাই লাঞ্ছনা ও শাস্তিতে আর ভয় রইলো না। ঘরের জানালা খুলে সে পাশের বাড়ীর ছেলেকে আকর্ষণ করলো তার রূপ দিয়ে। ফলে সে বুঝে নিল তার দেহের দাম!"···

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন বর্ণিত মেয়েটির জীবনে ব্যর্থতার মূলে আছেন তাঁর বাবা-মা'ই! কারণ বালিকাটিকে যদি যৌন-জীবনের প্রকৃত ঘটনা বুঝিয়ে দেওয়া হত, তাহলে আর সে বিপথে যেত না। ছেলে মেয়েদের যথার্থ যৌনশিক্ষার অভাবে তারা কিভাবে ভুল বুঝে থাকে Dr. Margaret Mid ও Kense তাঁদের "Psychology of lust" নামক গ্রন্থে তার কারণ নির্দেশ করে বলেছেন: "সমাজ জীবনের যৌন আচরণ, অসংযত পিতামাতা বা বয়স্কদের যৌন-জীবন, নগ্ন দেহের প্রচার-পত্র, অবৈধ মেলামেশা ইত্যাদি। হ্রদ বা জলাশয়ে সন্তরণ শিক্ষাকালে মেয়েরা ছেলেদের নগ্ন পেশীবহুল লিঙ্গ এবং স্বল্প সন্তরণ-পোষাকের মধ্য দিয়ে ছেলেদের যৌনাঙ্গ মেয়েরা দেখে। আবার স্বচ্ছ পাতলা সন্তরণ-পোষাকের মধ্য দিয়ে মেয়েদের দেহ দর্শনে ছেলেদের মধ্যে যৌনক্ষুধা জাগিয়ে তোলে।"···তাই যৌনবিজ্ঞানীরা মনে করেন শৈশবাবস্থা থেকেই শিশুদের মধ্যে যৌনশিক্ষা দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আর তা যদি না দেওয়া হয়, তাহলে তাদের মন বিষাক্ত হয়ে যায় এবং নবোদ্ভূত কামনা চরিতার্থ করার জন্যে তারা সঙ্গোপনে অবৈধ রতি-জীবন গ্রহণ করে। এবং ভবিষ্যতে তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়। তাই মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টির অনুসরণে যৌনশিক্ষা শিশুদের জন্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়—অভিভাবক এবং শিক্ষকদের এই তথ্য মেনে চলা উচিত। আর তা মেনে চললে আমরা ভবিষ্যতে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজে বাস করতে পারব।
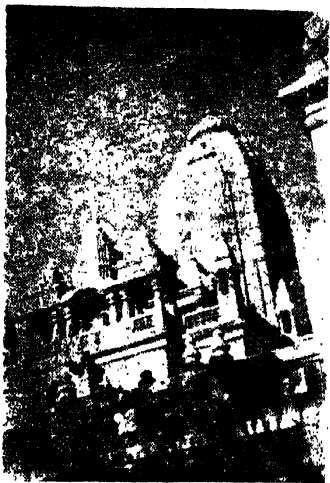
বিড়লা মন্দির, দিল্লী

দক্ষিণেশ্বর মন্দির
—তারাজ্যোতি রায়চৌধুরী
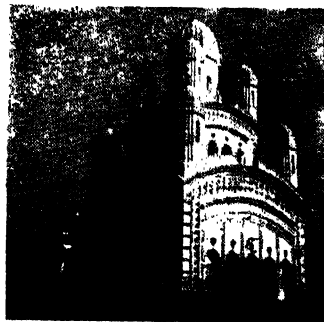
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান
— সুখেন্দু পোড়েল

পাঠ

—দীপালী দত্তচৌধুরী

লিখন

—দেবপ্রিয় দত্ত

জানালা

—স্বদেশ ঘোষ

নববধূ

—প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অ বা ক

—শ্রীমতী জানা দে

—বিমল ঘোষ
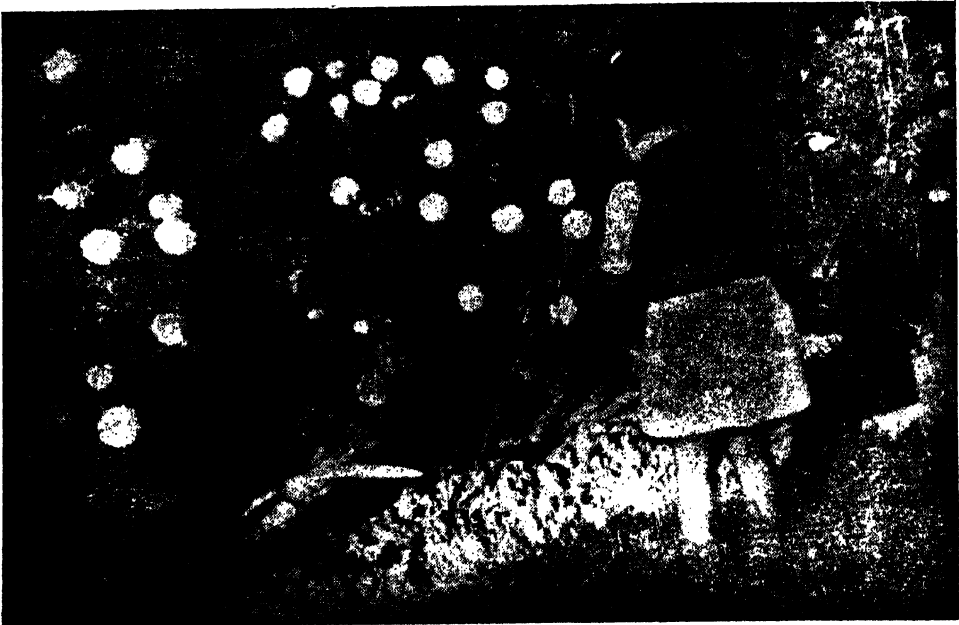
চয়ন

—এস, এম, হায়দার

গাঁয়ের মেয়ে

—নিতু সরকার

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

চার

[ক]

নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি হরনাথের দৃষ্টি সুলোচনার মুখের উপর থেকে ঘুরে গিয়ে পড়ে অদূরে ঘরের মেঝেতে উপবিষ্টা ক্ষীরোদার 'পরে এক সময় আবার।

মাথার এলায়িত কেশ খানিকটা বুকের 'পরে খানিকটা পৃষ্ঠের 'পরে ছড়িয়ে পড়েছে, সমস্ত মুখটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

কারো মুখে কথা নেই তিনজনেই নির্বাক।

ক্ষীরোদাই শেষপর্যন্ত এক সময় গায়ের খলিত আঁচলটা কোন মতে বুকের উপর টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবং টলতে টলতে ঘর থেকে বের হ'য়ে গেল।

হরনাথের আকস্মিক পদাঘাতটা ক্ষীরোদাকে যতখানি না আহত করেছিল তার চাইতেও বেশী বুঝি আহত করেছিল তার মনকে।

হরনাথের কাছ থেকে এতবড় একটা লজ্জাকর আঘাত কোন দিন আসতে পারে, এ বুঝি তার চিন্তারও অতীত ছিল।

এবং আঘাত পেয়ে ছিটকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরোদা বুঝতে পেরেছিল ওখানকার ঘর তার ভেঙ্গেছে চিরদিনের মতই।

ঘর থেকে বের হয়ে মুহ্যমানের মতই সোজা আঙ্গিনা অতিক্রম করে ক্ষীরোদা সদর দরজা খুলে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। এবং অন্ধকার জনহীন রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে হতাশা, লজ্জা ও অপমানের যে জ্বালাটা এতক্ষণ তার সমস্ত মনটাকে পুড়িয়ে খাঁক্ করে দিচ্ছিল সেইটাই যেন অশ্রুর আকারে দর-দর ধারায় তার দুই চক্ষুর কোল বেয়ে ঝরে পড়তে লাগল।

অবিরল অশ্রু ধারায় তার দুই চক্ষুর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় কিন্তু তবু সে চলতে থাকে। কিন্তু কোথায় যাবে সে।

সংসারে একমাত্র আপনার জন মাসী, এককালে যে তাকে বুকে পিঠে করে আপন সন্তানের মতই মানুষ করেছিল এবং যে মাসীই একদিন তার বিবাহ দিয়ে ঘর বেঁধে দিয়েছিল, আবার যে মাসীই বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যেই বিধবা হয়ে ফিরে এলে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল, সেই মাসীকেই না মাত্র কয়েকদিন আগে উঁচু গলায় যা নয় তাই শুনিয়ে দিয়ে চলে এসেছিল, সেই মাসীর ঘরেই ফিরে যাবে কোন লজ্জায়।

মাসী যখন বলবে, কেমন মিনষের বুঝি দু'দিনেই সখ মিটে গেল, লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলে।

কি জবাব দেবে সে তখন।

না, না—তার চাইতে গঙ্গার জলেই ডুবে মরবে।

সত্যিই তো মা গঙ্গা ছাড়া তার আজকের এত বড় লজ্জা আর অপমানকে কে ঢেকে দেবে? হ্যাঁ, কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, কোন কিছুই বলবার প্রয়োজন হবে না। সোজা গিয়ে সেই ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ডুব দিয়ে তলিয়ে যাবে সে। সকল অপমান, সকল বেদনা, সকল লাঞ্ছনা—সমস্ত জ্বালা তার জুড়াবে।

ক্ষীরোদা ঘুরে গঙ্গার ঘাটের দিকেই হাঁটতে শুরু করে। হন হন করে গঙ্গার ঘাটের দিকে এগিয়ে চলে।

মা গঙ্গা, তুমি আমায় নাও মা, তুমি আমায় নাও।

কিন্তু গঙ্গার ঘাটে এসে একেবারে জলের ধারে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ক্ষীরোদা।

গঙ্গায় যেন জোয়ার এসেচে।

জোয়ারের স্ফীত জলধারা ছল ছল শব্দে এসে পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে যায় ক্ষীরোদার। এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটা যেন শিউরে ওঠে অকস্মাৎ ক্ষীরোদার।

অন্ধকার রাত্রি।

নিশ্ছিদ্র কালো অন্ধকার যেন ভয়াবহ একটা দুঃস্বপ্নের মত পরিদৃশ্যমান বিশ্বচরাচরকে বিরাট একটা হাঁ করে কুক্ষিগত করে ফেলেছে।

মাথার উপরে নিরালম্ব নক্ষত্রখচিত কালো আকাশ আর পায়ের নীচে গঙ্গার জোয়ার-স্ফীত জলরাশি। কেবল একটি মাত্রই শব্দ শোনা যায় কল-কল ছল-ছল।

মৃত্যু। মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দেবার জন্যই তো ছুটে এসেছিল ক্ষীরোদা আর সেই মৃত্যুর সামনা সামনি দাঁড়িয়ে এমন করে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল কেন।

সমস্ত শরীরটা সহসা অমন করে শিউরে উঠলো কেন? না, মরতেই তো ছুটে এলো ক্ষীরোদা গঙ্গার ধারে, তবে কিসের [illegible]। এগিয়ে যায় ক্ষীরোদা মন শক্ত করে জলের মধ্যে। উপর উপবিষ্ট পোড়ালী, হাঁটু পর্যন্ত জল। ক্রমশঃ আরো-আরো ও কথা বলতে অতলান্ত ডুব জল।

কিন্তু সুলোচনা—

রাত শেষ হয়ে এলো—যাও বাইরে গিয়ে মুখে হাতে জল দিয়ে এসে শুয়ে পড়।

হরনাথ আর কোন কথা বললে না।

পালঙ্ক থেকে নেমে বাইরে চলে গেল।

সুলোচনা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো।

চোখে মুখে জল দিয়ে ঘরের মধ্যে ফিরে এসে বস্ত্র পরিবর্তন করে হরনাথ সোজা গিয়ে ঘরের কোণে আসন পেতে বসল।

ওকি! আবার ওখানে গিয়ে বসলে কেন?

ঘুম আর আসবে না চোখে আজ আমার। তুমি যাও শোও গিয়ে।

সুলোচনা আর দ্বিরুক্তি করে না, ঘর থেকে বের হ'য়ে যায়।

পাশের ঘরে এসে প্রবেশ করলো সুলোচনা।

ঘর অন্ধকার।

অন্ধকারেই যে শয্যায় সুনয়না নিদ্রা যাচ্ছিল সেই শয্যায় গিয়ে বসল।

বড়মা!

চমকে ওঠে যেন ভূত দেখার মতই অন্ধকারে সুনয়নার কণ্ঠস্বরে সুলোচনা, কয়েকটা মুহূর্ত তার কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দ পর্যন্ত নির্গত হয় না।

তারপর এক সময় যেন চাপা কণ্ঠে কোন মতে শুধায়, তুই জেগে নয়না।

হ্যাঁ, বড়মা—অনেকক্ষণ থেকেই তো আমি জেগে আছি।

সুলোচনার বুঝতে আর কিছুমাত্র বাকী থাকে না, পাশের ঘরে যা কিছু ঘটেছে তার কিছুই অবিদিত নেই সুনয়নার।

সুনয়না সব কিছু জেনেছে।

ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ পরে সুলোচনা সুনয়নার গায়ে একখানি হাত রাখে নিঃশব্দে। আর কোন কথাই তার মুখ থেকে বের হয় না।

সুনয়না হাত বাড়িয়ে সুলোচনার হাতটা মুঠো করে অন্ধকারেই চেপে ধরে। সে যেন আজ সুলোচনার মধ্যেই আশ্রয় খুঁজছে।

সুলোচনার হাতটা ধরেই যেন সে আজ বাঁচতে চায়।

সুলোচনা নিঃশব্দে বসে থাকে। আর তার দু চোখের কোল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে নামতে থাকে।

[ক্রমশঃ

বিস্মরণে

সবিতা রায়চৌধুরী

তোমারে আমি,
গিয়েছি ভুলে।
দিবস-যামী,
স্মৃতির কূলে,
জাগে না আর, কাঁদনরোল
শুকায়ে গেছে সবি।
আপন মনে
স্বপন ভরে,
বিরল ক্ষণে,
যতন করে'
ব্যর্থ শত কল্পনাতে,
আঁকি না সুখছবি।
সে রূপমধু
গিয়েছি ভুলে,
যা স্মরি, বঁধু
উঠিত দুলে
জীবন মম, মরণ মম,
প্রণয় পারাবার।
সুঠাম, শ্যাম
তরুণ তনু
ভ্রুকুর বাঁকা
পুষ্পধনু
দীঘল আঁখি, নিতল কালো,
পড়ে না মনে আর।

পড়ে না মনে,
তোমার হাসি।
নিভৃত ক্ষণে
কথার রাশি,
মুগ্ধ দিঠি, আবেশে ঘন
পরশসুধা সেই,
আঁকিত তব
আশার বাণী,
রঙীন নব
স্বপনখানি,
মিথ্যে সেই মোহন ছবি
আজ তো মনে নেই!
গিয়েছি ভুলে,
সত্য এ কি?
হৃদয় দুলে'
উঠিছে দেখি!
মুছিল কি গো ব্যথার কালি
ঘুচিল গ্লানি লেশ?
ঘুম না আসা
কত না রাতে
অশ্রুভাসা,
আঁখির পাতে
ভোলার সেই কঠোর তপ,
আজি কি হল শেষ?

(Alibi অবলম্বনে)

ড্যাফ্‌নে ডু মরিয়ের

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

২

মেয়েটি শিল্পীর সরঞ্জামের কথা তুলে ভালই করেছিল। পরদিন বিকেলে খালি হাতে এসে উপস্থিত হ'লে কি বোকাই না দেখাত। এইসব টুকিটাকি কিনতে এমনিতেই তাড়াতাড়ি আফিস থেকে কাটতে হয়েছে। একেবারে দড়িছাড়া ভাব এসে গেছে। ইজেল, ক্যানভাস, অসংখ্য রং-এর টিউব, তুলি, টারপেনটাইন,—ভেবেছিল ছোটখাট প্যাকেট কটা হবে,—কিন্তু শেষে এমন দাঁড়াল যে, ট্যাক্সি ছাড়া নেবার উপায় রইল না। সব মিলিয়েই দারুণ উত্তেজনার ব্যাপার হ'ল। নিজের দিকটা তাকে ভালভাবেই উৎরে দিতে হবে। খদ্দেরের তাড়ায় দোকানের এসিস্টেণ্ট ছেলেটি একটার পর একটা রং ধরে দিতে লাগল; ইতিমধ্যে ফেনটন রং-এর নামগুলোর সঙ্গে পরিচয় করে নিল। এই কেনাকাটার মধ্যে দারুণ একটা আনন্দের ব্যাপার পেয়ে রাশ ছেড়ে দিয়ে সে বাজার করল; মাথার মধ্যে ক্রোম, সিনা, টেরেভার্টে—নামগুলো নেশা ধরিয়ে দিল। শেষ অবধি জোর করে লোভ সামলে জিনিষপত্র নিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে বসল। ৮নং বেণ্টিং স্ট্রীট, চিরপরিচিত নিজের স্কোয়ারের বদলে এই অনভ্যস্ত ঠিকানা কেমন যেন রহস্য ঘন হয়ে ওঠে। আশ্চর্য, ট্যাক্সিটা নির্দিষ্ট জায়গার কাছাকাছি আসতে বাড়িগুলো আর তেমন বিশ্রী লাগল না। গত দিনের জলো হাওয়াও নেই, মাঝে মাঝে রোদ উঠছে, তা ছাড়া আগামী এপ্রিলের লম্বা দিনগুলোর আভাস আছে বাতাসে। কিন্তু শুধু তাই নয়। আট নম্বর বাড়িটা যেন কিসের প্রতীক্ষা করে আছে। ড্রাইভারকে টাকা দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে নেমে দেখে অন্ধকার খড়খড়িগুলোর জায়গায় বিকট দৃষ্টিকটু কমলা রং-এর পরদা ঝোলানো হয়েছে। সেদিকে চোখ পড়তেই পরদা সরে গেল, একমুখ জ্যাম-মাখা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে মেয়েটি তাকে হাত নেড়ে আহ্বান জানায়। বেড়ালটা জানলার ওপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে গর গর করতে করতে এসে ঘাড় বাঁকিয়ে তার প্যাণ্টের পায়ে গা ঘষতে থাকে। ট্যাক্সি চলে গেল, মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এল।

মুখে বলল,—"আমি আর জনি সারা বিকেল ধরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। আপনার সব জিনিস কি এই—ব্যাস্?"

"সব! কেন কম হ'ল নাকি?"—হেসে উঠল ফেন্টন। সিঁড়ি বেয়ে নিচের ঘরে জিনিসপত্র নিয়ে যাবে বলে এগিয়ে এল মেয়েটি। রান্না ঘরের দিকে চোখ পড়তে দেখা গেল, পরদা ছাড়াও পরিষ্কার করার একটা চেষ্টা হয়েছে বটে। বাচ্চার খেলনা সমেত জুতোগুলো দেওয়াল আলমারির নিচে অন্তর্হিত হয়েছে। টেবিলের ওপর চায়ের জন্য একটা টেবিল-ঢাকাও শোভা পাচ্ছে।

মেয়েটি বলে,—"আপনার ঘরে যে কি পরিমাণ ধুলো ছিল, সে আর বলা যায় না। প্রায় মাঝে রাত অবধি আমি ও-ঘর নিয়ে হিমসিম্ খেয়েছি।"

সে জবাব দেয়,—"তার কোন দরকার ছিল না, ক'টা দিনের জন্যে এত কিছু লাগত না।"

দোরগোড়ায় থমকে থেমে গেল মেয়েটি, সেই পুরনো বোকার মতো ভাব নেমে এল মুখের ওপর,—"তাহ'লে আপনি বেশী দিন থাকবেন না?" আমতা আমতা করে,—"আপনার গতকালের কথা থেকে ভেবেছিলাম, আপনি বেশ কিছুকাল থাকবেন।"

"ওঃ না সে কথা বলিনি" তাড়াতাড়ি সংশোধন করে নেয় সে—"আমি—এত রাজ্যের রং নিয়ে আমি যা কাণ্ড করব, তার জন্যে এত খাটনি পোষায় না।"

মেঘ কেটে গেল। মৃদু হেসে দরজা খুলে দিল মেয়েটি,—"আসতে আজ্ঞা হয় মিঃ সিমস।"

যার যা ন্যায্য পাওনা, তাকে তা দেওয়া উচিত নিশ্চয়ই। মেয়েটি খেটেছে বটে। ঘরের চেহারা পালটে গেছে। গন্ধটাও বদলেছে। আর গ্যাস নয়, কারবলিক কিম্বা ঐ জাতীয় বিশুদ্ধ করার অন্য কোন ওষুধ।

জানলা থেকে ব্ল্যাকআউট আমলের টুকরোগুলো দূর হয়েছে। এমনকি মিস্ত্রী ধরে জানলার ভাঙ্গা কাঁচটা পর্যন্ত মেরামত করা হয়েছে। মার্জার-শয্যা প্যাকিং-বাক্সটা না পাত্তা। দেওয়াল ঘেঁষে একটা টেবিল, দুটো নড়বড়ে চেয়ার, বিকট কমলা রং-এর কাপড় ঢাকা একটা আরাম চেয়ার দিয়ে ঘরটা সাজানো হয়েছে। গতকাল চুল্লীর ওপরের তাকটা শূন্য ছিল, সেখানে মস্ত বড় জমকালো রং-এ আঁকা ম্যাডোনার মাতৃমূর্তি সাজানো হয়েছে। ঠিক তার নিচে একটা ধর্মপঞ্জিকা শোভা পাচ্ছে। ম্যাডোনার শান্ত, সান্ত্বনা মাখা চোখ দুটি ফেনটনের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

এখন এ দুনিয়ায় যে মেয়েটির মেয়াদ আর বড় জোর একটা দুটো দিন, নিজের জন্যে তাকে এমন কষ্ট স্বীকার করতে দেখে ফেনটনের মুখের কথা আটকে গেল। মনের ভাব গোপন করার চেষ্টায় প্যাকেটগুলো খুলে ফেলতে ফেলতে বলল, "সত্যি এ কি ব্যাপার!"

"মিঃ সিমস আমি আপনাকে সাহায্য করি, কেমন?" বাধা দেবার আগেই মেয়েটি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কাগজের মোড়ক খুলে দড়ির ফাঁস জড়িয়ে ইজেলটাকে জায়গামতো বসিয়ে দিল। তারপর দুজনে মিলে যাবতীয় রং-এর টিউব বের করে টেবিলের ওপর সারবন্দী করল, ক্যানভাসগুলো দেওয়ালে হেলিয়ে ফেলল। অদ্ভুত যেন এক খেলায় মেতে গেছে, এমনি মজা লাগছে, অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে মেয়েটি এই কাজের মধ্যে ডুবে গেছে।

সব গোছানো হ'লে, একখানা ক্যানভাস ইজেলে চড়ানো হবার পর

মেয়েটি প্রশ্ন করে—"প্রথমে কি ছবি আঁকবেন ? নিশ্চয় মনে মনে একটা বিষয় ভেবে নিয়েছেন।"

"তা-তো বটেই।" জবাব দেয় সে,—"একটা বিষয় আমার ঠিক করা আছে।" বলে হাসতে শুরু করে,—মেয়েটিও পরিপূর্ণ বিশ্বাসে তার দিকে চেয়ে হাসতে থাকে,—"আমি জানি, আমি আপনার মনের কথা জেনে ফেলেছি।"

সে তো আঁতকে ওঠে, কি করে তা' সম্ভব ? মেয়েটি বলে কি ? চড়া গলায় বলে সে,—"কি আন্দাজ করেছ তুমি ?"

"আমার ছেলে জনি—তাই না ?"

কি করে মায়ের সামনে ছেলেকে খুন করা যায় ? কি অদ্ভুত প্রস্তাব ! আর কেনই বা মেয়েটা এমন ভাবে তাকে ঐ নৃশংস ব্যাপারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এখনও তার সময় হয়নি। এখনও মনই স্থির করা যায়নি।

মেয়েটি বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে চলেছে, জোর করে মনটাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে হয়। ওমা ! ও' তো শুধু ছবির কথা বলছে।

"বাস্তবিক, বুদ্ধি আছে তোমার। হ্যাঁ জনিই আমার প্রথম ছবির বিষয়।"—উত্তর করে ফেনটন !

মেয়েটি খুশি হয়ে ওঠে,—"ও খুব লক্ষ্মী ছেলে, নড়বে না মোটেই, দড়ি দিয়ে বেঁধে দেব আমি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকবে চুপ করে। এখনি দেব ?"

"না, না," ফেনটন চেপে যায়, "আমার তাড়া নেই মোটেই, প্রথমে আমায় সবটা ভেবে নিতে হবে।"

মেয়েটির মুখটা শুকিয়ে গেল। হতাশ হ'ল নিশ্চয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘরটাকে কেমন ষ্টুডিও বানিয়ে ফেলেছে—মাথা ঘুরিয়ে তাই দেখতে লাগল বেচারী।

"তাহ'লে আগে আপনাকে চা দিই।"

কথা বাড়াতে চায় না ফেনটন, তাই তার পেছন পেছন রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে, মেয়েটি তার দিকে চেয়ার এগিয়ে দিতে, সেখানে বসে চায়ের সঙ্গে বক্রিল-স্যাণ্ডউইচ খেল। ছেলেটা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে।

হঠাৎ শব্দ করে ওঠে বাচ্চাটা—'ডা', আর সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

"পুরুষ মানুষদের ও ডা বলে, যদিও বাপ মোটে আমল দেয়নি ওকে। মিঃ সিমস্ কিছু মনে করবেন না। জনি—।"

ফেন্টন্ ভদ্রতা করে হাসল। বাচ্চাদের ও' ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না। বক্রিল-স্যাণ্ডউইচ আর চা'য়ে ডুবে রইল সে।

মেয়েটি নিজের পেয়ালার চা'টা নাড়তে নাড়তে ঠাণ্ডা, অখাদ্য করে তুলল। শেষে বলে,—"কথা বলার লোক পেলে বেশ লাগে। জানেন মিঃ সিমস্ আপনি আসার আগে পর্যন্ত আমি একলা ছিলাম—এই খালি বাড়ি, কোন লোক কাজ করতে আসে না ! এ পাড়াটাও ভাল নয়, আমার বন্ধু কেউ নেই।"

অতি উত্তম কথা মনে হয় ফেন্টনের। মেয়েটা মরলে কেউ খোঁজ নেবে না। বাড়িতে লোকজন থাকলে ব্যাপারটা জটিল হ'তে পারত। এখনকার ব্যবস্থায় দিনের যে কোন সময়ে কাজ সেরে রাখা যাবে, কেউ টেরও পাবে না। বেচারী, ছাব্বিশ, সাতাশের বেশী বয়স হবেনা, কি জীবনটাই না কাটাচ্ছে ! কোন কথা না বলেই সে চলে গেছে। মেয়েটি বলে চলেছে। "এদেশে মাত্র তিন বছর হ'ল এসেছি, কাজের সন্ধানে জায়গায় জায়গায় ঘুরেছি, ঠিক মতো চাকরি জোটেনি। একবার ম্যানচেষ্টারে ছিলাম, জনি সেখানেই জন্মেছে কিনা।"

সহানুভূতি ফুটিয়ে তোলে সে,—"বিশ্রী জায়গা বৃষ্টির বিরাম নেই।"

সে তখনও বলে চলেছে,—"তোমায় চাকরি নিতেই হবে।" টেবিল চাপড়ে পুরনো দিনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে এ্যান্।

আমি বললাম,—"এভাবে চলতে পারে না, আমার বা শিশুর এভাবে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। মিঃ সিমস্, কি বলব আপনাকে—আমাদের ঘরভাড়া দেবার মতো সামর্থ্যটুকুও' ছিল না। বাড়িওয়ালা হাঁক ডাক করলে আমি কি তার জবাব দেব বলুন। তাছাড়া বিদেশী বলে পুলিশও পেছন ছাড়ে না।

চমকে ওঠে ফেনটন,—"পুলিশ।"

সে বোঝায়,—"কাগজপত্রের ব্যাপার আর কি ? আমাদের পাসপোর্ট নিয়ে সে কি হুজ্জুতি বাবাঃ। আপনি তো জানেন আমাদের কত রকমই না সইপত্তর লাগে। মিঃ সিমস সুখের মুখ দেখিনি কোনদিনও। অষ্ট্রিয়াতে এক বদ লোকের কাছে চাকরি করতাম। পালালাম একদিন। মাত্র ষোল বছর বয়সে আমার স্বামীর—তখনও অবশ্য আমার স্বামী হয়নি—সঙ্গে দেখা হ'ল। ভাবলাম ইংলণ্ডে গেলে হয়তো একটা ব্যবস্থা হতে পারে।"

ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে চা নাড়তে নাড়তে বলে চলেছে সে। জার্মাণ টানে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করা কথাগুলোর মিষ্টি একটা সুর আলমারির ওপর রাখা এলার্ম ঘড়ির টিক্-টিক্ শব্দ, বাচ্চাটা প্লেটের ওপর একটানা ঠক্ ঠক্ করে চলেছে—তার শব্দ, সব মিলিয়ে তার চিন্তা ধারার সঙ্গে বেশ একটা তাল মিলে যাচ্ছে। অফিসের চিন্তা নেই, বাড়ির ভাবনা নেই, মিঃ সিমস এক সুদক্ষ শিল্পী, ছবি আঁকায় না হলেও, সুচিন্তিত অপরাধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তো বটেই। নিশ্চিন্ত মনে এখানে বসে আছে আর তার শিকার তাকেই ত্রাণকর্তা ভেবে তারই হাতে পরম নিশ্চিন্তে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। ধীরে উচ্চারণ করে সে—"আশ্চর্য গতকাল আমি আপনাকে চিনতাম না, আর আজ আমার জীবনের সবটুকু আপনার কাছে বলে ফেললাম। আপনি আমার বন্ধু।"

তার শীর্ণ হাতের ওপর হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয় সে—"তোমার বিশেষ বন্ধু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।" হেসে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

পেয়ালা পিরিচ নিয়ে বাসন মাজার জায়গায় নামিয়ে রেখে নিজের জামার হাতায় বাচ্চার মুখ মুছিয়ে দিয়ে মেয়েটি বলে,—"আচ্ছা মিঃ সিমস আপনি কোনটা আগে চান ? জনির ছবি আঁকবেন ? না—আগে শুতে আসবেন ?"

ফেনটন এবার ভাল করে তার দিকে তাকায়, "শুতে আসবেন ? শুনতে ভুল হয়নি তো ?"

"কি বললে ?" জিজ্ঞেস করে নেয়।

সে এগিয়ে আসবে বলে মেয়েটি ধীরভাবে অপেক্ষা করে থাকে। মেয়েটি আবার বলে, "মিঃ সিমস আপনার চাইবার অপেক্ষামাত্র। আমার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। আমি আপনার সেবা করতে প্রস্তুত।"

প্রথমে ঘাড়, তারপরে মুখ, সবশেষে কপাল পর্যন্ত টুকটুকে লাল হয়ে উঠছে, দিব্যি অনুভব করা যায়। সন্দেহের অবকাশ নেই। বুঝতে ভুল হয়নি, ঐতো ঠোঁটের পাশে হাসির রেখা ফুটি ফুটি করছে—মাথাটা শোবার ঘরের দিকে হেলান। হতভাগিনী তাকে কিছু দিতে চায়, ভদ্রলোক যে নেবেই, নিতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক এ বিশ্বাস তার বদ্ধমূল—কি জঘন্য ব্যাপার!

"প্রিয় মাদাম কোফম্যান"—সে শুরু করে; 'মিসেস' এর চেয়ে 'মাদাম'টা শোনায় ভাল, তার বিদেশী সত্তার সঙ্গে মেলেও ভাল।—"কোথাও মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে।"

বিব্রত গলায় সে প্রশ্ন করে,—"কি বললেন? ভয় পাবার কিছু নেই, এদিকে কেউ আসবে না, আমি জনিকে বেঁধে রাখব।"

কি কুৎসিত পরিস্থিতি! বাচ্চাটাকে বেঁধে রেখে···এ পর্যন্ত তার সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছে তা' থেকে এমন একটা জিনিস ভেবে নেবার তো কোন কারণ হয় নি। কিন্তু তবু এ ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক, তেমনি মেজাজ দেখিয়ে বেরিয়ে গেলে তার সব মতলব ভেস্তে যাবে। আবার কোথাও ঘাঁটি গাড়তে হবে।

"মাদাম কোফম্যান, তোমার উদ্দেশ্য সাধু, আমি মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু বৎসর ধরে, সেই যুদ্ধের আমল থেকে আমি অশক্ত। বহুকাল হ'ল আমার জীবন থেকে এ জাতীয় আনন্দ ঝেড়ে ফেলতে হয়েছে। বস্তুতঃ আমার সমস্ত উদ্যম আমি ছবি আঁকায় ঢেলে দিয়েছি, বর্তমানে আমার এই একমাত্র আনন্দ। কাজেই এই নিরিবিলি আস্তানাটুকু পেয়ে পরম শান্তি লাভ করেছি, আমার দুনিয়া বদলে গেছে। তাছাড়া আমরা এখন বন্ধু···"

বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাবার আশায় সে কথা হাতড়াতে থাকে। মেয়েটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে কথাটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে।—"আমি ভাবলাম হয়তো আপনিও একা। আমি জানি একা হওয়ার কি শাস্তি। তাছাড়া আপনি এত ভাল। যদি কখনও প্রয়োজন বোধ করেন···"

চট্ করে উত্তর দিয়ে দেয় ফেনটন—"সে আরও বলতে! সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমায় জানাব। সেটা কোন কথাই নয়। কিন্তু হায় ভাগ্য বিমুখ। আচ্ছা এবার তাহলে কাজে বসা যাক, কাজ শুধু কাজ।"

মৃদু হেসে হঠাৎই ব্যস্ততার ভান করে রান্নাঘরের দোর খুলে দেয়। মেয়েটা সোয়েটারের বোতাম খুলে ফেলেছিল, আবার লাগিয়ে নিল দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বাচ্চাটাকে চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে মেয়েটি তার পিছু নেয়। মুখে বলে,—"কাজের সময় শিল্পীকে দেখার সাধ আমার বহু পুরণো, এতদিনে আমার সে সুযোগ হল। জনি, বড় হয়ে দেখে কত খুশি হবে। মিঃ সিমস্ ওকে কোথায় বসাই। বসবে না দাঁড়াবে? কোন্‌টা ভাল হবে?

জ্বালালে দেখছি; তপ্ত কড়া থেকে সোজা আগুনের ভেতর! ফেনটনের দম ফুরিয়ে এল। মেয়েটা তো বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। এভাবে চারপাশে ঘুর ঘুর করতে দেওয়া হবে না কিছুতেই। ছেলেটাকে ঘাড় থেকে নামাতে হ'লে মা'টাকে আগে বিদেয় করতে হবে।

এবার একটু চড়া সুরেই বলে,—"কি ভাবে আঁকব, দাঁড় করিয়ে, না বসিয়ে, তা দিয়ে তোমার কি দরকার? আমি তো ছবি তুলছি না। তাছাড়া কাজের সময়ে কেউ দেখে—এ আমার সহ্য হয় না। ঐ চেয়ারে জনিকে বসিয়ে দাও, আশা করি ও চুপ করে বসে থাকবে।"

"আমি ষ্ট্র্যাপটা নিয়ে আসি"—বলে সে রান্নাঘরে চলে যেতে ফেন্‌টন্ ক্যান্‌ভাস আর ইজেলের দিকে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। এটা ঠিক যে, কিছু একটা আঁকতেই হবে। এমনি রাখা বিপজ্জনক। মেয়েটা বুঝবে না, নিশ্চয় কিছু গণ্ডগোল হয়েছে বলে ধরে নেবে। হয়তো মিনিট পাঁচেক আগের প্রস্তাবটা আবার ঝালিয়ে নেবে।

দু' একটা টিউব তুলে নিয়ে প্যালেটের ওপর খানিক-খানিক রং বের করে নিল। র' সিনা, নেপল্‌স-ইয়েলো নামগুলো কি সুন্দর! বহুকাল আগে বিয়ের পরেই সে আর এড্‌না সিনায় গিয়েছিল একবার। দুঃখের বিষয় তারপরে আর বেরোন হয়নি, বোকার মত প্রত্যেকবার ওরা স্কটল্যাণ্ডে যায়—এড্‌না গরম বিশেষ পছন্দ করে না। এজিওর ব্লু বলতে চোখের সামনে সবচেয়ে গাঢ় পরিষ্কার নীল-রং-এর ছবি ভেসে ওঠে। দক্ষিণ সাগরের হ্রদগুলো, উড়ুক্কু মাছ। প্যালেটের ওপর থ্যাবড়ানো সব রং কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

ফেন্‌টন মুখ তুলে চায়,—"জনি এবার লক্ষ্মী ছেলে হও।" মেয়েটি বাচ্চাটাকে চেয়ারে ঠিক করে বসিয়ে তার মাথা চাপড়ে আদর করে। "যদি কিছু দরকার লাগে হাঁক দেবেন মিঃ সিমস্।"

"ধন্যবাদ মাদাম কোফম্যান।"

আস্তে আস্তে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সাবধানে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শিল্পীকে ব্যাঘাত করা চলে না। সৃষ্টির সময়ে শিল্পী একা থাকবে!

জনি হঠাৎ ককিয়ে ওঠে—"ডা।"

ফেনটন ধমক দিয়ে ওঠে,—"চুপ কর।" একটা চারকোল ভেঙ্গে দু' খণ্ড করে নেয়। কোথায় যেন পড়েছিল যে, শিল্পীরা প্রথমে মাথাটা চারকোল দিয়ে এঁকে নেয়। ভাঙ্গা টুকরোগুলো আঙুলে চেপে ধরে। ঠোঁট টিপে ক্যানভাসের ওপর চাঁদের মতো একটা গোল এঁকে নেয়। তারপর দু'পা পিছিয়ে এসে চোখ দুটো আধখানা বুজে ফ্যালে। মজা এই যে, সত্যিই যেন মুখ, নাক, চোখ ছাড়া একটা মুখের আকার এরই মধ্যে এসে গেছে। জনি চোখ বড় বড় করে দেখছিল। ফেনটন বুঝল এর চেয়ে অনেক বড় ক্যানভাসের দরকার। ইজেলের পরানোটায় শুধু এর মাথাটুকু আঁটবে। ক্যানভাসের ওপর ঘাড় সমেত মাথাটা পাওয়া গেলে ভাল হয়, কারণ তা হ'লে বাচ্চার সোয়েটারে কিছুটা এজিওর ব্লু ব্যবহার করা যাবে।

বড় মাপের একটা দিয়ে প্রথম ক্যানভাসটা পালটে ফ্যালে। হ্যাঁ এইটের মাপ ঠিক হয়েছে বলেই মনে হয়। আবার করে মুখের বাইরের রেখা চোখ দুটো···নাকের জায়গায় দুটো ক্ষুদে ক্ষুদে বিন্দু, কোট-ঝোলানো তারের মতো চৌকো ঢং-এর কাঁধ। মুখ ঠিকই হয়েছে, মানুষের মুখ, এক্ষুনি ঠিক জনির মতো না হলেও। খানিকটা থাপচা থাপচা রং এক সঙ্গে মাখিয়ে দিল। জল জলে রংটা অত্যধিক তেলের চাপে তার দিকে ক্যাট ক্যাট করে চেয়ে রইল—ভাবখানা আরও চাই। জনির সোয়েটারের নীল রংটা আসেনি বটে, কিন্তু তাতে কি এসে যায়?

সাহস বেড়ে যায়, আরও রং চাপিয়ে দেয়, এবার ক্যানভাসের সমস্ত নিচটা জুড়ে কটকটে কতগুলো মোটা মোটা নীলের চাবড়া চারকোলে আঁকা মুখখানার সঙ্গে বিকট এক বৈষম্যের সৃষ্টি করে। এতক্ষণে

মুখখানা মুখ বলে চেনা যায়; বাচ্চার মাথার পেছনের দেওয়ালটা এ পর্যন্ত শুধুই দেওয়াল বলে মনে হচ্ছিল, এতক্ষণে তাতেও যেন রং এর আভাস পাওয়া যাচ্ছে হাল্কা গোলাপীর আভা দেওয়া সবুজ রং। টিউবের পর টিউব তুলে নিয়ে টিপে টিপে রং বের করে, নীল রং নষ্ট হবার ভয়ে ঐ তুলিখানা রেখে আরেকটা তুলি নেয়; কি জ্বালা—বার্ণ্ট সিনা রংটা তো তার দেখা সীনা নদীর সঙ্গে আদপেই মেলে না বরং কালো রং বলে মনে হয়। এটুকু মুছে নেওয়া দরকার, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো চাই, নইলে তুলি খারাপ হয়ে যাবে···দরজা পেরিয়ে হাঁক দেয়,—"মাদাম কোকম্যান, মাদাম কোকম্যান। একফালি কাপড় পাওয়া যাবে?"

যা হোক এতটুকু ফালি পাওয়া গেল, মেয়েটির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তুলি থেকে বিদঘুটে সিনা-রং মুছে নেয়। ফিরে ভাখে মেয়েটি ক্যানভাসের দিকে উঁকি দিচ্ছে।

হুঙ্কার দিয়ে ওঠে সে, "খবরদার, প্রথম অসমাপ্ত অবস্থায় কক্ষনো শিল্পীর কাজ দেখবে না"

বকুনি খেয়ে ফিরে এল সে, "অত্যন্ত লজ্জিত" তারপর আমতা আমতা করে বলে—"অতি আধুনিক—তাই না?"

ওর দিকে একদৃষ্টে খানিক দেখে নিয়ে ক্যানভাসের দিকে ফেরে তারপর জনির দিকে···

"আধুনিক, অবশ্যই আধুনিক! তুমি ভেবেছিলে ঐ ছবিটার মতো হবে?"···তুলি দিয়ে তাকের ওপর সাজানো হাস্যময়ী ম্যাডোনার দিকে নির্দেশ করে। "আমি আমার কালের শিল্পী। আমি যা দেখি, তাই দেখি। এখন আমায় কাজ করতে দাও।"

ধ্যাবড়ানো রং-এ একটা প্যালেট ভরে গেছে, ভাগ্যিস, দু'খানা কিনেছে! দ্বিতীয় প্যালেটে রং মেশাতে থাকে—এবার একটা জগাখিচুড়ি ব্যাপার হ'ল,—অভূতপূর্ব সূর্যাস্ত, অনুদিত ঊষা। ভেনিসিয় লাল রং-এর সঙ্গে ডোজ রাজাদের প্রাসাদের কোন সাদৃশ্য তো নেই-ই, বরং যে রক্ত কখনও বাইরে দেখা যায় না, মস্তিষ্কের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, সেই রক্তকণিকার সঙ্গে মেলে ভাল, হোয়াইট জিঙ্ক মৃত্যুর রং নয়—বিশুদ্ধ সাদা, ইয়েলো ওকারের মধ্যে পাওয়া গেল উচ্ছ্বসিত জীবন, পুনর্জীবন, বসন্ত, এপ্রিল মাস, অন্য কোন কালে, অন্য কোন স্থানে।

অন্ধকার নেমে এল, আলো জ্বললো, কি এসে যায় তাতে। বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়েছে শিল্পীর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে, এঁকেই চলেছে। একটু পরে মেয়েটি এসে বলল, "আটটা বেজে গেছে, তিনি কি রাত্রের খানা খেয়ে যাবেন?" মেয়েটি আবার বলল,—"মিঃ সিম্‌স্ কোন অসুবিধা হবে না আমার।"

হঠাৎ ফেনটনের হুঁশ হয়, কি কাণ্ড করেছে সে। আটটা বেজে গেছে, আর ওরা প্রতিদিন পৌনে আটটায় খায়। এতনা অপেক্ষা করে থাকবে, ভাববে কি হ'ল তার। প্যালেট আর তুলি রেখে দেয়। ওর হাতে, কোটের ওপর রং-এর দাগ। আঁৎকে উঠে বলে,—"কি করি আমি এখন?"

মেয়েটি বুঝল। টারপেনটাইন আর ন্যাকড়া নিয়ে কোট ঘষে পরিষ্কার করে দিল। তার সঙ্গে রান্নাঘরে গিয়ে হড়বড় করে হাত ধুয়ে নিয়ে বলল,—ভবিষ্যতে আমি ঠিক আটটায় যাব।"
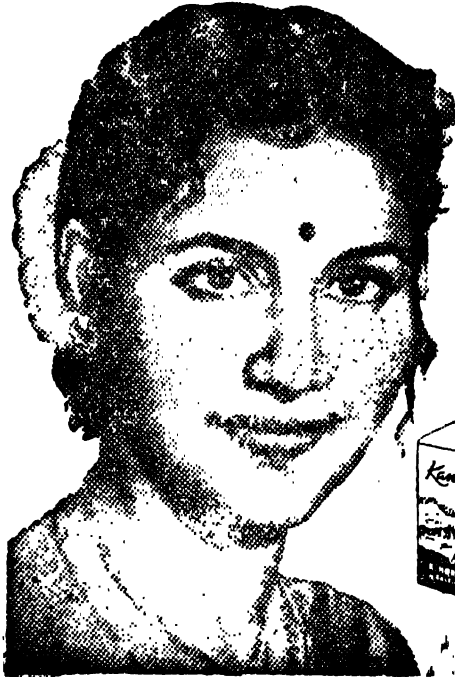
মেয়েটি সায় দেয়,—"বেশ তো, আমি ডেকে দেব। কাল আসবেন তো ?"

"নিশ্চয়ই"—অধীর হয়ে ওঠে সে,—"জিনিসে হাত দেবে না।"

"না মিঃ সিম্‌স্‌।"

সিঁড়ি বেয়ে উঠে দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটতে থাকে, যেতে যেতে এড্‌নাকে কি বলবে, সেই গল্প বানাতে থাকে। ক্লাবে গিয়ে কয়েকজনের পাল্লায় পড়ে ব্রিজ খেলতে বসে, খেলা নষ্ট করতে মন চায়নি, তাই সময় পেরিয়ে গেছে। যথেষ্ট। কালও এই ভাবেই চলবে। আফিসের পর ক্লাবে ঢুঁ মারার নতুন অভ্যাসটা এড্‌নাকে সইয়ে নিতে হবে। অজ্ঞাতবাসের এমন সুন্দর অছিলা আর কিছু হ'তে পারে না।···

৩

যে দিনগুলো এত কাল অসহ্য একঘেয়ে মনে হত, সেগুলো কি ভাবে হুস্‌হুস্‌ করে বেরিয়ে যাচ্ছে ভাবতে অবাক লাগে। অনেক পরিবর্তনের প্রয়োজন হ'ল অবশ্য। এড্‌নাকে শুধু নয়, আফিসেও মিথ্যে বলতে হ'ল। একটা পারিবারিক ব্যবসার নতুন নতুন কাজকর্মের জালে জড়িয়ে গিয়ে বিকেল হবার আগেই তাকে আফিস পালাতে হয়। বাস্তবিক কিছুদিনের জন্ত সে অফিসে মাত্র অর্দ্ধেক সময় দিতে পারবে। টাকা কড়ির ব্যাপারেও কিছু ঘাটতি হবে, সে তো জানাই কথা। ইতিমধ্যে উপরওয়ালা মালিক যদি ও'র দিকটা দেখেন···

আশ্চর্য ওরা বিশ্বাস করে নিল। এড্‌নাকেও ক্লাবের কথা বলা হয় না। মাঝে মাঝে শহরের অন্ত কোথায় আরেকটা আফিসে বাড়তি একটু কাজ, কি যেন এক মস্ত কাজের সন্ধান নাকি সে পেয়েছে, এক্ষুনি পাঁচকান করা উচিত হবে না—এমনি রহস্যে জড়ানো কথাবার্তা। এড্‌নার অ-খুশি হবার কিছু নেই। তার জীবন আগেকার মতোই বয়ে চলেছে। কেবল ফেন্‌টনের জীবনেই পরিবর্তন এসেছে। এখন প্রত্যহ বিকেল সাড়ে তিনটের সময় আট নম্বরের ফাটক দিয়ে ঢুকে, রান্নাঘরের জানলা দিয়ে কমলা রং-এর পরদা ভেদ করে মাদাম কোফম্যানের মুখ দেখা যায় কি না একবার নজর করে। তারপর মেয়েটি বাগান নামক রুক্ষ জায়গা পেরিয়ে পেছনের ফাটক খুলে দেয়। পেছন দিয়ে আসাই নিরাপদ। বিশেষ কারো চোখে পড়ে না।

"আসতে আজ্ঞা হয় মিঃ সিম্‌স্‌।"

"নমস্কার মাদাম কোফম্যান।"

এ্যানা ট্যানা বলে ডাকার কোনও মানে হয় না। ও হয়তো ভাববে···। হয়তো ধরে নেবে···! মাদাম দিয়ে তাদের মধ্যের ব্যবধান ঠিক বজায় থাকে। ভারি কাজের মেয়ে। ষ্টুডিও পরিষ্কার করে,—ষ্টুডিও-ই বলে ওরা; রং তুলি ধোয়, রোজ একটুকরো কাপড় ছিঁড়ে রাখে, আসামাত্র ধোঁয়া ওঠা এক পেয়ালা গরম চা দেয়—আফিসের চা যা বিশ্রী! বাচ্চাটা···এতদিনে বাচ্চাটাকেও ভাল লাগতে শুরু করেছে। প্রথম ছবি শেষ হবার পর থেকে বাচ্চাটাকে বরদাস্ত করা অনেক সহজ হয়েছে। সে যেন নতুন করে বেঁচে উঠেছে। ফেন্‌টনের সৃষ্টি সে।

গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। ফেন্‌টন ও'র আরও অনেক ছবি এঁকেছে। বাচ্চা ওকে ডা' বলেই ডাকে, কিন্তু ওকেই শুধু তো আঁকেনি। ও'র মাকেও এঁকেছে, সেটা আরও ভাল উৎরেছে। মেয়েটিকে ক্যানভাসের ওপর তুলতে পেরে সে নিজেকে যথেষ্ট শক্তিমান শিল্পী বলে ধরে নিয়েছে। ওর চোখ নয়, মুখ-নাক নয় পায়ের ঘটা পর্যন্ত ওর নয়। ঈশ্বরেচ্ছায় ও'র গায়ে রং-এর যথেষ্ট অভাব আছে। তা হোক তবু আকৃতিতে ওকে ভুল হয় না। শূন্য ক্যানভাসের গায়ে একটি জীবন্ত মানুষ, একজন স্ত্রীলোকের ছবি তার হাত দিয়ে বেরিয়েছে এই সত্যটুকু বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্ট। অষ্ট্রিয়ার মেয়ে এ্যানা কোফম্যানের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নাই বা থাকল—কি এসে যায় তাতে। সেটা কোন কথাই নয়। বোকা মেয়েটা প্রথম যখন ওর মডেল হয়, তখন ভেবেছিল চকোলেটের বাক্সের গায়ে যেমন ছবি থাকে তেমনি তারও ছবি হবে। শিল্পী অবশ্য তখনই তাকে দমিয়ে দেয়। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মেয়েটি বলে ওঠে,—"আপনি কি আমায় অমনি দেখেন ?" সে উত্তর দেয়,—"কেন কি হ'ল ?"

"এই, এই আর কি মিঃ সিম্‌স আমার মুখটা ঠিক হাঁ-করা মাছের মতো দেখাচ্ছে নাকি ?"

তবে কি মদনের ধনুকের মতো হবে ভেবেছে নাকি ?"—কি অদ্ভুত বোকার মতো কথা। মুস্কিল এই যে, তোমায় কিছুতেই খুশি করা যায় না। সব মেয়েদের সঙ্গে তোমার কোন তফাৎ নেই।"

চটে গিয়ে ঘস্‌ ঘস্‌ করে রং মেলাতে থাকে। তার কাজের সমালোচনা করার কি অধিকার আছে বোকা মেয়েটার ?

দু' এক মিনিট অপেক্ষা করে জবাব দেয় সে,—"মিঃ সিমস্‌ এমন কথা বলবেন না। হপ্তায় হপ্তায় আপনি যে পাঁচ পাউণ্ড করে দেন, তার জন্ত আমি কৃতজ্ঞ।"

সে বলে,—"টাকার কথা বলিনি।"

মেয়ে তো অবাক্‌,—"তবে কিসের কথা বলছিলেন ?"

ক্যানভাসের কাছে ফিরে গিয়ে হাতের মাংসল জায়গায় সামান্ত গোলাপী রং-এর আভা ছোঁয়ায়,—"কি আবার বলব ? কি বলছিলাম একেবারে ভুলে গেছি। মেয়েমানুষ তাই না ? ঠিক বলতে পারি না। বাধা দিতে বারণ করেছি না ?"

"দুঃখিত মিঃ সিম্‌স্‌।"

এই ঠিক হয়েছে—মনে মনে ভাবে সে। নিজের জায়গায় থাক। যে মেয়ে নিজের অধিকার দাবী করে, খোঁচা দিয়ে কথা বলে, নিজের ক্ষমতা জাহির করে, তর্ক করে—তেমন মেয়ে তার সহ্য হয় না—কারণ নিশ্চয় এসব ওদের এক্তিয়ারের বাইরে। শান্ত, বিনয়ী, সহিষ্ণু, নমনীয় করেই ভগবান ওদের সৃষ্টি করেছেন। মুস্কিল এই যে, বাস্তবিক খুব কম মেয়ে এমনটি হয়ে থাকে। শুধু কল্পনায়, পথ চল্‌তি ভিড়ের মাঝে এক ঝলক্‌, কিম্বা জানালার সার্সির পেছনে, কিম্বা খোলা বারান্দায় দূরের পানে চেয়ে থাকা, কিম্বা ছবির ফ্রেমে, কিম্বা তার সামনে যেমনটি আছে তেমনি ক্যানভাসের ওপরেই এমন মেয়ের সাক্ষাৎ মেলে। চট্‌ করে তুলি বদলে নেয় সে; এতদিনে হাত পেকে এসেছে। মেয়েদের যে কোন মানে হয়, কোন সত্তা আছে, এতদিনে তার নিজের সৃষ্টির ভেতর দিয়ে সে বুঝতে পারছে। এরপরেও বলে কিনা মাছের মতো হাঁ-করা মুখ।

চেঁচিয়ে বলে,—"ছোটবেলায় কত স্বপ্নই না দেখতাম।"

"বড় শিল্পী হবার ?" প্রশ্ন করে মেয়ে।

"কেন ? না তা ঠিক নয়। কিন্তু বড় হবার, বিখ্যাত হবার, ছুনিয়াকে কিছু চিনবার স্বপ্ন।"

উত্তর আসে,—"মিঃ সিমস্। তার সময় এখনও বয়ে যায়নি।"

"হয়তো, হয়তো,"—গায়ের চামড়ার রং গোলাপী না হয়ে জলপাই-এর মতো, পাকা জলপাই-এর মতো হওয়া উচিত ছিল। এড্‌নার বাপ চিরদিন খোঁটা দিয়ে দিয়েই তো সর্বনাশটা করল। মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হবার পর থেকেই সে নাকি কোন কাজ ঠিকমতো করেনি। বুড়ো সারাক্ষণ খিট্ খিট্ করে ভুল ধরত। "বাইরে যাও, বিদেশে যাও।" বলতো বুড়ো।

জামাই উত্তর দিত,—"বাইরে গিয়ে বেশী রোজগার করা যায় না। তা ছাড়া এডনার সইবে না। বন্ধু-বান্ধব, চিরদিনের চেনা পরিবেশ ছেড়ে থাকতে ও পারবে না। এমন কথা জন্মেও শুনিনি বাপু।"

মরে বাঁচিয়েছে বুড়ো। প্রথম থেকে তাদের দু' জনের মধ্যে একটা কাঁটা হয়েছিল। মার্কাস সিম্‌স্—আজকের মার্কাস সিমস্ সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। স্যারিয়ালিষ্ট। আধুনিক। কবরের মধ্যে নড়ে উঠবে বুড়ো।

মেয়েটি ফিস্ ফিস্ করে ওঠে,—"পৌনে সাতটা।"

ইজেল থেকে সরে এসে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে,—"কি জ্বালা, সবে সন্ধ্যে হয়েছে। এ ভাবে ছেড়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না। আর এক ঘণ্টার ওপর দিব্যি কাজ চালানো যেত।

মেয়ে ভরসা করে বলে—"থাকলেই তো পারেন।"

জবাব আসে,—"আঃ বাড়ির পেছু টান। মা বুড়ি ভিরমি খেয়ে পড়ে থাকবে। যাকগে মাদাম কোফম্যান একদিন না একদিন আমরা একটা প্রদর্শনী করব। তোমার আর জনির চেহারার আলোচনা লোকের মুখে মুখে থাকবে।"

মেয়েটির স্বরে অবিশ্বাস,—"এ বছর ? আসছে বছর ? কোনও সময়ে ? কোনও দিনেই নয়। ছেলে ভোলানো কথা—না ?"

জোর দিয়ে বলে সে,—"তোমার কোন আস্থা নেই আমার ওপর। আমি প্রমাণ করে দেখাব। অপেক্ষা করে দেখই না।"

মেয়েটি আবার তার সেই পুরণো গল্প পাড়ে, কেমন করে অষ্ট্রিয়া থেকে পালিয়েছিল, তার স্বামী তাকে লণ্ডনে ছেড়ে গিয়েছিল, বলতে শুরু করে সে। শুনে শুনে তার এমন মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল যে, শ্রোতা এখন অনায়াসে গড়গড়িয়ে বাকী গল্পটুকু বলে দিতে পারে। কিন্তু তাতে ওর বিশেষ কিছু এসে যায় না। এ সব মিলিয়েই তো তার অজ্ঞাতবাসের পরিবেশ। মনে মনে ভাবে, বকে মরুক না কেন মেয়েটা, ওতেই যদি শান্তি পায় তো পাক—কি এসে যায়, যে লেবুটা ও চুষছে আর কোয়া ছাড়িয়ে কোলে বসা জনিকে খাওয়াচ্ছে, সেটাকে আসলের চেয়ে অনেক বড়, অনেক বেশী গোল, ঢের বেশী উজ্জল চেহারা দিতে বাধা কি ?

আগেকার একঘেয়ে রবিবারগুলো ফুরিয়ে গিয়ে নতুন পাওয়া জীবনের মধ্যে মিশে গেছে, তাই সন্ধ্যাবেলা বাঁধের পাশ দিয়ে বাড়ি ফেরার সময়ে চারকোলের আঁকিবুকি আর খসড়া ছবিগুলো নদীতে ফেলে দেয়। সে সব এখন রঙীন ছবিতে পরিণতি লাভ করেছে—কাজেই নষ্ট হলেও ক্ষতি নেই কিছু—এইসঙ্গে ফুরিয়ে যাওয়া রং-এর টিউব, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, তেলে নষ্ট হওয়া তুলি, সব জলে ফেলে দেয়। এলবার্ট ব্রিজের ওপর থেকে সে ছুঁড়ে দেয় জিনিসগুলো, মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে সে সব ভেসে যেতে, জলের টানে তলিয়ে যেতে কিম্বা পাখীদের ঠোঁটে উড়িয়ে নিয়ে যেতে ভাখে। ফেলে দেওয়া বাজে মালের সঙ্গে তার মনের অশান্তি, যত ব্যথা সব দূর হয়ে যায়।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—কল্পনা রায়।

আজকের ছেলের সমস্যা

শিক্ষা শেষে প্রতিষ্ঠানের কাছে তরুণ শিক্ষার্থীর একটি মাত্র বস্তুই কাম্য থাকে, তা হচ্ছে একটি সার্টিফিকেট, যাতে সে কর্মজীবনে প্রবেশের ব্যাপারটা সহজেই নিষ্পন্ন করে ফেলতে পারে।

বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনের বিশেষ কোন ঔৎসুক্যই লক্ষিত হয় না আজকের শিক্ষার্থীদের ভেতর, কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করতে পারাটাই তাদের সামনে আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতাদের কাছেও এই সার্টিফিকেটটিই একমাত্র বিবেচ্য বস্তু, ওইটি থাকলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে কোন অযোগ্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না।

তরুণ শিক্ষার্থীর অভিভাবকও শুধু এই বস্তুটি পেলেই সুখী, ছেলে বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট পেয়ে গেলেই তিনিও ভাবেন জলের মত পয়সা খরচা করে লেখাপড়া শেখানোটা তাহলে সত্যই সার্থক হল।

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষর কাছেও ছেলেদের পরীক্ষায় পাশ করাটা যেন এক ব্যক্তিগত সাফল্য, ছেলে অকৃতকার্য্য হলে তার অভিভাবক-বৃন্দের নীরব ও সরব অসন্তোষের ভাগী হতে হয় তো তাঁকেই। কিন্তু যদি কোনদিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ হঠাৎ প্রশ্ন করে ওঠে যে, গাদা গাদা বই মুখস্থ করিয়ে পাশ করানোতেই কি তাদের উপর কর্ত্তব্য শেষ ?

যদি জানতে চায় যে, যেভাবে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার কি সত্যই কোন সার্থকতা আছে ? তখন কি উত্তর দেবেন জ্ঞানী ও গুণী শিক্ষকবৃন্দ বা অভিভাবক মহাশয়রা ?

অবশ্য এ ধরণের বেয়াড়া প্রশ্ন কদাচিৎ কেউ করে থাকে এবং করলেও জোরালো কণ্ঠে সে প্রশ্নকে চাপা দিয়ে ফেলতে তিল মাত্র দেরী হবে না শিক্ষাধিকারের কর্ত্তাদের, গতানুগতিকতার পথে চলার সঙ্গী সর্ব্বদাই তাঁরা পাবেন। কর্ম্মপ্রার্থী তরুণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য তার বিদ্যালয়ে কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যে অনুসন্ধান লিপি পাঠানো হয়ে থাকে, তাও বড় কম মজার নয়।

এতে জানতে চাওয়া হয় যে কর্ম্মপ্রার্থী সৎ না অসৎ, পরিশ্রমী না শ্রমবিমুখ, যেন এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড়ই সহজ।

কর্ম্মপ্রার্থীকে যখন ব্যক্তিগত ভাবে যাচাই করে নেওয়া হয় তখনও তাকে এমন সব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়, যা একেবারেই অবান্তর, আর এই ধরণের অর্থহীন প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে অত্যন্ত বুদ্ধিমান তরুণের পক্ষেও বিচলিত হয়ে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক।

প্রকৃতপক্ষে আজকের ছেলেমেয়েকে নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান যে খেলা চালাচ্ছেন তা তাদের স্নায়ু বিপর্য্যস্ত করে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট।

বহু নবীন উদ্যমশীল প্রাণ এর চাপে পড়ে বোধহীন যন্ত্র বিশেষে পরিণত হতে বসেছে, মনে হয় এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়ার সময় উপস্থিত।

বিবাহ ও সমাজ

সুধাংশু চৌধুরী

বিবাহ কথাটার উদ্ভব সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই। তখন হয়তো বিবাহের মধ্যে তেমন একটা গুরুত্ব আরোপ করা হতো না বা তেমন কোন আচার-অনুষ্ঠানের বালাই ছিল না, যখন মানুষ সত্যিকারের মানুষ বলে নিজেকে চিনতে শেখেনি। কিন্তু সমাজ যখন ধীরে ধীরে সভ্যতার আলোকে আলোকিত হতে শুরু করলো—সৃষ্টির তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলো তখন বিবাহের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করলো। পুরুষ ও প্রকৃতির সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই যে এ সৃষ্টির উৎস—সে উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে নরনারীর মিলনের মধ্যে খুঁজে পেল একটা আদর্শ। তারপর সে আদর্শের মধ্যে টেনে আনলো কল্যাণকামী ধর্মকে। সে থেকে ধীরে ধীরে সুরু হলো আচার অনুষ্ঠান-মন্ত্র-জপ-তপ যজ্ঞ ইত্যাদি। এবং সেই অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে পুরুষ ও প্রকৃতির চিরন্তন আকর্ষণটা আরো স্বতঃস্ফূর্ত ও সুদৃঢ় হোয়ে উঠলো। সে আকর্ষণ শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—ইতর প্রাণীর এবং অবুঝ প্রকৃতির মধ্যেও বিস্তৃত।

আজকের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকায় বিবাহকে কেন্দ্র করে অনেক প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে, যার ভেতর দিয়ে সহজেই অনুমান করা যায় যে, আজকের এই জটিল বাস্তব যুগে বিবাহ সমস্যাটা সমাজের মেরুদণ্ডকে আরো প্রধানতর সমস্যার সম্মুখীন করে দিয়েছে। সমস্যাটা যেন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তার নজীর রোববারের খবরের কাগজের পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন বিভাগটাই যথেষ্ট। এই বিজ্ঞাপনের মাত্রা দিনের পর দিন যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে মনে হয় না যে, বিজ্ঞানের যুগে এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আশানুরূপ কোন সফলতা দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এ বিজ্ঞাপন দেন কারা? সোজা কথায়—যাদের বিজ্ঞাপন দেবার সামর্থ্য আছে তারাই এবং আর তারাই দেন যারা পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপনের সংগে প্রকাশ করতে পারেন গুণবাচক এবং গালভরা বিশেষণ। যে বিশেষণের ঠেলায় পাত্র বা পাত্রী পক্ষ হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারেন পরস্পরের দোর গোড়ায়। কিন্তু তাতে যে বিশেষ কোন ফল হচ্ছে তা তো বোঝা যাচ্ছে না। হচ্ছে হয়তো—আশানুরূপ নয়, এই আর কি। কিন্তু যাদের বিশেষণ দেবার বা প্রকাশ করবার মতো ক্ষমতা নেই তারা কি করেন? তারা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকেন। জীবন-তরণী যেদিকেই ভেসে যাক না কেন, প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা তাদের নেই। তখন সে সমাজে একটা অসাধারণ হাওয়া এসে ঢুকে সমাজকে বিষিয়ে তোলে। তারপর সে বিষ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ছড়িয়ে পড়ে সমাজের সর্ব স্তরে—যার প্রতিষেধক টিকা এখনো বেরোয়নি। এবং কোন দিন বেরুবে কিনা সে বিষয়ে অনেকের সন্দিগ্ধ মনে সন্দেহ বাসা বেঁধে আছে।

আজকের এ সমস্যায় শুধু আমি পড়িনি—আপনিও পড়েছেন। এ সমস্যা সকলের। এটা তাদের নিয়েই আলোচনা যারা দাম্পত্য জীবনকে মনে প্রাণে ভালোবাসে এবং সুখে দুঃখে ঘর বাঁধতে চায়। এটা তাদের জন্য নয়, যারা নারীকে সুরা ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। তাই এই নিরপেক্ষ আলোচনার মধ্যে গ্রহণীয় যদি কিছু থাকে পাঠকের, সেটা গ্রহণ করবেন; না থাকলে মনগড়া ভাববিলাসটুকু নিতান্তই লেখকের। সেটা অবশ্য আগে-ভাগেই বলে রাখছি।

বিবাহকে আমরা যে যেমন করেই ভাবি না কেন আজকের যুগে এর সমস্যা জটিলতর। তাই এই ব্যাপারে নানা প্রকার প্রশ্ন উঠতে পারে, সে প্রশ্নগুলো আধুনিক কিছু নয়—আদিমতম। যুগের সংগে সংগে তার সংস্কার হোয়েছে মাত্র। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান পরিপূর্ণভাবে কোন কালেই হয়নি। সে সমস্যার ব্যুৎপত্তি কোথায়? ডাঃ ষ্টোন বলেছেন—

On one hand the social and economic conditions make early marriages in practicable and on the other, our ethical and religious standard prohibit sexual relations outside of wedlock. Thus a serious problem is created concerning one's sexual behaviour during the age of marriage, a problem to which no socially sanctioned solution has yet been found...অর্থাৎ একদিকে সামাজিক এবং আর্থিক কারণ সমূহের জন্য সকাল সকাল বিবাহ করা সম্ভব হোয়ে উঠে না, অপর দিকে আবার নীতি ও ধর্ম বিবাহের মিলনকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। তাই দেহের পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্তি ও বিবাহকালের মধ্যবর্তী সময়ে ব্যক্তিগত যৌন আচরণ সম্পর্কে এমন একটা জটিল সমস্যা উপস্থিত হোয়েছে, যার সমাজস্বীকৃত কোন সমাধান এখনো হোয়ে উঠেনি...

সমাধানের প্রতীক্ষা করে আর কতকাল কাটবে? সমাজের ঘুণধরা কাঠামোটাকে কিছু পরিবর্তন করার সময় কি আজো আসেনি? সমাজটা যখন মানুষেরই গড়া তখন যুগের পরিবর্তনের সংগে সংগে তারো পরিবর্তন দরকার। এ পরিবর্তন হয়তো একদিন হবেই—সেটা সময় সাপেক্ষ। সমাজ সমাজ করে অন্ধ-সংস্কারের বশে আমরা দিন দিন নিজেদের মন-প্রাণ-উৎসাহকে মাটির সংগে মিলিয়ে দিচ্ছি। প্রত্যেক সাধারণ নরনারী মাত্রেই মনের অজান্তে হলেও বিবাহ জীবনের একটা মধুর স্বপ্নকে পোষণ করে থাকেন। সেটা পুরুষ ও নারীর পক্ষে অবাঞ্ছিত কিছু নয়। শাশ্বত চিন্তা। বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে—জীবন বিকাশের সংগে সংগে মনের মর্মমুকুরে অজানিত অথচ মধুরেণ একটা

মিলনের ছায়া এসে পড়েই, সেটাকে জোর করে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

সাধারণতঃ লোকে বলে থাকে (নীতি-বাক্য অবশ্য), আগুন আর ঘি পাশাপাশি থাকলেই একদিন জ্বলে উঠবে। কথাটা মূল্যবান সত্য, কিন্তু অনেক সময় জ্বলে উঠতে উঠতেই নিভে যায়। যখন ঘিয়ের মনে হয়, এ ভাবে নিঃশেষে পুড়িয়ে ফেলার মতো 'দ্রব্যগুণ' আমার মধ্যে কোথায়? অথবা ভেবে নেয়, পুড়ে ছাই হোয়ে যাবার পর আমার মধ্যে অবশিষ্ট তো কিছু থাকবে না—তবে এ জ্বলার সার্থকতা কোথায়? শুধু জ্বলেই মরবো—মধুরতম কিছু পাবো না, শুধু ছাই! তখন বাইরের জ্বলা বন্ধ করে তুষের মতো ঘুষঘুষে জ্বলে। সে জ্বলা কেউ লক্ষ্য করে না। কিন্তু যে জ্বলে সে বোঝে, আমি জ্বলছি। আমরণ জ্বলবো। একদিন ছাই হোয়ে উড়ে যাবো বাতাসের সংগে এই হবে পরিণতি। আর অগ্নির?···যে তীব্র দাহ নিয়ে সে ঘি কে আকর্ষণ করতে চেয়েছিল, একদিন হয়তো দেখা যাবে, তার সে তীব্রতা ফিকে হোয়ে গেছে—তার তীব্রতা কমে এসেছে এবং অগ্নির অগ্নিত্ব ঘুচে যাবার সামিল হোয়েছে। সামিলই বা বলি কেন, জ্বলুনি ঠাণ্ডা হোয়ে যাচ্ছে।

এই যে জ্বলুনি, এই জ্বালায় আজ কতজন জ্বলছে। জ্বলে পুড়ে ছাই হোয়ে যাচ্ছে। সেটা হয়তো চোখে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মন দিয়ে কিছুটা অনুভব করা যায় বৈ কি। এবং সে অনুভূতির পাওনাটুকু, চিরদিন অনুভূতির জগতেই বাস করে—বেরিয়ে আসে না কোন দিন।

আজ সংসারের সারটুকু যাতে অসার হোয়ে না পড়ে, তার জন্য অনেক মেয়ে নানা প্রকার প্রতিষ্ঠানে ঢুকে অর্থোপার্জন করছে। প্রথম যেদিন তারা ঢোকে, সেদিন তাদের মধ্যে নানা প্রকার উৎসাহ উদ্যম এবং বিশেষ করে পুরুষের পাশে বসে কাজ করার পেছনে তাদের নিভৃত মনের জমাট মুহূর্তগুলোকে এক অনাস্বাদিত শিহরণ বার বার দোলা দিয়ে যায়। কর্মের মুহূর্তগুলো তাদের হোয়ে উঠে স্বতঃস্ফূর্ত। পুরুষের মধ্যেও ততোধিক সাড়া জাগে। একটা অবর্ণনীয় কর্ম-প্রবণতা দেখা দেয় প্রত্যেকের মধ্যে। তার ফলে কাজের অগ্রগতি। কিন্তু সে রোমাঞ্চ আর ক'দিন?

যে উন্মাদনা আর রোমাঞ্চকে মনের নিবিড়ে লুকিয়ে রেখে ওরা এসে দাঁড়িয়েছিল বাস্তবের কর্মক্ষেত্রে—সে কর্মক্ষেত্রেই রয়ে যাচ্ছে ওরা, জীবনের কর্মক্ষেত্রে ওরা স্থানান্তরিত হতে পারছে না। কেন? আর্থিক কারণে, সামাজিক সংস্কারে, অহেতুক মনোবিকারে। তারপর যখন ভাবে বসে, জীবনের এই সুন্দর সোনালী মুহূর্তগুলো যে যৌবন-বসন্তের স্বর্ণালী স্পর্শে মধুরেণ হোয়ে উঠেছে—একদিন অনাঘ্রাত অবস্থায়ই শুকিয়ে যাবে, চলে যাবে এ বসন্ত—যে বসন্ত আর কোনদিন ফিরে আসবে না, ফেরানো যাবে না, তখন?

তখন সে চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র মনকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে—কর্মোৎসাহকে কেড়ে নেয়। মনের অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাসের সংগে হয়তো একটা কথা ভেসে উঠে, এই সুন্দর পৃথিবীতে এসে আমি কি বা পেলাম? আমার নারীত্বের মূল্য তো পেলেম না? পুরুষ ভাবে, সৃষ্টির লীলানিকেতনে কেউ তো আমার পৌরুষকে সম্মান দিল না? তবে ফুটলাম কেন পৃথিবীর এ সুন্দর পুষ্পোদ্যানে? এ ফোটার সার্থকতা কোথায়?

একদিন যারা পথ চলতে চলতে বা ট্রামে বাসের ভীড়ে একটা, অলিখিত রোমাঞ্চকে বুকে নিয়ে নিজের গন্তব্যপথকে ছাড়িয়ে যেতো এবং চমকে উঠে আপন মনে বলে উঠতো, এরি মধ্যেই গন্তব্যপথ পেরিয়ে এলাম! আজ তারা আর চমকে উঠে না, পথের দিকে তাকিয়ে শুধু ভাবে, পথ এখনো কতদূর.? কোথায় এর শেষ·····

আজকের দিনে আমাদের মধ্যে যতই সৌখীনতা আসুক না কেন, সে সৌখীনতার মধ্যে একটা মন সব সময় সজাগ ও সতৃষ্ণ হোয়ে থাকে। সে মনকে নিজের সৌখীনতার আড়ম্বর দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। সে মন যেন অবুঝ। সে অবুঝ মনের চাওয়া-পাওয়ার সীমা নেই। সে সীমাহীন আবদারকে আঁকড়ে বসে থাকে আমৃত্যু। সে মনের উদ্দেশ্য মহৎ। দিনের পর দিন সেটা মহত্তর হতে থাকে। তারপর সে মহত্তরের প্রভাব এক বৃহত্তর সমস্যা হোয়ে আমাদের চলার পথকে করে তুলে অসুখী। কারণ মহৎ চিন্তার পরিপূর্ণতা ঠিক সময় না এলে সেখানে বৃহত্তর এক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তারপর মন হীন হতে হীনতরে নেমে যায়—অকূল পাথারে ভেসে যায়, কূল আর পায় না।

চিরন্তন একটা মাতৃত্বের অনুভূতি নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নারী। তাই তার জীবনের সমস্ত বাস্তব রুক্ষতার মধ্যে একটা স্নেহপ্রবণ—বাৎসল্যপরায়ণ এবং প্রেমিক মন চিরদিন বাসা বেঁধে থাকে। সে চায় মা হতে। সর্বান্তঃকরণে মাতৃত্বকে অনুভব করতে। কিন্তু আজকের সমাজ সে সুখ থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে। কারণ, ভালোবেসে সে মন পায় না—মন পেলে সে ঘর পায় না—ঘর পেলে সে স্বীকৃতি পায় না। জীবনটাই যেন না-পাওয়ার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে বার বার পাক খাচ্ছে। যার বিরাম নেই। পুরুষ-জীবনেও জেগে থাকে তেমনি পিতৃত্বের অনুভূতি। সে অনুভূতি পরিপূর্ণ করতে গিয়ে তাকে পেছিয়ে দিচ্ছে সমাজ—আর্থিক সংকট। কনজারভেটিভ মাইণ্ড নিয়ে এখনো আমাদের সমাজের বৃহত্তমাংশ আধুনিক যুগের বুকে অন্ধ-সংস্কারের ধ্বজা তুলে আছে। যার ফলে উঠতে গিয়েও আমরা বাধা পাচ্ছি। যার ফলে মন ভেংগে যাচ্ছে—গুড়িয়ে যাচ্ছে—নিস্তেজ হোয়ে আসছে··

নারী ও পুরুষ। নারী সংসার-জীবনের আনন্দস্বরূপা। কর্মক্লান্ত পুরুষের সমস্ত ক্লান্তি নারীর সান্নিধ্যে এসে জুড়াতে পারে বলে পুরুষের কাছে নারী মমতাময়ী—শান্তিপ্রিয়া। একজন সাধারণ নারীর কথা ভাবতে গেলে—সুখে দুঃখে স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করা একটি গৃহের স্বপ্নই ভেসে উঠে। সে আদর্শ ভাবধারায় মন পূর্ণ হয়। নারীর আদর্শ যুগে যুগে। কিন্তু আজকের বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞাপনের ঠেলায় নারীকে এমন স্তরে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সমাজ, যে, তাকে মা বলে ভাবা যায় না, বোন বলে কল্পনা করা যায় না, জীবন-সংগিনী বলে ধরে নেয়া যায় না—ধরে নিতে হয় একটা কামনাবিলাসী নারী হিসেবে। পুরুষ তাকে ভোগের একটা জীবন্ত পুত্তলী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না। এই অনুভূতি সাধারণ মানুষ যাদের কাছ থেকে পান—তারা হলেন বিজ্ঞাপনদাতা। এর মূলে তাদের দান অতুলনীয় বলা চলে। দুনিয়ায় আজকাল যত রকমের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে, প্রায় সবতাতেই নারীর ছবি। কুরুচিপূর্ণ—বিকৃত যৌন আবেগে ভরপুর ছবি! তা দেখে মনে হয়, নারী বুঝি এ যুগে বিজ্ঞাপনের জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে। সেজন্য

ব্যবসায়ীরা নারীর নারীত্বকে ঘুচিয়ে নারীকে একেবারে পণ্য করে বাজারে ছেড়ে দিয়েছে। সে অর্থলুব্ধ ব্যবসায়ীদের কাছে নারীর মূল্য জীবন্ত-কামনার পিণ্ডি ছাড়া (পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের পিণ্ডি নয় অবশ্য) আর কিছুই নয়। বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পাচ্ছে উলংগ আধুনিকতার বাহার। ইউরোপের অনেক জায়গায় শুনেছি জীবন্ত মেয়েরাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা শো-কেসের ভেতর শো হয়ে থাকে। আজকের সিনেমার পোষ্টারে দেহের অনাবৃত যেখানে বেশি সেখানেই দর্শকের ভীড়। তাছাড়া নারীর যৌন-অঙ্গের বিজ্ঞাপন যে সচিত্র হারে রুচিশীল কাগজে বেরুচ্ছে তাতে আমাদের সমাজকে একটা রুচিবান জড়পিণ্ডি ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। এ ছাড়া নারীকে সৌন্দর্যময়ী (বক্ষকে) করে তুলবার জন্ত ব্যবসায়ীরা উঠে পড়ে লেগেছেন। তাদের ক্রীমের কয়েকটা বিজ্ঞাপন নিয়ে উদ্ধৃত করছি—

...It is the best that gives you prominence at the first sight. Marital happiness depends on keeping the proper form and your bust is an invaluable possession of your husband or lover and its proper contours is his first concern. Remember that your bust is the first choice of beauty"...তার পর আছে—Cream externally and,... tablets and,...forte internally, will help to develop the breasts to its full."

আর একটিতে আছে—

If you prefer to enhance the beauty of your bust, ask your husband or lover to squeeze and suck your breasts regularly and also use our arrow-snopped artificial breasts.

আর একটি ঔষধ-ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন—

...For contracting relaxed vazina, It is an open fact that a woman with no issue is sexually more stimulating of the man than a woman who has undergone pregnencies. The supreme swaying thrills are due to the lightness of the female organ...

(বিজ্ঞাপনগুলি 'নরনারী'র একটি প্রবন্ধ থেকে গৃহীত)

এ সব বিজ্ঞাপন ছাড়া আরও কত নিম্নস্তরের বিজ্ঞাপন আছে—যেগুলো আর উদ্ধৃতি করবার মত নয়। এই ধরণের বিজ্ঞাপন আমাদের প্রগতিশীল ভারতের নানা পত্রিকায় বেরুচ্ছে।

সুতরাং এর মাধ্যমে এটা আন্দাজ করে নিতে অসুবিধে হয় না যে, আজকের রুচিবায়ুগ্রস্ত সমাজ আমাদের দেশের নারীদের কি চোখে দেখেন। তাই আজকের শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে (যারা শিক্ষা পেয়েও শিক্ষিত হননি তাদের কথা বলছি না) এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত। না হলে ভবিষ্যতে এর বিষময় ফল আরো বিস্তার লাভ করবে।

বিবাহের ব্যাপারে বলতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন—Real life has certainly its claimes in one case, that all who are hungry for food should have work at such a rate of pay that they can eat, in the other that all who are of marriageable age should have the possibility of contracting marriage at the right time. অর্থাৎ প্রত্যেক যৌবনপ্রাপ্ত নরনারীর সকাল সকাল বিবাহ করবার ইচ্ছা, সুবিধা ও শক্তি থাকা চাই।

কিন্তু আজকে অনেক ক্ষেত্রে শক্তি-সামর্থ্য থাকলেও বিবাহটা হোয়ে উঠছে না। কেন? অনেকে অবিবাহিত থেকে জীবনটাকে সুখী করতে চায় (আমি অবশ্য মেজরিটির কথা বলছি), বয়েসটাকে পেছিয়ে দেন, তারপর একদিন তার জন্ত মনস্তাপ করতে দেখা যায়। অনেকে আবার বিয়ে করবে না—করবে না করে হুম করে হঠাৎ কাজটি শেষ করে ফেলেন। তার পরিণামটা সুখের হয় না কোনদিন। তা ছাড়া আর একটি কারণ এই যে, বেশি বয়েসে বিয়ে করলে মা-বাপ বেঁচে থাকতে থাকতে আর ছেলেপুলেদের মানুষ করা যায় না। তার ফলে সমাজে আর একদল বকাটের সৃষ্টি হয়। যারা সুযোগের অভাবে হতে বাধ্য হয়।

সরে যাবার জন্ত—নিঃশেষে মুছে যাবার জন্য এই জীবনের সৃষ্টি নয়; হাসি-অশ্রুর চিরন্তন প্রবাহে এ জীবন এগিয়ে যাক—এটা সকলের কাম্য হওয়া উচিত। কারণ বিবাহকে অস্বীকার করা কোনদিন যাবে না। যদি যেতো, তবে সৃষ্টি রসাতলে যেতো। কামনা-বাসনা জন্ম-মৃত্যুর সংগী। তাই বাসনা যেখানে পবিত্র, সেখানে কামনাও মধুর। নরম্যান হাইমস্ বলেছেন—Sexual experience is a fundamental need of normal human nature. It is not necessarily a social evil provided the relations are ethical and considerable there is mutual affection and a willingness to bear any subsequent responsibilities together. অর্থাৎ রতি সম্ভোগ মানব প্রকৃতির একটি মৌলিক প্রয়োজন। উভয় পক্ষের সম্বন্ধ যদি নীতিবিগর্হিত না হয়, যদি পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় প্রেম থাকে এবং যদি পরস্পরে উহার ভবিষ্যৎ ফলের দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক থাকে, তা হলে ইহাকে সমাজের অনিষ্টকর বলা চলে না।

আমার মনে হয়, আজকের স্বাধীন চিন্তা প্রাপ্ত প্রত্যেক নর-নারীকে জীবনের চাকাকে এদিকটায় ঘোরানো দরকার, না হলে বিবাহ-বন্ধনের আশা সুদূর পরাহত। এর মধ্যে পণের কথা অবশ্যই ভুলতে হবে। পুরুষ নিজের অনুভূতি দিয়ে নারীর ব্যথা বুঝবে—নারী নিজের অন্তর দিয়ে পুরুষের ব্যথা বুঝবে, এটাই স্বাভাবিক হওয়া উচিত।

আধুনিক প্রথায় যে বিয়ে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু যেটা হচ্ছে সেটা প্রায় ক্ষেত্রেই মারাত্মক আকার ধারণ করছে। সেটা কি? —আমরা ভালোবাসাবাসি করতে গিয়ে এমন স্তরে এসে পৌঁছায়,—এতদূর এগিয়ে যায় যে, বিয়ের পর এক দেহ-সম্ভোগ ছাড়া আর কোন আকর্ষণই থাকে না (সেটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে)। তার ফলে জীবনটা একঘেয়ে হোয়ে আসে। দাম্পত্য-জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হয়। তাই আমার মনে হয়, ভালোবাসার উৎসের সংগে সংগে যদি আমরা পরস্পর মিলিত হতে পারি, তবে তৎপরবর্তী জীবনটা ধারে ধারে প্রগাঢ় প্রেমের বন্ধনে বন্দী হোয়ে সুখী দাম্পত্য-জীবনের সূচনা করে। তাই নয় কি?

অতিরিক্ত মেলামেশার পর যখন মিলন হয়—মিলনের পর

ডাইভোর্স হতে আর দেরি হয় না। পাশ্চাত্য দেশের যুবক-যুবতীরা গীর্জা থেকে বেরিয়ে এসে 'হনিমুন'এর মধুর রাত্রি কাটিয়ে চিন্তা করে—কে কখন কিসের অজুহাতে ডাইভোর্স নোটিশ জারি করবে। আমাদের দেশ হয়তো ততদূর এগোয়নি, তবুও কম বলা চলেনা। গত বৎসর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ছয় হাজারের মতো ডাইভোর্সের কেস উঠেছে কোর্টে। ভারতের মতো নীতিবাগীশ দেশে এটা লজ্জার —শুধু কি লজ্জার, ভাবনার বিষয় নয় কি?

আজ প্রেমের পাখা না গজাতেই উড়তে গিয়ে আমরা মরছি। পতিতালয়ের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তারপর সর্বান্তঃকরণে ইন্ধন যোগাচ্ছে—সিনেমা, বিজ্ঞাপন, শিক্ষা, রুচি এবং অর্থগৃধ্নু সমাজ। ধীরে ধীরে সমাজের 'মরালিটি' ডুবে যাচ্ছে। ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য আর সত্যকে তলিয়ে দিচ্ছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশে বর্তমানে বছরের শেষে কুমারী গর্ভবতীর সংখ্যা গণনা করা হয়। আমাদের দেশেও যদি শেষ পর্যন্ত সে হিসেবের জন্য নতুন পোষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ভারতের (বিশেষ করে বাঙলার) নারীত্বের আদর্শ বলে আর কিছু থাকবে না। গাধা ঘোড়া তখন একদর হয়ে যাবে।

তবুও, এখনো এটুকু আস্থা রাখা যায় যে, আমাদের দেশে যতই অনাচার হোক—পাশ্চাত্য দেশকে ছাড়িয়ে যায়নি। কারণ, নতুন কিছু করতে গেলে বরাবরই ভারতের ধর্ম ও রুচিতে বাধে। সেই সনাতন রীতিনীতির ফলে ভারতের আদর্শ এখনো বলিষ্ঠ আছে, কিন্তু বিদেশের যে বিষফল এখানে গজিয়েছে, সময় থাকতে তাকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে—না হলে তার প্রতিক্রিয়ার কথা বলাই বাহুল্য।

প্রত্যেকের এটাই কাম্য হওয়া উচিত, আদর্শ ও ধর্মকে সম্মুখে রেখে আমরা পরস্পরকে গ্রহণ করবো। আর সুখে দুঃখে বিবাদ-কলহে দাম্পত্য-জীবনে ভাঙন আসবে না, এমনি মনোবল প্রয়োজন। তাহলে বার্ধক্যেও ব্রাউনিং-এর মতো বলা যাবে—

'Ah Love ; Grow old with me,
The best is yet to be'—

'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা' পাঠে

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা'
লেখার কিবা ঢংগা!
অসুর যদি বেদ বিচারে
তবেই হেন কইতে পারে
তারিফ দিয়া স্বৈরাচারে
ব্রহ্মে মিছা সজ্ঞা;
নয় যা কবি-কীর্ত্তনীয়
কিম্বা অনুচিন্তনীয়
সভ্য যুগে নিন্দনীয়
এমন রুচি রঙ্গা!
'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা'।

ভারত সাধে সত্য
দেয় অমৃত তথ্য।
অতীত হ'তে বিবেক-মতি
মন্থ ল'ভে ভবিষ্যতি,
বুঝেই না সুকর্ম্ম-গতি
কয় অযথা কথ্য।
ব্রাহ্মণ্য সগৌরবে
সূর্য্য-সম পূজ্য র'বে,
ঘোর আহবে নিধন হ'বে
মত্ত যত জঙ্গা।
'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা'।

ফুটল নভে পৃথি
জীব-জীবন ভিত্তি।
কতই ফেরা বিবর্ত্তনে
মানব হ'লি চিত্ত-মনে;
কে অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণে
কাহার অনুবৃত্তি?
মিলতে আছে দিব্য দেহ
আনন্দেরি মূর্ত্ত গেহ'
যাহার পরে মিলায় স্নেহ
সমাধি নিস্তরঙ্গা।
'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা'।

বিবাহে বৈচিত্র্য

এম, আবদুর রহমান

[দেশ-জাতি-কওম এবং ধর্মভেদে বিবাহ-পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের হলেও তামাম দুনিয়ার আদম গোষ্ঠির বিবাহ-প্রথার মূল মতলব একই। নিখিল বিশ্বের নানা জাতি-গোত্রের বিবাহ ও তালাক পদ্ধতির মধ্যে রকমারী রেওয়াজ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রথা প্রচলিত আছে; বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা ব্যক্তি বিশেষের বৈচিত্র্যপূর্ণ কয়েকটি বিবাহের বিবরণী প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের দরবারে পেশ করবার চেষ্টা করবো। গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয়ের অনুগ্রহ এবং পাঠক-পাঠিকাদের আগ্রহ থাকলে আমরা ক্রমে ক্রমে বিবাহ ও তালাক বৈচিত্র্যের আরও বহু বিবরণী প্রকাশ করবো।—লেখক]

মৃতের বিবাহ

মরা-মানুষের বিয়ে, তাজ্জব ব্যাপার নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্যও বটে। কিন্তু এরূপ ঘটনা যে না ঘটে তা' নয়। সিঙ্গাপুরের একটি সংবাদে জানা যায় এক মৃত চীনা যুবকের সঙ্গে এক মৃতা তরুণীর বিবাহ অনুষ্ঠানের কথা। স্বাভাবিক বিবাহ উৎসবের মতই সে বিয়েতে পান-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। আর ছিল সত্যিকারের বিয়ের মতই অনুষ্ঠানের সকল রকম আয়োজন। এই বিবাহের কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, মৃত যুবকের পিতাকে স্বপ্নে এক প্রেতাত্মা নাকি জানিয়েছিল যে, তাঁর মৃত পুত্র প্রেতলোকে গিয়ে জীবন-সঙ্গিনীর সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। তাই পরলোকগত পুত্রের আত্মার তৃপ্তি-সাধনের উদ্দেশ্যে ইহলোকে পুত্রহারা পিতা মৃতা এক তরুণীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করেছিলেন উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

ভারতবর্ষে কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃতা কুমারীকে আনুষ্ঠানিক ভাবে একজন যুবকের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে সৎকার করা নাকি নিষিদ্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বিবাহ না দিলে পরলোকগতা কুমারীর অতৃপ্ত আত্মা সঙ্গী খুঁজে বেড়ায়। আর তার ফলে অবিবাহিত কোন না কোন জীবিত যুবকের নাকি বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রেতাত্মা সম্পর্কে এরূপ বহু সংস্কার আছে এবং এই বৈজ্ঞানিক যুগেও ইহা অনেকেই বিশ্বাস করেন। (১)

বর্ত্তমান 'জামানার' সুসভ্য ফরাসীদেশে মৃতের সঙ্গে একাধিক জীবিত নারীর বিবাহ হয়েছে এবং সে সব পরিণয় হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। বিগত ১৯৪৪ সালে এক বিধান-দ্বারা উক্তরূপ বিবাহকে আইন-সিদ্ধ (Valid) ব'লে গণ্য করা হয়েছে। এই "কিসিমের" বিবাহে পাত্র এবং পাত্রী পক্ষের পরিবার পরিজনের সম্মতি এবং সরকারের অনুমতি গ্রহণের আবশ্যক হয়। এবম্বিধ বিবাহের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিয়েছে নিম্নলিখিত ঘটনাটি পাঠ করলে তা জানা যাবে।

জ্যাকুলিন ত্রিবু নাম্নী এক ফরাসী ললনা। বর্ত্তমানে তিনি অর্থমন্ত্রী দফতরের কর্ম্মী। বিবাহ করেছেন তিনি তাঁর গর্ভজাত কন্যার মৃত পিতা—জ্যঁা-ভেরনকে। জ্যাকুলিন ত্রিবুর সঙ্গে জ্যঁা ভেরনের প্রণয় হয় গত ১৯৪১ সনে। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। যুদ্ধের জন্য তাঁদের পরিণয় হতে দেরী হ'ল। ইতিমধ্যে জার্মাণরা বসলো ফ্রান্স দখল করে। জ্যঁা-ভেরনকে রাজনৈতিক কারণে করতে হ'ল আত্মগোপন।

১৯৪৪ সনে ফ্রান্সের মুক্তির পর ত্রিবুর সঙ্গে জ্যঁা-ভেরনের আবার মিলন হ'ল। সন্তান এলো ত্রিবুর গর্ভে। বিবাহের কথা-বার্ত্তা ঠিক, বার দিন ক্ষণ পর্য্যন্ত। এমন সময় জ্যঁা-ভেরন ডিফথিরিয়া রোগে মারা গেলেন। জ্যাকুলিন ত্রিবুর—অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল মাদাম জ্যঁা-ভেরন নামে পরিচিত হতে। কারণ সমাজ ও আইনগতভাবে স্বীকৃত নাহলেও তাঁরা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী এবং জ্যঁা-ভেরন তাঁর সন্তানের পিতা। এজন্য এবং সন্তানের বৈধতার (Legalizing her child) জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের একটা স্বীকৃতি প্রয়োজন।

একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে সুযোগ এসে গেল। সংবাদপত্রের পাতা উলটাতে উলটাতে ত্রিবুর নজরে পড়লো, নিকোল-রেমুদ নাম্নী একটি মেয়ে বিয়ে করতে চান, তাঁর প্রণয়ীকে, যিনি মারা গেছেন দু' বছর আগে।...এই দেখে জ্যাকুলিন ত্রিবু, জেনারেল দ্য গলের কাছে দরখাস্ত পাঠালেন,—তাঁর মনের কথা জানিয়ে। সম্মতি এলো সরকারের পক্ষ থেকে—এই সর্ত্তে যে, উভয় পরিবারের মতামত থাকা চাই উক্তবিধ বিবাহে। শেষ পর্য্যন্ত সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ল ঘটা করে লানী শহরের টাউন-হলে। বিয়ে হ'ল জ্যাকুলিন ত্রিবুর মেয়ের বয়স যখন প'নেরো। স্বামীকে কাছে না পেয়েও তিনি খুশী হলেন। খুশী এইজন্য যে, তিনি আজ সমাজ ও আইনের চোখে জ্যঁা-ভেরনের বৈধ পত্নী। স্বীকৃত তাঁর এবং সন্তানের দাবী জনগণের কাছে। (২)

আকাশে বিবাহ

নূতনত্ব এবং বৈচিত্র্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। যা' কেউ করতে পারেনি, করেনি—আমি তাই করবো। চমক লাগিয়ে দেবো—জনগণকে এই মনোভাব অনেকেরই আছে। এরা সাধারণ নয়, অসাধারণ, এরা হতে চায় পথিকৃৎ পাইয়োনিয়ার (Pioneer)। চীন দেশের এক ধনী তুলা ব্যবসায়ী তরুণ, চিরাচরিত পথ ও

(১) পয়গাম ২৭-৫-৫২

(২) দৈনিক আনন্দ-বাজার ১২।৩।৬১

প্রথা ত্যাগ করে উর্দ্ধ আকাশে বিবাহ অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছা করলেন। অঢেল অর্থ, সাধ জেগেছে যখন, পূর্ণ হতে দেরী হ'ল না তাঁর আকাঙ্ক্ষা। পাত্রী ছাব্বিশ বৎসর বয়স্কা সিসলিতানকে নিয়ে—তিনি উড়ুক্কু-জাহাজে উঠলেন। উঠলেন তাতে পুরোহিত আর জনকয়েক বরযাত্রী। চা'র হাজার ফিট উর্দ্ধে গগন-তলে বিমানে সুসম্পন্ন হ'ল বিবাহ অনুষ্ঠান! (৩)

পাতালে বিবাহ

অর্থের প্রাচুর্য্য থাকলে অনেক আজব কাজ করা যায়। ধনী বণিকের দেশ—আমেরিকা। বর মিঃ কে, টি, উইলিয়ম, আর কর্থে মিস জে, এফ, গাট্রিক তাঁদের ইচ্ছা পাতাল প্রদেশে নেমে, সেখানে "শাদী" করবেন। কাগজে কাগজে বের হ'ল তাঁদের বিয়ের এই তাজ্জব খবর। জলে নামা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আর জলযান নিয়ে, আর সেই সঙ্গে নিয়ে পাত্রী পুরোহিত সাগরের অতল-তলে নেমে বিবাহ অনুষ্ঠান সারলেন তাঁরা। কাজ সারা হ'ল নির্ঝঞ্ঝাটেই। উঠে এলেন উপরে ধূলি-ধরণীর বুকে। তার পর হ'ল মধুযামিনী যাপনের ব্যবস্থা। (৪)

গুহা-গহ্বরে বিবাহ

রয়টার-পরিবেশিত ইতালীর গোরিভসিয়ার একটি সংবাদে প্রকাশ—পাত্র বোরিস ফ্রান্সেসচিনি ভূগর্ভের চল্লিশ মিটার নীচে গিয়ে পাত্রী রেণাতা ওসানাকে বিয়ে করেছেন। পর্ব্বত শৃঙ্গের পার্শ্বে দড়ির মই দিয়ে তাঁরা একটি ভূগর্ভস্থ গুহায় নামেন। তাঁদের সঙ্গে নামেন পুরোহিত এবং কয়েকজন দর্শক। এই বিবাহ-উপলক্ষে উক্ত গিরি-গহ্বরটিকে আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়েছিল। কনে গুহাবাসী মানুষদের পোষাক পরিধান করেছিলেন। এই নব দম্পতি বিবাহের পূর্ব্ব হতে প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসী মানুষদের গৃহ-জীবন-সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। সম্ভবত: গুহা-জীবনের অভিজ্ঞতা ও আস্বাদ গ্রহণের জন্য তাঁরা গুহা অভ্যন্তরে বাসর-রচনা করেছিলেন। (৫)

সিংহের পিঞ্জরে বিবাহ

ওহিও'র ক্লীভল্যাণ্ডের সন্দেশ। পরিবেশন করেছেন রয়টার। বিগত ১৯৫৭ সালের ১১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের রাত্রে জন্তু-জানোয়ারের প্রখ্যাতনামা শিক্ষক জর্জ্জ কেলারের সঙ্গে, শিল্প-শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী জিনিওরীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে সিংহ-পিঞ্জরের অভ্যন্তরে। দু'হাজার সার্কাস-দর্শক প্রত্যক্ষ করেছিলেন এই বিবাহ-অনুষ্ঠান। পিঞ্জরের অভ্যন্তরে যে সব 'মেহ্‌মান' ছিলেন, তাদের মধ্যে "লিউ" ও "নোসী" (Lew and Nosi) নামক পশুরাজদ্বয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিঃ কেলার পিঞ্জরের মধ্যে শান্ত ও স্বাভাবিকভাবেই ছিলেন কিন্তু নববধূ জিনিওরীর মধ্যে কিছুটা ভীতির ভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। অঙ্গুরীয় বিনিময় কালে তাঁকে দেখা গিয়েছিল ঈষৎ কম্পমানা অবস্থায়। (৬)

(৩) দৈনিক ইত্তেহাদ (কলিকাতা সংস্করণ) ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৩।

(৪) মাসিক মোহাম্মদী—আষাঢ়, ১৩৩৭, পৃঃ ৬৯১।

(৫) দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা ২১।৪।৬০

(৬) দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা ২১।২।৫৭

বৃক্ষ-শীর্ষে বিবাহ

ফিলিপাইনের নেগ্রিটো (Negrito) উপজাতির মধ্যে গাছে চড়ে বিয়ে করার এক প্রথা আছে। নেগ্রিটো পাত্র এবং পাত্রী যথাক্রমে পাশাপাশি দুটো পাম (Palm) গাছে উঠে দোল খেতে খেতে এক অপরকে ছুঁয়ে দেয়, এবং ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যেই জানিয়ে দেয় যে, তারা এক অপরকে বিয়ে করলো। তার পর তারা গাছ হতে নামে এবং বিবাহের অন্যান্য আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। (৭)

কারাগারে বিবাহ

জাপান। কারখানার পুরুষ শ্রমিক সাদাও-সিমিজু এবং নারী মজদুর জাংকে-কাওয়া-সিমা। প্রণয় হয় তাদের মধ্যে এবং পরিণয়ের কথাও পাকা হয়। অপর শ্রমিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপে বিরক্ত হয়ে উঠে সাদাও-সিমিজু। উদোর পিণ্ডি পড়ে বুধোর ঘাড়ে। কাছে-ভিতে আর কাউকে না পেয়ে—সামনে থাকা, কাওয়া সিমার গলা টিপে ধরলো। কাওয়া সিমার সত্যি সত্যি খুন হ'ল না বটে তবে নিমখুন হ'ল কাওয়া-সিমা। হৈ-চৈ হ'ল। পুলিশ এলো পাকড়াও করে হাজতে নিয়ে গেলো সাদাও সিমিজুকে।

ধীরে ধীরে সেরে উঠলো কাওয়া-সিমা। সেই সঙ্গে জেগে উঠলো তার পুরোনো প্রেম। কেঁদে উঠলো মন। বিরহ আর সহ্য করতে পারলো না সে, জেলখানায় গিয়ে দেখা করলো সাদাও সিমিজুর সঙ্গে। দু'জনের চোখেই দেখা দিলো জল। চোখের জলে ধুয়ে মন পরিষ্কার হয়ে গেল। মেঘ কেটে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠলো আবার জ্যোৎস্নার আলো। কথা উঠলো বিয়ের। সঙ্গে সঙ্গে তারিখও ঠিক হয়ে গেল। সরকারের অনুমতিক্রমে বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ল কারাগারের অভ্যন্তরে; (৮)

যুক্তরাষ্ট্রের এক ব্যাঙ্ক-ডাকাত। ধরা প'ড়ে জেল হয় বারো বৎসরের জন্য। তারও বিয়ে হয়েছিল জেলখানার ভিতর। বিয়ের পর ছাব্বিশ বৎসর বয়স্কা বধূ মন্তব্য করেছিল তার বর ছাড়া পাবার পর সৎভাবে জীবন-যাপন করবে—এই শপথ করেছে। আর এই প্রতিজ্ঞার উপরে বিশ্বাস করেই সে তাকে বিয়ে করেছে।

আমেরিকার আর এক কয়েদী। জেলের লাইব্রেরীতে এসে সে বই-নেওয়া-দেওয়া করতো। লাইব্রেরীয়ান ছিলেন এক তরুণী। যাওয়া-আসা করতে করতে কয়েদী তার প্রেমে পড়ে। বই অদল বদল করার সংখ্যা আরও বেড়ে যায় ঘন হয় যাতায়াত, ভাব জমে উঠে উভয়ের মধ্যে। বিয়ের কথা-বার্ত্তাও ঠিক হয়; মুক্তি পাবার পর সেই তরুণীর সঙ্গে হয় তার বিবাহ। পরে জানা যায় সে—তরুণী সেই কারাধ্যক্ষেরই কন্যা।

মেক্সিকোর এক কয়েদী। দু'টি খুনের জন্য হয় তার কুড়ি বছর জেল। জেলখানাতেই হয়েছিল তার বিয়ে। যে মেয়েটিকে সে বিয়ে করেছিল—সে ছিল সুন্দরী। দোহারা-চেহারার স্বাস্থ্যবতী নারী। (৯)

(৭) AmritaBazar Patrika 21-7-61

(৮) যুগান্তর পত্রিকা ৪।৬।৬১

(৯) আনন্দবাজার পত্রিকা ১০।১২।৬১

নিষিদ্ধ এলাকা

কালপুরুষ

৯

আমি বারান্দায় বসে বসে ভাবছি—আকাশ-পাতাল। কতক্ষণ ভাবছিলাম মনে নেই। হঠাৎ পিছন থেকে এসে কে যেন দুই চোগ চেপে ধরল।

মাষ্টারবাবুর একটা ছেলে অমল আমার খুব ন্যাওটো ছিল। সে প্রায়ই যখন-তখন আসত। রান্না করছি হয়ত, কোথা থেকে এসে গলা জড়িয়ে ধরে ঝুকে পড়ল। আমি হয়ত খানিকটা চিৎ হয়েই সামলে নিলাম। কখনও বা পিছন থেকে এসে এই ভাবে চোখ দুটো চেপে ধরত। আমি দু'একবার এমনি জোর করে হাত ছাড়িয়ে দিয়েছি ওর। কিন্তু এ-সময়ে তো তার স্কুলে থাকবার কথা। তাই একবার হাতে হাত বুলাতেই বুঝলাম। চাপা গলায় বললাম—ছাড়ুন, মা রয়েছেন যে ও ঘরে। তিনিও উত্তরে বললেন—থাকুক মা। চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে আমার হাত ধরলেন। বললেন—এসো। আজ আর পড়া মোটেই হল না! আমার আবার বেরোবার সময় হয়ে এল।

তাই নাকি? যাই তা হলে চা তৈরির যোগাড় করি।

না—বলে বিশুবাবু পথ আটকে দাঁড়ালেন।

মাঝ পথে আবার বাধা দিলেন ইনস্পেক্টর—তোমার এ সব প্রেমের গল্প তো আমরা শুনতে আসিনি। তোমার আসল পরিচয় কিছু থাকে তো বলো। আর, না বলো তো চলে যাই। তুমি পচতে থাক জেলে।

বন্দনা-ও এতে একটু ক্ষুণ্ণ হল। বলল ইতিহাস-ই আমার এই। ইচ্ছা হয় শুনবেন। না হলে আমি আর কি করতে পারি!

আচ্ছা, আমি চলি—বলে ইনস্পেক্টর ছোট্ট একটা নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য, আমিও একটা প্রতি-নমস্কার করলাম।

ইনস্পেক্টর চলে গেলে বন্দনা আমাকে প্রশ্ন করে—ইনস্পেক্টরবাবু রাগ করে চলে গেলেন, তাই না?

আমি উত্তর দিলাম—মনে হল তো সেই রকমই। আচ্ছা, তারপরে সত্যিই কি হল? ওখানে ছিলে তো ভালই। এখানে ছিটকে এলে কি করে?

ওই বিশুবাবুর জন্যেই।

চমকে উঠলাম আমি—বিশুবাবুর জন্যে! কেন তিনি তো তোমাকে—

হাঁ, ভালবাসতেন। শুধু তিনিই নয়, তার মা-ও আমাকে স্নেহ করতেন রীতিমত। এমন কি—না থাক, পাপমুখে আর সে কথা নাই বা শোনালাম আপনাকে।

বুঝেছি—ছেলের বৌ করতে চেয়েছিলেন, এই তো? তা অন্যায়টা কিসের? দোষ কোথায়?

তাদের পক্ষে হয়ত অন্যায় হত না, বা দোষও ছিল না; কিন্তু আমার পক্ষেই তা দোষের হত।

হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে বিশুবাবুর শরীরটা অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রথমটা তেমন গ্রাহ্য না করাতে শেষে সেটা ঘোরতর হয়ে দাঁড়াল। আমার আর কিছুতেই বেরিয়ে পড়া হল না। অসুখ ক্রমে টাইফয়েডে দাঁড়াল। আমার যে কি চিন্তা হতে লাগল। দিনরাত ভগবানকে ডাকতে লাগলাম—ওকে ভাল করে দাও, ঠাকুর। ঠাকুর-ঘরে পুজো করতে বসে খালি ওরই চিন্তা। ডাক্তার সেদিন এসে মুখ গম্ভীর করে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে, আমি তার পাশে গিয়ে শুধালাম—ডাক্তারবাবু, কেমন দেখলেন?

তেমনি গম্ভীর মুখে তিনি বললেন—বলা কঠিন! তবে সেবা শুশ্রূষার দরকার। প্রচুর।

মন স্থির করে ফেললাম। আমি-ই করব, ওর সেবা-শুশ্রূষার ভার সম্পূর্ণ আমি নেব। মাকে বললাম। তিনি শুনে চোখের জলে আমাকে বুকে টেনে নিলেন, বললেন—মা, আগের জন্মে তুমি নিশ্চয়ই আমাদের কেউ ছিলে।

কয়েকদিন পর। বিশুবাবু তখন ফাঁড়া প্রায় কাটিয়েছেন।

রাত্রি তখন দু'টোর কাছাকাছি হবে। আমি ওকে একটা ক্যাপস্যুল খাইয়ে দিয়ে ঐ বিছানাতে বসেই তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু কখন যে দু'চোখ ভেঙে ঘুম এসেছে এবং আমি ঐ বিছানাতেই—ওরই পাশে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা টের পাইনি মোটেই। কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম—না, কেউ দেখেনি। কিন্তু যে দেখবার সে ঠিকই দেখেছিল। দেখেও সে কিছু বলেনি।

আমার ধড়মড় করে উঠে বসাতেই হয়ত বিশুবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। হেসে বললেন—কি দেখছ অমন করে?

এই এখানে—

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—এই তো! আমি জানি।

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ডাকোনি কেন?

আমি তো ইচ্ছে করেই ডাকিনি। দেখছি তো, তুমি কি ভাবে আমার সেবা করছ। তুমি না থাকলে এ যাত্রা বোধ হয় আর—বলে সত্যি সত্যি সে কেঁদে ফেললে।

আমি আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললাম—ছিঃ, কাঁদে না। তাতে আরও খারাপ হবে।

আমাকে পাশে বসতে ইঙ্গিত করল। আমি পাশে বসলাম। আমার কোলের উপর শীর্ণ একটা হাত রেখে সে শুধাল—আর জন্মে তুমি আমার কে ছিলে বলো তো?

চুপ করে রইলাম। ওর সঙ্গে ছেলেমানুষী করতে গেলে এই ভাবে আবোল-তাবোল বকেই রাত কাবার হয়ে যাবে।

কি, উত্তর দিলে না যে! আচ্ছা সে যাক, এ জন্মে তুমি আমার হবে?

চমকে উঠলাম আমি এ প্রশ্নে। উত্তর না দিয়েই বললাম—দাঁড়াও, আসছি।

এসে দাঁড়ালাম বারান্দায়। মহাশূন্যে, নীলাকাশে রাত্রিশেষের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। অগুনতি তারা-ভরা আকাশে কয়েকটি তারা খুব উজ্জ্বল আর প্রকট আর মৌন। কত শতাব্দীর ব্যথা তাদের বুকে। চঞ্চল তারার সভায় তারা যেন একান্ত বেমানান। দু'একটি নিশাচর ঘরে ফেরার পথে স্তব্ধ আকাশকে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে কর্কশ স্বরে ডেকে।

আমি এমনই চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলাম যে, ওপাশের ঘর খুলে মা যে কখন বেরিয়েছেন, বুঝতেই পারিনি।

আমাকে ঐ অবস্থায় দেখেই তিনি বেশ জোরেই চীৎকার করে উঠলেন—কে, ওখানে?

আমি, মা।

ও-মা, বন্দনা। বলে ধীরে ধীরে কাছে এসে মাথায় হাত রেখে বললেন—খুব গরম লেগেছে বুঝি? একদিন যা গরম পড়েছে! তা তোমার বোধ হয় এক কোঁটাও ঘুম হয়নি।

হ্যাঁ—বলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম বটে; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল—সব কটি প্রশ্নের উত্তর এতে শোভন হবে না।

বিশুর পথ্য করার দিন। আমি খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে নিলাম। একাই রান্নাবান্নার যোগাড় করা, জল আনা,—সব করলাম। কে যেন আমাকে ভিতর থেকে অফুরন্ত উৎসাহ দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

খেতে দিয়ে আমি সামনে বসে বাতাস করছি, মা এসে থপ করে সেখানে বসে পড়লেন। তারপর নিজেই বলতে আরম্ভ করলেন—কি সেবাটাই না করলে তুমি, মা। তুমি না থাকলে এ যাত্রা আমার ছেলেকে যমের মুখ থেকে ফেরানোই যেত না। এত মমতা, এমন স্নেহ, আন্তরিক টান না থাকলে কেউ কি করতে পারে কারো জন্যে? তা মা, আমি বলছিলাম কি, তোমার হাতেই ওর চিরদিনের ভার তুলে দিই।

লজ্জায় আমার কর্ণমূল গরম হয়ে উঠল। কোন কথা বলতে পারলাম না।

এদিকে হাতের পাখাও কখন থেমে গিয়েছে বুঝতে পারিনি। বিশু বলল—দাও, পাখাটা আমার হাতে দাও। এ কথায় আমার সম্বিৎ ফিরে এল। কিছুটা ধাতস্থ হলাম। আবার জোরে জোরে বাতাস করতে লাগলাম।

বিশু সেরে উঠে চাকরিতে জয়েন করেছে। কিন্তু এখন সে এত খিটখিটে হয়েছে, আর অল্পেতেই এত রেগে যায় যে, মাঝে মাঝে আমারই ভয় হত তার সামনে যেতে। তার জামা-কাপড়, জুতো-ঘড়ি কলম সব আমাকে হিসাব রাখতে হত, প্রয়োজন মত তা আনাতে হত, গুছিয়ে তুলতে হত। বেরোবার সময় হাতে হাতে এগিয়ে দিতে হত ঘড়ি কলম ইত্যাদি।

শহরের সিনেমায় ভাল ছবি এসেছে। সন্ধ্যেবেলা যাবে বলে বিশু সকাল সকাল বাড়ী ফিরে এসে বলল—সিনেমায় যাব, একটু তাড়াতাড়ি কর।

সিনেমা নাম-ই শুনেছি এতদিন। যারা দেখেছে তারা বলত 'টকি', ছবিতে কথা কয়। বিশ্বাস হত না পুরোপুরি তাদের কথা। তাই মনে মনে ইচ্ছা থাকলেও মুখে স্বীকার করতে কোথায় যেন একটু বাধো-বাধো ঠেকছিল। বলে ফেললাম—আমার তাড়াতাড়ি করার কি আছে?

বারে, তোমাকেও যেতে হবে যে,—এই দেখ। বলে পকেট থেকে দু'খানা টিকিট বের করে দেখাল আমাকে।

কেন আবার আমার জন্যে এত খরচ করে ফেললে। এ তোমার ভারী অন্যায়। আমি যাব না।

রেগে উঠল বিশু। যাবে না তো? সত্যি বলছ? বেশ, আমিও যাব না—ছিঁড়ে ফেলছি টিকিট দুটো। সত্যি ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিল টিকিট দু'খানা—আমি চেপে ধরলাম হাত দু'খানা—ছিঁড়ো না, ছিঁড়ো না। আচ্ছা যাও, যাব।

হাসি ফুটল বিশুর মুখে মেঘলা-ভাঙা রোদের মত।

অমিতা দেবী ঠিক এই সময় বাড়ীর ভিতর ঢুকেই বললেন—কি ছিঁড়তে যাচ্ছিলি রে বিশু?

গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল বিশু—সিনেমার টিকিট।

কেন?

বন্দনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিশু বলল—উনি যাবেন না, তাই রাগ করে—

মাঝপথে বাধা দিয়ে শাসনের সুরে মা বললেন—বলছে যখন, যাও না মা। আমি চালিয়ে নেব এদিককার কাজ সব।

ছবিখানায় জায়গায় জায়গায় খুব ভয়ের দৃশ্য ছিল। আমার আবার ও ধরণের ছবি মোটেই ভাল লাগে না। খুন জখম বা তার সম্ভাবনা থাকলে তেমন দৃশ্যে আমি চোখ বুজে থাকি। একবার ফিসফিস করে বললামও সে কথা বিশুকে। হেসে উঠে সে বলল—দূর পাগলী। আচ্ছা, আমার হাত ধরে রাখো। কোন ভয় নেই।

সিনেমার শেষে দু'জনে হেঁটে আসতে আসতে ঐ গল্পই হচ্ছিল। আমি একেবারে ওর গা ঘেঁসে চলতে লাগলাম। হেসে একবার শুধাল বিশু এখনও ভয় করছে নাকি?

হুঁ। ছোট্ট একটা উত্তর দিলাম।

আচ্ছা, ও গল্প থাক তবে।

ফিরতে আমাদের প্রায় রাত দশটা হয়েছিল। দরজা খোলা ছাড়া মা'কে আর কোন বিরক্ত করিনি।

ওখানে একটা পুরানো রাজবাড়ী আছে। কেউ বলে তার বয়স ছ'শো বছর। কেউ বলে তারও বেশি। রাজবাড়ী সংলগ্ন একটা মন্দির আজও অক্ষত আছে। তার পুরোহিত বলে যায় গড় গড় করে রাজার ইতিহাস, তার পূর্ব-পুরুষদের কাহিনী। কিছুটা মনে হয় সত্যি, খানিকটা তার পূর্বগামীদের কাছ থেকে শোনা, কিছু বা তার মন-গড়া।

বিশু সেদিন বিকেলে আমাকে টেনে নিয়ে গেল এই রাজবাড়ী দেখাতে।

জরাজীর্ণ ঘর, দালান। এখানে ওখানে মস্ত ফাটল। দেয়াল বেয়ে নেমে এসেছে রাজ্যের শিকড় অসংখ্য সাপের মত। পায়ে চলা সরু পথটা বাদে আশে-পাশে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। বিকেল বেলাতেই সুরু হয়েছে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক!

তিনতলার ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আছি। জোর হাওয়া দিচ্ছে। আমার শাড়ীর আঁচলটা কখনও কখনও বিশুর পিঠের সঙ্গে লেপটে যাচ্ছে। দূরে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। বনান্তের মাথায় মাথায় নীলচে রঙের সন্ধ্যা নেমে আসছে।

কোন কথা নেই দুজনের মুখে।

হঠাৎ আবার বিশুই বলে উঠল, ভাঙা ছাদের নীচের দিকে একটা হলঘরের ভগ্নাবশেষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে—

ঐ যে হল-ঘরটা দেখছ, ওটা ছিল ওদের মজলিশের ঘর। নাচ-গান-বাজনা হত ওখানে। রাজারা ছিলেন সমজদার লোক। আর সেকালের রাজাদের বা বড়লোকদের যা দোষ ছিল, জানোই তো। বাইজী নাচ থেকে আরম্ভ করে কিছুই বাদ যেত না। সময় সময় খুন-খারাপীও হতো এতে। কিন্তু এরা খুন হয়ে গেলে বা গুম করে দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে মাটির নীচে একটা ঘরে ঠেলে দিয়ে চাবি বন্ধ করে দিত। এখন সে ঘরের মুখটাতে একটা বিরাট চৌকো হাঁ-এর মতন হয়ে আছে। চল—দেখাব তোমাকে।

আমি তার কাছে সরে গিয়ে বললাম—আমার আর তার দরকার নেই। বাড়ী চলো। যত আমি এসব ভাল বাসিনে, ততই তোমার এই সব কথা। তোমার বুঝি খুব মজা লাগে!

কত যুগের আগের কাহিনী। তাতেও ভয় করে তোমার? হো হো করে হেসে উঠল বিশু।

হুঁ, করে। আর নয়, চলো বাড়ী যাই। বলে তার হাতে একটা মৃদু টান দিলাম।

বেশ, চলো।

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি বললাম—দেখো তো কি অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। হুমড়ি খেয়ে পড়ে না মরি।

আমার হাত ধরো শক্ত করে।

ওর হাত ধরেই নীচে এসে যখন নামলাম মুক্ত হাওয়ায়, তখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—বাবাঃ, বাঁচলাম।

গোধূলির হালকা আঁচল তখন ছড়িয়ে পড়েছে শহরের গায়ের উপর। রাস্তার বাতিগুলো সবে জ্বলে উঠেছে। আমরা পথ বেয়ে চলেছি অতি লঘু পদক্ষেপে।

রাস্তার ডানদিকে একটা ফটোর দোকান। বাইরের দিকে সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধাই রকমারী সাইজের ফটো ঝুলছে। কত ফটো বা শো-কেসের মধ্যে সাজানো। একটি ফটোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বললাম বিশুকে—দেখ, ফটোটা কি সুন্দর। মেয়েটার চেহারাটা বড় কোমল—তাই না?

হ্যাঁ, তোমার মতই।

যাও—তুমি ভারী অসভ্য—

কথা শেষ না হতেই বিশু বলে উঠল—চল না, তোমাতে আমাতে মিলে একটা ফটো তোলাই।

কোন কথা বললাম না। ফটোর দোকান পার হয়ে গেলাম।

আবার একটা ফটোর দোকান সামনে। বিশু আবার প্রশ্ন করল—কি হল, উত্তর দিলে না যে আমার কথার।

আচ্ছা চলো। কিন্তু একসঙ্গে হবে না।

বেশ, তাই চলো। আগে কিন্তু তোমার হবে।

দুজনে ঢুকে পড়লাম দোকানে; ফটোগ্রাফার কি মনে করেছিল জানিনা। তবে বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে দুজনের দুখানা ফটো তুলে নিল। পরের দিন এসে কপি নিয়ে যেতে বলল।

পরদিন বিকেলে গিয়ে বিশু ছয়কপি ফটো নিয়ে এল। আর ফটোগুলো সবই আমার কাছে রাখতে দিল। আমি রেখে দিলাম কাগজে মুড়ে বিছানার তলায় মাথার নীচে।

কয়েকদিন পরের ঘটনা।—রাত্রিতে ফিরতে সেদিন অনেক দেরি হল বিশুর। মা তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি একা জেগে বসে ছিলাম। একটু ঝিমোনি এসেছিল হয়ত—জোর কড়া-নাড়ার শব্দে চমকে উঠে দরজা খুলে দিলাম।

হেসে শুধালাম, এত দেরী যে!

ওঃ, সে আর বল না। আজ একটা লোক কাটা পড়েছে রেলে, আমাদের ষ্টেশনে। এই সন্ধ্যে সাতটার ট্রেণে। তাই নিয়ে হৈ চৈ, থানা—পুলিশ, এনকোয়ারী ইত্যাদি। তাই ছিলাম এতক্ষণ। লোকটার বোধহয় মুদিখানার দোকান ছিল—

আমার বুকটা ধড়াস করে কেঁপে উঠল। গলার স্বর বোধ হয় বিকৃত হয়ে গেল যখন আমি প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা, তার নামটা কি?

মুদিখানার হিসাবের খাতায় যে নাম পাওয়া গেছে তাতে লেখা আছে—অমূল্যচরণ দাস।

আমার চোখ মুখের চেহারা নাকি অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। বিশু তাই দেখে বলল—অমন করছ কেন তুমি? চলো—বলে আমাকে একরকম ঠেলেই নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। চৌকিতে বসিয়ে নিজে পাশে বসল। কুঁজো থেকে জল এনে চোখে মুখে ঝাপটা দিল। শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখ-চোখ মুছাবার পর হাওয়া দিতে লাগল।

একটু সুস্থ হলে আমাকে জোর করেই বিছানায় শুইয়ে দিলে। উঠবে না খবরদার—বলে বিশু জামা-কাপড় ছাড়তে লাগল। আমি তার দিকে অপলক নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম।

জামা কাপড় ছাড়া হয়ে গেলে বিছানার পাশে এসে একেবারে মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে শুধাল—কেমন লাগছে?

হাসলাম আমি—ভালই। কিছু হয়নি আমার। তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

আচ্ছা লোকটার বাড়ী কোথায়—দেখেছ কিছু?

হ্যাঁ—দেখেছি, গোবিন্দপুর।

ওঃ, ঠিক যা মনে করেছি, তাই—

তার মানে? হ্যাঁ, আর একটা কথা। ওর পকেটে একটা নোটবই ছিল। তাতে একটা রহস্যজনক কথা লেখা ছিল—

কি? বলে আমি বিছানার উপর উঠে বসলাম। আর ধৈর্য্য ধরতে পারছিলাম না। বললাম—কি, বলোই না ছাই তাড়াতাড়ি।

এক জায়গায় লেখা আছে বন্দনার দাদাকে তিনশ' টাকা আগাম দেওয়া হল। কিন্তু কি জন্যে, তা লেখা নেই, এইটুকুই এর রহস্য।

তারপর?

বললাম যে, আর কিছু নেই। তার পরের টুকুই তো বের করবে পুলিশে।

তাহলে তো এখানেও পুলিশ আসবে।

কেন? তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

সম্পর্ক? আমিই তো সেই বন্দনা। আর সত্যিই আমার দাদা তিনশ' টাকা আগাম নিয়েছিল, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে বলে।

ও আমাকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমি রাজী হইনি। তা ছাড়া, সে টাকা আমি নিজে হাতে সম্পূর্ণ ফেরৎ দিয়েছি। আর সেদিন রাত্রিতেই আমি ঘর ছেড়ে আসি—অনির্দিষ্ট পথে। তারপর কলকাতা যাওয়ার পথে টিকিট কাটতে গিয়েই তো—

বুঝেছি। তারপর আমার এখানে। তা এতে তোমার ভয় কি? আমি তার জবাব দেব তোমাকে বিয়ে করে।

না। তা কখনই হবে না—হতে পারে না। বলে আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

রান্নাঘরে গিয়ে গুম হয়ে বসেছিলাম, হঠাৎ বিশু এসে হাত ধরতেই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললাম। বিশু কোন কথাই বলল না।

খানিকক্ষণ পর নিজেই চোখ মুছে বললাম—চলো তোমাকে খেতে দিই।

চলো—নির্লিপ্তের সুরে বলল বিশু।

বিশুর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে যথারীতি আমি খেয়ে নিলাম।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি—ঘুম আসছে না কিছুতেই। রাজ্যের চিন্তা মাথায় গিজ-গিজ করছে। কোথায় ছিলাম—আর কোথায় এলাম। অমূল্যের মত বিশু-ও আমায় বিয়ে করবার জন্যে পাগল। বিশুর ভালবাসার প্রতিদান কি একটা জীবনে দেওয়া যায়! তার চেয়ে দূরে সরে যাওয়াই ভালো। আমি যে বিধবা!

নিস্তব্ধ নিশুতি রাত। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা সুরে রাতের স্তব্ধতা কেঁপে কেঁপে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

হ্যারিকেনটা নিয়ে বাইরে এলাম। তারি আলোতে বারান্দায় বসে ধীরে ধীরে লিখলাম—"বিশু, তোমার ভালবাসা একদিন তোমার কাছে এনে দিয়েছিল আমায়। আজ সেই অগাধ ভালবাসাই আমাকে দূরে যেতে বাধ্য করছে। এ-জীবনে দ্বিতীয় বার বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ইতি—বন্দনা।" তারপর এসে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

আপ-ট্রেণ ডাউন-ট্রেণের ঘণ্টা চিনতে শিখেছিলাম। একটা ট্রেণের টিকিটের ঘণ্টা হতেই কান খাড়া করে শুনলাম—ডাউন ট্রেণ আসছে, রাত আড়াইটের ট্রেণ।

ক্ষিপ্রহস্তে গুছিয়ে নিলাম অন্ধকারে যা পেলাম খান কতক কাপড় জামা। আর নিলাম ফটোগুলো। সব কটা কপি। ওগুলো আমার বিছানার নীচেই ছিল সেদিন থেকে।

চিঠিখানি চাপা দিয়ে রাখলাম বিশুর টেবিলের উপরে। খোলা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়েই কাজটা সারলাম। সকালেই ওর চোখে পড়বে ঠিকই। তখন আমি অনেক দূরে। এই পৃথিবীর জনারণ্যে ঠিকানাহীন হয়ে ঘুরে বেড়াব, হয়ত ওর নাগালের বাইরে।

গাড়ীর শব্দ শোনা যাচ্ছে, দূর থেকে ভেসে আসছে। বেরিয়ে পড়লাম বাড়ী থেকে নিঃশব্দে। সোজা পথে সবার সঙ্গে ঢুকিনি ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মে, টিকিটও কাটিনি। প্ল্যাটফর্মের শেষ-সীমানা দিয়ে গিয়ে উঠলাম। ডাউন প্ল্যাটফর্মের উপর বিশ্রামের জন্য একটা শেড ছিল। নির্জ্জন দেখে সেখানেই কোন রকমে আত্মগোপন করে রইলাম।

ট্রেণের আলো দেখা যাচ্ছে—কিন্তু আমার কোন তাড়াহুড়ো নেই। চুপচাপ পড়ে আছি—বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ করছে। যদি হঠাৎ কেউ দেখে ফেলে! বিশু-ই যদি হৈ-হৈ করে এসে পড়ে! কত কি ভাবছি। এই ষ্টেশনেই একদিন এসে পড়েছিলাম—নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল; আবার আজ এই ষ্টেশন থেকেই বেরিয়ে পড়ছি ঠিক তেমনি ভাবে!

ট্রেণ এসে দাঁড়ালো। সামনেই একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। উঠে পড়লাম। এ কামরায় প্রায় সকলেই ঘুমে অচেতন।

শেষ রাত্রে ট্রেণ এসে যখন থামল শিয়ালদহ ষ্টেশনে, সবাই নেমে পড়ল। কি জানি আমার কাছে কেউ টিকিট চাইল না, অবশ্য আমি নেমেছিলাম অনেক পরে। বাইরে এসে ইতস্ততঃ করছি দেখে সন্দেহ হল পুলিশের। জিজ্ঞাসাবাদে সে সন্দেহ আরও বাড়ল। তারপর পুলিশের হাতে। সেখানে ঠিকানা চেয়েছিল। আমি দিইনি। মন-গড়া কতগুলো কথা বলেছি, আর বলেছি—কেউ নেই আমার।

কাজে কাজেই শেষ এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে এখানেই এসেছি। দেখা যাক ভাগ্য আবার কোথায় নিয়ে যায়।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল বন্দনার।

তোমার দাদা এর মধ্যে খোঁজ করেনি?

দাদার তো ভালই হয়েছে—নির্ঝঞ্ঝাট হয়েছে একেবারে। খোঁজ করেনি, আর করবেও না কোনদিন।

একটু ম্লান হাসি বোধ হয় ফুটল বন্দনার ঠোঁটের উপর।

সংস্কৃতস্য রাষ্ট্রভাষা-যোগ্যতা

শ্রীকুরুনাথ ন্যায়তীর্থ

সুপ্রাচীনতয়া প্রশংসিততয়া পাশ্চাত্যবিজ্ঞৈরপি।
বিশ্বেষাং পরমৈক্যসাধকতয়া লোকপ্রিয়া যুক্তিভিঃ ॥
নানা যান-বিমান-বাণ-রচনা-বৃত্তান্ত-পুষ্টাপরা।
ভাষা সংস্কৃত-সংজ্ঞকা ভবতু ভো! রাষ্ট্রীয় ভাষা দ্রুতম্ ॥

আসীৎ প্রাগজনাভ নাম বিদিতো বর্ষোত্তমোঽয়ং ততঃ।
খ্যাতো ভারত-নামতস্তু ভুবনে রত্নাদিভি র্ভূষিতঃ ॥
ভাষা সংস্কৃত-সংজ্ঞকাপি নিতরাং স্পর্দ্ধাবশাদ্ভারতী।
ব্রাহ্মীনাম সমাশ্রিতা চ জননী সংজ্ঞান বিজ্ঞানয়োঃ ॥

শাস্ত্রেঽস্মিন্ নৃপতন্ত্র শাসনবিধৌ কিংবা প্রজাতন্ত্রকে।
রাষ্ট্রাণাং পরিচালনে প্রতিদিনং যদ্ যদ্ বিধেয়ং তথা ॥
বাণিজ্যে কৃষিশিল্প-নীতি-নিবহে সন্ধৌ পুনর্বিগ্রহে।
তৎ সর্ব্বং কথিতং হিতায় জগতাং মন্বাদিভির্জ্ঞানিভিঃ ॥

ধাতুঃ শ্রীমুখনিঃসৃতা কবিকুলারাধ্যা চতুর্বর্গগা।
ভাবেয়ং ন মৃতা গতা চ কৃশতাং সেবাং বিনা সর্ব্বথা ॥
সর্বৈঃ প্রাণপণৈরহর্নিশমহো সংসেব্যতে চেৎ পুনঃ।
সংপুষ্টা বিবিধৈর্গুণৈ রসবতী সালঙ্কৃতা জায়তে ॥

বালির ওপর এই টা টা রোদ্দুরে ওরা ঘুরছে। হোটেলের গাছপালা-ঘেরা একতলার সাজান বারান্দায় বসে সেদিকে চোখ রেখেছিল শ্রাবণী, হাতের বোনা কোলের ওপর জড়োসড়ো হয়ে পড়ে আছে, সেদিকে একটুও মন নেই, পাশের চেয়ার ক'টিতে গৃহিণীদের মধ্যাহ্ন-মন্থর আলোচনা টুক টাক চলেছে, তাতেও তার কান নেই, শুধু চোখজোড়া দিয়ে সে যেন বালির ওপর ওদের এই ঘোরা ফেরা গোগ্রাসে গিলছে।

ঝিনুক কুড়োচ্ছে দীর্ঘ একহারা গড়নের মেয়েটি, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তিড়ি মেরে মেরে বালি-কাঁকড়ার মত তরতর করে এগোচ্ছে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনারাশির দিকে, ভাঁটা পড়ে বালি টান টান হয়ে বুক চিতিয়ে পড়ে আছে, এখন জলের রঙে শ্যামলের ঘোর লেগেছে, দক্ষিণের হাওয়া বইতে সুরু করেছে; মেয়েটির চুল ওড়ে, সাড়ির আঁচল এলোমেলো হয়ে যায়। থেকে থেকে সে পিছু হেঁটে এসে সঙ্গের মানুষটির খোঁজ করে, তারপর তার হাতের রুমালের ওপর দুহাতের ঝিনুক উপুড় করে দেয়।

সেদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে মিসেস সেন বেটক্কা বলে বসেন—মেয়েটি আপনার দস্যি বটে শ্রাবণীদি কিন্তু চেহারায় বড় শ্রী, দেখছেন ত ঐ আন-সোস্যাল মানুষটিকেও কেমন বশ করেছে?

এই প্রসঙ্গটাই চাপা দেবার চেষ্টা করছিল শ্রাবণী কিন্তু উপায় কী।

আর একজন বলেন—সত্যি তারিফ করতে হয় আপনার মেয়েকে; ভদ্রলোক আজ পর্যন্ত হোটেলের একটি বাচ্চার দিকেও মুখ তুলে চেয়ে দেখেন নি।

ঘামতে সুরু করেছে শ্রাবণী, বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে, কি করে; একটা যা কিছু হোক মন্তব্য তারও ত করা উচিত।

দোতলার আট নম্বর ঘরের মিঃ সেনাপতি চমৎকার বাঙলা বলেন। অবিবাহিত ইঞ্জিনিয়র, প্রৌঢ়ত্বের সীমা-রেখায় পৌঁছে গেছেন কিন্তু এখনও অবধি তাঁর বিয়ে করবার ফুরসৎ ঘটেনি। পরিহাস-মুখর মানুষটি মেয়েমহলে ইতিমধ্যে বেশ আসর জমিয়ে নিয়েছেন।

দু' চার বার কেসে তিনি বলেন—এ হোটেলে আপনারা সবাই ত এসেছেন এই প্রথম। আমি এসেছি বহুবার, বলতে গেলে সেই গোড়ার যুগ থেকে। তখন এমন সাজান গোছান হোটেল নয়, তার বদলে এই সাগর-পারে আটচালার মত গুটিকয়েক ঘর ছিল। এই কারণেই বোধ হয় যখনই আসি, এঁরা যত অসুবিধা হোক না কেন, দোতলায় সমুদ্রের মুখোমুখি আট নম্বরের ঘরটি প্রতিবারই আমাকে দেন।

ভাগ্যবান পুরুষ। সুরঙ্গমা টিপ্পনি কাটে, তার দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে উদ্ভাসিত মুখে সেনাপতি বলেন—ভাগ্যবান আমার চেয়েও সামনের ঐ মানুষটি, এ হোটেলের সব সেরা ঘর তিনতলার সতের নম্বর, এ নিয়ে প্রায় বার পাঁচ ছয় ওঁকে দেখেছি, প্রতিবারই ঐ সতের নম্বরে। শুনেছি মিঃ ব্যানার্জী নাকি হোটেলের মালিক চক্রবর্তী-পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভদ্রলোক মস্ত বৈজ্ঞানিক, এখন বোম্বাইতে থাকেন, নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে সম্প্রতি নাকি এক উল্লেখযোগ্য গবেষণার কাজ করেছেন।

এ সব মানুষের দুর্বলতা কখন কোন্ ফাঁকে ধরা পড়ে, তা কেই বা জানে?

শ্রাবণীর দিকে চেয়েই বোধ করি বিচিত্রভাবে হাসেন সেনাপতি। উত্তেজনায় কান ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে শ্রাবণীর। দুই একটা ছুতো খুঁজে শেষ পর্যন্ত নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করল। আজই মিষ্টুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে। যে মানুষটিকে দেখা পর্যন্ত সে সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছে, মেয়ে যেন তার দিক পানেই ঝোড়ো হাওয়ার মত ছুটছে।

এখানে আসাটাই এবারে বৃথা হ'ল। যা চায়নি, যাকে ভুলেও দেখতে চায়নি, সেই এসে পথ জুড়ে দাঁড়াল; কুড়ি বছর আগেকার একটা ভয়ানক সত্য এক্ষুণই বুঝি প্রকাশ হয়ে পড়বে, কি একটা শীগ গিরই ঘটে যাবে, ভয়ে হাত পা হিম হয়ে যায় শ্রাবণীর। পর মুহূর্তে মনে হয় এমন করে পালিয়ে না এলেই ভাল হ'ত, নীচে ওরা এতক্ষণ কত কিছু না জানি আলোচনা করছে। সেনাপতি লোকটা রসদ জুগিয়ে তার ওপর মেয়েদের মন পাবার জন্য কতই না চেষ্টা করছে। তবু ওখানেই চুপচাপ উলবোনা ভাল ছিল। বালির ওপর মিষ্টু আর ঐ মানুষটা ঘোরাফেরা করছে। হোটেলের নীচ থেকে জোড়া জোড়া চোখে ওরা তাদের পরখ করছে নিশ্চয়ই। কতখানি চওড়া কপাল ওদের, চিবুকের গঠন দুজনেরই চ্যাটাল কি নয় সে নিয়েও হয়ত ওদের তর্কাতর্কি হচ্ছে, ভগবান করুন মিষ্টুর কানে যেন সে সব না আসে। একটুক্ষণের মধ্যেই হৈ হৈ করে মিষ্টি ঘরে আসে, মার মনোভাব তার জানা,—মাগো, মা-মণি কেন তুমি অত রাগ কর ব্যানার্জী-কাকার সঙ্গে বেড়ালে?

মা বলেন—তোমার কাকাই বা উনি হতে গেলেন কবে থেকে? বিদেশে এসে যার তার সঙ্গে অত কাকা-মামাই বা পাতান কেন শুনি? আলাপ করতে হয়, যাও না বার নম্বর ঘরে, কলেজে-পড়া তোমারই বয়সী কত মেয়ে এসেছে কলকাতা থেকে। মায়ের বকুনিতে মিষ্টুর ভারি মজা লাগে। রেগে গেলে মার সম্বোধন তুই তুই ছেড়ে তুমিতে এসে দাঁড়াবে, তখন মায়ের পিঠের ওপর ছড়ান খোলা চুলে মুখ গুজে চুপচাপ পড়ে থাকে মিষ্টু।

মা ওর সর্বাঙ্গ জুড়ে রয়েছে। বালিতে লুটোলুটি খেতেও সে টের পায় তার পিঠে এসে লেপটে রয়েছে মায়ের স্নেহ-নিবিড় একজোড়া চোখ।

তবু আর কি কিছুই পাওনা নেই?

সবার বাপ থাকে, বাপের বাড়ি, মামার বাড়ি, আদিখ্যেতা করবার জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি মানুষ থাকে। ওরা শুধু দুজন, মা আর মেয়ে।

জন্মেতক দেখে আসছে মার হাঁসপাতাল-ডিউটি আর মিষ্টু। মধ্যপ্রদেশের রুক্ষ পোড়খাওয়া মাটিতে হেলা-ফেলার মাঝে মানুষ হয়েছে মিষ্টু। মিষ্টু শুধু সব চেয়ে বড় কথা এর মধ্যে ওর মা রয়েছে।

বছরের পর বছর সেই ছোট্ট জায়গায় একটু একটু করে বড় হয়েছে মিষ্টু। ওর মা শ্রাবণী হাঁসপাতালের নার্স। বিরাম নেই তার খাটুনির সারা বছর ভোর, মাকে দুঃখ দিতে মিষ্টুও ব্যথা পায়।

তাই দুচার দিন ও মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই নেটিপেটি হয়ে ঘোরে। ব্যানার্জী-কাকাকে মা পছন্দ করে না, নাই বা গেল তার কাছে যদি মা-মণি খুশী হয়! কিন্তু দুচার দিন বাদে সূর্যোদয় দেখতে যেয়ে আবার দেখা হয় ব্যানার্জী-কাকার সঙ্গে। যেন কিছুই হয়নি, মিষ্টু যে তাঁর কাছে আসেনি, সেদিকে যেন তার হুঁশই নেই মোটে, কাঁধে ঝোলান থলে থেকে ওর জন্য বেরুল রাশিকৃত ঝিনুক। সবগুলি তিনি যতনে মিষ্টুর জন্যই কুড়িয়ে রেখেছেন।

তারপর ওদের আবার দেখা যায় বালির চরে. দুপুর বেলা গৃহিণীরা বই পড়েন, কেউ বা উল বোনেন হোটেলের ছায়া-ঘেরা বারান্দায়। কথাপ্রসঙ্গে ওদের কথাও ওঠে।

মিসেস সেন সেদিন ফস করে বলেই বসেন—কিছু মনে করবেন না শ্রাবণীদি, কোথায় উনি আর কোথায় আপনি, তবু মনে হয় ভদ্রলোক মিষ্টুর কেউ ছিলেন বোধ হয় কোন জন্মে, মনের টানের কথা ছেড়েই দিন, দুজনের মুখেরই বা কি সাদৃশ্য! শুধু উনি কালো আর আপনার মেয়ে আপনারই মত টুকটুকে।

—অমন সাদৃশ্য ত কতজনারই কতজনার সঙ্গে আছে, তাতে কি এসে যায়?

শুধু এইটুকু বলেই গলা ধরে যায় শ্রাবণীর, একেবারে সরাসরি অপমান, আসল কথা সবই ঐ মানুষটার ষড়যন্ত্র। সবাইকে সাক্ষী মানাবার ফন্দী ছাড়া আর কী? অভিমানে, দুঃখে প্রায় কেঁদে ফেলে শ্রাবণী!

আর যাদের নিয়ে এ প্রসঙ্গ, তারা একজন বক্তা আর একজন শ্রোতা, এমন একনিষ্ঠ শ্রোতা পেয়ে মিষ্টু যেন বর্তে যায়।

কথাপ্রসঙ্গে যুদ্ধের কথাই ওঠে।

—যুদ্ধটা একটুও ভাল নয়, তাই না ব্যানার্জ্জী-কাকা?

—একটুকুও না।

—আমার বাবা ত যুদ্ধে মারা গেছেন, সেই কোহিমায়। এক মুহূর্তে মিষ্টুর গলাটা ধরে যায়, যে মানুষটিকে দেখেনি কোনদিন তাকেই মনে পড়ে বার বার, অন্ধকারে ব্যানার্জী-কাকার মুখটা দেখা যায় না, মনে হয় ব্যানার্জী-কাকা কম কথা বলে, একটু উঁহু, আহা অবধি করে না। মিষ্টুর অভাবটা কেউ বোঝে না। চোখ দুটো ওর কেমন জ্বালা করে।

এর পর ঘরে ফিরতেই মার তেমনি বেপরোয়া ভাব, বলেন কাল ভোর বেলাই নাকি হোটেল ছাড়তে হবে, যে ট্রেণ হোক সেই ট্রেণেই চাপতে হবে।

অভিমানে বুকটা গুমরে ওঠে, তবু মা-মণির জেদের কাছে হার মানতেই হয়।

নীল বাতি জালিয়ে অত বড় মেয়েকে সকাল সকাল শুইয়ে দেয় শ্রাবণী, একটা গানের কলি গুনগুন করে ওর গলায়।

নিস্তব্ধ নিকষ কালো রাত। অমাবস্যার ঘোর লেগে সমুদ্রের কোঁস-ফোঁসানি উত্তাল হয়ে উঠেছে, পর পর আসছে ঢেউ ফসফরাসের মালা গলায় গেঁথে, সেদিকে চেয়ে সেই ছোট্টবেলা মিষ্টুর চোখ চাপড়ে যেমন করে মা ঘুম পাড়াত, তেমনি করে তার চোখে হাত চাপা দেয় শ্রাবণী, আর মায়ের বুকের কাছে রাগে গরগর করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে মিষ্টু।

তখন নিঃশব্দে আলো জালিয়ে চিঠিটা লিখল শ্রাবণী—"কাল ভোরের ট্রেণেই আমরা চলে যাচ্ছি, যে ট্রেণ পাই সেই ট্রেণেই উঠে বসব, শুধু মিনতি করছি, তুমি আর আমার মেয়ের পিছু নিও না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ কথা তুমি রাখবে, কারণ যেখানে তোমার অধিকার নেই, সেখানে হাত বাড়ান ত মূর্খতা, তুমি জ্ঞানী, গুণী, প্রতিষ্ঠিত, মূর্খতা তোমার শোভা পায় না, মিষ্টুর জন্ম নিয়ে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছিল, মিষ্টুর পিতৃত্ব তুমি অস্বীকার করেছিলে। এতকাল আমরা দু'জন কোথায় আছি, কেমন করে দিন কাটছে, তা তুমি জানতে চাওনি, আজ এতকালকার পর মিষ্টুকে দেখে হঠাৎ তোমার মত মানুষের মনেও পিতৃত্বের আকাঙ্খা মুখর হয়ে আত্ম ঘোষণা করেছে, তোমার এই পিতৃত্বের কাঙালপনা থেকে যেমন করে হোক আমার মেয়েকে মুক্ত করতেই হবে।

"অধিকার তোমার সত্যিই নেই, মুখের আদল নিয়ে ঢাক পেটালেও নয়, সেদিন যা ভেবেছিলে তাই সত্য, মিষ্টুর পিতৃত্বের গৌরব তোমার নয়, সে আর একজনার, দুর্ভাগ্য আমার আর আমার মেয়ের। যে যুদ্ধ তোমার মত তাকেও টেনেছিল, মিষ্টুর বাপ প্রাণ দিয়েছিল কোহিমার যুদ্ধক্ষেত্রে।"

এই পর্যন্ত লেখার পর কলম থামে শ্রাবণীর। মুখে তার যন্ত্রণার লেশ মাত্র নেই। কেমন বিচিত্র হাসিতে সারা মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, মিথ্যে অপবাদে সারা জীবনটা দগ্ধে মরেছে। আজ এতদিন পর তার অবসর হল আর একটা আঘাতে গল্পে একটি মানুষকে যন্ত্রণা দেবার। আত্মপ্রসাদে মন ভরে ওঠে শ্রাবণীর।

প্রশান্ত চৌধুরী

১৫

সকাল!

হোসপাইপের জলে ধোওয়া রাস্তাটা ইতিমধ্যেই মানুষের পায়ে পায়ে কাদা হয়ে উঠেছে। কুকুর ছুটো খাবারের দোকান কটার আশেপাশে ফেলে দেওয়া ঠোঙায় মুখ দিয়ে জিলিপির রস আর হালুয়ার ভুক্তাবশেষ চেটে খাচ্ছে। রঙ্গলাল শর্মাকে কাঁধে চাপিয়ে কাল রাতে এসেছিলেন যাঁরা, চান-টান সেরে সাতখানা মোটরগাড়িতে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসে ফিরে গেছেন তাঁরা কিছুক্ষণ আগে। নিত্য-গঙ্গাস্নানের খদ্দেরদেরও এখন ফেরবার পালা।

সাগর কাল শেষরাতে যে বৃদ্ধাটিকে নিয়ে এসেছে, এখনো তাঁর দাহকার্য সমাধা হয়নি। দল ছাড়া হয়ে সাগর একলা ঠানদির সঙ্গে গল্প করছে দোকানের সামনেকার প্যাকিংবাক্সের ওপর আসন-পিঁড়ি হয়ে ব'সে। গল্প করতে করতে পান চিবোচ্ছে নাগাড়ে।

ঠানদির গঙ্গাস্নান হয়ে গেছে, শ্মশান ঘুরে আসা হয়ে গেছে, দোকানের বেচা-কেনা সুরু হয়ে গেছে। শুধু শ্যামাঠাকুরকে তার প্রত্যহের বরাদ্দ দুখানি গরম জিলিপি দেওয়া হয়নি এখনও। সকালের গঙ্গাস্নান সেরে এসে শ্যামাঠাকুর রোজ দুখানি গরম জিলিপি কিনে খায় ঠানদির পয়সায়। ব্রাহ্মণকে জল খাইয়ে তবে জলগ্রহণ করে ঠানদি। আজ কিন্তু কেন কে জানে, শ্যামাপদ পুজারী এখনো আসেনি। মনটা তাই একটু উতলা আছে ঠানদির। সেই উতলা মন নিয়েই গল্প করছিল ঠানদি সাগরের সঙ্গে,—এমন সময় শ্যামাপদ এসে হাজির।

চান-টান সারা হয়নি শ্যামাঠাকুরের। উস্কোখুস্কো চুল। রাত-জাগা চোখ। বলল,—বড় বিপদ ঠানদি। সোহাগীকে বুঝি বাঁচান গেল না আর। কাল সারারাত ভুল বকেছে। গা যেন আগুন। গলার আওয়াজ এমন যে মুখের কাছে কান পাতলে তবে যদি কিছু কথা বোঝা যায়। মাঝে মাঝে আর চেতনাও থাকছে না। কুড়িটা টাকা দাও না ঠানদি এখনি; ডাক্তারের ফী আর ইঞ্জেকশন লাগবে।

বড়ো বাক্সর মধ্যে মেঝো বাক্স, মেঝোর মধ্যে সেজো বাক্স, সেজোর মধ্যে ছোট বাক্স। সেই ছোট বাক্সর মধ্যে থেকে পঁচিশটা টাকা বের করে দিল ঠানদি তিন চারবার গুণে। বলল,—পাঁচ টাকা বেশিই হাতে রাখো গো শ্যামাঠাকুর; কী জানি এদিক-ওদিক যদি হঠাৎ কিছুর দরকার হয়।

শ্যামাপদ তাড়াতাড়ি টাকা কটা নিয়ে ট্রামরাস্তার দিকে ছুটল ঊর্দ্ধশ্বাসে।

ঠানদি হাতের তেলে চিটে হয়ে যাওয়া ছোট্ট একটা খাতা আর তার সঙ্গে সুতোয় বাঁধা হাতের কড়ে আঙুলের মাপের একটা উটপেন্সিল সাগরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—আজকের তারিখটা দিয়ে লিখে রাখতো দাদা 'সোহাগীর দরুণ শ্যামাঠাকুরকে পঁচিশ টাকা'। লিখতে আজকাল হাত কাঁপে!

পেন্সিলের সিসটা ভোঁতা। তাই দিয়ে লিখতে লিখতে সাগর বলল,—যা হাতাক্ষর আমার। পড়তে পারলে হয়। তা' তোমার খাতায় তো দেখছি অনেক নাম গো! সুদের কারবার খুলেছ বুঝি?

সুপুরি কুচোতে কুচোতে ঠানদি বলল,—হুঁ।

—সুদ কত টাকায়?

—চার আনা।

—ওরেব্ বাবা! তুমি যে কাবলিওলাকেও হার মানালে গো ঠানদি। কিন্তু কাকে কি দিয়েছ তা' তো লেখা রয়েছে দেখছি;—কার কাছ থেকে কি পেলে তা তো লেখ নেই দেখছি একটাও। সে কি আবার অন্য খাতা আছে নাকি গো?

ঠানদি খাতাটা টান মেরে সাগরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বলল—দশটা খাতা পাব কোথায়। ওই একটাই খাতা আমার।

—তাহলে! সবাই বুঝি নেবার বেলায় চতুর্ভুজ নারায়ণ, আর দেবার বেলায় ঠুঁটো জগন্নাথ!

—আহা, সুযোগ-সুবিধে হলে তবে তো দেবে মানুষে। তা নাহলে কি আমার ধার সুধতে গিয়ে আরেকজনের কাছে ধার নিতে যাবে নাকি?

—তোমার খাতায় তারিখ যা সব দেখলুম, সুযোগ-সুবিধে এ-জীবনে কোনোদিন হবে বলে তো আর বোধ হয় না।

ঠানদি কট্ কট্ করে আস্ত সুপুরি আধখানা করতে করতে মুখ বেঁকিয়ে বলল,—হুঁঃ, আমায় তেমনি আলগা মানুষ পেয়েছিস কি না! সব সুদ সুদ্ধ্ কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে তবে ছাড়ব। বাড়ুক না সুদে, ভালই তো।

সাগর বলল,—তা তো বটেই! দশ বছর যাক, বিশ বছর যাক, পঞ্চাশ বছর যাক, একশ বছর যাক, তুমি মরে যাও,—নাই বা দিল ওরা এক পয়সাও। বাড়ুক না সুদে, ভালই তো। কী বল ঠানদি?

কোনো কথা না বলে ঠানদি এক মনে সুপুরি কুচোতে লাগল।

সাগর বলল,—ভাখো ঠানদি, ওসব ঢং-এর কথা অন্য কাউকে শুনিও, আমার কাছে ওসব ছেড়ো না। বল না বাবা সোজা কথা, —ওদের আমি দান করি।

ঠানদি চোখ বড় বড় করে, মাথা ঝাঁকিয়ে, জিভ কেটে বলল,—ওমা, ছি ছি, ও কী কথা! আমি হলুম কত নিচু জাতের হতচ্ছাড়া মেয়েছেলে,—আমি কি দান করতে পারি? আমার তিনকুলে কে আছে বল? বিপদে-আপদে ওরা চায়, না দিয়ে কি থাকা যায়?

সাগর বলল,—বেশ কর। কিন্তু তবে ঐ খাতায় লেখার ঢংটুকু কেন বাবা?

ঠানদি ফোকলা দাঁতে হেসে বলল,—সুদের হিসেবটা কষবার সুবিধে হবে যে।

ঠানদির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সাগর বলল,—দাও গো।

—কী? আবার পান? অত পান খাস্ নে সাগর। জিভ জেবড়ে গেলে ভাত-তরকারির সোয়াদ পাবি নে।

—পান নয়।

কী তবে?

—পা দুটো বের কর।

—কেন?

—আলতা পরাব।

—দূর শালা! বুড়ি-বিধবাকে বলতে আছে অমন কথা?

—ধুলো নেব।

—ওমা, ছি ছি, কী ঘেন্নার কথা! আমি কী তা জানিস?

—জানতে চাই না। আমি একটা উল্লুক, আমি একটা শুয়োর, আমি একটা গাধা, তাই এতদিনেও তোমার পায়ের ধুলো নিইনি একদিনও। দাও চটপট্।

—ওরে, তোর কাছে বলা যায় না সব কথা। আমি অতি নোঙরা মেয়েমানুষ।

—ভালয় ভালয় দেবে, না ঠেংরি দুটো খসিয়ে নিয়ে চলে যাব?

—ওরে শোন্, শোন্, এ হয় না, হতে নেই, আমার পায়ে হাত ছোঁয়াতে নেই কাউকে। আমার তাতে পাপ হবে। নরকে যেতে হবে।

—আমাকে ভালবাস তুমি? বুকে হাত দিয়ে বল।

—বাসি।

—সেই আমার বাসনা মেটাবার জন্যেই নরকেই না হয় গেলে। পারবে না এটুকু ?

বলতে বলতে ঠানদির পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সাগর মুখ কুঁচকে বলে উঠল,—উঃ, ধুলো তো নয়, কাদা। কাদা না গোবর, তাই বা কে জানে! সত্যিই তুমি অতি নোঙরা মেয়েমানুষ ঠানদি।

ঠানদি তখন শুনতে পাচ্ছে না কিছু।

ঠানদি শুনতে পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না, ভাবতে পারছে না। ঠানদি শুধু কাঁপছে। থরথর করে কাঁপছে, আর ঝরঝর করে কাঁদছে। কেন কাঁপছে? কেন কাঁদছে? আনন্দে? দুঃখে? —টের পাচ্ছে না ঠানদি তাও। আজ এতকাল, এতকাল পরে একটা মানুষ হাত ছোঁয়াল ঠানদির পায়ে। ঠানদির পায়ে; মেনকার পায়ে। নেইরামের মা-এর মেয়ে মেনকা, শশিকান্তর বৌ মেনকা, রঙ্গলাল শর্মার রঙ্গ-সহচরী মেনকা, আবদুলের মেনকা, ত্রিলোকী সিং-এর মেনকা, শোভানবাবুর মেনকা, ভুতি গায়েনের মেনকা···তার পায়ে হাত ছোঁয়াল একটা মানুষ! এ কেন হল? কেন হল? কেমন করে হল?···

সাগর ধরে না ফেললে ঠানদির মাথাটা ঠুকে যেত দোকানের বালি-খসা দেয়ালে।

জ্ঞান হারিয়েছে ঠানদি!

ঠানদিকে শুইয়ে বালতি থেকে তার মুখে জলের ছিটে দিতে দিতে সাগর নিজের মনেই বলল,—লাও ঠ্যালা! বুড়ি কি পটল তোলার তাল করল না কি রে বাবা! কেউ কোথাও নেই, আমাকে কী ফ্যাসাদে ফেলল দেখো দিকিনি!

কিছুটা দূরে রেল-লাইনে শুয়ে পড়ে কালীকিঙ্কর পাগলা চেঁচাচ্ছে তখন,—আত্মহত্যা, আত্মহত্যা, বিবাহরাত্রে বরের আত্মহত্যা!

কিছুক্ষণ জলের ছিটে দেওয়ার পর ধীরে ধীরে চোখ মেলল ঠানদি।

সাগর বলল,—যাক্ বাবা, বাঁচালে।

ঠানদি উঠতে যাচ্ছিল, সাগর বলল,—থাক্, এখনি আর উঠতে হবে না তোমাকে। কোনো কষ্ট-টষ্ট হচ্ছে না তো কোথাও?

ঠানদি বলল,—না।

—হঠাৎ ঘুম করে অজ্ঞান হয়ে পড়লে কেন বলতো? এমন হয় নাকি মাঝে মাঝে?

হাসল ঠানদি। বলল,—এই পের্‌থম!

সেদিন আর শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গে বাড়ি ফেরা হল না সাগরের। সঙ্গীদের বলে দিল,—দোকানে গিয়ে আমার গুণধর ভায়াদের খবর দিও গো যে আমার ফিরতে সন্ধ্যে হবে। ওরা যেন খেয়ে-দেয়ে নেয়! আর, খদ্দেরদের যাকে যা দেবার যেন দিয়ে দেয় ঠিকমতো।

ঠানদি শুয়ে শুয়েই বলল—গেলিনে কেন সাগর?

সাগর বলল,—খুশি!

ঠানদি বলল,—খাবি কোথায়?

—এখানে।

—রাঁধবে কে!

—আমি। তোমাকে আজ রেঁধে খাওয়াব। মাছ মাংস তো আর খাও না, তাহলে দেখাতুম কেমন পাকা রাঁধুনী আমি। নিরিমিষ্যিটা তেমন আসে না। ক্ষমাঘেন্না করে খেও বাপু।

কতকাল পরে ঠানদির দোকান বন্ধ রইল সেদিন। দুপুরে খদ্দেররা এসে দেখল দোকানের ঝাঁপ বন্ধ।···

দোকানের মধ্যে তখন খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প হচ্ছে সাগর আর ঠানদিতে।—

চাঁপাটার জন্যে ভাবি রে সাগর।

—সেটা আবার কে?

—ঐ যে সোহাগী, তার মেয়ে।

—সেটা আবার কেটা?

—সে একটা হতভাগী। আমার চেয়েও হতভাগী। সোহাগীর জীবনের সব কথা বলল ঠানদি সাগরকে,—যতখানি জানে। ওর সেই জন্ম-রাতের বিচিত্র কাহিনীটাও। বলল,—মেয়েছেলেটা বাঁচবে না বোধ হয় রে আর। তা' না বাঁচুক! সেজন্যে ভাবিনা। মরলেই তো এদের শান্তি। ভাবি শুধু ওর মেয়েটার জন্যে। ঐ মেয়েটার ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভেবেই মরণটাকে দূরে ঠেলে রেখে দিয়েছে হতভাগী। ওর বড় আশা, বড় বাসনা, মেয়েটা ওর মত হবে না, সে অন্যরকম হবে, সে লেখাপড়া শিখবে, সে নার্স হবে, কিংবা বাড়ি-বাড়ি সেলাই শেখাবে, কিংবা মেয়েদের ইস্কুলের বাসে কচি কচি মেয়েদের আগলাবে, কিংবা যাহোক কিছু হবে। শুধু সে নিজে যা, তার মেয়ে যেন তা না হয়,—এইটুকুই তার সাধ।

—ও' নিজে কী?

ঠানদি সাগরের মুখের পানে অনেকক্ষণ তাকিয়ে কী বলবে ভাবতে ভাবতে একসময় শুধু বলল,—নষ্ট।

—বুঝলুম না।

শীতকালে নারকেল তেলের বোতলের মুখে আঙুল ঢুকিয়ে তেল বের করতে গিয়ে মাঝে মাঝে আঙুল আটকে গেলে যতক্ষণ না আঙুলটা বের হয় ততক্ষণ যেমন একটা অস্বস্তি হয়, 'নষ্ট' কথাটার সরলার্থটা সাগরকে বোঝাবার মতন কোনও ভাষা বের করতে না পেরে ঠানদির ঠিক তেমনি অস্বস্তি হতে লাগল।

সেই অস্বস্তি নিয়ে ঠানদি বলল,—এত বড় হলি, এত জায়গায় ঘুরলি, এত মানুষ দেখলি, নষ্ট মেয়েমানুষ কাকে বলে তাও বুঝলি না এখনও!

একটু থেমে কেমন ধরা-ধরা কাঁপা-কাঁপা গলায় ঠানদি বলল—যে মেয়েমানুষদের সোয়ামী নেই, পুত নেই, সংসার নেই, গোত্তর নেই পদবী নেই;—যাদের ঘরে রাতেরবেলা ডুগিতবলা বাজে, যারা বাড়ির দোরে দাঁড়িয়ে সিগরেট খায়, যাদের—

সাগর গম্ভীর গলায় শুধু বলল,—বুঝেছি।

ঠানদি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,—সোহাগী তাই ছিল।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঠানদি বলল,—এখানকার গপ্প দেখছিস তো সাগর। ঘাট থেকে নেমেছিস কি দু-পায়ে কাদা আর কাদা। নেয়ে-ধুয়ে সেই কাদা পরিষ্কার করে ঘাটে উঠলি,—দেখবি আবার কাদা। কাদা আর যায় না। যতক্ষণ না এই অকূল ছেড়ে পালাতে পারছিস, ততক্ষণ কাদা আর ছাড়ছে না।

সাগর বলল,—ঐ জ্যামাঠাকুর কে?

—শেতলামন্দিরের পুজুরি বামুন। মাস গেলে পাঁচ টাকা মাইনে পায়, আর মন্দিরের প্রণামীটা পায়।

—সে তো অনেকদিন আগেই শুনেছি। জিজ্ঞেস করছি, তোমার ঐ সোহাগীর কে হয় জ্যামাঠাকুর?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আবার একটু চুপ করে থাকতে হয় দিকে। তারপর অনেক ভেবে বলে,—সোহাগীর জন্তে াঠাকুরের প্রাণ কাঁদে,—শ্যামাঠাকুরের জন্তে সোহাগীর প্রাণ কাঁদে। াঠাকুরকে পেয়ে অবধি সোহাগী গঙ্গায় নেয়ে ধুয়ে পরিষ্কার হতে য়েছে। কিন্তু ঐ যে বললুম, এখানে নেয়ে উঠলেও আবার পায়ে দা লাগে! তাই তো চাঁপাকে ও' কাদা থেকে বাঁচাতে চায় গোড়া কেই।

—এতই যদি জানে তো, এখান থেকে চলে যায় না কেন?

—যেতেই তো চেয়েছিল। শ্যামাঠাকুরও চেয়েছিল যে, কোথায় নি পেলাষ্টিকের কারখানায় তুলি দিয়ে পুতুলে রঙ করার চাকরি নিয়ে ল যাবে এখান থেকে হতভাগিনী ঐ ছুটো মা-বেটিকে সঙ্গে নিয়ে।

—তা গেলেন না কেন দয়া করে?

—সোহাগী যে হঠাৎ ব্যামোয় পড়ে গেল। ওকে যে বিছানা কে নড়ানো মানা। আমি বরং এখন একবার যাই রে সাগর, খে আসি একবার কেমন আছে সে হতভাগী। ওর বড় ভয়, ও' রে গেলেই কুসুমবুড়ির হাতে চলে যাবে ওর মেয়ে।

—কুসুম কে?

—তুই মন দিয়ে কিছু শুনছিস না সাগর। বললুম না তখন যে, কুসুমবুড়ি হচ্ছে সোহাগীর মা। আমি বরং যাই।

—যাই বললেই যাই! মাথা ঘুরে অজ্ঞান হবার সময় মনে ছিল না! মাঝ রাস্তায় মুখ থুবড়ে প'ড়ে মর আর কি দাঁত ছিরকুটে। আজ তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। চিঁড়ে ভিজিয়ে দিয়েছি। দই এনে রেখেছি। সন্ধে উৎরে গেলেই দই মেখে চারটি চিঁড়ে খেয়েই ঘুমিয়ে পড়বে। বুঝলে? আমি তো বিকেল হলেই চলে যাব।

—আমি মরলে তোর কী সাগর? কে আমি তোর?

—কিছু না। তুমি মরলে এখানে এসে বিনি-পয়সায় পান-জলটা পাব না, ভাত-ঝোলটা পাব না, এই আর কি! একটু অসুবিধে হবে।

ঠানদি সাগরের চঞ্চল চোখের দিকে চোখ রেখে ফোক্‌লা দাঁতে মুচকি হাসতে হাসতে বলল,—আমি কিন্তু জানি সাগর, ঠিক জানি, আমি মরে গেলে তুই কাঁদবি। তুই আমাকে ভালবাসিস।

সাগর বলল,—দায় পড়েছে আমার।

শুয়ে শুয়েই ঠানদি খপ করে সাগরের হাতটা ধরে ফেলে বলল,—"তোর মুখেই শুনেছি, তোর মা বলতেন,—'যত দুঃখুই পাস সাগর, যত কষ্টই পাস, মিথ্যে বলিসনি কখনো'—আমি যখন মরে যাব, তখন আমার মুখে একটু আগুন দিবি সাগর? দিবি? কথা দে। মুখ ফিরিয়ে চুপ করে থাকিসনে। বল। দিবি তো?

—দোবো। হয়েছে তো? ঐ বিচ্ছিরি কথাগুলো শুনিয়ে আমাকে কষ্ট না দিলে চলছিল না বুঝি তোমার? আমার মা নেই। পিসি-মাসি-দিদিমা কেউ নেই কোথাও। ঠানদি ব'লে তোমার কাছে আসি কি না, ছুটো আদর-আবদার করি কি না,—তাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাকে কাঁদিয়ে খুব আনন্দ পাও তুমি, না?

—ওরে মারে দাদা, না। রাগ করিস নে। যেতে তো এবার হবে, তাই সব জেনে নিচ্ছি। আরেকটা কাজ করে রেখেছি। এখানে রোজ সকালে যে বুড়ো উকিল চান করতে আসে, তাকে দিয়ে আমি উইল লিখিয়ে নিয়েছি যে, আমি মলে আমার যা-কিছু সব যেন ঐ চাঁপা পায়, শুধু এই দোকানটা বাদে।

—দোকানটা বাদে কেন?

—এখানে এ-অঞ্চলের কাদার মধ্যে ও'থাকে—এ যে আমি চাই না। দোকানটা তাই তোকে দিয়ে গেছি সাগর।

—লে কচু! আমার বেলায় বুঝি আর কাদার কথাটা মনে এল না?

ঠানদি সাগরের থুতনি ধরে নাড়া দিয়ে বলল,—সাগরের ধারে কাছে কি কাদা থাকে কখনো? কাদার সাধ্যি কি।

সাগর হেসে বলল,—কাদার চেয়ে খারাপ জিনিস সেখানে;—বালি। তা' ও-কথা থাক, একটা কথা বলি শোনো। ঐ যে আহুরী না কি নাম বললে—

—আহুরী নয়, সোহাগী।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সোহাগী। তা' সেই তার শরীর এখন কেমন আছে সেটা জানতে না পারলে যখন মনটা তোমার কিছুতেই ঠাণ্ডা হবে না, তখন আমিই না হয় তার খবরটা নিয়ে আসছি। ঠিকানা দিয়ে জায়গাটা বুঝিয়ে দাও।

ঠানদি বলল,—না, সাগর, না। সে নোঙরা জায়গায় তোকে আর দাঁড়াতে হবে না গিয়ে। তবে আমার জন্যে কষ্ট যখন করবিই, তখন এক কাজ কর, চানের ঘাটে গিয়ে বাইধর শতপথিকে আমার নাম করে বললেই সে খবর এনে দেবে। বাইধরকে চিনিস তো তুই?

সাগর উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—চিনি না আবার! তোমাদের এখানকার কোন্ লোকটাকে চিনি না বল তো? এমন কি ঐ যে তোমার ইষ্টিমারের টিকিট দেন রাজীববাবু, তাঁর সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেছে আমার। ভারী মজার মানুষ। আচ্ছা, চলি আমি। পাকা খবর এনে দিয়ে তবে বাড়ি ফিরব। নিশ্চিন্ত থাক তুমি ঠানদি।

চানের ঘাটে গিয়ে বাইধরের দেখা পেল না সাগর। তার বদলে দেখা পেল আরেকজনের। বাইধরেরই তেলচিটে তক্তাপোষ আর বাক্সর উপর ঠ্যাং ছড়িয়ে শুয়ে ছিল মানুষটা। এক মুখ অযত্নবর্ধিত দাড়ি গোঁফ, চোখের কোলে রাজ্যের ক্লান্তি, জামাকাপড়ে তিন-চার মাসের ময়লা। বলল,—কেন খুঁজছেন বাইধরকে?

সাগর বলল,—কাজ আছে। বিশেষ একটা দরকারি কাজ।

হো-হো করে হেসে উঠল মানুষটা। বলল,—অডিসি-ইলিয়াড পড়া আছে কিছু?

সাগর বলল,—না।

—সিসিফাস্ ছিল করিন্থের রাজা।

বাইধর শতপথির জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না কিছু সাগরের। কাজেই বাধ্য হয়েই তাকে শুনতে হল গল্পটা।

—সেই সিসিফাস্‌কে দেবতারা সব অভিশাপ দিলেন যে, একটা পাথরের চাইকে একটা ছুঁচলো ঢালু-পাহাড়ের ঠিক চূড়োর উপর তুলে বসিয়ে রাখতে পারলে তবে তার মুক্তি হবে। সিসিফাস্ ঠেলে ঠেলে পাথরের চাইটাকে অতি কষ্টে যেই না পাহাড়ের চূড়োয় তোলে, অমনি সেটা ঢালু-পাহাড়ের ও-ধার দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যায়,—আর সিসিফাস্ তাকে ধরে রাখবার জন্যে পিছনে পিছনে ছোটে। অনন্তকাল ধরে এই ভাবে সে ঢালু-পাহাড়ের একদিক দিয়ে উঠছে, আর একদিক দিয়ে নামছে। এর আর বিরাম নেই। মুক্তি আর সে পায় না।

গল্পটা শেষ করে মানুষটা বলল,—খুব কাজের মানুষ সিসিফাস্‌; তাই না?

বলেই আবার সেই হো-হো হাসি।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঝিকমিকে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে সাগর মানুষটার গল্পটা শোনে বটে, কিন্তু কী যে লোকটা বলতে চায়, তা বুঝতে পারে না ঠিক। তাই কী বলা উচিত ঠিক করতে না পেরে চুপচাপ বসে থাকে।

মানুষটা এবার বিজয়ীর হাসি শেষ করে পাশ ফিরে শুয়ে বাংলা থেকে ইংরিজি ধরে,—টাপ এ লিটল। ডোন্ট এ ড্রিম অ্যাণ্ড মেল ইয়োর সোয়েট।

কিন্তু, বাইধর শতপথি যে কখন আসবে!

উসখুস করে সাগর। ইতিউতি তাকায়।

একটু পরেই দেখতে পায় চুণীলালকে। শ্মশানের গেটের ধারে ব'সে ফুল আর এলাচদানা বিক্রি করে যে চুণীলাল;—সেই। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে গামছা দিয়ে পিঠ রগড়াচ্ছে।

ডাক দেয় সাগর,—ও এলাচদানা দাদা, বলি বাইধর ঠাকুরকে এখন পাওয়া যায় কোথায় বলতে পার?

—না গো। তা' তুমি যে এখনো বাড়ি ফেরোনি ভাই?

—ফিরতে দিল কই ঠানদিবুড়ি? সকালবেলা হঠাৎ অজ্ঞান-অজ্ঞান হয়ে একেক্কার কাণ্ড!

—সে কী!

—হ্যাঁ গো। একটু সুস্থ-টুস্থ করে যাব যদি, তো আর এক ফ্যাচাং; সোহাগী কেমন আছে জেনে এসে বলে যাও ঠানদিকে। তার জন্তেই তো খুঁজছি বাইধর ঠাকুরকে। আমি তো সোহাগীর ঠিকানা জানিনে।

ততক্ষণে জল ছেড়ে উঠে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে মাথা মুছছে চুণীলাল। বলল,—কেন? নতুন আবার কিছু হয়েছে নাকি সোহাগীর?

—ব্যাধিটা বেড়েছে আজ। শ্যামাঠাকুর সকালে ঠানদির কাছে এসে টাকা নিয়ে গেল।

গা মুছে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে চুণীলাল রাস্তার দিকে একদৃষ্টে কী দেখতে দেখতে সেই দিকে চোখ রেখেই বলল,—নির্ঘাৎ ভাল আছে সোহাগী। নির্ঘাৎ।

যে দিকে তার চোখদুটো আটকে রয়েছে, সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে চুণীলাল বলল,—ঐ যে চলেছেন। দেখতে পাচ্ছ? ইস্কুল থেকে ফিরছেন! বলি, এই চোদ্দ-পনেরোতেই গড়নখানা দেখেছ? সতেরো-আঠারোয় যা দাঁড়াবে না ভায়া! মাইরি, মাইরি!

একটা মেয়ে যাচ্ছিল। একটা বিনুনি ঝুলছে পিঠে। তাতে ফিতে নেই, দড়ি নেই, কিচ্ছু না। পাৎলা গড়নের মেয়ে। বুকের কাছে বই খাতা আঁকড়ে চলেছে পথ দিয়ে। পায়ের চটির কোথাও কিছু ছিঁড়ে গেছে বোধ হয়। তাই কেমন পা টেনে টেনে চলেছে। লালপাড় একটা শাড়ি পরে জড়োসড়ো হয়ে চলেছে মেয়েটা। শাড়ি না পরে অনায়াসে একটা ফ্রক পরতে পারত।

চুণীলাল বলল,—ঐ হচ্ছে গিয়ে সোহাগীর মেয়ে চাঁপা। সোহাগী ভাল না থাকলে মেয়ে ইস্কুলে যেতে পারত? পাকা খবর পেতে চাও তো মেয়েটাকে ডেকেই জিজ্ঞেস করে নাও না যে, কেমন আছে সোহাগী।

সাগর বলল,—চেনা নেই তো। তোমাদের যখন চেনা, বরং না জিজ্ঞেস। তাহলে আর আমার বাইধর ঠাকুরের জন্তে অপেক্ষা করতে হয় না। এমনিতেই বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেছে অনেক।

চুণীলাল চোখ দুটো বড় বড় করে বলল,—বাসরে! ডাকলেই হয়েছে আর কি! মেয়ে তো নয়, যেন কেঁাস্‌-কেউটে তার চেয়ে এক কাজ কর বরং। মেয়েটার পিছু পিছু ওদের বাড়ি পর্যন্ত যাও। সেইখানেই কারুর না কারুর কাছে খবর মিলে যাবে।

—সেই ভাল!

—বেশ খানিকটা দূরে দূরে চাঁপার পিছু পিছু চলতে লাগল সাগর। চলতে লাগল, আর মনে মনে ভাবতে লাগল।

এই চাঁপা। এরই জন্তে ভাবনা ঠানদির। কিন্তু কিসে ভাবনা? কেন ভাবনা?

চাঁপা তখন একটা গলির মধ্যে ঢুকেছে।

চাঁপার মা সোহাগী নিশ্চয়ই ভাল আছে। তা' না হলে চাঁ ইস্কুলে গেল কোন্ ভরসায়? শ্যামাপদ পুজুরী হয়ত মিছিমিছি ভ পেয়েছিল। কে ঐ শ্যামাপদ? কে হয় সে সোহাগীর? চাঁ কে হয়?

গলিটা সরু। দু-ধারে ডাল আর মশলার গুদাম। নোং রাস্তা। একটা হিন্দুস্থানী লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল চাঁপার।

ধাক্কা লাগল, না লাগাল? সাগরের মনে হল যেন, ই করেই ধাক্কা লাগাল লোকটা। রাগ হল সাগরের।

এই রাস্তা দিয়েই হাঁটতে হয় চাঁপাকে। দুবেলা হাঁটতে হয় কী মুস্কিল। মানুষগুলো এমন ইতর হয় কেন?

রাস্তার নর্দমা-ঘেঁষে একটা দড়ির খাটিয়া পেতে শুয়ে শুয়ে কোম দাদ চুলকোচ্ছিল একটা ডালওয়ালা। কাপড় একটা আছে ব অঙ্গে। কিন্তু কতটুকু আছে? কতটুকু?

চাঁপার দিকে একটা কাশি ছুঁড়ে দিল সে প্রথমে। তারপ একটা বেসুরো গলার গানের কলি,—বহি-ওয়ালী হামারি আইও।

এই রাস্তা দিয়ে চাঁপাকে হাঁটতে হয় রোজ দু'বার ক'রে।

একটা ঘোষের খাটাল চোখে পড়ল সাগরের। তার পা একটা ছোট্ট ঘুপ্‌সি জগন্নাথের মন্দির। সেই মন্দিরের চাতালে বাই শতপথিকে আবিষ্কার করে ফেলল সাগর। তাস খেলছিল বাইধ

সাগর ডাকল,—বাইধর ঠাকুর।

শুনতে পেল না বাইধর। তাসখেলাতেই তন্ময়।

বাধ্য হয়েই এগিয়ে গেল সাগর। কাছে গিয়ে হাঁটুতে ন দিয়ে বলল,—ও বাইধর ঠাকুর।

এতক্ষণে হুঁশ হল বাইধরের,—কী ব্যাপার? সাগর যে!

সাগর ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, চাঁপাকে আর দেখতে পাওয়া য না। রাস্তার আঁকি-বুকির মধ্যে সে কোথায় মিলিয়ে গেছে।

সাগর বলল,—ঠানদি সোহাগীর খবর জানতে চায়। আম বলল তোমাকে পাঠিয়ে খবরটা জেনে আসতে। তাই এলুম।

বাইধর আকাশের দিকে চোখ তুলে বলল,—ইস্! এ যে হয়ে এল! আজকের মতন এইখানেই খেলা থাম্। উঠ্‌ চল সাগর।

সাগর বলল,—আমি এখানেই রইলুম। খবরটা এসে দাও!

বাইধর বলল,—আমি আবার এই পথে ফিরতে যাই কেন? ...রে সোহাগীর খবরটা তোমায় দিয়ে ওইদিক দিয়েই বাজারে চলে ...।

অগত্যা বাইধরের সঙ্গে যেতে হল সাগরকে। কিছুটা এগিয়েই ...কের সরু একটা অপরিচ্ছন্ন গলির পথ ধরল বাইধর। নোঙরা-...য়া তেলেভাজার দোকান,—কামারের দোকান একটা, সেখানে ...রের কোঁস্ কোঁস চলেছে,—তার পাশেই কচি ছেলেদের লাল রঙের ...রির ঢাকনা তৈরির কারখানা একটা। এইসব পেরিয়ে বাইধর ... যেখানে, সেখানে একটা কলের ধারে অনেকগুলি স্ত্রীলোকের ...।

একটা মুড়ির দোকানের দিকে আঙুল দেখিয়ে বাইধর বলল,—...ই ওপরের ঐ মাঠকোঠার ঘরে থাকে সোহাগী। একটু দাঁড়াও ... সাগর। আমি চট্ করে খবরটা নিয়ে আসি।

ঠিক ঐ জায়গাটায় দাঁড়ানো মুস্কিল। ছেলেমেয়েরা জল তুলছে; ...ড় চোপড় সামলে পা ধুয়েও নিচ্ছে কেউ-কেউ।

সাগর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল খানিকটা। এবং পায়চারি ...ত করতে শেষ অবধি থামল যেখানে, সেখানে এ-গলির শেষে ... রাস্তাটার ঠিক মোড়ের মাথায় শনি মহারাজের মন্দির একটা। ...র না বলে মহারাজের চেম্বার বলাই বোধ হয় ঠিক। কারণ ...র বলতে গেলেই গোম্বুজে খিলানে মিশিয়ে যে একটা চেহারা ...খর সামনে ভেসে ওঠে, তার লেশ মাত্রও নেই কোথাও। ...রাজের চেম্বারের তিন-ভাঁজ কাঠের দরজায় দু-চারটে ওষুধ ...ানীর টিনের শো-প্লেট দেখে আন্দাজ করা যায়, ঘরটা আগে ...রখানা গোছের কিছু ছিল।

মহারাজের চেম্বারের ঠিক সামনের রাস্তাটা ইলেক্‌ট্রিক লাইন ...া জলের পাইপ কিসের জন্যে খোঁড়া হয়েছে খানিকটা। দিনের ...র শেষে জায়গাটায় 'ডেঞ্জার'-এর একটা বেমজবুৎ বেড়া তুলে ... গেছে মজুররা। সেই বেড়ার ধারটাতে দাঁড়িয়ে হাসল সাগর।

কী আসপদ্দা! জীবনের সবরকমের ডেঞ্জার থেকে উদ্ধার পাবার ... যাঁর মন্দিরে ধর্ণা দেয় ভক্তের দল, তাঁরই দরজার সামনে কিনা ...রে'র নিশেন পুঁতে দেওয়া! লোকগুলো বাঁচলে বাঁচি!

কিন্তু সেইখানেই আরেকটু হলেই ঘটে যাচ্ছিল ডেঞ্জারটা!

রাস্তা ভাঙা থাকায় কিছুটা তফাতে পর্দা ঢাকা রিক্সা থামিয়ে মহারাজের মন্দিরের দিকেই এগিয়ে আসছিলেন এক মহিলা এবং বৃদ্ধা। শাড়িতে-গহনায়-ঘোমটায় মহিলাকে বেশ বড় ঘরের ... মনে হল সাগরের। বৃদ্ধাটি সম্ভবত দাসী।

...ওয়া এগিয়ে আসছিলেন, এবং একটি বিশালকায় বেওয়ারিশ ... নেশা-ঢুলুঢুলু চোখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কী বুঝি রোমন্থন করছিল। ... কী যে দুর্মতি হল, ষণ্ডপ্রবরটি শিং বাগিয়ে তেড়ে গেলেন ...াটির দিকে এবং আত্মরক্ষার দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে মহিলাটি ... আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলেন 'ডেঞ্জার'-লেখা সেই গভীর গর্তটার ...। সাগর দুহাতে তাঁকে জাপটে ধরে বাঁচিয়ে দিল ঠিক সময়ে।

...জোয়ান সাগরের বলিষ্ঠ হাতের বাঁধনে আসন্ন-পতন থেকে ... পেয়ে মহিলাটি কৃতজ্ঞতা এবং লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে বসলেন ... শনি মহারাজের চেম্বারের চাতালে। বৃদ্ধাটি হাউমাউ করে ... জুড়ে দিল,—'ও মাগো, কী সব্বনাশই হতে যাচ্ছিল গো। লাগেনি তো গো মা? পা-টা মচকে যায়নি তো? হাড়-টাড় ভেঙে যায়নি তো? কী হতচ্ছাড়া ষাঁড় গো?'

ষাঁড় ততক্ষণে আবার পরম শান্ত চিত্তে নেশা-ঢুলুঢুলু চোখে রোমন্থন করে চলেছে আগেকার মতোই। আর সাগর জোওয়ান বয়সে এই প্রথম একটি অচেনা মহিলার গায়ে হাত দিয়ে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছে সর্বাঙ্গে।

ঠিক এমনি সময়েই ফিরে এল বাইধর শতপথি।

বলল,—এইখানে এসে দাঁড়িয়ে আছ তুমি সাগর? আর আমি তোমাকে খুঁজে মরছি। ভাল আছে গো সোহাগী। সামলে উঠেছে। ডাক্তার সকালে এসেই ওষুধ দিয়েছে, বলেছে ভয়ের কিছু নয়। তবে অনেকদিন ধরে ভুগে ভুগে বুকের যা অবস্থা, যে-কোনোদিন টুক্ করে থেমে গেলেই হল। আচ্ছা, তুমি তাহলে খবরটা দিয়ে যেয়ো ঠানদিকে। আমি ঐ সামনের সরু গলিটা দিয়ে বাজারের দিকে এগোই। কেমন?

বলেই খুটখুট করে এগিয়ে গেল বাইধর।

সাগরও উল্টোদিকে ফিরতে যাবে, এমন সময় সেই বৃদ্ধা দাসীটি এসে দাঁড়াল সামনে।

—মা আপনাকে ডাকতেছেন গো। দয়া করে একবার আসেন এদিকপানে।

মা মানে সেই সালঙ্কারা মহিলাটি। তিনি তখন মন্দিরের চাতালে বসে কথা বলছিলেন মহারাজের পূজারীর সঙ্গে। পূজারী বলতে গেলেই টিকিতে, চন্দনের ছাপে যে একটা চেহারা ভেসে ওঠে চোখের সামনে, তার সঙ্গে কোনো মিল নেই মহারাজের এই পূজারীর চেহারায়। গায়ে তাঁর দিব্যি গিলেদার আদ্দির পাঞ্জাবী, হাতে হাতঘড়ি, চোখে সোনার চশমা, পরণে ফাইন্ কালপাড় দিশি ধুতি।

তিনিও ডাক দিলেন এবার,—ও মশাই, আসুন না একটিবার।

বাধ্য হয়েই এগিয়ে গেল সাগর। দাঁড়াল গিয়ে মহারাজের মন্দিরের ঠিক সামনেটিতে।

তীক্ষ্ণ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখ চওড়া বলিষ্ঠ যুবক, মজবুৎ কব্‌জি, অবিন্যস্ত কোঁকড়া মাথার চুল, গায়ে হলুদ রঙের গেঞ্জির সার্ট সাগরের।

মহিলাটি তাকালেন সাগরের দিকে।

পূজারী বললেন,—বসুন ভাই।

গল্পটা শেষ করে মানুষটা বলল,—খুব কাজের মানুষ সিসিফাস্; তাই না?

বলেই আবার সেই হে'-হো হাসি।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঝিকমিকে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে সাগর মানুষটার গল্পটা শোনে বটে, কিন্তু কী যে লোকটা বলতে চায়, তা বুঝতে পারে না ঠিক। তাই কী বলা উচিত ঠিক করতে না পেরে চুপচাপ বসে থাকে।

মানুষটা এবার বিজয়ীর হাসি শেষ করে পাশ ফিরে শুয়ে বাংলা থেকে ইংরিজি ধরে,—স্টপ এ লিটল। ডোণ্ট এ ড্রিম অ্যাণ্ড স্মেল ইয়োর সোয়েট।

কিন্তু, বাইধর শতপথি যে কখন আসবে!

উসখুস করে সাগর। ইতিউতি তাকায়।

একটু পরেই দেখতে পায় চুনীলালকে। শ্মশানের গেটের ধারে ব'সে ফুল আর এলাচদানা বিক্রি করে যে চুনীলাল;—সেই। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে গামছা দিয়ে পিঠ রগড়াচ্ছে।

ডাক দেয় সাগর,—ও এলাচদানা দাদা, বলি বাইধর ঠাকুরকে এখন পাওয়া যায় কোথায় বলতে পার?

—না গো। তা' তুমি যে এখনো বাড়ি ফেরোনি ভাই?

—ফিরতে দিল কই ঠানদিবুড়ি? সকালবেলা হঠাৎ অজ্ঞান-অজ্ঞান হয়ে একেক্কার কাণ্ড!

—সে কী!

—হ্যাঁ গো। একটু সুস্থ-টুস্থ করে যাব যদি, তো আর এক ক্যাচাং; সোহাগী কেমন আছে জেনে এসে বলে যাও ঠানদিকে। তার জন্তেই তো খুঁজছি বাইধর ঠাকুরকে। আমি তো সোহাগীর ঠিকানা জানিনে।

ততক্ষণে জল ছেড়ে উঠে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে মাথা মুছছে চুনীলাল। বলল,—কেন? নতুন আবার কিছু হয়েছে নাকি সোহাগীর?

—ব্যাধিটা বেড়েছে আজ। শ্যামাঠাকুর সকালে ঠানদির কাছে এসে টাকা নিয়ে গেল।

গা মুছে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে চুনীলাল রাস্তার দিকে একদৃষ্টে কী দেখতে দেখতে সেই দিকে চোখ রেখেই বলল,—নির্ঘাৎ ভাল আছে সোহাগী। নির্ঘাৎ।

যে দিকে তার চোখদুটো আটকে রয়েছে, সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে চুনীলাল বলল,—ঐ যে চলেছেন। দেখতে পাচ্ছ? ইস্কুল থেকে ফিরছেন! বলি, এই চোদ্দ-পনেরোতেই গড়নখ'না দেখেছ? সতেরো-আঠারোয় যা দাঁড়াবে না ভায়া! মাইরি, মাইরি!

একটা মেয়ে যাচ্ছিল। একটা বিনুনি ঝুলছে পিঠে। তাতে ফিতে নেই, দড়ি নেই, কিচ্ছু না। পাৎলা গড়নের মেয়ে। বুকের কাছে বই খাতা আঁকড়ে চলেছে পথ দিয়ে। পায়ের চটির কোথাও কিছু ছিঁড়ে গেছে বোধ হয়। তাই কেমন পা টেনে টেনে চলেছে। লালপাড় একটা শাড়ি পরে জড়োসড়ো হয়ে চলেছে মেয়েটা। শাড়ি না পরে অনায়াসে একটা ফ্রক পরতে পারত।

চুনীলাল বলল,—ঐ হচ্ছে গিয়ে সোহাগীর মেয়ে চাঁপা। সোহাগী ভাল না থাকলে মেয়ে ইস্কুলে যেতে পারত? পাকা খবর পেতে চাও তো মেয়েটাকে ডেকেই জিজ্ঞেস করে নাও না যে, কেমন আছে সোহাগী।

সাগর বলল,—চেনা নেই তো। তোমাদের যখন চেনা, করই না জিজ্ঞেস। তাহলে আর আমার বাইধর ঠাকুরের জন্তে অপেক্ষা করতে হয় না। এমনিতেই বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেছে অনেক।

চুনীলাল চোখ দুটো বড় বড় করে বলল,—বাসরে! আমি ডাকলেই হয়েছে আর কি! মেয়ে তো নয়, যেন কেউটে-কেউটে! তার চেয়ে এক কাজ কর বরং। মেয়েটার পিছু পিছু ওদের বাসা পর্যন্ত যাও। সেইখানেই কারুর না কারুর কাছে খবর মিলে যাবে।

—সেই ভাল!

—বেশ খানিকটা দূরে দূরে চাঁপার পিছু পিছু চলতে লাগল সাগর। চলতে লাগল, আর মনে মনে ভাবতে লাগল।

এই চাঁপা। এরই জন্তে ভাবনা ঠানদির। কিন্তু কিসের ভাবনা? কেন ভাবনা?

চাঁপা তখন একটা গলির মধ্যে ঢুকেছে।

চাঁপার মা সোহাগী নিশ্চয়ই ভাল আছে। তা' না হলে চাঁপা ইস্কুলে গেল কোন্ ভরসায়? শ্যামাপদ পুজুরী হয়ত মিছিমিছি ভয় পেয়েছিল। কে ঐ শ্যামাপদ? কে হয় সে সোহাগীর? ঠিক কে হয়?

গলিটা সরু। দু-ধারে ডাল আর মশলার গুদাম। নোংরা রাস্তা। একটা হিন্দুস্থানী লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল চাঁপার।

ধাক্কা লাগল, না লাগাল? সাগরের মনে হল যেন, ইচ্ছে করেই ধাক্কা লাগাল লোকটা। রাগ হল সাগরের।

এই রাস্তা দিয়েই হাঁটতে হয় চাঁপাকে। দুবেলা হাঁটতে হয়। কী মুশ্কিল। মানুষগুলো এমন ইতর হয় কেন?

রাস্তার নর্দমা-ঘেঁষে একটা দড়ির খাটিয়া পেতে শুয়ে শুয়ে কোমরের দাদ চুলকোচ্ছিল একটা ডালওয়ালা। কাপড় একটা আছে তার অঙ্গে। কিন্তু কতটুকু আছে? কতটুকু?

চাঁপার দিকে একটা কাশি ছুঁড়ে দিল সে প্রথমে। তারপরে একটা বেসুরো গলায় গানের কলি,—বহি-ওয়ালী হামারি গলি আইও।

এই রাস্তা দিয়ে চাঁপাকে হাঁটতে হয় রোজ দু'বার ক'রে।

একটা ঘোষের খাটাল চোখে পড়ল সাগরের। তার পাশেই একটা ছোট্ট ঘুপ্‌সি জগন্নাথের মন্দির। সেই মন্দিরের চাতালে বাইধর শতপথিকে আবিষ্কার করে ফেলল সাগর। তাস খেলছিল বাইধর।

সাগর ডাকল,—বাইধর ঠাকুর।

শুনতে পেল না বাইধর। তাসখেলাতেই তন্ময়।

বাধ্য হয়েই এগিয়ে গেল সাগর। কাছে গিয়ে হাঁটুতে নাড়া দিয়ে বলল,—ও বাইধর ঠাকুর।

এতক্ষণে হুঁশ হল বাইধরের,—কী ব্যাপার? সাগর যে!

সাগর ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, চাঁপাকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। রাস্তার আঁকি-বুকির মধ্যে সে কোথায় মিলিয়ে গেছে।

সাগর বলল,—ঠান্‌দি সোহাগীর খবর জানতে চায়। আমাকে বলল তোমাকে পাঠিয়ে খবরটা জেনে আসতে। তাই এলুম।

বাইধর আকাশের দিকে চোখ তুলে বলল,—ইস্! এ যে সন্ধ্যে হয়ে এল! আজকের মতন এইখানেই খেলা খতম্। উঠলুম। চল সাগর।

সাগর বলল,—আমি এখানেই রইলুম। খবরটা এনে দাও তুমি।

বাইধর বলল,—আমি আবার এই পথে ফিরতে যাই কেন? একেবারে সোহাগীর খবরটা তোমায় দিয়ে ওইদিক দিয়েই বাজারে চলে যাব।

অগত্যা বাইধরের সঙ্গে যেতে হল সাগরকে। কিছুটা এগিয়েই বাঁদিকের সরু একটা অপরিচ্ছন্ন গলির পথ ধরল বাইধর। নোঙরা-নোঙরা তেলেভাজার দোকান,—কামারের দোকান একটা, সেখানে হাপরের কোঁস্ কোঁস চলেছে,—তার পাশেই কচি ছেলেদের লাল রঙের মশারির ঢাকনা তৈরির কারখানা একটা। এইসব পেরিয়ে বাইধর থামল যেখানে, সেখানে একটা কলের ধারে অনেকগুলি স্ত্রীলোকের জটলা।

একটা মুড়ির দোকানের দিকে আঙুল দেখিয়ে বাইধর বলল,—ওরই ওপরের ঐ মাঠকোঠার ঘরে থাকে সোহাগী। একটু দাঁড়াও তুমি সাগর। আমি চট্ করে খবরটা নিয়ে আসি।

ঠিক ঐ জায়গাটায় দাঁড়ানো মুস্কিল। ছেলেমেয়েরা জল তুলছে; কাপড় চোপড় সামলে পা ধুয়েও নিচ্ছে কেউ-কেউ।

সাগর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল খানিকটা। এবং পায়চারি করতে করতে শেষ অবধি থামল যেখানে, সেখানে এ-গলির শেষে চওড়া রাস্তাটার ঠিক মোড়ের মাথায় শনি মহারাজের মন্দির একটা। মন্দির না বলে মহারাজের চেম্বার বলাই বোধ হয় ঠিক। কারণ মন্দির বলতে গেলেই গোম্বুজে খিলানে মিশিয়ে যে একটা চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তার লেশ মাত্রও নেই কোথাও। মহারাজের চেম্বারের তিন-ভাঁজ কাঠের দরজায় দু-চারটে ওষুধ কোম্পানীর টিনের শো-প্লেট দেখে আন্দাজ করা যায়, ঘরটা আগে ডাক্তারখানা গোছের কিছু ছিল।

মহারাজের চেম্বারের ঠিক সামনের রাস্তাটা ইলেক্ট্রিক লাইন কিংবা জলের পাইপ কিসের জন্যে খোঁড়া হয়েছে খানিকটা। দিনের কাজের শেষে জায়গাটায় 'ডেঞ্জার'-এর একটা বেমজবুৎ বেড়া তুলে ফিরে গেছে মজুররা। সেই বেড়ার ধারটাতে দাঁড়িয়ে হাসল সাগর।

কী আসপদ্দা! জীবনের সবরকমের ডেঞ্জার থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে যাঁর মন্দিরে ধর্ণা দেয় ভক্তের দল, তাঁরই দরজার সামনে কিনা 'ডেঞ্জারে'র নিশেন পুঁতে দেওয়া! লোকগুলো বাঁচলে বাঁচি!

কিন্তু সেইখানেই আরেকটু হলেই ঘটে যাচ্ছিল ডেঞ্জারটা!

রাস্তা ভাঙা থাকায় কিছুটা তফাতে পর্দা ঢাকা রিক্সা থামিয়ে শনি মহারাজের মন্দিরের দিকেই এগিয়ে আসছিলেন এক মহিলা এবং এক বৃদ্ধা। শাড়িতে-গহনায়-ঘোমটায় মহিলাকে বেশ বড় ঘরের বলেই মনে হল সাগরের। বৃদ্ধাটি সম্ভবত দাসী।

ওরা এগিয়ে আসছিলেন, এবং একটি বিশালকায় বেওয়ারিশ ষাঁড় নেশা-ঢুলুঢুলু চোখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কী বুঝি রোমন্থন করছিল। হঠাৎ কী যে দুর্মতি হল, ষণ্ডপ্রবরটি শিং বাগিয়ে তেড়ে গেলেন মহিলাটির দিকে এবং আত্মরক্ষার দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে মহিলাটি যখন আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলেন 'ডেঞ্জার'-লেখা সেই গভীর গর্তটার মধ্যে, সাগর দুহাতে তাঁকে জাপটে ধরে বাঁচিয়ে দিল ঠিক সময়ে।

জোওয়ান সাগরের বলিষ্ঠ হাতের বাঁধনে আসন্ন-পতন থেকে উদ্ধার পেয়ে মহিলাটি কৃতজ্ঞতা এবং লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে বসলেন গিয়ে শনি মহারাজের চেম্বারের চাতালে। বৃদ্ধাটি হাউমাউ করে চীৎকার জুড়ে দিল,—'ও মাগো, কী সব্বনাশই হচ্ছে যাচ্ছিল গো। নাগেনি তো গো মা? পা-টা মচকে যায়নি তো? হাড়-টাড় ভেঙে যায়নি তো? কী হতচ্ছাড়া ষাঁড় গো?'

ষাঁড় ততক্ষণে আবার পরম শান্ত চিত্তে নেশা-ঢুলুঢুলু চোখে রোমন্থন করে চলেছে আগেকার মতোই। আর সাগর জোওয়ান বয়সে এই প্রথম একটি অচেনা মহিলার গায়ে হাত দিয়ে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছে সর্বাঙ্গে।

ঠিক এমনি সময়েই ফিরে এল বাইধর শতপথি।

বলল,—এইখানে এসে দাঁড়িয়ে আছ তুমি সাগর? আর আমি তোমাকে খুঁজে মরছি। ভাল আছে গো সোহাগী। সামলে উঠেছে। ডাক্তার সকালে এসেই ওষুধ দিয়েছে, বলেছে ভয়ের কিছু নয়। তবে অনেকদিন ধরে ভুগে ভুগে বুকের যা অবস্থা, যে-কোনোদিন টুক্ করে থেমে গেলেই হল। আচ্ছা, তুমি তাহলে খবরটা দিয়ে যেয়ো ঠানদিকে। আমি ঐ সামনের সরু গলিটা দিয়ে বাজারের দিকে এগোই। কেমন?

বলেই খুটখুট করে এগিয়ে গেল বাইধর।

সাগরও উল্টোদিকে ফিরতে যাবে, এমন সময় সেই বৃদ্ধা দাসীটি এসে দাঁড়াল সামনে।

—মা আপনাকে ডাকতেছেন গো। দয়া করে একবার আসেন এদিকপানে।

মা মানে সেই সালঙ্কারা মহিলাটি। তিনি তখন মন্দিরের চাতালে বসে কথা বলছিলেন মহারাজের পূজারীর সঙ্গে। পূজারী বলতে গেলেই টিকিতে, চন্দনের ছাপে যে একটা চেহারা ভেসে ওঠে চোখের সামনে, তার সঙ্গে কোনো মিল নেই মহারাজের এই পূজারীর চেহারায়। গায়ে তাঁর দিব্যি গিলেদার আদ্দির পাঞ্জাবী, হাতে হাতঘড়ি, চোখে সোনার চশমা, পরণে ফাইন্ কালপাড় দিশি ধুতি।

তিনিও ডাক দিলেন এবার,—ও মশাই, আসুন না একটিবার।

বাধ্য হয়েই এগিয়ে গেল সাগর। দাঁড়াল গিয়ে মহারাজের মন্দিরের ঠিক সামনেটিতে।

তীক্ষ্ণ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখ চওড়া বলিষ্ঠ যুবক, মজবুৎ কব্‌জি, অবিন্যস্ত কোঁকড়া মাথার চুল, গায়ে হলুদ রঙের গেঞ্জির সার্ট সাগরের।

মহিলাটি তাকালেন সাগরের দিকে।

পূজারী বললেন,—বসুন ভাই।

সাগর বলল,—উঁহু, মন্দিরে ঢুকি না আমি কোনোদিন। যা বলবার বলুন, এইখানে দাঁড়িয়েই শুনছি।

পূজারীর ভুরুটা কোঁচকাল একটু। বললেন,—থাকা হয় কোথায় ?

সাগর বলল,—কেন বলুন তো ?

এবার মন্দিরের চাতাল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মহিলাটি। বললেন,—আপনাকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি তখন। ভাগ্যিস আপনি ঠিক সময় আমাকে ধরে ফেলেছিলেন ! তা' না হলে—

আবার সেই ঝাপটে ধরার সময়কার নরম স্পর্শটা অনুভব করল যেন সাগর। তার কানদুটো ঝাঁঝাঁ করতে লাগল। কোনরকমে শুধু বলল,—ও আর কি ;—ঠিক আছে।

মহিলা বললেন,—তা হবে না। যেতে হবে একদিন আমাদের বাড়িতে। আপনি কি এখানেই কোথাও থাকেন ?

সাগর বলল,—উঁহু, এখান থেকে অনেক দূরে থাকি। অনেক দূরে। পাড়ার এক মড়া পোড়াতে এসেছিলুম। ফেরার পথে এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলুম একজনের জন্যে।

—কবে যাচ্ছেন তাহলে আমার বাড়িতে ?

মহিলা এবার পুরোপুরি মুখ তুলে তাকালেন সাগরের দিকে।

মুখখানা সুন্দর না ব'লে চটক্‌দার বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। বাঁ-দিকের চোখের ঠিক শেষ প্রান্তে মাঝারি গোছের একটা আঁচিল থাকায় মুখ খানার চটক্‌ যেন বেড়ে গেছে আরো।

পূজারীর দিকে তাকিয়ে মহিলা বললেন,—দয়া করে আমার ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে দিন না মুরারিবাবু।

ঠিকানাটা লেখা হতে কাগজটা সাগরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মহিলা বললেন,—এই ঠিকানায় গিয়ে মিসেস রায় বলে জিজ্ঞেস করলেই আমার ফ্ল্যাট দেখিয়ে দেবে দরোয়ান। আচ্ছা, চলি আজ। নিশ্চয়ই যাবেন কিন্তু। ভুলে যাবেন না যেন।

চলে গেলেন মহিলা। রিক্সাটা অপেক্ষা করছিল। তাইতে চড়েই চলে গেলেন মহিলা এবং তাঁর বৃদ্ধা দাসী।

কাগজটা কোমরের কাপড়ের খাঁজে গুঁজে ফিরে এল যখন সাগর, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

ফেরার পথে শ্যামাপদ পুজুরীর সঙ্গে দেখা। গলির মুখে একটা চায়ের দোকানের রোয়াকে চুপচাপ বসেছিল। সাগরকে গলি দিয়ে বের হতে দেখে বলল,—কী খবর গো ? তুমি এদিকে ?

সাগর বলল,—ঠানদি পাঠিয়েছিল চাঁপার মায়ের খবরটা জানতে। তাই বাইধরের সঙ্গে গিয়েছিলুম। কিন্তু সেখানে অসুখ, আর তুমি যে বড় এখানে বসে আছ পুরুতঠাকুর ?

শ্যামাপদ বুঝল, তার সঙ্গে সোহাগীর সম্পর্কের কথাটা যে-করেই হোক জানা হয়ে গেছে সাগরের। কাজেই ঢাকাঢুকি না রেখে সোজাসুজিই প্রশ্ন করল ব্যগ্রকণ্ঠে,—কেমন দেখলে গো সোহাগীকে এখন ?

সাগর বলল,—আমি তো ওপরে উঠিনি। রাস্তাতেই দাঁড়িয়েছিলুম আমি। বাইধর ঠাকুর খবর এনে দিল। বলল ভালই আছে এখন।

শ্যামাপদ নিশ্বাস ফেললে,—বাঁচলুম। কামারের দোকানের বুড়ো সুবলকে দিয়েই দিনেরবেলার খবর নিতে হয়। আজ তো সে সারাদিনই রুগীর কাছে আটকে পড়ে গেছে। তাই তার খবর পাইনি সারা-দুপুরের। মুস্কিল ছাখো না ;—রাত না হলে তো যাবার উপায় নেই আমার।

সাগর বলল,—কেন ?

ঠিক কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না শ্যামাপদ। বলল,—হাজার হোক্‌ মন্দিরের চাকরি করে কিছু তো পাই। সেটা গেলে খাব কী ?

সাগর বলল,—ঐ মিথ্যে বুজরুকির চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো চাকরি যোগাড় করে নাওনা কেন পুরুৎমশাই ?

শ্যামাপদ বলল,—যা বলেছ গো। মিথ্যে, মিথ্যে, বুজরুকি সব। আমি কি তা বুঝি না ভেবেছ ? লজ্জায় মরি। কিন্তু পুরুতের ঘরে জন্ম নিয়ে মন্তর ছাড়া আর কোনো বিদ্যে তো আর সেঁধোয়নি পেটে, বাধ্য হয়েই তাই পুজুরী হয়ে আছি। কিন্তু হয়েছে কি জান, যত দিন যাচ্ছে, এই কাজটার ওপর ততই বেড়ে যাচ্ছে ঘেন্নাটা। অন্য কোথাও চাকরি নিয়ে চলেও যেতুম এতদিনে সোহাগী আর চাঁপাকে নিয়ে। কিন্তু সোহাগীকে যে এখন নড়াবার উপায় নেই কোথাও ;—সেই জন্যেই তো এখান থেকে কোথাও নড়বার উপায় নেই আমার। নইলে এখান থেকে কোথাও চলে যাওয়া নিতান্তই দরকার। অন্তত: ঐ চাঁপাটার জন্যে। ওর মার বড় সাধ,—মেয়েটা ভদ্র হয়, ভাল হয়, বাড়ির বৌ হয়। আমি অবশ্য বাড়ির বৌ হবার আশা করি না। আমি চাই, আর কিছু না হয়, ও' লেখাপড়া শিখে কোনো কচিদের ইস্কুলের মাষ্টারণী হোক, কিংবা নার্স। ভদ্দর-রোজগারে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াক।—কিন্তু এখানের এইসবের মধ্যে তা' সে কী করে হবে !

শ্যামাপদ দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

সাগর বলল,—চলি আমি। ঠানদিকে খবরটা দিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে আবার। অনেক দেরী হয়ে গেল।

সোহাগীর খবরটা ঠানদিকে দিয়ে ফিরে চলেছে সাগর। সন্ধ্যায় বাতি জ্বলে উঠেছে রাস্তায়। বাসে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে লোকে। ট্রামেও বেজায় ভিড়। হেঁটে হেঁটেই এগিয়ে চলল সাগর। নতুন রাস্তার প'ড়ে ফাঁকা দেখে বাসে উঠবে।

আজ ওর মাথাটার মধ্যে ঘুরে ফিরে কেবলই আসছে দুজনের চিন্তা। একজন চাঁপা। আরেকজন মিসেস রায়।

চাঁপার কথা মনে হলেই মনে হচ্ছে, জলহীন একটা গভীর পাতকুয়ার তলায় দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে সে যেন আর্তনাদ করে বলছে,—কেউ একটা দড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে বাঁচাও আমাকে। আমার নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে।

আর মিসেস রায় ? তাঁর কথা মনে হলেই সাগরের মনে হচ্ছে, ঝকঝকে কাঁসার থালায় গরম গরম ফুলকো লুচি আর একবাটি মাংস সাজিয়ে তিনি সাগরকে ডেকে বলছেন,—কিছু ফেলে গেলে চলবে না। আমার নিজের হাতে রাঁধা।

নতুন রাস্তার বাস-ষ্টপে এসে দাঁড়াল সাগর। [ক্রমশঃ

ভারতে আধুনিক শিল্পের অগ্রগতি

বাসব ঠাকুর

কলকাতা, দিল্লী ও বম্বের মত ভারতের বড় বড় সহরগুলোয় চারুকলার প্রদর্শনীর জন্য একাধিক স্থায়ী আর্টগ্যালারী জন্ম নিচ্ছে দেখে মনে হয় যেন এদেশে চারুকলার ভবিষ্যৎ সত্যই উজ্জ্বল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েক বছর হল কলকাতায় আধুনিক ভারতীয় শিল্পের প্রদর্শনীতে তেমন কোন অগ্রগতি আজ অবধি আমার নজরে আসেনি।

সালভাদর দালী, প্যাবলোপিকাশো, লেনে ইত্যাদির অবাস্তব ও অর্দ্ধবাস্তব কলা সৃষ্টির আমি একজন ভক্ত। এঁদের মধ্যে ১৯৩৬ সালে লণ্ডনে দালীর সঙ্গে আলাপ হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। আধুনিক শিল্পের বিষয় লিখতে বসে আজ সেই কথাই মনে পড়ছে।

দালী তখন একজন দুঃস্থ স্প্যানিস উদ্বাস্তু, সুররিয়ালিষ্ট কংগ্রেসে যোগ দিতে লণ্ডনে এসেছেন ; একটা সস্তা স্পেনিস কাফের উপর তলায় বাসা নিয়েছেন তাঁরা। আমি তখন রয়েল কলেজ অফ আর্টের ভাস্কর্য্যের ছাত্র। ঐ কলেজেরই অধ্যাপক ছিলেন স্বনামধন্য আধুনিক ভাস্কর হেনরীমুর। ব্লু মসবারির ঐ কাফেতে আরও দু'একজন ভারতীয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে লাঞ্চ খেতে যেতাম। কাফের কর্ত্রী একদিন আমার সঙ্গে দালীর আলাপ করিয়ে দিলেন। আমরা দুজনে কেউ কারুর ভাষা বুঝি না, দালী তখনও ইংরেজী শেখেননি, আমিও ফরাসী অথবা স্প্যানিস শিখিনি, তাই যা দু' একটা কথা হয়েছে তা ওই কাফের কর্ত্রীর মারফৎ।

সেই সময় মে-ফেয়ারে এক ধনীর অট্টালিকায় সুররিয়ালিষ্টদের যে চিত্রপ্রদর্শনী হয়, সেটা আমাদের কলেজের ছেলে মেয়েরাই গড়ে তুলতে সাহায্য করে, তাই তাদের সঙ্গে কয়েকদিন আমিও ছিলাম। ঐ সময় প্রতি সন্ধ্যায় বিভিন্ন শিল্পীরা এসে বক্তৃতা দিতেন। সেদিন চেয়ারম্যান ছিলেন স্যার উইলিয়াম রথেনষ্টাইন আর বক্তা সালভাদর দালী। ঐ প্রদর্শনীতে তাঁর আঁকা কয়েকটি ছবির মধ্যে "শরৎকালীন নরখাদকত্ব" (Autumnal Camibalism) নামক ছবিটি বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

হল ভর্তি লোক, চেয়ারম্যান উদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছেন, বক্তার দেখা নেই। তখন ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুযায়ী বক্তাদের সান্ধ্যবেশে সুসজ্জিত হয়ে আসাই নিয়ম ছিল, কিন্তু সেদিন সভাস্থ সকলেই যখন বক্তার অপেক্ষায় অস্থির, ঠিক সেই সময় ডুবুরির পোষাকে আপাদ মস্তক ঢাকা একটি লোক মঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালেন এবং সবাই যখন লোকটির অনধিকার প্রবেশে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, (ডুবুরির পোষাকের কোন একটা কলকব্জা বিগড়ে যাওয়ায়) হঠাৎ তখন লোকটি মঞ্চের উপর লুটিয়ে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে থাকেন, শেষে সমবেত লোকজনদের চেষ্টায় পোষাকটি ছিঁড়ে অজ্ঞান অবস্থায় যাকে বার করা হলো—তিনিই হলেন সেদিনকার বক্তা সালভাদর দালী। ঘটনাটি হাস্যকর, তবু এর নতুনত্ব যেন আজও ম্লান হয়নি।

এর দু তিন বছর পর নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড ফেয়ারের সময় আমেরিকায় চলে যান দালী, সেখানে গিয়ে পেলেন তিনি প্রচুর সমাদর। এর কাছাকাছি সময় পিকাশোর অতিকায় চিত্র "গণিকা" লণ্ডনে প্রদর্শিত হয় এবং এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। দালী এবং পিকাশো দু'জনই হলেন স্প্যানিশ বংশোদ্ভব। পিকাশোর শিল্পী-জীবনের প্রথম দিকের একটি বিখ্যাত ছবির কথা মনে পড়ে "কয়েকটি ক্ষুধার্ত্ত বালক অন্য একটি খাদ্যরত বালকের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।" মাত্র ক'টি সবল লাইনের সাহায্যে যাঁরা এতই প্রাণবন্ত ছবি গড়ে তুলতে পারেন, তাঁদের পরবর্ত্তী কালের অর্দ্ধবাস্তব বা অবাস্তব ছবিগুলোর অভিনবত্বে মুগ্ধ হতে হয়। এবং তাঁদের ঐ মনোভাবের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে। আজকের পিকাশো এবং তাঁর অধিকাংশ সমসাময়িক শিল্পীদের সৃষ্টিতে যে সব বিকৃত ও বিকলাঙ্গ জীব ও বস্তু সদৃশ রেখার দেখা পাওয়া যায়, তা কি এক অনাগত গামা যুগের পূর্ব্বাভাস ? অবশ্য যে সব মানুষ বা অন্যান্য জৈবিক চেহারাকে আজ আমরা বিকৃত মনে করি, বৈজ্ঞানিকের মতে এক নিউক্লিয়ার যুদ্ধের শেষে যারা জন্ম নেবে ঐ টাই হবে হয়তো তাদের স্বাভাবিক চেহারা। তবে এই জাতীয় কলা সৃষ্টিও আজ আবার একঘেঁয়েমীর পর্য্যায়ে এসে পড়েছে। কিছুকাল হল ইংলণ্ডে আবার বাস্তব সৌন্দর্য্যবাদী তরুণ শিল্পীর দল গড়ে উঠেছে। মার্কিণ মুলুকে অবাস্তব কলার বিরুদ্ধে সামান্য কিছুদিন আগে যে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ঐ জাতীয় বিদেশী শিল্পীদের বিষয় সস্তা সিরিজের দু' চারটে সচিত্র বই দেখে আমাদের দেশের বোহেমিয়ান-এড ভেঞ্চারাস মনোভাববিহীন গৃহস্থ ভাবাপন্ন শিল্পীরা যাঁদের মোটা মাইনের সরকারি চাকরি বা বেশি দামে একটা ছবি বিক্রীর দিকেই সজাগ নজর, তাঁরা যখন রাতারাতি সুররিয়লিষ্ট হয়ে পড়েন, তখন তাঁদের সেই বিদেশী শিল্পের অনুকরণগুলো সহ্য করার মতন ধৈর্য্য রাখা সত্যই দায় হয়ে পড়ে।

বম্বে গ্রুপের কয়েক জন শিল্পী আজ প্রপাগ্যাণ্ডার জাহাজে চড়ে কলকাতা পর্য্যন্ত এসেছেন কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধেও এই কথাটাই খাটে। গুজরাল ইত্যাদি দিল্লীনিবাসী পাঞ্জাবী শিল্পীরা সম্প্রতি আক্ষেপ করেছেন যে, এ দেশে তাঁদের কাজের ক্রেতা কেউ নেই বা অত্যন্ত অল্প কয়েক জন বিদেশী মাত্র। কিন্তু এ দেশের সমাজ অথবা এ দেশী মনের উপযোগী শিল্প সৃষ্টি তাঁরা করেছেন কি ? ইউরোপের কোন অঞ্চলে কিংবা মার্কিণ মুলুকে (বেশির ভাগ সময়ই সরকারী অথবা বৈদেশিক অল্পকালীন স্কলারসিপের সাহায্যে) কয়েক মাস কাটিয়ে এলে আমাদের শিল্পীরা প্রায়ই পাশ্চাত্য শিল্পের অনুকরণে প্রবৃত্ত হন, সেই জন্যই অতুলনীয় গগনেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথের প্রবল প্রতিভার পর যামিনী রায় আমাদের জাতীয় শিল্পের যে ঐতিহ্য রক্ষার আশা দিয়েছিলেন, তাও আজ বিলুপ্তপ্রায়। তবু আশা করি, স্বাধীন ভারতে প্রভাবমুক্ত, স্বাধীন ভাবাপন্ন শিল্পীর দল অদূর ভবিষ্যতে সগৌরবেই আত্মপ্রকাশ করবে।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অবিনাশ সাহা

১২

পরের দিন বিজয়া। মহাপূজার সমাপ্তি। বাঙালীর কাছে এ দিনটি হাসি-কান্নায় ভরা। এই একটিমাত্র দিন—যে দিনে কেউ তার শত্রু থাকে না। শত্রু-মিত্র সকলকেই সে আলিঙ্গন করে এ দিনটিতে। মিষ্টি মুখের সঙ্গে দেয় মিষ্টি মনের পরিচয়। সকলের জন্যেই জানায় শুভ কামনা—যশস্বী হও, দীর্ঘজীবী হও, পরিপূর্ণ হও সমৃদ্ধিতে।…

এদিনে কারো কাছে সে ধার কর্জ করবে না। কাউকে তা দেবেও না। খাদ্য খাওয়াতেও থাকবে তার সতর্ক দৃষ্টি। কেউ বাসি পচা খাবে না, কোন রকম অশাস্ত্রীয় কাজ করবে না, কাউকে কোন কটু কথা বলবে না।

এদিনটিতে বাড়ির সকলে একত্র বসে পঞ্চ ব্যঞ্জন ভাত খাবে। অতিথি অভ্যাগতকে সাদর সম্ভাষণ জানাবে। খুশী উপচে পড়বে সকলের ঠোঁটে ঠোঁটে। যার প্রচুর আছে, সেও যেমন খুশী : যার কিছু নেই, সেও ঠিক তাই। এ খুশী তার মানস লোকের খুশী। অন্য কোন অঙ্কে এর হিসেব মিলবে না।

এই খুশীর দিনে তার চোখে আবার জলও ঝরবে। জল ঝরবে দেবী দুর্গাকে স্মরণ করে। মা ঘরে ছিলেন, দিন ক'টা আনন্দে কাটলো। এবার তো শুরু হবে আবার সেই মামুলী জীবন-যন্ত্রণা। শুরু হবে ভায়ে ভায়ে মারামারি কাটাকাটি। পাওনাদারের নিরন্তর তাগাদা। আর বেসরম নিন্দা চর্চা।…তার চেয়েও দুঃখের, দূরের জন যারা কাছে এসেছিল—যাদের সান্নিধ্যে মন প্রাণ ভরে উঠেছিল—একে একে তারাও এবার বিদায় নিতে শুরু করবে। ভরা গৃহে আবার নেমে আসবে শূন্যতা। তাই বাঙালীর কাছে বিজয়া যেমন সুখের, তেমনি দুঃখেরও ; কিন্তু দুঃখের চেয়ে বিজয়ার সুখের বহিঃপ্রকাশই বেশী। বিজয়ার নিরঞ্জন তাই সুখের অবসান নয়—আনন্দের মহোৎসব।

এই মহোৎসবই ফি বছর গঞ্জে চলে আসছে। বিজয়ার ভাসানকে কেন্দ্র করে গঞ্জের বাজারে মেলা বসে। মেলায় লোক জড় হতে থাকে সন্ধ্যা থেকে। দোকানীরা তার আগেই পণ্য সাজিয়ে তৈরী থাকে। অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর চেয়ে এ জেলায় খাদ্য দ্রব্যের আমদানীই বেশী হয়। আবার খাদ্য দ্রব্যের মধ্যেও মিঠাই মণ্ডাই উল্লেখযোগ্য। গঞ্জের ঘরে ঘরে সেদিন খাওয়ার ধুম। গৃহলক্ষ্মীরা সেদিন সকলের চেয়ে বেশী ব্যস্ত। রান্না-খাওয়ার পাট সকাল সকাল মিটিয়ে নিতে হয় তাদের। তার পর বেলা থাকতেই ঘরদোর গুছিয়ে সাজ্য প্রসাধন সারতে হয়। সেদিন কোন কিছু শূন্য রাখার উপায় নেই। হাঁড়ি, কলসী, বালতি সব ভরে রাখতে হবে। উদ্দেশ্য, ভরা গৃহে দেবী দশভূজা এসেছিলেন, ভরা গৃহ দেখেই আবার তিনি বিদায় নেবেন এবং তাঁর প্রসাদে সংসারও থাকবে পরিপূর্ণ।…

এদিনে কারো দম ফেলবার ফুরসৎ নেই। ঘরের কাজ শেষ করে সকলেই ছুটবে পূজা-মণ্ডপে। হাতে থাকবে প্রত্যেকের বরণ-ডালা। সে ডালায় থাকবে ধান-দুর্বো, পান বাতাসা, সিঁদুরকৌটো—এক প্রস্থ গহনা ও একটি রূপোর টাকা। প্রথমে ডালাসুদ্ধ দেবীর চরণে ছোঁয়াবে। তারপর কৌটো খুলে ললাটে এঁকে দেবে সিঁদুর টিপ। তারপর দেবে পান বাতাসা হাতে। সর্বশেষ চরণে ধান-দুর্বোর অর্ঘ্য দিয়ে কাতর প্রার্থনা জানাবে,—মাগো, আবার এসো। তোমার কৃপায় যেন আমার সিঁথির-সিঁদুর অক্ষয় থাকে—ধনে জনে যেন লক্ষ্মী লাভ হয়।…

বেলা থাকতেই আবার ফিরে আসবে গৃহে। সময় মতো জ্বালবে সান্ধ্য-দীপ। তারপর আর এক দফা সৌখীন জামা কাপড় পরে ছুটবে বংশীর পাড়ে। পাড় থেকে কেউ গিয়ে উঠবে নৌকোয়। গদগদ হয়ে ঘুরে বেড়াবে এমাথা ও মাথা কারো নৌকোয় বাজবে গ্রামোফোন, কারো নৌকোয় বসবে গানের আসর। আবার কেউবা ছেলে মেয়ের হাতে জ্বেলে দেবে রং মশাল। নৌবিহার আর ভাসান দর্শনের আনন্দে হবে ডগমগ।

অবশেষে সকলের নৌকোই একে একে এসে লাগবে বাজারের ঘাটে। মেলা তখন জমজমাট। জল স্থল সর্বত্রই সরগরম। প্রতিমার নৌকোয় বাজবে ঢাক ঢোল কাঁসর। দোকানীরা জিনিস দিয়ে কূল পাবে না। গঞ্জের বিজয়া-উৎসব বরাবর এভাবেই চলে আসছে। কিন্তু এবার কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। সকলের মুখেই কি হয় কি হয় আশংকা, সকলেই ভীত বিব্রত। দীনু ঘোষ এবার তার বিখ্যাত আলুর দম আর পরোটার দোকান লাগাবে না। কান্দনী ঘোষও মিষ্টি তৈরীর বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে। বউঝিরা অনেকেই নৌকোয় উঠবে না স্থির করেছে। সকলেরই ভাবনা, যশোদা মজুমদার যখন ক্ষেপেছেন, তখন গোলমাল একটা হবেই। কারো মনে তাই সুখ নেই।

সুখ যশোদা মজুমদারের মনেও নেই। গত রজনী বিনিদ্র গেছে, তাল-পুকুরে যাওয়া হয়নি। চাপালতা হয়তো ঠোঁট ফুলিয়ে বসে আছে। ফি বছর বিজয়ার রাত্রে ওঁর অন্তরঙ্গরা তালপুকুরে আসে। সেখানেই তাদের সাদর সম্ভাষণ জানানো হয়। চাঁপালতা প্রত্যেককে নিজের হাতে মিষ্টি পরিবেশন করে। মিষ্টির সঙ্গে এক গ্লাস করে সিদ্ধির সরবৎ। এবারের অনুষ্ঠান-সূচী আরো ব্যাপক হবার কথা ছিল। দক্ষযজ্ঞের প্রধান প্রধান ভূমিকাকারদের পেট ভরে খাওয়াতে চেয়েছিল চাঁপা। প্রথম রজনীর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে নিজের মুখে ও এ প্রস্তাব করেছিল। নিজের হাতেই তৈরী করতে চেয়েছিল নানা উপকরণ। কিন্তু ওর সে আশায় বাজ পড়েছে। নবীনচন্দ্রের কুটচক্রে সব বানচাল হয়ে গেছে।...ভাবতে ভাবতে অধীর হয়ে ওঠেন মজুমদার। না না, হেঁট মাথায় কিছুতেই ও আজ চাঁপার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। নবীনচন্দ্রের আচরণের সমুচিত জবাব দিতে পারলেই ও এ মুখ চাঁপাকে দেখাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সমুচিত জবাব। এমন জবাব যে নবীনচন্দ্র জীবনে কল্পনা করতে পারেনি।...উত্তপ্ত মগজে সেই জবাবের কথাই এতটা বেলা পর্যন্ত ভেবে চলেছেন। নাওয়া খাওয়া তো দূরের কথা, প্রাতঃকৃত্যাদির কথা পর্যন্ত ভুলে গেছেন। কিন্তু তবু কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। এবং পাচ্ছেন না বলেই চিন্তার জট ছাড়াতে পারছেন না। চোখ মুখের ভাব এমন রুক্ষ দেখাচ্ছে যে, কেউ কাছ ঘেঁষতে সাহস পাচ্ছে না। ভৃত্য হলধর তামাক দিতে এসে নিঃশব্দে পালিয়েছে! স্বয়ং মানবেন্দ্র নাথ পর্যন্ত কোন আলোচনায় আসতে ভয় পাচ্ছেন। মজুমদারের এমন ভয়াল মূর্তি অনেক দিন কেউ দেখেনি। গোপীবল্লভ সাধু, রাধারমণ পোদ্দার দর্পণ বিসর্জনের আগে হুবার কাছারিতে এসে ফিরে গেছে। ফি বছর মজুমদার দশমী পুজোর সময় মণ্ডপে উপস্থিত থাকেন। এবার কি হবে? দশমী তিথি যে ছেড়ে যায় প্রায়। ডাকতে না এলেও বিপদ, আবার এসেও বিপদ। কি করে ওরা? কেউ যে দোতলায় পা দিতেই সাহস করছে না! কাকে দিয়ে খবর দেয়? গোপীবল্লভ সাধু, রাধারমণ পোদ্দার মহা ফাঁপরে পড়ে।

ফাঁপরে দাসুর মাকেও পড়তে হয়। চাঁপার নির্দেশ মতো দশমীর ফর্দ নিয়ে এসেছিল দাসুর মা। কিন্তু জিনিস না নিয়ে ফর্দ হাতেই ফিরতে হয়েছে ওকে। হলধর খবর দিতে গিয়ে তাড়া খেয়েছে মজুমদারের কাছে।

সকলেই ফিরেছে, ভয়ে কেঁপেছে, কিন্তু কাঁপেননি শুধু একজন। তিনি বাড়ির কর্ত্রী—মজুমদারের স্ত্রী। তাড়া খেয়েও নিথর দাঁড়িয়ে থাকেন। যেন মূর্তিমতী মমতা। মজুমদার এ দৃশ্যে বেশীক্ষণ রেশ রাখতে পারেন না। বোঝেন, উনি না খেলে বাড়ির কারো খাওয়া হবে না। বিজয়ার আয়োজন সমস্তই পণ্ড হবে। তাছাড়া মা লক্ষ্মীর দানার ওপর রাগ করে লাভই বা কি? খেয়ে দেয়ে সুস্থ হলে বরং একটা হদিস মিলতে পারে। বেলাতো কম হলো না। সময়-মতো প্রতিমা বার করতে না পারলে লোকে আরো থুথু দেবে।... সাত পাঁচ ভেবে অনেকটা হালকা হন। বিশ্রামকক্ষেই ভাত দিয়ে যেতে আদেশ করেন। খাওয়া হয়ে গেলে একটা ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে দেন। হলধর তামাক দিয়ে যায়। তামাক টানতে টানতে মানবেন্দ্রনাথকে তলব করেন। হুপুর গড়িয়ে হাজির হন মানবেন্দ্রনাথ। মজুমদারের নির্দেশ মতো একটা চেয়ারে বসেন। গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করেন মজুমদার,—সব ব্যবস্থা ঠিক আছে তো?

সবিনয়ে উত্তর দেন মানবেন্দ্রনাথ,—আজ্ঞে হ্যাঁ, বিশু সর্দার চড়ে গিয়েছিল। পঞ্চাশজন লাঠিয়াল বৈরাগী খালের মোড়ে মোতায়েন থাকবে। আলাদা নৌকোয় কীর্তন করবে ওরা। কেউ হদিস পাবে না। প্রয়োজন হলে ইঙ্গিত মতো সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

উত্তর শুনে খুশী হতে পারেন না মজুমদার। চোখ কপালে তুলে বিস্ময় প্রকাশ করেন, মাত্র পঞ্চাশজন!

দৃঢ় থেকে মানবেন্দ্রনাথ বলেন, ইচ্ছে করলে এই পঞ্চাশজনেই গোটা উত্তরপাড়া চষে ফেলতে পারে। এছাড়া রমণীবাবু সদলবলে পুলিশের পেট্রোল-বোটে থাকছেন।

পুলিশের ওপর তুমি নির্ভর করো না। ওরা চোরকে বলবে চুরি করো, গৃহস্থকে বলবে সজাগ থাকো। পয়সার গন্ধ যেখানে ওরা জানবে সেখানে এবং সে হিসেবে নবীন চৌধুরীই আমাদের চেয়ে ওদের সাহায্য পাবে বেশী পরিমাণে।

না না, তা কখনো হতে পারে না।

আলবৎ পারে। তার প্রমাণ ওদের কালকের আচরণ। ওদের সমর্থন না থাকলে নবীন চৌধুরীর এত স্পর্দ্ধা আসে কোত্থেকে। তোমাকে আমি বলে রাখছি মানু, নিজের পায়ে যদি না দাঁড়াও, তাহলে আজো ঠকতে হবে।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আজ যদি নবীন চৌধুরী বাঁদরামো করে, তা হলে আর মায়ের বুকে ফিরে যেতে পারবে না। বর্শীর কোলেই হবে ওর শেষ সমাধি।

প্রয়োজন হলে সে রকম ব্যবস্থা করতে হবে। কাল রাত্রে আমি নিজেই ওকে রাইফেল দিয়ে খতম করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভেবে দেখলাম, ওতে প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। তোমাকে সত্যি বলছি, শির আমি ওর চাইনে। আমি চাই ওকে নত-শির দেখতে।

উত্তম, তাই হবে। ধরে এনে আমি ওকে আপনার কাছে হাজির করবো।

কাজটা ঠিক অতটা সোজা মনে করো না।

আপনি শুধু আমাকে আশীর্বাদ করুন কাকাবাবু।

তোমার ওপর আমি ভরসা রাখি মানু। ভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবন দান করুন। কিন্তু মনে রেখো, সামনে লাট কিস্তি।

বোড়ের কিস্তিতে লাট কিস্তি অনায়াসেই মিটবে বলে আশা করি।

মা দশভুজা তোমার সহায় হোন। তুমি মণ্ডপে যাও। সকলকে ডেকে বলো, সময় মতো যাতে প্রতিমা নৌকোয় ওঠে। আমি সরাসরি পানসীতেই উঠবো।

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান মানবেন্দ্রনাথ। কয়েক পা দরজার দিকে এগিয়ে যান।

মজুমদার পেছু ডাকেন, শোন, পিস্তলটা নিতে যেন ভুলো না।

মানবেন্দ্রনাথ এবার হেসে ফেলেন। কতকটা হালকা হয়েই উত্তর দেন,—আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু আমার মনে হয়, এ সবের কোন দরকার হবে না। আমি যতটা খবর পেয়েছি তাতে উত্তর-পাড়ার কোন মোড়লই প্রতিমার সঙ্গে থাকছে না। ওরা রীতি মতো ভয় পেয়েছে।

না না, ওদের কাউকে যেন বিশ্বাস করো না। ওরা সব করতে

পারে। কালও কি ভাবতে পেরেছিলে, ও রকম একটা অঘটন ঘটবে? জন কয়েক শয়তান নবীন চৌধুরীর কাঁধে ভর করেছে। ওরাই ওকে নাচাচ্ছে।

আজ নাচলে কারো আর ঠ্যাং নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে না।

হ্যাঁ, সেই ব্যবস্থাই করো। আচ্ছা, এসো এবার।

মজুমদারের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে বীর দর্পে এগিয়ে যান মানবেন্দ্রনাথ।

মজুমদারও বীরদর্পেই সাজ পোষাক করতে উঠে দাঁড়ান। দেহরক্ষী বিশু সর্দারকে ডেকে তৈরী হতে বলেন। না না, ঢিলে ঢালা পোষাকে আজ চলবে না। কোঁচানো ধুতি পাঞ্জাবী কখনো রণ-সাজ হতে পারে না। হিসেব মতো শিকারীর পোষাক পরাই উচিত। কিন্তু বিজয়ার দিনে ও পোষাক পরলে লোকে নিন্দা করবে। নবীনচন্দ্রই নানা কথা রটিয়ে বেড়াবে। তার চেয়ে গলবন্ধ তসরের কোট আর আঁট সাট করে ধুতি পরলেই সবদিক থেকে ভারসাম্য রক্ষা করা হবে। বিশুকে তাড়া দিয়ে নিজে তাই পরে নেন। পায়ে পায়ে বড় আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। সেখানে নিজের চেহারা দেখে নিজেই আঁৎকে ওঠেন। একি হাল হয়েছে ওর! এক রাত্রেই যেন মুখের সবটুকু রক্ত চুষে খেয়েছে কেউ। মোমের মতো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে মুখখানি। চোখের কোণে কালি পড়েছে। আজ হয়তো ওকে দেখে পাড়ার লোক হাততালিই দেবে। ভাববে, যাত্রা দলের সেপাই। লজ্জায় অপমানে তাড়াতাড়ি আয়নার সামনা থেকে পালিয়ে আসেন। গা এলিয়ে দেন সোফার ওপর। বুক ঠেলে কান্না আসে।

মজুমদার ভাবেন, মজুমদার-বংশের গৌরবসূর্য হয়তো আজ অস্তগামী। হয়তো ঘোর তমিস্রা তার শিয়রে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। হয়তো অন্ধকারের বুকে তলিয়েই যাবে মজুমদার-বংশ। আর তার বদলে জাগবে চৌধুরী-বংশ। নবীন চৌধুরীই হবে গঞ্জের মধ্যমণি। ৺রামচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র নবীন চৌধুরী। যে রাম চৌধুরীকে লোকে দু'দিন আগেও মুদী ছাড়া সম্বোধন করেনি। ভাগ্য—সবই ভাগ্যের খেলা। না না, অন্ধ নিয়তির কাছে কিছুতেই ও আত্মসমর্পণ করবে না। ভাগ্য বলে কিছু নেই। নিছক ধাপ্পা! আসলে পুরুষকারই সব। পুরুষকার দিয়েই ও হৃত গৌরব আবার ফিরিয়ে আনবে। আজকের নৌযুদ্ধেই হবে তার শুভ-সূচনা। কথায় আছে, ওল—তা সে যত বড়ই হোক, মাটির নীচেই তার স্থান। নবীনচন্দ্রকেও তাই থাকতে হবে। ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে, মজুমদাররা জমিদার, আর ওরা তাদের অনুগত প্রজা। প্রজা আর জমিদারের ইজ্জত এক নয়। সে কথা স্মরণ রেখেই যেন ওরা পথ চলে। অন্যথায় উপযুক্ত মাশুল দিতে হবে। ভেঙে পড়ছিলেন মজুমদার আবার চাঙা হয়ে ওঠেন। সোফা থেকে উঠে আবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। আবার চলে সাজসজ্জা। সে সাজ রণসাজেরই নামান্তর।

সন্ধ্যার আগেই সব প্রতিমা নৌকোয় তোলা হয়। উত্তরপাড়া দক্ষিণপাড়ার প্রতিমাও বাদ যায় না। বিরাট এক একখানি গস্তি-নৌকো। পাটাতনের মাঝ বরাবর প্রতিমা বসিয়েও আগে পাছে প্রচুর জায়গা থাকে। বরাবর পাড়ার মোড়লরা আগের দিকে ফরাস বিছিয়ে বসেন। পেছনের দিকে থাকে চাষী আর মাঝি-মাল্লারা।

এবারও সেই ব্যবস্থাই হয়েছে। তবে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, দক্ষিণ পাড়ার নৌকোয় এবার যাত্রীর সংখ্যা অন্যান্যবারের চেয়ে অনেক বেশী। অধিনায়ক রাধারমণ পোদ্দার আর গোপীবল্লভ সাধুর কণ্ঠস্বরে কেমন যেন বীভৎসতার আভাস ফুটে উঠছে। দেবী দুর্গার জয়ধ্বনি দিতে গিয়ে রণধ্বনিই দিচ্ছে যেন ওরা। মজুমদার আর মানবেন্দ্রনাথ প্রতিমার নৌকোয় উঠেননি। অবশ্য মজুমদার বরাবরই নিজের পানসীতে থাকেন। সঙ্গে থাকে চাঁপালতা আর বাকিন ছেলেপুলেরা। ইচ্ছে হলে মজুমদার-গিন্নীও কোন কোন বার থাকেন। মানবেন্দ্রনাথ থাকেন ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে আলাদা নৌকোয়। সে নৌকোয় চলে গান বাজনা খানা পিনা। কিন্তু এবার উনি আছেন বজনী দারোগার সঙ্গে জল-পুলিশের নৌকোয়। মজুমদারের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যায়। পানসীর ছাদের ওপর একা বসে আছেন ডেক-চেয়ারে। ছেলেপুলে কিংবা চাঁপালতা কেউ সঙ্গে নেই। চোখে মুখে কেমন যেন একটা হিংস্র দৃষ্টি। পায়ের কাছে রাইফেলটা লম্বালম্বি পড়ে আছে।

ছাদের ওপর আর কেউ না থাকলেও নীচে বিশু সর্দার ঠিকই আছে। আর আছে পরাণ মণ্ডল, যা... বিশ্বাস প্রভৃতি জনকয়েক পাকা লাঠিয়াল। প্রত্যেকেই এক একটি খুনে ডাকাত। উত্তরপাড়া তো তুচ্ছ, হুকুম পেলে গোটা গঞ্জকে পিষে ফেলতে পারে ওরা। মানবেন্দ্রনাথের ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি মজুমদার। নিজে সকলকে তলব করে হাজির রেখেছেন। প্রয়োজন হলে যুদ্ধের হুকুমও দেবেন।

যুদ্ধ অনিবার্যই ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিরত থাকেন নবীনচন্দ্র। বিরত থাকেন মার একান্ত অনুরোধে। উমা সুন্দরী কিছুতেই এবার ওঁকে ঘরের বার হতে দেবেন না। মজুমদারদের অনেক কথাই ওঁর কানে গেছে। কি করেন আর নবীনচন্দ্র। মার পেড়াপীড়িতে ঘর নিতে বাধ্য হন। স্ত্রী ছেলেপুলেরা যায় গদীবাবুর ছাদের ওপর। সেখান থেকেই এবার বিজয়া দেখবে। নবীনচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে মধু দত্ত, শ্যামলাল শীলও দমে যায়। মুখে আস্ফালন করলেও কেউ প্রতিমার নৌকোয় উঠতে সাহস করে না। উত্তরপাড়ার নৌকোয় জেলেরাই এবার প্রধান ভূমিকা নেয়। ওরাই প্রতিমা বিসর্জন দেবে।

রাত আটটা, দক্ষিণ পাড়ার নৌকো বাজারের ঘাটে এসে লাগে। উত্তর পাড়ার নৌকো তার আগেই এসে লেগেছে। লোকে যে রকম ভয় পেয়েছিল, ব্যাপার এ পর্যন্ত সে রকম কিছুই দেখা যায় না। মেলা বেশ জমে উঠেছে। দোকানীরা ভালই বেচাকেনা করছে। নৌকোয় নৌকোয় চলেছে গান বাজনা খানা-পিনা। থেকে থেকে জয়ধ্বনি দিচ্ছে ভক্তরা। ছোটরা ফুলঝুরি আর রংমশাল জ্বেলে মাতোয়ারা। কোথাও কোন দ্বন্দ্ব নেই। গঞ্জ উৎসব-মুখর।

রাত দশটা, বাড়ির প্রতিমা একে একে সবই প্রায় বিসর্জন হয়ে যায়। শান্তিবারি নিয়ে দর্শকদের অধিকাংশ চলেও গেছে। বাকী শুধু উত্তরপাড়া আর দক্ষিণপাড়ার প্রতিমা। বাবু ভুঁইএরা কেউ সঙ্গে নেই। উত্তরপাড়ার এবারকার মোড়ল দুখাই মাঝি। ভয় না পেলেও দুখাই আর রাত করতে রাজী নয়। বিসর্জনের জন্যে নৌকো বার নদীতে নিতে হুকুম করে। মোড়লের নির্দেশ মতো সকলে বৈঠা হাতে নেয়। সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি দেয় দেবী দুর্গার। নৌকো ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে বংশী-ধলেশ্বরীর সঙ্গমের দিকে। বরাবর সেখানেই বিসর্জন হয়ে এসেছে। এবারও তাই হবে।

উত্তর পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ পাড়ার নৌকোও এগিয়ে চলে। ঘাটে বসে মজুমদার অনেকক্ষণ ভেবেছেন। বুঝেছেন। বুঝেছেন, নবীন চৌধুরী দোষী। নয়তো সদলবলে অনুপস্থিত থাকবে কেন? সুতরাং শাস্তি ওর পাওয়া উচিত। উপস্থিত থাকলে হাতে হাতেই ফল পেতো। যে সব ডাকাতরা সঙ্গে রয়েছে, সে তুলনায় ওর জেলে জোলারা কিছু নয়। প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু এখন কি করা যায়? রামের শাস্তি রহিমকে দিয়ে কোন লাভ নেই। তাছাড়া ওকে মেরে ফেললেই বা কি ফায়দা হবে? সামনে লাট কিস্তি—ও ছাড়া টাকাই বা যোগাবে কে? ও আসেনি, ভালই করেছে। মা দুর্গাই সব কূল রাখলেন। আমাদেরও ইজ্জৎ বাঁচালো, ও-ও জানে বাঁচলো। না, আর কোন রকম গোলমাল করে লাভ নেই। বিসর্জন নির্বিঘ্নেই হয়ে যাক।...ভাবতে ভাবতে রক্ত শীতল হয়ে আসে মজুমদারের। ভেবেছিলেন বিসর্জনের জন্যে আর নিজে মাঝ দরিয়ায় যাবেন না। কিন্তু পাছে কোন রকম গোল বাধে, সেই ভয়ে নিজেও প্রতিমার পেছু পেছু ছোটেন।

কিন্তু মজুমদার শান্ত হলেও সঙ্গের অনুচররা স্থির থাকতে পারে না। চুপচাপই যদি ঘরে ফিরে যেতে হবে তাহলে আর ওদের ডাকা কেন? হুকুমের অভাবে উত্তরপাড়ার নৌকোকে লক্ষ্য করে নিজেদের মধ্যেই হাসাহাসি শুরু করে। কেউ কেউ নবীনচন্দ্রের উদ্দেশ্যে সরাসরি টিটকিরি কাটতেও ছাড়ে না। পাশাপাশি চলতে চলতে এক সময় যাদব বিশ্বাস দুখাইকে ডেকে ফোড়ণ কাটে,—কি গো মোড়লের পো, তোমাগ ঝোলাগুড়ের ব্যাপারীরা সব কৈ? এত নাচন কোদন এক রাইত্রেই খ্যাব হইল নাকি? হালরে ডাক না একবার, মায়ের কাছে বছরের নাচনডা নাইচা যাউক।...

দুখাই সবই বোঝে। শরীরে রাগও হয়। তবু ঝগড়া এড়াবার জন্যে কোন উত্তর করে না।

ওকে নিরুত্তর দেখে পরাণ মণ্ডল উল্লাস জানায়,—মুখ বুইজা রইলা যে মোড়লের পো, তোমার তেনাগ একবার ডাক না—বিজয়ার কোলাকুলিডা করি। ঝোলাগুড়ের বদলে কিঞ্চিৎ মিঠাই মণ্ডা দিমুনে।...

দুখাই এবার আর ধৈর্য রাখতে পারে না। রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু তার আগে মজুমদার অবস্থার মোড় ঘোরান। পরাণকে ধমক দেন। নৌকো ধীরে ধীরে সঙ্গমের দিকে এগিয়ে চলে।

তীরে অগণিত দর্শক হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। শেষ প্রতিমা দু'খানির বিসর্জন দেখে বাড়ি ফিরবে। না, যা আশংকা করেছিল ওরা, তা নয়। দিনটা বেশ ভালই কাটলো। মা ভগবতী করুন, দেশের যেন মঙ্গল হয়। সকলে যেন সুখে থাকে।...দেবীর উদ্দেশ্যে শেষবার প্রণাম করে অনেকে।

মজুমদারের আশ্বাস পেয়ে দুখাইও শঙ্কা কাটিয়ে ওঠে। দুই নৌকোতেই শুরু হয় শেষবারের মতো ধূপারতি। ঢাক বাজতে থাকে তালে তালে। মজুমদার নিজেও হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ান। গঞ্জের সকলের জন্যে শুভ কামনাই জানান।

আরতির পর কি[illegible]। দুদলই তৈরী, এমন

সময় তীরে হৈ চৈ শোনা যায়। মেলায় মানুষ যে যেদিকে পারছে ছুটছে। নৌকোয় থেকে দু'দলের কেউ বুঝতে পারে না কি হয়েছে। দুখাই, মজুমদার হতভম্বের মতোই দাঁড়িয়ে থাকেন। গঞ্জের বাজার ততক্ষণে সাফ। ঝাপ বন্ধ করে দোকানীরা সব পালাচ্ছে। চারদিক জুড়ে সোরগোল।—খুন হয়েছেন, খুন হয়েছেন। নবীন বাবু খুন হয়েছেন। হায় হায় কি সর্বনাশ।···

নবীন বাবু খুন হয়েছেন, কথাটা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মজুমদার আঁৎকে ওঠেন। কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। নিজের মনে নিজেই প্রশ্ন করেন—কে খুন করলো নবীনচন্দ্রকে? কই মানবেন্দ্রনাথকে তো ও কখনো এ কাজ করতে বলেনি! তবে!···

মজুমদারকে বোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দুখাই জ্বলে ওঠে। তাবে, মজুমদারদের যত দাপটই থাক, জলযুদ্ধে ওদের কাছে কেউ না। ওর একটা হুঙ্কারে আর না হোক পাঁচ শ জেলে এই মুহূর্তে বৈঠা হাতে ছুটে আসবে। একটা বন্দুক দিয়ে কটাকে ঠেকাতে পারবে যশোদা মজুমদার? উত্তরপাড়ার মাথার বদলে ওর মাথাও দিতে হবে। বিসর্জনের আগে মা ভগবতী ওর মুণ্ডুটাও চিবিয়ে খাক।··· দুখাই স্থির থাকতে পারে না। স্বজনদের হুকুম দেয়, মারশালা শয়তানরে। তলাইয়া দে অর পানসী।

মে'ড়লের হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে মার মার শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমস্ত জোয়ানরা। জন কয়েক বৈঠা হাতে লাফ দিয়ে ওঠে পানসীর ওপর।

মজুমদারও ঝা করে রাইফেলটা হাতে নিয়ে রুখে দাঁড়ান। অন্য সময় হলে কিছুতেই তিনি এ অপমান নীরবে সহ্য করতেন না। দুখাইর মতো পানিকাককে বন্দুক দেগে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু আজ তিনি সে কাজ করতে অক্ষম। নবীনচন্দ্রের প্রেতাত্মা আজ যেন ওঁর দু'খানি হাতকে অবশ করে ফেলেছে। রাইফেল উঁচিয়ে ধরে মজুমদার শান্তভাবেই অনুরোধ জানান, তোর লোকদের চলে যেতে বল দুখাই। ব্যাপার কি---আমাকে বুঝতে দে।

রাখ মশয় তোমার ঢলাইনা কথা। এ সব তোমাগ কারসাজী,— দুখাই জবাব দেবার আগে টেপা জেলে ফুঁসে ওঠে।

টেপার পিট পিট যাদব বিশ্বাসও প্রতিমার নৌকো থেকে লাফ দিয়ে এসে পানসীতে ওঠে। মজুমদারের হয়ে প্রতিবাদ করে, কি বললে শালা জাইলার পো, যত বড় মুখ না তত বড় কথা! ঘাড়ে তর কয়টা মাথারে শালা? বলতে বলতে হাতের লাঠি তুলে টেপার মাথার ওপর এক ঘা বসিয়ে দিতে যায়।

দুখাই তাড়াতাড়ি ছুটে এসে লাঠি মুঠ করে ধরে ফেলে।

সুযোগ পেয়ে টেপা বৈঠার এক ঘা বসিয়ে দেয় যাদবের মাথার ওপর।

যাদব সামলাতে পারে না। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। ফিনকী দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে।

মুহূর্তে শুরু হয় খণ্ডপ্রলয়। বৈঠা আর লাঠিতে খটাখট শব্দ হতে থাকে। সমুদ্র মন্থনের মতোই বংশীর জল আলোড়িত হয়। দু' পক্ষে গোটাকয়েক লাশ পড়ে যায়।

হাতের রাইফেল হাতেই থাকে মজুমদারের। কিছুতেই তাক করতে পারেন না। নিরুপায় হয়ে নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়েন জলের ওপর। ডুব দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন।

শরতের রূপসী। স্বচ্ছ চাঁদের আলোয় লক লক করছে বংশীর রাক্ষুসে জিহ্বা। যেন মহা ক্ষুধা ওর জঠরে। দু' পক্ষের তাজা রক্ত পলকে পলকে পান করছে। হয়তো বা আস্তই গিলে খাচ্ছে কাউকে। যুদ্ধ চলছে প্রাণপণ। কার কটা লাশ পড়লো কেউ টের পায় না। কেবল লাঠি বৈঠায় ঠোকাঠোকি। তবু তারই মধ্যে দুখাইর গলা শোনা যায়। দুখাই হাঁকে,—মাঝিরা কে কোথায় আচস রে, তরাতরি ছুইটা আয়। ডাকাইতরা আমাগ মাইরা ফালাইল। তরাতরি ছুইটা আয়।···

বংশীর তীর ঘেঁষে জেলেপাড়া। অন্যূন শ'খানেক ঘর জেলের বসতি। লোক সংখ্যা কম করেও পাঁচ শ। গোলমালের আশঙ্কায় অনেকে প্রায় তৈরীই ছিল। তাই মোড়লের ডাক কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘাটেই বাঁধা রয়েছে মাছ ধরা ডিঙি, খুদে এক একটা যুদ্ধ জাহাজই যেন। ছেলে বুড়ো যে যা হাতের সামনে পায় তাই নিয়েই ডিঙিতে গিয়ে ওঠে। বৈঠার পর বৈঠা ফেলে তীর বেগে এগিয়ে যায় সঙ্গমের দিকে। মুখে রণহুঙ্কার।

বৈরাগীর খালে নোঙর ফেলে নাচগানে মত্ত ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ। পুলিশের নৌকোয় অনেকক্ষণ টল দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। ডুবে ছিলেন মাইফলে। রমণী দারোগাও সঙ্গে ছিলেন। এতক্ষণের হৈ চৈ কিছুই কানে ঢোকেনি। এবার জেলেদের দলবদ্ধ হুঙ্কারে সম্বিৎ ফিরে পান। মদের গ্লাস ছুঁড়ে ফেলে ছইয়ের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। ব্যস্তভাবেই ইতিউতি তাকান। তাকিয়ে দেখেন মেলা ভেঙ্গে গেছে। বাজার অন্ধকার। মার মার রব উঠছে জেলেপাড়ায়। জেলেরা ডিঙি বোঝাই পিল পিল করে এগিয়ে আসছে। প্রতিমার নৌকোয় নৌকোয় চলেছে খণ্ড-যুদ্ধ। শয়তান নবীন চন্দ্রই কি তাহলে অতর্কিত আক্রমণ করলো? কাকাবাবুর পানসী কোথায়?··· মানবেন্দ্রনাথ স্থির থাকতে পারেন না। মাঝিদের সঙ্গমের দিকে যেতেই তাড়া দেন। নেশা ছুটে যায়। কেস থেকে পিস্তলটা বার করে শক্ত হাতে বাগিয়ে ধরেন। রমণী দারোগাও কর্তব্য কর্মে অবহেলা করেন না। হুইসল ফোঁকেন পেট্রোল-বোটের উদ্দেশে।

ছোটদারোগা দেদার বক্স ছিলেন পেট্রোল-বোটের জিম্মায়। হৈচৈ শুনে নিজেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় রমণী দারোগার সঙ্কেত-ধ্বনিতে বোট এনে বাঁধেন মানবেন্দ্রনাথের নৌকোর সঙ্গে। সকলে মিলে সঙ্গমের দিকে এগিয়ে যায়। চারজন সিপাই রাইফেল নিয়ে তৈরী। সুতরাং আর কোন ভয় নেই। রমণী দারোগা নিশ্চিন্ত। মানবেন্দ্রনাথও স্বস্তির হাঁপ ছাড়েন। শুধু ভাবনা মজুমদারের জন্যে। পানসীর যে কোন পাত্তাই নেই।···

যুদ্ধ তখনো তুমুল চলেছে। জেলেরা বেপরোয়া। নৌকো শুদ্ধ দক্ষিণ পাড়ার প্রতিমা ডুবিয়ে দেয় আর কি। রমণী দরোগা এক মিনিট ভেবে এক রাউণ্ড ফাঁকা গুলির আদেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে চারটে রাইফেল।

কাজ মন্ত্রবৎ হয়। জেলেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। দুখাই বাইচ দিয়ে পালিয়ে যায়। কেউ গুলির সামনে দাঁড়াতে সাহস করে না। মুহূর্তে ঝড় থেমে যায়। মানবেন্দ্রনাথ মজুমদারের খোঁজে পাগলের মতো হাতড়াতে থাকেন। নিজের নৌকো থেকে লাফ দিয়ে ওঠেন প্রতিমার নৌকোয়। অনেকেই জখম হয়ে পড়ে আছে। অনেকে কাতরাচ্ছে। উত্তরপাড়ার নৌকোতেও একই অবস্থা, শুধু মৃত্যু

আছে টেঁপা। ওর বিশেষ কিছু হয়নি। অনেককে ও একা ঘায়েল করেছে। কাউকে বা খতমও করেছে। তাই পুলিশের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়। কিন্তু পেছন দিক থেকে রমণী দারোগা লাফ দিয়ে ওর চুলের মুঠি চেপে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে দুজন সিপাইও ছুটে গিয়ে হাতে হাত-কড়া লাগিয়ে দেয়।

ছুটে মানবেন্দ্রনাথও আসেন। টেঁপার বুকের ওপর পিস্তল ধরে প্রশ্ন করেন,—বল কুত্তার বাচ্চা, আমাদের পানসী কোথায়?

টেঁপা সে কথায় দমে না। খাঁচায় বদ্ধ বাঘের মতোই গর্জে ওঠে,—জানি না, জানলেও কমু না।

কি বললি হারামজাদা, বলবিনে? দেখি শালা বলিস কি না বলিস, বলতে বলতে পিস্তলের বাঁট দিয়ে মাথার ওপর এক ঘা বসিয়ে দেন।

টেঁপা নিরুপায়। ক্রোধে হাত নেড়ে নেড়ে গজরাতে থাকে।

মানবেন্দ্রনাথ আবার আর এক ঘা বসিয়ে দেন। হয়তো বা পিস্তল দেগে মেরেই ফেলেন টেঁপাকে। কিন্তু বেশীক্ষণ বাদানুবাদের অবকাশ পান না। পরাণ মণ্ডল পাটাতনের ভেতর থেকে কাতরাতে থাকে, বড় বাবুর পানসী শালারা ডুবাইয়া দিচে ছোট কত্তা। সামনের দিকে একটু খুঁইজা দ্যাখেন।

টেঁপাকে ছেড়ে পরাণ মণ্ডলের ওপর রুখে ওঠেন মানবেন্দ্রনাথ, বলিস কি হারামজাদা! পানসী ডুবিয়ে দিলো,—তোরা কি তামাসা দেখছিলি?

এমুনডা অইব আমরা ভাববার পারি নাই! জাইলারা আমাগ আগে আক্রমণ করল, কাতরাতে কাতরাতেই জবাব দেয় পরাণ।

মানবেন্দ্রনাথ সে কথায় কান দেন না। পাগলের মতো এদিক ওদিক খুঁজতে থাকেন। দূরে কি যেন একটা ভেসে যেতে দেখে প্রাণপণ শক্তিতে হাঁকেন, কাকাবাবু—কাকাবাবু—

আমি এখানে মানু। আর পারছিনে, শীগগির নৌকো নিয়ে আয়, মজুমদারের আর্তকণ্ঠ ভেসে আসে।

ভয় নেই—ভয় নেই কাকাবাবু, আমরা আসছি, ভয় নেই—তাড়াতাড়ি নৌকো নিয়ে ছুটে যান মানবেন্দ্রনাথ। সঙ্গে রমণী দারোগা ও অন্যান্য সকলে। কাছে গিয়ে দেখেন, একটা প্রতিমার কাঠামোয় ভর দিয়ে ভেসে চলেছেন মজুমদার। সামনেই বংশী-ধলেশ্বরীর সঙ্গমস্থল। নাগিনীর ছোবলের মতোই ফোঁস ফোঁস করছে। ওখানে গিয়ে পড়লে চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানবেন্দ্রনাথ মাঝিদের তাড়া দিয়ে আবার হাঁক ছাড়েন, আমি এসে পড়েছি কাকাবাবু, ভয় নেই। আপনি আর একটু চেষ্টা করুন।···

অল্পের জন্যে রক্ষা পান মজুমদার। বংশীর সীমারেখা ছাড়িয়ে ধলেশ্বরীর সীমা ধরছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ গিয়ে টেনে তোলেন। নৌকোয় উঠেই হাত-পা ছেড়ে দেন মজুমদার। অপমানে লজ্জায় মুখ দিয়ে কোন কথা সরে না। মাঝিরা যথাশক্তি দাঁড় টেনে নৌকো তীরে নিয়ে আসে। সকলে মিলে ধরাধরি করে মজুমদারকে বাড়িতে নিয়ে আসে। বিজয়ার আনন্দের পরিবর্তে গঞ্জে নেমে আসে বিষাদের ছায়া। একটু আগে নবীন চৌধুরী খুন হয়েছেন। মজুমদারও কি সকলকে ছেড়ে চললেন? কেউ কেউ আবার খুশীও হয়। মনে মনেই ভাবে, মাথার ওপরে ধর্ম এখনো আছে। মা দুর্গা উপযুক্ত বিচারই করলেন। এমন জল্লাদের মরাই ভাল। ওরা ছাড়া গঞ্জে আর এমন কেউ নেই নবীনবাবুর গায়ে হাত ছোঁয়ায়। ছি ছি ছি,—সামান্য ঝগড়া-ঝাটির দরুণ মানুষ খুন! কিন্তু কেউ কোন কথা মুখ ফুটে বলতে সাহস করে না। যে যার মতো নিঃশব্দে ঘর নেয়।

গভীর রাত। মজুমদার এখন দৈহিক সম্পূর্ণ সুস্থ। শুধু মগজের পোকাগুলো কিলবিল করছে। চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা। চাঁপার ওখানে যাননি। যাবার শক্তি ছিল না। স্ত্রীকেও ঘরে থাকতে দেন না। গভীর উদ্বেগ নিয়েই বিদায় নিতে বাধ্য হন বেচারা। হুকুম তামিল না করে উপায় নেই। ওর যদি জমিদারের সঙ্গে বিয়ে না হয়ে কোন গরীব নিষ্ঠাবানের সঙ্গে বিয়ে হতো। কি পেলো ও সারা জীবনে?···

নিরুপায় হয়েই বিদায় নেন মজুমদার-গিন্নী। মজুমদার একাকী দুর্ভাবনার জাল বুনতে থাকেন। উমাসুন্দরী তখনো ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন। নিস্তব্ধ রাত্রিতে এত দূর থেকেও সে কান্নার রোল ভেসে আসছে। হয়তো বা মনের কান্নাই শুনতে পাচ্ছেন মজুমদার। সে কান্নায় সহসা চীৎকার করে ওঠেন,—না না, আমি নবীনচন্দ্রকে খুন করিনি। আমি খুনের কথা ভাবিওনি। আমি—

শুয়ে ছিলেন মজুমদার; সহসা লাফ দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসেন। বসে ভাবতে থাকেন, সত্যি, কে খুন করলো নবীন চৌধুরীকে? তবে কি মানু? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে। নবীনচন্দ্রের পরও আমাকেও খতম করবে। তারপর গঞ্জের একমাত্র অধীশ্বর হয়ে বসবে। পুলিস ওর হাতে। বুদ্ধিতেও শকুনিকে হার মানায় ও। এ কাজ ওরই। কিন্তু সেটি হবে না। ওর বিষ-দাঁত আজই ভাঙবো। রাইফেল দিয়ে আজই ওকে আমি শেষ করবো। শয়তান, এই তোর ভক্তি শ্রদ্ধা! আমাকে ডাকাতদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের আখের গুছাতে গিয়েছিলি!···ভাবতে ভাবতে উত্তেজনায় বিছানা থেকে নেমে আসেন মজুমদার। আলমারী খুলে রাইফেলটা হাতে নেন। তরতর করে কয়েক পা দরজার বাইরে এগিয়ে যান। মানবেন্দ্রনাথের ঘরে তখনো আলো জ্বলছে। রাত্রির হয়তো তৃতীয় প্রহর। জানালাগুলো সব খোলা রয়েছে। রাইফেল উঁচিয়েই আবার কয়েক পা এগিয়ে যান। যেতে যেতে সহসা মনে পড়ে যায়, শয়তান তো বাড়ি নেই এখন। রমণী দারোগা থানায় ডেকে নিয়েছে ওকে। নবীনচন্দ্রের মৃতদেহ নিয়ে নাকি দারোগার ওর সঙ্গে পরামর্শ আছে। কিন্তু সত্যি কি তাই? না ওকে আড়াল করবার জন্যেই এ ব্যবস্থা? কিন্তু সে যা-ই কেন হোক না, খতম ওকে আমি করবোই। লোকে দেখবে, যশোদা মজুমদার এখনো মরেনি। জমিদারী রক্ষা করতে সে জানে।···

ক্রুদ্ধ মেজাজে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, মজুমদার ক্রুদ্ধ মেজাজেই আবার ঘরে ফিরে আসেন। কিন্তু কিছুতেই আর শয্যা নিতে পারেন না। কোলাহল-মুখর গঞ্জ নিস্তব্ধ। সমস্ত ঘর-বাড়ি গাছপালা খাঁ খাঁ করছে। কোনদিকে চোখ মেলে তাকাতে পারেন না। কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে। চারদিক থেকে যেন নবীনচন্দ্রের প্রেতাত্মা ধেয়ে আসছে। ধেয়ে আসছে ওকে শ্বাস রোধ করে মেরে ফেলবার জন্যে। কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ। চীৎকার করার পর্যন্ত শক্তি নেই। দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে ভয়ে কাঁপতে থাকেন মজুমদার

রাত্রির শেষ প্রহর। দুচোখের পাতা এক করতে পারেননি মজুমদার। আত্মভ্রম নয়। নবীনচন্দ্রের স্ত্রীর বুকভাঙা কান্না শেলের মতো বুকে এসে বিঁধছে। ওর সঙ্গে সুর মিশিয়ে উমাসুন্দরীও কাঁদছেন। একমাত্র পুত্রের জন্যে বিলাপ করে করেই কাঁদছেন। ওঁদের সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। কি দিলে কি হলো। কোথায় মাথায় ধান-দুর্বো দিয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ করবেন, আর কোথায় তার মৃতমুখে আগুন জ্বলবে। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!··· উমাসুন্দরীর ব্যথায় মজুমদারের বুকের ভেতরটাও মোচড় দিয়ে ওঠে। যেন ওঁর নিজেরই পুত্রবিয়োগ হয়েছে। মানবেন্দ্রনাথের ওপর অসম্ভব ঘৃণা জন্মে। ব্যক্তিগত স্বার্থটা কি ওর এতই বড়? বুড়িটার মুখের দিকে চেয়েও কি ও নবীনচন্দ্রকে ক্ষমা করতে পারলো না? টাকা আর মাটি কি ও পরকালে সঙ্গে নিয়ে যাবে? কিন্তু মানবেন্দ্রনাথের চেয়ে সর্বশেষ নিজের ওপরেই বেশী করে ঘৃণা জন্মে! খুন যে-ই করে থাক তার জন্যে মূলত: ও নিজে দায়ী। ওর প্রশ্রয় না পেলে কারো সাধ্য ছিল না নবীনচন্দ্রের গায়ে হাত তোলে।··· শুয়ে শুয়ে সারা রাত ছটফট করতে থাকেন মজুমদার।

ছটফট মানবেন্দ্রনাথও করতে থাকেন। থানা থেকে অনেকক্ষণ হয় ফিরেছেন। স্ত্রীপুত্রের পাশে শুয়ে ঘুমোতেও চেষ্টা করছেন। কিন্তু কিছুতেই পারছেন না। মজুমদারের মতো ওর মনেও প্রশ্ন, কে খুন করলো নবীনচন্দ্রকে। শত্রু মিত্র অনেককেই অনেকভাবে ভাবতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই অঙ্ক মেলাতে পারেন না। মজুমদারের কথাও মনে হয়েছে। মনে হয়েছে স্বার্থ আর ইজ্জতের কথা। নবমীর রাত্রের প্রহসনের কথাও বাদ যায় না। কিন্তু সে তো শুধুই প্রহসন। তার জন্যে কখনো মানুষ খুন হতে পারে না। পাড়ায় পাড়ায় কোঁদল দীর্ঘদিনের। অনেক মারপিট গালমন্দ হয়েছে। কিন্তু এমন সর্বনেশে কাণ্ড কখনো ঘটেনি। আজ কি সেই ভুলই করলে কাকাবাবু। কিন্তু তাইবা কি করে সম্ভব? উনিই যদি নবীনচন্দ্রকে খুন করবেন, তাহলে নিজে অতো অসাবধান ছিলেন কেন? আজ তো নিজেও ডুবতে বসেছিলেন। না না, কাকাবাবু কখনো এমন কাজ করতে পারেন না। কিন্তু তাহলে কে খুন করলো নবীনচন্দ্রকে?···সারা রাত ভেবেও কোন কূল পান না মানবেন্দ্রনাথ। গাঁয়ের অনেকেই না। [ক্রমশঃ।

ব্যাধিত

সত্যধন ঘোষাল

সেই যুবক সিগারেটের ছাই ঝাড়লো
আর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভয়ভাবনাগুলিকেও মুছে ফেললো
এবং কি মিষ্টি হাসি তীক্ষ্ণতায় ছড়িয়ে দিল
পারবে না
এই যুবতী কোনদিনও পারে না
তাই শুধু অঝোরে ঝরবেই।

সেই যুবক এই যুবতী সামনে পৃথিবী
আকাশে অনেক তারা
এক চাঁদ ঘিরে
সোজা যে পথ চলে গেছে
শেষ তার নাকি বেঁকে গিয়ে পিচ্ছিল।

নিভে গেল যুবকের ঠোঁটের আগুন
অনুকাঙ্ক্ষাও
কেননা এই যুবতী বুঝি হিম হয়ে গেছে
এই শব নিয়ে যুবক দীর্ঘ রাত্রিতে কতদূর পাড়ি দেবে।

অথচ যেখানে-যা-ছিল সব ঠিকঠাক
কেবল বাতাসের মত যুবতীর স্পর্শ যুবককে
পীড়িত করছে অবিরত।

একটি সমস্যার মতই যুবকের মনে হয় যুবতীর দেহ
ধীরে ধীরে যুবক নিজেকে ভয়ানক
নিরীক্ষণ করে হঠাৎ পাণ্ডুর হয়ে গেল।

এই যুবতী এতক্ষণে যথার্থই মেলে ধরলো
তার চেতন চোখ জোড়া
সেই যুবক ততক্ষণে মাস্তুলের মত মিলিয়ে যায়।

আবার ভোর হয়ে আসবে
আর এই যুবতী হঠাৎ হেসে হেসে আকুল হয়ে কাঁদবে
কেননা সে আজও তার হাসিকান্নায়
ঈপ্সিত যুবককে ঘনিষ্ঠ করতে পারে না
প্রতিটি আশ্লেষই বিশ্লিষ্ট করে দেয়
আর সেই যুবক জনারণ্যে বিস্মৃত হয়।

সেই যুবক এই যুবতী নিত্য আসাযাওয়া
তবুও আশ্চর্য ব্যবধান ঘটে
এই শতকের টানা প'ড়েনে।

ব্রহ্মজ্ঞান ও বিজ্ঞান

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

ব্রহ্মজ্ঞান ও বিজ্ঞানে কোন বিভেদ নাই। ব্রহ্মজ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত। বিজ্ঞান বহুলাংশে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হলেও কিয়দংশে অনুমানসিদ্ধও বটে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, পরমাণু বৈজ্ঞানিকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির বহির্ভূত, তথাপি বৈজ্ঞানিকের অনুমান অনুযায়ী পরমাণুর অস্তিত্ব আছে এবং সেই অনুমান সত্য প্রতিপন্ন হওয়ায় পারমাণবিক বোমা সৃষ্টিও সম্ভব হয়েছে।

আর্য্যঋষি প্রবর্তিত আমাদের ব্রহ্মজ্ঞানও তদ্রূপ বহুলাংশে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ এবং কিয়দংশে অনুভূতি সিদ্ধ। সে অনুভূতি কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং যে কোন ন্যায়শাস্ত্রের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। এখন দেখা যাক, ব্রহ্ম কি এবং ব্রহ্মজ্ঞান কি? ব্রহ্ম কথাটার অর্থই হোল চেতনার বৃহত্ব। নিজকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন মনে করাই এই সাধনার লক্ষ্য। কঠিন, তরল, বায়বীয়, জৈব, অজৈব, স্থূল ও সূক্ষ্ম সকলের সমন্বয়েই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কেউ বাদ নেই, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগৎ ও বিশ্ব এবং দৃষ্টির অন্তরালেও সেই একই সত্তা বিরাজমান। খণ্ডরূপেও তিনি, আবার অখণ্ডরূপেও তিনি। সর্বলোকের চেতনারূপে যেমন তিনি, আবার লোকাতীত চেতনারূপেও তিনি। ব্রহ্ম অখণ্ড চেতনা। এই অখণ্ডরূপ চেতনাতেই জগৎ ও জীবচেতনার সামঞ্জস্য ঘটেছে। নামরূপেও তিনি যেমন অভিব্যক্ত, আবার নামাতীতরূপেও তিনি অব্যক্ত।

ব্রহ্ম একাধারে নির্গুণ ও সগুণ। নামরূপে সগুণ ব্রহ্মই সত্য—ইহা যেরূপ অপূর্ণ, নামরূপের ঊর্দ্ধে একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য—ইহাও তেমনি অপূর্ণ। নির্গুণ ব্রহ্মের দিকে অতিরিক্ত মনোযোগের ফলে জগতের প্রতি আসে উপেক্ষা। উহা সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞান নহে, উহা ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্ম অনুভূতির একটি দিক মাত্র। উহার আরও বিভিন্ন দিক আছে। মস্তক যেমন মানুষের শরীরের একমাত্র অংশ নহে এবং হস্ত, পদ, পেট, পিঠ ও মানুষের দেহের অন্যান্য অংশ, তদ্রূপ নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান চেতনার একমুখী সমাধান। পূর্ণ সমাধান নহে। একমুখী চেতনায় সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে।

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—ইহা যেমন ভুল; তেমনি জগৎ সত্য ব্রহ্ম মিথ্যা—ইহাও তেমনি ভুল। সগুণ এবং নির্গুণ ভাব এক অখণ্ড অনুভূতি বা সত্তার মধ্যেই বিধৃত; উহারা পরস্পর বিরোধী নহে, একে অন্যের পরিপূরক। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিকাশে দেখা যায় এক ব্রহ্ম চেতনাবোধই নানামূর্তি পরিগ্রহ করেছে। পূর্ণব্রহ্মের মধ্যে হয়েছে সর্ববোধের অপূর্ব মিলন; ব্রহ্ম চেতনায় কাহারও প্রতি উপেক্ষা নাই। ব্রহ্মজ্ঞানী বা যোগী তপস্বী 'ভূমা' (দিব্যলোক বা দিব্য অনুভূতি) হতে 'ভূমির' দিকে ফিরে আসতে পারেন। ভূমিকে উপেক্ষা না করে তিনি ভূমার দিকে অগ্রসর হতে পারেন এবং ইহাতে তার পতন না ঘটাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীর পরিচয়।

ব্রহ্মজ্ঞানীর মতে 'তত্বমসি' (তৎ+ত্বম্+অসি) অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের অংশ-স্বরূপ। সেই সূত্র অনুযায়ী উপসংহারে এসেছেন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ কঠিন, তরল, বায়বীয়, জৈব, অজৈব, স্থূল, সূক্ষ্ম, সর্ব প্রাণীতে বস্তুতে এবং সর্বঘটে তিনি (ব্রহ্ম) আছেন। এখন স্বতঃই প্রশ্ন জাগে যে, এই নামরূপী দেহধারী আমি কে, কোথা হতে এসেছি এবং আমার সঙ্গে এই জীবজগতের অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য

সম্বন্ধই বা কোথায়? আমার পরিণামই বা কি? এই প্রশ্নের সমাধান করা যাক।

সৃষ্টির কর্ত্তা কে? এই যে মহাকাশব্যাপী অনন্ত নক্ষত্রলোক, উহারা কি কাহারও নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে স্বীয় পথে নিয়মিত ধাবিত হচ্ছে? তাহা কখনই সম্ভব নয়। নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তা নিশ্চয়ই কেউ আছেন; নতুবা সুনির্দ্দিষ্ট পথে অনন্তকাল ধরে উহারা সুনিয়মিতভাবে চালিত হোত না। পৃথিবী সৃষ্টির আদিতে মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ ও বৃক্ষাদি ছিল না; এমন কি অজৈব পদার্থ, আজিকার মাটি, জল, পাথর, পাহাড়ও ছিল না। ছিল কেবলমাত্র অতি উত্তপ্ত বাষ্পমেঘ। সেই বাষ্পমেঘও কয়েক ফুটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কালক্রমে সেই উত্তপ্ত বাষ্প ঠাণ্ডা হতে হতে শীতলতা প্রাপ্ত হয়। অতি উত্তপ্ত আদি অবস্থায় পৃথিবীতে কেবলমাত্র পরমাণুর ক্রীড়া চলেছিল। তারপর উত্তপ্ত ও নাতিউত্তপ্ত অবস্থায় পৃথিবীর বাতাসে অণুর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। সেই অণুযুগেই কার্বণ, হিলিয়াম, ক্লোরিন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস সৃষ্ট হতে আরম্ভ করে। পরমাণু যুগে পৃথিবীতে কেবলমাত্র হাইড্রোজেনেরই অস্তিত্ব সম্ভব ছিল, অন্যান্য গ্যাসের নহে। যদিও পরমাণযুগে অন্যান্য গ্যাসের পরমাণু সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে তথাপি পূর্ণ কার্বণ, পূর্ণ হিলিয়াম্ ইত্যাদি সৃষ্ট হওয়া সম্ভব হয় নাই।

অণুযুগে উপরোক্ত গ্যাস সমূহের সৃষ্ট হওয়ার পরেই লৌহ, নিকেল, কোবাল্ট, তাম্র, দস্তা এলুমিনিয়াম ইত্যাদি প্রাচীন ধাতু সমূহ ও উত্তাপজনিত যে গলিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল, তাহা পরিহার করে স্বীয় কঠিনরূপ পরিগ্রহে সমর্থ হয়। গলিত অবস্থায় উপরোক্ত ধাতু সমূহ অধিকাংশই এক দেহে একাকার হয়ে পিণ্ডবৎ বিরাজমান ছিল। পৃথিবীর মাটি বলতে উহাই ছিল একমাত্র সম্বল। তখনও পৃথিবীতে জল, লবণ ও বৃক্ষাদির সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং দেখা যায়, হাইড্রোজেনের পরমাণুই সর্বপদার্থের মূলাধার। পরমাণু যুগে ঐ হাইড্রোজেন গ্যাসেই উহারা নিবদ্ধ ছিল। তারপর পৃথিবীতে এলো জল ও লবণ। অক্সিজেন গ্যাস। প্রতিকুল উত্তপ্ত আবহাওয়ায় মুক্ত বায়ুতে বিচরণে অসমর্থ হয়ে নানা প্রকার আদি ধাতুর সংযোগে অর্থাৎ অক্সাইড রূপে এবং প্রাচীন এসিড যেমন, হাইড্রোক্লোরিক ও সালফিউরিক এসিড দ্বয়ের সংযোগে পৃথিবীতে জল ও লবণ সৃষ্টি করে।

জল সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীতে অনুকুল আবহাওয়া প্রবর্তিত হয় এবং জলজ উদ্ভিদ যেমন শৈবাল এবং অনুরূপ বৃক্ষাদির উদ্ভব হয়। তারপর জলজ প্রাণী, যেমন স্পঞ্জ কিংবা জোঁকের জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন দেখা দেয়

স্বষ্টির একটি অদ্ভুত রহস্য এই যে; পৃথিবীর আদিবৃক্ষ, যাহা নিঃসন্দেহে ছিল জলজ, যেমন শেওলা ছিল সম্পূর্ণ সচল, পৃথিবীর আদি 'প্রাণী, যাহা নিঃসন্দেহে ছিল জলের, যেমন স্পঞ্জ ও কোরাল—ছিল অচল। শৈবালের (শেওলা) সচলতার কারণ রূপে বলা চলে যে, আদি অবস্থায় বৃক্ষের পক্ষে প্রয়োজনীয় দশটি উপাদান স্বষ্ট হয় নাই, অক্সিজেন তখন সামান্যই ছিল নাইট্রোজেন মুক্ত অবস্থায় ছিল না। ছিল বিভিন্ন পদার্থের সংযোগ নাইট্রাইড রূপে, এমোনিয়া তখন ও ভবিষ্যতের গর্ভে, তবে হাইড্রোজেন ও কার্বণ প্রচুর ছিল, কারণ হাইড্রো কার্বণ যুগেই বৃক্ষাদির উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল।

বৃক্ষের পক্ষে প্রয়োজনীয় লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম ক্যালসিয়াম্, সোডিয়াম্, পটাসিয়াম্ ফস্ফরাস ও সালফার তখন ছিল, সুতরাং স্বস্থানে প্রচুর খাদ্য দ্রব্যাদি আহরণ করা শৈবালের পক্ষে অসম্ভব ছিল এবং পৃথিবীর সেই আদি হাইড্রো কার্বণ যুগের কতিপয় জলাশয়ে বাতাসে আন্দোলিত হয়ে শৈবাল আহার সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিল। শৈবাল আজও তার সেই পুরাতন আদিকালের অভ্যাস পরিবর্তনে সমর্থ নহে। সেই হাইড্রো-কার্বণ যুগে পাহাড় পর্বতাদির স্বষ্টি হয় নাই, কেবলমাত্র এসিড ও অক্সাইড সংযোগে কতিপয় আবদ্ধ জলাশয় স্বষ্ট হয়ে ছিল। স্থলেও তখন কেবলমাত্র পাইন, ফার্ণ ও মস্ ব্যতীত হাইড্রো-কার্বণ যুগের কতিপয় শ্রেণীর বৃক্ষাদি যেমন ইক্ষু, নারিকেল, খেজুর ও তাল ইত্যাদির উদ্ভব সম্ভব ছিল। উহারা নগ্নবীজ বা একদলীয় বীজ জাতীয় বৃক্ষ। উহাদের দেহে ও ফলে প্রচুর হাইড্রো-কার্বণ, ফ্যাট ও প্রোটিন থাকে। উহাদের সকলেরই গুচ্ছমূল, কারণ মূল উৎপাদনের জন্য প্রচুর নাইট্রোজেন এবং এমোনিয়াঘটিত পদার্থ তখনও স্বষ্ট হয় নাই।

প্রাণীদের মধ্যে কেবলমাত্র কতিপয় মেরুদণ্ডহীন জলজ ও স্থলচর প্রাণীর স্বষ্টি হয়েছে। বর্তমান ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহদ্বয়ের ন্যায় পৃথিবীর অবস্থা ছিল। পাহাড়-পর্বতাদি স্বষ্ট হওয়ার পর নানা প্রকার অনুকূল গ্যাসীয় পর্বের সাহায্যে। যেমন, এমোনিয়া, কার্বণ-ডাইঅক্সাইড ইত্যাদির সাহায্যে পৃথিবীতে সাগর, মহাসাগরের স্বষ্টি সম্ভব হয়েছিল। কার্বণ-ডাইঅক্সাইড যুগের সমাপ্তিপর্বে যখন বৃক্ষ প্রচুর উক্ত গ্যাস স্বীয় দেহে ধারণ করেছিল এবং পরে সূর্যতাপে বৃক্ষ সেই কার্বণ স্বীয় বক্ষে ধারণ করে অক্সিজেনকে বাতাসে মুক্ত করে, কেবলমাত্র সেই সময় হতে প্রচুর স্থলপ্রাণীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল।

এমোনিয়া গ্যাসপর্বের সমাপ্তিতে ওজন গ্যাস ও অক্সি-নাইট্রোজেন গ্যাস পর্বদ্বয়ে মৎস্য, কচ্ছপ ও কুমীর ইত্যাদি জলচর প্রাণীর আবির্ভাবও সম্ভব হয়েছিল। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ বহু যুগব্যাপী পৃথিবী অধিকার করেছিল। এখন প্রশ্ন জাগে, আমি মনুষ্যরূপধারী প্রাণীটি তখন কোথায় ছিলাম? এই প্রশ্নের উত্তর সুকঠিন। অধিকাংশ মনুষ্যই হয়তো পরব্রহ্মে লীন ছিলাম। তারপর এই আমি, নাম ও রূপধারী মানুষটি কখনও কীটপতঙ্গরূপে, কখন পক্ষীরূপ, কখন পশুরূপে বহু যুগ অতিক্রম করেছি। অবশেষে সেই পশুরূপী আমি কিয়ৎ পুণ্য কার্যের ফলস্বরূপ মনুষ্য জন্মলাভে সমর্থ হয়েছিলাম। মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করলেও প্রকৃতির কোলে সম্পূর্ণ বন্য ছিলাম। আমার এই কীটপতঙ্গের জন্ম হতে পশুরূপ জন্মের এবং অবশেষে মনুষ্যজন্মের উন্নতির মূলে ছিল নিরপেক্ষ, নির্বিকার নির্লিপ্ত সাক্ষীস্বরূপ পরমাত্মা

কীটপতঙ্গ হতে সুরু করে মনুষ্য জাতির প্রতিটি অন্তরের অন্তস্তলে তিনি বিরাজমান—নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপে। তিনি শুধু জীবের প্রতিটি কার্যেরই সাক্ষ্য নহেন, প্রতিটি চিন্তা—সৎ হউক অসৎ হউক, প্রতিটি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির তিনিই একমাত্র সাক্ষী। এখানে ফাঁকির কোন প্রশ্নই উঠে না। কোন মানুষই একবার মাত্র মনুষ্য জন্মলাভ করে বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাবিশারদ, সাহিত্য বিশারদ, সঙ্গীত বিশারদ কিংবা যোগী, তপস্বী, মহাজ্ঞানী হতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায়, কোন কোন ছেলে বাল্যকালেই অতিশয় মেধাবী হয় কিংবা বাল্যকালেই সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করে। উহা আর কিছুই নহে, পূর্বজন্মে ঐসব বিষয়ের সাধনালব্ধ ফল। যেসব মহাপুরুষ নির্বাণ বা মোক্ষলাভ করেছেন বলে অনুমান করা চলে; রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী ইত্যাদি—ইহারা কেহই একবার মাত্র মনুষ্য জন্মলাভ করে এমন এক উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছিলেন যে, নির্বাণ তাদের প্রায় করতলগত ছিল; শুধু সামান্য ধ্যান-তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভই বাকী ছিল। সেই কুমারের (মহাশিল্পীর) শুধু মাটির প্রতিমার উপর রং লাগানই বাকী ছিল। এই পৃথিবীর মাটিতে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মাটির প্রতিমা তৈরী ছিল।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক; একটি সাইকেল, কিংবা একটি মোটর গাড়ী কিংবা একটি রেলগাড়ী হাওড়া ষ্টেশন হতে দিল্লী পৌঁছতে চায়—তার গন্তব্যস্থল দিল্লী। সেটা যেমন একবার চাকা ঘোরালেই এক মুহূর্তে দিল্লী পৌঁছায় না; ঠিক তদ্রূপ একবার মনুষ্য জন্মলাভে সমর্থ হলেই নির্বাণ বা মুক্তিলাভ সম্ভব নহে। আবার ধরুন, একটি রেলগাড়ী হাওড়া হতে দিল্লীর পথেই কাশী কিংবা পাটনা পৌঁছে গেছে, সে ক্ষেত্রে দিল্লীগামী পরবর্তী ট্রেণখানা প্রথম ট্রেণখানিকে কখনই ধরতে সমর্থ হবে না। দিল্লী পৌঁছবার পূর্বে সেই সাইকেল, মোটরগাড়ী কিংবা রেলগাড়ীর চাকাকে যেমন অন্ততঃ লক্ষবার ঘোরাতে হবে, নির্বাণ বা মুক্তিলাভও ঠিক সেইরূপে সম্ভব। পূর্বজন্মের কোন বিশেষ বিষয়ের সাধনা পরজন্মে সেই বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা এনে দেয়। পূর্বজন্মের সংস্কার ও পরবর্তী জন্মে মানুষকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, একজন মানুষ নানা প্রকার অবস্থা বিপর্যয় অতিক্রম করে অর্থ কিংবা বিদ্যার জন্য সারা জীবন ক্ষোভ নিয়ে ৮০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করলো। তখন তার পুনর্জন্ম হবে। মানুষের জীবাত্মা যে দেহে ৮০ বৎসর পর্যন্ত বাস করলো তার একটা সূক্ষ্ম সংস্কার সে মৃত্যুর পরও সূক্ষ্মদেহে নিয়ে চলে যায়। যেমন একটা ঔষধের শিশিতে টিংচার আয়ওডিন কিংবা অনুরূপ কোন ঔষধ দীর্ঘদিন রাখলে জল দিয়ে ধুয়ে ফেললেও ঔষধের গন্ধ শিশিতে থেকেই যায়, আমাদের জীবাত্মার ঠিক সেই অবস্থা। দেহরূপী আধারের স্পর্শদোষে সে দুষ্ট হয়। বাতাসের কি কোন গন্ধ আছে? বাতাসের নিজের কোন গন্ধ নেই। বাতাস যখন গোলাপ, হাসনুহানা, কামিনী ইত্যাদি ফুলের সংস্পর্শে আসে সে তখন সুগন্ধ বহন করে; আবার যখন পচা দুর্গন্ধযুক্ত জিনিষের সংস্পর্শে আসে সে তখন দুর্গন্ধই বহন করে,—উভয় ক্ষেত্রেই বাতাস স্পর্শ দোষে দুষ্ট। তজ্জন্যই বাতাসকে বলা হয় গন্ধবহ।

এখানে কতগুলি তথ্যও সত্যের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। মানুষ সুখ চায়, দুঃখ চায় না, মানুষ আবিরত বিষয় হতে

বিষয়ান্তরে ছুটে চলেছে প্রকৃত সুখের সন্ধানে। বাহ্য বিষয়বস্তুতে প্রকৃত নিত্যসুখ নেই অবশ্য অনিত্য ক্ষণস্থায়ী সুখ আছে। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের রাজা মন। মনই ইন্দ্রিয়সমূহকে তার খেয়াল খুসিমত পরিচালনা করে। অতএব সকল ইন্দ্রিয় হতে মন শ্রেষ্ঠ। মন হতে বুদ্ধি বা বিবেক শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি, বিবেক, হতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ। জীবাত্মা হতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। জীবাত্মা যদি কোন সাধনায় পরমাত্মার স্বচ্ছ দর্শন লাভ করে কিংবা প্রায় একাত্ম হয়ে পড়ে, তখন দর্শনের আর কিছুই বাকী থাকে না। সেই অবস্থাই নির্ব্বাণ ও মোক্ষলাভ।

মন কোন অন্যায় কার্য করতে উদ্যত হলে বুদ্ধি বা বিবেক তাকে আঘাত করে। এই দ্বন্দ্বস্থলে মনের শক্তি যদি প্রবল হয়, তাহলে বুদ্ধিকে পরাজিত করে মানুষ অন্যায় কার্য করে। আবার এই দ্বন্দ্বে যদি বুদ্ধি বা বিবেক জয়লাভ করে, তাহলে মানুষ অন্যায় কার্যে নিবৃত্ত হয়। মানুষের অন্তরে অবিরতই এই যুদ্ধ চলেছে এবং এই ভাবে সে ন্যায়-অন্যায়ের সমাধান করে। পরমাত্মা কিন্তু নির্বিকার, নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ সাক্ষীস্বরূপ। নিদ্রিত ও জাগ্রত অবস্থায় সে একমাত্র সজাগ সাক্ষী। পাপকার্য না করলেও পাপ চিন্তার সে সাক্ষী; পুণ্যকার্যে অক্ষম হলেও পুণ্য চিন্তার সেই একমাত্র সাক্ষী।

সারা জীবন কেহ কার্যে অক্ষম হলেও তার সারা জীবনের পুণ্য, পাপ, সৎ ও অসৎ চিন্তার স একমাত্র সাক্ষী। অনুকূল পরিবেশের অভাবে কিংবা শিক্ষা-দীক্ষাজনিত সংস্কার সত্বেও মানুষ জঘন্য পাপচিন্তা করতে পারে কিন্তু সেই পাপকার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার মত দুঃসাহস না-ও থাকতে পারে, সে ক্ষেত্রে পরমাত্মাই সাক্ষী। আবার মানবের অশেষ মঙ্গলের জন্য কেহ মঙ্গলচিন্তাও করতে পারে, কিন্তু অর্থ ও সামর্থ্যের অভাবে হয়তো তাহা কার্যে পরিণত করতে অক্ষম, সে ক্ষেত্রেও পরমাত্মাই সাক্ষী। সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, জীবাত্মাই ভোগ করে। পরমাত্মা, সুখ-দুঃখ, শান্তি ও অশান্তি ভোগের কিছুমাত্র অধীন নহে; শুধু চৈতন্যময় পরমাত্মারূপে দেহে অবস্থান করে। ইনিই একমাত্র ব্রহ্মের অংশ স্বরূপ। তিনি সর্বজীবে আছেন। অতএব তিনি খণ্ডিতরূপে আছেন। এই দেবত্ব (পরমাত্মা) কীট পতঙ্গেও আছে বলেই সর্ব ধর্মে 'অহিংসা পরমধর্ম' বাণীর সৃষ্টি হয়েছে। শুধু প্রভেদ এই যে, কীট পতঙ্গে এই দেবত্ব বহুলাংশে অস্বচ্ছ কিন্তু মানুষে উহা বহুলাংশে স্বচ্ছ; মানুষই ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব। ক্রমবিকাশের ধারায়ও মানুষের আবির্ভাব দেখা যায় সর্বশেষে। অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেই (হয় তো অজ্ঞাত ভাবে) সর্বধর্মে এই 'অহিংসা পরম ধর্মের' সৃষ্টি হয়েছে। একটি স্বচ্ছ কাচের উপর আপনার প্রতিবিম্ব স্পষ্ট ও পরিষ্কার দেখা যায় কিন্তু একটি অতি অস্বচ্ছ কাচের উপর আপনার প্রতিবিম্ব ততো স্পষ্ট পরিষ্কার দেখা যায় না। সেইরূপ মানুষের দেবত্ব বা পরমাত্মার অস্তিত্ব যেরূপ বহুলাংশে দৃষ্ট হয়; ইতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। দেহাবসানে কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই দেহ পরিত্যাগ করে কিন্তু এখানেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমাপ্তি পর্ব নহে।

বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী শক্তির যেরূপ ধ্বংস নেই (Energy is indestructible) জীবাত্মা ও পরমাত্মা-রূপী দুই সূক্ষ্ম শক্তিধরেরও বিনাশ নেই; শুধু অবস্থান্তরে রূপান্তর বা রং বদলানো আছে। ইহা ঠিক সূর্য কিরণ কিংবা উত্তাপ দ্বারা জলের বাষ্পাকারে পরিবর্তনের ন্যায়। উহাদের অস্তিত্ব যদি অস্বীকার করতে হয়, তা হলে নিদ্রাকেই মৃত্যু বলে অভিহিত করতে হয়। কর্মবাসনা দ্বারা (সে জ্ঞানই হউক, অর্থই হউক, মোহই হউক) জীব পুনরায় নবদেহে নবরূপে আবির্ভূত হবে—অতীত জন্মের কৃতকর্মের ফলভোগের জন্য নিদ্রা কি? সুষুপ্তিকালে বাহ্য ইন্দ্রিয় সমূহ নিষ্ক্রিয় থাকে কিন্তু তখন অন্তরিন্দ্রিয় সমূহ সক্রিয় থাকে, সুতরাং দেহী তখন অলীক স্বপ্নকেই সত্যরূপে দেখে। বাহ্য ইন্দ্রিয় সমূহকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত, সংহত ও সংযত করে ধ্যানী, যোগী ও তপস্বী সুস্থ সমাহিত চিত্তে বহু দূরে অর্থাৎ অন্তলোকের তথ্য ও সত্য সংগ্রহে সমর্থ হয়। তখন বহু লক্ষ মাইল দূরের শব্দ ও কথা তাঁর শ্রুতিগোচর ও দৃষ্টির অন্তর্ভুক্তি হয়। শারীর-বিদ্যা অনুযায়ী (Science of Physiology) সম্মোহন অবস্থায় মানুষের স্নায়ুমণ্ডলী ও স্থূল ইন্দ্রিয় সমূহ নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন মানুষ বাইরের কোন শব্দ শুনিতে অক্ষম ও কিছু দেখিতেও অক্ষম। কিন্তু সম্মোহন অবস্থায় (Hypnotism) দেখা গেছে যে একটি লোক দুই শত বা চারি শত ক্রোশ দূরের জিনিষ দেখিতে পায় ও শুনিতে পায়। এটা কি করে সম্ভব? এটা সম্ভব হতে পারে, কারণ মনের রাজ্য বিভিন্ন।

বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহকে পরাভূত করে কঠোর সংযমের দ্বারা ধ্যানী বা যোগীর পক্ষে সর্বজ্ঞান ও সর্বদর্শন সম্ভব। যে শক্তি দ্বারা অন্যকে প্রভাবিত করে স্বীয় শক্তি অন্যের উপর প্রয়োগেও কিয়দংশে সে সমর্থ। ধ্যানী বা যোগী সর্বাপেক্ষা নিশ্চল ও স্থির হলে ও তাঁর ধ্যান ও তপস্যা তখন হয় সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল (Dynamic)। চুম্বকের ন্যায় সে তখন পৃথিবী ও পৃথিবীর বহু ঊর্ধ্বে বহু সূক্ষ্ম ও স্থূল বস্তুকে আকর্ষণ করে এবং তাদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। আমি মানুষ, ভূলোকে রয়েছি, আর দেবগণ স্বর্গলোকে রয়েছেন। আমি এখান হতে "স্বাহা" এই মন্ত্রে যজ্ঞে হবিঃ প্রদান করছি, আর স্বর্গের দেবতা তা পাচ্ছেন; এটা কি করে সম্ভব? এখানে প্রশ্ন ওঠে যোগাযোগের। রাশিয়ার মহাকাশচারী গাগারিন কিংবা টিটভ মহাকাশে আরূঢ় অবস্থায় যদি বেতার মারফৎ সংবাদ পাঠান 'আমি সুস্থ ও সবল আছি' তাহলে সে বেতারের শব্দ একমাত্র উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বেতার মারফৎই ধরা পড়ে;

আমরা সাধারণ লোক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকি; তদ্রূপ 'স্বাহা' মন্ত্র দ্বারা হবিঃ প্রদানে স্বর্গের দেবতাগণ গ্রহণ করেন, সেই দৃষ্টি লাভের জন্য কঠোর সাধনা ও তপস্যার প্রয়োজন। সেই আত্মদর্শন বা বিশ্বদর্শন বা দেবদর্শনের জন্য আমাদের মানস যন্ত্রটিকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সেই দান গ্রহণ করে দেবগণ তুষ্ট ও পুষ্ট হন বলে পৃথিবীর কল্যাণ হয়; যেমন প্রয়োজনের সময় বৃষ্টি হয়, প্রয়োজনের সময় জল বর্দ্ধিত হয়ে পৃথিবী উপযুক্ত রূপে শস্যশ্যামলা হয়। ইন্দ্র, বরুণ, বৈশ্বানর, পবন, রুদ্র, প্রভৃতি সেই সৃষ্টিকর্তার (ব্রহ্মের) এক একটি শক্তি। এইরূপে হিন্দুধর্মের বহু শক্তির কল্পনা করা হয়েছে। ব্রহ্মা সৃষ্টির কর্তা, বিষ্ণু সৃষ্টির রক্ষাকর্তা ও ত্রাণকর্তা, মহেশ্বর ধ্বংসের কর্তা ইত্যাদি। একজনমাত্র প্রধান মন্ত্রী কিংবা প্রেসিডেণ্ট দ্বারা যেরূপ ভারত শাসন সম্ভব নহে এবং নানা বিভাগের বিভিন্ন মন্ত্রী উপমন্ত্রী, সচিব, উপসচিব ও সহস্র সহস্র কর্মচারীর দ্বারা যেরূপ ভারত শাসিত হচ্ছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও অনুরূপভাবে বিভিন্ন শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সুনিয়মিত ও সুশৃঙ্খলভাবে যুগ হতে যুগান্তরে মহাকালের পথে

সৃষ্টির একটি অদ্ভুত রহস্য এই যে; পৃথিবীর আদিবৃক্ষ, যাহা নিঃসন্দেহে ছিল জলজ, যেমন শেওলা ছিল সম্পূর্ণ সচল, পৃথিবীর আদি 'প্রাণী, যাহা নিঃসন্দেহে ছিল জলের, যেমন স্পঞ্জ ও কোরাল—ছিল অচল। শৈবালের (শেওলা) সচলতার কারণ রূপে বলা চলে যে, আদি অবস্থায় বৃক্ষের পক্ষে প্রয়োজনীয় দশটি উপাদান সৃষ্ট হয় নাই, অক্সিজেন তখন সামান্যই ছিল নাইট্রোজেন মুক্ত অবস্থায় ছিল না। ছিল বিভিন্ন পদার্থের সংযোগ নাইট্রাইড রূপে, এমোনিয়া তখন ও ভবিষ্যতের গর্ভে, তবে হাইড্রোজেন ও কার্বণ প্রচুর ছিল, কারণ হাইড্রো কার্বণ যুগেই বৃক্ষাদির উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল।

বৃক্ষের পক্ষে প্রয়োজনীয় লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ফস্‌ফরাস ও সালফার তখন ছিল, সুতরাং স্বস্থানে প্রচুর খাদ্য দ্রব্যাদি আহরণ করা শৈবালের পক্ষে অসম্ভব ছিল এবং পৃথিবীর সেই আদি হাইড্রো কার্বণ যুগের কতিপয় জলাশয়ে বাতাসে আন্দোলিত হয়ে শৈবাল আহার সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিল। শৈবাল আজও তার সেই পুরাতন আদিকালের অভ্যাস পরিবর্তনে সমর্থ নহে। সেই হাইড্রো-কার্বণ যুগে পাহাড় পর্বতাদির সৃষ্টি হয় নাই, কেবলমাত্র এসিড ও অক্সাইড সংযোগে কতিপয় আবদ্ধ জলাশয় সৃষ্ট হয়ে ছিল। স্থলেও তখন কেবলমাত্র পাইন, ফার্ণ ও মস্ ব্যতীত হাইড্রো-কার্বণ যুগের কতিপয় শ্রেণীর বৃক্ষাদি যেমন ইক্ষু, নারিকেল, খেজুর ও তাল ইত্যাদির উদ্ভব সম্ভব ছিল। উহারা নগ্নবীজ বা একদলীয় বীজ জাতীয় বৃক্ষ। উহাদের দেহে ও ফলে প্রচুর হাইড্রো-কার্বণ, ফ্যাট ও প্রোটিন থাকে। উহাদের সকলেরই গুচ্ছমূল, কারণ মূল উৎপাদনের জন্য প্রচুর নাইট্রোজেন এবং এমোনিয়াঘটিত পদার্থ তখনও সৃষ্ট হয় নাই।

প্রাণীদের মধ্যে কেবলমাত্র কতিপয় মেরুদণ্ডহীন জলজ ও স্থলচর প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহদ্বয়ের ন্যায় পৃথিবীর অবস্থা ছিল। পাহাড়-পর্বতাদি সৃষ্ট হওয়ার পর নানা প্রকার অনুকূল গ্যাসীয় পর্বের সাহায্যে। যেমন, এমোনিয়া, কার্বণ-ডাইঅক্সাইড ইত্যাদির সাহায্যে পৃথিবীতে সাগর, মহাসাগরের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। কার্বণ-ডাইঅক্সাইড যুগের সমাপ্তিপর্বে যখন বৃক্ষ প্রচুর উক্ত গ্যাস স্বীয় দেহে ধারণ করেছিল এবং পরে সূর্যতাপে বৃক্ষ সেই কার্বণ স্বীয় বক্ষে ধারণ করে অক্সিজেনকে বাতাসে মুক্ত করে, কেবলমাত্র সেই সময় হতে প্রচুর স্থলপ্রাণীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল।

এমোনিয়া গ্যাসপর্বের সমাপ্তিতে ওজন গ্যাস ও অক্সি-নাইট্রোজেন গ্যাস পর্যায়ে মৎস্য, কচ্ছপ ও কুমীর ইত্যাদি জলচর প্রাণীর আবির্ভাবও সম্ভব হয়েছিল। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ বহু যুগব্যাপী পৃথিবী অধিকার করেছিল। এখন প্রশ্ন জাগে, আমি মনুষ্যরূপধারী প্রাণীটি তখন কোথায় ছিলাম? এই প্রশ্নের উত্তর সুকঠিন। অধিকাংশ মনুষ্যই হয়তো পরব্রহ্মে লীন ছিলাম। তারপর এই আমি, নাম ও রূপধারী মানুষটি কখনও কীটপতঙ্গরূপে, কখন পক্ষীরূপ, কখন পশুরূপে বহু যুগ অতিক্রম করেছি। অবশেষে সেই পশুরূপী আমি কিয়ৎ পুণ্য কার্যের ফলস্বরূপ মনুষ্য জন্মলাভে সমর্থ হয়েছিলাম। মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করলেও প্রকৃতির কোলে সম্পূর্ণ বন্য ছিলাম। আমার এই কীটপতঙ্গের জন্ম হতে পশুরূপ জন্মের এবং অবশেষে মনুষ্যজন্মের উন্নতির মূলে ছিল নিরপেক্ষ, নির্বিকার নির্লিপ্ত সাক্ষীস্বরূপ পরমাত্মা কীটপতঙ্গ হতে শুরু করে মনুষ্য জাতির প্রতিটি অন্তরের অন্তস্তলে তিনি বিরাজমান—নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপে। তিনি শুধু জীবের প্রতিটি কার্যেরই সাক্ষ্য নহেন, প্রতিটি চিন্তা—সৎ হউক অসৎ হউক, প্রতিটি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির তিনিই একমাত্র সাক্ষী। এখানে ফাঁকির কোন প্রশ্নই উঠে না। কোন মানুষই একবার মাত্র মনুষ্য জন্মলাভ করে বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাবিশারদ, সাহিত্য বিশারদ, সঙ্গীত বিশারদ কিংবা যোগী, তপস্বী, মহাজ্ঞানী হতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায়, কোন কোন ছেলে বাল্যকালেই অত্যাশ্চর্য মেধাবী হয় কিংবা বাল্যকালেই সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করে। উহা আর কিছুই নহে, পূর্বজন্মে ঐসব বিষয়ের সাধনালব্ধ ফল। যেসব মহাপুরুষ নির্বাণ বা মোক্ষলাভ করেছেন বলে অনুমান করা চলে; রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী ইত্যাদি—ইহারা কেহই একবার মাত্র মনুষ্য জন্মলাভ করে এমন এক উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছিলেন যে, নির্বাণ তাদের প্রায় করতলগত ছিল; শুধু সামান্য ধ্যান-তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভই বাকী ছিল। সেই কুমারের (মহাশিল্পীর) শুধু মাটির প্রতিমার উপর রং লাগানই বাকী ছিল। এই পৃথিবীর মাটিতে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মাটির প্রতিমা তৈরী ছিল।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক; একটি সাইকেল, কিংবা একটি মোটর গাড়ী কিংবা একটি রেলগাড়ী হাওড়া ষ্টেশন হতে দিল্লী পৌঁছুতে চায়—তার গন্তব্যস্থল দিল্লী। সেটা যেমন একবার চাকা ঘোরালেই এক মুহূর্তে দিল্লী পৌঁছায় না; ঠিক তদ্রূপ একবার মনুষ্য জন্মলাভে সমর্থ হলেই নির্বাণ বা মুক্তিলাভ সম্ভব নহে। আবার ধরুন, একটি রেলগাড়ী হাওড়া হতে দিল্লীর পথেই কাশী কিংবা পাটনা পৌঁছে গেছে, সে ক্ষেত্রে দিল্লীগামী পরবর্তী ট্রেণখানা প্রথম ট্রেণখানিকে কখনই ধরতে সমর্থ হবে না। দিল্লী পৌঁছবার পূর্বে সেই সাইকেল, মোটরগাড়ী কিংবা রেলগাড়ীর চাকাকে যেমন অন্ততঃ লক্ষবার ঘোরাতে হবে, নির্বাণ বা মুক্তিলাভও ঠিক সেইরূপে সম্ভব। পূর্বজন্মের কোন বিশেষ বিষয়ের সাধনা পরজন্মে সেই বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা এনে দেয়। পূর্বজন্মের সংস্কার ও পরবর্তী জন্মে মানুষকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, একজন মানুষ নানা প্রকার অবস্থা বিপর্যয় অতিক্রম করে অর্থ কিংবা বিদ্যার জন্য সারা জীবন কাটিয়ে নিয়ে ৮০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করলো। তখন তার পুনর্জন্ম হবে। মানুষের জীবাত্মা যে দেহে ৮০ বৎসর পর্যন্ত বাস করলো তার একটা সূক্ষ্ম সংস্কার সে মৃত্যুর পরও সূক্ষ্মদেহে নিয়ে চলে যায়। যেমন একটা ঔষধের শিশিতে টিংচার আয়ওডিন কিংবা অনুরূপ কোন ঔষধ দীর্ঘদিন রাখলে জল দিয়ে ধুয়ে ফেললেও ঔষধের গন্ধ শিশিতে থেকেই যায়, আমাদের জীবাত্মার ঠিক সেই অবস্থা। দেহরূপী আধারের স্পর্শদোষে সে দুষ্ট হয়। বাতাসের কি কোন গন্ধ আছে? বাতাসের নিজের কোন গন্ধ নেই। বাতাস যখন গোলাপ, হাসনুহানা, কামিনী ইত্যাদি ফুলের সংস্পর্শে আসে সে তখন সুগন্ধ বহন করে; আবার যখন পচা দুর্গন্ধযুক্ত জিনিষের সংস্পর্শে আসে সে তখন দুর্গন্ধই বহন করে,—উভয় ক্ষেত্রেই বাতাস স্পর্শ দোষে দুষ্ট। তজ্জন্যই বাতাসকে বলা হয় গন্ধবহ।

এখানে কতগুলি তথ্যও সত্যের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। মানুষ সুখ চায়, দুঃখ চায় না, মানুষ অবিরত বিষয় হতে

বিষয়ান্তরে ছুটে চলেছে প্রকৃত সুখের সন্ধানে। বাহ্য বিষয়বস্তুতে প্রকৃত নিত্যসুখ নেই অবশ্য অনিত্য ক্ষণস্থায়ী সুখ আছে। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের রাজা মন। মনই ইন্দ্রিয়সমূহকে তার খেয়াল খুসিমত পরিচালনা করে। অতএব সকল ইন্দ্রিয় হতে মন শ্রেষ্ঠ। মন হতে বুদ্ধি বা বিবেক শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি, বিবেক, হতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ। জীবাত্মা হতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। জীবাত্মা যদি কোন সাধনায় পরমাত্মার স্বচ্ছ দর্শন লাভ করে কিংবা প্রায় একাত্ম হয়ে পড়ে, তখন দর্শনের আর কিছুই বাকী থাকে না। সেই অবস্থাই নির্ব্বাণ ও মোক্ষলাভ।

মন কোন অন্যায় কার্য করতে উদ্যত হলে বুদ্ধি বা বিবেক তাকে আঘাত করে। এই দ্বন্দ্বস্থলে মনের শক্তি যদি প্রবল হয়, তাহলে বুদ্ধিকে পরাজিত করে মানুষ অন্যায় কার্য করে। আবার এই দ্বন্দ্ব যদি বুদ্ধি বা বিবেক জয়লাভ করে, তাহলে মানুষ অন্যায় কার্যে নিবৃত্ত হয়। মানুষের অন্তরে অবিরতই এই যুদ্ধ চলেছে এবং এই ভাবে সে ন্যায়-অন্যায়ের সমাধান করে। পরমাত্মা কিন্তু নির্বিকার, নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ সাক্ষীস্বরূপ। নিদ্রিত ও জাগ্রত অবস্থায় সে একমাত্র সজাগ সাক্ষী। পাপকার্য না করলেও পাপ চিন্তার সে সাক্ষী; পুণ্যকার্যে অক্ষম হলেও পুণ্য চিন্তার সেই একমাত্র সাক্ষী।

সারা জীবন কেহ কার্যে অক্ষম হলেও তার সারা জীবনের পুণ্য, পাপ, সৎ ও অসৎ চিন্তার স একমাত্র সাক্ষী। অনুকূল পরিবেশের অভাবে কিংবা শিক্ষা-দীক্ষাজনিত সংস্কার সত্ত্বেও মানুষ জঘন্য পাপচিন্তা করতে পারে কিন্তু সেই পাপকার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার মত দুঃসাহস না-ও থাকতে পারে, সে ক্ষেত্রে পরমাত্মাই সাক্ষী। আবার মানবের অশেষ মঙ্গলের জন্য কেহ মঙ্গলচিন্তাও করতে পারে, কিন্তু অর্থ ও সামর্থ্যের অভাবে হয়তো তাহা কার্যে পরিণত করতে অক্ষম, সে ক্ষেত্রেও পরমাত্মাই সাক্ষী। সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, জীবাত্মাই ভোগ করে। পরমাত্মা, সুখ-দুঃখ, শান্তি ও অশান্তি ভোগের কিছুমাত্র অধীন নহে; শুধু চৈতন্যময় পরমাত্মারূপে দেহে অবস্থান করে। ইনিই একমাত্র ব্রহ্মের অংশ স্বরূপ। তিনি সর্বজীবে আছেন। অতএব তিনি খণ্ডিতরূপে আছেন। এই দেবত্ব (পরমাত্মা) কীট পতঙ্গেও আছে বলেই সর্ব ধর্ম্মে 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' বাণীর সৃষ্টি হয়েছে। শুধু প্রভেদ এই যে, কীট পতঙ্গে এই দেবত্ব বহুলাংশে অস্বচ্ছ কিন্তু মানুষে উহা বহুলাংশে স্বচ্ছ; মানুষই ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব। ক্রমবিকাশের ধারায়ও মানুষের আবির্ভাব দেখা যায় সর্বশেষে। অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেই (হয় তো অজ্ঞাত ভাবে) সর্বধর্ম্মে এই 'অহিংসা পরম ধর্ম্মের' সৃষ্টি হয়েছে। একটি স্বচ্ছ কাচের উপর আপনার প্রতিবিম্ব স্পষ্ট ও পরিষ্কার দেখা যায় কিন্তু একটি অতি অস্বচ্ছ কাচের উপর আপনার প্রতিবিম্ব ততো স্পষ্ট পরিষ্কার দেখা যায় না। সেইরূপ মানুষের দেবত্ব বা পরমাত্মার অস্তিত্ব যেরূপ বহুলাংশে দৃষ্ট হয়; ইতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। দেহাবসানে কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই দেহ পরিত্যাগ করে কিন্তু এখানেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমাপ্তি পর্ব নহে।

বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী শক্তির যেরূপ ধ্বংস নেই (Energy is indestructible) জীবাত্মা ও পরমাত্মা-রূপী দুই সূক্ষ্ম শক্তিধরেরও বিনাশ নেই; শুধু অবস্থান্তরে রূপান্তর বা রং বদলানো আছে। ইহা ঠিক সূর্য কিরণ কিংবা উত্তাপ দ্বারা জলের বাষ্পরূপের পরিবর্তনের ন্যায়। উহাদের অস্তিত্ব যদি অস্বীকার করতে হয়, তা হলে নিদ্রাকেই মৃত্যু বলে অভিহিত করতে হয়। কর্ম্মবাসনা দ্বারা (সে জ্ঞানই হউক, অর্থই হউক, মোহই হউক) জীব পুনরায় নবদেহে নবরূপে আবির্ভূত হবে—অতীত জন্মের কৃতকর্ম্মের ফলভোগের জন্য নিদ্রা কি? সুষুপ্তিকালে বাহ্য ইন্দ্রিয় সমূহ নিষ্ক্রিয় থাকে কিন্তু তখন অন্তরিন্দ্রিয় সমূহ সক্রিয় থাকে, সুতরাং দেহী তখন অলীক স্বপ্নকেই সত্যরূপে দেখে। বাহ্য ইন্দ্রিয় সমূহকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত, সংহত ও সংযত করে ধ্যানী, যোগী ও তপস্বী সুস্থ সমাহিত চিত্তে বহু দূরে অর্থাৎ অন্যলোকের তথ্য ও সত্য সংগ্রহে সমর্থ হয়। তখন বহু লক্ষ মাইল দূরের শব্দ ও কর্ম্ম তাঁর শ্রুতিগোচর ও দৃষ্টির অন্তর্ভুক্তি হয়। শারীর-বিদ্যা অনুযায়ী (Science of Physiology) সম্মোহন অবস্থায় মানুষের স্নায়ুমণ্ডলী ও স্থূল ইন্দ্রিয় সমূহ নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন মানুষ বাইরের কোন শব্দ শুনিতে অক্ষম ও কিছু দেখিতেও অক্ষম। কিন্তু সম্মোহন অবস্থায় (Hypnotism) দেখা গেছে যে একটি লোক দুই শত বা চারি শত ক্রোশ দূরের জিনিষ দেখিতে পায় ও শুনিতে পায়। এটা কি করে সম্ভব? এটা সম্ভব হতে পারে, কারণ মনের রাজ্য বিভিন্ন।

বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহকে পরাভূত করে কঠোর সংযমের দ্বারা ধ্যানী বা যোগীর পক্ষে সর্বজ্ঞান ও সর্বদর্শন সম্ভব। যে শক্তি দ্বারা অন্যকে প্রভাবিত করে স্বীয় শক্তি অন্যের উপর প্রয়োগেও কিয়দংশে সে সমর্থ। ধ্যানী বা যোগী সর্বাপেক্ষা নিশ্চল ও স্থির হলে ও তাঁর ধ্যান ও তপস্যা তখন হয় সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল (Dynamic)। চুম্বকের ন্যায় সে তখন পৃথিবী ও পৃথিবীর বহু উর্দ্ধে বহু সূক্ষ্ম ও স্থূল বস্তুকে আকর্ষণ করে এবং তাদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। আমি মানুষ, ভূলোকে রয়েছি, আর দেবগণ স্বর্গলোকে রয়েছেন। আমি এখান হতে "স্বাহা" এই মন্ত্রে যজ্ঞে হবিঃ প্রদান করছি, আর স্বর্গের দেবতা তা পাচ্ছেন; এটা কি করে সম্ভব? এখানে প্রশ্ন ওঠে যোগাযোগের। রাশিয়ার মহাকাশচারী গাগারিন কিংবা টিটভ মহাকাশে আরূঢ় অবস্থায় যদি বেতার মারফৎ সংবাদ পাঠান 'আমি সুস্থ ও সবল আছি' তাহলে সে বেতারের শব্দ একমাত্র উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বেতার মারফৎই ধরা পড়ে;

আমরা সাধারণ লোক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকি; তদ্রূপ 'স্বাহা' মন্ত্র দ্বারা হবিঃ প্রদানে স্বর্গের দেবতাগণ গ্রহণ করেন, সেই দৃষ্টি লাভের জন্য কঠোর সাধনা ও তপস্যার প্রয়োজন। সেই আত্মদর্শন বা বিশ্বদর্শন বা দেবদর্শনের জন্য আমাদের মানস যন্ত্রটিকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সেই দান গ্রহণ করে দেবগণ তুষ্ট ও পুষ্ট হন বলে পৃথিবীর কল্যাণ হয়; যেমন প্রয়োজনের সময় বৃষ্টি হয়, প্রয়োজনের সময় জল বর্ষিত হয়ে পৃথিবী উপযুক্ত রূপে শস্যশ্যামলা হয়। ইন্দ্র, বরুণ, বৈশ্বানর, পবন, রুদ্র, প্রভৃতি সেই সৃষ্টিকর্তার (ব্রহ্মের) এক একটি শক্তি। এইরূপে হিন্দুধর্ম্মের বহু শক্তির কল্পনা করা হয়েছে। ব্রহ্মা সৃষ্টির কর্ত্তা, বিষ্ণু সৃষ্টির রক্ষাকর্ত্তা ও ত্রাণকর্ত্তা, মহেশ্বর ধ্বংসের কর্ত্তা ইত্যাদি। একজনমাত্র প্রধান মন্ত্রী কিংবা প্রেসিডেণ্ট দ্বারা যেরূপ ভারত শাসন সম্ভব নহে এবং নানা বিভাগের বিভিন্ন মন্ত্রী উপমন্ত্রী, সচিব, উপসচিব ও সহস্র সহস্র কর্ম্মচারীর দ্বারা যেরূপ ভারত শাসিত হচ্ছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও অনুরূপভাবে বিভিন্ন শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সুনিয়মিত ও সুশৃঙ্খলভাবে যুগ হতে যুগান্তরে মহাকালের পথে

চলেছে। নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তা কিন্তু এক ও অদ্বিতীয় ও তাঁর শাসনের রীতি নীতিও ভারত শাসন অপেক্ষা বহু কঠোর ও সুশৃঙ্খল।

ধর্ম্ম কি এবং ধর্ম্ম জীবন কি? ন অয়ম্ আত্মা বলহীনের লভ্যঃ 'ধৃ' ধাতু হতে ধর্ম্ম শব্দের উৎপত্তি; অর্থাৎ আমাদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য্য কতগুলি নিয়ম পালনই ধর্ম্ম। ঐ সব নিয়ম পালন দ্বারাই আমাদের দেহ ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় এবং স্বাস্থ্যই শক্তি। ধর্ম্মই বন্ধন, ধর্ম্মই যোগসূত্র। ধর্ম্ম যেমন হিন্দু ধর্ম্মের সকল মানুষকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে; তদ্রূপ অন্যান্য ধর্ম্মের সত্য উপলব্ধিতে উহা আমাদের নিকটবর্ত্তী করেছে। ব্যক্তিগত জীবন, গার্হস্থ্যজীবন, সামাজিক জীবনে ও ধর্ম্মের শাসন ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। মনু বলেছেন—অর্থ ও কামে আসক্তি শূন্য ব্যক্তিরই ধর্ম্মজ্ঞান হয়। ভ্রান্ত ও অন্ধ কুসংস্কার ধর্ম্ম নহে। কতগুলি মত বা পথ মাথা পেতে লওয়াই ধর্ম্ম নহে। কোন ব্যক্তি বা দলের চরণে স্বীয় স্বাধীন চিন্তার শক্তিকে উৎসর্গ করাই ধর্ম্ম নহে। সত্যের নামই ধর্ম্ম, মিথ্যার নামই অধর্ম্ম। মানব জীবনে ও কর্ম্মজীবনে ক্রীতদাস হওয়া ধর্ম্ম নহে। সদ্গুরু ও তাঁর উপদেশ অনুযায়ী চলাই ধর্ম্ম। সদগ্রন্থ অধ্যয়ন ও অনুশীলন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। সর্বপ্রথম প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি। এই, চিত্তশুদ্ধির জন্য আচার অনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে কতগুলি ব্রত বা আচার পালনই ধর্ম্ম নহে। পূর্বেই বলেছি সত্যই ধর্ম্ম। এই সত্যই কি কি?

আত্মা সত্য, ঈশ্বর সত্য, ধর্ম্ম সত্য, ধর্ম্মজীবন সত্য, উহারা শুধু সত্য নহে, পারমার্থিক সত্য। উহারা সার্ব্বজনীন, নিত্য মঙ্গল, পরম ও চরম মঙ্গল। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবন যেমন সত্য ও শিব (মঙ্গল), তেমনি সুন্দর, চরম ও পরম সুন্দর। এক ধর্ম্মের সঙ্গে অন্য ধর্ম্মের বিরোধ থাকা উচিৎ নহে, কারণ বিভিন্ন ধর্ম্মের মূল উৎস এক এবং পরিণতি ঐ এক। বিভিন্ন জলধারা যেমন গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, কাবেরী, মহানদী, ব্রহ্মপুত্র স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে যখন সাগরে পতিত হয়, তখন তারা সাগরের জলরূপেই পরিগণিত হয় এবং সাগরের জলেই একাকার হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে ধর্মমতাবলম্বী যেমন, শাক্ত, বৈষ্ণব, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি একই সাগর বা মহাসাগরে পরিণতি লাভ করে। জগৎ মায়া দ্বারা আবদ্ধ। এই মহামায়া আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মানব শিশু মাতৃগর্ভে নির্জ্জন ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে; অর্থাৎ জন্ম পরিগ্রহ করে সে নিজের মুক্তি ও অন্য সকলের মুক্তি আনয়ন করবে; এরূপ শোনা যায়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর আলো ও বাতাসে সে সব কিছু ভুলে যায় এবং ভুলে যাওয়ার জন্যই ক্রন্দন সুরু করে। সেই সময় মহামায়ায় আকৃষ্ট থাকে।

আমাদের ক্রোধ, লোভ, মোহ, কাম ইত্যাদিও মায়া বা অবিদ্যা। আমিরূপ অহঙ্কার সর্বাপেক্ষা অবিদ্যা। এই অবিদ্যা বা মায়া বা ভ্রান্তি হতে মুক্তি লাভ করলেই আত্মমুক্তি; আত্মদর্শনও সর্বদর্শন লাভ হয়। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান। তবে চৈতন্যবিজ্ঞান, ব্রহ্মবিজ্ঞান বা আত্মবিজ্ঞান। জড়বিজ্ঞান বা বস্তু বিজ্ঞান বাহ্য প্রমাণ ও বস্তু পরীক্ষার বিজ্ঞান। ধর্ম্ম বিজ্ঞান অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মদর্শনের বিজ্ঞান। এই উভয়ের মিলনেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন।

মার্কিণ বিমানবাহী জাহাজ 'কনষ্টিলেশন'—৬০ হাজার টনের এই জাহাজটি মহড়া দেবার জন্যে আটলাণ্টিক মহাসাগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পেছন দিকে মানহাটান সেতুটিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে লম্বমান। নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনস্থ নৌ বিভাগীয় জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানায় 'কনষ্টিলেশন' জাহাজটি নির্ম্মিত হয়েছে এবং পরিকল্পনা অনুসারে এইটি মার্কিণ নৌ-বিভাগের অধীনে নিযুক্ত থাকবে, বিমান-বিধ্বংসী অস্ত্র দ্বারা এই বিরাট জাহাজখানিকে সজ্জিত করা হয়েছে—এর গতিবেগ হবে ৩০ নট (প্রতি নট=৬০৮০ ফুট) এবং এতে প্রায় ৪,১০০ অফিসার ও অন্যান্য লোকজন থাকবেন।

হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ কর্তা কিন্তু এক ও অদ্বিতীয় ও তাঁর শাসনের রীতি নীতিও ভারত শাসন অপেক্ষা বহু কঠোর ও সুশৃঙ্খল।

ধর্ম্ম কি এবং ধর্ম্ম জীবন কি? ন অয়ম্ আত্মা বলহীনের লভ্যঃ 'ধৃ' ধাতু হতে ধর্ম্ম শব্দের উৎপত্তি; অর্থাৎ আমাদের জীবনধারণের জন্ত অপরিহার্য্য কতগুলি নিয়ম পালনই ধর্ম্ম। ঐ সব নিয়ম পালন দ্বারাই আমাদের দেহ ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় এবং স্বাস্থ্যই শক্তি। ধর্ম্মই বন্ধন, ধর্ম্মই যোগসূত্র। ধর্ম্ম যেমন হিন্দু ধর্ম্মের সকল মানুষকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে; তদ্রূপ অন্যান্য ধর্ম্মের সত্য উপলব্ধিতে উহা আমাদের নিকটবর্ত্তী করেছে। ব্যক্তিগত জীবন, গার্হস্থ্যজীবন, সামাজিক জীবনে ও ধর্ম্মের শাসন ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। মনু বলেছেন—অর্থ ও কামে আসক্তি শূন্য ব্যক্তিরই ধর্ম্মজ্ঞান হয়। ভ্রান্ত ও অন্ধ কুসংস্কার ধর্ম্ম নহে। কতগুলি মত বা পথ মাথা পেতে লওয়াই ধর্ম্ম নহে। কোন ব্যক্তি বা দলের চরণে স্বীয় স্বাধীন চিন্তার শক্তিকে উৎসর্গ করাই ধর্ম্ম নহে। সত্যের নামই ধর্ম্ম, মিথ্যার নামই অধর্ম্ম। মানব জীবনে ও কর্ম্মজীবনে ক্রীতদাস হওয়া ধর্ম্ম নহে। সদ্‌গুরু ও তাঁর উপদেশ অনুযায়ী চলাই ধর্ম্ম। সদগ্রন্থ অধ্যয়ন ও অনুশীলন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। সর্বপ্রথম প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি। এই, চিত্তশুদ্ধির জন্য আচার অনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে কতগুলি ব্রত বা আচার পালনই ধর্ম্ম নহে। পূর্ব্বেই বলেছি সত্যই ধর্ম্ম। এই সত্য কি কি?

আত্মা সত্য, ঈশ্বর সত্য, ধর্ম্ম সত্য, ধর্ম্মজীবন সত্য, উহারা শুধু সত্য নহে, পারমার্থিক সত্য। উহারা সার্ব্বজনীন, নিত্য মঙ্গল, পরম ও চরম মঙ্গল। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবন যেমন সত্য ও শিব (মঙ্গল), তেমনি সুন্দর, চরম ও পরম সুন্দর। এক ধর্ম্মের সঙ্গে অন্য ধর্ম্মের বিরোধ থাকা উচিৎ নহে, কারণ বিভিন্ন ধর্ম্মের মূল উৎস এক এবং পরিণতি ঐ এক। বিভিন্ন জলধারা যেমন গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, কাবেরী, মহানদী, ব্রহ্মপুত্র স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে যখন সাগরে পতিত হয়, তখন তারা সাগরের জলরূপেই পরিগণিত হয় এবং সাগরের জলেই একাকার হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে ধর্মমতাবলম্বী যেমন, শাক্ত, বৈষ্ণব, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি একই সাগর বা মহাসাগরে পরিণতি লাভ করে। জগৎ মায়া দ্বারা আবদ্ধ। এই মহামায়া আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মানব শিশু মাতৃগর্ভে নির্জ্জন ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে; অর্থাৎ জন্ম পরিগ্রহ করে সে নিজের মুক্তি ও অন্য সকলের মুক্তি আনয়ন করবে; এরূপ শোনা যায়। ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর আলো ও বাতাসে সে সব কিছু ভুলে যায় এবং ভুলে যাওয়ার জন্যই ক্রন্দন শুরু করে। সেই সময় মহামায়ায় আকৃষ্ট থাকে।

আমাদের ক্রোধ, লোভ, মোহ, কাম ইত্যাদিও মায়া বা অবিদ্যা। আমিরূপ অহঙ্কার সর্বাপেক্ষা অবিদ্যা। এই অবিদ্যা বা মায়া বা ভ্রান্তি হতে মুক্তি লাভ করলেই আত্মমুক্তি; আত্মদর্শনও সর্বদর্শন লাভ হয়। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান। তবে চৈতন্যবিজ্ঞান, ব্রহ্মবিজ্ঞান বা আত্মবিজ্ঞান। জড়বিজ্ঞান বা বস্তু বিজ্ঞান বাহ্য প্রমাণ ও বস্তু পরীক্ষার বিজ্ঞান। ধর্ম্ম বিজ্ঞান অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মদর্শনের বিজ্ঞান। এই উভয়ের মিলনেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন।

মার্কিণ বিমানবাহী জাহাজ 'কনষ্টেলেশন'—৬০ হাজার টনের এই জাহাজটি মহড়া দেবার জন্যে আটলাণ্টিক মহাসাগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পেছন দিকে মানহাটান সেতুটিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে লম্বমান। নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনস্থ নৌ বিভাগীয় জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানায় 'কনষ্টেলেশন' জাহাজটি নির্ম্মিত হয়েছে এবং পরিকল্পনা অনুসারে এইটি মার্কিণ নৌ-বিভাগের অধীনে নিযুক্ত থাকবে, বিমান-বিধ্বংসী অস্ত্র দ্বারা এই বিরাট জাহাজখানিকে সজ্জিত করা হয়েছে—এর গতিবেগ হবে ৩০ নট (প্রতি নট=৬০৮০ ফুট) এবং এতে প্রায় ৪,১০০ অফিসার ও অন্যান্য লোকজন থাকবেন।

সতেরো

ফোন শেষ অবধি করা হয়নি। প্রথমদিনই খোঁজ করলে হ'ত একরকম। পরে আর করতে বেধেছে।

কদিন দীপংকরদের খবর নেই কোন।

সেদিন হাসপাতাল থেকে ফোন করল দীপংকরের অফিসে। বেয়ারা ধরল। খবর পাওয়া গেল দীপংকর নেই, আজই বাইরে গেছে। কদিন পরে ফিরবে।

শুভজিৎ অবাক। বুঝতে পারছে না কিছুই। অথচ বেয়ারাটার এর বেশী জানা নেই কিছু। জীবেন গুপ্তও নেই অফিসে, ফিরবে ঘন্টাখানেক বাদে।···ফোন ছেড়ে দিয়ে আকাশ-পাতাল ভেবে ঠিক করল শেষে, চেম্বার ফেরৎ বেলেঘাটায় গিয়ে খবর নিতে হবে। নন্দিতার সংগেও দেখা করা হবে, এতদিনের মধ্যে হয়নি তো!

চেম্বারে গিয়ে সব খবর পেল। কাল সন্ধ্যেবেলা দীপংকর ফোন করেছিল এখানে। শুভজিৎ তখন চলে গেছে। ডাঃ ব্যানার্জিকে বলে দিয়েছে ওকে বলবার জন্য—ওরা দুর্গাপুর যাচ্ছে সবাই, দিন চার পাঁচ পরে ফিরবে।

শুভজিতের বিস্ময় বাড়লই বরং। কি কাজে হঠাৎ বাড়ীশুদ্ধ লোক দুর্গাপুর চলে গেল তা কিছু বলেনি দীপংকর ডাঃ ব্যানার্জিকে। তবে নন্দিতাও নেই সেটা জানা গেল। বেলেঘাটায় গেলে বিফল হয়ে ফিরতে হত।

সকাল সকাল কাজ শেষ আজ। বেরিয়ে পড়ল।···

অন্যদিন এমন হলে হয়তো ডাঃ ব্যানার্জির কাছেই কাটাত খানিকক্ষণ হয়তো নতুন আসা ডাক্তারি জার্ণালগুলো দেখত বসে বসে।

আজ 'মুড' নেই।

অন্যমনস্কভাবেই কাশীপুর চলে এল। বাস থেকে নেমে গলিটায় ঢুকে মেজাজটা খিঁচড়ে গেল।···সন্ধ্যে পেরোয়নি এখনও, কেন যে চলে এল এর মধ্যে।

গেট দিয়ে ঢুকেই থমকে দাঁড়াতে হল। তার ঘরে আলো জ্বলছে।

আশ্চর্য্য বটে। রোজকার মতই ঘরে চাবি দিয়ে বেরিয়েছে, প্যান্টের পকেটে রয়েছেও চাবিটা। তবে!···আউট হাউসে হরিহরের ঘর অন্ধকার, বাড়ী নেই নিশ্চয়ই।

ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত। চেয়ারে বসে শর্মিষ্ঠা।

—"আসুন." শর্মিষ্ঠা অভ্যর্থনা করল সহজকণ্ঠে, "আপনার ফিরতে আর দেরী হলে ঘুমিয়ে পড়তাম বোধ হয়।"

মুহূর্তখানেক বোধ হয় অবাক হয়ে চেয়েছিল শুভজিৎ। এগিয়ে এল, "অনেকক্ষণ এসেছেন? কিন্তু আজ তো বরং হঠাৎ [illegible] চেম্বার আছে জানেন তো।"

—"এতদিন জানতাম, কাল মনে হল আজকাল বোধ হয় তাড়াতাড়ি ফেরেন।

—"কাল?" শুভজিৎ ভাবল একটু, "ও হ্যাঁ, কাল চেম্বারে ছিলাম না বেশীক্ষণ, যদিও এখানে ফিরিনি। একটা ওষুধের খোঁজে গিয়েছিলাম।···কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?"

—"নন্দারা ফোন করেছিল চেম্বারে।"

—"তাই বলুন। আচ্ছা ভাল কথা, ওরা হঠাৎ দুর্গাপুর গেল যে?"

—"দিদিকে তাঁর দেওরের কোয়ার্টারে পৌঁছে দিতে।"

বিস্ময় কাটল না তবুও, "সস্ত্রীক?"

শর্মিষ্ঠা হেসে উঠল এবার. "সেটা দিদির সখ। ভায়ের বৌকে তিনি দেখাবেনই দেওরের বৌকে। নাহলে নন্দার ইচ্ছে ছিল না, এই সেদিন ফিরেছে তো।"

—"আর দীপুর অফিস?"

—"জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অবুঝপনা আপনার দীপুর দুর্ভাগ্যের কারণ। কারো কপালে জীবেন গুপ্তর বক্রোক্তি শোনা থাকলে ঠেকাবে কে! হায় হায় করতে করতে গেছেন।" হতাশভাবে হাত উল্টে শর্মিষ্ঠা দীপংকরের দুঃখে সাড়ম্বরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

শুভজিৎ হাসল একটু, "আমি শুনে অবাক হয়ে ভাবছিলাম কি হ'ল। ফেরবার আগে ভাবলাম ফোন করি আপনায় একটা, আপনি জানেন নিশ্চয়—"

—"পেতেন না অবশ্য। সেদিন অত ঝড়-বৃষ্টিতে বাড়ী গেলাম আজ সশরীরে তাই খবর দিতে এসেছিলাম বহাল তবিয়তেই আছি।"

ফোন না করার অস্বস্তিটা শুভজিৎ কাটিয়ে উঠেছিল। সিদ্ধান্তও একটা করেছিল মনে মনে, ঘনিষ্ঠতা না করাই ভাল।···ইঙ্গিতটা অপ্রকট নয়, নতুন করে অপ্রস্তুত হতে হ'ল।

নিস্পৃহভাবে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আছে শর্মিষ্ঠা।

খানিকক্ষণ। নীরবতা ভঙ্গ করল সেই, "ভাগ্যে এখানে ইলেকট্রিকটা আছে, না হ'লে"—

—"সত্যি একা একা এতক্ষণ ভারি কষ্ট হয়েছে আপনার।" শুভজিৎ যথার্থ লজ্জিত।

—"একা কই হরিহর ছিল তো এই আধঘণ্টা আগেও, গল্প করছিল বসে বসে। কি কাজ আছে ওর—তাও যাচ্ছিল না, আমি পাঠালাম জোর করে। আমার জন্যে আটকে থাকে কেন!

শর্মিষ্ঠার দুঃসাহসিকতায় শুভজিৎ বিমূঢ় প্রায়। এখানে চারপাশে কেউ থাকে না।···এমনও হয় শুভজিৎ কলকাতা থেকে দশটা সাড়ে দশটায় ফেরে। আজও তো হতে পারত তাই। এতক্ষণ বসে থাকত নাকি শর্মিষ্ঠা? এইরকম একেবারে একা?···অবশ্য দেরী দেখলে চলে যেতে বাধা ছিল না কিছু।···কিন্তু গাড়ীটা তো দেখতে পায়নি!

—"আপনার গাড়ী কোথায় ?"

হাত দিয়ে ওদিকটায় নির্দেশ করল শর্মিষ্ঠা, "ঐদিকে রেখেছি, আরও একটু এগোলে দেখতে পেতেন।"

একটু থেমে শুভজিতের ক্ষণপূর্বের ভাবনার সূত্র ধরেই কথা বলল, নিজে ফোয়ারার পাড়ে বসে হরিহরের সংগে গল্প করছিলাম, ভাবছিলাম যদি বৃষ্টি হয় গাড়ীতে গিয়ে বসতে হবে। তারপর হরিহর আপনার ঘর খুলে আমায় বসিয়ে গেল। বসে বসে ভাবছিলাম হরিহর তো চাবিটা রেখে গেল না, আপনার আরও দেরী হয়তো চলে যাওয়াও মুশকিল হবে।···এসে পড়ে বাঁচিয়েছেন।"

এইখানে এই নির্জন বাগানবাড়ীতে একা বসে বসে অনিশ্চিতকাল ধরে ঘর পাহারা দেওয়াটা উচিত হত কিনা সে প্রশ্ন আর করল না শুভজিৎ। ঘরের চাবিখোলার প্রসঙ্গটা উপর্য্যুপরি বিস্ময়ের ধাক্কায় ভুলেই গিয়েছিল। শর্মিষ্ঠার কথায় খেয়াল হয়েছে এবার।

—"কিন্তু হরিহর চাবি খুলে দিল কি করে তাই ভাবছি। ঘরে চাবি দিয়ে গেছি আমি, এই তো চাবি আমার কাছে।" প্যান্টের পকেট থেকে চাবিটা বের করে বিছানার ওপর রাখল শুভজিৎ।

—"বাঃ চমৎকার। চাকর রাখার গল্পটা হরিহরের কাছেও করেছিলেন নাকি ?"

শুভজিৎ হাসল, "করলেই বা দোষ কি হত ? হরিহরকে তো মাইনে দিই না আমি।"

—"যাক, তাহলে তো নিশ্চিন্ত—মাইনে-পাওয়াদের দলে ভেড়বার কুবুদ্ধি ওর হবে না কক্ষনো!···ভালো কথা, তালাটা কার ?"

—"হরিহরের, মানে এ ঘরেই লাগানো ছিল।"

—"আমিও তাই মনে করেছিলাম। না হারানো পর্য্যন্ত তো একটা তালার দুটো চাবিই থাকে। একটা ওর কাছেই ছিল।··· এবার কিন্তু উঠব আমি।"

—"আজও টুকুন একলা আছে নাকি ?"

শর্মিষ্ঠা উঠে দাঁড়িয়েছিল, সোজা চাইল একবার শুভজিতের দিকে। এক পলকও নয়। উত্তর দিল সহাস্যে, "না আজ সে ভুবনদার কাছে আছে। তাহলেও এবার ফিরি।"

ঘর থেকে বেরোল দুজনে। শুভজিতের অন্তরে সহজ হবার তাগিদটা ধাক্কা দিচ্ছেই অহোরহ।

গাড়ীটার দিকে এগোতে এগোতে সেই তাগিদেই প্রশ্ন করল হঠাৎ, "বুনোকে আজ আনেননি কেন ?"

—"আনলেই হ'ত, সত্যি, সংগে থাকত। অন্ধকারে একা একা গাড়ী চালাতে আমার বিচ্ছিরি লাগে।"

হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল, শুভজিৎ হেসে বলল, "বেশ তো চলুন, বুনোর বদলে না হয় আমিই যাচ্ছি। শ্যামবাজারের মোড় অবধি এগিয়ে দিয়ে আসি আপনায়। সেদিন যা বৃষ্টি শুরু হ'ল আপনি চলে যেতেই, ভাবনায় ফেলেছিলেন।

সমর্থনের ভংগীতে মাথা নেড়ে শর্মিষ্ঠাও হাসল, "তাই তো পরদিনই খোঁজ নিলেন আমার,—চলুন।"

সংগদান করতে যে এল সংগে এ কথাটা শুভজিতের মনে ছিল কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ লক্ষণ কিছু দেখা গেল না তার। সারা পথটাই নীরব হয়ে রইল প্রায়, আপন চিন্তায় বিভোর।···কথা যে দু'একটা বলল সেটা সেহাৎই ভদ্রতারক্ষার্থে, শর্মিষ্ঠার কথার উত্তরে।

কিন্তু শর্মিষ্ঠাও কথা বলল না বিশেষ।···একাগ্র মনে গা চালাচ্ছে, চোখ দুটো রাস্তার দিকে।···ফাঁকা নয় রাস্তাটা, অনে গাড়ী আসছে, যাচ্ছে। সামনের থেকে আসা লরির হেড লাই আলো পড়ছে বারবার শর্মিষ্ঠার মুখে···শুভজিৎ এক একবার অপাং দেখছে তাই।

সুসময়ে এসে পৌঁছেছে শ্যামবাজারের মোড়ে, থামতে হ'ল না সবুজ আলো জ্বলছে।··· শর্মিষ্ঠা ডান দিকে মোড় ফিরল।

শুভজিৎ অবাক হয়ে চাইল, "চলে যাচ্ছেন যে। দাঁড়ান, নামি গাড়ীর গতিবেগ বরং বাড়ল।···শুভজিতের বক্তব্য শুনতে পেয়েছে সেটাই তার প্রমাণ, না হলে অন্য কোন অভিব্যক্তি ছিল না।

শুভজিৎ হাসল একটু। ইচ্ছে করেই যখন থামছে না তখন কি আর করা যাবে, নিরুপায়। কনভেন্ট রোড থেকেই ফেরার বা ধরবে না হয়।

শুভজিৎ হাসতে শর্মিষ্ঠা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। বাঁ হাতি দূ যতীন্দ্রমোহন এ্যাভেন্যু ধরে সিধে যাচ্ছে। বলল, "কি হাসছেন যে বেশ তো, থামিয়ে নামুন।"

—"গায়ের জোরে নাকি ?"

—"উপায় কি, অন্য কোন রকম জোর নেই যখন আপনার।"

—"তার মানে ? অন্য জোর মানে—মনের জোর ? নেই আমার ?"

শর্মিষ্ঠা মাথা নাড়ল দৃঢ় ভাবে, "বিন্দু মাত্রও না। বন্ধু চাব পিটিয়ে বলে বেড়ালেই তো হ'ল না শুভো যা মনে করে তাই করে।"

শুভজিৎ হাসল আবারও।

জেদের বশে অনেকবার অনেক কাজ করেছে, যার পিছনে যুক্তি নেই কোন,··ঠকেছে বহুবার।

আজ হঠাৎ বিপরীত অভিযোগ শুনল।

—"বন্ধুর কথা ছেড়ে দিন, আমার মনের জোর নেই কে বললে ?"

—"আমি বলছি। থাকলে কাশীপুরে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হ'ত না।"

সন্দিগ্ধ চোখে শুভজিৎ তাকাল, "মানে ?"

—"সহজ কথায় পালিয়ে যাওয়া আর কি। আমি বলব, মনটা সবল হলে দরকার হ'ত না।"

শুভজিৎ চুপ করে রইল খানিকক্ষণ।···মনে মনে চিন্তার তাণ্ডব।

কিছুক্ষণ পরে বলল ধীরে ধীরে, "আর আমি যদি বলি আমায়

মনের জেদটাকেই সব চেয়ে বেশী ভয় করি আমি! হঠকারিতা করেছি অনেকবার, পুনরাবৃত্তি ঘটে চাই না।"

তখনই কোন উত্তর দিল না শর্মিষ্ঠা। চৌরংগীর সান্ধ্যভীড়ে নীরবেই গাড়ী চালালো একটুক্ষণ। দৃষ্টিটা পথেই নিবদ্ধ রেখে মৃদু কণ্ঠে বলল তারপর, "বললেও বিশ্বাস করব না। নিজের মনের জোরে কাজ করব, তাতে হঠকারিতার প্রশ্ন আসবে কেন? কাশীপুরেই বা যেতে হবে কেন?"

অসহিষ্ণু ভাবে মাথা নাড়ল শুভজিৎ।

শর্মিষ্ঠা জানে না আলোচনার ধারাটা শুভজিতের মনটাকে কোন, পথে চালিত করে দিচ্ছে। জানলে এমন অকারণ তর্কের সূত্রপাত করত না নিশ্চয়ই।

···হঠাৎ যদি শুভজিতের মনের ছবিটা দেখতে পেত শর্মিষ্ঠা চোখের সামনে? ··যদি শুভজিতের মনের ভাবনাটা প্রকাশ হয়ে যেত শর্মিষ্ঠার কাছে?···কি করত শর্মিষ্ঠা?

চমকে উঠত, গম্ভীর হয়ে যেত।

বাড়ীর পথে না এগিয়ে রেড রোড ধরেছিল শর্মিষ্ঠা। সোজা এসে ভক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের শেষ প্রান্তে গাড়ী থামাল হঠাৎ।

নিজের ভাবনায় মগ্ন ছিল শুভজিৎ।

গাড়ী থামতে অবহিত হ'ল "বাড়ী না গিয়ে এদিকে এলেন কেন?"

—"তর্কটা শেষ করতে। উত্তর দিলেন না যে?"

উত্তর দেয়নি, উত্তর দেবার মত কোন কথা মনে আসেনি বলে।

শর্মিষ্ঠার তাগিদে অন্যমনস্ক ভাবে বলল "চাইলেই যে সব কিছু পাওয়া যায় না এ কথাটা ভুললে চলবে কেন?"

—"পাগল। এমন ট্রাডিসানাল কথাটা ভুললে চলে! কিন্তু নীতি-বাক্যটা কর্মের ফল লাভ প্রসংগে, চেষ্টার সংগে তো এর বিরোধ নেই।"

শুভজিতের ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। কি কথায় কি কথা এসে পড়ছে ভেবে দেখবার অবকাশ পেল না, "চেষ্টার ক্ষেত্রটা সব সময় প্রশস্ত নাও হতে পারে···বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিঁড়ে ছোটার স্পৃহা নেই আমার।"

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হ'ল শর্মিষ্ঠার, "বুঝলাম না।"

সম্বিৎ ফিরে পেল শুভজিৎ। কে যেন ধাক্কা দিয়ে সোজা করে দিল তাকে।

···কি হ'ল তার?···কার কাছে এ কোন্ প্রসংগ এনে ফেলছে?

নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসে হাসল একটু, "আপনাকে বোঝানো সম্ভব নয়, প্রসংগটাও অবান্তর।···তার চেয়ে এবার বাড়ী ফিরুন।"

শেষ কথাটা কানে গেল কিনা সন্দেহ। হাত নেড়ে উদাস ভংগীতে শর্মিষ্ঠা বলল, "আমার জন্যে লোককে কাশীপুরে পালাতে হচ্ছে আর আমাকেই বোঝান সম্ভব নয়! ভালো!"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল শুভজিৎ। নিজের গোপনতম দুর্বলতা এমন করে প্রকাশ পেয়েছে, ধারণা ছিল না।

···অক্ষম ক্রোধের অনুভূতি একটা।···

শর্মিষ্ঠা অপেক্ষা করল খানিকক্ষণ।

তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলল আবার, "আমার কপালে আচ্ছা ফ্যাসাদ! বসে বসে শুধু লেক এ্যাভেন্যুর ক্যান্ডিডেটকে রিফিউজ করি বারাসাতের ক্যান্ডিডেটের পিসেমশায়ের সংগে ঝগড়া করি—এদিকে আবার কাশীপুর পলায়ন—ধরে আনলাম তো শুনছি আমাকে বোঝানো সম্ভব নয়। জীবনটা কি এমনই না বুঝেই কাটবে তাহলে?"

স্তব্ধ বিস্ময়ে শুভজিৎ নির্বাক।

···কতক্ষণ সময় কাটল খেয়াল নেই।···

এদিকটা একেই নির্জন ক্রমে আরও নির্জন হয়ে আসছে।··কাছেই একটা ল্যাম্পপোস্ট···তারই আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে শর্মিষ্ঠার কোলে···হাতের সরু সোনার চুড়িটা সেই আলোতে চিক্‌চিক্ করছে।···

—"শর্মিষ্ঠা!"

—"উঁ?" সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে চুপ করে বসেছিল শর্মিষ্ঠা। সহজ সুরে সাড়া দিয়ে জিজ্ঞাসুনেত্রে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

চোখে চোখ রাখল শুভজিৎ, "হঠাৎ এ কথা মনে এল কি করে?"

—"হঠাৎ আসেনি তো।"

—"তার মানে?"

—"মানে বোঝানো সম্ভব নয়।" গম্ভীরভাবে শুভজিতেরই ক্ষণপূর্বের উক্তিটুকুর মাধ্যমে সুদৃঢ় মতামত ব্যক্ত করে সেই ভংগীতেই হাতটা নাড়তে যাচ্ছিল।

উদ্যত হাতখানা ধরা পড়ল কঠিন মুষ্টিতে, "হতেই হবে সম্ভব। আমি জানতে চাইছি"—

নিরীহ মুখে চাইল শর্মিষ্ঠা, "মনের জোরের অভাবের কথা হচ্ছিল বটে, গায়ের জোর সম্বন্ধে তো সংশয় প্রকাশ করিনি।"

শুভজিৎ চমকে উঠে ছেড়ে দিল হাতখানা। নিজের অসহিষ্ণুতায় নিজেই বিব্রত।

হাসল অপ্রতিভভাবে, "লেগেছে?"

সহাস্যে সম্মতি জানাল শর্মিষ্ঠা, "অল্পবিস্তর।"

···বোঝানো সম্ভব হতেই হবে বলে কি যে জানতে চাইছিল শুভজিৎ, বলা হয়নি আর।···

···অন্যকথায় চাপা পড়েছে সেকথা···

কথা বলতে বলতে অনেকক্ষণ সময় কেটেছে। না বলেও বড় কম কাটেনি।

···দেবাশীষের কথা ভোলেনি শুভজিৎ। বলেছেও।

শর্মিষ্ঠা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল প্রথমে।

ব্যাপারটা উপলব্ধি করে হাসি হাসতে সময় লেগেছে তারপর।

···হঠাৎ এ কথা কি করে ভাবল শুভজিৎ।··জ্যাঠামশায়ের সন্দেহ নিয়ে মজা করে বলে কি সত্যিই দেবাশীষের সংগে বিয়ের ঠিক হয়ে আছে নাকি···না, ইন্দুভূষণ মৈত্রের হিম্মৎ আছে, স্বীকার করতেই হবে। এক সন্ধ্যায় এমন প্রভাব পড়ল যে এমন হাস্যকর কথাটা বিশ্বাস করে বসল শুভজিৎ।···আচ্ছা, তাহলে এতদিন বিয়ে হয়ে যেতে বাধা কোথায় ছিল এ কথা মনে হয়নি।···

···আকাশের বুকে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, আর ঘোলাটে জ্যোৎস্না।

···বাদলা হাওয়া বইছে।···

রাত দশটা বাজল।

এ পর্যন্ত বার পাঁচ-সাত বাড়ী ফেরার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেছে।

এবার শর্মিষ্ঠা বিদ্রোহ করল প্রায়, "এ কি হচ্ছে কি? আমিও কি বাউণ্ডুলে নাকি, বাড়ী যান না! বিকেল বেলা কিচ্ছু না বলে বেরিয়েছিলাম—ভুবনদা যে এবার পুলিশে খবর দেবে।" হেসে গাড়ীর চাবিটা বার করে দিল শুভজিৎ। পকেটে ছিল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

বাবরের কন্যা

শিবানী ঘোষ

মোগল সম্রাট বাবরের নাম ভারত ইতিহাসে একটি মূল্যবান স্থান অধিকার করে রয়েছে। সুদূর আফগানিস্তান থেকে ভারতে এসে তাঁরা ছয় পুরুষ ধরে অত্যন্ত গৌরবের সহিত শাসন করেন এই দেশ। সম্রাট বাবরের বহু বিচিত্র কাহিনী সকলের জানা থাকলেও তাঁর কন্যাদের সাথে পরিচয় খুব কম লোকেরই আছে। এই নিবন্ধে ইতিহাস নিঙড়ে সেই বাবর-দুহিতাদেরই কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছি সংক্ষিপ্ত আকারে।

বাবরের প্রথমা কন্যা হলেন ফকরুন্নিসা বেগম। এই সন্তানটি তাঁর প্রথমা মহিষী আয়েষা সুলতান বেগমের গর্ভজাত সন্তান। বাবরের উনিশ বৎসর বয়সে তার জন্ম হয়। এই কন্যাটি এক মাসের শৈশবাবস্থাতেই মারা যায়।

বাবরের অপর কন্যার নাম গুলরঙ বেগম। এঁর গায়ের রং ছিল গোলাপের মতো। তাই ঐ নাম রাখা হয়। ইনি ছিলেন দিলদর বেগমের গর্ভজাত প্রথম সন্তান। এঁর জন্ম হয় খোস্ট নগরে। এঁর জন্ম তারিখটা ঠিক মতো জানা যায় না, তবে ১৫১১ খৃষ্টাব্দ হতে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাবরের কাবুল অনুপস্থিত থাকাকালীন তাঁর জন্ম হয়। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবর যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী খাঁজাদা বেগমকে ডেকে তাঁর দুই কন্যার বিবাহ দেওয়ার কথা বলেন। খাঁজাদা বেগম বলেন, বিবাহের সব কিছুই প্রস্তুত আছে, চিন্তার কোন কারণ নেই। বাবরের মৃত্যুর পূর্বেই গুলরঙ বেগম এবং তাঁর অপর কন্যা গুলচিড়িয়া বেগমের বিবাহ হয়। গুলরঙ বেগমের স্বামীর নাম ইসান-তিমুর।

বাবরের আর একটি কন্যার নাম গুলচিড়িয়া বেগম, তা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এঁর গাল দুটি ছিল গোলাপের পাপড়ির মতো, তাই তাঁর ঐ নামকরণ হয়। ইনিও দিলদর বেগমের গর্ভজাত দ্বিতীয় সন্তান। এঁর জন্ম হয় ১৫১৫ খৃষ্টাব্দ হতে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এঁর বিবাহ-কাহিনী ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। এঁর চৌদ্দ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। এঁর স্বামীর নাম সুলতান তুখতা-বুঘা খাঁ। গুলচিড়িয়া বেগমের এই স্বামীর মৃত্যু হয় ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে। এর পর ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ বেগমের তিরিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত আর কোন বিবাহের সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে এই সময়টা তিনি বৈধব্য জীবন যাপন করছেন, এমন মনে করার কোন হেতু নেই। ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে গুলচিড়িয়া বেগমের পুনরায় বিবাহ হয় আব্বাস সুলতানের সাথে। এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় হুমায়ুনের বাল্খ অভিযানে যাওয়ার কিছু পূর্বে। এই বিবাহের কিছুদিন পরে আব্বাস সুলতান সন্দেহ করতে লাগলেন, তৈমুর সেনানীরা তাঁর লোকেদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করবে। এই আশঙ্কায় তিনি পলায়ন করেন। এই পলায়নের সময় তিনি খুব সম্ভবতঃ গুলচিড়িয়া বেগমকে আর সংগে নেননি, গুলচিড়িয়া বেগম ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে হামিদাবানু এবং গুলবদন বেগমের সাথে ভারতে আগমন করেন।

বাবরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কন্যার নাম হল গুলবদন বেগম। ইনিও ছিলেন দিলদর বেগমের গর্ভজাত সন্তান। গুলবদন বেগমের জন্ম হয় ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে। গুলবদন যখন দুই বৎসরের বালিকা তখন দিলদর বেগমের আলওয়ার নামক এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। সেই সময় গুলবদন বেগমকে অন্য মহিলার তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। এরপর দিলদর বেগম বিধবা হলে গুলবদন বেগম পুনরায় মায়ের কাছে আসেন এবং তাঁর বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছেই থাকেন। শিশুকালেই গুলবদন বেগম জীবন সম্বন্ধে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তাঁর সাংসারিক পরিবেশের মধ্যে থেকে। ভ্রাতা আলওয়ারের মৃত্যু, সিক্রির দুর্ঘটনা, হুমায়ুনের পীড়া, তাঁর আরোগ্যের জন্য পিতা বাবরের প্রার্থনা এবং তাঁর কৃতকার্যতা, তাঁর বোনেদের বিবাহ এবং বিবাহের পর তাঁদের দুঃখময় জীবন প্রভৃতি ঘটনাবলী গুলবদন বেগমের শিশুমনে বিশেষ ভাবে রেখাপাত করে।

গুলবদন বেগমের বিবাহ-বার্তার একটি ঘটনা থেকে আভাস পাওয়া যায়। একবার হুমায়ুন আগ্রায় নদীর তীরে পরিভ্রমণ করছিলেন। সেখানে গুলবদন বেগমও উপস্থিত ছিলেন। ভগিনীর কাছে হুমায়ুন আপন কন্যা আকিকাকে চৌসায় হারানোর কাহিনী বিবৃত করছিলেন। এই কথা প্রসঙ্গেই হুমায়ুন বলেন তিনি প্রথমে গুলবদন বেগমকে দেখে চিনতেই পারেন নি। কারণ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন যখন তাঁর সৈন্য নিয়ে চলে যান তখন গুলবদন মাথায় 'টাক' অর্থাৎ টুপি ব্যবহার করতেন, কিন্তু এখন তিনি 'লাচাক' অর্থাৎ বড় রুমাল কোণাকুণি ভাঁজ করে ঘোমটার আকারে ব্যবহার করছেন। এ থেকেই বোঝা যায়, যুদ্ধে যাবার সময় হুমায়ুন তাঁকে কুমারী অবস্থায় দেখে যান কিন্তু ফিরে এসে দেখেন তিনি বিবাহিতা মহিলা। গুলবদন বেগমের স্বামীর নাম খিজির খাজা খাঁ।

গুলবদন বেগম সাংসারিক কাজ এবং শিশুদের দেখাশোনা করেই অধিকাংশ সময় কাটান। রাজপরিবারের সকলেই তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। হুমায়ুনের ভ্রাতা কামরান বিদ্রোহী হয়ে রাজপরিবারের বহু নারীকে বন্দিকার করেন, কিন্তু তিনি গুলবদন বেগমের প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন করেননি। উপরন্তু তিনি তাঁর মাকে যে শ্রদ্ধা করতেন, গুলবদন বেগমকেও সেই শ্রদ্ধা দিতে রাজী ছিলেন। তবে গুলবদন বেগম তা গ্রহণ করেননি। গুলবদন

বেগম তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিন্দোলকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কামরানের অতর্কিত আক্রমণে হিন্দোল নিহত হলে গুলবদন বেগম অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি বলেন, তাঁর স্বামীপুত্রের মৃত্যু ঘটলেও তিনি ততখানি আঘাত পেতেন যতখানি পেয়েছেন তাঁর ভ্রাতার মৃত্যুতে।

গুলবদন বেগম ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজপরিবারের অন্যান্য মহিলাদের সাথে ভারতে আসেন। তিনি ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মক্কা যাত্রা করেন। তাঁর ভারতে আসার পর এই মক্কা যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত আর কোন সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

গুলবদন বেগমের পুত্রের নাম সাদাত-ইয়ার। খিজির খাজা খাঁয়ের আর একটি কন্যা সন্তানের নাম সালিমা খানাম। তবে ইনি গুলবদন বেগমের গর্ভজাত সন্তান কিনা সে-সংবাদ সঠিকভাবে পাওয়া যায় না ইতিহাসে। গুলবদন বেগমের এক নাতনীর নাম উম-কুলসম। তবে মেয়েটি সাদাত ইয়ারের কন্যা অথবা সালিমার কন্যা তা জানা যায় না।

গুলবদন বেগম ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী মহিলা। তাঁর লেখা 'হুমায়ুন-নামা' পুস্তকটি তার পরিচয় বহন করে চলেছে। আবুল ফজল তাঁকে বাবরের সম্বন্ধে বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গুলবদন বেগম যখন আট-বৎসরের বালিকা তখনই বাবর পরলোকগমন করেন। তাই তাঁর সম্বন্ধে নানা কাহিনী স্মরণ করে লেখা বেগম সাহেবার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে যতটা তিনি স্মরণ করতে পারেন এবং যে সব কাহিনী তিনি বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট শুনেছেন তাই নিয়েই তিনি পিতার পরিচয় লেখেন হুমায়ুন-নামা পুস্তকের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায়। পরে তিনি হুমায়ুনের বহু বিচিত্র নূতন তথ্য পরিবেশন করেন ঐ পুস্তকে। গুলবদন বেগমের পক্ষে বাবর, হুমায়ুন এবং আকবর—এই তিন সম্রাটের রাজত্বকাল স্বচক্ষে দেখা সম্ভব হয়েছে। তাই তিনি রাজপরিবারের এমন অনেক কথা তাঁর পুস্তকে লিখতে পেরেছেন যা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। গুলবদন বেগম কবিতা লেখাতেও ছিলেন বিশেষ পারদর্শিনী। মীর মাহদি সিরাজি তাঁর 'তাজকিরাতুল খাওয়াতিন' পুস্তকে বেগমসাহেবার কবিতার দুটি পদ সংগ্রহ করে রেখেছেন—

হর্ পরি কি আউ বা আশাক খুদ ইয়ার নিস্ত
তু য়াকিন মিদন কি হেচ্ অজ উমর বার-খুর-দার নিস্ত্।

গুলবদন বেগম ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে আশি বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলিতে তাঁর কাছে ছিলেন হুমায়ুন-জায়া হামিদাবানু বেগম এবং হিন্দোলের কন্যা রুকায়া বেগম। জীবনের শেষ মুহূর্তে গুলবদন বেগম যখন তাঁর চোখ দুটি বুজে শুয়েছিলেন তখন হামিদাবানু বেগম তাঁর কাছে এসে বহুদিন ধরে ডাকা আদরের নামে ডাকেন—জিউ, অর্থাৎ দিদি! কিন্তু কোন সাড়া আসে না গুলবদনের পক্ষ থেকে। তখন হামিদাবানু পুনরায় ডাক দেন—গুলবদন! তখন গুলবদন বেগম ধীরে ধীরে চোখ দুটি খুলে বলেন—আমি চললাম, তোমরা দীর্ঘজীবী হও। তার পরই বুজে আসে তাঁর চোখ দুটি এবং চিরদিনের মতো চলে যান এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে।

বাবরের অপর একটি কন্যার নাম গুল-ইজার বেগম। তিনি ছিলেন গুলরুখ বেগমের গর্ভজাত সন্তান। গুলবদন বেগম তাঁর পুস্তকে এঁর বিবাহের কোন কথা উল্লেখ করেন নি। তবে তিনি খুব সম্ভবতঃ ছিলেন ইয়াদগার-নাসিরের সহধর্মিণী।

বাবরের আর একটি কন্যা-সন্তানের নাম মাসুমা-সুলতান বেগম। ইনি হচ্ছেন মাসুমা বেগমের গর্ভজাত সন্তান। মাসুমা বেগম ঐ কন্যা-সন্তানটি প্রসব করেই মারা যান। তাই ঐ মেয়েটিরও তাঁর নামেই নাম রাখা হয়।

বাবরের আর এক কন্যার নাম মিহ্‌র-জাহান বেগম। এর জন্ম হয় খোষ্ট নগরে। এটি মাহাম বেগমের গর্ভজাত সন্তান। শৈশবাবস্থাতেই এর মৃত্যু হয়।

চলন্তিকার পথে

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

আভা পাকড়াশী

অনেকটা উঠে এসেছি। ঘোড়ার পায়ের চাপে বরফগুলো মচ মচ করছে। খালি খালি পিছলে যাচ্ছে ঘোড়ার পা। এবার আবার ভয় করছে আমার। সমস্ত শরীর ঠাণ্ডায়, আতঙ্কে কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে। সামনে আর কালো কিছু নেই সাদা, যেদিকে দুচোখ যায় শুধু ধূ-ধূ করছে সাদা। এরই নাম কি তুষার-মরু? এবার অমর সিং বলে, পথ বড় খারাপ বহেনজী আমার ঘোড়ার পা জখম হয়ে যাবে। আর আমি যাব না।

সেকি মন্দির পর্য্যন্ত যাবার কথা ছিল যে?

বলে, এত বেশী বরফ পড়েছে তা আমার জানা ছিল না, তাই আমি বলেছিলাম। বরং ফেরার পথে তোমাকে আবার নিয়ে যাব। ঐ যে আগের যে দোকানে চা খেলে ঐখানেই থাকব আমি।

তা তো হল, কিন্তু আমিই বা একেবারে একা এই বিপদসঙ্কুল পথ পেরুব কি করে?

হাঁটতে চেষ্টা করতেই পা পিছলে পড়ে গেলাম! লাগল না একটুও। যেন একরাশ পেঁজা তুলো ছড়িয়ে দিয়েছে যতদূর দৃষ্টি যায়। না লাগলেও চলতে ভয় পাচ্ছি। পেছনের যাত্রীরা বলে খুব সাবধান দিদি, এই পায়ের ছাপের ওপর আগে লাঠি ঠুকে দেখে নাও, ভর সইলে তখন পা দিও। অনেক জায়গায় ফাঁপা বরফ থাকে অসাবধানে পা পড়লে আর রক্ষা নেই, একেবারে চোরাবালির মত তলিয়ে নিয়ে যাবে। আর এদিক ওদিকে যেওনা ঠিক পায়ের দাগে পা ফেলে চলো, না হলেই বরফে ডুবে যাবে।

উঃ ভগবান একি পরীক্ষায় ফেললে তুমি আমাকে! কি বিপদেই পড়লাম? কোনখানেই ধরার কিছু নেই এমন কি, পথের সঙ্গী লাঠিটাও হাতে নেই। হাঁটতে গেলে পা পিছলে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকলে ঠাণ্ডায় পা অবশ হয়ে আসছে। ওদিকে বেলা বেড়ে উঠছে। বরফের ওপর সূর্য্যের কিরণ পড়ে আয়নার ফেলা আলোর মত চমকাচ্ছে। চোখে এমন ধাঁধা লাগছে যে সামনের পথ দেখতেই পাচ্ছি না। ঐ ঠাণ্ডাতেও দু'পা হাঁটতে ঘাম বেরিয়ে যায় আমার। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে ওঠে। মনে হয় আজই আমার শেষ দিন আর কখনো ওকে বা ছেলেদের দেখতে পাব না। না জানি এখনো ওরা কত পেছনে পড়ে আছে। ঘোড়াওয়ালা তো সর্টকাট করে আমাকে অন্য রাস্তা দিয়ে এনেছে। আর এ এমনই পথ, এ পথে কেউ কারুর জন্য অপেক্ষা করে না। যে যার নিজের শক্তিতেই যতটা পারে এগিয়ে চলে। তা ছাড়া আজ যে তারা এসে পড়েছে তাদের

কেদারবাবার দরজার গোড়ায়। আর কি তারা দাঁড়াতে পারে? আকুল হয়ে ছুটছে সবাই তাঁকে দর্শনের অভিলাষ নিয়ে। সবার মুখে এক কথা কত দূর—আর কত দূর—? আমার সামনে দিয়ে একদল যাত্রী ফিরে চলেছে দর্শনের শেষে, বলে দাঁড়িও না মা, তাঁকে স্মরণ করে এগিয়ে যাও।

এতদিন আমার ছিল পথের নেশা। মনের থেকে আর কোন আবেগ বা আকুলতা বিশেষ অনুভব করিনি। এবার আমার সারা মন জুড়ে ধ্বনি ওঠে, চলো চলো, দেখবে চলো তাঁকে। একপা একপা করে কোন রকমে এগিয়ে চলি। আমার সঙ্গেই চলেছে একটি বুড়ী আর তার মেয়ে। এবার আরও সঙ্কট দেখা দিল। রাস্তা ক্রমশঃ উঁচুতে উঠছে। যদিও বরফের ওপর সিঁড়ির মত ধাপ কেটে দিয়েছে P. W. D.র লোকেরা। তবু একবার যদি পা পিছলে যায় সঙ্গে সঙ্গে হবে তার তুষার সমাধি। গেল গেল ঐ বুড়ী তার মেয়ের হাত ফস্কে পড়ে গেল একেবারে নীচে। তলিয়ে গেল কোন্ অতলে। আহা, এত কষ্ট সহ্য করে এত কাছে এসেও সে পেল না তোমার দর্শন, এ কি প্রহসন তোমার প্রভু! কিম্বা তুমিই হয়ত তাকে কোলে তুলে নিলে, ভুলিয়ে দিলে তার জরা দুঃখের শত বেদনা। কিন্তু আমরা পার্থিব মানুষ কি তা বুঝি? হাহাকার করে কেঁদে ওঠে তার মেয়ে। ঝুঁকে দেখতে যায়। ঐ নিষ্প্রাণ শিলার স্তূপে খোঁজে একটুখানি প্রাণের স্পন্দন? একটি সন্ন্যাসী টেনে তোলেন তাকে। বলেন মায়ের সঙ্গে তুইও কি অমনি করে শেষ হবি নাকি, যা তাঁর কাছে যা।

শ্বেত শ্মশ্রু, সৌম্য দর্শন, উদ্ভাসিত মুখ দীর্ঘকায় এই সন্ন্যাসীকে দেখে হঠাৎই আমার মনে হয় ইনিই মহাদেব। এই অভাবিত আকস্মিক ঘটনায় আমার ভয় চকিত দৃষ্টি, বেপথুমতি ভাব আকর্ষণ করল সাধুকে, সাদরে হাত ধরে সেই মরণসিঁড়ি পার করে দিলেন তিনি।

জীবনের এই পথ চলায় নানা চরিত্রই সামনে আসে, প্রাকৃতিক দৃশ্যের মত। সব সময়ে যে সুন্দর শোভাই মনকে টানে এমন কথা বলা যায় না। জীবনের মত আমাদের মনের অভিজ্ঞতা আহরণ করবার ক্ষমতাটি অদ্ভুত। সব সময় যে সুন্দর দৃশ্য বা সুন্দর মুখই যে তাকে আকৃষ্ট করে তা নয় যেমন তাকে আকৃষ্ট করে কোন বিশিষ্ট বিকাশ! এই সন্ন্যাসী গভীর ছাপ রেখে গেলেন আমার মনে।

ওদিকে পৌঁছেই দেখি আমাদের কুলি 'গোমা' আমাদের খুঁজছে। আজ তার পিঠে বোঝা নেই। আমরা এখানে থাকব না বলে মাল নীচেই রেখে এসেছে। কি যে আনন্দ হল ওকে দেখে কি বলি? মনে হল ভগবানই যেন ওকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেও আমার অবস্থা দেখে আমার হাত ধরে পরম যত্নে বাকি পথটুকু নিয়ে চলল। আমার তখন শরীরে বা মনে কোন রকম বোধ শক্তিই নেই। ঐ আকস্মিক ঘটনা কেমন যেন পাথর করে দিয়েছে—আমাকে। সামনে শুধু দেখছি বিশাল মন্দিরের চূড়া।

এখানকার নেপাল হাউসে নিয়ে এসেছে গোমা। দেখি গোরা আর তার কাণ্ডিবালাও রয়েছে সেখানে। বাকি রয়েছে শঙ্কর আর ও। আমার অসার মনে আর কোন রকম ভয় বা উদ্বেগই স্থান পাচ্ছে না। মনটা যেন কেমন হয়ে গেছে। ভাবছি আমি কে? ওদের জন্য চিন্তা করলেই কি এ বিপদ থেকে ওদের উদ্ধার করবার

ক্ষমতা আছে আমার? তবু পাণ্ডাকে ওর পোষাক আর চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলি খুঁজে আনতে। আমাকে অনেক আশ্বাস দেয় তারা। বলে ঠিক পাওয়া যাবে তাঁকে। তিনতলা নেপাল হাউসের অর্ধেকটা বরফে ডুবে আছে। আমার সামনের জানলাটার গায়েই এক চাঙ্গাড় বরফ। একটুখানি ফোকর দিয়ে বাইরেটা দেখা যাচ্ছে। সেখান দিয়েই চেয়ে আছি বাইরে, ওদের আশায়। গোমা গেছে পাণ্ডার সঙ্গে। এই পাণ্ডারা কত সামান্য দক্ষিণার বদলে, যাত্রীদের যে কত স্বাচ্ছন্দ্য দেয় এই পথে, তা এক মুখে বলে শেষ করা যায় না। এই পাণ্ডাটি সেই দেবপ্রয়াগের পাণ্ডার লোক। কেমন যেন আপনার লোক বলে মনে হয় এদের। অত ব্যস্ততার মধ্যেও একরাশ লেপ কম্বল এনে দিয়েছে। আঙ্গেঠিতে আগুন করে এনেছে। আর এনেছে এক প্লেট ভরে মেওয়া আর গরম চা। যত বলি ওরা আসুক, পুজো দিয়ে এলে তবে খাব, শুনবে না কিছুতেই সেই পাণ্ডার কিশোর ভাইটি। বড় ভাই গেছে ওদের খুঁজতে। ছোটটিকে রেখে গেছে আমার কাছে। গোরাকে বলি তুই খা ততক্ষণ, না হলে ও ছাড়বে না। লেপ কম্বলের মধ্যে বসেও বুকের মধ্যে গুড় গুড় করে কাঁপছে ঐ দিন দুপুরবেলা। ভাবছি রাত্রে ওখানে মানুষ থাকে কি করে। মজাও হল মন্দ নয়, এর মধ্যে সেই পাণ্ডা জন চারেক চুড়িদার পা জামা আর গান্ধী টুপিওয়ালাকে ধরে এনেছে আমার কাছে। বোধ হয় তাঁদেরও স্ত্রী পুত্র খোয়া গেছে। শেষ পর্য্যন্ত গোমাই ওদের নিয়ে এলো। গোমা নাকি পাণ্ডার সঙ্গে না থেকে নিজেই এগিয়ে গিয়েছিল আর পাণ্ডা এদিকে ঐ পোষাকে যাকে পাচ্ছে তাকেই আমার স্বামী বলে ধরে এনে আমায় দ্রৌপদী বানাচ্ছে।

নেপাল হাউস থেকে মন্দির বেশী দূরে নয়। বরফের ওপর দিয়ে দড়ির পাপোশ বিছিয়ে দিয়েছে যাতে যাত্রীরা খালি পায়ে মন্দিরে যেতে পারে তাই। অত লোকের পায়ের চাপে পাপোশ ভিজে সপ সপ করছে।

পাণ্ডা পুজোর উপকরণ নিয়ে এলো। একটি থালায় কিছু শুকনো ফুল, বলল তো পারিজাত। হবেও বা স্বর্গরাজ্যই তো। আর আছে কিসমিস, ছোলার ডাল আর শুকনো নারকোল এই এখানকার প্রসাদ।

কতলোক যে মন্দিরে ঢুকছে বেরুচ্ছে। এতদিনকার সঞ্চিত, ভক্তি, উচ্ছ্বাস উজাড় করে দিচ্ছে শিবশম্ভুর শ্রীচরণে। এক এক জনের এক এক রূপ। অতি আনন্দে কেউ পাগলের মত হাসছে, কেউ বা হাহাকার করে কাঁদছে। ঐ সিঁড়ির ওপর আছড়ে পড়ে। কেউ বা আপন মনে মন্ত্র পড়ছে। কেউ মন্দির প্রদক্ষিণ করছে। কে কি ভাববে বা কে কি মনে করবে, এসব কেউ ভ্রূক্ষেপও করছে না, সবাই নিজের নিজের অন্তরের আকুতি জানাতে ব্যস্ত। আমার বুকটা কেমন যেন দুরু-দুরু করে—না জানি গিয়ে কি দেখব কেমন বা মুর্ত্তি? আমার ধ্যানের দেবতা সেই ত্রিশূলধারী নটরাজের রূপ পাব কি দেখতে? কি পাবো ভেতরে গিয়ে? যা পেয়ে লোকে এত আনন্দিত আর না পেয়ে এমন দিশাহারা! অন্য কিছু নেই আছে সিন্দুর আর ঘি চর্চিত শিলাময় স্তূপ! কেমন যেন থিতিয়ে যাই প্রথমটা। পাণ্ডার ডাকে চমকে উঠি, শুনি মন্ত্র বলছে—বলে পুজো কর, নাও হাতে। ফুল নাও বল—ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং, নাঃ আর কোন ক্ষোভ নেই, মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে যোগাসনে সমাধিস্থ ধ্যান গম্ভীর মহেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি। এই কেদারেশ্বরের মন্দির সমুদ্রতল থেকে এগার হাজার সাতশো পঞ্চাশ মাইল উঁচুতে অবস্থিত। [ক্রমশঃ।

নিয়তি ও সাধনা

রমা গোস্বামী

মানব-নিয়তি হ'ল কর্মভোগ, আর উপাসনার অর্থ হল—মোক্ষ বা ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভের উপায়। মহারাজ পরীক্ষিত কর্মের দ্বারা প্রেরিত হয়ে ঋষির কণ্ঠে সর্প জড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন,—কেন না ঐ ছিল তাঁর নিয়তি। ঋষিপুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন—সাত দিনের দিন তক্ষকের দংশনে তোমার মৃত্যু হবে।

কেবল উপাসনা পথেই কর্মের হাত হতে নিস্তার পাওয়া সম্ভব। কর্ম, সে তার কার্য্য সম্পাদন করে চলে, আর উপাসনা ভগবৎ-সান্নিধ্য বা মোক্ষ লাভ করায়। এদিকে তক্ষকের দংশনে মৃত্যু হচ্ছে,—ওদিকে উপাসনা-শক্তি ব্রহ্মর দ্বারে আত্মাকে মুক্ত করে দিয়ে ভগবৎ-সান্নিধ্যে পৌঁছে দিচ্ছে। মানব-নিয়তি বন্ধন স্বরূপ, আর উপাসনার দ্বারা তার হাত হতে উদ্ধার লাভ হয়। একটি অভিশাপ,—অন্যটি অনুগ্রহ।

শ্রীরাম-অনুজ ভরতের মাতার বরদান, মানব-নিয়তি ভরতকে অহংকার ও মোহ-অন্ধকারে ডোবাতে চেয়েছিল। কিন্তু মহৎ হৃদয় ভরত সে অন্ধকারে না ডুবে শ্রীরামচন্দ্রের শরণ নিয়েছিলেন—হে প্রভু! আমাকে রক্ষা কর—উদ্ধার কর। মৃত্যুলোকে সবাই আমার মৃত্যু ঘটাতে প্রস্তুত হয়েছে। ভগবান সদয় হয়ে পাদুকা দান করেছিলেন—'মা ভৈঃ।' উপাসনায় তোমার অমরত্ব লাভ হবে। ভরত একাগ্রচিত্তে উপাসনায় মগ্ন হয়ে, অবসাদ হীন কঠিন পরিশ্রম আর প্রযত্নে—মরজগতে অমর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। উপাসনা-শক্তি তাঁকে ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করিয়েছিল।

কর্মানুসারে প্রকৃতি-পুরুষ সম্মিলনের পরিণতিস্বরূপ মানব দেহ প্রাপ্ত হয় জীব। কর্মভোগের নিমিত্ত এই পৃথিবীতে এসে জন্মগ্রহণ করে। তাই মানবের-নিয়তিই হ'ল ভোগ, আর ধ্যেয় হ'ল মোক্ষ বা ভগবৎ-সান্নিধ্য। উপাসনা-শক্তি মানবকে অমরত্ব দান করে। পঙ্গু যেমন গিরি লঙ্ঘন করতে সমর্থ হয়, ক্ষুদ্রজীবও তেমনি ঈশ্বরের অনুভব, অনুভূতি, সান্নিধ্য-সামীপ্য লাভ করে ধন্য হতে পারে—এক উপাসনা-শক্তিতে।

মানব দেহ মোক্ষের দ্বার—'নরদেহ সাধনের মূল'—এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়েও যাঁরা উপাসনাহীন,—তাঁদের মূঢ় যোনি অঙ্গীকার করতে হয়। মৃত্যুলোকে মৃত্যুই তাঁদের ঘিরে থাকে, প্রতিদিন মৃত্যু এসে আলিঙ্গন করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ, ময্যাবেশিত চেতসাম্ ॥

—সমস্ত কর্মফল আমাকে অর্পণ করে মদ্গত চিত্ত হতে হবে। যাকে বলে তল্লীন অবস্থা।' অতএব যত্নবান হও—মৃত্যু সংসার রূপী সাগর পার হতে। কিন্তু কি ভাবে পার হতে হবে? একজন কোনো পথ প্রদর্শকের ত' প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সে ব্যবস্থাও করে রেখেছেন, যথা—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

জ্ঞানী মহাপুরুষদের প্রণাম করে, তাঁদের সেবা করে, তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করে, পরি প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করতে হবে। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা যথার্থ জ্ঞানের উপদেশই দিয়ে থাকেন। সেই উপদেশে লোকের অজ্ঞান রূপ অন্ধকার দূর হয়। হৃদয় জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়। হৃদয়ের রং বদল হয়। মহাত্মা তুলসীদাসজী বলেছেন—

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ।
কৈলাকে মৈলা ছুটে যব আগি করে পরবেশ॥

—কয়লাতে অগ্নি সংযোগ হলে যেমন লাল বর্ণ ধারণ করে, তেমনি তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ পেলে অন্ধকারাবৃত হৃদয়ও জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়। কিন্তু প্রকৃত মহাত্মাদের চেনা বড় কঠিন। জ্ঞানীর বেশ ধরে অজ্ঞানী অসাধুরাই আজকাল উপদেশ দেন বেশী। সে উপদেশ বাক্‌জাল মাত্র, জীবের কোনো উপকারে লাগে না। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী পুরুষেরা নিজ অনুভব লব্ধ জ্ঞানের উপদেশ দিয়ে থাকেন। যে উপদেশে দ্বিধাহীন বিশ্বাস জন্মায়, যে উপদেশ শ্রবণ মাত্রেই হৃদয়গ্রাহী হয়,—সেই উপদেশই প্রকৃত জ্ঞানের উপদেশ।

রাজা পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপে সর্প দংশন অবধারিত জেনে কর্তব্য নির্দ্ধারণের জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। পুরোহিত ধৌম্য ও অন্তান্ত ব্রাহ্মণ সজ্জনের মুখে নানা কর্ত্তব্যের উপদেশ পেয়েও সুস্থির হতে পারেননি; কিন্তু পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল শুকদেবের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের লীলা কথা শ্রবণ করে শান্তি, আনন্দ ও নির্ভয়তা লাভ করেছিলেন এবং ব্রহ্মশাপে কিছু মাত্র শঙ্কিত না হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পেরেছিলেন। শ্রীল শুকদেবের মতো যথার্থ গুরু পেয়ে মৃত্যুকে মৃত্যু বলে তাঁর বোধ হয়নি। নিয়তিও আর তাঁকে মৃত্যু সংসারে টেনে আনতে পারেনি। শ্রীশুক মুখ নিঃসৃত হরি লীলামৃত পান করে নিয়তির হাত হতে চিরতরে অব্যাহতি লাভ করেছিলেন এবং গীতার ভাষায়—'যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম,—সেই পরমধাম প্রাপ্ত হয়ে মুক্ত হয়েছিলেন।

অতএব মরজগতের মানবের সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। তার মতো উৎকণ্ঠা নিয়ে সাধুমুখে শ্রীহরি কথামৃত পান করে ত্রিতাপ দগ্ধ হৃদয়কে চিরশান্তিতে ভরিয়ে তুলে শ্রীহরি পাদপদ্ম লাভের জন্ত ঐ পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়। শ্রীমদ্ভাগবত উদাত্তস্বরে আপামর জনসাধারণকে সেই উপদেশই দিয়েছেন—

সতাং প্রসঙ্গাৎ মমবীর্য্য সম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপ বর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

শাঁখা-সিঁদুর

উৎপলা সেন

বম্বের এক 'পার্টি'তে শ্রীযুত অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্ত্রীর সীঁথিতে সিন্দুর দেখে এক বাঙ্গালী শ্রীমতি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ও কি?" অন্নদাশঙ্কর অবাক হয়ে বলেছিলেন—"ও যে সিঁদুর।" সিঁদুর যে হিন্দুর সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত, তা যে কোন হিন্দু মেয়ের অজানা থাকতে পারে তা ভেবেই অন্নদাশঙ্কর অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। শাঁখা-সিঁদুর পরা বাঙ্গালী হিন্দু নারীর—এ রূপ চিরন্তন। সম্প্রতি অনেকেই শাঁখা সিঁদুর ধারণের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁদের মতে এই শাঁখা-লোহা সিঁদুর ধারণের মূলে আছে একটি বর্ব্বর প্রথা।

আজ ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর। নারী শুধু স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাই নয়, পরাধীনতার সব প্রতীক পর্য্যন্ত লোপ করতে চায়। এখন কথা হচ্ছে, শাঁখা-লোহা সিঁদুর যদি পরাধীনতার প্রতীক হয় তবে তার লুপ্তিসাধনই কাম্য। হীনতা কেন মেয়েরা মাথা পেতে নেবে? এদিক থেকে যাঁরা শাঁখা-সিঁদুর ধারণের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী তাঁদের সঙ্গে সকলেরই বোধ হয় একমত।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সত্যিই কি কোন বর্ব্বর প্রথা রয়েছে এর মূলে? এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। এর উৎপত্তির মূল সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে হঠাৎ কোন মতবাদ—বিশেষ বা সমাজে আলোড়ন আনবে—প্রচার করা ঠিক হবে না। তা ছাড়া যদি ধরে নেওয়া যায় যে, সত্যিই এর মূলে ছিল কোন বর্ব্বর প্রথা। এখন কথা হচ্ছে, উৎপত্তির কারণ যাই হোক না কেন, শাঁখা-সিঁদুরকে কি মর্য্যাদা দেওয়া হয়, তা থেকেই এর সত্যকার মূল্য নিরূপিত হবে।

আজ শাঁখা-সিঁদুরকে লোকে বিবাহের প্রতীক হিসাবেই জানে এবং এতেই এর সার্থকতা। স্বামীর মঙ্গল কামনায় বিবাহিতা নারী ধারণ করেন সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু। এতে স্বামীর কি মঙ্গল হয় যুক্তি দিয়ে হয়তো বোঝান যাবে না; যেমন বোঝান যাবে না সন্তান বা স্বামীর মঙ্গল কামনায় উপোসের অর্থ। এমন স্তরও আছে, যুক্তি যেখানে অচল। বিশ্বাসের স্থান সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে যুক্তির অনেক উপরে।

স্বামীর মঙ্গল কামনায় ও বিবাহের প্রতীক হিসাবে শাঁখা ও সিঁদুর ধারণ সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ। পরাধীনতার প্রতীক অর্থে কেউ গ্রহণ করেন না।

আজকাল অনেক বিবাহিতা মেয়েই সীমন্তে যে সিঁদুরের দাগ ধারণ করেন, তা বহু ক্ষেত্রেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া দৃষ্টিগোচর হয় না। এর কারণ বোধ হয় বিশদ করে বলবার প্রয়োজন নেই। অন্ততঃ সিঁদুর ধারণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্ত যে নয় একথা হলপ করে বলা যায়।

আসল কথা শাঁখা-সিঁদুর ধারণের প্রথা আজ কি ভাবে সমাদৃত এবং কি ভাবে মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত তা থেকেই এই প্রথার বিচার করতে হবে। পরাধীনতার প্রতীক যখন কেউ মনে করেন না (মুষ্টিমেয় বাদে) তখন এ প্রথার বিলোপ সাধনে কোন সার্থকতা নেই।

তাজমহল

অর্চ্চনা অধিকারী

প্রথমেই এই দিয়ে শুরু করি—

"হীরামণিমুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক
শুধু থাক
এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল—"

এই তাজ নিয়ে কাব্য করার সাহস আমি রাখি না। কিন্তু

যা দেখেছি তা ভোলবার নয়! বহু দিন থেকেই বড় সাধ ছিল এ তাজ দেখার।

পাখী যখন ধূলির ধরণীতে বিচরণ করতে চায় না, তখন সে তার কল্পনারঙিন পাখা মেলে আকাশের পানে ছুটে যায়। তখন তার মনে হয় হয়তো সে আর ধূলির ধরণীতে নামবে না। কিন্তু···? কিন্তু যখন পাখায় ক্লান্তি আসে তখন কঠিন মাটির ধরণীতে তাকে নেমে আসতে হয়। ধূলি আর আকাশ, আকাশ আর ধূলি—এই করেই তার জীবন কাটে। মানুষেরও তাই মাঝে মাঝে জীবনে বৈচিত্র্য চাই। কল্পনাবিহীন, আশা-আকাঙ্ক্ষাবিহীন জীবন হয় পালহারা নৌকোর তুল্য। মন মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় চারিদিকে ছুটে নীলাকাশের মেঘমালার মধ্য দিয়ে গিরিশিখরে যায় ও জানায়—"হে দেবতা কর হে পূর্ণ মোর বাসনা।" এই বাসনাতে মন শুধু অনুভব করছে জ্বালা, শুধু জ্বালা। হঠাৎ এই শৃঙ্খলাবদ্ধ মন ছাড়া পেল তাই পিতার নিকট আকুল ভাবে প্রার্থনা জানালাম, যে ভাবে সাজাহান তার পুত্র ঔরঙ্গজেবের নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিল। অনুমতি পেয়ে গেলাম।

মাসিমার সঙ্গে পাড়ি দিলাম আগ্রার পথে। রাত্রি ন'টার ট্রেণে যাবার জন্যে হাওড়াতে এসে উপস্থিত হলাম। ধীরে ধীরে ট্রেণ চলতে সুরু করলো। ট্রেণ ক্রমেই আগ্রার পথে এগিয়ে আসতে লাগলো। আকাশে তখন কোন বলাকার চিহ্ন ছিল না। সেই নিদাঘের মধ্যাহ্নে আমাদের ট্রেণ ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে।

যমুনা ব্রিজ ষ্টেশনে পৌঁছবার আগেই যমুনা পরপারে প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে রৌদ্রতপ্ত আকাশের নীচে পুঞ্জীভূত ফেনস্তূপের মত তাজমহল চকচক করে উঠলো। বাইরে তখন ভীষণ রোদ, দারুণ গরম বাতাস বইছে—তাই জানলা না খুলে সার্সির উপরে ঝুঁকে পড়ে ভাবছি এই কি সেই বহুজনশ্রুত তাজমহল! যাকে ঘিরে কত কাব্য গড়ে উঠেছে। এই কি সেই তাজ! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কতকটা অপ্রত্যয়, অবিশ্বাস, কতকটা নৈরাশ্যে মনকে দোলা দিয়ে গেলো। নাড়ীতে চঞ্চল পদধ্বনি শুনতে পেলাম—

"বক্ষ মোর উঠে রণঝনি
নাহি জানে কেউ"—

আগ্রা ষ্টেশনে নেমে একটি টাঙ্গা ভাড়া করে গেলাম তাজমহল দেখতে। টাঙ্গা এসে দাঁড়ালো তাজের সিংহদ্বারে, গাড়ী থেকে নেমেই ছুটে গেলাম তাজ দেখতে। এসে দাঁড়ালাম সাজাহানের পত্নীপ্রেম সাক্ষ্য তাজের নিকট। নয়নভরে দেখলাম তাজের সেই নয়নমুগ্ধকর রূপ। চোখে ছিল চঞ্চলতা, মুখে ছিল আনতদীপ্ত, হৃদয়ে ছিল এক বিপুল উচ্ছ্বাস। মাথার উপরে ঝাঁঝালো রোদ আর সম্মুখে ছিল—

"রাজবিরহীর অশ্রুবিন্দু জমিয়া পাষাণ স্তূপে
প্রেমের সমাধি করিল সৃষ্টি ভূবন ভুলানো রূপে"—

সাজাহানের একনিষ্ঠ প্রেমের সাক্ষ্যস্বরূপ এই তাজমহল সতত যেন এই বার্ত্তা শুনতে পাচ্ছে—"The pearls of the deep are not so precious, as are the consealed comforts of a man locked up in women's heart, the air of blessingness is sweeter than the bed of roses"

তাই সাজাহান গড়ে তুললেন পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের এক আশ্চর্য্য সৌধ। যাকে কেন্দ্র করে মুঘল আমলের শ্রেষ্ঠ কলা স্থাপত্য নমুনা। তাজ যেন শুভ্রবেশ পরিবৃতভাবে দণ্ডায়মান। তার কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—

'অভাগিনী কোন বালবিধবার অনুপম তনুলতা
শুভ্র বসনে সজ্জিত যেন মূর্ত্ত পবিত্রতা"—

পাশে ধীরে মন্থর গতিতে যমুনা বয়ে চলেছে। চুপি চুপি বলে যাচ্ছে তাজের বিরহের কথা। এই যমুনার মাঝে মাঝে চড়া পড়ে গেছে পথিক কূজন মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে—'যমুনে এ কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী'। যমুনা তার কুল কুল ধ্বনিতে বলে যাচ্ছে—"Man may come and man may go but I go on for ever" যমুনাকে দেখে মনে হল সেই কথা—

যুগে যুগে এসেছো চলিয়া
খলিয়া খলিয়া
চুপে চুপে
রূপে হ'তে রূপে

তাজকে দেখে আশ আর মেটে না। জীবনে এমন আনন্দ কখনও এমন করে অনুভব করতে পারি নি। এখানে বসে মনে মনে জীবনের সাফল্যের দিনগুলোর হিসেব মেলাতে ব্যস্ত ছিলাম। তাজের স্থানে স্থানে ফাটল ধরেছে। বোধ হয় তাজের বেদনার রক্তের ফোঁটা চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেয়ে ঝরে পড়ছে। কি এক অব্যক্ত বেদনা তাজ আজ প্রকাশ করতে চাইছে। কিন্তু পারছে কই? তাজের পূর্ব্বের শ্রী নাকি এখন আর নেই। কিন্তু তাতে কি বা আসে—"A thing of beauty is a joy for ever. It is still a beauty and it will be a joy to one and all."

তাজের ব্যথা বেদনা আকাশে বাতাসে মন্দ্রিত হচ্ছে! দূর দিগন্তে তার বার্ত্তা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। তাজের প্রেমের বার্ত্তা গিরিকন্দরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। প্রেমিকের কাছে ব্যাকুল আর্ত্তনাদ করছে, কিন্তু বারে বারে হচ্ছে ব্যর্থ। কবি নীলরতন দাসের ভাষায় বলা যায়—

"তাজের মিনারে মহলে ছড়ানো বেদনার ইতিহাস
পাথরের বুকে পাষাণ ফলকের জড়ানো দীর্ঘশ্বাস"।

তাজকে জ্যোৎস্না প্লাবিত রাতে অথবা শরতের রৌদ্রে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি কিন্তু জ্যৈষ্ঠের সেই অলস মধ্যাহ্নে তাজের রূপ দেখতে দেখতে কি জানি এক অজানা, এক অজ্ঞাত বেদনায় মনটা হু হু করে উঠলো। তাজকে তাই অন্য এক নয়ন দিয়ে পরিপূর্ণ ভাবে দেখলাম। কবির ভাষায় তাই বলছি—

"সম্রাট মহিষী
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্য্যে হয়েছে মহীয়সী
সে স্মৃতি তোমারে ছেড়ে
গেছে বেড়ে
সর্ব্ব লোকে
জীবনের অক্ষয় আলোকে।"

নীচে রাজমহিষী শেষ শয়নে শায়িতা—চিরনিদ্রায় নিদ্রাভিভূতা। আর প্রেমিক সাজাহানের মর্ম্ম বেদনা গম্বুজ হতে গম্বুজান্তরে কেঁদে কেঁদে ছুটে চলেছে। তাজের ভিতরে ছোট একটি ঘরে সম্রাট ও সম্রাট-মহিষীর কবরবেদী। তার উপরে ছোট একটি দীপ মিটমিট করে

জ্বলে ঘরের অন্ধকার দূর করার প্রচেষ্টা করছে। এই ঘরে হঠাৎ কি জানি কোন এক অজানা আশঙ্কায় বুকটা দুরু দুরু করে উঠলো। মনে হল সম্রাট মহিষী চুপি চুপি যে অভিসারে চলেছে পাশে শায়িত সম্রাট সাজাহানের কবর বেদীতে—

"ওগো নটী চঞ্চল অপ্সরী, অলক্ষ্য সুন্দরী কোথা যাও
কোথা যাও বারেক ফিরিয়া চাও"—

অভিসারিণী এই সম্রাট মহিষীর বুকে যেন কি ব্যথা। তাই ঘরের মধ্যে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছিল। ঘরের মধ্যে আমরা জনা পাঁচেক ছিলাম। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম। মনে পড়ে গেলো—

"রাজবিরহীর মর্ম্মবেদনা আজো যেন সেথা ঝরে
কত না বিরহী ফেলে অশ্রু এ প্রেমের তীর্থ পরে"।

ফিরে আসার সময় হয়ে এলো। তাই আর অপেক্ষা না করে পা বাড়ালাম। কিন্তু বারে বারে এই রাজবিরহীর মর্ম্মবেদনা মনকে বড় ঘা দিচ্ছিল। পিছনে ছিল সম্রাট সাজাহানের অমর কীর্ত্তি এই তাজমহল। তাকে ঘিরেই সাজাহানের আকুল আর্ত্তনাদ যুগে যুগে কালে কালে প্রবাহিত হয়ে চলেছে—

তোমার সৌন্দর্য্য দূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্য হারা এই বার্ত্তা নিয়া
চিরবিরহীর বাণী নিয়া
ভুলি নাই, ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়া"—

কে তুমি আমায় ডাকো

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সতীদেবী মুখোপাধ্যায়

মিতা চাপা গলায় বললে—দাদা, ঘড়ির কাঁটাকে কিন্তু আর ঠেলে রাখা সম্ভব নয়।

সুজাতা বললে—আপনার দুঃখ জানা রইলো। সুযোগ পেলে প্রতিকার করবার চেষ্টা কোরবো।

—প্রতিকার তো আপনারই হাতে।

জয়ন্তর অস্পষ্ট কথাটা সুজাতা ঠিক মত বুঝতে না পারলেও আন্দাজ করে প্রসঙ্গ বদলে বললে—আজ বুঝি আপনার ছুটি।

জয়ন্ত আবেগের মুখে কথাটা বলে লজ্জাবোধ করছিল। তাই সুজাতার কথা শুনে যেন হাঁফ ছেড়ে বললে—নাঃ, ছুটি আর কোথায়! অফিস যাবার সময় হয়ে এল।

—অফিস? কোথায় আপনার অফিস? লিলুয়ায় আপনাদের কারখানা নয়?

বে-কায়দায় পড়ে জয়ন্ত বললে—ঐ একই কথা। অফিস আর কারখানা ছুটোর তফাৎ আছে তো, তাই অফিস বলে একটু মর্য্যাদা দিই তাকে। আচ্ছা, আজ রাখলুম।

মিতা জয়ন্তকে বললে—দাদা, আজ আর কোন বাজে কথা শুনতে চাই না। আজ বলতেই হবে কে, কি, কেন? যদি সত্যি কথা না বলো, তোমার সঙ্গে আড়ি!

জয়ন্ত হেসে বললে—বলবো, বলবো। তোকে না বলে কি পারি।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে স্নান করতে গেল।

জয়ন্তের বাবা রিটায়ার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট। বর্ত্তমানে কনট্রাকশনে ব্যবসা করছেন। ব্যবসার ভবিষ্যত উন্নতির কথা চিন্তা করে ছেলে প্রশান্তকে ফরেন ট্রেনিং নিতে পাঠিয়েছেন। জয়ন্ত আর মি শুধু পিঠোপিঠি ভাই বোনই নয়, পরস্পর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরও মত বটে।

সুজাতার কথা মিতাকে বলবার জন্যে জয়ন্ত বেশ একটু ব্য হচ্ছিল মনে। সুজাতাকে সে দেখেছে, ভাল লেগেছে এই কথাগু কারুর কাছে বলবার জন্যে সে অধীর হয়ে উঠেছিল। মিতা ভিন্ন আ কার কাছে বলবে। সবার বড় জয়ন্ত তার পরে এক বোন তা কাছে সে সহজ হতে পারে না। কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ হয় মিতা যেমন প্রাণচঞ্চল, তেমনি বুদ্ধিমতী। এ ক্ষেত্রে মিতা হয়তে কোন নতুন দিক দেখিয়ে জয়ন্তকে ভারমুক্ত করতে পারবে।

সব শুনে মিতা কিন্তু উপস্থিত কোন আলোকপাত করতে পারলে না। বললে—ব্যাপার দেখছি খুব সহজ নয়। জটিলের জট ছাড়াবার মত ধৈর্য্য আছে তো তোমার?

জয়ন্ত একটু হেসে বললে—আরে জট ছাড়াবার সময় পাওয়া যাবে কি না সেটাই তো সমস্যা।

মিতা ফিক করে হেসে বললে—তুমি ওকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে ফ্যালো, তা হলেই সব কিছু সহজ হবে।

জয়ন্ত তাড়া দিয়ে বললে—দূর কি বলছিস! ধর আমি প্রস্তাব করার পর ওঁরা পাকা কথা বলতে এলে তখনই তো ফাঁকি ধরা পড়বে।

রাগ দেখিয়ে মিতা বললে—ফাঁকি আবার কিসের? তুমিও কিছু যা তা একটা ছেলে নও।

মিতার রাগ দেখে জয়ন্ত জোরে হেসে উঠে বললে—আরে, ওদিকে মস্ত বিজনেসম্যান। য়্যালুমিনিয়াম কারখানার মালিক। আর এদিকে একটা টি টেষ্টার। ওর আছে নিজের অফিস আর এদিকে আমি অন্যের অফিসে কাজ করি। দাঁড়িপাল্লায় এমনিতেই হাল্কা হয়ে আছি, তার পর যখন আসল কথা জানবে ও তখন তাড়াতাড়ি বরমাল্য নিয়ে এগিয়ে আসবে না, এটা বোকা লোকও বুঝতে পারবে। কাজেই প্রতিযোগিতার জয়ের হার বিজয়ের কাছে এটা সুনিশ্চিত। বিজয় তার বিজয়পতাকা উড়িয়ে যাবে তার কাছে—আর জয় জোচ্চোর উপাধি ধারণ করে মুখ লুকিয়ে পেছিয়ে পড়বে।

দাদার লম্বা বক্তৃতা শুনে মিতা নাক সিঁটকে বললে, যদি সত্যিই তাই করে তাহলে বুঝবো হীরে চিনতে ভুল করেছে সুজাতা।

জয়ন্ত হেসে বললে,—তোর কাছে যেটা হীরে ঠেকছে ওর কাছে সেটা কাচ মনে হতে পারে।

মিতা বললে—ওসব হীরে মুক্তোর কথা থাক। জানো দাদা, তোমার কাছে সুজাতার কথা যতটা জানলুম তাতে আমার মনে হয় সে তোমাকে পছন্দ করে। কাজেই ভবিষ্যতে যদি আসল বিজয় আসে—তবুও জয় মানে নকল বিজয়ের জয় সুনিশ্চিত।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে—তুই ভুলে যাচ্ছিস কেন, আমি নিজের পরিচয় গোপন করে অন্যের পরিচয়ে আলাপ করেছি। এই কথা সুজাতা জানতে পারলেই ওর মন ছোট হয়ে যাবে না? আমার সম্বন্ধে কি ধারণা সে কোরবে? যতই আমাকে সে পছন্দ করুক, এ অপরাধ সে ক্ষমা কোরবে বলে মনে হয় না।

—নিশ্চয় ক্ষমা কোরবে। ভালবাসলে ক্ষমা না করে পারবে না।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে—ভাল লাগা আর ভালবাসা দুটোর তফাৎ আছে, সেটা বোঝবার মত বুদ্ধি আছে নিশ্চয়।

মিতা রাগ করে বললে—বুদ্ধি তোমার চেয়ে অনেক বেশী আছে, পরে স্বীকার কোরবে। বিশ্বাস না হয় বাজী ফেলে ত্যাখো, কার কথা ঠিক হয়।

জয়ন্ত হাসি মুখে বললে বেশ বাজীতে আমি খুব রাজী।

দাদার কথা শুনে মিতা বললে—কথাটা লিখে রাখো, পরে অস্বীকার কোরবে তা হবে না।

রাত্রে খাবার টেবিলে ব্যারিষ্টার সাহেব বললেন সুমিত্রা দেবীকে—নীতিশের সঙ্গে দেখা হোল আজ···

সুমিত্রা দেবী বুঝতে না পেরে মুখ তুলে সপ্রশ্ন নেত্রে তাকাতে তিনি বললেন—সেই যে দেরাদুনে আলাপ হয়েছিল। একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে, অবশ্য তোমার মনে থাকার কথা নয় বহু দিন আগেকার কথা। ভদ্রলোক একাই বেড়াতে গিয়েছিলেন ওখানে—সেই সময় আলাপ হয়ে প্রায় বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তার পরেও দুই-একবার দেখা হয়েছে। যাই হোক নীতিশ এখন রিটায়ার করে কিসের যেন অফিস করেছে। রোল্যাণ্ড রোডে চমৎকার বাড়ী। নিয়ে গেল সেখানে···বলেছে কাল আসবে এখানে।

সুমিত্রা দেবী হেসে বললেন—তোমার তাহলে এবার কলকাতায় এসে বেশ লাভ হোল বল!

ব্যারিষ্টার মুখার্জ্জীও হেসে বললেন—কেস যত আসে ততই তো লাভ—সেই কেস নিয়ে অন্যত্র যাওয়া মানে ডবল লাভ।

সুজাতা বললে—এবারে তোমার তিন ডবল লাভ হোল, মা সেই কথাই বলছেন।

ব্যারিষ্টার সাহেব খাওয়া বন্ধ রেখে সুজাতার পানে তাকালেন, বললেন—তিন ডবল লাভ?

সুজাতা হাসিমুখে বললে—কেস হাতে এল, তার পর সেই কেস নিয়ে কলকাতায় এলে। এখানে এসে বন্ধুলাভ হোল। কাজেই লাভটা তোমার তিন ডবল হোল না?

সুজাতার কথায় ব্যারিষ্টার সাহেব উচ্চহাস্য করে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন—বন্ধু লাভ! ঠিক কথা বলেছিস মা। কাল আসবে বলেছে, আলাপ হলে দেখবি, কথাটা আমার একটুও বাড়ানো নয়। আমি ওকে চিনতে পারিনি, ও কিন্তু দেখেই চিনেছে।

সুজাতা মৃদু হাসির সঙ্গে বললে—ম্যাজিষ্ট্রেটের পাকা নজর।

সুজাতার কথায় দুজনেই হেসে উঠলেন।

যথাসময়ে সুমিতাকে নিয়ে নীতিশ ব্যানার্জ্জী এলেন ব্যারিষ্টারের বাড়ীতে। সুজাতাকে দেখে সুমিতা মনে মনে ভাবলে—নাঃ, দাদার কোন দোষ নেই। একে যে দেখবে, সেই ভালবাসবে।

মুখে বললে—সুজাতা তুমি আমাদের নিজের মত, তাই আপনি না বলে তুমি বললুম, তার জন্যে রাগ করোনি তো?

সুমিতার হাত ধরে সুজাতা স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে বললে—আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলুম, কিন্তু তুমি যদি কিছু মনে করো সেই ভেবে বলতে পারছিলুম না। কি জানি হয়তো ভাববে একেবারে ন্যাকা—কলকাতার ফ্যাসান বোঝে না।

মিতা হেসে বললে—ওসব ফ্যাসান-ট্যাসান বুঝি না। তোমাকে ভাল লাগলো তাই আপনি বলতে ইচ্ছে কোরলো না।

সুজাতাও সহাস্যে বলে—আমারও তোমাকে খুব ভাল লেগেছে।

মিতা দুষ্টু হাসির সঙ্গে বললে—আমার দাদার সঙ্গে আলাপ হলে তাকে তোমার আরও ভাল লাগবে।

সুজাতা সকৌতুকে বললে—তবে তো খুব ভয়ের কথা বল। ভাল লাগা হল ভালবাসার প্রথম ধাপ।

মিতার মনে পড়লো গত কাল দাদার সঙ্গে এই ধরণের কথাই হয়েছিল।

বললে—ভালবাসার প্রথম ধাপ ভাললাগা? তুমি বুঝি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বোলছো?

সুজাতা ঈষৎ আরক্ত হোল। কি যেন বলতে গিয়ে গেটের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে—মিতাও সেই দিকে তাকাল। জয়ন্তর গাড়ী গেটের কাছে থেমে আবার নিঃশব্দে চলে গেল। [ক্রমশঃ।

বিনিদ্র

বাণী সিংহ

চোখে আসে না যে ঘুম,
সারা রাত ধরে ঝিল্লী-নূপুর
কাণে বাজে রুম-ঝুম।
কালপরী আর নিদ্রাপরীরা
পথ বুঝি গেছে ভুলে;
নিশার আঁধারে চুপি চুপি তারা
আসে যদি ডানা মেলে;
রূপ-কাহিনীর দেশে,
নিয়ে যেতো যারা রাজকুমারীর পাশে;
সোনার কাঠির পরশে যে মেয়ে
নয়ন মেলিয়া হাসে।
সারা রাত ধরে কত কহিতাম কথা,
দিনের আলোয় যায় না যে বলা
রাতের বিহ্বলতা।
প্রহরের পরে প্রহর কাটিত
সোনার বাসর-ঘরে,
ভোরের হাওয়ায় জড়াতো আবেগে
মৃণাল বাহুর ডোরে;
তারপর ঘুমে ভরিয়া আসিত
কমল নয়ন দুটি,
আমারি বুকেতে এলায়ে পড়িত লুটি।
কালপরী আর নিদ্রাপরীরা,
ফিরে দিয়ে যেতো হেথায় তাহারা,
প্রভাত আলোর দেশে।
ভাবিতাম বসে অলস আবেশে,
স্বপ্ন দেখিনু নাকি?
আবার আসুক রজনী ঘনায়ে
আবার স্বপন দেখি।

গীতা কাপুরের আত্মহত্যা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

চিঠি পড়তে পড়তে বুঝি মন রীতিমত নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, মুখ তুলতে লক্ষ্য করলাম, ধূমায়মান অনেকগুলি প্লেট টেবিলের উপর রাখা রয়েছে। আমি মুখ তুলতেই হাত বাড়াল গুপ্তভায়া, চিঠিখানা নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিয়ে বলল, "এবার আরম্ভ করা যাক—"

আরম্ভ করল গুপ্তভায়া, আমিও আরম্ভ করলাম, কিন্তু গুপ্তভায়ার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া দূরে থাক, আমার স্বাভাবিক গতিতেও যেন এগোতে পারছিলাম না। ক্ষিদে ছিল না এমন নয় কিন্তু মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন, অনেক কৌতূহল জট পাকিয়ে গিয়ে এমন টগবগ ক'রে ফুটতে শুরু করেছিল যে, মন দিয়ে এবং খাওয়ার মত ক'রে ঠিক খেতে পারছিলাম না। খেতেও পারছিলাম না এবং মনের মধ্যে সেই ফুটন্ত কড়ার কোনো প্রশ্নও তুলে নিয়ে গুছিয়ে ধরতে পারছিলাম না গুপ্তভায়াকে।

এক সঙ্গে খেতে বসে এই প্রথম আমার আগে খাওয়া শেষ করল গুপ্তভায়া। ঢক ঢক ক'রে দু' গেলাশ জল খেয়ে তবে ওর নজর পড়ল আমার প্লেটগুলির দিকে।

"কী হোলো ? সব যে পড়ে রইল ?"

"হ্যাঁ,—"অস্বীকার করলাম না। "কিন্তু আপনার শর্মাকে প্রশ্ন করার ধরণ দেখে মনে হ'ল শর্মা সম্বন্ধে সব খবরই যোগাড় ক'রে ফেলেছেন আপনি"—

"হ্যাঁ, সব না হলেও অনেকগুলি খবর। কিন্তু প্লেটগুলি আগে খালি করো। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে অপিসে !'

"কিন্তু কী ক'রে জানলেন ?"

"কিছুটা শর্মার মিথ্যে কথায়, কিছুটা অনুসন্ধান, কিছুটা হোটেলের বেয়ারার কাছ থেকে এবং কিছুটা অনুমান ! কিন্তু এবার উঠতে হবে—নয় আমার তোমাকে ফেলে কিম্বা তোমার ঐ প্লেটগুলির মায়া ত্যাগ ক'রে। এতক্ষণ সেই জাল নার্সের খবর নিয়ে আপিসে নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে সরকার !"

খাওয়ার ব্যাপারে তাড়া ক'রেও খুব তাড়াতাড়ি ফেরা গেল না দপ্তরে। গুপ্তভায়ার পান খেতে এবং দু' ডজন পানের রসদ সংগ্রহ করতে মন্দ সময় লাগল না। দপ্তরে ফিরে অবিশ্যি দেখা গেল গুপ্তভায়ার অনুমান মিথ্যে নয়। সরকার ফিরে এসেছে এবং খবর নিয়ে এসেছে এবং খবর নিয়ে ফিরে শর্মার গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে অধীর আগ্রহে বসে রয়েছে। গুপ্তভায়াকে ঘরে ঢুকতে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে এল সে, "কী হোলো স্যর ?"

"কীসের কী হোলো ?"

"শর্মার ? জামিন পেয়ে গেল ?"

"হ্যাঁ। তোমার কী হোলো ?"

"আজ্ঞে,—কোম্পানীতে জাল-নার্সকে দেখতে পেলাম না। তারপর বেয়ারাদের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলাম, বছর খানেক আগে একটি মেয়ে টাইপিষ্ট হিসেবে কিছুদিন কাজের পরীক্ষা দিতে এসেছিল। বেয়ারাদের মোটা বর্ণনায় সেই মেয়েটির সঙ্গে জাল-নার্সের চেহারার অমিল হ'ল না দেখে আমি তখন কোম্পানীর ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করি এবং কথা বলি। ফাইল বার ক'রে দেখে তখন সেই টাইপিষ্ট মেয়েটির নাম ঠিকানা ম্যানেজার বার ক'রে দেয়।"

"কী নাম ?"

"মিস গ্লোরিয়া বেনেট।"

"ঠিকানা ?"

"—নং কুন্ট্রাকার রোড। আমি গিয়েছিলাম সেই ঠিকানায়। গ্লোরিয়া বেনেটকে বাসায় পেলাম না কিন্তু তার ছবি দেখলাম। আর কোনো সন্দেহ নেই স্তর, জাল-নার্স সেজে সে-ই এসেছিল।"

"তাহলে তার জন্যে অপেক্ষা না ক'রে চলে এলে যে ?"

"অপেক্ষা করলে দেখা হবে জানলে কখনো আসতাম না !"

"তার মানে ?"

"কাল সন্ধ্যের পর বাসায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ থেকে লোক এসে নাকি গ্লোরিয়াকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে বলে গ্লোরিয়ার দিদি বলল। সে-ও সঙ্গে যেতে চেয়েছিল কিন্তু পুলিশের লোকটি বারণ ক'রে এবং গ্লোরিয়ার ভগ্নীপতি ফিরলে তাকে থানায় পাঠিয়ে দিতে বলে। গ্লোরিয়ার ভগ্নীপতি রেল-এ কাজ করে, কাল রাতে ফিরে ও অঞ্চলের থানায় গিয়েছিল কিন্তু সে থানার লোকজন দেখা গেল ও ব্যাপারের কিছুই জানে না। সেই রাতেই ভগ্নীপতি আশে-পাশের আর দুটো থানায় খবর করে এবং দু' জায়গাতেই দেখে যে গ্লোরিয়ার কোনো ব্যাপার থানার লোকের কেউ জানে না। রাতে বাড়ি ফিরে সে স্ত্রীর সঙ্গে জেগে গ্লোরিয়ার জন্যে অপেক্ষা করে এবং অবশেষে আজ সকালে ওদের অঞ্চলের থানায় ডায়েরী ক'রে কাজে চলে যায়। আমি যেতে সেই ডায়েরি-সংক্রান্ত তদন্ত বলেই প্রথমে মনে করেছিল গ্লোরিয়ার দিদি, এখন পর্যন্ত গ্লোরিয়া না ফেরায় সে প্রায় অন্নজল ত্যাগ করেছে এবং স্বামীকে এ অবস্থায় কাজে যাওয়ার জন্যে একপ্রস্থ গালাগালও করল আমার কাছে !"

"গ্লোরিয়া কী কাজ করে খবর নিয়েছো ?"

"হ্যাঁ, স্তর। নার্সিং শিখছিল। টাইপিস্টের কাজ করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বেশি বানান-ভুলের জন্যে কোথাও চাকরি রাখতে পারেনি।"

"কাল সকালে কখন বেরিয়েছিল গ্লোরিয়া, সে খবর নিয়েছো ?"

"হ্যাঁ স্তর। সকাল আটটায়।"

"কোথায় ? কী পোশাকে ?"

"কোথায়, ওর দিদি জানে না, শুধু নাকি বলে গিয়েছিল দেরি হবে ফিরতে। বেরিয়েছিল সাধারণ পোশাকে।"

"গ্লোরিয়ার ছবি নিয়ে এসেছো !"

"হ্যাঁ, স্তর !" বলে তাড়াতাড়ি নিজের টেবিলের উপর থেকে ফ্রেমে বাঁধানো একটা ফটো তুলে নিয়ে এল সরকার, "এই যে !"

ছবিটা কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করল গুপ্তভায়া, তারপর সরকারের হাতে ফেরৎ দিয়ে বলল, "এই ছবিটা ভালো ক'রে দেখিয়ে লোক বসিয়ে দাও গ্লোরিয়ার বাসার সামনে। গ্লোরিয়াকে দেখতে পেলেই যেন ফোন করে কিম্বা অসুবিধে থাকলে গ্লোরিয়াকে অনুসরণ ক'রে সুবিধে মত খবর দেয় দপ্তরে।"

"ইয়েস স্তর।"

সরকার চলে যেতে যাচ্ছিল ব্যস্ত হ'য়ে, গুপ্তভায়া ডেকে থামাল তাকে, "মিসেস ওয়ার্ডের হোস্টেলের কোনো খবর আছে ?"

"না, স্তর।"

সরকার বেরিয়ে যেতে নিজের চেয়ারে এসে বসল গুপ্তভায়া। ঠিক বসল না, বসবার চেষ্টা করতে লাগল। নানা কসরৎ ও ভঙ্গী ক'রে আয়েসে আরাম ক'রে এলিয়ে বসবার বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করে এবং খাড়া কাঠের চেয়ারে শেষ পর্যন্ত ঠিক সুবিধে করতে না পেরে করুণ নয়নে হতাশ ভাবে তাকাল আমার দিকে।

"জানো খাওয়াটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছে ? কাজের সময় লোভে পড়ে অতটা খাওয়া বোধহয় উচিৎ হয়নি।"

"অন্তত খাওয়ার আগে এ-ঘরে একটা ইজি-চেয়ারের ব্যবস্থা করা উচিৎ ছিল !"

"যা বলেছো।" ঠাট্টাটা গায়ে মাখল না গুপ্তভায়া, "আজ দেখছি আর কোনো কাজ হবে না। মোমিনপুর থেকে শর্মাকে ওর স্ত্রীর লাশটা দিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রে চলো আজকের মত ঘরে ফেরা যাক।"

প্রস্তাবটা মনঃপুতও হল আমার। নিজের বাড়ি ফেরার তাগাদা বিশেষ ছিল না, কাজেই গুপ্তভায়ার সঙ্গে ওর বাড়িতে গিয়ে ঘরোয়া আবহাওয়ায় এই মামলার কিছু আলোচনা বেশ ভালোভাবে করা যাবে ভেবে আমিও সায় দিয়ে উঠলাম, "তাহলে আর দেরি করছেন কেন ? উঠে পড়ুন !"

আর বলেই উঠে দাঁড়ালাম আমি।

"উঠছো কি ? উঠবো বললেই কি ওঠা যায় ? আগে শর্মার স্ত্রীর লাশের সৎকারের ব্যবস্থা করি—" বলে গুপ্তভায়া রিসিভার তুলে নিল ফোনের এবং প্রথমে শর্মাকে চাইল হোটেলে এবং তারপর মোমিনপুর মর্গের লাইন।

মোমিনপুরের মর্গের লাইনটাই পাওয়া গেল আগে এবং সেখানে কথা শেষ করতে করতে দাশ এসে ঢুকল ঘরে।

"সি-টি-ও থেকেই পেল ?"

"হ্যাঁ, স্তর।" বলে দাশ একটা টেলিগ্রামের ফর্ম এগিয়ে দিল গুপ্তভায়ার কাছে এবং হাতে নিয়ে সেটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে গুপ্তভায়া আমায় দিল সেটা দেখতে। পড়ে দেখলাম গত উনিশ তারিখের মিনতি সরকারের সেই টেলিগ্রামের মূল লিপি—মেয়েলি ছাঁদের লেখায় শর্মার কাছে যা শোনা গিয়েছিল হুবহু তাই।

গুপ্তভায়া ততক্ষণে দাশকে মোমিনপুরে গিয়ে লাশ দেবার ব্যাপারটা বুঝিয়ে ফেলেছে। দাশ ঘর থেকে বের হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার বেজে উঠল ফোন। অন্য প্রান্তে শর্মাকে অনুমান ক'রে বেশ তাড়াতাড়িই দপ্তর থেকে বের হবার আশা করতে না করতেই ভেঙে গেল ভুল। গুপ্তভায়ারও এ-দিকের দু'চারটে কথা কানে যেতেই শঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগলাম ক্রমশঃ।

"রাত ঠিক সাড়ে নটার সময় গঙ্গার ধারে গোয়ালিওর মনুমেন্টের কাছে ? হ্যাঁ-হ্যাঁ, কেল্লার ঠিক উল্টোদিকে না ? কোথা থেকে ? ঢাকুরিয়া ডাকঘর ? আচ্ছা ঠিক আছে—"

বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল গুপ্তভায়া। গুপ্তভায়ার মুখে ছাড়া-ছাড়া কথাগুলির হদিশ না করতে পারলেও আশঙ্কাজনক বুঝতে অসুবিধে হ'ল না।

"কী ব্যাপার ? কার ফোন ?"

উত্তরে হাত-ঘড়িটা একবার দেখল গুপ্তভায়া, তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "তাহলে সিনেমা যাওয়াই সাব্যস্ত হোলো ?"

"তার মানে ?"

"চলো, নিউ এম্পায়ারের ছবিটা দেখে নেওয়া যাক।"

"বাড়ি যাবেন বললেন ?"

"গিয়ে আর কী হবে ? এখনি পাঁচটার কাছাকাছি আর সাড়ে নটার সময় গঙ্গার ধারের এ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা তো শুনলে ? মাঝখানের সময়টুকুর জন্যে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় ? না পারব নিশ্চিন্তে বসতে, না পারব শান্তিতে একটু গড়াতে !

"কার সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট ?"

"রুক্মিণী কাউলের সঙ্গে ?"

"রুক্মিণী কাউল ?"

"হ্যাঁ, শ্রীমতী রুক্মিণী কাউল—আঠারোই রাত্তির থেকে যিনি নিখোঁজ !"

ছবি দেখে—আমি দেখে এবং গুপ্তভায়া কতক দেখে কতক ঘুমিয়ে এবং তারপর বেরিয়ে চা খেয়ে সেই ঘুম কাটিয়ে সেই সওয়া নটায় এসে দু'জনে হাজির হয়েছি গঙ্গার ধারে। এসে কেল্লার দিকের ফুটপাথে জীপ দাঁড় করিয়ে নেমে গোয়ালিয়র মনুমেন্টের আশপাশ একবার ভালো ক'রে সরজমিন তদন্ত ক'রে আবার এসে উঠে বসেছি জীপে এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে দু'জনে লক্ষ্য রাখছি চারিধার। কোনদিক থেকে রুক্মিণীর আবির্ভাব হবে কে জানে ?

দেখতে দেখতে সাড়ে ন'টা বাজল কিন্তু গোয়ালিয়র মনুমেন্টের ধারে কাছে কোথাও রাধা-রুক্মিণী-সত্যভামা দূরে থাক, ঘাটের মাঝি-মাল্লাদের দু'চার জনের চলা ফেরা ছাড়া জন-প্রাণীর দেখা নেই। শীত পড়তে শুরু করেছে, শহরের মধ্যে খুব শানিয়ে না উঠলেও গঙ্গার ধারে জোলো বাতাসের খোঁচা দিয়ে বেশ ভালোভাবেই জানান দিতে লাগল। শহরের মধ্যে ঘুরব জেনে গায়ে গরম বা ভারী জামাও কিছু চড়িয়ে বেরুইনি।

"আর কতক্ষণ ?" একটু কাতর ভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম গুপ্তভায়াকে কিন্তু গুপ্তভায়া উত্তর দেওয়া দূরে থাক, যেন শুনতেই পেল না কথাটা। চুপচাপ ব'সে থেকে থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার সামনের রাস্তা আর একবার পিছনের রাস্তা দেখতে লাগল। তারপর সামনের দিক থেকে মন্থরগতিতে একটা ট্যাক্সি আসতে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠে সোজা হয়ে বসল।

ট্যাক্সিটা আমাদের থেকে প্রায় গজ পঞ্চাশেক আগেই থেমে গেল। গঙ্গার ধারের নিষ্প্রভ গ্যাসবাতির আলোয় বোঝা গেল না ট্যাক্সি থেকে যে নামল সে পুরুষ না রমণী। ভাড়া মিটিয়ে ছেড়ে দিল সে ট্যাক্সি, ট্যাক্সিটা এগিয়ে আমাদের পেরিয়ে যাবার পরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার উপর, তারপর লোহার রেলিং-এর তলা দিয়ে গলে পোর্ট কমিশনার্সের রেল লাইন পেরিয়ে গঙ্গার ধারে যাবার সময় হঠাৎ সমস্ত রাস্তা কাঁপিয়ে আর্তনাদ করতে করতে এগিয়ে আসা একটি বিরাট লরির হেডলাইটের ক্ষণকালের আলোয় ভালো ক'রে দেখা গেল তাকে—শাড়ি সালোয়ার নয়, স্কার্ট-পরা একটি মেয়েকে। "এই কি রুক্মিণী ?" জিজ্ঞাসা করলাম গুপ্তভায়াকে। "চলো, নেমে দেখা যাক"—বলতে বলতে গুপ্তভায়া নেমে পড়ল জীপ থেকে। আমিও তাড়াতাড়ি নেমে এসে দাঁড়ালাম ওর পাশে। দু'-একটা গাড়ি কাটিয়ে তারপর রাস্তাটা সবে পেরিয়েছি এমন সময় হঠাৎ কানে এল গুলির আওয়াজ আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটি নারীকণ্ঠের চীৎকার !

"কুইক !"

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, গুপ্তভায়ার গলার আওয়াজে চমক ভাঙতে তাকিয়ে দেখলাম রেলিং পেরিয়ে গুপ্তভায়া তখন রেল-লাইনের ওপারে পৌঁছে গিয়েছে দৌড়ে। আমিও দৌড়লাম এবং গুপ্তভায়াকে লক্ষ্য ক'রে অকুস্থানে পৌঁছুতে বোধ হয় পনেরো সেকেণ্ড লাগল না আমার।

গোয়ালিয়র মনুমেন্টের থেকে গজ বিশ-বাইশ দূরে মাটির উপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে সেই মেয়েটি। কাছাকাছি একটা গ্যাস লাইটের তেরছা আলো এসে পড়েছে মেয়েটির উপর এবং সেই আলোয় দেখা গেল বাঁদিকের বুকের উপরটাকে সে চেপে ধরেছে দু'হাতে আর চেষ্টা করছে উঠে দাঁড়াবার। আমরা সাহায্য করবার আগেই উঠে দাঁড়াবার শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে ঘুরে পড়ে গেল মেয়েটি।

"দেখি কোথায় লেগেছে গুলিটা ?" মেয়েটিকে ধরে উঠে বসাতে বসাতে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল গুপ্তভায়া আর মেয়েটি ওর দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে হাঁপাতে লাগল ভীষণ জোরে।

"আমি পুলিশ ইনসপেক্টর গুপ্তভায়া ! ভয় পাবার কিছু নেই"—তাকে আশ্বস্ত করতে বলে উঠল গুপ্তভায়া আর শুনে মেয়েটির ফ্যালফ্যাল চোখে যেন হঠাৎ ঝিলিক দেখা গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বাঁহাতে বুক চেপে ধরে ডানহাতটা বুক থেকে সরিয়ে আনল মেয়েটি এবং রক্ত দেখা গেল বুকে এবং ডানহাতের মুঠিতে। রক্তাক্ত তালুটা একবার চোখের সামনে টেনে নিয়ে দেখল মেয়েটি তারপর হাতটা আমাদের দিকে তুলে ধরে ভয়ার্তকণ্ঠে বলে উঠল, "রক্ত !"

"কে মারল গুলি ? কোত্থেকে এল ? কোনদিকে গেল ?" ব্যস্ত হয়ে আবার প্রশ্ন ক'রে উঠল গুপ্তভায়া।

"ওরা !" হাঁপাতে হাঁপাতে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলে উঠল মেয়েটি, "খালি জানতাম, ওরা আমায় মেরে ফেলবে !"

"ওরা কারা ?" গুপ্তভায়া অধিকতর ব্যস্ত হয়ে উঠল।

"ওরা—" বলে গুপ্তভায়ার উপর ভর দিয়ে আরো একটু উঠে বসল মেয়েটি, তারপর রক্তাক্ত ডানহাত দিয়ে ধরল স্কার্টের পাড়টা এবং আস্তে আস্তে টেনে তুলল হাঁটুর উপরে। ডানহাতটা মনে হ'ল অসাড় হয়ে আসছে তার এবং হাঁপানি যেন বেড়ে গেল আরো আর বুকটা ভেসে যেতে লাগল রক্তে। "বলো রুক্মিণী, ওরা কারা ?" গুপ্তভায়া অস্থির হয়ে প্রশ্ন করল আবার।

"বলছি, বলছি—" বলে ডানহাত বাড়িয়ে আবার স্কার্টটা ধরে টান দিল মেয়েটি এবং ঊরুর অর্ধেকের বেশি উন্মুক্ত ক'রে ফেলল। স্কার্টটা আরো উপরে তোলবার জন্য আবার একটা চেষ্টা করল কিন্তু পারল না, উপরেই হাতটা রয়ে গেল তার।

"ওরা কারা ? বলে যাও, ওরা কারা ?" অধৈর্য হয়ে চীৎকার ক'রে উঠল গুপ্তভায়া। উত্তরে ডানহাতটা একবার নড়ে উঠল মেয়েটির তারপর পড়ে গেল মাটিতে।

"রুক্মিণী ! রুক্মিণী !" যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল গুপ্তভায়া এবং ওর সেই আকুলতার উত্তরেই বুঝি একবার মুখটা ঊর্ধ্বে তুলে ধরল মেয়েটি, ধীরে ধীরে বলল, "আমার নাম রুক্মিণী নয়, আমার নাম মিনতি সরকার—"

আর তারপরই মাথাটা ঝুঁকে পড়ল, রক্তাক্ত বাঁ-হাতটা খসে পড়ল বুক থেকে, শরীরটা এলিয়ে গেল গুপ্তভায়ার কোলে।

"মিনতি ! মিনতি !" একটা হতাশ-স্বর বেরিয়ে এল

গুপ্তভায়ার মুখ থেকে। যেটুকু বা সন্দেহ ছিল গুপ্তভায়ার ঐ-স্বর শোনার পর আর বুঝতে বাকি রইল না আমার যে সারা দুনিয়া আর হাজার মাথা খুঁড়েও আর সাড়া পাবে না কোনোদিন মেয়েটির ঐ নিস্পন্দ দেহের কাছে।

মেয়েটিকে ধীরে ধীরে ঘাসের উপর শুইয়ে দিল গুপ্তভায়া, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল চারদিক। গুলির আওয়াজে লুঙ্গি-পরা মাল্লাজাতীয় দু'টি লোক উঠে এসে দাঁড়াল ঘাটের দিক থেকে। তাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল গুপ্তভায়া কাউকে তারা নেমে যেতে দেখেছে কি না সেদিক দিয়ে। ঘাসের উপর ভূ-লুণ্ঠিত রক্তাক্ত মেয়েটিকে দেখে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, গুপ্তভায়া তাদের দিকে এগিয়ে যেতে প্রথমে পিছিয়ে যাবার চেষ্টাও করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশের খাকি পোশাক দেখে ভরসা পেয়ে উত্তর দিতে শুরু করল গুপ্তভায়ার প্রশ্নের, না, তারা দেখেনি এবং ঘাটের বা আশেপাশের জলের দিকে কেউ গেলে নিশ্চয়ই নজরে পড়ত তাদের কেন না ঘাটের উপরেই তারা বসেছিল।

"তা হলে গঙ্গার দিকে নয়—" বলতে বলতে তাদের দিক থেকে আমার দিকে ফিরল গুপ্তভায়া, "পূর্ব বা উত্তর দিকেও নয় কেন না ঐ দিকগুলি দিয়ে ছুটে আসছি আমরা—দক্ষিণ দিকেই ত পালিয়েছে আততায়ী।"

"এবং আমরা আসবার আগেই। আমরা এসে কাউকে পালাতে দেখিনি।" উত্তেজিত ভাবে আমিও বলে উঠলাম।

"এবং এসেছেও বোধ হয় সে দক্ষিণ দিক থেকে"—বলে গুপ্তভায়া আবার ফিরল সেই লোকগুলির দিকে, "কোনো লোককে এখানে একটু আগে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছো তোমরা?"

উত্তরে লোক দু'টি জানাল, হ্যাঁ, একটু আগে দু'জন লোককে ঐ মনুমেন্টের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে তারা দেখেছে, দূর থেকে লোক দু'জনের চেহারা বা পোশাকে তারা ঠিক বুঝতে পারেনি। ওদের মনে হয়েছিল লোক দু'জন কাউকে খুঁজতে এসে না পেয়ে চলে গিয়েছে।

দক্ষিণ দিক থেকে এই সময় দু'জন লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল আমাদের দিকে। একটু কাছে আসতেই তাদের আর চিনতে অসুবিধে হ'ল না এবং তাদের দেখে আমরা যত না, আমাদের দেখে তারা যেন তার চেয়ে অনেক বেশিই চমকে গেল। এই সময় এই স্থানে আমাদের বোধ হয় তারা একেবারেই আশা করেনি এবং তাই ধরা-পড়া এবং চমকে যাওয়া ভাবটা আর গোপন করতে পারল না দু'জনের একজনও; লেঃ কর্ণেল শুক্লা ও শর্মার মধ্যে কেউ-ই।

"লেফটেনেন্ট কর্ণেল শুক্লা এবং মিষ্টার শর্মা!" কঠিন কণ্ঠে তাদের সম্বোধন ক'রে বলে উঠল গুপ্তভায়া, "ঠিক এই জায়গায়, এই অবস্থায় আমাদের বোধ হয় আশা করেননি?"

"সত্যিই করিনি।" শুক্লাই প্রথম সামলে নিয়ে উত্তর করল, "কিন্তু কী ব্যাপার?" বলতে বলতে দু'পা এগিয়েই দ্বিতীয় বার চমকে উঠল সে ঘাসের দিকে তাকিয়ে, "এ কী? মহিলাটি খুন না জখম?"

"সে—প্রশ্নের আগে ভালো ক'রে দেখুন তো—মহিলাটিকে চিনতে পারেন কি না?" বলে শুক্লার থেকে শর্মার দিকে ফিরল গুপ্তভায়া, দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন, মিষ্টার শর্মা। "আপনিও এগিয়ে আসুন, দেখুন একবার"—

শর্মা গুটি গুটি এগিয়ে এল, ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছে তার মুখ। শুক্লা ইতিমধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে এবং লক্ষ্য করবার চেষ্টা করছে মেয়েটির মুখ। শর্মা এগিয়ে এসে গ্যাসের আলোটা ঢেকে দাঁড়াতে অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে না পেরে পকেট থেকে একটা সিগারেট-লাইটার বার করে জ্বালিয়ে ধরল শুক্লা এবং তারপর সেই আলোয় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখতে লাগল এবং তারপরই তৃতীয় বার বুঝি চমকে উঠল, "কী সর্বনাশ!"

"তা হলে চিনতে পেরেছেন?"

গুপ্তভায়ার কথার উত্তর না দিয়ে শুক্লা তাকাল শর্মার দিকে এবং শর্মাকেই বলে উঠল, "ছাখো তো, তোমার স্ত্রীর বন্ধু সেই মিসেস সরকার না? তোমার বিয়ের দিন দেখেছিলাম"—

শর্মা ধীর কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ,"—আর তারপর আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে দেখল ঘাসের উপর।

জীপের বাঁ দিকের কোটরে একটা টর্চ আছে, নিয়ে এসো তো"—আমার দিকে ফিরে বলল গুপ্তভায়া, শুনে আমি চলে আসতে আসতে আবার ওকে বলতে শুনতে শুনলাম শুক্লা, ও শর্মার উদ্দেশে "আপনারা আসতে আসতে কাউকে যেতে দেখেছেন ওদিক দিয়ে?"

শুক্লা বা শর্মা কী উত্তর দিল শোনা হল না, টর্চ নিয়ে এসে দেখলাম একটি সিপাই কোথেকে এসে হাজির হয়েছে অকুস্থলে এবং গুপ্তভায়া তাকে বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পুলিশের রেডিও-ভ্যান ধরতে বলে দিচ্ছে।

সিপাইটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মাল্লা গোছের লোক দুটিও গুটি গুটি যাবার চেষ্টা করছিল, গুপ্তভায়া তাদের ধরে শুক্লার পাশে দাঁড় করিয়ে দিল এবং পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করবে ভয় দেখিয়ে দিল এমন, যে খুনীর আসামীর অধম চেহারা ক'রে দাঁড়িয়ে রইল দু'জন যেন অতি-প্রত্যাশিত ফাঁসির হুকুম শোনবার জন্য। [ক্রমশঃ।

তিমিঙ্গিল

মলয়জ শীতলম

তিমিদের বিষয়ে বাজারে যে-সব গাঁজাখুরি গালগল্প চালু আছে তার পরিমাণ মন্দ নয়। আর থাকবে নাই-বা কেন? এমনধারা অনেক কথা শুনেছি যে, তিমিরা নাকি জলের ভেতরে থপাৎ-থপাৎ করে অন্য মাছদের ধরে খায় বলে ওদের পেটের ভেতরে জল ঢুকে যায়। আর সেই জলটা মাথার ওপরের একটা ছ্যাঁদা দিয়ে ভোঁ-ভোঁ করে ছাড়ে। এ ধারণা ভুল। আরেক ধরণের চলতি আইডিয়া হল এই যে, একটা তিমি অন্য আরেকটা তিমিকে দেখতে পেলেই তাকে খাবার জন্যে তাড়া করে। এহ বাহ্য—এটাও একটা গাঁজা।

আসলে সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, সব তিমিদেরই দাঁত নেই। তিমিরও রকমফের আছে। কোনো তিমির দাঁত থাকে, আবার কোনো তিমির দাঁত থাকে না। যাদের দাঁত থাকে না, তাদের বলা হয় ব্যালীন-তিমি কিংবা হোয়েলবোন-তিমি, কেননা দাঁতের বদলে ওদের থাকে হোয়েলবোন, অর্থাৎ ব্যালীন। ব্যালীন কিন্তু হাড় নয়। ওটা একটা ডিম্বাকৃতি কচি শিঙএর মতো জিনিস। অজস্র সরু সরু সমান্তরাল কাঁটা দিয়ে তৈরী। এই কাঁটার প্রান্তভাগটা মসৃণ আর ঈষৎ বাঁকা। তাহলে এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কি করে ওরা খায়। সে বড়ো আজব দেশের কাণ্ড। তিমির (ব্যালীন) যখন ক্ষিদে পায় তখন ওরা চিংড়িমাছ জাতীয় প্রাণীদের কোনো ঝাঁকের খোঁজে থাকে। ঝাঁকটি দেখতে পেলেই খুব বেগে তার মধ্যে দিয়ে চলে যায়। যাবার সময় মুখটাকে হাঁ করে খুলে রাখে। ব্যাস, সেই ঝাঁকের অধিকাংশই ঢুকে যায় তার পেটে। অথচ জল ঢুকতে পায় না পেটের ভেতরে। তার কারণ এই যে, এক টন ওজনেরও বেশী থসথসে জিভটাকে ওরা তুলে ধরে থাকে যাতে জলটা ঢুকে আবার বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে, যাতে জলটা পেটের ভেতরে না সেঁধিয়ে যায়। ছোটো খাবার দাবার খায় বলে দাঁতহীন তিমির কণ্ঠনালিও ছোটো। সমুদ্রের বেশীর ভাগ তিমিই, আর দীর্ঘকায় তিমিগুলোই দাঁতহীন। সুতরাং বেশীর ভাগ তিমিই বড়ো জিনিস কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেয়ে নিতে পারে না। নিদন্তের তিমির মধ্যে যেগুলোর সঙ্গে নাবিকদের সাধারণতঃ পরিচয় ঘটে থাকে, সেগুলো হল গ্রে তিমি, বোহেড তিমি, হাম্পব্যাক তিমি, ফিনব্যাক তিমি, সালফারবটম তিমি, রাইট তিমি ইত্যাদি। সবগুলোকে দেখতে তা বলে একই রকম নয়, সাইজও একই রকম নয়। সবচেয়ে বড়ো হয় নীলচে রঙের সালফারবটম তিমি। একশো-পঁচিশ ফিটেরও বেশী হয়। বুকে গলায় প্রায় সত্তর আশীটা খাঁজ থাকে। পিঠে থাকে একটা ছোট্ট ডানা। সন্তরণাঙ্গগুলো হয় প্রায় আট ফিট লম্বা। আর্কটিক ছাড়া সব সমুদ্রে পাওয়া যায়। বোহেডগুলোর মুণ্ডুটা গোলপানা। থাকে কেবল আর্কটিকে। এরা প্রায় ষাট ফিট পর্যন্ত হয়। এদের ব্যালীন চোদ্দ ফিটের চেয়েও লম্বা হতে পারে। রঙটা এদের কালচে। রাইট তিমিগুলো পঞ্চাশ ফিট পর্যন্ত হয়। ব্যালীন হয় প্রায় সাত ফিটের। মারলে পরে ভেসে ওঠে বলে এর নাম "রাইট"—অর্থাৎ ঠিক। গ্রে তিমি হয় পঁয়তাল্লিশ ফিটের। বুকে গলায় দুটি কি তিনটি খাঁজ থাকে। এশিয়া-আমেরিকার তীরে এদের বাস। হাম্পব্যাক পঞ্চান্ন ফিট পর্যন্ত হয়। সন্তরণাঙ্গ হয় প্রায় পনের ফিটের। ব্যালীন এদের কালচে। ফিনব্যাক তিমিই পাওয়া যায় বেশী। পঁচাত্তর ফিটের ছুঁচালো চেহারার এই তিমিগুলোর পিঠটা ধূসর, পেটটা শাদা। আর্কটিক-এর সমুদ্র ছাড়া সব জায়গায় পাওয়া যায়। এসব ছাড়াও অনেক রকমের ব্যালীন তিমি হয়। যেমন শাদা-তিমি, যার গল্প শুনে মেলভিল লিখেছিলেন 'মবিডিক'; যেমন ঠোঁটওয়ালা তিমি এবং আরো কত কি।

দাঁতওয়ালা তিমির ব্যাপার আবার আলাদা। তাদের বেশ বড়ো-বড়ো দাঁত থাকে। সেই দাঁত দিয়ে ওরা মাছ কিংবা অক্টোপাসের মতো নরম স্কুইড খায়। দাঁতওয়ালা তিমির মধ্যে সবচেয়ে বিরাটাকার হল স্পার্ম-তিমি। সত্তর ফিটের চেয়েও বড়ো হয় এরা। মুণ্ডুটা ভীষণ বড়ো আর চারচৌকো। চুয়াল্লিশটা দাঁত থাকে এদের। স্পার্ম তিমির গায়ে এতো চর্বি থাকে যে, ওদের গায়ের একটা জায়গার নাম 'তেলের ট্যাঙ্ক'। বট্‌লনোজ তিমির কিন্তু স্রেফ চারটে দাঁত থাকে। এরা প্রায় পঁচিশ ফিটের হয়। মুখটা ছুঁচালো বলে এর নাম বট্‌লনোজ। সবচেয়ে ভয়ানক দাঁতের সারি থাকে কিলার তিমির। কাউকে পরোয়া করে না কিলার তিমি, এক স্পার্ম তিমি ছাড়া। এরা যখন দলবেঁধে ঘোরে তখন কোনো প্রাণী সেখান দিয়ে যায় না। এরাই হল আসল তিমিঙ্গিল—অন্য তিমিকে গিলে না ফেললেও, ছিঁড়ে খেয়ে নিতে পারে। কিলার তিমিরা যে গোষ্ঠীর তার নাম ডেলফিনিডা। সেই গোষ্ঠীর সব তিমিই দাঁতওয়ালা। কিন্তু তাদের মধ্যে এক কিলার ছাড়া অন্য কেউ পঁচিশ ফিটের বেশী হয় না। দাঁতওয়ালা তিমির কণ্ঠনালী চওড়া। মানুষকে গিলে খেয়ে ফেলতে পারে। তবে তিমির পেটে ঢুকে মানুষ বেশীক্ষণ বাঁচবে না। কেন না, দম বন্ধ হয়ে যাবে।

হাজার-হাজার বছর আগে তিমিরা ডাঙায় ঘুরে বেড়াতো। কিন্তু একদিন ওরা নেমে গেল জলে। কেন গেল তা কেউ জানে না। ডাঙায় যখন হাঁটতো তখন ওদের চারটে পা ছিল। জলেতে নেমে

সে-পা অদৃশ্য হয়ে গেল। চেহারাখানা মাছের মতো হয়ে গিয়ে পেছনের পা ছুটো একেবারেই অদৃশ্য হল। সামনের পা ছুটো রূপান্তরিত হল সন্তরণাঙ্গতে—যার আরেক নাম পাখনা।

অর্থাৎ তিমিরা মাছ নয়। একটা তিমি বেশীক্ষণ জলের নীচে থাকলে মানুষের মতোই মরে যাবে। একটা মাছ বেশীক্ষণ জলের ওপরে থাকলে মরে যাবে। মাছেরা কানকো দিয়ে নিঃশ্বাস নেয়। তিমিরা নিঃশ্বাস নেয় নাক দিয়ে। যখন জলের নীচে গোত্তা দেয় তিমিরা তখন নাকটাকে বন্ধ করে নেয়। বুকের ভেতরে যে হাওয়াটা থাকে, সেটা বেশ গরম হয়ে ওঠে। তারপর হাওয়া ছাড়বার সময়ে যখন ওপর দিকে ওঠে তখন বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে এসে সেটা জমে যায়, জমে মেঘের মতো হয়ে যায়। সেইটা দেখেই অনেকের মনে হয় তিমি বুঝি নাক দিয়ে জল ছুঁড়ছে। শীতকালে হাঁ করে প্রশ্বাস ফেললে আমরাও অমন করতে পারি। তা ছাড়া, মাছের সঙ্গে তিমির আরও প্রভেদ। মাছের রক্তের তাপ জলের তাপের সঙ্গে বদলাতে থাকে। তিমির সব সময়ে একই থাকে। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্যে ঋতু অনুযায়ী ওরা স্থান বদলায়। আমরা যেমন ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে জামা পরি, তিমিদের তেমনি চামড়ার নীচেই আছে মোটা একখানা চর্বি পরত। এই চর্বির নাম ব্লাবার। যে তিমি যতো ঠাণ্ডা জলে থাকে, তার ব্লাবার ততো মোটা। এই ব্লাবারের লোভেই তিমি শিকার বেড়ে চলেছে।

সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবের দেহেই চুল থাকে। তিমির সারা গায়ে না থাকলেও কয়েক স্থানে লোম থাকে—মাথায়, দাড়িতে ইত্যাদি। স্রেফ চুল থেকেই বলা চলে যে, কোনো এক সময়ে তিমিরা স্থলচর ছিল। জলের ওপর দিকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্বাস ফেলতে হয় বলে ওদের নাকের ছিদ্র মাথার ঠিক ওপরে। কিন্তু তিমির নাসারন্ধ্র গন্ধ আহরণে ব্যবহৃত হয় না। গন্ধ ওরা পায় না। কানের পাতাও তিমির নেই। না থাকলেও অসুবিধে হয় না। শব্দ বহন করার জন্যে জল জিনিসটা অতি সুন্দর। কানের ছিদ্রটি একটা বোনার কাঁটার মতো সরু। চোখগুলো ছোট্ট। কি বিরাট প্রাণী, তার কি ছোট্ট চোখ। তিমিরা কাঁদে না। না-কাঁদলেও, চোখটাকে নোনতা জল থেকে বাঁচাবার জন্যে একটা গ্ল্যাণ্ড থেকে সব সময়ে চোখের ওপরে একরকম তেল গড়ায়।

মাছেরা ডিম পাড়ে। তিমিরা বাচ্চার জন্মের পরে বাচ্চাদের দুধ খাইয়ে বড়ো করে তোলে। দুধটা শাদা কিন্তু স্বাদটা কষাটে। বাচ্চা ওদের সাধারণতঃ দুবছর অন্তর হয়। একবারে একটাই হয়, অবশ্য অনেক সময়ে দুটো হতেও দেখা গেছে। বাচ্চারা মায়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বাচ্চারা যদি সামান্যতম আঘাত পায়, তাহলে তার মা সামনে যাকে পাবে ভেঙে চুরমার করে দেবে।

তিমির লেজখানা চ্যাপ্টা, যাকে বলে হরাইজন্টাল। মাছের লেজ লম্বাটে, অর্থাৎ ভার্টিকাল। লেজেতে আর পাখনায় ব্লাবার ঠাসা। পাখনা দিয়ে সাঁতার কাটে, ব্যালান্স রাখে কিংবা মোড় ঘোরে অথবা ওপরে ওঠে। লেজ দিয়ে সামনে দিয়ে এগিয়ে যাবার গতি পায়।

ওদের পেটের ভেতরটা অন্য স্তন্যপায়ীদের সঙ্গে খুব বিশেষ মেলে না। স্তন্যপায়ীদের দেহের সাধারণতঃ একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিমির পেটের ভেতরে প্রায় পাঁচ-ছয়টা ঘরের অস্তিত্ব দেখা যায়। লিভারে আবার ওদের পিত্তকোষ নেই।

জন্তু-জানোয়ারদের অধিকাংশই দল বেঁধে ঘুরতে ভালোবাসে। তিমিরাও তাই। অনেক সময়ে একশো-দুশোটা তিমি দল তৈরী করে ঘুরে বেড়ায়। একসঙ্গে থাকা কালে নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি ওদের হয় না। অবশ্য কখনও-কখনো কোনো সুন্দরী নায়িকার জন্যে এক-আধটা ডুয়েল ঘটে থাকে। স্পার্ম. তিমি ছাড়া অন্য কোনো তিমিই হঠাৎ আঘাত করেনা। আঘাত করলে তবেই প্রত্যাঘাত করে। স্পার্ম তিমি কোনো অবলা নৌকো পেলে একটু মজা করতে ভালোবাসে। মানুষের পক্ষে সে-মজা নেহাত সুবিধের নয়।

তিমিরা যখন প্রশ্বাস ছাড়ে—ইংরেজীতে যাকে বলে ব্লো করা—তখন প্রচণ্ড একটা শব্দ হয়। আগেকার কালে এই আওয়াজ শুনে অনেকে মনে করত তিমিরা বুঝি তর্জন-গর্জন করে। আসলে কিন্তু তা নয়। আওয়াজ ওরা করে না। কিন্তু আওয়াজ না করেও—কথা না বলেও—কি করে যে ওরা ভাবের আদান প্রদান করে, তা আজও অজানা। অন্যান্য অনেক জীব-জন্তু যেমন ঘুমোয়, তেমন তিমিরাও ঘুমোয়। জলের নীচে কিন্তু ঘুমোয় না। কারণ জলের নীচে ঘুমোলে ডুবে মরে যাবে। জলের ওপর-ভাগে নাকটিকে বের করে ঘুমোয়। ঘুমোবার সময়ে নিজেদের বেশ ব্যালান্স করে রাখতে হয়। জলের নীচে ওরা খুব বেশীক্ষণ থাকে না। ব্যালীন তিমিদের খাদ্য জলের ওপর ভাগেই থাকে বলে ওদের বেশীক্ষণ থাকতে হয় না। ব্যালীন তিমি পনেরো মিনিট থেকে আধঘণ্টাটাক জলের নীচে থাকে। দাঁতওয়ালা তিমিকে একটু নীচে নামতে হয়, কেন না ওদের খাবার নীচেদিকেই থাকে। অনেক সময়ে খাবারের সঙ্গে আবার যুদ্ধ করতে হয়—যেমন স্কুইডদের সঙ্গে। স্পার্ম তিমি আর জায়ান্ট স্কুইডের লড়াই হয় দেখবার মত। বিরাট জায়ান্ট স্কুইড তার একগাদা অঙ্গ দিয়ে সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরে তিমিকে। দাঁতওয়ালা তিমি কামড়ে-কামড়ে সে-বাঁধন খোলে। দাঁতওয়ালা তিমিকে তাই এক ঘণ্টা পর্যন্ত জলের নীচে থাকতে হয়। কিলার তিমি থাকে সীল মাছের খোঁজে, তাই ওরা আরও একটু বেশীক্ষণ থাকতে পারে। সমুদ্রের অতল গহ্বর পর্যন্ত নেমে যেতে পারে তিমিরা। একবার গোঁত্তা মেরে দুহাজার ফিট পর্যন্ত যেতে পারে। ওই হাজার-হাজার ফিট জলের নীচে কিছুই হয় না ওদের। প্রচণ্ড জলের চাপ সহ্য করতে পারে তিমিরা। দেহটা ওদের তেমনি ভাবেই গড়া।

তিমির কোনো শত্রু নেই। ব্যালীন তিমির শত্রু আছে একটি মাত্র। সে হল কিলার তিমি। কিলার তিমির শত্রু কেবল মানুষ। মানুষ তাই তিমিঙ্গিল।

তিমি-শিকারের পদ্ধতি যেমন উন্নত পর্যায়ে উঠছে, তিমির সংখ্যাও তেমনি কমছে ক্রমশঃ। আগে নৌকোয় চেপে তীর আর বর্শা গেঁথে তিমি মারা হত। সেই জন্যে তীরের কাছাকাছিই ধরপাকড় চলত। হাম্পব্যাক তিমি তখন মরত বেশী। তারপর জাহাজে চড়ে মারা আরম্ভ হল। হার্পুণ, অর্থাৎ তিমি মারার বর্শাটাকে কামানের সঙ্গে আটকে দেওয়া হল। এখনকার অনেক জাহাজে তিমি মেরে তার তেল বের করা আর মাংস ছাড়ানোর সব আধুনিক বন্দোবস্ত থাকে।

কিন্তু যে-রেটে তিমি মারা আরম্ভ হয়েছে, শেষে একদিন হয়ত তিমি দেখার জন্যে মানুষকে যাদুঘরে যেতে হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

শিক্ষার মূল লক্ষ্য যদিও জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান সম্প্রসারণ, কিন্তু অর্থ পায়ের কথাটিও পাশাপাশি এসে থাকে। বাঁচবার জন্যে মানুষকে সংগ্রাম দিতে হয় আজীবন—প্রতি পদক্ষেপে টাকাকড়ি তার চাই-ই। লেখাপড়া শিখে অর্থ রোজগার করতে হবে, এ প্রায় ধরা বাঁধা কথা। আর তাই যেখানে সত্যি সে অবস্থায় বৃত্তিমূলক বা কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকার্য্য।

সব মানুষই একই ধাঁচের হয় না, গুণ ও কর্মক্ষমতার বিভিন্নতা থাকবেই বলা চলে। সাধারণ শিক্ষার দিকে যাদের ঝোঁক, তারা সে ভাবে নিজেদের গড়ে তুলুক, আপত্তির কিছু নেই, কিন্তু গোড়া থেকেই একটা বৃত্তি ঠিক করে নিয়ে ট্রেনিং গ্রহণ করলে আরও বোধ হয় ভালো হয়। যে বৃত্তিটি পছন্দসই হবে এবং যার অবলম্বনে পয়সাও আসবে ভবিষ্যতে, সেই বৃত্তির ওপরই জোর দিতে হবে।

একটা কথা ঠিক, আমাদের সমাজ বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এখনও সে পর্য্যায়ে পৌঁছে নি, যাতে যে-মানুষটি যে বৃত্তি বা পেশার উপযুক্ত, কার্য্যক্ষেত্রে সেইটি তার জুটে যাবে। বরং অনেক ক্ষেত্রে এর উল্টোটি দেখতে পাওয়া যায়, আর এর ফলে নির্দ্দিষ্ট কাজ আশানুরূপ সুষ্ঠু ভাবে হয়ে ওঠেনা। অগ্রসর দেশগুলোতে বিশেষ ভাবে রাশিয়ায় এক্ষেত্রে বিধি-ব্যবস্থা বেশ কিছুটা অন্য রূপ। সেখানে কার পক্ষে কোন্ বৃত্তি গ্রহণ করলে যথোচিত কাজের হবে, এইটি আগে থেকে ভালোরকম যাচাই করে তবেই কাজে লওয়া হয়। বৃত্তিমূলক বা পেশাদারী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করে যে কোন দেশের সরকারই বেকার সমস্যা সমাধানে এমনি তৎপর হতে পারেন।

আজকাল অবশ্য সকল দেশেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর কম'বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন, আমেরিকা, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশে তো বটেই, স্বাধীনোত্তর ভারতেও অসংখ্য ট্রেনিং কেন্দ্র খোলা হয়েছে, এই একটি লক্ষ্য থেকেই। দেশের বিভিন্ন'অঞ্চলে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতির সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি নানাবিধ কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্র, পলিটেকনিক সংস্থাও স্থাপিত হয়ে চলেছে এখানে সেখানে, সংখ্যায় যা কম হবে না। হাতে-কলমে কাজ জানা থাকলে, কোন একটা বিশেষ লাইনে পারদর্শী হলে, বেকার হয়ে থাকার প্রশ্নটি স্বতঃই অনেকটা গৌণ হয়ে পড়ে। জাতীয় সরকারকেই উদীয়মান তরুণদের সামনে সে সুযোগ তুলে ধরতে হবে, সাধারণ শিক্ষা লাইনে যাদের যাওয়ায়, তারা ছাড়া অন্যরা যাতে কোন বৃত্তিমূলক বা পেশাদারী শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হয়, এই দিকে মনোযোগ দেওয়া চাই। প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে রেখে শিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে—ট্রেনিং নিতে চেয়ে উদ্যমশীল কাউকে যেন বিমুখ হতে না হয়, সেটা দেখা প্রয়োজন।

সর্ব্বশেষ কথা—কে কোন্ লাইনে গেলে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারবে, কার পক্ষে কোন বৃত্তি বা পেশাটি হবে উপযুক্ত, গোড়াতেই এইটি ধরতে পারলে ভালো হয়। অভিভাবক ও শিক্ষকগণ একটু নিবিড় নজর রাখলে এটা-ওটার মাধ্যমে ছেলের মনের খবর মোটামুটি টের পেয়ে নিতে পারেন। আর এ যদি সম্ভব হয়ে গেলো, তা হলে সেই ছেলেকে ঠিক লাইনটি ধরিয়া দেওয়াই সঙ্গত। বৃত্তিমূলক শিক্ষার মূল্য যে কত বেশি, সে বিষয়ে নিয়মিত প্রচার আলোচনার ব্যবস্থা হলেও ফল ভালো ছাড়া খারাপ হবে না।

চা-পাতা থেকে ওষুধ

লতা-গুল্ম ও গাছ-গাছড়া থেকে নানা রকমের ওষুধ তৈরী হয়, এদেশে তো বটেই, অন্য সব দেশেও। আগেকার দিনে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থায় এই ছিল প্রধান অবলম্বন। বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষ আজ নানাভাবে ওষুধপত্র তৈরী করছে, কিন্তু তবুও বলতে হবে, গাছ-গাছড়ার দাম কমে যায়নি। গবেষণায় এখনও কত নতুন ভেষজ তৈরী হতে পারে, এই থেকেই, যার দ্বারা মানুষের হয়ত হবে অশেষ কল্যাণ।

গাছ-গাছড়া থেকে ওষুধ তৈরীর ব্যাপারে গবেষণা যে চলেনি, এমন নয়। সংবাদে জানা যায় যে, আজকের দিনে অন্ততঃ সোভিয়েট ইউনিয়নে এতৎ সংক্রান্ত গবেষণা প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। চা-পাতায় উত্তম পানীয় তৈরী হয়, এটা সকলেরই জানা বটে, কিন্তু চা-পাতা থেকেও মানুষের কল্যাণের জন্যে ওষুধ তৈরী করা চলছে, সংবাদটি নিঃসন্দেহে নতুন। চা-বাগান থেকে চায়ের পাতা সংগ্রহের পর সাধারণতঃ ভালো পাতাগুলো বাছাই করে নেওয়া হয় পানীয় চা তৈরীর জন্যে। বাকি যেসব মন্দ পাতা আর ডাঁটা ইত্যাদি পড়ে থাকে, রকমারী ওষধ তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলোই।

চা-পাতার পরিত্যক্ত অংশ থেকে এই যে উপজাত ভেষজ বা

রাসায়নিক তৈরী হচ্ছে, তার মধ্যে প্রধান হলো 'ক্যাফিন'। স্নায়ুতন্ত্রের ক্লান্তি দূর করার কাজে, হৃদযন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির কাজে এবং সাধারণ ভাবে শ্বাসক্রিয়াকে সহজ করার কাজে 'ক্যাফিন' নাকি বেশ সুফল দেয়। চা-পাতা থেকেই থিয়োফিলিন ওষুধ তৈরী হয়, আন্ত্রিক রোগ নিরাময়ে যা একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় ওষুধ বলে গণ্য হয়েছে।' শুধু তাই কেন, নানা রকমের ভিটামিন ইত্যাদিও এই পরিত্যক্ত চা-পাতা থেকে তৈরী হয়।

ভারতে এই দিকটিতে এখনও খুব বেশি গবেষণা চলেছে বলা যায় না, অথচ এখানে এর সুযোগ হতে পারে অনেক অধিক। এদেশে চা-এর অভাব নেই, বিপুল পরিমিত চা এখান থেকে বরং রপ্তানী হয়ে যায় অন্য দেশে। সংবাদে প্রকাশ, জর্জিয়ার অন্তর্ভুক্ত আজারিয়ান স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বাতুমিতে একটি বিরাট কারখানা আছে, যেখানে একমাত্র বাতিল চা-পাতা থেকে 'ক্যাফিন' ও অন্যান্য ভেষজ তৈরী হয়। ইউরোপে ঐ ধরণের কারখানা এখন অবধি আর নেই বলেই জানা যায়। বাতুমির কারখানাটিতে তৈরী ওষুধ সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের চাহিদা মেটানো ছাড়াও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও ইউরোপের বাইরেও রপ্তানী হয়ে যাচ্ছে।

বর্জি চা থেকে আরও কিছু নতুন ওষুধ তৈরী করা যায় কিনা, সোভিয়েট গবেষকরা তা ভেবে দেখছেন। ইতোমধ্যে ভিটামিন-সি তৈরীর একটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে—যা সবুজ চা-পাতা থেকে সরাসরি উৎপন্ন ভিটামিন-সি'র মতোই নাকি গুণসম্পন্ন। পরিত্যক্ত চা-পাতা থেকে 'ক্যাফিন' বের করে নেবার পর যে উদ্বৃত্ত তরল পদার্থটি পড়ে থাকে, তার থেকেই সামান্য খরচে ভিটামিন-সি বের করে নেওয়া হয়। এ দেশের সরকার বিষয়টির দিকে পর্য্যাপ্ত নজর দিতে পারেন নিশ্চয়ই এবং চা-পাতা ও অন্য দেশে জিনিস থেকে নতুন ভেষজ তৈরী করা যায় কি না, সেজন্যে উৎসাহও জোগাতে পারেন। আর ঠিক ভাবে উদ্যম চালানো হলো কিছু-না-কিছু সুফল মিলবেই, এটুকু অনায়াসে বলা চলে।

পরিবার পরিকল্পনা—কয়েকটি কথা

আজকের দিনে পরিবার পরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে প্রচার-অভিযান চলেছে একরূপ সর্বত্র। ভারতবর্ষে এই বিশেষ দিকটায় জাতীয় সরকার বিশেষ জোর দিয়েছেন—যার লক্ষ্য জনসংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা। আয় অনুযায়ী ব্যয় যেমন হওয়া দরকার, তেমনি পরিবারের কয়টি লোক থাকলে বাঁধা-ধরা আয়ের মধ্যেও চলা যাবে, সংসারজীবনের সূচনাতেই সেইটি ভাবতে বলা হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার সুকঠিন খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্ম নানা পরিকল্পনা নিয়েছেন। পরিবার পরিকল্পনাটিও সেই সব অভিনব পরিকল্পনারই অঙ্গ বলা চলে। সমস্যা এতে কতদূর সমাধান হয়েছে কিম্বা হবে বলে আশা করা যায়, সে এখনই বলা দুষ্কর। তবু দাবী নিয়ে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে—পরিবার পরিকল্পনার নাম করে পল্লী অঞ্চলে যতটা না হোক, সহরাঞ্চলে জন্মনিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, আগের তুলনায় বেশ বেশী।

ভারতে জনসংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে, তার পাশাপাশি একই অনুপাতে খাদ্যোৎপাদন বাড়ানো সম্ভব কি না, বিশেষভাবে ভাববার। সরকারী অভিমত অবশ্যি এই যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি নামিয়ে না আনা যায়, তা হলে কোন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাতেই স্থায়ী সুফল মিলবে না। এই ধরে নিয়েই তাঁরা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালেই পরিবার পরিকল্পনার কাজেও নেমে যান। সেই কাজ আজ বহু দূর সম্প্রসারিত হয়েছে—রাজ্যে রাজ্যে খোলা হয়েছে বিস্তর পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র। পরিবার পরিকল্পনা জন্মনিয়ন্ত্রণের নামান্তরমাত্র, সরকার এইটি স্বীকার করতে চান না। বস্তুতঃ, তাঁদের মতে পরিবার পরিকল্পনার একমাত্র উদ্দেশ্য সন্তান-প্রজনন রোধ করা—এরূপ ধারণাই মস্ত ভুল। যে পরিবারের সন্তান নেই, সেই স্বামী-স্ত্রীর যাতে সন্তান জন্মায়, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে তার জন্যেও ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়ে থাকে। কেমন করে বিবাহিত জীবন প্রত্যাশিত সুখের হতে পারে, স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্যরক্ষা (শারীরিক ও মানসিক) কিভাবে সম্ভবপর, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলোতে সে-সবও শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ভাবে পরিবার পরিকল্পনার মূল বক্তব্য ও দাবী ছড়িয়ে দিতে চাইছেন দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরসমূহ।

ক্ষুদ্রায়তন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আলোচ্য পরিকল্পনা অনুসারে কতটা কী কাজ চলেছে, পর্য্যালোচনা করে দেখা যাক। ১৯৪৭ সালে জনসংখ্যা ছিল আড়াই কোটির মতো। তারপর দেশ বিভাগের পরিণতিতে নতুন জন্মের প্রশ্ন বাদ দিয়েও লোকাগমন হয়েছে অর্দ্ধ কোটির কম হবে না। মোটের ওপর, ১৯৬১ সালের আদম সুমারীর হিসাবে দেখা গেলো এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন কোটিরও অধিক। আয়তনের তুলনায় ভারতের মধ্যে জনসংখ্যা সবচাইতে বেশি কেরলে আর পশ্চিমবঙ্গেই; কাজেই এখনকার সমস্যাও অন্য রাজ্যের তুলনায় বৃহৎ।

আলোচ্য সমস্যার দিকে নজর রেখে রাজ্য সরকার সহর ও গ্রামাঞ্চলের সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে তথ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে চলেছেন। ইতোমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কেন্দ্র খোলা হয়েছে প্রায় দেড় শতটি। এই সকল কেন্দ্রের বেশির ভাগই পরিচালিত হচ্ছে সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। বিভিন্ন হাসপাতালে প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার করার যেমন ব্যবস্থা হয়েছে, তেমনি গর্ভনিরোধক সরঞ্জাম ব্যবহার করার ট্রেনিংও দেওয়া হচ্ছে বহু জায়গায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনাটি একটি বিশেষ স্থান পেয়েছে, এটাও লক্ষ্য করবার।

তবুও সর্বশেষে একটি কথা বলতে হবে—পরিবার পরিকল্পনা বা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম বলে অনেকেই এটাকে ভয়ের চক্ষে দেখে থাকেন। রক্ষণশীল যারা, তাদের দৃষ্টিতে এখনও এ একটি ধর্মবিরোধী কাজ হিসাবেই গণ্য। সরকারী অব্যাহত প্রচেষ্টা ও প্রচার-অভিযান সত্ত্বেও সকল মহলে ব্যাপারটি সম-মনোযোগের সঙ্গে গৃহীত হচ্ছে না। পরিকল্পনার প্রত্যাশিত সাফল্যের পক্ষে এটা কিন্তু বড় রকমের প্রতিবন্ধক। সহজ কথায়, পরিকল্পনাটিকে সম্যক্ জনপ্রিয় করে তুলতে চাইলে, জাতির মঙ্গলের দিক থেকে এ কার্য্যকরী করা অপরিহার্য্য বিবেচিত হলে সমাজের মনোভাব বা চিন্তাধারা পাল্টানোই সকলের আগে প্রয়োজন।
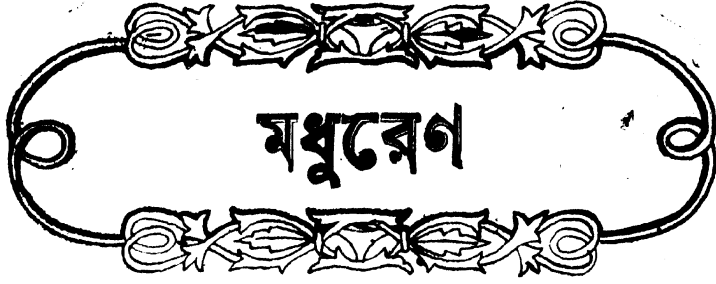
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বিনতা রায়

Sc. 72

জীমূতের বাড়ী। ড্রইংরুমে ছুটো কৌচে বসে হাসছে মণিকা আর অনুসূয়া।

অনু। হ্যাঁ, খুব তো হাসছিস. বাপী এলে কি বলবি? সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গাড়ীর আওয়াজ শোনা যায়—

মণি। (লাফিয়ে উঠে পড়ে) চল্ চল্—বাইরে যাই তুজনে ছুটে বাইরে যায়।
Cut

Sc. 73

জীমূত গাড়ী চালিয়ে নিয়ে গেট দিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়ায় বাড়ীর সামনে। দরজা খুলে নেবে আসে কৃষ্ণ, বিরূপাক্ষ, জীমূত। ড্রাইভার ছুটে গিয়ে ক্যারিয়ার খুলে নাবিয়ে আনে শিকার করা মরা পাখীর ঝাঁক।

মণি। (হাততালি দিয়ে ছেলেমানুষের মতো) ওরে বাবা:, কততো পাখী শিকার করেছেন মেসোমশাই, সকালে অনুকে নিয়ে পোষ্ট-অফিসে গেলাম বাড়ীতে টেলিগ্রাম করতে, তারপর ফিরে এসে অবধি ছটফট্ করছি, কখন আপনারা ফিরবেন। আজ আমি রাঁধবো।

কৃষ্ণ। (খুসী হ'য়ে হা হা ক'রে হেসে ওঠে) খেতে পারবো তো?

মণি। (কোমরে আঁচল জড়ায়) দেখুন না পারেন কি না।

কৃষ্ণবিহারী মণির পিঠে সস্নেহ চাপড় দেয়। তাকায় অনুসূয়ার দিকে। হাসিমুখে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ মনে পড়ে যায় জীমূতের কথা। কটমট্ ক'রে তার দিকে একবার তাকিয়ে নিজের মনে বলে—

কৃষ্ণ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলো—এ: আমার অমন শিকারটা—

বলতে বলতে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে যায়। মণিকা আড়চোখে অনুসূয়ার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসে। অনুসূয়া ভালমানুষের মতো মুখ ক'রে তার দিকে তাকায়।
Desolves

Sc. 74

রাত্রি। রণধীপ একটা বই হাতে নিয়ে ইজিচেয়ারে বসে আছে। পেট্রোম্যাক্সের নীচে বসে ছুরী দিয়ে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে আর গুনগুন ক'রে গান গাইছে বুদ্ধ। চোখ তুলে একবার রণধীপকে লক্ষ্য করে। হাতের বই হাতেই ধরা, রণধীপ চিন্তিত মুখে চেয়ে আছে সিলিং এর দিকে।

বুদ্ধ। আবার কি হ'ল?

রণ। কাল অনুসূয়ার জন্মদিনে কি করি বল তো?

বুদ্ধ। কি মুস্কিল। তা নিয়ে আর ভাবছো কেন? বললাম তো সব ব্যবস্থা আমি করবো।

রণ। যদি ধরা পড়ে যাই?

বুদ্ধ। আমার ব্যবস্থা নিখুঁত হবে, ধরা পড়া না পড়া তোমার ওপর। নাও আর ভাবতে হবে না, এখন খাবে চলো। (তরকারীর ঝুড়ি ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়) কথায় বলে, আগে মাকে খুসী করো, তারপরে মেয়ের দিকে এগোও। তা মেয়ের বাপকে একটু খুসী করতে পারলে না?

রণ। আরে তুই বুঝবি কি? একি শুধু বাপ। একেবারে বাপ রে বাপ। (উঠে পড়ে)

বুদ্ধ। আচ্ছা দেখা যাক না—বুদ্ধ র বুদ্ধির সঙ্গে কে পারে—

তুজনে এগোয়
Desolves

Sc. 75

জীমূতের বাড়ী। ড্রইংরুমে বসে আছে সুসজ্জিতা অনুসূয়া, মণিকা, কুশলা। হাজারিবাগে কৃষ্ণবিহারীর নব পরিচিত মি: চ্যাটার্জি এবং কৃষ্ণবিহারী বসে একটা বড় কৌচে। এক পাশে বসে আছে বিরূপাক্ষ, তার পাশে বসে ছটফট করছে বিচ্ছু।

অনু। আজ কিছু একটা ক্যারিকেচার করবে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় বিচ্ছু।

কুশলা। (হাসতে হাসতে) বাবা:, একেবারে তৈরী ছিল।

ঠিক এমনি সময় সুদাম আর একটি ভৃত্য গোঁফ দাড়িওয়ালা—সরবতের ট্রে নিয়ে ঘরে এসে ঢোকে। বিচ্ছু বিরক্ত হয়ে তাদের দিকে তাকায়।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ, একটু সরবৎ খেয়ে নিয়ে আজকের প্রোগ্রাম সুরু করা যাক।

ভৃত্যবেশী রণধীপ ট্রে নিয়ে কৃষ্ণবিহারীর সামনে দাঁড়ায়। কৃষ্ণ একটা সরবতের গ্লাস তুলে মি: চ্যাটার্জির হাতে দেয়, একটা নেয় নিজে।

Cont. তুমি নতুন এসেছো?

রণধীপ মাথা নেড়ে জবাব দেয়—হ্যাঁ। রণধীপ যায় বিরূপাক্ষর সামনে। বিরূপাক্ষ এক গ্লাস সরবৎ তুলে নিয়ে ঘ্রাণ করে।

বিরূ। জীমূতবাবু কোথায় ?

রণধীপ ইসারায় জানায় সে জানে না।

Cont. তুমি কথা বলতে পারো না !

রণধীপ ইসারায় জানায়, না। ঠিক এমনি সময় জীমূত এসে ঘরে ঢোকে হাতে একটা গয়নার বাক্স। অনুসূয়ার সামনে গিয়ে বলে—

জীমূত। এক মিনিট, একটু এদিকে এসো তো—

অনুসূয়া ওঠে। তাকে নিয়ে জীমূত ঘরের একটা কোণে গিয়ে দাঁড়ায়। বাক্সটা হাতে দিয়ে বলে—

Cont. সামান্য জিনিষ, দেখো তো পছন্দ হয় কিনা—

অনুসূয়া বাক্সটা খুলতেই দেখা যায়, জড়োয়ার নেকলেস একটা।

অনু। বাঃ, কি চমৎকার, সামান্য কি, এ তো দারুণ দামী জিনিষ।

বাক্সটা পাশের টেবিলে রেখে নেকলেসটা তুলে নিয়ে গলায় পরতে যায় অনুসূয়া, বাধা দেয় জীমূত।

জীমূত। আমি পরিয়ে দিই—

অনু। (অত্যন্ত সহজভাবে) দাও।

ইতিমধ্যে সুদাম খাবারের প্লেট সাজানো ট্রে নিয়ে সবার সামনে দিয়ে ঘুরছে, ভৃত্যবেশী রণধীপ ঘুরছে সরবতের ট্রে নিয়ে। জীমূত নেকলেস হাতে অনুসূয়াকে পরাবার জন্যে তার পেছনে যেতেই চট্ করে সে গিয়ে উপস্থিত হয় অনুসূয়ার সামনে। জীমূত ধমকে ওঠে—

জীমূত। এ্যাই, এখন যাও এখান থেকে।

সযত্নে নেকলেস-এর হুকটা আটকাতে থাকে। রণধীপ কিন্তু নড়ে না, অনুসূয়া অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকায়। রণধীপ বোকা বোকা মুগ্ধচোখে চেয়ে থাকে তার দিকে। মুহূর্তকাল সেদিকে তাকিয়েই চিনতে পারে অনুসূয়া, তার মুখ-চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে মৃদু হাসি। রণধীপও গোঁফের ফাঁকে একটু হেসে সরে যায় সেখান থেকে। জীমূত সামনে ঘুরে এসে মুগ্ধচোখে চেয়ে বলে—

Cont. চারমিং, অপূর্ব মানিয়েছে।

অনু। (হেসে) চলো, সবাই অপেক্ষা করছেন।

দুজনে এগিয়ে যায় জীমূত গিয়ে বসে বিরূপাক্ষর পাশে। অনুসূয়া তার পূর্বের আসনে গিয়ে বসে।

মণি। হ্যাঁ, এইবার সুরু কর বিচ্ছু।

বিচ্ছু সঙ্গে সঙ্গেই সুরু করে দেয় ক্যারিকেচার। সবাই হাসতে থাকে, শেষ হ'লে সপ্রশংস হাততালি দেয় সকলে।

কুশলা। এইবার অনুসূয়া একটা গান গাও।

অনু। আমার গান তো শুনেইছিস, আজ গাইবে মণি, গীতশ্রী মণিকা সেন।

মণি। তা গাইবো, তুই সঙ্গে বাজা—

দুজনে উঠে পড়ে। অনুসূয়া গিয়ে বসে পিয়ানোর সামনে একটা গদী মোড়া টুলে, পাশে দাঁড়ায় মণিকা।

গান সুরু হয়।

ক্যামেরা অনুসূয়া আর গানরতা মণিকাকে দেখিয়ে, এগিয়ে গিয়ে থামে কৃষ্ণবিহারী এবং চ্যাটার্জির সামনে। দুজনের মুখেই প্রশংসার ভাব। ক্যামেরা সরে গিয়ে থামে বিরূপাক্ষ আর জীমূতের সামনে।

জীমূত। (মুগ্ধভাবে) এমন বাজনা না হ'লে কি গান খোলে ?

বিরূ। ঠিক বলেছেন।

এদিকে রণধীপ আস্তে আস্তে পেছন দিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় পিয়ানোর বিরাট খোলা ঢাকাটার পেছন দিকে। নিজেকে আড়ালে রেখে দাঁড়ায় অনুসূয়ার মুখোমুখী।

কৃষ্ণ আর চ্যাটার্জিকে দেখা যায়। কৃষ্ণ বলে—

কৃষ্ণ। এককাপ কফি হ'লে মন্দ হতো না। আপনি খাবেন তো ?

চ্যাটার্জি। আপত্তি কি ?

কৃষ্ণ নিঃশব্দে উঠে পড়ে এদিক ওদিক তাকায়।

কৃষ্ণ। বেয়ারাগুলো গেল কোথায় ?

এগিয়ে যায় কৃষ্ণবিহারী। রণধীপ হাতের ট্রেটা নাবিয়ে রেখেছে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে অনুসূয়ার দিকে। গান শুনে মাঝে মাঝে প্রশংসায় মাথা নাড়ছে। হঠাৎ বাতাসে গোঁফটা উড়ে নাকের ভেতর সুড়সুড়ি দেয়, সাবধানে নাকটা ঘষে নিয়ে আবার গান শুনতে থাকে, আবার গোঁফটা ফুরফুর ক'রে উড়ে নাকে সুড়সুড়ি দেয়। বিরক্ত হয়ে টান মেরে গোঁফটা খুলে ফেলে পকেটে রাখে, যন্ত্রণার মুখটা বিকৃত করে। পাগড়ীটাও খুলে রেখে দেয় সামনে।

হঠাৎ দূর থেকে কৃষ্ণবিহারীর নজর পড়ে সেদিকে। রণধীপকে চিনতে দেরী হয় না তাঁর। রাগে চোয়াল দুটো শক্ত হ'য়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত ঘষে পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় ঠিক রণধীপের পেছনে। একবার তাকায় রণধীপের দিকে আর একবার তার পাগড়ীটার দিকে।

পাশে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে টের পেয়ে রণধীপ খোসমেজাজে বলে—

রণ। একটা সরবৎ দে—

দাঁতে দাঁত চেপে কৃষ্ণবিহারী ট্রে থেকে এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

ঢকঢক্ ক'রে সরবৎটা খেয়ে নিয়ে গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরে রণধীপ।

কৃষ্ণবিহারী তেমনি ভাবেই হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা টেনে নিয়ে রেখে দিয়ে রাগে কাঁপতে থাকে।

Cont. কেমন শুনছিস রে সুদাম ?

সুদাম ভেবে কৃষ্ণবিহারীর পিঠে চাপড় দিতে গিয়ে রণধীপের মাথা ঘুরে যায়। মুহূর্তকাল হাঁ ক'রে চেয়ে থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে সুরু ক'রে দেয়।

কৃষ্ণ ছোটে তার পেছনে　　Cut

Sc. 76

হলের বাইরে বারান্দা। সেখান দিয়ে ছুটে চলেছে রণধীপ। পেছনে ছুটছে কৃষ্ণবিহারী।

ছুটতে ছুটতে সামনেই চৌধুরীর ঘরটা দেখে তারই ভেতর ঢুকে পড়ে রণধীপ।　　Cut

Sc. 77

চৌধুরীর ঘর। ছুটে ভেতরে এসে ঠকঠক ক'রে কাঁপছে রণধীপ। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকে বাঘের মতো মুঠো ক'রে ধরে কৃষ্ণবিহারী রণধীপের দাড়িটা, হ্যাঁচকা টানে সেটা খুলে ফেলে।

কৃষ্ণ। (রক্তচক্ষু হ'য়ে) ইউ রাস্কেল।

রণ। কি বলছেন ?

কৃষ্ণ। (রাগে কাঁপতে কাঁপতে) বুঝতে পারছো না ?

রণ। আজ্ঞে না।

কৃষ্ণ। পারবে, স-ব বুঝতে পারবে, আমার দোনলা বন্দুকের দু-দুটো গুলি যখন এক সঙ্গে গিয়ে বিঁধবে বুকে।

রণদীপ দুই হাতে বুকটা চেপে ধরে। কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বাইরে গিয়ে দরজাটা টেনে দিতে দিতে বলে—

Cont. আপাততঃ বন্দী থাকো এই ঘরে। ফাঁসন শেষ হ'লে তুমিও শেষ হবে।

বিস্ফারিত চোখে দরজার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে রণদীপ। তার মুখের ওপর দরজায় শেকল তুলে দেওয়ার আওয়াজ আসে। হাঁ করে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে। হাত দুটো মুঠো ক'রে ছটফট্ করে ঘোরে ঘরের এদিক ওদিক। হঠাৎ বাইরে থেকে শেকল খোলার আওয়াজ শুনে থমকে থামে, তারপর ছুটে যায় ঘরের কোণে দাঁড় করানো এ্যালকওটার কাছে। হ্যাঙ্গারে ঝোলানো রয়েছে কৃষ্ণ বিহারীর ড্রেসিংগাউন। সেই খুঁটের মাথায় পরানো একটা টুপী। রণদীপ ঢুকে পড়ে গাউনটার ভেতর মুঠো করে চেপে থাকে বুকের কাছটা। মাথার ওপর টুপীটা ঝুলে পড়েছে চোখ পর্যন্ত। গাউনের কলারটা ঠেলে তুলে দিয়েছে কান অবধি। চোখ দুটি খোলা, যেটা বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয়।

ঘরে এসে ঢোকে জীমূত আর অনুসূয়া।

অনু। একি অমন জরুরী তলব দিয়ে ডেকে আনলে কেন ?

জীমূত। অতিথিরা তো চলেই গেছেন—

অনু। তা তো গেছেন, কিন্তু তুমি কি বলতে চাইছো ?

জীমূত। (বিহ্বল কণ্ঠে) আমি তোমাকে যা বলতে চাই—মানে, ধাত্রীপান্না যেমন উদয়কে ভাল—

অনু। কি !

জীমূত। না, মানে লর্ড বায়রণ যেমন বিয়াত্রিসকে চেয়েছিলেন—

অনু। বায়রণ নয়, গ্যেটে।

জীমূত। ওই একই হ'ল। বিদ্যাপতি যেমন রামীকে—

অনু। চণ্ডীদাস।

জীমূত। কেন বাধা দিচ্ছ—মানে দেবদাস—

অনু। উপমা থাক্, যা বলবে সোজা বাংলায় বলো।

জীমূত। (কাঁদো কাঁদো ভাবে) আমার যে বাংলা ভাল আসে না—

অনু। (গম্ভীর মুখে) হিন্দিতে বলো।

জীমূত। (ঝপ কোরে অনুর হাতটা ধরে ফেলে) হাম্-ম্যয়-হাম তুমকো বহুত বহুত—

অনু। বুঝেছি। (আস্তে নিজের হাতটা টেনে নেয়) জগতে যে যেখানে আর একজনকে যেমন করে ভালবেসেছিলো, তুমি তাদের সবার থেকে বেশী সিরিয়স। এই তো বলতে চাও ?

জীমূত। (গদগদ ভাবে) ঠিক তাই। একমাত্র তুমি ছাড়া আমাকে আর কেউ এমন ভাবে বুঝতে পারতো না।

বিহ্বল দৃষ্টিতে জীমূত চেয়ে থাকে অনুসূয়ার দিকে হঠাৎ অনুসূয়ার নজরে পড়ে ড্রেসিং গাউনের নীচে দুটো পা। ভয়ে আঁতকে সে চেঁচিয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে রণদীপ ড্রেসিংগাউনটা ফাঁক করে তার মুখটা দেখায়।

Cont.—কি কি হল ?

অনু। না, কিছু না।

অনুসূয়ার চিৎকার শুনে দ্রুত ঘরে এসে ঢোকে কৃষ্ণবিহারী।

কৃষ্ণ। কি হ'ল মা ?

অনু। না, বাপী, মনে হ'ল বাথরুমের চৌকাঠের ওদিকে একটা ব্যাং !

কৃষ্ণ। (হা হা ক'রে হেসে ওঠে) খোলামেলা যায়গা, আশ্চর্য কি ? দে আমার ড্রেসিংগাউনটা, ধড়াচুড়োগুলো ছেড়ে ফেলি।

কোট খুলে টাইটা খুলে ফেলতে যায় কৃষ্ণবিহারী। ভয়ে অনুসূয়ার মুখ শুকিয়ে যায়।

অনু। (একটা ঢোঁক গেলে) না বাপী, আগে ব্যাংটা তুমি তাড়িয়ে দাও, এক্কেবারে বার করে দাও বাগানে।

কৃষ্ণ। (হাসতে হাসতে) আচ্ছা আচ্ছা, আমার মেয়ে হ'য়ে ব্যাং দেখে ভায় পায়—

বলতে বলতে এগিয়ে যায় বাথরুমের দিকে।

অনু। (আব্দারের ভঙ্গীতে) তুমিও যাও জীমূতদা, আমার বড্ড ভয় করে।

জীমূত। (অনিচ্ছাসত্বেও এগোতে গিয়ে) তা যাচ্ছি, কিন্তু তুমি আমাকে অমন দাদা দাদা বলো কেন ?

অনু। (রাগে দাঁতে দাঁত চেপে) আঃ যাও না—

জীমূত হেট্ হেট্ করতে করতে চলে যায় বাথরুমের ভেতর। অনুসূয়া ছুটে গিয়ে কাচের জানলাটা খুলে রণদীপকে ইসারা করে। রণদীপ নিমেষের মধ্যে ছুটে গিয়ে লাফ দিয়ে জানলা টপকে বাইরে পড়ে। Cut

Sc. 78

জানলার বাইরে একফালি বারান্দা। তার অপর প্রান্তে বসে সুদাম আর বৃন্ধ খোসগল্প করতে করতে বিড়ি টানছিল। হঠাৎ জানলা দিয়ে রণদীপকে বাইরে পড়তে দেখে বৃন্ধ বলে ওঠে—

বৃন্ধ। দা-বাবু! দেখি আবার কি বিপদ হ'ল—

দুজনেই হাতের বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে আসে।

Cont. কি হ'ল ?

রণ। পালাতে হবে

সুদাম। কিন্তু পালাবেন কি করে, বাইরে সাঁওতাল পাহারা রয়েছে যে—

বৃন্ধ। ঠিক আছে, চট্ ক'রে একটা জুতোর কালো কালি নিয়ে আয়।

রণ। তার মানে, তুই কি আমাকে জুতোর কালি মাখাবি নাকি ?

বৃন্ধ। প্রশ্ন করো না', যা করি চুপচাপ দ্যাখো।

সুদাম ছুটে চলে যায়। Cut

Sc. 79

চৌধুরীর ঘর। কৃষ্ণ আর জীমূত এসে ঢোকে। কৃষ্ণবিহারী সার্ট ছেড়ে ফেলে, অনুসূয়া গাউনটা পরতে সাহায্য করে—

অনু। ব্যাংটা চলে গেছে বাপী ?

কৃষ্ণ। আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ। ব্যাং কি করবে? আচ্ছা—আমি যাই, ডাক্তার একা বসে আছে।

চলে যায় কৃষ্ণবিহারী। এগিয়ে আসে জীমূত।

জীমূত। অনুসূয়া, অনু, আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। বিশ্বাস করো, ওই রণধীপ মিত্তিরের চেয়ে অনেক বেশী।

অনুসূয়া। তা আমি বুঝি জীমূতদা। কিন্তু একটা কথা কি জানো? এই কিছুদিন আগে, বাপী এক জ্যোতিষীকে দিয়ে আমার কোষ্ঠী বিচার করিয়েছেন। আমাকে ভালবেসে যে বিয়ে করতে চাইবে তার ভালবাসার কথা উচ্চারণ করার পর রাত্তিরও বাদ্ দ না। মৃত্যুদূত দেখা দেবেই।

অনুসূয়ার এই কথাটির সঙ্গে সঙ্গে জানলা দিয়ে একটা কালো বীভৎস মূর্তি মুখ বাড়িয়ে চেয়ে থাকে জীমূতের দিকে। জীমূতের দৃষ্টি সেদিকে পড়তেই থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে সে।

জীমূত। (ভাঙ্গা বিকৃত গলায়) এ্যাঁ—তবে, তুমি কি বলছো? জীমূত আবার তাকায় জানলার দিকে। কিছুই দেখতে পায় না।

Cont. অনু, অনুসূয়া, তোমাকে না পেলে—

ভয় ভয় তাকায় জানলার দিকে, আবার বেরিয়ে আসে সেই মুখটা।

Cont. (প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে) আর যদি না ভালবাসি, ধরো কোনোদিন বাসিনি—মানে ওসব কথাই বলিনি—

আবার তাকায় জানলার দিকে। কিছুই নেই সেখানে।

অনু। (চূড়ান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে) কি হ'ল তোমার? মাথা খারাপ নাকি?

জীমূত। না না, আমি মরতে চাই না। আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।

বলতে বলতে পেছন ফিরে কাঁপতে কাঁপতে দরজার দিকে যায়। অনুসূয়া মুখ টিপে একটু হেসে জানলার দিকে এগোতে যায়, হঠাৎ কালো মূর্তিটা আবার মুখ বাড়াতেই চমকে চিৎকার ক'রে ওঠে—

অনু। বাপী—ভূত—(ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে থাকে)।

কালিমাখা রণধীপ কিছু একটা বলতে যায়। কিন্তু ততক্ষণে কৃষ্ণ, বিরূপাক্ষ, মণিকা, কুশলা সবাই ছুটে আসে। জীমূত দরজা ঘেঁসে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

Cont. বাপী—ভূত—

বলতে বলতে অজ্ঞান হ'য়ে যায়। কৃষ্ণ আর বিরূপাক্ষ তাড়াতাড়ি তাকে ধ'রে শুইয়ে দেয় খাটের ওপর। মনিকা কুশলা ছুটে যায় কাছে, কেউ পাখা নিয়ে বাতাস করে, কেউ চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দেয়।

কৃষ্ণ। ডাক্তার—একজন ভালো ডাক্তার চাই—

বিরূ। এই তো আমি আছি স্যর—

কৃষ্ণ। না না, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। রোগ সারা দূরের কথা, নতুন নতুন সিমটম দেখা দিচ্ছে। কোথাও কিছু নেই ব্যাং দেখছে, ভূত দেখছে, এ সব মনের আতঙ্ক ছাড়া আর কি? বড় ডাক্তার চাই—

জীমূত। এখানে চেঞ্জে এসেছেন ডাঃ সেন। মস্ত বড় ডাক্তার। আমি এখুনি তাঁকে নিয়ে আসছি।

ছুটে বেরিয়ে যায় জীমূত।

বিরূ। দেখুন, আপনি তিনমাস সময় দিয়েছিলেন, তা এখনো তো—

কৃষ্ণ। সাট আপ, আর তিন দিনও অপেক্ষা করবো না আমি

বিরূ। একটা ইনজেকসন দিই?

কৃষ্ণ। (চিৎকার ক'রে) No, No, কিছু করতে হবে না

ইতিমধ্যে অনুসূয়া একটু চোখ খোলে—

অনু। জল—

কৃষ্ণবিহারী ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। ম্যাণ্টলপিসের ওপর গ্লাস ঢাকা দেওয়া ছোট কাচের কুঁজো থেকে গ্লাসে জল ঢেলে নিয়ে আসে।

কৃষ্ণ। খেয়ে নে মা, কিছু ভাবিস নে, মস্ত ডাক্তার আসছে।

বিরূ। (হতাশ ভাবে) উঃ—(চেয়ে থাকে অনুসূয়ার দিকে)

বাইরে গাড়ী থামার শব্দ শোনা যায়। সবাই উৎকর্ণ হ'য়ে তাকায় সেদিকে। একটু পরেই ডাঃ সেন জীমূতের সঙ্গে ঘরে এসে ঢোকে। জীমূত তাঁর ব্যাগটা রাখে টেবিলের ওপর। একটা চেয়ার টেনে দেয় সসম্ভ্রমে। ডাক্তার সেন চেয়ারে বসে অনুর নাড়ী ধরে হাতঘড়ির দিকে চোখ রাখে।

ডাঃ সেন। জ্ঞান তো ফিরেছে দেখছি। (হাতটা নাবিয়ে রেখে) হ্যাঁ, পথে আসতে আসতে জীমূত বাবুর কাছে এঁর অসুখ সম্পর্কে যতটুকু শুনলাম, তাতে আমি মনে করছি এঁর সঙ্গে আমার একটু একলা কথা বলা দরকার। আপনারা—

কৃষ্ণ। ও সিওর, আমরা বাইরে যাচ্ছি, চলো চলো সবাই।

সকলকে নিয়ে কৃষ্ণবিহারী বেরিয়ে যায়　　Cut
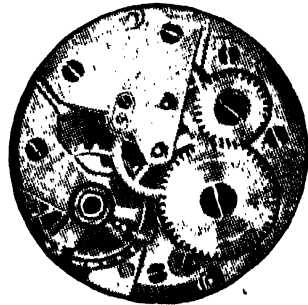
[ক্রমশঃ।

জীবন-শিল্পী

শিবানী কুণ্ডু

কথাটা মিনতির কানে একদিন যে উঠবে, এটা জানাই ছিল সৌরাংশুর। তাই মিনতি যেদিন জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি নাকি এক অভিনেত্রীর সঙ্গে মিশছো আজকাল?" সে দিন স্পষ্ট উত্তর দিলে সৌরাংশু, "তাতে ক্ষতি কি?" পরে যেন জবাবদিহি করলো নিজের কাছেই, "অভিনয় তার পেশা নয়, আসলে সে ছাত্রী আজও।"

বাঁকা চোখে কটাক্ষ করলো মিনতি, "তোমার ছাত্রী বুঝি?"

অবজ্ঞাভরে হাসলো সৌরাংশু, "তোমার প্রশ্ন করা ভুল হয়েছে মিনতি। আমি যার সঙ্গে মিশি সে অভিনেত্রী এবং সে আমার ছাত্রী কি না, এর জবাব নেবার মত অধিকার তোমার আজও জন্মায়নি, তাই উত্তর দিতেও আমি বাধ্য নই।"

কথাটা বলেই কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল সৌরাংশু। মিনতির কথার মধ্যে যে ইঙ্গিতই থাক, উত্তরটা এমন করে না দিলেও চলতো। কারণ লোকচক্ষে তাদের সম্পর্কের স্বীকৃতি না থাকলেও মিনতির অধিকারবোধকে সৌরাংশুই যে প্রশ্রয় দিয়েছে এটা তার চেয়ে বেশী কে জানে! তবু এটাকে অস্বীকার করতে পারলেই যেন আজ বাঁচে সৌরাংশু। মিনতি তাদের পাশের বাড়ীর মেয়ে, তাদের গ্রামের মেয়ে, এটুকুও না জানলেও যেন ভাল ছিল আজ।

না। মিনতিকে সে কোনদিন ভালবাসেনি। তাকে সে চিনতো। অন্তত আজ তাই মনে হচ্ছে। মিনতিকে সে শুধু চেনে। আর কিছু না।

নিতান্ত গরীব, নিম্নতম কেরাণীর তৃতীয়া কন্যা, রূপে ও সজ্জায় যেমন হয়, মিনতি ঠিক তেমনি। সদ্য বিবাহ নদী পার হওয়া বড় বোনের হাত-ফেরতা রঙচটা জামা-কাপড় তার শ্যাম অঙ্গে, দু'হাতে কয়েকগাছি কাচের চুড়ি। সাজের বাহুল্যের মধ্যে মুখে পাউডারের হাল্কা প্রলেপ, কালো ডাগর চোখের কোণায় কাজল, রাশিকৃত রুক্ষ চুলের বেণীর মধ্যে প্লাষ্টিকের বেলকুঁড়ি।

মিনতি তবু এতেই ঝলমল করতো। তার রূপের বা সজ্জার আলোয় নয়। সৌরাংশুর চোখের আলোয়।

ছুটে ছুটে এসেছে সে এ বাড়ী। সৌরাংশুর কাছে শুধু লেখাপড়াই করেনি, সৌরাংশুর রুগ্ন মায়ের সেবা করেছে, সংসারের খুঁটিনাটি সেরে দিয়েছে। দরকার পড়লে কখনও বা রান্নাও করেছে।

সৌরাংশুর মা তাকে আপন করতে চেয়েছেন, সৌরাংশুর সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন স্থির করে। ছেলের মনের কথাও তাঁর জানা।

সৌরাংশুও তো জানতো সে কথাই। কিন্তু শম্পাকে ভালবাসতে গিয়ে সে নিজের মূল্য বুঝলো।

ঠিক ঐ মিনতিদের মতই গরীব রেফিউজি ওরা। নিজের স্কলারশিপের ওপর নির্ভর করেছে পড়াশোনা। কয়েকটি টুাশনি মায়ের গচ্ছিত ধনের সুদের ওপরই নির্ভর করে চলেছে দু'টি প্রাণী। মা ও ছেলে। সংসারে আর কেউ নেই।

আর কেউ সংসারে এবারে যে আসবে সে ঐ মিনতি—সৌরাংশুর শিক্ষকতায় "হায়ার সেকেণ্ডারী" পাশ করে কলেজে ঢুকেছে। চোখে-মুখে স্বপ্নের আবেশ—সৌরাংশুর পাশে বিজ্ঞান সাধনায় সেও যেতে থাকবে। এরই ফাঁকে গড়বে সে একটি সুখের নীড়। সে ও সৌরাংশু। আর দু' একটি কচি মুখ।

কিন্তু না। মিনতি বুঝতে পেরেছে স্বপ্ন তার ভেঙ্গে গেছে। সৌরাংশুর অন্তরের দুরন্ত প্রেমের গতি বাঁক নিয়েছে অন্য পথে। মিনতি যেখানে নাগাল পায় না।

আর সৌরাংশু? শম্পাকে ভালবাসতে গিয়েই যেন অনেক পাওয়ার দ্বারোদঘাটন হয়েছে তার কাছে। মিনতির মত একটু চাওয়া, একটু পাওয়া, এতটুকু নীড়, একটু আনন্দের কাঙ্গালপণা নয়। অনেক আলো, অনেক হাসি অনেক আশা, অনেক গৌরবের এক বৃহত্তর জীবন যেন শম্পার চারপাশে। মনেরও পরিব্যাপ্তি তাই সেখানে। অন্তত সৌরাংশু তাই মনে করে।

মিনতিকে তাই সে আর চায় না বলেই চাপা অসহিষ্ণুতায় অধীর হয়েই ছিল সৌরাংশু, মিনতির এতটুকু প্রশ্নের আঘাতে সহজেই অনেক বড় উত্তর দিল।

মিনতি প্রতিবাদ করলো না। নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে মাথা নীচু করে নিঃশব্দে সরে গেল সৌরাংশুর সুমুখ থেকে।

সৌরাংশু জানতো, মিনতি কিছু বলবে না। বলতে তেমন জানেও না। শুধু তার ঘ্যানঘেনে জীবনের স্বপ্ন-ভাঙ্গা নৈরাশ্যে প্যান প্যান করে কোঁপাবে আড়ালে।

কোঁপাক। সৌরাংশুর সময় নেই। শম্পার কাছে অনেক আগেই যাওয়া উচিৎ ছিল।

নিউ আলিপুরের ঐ বাড়ীটার গেটের পরে লন্ পার হয়ে কুঞ্জবীথি ঘেরা গাড়ী-বারান্দার কোল ঘেঁসেই সুরু হয়েছে গৃহ-প্রবেশের 'মোজেইক' করা সিঁড়ির ধাপগুলি।

সৌরাংশু এ বাড়ীতে নতুন আসছে না। আজ মাস তিনেক তার নিত্য যাওয়া আসা। এ বাড়ীর দরোয়ান, চাকর তাই চিনে গেছে। তবু গেটে ঢোকার মুখে দরোয়ানের সেলাম নিতে গিয়ে কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। নিজেকে বড় দীন মনে হয়, বাড়ীর গেটে লাইন দিয়ে থাকা ভক্সহল, ডজ, প্লিমাউথের গা ঘেঁসে পথ অতিক্রম করে সিঁড়ি পার হয়ে শম্পার মুখোমুখী হতে।

শম্পার দর্শন প্রার্থী রথীদের রথ উৎসব। ভীড় ওদের অবিরাম

মন লেগেই থাকে। সৌরাংশুর মনে হয়, তার যথাসম্ভব কেতাদুরস্ত পোষাকের আড়ালে তার সত্যকার দীনতাকে ওরা স্পষ্ট চিনতে পারে, তাই ঠোঁটে মুখে ওদের অবজ্ঞা চাপা হাসাহাসি।

ও-ঘরে প্রথমে ঢুকতে তাই ভারী অসহায় বোধ করে সৌরাংশু। পরীক্ষার হলে ঢোকার মত বুকটা থর থর করে।

শম্পা কিন্তু ওকে দেখামাত্র সহায় হয়। অভ্যর্থনা, আলাপের আতিশয্যে ওদের সামনে ওকে উঁচু করে ধরে আর সেটাই সৌরাংশুর ভরসা।

পায়ে পায়ে ঠেকে আজও এগিয়ে এলো সৌরাংশু। আর আজও সোৎসাহে অভ্যর্থনা করলো শম্পা, "হ্যালো সৌর, আজ এত দেরী যে!"

পরে মুখোমুখী বসে থাকা মিঃ রয় ও লাহিড়ীর চাপা বিদ্রূপ ভরা চাহনি লক্ষ্য করে মৃদু হেসে বললে, "তুমি বড় দাম্ভিক সৌর। আমাদের আজ যে একটা প্রোগ্রাম আছে এটা জেনেও তুমি শুধু দেরী কর নি, আমি গাড়ী পাঠাবো বলেছিলাম, তাতেও তুমি না বলেছ। যাক্ চলো, সাড়ে ছ'টা বাজে।"

পা বাড়াতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালো শম্পা। "প্লিজ, মিঃ রয় এ্যাণ্ড লাহিড়ী, আপনারা একটু গল্প করুন ততক্ষণ, বাবা এলেন বলে। আর আমিও এসে যাচ্ছি ঘণ্টাখানেক পরেই। কিছু মনে করবেন না, প্লিজ—

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে গীয়ার দিতে দিতেই বললে শম্পা, বাড়ীতে ভাল লাগছে না, চল একটু ঘুরে আসি।

পাশে বসে সৌরাংশু বুঝতে পারছিল না, শম্পা কি শুধু ওদের কাছ থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে এলো, না তার দাম্ভিকতাকে প্রকাশ করে ওদের সামনে তার মানসিক আভিজাত্যকে স্পষ্ট করতে চাইল।

চলতে চলতেই এক সময় একটু ঠেলা দিল শম্পা "সৌর কোথায় যাবে বল, অমন চুপচাপ কেন!"

এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক দিনের মত আজকেও তার সঙ্গে প্রোগ্রামের অছিলায় বেরিয়ে এসে ওদের সামনে শম্পা তাকে যে মর্য্যাদা দিল তারই ঘোরে বেহুঁস ছিল বুঝি সৌরাংশু। শম্পার ঠেলা পেয়ে সচকিত হল। নড়ে চড়ে বসে বললে, "হ্যাঁ, না, তা কোথায় যাবে? কেন গঙ্গার ধারে! কাছাকাছি কত ঘাট।"

হো-হো করে হেসে উঠলো শম্পা। বললে, "শিক্ষা তোমার অনেক দূর এগিয়েছে সৌর কিন্তু দীক্ষা কিছু হয়নি। কলকাতার ঐ ষ্টীমারের ভোঁ বাজা গঙ্গা, ঐ জেটীর ওপর অনেক কৌতূহলী দৃষ্টিকে আড়াল করে যে সব যুগলমূর্ত্তি কূজন করে, তাদের কেমন এক নিঃস্ব রিক্ত মুখভাবের ওপর লাজুক প্রেমের মিনমিনে অভিব্যক্তি দেখলে আমার গা জ্বালা করে। দীক্ষা তোমায় আমি এইখানেই দেব সৌর। তুমি চাইতে শেখ অনেক বেশী, দৃষ্টিকে করো সুদূরপ্রসারী। গঙ্গাকে দেখতে চাও, বেড়াতে চাও তা এই গণ্ডীবদ্ধতার মধ্যে কেন? চলো এগিয়ে। না, না ডায়মণ্ডহারবারেও নয়। ওখানেও শহুরে গাড়ীগুলি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থেকে অদূরে প্রিয়জনের সঙ্গে ঘন হয়ে বসে থাকা তাদের মালিক মালিকানার জন্য অপেক্ষা করছে। ভীড় তাই ওখানেও। তাই ও পথে না গিয়ে চল ফলতা। গঙ্গাকে দেখতে গেলে এখানে এসো। জে, সি, বোসের বাড়ীর নীচ থেকে
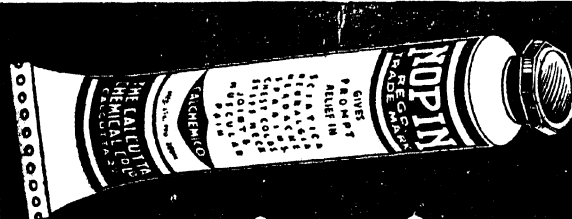
যেখানে গঙ্গা বইছে তার পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখ তুমি ওপার খুঁজে পাবে না। আর গঙ্গার সে কি বা রূপ। ঐ বিশাল গঙ্গাকে পাশে রেখে এমন একটা নির্জন জায়গাও তুমি কাছাকাছির মধ্যে পাবে না।"

সৌরাংশু আবার বিভ্রান্ত হল শম্পার কথায়। শম্পা কি বলতে চাইছে রিক্তা, নিঃস্ব তুমি বদ্ধ গণ্ডী ছাড়া আর কি-ই বা চিনবে? শম্পা এরকম করেই কথা বলে। তার মধুমাখা কথার তলায় একটা চিনচিনে জ্বালা থাকে। সে জ্বালায় মাঝে মাঝেই যেন ছিটকে পড়ে সৌরাংশু শম্পার জগৎ থেকে। যেন বুঝতে পারে তার দারিদ্র্যের মত ইচ্ছাশক্তিও এমনি দীনহীন যে আপন গণ্ডীর মধ্যে সে মাথা কুটেই মরতে জানে, চাইতে সাহস পর্য্যন্ত নেই কোন বিশালতর স্বপ্নকে, কোন অপর্য্যাপ্ত খুশীকে।

শম্পা বুঝতে পারে না কিংবা বুঝতে চায় না, শম্পার পক্ষে যেটা কিছু না সৌরাংশুর কাছে সেটাই অনেকখানি। শম্পার সাদাটে 'শেভরলে'খানা রাজহংসীর মত রাস্তায় যেন ভেসে চলতে চলতেই অনায়াসে ফলতায় গঙ্গা দর্শনে আসতে পারে যখন তখন! কিন্তু বেচু চক্রবর্তী লেনের সরু গলি থেকে বেরিয়ে এই বিরাট রাস্তা অতিক্রম করে ফলতায় গঙ্গা দর্শন করা সৌরাংশুর পক্ষে কি সম্ভব সব সময়?

সৌরাংশু বুঝতে পারে এখানেই শম্পার সঙ্গে পরিচয়ে তার ভুল হয়েছে। শম্পা অহেতুক খেয়ালখুশীতে অবহেলায় যেটা করে সৌরাংশুর সেটা করতে অনেক আয়াসের প্রয়োজন। তবু শম্পার সঙ্গে আলাপ হল সৌরাংশুর।

'ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ' ক্লাশের ফ্রেঞ্চ ভাষায় তালিম নিতে গিয়ে শম্পা সোমের সঙ্গে পরিচয় হল। ক্রমে চিনলো শম্পাকে। পরিচয় গাঢ় হল অনেক।

বিরাট ধনীর দুলালী সে। সাবালিকা হবার পর থেকে নিজের ইচ্ছামত চলে-ফেরে।

অভিনয় করার সখ খুব। ইতিমধ্যেই সিনেমায় নেমেছে। 'মধু-যামিনীতে' সখী এবং 'কালরাত্রি'তে সহনায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে সুনাম কিনতে পারে নি। তবু 'চান্স' পাচ্ছে। আগামী কোন এক বই-এ নাকি নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে, কথা চলছে।

এ সম্বন্ধে তার মতামতও সে ব্যক্ত করেছে। আজকের দিনে সিনেমার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আর নতুন করে বলবে কি-ও। তার মত অভিজাত ঘরের শিক্ষিতা কন্যারাও এ লাইনে আসছে বলেই এত দ্রুত উন্নতিও সম্ভব হচ্ছে।

সৌরাংশু এ লাইনের কথা ভাবেনি কোন দিন। শম্পার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পরও ভাবা উচিত ছিল হয়তো, কিন্তু অবসর পায় নি। এই তিন মাসের মধ্যে শম্পা তাকে যে জগতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে জানতো সৌরাংশু, চিনতো না। আজ তাকে চিনতে চিনতেই তার দিশাহারা মন শুধু একটি জিনিষ বুঝতে পেরেছে, শম্পা যা-ই হোক, সে যাই করুক, তবু শম্পাকে তার ভাল লাগে, সে শম্পাকে বুঝি ভালবাসে।

হাঁ, ভালই বাসে। শম্পা তাকে ভালবাসে কি না এ হদিস সে এখনও পায় নি। নিজেকে বুঝেছে। বুঝেছে মিনতিকে সে এতদিন ভালবাসে নি, ভালবাসতে পারে নি ঐ মিনমিনে কাদার তাল মেয়েকে। শম্পার মধুঝরা কথার আড়ালে হুলের জ্বালা থাক তবু তার চোখে অনেক ভাষা বাঁকা-ঠোঁটে বিদ্যুৎ, হাতের ইঙ্গিতে স্পষ্ট উচ্চারণ। হাঁ, এই মেয়েকেই তো স্বপ্নে দেখেছে সৌরাংশু!

সৌরাংশুকে আবার ঠেলা দিয়ে সচেতন করলো শম্পা। ঠোঁটে মুখে হাসি উপছিয়ে বললে, "আরে, তুমি কি যে ভাবছো আজ! চল, আজ তো আর ফলতায় যাবার সময় নেই। একটু অতিথি-সৎকারই করা যাক। 'হট ডগ' খাইয়ে তোমায় চাঙ্গা করি।"

"হট ডগ"!—না আজ আর চমকায় নি, সৌরাংশু। চৌরঙ্গী পাড়ায় আজকাল হামেশাই ঘোরে সে। 'এয়ার কণ্ডিশন্‌ড' রেস্তোরাঁয় বসে আড ডা জমায় শম্পার সঙ্গে।

রেস্তোরাঁর সামনে নিওনের আগুনে ইংরাজী অক্ষরে লেখা জ্বলজ্বলে নামগুলি ইংরাজী না ফরাসী না জার্মানি, না মার্কিণ ভাষার তা খেয়ালও করে নি সৌরাংশু। শুধু শম্পার সঙ্গে পুশডোরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে, যেখানে উর্দিপরা, দরোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। পুশডোর খুলে দিলে সিঁড়ি বেয়ে চলে এসেছে।

ভিতরে আশ্চর্য্য এক জগতের পরিবেশ। থামের গায়ে প্লাষ্টিকের লতা লতিয়ে ওপরে উঠে নীচে ঝুলে পড়েছে। এ্যারিকো পাম্ গাছের ঝোপ জঙ্গল। নরম আলোর কেরামতিতে কুঞ্জবনের ম্লান ছায়া। পিয়ানোর টুং-টাং-এ, কখনও বা চেলোর গম্ভীর গমকে সমস্ত ঘর যেন মন্ত্র-মুগ্ধ।

সারি সারি সোফা কৌচ পাতা। খানার টেবিল সামনে। জোড়ায় জোড়ায় খেতে বসেছে ছেলে-মেয়ে। দল বেঁধেও আছে।

কৌচে গা ঢেলে দিয়ে প্রথমেই অর্ডার দেয় শম্পা, "কোনা কফি উইথ ক্রিম" লে আও। চৌরঙ্গীর কেতাদুরস্ত ভোজনাগারে এটি একটি অতি আধুনিক পানীয়। "হট ডগ" গরম কুত্তা এ পাড়ারই খাবার। শুয়োরের মাংসের স্যাণ্ডউইচ, চর্ব্বি দিয়ে ভাজা।

শম্পা নামিয়ে দিয়ে যাবার পর নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়েই যেন স্বপ্ন ভঙ্গ হল সৌরাংশুর। মা অসুস্থ বলে তার খাবার রান্না করে অদূরে ঢাকা দিয়ে রেখে, রুগ্ন মায়ের পথ্য করে তাঁকে খাইয়ে অতি যত্নে মায়ের গায়ে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছিল মিনতি। সৌরাংশুকে দেখে নিঃশব্দে মুখ নীচু করে সরে গেল।

ঢাকা খাবারের দিকে অবজ্ঞা ভরে তাকালো সৌরাংশু। মুচকে হাসলো। হুঁ, সে যেন বুভুক্ষুর ক্ষুধা নিয়েই বসে আছে ওর জন্য!

চৌকির ওপর পাতা পাতলা বিছানাটায় গা ঢেলে দিতে দিতেই স্বপ্নের জগতে আবার ফিরে গেল সৌরাংশু।

ডিভানে ডুবে থাকা ক্লান্ত দেহটা টেনে তুললো শম্পা। রাত্তির তেমন কিছু হয় নি। তবু আজ একটু সকাল সকালই শোবে সে। বড় ক্লান্ত।

সজ্জা-ঘরে বেশ পরিবর্ত্তন করে ড্রেসিং টুলে আয়নার মুখোমুখী বসলো সে। চাকরে সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রেখে গেছে। শম্পা তারই থেকে নরম তোয়ালেটা তুলে নিয়ে "ডেটলে" ভিজিয়ে মুখের "মেক আপ" মুছে সামনে রাখা ঈষদুষ্ণ জলে মুখটা পরিষ্কার করে ধুয়ে

নিল। পরে নরম ক্রীম আঙুলের ডগায় তুলে নিয়ে মুখে মাখতে গিয়েই তাকালো নিজের দিকে।

'মেক আপ' মুছে গেছে। কারিকুরি নেই। তবুও এ মুখ কত সুন্দর। ভরা বয়সের ঢলঢলে মুখখানি নিজেরই দেখতে যদি এত ভাল লাগে তো কেন ভাল লাগবে না রয় আর লাহিড়ীর, ব্যানার্জ্জী আর বোসের? আর—আর ঐ সৌর?

দমকা হাসি যেন পেটের মধ্যে পাক খায় শম্পার। অনেক রথী মহারথীর পদধূলি পড়ে এখানে। কিন্তু সৌরের মত লোক এ বাড়ীর গেট পার হয়ে শম্পার মুখোমুখী দাঁড়াবার সাহস পায় না, শুধু সৌরাংশু এসেছে...।

শম্পা তাকে এনেছে। তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কারণ তার মজা লেগেছে। সৌরাংশুর জগৎকে সে ঘৃণা করে, তবু তাকে সে এনেছে। রথী মহারথীদের বন্দনায় একঘেয়েমি কাটাতে এর জুড়ি অবুধ নেই। এমন একজন দরিদ্র অথচ দেখতে শুনতে ভাল, ভাল ইডেণ্টকে নিয়ে খেলিয়ে বেড়ানো। শম্পার জগৎকে ঘনিষ্ঠ করে পেতে এর পদে পদে বিস্ময়, শম্পার নিখুঁত অভিনয়কে সত্য ভেবে এর প্রতিক্ষণে শিহরণ। আর সেটাই শম্পার কাছে মজার। ভারী মজার।

উঠে এসে জোরালো আলোটা নিভিয়ে সবুজ আলোটা জেলে নরম বিছানায় আবার ডুবে গেল শম্পা। চোখ ফেরাতে গিয়ে ম্লান জ্যোৎস্নার মত আলোটার দিকে চেয়ে সৌরাংশুর বিমুগ্ধ মুখটা মনে পড়তে বাঁকা হেসে পাশ ফিরে শুল সে।

ড্রইং-রুমে অনেকেই বসেছিল। রয়, লাহিড়ী, ব্যানার্জ্জী, সেন।

বড় কৌচের রয়ের পাশের খালি জায়গায় বসে বিলোল কটাক্ষ টেনে হেসে বললে শম্পা, "জানেন, মিঃ রয়, আগামী বইটাতে আজই কনট্রাক্ট হয়ে গেল। আগামী ২৫শে স্যুটিং আরম্ভ।"

উৎসাহে একটু কাছ ঘেঁষে এলো রয়। "ভেরী গুড। আশা করি, এবারের অভিনয়ে তুমি 'সাকসেসফুল' হবে। শম্পা, শিল্পী-সুলভ দক্ষতা তোমার থাকলেও কিছু সাধনারও প্রয়োজন হয়। এবার সেদিকে একটু মন দাও।"

হেসে গলার শুভার্থীর সুর মিশিয়ে বললে লাহিড়ী, "হ্যাঁ ইদানীং তোমার তো আর কোন দিকেই মন নেই। শুধু ঐ সৌর না কে, তার সঙ্গে একটু বেশী রকম মাতামাতি ছাড়া—"

একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে এসে বললে রয়, "কিছু মনে কোরো না শম্পা, হঠাৎ তোমার অমন বাঁদর নাচাতে কেন সখ হল"—

খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়লো শম্পা। বললে, "বাঁদর তো নেচেই আছে মিঃ রয় আমি নাচাই নি, আমি শুধু মুখ বদলাচ্ছি।" একটু থেমে রয়ের দিকে সোজাসুজি চেয়ে যেন কথাটাকে হাল্কা করতে বললে, "জানেন, আগামী বইটাতে আমার বিপরীতের নায়ক ও অমনি ছন্নছাড়া, হা-ঘরের। তাই একটু রিহ্যার্সালও হচ্ছে আর কি।"

কাল অনেক দেরী হয়েছিল, তাই আজ একটু সকাল সকালই আসছিল সৌরাংশু। ঘরের প্রত্যেকটি কথা কানে যেতে যেন তড়িতাহত মৃত ব্যক্তির মত মুহূর্তে মরেই গিয়ে দেওয়ালে ভর রেখে দাঁড়িয়ে থাকলো সে।

অনেক পরে নিজেকে সংযত করে যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেট পার হয়ে নেমে এলো রাস্তায়। এক-একটি রাস্তার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে নয় যেন দাপাদাপি করে ফিরলো সে। অনেক পরে অনেক রাত করে বাড়ী এলো।

মায়ের অসুখটা আজ বেড়েছে, তাই সৌরাংশু বাড়ী ফেরেনি বলে খাড়ী খেতে পারে নি মিনতি।

সৌরাংশুর জবাব শোনবার পর থেকে আর মুখ তুলতে পারেনি সে তার কাছে। তবু নিঃশব্দে সে সবই করেছে। আজও মাকে অষুধ-পথ্য খাইয়ে অতি যত্নে ঘুম পাড়িয়েছে। সৌরাংশুর ক্ষুধার অন্ন রান্না করে পরিপাটী করে ঢেকেছে। পরে সৌরাংশুর ফেরার অপেক্ষায় ওপাশের জানালার গরাদ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

আস্তে দোর ঠেলে ঘরে ঢুকলো সৌরাংশু। মিনতি এদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে।

না। দাঁড়িয়ে নেই। ঘরের চারিদিকে চেয়ে এতক্ষণে বুঝতে পারলো সৌরাংশু সেও সাধনা করছে। বাঁদর নাচিয়ে অভিনয়ের মহড়া দিচ্ছে না সে জীবনের সাধনা করছে। সে জীবন-শিল্পী।

কখনো যদি

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাত্রিতে যদি প্রিয়
বাতায়নে তব মৃদু করাঘাত হানি,
বাতায়ন শুধু একবার খুলে দিও:
যেন দেখি হাসি-উজ্জ্বল মুখখানি!
অধরের সুধা নাই বা আমারে দিলে,
দুরাশাও নেই বাঁধতে বাহুর ডোরে;
খুশি রব তুমি হাত পেতে শুধু নিলে
নিয়ে-আসা-ফুল যতনে চয়ন ক'রে।
শুধু একখানি বাতায়ন রেখো খুলে,
আর কিছু নয়, আর কিছু নয় প্রিয়!
যদি বা কখনো এসে পড়ি পথ ভুলে—
হাসি মুখখানি বারেক দেখতে দিও॥

সব পেয়েছির দেশ

অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য

মনে করো তুমি একটি হারানো গানের সুর—
ছন্দের খোঁজে আকাশে বাতাসে অনেক দূর
চলে গেছ একা পেছনের পথ হারিয়ে;
ভাঙা জাহাজের একফালি কাঠ তোমার মন:
অশেষ সাগরে ভেসে অবশেষে অনেকক্ষণ
দিশাহারা জলে নিরুপায় আছ দাঁড়িয়ে।

আশা যেন থাকে: কোন একদিন এ' সন্ধান
সফল হবেই। তোমার খোঁজের সে' সমাধান
হয়তো লুকিয়ে অনেক পৃথিবী ছাড়িয়ে,
যেখানে কখনো জীবন-বীণায় ছেঁড়ে না তার
ছোঁয়া নেই কোনো কল্পনা-মন-মরীচিকার—
শান্তি রয়েছে সান্ত্বনা-হাত বাড়িয়ে।

আরব রাষ্ট্রের আসওয়ান উচ্চ বাঁধ

সবিতা মুখোপাধ্যায়

মিশর দেশের নাম তোমরা শুনেছো—পিরামিডের দেশ—যার তলায় চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন তুতেনখামেন, আরও কতো রাজা আর তাঁদের রাণী। যেখানে পাওয়া গেছে অনেক অনেক মণি-মুক্তা, রত্নহার। হ্যাঁ, আর যাদুঘরে তোমরা যা দেখেছো—সেই মমির দেশও মিশর। মিশর স্ফিংকসের দেশ। সেখানে গেলে আরও দেখতে পাবে বিস্তীর্ণ বালুকারাশির ওপর চলেছে উটের বাহিনী, আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অজস্র খেজুর গাছের সারি। এদের নিয়ে কতো প্রবচন—কতো না কাহিনী। পৃথিবীর প্রাচীন সপ্তম আশ্চর্য্যের একটির সাক্ষ্য বহন করে বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিস্ময় সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে মিশর নীল নদের তীরে। ইংরেজীতে এরই নাম ইজিপ্ট। আর এই ইজিপ্ট আর প্রতিবেশী রাজ্য সিরিয়া নিয়ে গঠিত বর্তমান 'সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র'—যার প্রেসিডেন্ট কর্ণেল নাসের।

ওদেশের পুরাতত্ত্ব আর প্রাচীনত্বর কথা আজ থাক। সে তোমরা ইতিহাস ভূগোল আর নানান কাহিনী উপাখ্যানে কিছু পড়েছো, কিছু শুনেছো। তোমরা জেনেছো মিশরীয় সভ্যতা হোল পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার মধ্যে একটি। আজ তোমাদের মিশরের সাম্প্রতিক কালের কিছু কথা বলি শোনো। বর্তমানের কথা মানেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্ম গঠনমূলক পরিকল্পনা, প্রগতি আর অগ্রগতির কথা। আর সে অগ্রগতি বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে।

সভ্যতা ও জনপদ গড়ে ওঠে নদীকে কেন্দ্র করে। নদীর জলরাশি মাঠে ফসল ফলায়। উন্নত করে কৃষি ব্যবস্থা। বাণিজ্য ও যোগাযোগ প্রথা বিস্তীর্ণ ব্যাপক করে। দেশের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু সেই নদী যদি ক্ষ্যাপা হয়—নিমেষে ধ্বংস করে সৃষ্টির সকল সম্পদ। পৃথিবীর অন্যতম দীর্ঘ নীল নদ। ইতিহাস খ্যাত নীল নদের বন্যা। বারবার নীল নদের বন্যায় বিধ্বস্ত হয়েছে মিশর। দেশবাসী প্রতিরোধ করতে পারেনি জলোচ্ছাস রক্ষা করতে পারেনি দেশের খাদ্য। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান পারে প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনতে, নদীর জলশক্তির গতি ধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে উন্নতির কাজে লাগাতে।

আসওয়ান বাঁধ পরিকল্পনা এই উদ্দেশ্যেই করা হয়। একটি আন্তর্জাতিক হাইড্রোলজি, জিওলজি ও টোপোগ্রাফি বিশেষজ্ঞ দল সম্মিলিত ভাবে দু'-বছর আলোচনার পর ১১৫৪ সালের নভেম্বর মাসের অধিবেশনে বাঁধ নির্মাণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ পরিকল্পনা আরব রাষ্ট্রের জাতীয়-জীবনে আজ নয়া যুগের সূচনা ক'রেছে। নীল নদের প্রবাহে শোনা যাচ্ছে আগামী দিনের প্রাচুর্য্যের স্পন্দন।—ভবিষ্যৎ উন্নতি প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির আভাস। বর্তমান বিশ্বে সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তনের জন্ম গৃহীত সব কটি পরিকল্পনার মধ্যে মধ্য-প্রাচ্যের এইটি অন্যতম প্রধান। মিশরীয় প্রদেশগুলির ক্রম বর্ধমান জনসংখ্যা, বিগত দিনের কৃষিজ অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রধান উপজাত দ্রব্য তুলোর চাষের উন্নতির প্রশ্ন—ইত্যাদি বিষয় এবং সমস্যাগুলির সমাধান করা হোল এই বাঁধের উদ্দেশ্য। বাঁধটি আরব রাষ্ট্র ও সুদানের জনগণের কাছে অবিমিশ্র সৌভাগ্যের প্রতীক রূপে দেখা দিয়েছে। অনেকগুলি জলযোজনা একত্র করলে যে উপকার পাওয়া যায়, নীল নদের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক'রে এই একটি বাঁধই সে উপকার সাধন করবে। বাঁধটির প্রথম ও দ্বিতীয় দফার কাজ সম্পাদনের জন্ম সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে—সেখান থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া যাবে।

নীল নদের গতি প্রতি বছর বিশেষ ভাবে পরিবর্তিত হয়। ইজিপ্টে প্রতি বছর চাষের জন্ম জলের প্রয়োজন (সুদান বাদ দিয়ে) বাহান্ন কোটি কিউবিক মিটার। কিন্তু প্রতি বছরই জলাভাবে জমি শুকনো যায়। যেমন ১১১৩—১৪ সালে দেখা গিয়েছিল সারা বছর চাষের জন্ম বেয়াল্লিশ কোটি কিউবিক মিটার জল পাওয়া গিয়েছিল।

বর্তমানে আসওয়ান বাঁধ ও জিবেল আওলিয়া বাঁধ দুটি বছরের প্রয়োজন মেটাবার জন্ম অতিরিক্ত জলরাশি সঞ্চিত ক'রে রাখে। জলস্তর প্রয়োজনীয় সীমার নীচে গেলেই সঞ্চিত জলরাশি ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রতি বছরই প্রয়োজনের তুলনায় জল কম পাওয়া যায়। পলিমাটি জমে যে ক্ষতি হয়—সঞ্চয়শক্তি নির্দ্ধারণের জন্ম তার হিসেব নেওয়া হবে। যে বছর জল বেশি পাওয়া যাবে—সে জল ঘাটতি বছরের জন্ম মজুত রাখা হবে। এ সব বিষয়ে স্থায়ী ব্যবস্থার জন্মই আসওয়ান বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও বাঁধটির অন্য একটি উদ্দেশ্য হোল সমুদ্রগামী বন্যার জলকে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা। এভাবে বিপুল জলরাশি সঞ্চিত হলে প্রাকৃতিক কারণে অর্থাৎ বাষ্প হয়ে বা পলি জমে যে ক্ষতি হবে, তা তুলনায় নগণ্য।

নতুন বাঁধটি বর্তমান আসওয়ান বাঁধের পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এই বাঁধটি গ্র্যানাইট পাথরে তৈরি এবং সমুদ্রবক্ষ হ'তে উচ্চতায় একশো মিটার ও দৈর্ঘ্যে পাঁচশো মিটার হবে। সমস্ত অঞ্চলটির ভিতের দৈর্ঘ্য পাঁচ হাজার কিলোমিটার এবং মূল ভিতের দৈর্ঘ্য হবে হাজার মিটার। সমগ্র অঞ্চলটির বিস্তার হবে বেয়াল্লিশ স্কোয়ার মাইল, অর্থাৎ সবচেয়ে বড় পিরামিডটির সতেরো গুণ। এ বাঁধটি বর্তমান বাঁধের প্রায় পঁচিশ গুণ অর্থাৎ একশো কুড়ি কোটি কিউবিক মিটার জল সঞ্চয় করতে পারবে।

নীল নদের বর্তমান চ্যানেলটি বন্ধ করে তেরোশো মিটার দূরে পূর্বপাড়ে পাহাড় কেটে একটি নতুন খাল খনন করা হবে। সাতটি টানেলের সাহায্যে বাঁধের সামনের জলরাশি পেছনে প্রবাহিত করা হবে। জল-বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্ম পশ্চিম পাড়েও চারটি টানেল নির্মিত হবে।

তিনটি বিভিন্ন পর্য্যায়ে বাঁধটি নির্মিত হবে। এবং শেষ করতে সাত হ'তে দশ বছর সময় লাগবে। প্রথম পর্য্যায়ে বাঁধটির সামনের ও পেছনের অংশ ও "উপর্ স্পাই" খালটি নির্মিত হবে। ফলে, বর্ত্তমানের তুলনায় কৃষির জন্ত বাড়তি আট কোটি কিউবিক মিটার জল পাওয়া যাবে। উপত্যকা অঞ্চলের লক্ষ একর অকর্ষিত চাষের জমি চাষের উপযোগী করা হবে—এমন কী অনাবৃষ্টির দিনেও। এ অঞ্চলের ১০০,০০০ লক্ষ একর জমি স্থায়ী ভাবে চাষ ব্যবস্থার আওতায় আনা যাবে; এবং ধানচাষের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। শতকরা প্রায় ৩৫% ভাগ জমি চাষের উপযুক্ত হবে। চাষের সামগ্রিক উন্নতি হবে শতকরা ২০% ভাগ। বন্তার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে। এবং জলপথের উন্নতিবিধান করা হবে।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ে সমগ্র বাঁধ, টানেলগুলি, আটটি টারবাইন ও জল-বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পন্ন করা হবে। নীল নদের প্রধান খালে নিম্নচাপের ব্যবস্থা করতে পারলে জল-শক্তি উৎপাদনের সুরাহা হবে। বর্তমানের তুলনায় আট গুণ অর্থাৎ বছরে দশ কোটি কিলোয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হলে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সার উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হবে। বছরে প্রায় দু' লক্ষ টন 'হেভি অয়েল' বাঁচানো যাবে। সরকারী রাজস্ব প্রায় তেইশ লক্ষ পাউণ্ড এবং জাতীয় আয় ২৫৫,০০০,০০০ পাউণ্ড (এর মধ্যে কৃষিজাত জাতীয় আয় শতকরা ৩৫% ভাগ) বাড়বে।

তৃতীয় ও শেষ পর্য্যায়ে আটটি নতুন টারবাইন নির্মিত হবে।

সুদানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে। চাষের জমি বর্তমানের তিনগুণ হবে। সেচের জল সব সময় পাওয়া যাবে। জল-বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে। সঞ্চিত জল অপেক্ষাকৃত পলি-শূন্য হবে। লম্বা আঁশযুক্ত তুলো চাষের উন্নতি হবে।

মিশরীয় প্রদেশের উন্নতিও তেমনি প্রত্যক্ষ। বন্তার সময় সামগ্রিক প্রতিবিধান ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। বিদ্যুৎ-শক্তির খরচ কমে যাবে, শিল্পাঞ্চলে প্রচুর জল-বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে শিল্প-সংগঠন ও উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। নীল নদের উভয় তটবর্তী সহর ও গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

বাঁধটির নির্মাণ খরচ হবে মিশরীয় মুদ্রায় ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। এ ছাড়া নদী তীরের অধিবাসীদের ক্ষতিপূরণ বাবদ খরচ হবে মিশরীয় মুদ্রায় ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড। এবং এই পরিকল্পনায় জন্ত জল-বিদ্যুৎ-শক্তি প্রতিষ্ঠা, আসওয়ান হতে কায়রো পর্য্যন্ত সরবরাহ ব্যবস্থা, মিশরীয় উপত্যকার উপর অঞ্চলে ১০০,০০০ একর জমির স্থায়ী সেচ ব্যবস্থা, তেরো লক্ষ একর জমির পুনর্বিন্যাস ও জনগণের জন্ত উন্নত বাসস্থান নির্মাণ ইত্যাদির জন্ত ৪০০ মিলিয়ন পাউণ্ড দরকার হবে।

আরব রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল নাসের গত ৯ই জানুয়ারী ১৯৬০, মরক্কোর রাজা পঞ্চম মহম্মদ, সোভিয়েট পাওয়ার ও কনস্ট্রাকসন মন্ত্রী মি ইগনভি নভিকভ, সুদানের সেচ মন্ত্রী মিঃ মকবুল-এল-আমিন, সমস্ত কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দ এবং Times of India-র কায়রোস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা শ্রীকে. সি. খান্নার উপস্থিতিতে বাঁধটির নির্মাণ কার্য্যের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সেদিন কায়রোর দৈনিক 'Al Gamhoaria' পত্রিকা লাল বড় হরপের শিরোনামায় লেখে—"আজ আমাদের ভবিষ্যৎ সূচিত হোল।"

চার নির্বোধ

(ব্রহ্মদেশের লোক-সাহিত্য থেকে)

জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

এক গ্রামে চারজন বোকা লোক ছিল। তারা দারুণ নির্বোধ। তাদের কেহই কোন কাজ কর্ম্ম দিত না। একদিন তারা এক বৃদ্ধা প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে, কাজ দেবার জন্ত অনেক অনুনয় বিনয় করাতে বৃদ্ধার মন ভিজে গেল।

তিনি বললেন, "দেখ, ঐ দূরের মাঠ থেকে খড়ের বোঝাগুলো নিয়ে আয়, ঘরের ছাত হবে।—"

তারা চারজন খড়ের বোঝা মাথায় করে নিয়ে হাজির হ'লো। প্রথম জন জিজ্ঞাসা করলো, "মা, খড়ের বোঝা কোথায় রাখবো?"

বৃদ্ধা বললেন, "রান্নাঘরের পিছনে রাখ।"

দ্বিতীয় বোকা আবার সেই একই প্রশ্ন করলো।

বৃদ্ধা বললেন, "রান্না ঘরের পিছনে রাখ।"

তৃতীয় জন জিজ্ঞাসা করলো, "মা খড়ের বোঝা কোথায় রাখবো"

বৃদ্ধা সেই একই উত্তর দিলেন। চতুর্থজন সেই একই প্রশ্ন করলো, তিনি তাকেও সেই উত্তরই দিলেন। রাখা হয়ে গেলে ওরা মাঠে চলে গেল। আবার খড়ের বোঝা নিয়ে এসে—সকলেই এক একজন করে একই প্রশ্ন করলো। বৃদ্ধা তাদের সেই একই উত্তর দিলেন। আবার মাঠে গিয়ে বোঝা নিয়ে তারা ফিরে এলো। প্রত্যেকই এক একজন করে একই কথা জিজ্ঞাসা করলো। তিনি তাদের সেই আগের উত্তর দিলেন।

এবার চতুর্থ বার। আবার সেই এই প্রশ্ন করাতে বৃদ্ধা ধৈর্য্য হারালেন। রাগে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "নির্বোধ কোথাকার? কোথায় রাখতে হবে জান না? রাখ আমার মাথায়।"

বোকারা খড়ের বোঝাগুলো বৃদ্ধার মাথার উপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। বোঝার চাপে বৃদ্ধা মারা গেলেন।

পাড়া-প্রতিবাসীরা জানতে পেরে হায় হায় করতে লাগলো। এবং নির্বোধদের অনেক তিরস্কার করলে। পরে বলল, "যাও বন থেকে কাট কেটে নিয়ে এসো—বৃদ্ধার সৎকার করতে হবে।"

নির্বোধেরা লক্ষ্যহীনের মত এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে বনের ধারে এলো। একটা বড়ো গাছ দেখে বলল "এসো ভাই এইটে কাটা যাক।"

দ্বিতীয় জন বললো, "আমি গাছে চড়ি আমার ভার দিয়ে গাছটাকে ফেলতে সাহায্য করবো।" তৃতীয় ও চতুর্থ জন বললো, "আমরা গাছটাকে কাঁধে ধরবো, তা না হ'লে পড়া গাছটাকে আবার মাটি থেকে কাঁধে তুলতে হবে।"

তারা দু'জন গাছটাকে ধরবার জন্ত কাঁধ পেতে রইল। দ্বিতীয় জন গাছে উঠে গেল। প্রথম জন কাটতে সুরু করলো।

কাটতে কাটতে গাছ যখন তৃতীয় ও চতুর্থের ঘাড়ে পড়লো, তার চাপে দু'জনই মারা গেল। দ্বিতীয় জন গাছের উপর ছিল। দারুণ আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারালো কিন্তু ভাগ্যক্রমে প্রাণ গেল না।

কিছুক্ষণ পরে তার জ্ঞান হতে প্রথম জন বললো, "এতক্ষণে তোমার ঘুম ভাঙ্গলো। কিন্তু এদের ঘুম এখনো ভাঙেনি আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক্। এরা দুজন তাদের মুখ চেয়ে বসে রইল ঘুম ভাঙার অপেক্ষায়।"

একদিন চলে গেল, ছুদিন চলে গেল তিন দিন যায় যায় এদের ঘুম আর ভাঙে না। এক কাঠুরে সেই বনে কাঠ কাটতে এসেছিল সে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলো যে, ছুজন গাছ চাপা পড়ে মারা গেছে আর ছুজন শান্ত ভাবে তাদের পাশে বসে রয়েছে।

সে জিজ্ঞাসা করলো, "কি হয়েছে? এমন ভাবে বসে কেন?"

এরা বললো, "অপেক্ষা করছি এদের ঘুম দেখছ না এখনো ঘুমুচ্ছে, ওরা দারুণ অলস। ঘুমান ছাড়া আর কিছু জানে না।"

উত্তর শুনে কাঠুরে আরো আশ্চর্য্য হয়ে গেল। বলল, "এরা মারা গেছে তা কি জান না?"

এরা বলল, "এঁ্যা, তাই নাকি? তুমি কি করে বুঝলে?"

কাঠুরে বলল, "নির্বোধ। তোমাদের নাক কোথায় গেল, গন্ধও পাওনি? এই বলে কাঠুরে চলে গেল।"

তারা ছুজন পথে পথে আবার পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এতদিন ধরে খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, পেটে দারুণ হাওয়া হয়েছে। একজন ঢেকুর তুলে বললে, "তাই ত আমার মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ উঠছে—তা'হ'লে ত আমি মরে গেছি।"

দ্বিতীয় জন বলল, "হ্যাঁ, ঠিক ত, এই রকম গন্ধই সেই বন্ধুদের গা থেকে বেরুচ্ছিল।"

প্রথম জন বলল—"তবে, ঠিক আমি মরে গেছি।" এই বলে সে পথের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো।

একটু পরে দ্বিতীয় বন্ধুও ঢেকুর তুলল—সেই একই গন্ধ। বলল, "আমিও মরে গেছি নিশ্চয়, তাই এমন গন্ধ বেরুচ্ছে।" এই বলে সে তার বন্ধুর পাশে শুয়ে পড়লো।

এমন সময় ঐ পথ দিয়ে একজন মাহুত হাতী নিয়ে যাচ্ছিল। বলল, "পথ দাও, সরে যাও এখান থেকে।"

নির্বোধেরা বলল, "কি করে পথ দেবো? দেখছ না আমরা মরে গেছি।"

এদের উত্তর শুনে মাহুত রেগে গেল—বলল দাঁড়াও এক্ষুনি বাঁচাচ্ছি। এই না বলে হাতী থেকে নেমে এসে অঙ্কুশের দ্বারা খোঁচা দিতে লাগলো।

ছুই বন্ধুই লাফিয়ে উঠলো। বলল "মহাশয়, এটা কি অলৌকিক অঙ্কুশ।—যাতে মৃত জীবন পায়? আমাদের এই কুড়ুল ছুটোর বদলে—ওটা আমাদের দিন।"

মাহুত দেখলো—অঙ্কুশের চেয়েও কুঠার ছুটোর মূল্য বেশি—সে বদলে নিয়ে চলে গেল।—

ছুই বন্ধু ঘুরতে ঘুরতে এক ধনী লোকের বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছাল। বাড়ীর কর্ত্তার এক মাত্র মেয়ে মারা গেছে। সকলেই কান্নাকাটি করছে।

ওরা জিজ্ঞেসা করলো, "কি হয়েছে, অমন করে কাঁদছ কেন?"

সব শুনে বলল, "ওঃ এই—কিছু ভাবনা নেই—এসো আমরা এখনই এঁকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি।"—

শোকার্ত্ত পিতা মনে করলেন,—এরা হয়ত যাদুকর। তাঁর মেয়েকে সত্যই বাঁচিয়ে দিতে পারবে। বললেন, "তোমরা যদি আমার মেয়েকে সত্যই বাঁচিয়ে দিতে পারো তোমাদের অনেক টাকা কড়ি ধনরত্ন দেবো।"—

তারা একটা ঘরে মৃত মেয়েটিকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর অঙ্কুশের দ্বারা খোঁচার পর খোঁচা দিতে লাগলো। মেয়েটির সমস্ত দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল—তবুও সে প্রাণ ফিরে পেল না।—

কিছুক্ষণ পরে গৃহস্বামী এসে তাঁর একমাত্র কন্যার এই অবস্থা দেখে জ্ঞান হারালেন। ভৃত্যদের ডেকে হুকুম দিলেন, "এদের বেঁধে চাবুক লাগাও।"

শাস্তি দেওয়া শেষ হ'লে—গৃহস্বামী তাদের জিজ্ঞেসা করলেন, "তাঁর মৃত কন্যার উপর এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার কেন করেছে?"

বোকা ছুজন কাঁদতে কাঁদতে জোড় হাতে বলল, "কর্ত্তা, আমরা আপনার মেয়েকে বাঁচিয়ে আপনাকে খুশী করতে চেয়েছিলাম—যাতে আমরা কিছু খেতে পাই।"

গৃহস্বামী বুঝলেন এরা সেই আকাট নির্বোধ। একটু শান্ত হয়ে বললেন, "তোমাদের বলা উচিৎ ছিল, ও, ভগিনী তুমি আমাদের ছেড়ে কেন চলে যাচ্ছ—তোমার যাওয়াতে আমরা দারুণ শোকার্ত্ত হয়েছি।" এই বলে তিনি, তাদের আর শাস্তি না দিয়ে বিদায় দিলেন।—

ছুই বন্ধু আবার পথে পথে ঘুরতে লাগলো। যেতে যেতে দেখতে পেলো একটি গৃহে বিবাহ উৎসব হচ্ছে। ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে কাঁদতে কাঁদতে কনেকে জড়িয়ে ধরলো। বলল "ও ভগিনি। কেন তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ তোমার জন্য আমরা শোকার্ত্ত হয়েছি।"—বলে ছুচোখের জলে কনেকে ভিজিয়ে দিলো।

এই কাণ্ড দেখে উৎসব সভার লোক জন একেবারে ক্ষেপে গেল—ওদের মারতে মারতে বাইরে নিয়ে এলো। কনের বড়ো ভাই জিজ্ঞেসা করলো—"তোমাদের ঐ রকম ব্যবহারের কারণ কি?"

তারা চোখের জলের ভিতর থেকে বলল, "তোমাদের খুসী করতে চেয়েছিলাম। অনেক দিন কিছু খাইনি,—যাতে আমরা কিছু খেতে পাই।"

বড়ো ভাই বুঝতে পারলো এরা সেই নির্বোধ। বলল, "বোকা! তোমাদের উচিৎ সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে আনন্দ করা। নাচ গান করে বলা উচিৎ, "ওঃ ভগিনী আমরা খুব খুসী হয়েছি।" বড়ো ভাই ওদের আর কিছু না বলে যেতে দিলো।

তারা আবার চলতে লাগলো। এক জায়গায় দেখলো স্বামি-স্ত্রী দু'জনে খুব ঝগড়া করছে। দু'জনেই দু'জনকে মারছে—পাড়া-প্রতিবাসী এসে চারি পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

এরা ছুটে গিয়ে তাদের মধ্যিখানে পড়লো। নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে বলল,—"ওঃ আমরা কি খুসী হয়েছি খুব খুব আনন্দিত হয়েছি।"

এই অপমানে স্বামি-স্ত্রী দু'জনেই হ'তবাক। সম্বিৎ ফিরে আসতে রাগে জ্বলে উঠে ওদের বেদম মারতে সুরু করলো। মারতে মারতে যখন আধমরা হয়ে এলো—তখন জিজ্ঞেস করলে, "এই অপমান ওরা কেন করলো?"

তারা অবাক হয়ে বলল, "অপমান! অপমান তো করিনি—শুধু তোমাদের খুসী করতে পারলে খেতে দেবে। তাই নাচ গান করতে এসেছি।"

স্বামি-স্ত্রী বুঝলো—এরাই সেই বোকা লোক। বলল, "তোমাদের বলা উচিৎ ছিল "ওগো তোমরা রাগ থামাও—এমন মারামারি করা উচিৎ নয়, কারণ তোমরা স্বামি-স্ত্রী।"

তারা আবার যেতে লাগলো। পথে দেখলো ছুটো ষাঁড় দারুণ

ক্ষেপে গিয়ে লড়াই করছে শিং দিয়ে গুঁতলেই দুজনকে ক্ষত-বিক্ষত করছে।

তারা ছুটে মধ্যিখানে গিয়ে বলল, "ওগো তোমরা রাগ থামাও এমন মারামারি করা উচিৎ নয়,—কারণ তোমরা স্বামি-স্ত্রী।"

আর বলতে হ'লো না—ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের আক্রমণে তারা দু'জনেই প্রাণ হারালো।

এক বুড়ো নাবিকের কাহিনী

(ইংরেজি গল্পের ভাবানুবাদ)

শ্রীমতী সাধনা কর

বিয়ের উৎসব চলছে। বর-কনে এসে পৌঁচেছে, অতিথি-নিমন্ত্রিতদের ভিড়। কত সাজ-সজ্জা, আমোদ-প্রমোদ, খাওয়া-দাওয়া। তিনজন লোক সেই উৎসবে যাচ্ছিল, বাড়িতে ঢুকবার মুখে দেখলে এক বুড়ো থুখুড়ে লোককে। পুরোনো দিনের নাবিকের মতো চেহারা, হাড়-বের-করা হাত, বড় বড় দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ, গর্তে-ঢোকানো চোখ দুটো তার জ্বল-জ্বল করছে। সে চোখে কি যাদু ছিল, তিনজনের মধ্যে একজনের দিকে তাকাতেই সে একেবারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অস্থির হয়ে বললে—কে তুমি? কি চাও? কেন আমাকে এমন করে ধরে রাখলে? দেখছ না, বিয়ের উৎসবে যাচ্ছি। আমি ওদের নিকট আত্মীয় আমাকে যেতেই হবে, আমাকে ছেড়ে দাও।

বুড়ো তার শীর্ণ লম্বা হাত দিয়ে তাকে ধরে ফেললে। ভাঙা অস্পষ্ট মোটা গলায় বললে—শোনো, একটা জাহাজ ছিল…

ভদ্রলোক আরো অস্থির হয়ে বললে—না, না, এখন আমার ওসব শোনবার সময় নেই। আমাকে যেতে দাও।

বুড়ো হাত ছেড়ে দিল কিন্তু তার চোখের এমনি দৃষ্টি যে, ভদ্রলোক তিন বছরের শিশুর মতো হত-বিহ্বল হয়ে একটা পাথরের উপর বসে পড়লো। বুড়োর কথা না শুনে তার যেন এক পা বাড়াবার জো নেই। সেই জ্বলজ্বলে চোখওয়ালা বুড়ো বলতে লাগল—দিনটা বেশ ভালোই ছিল। রোদ উঠেছে, হাওয়া বইছে, আমরা পাল তুলে জাহাজ ছেড়ে দিলাম। জাহাজ হেলেদুলে নেচে-নেচে পাহাড়ের পাস ঘেঁসে, পাহাড়ের উপরের গির্জার তলা দিয়ে, আলোঘর পেরিয়ে এগিয়ে চলল। বেলা দুপুর গড়ালো, সুন্দর দিনটি, রোদে চারদিক ঝলমল করছে। জাহাজ দক্ষিণমুখো এগিয়ে চললো। দিনের শেষে সূর্য মাস্তুলের ডগা ছুঁয়ে ধীরে ধীরে অস্ত গেল।

হঠাৎ বিয়ের সভায় জোরে বাজনা বেজে উঠল। খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল বর-কনে অপূর্ব সাজে সেজে হলঘরে এসেছে। অতিথি নিমন্ত্রিতদের নমস্কার করে করে তারা দুটিতে এগিয়ে যাচ্ছে আর আগে আগে গান গেয়ে গেয়ে চলেছে গায়ক দল। বিয়ের সভায় যাবার জন্যে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। ইচ্ছে হল এই মুহূর্তে ছুটে চলে যায়, কিন্তু তার যাবার উপায় নেই। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই বুড়োর কাহিনী শুনে যেতে হল।

—চলতে চলতে হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এল এক প্রচণ্ড ঝড়, তার ঝাপটে দাপটে জাহাজ একেবারে লণ্ডভণ্ড হবার জোগাড়। বিরাট একটা কালো পাখির মতো সে যেন তার ডানার উপর আমাদের ছোট্টো জাহাজটাকে তুলে নিলে। সোজা বরফ-ঢাকা দক্ষিণ মেরুর দিকে নিয়ে চলল। জাহাজের মাস্তুল ঝুঁকে পড়ল, দাঁড় ভেঙে পড়ল, সামনের দিকে মাথার দিকটা নুয়ে পড়ল, সেই ঝড়ের সোরগোল শুনতে শুনতে আর ঝাপটের মার খেতে খেতে জাহাজটা দ্রুতবেগে মৃত্যুর করাল গ্রাসের মধ্যে এগিয়ে চলল। চার পাশে ঝড় আর ঝড়, ঝড়ের ধমকানি আর ঝাপটানি।

ক্রমে ঝড় থেমে গেল। কিন্তু ঘনিয়ে এল কুয়াশা, বরফের আস্তরণে মৃত্যুর শীতলতা জাহাজটাকে জড়িয়ে ধরল। মাস্তুলের সমান বরফের স্তূপ, গাঢ় সবুজ পান্নার মতো রঙ। সেই বরফ আশে-পাশে ভেসে ভেসে এসে জাহাজ ঘিরে ফেললে। চারদিকে কেবল বরফের চাপ, বরফের পাহাড়। জীব নেই, জন্তু নেই, গাছ নেই পাতা নেই, রাশি রাশি বরফ প্রচণ্ড শব্দে ধাক্কা খাচ্ছে, ভেঙে ভেঙে কেটে পড়ছে, শব্দে কান পাতা দায়। এরই মধ্যে কোত্থেকে কি জানি, উড়ে এল একটা সমুদ্রের পাখি। সেই ঘন কুয়াশার অন্ধকার আবরণ ভেদ করে সে জাহাজের চার পাশে উড়ে বেড়াতে লাগল। জাহাজের নাবিকরা এতক্ষণে একটা জীবন্ত প্রাণী দেখে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। সবাই তাকে খাবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল। পাখিটা এ সব খাবার কখনো খায়নি, মনের আনন্দে ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে খেতে লাগল। পাখিটা আমাদের সৌভাগ্য নিয়ে এসেছিল। একটা বরফের স্তূপ ভেঙে পড়ল আর তার মধ্য দিয়ে আমাদের জাহাজের যাবার রাস্তা হয়ে গেল। এর পর থেকে সুন্দর দক্ষিণের বাতাস বইতে লাগল। কিন্তু কুয়াশা তখনো কাটল না। সমুদ্রের পাখিটা রোজ খাবার লোভে খেলার আনন্দে জাহাজের কাছে আসতে লাগল, নাবিকরা তাকে ভালবেসে ফেললে। পাখিটা কুয়াশার ঘন মেঘ ভেদ ক'রে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। রাত্রে চাঁদের আলোয় চারদিক ঝলমল করে। জাহাজ বেশ ভালভাবে চলতে লাগল।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ সেই বুড়ো নাবিক দেখতে কেমন অদ্ভুত রহস্যময় হয়ে উঠল, যেন তাকে শয়তানে ভর করেছে, যেন সে মানুষ নয়। বুড়ো কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল—কী যে দুষ্টবুদ্ধি জাগল, পাখিটাকে গুলি করে মেরে ফেললাম। যে আমাদের পথ দেখিয়ে ভাল পথে নিয়ে যাচ্ছিল, খেলার ছলে তাকেই গুলি করে বসলাম।

বুড়ো একটুক্ষণ থেমে রইল। তারপর আবার তার সেই অদ্ভুত স্বরে বলতে লাগল—আর কোনো পাখি আমাদের জাহাজের কাছে খাবার খেতে বা খেলা করতে এল না। সূর্য্য ডানদিকের সমুদ্র থেকে উঠে এসে বাঁদিকের সমুদ্রে কুয়াশার মধ্যে অস্ত গেল। তারপরে এক সময় বাতাসটা থেমে গেল। সবাই বলতে লাগল—পাখিটা মারা আমাদের খুবই অন্যায় হয়েছে। নিশ্চয়ই এতে কোনো অমঙ্গল ঘটবে। পাখিটাই দক্ষিণের ফুরফুরে বাতাস নিয়ে এসেছিল, ভাল পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, এখন কি হয় তার ঠিক নেই।

কিন্তু পরের দিন সুন্দর সূর্য উঠল, কুয়াশা কেটে গেল, সবাই বললে পাখিটাকে মেরে ফেলে ভাল হয়েছে। ওটাই এই কুয়াশা আর ঝড় বৃষ্টি নিয়ে এসেছিল।

জাহাজের পালে হাওয়া লাগতে লাগল। সাদা সাদা ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে জল কেটে কেটে আমাদের জাহাজ নেচে নেচে

চলতে লাগল। দেখতে দেখতে আমরা প্রশান্ত মহাসাগরের কূল-কিনারা হীন অথৈ জলরাশির মধ্যে এসে পৌঁছলাম। সেখানে কোনোদিন কোনো জাহাজ যায়নি, কোনো মানুষ আসে নি। আমাদের জাহাজই প্রথম এসে পৌঁছল। হাওয়া জোরে বইতে বইতে এখানে এসে আচমকা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। পাল ঝুলে নেবে পড়ল, জাহাজ নিশ্চল হয়ে গেল। জলে একটি ঢেউ নেই, ঢেউয়ের শব্দ নেই, খাঁ খাঁ করছে নিঝুম নীরব মহাসমুদ্র। সেই নিস্তব্ধ ভয়াবহতা তাড়াবার জন্য আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলাম। দুপুর বেলা আগুন-ঢালা তীব্র সূর্য উঠল, কিন্তু কোথাও এক ঝলক হাওয়া নেই। দিনের পর দিন কাটতে লাগল, পালের জাহাজ হাওয়া শূন্য অবস্থায় মাঝসমুদ্রে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন সত্যিকারের জাহাজ নয়, যেন সমুদ্রের বুকে আঁকা ছবি। আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। জল জল আর জল। ধূ ধূ জল ছাড়া আর কিছু নেই; কিন্তু সেই লবণ সমুদ্রের জল এক ঢোক খাবার উপায় নেই। জাহাজের জল ফুরিয়ে গেছে। পিপাসায় গলা শুকিয়ে উঠল। চারিদিকে জলের মধ্যে কতরকম প্রাণী সাঁতরে বেড়াচ্ছে। সেগুলো কি প্রাণী! মৃত্যু যেন চারপাশে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে জলের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠছে—লাল-নীল, সাদা-সবুজ। সারা রাত সেই মৃত্যুর খেলা দেখে কাটতে লাগল। আলেয়ার আলো, ডাইনীর আলো যেন আমাদের সামনে পিছনে। ভূত-প্রেত দৈত্যি-দানো—কত কিছু সেই কুয়াশার রাজত্ব থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের ঘিরে ফেললো। ভয়ে-ভাবনায় জাহাজের নাবিকদের একটি কথা বলবার শক্তি রইল না, জিভের গোড়া থেকে লালাটুকু অবধি শুকিয়ে গেল। তারা ভয়াল চোখে তাকিয়ে আমাকে ভস্ম করে ফেলতে চাইল। রাগে দিশেহারা হয়ে আর কি করবে ভেবে না পেয়ে শাস্তিস্বরূপ সেই গুলি-করে-মারা সমুদ্রের পাখিটাকে এনে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিল।

সময় কাটাতে লাগল। দীর্ঘ বিরস দিন। শুকনো খটখটে জিভ, শুকনো গলা আর জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে সেই মৃত্যুপথের পথিক নাবিকরা পরস্পরের দিকে ভয়াবহ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। সময় আর কাটতে চায় না। পশ্চিম কোণে তাকিয়ে মনে হল কিছু-একটা দেখা যাচ্ছে। এক-টুকরো কালো মেঘ! না, কোনো জাহাজের মাস্তুল। তাকাতে তাকাতে মনে হল সেটা যেন আকার ধরে এগিয়ে আসছে। জাহাজই হবে। ক্রমেই এগিয়ে আসছে, জলের আলোড়নে শব্দ উঠছে, ঢেউ ভাঙছে যেন। আমাদের গলা এমন ভাবে শুকিয়ে গেছে, মনে হচ্ছে জিভ যেন কড়া করে ভাজা হয়েছে। জাহাজটাকে দেখে না পারলাম কেউ হাসতে, না পারলাম কাঁদতে। কেবল স্তব্ধ হয়ে বোবার মতো তাকিয়েই রইলাম। এমন সময় আমি হাত কামড়ে রক্ত চুষে জিভ ভিজিয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—জাহাজ, পাল দেখা যাচ্ছে।

অন্য সবাই শুকনো শক্ত জিভ আর কালো পোড়া ঠোঁট মেলে হাঁ করে তাকিয়ে আমার কথা শুনলো। তারপরে একসঙ্গে একটা বড় নিশ্বাস টেনে নিয়ে হা হা হা হা করে অট্টহাসি হেসে উঠল।

[ক্রমশঃ।

গল্প হোলেও সত্যি

শ্রীমৃণালকান্তি বসু

আজ তোমাদের একজন বাঙালী বিপ্লবী বীরের গল্প বলব, যাঁর দেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি ছিল অতীব অসাধারণ। ১৯০৫ সাল, স্বদেশীর জোয়ার ছুটেছে—দেশকে ভাসিয়ে মাতিয়ে, বিশেষতঃ ছাত্রকুলকে। এ হেন যুগে আকাশ যখন লাল হয়ে উঠেছে, বাতাস উত্তপ্ত—লোকের মন, যুবকদের প্রাণ বিক্ষুব্ধ। তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র; তার ক্লাসের ইংরেজ প্রফেসার (লজিক ও দর্শনের) কি এক অনুষ্ঠানে বেফাঁস কিছু বলে ফেললেন বাঙালীদের বিরুদ্ধে। বারুদের স্তূপে আগুনের ফুলকি। ছাত্রমহলে আবেগ-উত্তেজনা চলল। এর কি প্রতিকার নেই? সাদা চামড়া কি এমনই নিরঙ্কুশ? কিন্তু দিন এল—আকাশ ভেঙ্গে বজ্রপাত! কি ব্যাপার? এমন সময়ে হঠাৎ চারদিক উদ্বেলিত, মুখরিত করে শতকণ্ঠে বিরাট ধ্বনি উঠল, "বন্দেমাতরম্", "বন্দেমাতরম্"। সবাই ছুটল এদিক-ওদিক—কী হল, কী হল? ইংরেজ প্রফেসারকে জুতো মেরেছে কে? কে বলতে পার? কে এই বাঙালী বিপ্লবী বীর যুবক ও ইংরেজ প্রফেসার?—আমাদের উল্লাসকর দত্ত ও রাসেল (Mr. Russel) সাহেব।

গুরুদেব

(কবি রবীন্দ্রনাথ স্মরণে)

রুদ্রাণীশংকর ঘোষ

তোমার কালের পোড়ো হ'লে
কেমন মজা হ'ত!
এ-সব পাঠশালা নয় বন্দীশালায়,
আর কি কেউ যেত।
সূর্য্য ওঠার অনেক আগে
যেতেম পাঠে, পুরোভাগে
থাকতে তুমি গুরুর গুরু
ভয়ত নাহি পে'ত!
নেইক প্রাচীর, গাছের তলে
বসতে তুমি—বেদীর 'পরে
তৃণের পরে আমরা সবাই
আরাধনাই—পে'ত।
সন্ধ্যা-সকাল দুটি বেলা
তোমায় ঘিরে পাঠের মেলা
থাকত নাকো শাসন-শোষণ
থাকত নাকো বেত'ও।
আর, উজাড় ক'রে দিতে তুমি,
সব খুশি মনেই নিত'।

কবি কর্ণপুর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৮৮। দয়াহীন আঘাতে সখাকে বিমূঢ় হয়ে যেতে দেখে হঠাৎ যেন আবেগের বেগ বেড়ে গেল শ্রীবটুর। দুহাত তুলে ঢেউ-নাচানি নাচতে নাচতে বিপুল বিক্রমে বলে উঠলেন,—

"তোমার শ্রেষ্ঠ সহায় এই তো আমি হেথায় রয়েছি বয়স্য। মোহে পোড়ো না মোহে পোড়ো না।"

বলতে বলতে কেলি-কন্দুকগুলি হাতে গুঁজে দিয়ে আবার যেই না তড়পেছেন,—

"তাড়াও বয়স্য এদের তাড়াও। এই তো আমি তোমার গোড়ালি আঁকড়িয়ে আছি। আমি থাকতে তোমার আবার অসাধ্যটা কি ?"

অমনি লীলাভরেই যেন অলস হয়ে বঙ্কিম হয়ে হয়ে পড়লো বৃষভানুপুত্রীর ভ্রূ, মুকুলিত হল তাঁর আঁখি আর তারপরেই পলকে ঝঙ্কৃত-কঙ্কণ লাফিয়ে উঠল তাঁর পদ্মকোষের মত ছোট্ট হাত। কেউ দেখতে পেলে না কখন গিয়ে মুরারির বক্ষে লাগল রাধার সিন্দুর-কন্দুক।

৮৯। মার খেয়েই শ্রীকৃষ্ণের মনে হল তিনি যেন জেগে উঠেছেন, অতিসুখের ঘুম থেকে যেমন জেগে ওঠে কিশোর কেশরী। রাগ হল ঘটে কিন্তু কেমন যেন ভীষণ ভাল লাগল সেই মার।

কুসুমাসবের হাত থেকে, ললিতাদের হাত থেকে গুলাল ছিনিয়ে নিয়ে নন্দকিশোর যখন অনুধাবন করলেন রাধার, তখন যদিও তাঁর কানে এসে পৌঁছল ললিতার বাণী, যথা—

"ওমা, তোমার বুকে অমন করে···আহা নিজের অনুরাগের মত করে··কোন্ রসিকা হেনে গেল সিন্দুরের কন্দুক।···কে জানে লো কে জানে।···বোকামির অতিটা কিন্তু ভাল নয়। বুঝে চলুন সমঝে চলুন।···অনুরোধ উপরোধ করেন নি আমাদের প্রিয়-সই, বৃথা তাঁর এই পিছু ধাওয়া কেন ?"

তবুও তিনি থামতে পারলেন না। দৌড়তে লাগলেন। দৌড়তে দৌড়তে দেখতে পেলেন,···রাধার চোখ হাসছে, চোখের কোণে ঢেউ দুলছে হাসির। তারপরেই দেখতে পেলেন··· ঠোঁটের মাথা থেকে যেন ঠিকরিয়ে পিছলিয়ে পড়ে গেল এক টুকরো হাসি,···দেখিয়ে দিল শ্যামাকে, ঐ যিনি রগড় দেখবার লোভে ঘাপটি মেরে বসেছিলেন সখীদের চক্রব্যূহের মধ্যে। শ্যামাকে দেখাও যেই অমনি শ্রীকৃষ্ণ ছুটলেন তাঁর দিকে। বসন্তের বৈভবে কুঙ্কুমে চন্দনে নিমেষের মধ্যে তিনি লেপন করে দিলেন শ্যামার দুটি গাল, কপাল, কবরী এমন কি বুক।

৯০। কী অন্যায়, কী অন্যায়! শ্যামার সখী বকুলমালা এই অন্যায় আচরণ নিরীক্ষণ করে আবিষ্কার করে বললেন, একখানি আকুল আলাপ; যথা:—

"আমাদের হৃদয়টাকে যে পুড়িয়ে ছাড়ছে আপনার মত রসিকের পাণ্ডিত্য। যদি, কন্দুক ছুঁড়তে এসে ময়ূরপাখীর চূড়ো হেলিয়ে চন্দ্রবদনে জ্যোৎস্নার মত অতো হাসির মুক্তো ঝরানো কেন? কী এমন রাগের হোতো, কী এমন ব্যথা পেলেন, যে তাঁকে ছেড়ে এখন আমার নির্দোষ সখীটিকে যন্ত্রণা দিচ্ছেন ?"

৯১। বচনের তাৎপর্য্যের পর্য্যবসানটি দিয়ে যেই বকুলমালা সূচনা করে দিলেন শ্রীরাধিকার শ্রেষ্ঠতা, অমনি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল শ্রীকৃষ্ণের কৌতূহল। রাধার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসিতে রাগের রাগিণী লতিয়ে বলে উঠলেন,—

"দেখি তো একবার গরবিনীর কত বল। কই আসুন তো দেখি এগিয়ে। ছুঁড়ুন ছুঁড়ুন, দেখি কত ছুঁড়তে পারেন কন্দুক।"

বলতে বলতে মাধবকে বেগে এগিয়ে আসতে দেখে পদ্মাক্ষীদের হেসে উঠল ঠোঁট, আর সেই ঠোঁটে কলকল ধ্বনি তুলে যেই জাগল,—

"উঁ হুঁ হুঁ, তর্ক করিসুনি, ঘেরাও কর, ঘেরাও কর, মার, মার···উঁ হুঁ···"

অমনি বসন্তের কোকিলদেরও ঠোঁট ফেটে বেরল ধ্বনি—পোৎণ··· কুহু কুহু কুহু।

৯২। রসিক-সভার যিনি তিলক-স্বরূপ, অকস্মাৎ তিনি বন্দী হয়ে গেলেন নববধূদের সুন্দরী আবেষ্টনীর মধ্যে। তখন তাঁর উপর বৃষ্টি হতে লাগল আবীর-গুলাল, কারো কারো হাত থেকে পৌষ্প কন্দুক, কারো কারো মাণিক্য-পিচকারী থেকে আর্দ্র-চন্দন আর কুঙ্কুমবারি। কিন্তু সিক্ত হয়েও শ্রীগোপেন্দ্রসুত স্বয়ং একাকীই বারংবার তাঁদের তাড়া করতে লাগলেন লীলাভরে।

দেখতে দেখতে সুন্দরীদের কোথায় যেন ভেসে গেল লজ্জা, সদনুরাগের স্বাভাবিক আবেগে চুলবুল করে উঠল চিত্ত। অলৌকিক সাহস কলিয়ে তাঁরা একসঙ্গে পুনর্ব্বার ঘিরে ফেললেন প্রিয়তমকে,··· একফালি মেঘকে যেমন করে ঘিরে ফেলে জ্যোৎস্না।

চৈতী গান গেয়ে উঠলেন মাতঙ্গীদেবীর দল। বীণার গুঞ্জনে মুখর হল দিগন্ত।

স্তবগান করে উঠল নীলভ্রমর, কালো কোকিল, চিত্রবরণ বিহঙ্গ। আচার্য্য পবনদেবের উপদেশে নেচে উঠল লতারা।

আর ওদিকে যখন একদল বাজাতে থাকেন যন্ত্র, এদিকে তখন অন্য দল গাইতে থাকেন বসন্ত, একদল ছুঁড়তে থাকেন গন্ধ-আবীর অন্যদল হানতে থাকেন কন্দুক। এঁদের গায়ের আবীর ওঁদের গায়ে উড়ে লাগে। আর···সুবল-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ সখাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাটি-হাটি উল্লাস-নৃত্য প্রদর্শন করতে থাকেন হাসকপ্রণয়ী শ্রীবটু।

১৩। ব্রজসুন্দরীদেরও কর-কঙ্কনের তখন সে কি অমিলা মুখরতা। যেন এক কমনীয় অলক্ষ্য ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে ঝাঁকে ঝাঁকে কলবিঙ্কের উদ্ধত সমাজ। চতুর্দ্দিক থেকে তাঁদের লাফিয়ে উঠল অভিহন্যমান ভুজ-মৃণালদণ্ড। প্রণয়িতমা অবলাদের মুষ্টিপূর্ণ কুঙ্কুমচূর্ণের বলাৎকার-সুখের চমৎকারিতায় পুষ্ট হয়ে উঠল রণ-কলহ। অতএব অবশেষে, পরাজয়টিকেই জয় বলে মেনে নিতে হল শ্রীকৃষ্ণকে। পাল্টা-জবাব না দিয়েই তিনি হঠাৎ আকার-গুপ্তি করে নিজের চাঁদমুখে ফুটিয়ে তুললেন নাটুকে একখানি কলঙ্ক। এমন ভাব দেখালেন যাতে সকলের মনে হয়, নিভে গেছে তাঁর মহাপ্রভাবের মহাদীপ।

তখন আনন্দে ডগমগ করতে করতে কোনো অবলা চুরি করলেন তাঁর বাঁশরী, কেউ চুরি করলেন পানীয়যন্ত্র, কেউ ফুলময় ধনুকখানি কেউ অনুপম বাণজাল। তারপরে যখন আর একদল অবলা কৌতুকের আধিক্যে আহরণ করতে গেলেন কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের বিভূষণ, তখন হাস্য-সুন্দর ভুরুখানি বঙ্কিম করে শ্রীরাধিকা বাধিকা হয়ে দাঁড়ালেন।

অঞ্চল দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে মুছিয়ে দিলেন পরাজিত লীলাপক্ষের স্বেদবারি। মুছিয়ে দিলেন মুখের কুঙ্কুম-পঙ্ক। এবং মোছাতে মোছাতে দৃষ্টি দিয়ে এমন ভাবে পান করলেন কৃষ্ণের মধুরিমা, যে সেই পানটিই হয়ে দাঁড়াল রণক্ষেত্রে জয়ী যোদ্ধার বীরপানের সমতুল।

তারপরে সখীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে খাইয়ে দিলেন তাম্বূল বীটিকা, এবং খাওয়াতে খাওয়াতে যেই তিনি নাচিয়ে দিলেন ভ্রূ অমনি ইঙ্গিত বুঝে রাধার হৃদয়নাথকে বাতাস করতে বসে গেলেন সখী শ্যামা।

১৪। আবীর-রগরগে ঘাড় বাঁকিয়ে ইত্যবসরে ব্যাপারখানা দেখে ফেলেছেন শ্রীবটু। আর যায় কোথায়? চমকে উঠল তাঁর উৎসাহ ও সাহসিক্য। গর্জ্জমান মেঘের মত গর্জ্জন করে উঠলেন,—

"হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ, হে সখীশ্রেষ্ঠগণ, আমরা জয়ী। আমাদের অনন্ত মাহাত্ম্যে পরাজিতা হয়েছেন সর্ব্বোত্তমা বৃষভানুনন্দিনী। গর্ব্ব ভেঙেছে। আপনারা জেনে রাখুন, বিজয় তেজে দীপ্যমান আমার প্রিয়বয়স্য মাত্র অলস হয়ে এলিয়ে পড়েছেন উৎসব-শেষে। অকম্পিতা রাজবালা তাঁকে সেবা দান করে চলেছেন অনুগৃহীত দাস্য-রসের মত। অতএব কৌতুকের পরাকাষ্ঠায় দাঁড়িয়ে বলতে পারি···এই হওয়াই সমুচিত। আমি যাঁর বুদ্ধি মন্ত্রী তাঁর আবার কোথায় পরাভব?"

বলতে বলতে সুখের প্রচণ্ড বৈভবে দু হাত তুলে নরীনর্ত্তন আরম্ভ করে দিলেন শ্রীবটু। আর তাঁর সেই বল্‌গন নটন-ময় ভাঁড়ামির ও প্রতিভার আকর্ষণে উভয় পক্ষেরই পায়ে জাগল অক্ষয় নৃত্যবেগ। দেবী বৃষভানুনন্দিনীরও উথলে উঠল সন্তোষ। কণ্ঠ থেকে নতুন হারযষ্টিখানি খুলে নিয়ে তিনি দক্ষিণান্ত করলেন শ্রীবটুকে।

১৫। লীলা-রণের পরিশ্রমে দু'পক্ষেরি অলস ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল অঙ্গ। সেই অঙ্গের মাধুর্য্য-সঙ্গী সমকালীন সৌন্দর্য্য-রসতরঙ্গে যেন ডুবতে ডুবতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন বনদেবীরা। মাতঙ্গী দেবীরও দশা হল তাই। তাঁরা সর্ব্বত্রই সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন··লঘুতার উৎকৃষ্ট অভাব। আত্মশ্লাঘার আনন্দে ও সহজাত ভাবাবেগে বনদেবীগণ ও মাতঙ্গী দেবী তখন যথাক্রমে আশা করলেন সঙ্গীতের এবং উৎসবের অভিরাম বিরাম

১৬। সমাপ্ত হল বসন্তোৎসব।

শ্রীকৃষ্ণ এবার হাতে তুলে নিলেন বেণু। তাঁকে ঘিরে মিলিত হলেন সহচরেরা। এবং সে মিলনে শ্রীকৃষ্ণের সাথী হল শ্রীরাধার উপহার··ভ্রমর-ঝঙ্কার একগাছি নবমাল্য বনফুলের। তারপরে বনতরুর ছায়ায় বসে তাঁদের মধ্যে উঠল নববসন্তের কত গান, মহানন্দে ভরা চন্দনগন্ধী কত আলাপ, কত গুঞ্জনের তারল্য।

১৭। আভীরকিশোরীদের ঈশ্বরীও বিরাম দিলেন খেলায়। আলি-মালাদের সঙ্গে নিয়ে তিনিও সহর্ষে কিছুকাল উপভোগ করলেন কৃষ্ণসঙ্গের পরমানন্দের সমৃদ্ধি। তারপরে··ভাবতে ভাবতে বিশ্রাম করতে চলে গেলেন আম্রমঞ্জরীর গন্ধে-উদাস বাসন্তী-মণ্ডপে। ভাবলেন—"আমার প্রিয় যদি আমারই হয় তাহলে কত সুখই না হয়"···

সেখানে তিনি আহ্বান করলেন মাতঙ্গী দেবীর গানের দলটিকে। তাঁদের প্রণাম জানালেন, এবং পরিশেষে পারিতোষিকের কমনীয়তায় হৃদয় ভরিয়ে স্নিগ্ধ দিলেন সবহুমান বিদায়।

ইতি কৈশোরলীলাবিস্তারে বসন্তোৎসবো
নাম চতুর্দ্দশঃ স্তবকঃ।

পঞ্চদশ স্তবক

গোবর্দ্ধন-ধারণ

১। বসন্তোৎসবের বাকি তিথিগুলি ধীরে ধীরে অতিবাহিত হয়ে গেল এই [illegible] বিবিধ বিলাসের মধ্য দিয়ে। ঊঢ়া ও অনূঢ়া সুন্দরীদের এবং নিজের নর্ম্মসখাদের সান্নিধ্যে বিলাস করতে লাগলেন আভীর-রাজাত্মজ শ্রীকৃষ্ণ। এ যেন তারার মণ্ডলীর মধ্যে কলানিধির বিলাস। বৃন্দাবনে যদিও প্রকাশ পেল এই বিলাসের বহু আঙ্গিক, তবু তাদের অনাবিল [illegible] অনাবিষ্কৃত রইল বৈমুখিনতা। যিনি রসময়, যিনি সুরঙ্গীদের অগ্রণী তাঁর লীলায় কেমন করেই বা থাকতে পারে অভিরমণীয়তার অভাব?

এই বিলাসের মধ্যেই ধরণীর আনন্দ জাগিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চলল গোচারণ-কৌতুক। কখনও কখনও করতেন দানব-বধ। তারা যে বিষ,··বিদ্বানদের চোখে।

২। তারপরে একদিন বিস্মিত-নয়নে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ দেখতে পেলেন,··ব্রজধামের গোপেরা, যাঁরা পরম-নির্বৃত, যাঁদের দয়া দাক্ষিণ্যের অন্ত নেই, তাঁরা যেন এক নবীন আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছেন,··· উঠেছেন ইন্দ্রযজ্ঞের মত কোন এক অখণ্ড অনুষ্ঠানের জন্যে,··সংগ্রহ করেছেন নানান্ প্রকারের অগ্রীয় সামগ্রী,···এবং চলেছেন রাজসভার অভিমুখে। তারপরে পুনর্ব্বার যখন তিনি দেখলেন, তাঁর পিতৃদেবও বয়োবৃদ্ধ ও সম্পন্ন গোপদের নিয়ে সভা জম্‌কিয়ে বসেছেন, তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না; সভঙ্গি সভায় উপস্থিত হয়ে বললেন,—

"আর্য্যপাদগণ, এই উদার মহোৎসবের নাম কি? এ উৎসবের দেবতা কে? আচার্য্যই বা কে? কী এর বিধি-নিষেধ? আশ্চর্য্য, আমার মেধাবী হৃদয়ের কাছে কিছুই তো প্রতিভাত হচ্ছে না। কোন্ প্রয়োজনেই বা এই বিপুল জনতা যন্ত্রচালিতের মত সর্ব্বত্র দৌড়চ্ছে? তাই আমার এই বালক-সুলভ প্রশ্ন। আশা করি উৎসবের আকর সম্বন্ধে আপনারা আমাকে অভিজ্ঞ করবেন। সুহৃদের কাছে বা হৃদয়ের
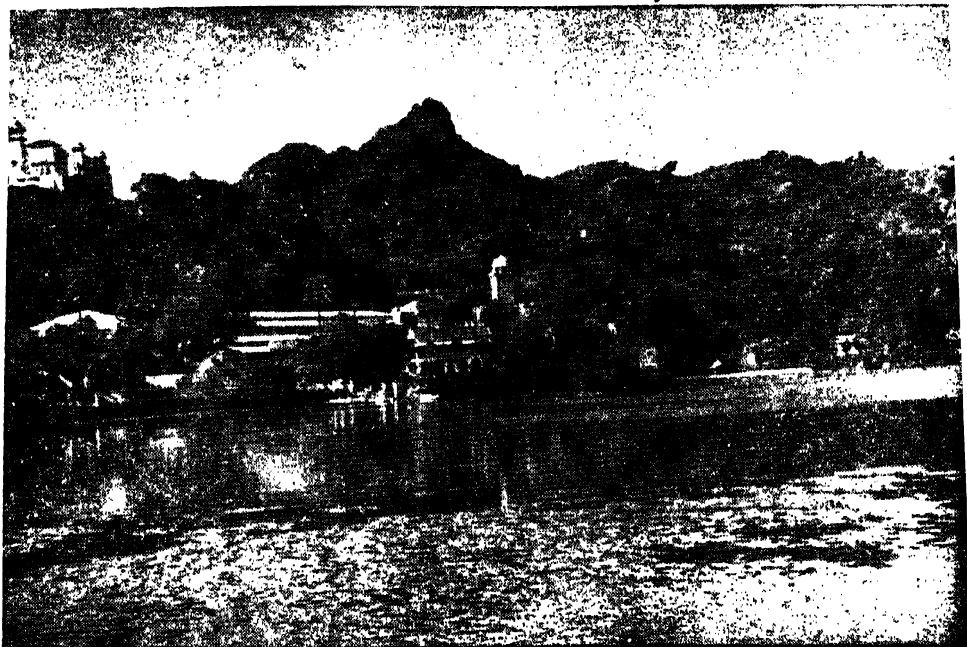
মাউণ্ট আবু —নারায়ণ সাহা

॥ আ লো ক চি ত্র ॥

দ্বিপ্রহর —সুব্রত পত্রনবীশ

বিশ্রাম —জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘাটের পথে

—রামকিঙ্কর সিংহ
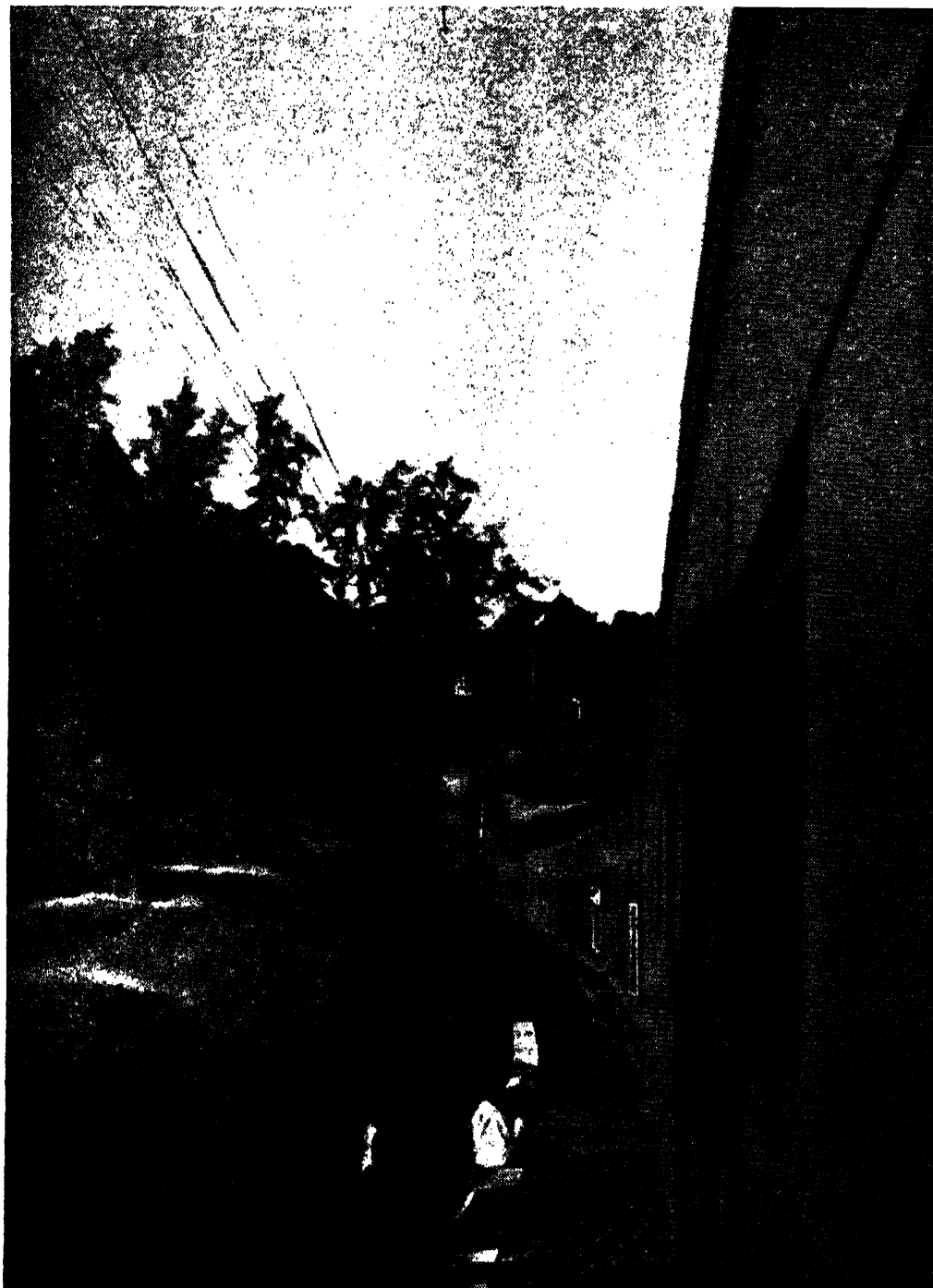
বিসর্পিল —কান্তিভাই

কাছে গুপ্ত বার্ত্তা লুকিয়ে রাখা সমীচীন নয়; বিপক্ষ উদাসীন হলেও তথ্য-প্রক্ষেপ সমীচীন নয়।"

৩। বাক্য-রচনায় বিশ্রাম দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে বসে পড়লেন নিকটবর্ত্তী বস্ত্রাসনে। পুত্রের নীতিজ্ঞান দেখে ব্রজরাজের শুভ্র-শ্মশ্রু মুখখানিতে ভেসে উঠল আদর-মিশ্র হাস্যের মহোল্লাস। এ তো ছেলে নয়, এ যে তাঁর বসুধা-করম্বিত অকলঙ্ক সুধাকর। অঙ্কে টেনে নিয়ে আভীর-রাজ ধীরে ধীরে বললেন,—

৪। "কৃষ্ণ, আমাদের কুলে নানান্ ক্রিয়াকাণ্ডে পরিপুষ্ট হয়ে নিরাবিল একটি আচার চিরকাল ধরে বংশপরম্পরায় চালিত হয়ে এসেছে। সেটি হচ্ছে এই।···গোধনই আমাদের ধন; গোধনের জীবন হচ্ছে ঘাস। ঘাস খেয়েই তারা বাঁচে। ঘাসের নির্ব্বিঘ্ন অভ্যুদয় হতে পারে না···বৃষ্টি বিনা। বৃষ্টিও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, যদি মেঘ না ভাসে আকাশে। ইন্দ্রদেবের ভয়ে স্বাধীন নয় কিন্তু মেঘ। অতএব তাঁর উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আমাদের এই ত্রুটিহীন যজ্ঞ। দেবেন্দ্র তুষ্ট হলে প্রীতি-পুষ্পের মত প্রতি বৎসরেই নামে তাঁর সুরীতি বর্ষণ।

৫। সম্প্রতি ইন্দ্রদেবই হবেন আমাদের যোগক্ষেমের সম্পাদক। স্বর্গের সুধার চেয়েও মানবের আরাধনা দেবতাদের কাছে প্রিয়তর। এই তাঁদের রীতি। দেবতারাও সম্পদ ও বিপদের অধীন; কিন্তু আরাধনার প্রভাবে নব-নব ভাবে কৃশ হয়ে যায় মানসপীড়া। অনারাধিত হলে সে পীড়া তেমনিই থেকে যায়।

৬। মহারাজের কথা শুনতে শুনতে যদিও প্রচুর ভাবে রক্তিম হয়ে উঠল তাঁর কর্ণযুগ, তবুও শ্রীকৃষ্ণ এমন একটি ভাব দেখালেন যাতে কেউ লক্ষ্য করতে না পারে তার গোপন মনোভাব। তাই প্রথমে অত্যন্ত মিষ্টি করে তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ মুচকি হাসিখানি হাসলেন; এবং তারপরেই···প্রতিবাদী যেমন করে মীমাংসা বচন আওড়ায়, তেমনি করে আবৃত্তি প্রত্যাবৃত্তি মূলে সবিবাদ এমন তিনি বিরচন করতে লাগলেন তাঁর ভাষণ, যে বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে গেলেন উপস্থিত সকলেই। বিস্মিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কিন্তু মন ভরে গেল সম্পূর্ণ। এমন সস্নেহজনক ভাষণ তাঁরা কখনও শোনেননি।

(ক্রমশঃ।

আশীর্বাদ

কুমারী সুস্মিতা বিশ্বাস

প্রাণাধিক, তব জীবন মধুর হোক,
সন্ধ্যার রাগে ছড়িয়ে পড়ুক দূরে
কুসুমগন্ধে দূরিত হউক, শোক
লভুক শান্তি সুন্দর তব সুরে।
তোমার ভাবনা ধরণীর বুকে আঁকে
সম্ভাবনার দীপ্ত সোনালি ফুল,
মেঘলা আকাশে তাই দেখি ফাঁকে ফাঁকে
বিধাতার হাসি ভেঙ্গে চলে দুই কূল।
আর আমি? থাকি মধুর ছলনা নিয়ে,
চারিদিকে শুধু নীল ও গোলাপী ভুল!

যাত্রা তোমার জীবনের গীতিলেখা,
একটি মধুর ভোর বয়ে আনে, আর
সে পথে আঁধার আমারি চলার রেখা,
অদেখা আগুন বীভৎস ফুৎকার।

মরুর বালুকা ঢাকে যে গোপন জল
ব্যথার দহনে তারেও শুকাই আমি;
তোমার মননে ধ্রুবজ্যোতি যে নল,
কলির কালিমা তারো মাঝে আসে নামি।
[কপট দ্যূতের মরুতে গেল যে প্রাণ,
বাঁচাতে তাহারে পারেনিক তব গান।]

জীবনপেয়ালা খালি হয়ে যদি আসে
যে আগুনে মোর শুকায় অশ্রুজল,
মাতালের মত এ মুখ যদিও হাসে,
তুমি থেকো বোন স্নিগ্ধ অচঞ্চল।
পৃথিবীর বুক রাঙিয়ে সোনালি রাগে
পূর্ণবিভাস তোমার মুরতি জাগে।
কালো মেঘ যদি চূর্ণ করিতে নাগো
সোনালি প্রলেপে ক'রো তারে মধুময়।
কান্নার নদী
ক্রমশঃই যদি উত্তাল হয় আরো,
সবুজ প্রাণের বাঁধ দিয়ে প্রিয় রুধিও প্রাণের ক্ষয়।

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বই

কবি প্রণাম

মহাকালের ধ্বংসের ঢেউ যে সব পুণ্যনাম কোনদিন গ্রাস করতে পারবে না—রবীন্দ্রনাথ সেই তালিকায় প্রথম উল্লেখের অধিকারী। আজকের পৃথিবী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়েই ভারতবর্ষকে দেখেছে, চিনেছে, জেনেছে। বাঙলার জাতীয় জীবন যে ভাবে তাঁর কাব্যে, গানে, রচনায় কানায় কানায় ভরে উঠেছে তার মূল্যায়ন আমাদের সাধ্যাতীত। তাঁকে কেন্দ্র করেই অন্তরে অনুভূতির আলো জ্বলে উঠেছে সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ভারতের শাশ্বত আত্মার প্রকাশ ঘটেছে। বাঙালীর সমগ্র জীবনে তাঁর অনতিক্রম্য প্রভাবের অত্যুজ্জ্বল স্বাক্ষর দেদীপ্যমান। আমাদের আলোচ্য কবি-প্রণাম গ্রন্থটি কবিতার লীলাভূমি, বাঙলার বিভিন্ন কবির রবীন্দ্র সম্পর্কিত রচনার এক সার্থক সঙ্কলন। গ্রন্থটি সঙ্কলন করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে রচিত কবিতার যথার্থ সংখ্যা নিরূপণ করা এক অসাধ্য প্রচেষ্টা—এই গ্রন্থে বহু কবির কবিতা স্থান পেয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ তদানীন্তন মনীষী থেকে শুরু করে আধুনিক কবিকুলের বহুজনের কবিতা ও গান এতে সংযুক্ত হয়েছে। একটি গ্রন্থে বিভিন্ন যুগের অতগুলি কবির সম্মেলন বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয়। প্রতিটি কবিতা ও গান আপন আপন বৈশিষ্ট্যের ও স্বকীয়তার স্পর্শযুক্ত ও আপন স্রষ্টার প্রতিভার স্বাক্ষর সমৃদ্ধ। রবীন্দ্র-জীবনের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন কবির চোখে বিভিন্ন রূপ ও ব্যাখ্যা নিয়ে প্রকটিত হয়েছে তারই প্রকাশ তাঁদের রচনায়। এবং এই থেকেই এক অপরূপ রবীন্দ্রভাষ্যের সৃষ্টি, গ্রন্থটির মধ্যে যেন অসংখ্য কবির সম্মিলিত কণ্ঠে এক অভিনব রবীন্দ্রগীতির স্নিগ্ধ ও রূপমধুর সুর শোনা যায়। সঙ্কলনকার শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় গ্রন্থটি সঙ্কলনের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা অনস্বীকার্য। যে পরিমাণ অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তা অচিন্ত্যনীয়। সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে তাঁর কৃতিত্ব, নৈপুণ্য ও দক্ষতার চিহ্ন ফুটে ওঠে। তাঁর কবিতা নির্বাচন প্রশংসার দাবী রাখে। কয়েকটি মূল্যবান চিত্র গ্রন্থের মর্যাদা বাড়িয়েছে। গ্রন্থটির সর্বাঙ্গে সুরুচির এবং শোভনতার স্বাক্ষর পরিস্ফুট। আজকের দিনের পাঠক-সমাজে বিস্মৃত বহু কবিতায় এখানে পুনরুদ্ধার করে লেখক কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এই সার্থকনামা গ্রন্থে সঙ্কলনকার বিভিন্ন যুগের কবিকুলের সমাবেশ ঘটিয়ে একটি নির্দিষ্টকাল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাঙলা কাব্য জগতের এক পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ রাখলেন। বিভিন্ন কবির বিভিন্ন ভঙ্গিমায়, বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গীর, বিভিন্ন বর্ণনারীতির মধ্যে দিয়ে তাঁদের যুগের ছায়া পড়েছে। এই ভাবে সমগ্র গ্রন্থে বিভিন্ন যুগের চিত্রায়ণের মধ্যে এই পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্তটি রূপ নিয়েছে। আমরা সঙ্কলনকারের কুশলতাকে অভিনন্দন জানাই এবং এই সর্বাঙ্গসুন্দর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

রবীন্দ্র সাহিত্যের অভিধান

রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা চলে একমাত্র মহাসমুদ্রেরই। লবণ সাগরের নয়, অমৃতসাগরের। সংখ্যার দিক দিয়েও রবীন্দ্ররচনা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে অনতিক্রম্য। তাঁরা সারা জীবনব্যাপী সমগ্র রচনার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটি। বর্তমান বিশ্বের পরমপূজ্য কবির যে অনবদ্য রচনা সারা পৃথিবীকে অসীমের, অপরূপের অনবদ্যের সন্ধান দিল সে রচনা মানুষের জীবনের প্রতিটি ছন্দে একীভূত হয়ে গেছে। যে রচনা নবমানবতার মহিমান্বিত বাণী প্রচারের মাধ্যমে বাঙলাকে বিশ্বের সমাজে এক মহিমান্বিত আসনে করেছে প্রতিষ্ঠিত বাঙলা সাহিত্যের নবজন্ম হয়েছে। সম্ভবপর যে রচনার কল্যাণে নতুন পথের নতুন জীবনের নতুন আলোকের সন্ধান পাওয়া গেছে যে রচনায় সেই রচনার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা এই স্বল্লায়তন গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা প্রশংসার দাবী রাখে। রচনাগুলির প্রকাশকাল, গানগুলির কোনটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কোন রচনা কোথায় প্রকাশিত হয় সে সম্পর্কেও এক নির্ভরযোগ্য বিবরণী এতে সংযুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রজিজ্ঞাসু যাঁরা এই গ্রন্থ তাঁদের এবং সমগ্র পাঠক সমাজকে নানা ভাবে উপকৃত করবে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত তথ্য জ্ঞাপক গ্রন্থগুলির মধ্যে এই জাতীয় গ্রন্থের স্থান পুরোভাগে। এই গ্রন্থের ব্যাপক প্রভাবে পাঠক সাধারণের পক্ষেই শুভ ফলদায়ক। সংকলনকার শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল এক দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু আনন্দের সঙ্গে পরিলক্ষ্যণীয় যে এই প্রচেষ্টায় তিনি সফলকাম হয়েছেন। সারা গ্রন্থটি শ্রীঘোষালের বিপুল শ্রম স্বীকার প্রখর দায়িত্ববোধ এবং পরিপূর্ণ আন্তরিকতার স্বাক্ষর বহন করে। গ্রন্থটির শেষ ভাগে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ইংরাজী ও বাঙলা ভাষা প্রকাশিত গ্রন্থাদির একটি তালিকা পেশ করে গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। আমরা তাঁকে এই সাধু ও দুরূহ প্রচেষ্টায় সফলতা অর্জনে অভিনন্দন জানাই। প্রকাশক—লেখক স্বয়ং। ৩০।৬।১ মদন মিত্র লেন, কলকাতা—৬। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

আমার সত্য সন্ধান

আচার্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ-এর নাম আজ আর কোন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না, এই জনসমাদৃত মানুষটির আত্মজীবনীমূলক সংক্ষিপ্ত রচনাটি নানা কারণেই উল্লেখ্য। লেখক পৃথিবীখ্যাত দার্শনিক

পণ্ডিত, বর্তমান রচনায় তাঁর জীবন ও দর্শন এ ছুটোর উপরই আলোকপাত করা হয়েছে, বিশেষ করে জীবনের পরতে পরতে তাঁর যে আত্মজিজ্ঞাসামূলক সত্যসন্ধান চলেছে তারই পরিচয়ে তাঁর রচনা সমুজ্জ্বল। লেখক আধুনিক নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী নন, ঈশ্বরের কল্যাণ হস্তকে তিনি স্বীয় জীবনে উপলব্ধি করেছেন অকৃত্রিম আন্তরিকতায় আর সেটাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির মূল বক্তব্য। বর্তমান বস্তুসর্বস্ব জড়-বিজ্ঞানের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ব্যক্তির কাছে হয়তো উপরোক্ত মত ভ্রান্ত বলে পরিগণিত হতে পারে কিন্তু চিন্তাশীল অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ মাত্রেই এই রচনায় সত্যের আলোক দেখতে পাবেন, পাবেন নির্দেশ সত্যকার কল্যাণের সত্যকার মঙ্গলের পথের। মানুষের নিপীড়িত অশান্ত আত্মারই জিজ্ঞাসার উত্তর যেন অকথিত অথচ উজ্জ্বল হয়েই আত্মপ্রকাশ করে রচনাটির ছত্রে ছত্রে। মূল বইটির অনুবাদে, অনুবাদিকা বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর ভাষা যেমন সহজ তেমনই সাবলীল। এর আঙ্গিক সম্বন্ধেও অনুযোগ করার কিছু নেই। লেখক—সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ভাষান্তর—শুভ্রা ভট্টাচার্য্য, এম-এ। প্রকাশক—মেট্রোপলিটন বুক কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১নং নেতাজী সুভাষ মার্গ, দিল্লী—৬। মূল্য—২৲ মাত্র।

নিশিপদ্ম

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস "নিশিপদ্ম" নানা কারণেই একটা আলোড়ন তুলবে সাহিত্যপ্রিয়দের মধ্যে। যে দীপ্ত বলিষ্ঠ সুষমা তারাশঙ্করের লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচ্য গ্রন্থে তার আভাস মিলবে সর্বত্র, বারবনিতা কাঞ্চনমালা ও তার কন্যা মুক্তামালা এই ছুটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনী আবর্তিত হয়েছে, অসাধারণ কৌশলে লেখক এই নারী-চরিত্র ছুটিকে রেখায়িত করেছেন। নারীহৃদয়ের যা চরমতম সত্য সেই আত্মবিসর্জনকারী উদগ্র প্রেমের বার্তাই এই কাহিনীর মূল উপজীব্য। রূপোপজীবিনীর পঙ্কিল জীবন পঙ্কজ হয়ে ফুটে উঠল একদিন এই প্রেমের স্পর্শে, ধন মান নিশ্চিন্ত আয়াসবহুল জীবনের সব মোহ কাটিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল সেদিন যে নারী সে আর তখন সামান্যা বারবনিতা কাঞ্চনমালা নয়, তার মাঝেই প্রকাশিত তখন মহাপ্রকৃতি শ্রীরাধা, আপন মহিমায় দীপ্তোজ্জ্বলা শাশ্বতী নারী। চরিত্র রূপায়ণের এই অনন্য শক্তিই বোধহয় তারাশঙ্করের প্রতিভার সব চেয়ে বৈশিষ্ট্য, গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি চরিত্র সৃষ্টি করেন, কাদামাটির প্রলেপ লাগিয়েই তাঁর প্রতিমা গড়া শেষ হয় না তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য যে মন্ত্রের প্রয়োজন তাও তাঁর আয়ত্তে, আর শুধু সে জন্যই তাঁর রচনা মনকে আবিষ্ট করে তোলে এত গভীর ভাবে।

আমরা তাঁর এই নবতম রচনাটিকে সানন্দে স্বাগত জানাই। বইটির আঙ্গিক যথাযথ। প্রকাশক—বাক সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ দাম—চার টাকা।

রূপং দেহি ধনং দেহি

সাহিত্য ক্ষেত্রে বাস্তববাদ কথাটির সার্থক রূপায়ন ঘটেছিল একদিন যে কজন সার্থক শিল্পীর মাধ্যমে, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক তাঁদেরই পুরোধা শ্রেণীর একজন। শৈলজানন্দ পাঠককে যা দেন, তা একেবারে খাঁটি বস্তু। আঙ্গিকের চাকচিক্যে তিনি অভিভূত করেন না, সত্যের স্বাক্ষরে ভাস্বর করে তোলেন, তাই আজও তাঁর রচনার আবির্ভাবে খুশী হয়ে ওঠে মন, আনন্দিত হয় প্রাণ। অতি সহজ সুরে যে গল্পটি বলেছেন তিনি এখানে, তাতে মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচয় মেলে। বিশেষ করে মেয়েরা যে আজও কতখানি অসহায়, সেটাও উপলব্ধি করে বেদনার্ত্ত হয়ে ওঠে হৃদয়। নায়িকা কাঞ্চনের ভাগ্য বিড়ম্বনা কত সহজেই না ব্যক্ত করেছেন তিনি আর শেষ পর্য্যন্ত তার যে মধুর পরিণতি এঁকেছেন, তা বড়ই উপভোগ্য। সহজ সুরে বলা এই মানুষের গল্পটি বোদ্ধা পাঠকমাত্রকেই খুসী করে তুলবে বলে মনে হয়। বইটির ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন, অপরাপর আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—গ্রন্থ প্রকাশ, ৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—তিন টাকা পঁচিশ নঃ পঃ।

যদি জানতেম

"যদি জানতেম" এর মূল আখ্যানভাগের সঙ্গে মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার আশা করি অপরিচয় নেই। কিছুকাল আগে এই কাহিনী মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এবং তখনই স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও মানবতার জন্যে পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ ক'রে। বর্ত্তমান যুগে যে সকল শক্তিময়ী লেখিকার আবির্ভাব সাহিত্য জগতের কল্যাণ সাধন করে চলেছে শ্রীমতী ভক্তি দেবী তাঁদেরই অন্যতমা। এই উপন্যাসটির মাধ্যমে লেখিকা একটি মহৎ দায়িত্ব অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। রঞ্জনার প্রণয়ের ব্যর্থতা তথা তার জীবনের সর্বৈব পরিণতিকে কেন্দ্র করে লেখিকা সমাজের একটি বিশেষ চিত্র এক অপূর্ব দক্ষতা সহকারে অঙ্কিত করেছেন। সুজনের মত নরপশুদের সম্বন্ধে তিনি সমাজকে সচেতন করে তুলেছেন। এই সকল নরদানবদের দ্বারা সমাজের পবিত্র আবহাওয়া কতখানি কলুষিত হয় সে সম্বন্ধে লেখিকা একটি অসাধারণ আলেখ্য অঙ্কন করেছেন। লেখিকার রচনানীতি অভিনন্দনীয়। তাঁর প্রাঞ্জল ভাষা, বিশ্লেষণী শক্তি এবং প্রয়োগকুশলতা সম্মিলিত ভাবে গ্রন্থটিকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। কাহিনীর বক্তব্য যেমন বলিষ্ঠ গতি তেমনি বেগবান। সমগ্র কাহিনীটির মধ্যে বিন্দুমাত্র শূন্যতা নেই, কোথাও ঘটে না কোন রসবিচ্যুতি, চোখে পড়ে না কোন অসংলগ্নতা। গ্রন্থটিতে একাধারে বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। লেখিকার পরিবেশ সৃষ্টির নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। সমগ্র উপন্যাসটির মধ্যে আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও দরদের এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছবি ভেসে ওঠে। চমৎকারিত্বে পরিপূর্ণ এই উপন্যাসটি পাঠক সমাজে তার প্রাপ্য মর্যাদা পাবে—এ বিশ্বাস আমরা রাখি এবং সুদূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টি, সজীব চিন্তাধারা ও সমাজকল্যাণ সচেতন মনের জন্যে লেখিকাকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন নিবেদন করি। প্রকাশক—নবযুগ প্রকাশনী, ২১-বি নাসিরুদ্দীন রোড, কলকাতা—১৭, পরিবেশক—ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উপায়

সাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষায় লোকশিক্ষার উদ্দেশে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তকাদি প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, আলোচ্য পুস্তকটি সেই উদ্যমেরই অন্যতম ফল। ক্রমবর্দ্ধমান লোকসংখ্যা ক্রমেই দেশের ও জাতির পক্ষে উদ্বেগজনক এক সমস্যায় পরিণত হতে চলেছে, সর্ব্বনাশ! পরিণামের হাত থেকে বাঁচতে হলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যে একান্ত আবশ্যক, একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত সত্য, এবং এদিকে দেশের সরকার ও বিশিষ্ট চিন্তানায়কগণ যে বিশেষ মনোযোগী হয়েছেন, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। আলোচ্য গ্রন্থে এই বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী লেখক জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য যা যা করণীয়, তার এক পুর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন এতে, অত্যন্ত সহজ ভাষায় লিখিত হওয়াতে অতি সাধারণ শিক্ষিত মানুষও এর দ্বারা উপকৃত হবেন। বইটিকে প্রামাণ্য বলা তাই একেবারেই অসঙ্গত নয়। এ ধরণের পুস্তকের বহুল প্রকাশ ও প্রচার জনসাধারণের স্বার্থেই বাঞ্ছনীয়। আমরা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগকে এই সাধু দায়িত্বে অগ্রসর হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। বইটির আঙ্গিক ত্রুটিহীন। লেখক—নীলরতন ধর। প্রকাশক—বিশ্বভারতী, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য—৫০ নঃ পঃ।

দময়ন্তী

সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একদিন পাঠকের মন কেড়ে নিয়েছিলেন যে নবীন লেখক; তাঁরই লেখনী আজ পরিণত সুষমায় আত্ম প্রকাশিত; বাস্তবিক পক্ষে সেদিনের সুধীরঞ্জনে যে প্রত্যাশার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল আজ সেটাই সম্পূর্ণ রূপে সফল হয়ে উঠেছে। আলোচ্য গ্রন্থটি একটি ছোট গল্প সংগ্রহ, মোট এগারোটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে এতে। গল্পগুলি আশ্চর্য্য ভাবেই সজীব, গভীর বাস্তববোধের সঙ্গে গভীরতর দরদী মনের ছাপে এরা উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, যেন জীবন রসিক এক শিল্পীর আঁকা কয়েকটি বর্ণাঢ্য ছবি। গল্প কটির প্রায় সবগুলিই সুপাঠ্য হলেও দু একটি বিশেষ ভাবেই উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত 'জন্মশর্ত', 'ধনুষ্টঙ্কার', 'দময়ন্তী' প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে, সুতীক্ষ্ণ মননশীলতার ছাপ এদের আষ্টেপৃষ্ঠে, পড়তে পড়তে লেখকের আন্তরিকতায় সত্যই অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

সংগ্রহটির বাহ্যিক সৌন্দর্য্যও বড় কম নয়, প্রচ্ছদটি শিল্পানুগ অপরাপর আঙ্গিকও যথোচিত। লেখক—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—তিন টাকা।

নাট্যে প্রণাম

আলোচ্য রচনাটি শিশু-সাহিত্যের অন্তর্গত হলেও বয়স্ক মনকেও রীতিমত দাগ কেটে দেয়। লেখক প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক, ভারতের স্মরণীয় সন্তানদের জীবনের কোন কোন ঘটনা নাট্য সূত্রে গেঁথে নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিকাকারে পরিবেশন করেছেন তিনি সহজ কুশলতায়, ছেলে মেয়েরা অনায়াসেই এগুলি অভিনয় করে উপভোগ করতে পারবে ও সেই সঙ্গে দেশের বরণীয় মানুষদের সম্পর্কে একটু ধারণাও পেয়ে যাবে। একাধারে আনন্দ ও জ্ঞান এক্ষেত্রেই মিলবে এদের মাঝে, কাজেই বর্তমান গ্রন্থটি শুধু মনোরম শিশুপাঠ্যই নয় প্রামাণ্য ও।

লেখকের সহজ ও মধুর শৈলী রচনাটির আকর্ষণ বাড়ায়। বইটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—স্বপনবুড়ো। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭।

পেয়ারার স্বর্গ

যাঁর নাম বইয়ের প্রথম পাতায় ধরা পড়লে ছোট ছোট পাঠক পাঠিকার ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস আপনা থেকেই উঁকি দেয়, এ সেই শিব্রামের বই। লেখক বহুদিন হল শিশু-মহলে প্রতিষ্ঠিত, আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর এক নবতম সরস গল্প সংগ্রহ। মোট এগারোটি গল্প স্থান পেয়েছে এতে, সবগুলিই হাসির হুল্লোড়ে ভরপুর, লেখকের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে 'পান' বহুল সংলাপই এদের প্রধান বৈচিত্র্য, বিষয়-বস্তুর কোন গুরুত্বই নেই শুধু হাল্কা হাসির বেলুন উড়িয়ে যাওয়া, শিশুরা তো বটেই তাদের অভিভাবক, অভিভাবিকারাও কম খুশী হবেন না পড়তে সুরু করলে। হাসতে পারাটা মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, বর্ত্তমান গ্রন্থ সেদিক দিয়েই অতি মূল্যবান। বইটির ছাপা বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক শোভন। লেখক—শিবরাম চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭ দাম—২·৩০ নঃ পঃ।

Walt Whitman

ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটা আমেরিকান সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে যে সব পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন আলোচ্য পুস্তিকাটি তাদেরই অন্যতম। ওয়াল্ট হুইটম্যানের নাম সাহিত্য জগতে সকলেরই অতি পরিচিত, শ্রেষ্ঠতম আমেরিকান কবি বলিতে তাঁকেই বোঝায়, সুতরাং তাঁর শিল্পরীতি সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু আলোচনা অনেকেরই কাছে মূল্যবান বলে পরিগণিত হবে। বর্ত্তমান রচনার মূল্যও সেইখানে। হুইটম্যানের কাব্যপ্রকৃতি অতি সুন্দর ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে এই সংক্ষিপ্ত রচনাটুকুতে, সহজেই পাঠক মননে তা ছাপ দিয়ে যায়। পুস্তিকাটির আঙ্গিক শোভন। লেখক—Richard Chase প্রকাশক—University of Minnesota Press. Minneapolis. দাম—65 Cents.

T. S. Eliot

মিনেসোটা বিশ্ববিত্তালয়ের তরফ থেকে অ্যামেরিকান সাহিত্যিক-বর্গের সম্বন্ধে যে পুস্তিকা প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে, আলোচ্য পুস্তিকাটি তারই অন্যতম। বিখ্যাত কবি T. S. Eliot. আলোচ্য রচনার কেন্দ্র। এলিয়টের জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর আলোচনা করেছেন লেখক, প্রধানতঃ আলোচিত হয়েছে অবশ্য কবির সৃষ্টিই। এলিয়টের কাব্যচেতনা তার প্রকাশভঙ্গী ও তার প্রাণসত্বা এ সবই অতি গভীর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা হয়েছে, বিশ্ব-সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয় প্রোৎসাহী পাঠক মাত্রই পুস্তিকাটিকে আদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন। T. S. Eliot—by Leonerd Unger, University of Minnesota Press. Minneapolis. 65 cents.

Wallace Stevens

মিনেসোটা ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যামেরিকান সাহিত্যিকবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়বাহী যে সব পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে, আলোচ্য পুস্তিকাটি তাদেরই অন্যতম। কবি ·ওয়ালেস ষ্টিভান্স সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন লেখক এতে। ষ্টিভান্সের দ্বৈত সত্বা সত্যই বড় বিস্ময়কর, পেশায় তিনি ইন্সিওরেন্সের কর্মচারী, নেশায় তিনি কবি। স্পষ্টতঃই কবি নিজে এর মধ্যে আশ্চর্য্য হওয়ার মত কিছু খুঁজে পান না কারণ তিনি স্বমুখেই বলেন "It gives a man character as a poet to have daily contact with a Job". অর্থাৎ কবি বলতে চান যে দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কর্মজীবন কোন মানুষেরই শিল্পী সত্বার আত্মপ্রকাশকে ব্যাহত তো করেই না বরং বিকশিত করে। ষ্টিভান্সের এই উক্তি কবি ও সাহিত্যিক সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাবে। কবির কাব্য সম্পর্কে লেখক সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে এক পরিষ্কার ধারণা দিতে প্রয়াসী হয়েছেন ও তাঁর এই প্রয়াস সার্থক হয়েছে সম্পূর্ণ ভাবেই। জিজ্ঞাসু সাহিত্য রসিকের কাছে এ ধরণের পত্রপুস্তিকা যোগ্য সমাদর লাভে বঞ্চিত হবে না বলেই আমরা আশা করি। Wallace Stevens by William York Tindall. University of Minnesota Press. Minneapolis. 65 Cents.

Recent American Drama

আধুনিক আমেরিকান নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে এক সুষ্ঠু ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে বর্ত্তমান পুস্তিকাটিতে। মিনেসোটা ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে যে পুস্তিকা প্রকাশ করা হচ্ছে আমেরিকান সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে, আলোচ্য পুস্তিকাটি তাদেরই অন্যতম। লেখক যথোচিত যত্ন ও অনুশীলনের সহিত আধুনিক আমেরিকান নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তারই পরিচয়ে তাঁর রচনা উজ্জ্বল। সাহিত্য জিজ্ঞাসু বিদগ্ধ পাঠকের কাছে পুস্তিকাটি সমাদৃত হবে বলেই মনে হয়। লেখক—Alan Downer প্রকাশক—University of Minnesota Press Minneapolis. মূল্য—65 Cents

কিশোর কাহিনী

আমাদের প্রাচীন পুরাণাদি থেকে শিশুদের উপযোগী কয়েকটি কাহিনী একত্র গ্রথিত করে উপহার দিয়েছেন লেখক আলোচ্য গ্রন্থে। নচিকেতা, ধ্রুব, একলব্য প্রভৃতির গল্প অত্যন্ত সহজ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যাতে শিশুদের রস গ্রহণে কোন অসুবিধা না হয়, এই সব কাহিনীতে শিশুচিত্ত বিকশিত করার সমস্ত উপাদানই উপস্থিত থাকায় এগুলি পাঠ করে শিশুরা শুধু প্রমোদিতই হবে না, উচ্চ আদর্শের একটা ধারণাও গড়ে উঠবে তাদের মধ্যে সহজেই। এ ধরণের গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়। বইটির আঙ্গিকও যথাযথ। লেখক—শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭, দাম—১·৫০ নঃ পঃ।

রবীন্দ্রনাথ ও আমেরিকা

সমগ্র বিশ্বে আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালিত হয়ে চলেছে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও উত্তমের সঙ্গে, এই ব্যাপারে আমেরিকাও পেছিয়ে নেই যথোচিত গাম্ভীর্য্য ও সমারোহের সঙ্গে সেখানেও গুরুদেবের জন্ম শতবার্ষিক উৎসব প্রতিপালিত হচ্ছে, এই শুভ মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান পুস্তিকাটির আবির্ভাব অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে এ-কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমেরিকার সঙ্গে বিশ্বকবির যে পরিচয় ঘটেছিল তার সবটাই লেখকের জবানীতে পাঠকের দরবারে হাজির করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্র যে ভারতের এই মহামনীষীকে কি ভাবে বরণ করে নিয়েছিল, দিয়েছিল শ্রদ্ধার অঞ্জলি সমগ্র হৃদয় মন দিয়ে সেই কাহিনী যেন মূর্ত্ত হয়ে ওঠে পাঠকের মনশ্চক্ষুতে। কবির বিশ্বমানবিকতাবাদ, অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা এই দুটি মানসিকতাকেই এক সময়ে বিভ্রান্ত পাশ্চাত্য ভুল বুঝেছিল বটে কিন্তু সত্যনিষ্ঠ মহাপুরুষের বলিষ্ঠ ভাবধারা সে বিভ্রান্তিকে সহজেই নাশ করতে সক্ষম হয়েছিল আর সেইজন্যই জড়বাদী ইউরোপ আমেরিকার চিন্তানায়করাও তাকে সাগ্রহ স্বাগত জানাতে দ্বিধামাত্র করেনি সেদিন। রবীন্দ্রনাথের মাঝেই দেখেছিল তারা ভারতের আত্মাকে। আর অকুণ্ঠভাবেই স্বীকৃতি দান করেছিল তাঁর বাণীকে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী আত্মসর্ব্বস্ব জড়ত্ব ও যেন ম্লান হয়ে গিয়েছিল তাঁর মানবিক ব্যক্তিসত্তার সংস্পর্শে এসে। এই সমস্তই লেখক এই ক্ষুদ্র রচনাটির মাধ্যমে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। বইটি রবীন্দ্র জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়কে উন্মোচিত করেছে। এর আঙ্গিক শোভন, কয়েকটি রঙীন চিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় রচনাটির মূল্যমান বেড়ে যায়। লেখক—জে. এল. ডীজ, ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এস. কে. গোসেন, এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা—১২ থেকে মুদ্রিত।

আবির্ভাব

বাঙলা সাহিত্যের শিশু ও কিশোর পাঠক-পাঠিকা সমাজে ইন্দিরা দেবীর পরিচয় প্রদান বাহুল্য মাত্র। দীর্ঘকাল নানা ভাবে এদের মনের খোরাক জুগিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারিণী হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন কাহিনীই এই গ্রন্থের উপজীব্য। কিশোর পাঠ্য এই গ্রন্থটি লেখিকার শক্তির নিদর্শনই বহন করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন একমাত্র সমুদ্রের সঙ্গেই তুলনীয়। সামগ্রিক ভাবে সেই বিরাট জীবনের সাহিত্যের পৃষ্ঠায় রূপায়ণ অতীব দুরূহ প্রচেষ্টা। সেই প্রচেষ্টায় ইন্দিরা দেবী যে সফলকাম হয়েছেন এই গ্রন্থটিই সে কথা প্রমাণ করে। অল্প আয়তনের মধ্যেই কিশোরদের উপযোগী অতি মনোরম ভাবে ও সরস বর্ণনায় ইন্দিরা দেবী এখানে রবীন্দ্রজীবনী রচনা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনের প্রতিটি দিক, প্রতিটি পরিবেশ, প্রতিটি ঘটনা কিশোরদের উপযোগী নিখুঁতভাবে তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। সেই বিরাট জীবনের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে এখানে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর কোনটিই এখানে বর্জ্জিত হয়নি। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের একটি পূর্ণ আলেখ্য যেন লেখনীর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। লেখিকার ভাষা যেমনই সরস ও তেমনই মনোরম। তাঁর বর্ণনা চিত্তাকর্ষক। তাঁর রচনা হৃদয়গ্রাহী। কিশোরকুল এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের এবং আরও বহু বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারবে। এই গ্রন্থটি তাদের সামনে বহুবিধ তথ্য উপস্থাপিত করেছে। গ্রন্থটির মধ্যে এক পরম আন্তরিকতা ও সুষ্ঠু ধারাবাহিকতার চিহ্ন মেলে। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা, মুদ্রণ কার্য ও বাঁধাই প্রশংসনীয়। কিশোরকিশোরীদের মধ্যে এই গ্রন্থ প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করবে—এ বিশ্বাস আমরা রাখি। প্রকাশক—শরৎ পুস্তকালয়, ৩ কলেজ স্কোয়ার। দাম—তিন টাকা মাত্র।

মর্ণিং গ্লোরী

ফুলবালা রায়

রবির তপস্যারতা শ্যামা স্মিতাননা
কে তুমি তরুণী উমা!
চন্দনের রেখা চিত্র—
এঁকেছে ললাট-কোণে শুভ্র আলিপনা!
শুচি-স্নাত তন্বি-তনু নীহার কণায়
তুলিয়া ধরেছ তাই—
উপাস্যের পদপ্রান্তে
নিঃশেষে বিলায়ে দিতে আপন সত্তায়।
জান তুমি, তপ-তুষ্ট দেব প্রভানন—
উগ্র-আলিঙ্গনে তার
বাঁধিবে তোমারে বুকে
নিঙাড়ি' জীবন-সুধা করিবে গ্রহণ।
সর্ব্ব-সমর্পণে তব সিদ্ধ আরাধনা?
বোঝে না অবুঝ মন—
নীরব তোমার বাণী,
নিশ্চিত মরণ জানি, কেন এ সাধনা?

দ্বিতীয় শৈশবে

মঞ্জুলিকা দাশ

বার্দ্ধক্যে মানুষ নাকি দ্বিতীয় শৈশবে যায়
জন্মান্তর বিনা, আমি-ও তেমনি যাব, যৌবন প্রহরী ঘিরে
নায়কের স্পর্শ এঁকে চিহ্নিত শরীরে,
যেমন ক্রমশ স্মৃতি অবচেতনের ঘরে
গন্ধ হয়ে বেঁচে থাকে, আমি-ও তেমনি সেই প্রেমিকেরে
ভুলে যেতে গিয়ে রূপরেখা মুছে নেব চুম্বিত শরীরে।
আমি তার ঘৃণা নিয়ে বেঁচে বর্ত্তে
যেতে চেয়ে তবু বিমুখতা দুর্ব্বিষহ সইতে পারিনে
কিন্তু এ তিক্ত শরীরে অমর প্রেমের নামে
ক্ষয়ে না উল্লাসে ভালবাসা নিয়ে যাবে কোন—পরিণামে?

যদিও সত্তা এই শস্যহীন থেকে যায়
কর্ষ লাভ বিনা, তবু দীর্ঘ দুঃখ প্রতীক্ষায়
প্রেমিকের পথে; শরীরে অতৃপ্তি জ্বলে,
অপমানে, অনাদরে পুড়ে দ্বিতীয় শৈশবে আমি
বেঁচে যাব চলে!!

দার্জ্জিলিঙ দৃশ্য

সমর চট্টোপাধ্যায়

খুব গরম পড়েছে নয়? ভাবছেন এই গরমে আর কোথায় বেড়াতে যাবো? কেন বাংলাদেশ কি রিক্ত? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি এই বাংলাদেশে কি শান্ত শীতল আশ্রয়ের অভাব আছে? আছে সবই, কিন্তু চোখ মেলে আমরা দেখি না; অনেক সময় জানতেও চাই না। এই গরমকালে কোথাও বেড়াতে যাবার বা সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে বেরুবার কথা উঠলেই অনেকে লাফিয়ে উঠে পরামর্শ দেবেন, 'যেতে হয় কাশ্মীর যাও'। আমি বলবো—'তিষ্ঠ'। আগে একবার দার্জ্জিলিঙ ঘুরে আসুন, ভাল ক'রে চারদিকে বেড়ান, শুধু সহরের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ না রেখে জীপ ভাড়া করে আশে পাশে মাইল ৪০ পর্য্যন্ত দূরে চলে যান—পাহাড় ঘেরা অপরূপ সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার উজাড় করে ফিরে এসে বলুন দার্জ্জিলিঙ আর কাশ্মীরের তফাৎ কোথায় বা কতটুকু? চৈত্র-বৈশাখের অসহ্য গরমে প্রায় সারা বাংলাদেশ যখন হাইফাই করে তখন হিমালয়ের রাণী দার্জ্জিলিঙ বসন্তের অপরূপ সৌন্দর্য্যে বিভোর হয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। সেই আনন্দের আহ্বানে এতদিন সাড়া দিয়েছেন বিদেশী সাহেবরা একটু গরম পড়লেই লাট, বড়লাট, রাজা, মহারাজা থেকে সুরু করে বিদেশী সাহেবরা তখন ছুটতেন দার্জ্জিলিঙের শৈলাবাসে। দেশ স্বাধীন হবার পর মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জাতিকে দার্জ্জিলিঙের সঙ্গে পরিচিত করে দেবার জন্য উদ্যোগী হন। এই গরম কালেই তিনি নিয়ে যান তাঁর সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলীকে দার্জ্জিলিঙে, সেখানে আয়োজনের ব্যবস্থা হয় নানা সম্মেলন ও বিচিত্র অনুষ্ঠানের। কয়েকদিনের জন্য দার্জ্জিলিঙ সরগরম হয়ে ওঠে। এসবের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—শুধু দার্জ্জিলিঙে সপরিবারে বেড়াতে যাবার জন্যে আপনার আমার প্রতি সনির্ব্বন্ধ আহ্বান।

এবার চলুন দার্জ্জিলিঙের পথে রওনা হই। কিসে যাবেন? ট্রেনেও যেতে পারেন, বিমানেও যেতে পারেন। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশনের বিমান এখন রোজই কোলকাতা ও বাগডোগরার মধ্যে যাতায়াত করছে। দমদম বিমানঘাটি থেকে বাগডোগরার বিমান ঘাটিতে যেতে মাত্র দু'ঘণ্টা সময় লাগে। বাগডোগরা থেকে দার্জ্জিলিং সহর মাত্র ৫৬ মাইল। বাগডোগরায় বিমান থেকে নেমেই ট্যাক্সি ধরুন—দার্জ্জিলিঙের ভাড়া ৫০৲ টাকা।

যাঁরা ট্রেণে যেতে চান তাদের কোলকাতা থেকে রোজ সকালে

যে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ছাড়ে তাতেই যাওয়ার সুবিধে। আজ সকালে চাপলে কাল সকালে শিলিগুড়ি গিয়ে পৌঁছুতে পারবেন। তবে যাওয়াটা একটু দুর্ভোগ সাপেক্ষ! নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস সকরীগলীঘাটে নামিয়ে দেবে। সেখান থেকে ষ্টিমারে করে গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে মণিহারিঘাট। এই মণিহারিঘাট থেকে মিটারগেজের ট্রেণ ধরে একেবারে—শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি থেকে দার্জ্জিলিঙ ৫০ মাইল রাস্তা। এখান থেকে ছোট গাড়ীতে ক'রে দার্জ্জিলিঙ যেতে হবে। অবশ্য আপনার যদি তাড়াতাড়ি থাকে তাহলে শিলিগুড়ি থেকে বাস, ট্যাক্সি বা ষ্টেশন ওয়াগনে দার্জ্জিলিঙ সহরে চলে যান। যারা প্রথম দার্জ্জিলিঙ যাচ্ছেন তাঁদের আমি পরামর্শ দেবো, সৌন্দর্য্য আর রোমাঞ্চ উপভোগ করার জন্যে বাকী পথটা ট্রেণেই যান।

যদি কোলকাতা থেকে সরাসরি জীপে করে দার্জ্জিলিঙে যেতে চান তাহলে কৃষ্ণনগর দিয়ে আসুন। কোলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর ৭২ মাইল। কৃষ্ণনগর থেকে এক মাইল দূরে জলঙ্গীনদী ফেরী নৌকা করে পার হোন। এই ফেরীর সাহায্যে আপনার জীপও ওপারে পৌঁছে যাবে। এবার বহরমপুরের দিকে গাড়ী চালান। বহরমপুর থেকে ৪০ মাইল দূরে রঘুনাথগঞ্জে এসে এবার আপনাদের ভাগীরথী নদী পেরুতে হবে। এখানেও ফেরীর ব্যবস্থা আছে। রঘুনাথগঞ্জ থেকে ধুলিয়ান, ধুলিয়ান থেকে সরাসরি—খেজুরিয়াঘাট পাড়ি দিন। এই খেজুরিয়াঘাটায় আপনাকে গঙ্গা পেরুতে হবে। এখানে রাজ্য সরকারের যে ফেরীর ব্যবস্থা আছে তার সুযোগ গ্রহণ করতে হলে ধুলিয়ানের এস ডি ও (রোডসৃকে) ও মালদহ ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী, ৭, চৌরঙ্গী রোড কোলকাতা—১৩ —এই ঠিকানায় আগে থেকে যোগাযোগ করে অনুমতি পত্র নিতে হবে? খেজুরিয়াঘাট থেকে মালদহ (২০ মাইল) মালদহ থেকে বংশীহারি (৩২ মাইল), বংশীহারী থেকে কালীয়াগঞ্জ (২০ মাইল) কালীয়াগঞ্জ থেকে রায়গঞ্জ (১৬ মাইল), রায়গঞ্জ থেকে ডালখোলা (২১মাইল), ডালখোলা থেকে কিষণগঞ্জ হয়ে বাগডোগরার (৭৪ মাইল) পথে গাড়ী চালান। বাগাডোগরা থেকে শিলিগুড়ি মাত্র ৮ মাইল, তারপর শিলিগুড়ি থেকে সরাসরি দার্জ্জিলিঙ (৫১ মাইল) চলে আসুন। কোলকাতা থেকে দার্জ্জিলিঙ মোট পথের দূরত্ব—৪৩৫ মাইল।

পথে বিশ্রাম বা থাকার জন্যে কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, রঘুনাথগঞ্জ (জঙ্গীপুর), মালদহ, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, ডালখোলা, কিষেণগঞ্জ ও শিলিগুড়িতে ডাকবাঙলো পাবেন।

ট্রেণে দার্জ্জিলিঙ পর্য্যন্ত যেতে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া লাগবে ৪৮ টাকা ৪১ নয়া পয়সা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ২৭ টাকা ১৬ নয়াপয়সা, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া পড়ে ১৭৲ টাকা। রেলকর্তৃপক্ষ প্রতি বছরই পাহাড়াঞ্চলে বেড়াতে যাবার জন্যে ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত হিল কনসেসন্ রিটার্ণ টিকিটের সুবিধা দিয়ে থাকেন।

বিমানে কোলকাতা থেকে বাগডোগরার দূরত্ব ২৭১ মাইল এবং ভাড়া মাথাপিছু ৭১৲ টাকা। যারা এই এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে দার্জ্জিলিঙ বেড়াতে যাবেন তাঁদের হাল্কা ধরণের গরমের পোষাক নিলেই চলবে। তবে, শরতের শেষাশেষি মানে নভেম্বরে যারা যাবেন তাঁদের শীতের পোষাক বেশী করে নিতে হবে? তবে সঙ্গে সব সময়েই একটি ছাতা বা ওয়াটার প্রুফ কোর্ট থাকা ভাল।

বছরের মধ্যে দু'টি সময় দার্জ্জিলিঙে বেড়াতে যাবার পক্ষে উৎকৃষ্ট সময়। কোলকাতায় যখন প্রচণ্ড গরম অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জুন তখন দার্জ্জিলিঙে বসন্তকাল। এই সময় দার্জ্জিলিঙ বেড়াবার পক্ষে উৎকৃষ্ট সময়। তারপর বর্ষার শেষে দার্জ্জিলিঙে যখন শরৎকাল বিরাজ করে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত তখন দার্জ্জিলিঙের আবহাওয়া সব চেয়ে আরামপ্রদ। যারা শীতকে ভয় করেন না তারা ডিসেম্বর জানুয়ারীতে দার্জ্জিলিঙে বেড়াতে যেতে পারেন।

৪'১ বর্গমাইল পরিবৃত্ত দার্জ্জিলিঙ সহরের মোটামুটি লোকসংখ্যা হ'ল ৪০ হাজার। সমুদ্র থেকে এই সহরের উচ্চতা কোথাও ৬৫০০ মাইল, কোথাও বা ৭৫০০ মাইল। ইংরাজী, বাংলা, নেপালী, হিন্দি ও তিব্বতি এখানকার ভাষা।

দার্জ্জিলিঙে থাকার প্রথম শ্রেণীর হোটেল অনেক। যারা পশ্চিমী আদব কায়দা পছন্দ করেন এবং সেই রকম থাকা খাওয়া চান তাঁদের জন্যে আছে গান্ধী রোডে ওবেরয়, অবসারভেটারী হিলে উইণ্ডামেয়ার, রবার্টসন রোডে সেণ্ট্রাল হোটেল, চৌরাস্তায় বেলিভ্যুই, মাউণ্ট প্লেসেণ্ট রোডে নিউ এল্‌পিন্ ও এলিম্‌ভিলা, গান্ধী রোডে এভারেষ্ট লাক্সারী, হলিডে হোমে ওয়াই ডবলিউ সি এ আর কুছরী রোডে ইডেন চাইন; এই সব হোটেলে চার্জ্জ মাথাপিছু দৈনিক কোথাও ১৪৲ টাকা থেকে সুরু করে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত নেওয়া হয়ে থাকে।

যাঁরা ভারতীয় রীতিতে অভ্যস্ত তাঁদের জন্যে থাকবার ব্যবস্থা হবে ল্যাডেনলা রোডের স্নোভিউ হোটেলে, কার্ট রোডের সেন্ট্রাল বোর্ডিং ও স্যানাটোরিয়াম, থিয়েটার রোডের ইণ্ডিয়ান হোটেল ও দিলখুসা বোর্ডিং, ল্যাডেনলা রোডের হিন্দু বোর্ডিং, রেলষ্টেশনের ঠিক বিপরীত দিকেই হোটেল কাঞ্চন জঙ্ঘা, এন সি গোয়েঙ্কা রোডে পাঞ্জাব হোটেল ও এন বি সিং রোডে রাধা হোটেল। এই সব হোটেলের চার্জ্জ মাথা পিছু ৬৲ টাকা থেকে সুরু। হোটেলগুলি ছাড়াও রেষ্ট হাউস হিসেবে ধর্ম্মশালা, আঞ্জুমান রেষ্ট হাউস ও সার্কিট হাউসও আছে। একটু খোঁজ খবর করলে থাকার জন্যে বাড়ী ভাড়া বা ফ্লাট ভাড়াও পেয়ে যাবেন।

দার্জ্জিলিঙ সহরকে কেন্দ্র করে এবার বেড়াতে যাবার উদ্যোগ করুন। হোটেলে বসে থেকে বা বুড়ো মানুষের মত চৌরাস্তা বা ম্যাল পর্য্যন্ত একটু ঘুরে এসে শরীরটাকে এলিয়ে দেবেন না। দার্জ্জিলিঙ এমনই জায়গা সহজে ক্লান্তি আসবে না। পাহাড়ে জায়গায় পেটটা কখনও খালি রাখবেন না। যখনই ক্ষিদে পাবে তখনই কিছু না-কিছু খেয়ে যান—পেটভরে খান, হজম তো হবেই; দেখবেন কয়েক দিনের মধ্যে শরীরের চেহারাও একটু পালটেছে।

ভোরে ঘুম থেকে উঠেই অদম্য উৎসাহ ও মনে স্ফূর্ত্তি নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন টাইগার হিলে সূর্য্যোদয় দেখার জন্যে। চৌরাস্তা পর্য্যন্ত হেটে আসুন, এখান থেকে ট্যাক্সি বা ল্যাণ্ড রোভার ভাড়া করে টাইগার হিল চলে যান। টাইগার হিল যাতায়াত ভাড়া লাগবে ট্যাক্সিতে ১৫৲ টাকা আর ল্যাণ্ড রোভারে ২৫৲ টাকা। চৌরাস্তা থেকে টাইগার হিলের দূরত্ব মাত্র ৭ মাইল। দার্জ্জিলিঙ জেলার সব চেয়ে উঁচু সহর ঘুম (৮৪৮২ ফুট) থেকেই টাইগার হিল উঠেছে। টাইগার হিলে এই দ্বিতল প্যাভেলিয়ানটি দর্শকদের

সূর্য্যোদয় দেখার জন্তেই করা হয়েছে। এখানে গরম চা ও কফি পাবেন তাই খেতে খেতে সূর্য্যোদয়ের শোভা দেখুন। বাঁ-দিকে ঐ যে উঁচু পাহাড়টি দেখছেন ঐটি হ'ল কাঞ্চনজঙ্ঘা। দেখুন তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াগুলির উপর প্রভাতী সূর্য্যের কিরণমালার খেলা, আর দিগন্ত কি অপরূপ রঙেই না উদ্ভাসিত!

সূর্য্যোদয় দেখে এত সকাল সকাল হোটেলে ফিরে কি করবেন? ট্যাক্সি বা ল্যাণ্ডরোভার যাতে ক'রে আপনি এসেছেন তার ড্রাইভারকে আর দশটি টাকা আপনি দিয়ে দিন। টাইগার হিল থেকে ফেরবার পথে সে আপনাকে লেক, ডেয়ারী ফার্ম ও ঘুম দেখিয়ে আনবে।

এবার একে একে দার্জ্জিলিঙের দর্শনীয় জায়গাগুলি দেখে নিন। জলা পাহাড়, বার্চ্চ হিল, অবসারভেটারী হিল, ষ্টেপ এসাইড (এই বাড়ীতেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মারা যান, এখন এখানে তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে,) মাউণ্টেনিয়ারিং কলেজ, সেণ্ট পলস্ স্কুল, সেণ্ট জোসেফ কলেজ, সকালে ও বিকালে বেড়াবার জায়গা দি ম্যাল (অবসারভেটারী পাহাড় বেষ্টন ক'রে আছে এই রাস্তাটি,) রাজভবন, ভিক্টোরিয়া ফলস্, ন্যাশানাল হিষ্ট্রি মিউজিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ধীরধাম মন্দির, মার্কেট স্কোয়ার, শ্রীমন্দির, ভুটিয়া বস্তি মঠ—এগুলোর কোনটাই যেন বাদ দেবেন না। চৌরাস্তা থেকে বড় জোর দু'মাইলের মধ্যে এগুলিকে পাবেন—কাজেই হেঁটে হেঁটেই এগুলি সব ঘুরে দেখুন। মার্কেট স্কোয়ারের বাজারটি আজকাল রোজই বসে, তবে শনি ও রবিবার হাটের দিন—আশে পাশের গ্রাম থেকে টাটকা সব্জি ও আর পাঁচ রকম পসরা নিয়ে গ্রামবাসীরা বেচার জন্তে আসে। তাই বাজার এই দুই দিন খুব জমজমাট হয়ে উঠে। দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে দার্জ্জিলিঙ সহর থেকে ৫ মাইল দূরে লেবং রেস কোর্সটি দেখে আসতে পারেন। পৃথিবীর মধ্যে এইটেই সব চেয়ে ছোট রেসকোর্স, তবে সব চেয়ে উঁচু জায়গায় যতগুলি রেসকোর্স আছে এটি তার অন্যতম।

দার্জ্জিলিঙে যে তিনটি বৌদ্ধ মঠ আছে সে তিনটি মঠই দর্শনীয়। চৌরাস্তার নিচে সি, আর, দাস রোডের উপর ভুটিয়া মঠ, মাইল খানেক দূরে তেনজিং নোর গে রাস্তায় আলুবাড়ী মঠ; সহর থেকে ৫ মাইল দূরে সব চেয়ে বিখ্যাত ও বড় মঠ—ঘুম মঠ। ঘুম মঠ দেখে ফেরবার পথে সেন্‌চল লেকে একটু বেড়িয়ে আসবেন। দার্জ্জিলিঙ থেকে ট্রেনে করেও ঘুমে যাওয়া যায়—সেখান থেকে লেক মাত্র দু মাইল রাস্তা। এটা কৃত্রিম লেক অর্থাৎ জলাধার। এই জলাধার থেকেই দার্জ্জিলিঙ সহরে জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। পিকনিক বা চড়ুই ভাতির পক্ষে এ জায়গাটি খুব মনোরম।

এবার চলুন সহর ছেড়ে একটু বাইরে যাই। প্রথমেই চলুন টংলু। টংলু দার্জ্জিলিঙ থেকে ২২ মাইল পথ। ১০০৫১ ফুট উঁচুতে টংলু অবস্থিত। টংলু থেকে রাত্রে দার্জ্জিলিঙের শোভা দেখুন—ভারী চমৎকার লাগবে। এখানে রাত্রে থাকার জন্তে ইউথ হোটেল বা ডাকবাঙলো আছে। রাত্রে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা—উনুনের ধারে হাত-পা গরম না করলে কিছুতেই স্বস্তি পাবেন না। ডাকবাঙলোয় থাকতে গেলে আগে থেকে সিট রিজার্ভ করতে হবে। টংলু একটি ছোটখাট উপত্যকা—মোটা সবুজ ঘাসের আস্তরণ বিছিয়ে আর অঙ্গে রঙ বেরঙের ফুলের অলঙ্কার আর সৌরভ নিয়ে সুন্দরী গরবিনী—টংলু বিদেশী পর্যটকদের মন হরণ করেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা সতর্ক প্রহরীর মতো টংলুর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। টংলুতে যখন যাবেন খাবার সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, এখানে কোন খাবার পাওয়া যায় না।

ডাকবাঙলোয় রাত্তিরটা কাটিয়ে সকালেই বেরিয়ে পড়ুন সন্দকফুর দিকে। দার্জ্জিলিঙ থেকে ৩১ মাইল—আর টংলু থেকে ১৫ মাইল দূরে নেপাল সীমান্তে ১১৯৫৭ ফুট উঁচুতে সন্দকফু। জীপে করেও যাওয়া যায়, তবে ভয়ঙ্কর খাড়াই ও বিপজ্জনক। খুব সাবধানে গাড়ী চালিয়ে যেতে হবে। সন্দকফু থেকে সব ক'টা উঁচু পাহাড়ের চূড়া বেশ ভালভাবেই দেখা যায়। সঙ্গে যদি গাইড থাকে, প্রত্যেকটি চূড়ার সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেবে। একটি একটি করে চিনে নিন, ঐ যে ওটি হচ্ছে নৌলেক (২১৪২২ ফুট), ছ্যামল্যাং (২৪০১২ ফুট), মুপংসি (২৫১০০ ফুট), লোট্‌সি (২৬৮৮৭ ফুট), মাউন্ট এভারেষ্ট (২৯০০২ ফুট), মাকালু (২৭৭৯০ ফুট) চোখোলোঙ্গু, কিয়াংপিক, জান্নু (২৫৩০০ ফুট), কাঞ্চনজঙ্ঘা, ডোমপিক্। এখানে ভোরবেলায় উঠে এসে সূর্য্যোদয় দেখুন কি ভালই না লাগবে। ফিরে যেতে আর মনই চাইবে না। গাছের গুড়িগুলি দেখুন সব লাল। গোলাপ, রোডোডেণ্ড্রাম, ম্যাগনোলিয়া, একোনাইট প্রভৃতি পাহাড়ি গাছের বাহার ও ফুলের সৌরভে মানুষকে যেন পাগল করে তোলে। রাত্রে থাকার জন্তে এখানে আছে একটি ইউথ হোটেল ও ডি আই বাংলো। এখানে খাবারদাবার কিছু পাওয়া যায় না।

সন্দকফু থেকে আরও ১৪ মাইল দূরে ভারত, নেপাল ও সিকিম সীমান্তে ফালুত ঘুরে আসতে পারেন। রাস্তা মোটেই ভাল নয়। খাবার দাবারও কিছু পাওয়া যায় না। সন্দকফুই বলুন আর ফালুতই বলুন খুব নির্জ্জন জায়গা। খুব সাহসী লোকেরও এসব জায়গায় গা ছমছম করে। যখন বেড়াতে যাবেন কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে যাবেন এবং সঙ্গে যেন থাকে একজন বিচক্ষণ গাইড। দার্জ্জিলিঙ থেকে জীপে করে সন্দকফু বা ফালুত ঘুরে আসতে গেলে ৩০০৲ টাকার ওপর খরচ লাগবে। অনেক জায়গায় রাস্তা মোটেই ভাল নয়—প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এগুতে হবে। সঙ্গে বিচক্ষণ গাইড থাকলে সে আপনাদের যাতায়াতের সুবিধাজনক পথ বাৎলে দেবে। দার্জ্জিলিঙের শেষ লোকালয় নেপাল সীমান্তের কাছে মানভঞ্জন পর্য্যন্ত জীপে আসুন; সেখান থেকে বেড়াতে বেড়াতে সন্দকফুর দিকে এগিয়ে যান। সন্দকফু থেকে হিমালয়ের ৫২টি নামকরা চূড়া এত স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে দেখা যায় যা আর অন্য কোথাও থেকে দেখা যায় না। বিশেষ করে সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য ভোলবার নয়।

দার্জ্জিলিঙে আরও অনেক কিছু দেখার আছে—কিন্তু সে সব এখন থাক—আবার পরের বার যখন আসবেন তখন সে সব দেখবেন। এখন যা দেখলেন বিচার করুন দার্জ্জিলিঙ বেড়ানো আপনার সার্থক কি না।

[আগামী সংখ্যায় দীঘায় চলুন]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৯

সিতাংশুর বিয়ে হয়ে গেল।

বড়সাহেবের বুক থেকে চিন্তার পাহাড় সরল। আত্মতুষ্টিতে ভরপুর তিনি, এর পরের যা-কিছু সবই একটা নিশ্চিন্ত প্রতিশ্রুতির সুতোয় গাঁথা যেন।

অনিশ্চিয়তার ছায়া সত্যিই কোথাও পড়েনি। আর পাঁচটা বড়লোকের বাড়ির বিয়ে যেমন হয় তেমনি হয়েছে। তেমনি সমারোহ হয়েছে, উৎসব হয়েছে। এই বিয়ে নিয়ে কোনদিন কোনো সমস্যা ছিল, কোনো বিঘ্ন রেখাপাত করেছিল, একবারও তা মনে হয়নি বরং ভারী সহজে শুভ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এত সহজে যে ধীরাপদর চোখে সেটুকুই রহস্যের মত। তার কেবলই মনে হয়েছে এমন সুনির্বিঘ্নে বিয়েটা ঘটে যাওয়ার পিছনে শুধু বড়সাহেবের নয়, আরো একজনের ইচ্ছা অমোঘ নির্দেশের মতই কাজ করেছে।

সেই একজন লাবণ্য সরকার। উৎসব বাড়িতে তার নির্লিপ্ত সহজতায় মধ্যেও ধীরাপদ শুধু এটুকুই যেন আবিষ্কার করতে পেরেছিল।

বিয়ে বড়সাহেবের মনোনীত পাত্রী অর্থাৎ মানুকের সেই 'মিনিশটারের কন্যে'র সঙ্গেই হয়েছে। যে মেয়ে বিয়ের আগে বাপের সঙ্গে হবু-শ্বশুরবাড়ী বেড়িয়ে গেছে একদিন। মানুকের সেই 'পরীর মত মেয়ে —দু'গালে আপেলের মত রঙ বোলানো আর ঠোঁটদুটো'টুকটুক করছে লাল—লিপটিকের লাল, চিত্তোর-করা পটে আঁকা মুখ একেবারে।' মানুকের প্রথম দেখার সঙ্গে উৎসব-রাতে ধীরাপদর প্রথম দেখার অমিল হয়নি খুব। কিন্তু তারপর মানুকে ধাক্কা খেয়েছে হয়ত, রঙশূন্য ঘরোয়া সাজে মেয়েটিকে অন্যরকম লেগেছে ধীরাপদর। ভালই লেগেছে। মোটামুটি সুশ্রী, চাউনিটা সপ্রতিভ, মুখখানা হাসি-হাসি।

দাম্পত্য রাগের সুর তাল লয় মানের হদিস মেলেনি এখনো। বিয়ের দায় সেরেই সিতাংশু কাজে অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে পড়েছে। আপাতদৃষ্টিতে নিরাপত্তার ভিত যদি কারো নড়ে থাকে, সে মানকের আর কেয়ার-টেক বাবুর। বিয়ের সাত আট দিনের মধ্যেই ওদের রেষারিষির শেষ দেখেছে ধীরাপদ। নিরিবিলিতে মুখোমুখি বসে আলাপচারি পর্যন্ত করতে দেখেছে। ধীরাপদ হেসেছে, ভয় পরস্পরকে যত কাছে টানে ততো আর কিছুতে নয়।

কিন্তু দিন কতকের মধ্যেই ধীরাপদকে আবারও হাসতে হয়েছে। নিভৃতের আশঙ্কা বস্তুটা বড় বিচিত্র। কাজ ফেলে বউরাণীর সঙ্গে মানকের অত গল্প করা পছন্দ নয় কেয়ার-টেক বাবুর। ফাঁক পেলেই বিনয়ের অবতারটি হয়ে পায়ের কাছে গিয়ে বসা চাই।

—সারাক্ষণ গুজুর গুজুর, লাগান ভাঙান দেয় কিনা কে জানে, সম্ভব হলে ওর চরিত্তিরটা বউ-রাণীকে একটু বুঝিয়ে দেবেন বাবু, অত আসকারা পেলে মাথায় উঠবে।

নতুন বউ এরই মধ্যে প্রশ্রয় ওকে কতটা দিয়েছে ধীরাপদর জানা নেই। তবে মানুকের ভয় অনেকটাই ঘুচেছে বোঝা যায়। বউ-রাণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সে—পা দিতে না দিতে বাড়িটায় যেন লক্ষ্মীর পা পড়েছে, বাড়িটা এতদিনে বাড়ি বলে মনে হচ্ছে তার। এই মনে হওয়াটা অকপটে সে নববধূর কাছেও ব্যক্ত করেছে সন্দেহ নেই।

—অত বড়লোকের মেয়ে, কতই বা বয়েস, বেশি হলে তেইশ চব্বিশ—এরই মধ্যে সক্কলকে আপন করে নেবার বাসনা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সক্কলের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন বউ-রাণী, বড় সাহেবের কথা, বাবুদের কথা—ধীরু বাবুর কথাও। এদিক-ওদিক চেয়ে মানকে গলা খাটো করেছে, সব দিকে চোখ বউ-রাণীর, দুদিন ধরে দু'বেলাই অন্য-রকম খাচ্ছেন না বাবু? মানুকের সব থেকে বেশি আনন্দ বোধ হয় এই কারণেই, হি-হি করে হেসেছে আর রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে।—সব বউ-রাণীর ব্যবস্থা, বুঝলেন? চুপ চাপ এতদিন দেখেছেন তারপর এই ব্যবস্থা করেছেন। ওনার বাপের বাড়ির ঝি সঙ্গে আসতেই কেয়ার-টেক বাবুর চোখ কপালে উঠেছিল, এখন আবার রাঁধুনী এলো—কেয়ার-টেক বাবুর মুখে আর রা নেই!

—নিজের হাতে দুবেলা শ্বশুরের চা জলখাবার এনে দেন, খাবেন না বললেও দুধের গেলাস হাতে করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন খেতে হয়—খপরের কাগজ পড়ে শোনান আর দিনে দুই একখানা চিঠিও লিখে দেন। বউ-রাণীর টুকিটাকি এ-রকম আরো অনেক কাজের ফিরিস্তি দিয়েছে মানুকে। তারপর হৃষ্ট গাম্ভীর্যে মন্তব্য করেছে, বিয়েটা হয়ে ছোটসাহেবের থেকেও বড় সাহেবের বেশি সুবিধে হয়েছে বাবু···

ধীরাপদর চোখ দুটো একেবারে সোজাসুজি মুখের ওপর এসে পড়তে কাজের ত্রাসে মুখের ভোল বদলে মানুকে দ্রুত প্রস্থান করেছে!

বউ-রাণীর নাম আরতি। সকালের দিকে ওপরে উঠলে শ্বশুরের কাছেই তাকে দেখা যায় বটে। ধীরাপদর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ

এখনো হয়নি, প্রাথমিক পরিচয়টা অবশ্য বড়সাহেব গোড়ার দিকেই করিয়ে দিয়েছেন।—ইনি ধীরুবাবু, ভালো করে চিনে রাখো। এ বাড়ির গার্জেন বলতে গেলে ও-ই, আর আমাদের কারখানারও মস্ত কর্তা-ব্যক্তি, দরকার হলে আমার উপর দিয়ে লাঠি ঘোরায়।

হাসি মুখে মেয়েটি চিনে রাখতেই চেষ্টা করেছে।

নিছক কৌতুকবশতই বড়সাহেব ওর পরিচয়টা এভাবে কাঁপিয়ে তোলেন নি হয়ত। এখানে আছে বলে কেয়ার-টেক বাবুর মতই একজন না ভেবে বসে থাকে বউ, সেই ভয় বোধহয় তাঁর।

ধীরাপদর এ-বাড়িতেই থাকা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। যাবার তাড়া আর ছিল না, তবু হিমাংশুবাবু কানপুর থেকে ফেরার পর যাবার কথাটা সে-ই তুলেছিল। হিমাংশুবাবুর তখনো ধারণা, এক-রকম জোর করেই আটকে রাখা হয়েছে তাকে, আর আপত্তি করার কথাও ভাবেননি তিনি। তবু হালকা ভ্রূকুটি করেছেন, কোথায় যাবে? তোমার সেই সুলতান কুঠিতে?

জবাব না দিলে এর পরের কৌতুক আরো ঘোরালো হবে জানত। তাই চুপ করে থাকেনি। —না, কাছাকাছি একটা বাসা দেখে নেব।

যেখানে থাকতে সেখানে যাচ্ছ না? বড় সাহেব অবাক।

না, যাতায়াতের বড় অসুবিধে, তা ছাড়া একটা মাত্র ঘর····

বড়সাহেব সোজা হয়ে বসেছেন, মুখের পাইপ নামিয়েছেন, তারপর ছদ্ম গাম্ভীর্যে মুখখানা ভরাট করেছেন।—কটা ঘর দরকার তোমার? এই গোটা বাড়িটা ছেড়ে দিলে চলতে পারে?

ধীরাপদ আগের মত বিব্রত বোধ করেনি আর। প্রশ্ন শুনে হেসেও ফেলেছিল।

আমি ভেবেছিলাম কি না কি গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে আছে সেখানে, তা না তুমি বাসা খুঁজছ?

অতঃপর সানন্দে তার যাওয়ার ইচ্ছেটা বাতিল করে দিয়েছেন বড়সাহেব, ফের যাওয়ার কথা তুললে রাগ করবেন বলে শাসিয়েছেন।

ধীরাপদ আর আপত্তি করেনি, আপত্তি করার ফুরসতও মেলেনি। কত কারণে ওর এখানে থাকাটা জরুরী এখন, মনের আনন্দে বড় সাহেব সেই ফিরিস্তি দিয়েছেন।

এক, ছেলের বিয়ে। খুব ছোট ব্যাপার হবে না সেটা, ও কাছে না থাকলে সব দিক দেখবে শুনবে কে? দ্বিতীয়, ছেলের বিয়ে চুকলেই মাস ছয়েকের জন্য আর একবার য়ুরোপের দিকে পা বাড়াবেন তিনি। ও দেশের কারবারগুলোর আধুনিক ব্যবস্থাপত্র হাল-চাল পর্যবেক্ষণে যাবেন। ভারতীয় ভেষজ সংস্থার সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগসূত্রটা চোখে পড়ার মত করে পুষ্ট করে আসা যায় কি না সেই চেষ্টা করবেন। এর ফলে সংস্থার আগামী প্রেসিডেণ্ট ইলেকশনের ব্যাপারে তাঁর মর্যাদা বাড়বে, দাবি দ্বিগুণ হবে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে হয়ত বা কেউ আর মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াবেই না। পাটনার অধিবেশনে এ নিয়ে অনেকের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে। অমন জোরালো বক্তৃতার পরে নিজের খরচে

সংস্থার এই উন্নয়ন পরিকল্পনা শুনে তাঁরা এক-বাক্যে প্রশংসা করেছেন। সেখানে বসেই বাইরে অনেকগুলো চিঠি-পত্র লিখে ফেলেছেন তিনি। জবাবের প্রত্যাশায় আছেন। ধীরাপদর সঙ্গে বসে এরপর ভ্রমণ-সূচী ঠিক করবেন। অতএব এখান থেকে নড়ার চিন্তা ধীরাপদর একেবারে ছাড়া দরকার।

চিন্তা ছেড়েছে। কিন্তু খবর দুটো শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনের তলায় যে-দুটো প্রশ্ন আঁচড় কাটছে, জানলে বড়সাহেব রেগে যেতেন কি হেসে ফেলতেন বলা যায় না। মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করার মত নয় একটাও। প্রথম, ছেলের বিয়ে ছেলে নিজে তা জানে কি না। দ্বিতীয়, তিনি একা যাচ্ছেন না এবারও চারুদি সঙ্গিনী হবেন। চারুদি সঙ্গে গেলে পার্বতীকে নিয়ে সমস্যাটা যেন ধীরাপদরই।

চারুদির বাড়ি গিয়েছিল সিতাংশুর বিয়েরও দিন কয়েক পরে। চারুদির ডাক আসার প্রতীক্ষায় একটানা অনেকগুলো দিন কাটিয়ে শেষে নিজেই গেল একদিন। যেতে দ্বিধা বলেই যাবার ঝোঁক বেশি। তাড়না বেশি। কিন্তু এসে শঙ্কা বোধ করল। যে চারুদির দিকে তাকালে বয়েসের কথা মনে হত না, শুধু ভালো লাগত—তাঁর দ্রুত পরিবর্তনটা বড় বেশি রুক্ষ লাগছে। বয়েসটাই আগে চোখে পড়ে এখন। তাঁকে দেখামাত্র কি জানি কেন পার্বতীর সেদিনের উক্তিতে সংশয় জাগাল মনে। বড়সাহেবের সঙ্গে তাঁর পাটনায় যাওয়া ব্যর্থই হয়েছে বোধহয়···কাছে থেকেও এবারে চারুদি কিছু করাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

বোসো—। খুশিও না, বিরক্তিও না। শুকনো অভ্যর্থনা। আগে হলে এতদিন না আসার দরুন অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হত, অনেক সরস আর উষ্ণ টিপ্পনী শুনতে হত।

বিয়ের ঝামেলা মিটল?

হ্যাঁ, কবেই তো।···বড়সাহেবের ছেলের বিয়েতে চারুদি কেউ না, একেবারে অস্তিত্ব শূন্য।

বউ কেমন হল?

ভালই।

ছেলের মাথা ঠাণ্ডা থাকবে মনে হয়?

ধীরাপদ নিজেই জানে না থাকবে কি না। মাথা নাড়ল, মনে হয়।

চারুদির আর কিছু শোনার আগ্রহ নেই, কথা বলার আগ্রহও না। মনে হয় না বললে বিরসমুখে একটুখানি উদ্দীপনা দেখা যেত বোধ হয়। পিছনে সরে খাটে ঠেস দিলেন, ধীরাপদ উঠলে হয়ত শুয়ে পড়বেন।

ওদিকে পার্বতীও হয়ত সে এসেছে টের পেয়ে আড়াল নিয়েছে কোথাও। এক পেয়ালা চা খেতে চাইলে কেমন হয়? পার্বতীর ডাক পড়বে, কতখানি ঘৃণা আর বিদ্বেষ জমেছে মুখে, দেখা যাবে। চা চাওয়া হল না, এমনিতেই তেতে উঠছে। এতকাল ধরে অমিত ঘোষের অমন দস্যুবৃত্তির প্রশ্রয় কে দিয়ে এসেছে? তখন ধীরাপদ কোথায় ছিল? লোকটার সেই ফোটো অ্যালবামের পার্বতী কি আর কেউ নাকি?

চারুদির সঙ্গেই সহজ আলাপে মগ্ন হতে চেষ্টা করল, বড়সাহেব য়ুরোপ যাচ্ছেন শিগগীরই শুনেছ?

শুনেছেন জানে, কারণ যাত্রার সঙ্কল্প কানপুর থেকেই পাকা হয়ে এসেছে। চারুদি আধ-শোয়া, মাথাটা খাটের রেলিংয়ের ওপর। ফিরে তাকালেন একবার, তারপর দৃষ্টিটা ঘরের পাখার ওপর রাখলেন।—দিন ঠিক হয়ে গেছে?

না, ছেলের বিয়ের জন্য আটকে ছিলেন, এবারে যাবেন। কি মনে হতে পরামর্শ দিল, বলে কয়ে অমিতবাবুকেও সঙ্গে পাঠাও না, বাইরে কাছাকাছি থাকলে অন্যরকম হতে পারে···

বিরক্তি-ভরা দুই চোখ পাখা থেকে তার মুখের ওপর নেমে এলো আবার। বললেন, তোমার অত ভেবে কাজ নেই, নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও।

হঠাৎ এই উষ্মার কারণ ঠাওর করা গেল না। চারুদির রাগ দেখেছে, হতাশা দেখেছে কিন্তু এ-ধরণের বচন আগে আর শোনেনি। কর্কশ লাগল কানে, ভিতরটা চিনচিনিয়ে উঠল।

কিন্তু ভিতরে বাইরে এক হতে নেই এ-যুগে, ধীরাপদ হাসতে পেরেছে। রয়ে সয়ে বলল, কানপুর থেকে ঘুরে এসে তোমার মেজাজের আরো উন্নতি হয়েছে দেখছি, অমিতবাবুর মাসি বলে চেনা যায়···

চারুদি আস্তে আস্তে উঠে বসলেন, তারপর মুখোমুখি ঘুরে বসলেন। এই প্রতিক্রিয়ার কারণও দুর্বোধ্য।—আমি কানপুরে গিয়েছিলাম তোমাকে কে বলল?

ধীরাপদর একবার ইচ্ছে হল চোখ কান বুজে বলে দেয় বড়সাহেব। পার্বতী বাড়িতে ডেকে এনে বলেছে বললেই বা কোন্ ভাব দেখবে মুখের?

এখানেই শুনেছি। একদিন এসেছিলাম।

কবে এসেছিলে?

তোমরা যাওয়ার দিন কয়েকের মধ্যে। তুমি যাবে জানতুম না।

তুমি একা এসেছিলে?

আর কে আসবে! জেরার ধরনে স্বস্তি বোধ করছে না খুব।

চারুদির সন্ধানী দৃষ্টিটা যা খুঁজছিল তা যেন পেল না। তবু খুঁজছেন কিছু।—পার্বতী আর কি বলেছে তোমাকে? চাপা ঝাঁঝ, এদিকে সরে এসো, দেয়াল ফুঁড়ে কথা কানে যায় বেইমান মেয়ের। কি বলেছে?

চকিতে ধীরাপদ দরজার দিকে ঘাড় ফেরাল একবার, তারপর বিস্ময়ের আড়ালে একটুখানি অবকাশ হাতড়ে বেড়াল।—কি বলবে!

ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, সমস্ত মুখ লাল। এই রাগ সামনে যে বসে তার ওপরেই।—নিজেকে খুব একজন আপন জন ভাবো ওর, কেমন? কি বলেছে?

যে-টুকু ভাবা দরকার ছিল ভেবে নেওয়া গেছে। পার্বতী কি বলেছিল স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে। চারুদির কানপুরে যাওয়ার উদ্দেশ্য জানিয়ে পার্বতী অনুরোধ করেছিল, আপনি এ-সব বন্ধ করুন। পার্বতী শুধু তাকে শোনাবার জন্যে বলেনি, শুনে মুখ বুজে বসে থাকতেও বলেনি।

ধীরাপদ আগে তবু চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক, চারুদির হাব-ভাব সুস্থ লাগছে না তাই বুঝিয়ে দিল। তারপর পার্বতী কি বলেছে স্মরণ করতেও যেন সময় লাগল একটু।

···পার্বতী বলছিল তুমি ওকে সম্পত্তি দান করার মতলব নিয়ে কানপুরে গেছ। ব্যাঙ্কের পাস-বইটাই আর কারবারের কাগজপত্রও সঙ্গে নিয়েছিলে শুনলাম।

চারুদির নিষ্পলক প্রতীক্ষা, মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় বুকের মধ্যে গনগনিয়ে জ্বলছে কিছু।

একবারে উপসংহারে পৌঁছাল ধীরাপদ, ওর তাতে বিশেষ আপত্তি দেখলাম—

ছাই দেখেছ তুমি! ছাই বুঝেছ! শুধু আমার হাড়-মাস চিবিয়ে খাওয়া ছাড়া আর সবেতে আপত্তি ওর সে-কথা বলেছে তোমাকে?

ধীরাপদ হকচকিয়ে গেল. এক পশলা তরল আগুনের ঝাপটা লাগল যেন মুখে। একটু আগে যে কারণে তাকে কাছে সরে আসতে বলেছিলেন চারুদি নিজেই তা ভুলে গেলেন। রাগে উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর হিসহিসিয়ে চড়তে লাগল।

—আমাকে আক্কেল দেবার জন্যে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতেও আপত্তি নেই ওর, কেমন? নিজের মুখে কালি লেপে আমাকে খুব জব্দ করবে ভেবেছে! কেটে কুচি কুচি করে ওকে ওই বাগানে পুঁতে রেখে আসব তবে আমার নাম—করাচ্ছি আপত্তি!

প্রবল উত্তেজনায় মুখে চারুদি হঠাৎই ভেঙে পড়লেন আবার। অবসন্ন ক্ষোভে খাটের রেলিংয়ে মাথা রেখে বাহুতে মুখ ঢেকে ফেললেন। ধীরাপদ বিমূঢ়, দরজার দিকে চোখ গেল, মনে হল পার্বতী বুঝি মূর্তির মত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। নেই কেউ। আর একদিন স্বর্ণসিন্দুর হাতে ঘরে ঢুকেছিল, আজও সেই রকমই একটা আশঙ্কা ধীরাপদর।

উঠে চারুদির সামনে এসে দাঁড়াল। চারুদির হাতখানা আস্তে আস্তে মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল। চমকে উঠে চারুদি নিজেই হাত সরালেন।

পার্বতী কি করেছে?

কিছু না। চারুদি এবারে বিদায় করতে চান ওকে, আজ যাও তুমি, আর একদিন এসো, কথা আছে—

কি হয়েছে বলো না?

আঃ! আজ যাও বলছি, আর একদিন এসো—

চারুদি তাড়িয়েই দিলেন যেন। ঘর ছেড়ে ধীরাপদ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকালো, কান পাতল। পার্বতী এই বাড়িতেই নেই যেন, অথচ মনে হচ্ছে সমস্ত বাড়িটা জুড়ে শুধু পার্বতীই আছে, আর কেউ নেই।

ধীরাপদ নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো।

অবাঞ্ছিত লাগে নিজেকে, পরিত্যক্ত মনে হয়। কার্জন পার্কের লোহার বেঞ্চির ধীরাপদ আজ অনেক উঠেছে, অনেক পেয়েছে। কিন্তু অঙ্কের বাইরেও অনেক রকমের হিসেব আছে। তেমনি কোনো একটা হিসেবে সে যেন অনেক নেমেছে, অনেক হারিয়েছে। সেই ওঠা-নামা আর পাওয়া হারানোর একটা শূন্য ফল অষ্টপ্রহর হাউইয়ের মত জ্বলে জ্বলে উঠতে চায়।

যে অসহিষ্ণু তাড়না তাকে চারুদির বাড়িতে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল সেটাই তাকে সুলতান কুঠির দিকেও ঠেলে পাঠাতে চেয়েছে বার বার। সেখানে যাওয়ার পথ বন্ধ ভাবছে কেন, গেলে কে বাধা দেবে? তার ঘর আছে সেখানে, যাবার অধিকারও আছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে শূন্য ঘরে ঘণ্টা দু' চার মুখ বুজে বসে থেকে অধিকার দেখিয়ে আসবে?

যাবার মত হঠাৎই একটা উপলক্ষ হাতড়ে পেল। পেল যখন, সেটাকে একেবারে তুচ্ছ ভাবা গেল না। একাদশী শিকদারকে কাগজের দাম দিয়ে আসা দরকার। একখানা কাগজের গোটা বছরের টাকা আগাম দেওয়া আছে। গণুদার অফিস থেকে যে-কাগজ আনত সেটাও রাখার পরোয়ানা দিয়ে এসেছি তাঁকে, কিন্তু দাম দেওয়া হয়নি। দিয়ে আসা দরকার।

বাস থেকে নেমেই ধাক্কা খেল একটা। কুঠি এলাকা খুব কাছে নয় সেখান থেকে। সামনের অপরিসর চার রাস্তা পেরিয়ে সাত-আট মিনিটের হাঁটা-পথ। রাস্তাটা পেরুতে গিয়ে পা থেমে গেল। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে গণুদা কথা কইছে কার সঙ্গে। লোকটা গণুদার মুখোমুখি অর্থাৎ এদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বলে গোটাগুটি দেখা যাচ্ছে তাকে।···চকচকে চেহারা, পরনে ঝকঝকে স্যুট, হাতে ঘাস-রঙা সিগারেটের টিন, চঞ্চল হাব-ভাব, কথা কইছে আর কোটের হাতা টেনে ঘড়ি দেখছে। দেখা মাত্র একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি ছেঁকে ধরার উপক্রম ধীরাপদকে। এ-রকম একজন লোককে সে কোথায় দেখেছিল? কবে দেখেছিল? এ-রকম এক জনকে নয়, এই লোককেই। কিন্তু কোথায়? কবে? চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না কোথায় দেখেছে, কবে দেখেছে। যেখানেই দেখুক, সেই দেখার সঙ্গে কোনো শুভ স্মৃতি জড়িত নয়—চেতনার দরজায় শুধু এই বার্তাটাই ঘা দিয়ে গেল বার-কতক।

একটা লোককে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতে দেখলে সেদিকে চোখ যাবেই। লোকটাও দেখল, দেখে ভুরু কোঁচকালো। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে গণুদা ঘাড় ফেরাল। এবারে গণুদাকেই দেখল ধীরাপদ। পরনের জামা-কাপড় আধ-ময়লা, শুকনো মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, ফর্সা রঙ তেতে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

এক মুহূর্তে যতখানি ঘৃণা আর বিদ্বেষ বর্ষণ করা যায় গণুদা তা করল। তারপর একেবারে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল।

ধীরাপদ পাশ কাটিয়ে গেল।···সঙ্গের ওই ঘাস-রঙা সিগারেটের টিন হাতে লোকটাকে কোথায় দেখল? কবে দেখল?

সুলতান কুঠি যত কাছে আসছে পা দুটো ততো ভারী লাগছে। মজা দীঘির অনেকটা এধারেই পা দুটো অচল হয়ে থেমেই গেল শেষে। কোথায় যাচ্ছে সে? কি দেখতে যাচ্ছে? গণুদার ওই মূর্তি, যাচ্ছে যেখানে সেখানকার চেহারা কেমন দেখবে? দুটো মাস কেটে গেল এরই মধ্যে, কিন্তু এখানে এই দুটো মাসের প্রত্যেকটা দিন কি-ভাবে কেটেছে? ওকে দেখেই হয়ত উমা বেরিয়ে আসবে, তার পিছনে হয়ত ছেলে দুটোও বেরিয়ে আসবে—এলে ধীরাপদ কি দেখবে ঠিক কি!

দম বন্ধ হয়ে আসছে, একটা অব্যক্ত যাতনা শুধু দুই চোখের কোণ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ধীরাপদ হন হন করে ফিরে চলল। একাদশী শিকদারের খবরের কাগজের টাকা মনি অর্ডার করে পাঠালেই হবে। তারপর আর একদিন প্রস্তুত হয়ে আসবে সে। সব দেখার মত, সব সহ্য করার মত, আর সব কিছুর চূড়ান্ত বোঝাপড়া করে নেবার মত প্রস্তুত হয়ে।

চার রাস্তার মোড়ে গণুদা বা সেই লোকটা নেই। আরো একবার মনের তলায় ডুব দিয়ে লোকটাকে আঁতিপাতি করে খুঁজল। পেল না। লোকটাকে দেখেছিল কোথাও ভুল নেই। অন্তত দেখা

সংস্থায় এই উন্নয়ন পরিকল্পনা শুনে তাঁরা এক-বাক্যে প্রশংসা করেছেন। সেখানে বসেই বাইরে অনেকগুলো চিঠি পত্র লিখে ফেলেছেন তিনি। জবাবের প্রত্যাশায় আছেন। ধীরাপদর সঙ্গে বসে এরপর ভ্রমণ-সূচী ঠিক করবেন। অতএব এখান থেকে নড়ার চিন্তা ধীরাপদর একেবারে ছাড়া দরকার।

চিন্তা ছেড়েছে। কিন্তু খবর দুটো শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনের তলায় যে-দুটো প্রশ্ন আঁচড় কাটছে, জানলে বড়সাহেব রেগে যেতেন কি হেসে ফেলতেন বলা যায় না। মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করার মত নয় একটাও। প্রথম, ছেলের বিয়ে ছেলে নিজে তা জানে কি না। দ্বিতীয়, তিনি একা যাচ্ছেন না এবারও চারুদি সঙ্গিনী হবেন। চারুদি সঙ্গে গেলে পার্বতীকে নিয়ে সমস্যাটা যেন ধীরাপদরই।

চারুদির বাড়ি গিয়েছিল সিতাংশুর বিয়েরও দিন কয়েক পরে। চারুদির ডাক আসার প্রতীক্ষায় একটানা অনেকগুলো দিন কাটিয়ে শেষে নিজেই গেল একদিন। যেতে দ্বিধা বলেই যাবার ঝোঁক বেশি। ভাবনা বেশি। কিন্তু এসে শঙ্কা বোধ করল। যে চারুদির দিকে তাকালে বয়েসের কথা মনে হত না, শুধু ভালো লাগত—তাঁর দ্রুত পরিবর্তনটা বড় বেশি রুক্ষ লাগছে। বয়েসটাই আগে চোখে পড়ে এখন। তাঁকে দেখামাত্র কি জানি কেন পার্বতীর সেদিনের উক্তিতে সংশয় জাগাল মনে। বড়সাহেবের সঙ্গে তাঁর পাটনায় যাওয়া ব্যর্থই হয়েছে বোধহয়···কাছে থেকেও এবারে চারুদি কিছু করাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

বোসো—। খুশিও না, বিরক্তিও না। শুকনো অভ্যর্থনা। আগে হলে এতদিন না আসার দরুন অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হত, অনেক সরস আর উষ্ণ টিপ্পনী শুনতে হত।

বিয়ের ঝামেলা মিটল?

হ্যাঁ, কবেই তো।···বড়সাহেবের ছেলের বিয়েতে চারুদি কেউ না, একেবারে অস্তিত্ব শূন্য।

বউ কেমন হল?

ভালই।

ছেলের মাথা ঠাণ্ডা থাকবে মনে হয়?

ধীরাপদ নিজেই জানে না থাকবে কি না। মাথা নাড়ল, মনে হয়।

চারুদির আর কিছু শোনার আগ্রহ নেই, কথা বলার আগ্রহও না। মনে হয় না বললে বিরসমুখে একটুখানি উদ্দীপনা দেখা যেত বোধ হয়। পিছনে সরে খাটে ঠেস দিলেন, ধীরাপদ উঠলে হয়ত শুয়ে পড়বেন।

ওদিকে পার্বতীও হয়ত সে এসেছে টের পেয়ে আড়াল নিয়েছে কোথাও। এক পেয়ালা চা খেতে চাইলে কেমন হয়? পার্বতীর ডাক পড়বে, কতখানি ঘৃণা আর বিদ্বেষ জমেছে মুখে, দেখা যাবে। চা চাওয়া হল না, এমনিতেই তেতে উঠছে। এতকাল ধরে অমিত ঘোষের অমন দস্যুবৃত্তির প্রশ্রয় কে দিয়ে এসেছে? তখন ধীরাপদ কোথায় ছিল? লোকটার সেই ফোটো অ্যালবামের পার্বতী কি আর কেউ নাকি?

চারুদির সঙ্গেই সহজ আলাপে মগ্ন হতে চেষ্টা করল, বড়সাহেব য়ুরোপ যাচ্ছেন শিগগীরই শুনেছ?

শুনেছেন জানে, কারণ যাত্রার সঙ্কল্প কানপুর থেকেই পাকা হয়ে এসেছে। চারুদি আধ-শোয়া, মাথাটা খাটের রেলিংয়ের ওপর। ফিরে তাকালেন একবার, তারপর দৃষ্টিটা ঘরের পাখার ওপর রাখলেন।—দিন ঠিক হয়ে গেছে?

না, ছেলের বিয়ের জন্য আটকে ছিলেন, এবারে যাবেন। কি মনে হতে পরামর্শ দিল, বলে কয়ে অমিতবাবুকেও সঙ্গে পাঠাও না, বাইরে কাছাকাছি থাকলে অন্যরকম হতে পারে···

বিরক্তি-ভরা দুই চোখ পাখা থেকে তার মুখের ওপর নেমে এলো আবার। বললেন, তোমার অত ভেবে কাজ নেই, নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও।

হঠাৎ এই উষ্মার কারণ ঠাওর করা গেল না। চারুদির রাগ দেখেছে, হতাশা দেখেছে কিন্তু এ-ধরণের বচন আগে আর শোনেনি। কর্কশ লাগল কানে, ভিতরটা চিনচিনিয়ে উঠল।

কিন্তু ভিতরে বাইরে এক হতে নেই এ-যুগে, ধীরাপদ হাসতে পেরেছে। রয়ে সয়ে বলল, কানপুর থেকে ঘুরে এসে তোমার মেজাজের আরো উন্নতি হয়েছে দেখছি, অমিতবাবুর মাসি বলে চেনা যায়···

চারুদি আস্তে আস্তে উঠে বসলেন, তারপর মুখোমুখি ঘুরে বসলেন। এই প্রতিক্রিয়ার কারণও দুর্বোধ্য।—আমি কানপুরে গিয়েছিলাম তোমাকে কে বলল?

ধীরাপদর একবার ইচ্ছে হল চোখ কান বুজে বলে দেয় বড়সাহেব। পার্বতী বাড়িতে ডেকে এনে বলেছে বললেই বা কোন্ ভাব দেখবে মুখের?

এখানেই শুনেছি। একদিন এসেছিলাম।

কবে এসেছিলে?

তোমরা যাওয়ার দিন কয়েকের মধ্যে। তুমি যাবে জানতুম না।

তুমি একা এসেছিলে?

আর কে আসবে! জেরার ধরনে স্বস্তি বোধ করছে না খুব।

চারুদির সন্ধানী দৃষ্টিটা যা খুঁজছিল তা যেন পেল না। তবু খুঁজছেন কিছু।—পার্বতী আর কি বলেছে তোমাকে? চাপা ঝাঁঝ, এদিকে সরে এসো, দেয়াল ফুঁড়ে কথা কানে যায় বেইমান মেয়ের। কি বলেছে?

চকিতে ধীরাপদ দরজার দিকে ঘাড় ফেরাল একবার, তারপর বিস্ময়ের আড়ালে একটুখানি অবকাশ হাতড়ে বেড়াল।—কি বলবে!

ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, সমস্ত মুখ লাল। এই রাগ সামনে যে বসে তার ওপরেই।—নিজেকে খুব একজন আপন জন ভাবো ওর, কেমন? কি বলেছে?

যে-টুকু ভাবা দরকার ছিল ভেবে নেওয়া গেছে। পার্বতী কি বলেছিল স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে। চারুদির কানপুরে যাওয়ার উদ্দেশ্য জানিয়ে পার্বতী অনুরোধ করেছিল, আপনি এ-সব বন্ধ করুন। পার্বতী শুধু তাকে শোনাবার জন্যে বলেনি, শুনে মুখ বুজে বসে থাকতেও বলেনি।

ধীরাপদ আগে তবু চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক, চারুদির হাব-ভাব সুস্থ লাগছে না তাই বুঝিয়ে দিল। তারপর পার্বতী কি বলেছে স্মরণ করতেও যেন সময় লাগল একটু।

···পার্বতী বলছিল তুমি ওকে সম্পত্তি দান করার মতলব নিয়ে কানপুরে গেছ। ব্যাঙ্কের পাস-বইটাই আর কারবারের কাগজপত্রও সঙ্গে নিয়েছিলে শুনলাম।

চারুদির নিষ্পলক প্রতীক্ষা, মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় বুকের মধ্যে গনগনিয়ে জ্বলছে কিছু।

একবারে উপসংহারে পৌঁছাল ধীরাপদ, ওর তাতে বিশেষ আপত্তি দেখলাম—

ছাই দেখেছ তুমি! ছাই বুঝেছ! শুধু আমার হাড়-মাস চিবিয়ে খাওয়া ছাড়া আর সবেতে আপত্তি ওর সে-কথা বলেছে তোমাকে?

ধীরাপদ হকচকিয়ে গেল, এক পশলা তরল আগুনের ঝাপটা লাগল যেন মুখে। একটু আগে যে কারণে তাকে কাছে সরে আসতে বলেছিলেন চারুদি নিজেই তা ভুলে গেলেন। রাগে উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর হিসহিসিয়ে চড়তে লাগল।

—আমাকে আক্কেল দেবার জন্যে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতেও আপত্তি নেই ওর, কেমন? নিজের মুখে কালি লেপে আমাকে খুব জব্দ করবে ভেবেছে! কেটে কুচি কুচি করে ওকে ওই বাগানে পুঁতে রেখে আসব তবে আমার নাম—করাচ্ছি আপত্তি!

প্রবল উত্তেজনার মুখে চারুদি হঠাৎই ভেঙে পড়লেন আবার। অবসন্ন ক্ষোভে খাটের রেলিংয়ে মাথা রেখে বাহুতে মুখ ঢেকে ফেললেন। ধীরাপদ বিমূঢ়, দরজার দিকে চোখ গেল, মনে হল পার্বতী বুঝি মূর্তির মত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। নেই কেউ। আর একদিন স্বর্ণসিন্দুর হাতে ঘরে ঢুকেছিল, আজও সেই রকমই একটা আশঙ্কা ধীরাপদর।

উঠে চারুদির সামনে এসে দাঁড়াল। চারুদির হাতখানা আস্তে আস্তে মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল। চমকে উঠে চারুদি নিজেই হাত সরালেন।

পার্বতী কি করেছে?

কিছু না। চারুদি এবারে বিদায় করতে চান ওকে, আজ যাও তুমি, আর একদিন এসো, কথা আছে—

কি হয়েছে বলো না?

আঃ! আজ যাও বলছি, আর একদিন এসো—

চারুদি তাড়িয়েই দিলেন যেন। ঘর ছেড়ে ধীরাপদ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকালো, কান পাতল। পার্বতী এই বাড়িতেই নেই যেন, অথচ মনে হচ্ছে সমস্ত বাড়িটা জুড়ে শুধু পার্বতীই আছে, আর কেউ নেই।

ধীরাপদ নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো।

অবাঞ্ছিত লাগে নিজেকে, পরিত্যক্ত মনে হয়। কার্জন পার্কের লোহার বেঞ্চির ধীরাপদ আজ অনেক উঠেছে, অনেক পেয়েছে। কিন্তু অঙ্কের বাইরেও অনেক রকমের হিসেব আছে। তেমনি কোনো একটা হিসেবে সে যেন অনেক নেমেছে, অনেক হারিয়েছে। সেই ওঠা-নামা আর পাওয়া হারানোর একটা শূন্য ফল অষ্টপ্রহর হাউইয়ের মত জ্বলে জ্বলে উঠতে চায়।

যে অসহিষ্ণু তাড়না তাকে চারুদির বাড়িতে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল সেটাই তাকে সুলতান কুঠির দিকেও ঠেলে পাঠাতে চেয়েছে বার বার। সেখানে যাওয়ার পথ বন্ধ ভাবছে কেন, গেলে কে বাধা দেবে? তার ঘর আছে সেখানে, যাবার অধিকারও আছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে শূন্য ঘরে ঘণ্টা দু'চার মুখ বুজে বসে থেকে অধিকার দেখিয়ে আসবে?

যাবার মত হঠাৎই একটা উপলক্ষ্য হাতড়ে পেল। পেল যখন, সেটাকে একেবারে তুচ্ছ ভাবা গেল না। একাদশী শিকদারকে কাগজের দাম দিয়ে আসা দরকার। একখানা কাগজের গোটা বছরের টাকা আগাম দেওয়া আছে। গণুদার অফিস থেকে যে-কাগজ আনত সেটাও রাখার পরোয়ানা দিয়ে এসেছি তাঁকে, কিন্তু দাম দেওয়া হয়নি। দিয়ে আসা দরকার।

বাস থেকে নেমেই ধাক্কা খেল একটা। কুঠি এলাকা খুব কাছে নয় সেখান থেকে। সামনের অপরিসর চার রাস্তা পেরিয়ে সাত-আট মিনিটের হাঁটা-পথ। রাস্তাটা পেরুতে গিয়ে পা থেমে গেল। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে গণুদা কথা কইছে কার সঙ্গে। লোকটা গণুদার মুখোমুখি অর্থাৎ এদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বলে গোটাগুটি দেখা যাচ্ছে তাকে।...চকচকে চেহারা, পরনে ঝকঝকে স্যুট, হাতে ঘাস-রঙা সিগারেটের টিন, চঞ্চল হাব-ভাব, কথা কইছে আর কোটের হাতা টেনে ঘড়ি দেখছে। দেখা মাত্র একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি ছেঁকে ধরার উপক্রম ধীরাপদকে। এ-রকম একজন লোককে সে কোথায় দেখেছিল? কবে দেখেছিল? এ-রকম এক জনকে নয়, এই লোককেই। কিন্তু কোথায়? কবে? চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না কোথায় দেখেছে, কবে দেখেছে। যেখানেই দেখুক, সেই দেখার সঙ্গে কোনো শুভ স্মৃতি জড়িত নয়—চেতনার দরজায় শুধু এই বার্তাটাই ঘা দিয়ে গেল বার-কতক।

একটা লোককে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতে দেখলে সেদিকে চোখ যাবেই। লোকটাও দেখল, দেখে ভুরু কোঁচকালো। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে গণুদা ঘাড় ফেরাল। এবারে গণুদাকেই দেখল ধীরাপদ। পরনের জামা-কাপড় আধ-ময়লা, শুকনো মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, ফর্সা রঙ তেতে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

এক মুহূর্তে যতখানি ঘৃণা আর বিদ্বেষ বর্ষণ করা যায় গণুদা তা করল। তারপর একেবারে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল।

ধীরাপদ পাশ কাটিয়ে গেল।...সঙ্গের ওই ঘাস-রঙা সিগারেটের টিন হাতে লোকটাকে কোথায় দেখল? কবে দেখল?

সুলতান কুঠি যত কাছে আসছে পা দুটো ততো ভারী লাগছে। মজা দীঘির অনেকটা এধারেই পা দুটো অচল হয়ে থেমেই গেল শেষে। কোথায় যাচ্ছে সে? কি দেখতে যাচ্ছে? গণুদার ওই মূর্তি, যাচ্ছে যেখানে সেখানকার চেহারা কেমন দেখবে? দুটো মাস কেটে গেল এরই মধ্যে, কিন্তু এখানে এই দুটো মাসের প্রত্যেকটা দিন কি-ভাবে কেটেছে? ওকে দেখেই হয়ত উমা বেরিয়ে আসবে, তার পিছনে হয়ত ছেলে দুটোও বেরিয়ে আসবে—এলে ধীরাপদ কি দেখবে ঠিক কি!

দম বন্ধ হয়ে আসছে, একটা অব্যক্ত যাতনা শুধু দুই চোখের কোণ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ধীরাপদ হন হন করে ফিরে চলল। একাদশী শিকদারের খবরের কাগজের টাকা মনি অর্ডার করে পাঠালেই হবে। তারপর আর একদিন প্রস্তুত হয়ে আসবে সে। সব দেখার মত, সব সহ্য করার মত, আর সব কিছুর চূড়ান্ত বোঝাপড়া করে নেবার মত প্রস্তুত হয়ে।

চার রাস্তার মোড়ে গণুদা বা সেই লোকটা নেই। আরো একবার মনের তলায় ডুব দিয়ে লোকটাকে আঁতিপাতি করে খুঁজল। পেল না। লোকটাকে দেখেছিল কোথাও ভুল নেই। অন্তত দেখা/

অন্তত স্মৃতি কিছুর···এই লোক গণুদার সঙ্গে কেন! কিন্তু কে লোকটা?

রাজ্যের ক্লান্তি। থাক, মনে পড়ে যখন যখন হয়।

ক'টা দিন না যেতে মনটা আবার যে স্রোতের মুখে গিয়ে পড়ল তার বেগ যত না, আবর্ত চতুর্গুণ। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সেটা প্রবল নয় খুব, প্রত্যক্ষগোচরও নয় তেমন।

অমিতাভ ঘোষের রিসার্চের প্ল্যান নাকচ হয়ে গেল।

বিয়েটা করে ফেলার পর ছোট সাহেব সিতাংশু মিত্র হৃত ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে। শুধু ফিরে পাওয়া নয়, ওই এক কারণে তার আধিপত্যের দাবি আগের থেকেও বেড়েছে যেন। বড়সাহেব বিদেশ-যাত্রা করলে ব্যবসায়ের সর্বময় কর্তৃত্বের দখলও সেই নেবে এ-ও প্রায় প্রকাশ্যেই স্পষ্ট। তার চালচলন ঈষৎ উগ্র, কাজ কর্মে দৃষ্টি প্রখর।

কারখানার কর্মচারীদের অনেকে শঙ্কা বোধ করেছে। গত উৎসবে বড়সাহেবের ঘোষণা অনুযায়ী তাদের পাওনা গণ্ডা মেটেনি এখনো। অনেককিছুই প্রতিশ্রুতির সুতোয় ঝুলছে। কেউ কেউ ধীরাপদর কাছে প্রস্তাব করেছে, বড়সাহেবকে বলুন না, যাবার আগে এদিকের যদি কিছু ব্যবস্থাপত্র করে যেতেন···। তানিস সর্দার পরামর্শ করতে এসেছিল, সদলবলে বড় সাহেবের কাছে এসে তারা একটু সরব আবেদন পেশ করে যাবে কি না। হাসি চেপে ধীরাপদ আশ্বাস দিয়ে নিরস্ত করেছে। বড়সাহেবের সঙ্গে তার কথা হয়েছে, ছেলের সঙ্গে আর লাবণ্যর সঙ্গে পরামর্শ করে আপাতত যতটা করা সম্ভব তিনি করতে বলেছেন।

সিতাংশু দিনের অর্ধেক প্রসাধন বিভাগের কাজ দেখে। সেখানে সে নতুন ম্যানেজার নিযুক্ত করেছে একজন। বেলা ছুটোর পর এই অফিসে আসে। লাবণ্যর ঘরে নিজের সেই পুরনো টেবিলেই বসে। বড়সাহেবের কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই আর। হুকুম-মত বিয়ে করে ছেলে যে গুণের পরিচয় দিয়েছে আপাতত সেটা সব কিছুর ঊর্ধ্বে। তাছাড়া, তাঁর অনুপস্থিতে মালিক তরফের প্রধান একজন দরকার। চেক-টেক সই করা আছে, আরো অনেক-রকমের দায়িত্ব আছে। ভাগ্নের ওপর এ দায়িত্ব দেওয়া চলে না ধীরাপদও বোঝে। নিজের কাজ-কর্ম দেখাই ছেড়েছে সে। সেখানে এখন সিনিয়র কেমিষ্ট জীবন সোম সর্বেসর্বা।

অমিতাভ ঘোষ সরাসরি মামাকেই কড়া নোটিশ দিয়েছিল, বাইরে পা বাড়াবার আগে তার গবেষণা বিভাগ চালু করে দিয়ে যেতে হবে। মোটামুটি স্কীমও একটা দিয়েছে সে, কিন্তু সেটা খুঁটিয়ে দেখার অবকাশ কারো হয়েছে বলে ধীরাপদর মনে হয় না। কাগজ-পত্রগুলো বড়সাহেব তার কাছে চালান করেছেন, বলেছেন, দেখো কিভাবে মাথা ঠাণ্ডা করবে, সতুর সঙ্গেও পরামর্শ করে দেখো।

সিতাংশু পরামর্শ কিছু করেনি, ভাল-মন্দ একটা কথাও বলেনি। কাগজ-পত্রগুলো নিজের হেপাজতে রেখে দিয়েছে। মনে মনে বেশ একটা অস্বস্তি নিয়েই দিন কাটাচ্ছিল ধীরাপদ, অনাগত দুর্যোগের ছায়া দেখছিল। অমিতাভর এই প্রেরণার সবটাই একটা সাময়িক খেয়াল বলে মনে হয়নি তার, একেবারে তুচ্ছ করার মত মনে হয়নি। সে বিজ্ঞান বোঝে না কিন্তু সত্তার তাগিদ বোঝে। এই দুর্দম দুরন্ত লোকের মধ্যেই সাধনার ক্ষেত্রে যে সমাহিত তন্ময়তা নিজের চোখে দেখেছে, তা যেন উপেক্ষার বস্তু নয়। কিন্তু এ নিয়ে ধীরাপদ ভাবনা-চিন্তার অবকাশও তেমন পায়নি; অফিসের কয়েক ঘণ্টা বাদে সর্বদাই বড়-সাহেবের প্রবাসের প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত।

ধূমকেতুর মত অমিতাভ সেদিন তার অফিস-ঘরে এসে হাজির। মারমুখি মূর্তি।

আপনি মস্ত অফিসার হয়ে বসেছেন, কেমন?

আগে হলে ধীরাপদর হাত থেকে কলম খসে যেত! এখন অতটা উতলা হয় না। মানুষটার প্রতি তার আকর্ষণ কমেনি একটুও, কিন্তু মুখোমুখি হলে সেই সঙ্গে এক-ধরণের প্রতিকূল অনুভূতিও জাগে।

বসুন। কি হয়েছে?

মামার কাছ থেকে আমার কাগজপত্র নিয়ে আপনি কোন সাহসে চেপে বসে আছেন? এ-পর্যন্ত কি অ্যাকশন নিয়েছেন তার? অমিতাভ বসেনি, সামনের চেয়ারটায় হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল, ক্রুদ্ধ প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটাতেও ঝাঁকুনি পড়ল।

অ্যাকশন নেবার মালিক আমি নই। আপনার কাগজ-পত্র সব সিতাংশুবাবুর কাছে।

মুহূর্তের জন্য থমকালো অমিতাভ, তার কাছে কে দিতে বলেছে?

আপনার মামা।

রাগে ক্ষোভে নীরব কয়েক মুহূর্ত। ডাকল, আমার সঙ্গে আসুন একটু।

পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল, অর্থাৎ লাবণ্য আর সিতাংশুর ঘরে। পিছনে ধীরাপদ। ঘরের দুই টেবিল থেকে দুজনে একসঙ্গে মুখ তুলল। অমিতাভ সোজা সিতাংশুর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

—ইনি বলছেন আমার কাগজপত্রগুলো সব তোর কাছে?

কোন কাগজ-পত্র?

রিসার্চ স্কীমের?

ও, হ্যাঁ।

সরোষে ধীরাপদর দিকে ফিরল অমিতাভ, কবে দিয়েছেন আপনি?

দিন পাঁচ ছয়—

ধীরাপদর জবাব শেষ হবার আগেই সিতাংশুর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।—ওগুলো আমার চাই এক্ষুনি।

সিতাংশুর ঠাণ্ডা উত্তর, ওগুলো এখন আমার কাছে নেই, ওপিনিয়নের জন্য এ-লাইনের দু'জন এক্সপার্টকে দেখতে দিয়েছি।

রাগে অপমানে লোকটা নির্বাক খানিকক্ষণ। চেয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে সেই চোখেই ও-ধারের টেবিলের সহকর্মিণীটিকেও বিদ্ধ করে নিল একবার। ফেটে পড়ার বদলে প্রথমে ব্যঙ্গ করল এক পশলা।—তোর একজন এক্সপার্টকে তো সামনেই দেখছি, আর একজন কে?

না, রমণী-মুখ একটুও আরক্ত হয়ে উঠল না। আরো বেশি স্থির, নির্বিকার মনে হল। সিতাংশু রূঢ় জবাব দিতে যাচ্ছিল কিছু কিন্তু তার আগেই অমিতাভ ঘোষ গর্জে উঠল, কেন আমাকে না জানিয়ে সেটা বাইরের লোকের কাছে দেওয়া হয়েছে? হোয়াই?

চেঁচিও না। এটা অফিস। তোমার জিনিস বলেই ওপিনিয়ন চেয়ে পাঠানো হয়েছে, অন্য লোকের হলে ছিঁড়ে ফেলা হত। টাকা তোমারও না আমারও না, তুমি চাইলেই লিমিটেড কোম্পানীর টাকায় রাতারাতি রিসার্চ বিল্ডিং গজাবে না।

প্রতিষ্ঠানের ভাবী প্রধানের মতই কথাগুলো বলল বটে, ধীরাপদ মনে মনে তা স্বীকার না করে পারল না। অমিতাভ ঘোষ আর দাঁড়ায়নি, ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলা কাঁপিয়ে নিচে চলে গেছে।

দিন কয়েকের মধ্যেই বাবার অফিস ঘরে সিতাংশু আলোচনার বৈঠক ডেকেছে। কিন্তু অমিতাভ সেটা মিটিং ভাবেনি, তার অপমানের আসর ভেবেছে। তার থমথমে মুখের দিকে চেয়ে ধীরাপদর সেই রকমই মনে হয়েছে। চশমার পুরু কাচের ওধারে দুই চোখ থেকে একটা শাদাটে তাপ ঠিকরে পড়েছে একে একে সকলের মুখের ওপর—বড়সাহেবের, ছোটসাহেবের, লাবণ্যর, সিনিয়র কেমিষ্ট জীবন সোমের—ধীরাপদরও।

বৈঠক দশ মিনিটও টেকেনি, তার মধ্যেই ওলট-পালট যেটুকু হবার হয়েছে। আলোচনাটা খানিকটা আনুষ্ঠানিক গাম্ভীর্যে শুরু বা সম্পন্ন করার ইচ্ছে ছিল হয়ত সিতাংশুর। অন্যথায় বাকি ক'জনকে ডাকার কারণ নেই। কিন্তু হিমাংশু বাবু সে অবকাশ দিলেন না, ভাগ্নের মুখ দেখেই তিনি বিপদ গণেছেন। ঘরোয়া আলাপের সুরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি করতে চাস না চাস এদের বুঝিয়ে বলেছিস ?

স্বভাব অনুযায়ী লোকটা ক্ষেপে উঠলেও হয়ত কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত বোধ করত ধীরাপদ। কিন্তু তার বিপরীত দেখছে, চোখের পলক পড়ে না এমনি ধীর, শান্ত।

এঁদের বোঝার দরকার নেই। তুমি কি বুঝেছ ?

বড়সাহেবের হাতের পাইপটা অনেক গোলযোগে সহায় বটে। পাইপ পরখ করলেন, একটা কাঠি বার করে খোঁচালেন একটু, তারপর দাঁতে চালান করলেন। এই ফাঁকে হাসছেন অল্প অল্প।—যে তাড়া তোর আমি আর সময় পেলাম কোথায়। আপাতত বাজে হাত দিতে চাস সেটা কত দিনের ব্যাপার ?

সেটা তোমার ছ'মাসে এক চক্কর য়ুরোপ ঘুরে আসার মত ব্যাপার নয় কিছু, ছ'দিনে হতে পারে, ছ'মাস লাগতে পারে, ছ'বছরেও কিছু না হতে পারে। তোমাকে পারমানেন্ট রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের কথা বলা হয়েছিল।

তা তো বলেছিলি।…পাইপটা এবারে ধরানো দরকার বোধ করলেন তিনি, তারপর বললেন, সে ভাবে কেঁদে বসতে গেলে টাকা তো অনেক লাগে।

যেখানে যাচ্ছ ভালো করে দেখে এসো রিসার্চে তাদের টাকা লাগছে কিনা।

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আঁচে সিতাংশু উক্তিটা সমর্থন করল যেন। বলল, ওদের কোন্ একটা কোম্পানী রিসার্চে চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ করে বছরে শুনেছি।

আশ্চর্য, এবারও অমিতাভ ঘোষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল না। কঠিন সংযমের বাঁধন টুটল না। ফিরে তাকালো শুধু, পুরু চশমার কাচ আর একটু বেশি চকচকে দেখাল। রসিকতাটা শুধু জীবন সোমই যা একটু উপভোগ করেছেন, তবে স্পষ্ট করে হাসতে সাহস করেননি তিনিও। আড়চোখে ধীরাপদ লাবণ্যর দিকে তাকালো একবার, মনে হল সেই মুখেও চাপা অস্বস্তির ছায়া।

বাবার বাক্যালাপের এই আপসের সুরটা আদৌ পছন্দ নয় সিতাংশুর। পাছে তিনি গণ্ডগোল বাধান সেই আশঙ্কায় অপ্রিয়
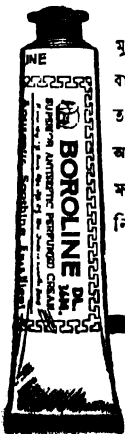
ভাবনের দায়টা সে নিজের কাঁধেই তুলে নিল। বেশ স্পষ্ট করে ঘোষণা করল, রিসার্চে কি সুফল হবে না হবে সেটা পরের কথা, আনপ্রোডাকটিভ ইনভেষ্টমেণ্টে টাকা ঢালার মত অবস্থা নয় কোম্পানীর এখন।

কথাগুলো ঘরের বাতাস শোষণ করতে থাকল খানিকক্ষণ ধরে। বড়সাহেব শব্দ না করে ডান হাতের পাটপটা বাঁ-হাতের তালুতে ঠুকলেন কয়েকবার। লাবণ্য টেবিলের কাচের ওপর তর্জনীর আঁচড় কাটতে লাগল। জীবন সোম চিবুক বুকে ঠেকিয়ে নিজের পরিচ্ছদ দেখছেন। ধীরাপদর মূক দ্রষ্টার ভূমিকা।

অমিতাভ চেয়ার ঠেলে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

এর আধ ঘণ্টা বাদে ধীরাপদ নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে বড়সাহেবকে গাড়িতে উঠতে দেখেছে, সঙ্গে ছোটসাহেবকেও। তারও ঘণ্টা খানেক বাদে লাবণ্য এলো তার ঘরে। বর্তমানে তার সঙ্গে বাক্যালাপের ধারাটা নিছক প্রয়োজনের আঁট-সূতোয় বাঁধা। সপ্তাহে ক'টা কথা হয় হাতে গোণা যায়।

লাবণ্য বসল না, ধীরাপদও বলল না বসতে। লাবণ্য বলল, ব্যাপারটা খুব ভালো হল না বোধ হয়··· একেবারে বাতিল না করে ছোট করে আরম্ভ করা যেত।

ধীরাপদ হাসতেই চেষ্টা করল, আপনার মতটা কাউকে জানাতে বলছেন?

মিঃ মিত্রকে জানাতে পারেন।

তার থেকে আপনি সিতাংশুবাবুকে বললে কাজ হতে পারে মনে হয়।

চোখে চোখ রেখে লাবণ্য সায় দিল হতে পারে। কিন্তু এরপর এক মিষ্টার মিত্র ছাড়া আর কেউ কিছু করলেও কাজ হবে না।

অর্থাৎ, অমিতাভ ঘোষের মাথা ঠাণ্ডা হবে না। লাবণ্য আসার আগের মুহূর্তেও এই একজনের জন্য ধীরাপদরও দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। কিন্তু সেই দুশ্চিন্তার সঙ্গিনী লাভ করে তুষ্ট হওয়া দূরে থাক, উল্টে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। একটু থেমে বক্র-গাম্ভীর্যে জিজ্ঞাসা করল, কোম্পানীর ছোটখাট রিসার্চ ইউনিট একটা দরকার ভাবছেন না ব্যক্তিগতভাবে অমিতবাবুর দিকটা চিন্তা করে বলছেন?

ডাক্তার হিসেবে তাঁর দিকটা চিন্তা করেই বলছি।

আবির্ভাবের থেকেও প্রস্থানের গতি আরো মন্থর। ধীরাপদ ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। কার্জন পার্কের লোহার বেঞ্চির ধীরাপদ চক্রবর্তী এতখানি ভাগ্যের প্রসন্নতা সত্ত্বেও আজ নিজের নিভৃতে যতখানি দেউলে, তার সবটার মূলে এই একজন। তাই তার এ-দেখাটা সহজও নয়, সুস্থও নয়।

তবু সুযোগ মত বড়সাহেবের কাছে প্রস্তাবটা উত্থাপন করবে ভেবেছিল। কিন্তু যাবার আগে হিমাংশুবাবু ভাগ্নের মাথা ঠাণ্ডা রাখার যে নিশ্চিন্ত হদিস দিয়ে গেলেন, শুনে ধীরাপদর মুখে কথা সরে নি। হদিস দেওয়া নয়, পরোক্ষে তিনি তাকে নিগূঢ় দায়িত্ব দিয়ে গেলেন একটা।

—তোমার দিদিকে বুঝিয়ে বোলো। সব-দিক ভেবে চিন্তে দেখতে বলে তাঁর মত করাও। এই কাজটা করো দেখি—ডু ইট। তা বলে তাড়াহুড়ো করে গোল বাঁধিয়ে বোসো না। রাদার টেক ইউওর টাইম অ্যাণ্ড গো স্লো। তিনি রাজি হলে আমাকে জানিও, একটা টেলিগ্রাম করে দিও না-হয়, সম্ভব হলে কিছু আগেই চলে আসতে চেষ্টা করব।

ভা'গ্নর জন্যে আর একটুও উতলা নন তিনি। ছেলের বিয়েটা দিয়ে ফেলতে পেরেই তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত। দু'দিন আগে হোক দু'দিন পরে হোক, ভাগ্নে শেকল পরবে। লাবণ্য সেই শেকল, তাঁর মনের মত জোরালো শেকল। বাধা এখন চারুদি। বাধাটা হিমাংশুবাবুর কাছে অন্ততঃ উপেক্ষা করার মত তুচ্ছ নয়।

তুচ্ছ না হলেও দুরতিক্রমণীয় ভাবছেন না। তার ওপর ধীরাপদ আছে যোগ্য চক্রী। [ক্রমশঃ।

আরোগ্য

বুদ্ধদেব গুহ

ভীত বলে নয়। আমি স্পষ্ট করে বলি অবশেষে:
ভাখো আজ এ জীবন ছিন্নবিদ্ধ যাতনার ক্রুশে।।
যদিও তোমার চোখে সম্রাট আমি, সত্যগুণ অপূর্ব পবিত্রতায়;
আততায়ী দস্যুর হাতে এক লুণ্ঠিত তবু বারবার;
প্রবৃত্তির বাহুপাশে পিষ্ট হই আচম্বিত ঘোরে
পাওনায় কড়ি দেখি চুরি হয়ে গেছে অগোচরে।
আমাতে বিশ্বাস তাই হৃদয়ের তটে রামধনু
বিচিত্র রঙে রসে ভঙ্গুমন বৃথ নতজানু,
শাখা হ'তে পেড়ে ফুল গাঁথি মালা কবরী সাজাই
যা-কিছু সঙ্গীত আনে আনন্দের বাঁশীতে বাজাই।

মাটির পুতুল তবু যতবার গড়ি কেন ভেঙে ভেঙে হয় চুরমার
(পা ছুঁয়ে ভাখো ভাখো—যেন এক জলন্ত অঙ্গার!)
আচ্ছন্ন, জ্বরের ঘোর; নিবে গেল আকাশ গোধূলি
জল্লাদ রাত্রি এলো ফের, আপাদমস্তক তার খালি
জমাট রক্তের ছাপ।
এখন কি ভালো লাগে—বলো—বিশ্রব্ধ হাস্য আলাপ?
কম্পিত ভুবনে তাই বিকশিত সুন্দর ছিল কলাপের মতো
মমতার বক্ষে তুলে বুকে করুণায় স্তনপুষ্ট হোতো
লুপ্তপ্রাণ সবকিছু আজ দেখি—সমাধিস্থ শব;
দীপ জেলে প্রার্থনায়—বলো তুমি—রোগমুক্ত হওয়া কি সম্ভব

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পরিমল গোস্বামী

৯

শিশিরকুমার ভাদুড়ির সীতার কথা বলেছি—তাঁর অভিনয় সম্পর্কে অতিরিক্ত বলা বৃথা। এ যুগের যাঁরা তাঁর প্রথম যুগের অভিনয় দেখেননি, তাঁর প্রয়োগকুশলতা দেখেননি, তাঁদের কাছে শুধু বর্ণনায় তার সামগ্রিক সৌন্দর্যের কিছুই বোঝানো যাবে না। তাঁর শেষ বয়সে অথবা অভিনয়-জীবনের শেষ পর্যায়ে সীতার অভিনয় অনেকবার হয়েছে শুনেছি, কিন্তু আমি দেখিনি। ইচ্ছে করেই দেখিনি। তবে তাঁর ৩৫ বছরের অভিনয়-প্রসিদ্ধ আলমগীরে (এবং রঘুবীরে) পূর্ব অভিনয়ের সমস্ত সৌন্দর্যই তিনি বজায় রাখতে পেরেছিলেন। তখতে-তাউসে জাহান্দার খাঁর ভূমিকাতেও তাঁর প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু অনুজ্জ্বল পরিবেশে সামগ্রিক প্রকাশ রূপটি নিষ্প্রভ বোধ হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলমগীরের ভূমিকা শেষ পর্যন্ত বার বার দেখবার মতো ছিল।

অভিনয়ে গুরুগিরি করবার ক্ষমতা তাঁর অক্ষুণ্ণ ছিল, এবং উৎসাহ ছিল অদম্য। এ সব তাঁর অভিনয় শিক্ষা দেবার আসরে ব'সে ব'সে প্রত্যক্ষ করেছি।

বন্ধু বিনয়কৃষ্ণ দত্তর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। (বিনয়কৃষ্ণের কথা স্মৃতিচিত্রণে অনেকখানি বলা হয়েছে) বিনয় সমস্ত জীবনটাই পরার্থে উৎসর্গ করেছে। বিরাট লাইব্রেরির মাঝখানে নিষ্ঠাবান পাঠকরূপে তার সাধনা। এই হল ইনডোরের পরিচয়। আউটডোরে বিনয় হাজার হাজার টাকা এবং লাইব্রেরির শত শত বই অন্যকে বিলিয়েছে। অন্যের ব্যবসায়ের প্ল্যান ফ্রী, এবং নিজের সামর্থ্য এবং টাকা ফ্রী। এখন সম্পদের প্রায় শেষ প্রান্তে উপস্থিত।

এমনি অবস্থায় শিশিরকুমারের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটল। এবং তখনও বাজারে তার এমন ক্রেডিট যে শুভকাজে অগ্রণী আদর্শবাদী ধনী বন্ধুরা বিনয়ের কথায় শিশিরকুমারের প্ল্যান সাফল্যে টাকা দিতে রাজি। টাকা তোলবার সফল পরিকল্পনাও বিনয়ের অনেক ছিল, এবং শিশিরকুমারের তা মনে ধরেছিল।

শিক্ষিত অভিনয়-উৎসাহী যুবক-যুবতীদের একত্র করা হ'ল। ঠিক হল 'তপতী' নাটক মঞ্চস্থ করা হবে তাদের সহযোগিতায়। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে রিহার্সালের আয়োজন হয়েছিল। আমি সময় পেলেই সেই আসরে উপস্থিত হয়েছি এবং নবাগতদের শেখানোর কৌশল দেখেছি। তাঁদের ভুল উচ্চারণে বিরক্ত না হওয়া, এবং ঠিক কোন জিনিসটি হ'লে তাঁর মনের মতো হবে তা বার বার অক্লান্ত পরিশ্রমে বুঝিয়ে দেবার অনন্যসাধারণ আগ্রহ এবং ধৈর্য দেখে অবাক হয়েছি। যে বয়সে সাধারণতঃ লোকে অল্প পরিশ্রমে কাতর হয়, সেই বয়সে এ রকম শ্রমনিষ্ঠা দুর্লভ ব'লে মনে হয়েছে।

শিশিরকুমার আমার শিক্ষক ছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজে। তারপর বহুকাল পরে তিনি যখন স্বাস্থ্যের খাতিরে উত্তেজক পানীয় ব্যবহার পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন, যখন কৃত্রিম উত্তেজনায় আর প্রয়োজন নেই, তখনই তিনি গভীর পড়াশোনার মধ্যে এবং বন্ধু সন্ধান ক'রে তাদের সাহচর্যের মধ্যে ডুবে থাকতে আরম্ভ করলেন। এমনি অবস্থায় আমার সঙ্গে পুনঃ পরিচয় হ'ল, এবং আমি তখনই তাঁর বন্ধুর পদে প্রতিষ্ঠিত হলাম। সেটি ১৯৫১ সাল। তার পূর্বে ছ সাত বছর তিনি উত্তেজক কিছু স্পর্শ করেননি। একদিন আমার ব্যবহারের একটি টনিক দেখে কৌতূহল বশতঃ জিজ্ঞাসা করলেন, "ওর নাম তো দেখছি এ সৃ কে বি। তার মানে শিশির কুমার ভাদুড়ি। ওতে কি আছে?" ভাইটামিন ইত্যাদির সঙ্গে শতকরা পাঁচ অ্যালকোহল আছে শুনেই চমকে উঠলেন। বললেন, "এক পারসেণ্ট থাকলেও আমার চলবে না।"

আমার মনে হয় অত্যধিক সুরা পানে তাঁর দেহে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যাতে দেহটি সম্পূর্ণ অ্যালকোহল বিরোধী হয়ে পড়েছিল। শুনেছি তাঁর সুরাপান মাত্রা ছাড়িয়েছিল এক কালে। এবং তাতে তাঁর ক্ষতিও হয়েছে অনেক। শরৎচন্দ্র পণ্ডিত সে সময় কোনো বন্ধুর মুখে শিশির ভাদুড়ি নাম উচ্চারণ শুনে হেসে বলেছিলেন, নাম তো শিশির ভাদুড়ি নয়, বোতলের ভাদুড়ি। 'শিশি-'র অর্থে শিশির উচ্চারণ করেছিলেন।

অতএব আমার সঙ্গে যখন নতুন পরিচয় হ'ল তখন তাঁকে আবার সেই অধ্যাপক রূপেই দেখলাম, শুধু বয়সে চেহারার সামান্য পার্থক্য চোখে পড়ল। সম্ভবতঃ মাঝখানে তাঁর অনেক অভিনয় দেখেছি বলেই চেহারার বড় পরিবর্তনটা আমার চোখে পড়েনি। অধ্যাপক রূপে তাঁর সুমার্জিত ব্যবহার, পোষাক, বাচনভঙ্গি এবং উচ্চারণ আমার মনে স্থায়ী চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। তিনি তখন অনেকটা দূরে ছিলেন, তাঁর সান্নিধ্য অত্যন্ত লোভনীয় মনে হত। তার পর

থিয়েটারে আত্মপ্রকাশের পর তিনি সম্পূর্ণ দূরে স'রে গিয়েছিলেন। সে সময়ে যদিও কদাচিৎ তাঁর সঙ্গে দু'একটা কথা হয়েছে, কিন্তু তা এমনই হঠাৎ এবং পরিকল্পনা-বর্জিত যে, তাকে কোনো মতেই আলাপ বলা চলে না। তারপর কলেজের ঘর থেকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পার হয়ে তিনি এলেন আমার ছোট্ট ঘরখানিতে। এবং এসেই ঘনিষ্ঠ ভাবে, অন্তরঙ্গ ভাবে, এবং আত্মীয় ভাবে মিশলেন। সে সব কথা আমি দৈনিক বসুমতীর পূজা সংখ্যায় দুবার লিখেছি বিস্তারিত ক'রে।

তাঁর সহৃদয়তা আন্তরিক ছিল, কারণ এদিকে তাঁর হৃদয় ছিল অত্যন্ত প্রকাণ্ড। আর একটি বিষয় আমি স্পষ্ট দেখেছি তাঁর চরিত্রে ? সে হচ্ছে তাঁর ভ্রাতৃপ্রেম। তিনি এদিক দিয়ে রামের ভূমিকা শুধু মঞ্চেই অভিনয় করেননি, জীবনেও সে আদর্শ অনুসরণ করেছেন। যেখানে তাঁর যত আত্মীয়, সেখানেই ছিল তাঁর নাড়ির টান। তাঁর নিজের জীবনে সীতা-হারার দুঃখও বিঁধে ছিল।

"বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না" ও ভূত

এই নামে একটি ধারাবাহিক লেখা আহ্বান করেছিলাম ১৯৫২ সালে যুগান্তর সাময়িকীতে। কথাটির আসল অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা সহজে চলে না, বা হঠাৎ মনে হয় কোনো ব্যাখ্যা নেই, বা আমাদের বুদ্ধির অতীত কোনো ব্যাখ্যা থাকলেও থাকতে পারে। অলৌকিক কোনো পৃথক বস্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আছে এমন বিশ্বাস আমার নেই। প্রকৃতি মানেই বিশ্বপ্রকৃতি, অনন্ত শূন্যে যা কিছু দৃশ্য বা অদৃশ্য যা কিছু আমাদের ধারণার মধ্যে অথবা বাইরে, সবই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের বিশ্ব মহাবিশ্বের অন্তর্ভুক্ত একটি ছোট্ট বিশ্বমাত্র। মহাশূন্যের সমুদ্রে ভাসমান একটি দ্বীপ। আমাদের এই ছোট্ট বিশ্বদ্বীপে মাত্র ১৫ হাজার কোটি সূর্য আছেন। যে সূর্য আমাদের পালন করবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি সেই ১৫ হাজার কোটির মধ্যে অত্যন্ত নিরীহ আকারের একটি সূর্য। (তাঁকে ঘিরে যে সব গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরছে, তারই একটি হচ্ছে পৃথিবী।)

১৫ হাজার কোটি সূর্য সমন্বিত আমাদের এই বিশ্বের বাইরে আরও যে কত বিশ্ব আছে তার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। অগণিত আছে। রেডিও টেলিস্কোপে তাদের অস্তিত্ব মাঝে মাঝে ধরা পড়ছে। তাদের কোনো দূরবীক্ষণ যন্ত্রেই দেখা যায় না। শুধু রেডিও টেলিস্কোপে যেটুকু সাড়া পাওয়া যায়। এক বিশ্বের সঙ্গে আর এক বিশ্বের সংঘর্ষ চলছে এমন খবরও পাওয়া গেছে ঐ রেডিও টেলিস্কোপে।

আমাদের ধারণার বাইরে এ সব। কিন্তু তাই ব'লে এ সব ঘটনা অতিপ্রাকৃত নয়, সবই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত, প্রকৃতির বাইরে কিছুই নেই, অতিপ্রাকৃত কিছুই নেই। আমরা নিজেদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে প্রকৃতির যে সামান্য অংশ জানি, তার বাইরের ঘটনা আমরা জানি না বলেই তা প্রকৃতির বাইরের ঘটনা নয়, তা শুধু আমাদের জ্ঞানের বাইরে মাত্র। অতএব অলৌকিক কথাটার অর্থ সব সময়েই আপেক্ষিক ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ অলৌকিক তাকেই হয় তো বলা যায়, যা লৌকিক বুদ্ধিতে ধরা যায় না। প্রকৃতপক্ষে তা মিরাকল নয়।

প্রকৃতিতে মিরাকল বা অলৌকিক যদি কিছু থাকে তবে সেই অলৌকিকত্ব প্রত্যেকটি দৃশ্য বা অদৃশ্য বস্তুর মধ্যে প্রকাশিত প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু এবং অতিপরমাণুর মধ্যে প্রকাশিত। সে হিসেবে বিশ্বজগৎটাই একটা মিরাকল।

সমস্ত বিশ্বজগতের দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বস্তুর মূলে পরমাণু। এই পরমাণুর নিজস্ব একটি গঠন আছে। অর্থাৎ একটি কেন্দ্র আছে এবং তার চারদিকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন নামক নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণিকা ঘুরছে। কেন্দ্রটি যদি একটি মটরের মতো বড় হত, তাহলে সমস্ত পরমাণুটির আকার হত একটি ঘরের মতো। একটিমাত্র পরমাণুকে বাড়িয়ে দেখলে এমনি বড় দেখাত। অথচ একটি পিনের মাথায় এই পরমাণু যে কত কোটি আছে তার হিসাব করা দুঃসাধ্য।

এই পরমাণু আমার জৈব দেহ গঠন করেছে। এই পরমাণুর বিশেষ সংযোগে আমার চেতনা এবং মননশক্তি সৃষ্টি হয়েছে। অজৈব বস্তু জৈব বস্তু সৃষ্টি করেছে। এ কি কম অলৌকিক ?

এ যদি হৃদয়ঙ্গম করা যায় তা হলে সংসারে একমাত্র ভূত সুপারন্যাচারল হবে কেন ? অলৌকিক হবে কেন ? তা ভিন্ন ভূত বা প্রেতদেহ দেখাটা সত্য দেখা কি না তা নিয়ে মতভেদ আছে। মনের রহস্য আজও আমাদের অজ্ঞাত। সে চেতনার বাইরে কিছু দেখে কি না তার বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ কিছু আছে কি না তাও জানি না। তবে আমি নিজে কখনও ভূত দেখিনি, দেখবার আশাও করি না। যে জাতীয় ভয়ে ভূত দেখা যায়, সে জাতীয় ভয় আমার মনে নেই।

কিন্তু একটি ব্যাপার দেখে বিস্মিত হয়েছি যে, বাংলা দেশে হাজার-হাজার লোক ভূত দেখেছে, এবং প্রতিদিন দেখছে। অন্য দেশের লোক কখনও এত ভূত দেখে না। তাই প্রত্যক্ষদর্শীদের লেখার চাপে ঘরে স্থানাভাব ঘটতে লাগল।

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, এই ফীচারটির উদ্দেশ্য ছিল জীবনের বহু দুর্বোধ্য ঘটনার বিস্ময় জাত সুপাঠ্য লেখা পরিবেশন করা। কিন্তু প্রায় সব লেখাই ভূত সম্পর্কে আসতে লাগল, এবং তাতে বোঝা গেল বাঙালী ভূতের মধ্যে অভিনবত্ব বা দুর্বোধ্যতার চমক আর নেই, বাঙালী ভূত বাঙালীদের নিত্য সহচর, অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। সাধারণতঃ মানুষ দেখে আমাদের বিস্ময় জাগে না, যদিও মানুষের কথা ভাবতে গেলে এর চেয়ে বড় বিস্ময় সংসারে আর কি আছে! কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ চমক লাগার আঘাত নেই বলেই আমরা তা ভুলে থাকি। আমি একটি মানুষ দেখেছি বললে কেউ আর চমকে ওঠে না। ভূতের বেলাতেও তাই। সবাই যদি এত ভূত দেখে, তা হলে চমকাবার কি আছে।

এই কথাটা বোঝাবার জন্য ভূতদর্শীদের কাছে সোজা আবেদন না ক'রে একটি গল্প লিখে সেই গল্পের ভিতর কৌশলে আমার সমস্ত বক্তব্যই প্রকাশ করলাম। গল্পটির নাম অধর সরকার। সে একটি ভূত দেখার গল্প পাঠিয়ে জানতে এসেছে সেটি ছাপা হবে কি না! বললাম, ছাপা হবে না, এবং কেন হবে না বুঝিয়ে দিলাম। সে অনেক কথা। গল্পের শেষে আমি একটুখানি অন্যদিকে দৃষ্টি এবং মন ফিরিয়েছিলাম, ইতিমধ্যে দেখি অধর সরকার নেই।

এরকম ঘটনায় বিস্ময়ের কিছুই থাকতে পারে না, কারণ প্রতিদিনই প্রায় দেখছি কোনো বন্ধু বা কোনো নবাগত আলাপ করতে করতে কখন হঠাৎ উঠে গেছে খেয়াল থাকে না, কিন্তু যে

হেতু তার চলে যাওয়া আমি লক্ষ্য করিনি; সেই হেতু সে ভূত এমন কখনও মনে করি না। আমার অধর সরকারও তেমনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছিল, এবং একটি জীবন্ত মানুষ আমার অন্যমনস্কতার মুহূর্তে আমার সামনে থেকে উঠে গেলে যেমন হওয়া উচিত, অধর সরকারের উঠে যাওয়াকেও তেমনি ফিজিক্যাল বা ভৌতিক অন্তর্ধানের সীমানাতেই রেখেছিলাম, কোনো আত্মিক অন্তর্ধানের কোঠায় ফেলিনি। তবে এমন ভাবে লিখেছিলাম যাতে ভূতবিশ্বাসীদের মনে হতে পারে অধর সরকার একটি ভূত।

উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল কারণ অনেক চিঠি এসেছিল অনেকেই আতঙ্কিত, শেষে কি না যুগান্তর সাময়িকী বিভাগেই একটা জ্যান্ত ভূত এলো? এ বড়ই আশ্চর্য।

এ সব চিঠি পড়ে সরল বিশ্বাসী পাঠকদের ভুল ভাঙার জন্য সোজা তাঁদের চিঠির উত্তর না দিয়ে আরও একটি গল্প লিখে তার ভিতর কৌশলে প্রকাশ করলাম ওটা বানানো গল্প এবং অধর সরকার বিশুদ্ধ দেহের অধর সরকার। ইউরোপীয় তিনজন জনপ্রিয় ডিটেকটিভ দলের ডিটেকটিভ এসে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সন্ধান চালালেন এবং তাদেরই একজন সে কথা জানিয়ে গেলেন। বললেন, গল্পটা উদ্দেশ্যমূলক। অর্থাৎ আমার বক্তব্য নিজে না বলে ডিটেকটিভকে দিয়ে বলানো হ'ল।

কিন্তু ফল হল উলটো। এ কাহিনীকেও পাঠকেরা সত্য ঘটনা ব'লে বিশ্বাস করলেন। আমার এই গল্পে এক ডিটেকটিভ এক জায়গায় বলেছেন, ভূত গল্প লিখতে জানে না, আর জানলেও অনুরোধ করতে আসবে কেন, সম্পাদকের ঘাড়ে চেপে জোর ক'রে ছাপিয়ে নিতে পারত।

কিন্তু এর ফলে এক মজার ঘটনা ঘটল। একজন মহিলা আমার উপর কিছু ক্রুদ্ধা হলেন। তিনি লিখলেন আপনি ভুল লিখেছেন, ভূত সব পারে, আমি বহুকাল ভূত নিয়ে গবেষণা করছি, আমি প্রমাণ দেখাতে পারি।

এই চিঠিখানায় বিশেষ কৌতুক অনুভব ক'রে আমি ছেপে দিলাম। ছাপায় অনেক ঝুঁকি ছিল। কেন না এ চিঠি পড়লে বাংলাদেশের প্রায় সবাই পত্র লেখিকার ঠিকানা চেয়ে চিঠি দেবেন, এবং প্রত্যেককে ঠিকানা সরবরাহ করতে ২৪ ঘণ্টা কাটবে। অনেক চিন্তা ক'রে চিঠিখানা ঠিকানাসুদ্ধ ছেপে দিলাম। (কোনো পত্র লেখিকারই ঠিকানা আমরা ছাপি না, বিশেষ নির্দেশ ভিন্ন। পত্রলেখিকারা এতে অনেক সময় মনে করেন ঠিকানা দিতেই হয় না। এটি ভুল ধারণা। ঠিকানা চিঠিতে না থাকলে সে চিঠি ছাপা হয় না, কিন্তু চিঠি ছাপবার সময় আমরাই ঠিকানাটি বাদ দিয়ে ছাপি।)

কিন্তু এই ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করতে হল। কেন, তা আগেই বলেছি। তা ভিন্ন পত্রলেখিকা খুব জোরের সঙ্গে লিখেছিলেন, 'ভূত সব পারে' তা তিনি প্রমাণ করিয়ে দিতে পারেন, তাই মনে হ'ল এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকে পাঠকদের বঞ্চিত ক'রে লাভ কি? অবশ্য আমি নিজে ভূতের ক্ষমতা কতটা আছে বা না আছে তার প্রমাণ দেখতে আদৌ উৎসুক হইনি, কারণ আমিও জানি ভূত সব পারে।

ঠিকানাসুদ্ধ চিঠি ছাপা হল, তাই আমাদের কাছে এ বিষয়ে পাঠকদের কোনো চিঠিই এলো না, এবং তাতে বেশ আরাম বোধ করলাম। তারপর এ ব্যাপারটি আর মনে ছিল না। এমন সময় দিন সাতেক পরে একটি ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে প্রবেশ করল আমাদের বিভাগে, তার হাতে একখানা খোলা চিঠি, পেন্সিলে লেখা লিখেছেন ঐ পত্রলেখিকা। পড়ে দেখি ভীষণ ব্যাপার। মহিলা লিখছেন, আমার ঠিকানাসমেত চিঠি ছেপে আমার সর্বনাশ করেছেন। আমার বাড়িতে শত শত লোক এসে পড়ছে, আমাকে বাঁচান।

কিন্তু কি ক'রে যে বাঁচাব ভেবে পেলাম না। কারণ ঐ পত্রবাহক ছেলেটির কাছে শুনলাম মহিলার স্বামী সব কাজ ছেড়ে লাঠি নিয়ে দরজায় বসে লোক তাড়াচ্ছেন।

আমি ভেবে পেলাম না কেন এত লোকের ভূত দেখার কৌতূহল। আমার ধারণা এক মাত্র আমি ভিন্ন বাংলাদেশের আর সবাই ভূত দেখেছেন। কারণ তখনই ভূতদর্শীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনা সম্বলিত রচনায় সাময়িকী বিভাগ প্রায় ভরে উঠেছিল।

তবে উক্ত মহিলার দুর্ভোগের কথায় খুবই বেদনা অনুভব করেছিলাম। তিনি তাঁর চিঠিতে যে সরলতার প্রকাশ করেছিলেন ততখানি না করলেই ভাল করতেন। এবং যিনি ভূত নিয়ে গবেষণা করছেন এবং ইচ্ছে করলে অন্যকে ভূত দেখাতে পারেন ব'লে মনে করেন, তাঁর উচিত এ ইচ্ছাকে দমন করা। নিজের পরিচিত বা বশমানা ভূত অন্যকে দেখিয়ে তবে তার ভূতে বিশ্বাস জন্মাতে হবে, এ ইচ্ছায় বিপদ আছে। যদি কেউ বিশ্বাস না করে, তবে সে তার নাস্তিকতা নিয়ে সুখে থাক না? তাঁকে ভূতের অস্তিত্ব-বিশ্বাসে দীক্ষা দিয়ে এমন কি লাভ হবে?

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার এই যে, ভূতকে অপমান করলে বা ভূতের মানহানিকর কিছু বললে তা নিজের অপমান ব'লে না মানাই ভাল। ভূতের অপমান নিজের গায়ে মাখতে নেই। অনেক ভূত অবশ্য নিরীহ আছে, তারা মানুষকে দেখে ভয় পায়, এবং কদাচিৎ মানুষের সামনে আসে। তাদের অসহায়ত্ব স্মরণ ক'রে ভূত না মানা লোকদেরও কিছু সংযত হওয়া উচিত। তাদের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করা উচিত নয়। কিন্তু যে সব ভূত হিংস্র এবং আত্মরক্ষায় পটু তাদের বিরুদ্ধে যে-কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

ভূত সম্পর্কে আমার নিজস্ব কোনো মত নেই, কারণ আমি ভূত দেখিনি। আমি মনে করি প্রত্যেকেরই একটি ক'রে ব্যক্তিগত ভূত থাকা উচিত। তা হলে অন্য ভূত দেখার ইচ্ছা কমতে পারে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভূতে দারুণ বিশ্বাসী ছিলেন। ভূত-জগতের সমস্ত ভূগোল তাঁর মুখস্থ ছিল। এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আগে মারা গেলে তিনি আমাকে দেখা দেবেন। শুনেছি এ প্রতিশ্রুতি তিনি আরও অনেককে দিয়েছিলেন, কিন্তু কারো কাছেই তিনি উপস্থিত হননি। আমার সেজন্য মনে হয় যারা প্রতিশ্রুতি দেয় না, একমাত্র তারাই ছায়া মূর্তিতে দেখা দিতে পারে।

ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিত্ব মৃত্যুর পরে পৃথক ভাবে থাকতে পারে কি না সে প্রশ্ন এখানে তোলাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে। এ সম্পর্কে আমার মূল বক্তব্য আমি ১৯৫৩ সালে মাসিক বসুমতীতে "জাগিল কি ঘুমাল সে" এই নামে লিখেছিলাম (পরে 'ম্যাজিক লণ্ঠনে' সংকলিত)।

পুনরায় "বিশ্বাস করুন আর নাই করুন" পর্যায় আরম্ভ ক'রে আরও বিপন্ন বোধ করছি। এবারে ভূতদর্শীর সংখ্যা সকল অনুমান

য়ে গেছে। স্কুলের ছেলেমেয়ে থেকে আরম্ভ ক'রে যে-কোনো ব্যক্তির নিজস্ব ভূত দেখার অভিজ্ঞতায় ঘর ভরে উঠছে মার।

১৯৫৩ সালে প্রথম উদ্বোধন গল্প লিখেছিল অনুজোপম বন্ধু রায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পর পর দুটো। দুটোই বানানো বা শোনা , কিন্তু তার নিজের অনবদ্য লিখনশিল্পের স্পর্শে তা খুবই জের হয়ে উঠেছিল। দুটো গল্পই সে লিখেছিল ছদ্মনামে। এই ছদ্মনাম' শব্দটির এখানে ব্যাখ্যা দরকার। বলা উচিত ছদ্মনামের দ্মনাম। কারণ এই প্রিয় কথাশিল্পীর "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়" নামটিই তো একটা ছদ্মনাম। অনেকের হয় তো এটা জানা নেই। কিন্তু এটাকে এতদিনের ব্যবহারের পর ছদ্মনাম বললে কেউ মানবেন কি না সন্দেহ।

আমি আগেই বলেছি মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি দৃশ্য বা অদৃশ্য বস্তুই এক একটি মিরাকল বা ব্যাখ্যার অতীত জিনিস। কিন্তু তাদের চলাফেরা বা ব্যবহারের ভিতর এমন একটা শৃঙ্খলা আছে বা আছে বলে আমাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ ধারণা জন্মে গেছে যে তাদের মধ্যে অলৌকিক কিছুই দেখি না। সবই অলৌকিক, তাই কোনোটাকেই পৃথকভাবে অলৌকিক মনে হয় না। এরই মধ্যে আমাদের জানা নিয়ম শৃঙ্খলার বাইরে হঠাৎ কোনো কিছু দেখলে তাকেই মনে হয় অলৌকিক। সে জন্য এককালে ধূমকেতুকেও অলৌকিক বলা হয়েছে।

ধরা যাক কোনো ব্যক্তির মারাত্মক কোনো অসুখ হয়েছে। কোনো চিকিৎসাতেই সারছে না। এমন সময় হঠাৎ কোনো বাইরের দৈব চিকিৎসক মন্ত্র পড়া জল খাওয়ালেন এবং রোগী ক্রমে ভাল হতে লাগল।

এর ব্যাখ্যা কি? হঠাৎ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

অথচ এর ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু তখন-তখনই ব্যাখ্যাটি যে পাওয়া গেল না, তার মধ্যে নিশ্চয়ই বিস্ময় আছে। এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না বলেই এতে বিস্ময় আছে। এর মধ্যে আপাত দুর্বোধ্যতার ধাক্কা আছে। যুক্তিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না— পর্যায়ের উদ্দেশ্যই ছিল জীবনের নানা বিভাগের এই জাতীয় সব ঘটনা প্রকাশ করা, এবং তা রিপোর্টিং মাত্র নয়। রচনাগুলি সামান্য সাহিত্যধর্মী হবে এমনি আশা করা হয়েছিল। কিন্তু বলা বাহুল্য এই পর্যায়ে পাইকেরি হিসাবে ভূত প্রবেশ ক'রে সব ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল। 'বিশ্বাস করুন আর নাই করুন' এই নব-পর্যায়েও দলে দলে ভূত ঢুকে পড়েছে। [ক্রমশঃ।

অয়ডেনের একটি কবিতা অবলম্বনে

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার আছে কী—
শুধু একটুখানি কণ্ঠের স্বর
একটুকরো প্রতিবাদের ভাষা
আশা ছিলো, তাই দিয়ে মিথ্যার ভাঁজগুলো
দলে দলে খুলে দেবো,
যে অনৃত আছে রোমাঞ্চিত চেতনায়
যে অসত্য আছে চিন্তার চিতাতে
যা ধরা পড়ে রাস্তায় ঘুরে পড়া
কামনাতাড়িত ঐ মানুষগুলোর ব্যথাতে
প্রভুত্ব মদগর্বিত অহংকৃতের সুরত সভাতে
যাদের বিশতলা বাড়ীগুলো থেকে থেকে হেসে ওঠে
আকাশের চুম্বনকে হরণ করবার বৃথা প্রয়াসে;
রাষ্ট্র বলে অদ্ভুত জিনিষ কিছু নেই
সংহতি সমাজ সমষ্টি, সে তো তোমাতে আমাতে
একা একা কেউ বাঁচে না, বাঁচতে পারে না
ক্ষিধের একমাত্র উত্তর হচ্ছে খেতে পাওয়া
সেখানে কোন তফাৎ নেই
নাগরিকে আর পুলিশে
আমাদের ভালোবাসতেই হবে
যদি না পারি, তবে মৃত্যু।

সকলের বন্ধু কবি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

"ধূলির ধূলি আমি এসেছি ধূলি পরে
জেনেছি ভাই বলে জগৎ চরাচরে।"— রবীন্দ্রনাথ।

যুগে যুগে যুগন্ধর এসেছেন বহু পৃথিবীতে
বিশিষ্ট আসন নিয়া বসেছেন উচ্চ মঞ্চোপরি
তাঁদের দেখিতে হয় দূর হতে গ্রীবা উচ্চ করি
নিকটে আসিতে, হবে আসিবার অনুমতি নিতে।

আসিলেন মহাকবি বসিলেন ধরার ধূলিতে
মহত্তের সিংহাসন ত্যাগ করি ভেদ পরিহরি
পতিত বঞ্চিত যত পরিত্যক্তে সমাদর করি
খেলিতে শিশুর সাথে দুঃখিতের অশ্রু মুছাইতে।

জিঘাংসা হিংসায় ধরা নিত্য হয় দস্তুর নিষ্ঠুর
লোভে লালসায় তার রসনায় সদা লালা ঝরে
কুটিল জটিল পন্থী মাকড়শার মত অতি ক্রূর
পরশ্রী কাতর দ্বন্দ্বে প্রতিদ্বন্দ্বী হয় পরস্পরে।

সকলের বন্ধু কবি করুণায় সমুদ্র গভীর
পীড়িত পৃথ্বীর আশা, মুখে শান্ত হাসিখানি স্থির।

বিপ্লবের সন্ধানে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সশস্ত্র বিপ্লবের সাহায্যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উচ্ছেদ করতে না পারলে যে পরাধীন জাতি স্বাধীন হতে পারে না,—দুনিয়ার ইতিহাসের এই চিরন্তন সত্য অনুসরণ করেই ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলন, গুপ্ত সমিতি, ষড়যন্ত্র প্রচেষ্টা ভারতে বৃটিশ শাসনের ইতিহাসের একটা বিশিষ্ট গৌরবময় অধ্যায়। সে প্রচেষ্টার শেষ প্রতিভূ সুভাষ বসুর বৈপ্লবিক তত্ত্বাদর্শের সঙ্গে কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংঘর্ষের মূলকথাই ছিল, ইংরেজের সঙ্গে আপোষ বন্দোবস্ত করে ভারত স্বাধীন হতে পারে না। সুভাষ বাবু তাঁর সমগ্র শক্তি দিয়ে ভারতবাসীকে এই কথাটা বোঝাবার এবং মানাবার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিপ্লব প্রচারের মধ্যে এই কথাটাই ছিল সর্বপ্রধান।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পড়েছিলেন একা। ভারতের মার্কামারা বিপ্লবীদলগুলো বিপ্লবের পথ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে গান্ধীবাদের বৈপ্লবিক ভূমিকা হৃদয়ঙ্গম করার ছল করে কংগ্রেসের আপোষ পন্থার চোরাগলিতে আশ্রয় নিয়েছিল! সুভাষ বাবুর সাংগঠনিক দুর্বলতার মূল এইখানে। তার সঙ্গে মিলেছিল তাঁর কোটি কোটি ভক্তের জয়ধ্বনির অন্তরালে লুকানো চরম বিশ্বাসঘাতকতা। গান্ধী-কংগ্রেস তাদের অবহেলে দিশাহারা করে স্বাধীনতার ঢাক পিটিয়েই নিজেদের পিছনে জড়ো করতে পেরেছিল। ফলে বিপ্লবের শেষ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল!

কংগ্রেস নেতারা তখন সুর ধরেছিলেন, Only Congress can deliver the goods. তার প্রকৃত অর্থ,—একদিকে ইংরেজের আর্থিক, বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যিক স্বার্থ নিরঙ্কুশ করা, এবং আর একদিকে স্বাধীনতার নামে জনগণকে স্বায়ত্বশাসনাধিকারের,—ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের,—দিল্লীকা লাড্ডু গলাধঃকরণ করানো,—একমাত্র কংগ্রেসই যে এই ভেল্কিবাজী সফল করতে পারে, ইংরেজকে এ কথাটা নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দেওয়া। তাদের সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হল।

৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর কার্য পরম গাম্ভীর্য্য সহকারে সমাধা হল,—ভারত স্বাধীন হল। সমগ্র দেশ জুড়ে হিন্দু-মুসলমান জনগণের সম্মিলিত উন্মত্ত আনন্দোৎসবে দাঙ্গার দাগ সাময়িক ভাবে সম্পূর্ণরূপে মুছে গেল। কারণ ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল,—বৃটিশভারত তিনটি স্বাধীন ডোমিনিয়নের রূপ পরিগ্রহ করেছিল,—কাটাছেঁটা ভারত,—পাকিস্তান এবং সিংহল।

আর "ভারতীয় ভারত", অর্থাৎ নেটিভ ষ্টেটগুলো সম্বন্ধে ক্যাবিনেট মিশনের অ্যাওয়ার্ড বলবৎ হল, তাদের ওপর থেকে বৃটিশ প্যারামাউণ্টি তুলে নেওয়া হল,—বৃটিশ ভারতের উত্তরাধিকারী সরকারগুলো সে প্যারামাউণ্টির উত্তরাধিকারী হল না,...৫৬৩ টা দেশীয় রাজ্য আইন ও বৈধতা অনুসারে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে গেল? সেদিকে ভারতীয় জনগণের হুঁস বা মাথাব্যথা ছিল না, তাদের বোঝানো হল মাউণ্টব্যাটেন ভারি ভাল বড়লাট,—তারা মাউণ্টব্যাটেন কি জয় বলে নাচতে লাগলো।

স্বনাম খ্যাত মডারেট নেতা সি, পি, রামস্বামী আয়ার সোৎসাহে কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দিলেন,—আমাদের রাজনৈতিক আদর্শই যে ঠিক, তা এতদিনে প্রমাণিত হল।"—অর্থাৎ Self Government within British Empire by constitutional means"—কংগ্রেসের প্রাক-অসহযোগ যুগের আদর্শ এতদিনে গান্ধী-নেহরুর সুবুদ্ধির ফলে সার্থক হল।

আমিও উৎসাহের চোটে এক কবিতা লিখে ফেলেছিলুম আগেই:

হায় রে মোদের বড়ই সাধের আটচল্লিশের জুন
তোরে—দিল যে ফাক্ কইর‍্যা
আগষ্ট মাসের মইদ্দেই নাকি ইংরেজের পো—শুন্
ভাই রে—যাবে ভারত ছাইর‍্যা
বড়লাট তো মিথ্যা কয় না ভাই—
খপরের কাগজে ল্যাখে—গান্ধীও কয় তাই—
মিথ্যা শুধু হইয়া গেল স্বাধীনতাটাই—
মিছা—হিন্দু-মুসলমানে মরলাম লইর‍্যা—
কার সাথে লারাইয়ের কথা, কার সাথে বা লরি
কার রাজত্ব কে দেয় কারে—মোরা ছরকট্ করি
বৃটিশের সাম্রাইজ্যটা অ'র নাই—
কংগ্রেস নেতা জহর পণ্ডিত সইত্যই কইছে ভাই—
হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানটা ডোমিনিয়ন তাই—
নিল—দোনো স্থানের হক্কল পাওয়ার হইর‍্যা—
ফিরোজ খান্ নুন, আর ভাই, মেহেরচাঁদ খান্না
বৃটিশেরি গুণগানে কেউই তো কম যান্ না—

খাইজা দিল, দৌলত দিল, কইত্তাও দিব নাকি ?
(এত) হক্কাল হক্কাল হক্কল দিল, হক্কল বা ইয়ু ফাকি।
দিব বইল্যা নিল হক্কল, নিব যেটুক বাকি—
মোরা—ভারতবাসী আক্কল খাইচি পুইর‍্যা

তখন স্বাধীনতার বাজার এত গরম যে, এ কবিতা ছাপা গেল না। স্বাধীনতাটা যে শাসন সংস্কারের শেষ ধাপ,—বৃটিশ শাসনযন্ত্রটার ভারতীয়করণ মাত্র,—এর অসংখ্য প্রমাণ নিত্য নূতন আকারে দেখা যেতে লাগলো। একদল ইংরেজ আই-সি-এস অফিসার ভারতীয় মন্ত্রীদের অধীনে কাজ করার মতন অপমান থেকে আভিজাত্য বাঁচানোর উদ্দেশ্যে চাকরী ছেড়ে দিলে,—এবং আনুপাতিক পেনসনের ওপর ক্ষতিপূরণের দাবী করে বসলো। সর্দার প্যাটেল সে দাবীর অযৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্যে বললেন :

"১৯২০ সালের শাসন সংস্কারের পর কয়েকজন আই-সি-এস অফিসার যখন চাকরী ছেড়ে দিলেন,—তখন তাঁরা শুধু আনুপাতিক পেনসনই দাবী করেছিলেন,—ক্ষতিপূরণের দাবী করেননি। তারপর যখন লী কমিশন আই-সি-এস অফিসারদের চাকরীর সর্তাদি পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেন,—তাতেও ক্ষতিপূরণের কোন কথার উল্লেখ করা হয়নি। তারপর '৩৫ সালের শাসন সংস্কারের পর যখন আর এক দল আই-সি-এস অফিসার চাকরী ছাড়েন, তাঁরাও আনুপাতিক পেনসন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন,—ক্ষতিপূরণের দাবী করেননি। সুতরাং আজই বা ক্ষতিপূরণের কথা উঠবে কেন ?"

যুক্তির এই ধারা দেখলেই বোঝা যায়, '৪৭ সালের কাণ্ডটা আর একটা শাসন সংস্কার ভিন্ন কিছুই নয়। কিন্তু এসব ব্যাপারে তাদের মাথাব্যথা ছিল না,—দেশবিভাগ, ডোমিনিয়ন, প্রভৃতি বড় বড় ব্যাপার হজম করতে করতে তাদের মন একটা হিপনোটিক অসাড়তার আচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। আরো বৃহৎ অঘটন ছাড়া তাদের মনে সাড়া জাগে না।

তেমন অঘটনও ঘটলো, যখন কিং জর্জ সিক্সথ লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম বড়লাট নিযুক্ত করলেন,—এবং পণ্ডিত নেহেরু হলেন তাঁর প্রধান মন্ত্রী। দেশের লোক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে পরস্পরকে প্রশ্ন করতে লাগলো,—এটা হল কি !

যাদুকর মহাত্মাজি—যিনি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই—তিনিই আবার এগিয়ে এলেন এবং জনগণের মাথার ওপর যাদুদণ্ড ঘুরিয়ে বললেন,—আমরা স্বাধীন হয়েছি,—আমরা যেমন ঝাড়ুদারও নিযুক্ত করতে পারি,—তেমনি বড়লাটও নিযুক্ত করতে পারি,—আর এ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রাক্তন শত্রুদের প্রতি উদারতা দেখাবার জন্যে তাদের একজনকেই বড়লাট করেছি।

মরা ছেলের মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে যখন গুরুঠাকুর লেকচার দেন, আত্মা অবিনশ্বর,—তখন সে মা যেমন নিরুপায়ে পুত্রশোক হজম করে,—জনগণও তেমনি নিরুপায়েই এত বড় প্রকাণ্ড কেলেঙ্কারীও হজম করে ফেললে। তখন তাদের মুখস্থ হয়ে গেছে,—বৃটিশ

ইম্পিরিয়ালিজমের এজেণ্ট হচ্ছে জিন্না,—আর কুইসলিং হচ্ছে সুভাষ বোস!

পাকিস্তানের বড়লাট নিযুক্ত হলেন জিন্না। ব্যাপারটা ভারতের মতন অশোভন হল না। ভারত এমন কাণ্ড কেন করলো? আমরা স্বাধীন ও উদারভাবে মাউণ্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম বড়লাটরূপে নিযুক্ত করেছি,—মহাত্মাজীর এই ভাঁওতার পিছনে এই ইঙ্গিতই ছিল যে, কিং জর্জ সিক্সথ আমাদের পরামর্শেই তাঁকে নিযুক্ত করেছেন।

কিন্তু সে কথাটাও অর্ধসত্যের বেশী নয়। পরামর্শ অবশ্য মহাত্মারা দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই,—কিন্তু পরামর্শ তাঁরা মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে করেছিলেনও—"বড়া সাব, ছোটা সাব, এক দিল" হয়েই ভারতবাসীকে বোকা বানানো হচ্ছিল। মাউণ্টব্যাটেনকে বড়লাট করার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল।

স্বাধীনতা দেওয়ার মালিক ইংরেজ,—তাদের প্রয়োজন এবং তাদের প্ল্যান অনুসারেই সমগ্র কাণ্ডটা চলছিল,—ভারতবাসীকে বোকা বানানো এবং বাগমানানোর কাজটাই ছিল তাদের স্থানীয় এজেণ্ট এবং ছোট পার্টনারদের কাজ। সংবিধান রচনা কারা করবে,—কেমন করে করবে, তা থেকে সুরু করে দুই ডোমিনিয়ম একভাবে সংগঠিত করার ব্যবস্থা পর্যন্ত, সবই ইংরেজের প্ল্যান।

দুই ডোমিনিয়ন এক ভাবে সংগঠিত করতে হলে ব্যবহারিক ব্যবস্থায় যে অনেক রদবদল এবং নতুন বিধি-নিষেধ চালু করতেই হবে,—তার জন্যে বৃটিশ সরকারই ঐ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্টের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা হিসেবে বড়লাটদের এক নতুন ক্ষমতা দিলেন,—তাঁরা যাতে প্রয়োজনীয় রদবদল ও বিধি-নিষেধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে, নিজেদের ব্যক্তিগত বিবেচনা অনুসারে, মন্ত্রিসভা বা কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শ না করেই, "অর্ডার ইস্যু" করতে পারেন।

সুতরাং দুই ডোমিনিয়নের দুই বড়লাট বিবেচনার তারতম্য অনুসারে দুই রকমের "অর্ডার ইস্যু" করে বসতে পারেন,—অথচ ইংরেজের প্ল্যান অনুসারে দুই ডোমিনিয়নের জন্ম কর্ম একরকম হওয়া চাই। এ সমস্যার সমাধানের উপায় কি? কংগ্রেস নেতা এবং লীগ নেতা বড়লাট হলেই যে একমতে কাজ করতে পারবে তার তো কোন গ্যারাণ্টি নেই। তাড়াতাড়ি এই সব রদবদল ও বিধি-নিষেধ চালু করতে হলে বিলেতের সঙ্গে বা পরস্পরের মধ্যে চিঠি চালাচালি এবং গরমিল মেলাতে জান হয়রাণ হতে পারে।

তাই বৃটিশ প্রতিনিধি মাউণ্টব্যাটেনকেই বড়লাট করা হল, যাতে বৃটিশ প্ল্যান অনুসারে তিনিই এই সব রদবদল ও বিধি-নিষেধ জারি করার প্রথম উদ্যোগ (initiative) গ্রহণ করেন, ও পাকিস্তানের বড়লাট নির্বিবাদে সেই লাইন অনুসরণ করতে পারেন। কংগ্রেসের কাজ,—ডিটো মারা ছাড়া জনগণকে বোকা বোঝানো ও বাগ মানানো।

মাউণ্টব্যাটেনকে হজম করার পর জনগণ এমন বাগই মানলো যে, তারপর একে একে অনেক দুষ্পাচ্য জিনিসও হজম করলো। প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার কথাই ধরুন। এটা নেহাৎ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়। বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত। এতকাল যে-ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের মূল প্রাচ্য ঘাঁটী ছিল, আজ হিন্দু-মুসলমান প্রজাকে আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্বশাসন দিলে কি সাম্রাজ্যের এই অন্যতম মূল ঘাঁটী ভেঙে যেতে পারে?—না তা ভেঙে দেওয়া যায়! —(তাই কয়েক বছর আগেও শ্রীনেহেরু পার্লামেণ্টে বলেছিলেন—Politically, Pakistan and India make a compact unit)।

সুতরাং লোকের চোখে ধূলো দেওয়ার জন্যে কিছু বৃটিশ সৈন্য ছাঁটাই করে পেনসন দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া এবং কিছু দেশী সৈন্য ভর্তি করা সুরু হল,—আর তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করা হল,—দুই ডোমিনিয়নের সৈন্যবাহিনী, নৌ-বহর ও বিমান-বহরের বৃটিশ নায়কেরা বহাল থাকবেন,—ইংরাজ সামরিক ইঞ্জিনিয়ার-যন্ত্রবিদ বাহিনীও যেমন ছিল তেমনি থাকবে, অফিসার স্তরের বহু ইংরাজও বহাল থাকবেন,—এবং দুই ডোমিনিয়নের ইংরাজ সেনাপতিদের ওপর লর্ড অকিনলেক থাকবেন সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন্ চীফ।

এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যে স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তানের, এ-কথা প্রমাণ করার জন্যে বলা হল,—বৃটিশ সরকার ভারতবাসীদের সেনাপতিগিরিতে পোক্ত করে তোলার জন্যে এই সব ইংরেজ অফিসার কর্মচারী "ধার" দিচ্ছে। ক্রমে জানা গেল, এদের ভারতে চাকুরীকালেও এদের শেষ আনুগত্য থাকবে বৃটিশ প্রতিরক্ষা বিভাগের কাছে।

এর অর্থ বোঝা যাবে, যদি বৃটেনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ কিম্বা বৃটেনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত কোন শত্রুপক্ষের সঙ্গে ভারতের যোগ দেওয়া কল্পনা করা যায়। তা হলে দেখা যাবে, ভারতের প্রতিরক্ষার এই গোড়াটা ইংরেজ কর্তারা ভারতের বিরুদ্ধে বৃটেনের দিকেই ভিড়ে গেছে।

ক্ষমতা হাতে পেয়ে ভারত-পাকিস্তান একযোগে কোনো দিন বৃটেনের প্রতি বেইমানী করে তাদের স্বার্থে রচিত অসম চুক্তিগুলো বাতিল করে দেবে, এমন সন্দেহ বা আশঙ্কা অবশ্য কারো ছিল না,—কিন্তু বৃটেন সেই কাল্পনিক দুর্দৈবের জন্যেও ব্যবস্থা রেখেছিল।

এত বড় কাণ্ডও জনগণ হজম করলে। কিন্তু দুই ডোমিনিয়নের মাথার ওপর এক ইংরেজ সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন্ চীফ, কাণ্ডটা অত্যন্ত বিসদৃশ এবং দৃষ্টিকটু বলে বছরখানেক পরে অকিনলেকের পদটা তুলে দেওয়া হয়েছিল। এই সমগ্র ব্যাপারটা এমন নির্বিবাদে চলতে পারতো না—যদি মাউণ্টব্যাটেন স্বাধীন ভারতের বড়লাট না হতেন। কিন্তু এটা বোঝা সোজা নয় যে, বৃটিশ সরকারই মাউণ্টব্যাটেনরূপে সর্বশক্তিমান বড়লাট হয়ে স্বাধীন ভারতের মাথার ওপর বসেছিলেন, এবং তাতে কংগ্রেস নেতাদের কাজ অনেক সহজ হয়েছিল,—তাঁরা প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেই কাজ করছিলেন।

তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলোও ছিল তাঁদের পরম সহায়। তারা অবিরাম জনগণের কানের কাছে ঢাক পিটে চলেছিল, ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। জনগণের মধ্যে যারা চালাক প্যাট্রিয়ট, তারা শোনে আর ভাবে,—ইংরেজ গেলেই তো ভারতের মওকা আসবে—দেখবো "কেমন লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।"

আর একদল পণ্ডিত প্যাট্রিয়ট ছ' মাসের মেয়াদ দিয়ে বললেন,—ভাখো না,—ওরা ছ' মাসের মধ্যেই মরবে। বিড়লা-টাটাগোষ্ঠির কল্যাণে ভারতের কত রকমের কত শিল্প-কারখানা আছে, তার এক

নিষ্ট প্রচার করে তাঁরা রায় দিলেন, পাকিস্তানের যখন এসব শিল্পের কিছুই নেই,—তখন ওরা আলবৎ মরবে।

অর্থাৎ যে সাম্প্রদায়িক শান্তির উদ্দেশ্যে কংগ্রেস-লীগ মিলে আপোষে দেশবিভাগ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ছত্র-ছায়াতলে দুই ডোমিনিয়ন হয়ে পাশাপাশি শান্তিতে বাস করার মতলব করেছিল,—প্যাট্রিয়টিক জনগণের এবং সংবাদপত্রের কল্যাণে সেই সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়া আবার দেখা দিতে বেশী দেরী লাগলো না।

এদিকে দেশবিভাগের কার্যকরী ব্যবস্থার বড় বড় কাজগুলো একে একে সারা হতে লাগলো। কতকগুলো প্রদেশ নিয়ে ভারত এবং কতকগুলো প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান নির্ধারিত হয়ে গেল, জনসংখ্যা প্রধানতঃ হিন্দু বা মুসলমান দেখে। পাঞ্জাব ও বাংলা নিয়ে গণ্ডগোল বাধলো হিন্দু-মুসলমান প্রায় সমান সমান দেখে। সুতরাং এই প্রদেশ দুটোকে ভাগাভাগির ব্যবস্থা করা হল। পাঞ্জাব ভাগাভাগিও অপেক্ষাকৃত চটপটই হয়ে গেল, কিন্তু বাংলায় কয়েকটা নতুন সমস্যা দেখা দিলে।

মুসলমান বেশী বলে পাকিস্তান পুরো বাংলা দাবী করে,—হিন্দু বাংলা তার বিরোধিতা করে,—এর মধ্যে শরৎ বসু ও সুরাবর্দী একযোগে ধুয়ো তুললেন,—ঝগড়া বন্ধ হোক, বাংলা একটা পৃথক অটোনমাস ষ্টেট হোক। তাঁদের এ ধুয়োর পিছনে ক্যাবিনেট মিশনের সি গপ ষ্টেটের আইডিয়া ছিল,—কিন্তু কেউ সেটাকে আমল দিলে না। হিন্দুমহাসভা ও শ্যামাপ্রসাদের বিশেষ চেষ্টায় বঙ্গবিভাগই স্থির হল। সীমা নির্ধারণ কাজটা কিন্তু সহজ হল না।

দুটো কারণে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য আবার চরমে উঠলো,—ভবিষ্যৎ দাঙ্গা-হাঙ্গামার ক্ষেত্র তৈরী হয়ে গেল। প্রথমতঃ অনেকগুলো জেলাকেও ভাগাভাগি করতে হল এবং কয়েকটা মহকুমাকেও। এই সব সীমানা নির্ধারণে প্রচুর সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল চললো।

আর দ্বিতীয়তঃ—দুই বড়লাটের আদেশ অনুসারে ঠিক হয়েছিল, সরকারী কর্মচারীরা ইচ্ছা করলে এক বাংলা থেকে আর এক বাংলায় বদলী হতে পারবেন,—দুই সরকারই বদলী অফিসারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে। তদনুসারে বহু অফিসার বদলী হয়েছিলেন। তাঁদের দেখাদেখি বড়লোকেরাও স্থাবর সম্পত্তি ছেড়ে টাকাকড়ি নিয়ে বাস-বদল করতে শুরু করেছিলেন। আবার তাদের দেখাদেখি অনেক গরীব লোকও দেশ বদল করতে শুরু করেছিল। এইভাবে উদ্বাস্তু সমস্যার গোড়াপত্তন হয়েছিল।

হিন্দু মহাসভা আন্দোলন সুরু করেছিল, অনেক তথাকথিত কংগ্রেসী হিন্দুও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল—দুই বাংলার সমগ্র হিন্দু-মুসলমান অধিবাসী বদল করার ব্যবস্থা হোক। কিন্তু দু কোটি উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন একটা অসম্ভব ব্যাপার, কাজেই সরকার তাতে রাজী হয়নি। বেসরকারী ভাবেই আন্দোলন চললো, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসুক, আমরা তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবো।

জনগণের দারিদ্র্য-দুর্দশা এবং বেকারী দুই বঙ্গেই প্রচুর এবং চিরন্তন, তাদের জন্যে মাথাব্যথার দায়িত্ব কোনো কালে কারুরই নেই, কিন্তু ডেকে আনলে সঙ্গে সঙ্গে সে-দায়িত্বও আসে। পূর্ববঙ্গের হিন্দু দরিদ্রদের এ আহ্বান হল একটা স্বস্তির কথা। দলে দলে তারা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে লাগলো। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো।

ওদিকে পূর্ববঙ্গের অবস্থাও আর একদিক দিয়ে কাহিল হচ্ছিল। পূর্ববঙ্গে কাজ-কারবারী পয়সাওয়ালা লোকের অধিকাংশই হিন্দু। তারা দলে দলে চলে আসার ফলে সেখানকার কাজ-কারবার বন্ধ হচ্ছিল, বেকার বাড়ছিল। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতাবাদী মোল্লা এবং তাদের চেলা-চামুণ্ডা গুণ্ডারা গরীব হিন্দুদেরও সেখান থেকে তাড়াবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিল—ভয় দেখানো এবং অত্যাচার দুই-ই চালিয়েছিল।

সুতরাং অবস্থা দাঁড়িয়েছিল,—ওদিক থেকে মুসলমান মোল্লারা ঠেলছে এবং এদিক থেকে হিঁদু মোল্লারা টানছে, আর ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে একটা প্রবল উদ্বাস্তু স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা বিরাট আকার ধারণ করলো।

বঙ্গ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে সাময়িক এক ছায়া মন্ত্রিসভা গঠিত হল (Shadow Ministry) প্রফুল্ল ঘোষ হলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বিলিতি লাটসাহেবের কাছে আনুগত্যের শপথ নিচ্ছেন, কাগজে ফটো ছাপা হল। এক কাগজে লেখা হল,—"স্বাধীন হিন্দু বঙ্গ রাষ্ট্রের বিজয় শঙ্খ গর্জিয়া উঠিয়াছে।"

তখন লর্ড লিষ্টওয়েল ভারত সচিব। তিনি গদ গদ হয়ে এক বাণী দিলেন,—"ভারতের বর্তমান মহান শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্পর্কে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো যে মহান ভূমিকার অভিনয় করেছে,—এবং

জমিদের ওপর যে ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে,—তাতে তাদের গর্ব করার অধিকার আছে।"

সর্বশক্তিমান বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনরূপী বৃটিশ সরকারের এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে, খুচরো কথায়, কোন মাথাব্যথা নেই। তাঁরা তখন আর এক বৃহত্তর ব্যাপারে মন দিয়েছেন।

৫৬৩টা সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশীয় রাজ্য যদি বৃটিশ ভারতের সঙ্গে লাইন-আপ না করে পৃথক ভাবে চলতে থাকে,—যদি তাদের পররাষ্ট্রনীতিও স্বাধীন ভাবে চলে,—তা হলে প্ল্যান সহজে সম্পূর্ণ হওয়ার পথে বাধা আসতে পারে। তাদেরও ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে মিলিয়ে এক "পলিটিক্যাল ইউনিট" সম্পূর্ণ করা দরকার। অথচ তাঁদের রাজ্য ও ধনসম্পত্তির ওপর হামলা করলে চলবে না। তাই তাঁদের সম্পর্কে এক নতুন প্ল্যান তৈরী হল, "অ্যাকসেশন প্ল্যান"—যেটা হবে আসল বৃটিশ প্ল্যানের অঙ্গ।

তদনুসারে মাউণ্টব্যাটেন ও মহাত্মাজী একযোগে দেশীয় রাজাদের কাছে এক "আবেদন" করে বললেন,—আইন ও বৈধতার হিসাবে আপনারা আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু আপনারা যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পৃথক ভাবে চলতে থাকেন,—তা হলে ভারতের অবস্থা কি রকম খণ্ড-বিখণ্ড (Balkanized) হবে,—তা আপনারা নিশ্চয়ই বোঝেন (তা ছাড়া ভারতের একাংশ যদি কোন বহিঃশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তা হলে সে বিপদ ভারতের সর্বাংশে ছড়িয়ে পড়বে,—এ কথাও আপনারা নিশ্চয়ই বোঝেন।

সুতরাং আমরা আপনাদের দেশপ্রেমিক কর্তব্যবোধের কাছে আবেদন করছি,—আপনারা আপনাদের পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষাশক্তি এবং যানবাহন-যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করুন।

রাজা ও রাজ্যের পৃথক সত্তা বজায় রেখে তিনটে পরস্পর সম্পর্কিত বিভাগ ঐক্যবদ্ধ করার এই প্ল্যানের নাম অ্যাকসেশন,—এবং এর জন্তে যে চুক্তি হবে তার সর্তাবলীর নাম ইনস্ট্রুমেণ্ট অফ অ্যাকসেশন—বাংলায় যে ব্যবস্থার নাম হল আংশিক ভারতভুক্তি।

যে চুক্তিপত্রে রাজাদের সই করতে হবে, তার বয়ানে লেখা হল,—আমি অমুক, আমার রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার অমুক অমুক বিভাগ ভারতের (বা পাকিস্তানের) সঙ্গে সম্মিলিত করার জন্তে এই সর্তে রাজী হয়ে এই চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করছি যে, এ চুক্তির বাধ্যবাধকতার মেয়াদ আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে—ইচ্ছা হলে আমি এ চুক্তি বাতিল করতে পারবো। আমার উত্তরাধিকারীরা এ চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ হবে না, ইচ্ছা হলে তারা স্বাধীন ভাবে এ চুক্তি গ্রহণ করবে। আর ভারত (বা পাকিস্তানের) বর্তমান শাসনবিধির পরিবর্তন হলেও আমি এ চুক্তি বাতিল করতে পারবো, ইচ্ছা হলে নতুন করে এ চুক্তি মেনে নোব।

মাত্র গোটাকয়েক দেশীয় রাজ্যের মালিক মুসলমান—বাকি সব রাজ্যের মালিক হিন্দু। একটা মুসলমান রাজ্য এবং একটা হিন্দুরাজ্য বাদে সকল রাজ্যেই রাজা ও প্রজা এক জাতের। রাজারাই মালিক, অ্যাকসেশনের মালিকও তাঁরাই, প্রজারা কেউ নয়। প্রজাদের মতামতের বালাই না রেখেই যেমন হিন্দু বা মুসলমান জনসংখ্যা অনুসারেই ভারত বিভাগ হয়েছিল, তেমনি অ্যাকসেশনও পটাপট হয়ে গেল জনসংখ্যা অনুসারেই। হিন্দুপ্রধান রাজ্যগুলো ভারতের সঙ্গে এবং মুসলমানপ্রধান রাজ্যগুলো পাকিস্তানের সঙ্গে ভিড়ে গেল।

রাজা-প্রজা এক জাতের বলে কেউ টের পেলে না, রাজারাই অ্যাকসেশনের মালিক—প্রজারা নয়। সেটা টের পাওয়া গেল ছুটো বৃহৎ রাজ্যে—যেখানে রাজা-প্রজা একজাতের নয়। হায়দারাবাদে রাজা মুসলমান, প্রজা হিন্দু, আর কাশ্মীরে রাজা হিন্দু, প্রজা মুসলমান। রাজা-প্রজার টান একমুখী না হওয়ায় ঐ ছুই রাজ্যের রাজারা ঘোষণা করলেন,—তাঁরা স্বাধীন এবং পৃথকই থাকবেন।

হায়দারাবাদে রামানন্দ তীর্থ প্রভৃতির নেতৃত্বে ষ্টেট কংগ্রেস নিজামের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়ছিল এবং কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে কাশ্মীর ন্যাশান্যাল কনফারেন্স মহারাজা হরি সিংয়ের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়ছিল। এই অবস্থার মধ্যে এই ছুই রাজ্যে ছুটো পৃথক রকমের দুর্দৈব দেখা দিল। মনে রাখা দরকার, ষ্টেট কংগ্রেসগুলো ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শাখা সংগঠন নয়।

হায়দারাবাদের হিন্দু প্রজাদের ষ্টেট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজা রাজাকার সংগঠন লড়াই করতো। এর মধ্যে আবার কমিউনিষ্ট পার্টির পরিচালনায় তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহ গড়ে উঠলো। বিদ্রোহী কৃষকদের শত্রু নিজাম সরকার, রাজাকার দল, ষ্টেট কংগ্রেস, জমিদার-মহাজন ধনিক ব্যবসায়ী, সকলেই—এবং বিদ্রোহের মুখে সকলেই পালালো, নিজামের পুলিশ পর্যন্ত। তেলেঙ্গানা হয়ে উঠলো একটা সোভিয়েত এলাকার মতন।

ক্রমে সে কৃষক বিদ্রোহ হায়দারাবাদ থেকে কৃষ্ণা-গোদাবরী জেলায় সংক্রামিত হতে লাগলো। তখন মাউণ্টব্যাটেন বৃটেনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সেরে চলে গেছেন—রাজাগোপালাচারী হয়েছেন ভারতের বড়লাট। তিনি এ বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা করলেন। নিজামকে লিখলেন, তোমার রাজ্য থেকে আমাদের রাজ্যে কমিউনিষ্ট বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ছে,—তুমি কিছু করতে পারছো না,—আমরাও চুপ করে থাকতে পারি না। সুতরাং আমি তোমার রাজ্যে সৈন্য পাঠালুম।

নিজাম রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নয়,—তাই তাঁর তরফ থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রসংঘে ভারতের বিরুদ্ধে "অ্যাগ্রেশনের" অভিযোগ পেশ করে বললে, আজ ওরা নিজামের রাজ্য আক্রমণ করেছে, কাল পাকিস্তানের ওপরও আক্রমণ চালাতে পারে।

ভারত জবাব দিলে, আমরা কারো রাজ্য আক্রমণ করিনি,—আমরা হায়দারাবাদে সৈন্য পাঠিয়েছি "পুলিশ অ্যাকশন" হিসেবে। রাষ্ট্রসংঘের মাতব্বরেরা বুঝলেন, এবং মামলা ডিসমিস করলেন। আমাদের প্যাট্রিয়ট পণ্ডিতেরা এই প্রথম "পুলিস অ্যাকশন" কথাটা শিখলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত অনেকেই কথাটার মর্ম বোঝেন না।

পুলিসের কাজ শান্তিরক্ষা করা, এবং তারই জন্তে সমাজ বিরোধীদের দমন করা। অ-রাজনৈতিক সমাজবিরোধী হচ্ছে চোর ডাকাত,—আর রাজনৈতিক সমাজবিরোধী হচ্ছে বিদ্রোহীরা। হায়দারাবাদে ভারতীয় সৈন্য প্রেরিত হয়েছিল কমিউনিষ্ট বিদ্রোহ দমনের জন্তে। আনুষঙ্গিক কাজ, নিজামকে অ্যাকসেশনে টেনে নেওয়া।

প্রথমে হায়দারাবাদ দখল করে নিজামের কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁকে বোঝানো হল,—বর্তমান যুগের ভারতীয় পরিস্থিতিতে স্বৈরাচারী শাসন আর চলতে পারে না। আমরা কমিউনিষ্ট বিদ্রোহ দমন

করবো, কিন্তু স্টেট-কংগ্রেসের গণতন্ত্রের সংগ্রাম দমন করে তোমার স্বৈরাচারী শাসন নিষ্কণ্টক করতে পারবো না। সুতরাং আজ হোক বা কাল হোক, এ শাসনের অবসান হবেই। তার সঙ্গে হয়ত তোমার রাজ্য-সম্পদ সবই যাবে।

তার চেয়ে আমাদের দলে ভিড়ে যাও,—স্টেট-কংগ্রেসের নেতাদের মন্ত্রী করে গণতান্ত্রিক শাসন সংস্কার প্রবর্তন কর, তোমার রাজ্যসম্পদ সবই বজায় থাকবে। নিজাম বুঝলেন, ভারতের সঙ্গে ভিড়ে গেলেন, এবং তারপরে কমিউনিষ্ট নিধন চললো চার বছর ধরে। এই ভাবে হায়দারাবাদ-সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। রামানন্দ তীর্থ মন্ত্রী হলেন।

কাশ্মীরের পরিস্থিতি গড়ালো সম্পূর্ণ অন্য খাতে। দেশীয় রাজ্যের স্বৈর শাসনের পৃষ্ঠপোষক ছিল ইংরাজ,—গান্ধী-কংগ্রেস লড়তো ইংরেজের বিরুদ্ধে, আর প্রজারা লড়তো রাজাদের বিরুদ্ধে। ফলে রাজাদের যেমন বিতৃষ্ণা ছিল গণতান্ত্রিক শাসন এবং গান্ধী-কংগ্রেসের প্রতি,—প্রজাদের তেমনি ভক্তি-বিশ্বাস ছিল গণতন্ত্রের সঙ্গে গান্ধী-কংগ্রেসের ওপর।

হায়দারাবাদের স্টেট-কংগ্রেসের মতই কাশ্মীরের ন্যাশান্যাল কনফারেন্সেরও আদর্শ ছিল গান্ধী-কংগ্রেসের আদর্শ,—এবং শেখ আবদুল্লা ছিলেন নেহেরুর ভক্ত ও বন্ধু। মহারাজা হরি সিং তাঁকে জেলে পুরে ছিলেন। ভারতের পুলিস অ্যাকশনের উপযোগী পরিস্থিতিও সেখানে ছিল না। সুতরাং প্রজাবিদ্রোহ ছাড়া মহারাজার স্বৈর-শাসনের অবসানের আর কোনো উপায় ছিল না।

এই অবস্থায়, প্রজারা মুসলমান বলে পাকিস্তান দাবী তুললো, কাশ্মীর রাজ্যের পাকিস্তানের সঙ্গে অ্যাকসেশন করাই প্রয়োজন,—এবং তাদের এই দাবীর সঙ্গে ন্যাশান্যাল কনফারেন্সের বহির্ভূত ও পাকিস্তানের প্রতি আকৃষ্ট কাশ্মীরী মুসলমান প্রজাদের তরফ থেকে মহারাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এক "আজাদ কাশ্মীর" দল সংগঠিত হল।

স্বভাবতঃই মহারাজা তাদের দমনের জন্যে পুলিস-সেপাই নিয়োগ করলে, কাশ্মীরের সীমানার বাইরে থেকে পাহাড়ী মুসলমান উপজাতিরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। পাকিস্তানও প্রয়োজন হলেই সৈন্য পাঠাবে বলে তৈরী হল।

এইবার মহারাজা বিপদ গণলেন,—এবং তাড়াতাড়ি শেখ আবদুল্লাকে জেল থেকে মুক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসালেন, আর দিল্লীর কাছে অ্যাকসেশনের রাজীনামা পাঠিয়ে সৈন্য সাহায্য চাইলেন। দিল্লীও তৈরী ছিল, সুতরাং পত্রপাঠ ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরে প্রবেশ করলো।

এর জবাবে কাশ্মীরের সৈন্যবাহিনীর "গিলগিট স্কাউট" দল বিদ্রোহ করে আজাদ কাশ্মীরের সৈন্যবাহিনী রূপে দাঁড়ালো এবং পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীও তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। কাশ্মীরে লড়াই সুরু হল। একদিকে একদল কাশ্মীরী সৈন্যের পিছনে ভারতীয় সৈন্য,—আর একদিকে আর একদল কাশ্মীরী সৈন্যের পিছনে পাকিস্তানী সৈন্য। আইনতঃ লড়াইটা দুই কাশ্মীরের মধ্যে,—ভারত-পাকিস্তান লড়াই নয়।

তখন লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের আমল। কিন্তু "ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে"—সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজের হস্তক্ষেপ ভাল দেখায় না,—আর তিনি নিজে তো ভারতের বড়লাট রূপে ভারতের পক্ষভুক্ত। সুতরাং ইংরাজের দুই জুনিয়ার পার্টনারের মধ্যে লড়াইয়ের ফয়শালার জন্যে ইংরেজের আন্তর্জাতিক বড় পার্টনার আমেরিকাকে আসরে নামাবার উদ্দেশ্যে মাউণ্টব্যাটেন শান্তিরক্ষার নামে কাশ্মীরের মামলা রাষ্ট্রসংঘে পাঠালেন। যথাসময়ে রাষ্ট্রসংঘের তদারকী কমিশন রূপে একদল আমেরিকান মিলিটারী অফিসার ও গোয়েন্দা কাশ্মীরে এসে জেঁকে বসলো, যুদ্ধ-বিরতির ব্যবস্থা হল,—রাষ্ট্রসংঘে মামলাও চললো।

কাশ্মীরে আমেরিকার ঘাঁটী স্থাপনের প্ল্যানও বৃটেনের বৃহত্তর প্ল্যানের একটা অঙ্গ। ৪৭ সালের গোড়াতেই চীনের গৃহযুদ্ধের গতি কমিউনিষ্টদের অনুকূলে মোড় ফিরেছিল,—মাও-চৌ-চু-তে উত্তর থেকে দক্ষিণে তাড়িয়ে আসছে, আর চিয়াং প্রাণপণে দক্ষিণে পালাতে সুরু করেছে, এই ছিল অবস্থা। আমেরিকা সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করেও চিয়াংকে খাড়া রাখতে পারছে না—তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও হটে আসছে।

এর অর্থ চীনে কমিউনিষ্ট-বিজয় অবধারিত বলে তারা বুঝেছে, এবং পাছে কমিউনিষ্ট বন্যাপ্রবাহ হিমালয় পার হয়ে ভারতের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে,—তাই সে দুর্দৈব রোধ করার জন্যে বৃটেন-আমেরিকা চিয়াংকে খরচের খাতায় লিখে নেহেরুকে পরবর্তী ঠেকনো রূপে খাড়া করার ব্যবস্থায় মন দিয়েছে। এ অবস্থায় কাশ্মীরে গণ্ডগোল ভাল কথা নয়। নিজেদের একটা ঘাঁটী সেখানে প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

তখন নেহেরু বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে কূটনীতিবিশারদ রূপে গড়ে তোলার জন্যে মাউণ্টব্যাটেনের সুপারিশ নিয়ে তাঁকে কিং জর্জ সিক্সথের স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়নের প্রধান প্রতিনিধি করে রাষ্ট্রসংঘে পাঠিয়েছেন, এবং তিনি তাঁর প্রথম বক্তৃতায় বলেছেন, কেমন

করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ছেড়ে দিয়েছে এবং কেমন করে ভারতবাসী কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়েছে।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে প্রতিনিধি দলের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল অভিজ্ঞ ও সিনিয়র কূটনীতিবিদ সর্দার পানিক্করকে। কেমন করে নেহেরুর বে-সরকারী ব্যক্তিগত নির্দেশে বিজয়লক্ষ্মী তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বে-সরকারী ভাবে আমেরিকার দপ্তরে গিয়ে প্রথম কাশ্মীর পরিস্থিতির বিবরণ পেশ করেন, তার বিস্তারিত বিবরণ পানিক্করের Two Chinas নামক বইয়ে আছে। তিনি চিয়াং চীনে শেষ দু'বছর এবং লাল চীনে প্রথম দু'বছর চীনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং আমেরিকার কর্তাদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট আলাপ খাতির ছিল।

যাই হোক,—'৪৮ সালের জুনটাকে তাড়াহুড়ো করে '৪৭ সালের আগষ্টে টেনে আনার অন্যতম কারণ এই কমিউনিজমের অগ্রগতি রোধের প্ল্যান। আর একটা প্রকাণ্ড কারণও ছিল, এবং সে হচ্ছে বৃটেনের যুদ্ধোত্তর অর্থ নৈতিক অবস্থা। এবং যত শীঘ্র সম্ভব ভারতের বাজারে বৃটেনের পুন: প্রতিষ্ঠার জরুরী প্রয়োজন।

দু'বছরের লড়াইয়ে ষ্টার্লি এলাকার ১৪টা দেশের কাছে বৃটেনের ঋণের বিরাট বোঝা জমে উঠেছিল। এ ঋণের বোঝা ঘাড় থেকে নামাতে হলে ঐ সব দেশ থেকে আমদানী কমিয়ে রপ্তানী বাড়াতে হয়। বৃটেনের সে ক্ষমতা প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্রচুর উৎপাদন বৃদ্ধি না করতে পারলে তা হয় না,—অথচ তার উৎপাদনের যন্ত্রগুলো হয়েছে পুরানো, সেকেলে, ঝরঝরে,—আমেরিকার মত আধুনিক ও উন্নত নয়।

সেগুলো বদলানো দরকার কিন্তু তার সঙ্গতি নেই। কাজেই আমেরিকা থেকে আধুনিক কলকব্জা যন্ত্রপাতি কিনতে তার আমেরিকার কাছ থেকে আর একটা প্রকাণ্ড ঋণ প্রয়োজন। অনেক দরবার করে এবং নিজেদের সংরক্ষিত বাজারে আমেরিকাকে অনুপ্রবেশের সুযোগ দেওয়ার সর্তে সে ঋণের বন্দোবস্ত হল।

আমেরিকা থেকে ক বছর কতটা করে বাড়তি আমদানী করা চাইই, তার হিসেব করে পাঁচ হাজার মিলিয়ন ডলার ঋণের বন্দোবস্ত হল,—এবং ভারতের বাজারে প্রতিষ্ঠার প্ল্যান করে তারা ঠিক করলে '৪৮ সালের জুন পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে ফয়সালা হলেই চলবে।

ঋণের বন্দোবস্ত হওয়ার পরই আমেরিকায় গড়ে শতকরা ২৫ ভাগ দর বৃদ্ধি হল,—ফলে ৫০০০ মিলিয়ন ডলার ঋণটা প্রকৃত পক্ষে হয়ে দাঁড়ালো ৩৭৫০ মিলিয়ন ডলার। সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনের উৎপাদন বৃদ্ধির যে হার আন্দাজ করা হয়েছিল,—কার্যত: সেটাও অনেক কম হল।

সুতরাং ভারতের বাজার দখলের কাজটা আরো তাড়াতাড়ি করা প্রয়োজন হল,—এবং '৪৮ এর জুনটাকে টেনে আনা হল '৪৭ সালের আগষ্টে। গান্ধী-নেহেরু-প্যাট্রিয়টিক সাংবাদিকেরা একযোগে ভারতবাসীকে বোঝালেন,—এটা মাউণ্টব্যাটেনের গুণ—ভারি ভাল বড়লাট!

ভারতের বাজারে তাড়াতাড়ি জেঁকে বসার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নতুন বড় প্ল্যান তৈরী হল,—Colonial Expansion Plan উপনিবেশগুলোতে নতুন ব্যবসার ব্যবস্থার জন্যে অনুসন্ধান এবং উপনিবেশগুলোর উৎপন্ন মালের মার্কেটিং অর্গ্যানাইজেশন সংগঠনের জন্যে বড় বড় বৃটিশ বিশেষজ্ঞ কমিশন প্রেরিত হল,—আমদানী-রপ্তানীর জমা-খরচ মিলিয়ে "ডলার গ্যাপ" কমাতে না পারলে আর চলে না। বলা বাহুল্য, ভারতও এই নতুন প্ল্যানের আওতায় এল।

লড়াইয়ের ক বছরে বৃটেনের কাছে ভারতের পাওনা জমেছিল; যাকে ষ্টার্লিং ব্যালেন্স বলা হয়, দু হাজার কোটি টাকা। আমরা বিলেতকে মাল সরবরাহ করেছি, কিন্তু তার বদলে বিলেত থেকে কিছু আমদানী করতে পারিনি,—তাই এই পাওনা জমেছে।

লড়াইয়ের পরও বৃটেনের আমদানীর প্রয়োজন আছে। কিন্তু বাড়তি রপ্তানীর ক্ষমতা নেই। সুতরাং এই পাওনাটা নানা ভাবে উবিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। আমাদের সুশাসন দেবার জন্যে কুইন ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব কিনে নিয়েছিলেন—তার মূল্য স্বরূপ ৪৫০ কোটি টাকা আমাদের পাওনা থেকে কাটা গেল। বছরে ১৩ কোটি টাকা ভারত বিলেতকে দিত "হোম চার্জেস" নামক পরাধীনতার খেসারৎ। ২০ বছরের হোম চার্জেস ২৬০ কোটি টাকাও এই পাওনা থেকে কাটা গেল।

বাকি টাকার এক চতুর্থাংশ পাকিস্তানের পাওনা,—সেটা বাদে যা বাকি রইলো, তা থেকে বছর বছর ২০ কোটি করে টাকা ভারতের ওয়ার কণ্টিবিউশন বলে কাটা হয়। আমাদের এ বাবদ মোট দেয় কত, তা আমরা জানি না। কিছু কিছু টাকা আদায় দেওয়া হয় সামরিক সরঞ্জাম এবং বাতিল মেসিন দিয়ে। ৩৫০-এর ওপর বৃটিশ কারখানায় আধুনিক মেসিন বসেছে,—বাতিল মেসেনগুলো এই ভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের এক চেয়ারম্যান—বোধ হয় এন, এন, ব্যানার্জি—তাঁর ভাষণে এ কথা বলেছিলেন।

এ সব ব্যাপারে কংগ্রেস নেতারা তো নির্বিবাদে সায় দিয়ে চললেনই,—উপরন্ত এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট কনট্রোল লাইসেন্সের ব্যবস্থার মারফৎ ভারতের জাতীয় অর্থনীতিকে তাঁরা বৃটেনের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে লাগলেন।

যেখানে বৃটেন থেকে বাড়তি আমদানীর অধিকার আমাদের কেউ অস্বীকার করতে পারে না, সেখানে আমরা প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাসনের লুটের ব্যবসার আমলের মতই অদ্যাবধি বৃটেন থেকে আমদানীর চেয়ে রপ্তানী বেশী করে থাকি, ট্রেড ব্যালেন্স আমাদের অনুকূল বলে সন্তোষ প্রকাশ ও প্রচার করি, নানাভাবে ষ্টার্লি ব্যালেন্স কমে গেলে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করি, আবার পাওনা বাড়িয়ে তুলি, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ পুঁজিপতিদের কাছ থেকে মোটা সুদে এড নেওয়ার ব্যবস্থা করি। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে আমরা বিনা সুদের পাওনাদার এবং বৃটিশ পুঁজিপতিদের কাছে মোটা সুদের দেনাদার। এবং এর নাম, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছেড়ে দিয়েছে, আর আমরা স্বাধীন হয়েছি। জগতের ইতিহাসের সব চেয়ে বড় ষড়যন্ত্র। [ক্রমশঃ।

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি বাঙালী মেয়ের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্রটি শ্রীবিমল হোড় কর্তৃক গৃহীত।

বার্ধক্যে

বারাণসী

নীলকণ্ঠ

কুড়ি

দূরের বন থেকে দুরন্ত হাওয়ায় ভেসে আসে মাতাল করা সুবাস। মৃগনাভির গন্ধে মাতাল মৃগ জানে না যে দূরের নয়; নিকটের। নিজের অঙ্গেই সে বহন করছে সেই অনঙ্গকে। সুরভিমাখা নাভিদেশ তার; সবাই জানে। জানে না শুধু যে তার ধারক, সে। মানুষ এই মৃগনাভির গন্ধে মাতাল মৃগের মতোই 'ক্ষ্যাপা; খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর'। সেই পাথর যার স্পর্শে তামা হয়ে যায় সোনা, রত্নাকর হয় বাল্মীকি, জগাই-মাধাই হয় উদ্ধার; তার উৎস যে মানুষের মধ্যে থেকেই হয় উৎসারিত,—নির্বোধ মানুষ তার খবর রাখে না। তাই সে বনে যায়, এক মনে বসে যায় গাছের তলায়, পথের ধুলায় মধ্যদিনে যখন গান বন্ধ করে পাখী তখনও যে রাখালের বেণু বাজে তার দেখা পাবে বলে। সাধনায় গলে যায় পাষাণ; দেখা দেন কখনও শংখচক্রগদাপদ্মপাণি; কখনও কংসবধের কারণে নৃসিংহ মূর্তি। কখনও নৃমুণ্ডমালিনী নগ্না; ভয়ংকর বেশে অভয়ংকরের ধ্যানমগ্না। দেখবার পর ধ্যানভঙ্গ হয় সাধকের। সে বলে, একি, একে তো অনন্ত কাল ধরে বুকের মধ্যে দেখে আসছি। তবে কি মানুষের মনই সেই অবাঙ্ মানসগোচরের মন্দির!

তা-ই। সত্যই তা-ই। এই একমাত্র সত্য।

যিনি অসীম তিনিই সসীম। যিনি অনন্ত তিনিই অন্ত। যিনি নশ্বর তিনিই অবিনশ্বর। যিনি মর তিনি অমর। যিনি পরমাত্মা তিনিই জীবাত্মা। উপনিষদ তাঁকে প্রত্যক্ষ করে বলছে, পরমাত্মা আর জীবাত্মা, দুটি পাখীর মতো। ডানায়-ডানায় যুক্ত তাদের একজন পিপ্পল আস্বাদ করছে; অনাহারী আরেক জন অনাসক্ত, শুধু তার সাক্ষী। মানুষের মধ্যেও একজন চাকরি করছে, মামলা করছে, বাড়ি করছে, গাড়ি করছে; ছেলে চাকরি পেলে ডিনার দিচ্ছে; ছেলের কিছু হলে মাথা খারাপ করছে ভেবে ভেবে। আরেক জন সে কিছুই করছে না। সহস্র লোকের ভীড়ের মধ্যে দেবালয়ে অনালোকিত অন্ধকারে অনন্ত কাল ধরে যিনি অপেক্ষা করছেন মূর্তির মধ্যে মূর্ত সেই দেবাদিদেবের মতো মানুষের মধ্যে সেই আর একজন ওই একজনের মতোই অনিত্যের মধ্যে নিত্য। যিনি নূতন নন; নন পুরাতন। যিনি অপরিবর্তনীয় সেই অসীমের কৌতুক এই সসীম

সকল কালের সকল মানুষের মধ্যে নয় কেবল; জড়ে এবং চেতনে, পদার্থে এবং অপদার্থে জীবাত্মার বাস এবং পরমাত্মার উপবাস কেবল প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরাই যাঁরা বলতে পেরেছেন সমস্বরে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় উষাকাল: নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!

লোকে বলে, স্ত্রীলোকেও বলে: প্রমাণ চাই; প্রমাণ দাও।

কি প্রমাণ চাও তুমি? আর কি প্রমাণ দেব অন্ধকে যে আশ্বিনের নিঃসীম নিরুপম নীলে, মৃগনাভির গন্ধে মাতাল অনিলে প্রমাণ পেলে না তাঁর? কি প্রমাণ পেলে না তাঁর? কি প্রমাণ দেব তাকে, যে হতভাগ্য মহামারী, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লবে তাকিয়ে দেখল না সেই অভয়ংকরকে ভয়ংকরবেশে? প্রতি অণুতে সে পরমকে দেখল না, পরমাণু তার হাতে বিপজ্জনক বোমা ছাড়া আর কি!

এই লোকেই, এই স্ত্রী-লোকেই ডাক্তারের কাছে প্রমাণ চায় না। ডিগ্রি আর ষ্টেথিসকোপ দেখেই তুলে দেয় ছেলের জীবন-মরণ তার হাতে। অসুখ সারলে বলে ধন্বন্তরী; অসুখ না সারলে বলে, ভগবান কি নিষ্ঠুর। এরাই ভক্তের কপালে চন্দনের তিলক দেখলে বলে ভণ্ড। ডাক্তার সারাতে না পারলেও তার কি দেয়; কিন্তু দেবার পরেও যদি পুত্র না বাঁচে তাহলেই কালাপাহাড়ের মতোই করতে চায় সব লণ্ডভণ্ড!

এইসব ভাগ্যাহিতেরা জানে না যে, যে বাঁচাতেও পারে না, মারতেও পারে না, সে-ই হচ্ছে ধন্বন্তরী, যে বাঁচায় এবং মারে সে-ই হচ্ছে শ্রীহরি!

চারশো ভোল্ট মাত্র বিদ্যুত-বিচ্ছুরণ যেখানে সেখানে মড়ার মাথা-আঁকা সতর্কবাণী: সাবধান! ছুঁইলেই মৃত্যু! ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হাতে নন-কণ্ডাক্টর বর্ম পরে; কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করে ভয়ে ভয়ে। অথচ মানবদেহ যা সেই দেবালয়ের প্রদীপ, সেই দুর্লভ দেহকে মানব গঠিত করছে না অনির্বচনীয়ের আবির্ভাবের জন্যে। বরং বলছে পণ্ডিত মূর্খের দল, যে যিনি দেহাতীত, দেহের সংগে তাঁর সম্পর্ক কি? না। যিনি দেহাতীত, তিনি দেহেই স্থিত আবার। এবং এই দেহ কেবল রক্তি-র জন্যে নয়; মানবদেহ অনির্বচনীয়ের আরতির দেহকে না বাঁধলে দেহাতীতের সে তার যে বাজে না! রমণের আস্বাদের চেয়ে পরার্দ্ধগুণ শিহরণ যাতে সেই রমণীয়ের আস্বাদ অযোগ্য দেহে বহন করবে কে?

বিবেকানন্দ যখন নরেন, তখন রামকৃষ্ণ স্পর্শে কেঁদে উঠেছিলেন তিনি: আমার মা আছে; ভাই আছে। সংসার আছে। এ কি করলে তুমি? রামকৃষ্ণ সংবরণ করেন শক্তি মুহূর্তে; সেই শক্তি যা নরদেহ সহ্য করতে পারে না। পারে কেবল নরেন্দ্রর বীর্য-অক্ষয় দেহ বরণ করতে; বরণ করতে পারে যে মনোহরণকে!

এবং তখনই পারে কেবল, যখন সে দেহ হয় নিঃসন্দেহ-নিষ্পাপ!

সেই লৌকিক জগতে অলৌকিক বলি আমরা যাকে, আমরা যারা কেউ নানা মত, নানা পথভ্রান্ত, জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুমান প্রমাণ-

মান-অভিমান-তর্ক-বিচার-বিশ্বাস-অবিশ্বাসের গোলকধাঁধায় উদ্‌ভ্রান্ত, তাদের প্রয়োজনে তিনি আসেন না। তিনি আসেন তাঁর নিজের প্রয়োজনে। কংসের যখন সময় হয়, আমাদের নির্বোধ বিচারে যা কুসময়, তখন মেলে কৃষ্ণের দর্শন! নৃসিংহমূর্তিতে ভয়ংকরের বেশে শুভ অভয়ংকরের আগমন। পার্থ যখন গাণ্ডীব ফেলে দেন মিথ্যা অহংকারে, তখন হুঙ্কার দেন পার্থসারথি! মামেকং শরণং ব্রজ! দুঃখের বরষায় চক্ষের জল নামলে আসেন তিনি; বক্ষের দরজায় থামে বন্ধুর রথ। দ্রৌপদী যতক্ষণ কাপড়ের প্রান্ত চেপে ধরে আছে ততক্ষণ নয়; যতক্ষণ না ঊর্ধ্ববাহু হয়ে বলছে কৃষ্ণসখী: হা কৃষ্ণ! ততক্ষণ দেখা নেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণির!

আবার 'পরধর্মো ভয়াবহ, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়।' বলবার জন্যে এই পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে তাঁর উদয় দেখেছি আমরা কতবার! রামের বেশে আসেন যিনি রাবণ উদ্ধারে; নৃসিংহের বেশে হিরণ্যকশিপু-মুক্তির কারণে; শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হয়ে আসেন যিনি চৈতন্য দিতে অচৈতন্যকে, তিনিই আসেন আবার রামকৃষ্ণ হয়ে, কৃষ্ণের কথা রাখতে, 'সম্ভবামি যুগে যুগে।' যুগে যুগে তাই সম্ভব হয় অসম্ভব, অসম্ভব হয় সম্ভব! যখন মনে হয় বৌদ্ধধর্ম ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ভারতবর্ষকে; আসমুদ্র-হিমাচল যখন কেঁপে ওঠে, কেঁদে ওঠে: বুদ্ধং শরণ গচ্ছামি। তখন আসেন মুণ্ডিতমস্তক মহাযোগী দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণপাণিতে নিয়ে অদ্বৈত ঐশ্বর্য; আসেন শংকর! চির পুরাতন মন্ত্র চির নূতন কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ভুবনমনোমোহিনী ভারতবর্ষের পথে প্রান্তে; কিং করোমি কঃ গচ্ছামি, কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিম্।

ঠিক এমনই আবার আরেক দিন যখন মনে হয়েছিলো খৃষ্টধর্ম ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ভারতভূমিকে, যখন মনে হয়েছিলো, হিতবাদের অহিত, জড়বাদের অবিশ্বাস নড়িয়ে দেবে ভারতের বিশ্বাসের ভিতকে তখন এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে রাম এবং কৃষ্ণ একাধারে যিনি রামকৃষ্ণ শুধু এই বিবেকানন্দময় বাণী গুঞ্জরণ করতে কুম্ভ-কর্ণে যে ভারতবর্ষ কেবল ভূমির নয়; ভূমার।

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিলে রাত্রি প্রভাত হবার আগেই ভারতের বিশ্বাসের প্রভাত আবার অবিশ্বাসের অমারাত্র হয়ে দিলো দেখা! শ্বেতদ্বীপ থেকে যারা এলো শাসনের নামে শোষণ করতে তারা আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং ধর্মকে আঘাত করলো। অল্প ব্যয়ে, সামান্য জনশক্তি সম্বল করে রাজত্ব করতে হলে এত বিরাট দেশের ওপর, তারা দেখল সব চেয়ে সহজ রাস্তা হচ্ছে ভারতীয়দের মনে নিজের দেশ সম্পর্কে বিদ্বেষ জাগানো। ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজি চাল, সাহেবদের মোসাহেবে পরিণত করে তুলল দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষাকে। আপনার ভুবনে ভুলল ভারত হলো 'ক্যাপটিভ লেডি' সে প্রকাশ্যে বললো: ইংরেজিতে বলো, ইংরেজিতে লেখো, স্বপ্ন দেখো যদি, তাও দেখো ইংরেজিতে।

স্বপ্নের নয়; ঊনবিংশ শতাব্দী স্বপ্নের যত তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃস্বপ্নের কাল!

সেই সময়ে, সেই দুঃসময়েই এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। একা নয়; একের পর এক এলেন তাঁরা। রামকৃষ্ণ থেকে বিজয়কৃষ্ণ সেই, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'-র প্রতিশ্রুতি রাখতেই, পরিশ্রুত রাখতে স্মরণের অতীত কাল থেকে অবিস্মরণীয় অবিনাশী বিশ্বাস: নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ঢেউ এসেছিলো; নবজাগরণের ঢেউ; পুরাতনের সঙ্গে নবীনের প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের, ভক্তির সঙ্গে যুক্তির ভাববিরোধের যুগসন্ধিক্ষণে এসেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। সন্ধি করতে আসেননি; এসেছিলেন যুদ্ধ করতে! মিথ্যার সঙ্গে যুদ্ধ; যুদ্ধ কুসংস্কারের সঙ্গে! কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ-বিজয়ী কৃষ্ণের মতোই এ যুদ্ধেও জয়লাভ করেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ!

কি পরিমাণ যুদ্ধ তাঁকে সেদিনকার সমাজের সঙ্গে করতে হয়েছিলো; শুধু সমাজের সঙ্গে কেন, আত্মীয়র সঙ্গে, 'আত্ম'-র সঙ্গেও। তারই পরিচয়ে এই দিব্যজীবন, এই দীপ্ত, উদ্দীপ্ত জীবন আজও প্রদীপ্ত!

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত বিজয়কৃষ্ণ উপবীত ত্যাগ করেন এক সময়ে। আত্মীয়-পরিজনরাও তাঁকে ত্যাগ করেন প্রায়। কিন্তু তাতে বিচলিত হবার পাত্র নন বিজয়কৃষ্ণ। কিন্তু মাঝে মাঝে মূর্তিতে অবিশ্বাসীর মনে নতুন করে বিশ্বাসের জন্ম দিতে যখন স্বয়ং গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর আবির্ভূত হন সম্মুখে তখনও কোন্ ধর্ম, কোন্ শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে অস্বীকার করেন তাঁকে। এবং শ্যামসুন্দরও আশ্চর্য সুন্দর! তিনি বেছে বেছে তাকেই কি দেখা দেবেন যে তাঁর দেখা পেলেও বলবে, এ দেখা ঠিক দেখা নয়, তার সঙ্গেই কি যত কথা তাঁর, যে তাঁর কথা শুনেও বলবে, এ শোনা খাঁটি সোনা নয়!

সারাদিন তৃষ্ণায় জল দেয়নি শ্যামসুন্দরকে। সেই তৃষ্ণার বার্তা স্বয়ং শ্যামসুন্দর তোলেন বিজয়কৃষ্ণের কানে। বিজয়কৃষ্ণ যখন সে কথা বাড়ীর কর্ত্রীর কানে তুললেন, তখন তিনিও প্রথমে অবিশ্বাস করেন; পরে আবিষ্কার করেন বিজয়কৃষ্ণের কানে শ্যামসুন্দরের অভিযোগ সত্য!

তাই পরবর্তী জীবনে একদিন কাশীতে ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণকে তাঁর গুরুদেব পরমহংসজী বলেছিলেন: এসব খোলস সময় হলেই খসে যাবে!

খসে গিয়েছিলো বিজয়কৃষ্ণের অলৌকিকে অবিশ্বাস! ধ্বসে গিয়েছিলো যুক্তির অচল পাহাড়; ভক্তির মুক্তধারা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো অহং-এর অচলায়তনকে। ঈশ্বর নির্দিষ্ট পুরুষ বহু মত, বহু পথের শেষে যেখানে এসে পৌঁছলেন, সেখানে ব্রাহ্ম বা হিন্দু নেই; আছে কেবল ব্রহ্ম। নদী যত পথেই ঘুরে আসুক তার মৃত্যু, তার মুক্তি ওই সিন্ধুতেই। বিজয়কৃষ্ণ হিন্দু না ব্রাহ্ম কি ছিলেন, কোন্‌টা কত দিন ছিলেন তার চুলচেরা হিসাব জানি না; জানি কেবল, তিনিও সেই নদী যার জীবনসিন্ধু হচ্ছে ব্রহ্ম!

ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ; বিশ্বাস করেন না প্রতিমায়। মূর্তি ধরে অনু এসে দাঁড়ান শ্যামসুন্দর; বলেন: আমায় অলংকার গড়িয়ে দিতে বল তোর কাকীকে। তার কাছে টাকা আছে। অলংকার উপলক্ষ্য মাত্র; লক্ষ্য,—বিজয়ের অহংকার চূর্ণ করা! অবিশ্বাসের অহংকার। বিজয় বলেন: আমাকে কেন? কাকীকেই বল না কেন? শ্যামসুন্দর হাসেন: সেই ক্ষমাসুন্দর হাসি: তাকেও বলেছি কাল; জিজ্ঞেস কর কাকীকে। কটি টাকা লুকোনো ছিলো কাকীমার কাছে। লুকোনো রইলো না সেই অর্থ; তাই দিয়ে তৈরী হলো শ্যামসুন্দরের সোনার চূড়ো। কাকীমার লুকোনো সামান্য টাকা নয়; বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে লুকোনো অসামান্য ঐশ্বর্য,—তাকেই বাইরে টানছেন শ্যামসুন্দর। সোনার চূড় পরতে চাইছেন না শুধু; বিজয়কৃষ্ণ সেই বিশ্বাসের স্বর্ণ চূড়ায় নিয়ে যেতে চাইছেন তুলে; দেখাতে চাইছেন চোখ খুলে দিয়ে সে নিখিল বিশ্ব এক বিশ্বনাথের প্রতিমা!

বিজয়ের দিক্ বিজয়ের সেই সুরু! সেই দিগ্বিজয় শ্যা ... আজ; সারা নেই!

নবদ্বীপে জ্বলে ওঠে নতুন দীপ। উপবীত ত্যাগী বিজয়কৃষ্ণকে দেখেন চৈতন্যদাস। বলেন: তোমার ললাটে তিলক আর গলায় কণ্ঠি দেখছি অদূর ভবিষ্যতে!

ঠিকই দেখা যায়; ঠিকই দেখেছেন চৈতন্যসিদ্ধ মহামানব। স্থূল দুই চোখে দেখলে, শিব তো শ্মশানচারী, নেশাসক্ত, ভিখারী মাত্র। কিন্তু তৃতীয় দৃষ্টি খুলে গেছে যার সে তো দেখবেই সেই জটা, সৃষ্টির প্রাণগঙ্গাকে সেখানে ধরে রেখেছেন গঙ্গাধর! তার দৃষ্টি এড়াবে কি করে উমানাথ, সূক্ষ্ম দৃষ্টির সামনে যার আবির্ভূত সেই ত্রিশূল,—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের পরমাশ্চর্য প্রতীক! প্রতিমায় বিশ্বাস আর অবিশ্বাসে এসে যায় কি, অপরূপের আলো লেগেছে যাঁর চোখের কালোয় তার কলমে তো উচ্চারিত হবেই, 'হে ভয়ঙ্কর! ওহে শঙ্কর, হে প্রলয়ঙ্কর!'

উপবীত নেই বিজয়গাত্রে; বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য, শুনে, কালনার ভগবানদাসজী হাসেন: শ্রীঅদ্বৈতেরও বালাই ছিলো না উপবীতের; শ্রীঅদ্বৈতের সন্তানের নেতৃত্ব যায়নি তাতে; ব্রাহ্ম-সমাজেই গোঁসাই আমার সেই আচার্যপদেই আসীন!

তবু বিদ্রূপ করে কেউ! জুতো-জামা-পরা আধুনিক আচার্য! চরমের করুণা-প্রাপ্ত, পরমভাগবত, ভগবানের দাস, ভগবানদাসের চোখে এবার অশ্রুর মুক্তো টলমল করে: নিজের লজ্জা নিজেকে করতে হয়েছে সে গোঁসাইপ্রভুর,—এ লজ্জা তো আমাদের ভাই—[ভারতের সাধক: তৃতীয় খণ্ড]।

চৈতন্যদাস প্রথমে; তারপর এই ভগবানদাস। এঁদের কটি কথায় ঘটে যায় সেই অন্তর্বিপ্লব; কোটি কথায় যা ঘটেনি এতকাল। চাতক শুনতে পায়, মেঘের গুরু গুরু!

'বৈশাখের উদাসী আকাশে অকস্মাৎ আসে ভৈরবের হাঁক।'

শানবাঁধানো কলকাতার পাষাণ হৃদয়ও গলে যায় বিজয়কৃষ্ণের পায়ের তলায়। ছেঁড়া চটি সারাতে দিয়েছিলেন একদিন এক মুচিকে; মেছোবাজার স্ট্রীটে। জুতো সেলাই হয়ে গেলে বিজয়কৃষ্ণ পয়সা বার করে দিলেন। তার থেকে দুটি মাত্র পয়সা নিয়ে মুচি গুটিয়ে ফেললো তার ব্যবসার সাজ-সরঞ্জাম; তারপর গুটি গুটি চললো গঙ্গার দিকে। বিজয়কৃষ্ণ অনুসরণ করতে করতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন সেই মুচি জাতিতে ব্রাহ্মণ; মস্ত মহান্ত! মহন্ত অবগত হলেন সেই চর্মকর্মেতর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে। মহন্ত বললেন: অতিথি-সেবার আগে একদিন খেয়ে ফেলেছিলাম বলে, গুরু বলেছিলেন! তুই কিসের সাধু? তুই চামার—! গুরুবাক্য যাতে মিথ্যা না হয় তাই আজও আমি চামারবৃত্তি ত্যাগ করিনি!

সাধু নাগ মশায়কে ঠিক এমনই একদিন বলেছিলেন: কাজকর্ম ছেড়ে দিলি; এখন ন্যাংটো হয়ে মরা ব্যাং ধরে খা! পিতৃসত্য পালনের জন্যে শ্রীরামচন্দ্র গিয়েছিলেন বনে; পিতৃবাক্য পালন করতে সাধু নাগ মশায় মুহূর্তের মধ্যে বস্ত্রত্যাগ করেন; উঠোনের ওপর পড়ে থাকা মরা ব্যাং মুখে দেন নিজের!

গুরু-তিরস্কারের মান রাখতে অভিমান ত্যাগ করেন যে চামার তার চেয়ে বড় ব্রাহ্মণ আর কে?

তবু গুরুতে বিশ্বাস হয় না জগদগুরুর দর্শনাভিলাষী বিজয়কৃষ্ণের। জগদগুরুর কাছে পৌঁছতে হলে গুরু চাই,—একথা তাঁকে বলেন কলকাতার রাস্তায় আরেক সাধু; গুরু হচ্ছে সেই ভিৎ যার ওপর বিশ্বাসের ভিত্তি গড়ে না উঠলে কেউ জগৎগুরুর হতে পারে না প্রত্যক্ষকার।

সেই গুরুর অপেক্ষায় ঘুরে বেড়ান বিজয়কৃষ্ণ! শ্রীরামপদ স্পর্শের জন্যে প্রতীক্ষা করেন অহল্যা!

ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে যেতেই হয় কাশীতে। বিশ্বপরিক্রমার পরে যেতে হয় বিশ্বনাথ-এর পরিক্রমায়। বিশ্বনাথের ভূমি বারাণসী; বিশ্বাসের জ্বলন্ত পটভূমিকা! কাশীতে তখন দুই বিশ্বনাথ; মন্দিরে অচল আর গঙ্গার ঘাটে সচল বিশ্বনাথ তৈলঙ্গ স্বামী!

সেই অচল বিশ্বনাথের ভূমিতে সচল বিশ্বনাথ কালীর মন্দিরে মূত্রত্যাগ করে বলেন: গঙ্গোদকং; মা কালীর গায়ে তা ছিটিয়ে বলেন, পূজা!

মূত্রধারায় আর মুক্তধারায় ভেদ জ্ঞান লুপ্ত যেখানে সেই কাশীতে শেষ পর্যন্ত আসতেই হলো বিজয়কৃষ্ণকে; আসতে হবেই! বিশ্বের সবাইকেই আসতে হবে আজ অথবা কাল, যৌবনে কিংবা বার্দ্ধক্যে; এজন্ম বা পরজন্মে জন্ম-মৃত্যুর অতীত এই ভূমিতে। বিশ্বের মধ্যে থেকেও যা বিশ্বের ভূমি নয়; বিশ্বাসের ভূমি, বিশ্বনাথের ভূমি।

[ক্রমশঃ।

মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের পত্নী শ্রীমতী কেনেডী দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বাসভবনে হোলি উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। চিত্রে তাঁকে শ্রীনেহরুর ললাটে আবির পরিয়ে দিতে দেখা যাচ্ছে।

● ● ●

সংগীত ও মাজ

শ্রীজ্যোতির্ময় মৈত্র

সংগীত যুগ যুগ ধরে গোষ্ঠী, দল এবং পরিবারের কার্য্যকলাপ, মানসিক অনুভূতি এবং ভাবাবেগের সংগে জড়িত আছে। সংগীত এবং ইহার উপভোগ্যতাকে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ বলা যায়। স্বরগ্রামের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে আদিম মানবেরা তাহাদের দৈহিক সহ্য শক্তি যতক্ষণ পর্য্যন্ত সীমা অতিক্রম করত না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নৃত্য করত। কারণ, কয়েক প্রকারের ছন্দ ও তাল সমন্বিত স্বরগ্রাম পেশীর পুষ্টি সাধন করে এবং ক্লান্ত অবসন্ন স্নায়ু ও পেশীগুলিকে নবতর শক্তি দ্বারা বলশালী করে, এই চিন্তা সেকালেও ছিল। কিন্তু লালিত্য বিহীন ধ্বনিও অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, কোন কোন শব্দ সাময়িক কালের জন্যও উৎসাহ বা উদ্দীপনা বৃদ্ধি করিতে পারে, কোন কোন বিশেষ পরিবেশে তাহাও বুঝিত। স্বরগ্রামের যে যে শব্দ এই সকল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, সেইগুলি সেই সকল আত্মসংরক্ষণশীল মানসিক অনুভূতিতে সহজাত প্রবৃত্তিগুলিও উদ্দীপ্ত হত। উচ্চগ্রামের শব্দ দ্বারা যে দক্ষতা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অচিরকালের মধ্যেই ক্লান্তি এবং দক্ষতাহীনতায় পর্য্যবসিত হয়, শব্দ আছে তাহা শব্দ এবং গোলমালের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট পার্থক্য নাই বরং কারোর নিজস্ব মনোভাবই কোন কোন আওয়াজ গোলমাল অথবা শব্দ কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সাহায্য করে তাহা প্রয়োগের দ্বারা অনুভব করত। এর পর এলো যন্ত্রবাদ্য বাদনের শব্দের প্রয়োগ, যে শব্দগুলি সহজেই, প্রতীয়মান হয় না, সেগুলি কমপক্ষেও সংগীতের আবেগপ্রধান বিষয়বস্তু এবং সৌন্দর্য্যমূলক মূল্যের সৃষ্টির ধারক হতে আরম্ভ হয় ও ব্যক্তিবিশেষের নিকট শব্দগ্রাম বলিয়া প্রতীয়মান হতে লাগল। আদিম যুগ থেকে সংগীত, কোন নির্দিষ্ট উপশমকারী প্রভাব সম্পন্ন কি না তাহার চিন্তা ছিল। সংগীত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে একটি ভূমিকা গ্রহণ করিত। থেরশাস্ত্র 'সংগীত চিকিৎসার' অন্তর্ভুক্ত। সংগীতের প্রয়োগে থেরপুত সমাজ উপকারিতা অনুভব করতেন ও অনুরাগী ছিলেন।

উত্তর-বংগের রংপুর (অধুনা পাকিস্তান) এবং জলপাইগুড়ির রাজবংশীরা যে সকল দেব-দেবীর উপাসনা করতে আরম্ভ করে, সেই অসংখ্য দেবতার একটি হলেন "মহাকাল" অর্থাৎ মহান মৃত্যু নামে অভিহিত। তাহারা এই দেবতাটিকে মহাকাল ঠাকুর নামে অভিহিত করিত এবং তাহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, মহাকাল ঠাকুর পর্বত এবং অরণ্যের দেবতা, এই দেবতাকে উপযুক্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ এবং উপযুক্ত উপহার দ্রব্যাদি উৎসর্গের দ্বারা যদি পরিতুষ্ট না করা যায়, তাহা হলে তিনি অতিশয় রাগান্বিত হয়ে নরখাদক ব্যাঘ্র মানব জাতিকে হত্যা করবার জন্য পাঠাতেন। এই রাজবংশীরা এই দেবতাটিকে এত ভয় করত যে, যখন তাহারা সত্য কথা বলবার শপথ গ্রহণ করত, তখন এই দেবতাটি সম্বন্ধে তাহাদের ভীতিরও উল্লেখ ছড়াগানে পাওয়া যেত।

"আমি অবশ্যই সত্যকথা বলব, যদি আমি না বলি, তাহা হলে যেন আমি, আমার স্ত্রী এবং আমার সন্তানেরা সকলেই মহাকালের (যিনি বন্যজন্তুর দেবতা) রোষ দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হই। ব্যাঘ্র ও ভল্লুকেরা আমাদের হত্যা করুক। পীড়া যেন আমাদের আক্রান্ত করে এবং আমাদের সকলকে সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সকল কিছুই যেন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।"

এই সকল গানগুলি 'চর্যা' গায়কিতে গাওয়া হত; এই সকল গায়ককে থেরপুত বলা হত। এই পদ্ধতি থেকেই কীর্তন গান পরবর্তীকালের রূপ পেয়েছে।

কালীকীর্ত্তন ঠিক কোন্ সময় থেকে প্রচলিত, তাহা অনুমান করতে গিয়ে দেখতে পাওয়া যায়—প্রাকৃত, পালি, রোমান থেকে মৈথলী ও পরে বংগজ হরফের পরিবর্তনের সময়। অনুমান প্রায় তিন হাজার বছর আগের যুগ।

চর্যাচর্যর যুগে কি কালীপূজা প্রচলিত ছিল ঠিক বর্তমান অর্থাৎ বিংশ শতকের বৈদিকের মত ?

এই প্রশ্নও গবেষণার বিষয়। তবে এই প্রসংগে সেকালের যে উপাখ্যান "কালিয় কুখিনিয়া-বথ" নামে প্রচলিত হয়ে শ্রীমৎ বুদ্ধ ঘোষ স্থবির-এর চেষ্টায় এশিয়া ও য়ুরোপীয় উপনিবেশে প্রচলিত হয়ে আছে। এই ঘোষক ও করণীক সমাজের বংশ গয়ার নিকট ঘোষপাড়ায় দুই থেকে তিন হাজার বছর আগে বর্তমান ছিলো। আমরা এই সমাজ কালচারের মানুষের কথা কতটুকু জানতে পেরেছি এই বিংশ শতকের কাছে? কিন্তু সিংহল, বর্মা, জাপান ইত্যাদি দেশের কালচার তাঁদের কথা আজ মনে রেখেছেন।

ঐ উপাখ্যান থেকে জানা যায়, আমরা বৈদিক প্রভাবে যখন প্রভাবান্বিত হয়ে মূর্ত্তি-পূজার কল্পনা রাজ শক্তির প্রভাবে আরম্ভ করলাম, তখনই এর নাম হয়েছে কালীযক্ষিণী। উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে "আমার সখী যক্ষিণী সুবৃষ্টি-দুর্বৃষ্টির কথা বলতে পারে, আমরা তাহার কথামত উচ্চ বা নিম্নভূমিতে শস্য বপন করি, তাই আমাদের সুজন্মা হয়। দেখছ না, আমাদের ভবন থেকে রোজ লাও-ভাত নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর জন্য। তোমরাও তাহাকে সাহায্য দাও,

দেখবে, তোমাদেরও কাজ-কর্মের প্রতি নজর রাখছেন।" এর পর সকল গ্রাম ও নগরবাসী তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার সেবা করতে আরম্ভ করে। এই কালীও সকলের কাজ-কর্ম দেখতে লাগলেন এমন কি তাহার বিশেষ লাভ হতে লাগল, বহু লোক তাহার অনুগত হল। পরে সে অনুক্রমে তাহাকে ভাত দেবার আটটি পালা প্রতিষ্ঠাপিত করেছিল। আজ পর্যন্ত জনসাধারণ তা পালন করছে। কালীকীর্তন পদাবলীতে বৈদিক যুগের প্রভাব পূর্বভারতে আট শ'শ বছরের মধ্যে বিস্তার হয়েছে। কিন্তু এইরকম বর্ণনা পদাবলীতে পাইনি। কিন্তু 'ধর্মপদট্‌ঠ কথায়' এর বর্ণনা আছে, যে বর্ণনা অনুযায়ী মূর্তি মৃৎশিল্পির কল্পনার মানসনেত্রে গঠিত হয়ে রূপায়িত হয়েছে। এই রূপায়নকে কেন্দ্র করে হুসেন সাহর রাষ্ট্রপরিচালন কালে তাঁর সভাসদগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে কীর্তন পদাবলী প্রচলন হয় তাহা অদ্যও একালেও প্রচলিত আছে।

রাগ, গ্রাম, স্বরবিন্যাস প্রভৃতি গৌড়িয় সংগীত ব্যাকরণের রীতিরও নমুনা কিছু বেঁচে আছে। কিন্তু ৩১৪ বছরের মধ্যে প্রাচীন বৈদিক রীতির লুপ্তি হয়েছে আমাদের ভারতবর্ষ হতে।

ধর্মপদের অ ট্‌ঠ কথা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষ স্থবির কর্তৃক প্রচার ও লিখিত হত। খৃষ্টীয় ৪১০-৪৩২ অব্দে মহানাম নামক পণ্ডিত মহাবংশ নামে ইতিহাসে লিখেছেন বুদ্ধঘোষ গৌড়রাষ্ট্র মগধ থেকে সিংহলের অন্তর্গত অনুরাধাপুর নগরে গমন করে পালী ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহা লঙ্কাদ্বীপে মহামহেন্দ্র স্থবির খৃষ্টপূর্ব ২৪১ অব্দে সংকলিত করে সিংহলী ভাষায় লিখিত ত্রিপিটকের অনুবাদ।

বুদ্ধঘোষ স্বীয় রচিত সংগীত গাথায় প্রারম্ভে প্রকাশ করেছেন আমি কুমার কস্তপস্থবির কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে পৌণ্ড্র-মাগধী ভাষায় পরিবর্তনে অগ্রসর হইলাম।

থেরেন বুদ্ধঘোষেণ ধীমতা অয়ং,
ধর্মপদট্‌ঠ কথা চ সোদন্তাভিধানক।
সতেবীস চতুসতা চতুসচ্চ বিভাবিনা,
সতত্তয়মিয় বণ্ণনং একেনূন সমুট্‌ঠিতা।
তাসং অট্‌ঠকথং, এতং করোন্তেন সুমিম্মলং,
যসন্তাতি পমাণায় ভাণবারেহি পালিয়া।

এই উপাখ্যান গ্রন্থে মূল গাথার সংখ্যা ৪২৩টি, উপগাথার সংখ্যা ২৯৫টি। লঙ্কাধিপতি শ্রীলদেব বর্মাভয় কস্তপ এই সকল গ্রন্থি গ্রন্থাকারে সম্পাদন করিয়েছিলেন। কিন্তু ইহার আগে শ্রীমৎ ধর্মসেন স্থবির রত্নাবলী নামে এক সিংহলী ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন।

পহারাঘোপরিয়ান তত্তি ভাসং মোনরমং,
গাথানং ব্যঞ্জনপদং য়ং তত্‌ থুন বিভাবিতং।
কেবলং তং বিভাবেত্বা সেসং তমেব অথ্‌ তো,
ভাসান্তরেন ভাসিসমসং আবহন্ত বিভাবিতং;
মনোসো পীতপামোজ্জিং অথ্‌ ধর্মপনিস্সিতন্তি।

(বুদ্ধঘোষ)

মনোপুব্বংগমা ধর্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া,
মনোমা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা;
ততো নং দুক্‌খমন্বেতি চক্কং'ব বহোতো পদংতি।
লোকমুক্ত মনে যদি কেউ কিছু কাজকর্ম করেন, তাহাকে পশ্চাতে

চাকায় যেমন চক্র যেমন গাড়ীর বাহন বৃষের পেছনে পেছনে যায় তেমনি আপনার পেছনেও দুঃখ তার অবিরাম গমন করে]

এই প্রসংগ কথকতা ও গদ্যে গল্পাকারে প্রকাশ পেয়েছে বিস্তৃত ভাবে। [ক্রমশঃ।

আমার কথা (৮৪)

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

নিষ্ঠা এবং প্রতিভা যাঁদের জীবনে যুগপৎ জনপ্রিয়তা এবং প্রসিদ্ধি এনে দিয়েছে তাঁদের তালিকায় শক্তিমান রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের নামটিও অনায়াসে অন্তর্ভুক্ত করা চলে। বর্তমান সংখ্যায় "আমার কথা"য় এই স্বনামধন্য শিল্পীর জীবন-কাহিনীই আলোচ্য। শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম আজ বত্রিশ বছর আগে। ১৩৩৭ সালের আশ্বিন মাসের কোন এক দিনে, (১৯৩০ খৃষ্টাব্দে) যথারীতি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় যাত্রা শুরু হল। তীর্থপতি ইনষ্টিটিউশানের ছাত্র হিসেবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। পরবর্তীকালে তিনি আশুতোষ কলেজের ছাত্র হিসেবে বি-এ পর্যন্ত পাঠ নিয়েছেন।

গানের প্রতি তাঁর আসক্তি বাল্যকাল থেকেই। ছেলেবেলায় সেই ফেলে আসা দিনগুলিতে তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করতেন সুরের প্রতি প্রবল আকর্ষণে সঙ্গীতের আবেদন তখন বালক চিন্ময়ের অন্তরে অন্তরে ধ্বনিত করত এক অনবদ্য ঝঙ্কার, পরবর্তীকালে সঙ্গীতই হ'ল জীবনপথের পদক্ষেপণের পরম পাথেয়। সঙ্গীতকে অবলম্বন করেই শিল্পীর জীবনের যাত্রাপথে পরিক্রমণের সূচনা।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়ক হিসেবে শ্রোতৃমহলে ইনি সমধিক পরিচিতি লাভ করলেও সঙ্গীতসাধনা ইনি প্রথমে শুরু করেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুশীলনের দ্বারা। কিছুকাল স্বনামপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ইনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ অধিকার করে ফেলে

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনুরক্ত হয়ে নিয়মিত ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা শুরু করলেন। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্যটি হল যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তিনি ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে শিক্ষালাভ করলেও রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ইনি প্রত্যক্ষ ভাবে কারো কাছে শিক্ষালাভ করেননি। রবীন্দ্রসঙ্গীত এঁকে আকর্ষণ করেছে, এঁর দরদভরা কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান এক অনবদ্য রূপ নিয়ে রসিক সমাজকে যথেষ্ট তৃপ্তি দান করেছে এবং করে চলেছে।

বেতার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর কলেজ জীবন থেকে যোগ। আশুতোষ কলেজের ছাত্র যখন, তখনই বেতারের মাধ্যমে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ইণ্টার কলেজিয়েট মিউজিক কম্পিটিশানে এঁর রবীন্দ্র-সঙ্গীত এক অসামান্য সাফল্যের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল, বর্তমানে বেঙ্গল মিউজিক কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত আছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিক বোর্ড অফ ষ্টাডিস-এর সঙ্গেও ইনি সংশ্লিষ্ট। বাঙলার এবং বাঙলার বাইরে নানা স্থানে সঙ্গীত পরিবেশন করে ইনি শ্রোতাদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তোলেন। অনবদ্য কণ্ঠের বিনিময়ে জনসাধারণের প্রীতি ও শুভকামনারূপী বিত্ত আজ তাঁর অধিকারগত। সম্প্রতি প্রদর্শিত "সঞ্চারিণী" ছায়াছবির রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিচালনার গৌরব এঁরই প্রাপ্য। এ ছাড়াও আরও কয়েকখানি ছায়া-ছবিতে ইনি নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে শিল্পীর যে সংযোগ গড়ে ওঠে তা শিল্পীর মতে তাঁকে লাভবান করে তুলেছে, তিনি বলেন যে জনসাধারণের সাধুবাদ তাঁর শিল্পীমনকে নানা ভাবে অনুপ্রাণিত করে তোলে। 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' শীর্ষক বিখ্যাত রবীন্দ্র-সঙ্গীতটিই তাঁর প্রথম রেকর্ড। কলেজ ছাড়ার কিছু পরেই এই গানটি তিনি রেকর্ড করেন। এ পর্য্যন্ত তাঁর গানের প্রায় আট-নটি রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে। বছরে অধিক সংখ্যক রেকর্ড করার পক্ষপাতী তিনি নন। তার কারণও নিজেই ব্যক্ত করে বলেন যে সংখ্যাধিক্যই গুণনৈপুণ্যের একমাত্র পরিচায়ক নয়। সংখ্যার প্রাচুর্য আর প্রতিভার নিদর্শন এক জিনিষ নয়ই বরং প্রতিভার প্রকৃত প্রকাশের ক্ষেত্রে সংযম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক সর্বোপরি শিল্পীকে সকল সময়েই নিজের সৃষ্টির সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। চিন্ময়বাবুর মতে গান হল ভাবপরিবেশনের একটি মাধ্যম। কথার সঙ্গে সুরের সম্পর্কটিকে অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করে সেই অনুভূতি প্রকাশের যথাযথ রূপই হ'ল আদর্শ সঙ্গীত পরিবেশন। ভাবীকালের সঙ্গীতের ইতিহাসে আমাদের নিজস্ব ভারতীয় সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতের এক বিরাট অবদানের স্বাক্ষর থেকে যাবে প্রসঙ্গতঃ এই ধারণা তিনি প্রকাশ করলেন। আমাদের সাক্ষাৎকারের অন্তর্গত বিভিন্ন আলাপ-আলোচনার মধ্যে শিল্পী ও সৃজনধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেন শিল্পীকে সকল সময়ে নতুন কিছু করার ও ভাবার চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকতে হবে। তাঁর মন হবে অভিসারী— নতুনত্বের অভিসারে তাঁর শিল্পিচিত্ত থাকবে উৎসুক। নতুনত্বের পিপাসায় তাঁরা শিল্পীমন থাকবে সদা আকুল। নতুনত্বের সাধনায় তাঁকে হতে হবে সমাহিত প্রাণ।

বাঙলার এই সার্থকনামা শিল্পীর দ্বারা সঙ্গীতজগৎ আরও সমৃদ্ধ হোক এই কামনাই করি।

বৈজু বাওরা বিরচিত গান

ধ্রুপদ

নাদ বিত্তা পার ক্বিনহুন পায়ো
রচ পচ নর জনম গবাঁয়ো।
নিয়ম স্বুর সাধনা সপ্ত সুর ম ...
পট দে দীপক গায়ো।
রূপকো দিবয়ো সোনেকী বাতী ...
ইকইশ মূরছা জোত দিখায়ো।
আরোহী অবরোহী বাইশ সুরত প্র...
নায়ক বৈজু দীপক গায়ো ॥

* * *

প্রথম মণি ওঙ্কার, দেবন-মণি মহাদেব,
জ্ঞানন-মণি গোরক্ষ, নদীদ-মণি গঙ্গা।
গীতকী সঙ্গীত মণি, সঙ্গীতকী সুর-মণি,
তাল মণি মৃদঙ্গ, নৃত্য মণি রম্ভা।
রাজন মণি ইন্দ্ররাজ, গজন-মণি ঐরাবত,
বিত্তামণি সরস্বতী, বেদ মণি ব্রহ্মা।
কহে বৈজু বাবরো, শুনিয়ে গোপাল লাল,
দিন মণি সুরজ, রৈম মণি চন্দা।

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।
গোষ্ঠে যবে নামে সন্ধ্যা শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি।
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল লজ্জিত বাসরশয্যাতে
অর্ধরাতে।
উষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি : শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

II {সা সা সা -া । সরা -া রা সা I রা -মা মা -জ্ঞা । -া -া -া -া I
ন হ মা ০ তা ০ ন হ ক ন্ না ০ ০ ০ ০ ০

I (মা মপা পা পা । পা -া পা ধণা I পধা ধা পা -া । -া -া পা -ধা I
ন হ ব ধূ সু ন্ দ রী০ রূ০ প সী ০ ০ ০ হে ০

I মা -াপ পা পা । পমা-ণা ধা ধপা I মা -পা -ধা পধপা । মা-জ্ঞা -া -া)} I
ন ন্ দ ন বা ০ সি নী উ ০ র্ ব০ শী ০ ০ ০

I মা-পা পা পা । পা -া ধা পধঃপঃ I মা-পা পা -া । -া -া -া -া I
গো ষ্ ঠে য বে ০ না মে০০ স ন্ ধ্যা ০ ০ ০ ০ ০

I পা -ণা ণা ণা । ণা -া ণা -া I ণা -র্সা র্সা র্সা । র্সা -ণা ণা -া I
শ্রা ন্ ত দে হে ০ স্ব র্ ণা ন্ চ ল টা ০ নি ০

I ণা র্সা র্সা র্সা । র্সা সা ণা -া I ধঃর্সণঃ -ধণঃ-ঃ ধা পা । মা মপা পা -া I
তু মি কো নো গৃ হ প্রা ন্ তে০০ ০০০ না হি জ্বা লো০ স ন্

I মা-ণা ণা ণা । পধা -া পা -া I -া -া -া -া । মা-পা পা পা I
ধ্যা ০ দী প খা ০ নি ০ ০ ০ ০ ০ গো ষ্ ঠে য

I পা -া ধা পধঃপঃ । মা-পা পা -া I -া -া -া -া । পা-ণা ণা ণা I
বে ০ না মে০০ স ন্ ধ্যা ০ ০ ০ ০ ০ শ্রা ন্ ত দে

I ণা -া ণা -া । ণা-র্সা র্সা র্সা I র্সা-ণা ণা -া । ণা র্সা র্সা র্সা I
হে ০ স্ব র্ না ন্ চ ল টা ০ নি ০ তু মি কো নো

I র্সা র্সা ণা -া । ধঃর্সণঃ ধণঃ-ঃ ধা পা I মা মপা পা -া । মা-ণা ণা ণা I
গৃ হ প্রা ন্ তে০০ ০০০ না হি জ্বা লো০ স ন্ ধ্যা ০ দী প

I পধা -া পা -া । -া -া -া -া I র্সা র্সা -া র্সা । র্সা র্সা র্সা -া I
খা ০ নি ০ ০ ০ ০ ০ দ্বি ধা য় জ ড়ি ত প ০

I র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I র্সা -া -া র্রর্সা । র্সা -া -ণা ণা I
দে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ক ০ ম্ প্র০ ব ০ ক্ ষে

I ণা -া -া র্সণা । ণা -দা ণদা দা I পা -া -া -া । -া -া -া -া I
ন ০ ০ ম্র০ নে ০ ত্র০ পা তে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I {ণা ণা ণা -া । ণা -া ণা ণা I ণা -ধা ধঃর্সণঃ -ধণঃ-ঃ । -া -া -দা -পা I
স্মি ত হা স্ সে ০ না হি চ ০ লো০০ ০০০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা -দা দা দা । দা -া দা পা I মা -পা পণা -ণদা । পা -া -া -দা I
ল জ্ জি ত বা ০ স র শ য্ যা০ ০ তে ০ ০ ০

I মা -ণা ণদা দা । পা -া -া -া} I {র্রা র্রা -া র্রা । র্রা র্রা র্রা -র্সর্রা I
অ বৃ ধং রা তে ০ ০ ০ উ ষা যু উ দ য় স ০০

I র্রা -া র্জ্ঞা -া । -া -া -া -া I র্রা র্রর্মা র্মা র্জ্ঞর্মঃর্জ্ঞঃ । -া র্রা র্সা -া I
ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ অ ন০ ব গু০০ ণ্ ঠি তা ০

I -া -া -া -া । র্সা র্রা রর্সা ণা I -দণা দা পা -া । -া -া -া -া} II II
০ ০ ০ ০ তু মি অ কু ০ণ্ ঠি তা ০ ০ ০ ০ ০

[বিশ্বভারতীর সৌজন্যে ।

রবীন্দ্রনাথের "মায়ার খেলা"র রেকর্ড

রবীন্দ্র-সঙ্গীত পিপাসু মহলে একটি পরম আকর্ষণীয় ও বিশেষ আনন্দদায়ক সংবাদ হচ্ছে যে বর্তমানে গ্রামোফোন কোম্পানী হিজমাষ্টার্স ভয়েস রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের "মায়ার খেলা" গীতিনাট্যটি একই সঙ্গে একটি লং প্লেইং রেকর্ডে (ELAP 1269) এবং ছ খানি রেকর্ডের অটোকাপলিং সেট হিসেবে প্রকাশিত করেছেন। গত ১৬ই মার্চ লাইট হাউস মিনিয়েচার থিয়েটারে বিশিষ্ট সাংবাদিকবৃন্দ রেকর্ডে অংশগ্রহণকারী শিল্পিবৃন্দ এবং অভ্যাগতদের সম্মেলনে মায়ার খেলা গীতিনাট্যটি বাজিয়ে শোনানো হয়। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলির মধ্যে অনেকগুলিই রেকর্ডের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, তাদের মধ্যে শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, শাপমোচন, চণ্ডালিকা, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সাধারণ্যে, ব্যাপক প্রচারের ক্ষেত্রে রেকর্ড একটি মুখ্য মাধ্যম। এই বিষয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রচেষ্টাও নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। রেকর্ডের সাহায্যে অমর ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের গানগুলির প্রচারের মহান কর্মে তাঁদের অবদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অবশ্য, রেকর্ডের গীতিনাট্যে মূল গীতিনাট্য থেকে বহু উল্লেখযোগ্য অংশ পরিবর্জিত হয়েছে কিন্তু তার ফলে কোথাও কোন অসংহতি সৌষ্ঠবহানি বা রসবিচ্যুতি ঘটেছে বলে আমাদের মনে হয় না। পরিচ্ছন্ন প্রয়োগকুশলতা সুষ্ঠ টিমওয়ার্ক এবং প্রশংসনীয় শিল্পী নির্বাচনে সমগ্র গীতিনাট্যটি এক রসোজ্জ্বল অবর্ণনীয় সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। বলা বাহুল্য পরিবেশ রচনা আবহসঙ্গীত এবং যন্ত্রশিল্পীদের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে সাধুবাদের দাবী রাখে। শিল্পীদের তালিকায় বহু খ্যাতিমান শিল্পীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মঞ্জু গুপ্তের নাম। এঁদের দক্ষতা অনবদ্য। শ্যামল মিত্র ব্যাপকভাবে আধুনিক গানের গায়ক হিসেবে প্রচারিত হলেও তাঁর গাওয়া স্বল্পসংখ্যক রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড এ ক্ষেত্রে তাঁর শক্তির সারবত্তার প্রমাণ করে, এখানেও রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁর ব্যাপকতরভাবে আত্ম-সংযোজন তাঁর বিশেষ প্রতিভার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের দরদী কণ্ঠ সমগ্র গীতিনাট্যটিকে নানা ভাবে পূর্ণতা আরোপ করেছে। এঁরা ছাড়াও সুমিত্রা সেন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলেন মুখোপাধ্যায়, বনানী ঘোষ, আলপনা রায়, কৃষ্ণা সেন ও শ্রীপর্ণা ঘোষ প্রমুখের গানও গীতিনাট্যটিকে এক সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। এঁদের প্রত্যেকের কণ্ঠ স্পষ্ট শ্রুত হয় এই সর্বাঙ্গসুন্দর গীতিনাট্যটির মাধ্যমে এঁরা আপন আপন দক্ষতার, শক্তির ও নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিলেন। এই "মায়ার খেলা"র বহুল প্রচার ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা আমাদের কাম্য।

গীতিনাট্য "মায়ার খেলা"র অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দসহ গ্রামোফোন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে, ই, জর্জকে মধ্যভাগে দেখা যাচ্ছে। রেকর্ডিং অধিকর্তা শ্রী পি, কে, সেন পশ্চাদভাগের সর্বদক্ষিণে পরিদৃশ্যমান।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের "রাবার" লাভ

ভারতের বিরুদ্ধে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল পর পর তিনটি টেষ্টে সহজেই জয়লাভ করে বর্ত্তমান টেষ্ট পর্য্যায়ে "রাবার" লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ক্রীড়ামোদীদের মনে জেগেছে, এই ভারতীয় দলটি কি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে "রাবার" লাভ ক'রছে—আর তারাই কি এর আগে দুর্দ্ধর্ষ অষ্ট্রেলিয়া দলকে ঘায়েল করেছিল। ভারত এইভাবে এবার পরাভূত অর্থাৎ নাজেহাল হবে এটা অনেকেই কল্পনা করতে পারেননি।

এবার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে "রাবার" লাভ করে ভারত বিশ্ব ক্রিকেট ইতিহাসে তাদের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল; কিন্তু আজ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মাটিতে ভারতের সকল গৌরব ধূলোয় লুটিয়ে গেছে।

প্রথম দু'টি টেষ্টে "ফাষ্ট বোলার" হলের "বাম্পার" ভীতি ভারতের বিপর্য্যয়ের কারণ হলেও পরে "স্পিন" বোলিং-এতেও ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যানরা কম ঘায়েল হননি। তৃতীয় টেষ্টে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ "বোলাররা" একটিও "বাম্পার" বল করেন নি। কিন্তু ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা গিবসের "স্পিন" বোলিং-এর কাছে একেবারে নাস্তানাবুদ হন। এক সময় খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হবে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু গিব্‌স ভারতের সে আশায় বাদ সাধলেন। তিনি মাত্র ছয় রাণে ভারতের নামকরা আটজন ব্যাটসম্যানকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিলেন।

সময় নষ্ট করে ম্যাচ "ড্র" করার পরিকল্পনা যে কতখানি ভুল হয়েছে, তা ভারত ভাল ভাবেই উপলব্ধি করেছে। অতিরিক্ত সতর্কতার সঙ্গে খেলে কোন খেলা "ড্র" করা যায় না। ভারত স্বাভাবিক ভাবে খেলে রাণ তোলার চেষ্টা করলে ফল ভাল হত—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তৃতীয় টেষ্টে দুজন ব্যাটসম্যান মাঞ্জরেকার ও সরদেশাই ভাল খেলেছেন সত্য, কিন্তু তাঁরা যে ভাবে মন্থর গতিতে খেলেছেন, তা সমালোচনার অপেক্ষা রাখে।

ভারতের অধিনায়ক নরী কনট্রাক্টর আহত হওয়ায় দলের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে সত্য—তবে সেই অজুহাতে তৃতীয় টেষ্টের শেষের দিকে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বিবাদের মধ্যেও এই আশাই সকলে করবেন—ভারতীয় খেলোয়াড়রা তাঁদের মনোবল ফিরিয়ে পান। তাঁরা স্বাভাবিক ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করে—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ক্রীড়ামোদীদের বুঝিয়ে দিক—হ্যাঁ! এই দলই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে "রাবার" পেয়েছে। ভারতের নওজোয়ানদের ক্রিকেটের ঐতিহ্য আজ ম্লান হয়ে যায়নি।

নিম্নে দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেষ্ট খেলার সংক্ষিপ্ত রাণ সংখ্যা দেওয়া হলো :—

দ্বিতীয় টেষ্ট

ভারত—১ম ইনিংস ৩১৫ (বোড়ে ১৩, নাদকার্ণি নট আউট ৭৮, ইঞ্জিনীয়ার ৫৩, উম্রীগড় ৫০, দুর্রাণি ৩৫; সোবার্স ৭৫ রাণে ৪ উইঃ ও হল ৭১ রাণে ৩ উইঃ)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস (৮ উইঃ ডিঃ) ৬৩১ (সোবার্স ১৫৩, কানহাই ১৩৮, ম্যাকমরিস ১২৫, মেনডোজা ৭৮, ওরেল ৫৮, ষ্টেয়ার্স নট আউট ৩৫; প্রসন্ন ১২২ রাণে ৩ উইঃ ও দুরাণী ১৭৩ ২ উইঃ)।

ভারত—২য় ইনিংস ২১৮ (ইঞ্জিনীয়ার ৪০, নাদকার্ণি ৩৫, উম্রীগড় ৩৪; হল ৪১ রাণে ৬ উইঃ ও গিবস ৪৪ রাণে ৩ উইঃ)

ভারত এক ইনিংস ও ১৮ রাণে পরাজিত।

তৃতীয় টেষ্ট

ভারত—১ম ইনিংস ২৫৮ (পাতৌদির নবাব ৪৮, দুরাণী নট আউট ৪৮, জয়সীমা ৪১, সারদেশাই ৩১; হল ৬৪ রাণে ৩ উইঃ, সোবার্স ৪৬ রাণে ২ উইঃ ও ওরেল ১২ রাণে ২ উইঃ)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংস ৪৭৫ (সলোমন ৯৬, কানহাই ৮৯, ওরেল ৭৭, হাণ্ট ৫৯, সোবার্স ৪২, এলে নট আউট ৪০, ম্যাকমরিস ৩৯; দুরাণী ১২৩ রাণে ২, নাদকার্ণি ১২ রাণে ২ উইঃ, বোড়ে ৮৯ রাণে ২ উইঃ ও উম্রীগড় ৪৮ রাণে ২ উইঃ)।

ভারত ২য় ইনিংস ১৮৭ (সরদেশাই ৬০, মাঞ্জরেকার ৫১, দুর্রাণি ৩৬; গিবস ৩৮ রাণে ৮ উইঃ ও ষ্টেয়ার্স ২৪ রাণে ২ উইঃ)।

ভারত এক ইনিংস ও ৩০ রাণে পরাজিত।

কণ্ট্রাক্টর আহত

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নরী কনট্রাক্টর বারবাডোজ দলের বিরুদ্ধে খেলার সময় "ফাষ্ট" বোলার গ্রিফিথের বলে আঘাত পান। বল তাঁর মাথার খুলিতে লাগে। দু'বার তাঁর মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়। বর্ত্তমান সফরে তার পক্ষে আর কোন খেলায় যোগদান করা সম্ভবপর হবে না। তবে আশঙ্কার কোন কারণ নেই। তাঁর অবস্থা দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। তাঁর স্ত্রী ডলি কনট্রাক্টরও স্বামীর কাছে হাজির হয়েছেন। সকলেই আশা করেন—কনট্রাক্টর সুস্থ হয়ে আবার ক্রিকেট আসরে ফিরে আসুন।

নরী কনট্রাক্টরের সাহায্য ভাণ্ডার

বারবাডোজ ক্রিকেট এসোসিয়েশন ভারতের অধিনায়ক নরী কনট্রাক্টরের চিকিৎসার জন্য একটা সাহায্য ভাণ্ডার খুলেছেন। কেনসিংটন ওভাল মাঠেই কিছু টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর পরিমাণ ৪৮৭ ডলার বা প্রায় ১৫০০ টাকা। পোর্ট অফ স্পেনের একটা সংবাদপত্রও সাহায্য ভাণ্ডার খুলেছে।

ভারতও এ বিষয়ে চুপ করে বসে নেই। ভারতের প্রতিটি মানুষই কন্‌ট্রাক্টরের জন্ত দুঃখ প্রকাশ করেছেন। গুজরাট ক্রিকেট এসোসিয়েশন কন্‌ট্রাক্টরের জন্ত এক লক্ষ টাকা সাহায্য ভাণ্ডার খুলেছে। এক দিনেই সেখানে পাঁচ হাজার টাকা উঠেছে।

সকলের সমবেত প্রচেষ্টা সাফল্যজনক হউক, কন্‌ট্রাক্টর সত্বর সুস্থ হয়ে উঠুক—এটাই সকলে আশা করেন।

বাম্পার বল লইয়া আলোড়ন

ভারতের এবারকার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে "বাম্পার" বল নিয়ে বিশ্বের চতুর্দ্দিকে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এর আগেও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও ইংলণ্ডের খেলার সময় "বাম্পার" বল নিয়ে কম আলোচনা হয় নি। কিন্তু এই ভাবে বল করা অবৈধ বলে ঘোষণা হয় নি। ক্রিকেট খেলার আইনে "সর্ট পিচ" বলে কথা উল্লেখ আছে। ব্যাটসম্যানকে ক্রমান্বয়ে "ফাষ্ট সর্ট পিচ" বলে করে ঘায়েল করার চেষ্টাকে অন্তায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের "ফাষ্ট বোলাররা" প্রায়ই "সর্ট পিচ" বলে মাপা বাউন্সার ছাড়তে থাকেন। এই সকল বোলারদের থ্রোইং-এর সংখ্যা যেন খুব বেশী। এই "বাম্পার" বল সাহসের সঙ্গে না খেলতে পারলে আঘাত লাগাটা অস্বাভাবিক নয়।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ডের সভাপতি শ্রীচিদাম্বরম ইম্পিনিয়ন ক্রিকেট কন্‌ফারেন্সের পরবর্ত্তী সভায় "বাম্পার" সম্পর্কে যে আলোচনার প্রস্তাব করেছেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক গডার্ড ও বারবাডোজ ক্রিকেট এসোসিয়েশনের মিঃ হ্যারল্ড গ্রিফিথ তার প্রতিবাদ জানান। গ্রিফিথ বলেছেন যে, "বাম্পার" বোলিংই হল "ফাষ্ট বোলারদের" ন্যায্য অস্ত্র। কোন ব্যাটসম্যানই "বাম্পার" বল পছন্দ করেন না। কিন্তু তা বলে এটা বন্ধ করে দেওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। তবে তিনি এটাও বলেছেন যে আম্পায়ারদের দেখা উচিত যে বোলার অতিরিক্ত "বাম্পার" বল না করেন।

ভারতের খ্যাতনামা প্রবীণ খেলোয়াড় সি, কে, নাইডু ও মুস্তাক আলি অবশ্য "বাম্পার" বলকে অবৈধ ঘোষণার সমর্থন করেননি। তাঁদের মতে "বাম্পার" ফাষ্ট বোলারদের অস্ত্র। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের "ফুট ওয়ার্ক" নেই বলেই তাঁরা আহত হচ্ছেন।

বাঙ্গালার খ্যাতনামা খেলোয়াড় পঙ্কজ রায় "বাম্পার" বল সম্পর্কে নাইডু ও মুস্তাক আলির মন্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন। তবে তিনি "ফুট ওয়ার্ক" সম্পর্কে বলেছেন যে নাইডু ও মুস্তাক আলির মতন বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাঙ্গী খেলোয়াড় খুব কম দলেই থাকে। পঙ্কজ রায় বলেন যে তাঁর মত বেঁটে খেলোয়াড়ের পক্ষে "বাম্পার" বলের ঠিকভাবে সম্মুখীন হওয়া সত্যই বিপজ্জনক! কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ পি সুব্বারায়ণ বলেছেন যে "বাম্প" বল নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

পাকিস্তানের সংবাদ পত্রেও "বাম্পার" বল সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা হয়েছে।

"বাম্পার" বল সম্পর্কে যে যেরূপ মন্তব্যই প্রকাশ করুন না কেন যে বোলিং-এ খেলোয়াড় আহত করার কৌশল থাকে—সেরূপ বোলিং না করাই যুক্তি সঙ্গত। এটাই ক্রীড়ামোদীরা চান।

অর্জ্জুন পুরস্কার বিতরণ

রাষ্ট্রপতি ভবনে দরবার হলে সম্প্রতি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ এস রাধাকৃষ্ণ "অর্জ্জুন পুরস্কার" বিতরণ করেন। ২০ জনের মধ্যে চার জন ম্যানুয়েল এ্যারন (দাবা), সেলিম ডুরানী (ক্রিকেট), রমানাথ কৃষ্ণণ (টেনিস) ও মহারাজা প্রেম সিং (পোলো) ভারতে না থাকায় বাকি ১৬ জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

খেলাধূলাও সরকারের সমর্থন লাভ করেছে এটা খুবই আশার কথা। গুরুচরণ সিং (এ্যাথলেট) নান্দু নাটেকার (ব্যাডমিণ্টন), সরবজিৎ সিং (বাস্কেটবল)। এল ডি' সুজা (মুষ্টিযুদ্ধ), প্রদীপ ব্যানার্জ্জী (ফুটবল)। পি, শেঠী (গলফ), শ্যামলাল (জিমন্যাষ্টিক), পৃথীপাল সিং (হকি), মহারাজা কারনী সিং (সুটিং), রাজবল্লী প্রসাদ (সাঁতার), কে, এস, জৈন (স্কোয়াস), জয়ন্ত ভোরা (টেবিল টেনিস), এ, পাথানি চাসী (ভলিবল), এ, এন ঘোষ (ভারোত্তোলন), উদয়চাঁদ (কুস্তি) ও এ্যানী লামসডেন (মহিলা হকি খেলোয়াড়) এই পুরস্কার পান। এদের ১৬ জন খেলোয়াড়কে অর্জ্জুন পুরস্কার ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত কাগজে হিন্দী ও ইংরাজীতে লেখা মানপত্র দেওয়া হয়েছে।

পাঞ্জাব দলের অষ্টমবার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ

সম্প্রতি ভূপালে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়ে গেল। পাঞ্জাব এক দিন অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করার পর দ্বিতীয় দিনে ভূপালকে পরাজিত করে অষ্টমবার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। গত বছর পাঞ্জাব "রাণার্স আপ" পায়—এ ছাড়া ১৯৩২, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫১ ও ৫৪ সালে পাঞ্জাব বিজয়ী হয়েছিল।

এশিয়ান লন-টেনিস প্রতিযোগিতায় মিক্সড ডাবলস ফাইনালে বিজিত রয় এমার্সন ও মিস ম্যাডোনা সাকটকে (অষ্ট্রেলিয়া) বিজয়ী ফ্রেড ষ্টোলি ও মিস লেসলি টার্ণারের করমর্দন করতে দেখা যাচ্ছে।

কাইন্যালে পাঞ্জাব ও ভূপালের এটা দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। প্রথম সাক্ষাৎকারে ১৯৫০ সালে পাঞ্জাব ৪—২ গোলে জয়ী হয়েছিল।

বাঙ্গালা দলও এবার অনেক তোড়জোড় করে জাতীয় প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল, কিন্তু প্রথম দিনই তারা দিল্লীর কাছে পরাজয় বরণ করে ফিরে এসেছে। এ থেকেই বাঙ্গালার হকি খেলার মান উপলব্ধি করা যায়। কেবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা না করে বাঙ্গালা হকি এসোসিয়েশনের এখানকার তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড়দের শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার।

বোম্বাই দলের উপর্য্যুপরি চতুর্থবার রণজি ট্রফি লাভ

বোম্বাই এবারও রাজস্থান দলকে এক ইনিংস ও ২৮৭ রাণে পরাজিত করে উপর্য্যুপরি চারবার রণজি "ট্রফি" লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে বোম্বাই দলের অবদান চিরদিনই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বোম্বাইয়ের ঐতিহ্য আজও সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। তবে কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় সমন্বয়ে গঠিত রাজস্থান দল এ বছর যে ভাবে পরাজিত হয়েছে তাতে সকলেই দুঃখ প্রকাশ করেছেন। নিম্নে খেলার সংক্ষিপ্ত রাণ সংখ্যা দেওয়া হলো।

বোম্বাই—১ম ইনিংস ৫৩১ (এ. এইচ ওয়াদেকার ২৩৫, রামচাঁদ ১০০; রাজ সিং ৮৬ রাণে ৪ উইঃ ও সুভাষ গুপ্তে ১৫২ রাণে ৪ উইঃ)।

রাজস্থান—১ম ইনিংস ১৫৭ (সূর্য্যবীর সিং ৩২, ভিন্নু মানকড় ২৮; সুভাষ গুপ্তে ১৩)।

রাজস্থান—২য় ইনিংস ৯৫ (হনুমন্ত সিং নট আউট ৪৮, ভিন্নু মানকড় ১৭)

এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দল গঠন কল্পে তোড়জোড়

ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা বলিন্দর সিং সম্প্রতি দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, সাঁতার, ভারোত্তোলন ও রাইফেল ছোঁড়া প্রভৃতি ক্রীড়ায় যোগদানের জন্য এথেলেটদের দল মনোনয়ন সম্পর্কে এমেচার এথেলেটিক ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার অনুসৃত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। এই খেলোয়াড়দের মনোনয়ন ব্যাপারে টোকিওতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্ততঃ দ্বিতীয় স্থান অধিকারী পর্য্যায়ের মান কিংবা তাঁদের বর্ত্তমান নৈপুণ্যের মান ইহার মধ্যে যাহা উন্নত বলে প্রমাণিত হবে—তাহাই বিবেচনা করার জন্য বিভিন্ন ফেডারেশনকে বলে ঠিক হয়েছে।

হকি, ফুটবল, বাস্কেটবল, ভলিবল, মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তি প্রভৃতি খেলার দল নির্ব্বাচন সম্পর্কে বলা হয়েছে এশিয়ান গেমস প্রতিযোগিতার অন্ততঃ তৃতীয় স্থান অধিকার করতে পারে সে বিষয়ে পাতিয়ালার ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ স্পোর্টসের কোন শিক্ষক কিংবা বিশেষ ভাবে নিযুক্ত কোন শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করে দল গঠন করেন। নিম্নে মনোনীত এথেলিট ও তাঁদের নির্দ্ধারিত মানের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

[পুরুষ বিভাগ]

১০০ মিটার দৌড়—পি, রাজশেখর (মাদ্রাজ), এন, ফেরাও (মহারাষ্ট্র), এন, সি, দেব (উত্তরপ্রদেশ), তাওদে (সার্ভিসেস), মহম্মদ কাশিম (অন্ধ্র), সোমায়া (মাদ্রাজ) ও কে, পাওয়েল (মহীশূর) নির্দ্ধারিত মান—১০'৭ সেকেণ্ড।

২০০ মিটার দৌড়—মাখন সিং (সার্ভিসেস), নাগাভূষণম (অন্ধ্র), মিলখা সিং (পাঞ্জাব), দলজিৎ সিং (সার্ভিসেস), এলেক্স সিলভেরিয়া (মহারাষ্ট্র) জগদীশ সিং (দিল্লী) ও অমরজিৎ সিং (পাঞ্জাব)। নির্দ্ধারিত মান—২১'৫ সেকেণ্ড।

৪০০ মিটার দৌড়—দলজিৎ সিং (সার্ভিসেস), মিলখা সিং (পাঞ্জাব), মাখন সিং (সার্ভিসেস), আলেক্স সিলভেরিয়া (মহারাষ্ট্র), জগদীশ সিং (দিল্লী) ও অমরজিৎ সিং (পাঞ্জাব)। নির্দ্ধারিত মান—৪৮'৫ সেঃ।

৮০০ মিটার দৌড়—দলজিৎ সিং (সার্ভিসেস), হাজারি রাম (রাজস্থান) ও বান সিং (সার্ভিসেস)। নির্দ্ধারিত মান—১ মিনিট ৫২'২ সেঃ।

১৫০০ মিটার দৌড়—মাহিন্দর সিং (সার্ভিসেস), প্রীতম সিং (সার্ভিসেস) ও জি, পিটার্স (মহীশূর)। নির্দ্ধারিত মান—৩ মিনিট ৫৮'২ সেকেণ্ড।

৫০০০ মিটার ভ্রমণ—ত্রিলোক সিং (সার্ভিসেস), হুকুম সিং (সার্ভিসেস) ও জি, পিটার্স (মহীশূর)। নির্দ্ধারিত মান—১৪ মিনিট ৪১ সেকেণ্ড।

১০০০০ মিটার ভ্রমণ—ত্রিলোক সিং (সার্ভিসেস), হাম সিং (সার্ভিসেস) ও নারায়ণ সিং (রাজস্থান)। নির্দ্ধারিত মান—৩০ মিনিট ৪২ সেকেণ্ড।

৩০০০ মিটার ষ্টিপলচেজ—চুণীলাল (সার্ভিসেস) ও মুক্তার সিং (সার্ভিসেস)। নির্দ্ধারিত মান—৯ মিনিট ৩'১ সেকেণ্ড।

১১০ মিটার হার্ডল—গুরবচন সিং (সার্ভিসেস) ও গুরদীপ সিং (সার্ভিসেস)। নির্দ্ধারিত মান—১৪'৫ সেকেণ্ড।

৪০০ মিটার হার্ডল—বলবন্ত সিং (পাঞ্জাব)। নির্দ্ধারিত মান—৫২'৮ সেকেণ্ড।

ম্যারাথন দৌড়—জগমল সিং (সার্ভিসেস) ও লাল সিং (সার্ভিসেস)। নির্দ্ধারিত মান—২ ঘণ্টা ২৭ মিনিট ২২ সেকেণ্ড।

দীর্ঘ লম্ফন—গুরুনাম সিং (সার্ভিসেস) ও সত্যনারায়ণ (মাদ্রাজ)। নির্দ্ধারিত দূরত্ব ২৪ ফুট ৬¾ ইঞ্চি।

সট পাট (লৌহবল নিক্ষেপ)—ডি, ইরাণী (মহারাষ্ট্র) ও যোগিন্দার সিং (সার্ভিসেস)। নির্দ্ধারিত দূরত্ব—৪৯ ফুট ৩¾ ইঞ্চি।

ডিসকাস নিক্ষেপ—ডি, ইরাণী (মহারাষ্ট্র), পদ্মমান সিং (সার্ভিসেস) ও বলকার সিং (সার্ভিসেস)। নির্দ্ধারিত দূরত্ব—১৫০ ফুট ১১½ ইঞ্চি।

ডেকাথেলন—গুরবচন সিং (দিল্লী)। নির্দ্ধারিত পয়েণ্ট—৫৯৬৮।

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার দৌড়—এস, ডি'সুজা (মহারাষ্ট্র), হকিন্স (পশ্চিম বাঙ্গালা), ভায়োলেট পিটার্স (মহারাষ্ট্র), সাইমা (মহীশূর), সরদেশ সোধী (দিল্লী), সি, পাইস (মহারাষ্ট্র) ও জে স্পিক্স (মাদ্রাজ)। নির্দ্ধারিত মান—১২'৩ সেঃ।

২০০ মিটার দৌড়—এস, ডি'সুজা (মহারাষ্ট্র) ও হকিন্স (পশ্চিম বাঙ্গালা)। নির্দ্ধারিত মান—২৬'১ সেঃ।

উচ্চ লম্ফন—ব্রাউন (পশ্চিম বাঙ্গালা)। নির্দ্ধারিত উচ্চতা—ফুট ১½ ইঞ্চি।

শিল্পী

সুশীল রায়

লাউঞ্জে এসে যখন দাঁড়ালাম, তখন দেখলাম—আমাকে কেউ চেনে না।

কিন্তু মস্ত অহংকার নিয়ে এসেছিলাম এখানে। ভেবেছিলাম, আমার মত এত বড় একজন গাইয়ে সেখানে পৌঁছানো মাত্র সকলে এসে আমাকে লুফে নেবে।

বিরাট হোটেল। তার মাপটা এখানে এঁকে দেখানো যাবে না, কুলোবে না এই কাগজে। লম্বা আর চওড়া যেমন, উঁচুও সেই অনুপাতেই। উঁচু সেই অনুপাতেই বলছি বটে, কিন্তু উচ্চতা যেন অনুপাতে একটু বেশিই।

আমিও মানুষটা লম্বায় খুব বেশি, চওড়ায় অবশ্য তত না। সেই জন্তে, নিজের চেষ্টাতে না হলেও, স্বাভাবিক ভাবেই মাথাটা বেশ উঁচু করেই এখানে প্রবেশ করলাম।

এবং আমি গাইয়ে, আর আমার চাহিদাও খুব বেশি। এই জন্তে আমার মাথা সহজেই বেশ উঁচু হয়ে আছে। অতএব, নিজের উপর ভরসা আমার আছেই, তার উপর এবার ডাক পেয়েছি এমন জায়গা থেকে যেখানে সচরাচর সাধারণ গাইয়ের ডাক পড়ে না।

সবিনয়েই বলব—আমি একজন সাধারণ গাইয়ে না। অন্ততঃ, আমি নিজেকে সাধারণ বলে মনে করিনে; আমার ভক্তরাও আমাকে অসাধারণ বলেই মান্য করে।

আমার নাম অনেকেই জানে। আপনারাও নিশ্চয় শুনেছেন। আমার নাম হরিহর সিদ্ধান্ত।

আমি যে একজন বড় গাইয়ে হব—এ সিদ্ধান্তে আমি এসেছি অনেক দিন আগে। যখন বয়স আমার দশ।

যাত্রার বই লিখতেন মন্মথেন্দ্রবাবু। তিনি টাইপিষ্টের কাজ করতেন এক সদাগরী আপিসে। যাত্রা-থিয়েটারে তাঁর সখ খুব। তাঁর বাবরি চুল ছিল, আর তিনি যাত্রার বই লিখতেন। আমার প্লে করার খুব সখ দেখে তিনি আমাকে একবার নামিয়েছিলেন। আজও মনে আছে অস্থমুনির উপাখ্যান নিয়ে সেই যাত্রাটা। আমি তাতে পার্ট করিনি, গান গেয়েছিলাম। যাত্রা তো আপনারা দেখেছেন। তাতে নিয়তি থাকে, অভিশাপ থাকে। তারা নাটকের পরিণতির আভাস-ইঙ্গিত দিয়ে যায় গান গেয়ে। আমি তেমনি নেমেছিলাম অভিশাপ হয়ে। কিন্তু শাপে বর হল। আমি খুব হাততালি পেলাম। গান নাকি গেয়েছিলাম অপূর্ব।

মন্মথেন্দ্রবাবু পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলেন, তোফা। গুরু মারা চ্যালা হলি যে, হরিহর।

গান অবশ্য আমি তাঁর কাছে শিখিনি। তিনি গাইতে জানতেন না। তবু, নিজেকে তিনি আমার গুরু বলে ঘোষণা করলেন কেন, বুঝতে পারিনি। সে কথা বোঝার চেষ্টাও করিনি অবশ্য।

কিন্তু আমি নিজেই ঠিক করে ফেললাম—আমি গাইয়ে হব।

বলুন সংকল্প পালন করেছি কি না। বলুন, গাইয়ে আমি হয়েছি কি না?

এ কথা আপনাদের কাছে আমি স্পষ্ট করেই জানাতে চাই যে, শুধু গান গাইতে জানলেই গাইয়ে হওয়া যায় না—গান তো কতজনই গাইতে জানে, কিন্তু হিসেব করে দেখুন তো, সংসারে গাইয়ে হয়েছে ক'জন! কেবল নিজের গলা সাধলেই চলবে না, যারা গান শুনবে—সাধতে হবে তাদের মনও। আমি মন সেধেছি। ফলও পেয়েছি। আমি এখন একজন নামকরা গাইয়ে।

কোনো জলসায় হরিহর সিদ্ধান্ত হাজির থাকবে জানতে পারলেই সেখানে লোকের ভিড় ঠেকানো দায় হয়ে ওঠে।

আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে সেই ঘটনাটার কথা? কলকাতা শহরের হিন্দুস্থান পার্ক অঞ্চলের সেই ইন্‌সিডেন্ট? বিরাট প্যাণ্ডেল—লোক ঠাসাঠাসি, তিল ধারণের আর জায়গা নেই। সেই ঠাসা প্যাণ্ডেলে হাজার হাজার লোকের সামনে আমি যখন গলা ছাড়লাম, অমনি বাইরে বেজে উঠল ভীষণ হল্লা। ব্যাপার কি? বাইরে ভীষণ ভিড়। কাতারে-কাতারে জড়ো হয়েছে লোক। তারা ভিতরে ঢুকতে পারেনি। ঢুকবার জন্তে তারা ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ করেছে গেটে, তারা চীৎকার করছে।

শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল—আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়। আগুন লেগেছিল প্যাণ্ডালে। পুলিশ এসেছিল।

আগুন ধরিয়ে দিয়েছি আমি মানুষের মনে। আমার গানে আগুন আছে।

সেই আমি, সেই হরিহর সিদ্ধান্ত, আজ এসেছে এখানে। এই বোম্বাই শহরে।

কিন্তু এ কি, লাউঞ্জে এসে যখন মাথা উঁচু করে দাঁড়ালাম, তখন মাথাটা কেমন যেন নীচু হয়ে গেল। আমাকে যেন কেউ চেনে না।

সংসারটা সত্যিই বড় বেইমান। দশ বছর বয়স থেকে গানের চর্চা করতে করতে যে লোকটা ত্রিশে এসে পৌঁছল, তার জীবনের একটানা এই চর্চার কি এই পুরস্কার?

কেমন যেন অদ্ভুতই লাগল ব্যাপারটা। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ।

লাউঞ্জটা মস্ত বড়। মোটা-মোটা দামী-দামী ভারি-ভারি সোফায় সমস্ত জায়গাটা ভরা। খুবই সৌখিন জায়গা, খুবই জমকালো।

কিন্তু এই শোভা আর এই সৌন্দর্য আমাকে যেন তেমন করে মুগ্ধ করতে পারছে না। আমি যেন কেমন বোকা আর বেকুব হয়ে গিয়েছি। এত চালাক, এত চটপটে, এত স্মার্ট বলে নিজেকে মনে করে এসেছি এতকাল—কিন্তু সে সব মনে করা কি আগাগোড়াই ভুল? ঠিক যেন ধরতে পারছিনে।

আর একটা কথা আপনাদের বলব। অকপটেই বলব। আমার গলায় নাকি কি-একটা জিনিস আছে, তাকে নাকি মাদকতা বলে। আমার গলা শুনে যারা মোহিত হয় তাদের বেশির ভাগই—

কিন্তু থাক্ সে কথা। এখানে এই লাউঞ্জে বসে আছেন যে রিসেপশনিষ্ট মহিলাটি, তাঁর ব্যবহার দেখে একটু চমকই বুঝি লাগল। এতটা উপেক্ষা এবং এতটা অনাদর তিনি আমাকে করছেন কেন?

মহিলাটিও বেশ মনোহর। যেমন চটপটে, তেমনি ছটফটে, তেমনি সুশ্রী, তেমনি নম্র।

বিরাট গানের জলসা বসছে এই বোম্বাই শহরে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বাছাবাছা আর্টিস্ট আসছেন। এই হোটেলে তাঁদের ওঠার ব্যবস্থা হয়েছে। এখানে এসে সকলে পৌঁছনো মাত্র রিসেপশনিষ্ট মহিলাটি প্রত্যেকের হাতে কামরার নম্বর দিয়ে দিচ্ছেন, মালপত্তর নিয়ে চলে যাচ্ছেন যে-যার কামরায়।

কিন্তু আমার মতন একজন আর্টিস্টের দিকে তাঁর তেমন মনোযোগ নেই কেন, ভাবতে ভালো লাগছিল না। মনে হল, হয়তো উনি চিনতে পারেন নি আমাকে। এই সামান্য কথাটা মনে করতে আমি সময় নিলাম অনেকটা। নিজের খ্যাতি আর দম্ভ নিয়েই নিশ্চয় বিভোর ছিলাম এতক্ষণ, সেই জন্যে এই সামান্য বিষয়টা মনে পড়তে সময় লাগল।

গলাটা সাফ করে, পাঞ্জাবির দুই পকেটে হাত গলিয়ে, একটু এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম, বললাম, "আমি—ইয়ে—আমি হরিহর সিদ্ধান্ত, বেঙ্গল থেকে আসছি।"

আমার গলা শুনে মহিলাটি মুখ তুলে আমার দিকে একটু যেন তাকালেন, অমনি একটু উল্লসিত হয়ে উঠলাম আমি। আর একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, "ইয়েস। হরিহর সিদ্ধান্ত।"

স্মিত হাসলেন মহিলাটি, ইসারা করে দূরের একটা সোফা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "একটু বসুন। সামান্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। কিছু মনে করবেন না।"

সে কি কথা! মনে করব কেন! এ তো উত্তম প্রস্তাব। অপেক্ষা নিশ্চয়ই করব। আর, এই যে পরিবেশ—এই আলো এই হাওয়া, নরম সোফার মধ্যে এই যে ডুবে বসার আরাম; এখানে কিছু মনে করার কথা উঠবে কেন।

মহিলারাই আমার গানের বেশি ভক্ত, আমার গলায় যে-মাদকতা আছে, তাতেই নাকি তাঁরা মোহিত। একথা যদি সত্যি তবে ঐ মহিলাটি এমন উদাসীন কেন? নিশ্চয় আমার গান তিনি শোনেননি, অথবা নিশ্চয় উনি গান কিছু বোঝেন না।

বসে-বসে নিজেকে এইভাবে সান্ত্বনা দিয়ে চলেছি। কতক্ষণ এইভাবে বসে আছি সে খেয়ালও তেমন নেই।

হঠাৎ চেয়ে দেখি, ইসারা করে মহিলাটি আমাকে ডাকছেন।
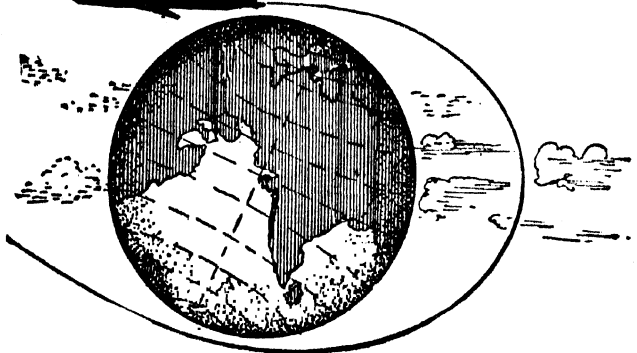
[illegible] উঠে ব্যস্ত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি একটা লম্বা ফর্দ তাঁর সামনে মেলে নিয়ে বসেছেন।

বললেন, "বেঙ্গল থেকে এসেছেন? লাইট মিউজিক? কি নাম বললেন যেন—হরিহর সিদ্ধান্ত? এক কাজ করতে হবে আপনাকে। আপনার থাকার ব্যবস্থা এখানে হয়নি। আমরা আরো কয়েকটা জায়গার ব্যবস্থা করেছি। আপনাকে যেতে হবে এ. ভি স্কুলে। বেশি দূর না—ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনের কাছেই।"

বুকের মধ্যে কি-রকম একটা যেন ব্যথা বোধ করলাম। এই সৌখিন হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা নয়, আমাকে থাকতে হবে একটা ইস্কুলবাড়িতে?

মহিলাটি বললেন, "এক্সকিউজ মি।"

মাপ করে দিলাম তাঁকে, তাঁকে মার্জনা করলাম। কিন্তু নিজের কাছে যেন কোনো কৈফিয়ৎ দিতে পারলাম না। এত বড় একজন পপুলার আর্টিষ্ট আমি, যার গান শোনার জন্যে কত না হাঙ্গামাই না ঘটেছে কত জায়গায়। তার জন্যে আজ এই আলাদা ব্যবস্থা কেন?

ঐ মহিলাটির উপর রাগ করে লাভ কি। রাগ হতে লাগল ব্যবস্থাপকদের উপর। আসলে, ওঁর দোষই বা কি। উনি তো হুকুম তামিল করার জন্যেই এখানে বসে আছেন।

বসে আছেন যেন সমস্ত লাউঞ্জটা আলো ক'রে। রূপে যাঁর এত জাঁক, গুণে তাঁর বুঝি কিছুই নেই। তা যদি থাকত তাহলে গুণের কদর করতে তিনি পারতেন। একজন গুণীকে তাহলে এ ভাবে এতক্ষণ বসিয়ে রেখে হয়রাণ করতেন না।

কিন্তু তবু মাপ করে দিয়েছি তাঁকে। মাপ করেছি বটে, সেই সঙ্গে একটু করুণাও করেছি। বেচারি গান শোনেনি আমার। যদি শুনত তবে মোহিত নিশ্চয়ই হত।

যাই হোক, এত দূরে এসে যখন পড়েছি, অভিমান ক'রে তখন ফিরে যাওয়া চলে না। আমি ইস্কুলবাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সেখানে বহু মানুষের ভিড়। আমারই মতন আরো অনেকে উঠেছেন।

কারো সঙ্গে আমি মিশিনি। একটু আলাদা আলাদা আর তফাৎ তফাৎ থাকার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বিফল হয়ে গেল আমার সব চেষ্টা। আমি মিশব না ঠিক করলে কি হবে, আমাকে পাওয়ার জন্যে সকলে ব্যাকুল। এরা চিনে ফেলেছে আমাকে। এরা চিনতে পেরেছে তাদের পপুলার আর্টিষ্টকে।

বেশ মজার ঘটনা ঘটল এখানে। সকলে দল বেঁধে এ. ভি. ইস্কুলেই আয়োজন করল জলসার। আমার মত একজন গাইয়ে পেয়ে তারাও ধন্য, তাদের এই ব্যবস্থার জন্যে আমিও ধন্য।

ইচ্ছে হতে লাগল, ধরে নিয়ে আসি ঐ মহিলাকে। তাকে এনে একবার দেখাই যে, যে লোকটাকে তিনি অতক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছিলেন, সেই লোকটা কে।

আমি যে কে, তা তাঁকে জানাবার ইচ্ছে খুবই প্রবল হল বটে, সেই সঙ্গে এ ইচ্ছেও হল তিনি কে তা জানবার।

জলসার উদ্যোগ চলেছে এখানে। ওদিকে সমুদ্রের কিনারে, মেরিন ড্রাইভের শেষ প্রান্তে, মস্ত প্যাণ্ডাল গড়ে তুলে সেখানে আয়োজন চলেছে সঙ্গীত সম্মেলনীর।

বোম্বাইয়ের রাস্তায় পোষ্টার পড়ে গেল। তাতে বড় বড় হরফে নাম লেখা আমার। একটা হোটেলের লাউঞ্জে অপমান সহ্য করতে হয়েছে যাকে, তার নাম ছেয়ে গেল শহরের দেয়ালে-দেয়ালে। আমি তৃপ্তি পেলাম। বহুদিন পরে আমার মনে পড়ে গেল মনুজেন্দ্রবাবুর কথা। তিনি একদিন আমাকে গান গাইবার সুযোগ দিয়েছিলেন, সেইজন্যেই আজ আমি এখানে এসে এভাবে সম্মানিত হচ্ছি। আজ তিনি যদি দেখতে পেতেন তবে নিশ্চয়ই আহ্লাদিত হতেন।

জলসার দু'একদিন দেরি আছে। ওদিকে শুরু হয়ে গিয়েছে সংগীতসম্মিলনী। ওখানে যাই। গান শুনে আসি। ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে বড় বড় ওস্তাদ এসেছেন। অনেক রাত অবধি চলেছে গান। চলেছে তানপুরার শব্দ আর তবলার ধ্বনি।

সেদিন সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে গিয়ে গান শুনতে বসে অবাক। সেই মহিলাটি গান গাইতে বসেছেন। এই ওস্তাদের আসরে ইনি? কে ইনি? নাম কি? নাম হচ্ছে মলয়া মুনশি।

এ নাম শুনি নি আমি। কিন্তু এ নাম নাকি খুব চেনা নাম। ওদের মহলে নাকি সেরা গাইয়ে। খুব নাকি নাম ডাক। অবাক লাগল। একটু পরে, আরও একটু বেশি অবাক লাগল। গান শুরু করল মলয়া মুনশি। গলায় যেন বেজে উঠল বাঁশি। গোটা আসরে আনন্দের ঢেউ উঠল যেন।

আমার বুকের ভিতরটা দুরু-দুরু করে উঠল। এসব গান না জানতে পারি। কিন্তু গলা তো চিনি, কা'কে ভালো গলা বলে, কা'কে খারাপ গলা বলে তা জানা আছে। মলয়া মুনশির গান শুনে অবাক লাগল আমার। আরো অবাক লাগল ঐ লাউঞ্জে বসে তার সঙ্গে কথা বলা সত্ত্বেও তার পরিচয় না জানার দরুণ। সারা শহর ঘুরে বেড়িয়েছি। সংগীত সম্মিলনীর কোনো পোষ্টার কোনো দেয়ালে চোখে পড়েনি। মলয়া মুনশির নাম নেই কোনো দেয়ালে।

অথচ, শহরময় তার নাম যেন ছড়িয়ে গিয়েছে বলে আমার মনে হতে লাগল।

পরদিন সকালে আমি হোটেলে গেলাম খুঁজতে লাগলাম সেই রিসেপশনিষ্টকে। কোথাও পেলাম না।

হোটেল থেকে বেরিয়ে ইণ্ডিয়া গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। সমুদ্রের হাওয়া মাখতে লাগলাম সারা শরীরে। ইচ্ছে হল, লঞ্চে উঠে একবার গিয়ে ঘুরে আসি—দেখে আসি ত্রিমূর্তি।

এমন সময় দেখি, সম্মুখে এক মূর্তি। এগিয়ে গেলাম, বললাম, "নমস্কার।"

স্মিত হেসে তিনি নমস্কার করলেন আমাকে।

বললাম, "আপনার গান শুনে অবাক হয়েছি।"

"ধন্যবাদ।" তিনি বললেন। বলেই চলে যাচ্ছিলেন হোটেলের দিকে। এগিয়ে গিয়ে বললাম, "আমি এ. ভি. স্কুলেই আছি।"

"কে আপনি?"

"আমার নাম হরিহর সিদ্ধান্ত।"

"ও:" কেমন-যেন শব্দ করে হেসে উঠলেন তিনি, বললেন, "ওখানে বুঝি জলসা করছেন আপনারা?"

প্রশ্ন শুনে খুশিতে গদগদ হয়ে উঠলাম। বললাম, "আসবেন।"

সমুদ্রের হাওয়ায় তাঁর শাড়ি কেঁপে উঠছে বেলুনের মত। আমার বুকটাও বুঝি কেঁপে উঠছে ওই ভাবেই।

বললাম, "আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

"কলকাতা। আপনি?"

"আমিও, আমিও কলকাতা থেকে। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখুন, কলকাতায় কখনো দেখা হয় না। দেখা হল দূর দেশে—বোম্বাইতে।"

তিনিও হাসলেন, বললেন, "সত্যিই আশ্চর্য।"

তার পর আর দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে। যত জলসায় যাই তাঁকেই খুঁজি। পাই নে। গান গাইতে বসে চোখটা ঘোরাই চার দিকে, খুঁটিনাটি করে খুঁজি তাঁকে পাই নে। হয়তো মনটা এলোমেলো হওয়ার দরুণ গলার কাজ ঠিকমত হয় না। আমার ভক্তরাও আমার গানের সমালোচনা করতে আরম্ভ করেছে।

ইণ্ডিয়া গেটের সামনে বেলুনের মত ফুলে-ওঠা সেই শাড়িটা চোখে ভেসে, গলা কেঁপে যায়।

অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি এই গাইয়ের নাম। কেউ জানে না। তবে কে-ও। কাশীর কোনো বাইজি, কিংবা লখনউ-এর?

এর উত্তর যদি কেউ আমাকে দিতে পারেন, তবে ধন্য হব।

রাণীর গয়না

'খুন-খুন ডাকাতি,'—টাওয়ার-অব লণ্ডনের গুপ্ত রত্নকুঠুরি থেকে হঠাৎ জেগে উঠল একজনের মরণ-আর্তনাদ, রাজকীয় রত্নশালার সহাধ্যক্ষ মিঃ ট্যালবট্ এডোয়ার্ডসকে কে বা কারা মর্মান্তিক ভাবে আহত করে ফেলে রেখে গিয়েছে, সহাধ্যক্ষের কন্যাই সর্বপ্রথম চীৎকার-ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে প্রবেশ করেন সেই কুঠুরিতে। ভীতি-বিহ্বল আঁখিতে আহত ভূতল-শায়িত পিতার অবস্থা দেখতে দেখতে আপনা হতেই কক্ষস্থিত দুর্ভেদ্য আলমারীটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তাঁর, রাজকীয় রত্নের পেটিকাটি তো ওরই মধ্যে থাকত—তবে—কি? মুহূর্তের মধ্যে রাজকীয় রত্নরাজি অপহৃত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র, টাওয়ারের আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠল আশঙ্কায় অনিশ্চয়তায়। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দের মে মাসের সেই ঘটনা-বহুল প্রভাতটি পেল এক চিরস্থায়ী ঐতিহাসিক মর্যাদা। ক্রমওয়েলের বাহিনীর এক ভূতপূর্ব সামরিক কর্মচারী 'কর্ণেল ব্লাড' রাজমুকুট ও দণ্ড লুণ্ঠন করে পলায়নের পথে সামান্যর জন্য ধরা পড়ে যান। টাওয়ারের বাইরে একটা মোড়ের মাথায় সৈন্যবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন তিনি। সাধারণ দর্শকের ভূমিকায় ঘটনার কয়েকদিন মাত্র আগেই এই দুঃসাহসী তস্কর তার এক সহকারিণীকে নিয়ে টাওয়ার অব লণ্ডনে যায় রত্নগুলির সঠিক অবস্থান-রহস্য জেনে নিতে। সহকারী রত্নাধ্যক্ষ এডোয়ার্ডস যখন দর্শকবৃন্দকে রাজকীয় রত্নরাজি প্রদর্শন করছিলেন, ক্যাপ্টেন ব্লাডের সঙ্গিনীটি হঠাৎ পেট ব্যথার ভাণ করে তখন ককিয়ে ওঠেন; মনে হয় যেন তিনি মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছেন। যাই হোক, সদাশয় এডোয়ার্ডস তৎপর হয়ে মহিলাটির সাহায্যার্থে তৎক্ষণাৎ নিজ পত্নীকে আহ্বান করেন ও তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই উক্ত রমণীকে চাঙ্গা হয়ে উঠতে দেখা যায়। দু' একদিনের মধ্যেই পীড়িতার কৃতজ্ঞ পতিদেবতা (ক্যাপ্টেন ব্লাড)কে উপহার-দ্রব্যাদি নিয়ে শ্রীমতী এডোয়ার্ডসের সঙ্গে দেখা করতে দেখা যায় এবং এই ভাবে শীঘ্র ওই ভুয়া দম্পতিটি এডোয়ার্ডসদের সঙ্গে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে নিতে সক্ষম হয়। এই সম্বন্ধ আরও গাঢ় হয়ে ওঠে যখন ব্লাড এডোয়ার্ডস দম্পতিকে জানায় যে, তার একটি উপযুক্ত ভাইপো আছে (সম্পূর্ণ অলীক) রূপে গুণে ধনে মানে যে এডোয়ার্ডস দুহিতার যোগ্য পাত্র। সরল-হৃদয় এডোয়ার্ডসরা তো আহ্লাদে আটখানা, মে মাসের এক সকালে পাত্রটিকে নিয়ে এসে পাত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে বলে কথাবার্তা হয়ে যায়। এই আনাগোনার ফলে প্রাসাদের রক্ষীরা ব্লাডের মুখচেনা হয়ে গিয়েছিল আর সেজন্যই মে মাসের সেই বিশেষ প্রভাতটিতে সে যখন আরও তিন জন সঙ্গীর সঙ্গে টাওয়ারে প্রবেশ করে কেউ তাদের বাধা দেওয়ার কথা চিন্তা করেনি। কুমারী এডোয়ার্ডস তো দুরু দুরু বক্ষে অভ্যর্থনা সুরু করে দিলেন কারণ আগন্তুকদের মধ্যে তাঁর ভাবী স্বামীটিও যে উপস্থিত রয়েছেন; অতিথিদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত এডোয়ার্ডস তাদেরই অনুরোধে তাদের নিয়ে গেলেন রাজকীয় রত্নগুলি দেখাতে। রত্নকুঠুরিতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অমায়িক ভাবী কুটুম্বরা পরিবর্তিত হল রক্তলোলুপ তস্করে, ট্যালবট এডোয়ার্ডস মাথায় গুরুতর ভাবে আহত হয়ে চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলেন। রত্নপেটিকার আধার সবলে উন্মোচন করে ফেলে দস্যুরা নিজেদের অভীষ্ট বস্তু বার করে নিল। রাজকীয় রত্নমুকুটখানির উপরই বিশেষ লক্ষ্য ছিল ক্যাপ্টেন ব্লাডের। সেটি হস্তগত করে সে একটি ঝোলার ভিতর পুরে ফেলল। সবচেয়ে বিস্ময়কর হল এর পরের ঘটনাটিই একরকম হাতে নাতে ধরা পড়লেও ক্যাপ্টেন ব্লাডকে ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এর কোনটাই ভোগ করতে হল না। রাজা নিজে এই দুঃসাহসী তস্করকে ডেকে পাঠালেন, একেবারে নিরালায় তার বক্তব্য শুনলেন, কি কথাবার্তা যে হল তাঁদের মধ্যে. তা সকলেরই অগোচর, শুধু দেখা গেল যে, রাজার ঘর থেকে সে বেরিয়ে এল বার্ষিক পাঁচশো পাউণ্ডের এক বৃত্তি সংগ্রহ করে। বর্তমানে রাজকীয় রত্নরাজি ওয়েক্ফাল্ড টাওয়ারের এক সুরক্ষিত কক্ষে সুদৃঢ় ইস্পাতের আধারে রক্ষিত আছে, এ পর্য্যন্ত আর কেউ তা লুণ্ঠনে-প্রয়াসী হয়নি। বর্তমানে ইংলণ্ডেশ্বরী যে রত্নমুকুটটি শিরে ধারণ করেন পৃথিবীর বৃহত্তম কুলিনান হীরকের অংশ বিশেষ দ্বারা তা খচিত। ভারতের অমূল্য কোহিনূর হীরক যার জন্য একদিন রক্তের স্রোত বয়ে গেছে—অম্লান দীপ্তিতে আজও বিরাজিত, ইংলণ্ডেশ্বরীর অভিষেকে যে শিরোভূষণ ব্যবহৃত হয়েছে, তাতেই এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রত্ন-খণ্ডটি সন্নিবেশিত আছে। দ্বিতীয় এলিজাবেথের নিজস্ব রত্নালঙ্কারের ভাণ্ডার নিঃসন্দেহে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। দ্বিতীয় জর্জের আমলের হীরক-খচিত সান্দ্রে টায়রা গঠন বৈচিত্র্যে ও মহার্ঘ্যতায় অদ্বিতীয় আখ্যা পেতে পারে সহজেই। আর একটি হীরক টায়রা মহারাণী ভিক্টোরিয়া যা প্রায়ই পরিধান করতেন, বর্তমান ইংলণ্ডেশ্বরীর এক অতি প্রিয় অলঙ্কার, টায়রাটিতে হীরক-বেষ্টনীর মধ্যে মধ্যে বড় বড় মুক্তার দোলকগুলি বড়ই মনোহর দর্শন। নিজের নীলাভ আঁখিতারার সঙ্গে সমতা বজায় রাখে বলে দ্বিতীয় এলিজাবেথ নীলার বিশেষ ভক্ত। তাঁর শুভ পরিণয় উপলক্ষে পিতা স্বর্গত ষষ্ঠ জর্জ তাঁকে যে অপূর্ব হীরা ও নীলার কণ্ঠাভরণ ও কর্ণভূষণ উপহার দিয়েছিলেন, সেগুলি তরুণী রাজ্ঞীর অতি প্রিয় বস্তু। রত্নালঙ্কারে দ্বিতীয় এলিজাবেথের আসক্তি নারীজনোচিত ভাবেই স্বাভাবিক, নিজের অমূল্য হীরক-রত্নাদির প্রতি সেজন্যই তাঁর অত্যধিক মমতা। সাধারণ যে কোন মেয়ের মতই নিজের অলঙ্কার দেখাতে ও তা দিয়ে নিজেকে সাজাতে তিনি সদাই উৎসুক।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন—

গত ১৪ই মার্চ (১৯৬২) জেনেভায় যে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইবে কি ব্যর্থ হইবে তাহা লইয়া আলোচনা করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। অনেক আশা লইয়া বহু সম্মেলন জেনেভায় আরম্ভ হইয়াছে, আবার বহু আশার সমাধিও রচিত হইয়াছে এই জেনেভাতেই। এই নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন যেমন দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পরে জেনেভায় প্রথম নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন নয় তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পূর্ব্বেও জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হইয়াছে। যে প্রাসাদে এই নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হইতেছে উহার নাম Palais des Nations এই প্রাসাদের দ্বারদেশে 'The Nations must disarm or perish' লর্ড সেসিলের এই উক্তিটি লিখিত রহিয়াছে। এই প্রাসাদেই ১৯৩২ এবং ১৯৩৩ সালে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হইয়াছিল। ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে যে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হয় হিটলারের জার্ম্মাণী তাহা ত্যাগ করে এবং সেই সঙ্গে জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) হইতেও সরিয়া আসে। উহা হইতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ভরাডুবির সূত্রপাত। প্রথম বিশ্বসংগ্রামের পর শান্তিচুক্তি সম্পাদিত এবং জাতিসঙ্ঘের কভেনেণ্ট রচিত হওয়া, অস্ত্রসজ্জা সম্পর্কে স্থায়ী উপদেষ্টা কমিশন এবং মিশ্র নিরস্ত্রীকরণ কমিশন গঠিত হওয়ার পর হইতে নিরস্ত্রীকরণের সমস্ত চেষ্টাই শুধু ব্যর্থ ই হয় নাই, শেষ পর্য্যন্ত উহার পরিণতি হইয়াছিল দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম। অতীতের এই নজীর সত্ত্বেও সম্প্রতি জেনেভায় যে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে তাহার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিতই হউক আর ব্যর্থ ই হউক, আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্ক, বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, এবং অস্ত্রসজ্জার ভবিষ্যৎ গতির মধ্যে উহার তাৎপর্য্য অবশ্যই প্রতিফলিত হইবে। প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্রেরই হউক আর পরমাণু অস্ত্রেরই হউক অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা ঠাণ্ডা যুদ্ধের কারণ নয়, উহা ঠাণ্ডাযুদ্ধের একটা লক্ষণ মাত্র। এই অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতার পরিণতি যে সর্ব্বগ্রাসী ধ্বংস তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ফল যাহাই হউক, উহার বিকল্প যে চরম বিপর্য্যয়, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

আঠারটি দেশ লইয়া নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হওয়া সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে যে মতৈক্য হয়, গত ডিসেম্বর মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিষদ তাহা অনুমোদন করেন। ইহাই জেনেভায় বর্ত্তমান নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার মূল ভিত্তি। এই সম্মেলনকে আগামী ১লা জুন (১৯৬২) নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের নিকট আলোচনার ফলাফল সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রদান করিতে হইবে। আঠারটি রাষ্ট্রের মধ্যে ফ্রান্স এই সম্মেলনে যোগদান করিতে অস্বীকার করে। জেনেভায় সতেরটি রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। এই সপ্তদশ রাষ্ট্রের পশ্চিমী শিবিরের আছে চারিটি রাষ্ট্র, কম্যুনিষ্ট শিবিরের পাঁচটি রাষ্ট্র এবং নিরপেক্ষ বা জোট বহির্ভূত দেশ আছে আটটি। পশ্চিমী শিবিরের চারিটি রাষ্ট্র :—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, কানাডা এবং ইটালী। সোভিয়েট রাশিয়া বুলগেরিয়া, চেকোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড এবং রুমানিয়া এই পাঁচটি কম্যুনিষ্ট দেশ। নিরপেক্ষ বা জোট বহির্ভূত আটটি দেশের নাম :—ভারত, ব্রেজিল, ব্রহ্মদেশ, ইথিওপিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, সুইডেন এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে অষ্টাদশ রাষ্ট্রের কাহারা প্রতিনিধিত্ব করিবেন এবং সম্মেলনের কর্ম্মসূচী কি হইবে সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবে তাহা কিছুই বলা হয় নাই। এই প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন লইয়া এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল যে বোধনের পূর্ব্বেই বুঝি বা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের বিসর্জ্জন হইয়া যায়। রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ প্রস্তাব করেন যে, আঠারটি দেশের রাষ্ট্রনায়করা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যোগদান করিবেন, অন্ততঃ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের আরম্ভটা হইবে শীর্ষ সম্মেলন রূপে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ অবিলম্বেই মঃ ক্রুশেভের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তাঁহারা বলেন যে, অগ্রগতির পরিচয় যদি পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের উপস্থিতি যদি সাফল্যের সম্ভাবনাকে সুদৃঢ় করে তাহা হইলেই তাঁহারা নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করিবেন। পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রস্তাব এই যে, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হইবে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর স্তরে। ইহার পরেও মঃ ক্রুশেভ আর একবার শীর্ষ স্তরে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হওয়ার প্রস্তাব করেন। ওয়াশিংটন অবশ্য অবিলম্বে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নাকি এ বিষয়ে আমেরিকার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারেন নাই। তিনি জেনেভাতেও হউক আর পরেই হউক শীর্ষ সম্মেলনের দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে চান। তবে এই মতভেদটা তেমন গুরুতর কিছুই ছিল না। কিন্তু ফ্রান্সের সহিত মতবিরোধটাই হইয়াছিল গুরুতর। পশ্চিমী শক্তিবর্গের দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইবে, এইজন্য দ গল নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বয়কট করার সিদ্ধান্ত করেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গত ৮ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডন এবং ওয়াশিংটন হইতে যুগপৎ ঘোষণা করা হয় যে, জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের পূর্ব্বে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করার চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

বং রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক সম্মেলন হওয়ার জন্ত বৃটেন এবং আমেরিকা মঃ ক্রুশেভের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন। কমন্স সভায় এই ঘোষণা করার সময় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান ইহাও জানান যে, বৃটিশ সরকার ক্রীষ্টমাস দ্বীপে পরমাণবিক বিস্ফোরণের জন্ত আমেরিকাকে অনুমতি দিয়াছেন এবং উহার বিনিময়ে বৃটিশ সরকারকে ভূগর্ভে বিস্ফোরণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। পরে প্রেসিডেন্ট কেনেডী এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান জানাইয়াছেন যে, জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের পূর্ব্বে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হইবে না।

শেষ পর্য্যন্ত মঃ ক্রুশেভ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে শীর্ষ সম্মেলনের দাবী পরিত্যাগ করিয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রীর স্তরে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হওয়া সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রস্তাবে স্বীকৃত হওয়ায় জেনেভায় সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডীন রাস্ক, রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ আন্দ্রে গ্রোমিকো এবং বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী লর্ড হোমের মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনার সঙ্গে বার্লিন প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কেও আলোচনা হয়। এই আলোচনার সময় পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ ব্যাপারে রাশিয়া আন্তর্জ্জাতিক পরিদর্শনের ব্যবস্থা মানিয়া লইতে রাজী আছে কি না মঃ গ্রোমিকোকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তিনি নেতিবোধক উত্তর দিয়াছেন। যাহাই হউক, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ ওমর লুৎফী সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে 'পারস্পরিক আশঙ্কা এবং অবিশ্বাসের বিরাট গহ্বরের' উপর একটি সেতু নির্ম্মাণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে যে আলোচনা আরম্ভ করা হইতেছে শুধু তাহা দ্বারাই আন্তর্জ্জাতিক উত্তেজনা প্রশমিত করিতে সাহায্য করা যাইতে পারে। গত ১৯৪৫ সাল হইতে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনার ভাগ্য হইতে এই সম্মেলনে পারস্পরিক আশঙ্কা ও অবিশ্বাসের বিরাট গহ্বরের উপর সেতু নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইবে কি না, সে-সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। সম্মেলন যদি ব্যর্থ-ও হয়, তাহা হইলেও এই ব্যর্থতার রিপোর্ট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে দিতে হইবে। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কি করিতে পারে? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন দেশকে নিরস্ত্র হইতে বাধ্য করিতে পারে না। পরমাণু অস্ত্রের অধিকারিগণ সহ সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্রকে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে একমত হওয়ার জন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে মাত্র। এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ১০৪টি সদস্য রাষ্ট্রের সকলেই সাধারণ পরিষদ এবং নিরস্ত্রীকরণ কমিশন উভয় সংস্থারই সদস্য। পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করা এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনা যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আওতার বাহিরেও হইয়াছে এ কথাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না। পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা এবং আকস্মিক আক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ ১৯৫৮ সালে জেনেভায় ত্রিশক্তির আলোচনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৯৬০ সালের মার্চ্চ মাসে জেনেভায় দশ রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হয়। এই দুই সম্মেলন-ই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আওতার বাহিরে আরম্ভ হইয়াছিল। দুইটি সম্মেলনই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

জেনেভায় সপ্তদশ শক্তির নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া উভয়েই নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে নিজ নিজ সাধারণ পরিকল্পনা পেশ করিয়াছে। মার্কিণ প্রস্তাব পশ্চিমী শক্তিবর্গ সমর্থন করিয়াছে এবং রুশ প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে কম্যুনিষ্ট শিবিরের সদস্যরা। এই প্রস্তাব দুইটি সম্পর্কে নিরপেক্ষ দেশগুলির মন্তব্য আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্যন্ত আমরা পাই নাই। তাহাদের মধ্যে ভারত এবং ব্রেজিল উভয় পক্ষকেই পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিবার জন্ত অনুরোধ জানাইয়াছেন। সাধারণ এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে গত সেপ্টেম্বরে নীতিগত দিক হইতে উভয় পক্ষই একমত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ বা পরিদর্শনের ব্যাপারে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য কোন সমাধানের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আন্তর্জ্জাতিক পরিদর্শন হইল পশ্চিমী শক্তিবর্গের দাবী। আন্তর্জ্জাতিক পরিদর্শন বলিতে পশ্চিমী শক্তিবর্গ বুঝেন পরিদর্শকদের জাতীয় সীমান্তের বাহিরে সন্দেহজনক কোন ঘটনা বা কার্য্যকলাপ সম্পর্কে স্থানীয় তদন্তের অধিকার। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মনে করে শুধু এই ধরণের তদন্ত দ্বারাই উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু রাশিয়া আন্তর্জ্জাতিক পরিদর্শনের ব্যবস্থাকে এক ধরণের গোয়েন্দাগিরি বলিয়া মনে করে। এই আশঙ্কার জন্তই রাশিয়া আন্তর্জ্জাতিক পরিদর্শনের ব্যবস্থায় সম্মত নয়। বিলাতের টাইমস্ পত্রিকাও রাশিয়ার এই আশঙ্কাকে 'very real and deep rooted' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

পশ্চিমী শক্তিবর্গের পক্ষে মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ রাস্ক যে চারি দফা প্রস্তাব জেনেভা সম্মেলনে উপ্থাপন করিয়াছেন তাহাতে আকস্মিক আক্রমণের (surprise attack) আশঙ্কা প্রতিরোধ করা, সমস্ত ফিশনেবল্‌ (fissionable) দ্রব্য একত্রিত করিবার এবং প্রথম তিন বৎসরে পরমাণু অস্ত্র বহনের যানসমূহের (রকেট, বিমান, সাবমেরিন প্রভৃতি) শতকরা ত্রিশ ভাগ হ্রাস করার কথা আছে। কম্যুনিষ্ট শক্তিবর্গের পক্ষ হইতে মঃ গ্রোমিকো আটচল্লিশটি ধারা সমন্বিত একটি চুক্তিপত্রের খসড়া সম্মেলনে পেশ করিয়াছেন। উহাতে চারি বৎসরের মধ্যে সমস্ত জাতীয় সৈন্যবাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্র বিলোপের প্রস্তাব আছে। উভয় পক্ষের প্রস্তাবের মধ্যে যে কোন সাধারণ ভিত্তি নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। নিরস্ত্রীকরণের মূল নীতি সম্পর্কে উভয় পক্ষ একমত হওয়া সত্বেও নিরস্ত্রীকরণের পন্থা সম্পর্কে এত বিপুল মতভেদ রহিয়াছে যে, উহার সমাধান একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই মতদ্বৈধের কারণটা বুঝিয়া উঠাও কঠিন নয়। রাশিয়া দীর্ঘ সাত বৎসর মার্কিণ পরমাণু বোমার আতঙ্কের মধ্যে কাটাইয়াছে। অতঃপর রাশিয়া পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার অধিকারী হইয়াছে বটে, কিন্তু পরিমাণের দিক হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এখনও অগ্রবর্ত্তী। কাজেই রাশিয়ার চারিদিকে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি থাকিবে আর রাশিয়া রকেট ধ্বংস করিয়া ফেলিতে রাজী হইবে ইহা প্রত্যাশা করা সম্ভব নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য্যনির্ব্বাহক ব্যবস্থা পশ্চিমী শক্তিবর্গের অনুকূল। এ-সম্পর্কে রাশিয়ার মনোভাব কাহারও অজানা নয়। কাজেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য্যনির্ব্বাহক ব্যবস্থা রাশিয়ার পছন্দমত না হওয়া পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক পরিদর্শন এবং আন্তর্জ্জাতিক সেনাবাহিনীকে রাশিয়া ভয়ের দৃষ্টিতেই দেখিবে ইহাও খুব স্বাভাবিক। তবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে পরমাণু অস্ত্রের দিক হইতে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি হইয়াছে এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। কি মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট কেনেডী, কি রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ কেহ-ই এই ভারসাম্যের স্থায়িত্ব নষ্ট করিতে চাহেন নাই। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হওয়া সম্ভব হইয়াছে এইজন্যই। পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ করা হইলেও বিশ্বে প্রকৃত নিরাপত্তা আসিবে না যদি তৈয়ারী পরমাণু অস্ত্র মজুত থাকে। আর পরমাণু অস্ত্র মজুত থাকিলে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ অর্থহীন। এদিকে পরমাণু অস্ত্রের অধিকারীর সংখ্যাও বাড়িতেছে। ফ্রান্স পরমাণু অস্ত্র নির্ম্মাণ ও পরীক্ষা করিতেছে। চীনও শীঘ্রই পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা আরম্ভ করিবে। নিরস্ত্রীকরণের জন্য নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিও চাপ দিতেছে। তাহাদের নিকট কি আমেরিকা, কি রাশিয়া কেহই জনপ্রিয়তা হারাইতে চাহে না। সর্ব্বোপরি রহিয়াছে বার্লিন, লাওস, দক্ষিণ ভিয়েটনাম, কিউবা, কঙ্গো, আলজেরিয়া, এঙ্গোলা প্রভৃতির সমস্যা। এই সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিলে মনে হয়, জেনেভার নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে মতৈক্য না হইলেও শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী ১৫ই মার্চ্চের পূর্ব্ববর্ত্তী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছিলেন যে, দুইটি অবস্থায় তিনি শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করিবেন, একটি অবস্থা জেনেভায় যদি বিশেষ মতৈক্য হওয়া সম্ভব হয়, দ্বিতীয় অবস্থা যদি যুদ্ধের বিপদ কিম্বা গুরুতর সঙ্কট (Crisis) দেখা দেয়। ১৫ই মার্চ্চের সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি তৃতীয় আর একটি অবস্থার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি জাতীয় স্বার্থের জন্য প্রয়োজন বলিয়া তিনি মনে করেন তাহা হলেও শীর্ষ সম্মেলনে তিনি যোগদান করিবেন। সুতরাং নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের পরিণতিতে শীর্ষসম্মেলন হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আলজেরিয়ায় যুদ্ধবিরতি—

অবশেষে আলজেরিয়ায় যুদ্ধ বিরতি হইয়াছে। গত ১৮ই মার্চ্চ (১৯৬২) সুইস সীমান্তবর্ত্তী এভিয়াতে (Evian-les Bains) ফরাসী সরকার এবং আলজেরিয়া অস্থায়ী বিদ্রোহী সরকারের প্রতিনিধিদের বৈঠকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং উহার পরদিন বেলা ১২টার সময় উভয় পক্ষের সাড়ে সাত বৎসর ব্যাপী সংগ্রামের অবসান ঘটিয়াছে। ফরাসী সরকারের সৈন্যবাহিনীর সহিত জাতীয়তাবাদীদের মুক্তি ফৌজের লড়াই থামিয়াছে বটে, কিন্তু আলজেরিয়ার শান্তি ফিরিয়া আসে নাই। যুদ্ধ বিরতির পর বিদ্রোহী জেনারেল সালানের নেতৃত্বে গুপ্তসৈন্যবাহিনীর (Secret Army organization) তৎপরতা ওরান, আলজের্স এবং কনস্টাণ্টিন আলজেরিয়ার এই তিনটি সহরে তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। যে দিন যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে সেই দিনই গুপ্ত সৈন্যবাহিনী একটি অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠনের সংবাদ ঘোষণা করে। গুপ্ত সৈন্য বাহিনীর অন্যতম প্রধান কর্ত্তা প্রাক্তন জেনারেল এডমণ্ড জোহো ওরান সহর হইতে গুপ্ত বেতার ভাষণে বলেন যে, গোপন অস্থায়ী সরকার দ গলের ডিক্টেটরী শাসনের অবসান ঘটাইতে বদ্ধপরিকর। ১৯শে মার্চ্চ বেলা বারটার সময় যুদ্ধবিরতি চুক্তি বলবৎ হইয়াছে বটে, কিন্তু গুপ্ত সৈন্যবাহিনী আলজিয়ার্স সহরে দুই দিনের জন্য সাধারণ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করে। ফলে যুদ্ধবিরতির প্রথম দিনেই এই সহরটি নির্জ্জীব আকার ধারণ করে, সমগ্র নগরী এক গভীর আতঙ্কে ডুবিয়া যায়।

যে সকল সর্ত্তে যুদ্ধবিরতি হইয়াছে তাহা দ্বারা আলজেরিয়ার মুসলমানদের দাবী পূরণ হইয়াছে কিনা সে-সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ অবশ্যই আছে। কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন যে, এই চুক্তি দ্বারা কোন পক্ষেরই হার নাই, আবার কোন পক্ষের জয়ও হয় নাই। আলজেরিয়ার মুসলমানরা যে স্বাধীনতা চায়, সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকিলেও আলজেরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্বন্ধে গণভোট গ্রহণের চুক্তি হইয়াছে। জুলাই মাসের শেষে এই গণভোট গ্রহণ করা হইবে। সাহারা অঞ্চলের তৈল ও অন্যান্য খনিজ-সম্পদ আহরণের জন্য সার্ব্বভৌম আলজেরিয়া ফ্রান্সকে লীজ দিবে। তবে সাহারার তৈল ও অন্যান্য খনিজ-সম্পদ ফ্রান্স ও আলজেরিয়া একত্রে আহরণ করিবে। মার্স-এল-কবীর বিমান ঘাটির উপর আলজেরিয়ার সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করা হইবে বটে, কিন্তু উহা পনের বৎসরের জন্য ফ্রান্সকে লীজ দেওয়া হইবে। আলজেরিয়ার অন্যান্য বিমান ঘাটি ও সামরিক ঘাটি সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থাই হইবে। সুতরাং স্বাধীন আলজেরিয়াতেও ফ্রান্সের সামরিক কর্ত্তৃত্ব অব্যাহতই থাকিবে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। মনে হইতে পারে যে, আলজেরিয়ায় গুপ্ত সৈন্যবাহিনীর সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ দমনের জন্যই এইরূপ ব্যবস্থায় অস্থায়ী বিদ্রোহী সরকারের প্রতিনিধিরা রাজী না হইয়া পারেন নাই। কিন্তু আলজেরিয়ায় অবস্থিত ফরাসী সরকারের অনুগত ফরাসী বাহিনীতেও গুপ্ত সৈন্যবাহিনীর

প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বহু অফিসার ও সৈন্য রহিয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। ফরাসী সৈন্যরা আলজেরিয়ায় অবস্থিত ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে কি? আলজেরিয়ার ফরাসীদের স্বার্থ রক্ষার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা যে সন্তোষজনক, একথা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায়। যে সকল ফরাসী বিশ বৎসর যাবৎ আলজেরিয়ায় বাস করিতেছে, তাহারা এবং যে সকল ফরাসী কিম্বা তাহাদের পিতামাতার জন্ম আলজেরিয়ায়, তাহারা আলজেরিয়ার নাগরিক অধিকার লাভ করিবে। ফরাসী ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থাও থাকিবে।

গণভোটের পর স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অন্তবর্ত্তী সরকার থাকিবে। উহাতে বার জন সদস্য থাকিবেন। তন্মধ্যে পাঁচজন হইবেন এফ-এল-এন দলের, তিনজন ফরাসী সম্প্রদায়ের এবং চারিজন নির্দ্দলীয় মুসলমানদের। মঃ আব্দার রহমান ফারেস হইবেন এই অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের প্রধান। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, তিনি একজন দক্ষিণপন্থী হইলেও এবং আলজেরিয় বিধান-সভার সভাপতি থাকিলেও, বিপ্লবীদিগকে সাহায্য করার জন্য গত নভেম্বর মাসে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ফরাসী সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আলজেরিয়ায় একজন হাই-কমিশনার থাকিবেন। তাঁহার উপর থাকিবে দেশরক্ষা ও নিরাপত্তার ভার। আলজেরিয়ায় যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে এই যে চুক্তি হইয়াছে, উহার প্রতি ফরাসী জনসাধারণের সমর্থন আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য ৮ই এপ্রিল (১৯৬২) গণভোট গ্রহণের পর অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠিত হইবে। স্বাধীন আলজেরিয়া অবিভক্ত থাকিবে এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে ফ্রান্সের সহযোগিতা পাইবে। পররাষ্ট্রনীতিতে ফ্রান্স অবশ্য হস্তক্ষেপ করিবে না, কিন্তু অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তারের অনেক সুযোগ থাকিবে। স্বাধীন আলজেরিয়া দক্ষিণ-ঘেঁষা কি বাম-ঘেঁষা হইবে, না মধ্যপন্থী হইবে, তাহা এখনই অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু ফরাসী সরকার এবং এফ-এল-এন দলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হইলেও গুপ্ত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এফ-এল-এন দলের যুদ্ধ বাধিয়া উঠা মোটেই অসম্ভব নয়। ওরান প্রভৃতি কয়েকটি সহরে ফরাসী সরকারের কর্ত্তৃত্ব আর নাই বলিলেই চলে। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার ঐ সকল সহরে যদি কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে, তাহা হইলে কার্য্যতঃ আলজেরিয়া বিভক্ত হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু সর্ব্বোপরি প্রশ্ন—গুপ্ত সৈন্যবাহিনী যদি তাহাদের সন্ত্রাসমূলক কার্য্যকলাপ চালাইয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে এফ-এল-এন দল তাহাদের সহিত লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হইবে, আলজেরিয়ায় শান্তি-প্রতিষ্ঠিত হইবে না। শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হইলে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবে কে বা কাহারা? গুপ্ত সৈন্যবাহিনী প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মজুত করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সন্ত্রাসবাদী দলগুলি যদি তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ না যোগায় তাহা হইলে বেশীদিন তাহাদের পক্ষে টিকিয়া থাকা সম্ভব হইবে না। আলজেরিয়ায় ওরান প্রভৃতি সহরে গুপ্ত সৈন্য বাহিনীর সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা অবশ্য সমানভাবেই চলিতেছে। কিন্তু আরবরা প্রতিশোধ লওয়ার জন্য ক্ষেপিয়া উঠে নাই, বলিয়াই মনে হইতেছে। ইহাতে ফরাসী সৈন্যদের কতকটা সুবিধাই হইয়াছে এবং গুপ্তসৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানের প্রয়োজনীয়তা তেমন ভাবে দেখা দেয় নাই। আলজিয়ার্সে গুপ্তসৈন্য বাহিনীর ঘাঁটি ফরাসী সৈন্যরা ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে। গুপ্তবাহিনীর প্রতি আলজেরিয়ার অধিকাংশ ফরাসী অধিবাসীর সহানুভূতিই দ গলের পক্ষে বড় সমস্যা।

কাজি নজরুলের মঞ্চ-প্রবেশ

শ্রীঅখিল নিয়োগী

বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইস্‌লাম কি ভাবে বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চে যোগদান ক'রে সঙ্গীত রচনা ও সুর-সংযোজনার দ্বারা দেশকে মাতিয়ে তুলেছিলেন, সেই উপভোগ্য কাহিনী আজ পরিবেশন করছি।

আমি যখন সিটি কলেজে পড়তাম, তখন আমার সহপাঠী ছিল বন্ধুবর সুসাহিত্যিক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। নৃপেন প্রতিদিন ক্লাশে এসে কাজি নজরুলের নতুন নতুন কবিতা ও গান আবৃত্তি করে আমাদের অবাক করে দিত। তখনো নজরুল ইস্‌লাম আমার পরিচয়ের গণ্ডীর মধ্যে আসেন নি। নৃপেনের সঙ্গে তাঁর ইতিমধ্যেই পরিচয় হয়ে গেছে। কাজি নজরুলের সে সব কবিতা তখনো বাইরে ছাপা হয়নি, শুধু খাতার পাতার মধ্যে আবদ্ধ আছে, সেইগুলি এক এক দিন চমৎকার ভাবে আবৃত্তি করে নৃপেন আমাদের অবসর-মুহূর্তগুলি কাব্যরসে সরস করে রাখতো।

নৃপেনের আবৃত্তির কণ্ঠস্বর ছিল অতি মধুর। তাই অতি সহজেই সে আমাদের অন্তর জয় করে নিয়েছিল। আর সেই সঙ্গে ছাত্র-মহলে নজরুলের কবিতাকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

এর পরে অবশ্য "কল্লোল"-কার্য্যালয়ে শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় কবি নজরুলের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে এবং সেই পরিচয় দিনের পর দিন ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার পর্য্যায়ে পৌছে যায়।

সেই সময় কল্লোল-কার্য্যালয়ে দীনেশরঞ্জন দাসের উদার অভ্যর্থনায় শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, সুনির্ম্মল বসু, ভূপতি চৌধুরী প্রভৃতি প্রতি সন্ধ্যায় সমবেত হ'ত এবং নানা রকম মধুর আলোচনায় এই বন্ধু-সমাগম মধুরতর হয়ে উঠত।

কবি নজরুল তখন কলকাতার বাইরে থাকতেন—এবং মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মতো কল্লোল-কার্য্যালয়ে আবির্ভূত হয়ে হাঁক ছাড়তেন—"দে গরুর গা ধুইয়ে"। বন্ধু মহলে নতুন করে হুল্লোড় পড়ে যেত। কবি নজরুল তক্তপোষের তলা থেকে একটি ভাঙা হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে গান ধরতেন—

"বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে
দিস্‌নে আজি দোল"

তখন বন্ধু মহলে যে আনন্দের প্রস্রবণ বয়ে যেতো, তার তুলনা ছিল না। বন্ধু সুনির্ম্মল ঘন ঘন মাথা নাড়তো আর তক্তপোষে তাল ঠুকতো। প্রেমেন্দ্র মিত্র চক্ষু মুদে গানের সুর-সুধা পান করতো। একটা অনাবিল কাব্য-রস-ধারা প্রবাহিত হ'ত এই আমাদের ধূলির ধরণীতে।

আর হবেই বা না কেন? স্বয়ং বিশ্বকবি শান্তিনিকেতন থেকে নজরুলকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন কবিতায়—

"আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু
দুর্দ্দিনের এই দুর্গ-শিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন,
অলক্ষণের তিলক-রেখা—
রাতের ভালে হোক্ না লেখা—
জাগিয়ে দেবে চমক মেরে আছে যারা অর্দ্ধ-চেতন।।"

এই শুভেচ্ছা-বাণী বিশ্বকবি পাঠিয়েছিলেন নজরুলের "ধূমকেতু" কাগজকে আশীর্বাদ জানিয়ে।

তখনকার দিনে কবিতাটি আমাদের মুখে-মুখে ফিরতো!

কবি নজরুল বয়সে আমার চাইতে বেশ বড়—তাই আমি তাঁকে বরাবর কাজিদা বলেই ডাকি।

এই বিদ্রোহী কবি কি ভাবে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে তাঁর গান আর সুরে সবাইকে মাতিয়ে তুললেন, সে কাহিনী জানতে হলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে।

কণিকা মজুমদার

নাট্যকার মন্মথ রায় তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় সেই সময় "বাসন্তিকা" নামে একটি সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশিত হত। সেই কাগজে প্রকাশিত হ'ল মন্মথ রায়ের অভিনব নাটক "সেমিরেমিস্"। এই "সেমিরেমিস" নাটক পড়ে কবি নজরুল একেবারে মোহিত হয়ে যান। কবি নজরুল তখন সর্ব্বজন-পরিচিত বিদ্রোহী কবি নজরুল, আর মন্মথ রায় তখন অখ্যাত অজ্ঞাত নাট্যকার। এই অখ্যাত নাট্যকারকে কবি নজরুল একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তার খানিকটা অংশ তুলে দিচ্ছি—

"এক-বুক কাদা ভেঙে পথ চলে এক-দীঘি পদ্ম দেখলে দু'চোখে আনন্দ যেমন ধরে না—তেমনি আনন্দ দু'চোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখায়। সেমিরেমিস্ পড়ে যে কী আনন্দ পেয়েছি তাও বলে উঠতে পারছি না। * * * এই ঈর্ষা ও ততোধিক ঈর্ষাতুর সাহিত্যিকের দেশে আপনার যোগ্য আদর হয়নি দেখে বিস্মিত হইনি একটুও,—দুঃখিত যতই হই!"

এই দীর্ঘ চিঠিখানি পড়লে বোঝা যায় কবি নজরুল মানুষ হিসেবে কতখানি উদার মনের অধিকারী ছিলেন।

এরপর মন্মথ রায়ের সঙ্গে কবি নজরুলের যোগাযোগ হয় কলকাতায়। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মধুর আলিঙ্গন। এক মুহূর্ত্তে 'আপনি' 'তুমি' হয়ে 'তুই' তে নেমে এলো।

এই সময় নাট্যকার মন্মথ রায় মনোমোহন থিয়েটারের জন্যে "মহুয়া" নাটক রচনা করবেন—এই রকম পরিকল্পনা করা হয়েছিল। দীনেশ সেন সংগৃহীত 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' সেই সময় বাঙলা সাহিত্যে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। মন্মথ রায় সেই গ্রন্থ থেকে 'মহুয়া' আখ্যানটি নাটকের জন্যে নির্ব্বাচন করেছিলেন।

মনোমোহন নাট্যশালার কর্ণধার শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ বললেন,—নাটক ত' বাছাই করলে মন্মথ, কিন্তু 'মহুয়া' নাটক হবে গীতি-নাট্য। তুমি আবার নিজে সঙ্গীত রচনা করতে পারো না! এ যে একটা সমস্যা হল। মহুয়ার গান লিখ্‌বে কে?

নাট্যকার মন্মথ রায় উত্তর দিলেন,—গানের জন্যে আপনি ভাববেন না প্রবোধদা। খুব নামকরা এক কবি আমার হাতে' আছেন। আমি অনুরোধ করলে তিনি আনন্দের সঙ্গে 'মহুয়া' নাটকের গান রচনা করে দেবেন।'

—সেই কবিটি কে শুনি?

—বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইস্‌লাম!

প্রবোধদা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—কাজি নজরুল কি থিয়েটারের গান লিখ্‌তে রাজি হবেন?

মন্মথ রায় জবাব দিলেন,—অবশ্যই হবেন—যদি আমি অনুরোধ করি।

একথা জোর দিয়ে বল্‌বার কারণ ছিল। কেন না, কয়েক দিন আগেই কাজি নজরুল মন্মথ রায়কে চিঠিতে জানিয়েছিলেন,—'তোমার নাটকে যদি আমাকে দিয়ে গান না লেখাও—তবে সেটা আমার অভিমানের কারণ হবে।'

সব কথা শুনে প্রবোধদা ত' ভারী খুশী। কবি কাজি নজরুল যদি 'মহুয়া' নাটকের জন্যে গান রচনা করেন, তবে সেটা হবে নাটকের অতিরিক্ত আকর্ষণ। একদিন সন্ধ্যেবেলা মন্মথ রায় কবি নজরুলকে মনোমোহন থিয়েটারের দোতলায় বিরাট ঢালা ফরাসের আড্ডাখানায় ধরে নিয়ে এলেন।

আর কাজি নজরুল এমন মজ্‌লিশি মানুষ যে, তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে—VINI-VIDI-VICI! তার মানে তিনি এলেন,···তিনি দেখ্‌লেন···আর তিনি জয় করলেন!

সত্যি, একদিনে তাঁর গান আর সুরে—সারা মনোমোহন থিয়েটারের মানুষদের অন্তর জয় করে নিলেন।

যেখানে কাজি—সেইখানেই অট্টহাসি—আর সেইখানেই প্রাণ-বিনিময়ের মোহন-মেলা!

প্রবোধদাও মানুষটিকে চিনে নিতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করলেন না। দুইদিন পরেই দেখা গেল, মনোমোহন থিয়েটার কাজিদার বাড়ী-ঘর হয়ে উঠেছে।

কাজিদাকে দিয়ে গান লেখাবার কতকগুলি টোটকা অষুধ ছিল। প্রবোধদা, সেই অষুধের ঘন ঘন সরবরাহ দিতে লাগলেন। প্রথমে চাই ডাবর-ভর্ত্তি পান, কৌটো ভর্ত্তি জর্দা, আর চাই—ঘন ঘন চা।

যত এই জাতীয় জিনিস আস্‌তে লাগ্‌লো, কাজিদার সঙ্গীত-রচনাও তত জমে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। প্রথমেই রচিত হল—"কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা ফুল্ লো—"

বসন্তের কাননে যেমন অকারণের ফুল ফুটে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে—বনপথকে কুসুমে ঢেকে ফেলে, ঠিক তেমনি কাজিদার কণ্ঠের অজস্র গান মনোমোহন থিয়েটারের দেয়ালে-দেয়ালে প্রতিহত হয়ে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেল্‌লো; মহুয়ার গান, মহুয়ার সইদের গান যেন সবাইকার কানে মধুবর্ষণ করতে লাগ্‌ল।

কণিকা মজুমদার ও নবাগতা শর্মিষ্ঠা

আমরা অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম—

"মউল গাছে ফুটেছে ফুল
নেশার ঝোঁকে ঝিমায় পবন ॥"

সে এক কী সুরের হেলা-ফেলার দিনই গিয়েছে !

এই সময়ে মনোমোহনের সান্ধ্য মজলিশে আসতেন—শিল্পী যামিনী রায়, সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়, শিল্পী চারু রায়, সাংবাদিক প্রভাত গাঙ্গুলী, সাংবাদিক শচীন সেনগুপ্ত, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায় (ইনি 'নাচঘর' কাগজে হেমেন্দ্রকুমারের সহকারী ছিলেন), নট দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত সিংহ, আরো বহু শিল্পী-সাহিত্যিকের দল। সবাই সন্ধ্যেবেলায় এসে কাজি নজরুলের এই গানের আসরে যোগ দিতেন আর তৃপ্ত-মনে বহু রাত্রে ঘরে ফিরে যেতেন। প্রবোধদা কিন্তু চুপ চাপ বসে থাকতেন না। তিনি নিজে হাতে মাংস, চপ, কাটলেট, ডেভিল ইত্যাদি তৈরী করে সবাইকে পরিবেশন করতেন। মানুষকে খাওয়াতে প্রবোধদার ভারী আনন্দ।

তখনো অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন তৈরী হয়নি। শ্রীঅনাদি বসু সেই সময় এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। তিনি সবাইকে পানের ডিবে এগিয়ে দিয়ে আপ্যায়িত করতেন। অনাদি বাবুর মুখে মিষ্টি হাসিটুকু সব সময়ই লেগে থাকতো।

গানে আর অভিনয়ে 'মহুয়া' গীতিনাট্য খুব জমে উঠেছিল। হুমড়ো সর্দ্দারের পার্ট করেছিলেন নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী। নায়ক নদেরচাঁদ—দুর্গাদাস বন্দ্যো। মহুয়া—সরযূবালা। সুজন—প্রভাত সিংহ। প্রথম অভিনয়-রজনীতে চারিদিকে জয়জয়কার পড়ে গেল। নাট্য-রসিক ব্যক্তিরা বলে গেলেন,—মহুয়ার গান লোকের মুখে মুখে ফিরবে। মহুয়াতে আমার সামান্য দান ছিল তিন রঙা প্রাচীর-পত্র। বাঙলা মঞ্চে সর্বপ্রথম লিথোপ্রিণ্ট। এটা সম্ভবপর হয়েছিল প্রবোধদার আন্তরিক আগ্রহে।

মহুয়ার ২য় অভিনয় রজনীতে একটা মজার কাণ্ড ঘটলো। সেই কৌতুকজনক কাহিনীই এবার বলব।

নাটক খুব জমে গেছে—চারদিকে নাটকের প্রশংসা আর ধরে না। নাট্যকারকে সবাই হাসিমুখে সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে যাচ্ছেন। প্রবোধবাবু মহা খুশী হয়ে আরো বেশী করে চপ-কাট্‌লেট্ তৈরী করতে মেতে উঠেছেন।

পরিচালক রাজেন তরফদার ও বসন্ত চৌধুরী

বুকিং অফিস থেকে খবর এলো—খুব ভালো বিক্রী,—হাউস ফুল।

এমন সময় এক ভগ্নদূত এসে প্রবোধবাবুর কাছে করুণ কণ্ঠে বললে, থিয়েটারের সময় হয়ে গেছে—কিন্তু দুর্গাদাসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রবোধবাবু প্রথম কথাটায় বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু অভিনয়ের সময় যত সন্নিকট হয়ে আসে—প্রবোধদা তত বেশী ঘর-বার করতে থাকেন। ইতিমধ্যেই চারদিকে লোক ছুটেছিল। একে-একে সবাই ভগ্নদূতের মতো ফিরে এলো। দুর্গাদাস বাড়ীতে নেই, সম্ভাব্য কোনো যায়গাতেই তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

প্রবোধদা ত' মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। আমরা সবাই নির্বাক! নিচ থেকে অসহিষ্ণু দর্শকবৃন্দের কোলাহল ভেসে আসছে এখনই হয়তো তারা টিকিটঘর আক্রমণ করবে।

কিন্তু কোথায় দুর্গাদাস ?

কোথায় 'মহুয়া'র নায়ক—নদের চাঁদ ?

প্রবোধদা পাগলের মতো জনে-জনে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন,—তুমি জানো ? তুমি জানো ? তুমি জানো ?—কাজি তুমি জানো ?

কাজিদা মৃদু হাস্যে উত্তর দিলেন, দুর্গা কোথায় কোথায় যায়—আমায় বলেছে। কিন্তু তা কন্‌ফিডেন্সিয়াল।

প্রবোধদা বললেন, আমায় হদিশ দাও—আমি বের করার চেষ্টা করি—

কাজিদা উত্তর দিলেন, তার চাইতে আমায় একটি গাড়ী দিন, আমি সারা শহর চুঁড়ে দেখি—

প্রবোধদা হতাশার সুরে বললেন, তবেই হয়েছে। এদিকে দুর্গাকে পাওয়া যাচ্ছে না, তার ওপর তোমায় যদি ছেড়ে দিই তবে গানের দিকটা দেখবে কে ? তার চাইতে তুমি থাকো—

এই সময় নীচে একটা সোল্লাস-ধ্বনি শোনা গেল—

এসেছে—এসেছে !

ওপর থেকে উঁকি দিয়ে দেখা গেল, দুর্গাদাস একটি ট্যাক্সি থেকে গদাইলস্করী চালে নেমে,—কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা গ্রীণরুমের দিকে চলে যাচ্ছেন—

ট্যাক্সিওয়ালা যখন ভাড়া চাইছিল, তখন দুর্গাদাস একটা আঙুল তুলে ওপরের দিকে দেখিয়ে দিলেন। মুখে কোনো কথা বললেন না।

ট্যাক্সিওয়ালার সব অন্ধি-সন্ধি জানা ছিল। সে সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে প্রবোধদার সামনে সেলাম করে দাঁড়ালো।

গম্ভীর গলায় প্রবোধদা জিজ্ঞেস করলেন—কত ভাড়া ?

ট্যাক্সিওয়ালা ৬০৲ টাকা কি ৬৫৲ টাকা ভাড়া চেয়ে বসল।

সেই অঙ্কটাই নাকি মিটারে উঠেছে।

ট্যাক্সিওয়ালা তার দুঃখের কথা প্রবোধদার কাছে নিবেদন করলে—কাল রাত সে দো রোজ হাম বাবুকা সাথ ঘুমতা হ্যায় ! নিদ নেই হুয়া,—খানা ভি নেই খায়া—

প্রবোধদা হাসবেন কি কাঁদবেন—ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। ওদিকে নীচে ক্ষিপ্ত দর্শক দল—এদিকে অভিনয়ের অত্যধিক বিলম্ব !

তাই মৃদু কণ্ঠে কাকে আদেশ করলেন, বুকিং অফিস থেকে ট্যাক্সিওয়ালাকে টাকাটা আগে দিয়ে দাও—

কাজি নজরুল রসিকতা করে চীৎকার করে উঠলেন—দে গরুর গা ধুইয়ে।

তাপপর তাঁর সেই প্রাণ-খোলা হো-হো হাসি।

ভগিনী নিবেদিতা

যে বিদেশীর দল সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে সুদূর ভারতবর্ষে স্থায়ী ভাবে এসে বাসা বাঁধলেন, ভারতের মাটিকে জননীজ্ঞান করলেন, ভারতের ঈশ্বরকে নিজের ঈশ্বর বোধ করলেন, ভগিনী নিবেদিতা সেই অবিস্মরণীয় নামগুলির মধ্যে অন্যতম। নিবেদিতা এ দেশে এলেন এ দেশের মুক্তির জন্যে উন্নয়নের জন্যে, কল্যাণের জন্যে. এই মহীয়সী সাধিকার পবিত্র জীবনকাহিনী অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রটি বর্তমানে সগৌরবে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। আজকের এই হতাশ বেদনা আর গ্লানির কৃষ্ণমুহূর্তে এই শিখাময়ী মুক্তিসাধিকার পবিত্র জীবনের ভাবধারা প্রচারের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে কয়েকটি ধিক্কারজনক ছবি যেখানে বাঙলা ছবির মান ক্রমশঃই কুরুচি প্রচারের দ্বারা নিম্নগামী করে তুলছে, সেই সময় এই জাতীয় ছবি জাতীয় মঙ্গলের জন্যে সবিশেষ প্রয়োজন। আবহাওয়া বদলে দেবার ক্ষমতা এই সব ছবিগুলিরই আছে।

ছবিটিতে নিবেদিতার সমগ্র জীবনই দেখানো হয়েছে। নিবেদিতার জীবনে ত্যাগ মৈত্রী ক্ষমা তিতিক্ষা ও কর্মের আলো উজ্জ্বল। জনসেবা তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। লোকশিক্ষায় তাঁর জীবন উৎসর্গীত। ছবিটিতে তাঁর জীবনের আদর্শ ভাবধারা, মর্মবাণী সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে পরিচালক দর্শকচিত্তে এক অপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার করেছেন। ছবির গতি মনোরম, কোথাও ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয় নি। সমগ্র ছবিটিতে কোথাও কোন ফাঁক বা শূণ্যতা চোখে পড়ে না। সারা ছবিতে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের চিহ্ন মেলে। ছবিটিকে দুটি দিক থেকে পর্যালোচনা করা যায়। একদিকে ভক্তিরসের বন্যা, অন্যদিকে বীররসের তরঙ্গ। একদিকে দেখা যাচ্ছে ভক্তির বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ। অন্যদিকে জাতীয়তার জাগরণকল্পে উদ্দীপক মন্ত্রোচ্চারণ। নিবেদিতা বিবেকানন্দের কাছে মন্ত্র দীক্ষা লাভ করে ঈশ্বরের সাধনায় সেবায় আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন, আবার তিনিই জাতির চরম দুর্দিনে তার পুরোভাগে এসে তাঁর মাভৈঃ মন্ত্রে জাতির নবপ্রাণের প্রতিষ্ঠা করেন। ভক্তিরস আর বীররসের এক অনবদ্য সমন্বয় দেখা গেছে নিবেদিতার জীবনে; ছবিটির মধ্যেও এই সত্যের প্রতিফলন দেখা যায়। দুটি রেখা যেন একটি বিন্দুতে এসে মিলে গেছে।

চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অনিল বাগচী। ছবিটি পরিচালনা করে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন সুখ্যাত অভিনেতা বিজয় বসু। নিবেদিতার ভূমিকায় অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় তুলনাবিহীন। ছবিটির সফলতায় তাঁর অভিনয় যে কতখানি সহায়তা করেছে তা অবর্ণনীয়। তাঁর বাচনভঙ্গী অভিব্যক্তি এবং অভিনয়রীতি চমৎকার। স্বামিজীর ভূমিকায় অমরেশ দাসের অভিনয়ও আশানুরূপ। স্বামিজীর চরিত্রের দৃঢ়তা ও কোমলতা দুটি দিকই তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্রজগতে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমরা কামনা করি। স্মরণ থাকতে পারে আজ থেকে ঠিক ছ' বছর আগে 'হে মহামানব' ছবিতে স্বামিজীরই ভূমিকায় ইনি সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। অন্যান্য ভূমিকায় অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, প্রেমাংশু বসু, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী সরকার, শিশির মিত্র, শোভা সেন, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা রায় চৌধুরী প্রভৃতি আশানুযায়ী দক্ষতাই প্রকাশ করেছেন। ছবিটির অংশবিশেষ লণ্ডনে তোলা হয়েছে। ইতিপূর্বে বাঙলা ছবির ইতিহাসে এ ঘটনা ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই। সর্বশেষে আমরা অরোরা গোষ্ঠীকে এই সর্বাঙ্গসুন্দর যুগোপযোগী ও অনন্যসাধারণ ছবিটি সাধারণ্যে উপহার দেওয়ার জন্যে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সংবাদবিচিত্রা

গত ৬ই মার্চ বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘের এক বিশেষ অধিবেশনে গত বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত দেশী ও বিদেশী ছবিগুলির বিষয়গত শ্রেষ্ঠত্বের নির্বাচন সুসম্পন্ন হয়েছে। এই নির্বাচনের ফল নিম্নরূপ।

দশটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবি:—তিন কন্যা, গঙ্গাযমুনা, পুনশ্চ, মধ্যরাতের তারা, সপ্তপদী, কাবুলিওয়ালা... চার দিওয়ারী, উসনে কহা থা, যিস দেশ মে গঙ্গা বহাত হ্যায়, স্বয়ম্বরা। দশটি শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি:—বেন-হুর, দ্য অ্যাপার্টমেণ্ট, কানাল গার্ল সিকস ফাদার, মিলিওনেয়ারেস, অন দ্য বিচ, সাউথ প্যাসিফিক, পেপে দ্য সিঙ্গার নট দ্য সং, এল মার গেনট্রি। শ্রেষ্ঠ পরিচালক:—সত্যজিত রায় (তিনকন্যা), নীতিন বসু (গঙ্গাযমুনা), উইলিয়াম ওয়াইলার (বেন-হুর)। শ্রেষ্ঠ অভিনয়: অভিনেতা:—উত্তমকুমার (সপ্তপদী) দিলীপকুমার (গঙ্গাযমুনা)

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের ছবি—ছায়াছবির বাইরে

চার্লটন হেসটন (বেন-হুর) অভিনেত্রী :—সুচিত্রা সেন (সপ্তপদী) বৈজয়ন্তীমালা (গঙ্গাযমুনা), শার্লি ম্যাকলেন (য়্যাপার্টমেণ্ট)।

শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতপরিচালক :—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (স্বরলিপি), রবিশঙ্কর (সন্ধ্যারাগ), নৌশাদ (গঙ্গাযমুনা),

ভারত সরকারের ফিল্মস্ ডিভিসানের ভারপ্রাপ্ত প্রযোজকের পদে নিযুক্ত হয়েছেন মিঃ কে, এল, খান্দপুর। এজরা মীরের পর ইনি এই আসন অলঙ্কৃত করলেন। এই বিভাগটির সঙ্গে ১৯৪১ সাল থেকে তিনি যুক্ত। ঐ বিভাগের সহযোগী পরিচালক, প্রধান পরিচালক, সহযোগী প্রযোজক প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ আসনগুলি ইনি অধিকার করেছেন। ইনি এম, এস, সি, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ এবং দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন।

অমর সাহিত্যস্রষ্টা চার্লস ডিকেন্সের 'ব্লিক হাউস' কাহিনীকে চলচ্চিত্রায়িত করা হচ্ছে। বিখ্যাত লেখকের বিখ্যাত কাহিনীর চিত্রায়ণ চিত্রামোদীদের কাছে নিঃসন্দেহে এক আনন্দ সংবাদ। 'ব্লিক হাউস'এর চিত্রায়ণকে কেন্দ্র করে যে আকর্ষণীয় সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে সেটি হচ্ছে যে এর চিত্রনাট্য রচনা করছেন স্বনামধন্যা আগাথা ক্রিষ্টি। রহস্যকাহিনীর রচয়িত্রী হিসেবে সারা জগতের পাঠকসমাজে যিনি বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারিণী। এই চিত্রনাট্য রচনা করার জন্যে শ্রীমতী ক্রিষ্টি দক্ষিণা গ্রহণ করেছেন সাড়ে তিনলক্ষ টাকারও বেশী অর্থ।

'ক্লিওপেট্রা' ছবিটির বিষয়ে নানা সংবাদ ইতিমধ্যে জগতের চলচ্চিত্র রসিক সমাজে এক আলোড়ন এনেছে। ক্লিওপেট্রা নির্মাণে যে অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে তার অঙ্ক এ ক্ষেত্রে বিস্ময়কর। এই প্রসঙ্গে ওয়ার্ণার ব্রাদার্স আরও একটি ছবির সংবাদ ঘোষণা করেছেন যার নাম "মাই ফেয়ার লেডি" যার নির্মাণ ব্যয়ের অঙ্কও সমান বিস্ময়কর। শোনা যাচ্ছে এই ছবিটির নির্মাণে প্রযোজকবৃন্দ প্রায় দশ কোটি টাকা খরচ করছেন। খবরটি সত্যিই বিস্ময়কর নয় কি?

গত ৫ই মার্চ হলিউড ফরেন প্রেস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক নৈশ ভোজসভায় ১৯৬১ সালের জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক চিত্রতারকা হিসেবে চার্লটন হেসটন এবং মেরিলিন মনরোর নাম বিঘোষিত হয়েছে। 'গান্স অফ নাভারোন' এবং 'ওয়েষ্ট সাইড ষ্টোরি' ছবি দুটি যথাক্রমে বছরের শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রধান ও সঙ্গীতপ্রধান চিত্ররূপে নির্বাচিত হয়েছে।

চিত্রতারকা ভ্যান হেফলিন বর্তমানে এক ভয়ঙ্কর সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছেন। আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে ১৭৫০০০ পাউণ্ডের এক মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা করেছেন ডক্টর রেমন প্রেজলার। ডক্টর প্রেজলারের স্ত্রী নেটালির গাড়ীর উপর একটি নব্বই ফুট গাছ পতিত হওয়ায় নেটালির মৃত্যু হয়। তাঁর স্বামীর অভিযোগ ঐ বৃক্ষ হেফলিনের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত এবং সেটি বহু দিনই এক বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। সুতরাং সাধারণের জন্যে হেফলিনের এক্ষেত্রে যথাকর্তব্য পালিত হয়নি।

সুপ্রিয়া চৌধুরী ছবি—ছায়াছবির বাইরে

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

বর্ণচোরা

বিশিষ্ট কথাশিল্পী বনফুলের 'কষ্টি' অবলম্বনে 'বর্ণচোরা'র চিত্ররূপ গড়ে উঠছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন বনফুল-অনুজ চিত্রপরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিচ্ছেন অনিল চট্টোঃ, গঙ্গাপদ বসু, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, গীতা দে প্রভৃতি।

নতুন দিনের আলো

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের "নতুন দিনের আলো" কাহিনীটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দিচ্ছেন অগ্রদূত গোষ্ঠি। এর চিত্রনাট্য রচনা করছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায়। রূপায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বসন্ত চৌধুরী, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় প্রভৃতি শিল্পিবর্গ।

মুক্তিবন্যা

শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা অবলম্বনে 'মুক্তিবন্যা' ছবিটি পরিচালিত হচ্ছে সুভাষচন্দ্র চন্দ্রের দ্বারা। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন, বিকাশ রায়, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস, শোভা সেন, বনানী চৌধুরী, দেবযানী, যমুনা সিংহ প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পীর দল।

শেষ চিহ্ন

'শেষ চিহ্ন' ছবিটি রূপ নিচ্ছে বিভূতি চক্রবর্তীর পরিচালনাধীনে। এই ছবিটির মাধ্যমে যাঁদের অভিনয় রূপালী পর্দায় দেখা যাবে তাঁদের মধ্যে কমল মিত্র, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, রেণুকা রায়, লিলি চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অন্ধদেবতা

'অন্ধদেবতা' ছবিটির পরিচালন ভার নিয়েছেন সরোজ কুশারী, এই ছবিটির গল্পাংশও তাঁরই লেখনীজাত। ছবিটিতে সুর যোজনাও তিনিই করছেন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন বলে যাঁদের নাম বিজ্ঞাপিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রা দেবী, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, শুক্লা দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে

সুদর্শন অভিনেতা—শ্রীবিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

কয়েক বছর আগে পর্য্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্রের পরিচালকদের নিয়ে যা একটা বিশেষ সমস্যার আকারে দেখা দিয়েছিল বর্ত্তমানে কয়েকজন তরুণ সুদর্শন এবং প্রতিভাবান নায়কের আগমনের ফলে তার কিছুটা সমাধান হয়েছে। সেই কয়েকজনের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীবিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তাই তাঁর সঙ্গে চলচ্চিত্র সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার জন্য একটা দিন স্থির করে গেলাম তাঁর কাছে। উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর শুরু হল আমাদের প্রশ্নোত্তরের পালা।

আমার প্রথম প্রশ্ন। কিছুদিন আগে B. M. P. A-র ডাকে চলচ্চিত্রে নিয়োজিত এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে যে ধর্ম্মঘট হয়ে গেল তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আপনাদের কি কোন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে?

এখুনি কিছু হয়নি, বললেন বিশ্বজিৎবাবু, কারণ Strike-এর পর কোন চুক্তি করার সঙ্গে হয়নি। তবে, একটা কথা কি জানেন, প্রযোজকরা যখুনি আসেন তখনি একটা না একটা Source নিয়ে আসেন। সেইজন্যে ভবিষ্যতে আবার কি কথা নিয়ে আসবেন, তা এখন থেকে বলতে পারছি না।

কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় যদি অপর এক শ্রেণীর মধ্যে অনির্দ্দিষ্ট কালের অনুরূপ ধর্ম্মঘটের সৃষ্টি হয় তা হলে শিল্পী হিসেবে আপনি অথবা আপনারা কি করবেন?

একটু হেসে বিশ্বজিৎবাবু বললেন, কি করব, সে কথা এখন থেকে বলা তো মুশকিল। তবে উপায় যা হোক তখন একটা বার করতে হবে বৈ কি! যাতে তাঁরাও বাঁচেন, আমরাও বাঁচি এবং এই শিল্পও বেঁচে থাকে।

প্রশ্ন—লক্ষ্য করে থাকবেন বোধ হয়, কোন একটা ষ্টুডিওর বহু সংখ্যক কর্ম্মচারী আজ অনশনে দিন কাটাচ্ছেন এবং সেই ষ্টুডিও তার ফলে আজ অবলুপ্তির মুখে। এতে কি ঐ শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটা ব্যক্তিই ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন না?

নিশ্চয়ই হচ্ছেন এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্য হচ্ছেন জেনেও কেউ কিছুই করছেন না আসলে Who will bell the cat এই হচ্ছে সমস্যা।

আচ্ছা, বর্ত্তমানে বাংলা দেশের অভিনেতাদের মধ্যে বিশেষ করে যাঁরা নায়ক নির্ব্বাচিত হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে পাশ্চাত্যের ছাপ আজকাল এসে পড়েছে এটা কি ঠিক। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

যাঁর যা কিছু ভাল তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি। তবে পুরোপুরিভাবে নকল করাটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

আমার পরের প্রশ্ন, সিনেমায় যোগ দিলে অথবা একটুখানি প্রতিষ্ঠিত হলেই অভিনেতারা অসামাজিক হয়ে পড়েন বলে শোনা যায় এটা কি ঠিক? এর উত্তরে ডাকহরকরা চিত্রের নতুন শিল্পী বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় বললেন, অসামাজিক হয়ে পড়ে নয় ওটা করিয়ে দেয়। কারণ এক শ্রেণীর অত্যুৎসাহী দর্শক আছেন যাঁরা কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে পথে-ঘাটে কোথাও দেখলেই ভিড় জমিয়ে দেন অনেক সময় তাদের remarkও ভাল হয় না। তাঁরা এই অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের অন্য জগতের লোক বলে মনে করেন। এঁরা যে ওঁদেরই মত সাধারণ মানুষ এ কিছুতেই ভাবতে পারেন না। বাধ্য হয়েই তাই তাঁদেরকে দূরে দূরে থাকতে হয়।

আপনি আপনার অভিনীত কোন বই দেখেন কি? দেখলে কতগুলি? এবং দেখার সময় আপনার মনের উপর তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় কি?

দেখি বৈ কি? তবে বিশ-শাল-বাদ চিত্রের নায়ক বিশ্বজিৎ বাবু বললেন তবে সবগুলি দেখা সম্ভব হয় না। আর প্রতিক্রিয়ার কথা যা বললেন, তা হয় বৈকি? কখনও আনন্দ পাই, কখনও আঘাত পাই। তখন মনে হয় মানুষ কি সত্যই social lifeএ এ রকম হয়।

চলচ্চিত্রে মঞ্চে এবং বেতারের মধ্যে কোনটিকে আপনি অভিনয় প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলে মনে করেন এবং কেন?

দেখুন, বিশ্বজিত বাবু বললেন, অভিনয় যার মাধ্যমেই করা হোক না কেন, অভিনীত চরিত্রটিকে যদি মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করা যায় তা হলে অভিনেতার কাছে সবই সমান। Goethe-এর ভাষায় Art is as interpretation but not representation."

শোনা যায় আপনি ধনীসন্তান আপনার পক্ষে জীবনে করারও অনেক কিছু ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও এ লাইনে যোগ দিলেন কেন? যেখানে প্রতি মুহূর্ত্তে রয়েছে পদস্খলনের সম্ভাবনা ও অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ।

কি বললেন, ধনী সন্তান! একটু হাসলেন বিশ্বজিৎ বাবু; বললেন, অভিনয় করাটাকে art হিসেবে যদি ধরা যায় তাহলে সেখানে গরীব-বড়লোকের কোন পার্থক্য নেই। উইনষ্টন চার্চ্চিলের

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

কন্যাও অভিনয় করছেন আবার অন্যদিকে গ্রেগরী পেকও। বরঞ্চ আমি এ লাইনে যোগদান করে বিন্দুমাত্রও জয়যুক্ত হতে পেরেছি কিনা সেই কথাটা বলুন। বাকী যে কথাগুলো বললেন তার সম্বন্ধে কি বলব বলুন, ও-তো একজন মানুষের বৃহৎ জীবনের মধ্যে যে কোন মুহূর্ত্তেই আসতে পারে। আর শিল্পী জীবনকে ভালবেসে শিল্পকে আঁকড়ে থাকাই হবে আমার ভবিষ্যৎ।

বম্বের কোন ছবিতে আপনি কি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন, না হবার বাসনা রাখেন ?

বাসনা নয়, অলরেডি হয়ে গেছি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় Productions-এর 'বিশ সাল বাদ' চিত্রের ওহাদিয়া রহমনের বিপরীতে নায়ক হিসেবে। বইখানা হয়তো এপ্রিলেই মুক্তি পাবে।

আচ্ছা, বাংলা এবং বম্বের ষ্টুডিওর মধ্যে কোন পার্থক্য চোখে পড়ল কি ?

তফাৎ আছে বৈকি! ওখানকার Equipment অনেক বেশী। Technically ওরা অনেক Advanced. Technicians Groupও ওদের অনেক Strong.

শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত কাহিনী এবার আপনাদের কিছু জানাব। বিশ্বজিৎবাবু প্রথম অভিনয় করার সুযোগ পেলেন 'ডাকহরকরা' চিত্রের একটি ছোট চরিত্রে এবং এ সুযোগ প্রথম তাঁকে দেন অগ্রগামীর সরোজ দে। কালুদা নামে ইনি সকলের পরিচিত। এরপর 'কংস' এবং 'মায়ামৃগ' চিত্রে নায়ক হিসেবে অভিনয় করেন। এর জন্যে শ্রীবিমল ঘোষের কাছে ইনি বিশেষ ভাবে ঋণী। বর্ত্তমানে বিশ্বজিৎবাবু বধূ, দাদাঠাকুর, নতুন দিনের আলো, অগ্নিবন্যা, ধূপছায়া, এক টুকরো আগুন, মায়ার সংসার ইত্যাদি চিত্রে অভিনয় করছেন। আপনারা শুনলে আশ্চর্য্য হবেন বিশ্বজিৎবাবু সুকণ্ঠের অধিকারী। এবং H. M. V.-তে তিনি পর পর দুখানি রেকর্ডও করেছেন। খেলাধুলা, বই পড়া, ইংরেজী সিনেমা দেখার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ আছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের পিতা ডাঃ রঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায় Chief Medical Officer, Hooghly এবং Air Technical Institute-এর Principal শ্রীসুবোধচন্দ্র মৈত্র হচ্ছেন এর শ্বশুর। ২৬ বছরের যুবক বিশ্বজিৎবাবু মাত্র দু বছর আগে বিবাহ করেছেন শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায়কে। বর্ত্তমানে এদের একটিমাত্র সন্তান নাম প্রসেঞ্জিত।

—শ্রীজানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[এই সংখ্যায় প্রকাশিত ছায়াচিত্র সংক্রান্ত ছবিগুলি জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত নন্দী ও মোনা চৌধুরী কর্তৃক গৃহীত। এই আলোকচিত্রগুলির মধ্যে প্রথম তিনখানি "অগ্নিশিখা" ছবিটির নির্মাণকালে গৃহীত]

স্বনামধন্য শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিতের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনী অবলম্বনে "দাদাঠাকুর" নামে একটি ছায়াছবি বর্ত্তমানে প্রস্তুতির পথে। দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন প্রখ্যাত নট ছবি বিশ্বাস। শ্যামলাল জালান প্রযোজিত ও সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবিটির একটি দৃশ্যে ছবি বিশ্বাস এবং অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে

ফাল্গুন, ১৩৬৮ (ফেব্রুয়ারী—মার্চ্চ, '৬২)

অন্তর্দেশীয়—

১লা ফাল্গুন (১৩ই ফেব্রুয়ারী) : সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ কর্ত্তৃক শ্রীনেহরুর (প্রধান মন্ত্রী) নিকট লিপি প্রেরণ—নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে জেনেভায় ১৮-জাতি শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব।

২রা ফাল্গুন (১৪ই ফেব্রুয়ারী) : এভারেষ্ট অভিযানে মেজর জন ডায়াসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ভারতীয় এভারেষ্ট অভিযাত্রী দলের যাত্রা।

৩রা ফাল্গুন (১৫ই ফেব্রুয়ারী) : প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের (৮৬) কলিকাতার বাসভবনে লোকান্তর।

৪ঠা ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারী) : ভারতে তৃতীয় সাধারণ নির্ব্বাচন সুরু—প্রথম দিনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ১১টি লোকসভা ও ৪৪টি বিধান সভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ।

৫ই ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারী) : সাধারণ নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনে পশ্চিমবঙ্গের ৭টি লোকসভা ও ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন।

মধ্যপ্রদেশের ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানায় ধর্ম্মঘট ও হাঙ্গামা—ধর্ম্মঘটীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশের লাঠি চার্জ্জ ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ।

৬ই ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী) : নির্ব্বাচনের তৃতীয় দিনে পশ্চিমবঙ্গে ১টি লোকসভা কেন্দ্র ও ১৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ।

৭ই ফাল্গুন (১৯শে ফেব্রুয়ারী) : সাধারণ নির্বাচনের চতুর্থ দিবসে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ১১টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সমাধা।

৮ই ফাল্গুন (২০শে ফেব্রুয়ারী) : নির্ব্বাচনের পঞ্চম দিনে পশ্চিমবঙ্গের ১১টি লোকসভা ও ২২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ।

৯ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী) : নিরস্ত্রীকরণ শীর্ষ সম্মেলন প্রসঙ্গে ক্রুশ্চেভের প্রস্তাবে শ্রীনেহরু সম্মত—রুশ প্রধান মন্ত্রীর নিকট লিপি প্রেরণ।

১০ই ফাল্গুন (২২শে ফেব্রুয়ারী) : নির্ব্বাচনের সপ্তম দিবসে পশ্চিমবঙ্গের ৪৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ।

১১ই ফাল্গুন (২৩শে ফেব্রুয়ারী) : সাধারণ নির্ব্বাচনের অষ্টম দিনে পশ্চিমবঙ্গের ৬টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সমাধা।

১২ই ফাল্গুন (২৪শে ফেব্রুয়ারী) : আসাম, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, কেরল (কেবলমাত্র লোকসভা নির্ব্বাচন) ও কেন্দ্র শাসিত দিল্লী রাজ্যে ভোটগ্রহণ সমাপ্ত।

১৩ই ফাল্গুন (২৫শে ফেব্রুয়ারী) : কলিকাতার ২৬টি বিধানসভা ও ৪টি লোকসভা কেন্দ্রে এবং হাওড়ায় ভোটগ্রহণ সম্পন্ন।

শালতোড়া বিধানসভা কেন্দ্র (বাঁকুড়া) হইতে নির্ব্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জয়লাভ।

১৪ই ফাল্গুন (২৬শে ফেব্রুয়ারী) : কলিকাতার চৌরঙ্গী কেন্দ্র হইতেও মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বিধানসভায় নির্ব্বাচিত।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুর নির্ব্বাচনে পরাজয় বরণ। পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে কংগ্রেসের একক সংখ্যাধিক্য।

১৫ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুয়ারী) : পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসচিব শ্রীভূপতি মজুমদার ও শ্রমসচিব শ্রীআব্দাস সাত্তারের নির্ব্বাচনে পরাজয় বরণ। আসাম, অন্ধ্র প্রদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রেও কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

১৬ই ফাল্গুন (২৮শে ফেব্রুয়ারী) : পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেসের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জন—নির্ব্বাচনে বিধানসভা স্পীকার শ্রীবঙ্কিম করের পরাজয়। প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান শ্রীঅতুল্য ঘোষ লোকসভায় নির্ব্বাচিত। মহীশূরে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য লাভ। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ।

১৭ই ফাল্গুন (১লা মার্চ্চ) : পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচনী ফলাফল—কংগ্রেস-১৫৭, কম্যুনিষ্ট-৫০ এবং অন্যান্য দল ও নির্দ্দলীয়গণ-৪৫টি আসনের অধিকারী। লোকসভায় কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস একক সংখ্যাধিক্য অর্জ্জনে অসমর্থ। উত্তর বোম্বাই লোকসভা কেন্দ্রে আচার্য্য জে, বি, কৃপালনীর (নির্দ্দলীয়) বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা সচিব শ্রীকৃষ্ণমেননের জয়লাভ।

১৮ই ফাল্গুন (২রা মার্চ্চ) : পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার ৩৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের ২২টি আসন অধিকার—ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসভার দুইটি আসনই কমুনিষ্টদের করতলিত।

১৯শে ফাল্গুন (৩রা মার্চ্চ) : নির্ব্বাচনে সাফল্য অর্জ্জনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের বিজয়োৎসব—কলিকাতা ময়দানে প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান শ্রীঅতুল্য ঘোষের সভাপতিত্বে বিরাট জনসভা।

২০শে ফাল্গুন (৪ঠা মার্চ্চ) : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী কর্ত্তৃক দীঘায় 'অঘোর কামিনী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে'র (মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের মাতার নামানুসারে) ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

২১শে ফাল্গুন (৫ই মার্চ্চ) : মুক্ত গোয়া, দমন ও দিউ'র প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স জারী।

২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ্চ) : চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক বিপ্লবী শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্ত্তীর (৭২) জীবনাবসান।

২৩শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ্চ) : উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, আসাম ও বিহারের কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা (ভাবী মুখ্যমন্ত্রী) হিসাবে শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্ত, সর্দ্দার প্রতাপ সিং কাইরণ, শ্রী বি, পি, চালিহা ও শ্রীবিনোদানন্দ ঝা নির্ব্বাচিত।

২৪শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ্চ) : 'ভারতের জাতীয় আয় এক বৎসরে ৮৪০ কোটি টাকা বর্দ্ধিত হইয়াছে'—কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার রিপোর্টে তথ্য প্রকাশ।

২৫শে ফাল্গুন (৯ই মার্চ্চ) : মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় পুনরায় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা নির্ব্বাচিত।

২৬শে ফাল্গুন (১০ই মার্চ্চ) : ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক ১৩ জন

সদস্য (পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী) লইয়া পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত।

২৭শে ফাল্গুন (১১ই মার্চ্চ): রাজভবনে ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভার (পশ্চিমবঙ্গ) শপথ গ্রহণ।

কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার কম্যুনিষ্ট দলের প্রধান নির্ব্বাচিত।

২৮শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ্চ): শ্রীকেশব বসু (কংগ্রেস) পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার নির্ব্বাচিত।

তৃতীয় অর্থ কমিশনের (চেয়ারম্যান শ্রী এ, কে, চন্দ) সুপারিশসমূহ লোকসভায় পেশ।

মার্কিণ প্রেসিডেন্টের পত্নী শ্রীমতী কেনেডির ভারত সফর উদ্দেশ্যে দিল্লী উপস্থিতি।

২৯শে ফাল্গুন (১৩ই মার্চ্চ): পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভার ১১ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ১০ জন উপমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ।

লোকসভায় ভারতের ১৯৬২-৬৩ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ—১৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত।

৩০শে ফাল্গুন (১৪ই মার্চ্চ): লোকসভায় উপস্থাপিত ভারতের অন্তর্ব্বর্ত্তী বাজেটে (১৯৬২-৬৩) ৬৩ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি। পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে ৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি প্রদর্শন।

গোয়া, দমন, দিউ'র ভারতভুক্তি সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধন বিল লোকসভায় গৃহীত।

বহির্দেশীয়—

১লা ফাল্গুন (১৩ই ফেব্রুয়ারী): পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুবের মন্ত্রিসভা সঙ্কটের সম্মুখীন—নূতন শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে অন্তর্দ্বন্দ্বের সংবাদ।

২রা ফাল্গুন (১৪ই ফেব্রুয়ারী): বৃটেন ও আমেরিকা কর্ত্তৃক রাশিয়ার ১৮ জাতি নিরস্ত্রীকরণ শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

৩রা ফাল্গুন (১৫ই ফেব্রুয়ারী): নিরাপত্তা পরিষদে (রাষ্ট্রসঙ্ঘ) কাশ্মীর প্রশ্ন উত্থাপন ব্যাপারে করাচীতে পাক্ নেতৃবর্গের বৈঠক।

৪ঠা ফাল্গুন: (১৬ই ফেব্রুয়ারী) বৃটিশ গায়নার গভর্ণর কর্ত্তৃক জর্জ টাউনে অবরোধের অবস্থা ঘোষণা।

৬ই ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী): ভারতীয় বিমান কর্ত্তৃক চীনের আকাশ সীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ—ভারতের নিকট চীন সরকারের প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ।

আয়ুবের (পাক্ প্রেসিডেন্ট) শাসনের বিরুদ্ধে লণ্ডনে পাকিস্তানী ছাত্রদের প্রবল বিক্ষোভ।

৭ই ফাল্গুন (১৯শে ফেব্রুয়ারী): আলজিরিয়া সপ্ত বর্ষব্যাপী যুদ্ধবিরতির জন্য আলজিরীয় বিদ্রোহী দল ও ফরাসী সরকারের মধ্যে প্রাথমিক মতৈক্য।

৮ই ফাল্গুন (২০শে ফেব্রুয়ারী): পৃথিবীর কক্ষপথে আমেরিকার মানুষ প্রেরণ—ঘণ্টায় ১৭ হাজার মাইল বেগে মানুষবাহী মহাকাশ-যানের পৃথিবী পরিক্রমা।

৯ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী:) মার্কিণ প্রথম মহাশূন্যচারী জন গ্লেনের নিরাপদ অবতরণ—সকল মহলে আনন্দোচ্ছাস।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের সর্ব্বত্র (ঢাকা সহ) শহীদ দিবস (ভাষা আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে) পালন।

১১ই ফাল্গুন (২৩শে ফেব্রুয়ারী): তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থানের চক্রান্ত ব্যর্থ—একজন জেনারেল সহ ১৫ জন তুর্কী অফিসার গ্রেপ্তার।

১২ই ফাল্গুন (২৪শে ফেব্রুয়ারী): সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার সৈন্য সমাবেশের আয়োজন—প্রেসিডেন্ট সুয়েকার্ণোর নির্দ্দেশনামা জারী।

১৫ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুয়ারী): সায়গান রাজপ্রাসাদের উপর জঙ্গী বিমানের আক্রমণ—দক্ষিণ ভিয়েৎনাম প্রেসিডেন্ট দিয়েমের প্রাণনাশের ব্যর্থ চেষ্টা।

১৭ই ফাল্গুন (১লা মার্চ্চ): পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান কর্ত্তৃক পাকিস্তানের নূতন শাসনতন্ত্র ঘোষণা।

১৮ই ফাল্গুন (২রা মার্চ্চ): প্রধান সেনাপতি জেঃ নে-উইনের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক ব্রহ্মের শাসন ক্ষমতা দখল—প্রধান মন্ত্রী উ নু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার।

১৯শে ফাল্গুন (৩রা মার্চ্চ): বিদ্রোহীদের আক্রমণের পরিণতিতে বীরগঞ্জে সান্ধ্য আইন জারী।

২০শে ফাল্গুন (৪ঠা মার্চ্চ): জেঃ নে উইনের নেতৃত্বে গঠিত বিপ্লবী পরিষদ কর্ত্তৃক ব্রহ্মের পার্লামেণ্ট বাতিল।

২১শে ফাল্গুন (৫ই মার্চ্চ): পররাষ্ট্র সচিব পর্য্যায়ে জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন অনুষ্ঠানে ইঙ্গ-মার্কিণ প্রস্তাবে রাশিয়ার সম্মতি।

আলজিরিয়ায় সর্ব্বত্র ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের দৌরাত্ম্য।

২৩শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ্চ): ফ্রান্স আলজিরীয় যুদ্ধবিরতি আলোচনা চূড়ান্ত পর্য্যায়ের সুরু।

২৪শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ্চ): রুশিয়া কর্ত্তৃক এশীয় অর্থ নৈতিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের আহ্বান—ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের চাপ হইতে অনুন্নত দেশগুলির রপ্তানীকে বাঁচাইবার উপায় উদ্ভাবন।

২৫শে ফাল্গুন (৯ই মার্চ্চ): দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কম্যুনিষ্ট উচ্ছেদে আমেরিকার সরাসরি হস্তক্ষেপের প্রমাণ্য সংবাদ।

২৬শে ফাল্গুন (১০ই মার্চ্চ): ব্রহ্মের বিপ্লবী পরিষদ কর্ত্তৃক জেঃ নে উইনের হস্তে সর্ব্বোচ্চ প্রশাসনিক ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পণ।

২৭শে ফাল্গুন (১১ই মার্চ্চ): ইভিয়ানে ফরাসী ও আলজিরীয় প্রতিনিধি দলের (বিদ্রোহী) যুদ্ধ বিরতি আলোচনায় অধিকাংশ প্রশ্নের মীমাংসা।

'বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণের ফলে অর্থ নৈতিক বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না' রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ নিযুক্ত দশ জাতি বিশেষজ্ঞ সংস্থার রিপোর্ট।

২৮শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ্চ): জেনেভায় রুশ পররাষ্ট্র সচিব গ্রোমিকোর সহিত বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হোম ও মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্কের বৈঠক—নিরস্ত্রীকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা।

জেনারেল নে উইন কর্ত্তৃক স্বহস্তে ব্রহ্মের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা গ্রহণ।

৩০শে ফাল্গুন (১৪ই মার্চ্চ): জেনেভায় প্রতীক্ষিত ১৭ জাতি (পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত ফ্রান্স বাদে) নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ—ভারতের পক্ষে প্রতিরক্ষা সচিব শ্রীকৃষ্ণমেননের যোগদান।
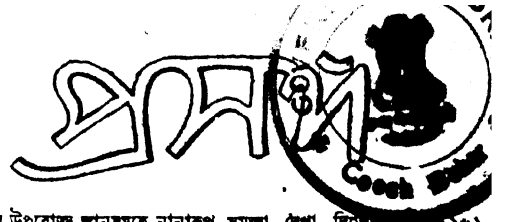
পাকিস্তানী উৎপাত

"পাকিস্তান সরকার পশ্চিম দিনাজপুরে দ্বিতীয় বেরুবাড়ী সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া যে সংবাদ পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা খুবই উদ্বেগজনক। র‍্যাডক্লিফ এমন একটি রোয়েদাদ দিয়া গিয়াছেন যাহা শুধু নিত্য নূতন বিরোধ সৃষ্টির সুযোগ পাকিস্তানকে দিতেছে। উক্ত রোয়েদাদ অনুযায়ী হিলি থানার অন্তর্গত আপ্তের মৌজাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। পাকিস্তান সরকার হিলির রেল লাইনের পশ্চিম দিকে অধিক পরিমাণে জমি দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনে করেন, পুরাতন ব্রডগেজ লাইনের জন্য সংগৃহীত পশ্চিম সীমান্তই প্রকৃতপক্ষে দুই সরকারের অধীনস্থ জমির সীমানা হওয়া উচিত। কিন্তু পাক সরকার রেল লাইনের পার্শ্ববর্তী টেলিগ্রাফের পোষ্ট ধরিয়া সীমানা বিস্তার করিয়া চলিয়াছেন। পাকিস্তান যদি এই ভাবে নির্বিবাদে কিছু কিছু করিয়া সীমানা বাড়াইতে থাকে, তাহা হইলে কালক্রমে পশ্চিমবঙ্গের অনেকখানি পাকিস্তানের কবলিত হইয়া পড়িবে। শেষ পর্যন্ত না গোটা পশ্চিমবঙ্গই এই ভাবে চলিয়া যায়।"

—দৈনিক বসুমতী।

মেট্রিক বিড়ম্বনা

"১লা এপ্রিল হইতে মেট্রিক ওজনের ব্যবহার বাধ্যতামূলক হইয়াছে। পুরানো এবং নূতন কিছুকাল যাবৎ এই দুই প্রকারের ওজন-পদ্ধতির সহাবস্থান চলিতেছিল। এবারে পুরানো পদ্ধতি একেবারে সর্বাংশে বিদায় লইবে। তার ফলে প্রথম-প্রথম যে বেশ-কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অসুবিধা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে। সব চাইতে বড় অসুবিধা, নূতন ওজনের বাটখারা নাকি চাহিদা মতন পাওয়া যাইতেছে না। তা ছাড়া, নূতন ওজনের অঙ্ক এখনও অনেকেরই সড়গড় হয় নাই; ইতস্তত তাঁহারা প্রতারিত হইতে পারেন। তবে বলাই বাহুল্য, এ-সব অসুবিধা ধীরে-ধীরে কাটিয়া যাইবে। তখন বুঝিতে পারা যাইবে, নূতন পদ্ধতিতে হিসাবের সুবিধা অনেক বেশী। নয়াপয়সা লইয়াও ত এককালে পথে ঘাটে, হাটে বাজারে কম ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হইত না। অথচ নয়া পয়সায় হিসাব এখন দিব্য চলিতেছে। নয়া ওজনও চলিবে। ইতিমধ্যে, প্রাথমিক পর্যায়ে যাহাতে অত্যধিক ভুলচুক না ঘটে, তার জন্য প্রচারের দিকটাই আর-একটু লক্ষ্য রাখা দরকার।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

দার্জিলিং সমস্যা

"সমগ্র দার্জিলিং জেলা, উত্তরপ্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশের কয়েকটি এলাকা বিজ্ঞাপিত অঞ্চল বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ইহাতে স্থানীয় অধিবাসী ছাড়া অন্য কাহারো সেখানে যাইতে হইলে অনুমতিপত্র লইয়া প্রবেশ করিতে হইবে। বাহিরের লোকজনের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের জন্য উপরোক্ত স্থানসমূহে নানারূপ সমস্যা দেখা দিতে[illegible] ১৯৬১ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে এই সকল এলাকা 'নোটিফাইড' এরিয়া বা বিজ্ঞাপিত এলেকা ঘোষণা করার সঙ্গে এই মর্মে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা, অত্যাবশ্যক সরবরাহ চালু রাখা বা অত্যাবশ্যক ব্যবস্থাগুলি বজায় রাখা অথবা ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে এরূপ কোন বিবৃতি, গুজব বা সংবাদ প্রকাশ বা প্রচার করিলে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তির তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয় প্রকারের দণ্ড হইতে পারিবে। এই আদেশও পূর্বেই দেওয়া উচিত ছিল। ইহাতে স্থানীয় শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের কোনই চিন্তা বা উদ্বেগের কারণ নাই। কেবল যাহারা বে-আইনী কাজে লিপ্ত এবং এই দেশের ক্ষতি করিতে বা ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত, এই আদেশ তাহাদের বিরুদ্ধেই উদ্যত।"

—যুগান্তর।

খনি দুর্ঘটনা

"কয়লা খনি দুর্ঘটনা কোন নূতন ঘটনা নহে। পরন্তু ইহা প্রায় দৈনন্দিন ঘটনার পর্যায়ে পড়িয়াছে। সম্প্রতি আসানসোলের নিকটবর্তী শাপি কাজোরা কোলিয়ারীতে খনির ছাদ ধ্বসিয়া ৫জন কর্মরত শ্রমিকের জীবন্ত সমাধি হয় এবং কয়েকজন গুরুতররূপে আহত হন। ২৩শে মার্চের এই ঘটনার পর একই খনিতে এখনো কয়লা তোলার কাজ চলিতেছে বলিয়া কোলিয়ারী মজদুর সভার সম্পাদক শ্রী বি, এন, তেওয়ারী অভিযোগ করিয়াছেন। শ্রীতেওয়ারীর বিবৃতিতে এই সম্পর্কে অবিলম্বে সরকারী তদন্ত দাবী করিয়া, ক্ষোভের সহিত, খনি শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তার প্রতি কত কম নজর দেওয়া হয় তাহার প্রতিই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। দেশের শিল্পোন্নয়নের সহিত কয়লার প্রয়োজন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কয়লা উৎপাদনের উন্নয়ন আজ যখন অপরিহার্য তখন এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের প্রতি এই অবহেলা শুধু জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী নহে, ইহা মানবতা-বিরোধীও বটে। খনি-মালিকদের মুনাফার লালসা হইতে যে সরকার ইহাদের বাঁচাইতে পারে, দুঃখের বিষয়, সেই সরকারী পরিচালনাধীনে খনিগুলির অবস্থাও খুব নিরাপদ ও সুষ্ঠু না হওয়ায় ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত কর্তৃপক্ষ যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে সাহসী হইতেছেন। এই দুর্ঘটনা বন্ধ করিয়া নিরাপত্তার সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য যে দাবী উঠিয়াছে তাহা অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য আমরাও অনুরোধ জানাইতেছি।"

—স্বাধীনতা।

ভারতের আশে-পাশে

"ভারতের মধ্যে আসামই একমাত্র রাজ্য যাহা চীনা, পাকিস্তানী ও বিদ্রোহী নাগা এই ত্রিবিধ উপদ্রবের দ্বারা উৎপীড়িত। প্রথমেই নাগা বিদ্রোহীদের কথা ধরা যাক। বিদ্রোহী নাগাগণ ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক না হইলেও, পৃথক রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের তাহারা দাবীদার। কেবল তাহাই নয়, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী সৈন্যদল যখন পলাতক

নাগাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, তখন তাহারা ব্রহ্মের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া স্বচ্ছন্দে আশ্রয় গ্রহণ করে ব্রহ্মদেশের আরণ্য আবাসে। তাহাদের দৌরাত্ম্য দমন করিবার জন্য এ যাবৎকাল যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা যে বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহা স্বয়ং। তিনি বলেন, ভারতের যথাসাধ্য প্রয়াস সত্ত্বেও, নাগা উপদ্রবের বিশেষ কোন উপশম ঘটে নাই তাহার প্রদত্ত বিবৃতি হইতে ইহাও প্রকাশ যে, চীনা গুপ্তচর-চক্র সীমান্ত অঞ্চলে আজও কর্মতৎপর এবং তাহাদের ক্রিয়া-কলাপের উপরে যথাসম্ভব সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইতেছে। অতঃপর স্বভাবতঃই আসে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশের প্রশ্ন। শোনা যাইতেছে, সে অনুপ্রবেশ রোধ করিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট নাকি সীমান্তবর্তী কয়েকটি রাজ্যের পুলিস কর্তৃপক্ষের হাতে বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। সে ক্ষমতা যদি সত্য সত্যই প্রদত্ত হয়; সে ক্ষেত্রে উল্লিখিত উপদ্রব রোধ করায় পক্ষে তাহা পর্যাপ্ত হইবে কিনা তাহা পরে বিবেচ্য। চীনের উপদ্রবে কেন্দ্রীয় সরকারের এতদিনে টনক নড়িয়াছে, ভারতের রাজনৈতিক দল বিশেষের সহিত চীনের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে ভারত সরকারকে সচকিত ও সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। তাহার এক বিশেষ ঘোষণা বলে পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশের কোন কোন অংশকে বিজ্ঞাপিত অঞ্চল রূপে ঘোষণা করিয়া আগম নিগম নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তৎপর হইয়াছেন। উক্ত ঘোষণা প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কার্যে প্রযুক্ত হইবে ইহাই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ।"

—জনসেবক।

হতভাগ্য জীব

"মাথা প্রতি জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে হিসাব কষিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ কৃষিজীবী আধপেটা খায়। তাহাদের দ্বারা লালিত বলদ ইত্যাদির ভাগ্য অধিকতর সুপ্রসন্ন হওয়া সম্ভব নয়। চাষের বলদ বৎসরের অধিকাংশ সময় নিষ্কর্মা থাকে। গোযানের রেওয়াজ উঠিয়া যাইতেছে। বলদে টানা যানের অস্তিত্ব লোপ পাইতেছে। কাজেই বলদ স্বীয় শ্রমশক্তিতে খোরাকের খরচ জুটাইতে পারে না। অর্দ্ধ ভোজনে ক্লিষ্ট গাভী গড়ে বৎসরে শতাধিক টাকা মূল্যের দুধ দিলেই যথেষ্ট। কিন্তু বলদ ও গাভী বাদ দিবার উপায় নাই। এমতাবস্থায় বলদকে বারো মাস কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। উহা পাম্প চালাইয়া সেচ এবং জলনিকাশের দায়িত্ব পালনে সক্ষম, উহার সহায়তায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারে। দুঃখের বিষয় যাঁহারা গোবরের সদ্ব্যবহারে সচেষ্ট, তাঁহারা অর্দ্ধোপবাসী গো-মহিষের কথা চিন্তা করার অবকাশ পান না। বলদের প্রতীক দেখাইয়া যাহারা ভোট সংগ্রহে অভ্যস্ত, তাঁহারা বলদ গাভীর ক্ষুন্নিবৃত্তি সম্বন্ধে মাথা ঘামান না। গৃহপালিত চতুষ্পদ জীবেরা বিক্ষোভ জানাইতে পারে না, তাহাদের ভোটাধিকারও নাই। সুতরাং তাহাদের খাদ্যাভাব ঘুচাইবার সাধু সঙ্কল্পও ঘোষিত হয় না।"

—লোকসেবক।

মন্থরগতি যানবাহন

"কলিকাতার পুলিশ কমিশনার উপানন্দ মুখোপাধ্যায় নূতন কাজে যাওয়ার আগে দিনের বেলায় সহরে ঠেলাগাড়ী চালানো বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমরা আশা করি নূতন কমিশনার শচীন্দ্রমোহন ঘো[illegible] এই আদেশ বলবৎ রাখিবেন এবং দৃঢ়হস্তে উহা কার্যে পরিণ[illegible]

করিবেন। মন্থরগতি গাড়ি প্রত্যেক সহরে যানবাহন চলাচলের সবচেয়ে বড় বাধা। দিল্লীতেও এদিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে এবং সহরের মধ্যে টাঙ্গা চালানো বন্ধ হইতেছে। কলিকাতায় ঠেলাগাড়ী বন্ধ হইলে ব্যবসায়ীদের অসুবিধা হইবে এবং তার আশু প্রতিকার বাঞ্ছনীয়। ঠেলার পরিবর্ত্তে ছোট ট্রাকের লাইসেন্স দিলে সব অসুবিধা দূর হইয়া যাইবে। তবে এই লাইসেন্স কেবলমাত্র বাঙ্গালীদের মধ্যে কঠোর ভাবে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। তাহা করিলে সহরের যানবাহনে অধিকতর শৃঙ্খলা সাধন এবং বেকার বাঙ্গালীর কর্ম্ম সংস্থান উভয়টিই একসঙ্গে হইতে পারিবে। কলিকাতার লরীর লাইসেন্সও বাঙ্গালীর হাতে আনিবার সময় আসিয়াছে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ স্বীকার করিয়াছে যে এরূপ আদেশ দান প্রাদেশিকতা নহে। বাঙ্গলার পক্ষে অযথা পিছাইয়া থাকিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই।"

—যুগবাণী।

পৌরাধ্যক্ষ অবহিত হইবেন কি ?

"গরম পড়িবার পূর্ব্বেই আমরা কলের জলের সম্পর্কে পৌরাধ্যক্ষকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। কলে ইতিমধ্যেই লাইন পড়িতে শুরু হইয়াছে। তবে মারামারির খবর এখনও পাই নাই। এই মারামারি হইবার পূর্ব্বেই আমরা পৌরাধ্যক্ষ মহোদয়কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। যদি নূতন কলের জল সংযোগ হইতে দেরী থাকে তবে কলে জল ছাড়িবার সময় বাড়ানর কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভোর ৪টার নিয়মিত কলে জল আসে না কোন কোন দিন ৫টা ৫।৷টাও বাজিয়া যায়। যদি নিয়মিত ভোর ৪টা হইতে বেলা ১১টা ও বেলা ২।৷০টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা, ৭।৷০টা পর্যন্ত কলে জল থাকে তবে মনে হয় উপস্থিত জন-সাধারণ মারামারি না করিয়াও জল পাইতে পারে। যে সমস্ত জায়গা উঁচু বলিয়া কলের জল যথা-প্রয়োজন পৌঁছায় না সেখানে এখন হইতেই ট্রাকে করিয়া জল পাঠাইতে হইবে। আমরা মনে করি, নাগরিকগণের যেমন পৌরসভার প্রতি কর্ত্তব্য আছে সেইরূপ পৌরাধ্যক্ষেরও নাগরিকদের প্রতি কর্ত্তব্য আছে—মনে করাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শুধু নাগরিকগণের নিকট হইতে ট্যাক্স নিয়মিত আদায় করাই পৌরাধ্যক্ষের কার্য্য হইবে না, তাহাদের সুখ সুবিধার দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রাস্তা-ঘাটের কথা ছাড়িয়া দিলাম কিন্তু যে জলের জন্য জন-সাধারণের জীবন বিপন্ন হইতে পারে—সেই জলের ব্যবস্থা আশু অবলম্বন করা পৌরাধ্যক্ষের একান্ত কর্ত্তব্য।"

—আসানসোল হিতৈষী (আসানসোল)।

শ্রীমতী আশা গঙ্গোপাধ্যায়

সিটি কলেজের অধ্যাপিকা ও "মহিলা" সম্পাদিকা শ্রীমতী আশা গঙ্গোপাধ্যায় ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-ফিল উপাধি লাভ করেছেন। এঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ। এই বিষয়বস্তু অবলম্বন করে ইতিপূর্বে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর কেউ এই সম্মান পাননি। শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায় ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে এই থিসিসটি প্রণয়ন করেন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন ও শ্রীমতী লীলা মজুমদার থিসিসটি পরীক্ষা করেন ও থিসিসটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। সুলেখিকা হিসেবেও ইনি বাঙলার পাঠকসমাজে যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারিণী। পারিবারিক জীবনে ইনি বাঙলার প্রখ্যাতনামা কথাশিল্পী অধ্যাপক নারায়ণ গাঙ্গুলীর সহধর্মিণী।

শ্রীমতী জ্যোৎস্না চক্রবর্তী

শ্রীমতী জ্যোৎস্না চক্রবর্তী (মুখোপাধ্যায়) প্রাণিবিজ্ঞানে ডি, ফিল উপাধিলাভ করেছেন। ভারত সরকারের রিসার্চ ট্রেণিং স্কলারশিপ লাভ করে (১৯৫৭) ইনি সাহা ইনষ্টিটিউটে অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর বায়ো-ফিজিক্সের অধ্যাপক ডক্টর নীরজনাথ দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেন। এঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে কালাজ্বর ও অন্যান্য পরজীবি এককোষী প্রাণিদেহের অতি সূক্ষ্ম গঠন বিন্যাস। জার্মাণীর জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর বি, স্নুশনিগ এবং কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক ডক্টর এইচ, এন, রায় কর্তৃক তাঁর থিসিস উচ্চ প্রশংসিত ও পরীক্ষিত হয়। শ্রীমতী চক্রবর্তী বর্তমানে অধ্যাপক ডক্টর দাশ-গুপ্তের তত্ত্বাবধানে উক্ত গবেষণাগারে রিসার্চ য্যাসোসিয়েট হিসেবে উচ্চতর গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। ইনি পাটিকাবাড়ী নিবাসী শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা ও শ্রীরামপুর (বর্তমান কলকাতা নিবাসী) শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তীর পত্নী।

শোক-সংবাদ

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বর্তমানকালের সাংবাদিক জগতের কুলপতি, বাঙলার বরেণ্য সন্তান দৈনিক, সাপ্তাহিক ও ইংরাজী বসুমতীর প্রাক্তন সম্পাদক মনস্বী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের গত ৩রা ফাল্গুন ৮৬ বছর বয়সে কর্মবহুল জীবনের অবসান ঘটেছে। কেবল মাত্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিল না, সাহিত্যে, বাগ্মিতার এবং ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভার

উল্লেখযোগ্য ফসল ফলেছে। কপোতাক্ষ নদীতীরবর্তী চৌগাছা গ্রামে ১২৮৩ সালের ১ই আশ্বিন (২৪এ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬) হেমেন্দ্রপ্রসাদের জন্ম। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন বিবিধ বিষয়ক তথ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। এই অতুলনীয় প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ইনি সাধারণ্যে 'চলন্ত অভিধান' আখ্যায় খ্যাত হয়েছিলেন এবং কালক্রমে নিজেই একটি ইতিহাসে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর সারগর্ভ সুচিন্তিত রচনাদি বাঙলা-সাহিত্যের মণ্ড দিয়েছে। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সঙ্গে

তিনি অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিল। ইনি কিছুকাল গ্যাডভাল পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং কিছুকাল স্বয়ং আর্যাবর্ত নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বঙ্গবাণী, সন্ধ্যা, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকাদির সঙ্গে নিয়মিত লেখক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। বন্দেমাতরম'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। ভারতীয় সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের সদস্য রূপে ইনি ১৯১৭ সালে মেসোপটেমিয়ায় গমন করেন। প্রথম ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামানন্দ ও গিরিশ ঘোষ বক্তৃতা প্রদান করেন। সাংবাদিকতা শিক্ষার ক্লাস সূচিত হলে সেখানে নিয়মিত বক্তা রূপে যোগ দেন। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর ইনি সেনেটের সদস্য হন। কিছুকাল পৌরসভার সদস্যও ছিলেন। অসংখ্য গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। তাঁর প্রয়াণে জাতীয় জীবনে যে শূন্যতা সূচিত হল তা পূর্ণ হওয়ার নয়।

সুনয়নী দেবী

বর্তমান ভারতের মহিলা চিত্রশিল্পীদের নেত্রীস্বরূপা শ্রদ্ধেয়া সুনয়নী দেবী মহোদয়া গত ১১ই ফাল্গুন ৮৭ বছর বয়েসে লোকান্তর যাত্রা করেছেন। ইনি শিল্পাচার্য গগনেন্দ্রনাথ ও শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের স্বনামধন্যা সহোদরা। ভারতের মহিলাদের মধ্যে চিত্রশিল্পীদের খ্যাতি অর্জন করা গৌরব তিনিই প্রথম লাভ করেন। বাঙলার পটশিল্পের পুনরুদ্ধার তথা গবরূপায়ণে তাঁর অসামান্য অবদান। জীবনের সুদীর্ঘকাল অঙ্কনসাধনার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখে শিল্পজগতের ইনি যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। পটশিল্পের ক্ষেত্রে কল্পনা ও বাস্তবতার সমন্বয় সাধন তাঁর শিল্পী-জীবনের এক মহান কীর্তি। পুণ্যশ্লোক রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্রীর পৌত্র স্বর্গত: এটর্নি রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন।

জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল

সাহিত্যসম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয় স্যার জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল গত ২৬এ ফাল্গুন ৯১ বছর বয়েসে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। একজন বিশিষ্ট ও সুদক্ষ সিভিলিয়ানরূপে ইনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। এঁর কর্মজীবনের একটি বিরাট অংশ বোম্বাইতে অতিবাহিত হয়। ইনি বোম্বাই লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, কাউন্সিল অফ ষ্টেট, গভর্ণরস এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (বোম্বাই) প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। দেশের বহু বিরাট শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ইনি পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন। কিছুকাল ইনি ক্যালকাটা ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অন্যতমা দৌহিত্রী কুচবিহারের মহারাজকুমারী সুকৃতি দেবীর সঙ্গে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে অল্পকালের ব্যবধানে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের মৃত্যুতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নাতিদের মধ্যে আর কেউই জীবিত রইলেন না।

অম্বিকা চক্রবর্তী

প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নায়ক এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ভূতপূর্ব সদস্য অম্বিকা চক্রবর্তী গত ২২এ ফাল্গুন ৭০ বছর বয়েসে এক মোটর দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার ফলে পরলোকগমন করেছেন। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের পিতৃদেব যাত্রামোহন সেনগুপ্তের আহ্বানে ইনি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২১-২২ সালে ইনি চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন, ঐ সময় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিরও সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম লুণ্ঠনের আসামীস্বরূপ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আদেশ কার্যকরী হয়নি। ১৯৪৬ সালে ইনি কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হন।

সুধাংশুমোহন বসু

সুপ্রবীণ আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ সুধাংশুমোহন বসু গত ১৫ই ফাল্গুন ৮৪ বছর বয়েসে দেহান্তরিত হয়েছেন। সুদীর্ঘকাল ইনি আইন কলেজের অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষাজগতে এক গৌরবময় আসন অধিকার করেন ইনি ছ'বছর অখণ্ড বাঙলার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য এবং কিছুকাল চেয়ারম্যান ছিলেন। ইনি সিটি কলেজ ও ব্রাহ্ম-বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি এবং বসু বিজ্ঞান মন্দির ও ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রভৃতি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান সভাপতি স্বনামধন্য মনস্বী স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন এবং লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যক্ষা স্বনামধন্যা ডক্টর রমা চৌধুরী এঁর কন্যা।

কাজরী গুহ

বাঙলার খ্যাতিময়ী চিত্রাভিনেত্রী কাজরী গুহের গত ২০এ ফাল্গুন মাত্র ৩১ বছর বয়েসে অকালে জীবনাবসান ঘটেছে। ইনি শুধু অভিনয়ের ক্ষেত্রেই নয়, শিল্পচর্চায় এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুশীলনেও যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স ক্লাবের বিভিন্ন নাটকে অংশগ্রহণ করে ইনি সুনাম অর্জন করেন। হারানো সুর, দীপ জ্বেলে যাই, সাথীহারা প্রভৃতি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাঁর অভিনয় প্রতিভা প্রকাশিত হয়েছে। চলচ্চিত্র জগতে একজন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী রূপে ইনি যুগপৎ যশ ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

অরিজিৎ রায় (মাষ্টার টুকাই)

"অবাক পৃথিবী" খ্যাত শিশুশিল্পী অরিজিৎ রায় (মাষ্টার টুকাই) গত ১ই ফাল্গুন মাত্র ৮ বছর বয়েসে ইহলোক ত্যাগ করেছে। মাত্র একটি ছবির মাধ্যমে সে দর্শকসমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বেতার নাটকে সে নিয়মিত অংশগ্রহণ করত। অরিজিৎ সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের অন্যতম মেধাবী ছাত্র ছিল।
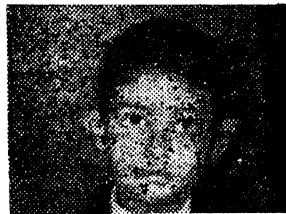
সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
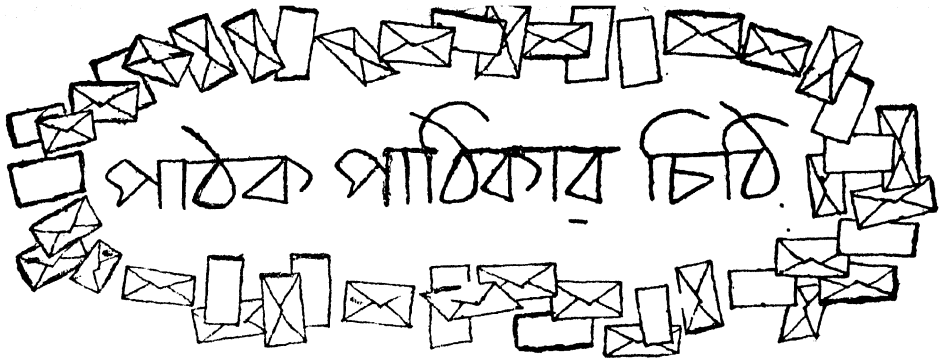
পত্রিকা সমালোচনা

পতিতাবৃত্তির প্রতিকার

শ্রীহৃদয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লেখা পতিতাবৃত্তি ও তাহার প্রতিকার এবং শ্রীমতী জ্যোৎস্না চক্রবর্ত্তীর লেখা চিঠিখানি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। আমিও এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন আছে মনে করি। বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খলতার জন্ত দেশের কর্ণধার ও মাতা পিতার দোষ বেশী। ছেলেমেয়েদের যথা সময়ে বিয়ে দেওয়ার দায় বাপ মা'র। অনেকে অনেক সময় হাতে চাঁদ ধরতে চান, তা না করে যদি নিজেদের সামর্থ্য-অনুযায়ী বিবাহের ব্যবস্থা করতেন তবে অনেক ছেলেমেয়েই হয়ত বিপথে যেত না। মেয়ে বি এ পাশ করলে বরও অনুরূপ খুঁজতে হয় আর কাঞ্চন মূল্য'ত আছেই। এই কাঞ্চন মূল্য বন্ধ করা দরকার এবং সমাজের কর্ত্তব্য। যৌনক্ষুধা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাকে দমন করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না? বর্ত্তমান যুগে কোন সমাজ বন্ধন ও শাসন না থাকায় যুবক যুবতী আত্মীয়-অনাত্মীয় অবাধ ভাবে মেলা মেশা করতে পারে যেমন জলসা, থিয়েটার, চাকরী জীবন প্রভৃতি। পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবে আর মন বিচলিত হবে না এটা অস্বাভাবিক, আর এই অবাধ মেলামেশার ফলে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের সুযোগ আসে কত ঘর যে ধ্বংস হচ্ছে তার প্রমাণ বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত। বিবাহ বিচ্ছেদ—পাশ্চাত্য দেশের অভিশাপ আমরাও তাহার নকল করিয়া সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়াছি। কিন্তু আজ যে কারণে একজনের সঙ্গে বনল না কালও ত অন্তের সঙ্গে সেই একই কারণ উপস্থিত হতে পারে তখন আবার এবং বার বার বিবাহ বিচ্ছেদ ছাড়া উপায় কি? তাতে কি কোন পক্ষ সুখী হবে? একবার বিবাহ বিচ্ছেদ করে চোখের লজ্জা কেটে গেলে দ্বিতীয়বার আর ততটা সঙ্কোচ হয় না এও কি এক ধরণের বহুপতি বৃত্তি নয়? বিবাহ বিচ্ছেদের সব থেকে করুণ দিক শিশুরা তারা না পায় মার স্নেহ না পায় বাপের। ফলে বাপে তাড়ান মায়ে খেদান শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি। তাছাড়া যদি মা'ই প্রকৃতি শিশুর শিক্ষাদাতৃ হয় তবে তারা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হোল। মার স্নেহ না পেয়ে তাদের জীবন বিষময় হয়ে উঠে তাদের কোমল বৃত্তিগুলি নষ্ট হয়ে যায় না কি? ধর্ম্মহীন শিক্ষা—বর্ত্তমান আমাদের শিক্ষায় ধর্ম্মের স্থান নাই তাই ছাত্ররাও অন্যায় করতে সঙ্কুচিত হয় না। এটা অন্যায়, দোষ করলে শাস্তি পেতে হবে এ জ্ঞান যদি না থাকে তবে অন্যায় ও দোষ করতে বাধাটা কোথায়? তাই হয়ত বর্ত্তমান ছাত্র সমাজ এত উচ্ছৃঙ্খল। যদি বাপ মা আদর্শস্থানীয় হোত যদি স্কুলেও স্তায় অন্তায় ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হোত তবে হয়ত তারা ভবিষ্যৎ জীবনে অন্যায় অধর্ম্ম করতে সঙ্কুচিত হোত। এটা সত্য যে উচ্ছৃঙ্খল পিতা মাতার উচ্ছৃঙ্খল সন্তান হয়? যে সিগারেট খায় তার সিগারেট খেতে নিষেধ করা ততটা ফলবতী হয় না, Inheritence বলে একটা জিনিষ আছে তা স্বীকার করতে হবে। প্রত্যেক মা বাপের উচিত নিজেরা আদর্শ স্থানীয় হয়ে সন্তানদের গড়ে তোলা। উচ্ছৃঙ্খলতায় রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, চৈতন্ত হতে পারে না। বর্ত্তমান নৈতিক চরিত্র অবনতির আর কয়টি সাহায্যকারী জিনিষ বাজারে উপস্থিত হয়েছে। যেমন গর্ভনিরোধক জিনিষপত্র ইহা এক প্রধান উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের মঙ্গলাকাঙ্খী প্রত্যেকের ইহার প্রতিবাদ করা দরকার। উত্তেজক পানীয় আহার—কিছু দিন আগে মাসিক বসুমতী মহিলা বিভাগে পড়েছিলাম আমিষ আহার বিধবাদের গ্রহণে দোষ কি? উত্তেজনা হয় বা বাড়ে সেটা কি কুমারী আর কি বিধবা। তাই আমাদের শাস্ত্রে বিধবার খাওয়া নিষেধ ছিল তা ছাড়া আগে ত ৩০ বছরেও কুমারী ছিল না। খাওয়াতে প্রত্যেক লোকেরই সংযত হওয়া দরকার। চাকরী—যুবতী নারীদের চাকরী আর একটি কারণ, ঘি আর আগুন একসঙ্গে কঠিন থাকতে পারে না। যেখানে ছেলেদের চাকরী জোটে না এত বেকার সমস্যা ছেলে একটা চাকরী পেলে যেখানে একটা সংসার বেঁচে যায় ছেলেটাও বর্ত্তে যায় সেখানে ছেলেকে চাকরী না দিয়ে মেয়েদের চাকরীর প্রয়োজন কি? মেয়েটি ত একটি ছেলেকে বেকার করে স্বলাভিষিক্ত হোল, এও কি এক ধরণের indirect stimulant দেওয়া বা পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা নয়? এমন সংসার আছে যেখানে স্বামি-স্ত্রী চাকরী করছে অথচ পাশের বাড়ীতে বেকার ছেলে গলায় দড়ি দিচ্ছে দিনান্তে হাঁড়ি চড়ছে না বলে। আজকাল কানে আসে বিবাহ, সতীত্ব, বাজে কথা। বিবাহ সতীত্ব ঠিক, কি ছাগবৃত্তি ঠিক তা আপনারাই বিচার করুন, একনিষ্ঠতার দাম অনেক বেশী সর্ব্বকালে সর্ব্বসমাজে বিশেষতঃ আমাদের সোনার দেশ ভারতবর্ষে। সিনেমা সংক্রান্ত পুস্তকের প্রশ্নোত্তর বিভাগ পড়লেই মাথা ঘুরে যায় আমরা কোথায়! এসব কি বন্ধ করা যায় না। আমি গত ১২ই ডিসেম্বর কলকাতা গেছলাম। আত্মীয় বাড়ী থেকে রাত ৭৷৷০ সময় ফিরছি, বাঘা যতীনের মোড়ে অজাতশ্মশ্রু ২টি বালক গর্ভপাত, কি ভাবে গর্ভ হয় ইত্যাদি সুমধুর শ্লীলতাহীন ভাবে আলোচনা করছে। লোকেদেরও কর্ণগোচর হচ্ছে অথচ প্রতিবাদ নাই। শীতের পড়ন্ত বেলায় (মাধবী ভট্টাচার্য্য মাসিক বসুমতী) পড়িয়া একটি ষোড়শী অনুরূপ চেষ্টা করে ও অসাফল্য হেতু যৌনমনোবিকারে ভুগে ও চিকিৎসিত হয়।

প্রেমী চাঁটার্লীর প্রেম ও একবুঝা আকাশের। শ্যামলের নিকট মনোলার আত্মসমর্পণ পর্যন্ত পড়িয়া একটি কিশোর উদ্দাম হইয়া উঠে এবং হস্তমৈথুনের আশ্রয় নেয়। শেষকালে তাহাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হয়। নিবেদনান্তে, ডাঃ নীলিমা ভট্টাচার্য্য পোঃ পালঝিয়া, via-সারিয়া হাজারিবাগ।

সবিনয় নিবেদন—আপনার সম্পাদিত 'মাসিক বসুমতী' নিঃসন্দেহে একটি পরম লোভনীয় বই। নীল অথবা সবুজ খামের মতই এই বইটির জন্যও বহু পাঠক-পাঠিকারা অপেক্ষা করে থাকেন। এই প্রিয় জিনিসটা সুন্দর হলেও আরও সুন্দর দেখতে চাই। কয়েকটা অনুরোধ করছি। আপনার (প্রাণতোষ ঘটক), প্রতিভা বসুর, জরাসন্ধর, সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা বসুমতীতে আমরা পড়তে চাই। কয়েকটা উপন্যাস পড়তে অত্যন্ত বোরিং লাগে। বলতে বাধ্য হচ্ছি। আশুতোষ মুখার্জীর 'কাল তুমি আলেয়া' ভীষণ সুন্দর লাগছে। প্রশান্তি মুখার্জীর 'সিক্ত যুথীর মালা'ও বেশ লাগছে। নীলকণ্ঠের 'বার্দ্ধক্যে বারাণসী' এক কথায় অপূর্ব্ব। প্রশান্ত চৌধুরীর 'পায়ে পায়ে কাদা' সুন্দর হলেও স্বগতোক্তির মত অত সুন্দর নয় কিন্তু। পরিমল গোস্বামীর 'স্মৃতি চিত্রণ' পড়তে রীতিমত ভালো লাগে। ছোট গল্পের মাঝে পূরবী চক্রবর্ত্তীর লেখার টাইলটা সুন্দর। বিশ্বনাভিক্ষুর লেখা আর পাইনা কেন? রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে লেখা দিলে ভালো হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরও পড়তে চাই। সুবোধ চক্রবর্ত্তীর কোন লেখা প্রকাশ করলে বাধিত হব। সবশেষে বলি, এভাবে আপনার রচনা মাসিক বসুমতী থেকে থামিয়ে দিলেন কেন? খুব তাড়াতাড়ি আপনার লেখা অবশ্যই বার করতে হবে? নমস্কারান্তে—রাণু, বন্দনা ও অম্বিতা সিংহ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

সচিব, স্যানেটোরিয়া কোলিয়ারী ক্লাব, ডাক—ডিসেরগড়, জেলা—বর্দ্ধমান * * * সচিব, কমনরুম কমিটি, আলিপুর-দুয়ার কলেজ ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন, আলীপুর-দুয়ার * * * শ্রীমতী রেখারাণী দাশগুপ্ত, II (দ্বিতীয়) মেন রোড, গান্ধীনগর, মাদ্রাজ—২০ * * * শ্রীগোপাল চন্দ্র সাহা, সহকারী সচিব, পি য়্যাণ্ড টি রিক্রিয়েশান ক্লাব, ডাক—গ্যাংটক, সিকিম * * * শ্রীজি, ডি, ঘোষ, বৈদ্যুতিক বিভাগ, বল্লভপুর পেপার য়্যাণ্ড এস, বি, মিলস লিমিটেড, ডাক—বল্লভপুর, চান্দা (মধ্যপ্রদেশ) * * * শ্রীনরেন্দ্রনাথ লোধ, কমলপুর, ত্রিপুরা * * * শ্রীরাধাশ্যাম চন্দ, সচিব, অরুয়া মিলন সঙ্ঘ, ডাক—পাঁচরোল, জেলা—মেদিনীপুর * * * প্রধান শিক্ষক, মাধ্যমিক শিক্ষণ বিদ্যালয়, আগড়পাড়া, ডাক—বি, টি, পার (ভদ্রক হয়ে), বালেশ্বর * * * শ্রীমতী রেবা সিংহ, অবধারক—শ্রীবি, এল, সিংহ, পূর্ব্বায়ন, মিশন হসপিটাল রোড, ডাক—হাজারীবাগ, বিহার * * * প্রধান শিক্ষক ভদ্রপুর, মহারাজ নন্দকুমার হাই-স্কুল, ভদ্রপুর, বীরভূম * * * শ্রীআর, এন, বাগচী, ৪৪।১৮ মাইসোর ল্যান্সার্স লাইন, ব্যাঙ্গালোর—৬ * * * শ্রীমণীন্দ্রকুমার রায়, অবধারক—অন্নদা মেডিক্যাল হল, বড়বাজার, নেত্রকোণা (ময়মনসিংহ), পূর্ব-পাকিস্তান * * * শ্রীমতী রেবা মুখোপাধ্যায়, অবধারক—শ্রীজি, কে, মুখোপাধ্যায়, ৫ ম্যাপটার্ড লেন, রেওয়া (মধ্যপ্রদেশ) * * * ডক্টর বি, আর, মুখোপাধ্যায়, ভেটিরিনারি অফিসার, কুরভয়, সুলতানপুর, (উত্তরপ্রদেশ), * * * তত্ত্বাবধায়ক, সেবায়তন শিল্প বিদ্যালয়, ডাক—সেবায়তন (ঝাড়গ্রাম হয়ে), জেলা—মেদিনীপুর * * * গ্রন্থাগারিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা—২ পূর্ব-পাকিস্তান * * * শ্রীমতী সরস্বতী দত্ত, অবধায়ক—শ্রীআর, আর, দত্ত, আণ্ডার ম্যানেজার, ২ নং ইনক্লাইন কলিয়ারী, ডাক—বেলামপল্লী অন্ধ্র-প্রদেশ * * * ব্লক ডেভেলোপমেণ্ট অফিসার, ধনিয়াখালি ডেভ I ডেভেলোপমেণ্ট ব্লক, ডাক—ধনিয়াখালি (হুগলী)।

Sending herewith Rs. 15/- as an annual subscription of monthly Basumati—Headmaster Paranpur Higher Secondary Multipurpose School, Malda.

Subscription for one year from Magh 1368 B. S.—Head Master Amtala Multipurpose School, Murshidabad.

বার্ষিক মূল্য পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন।—শোভনা বসু, ধানবাদ।

Subscription for the Year 1961-62—Head Mistress Govt. Girls H. S. & Multipurpose School, Krishnagar.

মাসিক বসুমতীর গ্রাহকমূল্যের মেয়াদ পৌষ সংখ্যায় শেষ হওয়াতে বাৎসরিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম।—Mrs. Bina Mittra, Nagpur.

Sending Rs. 15/- as subscription for monthly Basumati. Please arrange to send by post commencing from Falgun sankhya—Secretary Sanatorium Colliery Club. Burdwan.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদার renewal বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীঅশোক চৌধুরী, সম্পাদক, হরিপদ সাহিত্য মন্দির, পুরুলিয়া।

Remitted Rs 15/- in payment of your annual subscription from Magh 1368 B. S.—Principal, Teachers Training College, Kalyani.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠালাম। ১৩৬৮ সালের শুরু থেকে বসুমতীর কপি পাঠাবেন।—Dr. B. R. Mukherjee, Sultanpur, U.P.

Remitted Rs. 15/- in payment of annual subscription of Monthly Basumati—Principal M. B. B. College, Agartala, Tripura.

Sending herewith Rs. 15/- as my annual subscription from "Magh"—R. N. Bose, Jaipur Rajasthan.

মাসিক বসুমতীর ফাল্গুন ১৩৬৮ হইতে শ্রাবণ ১৩৬৯ পর্য্যন্ত ছয় মাসের চাঁদা পাঠাইলাম।—Bandhab Samiti, Bhabanagar, Guzrat.

Remitted Rs. 15/- as annual subscription of Monthly Basumati for one year commencing from Magh 1368 B. S.—Headmaster, Krishnagar P. T. School.

Rs. 15/- is sent towards yearly subscription—Sushama Devi, Raipur, M. P.

Sending herewith Rs. 15/- only. Kindly send Basumati regularly—Headmaster Secondary Training School, Agarpara. 24 Paraganas.

মাসিক বসুমতী

চৈত্র, ১৩৬৮ ॥

[শ্রীমতী রচনা ঠাকুরের সৌজন্যে]

(অপ্রকাশিত : জলরঙ)

শকুন্তলা

—স্বর্গতা সুনয়নী দেবী অঙ্কিত

স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী
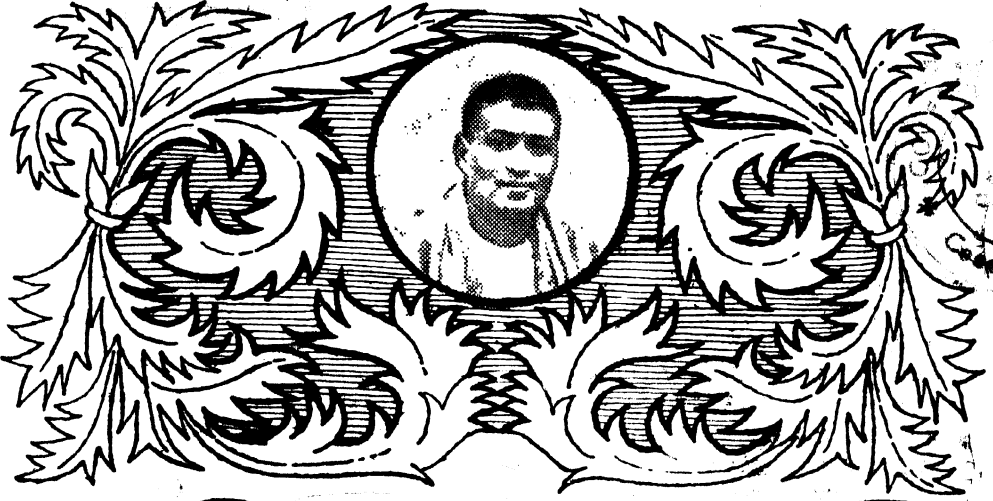
৪০শ বর্ষ—চৈত্র, ১৩৬৮] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কথামৃত

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যাবে, প্রেমভক্তি উথলিবে,
হেরিবে আপন ইষ্টদেবে।
ভুবনমোহন রূপ, অপরূপ যেই রূপ,
নামগুণে তাহাও দেখিবে॥
কর সবে নাম সার, ত্যজ বিষয় অসার,
রবে আর কতদিন ভুলে।
বল সবে রামকৃষ্ণ, গাও সবে রামকৃষ্ণ
মাত সবে রামকৃষ্ণ বলে॥
পূর্ণব্রহ্ম নরহরি, ধরাধামে অবতরি,
রামকৃষ্ণ বল বাহুতুলে।
পাইবে অপরানন্দ, ঘুচিবে মনের দ্বন্দ্ব,
ভাবের কপাট যাবে খুলে॥
অদ্বৈত গৌর নিতাই, তিনে মিলে একঠাই,
দেখরে ভাবের হাটে খেলে।
রামকৃষ্ণ সুধানিধি, পান কর নিরবধি,
নামরসে ভাস কুতুহলে॥
ওঁ রামকৃষ্ণ, ওঁ রামকৃষ্ণ, ওঁ রামকৃষ্ণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিত সেবক জনকোপম—মহাত্মা রামচন্দ্র।

২*

দেবদেব মহাদেব সর্ব্বারাধ্য পরাৎপর।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ১
পতিতানাম্ হিতার্থায় নররূপ ধরোঽভবঃ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ২॥
ত্বমেবাদিরনাদিস্ত্বং সর্ব্বসাক্ষী ত্বমেব হি।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ৩॥
ত্বং জলং ত্বং স্থলং ত্বং ব্যোম বায়ুর্বৈশ্বানরস্তথা।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ৪॥
স্থূলো সূক্ষ্মোঽনন্তশ্চ ত্বং হি কারণকারণং।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ৫॥
পুরুষঃ প্রকৃতি ত্বং হি স্ব প্রকাশো চরাচরে।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ৬॥
ত্বং হি জীবস্ত্বং মুক্তিজ্ঞঃ স্থাবরাঞ্চাপি জঙ্গমম্।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ৭॥
লীলাজাতোঽসি নিত্যোঽসি নিত্যলীলাবহিঃস্থিতঃ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ৮॥

অব্যক্তস্ত্বমচিন্ত্যস্ত্বং সত্যং জ্ঞানং ত্বমেব চ ।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে ॥ ৯ ॥
ত্বং হি ব্রহ্মা চ বিষ্ণু স্ত্বং হি দেবো মহেশ্বরঃ ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্ ॥ ১০ ॥
কালী দুর্গা ত্বমেবাসি ত্বং চ রাসরসেশ্বরী ।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে ॥ ১১ ॥
মীনঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ রূপাণ্যন্যানি তে বহিঃ ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্ ॥ ১২ ॥
ত্বং হি রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বামনাকৃতিরীশ্বরঃ ।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে ॥ ১৩ ॥
নানকস্ত্বং যীশু ত্বং চ শাক্যদেবো মহম্মদঃ ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্ ॥ ১৪ ॥
শচীসুতোঽসি ত্বং দেব নামধর্ম্মপ্রকাশকঃ ।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে ॥ ১৫ ॥
রামকৃষ্ণেতি প্রখ্যাতং নবরূপং প্রকল্পিতং ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্ ॥ ১৬ ॥
ধর্ম্মং কর্ম্ম ন জানামি শাস্ত্রজ্ঞানবিবর্জ্জিতঃ ।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে ॥ ১৭ ॥
দয়াবতার হে নাথ পাপিনাং ত্বং সমাশ্রয়ঃ ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্ ॥ ১৮ ॥
অজ্ঞানকূপমগ্নস্য অন্যা নাস্তি গতির্মম ।
দেহি দেহি কৃপাসিন্ধো দেহি মে চরণাশ্রয়ম্ ॥ ১৯ ॥
ওঁ রামকৃষ্ণ, ওঁ রামকৃষ্ণ, ওঁ রামকৃষ্ণ—মহাত্মা রামচন্দ্র ।
প্রণামং ।

৩

অখিলভুবনভর্ত্তা দুর্গতি-ত্রাণকর্ত্তা ।
কলি-কলুষ-হন্তা দীন-দুঃখৈক-চিন্তা ।
নিরবধি হরিগুণগাতা কীর্ত্তনানন্দদাতা ।
স্ফুরতি হৃদিনটেন্দ্রং শ্রীরামকৃষ্ণায় নমোনমঃ ॥
শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী—বিরচিতং ।

৪

নিখিলজনহিতার্থং ত্যক্তবৈকুণ্ঠবাসং
ধৃতনবনরদেহং দিব্যভাতিপ্রকাশং
বিজিতবিষয়চেষ্টং দুঃখসৌখ্যেনিরাশং
ত্রিভুবনজনপূজ্যং রামকৃষ্ণং নমামি ॥ ১ ॥
পরিহিতসিতবেশং দীনভাবৈকমূর্ত্তিং
বিকশিতকমলাস্যং হাস্যমাধুর্য্যপূর্ত্তিং
দলিতদুরিতবৃন্দং বিশ্বসংব্যাপ্তকীর্ত্তিং
সতত সদয়চিত্তং রামকৃষ্ণং নমামি ॥ ২ ॥
পটলডাঙ্গা-নামকীর্ত্তনসমিতি-বিরচিতম্ প্রণামমিদং সমাপ্তম্ ।

জয় জয়, জয় জয় শ্রীগুরুদেব ।
জয় জয়, জয় জয় শ্রীগুরুদেব ।
জয় জয়, জয় জয় শ্রীগুরুদেব ।
জয়, জয়, জয় জয় শ্রীগুরুদেব ॥

শ্রীশ্রীগুরুমাহাত্ম্যম্ । *

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১ ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩ ॥
স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪ ॥
চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৫ ॥
সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্ন বিরাজিত পদাম্বুজঃ ।
বেদান্তাম্বুজসূর্য্যো য তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৬ ॥
চৈতন্য শাশ্বতঃ শান্তো ব্যোমাতীতো নিরঞ্জনঃ ।
বিন্দুনাদকলাতীতঃ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৭ ॥
জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়স্তত্ত্বমালাবিভূষিতঃ ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতাচ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৮ ॥
অনেকজন্মসংপ্রাপ্তকর্ম্মবন্ধবিদাহিনে ।
আত্মজ্ঞান প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৯ ॥
শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদঃ ।
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১০ ॥
ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১১ ॥
মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদগুরুঃ শ্রীজগদগুরুঃ ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১২ ॥
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্ ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১৩ ॥
ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্ ।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥ ১৪ ॥
সপ্তসাগরপর্য্যন্ততীর্থস্নানাদিকৈঃ ফলম্ ।
গুরোরঙ্ঘ্রিজলংবিন্দুং সহস্রাংশেন দুর্লভং ॥ ১৫ ॥
গুরুরেব জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্ ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ গুরুম্ ॥ ১৬ ॥
জ্ঞানং বিনা মুক্তিপদঃ লভতে গুরুভক্তিতঃ ।
গুরোঃ পরতরংনাস্তি ধ্যেয়োঽসৌ গুরুমার্গিনা ॥ ১৭ ॥
গুরোঃ কৃপা প্রসাদেন ব্রহ্মাবিষ্ণুসদাশিবাঃ ।
সৃষ্ট্যাদিকসমর্থাস্তে কেবলং গুরুসেবয়া ॥ ১৮ ॥
দেবকিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষচারণাঃ ।
মুনয়োঽপি ন জানন্তি গুরুশুশ্রূষণাবিধিম্ ॥ ১৯ ॥
ন মুক্তা দেবগন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষকিন্নরাঃ ।
ঋষয়ঃ সর্ব্বসিদ্ধাশ্চ গুরুসেবাপরাঙ্মুখাঃ ॥ ২০ ॥

[ক্রমশঃ ।

—স্বামী যোগবিনোদ মহারাজের 'ঠাকুরের কথা' হইতে ।

---

* স্তোত্র তিনটী কলিকাতা কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমন্দির মঠে পূজাকালীন নিত্য গীত হইয়া থাকে ।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।···

হে পরমদ্যুতি দিবাকর, তোমায় প্রণাম। ত্রিতাপহারিণী জাহ্নবী, তুমি সর্বপাপবিনাশিনী। তোমায় নিবেদন করি কৃতজ্ঞতা, করুণা যাচ্ঞা করি তোমার।···

জ্যোতির্ময় উদয়াচলে নব-জীবনের স্পন্দন। নতুন আশায় ও নবীন আনন্দে শিহরিত ধরণী।

নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাট। পুণ্যলোভাতুর স্নানার্থীরা একাগ্রচিত্ত, চঞ্চল। জাহ্নবীর স্বচ্ছ জলধারা কলোচ্ছ্বাসপূর্ণ, স্বাগত সম্ভাষণমুখর। পাল তুলে চলেছে ভোরের তরণী। রাত্রির অন্ধকারে বিলীন অথৈ জলরাশি অরুণালোকে উজ্জ্বল, হাস্যময়। ঘুম-ভাঙা প্রকৃতির বিচিত্র রূপময়ী মূর্তি ক্রমপ্রকাশমান।

ঘাটে ঘাটে স্তবগান, প্রাতঃসন্ধ্যা।

পরম শান্তিপ্রদায়িনী চিরপ্রবাহিতা সুরধনী-তীরে সমাগত অগণিত নরনারী। দিনমণির শুভ-আবির্ভাবের পূত লগনে ধর্মাকাঙ্ক্ষীর দল।

গঙ্গাস্নানে চলেছেন শচীদেবী। নিমাই পণ্ডিতের জননী, জগন্নাথ মিশ্রের বিধবা পত্নী, সাধ্বী। প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান তাঁর নিত্যকর্ম। এ নিয়ম ভঙ্গ হয়না কখনও। জাহ্নবীর পূত সলিলে অঙ্গ ধারণ না করে জলস্পর্শ করেন না ধর্মপ্রাণা শুদ্ধাচারিণী।

উষা-লগ্নে স্নানার্থীর ভিড় থাকে না। এ সময়েই গঙ্গার ঘাটে আসেন শচীদেবী। স্নান সমাপনান্তে প্রত্যাগত হন আপন গৃহে। এই তাঁর দিনের প্রথম ও অপরিহার্য কর্মসূচী।

কিন্তু বিলম্ব হয়ে গেছে আজ। প্রাতঃকৃত্য শেষ করে ফিরে গেছে অনেকে। আর একটু পরেই স্পষ্টতর হয়ে উঠবে আলো, রৌদ্র প্রখর হবে, তাই ত্রস্তপদে আসছেন শচীদেবী।

নিদারুণ চিন্তায় সারারাত্রি ঘুম হয়নি তাঁর। পণ্ডিতের জননী তিনি। রত্নগর্ভা। কিন্তু কোথায় তাঁর নিশ্চিন্ততা? সর্বগুণান্বিত পুত্র সংসারের প্রতি উদাসীন। বিধবার একমাত্র তনয় বিবাগী। তাঁর যে আর কোন অবলম্বন নেই। সন্তান-শোক-জর্জরিতা জননীর অন্তরে নতুন শোক রাখবার ঠাঁই নেই। নিমাই! নিমাইকে ধরে রাখতে হবে সংসারে। সৃষ্টি করতে হবে আকর্ষণ। কিন্তু কেমন করে? জননী শুধু ভেবেছেন সারারাত্রি ধরে। সমাধান করতে পারেননি সমস্যার। হয়তো হারাতে হবে তাঁর নয়নমণি, একমাত্র পুত্রকে। অসহায়ভাবে কেঁদেছেন সারাটি রাত। রাত্রিশেষে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ক্লান্ত চোখে এসেছিল তন্দ্রা।

ঘাটে এসে স্নান করলেন শচীদেবী।

কোনদিকে লক্ষ্য না করে ফিরে যাচ্ছিলেন।

পায়ে কোমল হাতের স্পর্শে চমকে উঠলেন। চোখ তুলে চাইলেন।

কে? এই ব্রাহ্ম মুহূর্তে কে এসে স্পর্শ করল তাঁর চরণ? কোন অস্পৃশ্য নয় তো?

বিস্মিত হলেন শচীদেবী। অপূর্ব লাবণ্যময়ী স্নানশুদ্ধা লাজনম্রা অপরিচিতা কুমারী। কী অপরূপ কান্তি তার চোখে-মুখে। এমন শান্ত স্নিগ্ধ সুন্দর মূর্তি তো তিনি দেখেননি জীবনে। এ যেন বিশ্বের রূপ-ভাণ্ড-মথিত দুর্লভ সৌন্দর্য। এমন রূপ তো সম্ভব নয় পৃথিবীতে। ধরার ধূলায় এমন নিখুঁত সৃষ্টি চোখে পড়ে না। তবে কি স্বর্গের দেবী মানব-মূর্তিতে ছলনা করতে এলো তাঁকে?

অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শচীদেবী।

নীরবে কেটে গেল একটি মুহূর্ত।

উঠে দাঁড়ালো চরণলীনা। নিবিষ্টভাবে দেখলেন শচীদেবী। তাঁর সন্দেহ রইল না—সে মানবী। শুধু কি তাই? মনে হলো এ মুখখানি তাঁর অতি প্রিয়, পরিচিত। কতদিন পরে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে অতর্কিতে।

লজ্জারুণ মুখখানি তুলে অনিন্দ্যসুন্দরী কুমারী যেন নীরব ভাষায় স্নেহাশ্রয় প্রার্থনা করছে শচীদেবীর কাছে। তাঁর সর্বাঙ্গে ছুটলো পুলক-প্রবাহ। তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। অস্ফুট ভাষায় কুমারীর মুখে ধ্বনিত হলো মধুর পবিত্র সুধাভরা ডাক—মা!

উভয়ের চোখে প্রবাহিত হতে লাগলো আনন্দাশ্রু।

: কে তুমি মা?

: বিষ্ণুপ্রিয়া।

: কার তনয়া?

: রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র আমার বাবা।

: রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র!

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শচীদেবী।

আশার আলোক-শিখা যেন নির্বাপিত হলো, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-বাত্যাঘাতে—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে।

সনাতন মিশ্র প্রতিপত্তিশালী, বিত্তবান। আর তিনি বিত্তহীনা, বিধবা। সনাতনের সঙ্গে কি তাঁর তুলনা চলে? কিন্তু তিনি নিমাই পণ্ডিতের জননী। নিমাই তরুণ, রূপবান, গুণবান। আজ

সে বিত্তবান নয়, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সেও কি সনাতন মিশ্রের সমকক্ষ হতে পারে না ?

ক্ষীণ আশা, স্বপ্ন ও সংশয়ে আন্দোলিত হলো জননী-হৃদয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলল,—যাই মা, কাল আবার দেখা হবে।

বিদায় নিল বিষ্ণুপ্রিয়া।

অভিভূতের মতো গৃহাভিমুখিনী শচীদেবী ভাবতে লাগলেন—এই ভক্তিমতী কুমারীকে যদি পুত্রবধূ রূপে পাওয়া যায়, তবে নিমাইকে গৃহে রাখা সম্ভব। এই স্নিগ্ধ রূপদীপ্তি প্রভাবে তার ঔদাসীন্য অন্তর্হিত হবে। কিন্তু এওকি সম্ভব ? সনাতন মিশ্র তাঁর একমাত্র তুলালীকে নিমাই-এর হাতে তুলে দেবেন কোন্ ভরসায়, কিসের আশায় ?······

উৎকণ্ঠায় কেটে গেল দিন।

পরদিন উষাসমাগমে গঙ্গার ঘাটে এলেন শচীদেবী।

দু'চোখ মেলে অনুসন্ধান করতে লাগলেন সেই অনিন্দ্যসুন্দরীকে।

তাঁর আগেই এসেছে বিষ্ণুপ্রিয়া।

স্নানসমাপনান্তে সে শচীদেবীর পদধূলি গ্রহণ করলো। শচীদেবী আশীর্বাদ করলেন,—জন্ম-এয়োতী হও মা।

জননীর আশীর্বাদ মাথা পেতে নিল কুমারী। মৃদু হাসলো। যেন মুক্তো ঝরলো হাসিতে। মুখে ফুটে উঠলো তৃপ্তির রেখা।······

ব্যাকুল হয়ে উঠলেন শচীদেবী। বিষ্ণুপ্রিয়াকে আপন করে পাওয়ার আগ্রহ হলো প্রবলতর।

যদি সম্মত না হন সনাতন মিশ্র ? তবু, একবার প্রস্তাবে আপত্তি কি ? ভগবান তাঁকে কাঙালিনী করেছেন, দুঃখ-শোকতাপে জর্জর করেছেন তাঁর চিত্ত। তবু, আবার নিমাই-এর মতো সর্বগুণান্বিত পুত্রের জননীর গৌরবও তো দিয়েছেন। ঈশ্বর মঙ্গলময়। অসাধ্য সাধন করা যায় তাঁর ইচ্ছায়। বিষ্ণুপ্রিয়া সনাতন মিশ্রের তনয়া। তাঁর নিমাই-ও তো আর অযোগ্য নয়। তবে হ্যাঁ। নিমাই-এর বাবা বেঁচে নেই। জগন্নাথ মিশ্রের অনাথ ছেলেকে সনাতন মিশ্রের মতো পদস্থ ব্যক্তি পছন্দ না-ও করতে পারেন। তথাপি নিরস্ত হতে পারলেন না শচীদেবী। ওই মুখখানি যে কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না। ত্রিজগতে এমন রূপ কল্পনা করাও কঠিন। তাঁর পুত্রবধূরূপেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে মানাবে ভালো। নিমাই-এর মতো রূপবান তরুণ আর কে আছে এ অঞ্চলে ?···

মনে মনে ভাবলেন গর্বিতা জননী। মা হয়ে পুত্রের গর্ব করবেন না তিনি।

ভাবলেন—একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। হয়তো পূর্ণ হ'তে পারে তাঁর মনস্কামনা। না হলেও ক্ষতি নেই। মানুষ তো কত কিছু চায়, কিন্তু সব কি পায় ? সব সাধ তো পূর্ণ হয়না কারো জীবনে। তবু সাধ বাসা বাঁধে মনে। অস্থির হয়ে উঠলেন শচীদেবী। আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে লাগলো তাঁর অন্তর। অবশেষে ডেকে পাঠালেন ঘটক কাশী মিশ্রকে।

আশা দিলেন ঘটক। বললেন, অবিলম্বেই সনাতনের অভিমত জানাবেন।···সে-দিনের আশায় রইলেন উৎকণ্ঠিতা জননী।

রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র যশস্বী, প্রতিপত্তিশালী। তাঁর একমাত্র তনয়া বিষ্ণুপ্রিয়া রূপেগুণে তুলনা বিরহিতা। প্রাণাধিক প্রিয় দুহিতাকে সুপাত্রে সম্প্রদান করাই তাঁর সংকল্প। কিন্তু সুপাত্র বিরল। তাই তাঁর মন ব্যাকুল। কন্যাদায়গ্রস্ত সনাতন কন্যাদায়মুক্ত হতে চান। তবে যোগ্যপাত্র চাই। অতর্কিতে তাঁর মনে পড়লো নিমাইকে। নিমাই পণ্ডিতের হাতে যদি বিষ্ণুপ্রিয়াকে তুলে দেওয়া যায় ? দুজনকে মানাবে যেন হরগৌরী। যেমন বিষ্ণুপ্রিয়া, তেমনি নিমাই। রূপবান্ রূপবতী। উপরন্তু নিমাই-এর মতো গুণবান পাত্র আর কোথায় আছে ? অসাধারণ তার পাণ্ডিত্য। এ বয়সে এত জ্ঞান তিনি দেখেননি আর কারো মধ্যে। একদিন নিমাই খ্যাতিমান হবে, এ ধারণা সুস্পষ্ট হয়েছে তাঁর মনে।

গুণী গুণবানকে সহজেই আবিষ্কার করতে পারেন।

সনাতন গুণী, তিনি চিনলেন নিমাইকে। কিন্তু মনের কথা প্রকাশ করলেন না কারো কাছে।···

কাশীমিশ্র এসে সনাতনকে জানালেন, শচীদেবীর আকাঙ্ক্ষা। বিষ্ণুপ্রিয়াকে পুত্রবধূরূপে বরণ করতে চান তিনি।

আনন্দে নেচে উঠলো সনাতনের অন্তর।

গৃহিণীকে ডেকে বললেন,—ওগো শোন, ভগবান এতদিনে সদয় হয়েছেন আমাদের উপর। নিমাই পণ্ডিতের জননী বিষ্ণুপ্রিয়াকে পুত্রবধূরূপে পেতে চান।

ছুটে এলেন গৃহিণী।

কাশীমিশ্রের প্রস্তাবে সানন্দ সম্মতি জানালেন সনাতন।

বিষ্ণুপ্রিয়া শুনলেন এ সংবাদ। উৎফুল্ল হলেন তিনি। যেন তাঁর কুমারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা সিদ্ধ হলো। তিনি যে নিমাই-পণ্ডিতের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। নিত্য গঙ্গাস্নানে যান তিনি। সেখানে তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত মনোমূর্তির দর্শনলাভ করেন না, কিন্তু তাঁর স্নেহময়ী জননীর স্নেহাঞ্চলাশ্রয়ে পরম তৃপ্তি বোধ করেন। ইচ্ছা হয় না তাঁর কাছ থেকে ফিরে আসবার। মনে হয়, তিনিই তাঁর একান্ত আপনার জন। তাঁর সেবায় জীবন উৎসর্গ করে সার্থক হতে চান কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়া।

লজ্জা, বিনয় ও ভক্তির অফুরন্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত এই একাদশীর অন্তরে। তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণ, হিঙ্গুল রাঙা অধর, কমল নয়ন, অমল আনন। তাকে কাছে নেবার জন্য, তার সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন শচীদেবী।

এ যেন স্বভাবতঃ সহজ আকর্ষণ। এ সম্পর্ক যেন জন্মান্তরের।···

ঘটক কাশীমিশ্র সুসংবাদ নিয়ে গেল শচীদেবীর কাছে। গভীর আনন্দে ও তৃপ্তিতে মঙ্গলময়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন শচীদেবী।···

নিমাই জননীর একান্ত অনুগত।

জননীর কোন আদেশ সে অমান্য করে না, তাঁর কথার উপর কোন কথা বলে না।

শচীদেবী জানেন, পুত্র কখনও তাঁর অবাধ্য হতে পারে না, মাতৃগত-প্রাণ নিমাই ব্যথা দিতে পারে না স্নেহময়ী জননীর কোমল প্রাণে। তাই তিনি কাশী মিশ্রকে বললেন, বিবাহের দিন স্থির করুন, আর কালক্ষেপ করা চলে না।

সনাতন মিশ্রও প্রস্তুত।

সোৎসাহে সনাতনের গৃহে চলেছেন গণৎকার। বিবাহের দিন-লগ্ন স্থির করতে হবে। পথে নিমাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো।

: কোথায় চলেছ গণক ঠাকুর এমন মহোল্লাসে ?

গণৎকার নিমাইকে জানালেন যে, সনাতন মিশ্রের বাড়ি যাচ্ছেন তিনি, নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার শুভ-বিবাহের দিন স্থির করার উদ্দেশ্যে।

নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ !

যেন আকাশ থেকে পড়লেন নিমাই। বললেন,—আমার বিবাহ, অথচ আমি তো এর কিছু জানিনা। না না, আমি বিয়ে করবো না। এই তো বেশ আছি। আমি বিয়ে করবো না—তুমি যেয়ো না।

অভিজ্ঞ গণৎকার। নিমাই-এর কথা শুনলেন। তারপর ধীরে ধীরে চললেন। অনতিবিলম্বে সনাতনের গৃহে উপস্থিত হলেন গণৎকার। প্রচার করলেন দুঃসংবাদ—নিমাই-এর বিবাহে সম্মতি নেই।

বিষাদের ছায়া নেমে এলো অতর্কিতে। অনাগত আনন্দের সুভলগ্ন যেন হারিয়ে গেল আসার আগেই।

চিন্তাকুল হলেন সনাতন। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সনাতন-গৃহিণী। বিষ্ণুপ্রিয়া বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

নিমাই বিবাহে অসম্মত। সুতরাং দিন নির্ধারণের প্রয়োজন নেই।......

ফিরে এলেন গণৎকার।

নিমাই শুনলেন সব। বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থার কথা জানলেন। কী ভাবলেন। তারপর সংবাদ পাঠালেন সনাতনের কাছে। জানালেন তাঁর জননী শচীদেবী যা স্থির করেছেন, তাই তাঁর শিরোধার্য।

মথিত হলো বিষাদ-সিন্ধু। আনন্দ ও উৎসাহের তরঙ্গ এলো ছুটে। বিষ্ণুপ্রিয়াকে উপেক্ষা করেছিলেন নিমাই। আবার নিমাই-এর আগ্রহেই সেই ক্ষণ-বিরাগ রূপান্তরিত হলো গভীর অনুরাগে।

অবধারিত হলো শুভ-মিলনের দিন।......

সানাই উঠলো বেজে। মঙ্গল শঙ্খনাদ ও হুলুধ্বনি শোনা গেল মুহুর্মুহু। নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ।

বিচিত্র চন্দ্রাতপ শোভা পাচ্ছে নিমাই-এর গৃহাঙ্গনে। নিশান উড়ছে, সারি সারি কদলীবৃক্ষ ও সহকার-পল্লবে সুসজ্জিত বিবাহ-মণ্ডপ। মাটির মঙ্গল-প্রদীপ উঠেছে জ্বলে, মঙ্গলঘট সাজানো হয়েছে, হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে মুখর দশদিক।

সনাতন মিশ্রের গৃহেও অনুরূপ উৎসব।

সেখানে নবদ্বীপ-সমাজের সকলের নিমন্ত্রণ। নবদ্বীপে এমন সমারোহ অভূতপূর্ব। এ যেন কোন রাজ-পরিবারে পরিণয়-উৎসব।

সনাতন মিশ্র নিজেই উভয় পক্ষের ব্যয়ভার বহন করেছেন।

বরবেশে সাজলেন নিমাই।

কপালে চন্দন-তিলক, চোখে কজ্জলরেখা, কণ্ঠে গজমোতিহার, বাহুতে রত্নবলয়, কর্ণে কুণ্ডল, পরণে পীত পট্টবস্ত্র, গায়ে পট্টউত্তরীয়, মাথায় মুকুটশোভা।

অজস্র আলোকমালায় ঝলমল বিরাট শোভাযাত্রা চললো সনাতন মিশ্রের গৃহাভিমুখে। কোলাহল ও বাদ্যধ্বনিতে মেতে উঠেছে নবদ্বীপ। সারা নবদ্বীপ যোগ দিয়েছে এই উৎসব-শোভাযাত্রায়।

বরকে বরণ করা হলো হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে। সানাই নহবৎ উঠলো বেজে, উৎফুল্ল জনতার হর্ষধ্বনি আকাশে প্রতিধ্বনিত হলো।

বিবাহের লগ্ন সমুপস্থিত।

বধূবেশিনী বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ-বাসরে আনয়ন করা হলো।

স্বর্ণকান্তি বিষ্ণুপ্রিয়া।

কবির ভাষায়—"ঝলমল করে যেন তড়িৎ-প্রতিমা।"

দেবকান্তি নিমাই। এ যেন সত্যই শিব-পার্বতীর মহা মিলন। ধরায় দুর্লভ এ রূপ।

এলো শুভদৃষ্টির লগ্ন। এ দুর্লভ মুহূর্তে ব্রীড়াজড়িত হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। উৎসুক বিমুগ্ধ নরনারী রয়েছে তাঁকে ঘিরে। কেমন করে তিনি স্বামীর চোখে-চোখে চাইবেন? অথচ প্রবল উৎকণ্ঠা যে নিবৃত্ত করতে পারছেন না কিছুতেই।

শুধু তা নয়। এ যে সামাজিক রীতি। যুগসঞ্চিত বিধি। চোখ তুললেন বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁর দৃষ্টি মিললো নিমাই-এর দৃষ্টির সঙ্গে—মুহূর্তের মধ্যেই মিলন হলো দুটি হৃদয়ের।

পাশাপাশি দণ্ডায়মান বর-বধূ।

উদগ্রীব শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁর ইচ্ছা নয়নভরে একবার দর্শন করেন সেই মুখচন্দ্র। বহু সাধনার অভীপ্সিত ফল লাভ করেছেন তিনি। পেয়েছেন এমন দুর্লভ স্বামিরত্ন। দেখেছেন সেই অনিন্দ্য-সুন্দর সৌম্যকান্তি তরুণকে। আবার সে-মুখকান্তি দেখবার লোভ যে সংবরণ করা যাচ্ছে না। নিমাই একান্তভাবে তাঁর, তিনি নিমাই-এর। নিমাইকে সব সমর্পণ করেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। তবু যেন নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেন না এ সত্য।

অবিরল উৎসারিত আনন্দাশ্রুধারায় ক্ষণে ক্ষণে ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি। সে কি অনাবিল তৃপ্তি, অপরিমেয় আনন্দ, বর্ণনাতীত সুখ! এত সুখ কি সইতে পারবেন তিনি?.....

সমাপ্ত হলো পারিবারিক অনুষ্ঠান।

বাসর-ঘরে আশ্রয় নিল বরবধূ।......

পরদিন।

এবার বিদায়ের পালা।

একমাত্র দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে স্বামিগৃহে পাঠাবেন সনাতন মিশ্র। জননীর বুক শূন্য করে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করতে চলে যাবে নবোঢ়া বিষ্ণুপ্রিয়া। দুলালীর বিচ্ছেদব্যথায় কাতর হলো সনাতনের পিতৃহৃদয়। কিন্তু গোত্রান্তরিতা বিষ্ণুপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া সমর্পিতা। তার উপর কোন অধিকার নেই সনাতনের। বিষ্ণুপ্রিয়াকে ধরে রাখতে পারবে না সনাতন। তাকে বিদায় দিতে হবে।

অশ্রুসজল চোখে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাই-এর হাতে তুলে দিলেন সনাতন। বিষ্ণুপ্রিয়া জননীর বুকে মুখ লুকিয়ে চোখের জল ফেললেন। পরম আদরে কন্যার অশ্রু আঁচলে মুছে আশীর্বাদ করেলেন জননী,—চিরায়ুষ্মতী হও মা।

নিমাই-এর চোখেও অশ্রু দেখা দিল।

নিজেকে দৃঢ় করলেন সনাতন। সান্ত্বনা দিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। সনাতন মিশ্রের গৃহ অন্ধকার করে বিষ্ণুপ্রিয়া চললেন শচীদেবীর ঘর আলো করতে।

শৈশব-কৈশোরের খেলাঘর ফেলে বিষ্ণুপ্রিয়া এলেন স্বামিগৃহে।

সুলক্ষণা পুত্রবধূ কোলে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন শচীদেবী। "বধূ কোলে করি তবে শচীর নাচন।"

নিমাইও পত্নীপ্রেমে মগ্ন হয়ে রইলেন। কেটে গেল তাঁর নিরাসক্তি

"যে-প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির"

মহানন্দে অতিবাহিত হলো দু'টি বৎসর।

বিষ্ণুপ্রিয়ার গর্বের শেষ নেই। তাঁর মতো সৌভাগ্যবতী আর কে আছে? এমন স্বামী ক'জনের হয় এ জগতে? [ক্রমশঃ।

কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়ান

দারা সিং

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কথায় বলে 'ওস্তাদের মার শেষ রাতে।' গত ৯ই মার্চ ১৯৬১ বৃহস্পতিবার রাত্রে কলকাতার ইডেন উদ্যানের 'ইণ্ডোর ষ্টেডিয়ামে' 'কমনওয়েল্‌থ চ্যাম্পিয়ানশিপ' কুস্তি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্য্যায়ে ভারতের চ্যাম্পিয়ান কুস্তিগীর দারা সিং কানাডার চ্যাম্পিয়ান কুস্তিগীর জর্জ গোর্ডিয়েঙ্কোকে শেষ চক্রে পরাস্ত করে এ কথার সত্যতা প্রমাণ করেন। দারা সিং ও জর্জ গোর্ডিয়েঙ্কোর যুদ্ধে বাজি ছিল 'কমনওয়েলথ প্রাধান্য শীল্ড (Commonwealth Challenge Shield) ও রৌপ্য নির্মিত কাপ। বিজয়ীর প্রাপ্য ছিল শীল্ড আর বিজিতের প্রাপ্য ছিল কাপ। অর্থাৎ এই লড়াইটি "কমনওয়েলথ হেভি ওয়েট মল্ল-প্রাধান্য" (Commonwealth Heavy Weight Wrestling Championship) উপলক্ষ করে হয়েছিল। অতএব একথা বলাই বাহুল্য যে, এটা ছিল মল্ল-জগতের এক ঐতিহাসিক সংঘর্ষ, যাতে দারা সিং ও গোর্ডিয়েঙ্কোর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষ ও কানাডা নেমেছিল।

আন্তর্জাতিক মল্ল-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত এই ধরণের কুস্তির দংগল ও লীগ-প্রথায় কমনওয়েলথ মল্ল-প্রাধান্য প্রতিযোগিতা ভারতে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হল। এর আগে আর মাত্র দু'বার এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমবার হয় নিউজিল্যাণ্ডে, আর দ্বিতীয়বার হয় ইংলণ্ডে। আন্তর্জাতিক ফ্রি-ষ্টাইল (International Free-style) প্রথায় প্রতিযোগিতাও ভারতে এই প্রথম। ভারতের বুকে 'ক্যাচ-অ্যাজ-ক্যাচ-ক্যান (Catch-as-Catch-can)', 'গ্রীকো-রোমান' (Greeco-Roman), 'অল-ইন' (All-in), 'আমেরিকান ফ্রি-ষ্টাইল' (American Free-style) কুস্তির নিয়মগুলো উঠে গিয়ে 'আন্তর্জাতিক ফ্রি-ষ্টাইল' কুস্তির আমদানি এটাই প্রথম। আগের নিয়মগুলোর চেয়ে এটি অভিনব ও মার্জিত।

ভারতবর্ষ ছাড়া ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং, মাণ্টা, ইন্দোনেশিয়া, রুমানিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি ১২।১৩ দেশের বিখ্যাত মল্ল ঐ দংগলে সমবেত হয়।

বৈদেশিক পালোয়ানদের মধ্যে কানাডার চ্যাম্পিয়ান জর্জ গোর্ডিয়েঙ্কো (George Gordienko), ইউরোপ চ্যাম্পিয়ান বিগ বিল ভার্ণা (Big Bill Verna) ও রুমানিয়ার কিং কং (King Kong, Champion of the orient) ভিন্ন আর সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর মল্ল। অন্যান্য পালোয়ানদের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়ান ব্যারণ ভন্ হেকজী (Baron Von Heczey), নিউইয়র্কের চ্যাম্পিয়ন, রুশ-রকেট জর্জ পেন্‌চেফ (George Penchiff), পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ান সৈয়দ সাঈফ শা, ইংল্যাণ্ডের জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ান লর্ড এডোয়ার্ডস (Lord Edwards) ও মাণ্টার চ্যাম্পিয়ান ভাল্ সেরিণো (Val Cerino) প্রভৃতি নিজ নিজ দেশের চ্যাম্পিয়ান কুস্তিগীর হলেও, বিশ্বের দরবারে খ্যাতনামা কেউই নন। এ ছাড়া মালয়ের চ্যাম্পিয়ান সওদাগর সিং, ইন্দোনেশিয়ার চ্যাম্পিয়ান স্মরণ সিং, হংকং-এর চ্যাম্পিয়ান হরজিৎ সিং, সিঙ্গাপুরের চ্যাম্পিয়ান তারলোক সিং প্রভৃতি ভারতীয় হয়েও আজ বৈদেশিক। ভারতীয় পালোয়ানদের মধ্যে ভারত চ্যাম্পিয়ান দারা সিং, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার চ্যাম্পিয়ান 'টাইগার' যোগিন্দর সিং ও পাতিয়ালার চ্যাম্পিয়ান 'টাইগার' সুচা ভিন্ন আর সবাই উঠতি নওজোয়ান।

এই প্রতিযোগিতাটিই 'আন্তর্জাতিক ফ্রি-ষ্টাইল' প্রথায় প্রথম আন্তর্জাতিক লড়াই। ১৯৬১ সালের ১৭ই জানুয়ারী থেকে ৯ই মার্চ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলে। ইংল্যাণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের পশ্চিমবঙ্গ সফরের জন্যে কিছুদিন দংগল-লড়াই বন্ধ ছিল। প্রতিযোগী ২৮ জন মল্লের মধ্যে মোট ৪০টি কুস্তি হয়। এ ছাড়া ৩টি প্রতিযোগিতা হয়—'টাগ-টিম কনটেষ্ট' বা জুটি প্রতিযোগিতা। ৯ই মার্চ প্রতিযোগিতার শেষ দিনে ভারত বনাম ইউরোপ এই ট্যাগ টিম কনটেষ্টে ভারতের পক্ষে ছিলেন 'টাইগার' যোগিন্দর সিং ও হরজিৎ সিং; আর ইউরোপের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বিগ বিল ভার্ণা ও লর্ড এডোয়ার্ডস্। এই লড়াইতেও ভারতেরই জয়লাভ হয়।

প্রতিযোগিতার হেভিওয়েট বিভাগে সবচেয়ে বেশী ও সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লদের সাথে লড়াই করে একমাত্র দারা সিং-ই সবচেয়ে বেশী সংখ্যা পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। একমাত্র যোগিন্দর সিং-এর সাথেই তিনি লড়েননি। কারণ তার আগেই যোগিন্দরকে কিং কং টেকনিক্যাল্ বিচ্যুতির ফলে পরাস্ত করেন। ৯ই মার্চ দারা সিং ও জর্জ গোর্ডিয়েঙ্কোর মধ্যে চূড়ান্ত লড়াই হয়। তার আগে একমাত্র এই দু'জন মল্লই অবিজিত ছিলেন। তাই কমনওয়েলথ ফ্রি-ষ্টাইল কুস্তি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে এই দু'জনেই লড়বার অধিকার পান।

দংগলে যে ক'জন নবাগত যোগ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে প্রাক্তন বৃটিশ সাম্রাজ্যের' চ্যাম্পিয়ান হরবন্ সিং-এর ছেলে অজিত সিং-ই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দারা সিংও হরবন্ সিং-এরই যোগ্যতম সাকরেদ। অজিত সিং কিং কং-এর চেয়ে একটি কুস্তি কম

লড়েও পয়েন্টে কিং কং-এর সমান হয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

মল্ল হিসেবে কানাডা-বিজয়ী জর্জ গোর্ডিয়েঙ্কোর খ্যাতি সারা আমেরিকা ও ইউরোপে পরিব্যাপ্ত। ১৯৬০ সনে প্রাক্তন কানাডার চ্যাম্পিয়ান কুস্তিগীর ডন্ ষ্টেডম্যান (Don Steadman)-কে পরাস্ত করে তাঁর চ্যাম্পিয়ানশিপ কেড়ে নেন। তা'ছাড়া ইনি এর আগেও দারা সিং সিলি সামারা, লো-থেজ, কিং কং, বিগ বিল ভার্ণা প্রভৃতির সাথে লড়াই করে যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কৌশলে (কুস্তি লড়ার জ্ঞানে) ও দলের ক্ষমতায়ও তাঁর অসাধারণ দক্ষতা আছে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বেশী দক্ষতা দেখা গেল 'মল্ল-সেতু'-তে। কুস্তি লড়তে লড়তে যখন কারর চিৎ হয়ে যাবার আশংকা দেখা দেয়, তখন সেই বিপজ্জনক মুহূর্তে শুধু মাথা আর পায়ের পাতায় ভর দিয়ে কাঁধ, পিঠ ও কোমরকে উঁচু করে রাখার নামই 'মল্ল-সেতু'। অনেক সময় প্রতিপক্ষকে কাবু করার জন্যেও 'মল্ল-সেতু'র প্রয়োজন হয়। এই মল্ল-সেতুর সাহায্যে অনেকবারই তিনি নিশ্চিত পরাজয় এড়াতে পেরেছেন। ১৯৩৬ সালে জার্মাণ মল্ল ক্রেমার ভারত সফরে এসে প্রথম লড়াইতেই গোংগার মতন শক্তিমান মল্লকে 'ব্রিজ' বা মল্ল-সেতুর জোরে সহজেই পরাস্ত করেছিলেন। ইংরেজী প্রথায় মল্লেরা প্রথমেই 'ব্রিজ' করতে শেখে, যা আমাদের দেশের কুস্তিগীরেরা আজো শিখতে পারেনি।

দারা সিং ও জর্জ গোর্ডিয়েঙ্কোর এই ঐতিহাসিক লড়াই প্রথম পাঁচটি চক্রই অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। প্রথম চক্রে ও দ্বিতীয় চক্রে উভয়েই সমান সমান লড়েন। এই সময় ছ'জনেই ছ'জনের হিম্মৎ বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। তৃতীয় চক্রে দারা সিং-কে গোর্ডিয়েঙ্কো পর পর ছ'বার দড়ির বাইরে ফেলে দেন। কিন্তু ছ'বারই দারা সিং তৎপর হয়ে ভেতরে চলে আসেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই। এরপর চতুর্থ চক্রে দারা সিংও একবার গোর্ডিয়েঙ্কোকে দড়ির বাইরে ফেলে দেন, কিন্তু তিনিও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই গদীর মধ্যে ফিরে আসেন। এই চক্রে দারা সিং অনেকগুলো অভিনব ও অমোঘ প্যাঁচে কানাডাবীরকে কাবু করে দেন। ছ'বার গদীতে চিৎ করে চেপেও ধরেছিলেন, কিন্তু ছ'বারই গোর্ডিয়েঙ্কো তাঁর বিখ্যাত 'ব্রিজ'-এর সাহায্যে রক্ষা পান। পঞ্চম চক্রেও গোর্ডিয়েঙ্কো একবার 'ব্রিজ' করে নিশ্চিত-পরাজয় এড়ান। এই সময় দারা সিং-এর ধোবীপাটের (Pinfall) কবলে পড়ে কয়েকবার আছাড় খেয়ে গোর্ডিয়েঙ্কো বিশেষভাবে কাবু হয়ে পড়েন। তাই ষষ্ঠ চক্রের বাঁশী বাজার সাথে সাথেই তিনি দারা সিং-কে ক্ষিপ্তভাবে আক্রমণ করে অসংযতভাবে লড়াই করার দরুণ মধ্যস্থ কর্তৃক সতর্কিত হন। মধ্যস্থ ছিলেন প্রাক্তন প্যালেষ্টাইন-চ্যাম্পিয়ন জেজি গোল্ডষ্টেইন্ (Jeji Goldstein)। এর পরেই দারা সিং আবার গোর্ডিয়েঙ্কোকে আছাড় মেরে গদিতে চিৎ করে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাঁর দুই কাঁধ চেপে ধরেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গোর্ডিয়েঙ্কো উঠতে না পারায় মধ্যস্থ তাঁর বাঁশী বাজিয়ে দারা সিং-এর পিঠ চাপড়ে তিনি দারা সিংকেই জয়ী বলে ঘোষণা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন। ভূতপূর্ব স্পীকার শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও লালগোলার মহারাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ও ঐদিন আসরে উপস্থিত ছিলেন।

দারা সিং-এর বিষয় বড় করে কিছু বলবার আগে তাঁরই প্রধান প্রতিদ্বন্দী জর্জ গোর্ডিয়েঙ্কোর ভাষায় বলতে হয়,—"......About the final of Commonwealth Championship, I have to say that Dara Singh is a superb wrestler and a great champion and I am sure this will be the closest fight of my wrestling life." তিনি এমন কথাও স্বীকার করেছেন যে, তাঁর মল্ল-জীবনে তিনি এমন কুশলী মল্লের সাথে আর কখনো লড়েননি। তুলনামূলক বিচারে দারা সিং ও গোর্ডিয়েঙ্কো উভয়েই প্রায় সমান সমান যাচ্ছিলেন। গোর্ডিয়েঙ্কো শুধু যে কানাডারই সর্বশ্রেষ্ঠ মল্ল, তা নয়। দারা সিং-এর সাথেও এর আগে তিনি ছ'বার লড়েছেন, আর সে ছ'বারই লড়াই শেষ হয়েছে অমীমাংসিতভাবে। আজ থেকে ৯ বছর আগে ১৯৫৩ সালে বোম্বাই দংগলে দারা সিং চূড়ান্ত লড়াইতে 'টাইগার' যোগিন্দর সিং-কে টেকনিকাল বিচ্যুতির (Technical Foul) ফলে পরাস্ত করে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'রুস্তম্-ই-হিন্দ' (Rustom-E-Hind) বা 'ভারতের চ্যাম্পিয়ান কুস্তিগীর' আখ্যা লাভ করেন। এর পরই তিনি বিশ্বপরিক্রমার পথে বৃটিশ সাম্রাজ্যের চ্যাম্পিয়ান ইংল্যাণ্ডের বার্ট আস্রাথি (Burt Ashrathi), আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যান ক্যানেথ, টেক্সাসের নিগ্রো চ্যাম্পিয়ান সিলি সামারা, কানাডার চ্যাম্পিয়ান ডন ষ্টেডম্যান (Don Steadman), রুমানিয়ার কিং কং প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত অনেক কুস্তিগীরকে পরাস্ত করেন। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে হাঙ্গেরির 'জগজ্জয়ী মল্ল' (World's Heavy Weight Wrestling Champion) লো-থেজ বা লুইস থেজ (Liu Thesz)-এর সাথে তিনি সমান তালে পাঁচ রাউণ্ড অর্থাৎ ৫০ মিনিট লড়াই করেন। পাঁচ চক্রের লড়াইতেও বিশ্বজয়ী মল্ল লো-থেজ দারা সিং-কে পরাস্ত করতে পারেননি। অবশ্য এতে লো-থেজের খ্যাতি বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয়নি। আজ থেকে ২৪ বছর আগে ১৯৩৮ সালে 'জগজ্জয়ী' এভারেট মার্শেলকে হারিয়ে লো-থেজ প্রথম 'জগজ্জয়ী' আখ্যা লাভ করেন। এর কিছুদিন পর আয়ার্ল্যাণ্ডের ষ্টিভ 'ক্রাশার' কেজি লো-থেজ-এর কাছ থেকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান কেড়ে নিলেও কয়েক মাসের মধ্যেই এভারেট মার্শেলের কাছে তা হারান। এভারেট মার্শেলকে হারিয়ে লো-থেজ আবার 'জগজ্জয়ী' আখ্যা লাভ করেন। এর পর আবার তিনি সে-খেতাব হারালেও ১৯৪২ সালে রে৷ ষ্টিলকে পরাস্ত করে তৃতীয়বার 'জগজ্জয়ী' খেতাব লাভ করেন। সেই থেকে এই বিশ বছর ধরে 'বিশ্বজয়ী' খেতাব হাতের মুঠোয় রাখা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

'জীবন্ত টিলা' কিং কং-কেও দারা সিং বারবার পরাস্ত করেছেন। অবশ্য কিং কং-এর এ-পরাজয়ও অগৌরবের নয়। তাঁর সমসাময়িক কুস্তিগীরদের মধ্যে আজ আর কেউ নেই। সবাই একে একে অবসর গ্রহণ করেছেন। এভাবে রাশিয়া, কানাডা, আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, বার্মা, মালয় ও ইংল্যাণ্ড ঘুরে তিনি ৭২টি প্রথম শ্রেণীর কুস্তি-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে—একটিতেও পরাস্ত না হয়ে—জয়ের গৌরব হাতে নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। এখানে এসে কমনওয়েলথ প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করেন বিগ্ বিল্ ভার্ণা, জর্জ পেনচেফ, সৈয়দ সাঈফ শা, 'টাইগার' খুচা, কিং কং মিঃ এ্যাটোমিক ও

জ্যাল সেরিগোফে। এঁরা সকলেই নিজ নিজ দেশের সেরা কুস্তিগীর।

মল্লযুদ্ধে ভারতীয় ধারা, ইউরোপীয় গ্রীকো-রোমান ও ক্যাচ-অ্যাজ ক্যাচ-ক্যান, আমেরিকান্ ফ্রি-ষ্টাইল, ইণ্টারন্যাশনাল ফ্রি-ষ্টাইল, ইণ্টারন্যাশনাল ফ্রি-ষ্টাইল প্রভৃতি সবরকম ধারাতেই দারা সিং বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছেন। আর সব শিক্ষাই তিনি পেয়েছেন স্বনামধন্য মল্ল প্রাক্তন বৃটিশ সাম্রাজ্যের চ্যাম্পিয়ান হরবন সিং-এর কাছ থেকে। জলন্ধরের হরবন সিং-এর মতন যোগ্যতম গুরুর তিনি যোগ্যতম ছাত্র। অলিম্পিকের আসরে ভারতীয় অপেশাদার কুস্তিগীরেরা যখন বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে গামা-গোবরের সুনাম নষ্ট করছিলেন, ঠিক সে-সময়ই দারা সিং-এর মতন নূতন ধরণের দক্ষ ও শক্তিমান মল্লের অভ্যুদয় ভারতের পক্ষে গৌরবের কথা। তিনি ভারতীয় কুস্তিগীরদের সম্মান প্রভূতভাবে বৃদ্ধি করেছেন।

সীমান্ত প্রদেশ পাঞ্জাব ভারতের বহু অবিস্মরণীয় মল্লবীর-প্রসবিনী বলে গর্ব করতে পারে। এই পাঞ্জাবেই বিশ্ববিশ্রুত মল্ল গোলাম পালোয়ান, আহ্‌মদ বখ্‌শ, বড় গামা, গোংগা, ইমাম বখ্‌শ, ছোট গামা, হরবন সিং প্রভৃতি বহু কুস্তিগীর জন্মগ্রহণ করেছেন। এঁদেরই দৌলতে মল্লজগতে ভারতের স্থান সবার ওপরে। দারা সিং-এর জন্মস্থানও পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধরে। দারা সিং-এর ভাই এস, এস, রণধাওয়াও একজন উঠতি নওজোয়ান। তাঁর মল্লজীবনও সম্ভাবনাপূর্ণ। জুনিয়ার বিভাগে এর মধ্যেই তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ দশজনের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। রণধাওয়ার যা-কিছু শিক্ষা অধিকাংশই দারা সিং-এর কাছে। অবশ্য তাঁর প্রথম গুরুও হরবন সিং।

'ট্যাগ-টিম কনটেষ্টে'-ও দারা সিং ও তাঁর ভাই এস, এস, রণধাওয়া—এই ভ্রাতৃযুগল আজ ভারত-চ্যাম্পিয়ান। ১৯৬০ সালে ৫ই জুলাই নিউ-দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক কুস্তির দংগলে 'ট্যাগ্-টিম কনটেষ্টে' বা জুটি-লড়াইয়ে এই জুটিই 'সর্বজয়ী' আখ্যা লাভ করেছেন। ঐদিন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও উপস্থিত ছিলেন।

মল্লযুদ্ধে বিশ্ববিজয়ীর সম্মান সহজলভ্য নয়। এই দুর্লভ জয়মাল্য লাভ করতে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা ও ঐকান্তিক সাধনার প্রয়োজন। এই সাধনা ও অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলেই একে একে তিনি ভারত-চ্যাম্পিয়ানশিপ 'রুস্তম্-ই-হিন্দ' ও 'কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়ানশিপ' লাভ করেছেন, যা আজও কোন ভারতীয় মল্লবীর লাভ করতে পারেননি। নিজের শক্তি ও উৎসাহের ওপর নির্ভর করে দুর্বার আক্রমণের সাহায্যে তাঁকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে বিশ্বজয়ের জয়যাত্রার পথে। একাগ্র ও একান্ত সাধনায় তাঁর বিশ্ব-বিজয়ীর মুকুট করায়ত্ত হোক—আজ এই কামনাই করি।

দারা সিং-এর বিষয়ে সর্বশেষ কথা এই যে, মল্ল হিসেবে তিনি আজও কারুর কাছেই পরাজয় স্বীকার করেননি।

কলকাতার পাঁচালি

অবিনাশ রায়

সৌখিন আনন্দে যেন মৃত্যুত্তীর্ণ পরম বিস্ময়।
কলকাতার প্রেক্ষাপটে বিচিত্র গল্পের কারুকাজ
পঞ্চম রাগের দৃশ্য দৃশ্যান্তরে জুড়েছে স্বরাজ
অদৃশ্য আঙুলে নড়ে জন্ম-মৃত্যু জয়-পরাজয়।
দিবসে রাত্রির গলে মণিমালা অমৃতবিলাস
রাজন্য চৈতন্যে ধন্য আকাঙ্ক্ষার দীপ্ত পারাবার
অথচ গভীরে বুকে চেপে আছে স্থির অন্ধকার
আজন্ম অস্তের মত : কোটিকল্প মানুষের বাস।

জীবনে যৌবন আছে পৌরুষের কেরাণীগিরিতে
দশটার পাঁচটার ছকে বৃদ্ধ জটায়ুর মত
দিনগত পাপক্ষয়, প্রাত্যহিক তপশ্চর্য ব্রত
ঘর ও ঘরের বাইরে পঞ্চ-ম-কার রসের পিরীত-এ
কফি বা চায়ের আড্ডা রেঁস্তোরায়, ছুঁক্সো নতুবা
একই যুবতীকে ঘিরে সংজাত কতকগুলি যুবা।

মনে রেখো

রচনা—C. G. Rossetti

আমায় মনে রেখো আমার চলে যাবার পরে,
দূর নৈঃশব্দ্যের দেশে চলে যাবার পরে;
যখন তোমার হাত মিলবে না মোর হাতে,
বা আধেক পালিয়ে ফিরব না আর রইতে।
সেদিন তুমি মনে রেখো যেদিন কভু আর
শুনাবে না ভবিষ্যতের কল্প-কথা তোমার।
আমায় শুধু মনেই রেখো; এ-তো তোমায় জানা,
তখন সময়ের অতীত হবে সব উপদেশ বা প্রার্থনা।
যদিবা আমায় ক্ষণিকের তরে ভুলে যাও,
তারপর ফের মনে পড়ে—দুঃখ করো না তায়।
আর যদি আঁধার আর পাপে মিলে
আমার ভাবনার সবটুকু মুছে ফেলে
দুঃখ তখন নাইবা পেলে আমায় মনে ভাবি',
বরং হাসির ছলে মুছে ফেল স্মৃতি হতে সবই।

অনুবাদ—বিকাশ ভট্টাচার্য

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে লেখা

মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের পত্র

শ্রীশ্রীকালী সহায়

পরম কল্যাণবরেষু,

বাবাজীবনের প্রেরিত কয়েকখানি সাহিত্য পুস্তকোপহার সাদরে গ্রহণ করিলাম। বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে তোমার ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির লেখনীপ্রসূত গ্রন্থাদিপাঠে স্বতঃই আগ্রহ জন্মিয়া থাকে। ইতিপুর্বে তোমার কয়েকখানি কবিতা ও উপন্যাস গ্রন্থ পাঠ করিয়া সমধিক প্রীতিলাভ করিয়াছি। বর্ত্তমান পুস্তকগুলিও অবকাশমতে পাঠ করিবার ইচ্ছা এবং পুর্ব্বমত প্রীতিলাভ পুনরায় করিব ইহাই মনে বলবতী আশা।

তোমার সাদর উপহারের বিনিময়ে আমার প্রীতিপুর্ণ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ইতি— ৫ই কার্ত্তিক, ১৩১৪,

আশীর্ব্বাদক

স্বাঃ—শ্রীযতীন্দ্রমোহন শর্ম্মা ঠাকুর

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সম্পর্কে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই পত্রের নকলটি মহারাজার সংগ্রহে সংরক্ষিত আছে।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লিখিত পত্রাবলী

দীনেশচন্দ্র সেনের পত্র

মহাত্মন,

আমার বন্ধু রাজশাহী জজকোর্টের উকীল বাবু রজনীকান্ত সেন বি, এল সম্প্রতি আমাদের সান্নিধ্যে কিছুকাল দিনযাপন করার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়া আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ কবিতাশক্তি এবং অপূর্ব সুমিষ্ট সুরসমৃদ্ধ কণ্ঠ তাঁহার পরিচিতমহলে তাঁহাকে সবিশেষ জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। সমাজে এই গুণের জন্য তিনি সকলের বিশেষ প্রীতি অর্জনে সমর্থ হইয়াছেন। বাঙলার সাহিত্য জগতে বর্ত্তমানে কবি হিসাবে ইনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারী হইয়াছেন এবং একজন প্রথম শ্রেণীর কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন। ইতোমধ্যে তিনি প্রায় একশতটি হাস্যরসাশ্রয়ী গান রচনা করিয়াছেন যাহা মাজ্জিত রসবোধ এবং যথোপযুক্ত কবি-প্রতিভার সমন্বয়ে অতুলনীয়। ইনি ইঁহার কয়েকটি গান সম্প্রতি গগনবাবুর গৃহে গাহিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছেন, সমগ্র শ্রোতৃবর্গ তাঁহার গানে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। আমি আপনার প্রাসাদে একদিন সন্ধ্যায় তাঁহাকে গান গাহিতে অনুরোধ জানাইয়াছি, অবশ্য যদি ইহাতে মহাশয়ের সম্মতি থাকে। যদি মহারাজ কোন সন্ধ্যায় তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করিতে চান তাহা হইলে কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে এ বিষয়ে একটি পত্র দ্বারা আপনার সিদ্ধান্ত জানাইতে অনুরোধ করি। আমার তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে পত্র দিলে চলিবে।

যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহ

একান্ত বশম্বদ

স্বাঃ দীনেশচন্দ্র সেন

পত্রে উল্লিখিত গগনবাবু—শিল্পাচার্য্য গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন এই পত্রের সূত্র ধরে সাদরে কবি রজনীকান্তকে তাঁর প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর পত্র

শ্রীশ্রীহরি

বিশ্বকোষ কার্য্যালয়
১৪ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামবাজার
কলিকাতা তাং ১৫ই মাঘ সন ১৩১২।

পরম ভক্তিভাজন

শ্রীশ্রীমহারাজ সর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর

শ্রীচরণকমলেষু

প্রণামপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন,

মহারাজ বাহাদুরের নিকট হইতে প্রুফ ফেরত পাইয়াছি, কিন্তু সেই সকল প্রুফ মধ্যে অনেক নতন কথা সংযোজিত হওয়ায় বিশেষতঃ মেল হইবার প্রকৃত কারণ এক প্রাচীন কুলগ্রন্থে বাহির হওয়ায় তাহা গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশ করিয়া দিলাম। পুর্ব্ব প্রুফ মধ্যে বংশাবলীগুলি দেওয়া হয় নাই। বহু পরিশ্রমে বংশাবলীগুলি ঠিক করিয়া দিয়া সেই সমস্ত প্রুফ পুর্ব্বচিহ্নাঙ্কিত করিয়া পাঠাইলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক অবকাশমত দেখিয়া পাঠাইবেন। অদ্য এককালে তিন ফর্ম্মার প্রুফ পাঠাইতেছি। আগামী বুধবার সন্ধ্যাকালে মহারাজ বাহাদুরের শ্রীচরণ দর্শনার্থ উপস্থিত হইব। সঙ্গে আরও ৩ ফর্ম্মার প্রুফ লইয়া যাইব। মহারাজ বাহাদুরের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা।

স্নেহানুরক্ত প্রণত,

স্বাঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদকার প্রতাপচন্দ্র রায়ের পত্র

দাতব্য ভারত কার্য্যালয়
৩৬৭ আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা, ২৭এ ডিসেম্বর ১৮৮৬

সম্মানিত মহোদয়,

যেদিন আপনার প্রাসাদে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম, সেইদিন আপনি অন্যান্য কর্মে ব্যাপৃত থাকায় আমার সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে পারি নাই। আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে, একটি বাড়ী ক্রয় করিতে পারিলে কার্য্যালয়ের সুবিধা হয়। বাড়ীটি ক্রয় করিলে প্রতিমাসে বাড়ীভাড়া দেওয়ার দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিব এবং এমনই একটি বাড়ী লইতে হইবে যেখানে অফিস, ছাপাখানা এবং গ্রন্থাগার একই গৃহে অবস্থিত হইবে। এক্ষণে আমার গ্রন্থাদি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষিত হইতেছে না বলিয়াই এই অবস্থা। প্রতিমাসে যে টাকা ভাড়া বাবদ দিতে হয় সেই টাকা কার্য্যালয়ের উন্নতি ক্ষেত্রে ব্যয়িত হইতে পারে। আমার এই পরিকল্পনা কয়েকটি বন্ধুর সমর্থনও লাভ করিয়াছে। এই পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য আমি কাহার সাহায্য প্রার্থনা করিব—আপনি ছাড়া? যেখানে আপনার মত একজন সর্বশক্তিমান দেশবরেণ্য একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আমার আছেন তখন এই দেশসেবামূলক কার্য্যে আপনার সাহায্য ও সহযোগিতাই আমার বিশেষ কাম্য। এই বিষয়ে আরও ব্যাপক আলোচনার জন্য এই সপ্তাহেই একদিন সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দিলে কৃতার্থবোধ করিব—সেই সঙ্গে এক্ষণে আমি যে কার্য্যে ব্যাপৃত অর্থাৎ প্রকাশনীর বিষয়েও আপনার উপদেশ পাইবার আশা রাখি।

আপনার একান্ত বিনত
স্বাঃ প্রতাপচন্দ্র রায়

বিজ্ঞানাচার্য মহেন্দ্রলাল সরকারের পত্র

৫১ শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২৪এ মে ১৮৮২

প্রিয়বন্ধু মহারাজা!

অদ্যকার প্রভাতের নিদ্রাভঙ্গ সত্যই পরম আনন্দদায়ক। নিদ্রাবসানে আপনার সম্মানপ্রাপ্তির সংবাদ গোচরীভূত হইল। জানিলাম সরকার আপনাকে নাইটহুড অফ দ ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া এই উচ্চতম সম্মানে বিভূষিত করিয়াছেন। আপনার এই সম্মানপ্রাপ্তি দিবসে আপনাকে সশ্রদ্ধ ও আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার অনুমতি প্রদান করুন। আপনি আমাদের দেশের উজ্জ্বলতম রত্ন। আপনি আজ আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ। আপনার মত দেশের মঙ্গলকামী নেতার জন্য বাঙলার প্রতিটি সন্তান গর্ব্ববোধ করিতে পারে। আপনার আরও সম্মানপ্রাপ্তি এবং দীর্ঘজীবন কামনা করি।

প্রিয় মহারাজা
আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু
স্বাঃ—মহেন্দ্রলাল সরকার

গ্রীস (গিরিশ) চন্দ্র দত্তের পত্র

প্রিয় বন্ধু,

ইংল্যাণ্ড হইতে যে খণ্ডটি পাইয়াছি তাহা তোমার জন্য এতৎসহ পাঠাইলাম। তুমি গ্রহণ করিলে বৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করিব। সহপাঠীদের মধ্যে আজ অনেককেই হারাইয়াছি, ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া অনেকেই আজ অজানার উদ্দেশে যাত্রারম্ভ করিয়াছে, সেই সকল মধুময় অতীত দিনগুলির আজ কেবল স্মৃতিই সম্বল, তাহাদের স্মৃতি বহন করিয়া তুমি আমি আজও বর্ত্তমান। বলা বাহুল্য সমগ্র সহপাঠীদের মধ্যে তোমার ও আমার বন্ধুত্বই সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। তোমাকে যে বস্তু পাঠাইলে অন্ততঃ মুহূর্তের জন্য তোমার মন সেই সুদূর অতীতে সেই আবেষ্টনীর মধ্যে চলিয়া যাইতে পারে, তাহা পাঠাইয়াও অন্তরে প্রভূত সান্ত্বনা অনুভব করি।

তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু
স্বাঃ গ্রীস (গিরিশ) চাণ্ডার ডাট
সেপ্টেম্বর ১৭, ১৮৮৭

মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পত্র

কাশিমবাজার রাজবাটী
১৯এ অক্টোবর ১৯০৭

শ্রদ্ধেয় মহারাজা বাহাদুর,

আগামী ৩রা ও ৪ঠা নভেম্বর এখানে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার নিমন্ত্রণ আপনার উদ্দেশে আমি ইতোমধ্যেই পাঠাইয়া দিয়াছি। আপনার গৃহ বঙ্গসাহিত্যের লালনকেন্দ্র। ঐ গৃহে সাহিত্য নানাভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, আপনি সেই গৃহের প্রধান। শুধু তাহাই নয়, অদ্যকার সামাজিক ক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রের বিবিধ উন্নয়নে আপনি পথিকৃৎ, তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি যে, এই সম্মেলন আপনার উপস্থিতি ও উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইবে না।

গত বৎসর এখানে যে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা গ্রহণ ও পুরস্কার বিতরণের দিনও ৩রা ও ৪ঠা নভেম্বর ধার্য্য হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর দেশবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও বাদ্যযন্ত্রীদের প্রায় সকলকেই আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে। আমি আশা করি, আপনার সেতারবাদক স্বনামধন্য ইমদাদ খানও আপনার সহিত আসিবেন। তাঁহার উপস্থিতিও আমি বিশেষভাবে কামনা করি।

আশা করি আপনি সপরিবারে সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছেন।

আপনার স্নেহভাজন
স্বাঃ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরকে লেখা পত্রাবলী

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পত্র

দি বেঙ্গলী
স্থাপিত ১৮৫৯

কলিকাতা, ১১-৪-১৯১১

প্রিয়বরেষু,

মহারাজা, আগামীকল্য দিবা বারোটা হইতে একটার মধ্যে আপনার প্রাসাদে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি কি? বিষয়টি সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে আলাপ-আলোচনা করিয়া কর্মে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয় বলিয়া মনে করি সেইজন্য আপনার সহিত আলোচনা করিতে বিশেষ ইচ্ছুক জানিবেন।

আশা করি, আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক ছত্র উত্তর লিখিয়া দিলে সুখী হইব।

আপনাদের
স্বাঃ—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

আচার্য স্যার যদুনাথ সরকারের পত্র

১৮ বি, মোহনলাল ষ্ট্রীট
শ্যামবাজার, কলিকাতা
৮ই জানুয়ারী ১৯৩১

প্রিয়বরেষু,

মহারাজা বাহাদুর, মিউটিনীর পূর্ব্বে বাঙলা দেশে অবস্থিত বাঙলা ছাপাখানা সম্বন্ধে গত ৯ই ডিসেম্বর আপনি যে পত্র দিয়াছেন, তাহার জন্য প্রভূত ধন্যবাদ। আপনি যদি কোন নির্দ্দিষ্ট দিন ও সময়ে আমার প্রতিনিধিকে আপনার সুবিখ্যাত গ্রন্থাগারে বসিয়া প্রাচীন বাঙলা কাগজপত্র দেখিবার অনুমতি দেন, তাহা হইলে আপনার কর্ম্মচারীবৃন্দ অহেতুক শ্রম-স্বীকার ও সময় নষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবেন বলিয়া মনে হয়। আমার যাহা প্রয়োজন আমার প্রতিনিধিই তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রয়োজনমত নকল করিয়া লইবেন। প্রস্তাবটি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন আশা করি।

আপনাদের
স্বাঃ—যদুনাথ সরকার

পত্রে উল্লিখিত এই প্রতিনিধি—বাঙলার স্বনামধন্য ইতিহাসবেত্তা ও সাহিত্যসেবী স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ বাদুড়বাগান রো
কলিকাতা, ৩রা মে, ১৯২৮

প্রিয় মহারাজা,

প্রতাপাদিত্যের স্বপক্ষে কিছু লিখিবার জন্য যে পত্র দিয়াছেন, তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করি। এই বিরাট মানুষটি এক ঐতিহাসিক চরিত্র, সেইজন্যই নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণগুলিকে ভিত্তি করিয়া সত্যের আলোয় তাঁহাকে বিচার করা কর্ত্তব্য। নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসাবে ফ্রেঞ্চ জেসুইট য্যাকাউন্ট এবং পারস্য ইতিহাসের নামোল্লেখ করা যায়। আমি এ বিষয়ে তিনটি প্রবন্ধ রচনাও করিয়াছি এবং তাহা প্রকাশিতও হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া নূতন কোন উপকরণ আমার কাছে নাই, অধিকন্তু, উপকরণ আর আছে বলিয়াও মনে হয় না। তদুপরি কেবলমাত্র আবেগ-প্রবণতা ও উচ্ছ্বাসের বশীভূত হইয়া প্রতাপাদিত্যের স্বপক্ষে কোন কাহিনী খাড়া করিলে অতীব ভ্রমাত্মক কার্য্য হইবে।

আপনাদের
স্বাঃ—যদুনাথ সরকার

দেবকুমার রায়চৌধুরীর পত্র

বরিশাল

নমস্কারান্তে সসম্মান নিবেদন,

কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় আপনার জনৈক গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "হাসির গান" নামক অমূল্য পুস্তকখানি তিনি আপনাকেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের আকস্মিক অকালমৃত্যুতে বঙ্গদেশের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের নিতান্তই দুরপনেয় ক্ষতি হইয়াছে। বঙ্গবাসীর এই স্বর্গীয় মহাত্মার নিকটে ঋণের পরিমাণ তাদৃশ অনায়াসে নির্দ্ধারিত হইবার নহে। সে ঋণ প্রভূত।

কবিবরের অকাল মৃত্যুতে শোকপ্রকাশার্থ কলিকাতা টাউনহলে যে অতি মহতী এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে এই ক্ষণজন্মা কবির যোগ্য স্মৃতিরক্ষার্থ একটি সমিতি গঠিত হয় এবং এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার জন্য একটি স্মৃতি-ভাণ্ডারেরও প্রতিষ্ঠা হয়। বলা বাহুল্য, আপনি এই সমিতির জনৈক সম্মানিত সদস্যরূপে সর্বসম্মতিক্রমে সাগ্রহে নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্মৃতিভাণ্ডারে প্রতিশ্রুত দানসমূহের প্রায় অধিকাংশই সংগৃহীত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কৃপার্থীভাবে স্মৃতি-সমিতির পক্ষ হইতে আমি আপনারই দ্বারে সাহায্য ভিক্ষা করিতে আজ উপস্থিত হইলাম। আপনি যাহাই দিবেন, সাগ্রহ সম্মানে সাদরেই গ্রহণ করিব। আশা করি, আমাদের এই সনির্বন্ধ প্রার্থনা আপনার নিকটে উপেক্ষনীয় গণ্য হইবে না। ইতি ৮ই শ্রাবণ ১৩২১

ভবদীয় গুণমুগ্ধ
স্বাঃ শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী
সম্পাদক
৺দ্বিজেন্দ্রলাল স্মৃতি-সমিতি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের পত্র

(একটি বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে)

সেনেট হাউস
কলিকাতা
১লা ফেব্রুয়ারী ১৯১১

প্রিয় মহাশয়,

আগামী ৪ঠা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্ত্তনে জার্মাণ সাম্রাজ্যের পরম মান্যবর যুবরাজকে সম্মানাত্মক "ডক্টর অফ ল" উপাধি দেওয়া হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার হিসাবে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য আপনি যদি আপনার তিনটি ষ্টেট চেয়ার ব্যবহার করিতে দেন তো বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

একটি ঢাকা সহ লম্বা টেবিল—যাহার উপর সম্মানাত্মক উপাধি-প্রাপকদের তালিকায় যুবরাজ আপন স্বাক্ষর প্রদান করিবেন—তৎসহিত ব্যবহারের জন্য পাঠাইবার অনুমতি দিলে প্রভূত উপকৃত হইব।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাঃ—অস্পষ্ট
রেজিষ্ট্রার

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তনকালের সমাবর্তনাদিতে মহারাজার প্রাসাদ থেকে ব্যবহারের জন্য কিছু আসবাবপত্র সরবরাহ হোত। মহারাজের সংগ্রহে সংরক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেরিত বিভিন্ন পত্রাদিতে এই সত্য আলোকিত হচ্ছে। পত্রগুলির বিবরণ একই বলে সেগুলি প্রকাশিত হল না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, জার্মাণ সাম্রাজ্যের যুবরাজকে যে সময়ে উপাধি দেওয়া হয়, সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ছিলেন আচার্য্য স্যার আশুতোষ। এই অপ্রকাশিত পত্রগুলি মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

ধারাবাহিক জীবনী-রচনা

৪৫

দেরি নয়, আজ সন্ধ্যাতেই দেখা করব। ভাবছে রামানন্দ। প্রভু ভাবছেন, কতক্ষণে না জানি দেখা পাই। সন্ধ্যা হতেই যেন চলে আসে।

সান্ধ্য স্নান সেরে প্রভু বসে আছেন, রামানন্দ রায় উপস্থিত। রামানন্দ নমস্কার করল, প্রভু আলিঙ্গন করলেন।

নির্জনে বসে আলোচনা সুরু করলেন দুজনে।

'জীবের কাম্য বা সাধ্য বস্তু কী?' জিগগেস করলেন প্রভু, 'শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ বলো।'

শুধু তোমার কী অনুভূতি, তা নয়, শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও প্রকাশ করো। অর্থাৎ শাস্ত্রবচনেব সঙ্গে তোমার নিজের অনুভবকে মেলাও।

রামানন্দ বললে, 'স্বধর্মাচরণই সাধ্য। তাই বলেছে বিষ্ণুপুরাণে। অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুষ্ঠানেই বিষ্ণুপ্রীতি। যে যে আশ্রমে যে ভূমিতে আছে, সেই আশ্রমের বা সেই ভূমির বিহিত কাজ পালন করলেই বিষ্ণুর সন্তোষ।'

প্রভু বললেন, 'ইহ বাহ্য, আগে কহ আর। মহত্তর সাধ্যের কথা শুনতে চাই।'

'কৃষ্ণে কর্মার্পণ।' বললে রামানন্দ, 'শুধু সাধ্য নয়, সাধ্যসার। অর্থাৎ যা কিছু কাজ করো সব কৃষ্ণে অর্পণ করো। তোমার অধিকার কর্মে, ফলে নয়। যে কর্মের ফল কৃষ্ণের সুখে নয়, নিজের সুখে নিয়োজিত, তা অকর্ম।'

'এও বাহ্য, এও বাইরের দরজা,' বললেন প্রভু, 'আগে কহ আর। অন্দরমহলের দ্বার দেখাও।'

'স্বধর্মত্যাগ—সর্বধর্মত্যাগ।' রামানন্দ বললে। 'কর্ম করে ফল অর্পণ নয়, কর্ম করবার আগেই আত্মসমর্পণ। ফলদান নয়, আত্মদান। গীতায় যাকে বলেছে,—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। যে নিজেকে দিয়েছে, তার আর ধর্ম থাকল কই? তার তখন স্ব-ও গেছে, ধর্মও গেছে। আত্মসমর্পণই শ্রেষ্ঠ সাধ্য।'

প্রভু আরো এগোতে চাইলেন। বললেন, 'এও বাহ্য, আগে বলো।'

সমর্পণ যে করবে, পূর্বাহ্নে জানতে হবে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র শরণ্য, একমাত্র আশ্রয়স্থল। না জেনে সমর্পণে সার্থকতা কী। শুধু উপদেশ শুনে শরণাগত হবে? পাপ-পুণ্য বিচার করে? মুক্তি-ভুক্তির আকাঙ্ক্ষায়? পায়ে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ার আর কোনো টান নেই? আর কোনো আকূতি?

রামানন্দ বললে, 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সারসাধ্য।'

আগে জানো শ্রীকৃষ্ণই শরণ্য, মহদাশ্রয়, তারপর ভক্তিই তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে তাঁর দিকে। তারপর এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই পরাভক্তিতে পরিণত হবে।

জ্ঞানের উদয়ে কী হবে? সর্বভূতে সমদৃষ্টি হবে। সর্বাত্মময় সর্বানন্দময় হবে। ব্রহ্মভূত হবে। সেই প্রসন্নাত্মার তখন আর কোনো শোক নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। আর তখনই উপনীত হবে সে পরাভক্তিতে।

সেই পরাভক্তির—উত্তমা ভক্তির কথা বলো।

প্রভু বললেন, 'এহ বাহ্য আগে কহ আর।'

'জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই সাধ্যোত্তম।' বললে রামানন্দ।

হে অজিত, তোমার স্বরূপের—তোমার ঐশ্বর্যের মহিমা জানবার জন্যে আমার কোনো চেষ্টা নেই। শুধু সৎ সঙ্গে থেকে সাধুদের মুখে তোমার রূপগুণ

লীলাকথা, তোমার ভক্তদের চরিতকথা শুনব, তনুমনোবাক্যে নমস্কার করব সে সমস্ত কথাকে। জানি শুধু তাতেই, শুধু এইটুকুতেই তুমি আমার হয়ে যাবে। তুমি ভগবান, এ ভাবলেই ঐশ্বর্যবুদ্ধি ভক্তিকে শিথিল করে দেয়। তুমি আমার আপনজন মনে করলেই তুমি নিবিড়তম সান্নিধ্যে ধরা দাও।

প্রভু একটু হাসলেন। বললেন, 'এও হয়, তবু আরো কিছু বলো।'

রামানন্দ বললে, 'প্রেমভক্তিই সর্বসাধ্যসার।'

জ্ঞানশূন্যা বা শুদ্ধা ভক্তির সঙ্গে একটু কৃষ্ণতৃষ্ণা মেশাও, তাহলেই প্রেমভক্তি। ক্ষুধা না থাকলে ভোগ কী: জঠরে বলবতী ক্ষুধা-পিপাসা আছে বলেই ভক্ষ্যপেয় আনন্দদায়ক। শুধু প্রেমার্তিতেই আর্তবন্ধু কৃষ্ণ বিগলিত। কৃষ্ণ শুধু প্রশংসার বস্তু নয়, আস্বাদনের বস্তু। কৃষ্ণমতির মূল্য শুধু একটি। সে হচ্ছে লালসা। কৃষ্ণসেবার জন্যে আতীব্র উৎকণ্ঠা। লৌল্যং অপি মূল্যং একলং। লোভ জাগলেই বস্তু মেলে। আর এই লোভ জাগে কৃপায়। কোটিজন্মের সুকৃতির বিনিময়েও এ লোভ লাভ করার নয়।

সেবা দিয়ে কৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছাই প্রেমভক্তি। আর লৌল্য বা লালসাই সেই প্রেমভক্তির প্রাণ।

'জলবিন্দু যেন মীন দুঃখ পায় আয়ুহীন,
প্রেমবিন্দু এই মত ভক্ত।
চাতক জলদ-গতি এমতি একান্ত রীতি
যেই জানে সেই অনুরক্ত॥
লুবধ ভ্রমর যেন চকোর চন্দ্রিকা তেন
পতিব্রতা জন যেন পতি।
অন্যত্র না চলে মন যেন দরিদ্রের ধন
এই মত প্রেম-ভক্তি রীতি॥'

প্রভু আবার হাসলেন। 'এও হয়। তবু আগে কহ আর।' দেখ আর কোনো নিগূঢ়তর আস্বাদ আছে কি না।

'আছে।' বললে রামানন্দ, 'দাস্য প্রেম।'

শান্তে কেবল কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা, দাস্যে সেই নিষ্ঠার উপরে আবার সেবা। শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাবুদ্ধিহীন। আর দাস্যে 'এক কৃষ্ণ সর্বসেব্য জগত-ঈশ্বর। আর যত সব তাঁর সেবকানুচর।' জীবের স্বরূপগত ভাবই দাস্যভাব। জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবক, কৃষ্ণানুজীবী।

অম্বরীষকে কী বলেছিল দুর্বাসা? বলেছিল, যাঁর নাম শোনা মাত্রই মানুষ নির্মল হয়, পবিত্র হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের দাসানুদাসের আর কি পাওয়া বাকি থাকে?

কবে আমি তোমার ঐকান্তিক নিত্যকিঙ্কর হব? কবে তোমার সেবায় নিযুক্ত হয়ে নিজেকে সনাথজীবিত বলে অনুভব করব? কবে আমার অন্য সব বাসনা তিরোহিত হবে? কৃষ্ণসেবার বাসনা ছাড়া অন্য মনোরথ নিঃশেষে প্রশান্ত হবে! কবে আমি প্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথান্তর হব।'

'এও হয়।' মৃদু-মৃদু হাসলেন আবার প্রভু। বললেন, 'আরো—বলো।'

রামানন্দ বললে, 'সখ্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার।'

প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধের মধ্যে ব্যবধান থেকে যায়। গৌরববুদ্ধিতে সেবায় সঙ্কোচ আসে। কৃষ্ণকে যদি ত্রাতা বিবেচনা করতে হয়, তা হলে সেবা সর্বাঙ্গীণ হয় না। সখ্যপ্রেম নিঃসঙ্কোচ। সখ্যপ্রেমে অভেদবুদ্ধি। নিজদেহে ও কৃষ্ণদেহে তফাৎ নেই। কার বা পাত্র, কার বা চরণ। গায়ে পা ঠেকলেও তাই চাঞ্চল্য নেই। নিজের পায়ে নিজের পা ঠেকলে কে উদ্বিগ্ন হয়? কে কার কাঁধে উঠছে। কে খাচ্ছে কার উচ্ছিষ্ট! কৃতপুণ্যপুঞ্জ ব্রজবালকদের সঙ্গে লীলারঙ্গী কৃষ্ণ অনেক ক্রীড়াকৌতুক করেছে, অনেক ছুটোপুটি—অনেক দৌড়ঝাঁপ।

'এহোত্তম।' প্রভু আবার স্নিগ্ধনেত্রে হাসলেন। বললেন, 'আগে কহ আর।'

'বাৎসল্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার।' রামানন্দ উত্তর দিল।

সখ্যে কৃষ্ণ সমান-সমান, বাৎসল্যে কৃষ্ণ ছোট, দুর্বল, দীনহীন। বাৎসল্যে কৃষ্ণে অনেক দোষ, তাই তাকে তাড়ন-তর্জ্জন, শাসন-পীড়ন, এমন কি রজ্জুবন্ধন। বাৎসল্যে বৃহত্তমকে ক্ষুদ্রতম মনে করা, সমর্থতমকে অক্ষমতম। যে ভুবনের পালক—তাকে একটি অপোগণ্ড বালকরূপে অনুগ্রহ করা।

বিমুক্তিদাতা কৃষ্ণের থেকে যে প্রসাদ যশোদা পেয়েছে, তা না পেয়েছে ব্রহ্মা, না পেয়েছে শিব, না বা তার অঙ্গসংলগ্না লক্ষ্মী।

আর বাৎসল্যে কৃষ্ণেরও সেই বালকভাব। নন্দের পাদুকা মাথায় নিয়ে চলেছে গোষ্ঠের পথে। মায়ের হাতের প্রহার এড়াবার জন্যে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে,

মিথ্যে কথা বলছে, লজ্জিত-কুণ্ঠিত হচ্ছে। নিজে মুক্তিদাতা হয়ে বন্ধন মানছে।

'এহোত্তম। আগে কহ আর।' প্রফুল্লনেত্রে প্রভু বললেন, 'প্রেমের আরো কোনো পরিপক অবস্থা যদি থাকে, তাই বলো।'

রামানন্দ বললে, 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার।'

কৃষ্ণের কাছ থেকে যে প্রসাদ ব্রজসুন্দরীরা লাভ করেছে, যে কণ্ঠাশ্লেষ, তা নিতান্তরতি লক্ষ্মীও পায়নি, স্বর্গাঙ্গনারাও পায়নি।

কৃষ্ণে লক্ষ্মীর ঈশ্বরবুদ্ধি, গোপীর আত্মবুদ্ধি। অনেকের মধ্যে আমি একজন সেবিকা—এই ভাব লক্ষ্মীর, আর কৃষ্ণ আমারই একলার, একান্ত আপন, —এইটিই গোপীভাব।

কান্তাপ্রেমই "সাধ্যাবধি।" গুণাধিক্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বাদাধিক্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ।

'পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।' শান্তের গুণ দাস্যে, দাস্যের গুণ সখ্যে, সখ্যের গুণ বাৎসল্যে, বাৎসল্যের গুণ মধুরে। শান্তের একটি গুণ—কৃষ্ণনিষ্ঠা। দাস্যে দুটি—কৃষ্ণনিষ্ঠা তো আছেই, তার উপরে সেবানিষ্ঠা। সখ্যে দাস্যের দুটি গুণ তো আছেই, তদুপরি অসংকোচ অভিন্নমনন। বাৎসল্যে সখ্যের তিনটি গুণ তো আছেই, অধিকন্তু আছে মমত্ব-বুদ্ধিতে শাসন-ভর্ৎসন। মধুরে বা কান্তারতিতে বাৎসল্যের চারটি গুণ তো আছেই, তাছাড়া আছে—অঙ্গদানে কৃষ্ণসেবা—যা বাৎসল্যে অপ্রকট। সেই কারণে মধুরেই পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি। মধুরই পরাকাষ্ঠা।

'পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥'

'আরো যদি থাকে তো আরো বলো।'

'আরো বলব? এর পর আরো আছে?'

'আছে।' বললেন প্রভু, 'কৃপা করে বলো শুনি।'

'সন্দেহ কী, আমার মুখে তুমিই বক্তা, আবার তুমিই শ্রোতা।' বললে রামানন্দ, 'কান্তাপ্রেমের মধ্যে রাধার প্রেমই শিরোমণি।'

রাসমঞ্চে প্রত্যেক গোপীর পাশে শ্রীকৃষ্ণ। রাধার পাশেও এক মূর্তি। সর্বত্রই যদি সমভাব, তাহলে আর রাধিকা অসামান্যা কিসে? রাধিকার মান হল। রাস-মণ্ডলী ছেড়ে চলে গেল একা-একা। কৃষ্ণও উতলা হয়ে তাকে খুঁজতে বেরুল। যাকে সকলে খোঁজে, সেই আজ অনুসন্ধানে তৎপর। যে আকর্ষী, সেই আজ আকৃষ্ট।

কিন্তু কাকে খুঁজছে? খুঁজছে সমস্ত আরাধনার ধন রাধিকাকে। ব্রজসুন্দরীদের ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছে। এখন কৃষ্ণের রাধাভিসার। মুখে রাধানাম, হৃদয়ে রাধাভাব, সমস্ত জগৎ বিরহতন্ময়। ভগবানের সেবা করতে না পারলে ভক্ত যেমন উৎকণ্ঠিত, তেমনি ভক্তের সেবা গ্রহণ করতে না পারলে ভগবানও উৎকণ্ঠিত। তাই কৃষ্ণ রাধার ব্যাকুলতা হৃদয়ে নিয়ে রাধাকেই খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু কোথায় সে সর্বস্বা, কোথায় সে সর্বেশ্বরী?

'বলো, আরো কিছু বলো।'

'আমি বলব?' রামানন্দ কাতরমুখে বলে।

'হ্যাঁ, তোমার কাছে এসেই তো রসবস্তু কী বুঝতে পারলাম।' প্রভু বললেন, 'এবার তবে রাধা-কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করো।'

'কী যে বলো তার ঠিক নেই। তুমি যা বলাচ্ছ, তাই বলছি। হৃদয়ে প্রেরণা দিচ্ছ, তাই কথা হয়ে আসছে মুখ দিয়ে। ভালো-মন্দ কী বলছি কিছুই জানিনা। হৃদয়ে প্রেরণ করো জিহ্বায় বহাও বাণী। কি কহিয়ে ভালো-মন্দ কিছুই না জানি॥''

প্রভু বললেন, 'আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তি কী জানিনা। তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শোনবার জন্যে সার্বভৌম এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তুমি আমাকে এত স্তুতি করছ কেন? আমি ব্রাহ্মণ বলে, না, সন্ন্যাসী বলে? শোনো, যে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু। তুমি কৃষ্ণজ্ঞ, তাই তুমি অব্রাহ্মণ হলেও, গৃহী হলেও, গুরু। সুতরাং শোনাও আমাকে কৃষ্ণকথা।'

রামানন্দ বললে, সূত্রধারের ইঙ্গিতে নট নাচে, তেমনি আমি নট, তুমি সূত্রধার। তুমি বীণাধারী, আমি তোমার হাতে বীণাযন্ত্র।'

'এ সব কথা রাখো, কৃষ্ণকথা আরম্ভ করো।'

রামানন্দ বলতে লাগল:

'কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান। সমস্ত কারণের কারণ, সমস্ত অবতারের মূল। সচ্চিদানন্দতনু। রসে, শক্তিতে ও ঐশ্বর্যে সর্বাতিশায়ী।

কৃষ্ণ অপ্রাকৃত নবীন মদন। যে মত্ততা জন্মায় সে মদন। যে প্রাকৃত বস্তুতে কামনা জন্মায়, সে প্রাকৃত মদন আর যে অপ্রাকৃত বস্তুতে লালসা জাগায়, সে অপ্রাকৃত মদন। প্রাকৃত মদনে কাম্যবস্তু লাভের পরে লালসা প্রশমিত হয়। আস্বাদনেও নূতনত্ব থাকে না। কিন্তু কৃষ্ণকামনায় কৃষ্ণকে যত আস্বাদন

করা যায়, ততই লালসা বাড়তে থাকে। যত পান তত পিপাসা। কৃষ্ণমাধুর্য নিত্য নবায়মান।

সমস্ত রসের বিষয়-আশ্রয় কৃষ্ণ। অখিলরসামৃত-মূর্তি। সকল রসের রাজস্বরূপ শৃঙ্গার, আর তারই প্রতিমূর্তি কৃষ্ণ। সকলের চিত্তহর, সকলের তো বটেই, এমন কি নিজেরও। 'আত্মপর্যন্ত সর্বচিত্তহর।' নিজের রূপে নিজেই বিভোর। এত বিভোর যে নিজেই নিজেকে আলিঙ্গন করতে উন্মুখ।'

প্রভু থামিয়ে দিয়ে বললেন, এবার রাধাতত্ত্ব বলো।

'রাধিকা সেই শক্তি—যা কৃষ্ণকে আহ্লাদিত করে। শুধু কৃষ্ণকে নয়, কৃষ্ণভক্তকেও সুখাস্বাদন করায়। হ্লাদিনীর সার অংশ প্রেম, আনন্দ-চিন্ময়-রস। আর প্রেমের সার মহাভাব। আর মহাভাবরূপাই রাধিকা। প্রেমে দেহ গড়া প্রেমের প্রতিমা। তার কাজ কী? কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করাই তার কাজ। সর্বদা কৃষ্ণসঙ্গ চিন্তা করছে। কৃষ্ণের নাম গুণ যশ শোনাই তার কর্ণভূষণ। নাম গুণ যশের প্রবাহই তার সুখের মধুধারা। তার মাধ্যমেই কৃষ্ণ নিজেকে নিজে আস্বাদন করে। রাধা ছাড়া কৃষ্ণের গতি নেই। রাধার গুণের পার পাওয়াও কৃষ্ণের অসাধ্য।

কৃষ্ণের প্রণয়ের উৎপত্তি-ভূমি কে? একা রাধিকা। কৃষ্ণের প্রেয়সী কে? অনুপমগুণা একা রাধিকা। রাধিকার কেশে কুটিলতা, নয়নে তরলতা, কুচে কঠিনতা—একা রাধিকাই কৃষ্ণের সমগ্র বাসনা পূর্ণ করতে সমর্থা, আর কেউ নয়।

সত্যভামা সকলের চেয়ে সৌভাগ্যবতী হয়েও রাধার সৌভাগ্য কামনা করে। ব্রজরামা রাধার কাছে কলাবিলাস শিখতে চায়। পতিব্রতাদের মুকুটমণি অরুন্ধতী রাধার পাতিব্রত্য অভিলাষ করে। আর শ্রীমতী লক্ষ্মী ভাবে, হায়, আমার যদি রাধার মত রূপ থাকত।

প্রভু বললেন, 'রাধাকৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্ব জানলাম। এবার রাধাকৃষ্ণের বিলাসমহত্ত্ব শোনাও।'

রামানন্দ বললে, 'কৃষ্ণের বিলাসতত্ত্ব হল নিরন্তর কামক্রীড়া, অবিচ্ছিন্ন প্রেমের খেলা।'

এক মুহূর্তও খেলা ছাড়া নেই তিনি। রক্তক-পত্রকের সঙ্গে কখনো দাস্যরসের খেলা, যশোদা রোহিণীর সঙ্গে বাৎসল্যরসের খেলা, শ্রীদাম সুদামের সঙ্গে সখ্যরসের খেলা, আর রাধাচন্দ্রাবলীর—ললিতা বিশাখার সঙ্গে মধুর রসের খেলা। কুঞ্জক্রীড়া। খেলাচ্ছুট নয় কখনো কৃষ্ণ। সে বিদগ্ধ, ধীর ললিত, নবীন তরুণ, পরিহাস-বিশারদ, নিরুদ্বেগ, আর যে প্রেয়সীর যে রকম প্রেম, সেই প্রেয়সীর প্রেমে সেইরকম বশীভূত।

'যা বলছ তা ঠিক।' বললেন প্রভু, 'তবু দেখ আরো কিছু আছে কিনা।'

'এর বাইরে আমার আর বুদ্ধিগতি নেই। তবে একটি প্রেমবিলাসের কথা তোমাকে বলি,' বললেন রামানন্দ, 'জানিনা তা তোমার মনোগত হবে কিনা।'

এই বলে স্বরচিত একটি গান ধরল রামানন্দ।

> পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
> অনু দিন বাঢ়ল—অবধি না গেল॥
> না সো রমণ না হাম রমণী।
> দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥
> ও সখি! সে সব প্রেম কাহিনী।
> কানুধামে কহবি, বিছুরহ জানি॥
> না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন।
> দুহুঁ বেরি মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ॥
> অব সোই বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী।
> সুপুরুখ-প্রেমকি ঐছন রীতি॥

তাকে দেখলাম কি না-দেখলাম, চক্ষের পলকে অনুরাগ জন্মাল। সে অনুরাগ নিরবধি বেড়েই চলল। কে জানে, এ অনুরাগ জন্মের আগে থেকেই ছিল না। কে জানে, এ অনুরাগ বুকে নিয়েই জন্মেছি কিনা। নইলে চোখ মেলেই যেন কৃষ্ণমুখ দেখি, কৃষ্ণমুখ না দেখে চোখ খুলব না—এই সঙ্কল্পে চোখ বন্ধ করে জন্মেছিলাম কেন?

আমি রমণী, সে পুরুষ; সে স্বামী, আমি স্ত্রী—এই সম্বন্ধ থেকে অনুরাগ নয়। তুমি-আমি তখন কোন ভেদবুদ্ধি নেই, নেই কান্ত-কান্তার সীমারেখা। প্রেমের পেষণে মীনকেতু দুজনকে একজন করে ফেলেছে। এক দেহ দুই প্রাণ। এক দেহ দুই মনের খেলা, কখনো কৃষ্ণ কখনো রাধা, কখনো ভগবান কখনো ভক্ত।

এই মিলন ঘটাতে দূতী খুঁজতে হয়নি। শুধু জন্মের আগে থেকেই পরস্পরের যে নিদারুণ উৎকণ্ঠা, তাই আমাদের মিলিয়ে নিয়েছে। পৌঁছে দিয়েছে পরিপূর্ণতায়।

প্রভু বুঝি এবার ধরা পড়ে যান—সেই আশঙ্কায় না, সেই আনন্দে, প্রভু রামানন্দের মুখ চেপে ধরলেন। আর নয়, আর হবেনা বলতে।

'এই সাধ্যবস্তুর শেষ সীমা।' বললেন প্রভু, 'তোমার অনুগ্রহে জানতে পারলাম পুরোপুরি।'

প্রভু কহে—সাধ্যবস্তু অবধি এ হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥'

'তবে এবার বলো এই সাধ্যবস্তু কি করে পাওয়া যায়? এবার বলো সাধকের কথা।'

রামানন্দ দেখল প্রভুর আর সন্ন্যাসীরূপ নেই। এক শ্যামল কিশোর দাঁড়িয়ে আছে মুখে বাঁশি নিয়ে। সামনে এক কাঞ্চন-পঞ্চালিকা—স্বর্ণবর্ণা প্রতিমা। ও কি, প্রতিভার উজ্জ্বল গৌরকান্তিতে শ্যামল কিশোরের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

'মনে প্রবল সংশয় জাগছে।' স্থির স্বরে বললে রামানন্দ, 'তোমাকে তো আগে সন্ন্যাসী দেখেছিলাম, এখন তোমার মধ্যে শ্যামগোপরূপ দেখছি কেন? দেখছি তার সামনে এক কাঞ্চন-প্রতিমা, আর প্রতিমার অঙ্গ-কান্তিতে তুমি ঢাকা পড়েছ। এর অর্থ কী?'

প্রভু বললেন, 'এ কিছু নয়, এ তোমার চোখের ভ্রমমাত্র। রাধাকৃষ্ণে তোমার প্রগাঢ় প্রেম, তাই আমার মধ্যেও তুমি তোমার সেই ইষ্টের প্রকাশ দেখছ। যারা মহাভাগবত, স্থাবরে জঙ্গমে সর্বত্রই তারা ইষ্টস্ফুর্তি দেখে। তাই যা দেখছ তা আমার রূপ নয়, তোমারই প্রেমচক্ষুর প্রসাদ।

রামানন্দ আর ভুলবেনা ছলনায়। বললে, 'প্রভু, তোমার চতুরালি এবার ছাড়ো। আর আত্মগোপন কোরো না। আমি এতক্ষণে নিঃসংশয় হয়েছি। তুমি রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকৃত করে অবতীর্ণ হয়েছ, গৌরকান্তিতে শ্যামকান্তিকে আচ্ছন্ন করেছ, নিজের মাধুর্য নিজে আস্বাদন করবে বলে। প্রেমভক্তি বিতরণ করে নির্বিশেষে সকলকে কৃষ্ণ-প্রেমময় করবে বলে। তোমাকে বুঝতে আর আমার বাকি নেই।'

'রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য তোমার প্রেম-আস্বাদন
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥'

[ক্রমশঃ

দূরত্বের মধুরতা

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১

কাছের থেকে সুদূর ভালো,
মধুর দূরের দেখা!
দূরের দিকে দৃষ্টি রেখে
তাইতো বেড়াই একা।
কলসী কাঁখে পথের বাঁকে
যাচ্ছে কে ওই নত আঁখে!
সুদূর থেকে উঠছে ফুটে
অপূর্ব্ব রূপ রেখা!

২

বড়ই মধুর লাগছে সুদূর
নীল পাহাড়ের রূপ!
যুগ-যুগান্ত করছে ধেয়ান
নীরবে নিশ্চুপ।
গুরুগম্ভীর ওই মূরতি
জাগায় মনে দিব্যারতি!
দূরের আকাশ হাতছানি দায়,
ভুলায় অন্ধকূপ!

৩

কাছের যে-গান শুনছি কানে,
প্রাণ তা ভালোবাসে!
তার চাইতে মধুর দূরের
যে-গান কানে আসে!
শোনার চেয়ে না-শোনা গান
আকুল আমার করলো পরাণ!
সেই গানেরে ভাষা দিতে
মন মেতেছে আশে!

৪

পাওয়াতে সব আশা ফুরায়,
না-পাওয়া ঢের ভালো!
ঘোর বিরহে সদাই জ্বলে
অনুরাগের আলো!
হাসির চেয়ে কান্না মধুর,
ক্রন্দনে রই সেই ভাবাতুর!
মূক আমারে মুখর করে,
ভালায় সকল কালো!

কবি ওমরের দর্শন

অমল চট্টোপাধ্যায়
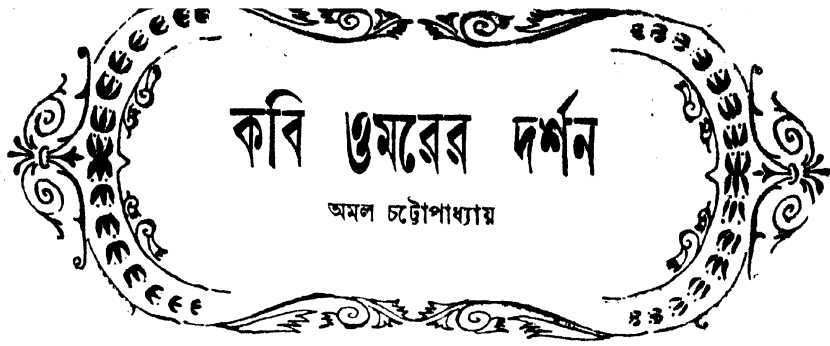
কবি ওমর—বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে পারস্যের এই কবির নামটুকু। মধ্যযুগে আবির্ভূত এই কবির কাব্যসাধনা বিশ্বসাহিত্যকে ভাব ও ভাষার দিক থেকে কতই না করেছে সমৃদ্ধ—অলংকৃত করেছে বিশ্ববাণীর তনুদেহটি, মহিমান্বিত করেছে বিশ্বজনের আশা-আকাংখাকে, মানুষের চাওয়া-পাওয়াকে।

পূর্ব ও পশ্চিম—দুই প্রত্যন্ত দেশ। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দুই বিভিন্ন ও বিচিত্র ধারার উদ্ভব হয়েছিল এই দুই দেশে। আদর্শ ও জীবনদর্শনের মধ্যে যে মূল বিভেদের সুর ধ্বনিত, তাই পূর্ব ও পশ্চিমের জীবনতন্ত্রীকে একই সুরে বেঁধে দিতে পারেনি। প্রতীচ্য বস্তুবাদী জীবনদর্শনের আওতায় আর প্রাচ্য ভাববাদী জীবনদর্শনের আওতায় বেড়ে উঠেছে। অবশ্য সাগরের তরংগের মতো দুই প্রত্যন্ত দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি দুই দেশের জীবন-জাহ্নবীর তটদেশ ছুঁয়ে আছে। কিন্তু এ শুধু স্পর্শমাত্র—তনুপ্রবেশ নয়।

রাষ্ট্রসাধনা বা সমাজ-জীবনে পশ্চিমের জীবন-বীণায় পূরবী রাগ বেজে উঠল না। কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে—দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে দুই দেশই তাদের উন্মুখ করে দিতে পেরেছিল। পারস্যের দার্শনিক কবি ওমরের জীবনদর্শনে, তাঁর কাব্যসাধনায় দেখি এমনি এক মিলন-প্রচেষ্টা। পূর্ব ও পশ্চিমের দুই ভিন্নমুখী জীবন-দর্শন তাদের স্তন্যরসে পরিপুষ্ট করে তুলেছে ওমরের জীবন-বাণী। তাই এখানে দুই দেশ রাষ্ট্র-জীবনের, সমাজ-জীবনের, হাজারো সংঘাত ও সংঘর্ষ ভুলে মিলতে পেরেছিল। শুধু মিলতে পারাই নয়, দুই জীবন-রাগিনীর মিলিত ঝংকারে এক বিশ্বজনীন—সার্বজনীন মিলন-রাগিনীর মূর্ছনা জেগেছিল। সেই সংগীতের মূর্ছনা শুনতে পাই ওমরের কাব্যে।

ওমর ভালোবেসেছেন এই মাটির পৃথিবীকে। ফলে-ফুলে, রূপে-রসে, গন্ধে-বর্ণে স্পর্শে ভরা এই পৃথিবীকে। বিদেহী আত্মা একদিন এখানেই রূপ নিয়েছিল জীবন্ত হয়ে—স্থূল দেহে। তারপর জীবনের মধ্যপথের দীর্ঘায়িত যাত্রাশেষে শেষ দীর্ঘশ্বাস একদিন মিশে যাবে অনন্তে। শেষ হবে জীবনের স্পন্দন, তখন কবি আশ্রয়গ্রহণ করবেন মাটি-মার কোলে—অনন্ত শয্যায়। গোরস্থানের মাটি একদিন গ্রাস করবে পঞ্চভূতে-গড়া দেহ। কণা-কণা ধূলিতে হবে রূপান্তর। তাই ভালবাসেন কবি পৃথিবীকে তাঁর সমস্ত চেতনার দ্বার খুলে।

রূপ-বিরূপের অজস্র সমারোহ এখানে। ঐশ্বর্য-গর্বিতা প্রকৃতির দেউলে ভোগের নৈবেদ্য। জীবন-দেবতাকে উপবাসী রাখতে চান না কবি। জীবনের পেয়ালা ভ'রে ভোগের মদিরা পান করতে চান আকণ্ঠ। বিচিত্র এই জগতে আরও এক বিচিত্র সৃষ্টি—নারী। এখানেই জীবনের উৎস। তবু কৌতূহলের অন্ত নেই। তার সৌন্দর্য—সৃষ্টি করে মায়া,—চোখে লাগে মোহের অঞ্জন। সেই অপার বিস্ময় দেয় হাতছানি। কৌতূহলের পর্দার ফাঁক দিয়ে সরমের লাজে গড়া নারীর অপাংগ ইংগিতে মানুষ শুধু মুগ্ধই নয়, পাগল—উন্মত্ত। মিলনের গভীর আবেগে দুলে উঠে মানবের মন। মানবীও নয় নির্লিপ্ত। বিশ্বসৃষ্টির মূলে, বিশ্বচৈতন্যের উৎসদেশে মিলেছে এই দুই পৃথক সত্তা—পুরুষ ও প্রকৃতি। অবশ্য মানুষ নারীকে দেখেছে ভোগের সামগ্রীর মতো। কবি ওমরও। দৃষ্টি তাঁর মুগ্ধ। প্রিয়তমার যৌবনভারে আনত অপূর্ব তনুদেহটি ভোগের আবেশে বিহ্বল করে দিয়েছে তাঁর সকল সত্তাকে। তিনি তাই বলে উঠেছেন—

"দাও সখি, পূর্ণ করে দাও পান-পাত্র মোর।"

তার সাথে প্রিয়তমা নারীর 'অধরসুধা' আর 'বক্ষের পীন পয়োধর'ও তাঁর কামনাকে উত্তপ্ত করেছে, উদ্দীপ্ত করেছে। তিনি চান "অক্ষুবস্থ হয়ে থাক স্বপনের ঘোর।" কখনও জীবন-সংগ্রামের কঠোর আহ্বানকে উপেক্ষা করে ভাবেন—

"এইখানে এই তরুর তলে
তোমায় আমায় কুতুহলে
এ জীবনের একটি দিন
কাটিয়ে যাবো···।"

ভোগের মদির আবেশে অচেতন অবচেতন মনের কোণে এমনি কত কথাই না জাগে। শুধু কি তাই? তিনি জানেন 'কালের বিহংগ তার ক্ষিপ্রগতি পক্ষ দুটি মেলি জীবনের বায়ু নিঃশেষ করে চলেছে মহাকালের দিকে। জীবন যখন দুদিনের—আজবাদে কালকের নাও হতে পারে, তখন আকণ্ঠ পান করো ভোগের মদিরা জীবন রঙিন পানপাত্রে। এখানে পশ্চিমের বস্তুবাদী জীবনবাদের সাথে ওমরের জীবনবাদের গভীর আত্মীয়তা।

ওমর কিন্তু এখানেই শেষ নন। ভোগসুখে মত্ত, কামনায় অন্ধ অবচেতন মনের আনাচে কানাচে যে ঘনান্ধকার, ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক জীবন বোধ, ভেঙে যায়—অখণ্ড জ্যোতির উদ্ভাসে। আঁধারের কালোপর্দা টুটে যায় চৈতন্যের উন্মেষে। জাগ্রত দৃষ্টি মেলে ধরেন—চলমান এই বিশ্বদুনিয়ার দিকে। 'বিরাট ধ্বংসের এই বিশ্বগ্রাসী তীরে' অজানা কোন মহাশূন্যে ব্যর্থতার নিষ্ফল উদ্যমে যাত্রীদল উধাও হচ্ছে। ঐশ্বর্য ও বিলাসের নিরন্তর স্রোত একদিন থেকে যায় কালের ভ্রূকুটিতে। লক্ষ কোটি জীবনের অস্থিমজ্জা দিয়ে যে ঐশ্বর্য-বিলাসের

মণিপুরী রচিত হয়, কালের অমোঘ আঘাতে তাও একদিন ধূলিসাৎ হয়; নিষ্ঠুর অরণ্য গ্রাস করে সমৃদ্ধ জনপদ—লক্ষ কোটি মানুষের বসতি। প্রলয়ের ঝঞ্ঝাবাতাসে কোটি কোটি বছরের প্রাণপাত পরিচর্য্যায় গড়া সভ্যতার স্বর্ণসৌধ ধ্বসে যায়; মহাকাল হরণ করে আয়ু। প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নেয় মৃত্যু। বীণার তন্ত্রী যায় ছিঁড়ে। বেসুরো বেজে উঠে জীবন বীণায়। সত্যসন্ধ ওমরের জ্ঞানদৃষ্টিতে জীবনের এই সব সত্য আর অপ্রকাশের আড়ালে আত্মগোপন করে রইল না। বেদনার আঘাত, মৃত্যু, শোক, 'রূপরসস্পর্শ' ভরা জগৎ থেকে চিরকালের জন্য যে মহাপ্রয়াণ, তা কিন্তু কবিকে অভিভূত করতে পারলো না। অন্ধকার করতে পারে না তাঁর সত্য দৃষ্টিকে। তাই তিনি বলেন তাঁর প্রিয়তমাকে—জীবনের শেষদিনে ত্রিদিবের দূত যখন এসে দাঁড়াবে দুয়ারে, তখন, 'কুণ্ঠিত হোয়ো না যেন বিদায়ের দুখে'। তাকে স্বাগত জানিও হাসিমুখে।

এই দুনিয়ার বুকে বসে জ্ঞানের অভিমানে অন্ধ যাঁরা জীবনকে বিচার করেন ন্যায় অন্যায়, সত্যমিথ্যার সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে, তাদের প্রতি কবির অপরিসীম ঘৃণা আর উপেক্ষা। জাতি বর্ণ ও ধর্মে কৃত্রিম প্রাকার তুলে যারা বিশ্বলোকের উদার প্রাংগনে বিশ্বমানবের মহান মিলন সাধনাকে বাধা দেন, 'জীবনের ঐশ্বর্য হ'তে বঞ্চিত সেই হতভাগ্যদের জন্যে কবি প্রকাশ করেন অনুকম্পা।

জীবনের অভিযাত্রায় বের হবার পর তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে—পথ আর বিপথের! কিইবা ন্যায় আর কিইবা অন্যায়? ন্যায় অন্যায়ের এই টানাপোড়েনের মাঝে পড়ে কবি সত্যই জর্জ্জরিত হয়েছেন। কবি দেখেছেন সামনে উন্মুক্ত পাপের অতলান্ত গহ্বর। যাত্রার পথ চলে গেছে সেই দিকে। চলার পথ পিচ্ছিল—কলংকের কালিতে। কিন্তু তাঁর অনন্ত জিজ্ঞাসা রয়ে গেছে উত্তরহীন। কবি বিদ্রোহী হয়ে পড়েন—

"মানুষেরে হীনচেতা
তুমিই করেছ হেথা,
তোমারই সৃজিত যত
কাল ফণীদল।
আনন্দ-নন্দনে আনে
তীব্র হলাহল।"

দেবতার উদ্দেশ্যে তাই তিনি বলে উঠেন—

"যতকিছু মহাপাপে কলংকিত মানুষের মুখ
সে তোমার বুক,
ক্ষমা চাও মানুষের কাছে।"

কিন্তু শুধু বিদ্রোহই নয়, আত্মসমর্পণও তিনি করেছেন—বলেছেন—

"ক্ষমা কোরো, দোষ তার
যত কিছু আছে।"

জীবনকে কবি ভোগ করেছেন। তাই মৃত্যুতে তাঁর দুঃখ নাই। তবু, এই ধরণীকে তিনি ভালোবেসেছেন। এই ধরণীর আলো-বাতাসের সাথে তাঁর নিবিড় পরিচয়। বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতি অণুপরমাণুকে তিনি ভালোবেসেছেন। তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন মিশে আছে বিশ্বপ্রকৃতির হৃৎস্পন্দনের সাথে; তাই এই পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে তাঁর কষ্ট হয়। বেদনা বোধ করেন এই আলো-বাতাস-সংগীতের রাজ্য ছেড়ে—আবছা আলো-আঁধারের মধ্যে অজানা অচেনা রাজ্যে প্রস্থান করতে। আগামী অন্ধকারের কথা মনে পড়লে তাঁর হৃদয় অজানা আশংকায় ও বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে। তবু যেতে হবে চলে। দিতে হবে পাড়ি। সব আলো নিমেষে নিভে যাবে। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে ত্রিদিবের দূত এসে দাঁড়াবে দুয়ারে ওপারের পরোয়ানা হাতে নিয়ে। তারই হাত ধরে এগিয়ে যেতে হবে মহাপ্রয়াণের পথে। পঞ্চভূতে গড়া দেহ আশ্রয় নেবে মাটি। কবির শেষ প্রশ্ন—অনুরাগে, শোকে ও বেদনায় কাতর প্রিয়জনের অশ্রুধারা কি সিক্ত করে দেবে তাঁর কবরের ঊষর মাটির আস্তরণ

তাঁর এই শেষ চাওয়ার মাঝে শুনতে পাই অমরত্বের প্রতি তাঁর পরম আকুতি। যেন ভুলে না যায় মানুষ। মনের মন্দিরে স্থান পায় যেন তাঁর স্মৃতি। বিস্মৃতির গহন পাতালে নিতল আঁধারে যেন হারিয়ে না যান তিনি।

ওমরের জীবন-দর্শন গভীর—অতলান্ত। বিগত ও অনাগত কালের বিশ্বমানবের বহু বলা ও না বলা বাণীকে তিনি দিয়েছেন ভাষা। মানব-জীবনের চিরকালের কত কথা, কত সমস্যা তাঁর কবি-দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছিল। যে প্রশ্ন তাঁর মনের কোণে জেগেছিল—তা যেন বিশ্বমানবের চিরকালের প্রশ্নে উত্তরণ করেছে। শুধু তাই নয়, ভোগ ও ত্যাগ—এই দুইটীর মধ্যে জীবনের যাত্রা যে মধ্যপথে—সে আভাষ আমরা পেয়েছি। শুধু নয় ভোগ। শুধু নয় ত্যাগ। এ দুয়ের মাঝে আছে সেই পথ। এই সত্য এই জীবনবোধ চৈতন্যের আলোকে বিধৃত, উপলব্ধির বস্তু। ওমরের বাণী-সাধনা যা এই সত্যের সন্ধান পেয়েছিল তা বিশ্বের ভাব ও চিন্তার জগতে এক পরম বিস্ময়কর অবদান। তাইতো তাঁর কাব্য-সাধনা, তাঁর বাণী-সাধনা বিশ্বের সর্বকালের সাহিত্যের ও কাব্যের ইতিহাসে হয়ে রয়েছে অক্ষয়।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সে

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সে। পরিপাটি চুলগুলো আলগোছে বাতাসে উড়িয়ে,
বঙ্কিম-কৌতুকভরা চোখদুটো তুলে নিয়ে শ্লথ-স্বরে বলে, দিও পা—
এ-পাড়েতে দরজার। সঙ্কোচ, লজ্জা-ভয়, শিথিলতা দু'পায়ে গুঁড়িয়ে
নিজেকে পূর্ণ করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসে বিপর্যস্ত করো এই খোঁপা।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সে। দরোজার পথ নেই, পাথরের শক্ত দেওয়াল,
এবং নিথর-চোখ ক্রমশঃ খাচ্ছে গিলে বুকে বাজে খোল-করোতাল।

মহিলা সাহিত্যিক পার্ল বাক

(প্রবন্ধ)

সুখেন্দু দত্ত

মার্কিন লেখিকা পার্ল বাকের নাম আজ বাংলা দেশে অত্যন্ত সুপরিচিত। ইদানীংকালে কোন দেশের কোন মহিলা সাহিত্যিক বোধহয় এতখানি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন নি।

পার্ল বাক্ জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন চীন দেশে। তাই তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টির ওপর পড়েছে চীনের জীবন ও সংস্কৃতির অনিবার্য্য প্রভাব। চীনা সমাজের আভ্যন্তরীণ খুঁটিনাটি তিনি সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন, চীনা জীবনের জটিলতাকে রূপ দিয়েছেন সাহিত্যে।

পার্ল বাক্ জন্মগ্রহণ করেন আমেরিকায়, কিন্তু জীবনের বেশির ভাগ দিনই কাটিয়েছেন চীনে। তাই চীনের জীবন, চীনের সমাজ তাঁর রচনার বিষয়বস্তু। কিন্তু চীনের কথা তিনি লিখেছেন চীনের প্রতি সহানুভূতি নিয়ে, চীনবাসীদের তিনি দেখেছেন তাদের একজন হয়ে, তাদেরই সঙ্গে মিশে। তাঁর আগে এমন করে দরদ দিয়ে আর কোন পাশ্চাত্য লেখক প্রাচ্যবাসীকে চিনতে চায়নি, চিনতে পারেনি। কিন্তু আমেরিকার দুহিতা পার্ল বাক্, তাঁর সমস্ত অন্তর সমর্পণ করেছেন চীনকে, অভিশাপগ্রস্ত এই প্রাচ্য-ভূ-খণ্ডকে। একটা জাতি ও দেশকে এমন করে জগতের সামনে আর কোন সাহিত্যিকই বোধহয় তুলে ধরতে পারেননি। "গুড আর্থ," "মাদার," "ইষ্টউইণ্ড: ওয়েষ্ট উইণ্ড," "ড্রাগন সীড" ইত্যাদি উপন্যাস তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

• • •

১৮৯২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়ার হিলস বোরোতে এক মিশনারীর ঘরে পার্ল বাক্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন চীনে একজন ধর্ম্মপ্রচারক। পার্ল বাকের বয়স যখন মাত্র চার মাস, তখন তাঁর মায়ের সঙ্গে তিনি চীনে আসেন।

বাকের বাল্য জীবন কেটেছে চীনের ইয়াংসী নদীর তীরে সিনকিয়াং সহরে। নিঃসঙ্গ বাল্যজীবনে পার্ল বাকের সঙ্গী ছিল তাঁর চীনা নার্স, তাই মাতৃভাষায় কথা বলবার আগেই তিনি চীনাভাষা আয়ত্ত করেন। বাল্যে এই বৃদ্ধা নার্সের কাছে তিনি শুনেছেন কত উপকথা আর উপাখ্যান, চীন দেশের যা নিজস্ব সম্পদ। বাবার কাছে শুনেছেন দেশ-বিদেশের কত গল্প, আর মায়ের কাছে শিখেছেন সঙ্গীত।

প্রথম জীবনে পার্ল বাক্, শিক্ষালাভ করেন সাংহাইতে। কিন্তু তারপর তিনি আমেরিকায় ফিরে আসেন এবং র‍্যাণ্ডলফমেকন কলেজে ভর্ত্তি হন। এই কলেজের পত্রিকায় সতের বছর বয়সে পার্ল বাকের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়, আর তাতে ছোট গল্পের পুরস্কারটিও কয়েকবার তিনিই লাভ করেন।

স্বদেশে শিক্ষালাভ শেষ হবার পর পার্ল বাক আবার চীনে ফিরে আসেন। নানকিং বিশ্ববিদ্যালয় ও চুয়াংউয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীর অধ্যাপনা করেন তিনি কিছুকাল। ইতিমধ্যে তাঁর বিয়েও হয়ে যায়।

চীনে বসবাসকালে সে-দেশের মহামারী আর মন্বন্তর, দুর্গত মানুষের দুর্গতি আর চুরি, ডাকাতি, দস্যু আক্রমণ—সব কিছুই খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন পার্ল বাক। তিনি দেখেছেন কৃষকের জীবনের স্নেহ-ভালবাসা, দ্বেষ-প্রতিহিংসা, জমির প্রতি টান আর সংগ্রাম। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে তাই আমরা পাই চীন ও চীনের সমাজ সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয়।

পার্ল বাকের "দিস প্রাউড হার্ট" উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। এর দু'বছর পরই তিনি রচনা করেন তাঁর অপরূপ উপন্যাস "গুড আর্থ।" চীনা কৃষক ওয়াং পরিবারের কাহিনী ভিত্তি করে পার্ল বাক তিনটি বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করেন। "গুড আর্থ" তার প্রথম, দ্বিতীয়টির নাম "সনস" এবং তৃতীয় উপন্যাস "এ হাউস ডিভাইডেড।" এরপর বাক আটখানি চীনা কাহিনী ভরা উপন্যাস রচনা করে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখ-যোগ্য উপন্যাস হল: "দি ফার্ষ্ট ওয়াইফ", "মাদার" ও "ইষ্ট উইণ্ড: ওয়েষ্ট উইণ্ড"। এইসব উপন্যাসে বাকের লিপি-কুশলতা, চরিত্র চিত্রন ও চিত্রাঙ্কন, সব কিছুই পাঠকের মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। পার্ল বাকের সমস্ত উপন্যাসই পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

১৯৩৬ সালে "গুড আর্থ" সবাক চিত্রে রূপান্তরিত হয়। প্রকৃতপক্ষে "গুড আর্থ" যখন ছায়াচিত্রে জগতের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখনই আমরা পার্ল বাকের নাম জানতে পারি। তাঁর বিখ্যাত "ড্রাগন সীড" উপন্যাসটিও সবাক চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

"গুড আর্থ" উপন্যাসের জন্য পার্ল বাক ১৯৩২ সালে পলিটজার পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৮ সালে তাঁকে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

পার্ল বাক তাঁর জীবনের বেশির ভাগই কাটিয়েছেন চীনে। বর্ত্তমানে তিনি আমেরিকায় বসবাস করেন।

• • • •

পার্ল বাকের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে "গুড আর্থ", "মাদার", "ড্রাগন সীড", "ইষ্ট উইণ্ড: ওয়েষ্ট উইণ্ড" ইত্যাদি উপন্যাস বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

"গুড আর্থ" এযুগের এক অনন্যসাধারণ সাহিত্যকীর্ত্তি। মহাচীনের কৃষি-জীবনের ওপর, তাদের সুখ-দুঃখ নিয়ে পার্ল বাক রচনা করেছেন তাঁর এই অমর উপন্যাস। অর্থনৈতিক চাপে পৃথিবীর সর্ব্বত্র তখন বাণিজ্যিক ব্যবস্থা অচল হতে বসেছে। চীনা কৃষক ওয়াংলাঙ-এর সমাজ-জীবনের বাঁধা-ধরা রাস্তায়ও ভাঙ্গন লাগে। ওয়াংলাঙ মাটির মানুষ, মাটির টান তার কাছে অত্যন্ত বেশি। তার স্ত্রী পারিপার্শ্বিক ঘূর্ণিপাকে বিজড়িত, কিন্তু বিচলিত নয়। বহু দুর্দ্দশার মধ্যে দিয়ে গিয়েও শেষ পর্য্যন্ত ওয়াংলাঙের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটলো। এই কাহিনী নিয়েই পার্ল বাক রচনা করেছেন এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "গুড আর্থ।"

"মাদার" পার্ল বাকের আর একখানি বিখ্যাত উপন্যাস। দেশে দেশে সর্ব্বকালে, শয়ন-শিয়রে জেগে বসে আছেন জননী। এই জননীরই ব্যথা বেদনা, আশা ও আনন্দের অপরূপ কাহিনী "মাদার।" চীনা কৃষকের ঘরে যে নারী একদা পুত্রবধূরূপে এসেছিল, সেই রমণীই একদিন রূপান্তরিত হল জায়া থেকে জননীতে। তারপর একদিন এল যেদিন দেখা গেল, কখন পাশ থেকে সরে গেছেন বৃদ্ধা শাশুড়ি আর তাঁর সেই শূন্য আসনটি অধিকার করে বসেছেন বিগতকালের সেই পুত্রবধূ। তার স্নেহের স্পর্শ থেকে কেউ বঞ্চিত নয়, সকলের জন্যই করুণা আর কোমলতায় ভরে আছে তার মন। কিন্তু আবার আসে নতুন পুত্রবধূ। নতুন বেশে, নতুনরূপে, যে ছিল বধূ তারও একদিন পরিণতি হয় জননীত্বে। বৃদ্ধা নারী তখন সযত্নে কোলে তুলে নেয় সেই নবজাতককে। "মাদার"-এর এই সাধারণ অনাড়ম্বর কাহিনী চীনের কৃষি-সমাজ সম্পর্কে পার্ল বাকের জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় দেয়।

বিখ্যাত "ড্রাগন সীড" উপন্যাস চীনের সাধারণ মানুষ কিভাবে দেশের শত্রুদের পর্য্যুদস্ত করেছিল তারই জীবন্ত আলেখ্য। দেশের সাধারণ মানুষ বীর, তারা অমর, তারা চীনের উপাখ্যানে বর্ণিত মহান বীর ড্রাগনের বংশধর, তাদের পদদলিত করে রাখা যায় না। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীন আক্রমণ করলে দেশের পঙ্গু শাসকরা পালিয়ে গেল, ব্যবসায়ী উলিনরা শত্রুর তাঁবেদারী শুরু করল। কিন্তু প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাল গ্রামের কৃষক লিংটান লাও-এরার। শত্রু আক্রমণ শুরু হলে কত লোক দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল কিন্তু লিংটানরা পারল না জমি ছেড়ে যেতে। বিছানার মত জমি যদি পিঠে বেঁধে নেওয়া যেত তবে হয় তো লিংটানরাও পালাত। তাই তো জমি কামড়ে থেকে প্রতিরোধ সংগ্রাম করে দেশকে রক্ষা করবে তারাই। চীনের কৃষকের জীবনের স্নেহ-ভালবাসা, দ্বেষ-প্রতিহিংসা, জমির টান, প্রতিরোধ-সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে গ্রাম্য-জীবনের সব কিছু সার্থকভাবে ফুটিয়েছেন পার্ল বাক তাঁর এই বিখ্যাত উপন্যাসে।

পার্ল বাকের আর একখানি অপরূপ উপন্যাস "ইষ্টউইণ্ড: ওয়েষ্ট-উইণ্ড।" এশিয়ার ঔপনিবেশিক মঞ্চে তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারায় অনিবার্য্য সংঘাত দেখা দিয়েছে, দেখা দিয়েছে সংস্কারের অনিবার্য্য বিরোধ। কিন্তু এরই মধ্যে আবার দেখা যাচ্ছে প্রগতির স্ফুলিঙ্গ। কিউ-ই-লান চীনের বনেদী ঘরের মেয়ে। ঐতিহ্যের বিকৃতি ঘটেছে তখন চীনের এই সব বনেদী পরিবারে। তাই কুসংস্কার তখন সংস্কার—ঐতিহ্য। অবশেষে প্রাচীর-ঘেরা অন্দর থেকে কিউ-ই-লানকে মুক্তি দিল তার স্বামী, দিল পথের নিশানা। কিউ-ই-লান বহু বিরোধ, বহু সংগ্রামের ভিতর দিয়ে পথের ইঙ্গিত পেল, প্রাচ্যের জমিতে দাঁড়িয়ে, প্রাচ্যের ঐতিহ্যকে বজায় রেখে পাশ্চাত্যকে দু'বাহু বাড়িয়ে বরণ করে নিল সে নিজের ঘরে। বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত অগ্রজের তার বিদেশী বৌয়ের ভালবাসাকে স্বীকার করে নিল সে। তাদের নবজাত শিশুর আগমনও নিয়ে এল এক নতুন বার্ত্তা। পূব আর পশ্চিমের যুগার্জ্জিত সংস্কার নিয়ে নবজাতকের মা-বাপ দু'জনেই জর্জ্জরিত, কিন্তু এই শিশু চূর্ণ করে দিল তাদের সংস্কার। নবজাতক শুধু চীনের নয়, শুধু দুই দেশের নয়, দুই মহাদেশের—পৃথিবীর মানুষ। নতুন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন পার্ল বাক তাঁর এই উপন্যাসে।

* * *

"প্রাচ্য প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য পাশ্চাত্য, এই দু'য়ে কখনো মিল হবে না"—এই মিথ্যা স্বাজাত্যবোধকে পার্ল বাক আঘাত করেছেন তাঁর সাহিত্যে। দুর্ভাগা চীনকে বহুকাল দেশী ও বিদেশী শোষকদের হাতে অকথ্য নিগ্রহ ও নিপীড়ন ভোগ করতে হয়েছে। পার্ল বাক তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে এই দুর্ভাগা চীনকেই চিত্রিত করেছেন। চীনকে জানতে হলে তাই আমাদের পার্ল বাককে জানতে হয়।

পিরীতির মর্মকথা

আনন্দ

(Shelleyর Love's Philosophy কবিতাটির অনুবাদ)

নদীসাথে মিলিবারে ছুটে প্রস্রবণ,
তটিনী সাগরোদ্দেশে করিছে গমন।
মধুর আবেগে বায়ু মেশে চিরকাল,
বিশ্বমাঝে কে কাটায় সংগিহীন কাল ?
সবি মিলে পরস্পরে বিধির লিখন।
তব সাথে কেন মোর হবে না মিলন ?

তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ করে গগনচুম্বন ;
তরঙ্গ তরঙ্গে করে দৃঢ় আলিঙ্গন।
ফুল যদি ফুলে কভু করে থাকে ঘৃণা,
ফুল-মিতা হতে তার হয়না মার্জনা।
রবিকর ধরাতলে করে আলিঙ্গন,
চন্দ্রালোক সমুদ্রেরে করিছে চুম্বন।

বিফল বিফল যত প্রেমের চুম্বন,
যদ্যপি তব যদি না চুমে বদন।

প্রেমের জগতে মহাকবি গ্যেটে

দেবব্রত ভট্টাচার্য্য

মহাকবি গ্যেটের নাম ও তাঁর বহু অবিনশ্বর কীর্তির সঙ্গে আমরা অনেকেই বেশ কিছু না কিছু পরিচিত। তাঁর বিভিন্ন রচনাবলীর সঙ্গে যাঁদের বিশেষভাবে পরিচিতি ঘটেছে, তাঁদের কাছে হয়ত কবির মহান্ জীবনের নানান দিকই অতি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে থাকবে। সুতরাং আমি এখানে সে সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস রাখি না; শুধু তাঁর গভীর অন্তরের প্রেম ও ভালোবাসার ত্থ'একটি কথাই বলব। তবে তার আগে আমরা যেন এটুকু অবশ্যই স্মরণ রাখি যে, পার্থিব প্রেম ও ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই বিরাট কবি-জীবনের অভিব্যক্তি ঘটে থাকে, এবং তাই কোনো কবিই প্রেমিকা নারীর সংস্পর্শে না এসে বোধ হয় সার্থক কবিতা সৃষ্টি করে যেতে পারেন না। সুখের মধ্যে দিয়ে হোক কিংবা দুঃখের মধ্যে দিয়েই হোক, প্রেমিকা নারী যখন কবিকে তার প্রেম নিবেদন করে, কবি তখন তা নিঃসঙ্কোচে সমস্ত হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেন। আবার শুধু যে গ্রহণই করেন তা নয়, পরন্তু তার প্রতিদানে কবি তাকে যা দিয়ে থাকেন, তা চিরকালের মানুষের কাছে সম্পদ বিশেষ।

এইখানে সেই রকম এক প্রেমময়ী নারীর কথাই বলতে চলেছি—যে নাকি কবি-হৃদয়কে একেবারে জয় করে নিয়েছিল, যে নাকি কবিকে ভালোবেসে কবির ভালোবাসাকে সার্থক করে তুলেছিল অনেক দিক দিয়ে। এই মহীয়সী প্রেমিকা নারীর নাম ছিল ফ্রেডারিকা। রূপে গুণে অতুলনীয়া। কবিকে সে ভালোবাসে একেবারে নিঃস্বার্থ ভাবে, সমগ্র অন্তর দিয়ে। কবিও যথার্থ ফ্রেডারিকার প্রেমে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। অবশ্য এতখানি তৃপ্তি লাভ করার পেছনে একটু কারণও যে একেবারে না ছিল তা নয়, এবং সেটুকুও এখানে বলা দরকার। কারণ হল এই যে, ফ্রেডারিকার সঙ্গে ভালোবাসা হওয়ার আগে বা কবির যখন ছাত্রজীবন তখন একটি মেয়েকে তিনি ভালোবেসেছিলেন এবং প্রেমের আদান-প্রদানও যথেষ্ট চলেছিল বেশ কিছু দিন ধরে; কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক কবির সে প্রেম সরাসরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং এক কথায় বলতে গেলে কবি তখন ব্যর্থ-প্রেমিক। এই ব্যর্থতার পরেও যে আর এক জনের আন্তরিক ভালোবাসা এসে কবি-চিত্তকে ভরপুর করে তুলবে, তা বোধহয় তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। কিন্তু ফ্রেডারিকার ভালোবাসা কোনো কল্পনার অপেক্ষা না রেখে অতি সন্তর্পণে এসে কবি-প্রাণকে এক নতুন প্রেম-জগতের সন্ধান দিয়ে কবির সেই ভগ্ন-হৃদয়ের সকল ব্যর্থতাকে ঘুচিয়ে নিজের মধ্যে টেনে নেয়।

ফ্রেডারিকা যেন হঠাৎ কবিকে জাগিয়ে তুলল স্নিগ্ধমধুর প্রভাতের বেলায় অরুণ আলোর প্রথম ছটায়। কবিও তাই তাকে দিলেন প্রাণের আলিঙ্গন। ভুলে গেলেন ব্যর্থতার সকল গ্লানি। মানস লোকের হল এক অভিনব উন্মেষ, এবং সেই অপূর্ব কল্পলোকের মানসী প্রিয়া হয়ে দেখা দিল এই ফ্রেডারিকা। মুক্ত আকাশচারিণীর ন্যায় ফ্রেডারিকা যেন ঘুরে বেড়াত আনন্দময়ীর অপার আনন্দের হিল্লোল নিয়ে মহাকবির মহা ঊর্ধ্ব মানস-আকাশে। কবি তখন ষ্ট্রাসবাগে আইনের ছাত্র। তাই মাঝে মাঝে আইন পড়ার খুঁটিনাটির শুকনো কচকচি থেকে মনটাকে একটু ঘুরিয়ে আনতে যেতেন এদিক সেদিক ফাঁকা জায়গার আবহাওয়ায়। এই রকম একদিন ঘুরতে যান সেসিনহিমে। এটা নাকি ভ্রমণের পক্ষে বেশ মনোরম জায়গা। প্রকৃতির খোলা বাজার। চিন্তাশীল মনে কল্পনার অনেক খোরাক জোটে। কবি এইখানে তাঁর একলা মনটাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে কখনো ক্লান্তি বোধ করেননি। আবার এইখানেই হল তাঁর এই প্রণয়িণীর সঙ্গে প্রথম প্রণয়-অভিষেক। কবির কল্পনার চোখে ফ্রেডারিকা যেন একটা সম্ভ-ফোটা ফুল, যার ভেতর কোনো মলিনতা নেই, কোনো একটিও কীটের প্রবেশ হয়নি। সে তার ঐ সুন্দর পাঁপড়ি পাতার বন্ধনে কবির সকল আকাঙ্ক্ষাকে চমৎকার ভাবে বেঁধে ফেলল। কবির সেদিন মনে হয়েছিল যে, ফ্রেডারিকার প্রণয়-কাতর দুটি নীল চোখের রঙ বুঝি ঐ ঘন নীল আকাশের নীলিমাকেও হার মানায়।

সত্যি সত্যিই ফ্রেডারিকা কবির জীবনকে সুরভিত করেছিল, নিছক ভালোবাসার ঐশ্বর্য দিয়ে পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে রেখেছিল সারাটা জীবন ধরে। যে প্রেমের উৎস তিনি এই প্রেমিকার মধ্যে দেখেছিলেন, তা তাঁকে সমস্ত জীবনভোর এগিয়ে নিয়ে যায় রূপ-জগতের নিত্য নতুন স্বপ্নালোকের ধারে। বাস্তব জগতের এই নারীর সৌন্দর্য উপভোগের মধ্যে দিয়ে কবির অন্তরে যে মধুময় আনন্দের সঞ্চার হয়, তা কোনো স্বর্গীয় আনন্দেরই অংশ বিশেষ বলে বোধ হয়েছিল। কবি কখনই ফ্রেডারিকার রক্ত-মাংসের দেহটাকে আঁকড়ে থাকতে চাননি, কাম-দৃষ্টি দিয়ে তার রূপ ও যৌবনকে দেখেননি,—দেখেছিলেন তার অন্তরের গভীরতম প্রদেশের এক ঔজ্জ্বল্যময় রূপ, যার মধ্যে ছিল সত্যিকারের মাধুর্য আর যার মধ্যে ছিল আত্মদানের এক প্রবল প্রণয়-আকুতি। তাই ফ্রেডারিকা তার ঐকান্তিক ভালোবাসার মধ্যে কবির প্রেমের জগৎকে পরিপূর্ণ করে দেয়, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেয়, এতটুকু কোথাও ফাঁক না রেখে। সেও যে কবির অন্তরটাকেই একান্তভাবে ভালোবেসেছিল এবং তার ঐ অদ্ভুত ভালোবাসার প্রতিদানে হয়ত বা তার মনের এক কোণে একটু আশা হয়েছিল কবির সার্থক জীবনসঙ্গিনী হওয়ার, কিন্তু না;—সে আশা তার পূর্ণ হয়নি। তাই সে আজীবন কুমারীব্রত যাপন করে এবং কোনো প্রলোভনই তাকে এ ব্রত উদ্‌যাপনের পথ থেকে এক বিন্দুও নড়াতে পারে নি। কারণ যে মন প্রাণ দিয়ে সে গ্যেটেকে ভালোবেসেছিল, তা দিয়ে আর পৃথিবীর অন্য কাউকে সে ভালোবাসতে পারবে না বলেই আমরা কুমারী থেকে প্রেমিকের স্মৃতি বহন করে * *। ফ্রেডারিকার এ ভালোবাসা যেমন কবির জীবনকে জয়যুক্ত করেছিল, মহিমান্বিত করেছিল, অরূপত্ব দান করেছিল, কবিও তেমনি তার এই প্রেমিকা নারীকে নাটকীয়রূপে রূপায়িত করে "ফাউষ্ট" নাটকে হেলানা চরিত্রকে জগৎ বিখ্যাত করে অমরত্ব দান করেছেন মহাকালের বুকে। যথার্থই আজও এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, ফাউষ্টের হেলানা চরিত্র মহাকবি গ্যেটের এক অভিনব কালজয়ী সৃষ্টি-সম্ভার, এক অপূর্ব কীর্তিস্তম্ভ। অনেকে মনে করে থাকেন যে, ফ্রেডারিকাকে কবির জীবনসঙ্গিনী

হওয়ায় আশা থেকে বঞ্চিত করার পেছনে কোনো যুক্তিই দাঁড় করানো চলে না বা কোনো অজুহাতই দেখানো যায় না। তর্কের খাতিরে যদিও এটা না মেনে আমাদের উপায় নেই, তথাপি আরো একটা দিক চিন্তা করা প্রয়োজন। সে দিকটা হচ্ছে কবি-মনের আদর্শের কথা। বাস্তব জীবনের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাতের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে ফুলের মত সুন্দর ঐ ফ্রেডারিকার জীবনটাকে টেনে আনতে হয়ত তাঁর আদর্শবাদের ওপর কোথাও একটু ঘা দিয়েছিল; এবং তাই দূরে দূরে রেখে শুধু ভাবের মধ্যে দিয়ে তাঁর এই প্রেম বা ভালোবাসাকে আজীবন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন নিজের মনের আকাশে চির-নতুন করে, চিরস্মরণীয় করে। তাই আমরা দেখতে পাই যে, ফ্রেডারিকার কথা কবি একদিনের জন্যেও কখনো ভুলে যান নি, বরং সদা সর্বদা সে ভাবময়ী রূপময়ী হয়ে কবির মনের চোখে ভেসে থাকত। যদিও গ্রেচেন ও ক্রিশ্চিয়ান ভুলপিয়াস নামে আরো দুটি প্রণয়িণীর গভীর প্রণয়ে আবদ্ধ হন তাঁর পরবর্তী জীবনে। সুন্দরী ভুলপিয়াসের রূপে কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং স্ত্রী শ্রীমতী স্তায়েন তাঁর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার কিছুদিন পর কবি ভুলপিয়াসকেই স্ত্রী বলে গ্রহণ করেন। প্রেম-জগতে এই ভাবে তাঁর ক্রমাগত পরিবর্তনের পালাই চলেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই জগৎ ও জীবনের যে কত নতুন নতুন সংজ্ঞাই না তাঁর মনে জেগেছে, তার হিসেব বোধ হয় কেউ কষে উঠতে পারে নি। না পারাটাই স্বাভাবিক। কারণ, তাঁর প্রেম-জীবনের এক একটি প্রেমপত্র এক একটি সাহিত্য বিশেষ, যার পূর্ণ পরিচয় বহন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

ব্যবহারবাদ ও ডঃ ওয়াটসন

বিনোদশঙ্কর দাশ

আমেরিকায় আজ চল্লিশ বছর ধরে মনস্তত্ত্বের একটি শাখা প্রসারলাভ করেছে—নাম তার Behaviorism. ডঃ ওয়াটসন প্রথমে এ সম্বন্ধে লেখেন। পরে Thorndike, Carr প্রমুখ পশু-মনস্তাত্ত্বিকেরা এর ওপর গবেষণা শুরু করেছিলেন। এখন এই মনস্তাত্ত্বিক বিভাগটি William James প্রমুখের Chicago group, Structuralism এবং Functionalism প্রভৃতি শাখা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলা যায়।

John Brodus Watson ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন। চিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে পড়াশোনা শেষ করে ১৯০৮ সালে John Hopkins Universityতে অধ্যাপনা শুরু করেন। পশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দু'টো বিষয় তাঁর চিন্তাজগতে প্রভাব বিস্তার করল। এক, মধ্যযুগীয় দর্শন মানুষের কর্মধারার নিয়ন্তা হিসেবে যে আত্মার ব্যাখ্যা দিয়েছে, তার বদলে আধুনিক যুগে মনস্তাত্ত্বিকরা আমদানী করলেন সজ্ঞান মনের। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন হচ্ছে মনস্তত্ত্বে অবাঙমনসোগোচর মন নিয়ে আর মানুষের কর্মধারা কি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায়? দুই, মানুষের ব্যবহার থেকে তার সজ্ঞান মনের অবস্থিতির কথা জানতে পারি। তেমনি পশুর সজ্ঞান মন আছে, তা' কেবল তার ব্যবহার থেকে অনুমান করে থাকি। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হোল,—মনস্তত্ত্ব যদি মানুষের সজ্ঞান মনের অভিজ্ঞতার বিজ্ঞান হয়, তা'হলে পশু-মনস্তত্ত্বের কী সংজ্ঞা হতে পারে?

১৯১২ থেকে '১৪র মধ্যে ডঃ ওয়াটসন প্রথম তাঁর Behavior মতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি বললেন মনস্তত্ত্ব হচ্ছে আচরণ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শুদ্ধ বহির্মুখী বাস্তব পরীক্ষামূলক একটি বিভাগমাত্র। এর লক্ষ্য হচ্ছে "Prediction and control of behavior" Structuralist ও functionalistরা যে অনুভূতি, আবেগ, আবেশ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, তার বদলে Behavior মতবাদ তুলে ধরা হোল। মনস্তত্ত্বের সংজ্ঞা হোল সজ্ঞান মনের নয়, আচরনের বিজ্ঞান। এতে রয়েছে পশু এবং মানুষের আচরণের ওপর গবেষণা করার প্রচুর অবকাশ। এজন্য অন্তর্মুখী চিন্তার ওপর জোর না দিয়ে বহির্মুখী বাস্তব ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়া হচ্ছে। ধারণার দিক থেকে বলা হোল—অনুভূতি, আবেগ, উচ্ছ্বাস প্রভৃতি mentalistic concepts-গুলির বদলে stimulus response এবং learning habit প্রভৃতি আচরণ ধারণাগুলির যোজনা করতে হবে। mentalistic ধারণা অনুযায়ী concepts গুলি introspection এবং সজ্ঞান অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত কিন্তু Behavior ধারণাগুলি পশু ও মনুষ্য ব্যবহারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই মনস্তাত্ত্বিক শাখাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিজ্ঞানোচিত উপায়ে মানুষের ব্যবহারের সমস্যাগুলির সমাধানের দ্বারা আচরণের সংযম আনয়ন করতে হবে যা কিনা psychistric clinic গুলিতে হওয়া সম্ভব। আগেকার যুগের শরীর ও মনের সমস্যা বা প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণাবলী, যেমন interaction এবং parallelism, হোল অদৃশ্য। মাথা থেকে মনের উৎপত্তি বা মনদ্বারা পরিচালিত—এইসব ধারণা বরবাদ করে দিয়ে মানুষের আচরণ তার সমস্ত শরীরের স্নায়ু, গ্ল্যাণ্ড, মস্তিষ্ক প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা পরিচালিত হয়—এই কথা ঘোষণা করা হোল।

Behavirourismএর এই নেতিবাচক দিকটি লক্ষ্যণীয়। Introspection of consciousness প্রভৃতি mentalistic conceptগুলি বাদ দিয়ে—মস্তিষ্কই মনের নিয়ন্তা—এই চিন্তা সম্পূর্ণ দূর করা হোল। প্রশ্ন হোল—মনস্তত্ত্বের আসল সংজ্ঞা কি? তিনি বললেন,—psychology শুধু মনের বিজ্ঞান নয়। এটা হোল positive science of the conduct of the living creatures. কারণ মানুষকে objectively একটা physical phenmenon হিসেবে দেখতে হবে। সমস্যা হোল, মানুষের মনে রয়েছে সজ্ঞান অভিজ্ঞতা, সে তার কাজকর্ম বা আচরণের কথা বুঝতে পারে। কিন্তু পশুদের সে সজ্ঞান অভিজ্ঞতা আছে কিনা, আমরা জানিনে। ওয়াটসন এধরণের introspectionএর পক্ষপাতী নন বা consciousmess of imagery শব্দগুলি ব্যবহার করতে রাজী নন। কারণ কি? প্রথম, এটা structuralistরা মন বিশ্লেষণের একমাত্র উপায় হিসেবে স্থিরীকৃত করেছেন যা কিনা animal psychologyতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়, imageless

thought controversy থেকে প্রমাণিত হয়েছে introspection সত্যই সম্পূর্ণ সত্যে উপনীত হতে খুব একটা সাহায্য করে না। মন্তব্যগুলি যেমন 'আমার মনে হয়' 'আমি ধারণা করি যে' প্রভৃতি ব্যক্তিগত ধারণা ও কুসংস্কারের দ্বারা যেখানে সীমিত, সেখানে introspective বিশ্লেষণ এর ওপর জোর দিলে বিভিন্ন মতবাদেরই কেবল সৃষ্টি হবে। এছাড়া ডঃ ওয়াটসন চাইছেন সত্য হবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিলক্ষ্যনীয়। কিন্তু শারীরিক প্রত্যঙ্গ-সমূহে এমন কর্ম প্রণালী চলেছে যা কিনা বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বা অনুভবেদ্য নয়; যেমন গ্ল্যাণ্ডগুলির secretions, সেগুলি বুঝতে হলে introspectionএর সাহায্য নিতে হয়। ওয়াটসন ঘোষণা করলেন—ওসব হচ্ছে overt of implicit behavior এবং এই সমস্ত implicit behavior সমূহ সাদা চোখে দেখা না গেলেও বা অনুভববেদ্য না হলেও "They are theoretically observable by physical means". Parallelistরা বলেছেন শরীরের ভেতর দুটো process চলেছে—একটা conscious physical process আর অন্যটা সমান্তরাল ভাবে Psychical procers. ওয়াটসন প্রমুখ Behavioristরা এই physical processটা বরবাদ করে দিয়ে ঘোষণা করেছেন—মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আচরণগুলির মতো implicit behavior গুলিও "of the same order as the actually observatic movements of the organism".

অতএব, মনস্তত্ত্ব Behaviorist দের মতে কেবলমাত্র শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আচরণ বিশ্লেষণ করে তার environmentএর সম্পর্ক নিয়ে। অন্যদিকে structuralistরা ঘোষণা করেছেন—সজ্ঞান মনের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের কোন যোগ নেই বলে মনস্তত্ত্বের গণ্ডী থেকে তাকে বাদ দিতে হবে। এবং শেষ কথা, ওয়াটসন বলেছেন—মনস্তত্ত্বকে হতে হবে শুধু মানুষের নয়, সমস্ত প্রাণীরই আচরণ বিশ্লেষক বিজ্ঞান। শুধু মন বা তার সজ্ঞান অভিজ্ঞতার বিজ্ঞান নয়। মানুষের পারিপার্শ্বিক ও প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে মূলীভূত সম্পর্ক তা অমানুষ প্রাণীর পক্ষেও একই। সুতরাং anthropomorphism ধারণা থেকে মুক্ত এমন কতকগুলি fundamental concepts তৈয়েরী করা যেতে পারে যা কিনা animal behaviorএর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। যেমন জ্ঞান অর্জন সম্পর্কের নিয়মগুলি অমানুষের ওপর চালিয়ে এমন ভাবে নির্দ্ধারিত করতে হবে যা কিনা মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কিন্তু এই ধরণের behavioristic tendency কতকগুলো কারণে অসুবিধাজনক। বলা হয়েছে organismএর সাথে environmentএর সম্পর্ক একদিক থেকে sensory এবং অন্যদিক থেকে motor, সুতরাং envirormentএর সঙ্গে মানুষকে খাপ খাওয়াতে হলে তাকে আবিষ্কার করতে, অনুভব করতে ও জানতে হবে যেটা কিনা objective অপেক্ষা introspectively ভাল ভাবে জানা যায়। অবশ্য environmentকে আবিষ্কার বা অনুভব করবার ক্ষমতা পশুর মধ্যেও দেখা যায়। আমরা বেড়াল ও কুকুরকে কান খাড়া করে শব্দ কোন দিক থেকে আসছে অনুভব করতে দেখেছি। সুতরাং তার মধ্যে মনের সজ্ঞান অভিজ্ঞতার কথা কল্পনা করা যেতে পারে। এখানে কিন্তু আচরণবাদীরা conseiousness আছে না আছে তা ধরে নিচ্ছেন না। মনের মনস্তত্ত্বের মতো এখানেও ওঁরা অমানুষ কতটা অনুধাবন করে তা' বোঝার জন্য behavioral test প্রয়োগ করতে রাজী আছেন।

যে তিনটে বইতে ডঃ ওয়াটসন তাঁর system of behavioristic psychologyর মূল বক্তব্যগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন, তা হোল The Behavior [১৯১৪], Psychology from the standpoint of a behaviorist [১৯১৯] এবং Behaviorism [১৯২৪]. প্রথম বইতে পশু মনস্তত্ত্ব আর বাকি দু'টোতে শিশু ও বড় মানুষের সম্পর্কে বলেছেন ও ওঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সব বইগুলিতে প্রকাশিত। কিন্তু ১৯১৯ সালের প্রকাশিত Psychology বলে ওঁর বই থেকে আমরা সেগুলি আলোচনা করে দেখতে পারি।

Stimulus and Response: Wurdt বলেছেন সজ্ঞান অভিজ্ঞতার জটকে feelings and sensationsএর দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়। আর ডঃ ওয়াটসনের মতে Behavior হচ্ছে এমন complex যাকে stimulus response unit, যাকে তিনি বলেছেন Reflexএর দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়। বলেছেন, "Instinct and habit are composed of the same elementary reflexes—in instinct the pattern and order are inherited, in habit both are acquired during the life-time of the individual. Response বলতে তিনি যে কতকগুলো অঙ্গের অনুভূতির প্রকাশ বলতে চাইছেন তা নয়, অন্যরকম Reflexও তাঁর চিন্তার গণ্ডীর মধ্যে আছে। যেমন চিঠি লেখা, দরজা বন্ধ করা ইত্যাদি। অতএব, Response মানে দাঁড়াল শুধু মাংসপেশীর সাড়া নয়, একটা বিশেষ পরিবেশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কয়েকটা বিশেষ কার্য সম্পাদনও ধর্তব্যের মধ্যে। চোখের ওপর আলোর সম্পাতে অথবা কানের ভেতর ধ্বনির প্রবেশে stimulus এর শুরু হোল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ Response করলো ভ্রূ-কুঞ্চিত করে অথবা ধ্বনি প্রবেশ রোধ করার জন্য দরজা, জানলা বা কাণ বন্ধ করে। ডঃ ওয়াটসনের আসল উদ্দেশ্য একটা বিশেষ stimuliতে বিশেষ responseএর বিশ্লেষণের দ্বারা আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখান নয়। একটা বিশেষ পরিবেশে একটি বিশেষ ব্যক্তি কী আচরণ করে, তাই দেখান অর্থাৎ আচরণবাদ হচ্ছে data এবং নিয়মগুলি এমনভাবে নির্ণয় করা যাতে করে কোন stimulus এ কী ধরণের Response হবে বা Response এর রূপ, প্রকৃতি দেখে বোঝান যাবে কি ধরণের stimulus দেওয়া হয়েছিল। response দুই ধরণের; learned এবং unlearned। আবার explicit ও implicit, Behavior psychologistদের কাজ হোল কোনটা সহজাত, কোনটা অর্জিত, তা' আবিষ্কার করে দেখান।

Sensation and Perception: প্রশ্ন জাগে—আমরা অমানুষের সজ্ঞান মন আছে কি না জানিনে; কিন্তু আমরা কী বলতে পারিনে যে, তারা দেখতে পায়? যেহেতু, তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য stimuliতে motor response দিয়ে থাকে, সেই হেতু আমরা বলতে পারি যে, তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য response দিয়েছে। সুতরাং মানুষের সজ্ঞান মনের কথা objectively যখন আমাদের অজ্ঞাত তখন আমরা বলতে পারি মানুষও সেইরূপ motor response করে। একজনকে সবুজ আলো দেখান হলে সে বললে এটা সবুজ।

সবুজ আলো ধীরে ধীরে লাল আলোতে পরিণত হলে সে বলবে এটা লাল আলো, সবুজ নয়। অতএব, এক্ষেত্রে তার মৌখিক ভাবপ্রকাশ থেকে ধরে নিতে হয় তার সজ্ঞান অনুভূতি রয়েছে, যা'তে করে সে রঙ্‌ বিশ্লেষণ করতে পারে। Behavioristরা বলেছেন একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে একটা বিশেষ stimulus-এর বিশেষ response হলেই আমরা তার সজ্ঞান অভিজ্ঞতা আছে কিনা তার আচরণের মধ্যে ফুটে বেরুচ্ছে—একথা বলতে পারিনা। Method of impression কে ড: ওয়াটসন একটা dejective method-এ পরিবর্ত্তিত করতে চান। প্রাণীদের sensory discrimination প্রমাণ করবার জন্য যা খুব প্রয়োজনীয় Pavolov-এর সেই conditioned reflex method ওয়াটসন প্রয়োগ করলেন। কারণ এটা সম্পূর্ণ Behavioral এবং introspection-এর সন্দেহমুক্ত। এবং সেইজন্য visual after-image গুলিকে তিনি introspective delusion বলে বরবাদ করে দিতে চান না। অথবা পুরাতন জৈবিক ব্যাখাও গ্রাহ্য করেন না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। যদি কেউ monocromalic light এর দ্বারা stimulated হয় এবং পরে সেই আলোটা সরিয়ে নিলে দুই ধরণের response আশা করা যেতে পারে। এক, সেই পুরাতন আলোর দ্বারা সে নতুন করে stimulated হতে পারে, যাকে বলা যায় positive after-image অথবা সে এমন আলোর দ্বারা stimulated হচ্ছে যার wave length আসল সরিয়ে নেওয়া আলোটির পরিপূরক। এর নাম দেওয়া হয়েছে negative afterimage.

Memory Image: ওয়াটসনের মতে আচরণ হচ্ছে শুধু মস্তিষ্কের নয় সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মের প্রকাশের বিশেষ ধারা। মস্তিষ্কের কাজ হচ্ছে sensory nerve-এর সঙ্গে motor nerve-গুলি যুক্ত করে দেওয়া এবং sense organ গুলির সঙ্গে মাংসপেশী-সমূহের সংযুক্তিসাধন। সুতরাং sensory nerve-এর দ্বারা বাহিত impulse গুলি মস্তিষ্কের দ্বারা motor nerve-এর দ্বারা রূপান্তরিত হয়। ওয়াটসন বলেছেন আচরণ হচ্ছে এই sensori-motor process, অতএব, memory imageগুলিও বলা যেতে পারে এই ধরণের process যা কিনা ঘটে থাকে একটি ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্রে যখন তাকে একটি পুরাতন বন্ধুর মুখ মনে করতে বলা হয় অথবা একটা পুরাতন গানের কলি মনে করতে বলা হয়। এই memory image গুলো অনেকটা অনুভূতির সঙ্গে তুলনীয় যা কি না বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য stimulus-এর দ্বারা উৎপন্ন হয়। অতএব, বলা যায় introspection-এর আওতায় পড়ে এই সব মস্তিষ্কে উদ্ভূত অনুভূতি সমূহ আচরণ প্রকাশ মাত্র। ওয়াটসন বলেছেন আসলে memory image গুলো sensorimotor ঘটনাবলী মাত্র যেগুলো অংশত: অবস্থান করছে চোখের থেকে afterimage পেয়ে বা অংশত: implicit speech movementএর মধ্যে।

Feeling and Emotion: অনেকে বলেন memory image-এর মতো ভালো মন্দের অনুভূতি ও আবেগ হোল মস্তিষ্ক-কেন্দ্রগত ব্যাপার যা কি না কোন sense organকে জানায় না এবং যার কোন motor expression নেই। ওয়াটসন বলেছেন—আবেগ ও ভালমন্দের অনুভূতিই একটা sensori motor ঘটনা। কারণ sensory impulse গুলো আসছে tumescent sex organ গুলো থেকে আর motor responseএ শরীরের প্রত্যঙ্গ ও মাংসপেশীগুলি জেগে ওঠে। সেইরকম আবেগগুলিও সত্যিকারের motor response process; কেননা মনস্তাত্ত্বিকেরা বহু পূর্ব থেকেই আবেগের জাগরণে বুকের ধুকপুকানি, শ্বাসপ্রশ্বাসের পরিবর্ত্তন বা মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ লক্ষ্য করেছেন। James-Lange theoryর দ্বারা ১৮৮৪-৮৫র আগেই বলা হয়েছে বিপদের আশঙ্কা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে পরিবর্ত্তন আনে, তার মোট শারীরিক অনুভূতিগুলিই আমাদের কাছে আবেগরূপে প্রতিভাত। ওয়াটসন অবশ্য কোন সজ্ঞান বিপদের আশঙ্কা বা শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মোট অনুভূতি সমূহের ধারণা করতে রাজী নন। তিনি বলেন আবেগ হচ্ছে সমস্ত শরীরের কলকব্জাগুলোর একটা বিরাট পরিবর্ত্তন সংঘটন, বিশেষ করে visceral ও glandular system গুলির এবং প্রত্যেকটা আবেগের ক্ষেত্রে কতকগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য explicit Behavior প্রকাশ পায়, যেমন হাত পা বা চোখের পাতার কম্পন এবং impiicit Behaviorও অনেক সময় অপ্রকাশ্য থাকে যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিবর্ত্তন, বুকের ধুকধুকুনি ইত্যাদি। James বলেছেন আবেগের পেছনে পাঁচটা Process আছে—situation, তার অনুধাবন, শারীরিক ক্রিয়া, তার ফলে যেমন ভয়ে পালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি বা আবেগে ধরা দেওয়া এবং আবেগের সজ্ঞান অভিজ্ঞতা। ওয়াটসন এর থেকে দুটো Conscious বা cerabral process বাদ দিয়ে বলেছেন—আবেগের পেছনে আছে Situation, Overt response এবং Visceral changes. তিনি শিশু মনস্তত্ত্ব আলোচনা করে দেখিয়েছেন তাদের তিন ধরণের well marked patterns of emotional behavior রয়েছে,—ভয়, রাগ, অনুরাগ। বাকি আবেগগুলি শিশু জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে গড়ে তোলে। শিশু বয়োতে গিয়ে ভয় পায়, কাঁদে। এগুলি ওই আদিম আবেগের overt response এবং এই সব আচরণকে Conditioned response techniqueএর দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

Theory thinking: Watsonএর সব থেকে বড় অবদান হোল thinking processকে একটা implecit motor behavior এ পরিণত করা। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন চিন্তা করাটা বোধ করি কোন Sensori motor আচরণ। পরে তাঁর মনে হোল implicit speech movement টা হোল সম্ভবত: চিন্তা করবার বহি:প্রকাশ। ছোটরা মুখর হয়ে চিন্তা করতে থাকে। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট নেড়ে তারপর চুপিসাড়ে ভেবে থাকে। বড় হয়ে সে যখন চিন্তা করে তখন সে নিজের মনেই নিজে কথা বলে, কিন্তু বুঝতে পারে না তা'। যারা শুনতে পায় না বা কথা বলতে পারে না, তারা হাত নেড়ে চিন্তা করে বা মনের ভাব প্রকাশ করে। আচরণবাদীরা বলেন inner speech movement মানে কোন রকমের speech organ গুলোর কম্পন। আধুনিক বিজ্ঞান তা' প্রমাণও করেছে যে, মানুষ যখন ভাবে তখন speech organ গুলোর সামান্যতম কম্পনও ধরা পড়ে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে—এগুলোকে মস্তিষ্ক না অন্য কোন কেন্দ্র পরিচালিত করে থাকে? যাই হোক, এ বিষয়ে ওয়াটসন নি:সন্দেহ যে, যদি inner movement ধরা নাও পড়ে, কোন রকমের মাংসপেশী জাত কম্পন থাকবেই যা কিনা sensorimotor process আনয়ন করে থাকে।

১৯২০ সালে Watson জনসমক্ষে সুপরিচিত হলেন যখন তিনি heredityর বদলে environment-এর ওপর বেশী জোর দিলেন। তিনি বললেন যে, বিশেষ environment-এর মধ্যে শিশুকে রেখে, পরে তাকে ইচ্ছেমত ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে গড়ে তোলা যায়। পরিবেশের ওপর জোর দেওয়া হোল ওয়াটসনের আচরণবাদের অমোঘ পরিণতি। কুড়ি সালের পরে লেখা ওয়াটসনের বইগুলো হোল জনসাধারণের জন্য লেখা। দেখতে দেখতে বহু মনস্তাত্বিকই তাঁর মতবাদ গ্রহণ করলেন এবং আচরণবাদ হয়ে উঠল একটা পরিবর্ত্তনশীল বিজ্ঞানের শাখা। মনস্তত্বে আচরণবাদের অনুপ্রবেশ ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় হলেও, জনসাধারণের কাছে আদরণীয় হবার এর কতকগুলো কারণ রয়েছে। সাধারণ মনস্তাত্বিক সমস্যার সমাধান এর মধ্যে রয়েছে সহজভাবে। বহু প্রাচীন কুসংস্কার ও ঘেঁষাটে ধারণা এই সিদ্ধান্ত সমূলে বিনষ্ট করেছে। আচরণবাদ হোল একটা নতুন মানবধর্ম যা পুরাতন ধর্মকে বরবাদ করে দিয়েছে।

যক্ষ্মা রোগে বয়স

ডাঃ অমিয়নাথ মিত্র

সাধারণ মানুষের একটা ধারণা আছে যে, কোনরকমে একবার প্রৌঢ়ত্বের পাঁচিল পেরিয়ে বার্দ্ধক্যের চৌকাঠে উপনীত হলে যক্ষার আর আক্রান্ত হতে হয়না, এই ধারণাটা একেবারে অমূলক, অহেতুক বা সম্পূর্ণ যুক্তিবিবর্জ্জিত নয়। নৌকার কাঠ যেমন বহু দিন ধরে জলে ভিজে রোদে পুড়ে বড় একটা নষ্ট হয় না বা ঘুণ প্রভৃতি পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয় না, তেমনি মানুষ বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বহু ব্যাধির বহু বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার বা তাদের সংস্পর্শে আসার দরুণ তার শরীরে রোগ-প্রতিরোধের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে নানা ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিষেধকও গড়ে ওঠে—যাকে বলা হয় অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি। মানব শিশু এই অনাক্রম্যতা-সম্পদ-বিহীন হয়েই ভূমিষ্ঠ হয়, তাই জীবনের প্রথম লগ্নে সে যখন পথ চলা সুরু করে তখন তার এই অক্ষয় কবচ থাকে না। তারপর ধীরে ধীরে পথ চলার সাথে সাথে যখন নানা ব্যাধির বীজাণু-কণ্টক তার অঙ্গে বিঁধতে থাকে, তখন তার নিজেরই অলক্ষ্যে তার শরীরের এই অনাক্রম্যতার অনড় অবরোধ আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে। যক্ষাক্রান্তা মাতার জঠরে যখন শিশুর আগমন হয়, সে তখন সেখানে পরম নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় বাস করে। ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত মাতার শরীর থেকে সে ঠিক তার জীবন-রসায়ন সংগ্রহ করে একান্ত স্বার্থপরের মত ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে, প্রকৃতির এক অদ্ভুত বিধানে মাতার ব্যাধি সন্তানের শরীরে সংক্রামিত হয় না। কিন্তু মাতা ও পিতার উভয়েরই যদি যক্ষা থাকে, তবে সন্তানের মধ্যে এই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তির ক্ষীণতা সহজেই সঞ্চারিত হয়। সুতরাং যক্ষা যদিও পুরুষানুক্রমিক ব্যাধি নয়, তবে যক্ষারোগগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানদের পূর্ব্ব পুরুষানুগত প্রবণতা থাকে। তাতেই এই সব শিশুরা ভূমিষ্ঠ হবার পরে যক্ষার সংস্পর্শে এলে অন্য শিশুদের চেয়ে অতি সহজে আক্রান্ত হয়। জন্মাবার পর ২।৪ বছরের মধ্যে যদি কোন শিশু প্রভূত পরিমাণে যক্ষা-বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়—তা সে যক্ষাগ্রস্ত পিতামাতার সান্নিধ্যে এসেই হোক বা অপর কোন যক্ষারোগীর সংস্পর্শে আসার দরুণই হোক, তবে তার মধ্যে রোগের অতি দ্রুত বিকাশলাভ ঘটে ও রোগ প্রায়ই মারাত্মক হয়, কারণ তার কোন স্বোপার্জ্জিত অনাক্রম্যতা থাকেনা। কিন্তু যদি সে অল্প পরিমাণে বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় অথচ ব্যাধিগ্রস্ত হয়না, তবে তার মধ্যে ইমিউনিটির আবির্ভাবের দরুণ পরবর্ত্তী জীবনে যক্ষাক্রান্ত হলেও সেই যক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং মারাত্মক হয় না। সাধারণতঃ যে কোন জনাকীর্ণ সহরে বিশেষ কোরে আজকের দিনে মানব শিশু বছর চার পাঁচ বয়সের সময় থেকে যক্ষা বীজাণু একটু একটু ক'রে শরীরের মধ্যে গ্রহণ করে এবং যদি জীবন যাপনের ধারা সুষ্ঠু ও সুস্থ হয় অথবা বীজাণুদের মাত্রা যদি অল্প হয়, তবে তার শরীরে ধীরে ধীরে যক্ষার বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা গড়ে ওঠে এবং পরবর্ত্তী জীবনে এইটাই তাকে যক্ষার আক্রমণ থেকে অনেকাংশে রক্ষা করে। যদিও শিশুদের স্বোপার্জ্জিত অনাক্রম্যতা থাকে না, তবে বহুদিন ধরে যারা সহরবাসী, তাদের সন্তানদের পূর্ব্বপুরুষলব্ধ খানিকটা অনাক্রম্যতা সঞ্চারিত হয়। সাধারণতঃ ১০।১২ বছর বয়সের মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী যক্ষা হয় না; কেননা, তখন ইমিউনিটি ভাল কোরে গড়ে ওঠে না। ২-১২ বছরের মধ্যে লসীকাগ্রন্থি (লিম্ফ গ্লাণ্ড), অস্থিদের সন্ধিস্থল বা অস্থি প্রভৃতি অঙ্গের বৃহৎ ধরণের যক্ষা হয়। ১৪-১৫ বছর বয়সের পরেই ক্ষয়রোগ দেখা দেয় এবং ১৫-৪৫ বছর বয়সের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে যক্ষার আক্রমণ ঘটে থাকে এবং এই যক্ষা প্রায় সব ক্ষেত্রেই—বিশেষতঃ সহরবাসীদের ক্ষেত্রেই—দীর্ঘকালস্থায়ী যক্ষায় পরিণত হয়, যাকে বলা হয় ক্রনিক পাল্‌মনারি টিউবারকিলোসিস। এবং এই দীর্ঘকালস্থায়ী যক্ষা পূর্ব্বজীবনের আংশিক অনাক্রম্যতা অর্জ্জনের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই অনাক্রম্যতা যদি সম্পূর্ণ ও চিরজীবনস্থায়ী হত, তাহলে আর যক্ষায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাই থাকত না। কিন্তু এর ভিত খুব সুদৃঢ় ও পাকা হয় না মানুষের ১৫-৪৫ বছর বয়সের মধ্যে। নানাবিধ স্বাস্থ্যবিধির লঙ্ঘন, যক্ষা ব্যতীত অন্যান্য ব্যাধির উপর্যুপরি আক্রমণ, অতিরিক্ত মাত্রায় যক্ষাবীজাণুদের দুর্দ্দম বেগ ও দুঃসহ আঘাত এই ভিতে ফাটল ধরিয়ে দেয়। আবার সহরাঞ্চলে ১৫-৪৫ বছর বয়সের যত মানুষ আক্রান্ত হয়, তার থেকে বেশী সংখ্যায় ঐ বয়সের গ্রামবাসী এবং তার থেকেও আরও অধিক সংখ্যায় পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসী বা আদিম অধিবাসীরা আক্রান্ত হয়; কারণ, তাদের মধ্যে অনাক্রম্যতা একেবারেই থাকে না এবং তাদের যক্ষা অল্পকাল স্থায়ী, উগ্র ও মারাত্মক ধরণের হয়। আবার এই অনাক্রম্যতা চিকিৎসক ও যক্ষা শুশ্রূষাকারী বা কারিণীদের মধ্যে বেশ পাকাপাকি ভাবেই গড়ে ওঠে এবং তারা বড় একটা ও রোগে আক্রান্ত হয় না। ৪৫-৫০ বছরের পর মানুষের শরীরে এই যক্ষার বিরুদ্ধে বেশ সুদৃঢ় ভাবেই প্রতিষেধক গড়ে ওঠে, এবং সেটা হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অক্ষয় অটুট এবং যদি না কোন একটা বিরাট বিপর্য্যয় ঘটে—যথা বহুমূত্র প্রভৃতি ব্যাধির দুরন্ত আক্রমণ—তবে সেটা অবশিষ্ট জীবন পর্য্যন্ত থাকে অক্ষত এবং যক্ষা-বীজাণুরা সেই বর্ম্মে বিফল আঘাত কোরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

বৈদিক শ্রদ্ধা

সুরেশচন্দ্র নন্দী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অবনো বৃজিনা শিশী হ্যাচাযণে মানূচ।
না ব্রহ্মা যজ্ঞে ঋধক্ জোষতে ঘে।

ঋগ্বেদ—১০।১০।৫।৮

ঋষি বশিষ্ঠও বলিয়াছেন, স্তব-স্তুতিই বৈদিক যজ্ঞের অন্যতম উপাদান। তাই মিত্রাবরুণের উদ্দেশে সূক্ত উচ্চারণ করিয়া বলিতেছেন—হে মিত্র বরুণ! আমি স্তুতি নমস্কার দ্বারা তোমাদের প্রীতি কামনা করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। ইহা যেন ফলপ্রসু হয়। দুঃখে পতিত হইয়া তোমাদের শরণাগত হইয়াছি। তোমাদের পূজার জন্য আমি নূতন সূক্ত বা স্তোত্র রচনা করিয়াছি। এই স্তোত্র তোমাদের প্রীতিকর হউক।

সমু বাং যজ্ঞং মহয়ং নমোভি হু বেবাং মিত্রাবরুণাসবাধঃ।
প্রবাং মন্মান্যৃচসে নবানি কৃতানি ব্রহ্ম জুজুষন্নিমানি।

ঋগ্বেদ—৭।৬১।৬

ঋষি বামদেব বলিয়াছেন—শ্রদ্ধারসপূর্ণ সূক্ত বা স্তোত্র উচ্চারণই বৈদিক যজ্ঞের প্রধান উপাদান। তিনি শ্রদ্ধারসোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে সূক্ত উচ্চারণ করিয়া বলিতেছেন,—দেবগণের আহ্বানকারী, বিশ্বের পালনকর্ত্তা, পূজনীয় দেবতা অগ্নির উদ্দেশে স্তব উচ্চারণ করিতেছি। গভীর পবিত্র উধান হইতে দুগ্ধ দোহন করিতেছি না। অথবা সোমলতা নিঃসৃত রসরূপ অন্ন শোধিত করিয়া যজ্ঞবেদীর চতুর্দ্দিকে সিঞ্চন করিতেছি।

অচ্ছা বোচেয় শুশুচানমগ্নিং হোতারং
বিশ্ব ভরসং যজিষ্ঠাংশ শুচ্যূধো অতৃনন্ন
গবামন্ধোন পূতং পরিষিক্তমংশোঃ

ঋগ্বেদ—৪।১।১১

ঋষি শুনঃশেপ দেবতার প্রীতি কামনায় সূক্ত রচনা করিয়া প্রার্থনা জানাইয়া বলি তেছেন—তাঁহার রচিত সুত প্রীতিকর হউক।

হে স্তুতিদ্বারা বোধনীয় অগ্নি! প্রত্যেক মানবের যজ্ঞকর্ম্ম সার্থক করিবার জন্য তুমি তাহার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে বিশেষভাবে প্রকাশিত হও। তুমি রুদ্র বা মহাশক্তি বিদ্যুতাগ্নি, আমাদিগের সূক্ত বাস্তব তোমার প্রীতিকর হউক।

জরো বোধতদ্বিবিড্ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায় স্তোমং রুদ্রয় দৃশীকং।

ঋগ্বেদ—১।২৭।১০

ঋষি বশিষ্ঠ তাঁহার রচিত স্তোম বা স্তোত্রকে সোমরসের সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছেন,—হে বরুণ! হে মিত্র! এই স্তোম বা স্তোত্র তোমাদিগের উদ্দেশে উচ্চারণ করিতেছি, ইহা উচ্চল সোমরসের তুল্য। ইহা তোমাদিগকে আনন্দ দান করুক।

এবঃ স্তোমো বরুণমিত্র তুভ্যং
সোমঃ শুক্রো বায়বে হ্যম্মি।
অবিষ্টং ধিয়ো জিগৃতং পুরন্ধী:

ঋগ্বেদ—৭।৬৫।৫

অগ্নি

আচার্য্য যাস্ক বৈদিক দেবতাগণকে লোকভেদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোক—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া অগ্নি পৃথিবীর, বায়ু অন্তরীক্ষের এবং সূর্য্য দ্যুলোকের দেবতা রূপে অভিহিত করিয়াছেন।

তিস্র এব দেবতা। — নৈরুক্ত—৭।১

অগ্নিঃ পৃথিবী স্থানো বায়ু র্বেন্দ্রোবা অন্তরীক্ষ স্থানঃ সূর্য্য দ্যুস্থানঃ।

নৈরুক্ত—৭।২

প্রাচীন আর্য্য-সমাজে ও প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীনতা ও প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদ দশটি মণ্ডলে বিভক্ত। প্রত্যেক মণ্ডলে দেবতা ও মণ্ডলের বিষয়বস্তুগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নবম মণ্ডল ব্যতীত সমস্ত মণ্ডলেই অগ্নি-দেবতা নাম দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে যে সমস্ত প্রধান দেবতার নামে সূক্ত রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইন্দ্রের পরই অগ্নির স্তুতিসূচক সূক্ত দেখা যায়। উহার সংখ্যা দুই শত তিনটি।

অগ্নিই মনুষ্যজাতির যাবতীয় সভ্যতার জনক। যে মানব সর্ব্বপ্রথমে অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বেদে, ব্রাহ্মণে, উপনিষদে, পুরাণে স্মরণীয় হইয়াছে। সেইজন্যই ঋগ্বেদে "অগ্নির্জাতো অথর্বণা," সামবেদে "ত্বাগ্নে পুষ্করাদ অথর্বা," শুক্ল যজুর্ব্বেদে "অথর্ব্ব বা প্রথমো নিরমন্থ দগ্নে," মন্ত্রে মহর্ষি অথর্ব্বাকে অগ্নি-উৎপাদক বলিয়া অগ্নি-দেবতার সহিত স্তুত হইয়াছে। আবার অথর্ব্ব বেদে "অথর্ব্বা ব্রহ্মতে যজ্ঞং যজ্ঞস্য পতিরঙ্গিরা" প্রভৃতি শ্রবণ করি।

সেই বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি জন্মগ্রহণ করেন।

মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ জন্মত। — ঋগ্বেদ—১০।৯০।১৩

পৃথিবীর দেবতা অগ্নি 'বিষ্ণু' নামে পরিচিত; ঋষি ত্রিত অগ্নিকে "বিষ্ণু" নামে সম্বোধন করিয়া তাঁহার জন্ম-পরিচয় এইভাবে দিয়াছেন,—সংঘর্ষিত অরনিদ্বয় হইতে বিষ্ণু (অগ্নি) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পরমতত্ত্ব জ্ঞাত আছেন।

বিষ্ণুরিত্থা পরমং বিদ্বান জাতো বৃহং।

ঋগ্বেদ—১০।১।৩

মনুর সময় হইতে বৈদিক যজ্ঞে অগ্নির প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহার পিতা বৈবস্বতের সময় যজ্ঞে অগ্নি প্রজ্বলিত হইত না। এই সম্পর্কে ঋষি বশিষ্ঠের স্তব উক্তি স্মরণীয়। উহা এইরূপ:—পূজনীয় প্রাণদাতা শোভনশালী সত্যবাক্ দ্বারা পৃথিবীর মধ্যস্থিত দূতস্বরূপ অগ্নিকে—মনু যাঁহাকে যজ্ঞে প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, সেই অগ্নিকে— আমরা পূজা করি।

ঈলেমংবো অসুরং সুদক্ষং অন্তর্দূতং রোদসী সত্য বাচং।
মনুষ্বদগ্নিং মনুনা সমিদ্ধং সমধ্বরায় সদং ইৎমহেম।

ঋগ্বেদ—৭।২।৩

অগ্নি কে? অগ্নি ব্রহ্মের নিকট নিজের পরিচয় নিজেই দিয়াছেন। তিনি নিজের পরিচয়ে বলিয়াছেন,—আমি অগ্নি জাতবেদা।

অগ্নি অব্রবীৎ অহম অগ্নি বৈ
অস্মি অহম্ জাতবেদা বৈ অস্মি। ইতি

কেনোপনিষৎ—৩।

দেবতাগণও অগ্নিকে "জাতবেদ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

তেঽগ্নিম্ ব্রুবন্ জাতবেদ। — কেনোপনিষৎ—৩।৩

ঋষি বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন,—অগ্নি যজ্ঞের হোতা এবং সম্রাট।

হোতা বিদথেষু সম্রাট — ঋগ্বেদ—৩।৫৫।৭

ঋষি কাম্ব বলিয়াছেন, অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত।

অগ্নি মীলে পুরোহিতং— ঋগ্বেদ—১।১।১

অগ্নিদেব ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজিত। পৃথিবীতে অগ্নি, আকাশে বিদ্যুৎ এবং স্বর্গে জ্যোতিরূপে প্রকাশিত। তিনি যজ্ঞবেদীতে, বন মধ্যে, আকাশে স্বর্গ লোকে, সর্ব্বত্রই অবস্থান করেন।

অগ্নি দেবতাগণের মুখপাত্ররূপে সকল দেবতার নিকট হব্য বহন করিয়া লইয়া যান। অগ্নি সর্ব্বজ্ঞ—পরমেশ্বর এবং সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর বেত্তা। এই জন্যই অগ্নি যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ঋষিগণের প্রিয়তম এবং শ্রেষ্ঠতম দেবতা।

ঋতু কেতু অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—হে অগ্নি! তুমি সকল মানবের জ্ঞানদাতা, তুমিই প্রিয়তম। তুমিই শ্রেষ্ঠতম! তুমি আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধাপূর্ণ পূজা—নিবেদন গ্রহণ কর। স্তবকারীকে অন্নদান কর।

অগ্নে কেতু বির্ব্বশামসি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ উপস্থ সং। বোধা স্তোত্রে বয়োদধৎ। ঋগ্বেদ ১৫৬—৫

অগ্নি সমিদ্ধ না হইলে—অগ্নি প্রসন্ন না হইলে যজ্ঞ কর্ম্ম সুসিদ্ধ হয় না; সেইজন্য ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ব্বে তাঁহাকে যজ্ঞ-ভূমিতে আগমনের জন্য ব্যাকুলভাবে আহ্বান করিতেন। ঋষি ভরদ্বাজ অগ্নিদেবকে এইভাবে আহ্বান করিতেছেন,—হে অগ্নি! এই যজ্ঞে তোমাকে আহ্বান করি। তুমি এস! যজ্ঞীয়ান্ন (ঘৃতচরু) এবং যবাদি ভক্ষণের জন্য তুমি এস! দেবতাগণকে যজ্ঞভূমিতে আহ্বানের জন্য তুমি কুশাসনে উপবেশন কর।

অগ্ন আযাহি বীতয়ে গৃণানো হব্য দাতয়ে।

নিহোতা সংসি বর্হিষি। সামবেদ সংহিতা—১।১।১

আবার তিনিই পুত্রের নিকট পিতা যেরূপ সহজলভ্য অগ্নিকে সেইরূপ অনায়াস-লভ্য হইবার প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেছেন,—হে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মন্ অগ্নি! পুত্রের নিকট পিতার মত তুমি আমাদের নিকট সহজলভ্য হও! কল্যাণদানের জন্য তুমি আমাদের পরস্পরকে মিলিত কর।

স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সুপায় নো ভব।

সচ স্বানঃ স্বস্তয়ে। ঋগ্বেদ—১।১।৯

ঋষি মেধাতিথি শ্রদ্ধাসমন্বিত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা কামনা করিতেছেন,—যিনি যজ্ঞকর্ম্ম সিদ্ধি বিষয়ে কর্ম্মনিপুণ দেবতাগণের দূত-কর্ম্মে নিযুক্ত, দেবগণেব আহ্বানকারী এবং সর্ব্ববিৎ, সেই অগ্নিদেবকে আমরা স্তুতি ও হোমের দ্রব্য নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা কামনা করিতেছি!

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ব বেদসং

অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম। সামবেদ সংহিতা—১।২।৩

ঋষি প্রয়োগ বলিতেছেন—মর্ত্ত্যের মানবগণ শ্রদ্ধাযুক্ত মনের বৃদ্ধি পূর্ব্বক ঋত্বিকগণ প্রদত্ত বাণী দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া উপাসনার জন্য অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিতেছেন।

অগ্নি মিন্ধানো মনসা ধিয়ং সচেত মর্ত্ত্যঃ

অগ্নি মিন্ধে বিবিশ্বভিঃ। সামবেদ সংহিতা—১।১।৯

ইহার পরই ঋষিগণ অগ্নিদেবের অর্চ্চনা করেন। ঋষি বিরূপ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিদেবের অর্চ্চনা করিতেছেন—হে অগ্নি! হে বক্ষক! হে সত্য স্বরূপ! হে কবি! তুমিই সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছ! হে দীপ্তগ্নে! তোমাকে মেধাবী ঋত্বিকগণ বিশেষভাবে অর্চ্চনা করিতেছেন।

তুমিং সপ্রথা অস্যগ্নে ত্রাত ঋাত কবিঃ

ত্বাং বিপ্রসিঃ সম্মিধান দীদৈবস্ব

বিবাসন্তি বেধস। সামবেদ সংহিতা—১।৪।৮

অগ্নি সমিদ্ধ এবং প্রসন্ন হইয়া যখন যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, সেই যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ঋষি শ্রদ্ধারসে বিগলিতহৃদয় হন। নিজ সত্তা বিস্মৃত হন—অর্থাৎ সমাধিযোগ লাভ করেন। সেই সময় ঋষি কণ্ব অগ্নিদেবের উদ্দেশে বলিতেছেন—হে প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মন্! যখন আমি তুমি হইয়া যাই বা তুমি আমি হইয়া যাও, তখনই এ সংসারে তোমার সব করুণাই সার্থক হয়।

যদগ্নে সাম্যং ত্বং ত্বাং বা ঘস্যো

অহম্ স্যুষ্ঠে সত্যা ইহাশিষঃ। ঋগ্বেদ—৮।৪৪।২৩

ঋষি বশিষ্ঠ অগ্নির তেজের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন,—হে সুন্দর তেজোবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি যখন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাও, তখন তোমার রূপ সুদর্শনীয় হয়। তোমার তেজ অন্তরীক্ষ হইতে অশনির ন্যায় নির্গত হয়, তুমি দর্শনীয় সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় দীপ্তি প্রকাশ করিয়া থাকো।

সুসংদৃক্তে স্বনীক প্রতীকংবি যদ্র ক্মো নো বোবসে উপাকে।

দিবো নতে তন্যতুরেতি শুষ্মশ্চিত্রো

ন স্যুরঃ প্রতে চক্ষে ভানুং। ঋগ্বেদ—৭।৩।৬

যজ্ঞাহুতি

যজ্ঞাহুতি শ্রদ্ধারই প্রতীক। বৈদিক ঋষিগণ সর্ব্বাবস্থায় শ্রদ্ধাসাধনশীল ছিলেন। তাঁহারা কিরূপ গভীর শ্রদ্ধার সহিত যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন, ঋষি বামদেবের রচিত মন্ত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়। ঋষি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বলিতেছেন,—শ্রদ্ধারসপূর্ণা নদীর ন্যায় সমুদ্র হইতে এই ঘৃতধারা ক্ষরিত হইতেছে! হৃদয়ের শ্রদ্ধাধারায় উহা পূত হইতেছে।

এতো অর্ষন্তি হৃদ্যাৎ সমুদ্রাৎ ঋগ্বেদ—৪।৫৮।৫

সম্যক স্রবন্তি সরিতোন ধেনা অন্ত হৃদামনসা ঋগ্বেদ—৫।৫৮।৬

যজ্ঞান্তে আহুতি প্রদান বিষয় সম্পর্কে ঋষি অঙ্গিরার উপদেশ এইরূপ—অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে যখন অগ্নিশিখা কম্পিত হইতে থাকে, তখন যাগ সাধন ঘৃতাদির দুই অংশের মধ্যস্থলে শ্রদ্ধার সহিত অগ্নির উপহার স্বরূপ আহুতি সকল প্রদান করিবে।

যদা লেলায়তে হ্যর্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।

তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতিঃ প্রতি পদয়েচ্ছ দ্ধয়া হুতম।

মুণ্ডকোপনিষৎ—১।২।২

দীপ্তিমতী আহুতি সকল যজমানকে "এস! এস! এই তোমাদের পুণ্য কর্ম্মলব্ধ পবিত্র ব্রহ্মলোক!" এইরূপ প্রীতি-বাক্য দ্বারা যজমানকে অর্চ্চনা করিয়া সূর্য্য-রশ্মির ভিতর দিয়া লইয়া যায়।

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।

প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যো ঽর্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো

ব্রহ্মলোকঃ। মুণ্ডকোপনিষৎ—১।২।৬

অগ্নিতে আহুতি প্রদানের নাম অগ্নিহোত্র। প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে নির্দ্দিষ্ট অগ্নিতে আহুতি প্রদান গৃহস্থের অন্যতম নিত্যকর্ম্ম।

অজ্ঞ লোকে অগ্নিহোত্র করিলে ভস্মে ঘৃতাহুতির তুল্য নিষ্ফল হয় এবং ঐ বিষয় জ্ঞানবান লোক দ্বারা সম্পাদিত হইলে ফলপ্রসূ হয়। ঋষি বলিয়াছেন, যে অবিদ্বান মানব বৈশ্বানর-বিদ্যা বিষয়ে জ্ঞানলাভ না করিয়া ঐ কর্ম্ম করেন, ভস্মে ঘৃতাহুতির তুল্য তাঁহার কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। আর যিনি বিদিত হইয়া যথারীতি অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাঁহার সর্ব্বলোকে সর্ব্বভূতে সমুদায় আত্মাতে হোম করা হয়।

স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি যথাঙ্গা-
রাণপোহ্য ভস্মনি জুহুয়াত্তাদৃক্ তৎ স্যাৎ।
অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি তস্য
সর্ব্বেষু লোকেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মসু হুতং ভবতি।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৫।২৪।১-২

যজ্ঞাহুতি ঊর্দ্ধে গমন করে, অন্তরীক্ষে প্রবেশ করে, উহাকেই আহ্বনীয় অগ্নি, বায়ুকে সমিৎ এবং শুভ্ররশ্মিকে আহুতি করে, তাহারা অন্তরীক্ষকে পরিতৃপ্ত করে। এইরূপে সকল আহুতি দ্যুলোকে, ক্রমে পৃথিবীতে, পুরুষেতে এবং সর্ব্ব শেষে স্ত্রীতে প্রবেশ করে।

তেবা এতে আহুতি হুতে উৎক্রামতঃ তে অন্তরীক্ষে মা বিশতস্তে অন্তরীক্ষ মে বাহ্বনীয়ং কুর্ব্বাতে বায়ু সমিধং, মরীচিমেব শুক্রমাহুতিংতে অন্তরীক্ষং তর্পয়ত স্তোত্ত উৎক্রামতঃ।

বিদেহ জনকের যজ্ঞের হোতা অশ্বলের প্রশ্নোত্তরে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—তিনটি আহুতি দ্বারা অধ্বর্য্যু হোম করিবেন। সেই তিনটির আহুতি এইরূপ: (১) যে আহুতি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে প্রজ্জলিত হয়। (২) যে আহুতি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অতিশয় শব্দ করে এবং (৩) যে আহুতি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে নিম্নভাগে পড়িয়া থাকে।

পুনশ্চ অশ্বল প্রশ্ন করেন,—এই সমস্ত আহুতির দ্বারা কি জয় করা যায়? ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—যাহা আহুত হইলে প্রজ্জলিত হয়, তাহার দ্বারা দেবলোক জয় করা যায়। যাহা আহুত হইলে অতিশয় শব্দ করে, তাহার দ্বারা পিতৃলোক জয় করা যায়; কারণ পিতৃলোক যেন অতিশয় শব্দপূর্ণ। যাহা আহুত হইলে নিম্নভাগে পড়িয়া থাকে, তাহার দ্বারা মনুষ্যলোক জয় করা যায়, কারণ মনুষ্যলোক যেন নিম্নেই।

জনক যজ্ঞ—অশ্বল-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—৩।১।৮

আহুতি বিষয়ে আচার্য্য শঙ্করের মত এই প্রকার—(১) ঘৃত সমিধাদি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নি আরো প্রজ্জলিত হয়। (২) মাংসাদি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে এক প্রকার বিকট শব্দ উত্থিত হয়। (৩) দুগ্ধ সোমাদি আহুতিরূপে নিক্ষেপ করিলে ভূতলেই পড়িয়া থাকে।

পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায় দেখা যায় পঞ্চ আহুতির অন্যতম আহুতি শ্রদ্ধাকে অগ্নিতে হোম করা হইয়াছে। রাজর্ষি প্রবাহন ব্রাহ্মণ গৌতমকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন,—হে গৌতম! দেবগণ অপরূপী শ্রদ্ধাকে অগ্নিতে আহুতিরূপে অর্পণ করেন। সেই আহুতি হইতে সোমরাজা (চন্দ্র) উৎপন্ন হন।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি
তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৫।৫।২
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—৬।২।৯

পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায় শ্রদ্ধাই প্রথম আহুতি এবং ইহার শেষফল মানবের উৎপত্তি। এই জন্যই বলা হয়, পুরুষ অগ্নি হইতে জন্মিয়াছে। এই আহুতিতে শ্রদ্ধারই বিশেষত্ব।

ঋষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন, যে সমস্ত শান্তিকামী জ্ঞানবাদী ঋষি অরণ্য বাস করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা ও সত্যরূপে শ্রদ্ধার উপাসনা করেন, তাঁহারা বিরজ অর্থাৎ ফল-কামনা-শূন্য হইয়া সূর্য্য দ্বার দিয়া অবিনাশী অব্যয়াত্মা পুরুষ যে স্থানে বিরাজমান, সেই স্থানে গমন করেন।

তপঃ শ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তাবিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাংচরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষোহ্যব্যয়াত্মা॥

মুণ্ডকোপনিষৎ—১।২।১১

ঋষি পিপ্পলাদ শিষ্য কবন্ধীকে উপদেশ ছলে বলিয়াছেন, জ্ঞানীমানব ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া উত্তমমার্গ দ্বারা সূর্য্যলোক লাভ করেন।

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্য মভিজায়ন্তে।

প্রশ্নোপনিষৎ ১।১০

অতএব শ্রদ্ধাই সমস্ত বিদ্যা-উপাসনার প্রাণ-মূল। শ্রদ্ধাবান না হইলে জ্ঞান লাভ হয় না—পরমাত্মা লাভ হয় না। এই জন্য ঋষি অঙ্গিরার উপদেশ—যে ক্রিয়াবান্ বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধাবান হইয়া একর্ষি নামক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং যাঁহারা যথাবিধি শিরোব্রত অর্থাৎ শিরে অগ্নি ধারণ করেন, তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মবিদ্যা দান করিব।

তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত।
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্ ॥১০

মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।১০

বাজশ্রবা ঋষির পুত্র নচিকেতা সর্ব্বাবস্থায় শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলিয়াই বৈবস্বত যমকে "আমি শ্রদ্ধাবান, আমাকে জ্ঞানোপদেশ দান করুন" বলিতে সাহস করিয়াছিল। যম শিষ্য যোগ্যতা অর্থাৎ বালককে শ্রদ্ধাযুক্ত দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন।

হৃদয় শ্রদ্ধারসে বিগলিত হইলেই মানব আব্রহ্মস্তম্ব সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে শ্রদ্ধালু হয়। মানবকে শ্রদ্ধাময় করিবার জন্য পরমাত্মা প্রথমে সর্ব্বপ্রাণরূপী হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টি করেন। সেই প্রাণ হইতে সকল শুভ কর্ম্ম প্রবৃত্তির উদ্বোধন হেতু শ্রদ্ধার সৃষ্টি করেন।

স প্রাণম্ সৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং

প্রশ্নোপনিষৎ—৪ প্রশ্ন

যে শ্রদ্ধার অনুশীলন—উপাসনা করিয়া মানব শ্রদ্ধাময় হয়, সেই শ্রদ্ধার স্বরূপ কি? ঋষি বলিয়াছেন,—সত্যকে যিনি ধারণ ও আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই শ্রদ্ধা।

সত্য সমস্যাং ধীয়ত ইতি শ্রদ্ধা। সে কি রূপ? নিশ্চয়াত্মক সত্য জ্ঞান দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সম্পর্কে যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি-জ্ঞানের যিনি অধিদেবতা—তিনিই "শ্রদ্ধা" নামে খ্যাতা।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু অবিপর্য্যয়ে নৈবমেতদিত যা বুদ্ধিরুৎপদ্যতে তদধি দেবতা ভাবাখ্যা শ্রদ্ধেত্যুচ্যতে।—নিরুক্ত ভাষ্য।

'শ্রৎ' পদ পূর্ব্বক 'ধা' ধাতুর উত্তর অঙ্ প্রত্যয় করিয়া শ্রদ্ধা শব্দ

নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শ্রৎ' শব্দের অর্থ সত্য বা সত্যজ্ঞান। সত্য বা সত্যজ্ঞান ও শ্রদ্ধা তুল্যার্থক।

সত্যের স্রষ্টা কে? যে পরম পুরুষ শ্রদ্ধার জনক, তিনিই সত্যেরও স্রষ্টা। শ্রুতি বলিতেছেন,—সেই পরম পুরুষ হইতেই বসু রুদ্রাদি দেবতা, সাধ্য (দেবতা বিশেষ), মানুষ, পশু, পক্ষী, প্রাণ, (উর্দ্ধগামী বায়ু), অপাণ (অধোগামী বায়ু), ব্রীহি, যব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও রবি উৎপন্ন হইয়াছে।

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।

প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ।

মুণ্ডকোপনিষৎ ২।১।৭

শ্রুতি বলিতেছেন, পূর্ব্বে এই বিশ্বচরাচর জলরূপে বর্ত্তমান ছিল। এই জল সত্যকে সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সত্য ব্রহ্মকে সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্রহ্ম প্রজাপতিকে, প্রজাপতি দেবতা সকলকে সৃষ্টি করেন। সেই দেবগণ সত্যেরই উপাসনা করিয়া থাকেন।

আপ এবেদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত। সত্যং ব্রহ্ম। ব্রহ্ম প্রজাতিম্ প্রজাপতি দের্বাংস্তে দেবাঃ সত্যমেবোপাসতে।

বৃহদারণ্যে কোপনিষৎ ৫।৫।১

শ্রদ্ধার মত সত্যেরও অধিষ্ঠানস্থান হৃদয়। বিদগ্ধ শাকল্যের প্রশ্নোত্তরে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, হৃদয় দ্বারাই সকল মনুষ্য সত্য অনুভব করে। হৃদয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত।

হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি হৃদয়েহ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং

বৃহদারণ্য কোপনিষৎ ৩।১।২৩

যে হৃদয়ে শ্রদ্ধা এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত, সেই হৃদয় কি? ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বৈদেহ জনককে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন,—হে সম্রাট! হৃদয়ই সর্ব্বভূতের আয়তন। হৃদয়ই সর্ব্বভূতের প্রতিষ্ঠা। হে সম্রাট! হৃদয়েই সর্ব্বভূত প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। হে সম্রাট! হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম।

হৃদয়ম্ বৈ সম্রাট! সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম আয়তনম্; হৃদয়ম বৈ সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম প্রতিষ্ঠা। হৃদয়ে হি সম্রাট! সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি। হৃদয়ম্ বৈ সম্রাট! পরমম্ ব্রহ্ম।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।১।৭

কাম দ্বারা যেমন কামনা, হৃদয় দ্বারা তেমনি হৃদয় অর্থাৎ হৃদয় ব্রহ্মলাভ করা যায়। বৈদিক ঋষি শ্রদ্ধাবৃত্তির অনুশীলন দ্বারা হৃদয় ব্রহ্মলাভ করিয়া বলিতেছেন, কাম দ্বারা কাম এবং হৃদয় দ্বারা আমি হৃদয় ব্রহ্মলাভ করিয়াছি, সকলের মন আমার নিকটবর্ত্তী হউক।

কামেন কাম আপন হৃদয়া হৃদয় পরি।

যদমীষু মদোমন স্তদৈতুপ মামিহ। অথর্ব্ব বেদ, ১৯।৫২।৪

পুনশ্চ ঋষি বলিয়াছেন, এই হৃদয়ই তাহা ছিল সত্য। যিনি এই প্রথম জাত মহান্ পূজনীয়কে সত্য ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনি এই সমুদয় লোককে জয় করেন। তাঁহার শত্রুও পরাজিত হয়। সত্যই ব্রহ্ম।

তদ্বৈতদেতদেব তদাস সত্যমেব স যো হৈতং মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি জয়তীমাল্লোকাঞ্জিত ইন্বসাবসদ্ য এবমেতং মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি সত্যংহ্যেব ব্রহ্ম।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৫।৪।১

এই সত্য ব্রহ্ম বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজিত। ঋষি বামদেব বলিতেছেন, তিনি সূর্য্য (হংস) রূপে আকাশে, বসুরূপে অন্তরীক্ষে, হোতা রূপে বেদীস্থলে, অতিথিরূপে মনুষ্যগৃহে, মানবরূপে বরণীয় স্থানে, যজ্ঞ-ভূমিতে, অন্তরীক্ষস্থলে বিরাজ করেন। তিনি জলে, কিরণে, অদ্রিতে জন্মিয়াছেন। তিনিই সত্য।

হংস শুচিসদ্ বসন্ত রেক্ষস দ্বোতা বেদিষদ তিথি দুর্রোণ সৎ।

নৃষদ্ বরসদৃত সদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্।

ঋগ্বেদ ৪।৪০।৫

এই সত্যই বিশ্বচরাচরকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সত্যের প্রভাবেই পৃথিবী উত্তম্ভিত, আদিত্য আকাশে অবস্থিত, সত্যেরই প্রভাবে সোম সেই আকাশকে আশ্রয় করিয়া রাখিয়াছে।

ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন এই সত্যই সর্ব্বভূতের মধু; সত্যই অমৃত, সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই সর্ব্বজ্ঞ।

ইদং সত্যং সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু

ইদং অমৃতং ইদং ব্রহ্ম ইদং সর্ব্বম্।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ২।৫।১২

সত্য মানব জীবনের দর্শনীয়, সেই মূল সত্যকে জানিতে হইবে। চক্রের কেন্দ্র স্থানে যেমন সমস্ত দণ্ডগুলি (অরা) বিস্তৃত, তেমনি এই মূল সত্যেই সব সত্য বিস্তৃত।

তদযথা বৃথ সর্ভৌচ রথ নেমৌচ।

অরাঃ সর্ব্বে সমার্পিতা। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

ইন্দ্র বলিয়াছেন, প্রজ্ঞাদ্বারাই সত্য সঙ্কল্প লাভ করে।

প্রজ্ঞয়া সত্যং সঙ্কল্পম্—কৌষীতকি ৩।২

মহানারায়ণ উপনিষদ বলিয়াছেন, সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের মূলে যে সত্য বিবৃত, সেই সত্যতেই সমস্ত বিশ্ব জগৎ বিধৃত! তাই সত্যের সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব।

সত্যে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং।

তস্মাৎ সত্যং পরমং বদন্তি।

সত্য কিরূপ? পরম শিব ঈশান বলিয়াছেন, সেই সত্য সর্ব্ব বন্ধন মুক্ত।

সত্যো মুক্তো নিরঞ্জনঃ।

ঋষি বলিয়াছেন, এই সত্যই তপস্যা, সেই তপস্যাই ধর্ম্ম। ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ।

—মহানারায়ণ উপনিষৎ

এই জন্যই ঋষি বলিয়াছেন, ব্রহ্মকে বলিব সত্যাশ্রয়ীকে রক্ষা করুন, সত্য রক্ষককে রক্ষা করুন।

ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু।

তদবক্তারমবতু। অবতু মাম। অবতুবক্তারম্।

কৌলোপনিষৎ ৪

সনৎ কুমার স্কন্দদেব দেবর্ষি নারদকে উপদেশ দিয়াছেন,—মনুষ্য যখন সত্য উপলব্ধি করে, তখনই সত্য প্রকাশ করে।

যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদন্তি।

ছান্দোপনিষৎ ৭।১৭।১

সত্য প্রাপ্তি কিরূপে হয়? বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন, শ্রদ্ধা দ্বারাই সত্য লাভ হয়।

শ্রদ্ধয়া সত্য মাপ্যতে।

—যজুর্ব্বেদ ১৯।৩০

সত্য জ্ঞান দ্বারাই পরমাত্মা লভ্য। সেই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন, যে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দেহ মধ্যে বিরাজিত, যাঁহাকে নির্ম্মলচিত্ত যতিগণ দর্শন করেন, তিনি সত্য, তপস্যা ও জ্ঞান এবং নিত্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লভ্য।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়োহি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ—৩।১।৫

এই জন্যই ঋগ্বেদের ঋষি যতিগণের উদ্দেশে বলিয়াছেন, হে যতিগণ! সত্য বাক্য, সত্য ব্যবহার, শ্রদ্ধা, তপ দ্বারা সহজভাবে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিকে পবিত্র করিয়া ঐশ্বর্য্যবান্ পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা কর।

আ পবদিশাং পত আর্জীকাৎ সোমমীঢ়ঃ
ঋতে বাক্যেন সত্যেন শ্রদ্ধয়া তপসাবৃত
ইন্দ্রায়েং দো পরিস্রব।

ঋগ্বেদ—৯।১১৩।৩

শ্রদ্ধাই সত্য-জ্ঞানের জনয়িত্রী। প্রজাপতি বিশেষ বিবেচনা—বিচারপূর্ব্বক শ্রদ্ধাকে সত্যে অর্থাৎ সত্য-জ্ঞানের উপর এবং অশ্রদ্ধাকে অসত্যে—মিথ্যাজ্ঞানের পর স্থাপিত করিয়াছেন।

দৃষ্ট্বা রূপে ব্যাকরোৎ সত্যানৃতে প্রজাপতিঃ।
অশ্রদ্ধ মনৃত্তি দধাচ্ছ্র দ্ধাং সত্যে প্রজাপতিঃ॥

যজুর্ব্বেদ ১৯।৭৭

এইজন্যই শ্রুতি উচ্চৈঃস্বরে সত্যেরই মহিমা জয় ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন,—সত্যেরই জয় হয়। মিথ্যারই পরাজয় হয়।

'সত্যমেব জয়তে নানৃতং।'

আবার সত্য দ্বারাই দেবযান বিস্তীর্ণ অর্থাৎ মুক্তদ্বার হয়। যদ্দ্বারা আপ্তকাম অর্থাৎ নিষ্কাম ঋষিগণ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সেই পরম ধাম যে স্থানে বিরাজমান, সেই স্থানে গমন করেন।

সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্।

মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।৬

সত্য-জ্ঞানের প্রসূতি শ্রদ্ধা কিরূপে লাভ করা যায়? ঋষি বলিয়াছেন,—শ্রদ্ধাযুক্ত মনের ইচ্ছায়, হৃদয়ের ব্যাকুলতায়।

শ্রদ্ধাযুক্তয়া মনস ইচ্ছয়া। ঋগ্বেদ ১০।১৫১।১

সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে উপদেশ দিয়াছেন,—নিষ্ঠা দ্বারা শ্রদ্ধা লাভ করা যায়। কারণ মানুষ যখন নিষ্ঠাবান্ হয়, তখন শ্রদ্ধাবান্ হয়। নিষ্ঠাবান্ না হইলে শ্রদ্ধাবান হওয়া যায় না। নিষ্ঠাবান্ই শ্রদ্ধাবান্ হয়।

যদাবৈ নিস্তিষ্ঠত্যথশ্রদ্দধাতি।
না নিস্তিষ্ঠঞ্ছ্রদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি।

ছান্দ্যোগ্যোপানিষৎ—৭।২০।১

অতএব শ্রদ্ধা প্রাপ্তির অন্যতম পন্থা নিষ্ঠা। মনন অর্থাৎ অনুক্ষণ ঈশ্বরচিন্তনও শ্রদ্ধা সাপেক্ষ। সে কিরূপ? সনৎকুমার পুনশ্চ নারদকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন,—যখন মানব শ্রদ্ধালু হয়, তখনই মনন করে। শ্রদ্ধাপরায়ণ না হইলে মননশীল হইতে পারে না। শ্রদ্ধাশীলই মননশীল হয়।

যদাবৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে নাশ্রদ্দধন্মনুতে। শ্রদ্দধদেব মনুতে।

ছান্দ্যোগ্যোপানিষৎ ৭।১৯।১

সর্ব্বগুণময়ী শ্রদ্ধাদেবীর সকল গুণ লক্ষ্য করিয়াই ঋষিগণ তাঁহার উদ্দেশে বলিয়াছেন,—অয়ি শ্রদ্ধে! তুমি দানকারীর পক্ষে যেরূপ মঙ্গলময়ী, দানকরনেচ্ছুর পক্ষেও তদ্রূপ।

প্রিয় শ্রদ্ধে দদতঃ প্রিয়ং শ্রদ্ধে দিদাসতঃ।

ঋগ্বেদ—১০।১৫১।২

আমরা শ্রদ্ধাদেবীর উদ্দেশে আমাদের হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বৈদিক ঋষিগণের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া প্রার্থনা জানাই,—অয়ি শ্রদ্ধে! তুমি আমাদিগকে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে শ্রদ্ধাময় কর!

শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহনঃ।

পরাবাস্তব

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

মৃত পৃথিবীর বুকে জাগিলাম,
জানিলাম এ জগৎ সত্য নয়।
পুড়ে গেছে বায়ু, জ্বলে গেছে তরু আর ঘাস,
চাঁদের বুকের মত পড়ে আছে সমুদ্রের লাশ।
ন্যাড়া পাহাড়েরা যেন সব কঠিন আঁধার উত্তাল
এঁকে-বেঁকে পাক খেয়ে পড়ে আছে রুক্ষ নদীর জাল।

সেক্সপীয়ার—রবীন্দ্রের কাব্যের ঝঙ্কার,
সীজার—চেঙ্গিজ হুরারের অস্ত্রের হুংকার;
উড়ুক্কু আকালের মত বাদুরের ডানা,
উঞ্ছজীবি ইন্দুরের লোভে পেঁচার নখর হানা।
—এক লহমায় সব মুছে গেছে।
শুধু এক ড্যাবডেবে চাঁদ চেয়ে আছে।

রুদ্ধশ্বাস শঙ্কায় করিলাম চীৎকার চীৎকার।
ভেঙে গেল ঘুম। বুক থেকে নেমে গেল নিজ হস্তের ভার।

ফেলিক্স কেরী

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার ভাগ্যাকাশ বহু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সমাবেশে উদ্ভাসিত হয়েছিল। এক শতাব্দীতে একটি দেশে এত বেশী প্রতিভাশালী মনীষীর আবির্ভাব সত্যই অভাবনীয় বিস্ময়কর ব্যাপার। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সময়েই এদেশে আসেন এমন কয়েকজন বিদেশী মহাপ্রাণ মনীষী, যাঁদের পূত-পরশে ঘুমন্ত জাতির প্রাণে জাগরণের সাড়া জেগে ওঠে। তাঁদের মধ্যে অনেকের নাম ইতিহাসের পাতায় পেয়েছে স্থান। আর অনেকে সেই দুর্লভ সুযোগলাভে বঞ্চিত হয়েছেন। এই বঞ্চিত দলের মধ্যে আছেন মহাপ্রাণ উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরী। বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে তাঁর মত পারদর্শী খুব অল্প কয়েকজনই ছিলেন। মাত্র চার বৎসর তিনি বাংলাভাষার সেবা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যা সৃষ্টি করে গেছেন, তাতেই তাঁকে বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় লেখক বলে গণ্য করা যেতে পারে। বাংলাভাষায় পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-পুস্তক তিনিই সর্ব্বপ্রথম রচনা করেন এবং বাংলা-জ্ঞানাত্মক সাহিত্যসূচনায় সূত্রপাত করেন।

রোমাঞ্চকর উপন্যাসের নায়কের মত বৈচিত্র্যময় জীবনের অধীশ্বর ফেলিক্স কেরী। উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাতের বন্ধুর পথে দুঃখ, শোক, সংশয়, শঙ্কা প্রভৃতি সবকিছুর মধ্য দিয়েই তাঁর উদ্দাম গতিময় জীবনরথ পরিচালিত হয়েছে। মহামনীষী কেরীর ঘনিষ্ঠ প্রভাব সত্ত্বেও তিনি শান্ত বা বিনম্র স্বভাবের হন নাই। স্থিতিশীলতা ছিল তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর ইংলণ্ডে তাঁর জন্ম হয়, সাত বৎসর বয়সে পিতার সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন, চৌদ্দ বৎসর বয়সে দীক্ষা পান এবং একুশ বৎসর বয়সে ধর্মপ্রচারকের কাজে ব্রতী হন। এদেশে পৌঁছবার পর হতেই তাঁর পিতার মুন্সী রামরাম বসুর নিকট হতে বাংলা শিখতে থাকেন। শ্রীরামপুরে এসে ওয়ার্ডের ছাপাখানায় তাঁর সহকারীরূপে যোগ দেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একাজে দক্ষতার পরিচয় দেন। বাংলা ছাড়া সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষাতেও তিনি পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ধর্মপ্রচার অপেক্ষা ভাষা-শিক্ষা ও ছাপাখানার কাজ তাঁর কাছে বেশী প্রিয় ছিল এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে ও ছাপাখানার কাজে পিতাকে খুব বেশী সাহায্য করতেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মার্গারেট কিনৃষী নামক ইংরাজ ভদ্রমহিলাকে বিবাহ করেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ডক্টর টেলর নামক একজন বন্ধু চিকিৎসকের নিকট হতে ফেলিক্স কেরী চিকিৎসা-বিদ্যা শেখেন এবং বিশেষ করে অস্ত্রোপচার-বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তাঁর অনেক বেশী উৎসাহ ছিল রোগনিরাময়ের কাজে এবং কলকাতার হাসপাতালগুলিতে শিক্ষানবিশী করে হাত পাকিয়ে ফেলেন। বাইরে গিয়ে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করবার গোপন আগ্রহ এই সময় তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। আর সেই সময় সুযোগও এসে যায়, বর্মায় প্রচারক প্রেরণের প্রয়োজন ঘটে। শ্রীরামপুরে তাঁর প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে কেউই তাঁকে ছেড়ে দিতে চান নাই, কিন্তু কোন বাধাই তাঁর প্রবল আগ্রহের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না।

১৮০৭ খৃঃ তিনি রেঙ্গুনে চলে যান। বর্মায় তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ হোল বর্মীভাষা শিক্ষা, খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থ বর্মীভাষায় অনুবাদ করা, ঐ ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করা এবং একটি অভিধান সংকলন করা। কিন্তু রোগ নিরাময় এবং রোগ প্রতিরোধের কাজ তিনি কোন সময়েই বন্ধ করেননি। বরং ব্রহ্মদেশে চিকিৎসক হিসাবে তিনি ধীরে ধীরে সুনাম অর্জন করতে থাকেন। বিশেষ করে তাঁর রোগ-প্রতিষেধক টীকা ঐ দেশে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আভার রাজা এতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে নিজ পরিবারে টীকা দেবার জন্য আহ্বান জানান। এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন ফেলিক্স কেরী এবং টীকা ও সুচিকিৎসার গুণে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আভার রাজার আস্থা অর্জন করে ফেলেন। এ সৌভাগ্যসুখ কিন্তু তাঁর বরাতে বেশীদিন থাকে না। নাটকীয়ভাবে তাঁর ভাগ্যবিপর্য্যয় জীবনের গতিকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে। টীকার বীজ, ছাপার যন্ত্রাদি, কয়েকটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি নিয়ে শ্রীরামপুর হতে আভায় ফেরবার পথে নৌকাডুবির ফলে তিনি সর্বস্ব হারান, এমনকি, স্ত্রী পুত্র কন্যা সব। শোকে দুঃখে পাগলের মত হয়ে তিনি যখন আভায় ফেরেন তখন সহৃদয় আভার রাজা তাঁর প্রতি যথেষ্ট সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। সান্ত্বনাস্বরূপ তিনি ফেলিক্স কেরীকে রাজদূত রূপে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্যসেবী ভাষাবিদ ধর্মযাজক ফেলিক্স কেরী রূপান্তরিত হলেন রাজদূতে, আর সুরু হল তাঁর আড়ম্বর পূর্ণ জীবনযাত্রার। পুত্রের এ রূপান্তর দেখে তাঁর পিতা ডাঃ উইলিয়াম কেরী ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তবে ফেলিক্স একাজ নিজের ইচ্ছায় গ্রহণ করেননি, নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় তাঁকে এ কাজ নিতে হয়েছিল। এসম্বন্ধে ডাঃ ইয়েটসের জীবনীতে আছে "It should be mentioned however that the office of Ambassador was not his own seeking. It was in a manner, thrust upon him," (Life of Dr. Yates, by J. Hobby P 66). কিন্তু এ জীবনও তাঁর বেশীদিন স্থায়ী হয় না। কয়েকটি কাজের জন্য তিনি আভার রাজাকে এমনভাবে চটিয়ে দেন যে, প্রাণভয়ে তাঁকে পলায়ন করে অজ্ঞাতবাসে থাকতে হয় এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বৎসর তিনি অত্যন্ত হীন জীবন যাপন করেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁর শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন,—"He wandered amoung the independent provinces of East Bennal and passed through a series of adventures by land and by sea, which would appear incradible even in a novel. At one time he repaired to the court of one of the

Barbarous chiefs on the frontier and was constituted his Primeminister and Generalissimo and led his forces to a conflect with Burmese, in which from his utter ignorance of even the rudiments of Millitary Science, he was ignominiously defeated and obliged to take refuge in the jungles. After three years of this wild and romantic life, he accidentally fell in with Mr. Ward at Chittagong and was persuaded to return to repose and usefulness at Serampur." [History of Serampore Mission—J. C. Marshman, Vol II P. 54-5c]

এই কয় বছর কিন্তু তিনি পিতার সহিত সংযোগ রেখেছিলেন এবং পিতার চিঠির মধ্য দিয়েই তিনি বেঁচে থাকার রসদ পেয়ে এসেছিলেন। এইরূপ অরণ্যচারী বৈচিত্র্যময় রোমাঞ্চকর জীবন অতিবাহিত করে পুরানো আবেষ্টনীর মধ্যে আবার ফিরে এলেন ফেলিক্স কেরী : আর মৃত্যুকাল পর্যন্ত শান্ত ও কর্মবহুল জীবন যাপন করেন এইখানেই। শ্রীরামপুরে আসার পূর্বে তিনি ব্রহ্ম ও পালি ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এখানে এসে বাংলা ভাষায় অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত এই প্রভূত সম্ভাবনাময় জীবনকে অকালে কবলিত করে। মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ফেলিক্সের বিচিত্রঘটনাবহুল জীবনের অবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুতে Friend of Indiaতে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাতে এরূপ লিখিত ছিল,—"The death of this individual will be considered as a great loss by those who are labouring in the intellectual and moral cultivation of India. [Friend of India, vol. V, Dec. 1822]

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ফেলিক্স কেরী। যে যে ক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করেছিলেন, সে সে ক্ষেত্রেই তিনি রেখে গেছেন তাঁর প্রতিভার সুস্পষ্ট ছাপ। যদিও তাঁর পিতা চেয়েছিলেন তিনি প্রধানভাবে হবেন ধর্মযাজক ; কিন্তু সে কাজে তিনি প্রাণের সংযোগ বোধ করেন নি। কিন্তু যতটুকু করেছিলেন সে কাজ, তার মধ্যেই তাঁর দক্ষতার প্রভূত পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর প্রচার সম্বন্ধে ওয়ার্ড লিখে গেছেন,—"He never heard a message better fitted for India." ছাপাখানার সমস্ত কাজে তিনি এত পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন যে, ওয়ার্ডের স্থলে সমগ্র কাজের ভার একমাত্র তাঁর ওপরই দেওয়া হত। বহুভাষাবিদ্ কেরীর পুত্র, তাই তিনিও নানা ভাষায় জ্ঞানলাভ করেন। বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, পালি—এই সব কয়টা ভাষার ওপরই তাঁর বিশেষ দখল জন্মেছিল। বাংলা ভাষায় তাঁর দখল এত বেশী ছিল যে, বাংলা তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভাষা ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাছাড়া বর্মীভাষাও তিনি ভালো জানতেন এবং চীনাভাষাও কিছু শিখেছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর অপরিসীম। মানুষের প্রতি অপরিসীম দরদের জন্যই রোগ-নিরাময়ের কাজকেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। সুচিকিৎসার গুণেই তিনি ব্রহ্মদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। শুধু চিকিৎসকরূপেই তিনি যদি জীবনযাপনে সচেষ্ট হতেন, তবে হয়ত জীবনে এত অশান্তি, দুঃখ-দুর্দশা তাঁকে ভোগ করতে হত না। বিজ্ঞান-সাধক কেরী ও সাহিত্য-সাধক কেরী—এই দুই-এ মিলে তাঁর যা পরিচয়, সেইটিই বোধ হয় তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সাংবাদিক ও অনুবাদক হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। নিম্নে তাঁর রচনার একটি তালিকা প্রদত্ত হল :—

(১) ব্রহ্মভাষার ব্যাকরণ
(২) ব্রহ্মভাষার অভিধান
(৩) ব্রহ্মভাষায় নিউটেষ্টামেন্টের কিছু অংশ
(৪) সংস্কৃত অনুবাদ সহ পালিভাষার ব্যাকরণ
(৫) "বিদ্যাহারাবলী" (১ম খণ্ড) ব্যবচ্ছেদবিদ্যা
(৬) বাংলা অভিধান (রামকমল সেনের সহযোগিতায় ইহা আরম্ভ করেন কিন্তু সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই মারা যান)
(৭) বিদ্যাহারাবলীর ২য় খণ্ড, স্মৃতিশাস্ত্র (দুইটী অংশ কেবল প্রকাশিত হয়েছিল)
(৮) গোল্ডস্মিথ-লিখিত ইংলণ্ডের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ
(৯) মিল লিখিত ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ
(১০) পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেসের বঙ্গানুবাদ
(১১) জনম্যাকের প্রিন্সিপল্‌স্ অফ্ কেমিষ্ট্রির বঙ্গানুবাদ।

[Friend of IndiaVol-V, Dee. 1822]

বিদ্যাহারাবলীই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। এর মধ্য দিয়ে তিনি এনসাইক্লোপিডিয়ার মত সুবৃহৎ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন। বাংলা গদ্যের সেই আদিযুগে যখন বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয় প্রকাশের ভাব ও ভাষার একান্ত অভাব ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা চয়নও দুঃসাধ্য বাপার, সে সময় সুবৃহৎ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনার প্রয়াসের মধ্য দিয়া তিনি যে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার তুলনা পাওয়া যায় না। বিদ্যাহারাবলী বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের পুস্তক। এর প্রথম খণ্ড ব্যবচ্ছেদবিদ্যার প্রথম অংশ আটচল্লিশ পাতার গ্রন্থ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং প্রতি মাসে একটি করে বাহির হয়ে মোট চৌদ্দটী অংশ একাশিত হয়। জন ম্যাকের প্রিন্সিপল্‌স অফ কেমিষ্ট্রীর অনুবাদ সম্পর্কে ম্যাক গ্রন্থের ভূমিকায় কোন কিছু না লিখলেও Friend of Indiaর সংবাদ, Bengal obituary and জে, সি, মার্শম্যানের Life and times of Carey, Marshman ও Ward হতে আমারা জানতে পারি যে, He tranalated a manual of chemistry compiled by Mr. Mack. শ্রীরামপুর হতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা মাসিক পত্রিকা 'দিগদর্শনে' বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ফেলিক্সের রচনা বলে অনেকে অনুমান করেন। বাংলা রচনার উল্লেখযোগ্য বিষয় হল তথ্যবাহুল্য এবং পাণ্ডিত্যের সুস্পষ্ট ছাপ এবং একমাত্র অভাব ছিল চিত্তাকর্ষতার। তবে সে সময় চিত্তাকর্ষক পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা করা খুবই দুরূহ ও দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। মিশনারী-শ্রেষ্ঠ রেভারেণ্ড কেরীর এই অসমদুঃসাহসী পুত্র বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীর কল্যাণ ও জ্ঞানোন্নতির জন্য তাঁর ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যে যা করে গেছেন, তার ঋণ কোন দিন শোধ করা যাবেনা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় বাংলাভাষাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষায় উন্নীত করবার তাঁর অপরিসীম প্রয়াসের কথা বাঙ্গালীজাতি পরম শ্রদ্ধার সংগে চিরদিন মনে রাখবে।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বার-য়্যাট-ল

(প্রখ্যাত আইনজীবী ও লোকসভা-সদস্য)

বঙ্গ জননীর একজন পরম কৃতী ও সুযোগ্য সন্তান শ্রীশচীন্দ্রনাথ চৌধুরী। আইনজীবী হিসাবে তাঁর খ্যাতি স্বদেশেই শুধু নয়, বাইরেও পরিব্যাপ্ত। এ যাবৎ নানা ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। সমগ্র জীবনটাই তাঁর নব নব সাফল্যের পরিচয়বাহী—সেটা আপনিই লক্ষ্য পড়ে। এবারে ঘাটাল লোকসভা-কেন্দ্র থেকে তিনি কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে বিজয়ী হয়েছেন—এও নিঃসংশয়ে তাঁর প্রাপ্য সম্মান।

হুগলী জেলার জনাই-বাকসা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বংশে এই মানুষটি জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৩ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী। তাঁর পূজ্যপাদ পিতা প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন একজন স্বপ্রতিষ্ঠ পুরুষ! ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তিনি যেমন অসাধারণ সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি পরিচয় রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সেবাব্রতী, দরদী ও জ্ঞান-পিপাসু হৃদয়ের। আগে ও পরে একাধিক কৃতী পুরুষের আবির্ভাবে এই চৌধুরী-বংশটি প্রোজ্জ্বল হয়। এই বংশেরই অন্যতম সুসন্তান—বার্ক যাঁকে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের সময় 'চতুর ও কুশাগ্রবুদ্ধি' আখ্যা দিয়াছিলেন—সেই রূপনারায়ণ বর্গীর আক্রমণে বাধা দেন, এমন কি, ইংরেজের আক্রমণের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ান। হেষ্টিংসের রোষবহ্নি ও ভ্রূকুটি অপেক্ষা করে এই স্বদেশ-প্রেমিক বীর মহারাজা নন্দকুমারের সমর্থনে আদালতে সাক্ষ্য দিতেও পিছপাও হন না!

মনীষা, দানশীলতা ও দেশসেবার আদর্শ, সংগঠনী শক্তি—বলতে গেলে এ সকল শচীন্দ্রনাথ পেয়ে যান উত্তরাধিকারী সূত্রেই। ছাত্র-জীবনের প্রতিটি ধাপে তিনি অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৯১৯ সালে রাণী-ভবানী স্কুল (কোলকাতা) থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দু'বছর পর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেন সমধিক কৃতিত্বের সঙ্গে। এই পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে মর্যাদা-চিহ্ন তিনি লাভ করেন—যা বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে যে কোনও ছাত্রের পক্ষেই একটি সুবিরল সম্মান।

ইত্যবসরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য শচীন্দ্রনাথের মনে প্রবল ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়—সঙ্কল্পকে যেমন করেই হোক তাঁর রূপ দেওয়া চাই। তাই দেখা গেলো অষ্টাদশ বর্ষীয় এই যুবক পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেছেন ইংলণ্ডে। ১৯২৩ ও ১৯২৪ সাল—এই দুটি বছর একটানা পড়ে ক্যাম্বি জ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্র ও আইনে অনার্স সহ ডিগ্রী লাভ করেন। এইখানেই তিনি অধ্যয়ন শেষ করেন না—১৯২৫ সালে ব্যারিষ্টারী পাশ করে যোগ দেন এসে কোলকাতা হাইকোর্টে। এর পরও কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলে তাঁর পড়াশুনো, যার সুফলস্বরূপ ১৯২৭ সালে তিনি ক্যাম্বি জ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, ডিগ্রীতে ভূষিত হন।

হাইকোর্টে যোগদানের অত্যল্প সময় মধ্যেই বিচক্ষণ আইনজ্ঞ হিসাবে শচীন্দ্রনাথ বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়ে চলেন। দেখতে দেখতে একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যবহারজীবী হয়ে ওঠেন তিনি—বিভিন্ন আইন-পত্রিকায় তাঁর সূক্ষ্ম আইন-জ্ঞানের নিদর্শন স্বরূপ নানা বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩৭ সালে তিনি দিল্লীর ফেডারেল কোর্টের এডভোকেট হন এবং পরে যখন সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হলো, সেখানকারও সিনিয়র এডভোকেটরূপে তাঁকে গোড়া থেকেই দেখা যায়। ইংলণ্ডের হাউস অব্ লর্ডস্ ও প্রিভি কাউন্সিলের অনেক মোকদ্দমায় তিনি হাজির হয়েছেন—বহির্ভারতেও এই সব সূত্রে তাঁর অসাধারণ আইনজ্ঞানের পরিচয় ছড়িয়ে পড়ে। এখানে লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ব্যাপারে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেন, তা-ও স্মরণ রাখার মতো।

স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার এই প্রতিভাবান্ মানুষটির যোগ্যতার স্বীকৃতি দেন। ১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় তিনি ভারতের প্রতিনিধি মনোনীত হন এবং ১৯৫১ সালেও তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। স্বনামধন্য আইনজ্ঞ স্যার বেনেগল নরসিংহ রাও (বি, এন, রাও) সেই সময় রাষ্ট্রসংঘে ছিলেন—সমগ্র ভারতে শচীন্দ্রনাথই তাঁর যোগ্য সহকর্মীরূপে মনোনীত হবার সুযোগ পান, এটা লক্ষ্য করবার। ভারতের এটর্ণী-জেনারেলের সহিত দ্বিতীয় সদস্যরূপে এক সময় শ্রীচৌধুরী আফ্রো-এশীয় আইন-পরামর্শ-সভার সদস্য হন। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে ভারতীয় আইন-কমিশনেরও একজন সভ্য মনোনীত করেন। ১৯৬১ সালে মার্চ্চ মাসে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত আইন সম্মেলনে তাঁকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যায়।

নিজে যেমন একটি প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বংশের সন্তান, শচীন্দ্রনাথ তেমনি বিবাহ করেন বাংলার এক অভিজাত বংশে। তাঁর পত্নী শ্রীমতী সীতা চৌধুরী স্বর্গত স্যার বি, এল, মিত্র (পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল) মহোদয়ের কন্যা। স্বামীর যোগ্যা সহধর্ম্মিণীরূপে শ্রীমতী চৌধুরী দেশের নানা কল্যাণব্রতে ব্রতী রয়েছেন। শচীন্দ্রনাথের একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথও (বন্ধুমহলে যিনি 'সতু' নামে পরিচিত) বহু সদ্গুণের আধার, অথচ প্রচারবিমুখ। সব দিক থেকে অনুকূল উচ্চ পরিবেশে থেকে শচীন্দ্রনাথ জীবনপথে এগিয়ে চলেছেন। বহু বৃহৎ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একাধিক ভাষা ও সাহিত্যে তিনি সুপণ্ডিত। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁর অন্তরের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে বরাবরই। শিক্ষা ও সামর্থ্যে সমুন্নত এই মানুষটি আরো নতুন সম্মানের অধিকারী হলে বিস্ময়ের কিছু হবে না।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

(প্রথিতযশা শিল্পপতি ও বাণিজ্যনায়ক)

পৃথিবীর দরবারে বাঙলার বাণিজ্যের বিজয়-পতাকা যাঁদের কৃতিত্বে আজও সগৌরবে উড্ডীয়মান, বাঙলাদেশের বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় যাঁদের চিন্তাধারা সমাচ্ছন্ন, বাঙলার যে কীর্ত্তিমান সন্তানদের দ্বারা তার বাণিজ্যগত সুনাম ও সম্মান বিবর্দ্ধিত হয়ে চলেছে, প্রথিতযশা বাণিজ্যবিদ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁদেরই অন্যতম। অসাধারণ কর্মনৈপুণ্য ও অনন্যসাধারণ ব্যবসায়-প্রতিভার সমন্বয়ে আজ বাঙলার তথা ভারতের বাণিজ্য-জগতের একটি বিশেষ সম্মানজনক আসন তাঁর অধিকারভুক্ত।

এই প্রৌঢ় বাণিজ্যনায়ক বাঙলার লোকান্তরিত এক খ্যাতিমান বাণিজ্যরথীর সুযোগ্য পুত্র। বাঙলার বীমা-জগতের ইতিহাসে এক বিশেষ নাম ও 'মেট্রোপলিটান' বীমা-প্রতিষ্ঠানের রূপকার স্বর্গত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র দেবেন্দ্রনাথ কলকাতা মহানগরীর বুকে ১৯১৫ সালের ৬ই মার্চ্চ পৃথিবীর আলো প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন। কলকাতায় জন্মালেও এঁদের আদিনিবাস কলকাতায় নয়, ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ায়। বাল্যকাল অতিবাহিত হয় বারাণসীতে। ভারতের শাশ্বত আত্মার বিকাশভূমি, আধ্যাত্মিকতার লীলাভূমি, মর্ত্তলোক ও অমর্ত্তলোকের সঙ্গমস্থল, সুপবিত্র কাশীধামে পিতামহ স্বর্গীয় প্রশন্নকুমার বেদান্ততীর্থ মহোদয় কাশীবাসী ছিলেন। তাঁর কাছেই বাল্যকাল অতিবাহিত হয়, এবং বাল্যকালীন শিক্ষালাভও কাশীতেই হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন সিটি কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৩০ সালে। প্রবেশিকার গণ্ডী অতিক্রম করার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। কলেজ ছাড়েন ১৯৩৩ সালে। তারপর কর্মজীবনের সূত্রপাত। এই বিশিষ্ট শিল্পপতির কর্ম্মজীবনের সূচনা হয় ১৯৩৪ সালে কর্ণ ফ্যাক্টরি কাজ নিয়ে। টেক্সটাইলে শিক্ষা-গ্রহণ করেন ১৯৩৭ সালে। ১৯৪৫ সালে পিতৃদেব সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গতায়ু হন। পিতৃবিয়োগের পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিরাট বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনভার গ্রহণ করেন। অবশ্য কমলক্ষ্মী কটন মিলস্-এর সঙ্গে এর আগে থেকেই তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯৫০ সালে রিপাব্লিক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর পত্তন করলেন। সেই বছরেই চৌরঙ্গীর সুবিখ্যাত হোয়াইওয়ে লেড্‌ল অট্টালিকাটি এঁরা ক্রয় করেন। ১৯৫৬ সালে দেশের বীমা ব্যবসায়ের ইতিহাসে এক পটপরিবর্ত্তনের সময়। ঐ বছরে সরকার বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয়করণ করলেন। ইতিহাস রূপ বদলাল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বাঙলার বহু সংখ্যক বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে অন্যতম পরিচালক রূপে দেবেন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে মেট্রোপলিটান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশান লিমিটেড, মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক লিমিটেড, বৃটিশ ইলেকট্রিক্যাল য্যাণ্ড পাম্পস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ইষ্ট ইণ্ডিয়া হোটেলস্ লিমিটেড, য্যাসোসিয়েটেড হোটেলস্ অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, জয়শ্রী টি য্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, রিপাব্লিক ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশান লিমিটেড, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল কোল ফিল্ডস্ লিমিটেড, বাসন্তী কটন মিলস্ লিমিটেড প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বেঙ্গল লক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেডের তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এছাড়া কাউন্সিল অফ সায়েণ্টিফিক য্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের কার্যকরী সমিতির, ট্র্যাফিক য়্যাডভাইসারি বোর্ডের ও টেলিফোন য়্যাডভাইসারি বোর্ডের সদস্যপদ এবং বেঙ্গল মিল ওনার্স য়্যাসোসিয়েশান ও বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতির আসনও এই স্বনামধন্য শিল্পপতির দ্বারা অলঙ্কৃত।

১৯৩৩ সালে কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাঃ শিবপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শোভনা দেবীর সঙ্গে ইনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

সেদিন চৈত্রের মধ্যাহ্ন। মধুভাষী, বিনয়ী ও সদালাপী এই মানুষটির সঙ্গে নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে একটি প্রশ্ন করি। প্রশ্ন করি যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের বীমা-ব্যবসায়ের প্রগতি কি আশানুরূপ বা এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীমাবিদ্ আমায় উত্তরে জানালেন যে, যতদিন বীমা-ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীয়করণ হয়নি, ততদিন আমাদের দেশের বীমা-ব্যবসায়ের খুবই দ্রুত উন্নতি হচ্ছিল। আমার পরবর্তী প্রশ্ন যে, বীমা-ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সম্বন্ধে আপনার মত কি?—উত্তর এল, বীমার রাষ্ট্রায়ত্ত-করণের আমি বিরোধী নই, তবে আমাদের দেশে যথাসময়ে বীমা-ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীয়করণ হয়নি। আরও দশ বছর পরে যদি রাষ্ট্র বীমা-ব্যবসায়ের ভার গ্রহণ করতেন, তাহলে তার ফল সকল দিক দিয়েই ভালো হোত।

ডক্টর ধীরেন্দ্র চন্দ্র গাঙ্গুলি

(ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সেক্রেটারী ও কিউরেটর)

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক গবেষণায় এই প্রাজ্ঞ মানুষটির অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে গোড়া থেকেই ইনি কী নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে এসেছেন। বলতে দ্বিধা নেই যে, ডক্টর ধীরেন্দ্র চন্দ্র গাঙ্গুলি বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী—তাঁর অদম্য জ্ঞান-পিপাসা ও গঠনাত্মক উদ্যমই তাঁকে এমনি বড় করেছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের প্রথম ভারতীয় সেক্রেটারী ও কিউরেটার তিনিই—যে সম্মাননা তাঁর প্রাপ্যের অতিরিক্ত নিশ্চয়ই কিছু নয়।

ঢাকায় একটি উচ্চাদর্শ সম্পন্ন সম্রান্ত পরিবারের কৃতী সন্তান শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র। ১৮৯৯ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি নারায়ণগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন—তাঁদের আদি নিবাস অবিশ্যি ঢাকায় চূড়াইল গ্রামে। পিতা ৺মহিম চন্দ্র গাঙ্গুলি সে-যুগে নারায়ণগঞ্জের একজন নামকরা উকীল ছিলেন; পৌরসভার চেয়ারম্যানের আসনেও তাঁকে দেখা গেছে বহুবার। বাপ-মায়ের স্নেহের অনুশাসনে থেকে ধীরেন্দ্রচন্দ্রের ছাত্র-জীবন এগিয়ে চলার পথ পায় ধাপে ধাপে।

দেশাত্মবোধের জন্যে এই গাঙ্গুলি পরিবারটির খ্যাতি ছিল তখন দূরবিস্তৃত। এদের বাড়ীটি বৈপ্লবিক সমিতির একটি বড় আড্ডা ছিল সেদিন—এ কারো অজানা ছিল না। ধীরেন্দ্রচন্দ্রের জননী বগলা-সুন্দরী দেবী সর্ব্বক্ষণ উদ্দীপনা জোগাতেন কাছের ও দূরের সকল মানুষের প্রাণেই। তিনটি ছেলে তাঁর—দেশপ্রেম ও বিপ্লবের আগুনে শোধিত হয় একে একে সবাই। জ্যেষ্ঠ বিপ্লবী ৺প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলিকে অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বের ভূমিকায় আমরা দেখেছি। কনিষ্ঠ শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র গাঙ্গুলিও সূচনাতেই বিপ্লববাদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন মনে-প্রাণে। আর দুই-এর-মাঝখানে দাঁড়িয়ে ধীরেন্দ্রচন্দ্র—ছাত্রাবস্থাতেই বৈপ্লবিক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হন তিনিও।

নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুলেই ধীরেন্দ্রচন্দ্রের ছাত্র-জীবনের সূচনা হয় বটে কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন (১৯১৬) তিনি ঢাকার কিশোরীলাল জুবিলী স্কুল থেকে। তারপর ঢাকা কলেজে আই-এ পড়তে সুরু করেন কিন্তু চলতি পায়ে বিঘ্ন এসে হাজির হয়। এই বিঘ্ন বিপদ অবশ্যি তাঁর নিজেরাই ডেকে আনা। স্কুলের যখন ছাত্র তখনই বিপ্লবী দলে (অনুশীলন সমিতি) তিনি যোগ দিয়েছেন। পুলিসের কড়া নজর এড়িয়ে থাকা কতদিন সম্ভব। তাই কলেজের প্রথম বর্ষ কাটতে না কাটতেই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হলো। গোপনে ঢাকা থেকে অমনি চলে আসেন—ঘুরতে থাকেন এখানে সেখানে। হঠাৎ একদিন দমদম ষ্টেশনে বিরাট পুলিসবাহিনী নিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন স্বয়ং টেগার্ট সাহেব। কিছুকাল প্রেসিডেন্সী জেলে তিনি আটক থাকলেন, তারপর একেবারে চট্টগ্রামের নিকটই বঙ্গোপসাগরের মহেশখালি দ্বীপে। এই দ্বীপ-শিবিরে তাঁর সঙ্গে আটক ছিলেন আরও ২৩ জন বিপ্লবী—স্থানটির চারিদিকে ছিল অবিরাম পুলিস প্রহরা।

আটকাবস্থা থেকে শ্রীগাঙ্গুলি মুক্তি অর্জ্জন করেন ১৯২০ সালে। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দী হওয়ার অপরাধে ঢাকার কলেজে আর ভর্ত্তি হতে পারেন না। সুযোগ খুঁজে পেতে বাধ্য হয়ে আসেন তিনি কোলকাতায়। ঋষি-প্রতিম অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর স্নেহের দৃষ্টি পড়ে তাঁর ওপর—তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবাসী কলেজে এই স্বদেশ বৎসল নির্ভীক যুবককে ভর্ত্তি করে নেন। ১৯২১ সালেই ধীরেন্দ্র চন্দ্র আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন—এবারে আবার চলে যান সেই ঢাকায়, ভর্ত্তি হতে পারলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯২৫ সালে তিনি ইতিহাস শাস্ত্রে এম-এ পাশ করেন—কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে গবেষণার জন্যে বৃত্তি মঞ্জুর করেন দুটি বছরের। কিন্তু বিদেশে থেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তাঁর মন অতিমাত্র ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ১৯২৮ সালে তিনি ইংল্যাণ্ড রওয়ানা হয়ে যান—সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চললো তাঁর নিবিড় অধ্যয়ন ও গবেষণা। ডা: এল্. ডি বারনেট-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্কুল অব ওরিয়েন্টেল ষ্টাডিজ ও বৃটিশ মিউজিয়ামে রাজপুত ইতিহাস বিষয়ে তিনি গবেষণা সমাপ্ত করেন এবং ১৯৩০ সালে থিসিস্ পেশ করে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব্ ফিলোসোফি ডিগ্রীতে ভূষিত হন।

এভাবে পরম যোগ্যতা ও মর্য্যাদার অধিকারী হয়ে ডক্টর গাঙ্গুলি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তারপর সুরু হয়ে যায় তাঁর সমধিক সাফল্যমণ্ডিত কর্ম্ম-জীবন। প্রথমেই তিনি যোগদান করেন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক রূপে—সেখানকার উপাচার্য্য ছিলেন তখন মালব্যজী। ১৯৩৭ পর্য্যন্ত বারাণসীতে কাটিয়ে পর বৎসর যোগ দেন এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের তিনি রীডার নিযুক্ত হন—যে সম্মানিত আসনে তাঁকে অধিষ্ঠিত দেখা যায় ১৯৪৮ সাল অবধি।

ইতিমধ্যে দেশ বিভাগ হয়ে যাবার পর নতুন দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য ডক্টর গাঙ্গুলির প্রতি আহ্বান আসে। লণ্ডনে থাকতেই মিউজিয়াম পরিচালনা বিষয়ে তাঁর প্রাথমিক ট্রেণিং নেওয়া ছিল আর ইতিহাসে তাঁর পাণ্ডিত্য দীর্ঘদিন স্থাপিত। এই দুই বিশেষ যোগ্যতার দাবীতে পার্সি ব্রাউনের স্থলে তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সেক্রেটারী ও কিউরেটার নিযুক্ত হলেন—দায়িত্বপূর্ণ পদটি অলঙ্কৃত করে আছেন এই গুণী মানুষটি আজও। ঢাকা মিউজিয়ামের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল—তিনি ছিলেন ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-কমিটির অন্যতম সদস্য। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিউজিয়াম সংক্রান্ত বিষয়ে (Museology) যে ট্রেণিং-দানের ব্যবস্থা আছে, দীর্ঘদিন থেকেই তিনি সেই বিভাগের একজন লেকচারার যা নিঃসন্দেহে গৌরবের।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণায় ডক্টর ধীরেন্দ্রচন্দ্র নিরলস ভাবে ব্যাপৃত রয়েছেন—বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি, যা সর্বত্র বিদ্বৎসমাজের শ্রদ্ধাদৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর স্বহস্ত রচিত 'History of the Paramara Dynesty', 'Eastern Chalukyas', 'Victoria Memorial Hall', 'Select
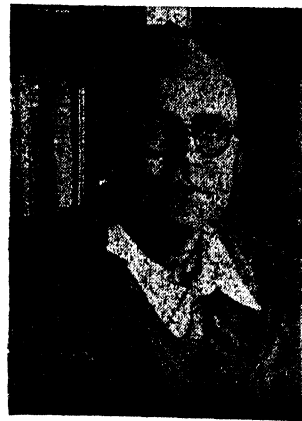
শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলি

Documents of the British Period of Indian History'—সকলই বিশ্ব ইতিহাসের স্থায়ী সম্পদ। বোম্বাই-এর ভারতীয় বিদ্যাভবন হইতে প্রকাশিত ভারতীয় জনগণের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিরাট গ্রন্থের (History and Culture of the Indian people) কয়েকটি অধ্যায়ও ডক্টর গাঙ্গুলির লেখনীতে সমৃদ্ধ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাংলা ইতিহাসে (History of Bengal)—প্রথম খণ্ডেও তাঁর বিশিষ্টতার সাক্ষর বিদ্যমান। এ যাবৎ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর বহু জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। একটা কথা প্রথমত: উল্লেখ করতে হবে—এই মানুষটির গবেষণা ও গ্রন্থাদি রচনা ব্যাপারে তাঁর বিদুষী পত্নী শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী বরাবর উৎসাহ জুগিয়ে চলেছেন। একাধিক শিক্ষা ও সরকারী গবেষণা সংস্থার সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। ১৯৪৯ সালে কটকে যে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাতে তিনি একজন বিভাগীয় সভাপতি ছিলেন। দেশ ও জাতি এই গবেষক পণ্ডিতের কাছ থেকে এখনও অনেক সম্পদ পাবে বলে প্রত্যাশা রাখতে পারে।

শ্রীকিরণকুমার ভট্টাচার্য্য

(উত্তর প্রদেশের প্রখ্যাত আইনজীবী)

সুদৃঢ়-স্বাস্থ্য, অটুট-মনোবল, সুষ্ঠু আলাপী, ছাত্রবৎসল ও চিরকুমার আইনজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীকিরণ কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জীবন গঠিত হয়েছে বিভিন্ন পরিবেশ ও ঘটনার মাধ্যমে। নেতাজীর সহাধ্যায়ী, উজ্জ্বল ছাত্রজীবন, সরকারী চাকুরি, স্বাধীন পেশা, অধ্যাপনা, রাজনীতিতে যোগদান ও পার্লামেণ্ট-সদস্য—এগুলির একত্র সমাবেশ হয়েছে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে।

শ্রী ভট্টাচার্য্য ১৮৯৮ সালের ১লা আগষ্ট নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ রায় বাহাদুর ৺দ্বারকা নাথ ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপ পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মাতা ৺নগেন্দ্রবালা দেবী। পিতা ছিলেন স্বর্গত সুকুমার ভট্টাচার্য্য। বিচারবিভাগে যুক্ত থাকায় সুকুমারবাবুকে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার বহুস্থানে থাকিতে হয়। তজ্জন্য কিরণ কুমার ডায়মণ্ডহারবার, বালেশ্বর ও কটক সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে ইণ্টারমিডিয়েট ও চতুর্থ স্থানাধিকারী হিসাবে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স সহ স্নাতক হন। ১৯১৭-১৯ সাল তিনি নেতাজীর সহপাঠী ছিলেন ও তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ হন। ১৯২২ সালে তিনি ইতিহাসে এম, এ, পরীক্ষায় উচ্চস্থান পান। ১৯২৪ সালে তিনি সসম্মানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শেষ আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্থানীয় হাইকোর্টে যোগদান করেন। ১৯২৭ সালে শ্রী ভট্টাচার্য্য মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়া পূর্ব্ব-বঙ্গের বহুস্থানে অবস্থান করেন, এবং ১৯৩১ সালে ছুটী লইয়া তিনি ইংল্যাণ্ডে যাইয়া Grag's Inn-এ ভর্ত্তি হন। তথা হইতে ১৯৩২ সালের পরীক্ষায় Constitutional Law-তে পূর্ণ সংখ্যা (Cent Pr Cent Marks) পান ও পর বৎসর ব্যারিষ্টারী সনদ লাভ করেন। উক্ত বৎসরেই তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Master of Law (LL. M.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তথায় "Grand Oration Day"-তে তিনি নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

ভারতে ফিরিয়া নেতাজীর অনুপ্রেরণায় ১৯৩৫ সালে সরকারী চাকুরী হইতে পদত্যাগ করিয়া শ্রী ভট্টাচার্য্য পুনরায় কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। পর বৎসর তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-বিভাগের 'রীডার' ও 'ফ্যাকাল্টীর ডীন' হিসাবে নিযুক্ত হন। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে জাতীয় কংগ্রেসের সহিত যুক্ত থাকায় শেষ পর্য্যন্ত 'ডীন অব ল' পদের নিয়োগপত্র প্রত্যাহৃত হয়। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড় আন্দোলন'-এর জন্য তিনি ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি অধ্যাপক ও ডীন (Dean) হইয়া ১৯৬০ সালের আগষ্ট মাসে অবসর গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে অন্যতম প্রখ্যাত আইনজীবীরূপে সংশ্লিষ্ট।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী জহরলাল নেহরুর সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় থাকায় ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হিসাবে আই, এন, এ বিচার (I. N. A. Trial) পর্ব্বের পূর্ব্বে উহা আইনসম্মত কিনা (Legality or otherwise) ইহা নিরূপণের জন্য শ্রী নেহরু প্রথম তাঁহাকে জানান। শ্রী ভট্টাচার্য্য "আই, এন, এ, বিচার"-কে আইনবিরুদ্ধ (Illegal) বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

১৯৫০ সালে কিরণবাবু (Provisional) পার্লামেণ্টে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী হিসাবে সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজাজী কর্ত্তৃক উত্থাপিত "Press objectionable Matter Bill—1951" সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় তিনি ১৯৫২ সালে কংগ্রেসদল পরিত্যাগ করেন। পরে পি, এস, পি, প্রার্থী হিসাবে দুইবার প্রাদেশিক বিধান সভার সদস্য পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি উক্ত দল ত্যাগ করেন।

শ্রী ভট্টাচার্য্য একজন সুলেখক। তাঁহার বহু নিবন্ধ ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁহার লিখিত "Failure of Cripps Mission," "British constitutional Law" Indian Constitution 1935," "Company Law" ও "Public International Law" বহুপঠিত পুস্তক। ১৯৩৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভারতীয় সংবিধান—১৯৩৫" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বর্ত্তমান বৎসরের "স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা" (on disarmament) দেওয়ার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

অকৃতদার কিরণ কুমার বরাবর ক্রীড়ানুরাগী। ছাত্রজীবনে তিনি একজন কৃতী খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতারাও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি শ্রী বি, কে, ভট্টাচার্য্য তাঁহাদের অন্যতম।

কুলটা

রচনা—রাজেন্দ্র যাদব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ড্রইংরুমে বসে বসে বড় অস্বস্তি হচ্ছিল। এখানে এমন একটা দমবন্ধ করা আবহাওয়া ছিল যে, মনে হচ্ছিল বাইরের বারান্দায় গিয়ে খোলা হাওয়ায় একটু নিঃশ্বাস নিই; কিন্তু ওখানে ছিল 'গুলির ফুল'—যা দেখবার জন্যে একাধারে ব্যগ্রতা আর ভয় সমস্ত মনটাকে অস্থির করে তুলছিল। মেজর তেজপাল একটা পা সোজা করে যেন বড় পরিশ্রমের সঙ্গে শক্ত ফৌজি পাতলুনের পকেট থেকে সিগারেট-কেস বার করেন আর আমাদের প্রত্যেককে 'অফার' করার পর বিনীতভাবে বিনুকে বলেন "উইথ ইয়োর পারমিশন"।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়" বিনু বলল। "এখুনি আসছি," কাঁধে আর কুনুইয়ে শাড়ির আঁচল ঠিক করতে করতে সে উঠে দাঁড়ায়: "মিসেস তেজপালকে একটু সাহায্য করে আসি।"

"আরে, না-না, বসুন, কাজ তো শেষ হয়েই গেছে সব।" তেজপাল বলেন। ওর হাত আর আঙুল ঘন লোমে ঢাকা ছিল। কবজিতে বাঁধা চৌকো কালো কালো ডায়াল দেওয়া ঘড়ি থেকে থেকে আলোতে ঝকমক করে উঠছিল। সংখ্যার জায়গায় তাতে ছোট ছোট সোনালী ফোঁটা দেওয়া ছিল আর লাল রঙের সাপের জিভের মতন সেন্টারে সেকেণ্ডের কাঁটা ঘুরছিল চারদিকে। সেইদিকে চেয়ে চেয়ে চমক লাগছিল—কোন অনেক-জানা জিনিসের কথা মনে পড়ছে হঠাৎ যেন।

বিনু চলে গেল। থেকে থেকে মনে হচ্ছিল নিচে থেকে যে গানের সুর সব সময় শুনতে পাই, সে কি সত্যি এই ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের কেউ গান? কে গাইতে পারে এর মধ্যে—এই বাঘ, এই 'গুলির ফুল'···

"কলকাতা কেমন লাগছে?" তেজপাল একদিকের ঠোঁট কুঁচকে একটা রেখা টানেন। আমার মনে হয় ওর চেহারায় এমন কিছু আছে যা দেখে 'স্থূল চেহারা' বলতে যা বোঝায় একেবারে তাই।

"ভালই লাগছে। আমার তো এখানে এমন বিশেষ কিছু কাজ নেই। কিছু রিপোর্ট তৈরী করতে হয়। সে কোথাও বসে টাইপ করে নিলেই চুকে যায়।"

"আর বেড়ান?"

"হ্যাঁ, তাও তাই মাঝে মাঝে সময় পেলে।" ওঁর জিজ্ঞেস করার ভঙ্গিতে মনে মনে হাসি আমি। যেন জিজ্ঞেস করছেন 'ভাল কথা, আপনার মাথায় যে মাঝে মাঝে যন্ত্রণা উঠত—এখন কেমন আছে?'

"হ্যাঁ, ভালো কথা মেজর তেজপল, আজ দুপুরে হয়েছিল কি? খুব গণ্ডগোল হচ্ছিল।" হঠাৎ প্রশ্ন করে রণধীর।

"ওঃ, সেই? আরে সে কিছু নয়।" এবার ওঁর দু'চোখ যেন জ্বলে ওঠে। সোজা হয়ে বসে হাঁটুর ওপর কুনুই রেখে বলেন, —বাড়ীতে ঝাড়পোঁছ করবার জন্যে যে ঝি আসে না, সেই মেমসাহেবের প্রেম হয়ে গেছে আমার খানসামার সঙ্গে। হতভাগা নিজের ভাগের সমস্ত খাবার ওকে খাইয়ে দিচ্ছিল। ওর যে কিছু বিশেষ ব্যাপার হয়েছে, এ খেয়াল তো আমি কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছিলাম। উনি সে যাবার আগে কোন না কোন ছুতোয় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবেন আর পথে তার সঙ্গে দেখা করবেন। বাড়ী ফেরার পথে আমি কয়েকদিনই দেখেছি কিন্তু রাস্তার মধ্যে গাড়ী থামান ঠিক নয় ভেবে আর কিছু বলিনি। বারান্দার সামনে কোণের দিকে যে ঘরটা আছে, আসবার পথে হঠাৎ ওদিকে মাথা ঘুরিয়েই দেখি উনি তাকে চুম্বন করছেন···"

"তাতে কি হয়েছে?" থাকতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করি যে, এদের জীবনেও তো কিছু রোমান্স থাকা উচিৎ। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ভেতরে ভেতরে যেন সজোরে একটা ধাক্কা লাগে আর কথার স্রোত বন্ধ হয়ে যায়। এইমাত্র সেই ভীষণ আর রহস্যময় দৃশ্য দেখে আসার পরও কি করে এই হাল্কা পরিহাস করতে পারছি?

"আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না রাজেনবাবু। 'ফিল্ডে' তো আমরা নিজেরাই এই ধরণের ছাড় দিই। কিন্তু এতো আর ফিল্ড নয়। আর তাছাড়া···একটু যেন অনুশোচনার সঙ্গে আবার তেজপাল বলেন,—'দিস চ্যাপ' এই লোকটা আমার অনেক দিনের পুরনো। অনেক বড় বড় রাজা-মহারাজার কাছে কাজ করে এসে ওর বাবা আমার বাবার কাছে এসে এমন মায়ায় পড়ে গিয়েছিল যে, আর কোনদিন কোথাও যাবার কথা ভাবতেই পারেনি। আমি যখন 'কমিশন' পেলাম তখন বাবা ওকে আমার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ীর মতন হয়ে গিয়েছিল, তাই আমার কখন কি চাই সব জানত। দশ বারো বছর ধরে আমার সঙ্গে আছে···কিছু তো বোঝা তো উচিৎ ছিল ওর···"

রণধীর কিছু বলবার চেষ্টা করছিল কিন্তু মাঝখানে আমিই বলে উঠি,—মেজর সাহেব, ওরও তো নিজের কিছু চাহিদা আছে, মন আছে, জীবন আছে।

"নো। আমি এ সব সহ্য করতে কিছুতেই পারব না।" মাথা বাঁকিয়ে সক্রোধে বলেন তেজপাল, "ওর দরকার থাকে তো ও এসে বলুক আমার কাছে। আমি দিয়ে দিচ্ছি বিয়ে। এই সব বেহায়াপনা আমার কাছে চলবে না। আমি তো তখুনি ওকে কান ধরে বার করে দিয়েছিলাম। 'আই সেড গেট আউট'। আমি তো ওকে গুলি করে মারতাম। এটা রোমান্স করবার যায়গা নয়, থাকবার।" হঠাৎ গলার স্বর একেবারে নিচের ধাপে নিয়ে গিয়ে অল্প হেসে বলেন, "দেখবেন কাল পরশুর মধ্যেই এসে ক্ষমা চেয়ে আবার কাজে লাগবে। যাবে কোথায় আর হতভাগা।"

"আরে ভাই কখনো কখনো এদের জীবনেও তো কিছু রসের কারবার করতে দিও।" হালকা সুরে বলে রণধীর।

তুমিও দেখি মেয়েদের মতন কথা বলছ ধীর। উ-ও বলছিল যে "খারাপটা কি হয়েছে? যদি ওরা বিয়ে করে?" "আই সেড, সাটাপ। তুমি বুঝতে পারছ না বন্ধু এইসব সস্তা ছবিগুলো এদের মাথা একেবারে খারাপ করে দিতেছে।"

"ও তাই জন্যেই আজ মিসেস তেজপাল রান্নাঘরে।" রণধীর রেডিওগ্রামের ওপর রাখা এ্যাশ-ট্রের মধ্যে সিগারেট রেখে বলে।

"না, এক্ষুনি আসছি।" ভেতর থেকে আওয়াজ আসে—সেই পাখীর ডাকের মতন গলার স্বর। তক্ষুনি আমার মনে পড়ে সামনে রাখা ঘড়িটার সংখ্যার অঙ্কগুলো যেন বাইরের সাজান ফুল

থেকে তোলা। কিন্তু তার সেকেণ্ডের কাঁটাগুলো এমন করে ঘুরছিল যেন এক একটি গুলির আগুন মুখ থেকে ছুটে চলেছে জ্বলন্ত মশাল।

ভেতর থেকে বিনুর কথার স্বর ভেসে আসছিল। চাকরের স্বর আর গুলির ফুল—আমি মনে মনেই শিহরিত হই। ওরা বোধ হয় টেবিলে চাকরের হাতে হাতে প্লেট সাজাচ্ছিল।

"হ্যাঁ, আমি যেন কি বলছিলাম?" সোজা এসে ও তেজপালের দিকে চেয়ে মনের সবটুকু ভাব মিষ্টি এক টুকরো হাসির আবরণে লুকিয়ে বসে। তারপর রণধীরকে বলে,—"মেজর ধীর, এর কথা সত্যি মনে করবেন না। নিজেই তো তাড়িয়ে দিল। যদি ওরা বিয়ে করে, তবে?"

এক মুহূর্ত্তে তেজপাল বুঝি চঞ্চল হয়ে ওঠে। বোধহয় এমনি ভাবে ওর আসাটা সম্ভব মনে হয়নি ওঁর। সামলে নিয়ে বলেন, "তাহলে আমাকে এসে বলা উচিৎ ছিল।"

বিরক্ত মুখে হাত নাড়িয়ে ও বলে, "আমাকে এসে বলা উচিৎ ছিল! মশাই, ও কি তোমার কাছে এসে বলবে যে আমার বিয়ে দিয়ে দাও?"

"আচ্ছা, মারো গুলি।" কথাটা তেজপাল এমন ভাবে বলে যে আমার মনে হয় যদি আমরা না থাকতাম তাহলে উনি চীৎকার করে উঠতেন "তুমি চুপ করে থাক।"

কথা একেবারে শেষ হয়ে যায়। আমার দিকে চেয়ে এতক্ষণে ও বিনীতভাবে হাতজোড় করে বলে, "আমি বড্ড দেরী করিয়ে দিলাম। কিছু মনে করবেন না।"

মিসেস তেজপাল আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। "আমাদের জন্যে শুধু শুধু আপনার এই কষ্ট···"

"খাওয়া দাওয়া তো বোধহয় আমরাও করে থাকি।" হেসে বলেন মিসেস তেজপাল আর আরও একবার ঘাড় পর্য্যন্ত কাটা চুল পেছন দিকে ঝাকিয়ে দিয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন আমার দিকে। সে দৃষ্টি যেন আর সহ্য করতে পারছিলাম না আমি। সেই অসহ্য অবস্থায় বুঝতে পারছিলাম না কি করা উচিৎ। ওর কথায় সকলে হেসে উঠি হো হো করে।

"বসুন না।" মিসেস তেজপাল বলেন। "ক্যাপ্টেন রুদ্রও ততক্ষণে এসে পড়ুন।"

"বড় দেরী করে দিল। ওরা সব সময় দেরীতেই আসবে। আমি বলি, ফৌজেই যদি তোমাদের এই অবস্থা তো সময়ের মূল্য আর কোথায় শিখবে?"

বসে পড়ি আমরা। আমি দেখি মিসেস তেজপালের সমস্ত অবয়বে এক অদ্ভুত ধরণের চমক। যে চমক প্রসাধনের উগ্র কৃত্রিমতা শুধু অভিনেত্রীদের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। প্রসাধনের এ উজ্জ্বলতা আমার কোনদিনই ভালো লাগেনি। মনে হয় সমস্ত মুখের ওপর প্লাষ্টিকের একটা মস্ত মুখোশ জড়ান। রান্নাঘরের আগুনের তাত থেকে এসেছিলেন মিসেস তেজপাল। তবুও চুলের বিন্যাসে যে যত্নের ছাপ ছিল, ঠোঁটে লিপষ্টিকের যে মোহময় স্পর্শ ছোঁয়ানো ছিল, তাতে মনে হচ্ছিল না যে, উনি তক্ষুণি রান্নাঘর ছেড়ে এসেছেন। পরণে আসমানী শালওয়ার আর পাঞ্জাবী। পায়ে হাল্কা ফুল-তোলা সাদা জুতো, আর গলায় পাতলা মলমলের দুধ-সাদা ওড়না।

তেজপাল স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলেন, "ততক্ষণে একটা 'রবার' হয়ে যাবে না কি?"

"না না।" শশব্যস্তে বলেন মিসেস তেজপাল। "সময় নেই, অসময় নেই, তোমার খালি তাস আর তাস। টেবিলে খাবার দেওয়া হয়ে গেছে, এখন ব্রিজ নিয়ে বস আর কি·····"

এমন গোঁয়ার লোকের বিরোধিতা করা একটা সাহসের ব্যাপার বটে। ওর তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আর ঘন ভারী নিশ্বাসে প্রতিমুহূর্ত্তে আশঙ্কা আনছিল, এক্ষুনি উঠে কারুর দিকে একটা গুলি ছুঁড়ে দেন বুঝি। ভাবতে ভাবতেই আবার দরজার ঘণ্টা বেজে ওঠে, আর পাশের ঘর থেকে চাকর আর একদিক থেকে ঘুরে দৌড়ে যায়। এবার আসেন ক্যাপ্টেন রুদ্র আর মিসেস রুদ্র। আমরা আবার উঠে দাঁড়াই। দেরীতে আসার জন্যে ক্ষমা চাওয়ার পালা আরম্ভ হয়।

"গুড্ডীকে নিয়ে এলেন না তো?" আবদারের সুরে জিজ্ঞেস করেন মিসেস তেজপাল।

"ও ঘুমিয়ে পড়েছিল।" মিসেস রুদ্র বলেন। মাথায় দুই বেণী-বিন্যাস, পরণে ধূপছায়া ব্যাঙ্গালোর শাড়ী। ভরা শরীরের খাঁজে খাঁজে ভাঁজ। সর্ব্বাঙ্গে পাউডারের উদার প্রলেপ—তিনজন মহিলা বসেন সোফার ওপর।

"বড় তাড়াতাড়ি শুইয়ে দিয়েছেন ওকে।" কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়েন মিসেস তেজপাল। "আমার যেন মনে হচ্ছিল এক্ষুনি নিচে ওর কান্না শুনছিলাম।"

ডিনার স্যুটে কাপড়জামার প্রতি অত্যন্ত সজাগ ক্যাপ্টেন রুদ্র। হাঁটুর ওপরকার ভাঁজ ঠিক করতে করতে সোফার হাতায় বসে পড়েছিলেন। ঘাড় বেঁকিয়ে টাইএর গিঁঠ ঠিক করতে করতে বলেন, "আরে না, শোওয়া টোওয়া কিছু নয়। নিচে পর্য্যন্ত তো এসেই ছিল: সন্ধ্যে থেকেই জিদ ধরেছিল কাকিমার বাড়ী যাব, গান শুনব, নাচ শিখব।"

"তাহলে রেখে এলেন কেন?" সব ভুলে অনেক খানি মুখ খোলা রেখে প্রশ্ন করেন মিসেস তেজপাল।

"আমি তো আনছিলামই। রুমালে বেঁধে সঙ্গে করে ঘুঙুরও নিয়ে আসছিল। নিচে সিঁড়ি পর্য্যন্ত এসে হঠাৎ কান্না ধরলেন মেয়ে 'আমি যাব না।' একেবারে অস্থির করে তোলাতে আবার ফিরে গিয়ে রেখে আসতে হল। এইজন্যেই তো এত দেরী।" বলেন মিসেস রুদ্র।

"ফিরে আর কৈ গেলে? আমিই তো রেখে এলাম। তুমি তো বললে বেশী সিঁড়ি উঠলে নামলে তোমার সাড়ীর পাট নষ্ট হয়ে যাবে। আমি কত বোঝালাম ঐ বাঙালী মেয়েদের দেখে শেখ না—সোজা রাস্তা ধরে চললেও সাড়ীর কুঁচি উঠিয়ে ধরে রাখে।" স্ত্রীকে রাগাতে নিজেই হেসে ফেলেন রুদ্র। আমি দেখি ওঁর ছোট ছোট ঘন ভুরু বাটারফ্লাই গোঁফের ওপর এমন করে কাঁপছে যেন এক্ষুনি খুব মজার একটা কথা বলব বলব করছেন উনি। তীক্ষ্ণ চোয়ালের হাড় চামড়ার তলায় এমনভাবে নাচছিল যেন এক একটা ঢেউ উঠছে আর নামছে। মুচকি হেসে বলেন উনি: আমার ওঁর সঙ্গে কি আর বিয়ে হয়েছিল? এঁর পিতাঠাকুর আমাকে তো মেয়ের চাকর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন,—বৎস, উপায় কর আর কর্ত্রীর সেবায় চাল।"

কথাবার্ত্তা হাল্কা হয়ে আসে। সকলে মিসেস রুদ্রের দিকে চেয়ে হেসে ওঠে। কাল হয়ে উঠেছিলেন মিসেস রুদ্র। স্বামীর হাসিখুশি স্বভাব আর স্ত্রীর প্রতি আনুগত্যে গর্ব্বে বুক ভরে উঠছিল, তবু এত লোকের মাঝে কথায় লজ্জায় বুঝি কাল হয়ে উঠেছিলেন। বোধহয় মেজর তেজপালের উপস্থিতিতে এত হাল্কা ভাব ওঁর ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। ভুরু কুঁচকে ওঠে ওঁর। "আহা সেবা যদি করা হয়তো সে নিজেরই মেয়ের। আমার কি? তাছাড়া আমি ওকে সারা দিনরাত রাখি না, না? আর সেও যে কি একখান শয়তান মেয়ে হয়েছে—যে সমস্ত দিন যখনই দেখ কাকিমার গান···"

"আপনারাই দেখুন, রুদ্র মিসেস তেজপালের দিকে চেয়ে বলে, এ কথা কি ঠিক যে আপনি আমার মেয়েকে ভুলিয়ে নিচ্ছেন? একদিকে তো মেজর ধীরের ছেলে, আসতে না আসতেই ওকে কাঁধে নিয়ে সমস্ত দেশ ঘুরে বেড়াবে। এখন থেকে বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ হচ্ছে আর কি।" তারপর বিনুর দিকে ফিরে কিশোর ছুটিতে আবার কবে আসবে জিজ্ঞেস করতে থাকেন।

নিঃশ্বাস ফেলে হোঁচট খাওয়া ভঙ্গিতে মিসেস তেজপাল বলেন, "ইস কেন যে নিয়ে এলেন না তাকে। নিচে থেকে নিয়ে গেলেন। কি যে করেন আপনারা। আমি ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে খানিকক্ষণের মধ্যেই চুপ করিয়ে নিতাম ঠিক।

"আপনার কাছে তো ও আসছিলই"—মিসেস রুদ্র নিজের মেয়ের ওপর ওর স্নেহে গদগদ হয়ে বলেন,—"কিন্তু এখানে আসতে যে আবার ভয় পায় মেয়ে।" একবার মেজর তেজপালের দিকে চেয়ে বলেন,—বলে ওপরে বাত আছে। বাত কি? আমি জিজ্ঞেস করি।

"বাঘ।" বিনু বলে। "কিন্তু কিটিকে একেবারে ভয় করেনা। গায়ে মাথায় চড়ে ওর।"

কিটি তেজপালের এ্যালসেসিয়ান কুকুর।

"ওঃ"। আবার সবাই ড্রইংরুমে হাত পা ছাড়িয়ে শুয়ে থাকা হাতটার দিকে চেয়ে হেসে ওঠে। আমি দেখি মিসেস তেজপালের ভীতু ভীতু দৃষ্টি গিয়ে পড়ে মেজর তেজপালের ওপর—যেন আন্দাজ করতে চেষ্টা করে ওর মানসিক প্রতিক্রিয়া। আস্তে বলেন, আচ্ছা আমিই যাব ওকে আনতে।

"ওঃ, ভয়ানক জীব ছিল এটি।" দম একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন মেজর তেজপাল। কি যেন কেন হঠাৎ ওঁর মনে হয় সমস্ত হালকা হাসি-ঠাট্টা ওঁকে কেন্দ্র করেই জমা হয়। অশান্তিতে চঞ্চল হয়ে উঠেন মেজর তেজপাল। একটু সামলে আবার বলেন,—"বড় ঝামেলা শুরু করেছিল হতভাগা। আজ এর ছাগল নিয়ে যাচ্ছে, কাল ওর গরুর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে দিন দুপুরে একটা মানুষকেই তুলে নিয়ে গেল। আমি লাইনে ছিলাম। বম পিটানো আরম্ভ করা গেল। সাতদিন ধরে সে কি হয়রানি, 'আই সেড, বাই কিছু হোক, ওটাকে মারতেই হবে।' কথা বলতে বলতে সামলে নেন উনি।

আমি দেখি কথা বলতে বলতে মেজর তেজপাল শরীরটাকে এমনভাবে রাখেন যেন প্রত্যেকটি জোড়ের মুখেয় প্যাঁচ ঢিলে হয়ে গেছে। এমনিতে তো ফৌজি স্বভাবের অভ্যেস বশতঃ সমস্ত শরীরের অস্থিমজ্জা টান টান হয়ে থাকে সব সময়ই কিন্তু এখন যেন প্রত্যেকটি শিরায় এক অদ্ভুত প্রাণ-স্পন্দন জেগে ওঠে। উনি সবিস্তারে শিকারের বর্ণনা করতে থাকেন—কি রকম ভীষণ চালাকি করে বাঘটা টপ করে ছাগলটাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সামনে বসে লক্ষ্য ঠিক না পাওয়ায় মেজর তেজপাল নিচে নেমে এসেছিলেন··· মানা করা সত্ত্বেও শিকারের নিশানা দেখে দেখে দূরে চলে গিয়েছিলেন। তারপর কি করে একেবারে হঠাৎ বাঘটা নালা থেকে লাফ দিয়ে উঠে ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। উনিও তৈরীই ছিলেন; গুলি চালান দু-তিন গজের দূরত্ব থেকে। একটার পর একটা করে তিনটে গুলি। একজন পিটুনেকে এক থাবায় শেষ করে বাঘ পালায়। উনি আবার দুটো গুলি চালান। এরপর তেজপাল উঠে ওর কুমীরের চামড়ার জুতোর আগা দিয়ে যেখানে গুলি বিঁধেছিল সে জায়গাটা দেখান। তারপর ভেতরের ডাইনিং রুম থেকে একটা ছবি নামিয়ে আনেন উনি। সামনে পড়েছিল মড়া বাঘটা আর রাইফেলটা তার গায়ে বিধিয়ে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে একটা পা তার ওপর তুলে ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন ক্যাপ্টেন তেজপাল।

ঠিক একই ধরণের বাঘ মারার একটা গল্প, কিন্তু ওরা সকলে এমন ভাবে শুনছিল যেন এমন অভূতপূর্ব ঘটনা কোন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনছে এই প্রথম। মেয়েদের চেহারায় এমন তন্ময়তা আর আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল যে, সামনে সত্যিই বাঘ শিকার করা হচ্ছে। বিনুর চোখ বেরিয়ে আসছিল আর মিসেস রুদ্রের কপালে ঘামের রেখা ফুটে উঠেছিল। শুধু মিসেস তেজপাল অস্থির ভঙ্গিতে হাতে বাঁধা ঘড়ির চাবিটা নাড়াচাড়া করতে আরম্ভ করেন। এরপর সকলে মিলে সে বাঘের থাবাটা এমন সুন্দর আর পরিষ্কার ভাবে যে বাঁধিয়েছে তার কাজের প্রশংসা করতে সুরু করে। চোখ, দাঁত, গোঁফ—সবকিছু একেবারে সত্যি বাঘের যেন। তেজপাল বলেন কখনো কখনো ওকে দেখে কিটিও কি জোরে ডাকতে আরম্ভ করে।

এক বন্ধুর শিকারের গল্প আমারও মনে পড়ে যাচ্ছিল, আর ইচ্ছে হচ্ছিল শুনিয়ে দিই। আর প্রত্যেকের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন প্রত্যেকের মুখে ঠিক এমনই এক একটা গল্প চুলবুল করছে··· আমার থেকে থেকে মনে হচ্ছিল প্রত্যেকটি ছোটখাটো কথার ওপর দরকারের চেয়ে বেশী আগ্রহ দেখিয়ে এরা বুঝি কোন রকমে পার করছে সময়ের বোঝা। সামান্য কথা নিয়ে কতক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া!

বেয়ারা এসে খাবার তৈরী হওয়ার খবর দেয়। কথাবার্ত্তা মাঝখানেই শেষ হয়।

"রান্না ভালো না-হলে কিন্তু নিন্দে করতে পারবেন না।" সাজান টেবিলের একদিকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে বলেন মিসেস তেজপাল। "আজ তো যেমন তেমনই রান্না হল। অন্য আর একদিন ভালো করে কিন্তু খেতে হবে।" মেজর তেজপালের দিকে একবারও না চেয়ে তেমনি ভঙ্গিতে বলেন মিসেসে তেজপাল।

চেয়ার টানা, সাড়ীর খসখসানি, শব্দ করে মাড় দিয়ে ভাঁজ করা ন্যাপকিন, ছুরি-চামচে-কাঁটার শব্দ ঝঙ্কার তোলে এক সঙ্গে।

"আপনার বোধহয় এটা ভালো লাগছে না।" "এটা আর একটু নিন···" অনুরোধের মধ্যে মধ্যে মহিলারা কথা সুরু করেন পাড়া-পড়শি আর রান্নার এটা সেটা, পুরুষেরা আরম্ভ করেন নিজের নিজের 'ডিভিসনে'র আলোচনা। কোন জে-সি-ও'র বিচ্ছিরি ব্যবহারের কথা বলতে বলতে মেজর তেজপালের স্বর চড়ে ওঠে, ফুলে ওঠে কপালের রগ। আর সেই রাগের মাথায় একটা মাংসের টুকরো উনি এত

জোরে চিবিয়ে ফেলেন যে, তার হাড়গুলো পর্য্যন্ত মড়মড় করে ওঠে। আলোর দিকে চেয়ে থাকেন মিসেস তেজপাল। আমাদের সকলেরই লক্ষ্য আচমকা পড়ে ঐ দিকেই। এই একটু আগেই মিসেস তেজপাল কি একটা কাটতে দিয়ে ছুরি দিয়ে প্লেটের ওপর আওয়াজ করে ফেলেছিলেন খট করে'। সে সময় ওঁর আঙ্গুলগুলোর দিকে মেজর তেজপাল যে চোখে চেয়েছিলেন, তা এখনও মনে ছিল আমার।

আমি এদিক ওদিক চেয়ে দেখি, দেওয়ালে হলদে আস্তর করা ছিল আর চামড়ার 'কেসের' মধ্যে বন্দুক আর পিস্তল টাঙ্গান ছিল। আমার দৃষ্টি সেদিকে পড়া মাত্র মনে পড়ে যায় সেই 'গুলির ফুলের' কথা! বেয়ারা খুব তাড়াতাড়িই রুটিগুলো আনছিল। কিন্তু একা হাত হওয়ায় নিজেই সেঁকছিল, আবার পরিবেশনও করছিল। তরি-তরকারির ডোঙ্গা নিয়ে ঘুরছিল একদিক থেকে আর একদিক। থেকে থেকে মিসেস তেজপালের প্লেটের ওপর ঝুঁকে মুক্তোর মতন সাদা দাঁতে রুটি ছিঁড়তে ব্যস্ত মুখ আমার দিকে পড়তেই সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে অল্প অল্প হেসে উঠছিল। থেকে থেকে চুল ঝাপটাবার ছুতোয় আমাকে দেখছিলেন উনি। ওঁর কানে হাল্কা আশমানী রঙের ফুল অপূর্ব্ব দেখাচ্ছিল। উনি বুঝতে পারছিলেন যে আমি বড়ই একলা পড়ে গিয়েছি। আর যেন এই অস্বস্তিকর মনোভাব থেকেই থেকে থেকে আমাকে এটা ওটা নিতে অনুরোধ করছিলেন। ওঁর এই অনুভূতি যেন সবটুকু উপলব্ধি করতে পারছিলাম আমি। আর চোখোচোখি হতেই অল্প হেসে নির্ভয় দিচ্ছিলাম—"ভাববেন না। আমি তো ভালই আছি।" কিন্তু যতবার এ ঘটনা ঘটেছে, আমার দৃষ্টি ততবার গিয়ে পড়েছে মেজর তেজপালের ওপর।

এমনিতে ওপর থেকে দেখে সব খুবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। খাবার দাবারের খুবই প্রশংসা করা হল। কেউ এটা ভালো বল্লেন, অন্য কেউ আর একটা। পাল্টা নিমন্ত্রণ দিলেন প্রত্যেকে প্রত্যেককে। তারপর আবার ড্রইংরুমে বসে ইংরিজি এ্যামেরিকান পত্রিকায় অনেকবার পড়া 'মজা' বলাবলি চলল। 'বলিয়ে'র সম্মানের জন্যে শেষপর্য্যন্ত হাসতেও হল সবাইকে। বেয়ারা কফি দিয়ে গেল। একটা টেবিলেই সব পেয়ালা ভর্ত্তি করে একে একে সকলকে দিলেন মিসেস তেজপাল। সিগারেট আর কফির মধ্যে বসে এ্যালবামের এক একটা পাতা ওলটাই আমি, আর প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কা করতে থাকি এই বুঝি কেউ ব্রিজের প্রস্তাব করে বসেন আর আমার রিপোর্ট কাল পর্য্যন্তও তৈরী না হয়ে ওঠে। তাই-ই হল। উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। সকলের ঘাড় ফিরে যায় আমার দিকে। "কাল রিপোর্ট তৈরী করতেই হবে" বলে ক্ষমা চেয়ে চলে আসি। রুদ্র বলে বসেন, "আহা, রিপোর্ট লেখা কি আর আপনার পালিয়ে যাচ্ছে মশাই।" বাকি সকলে বিদায় জানান দাঁড়িয়ে উঠে। বিনু আর মিসেস তেজপাল পৌঁছতে আসেন সিঁড়ি পর্য্যন্ত।

"বড্ড 'বোর' হলি তুই না?" বিনু জিজ্ঞেস করে।

"সত্যি। আপনি একেবারে একা পড়ে গিয়েছিলেন।" ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে আন্তরিক ভাবে বলেন মিসেস তেজপাল,—"আবার আসবেন একদিন।" এমন ভরপুর দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে উনি মাথা ঝটকান যে, ওঁর কানের দুটো হাল্কা নীল ফুল মনের কোন অন্ধকার আকাশে তারার ফুলের মতন ঝিকঝিক করতে থাকে। দরজার গায়ে এক হাত রেখে দাঁড়িয়েছিলেন উনি। দৃষ্টি ওঁর মাথা ছাড়িয়ে পেছনে দেওয়ালে টাঙ্গান হরিণের মাথা আর 'গুলির ফুলের' ওপর পড়ে আর সমস্ত মুখের স্বাদ যেন তিক্ত হয়ে ওঠে। কিছু বোধহয় বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু এক মুহূর্ত্তে এমনভাবে সব উড়ে পালায়—কিছুতেই মনে আসে না আর কিছুতেই।

মনে মনে আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম যে, এ ফ্ল্যাটে আর আসা উচিৎ নয়। কিন্তু ওঁর আগ্রহের কাছে সব বুঝি ভুল হয়ে যায়। আমি আশ্বাস দিই—আবার আসার। মাথা নিচু করে প্রত্যেকটি সিঁড়ি গুনে গুনে নামবার মুখে মিসেস তেজপাল বললেন—"আমার নামে কবিতা তো লিখলেন না। এবার কিন্তু লিখবেন ঠিক।"

ওঁর গলার স্বর শুনে এতক্ষণে আমার মনে পড়ে যে, দরজায় দাঁড়িয়ে আমি বলতে চেয়েছিলাম "মিসেস তেজপাল, সারাদিন ধরে গান করেন আপনি, অথচ আজ আমাদের তো শোনালেন না।" অন্য কেউই ওঁকে গানের কথা বলেও নি।

নিজের ফ্ল্যাটে এসে আমি মুক্তির গভীর নিশ্বাস নিই। যেন কোন গভীর পরিশ্রমের কাজ করে এলাম, যাতে সমস্ত শরীর মন এক অস্বাভাবিক বিকল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। ড্রইংরুমে সোফায় শুয়ে শুয়ে বিফল শূন্য মনে শুধু চেয়ে রইলাম ঘূর্ণমান পাখাটার দিকে। এই ঘরটাও তো ওপরের ঘরটার মতনই—কিন্তু দুটো যেন দুই পৃথিবী। ওপর থেকে ক্যাপ্টেন রুদ্রের গলার আওয়াজ ভেসে আসছিল। নিচে মেজর টার্ণাবের বাড়ীর পিয়ানোর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন ফিলজিতের ফ্ল্যাটের রেডিওতে 'তোমার পৃথিবীতে সব কিছু আছে শুধু প্রেম নেই' গান হচ্ছিল। বাইরে পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে রাস্তার গ্যাসের আলো ঘোমটা তোলা গাছের মাথার ওপর দিয়ে দেখা দিচ্ছিল। থেকে থেকে ভুঁ-ভুঁ করতে করতে মোটর আর মাল-বোঝাই ট্রাক ঘোঁ-ঘোঁ করে চলে যাচ্ছিল। মনের ভেতর কে যেন বলল 'আজ দানা যেন বড় অসুস্থ ছিল।' এটা রণধীরের ভাবনা। আমি শুধু শব্দে রূপ দিলাম। ওর 'দানা' শব্দটা মনে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনেই আবার হাসি এসে পড়ে···

আজ সে সব ঘটনার এক বছর হয়ে গেছে। বিনু বোধহয় বিলিয়ার্ডস খেলা দেখতে গিয়েছিল। অন্তত আমি তাই ভেবেছিলাম। চা খেতে খেতে মনে হল ঐ ফ্ল্যাটে সত্যি সত্যি কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার ছিলই। আজ বিনুর কথায় পেছন ফিরে সেদিনের দিকে চেয়ে মনে হল সেদিন মেজর আর মিসেস তেজপালের মধ্যে যা দেখেছিলাম, তা শুধুই মনের অমিল নয়—একটা গভীর ভিন্নমুখী চরিত্র মাঝখানে খাড়া হয়ে উঠেছিল দুজনের। বিনুর কাছে সব সময় মিসেস তেজপালের হাসিখুশি আমুদে স্বভাবের কথা শুনতাম। সারাদিন সব কাজে হেসে খেলে গান গেয়ে কাটত ওঁর সময়। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম—মেজর তেজপালের উপস্থিতি ওঁকে যেন স্তব্ধ কঠিন করে সব কিছু থেকে ঢেকে রাখত। রণধীর আর তেজপালের র‍্যাঙ্ক এক ছিল। কিন্তু আজও রণধীর কর্ণেল হবার পরও সে যে কি সে-কথা একবারও কারুর মনে পড়েনি। আর মেজর তেজপালের এমন প্রতিটি কথায় চলায় বলায় মিলিটারির বড় অফিসার ফুটে উঠত। উন্নাসিকতা এমন একটা অদৃশ্য স্বাতন্ত্র্যবোধ সমস্ত কথাবার্ত্তার মধ্যে ছেয়ে থাকত, যে মনে হত যেন অনেক ওপরের কোন মানুষ কথা বলতে চেষ্টা করছে নিচের দিকে খানিকটা বুঝি ঝুঁকে পড়ে। [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

অনুবাদ—নীলিমা মুখোপাধ্যায়

মৌন-বসন্ত —এস, পি, মণ্ডল

॥ আ লো ক চি ত্র ॥

চয়ন —বিবেক সাহা

নিশাতবাগ থেকে (কাশ্মীর) —নির্মল দত্ত

বার-দুয়ারী (গৌড়) —বিবেক সাহা

বিশ্রাম

—প্রাণগোপাল পাল

পদ্মবন

—দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী
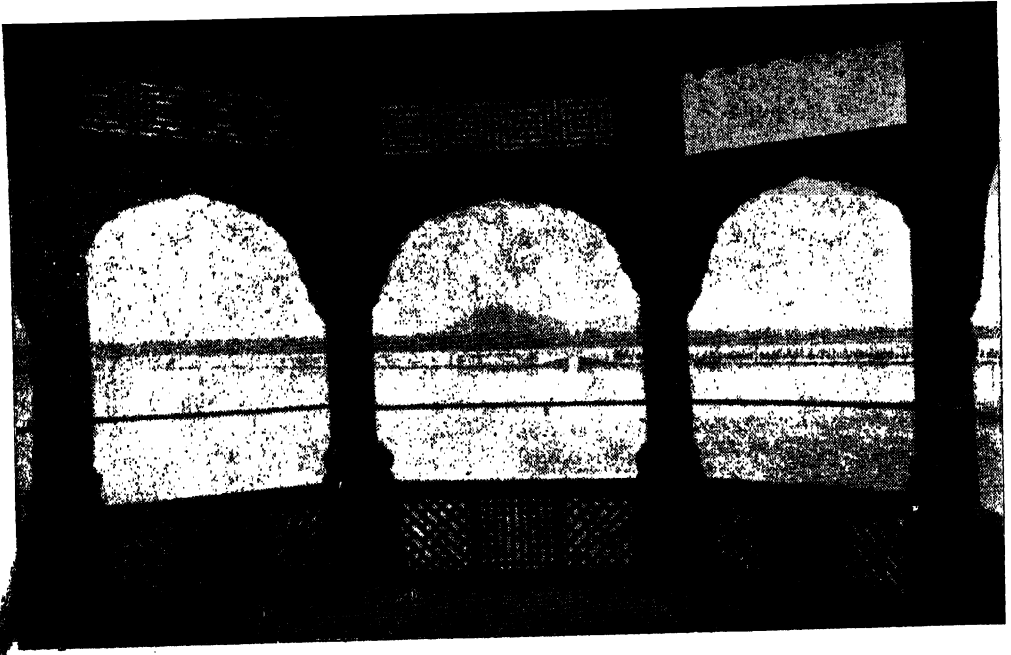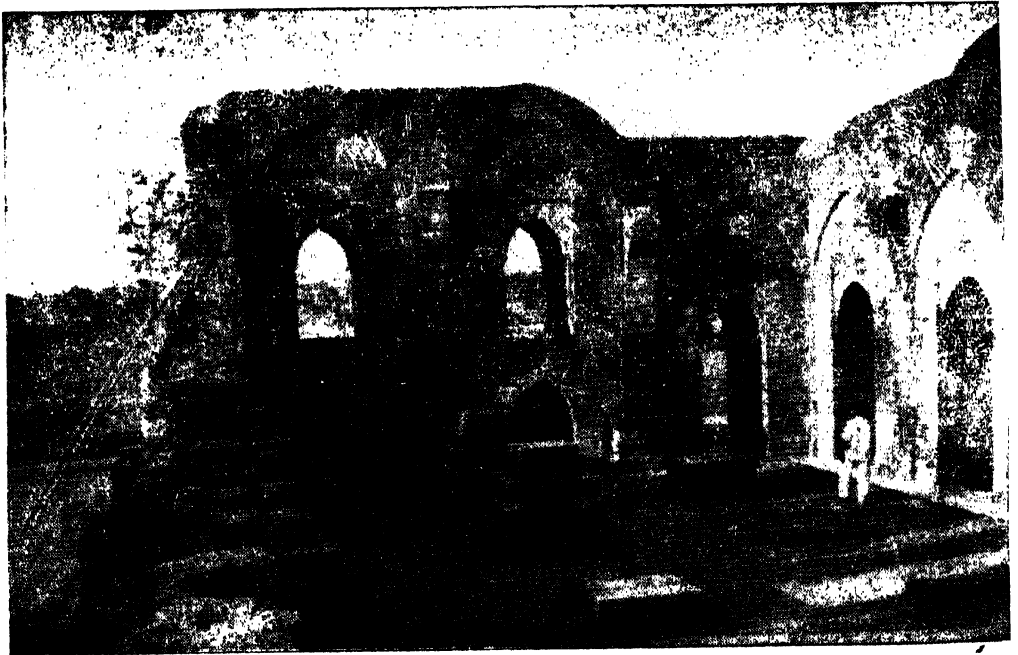
পাঠিকা

—চিত্ত নন্দী

আমি চিনি গো চিনি— —শান্তিময় সান্যাল

ছুটিতে বেরোবার সময়টা গ্রীষ্মের মাঝ বরাবর পিছিয়ে দিতে বলেছে সে এডনাকে। এখন যে কাজগুলো হাতে নিয়েছে তার মধ্যে নিজের ছবিটাকে শেষ করতে পারলে আপাতত একটা ছেদ টানা যায়। স্কটল্যাণ্ডের ছুটিটা এবার বেশ আনন্দে কাটবে বলেই মনে হয়। বহুকাল পরে এ ছুটিটা উপভোগ করা যাবে, কারণ লণ্ডনে ফেরার নতুন একটা তাগিদ থাকবে। এখন সকালে অফিসের কয়েক ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে যায় যেন। রুটিন মাফিক কাজ করে যায়, দুপুরে খাবার পর আর ফিরে যায় না। সহকর্মীদের বলে তার বাইরে কাজের চাপ দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। শরৎকাল নাগাদ তাকে এ ব্যবসা থেকে অবসর নিতে হবে বলেই মনে হয়। ওপরওয়ালা মালিক বলে, "তুমি নোটিস না দিলে, আমরা তোমায় নোটিস দিতে বাধ্য হতাম।"

ফেনটন কাঁধ দুটোকে ঝাঁকিয়ে নেয়। ওরা যদি এ বিষয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করে, তবে যত শীঘ্র বিদায় নেওয়া যায় ততই ভাল। দরকার হলে স্কটল্যাণ্ড থেকেও দরখাস্ত করা যাবে। তাহ'লে সারা শরৎকাল আর শীতকাল ভর আঁকা যাবে। একটা ভাল মতো ষ্টুডিও ভাড়া করবে। আট নম্বর একটা জোড়াতালি দেওয়া ব্যাপার বৈ তো নয়। বড় ষ্টুডিও, ভালো আলো, লাগোয়া এতটুকু রান্নাঘর। কয়েকটা গলি পেরিয়ে ক'টা বাড়ি উঠছে. শীতের সময় কাজে লাগবে বলেই মনে হয়। সেখানে মনের মতো কাজ করা যাবে। ভাল রকম খেটে ভালো কিছু দাঁড় করানো যাবে, নিজেকে একেবারে অপেশাদারী মনে হবে না তখন।

ফেনটন নিজের ছবিটাতে মেতে আছে এখন। মাদাম কোফম্যান সামনের দেওয়ালে তাকে একটা আয়না টাঙিয়ে দিয়েছে, কাজেই শুরু করতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু চোখ আঁকতে গিয়েই যত গণ্ডগোল, চোখ দুটো বন্ধ না করলে আঁকা যায় না, অথচ বন্ধ করলে ঘুমন্ত বা অসুস্থ মানুষ বলে মনে হয়। কি রকম যেন গা ছম ছম করে।

সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেছে এই কথা জানাতে এলে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে—"মাদাম কোফম্যান, তোমার কেমন লাগছে?"

ঘাড় নেড়ে উত্তর দেয় সে,—"ও বাবা: আমার ভয় করছে। না, না মিঃ সিমস এ কখনো আপনি নন।"

হাসিতে ডগমগ করে শিল্পী, "তোমার পক্ষে একটু বেশী আধুনিক হয়েছে সত্যি—এই ষ্টাইলের নাম হল আভাস্ত গার্দে।"

মনটা খুশিতে ভরে উঠেছে। নিজের এই ছবিটা বাস্তবিক দারুণ হয়েছে। মুখে বলে,—যা হোক এখনকার মতো এতেই চলবে। সামনের হপ্তায় ছুটিতে বেরোব।"

"চলে যাবেন আপনি? তার গলার স্বরে এমন একটা উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে যে, ভদ্রলোক পেছন ফিরে তাকাতে বাধ্য হয়। "হ্যাঁ", জবাব দেয় সে, "বুড়ি মাকে স্কটল্যাণ্ডে নিয়ে যাব। কি হল?"

উদ্বেগে বিকৃত সেই মুখের ভাব দেখে যে কেউ ভাববে হঠাৎ তাকে যেন দারুণ আঘাত করা হয়েছে।

"কিন্তু আমার আপনি ছাড়া যে আর কেউ নেই"—বলে মেয়েটি—"আমি যে সম্পূর্ণ একা।"

ভরসা দেয় ফেনটন,—"তোমার টাকা তুমি পাবে। আমি আগাম দিয়ে যাব। তিন হপ্তা মাত্র আমরা বাইরে থাকব।"

মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে চেয়ে রইল; কি কাণ্ড।

অ ছি না

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(Alibi অবলম্বনে)

ড্যাফ্নে ডু মরিয়ের

তার চোখে জল ভরে আসছে যে। একি কাঁদছে নাকি! সর্বনাশ!

মেয়েটা কাঁদে আর বলে, "আমি কি করব? কোথায় যাব?"

বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করল যে! এ আবার কি ন্যাকামি! কি করবে? কোথায় যাবে? টাকা তো পাবেই সে। যেমন আছে তেমনি থাকবে। বাবা:, বেশী কিছু বাড়াবাড়ি হবার আগেই তাকে ষ্টুডিও খুঁজে নিতে হবে। মাদাম কোফম্যান তার কাঁধে চেপে বসবে, এ কিছুতেই চলবে না।

কড়া স্বরে ধমক দেয় সে, "মাদাম কোফম্যান, তুমি জান বরাবর থাকতে আমি আসিনি। শীগ্‌গিরই চলে যাব। সম্ভবতঃ শরৎকালেই যাব। ফলাও করে বসার জন্য জায়গা আমার চাই। আমি আগে থেকে তোমায় জানাব। কিন্তু জনিকে নার্সারি স্কুলে দিয়ে তোমার দৈনিক কোন চাকরি নেওয়া দরকার। তাতেই তোমার শেষ রক্ষা হবে।"

মনে হ'ল মার খেয়েছে মেয়েটা। একেবারে মুষড়ে হতভম্ব হয়ে গেছে। বোকার মতো বার বার বলছে—যেন বিশ্বাস হচ্ছে না, "আমি কি করব? কবে যাবেন আপনি?"

উত্তর আসে, "সোমবার স্কটল্যাণ্ডে, তিন হপ্তা আমরা বাইরে থাকব।" শেষ কথাগুলো জোর দিয়ে উচ্চারণ করে, যেন সন্দেহের কোন অবকাশ না থাকে। রান্নাঘরে হাত ধুতে ধুতে সে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, মেয়েটা বড্ড বোকা। ভাল চা করতে পারে, তুলি ধুতে পারে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। খুশি খুশি গলায় প্রস্তাব করে, "তুমি নিজেও তো একটু ছুটি করলে পার। জনিকে নিয়ে নদীপথে সাদেণ্ড কিম্বা আর কোথাও ঘুরে এস না।"

কোন সাড়া এল না ওধার থেকে, বোকার মতো ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাউনি আর হতাশা ভরা কাঁধের ঝাঁকুনি ছাড়া।

পরদিন শুক্রবার কাজের সপ্তাহের শেষ দিন। সকালে একটা চেক্ ভাঙিয়ে নিল, কারণ মেয়েটিকে তিন হপ্তার আগাম দিতে হবে। এ ছাড়া খুশি করার জন্য বাড়তি পাঁচ পাউণ্ড দিয়ে যাবে।

আট নম্বরে এসে ছাখে জনি তার নিজের জায়গার সিঁড়ির মাথায় পাপোষে বাঁধা অবস্থায় বসে আছে। ক্লিপুজ্বাল

যাবৎ বাচ্চাটার এ হাল চোখে পড়েনি। পেছনের দোর দিয়ে নিচের তলায় ঢুকে ভাখে রান্নাঘর বন্ধ, ওয়ারলেসের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। দরজা ঠেলে ভাখে শোবার ঘরের দরজাও বন্ধ।

"মাদাম কোফম্যান?"—ডাকে সে, "মাদাম কোফম্যান?"

কাঁপা কাঁপা গলার ক্ষীণ স্বরে জবাব আসে—"কি?"

—"কোন অসুবিধা হয়েছে কি?"

একটু থেমে উত্তর আসে,—"আমার শরীর ভাল নেই।"

কেনটন্ জিজ্ঞেস করে—"কিছু করতে পারি কি?"

"না।"

যাক্ এই তো অবস্থা। নিশ্চয় তাকে বাজিয়ে নেবার চেষ্টা সুস্থ তাকে কোন দিনই দেখায়নি, কিন্তু এমন ব্যবহার তো আগে কখনও করেনি। চা' তৈরীর কোন চেষ্টা দেখা গেল না। ট্রে টা পর্যন্ত সাজানো নেই।—টাকার খামটা রান্নাঘরের টেবিলে রেখে দিয়ে ডেকে বলে,—"তোমায় টাকা এনেছি। সবশুদ্ধ কুড়ি পাউণ্ড। বাইরে কোথাও গিয়ে এর খানিকটা খরচ করে এসো না একবার! বিকেলটা ভারি সুন্দর হয়েছে আজ। বাতাসে তোমার উপকার হবে।"

সহজ ব্যবহার দিয়ে ওর স্থাকামির জবাব দেওয়াই ঠিক হবে। দরদের কাজ নয়।

শিস্ দিতে দিতে ষ্টুডিওতে ঢুকে পড়ল। গত সন্ধ্যায় যেমন অবস্থায় সব ফেলে গিয়েছিল, সব ঠিক সেই অবস্থায় পড়ে আছে। তুলি ধোয়া হয়নি। ময়লা প্যালেটের ওপর আটকে রয়েছে। ঘরের অবস্থা তথৈবচ। বাস্তবিক এ' একেবারে মাথায় উঠেছে। ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে রান্নাঘরের টেবিল থেকে টাকার খামটা তুলে নিয়ে আসে। ছুটির কথা বলাই ভুল হয়েছে। হপ্তার শেষে ডাকে টাকা পাঠিয়ে; স্কট্ল্যাণ্ড যাবার কথা চিঠি লিখে জানালেই হ'ত। উল্টে এই গোমড়া মুখের ব্যাপার—কাজের ফাঁকি—গা জলে যায়। বিদেশী বলেই এমন, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। ওদের বিশ্বাস নেই। শেষ অবধি ওরা তোমায় মুস্কিলে ফেলবেই ফেলবে।

তুলি, প্যালেট, টার্পেনটাইন, কিছু ন্যাকড়া নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে, তেড়ে কল খুলে দিয়ে জোরে জোরে শব্দ করে ধুতে থাকে, মেয়েটা বুঝুক—এই সব চাকর বাকরের কাজ তাকে নিজে হাতে করতে হ'চ্ছে। চায়ের পেয়ালায় টুং-টাং শব্দ করে, চিনির টিনটা ঝাঁকি দেয়। তবু শোবার ঘর থেকে কোন শব্দ আসে না। উঃ কি জ্বালা···যাক্‌গে মরুক গে···

ষ্টুডিওতে ফিরে গিয়ে নিজের ছবিটায় শেষ টান দেয়। কিন্তু মন দিতে অসুবিধা হচ্ছে আজ। কাজ এগোয় না। ছবিটা মরা মরা লাগে। সমস্ত দিনটাই বরবাদ করে দিল মেয়েটা। শেষ পর্যন্ত সাত দিনের জন্যে ঘণ্টাখানেক আগেই বাড়ি ফিরে যাবে বলে স্থির করল। নাঃ জিনিসপত্র পরিষ্কার করেই যাবে, ও মেয়েকে বিশ্বাস নেই আর। তিনহপ্তা সব ঐ ভাবেই ফেলে রেখে দেবে হয়তো।

একটার পর একটা ক্যানভাস গুছিয়ে তোলার আগে দেওয়ালের গায়ে পর পর ঠেস দিয়ে রেখে ভাববার চেষ্টা করে প্রদর্শনীতে সাজালে কেমন দেখতে হবে।

চোখে লাগে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। সবকটা একত্র করে একটা কিছু বলা যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই কথাটা যে কি, তা তার জানা নেই। নিজের কাজের সমালোচনা করা শক্ত বৈকি। কিন্তু ধর, মাদাম্ কোফম্যানের মাথার ছবিটা—যাকে ও মাস্কের সঙ্গে তুলনা করেছিল—হয়তো মুখের আকারের মধ্যে কিছু আছে, কিম্বা ঐ চোখ দুটো—ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটোয় বোধহয়···। খুব চোখে লাগছে ছবিটা আর ঘুমন্ত-মানুষ, নিজের ছবিখানার যথেষ্ট মানে আছে বৈকি।

মনে মনে কল্পনা করে নেয়—বণ্ড ষ্ট্রীটের ছোট্ট গ্যালারিগুলোর মধ্যে একটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে এডনাকে সে বলছে,—"শুনেছি এক নতুন শিল্পীর প্রদর্শনী হচ্ছে এখানে, প্রচণ্ড মতদ্বৈধ চলেছে তাকে নিয়ে। সমালোচকরা ভেবে পাচ্ছে না লোকটা প্রতিভাবান না পাগল।

এডনা যেন উত্তর দিচ্ছে,—"তোমার জীবনে এই প্রথম এ ধরণের জায়গায় আসা—তাই না?" কি বিপুল শক্তি, কি অভাবনীয় বিজয় গর্ব! তার পর যখন আসল খবর শুনবে, তখন এডনার চোখে নতুন করে শ্রদ্ধার আলো জ্বলবে। এতদিনে তার স্বামী বিখ্যাত হ'য়ে উঠেছে। অবাক করার এই যে আনন্দ এইটুকুই তার কাম্য। শুধু এইটুকুই! অবাক করার আনন্দ।·····

শেষ বারের মতো পরিচিত ঘরটার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নেয় কেনটন—ক্যানভাসগুলো এক জায়গায় গুছিয়ে রাখা হয়েছে। ইজেলেটা নামানো, তুলি, প্যালেট ধোয়া মোছা কাগজে জড়ানো হয়ে গেছে। স্কটল্যাণ্ড থেকে ফিরে যদি অন্যত্র চলে যেতে হয়, বিশেষতঃ মাদাম কোফম্যানের এই রকম বোকার মতো ব্যবহারের পর তো চলে যাওয়াই উচিত। তাহ'লে সব ঠিকঠাক গোছানো পাওয়া যাবে। শুধু একটা ট্যাক্সি ডেকে মালপত্র তুলে নিয়ে রওনা হবার অপেক্ষা।

জানলা দরজা বন্ধ করে; ফেলে দেওয়া ছবি আঁকার ফালতু টুকরো, এটা সেটা মিলিয়ে একটা প্যাকেট বগলদাবা করে আরেক বার রান্নাঘরে গিয়ে শোবার ঘরের বন্ধ দরজার বাইরে থেকে সাড়া দিল, "আমি চললাম। আশা করি কাল নাগাদ ভাল হয়ে যাবে। তিন হপ্তা পরে দেখা হবে।"

রান্না ঘরের টেবিলের ওপর থেকে খামটা ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে, এটুকু নজর এড়ালো না। হয়তো তেমন অসুস্থ কিছু নয়। তারপর শোবার ঘরে নাড়াচাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। মিনিট দু'এক পরে দরজাটা সামান্য কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হ'ল, ঠিক দরজার ওপারেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। একি মেয়েটাকে ভুতের মতো দেখাচ্ছে যে! মুখের ওপর থেকে রক্তের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। চুলগুলো এলোমেলো, চ্যাটচাটে আঁচড়ানো পর্যন্ত হয়নি। এত গরমের দিনেও শরীরের নিচের দিকটা একটা কম্বলে জড়ানো। হাওয়ার লেশমাত্র নেই, তবু মেয়েটির গায়ে মোটা পশমের জামা।

উদ্বিগ্ন স্বরে কেনটন খবর নেয়—"ডাক্তার দেখিয়েছ?"

মাথা নেড়ে না বলল মেয়েটি।

সে বলে,—"আমি হ'লে দেখাতাম, তোমার চেহারা মোটেই ভাল ঠেকছে না।" পাপোষে বাঁধা ছেলেটার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।—"জনিকে এনে দেব?"

"তাই দিন দয়া করে।" তার চোখ দুটো দেখে ব্যথা খাওয়া পশুর কথা মনে পড়ে যায়। মনটা কেমন করে ওঠে। ওকে এ অবস্থায় ফেলে যেতে খুব খারাপ লাগে। কিন্তু কি উপায়?

নিচেকার সিঁড়ি দিয়ে উঠে ফাঁকা হলঘরটা পেরিয়ে সদর দরজা খুলে দেয়। বাচ্চাটা তখনও সেখানে কুঁজো হয়ে বসে আছে। ফেন্‌টন্ বাড়িতে ঢোকার পর থেকে এ পর্যন্ত সে তো আর নড়তে পারেনি। ফেন্‌টন্ বলে, "এস জনি, আমি তোমায় নিচে তোমার মার কাছে নিয়ে যাই।"

দড়ি খুলতে দিল বাচ্চাটা। মেয়েটির মতো বাচ্চাটার মধ্যেও কেমন যেন বিতৃষ্ণার ভাব আছে। ফেন্‌টন ভাবে কি অদ্ভুত জুটেছে দুটিতে, এই মা, আর ছেলে। কোনরকম আর্ত সেবায়তনের মতো জায়গায় কারুর জিম্মায় থাকা উচিত দু'জনেরই। এদের মতো লোকেদের দেখা শোনা করে এমন জায়গা নিশ্চয় আছে কোথাও। বাচ্চাটাকে নিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের টেবিলের ধারে ও'র চেয়ারে বসিয়ে খোঁজ নেয়, "ওর চা কি হ'ল ?"

মাদাম কোফম্যান জবাব দেয়,—"এই দিচ্ছি।" তেমনি কম্বলে জড়ানো অবস্থায় দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা কাগজের প্যাকেট হাতে করে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

সে জিজ্ঞেস করে,—"ওটা কি ?"

মেয়েটি বলে, "আপনার জঞ্জালের সঙ্গে এটাও যদি ফেলে দেন তো বড় উপকার হয়। আসছে হপ্তার আগে জমাদার আসবে না।"

প্যাকেটটা ও'র হাত থেকে নিয়ে মেয়েটির জন্য আর কিছু করা যায় কিনা ভাবতে চেষ্টা করে। তারপর বিব্রত ভাবে বলে—"তোমায় এ অবস্থায় দেখে যেতে খুব খারাপ লাগছে। আর কিছু চাই না তোমার ?"

সে জবাব দেয়,—"না," মিঃ সিমস্ নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করে না। হাসবার চেষ্টা বা হাত বাড়িয়ে বিদায় দেবার চেষ্টা পর্যন্ত করে না। চোখের ভাবে বিরক্তির লেশ নাই। বোবা দৃষ্টি শুধু।

সে বলে, "স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে চিঠি দেব। তারপর জনির মাথায় হাত বুলিয়ে "চলি তবে" ব'লে বিদায় নেয়। এই বোকার মতো চলতি কথাটা সাধারণতঃ সে ব্যবহার করে না। তারপর পেছনের দোর দিয়ে বেরিয়ে ফটক পেরিয়ে বোর্পিং স্ট্রীট ধরে এগিয়ে যায়। বুকের ভেতর কি যেন এক অপরাধবোধ চেপে বসে আছে। নিজের ব্যবহারটা যেন বড় বেশী কাঠখোট্টা বলে মনে হ'ল। এগিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে মেয়েটিকে দেখানোই উচিত ছিল হয়তো।

সেপ্টেম্বর মাসের আকাশ জুড়ে মেঘ করে আছে, বাঁধের কাছে ধুলোয় অন্ধকার। ব্যাটারসি বাগান ম্লান, ঝিমিয়ে পড়া গ্রীষ্মশেষের রসকসহীন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে বিশুদ্ধ বায়ু কিছু সেবন করলে উপকার পাওয়া যাবে।

নিজের প্যাকেটটা খুলে একে একে জঞ্জালগুলো নদীতে ফেলে দিতে লাগল। জনির মাথাটা খুব বিশ্রী আঁকা হয়েছিল বটে। বেড়াল আঁকার চেষ্টাও। কি দিয়ে যেন নষ্ট একটা ক্যানভাস ব্যবহার করা যায়নি। ব্রিজের ওপর থেকে তারা স্রোতের মুখে বয়ে গেল। ক্যানভাসটা পলকা সাদা চেহারা নিয়ে দেশলাই-এর বাক্সের মতো ভেসে গেল। চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে দেখে মন কেমন করে ওঠে।

ধার দিয়ে দিয়ে বসতির দিকে এগিয়ে গেল সে, তারপর মোড় ঘোরবার ঠিক আগে মনে পড়ে গেল মাদাম কোফম্যানের জঞ্জালের প্যাকেটটা ফেলা হয়নি। নিজের জিনিসগুলোর ভেসে যাওয়া দেখতে দেখতে ভুল হয়ে গেছে।

ফেন্‌টন্ নদীতে প্যাকেটটা ফেলতে গিয়ে দেখে এক পুলিশ তার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এভাবে জঞ্জাল ফেলা বে-আইনী। আত্মসচেতন হয়ে হেঁটে চলল সে। একশো গজ যাবার পর ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখে, পুলিশটা তখনও তার দিকে চেয়ে আছে। কি আশ্চর্য! এতে করে নিজেকে শুধু শুধু অপরাধী মনে হচ্ছে। গুণ গুণ করে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে কাগজের প্যাকেটটা বেপরোয়া ভাবে দোলাতে দোলাতে এগিয়ে যায় সে। চুলোয় যাক্ নদী। চেল্‌সি হাসপাতালের বাগানে ঢুকেই প্রথম জঞ্জালের বাক্সে কতগুলো খবর কাগজ আর কমলা খোসার গাদার ওপর প্যাকেটটা ফেলে দিল। এতে কোন দোষ নেই। বোকা পুলিশটা তখনও রেলিং এর ফাঁক দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে, কিন্তু ফেন্‌টন্ যে তা'ক দেখছে ; এ কথাটা জানতে দেবে না কিছুতেই। কেউ ভাবতে পারে সে বুঝি একখানা বোমা ফেলে দিয়ে গেল। তারপর পা চালিয়ে বাড়ির দিকে চলল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে মনে পড়ে গেল আলহুস্‌নরা আজ তাদের ছুটির আগে শেষ দেখা করতে আসবে, আর রাত্রে খেয়ে যাবে। এককালে যেমন লাগত এখন আর সেকথা ভাবতে তেমন খারাপ লাগে না। এদের সঙ্গে গল্প করার সময় ফাঁদে পড়া বা দম্ বন্ধ হয়ে আসা এ জাতীয় কোন অনুভূতি তাকে আর পীড়া দেয় না। জ্যাক আলহুস্‌ন্ যদি জানে যে কিভাবে বিকেলটা কাটায় সে, তবে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। নিজের কানকে সে বিশ্বাস করবে না।

"আরে, তুমি আজ এত সকাল সকাল যে ?" বসার ঘরে ফুল সাজাতে সাজাতে এডনা বলে।

জবাব দেয় ফেন্‌টন্,—"হ্যাঁ আজ আফিসে সময়মতো সব গুছিয়ে নিয়েছি, ভাবলাম যাবার আগে টুকিটাকি কি লাগবে দেখে নেবার সময় পাওয়া গেল।"

স্ত্রী বলে,—"আমি যে কত খুশি হয়েছি কি বলব! ভেবেছিলাম বছরের পর বছর স্কটল্যাণ্ডে যেতে তোমার একঘেয়ে লাগবে। কিন্তু তোমায় দেখে মোটেই তা মনে হচ্ছে না। বহু বছর তোমায় এমনটি দেখি নি।"—বলে তার গালে চুমু খেল, সেও পরম তৃপ্তি ভরে তার গালে চুমু দিল। ম্যাপ দেখতে বসে নিজের মনে হাসি পায়। বেচারী এডনা জানে না, তার স্বামী কত বড় প্রতিভাবান ব্যক্তি।

আলহুস্‌নরা এসেছে—ঠিক খেতে বসতে যাবে সবাই এমন সময় সদর দরজায় ঘণ্টা বেজে ওঠে।

এডনা চটে যায়,—"কি ব্যাপার? তুমি কি কাউকে আসতে বলে ভুলে গেছ ?"

ফেন্‌টন্ জবাব দেয়,—"ইলেকট্রিক বিল দিতে ভুলে গেছি। ওরা আমাদের (তার) কেটে দিতে এসেছে, আমাদের আর (মুরগী) কেটে কাজ নেই।" মুরগীটা ছুরি দিয়ে ভাগ করতে করতে থেমে যায়, আলহুস্‌নরা হেসে ওঠে।

এডনা বলে, "আমি দেখছি। রান্নাঘর থেকে 'মে'কে এখন ডাকতে আমার সাহস হয় না। কি কি পদ হয়েছে তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ—নরম-সেঁকা মুরগী ওটা।"

কয়েক মিনিট পরে খানিক তামাসা ভেবে, খানিক বিব্রত হয়ে ফিরে এসে বলে,—"ইলেক্ট্রিকের ব্যাপার নয়। পুলিশ।"

ফেনটন তো অবাক,—"পুলিশ?"

জ্যাক আলছসন আঙুল নেড়ে বলে, "আমি জানতাম, এইবার ঠিক ধরা পড়ে গেছ হে।"

ছুরিটা নাবিয়ে রেখে ফেনটন জিজ্ঞেস করে,—"বাস্তবিক এডনা, কি চায় ওরা?"

জবাব আসে,—"কি করে জানব বল? একটা সাধারণ পুলিশ সঙ্গে একজন এমনি পোশাক পরা পুলিশেরই লোক বলে মনে হ'ল। ওরা বাড়ির কর্তার সঙ্গে কথা বলতে চায়।"

বিরক্তিভরে কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে নিয়ে স্ত্রীকে বলে, "তোমরা চালিয়ে যাও, আমি ওদের বিদেয় করে আসি। হয়তো ঠিকানা ভুল করেছে।"

খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে বসার ঘরে এসে সরকারি পোশাক পরা পুলিশটাকে দেখে ওর মুখের চেহারা পালটে যায়। বাঁধের ধারে যে লোকটা ওকে লক্ষ্য করছিল, এ সেই লোক। সে জিজ্ঞেস করে, "নমস্কার কি করতে পারি আপনাদের জন্যে?"

সাদা পোশাক পরা লোকটি এগিয়ে এল,—"মশাই, চেলসি হাসপাতালের বাগান দিয়ে আপনি কি আজ সন্ধেবেলা হেঁটে আসছিলেন? দুজনেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সে বুঝল মিথ্যে বলে লাভ নেই। সহজেই উত্তর দেয়,—"হ্যাঁ আমিই ওদিক দিয়ে আসছিলাম বটে।"

"হাতে কি একটা প্যাকেট ছিল আপনার?"

"তাই বোধ হচ্ছে।"

"বাঁধের দিকের কোণে যে ময়লা ফেলা বাক্সটা আছে, তাতে কিছু ফেলছিলেন আপনি?"

"হ্যাঁ ঠিক।"

"প্যাকেটে কি ছিল আমাদের বলতে আপত্তি আছে কি?"

"জানি না তো!"

"আজ্ঞে, কথাটা না হয় অন্য রকম করে জিজ্ঞেস করি। ওটা কোথায় পেয়েছিলেন, বলতে পারেন কি?"

মুহূর্তের দ্বিধা; কি বলতে চায় এরা? এদের প্রশ্নের রকমফেরে কিছু এসে যায় না তার; তাই রেগে ওঠে।

"তাতে আপনাদের কি এসে-যায়? জঞ্জালের বাক্সে জঞ্জাল ফেলা অপরাধ নাকি?"

সাদা পোশাক পরা লোকটি বলে, "সাধারণতঃ জঞ্জাল বলতে যা' বোঝায়, তা নয়।"

সে এক জনের মুখের ওপর থেকে আরেক জনের দিকে দৃষ্টি ফেরায় মুখের ভাব ওদের গম্ভীর।

তখন সে পাল্টা প্রশ্ন করে,—"আমি যদি একটা প্রশ্ন করি—জবাব দেবেন?"

"অবশ্যই দেব।"

"ওতে কি আছে আপনারা তা' জানেন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনারা কি বলতে চান যে, এই পুলিশটি বাঁধের ওপর থেকে আমার পেছন পেছন এসে আমি প্যাকেটটা ফেলে দেবার পর সেটা তুলে নিয়ে দেখেছে?"

"ঠিক তাই।"

"কি অদ্ভুত কথা! আমি জানতাম সাধারণ নিয়মে ওর কাজের ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন।"

"সন্দেহজনক চলা ফেরা লক্ষ্য করাই ওর কাজ।"

এতক্ষণে মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে, সে চেঁচিয়ে ওঠে, "আমার ব্যবহারে সন্দেহজনক কি থাকতে পারে? আজ বিকেলে আফিসের এটা-ওটা পরিষ্কার করছিলাম। বাড়ি ফেরার মুখে নদীতে জঞ্জাল ফেলা আমার অভ্যাস। অনেক সময় জল-পাখীগুলোকে খেতে দিই। আজকে তেমনি জঞ্জাল ফেলতে যাব—হঠাৎ দেখি পুলিশটা আমায় দেখছে। খেয়াল হ'ল, এভাবে নদীতে জঞ্জাল ফেলা হয়তো ঠিক নয়। তাই আমি ময়লার বাক্সে ফেলে দিয়েছি।" লোক দু'টি তেমনি এক ভাবে চেয়ে আছে।

সাদা পোশাক পরা অফিসারটি জিজ্ঞেস করে—"এইমাত্র বললেন প্যাকেটে কি আছে জানেন না, আবার বলছেন আফিসের টুকিটাকি জিনিস। কোনটা সত্যি?"

বেকায়দায় পড়ে গেল ফেনটন।

বাধা দিয়ে ওঠে সে,—"দুটোই সত্যি। আফিসের চাকর বাকরে প্যাকেটটা করে দিয়েছিল আমায়, আমি জানি না ঠিক কি দিয়েছিল ওর ভেতর। মাঝে মাঝে ওরা জলের পাখীগুলোর জন্যে মিইয়ে যাওয়া বিস্কুট ভরে দেয়, আমি বাড়ি ফেরার পথে পাখীদের সেগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে খাইয়ে দিই—এ কথা আমি আপনাদের বলেছি।"

এও অচল। তাদের মুখ দেখে বোঝা গেল, শুনতেও কেমন বেখাপ্পা লাগে। মাঝ বয়সী এক ভদ্রলোক জঞ্জাল জড়ো করে বাড়ি ফেরার পথে নদীতে ফেলে দেয়—এ যেন বাচ্চা ছেলেদের কাঠকুটো জলে ছেড়ে দিয়ে ওপারে ভেসে যেতে দেখা। কি করা যাবে? সে মুহূর্তে যা' মাথায় এসেছে তাই বলে ফেলেছে—এখন আর বদলানো যায় না। যাই হোক একে অপরাধ বলা চলে না, বড়জোর ওরা ওকে ছিটগ্রস্ত ভাবতে পারে।

সাদা পোশাক পরা অফিসারটি শুধু হুকুম দিল, "সার্জেন্ট, নোটিশটি পড়ে শোনাও।"

"ছ'টা বেজে পাঁচ মিনিটের সময় বাঁধের ধার দিয়ে যেতে যেতে আমি ফুটপাতের অন্য দিকে এক ভদ্রলোককে দেখতে পাই, মনে হ'ল যেন নদীতে একটা প্যাকেট ফেলতে চলেছেন।

আমায় দেখে তিনি পা চালিয়ে এগিয়ে গিয়ে আবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলেন আমি লক্ষ্য করছি কি না। তাঁর ধরণটা সন্দেহ জাগানো মতোই ছিল। এরপর তিনি চেলসি হাসপাতালের বাগানে ঢুকে চোরের মতো চার পাশে তাকিয়ে দেখে নিয়ে প্যাকেটটা জঞ্জালের বাক্সে ফেলে দিয়ে হন হন করে কেটে পড়লেন। আমি জঞ্জালের বাক্সের কাছে গিয়ে প্যাকেটটা নিয়ে ভদ্রলোকের পেছু নিলাম। শেষ অবধি তিনি ১৪ নং এনার্সলি স্কোয়ারে ঢুকে গেলেন। প্যাকেটটা নিয়ে থানায় অফিসারের হাতে তুলে দিলাম। আমরা দু জনে মিলে সেটা পরীক্ষা করে তার ভেতর থেকে সত্তোজাত অসময়ের মরা বাচ্চা পেলাম।"

নোট বই বন্ধ করার শব্দ হ'ল।

ফেনটনের মনে হ'ল শরীরের সমস্ত রক্ত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ভয় আর বিভীষিকায় মিলে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ধপ

করে চেয়ারে বসে পড়ল। অস্ফুট উচ্চারণ করে—"হায় ঈশ্বর! হায় ভগবান—একি হ'ল?"

ঘোরের ভেতর মনে হ'ল খাবার ঘর থেকে এডনা আর তার পেছনে আলহুসনুরা দ'র দিকে চেয়ে আছে। সাদা পোশাক পরা লোকটি বলছে,—"থানায় গিয়ে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।"

৫

ফেন্টন্‌কে পুলিশ ইন্সপেক্টরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইন্সপেক্টর তার ডেস্কের পেছনে চেয়ারে বসে আছে। বিশেষ করে এডনাকে থাকতে বলেছিল ফেন্টন্। আলহুসনুরা বাইরে অপেক্ষা করে আছে, কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক হল এডনার মুখের থমথমে ভাব। পরিষ্কার—বোঝা গেল যে, তার ওপর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই এডনার। পুলিশটারও নেই।

সে বলল,—"হ্যাঁ গত ছ'মাস যাবৎ একই ভাবে চলেছে। 'চলেছে' বলতে শুধু ছবি আঁকার কথাই আমি বলতে চাই। এছাড়া আর কিছু নয়···। হঠাৎ আমার মাথায় ছবি আঁকা ভূত চেপে বসল—এ আমি বোঝাতে পারব না। কোনও দিনও না। হঠাৎ আমার মাথায় এ খেয়াল চেপে বসল। সেই খেয়ালই আমায় বেণ্টিং ষ্ট্রীটের আট নম্বর ফাটকের দিকে টেনে নিয়ে গেল। স্ত্রী-লোকটি বাইরে এলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঘর ভাড়া দেবে নাকি? কয়েকটা কথার পর, সে বলল নিচে চাকরদের জন্যে যে ঘরগুলো আছে, তারই ভেতর সে থাকে, বাড়িওয়ালার কোন হাত নেই, কাজেই তার কানে কথাটা তোলা হবে না বলেই ঠিক করলাম দুজনে। আমি ঘর দখল করলাম। আর গত ছ'মাস ধরে রোজ বিকেলে আমি সেখানে যাই—একথা স্ত্রীকে বলিনি, কারণ মনে হয়েছিল সে বুঝবে না।"

মরিয়া হয়ে এডনার দিকে তাকিয়ে দ্যাখে, তার মুখের ভাবের কোন বৈচিত্র্য হয়নি। তার দিকে কেমন কাঠ হয়ে চেয়ে আছে।

সে বলে—"স্বীকার করছি, বাড়িতে, অফিসে সবার কাছেই মিথ্যে বলেছি আমি। অফিসে বলেছি আমি একটা কারবারের মধ্যে ফেঁসে গেছি—রোজ বিকেলে সেখানে যেতে হয়। স্ত্রীকে বলেছি বিকেলে হয় অফিসে দেরী হয়, নয় ক্লাবে ব্রিজ খেলি। এডনা, বলো আমি সত্যি বলছি কি না!···আসলে প্রতিদিন আমি ৮নং বোণ্টিং ষ্ট্রীটে গিয়াছি।"

অন্যায় তো কিছু করেনি সে। অমন করে সবাই চেয়ে আছে কেন? এডনা চেয়ারের হাতলটা অমন শক্ত করে ধরে আছে কেন?

"মাদাম কোফম্যানের বয়স কত? আমি জানি না। মনে হয় সাতাশ, হয়তো তিরিশ, যে কোন একটা বয়স হ'তে পারে তার। ছোট ছেলে আছে একটা, নাম জনি।···অষ্ট্রিয়ার মেয়ে, বড় দুঃখের জীবন ওর—স্বামী ছেড়ে চলে গেছে। কখনো কাউকে ওর কাছে আসতে দেখিনি। কোন পুরুষ মানুষ কখনো চোখে পড়েনি ওখানে। আমি জানি না···বলছি···আমি জানি না। আমি ওখানে ছবি আঁকতে যেতাম, আর কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না? সেও সেকথা বলবে। সত্যি কথাই বলবে সে। আমি জানি ও আমার ওপর যথেষ্ট ভরসা করে, অন্ততঃ··না, ভরসা করে বলতে আমি সেভাবে বলিনি। আমি যে টাকাটা ওকে দিই, তার জন্য সে আমার কাছে কৃতজ্ঞ··ঘরভাড়া বাবদ পাঁচ পাউণ্ড। আমাদের দু'জনের মধ্যে অন্য কিছু ছিল না, থাকা সম্ভব ছিল না। এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। সব জিনিস আমার চোখে পড়ে না—নইলে হয়তো আমি সাবধান হ'তাম। ও আমায় বলেনি কিছুই—একটা কথাও না।"

এডনার দিকে ফিরে বলে,—"তুমি নিশ্চয় আমার কথা বিশ্বাস করো।"

সে জবাব দেয়, "তুমি যে ছবি আঁকতে ভালোবাস একথা তো কোনদিন বলনি। এত বছর বিয়ে হয়েছে আমাদের ছবি বা শিল্পীর কথা কোনদিনও তুমি আমার কাছে বলনি তো!"

তার চোখে অদ্ভুত একটা মরা নীল রং—মোটে সহ্য হয় না ফেন্টনের।

ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞেস করে—"একবার সবাই মিলে বোণ্টিং ষ্ট্রীটে গেলে হয় না? বেচারী নিশ্চয় দারুণ বিপদে পড়েছে। এক্ষুণি তাকে ডাক্তার দেখানো উচিত? আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সবাই সেখানে একবার যেতে পারি না? মাদাম কোফম্যান হয়তো আমার স্ত্রীকে সব কথা খুলে বলতে পারে।"

ভগবানের ইচ্ছায় তাই হ'ল। সবাই মিলে বোণ্টিং ষ্ট্রীটে যাওয়াই স্থির হ'ল। পুলিশের গাড়ি ডাকা হ'লে সে, এডনা আর দুজন পুলিশ অফিসার তার ভেতরে উঠে বসল। আলহুসনুরা তাদের নিজেদের গাড়ি করে পেছনে চলল। স্ত্রীর পক্ষে নাকি আঘাতটা গুরুতর হয়েছে—এই ধরণের কি একটা ওরা যেন ইন্সপেক্টরকে বলেছিল, কথাটা ফেনটনের কানে গেল। যথেষ্ট দরদী মনের পরিচয় সন্দেহ নেই, কিন্তু একবার বাড়ি ফিরে নিরিবিলিতে এডনাকে যখন সব কথা খুলে বলতে পারবে, তখন এসবের কোন প্রয়োজন থাকবে না। পুলিশ ষ্টেশনের এই পরিবেশটাই জঘন্য, এর জন্যই নিজেকে কেমন অপরাধী, অপরাধী মনে হচ্ছে।

পরিচিত বাড়িটার সামনে গাড়ি থামল। সবাই নেমে এল। ফাটকের ভেতর দিয়ে, পেছনের দোরের দিকে সে-ই এদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল, নিজেই দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকতেই প্রচণ্ড গ্যাসের দুর্গন্ধ সবার নাকে এল।

সে বলে, "আবার গ্যাসটা খারাপ হয়েছে। কতবার ও মিস্ত্রিদের খবর দেয়, তারা কখনও যদি মনে করে আসে।"

কেউ জবাব দিল না। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে গেল। দোর বন্ধ, গ্যাসের গন্ধ এদিকটা সবচেয়ে কড়া।

ইন্সপেক্টর চারদিকে তাকিয়ে প্রস্তাব করে, "মিসেস্ ফেন্টন্ বরং তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে গাড়িতে অপেক্ষা করুন।"

ফেন্টন বাধা দেয়, "না, না, আমার স্ত্রী নিজের কানে সত্যি কথাটা জেনে যান।"

কিন্তু এডনা একজন পুলিশের সঙ্গে দূরে আলহুসনুরা যেখানে তার জন্যে গম্ভীর মুখে অপেক্ষা করছিল, সেখানে ফিরে গেল। তখন সবাই হুড়মুড় করে মাদাম কোফম্যানের শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে। তাড়াতাড়ি জানালা খুলে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা হ'ল কিন্তু তব গ্যাসের গন্ধ অসহ্য রকম কড়া বোধ হ'ল। বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে ভাখে ওরা—জনিকে পাশে নিয়ে মেয়েটি ঘুমিয়ে আছে। কুড়ি পাউণ্ডের খামটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

ফেন্টন্ জিজ্ঞেস করে, ওকে জাগানো যায় না। ওকে জাগিয়ে

কেউ বলতে পারেন না আপনারা যে, মিঃ সিম্‌স এসেছে? মিঃ সিম্‌স?"

একজন পুলিশ ওর হাত ধরে ঘর থেকে বের করে আনল। ওরা যখন ফেনটনকে বলল—জনি আর মাদাম কোফম্যান মারা গেছে, সে তখন মাথা নেড়ে বলতে লাগল, "কি কাণ্ড···কি কাণ্ড···যদি আমাকে সে একবারও বলত, যদি জানাতো আমার কি করা উচিত!"

যা হোক পুলিশ তার বাড়িতে হানা দেওয়ার পর থেকে, প্যাকেটের জঞ্জালের অভাবিত বীভৎসতা থেকে শুরু করে সর্বনাশের এমন চূড়ান্ত পরিণতি তাকে এমন বিমূঢ় করে ফেলেছিল যে, নতুন করে এদের মৃত্যুর আঘাত আর বেশী নাড়া দিতে পারল না। এ যেন হবারই ছিল।

সে বলে,—"হয় তো ওর ভালোই হ'ল। ছনিয়াতে কেউ নেই ওর শুধু ওরা ছজন। পৃথিবীতে একেবারে একা।"

সবাই এখনো কিসের অপেক্ষা করছে ও ধরতে পারে না। এম্বুলেন্সটা বোধ হয় জনি আর তার মাকে নিয়ে যাবে। তাই জিজ্ঞেস করে, "স্ত্রীকে নিয়ে আমি এবার বাড়ি যেতে পারি?"

ইন্সপেক্টরের সঙ্গে সাদা কাপড় পরা পুলিশের চোখাচোখি হয়, "মিঃ ফেনটন—ছঃখিত আমরা। তা' হবার নয়, আপনাকে আবার আমাদের সঙ্গে থানায় ফিরতে হবে।"

বিব্রতভাবে সে বলে,—"কিন্তু যা' বলার ছিল সব তো আপনাদের বলেছি। এই মর্মান্তিক ঘটনার সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। আদপেই কিছু নেই। তারপর নিজের আঁকা ছবিগুলোর কথা মনে পড়ে যায়—"আমার আঁকা আপনারা দেখেননি তো! পাশের ঘরেই সব আছে। দয়া করে আমার স্ত্রী আর আমার বন্ধুদের ডাকুন। ওরা আমার আঁকা দেখুন। 'তাছাড়া এ ঘটনার পর আমি এখান থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।"

ইন্সপেক্টর উত্তর দেয়; "তার ব্যবস্থা করা হবে। আশ্বাসহীন কঠিন কণ্ঠস্বর। ফেনটনের মনে হয় বড় যেন হৃদয়হীন। আইনের কায়দা কানুনই এইরকম।

মুখে বলে, "তা না হয় হ'ল, কিন্তু এসব আমার সম্পত্তি, দামও অনেক। আপনাদের হাত দেবার কি অধিকার থাকতে পারে, বুঝি না।"

ইন্সপেক্টর সাদা পোশাক পরা অফিসারের দিকে তাকিয়ে আছে। ডাক্তার আর অন্য পুলিশটি এখনও শোবার ঘরে। এদের মুখ দেখে মনে হয় না, তার কাজ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে কারো। ভাবছে বোধ হয়, ছবি আঁকার ব্যাপারটা একটা অছিলামাত্র। থানায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে এই শোবার ঘরের করুণ মৃত্যুর ব্যাপার আর অসময়ে জন্মানো বাচ্চার মরা দেহটার সঙ্গে ওকে জড়িয়ে আরও কতগুলো হিজিবিজি প্রশ্ন করাই এদের উদ্দেশ্য।

শান্ত গলায় বলে এবার, "ইন্সপেক্টর, আপনাদের সঙ্গে যেতে আমার কোন আপত্তি নেই। শুধু একটা অনুরোধ আছে, আমার স্ত্রী আর বন্ধুদের একবার আমার ছবিগুলো দেখাতে চাই।" ইন্সপেক্টর অধস্তন কর্মচারীদের দিকে কি যেন ইশারা করলে—সে রান্নাঘর থেকে
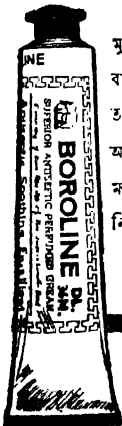
বেরিয়ে গেল তারপর সবাই মিলে ফেন্টনের পেছন পেছন তার ষ্টুডিওতে গিয়ে ঢুকল।

সে বলে, "অবশ্যই বিশ্রী ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে আমায়। দেখছেই পাচ্ছেন—আলোর অভাব, জিনিসপত্রের অভাব। কি করে যে এতদিন কাটিয়েছি এখানে, নিজেই জানি না। আসলে ছুটি থেকে ফিরেই ঘর বদলাতে হবে—এই কথাটাই স্থির করে রেখেছি। সেকথা হতভাগী মেয়েটাকে বলেছিলাম—শুনে হয়তো খুব খারাপ লেগেছিল ও'র।"

আলো জ্বেলে দিল ফেন্টন্, ওরা সেখানে দাঁড়িয়ে খুলে রাখা ইজেল, দেওয়ালের গায়ে পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখা ক্যানভাসগুলোর দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ তার মনে হ'ল, যাবার আগের এই গোছগাছ তাদের চোখে সন্দেহজনক ঠেকতে পারে। অর্থাৎ রান্নাঘরের পেছনে শোবার-ঘরের ঘটনাটা ও জানে বলেই হয়তো পালাবার মতলব করেছে। আদপেই ষ্টুডিও'র মতো দেখতে নয় এমন একখানা ঘরের জন্য কুণ্ঠিত হ'য়ে বলে,—"বুঝতেই পারছেন, সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবেই আমি এ ঘরখানা ভাড়া নিয়েছি, কিন্তু ঘরটার সুবিধেও আছে। বাড়িতে আর কেউ থাকে না। কাউকে জবাবদিহি করতে হয় না। মাদাম কোফম্যান আর তার ছেলে জনির মতো এমন আর কাউকে আমি দেখিনি।"

এডনা, আলহুসন্ অন্য পুলিশটা সবাই ঘরের মধ্যে জড়ো হয়েছে, সবার মুখেই একরকম কঠিন ভাব। কেন এডনা? আলহুসন্ ব্যাপার কি? দেওয়ালের গায়ে এতগুলো ক্যানভাস দেখেও কি বিশ্বাস হয় না? গত সাড়ে পাঁচ মাসের পরিশ্রমের সমস্ত ফলাফল এই ঘরের মধ্যে জমা হয়ে আছে—শুধু একটা প্রদর্শনী করার অপেক্ষা মাত্র। সোজা এগিয়ে গিয়ে হাতের কাছে প্রথম ক্যানভাস খানা ওদের সামনে মেলে ধরে। মাদাম কোফম্যানের ছবিখানাই তার সবচেয়ে ভাল উৎরেছে—বেচারী মেয়েটি বেটাকে মাছের মতো মুখ বলেছিল।

সে বোঝায়—"আমি জানি, চিরাচরিত ঢং—এর থেকে আমার ছবি আঁকার ষ্টাইল ভিন্ন। বাজারের ছবির বইগুলোর সঙ্গে আদপেই মেলে না। কিন্তু এর মধ্যে শক্তির পরিচয় আছে। এর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আছে"

আরেকটা—আবার মাদাম কোফম্যানের কোলে জনি। মৃদু হেসে বলে,—"মা ও ছেলে, সেই গোড়ার কথা, প্রথম মা ও প্রথম সন্তান।"

ঘাড় কাৎ করে' বুঝতে চেষ্টা করে প্রথম দৃষ্টিতে এদের কেমন লাগছে। এডনার চোখে বিস্ময়ের আলো কৈ? হঠাৎ পাওয়া আনন্দের অস্ফুট অভিব্যক্তি কৈ? সেই এক রকম না—বোবা কঠিন দৃষ্টি। তারপর তার মুখ বিকৃত হ'ল, আলহুসনের দিকে ফিরে বলল—"এ গুলোকে ছবি বলে না, কোন রকমে রং-এর পোঁচ মারা হয়েছে শুধু।" চোখের জলের ধারার ভেতর দিয়ে ইন্সপেক্টরকে বলে,— "আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম—ছবি আঁকতে ও কোন কালেও পারে না। জীবনে কোন দিন আঁকেনি। এই বাড়িতে ঐ মেয়েমানুষটার কাছে থাকতে পারবে বলে এ একটা অছিলা মাত্র।"

ফেন্টন্ চেয়ে দেখল, আলহুসন্‌রা ওকে ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। পেছনের দরজা খুলে বাগানের ভেতর দিয়ে সদরে চলে যাবার শব্দ ও'র কানে এল। দেওয়ালের দিকে ফিরিয়ে ক্যানভাসখানা মাটিতে নাবিয়ে রাখতে রাখতে উচ্চারণ করে,—"ওগুলোকে ছবি বলে না। কোন রকমে রং-এর পোঁচ মাখানো হয়েছে শুধু।"—তারপর ইন্সপেক্টরকে বলে—"এবার আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি।"

পুলিশ-ভ্যানে গিয়ে উঠল ওরা। ইন্সপেক্টর আর সাদা পোশাক-পরা অফিসারের মাঝখানে ফেন্টন্ বসল। বোর্ণিং ষ্ট্রীটের মোড় ঘুরে গেল। আরও ছুটো রাস্তা পেরিয়ে ওকলে ষ্ট্রীটে পড়ে' বাঁধের দিকে এগিয়ে গেল। পথের আলো হলুদ থেকে লাল বদলে গেল। ফেন্টন্ নিজের মনে বিড় বিড় করে,—"ও আমায় বিশ্বাস করে না, আর কোন দিনও করবে না।"

তারপর বাতির রং পালটাতে গাড়ি যেমন ছুটে এগিয়ে গেল—ও' চেঁচিয়ে উঠল,—"বেশ, তাই হোক্, আমি সব কথা স্বীকার করছি। আমিই তো ও'র প্রেমিক ছিলাম। বাচ্চাটা আমারই। আজ সন্ধ্যেবেলা বেরোবার আগে গ্যাস আমিই বাড়িয়ে দিয়ে যাই। আমি ওদের খুন করেছি। স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে আমার স্ত্রীকেও শেষ করার ইচ্ছে আমার ছিল। আমি স্বীকার করতে চাই, আমি অপরাধী, আমি অপরাধী, আমি অপরাধী···।"

শেষ

অনুবাদিকা—কল্পনা রায়

ড্যাফ্‌নে ডু মরিয়ের—পরিচয়

[১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে লণ্ডন শহরে এই ঔপন্যাসিকের জন্ম হয়। 'ট্রিলবি' ও 'পিটর ইবেৎসঁ'র লেখক, বিখ্যাত শিল্পী ও ঔপন্যাসিক জর্জ ডু মরিয়েরএর পৌত্রী এবং জিরালড ডু মরিয়েরের পুত্রী ইনি।

ইনি বলেন,—"শহুরে জীবন, আতিথেয়তা, নিমন্ত্রণাদি এবং বড় বড় সামাজিক ক্রিয়াকর্মে আমার বিতৃষ্ণা। কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলগত মতবাদের প্রতি আমার আস্থা নেই; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তাই জগতের যাবতীয় দুঃখের মূল এবং যে পর্যন্ত না নরনারী নির্বিশেষে প্রত্যেকে আপন আপন যশঃ ও সাফল্যের আশা সক্রিয়ভাবে বর্জন করে, সে পর্যন্ত স্থায়ী কোন শান্তির ব্যবস্থা হ'তে পারে না।"

এঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'রেবেকা' সমসাময়িক পাঠকের ঘরে ঘরে সমাদৃত হয়েছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে 'দি লাভিং স্পিরিট', 'আই উইল নেভার বি ইয়ং এগেন', 'দি প্রোগ্রেস অফ জুলিয়স', 'জামাইকা ইন' এবং 'ফ্রেঞ্চ ম্যানস ক্রীক'—প্রসিদ্ধ।]

ছদ্মবেশ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

থানারই একটি ঘরে মহিলাটি আশ্রয় নিলেন।

ওঁকে জানিয়েছিলাম এমন জায়গায় মেয়েদের পক্ষে একটি রাত্রি থাকাতেও অনেক অসুবিধা। উনি কিন্তু এই জায়গাটিই পছন্দ করলেন। বললেন, পর ভাতি হওয়া ভাল—তবু পর ঘরি হওয়া ভাল নয়।

অর্থাৎ পরের দেওয়া অন্নে দেহ পোষণ করাতে যত না অসম্মান, পরের আশ্রয়ে বাস করায় ততোধিক গ্লানি।

ওর মত ফেরাবার জন্য একবার চেষ্টা করলাম। বললাম, আমার কোয়ার্টারে এসেও তো থাকতে পারতেন। মেয়েরা রয়েছে—কোন অসুবিধা হবে না।

না বাবা—থাক। দরকার বুঝলে যাব বই কি। একটু ম্লান হেসে বললেন, কি এমন পুণ্য কর্ম করেছি যে, মানুষের আশ্রয় নেব না বলবার সাহস হবে। তেমন মনের জোরই বা কই! না বাবা, থাক এখন। একটা ফয়সালা হয়ে যাক—তখন একটা আশ্রয়ে মাথা তো গুজতেই হবে···কথাটা শেষ না করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

আমিও প্রসঙ্গের জের টানলাম না। ব্যাপারটা জানি তো মোটামুটি। উনি যেখান থেকে আসচেন—সেটি সংসারের মধ্যে হলেও সংসারাশ্রম ঠিক নয়। যাদের তিনকূলে কেউ নাই, কিম্বা দুর্ভোগের ঝাপটা খেয়ে ছিটকে পড়েছে সংসার কুলায় থেকে, কিম্বা সংসারের মায়াজাল হতে মুক্তিলাভের আশায় অনন্ত শয়ন—শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করেছে—তাদের জন্য ওই শান্তি-আশ্রম। আশ্রয়হারারা ওখানে শান্তি পায় কি না জানি না, ওটা তো খাইয়ে দেখানোর জিনিস নয়, তবে সান্ত্বনা যে পায়—এই সত্যটি কিছুদিন পরে ওদের মুখের ক্লেশকঠিন রেখাগুলি মিলিয়ে যাওয়া দেখে বুঝতে পারি। কয়েকটি মেয়ের মুখ স্বস্তির নরম আলোয় ঝলমলে হয়ে উঠতে দেখেছি। এই থানায় বদলি হয়ে আসার পর এই এক বছরে আমারই পরোক্ষ সাহায্যে অন্তত তিনজন আশ্রয় পেয়েছে ওই আশ্রমে। আদালতের সেই সব বিশ্রী কাহিনী অনেকেই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় দেখেছেন, যদিও আর দশটি ঘটনার আবর্তে সেগুলি কোথায় তলিয়ে গেছে।

আদালত প্রশ্ন করেছে,—কোথায় যেতে চান আপনি? স্বামীর ঘরে, বাপ-মায়ের আশ্রয়ে? কোন আত্মীয়-স্বজন বা বান্ধবের কাছে?

না—ওর কোনটাই চায়নি ওরা। ইচ্ছা করেই যে চায়নি, তা নয়। আজকাল সমাজ-শাসন বলে কোন ভয়ের বস্তু নাই, কিন্তু কুৎসা প্রচারের গ্লানি আছে। বহুজনের কাছে মাথা হেঁট করে থাকার গ্লানি আছে। এ ছাড়া কারও স্বামী নির্মম, কিম্বা বাপ-মায়েরা বহুকাল পৃথিবীর সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছেন। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের কি দায়—প্রকাশ্য বিচারালয়ের রায়-দেওয়া ঘটনাকে নিজেদের সংসারে এনে নূতন অশান্তির সৃষ্টি করা। সব সংসারই রোদ থেকে বর্ষণ কিম্বা হিমপাত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকবারই চেষ্টা করে যথাসাধ্য। অতএব সংসারাশ্রয় থেকে একবার বিচ্যুত হলে সেখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজনটি সহজসাধ্য নয়। এই সব আশ্রয়হারা মর্য্যাদা-হারা মেয়েকে এককালে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে ঠেলে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তা রসাতলের যে স্তরেই ওদের গতি হোক না কেন। সম্প্রতি মানব-হিতৈষী মহৎ প্রাণের চেষ্টায় আর সরকারের দাক্ষিণ্যে এরা যাতে মানুষের মর্য্যাদায় প্রাণ ধারণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা হয়েছে। শান্তি-আশ্রম—তেমনই একটি আশ্রয়, জেলার মধ্যে নামকরা প্রতিষ্ঠান, দু'কূলহারা মেয়েদের আশা-ভরসার স্থল। এখানে আশ্রয় তো মেলেই, নূতন করে জীবন আরম্ভ করার সুযোগও আছে, স্বাধীন বৃত্তিতে স্থিত হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিমলানন্দকে আমি জানি। বর্ষীয়ান সৌম্যদর্শন পুরুষ। শুধু কান্তিমান নয়, ওঁর কল্যাণ-শ্রী-দীপ্ত দু'টি চোখের পানে চাইলে কার না মনে হবে, মানবহিতব্রত সাধনে উনি স্থিরলক্ষ্য এবং সর্ব্বস্বদানে কৃতসঙ্কল্প। শুনেছি, সোনার চামচ মুখে করে জন্মেও বিত্ত বৈভব ওঁকে মলিন করেনি। সে অবশ্য আঘাত পাওয়ারই কাহিনী। সংসার ছিল ওঁর, একটি-দু'টি করে রঙের বাতি জ্বলতে সুরু হবার মুখেই উঠেছিল ঝড়। এক সংসারের আলো নিভিয়ে আর এক সংসারে আলো জ্বালার আয়োজন করেই বোধ করি ঝড় উঠেছিল। সেই ঝড় লোকযাত্রার পথ থেকে ছিনিয়ে এনে দিব্যযাত্রার পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। একটুও আক্ষেপ করেননি উনি। বিধি-নির্দ্দিষ্ট পথে অতঃপর চলতে সুরু করেছিলেন। সংসারী ব্যোমকেশ হয়েছিলেন সর্ব্বত্যাগী বিমলানন্দ স্বামী।

আমি বিমলানন্দকে জানি চাকরির আদিকাল থেকে, প্রায় পনেরো বছর ধরে। যখন অন্যত্র ছিলাম—শান্তি-আশ্রমের কথা কাগজে পড়েছি, কোর্টে শুনেছি। আশ্রয়হারা কাউকে বা পৌঁছে দিতে এসেছি ওখানে। এখানে বদলি হয়ে এসে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে স্বামীজীকে জানবার সুযোগ হয়েছে। অনেকগুলি কেস-এ কোর্টের নির্দ্দেশমত শান্তি-আশ্রমে এসেছি কয়েক বার। শুধু পৌঁছে দিয়েই

কর্ত্তব্যের শেষ হয়নি, মাঝে মাঝে তত্ত্ব নিতে হয়েছে আশ্রয়হারারা আশ্রমে কেমন আছে? ওঁরা কোন অসুবিধা ভোগ করছেন কিনা, কিম্বা কোন অভিযোগ আছে কিনা? সেই সময়ে লক্ষ্য করেছি, দুর্যোগ দুর্ভোগের চিহ্নগুলি ওঁদের সর্ব্বাঙ্গ থেকে মিলিয়ে গেছে; দেখেছি, নিরাপদ আশ্রয় প্রাপ্তির নির্ভরতার প্রশান্ত ওঁদের দৃষ্টি। খুসী হয়ে চেয়েছি স্বামীজীর পানে—স্বামীজীও পরিতৃপ্ত চোখে চেয়েছেন আমাদের পানে।

সর্ব্বপ্রথম একটি মেয়েকে নিয়ে আশ্রমে এসেছিলাম—সে অনেক দিনের কথা। প্রায় পনেরো বছর আগেকার কথা। তখন এই জেলারই বর্দ্ধিষ্ণু একটি গ্রামে বদলি হয়ে এসেছি। কোর্ট থেকে হুকুম হ'ল পাহারা দিয়ে মেয়েটিকে পৌঁছে দিতে হবে শান্তি-আশ্রমে। বেশ খানিকটা দূরেই আশ্রম—বিশ মাইল হবে। ওই গ্রামেও ছোটমত একটি আশ্রম ছিল। মেয়েটি থাকতে চায়নি সেখানে। মেয়েটি চেয়েছিল শান্তি-আশ্রমে থাকতে। ওখানকার স্বামীজী নাকি ওর গুরুবংশের আত্মীয়। শান্তি-আশ্রমে বার কয়েক গিয়েছে মেয়েটি।—আশ্রমের রীতি প্রকরণ ভালমতেই জানে। সুতরাং মেয়েটিকে পৌঁছে দিতে হলো আশ্রমে।

আশ্রমের প্রকাণ্ড গেটটা তখন বন্ধ ছিল। গেটের বাইরে একটি প্রায় নিরাভরণ কুটিরিতে সামান্য একটা তক্তাপোষের উপর কম্বল বিছানো। চাদর পাতা ছিল না—কম্বলের ফাঁকে ফাঁকে তক্তাপোষের জীর্ণ দেহ দেখা যাচ্ছিল। তার উপর হাসিমুখে বসেছিলেন স্বামীজী—কোলের কাছে হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স। দু'টি দুর্দ্দশাগ্রস্ত মেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে রোগের বিবরণ বলছিল হয়তো। আমাকে দেখে মেয়ে দু'টি সভয়ে সসম্ভ্রমে দেয়ালের গায়ে মিশে গেল। স্বামীজী মুখ তুলে অভ্যর্থনা করলেন, আসুন—আসুন।

হাসি হাসি মুখ, প্রশান্ত দৃষ্টি, নির্ব্বেদের আলোয় ঝল মল, কৌতুহলের ছায়াটুকুও সেখানে নাই। কি ঋজু দৃপ্ত ভঙ্গীতে বসে রয়েছেন গেরুয়া পরা রাজরাজেশ্বর যেন। প্রথম দর্শনে মুগ্ধ হলাম।

বললেন, বসুন।

পাশেই চেয়ার ছিল—বসলাম।

আমার আগমনের উদ্দেশ্য জেনে বললেন, মা জননীকে বুঝি বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন?

বললাম, আপনি ব্যস্ত হবেন না—উনি ঘোড়ার গাড়ীতে বসে আছেন।

তবু উনি উঠে দাঁড়ালেন। তক্তাপোষ থেকে নেমে মেয়ে দু'টির পানে চেয়ে বললেন, একটু অপেক্ষা কর মা, তোদেরই আর এক বোন বিপদে পড়ে এখানে ছুটে এসেছে—তার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে আসি। কি মা, কাজের কি খুব তাড়া আছে?

ওরা ঘোমটা-জোড়া মাথা নেড়ে ফিসফিসিয়ে বলল, না বাবা, আপুনি আসেন না, ওনার বেবস্থা করুন না আগে।

চাবি দিয়ে গেটের তালা খুললেন স্বামীজী। ডাকলেন, বিশুর মা, বিশুর মা।

এক বর্ষীয়সী বিধবা ভিতরের দুয়ার খুলে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল,—বাবা, ডাকছেন কেন?

তোমাদের আর একটি মা এসেছেন, ওই গাড়ীতে বসে রয়েছেন। তোমার বড়মার কাছে জেনে এসো গে, ওঁর জন্য কোন ব্যবস্থা হতে পারে কি না।

আমার পানে ফিরে বললেন,—আসুন, আমরা আপিস ঘরে গিয়ে বসিগে।

আমরা তখন গেটের ভিতরে। সেটিও আশ্রমের অভ্যন্তরভাগ অর্থাৎ অন্তঃপুর নয়। খোলা বারান্দাসমেত একখানি বড় ঘর; দপ্তরের কায়দায় টেবিল, চেয়ার, র‍্যাক-আলমারি ইত্যাদিতে সাজানো। খানিকটা উঠোন আছে সামনে—সেটুকু সবুজ ঘাস আর গাঁদা, সন্ধ্যামণি, রজনীগন্ধা আর পাতাবাহারের কেয়ারিতে ঠাসা। বারান্দার কোল থেকে উঠোন বরাবর একটি পাঁচিল, আশ্রমের সদর অন্দরকে দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছে। বারান্দার ঠিক পাশেই একটি মাঝারি গোছের দুয়োরে নীল পরদা ঝুলছে—অন্দর প্রবেশের পথ ওটি।

আমরা আপিসঘরে এসে বসতে না বসতে বিশুর মা সেই নীল পরদাটা সরিয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে এলো। স্বামীজী আমার পানে চেয়ে হাসিমুখে বললেন, যাক, নিশ্চিন্ত। আপনি বিশুর মায়ের সঙ্গে গিয়ে ওকে নামিয়ে আনুন গাড়ী থেকে। আর ফিরে যাবার আগে দু'খানা ফরম পূরণ করে দিয়ে যাবেন দয়া করে। ওটা আপনাদের ব্যবস্থামতই রাখতে হয়েছে।

মহিলাটি আশ্রমে আশ্রয় পেলেন।

স্বামীজী চা মিষ্টি খাওয়ালেন, সিগারেট অফার করলেন, এবং অনুরোধ জানালেন, এদিকে এলে মাঝে মাঝে যেন আশ্রম-দর্শন করে যাই।

স্বীকার করলাম—আসব। মনে মনে বললাম, আসতেই হবে। ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে নয়—কর্ত্তব্যের দায়ে বাঁধা যে আমরা।

পরে আরও কয়েকবার এসেছিলাম। বলতে দ্বিধা নাই—স্বামীজীর সুভদ্র সৌজন্যে প্রীতিলাভ করেছিলাম। সেখানে লক্ষ্য করেছিলাম একটি জিনিস। আশ্রমের তিনিই পরিচালক অথচ পরিচালনার রাশটিকে নিজের হাতে শক্ত করে টেনে ধরে রাখেননি। অন্দরের সম্পূর্ণ কর্ত্রী ছিলেন বড় মা। তাঁর ব্যবস্থার উপর কোন প্রতিবাদ করতেন না স্বামীজী।

বছর কয়েক পরে একটি ঘটনায় এটি বুঝতে পেরেছিলাম। আশ্রমের নিয়মভঙ্গ করেছিল একটি মেয়ে। প্রথম বারে তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় বারে সেই ঘটনা হওয়াতে বড়মা হুকুম দিয়েছিলেন—ওকে আশ্রম থেকে বা'র করে দিতে। আপিসঘরের দুয়োরের গোড়ায় হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটি। একটু আগে কেঁদেছিল। ওর চোখের কোল বেয়ে গড়ানো জলের দাগ গালের দু'ধারে তখনও স্পষ্ট। অনুনয় করছিল মেয়েটি।

আমি তখন বসেছিলাম আপিসঘরে।

স্বামীজী বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হচ্ছে মা, কিন্তু কি উপায়! ভিতরের নিয়ম-শৃঙ্খলায় ভার যিনি নিয়েছেন, তাঁর কাজে হাত দিলে আশ্রমের ক্ষতি হবে। সেটা কি উচিত হবে আমার?

মেয়েটি যেন বললে, এইবারটি মাপ করুন—

অন্দরের দুয়ারে ঝোলানো পর্দাটা তখন অল্প অল্প দুলছিল। সেই দিকে চেয়ে কোমল কণ্ঠে বললেন স্বামীজী,—মাগো, শুনছ?

ওপাশ থেকে মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠের প্রতিবাদ এ'লো,—তা হয় না। আশ্রমের সুনাম নষ্ট হবে, এমন কাজ করতে বলবেন না।
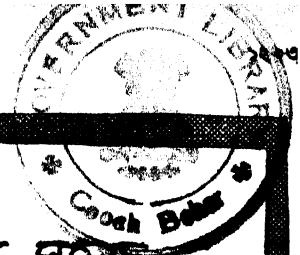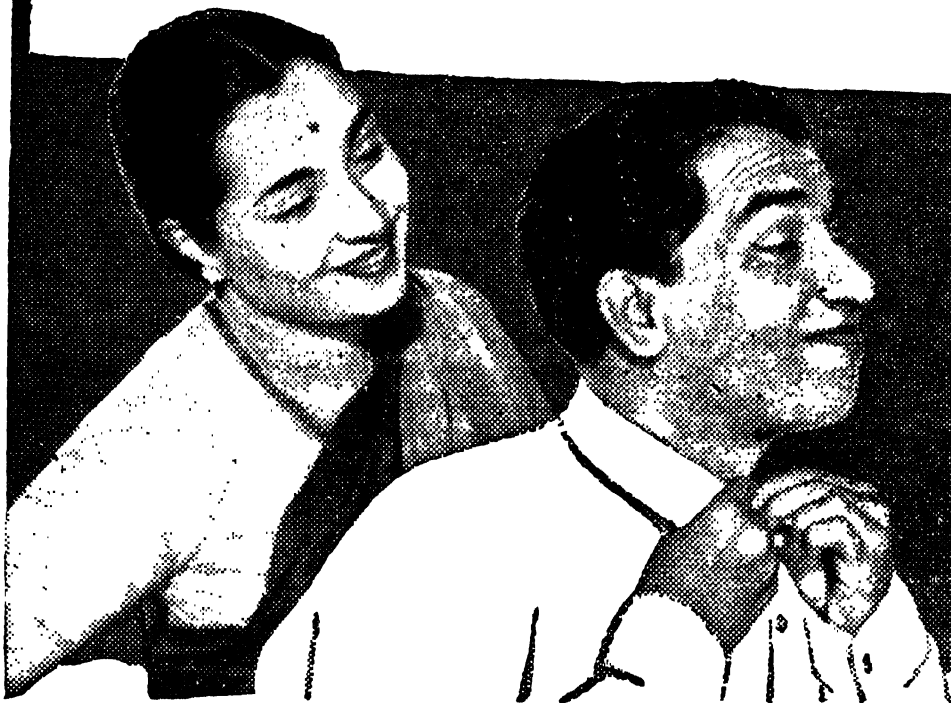
স্বামীজী নিরুপায় দৃষ্টিতে মেয়েটির পানে চেয়ে ঘাড় নাড়লেন। অর্থাৎ নিষ্ফল তোমার আবেদন।

ডায়েরিতে আশ্রমের নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে—স্বামীজী সম্বন্ধে উচ্চ ধারণানুযায়ী মন্তব্য করেছিলাম। শুধু আমি নয়, এই থানার ভারপ্রাপ্ত আমার পূর্ব্বতন সব ক'জন অফিসারের মন্তব্য আশ্রমের অনুকূল ছিল।

* * * *

সাব-ডিভিশন্যাল অফিসারের নির্দেশনামাখানি হাতে নিয়ে চেয়ারে এসে বসলাম। র‍্যাক থেকে টেনে নিলাম ফাইলটা, এই কেসটার আলাদা একটা ফাইল তৈরী করেছিলাম। পর পর দু'খানা দরখাস্ত ছিল, হাকিমের মন্তব্য সমেত একখানা কাগজ, আর ছিল এনকোয়ারির রিপোর্ট কতকগুলি। এস-ডি-ওর নির্দেশনামাখানা ফাইলজাত করলাম। আমার প্রথম দিনের কাজের ফলাফল নিয়ে একটা রিপোর্ট লিখলাম। লেখা শেষ করে সেটা ফাইলজাত করতে গিয়ে প্রথম আবেদনপত্রের একটি অংশে দৃষ্টি পড়ল। দু'লাইন লেখার নীচেয় লাল পেন্সিলের মোটা লাইন টানা। সম্ভবতঃ হাকিম এটা টেনেছেন। আর আবেদনপত্রের এই অংশটুকুর উপর জোর দিয়ে হাকিম থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে হুকুম পাঠিয়েছেন—যথাযথ অনুসন্ধান করতে। হুকুমনামায় একথাও স্পষ্ট ছিল যে, পরের দিন আদালত খুললে মহিলাটিকে যেন সেখানে হাজির করানো হয়।

আবেদন করেছিলেন মহিলাটির স্বামী—জগদীশ রায়। তিনি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছেন উক্ত শান্তি-আশ্রমে তাঁর স্ত্রী প্রিয়বালা দেবী সম্প্রতি স্বমর্য্যাদায় বসবাস করতে পারছেন না। তাঁর একান্ত ইচ্ছা আশ্রমের নিয়ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি শান্তিতে যাপন করেন। কিন্তু আশ্রমের স্বামীজী ওঁকে ছাড়তে চান না। শুধু ছাড়তে না-চাওয়া এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয়। মহিলাটি যাতে আশ্রম ত্যাগ করতে না পারেন—সেইদিকে খর দৃষ্টি রেখেছেন স্বামীজী। গেটের দ্বারবান ছাড়াও দু'জন মেয়ে-কর্মী সর্ব্বক্ষণ ছায়ার মত ওঁকে অনুসরণ করছে, যার ফলে আশ্রম-জীবন ওঁর পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। অতএব সদাশয় হাকিমের কাছে প্রার্থনা—উনি যেন উপযুক্ত রক্ষণার ব্যবস্থায় ওঁর স্ত্রীকে আশ্রম কারাগার থেকে উদ্ধার করে···ইত্যাদি ইত্যাদি। তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী টাইপ করা সুদীর্ঘ আবেদনপত্র। ওর সঙ্গে আছে প্রিয়বালা দেবী স্বাক্ষরিত এক পৃষ্ঠার ছোট একখানি দরখাস্ত। উনি শান্তি আশ্রম ত্যাগ করতে চান।

ফাইলটা খোলাই রইল—চেয়ারে বসে ভাবতে লাগলাম। প্রিয়বালা তরুণী হলে আশ্রমের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনতে পারতেন অনায়াসে। প্রৌঢ়াও তিনি নন। পঞ্চাশের পারে ঠেকেছে তাঁর বয়স। মাথার চুলগুলিতে ধূসর রঙের ছোপ ধরেছে—মাঝে মাঝে এক একটি রূপোর সরু তারের মত চকচকে। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম হলে কি হবে, গাল দু'টি ভাঙ্গতে শুরু করেছে—মুখের চামড়ার সে টান-টান ভাব আর নাই। ঈষৎ শিথিল চামড়া অনেকগুলি সূক্ষ্ম বলি রেখা চিহ্নে সুস্পষ্ট। মরাল-নিন্দিত গ্রীবা সৌন্দর্য্যকে নির্মম ভাবেই আক্রমণ করেছে জরা—যত বয়সের ভার জমেছে ওইখানে। গলার চামড়া জড়ো জড়ো, পেশী থল থলে। আর চোখ দু'টি? আধ-ঘোমটায় ঢাকা ছিল মুখখানা। তবু মুখের চেহারা দেখে নেওয়ার অসুবিধা ছিল না—অশালীনতা প্রকাশ পায় না তাতে। চোখের পানে দৃষ্টিক্ষেপ? হোক না সে চোখ বয়স্কা মহিলার—সম্পূর্ণ রূপে অনবগুন্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত ওদিকে পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ অলিখিত নিয়মে বর্ব্বরতার প্রকাশ। শুধু সতেজ রয়েছে কণ্ঠস্বরটি। স্বরে কম্পন নাই—উচ্চারণে জড়তা নাই। মানসিক দায়ে ও মর্য্যাদাবোধে উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য মন্ত্রের মূল্য বহন করেছে। যাই হোক—প্রিয়বালা দেবী এমন বয়সে এ হেন অভিযোগ আনলেন কেন?

ফাইলের কাগজগুলি ভাল করে ওলটাতে গিয়ে একটা চিরকুটে নজর পড়ল। পেন্সিলে লেখা প্রায় অস্পষ্ট মন্তব্য দু'লাইন। জগদীশ রায়ের সঙ্গে দেখা করে সম্পূর্ণ ঘটনা জানবার জন্য রাণীদি থানার ইনচার্জ্জকে নোট দেওয়া হোক। সম্ভবতঃ এই থানায় অনুসন্ধানের আদেশ জারি হওয়ার আগেই ওদিককার তদন্ত শেষ হয়েছে।

রাণীদি থানা নিকটে নয়—এখান থেকে অন্তত পনেরো মাইল দূরে। থানা থেকে আরও চার মাইল টিয়াখালি গ্রাম। জগদীশ রায় সেই গ্রামের বাসিন্দা। সাধারণ বাসিন্দা নয়—রীতিমত প্রভাবশালী ব্যক্তি। এককালে জমিদার বংশ বলে খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। জমিদারি প্রথা বিলোপের আইন জারি হবার বহু পূর্ব্ব থেকেই বেশীর ভাগ জমিদারের অবস্থা যেমন গজভুক্ত কপিত্থবৎ হয়েছে—এঁর অবস্থাও তথৈব চ। না হলে প্রিয়বালা কেন শান্তি আশ্রমে আশ্রয় নেবেন, আর জগদীশ রায়ই বা কেন অসহায় প্রজার মত আবেদনপত্র হাতে জেলা শাসকের দুয়ারে কৃপা-প্রত্যাশী হয়ে দাঁড়াবেন?

ফাইল ওলটাতে ওলটাতে কৌতূহল বাড়ল। রহস্য বটে। কতদিন ধরে মহিলাটি স্বামী সংস্রবশূন্য হয়ে আশ্রমবাসিনী হয়েছিলেন? ওঁর আশ্রমবাসের হেতু কি? স্বামীর সম্মতি নিয়ে কি ও কাজটি হয়েছিল?

ফাইলের ফিতেটা বেঁধে যে ঘরে প্রিয়বালা ছিলেন, তার সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বললাম, শুনচেন, যদি কিছু মনে না করেন দু'একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

দুয়ারের ওপিঠে সরে এলেন প্রিয়বালা। বললেন,—জিজ্ঞাসা করুন।

একটু ইতস্তত করে বললাম, কতদিন হ'ল আপনি আশ্রমে এসেছিলেন? মানে—

প্রিয়বালা সুস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, ঠিক মনে নেই, তবে পঁচিশ বছরের কম হবে না।

পঁ-চি-শ বছর। বলেন কি?

আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখে প্রিয়বালা বললেন, হাঁ পঁচিশ বছরই। কেন এসেছিলাম—এ কথায় জবাবও দিতে পারি, শুনবেন?

কৌতূহল যথেষ্ট ছিল, শালীনতায় বাধে বলে প্রকাশ করিনি। আমার উপরে এত কথা জানবার ভার দেওয়া হয়নি। মামলা যদি চলে, এই ধরণের সওয়াল আদালতের হক সীমানায় আইন অনুসারে অবশ্যই উঠবে। দু'পক্ষের উকিলের জেরায় আরও অনেক তথ্য প্রকাশ পাবে যা হয়তো লোকত ধর্ম্মত এবং সমাজ প্রথা মত গর্হিত।

কখন ঘাড় নেড়েছিলাম জানি না, ওঁর সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর কানে

এলো। পঁচিশ বছর আগে কোন কোন ঘটনায় স্বামীর সঙ্গে মতান্তর ঘটে, তার থেকে মনান্তর। সেই উপলক্ষ্যে শান্তি-আশ্রমে এসে উঠি। তারপর···একটু থেমে বললেন, পঁচিশ বছর কাটল ওখানে।

এর পরের প্রশ্ন স্বভাবতই এই রকম, পঁচিশ বছর নির্ব্বিঘ্নে কাটল যেখানে আজ কি এমন অশান্তির কারণ ঘটল যে জায়গাটাকে জেলখানার মত মনে হচ্ছে?

এ ধরণের প্রশ্ন করার অধিকার আমার ছিল না, চুপ করে রইলাম।

উনি বললেন, শেষ পর্য্যন্ত ওখানেও থাকতে পারছি না। কেন পারছি না তা বলতে পারব না। বলতে বাধছে বলে নয়, নিজেই বুঝতে পারছি না কেন এমনটা হ'লো? খালি মনে হচ্ছে আর কোথাও না গেলে আমার শান্তি নেই।

প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে করলাম,—আর কোথায় যাবেন?

জানি না।

বললাম, আপনি বোধ করি জানেন না—আপনার স্বামী হাকিমের কাছে জানিয়েছেন—আপনি যাতে বিনা বাধায় শান্তিআশ্রম থেকে চলে আসতে পারেন।

জানি! চিঠিতে আমিই ওঁকে জানিয়েছিলাম, আশ্রম থেকে আমি অন্যত্র যেতে চাই, কিন্তু বাধার জন্য পারছি না।

হাঁ—সে কথাও লেখা আছে আবেদনপত্রে। স্বামীজী আপনার গতিবিধির উপর পাহারা বসিয়েছেন যাতে আপনি পালাতে না পারেন।

উনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, তাই নাকি!···

খানিক চুপ করে থেকে বললেন, তা হবে। তবে পালাবার চেষ্টা আমি করিনি, বাইরে কি বাধা দিল জানি না, কিন্তু—হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

বলুন। আগ্রহভরে বললাম।

কি বলব—নিজেই বুঝতে পারিনি কিসের বাধা, অথচ পালাবার ইচ্ছা হলেই বাধাটা অনুভব করতাম। আশ্রমের বাইরে পা বাড়াতে সাহস হ'ত না।

বললাম, পঁচিশ বছর এক জায়গায় ছিলেন—নিশ্চিন্ত একটি আশ্রয়—মায়াও খানিকটা—

না—না, ঠিক তা নয়। প্রিয়বালা যেন আর্ত্তনাদ করে উঠলেন। যে আশ্রয়েই থাকি আমরা—মানে মেয়েরা—সে কোনদিনই নিশ্চিন্ত আশ্রয় নয়। আর জীবনে অশান্তি উদ্বেগ নেই এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে কি ইন্‌সপেক্টরবাবু?

কি উত্তর দেব এই প্রশ্নের! এমন একটি প্রশ্ন যে উনি করবেন—ভাবতেই পারিনি। আমি কবি বা দার্শনিক নই, চিকিৎসক অথবা মনস্তাত্ত্বিক নই, ক্রিমিনোলজিষ্টও ঠিক নই—যদিও আইনভঙ্গকারী দুষ্কৃতদের নিয়ে দিন রাত ঘাঁটাঘাঁটি করে থাকি।

ভাবছিলাম কি উত্তর দেব। ওঁর কথা শুনে বুঝলাম, উত্তরের আশায় প্রশ্নটি করেন নি—প্রসঙ্গতঃ নিজের ধারণাকেই প্রশ্নের আকারে ব্যক্ত করেছিলেন।

বললেন, তাই ভাবতেও পারছি না—এই অবস্থায় কি করব। আশ্রমে তো আর যাবই না—

বললাম, আপনার স্বামীর সংসার তো আছে।

সহসা কোন উত্তর দিলেন না। একটুখানি কি যেন ভাবলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, না, ওখানেও হয়তো যাব না।

সেকি! উনি যে হাকিমকে জানিয়েছেন—

জানি—আমি যাতে শান্তি আশ্রম থেকে নিরাপদে চলে আসতে পারি, সেইমত প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু কোন আশ্রয়ে আমি নিরাপদে বাস করতে পারব, সে কথা তো জানাননি।

স্বরে বেদনার আভাস ছিল না। অভিযোগের সুরও নয়, তবু মনে হ'ল ওটি অভিমানেরই প্রচ্ছন্ন রূপ। বললাম, আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন, নিতান্ত আপনজন না হ'লে এমনভাবে আবেদন করতে পারেন কেউ? ওর মানেই—

বাধা দিয়ে বললেন উনি, আপনারা ঠিক জানেন না। আগেকার ঘটনা জানলে এ ধারণা আপনার থাকত না। যাক সে কথা! কাল হাকিমের সামনেই যা হয় ঠিক করে নেব। আজ সারাটা রাত না ঘুমিয়ে ভাবব কি করা উচিত, কোথায় বা যেতে পারি! একটা উপায় অবশ্য হবেই।

পায়ের শব্দ শুনে বুঝলাম দুয়ারের কাছ থেকে সরে গেলেন।

একটু উচ্চকণ্ঠে বললাম, রাত্রিতে কি খাবেন—জানালে ব্যবস্থা করে দেব।

কিছুই দরকার হবে না বাবা।

সেকি—আপনি আমাদের অতিথি। আপনি না খেলে—

আপনাদের অকল্যাণ হবে, না দোষী হবেন উপরওলার কাছে? এটা তো আপনার বাড়ী নয়। সরকারী সংসারেও কি অতিথি সৎকার না হ'লে অকল্যাণ হয়?

স্বরে ব্যঙ্গধ্বনি ছিল না, কিন্তু এমন ব্যঙ্গাত্মক কথা কমই শুনেছি।

আমাকে নিরুত্তর দেখে বললেন, দুঃখু করো না বাবা—এমনিই কথাটা মনে হ'লো, তাই বললাম। তোমার বাড়ীতে একদিন আসব, বৌমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে যাব। সেদিন মিষ্টি খাইয়ো, কেমন?

আশ্চর্য্য মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর, আশ্চর্য্য বলার ভঙ্গী। খুসী মনে বললাম, আপনি এলে সত্যিই ভারি খুসী হব। আজ কিছু ফলমূল পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি—না' বলবেন না।

বেশ দিও। বলে চুপ করলেন।

এই দৃশ্যের পটোত্তোলন হল আদালতে। পঁচিশ বছর আগেকার পুরাতন যবনিকাখানি একটু একটু করে উঠতে লাগল—আর পঁচিশ বছরের সঞ্চিত ধূলার রাশি ঝরে ঝরে পড়তে লাগল তার গা বেয়ে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে এই কাহিনী শুনছিলাম। জেরায় জেরায় একটু একটু করে রহস্যের গ্রন্থিটুকু উন্মোচিত হচ্ছিল।

তার আগে টিয়াখালির কথাটুকু সেরে নিই। পটভূমিকার মত যেটিকে জুড়ে না দিলে—কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

টিয়াখালিতে আমি যাইনি—জগদীশ রায়কেও দেখিনি। আদালত বসবার আগে দেখা হলো আমার অগ্রজোপম রবিদার সঙ্গে। রবিদা এখন রাণীদি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। একটা জরুরি কেস নিয়ে কোর্টে হাজির হয়েছেন। পরে জানলাম এই কেসটার সঙ্গেও সামান্য একটু যোগসূত্র ছিল।

কোর্ট ইনস্পেক্টরের ঘরেই বসেছিলেন রবিদা। সামনে কয়েক

খাজা ফাইল। বয়স হয়েছে রবিদা'র। লম্বা চওড়া দেহ, শক্ত মজবুত। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, অত্যন্ত সপ্রতিভ স্মার্ট চেহারা। আমার চেয়ে অন্তত সাত আট বছরের সিনিয়র। জোর গুজব—উনি ডি-এস-পি পদে শীঘ্রই প্রমোশন পাচ্ছেন। প্রথম চাকরিতে ঢুকে ওঁর সহকারিত্বে বহাল হয়েছিলাম। এবং বলতে গেলে এই লাইনে উনি আমাকে বেশ খানিকটা ওয়াকিবহাল করে দিয়েছিলেন।

হেঁট হবার আগেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, ভাল? এরিয়াটার সুনাম আছে শুনেছি।

বললাম, হাঁ—খুনজখমের কেস একটাও পাইনি। ছিঁচকে চুরি, জমিজমা নিয়ে সামান্য গোলযোগ—কখনও বা দু' একটি আত্মহত্যা। স্মাগলিং'এর কেস একদম নেই।

হতো হিন্দুস্থান বর্ডার, বুঝতে। হাসলেন রবিদা। বড্ড একঘেয়ে সব কেস, বোরিং মনে হয়, না?

বললাম, বোরিং মনে হয় এই কারণে—থানাটা লোকালয় থেকে বেশ খানিকটা দূরে বলে। রিক্রিয়েশনের অভাব। আর প্রফেসনটাই আমাদের এমন—সাধারণ লোকে ভক্তিতে না হোক ভয়েতেও একটু তফাৎ তফাৎ চলে। কারও বৈঠকখানার আড্ডায় প্রাণখুলে মিশতে পারি না।

ওটা তোমার কমপ্লেক্স। বললেন রবিদা। মিশবে, মিশবে—লোক সমাজে প্রাণভরে মিশবে। নানা চরিত্র, সাইকোলজির জটিল তত্ত্ব—ক্রিমিন্যালদের মুভমেণ্ট ষ্টাডি করলে তবে তো অভিজ্ঞতা বাড়বে, আনন্দ পাবে। তখন এ লাইন মোটেই বোরিং মনে হবে না।

বললাম, তা বটে। সম্প্রতি একটি বড় মজার কেস হাতে এসেছে। সেটির পরিণতি জানবার জন্য কৌতূহল রয়েছে।

কি কেস?

প্রিয়বালার ঘটনাটা সংক্ষেপে বললাম। বললাম, ঘটনার আদিপর্ব্বটা জানি না বলেই কৌতূহল।

রবিদা বললেন, ওহো—ওটা যে বহুদিন আগেকার ঘটনা। আমি তখন রাণীদি' থানার সাব-ইন্‌স্পেক্টর। কেসটা যদিও কোর্ট অবধি গড়ায়নি—ওটা নিয়ে হৈ চৈ হয়েছিল যথেষ্ট। আজ আবার তারই একটি ক্ষীণ সূত্র ধরে এসেছি কোর্টে—ছোট্ট একটু কুইরি ছিল। কিন্তু এটা তো কোন কেস নয়, আইনের ধারায় কোর্ট সোপর্দ্দ হয়েছে বলেও তো মনে হচ্ছে না। বলতে বলতে সবুজ কভার দেওয়া একটা ফাইল টেনে নিলেন। হিয়ার ইট ইজ। ফাইলের পাতা উল্টাতে উল্টাতে রবিদা বললেন, গ্রাম—টিয়াবালি, জগদীশ রায়, পেশা—জমিদারি। যদিও জমির উপস্বত্ব ল্যাংড়া বোম্বাই আমের সত্বের মত নিংড়ে নিংড়ে বার করে নিয়েছিল লোকটা। ঠিক দুর্দ্দান্ত টাইপের মাতাল আর লম্পট নয়, বিষয় সম্পত্তি উড়িয়ে দেবার নেশাটাই ওর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আর দু'টি মকারের নেশা ওয়াইন এ্যাণ্ড উয়োম্যান হল গৌণ।

উৎসুক হয়ে চেয়ারটা সরিয়ে নিলাম ওর দিকে।

রবিদা বললেন, ছিলাম ওখানে দু'টি বছর—কীর্তিমানের বহু কাহিনীর খবরই কানে আসত। একদিন শুনলাম—কোন বিখ্যাত কীর্ত্তন-গায়িকাকে স্বভবনে এনে তুলেছেন—আর মাইফেল বসিয়েছেন পিতৃপিতামহের সেই ভিটায়। মাথার উপর কেউ ছিলেন না, না বাপ মা—না জ্ঞাতি পক্ষের কোন গুরুস্থানীয় লোক। তিনদিন ধরে নির্ব্বিরোধে চলছিল ফুর্ত্তি আনন্দ। কিন্তু আর একজন ছিলেন—তিনি কিছুতেই সেটি সহ্য করতে পারলেন না। ওর স্ত্রী—ওই প্রিয়বালা বিধিমতে চেষ্টা করলেন—স্বামীর মতিগতি ফেরাতে। কিন্তু পুরুষরা কি স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করে থাকেন—তাতে যে পৌরুষ হানি হয়। শুনেছি—স্ত্রীটি ছিলেন পরমা সুন্দরী, —অথচ বীরপুরুষের কিছুমাত্র লোভ ছিল না সেই অনায়াস-লব্ধ সৌন্দর্য্যের প্রতি। বরং সুযোগ ঘটলেই অবহেলা আর ঔদাসীন্য দিয়ে—বিঁধতেন স্ত্রীকে। অবহেলার প্রতিক্রিয়াটা অন্তদিকেও জমছিল বইকি। ওঁদের কুলগুরু সেই সময়ে বার কয়েক এসেছিলেন, শিষ্যকে উপদেশ দিয়ে সৎপথে ফেরাবার চেষ্টাও করেছিলেন। সবাই দেখলে—সে চেষ্টা বৃথা হল। কিন্তু অপর দিকের প্রতিক্রিয়ায় আর একটি ঘটনা হল। মেয়েদের জগতে দু'টি ঈশ্বর জান তো? একটিকে ধরতে পারলে অপরটিকে ধরা যায় সহজে! একটি দেবতাকে অন্ততঃ ওদের প্রয়োজন,—না হলে ওঁরা দাঁড়াতে পারেন না। বৈষ্ণব কবিরা বেশ উপমাটি দিয়েছেন—সহকারবৃক্ষে মাধবীলতা। ওঁরা সংসারের বিস্তার ভালবাসেন না, ছড়ানো জগৎকে ছোট সংসারটুকুর মধ্যে গুটিয়ে এনে নিশ্চিন্ত হতে চান। অবশ্য সব মেয়ের মনের ধারাটি যে এমন তা নয়, বরং আজকাল এর বিপরীতটাই চোখে পড়বে। প্রিয়বালা চেয়েছিলেন হাতের নাগালের দেবতাকে ধরে—আকাশের দেবতার রাজসভায় পৌছবেন। তা যখন হল না—তখন অন্য উপায় বেছে নিলেন তিনি।

হাতের সিগারেট পুড়ে গিয়েছিল। রবিদা থামলেন। নতুন একটি সিগারেট ধরিয়ে বাঁ হাতের কব্জি উল্টে বললেন, সাড়ে দশটা বাজে—এখনি তলব পড়বে হুজুরে, অতএব সংক্ষেপ করি। হাঁ—ওই যে সাকার দেবতা যিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি—পরমগুরু পতি—তিনি যদি মুখ ফিরিয়েছেন—স্ত্রীও মন ফেরালেন অন্যদিকে। এক দেবতাকে যখন পাওয়াই গেল না—আর এক দেবতাকে তখন চাই বইকি—না হলে আশ্রয় কোথায়—আশ্রয় কে দেবে! সেই পরম দেবতাকে পাওয়ার জন্যে গুরুদেবের শরণাপন্ন হলেন স্ত্রী। দীক্ষা নিলেন গুরুদেবের কাছে। গুরুদেব পরমব্রহ্ম—এই সত্যে বিশ্বাস করলেন। আর একদিন এই সত্যকে পাবার জন্য সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করে গুরুর আশ্রমে এসে উঠলেন। এসব হ'ল পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনা।

বললাম, তারপর?

ফাইল গুছিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রবিদা। বললেন, এখন এই পর্যন্ত—ডিউটি শেষ করে আসি। কোর্ট শেষ হলে আমার বাসায় আসবে? শেষ যেটুকু জানি—শোনাবো।

পট-ভূমিকা সম্পূর্ণ হ'ল না—তবু একটু যেন আশ্রয় পেল গল্পটি। প্রিয়বালার মূর্তিটি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হল।

* * * *

কোর্টের বারান্দায় সেই অদ্ভুত-দর্শন মূর্ত্তিটিকে দেখলাম। কিন্তু রবিদা-বর্ণিত চেহারার সঙ্গে সম্পূর্ণ অমিল। রবিদা অবশ্য চেহারার কোন বর্ণনা দেননি—চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। আমার কল্পনা মত চেহারাটি গড়ে নিয়েছিলাম। অভিভাবকহীন ধনীর সন্তান —উচ্ছৃঙ্খল—উন্মার্গগামী। গৌরবর্ণ, মেদভারে থলথলে দশাসই চেহারা

ঘাড় ছাঁটা চুল। ঈষৎ আরক্তিম ঢুলুঢুলু চোখ। পরনে মিহি ধুতি, কোঁচা লুটিয়ে পায়ের তলায়, গায়ে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, কব্জিতে ঘড়ি—চার আঙুলে চার পাঁচটি আংটি··কিন্তু সামনের সচল মূর্তিটি এক ধাক্কায় আমার কল্পনাকে হটিয়ে দিলে। বদল সব বুটা ছায়। অর্থাৎ শুধু মূর্তি নয়, চরিত্রও কিছু অংশে ঝুটা। বেশ বয়সে রবিদা-বর্ণিত চেহারা ধরা পড়ল না বটে, চেহারায় আভাস জাগল চরিত্রাংশের। দৈর্ঘ্যের অভাব পূরণ করেছে প্রস্থ—তাতেই আরও বেমানান দেখাচ্ছে মানুষটিকে। এমন খাঁটি কালো রং কমই দেখেছি—আর এমন বেঢপ গড়ন। থলথলে প্রায় অপূর্ব্ব এক বৃদ্ধ, আধপাকা কদম-ছাঁট চুলের মাঝখানে ইঞ্চি দুয়েক একটি শিখা। পরণে মিলের মোটা ধুতি, গায়ে বেনিয়ান গোছের একটা জামা, কাঁধে সাদা চাদর আর পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো। হাতে বেশ শক্তমত্ত মোটা লাঠি এক গাছা। দর্শনধারী না হলেও—এমন চেহারার মানুষের সৎ হতে বাধা নাই, চরিত্র-গৌরবে এঁরা মহৎও হয়ে থাকেন। কিন্তু রবিদা এই যে বলেছিলেন, দুর্দ্দান্ত টাইপের মাতাল আর লম্পট ঠিক নয়—বিষয় সম্পত্তি উড়িয়ে দেবার নেশাটাই ওঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—ওইটিই গেঁথে ছিল মনে। লোকটাকে দেখে ধারণা দৃঢ় হল—এ ব্যক্তি স্বভাবে দুশ্চরিত্র—বিবেকহীন, যে কোন অপকর্ম্ম করতে কুণ্ঠা নাই ওর। অথচ কেমন নিখুঁত ছদ্মবেশ নিয়ে লোক-সমাজে চলাফেরা করছে। প্রিয়বালা যে এই দুর্ব্বৃত্তের আশ্রয়ে যেতে চাইছেন না—এটি স্বাভাবিক। পঁচিশ বছরে অনেক কিছুই পরিবর্ত্তিত হয়, স্মৃতিতে ধরা ছবিটার রং বদল করে নেওয়া সহজসাধ্য নয়।

ইনি এখানকার থানার ও-সি, আমাদের কেসটার তদ্বির করছেন। ওঁর উকিল পরিচয়ের সূত্রটা সামনে আনল।

নমস্কার—নমস্কার। বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে দু'টি হাত এক করে কপালে ঠেকালেন।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে সামনে থেকে সরে এলাম।

• •

প্রতিপক্ষ কেউ ছিল না—এক পক্ষই সওয়াল চালাচ্ছিল। ওঁদের উকিলকে দিয়ে সওয়াল করিয়ে ঘটনাটি সহজবোধ্য করে নিচ্ছিলেন স্মারক।

পঁচিশ বছর আগে যখন ওই আশ্রমে আসেন, তখনও কি আশ্রম এই রকম ছিল?

না।

প্রসূতি-আগার ছিল? সুতা কাটা, তাঁতে কাপড় গামছা বোনা, জামা সেলাই, ঠোঙা তৈরী, খেলনা তৈরী—এসব ছিল?

না।

এসব হল কোন্ সময়ে? বিমলানন্দ স্বামী আশ্রমে আসার পর? এক কথায় ওঁর টাকাতেই আশ্রমের ঘর হ'ল, সাজসরঞ্জাম হ'ল, অনেকগুলি বিভাগ খুলল, আশ্রমটি স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠল, কেমন? আর এই সব দুর্গত অনাথ মেয়েরা আশ্রয় পেতে লাগল।

হাঁ।

আপনার গুরুদেব দেহ রাখবার আগেই বিমলানন্দ স্বামীর হাতে আশ্রমের ভার দিয়েছিলেন? ক্রমে নানা বিভাগ হয়ে যখন আশ্রমটি বড় হয়ে উঠল এবং অনেক মেয়ে আসতে লাগল, তখন স্বামীজী একজন মেয়ে অধ্যক্ষা ঠিক করে তাঁর হাতে আশ্রম পরিচালনার ভার দিলেন। অবশ্য আর্থিক সমস্যা মিটানোর ভার রইল ওঁরই। মেয়ে কর্মীরাই আশ্রমের ভিতরে সব দেখা-শোনা করতে লাগলেন—কালে ভদ্রে স্বামীজী ওখানে যাওয়া-আসা করতেন?

হাঁ।

আপনিই কি প্রথম অধ্যক্ষা ছিলেন?

না।

আপনার আগে যিনি অধ্যক্ষা ছিলেন—তাঁর বয়স কত?

বছর চল্লিশ হবে।

তিনি আশ্রম ত্যাগ করে যাওয়ার পর আপনাকে আশ্রমের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল, না আপনি দায়িত্ব নেবার পর তিনি আশ্রম ছাড়লেন?

ঠিক মনে নাই।

সে কত দিনের কথা?

প্রায় কুড়ি বছর হবে।

সেই থেকে একটানা আপনি ওই পদে রয়েছেন?

ছিলাম। এখন নাই।

সম্প্রতি আর একটি মেয়েকে এই পদে বহাল করা হয়েছে?

ঘাড় নাড়লেন প্রিয়বালা।

এতে আপনার মনে কোন কষ্ট হয়নি?

চুপ করে রইলেন প্রিয়বালা।

বুঝেছি, আপনি আঘাত পেয়েছেন। সেই জন্যই কি আশ্রমে থাকতে চাইছেন না? না অন্য কোন কারণ আছে?

চকিতে মাথা তুলে কি বলতে গেলেন প্রিয়বালা। কিন্তু কথা বলবার আগেই মাথাটা নামিয়ে নিলেন, বাঁ হাতে ঘোমটাটা একটুখানি টেনে দিয়ে চুপ করে রইলেন।

যাক—যে কারণেই হোক আশ্রম আপনার ভাল লাগছে না—তাই ওখান থেকে মুক্তি চাইছেন? কিন্তু সেজন্য আপনার স্বামী কেন কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন? আপনার চলে আসাতে কেউ আপত্তি করেছিলেন? বাধা দিয়েছিলেন?

না। ঘাড় নেড়ে সুস্পষ্ট কণ্ঠে জবাব দিলেন প্রিয়বালা।

তাহলে—

প্রশ্নের আগে সেই অপ্রিয়-দর্শন লোকটি তর্জ্জনী উঠিয়ে উভয়কে ইসারা করলেন। উকিল বললেন, আচ্ছা থাক এ সব প্রসঙ্গ। আপনি চলে আসতে চান—এই যথেষ্ট। সে স্বাধীনতা আপনার অবশ্যই আছে।

একটু থেমে পুনরায় বললেন, আর দু' একটি প্রশ্ন করব আপনাকে। স্বামীজী কি আশ্রমের ভিতরে বাস করেন না? আশ্রম সংলগ্ন একটি ঘর আছে যার একটি দরজার সঙ্গে অন্দরমহলের যোগ—সেইটিই কি ওঁর সাধন-ভজনের ঘর? সে ঘরে উনি কতক্ষণ জপধ্যান করেন?

জানি না।

উনি কোন্ মতে সাধনভজন করেন? শাক্ত মতে, বৈষ্ণবাচারে, না তন্ত্রসাধনা—

জানি না। অত্যন্ত স্পষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে যেন ধমক দিয়ে উঠলেন প্রিয়বালা।

...সওয়াল শেষ হ'ল।

এবার হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি টিয়াবাগিতে আপনার শ্বশুর-বাড়ীতে ফিরে যেতে চান কি?

এখনও কিছু ঠিক করিনি।

যাই হোক—মন স্থির করে কোর্টকে জানিয়ে দেবেন। আপনার স্বামী যে আবেদন করেছে তাতে পরোক্ষে শান্তি-আশ্রমের পরিচালককে কটাক্ষ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার কি মত? আশ্রমে কোন রকম দুর্নীতি যদি আপনার চোখে পড়ে থাকে, নির্ভয়ে তা বলতে পারেন। হয় তো এই কারণেই আশ্রম আপনার ভাল লাগছে না!

...প্রিয়বালা সজোরে মাথা নাড়লেন বার কয়েক। বোধ হল তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন—উত্তেজিত হয়েছেন রীতিমত। কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে এক সময়ে বলে উঠলেন,—এসব কথার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমায় মাপ করবেন।

আর কোন প্রশ্ন হল না, হলেও প্রিয়বালা হয়তো উত্তর দিতেন না। শেষ প্রশ্নটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর সর্ব্বাঙ্গ কঠিন হয়ে উঠেছিল, কাঠের রেলিঙে-রাখা ডান হাতখানা দিয়ে আরও শক্ত করে চেপে ধরেছিলেন রেলিঙটা। আলগা কাঠ নড়ে গিয়ে কাঠে লোহায় ঘা লেগে একটা ধাতব আর্ত্তনাদ উঠেছিল। যে শব্দে মুখ তুলে চেয়েছিলেন হাকিম, আমি তো রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলাম।

প্রিয়বালার কঠিন কণ্ঠস্বর বিচারালয়ের দেওয়ালে আঘাত করে মিলিয়ে গেল। অপর পক্ষ থেকে তদ্বিরের তাগিদ ছিল না—জেরার জের টানা হ'লো না। বেশ বুঝা গেল—কিছু চেপে যাচ্ছেন প্রিয়বালা। আশ্রমে এমন কিছু ঘটেছে—যা নিতান্ত লঘু বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। না হলে পঁচিশ বছর নিরুদ্বিগ্ন শান্তিতে কাটিয়ে—সেখান থেকে চলে আসার চেষ্টা কেন!

আহার-বিশ্রামাদির জন্য বাসা ঠিক করা ছিল—সেইখানে উঠলেন প্রিয়বালা। সরকারী উকিলের উপর ভার দিয়েছিলেন বিচারক—প্রিয়বালার খুসীমত ব্যবস্থা হ'লে—রিপোর্টটা যেন নথিবদ্ধ করে রাখা হয়।

* * * *

আহারাদি শেষ হলে ভাবছিলাম রবিদার কাছে যাব, উনিই এলেন আমার বাসায়। ওঁর পিছনে সেই শ্রীমূর্ত্তি জগদীশ রায়।

রবিদা ওঁর কেসটা শেষ করে সবে কোর্ট থেকে ফিরছেন—তেমনি ধড়াচূড়া পরা—স্নান আহার হয় নি।

বললাম, এইখানে আহারাদি সেরে নিন।

হেসে বললেন, ও কাজটা রেষ্ট রেণ্টে সেরে নিয়েছি। জানি, তো আর সময় পাব না। একটা কুইরির ভার দিলেন হাকিম—এখনি সদরে ছুটতে হবে। মাত্র আধঘণ্টা সময় হাতে। কাল কোর্ট বসলে রিপোর্ট চাই। শোন, ইনি পথে ধরলেন আমায় তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন বলে। ইনি হচ্ছেন—

কপালে হাত ঠেকিয়ে দু'পক্ষ নতুন করে পরিচিত হলাম।

রবিদা বললেন, পৃথিবী যেমন বদলাচ্ছে—মানুষও তেমনি চলছে তার সঙ্গে তাল রেখে। ইনি ওঁর অতীত কষ্টের জন্য অনুতপ্ত—যদিও বিশ্বাস করেন—ওটা অত্যন্ত দেরীতেই ঘটল! কিন্তু কিছুই ট্রাজিক হয় না—তা সে যত বিলম্বে হোক—যদি শেষ ভাগটা রক্ষা পায়। ইনি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চান সংসারে—তাহলে দু'টি জীবন ট্রাজেডি থেকে বেঁচে যাবে। এ ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকেই।

রবিদা চলে গেলেন।

ভদ্রলোক চেয়ার টেনে বসে বললেন,—এটি আপনাকে করতেই হবে যেমন করে হোক।

ভদ্রলোকের চেহারা বিরক্তি উদ্রেককর, গ্রাম্য ভাবটিতেও ভব্যতার অভাব। ভাল লাগল না। সরাসরি আঘাত দিয়ে বললাম, মানুষের মনের উপর কি জুলুম চলে? উনি আপনার আশ্রয়ে যেতে চান না। বলেন, ওখানে যাওয়া চলে না। জানি না, পঁচিশ বছর আগে কি এমন মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন—যা আজও ভুলতে পারেননি।

জগদীশ রায়ের মুখ পাংশু হয়ে উঠল। অধোমুখে চুপচাপ বসে রইলেন কিছুক্ষণ। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ওঁর দিকে। একটুও শ্রী ছিল না ওঁর মুখে। দীর্ঘকাল অমিতাচারের ফলে গালের চামড়া বহু ভাঁজে ভাঁজ করা কাগজের মত হয়েছে; তাতে যা লেখা ছিল, তা তো মুছেই গেছে—নূতন করে কিছু লেখাও চলবে না আর! তবু ওই শত ভাঁজে ভাঁজকরা দলা-পাকানো কাগজটা এমনই নরম হয়েছে যা দেখলে মনের বিরূপ ভাবটা কেটে যায়।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুললেন। আমার পানে না চেয়েই বলতে লাগলেন,—আজ বুঝতে পারি সেদিনকার আঘাতটা কত গভীর ছিল। পুরুষের পক্ষে যা অবহেলার জিনিস—মেয়েদের সেটা কত মর্মান্তিক! বলে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

কাহিনী শোনার কৌতূহল থাকলেও তা নিয়ে হৃদয়-বিলাস করার অবকাশ আমার ছিল না। চেয়ারটা ঈষৎ শব্দ করে সরিয়ে নিলাম। উনি বুঝুন—কার্য্যান্তরে যাবার তাড়া আছে আমার।

এই ইঙ্গিতে উনি সচেতন হলেন হয়তো। মুখ তুলে বললেন,—ইনস্পেক্টর বাবু, অনেক মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয় আপনাদের, অনেক রকমের চরিত্র ঘাঁটতে হয়, সাইকোলজির অনেক তত্ত্ব—আপনারা জানেন। এটাও নিশ্চয় জানেন যে, যৌবনকে আমরা পুরুষমানুষরা হেলায়-ফেলায় অনাদরে উচ্ছৃঙ্খলতায় নষ্ট করে দিতে পারি—মেয়েরা তাকে পরম সম্পদের মত আগলে রাখতে চায়। জামা-কাপড় সোনাদানা বিষয়সম্পত্তি খোয়া গেলে কিম্বা ছেলেমেয়েদের দিক থেকে দুঃখ অবহেলার আঘাত এলে ওরা অনায়াসে সইতে পারে—অথচ কেউ যদি ওদের রূপকে তুচ্ছ করে যৌবন-গর্ব্বে আঘাত দেয়—ভালবাসাকে উপেক্ষা করে—সে ওরা কিছুতেই সইতে পারে না। সে আঘাত ওদের কাছে মর্মান্তিক। তা কিছুতেই ভুলতে পারে না, সারা জীবনেও মোছে না সে দাগ।

একটি ছোট নিঃশ্বাস বুকে টেনে নিয়ে বললেন,—ভেবেছিলাম সে তো অনেকদিন হ'ল—আমরা দু'জনেই সেই সাংঘাতিক কালটি পার হয়ে এসেছি। যে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছিলাম ওঁকে—যৌবনের ভোগবাসনা তা আমার নাই, উনিও মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন। দেহ সম্বন্ধ রাখার তাগিদ যখন কোন পক্ষেরই নাই—তখন নতুন করে পুরণো দিনের মান-সম্মান অশান্তি-উদ্বেগ কিছুই ভোগ করব না আর। কিন্তু···না থাক। আপনি ওঁকে জানাবেন—ওঁর খুসীমত জায়গায় গিয়ে থাকুন; কোন আশ্রমে, তীর্থস্থানে, যেখানে খুসী। আর্থিক সাহায্য দরকার হলে যথাসাধ্য পাবেন। আচ্ছা—নমস্কার।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মনে হল অল্প অল্প কাঁপছেন। আবেগ উত্তেজনায় খানিকটা বিহ্বল হয়ে পড়েছেন বোঝা গেল।

আশ্চর্য্য লাগল—দীর্ঘকাল পরে যৌবনদিনের সতেজ বৃত্তিগুলি ওঁর রক্তকণিকায় সহসা দোলা দিল কোন্ যাদুমন্ত্রবলে!

টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন উনি।

* * * *

জগদীশ রায় বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। যে চেহারা নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন—সাধারণত: সেই চেহারা নিয়েই গেলেন, আমার কিন্তু মনে হ'ল—ওটি ওঁর ছদ্মবেশ। ধনীর দুলাল—মত্তপ, লম্পট, অশিক্ষিত···আমার কল্পনা-মূর্ত্তির সামান্য নিদর্শনও রেখে গেলেন না। এ যে অন্য এক মানুষ। সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের মানুষ, অপরের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সজাগ, স্নেহময় এবং শিক্ষাসহবৎ লালিত। মনস্তত্ত্ব বিষয়ে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে মনে হল।

মনে হল আরও দু'একটি প্রশ্ন তো করতে পারতাম ওঁকে। উনি একদিকের রহস্য আবরণ যেটুকু সরিয়েছেন তার আলোয় পঁচিশ বছর আগেকার প্রিয়বালাকে দেখতে পাচ্ছি। যৌবনবতী তরুণী, রূপসী, অভিমানিনী। ইন্দ্রিয়-পরায়ণ রূপোন্মত্ত স্বামী খরবহ্নিদীপ্ত সেই রূপে একটুও আকৃষ্ট হ'ল না। যৌবনজ্বালা-জর্জ্জরিত পরাজিত

হতমান প্রিয়বালার পক্ষে সংসার তখন বিষ তুল্য। সেই অপমান জ্বালাকে ভুলতে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে গুরুর আশ্রমে চলে গেলেন প্রিয়বালা। তারপর কাটল দীর্ঘ দিন। অনুমান করা শক্ত নয়—শান্তিতেই কেটেছিল দিনগুলি। কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে আবার কোন অপমান-জ্বালা ওঁকে আশ্রয় থেকে বিচ্যুত করে পথের মাঝখানে এনে ফেলল। সে কি আশ্রম-কর্তৃত্বভার থেকে অপসারণের বেদনা? স্বামীজীর বিশ্বাস-স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হওয়ার অস্বস্তি? কি সে রহস্য? বিচারকের সামনে যে সব প্রশ্ন করা হয়েছিল—তার মধ্যে দু'টির গুরু ভার আমার মনে চেপে বসেছে।

স্বামীজী কোন্‌মতে সাধনা করেন—বৈষ্ণবাচার, না তান্ত্রিকাচার?

সম্প্রতি আর একটি তরুণী মেয়েকে অধ্যক্ষার দায়িত্ব ভার দেওয়া হয়েছে, সেজন্যই কি আপনার মনে কষ্ট হয়েছে?

পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত দু'টি প্রশ্ন। স্বত্ব ও সম্মানের তৌলে ওজন করা দুটি জিনিস—যা হারালে মেয়েরা জীবন ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করে। কোনটিরই জবাব দেননি প্রিয়বালা। কেন? কেন?

সন্দেহের বিদ্যুৎ আমার মনের কালো মেঘকে চিরে চিরে চমকাতে লাগল। ফাইলটা গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়লাম। আর একবার জগদীশ রায়কে আমার চাই। একটি প্রশ্ন করব ওঁকে।

* * * *

স্নান সেরে আহ্নিকে বসেছিলেন জগদীশ রায়, খানিকটা অপেক্ষা করতে হল।

এদিকে আহার্য্য প্রস্তুত করে ঠাকুর অপেক্ষা করছিল রান্নাঘরে।

আহ্নিক শেষে আমাকে দেখলেন—জগদীশ রায়। রান্নাঘরের দিকে পা না বাড়িয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, উনি রাজী হয়েছেন? যাবেন টিয়াখালিতে!

বললাম, সে খবর পরে। আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে, কিন্তু আপনি আহার না সেরে এলে তো বলতে পারব না।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন উনি। হাসলেন। গালের কোঁচকানো চামড়াগুলো টান টান হয়ে উঠল—চমৎকার একটি সারল্যদ্যুতি ফুটে উঠল মুখে। বললেন, টাইম বাঁধা-খাওয়া শোওয়া ঘুমনো এসব বদ অভ্যাসগুলি প্রায় ভুলতে বসেছি ইন্‌সপেক্টরবাবু! এসব যাঁদের দেখার কথা—তাঁরা তো কেউ নাই। কিছু সঙ্কোচ করবেন না, বলুন।

সামান্য ইতস্তত করে বললাম, আপনার স্ত্রীকে যখন সওয়াল করা হচ্ছিল—তখন দু'একটি প্রশ্নের প্রতি আশা করি আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল? আপনার স্ত্রী দীর্ঘকাল পরে কেন ওই আশ্রম থেকে চলে আসতে চাইছেন—

জগদীশ রায় বললেন, হাঁ—বেশ মনে আছে। প্রশ্নগুলি আমিই করিয়ে ছিলাম উকিলকে দিয়ে। অর্থাৎ আগে থেকে ঠিক করা ছিল—

বিস্ময়ে চমকে উঠলাম। আপনি করিয়েছিলেন ওই ধরণের প্রশ্ন? স্বামীজীর সাধন সম্বন্ধে—নতুন যে মেয়েটি কর্তৃত্ব ভার নিয়েছে—

হাঁ—আমারই প্রম্‌ট্ করা সওয়াল গুগুলি। স্বামীজী কোন্ মার্গের সাধক—জানবার কৌতূহল ছিল।

প্রশ্নের উত্তর তো পাননি আপনি। বললাম।

না পেলেও জানতে পেরেছি—ওঁর সাধন-রহস্য।

আমি তো বিস্ময়ে স্তম্ভিতপ্রায়। বলেন কি—আমরা কেউ তা ধরতে পারিনি—

...একটু চেষ্টা করলেই ধরতে পারতেন। হাসলেন জগদীশ রায়। কিন্তু ওদিকে মনোযোগ ছিল না আপনাদের। আপনারা ওঁর আশ্রম ত্যাগের হেতুটা অন্যরকম মনে করেছিলেন। ক্রোধ ক্ষোভ কিম্বা ওই হঠাৎ উদ্দীপ্ত হওয়া কোন মনোবৃত্তির প্রভাব ভেবেছিলেন।

এসব ছাড়া কি হতে পারে! হতবুদ্ধির মত বললাম।

মনের ব্যাপার ভারি সূক্ষ্ম ইন্‌সপেক্টর বাবু—তবে বাইরের ঘটনাগুলিকে আশ্রয় করেই তা প্রকাশ পায়—

ওঁর ব্যাখ্যা শুনবার ধৈর্য্য আমার ছিল না। বললাম, যাই হোক—স্বামীজী কোন্ মার্গের সাধক বুঝতে পারলেন।

উনি প্রচ্ছন্ন কৌল।

সে আবার কি?

মানে উনি অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে তন্ত্র সাধনা করে থাকেন। আর ঐটিই স্বাভাবিক। যে বিষয়-ঐশ্বর্য্য ভোগের মধ্য দিয়ে ওঁকে এ পথে আসতে হয়েছে—তাতে শেষ এবং সাংঘাতিক ধাপটি অতিক্রম না করে উপায় কি!

আমি অবাক হয়ে ওঁর কথা শুনছিলাম।

উনি বলতে লাগলেন,—পঞ্চমকারের সব চেয়ে যেটি শক্ত মকার—সেইটিকেই কঠিন ধাপ বলছি। ওঁর জীবনের কথাটাই ভেবে দেখুন। যৌবনের অল্পদিন মাত্র তরুণী পত্নীকে পেয়েছিলেন। তাঁকে হারিয়েই বৈরাগ্যের টানে অন্য দিকে ভেসে গিয়েছিলেন। ওই যে বৈরাগ্য—ওকি সাময়িক স্নায়ু-উন্মাদনা নয়? ওর বেগ যতক্ষণ প্রবল, ততক্ষণই জীবনকে নলিনীদলগত জলের মত তরল মনে হবে, কিন্তু তারপর? মনের অপূর্ণ ভোগ যায় না—দুরন্ত যৌবন—এদের ক্রিয়া কর্ম্ম—এ সবকে কিছু না বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি? স্বধর্ম্মের নিয়ম অনুসারে মনকে এরা পীড়ন করবেই। আর অত্যন্ত কঠোর সে পীড়ন। সাধনার ক্ষেত্রে এই পীড়ন থেকে পরিত্রাণ পাবার একটি মাত্র পথ খোলা আছে—যাকে বলা হয় বীরাচার। ভোগের দ্বারা ভোগেচ্ছাকে ক্ষয় করা। তন্ত্রমতে পরিপূর্ণ ভোগ না হ'লে নিস্পৃহ মনের ক্ষেত্রে সাধক দাঁড়াতেই পারেন না। এ হল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত।

সবিস্ময়ে বললাম, আপনি অনেক জানেন দেখছি।

বিষণ্ন হাসি হেসে বললেন, ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার তো কম হয়নি, সব পথই একটু একটু জানা আছে। আচ্ছা, এবারে উঠি।

অপ্রতিভ স্বরে বললাম, আর একটি কথা। ধরে নেওয়া গেল বিমলানন্দ স্বামী তন্ত্রমতে সাধনা করেন। কিন্তু শ্মশান না হলে চক্র-সাধনা কোথায় করবেন? উপযুক্ত ভৈরবীই বা পাবেন কোথায়? আমি নিজের চোখে দেখেছি, আশ্রমের প্রতিটি মেয়েকে উনি মাতৃবৎ দেখেন; নিজের কানে শুনেছি প্রত্যেককে মাতৃ সম্বোধন করছেন।

একটু শব্দ করে হেসে উঠলেন জগদীশ রায়। কি প্রাণ খোলা সরল হাসি। বললেন, তন্ত্রাচারের গূঢ় তত্ত্ব জানা থাকলে এমন প্রশ্ন করতেন না ইন্‌সপেক্টর বাবু। কি জানেন—আমরা সংসারী মানুষরা লৌকিক সম্বন্ধ মেনে চলি, পান থেকে চুন খসলে ভয়ে আঁৎকে উঠি।

অন্নমতে সব সম্বন্ধ নির্ব্বিকার। ওখানে অস্তিত্ব মাত্র হু'টি বস্তুর, পুরুষ আর প্রকৃতি। লৌকিক যে সম্বন্ধ বন্ধনে তারা পরস্পর যুক্ত হোক না কেন, সাধনার ক্ষেত্রে সেটি খোলস ছাড়া কিছু নয়। ওই খোলস—যা মায়াবন্ধনের নামান্তর—না ছাড়লে সাধকের মুক্তি হবে কেমন করে? আর উত্তরসাধিকাদের বেশ বদলেরই বা প্রয়োজনটা কি। চক্রে গেরুয়া বসনের উপকরণ লাগে না, দিগ্‌বসনারাই প্রধানা।

বিদ্যুতের আলোয়—ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে প্রিয়বালার একটি উক্তি।

যে আশ্রয়েই থাকি আমরা মানে মেয়েরা, সে কোনদিনই নিশ্চিন্ত আশ্রয় নয়।

ভাবতে লাগলাম জগদীশ রায়ের কৌল-সাধনার ব্যাখ্যার পর প্রিয়বালার এই উক্তিটি জুড়ে দিলে ওঁর আশ্রম ত্যাগের রহস্যটা রহস্য থাকে কি!

আমাকে চিন্তান্বিত দেখে জগদীশ রায় বললেন, মরা অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কোন লাভ নেই ইন্সপেক্টরবাবু, খালি অশান্তি বাড়ে। তার চেয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? আপনি কি বলেন?

হতবুদ্ধির মত ঘাড় নাড়লাম শুধু।

নূতন জীবন, না বেশ বদল? অর্থাৎ ছদ্মবেশ। এই ছদ্মবেশীদের প্রতিনিয়তই খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা। বুদ্ধি-কৌশলে, যুক্তি-সিদ্ধান্তে, দৃঢ়প্রত্যয়ে, কখনো বা ভাবাবেগে চালিত হয়ে ওদের আসল রূপটিকে আলোয় আনার চেষ্টা করছি। কিন্তু সব সময়ে সে চেষ্টা সফল হচ্ছে না। সংসার-রঙ্গমঞ্চ রাত্রির মোহময় আলোক প্রক্ষেপে সর্ব্বক্ষণ চঞ্চল। দৃষ্টি বিভ্রমকর আলোকবৃত্তে সাজানো বস্তুগুলিও এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকছে না, ওদের চার পাশে ছায়া-ছায়া ছলো-ছলো ঢেউ-এর ভাঙ্গাগড়া। অবিরাম উঠছে ঢেউ—চলছে ভাঙাগড়া; আমরা ছদ্মবেশ উন্মোচকের দল সেখানে অসহায়।

চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল জগদীশ রায়ের কণ্ঠস্বরে। দালানের ফোকর দিয়ে ঘরের চৌকাট ডিঙিয়ে রোদ এসে পড়েছিল আমার চেয়ারের কাছটিতে। জগদীশ রায় চৌকাটের বাইরে এক পা রেখে আমার সামনে ছায়া ফেলে ঘাড় ফিরিয়ে বলছেন, আমার এই কথাটি শুধু ওঁকে জানাবেন ইন্সপেক্টরবাবু—উনি যে ভাবে থাকতে চাইবেন, সেই মত ব্যবস্থাই হবে। টিয়াবাগিতে হোক, অন্য যে কোন জায়গাতে হোক—যেখানে শান্তি পাবেন···একটু বুঝিয়ে বলবেন কেমন? আচ্ছা নমস্কার।

চৌকাট থেকে পা তুলে নিলেন জগদীশ রায়। আমার সামনের ছায়াটা··ছোট হয়ে এলো।

প্রতীক্ষা

শ্রীমতী বসু

রাতের পরে রাত জাগা এই আঁখি
সেদিন যদি ঘুমায় অচেতনে।
যেদিন তুমি আসবে আমার কাছে
হঠাৎ আনমনে।
সেদিন যদি ঘুম না আমার ভাঙ্গে
তোমায় পাবার স্বপ্নে হৃদয় রাঙ্গে,
ভুল বুঝে বা শুধু অকারণে,
চলে যেন যেওনা অভিমানে।
ডাকতে যদি না পারো গো মোরে
বাঁধতে নাহি পারো বাহুর ডোরে,
ফুলের মত পাপড়ি মেলা ঠোঁটে
কপোলে মোর যেও পরশ ক'রে।
আর কভু না দাওগো যদি ধরা
ডাকলে আমি না যদি দাও সাড়া,
সারা জীবন এই বেসাতি লয়ে,
জীবন-তরী চলব আমি বেয়ে।
হঠাৎ যদি রাত্রি আসে নামি
মধ্যপথেই যাত্রা যায় গো থামি।
দুঃখ কিছু রইবে নাকো মনে,
চিরতরেই বিদায় নেবার ক্ষণে।

অন্যদিন

রণেশ মুখোপাধ্যায়

আঁকাবাঁকা সোনামাখা রোদ:
কাঁচাসোনা ঝরানো বিকেল।
বাতাবীলেবুর ডালে শালিখের নরম পালকে
এ রোদের বিদায়ী ব্যস্ততা।

এ আকাশে ছিল তো সকাল:
একমুঠো সবুজ সকাল।
বাতাসের কানে কানে আশাবরী সুর—
কাক-চোখ নদীটির জল;
কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে
উর্বশীর কবরী রচনা।

সে সকাল আসে আর যায়,
দুপুরের তেমনই প্রহরা:
ছায়া ফেলে চিলের মাথায়
মেঘ ছোটে দূর ঠিকানায়।
বাতাসের কানে শুধু বৈরাগ্যের ব্যাকুল বেহাগ!
আর, বাতাবীলেবুর ডালে শালিখের নরম পালকে
আশার 'আল্পনা আঁকে একফালি সোনামাখা রোদ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অবিনাশ সাহা

১৬

সত্যি, নবীনচন্দ্রের হত্যাকারী কে? মানবেন্দ্রনাথ, যশোদা মজুমদারের মতো রমণী দারোগাও ভেবে ঠিক করতে পারেন না। ইন্সপেক্টর অম্বিকাবাবু, সার্কেল ইন্সপেক্টর বিজয় সেন—সকলেই হতভম্ব। নবীনচন্দ্রের জন্য সকলেই দুঃখ প্রকাশ করেন। সকলেই ভাবেন, দুঃখ প্রকাশ করাই পুলিশের একমাত্র কর্তব্য নয়; আততায়ীকে খুঁজে বার করার মধ্যেই রয়েছে তার গৌরবময় ভূমিকা। পুলিশ সাধ্যমতো সে চেষ্টাই করবে। এতে কোন রকম অন্যথা হবে না। —অম্বিকাবাবু দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। রমণী দারোগাও উঠে পড়ে লাগেন। ঘটনার রাত্রেই মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য সদরে পাঠিয়ে দেন। তারপর ভোর রাত্রেই আবার এসে হাজির হন চৌধুরী-বাড়িতে। আজকের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট সকলের জবানবন্দী নেওয়া শেষ করবেন।

শোকাচ্ছন্ন চৌধুরী পরিবার। ছেলে বুড়ো সকলেই কেঁদে কেঁদে আত্মহারা। নবীনচন্দ্রের স্ত্রী মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যাচ্ছে। সারারাত বিলাপ করে করে কেঁদেছে বেচারা। বিলাপ করেছে, ওর ভাগ্য-দোষেই এমন অঘটন ঘটলো। ও রাক্ষুসী—ডাইনী। কেন ও একা ভাসান দেখতে গেলো?···

কিন্তু সব চেয়ে মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে উমাসুন্দরীর অবস্থা। কোথায় নিজে যাবেন আর তার বদলে কিনা একমাত্র দুলালকে হারালেন। উমাসুন্দরীর চোখে আর জল নেই। বুক চাপড়ে চাপড়ে পাষাণ হয়ে গেছেন। পাথরের চোখের মতোই চোখের দৃষ্টি। আলুথালু পাগলিনীই যেন। রমণী দারোগা বাড়িতে পা দিয়েই বিব্রত বোধ করেন। মায়ের দুঃখে নিজের চোখেও জল আসে। কি করে প্রশ্ন করবেন হতভাগ্য এই বুড়িটাকে? নবীনচন্দ্রের স্ত্রীকেই বা কি বলে সান্ত্বনা দেবেন? তবু যদি আততায়ীর একটা কিনারা করতে পারতেন!···রমণী দারোগা মাথা নীচু করেই খানিক অপেক্ষা করেন। তারপর ভাবেন,—না না, আমি পুলিশ। কোন রকম ভাবাবেগে ডুবে যাওয়ার চেয়ে কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়াই আমার ধর্ম। চৌধুরী-পরিবারের ক্ষতি অপূরণীয়। তবু আততায়ীর সাজা হলে ওরা অনেকটা সান্ত্বনা পাবেন!···জড়তা কাটিয়ে ওঠেন রমণী দারোগা। অবিচলিত চিত্তেই যথা কর্তব্য করে যান। প্রথমেই ডেকে পাঠান নবীনচন্দ্রের স্ত্রীকে। খবর নিয়ে জেনেছেন এখন কতকটা সুস্থই আছে বেচারা। বলা যায় না আবার কখন কি হয়। তাই সর্বপ্রথম ওকেই জেরা শুরু করেন।

স্বামী-শোকে বিহ্বলা নারী। বুকে চিতায় আগুন জ্বলছে। সহসা সেই আগুনের শিখার মতোই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। জীবনে কোনদিন যে পরপুরুষের মুখোমুখি হয়নি, সে-ই আজ দারোগার পায়ের ওপর মাথা ঠুকতে থাকে। বুক চাপড়ে দাপাতে থাকে,—আমার যথা সর্বস্ব দেবো দারোগাবাবু, যে ডাকাতরা আমার সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছে, তাদের আপনি খুঁজে বার করুন। আমার মতো তাদের বউ ঝিরাও জ্বলে পুড়ে মরুক। আমার মতো তাদেরও সিঁথির সিঁদুর মুছে যাক। আপনি আমাকে দয়া করুন দারোগাবাবু—দয়া করুন। রুদ্ধ আবেগে কণ্ঠ জড়িয়ে যায় নবীনচন্দ্রের স্ত্রীর। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে।

সে কান্নায় রমণী দারোগা থৈই হারিয়ে ফেলেন। দু'চোখ জলে ভরে আসে। কোন রকম প্রশ্ন করতে মন সরে না। তবু কর্তব্যের তাগিদে দু'-চার কথা জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু জবাব যা পান তাতে মামলার কোন হদিস মেলে না। অগত্যা ওকে অব্যাহতি দিতেই মনস্থ করেন। কিন্তু নবীনচন্দ্রের স্ত্রী কিছুতেই পা ছাড়তে রাজী নয়। স্বামীহন্তার শাস্তি না হলে দারোগার পায়ের ওপরে মাথা ঠুকেই মরবে ও। কি হবে মূল্যহীন জীবনের বোঝা বয়ে?···

রমণী দারোগা বিভ্রাটে পড়েন। অনেক কষ্টে ছাড়া পান। মতি দেওয়ান এক রকম জোর করেই ওকে তুলে নিয়ে যায়।

ডাক পড়ে এবার উমাসুন্দরীর। লোল চর্ম, ন্যুব্জ দেহ। পুত্রশোকে ভেঙে পড়েছেন। মার এমন হৃদয়বিদারক মূর্তি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখেছেন বলে স্মরণ করতে পারেন না রমণী দারোগা। কি প্রশ্ন করবেন কিছুই ভেবে পান না। তবু কর্তব্যের খাতিরে মনকে শক্ত করতে চেষ্টা করেন। রুমালে মুখ পুছে সহৃদয় ভাবেই শুধোন,—আচ্ছা মা, কাল ঘটনার সময়ে আপনি কোথায় ছিলেন?

দারোগার সঙ্গে সঙ্গে সহসা উমা সুন্দরীকেও অনেকটা শক্ত মনে হয়। মৃত পুত্রের জন্যে হা-হুতাশ করার চেয়ে জল্লাদকে খুঁজে বার করতেই যেন তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একটুও গলা কাঁপে না। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই ফেটে পড়েন,—আমি ঘাটে ছিলাম বাবা! আর সেই সুযোগেই ডাকাতরা আমার বাছাকে—

আপনি উত্তেজিত হবেন না মা।

বনস্পতি পঞ্চাশটিরও অধিক দেশে ব্যবহার করা হয়

পৃথিবীর সবজায়গায় বনস্পতিজাতীয় স্নেহপদার্থের ব্যবহার বহুকাল ধরে প্রচলিত। পাশ্চাত্যদেশে বলা হয় মার্গারিন ও শর্টনিং যা খুবই জনপ্রিয়। প্রচুর মাখনের দেশেও মাখনের চেয়ে বনস্পতিজাতীয় স্নেহপদার্থের ব্যবহারই বেশী। নীচের তালিকাটি দেখলেই বুঝবেন :

বছরে মাথাপিছু দরকার হয় (পাউণ্ড হিসেবে)

	মাখন	শর্টনিং ও মার্গারিন
ডেনমার্ক	২৩.০	৪১.৪
নেদারল্যাণ্ডস	৯.০	৪৪.৮
যুক্তরাজ্য	১৮.৫	১৯.৯
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৮.০	২০.৬
পশ্চিম জার্মানী	১৭.২	২৭.১

সারা পৃথিবীতে বনস্পতিজাতীয় স্নেহপদার্থের এই যে জনপ্রিয়তা তার মূলে আছে শিল্পবিপ্লব। পাশ্চাত্যদেশগুলির শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়, খাদ্যসামগ্রী আরও উপাদেয় ক'রে তৈরী হ'তে থাকে এবং খাদ্যস্নেহের চাহিদা বেড়ে যায়। প্রচলিত স্নেহপদার্থ মাখন, চর্বি এবং ড্রিপিং দিয়ে সে চাহিদা মেটে না।

ফলে, অপেক্ষাকৃত কমদামী অথচ সমভাবে পুষ্টিকর খাদ্যস্নেহের অনুসন্ধান চলতে থাকে এবং হাইড্রোজেনেশন পদ্ধতিতে খাদ্যোপযোগী তৈলকে ঘন স্নেহপদার্থে রূপান্তরিত করা শুরু হয়। তার পর থেকে উৎপাদন ক্রমেই বাড়তে থাকে। নানা দেশে এর নানা নাম, যেমন শর্টনিং, মার্গারিন, ভেজিটেব্‌ল ঘি, বনস্পতি।

আজকাল বনস্পতি জাতীয় স্নেহপদার্থ পঁচিশটিরও বেশী দেশে প্রস্তুত হয়। সবচেয়ে বেশী উৎপাদন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট রাশিয়া ও ভারতবর্ষ।

পুষ্টিকর ও কমদামী স্নেহপদার্থ

ভারতবর্ষেও লোকসংখ্যা বাড়ছে, জীবনযাত্রার মান উন্নততর হচ্ছে, আর বাড়ছে তার খাদ্য-স্নেহের চাহিদা। কিন্তু প্রচলিত স্নেহপদার্থ ঘি এবং কয়েকটি উদ্ভিজ্জ তৈল যেমন দুর্মূল্য, তেমনি পাওয়াও যায় কম। সৌভাগ্যবশতঃ ভারতে বাদামতেলের অভাব নেই এবং এ থেকে প্রচুর বনস্পতি তৈরী করা হচ্ছে। সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকের মত ভারতবর্ষে আমরাও রান্নার উপকরণ হিসেবে এই পুষ্টিকর কমদামী স্নেহপদার্থটি ক্রমেই বেশী করে ব্যবহার করছি।

বনস্পতি-জাতীয় স্নেহপদার্থ পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহার করা হয়

আলবানিয়া, আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, অষ্ট্রীয়া, বেলজিয়াম, ব্রেজিল, ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকা, বুলগেরিয়া, ব্রহ্মদেশ, কানাডা, মধ্য আফ্রিকান ফেডারেশন, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ইথিওপিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, গ্রীস, হাঙ্গেরী, ভারত, ইরান, ইরাক, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইস্রায়েল, ইটালী, জাপান, লিবিয়া, মালয়, মেক্সিকো, মরক্কো, নাইজিরিয়া, নরওয়ে, নেদারল্যাণ্ডস্, পাকিস্তান, পোল্যাণ্ড, পর্তুগাল, রুমানিয়া, সৌদী আরব, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, রাশিয়া, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ইয়েমেন, যুগোস্লাভিয়া।

আরও বিস্তারিত জানতে হলে এই ঠিকানায় চিঠি লিখুন :

দি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব্ ইণ্ডিয়া
ইণ্ডিয়া হাউস, ফোর্ট ষ্ট্রীট, বোম্বাই

JWTVMA 2466A

না না, আমি উত্তেজিত হবো কেন ? আমার উত্তেজনায় কার কি এসে যায় ? আমার কি আর সে বয়েস আছে ?.....

আপনি শান্ত হোন মা—আমাকে সাহায্য করুন। আপনার সাহায্য পেলে সে ডাকাতদের আমি খুঁজে বার করতে পারবো।

তুমি—তুমি তো তা পারবে না বাছা। অসুরকে যে মা ভগবতীই নিধন করেছিলেন।

মা—

আমাকে একটা বন্দুক দিতে পারো বাবা ? আমাদের বন্দুকগুলো আবার নবীন তালা-চাবি দিয়ে রেখে গেছে।

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন ভেবে পান না রমণী দারোগা। এক রাত্রে সত্যি বোধ হয় ক্ষেপে গেছেন উমাসুন্দরী।

ওকে নিরুত্তর দেখে উমাসুন্দরী আবার গর্জে ওঠেন,—কি, বোবা হয়ে গেলে যে ! বলো, তোমাদের বন্দুকেও তালাচাবি পড়েছে ?

বন্দুক আমি আপনাকে এক্ষুনি দিতে পারি। কিন্তু তাতে তো উপযুক্ত বিচার হবে না মা !

বিচার ! বিচার কি দেশে আছে ?

নিশ্চয় আছে মা। ধর্মের ঢোল একদিন বাজবেই। আপনি শুধু আমাকে একটু সাহায্য করুন।

কি সাহায্য চাও তুমি ?

আপনি আমাকে বলুন, সকলে আপনারা বিজয়া দেখতে ঘাটে গেলেন অথচ নবীন বাবু গেলেন না। এর মানে কি ?

নবীন আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে ছটফট করেছিল। কিন্তু আমি অভাগিই ওকে যেতে দিইনি।

কেন মা ?

আমি শুনেছিলাম, ঘাটে বেশ একটা গোলমাল হবে। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি বলুন ?

মতিও আমাকে ওকে ঘাটে পাঠাতে নিষেধ করেছিল।

কে—মতি ?

আমাদের দেওয়ান—মতি রায়।

রমণী দারোগা সহসা যেন অন্ধকারে আলোর সন্ধান পান। যেন গুপ্ত পথের রুদ্ধ দরজাটাই এক নিমেষে খুলে যায়। তাই সোৎসাহে আবার প্রশ্ন করেন, উনি আর কিছু বলেছিলেন ?

না।

আচ্ছা, আপনি বিশ্রাম করুনগে। আমি আর আপনাকে বিরক্ত করবো না।

বিশ্রাম, বিশ্রাম কি আমার অদৃষ্টে আছে ! নবীন কি আমাকে ওর কাছে ডেকে নেবে ? নবীন, বাবা। আমাকে তোর কাছে নে—তোর কাছে নে,—বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বেরিয়ে যান উমাসুন্দরী।

রমণী দারোগার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। উমাসুন্দরী ওঁর হাতে গুপ্তপথের সন্ধান দিয়ে গেলেন। সে পথ ধরেই ওকে এখন অগ্রসর হতে হবে। পুলকে পকেট থেকে কেস বার করে একটা সিগারেট ধরান। সজোরে গোটা কয়েক টান দিয়ে তলব করেন মতি দেওয়ানকে।

কাল রাত থেকে চৌধুরী-বাড়িতেই আছে মতি। সোরগোল শুনে ঘাট থেকে সোজা চলে এসেছিল। বাড়ি যাবার ফুরসৎ পায়নি। মাকে পর্যন্ত প্রণাম করতে পারেনি। পার্বর কথাও ভুলে যেতে হয়েছে। ও না থাকলে আর কেউ উমাসুন্দরীকে সামলাতে পারতো না। হয়তো বা বুক চাপড়েই মারা যেতেন।

দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল মতি, ডাক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়। চোখে মুখে বিষাদের ছায়া। যেন ওরই নিজের ছেলে অপঘাতে মারা গেছে।

কিন্তু রমণী দারোগা তাতে গলেন না। গম্ভীরকণ্ঠেই প্রশ্ন করেন,—ঘটনার সময়ে আপনি কোথায় ছিলেন মতিবাবু ?

আজ্ঞে আমি কর্ত্রীদের সঙ্গে গদি-বাড়ির ছাদে ছিলাম। সকলেই আমরা ফিরবো ফিরবো ভাবছিলাম, এমন সময় সোরগোল পড়ে।

আপনি নবীন বাবুর মা এবং ওঁর স্ত্রীর সঙ্গেই ছিলেন ?

আজ্ঞে হাঁ।

নবীন বাবু আপনাদের সঙ্গে গেলেন না কেন ?

উনি কোন সময়েই আমাদের সঙ্গে যেতে চাননি। গেলে পাড়ার প্রতিমার নৌকোয় যেতেন।

বেশ তো, তাইবা গেলেন না কেন ?

আমরা ওঁকে নিষেধ করেছিলাম।

আমরা কে ?

আমি আর ওঁর মা।

ওঁর মা করেননি—আপনি একা করেছিলেন।

আজ্ঞে না, ওঁর মা-ও নিষেধ করেছিলেন।

সে আপনার প্ররোচনায়।

প্ররোচনা কেন হবে ? বিপদের আশঙ্কা করেই আমি—

কিন্তু আপনি নিজে না বলে ওর মাকে দিয়ে বলালেন কেন? কই উত্তর দিন। চুপ করে রইলেন যে ?

হালে উনি আমার ওপর তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই—

দ্যাটস রাইট, আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না।

না না, একি বলছেন আপনি।

চুপ করুন। আপনি বলতে পারেন, বিপদের আশঙ্কাই যদি করলেন, তাহলে মনিবকে অসহায় রেখে সকলকে নিয়ে গা ঢাকা দিলেন কেন ?

একলা তো উনি ছিলেন না হুজুর। দারোয়ান, ঝি, চাকর সকলেই ওরা বাড়ি ছিল।

তাইবা আপনি কি করে বলতে পারেন ?

দোহাই আপনার, আপনি বিশ্বাস করুন, ওদের সকলকে বাড়িতে রেখেই আমরা ঘাটে গিয়েছিলাম।

দেখুন, আপনার কিছু বুদ্ধি আছে তা স্বীকার করছি। কিন্তু মনে রাখবেন, আমাদের চোখে ধুলো দেবার মতো বুদ্ধি ভগবান আপনাকে দেননি।

আজ্ঞে, এসব কি বলছেন আপনি ! আমরা কেউ ভাবতেই পারিনি বাড়ির মধ্যে এ রকম একটা অঘটন ঘটতে পারে।

খুব ভাবতে পেরেছিলেন। আর এটাও ভেবেছিলেন, এ জাল কেউ ভেদ করতে পারবে না। দেখুন মশায়, ভালভাবে বলছি, বেশী প্যাঁচ না কষে স্পষ্ট বলুন,—নবীনবাবুর হত্যাকারী কে ? আপনি নিজের হাতে এ কাজ করেননি, এ কথা আমি মেনে নিচ্ছি।

দোহাই আপনার। দয়া করে এ প্রশ্ন আমাকে করবেন না। মাথার ওপরে ঈশ্বর সাক্ষী, মনিব হলেও নবীনকে আমি নিজের ছেলে ছাড়া কোন দিন ভাবিনি।

চুপ করুন মশায়। আর নেকা সাজবেন না। ছেলে বলেই যদি ভাববেন, তাহলে এতক্ষণ ওঁকে আপনি আজ্ঞে বলে সম্বোধন করছিলেন কেন?

সে আমার দীর্ঘকাল গোলামগিরির কুফল। নয়তো বরাবর ওকে আমি ছেলের মতো ভেবে এসেছি। ছেলের মতো করেই এতটুকু থেকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। কিন্তু—

কিন্তু বিষয়ের লোভে ছেলেকে পর ভাবতে একটুও দেরী হলো না, কেমন?

আপনার পায়ে পড়ছি দারোগাবাবু, অমন কথা বলবেন না। নবীনকে যদি একদিনের জন্যেও ছেলে ছাড়া অন্য কিছু ভেবে থাকি, তাহলে যেন আমি আমার পার্থর মাথা খাই।

ওসব মেয়েলি ঢং রাখুন মশায়, ওতে আমি ভুলবো না। আমি স্পষ্ট বলছি, নবীনবাবুর হত্যাকারীকে আপনি চেনেন।

উঃ মাগো!—দাঁড়িয়ে ছিল মতি, রমণী দারোগার আচরণে মাথায় করাঘাত করে বসে পড়ে। ক্ষোভে, লজ্জায় সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে।

কিন্তু রমণী দারোগা অবিচল। গলার স্বর আরো তীক্ষ্ন করে শাসান,—শুনুন মশায়, ওসব রং-ঢং আমি পছন্দ করিনে। ভাল ভাবে শেষ বার বলছি, যা জানেন, খোলাখুলি বলে ফেলুন। নয়তো বিপদ আছে।

মতির কানে বোধ হয় এর এক বিন্দুও ঢোকে না। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে অবিরত দাপাতে থাকে,—হা ভগবান, অদৃষ্টে এ-ও ছিল। শেষটায় খুনে সাব্যস্ত হলাম!···

প্রশ্নের জবাব না পেয়ে রমণী দারোগা ক্ষেপে ওঠেন। শ্লেষের সঙ্গেই মন্তব্য করেন,—বুঝেছি, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।

সেই ভাল, আপনি আমাকে মেরে ফেলুন দারোগাবাবু। তবু এ ভাবে অপমান করবেন না। আপনার দুটি পায়ে পড়ছি,—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বাধা দেয় মতি।

মেরে আর আপনাকে আমাকে ফেলতে হবে না মশায়, সে ব্যবস্থা কোর্টই করবে। তবু বলছি, ভেবে দেখুন। এখনো সময় আছে, সত্যি কথা বললে রেহাই পেতে পারেন।

সত্যি ছাড়া এক বর্ণও মিথ্যা বলছিনে হুজুর। নাগর গোঁসাই সাক্ষী।

বেশ, তাহলে চলুন, 'লকাপে' থেকেই নাগর গোঁসাইকে সাক্ষী মানবেন।

আপনি আমাকে চালান দিচ্ছেন দারোগাবাবু?

না দিয়ে আর কি করি হুজুর, বলুন। আপনার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা যে আমার জানা নেই, মুখ ভেংচিয়ে জবাব দেন রমণী দারোগা।

নিরুপায় মতি হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে।

রমণী দারোগা সেই একই ঢংএ জের টানেন,—কি, ভালয় ভালয় অগ্রসর হবেন, না এখানেই হাতকড়া লাগাতে হবে?

মতির সরব কান্নায় আশপাশের সমস্ত লোক এসে জড় হয়। উমাসুন্দরীও পাগলিনীর মতো আবার ছুটে আসেন। একান্ত বিস্মিত ভাবেই প্রশ্ন করেন, ওকে ধরে কেন তুমি টানাটানি করছো বাবা? ওর তো কোন দোষ নেই। নবীনকে তো আমিই বাড়ির বার হতে নিষেধ করেছিলাম। আসল ডাকাতদের গায়ে হাত দিতে বোধ হয় তোমার ভয় করছে?—

আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন মা। কে আসল আর কে নকল, তা দুদিন বাদেই টের পাবেন। দয়া করে এখন অন্তঃপুরে যান। মতিবাবু চলুন, বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান রমণী দারোগা।

উমাসুন্দরী ব্যগ্রভাবে পথ রোধ করে দাঁড়ান,—না, ওকে আমি কিছুতেই যেতে দেবো না।

রমণী দারোগা এবার আর ধৈর্য রাখতে পারেন না। কণ্ঠে গাম্ভীর্য টেনেই অনুরোধ জানান, দয়া করে পথ ছেড়ে দিন মা। পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া আইন-বিরুদ্ধ। রাজেনবাবু, ওঁকে সরিয়ে নিয়ে যান, উমাসুন্দরীকে তাড়া দিয়ে অপেক্ষমান রাজেন দত্তকে অনুরোধ করেন।

রাজেন হয়তো এ রকমটাই আশা করেছিল। তাই অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে। করজোড়ে উমাসুন্দরীকে পাল্টা অনুরোধ জানায়, আপনি বাড়ির ভেতরে চলুন বৌঠান। পুলিশকে বাধা দেওয়ায় বিপদ আছে।

বিপদ—বিপদের কি আরো কিছু বাকী আছে খাতাঞ্চি?—উমাসুন্দরী দমেন না।

রাজেনও না। উমাসুন্দরীর মুখ বরাবর দাঁড়িয়ে পুলিশকে পথ করে দেয়।

রমণী দারোগা সে সুযোগে মতির আগে পিছে পুলিশ রেখে সদলবলে বেরিয়ে যান।

উমাসুন্দরী আর চেঁচাতে পারেন না। বোবার মতোই ফ্যাল ফ্যাল চোখে রাজেনের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

১৪

বিজয়ার পরের দিন। রীতি অনুযায়ী অনেকেই আজ দেওয়ান-বাড়িতে আসবে। কেউ আসবে আশীর্বাদ কুড়োতে, কেউ আসবে প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন জানাতে। বেঁচে থাকলে নবীনচন্দ্রও আসতেন। ফি বছর এসেছেন। বৎসরের এই দিনটিতে কোন বাধাই ওঁর নিকটে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ঠোঙা ভর্তি মিষ্টি হাতে মতির মাকে ছোট ঠাকুর-মা বলে ডাকতে ডাকতে সদরে পা দিয়েছেন। নিঃসঙ্কোচে নিয়েছেন ওর পায়ের ধূলো মাথায়। কিন্তু এবার সে পাট জন্মের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। সকালে বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে ওঠে মতির মার। কি অঘটন ঘটে গেছে কাল! সোরগোল শুনে সকলেই ওরা গতরাত্রে গিয়েছিল চৌধুরী বাড়িতে। কিন্তু কাউকে কোন রকম সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পায়নি। মতি তো সেই থেকে ওখানেই আছে। ও ছাড়া উমাসুন্দরীকে কেইবা আর সামলাবে!···মতির মা জলভরা চোখেই প্রাতঃস্নানে যায়। স্নান সে'র আহ্নিকের যোগাড়ে ব্যস্ত। কি করবে, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা তো আর আজকের দিনে চলে না। একটু বেলা হতে না হতেই তো লোকজন আসতে শুরু করবে।··· মহামায়াও বসে থাকতে পারে না। তাড়াতাড়ি চোখে মুখে জল দিয়ে পার্থকে কোলে করে দুধ খাওয়াতে বসে। মার কোলে বসে

দুধ খেতে খেতে খিল খিল করে হাসতে থাকে পার্থ। কিন্তু মার তরফ থেকে তেমন সাড়া পায় না। মহামায়াকে সত্যি খুব বিষণ্ণ দেখায়। কথা ছিল, পার্থর বাবা ফিরে এলে ওরা দুজনে একত্র যাবে নাগর গোসাঁইর মন্দিরে প্রণাম করতে। পার্থকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু আজ আর সে সাধ পূর্ণ হবে না। মহামায়া মনে মনেই নাগর গোসাঁইর উদ্দেশে প্রণাম করে, পার্থর জন্য করে করুণা ভিক্ষা।

এখনো পৈঠার ওপরে রোদ আসেনি। সুতরাং লোকজন আসতে এখনো বিলম্ব আছে। মতির মা তাড়াতাড়ি আহ্নিক শেষ করে চৌধুরী বাড়ির দিকেই পা বাড়াতে যাবে, এমন সময় শিরে বজ্রাঘাত হয়। খবর আসে, মতি নবীনচন্দ্রকে খুন করার দায়ে গ্রেফতার হয়েছে। দাঁড়িয়ে ছিল মতির মা, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। কি করবে ভেবে পায় না। এ যে স্বপ্নের চেয়েও অবিশ্বাস্য ব্যাপার! মতি খুন করবে নবীনকে! পুলিশ এমন কথা ভাবতে পারলো! কি সাক্ষী প্রমাণ পেয়েছে ওরা?—ভাবতে ভাবতে খেই হারিয়ে ফেলে। হয়তো বা মূর্চ্ছাই যায়। কিন্তু তার আগে দৃষ্টি পড়ে পার্থর ওপর। মার কোলে শুয়ে তখনো হাত নেড়ে নেড়ে খেলা করছিল বেচারা। থেকে থেকে খিল খিল করে হাসছিল। কিন্তু ঠাকুরমা এ দৃশ্য সইতে পারে না। পার্থর দিকে চেয়ে ভাবে, এই ছেলেটাই কাল হয়েছে। পেটে আসার পর থেকেই সংসারে ঘুন ধরেছে। একে একে সকলকেই চিবিয়ে খাবে শত্রু।···মুখ বিকিয়ে ফুকরে ওঠে মতির মা।—

স্বামী বন্দী—তার ওপর শাশুড়ীর এই মন্তব্য, মহামায়া স্থির থাকতে পারে না। পার্থর বুকের ওপর মাথা গুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। একবার মনে হয় কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আপদটাকে। কিংবা গলা টিপে মেরে ফেলে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে। মহামায়া ভাবে, পার্থ কেন আপদ হবে? গণকঠাকুর তো ওর জন্মলগ্ন বিচার করেই বলেছেন, পরম সৌভাগ্যশালী ও। আর তাতো হবেই ; অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কি কখনো অভাগা হতে পারে? স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মায়ের অষ্টম গর্ভজাত সন্তান। না না, ও কেন অভাগা হতে যাবে? ও তো লক্ষ্মীর বরপুত্র—আমার বুকের মানিক। সংসারে বিপদ-আপদ কার না আসে? পার্থর বাবা মুক্তি পাবেনই। পার্থর বরাতেই পাবেন। যেমন পেয়েছিলেন কংসের কারাগার থেকে শ্রীকৃষ্ণ-জনক বাসুদেব।···মহামায়া অন্তরে বল পায়। মনে মনে নাগর গোসাঁইকে স্মরণ করে। পার্থকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে।

মতি দেওয়ান খুনী—হাটে বাজারে কেউ একথা বিশ্বাস করে না। সকলেই পুলিশের আচরণে থ বনে যায়। কিন্তু রমণী দারোগা নাচার। ভয়, প্রলোভন, ধর্মের দোহাই, পর পর সব অস্ত্রই মতির ওপর প্রয়োগ করেন। যে কোন ভাবে মতিকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিতে পারলে মামলা সাজাবার সুবিধে হয়। কিন্তু মতির উত্তর এক—নির্দোষ ও। নবীনচন্দ্রের মৃত্যুতে মর্মাহত। মর্মাহত হয়েই দারাদিন কেঁদেছে। এ যে ওর পুত্রশোক।···

মামলার কোন কিনারা করতে না পেয়ে রমণী দারোগা বিরক্তির সঙ্গেই ওকে সদরে চালান দিয়ে দেন। সঙ্গে দেন রাইফেলধারী উপযুক্ত পাহারা। কেন না, পথে ভয় আছে। খুনের দল যদি পুলিশের নৌকো চড়াও করে মতিকে ছিনিয়ে নেয়? অন্য কোন সুযোগ সন্ধান না মিলুক, উমাসুন্দরীর জবানবন্দীই মামলা দায়ের করানোর পক্ষে যথেষ্ট। তা ছাড়া চেষ্টা করলে এর ভেতরে দু পাঁচ জন সাক্ষী নিশ্চয় যোগাড় করা যাবে।···রমণী দারোগা শক্ত করেই হাল ধরেন। দেওয়ানকে ঝুলিয়ে দিতে পারলে পদোন্নতি আটকায় কে?

স্বপ্ন যশোদা মজুমদারও দেখেন। তবে সুখের নয়—দুঃস্বপ্ন। পুলিশ যেমন খুশি ভাবুক, ওঁর মতে মতি দেওয়ান কখনো মানুষ খুন করতে পারে না। ওর মতো ধর্মভীরু লোকের পক্ষে তা পাপ সম্ভব নয়। তবে আসল খুনী কে? আশ্চর্য রকমের হাত সাফাই বলতে হবে। কোন রকম চিহ্ন রেখে যায়নি। নিশ্চয় এর ভেতরে কোন পাকা মাথা আছে। কিন্তু কে সেই ব্যক্তি? এরপর যে আমাদের ঘরে টান পড়বে না, তাই বা কে বলতে পারে!—স্বপ্ন দেখা দূরের কথা, যশোদা মজুমদার মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং চিন্তা দূর করতেই মানবেন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠান।

মজুমদারের মতো মানবেন্দ্রনাথও ভেবে কূল পাচ্ছিলেন না। তাই কাকার ডাকে ছুটে আসেন। পাকা মাথার সঙ্গে পরামর্শ করে দেখবেন কোন কিনারা করা যায় কি না।

ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে গড়গড়া টানছিলেন মজুমদার। মানবেন্দ্রনাথ পাশে এসে দাঁড়ান। ওঁর পায়ের শব্দে চোখ তুলে তাকান মজুমদার। ইসারায় বসতে বলেন। তার পর মুখ থেকে নলটা হাতে নিয়ে প্রশ্ন করেন,—রমণী দারোগা তাহলে মতিকেই চালান দিলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তুমি কি মনে করো দেওয়ান এ কাজ করেছে?

আজ্ঞে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। রাজেন দত্ত যা বলে গেলো, তাতে দেওয়ানকে নির্দোষ ভাবাও শক্ত।

কি বলেছে দত্ত?

চৌধুরীদের বগা মোকামের হিসেবে নাকি প্রচুর গলদ দেখা যাচ্ছে! পূর্ণ পার্সে জার নাকি বহু টাকা গায়েব করে বসে আছে। দেওয়ানেরও নাকি তাতে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে।

কখনো এ হতে পারে না। দত্তটাকে তুমি চেনো না। বেটা সময়ের সুযোগ নিচ্ছে।

আপনার কানে গিয়েছে কিনা জানি না, দেওয়ানের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের কিছুদিন থেকেই মনকষাকষি চলছিল। ওকে ওর পদ থেকে সরিয়ে দিতেই চেয়েছিল চৌধুরী।

তুমি থামো। এটাও ঐ নচ্ছারটার কারসাজী। ঐ বেটাই সত্য মিথ্যা কানভাঙানী দিয়ে চৌধুরীর মনটা বিষিয়ে তুলেছিল। ওর অনেক কথাই আমার জানা।

আজ্ঞে—

না না, আমি দত্তর কোন কথা বিশ্বাস করি না। যদি অন্য কোন প্রমাণ পেয়ে থাকো বলো।

অন্য প্রমাণ আর কি। আপনার নিশ্চয় স্মরণ আছে, চৌধুরী তার নবদ্বীপ যাত্রার সঙ্গী রাজেন দত্তকেই করেছিল।

তাতে কি এসে-যায় ?

না, বিশেষ কিছু নয়। তবে এখানে আমরা প্রমাণ পাচ্ছি, নবীনচন্দ্র নিজেই দত্তকে দেওয়ান পদে বহাল করেছিল। মতির ওপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল।

মোটেই না। চৌধুরীর ওটা একটা কৌশলমাত্র। আসলে মতি যেমন ছিল তেমনই ছিল। টাকা তছরূপই যদি করবে মতি, তাহলে নবীনচন্দ্রের শেষ দিন পর্যন্ত কেন ওর হাতে সিন্দুকের চাবিকাটি ছিল ?

আপনাকে হয়তো আমি স্পষ্ট বোঝা ৮ পারছিনে। ব্যাপারটা নাকি হালে ধরা পড়েছিল।

কি আশ্চর্য, তুমি এমন অন্ধ হলে কবে থেকে ?

আজ্ঞে টাকা-পয়সার কথা যাই হোক, দেওয়ানের ধাপ্পাবাজীর আরো একটা নজীর পাওয়া গেছে।

সেটা আবার কি ?

উমাসুন্দরী দেবী রমণীবাবুর কাছে স্পষ্ট বলেছেন, দেওয়ানই নাকি সকলকে বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

তুমি কি বলছো মামু। এটাকে তুমি ধাপপা বলতে চাও! আমাদের সঙ্গে কি সত্যি ওর লাঠালাঠি হতো না ?

তা নিশ্চয় হতো। কিন্তু আমরা যে ওকে প্রাণে মারবো না, এ ধারণা দেওয়ানের নিশ্চয় ছিল।

তা হয়তো ছিল। কিন্তু তুমি কি ভাবতে পারছো মতি নিজে এ কাজ করেছে ?

আজ্ঞে না। আমি কখনো তা মনে করি না। এখানে আমি আপনার সঙ্গে একমত। দেওয়ানের মতো ভীরু লোক কখনো নিজের হাতে অস্ত্র ধরতে পারে না।

তবে ?

আমি বলতে চাই, দেওয়ান ষড়যন্ত্রকারী। আসল খুনী অন্য কেউ।

নিশ্চয় তাই। আর আমি তো সেই ব্যক্তিকেই ধরতে চাই।

আজ্ঞে সেইটেই ঠিক ঠাওর করতে পারছিনে।

তাহলে তো দেখছি আমাদেরও বিপদ আছে।

আজ্ঞে—

আমি অবাক হচ্ছি মামু, গঞ্জে তা'হলে এমন লোকও আছে—যে আমাদের চোখেও ধুলো দিতে পারে!

সত্যি, তাজ্জব ব্যাপার। এমন পাকা মাথা গঞ্জে আ'ছে কোন-দিন ভাবতে পারিনি।

ভাবতে আমিও পারিনি। কিন্তু এবার আর না ভাবলে নয়। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, তৃতীয় কোন শক্তি মাথা চাড়া দিতে চাচ্ছে। উঠতি নবীনচন্দ্রকে খতম করলো, এবার হয়তো আমাদের পালা।

না না, আপনি অতোটা বিচলিত হবেন না।

তুমি বলছো কি! বিচলিত হবো না ? ঘরে কাল সাপ কোঁস কোঁস করছে আর নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাবো ?

নিদ্রা কেন যাবেন, শুধু দিন কয়েক অপেক্ষা করতে বলছি। যতো বড়ো বিষধর সাপই হোক আর যে কোন গর্তেই সে থাক, খুঁজে বার করবোই।

হ্যাঁ, তাই করো বাবা। হতশ্বাসে ভেঙে পড়েন মজুমদার। তারপর গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে আবার মৃদু মৃদু টানতে থাকেন টানতে টানতেই বলে যান,—মামু, তোমার বয়েস তখন মাত্র পাঁচ—দাদা মারা গেলেন। হাত প্রায় শূন্য। কিন্তু জমিদারের ঠাট বজায় না রাখলেই নয়। কাশীমপুর তখন প্রবল পরাক্রান্ত। রমেন্দ্রনারায়ণ পারে তো পিশে ফেলে আমাদের। কিন্তু তোমাকে সত্যি বলছি, কোনদিন পিছু হটিনি। ঐ চরফুটনগরের সীমানা নিয়ে একাধিকবার লাঠালাঠি হয়েছে ওর সঙ্গে। উভয় পক্ষে দুপাঁচটা লাশও পড়েছে, তবু ভেঙে পড়িনি। এক বছরে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন কোর্ট কাছারি করেছি। একাই ছুটেছি আবার অর্থের অন্বেষণে। নবীনের বাবা ৺রামচন্দ্র চৌধুরী অসময়ে আমার প্রয়োজন মিটিয়েছে। না না, কোন রকম দান খয়রাত নয়। মোটা সুদের লোভেই বাড়ি বয়ে টাকা দিয়ে গেছে সে, জীবনে অনেক টাল মাটাল সামলিয়েছি। নিঃস্বার্থভাবে পাশে দাঁড়ায় এমন কেউ কোনদিন ছিল না। একমাত্র ভরসা ভগবান। ভগবানের দয়াতেই ধীরে ধীরে তুমি বড় হয়ে উঠলে। কিছুটা শ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু আজ আবার দম আটকে আসছে,—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যান মজুমদার। গড়গড়ার নলটা হাত থেকে খসে পড়ে। তারপর একটু দম নিয়ে আবার শুরু করেন,—মামু, মজুমদারদের বংশকৌলীন্য বোধ হয় এখানেই শেষ হতে চলেছে। ইজ্জত তো যাবেই, সঙ্গে অপঘাতে না প্রাণটা যায়।...

কি বলছেন আপনি ? মানবেন্দ্রনাথ জীবিত থাকতে কারো সাধ্য নেই মজুমদার বংশের শিরোমণির গায়ে হাত ছোঁয়ায়।

উত্তর শুনে মজুমদারের খুশী হবারই কথা, হয়তো অন্তরে কিছুটা ভরসাও পান। কিন্তু সংশয় কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেন না। আজ যেন উনি মানবেন্দ্রনাথকেও বিশ্বাস করতে পারছেন না। কে জানে—এমন কুকীর্তি ওরই কিনা। ভাবতে ভাবতে পাথর হয়ে যান মজুমদার।

মানবেন্দ্রনাথ শান্ত থেকেই আশ্বাস দেন, আপনি এতো ভাববেন না কাকাবাবু—ডাক্তারের বারণ আছে।

ডাক্তার আমার মনের কথা জানেন না, তাই বারণ করেছেন। মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। জন্মেছি যখন, তখন একদিন মরবোই। কিন্তু বেঁচে থেকে ইজ্জত খোয়াতে হবে—এটা ভাবতে পারছিনে।

আমাকে বিশ্বাস করুন। মানবেন্দ্রনাথ জীবিত থাকতে আপনাকে তা খোয়াতে হবে না। জান দেবো, তবু ইজ্জত দেবো না।

সাবাস, এই তো কথা, কিন্তু তোমাকে বলে রাখছি মামু, শুধু পুলিশের ওপর নির্ভর করে থাকলে ঠকতে হবে।

আপনি আদেশ করুন কি করতে হবে ?

খুনীকে খুঁজে বার করাই এখন আমাদের একমাত্র কাজ।

দয়া করে আপনি আমাকে দুটো দিন সময় দিন। আমি আশা করছি এর ভেতরেই হদিস পাবো।

বেশ, তা হলে এখন এসো। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

মানবেন্দ্রনাথ বিদায় নেয়।

মজুমদার আবার গড়গড়ার নলটা মুখে পুরে মৃদু মৃদু টানতে থাকেন।

[ক্রমশঃ।

মানবেন্দ্র পাল

এই নূতন বাড়িটা লীলার মন্দ লাগল না। একতলা বাড়ি। দুখানি ঘর। ওদিকে রকের ওপর টালির ছাউনি দেওয়া ছোট্ট একটা রান্নাঘর। কুয়ো আছে, স্নান করবার জায়গাটা আবার একটু দেওয়াল দিয়ে আড়াল করা। কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণের বিষয় দুটি। একটি হচ্ছে পেয়ারা গাছ আর একটি ছাত। নেড়া ছাত—সিঁড়িরও তেমন ব্যবস্থা নেই। কবেকার একটা কাঠের সিঁড়ি লাগানো—তাও মজবুত নয়—পা দিলেই মচ মচ করে। তা হোক তবু তো ছাতে ওঠা যায়। এইই যথেষ্ট।

কাকা-কাকীমার সংসারে লীলা আছে তা প্রায় পাঁচ ছ' বছর। অক্ষম বাপ আর ধৈর্যের প্রতিমূর্তি মা থাকে দেশে। অনেকগুলি ভাই বোন তারা। লীলাই বড়ো। কাকীমা অনুগ্রহ করে এই বড়ো মেয়েটির ভার নিয়েছেন—যদিও বেশি ভার নেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই,—তাঁর নিজেরই ছেলেমেয়ে নিতান্ত কম নয়। এ পরিবারেও লীলাই বড়ো। এবং বড়ো মেয়ের কর্তব্য হিসেবে কাকীমার সঙ্গে সংসারের কাজে সহযোগিতা চলছেই।

কাকা-কাকীমার সংসারে লীলা এসেছে পাঁচ-ছ' বছর। এই পাঁচ ছ' বছরের মধ্যে কত বাড়িই না বদলানো হল। শুধু বাড়ি বদলানোই নয় এই পাঁচ ছ' বছরের মধ্যে তার নিজেরই মধ্যে কত অদল বদল হয়ে গেল। এসেছিল আট ন' বছরের মেয়ে। কটা কটা পাতলা চুল—ছেঁড়া একটা ফ্রক—দু চোখে ভীতু ভীতু চাউনি—করুণকাতর মুখের ভাব। আর এই ক' বছরের মধ্যে কী না ওলোট-পালোট হয়ে গেল দেহে আর মনে। এখন যেন সবই নতুন—সব কিছুকেই যেন ভালো লাগে। এমন কি কাকীমা বকলেও সে বকুনি খারাপ লাগে না। এমন কত দিন হয়েছে—ভাত আছে তরকারিতে কুলোয় নি। কাকীমার সঙ্গে বসে একটা বেগুনপোড়া দিয়ে দিব্যি হাসতে হাসতে খেয়েছে। এই যে হাসতে হাসতে খাওয়া—এটা কর্তব্য বোধে নয়—এ নিতান্তই নতুন বয়েসের নতুন আনন্দে।

লীলারা এ বাড়িতে এল আষাঢ় মাসের তেরোই আর তার ঠিক পাঁচ দিন পরই নতুন ভাড়াটে এল ওদের পাশের বাড়িতে। পাশের বাড়ি বললেও যেন তফাৎ বোঝায় অনেকটা—কিন্তু এ একেবারে এক পাঁচিলের বাড়ি। গায়ে গায়ে লাগাও। তবে তফাৎ এই—সে বাড়িটা দোতলা আর তাদেরটি একতলা। বেমানান হলেও মানিয়ে গেছে—যেমন পঁয়ত্রিশ বছরের যোয়ানের পাশে তেরো বছরের বালিকাবধূ। এ উপমাটি লীলারই। ঘাট থেকে কাপড় কেচে ফিরছে কিম্বা গঙ্গাস্নান করে আসছে—একটু দূর থেকে এই গলাগলি বাড়ি দু'খানি দেখলেই ওর যেন কেমন হাসি পেত। ডানদিকে মস্ত বড় বর আর বাঁ-দিকে লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকা কনে।

নতুন ভাড়াটে এল—লীলার আবার নতুন বিস্ময়ের নতুন আনন্দের খোরাক জুটল। ও বাড়ির মেয়েরা দোতলার জানলা দিয়ে অবাক হয়ে তাদের দেখে—লীলাও তাকিয়ে থাকে। ও-বাড়ির কোনো মেয়ে লীলাকে জিজ্ঞেস করে—তোমরাও তো নতুন এসেছ ?

লীলা একটু হেসে মাথা দুলিয়ে বলে হ্যাঁ—বলেই তার কেমন লজ্জা করে, ছুটে পালিয়ে যায়। পালিয়ে যায় কোথায় ? একেবারে পেয়ারা গাছের নীচে। কোমরে ভালো করে আঁচল জড়িয়ে একটা লম্বা আঁকশি দিয়ে ডালে ডালে পাতায় পাতায় অকারণে পেয়ারা নিধনপর্ব শুরু করে। জানলায় দাঁড়িয়ে ও বাড়ির মেয়েরা লুব্ধ সকৌতুক দৃষ্টিতে দেখছে—এইটেই তার প্রেরণা।

একদিন লীলা ছাতে উঠে ঘুঁটে শুকোতে দিচ্ছে হঠাৎ তার কানে এল ভারি সুন্দর বাঁশির সুর। খুব চলতি একটা গান কে যেন কাছেই কোথায় হারমোনিয়ম বাঁশিতে বাজাচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে তাকাতেই চোখে পড়ল তাদেরই পাশের বাড়ির ছাতে একটি ছেলে—চোখোচোখি হতেই লীলাকে লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিতে হল—কি অসভ্য ছেলে বাবা !

বাঁশি থেমে গেল, এবার শিস দিয়ে গান। লীলা থপ থপ করে ঘুঁটেগুলো কোনো রকমে মেলে দিয়েই কাপড়টা একটু সামলে মুখ গম্ভীর করে নীচে নেমে গেল। নীচে নেমে গেল একেবারে শোবার ঘরে। বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কতক্ষণ অমনি চোখ বুজিয়ে পড়ে রইল। কেবলই কেমন রাগ হচ্ছে—গা রি-রি করছে ! পাজি বদমাস ড্যাগরা ছোটো লোক ! চোখ ছোটো ছোটো করে তাকালো ! গোঁফের ফাঁকে হাসি ! মুড়ো জেলে দেব ঐ মুখে।

কাজকর্ম পড়ে রইল। ঘরের বাইরে যেতে আর ইচ্ছে করে না। কাকীমা ঘরে ঢুকে অবাক! কি রে, শরীর খারাপ নাকি!

—মাথা ধরেছে। বলে লীলা পাশ ফিরে শুলো।

কিন্তু এমনি করে সুস্থ শরীরে বেশিক্ষণ শুয়ে থাকা যায় না। উঠতেই হল। আবার রকের দিকে পা বাড়াতে হল। একটু লজ্জা করছিল—আবার যদি সেই ছোঁড়াটা—

লীলা মনে মনে বললে—এবার অমন কিছু করলে ঝাঁটা মারবে। তা বলে সে তো আর দিন রাত ঘরে আটকা থাকতে পারে না। তাদের বাড়ি তাদের রক তাদের উঠোন, সে হাজার বার বেরোবে। এবার করুক না কিছু!

লীলা মুখ ফিরিয়ে রকে এসে দাঁড়ালো। কিছুতেই যেন ও বাড়ির দিকে চোখ না যায়। পাছে শিস দিয়ে কারও গান কানে আসে তাই নিজেই গুন গুন করে গাইতে গাইতে অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

এমনি ভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটল। তারপর কুয়ো থেকে জল তুলতে গিয়ে হঠাৎই এক সময়ে অলস মুহূর্তে তাকিয়ে ফেলল ও বাড়ির ছাতের দিকে। তাকাতেই বুকটা কেমন করে উঠল। যাক বাঁচা গেছে, ছাতে কেউ নেই। তখন ভয়ে ভয়ে সসংকোচে ভালো করে ছাতের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। না, কেউ নেই। তখন জামলায় জানলায় তার সাগ্রহ দৃষ্টি কাকে যেন তল্লাস করে ফিরতে লাগল। না কেউ নেই। লীলা বাঁ হাতে শাড়ির প্রান্ত একটু তুলে ধরে ডান হাতে জলভরা বালতি নিয়ে মাথা নিচু করে রান্নাঘরে এসে দাঁড়ালো। কাকীমার সঙ্গে দুটো কথা বলেই রান্নাঘরের বাইরে এসে আর একবার তাকালো বাড়িটার দিকে। না, কেউ নেই। মনে মনে ভাবল—যাক লজ্জা হয়েছে তাহলে। নইলে দেখাতাম এবার।

কিন্তু লীলার কল্পনায় একটু ভুল হয়েছিল। সে ভুল ভাঙতে দেরি হল না। দুদিন পরেই একদিন ও যখন ছাতে উঠে ভিজে শাড়ি মেলে দিচ্ছে হঠাৎ চোখ পড়ল পাশের বাড়ির ছাতের দিকে। পাঁচিলের ওপর দুহাত রেখে মাথাটা ঝুঁকিয়ে সে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। চোখোচোখি মাত্তই ছেলেটা হাসল। চোখোচোখি হতেই লীলা যেন চমকে উঠল। ভয়ে চমকানো নয়—কেমন যেন অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের চমক। এবার কিন্তু লীলা চোখ ফিরিয়ে নিল না। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ছেলেটার দিকে। এই কয়েক মুহূর্তেই ভালো করে দেখে নিল। বাবাঃ কি গোঁফের বাহার! নাকের নীচে এসে যেন ঠোঁটের দুপাশে ডানা মেলে দিয়েছে। চুলগুলো কোঁকড়ানো তো নয়, যেন সমুদ্দুরের কালো কালো ঢেউ! আর ঠোঁট দুটো সিগরেট খেয়ে খেয়ে হয়েছে যেন কাকের ঠোঁট! মরি! মরি! আর তাকিয়ে আছে না তো যেন—চোখ দিয়ে চাটছে। মরণ! মনে মনে গাল দিয়ে শূন্য গায়ে কাপড়টা একটু ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে গ্রীবাভঙ্গি করে লীলা হন্ হন্ করে নীচে নেমে গেল।

কিন্তু এই দ্বিতীয়বার পাশের বাড়ির ছেলেটির সঙ্গে যে চোখোচোখি হল তাতে কিন্তু প্রথম বারের মতো রাগ হল না, মনও তেমন বিরূপ

হল না। কেমন যেন উপেক্ষা করে গেল—ইচ্ছে করে নয় আপনা আপনিই।

সেদিনই বিকেলে আবার দেখা গেল মূর্তিমানকে। কি কাণ্ড! ছাতের আলসের ওপর বসে আছে। মরণ। এখুনি পড়ে মরবে যে! আর যদি মরে তাহলে তাদেরই বাড়িতে ধড়ফড় করতে করতে মরবে। দেখো, কি বিপদ ঘটায়।

লীলা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কিন্তু ছেলেটার সঙ্গে চোখোচোখি হল না। কারণ সে ছিল পিছন ফিরে বসে।

হঠাৎ পিছন থেকে কাকীমা এসে বললেন—কি দেখছিস রে, অমন হাঁ করে।

লীলা চমকে উঠল। মুহূর্তে সামলে নিয়ে চাপা গলায় বলল—দেখো না কাণ্ড। এখুনি পড়ে মরবে যে!

কাকীমা বিরক্ত হয়ে বললে—মরুক গে! তুই ঘরে যা। এখানে এসে পর্যন্ত দেখছি ঐ এক শনি লেগেছে।

লীলার বুকে একটু ঘা লাগল। কাকীমার কথার টোনটা যেন কেমন। যেন তাকে সুদ্ধ অপরাধী করছে। লজ্জায় মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু সে ছেলেটার কোনো লজ্জা নেই। রোজ দু'বেলা ছাদে এসে দাঁড়াবে। কখনো হারমোনিয়ম বাঁশি বাজায়, কখনো শিস দেয়, কখনো বা গান করে। চোখোচোখি হলেই সেই ভাবে হাসবে—যেন কত দিনের চেনা। ইদানীং আরও একটু উন্নতি হয়েছে। হাত নেড়ে ডাকে। রাগে লীলার সর্ব শরীর জ্বলে যায়। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। কে জানে, কাকীমা আবার কি মনে করে বসবে।

ছেলেটার এই সব হাবভাব লীলার এক রকম গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। কোনো ভদ্রলোকের ঘরের ছেলে যে এই রকম করতে পারে, এ ধারণাই ছিল না। সময় সময় এখন মনে মনে ওকে গাল দেয় পাগল বলে। ভাবে, পাগলটা যা খুশি করছে করুক, ওর দিকে না তাকালেই হল। কেবল ভয় ছিল, কোন্ দিন কাকীর চোখে পড়বে, অমনি রসাতল বাধবে! কাকী তো কখনো অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করে না। বড়ো মুখরা!

এই ভাবেই চলছিল, একদিন ঘটনা ঘটল একটু অন্যরকম। ছাতে উঠেছে লীলা। উঠতেই চোখোচোখি। ছেলেটা এবার গানও গাইল না, শিসও দিল না, এমন কি কোনো ইশারা-ইঙ্গিতও না। শুধু চারিদিক তাকিয়ে নিয়ে লুকিয়ে কী একটা কাগজ দেখালো। যেন অনুমতি চাইল, কাগজটা লীলার কাছে ছুঁড়ে দেবে কিনা।

লীলা আর এক মুহূর্ত ছাদে দাঁড়াতে পারল না, তখনই নীচে নেমে গেল। ঠিক আবার আজকে সেই প্রথম দিনের মতো অবস্থা। বুকের ভেতরটা কি রকম যেন করছে। রোজ ও শিস দেয়, ইশারা করে সে যেন তবু সহ্য হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এ আবার কী! কাগজ! কী আছে কাগজে? চিঠি নাকি? প্রেমপত্র। 'প্রেমপত্র'-র কথা লীলা শুনেছে। গল্পে উপন্যাসে পড়েছে। তারও আগে যখন ওর বয়েস ন'-দশ, তখনই ঐ কথাটা কানে এসেছে। কিন্তু মানেটা তখন ঠিক বুঝত না। আজ কি ঐ ছেলেটা সেই প্রেমপত্র দিতে চাচ্ছিল! লজ্জায় ঘেন্নায় মাথা কুটতে ইচ্ছে করল। ছিঃ ছিঃ, তাহলে আর বাকি কী রইল! 'প্রেমপত্র' তো বয় বৌকে দেয়। আর তা ছাড়া যারা লুকিয়ে দেয় তারা তো খারাপ, সে ছেলেও খারাপ—সে মেয়েও খারাপ।

উঃ খুব সময় পালিয়ে এসেছে! ভাগ্যি ছুঁড়ে দেয়নি। কি ভাগ্যি দেবে কি না জানতে চাইছিল। এটুকু বুদ্ধি তা হলে আছে। কিন্তু যদি কাকীমা দেখে ফেলত! কি সর্ব্বনাশ হত!

ভাবতে ভাবতে ভয়ে লীলা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। না জানি এর পরে আরও কী আছে!

দু তিন দিন আর ছাতেই উঠল না লীলা। কিন্তু ক'দিন আর ছাতে না উঠে পারা যায়। আবার উঠতে হল, আবার দেখা হল—আবার সেই কাগজ—আবার সেই অনুমতি ভিক্ষা! লীলা আশ্চর্য হয়—এ উন্নতি কবে থেকে হল? কি কাতর ভাবে কি করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইশারায় জিগেস করে এটা দেব? কেমন অবাক হয়ে যায় লীলা। এ আবার কি! যে ছেলে বদ যে অভদ্র যার ইশারা ইঙ্গিতেও কিছু মাত্র সংকোচ নেই সামান্য একটা কাগজ ছুঁড়ে দেবে তার কাছে, তাতে ভাবনার কি! দিলেই তো হয়।

কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না লীলা। নেমে আসে। এসেই একবার উঁকি মারে রান্নাঘরে। দেখে নেয়, কাকী কি করছে! তারপর শুয়ে শুয়ে সারা দুপুর ভাবে, নাঃ ছেলেটাকে যা মনে করেছিল তা নয়। শুধু ফাজিল ফক্কড় নয় এক নম্বরের ভীতু। আর ভীতু ছেলেদের মোটে ও দেখতে পারে না। বরঞ্চ এখন লীলার চোখে একটি ছবি প্রায় ভেসে ওঠে—সেই যে ছাতের আলসের ওপর বসে ছিল! উঃ সে দৃশ্য দেখে তার নিজেরই গা শির শির করছিল।

সে দিন তখন শ্রাবণের মাঝামাঝি। একটু আগে প্রবল ধারাবর্ষণ হয়ে গিয়েছে। বেলা আড়াইটে। পাড়া নিস্তব্ধ। যে যার ঘরে ঘরে সুখনিদ্রা দিচ্ছে। বৃষ্টি ছেড়েছে সবে মাত্র। আকাশ এখনো মেঘাচ্ছন্ন। পেয়ারা গাছের পাতায় পাতায় জল, হাঁসগুলো পুকুর থেকে উঠে আসছে ঠোঁট দিয়ে ডানা ঠোকরাতে ঠোকরাতে। লীলা ঘুমোয়নি। হঠাৎ তার কী মনে হল, উঠে এল ছাতে। নালিগুলোতে ময়লা জমে মুখ বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। জল জমছে। ছাতে উঠে দেখল সারা বিশ্বে যেন কেউ নেই। এই বৃষ্টিস্নাত পৃথিবীতে সে একা—একটি মাত্র মেয়ে—তরুণী মেয়ে!

মনের আনন্দে লীলা পা দিয়ে দিয়ে নালির মুখগুলো পরিষ্কার করতে লাগল। হঠাৎ এমনি সময় মনে হ'ল, ও বাড়ির ছাতে যেন কার আবির্ভাব হয়েছে। চকিতে দৃষ্টি মেলে দিল। ঠোঁটের কোলে একটু হাসি ফুটে উঠল। হুঁ, ঠিক সময়ে এসেছে! আবার একবার তাকালো। ছেলেটিও যেন তাকে দেখে খুশি হয়েছে খুব। গায়ে একটা ডোরাকাটা শার্ট—বোতাম লাগাবার পর্যন্ত তর সয়নি। সেই কালো কালো ঢেউয়ের মতো চুলগুলো ভালো করে আঁচড়ানো নেই। বোধ হয় ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎই উঠে এসেছে। সে একবার অভ্যাস মতো এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সেই এক টুকরো কাগজ বের করল। আবার সেই করুণ মিনতি ভরা চাউনি। লীলার কেমন মজা লাগল—কৌতূহল হল। একবার সেও চারিদিক দেখে নিল, কেউ নেই। তখন এদের ছাতের দিকের নালিটা পরিষ্কার করবার ছলে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল কাছে। এত কাছে কোনোদিনও আসে নি। ও যেখানটায় এসে দাঁড়ালো ঠিক তার সাত হাত ওপরেই সে রয়েছে। স রয়েছে একেবারে ঝুঁকে পড়ে। এখুনি যেন ওর নিশ্বাস এসে

ছুঁয়ে দেবে লীলার চুল। লীলার বুক কাঁপতে লাগল। এত দেরি করছে কেন বোকাটা। যা দেবার দিয়ে দিলেই তো পারে। এমনি সময় টুক্ করে কী যেন পড়ল তার পায়ের কাছে। টপ করে লীলা সেটা তুলে নিল মুঠোয়। বুক কাঁপছে বড্ড! হ্যাঁ, সেই কাগজটা। সেই যেটা ও রোজ দেখাতো। এখনো যেন কাগজটা গরম হয়ে আছে। ওর হাতের মুঠোয় ছিল তো অনেকক্ষণ! একরকম দৌড়তে দৌড়তে নীচে নেমে গেল লীলা। ফিরে তাকাতে সাহস হল না।

নীচে গিয়েই প্রথমে একবার উঁকি মারল কাকীর ঘরে। না, কাকী দিব্যি ঘুমোচ্ছে। ছেলেমেয়েগুলোও গড়াচ্ছে পাশে। যাক্ কেউ দেখতে পায়নি। লীলা নিজের ঘরে এসে খিল দিল। তারপর তখনই চিঠিটা পড়তে গেল, কিন্তু পড়ল না। শুলো বিছানায়। উপুড় হয়ে শুলো। বুকের নীচে দিল বালিশ। তারপর আস্তে আস্তে ভাঁজ খুলল। ছোট্ট কাগজ—ছোট্ট চিঠি। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। খুলে ফেলল কাগজটা। চিঠি নয়—শুধু কয়েকটা কথা মাত্র। তোমায় আমি ভালোবাসি।

কে লিখছে কাকে লিখছে কিছুই লেখা নেই। শুধু মাত্র ঐ কটি কথা! তা হোক। ঐ কটি কথাই লীলা উপুড় হয়ে শুয়ে—চিৎ হয়ে শুয়ে পাশ ফিরে শুয়ে অজস্র বার পড়ল। অজস্র বার পড়ল কিন্তু তবু মন ভরে না। এত ভালো কথা—এত মিষ্টি কথা জগতে যে আর কিছু আছে তা মনে হল না। চিঠি যে লিখছে তার নাম নেই—না থাক, কল্পনায় সেখানে একটিমাত্র মানুষেরই মুখ ভেসে উঠছে। ঢেউ খেলানো চুল—তরতরে নাক—আর গোঁফ? কি বাহার? লীলা হেসেই কুটি কুটি। শেষে অতি গোপনে—অতি যত্নে সেই চিরকুটটুকু লুকিয়ে রাখলে বইয়ের শেলফে কাগজের নীচে।

এর পর থেকে যখনই ফাঁক পায় লীলা চুপি চুপি ঘরে ঢোকে আর সন্তর্পণে সেই চিরকুটটি বের করে পড়ে—তোমায় আমি ভালোবাসি। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন দুলে ওঠে। সমস্ত শরীর যেন কেমন করে ওঠে—যেন সর্বাঙ্গে ভূমিকম্পের কাঁপন লেগেছে। দেহের ঘুম ভাঙছে।

সেদিন গঙ্গাস্নান থেকে বাড়ি ফিরতেই লীলা চমকে উঠল। কার সঙ্গে কাকীমা ঝগড়া করছে। আর দু'পা এগোতেই থমকে গেল। কাকীমা পাশের বাড়ির জানলা লক্ষ্য করে চীৎকার করছে—ভদ্রলোকের ছেলে! লজ্জা করে না পরের বাড়ির দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে! শুধু টাকা থাকলেই কি ভদ্রলোক হয়। বাড়িতে একটা সোমত্ত মেয়ে রয়েছে। যেন নিজের ঘরে মা বোন নেই।

জানলা থেকে উত্তর দিলেন ও-বাড়ির গিন্নি—লজ্জা করে না, অত বড়ো ধিঙ্গি মেয়ে বে-আব্রু হয়ে ঘুরে বেড়ায়, ছাতে ওঠে। গায়ে দেবার ব্লাউজ না জোটে পাড়ায় চাইলেই তো পারে। আমাদের ছেলের কী দোষ।

লীলার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল থর থর করে। তখনো সর্বাঙ্গে ভিজে কাপড় লেপটে আছে। তার ওপর কোনো রকমে গামছাটা জড়িয়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে মুখ লাল করে বললে—না, দোষ ছেলের হবে কেন, দোষ যত মেয়ের! আমাদের বাড়ি আমি যেমন খুশি থাকব—তাতে কার কি! এবার ইদিক পানে মুখ বাড়ালে ভদ্দরলোকের ছেলের মুখে ঝাঁটা ছুঁড়ে মারব।

গিন্নি চীৎকার করে বললেন—বলি হাঁ গা সতী মেয়ে, বলতে পার আমাদের ছেলে করেছে কী! নিজের বাড়ির ছাতে উঠবে না? ছোটোমুখে বড় কথা।

লীলা কাঁপতে কাঁপতে পাতলা ঠোঁট দাঁতে চিপে বললে—কি করেছে! দেখবে—দাঁড়াও দেখাচ্ছি। এই বলে ঝড়ের বেগে ভিজে কাপড়েই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। গিয়েই দাঁড়ানো সেই বইয়ের শেলফের কাছে। বইগুলোর নীচের কাগজটা তুলে ফেলল। হ্যাঁ, আজ হাতে নাতে প্রমাণ দেবে। ঐ যে রয়েছে সেই চিরকুটটা। খপ করে তুলে নিল সেটা। সেটা তুলে নিতেই লীলার বুকটা কেমন মুচড়ে উঠল। এখনি যেন লেখাটা একবার না পড়লেই নয়। তখনই খুলে পড়ে নিল মুহূর্তের জন্যে—'তোমায় আমি ভালোবাসি'। আবার একবার পড়ল। আবার পড়ল। শুধু কি পড়া? সঙ্গে সঙ্গে আরও যেন কি তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। সেই বৃষ্টিশেষের দুপুর পৃথিবীর সেই জনশূন্য দুপুরে দুটিমাত্র মানুষ।

লীলা সভয়ে একবার পিছন ফিরে দেখে নিয়ে চুপি চুপি লেখাটি যথাস্থানে রেখে দিল।

বাইরে তখনো ঝগড়া চলেছে। সে ঝগড়ায় তাকেই গাল দেওয়া হচ্ছে। নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে লীলা। আর তার কাকী সে দুর্নাম খণ্ডন করবার প্রমাণ না পেয়ে ক্রমশ পিছু হটছে। লীলা সবই শুনতে পাচ্ছে তবু সেই ঘরে দাঁড়িয়ে রইল মুখ বুজে। ভিজে কাপড় থেকে টস টস করে জল পড়ে মেঝে ভেসে যেতে লাগল।

ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

শর্মার অবস্থা খুব ভালো নয়, ঐ ঠাণ্ডার মধ্যেও থেকে থেকে রুমাল বার ক'রে কপালের ঘাম মুছতে লাগল সে। শুক্লা কিন্তু মনে হ'ল বেশ সামলে উঠেছে, সমঝে নিয়েছে পরিস্থিতিটা।

"কী ব্যাপার অফিসার? কে গুলি করল এই মেয়েটিকে? তুমিই বা কখন এলে?"

"মেয়েটিকে এখানে গুলি করা হবে খবর পেয়ে কে গুলি ক'রে দেখবার জন্তে ঠিক সময়টিতে হাজির হয়েছি।"

"ঠিক সময়টিতে? কে গুলি করেছে, দেখেছো?"

"হ্যাঁ—"

"ধরতে না পারলেও চিনতে পেরেছি, আর চিনতে পারলে ধরতেও খুব দেরি হবে না।"

"কে?"

"সে প্রশ্নের আগে আপনারা এখানে কেন! সেটা বললে আমার দিকের একটা কৌতূহল অন্তত নিবৃত্ত হয়।"

শুনে চুপ করল শুক্লা, একবার তাকাল শর্মার দিকে, তারপর বলল, "শর্মার স্ত্রীর লাশ নিতে শর্মাকে নিয়ে সাড়ে ছ'টায় মোমিনপুরে গিয়েছিলাম আমি। লাশ নিয়ে কেওড়াতলার শ্মশানে ইলেকট্রিক চুল্লীতে পুড়িয়ে হোটেলে ফেরার পথে শর্মা একটু আসতে চাইল এখানে—গঙ্গার জল ছুঁয়ে যাবে বলে!"

"এর মধ্যে পোড়ানো হয়ে গিয়েছে লাশ?" বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল গুপ্তভায়া।

"সম্পূর্ণ হয়নি কিন্তু শর্মা আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও-দৃশ্য দেখতে চাইল না—"

"কেন, বসবার ব্যবস্থা নেই ওখানে? আর ইলেকট্রিক চুল্লীতে তুলে দেবার পর দেখবারও খুব কিছু থাকে কি?"

"দাঁড়িয়ে মানে অপেক্ষা ক'রে আর দেখা বলতে ঐ-পরিবেশ বলতে চেয়েছি আমি"—শুক্লার গলাটাও উত্তরে বেশ কঠিন শোনাল।

"বুঝলাম। এই নিয়ে দ্বিতীয় খুন তাই প্রশ্নোত্তরগুলি সম্বন্ধে যতটা সম্ভব সঠিক হবার চেষ্টা করছি আমি—নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?" সহজ গলায় বলে উঠল গুপ্তভায়া।

"পারলাম!" গলাটা শুক্লারও একটু নরম হয়ে এল।

এদিকে কথা শুনতে শুনতে আমি নজর রাখছিলাম বড় রাস্তার দিকে। ইতিমধ্যে পরিক্রমারত একটি রেডিও-ভ্যান থামিয়ে ফেলেছে সিপাইটি এবং ভ্যান থেকে দু'টি সার্জেন্টকে নেমে আসতে দেখলাম।

সিপাইটির সঙ্গে সার্জেন্ট দু'টি এসে উপস্থিত হ'তে গুপ্তভায়া সরে গিয়ে তাদের সঙ্গে কী যেন কথা বলল, তারপর ফিরে এসে শর্মা ও শুক্লাকে বলল, "দুর্ভাগ্যবশত এই খুনের মামলারও সাক্ষী হ'য়ে গিয়েছেন আপনারা—তাই এখন আমাদের দপ্তরে একবার আপনাদের যাওয়া দরকার। আপনাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই গাড়ি আছে—ওই অফিসারটি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছে এবং আমিও দপ্তরে এসে পড়ছি এক্ষুণি—"

"কিন্তু এখনো খাওয়া হয়নি আমার!" শুক্লা বলে উঠল, "কতক্ষণ দেরি হবে সেখানে?"

"আপনার মত দায়িত্বপূর্ণ পদের লোকের কাছে এ প্রশ্নটা আশা করিনি। যতক্ষণ প্রয়োজন হবে তার চেয়ে যে এক মিনিটও বেশি আপনাকে ধরে রাখা হবে না—ওইটুকু আমি বলতে পারি, কিন্তু

সময়মত যুদ্ধ শেষ ক'রে সৈন্তদের ডিনারের ছুটি দিতে পারবেন কি না যেমন আপনার পক্ষে বলা সম্ভব নয় তেমনি আমার পক্ষেও সেই সময়টা বলা মুস্কিল !"

"হুঁ ! কৈ, কে যাবে আমার সঙ্গে"—শুক্লা আর বাক্যব্যয় করল না, শর্মা ও একটি সার্জেণ্টকে নিয়ে চলে গেল যেদিক দিয়ে এসেছিল সেই দিকে।

শুক্লা সদলে অপসরণ করতেই গুপ্তভায়া সিপাইটির দিকে ফিরল। ঘাট থেকে উঠে আসা সেই লোক ছুটিকে দেখিয়ে দিয়ে তাদের ভ্যানে নিয়ে তুলতে বলল। বিনা আপত্তিতে তাড়িত পালিত পশুর মত সিপাইটি বলতেই তারাও সিপাইটির আগে আগে চলতে শুরু ক'রে দিল বড় রাস্তার দিকে। "উইলসন, তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি একটু চারপাশটা ঘুরে দেখি—"টর্চটা আমার হাত থেকে নিতে নিতে উপস্থিত সার্জেণ্টটিকে বলল গুপ্তভায়া।

"ইয়েস জি-বি !" উত্তর করল সার্জেণ্টটি এবং শুনে কেমন খটকা লাগল আমার ! জি-বি যে গুপ্তভায়ার সংক্ষিপ্তকরণ এবং পুলিশ বিভাগে স্বয়ং পুলিশ কমিশনারের চালু করা সেটা তখনো আমি জানি না। উইলসনকে দাঁড় করিয়ে রেখে সেখান থেকে আন্দাজ শ'খানেক গজ দক্ষিণ পর্যন্ত টর্চ দিয়ে একদিকে বড় রাস্তার রেলিং অন্যদিকে গঙ্গা পর্যন্ত রেল লাইন, জমি, পারের ঢালু নেমে যাওয়া বাঁধানো জায়গা এবং আলো ফেলে জলের উপরেও তন্ন তন্ন ক'রে কী যেন খুঁজতে লাগল গুপ্তভায়া।

"কী খুঁজছেন ? এমনি এমনি কোনো সূত্র পাওয়া যায় কি না দেখছেন, না বিশেষ কোনো জিনিষের সন্ধান করছেন ?"

"বিশেষ একটি বস্তু।" টর্চটা উপরের দিকে একটা গাছের ডালে ফেলে উত্তর করল গুপ্তভায়া।

"পিস্তল বা রিভলবার ?"

"না, একটা ব্যাগ।"

"ব্যাগ ? কী ব্যাগ ? কার ?"

"কী ব্যাগ আবার ? মেয়েদের ব্যাগ—রুক্মিণী কাউল বা মিনতি সরকারের !"

"কোনো ব্যাগ হাতে ও:ক নামতে দেখেছিলেন ট্যাক্সি থেকে ?'

"না, তা অবশ্য দেখিনি। মানে, দেখতে পাইনি—"

"তা হলে ?"

"হুঁ"—বলে টর্চ নিভিয়ে খোঁজা বন্ধ করে দিল গুপ্তভায়া, ফিরে চলল অকুস্থলের দিকে।

সার্জেণ্ট উইলসন চেহারায় লম্বা-চওড়া হলেও বয়সে বেশি নয়। জাতে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, সিগারেট ধরিয়ে ঘাসের উপর মেয়েটির অর্ধ-উলঙ্গ দেহটি বেশ নিবিষ্ট মনে পর্যবেক্ষণ করছিল, গুপ্তভায়া ব্যস্ত ভাবে ফিরে এসেই তাকে বড় রাস্তায় রাখা ভ্যানে পাঠিয়ে দিল অয়্যারলেসে হেড কোয়ার্টার থেকে প্রয়োজনীয় লোকজন ডাকবার জন্ত।

উইলসন চলে যেতেই গুপ্তভায়া মেয়েটির পাশে ঘাসের উপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এবং টর্চের আলো ঘুরিয়ে ভালো ক'রে দেখতে লাগল মেয়েটিকে।

প্রথমে আলোটা ধরল মেয়েটির মুখে এবং লক্ষ্য ক'রে দেখলাম বব-করা চুল এবং প্লাগ-করা ভুরু সত্ত্বেও একটা মিষ্ট বাঙালী কমনীয়তা রয়েছে সেই মুখে। মৃত্যু-যন্ত্রণার কাতর অভিব্যক্তি সে-কমনীয়তাকে নষ্ট করতে পারেনি, শুধু করুণ ক'রে তুলেছে আরো। ঝরে পড়া দু' ফোটা চোখের জলের মত দু' কানে দুটো হীরের টাব যেন সেই বিষণ্ণতা বাড়িয়ে তুলেছে—বিলিতি-ফ্যাশনের মোটা শেকলের হারটা যেন আর আভরণ নয় কণ্ঠের—এক বন্দিনীর অসহায়তার নিষ্ঠুর নিদর্শন।

টর্চের আলো মুখ থেকে সরে এল বুকে। হৃৎপিণ্ডের দু' ইঞ্চি উপরে একটা ক্ষত দেখা গেল, বুকের বাঁ দিকটা সম্পূর্ণ ভেসে গিয়েছে রক্তে, রক্ত শুকিয়ে উঠেছে কিন্তু ভালো ক'রে জমাট বাঁধেনি এখনো ফুলকাটা দামী গাঢ় হলুদ লিনেনের ফ্রকটার ঐ জায়গায় রক্তের ঘন হয়ে আসা গাঢ় লাল দেখে হঠাৎ মনে হয় এ যেন একজিবিশনে দেখা কোনো আধুনিক শিল্পীর উৎকট রুচির শুধু বর্ণবিন্যাসের কোনো ছবি। অথচ জগতের অনেক আশ্চর্য দৃশ্যের মত এ-দৃশ্যও যে শিল্পীর পরিকল্পনা বা সৃষ্টি সে শুধু পুরাতন নয়, সে-শিল্পী আদিম ও অকৃত্রিম, সে-স্রষ্টা আদি ও অনাদি। অক্ষত ডান বুকের দৃপ্ত ও উদ্ধত প্রকাশের পাশাপাশি তার হৃতশ্রী হৃতমান পরিণতি হিসেবেই ছবিটা বুঝি সেই শিল্পী পরিকল্পনা করেছে, সম্পূর্ণ ও অর্থময় ক'রে তুলেছে।

বুক থেকে কোমর এবং কোমর থেকে উরুদেশে এসে গুপ্তভায়া ভালো ক'রে লক্ষ্য করতে লাগল স্কার্ট-অপহৃত প্রায় উন্মুক্ত দুটি অবয়ব পরিপুষ্ট নির্লোম, সুডৌল, সুসম, মসৃণ দু'টি অঙ্গ—যা এই রক্তাক্ত পরিবেশের বাইরে হ'লে যে-কোনো ভাস্করের স্বপ্ন, চিত্রকরের প্রেরণা ও মনুষ্য মধুকরের উন্মত্ততার কারণ হতে পারত।

লক্ষ্য করতে করতে হঠাৎ স্কার্টের গোটানো প্রান্তটা তুলে ধরল গুপ্তভায়া বাঁ-হাত দিয়ে এবং সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ক'রে দিল বাঁ-উরুটা এবং টর্চের আলোয় কী যেন লক্ষ্য করতে লাগল ভালো ক'রে। কী লক্ষ্য করছে সেটা মাথা নীচু ক'রে নজর করতে আমিও দেখতে পেলাম ফর্সা মসৃণ চামড়ার উপর নয়া পয়সার চেয়ে সামান্ত বড় আয়তনের একটি রক্তবর্ণের বৃত্ত ! কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয় স্কার্টটা টেনে

হাঁটুর নীচে নামিয়ে দিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল গুপ্তভায়া এবং বড় রাস্তার দিকে ফিরে উইলসনের নাম ধরে তারস্বরে ডাকতে লাগল।

উইলসনের সাড়া পাওয়া গেল, গুপ্তভায়ার ডাকে নয়, এমনিতেই ছুটে আসছিল সে এবং কাছে এসে সে-ই প্রথম কথা বলল।

"হেড কোয়ার্টার্স থেকে দাশ তোমাকে জানাতে বলছে যে, গ্লোরিয়া বেনেট নামে যাকে তোমরা খুঁজছিলে তার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।"

"কোথায়?" শুনে একরকম লাফিয়ে উঠল গুপ্তভায়া।

"তালতলা থানায়, একটি ট্যাক্সি একটি মেয়ের মৃতদেহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। খবর পেয়ে সরকার সেখানে গিয়ে দেখতে পেয়েছে মৃতদেহটি গ্লোরিয়া বেনেটের এবং সঙ্গে সঙ্গে হেড কোয়ার্টার্সে খবর দিয়ে তোমার অপেক্ষায় সেখানে বসে আছে।"

"দাশ কী করছে?"

"তোমার অপেক্ষায় বসেছিল। আমি খবর দিতে এখানকার চার্জ নেবার জন্যে এখনি আসছে বলল এখানে। তোমাকে এখনি সরকারের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে বলেছে।"

শুনে মাথা নীচু করে কী যেন চিন্তা করতে লাগল গুপ্তভায়া, তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে একবার ঘাসের উপর তাকাল এবং তারপরই আবার মুখ তুলল উইলসনের দিকে।

"কাছাকাছি যে কটা ভ্যান 'অয়্যারলেস'-এ ধরতে পারো, আসতে বলে দাও এখানে।"

"ইয়েস জি-বি!"

"এইখানে সিপাইটিকে এসে পাহারা দিতে বলো যতক্ষণ না হেড কোয়ার্টার্স থেকে দাশ এসে চার্জ নেয়। তুমি এখানে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না অন্যান্য ভ্যানগুলি এসে জড়ো হয়!"

"তারপর?"

"জড়ো হবার পর এই এসপ্লানেড মুরিং—ঐ যে কটা বিদেশী জাহাজ রয়েছে সেগুলির কাছাকাছি ঘাটে পাহারা দেবে এবং যেই দেখবে কোনো নাবিক—বিদেশী নাবিক এবং জাহাজের অফিসার জাতীয় কেউ জাহাজে ফিরছে এবং তাকে ঘাটে বিদায় দিতে এসেছে কোনো যুবতী তখনি তাদের গ্রেপ্তার করবে!"

"নাবিকদের?"

"সঙ্গে যুবতীদেরও। মেয়ে নিয়ে ঘাটে আসা একটি নাবিকও যেন পালাতে না পারে!"

"কিন্তু জি-বি—"

"তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বে-আইনি কোকেন আমদানি!"

"কোকেনের চোরা চালান? বলো কি জি-বি!"

"হ্যাঁ। যেমন যেমন ধরবে, পাঠিয়ে দেবে হেড কোয়ার্টার্স-এ। আমি সেখানে থাকব তাদের জোড়ায় জোড়ায় অভ্যর্থনা করবার জন্যে!"

"কিন্তু জি-বি"—

"হ্যাঁ, দায়িত্ব সব আমার! আমি হেড কোয়ার্টার্স-এ পৌঁছেই সি-পির সঙ্গে সব কথা বলে নিচ্ছি। আর, হ্যাঁ, ঐ ঘাটে নেমে এলোপাতাড়ি অ্যারেষ্ট করে ভ্যান বোঝাই কিছু লোক নিয়ে আসবে হেড কোয়ার্টার্স-এ।"

বলে আর বাক্যব্যয় না ক'রে গুপ্তভায়া আমাকে ইশারা ক'রে রওনা হল বড় রাস্তার দিকে।

বড় রাস্তায় অপেক্ষমান অয়্যারলেস ভ্যান থেকে মাল্লাজাতীয় সেই ছুটো লোককে আমাদের 'জীপ'-এর পিছনে তুলে গোয়েন্দা দপ্তরে যখন পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে সময় দেখে প্রথমে বিশ্বাস হ'তে চাইল না। মাত্র সাড়ে দশটা, অর্থাৎ গত চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ঘটে গিয়েছে এত ঘটনা, সত্যি বিশ্বাস করা শক্ত।

দপ্তরে পৌঁছে নিজের ঘরে ঢোকবার আগে অন্য একটা খালি ঘরে ঢুকে 'সি-পি' অর্থাৎ কমিশনারকে ফোন করল গুপ্তভায়া। কী কথা হ'ল সঠিক বুঝলাম না, শুধু একতরফা শুনে যেতে লাগলাম গুপ্তভায়ার কথা। গঙ্গার ধারে এ-যাবৎ কাল ঘটনা বিবৃত ক'রে গুপ্তভায়া তখনো বলে চলেছে ফোনে: "হ্যাঁ, স্যর, সব ক'টা অয়্যারলেস ভ্যান আমার লাগছে!"

"——"

"সবাইকে বলে দিয়েছি এবং দিচ্ছি কোকেন চোরাচালানের জন্যে গ্রেপ্তার করতে!"

"——"

"গোলমাল একটু হ'তে পারে, কিন্তু ও-ছাড়া উপায় দেখছি না আর?"

"——"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, স্যর, সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। দু'জন মেয়ে পুলিশও দরকার হচ্ছে আমার। অয়্যারলেস-দপ্তরকে তাহলে আপনি সেই রকম বলে দিন!"

"——"

"ধন্যবাদ, স্যর। গুড-নাইট!"

কমিশনারের সঙ্গে কথা শেষ ক'রেই টেলিফোনে তালতলা থানায় সরকারকে চাইল গুপ্তভায়া। রিসিভার নামিয়ে রাখতে না রাখতেই ঝনঝন ক'রে বেজে উঠল। ফোনে কান লাগিয়েই বুঝি তালতলা থানায় অপেক্ষা করছিল সরকার।

"বলো, সরকার, কী ব্যাপার?"

"——"

"সেই মেয়েটি তো বুঝলাম কিন্তু ওখানে কী ভাবে হাজির হোলো?"

"——"

"ট্যাকসি ড্রাইভারের ষ্টেটমেন্টটা খুব বিস্তারিত ভাবে নেবে আর ডাক্তার গিয়ে পৌঁছেছে!"

"——"

"মৃত্যুর কারণটা ডাক্তারকে ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করতে বলো? বিষ হলে কী জাতীয় বিষ?"

"——"

"হ্যাঁ, এই খবরগুলি সব জেনে ফোন কোরো আমায়। আমি দপ্তরেই আছি। আর হ্যাঁ, মেয়েটির বাঁ-উরুতে—প্রায় কোমরের কাছাকাছি—একটু ভালো ক'রে লক্ষ্য কোরো তো কোনো দাগ আছে কি না!"

"——"

"ডাক্তার পরীক্ষা করার সময় দেখে নিও এক ফাঁকে!"

টেলিফোন রেখে গুপ্তভায়া ব্যস্তসমস্ত হয়ে গিয়ে ঢুকল নিজের ঘরে। তাঁর পিছু পিছু গিয়ে ঘরের মধ্যে সেই সার্জেন্টটির সঙ্গে দাঁড়া
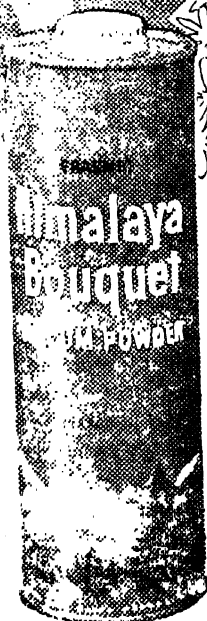
ও শুক্লাকে নিস্তেজভাবে বসে থাকতে দেখলাম এবং গুপ্তভায়াকেও দেখেও দু'জনের কারুকেই নড়তে দেখা গেল না। খালি পেটে আমাদের অপেক্ষায় বসে শুক্লাকে অন্তত ঘরে ঢুকে একটু উত্তেজিত দেখব আশা করেছিলাম, কিন্তু শুক্লা যেন শর্মার চেয়েও বেশি চুপচাপ হয়ে গিয়েছে এবং এই বিসদৃশ দৃশ্যের কারণটাও অবিলম্বে জানা গেল সার্জেন্ট গোল্ডারের কাছ থেকে? গুপ্তভায়াকে দেখেই পকেট থেকে একটা রুমালে মোড়া পিস্তল বার করে টেবিলের উপর রাখল সে এবং জানাল শুক্লার গাড়ির পিছনের সীটে বসে দপ্তর-মুখো আসতে আসতে হঠাৎ সীটের ধারে গোঁজা এই পিস্তলটায় হাত লেগে যায় তার এবং এই পিস্তলটা কার বা গাড়িতে কোথা থেকে এল সেটা শর্মা বা শুক্লা কেউ-ই তাকে বলছে না বা বলতে পারছে না।

রুমালসুদ্ধ পিস্তলটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে রুমালসুদ্ধই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল গুপ্তভায়া, দেখতে দেখতেই জিজ্ঞাসা করল গোল্ডারকে, "গাড়ির ড্রাইভার কিছু বলতে পারল না?"

"ড্রাইভার ছিল না, এঁরা-ই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছেন!" উত্তর করল গোল্ডার।

"হুঁ—" পিস্তলটা ভালো করে দেখে মুখ তুলল গুপ্তভায়া, "পিস্তলটা থেকে গুলি ছোড়া হয়েছে দেখছি এবং সেটা খুব বেশিক্ষণ আগে নয়!"

শু'নে শর্মা যেন কেঁপে উঠল একবার, শুক্লাও নড়ে বসল একটু।

"মিষ্টার শর্মা, আপনার পিস্তলের লাইসেন্স আছে না?"

শুনে এবার স্পষ্ট শিউরে উঠল শর্মা এবং বেশ কিছুক্ষণ পর ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করল, "হ্যাঁ—"

"তাহলে আপনার পিস্তলটা যে এইরকম দেখতে তাতে আর সন্দেহ নেই?"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত হঠাৎ যেন চেয়ারে সজীব হয়ে উঠল শর্মা, বেশ জোরে চীৎকারের মত ক'রেই বলে উঠল, "কিন্তু সে পিস্তল আমার হোটেলে স্যুটকেশের মধ্যে তালাবন্ধ করা রয়েছে!"

"না, নেই। আর তার কারণ এইটাই সেই পিস্তল, একটু আগে যে আপনার এই পিস্তলের গুলিতেই গঙ্গার ধারে খুন হয়েছে ঐ মেয়েটি, তাতেও আর কোনো সন্দেহ নেই আমার!"

দেখতে দেখতে কাগজের মত সাদা হয়ে গেল শর্মার মুখ আর কাঁপতে শুরু ক'রে দিল সর্বশরীর।

"ব্যাপারটা ঠিক আমি বুঝতে পারছি না!" শুক্লার গলা শোনা গেল, শ্মশান থেকে বেরিয়ে একমুহূর্তও শর্মা আমার চোখের আড়াল হয়নি। কোনো পিস্তল আমি শর্মার সঙ্গে দেখিনি আর যদি আমাকে লুকিয়েও শর্মা কোনো পিস্তল সঙ্গে এনে থাকে তো তা দিয়ে মেয়েটিকে গুলি করবার সুযোগ কখন পেল সেটা তো বুঝতে পারছি না!"

"যথা সময়ে বুঝতে পারবেন!" গম্ভীর গলায় উত্তর করল গুপ্তভায়া, "আপাততঃ শর্মা এখানে হাজতবাস করবেন কেননা তাঁকে আবার একটা খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হোলো। আপনাকেও গ্রেপ্তার করা হোলো, তবে আপনার ব্যক্তিগত জামিনে আপনাকে এখন ছাড়া যেতে পারে যদি কাল সকালে এগারোটায় পুলিশ কোর্টে হাজির হবার প্রতিশ্রুতি আপনি সই ক'রে দিয়ে যান!"

দেখতে দেখতে এবং গুপ্তভায়ার দিকে তাকিয়ে মুখখানা যেন কালো হয়ে গেল শুক্লার। মুখ ফিরিয়ে একবার শর্মার দিকে তাকাল শুক্লা, তারপর আবার গুপ্তভায়ার দিকে ফিরে বলল, "দিন, কী সই করতে হবে!"

শুক্লা চলে যেতে সার্জেন্টটির দিকে ফিরল গুপ্তভায়া, "গোল্ডার যাও, নীচে সিপাইদের কাছে দুটি লোককে জমা দিয়ে এসেছি। তাদের নাম, ঠিকানা নিয়ে ছেড়ে দাও গে। তারপর আমার জীপটা নিয়ে হোটেল '—' এ যাও এবং সেখানে গিয়ে এগারো নম্বর ঘরটা সিল করে দেবে, হোটেলের কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলবে আবার একটা খুনের জন্যে মিষ্টার শর্মাকে ফের অ্যারেষ্ট করা হয়েছে এবং তাই ঘরটা 'সিল' করার প্রয়োজন হয়েছে। যাও, কাজটা সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো এখানে—"

গোল্ডার চলে যেতে শর্মার দিকে তাকাল গুপ্তভায়া, এই দু'দিনে কুঁকড়ে শর্মা কেমন ছোটো হ'য়ে গিয়েছে তাকিয়ে সেইটাই বুঝি লক্ষ্য করতে লাগল ভালো ক'রে। শর্মা বসেছিল মাথা নীচু ক'রে, সেই অবস্থাতেই ঘরের নিস্তব্ধতার জন্যেই বুঝি ধীরে ধীরে গুপ্তভায়ার দৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠল শর্মা আর সচেতন হয়েই যেন ক্রমশ আরো সংকুচিত হ'য়ে যেতে লাগল চেয়ারে। তারপর এক সময় মরিয়া হয়েই বুঝি হঠাৎ মুখ তুলে তারস্বরে বলে উঠল, "বিশ্বাস করুন, মিনতি সরকারকে আমি খুন করিনি—"

"তবে কোন রাজ কাজে বৌয়ের লাশ আধপোড়া রেখে সাত তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিলেন গঙ্গার ধারে?" খোঁচা দিয়ে প্রশ্ন করে উঠল গুপ্তভায়া।

"বিশ্বাস করুন, রুক্মিণী কাউল ফোন ক'রে আমায় যেতে বলেছিল ওখানে।"

"ফোন ক'রে? কখন?"

"আমি আদালত থেকে ফিরবার ঘণ্টা দেড়েক পর—এই সাড়ে তিনটে নাগাদ।"

"আপনার হোটেলের টেলিফোনের দুটো লাইনই আমরা 'ট্যাপ' ক'রে রেখেছি জানলে বোধ হয় এই মিথ্যে কথাটা বলতেন না!"

"ট্যাপ করেছেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার কথাটা সত্যি!"

"হুঁ। তা টেলিফোন অনুযায়ী গঙ্গার ধারে পৌঁছে রুক্মিণীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপনার?"

"না—"

"কেন? রুক্মিণী আসেনি?"

"বোধ হয়, না! এসে থাকলেও আমি পৌঁছবার আগেই চলে গিয়েছে নিশ্চয়ই। সাড়ে ন'টায় যেতে বলেছিল আমাকে কিন্তু শ্মশান থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে পৌঁছতে পৌনে দশটা বেজে গিয়েছিল আমার!"

"মিনতিকে দেখতে পেয়েছিলেন আপনি?"

"না, মিনতি ওখানে আসবে বলে কোনো ধারণাই ছিল না আমার।"

"রুক্মিণী মিনতির কথা কিছু বলেনি?"

"না!"

"রুক্মিণীর সঙ্গে আপনার আলাপ মিনতির সঙ্গে আলাপের আগে না পরে?"

"আলাপ দূরে থাক, রুক্মিণীকে আজ পর্যন্ত চাক্ষুষ কখনো আমি দেখিনি, নামটাও কামপুর থেকে এইবার এসে গীতার দুর্ঘটনার ব্যাপারে প্রথম শুনছি।"

"আপনার স্ত্রীর মুখে রুক্মিণীর নাম কোনোদিন শোনেননি?"

"না।"

"কী প্রয়োজনে রুক্মিণী আপনাকে ডেকেছিল কিছু বলেছিল ফোনে?"

"হ্যাঁ, বলেছিল একটা চিঠি আমায় দেবে।"

"কী চিঠি?"

"গীতার শেষ চিঠি—আমার উদ্দেশ্যে লেখা।"

"মিষ্টার শর্মা, কেউ মিথ্যে কথা বললে আমি তার মুখ বুঝতে পারি। এই কথাগুলি আপনি সত্যি বলছেন, না, মিথ্যে—বুঝতে কিছু তাই অসুবিধে হচ্ছে না আমার।"

"এই কথাগুলি সব সত্যি।"

সত্যের টিকটিকির মতই বুঝি শর্মার কথার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল গুপ্তভায়ার পাশে টেলিফোনটা।

"হ্যা-লো? কে উইলসন? কী খবর?"

"——"

"এক জোড়া পেয়েছো? গুড, এখনি নিয়ে এসো দপ্তরে!"

বলেই ফোনের লাইন কেটে দপ্তরের একটা লাইন ধরে গুপ্তভায়া দু'টি মেয়ে-পুলিশকে অবিলম্বে এসে পড়তে বলল এই ঘরে। তারপর সে লাইন কেটে আবার একটা লাইন ধরে হুকুম করল একজনকে শর্মাকে এসে হাজতে নিয়ে যাবার জন্য। তারপর সে-লাইনও কেটে সরকারকে ধরতে বলল ফোনে। সরকারকে ধরতে ধরতে দু'টি মেয়ে-কনষ্টেবল এসে দাঁড়াল দরজায় এবং তাদের প্রায় সঙ্গেই একজন কর্মচারী এসে তুলে নিয়ে গেল শর্মাকে। চলে যাবার সময় শর্মা বোধহয় কিছু বলতে চেয়েছিল গুপ্তভায়াকে কিন্তু সে-সুযোগ আর তার হল না, টেলিফোন বেজে উঠতে গুপ্তভায়া ব্যস্ত হয়ে গেল সরকারের সঙ্গে কথা বলতে। শর্মা চেয়ার ছেড়ে উঠে কিছুক্ষণ উন্মুখ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর কী ভেবে মন বদলে একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সেই কর্মচারীটির সঙ্গে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। গুপ্তভায়া একবার তাকিয়েও দেখল না তাকে, ফোনে সরকারকে সে তখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে।

"কোনো দাগ নেই? ভালো ক'রে দেখেছো তো?"

"——"

"ট্যাক্সি-ড্রাইভারের ষ্টেটমেণ্ট নিয়েছো?"

"——"

"কোত্থেকে উঠেছে বলছে?"

"——"

"ষ্ট্যাণ্ড থেকে। যাচ্ছিল কোথায়?"

"——"

"ক্রষ্টোকার লেন। তার মানে বাসায় ফিরছিল। ডাক্তার কী বলছে মৃত্যুর কারণ?"

"——"

"ডাক্তার তোমার সন্দেহই সমর্থন করছে বুঝলাম কিন্তু কিছুটা ঐ জাতীয় বলে কিছু আন্দাজ করতে পারছে?"

"——"

"হুঁ। তাহলে লাশ নিয়ে তুমি কেত্তার কাছে গঙ্গার ধারে যাও। সেখানে দাশ, আরেকটি লাশ নিয়ে বসে রয়েছে। লাশ দু'টো দিয়ে দাশকে মোমিনপুরে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি ডাক্তারকে ধরে ময়না তদন্তের ব্যবস্থাটা যত তাড়াতাড়ি পারো ক'রে আমায় ফোন ক'রে জানাও, আমি দপ্তরেই আছি।"

"——"

"হ্যাঁ, একটি মেয়েরই এবং মেয়েটির নাম মিনতি সরকার।"

"——"

"সন্দেহক্রমে শর্মাকে আবার গ্রেপ্তার করেছি। আর কিছু এই মুহূর্তেই জেনে ফেলবার জরুরী প্রয়োজন আছে তোমার?"

"——"

টেলিফোন সেরে দরজার কাছে মেয়ে-কনষ্টেবল দুটিকে দেখেই গুপ্তভায়া চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে গুজ গুজ ক'রে কী শলা-পরামর্শ করতে লাগল দূর থেকে শুনতেও পেলাম না, বুঝতে পারলাম না। তাদের সঙ্গে কথা শেষ ক'রে গুপ্তভায়া আর চেয়ারে এসে বসল না, চিন্তিত মুখে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল, পায়চারি করতে করতেই আমার চোখে ওর চোখ পড়ল কয়েক বার কিন্তু সে-দু'টির দৃষ্টি কেমন যেন ভোঁতা—চোখে পড়েও যে আমায় ও দেখতে পাচ্ছে না তাতে কোনো ভুল নেই। আর আমি শুধু নই, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ে-কনষ্টেবল দু'টির ঐ একই অবস্থা।

এগারোটা বাজবার একটু পরেই সদলবলে উইলসনের আবির্ভাব ঘটল, সঙ্গে স্যুট-পরা নীল-চোখ এক সাদা-চামড়া ও সালোয়ার-পরা কালো-চোখ এক গৌরবর্ণায়। উইলসনের বাঁ-চোখটা কালো হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। এ-কাণ্ডকারখানায় গুপ্তভায়াই যে কর্মকর্তা ঘরে ঢুকে সেটা বুঝে নিতে বিশেষ সময় লাগল না নীল-চোখের, গুপ্তভায়ার সামনে গিয়ে টেবিলের উপর সশব্দে একটি ঘুষি বসিয়ে সদম্ভে ও সদর্পে সে জানতে চাইল এই ভাবে তাকে ধরে আনার অর্থ কী? উইলসনের চোখের কালসিটে যে কার হাতের কাজ বুঝতে বাকি রইল না আর।

টেবিলের ঘুষিটা লক্ষ্য ক'রে বুঝি একটু বেশি শান্তভাবে গুপ্তভায়া তাকাল নীল-চোখের দিকে, "উত্তম মধ্যম খাবার জন্যে মনে হচ্ছে তোমার শরীর নিসপিস করছে? কলকাতা পুলিশের সাত নম্বর দাবাই বোধ হয় চাখবার তোমার কখনো সৌভাগ্য হয়নি। বিশ্বাস করো, শরীরের একখানা হাড়ও তাতে তোমার আস্ত থাকত না, অথচ চামড়ার উপর সামান্য আঁচড়ের দাগও তাতে পড়ে না।"

কথাটায় বুঝি কাজ হ'ল। কিছুটা নরম হয়ে এল নীল চোখের সুর, "আমাকে এ-ভাবে হায়রাণ করার অর্থ কী, সেটা তো আমায় বলবে?"

"তার আগে নাম বলো, তোমার?"

"লাস হেগেনসন।"

"জাত?"

"সুয়েডিশ কিন্তু মার্কিণ নাগরিক।"

"মার্কিণ জাহাজে এসেছো?"

"হ্যাঁ, বাণিজ্য-জাহাজ এস. এস. সিটিস্-এর থার্ড মেট আমি।"

"কতদিন এসেছো কলকাতায়?"

"দশদিন। কাল ভোরে জাহাজ ছাড়বে আমাদের।"

"কী জন্যে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শুনেছো?"

"হ্যাঁ, কোকেনের চোরাচালানের অভিযোগে। কিন্তু গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে আমি অনবরত বলছি আমাকে তল্লাশী করবার জন্যে। আমার কাছে কোকেন না পেলে তোমরা আমায় গ্রেপ্তার করতে পারো না।"

"পারি যদি তোমার সঙ্গিনীর কাছে কোকেন পাই এবং বুঝতে পারি সেটা তুমি তার কাছে পাচার করেছো।"

"বেশ, তাহলে আমাদের দু'জনকেই তল্লাশী করে দেখো—"

"সেটা তুমি না বললেও করব।" বলে গুপ্তভায়া তাকাল এবার সালোয়ার পরিহিতার দিকে এবং দরজায় দাঁড়ানো মেয়ে-কনষ্টেবল দু'টিকে হুকুম করল তাকে নিয়ে গিয়ে তল্লাশী করতে।

মেয়ে-কনষ্টেবলদের সঙ্গে সালোয়ার পরিহিতা চলে যেতেই কারুর বলার কোনো অপেক্ষা না রেখেই নীল-চোখ হঠাৎ কোটটা খুলে টেবিলের উপর রাখল আর তারপর একে একে টাই শার্ট খুলে রেখে প্যান্টের বোতাম খুলতে আরম্ভ করল।

"হয়েছে, হয়েছে—"তাড়াতাড়ি নীল-চোখকে নিবৃত্ত করল গুপ্তভায়া, "তোমাকে আর উলঙ্গ হ'তে হবে না। তোমার ভাব দেখেই বুঝতে পারছি, তোমার কাছে কিছু নেই। এখন তোমার সঙ্গিনীটির কাছে কিছু না থাকলে হয়তো তোমাদের ছেড়ে দিতে পারি।"

"আমার সঙ্গিনীকে তল্লাশী করতে খুব দেরি হবে না, আশা করি।" বলে নীল-চোখ টেবিলের উপর থেকে তার শার্টটা নিয়ে চড়াতে শুরু করল গায়ে।

"তোমার মত সহযোগিতা করলে বিশেষ দেরি হবার কথা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য চোরা চালানকারীদের ধরা, তোমাদের অকারণ হয়রাণ করা নয়।"

উত্তর করল গুপ্তভায়া।

সঙ্গিনীটি খুব অসহযোগিতা করেছে বলে মনে হ'ল না, নীল-চোখের টাই বেঁধে কোট-পরে একটা সিগারেট ধরাবার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় মেয়ে-কনষ্টেবলদের একজনকে ফিরে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল।

"কী হোলো? পেলে কিছু?" তাকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে উঠল গুপ্তভায়া।

"হ্যাঁ—" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল মেয়ে-কনেষ্টবলটি।

"তাহলে আটকে রাখো। সঙ্গীটির সঙ্গে কথা বলে নিয়ে আমি আসছি—" বলে মেয়ে-কনষ্টেবলটিকে পাঠিয়ে দিয়ে নীল-চোখের দিকে আবার ফিরল গুপ্তভায়া।

"মিষ্টার—"

"হেগেনসন—"

"হ্যাঁ, হেগেনসন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তোমাকে জানাতে হচ্ছে যে তোমার সঙ্গিনীকে তল্লাশী ক'রে আমাদের সন্দেহ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে?"

"কোকেন পেয়েছো? কিন্তু কী ক'রে?"

"কী ক'রে পেতে পারি সে-সম্বন্ধে তোমার নিশ্চয়ই একটা ধারণা আছে?"

"বিন্দুমাত্র না।"

"তোমার বান্ধবীর অপরাধ সম্বন্ধে তোমার [illegible] রকম ধারণা বা যোগসাজস নেই—এ-কথা বুঝতেই পারছো আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু বিশ্বাস তোমাদের করতেই হবে কেন না তাই হচ্ছে সত্যি।"

"মেয়েটি—তোমার এই বান্ধবীটির সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ?"

"বান্ধবী নয়, সঙ্গিনী বলো। আর, কতদিন কী বলছ? আজ সকালের আগে ওকে কোনদিন দেখিইনি আমি।"

"বলো কী? তা, আজ সকালেই বা হঠাৎ কোথায় দেখলে এবং কী ভাবে?"

"যে-ভাবে এ-সব মেয়েদের সঙ্গে বন্দরে নেমে জাহাজী অফিসারদের দেখা হয়।"

"সেটাই বা কী ভাবে এবং কোথায়?"

"'—' হোটেলে মেয়েটি এসে আজ সকালে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।"

"এসে মিলিত হয়েছিল? তা ঐ মিলিত হতে যে এসেছিল সে কি বিশেষ ক'রে তোমার সঙ্গে, না তোমার মত যে কোনো একজনের সঙ্গে?"

"আজ সকালে বিশেষ ক'রে আমার জন্যেই এসেছিল।"

"তোমার সঙ্গেই তাহলে সকালে এ্যাপয়ণ্টমেণ্ট ছিল?"

"হ্যাঁ—"

"অথচ আবার সকালের আগে তুমি ওকে ছাখোওনি বলছো— কোনটা সত্যি?"

"দুটোই। একটি মেয়ের জন্যে আমি এ্যাপয়ণ্টমেণ্ট করি এবং সময়মত মেয়েটি আসলে পর তবে তাকে দেখতে পাই।"

"কিন্তু এ্যাপয়ণ্টমেণ্টটা করো কার সঙ্গে? কী ভাবে?"

"কার সঙ্গে জানি না কেন না এ্যাপয়ণ্টমেণ্ট হয় টেলিফোনে।"

"টেলিফোনে? টেলিফোন নম্বরটা তাহলে জানো?"

"হ্যাঁ—"

"বলো নম্বরটা—"

নীল-চোখ পকেট থেকে একটা পকেট-বুক মত বার করল এবং পাতা উল্টে বলল নম্বরটা।

"এই টেলিফোন নম্বরটাই বা তুমি পেলে কোথায়? কার কাছে?"

"এ-রকম এ্যাপয়ণ্টমেণ্ট করবার জন্যে প্রত্যেক বন্দরের এক একটা টেলিফোন নম্বর তুমি জাহাজের ক্যাপ্টেন-মেটদের কাছে পাবে।"

"তুমি পেয়েছো কার কাছে?"

"একটা ইটালিয়ান জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে?"

"কবে?"

"দু'সপ্তাহ আগে—"

"কোথায়?"

"কলম্বোতে।"

"এ-রকম ক'টা এ্যাপয়ণ্টমেণ্ট তুমি কলকাতায় এই দশ দিনে করেছো?"

"এই নিয়ে দু'বার। বুঝতেই পারছো, হোটেলে বসে থাকা সস্তা সাধারণ মেয়ে নয়—বেশ খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। মেয়েটিকে ত্রিশ ডলার দেওয়া ছাড়াও হোটেলের [illegible] আরো

ত্রিশ ডলার খরচা হয়ে গিয়েছে আমার, আর যত ভালো এবং যত বিচিত্রই হোক মেয়েমানুষের পিছনে রোজ ষাট ডলার খরচ করবার অবস্থা নয় আমার!"

"তা এই ষাট ডলার খরচ সার্থক হয়েছে!"

"প্রতিটি সেন্টের দাম উশুল পেয়েছি, অস্বীকার করব না!"

"তা, বেশ মেয়েটির সঙ্গে যে তোমার আগে আলাপ ছিল না, আজই প্রথম আলাপ সেটা যদি প্রমাণ করতে পারো তাহলে তোমায় আর আটকাবো না!"

"বেশ, বলো কী ক'রে প্রমাণ করবো? কী প্রমাণ তুমি চাও?"

"বলবার আগে মেয়েটির—তোমার সঙ্গিনীর সঙ্গে একটু কথা বলে আসা দরকার আমার!" বলে উইলসনকে সঙ্গে ডেকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গুপ্তভায়া।

আর গেল ত' গেলই। পাঁচ, দশ মিনিট ক'রে দেখতে দেখতে আধ ঘণ্টা কেটে গেল তবু গুপ্তভায়ার আর দেখা নেই। ঘরের মধ্যে উইলসনের রেখে যাওয়া দুই সঙ্গী যন্ত্র-মানুষের মত অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আর চেয়ারে বসে অস্থির নীল-চোখ ও অধীর আমি—চারজনের কারো মুখে কথা নেই। বারবার দরজার দিকে ফিরে এবং হাত তুলে ঘড়ি দেখে ক্রমশ: অধৈর্য হ'তে হ'তে হঠাৎ কী যেন চিন্তা করতে দেখা গেল নীল-চোখকে এবং সে-চিন্তা উইলসনের অনুপস্থিতিতে তার দুই সাকরেদকে ল্যাং মেরে ছুট লাগালে শেষ পর্যন্ত সে গোলকধাঁধার পথ চিনে এই বাড়ি থেকে বেরুতে পারবে কি না হওয়াও খুব বিচিত্র নয়!

বারান্দায় পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল এবং তারপর আবার ঘরে ঢুকতে দেখা গেল গুপ্তভায়াকে—একলা এবং আশ্চর্য গম্ভীর। ঘরে ঢুকে গুপ্তভায়া এসে বসল না চেয়ারে, নীল-চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

"কী হোলো?" বেশ একটু ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করল নীল-চোখ।

"কোকেনের চোরাচালানীদের এক দলে যে সে অনেক দিন ধরে কাজ করছে, তোমার সঙ্গিনী এ-কথা স্বীকার করেছে!"

শুনে ভীত হয়ে উঠল নীল-চোখ, "যীশুর দিব্যি, বিশ্বাস করো, ঐ মেয়েটা যে ঐ-রকম কোনো দলের তা আমি জানতাম, না আজই প্রথম দেখছি ওকে আমি আর সকাল থেকে এতক্ষণ 'কোকেন' নিয়ে কোনো কথা, কোনো আলোচনাও আমার সঙ্গে করেনি!"

"তোমার সঙ্গিনীও তাই বলছে বটে কিন্তু তার কথা কোনো প্রমাণ নয়!"

"অন্য কী প্রমাণ চাও বলো?"

"যে নম্বরে টেলিফোন ক'রে মেয়েটির জন্যে প্রথম এ্যাপয়ন্টমেণ্ট ক'রেছিলে সেই নম্বরে আবার ফোন ক'রো—"

"কিন্তু ক'রে কী বলবো?"

"বলবে মেয়েটিকে তুমি আজ রাতের মতও রাখছো এবং তোমার এক বন্ধুর জন্যে অন্য একটি মেয়েকে তারা পাঠাতে পারবে কি না?"

"কোন ক'রে আরেকটি মেয়ে আনাতে পারলে আমায় ছেড়ে দেবে তো!"

ফোনের দিকে হাত বাড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল নীল-চোখ, "তাহলে বুঝতে পারবে তো যে সত্যিই মেয়েটির সাথে ঐ-ভাবে আমার আলাপ!"

"ফোনটা তো আগে ক'রো—" গম্ভীর হয়ে উত্তর করল গুপ্তভায়া।

শুনে ফোনের দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল নীল-চোখ কিন্তু তার আগেই রিসিভার তুলে নিয়ে নীল-চোখের বলা নম্বরটা আওড়াল গুপ্তভায়া এবং একটু অপেক্ষা ক'রে, বোধ হয় ও প্রান্তের বাজনা শুনে, তাড়াতাড়ি নীল-চোখকে সেটা এগিয়ে দিল আবার। নীল-চোখ রিসিভার কানে লাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল এবং সেই সঙ্গে তার কথা শোনবার জন্য রুদ্ধনিঃশ্বাস হয়ে আমরাও।

"হ্যালো,—" হঠাৎ সাড়া দিয়ে উঠল নীল-চোখ, "হ্যালো, আমি এস এস সিট্‌ল্ জাহাজের লাস হেগেনসন, আজ সকাল থেকে একজন সঙ্গিনীর ব্যবস্থা কাল সন্ধ্যেবেলা তোমাদের ফোন ক'রে করেছিলাম।"

"——"

"হ্যাঁ, সঙ্গিনীটি ঠিকমত এসেছে এবং ঠিকমত ব্যবহার করছে এবং তার বিরুদ্ধে বলবার আমার কিছু তো নেই-ই, উল্টে আজ রাতটাও আমি তাকে রাখতে চাই কিন্তু কোথায় একটু কম হবে—সে রাতের জন্যে পঞ্চাশ ডলার চাইছে—"

"——"

"পঞ্চাশ ডলারই দিতে হবে? বেশ, তাকে যখন চাই তখন পঞ্চাশ ডলারই দেবো কিন্তু সেই সঙ্গে আমার বন্ধুর জন্যে আরেকটি সঙ্গিনীর ব্যবস্থা করতে পারো?"

"——"

"রাত অনেক হয়েছে বুঝলাম এবং তার জন্যে নয় কিছু বেশি দেবো আমরা, একবার দেখো না চেষ্টা ক'রে—"

"——"

"আমার বন্ধুটি বড় নিরাশ হবে!"

"——"

"একশো ডলার? ব্যাপারটা কী? ত্রিশ থেকে নয় পঞ্চাশ ক'রো। তা নয় একেবারে এক শো?"

"——"

"বেশ তাই দেবো। কতক্ষণের মধ্যে আসবে?"

"——"

"বেশ, ঐ হোটেলের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকবে আমার বন্ধু। না-ধরানো সিগারেটটা মুখে ক'রে! থ্যাঙ্ক ইউ! গুড নাইট!"

বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল নীল-চোখ এবং গুপ্তভায়ার দিকে ফিরল দৃপ্তভঙ্গীতে।—"হোটেলের সামনে আধঘণ্টার মধ্যে একটা ট্যাক্সি আসবে এবং না-ধরানো সিগারেট মুখে দিয়ে যে সেখানে সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে তাকে এসে আরোহিণী জিগ্যেস করবে হাওড়া ষ্টেশন কোনদিকে এবং এখন কোনো ট্রেন সেখানে থেকে ছাড়বে কি না। সিগারেট-মুখকে তখন বলতে হবে, তুমি যদি দিল্লী যেতে চাও তাহলে নেই নেমে এসো, দিল্লী যাবার প্লেনের ব্যবস্থা আমি তোমার ক'রে দিচ্ছি। সেই শুনে মেয়েটি নেমে আসবে এবং তুমি বুঝতে পারবে যে, সে ওদের প্রেরিত সঙ্গিনী!"

"হুঁ"—ব্যবস্থাটা দেখছি ভালোই! উত্তর করল গুপ্তভায়া।

"তা হলে তোমার লোক কাউকে সাদা-পোশাকে পাঠিয়ে দাও হোটেলের সামনে সিগারেট মুখে নিয়ে দাঁড়াবার জন্তে। আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সে মেয়েটিকে নিয়ে ফিরে এলেই প্রমাণ হয়ে যাবে আমার কথা।"

"প্রমাণ পাবার জন্তে অপেক্ষা করতে হবে না আমায়"—বলে ফোনের উপর এক দৃষ্টিতে এক রকম ঝুঁকে রইল গুপ্তভায়া এবং থাকতে থাকতেই ঝন ঝন ক'রে ডেকে উঠল ফোন। সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুলে সাড়া দিল গুপ্তভায়া।

"হালো, হ্যাঁ—হ্যাঁ"—

"উইলসন, ভালা ভেঙ্গে ফ্যালো। এতক্ষণ কথা শুনেছো ফোনে, ভিতরে লোক আছে সে তো বুঝতেই পারছো!"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, অপেক্ষা করছি আমি!"

বলে রিসিভার আবার নামিয়ে রাখল গুপ্তভায়া এবং আবার পায়চারি করতে লাগল ঘরময়। নীল চোখ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলবার চেষ্টা করল কয়েকবার, কিন্তু প্রতিবারই তাকে ইশারায় চুপ ক'রে বসতে বলল গুপ্তভায়া এবং চিন্তিত ভাবে ঘুরতে লাগল।

মিনিট কুড়ি বাদে আবার ঝনঝন ক'রে উঠল টেলিফোন, পায়চারি করতে করতে দরজার কাছে চলে গিয়েছিল গুপ্তভায়া ছুটে এসে তুলে নিল রিসিভারটা।

"হ্যালো? হ্যাঁ-হ্যাঁ"—

"—"

"কেউ নেই? কী বলছো উইলসন?

"—"

"অয়্যারলেস ব্যবস্থা রয়েছে ফোনের সঙ্গে? কী ক'রে বুঝলে?"

"—"

"ওয়েভ ধরতে পারবে?"

"—"

"ঠিক দশ মিনিটের মাথায় আমি আবার ফোন করছি। একজন গিয়ে ফোনের পাশে থাকো—"

"—"

"আর ন' মিনিট পঁচিশ সেকেণ্ড পরে। অয়্যারলেসটা কাজ করছে কি না একজন ভাখো—আর অন্ত সকলে গাড়িতে গিয়ে 'ওয়েভ'টা ধরবার চেষ্টা করো—আর ন' মিনিট পনেরো সেকেণ্ড পরে!"

হাত ঘড়ির উপর চোখ রেখে কথা বলতে বলতে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল গুপ্তভায়া, তারপর নীল-চোখের দিকে তাকিয়ে বলল "আবার একটা ফোন ক'রে তবে তোমার ছুটি। আর শুধু ফোন করা নয়—অনেকক্ষণ মানে যতক্ষণ পারো কথা চালিয়ে যেতে হবে—"

"কিন্তু কী বলবো?"

"যা খুশি—শুধু যেন সন্দেহ করতে না পারে! এক কাজ কারো, বলো, তোমার সঙ্গিনীটি রাতের জন্ত আরো পঞ্চাশ ডলার নিয়ে রাতে ফিরবে না খবরটা তার বাড়িতে দেবার জন্তে ফোন করার নাম ক'রে তোমাকে বসিয়ে রেখে সেই যে গিয়েছে আর তার ফেরবার নাম নেই। মতলব কী তার এবং এদের? মেয়েটি যদি আর দশ মিনিটের মধ্যে না ফেরে তাহলে, না, পুলিশে তুমি এখন যাবে না, তবে পৃথিবীর যেখানে যত জাহাজের লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হবে তাদের প্রত্যেককে কলকাতার ঐ জোচ্চুরির কথা তুমি বলে দেবে এবং পরের পোর্টে পৌঁছে উড়ো চিঠি দেবে পণ্ডিত নেহরুকে তার দেশের জোচ্চুরির কথা জানিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি।"

মনে হ'ল পরিস্থিতিটা ভালো করেই বুঝতে পেরেছে নীল-চোখ, চেয়ারে সোজা হয়ে সে বসল এবং বলল, "দাও, নম্বরটা ডেকে দাও—"

"দাঁড়াও, এখনো চার মিনিট বত্রিশ সেকেণ্ড বাকি!"

কিন্তু আমার জাহাজ ছাড়তে যে আর চার ঘণ্টা বত্রিশ মিনিটও নেই। পাইলট এতক্ষণ এসে গিয়েছে এবং জাহাজময় খোঁজ হচ্ছে আমার!"

গুপ্তভায়া কোনো উত্তর করল না সে-কথার, নির্বিকার ভাবে শুধু তাকিয়ে রইল নিজের হাতের ঘড়ির দিকে এবং ঠিক সময়ে ফোন তুলে নম্বর বলে এবং লাইন পেয়ে রিসিভারটা তুলে দিল নীল-চোখের হাতে এবং তারপর ক' সেকেণ্ড যেতে না যেতেই নীল-চোখ শুরু করল কথা বলতে। কথাগুলি শুনে, সেই কথোপকথনের একদিকের বাক্যগুলি শুনতে শুনতে রীতিমত শ্রদ্ধা হতে লাগল নীল-চোখের উপর এবং মনে হতে লাগল জাহাজে কাজ না নিয়ে সিনেমা-থিয়েটারে কাজ নিতে পারত সে এবং নিলে অন্তত 'মেট'-এর চেয়ে বেশি উন্নতি করত। [ক্রমশঃ।

মরণ, হে মোর মরণ

শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়

"জীবনের পর মৃত্যু"—এই দৃশ্য উল্টো ভাবে দেখিলে কেমন হয়? "জন্মিলে মরিতে হ'বে", এই ভাবে দেখাটায় আমরা অভ্যস্ত। বাহ্যতঃ মনে হয় বুঝি মৃত্যুতে আত্মার অদৃশ্য সংযোগ ছিন্ন হয়, কিন্তু মৃত্যুতেই আত্মার অনন্ত আধ্যাত্মিকতার পূর্ণবিকাশের সুযোগ হয়। মৃত্যুর বিরাট আলয়ে জগতের শক্তিগুলি প্রকাশমান। অনন্তের মধ্যে জীবন ও মৃত্যু দুইটি যমজের মত প্রকাশমান। মৃত্যু কি তাহা জানিলে তবে জীবনের প্রারম্ভ জানা যায়। কেহ কেহ হয়তো বলিবেন যে, মৃত্যুর পরপারে জীবনও নাই, মরণও নাই, কিম্বা সেখানকার অস্তিত্বের সুনিশ্চিত বিবরণ নাই। মুনি-ঋষি সাধকেরা অনেক কিছু বলিয়াছেন তাহাদের মধ্যে মতভেদও আছে—এইটুকু বুঝা যায় যে সকলকার পক্ষে পরকালের দৃশ্য একরূপ নহে। কেহ সাযুজ্য মুক্তি পান, কেহ বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করেন (গীতা ৯।২০), আবার কনান ডয়েলের বিদেহী আত্মার বর্ণিমা মতে যমদূতেরা মৃত্যুর পর জীবাত্মাকে বিচারের জন্য লইয়া যায় (vide "The great mistery or life beyond death" as dictated by the spirit of Sir Aurther Canan Doyle —published by the New Book Company, Kitab Mohal, Hornby Road, Bombay) এই সব বিবেচনা করিয়া বরং মরণের সেই বিমোহিত বা মুগ্ধভাব যাহাতে নবজীবন আনে, তাহার কথা বলাই ভাল।

প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিলেও মৃত্যু অস্বাভাবিক ভাবে বা নিকটতমের কাছ হইতে কাহাকেও অকালে বিচ্ছিন্ন করিতে আসিলে অনাদৃত হয়। মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা না বুঝিলে স্বাভাবিক মৃত্যুতেও লোকের আতঙ্ক আসে—মনে হয় যেন মানব জীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা নাই। যখন পরলোকে নিকটতম বা প্রিয়তম কেহ অপেক্ষা করিতেছে বলিয়া সুনিশ্চিতে জানা থাকে না, যখন মৃত্যুতে কোথায় যাইতে হইবে বলিয়া জানা থাকে না, তখন কি মৃত্যু বিষাদ বা হতাশার কারণ নহে কিম্বা তখন কি মৃত্যুকে অনিশ্চতের পথ বলিয়া মনে হয় না? অপরপক্ষে মৃত্যুতে কোথায় যাইতে হইবে তাহা জানা থাকিলে মৃত্যুযাত্রীর পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। মরিতে হইবে অথচ যদি না জানা থাকে যে কোথায় যাইতে হইবে, কোথায় কি ঘটিবে, কিম্বা মৃত্যুই কি আমাদের অনুভূতি ও সংজ্ঞার শেষ, তাহা হইলে এই সব চিন্তাতে মৃত্যুর সময় শান্তির ব্যাঘাত ঘটে। আমাদের এই জীবন শেষ হইবার পূর্ব্বে এই অজ্ঞানতার তিরোভাব হইলে তবে শান্তি ও নির্ভয়ে মরিতে পারি।

জ্ঞানেচ্ছুদের পক্ষে মৃত্যুতে কি হয়, আমাদের যেসব আপনজন ও প্রিয়জনেরা আমাদের আগে গিয়াছে তাহারা কোথায়, এই সব জানা খুবই সান্ত্বনাদায়ক ও শান্তির সহায়ক। "জন্মিলে মরিতে হইবে" ইহাই প্রকৃতির নীতি। সঠিক জ্ঞান না থাকিলে মৃত্যুতে অনিশ্চিতে ঝাঁপ দিবার ভাব আসে। এই অনিশ্চিত বা অন্ধকারের বদলে জ্ঞানালোক কতই না আশাপ্রদ, কতই না শান্তিপ্রদ। মৃত্যুর পর যে পথ দিয়া অনন্তে বা বিশাল-লোকে যাইতে হয়, সেই পথ যখন জ্ঞান ও বুদ্ধির জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় তখন আর অন্ধকারে ও অজ্ঞানে ঝাঁপ দিবার ভাব আসে না। চেষ্টা করিলে মৃত্যুর পরপারে আলোক সম্বন্ধে অনেকেই জানিতে পারেন।

যদিও ধর্ম্মযাজক ও পুরোহিতেরা বিলাপকারীদের শোকে শান্তি দিবার দাবী রাখেন কিন্তু সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ কথা যাহারা জানেন না তাহাদের কথায় বিশেষ লাভ হয় না। নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) অনেক ধর্ম্মযাজক ও পুরোহিতদের জিজ্ঞাসা করেন যে, ভগবান যদি সত্য সত্যই থাকেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি না—কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ছাড়া আর কেহই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখার কথা বলিতে পারেন নাই।

এক ধর্ম্মের লক্ষ লক্ষ লোক অন্য ধর্ম্মের দাবী অগ্রাহ্য করেন, লক্ষ লক্ষ লোক আত্মাতত্ত্ববাদীদের দাবী অগ্রাহ্য করেন; কিন্তু এই মর্ত্ত-জগতে মৃত্যুর পর কি হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে আত্মা-তত্ত্ববিদের সাহায্যের দরকার। "আত্মা অবিনশ্বর" ইহা বিশ্বাস করা এক কিন্তু প্রমাণ করা আলাদা। কোন বিষয়ে কেহ অবিশ্বাস করিলে, সে বিষয়ে যে সত্য থাকে তাহা নষ্ট হয় না। পার্থিব মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বস্তসূত্রে বহুভাবে প্রমাণিত হইয়াছে—বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বহু প্রকারের, হাতুড়ি ঠোকা প্রমাণ ছাড়া অন্য প্রকার প্রমাণও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি এক আপন জনের বিদেহী আত্মার নিকট হইতে আমার তৎকালীন ২০ বৎসরের দুরন্ত হাঁপানি রোগের (যাহা বিখ্যাত ডাক্তারেরা ভাল করিতে পারে নাই) ঔষধ পাই, তাহাতে নিজে তো সুস্থ হই, অধিকন্তু অন্য হাঁপানি রুগীকে সুস্থ করিতেছি—ইহা কি এই পৃথিবীর মৃত্যুর পর পরলোকে আত্মা থাকে, তাহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বলিয়া ধরা হইবে না? পশ্চাদ্‌পদ হইলে চলিবে না, সত্য দেখিতে হইলে সাহসের সহিত দেখিতে হইবে। সুবৃহৎ "জীবন বিজ্ঞান" পুস্তকে [Science of Life by H. G. Wells, Julian Huxley & G. P. Wells] বিদেহী আত্মার কার্য্যকলাপ ও দৃশ্যাবলী সম্বন্ধে এই মন্তব্য আছে যে, পরলোকগত আত্মার দ্বারা যেসব দৃশ্য দেখান হয়, তাহা অস্বীকার করা

যায় না, তবে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের যতটা স্বাধীনতা আছে ততটা উহাতে নাই। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখাইবার কর্ত্তা বৈজ্ঞানিক, কিন্তু আত্মিক দৃশ্য দেখাইবার কর্ত্তা আত্মা—এখানে বৈজ্ঞানিককে আত্মার শরণ লইতে হয়, এই জন্ম প্রভেদ। বেদ, গীতা, বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তকে কি আত্মার অবিনশ্বরতা ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বলে না? জ্ঞানযুক্তিযুক্ত লোকেদের বুঝান যায়, কিন্তু যাহারা বুঝিবেন না বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প তাহারা বুঝিতে চাহিবেন না।

মৃতেরা সত্য সত্য মরে নাই আর তাহাদের নিকট হইতে সান্ত্বনার বাক্য বা উপদেশ পাইলে আমরা কি সান্ত্বনা পাই না? পরলোক তত্ত্ববাদীরা এইটাই করে—তাহারা অনুকম্পার দ্বার খুলিয়া দেয়, তাহারা অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যায়। ক্রীষ্টানদের কথায়, "তাহারাই ভাগ্যবান যাহারা মৃতের জন্ম শোক করেন—কারণ পবিত্রাত্মা (Holy Ghost) তাহাদের সান্ত্বনা দেন।" ইহার দ্বারা কি "ঈশ্বর প্রেমময়" এই ভাবটি আমাদের মনে জাগ্রত হয় না?

আধ্যাত্মিকতা জড়বাদ হইতে পৃথক। ঈশ্বরই পরমাত্মা আর যাহারা ঈশ্বরবাদী তাহাদের মতে এই জগৎ আত্মার দ্বারা সৃষ্ট—আত্মাই সব। বেদান্ত আমাদের বলে যে ইহাই সৃষ্টির উপযুক্ত কারণ।

বিজ্ঞান ও দার্শনিক বিচারের দরকার নাই। মৃত্যুর কুরূপ অপরিহার্য্য। যাহারা শোক করিবার জন্ম রহিয়া যায় তাহাদের পক্ষে কি পরলোক তত্ত্ব মধুর প্রতিদান আনে না? যীশুখৃষ্ট তাঁহার ভক্তদের আধ্যাত্মিক উন্নতি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। যাহাদের আমরা "মৃত" বলি, তাহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা, রোগ হইতে মুক্তিদান, পাপীপঙ্গু-জীবনের সংশোধনের সুযোগ, পরিপুষ্ট হইবার উপায়, লুক্কাইত বিশাল পরলোক (স্বর্গলোকং বিশাল—গীতা ৯।২১) বা অধ্যাত্মলোকের সৌন্দর্য্য দেখিবার ও প্রবেশ করিবার সুযোগ করিবার সুযোগ ইত্যাদি—এইসব কি অসাধারণ সুযোগ ও সুবিধা নহে?

তুমি একাই হও বা অন্যের সাথে হও, জীবনের চূড়ান্ত সীমানায় চল। পরলোকতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে তফাৎ কম—আধ্যাত্মিকতাই শিক্ষা দেয় যে পরমেশ্বরের অনুধ্যান ও সংযোগই জীবনের চরম লক্ষ্য। নীতি বা উপদেশ বা ধর্ম্মমতের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা, পবিত্র আত্মার প্রেম ও জ্ঞান, পরিতাপের বা প্রার্থনা বা সাধুতার প্রয়োজনীয়তা বা সুবিমল ও হিতকর জীবনকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। খানিকটা পরলোকতত্ত্বের প্রয়োজন আছে কিন্তু উক্ত তত্ত্ব যদি অপরিণত হয়, যদি উচ্চ আত্মার সঙ্গে সংলাপ না হয়, তাহা হইলে তাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘ্ন হয়। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন যে, কিছু অগ্রসর হইবার পর কেবলমাত্র নিজের আত্মাতেই উন্নতি করিতে হয়।

যখন আমরা বুঝি যে মৃত্যু সুনিশ্চিত ও ইহাই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায়, মৃত্যুই লোকের সাফল্য ও অগ্রগতির স্বাভাবিক বাধ্যতামূলক উপায়, মৃত্যুই নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে যাইবার উপায়, তখনই মৃত্যুর ভয় চলিয়া যায়, তখনই মৃত্যুর কদর্য্যতার পরিবর্ত্তে সুন্দর ক্রমোন্নতি ভাব (evolution) বুঝা যায়। অজ্ঞানতায় মৃত্যু বিবর্ণ ও তিক্ত কিন্তু মানুষের মনে জ্ঞানদীপ জ্বলিলে ইহার সুবিশাল দ্বার খুলিয়া যায়।

মৃত্যু ও জীবনের স্বর্ণশিকল প্রেম, পবিত্রতা ও সেবার দ্বারা তৈয়ারী। সকল জাঁকজমকের কিম্বা সুখ দুঃখের পার্থক্য মৃত্যুর স্বাতন্ত্র্যেই নষ্ট হয়।

পৃথিবীতে অবারিত ভাবে খণ্ড করা ও যুক্ত করা চলিতেছে—নাম ও রূপের পরিবর্ত্তন হইতেছে। বৈজ্ঞানিক মতে এই দৃশ্য-জগতেরও ধ্বংস আছে—অবশ্য তৎপরে পুনরায় নূতন আকারে, নূতন ভাবে, নূতন সৌন্দর্য্যে নূতন জগতের আবির্ভাব হইবে। ভগবান জগৎকে ক্রমোন্নতি মূলক করিয়াছেন, তাই মৃত্যুর নবজীবন পূর্ব্বজীবন অপেক্ষা সুন্দরই হইবে, উন্নতই হইবে [অবশ্য নিম্নগতির যে দৃষ্টান্ত নাই তাহা নহে কিন্তু উহা অস্বাভাবিকও খুবই কম]। তাই ঠিক ভাবে জানিলে মৃত্যুর রূপ কদাকার নহে, ইহা আনন্দদায়ক ও উন্নতিমূলক। তাই কবির কথায় বলিতে চাই:—

"জন্ম মৃত্যু দোঁহে লয়ে জীবনের খেলা
যেমন চলার অঙ্গ, পা তোলা পা ফেলা।।"

এ কী সমারোহ

রমেন চৌধুরী

এ কী সমারোহ এ ভুবনে,
অসীম আকাশে বাতাসে বাতাসে
মাটির গোপন মনে!
দুচোখ ভরিয়া দেখি তাই
শুরু নাই বুঝি সারা নাই
তারি ঢেউ এসে দোলা দিলো ওই
কুঁড়ি-ধরা ফুল বনে।
এখনি আসিবে অলি
আনন্দে চঞ্চলি;
মধুঝরা কলগানে তার
শিহরিবে কলি বার বার
সহসা টুটিবে যতেক বাঁধন
নয়ন-উন্মোচনে।

পাথেয়

চন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়

কোন্ সে মায়ায় প্রিয় বেঁধেছ আমারে।
ভুলিতে পারি না তাই আসি বারে বারে।।
কামনার ধূপ মোর, পুড়ে হয় ছাই,
তবুও তোমায় আমি চাই আরো চাই।
শুভ্র শুচিতার মাঝে ফিরে ঘরে ঘরে,
পূর্ণ হয় না হিয়া ক্ষণিকেরও তরে।
পঞ্চ দীপে পুজারীর আরতির মাঝে,—
যুগে যুগে হিয়া মোর বাঁধা পড়ে আছে।।
(যবে) ক্ষণিকের তরে মোর যৌবন-সম্ভার,
তোমার চরণে দেব! দেই উপহার,'
আমার রূপের মোহে হাসি ও অধরে
পথের পাথেয় রূপে নিই বুক ভরে।।
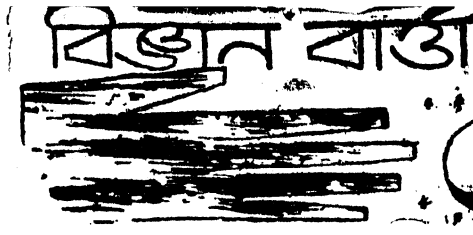
লালা-কাহিনী

লালা নামক রসটির সঙ্গে আমাদের সকলেরই আশৈশব পরিচয়। লোভনীয় খাবার সম্মুখে এলে আমাদের লালাস্রাব বাধা মানে না। আবার কদর্য দৃশ্য দেখলে, বা জুগুপ্সাজনক গন্ধ শুঁকলে আমার ধারায় লালাক্ষরণ হতে থাকে। কোনও তিক্তদ্রব্য, ঝাল, তেঁতুল অথবা কোন অ্যাসিড মুখে পড়লেও প্রচুর লালা নিঃসৃত হতে থাকে। এমনি কত বিচিত্র অবস্থাতেই যে আমাদের লালাক্ষরণ হয়ে থাকে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ এই অতি-পরিচিত দেহ-রসটির রাসায়নিক প্রকৃতি এবং শারীরবৃত্তীয় (physiological) ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আমরা অনেকেই অজ্ঞ। বর্তমান প্রবন্ধে লালা-বিষয়ক নানা অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবো।

লালা লালাগ্রন্থির ক্ষরিতরস। লালাগ্রন্থিগুলি বহির্নিঃস্রাবীগ্রন্থির (exocrine glands) পর্যায়ভুক্ত। মানবদেহে তিন জোড়া বৃহৎ লালাগ্রন্থি আছে—প্যারটিড (parotid) সাবম্যাক্সিলারী (submaxilary) এবং সাবলিঙ্গুয়াল (sublingual)। এতদ্ভিন্ন, ওষ্ঠ ও অধরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, মুখগহ্বরে এবং জিহ্বাতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালাগ্রন্থি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে। লালাগ্রন্থিগুলি মুখগহ্বরে অথবা মুখগহ্বরের আশে পাশে অবস্থিত।

লালাগ্রন্থিগুলির শারীর-স্থানিক অবস্থান (anatomical position) এবং আণুবীক্ষণিক গঠনের (microscopic structure) পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবরণ বর্তমান প্রবন্ধে অনাবশ্যক। তবে সাধারণ ভাবে বলে রাখা ভালো যে, প্রত্যেক লালাগ্রন্থি অসংখ্য ক্ষরণশীল (secretory) কোষের সমষ্টি। এই ক্ষরণকারী কোষগুলি গ্রন্থির মধ্যে বেশ সুসমঞ্জস ভাবে সাজানো থাকে। একসারি কোষ পাশাপাশি লগ্ন হ'য়ে গোলাকার বা ডিম্বাকার গহ্বরকে বেষ্টন ক'রে এক একটি গ্রন্থি-একক (glandunit) সৃষ্টি করে। এই একককে বলা হয় "অ্যালভিওলাস" (alveolus)। প্রতিটি অ্যালভিওলাস থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালিকা (ductules) বেরিয়ে এসে একত্র মিলিত হয়ে একটি বৃহৎ নালী (duct) তৈরী করে। সমস্ত লালানালীই অবশেষে মুখগহ্বরে এসে পড়ছে। প্যারটিডগ্রন্থির প্রধান নালী একটি ; তার নাম স্টেনসনের নালী (stenson's duct)। সাবম্যাক্সিলারীগ্রন্থির মূল নালীকে বলা হয় "হোয়ার্টনের নালী" (wharton's duct)। কিন্তু সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থির নালী অসংখ্য এদের বলা হয় "রিভিনাসে"র নালী। লিপিওডল (lipiodol) নামক একপ্রকার "রঞ্জনরশ্মি-অনচ্ছ" (radio-opaque) পদার্থ লালানালীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে রঞ্জন-চিত্র (radiograph) গ্রহণ করলে নালীগুলির আকৃতি প্রকৃতি এবং গঠন সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য জানা যায়। বিশেষতঃ, প্যারটিডগ্রন্থি বা নালীর বিশেষ বিশেষ রোগে এই রঞ্জনচিত্রের প্রয়োজন হয়ে থাকে। অবশ্য সে আলোচনা এখানে অপরিহার্য নয়।

ক্ষরিতরসের প্রকৃতিগত তারতম্য বিচার ক'রে লালাগ্রন্থিগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—

(ক) জলক্ষরী (serous) (খ) মিউসিনক্ষরী (mucous) (গ) মিশ্র (mixed) জলক্ষরী লালাগ্রন্থির ক্ষরিত রস জলবৎ তরল ; খুব কম মিউসিন থাকে বলে তত আঠালো হয় না। জলীয় লালাতে জৈবপদার্থ এবং জারকের পরিমাণও অকিঞ্চিৎকর। প্যারটিডগ্রন্থি এই শ্রেণীতে পড়ে। মিউসিনক্ষরী গ্রন্থির লালা ঘন, আঠালো এবং অনচ্ছ। মিউসিন (mucin) নামক একপ্রকার প্রোটিন এতে খুব বেশি পরিমাণে থাকে ; সেজন্য এই লালা আঠার মত চটচটে হয়। জলের ভাগ এতে কম থাকে। পক্ষান্তরে, জৈবপদার্থ এবং বিভিন্ন জারক পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। সাবলিঙ্গুয়াল এই শ্রেণীর গ্রন্থি। সাবম্যাক্সিলারীগ্রন্থিকে মিশ্র বলা হয় কারণ, এই গ্রন্থির মধ্যে জলক্ষরী এবং মিউসিনক্ষরী উভয় প্রকার কোষই বিদ্যমান। এই গ্রন্থির নিঃসৃত লালার গাঢ়তা প্যারটিড এবং সাবম্যাক্সিলারী গ্রন্থির রসের গাঢ়তার মাঝামাঝি। ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রন্থিগুলিকেও অনুরূপভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। আমরা যাকে লালা বলি তা এই যাবতীয় লালাগ্রন্থির ক্ষরিত রসের সংমিশ্রিত রূপ। মিশ্র লালা বর্ণহীন, ঈষৎ ঘোলাটে এবং চট্‌চটে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, মিশ্র লালাতে শতকরা ৯৯ ভাগ জল, অবশিষ্ট ১ ভাগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল মিউসিন নামক একপ্রকার প্রোটিন, এবং টায়ালিন্ নামক শর্করাধ্বংসী জারক। এতদ্ভিন্ন লালাতে পটাশিয়াম থাইওসাইয়ানেট্, বিবিধ অজৈব লবণ, গ্যাস, ভিটামিন-সি ইত্যাদিও রয়েছে। আমাদের দেহে দৈনিক ১০০০-১৫০০ মিলিলিটার লালা নিঃসৃত হয়। গরু, ঘোড়া প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণী দিনে প্রায় ৬০ লিটার লালা ক্ষরণ করে থাকে। খাদ্যদ্রব্যের প্রকৃতির ওপর লালাক্ষরণের পরিমাণ ও প্রকৃতি বহুলাংশে নির্ভর করে। মাংস প্রভৃতি মুখে দিলে স্বল্প পরিমাণ আঠালো লালা ক্ষরিত হয় প্রধানত সাবম্যাক্সিলারী এবং সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি থেকে এবং তাতে জৈব পদার্থের পরিমাণই বেশী। পক্ষান্তরে শুকনো বিস্কুট অথবা অবাঞ্ছিত কোনো বস্তু মুখে দিলে প্রচুর তরল লালা নির্গত হয়।

লালার কার্যকলাপ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ না হলেও বহুমুখী এবং বহু বিচিত্র। প্রথমতঃ লালা খাদ্যবস্তুকে ভিজিয়ে নরম এবং পিচ্ছিল করে। ফলে চর্বিত খাদ্যপিণ্ড সহজেই মুখ গহ্বর থেকে অন্ননালীতে প্রবেশ করতে পারে। কঠিন বস্তুকে তরলীভূত ক'রে লালা স্বাদবোধে সহায়তা করে, কারণ খাদ্যবস্তু তরলাকারেই স্বাদকোরকগুলিকে

যথাযথভাবে উত্তেজিত করতে পারে। অধিকন্তু, অত্যুত্তপ্ত খাদ্যকে শীতল ক'রে এবং তীক্ষ্ণবীর্য বস্তুর তেজ কমিয়ে লালা মুখগহ্বর, ওষ্ঠাধর এবং জিহ্বার কোমল এবং স্পর্শকাতর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীকে প্রদাহজাত ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। অপিচ, জিহ্বাকে সর্বদা রসসিক্ত ও মসৃণ রেখে লালা কথা বলার সাহায্য করে। অনেক বক্তা বহুক্ষণ বক্তৃতা দেওয়ার পর মাঝে মাঝে কয়েক ঢোক জলপান করেন জিভটাকে একটু ভিজিয়ে নেবার জন্য। বহুক্ষণ অনর্গল কথা বলার ফলে লালা শুকিয়ে গিয়ে কথাবলার অসুবিধা সৃষ্টি করে। অত্যধিক উত্তেজনা হেতুও লালাক্ষরণ সাময়িকভাবে বন্ধ হতে পারে। এবং তজ্জন্য উত্তেজনার সময় আমাদের কথা বলতে অসুবিধা হয়।

লালা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের আংশিক পরিপাকে সহায়তা করে। একমুঠো চিড়ে কিছুক্ষণ চিবুলে মিষ্টি মিষ্টি লাগে। কারণ, চিড়ের মধ্যে শ্বেতসার উপাদান থাকে ; সেই শ্বেতসার লালার টায়ালিন (ptyalin) নামক শর্করাধ্বংসী জারকের প্রভাবে আর্দ্র বিশ্লেষিত (hydrolysed) হয়ে মলটোজ (maltose) নামক ডাইস্যাকারাইডে (disaccharide) পরিণত হয়। এই মলটোজ বা যবশর্করা ঈষৎ মিষ্টি। অধিকন্তু লালাতে মলটেজ (maltase) নামে একটি মলটোজ-বিশ্লেষী এন্‌জাইম আছে। এর প্রভাবে সামান্য মলটোজ গ্লুকোজ বা দ্রাক্ষাশর্করায় রূপান্তরিত হয়। সেজন্যই মিষ্ট বোধ হয়। টায়ালিনের প্রভাবে শ্বেতসার পদার্থ নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে মলটোজে পরিণত হয়। এই জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সমস্ত পর্যায়গুলি এখনও নিঃসংশয়িতরূপে জানা যায়নি। তবে প্রধান প্রধান স্তরগুলো নিম্নরূপ : প্রথমত অদ্রাব্য (insoluble) শ্বেতসার দ্রবণীয় শ্বেতসারে পরিণত হয়। অদ্রাব্য শ্বেতসারের মত দ্রবণীয় শ্বেতসারও আয়োডিনে নীল রঙ দেয়। দ্রবণীয় শ্বেতসার অতঃপর আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে ডেক্সট্রিনে (dextrin) পরিবর্তিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এই ডেক্সট্রিন আয়োডিনে লালচে রঙ দেয়। তাই একে "ইরিথোডেক্সট্রিন" (erythrodextrin) বা রক্তিম-ডেক্সট্রিন বলা হয়। আরও কিছুক্ষণ রাসায়নিক বিক্রিয়া (reaction) চললে ঐ ডেক্সট্রিন আর আয়োডিনে কোন রঙ দেয় না। এই ডেক্সট্রিনকে বলা হয় "অ্যাক্রডেক্সট্রিন" (achroodextrin) বা বর্ণহীন ডেক্সট্রিন্। বর্ণহীন ডেক্সট্রিন অবশেষে মলটোজ এবং স্থায়ী ডেক্সট্রিনে (stable dextrin) পরিণত হয়। মলটোজ এবং স্থায়ী ডেক্সট্রিনের আনুপাতিক পরিমাণ যথাক্রমে ৮০ ভাগ এবং ২০ ভাগ। স্থায়ী ডেক্সট্রিনের ওপর টায়ালিনের কোন প্রভাব নেই। টায়ালিনের ক্রিয়াপ্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, এই জারক বা এনজাইমটি (Enzyme) এক মাত্র সিদ্ধকরা শ্বেতসারের ওপরই ক্রিয়া করতে পারে। কারণ, শ্বেতসারের কণিকাগুলো সেলুলোজ (Cellulose) নামক এক প্রকার জটিল কারবোহাইড্রেটের (Carbohydrate) আবরণে ঘেরাও করা থাকে। কিন্তু লালাতে সেলুলোজ-বিধ্বংসী কোন বিশেষ জারক নেই। তজ্জন্য সেলুলোজ ঘেরা শ্বেতসারের ওপর টায়ালিন ক্রিয়াশীল হতে পারে না। আর্দ্র উত্তাপে সেলুলোজের ঘেরাটোপ ভেঙে গেলে টায়ালিন অনায়াসে শ্বেতসারের ওপর ক্রিয়া করতে পারে। টায়ালিনের শর্করা-ধ্বংসের ক্ষমতা অগ্ন্যাশয়-রসের (Pancreatic Juice) অ্যামাইলেজের (Amylase) চেয়ে অনেক কম। কারণ, অগ্ন্যাশয়ী অ্যামাইলেজ সিদ্ধ অসিদ্ধ উভয় প্রকার শ্বেতসারকে বিশ্লিষ্ট করতে পারে। এবং টায়ালিনের চেয়ে অনেক কম সময়ে। শ্বেতসারের ওপর টায়ালিনের ক্রিয়াকে সংক্ষেপে নিম্নরূপ লেখা যায় :—
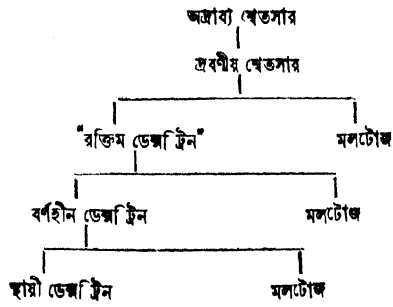
পরীক্ষায় দেখা গেছে, সামান্য পরিমাণ ক্লোরাইড আয়ন (Chloride ion) টায়ালিনের ক্রিয়ার গতি ত্বরিত করে। কথঞ্চিৎ অম্লতাও টায়ালিনের ক্রিয়া-সহায়ক, অবশ্য অম্লাধিক্য টায়ালিনকে অবদমিত করে।

আহারের পরে দাঁতের ফাঁকে, জিভের তলায় মুখগহ্বরের আনাচে-কানাচে খাদ্যের টুকরো জমে থাকে। সেগুলো নানা বায়ুচর ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা সন্ধিত (Fermented) হয়ে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। বহু প্রকার বীজাণু ঐ শটিত (Putrefied) খাদ্যের মধ্যে আস্তানা রচনা করে। কিন্তু লালা স্রোত অহরহ সেই নোংরা খাদ্যের ভগ্নাংশ ধৌত করে মুখগহ্বরকে দুর্গন্ধ এবং জীবাণু থেকে মুক্ত রাখে এ জন্য শারীরবিদ্‌গণ লালাকে "প্রকৃতিদত্ত মুখ-প্রক্ষালক" বলে থাকেন। জ্বরের সময় লালাক্ষরণ সুষ্ঠুভাবে হয় না বলে মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়।

কুকুর প্রভৃতি জন্তুদের দেহে যেখানে ঘর্মক্ষরণের দ্বারা তাপ হ্রাসের সুব্যবস্থা নেই, লালার মাধ্যমে প্রচুর তাপক্ষয় হয় এবং এই ভাবে ঐ সকল প্রাণীর দেহের তাপসাম্য রক্ষিত হয়। লালার কীর্তি কথার এখানেই শেষ নয়। বহু শারীরবৃত্তবিদের মতে, লালাতে "লাইসোজাইম" (Lysozyme) নামে একটি ব্যাকটিরিয়া-বিধ্বংসী এন্‌জাইম (Enzyme) বা 'উৎসেচক' (পরিভাষা :—কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়) আছে। এই রাসায়নিক পদার্থটি ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস, ষ্টেফাইলোকক্কাস্, গণোকক্কাস প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জীবাণুকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। জ্বর অথবা অন্য কোনো ব্যাধিতে লালাক্ষরণ বন্ধ হ'লে মুখে নানা বিধ জীবাণু সংক্রমণ ঘটে থাকে।

অধিকন্তু লালার মাধ্যমে ইউরিয়া, থায়োসাইয়ানেট প্রভৃতি বর্জ্য পদার্থ (Waste Products), পারদ, সীসা, বিসমার প্রভৃতি গুরু ধাতু (Heavy metals) বহুল পরিমাণে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। বিবিধ বর্জ্য পদার্থ নিঃসরণ ক'রে রক্তের রাসায়নিক স্থিতিসাম্য রক্ষা ক'রে। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ আবহাওয়ার সুস্থিতি (Constancy of Internal Environment) রক্ষায় লালারও কিঞ্চিৎ অবদান আছে।

থাইয়োসায়ানেট নিঃসরণের গুরুত্বও শরীরের পক্ষে কিছু কম নয়। এই থায়োসায়ানেট সৃষ্ট হয় সায়ানাইড জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ থেকে সালফার-সংযোগে। এই সায়ানাইড দেহে সৃষ্ট হয় বিভিন্ন জাতীয় প্রোটিনের রাসায়নিক বিশ্লেষের ফলস্বরূপ। সায়ানাইড দেহের পক্ষে ক্ষতিকর কিন্তু থায়োসায়ানেট ক্ষতিকর নয়। অর্থাৎ গন্ধকের সহিত

মিলনের ফলে সায়ানাইডের বিষক্রিয়া বিনষ্ট হয়েছে। এজন্য সালফার এবং সায়ানাইডের রাসায়নিক মিলনে থায়োসায়ানেটের উৎপত্তিকে "রক্ষণমূলক সংশ্লেষ" (Protective Synthesis)-এর অন্যতম উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। যক্ষ্মা, পলিওমাইলোইটিস, মাম্পস্, জলাতঙ্ক প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সংক্রামক রোগের জীবাণু লালায় নির্গত হয়। সুতরাং, যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করলে সংক্রামিত ব্যক্তির লালা রোগ বিস্তার ঘটাতে পারে। লালার এই জীবাণু-সঙ্কুল ক্ষতিকারক রূপকেই আমরা 'থুথু' এই ঘৃণ্যব্যঞ্জক নামে অভিহিত করে থাকি। এবং যেখানে সেখানে থুথু ফেলা এইজন্যই অনুচিত। নিজের লালাও কদাচ গলাধঃকরণ করা উচিত নয়। কারণ, লালান্তর্গত নানা জীবাণু দেহের আন্তরযন্ত্র সমূহকে আক্রমণ করতে পারে। প্যারটিডগ্রন্থির প্রদাহে অধিকাংশই পুংজননগ্রন্থির প্রদাহ দেখা যায়। বীর্যবাহী নালীও (Vas) সংক্রমিত হতে পারে। স্ত্রীদেহে স্তনপ্রদাহ এবং ডিম্বাশয়-প্রদাহ প্রায়শই দেখা যায়। বিভিন্ন সহায়ক যৌন-অঙ্গও আক্রান্ত হতে পারে।

জটিল স্নায়বিক প্রক্রিয়ায় লালাক্ষরণ ঘটে থাকে। লালাক্ষরণ মূলত স্বতঃক্রিয় (Autonomic) স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ আমাদের ইচ্ছার অধীন নয়। এই তন্ত্রের দুটি অংশ—

(ক) স্বতন্ত্র (Sympathetic) (খ) অভিস্বতন্ত্র (Parasympathetic) স্বতন্ত্র নার্ভগুলি লালাগ্রন্থির রক্তনালীর সঙ্কোচন ঘটায় এবং লালার বিবিধ উপাদান সংশ্লেষণে সহায়তা করে। অভিস্বতন্ত্র নার্ভগুলি "ক্ষরণোদ্দীপক" (Secretory) অর্থাৎ এদের উত্তেজনা লালাগ্রন্থিকে লালাস্রাবে উদ্দীপিত করে। লালাক্ষরণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য মস্তিষ্কের মেডালা বা সুষুম্না শীর্ষক অংশে একটি 'লালাকেন্দ্র' আছে। লালাস্রাব ঘটে প্রতীবর্ত প্রক্রিয়ায় (Reflex)। এই প্রতিবর্ত সাপেক্ষ (Conditioned) এবং অনপেক্ষ (Unconditioned) দু প্রকারই হতে পারে। কোনো কুকুরের মুখে এক টুকরো মাংস ফেলে দিলে প্রচুর লালাক্ষরণ হয়। এটাকে বলা হয় অনপেক্ষ প্রতিবর্ত কারণ, এটা কোনো বিশেষ অবস্থার এবং পরিবেশের উপর নির্ভরশীল নয়।

খাদ্য প্রকৃতপক্ষে গলাধঃকরণ না করলেও খাদ্য-দর্শন, খাদ্যের কথা শ্রবণ অথবা খাদ্যের ঘ্রাণ গ্রহণেও লালাক্ষরণ ঘটাতে পারে। এইরূপ প্রক্রিয়াকে সাপেক্ষ প্রতীবর্ত বলে। উভয়বিধ প্রতীবর্তই একটি জটিল প্রতীবর্তচক্রের (Reflex Arc) মাধ্যমে সংঘটিত হয়। অনপেক্ষ প্রতিবর্তের বেলায় মুখগহ্বরের স্বাদ-সহায়ক বা স্বাদগ্রাহী নার্ভপ্রান্তগুলি খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে উত্তেজিত হয়। মুখগহ্বরে সৃষ্ট এই অন্তর্মুখ আবেগ (Afferent Impulse) স্নায়ুপথে লালাকেন্দ্রে পৌঁছয়। লালাকেন্দ্র উদ্দীপিত হ'য়ে বহির্মুখ আবেগ (Efferent Impulse) স্নায়ুপথে ক্ষরণ-প্রেরণা (Secretory Impulse) পাঠায়। ঐ বহির্মুখ প্রেরণা লালাগ্রন্থিগুলিকে লালাস্রাবে উদ্দীপিত করে। সাপেক্ষ প্রতিবর্তের বেলায় অন্তর্মুখ প্রেরণা শ্রবণেন্দ্রিয় এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছে লালাকেন্দ্রকে উদ্দীপ্ত করে। লালাকেন্দ্র থেকে বহির্মুখ প্রেরণা জটিল স্নায়ুপথ বেয়ে লালাগ্রন্থিতে এসে পৌঁছায়। স্নায়বিক আবেগের তারতম্য অনুসারে লালার পরিমাণগত হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

—সুব্রতকুমার পাল।

একটি বিলাতী কবিতা

সেণ্ট ভিনসেণ্ট মিল্যে

(১৮৯২-১৯৫১)

(বীঠোফেনের সিম্ফনি শুনে)

মধুর আওয়াজ তুলে জেগে থাকো গান, তুমি থেমো না, থেমো না,
আবার এ সংসারের আঁস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে তুমি দিও না আমাকে,
তোমার ঐ সুরে, দেখি, জ্বলে শুধু শান্তি আর মহত্ত্বের সোনা,
গ্রাহ্য হয় মানুষের সত্তা, তার উদ্দেশ্যেরও অর্থ কিছু থাকে।
তোমার চাতুরী আর মাধুরীতে বিহ্বল মরমিয়া সুরে মূর্চ্ছাহত,
এলিয়ে অবশ অঙ্গ, রঙ্গমদে মুখখানি বিবর্ণ উদাস
যা কিছু কঠিন, রূঢ়,—যা কিছুই কার্পণ্যের বিষে বিক্ষত :
ঠিক যেন সেই রূপ-কথার কিঙ্করী,—শুধু ঘুমিয়েই পায় যে বিলাস।
এই সুরময় লগ্ন, এই তো চরম দান তৃপ্ত ধরিত্রীর,
যন্ত্রণা-বিক্ষত বৃন্তে মুঞ্জরিত মোহন মুকুল,
হে মধুর ধ্বনি, তুমি আমাকে বাঁচতে দাও, যেয়ো না অধীর
স্বপ্ন ছেড়ে।—যতদিন মৃত্যু এ সে দেহদুর্গ চূর্ণ ক'রে না খসায় মূল,
ততদিন বৃদ্ধ সূর্য্য দেখে যেন, আমি এক যাদুপুরী। আর,
দুর্ভেদ্য প্রাকার তুমি, গান, তুমি একান্ত আমার।।

অনুবাদক—অমিয় ভট্টাচার্য্য

এষণা

[T. S, Eliot এর Usk কবিতার ভাবানুবাদ]

চলতে হঠাৎ ডাল ভেঙ্গে কি দৃষ্টিপথের সম্মুখে,
মায়ামৃগ দেখতে পাবে শুকনো জলায় ধারাটিতে ?
বৃথাই আশা জপছ মনে, নয়ন ফেরাও পার্শ্বেতে,
দোহাই তোমার ! বর্শা পানে নজর যেন দিও না—
ক্ষান্ত করো মন্ত্রে বোনা মায়াজালের কল্পনা ;
ঘুমোক তারা অনন্তকাল, নিদ্রা ভেঙ্গো না।

ধীরে ডুব দাও মগ্ন হয়ো না গভীর গহন হৃদয়ে।
চোখ তুলে দেখো সামনে তোমার পথটি নেমেছে অতলে,
আবার উঠেছে সাপের মতন তুঙ্গ গিরির শিখরে।
যাত্রা পথের 'নামায়-ওঠায়' চালাও তোমার এষণা
সবুজ শৃঙ্গ মিশেছে যেথায় ধূসর সান্ধ্য আলোকে,
যুগের তিমিরে পথবাহী যাত্রীর দিন গোণা
তোমার মনের ধ্যানমন্দিরে শোনো ভেসে আসে,
তাদের নীরব আকুল অধীর প্রার্থনা।

অনুবাদক—শ্রীভাস্কর দাশগুপ্ত

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

বিনতা রায়

Sc. 80

জানলার বাইরে। রণদীপ আর বুদ্ধ একটু সরে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে।

রণ। কি ব্যাপার বাধালি বল তো—

বুদ্ধ। একটু ধৈর্য ধরো, বড় ডাক্তার এসেছে ভালই তো হয়েছে। Cut

Sc. 81

বসবার ঘর। কৃষ্ণবিহারী লম্বা লম্বা পা ফেলে চিন্তিতমুখে পায়চারি করছে।

বিরূপাক্ষ মুখ কাচুমাচু ক'রে। জীমূত গালে হাত রেখে বসে আছে। মণিকা বিষণ্ণ মুখে ঘরের এটা সেটা নাড়ছে, কুশলা জীমূতের কৌচের পেছনে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

বিরু। (হঠাৎ মুখ তুলে) আপনি দেখবেন স্যর, আমি ভুল করিনি। আমি আজ এক বছর ধ'রে মিস চৌধুরীকে দেখছি, আর উনি একদিনেই সব বুঝে ফেলবেন!

কৃষ্ণ। (ধপ করে দাঁড়িয়ে প'ড়ে ভারী গম্ভীর কণ্ঠে) ছাখো ডাক্তার, সময়টা কোনো কথা নয়। মালী বাগানে কাজ করে সারা জীবন ধরে, জগদীশ বোস পাতাটি ধরেই বলেছিলেন গাছের প্রাণ আছে। জ্ঞান আর দেখার দৃষ্টিটাই বড় কথা।

আবার পায়চারি করতে শুরু করে কৃষ্ণবিহারী। জীমূত আড়চোখে একবার তাকায় ডাক্তারের দিকে। ডাক্তারের চোখ ঘুরছে কৃষ্ণর ঘোরার সঙ্গে তার হাঁ-করা ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় কথাটা সে ঠিক ধরতে পারে নি।

এমনি সময় সুদাম এসে ঘরে ঢোকে।

সুদাম। আপনাকে দিদিমণির ঘরে ডাকছে।

সবাই উঠে পড়ে এগোতে যায়, বাধা দেয় কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। তোমরা বসো, আমি দেখি— Cut

Sc. 82.

চৌধুরীর ঘর। অনুসূয়া বেশ স্বাভাবিক ভাবে পা ঝুলিয়ে খাটের ওপর বসে আছে। ডাঃ সেন একটা চুরুট ধরিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে।

কৃষ্ণ এসে ঘরে ঢোকে ব্যস্ত পায়ে।

ডাঃ সেন। শুনুন, আপনার মেয়েকে আমি থরোলি এক্সামিন করলাম, সমস্ত হিস্ট্রী শুনলাম। ওঁর কোনো রোগ নেই। সি ইজ পারফেক্টলি অলরাইট। শুনলাম আজ একটা পার্টি ছিল বাড়ীতে, তা একটু স্ট্রেন হয়েছে হয়তো, বা কোনো ছায়া টায়া দেখে ভয় পেয়েছেন। শরীরে কোনো দোষ নেই। (একটু হেসে) বরং সাধারণ মেয়েদের তুলনায় স্বাস্থ্য তো ভালই বলবো।

কৃষ্ণ। (আবেগে ডাক্তারের হাত চেপে ধরে) আপনি আপনি বলছেন এ কথা ?

ডাঃ সেন। হ্যাঁ, বিশেষ জোর দিয়েই বলছি। ওঁকে ফ্রিলি ঘোরা ফেরা করতে দেবেন, যেমন আর সবাই করে। কোনো ওষুধ-বিষুধ কিছু না।

কৃষ্ণ। (হাত ছেড়ে দিয়ে) ওহ, ডক্টর, আপনি আমাকে বাঁচালেন, ওকে নিয়ে একটা বছর কি অশান্তিই যে আমার মনে ছিল—

ডাঃ সেন। দেখুন, বড় দুঃখের বিষয়—এ দেশে ডাক্তারির নামে, যদিও সংখ্যায় খুবই কম—তবু, গুটিকয় ডাক্তার যে ব্যবসার খেলা খেলছেন, তাতে এত বড় একটা নোবল্ প্রফেসনের যথেষ্ট অমর্যাদা করা হচ্ছে। যাক আমি চলি—

কৃষ্ণ। আসুন, আসুন—আজ যে আমার কি আনন্দের দিন—

ডাক্তারের ব্যাগটা নিজেই হাতে তুলে নিয়ে এগোয়। বেরিয়ে যায় ডাক্তারকে নিয়ে।

জানলার বাইরে মৃদুকণ্ঠে শোনা যায়—

O.C.V. রণ—অনু, অনু—

অনুসূয়া ছুটে যায় জানলার কাছে।

রণ। (এগিয়ে আসে) ভয় পেয়ো না, আমি রণদীপ।

অনু। কিন্তু এগুলো কি মেখেছো ? কি যে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে—

রণ। আরে বাবা, প্রাণের দায়ে। তোমার জন্যে কি না করতে হচ্ছে আমাকে।

একটা পায়ের শব্দ পাওয়া যায়।

অনু। স'রে যাও, স'রে যাও, কে যেন আসছে।

রণদীপ জানলা থেকে চট্ করে স'রে যায়। মণিকা এসে ঘরে ঢোকে।

মণি। এখন কেমন আছিস রে ?

অনু। ভাল। জানলার ঠাণ্ডা হাওয়াটা বেশ লাগছে।

মণি। যাক্, এখন খেতে চল্ সবাই অপেক্ষা করছে। মেসোমশাই আমাকে পাঠালেন তোকে ডাকতে।

অনু। (হাতের ইসারায় মণিকাকে ডাকে) জানলার বাইরে একটা জিনিষ দেখাবো, আগে বল্ ভয় পাবি না—

কৌতুকে মণিকার চোখদুটো নেচে ওঠে। ছুটে যায় জানলার কাছে, উঁকি দেয় বাইরে। রণধীপ এগিয়ে আসে।

মণি। (হাঁ হ'য়ে যায়) একি।

রণ। জুতোর কালি। আপনার বন্ধুর জন্যে আর কতো করবো বলুন তো—

খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে মণিকা। অনুসূয়া তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দেয়।

Cont. খুব হাসি পাচ্ছে, মা? বাড়ীতে সাঁওতাল পাহারা রেখেছেন কেন বলুন তো—কি বিদঘুটে ব্যাপার, লোকজন আসতে বেরোতে পারবে না?

অনু। (হাসতে হাসতে) কেন পারবে না? আসবে ভূত্য সেজে, বেরোবে সাঁওতাল পাহারাদার হ'য়ে।

রণ। বেশ, মাঘ আবার আসবে, তখন এই হাসির শোধ নেব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা হ'য়ে গেল চলি। সকালে দেখা হবে তো?

মণি। নিশ্চয়ই। তার আগে আমি একবার ভূ-ত বলে চেঁচাই?

রণ। (ব্যস্ততার ভান ক'রে) না না—ও বাবা, এবার ঠিক ধরা পড়ে যাবো—আমি পালাই।

দ্রুত বাইরের দিকে পা বাড়ায় রণধীপ। মণিকা আবার জোরে হেসে উঠতে যায়, অনুসূয়া তার মুখটা চেপে ধরে টেনে নিয়ে যায় দরজার দিকে। Quick Mix.

Sc. 85

খাবার ঘর। টেবিলের চারিদিকে সবাই বসে খাচ্ছে। হঠাৎ মণিকা হেসে ওঠে খুক খুক করে। শাসনের দৃষ্টিতে অনুসূয়া তাকায় তার দিকে।

কৃষ্ণ। কি হ'ল?

মণি। (সামলে নিয়ে) না, গলায় কি যেন আটকালো—

গেলাস মুখে তুলে সামলাবার চেষ্টা করে। Slow Mix.

Sc. 86

সকাল। রণধীপের ঘর। অনুসূয়া আর রণধীপ দাঁড়িয়ে আছে। অনুসূয়ার দুটো হাত রণধীপের হাতে ধরা।

অনু। পারবে তুমি বাপীর সামনে গিয়ে বলতে?

রণ। (নাটকীয় ভঙ্গীতে) অয়ি শক্তিদায়িনী, একবার ভাখোই না পরীক্ষা করে।

অনু। না ঠাট্টা নয়, বল না সত্যি, কি বলবে গিয়ে?

রণ। কি আর বলবো, সোজাসুজি—

অনু। (বাধা দিয়ে) মোটেই না। সোজাসুজি বললে বাবা দেবেন তোমায় ঠাণ্ডা করে।

রণ। (মাথা চুলকে) হ্যাঁ, তা ঠাণ্ডা করার যন্ত্রটি তো তাঁর সঙ্গেই থাকে। আচ্ছা দেখি ভেবে—

অনু। হ্যাঁ ভাল করে ভেবে ঠিক করে নাও, আমার বড্ড ভয় করছে।

রণধীপ স্মিত হেসে টেনে নেয় অনুসূয়াকে বুকের মধ্যে। এক হাতে চিবুকটা তুলে ধ'রে বলে—

রণ। কি আর হবে, তুমি মনে মেনে রেখেছো, তোমার বাবা মারবেন প্রাণে। (সান্ত্বনার সুরে) ভয় পেয়ো না। যা হোক, একটা-না-একটা উপায় আমি বার করবোই।

অনু। তা হ'লে আমি চলে যাই, তুমি একটু পরেই আসছো তো?

রণ। হ্যাঁ।

উভয়ের গভীর দৃষ্টি আর একবার মিলিত হয়। ধীরে নিজেকে মুক্ত ক'রে চলে যায় অনুসূয়া। Cut

Sc. 87

জীমূতের বাড়ীর বসবার ঘর। ব্রেকফাষ্ট দেওয়া হয়েছে। জীমূত, বিরূপাক্ষ, কুশলা, মণিকা, কৃষ্ণবিহারী আর বিচ্ছু উপস্থিত। একটা খাবার মুখে পুরে চিবোচ্ছে আর তীর ধনুক নিয়ে নাড়াচাড়া করছে বিচ্ছু। তার মাথায় রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো পালকের টুপী, পিঠে আটকানো আধারে কয়েকটি তূণ।

বিচ্ছু। কাল যদি ঘুমিয়ে না পড়তাম তো এই তীর দিয়ে ভূতটাকে খতম করে দিতাম।

মণি। তা ঠিক, তোমাকে যে রকম বীরপুরুষ দেখাচ্ছে। কিন্তু বিচ্ছু, ভূতের গায়ে তো তীর লাগে না।

বিচ্ছু। (ভয় ভয় একটুক্ষণ মণিকার দিকে তাকিয়ে থেকে) তা হলেও, ভয় তো পেতো? ওরা কেন শুধু শুধু মানুষকে ভয় দেখাবে?

বলতে বলতে কুশলার পাশে একটু ঘেঁষে বসে, হঠাৎ বলে ওঠে—

Cont. দিদি আজ আমি তোর বিছানায় শোবো।

সবাই হেসে ওঠে।

মণি। উঃ দারুণ বীরপুরুষ—

এমনি সময় অনুসূয়া এসে ঘরে ঢোকে।

কৃষ্ণ। কেমন আছিস মা?

অনু। খুব ভাল বাপী। এই সামনেটায় একটু বেড়িয়ে এসে আরও ফ্রেশ লাগছে।

কৃষ্ণ। বেশ, বেশ।

কাগজটা তুলে নেয় হাতে। অনুসূয়া একটা খাবারের প্লেট হাতে তুলে নিয়ে বসে কৌচে। রণধীপ ঘরে এসে দাঁড়ায়। মণিকা উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে ওঠে—

মণি। এস দাদা এস। কাল এলে না কেন বল তো?

কৃষ্ণ। (কাগজটা সরিয়ে রেখে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে রণধীপের দিকে তাকিয়ে) এসেছিল। তোমরা দেখতে পাওনি।

রণ। দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল।

কৃষ্ণ। (গম্ভীর ধমকের কণ্ঠে) তোমার সঙ্গে আমার কোনো কথা থাকতে পারে না। সুদাম—আমার বন্দুক—কাল হয়ত ফসকে পালিয়েছিলে, আজ আর তোমাকে ছাড়ছি না।

রণ। আমুন বন্দুক, আমি ভয় পাই না।

কৃষ্ণ। উঁ! আমার বন্দুককে ভয় পাও না? তোমার তো সাহস কম নয় হে! আচ্ছা, চলো শোনাই যাক কি তোমার বক্তব্য।

কৃষ্ণ উঠে বাইরে যায়, রণধীপ সঙ্গে যায়। জীমূত আর বিরূপাক্ষ সবিস্ময়ে দৃষ্টি বিনিময় করে। অনুসূয়া কৌচ ছেড়ে উঠে পড়ে।

বেশ চিন্তিত দেখায় তাকে। বিল্টু এ সব গ্রাহ্য করে না। উঠে লাফাতে লাফাতে ভেতরে চলে যায়। Cut.

Sc. 88

বাইরের বারান্দা। কৃষ্ণ আর রণধীপ এসে দাঁড়ায়। কৃষ্ণ পাইপ ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সোজা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রণধীপের চোখের দিকে। রণধীপ বেশ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। একটা ঢোঁক গিলে প্রায় মরিয়া হ'য়ে সুরু ক'রে দেয়।

রণ। দেখুন, চৌরঙ্গীতে আপনার মেয়েকে আমার গাড়ীতে ডাঃ বিরূপাক্ষ দেখেছিলেন, এটা সত্যি কথা।

কৃষ্ণ। (ক্ষেপে উঠে) এঁ্যা! তবে তো—

রণ। না তবে তো—নয়। আগে শুনুন সবটা। এই সময় সুদাম এসে বন্দুকটা ধরিয়ে দিয়ে চলে যায়। সেটা মাটিতে ঠক ক'রে নামিয়ে লাঠির মতো ভর ক'রে দাঁড়ায় কৃষ্ণবিহারী।

Cont. (এক নিঃশ্বাসে বলে যায়) ডাঃ সেনের কাছে শুনলেন আপনার মেয়ের কোনো অসুখ নেই। অমন বুদ্ধিমতী আমুদে মেয়ের মধ্যে মেলনকোলিয়ার কি লক্ষণ আপনারা দেখেছিলেন জানি না। বেচারী বাড়ীতে বন্দী থেকে, প্রায় পাগল হ'য়ে একদিন লুকিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, গড়ের মাঠে একটু হাওয়া খেতে। সেখানে ডাঃ বিরূপাক্ষকে দেখে ভয়ানক ভয় পেয়ে ছুটে গিয়ে উঠে পড়েছিলেন রাস্তার ধারে দাঁড়ানো আমার গাড়ীটাতে। এ ভাবে পথের মাঝে একটি মেয়েকে ভয় পেয়ে ছুটতে দেখে আমিই তাঁকে পৌঁছে দিই।

কৃষ্ণ। কি বলছো তুমি! ডাক্তারের ভয়ে আমার অনুকে অমন ভাবে পথের মাঝে ছুটোছুটি করতে হয়েছে!

রণ। আজ্ঞে হ্যাঁ। এর পর দু-তিন দিন গিয়েছি আপনার ওখানে, এই কথাটা আপনাকে বলবো বলে। কিন্তু আপনার ওই বন্দুক আর জিমির ভয়ে যাওয়া বন্ধ করতে হ'ল। কিন্তু পারলাম না। (কণ্ঠে প্রচুর আবেগ মিশিয়ে) অমন একটি সুন্দর মেয়ের শরীরে অকারণে ছুঁচ ফুটিয়ে, ধরে বন্দী করে রেখে, তাঁর হাসিখুসী মনটিকে পিষে মারার এই অমানুষিক অত্যাচার সইতে না পেরে আমি ছুটে পালিয়ে এলাম কলকাতা থেকে।

রণধীপের কণ্ঠ যেন প্রায় রুদ্ধ হ'য়ে আসে, আর তার কথার শেষের দিকে কৃষ্ণবিহারী বিরাট শরীরটা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদতে সুরু ক'রে দেয়। রণধীপ তাড়াতাড়ি তাকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দেয়, বন্দুকটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখে—

Cont. আপনি অধীর হবেন না—

সুযোগ বুঝে অনুসূয়াও বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় কৃষ্ণবিহারীর পাশে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেয়।

অনু। (কাঁদো কাঁদো স্বরে) বাপী তুমি কাঁদলে আমি যে সইতে পারবো না।

কৃষ্ণ। (একটু সামলে নিয়ে অনুর পিঠে হাত বুলিয়ে) উঃ, সত্যি কতো কষ্ট পেয়েছিস মা। এতটুকু ছেলেটা যা বুঝলো, আমি কেন তা আগে বুঝতে পারলাম না।

রণ। (হঠাৎ বলে ফেলার মতো) এখন আমি—

গম্ভীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে কৃষ্ণবিহারী তাকাতেই থমকে থেমে যায় রণধীপ। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে, তারপরেই বলে বসে—

Cont. আমি, মানে, আমি আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করছি।

কৃষ্ণ। (ভ্রূ তুলে) এঁ্যা! ডিপ্রেস্‌ড ড্যামসেলকে বাঁচিয়েছ, সেই শিভলরীর পুরস্কার। হাঃ হাঃ হাঃ (একটু হেসেই আবার ঝপ করে গম্ভীর হ'য়ে উঠে হাত বাড়িয়ে বন্দুকটা তুলে নেয়)।

রণ। এই দাঁড়ালাম। শিভলরী একবার যখন দেখাতে পেরেছি, ওঁর জন্যে প্রাণটাও দিতে পারবো।

কৃষ্ণবিহারী বন্দুক উঁচিয়ে রেখে প্রশ্ন ক'রে যায়। এর পর উত্তর প্রত্যুত্তরগুলো টপ টপ করে হতে থাকে পরস্পরকে একটুও সময় না দিয়ে।

কৃষ্ণ। (ধমকের সুরে) কি আছে তোমার?

রণ। সাত কাঠা জমির ওপর কলকাতায় একটা বাড়ী আছে।

কৃষ্ণ। কি করো?

রণ। কিছু না।

কৃষ্ণ। কিছু করতে হবে।

রণ। করবো।

কৃষ্ণ। বাঘের মুখোমুখী দাঁড়াবার সাহস আছে?

রণ। হ্যাঁ।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ খুসী এবং কৌতূহল ফুটে ওঠে মুখের ভাবে) দাঁড়িয়েছ কখনো?

রণ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কৃষ্ণ। কবে, কোথায়?

রণ। আজ সারা সকাল ধরে।

কৃষ্ণ। উঁ? (বুঝতে পেরে) ওহো হো হো, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

ভীষণ হাসতে থাকে কৃষ্ণবিহারী। রণধীপ একই ভাবে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হাসি থামলে যদি আবার প্রশ্ন হয় তারও জবাব দিতে সে প্রস্তুত এমনি ভাব। অনুসূয়ার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। Swing

Sc. 89

পাহাড়ী রাস্তা ধরে বহু দূর থেকে একটা গাড়ী আসছে। গাড়ী থেকে ক্ষীণ নারীকণ্ঠে গানের আভাস শোনা যাচ্ছে। ধীরে এগিয়ে আসছে গাড়ী। Cut.

গাড়ীর ভেতর। গান গাইছে অনুসূয়া ঘনিষ্ঠ ভাবে রণধীপের পাশে বসে। রণধীপের একটা হাত অনুসূয়ার কাঁধের ওপর দিয়ে জড়িয়ে ধরা অপর হাত ষ্টিয়ারিং-এ। সামনে একটা ঢালু পথে গাড়ীটা নেবে যায়। mix.

গাড়ী আসছে এগিয়ে। দু'-পাশের ঝরনা, পাহাড়, খোড়ো হাওয়ায়, পুঞ্জ মেঘের নীচে অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। গানের আভোগ অংশ গাওয়া হচ্ছে। গাড়ীটা ক্যামেরার সামনে দিয়ে মোচড় খেয়ে ঘুরে যায়, পাহাড়ী ঘোরানো রাস্তায়। গাড়ীর পেছনটা দেখা যায়। যেখানে কেরিয়ারের ঢাকা খুলে বুদ্ধু বসে আছে। গাড়ী ঘোরার সময় পড়তে পড়তে কোনো রকমে সামলে নেয়। তারপর বেশ গুছিয়ে বসে হাসি হাসি মুখে মুগ্ধ ভাবে গান শুনে মাথা নাড়তে থাকে পাকা সমজদারের মতো।

॥ সমাপ্ত ॥

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

ঋতু বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ

মল্লিকা সাহা

পরিণত যৌবনে রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের একস্থানে লিখেছিলেন, আমি আলো ও বাতাস এত ভালবাসি। গ্যেটে মরবার সময় বলেছিলেন, more light আমার যদি সে সময়ে কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তবে আমি বলি more light and more space.

মহান স্রষ্টার মহৎ সৃষ্টির মধ্যে থাকে lighted space. সেইখানেই থাকে স্রষ্টার সমস্ত সম্ভাবনা। তাই বলব এই কথাগুলি কবি মুহূর্তের আবেগে বলেননি, বললে তা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে একটি উদভ্রান্ত রেখামাত্রই হোত। সারা জীবনের কাব্য সাধনায়, নানা রং সংমিশ্রণে, যে অপূর্ব বর্ণালী আলো অন্ধকারের লীলাভঙ্গি লিপিবদ্ধ করেছে, তা ঋতু প্রকাশের সময় অসাধারণ সার্থকতা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করা যায়, সীমার মধ্যে অসীমকে বাঁধবার, চেতনাহীন জড়ের মধ্যে আনন্দ বেদনাময় অরূপের স্পন্দন অনুভব করার প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-পিপাসী কাব্যাত্মা প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই সেই আনন্দঘন অসীমকে উপলব্ধি করার জন্যে আকুল। তাই রবীন্দ্রনাথের ঋতু সম্পর্কিত কবিতাগুলিতেও অসীমের আনাগোনা ও সুন্দরকে পাবার উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষা উদ্বেল আবেগে প্রকাশ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নির্মলকুমারী মহালনবিশকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, "আমি বাংলার দুর্ভাগ্যতম কবি"। ক্ষুব্ধ মনে কবিগুরু জীবনের প্রান্তে বাংলার প্রতি এই অভিযোগ করতে কুণ্ঠিত হননি। বাংলার জনগণ বাংলা জীবনধারা, বাংলার সমাজ-ব্যবস্থা পৃথিবীর এই মহান কবিকে দেবার মত কিছুই করতে পারেনি বরং বাধাই সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ কবিগুরুকে দিতে পেরেছে একটি জিনিস। তা বাংলার অফুরন্ত প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যের আলো আঁধারের খেলা যা কবির কাছে এক Mystic রূপ নিয়ে প্রকাশ [illegible]

গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে কবিগুরুই বলেছিলেন, পাশ্চাত্ত যৌবনে "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান"—এই ছড়াটা যেন "কৈশোরের মেঘদূত" শিশুকালের সাহিত্যরস আহরণের উদ্বোধন হয়েছে তাই বাংলার ঋতুর মনোমুগ্ধকর রূপের মাধ্যমে। শুধু শিশুকালেই নয় সারা জীবনই তিনি ঋতু বৈচিত্র্য তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেছেন এক নূতন ভাবাবেগে।

একজন বলেছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থকে পড়ে প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখেছি। সেই রকম বাংলার মানুষও বলবে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমেই জেনেছি এই বাংলার মধুময় প্রকৃতি আর ঋতুর অসীম সৌন্দর্যকে। রবীন্দ্রনাথের পর হয়তো একজনেরই নাম করা যাবে তিনি জীবনানন্দ দাস। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিকে বলেছিলেন, চিত্র ঘন "আর চিত্ররূপময়।"

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ সালে। আর তার ঠিক দু' বৎসর পর ১৮৬৩ সালে প্রতীচ্যে উঠেছিল Impressionist movement-এর ঢেউ। এদেশে যে শিল্পী জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর চোখে কে যেন অলক্ষ্যে সেই দূরের নীলাঞ্জনরেখা টেনে দিল। বাংলার ঋতু প্রকৃতির রূপে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে তাই অনেক Indirect painting এঁকেছেন কবি। সেই দৃষ্টিতেই কবি রূপ দিয়েছেন হেমন্ত প্রকৃতির এক অপরূপ সৌন্দর্যকে।

হেমন্তে কোন্ বসন্তেরই বাণী পূর্ণশশী ওই যে দিল আনি।
বকুলের ডালের আগায় জ্যোৎস্না যেন ফুলের স্বপন লাগায়
কোন্ গোপন কানাকানি পূর্ণশশী ওই যে দিল আনি।

আবার সেই রকম Direct painting-এর জীবন্ত ছাপ বর্ষা প্রকৃতি বর্ণনায় কবি এঁকেছেন—

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর
ভরা বাদরে
আকাশ ভাঙা আকুল ধারা
কোথাও না ধরে।
শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয়, হেঁকে হেঁকে
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের 'পরে।
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে।

সেই রকম ভরা গ্রীষ্মের কালবৈশাখীর উদ্দাম রূপ ফুটে উঠেছে শব্দ চয়নের বলিষ্ঠতার মাধ্যমে—

এই পথে খেয়ে এসেছে কালবৈশাখীর ঝড়,
গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে,
ঘোড়-সওয়ার-বর্গী সৈন্যের মত,
কাঁপিয়ে দিয়েছে শাল সেগুনকে।
নুইয়ে দিয়েছে ঝাউয়ের মাথা,
হায় হায় রব তুলেছে বাঁশের বনে
কলাবাগানে করেছে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য।
ক্রন্দিত আকাশের নীচে ঐ ধূসর বন্ধুর
কাঁকরের স্তূপগুলো—দেখে মনে হয়েছে
লাল সমুদ্রে তুফান উঠল
ছিটকে পড়ছে তার শীকর বিন্দু।

কবির লেখনীতে Post Impressioinst রীতির সঙ্গেও শে[ষ] বয়সের লেখার একটি নিগূঢ় যোগ দেখা যায়। কবির দৃষ্টি বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে যখন ক্ষীণ ও অসাড় হয়ে এল তখন একটা উদ্বেগের আবেগে

থানিকটা দেখা থানিকটা স্মৃতির রেখা মিশিয়ে বিলুপ্ত প্রায় ঋতু বৈচিত্র্যের চিহ্নগুলিকে ধারালো ছন্দের দোলে ও বিচিত্র বাক্য বিন্যাসে ধরে রাখলেন। মহাকাশের তাণ্ডব লীলার মুহূর্তকাল গুলি জ্বলে জ্বলে নিভে গেল। যে মুহূর্তটি কবির চোখে ঝলসিয়ে চলে গেল তার কোনও প্রতিবিম্ব, কোনও প্রতীক রেখে যেন মহাকাশের বিরুদ্ধে যুগ যুগান্তর ধরে নব সৃষ্টির অভিযান করে আসছে। সেই মর মুহূর্ত গুলির মায়ামুগ্ধ সঞ্চিত হৃদয় শিল্পী অমর করে ধরে রাখলেন তার সৃষ্টির মধ্যে, ক্ষীণীয়মান দৃষ্টিতে আঁকা শেষ বয়সের রচনা অপরূপ রঙের ছটায় বিকাশিত হল।

হেঁকে উঠল ঝড়
লাগল প্রচণ্ড তাড়া—
পূর্বান্ত সীমায়—রঙীন পাঁচিল ডিঙিয়ে
ব্যস্ত বেগে বেরিয়ে পড়ল মেঘের ভীড়
বুঝি ইন্দ্রলোকের আগুন লাগা হাতিশালা থেকে
গাঁ গাঁ শব্দে ছুটছে ঐরাবতের কাল কাল শাবক
শুঁড় আছড়িয়ে।

মেঘের গায়ে গায়ে দগদগ করছে লাল
তার ছিন্ন ত্বকের রক্তরেখা।

রবীন্দ্রনাথের ঋতু সম্পর্কিত কবিতাগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাবে তা কেবল ঋতু বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগের প্রতিফলন বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে সেই কাব্য সাধনার মধ্য দিয়ে প্রথম বয়সের রচনা "শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন আমলকির ঐ ডালে ডালে"র মতো কাব্যে যে শান্ত মনের চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় তা উত্তর কালের রচনা গুলিতে নেই, বিক্ষুব্ধ সমাজে থাকা কালীন কবির মনে যে চেতনার ঝড় উঠেছিল তারই প্রতিফলন এই ঋতু সম্পর্কিত কবিতাগুলিতে পাওয়া যাবে।

চলন্তিকার পথে

পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আভা পাকড়াশী

পূজো দিয়ে বেরিয়ে এসে গেলাম ফলাহারি বাবাকে দেখতে। পাকা আমটির মত টুকটুকে রং, পক্ককেশ এক বৃদ্ধ। ইনি বার মাস এখানেই থাকেন। এমন কি যখন ছয় মাসের জন্য মন্দির বন্ধ করে পাণ্ডারা সব নেমে চলে যায় নীচে উখিমঠে। তখনো উনি এখানেই থাকেন। তার কারণ মন্দির বন্ধ হয়ে যাবার পর উনি একবার থেকে গিয়েছিলেন,—সেই সময় উনি মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেতেন—ওঁর মনে হত যেন কেউ আরতি করছে। তারপর বরফের ওপর পায়ের ছাপ দেখতে পেতেন। যেন মন্দির পর্য্যন্ত এসে সেই পায়ের মালিক মন্দির দ্বার রুদ্ধ দেখে আবার ফিরে চলে গেছে। সেই থেকে উনি থাকেন—পূজো করেন দেবতার যথারীতি। প্রচুর শুকনো মেওয়া আর কাঠ রেখে যায় পাণ্ডারা। তাতেই ওঁর আর ঠাকুরের ভোগ হয় এবং শীত কাটে। আর প্রায় একমণ ঘি দিয়ে একটি বিরাট প্রদীপ জ্বালান থাকে। সেটি পুরো ছ মাস ধরে জ্বলে। এটি নিভে যাওয়া খুবই অলক্ষণ মনে করে এরা। ঐ সময় উখিমঠেই কেদার বাবার পূজো হয়।

গোমাকে মহাপ্রসাদ খাওয়ার টাকা দিয়ে আমরা আবার নেপালী-হাউসে ফিরে এলাম। পাণ্ডা বলল আমাদের খুশী করে দাও তা না হলে তোমাদের পুণ্যলাভ হবে না। আমি যখন বলব তোমাদের তীর্থদর্শন সম্পূর্ণ হয়েছে তবেই তোমরা পুরোপুরি পুণ্যফল লাভ করবে। বেশ তাই হোক। একটা রূপোর থালার একরাশ সেই শুকনো পারিজাত এনে আমাদের হাতে তুলে দিল তারপর কি সব মন্ত্র পড়ে টাকা নিল হাতে আর বলল তোমাদের তীর্থ সম্পূর্ণ। হেসে উঠলাম আমরা, ওরাও সে হাসিতে যোগ দিল। গরম গরম পুরী আর হালুয়া এনে আমাদের খাওয়াল আমিও ওদের খাওয়ালাম—মহাখুশী ওরা।

খেয়ে দেয়ে কিন্তু বলল তোমাদের অর্দ্ধেক তীর্থের ফললাভ হল। আমি বলি সে কি? হ্যাঁ কেন না তোমরা তো মহাদেবের অর্দ্ধেকটা দর্শন করলে আজ। বাকি অর্দ্ধেকটা আছে নেপালের পশুপতিনাথে সে পুণ্যের দায়িত্ব আমরা কি করে নেব?

কি রকম?

বলে শোন তবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পাণ্ডবরা স্বর্গে যাবেন। নারায়ণ বললেন, তোমাদের জ্ঞাতিবধের পাপ হয়েছে, সেই পাপ খণ্ডন হলে তবেই তোমরা সশরীরে স্বর্গে যেতে পারবে। ভীম জিজ্ঞেস করেন, কি উপায়ে খণ্ডন হবে? নারায়ণ বলেন, দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর পায় যদি পাপ অর্পণ করতে পার তবেই তোমরা পাপ মুক্ত হবে। ভীমই তখন অগ্রসর হলেন পাপমোচনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কোথায় মহাদেব? খুঁজে আর পান না তাঁকে। অনুসন্ধান করতে করতে গুপ্ত কাশীতে এসে তাঁকে অর্দ্ধনারীশ্বরের মূর্ত্তিতে লুকিয়ে থাকতে দেখলেন। ভীমকে দেখতে পেয়েই মহাদেব আবার পালালেন, কারণ তিনি ঐ পাপের বোঝা গ্রহণ করতে নারাজ। এখানে এসে একরাশ ষাঁড়ের মধ্যে ষাঁড় হয়ে মিশে রইলেন। কিন্তু নাছোড়বান্দা ভীম আবার ধরে ফেললেন তাঁকে। আর এবার উপায়ান্তর না দেখে মহাদেব মাটির ভেতর ঢুকে যেতে লাগলেন—ভীম তখন মহারাগে মারলেন তাঁকে এক গদার বাড়ি। এত বল ছিল তাঁর গদায় যে মহাদেবের ষাঁড়রূপী পিঠ রইল এখানে পড়ে, আর মাথা পড়লো নেপালে পশুপতিনাথে। ঐ ষাঁড়ের পিঠেরই কেদারনাথ নামে পূজো হচ্ছে এখানে। আর এই মন্দির ভীম নির্ম্মাণ করেন নীচে থেকে পাথর এনে। তারপর বহু বছর তুষার সমাধি হয়েছিল কেদারনাথের। পরে শঙ্করাচার্য্য এই মন্দির আবিষ্কার করে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। সত্যি ভীমের পক্ষেই সম্ভব ঐ বিরাট মন্দির এই উত্তুঙ্গ হিমালয়ের বুকে গড়ে তোলা। সামনের নন্দী মূর্ত্তিটিও কি বড়। এই পরিবেশে বসে ঐ পাণ্ডার কোন কথাই অবিশ্বাস্য মনে হয় না।

এবার নামার পালা। ঐ ঠাণ্ডায় ছেলেদের নিয়ে রাত্রে থাকতে ভরসা হল না। যদিও পাণ্ডারা দুভাই খুব ধরেছিল। কিন্তু নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল তখনই। বললাম, এবার আর ছাড়াছাড়ি নয় সবাই একসঙ্গে নামব। ছেলেরা স্নোবল তৈরী করে খুব ছোড়াছুড়ি করে খেলা করল। তবে গোরা রাস্তায় আসতে আসতে রোদ্দুরের কষ্টে তেষ্টা পেলেই বলত, এখন জল খাচ্ছি কিন্তু কেদারে পৌঁছে খুব বরফ খাব মামণি সেই থেকে সাদা বরফে ঢাকা কেদারের চূড়া দেখিয়ে ওকে বলা হ'ত। দেখ ঐখানে যেতে হবে তবে বরফ খেতে পাবে। পারবে ত যেতে। সত্যি খুব হেঁটেছে ও, অদ্ভুত উৎসাহ ওর। বড় ছেলে মাঝে মাঝে থেমে গেছে, কিন্তু ছোট ভাই-এর প্রাণ প্রাচুর্য্যে

লজ্জা পেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে আবার। কিন্তু বরফ খাওয়া আর হল না বেচারীর—একবার মুখে ঠেকাতেই নীল হয়ে উঠেছিল মুখটা। ছবি তোলা হল। এবার শেষবারের মত মহাকালের চরণে প্রণাম জানিয়ে নেমে চললাম।

নামছি তো নামছি নেমেই চলেছি। রোদের তাপে বরফ গলে, কাদা কাদা হয়ে পথ আরও বিপজ্জনক হয়েছে। সেই দোকান তো এসে গেল। কিন্তু কোথায়ই বা অমর সিং আর কোথায়ই বা তার ঘোড়া? এদিকে সমানে উৎরাইতে নামতে নামতে হাঁটুতে আর পায়ের নখে ভীষণ লাগছে। হঠাৎ আমার নজর পড়ল সকলের নাকের দিকে। বলি ওকি তোমাদের নাকগুলো অমন লাল হয়ে ফুলে উঠেছে কেন। শঙ্কর বলে নিজের নাকে হাত দিয়ে দেখ না তোমারটাও অমনি হয়েছে। হেসে সারা হলাম। তবে ব্যথাও করেছে খুব। বরফে ফেটে গেছে। নেমে এলাম রামওয়ারা চটিতে। ওকে বললাম, আজ রাতটা না হয় এখানেই থাক। আর তো হাঁটতে পারছি না আমি। ও বললো, তাহলে না হয় ডাণ্ডিতেই ওঠ। ঘোড়া যখন পাওয়া যাচ্ছে না কি আর করা যাবে। বেলা যখন রয়েছে এখনো, চলো গৌরীকুণ্ডে চলে যাই। এই জঘন্য ঘরে আবার একরাত্রি থাকতে ইচ্ছে করছে না। ওর সবতাতেই এমনি তাড়া। কাল এই ঘরকেই মনে হয়েছিল পরম আশ্রয়। আর আজ সেটাই হল জঘন্য। কিন্তু নিজের শরীর নিয়ে কখনো এমন লজ্জায় পড়িনি বাপু। কোন ডাণ্ডিবালাই আমাকে তুলল না। সব আসে আর আমাকে দেখে চলে যায়। লজ্জায় মরি। চিরকাল স্বাস্থ্যবতী বলে সুনামই কিনেছি। সেই শরীরকে কিনা এত হেনস্থা। উঠে পড়লাম রাগ করে, চল হেঁটেই যাব আমি।

পথে অমর সিংকে পেলাম। একজন যাত্রীকে পৌঁছতে গিয়ে ফিরতে দেরী করে ফেলেছে। ওর ঘোড়ার চড়ে আবারও আগে আগে পৌঁছলাম গৌরীকুণ্ডে। কোথাও ঘর নেই। তখন চাটু চৌধুরী (মানে ঐ চটির ইনচার্জ আর কি—তাদের বলে চটি চৌধুরী) নিজের ঘরে নিয়ে গেল আমাকে। পরে ওরা এসে গেল। লোকটাও আমাদের সঙ্গে ঐ ঘরেই রইল। আর সারা রাত আমার মুখে টর্চ ফেলে জ্বালাতন করল। প্রথম থেকেই লোকটাকে আমার ভাল লাগেনি। কিন্তু কি করব, আমি তখন নিরুপায়। অন্তত ছেলে দুটোর জন্যেও তো মাথার ওপর একটু আচ্ছাদন চাই। ভোরের দিকে আমার কাছে বকুনি খেয়ে আবার মাফও চেয়েছিল। ওরা তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কিছুই জানে না। পথ চলতে কত রকম লোকই যে দেখছি।'

যে পথ দিয়ে গিয়েছিলাম আবার সেই পথেই ফিরে চলেছি। চড়াইগুলো এখন উতরাই হয়েছে, আর উতরাইগুলো চড়াই। পথের বাঁকের পাথর। যেখানে বসে যাবার পথে জল খেয়েছি, দম নিয়েছি; ডাকছে যেন সে আবার। এই যে বাসরুট তৈরী হচ্ছে। যাত্রীরা বাসে করেই গুপ্তকাশী পৌঁছে যাবে। তারপর মাত্র উনিশ মাইল হাঁটলেই পৌঁছে যাবে বাবা কেদারনাথের কাছে। কিন্তু পাবে কি তারা এই পথের অভিজ্ঞতা? নাঃ আবার অহঙ্কার করে ফেলছি।

বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর কিছু ঘটেনি নামার পথে। শুধু ও একদিন খুব বিপদে ফেলেছিল। রোজই ও এগিয়ে হাঁটে। সেদিনও অমনি করে এগিয়ে গিয়ে বিপদ ঘনিয়েছিল। রামপুর চটি ফাটা চটি পুরো পাঁচ মাইল। পথে পড়ে একটা জঙ্গল। নেকড়ে বেরোয় এই পথে। যাবার সময়ে এই পথ পেরিয়ে ছিলাম সকালের দিকে। তখন অনেক যাত্রী সঙ্গে ছিল। এখন বিকেল বেলা। বললাম, আজ এই পর্য্যন্ত থাক কাল যাব। শুনল না। গোমাকে নিয়ে চলতে সুরু করল। পথে ছেলেদের ক্ষিধে পাওয়ায় ওদের দুধ খাওয়াতে গিয়ে আমি পড়লাম পিছিয়ে। যত যাত্রী দেখি সবাই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আমরা যে চটি ছেড়ে এসেছি সেই রামপুর চটির দিকে ফিরে চলেছে। আমাদেরও বলছে পথটা ভাল নয় আর এগিও না বরং ফিরে চল মা-জি। আমি তখন নিরুপায় সঙ্গের জিনিষপত্র সব, গোমা নিয়ে চলে গেছে। ভাবছি এবার এই বাঁকটা ফিরলেই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে বোধহয়। এই পথের বাঁকগুলো এমন বিচ্ছিরি যে সামনের পথটা খালি এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের মধ্যে লুকিয়ে যাচ্ছে। আশা হচ্ছে এইবার—এইবার দেখা হয়ে যাবে ওর সঙ্গে। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি হাঁটছি। কেউ একটু এগিয়ে গেলেই পেছন থেকে তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। ওদিকে ঝিঁঝিঁ ডাকতে সুরু করেছে, সন্ধ্যা হয়ে এলো। আবার ঝিপ ঝিপ করে বৃষ্টিও পড়তে সুরু করেছে। পথে দেখলাম বাছুরের হাড়, পাঁঠার ঠ্যাং পড়ে রয়েছে। বিশ্রী পচা গন্ধ বেরুচ্ছে। সঙ্গে আর দ্বিতীয় কোন যাত্রী নেই, শুধু আমরা তিনটি প্রাণী। মাঝে মাঝে ছেলেরা ওকে ডাকছে বাপী বাপী। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে আসছে সেই প্রতিধ্বনি। এমন সময় মনে হল পেছনে থেকে যেন কারা ছুটে আসছে। দেখি দুটো পাহাড়ী। হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। আমরাও ছুটতে সুরু করলাম। কতক্ষণ পারব ছুটে। পা ধরে আসছে। দম বেরিয়ে যাচ্ছে এ উঁচু নীচু পাহাড়ী পথে দৌড়ে গিয়ে। এবার রুখে দাঁড়ালাম—এই কেয়া মাঙ্গতা? কিউ হামার পিছে দৌড়তা হায় তুম লোক?

তারও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তড়কে গিয়ে হাত জোড় করে বলে তুম ডর গিয়া মাজি, হামলোক এই সেই মজা করতা রহা। ঔর হাম দোনো বাজী লড়ায়া হায়। তুম তিনো ভাই-বহেন হায়? ইয়া মা বেটা হায়?

অত দুঃখেও হাসি আসে আমার। ওদের এক ধমক দিয়ে আবার পথ হাঁটি। ওরা পালিয়ে গেল ওপরের গাঁয়। আবার আমরা একা। এখন বেশ ঘোর হয়ে এসেছে। রাগে দুঃখে চোখ ফেটে জল আসে আমার। মনের ভয় মনে চেপে মুখে ছেলেদের সাহস দিচ্ছি। হঠাৎ দেখি মাথায় গান্ধীটুপি, পিঠে ঝোলা, চুড়িদার পাজামাপরা ও সামনের পাথরে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। চিৎকার করে বলে উঠি, তোমার আক্কেলখানা কি বলতো? ওমা কাছে গিয়ে দেখি একটা পাথর, পাহাড়ের গা থেকে ঝুঁকে বেরিয়ে আছে। ও নয়। অথচ আমরা তিনজনেই কিন্তু ঠিক দেখেছি, ও বসে আছে। শ্রীরাধিকার মত তমাল বৃক্ষকে নারায়ণ ভ্রমে আলিঙ্গন করার কথা কিন্তু তখন মোটেই মনে পড়েনি আমার। আমার তখন হাত পা ভয়ে শিথিল হয়ে আসছে। শিরদাঁড়া বেয়ে কেমন যেন একটা ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত নামছে। মুখে ছেলেদের বললাম, চল রে ঐ সামনে যে চটিতে আলো জ্বলছে রাত্রে ওখানেই থাকব। আর এগুব না। সেই চটিতেই ও ছিল। আমাদের না পেয়ে ভয়ও পেয়েছিল ওখানে পৌঁছে পাত্তা

বিছানা আর গরম দুধ পেয়ে অবশ্য আমার রাগ পড়তে বেশী দেরী হল না। তবে ওকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলাম যেন বিকেল বেলা পথ হাঁটার সময় আর কখনো অমনি করে এগিয়ে না যায়। কথা রেখে ছিল। আর যায়নি। আবার ফিরে এলাম রুদ্রপ্রয়াগে। এখান থেকে বাসে করে আবার যাব বদ্রীনারায়ণের পথে পিপ্পলকোঠি পর্যন্ত।

দারুণ পাহাড়ী বর্ষা নেমেছে, কোন বাসই যাচ্ছে না। মহামুস্কিল তবে কি যাওয়া হবে না বদ্রীনাথ? শরীর যদিও অপটু হয়ে পড়েছে, মন কিন্তু চাঙ্গা আছে ঠিক, তবু এমনি অব্যবস্থা দেখে ও বলল, তোমরা থাক আমি না হয় একাই ঘুরে আসি।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সকলেরই যাওয়া হল। যাত্রীদের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত দুটি বাস ছাড়ল। তারই একটির মধ্যে স্থান করে নিলাম আমরা। কেদার ফেরত কিছু যাত্রী আছে, তবে বেশীর ভাগ মাদ্রাজী আর রাজস্থানী। এই পথের রাজস্থানী মেয়েরা দেখছি হাতের কব্জি থেকে কাঁধ পর্যন্ত সাদা সাদা বালা পরেছে। পুরুষদের সেই বেশ। মাথায় বিরাট মুরেঠা, পায়ে ভারী নাগরা, আর হাতে লম্বা লাঠি। ও আমার পাশে বসা রাজস্থানী বৌটির বালাটা একটু ছুঁয়ে বলে এগুলো কি হাতীর দাঁতের নাকি? অমনি তার পেছনে বসা মুরেঠা বাঁধা স্বামী হুঙ্কার দিয়ে জিজ্ঞেস করে "বাবুজী কা বোলত বা?"

বৌটিও কর্কশকণ্ঠে উত্তর দেয় "বাবুজী জেবর দেখত বা।"

আমি ওকে চোখ রাঙাই, খবরদার! দেখছ না ওর স্বামীর হাতের তেলে পাকান লাঠি। রাজপুত কখনো নারীর অবমাননা সহ্য করেনি। পড়নি ইতিহাস? তারপর ওদের বোঝাই, কিছু মনে কর না ভাই; ওর মনে অন্য কোন রকম খারাপ ভাব ছিল না। ছিল, "পরদারেষু মাতৃবৎ" ভাব।

আবার সেই উদ্দাম বেগে বাস চলেছে। রাস্তা জায়গায় জায়গায় সত্যিই ভেঙ্গে গেছে? উপরন্তু বৃষ্টিরও বিরাম নেই। সমানে ঝমঝম করে পড়েই চলেছে বৃষ্টি। বচন সিং ড্রাইভার অতি কৌশলে গাড়ী চালিয়ে চলেছে, সেই বর্ষণমুখর সন্ধ্যার অন্ধকারে। এতগুলি যাত্রীর প্রাণ তার হাতে। প্রথমে মাদ্রাজী যাত্রীরা স্তোত্র পাঠ সুরু করেছিল—

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে—

কারণ কল্লোলিনী অলকানন্দা আবার বিপুল বেগে বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছেন। ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে ওদের মন্ত্রোচ্চারণ? সবাই স্তব্ধ হয়ে সেই পর্দাঢাকা বাসের মধ্যে বসে, ইষ্টনাম স্মরণ করছে। শেষ পর্য্যন্ত কর্ণপ্রয়াগে, সেই রাত্রের মত স্থিতি হল। মনে পড়ল অন্ধকারের মধ্যে সেই দেবপ্রয়াগে নামার কথা। তবু তো সেখানে ভাল আশ্রয় জুটেছিল। এখানে একটা জানলা-বিহীন ঘরে স্থান হল শেষ পর্য্যন্ত। চটিবালা অতি অভদ্র। আগে টাকা নিয়ে পরে জিনিষ রাখতে দিল। খাবার নেই। তারপর অনেক বলা কওয়াতে

ঐ চটিবালা নিজেদের জন্যে যে রুটি বানিয়েছিল তার থেকে খানকতক দিতে ছেলেরা খেয়ে বাঁচল। এখান থেকেই আমরা এই পথের নমুনা কিছুটা আঁচ করেছিলাম।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ পিপ্পলকোঠি পৌঁছে গেলাম। বেশ বড় শহর। চারদিকে বাজারের গোলমাল। পানের দোকানে রেকর্ড বাজছে, 'মেরা জুতা হায় জাপানি'। আমাদের কেদার ফেরত মনে কেমন যেন একটা ধাক্কা লাগল। যেন হঠাৎই রূঢ় বাস্তবে ফিরে এলাম। মনে পড়ে গেল কানপুরের সদাব্যস্ত মেষ্টন রোডকে। আবার এখান থেকে পদযাত্রা সুরু হল আমাদের। সঙ্গের সঙ্গী গোমা সংগেই আছে। তার সঙ্গে এমনিই চুক্তি হয়েছিল। এরা মণ প্রতি নেয় একশো টাকা। এছাড়া আর যা দেবে। এখানে এসে আমাদের স্যুটকেশটা আর নিতে চাইল না ও। বলল পথ বড় খারাপ মাজি, বোঝা কিছু হাল্কা করে দাও। কি বা হাল্কা করব? অতিরিক্ত তো কিছুই আনিনি। যেটুকু না হলে নয় তাই তো আছে সঙ্গে। শেষ পর্য্যন্ত সব কিছুই হোল্ডলে পুরে ঐ স্যুটকেশটাকে বাদ দেওয়া হল। গোটা দুই কম্বলও বাদ পড়ল। কালিকম্বলিবালার ধরমশালায় জমা রাখা হল। ওরা একটা স্লিপ দিল। সেটি দেখালে আবার ফেরত পাব আমার জিনিষ। মাঝখান থেকে এই হল যে ঐ বিছানা খুললেই সর্বস্ব বেরিয়ে পড়ত আর বাঁধলেই সব বন্ধ হয়ে যেত। মহা অসুবিধে। তাছাড়া ঐ কম্বলের জন্যও শীতে মহাকষ্ট পেয়েছি। কিন্তু উপায়ই বা কি, ও-তো কাহিল হয়ে পড়েছে।

ওদিকের পুরান রাস্তা গরুড় গঙ্গা হয়ে যেটা গেছে, অতিরিক্ত বর্ষায় বিপদ সঙ্কুল হয়ে উঠেছে সেই পথ। তাই আমরা মোটর যাবার জন্য যে নতুন পথ তৈরী হচ্ছে সেই পথেই যাত্রা সুরু করলাম। এই পথেই সব প্রথম পড়ল বেলাকুচি চটি। সবে নতুন পত্তন হয়েছে। দোকান পাট কিছুই বসেনি। তবু একজন দোকানদার পয়সা নিয়ে আমাদের ভাত ডাল রেঁধে দিল। নীচে পাহাড়ের খাঁজে ঝরণাও দেখিয়ে দিল। জায়গাটা বেশ আব্রু, আর নির্জন দেখে সেই বরফ গলা জলেই প্রাণ ভরে স্নান করলাম ক'দিন পরে। তারপর সেই গরম গরম ডাল আর ভাত কি অমৃতই যে লাগল। কাঠের ধোঁয়া না খেয়ে এই প্রথম ভাত খেলাম। আবার হাঁটা। উঃ ভরপেট খেয়ে প্রাণ বেরুচ্ছে হাঁটতে। এদিকে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটিয়ে রাস্তা তৈরী হচ্ছে। সুতরাং ওখান দিয়ে পথ নেই বা থাক, বিপথ তো আছে। ডিঙ্গোও পাহাড়, কঠিন চড়াই। নীচে থেকে দেখলে বুক কাঁপে, মনে হয় ঐ পাহাড়ের চুড়োয় উঠব কি করে?

অনেক গুলো ভেড়া চলেছে পিঠে ছোট ছোট চামড়ার থলি নিয়ে। ভারী হাসি পায় ওদের পিঠে থলি নিয়ে হেলে দুলে চলার ভঙ্গি দেখে। ওদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে একদল পাহাড়ী ছেলে। কেমন অবলীলাক্রমে তরতর করে পাহাড়ে উঠছে ওরা। ঐ থলিতে কি নিয়ে যাচ্ছে জিজ্ঞেস করায় বলল নুন নিয়ে যাচ্ছে। ওপরে ত কিছুই মেলে না, তাই এই ভাবে ওরা আটা নুন নিয়ে যায়। ঐ ভেড়ার দুধ বা ওদেরই লোমে তৈরী কম্বলের বদলে।

বিশ্রী রাস্তা। রাস্তা কোথায়? একে রাস্তা বলে না, ঝোপ-ঝোড়, ক্ষেত ডিঙিয়ে পথ চলছি। কখন দু'পায়ে কখন চার হাত পায়। সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছলাম গুলাবকোঠি চটিতে। এখানকার চটিগুলো কেদারের মত বড় তো নয়ই তার ওপর ভীষণ নোংরা। জায়গার সঙ্গে সঙ্গে খাবারেরও বড় অভাব। তৈরী খাবার তো ছেড়েই দিলাম। নিজেরাই যে করে খাব তারও উপায় নেই। আটা আছে তো ঘি নেই, সব আছে তো কাঠই নেই। সবচেয়ে কষ্ট চা-ও নেই দুধও নেই কোন চটিতে। ছেলেদের কি যে খেতে দিই? আবার এতদূর এসে ফিরে যাবারও কোন মানে হয় না। মহামুস্কিলে পড়া গেল। তার ওপর আবার চটিবালাদের ব্যবহারও মোটেই আতিথ্যপূর্ণ নয়। যাই হোক কোন রকমে গোয়ালঘরের মত একটা নোংরা ঘরে স্থান পেলাম। তার মেঝেটা আবার এমন এবড়ো খেবড়ো যে রাত্রে তার ওপর শুয়ে কি করে যে ঘুম হবে সেই ভাবনায় পড়লাম। এদিকে যেখানে সেখানে পেতে পেতে সঙ্গের সতরঞ্চি দুটি আর একটি তোষকের যা হাল হয়েছে তা আর কহতব্য নয়। আচ্ছাদনের জন্য আছে দুটি মাত্র কম্বল বাকি দুটি রেখে এসেছি গোমার ভার লাঘব করতে। কোন রকমে রাত ভোর করে আবার হাঁটা শুরু করলাম। বৃষ্টির দরুণ রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা ছিল। তাই অতিরিক্ত ক্লান্তি আর ঠাণ্ডা হয়েছিল ঘুমের সহায়।

[ক্রমশঃ।

উৎসবমুখর ইংল্যাণ্ড

শ্রীমতী মঞ্জুলা ঘোষ

উৎসব মানেই আনন্দ। আর আনন্দই জীবনকে সুন্দর ক'রে তোলে। মানুষের জীবন আজ নানান সংঘাত ও সংগ্রামের মাঝে জড়ান। এ সবকে দূরে সরিয়ে মানুষের মন সত্যিকার আনন্দ চায়। কিন্তু সমাজ'ও ব্যবহারিক জীবনের ধারা ও গতি সহজ নয়—জটিলতায় ভরা। তাই উৎসবের দিনে মানুষের মন আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে ওঠে। আমাদের দেশ কেন—সব দেশেই উৎসবের আবেদন সমান ভাবে সকলের মনে নাড়া দেয়।

এদেশেও শীতের তুহিন স্পর্শ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই উৎসব-মুখর হয়ে ওঠে। England, Scotland, Wales এবং Ireland সব স্থানেই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশিষ্টতা নিয়ে এইসব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এ দেশে যত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে ওয়েলস্-এর Llangollen-এর জুলাই মাসের উৎসবটি সত্যিই অভিনব। Unesco'র ডিরেকটর জেনারেল Dr. Luther Evans এই উৎসব দেখবার পর বলেছেন যে, ওয়েলস্-এর অতীত সভ্যতা এই উৎসবের মাঝে বিকাশ লাভ করেছে, এই উৎসবের মাধ্যমে ওয়েলস্-এর বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক প্রগতিকে বেশ উপলব্ধি করা যায়। এই উৎসবের 'আবেদন ওয়েলস্-এর সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের অন্যতম উৎসবের পর্য্যায়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা এই উৎসবে যোগদান করেছেন তাঁরা সবাই Dr. Luther এর এই উক্তির সঙ্গে একমত হবেন।

Llangollen ওয়েলস্-এর একটি ছোট্ট শহর। খরস্রোতা Dee নদী এ শহরের কোল ঘেঁষে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। Dee নদীর উপর চতুর্দশ শতাব্দীর সেতুটি বহু পুরাতন হ'লেও—বর্ত্তমান কালে বিশ্বমৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের মিলনসেতু হিসাবে গণ্য হ'য়েছে। এই উৎসব পালনের পেছনে একটি চমৎকার ঘটনা লুকিয়ে আছে। Mrs. Eleanor Butler এবং Miss Sarah Ponsonby দু'জনেই

ছিলেন Ireland-এর সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। পারিবারিক অশান্তির জন্যে নিজেদের জন্মস্থান ছেড়ে Llangollenএ পালিয়ে আসেন আজ থেকে দু'শত বৎসর আগে। Llangollen-এর অধিবাসীরা এই অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের গ্রহণ করেন। এই দুই অতিথির আগমন উপলক্ষ্য করে বছরের পর বছর উৎসবের মাঝে আজ বিশ্বের সবাইকে তারা আহ্বান জানায়। এবারের উৎসবে তিরিশটির উপর জাতি তাদের জাতীয় পোষাকে, তাদের নিজস্ব পল্লীগীতি ও লোকনৃত্যের মাধ্যমে উৎসবকে মাতিয়ে তোলে। তাছাড়া ছয়দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত হয়।

Llangollen এর উৎসব ছাড়া গ্রেটব্রিটেনে আরও বহু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে London থেকে বাইরের শহরগুলিতেই বেশীরভাগ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। লণ্ডনের উৎসবের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় আগামী পঞ্চবার্ষিক চলচ্চিত্র উৎসবের কথা। কিছুদিন বাদেই এ উৎসব শুরু হ'বে, এ উৎসবে দেখান হবে বিভিন্ন দেশের নামকরা বা পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি।

আগেই বলেছি, শীতের শেষ হ'তেই যে উৎসব শুরু হয় যে উৎসব চলতে থাকে বিভিন্ন স্থানে হেমন্তের শেষ অবধি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই সব উৎসব চলে একসপ্তাহ ধরে তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দু'তিন সপ্তাহ ধরেও চলে। আবার Glyndebourne, Pitlochry এবং Stratford upon Avonএর উৎসবগুলি মাসের পর মাস ধরেই চলে।

এবার আপনাদের কাছে এদেশের কয়েকটি বিশেষ উৎসবের কথা বলছি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে Aldeburgh এর সঙ্গীত ও কলা উৎসব। London থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে এই Aldeburgh শহর। Suffolkএর পূর্বপ্রান্তে সাগরতীরে এই শহরটির এক আপন বৈশিষ্ট্য আছে। জুন মাসের প্রথম দিকে বা মাঝামাঝি থেকে সুরু করে দশদিনব্যাপী এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। এ দেশের অপেরা সম্প্রদায়, রাগপ্রধান সঙ্গীত, বক্তৃতা, নাটক ও প্রদর্শনীর মাঝে এ উৎসব মুখর হয়ে ওঠে।

Yorkshire এর উৎসবটিও এদেশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। York অতি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় শহর। লণ্ডন থেকে ১৯৪ মাইল দূর। মধ্যযুগীয় ধর্মমন্দির ও সুসংরক্ষিত প্রাচীর এ শহরের শোভা। এখানেই জুন মাস থেকে সুরু করে তিন সপ্তাহব্যাপী পৃথিবী বিখ্যাত রহস্য নাটকের পরিবেশন, সঙ্গীত, কবিতা, আবৃত্তি ও প্রদর্শনী এই উৎসবকে উপভোগ করে তোলে।

এবার Scotland এর কথা কিছুটা বলি। এই Scotlandএর Pitlochry নাট্যোৎসব এই ক'বছরেই বেশ নাম করেছে। প্রকৃতির লীলাভূমিতে এই নাট্যোৎসব এপ্রিল থেকে সুরু করে পাঁচমাসব্যাপী একটানা চলতে থাকে পার্বত্য উপত্যকা Perthshire এর বুকে উৎসব রঙ্গমঞ্চটি এমন সুন্দরস্থানে অবস্থিত যে, হাজার হাজার দর্শককে চমক লাগিয়ে দেয়। এই অনুষ্ঠানে বহু খ্যাত আধুনিক, প্রাচীন, বিদেশী ও Scoltish নাটক প্রদর্শিত হয়।

এই কিছুদিন আগে Scotland এর Edinburgh শহরে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত ও নাট্যোৎসব এবং সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র উৎসবও খুব জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

এর পরেই নাম করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে Bath এর উৎসবের কথা। London থেকে ১০৫ মাইল দূরে এই Bath। Somersetএর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ দর্শকের কাছে খুবই প্রিয়। এখানেই মে অথবা জুন মাসে দশদিনব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। Mr. Yehudi Menuhin এই উৎসবের পরিচালনা করেন। যন্ত্র-সঙ্গীতে ঐকতান ছাড়া, নাটক ও ব্যালে এই উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ।

অমর কবি ও নাট্যকার Shakespeareকে স্মরণ করে তাঁর জন্মস্থান Stratford-upon-Avonএ এপ্রিল মাস থেকে সুরু করে নয় মাস যাবৎ যে নাট্যোৎসব চলতে থাকে তা সত্যি অভিনব। Avon নদীর তীরে অবস্থিত Shakespeare Memorial Theatre আজ নাট্যামোদী ও Shakespeare অনুরাগীদের কাছে বিশেষ প্রিয়। Shakespeare এর নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে যারা বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী তারাই নাটক পরিচালনা ও অভিনয় করেন।

এ সব উৎসব ছাড়াও আরো বহু উৎসব এদেশে হয়ে থাকে। তবে বেশীর ভাগ উৎসবই গ্রীষ্মকালে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়কার উৎসবমুখর ইংল্যাণ্ডকে ভোলবার নয়।

[বি, বি, সি, বেতার 'বিচিত্রা'র সৌজন্যে]

দুঃখের মূল্য

বীণা দাশগুপ্ত

দুঃখেরে কেউ করিস্‌নে ভয়—
দুঃখেরে কর জয়,
দুঃখে প'ড়েই মানুষরা ভাই খাঁটি মানুষ হয়।
দুঃখ ছাড়া সুখের কোন মূল্য তো নাই ভাই,
দুঃখ ছাড়া যে জীবন তাতে কোন বৈচিত্র্য নাই।
দুঃখে ভেঙে পড়িসনে কেউ ভাই,
দুঃখে প'ড়েই আমরা যে ভাই অনেক শিক্ষা পাই।
দুঃখেরে ক'রে জয়, যে মানুষ বড় হয়—
তাহাদেরই কথা মানুষের মনে চিরদিন গেঁথে রয়।

দুঃখের মাঝে প'ড়ে ওরে থাকিস ধৈর্য্য ধরে,
তুলিসনে কেউ দুঃখের নিঃশ্বাস—
একদিন ভাই মিটিবে মোদের সকল মনের আশ।
দুঃখেরে যা'রা করে শুধু ভাই ভয়,
জীবনে তাদের উন্নতি কোন দিন নাহি হয়।
শত দুঃখের মাঝে যে মানুষ স্থির হ'য়ে ভাই রয়,
জীবন যুদ্ধে তা'দেরই যে হয় জয়।
চির সুখে থাকে যা'রা—
দুঃখীর ব্যথা কোন দিন নাহি বোঝে ভাই তা'রা।

দুঃখেরে ক'রে জয়, যে মানুষ বড় হয়
গরীবের ব্যথা চিরদিন তাদেরই যে মনে রয়।
গরীবের ব্যথা নাহি বুঝলো যে জন ভাই,
মানুষ জীবনে তার কোন মূল্যই নাই।
দুঃখের পরে আছে আছে ওরে সুখ
সেই সে দিনের প্রতীক্ষাতেই বাঁধ আজ সবে বুক।

কে তুমি আমায় ডাকো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সতীদেবী মুখোপাধ্যায়

জয়ন্তর গাড়ী দেখে মিতা মনে মনে খুসী হয়ে ভাবলে এইবার একটা উপভোগ্য দৃশ্য হবে। পরমুহূর্তে জয়ন্তর গাড়ী চলে যেতে মিতা দাদার ওপর ভীষণ চটে গিয়ে মনে মনে বললে, এক নম্বরের ভীতু! পালাবার কি দরকার ছিল? আজ বাবার সামনে পড়লে কত সহজে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো।

সুজাতাও রাগ কোরে ভাবলে, একবার দেখা করে গেলে কি ক্ষতি হোত? তার মনে সূক্ষ্ম অভিমানের খোঁচা লেগে মুখেও কিছুটা প্রকাশ পেল।

মিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুই বাদ গেল না। ভাল মানুষের মত প্রশ্ন করলে—কার একটা গাড়ী থামলো না? কই, কেউ নামলো না তো?

সুজাতা অন্যমনস্ক ভাবে বললে—তাই তো দেখছি।

মিতা বললে—বোধ হয় বাড়ী খুঁজছে।

সুজাতা বললে—তাই হবে হয়তো। এসো মিতা ভেতরে বসি গিয়ে।

ব্যারিষ্টার মুখার্জ্জীর বাড়ী থেকে ফিরেই মিতা দাদার ঘরের উদ্দেশ্যে ছুটলো। হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে প্রবেশ করে বললে—জানো দাদা আজ কি ব্যাপার হয়েছে?

বইয়ের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জয়ন্ত বললে—জানি, সুজাতার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

মিতা বললে—তুমি ফিরে এলে কেন? ওখানে বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সব সমস্যার সমাধান কত সহজে হোত বলতো?

জয়ন্ত ঘুরে বসে বললে—সমস্যার সমাধান হোত ঠিক, তবে আমার মুখে চুণকালি দিয়ে বিদেয় কোরতো সুজাতা।

—আ হা কি কথাই বললে। সে অমন কাজ কিছুতেই কোরতে পারে না!

জয়ন্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে—যাকগে ও কথা, যা হবার তা হয়েছে। এখন বল কেমন দেখলি?

মিতা দুষ্টুমি করে বললে—কাকে বল? তোমার হবু বৌকে না সুজাতাকে?

জয়ন্ত হাত বাড়াবার আগেই মিতা নাগালের বাইরে সরে এল।

জয়ন্ত বললে—পাকামী হচ্ছে!

—বাঃ পাকামী কোথায়? তোমার জন্যে পাত্রী দেখতে গেলুম কেমন লাগলো, বলবো না?

বিস্ময়ে জয়ন্ত উঠে দাঁড়ালো—পাত্রী! সুজাতাদের বাড়ীতে তোরা যাসনি?

মিতা বললে—ঐ তো বললুম বাবা পাত্রী দেখে তোমার সুজাতার বাড়ী গেলেন। আমিও গেলুম বাবার সঙ্গে।

জয়ন্ত ধপ করে চেয়ারে বসে পোড়লো—ওঁদের সঙ্গে বাবার আলাপ আছে নাকি?

বিজ্ঞের মত মিতা বললে—আলাপ মানে, সেই যে লক্ষ্ণৌয়ে বাবার একটা কেস চলছে না? সেটা তো ব্যারিষ্টার মুখার্জ্জীর হাতে। তাই বোধ হয় পরামর্শ করিতে গিয়েছিলেন।

জয়ন্ত কি ভাবতে ভাবতে সবেগে বলে উঠলো—বিয়ে এখন কিছুতেই কোরবো না।

মিতা দাদাকে বোঝাতে বোসলো—বাবার বন্ধুর মেয়ে দেখতেও চমৎকার। বাবার খুব পছন্দ হয়েছে, অবশ্য আমারও হয়েছে।

জয়ন্ত ধমকে উঠলো—যা যা আগে নিজের বিয়ের ব্যবস্থার কথা বলগে যা বাবার কাছে।

দাদার রাগ দেখে মিতা খুসীতে উবছে পোড়লো। বাইরে মুখ ভারি করে বললে, বারে আমার ওপর রাগ কোরছো কেন? বিয়ে কোরবে না সেটা বাবাকে গিয়ে বল।

জয়ন্ত অস্থির ভাবে বললে—মিতা লক্ষ্মীটি রাগ করিসনে আমার কথায়!

মিতা দুঃখিত ভাবে বললে—দাদা ওসব আলেয়ার পেছনে না ছুটে বাবার পছন্দ করা মেয়ের গলায় দুর্গা বলে ঝুলে পড়ো।

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে—না, এখনি তা হয় না। আমি শেষ অবধি দেখবো। তারপর যা হবার হবে। আগে দেখতে চাই ও আমাকে আসল পরিচয় পেয়ে কতখানি ঘৃণা করতে পারে। কথা দিচ্ছি বাবার অবাধ্য আমি হবো না।

মিতা দুঃখিত ভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। মায়ের কাছে গিয়ে বললে—মা দাদা বলছে এখন কিছুতেই বিয়ে কোরবে না।

সর্ব্বাণী দেবী বিস্ময় ভরে বললেন—কেন কি বলছে সে? বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই?

—দাদা বলছে বিয়ে কোরবে তবে এখন নয়।

সর্ব্বাণী দেবী একটু ভেবে নিয়ে বললেন—হ্যাঁ রে মিতা ও কি কোন মেয়েকে পছন্দ করে তোর কাছে কিছু বলছে?

মিতা ভালমানুষের মত বললে—মা না তা নয়। বাবার পছন্দ করা মেয়েকেই বিয়ে কোরবে দাদা।

মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলতে সঙ্কোচ হোল মিতার। তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করলে।

রাত্রে নীতীশবাবু অফিসের খাতাপত্র নিয়ে বসেছেন, সর্ব্বাণী দেবী এসে বললেন—মেয়েটিকে যে দেখে এলে, কেমন দেখলে কিছু বললে না তো!

নীতীশবাবু চোখ থেকে চশমা নামিয়ে বললেন—একেবারে ভুলে বসে আছি। অফিসে হিসাবপত্র নিয়ে এমন গোলমাল পাকিয়েছে যে, কোন দিকে মন দেবার অবসর নেই। যাক ও কথা, সন্তোষের মেয়েটিকে আমার এত ভাল লেগেছে তোমায় কি বোলবো। একবার ভাবলুম আজই পাকা কথা দিয়ে আসি। কিন্তু পরামর্শ না কোরে কোন ব্যাপারে এগনো ঠিক নয় ভেবে কিছু বলিনি সন্তোষকে। তুমি একবার দেখে এস তারপর—

সর্ব্বাণী দেবী বললেন, তাড়াহুড়ো করবার কি দরকার—খোকা ফিরে আসুক তারপর বিয়ে হবে। এখন তুমি কিছু বোল না ওঁদের।

—সে তো ঠিক কথা, কিন্তু প্রস্তাব করে না রাখলে হয়তো অন্যত্র বিয়ে হয়ে যেতে পারে।

নীতীশবাবুর কথা শুনে সর্ব্বাণী বললেন—আমার অন্তরের মনে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বড়র জায়গায় বড় কেউ জুড়ে না বসলে একটা ফাঁক চোখে পড়েই। বড়সাহেব রওনা হয়ে যাবার দিন-কতকের ধীরাপদর কাছে অন্তত তেমনি একটা ফাঁক স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ...শুর প্রখর তত্ত্বাবধানে কর্মস্থলের হাওয়া পালটেছে বটে, ফাঁকটা হয়নি।

...আগে দিনের অর্ধেক প্রসাধন-শাখায় কাটিয়ে তারপর এখানে ...সিতাংশু। এখন সেই রীতি বদলেছে। সকালে সোজা এই ...সে আসে, লাঞ্চের পর ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা-দেড়েকের জন্যে প্রসাধন- দেখতে বেরোয়। এই শাখাটির সঙ্গেও লাবণ্য সরকারের কোন ...স্বার্থের যোগ দেখা দিয়েছে কিনা কেউ জানে না। কিন্তু তাকেও ...সঙ্গে দেখা যায়।

...ড় বড় পার্টিগুলোর সঙ্গে সংযোগ রক্ষার দায়িত্বও তারা ...দের হাতে তুলে নিয়েছে। এক সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে ...। কাগজে-কলমে তার রিপোর্ট শুধু ধীরাপদ পায়। বড় ...সংশোধনের ব্যাপারেও তাই। স্থির যা করার তারাই করে, ...ন হলে সিনিয়র কেমিষ্ট জীবন সোমের পরামর্শ নেওয়া হয়। ...র্শের জন্ত আজকাল প্রায়ই তাঁকে এ-দালানে আসতে দেখা যায়। ...সরকারের পরে তিনিই সব থেকে বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছোট সাহেবের। ...র শুধু নির্দেশ অনুযায়ী কাজ চালানোর দায়িত্ব।

...আপত্তি নেই। ঝামেলা কম, ভাবনা-চিন্তা কম। কাজে এসেও ...মিলছে খানিকটা। ধীরাপদ যেন মজাই দেখে যাচ্ছে বসে ...মজা দেখতে গিয়ে সেই একটা দিনের কথা মনে পড়ে, যে-দিন ...হেবের মন বুঝে কর্তব্য ঠিক করার জন্ত লাবণ্য তাকে নার্সিং হোমে ...ছিল। বড়সাহেবের মনোভাবটা সেদিন তাকে খুব ভালো করে ...দিয়েছিল ধীরাপদ। পারিবারিক প্ল্যানে অনভিপ্রেত কিছু ...টা বড়সাহেব চান না জানিয়ে সিতাংশুর সঙ্গে অমিতাভকেও ...। কিন্তু সেই রাগে লাবণ্য এই কর্তব্য বেছে নিল? ...সে বলসে উঠেছিল মনে আছে, বলেছিল, ঘটে যদি তিনি ...বন কি করে?

...দের বিয়ে দিয়েও আটকাতে পারেন কিনা সেই চ্যালেঞ্জ এটা? ...সঙ্গে কোন্ ধরণের প্যাক্ট হয়েছে লাবণ্যর?

...তে গিয়েও হাসা হল না। চ্যালেঞ্জ হোক আর যাই হোক ...উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য যে, তার রিসার্চের স্কীম বাস্তিলের ফলাফল ভেবে এখনো লাবণ্য সরকার বিচলিত হয়, অস্বস্তির তাড়নায় ধীরাপদর ঘরে না এসে পারে না। পারে নি।

বিয়ের পরেও ছোট সাহেবের ঠিক এই রকম হাল-চাল দেখবে কেউ ভাবে নি। অনেকদিন আগের মতই সসঙ্গিনী ছোট শাদা গাড়িটা চোখের আড়াল হতে না হতে অনেককে মুখ টিপে হাসতে দেখা গেছে, অনেককে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে দেখা গেছে। ধীরাপদ আর মেম-ডাক্তারের প্রসঙ্গে বউয়ের আবিষ্কারটা নিজেদের মধ্যে কতটা ফলাও করে প্রচার করেছে তানিস সর্দার, ধীরাপদ জানে না। কিন্তু তার চোখেও বিভ্রান্ত কৌতূহল লক্ষ্য করেছে। সম্ভব হলে জিজ্ঞাসাই করে বসত, এ আবার কি রকম-সকম দেখি বাবু? ভদ্রজনদের এই দুর্বোধ্য রীতি নিয়ে সে বউয়ের সঙ্গেই জটলা করে হয়ত।

নতুন বউ আরতির সঙ্গে লাবণ্যর প্রাথমিক আলাপটা বড়সাহেবের মারফৎই হয়েছে মনে হয়। সিতাংশুর বিয়ের পর দু মাসের মধ্যে বার তিনেক সে প্রেসার চেক করতে এসেছিল। আর শেষ এসেছে বড়সাহেবের যাত্রার আগের সন্ধ্যায়। সেটা প্রেসার দেখতে নয়, এমনি দেখা করতে। ধীরাপদ উপস্থিত ছিল সেখানে, সিতাংশু ছিল, আরতি ছিল। শুধু অমিতাভ ছিল না। বড়সাহেব খাসা মেজাজে ছিলেন সন্ধ্যাটা। ঠাট্টা করেছেন, লাবণ্যকে প্রায়ই আজকাল নাকি গম্ভীর দেখছেন তিনি। বলেছেন, তোমার নিজের ব্লাড প্রেসার চেক-টেক করেছ শিগ্গীর? আবার বউয়ের কাছে লাবণ্যর কড়া ডাক্তারীর প্রশংসা করেছেন, বলেছেন, লাবণ্যর রোগীরা ওষুধ খেয়ে যত না সুস্থ বোধ করে, ধমক খেয়ে তার থেকে কম সুস্থ বোধ করে না। হাসছিল কম বেশি সকলেই। আরতি হাসছিল আর সকৌতুকে লাবণ্যকে দেখছিল। বড়সাহেব আরতিকে বলেছেন, কোনোরকম দরকার বুঝলেই এঁকে টেলিফোনে খবর দেবে, তোমার তো আবার ঘন ঘন মাথা ধরার রোগ আছে। লাবণ্যকে বলেছেন, তুমিও একটু খেয়াল রেখো—

কড়া ডাক্তারটির প্রসঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে আর কোনো শুভ সম্ভাবনার ইঙ্গিত ইতিমধ্যে বউয়ের কাছে তিনি ব্যক্ত করেছেন কিনা জানে না। যে রকম নিশ্চিন্ত আনন্দে আছেন, একেবারে অসম্ভব মনে হয় না। তিনি রওনা হয়ে যাবার এই তিন সপ্তাহের মধ্যে অন্তত লাবণ্য বউয়ের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখার কোনো তাগিদ অনুভব করেনি। সে এলে এমন কি বউকে টেলিফোন করলেও

খবরটা ঘুরে ফিরে মানকের মারফত কানে আসত। খবর থাকলেই মানকে খবর দেয়, তার কাছে দরকারী বা অদরকারী বলে কিছু নেই।

কিন্তু ধীরাপদ সেদিন এই বউটির মধ্যেই একটুখানি বৈচিত্র্যের ইশারা দেখল।

গোডাউনের টক দেখে দালানের দিকে ফিরছিল। বড়সাহেবের লাল গাড়িটা গাড়ি-বারান্দার নিচে এসে থামতে দেখে অবাক। শুধু সে নয়, এদিক-ওদিক থেকে আরো অনেকের উৎসুক দৃষ্টি এদিকে আটকেছে। ছোট সাহেবের সাদা গাড়ি সামনেই দাঁড়িয়ে, এ গাড়িতে কে এলো?

ড্রাইভারের পাশ থেকে ব্যস্তসমস্ত মানকে নামল। পিছনের দরজা খুলে আরতি। বেশবাস আর প্রসাধন-শ্রীর সঙ্গে মানকের সেই পুরনো বর্ণনা মিলছে। জমজমে সাজ-পোষাক আর কপোলে অধরে লালের বিন্যাস। কিন্তু মানকের পটে আঁকা মূর্তি নয় আদৌ, উল্টে সজীব শিখার মত বলা যেতে পারে।

এই মেয়েই ঘরের বধূ বেশে এত অন্যরকম যে হঠাৎ ধোঁকা খেতে হয়। ধীরাপদ আরো হতভম্ব তাকে এইখানে দেখে। অদূরে দাঁড়িয়েই গেছে সে। ড্রাইভার আর দরোয়ান শশব্যস্তে বউরাণীকে ভিতরে নিয়ে চলল। পিছনে মানকে।

দোতলার বারান্দায় শুধু মানকের সঙ্গেই দেখা হল ধীরাপদর। বোকার মত এদিক-ওদিক উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল। অকূল-পাথারে আপন-জনের সাক্ষাৎ মিলল যেন, মানকে আনন্দে উদ্ভাসিত।—বউরাণীকে ব্যবসা দেখাতে নিয়ে এলাম বাবু! বাবুর মুখে তবু সপ্রশ্ন বিস্ময় লক্ষ্য করেই হয়ত বাহাদুরির সবটা নিজের কাঁধে নেওয়া সঙ্গত বোধ করল না। উৎফুল্ল মুখেই কার্য-কারণ বিস্তার করল। খাওয়া-দাওয়ার পর বউরাণী ওকে ডেকে বলল, মাণিক চলো বাবুদের কারবার দেখে আসি, মস্ত ব্যাপার শুনেছি। ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলো—

বউরাণীর হুকুম, মানকে না নিয়ে এসে করে কি! তবু ছোট-সাহেবকে সে একটা টেলিফোন করতে পরামর্শ দিয়েছিল। বউরাণী বলেছেন, টেলিফোন করতে হবে না, টেলিফোন করার কি আছে! আর কেউ না থাকলে ধীরুবাবুই সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দেবেন আমাদের।

তার দরকার হয়নি, ছোটসাহেব আর লাবণ্য দু'জনেই আছে। বউরাণী তাদের ঘরেই গেছে।

কারখানা ভালো করে দেখতে হলে ঘণ্টা দুই লাগে। কিন্তু বউরাণীর কারখানা দেখা আধ-ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে গেল। নিচে থেকে পরিচিত হর্ণ কানে আসতে উঠে ধীরাপদ জানালার কাছে এসে দেখল, সামনে হাস্যবদন মানকে আর পিছনে তার বউরাণীকে নিয়ে লাল গাড়ি ফিরে চলল।

ভাবতে গেলে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু না। অস্বাভাবিক ভাবছেও না ধীরাপদ। তবু সে-দিনটা তলায় তলায় বিস্ময়ের ছোঁয়া একটু লেগেই থাকল। অবশ্য পরদিনই ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক এক সপ্তাহের মুখে মানকের দ্বিতীয় দফা আনন্দের ঝাপটা লাগতে ভিতরটা সজাগ হয়ে উঠল। রাত বেশি নয় তখন, এ-সময়টা ধীরাপদ ঘরে থাকলে আর মানকের হাতে কাজ না থাকলে ঘুরে-ফিরে সে বার বার এসে দর্শন দিয়ে যায়। তাকে এড়াবার জন্য ধীরাপদ অনেক-সময় ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকে নয়তো নাকের ডগায় একটা বই ধরে থাকে।

মানকে হাঁটু মুড়ে শয্যার পাশে মেঝেতে বসে পড়ল। বলার মত সংবাদ কিছু আছে এটা সেই লক্ষণ, ফলে ধীরাপদর মুখের কাছ থেকে বই সরল।

আজ আবার বউরাণীকে নিয়ে নয়া কারখানা দেখে এলাম বাবু—সেই সাজের কারখানা।

নয়া কারখানা বলতে প্রসাধন শাখা। মানকে জানালো বউরাণীর দেখা-শোনার সখ খুব, সবেতে আগ্রহ। তার ধারণা, ভার দিলে বউরাণীও মেমডাক্তারের মত বড় সড় একটা 'ডিপার্টমেন্টো' চালাতে পারেন।

এটুকুই বক্তব্য হলে মানকের বসার কথা নয়। শ্রোতার মুখের দিকে চেয়ে কৌতূহলের পরিমাণ আঁচ করতে চেষ্টা করল সে, তারপর গলা নামিয়ে একটা সংশয় ব্যক্ত করল।—বউরাণী আগে থাকতে না বলে না কয়ে এভাবে ছুট করে বেরিয়ে পড়েন তা বোধ হয় ছোট সাহেবের খুব পছন্দ নয় বাবু। আজ গম্ভীর গম্ভীর দেখলাম তেনাকে। মেম ডাক্তার অবশ্য খুব খুশি হয়েছেন, নিজেই ঘুরে ঘুরে দেখালেন শোনালেন, তারপর একগাদা সাজের দ্রব্য দিয়ে দিলেন সঙ্গে।

মানকের ওঠার লক্ষণ নেই, আর কিছু বলারও না। বইটা আবার মুখের সামনে ধরবে কিনা ভাবছিল ধীরাপদ।

বাবু—

দৃষ্টিটা তার মুখের ওপরে ফেলল আবার।

ভাগ্নেবাবুর কি হয়েছে বাবু?

কেন?

মানকের মুখে অস্বস্তির ছায়া, ইয়ে বউরাণী আজ সকালেও শুধোচ্ছিলেন—ভাগ্নেবাবু এদানীং দু'বেলার একবেলাও বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করেন না, বাড়িতে থাকেনও না বড়—

বলতে বলতে মানকে হঠাৎ আর একটু সামনে ঝুঁকে আরাক কমালো। ঈষৎ উত্তেজনায় ফিস ফিস করে বলল, বউরাণী বাড়িতে অমনি সাদাসিধে ভাবে থাকেন আর মিষ্টি মিষ্টি হাসেন—কিন্তু ভিতরে ভিতরে তেজ খুব বাবু, কাল রেতে ঘর-কয়ে শুনছিলাম ছোটসাহেবকে কড়কড়িয়ে কি-সব বলছিলেন। ছোটসাহেব মুখ ভার করে বসেছিলেন··কেয়ার-টেকবাবুও বউরাণীকে একদিন অমনি কড়া কথা বলতে শুনেছিলেন—ছোটসাহেব বউরাণীকে খুব ভয় করেন বলেন উনি!

মানকের ধারণা বউরাণীর এই মেজাজের সঙ্গে ভাগ্নেবাবুর অস্থির মতির কিছু যোগ আছে। নইলে আজই সকালেও বউরাণী হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন, আচ্ছা মাণিক দাদার কি হয়েছে জানো? মানকে মাথা নেড়েছে, ভাগ্নেবাবুর কিছু হয়েছে সেটা সে দেখছেও বুঝছেও, কিন্তু কেন কি হয়েছে তা জানবে কি করে? কিন্তু মাথা খাটিয়ে বউরাণীকে সে বলেছে, ধীরুবাবু জানতে পারেন। শুনে বউরাণী তক্ষুনি আদেশ করলেন, ধীরুবাবুকে একবার ওপরে ডেকে নিয়ে এসো। কিন্তু মানকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে না নামতে ফিরে ডাকলেন আবার, বললেন, এখন ডাকতে হবে না, থাক্—

মানকে উঠে যাবার পরও তার সমস্ত কথাগুলো বহুবার ধীরাপদর

মগজের মধ্যে ওঠা-নামা করেছে। আরতির এই তীক্ষ্ণ দিকটা সেইদিনই ধীরাপদর চোখে পড়েছিল, সেজেগুজে যে-দিন ফ্যাক্টরীতে এসেছিল। কিন্তু সিতাংশুকে কড়া কথা বলার সঙ্গে অমিতাভ ঘোষের কিছু হওয়া না হওয়ার কি যোগ বোঝা গেল না। মানুকের ওপরেই মনটা বিরূপ হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে এই একটি মেয়ের মধ্যেও অশান্তির বীজ ছড়ানো হয়ে গেছে তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মানুকেকে একটু কড়া করে শাসন করা দরকার। আগেই করা উচিত ছিল।

ধীরাপদ উঠে সিঁড়ির ও-পাশের ঘরে উঁকি দিল। ঘর অন্ধকার। গত এক-মাসের মধ্যে তিন-চারদিনের বেশি অমিতাভর সঙ্গে দেখা হয়নি। আর কথা একটাও হয়নি। অমিতাভ মুখ ঘুরিয়ে চলে গেছে, সেই যাওয়াটা তুনিয়ার সব-কিছুর ওপর পদাঘাত করে যাওয়ার মত। বাড়িতে থাকেই না বড়, থাকলেও ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। কারখানায় আসাই বন্ধ এক-রকম, খরগোশ নিয়ে এক্সপেরিমেন্টও বন্ধ। ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে হঠাৎ এক-একদিন এসে হাজির হওয়ার খবর পায়। ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্টে ঘোরে, আর যখন খুশি যা খুশি ছবি তোলে। তার গুণমুগ্ধ অনুগতদের মুখের খবর, সে এলে সিনিয়র কেমিষ্ট জীবন সোম ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করেন। কারণ চীফ কেমিষ্ট এক-একদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওয়ার্কশপে বসে থাকে, এমন কি সকলের ছুটি হয়ে গেলে একাই বসে থাকে। কাগজে-কলমে তো এখনো সিনিয়র কেমিষ্টের মুরুব্বী তিনি, ভদ্রলোক বলেনই বা কি।

সকলেরই বিশ্বাস যে-কারণেই হোক, চীফ কেমিষ্টের মাথাটা এবারে ভালমতই বিগড়েছে। ধীরাপদর আশঙ্কাও অন্য রকম নয়। ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে লোকটা কোথায় কোথায় ঘোরে, সমস্ত দিন করে কি, কি ছবি তোলে, কার ছবি? ছবির কথা মনে হলেই তার ঘরের অ্যালবাম তুটোর কথা মনে পড়ে। ওর একটা খুলেই ধীরাপদকে পালাতে হয়েছিল। কিন্তু সেই উদ্ধত অসংবৃত বিস্মৃতির খোরাক লোকটা আর কোথায় পাবে? কার ছবি তুলছে?

পরদিন। ধীরাপদ অফিসে যাবার জন্যে সবে তৈরি হয়েছে। খানিক আগে ছোটসাহেবের শাদা গাড়ি বেরিয়ে গেছে। ক্ষুব্ধ মুখে সামনে এসে দাঁড়াল কেয়ার-টেক্ বাবু। তার দিকে চেয়ে ধীরাপদ অবাক।

বাবু! আমরা চাকরি করি বলে কি মানুষ নই? বিচার নেই, বিবেচনা নেই হুট করে এতকালের চাকরিটা খেলেই হল!

চাপা উত্তেজনায় লিকলিকে শরীরটা কাঁপছে তার, টাকে ঘাম দেখা দিয়েছে। ধীরাপদর মুখে কথা সরে না খানিকক্ষণ।—কি হয়েছে?

মানুকের জবাব হয়ে গেল। অফিস যাওয়ার মুখে ছোটসাহেব তার পাওনা-গণ্ডা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেলেন।

কেন? না জিজ্ঞাসা করলেও হত, আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মর্জি। মর্জি বলব না তো আর কি বলব? উত্তেজনা বাড়ছে কেয়ার-টেক বাবুর, রাগের মাথায় মানুকেকেই গালাগাল করে নিল একপ্রস্থ।—ওটা এক নম্বরের গাধা বলেই তো, মাথায় এক রত্তি ঘিলু নেই বলেই তো—কতদিন সমঝে দিয়েছি, ছোটসাহেবের চোখের ওপরে দিন-রাত অমন বউরাণীর পায়ের কাছে ঘুর ঘুর করিস না, অত ভাল-মানুসি দেখাস না—এখন টের পেলি তো মজাটা! উল্টো সওয়াল হয়ে যাচ্ছে খেয়াল হতে একমুখেই মানুকের পক্ষ সমর্থন করল আবার।—তা ওরই বা দোষটা কি বাবু, মনিব ইনিও উনিও। বউরাণী কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলবে না? কোথাও নিয়ে যেতে বললে নিয়ে যাবে না? তা হলে তো আবার ও-তরপ থেকে জবাব হয়ে যাবে! পরিবারের মন যুগিয়ে চললে চাকরি যায় এমন তাজ্জব কথা কখনো শুনেছেন? ছোটসাহেবের রাগ পড়লে আপনি একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে বলুন বাবু, এ তুর্দিনে চাকরি গেলে চলবে কেন!

অফিসে যেতে যেতে ধীরাপদ আর কিছু ভাবছিল না, ভাবছিল শুধু কেয়ার-টেক বাবুর কথা। মানুকের চাকরি গেছে শুনলে তু'হাত তুলে নাচলেও যেখানে অস্বাভাবিক লাগত না—তার এই মূর্তি আর এই বচন! হঠাৎ চোরের মার দেখে একাদশী শিকদারের আর্ত উত্তেজনার দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল! বুকের তলায় কি-যে ব্যাপার কার, হদিস মেলা ভার।

কিন্তু একাদশী শিকদারের না হোক, কেয়ার-টেক বাবুর চিত্ত বিক্ষোভের হদিস সেই রাতেই মিলল। মিলল চারুদির বাড়িতে।

অফিসে বসে চারুদির টেলিফোন পেয়েছে, আফসের পর একবার যেতে হবে, কথা আছে। টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে ধীরাপদ ঠিক করেছিল যাবে না। চারুদির এই ডাকটা অনুরোধ নয়, অনেকটা আদেশের মত। সেদিন বলতে গেলে ধীরাপদকে তাড়িয়েই দিয়েছিলেন। চারুদি ব্যবসায়ের মনিবদেরই একজন বটে, কিন্তু এই মনিবের মন জুগিয়ে না চললে মানুকের মত তার চাকরি যাবে না।

বিকেলে বাড়ি এসে দেখে মানুকেরও চাকরি যায়নি। বরং মুখখানা ঠুনকো গাম্ভীর্যের আড়ালে হাস-হাসি মনে হচ্ছে। চা-জলখাবার দিতে এলে ধীরাপদই জিজ্ঞাসা করেছে তোমার জবাব হয়ে গিয়েছিল শুনলাম?

গেছল। আবার বহাল হয়েছি।

গাম্ভীর্য টিকল না, চেষ্টা সত্ত্বেও মুখের খাঁজে খাঁজে হাসির রেখা ফুটে উঠতে লাগল। তারপর মজার ব্যাপারটা ফাঁস করল। বিকেলে ছোটসাহেব ফিরতে বউরাণীর ঘরে মানুকের ডাক পড়েছিল। বউরাণী ওকে বললেন, এখানে তোমার জবাব হয়ে গিয়ে থাকে তো আমার বাপের বাড়ি গিয়ে কাজে লাগো—মাইনে যাতে এখান থেকে বেশি হয় আমি বলে দেব। মানুকে পালিয়ে এসেছিল, ছোটসাহেব বেরিয়ে যেতে আবার ডেকে বললেন, কোথাও যেতে হবে না, কাজ করোগে যাও।

ওনাদের মধ্যে আরো কথা হয়েছে বাবু, বড়সাহেবের ঘরে দাঁড়িয়ে কেয়ার-টেক বাবু স্ব-কর্ণে শুনেছে! বিস্ময়ে আনন্দে মানুকের তুচোখ কপালের দিকে ঠেলে উঠছে, আমি ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসতে ছোটসাহেব বউরাণীকে বলেছেন, তুমি চাকরবাকরের সামনে আমাকে অপমান করলে কেন? বউরাণীও তক্ষুনি বেশ মিষ্টি করে পাণ্টা শুধিয়েছেন, তুমি ওকে যেতে বলে আমাকে অপমান করোনি?

ব্যস, ছোটসাহেবের ঠোঁটে শেলাই একেবারে! মানুকে হি-হি করে হেসে উঠল।

মানুকের সত্যিই চাকরি যাক ধীরাপদ একবারও চায়নি। বরং

কি করবে, সিতাংশুকে কিছু বলবে কিনা ভেবে চিন্তিত হয়েছিল। চিন্তা গেল বটে, কিন্তু একটুও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না। বসে থাকতে ভালো লাগল না। চারুদির বাড়ি যাবে না ভেবেছিল, তবু সেখানে যাবার জন্যেই ঘর ছেড়ে বেরুল। সিঁড়ির ও-পাশের সরু ফালি-বারান্দায় মুখোমুখি বসে কাচের গ্লাসে চা খাচ্ছে মানুকে আর কেয়ার-টেক বাবু। ফিস ফিস করে কথা বলছে আর হাসছে। অন্তরঙ্গতার দৃশ্যটা আর কোনো সময়ে চোখে পড়লে অভিনব লাগত। আজ লাগল না। ধীরাপদ ওদের অগোচরে বেরিয়ে এলো।···স্বার্থের বাঁধন পলকা হলেও বড় সহজে টোটে না।

চারুদির বাড়ির গেটের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল ধীরাপদ। ইচ্ছে করেই গাড়িটা ভিতরে ঢোকালো না। বাড়ির দিকে চোখ পড়তে হঠাৎই ট্যাক্সি থামিয়েছে, তারপর লালমাটির পথ ভেঙে হেঁটে আসছে। বারান্দার একটা থামে ঠেস দিয়ে সিঁড়িতে বসে আছে পার্বতী। সামনের দিকে মুখ, মনে হবে বাগান দেখছে। বসার শিথিল ভঙ্গি এমনি স্থির নিশ্চল যে জানা না থাকলে মাটির মূর্তি বলেও ভ্রম হতে পারে। ধীরাপদ একেবারে সিঁড়ির গোড়ায় দু হাতের ব্যবধানের মধ্যে এসে দাঁড়ানো সত্ত্বেও টের পেল না।

ভালো আছ?

পার্বতী চমকালো একটু। ফিরে তাকালো, শাড়ির আঁচলটা বুক-পিঠ ঢেকে গলায় জড়িয়ে দিল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল। ভালো আছে।

বিকেলের আলোয় আসন্ন সন্ধ্যার কালচে ছোপ ধরেছে বলেই হয়ত মুখখানা অন্যরকম লাগছে একটু। কিন্তু ধীরাপদর চোখে কেন জানি অনির্বচনীয় লাগছে। পার্বতী এখনো যেন খুব কাছে উপস্থিত নয়, তার শান্ত মুখ থেকে এখনো দূরের তন্ময়তার ছায়া সরেনি।

ধীরাপদ কেন বলা দরকার বোধ করল জানে না, বলল, আসার জন্যে টেলিফোনে জোর তাগিদ দিয়েছেন চারুদি—

মা ভিতরে আছেন। যান।

পার্বতী না চাইলে কথা বাড়ানো যায় না। ধীরাপদ ভিতরের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু হঠাৎই হালকা লাগছে, ভালো লাগছে। পার্বতীর চোখে কোনো অনুযোগ দেখেনি, ভর্ৎসনা দেখেনি, ঘৃণা দেখেনি, বিদ্বেষ দেখেনি। এই মেয়ে এক মুহূর্তের জন্যেও নিজের কোনো দায় অন্যের ঘাড়ে ফেলেছে বলে মনে হয় না।

তাকে দেখা মাত্র চারুদির ঈষদুষ্ণ অভিযোগ, অফিস তো সেই কখন ছুটি হয়েছে, এতক্ষণ লাগল আসতে!

মুখের দিকে এক-নজর তাকিয়েই বোঝা গেল, চারুদির স্নায়ুর ধকল কাটা দূরে যাক, বেড়েছে আরো। মুখ ছেড়ে কানের ওপরের দু'ধারের লালচে চুলও ভেজা। অনেকবার জল দেওয়া হয়ে গেছে বোধ হয়। ধীরাপদ ইজিচেয়ারে বসে হালকা জবাব দিল, তোমার কথাটা বেশ জরুরী মনে হচ্ছে।

যথারীতি শয্যায় বসলেন চারুদি।—অফিস থেকেই আসছ তো, খাবে কিছু?

না। আজকাল যে-রকম অভ্যর্থনা জুটছে, ও-পাট সেরেই আসি।

হাসার কথা, কিন্তু চারুদি ভুরু কোঁচকালেন।—ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বরণ-কুলো সাজিয়ে অভ্যর্থনা করতে হবে? পর না ভেবে যখন যা দরকার নিজে চাইতে পারো না?

পারি। এখন সমস্যাটা কি বলো শুনি।

কিন্তু চারুদি চট করেই বললেন না কিছু। খাটে পা তুলে ঠেস দিয়ে বসলেন। তারপর চুপচাপ বসেই রইলেন খানিক। সে দেরিতে এলো বলেই রাগ, নইলে প্রয়োজনটা খুব জরুরী কিছু নয় যেন।

এর মধ্যে অমিতের সঙ্গে তোমার কিছু কথা হয়েছে?

না।

দেখা হয়েছে?

এবারেও একই জবাব দিলে ক্ষোভের কারণ হতে পারে। বললেন, যেটুকু হয়েছে এক-তরফা, তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকছেন।

এ-রকম পাগলের মত করে বেড়াচ্ছে তার রিসার্চের প্ল্যান বাতিল হয়েছে বলে না আর কোনো কারণ আছে?

আর কি কারণ?

চারুদি হঠাৎই বে-খাপ্পা প্রশ্ন করে বসলেন একটা, অভয় বলছিল, বউয়ের কান-ভাঙানি দিচ্ছে সন্দেহ করে সিতাংশু পুরনো চাকরটাকে আজ জবাব দিয়ে দিয়েছে?

অভয় কে?

তোমাদের কেয়ার-টেকবাবু। শুনলাম, লাবণ্যর সঙ্গে আজকাল আবার সিতাংশুর খুব ভাব সাব হয়েছে, এই জন্যেই বউটার অশান্তি। যাকৃগে, অমিতেরও সেই জন্যেই অত গাত্রদাহ নয় তো?

ধীরাপদর চোখের সামনে থেকে একটা পরদা সরে গেল। না, কোনো কিছুর মূলে মানুকে নয় তাহলে—মূলে ওই কেয়ার-টেকবাবু। ও-বাড়ির সব খবর এ বাড়িতে পৌঁছয় তারই মুখে, আর বউরাণীর কান ভাঙানি যদি কেউ দিয়ে থাকে—দিয়েছে সে-ই মানুকে নয়। এ-কাজ করার পক্ষে মানুকে নির্বোধই বটে, আর ধীরাপদও নির্বোধের মতই সর্বব্যাপারে তাকে দায়ি করে আসছে। ওই জন্যেই সকালে ওই মূর্তিতে তার শরণাপন্ন হয়েছিল কেয়ার-টেকবাবু, মানুকের জবাব হয়ে যাবার মধ্যে নিজের বিপদের বিভীষিকা দেখেছিল সে।

একটু ভেবে বলল, না তা নয়, রিসার্চ প্ল্যান নাকচ হতে নিজে যে-ভাবে জ্বলছেন তিনি, তাতে আর কারো ভাব-সাব তাঁর চোখে পড়ছে না।

একেবারে নাকচ হল কেন তাহলে? আর তোমরাই বা চুপচাপ বসে আছে কেন? যে-রকম ক্ষেপে উঠেছে, একটা কিছু বিপদ হতে কতক্ষণ! আমাকে হুকুম করে গেছে, আমার চার আনা অংশ কড়ায় গণ্ডায় তুলে নিতে হবে, নিজের দু-আনা অংশও ছাড়িয়ে নেবে, ভিন্ন কোম্পানী করবে তারপর—তুমি এলে তোমাকেও নেবে। এই সব পাগলামী করছে আর উকীল ব্যারিষ্টারের কাছে ছোটাছুটি করছে। আমি সায় দিইনি বলে পারে তো আমাকে খুন করে, ঘন ঘন নানা রকমের পরামর্শদাতা এনে হাজির করছে বাড়িতে। এর কি হবে? নাকি কোর্ট-কাচারি হয়ে একটা কেলেঙ্কারি হোক তাই চায় সকলে? তোমাদের বড়সাহেবকে কালই একটা জরুরী খবর পাঠাও, সব খুলে লেখ তাকে—

ব্যাপারটা এদিকে গড়াচ্ছে ধীরাপদ ভাবেনি। হঠাৎই একটা ভাঙনের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে চুপচাপ বসে রইল

খানিকক্ষণ। কিন্তু এ-যেন কিছু একটা বলার মত প্রশস্ত মুহূর্তও বটে। বলল, বড়সাহেব এ-জন্যে একটুও চিন্তিত নন, আমাকে ওষুধ বাতলে দিয়ে গেছেন তিনি, এখন তুমি রাজি হলেই হয়।

চারুদি সোজা হয়ে বসলেন, চিন্তাক্লিষ্ট মুখে কঠিন রেখা পড়তে লাগল, তপ্ত চোখে শঙ্কার ছায়াও একটু। চাপা ঝাঁঝে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে রাজি হলে কি হয়?

বিয়েতে। অমিতবাবু আর লাবণ্য সরকারের বিয়েটা দিয়ে ফেললেই সব দিকের গোলযোগ মেটে, আর কোনো দুশ্চিন্তার কারণ থাকে না। তোমাকে বুঝিয়ে বলে মত করানোর জন্যে আমাকে বিশেষ করে বলে গেছেন তিনি।

আমার মতামতে কি যায় আসে, বিয়ে দিক! চারুদির লালচে মুখে আগুনের আভা, কণ্ঠস্বরেও আগুনের হলকা। তীক্ষ্ণ কটু কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন তিনি, কিন্তু এদিকের কি হবে? এদিকে?

কোন্ দিকের?

আমাকে আক্কেল দেবার জন্য ওই যে হতভাগী পোড়ারমুখি পেটে ধরেছে একটাকে, তার কি হবে? সে কি করবে? দুনিয়ায় উনি আর তার ভাগ্নেই শুধু মানুষ, তারা নিশ্চিন্ত হলেই সব হয়ে গেল—আর কেউ মানুষ নয় আর কেউ কিছু নয়, কেমন?

ধীরাপদ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল একটা, নিস্পৃহতার আবরণটা অকস্মাৎ ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে চারুদিকেই দেখছে সে। এই জন্যেই গেল দিনে চারুদির অমন ক্ষিপ্ত মূর্তি দেখেছিল, পার্বতীর ওপর অমন ক্ষিপ্ত আক্রোশ দেখেছিল।

চারুদি দম নিলেন একটু, একটু সংযতও করলেন নিজেকে। গলার স্বর অত চড়ল না কিন্তু তেমনি কঠিন। বললেন, বড়সাহেবের হয়ে পরামর্শ করতে আসার আগে অমিতকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, কি হবে—তার পর যেন অন্য ভাবনা ভাবে, নইলে আমিই তাকে ভালো হাতে শিক্ষা দেব। সবই খেলা পেয়েছে—

এই আগুনে-খেলার গোড়ায় প্রশ্রয়টা কে দিয়েছে সে কথা মনে হলেও বলা গেল না। খানিক নীরব থেকে ধীরাপদ শুধু জিজ্ঞাসা করল, তিনি জানেন···?

তার জানার দায়টা কী? চারুদি আবারও ফুঁসে উঠলেন, সে দিনরাত রিসার্চের ভাবনা ভাবছে না? মস্ত মানুষ না সে? আর বলবেই বা কে, মুখে কালি লেপেও দেমাকে মাটিতে পা পড়ে হতভাগীর? বললে মাথা নিতে আসবে না।

হঠাৎ দরজার ওধারে চোখ যেতে সেই উগ্র মূর্তিতেই চারুদি থমকালেন, তারপর নিরুপায় হয়েই আবারো জ্বলে উঠলেন যেন, ওখানে দাঁড়িয়ে শুনছিস কি পাথরের মত? এই তো বললাম ওকে—কি করবি তুই আমার?

ধীরাপদও ঘাড় ফিরিয়েছে, তার পরেই আড়ষ্ট। দরজার ওধারে পাথরের মতই পার্বতী দাঁড়িয়ে—কিন্তু পাথরের মত কঠিন নয় একটুও। কমনীয়। শাড়ির আঁচলটা বুক-পিঠ ঘিরে গলায় তেমনি করে জড়ানো। চারুদির দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইল খানিক, ধীরাপদকেও দেখল একবার। তারপর নিঃশব্দে চলে গেল।

একটা বিভ্রান্তির মধ্যে কেটেছে ধীরাপদর সেই রাতটা। আর থেকে থেকে চারুদির বিরুদ্ধেই রুক্ষ হয়ে উঠেছে ভিতরটা। রাগে জ্বলে পুড়ে দুদিনই মুখে কালি লেপা আর কালি মাথার কথা বলেছে চারুদি। কেবলই মনে হয়েছে নিজে একটা শিশু-অঙ্কুর প্রতিরোধ করতে পেরেছে বলেই এমন কথা চারুদির মুখে সাজে না। চকিতের দেখায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পার্বতীর সেই মুখে কোথাও এতটুকু কালোর ছায়া দেখেনি ধীরাপদ, কোথাও একটা কালির আঁচড় চোখে পড়েনি। কুমারী জীবনের এই পরিস্থিতিতে ও-ভাবে দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে শুধু পার্বতীই পারে বুঝি, দাঁড়িয়ে অমন নিঃশব্দে সেই আবার চলে যেতে পারে। চারুদির ধারণা, শুধু তাঁকে জব্দ করার জন্যেই ইচ্ছে করে এই প্রতিশোধ নিলে পার্বতী। কিন্তু ধীরাপদর একবারও তা মনে হয় না। তার ইচ্ছাটুকুই শুধু সত্যি হতে পারে, সেই ইচ্ছার মূলে আর যাই থাক, প্রতিশোধের কোনো জ্বালা নেই। তার দরজার কাছে এসে দাঁড়ানোর মধ্যে ধীরাপদ এতটুকু অভিযোগ দেখেনি, যাতনা দেখেনি, মর্মদাহ দেখেনি। সেখানে এসে আর তাদের দিকে চেয়ে পার্বতী নিঃশব্দে শুধু নিরস্ত হতে বলেছে তাদের। আর কিছুই বলেনি, আর কিছুই চায়নি।

সিঁড়ির থামে শিথিল দেহ-লগ্ন সেই দুয়ের তন্ময়তা ধীরাপদ ভুলবে না।

অফিস থেকে ফিরে সে অমিতাভর ঘরে উঁকি দেয় একবার। তারপর রাতের মধ্যে অনেকবার। কিন্তু বেশি রাতে ছাড়া তার দেখা মেলে না। আবার ফেরেও না প্রায়ই। মনে মনে কি জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ধীরাপদ, নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় খুব।

সেদিন অফিস থেকে ফিরেই হতভম্ব। তার ঘরে রমণী পণ্ডিত বসে।

উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারা মূর্তি। মুখ পোড়া কাঠের মত কালচে, দেখলেই শঙ্কা জাগে বড় রকমের ঝড়ে দিক কূল হারিয়েছেন। তাকে দেখা মাত্র গলা দিয়ে একটা কোঁপানো শব্দ বার করে উঠে এলেন, তারপরেই অকস্মাৎ বসে পড়ে তার দুই হাঁটু জাপটে ধরলেন।

সর্বনাশ হয়েছে ধীরুবাবু, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমার কুমু আর নেই, তাকে আপনি খুঁজে বার করে দিন।

ধীরাপদ এমনই হকচকিয়ে গেল যে কি বলবে কি জিজ্ঞাসা করবে দিশা পেয়ে উঠল না। বিমূঢ় বিস্ময়ে দাঁড়িয়েই রইল খানিক, তারপর রমণী পণ্ডিতকে টেনে তুলে বিছানায় বসিয়ে দিল।

কি হয়েছে?

পণ্ডিত আর্তনাদ করে উঠলেন, তিন দিন ধরে কুমু নেই, থানায় খবর দিয়েছি, সমস্ত কলকাতা চষেছি—কেউ কিছু বলতে পারলে না। তাকে কারা ধরে নিয়ে গেছে ধীরু বাবু, হয়ত সরিয়েই ফেলেছে—

দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। ধীরাপদ বিমূঢ় মুখে চেয়ে আছে, তাঁকেই দেখছে। এমন উদ্‌ভ্রান্ত শোক না দেখলে ব্যাপারটাকে হয়ত অনেকটা সহজ ভাবেই নিতে পারত সে। একটু আত্মস্থ হয়ে রমণী পণ্ডিত জানালেন, তিন দিন আগে খেয়ে-দেয়ে যেমন বেতের ঝুড়ি বানানোর কাজে বেরোয়, তেমনি বেরিয়ে ছিল কুমু, ফিরে এসে বাবার সঙ্গে ভাই-বোনদের জামা-কাপড় আর মায়ের জন্য শাড়ি কিনতে যাবে বলে গিয়েছিল। লোকে যাই বলুক, বাবা-মা ভাই-বোন অন্ত প্রাণ মেয়েটার। কক্ষনো সে নিজের ইচ্ছেয় কোথাও যায়নি, পণ্ডিতের দৃঢ় বিশ্বাস মেয়েটা কারো ষড়যন্ত্রের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। মেয়ের শোকে গণুদাস হাতে পায়ে ধরেছেন পণ্ডিত, তাঁর কেবলই

মায়ের মমতা ও
অষ্টারমিল্কে
প্রতিপালিত
আপনার শিশু অষ্টারমিল্কে প্রতি-
পালিত বলেই এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, সদাই
হাসি খুশী। কারণ অষ্টারমিল্ক ঠিক
মায়ের দুধেরই মতন। অষ্টারমিল্ক খাঁটি দুধ
থেকে শিশুদের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে
তৈরী। সেজন্য সহজেই হজম হয়। শিশুদের
রক্তাল্পতা থেকে বাঁচাবার
জন্য অষ্টারমিল্কে লৌহ আছে। এতে
ভিটামিন 'ডি' ও যোগ করা
হয়েছে, ফলে আপনার শিশুর
দাঁত ও হাড় মজবুত হয়ে
গড়ে উঠবে।
OSTERMILK
...মায়ের দুধেরই মতন
বিনামূল্যে অষ্টারমিল্ক পুস্তিকা (ইংরেজীতে) আধুনিক শিশু
পরিচর্য্যার সবরকম তথ্য সম্বলিত। ডাক খরচের জন্য ৫০ নয়া পয়সার ডাক টিকিট
পাঠান—এই ঠিকানায় 'অষ্টারমিল্ক' পোঃ বক্স নং ২২৫৭ কোলকাতা—১।
OS. 9-X51-C. BG

মনে হয়েছে সে হয়ত জানে কিছু, কিন্তু গণুদা ভয়ানক রেগে গাল মন্দ করে তাড়িয়ে দিয়েছে তাঁকে।

হঠাৎ এ কি হল ধীরাপদর? বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই দেহের সমস্ত কোষে কোষে অণুতে অণুতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি একটা, তারপরেই নিস্পন্দ একেবারে। শুধু মাত্র কোনো একটা সম্ভাবনার এমন প্রতিক্রিয়া হয় না, সম্ভাবনাটা নিদারুণ কিছু সত্যের মতই অন্তস্তল ছিঁড়ে-খুঁড়ে চেতনার গোচরে ঠেলে উঠছে।

সেই লোকটা কে? সুলতান কুঠির পথে চার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সেদিন গণুদা যার সঙ্গে কথা কইছিল, সেই কোট-প্যান্ট পরা ঘাস-রঙা সিগারেটের টিন হাতে লোকটা কে?

কে? কে? কে? কে?

আলো জ্বললে যে-ভাবে অন্ধকার সরে, ধীরাপদর চোখের সম্মুখ থেকে বিস্মৃতির পরদাটা পলকে সরে গেল তেমনি। অনেক, অনেক-দিন আগে প্রথম দেখেছিল কার্জন পার্কের লোহার বেঞ্চিতে বসে—গোপনীয় বাক-বিতণ্ডার পর পকেটের পার্স বার করে একজন অশুভ-মূর্তি লোকের হাতে গোটা কয়েক নোট গুঁজে দিতে দেখেছিল। দ্বিতীয় দিন দেখেছিল গড়ের মাঠে বসে, একদা লাইট পোষ্ট আর বাস-ষ্টপের ক্ষীণ-যৌবন পসারিণী কাঞ্চনের সঙ্গে। যে-দিন মেয়েটার পসারই লুঠ হয়েছিল—দাম মেলেনি।...এই লোকের কাছেই বঞ্চিত হয়েছিল, বঞ্চিত হয়ে ভয়ে ভগ্ন-বিকীর্ণ হতাশায় কাঁদতে কাঁদতে কাঞ্চন অন্ধকার মাঠে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।

সেই লোক। কার্জন পার্কের সেই লোক, গড়ের মাঠের সেই লোক।

সম্বিৎ ফিরতে ধীরাপদ ডাকল, আমার সঙ্গে আসুন।

ট্যাক্সি ছুটেছে সুলতান কুঠির দিকে। ধীরাপদ স্থাণুর মত বসে। পাশে রমণী পণ্ডিত। তাঁর শোক আর বিলাপে ছেদ পড়েছে আপাতত, আশা-আশঙ্কা নিয়ে ফিরে ফিরে দেখছেন। কেন জানি কথা কইতেও ভরসা পাচ্ছেন না খুব।

ট্যাক্সিটা সুলতান কুঠির খানিক আগে ছেড়ে দিয়ে ধীরাপদ হাঁটা-পথ ধরল। পিছনে রমণী পণ্ডিত, তাঁর অবসন্ন পা দুটো সামনের লোকটার সঙ্গে সমান তালে চলছে না।

ধীরাপদ দাঁড়িয়ে গেল, মজা পুকুরের ও-ধারে একলা গণুদা বসে। রমণী পণ্ডিতকে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে পুকুরটা ঘুরে একলাই ওধারে চলল। একটা অপ্রিয় পরিস্থিতি এড়ানো গেল, সোনাবউদি আর ছেলেমেয়েগুলোর চোখের ওপর গণুদাকে বাইরে ডেকে আনার দরকার হল না। ওখান থেকে সুলতান কুঠি দেখাও যায় না, গাছ-গাছড়ার আড়ালে পড়ে।

গণুদা আড়ালই নিয়েছে। ধীরাপদ আর ওপারে রমণী পণ্ডিতকে দেখে বিষম চমকে উঠল। পাংশু শুকনো মুখ আরো শুকিয়ে গেল।

কুমু কোথায়? নরম করে সাদাসিধে ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছে ধীরাপদ।

ইলেক্‌ট্রিক শক খাওয়ার মত গণুদা বসা থেকে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। তারপরেই রাগে ফেটে পড়তে চাইল, আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? আমি কার খবর রাখি? আমাকে জিজ্ঞাসা করার মানে কি?

কুমু কোথায়?

বা রে? গণুদার রাগের জোর কমছে, তাই গলা বাড়ছে। এবারের কোপটা রমণী পণ্ডিতের ওপর।—ওই উনি বলেছেন বুঝি আমার কথা! এত বড় জ্যোতিষী হয়েছেন গুণে মেয়ে কোথায় বার করুন—আমার কাছে কেন? আমি কি জানি! উনি নিজে জানেন না কেমন মেয়ে ওঁর? গণুদার ফরসা মুখ কাগজের মত শাদা, রাগে কাঁপছে।

ধীরাপদ দেখছে তাকে, সঙ্কটে পড়লে অনেক প্রারে মানুষ। একসঙ্গে পাঁচটা কথা জুড়তে পারত না গণুদা, তার এই মূর্তি আর এই কথা।

চার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সেদিন যার সঙ্গে কথা কইছিলেন সেই লোকটা কে? ধীরাপদর কণ্ঠস্বর আরো শান্ত, কিন্তু আরো কঠিন।

কো—কোন্ লোক?

চক-চকে চেহারা, চকচকে স্যুট পরা, হাতে ঘাস-রঙা সিগারেটের টিন—

ইয়ে, আমি—তার কি? দুই চোখে অব্যক্ত ত্রাস গণুদার। হঠাৎই যেন রাগের মুখোশটা এক টানে খুলে নিয়ে তারই আতঙ্কগ্রস্ত মুখের ওপর সেটা ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে সেটা।

তাকে আমি চিনি। তাকে কোথায় পাওয়া যাবে এখন?

আমি জানি না, আমি কিছু জানি না! নিজেকে টেনে তোলার শেষ উগ্র চেষ্টা গণুদার।

ধীরাপদ অপেক্ষা করল একটু। তারপর যাবার জন্য পা বাড়িয়েও ফিরল একবার। তেমনি অনুচ্চ কঠিন স্বরে বলল, পুলিস আপনার মুখ থেকে কথা বার করতে পারবে।

জোর গেল, পায়ের নিচে মাটি সরল, সবক'টা স্নায়ু একসঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ল। হঠাৎই দু' হাতে ধীরাপদর হাত দুটো আঁকড়ে ধরল গণুদা, সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে, গলা জিভ ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ।

আমাকে বাঁচাও ধীরু। লোকটা ঠিক এই করবে আমি জানতুম না। আমাকে বাঁচাও ধীরুভাই!

লোকটা ধরা পড়েছে আট চল্লিশ ঘণ্টা বাদে। সঙ্গে একটা সুসংবদ্ধ দলের হদিস পাওয়া গেছে।

কুমুকে থানায় আনা হয়েছে। আরো কয়েকটি নিখোঁজ মেয়ের সন্ধান মিলেছে।

আর, একাদশী শিকদারের খবরের কাগজ পড়ার তৃষ্ণা বরাবরকার মত মিটে গেছে।

রহস্যটা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট এখন। তিনি ঘরের কোণে সেঁধিয়েছেন। আর তাঁকে কোনদিন কাগজের প্রত্যাশায় উন্মুখ আগ্রহে কদমতলার বেঞ্চিতে বসে থাকতে দেখা যাবে না। যে ত্রাসে সকালে উঠেই তিনি কাগজ হাতে নিতেন আর যেটুকু খবরের ওপর চোখ বুলিয়েই সেই দিনটার মত নিশ্চিন্ত হতে পারতেন—চকচকে স্যুট পরা ঘাস-রঙের সিগারেটের টিন হাতে লোকটাকে পুলিস জালে আটকানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই সব কিছুর নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

লোকটা একাদশী শিকদারের ছেলে।

গণুদাকে সনাক্ত করার জন্ম পুলিস সেই ছেলেকে সুলতান কুঠিতে নিয়ে এসেছে। বাঁচার তাড়নায় বিপর্যয়ের মুখে লোকটা গণুদাকেও আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়েছে। ঘটনাটা স্বাবালিকার প্রতি একটা বিচ্ছিন্ন মোহ প্রমাণ করতে পারলে শাস্তি লাঘবের সম্ভাবনা। তার বক্তব্য, মেয়েটাকে গণুদাই তার হাতে তুলে দিয়েছে। আর, মেয়েটাও স্বেচ্ছায় এসেছে।

সেই একদিন ঘরের কোণ থেকে একাদশী শিকদারকেও টেনে বার করেছে পুলিস। জেরা করেছে। মামুলি জেরা। শিকদার মশাই সব কথার জবাব দিয়ে উঠতে পারেননি। চেষ্টা করেছেন, মুখ নড়েছে, ঠোঁট ছুটো নড়েছে—স্বর বেরোয়নি। কোটরাগত চোখ দুটো ছেলের সর্বাঙ্গে ওঠা-নামা করেছে। ধীরাপদ আড়ষ্ট হয়ে দেখছিল, হঠাৎই সেই চোরের মারের কথা মনে পড়েছে। একাদশী শিকদারের সেই অসহায় উদ্‌ভ্রান্ত উত্তেজনারও হদিস মিলেছে। চোরের জায়গায় নিজের অপরাধী ছেলেকে বসিয়ে জনতার বিচারের বিভীষিকা দেখেছিলেন তিনি।···শকুনি ভটচাযকে তোয়াজ করে চলতেন কেন একাদশী শিকদার? গোপনে শাস্তি-স্বস্ত্যয়ন করাতেন তাঁকে দিয়ে—কারো মঙ্গলের জন্ম, হয়ত বা কারো সুমতির জন্মও। রমণী পণ্ডিতের বদ্ধ ধারণা শকুনি ভট্চায্ কিছু দুর্বলতার আভাস পেয়েছিলেন, তাই তাঁর মৃত্যুতেও শিকদার মশাইকে শোকগ্রস্ত মনে হয়নি তেমন।

ধারণাটা এমন নির্মম সত্যের আগুনে দগদগিয়ে উঠতে পারে কেউ ভাবেনি। ছেলেকে নয়, দু'-চোখ টান করে একাদশী শিকদারকেই দেখছিল ধীরাপদ। মৃত্যু-ছোঁয়া ঘোলাটে চোখের তারায় আর বলির ভাঁজে ভাঁজে স্নেহের অক্ষরে বিধাতার অভিশাপ রচনা দেখছিল।

কুমু ভয় পেয়েছিল। অন্যথায় একাদশী শিকদারের ছেলের একার জবাবদিহিতে গণুদা এতটা জড়িয়ে পড়ত কিনা বলা যায় না। কিন্তু মেয়েটা মারাত্মক ভয় পেয়েছিল। পুরুষের যে-মোহ এতদিন রঙিন বস্তু বলে জেনে এসেছে এই ক'টা দিনে তার বীভৎস নিষ্ঠুরতার দিকটাও দেখা হয়ে গেছে বোধ হয়। তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসার পরেও নিরাপদ বোধ করছিল না, আসামীর সামনে বসে কাঁপছিল থরথরিয়ে। সেই দিশাহারা চাউনি দেখে ধীরাপদর মনে হয়েছে, তখনো মাংস-লোলুপ একটা নেকড়ের সামনেই বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে।

পরে কুমুর ভীতত্রস্ত জবানবন্দি থেকে পুলিসের খাতায় একটা বিস্তৃত সন্ধানের উপকরণ সংগ্রহ হয়েছে। শুধু নিপীড়ন নির্যাতন নয়, অনেক রকমের ভয় দেখিয়ে দলের একজনের স্ত্রী সাজিয়ে আসামী তাকে বাইরে চালান দেবার ব্যবস্থা করেছিল। পুলিসের জেরায় গণুদার নামটাও প্রকাশ হয়ে পড়েছে। লোকটার সঙ্গে গণুদাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল, তার বিশেষ বন্ধু, মস্ত কারবারী—এই বন্ধু সদয় থাকলে কুমুর আর ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে হবে না। পুলিসের একটা ঈষদুষ্ণ ধমক খেয়ে কুমু স্বীকার করেছে, অকারণে একবার গণুদা টাকাও তাকে কিছু দিয়েছে।

গণুদাকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে।

তার আগে ঘটনার একটা মোটামুটি আভাস ধীরাপদ পেয়েছে। প্রাণের দায়ে গণুদা যা বলেছিল তা মিথ্যে নয় হয়ত। মেয়েরা যে কার্সে বেতের ঝুড়ি কার্ড-বোর্ড বাক্স ইত্যাদি বানায় একাদশী শিকদারের ওই ছেলেকে প্রায়ই সেখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যেত। কার ছেলে সেটা জানা গেছে লোকটাকে পুলিসে ধরার পর। গণুদা-ও সেখানে চাকরির চেষ্টায় আসত প্রায়ই। নিজেকে লোকটা একজন বড় কনট্রাক্টর বলে পরিচয় দিয়েছিল। সেধে গণুদার সঙ্গে আলাপ করেছে, সে আলাপ ঘনিষ্ঠ হতেও সময় লাগেনি। তাকে সুদিনের আশ্বাস দিয়েছে আর দফায় দফায় টাকাও দিয়েছে। একটা মেয়ের সঙ্গে খাতির করার লোভে এ-ভাবে টাকা কেউ দিতে পারে গণুদার ধারণা ছিল না। বড়লোকের যেমন রোগ থাকে তেমনি রোগ ভেবেছিল। পণ্ডিতের ওই মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র যা, দু'দিন আগে হোক পরে হোক তার সাহায্য ছাড়াও লোকটা তাকে হাত করবেই জানত। তাই ফালতু আসছে ভেবে নির্বোধের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নিয়েছে গণুদা, অভাবের তাড়নায় লোভ সামলাতে পারেনি।···কিন্তু এ-যে এত বড় ষড়যন্ত্রের ব্যাপার সে কল্পনাও করেনি।

প্রধান আসামীসহ গণুদাকে অদূরের পুলিসভ্যানে চালান দিয়ে অফিসার ভদ্রলোক আবার দাওয়ায় ফিরে এলেন সোনাবউদির ষ্টেটমেন্ট নেবার জন্যে। ধীরাপদর তড়িতাহত বোধশক্তি এতক্ষণে একটা বিপরীত ঘায়ে সজাগ হল যেন। সোনাবউদি দরজা ধরে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে, উমা আর ছোট ছেলে দুটোর চোখে মুখে বোবা ত্রাস। সম্ভব হলে অফিসারটিকে ফেরাত ধীরাপদ। সম্ভব নয়, নিজের ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বসালো তাঁকে। সোনাবউদিকে ডাকতে হল না, বাইরে এসে তার দিকে তাকাতেই বুঝল। মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু, তারপর নিজের অগোচরেই যেন এক পা দু'-পা করে এ-ঘরে এসে দাঁড়াল।

এক অব্যক্ত বেদনায় ধীরাপদর তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল সেদিকে, অন্য দিকেই মুখ ফিরিয়েছিল। কিন্তু সোনাবউদির মুখে জেরার জবাব সশঙ্কে ফিরে তাকায়নি শুধু, সম্ভব হলে হাতে করে তার মুখ চাপা দিত। ঠিক এ ধরণের জবাব পাবেন অফিসারটিও আশা করেননি হয়ত, মুখে প্রশ্ন করছেন, হাতের পেন্সিল দ্রুত চলছে। সোনা-বউদির চোখে পলক পড়ছে না, প্রায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে, সমস্ত জেরারই উত্তর দিচ্ছে। ধীর অনুচ্চ কিন্তু এত স্পষ্ট সত্য যে ধীরাপদর উদ্‌বেগভরা দুই চোখে শুধু নিষেধের আকূতি। সোনা-বউদি তা দেখেনি, একবার তাকায়ওনি তার দিকে।

সুযোগ বুঝে ক্রমশ স্থূল কলাকৌশল বর্জিত হয়ে উঠতে লাগল জেরার ধরন। সোজাসুজি, স্পষ্টাস্পষ্টি। গণুদার কতদিন চাকরি গেছে, কি কি অপরাধে এতকালের চাকরি গেল, রেস বা জুয়ার নেশা ছিল কিনা, মদ খেত কিনা—। সব প্রশ্নেরই জবাব অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিপজ্জনক স্বীকৃতির মতই। যার প্রসঙ্গে বলা তার সঙ্গে কোন রকম ইষ্ট-অনিষ্টের যোগ নেই যেন সোনাবউদির।

এরপরের আচমকা প্রশ্নটা আরো অনাবৃত।—পণ্ডিত মশাইয়ের ওই মেয়েটির সঙ্গে আপনার স্বামীর ব্যবহার কি-রকম দেখেছেন?

ভালো।

কি-রকম ভালো?

তাকে সাহায্য করার আগ্রহ ছিল।

ধীরাপদ পটের ছবির মত দাঁড়িয়ে। পুলিস অফিসার পরিতুষ্ট গাম্ভীর্যে নোট করলেন, তারপর নিঃসঙ্কোচে জেরাটা স্থূল বাস্তবের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন।—এতদিন হয়ে গেল আপনার স্বামীর চাকরি নেই, আপনার সংসার চলছে কি করে?

তাঁর টাকাতেই।

তিনি টাকা পেলেন কোথায়?

এই প্রথমে সোনাবউদি ধীরাপদর দিকে তাকালো একবার, তারপর তেমনি মৃদু স্পষ্ট জবাব দিল, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা ছিল।

ধীরাপদ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে, পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্বন্ধেও তেমন সচেতন নয় যেন। এতক্ষণ সত্যি কথাই বলে এসেছে সোনাবউদি, কিন্তু এ-ও কি সত্যি ভাববে? এদিকে পুলিস অফিসারের দু'চোখ অবিশ্বাসে ধারালো হয়ে উঠল, গলার স্বরও রুক্ষ শোনালো। বললেন, যা জিজ্ঞাসা করছি সত্যি জবাব দিন, বাজে কথা বলবেন না—মাস কয়েক আগে উনি নিজে থানায় এসে আমার কাছে ডায়রী করে গেছেন তাঁর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা চুরি গেছে—

চুরি যায়নি।

পুলিস অফিসার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, চুরি না গেলে লেখালেন কেন? সে-টাকা কোথায়?

আমার কাছে।

ধীরাপদ হাঁ করে দেখছে, হাঁ করে শুনছে। কিন্তু সোনাবউদির মুখের দিকে চেয়ে কিছুই বোঝার উপায় নেই। ওই মুখে কোনো ভয় কোনো দ্বিধা কোনো অনুভূতির লেশমাত্র নেই। নিষ্পলক মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। জেরা ভুলে পুলিস অফিসারটিও নীরবে কয়েক মুহূর্ত দেখলেন তাকে। এক কাজে এসে আর এক ব্যাপারের হদিস মিলবে ভাবেন নি। সুর পাল্টে জিজ্ঞাসা করলেন, কত টাকা ছিল?

সাড়ে চার হাজার।

এই ক' মাসে আপনার সব খরচ হয়ে যায়নি নিশ্চয়?

সোনাবউদি নিরুত্তর। চেয়ে আছে।

আর কত আছে?

নিশ্চল মুহূর্ত দুই একটা, সোনাবউদি যন্ত্রচালিতের মত ফিরে দরজার দিকে অগ্রসর হতে গেল। কিন্তু তার আগেই বাধা পড়ল, কোথায় যাচ্ছেন?

অস্ফুট স্বরে সোনাবউদি বলল, নিয়ে আসছি।

সত্যি মিথ্যে যাচাই করার জন্ত পুলিস অফিসার নিজেই বাকি টাকা দেখতে চাইতেন, এই উদ্দেশ্যেই এ-ভাবে প্রশ্ন করা। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞ চোখে যাচাই হয়ে গেল বোধ হয়। বললেন, থাক, দরকার নেই। আপনি ও-টাকা পেলেন কোথায়?

তাঁর কোটের পকেট থেকে।

কবে নিয়েছেন?

যেদিন তিনি পেয়েছেন।

তিনি টের পাননি?

না।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে ধীরাপদ সোনাবউদির দিকেই চেয়ে আছে। কিন্তু তাকেও যেন ঠিক দেখছে না। তার মগজের মধ্যে তোলপাড় চলেছে কিছু একটা। সেই রাতের দৃশ্যটা চকিতে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। গণুদাকে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সোনাবউদিকে চমকাতে দেখেছিল, তার চোখে ত্রাসের ছায়া দেখেছিল। রিকশ-ভাড়া মিটিয়ে ফিরে আবার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সোনাবউদির অন্য মূর্তি দেখেছে। আর, প্রায় বেহুঁশ গণুদা খেদে ভেঙে পড়ছিল তখন···

পুলিস অফিসারের জেরা শেষ হয়েছে। এবারে ঈষৎ সদয় কণ্ঠেই বললেন, আচ্ছা আপনি যান।

সোনাবউদি যন্ত্রের মতই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। ধীরাপদর বোবা দৃষ্টিটা তাকে দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করল। পুলিস অফিসার এর পর তাকে কি দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করেছেন খেয়াল নেই। তিনি চলে যাবার পরেও একা ঘরে ধীরাপদ কতক্ষণ বসেছিল হুঁস নেই।

দুটো মাস টানা হেঁচড়ার পর কেস্ সেশানে গেছে।

এবারে আবার কম করে দু'তিন মাসের ধাক্কা। এ-পর্যন্ত ব্যবস্থা-পত্র যা করার ধীরাপদই করেছে। উকিলও সেই দিয়েছে। গণুদাকে জামিনে ছাড়িয়ে আনতে চেষ্টা করা হয়েছিল, বিচারক সে আবেদন নাকচ করেছেন। ব্যবস্থা-পত্রের ব্যাপারে সোনাবউদি এগিয়েও আসেনি, বাধাও দেয়নি। এমন কি দুমাসের মধ্যে ধীরাপদর সঙ্গে দুটো কথাও হয়নি। কিন্তু ধীরাপদ অনেকবার সুলতান কুঠিতে এসেছে। দরকারে এসেছে, বিনা দরকারেও। আসাটা কেমন করে জানি সহজ হয়ে গেছে। বক্তব্য কিছু থাকলে উমার মারফত বলে পাঠিয়েছে। নয়ত, উমা আর তার ভাইদুটোকে নিয়ে সময় কাটিয়েছে।

সোনাবউদিকে প্রথম বিচার-পর্বে হঠাৎ একদিন মাত্র কোর্টে দেখেছিল ধীরাপদ। কোর্ট থেকেই তাকে ডাকা হয়েছে ভেবেছিল। কিন্তু তাও নয়। পরে রমণী পণ্ডিতের মুখে শুনেছে নিজে থেকেই এসেছিল। চুপচাপ এক-ধারে বসেছিল, ধীরাপদ সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু একটিও কথা হয়নি। তার নিষ্পলক দু'চোখ আসামীর কাঠ-গড়ার দিকে। তারপর ঘণ্টাখানেক না যেতে হঠাৎই এক-সময় লক্ষ্য করেছে সোনাবউদি নেই। রমণী পণ্ডিতের সঙ্গে এসেছিল, তাঁর সঙ্গেই চলে গেছে।

রমণী পণ্ডিত কেস করছেন না, কেস চালাচ্ছে সরকার। কিন্তু গোড়া থেকেই তাঁকে আর তাঁর মেয়েকে নিয়ে টানা হেঁচড়া চলেছে। কাঁদ কাঁদ মুখে রমণী পণ্ডিত অনেকবার ধীরাপদকে বলেছেন, যা হবার হয়ে গেছে, তিনি কারো ওপর প্রতিশোধ নিতে চান না, কোন উপায়ে কেস বন্ধ করা যায় কি না। ধীরাপদ বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু

লোকটার দিকে চেয়ে কিছু বলতেও পারেনি। ওই বাত্যাহত মুখ যেন জীবিত মানুষের মুখ নয়। তার ওপর আরো অবাক হয়েছে, সোনাবউদির দুর্ভাগ্যে এই মানুষেরই প্রচ্ছন্ন অনুভূতির আবেগ লক্ষ্য করে। নিজের এতবড় ক্ষতি সত্ত্বেও মনে মনে উল্টে তিনিই যেন তার কাছে অপরাধী হয়ে আছেন।

কেস সেশানে চালান হয়েছে, সোনাবউদিকে ডেকে ধীরাপদ সে-খবরটা জানাবে কি না ভাবছিল। সোনাবউদি ডাকলে আসবে, শুনবে, কিন্তু একটি কথাও বলবে না, একটা কথাও জিজ্ঞাসা করবে না। তার এই দুর্বহ নীরবতার সামনে ধীরাপদ সব থেকে বেশি অস্বস্তি বোধ করে।

উমা ঘরে এলো। তার দুচোখ লাল। একটু আগে কেঁদেছে বোঝা যায়। একটু আধটু মার-ধরে মেয়েটা কাঁদে না বড়, বেশিই হয়েছে হয়ত।

মা বকেছে ?

দাঁতে করে পাতলা ঠোঁট দুটো কামড়ে উমা প্রথমে সামলাতে চেষ্টা করল নিজেকে। না পেরে ধীরাপদর কোলে মুখ গুঁজে দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। বলল, বাবাকে ওরা ছেড়ে দিল না ধীরুকা'।

উমার মাথার ওপর হাতটা থেমে গেল ধীরাপদর। খবরটা তাহলে সোনাবউদি জেনেছে। রমণী পণ্ডিত জানিয়েছে হয়ত। আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। এই মুহূর্তে ওই অমানুষকে হাতের কাছে পেলে কি করে সে? এই অবুঝ কচি মেয়ের বুকটা তাকে কি করে দেখায় ?

তখনো সন্ধ্যা হয়নি। ঘরের আলোয় সবে টান ধরছে। দোরগোড়ায় সোনাবউদিকে দেখে ধীরাপদ ফিরে তাকালো। উমা তক্ষুনি উঠে মায়ের পাশ ঘেঁষে প্রস্থান করল। সোনাবউদি ঘরে ঢুকল। কিছু বলবে। কিছু বলার আছে। নইলে আসত না। দু'মাসের মধ্যে নিজে থেকে আসেনি। আজই এলো বলে কৌতূহল ছেড়ে তলায় তলায় একটা অজ্ঞাত শঙ্কাই উকিঝুঁকি দিল।

শান্ত মুখে সোনাবউদি বলল, আবার বিচার হবে শুনছি···আপনি এ-পর্যন্ত অনেক করেছেন, আর কিছু করতে হবে না।

ধীরাপদ নিরুত্তর। গণুদা যত অমানুষই হোক, এই সঙ্কটের মুহূর্তে অনেক সময়েই কেমন অকরুণ মনে হয়েছে সোনাবউদিকে। আজও মনে হল।

এ কথায় সে কান দেবে না সেটা তার মুখ দেখে বোঝা গেছে কি না জানে না। তেমনি শান্ত অথচ আরো স্পষ্ট স্বরে সোনাবউদি আবার বলল, এরপর যা হবার হবে, আপনি নিজের কাজ ফেলে এ নিয়ে আর ছোটাছুটি করেন আমার তা ইচ্ছে নয়।

সব-সময় আপনার ইচ্ছে-মতই চলতে হবে ভাবেন কেন ?

ধীরাপদ আপন-জন তো কেউ নয়, তার বলতে বাধা কি···। কথা ক'টা আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, তারপর মাথা গোঁজ করে থেকেও সোনাবউদির নীরব দৃষ্টিটা মুখের ওপর অনুভব করেছে। কিন্তু একটু বাদে তেমনি শান্ত মৃদু জবাব শুনে সচকিত।

আপনি চলেন বলে ভাবি।

ধীরাপদ-মুখ তুলেছে। তারপর চেয়েই আছে। ঘৃণা নয়, বিদ্বেষ নয়, ওই স্তব্ধতার গভীরে একটু যেন হাসির আভা দেখেছে। আর তারও গভীরে কোথায় যেন বহুদিনের আগের দেখা এক বিস্মৃত-প্রায় স্নেহ-সমুদ্রের সন্ধান পেয়েছে।

এই ব্যাপারে এ-পর্যন্ত আপনার কত টাকা লেগেছে ?

অতর্কিতে ধাক্কা খেল, যদিও ঠিক এ-প্রশ্নটা না হোক, তাকে আজ এ-ঘরে আসতে দেখে এই গোছেরই কিছু একটা আশঙ্কা করেছিল। জবাব না দিয়ে ধীরাপদ অন্য দিকে চেয়ে রইল।

কত লাগল আমাকে জানাবেন। সোনাবউদি অপেক্ষা করল একটু, তারপর তার মনোভাব বুঝেই যেন আস্তে আস্তে আবারও বলল, আপনার কাছ থেকে আরো অনেক বড় ঋণই নেবো, কিন্তু এই যন্ত্রণার বোঝা আর বাড়াতে চাইনে, এ-টাকটা তার সেই টাকা থেকেই দিয়ে ফেলতে চাই।

নিজের অগোচরে ধীরাপদর চকিত দৃষ্টি আবারও সোনাবউদির মুখের ওপর এসে থামল, তারপর প্রতীক্ষারত দুই চোখের কালো তারার গভীরে হারিয়ে গেল যেন।

সোনাবউদির এবারের কথা ক'টা আরো মৃদু, আর শান্ত। —ওই টাকার জন্যে আপনার অনেক দুর্ভোগ হয়েছে। কিন্তু এতবড় অন্যায় আমি আর কার ওপরে করতে পারতুম ?···টাকা আমি নিয়েছি জানতে পেলে ছেলে পুলে নিয়ে পরদিন থেকেই উপোস শুরু হত।

সোনাবউদি আর দাঁড়ায়নি।

একটা উষ্ণ তাপে ধীরাপদর কপালটা চিনচিন করছে। ঠাণ্ডা কিছু লাগাতে পারলে আরাম হত, ভালো লাগত।

···আরো ভালো লাগত, আরো ঠাণ্ডা হত, যে চলে গেল তার দুই পায়ের ওপর কপালটা খানিক রাখতে পারলে। [ক্রমশঃ।

যাঁরা সফল হয়েছেন

জীবনে সাফল্য লাভ করেছেন এ ধরণের ভাগ্যবান ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলমেশা করে ব্যক্তিগত ভাবে আমি উপলব্ধি করেছি যে, যদিও তাঁরা অনেকেই জোরের সঙ্গে বলে থাকেন যে, ভাগ্যের প্রতিকূলতাকেও হটিয়ে দিয়ে তাঁরা একই সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হতেন, তবুও তাঁদের সাফল্যের অন্তর্নিহিত মূল সূত্রটি হল ভাগ্যের সদয় দাক্ষিণ্য; এই বস্তুটি না পেলে শুধু উদ্যমের দ্বারা তাঁরা সফলকাম হতে পারতেন না কখনই। আপন চেষ্টায় যাঁরা সামান্য অবস্থা থেকে লক্ষপতি হয়েছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই এক বিশিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা হল তাঁদের আশাবাদ প্রবণতা, কোন অবস্থাতেই তাঁদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে না, বিপদ ও বাধাকে সুদৃঢ় হাতে অপসারিত করার চেষ্টায় তাঁদের ক্লান্তি আসে না কখনও, সাফল্যই তাঁদের একমাত্র বীজমন্ত্র আর এই মন্ত্রের সাধনে সমস্ত পণ করেই তাঁরা জীবন সংগ্রামে ব্রতী হন।—বলাবাহুল্য যে এ ধরণের মনোবল যাঁদের থাকে ভাগ্যের প্রতিকূলতাকে জয় করাটাও তাঁদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ ধরণের লোকেদের সামনে ভাগ্যলক্ষ্মীও যেন তাঁর ঝাঁপি খুলে ধরেন অকৃপণ হাতেই। আপন আপন আন্তরিক উদ্যমের সঙ্গে ভাগ্যের দাক্ষিণ্যে তাঁদের সাফল্যের তরীটি যেন পাল তোলা নৌকার মতই তরতর করে এগিয়ে চলে, পরিয়ে দেয় তাঁদের মাথায় সৌভাগ্যের হেমকিরীট অনায়াসেই।

পরিসংখ্যান—কয়েকটি কথা

পরিকল্পনা আর পরিসংখ্যান—এ দুই-এর ভেতর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। যে কোন গঠনাত্মক উদ্যমের জন্যেই ভালো রকম পরিকল্পনা চাই, কিন্তু নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান ছাড়া পরিকল্পনার কথা ভাবাই চলে না। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে আগে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করে নিয়েই পরিকল্পনার খসড়া রচনা সম্ভবপর। পরিসংখ্যান-ভিত্তিক পরিকল্পনা না হলে সেই পরিকল্পনা ভুল ও ব্যর্থতার দায়ে পড়তে বাধ্য।

ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে অগ্রগতির প্রচেষ্টায় পরিসংখ্যানের গুরুত্ব যে কত অধিক, বলার অপেক্ষা রাখে না। চলতে গেলেই মানুষকে হিসাব করে পা বাড়াতে হবে, আর সেই হিসাব যা হোক একটা হলেই চলবে কেন? বিজ্ঞানের সূত্র ধরেই প্রতিটি হিসাব হতে হবে—সব ঠিক হয়ে গেছে বুঝলে তবেই করা চলতে পারে হাতে-কলমে কাজ সুরু। পরিসংখ্যান বিজ্ঞান তাই তো আপন বহুল স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গোড়াতেই বলতে চাওয়া হলো—ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোন কর্মোদ্যোগের বেলাতেই চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা অর্থাৎ যথার্থ পরিসংখ্যানের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে-পরিকল্পনা, তা-ই। আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখার সঙ্গে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের কোন যোগাযোগ নেই। সংখ্যা দ্বারা প্রদর্শিত বা প্রমাণিত তথ্যাবলীই হলো এর প্রধান উপজীব্য। এই থেকেই বোঝা যায়, তথ্য সংগ্রহের কাজটা যতই নিখুঁত হবে, পরিসংখ্যানের মূল্য স্বীকৃত হবে তত বেশি।

ব্যবসা-বাণিজ্যই হোক, সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনাই হোক, দেশ-সেবা জনসেবারই ক্ষেত্রই হোক—সর্বাগ্রে বিভিন্ন দিকের পরিসংখ্যান সংগ্রহ বিশেষ ভাবে দরকার। হিসাব করতে যেয়ে বছরের সঙ্গে বছরের, অঞ্চলের সঙ্গে অঞ্চলের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণও না করলে চলবে না। অগ্রসর ও বিজ্ঞানোন্নত দেশগুলোতে এই পরিসংখ্যানের ওপর সরকার সমধিক জোর দিয়ে চলেছেন। এদেশেও জাতীয় সরকার পরিসংখ্যানকে ঠিক উপেক্ষা করছেন, বলা যাবে না। তবে এখনও সবদিকে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান তৈরী হতে পারে, এমন ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। সেজন্যেই দেখা যায়, কার্যক্ষেত্রে অনেক পরিকল্পনাই ত্রুটিপূর্ণ—অগ্রগতির পথে যা একটি বড় বাধা।

শুধু তথ্য সংগ্রহই নয়, সংগৃহীত তথ্যাবলীর শ্রেণিবিন্যাস ও পরিসংখ্যান—বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ। একতরফা হিসাব দেখে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে সেই হিসাবে গলদ ধরা পড়বার আশঙ্কা থেকে যায়। পটভূমিতে নাগালের ভেতর যত কিছু তথ্য পাওয়া যাবে, সব টেনে এনে যদি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে হিসাবটি করা গেলো, তবেই তা হতে পারে নির্ভরযোগ্য। হিসাব বা পরিসংখ্যানের ভুলের দরুণ কত সরকারী পরিকল্পনাই বিফল প্রমাণিত হয়েছে, এ কারো অজানা নয়।

সবদিক দেখে শুনে পরিসংখ্যান না হলে, সেই পরিসংখ্যানের সত্যি মূল্য কি? যে-কোন হিসাবই পরিসংখ্যান পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে যে হিসাব করা হবে, পরিসংখ্যান বলতে পারা যাবে তাকেই। মার্কিণ মুল্লুকের বহু আলোচ্য সাম্প্রতিক একটি হিসাব নিয়ে বিষয়টির পর্যালোচনা চলতে পারে। সে-দেশের রাজপথে মোটর চলেছে হরদম, সংখ্যায় অগুনতি—মোটর-চালক নারী-পুরুষ দুই-ই। মোটর যেমন দ্রুত চলেছে, পথ-দুর্ঘটনারও অন্ত নেই, ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু একটি বেসরকারী পরিসংখ্যান যা হিসাব প্রকাশ পেলো—স্থানীয় ভাবে এবং জাতীয় ভিত্তিতে নারীরা পুরুষদের চেয়ে দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছেন অনেক কম। পুলিশের বিবৃতি বা বিবরণে এই দাবী সমর্থিত হয় না—সব দিক না দেখে শুনে বিচার-বিশ্লেষণ করতে যেয়েই এখানেও ত্রুটি থেকে গেছে। মোটর-চালকদের মধ্যে শতকরা কত জন নারী (৩০ ভাগ) কিংবা নারী ও পুরুষ শ্রেণীর কে কত মাইল মোটর চালনা করে থাকেন, এসব তুলনামূলক বিচার হিসেবে নেই। অথচ পুরুষরাই বেশি সংখ্যায় মোটর চালিয়ে থাকেন দূর-দূরাঞ্চলে তাদের গতিই অধিক। বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি প্রভৃতি মোটর যান পুরুষরাই এখন অবধি এক চেটিয়া ভাবে চালাচ্ছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হিসাব জুড়ে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ একটি অভিমত প্রকাশ করেছেন, যাতে দেখা যাবে, পথ দুর্ঘটনা ঘটানো ব্যাপারে পুরুষদের চেয়ে নারীরা অধিক দায়ী।

এমনি হিসাব বা পরিসংখ্যানগত গলদ নানা দেশে নানা ক্ষেত্রে ঘটছে, একটু ভালো-রকম নজর করলে হয়ত ধরা পড়বে। এদেশের খাদ্য ও কৃষি-পরিসংখ্যান বিষয়ে পর্যালোচনা করলেও ত্রুটি-বিচ্যুতি কম দেখা যাবে না। কাজেই পরিসংখ্যান প্রণয়ন ব্যাপারে যথেষ্ট হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করতে হবে—হিসাবের মারাত্মক ভুল যাতে না হয়, কোথাও যেন কারচুপি না হয়ে পড়ে, সেটাই হতে হবে লক্ষ্য। আর যতদূর সম্ভব নির্ভুল পরিসংখ্যান হাতে নিয়ে কাজে নামলে পরিকল্পিত কাজ সহসা ব্যর্থ হতে পারে না।

মানুষের খাদ্য প্রসঙ্গে

অন্য সব জীব যা খাবে, যে-ভাবে খাবে, মানুষের ঠিক তা-ই চলে না। মানুষ একটি বিশিষ্ট জীব—তার খাদ্য-তালিকাও বিশিষ্ট ধরনের। আবার সব মানুষের জন্যেই একই রূপ খাদ্য নির্ধারিত নয়, দেহের গঠন, স্বাস্থ্যাবস্থা ও কর্মধারা—এ সকলের ভিত্তিতে মানুষের বেলায় খাদ্য বাছাই হয়। রকমারী খাদ্য তৈরী এবং খাবার জিনিস সুস্বাদু করার নিয়মটি মানুষ আয়ত্ত করে নিয়েছে।

কিন্তু, এ সত্ত্বেও একটি কথা বলতে হবে, নিষিদ্ধ খাদ্যের প্রতি মানুষের ঝোঁক কম দেখা যায় না। আদম আর ইভের আমল থেকেই এই জিনিসটি লক্ষ্য করা যেতে পারে—যে-টি যার পক্ষে নিষিদ্ধ, কেন কি জানি, রসনা অনেক ক্ষেত্রে সে খাদ্যই চায়। যার হজমশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, তৈলাক্ত বা ভাজা-জাতীয় জিনিস তার স্বাস্থ্যের অনুকূল হতে পারে না। তবুও খাওয়া হয়, খেতে বসে লোভ সম্বরণ ক'জনা করতে পারেন?

সাধারণ নিয়মানুসারেই শরীরের পুষ্টি ও ক্ষয়রোধের জন্য পুষ্টিকর ও ভিটামিন সমন্বিত টাট্‌কা খাদ্য চাই। কিন্তু আশ্চর্য্য হলো—সকলেই এই ধরণের বাছাই করা খাদ্য-খাবার খাওয়ার জন্যে প্রস্তুত নয়—খেয়ে তারা পরিতৃপ্তও হয় না। পক্ষান্তরে যে খাদ্য নিষিদ্ধ ও অপকারী, তা খেতে অনেকেরই আগ্রহ বা ব্যস্ততার অবধি নেই। ভালো খাদ্য-সামগ্রী তারা ঘৃণার চক্ষে দেখে, খারাপ খাদ্য খারাপ জেনেও চিত্ত দ্বিধাহীন। গ্রাম্য ও কম শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের ভেতরই এই ঝোঁকটা বেশি দেখা যায়, বটে, তা বলে শিক্ষাভিমানীরা এই দায় থেকে মুক্ত নহেন।

এমনটি প্রায়শঃ দেখতে পাওয়া যায়, হাতের কাছে সুন্দর ও সুস্বাদু খাদ্য রয়েছে, কিন্তু রুচি গেলো অন্য খাদ্যের দিকে যা নিতান্ত অনুপকারী, খেতেও বিশ্রী। দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব এশিয়ায় বিস্তৃত অঞ্চল এবং উষ্ণভূমি আফ্রিকা দেশের বিস্তর লোক দুধ খেতে অনিচ্ছুক। ডিম মাংস প্রভৃতি শক্তিবর্ধক ও ক্ষয়পূরক খাদ্য গ্রহণেও অনেকেরই আপত্তি। দুধের নাম শুনতে পারে না, এমন কত শিশু কত পরিবারেই না দেখতে পাওয়া যায়। এ সকলের কারণ কি, শরীর বিজ্ঞানীদের কাছে'তা আজও মস্ত গবেষণার বিষয় হয়ে রয়েছে।

মানুষের খাদ্যাখাদ্য নিরূপণ কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নেই। বিশেষ করে এ কঠিন এইজন্যে যে, সকলের জন্যে একটি সাধারণ সূত্র বেঁধে দেওয়া চলে না। শারীরিক গঠন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জন্যে কতকগুলো ভিন্ন খাদ্য থাকা খুব স্বাভাবিক। একজন সুস্থ মানুষ যে খাদ্য-জিনিষ গ্রহণ করবে, রোগীর পক্ষে তাই খাদ্য বলে গণ্য হতে পারে না। সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও অবিশুদ্ধ অর্থাৎ শরীরের অনুপযোগী খাদ্য পরিহার করতে হবে—এটা স্বাস্থ্যবিধি।

অবশ্য একথা ঠিক, ধনিক শ্রেণীর লোকদের পক্ষেই খুশীমত ভালো খাদ্য গ্রহণ সম্ভবপর। গরীবদের বেলায় ইচ্ছা থাকলেও তা হয়ে উঠে না। মাছ-মাংস, দুধ-ঘি, ডিম আর আঙুর-বেদানা প্রভৃতি ফল খাওয়া তাদের স্বপ্নেরও বাইরে—শরীরের জন্য অপরিহার্য্য পুষ্টিকর খাদ্য ক্রয় বা সংগ্রহ সাধ্যাতীত ব্যাপার। দারিদ্র্যের প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও দেখা যায়, অনেকের মাংস খেতে অনাগ্রহ। অথচ মাংসাশী হতে পারলে প্রোটিনের অভাব সহজেই পুরণ করে ফেলা যায়।

ধর্ম্মীয় বা সংস্কারগত কারণেও অনেক খাদ্য অনেক সমাজে অচল। শাস্ত্র মানুষের তৈরী হলেও দেবতার দোহাই দিয়ে কতকগুলো পুষ্টি খাদ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী আছে। নারীরা এই সকল শাস্ত্রবিধি বেশিরকম মেনে চলেন; তাই অনেক ভালো খাদ্য খাবার ইচ্ছে জাগলেও তাদের খাওয়া হয় না। হিন্দু সমাজে বিধবা হয়ে গেলে (সে যে বয়সেই হোক) মাছ-মাংস চিরতরে খাদ্য-তালিকা থেকে বাদ যাবে। সে অবস্থায় সব্জী ও অন্যান্য জিনিস থেকে বিশেষ বিবেচনা করে সুষম খাদ্য বেছে নেওয়া অত্যাবশ্যক।

দেশে-দেশে জাতিতে-জাতিতে খাদ্য-তালিকায় বিভিন্নতা স্পষ্ট—একটি দেশের মধ্যেও দেখা যায় বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত। এ ছাড়াও খাদ্যের পার্থক্য রয়েছে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে অন্যান্যদের। যারা গায়ে খেটে খায়, তাদের শরীরের পুষ্টি ও ক্ষয় পুরণের জন্যে যে খাদ্য চাই, মাথার কাজ যারা করবে, একই জাতীয় খাদ্য তাদের হলে চলবে না। ভেবে দেখলে মানুষ কী না খায়—কেঁচো, আরশুলা, সাপ, ব্যাং, কুকুর, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি সবই। হয়ত এটা ওখানকার লোক খায়'না, ওটা খায় না এখানকার লোকেরা, এই যা পার্থক্য। আবার, একইরূপ খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস থেকে সম্প্রদায়গত বন্ধন দৃঢ় হয়। যেমন, মধ্য প্রাচ্যের মুসলমানরা উটের মাংস খেয়ে থাকে—এটাকে তাদের অনেকে ধরে নিয়েছে ধর্ম্মীয় নির্দ্দেশ। অনেক জায়গার মানুষ গোমাংস খায় না, শূকরের মাংস খাওয়া যেমন নিষিদ্ধ হয়ে আছে অন্য বহু স্থলে। এই সমস্ত নিষেধের ডোর কোনদিন ছিন্ন হবে কি না, চিরাচরিত রুচি ও অভ্যাসের পরিবর্ত্তন আদৌ হবে কি—এ ক্ষেত্রেও সেই প্রশ্ন তোলা অবান্তর বলা যায়।

লৌহপিণ্ড উৎপাদনে ভারত

স্বাধীন হবার পর থেকে নব ভারত গঠনের জন্য বিরাট কর্ম্মকাণ্ড চলেছে। এই গঠনকর্ম্মে লৌহ ও ইস্পাতের ভূমিকা অনেকখানি, এ বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকের দিনে বিশ্বের সকল দেশেই এর চাহিদা আগের তুলনায় বেড়ে গেছে খুব বেশি। কারণ, যে-কোন বৃহৎ ও স্থায়ী নির্ম্মাণ-কাজে লৌহ ও ইস্পাত প্রায় চাই-ই।

ভারতে আকরিক লৌহের মজুত ভাণ্ডার যা আছে, তা অতুলনীয়। ইতোমধ্যে যে কয়টি ইস্পাত কারখানা এখানে গড়ে উঠেছে, কাঁচামালের অভাব তাদের হবার অমনি কারণ নেই। লৌহপিণ্ড উৎপাদনের মাত্রা ভারতে ক্রমেই বাড়ছে, প্রসঙ্গতঃ এটা লক্ষ্য করবার। অল্পদিন পূর্ব্বের সরকারী একটি হিসাব পর্য্যালোচনা করলেই উৎপাদনের অগ্রগতি পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে। ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসের এই হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ মাসটিতে লৌহপিণ্ড উৎপাদিত হয়েছিল ১১,২৯,০০০ মেট্রিক টন। অপর দিকে আলোচ্য বছরের (১৯৬১) নভেম্বর পর্য্যন্ত ১১ মাসে মোট ১,০১,৩৮,০০০ মেট্রিক টন লৌহপিণ্ড উৎপাদিত হয়—যা পূর্ব্ব বছরের (১৯৬২) প্রথম ১১ মাসের তুলনায় ১২ শতাংশ বেশি। এই সমস্ত লৌহপিণ্ড উৎপাদিত হয়েছে উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, মহীশূর, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে। ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে বিদেশে রপ্তানীকৃত লৌহপিণ্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৭৬,০০০ মেট্রিক টন। সরকারী ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকলে ভারতে লৌহপিণ্ড উৎপাদন বাড়বে বই কমবে না। ভারতে ইস্পাতের বিপুল চাহিদা আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় পুরণ হলে, অগ্রগতির হার দ্রুততর হবে, এ বলাই বাহুল্য।

পায়ে পায়ে কাদা

প্রশান্ত চৌধুরী

১৬

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বেশ খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিতে হয় চাঁপাকে। সারাদিনের পর অতখানি পথ ভেঙে বাড়ি আসতে হাঁপিয়ে ওঠে রোগা মেয়েটা। কাছেপিঠে কত স্কুলই তো ছিল। তার যে কোনো একটাতে ভর্তি করে দিলে তো আর রোজ দুবেলা এতখানি পথ ভাঙতে হত না চাঁপাকে। কেন যে ওর বাবা ওকে অত দূরের স্কুলে ভর্তি করলেন ?

সোহাগীকে সেকথা একদিন জিজ্ঞেসও করেছিল চাঁপা,—মাগো কাছাকাছি কত ইস্কুলই তো ছিল। আমাকে তোমরা অত দূরে পাঠালে কেন ?

মা বলেছিল,—এখানে ভাল ইস্কুল নেই চাঁপা ; তাই।

মার অসুখ, তাই চাঁপা তর্ক করেনি আর। তর্ক ক'রে মার মনে কষ্ট দিতে চায়নি। চাঁপা চুপ করে গেছে।

কিন্তু স্কুলে যাবার পথে চাঁপা তো নিজের চক্ষেই দেখেছে সেই স্কুলটা, যার প্রকাণ্ড ঝকঝকে বাড়ি, দুখানা বাস, গেট্‌-এ গোঁফওলা দরোয়ান ! বেশ তো, অতবড় স্কুলের মাইনে জোগাবার পয়সা যদি না থাকে চাঁপার বাবার, তো কাছাকাছি আরো কমদামী মাঝারি স্কুলও তো ছিল দু-তিনটে। সে-সব ছাড়িয়ে অনেক দূরের বড় রাস্তার পার্কের পিছনের সরু গলির মধ্যেকার ঐ পুরোনো আমলের ছোট স্কুলটার মধ্যে কী এমন নিধি খুঁজে পেলেন বাবা, যে সব ছেড়ে সেখানেই ভর্তি করে দিতে হল চাঁপাকে !

স্কুলটাকে অবিশ্যি ভালই লাগে চাঁপার। এক-পা খোঁড়া বুড়ো পণ্ডিতমশাই, বৃদ্ধ সেক্রেটারি অতুলবাবু, বুড়ো দরোয়ান রামভরসা,—সবাই ভালবাসেন চাঁপাকে। শিবপুজো হয় স্কুলে। তারও প্রাইজ আছে। চাঁপা উপর্যুপরি দুবছর পেয়েছে সেই প্রাইজ। রামভরসা বলে,—ভশ.চাজ.মশার লেড়কি আছ তো তুম্‌হি, প্রাইজ তো তুম্‌হার মিলতেই হোবে।

বুড়ো পণ্ডিতমশাইও দিদিমণিদের ডেকে বলেন,—রক্তধারা বংশধারা এসব কথাগুলো উড়িয়ে দেবার নয় গো মায়েরা। দেখছ তো চাঁপাকে। পুরুৎবামুনের মেয়ে, রক্তের ভেতর দিয়ে ভাখো পুজোর কাজটি কেমন নিখুঁত করে করছে। এমনটা তো কই আর কোনো মেয়ে পারছে না।

দিদিমণিরাও সায় দেন সবাই সে কথায়।

শুনে বড় আনন্দ হয় চাঁপার। অপরিসীম আনন্দ।

সে পুরুতের মেয়ে। সে শ্যামাঠাকুরের মেয়ে। তার শিবপুজোর কাজের মধ্যে রয়েছে তার অকাট্য প্রমাণ। সবাই স্বীকার করেছেন তা'। তাহলে কুসুমবুড়ি যা বলেছে, তার একফোঁটাও সত্যি নয়। সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। কুসুমবুড়ি খারাপ, কুসুমবুড়ি কুচ্ছিৎ, কুসুমবুড়ির সঙ্গে আর কোনোদিন কথা বলবে না চাঁপা, কুসুমবুড়ি কেউ হয় না চাঁপার।

কিন্তু কেউই যদি না হয়, তাহলে এত লোক থাকতে ঐ কুসুমবুড়ির কাছেই বা থাকত কেন চাঁপা ছোট্টবেলায় ? চাঁপার এখনো আবছা-আবছা মনে পড়ে ছোট্টবেলার কথা। সন্ধ্যে হবার মুখেই মা পাঠিয়ে দিত চাঁপাকে নিচে কুসুমবুড়ির কাছে। তারপর অনেক রাত্তিরে ঘুমন্ত চাঁপাকে আবার তুলে নিয়ে যেত নিজের ঘরে।

চাঁপার এখনো বেশ মনে পড়ে, কুসুমবুড়ি ভালবাসত তাকে। কোলে নিয়ে আদর করত, কত গান শোনাত, লালকমল-নীলকমলের গল্প বলত, মাটির বেনেবৌকে কাপড় পরানো শিখিয়ে দিত। চাঁপার মা সোহাগী, আর সোহাগীর মা কুসুমবুড়ি,—এই তো জানত চাঁপা। কুসুমকে তাই দিদা বলে ডাকত সে।

তখনো পর্যন্ত চাঁপা তার বাবাকে দেখেনি কোনোদিন। বাবা বলে কাউকে যে থাকতে হবেই হবে, এমন কথাটাও তখন মাথায় আসবার বয়স হয়নি তার। তারপর হঠাৎ একদিন কোথা থেকে দুম্‌ করে এসে পড়ল তার বাবা। মা বলল,—বাবা নাকি বিদেশে ছিল এতদিন। কিন্তু কতটুকুই বা সম্পর্ক ছিল তার বাবার সঙ্গে ? মা যখন ঘুমন্ত চাঁপাকে কোলে করে তুলে নিয়ে যেত কুসুমবুড়ির ঘর থেকে, তখন কোনো কোনোদিন ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেলে চাঁপা ঘুম-চোখে দেখতে পেত তার বাবাকে ;—তক্তাপোষের একধারে বসে বিড়ি
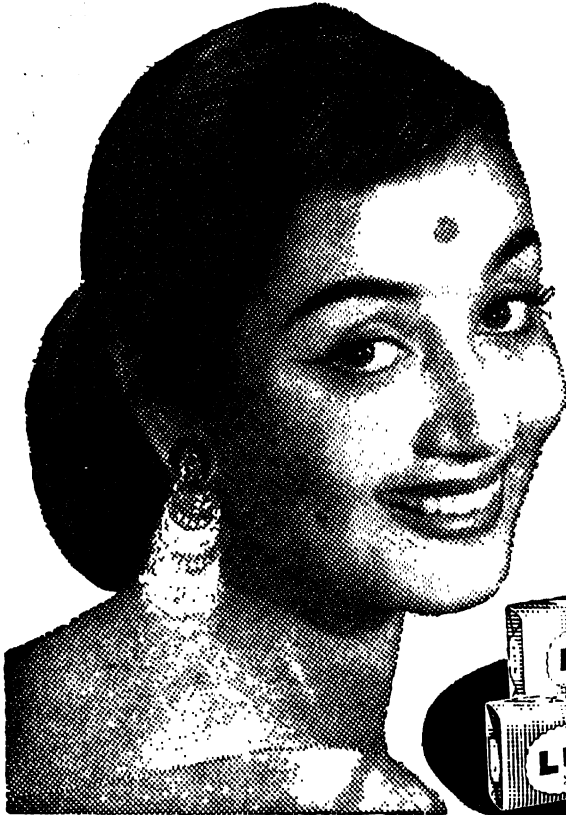
টানছেন, কিংবা মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন চুপচাপ। সে আর কতটুকু দেখা, কতক্ষণের দেখা! আবার ঘুমে জড়িয়ে আসত চাঁপার চোখ।

সকালে উঠে আর দেখতে পেত না বাবাকে। সারাদিনে আর একবারও না। তাই সেই ছোট্টবেলায় বাবার চেয়ে কুসুমবুড়িই ছিল চাঁপার কাছে অনেক আপনার জন।

সেই আপনার জন হঠাৎ পর হয়ে গেল একদিন। আবছা-আবছা একটু একটু মনে পড়ে চাঁপার সেদিনের কথা।

সন্ধ্যে উৎরে গেছে তখন। আম দুধ দিয়ে ভাত মেখে বড় বড় গরাস তুলে খাইয়ে দিয়েছে কুসুমবুড়ি ছোট্ট চাঁপাকে। তারপর ছোট্ট হামানদিস্তে নিয়ে নিজের জন্যে পান ছেঁচতে বসেছে ঠ্যাং ছড়িয়ে। পান ছেঁচা হয়ে গেলে সেই পান মুখে দিয়ে গল্প বলবে কুসুমবুড়ি, আর সেই গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে চাঁপা। সেই সময়টির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে চাঁপা শুয়ে শুয়ে তার বেনেবৌকে আদর করছিল একটু। পায়ের কাছে কুসুমবুড়ির বিড়ালটা গুটিসুটি হয়ে শুয়েছিল। এমন সময় বাইরে কেমন একটা দুমদাম্ হাউমাউ শব্দ উঠল, আর কিছুক্ষণ পরেই একজন মেয়েছেলে দৌড়ে এসে কুসুমবুড়ির ঘরে ঢুকেই দড়াম্ করে খিল দিয়ে দিল দরজাতে।

চাঁপা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে জড়িয়ে ধরল কুসুমকে। আর তারপর, কুসুমের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে চোখ পিট্‌পিট্ করে দেখতে পেল যে, সেই মেয়েমানুষটার পরণের কাপড়ের যে অর্ধেকটা তাড়াহুড়োতে দরজার বাইরের দিকেই থেকে গিয়েছিল, সেই-অর্ধেকের টানে বাকি অর্ধেকটাও খুলে গেল ফস্ করে। চাঁপার হাসি পেয়ে গিয়েছিল দেখে। কিন্তু চাঁপা হাসবার আগেই সেই মেয়েছেলেটা সামনে যা পেল তাই দেহে জড়িয়ে নিয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল কুসুমবুড়ির পা জড়িয়ে।

হাসির বদলে কান্নাই পেতে লাগল তখন চাঁপার।

কুসুমবুড়ির ঘরের বন্ধ দরজায় ধাক্কা পড়ছিল তখন বাইরে থেকে। সেই শব্দে আরো ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছিল সেই মেয়েটা। কেরোসিনের ল্যাম্পোটা বিচ্ছিরি ভুষো ওড়াচ্ছিল। বিড়ালটা ভয়ে মাটির জালার পিছনে লুকিয়ে পড়েছিল।

ছোট্ট চাঁপা তখন ঠিক বুঝতে পেরেছিল, কিসের ভয়ে অমন চিৎকার করতে করতে পালিয়ে এসেছে মেয়েটা;—কিসের ভয়ে সে কাঁদছে;—কিসে ধাক্কা দিচ্ছে কুসুমবুড়ির দোরে।

তাদের কুলোর মতন কান, তাদের মূলোর মতন দাঁত, তাদের উল্টোবাগে পা।

ছোট্ট চাঁপা জানত যে, চোখ বুজে শুয়ে মনে মনে খালি খালি রাম নাম করতে পারলে ভূতের সাধ্যিও নেই কারুর গায়ে হাত ছোঁয়াতে পারে। তাই কুসুমবুড়ির গলা ছেড়ে দিয়ে চাঁপা বালিসে মুখ গুঁজে মাদুরের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে রাম নাম আউড়ে যেতে লাগল ক্রমাগত।

দরজার ধাক্কার শব্দ কিন্তু বাড়তেই লাগল, মেয়েছেলেটার কান্নাও বাড়তে লাগল। চাঁপা তখন বালিসের খাঁজের ভিতর থেকে একটা চোখ খুলে অবাক হয়ে দেখল, কুসুমবুড়ি দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আর সেই মেয়েটা কুসুমবুড়ির পা-দুটো জড়িয়ে ধরে প্রাণপণে আটকাতে চাইছে তাকে।

পারল না আটকাতে। কুসুমবুড়ি খুলে দিল ঘরের দোরটা।

দোরটা খুলতেই ঘরে ঢুকল যে তার কুলোর মতন কান আর মূলোর মতন দাঁত ছিল কি না, অন্ধকারে আর আতংকে সেদিন ঠিক ঠাহর করতে পারেনি ছোট্ট চাঁপা। তবে সেই মিশ্‌কালো লোকটার প্রকাণ্ড গোঁফ আর পাহাড়ের মতন বিশাল দেহটা চাঁপা অত আতংকের মধ্যেও দেখে নিয়েছে ঠিক।

তারপরে আর কিচ্ছুটি মনে নেই চাঁপার। সেই প্রকাণ্ড ভূতটা এসে কখন যে সেই মেয়েছেলেটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাইরে কোথায় ব'সে তার হাড়-মাংস সব চিবিয়ে খেয়েছে, কিচ্ছুটি টের পায়নি চাঁপা। এইটুকু শুধু তার মনে আছে, তারপরে চোখ মেলে সে দেখতে পেয়েছিল, সে শুয়ে আছে তার মা সোহাগীর ঘরে, আর তার মা ও বাবা দুজনে দুপাশে বসে কপালে জলপটি দিয়ে বাতাস করছে তাকে।

পরদিন সকালে গত রাত্রের সেই ভূতের কথা বলেছিল চাঁপা তার মার কাছে। বলতে বলতে আতংকে শিউরে উঠেছিল বারবার। আর, সেই থেকে বন্ধ হয়ে গেল তার কুসুমবুড়ির কাছে যাওয়া। পর হয়ে গেল কুসুমবুড়ি।

মা বলেছিল,—ওর কাছে আর যাবি না কোনোদিন চাঁপা। ও' আমাদের কেউ না। ডাকলেও যাবি না। মুড়ি বাতাসা দিলেও যাবি না। মুগের নাড়ু দেখিয়ে কাছে ডাকলেও যাবি না। ও' রাক্‌সি।

ছোট চাঁপা মেনে নিয়েছিল সে কথা। রাক্‌সি না হলে কেউ ভূতকে দরজা খুলে দেয় মানুষকে চিবিয়ে খাবার জন্যে? কুসুমবুড়ি রাক্‌সি না হয়ে যায় না। কিন্তু একটা রাক্‌সি কী করে দিদা হল তার? কেমন করে হল? কেন হল?

মা বলেছিল,—ও' দিদা নয় তোর। কেউ হয় না আমাদের। ও আমার পাতানো মা, তোর পাতানো দিদা। কোনদিন তোকেও দিয়ে দেবে ভূতের হাতে।

সেই শুনে চাঁপা ভয়ে জড়িয়ে ধরেছিল সোহাগীর গলা। তারপর বলেছিল,—আমাকে কিন্তু ভূতের হাতে দেয়নি তো তুলে।

মা বলেছিল,—এখন যে তুই ছোট্ট, তাই দেয়নি। তুই যখন বড় হবি, গায়ে মাংস লাগবে ঐ মেয়েছেলেটার মতন, তখন দেবে। তুই কাঁদবি, ও' শুনবে না। তুই পা জড়িয়ে ধরবি, ও' তোকে লাথি মারবে। তুই বলবি, বাঁচাও; ও' দরজা খুলে ভূতকে বলবে, নিয়ে যাও এটাকে।

চাঁপা তখন ভয় পেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলেছিল,—আর আমি কোনোদিন যাব না মা কুসুমবুড়ির কাছে। তুমিও আমাকে আর ও-ঘরে রেখে এস না মা।

সোহাগী চাঁপাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলেছিল,—কোনো ভয় নেই তোর। আর তোকে কোনোদিন ঐ রাক্‌সির কাছে রেখে আসব না। এবার থেকে সারাদিন তুই আমার কাছেই থাকবি। লেখাপড়া শিখবি, ইস্কুলে যাবি, পাশ করবি, নার্স হবি। অনেক টাকা রোজগার করবি নার্সের চাকরি করে। আমি আর তোর বাবা তখন বুড়ো বয়েসে তোর রোজগারের টাকায় পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে ব'সে খাব। তারপর তোর বিয়ে হবে একদিন। আমরা জামাইকে বলব,—ভাখো বাবা, আমাদের তো ঐ মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। তুমি আমাদের সঙ্গে একসঙ্গেই থাকো। নৈলে মেয়েকে ছেড়ে আমরা বাঁচব না।

শুনে ছোট্ট চাঁপা মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বলেছিল,—আমি বিয়েই করব না।

সাধারণ কথা। দুনিয়ার সব মেয়েই বলে একথা ছোট্টবেলায়। শুনে হাসেন মায়েরা। সোহাগী কিন্তু হাসতে পারল না। কথাটা শুনে সে যেন কেমন শিউরে উঠে বলল,—ও-কথা বলতে নেই চাঁপা, ছিঃ!

তারপরে, দিন চারেকের মধ্যেই বস্তি বদল করল সোহাগী। পুরোনো বস্তি থেকে কিছুটা দূরে জলের কলের ধারের নতুন বস্তির দোতলায় ঘর নিলে একটা। তার নিচের তলায় ছাঁট-কাগজের গুদোম, আর একটা রাঙ-ঝালের দোকান।

চাঁপা যখন আরো একটু বড় হল, তখন এ-বাসাও ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও যেতে চেয়েছিল সোহাগী। কিন্তু তা' আর সম্ভব হয়নি। বাসা-বদলের আগেই সেই বিচ্ছিরি অসুখে শয্যা নিল সোহাগী, যে-অসুখে আজ ক'বছর ধরে সে তিলে তিলে খরচ করে ফেলছে নিজেকে।

॥

এই বাসায় নিজস্ব একটি খোপ আছে চাঁপার। চাঁপা নিজের হাতেই তৈরি করে নিয়েছে সেই খোপ। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেই কাঠের পাটা পাতা যে সরু বারান্দা দিয়ে দোতলার একমাত্র ঘরটিতে পৌঁছান যায়, সেই সরু বারান্দার একপ্রান্তে ছেঁড়া মাদুর, কাগজ, পিজবোর্ডের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে ছোট্ট একটি খুপরি বানিয়ে নিয়েছে চাঁপা। সেই তার পড়বার ঘর, তার স্বপ্ন দেখার ঘর, তার স্বর্গ!

নিজের হাতে তৈরি সেই ছোট্ট ঘরটিতে বসে এ-অঞ্চলের তিন দিক দেখতে পায় চাঁপা, অথচ ওকে দেখতে পায় না কেউ। এ-ঘরের ডানদিকের ফোকরে চোখ রাখলে দেখতে পাওয়া যায় এ-বাসার পিছন দিকের নোঙরা মোষের খাটালটা আর তারও পিছনের সেই বস্তিটা, ছোট্টবেলায় যে-বস্তিতে থাকত চাঁপারা।

মাঝরাতে কোনোদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে আর যখন ঘুম আসতে চায় না, চাঁপা তখন চুপিসাড়ে গিয়ে একলাটি বসে ওর সেই ছোট্ট খোপটুকুর মধ্যে। সেই মাঝরাতে সবকিছু যখন নীরব নিঝুম, —চাঁপার ঘরের বাঁ-দিকের ফোকর সুমুখের ফোকর কোথা দিয়েও যখন জেগে থাকার কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না, চাঁপা তখন চোখ রাখে ডানদিকের ফোকরে। ডানদিকের ফোকরে চোখ রাখলে তখন অন্ধকারে আবছা দেখতে পায় খাটালের মোষগুলোকে। শুনতে পায় দু-একটা জেগে-থাকা মোষের ল্যাজ দিয়ে মশা তাড়ানোর ফটাস্ ফটাস্ শব্দ। তারপর সেই মোষের খাটালকে ডিঙিয়ে আরো পিছনে চোখকে মেলে দিয়ে চাঁপা দেখতে পায় তাদের ছেড়ে-আসা সেই বস্তির মধ্যে জেগে-থাকার চিহ্ন। দেখতে পায় মানুষের ছায়ার ঘোরাফেরা, দেখতে পায় বিড়ির আগুনের দপদপানি, শুনতে পায় মাটির ভাঁড় ভেঙে ফেলার শব্দ, শুনতে পায় আচমকা একটা হাসি, শুনতে পায় বেসুরো গলার একটুখানি গান বা।

কোনোদিন চাঁপার হয়তো চোখে পড়েছে কোনো মানুষকে বেরিয়ে আসতে ঐ বস্তি থেকে। টলছে মানুষটা। চলন দেখলে হাসি পায় তার। সরু গলিটা দিয়ে আসতে গিয়ে দু-দিকের দেয়ালে মানুষটা কতবার যে ধাক্কা খেল তার আর গুনতি নেই। ধাক্কা খেয়ে খেয়ে আসতে আসতে মানুষটা হয়ত মাড়িয়ে ফেলল একটা ঘুমন্ত কুকুরের ল্যাজ। কেঁউ কেঁউ করে লাফিয়ে উঠে কুকুরটা ভয়ে ছুট মারল একদিকে, আর মানুষটা আরেকদিকে। ছুটতে গিয়ে পা হড়কে গিয়ে পড়ল মানুষটা গোবরে মাখামাখি হয়ে।

এ-দৃশ্য দেখে চাঁপা একলাটি হেসে উঠতে গিয়েও হাসতে পারেনি। ঠিক সেই মুহূর্তেই দূরের সেই বস্তির ভিতর থেকে ভেসে এসেছে হয়ত তীব্র করুণ একটা আর্তনাদ। হাসতে গিয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে চাঁপা।

মাঝরাতে ঐ বস্তিটা ভাবিয়ে তোলে চাঁপাকে। চাঁপা ভাবে। ভেবে কূলকিনারা পায় না।—মাঝরাতে সবাই যখন ঘুমোয় তখন যে-বস্তি হাসতে পারে গাইতে পারে, সেই বস্তিই আবার অমন করে কাঁদে কেন? ওর কিসের হাসি? ওর কিসের কান্না?

একদিন সোহাগীকে চাঁপা জিজ্ঞেসও করেছিল,—মাগো, আমি যখন ছোট্ট ছিলুম, তখন তুমি তো ছিলে ঐ বস্তির দোতলার ঘরে। বল না মা-গো, ওরা রাত্তিরে জাগে কেন? ওরা হাসে কেন? ওরা কাঁদে কেন?

সোহাগী চাঁপার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলেছিল,—আমি যখন থাকতুম ওখানে, তখন ওরা অমন করে রাত জাগত না। এখন যত মন্দ লোকের বাসা হয়েছে ওখানে। ওরা খারাপ। শুনেছি, ওরা রাত্তির বেলা জুয়া খেলে, নোট জাল করে, চুরির জিনিসের ভাগ-বাঁটরা করে।

শোনা কথায় মন ভরেনি চাঁপার। ইস্কুল যাবার পথে একদিন নিজের মাথার গোলাপী ফিতেটা দিয়ে ভাব করেছে পিছনের বস্তির মেয়ে খাঁদুর সঙ্গে।

চাঁপার চেয়ে কিছু বড়ই হবে খাঁদু। বিচ্ছিরি নোঙরা মেয়েটা। চুলে তেল থাকে না, পায়ে জুতো থাকে না,—ময়লা একটা ইজের আর তার ওপর ওর মায়ের ছেঁড়া একটা ব্লাউজ গায়ে দিয়ে লম্বা লম্বা ঠ্যাং বের কোরে রাস্তায় ঘুরতে একটুও লজ্জা করে না ওর। চাঁপা কতদিন বিকেলে ওর খোপের মধ্যে ব'সে বাঁ-দিকের ফোকরে চোখ রেখে দেখেছে খাঁদুকে দু-পয়সার আলুকাবলি কিনে সাতবার তেঁতুলের খাট্টা চেয়ে চেয়ে ঝগড়া করতে আলুকাবলীওলার সঙ্গে। দেখেছে, বিড়ির দোকানের বিড়ি-বাঁধা লোকগুলোর কাছ থেকে হ্যাংলার মতন পয়সা চেয়ে নিতে। দেখেছে, রাস্তার কুকুরকে ঢিল ছুঁড়ে মারতে, ফিরিওলার ডালা থেকে জিনিস চুরি করতে, যেখানে-সেখানে সিকনির হাত মুছতে, ঘুমন্ত রিক্সাওয়ালার গাড়িটাকে কিছুদূরে টেনে নিয়ে গিয়ে হি-হি করে হাসতে।

বিচ্ছিরি অসভ্য মেয়েটা।

কিন্তু সেই অসভ্য নোঙরা মেয়েটার সঙ্গেই একদিন যেচে ভাব করতে হয়েছে চাঁপাকে। গরজ এমন বালাই।

চাঁপা তখন ইস্কুলে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখতে পেল, ভাঙা পোড়ো বাড়িটার সামনে যেখানে কেউ কোত্থাও নেই, সেইখানে একটা ঢিপির আড়ালে ব'সে পেচ্ছাপ করছে খাঁদুটা।

দেখে খুব লজ্জা করছে চাঁপার, ঘেন্না করেছে চাঁপার। তবু ডেকেছে,—এই খাঁদু, শোনো।

খাঁদু ভেংচি কেটেছে।

চাঁপা তখন বুদ্ধি করে নিজের মাথার গোলাপী ফিতেটা খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছে,—এই ফিতেটা দেব তোমায়। শোনো ভাই একটা কথা।

ইজেরের দড়িটায় গিঁট বাঁধতে বাঁধতে এবার কাছে এসেছে খাঁদু। ছোঁ মেরে চাঁপার হাত থেকে গোলাপী ফিতেটা কেড়ে নিয়ে বলেছে,—কী? কী কথা?

—রাত্তিরে সবাই যখন ঘুমোয়, তোমাদের বস্তিটা তখন জেগে থাকে কেন? কী হয় ওখানে?

—আহা! ন্যাকা মেয়ে জান না যেন কিছু! ঢং!

—সত্যি জানি না।

—মানুষের মধ্যে একদল ব্যাটাছেলে কেন, আরেকদল মেয়েছেলে কেন, সেটা জান তো? না কি বলবে, তাও তো জানি না ভাই।

—জানি নাই তো। জানলে কি আর ওমনি-ওমনি অমন সুন্দর ফিতেটা দিয়ে দিই তোমায়?

—মাইরি জানিস না?

—সত্যি না।

—মাইরি বল?

—মাইরি বলতে বারণ করেছে মা।

—তুই তো ঐ টিনের বাড়ির দোতলায় থাকিস?

—হ্যাঁ।

—নাম কি রে?

—চাঁপা।

—ডাক-নাম ভাল-নাম সবই চাঁপা?

—হ্যাঁ।

—বেশ আছিস মাইরি। কী করিস রে সারাদিন?

—পড়ি। মার সেবা করি। মার সঙ্গে গল্প করি।

—তোর মার বুঝি অসুখ?

—হ্যাঁ। খুব অসুখ।

—কী অসুখ রে?

—তা জানি না।

—ফিতে তোকে কে কিনে দেয় রে?

—বাবা।

—তোর বাবা আছে বুঝি?

—আছেই তো। কেন? তোমার নেই?

—উঁহু! আমার নেই, পটলির নেই, সন্তুর নেই, গেঁড়ির নেই। আমাদের কারুর বাবা নেই।

—মারা গেছেন বুঝি?

—আরে দূর্! ছিলই না বাবা, তো মরবে কি করে? বেবুশ্যের মেয়েদের বুঝি বাবা থাকে? তুই কী হাবা মেয়ে রে!

—আমি জানি না তো। আমায় কেউ কিছু বলে না যে।

—আয় আমার সঙ্গে এই ভাঙা বাড়িটার ভেতরে। আমি তোকে সব বুঝিয়ে দেব।

—এখন নয়, ইস্কুলের বেলা হয়ে যাবে।

—তাহলে বিকেলে আসিস। ইস্কুল থেকে ফেরবার সময়। আমি এইখানেই থাকব।

—বেশ।

—আমাকে কিন্তু কাল চারটে পয়সা দিতে হবে।

—আমার তো পয়সা নেই।

—ওমা! সে কী রে! তোর মা তোকে পয়সা দেয় না?

—না।

—টিফিনে খাস্ কী?

—আমার কৌটোয় মুড়ি থাকে, বাতাসা থাকে, কলা থাকে, তাই খাই।

—ঘুগ্‌নি খেতে ইচ্ছে করে না? ছোলা-মটর? পকৌড়ি? পেঁয়াজী?

—করে। কিন্তু মা যে পয়সা দেয় না।

—আমাকেও তো দেয় না আমার মা। তাতে কি আমার কিছু কেনা আটকায় নাকি? বিড়ির দোকানের ছুতোদা পয়সা দেয়, মণিহারীর দোকানের সুশীলবাবু পয়সা দেয়। আরো কত আছে।

—কেন?

—আছে। ব্যাপার আছে। সব বলব তোকে। ইস্কুলের ছুটির পর মনে করে আসিস।

রুক্ষ চুলে গোলাপী ফিতেটা বাঁধতে বাঁধতে রোগা রোগা লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে চলে গেল খাঁদু। চাঁপা আবার ইস্কুলের পথ ধরল।

ইস্কুল থেকে ফেরার পথে চাঁপা গিয়েছিল সেই ভাঙা বাড়িটার মধ্যে। ওর খুব ভয় করেছিল। ও' বুঝতে পেরেছিল, বাড়ি ফিরতে দেরী হলে মা ভাববে;—তবু গিয়েছিল। কাজটা যে অন্যায় হচ্ছে, তাও টের পেয়েছিল সে মনে মনে;—তবু গিয়েছিল। ওকে জানতেই হবে, বস্তিটা কেন রাত জাগে, কেন হাসে, কেন কাঁদে?

ইস্কুল থেকে ফেরার পথে চাঁপা যখন থেমেছিল সেই ভাঙা বাড়িটার সামনে, তখন খাঁদুর কোনো চিহ্নই সেখানে না পেয়ে খু-উ-ব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। মনমরা হয়ে ফিরেই যাচ্ছিল সে, এমন সময় ডাক এল,—এই চাঁপা!

চাঁপা আনন্দে অবাক হয়ে ঘাড় তুলে দেখল, সেই ভাঙাবাড়ির দোতলার ভাঙা ছাতের আলসেতে বসে আছে খাঁদু। বলল,—আয় ভেতরে। তোর জন্যে সেই কখন্ থেকে বসে আছি এখানে।

—কোন্ দিক দিয়ে যাব?

—ঐ তো দরজা। কী ছেনাল মেয়ে রে!

—চাঁপা ঢুকেছিল সেই ভাঙা বাড়ির ভাঙা দরজার তলা দিয়ে। খুব গা-ছম্‌ছম্ করেছিল ওর তখন; বুক ধড়ফড় করেছিল।

ভাঙা দরজার 'পরে সরু একফালি দালান, সেই দালান দিয়ে চাঁপা প্রকাণ্ড একটা উঠানে গিয়ে পৌঁছেছিল। আর সেখানে পৌঁছেই যার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছিল তার, সে আর কেউ নয়, খোদ্ কুসুমবুড়ি!

কুসুমবুড়ি সেই ভাঙা বাড়ির ভাঙা দেয়াল থেকে শুকনো ঘুঁটে ছাড়াচ্ছিল তখন। চাঁপাকে দেখে বলেছিল,—ওমা তুই! এখানে আয়।

চাঁপা পালাত। নিশ্চয়ই পালাত। কিন্তু সেই মুহূর্তেই কোথা থেকে কোন্ ভাঙা পাঁচিল টোপ্‌কে খাঁদু এসে ওর হাতটা পাকড়ে ধরে বলেছিল,—জান কুসুমবুড়ি, আমাকে বিড়ির দোকানের ছুতোদা, মণিহারীর দোকানের সুশীলবাবু, সবাই পয়সা দেয় কেন তাই জানতে এসেছে চাঁপা।

চাঁপা বলেছিল,—না তা তো আমি জানতে আসিনি। আমি শুধু তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলুম, তোমাদের ঐ বস্তিটা রাত্তিরে জাগে

কেন? হাসে কেন? কাঁদে কেন? কিন্তু তাও আমি আর জানতে চাই না। তুমি আমার হাত ছেড়ে দাও খাঁদু। আমি বাড়ি যাব। দেরী হলে মা ভাববে, বাবা রাগ করবে।

—বাবা!

মিশিমাখা কালো কুচ্ছিৎ দাঁত বের করে ক্যারকেরে গলায় খন্‌খন্‌ করে হেসে উঠেছিল কুসুমবুড়ি।

—তোর বাপ আবার জন্মাল কবে রে? কে বিয়োলো তাকে? নামটা কিরে তার?

—শ্রীশ্যামাপদ ভট্‌চাজ্যি।

আবার হাসি কুসুমবুড়ির।

—তা' ভাল, তা' ভাল। ভস্‌চাজ্যির মেয়ে তুই, সতীনখির মেয়ে তুই, লেখাপড়া শিখে ভদ্দরনোক হবি। তা' বুড়ি দিদার কাছে এতদিন পর এলিই যদি, তো দুটো মুগের নাড়ু খেয়ে যা। অ খাঁদু এই নে পয়সা, চারটে মুগের নাড়ু এনে দেনা কিনে। নাতনী আমার ভালবাসে খেতে।

খাঁদু বলেছিল,—মুগের নাড়ু খাবি, না পেঁয়াজী খাবি রে চাঁপা?

—কিচ্ছু খাব না। বাড়ি যাব।

—ওমা! বস্তির গল্পটা শুনবি না? কী মেয়ে রে!

—শুনবে শুনবে, সব শুনবে চাঁপা। অনেকদিন দিদার সঙ্গে দেখাসাখ্যোত নেই কিনা, তাই লজ্জা করছে। তুই চট্‌ করে যা খাঁদু।

বলতে বলতে এগিয়ে এসে চাঁপার হাত ধরেছিল কুসুমবুড়ি। আর খাঁদু ছুটে গিয়েছিল পেঁয়াজী আনতে।

সেই ভাঙা বাড়িতে বসে পেঁয়াজী, ডালবড়া আর মালাই-বরফ খেয়েছিল সেদিন চাঁপা। আর খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে শুনেছিল যা কুসুমবুড়ির কাছে, তা' সম্পূর্ণ ভুলে যাবার জন্যে আজও প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছে চাঁপা।

কী বিচ্ছিরি নোঙরা সে-সব কথা!

আজও চাঁপা ভাবে, সেদিন কেন শুনেছিল সেসব চাঁপা? কী দিয়ে বশ কোরে সেদিন ঐ সব নোঙরা কথাগুলো শুনতে তাকে বাধ্য করেছিল কুসুমবুড়ি?

সেদিন সেই ভাঙা বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসায় ফিরতে রাত পৌনে আটটা হয়ে গিয়েছিল তার। সোহাগী ভেবে আকুল হয়েছিল। বলেছিল,—কোথায় ছিলি রে চাঁপা এতক্ষণ?

—জানি না।

—কেঁদে চোখ দু'টো ফুলিয়েছিস কেন? কেউ মেরেছে?

—না।

—তবে?

—সত্যি করে বল আগে, আমার বাবা কে?

—এ আবার কেমন প্রশ্ন? সত্যি করে বল্‌ চাঁপা, কোথায় গিয়েছিলি তুই?

চাঁপা সব বলেছিল সোহাগীকে। না, সব নয়। মার কাছে যতখানি বলা যায়, ঠিক ততখানিই বলেছিল সে বাদ-সাদ দিয়ে।

সেদিন রাত্রে শ্যামাপদ ঠাকুর এসে কুসুমবুড়ি যে কতবড় পাজী, কত বড় মিথ্যেবাদী সব বুঝিয়ে দিয়েছিল চাঁপাকে। কিন্তু সেই থেকে কোথায় কেমন একটা খোঁচা বিঁধে আছে চাঁপার মনের মধ্যে। মাঝে-মাঝেই সেটা কেমন খচ্‌খচ্‌ করে ওঠে। চাঁপার বুকের মধ্যে তখন তোলপাড় হয়।

ইস্কুলের পণ্ডিতমশাই যখন ওর শিবপুজোর কাজের গোছ দেখে বলেন,—"হবে না? পুরুত-বামুনের মেয়ে তো। রক্ত যাবে
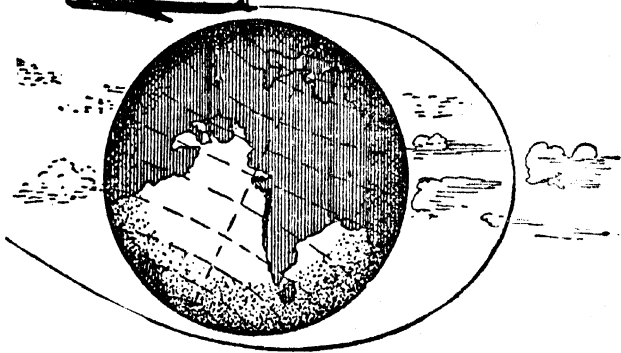
কোথায়”—তখন চাঁপার মনের ভিতরকার সেই খোঁচাটা সরে যায় কোথায়। আনন্দে ভরে ওঠে ওর মন। মাকে আবার ভাল লাগে, বাবাকে আবার ভাল লাগে।

কিন্তু যখনই মনে হয়,—তার মা-ও একদিন থাকত ঐ বস্তিতে; —শ্যামঠাকুর রাতের অন্ধকারে আসে, আবার ভোর হতেই চলে যায়;—তখনই আবার যেন সেই খোঁচাটা এসে বিঁধতে থাকে মনের মধ্যে। কী একটা কিছু বোঝা আর কিছু না-বোঝার কাঁটা ফুটতে থাকে ওর বুকের মাঝখানে।

কতদিন চাঁপা অর্ধেক রাতে তার সেই ছোট্ট খোপের মধ্যে একলা বসে আকাশের তারাদের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে জপ করেছে, —আমার মা ভাল, আমার মা-লক্ষ্মী, আমার বাবা শ্যামঠাকুর।

কোনোদিন মনে হয়েছে, আকাশের তারারা সবাই নীরবে সমর্থন করেছে তার কথা। কোনোদিন বা মনে হয়েছে, ওরা যেন চাঁপার কথা শুনে নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কী বুঝি কানাকানি ক'রে চাপা হাসি হেসেছে।

এই দু-রঙের সুতোর টানাপোড়েনে বোনা হতে হতে চাঁপার জীবনের শাড়িটা আজ চোদ্দ কাটিয়ে পনেরো গজে এসে পৌঁছেছে।

অর্থাৎ, চোদ্দ পেরিয়ে পনেরো বছরে পা দিয়েছে চাঁপা।

আর খাঁদু?

সে এখন শাড়ি পরে। সকাল বেলা গঙ্গাচ্চান সেরে ভিজে কাপড়ে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে ঘরে ফেরে সে, তখন তার দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে চাঁপার। অথচ, নিজের খোপের মধ্যে থেকে চাঁপা স্পষ্ট দেখেছে, ঐ অবস্থায় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে একটুও লজ্জা করে না খাঁদুর। বরং ঐ বিড়ির দোকানের ভুতো কিংবা আরো অনেক দোকানের অনেকে যখন হাবেভাবে শিসে-গানে ইঙ্গিত করে কিছু, খাঁদু মুচকি হেসে চোখ ঘুরিয়ে তার পাল্টা জবাব দেয় যেন বেশ। অন্তত তাই তো মনে হয় চাঁপার।

ইস্কুল থেকে ফেরার পথে এ-অঞ্চলের হতভাগা মানুষগুলোর যে-চাহনিকে পাশ কাটিয়ে কোন রকমে গা-বাঁচিয়ে বাড়ি ফেরে চাঁপা, সেই চাহনিকে খাঁদু যেন উপভোগ করে বেশ। ও যেন মজা পায় খুব। মেয়েটা যেন কী!

সেদিন ইস্কুল থেকে ফিরছে চাঁপা, এমন সময় বড় রাস্তার মোড় বরাবর খাঁদু কোথা থেকে জুটলো এসে সেখানে। বলল,—এই, এত সকাল-সকাল বাড়ি ফিরছিস যে আজ?

—আজ তিন-পীরিয়ড আগে ছুটি হয়ে গেছে।

—পীরিয়ড কী রে?

—ঘণ্টা। ছ'টা তো ক্লাস হয়। তাকে বলে পীরিয়ড।

—এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যাবি?

—কি করব তা'ছাড়া?

—কোথাও বেড়াতে গেলেই পারিস। পার্কে, গঙ্গার ধারে!

—মা বারণ করে।

—আজ তো আর তোর মা জানতে পারছে না।

—না।

—তাহলে চল না আমার সঙ্গে। যে সময় তোর বাড়ি ফেরবার কথা, তার মধ্যেই পৌঁছে দেব তোকে। মাইরি বলছি। আমি এখন কোথায় যাচ্ছি জানিস?

—কোথায়?

—গান শিখতে।

—কার কাছে শেখো?

—সে এক মস্ত ওস্তাদ আছে। বুড়ো হয়ে গেছে এখন, তবু কী গলা রে! কালীপুজোর বাজি তৈরি করতে গিয়ে ছোটবেলায় ডান হাতের দুটো আঙুল উড়ে গেছল, তবু কী ফাইন তুগি-তবলা বাজায় মাইরি! সে শুনলে তুই থ' হয়ে যাবি। গান শুনতে ভাল লাগে না তোর?

—হুঁ।

—তবে শিখিস না কেন?

—কে শেখাবে? আমাদের ইস্কুলে শুধু শিবস্তোত্র গাওয়া হয় সুর কোরে।

—দুর, ও-সব আবার গান নাকি। গান যদি শুনতে চাস তো আয় আমার ওস্তাদের কাছে। সে গান শুনতে শুনতে তোর যদি না নাচ পায় তো মুখে থুতু দিস আমার।

—থাক, বাড়ি যাই আমি।

—দূর, বড্ড ভীতু তুই। কুনোর মতো দিনরাত ঘরের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকিস কি করে রে? আয়, আয়, কিচ্ছু হবে না,—চল। একটু একটু সাহস কর দিকিনি।

চাঁপাকে টেনে নিয়ে চলল খাঁদু।

অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে যেখানে দাঁড়াল এসে ওরা, সানাই-ওলাদের পাড়া সেটা। সানাইয়ের প্যাঁ-পোঁ চলছিল ঘরে-ঘরে।

খাঁদু বলল,—বড়রা প্র্যাকটিশ করছে, আর নতুনরা শিখছে। বুঝলি না?

চাঁপা বলল,—এইখানে তোমার ওস্তাদ থাকেন?

—হ্যাঁ। সানাইওলাদের জাতের লোক নয় কিন্তু আমার ওস্তাদ। জাতে সোনারবেনে। উঁচু জাত। সানাইওলাদের পাড়ায় থাকে আর কি। ওরাই খেতে দেয় দু'বেলা। আর জামা-কাপড় পান-তামাক এ-সব আসে আমাদের বস্তি থেকে। তার বদলে আমাদের সব গান শেখায় ওস্তাদ। আর না দেখবি।

সানাইপাড়ার বস্তির একটা অন্ধকার ঘুপসি-ঘরের মধ্যে চাঁপাকে নিয়ে গেল খাঁদু। ঘরটা এতই অন্ধকার যে, সেই অন্ধকারে চোখ দুটোকে সইয়ে নিতে বেশ কিছুক্ষণ লাগল চাঁপার। চোখ দুটো সয়ে গেলে চাঁপা অবাক হয়ে দেখতে পেল, সেই ঘরের এক পাশে ব'সে আপন মনে দুলে চলেছে একজন 'মানুষ। তার দুটো পা-ই হাঁটু থেকে কেটে বাদ দেওয়া, আর তার চোখ দুটোর সাদার মধ্যে কোথাও এতটুকু একটা কালোর ফুটকি পর্যন্ত নেই!

ওদের পায়ের শব্দে মানুষটি দোলা থামিয়ে বলল,—কে?

খাঁদু বলল,—আমি গো। বনবালা।

খাঁদুর পোষাকী নামটা এই প্রথম শুনল চাঁপা।

ওস্তাদ বলল,—দু'জন মানুষের পায়ের শব্দ পেলুম যেন।

—সঙ্গে আমার বন্ধু আছে। চাঁপা। তোমার গান শুনতে এসেছে ওস্তাদ।

—তোদের ওখানে নতুন আমদানী বুঝি?

চাঁপা বলতে যাচ্ছিল,—খাঁদুদের বস্তিতে থাকে না সে। কিন্তু

চোখের ইসারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে খাঁদু বলল,—হ্যাঁ-গো। ওকেও গান শেখাতে হবে তোমায় এবার থেকে। মাঝে মাঝে সিকি ভরি আফিমের দাম দিয়ে যাবে ও'।

কেমন অম্লানবদনে বেমালুম মিছে কথা বলে যেতে পারে খাঁদুটা!

খাঁদুর কথা শুনে ওস্তাদের সেই ঘসা চোখদুটোও চক্‌চক্ করে উঠল আনন্দে। বললেন,—বেশ বেশ, খুব ভাল, খুব ভাল। এমন গান শেখাব তোকে যে, ঘরে তোর লোক বসাবার ঠাঁই কুলোবে না। তা' আয় দিকিনি কাছে, দেখি দিকিনি আমার ছাত্রীটি কেমন? দেখি দিকিনি কোন্ গান মানাবে তোর মুখে?

চোখের সাদায় যার এতটুকু কালোর ছিটেফোঁটা নেই, সে আবার দেখবে কী ভেবে পায় না চাঁপা। খাঁদু বলে,—এগিয়ে গিয়ে বোস্ চাঁপা।

বাধ্য হয়েই এগিয়ে গিয়ে বসে চাঁপা। মানুষটার নাগালের মধ্যেই। ওস্তাদের হাতদুটো চাঁপার মাথায় ছুঁইয়ে দেয় খাঁদু। সেই খোঁড়া অন্ধ নেশাখোর বুড়ো মানুষটার কাঁপা কাঁপা হাতদুটো চাঁপার মাথা থেকে গাল, গাল থেকে চোখ নাক মুখ চিবুক বয়ে বয়ে ক্রমেই নামতে থাকে গলা থেকে কাঁধ, কাঁধ থেকে বুক পর্যন্ত।

চাঁপার কেমন অস্বস্তি হতে থাকে। ঘরের অন্ধকারটাকে কেমন নোংরা বলে বোধ হয়। চারিদিকে' সানাই-এর এলোমেলো প্যাঁ-পোঁ শব্দটা কেমন যেন বিরক্তিকর লাগে। সানাই-পাড়ার চারিদিকের গন্ধটা কেমন ভ্যাপসা লাগে নাকে।

ওস্তাদ বলেন,—সাবাস! তুই তো বেশ্যা হতে করে দিবি রে ছুঁড়ি। তোর চোখের পাতায় লম্বা লম্বা চুল রয়েছে, মাথায় তোর কোঁকড়া চুলের ঢেউ, মাঝখানে খাঁজকাটা ফুলোফুলো ঠোঁট, চিবুকে টোল-খাওয়া গর্ত আছে একটা, নাকের ধারদুটো উঁচু। এই বয়সেই দেহের যা ঢেউ, বয়সকালে কামাল করে দিবি একেবারে!—তোর ভাবনা কী রে?

—আমি বাড়ি যাব।

—হ্যাঁরে বনবালা, আমার নতুন ছাত্রীর গায়ের রঙটা কেমন রে?

—আমার মতন ফর্সা নয় গো, ময়লা।

—কেমন ময়লা? আমার এই মাটির ঘরের দেয়ালের মতন?

—তাই ধরে নাও।

—মুখে তিল আছে কোথাও?

চাঁপার মুখের কাছে মুখ নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে খাঁদু বলে,—উঁহু মুখে একটাও নেই, গলায় আছে;—গলার কণ্ঠাটা নেমে যেখানে গর্তর মতন হয়, ঠিক তার মাঝখানে।

—না, না, ওতে চলবে না, ও তো হল গিয়ে ধার্মিক মনের চিহ্ন। ও-চিহ্নতে চলবে না। তুই এক কাজ করবি চাঁপা। তোর বাঁ-দিকের গালে ঠিক যেখানটায় চোখের পাতা ছুঁচোলো হয়ে এসে শেষ হয়েছে, তারই তলায় কাজল দিয়ে তিল এঁকে নিবি একটা। চোখের নাচনের সঙ্গে ঐ তিল যখন নাচবে না,—বাহারে বাহা,—মুণ্ডু ঘুরে যাবে সবার।

বলতে বলতে গুন্‌গুন্ করে গেয়ে উঠলেন ওস্তাদ,—

এমন কুল-মজান ফুল গেঁথেছে কে ?
আমার মন মজালে হায়।
আমায় গুণ করেছে, খুন করেছে,
পরাণ রাখা দায়।

চাঁপার রূপের এতখানি গুণকীর্তন গোড়া থেকেই কেমন খারাপ লাগছিল খাঁদুর। হিংসে-হিংসে হচ্ছিল। তার ওপর আবার গানটা শুনে তার যেন আর সহ্য হল না। থরথরিয়ে বলল,—উঠে আয় চাঁপা, উঠে আয়, ওস্তাদ আজ ডবল্-সিদ্ধি খেয়েছে। দেখছিস না, আবোল-তাবোল বকে মরছে শুধু। আজ আর গান-ফান কিচ্ছু হবে না।

অনেকক্ষণ থেকেই এখান থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে ছটফট্ করছিল চাঁপার মন। ও' তাড়াতাড়ি বলল,—হ্যাঁ ভাই, বাড়ি ফিরতে হবে এবার।

ওস্তাদ বলল,—সে কী ! গান শিখবে না ?

খাঁদু বলল,—নুড়ো জ্বালাবে তোমার মুখে। বুড়ো ঘুঘু কোথাকার !

চাঁপা বলল,—ছিঃ খাঁদু ! ও-কী কথা !

খাঁদু চাঁপাকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে চলতে চলতে বলল,—তুই থাম্ দিকিনি চাঁপা। যা জানিস না, তাই নিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিসনি। ও-বুড়ো কি কম শয়তান ?

চাঁপা বলল,—আহা, মানুষটা চোখে দেখতে পায় না, চলতে ফিরতে পারে না। আজ তো বাড়ি ফেরার তাড়া, আরেকদিন তোমার সঙ্গে এসে ওর গান শুনে যাব।

খাঁদু সানাইপাড়ার নোঙরা রাস্তায় একটা খালি-টিনের কৌটোকে পায়ে করে নর্দমায় ফেলে দিয়ে ঠোঁট উল্টে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল,—তা' আসবি না ? আসবি বৈকি আবার। ওর গাল-টেপা গা-টেপা খুব ভাল লেগেছে বুঝি তোর ?

—ছিঃ খাঁদু, তুমি অসভ্য-কথা বলছ !

—আমার কথা তো অসভ্য ; কিন্তু ও' কেন খোঁড়া জানিস ? কেন অন্ধ জানিস ?

—না তো।

খাঁদু এবার চাঁপার পাঁজরে কনুইয়ের একটা গোঁত্তা মেরে বলল,—খারাপ অসুখ রে নেকী, খারাপ অসুখ ;—গর্মি।

—সে কী অসুখ ?

—অতশত জানি না। আমি কি ডাক্তার ? তবে, ঐ যে ইস্‌মাইল সাহেব আসে না আমাদের বস্তিতে। কুন্‌কিমাসির ঘরে গিয়ে রোজ রাত্তিরে যে মাংসের ঘুগনি খায়। শুনছিলুম, ঐ হাতির মতন চেহারার মানুষটার নাকি খারাপ রোগে ধরেছে। ওর নাকের ডগা, কানের ডগা সব নাকি খসতে সুরু করেছে। কারুর নাক খসে, কারুর কান খসে, কারুর চোখ গলে যায়, কারুর পায়ে পচ ধরে। তাকেই বলে খারাপ অসুখ।

—অসুখ মানেই তো খারাপ।

—শোনো ঢং-এর কথা ! ও লো ছুঁড়ি·····ও মা ! ঐ ভাখ চাঁপা, যাকে তুই বাপ বলে ডাকিস সেই মানুষটা যাচ্ছে।

—বাপ বলে ডাকি মানে ?

—ডাকিস না ? ওঃ, তবে বুঝি মামা বলে ডাকিস আজকাল ?

—উনি আমার বাবা।

খাঁদু মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খুব ঢং করে হাসতে যাচ্ছিল, তার আগেই তার গালে ঠাস্ করে একটা চড় মেরে চাঁপা আবার বলল,—উনি আমার বাবা।

হতভম্ব খাঁদু কিছু বুঝে ওঠবার আগেই খাঁদুর ওদিকের গালে আরো একটা চড় মেরে চাঁপা তৃতীয়বার বলল,—উনি আমার বাবা।

তারপর শ্যামাপদ ঠাকুরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে চাঁপা চীৎকার করে বলে উঠল,—বাবা, বাবা, এই যে আমি, এখানে। [ক্রমশঃ।

হাইনরিখ হাইনের একটি কবিতা

(Heinrich Heine)

ভাগ্যদেবীর মতিগতি,
চলন বলন চপল অতি।
থাকেন নাকো একই ঘরে,
আজ এসেছেন তোমার তরে,
চুল সরিয়ে কপোল পরে
ছোট্ট চকিত আদর করে
গেলেন চলি দ্রুতগতি।
ঠিক বিপরীত স্বভাবখানি,
নাম শ্রীমতী দুর্ভাগিনী
নজর হানি দেখেন যাকে
বাঁধেন কঠিন বাহুর ফাঁকে
বলেন ত্বরা নেইকো আমার
শয্যা পাশে বসি তোমার
বুনব আমি দণ্ড-দু'চার॥

অনুবাদিকা—সুমিত্রা গুপ্ত

শ্রাবণ সাঁঝে

শ্রীমতী স্বাগতা গুপ্ত

ঐ কালো মেঘের নিবিড় ছায়া মাঝে,
সজল এক বাদল ঘেরা সাঁঝে,
করুণ কার নয়ন মনে রাজে ;
ব্যথিত হিয়া করিছে টলমল।
স্মৃতির ব্যথা বাজিয়া ওঠে মনে।···
বারির ধ্বনি শুনি পিয়াল বনে,
মন রহে না শুন্য গৃহকোণে,
মানে না বাধা গভীর আঁখিজল।

শুনি, উতলা বনের আকুল নিশ্বাসে
কোন হিয়ার ব্যাকুল ব্যথা ভাসে।
বাদলা দিনে যখন মেঘাকাশে
আনিয়া দেয় ঘন বাদল ধারা।
কোন প্রাণের তৃষিত ভালোবাসা
মরিছে ঘুরি না পেয়ে কোন ভাষা ;
মরিয়া কার হারানো সব আশা
শ্রাবণ সাঁঝে হৃদয় গৃহহারা।

[পরলোকগত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বঙ্গীয় মহাকোষ রচনার সময় ভারতীয় গাছ-গাছড়ার একটি অভিধান—বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত—সংকলন করেছিলেন। এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের যাতে কাজে লাগে তার জন্যে এখানে উহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হলো। এর মধ্যে যে বইগুলির সাংকেতিক শব্দ আছে সেগুলি এই—শব্দ°—শব্দকল্পদ্রুম, শব্দচ°—শব্দচন্দ্রিকা, রাজনি°—রাজনিঘণ্টু, উপ°—উপবনবিনোদ, রত্ন°—রত্নমালা, বৈদ্যনি°—বৈদ্যনিঘণ্টু, ভাবপ্র°—ভাবপ্রকাশ, অম°—অমরকোষ, মে°—মেদিনীকোষ, অভি°—অভিধান-চিন্তামণি। ওড়ি°—ওড়িয়া, তা°—তামিল, তে°—তেলেগু, মরা°—মরাঠি, গুজ°—গুজরাতী, ফ.°—ফার্সী, আ°—আর্বী, হি°—হিন্দী, স°—সংস্কৃত, দ্র°—দ্রষ্টব্য ইত্যাদি। —সম্পাদক]

অংশুমৎফল—কদলী, musa sapientun. কদলী দ্র°।

অংশুমৎফলা—কদলীবৃক্ষ। কদলী দ্র°।

অংশুমতীফলা—কদলীবৃক্ষ।

অংসপাশ্বিক—মহানিম্ববৃক্ষ। মহানিম্ব দ্র°।

অকরা আমলকী, phyllanthus emblica L আমলকী দ্র°।

অকরাকরভ—গাঁদা জাতীয়, anacyclus pyrethrum. আকরকরা।
পর্যায়—অকরাস্তক, অর্কর্কার, অকলকর, অকল্ল, আকল্ল।

অকরাস্তক—আকরকরা দ্র°।

অর্কর্কর—আকরকরা দ্র°।

অকল্কর—আকরকরা দ্র°।

অকূট—ফলবৃক্ষ বিশেষ। আগইফল। আগইফল দ্র°।

অক্লিকা, অক্লীকা—নীলী, নীলগাছ, the indigo plant indigofera tinctoria.

অক্ষিভেষজ—বৃক্ষবি°। লোহিতলোধ। রাজনি°।

অক্ষোট—পর্বতজাত পীলু, juglans regia. আখরোট দ্র°।

অখট্ট—পিয়াল, buchanania latifolia। পিয়াল দ্র°।

অখরোট—আখরোট দ্র°।

অখিলিকা—[হি° করেলী ছোটা] ক্ষুদ্র কারবল্লী, উচ্ছে, memordica charautia.

অগদ—দদ্রুঘ্নবৃক্ষ, দাদমর্দন গাছ, cassia alata ॥ রাজনি: ॥
দদ্রুমর্দী দ্র°।

অগরা অগরী—এক প্রকার তৃণ। সাধারণতঃ 'দেওতাড়' নামে পরিচিত, androgagon serratus. দেবদালিকা দ্র°।

অগরু, অগুরু—অগুরুচন্দন, গুগগুল, দীর্ঘ চিরশ্যামল বৃক্ষ, acquilaria agallocha, aquilaria ovata, amyris agallocha. [হি° ও গুজ° অগর্; তা° অগ্গলিবন্দ, অগর্; তে° হরুগুহচেট্টু, কৃষ্ণাগুরু।

অগস্তি, অগস্তিদ্রু—[হি° অগস্তিয়া, হতিয়া, বফুল; গুজ° অগথিয়ো; মরা° অগস্তা, হদগা; কন্নড় অগসেয়মরণু; তে° অনিয় বিসেচেট্টু, অনীসে, অবিসি; তা° অর্গতি] মুনিদ্রুম, পাশুপত, বক, বসু, মুনি, কুম্ভযোনি, বকফুলের গাছ, বাসকোণা ফুলের গাছ, sesbania grandiflora (Carey), aeschynomene grandiflora (Wilson).

অগ্নিগর্ভা—শমীবৃক্ষ, সাঁইগাছ, accacia suma. শমী দ্র°।

অগ্নিজিহ্বা, অগ্নিজিহ্বিকা—[হি° করিহারী; মহা° কললাবী] লাঙ্গলী বৃক্ষ, বিষ লাঙ্গুলিয়া, methonica superba ॥ রত্না° ॥

অগ্নিজ্বালা—গজপিপ্পলী, scirdapsus officinalis. পিপ্পলী দ্র°।
জলপিপ্পলী, grislea tomentosa; ধাতকী, ধাইগাছ। রাজনি°।

অগ্নিদমনক, অগ্নিদমনী—[ম° ধমামাভেদ, অগ্নিদবনা, কেহ কেহ শোলা বলিয়া থাকে; পর্যায়—বহ্নিদমনী, বহুকণ্টকা, বল্লিকণ্টকারিকা, গুচ্ছফলা, ক্ষুদ্রফলা, ক্ষুদ্রকণ্টকারী, ক্ষুদ্রদুস্পর্শা, ক্ষুদ্রকণ্টকারিকা, মর্তেন্দ্রমাতা, দমনী] ক্ষুদ্রকণ্টক বৃক্ষ, গণিকারী, গণিরী, গণিয়ারী species of cantacarica, narcotic plant, solanum jacquini.

অগ্নিনির্যাস—অগ্নিজার বৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

অগ্নিমন্থ—[হি° অনেথা, অর্ণী, গণিয়ারী; কোচবি° গঁয়দারী, গণেন্দারী, ওড়িয্যা° অগুয়াকং; গুজ° অরণী, তা; মুন্নে. ম° চামারি; পর্যায়—গণিকারিকা, শ্রীপর্ণ, হবিমন্থ, বহ্নিমন্থ, ইত্যাদি] গণিয়ারী, গণিরী, অগ্গাস্ত, premna integrifolia, premna spinose, prremna seratifolia.

অগ্নিশিখা—লাঙ্গলিকী, জুয়াকশাক দ্র°।

অগ্রপর্ণী—শূকশিম্বী, আলকুশী গাছ carpopogon pruriens, অজলোমা বৃক্ষ ॥ রত্ন° ॥

অগ্রবীজ—কুবণ্টাদি বীজাগ্র বৃক্ষমাত্র, কলমের গাছ, যেমন—gomphroena globosa. ॥ অভি° ॥

অগ্রিমা—লবনীফল, লবলীফল, লোনাফল, amnona reticulata.

অঙ্গনাপ্রিয়—অশোকবৃক্ষ, jonesia asoca.

অঙ্গারপর্ণী—বামনহাটি গাছ, clerodendron siphonanthus.

অঙ্গারমঞ্জরী, অঙ্গারমঞ্জী—রক্তকরঞ্জ, মহাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, cesalpinia banducella. ॥ রাজনি° ॥

অঙঘ্রিনামক—দমনক বৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

অঙ্ঘ্রিপর্ণিকা অঙ্ঘ্রিবলা, অঙ্ঘ্রিবল্লিকা—চিত্রপর্ণী বৃক্ষ, পৃশ্নিপর্ণী বৃক্ষ, চাকুলিয়া গাছ, hedysarum lagopodiodes.
অজকেশী—নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ।
অজক্ষীরনাশ—শাখোট বৃক্ষ, শ্যাওড়া গাছ, streplus asper.
অজটো—ভূম্যামলকী, ভুঁই আমলা দ্র°।
অজড়া—আলকুশী, শূকশিম্বী।
অজদণ্ডী—ব্রহ্মদণ্ডীবৃক্ষ, বামুনহাটী গাছ।। রাজনিঃ।।
অজপ্রিয়া—কুলগাছ।
অজবলা—কৃষ্ণতুলসী, কালতুলসী।
অজভক্ষ—বর্ধুর বৃক্ষ।। রাজনি°।।
অজমল—গোধূম. গম।
অজমোদ—দীপ্য, যমানী, যোয়ান, cuynmin-seed.
অজমোদা—রাঙ্কনী, রাঁধুনি, pinipinela. apium involucratum—eppich ligusticum ajowan. পর্য্যায়—খরাহ্বা বস্তমোদা, উগ্রগন্ধা, মর্কটী, মোদা, গন্ধদলা, হস্তিকারবী, গন্ধপত্রিকা, মায়ূরী, শিখিমোদা, মোদাঢ্যা, বহ্নিদীপিকা, ব্রহ্মকুশী, বিশালী, হয়গন্ধা, উগ্রগন্ধিকা, মোদিনী, কুলমুখ্যা, বিশল্যা।
অজহা—শূকশিম্বী, আলকুশী দ্র°।
অজাগর—ভৃঙ্গরাজ বৃক্ষ, eclipta or verbesena prostata.
অজাজি, জী—শ্বেতজীরক, cuminum cyminum. কৃষ্ণজীরক, nigella, india, কাকোডুম্বরিকা ficeus oppositifolia.
অঞ্জনাধিকা—কৃষ্ণকার্পাস বৃক্ষ। কালাঞ্জনী দ্র°।
অঞ্জনী—কটুকা বৃক্ষ, কটুকী গাছ black hellebore, picrorrihiza xarroa, কালাঞ্জনী বৃক্ষ।। রাজনি°।।
অঞ্জলিকারিকা—লজ্জালু (স্পর্শমাত্র ইহার পত্র সম্বদ্ধ হইয়া যায়) mimosa natans, mimosapudisa।. রাজনি°, ভাব প্র°। পর্য্যায়—রক্তপাদী, শমীপত্রা, সমঙ্গা, নমস্কারী, গন্ধকারী, স্পর্শসঙ্কোচপর্ণিকা. স্পৃক্কা, খদিরপত্রিকা, সঙ্কোচনী, প্রসারিণী, সপ্তপর্ণী, খদিরী, গণ্ডমালিকা, লজ্জিকা, লজ্জা, স্পর্শলজ্জা, অস্ররোধিনী, রক্তমূলা, তাম্রমূলা, স্বগুপ্তা।। রাজনি°, ধন্বন্তরী-নি°।।
অঞ্জীর, অঞ্জীরক—বড় জাতীয় পেয়ারা গাছ (হি° অঞ্জীর ও আমরুথ), আঁজীর, ficus carica, psidium pomiferum.
অট্টহাসক—কুন্দবৃক্ষ, কুঁদ ফুলের গাছ, jasminum multiflorum বা hirsutum.।। রাজনিঃ।।
অড়র, অড়হর [সা° আঢ়কী—আঢ়ক—আড়হর; হি° অড়হর, রহর, চহর] শিম্বাদিবর্গের কৃষিজাত কলায় বিশেষের গাছ, অড়হরগাছ, cajanus indicus. ডাঃ ওয়াট বলেন—এই গাছ আফ্রিকা হইতে ভারতে আসিয়াছে।
অণু—সূক্ষ্ম ধান্ত বিশেষ। চীনা ধান, panicum miliaceum.
অণুরেবতী—দণ্ডীবৃক্ষ, croton polyandrum.
অণ্ডকোটর পুষ্পী—অজান্ত্রী বৃক্ষ, নীল রাম্না, নীলবুহ্ন।
অতসী—তিসি, linum usitalessimum. মসিনা, অলসী। পর্য্যায়—চণকা, উমা, ক্ষৌমী, রুদ্রপত্নী, সুবর্চলা, পিচ্ছিলা, দেবী, মদগন্ধা, মদোৎকটা, ক্ষুমা, হৈমবতী, সুনীলা, নীলপুষ্পিকা।। শব্দ°।। প্রাচীনকালে আর্য্যগণ মসিনা গাছ আবিষ্কার করিয়া, উহার সূত্র দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন। তিসি দ্র°।

যে ফুলকে সচরাচর আমরা 'অতসী' বলিয়া থাকি তাহার প্রকৃত নাম 'বিলঝনঝন, crotalaria sericea. এই প্রকার আর একপ্রকার গাছকে আমরা বন আতুসী crotalaria retusa বলে।
অতিকেশব—কুব্জক বৃক্ষ, কাঁটা সেঁউতি।। রাজনি°।।
অতিগন্ধ—চম্পকবৃক্ষ, চাঁপা গাছ।। রাজনি°।।
অতিচর—স্থলপদ্ম hibiscus mutabilis।। অম° রাজনি°।।
অতিতীক্ষ্ণ—শোভাঞ্জন বৃক্ষ, সজিনা গাছ।
অতিতীক্ষ্ণা—রক্তসর্ষপ।
অতিতীব্রা—গণ্ডদূর্বা, গাঁটদূর্বা, রাজনি°।।
অতিদীপ্য—রক্তচিত্রক বৃক্ষ, রাঙ্‌চিতা, plumbeago rosea. পর্য্যায়—কাল, ব্যাল, কালমূল, মার্জার, অগ্নি, দাহক, পাবক, চিত্রাঙ্গ, রক্তচিত্র।। শব্দ°।।
অতিপত্র—হস্তিকন্দ বৃক্ষ।। রাজনি°।। শাক বৃক্ষ সেগুন গাছ।
অতিপত্রা—বলা, বেলেড়া, sida curdifolia.
অতিবলা—পীতবলা, পীতবর্ণ বেলেড়া, পীতবাকুলি, sida rhombifolia.
অতিমঙ্গল্য—বিল্ববৃক্ষ, aegle marmeles.
অতিমুক্ত—তিনিশবৃক্ষ, dalbergia oujeinesis. মাধবীলতা।
অতিমোদা—নবমল্লিকা, jasminum heterophylum or arboveum, সেউতি।
অতিরক্তা—জবাপুষ্প বৃক্ষ।। বৈত্তনি°।।
অতিরসা—মূর্বা, মুরগা sansebiefa zeylanica.।। বৈত্তনি°।।
অতিলোমশা—নীলবুহ্না, ছাগলাবেঁটে concolvulus argenteus.
অতিচ্ছত্র—বেঙের ছাতা, কোঁড়ক, কোঁড়, agaricaceae, agaricus campestris, or psalliata camplestris. ইং mushroom, toadstool. পর্য্যায়—ছত্রা, ছত্রাক, শিলীন্ধ্র, শিলীন্ধ্রক, ভূমিছত্র।। অম° শব্দ° ভাব-প্র°।।
অতিচ্ছত্রক—ভূতৃণ, গন্ধতৃণ, ছত্রবৃক্ষ, সপ্তপর্ণবৃক্ষ, গোরক্ষচাকুলিয়া।। রাজনি° শব্দ°।।
অতিচ্ছত্রা—শতপুষ্পা, শুলফা, peacedanum graveolens or sowa. অতিচ্ছত্রা বা শুলফা রবিশস্যের শ্রেণীভুক্ত।
অত্যম্ল—তিন্তিড়ী ফল, তেঁতুল।। রাজনি° শব্দ°।।
অত্যম্লা—বনবীজপূরক, ট্যাবালেবু, a species of citron.
অত্যাল—রক্তচিত্রকবৃক্ষ, রাঙ্‌চিতাগাছ, plumbego rosea.।। রাজনি°।।
অত্যুহা—নীল শেফালিকা।। মে°।। নীলপুষ্পনিসিন্দা, যে নিসিন্দার পুষ্প নীলবর্ণ।
অদল—হিজ্জলবৃক্ষ, ঝাড়া সিজ।। শব্দচ°।।
অদলা—ঘৃতকুমারী।। শব্দচ°।।
অদ্রিকর্ণী—অপরাজিতা, clitoria tarnatea।। রাজনি°।।
অদ্রিভূ—অপরাজিতা লতা, আখুকর্ণী বা ইন্দুর কাণি নামক পর্বতীয় লতাবি°।
অধঃপুষ্পী—অবাকপুষ্পী, মজল্যা, অমরপুষ্পিকা, pimpinella anisum, গোজিহ্বা নামক ক্ষুপবি°, চোরকাঁটা, ভাঁটুই, elephantopus scaher.। রত্না°।। [ক্রমশঃ।

চিন্তান্বিতা —দীপক ঘোষ

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি বাঙালী মেয়ের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্রটি শ্রীপি, সাহানা কর্তৃক গৃহীত।

সন্ধ্যার হাসি —মোনা চৌধুরী

বিজ্ঞান-বিহঙ্গ —ভবেশ ঘোষ
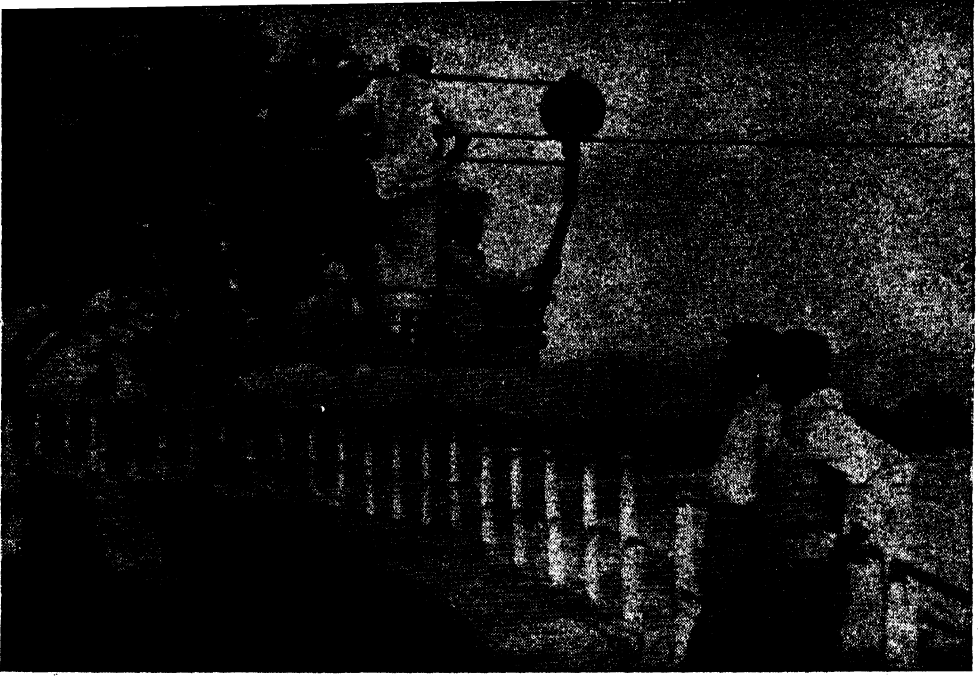
গ্রামের মেয়ে
—স্বপন ঘোষ

বিড়ালের হাসি
—গৌর দত্ত

প্রণতোস্মি দিবাকরম্ —নিতু সরকার

গোপন চিঠি —আনন্দ মুখোপাধ্যায়
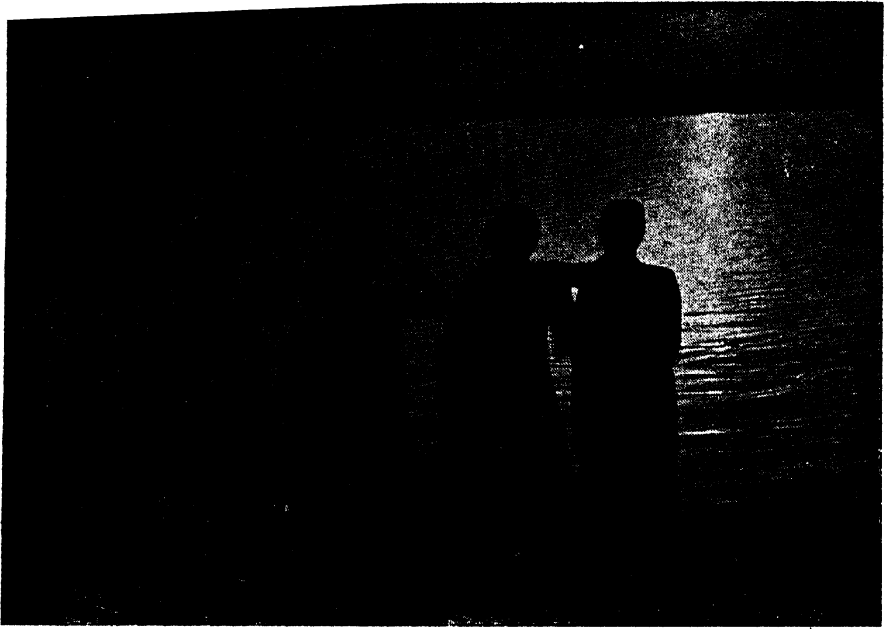
সমাজ সেবায় রবীন্দ্রনাথ

সুজিতকুমার নাগ

অনেক দিন আগের কথা। তখন আমাদের বাংলাদেশে কাপড়ের কল ছিল না। তাঁতিরা তাঁত বুনত। তাদের হাতে বোনা শাড়ি, ধুতি, গামছা, চাদর বাজারে চালু ছিল।

সেদিন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য ছাড়াও ভাবতেন দেশের তাঁতিদের কথাও। দেশের সম্পদ এই তাঁত শিল্প। এ কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ একটি বয়ন-শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন করেন—কুষ্টিয়াতে।

অবাক লাগছে তাই না?

শুধু কি তাই? তাঁর নিজের জমিদারী রয়েছে। তা থেকে অনেক টাকা আসে। চাষী, মজুর, কৃষকদের কথাও তাঁর অন্তরে গাঁথা রয়েছে। বেশীর ভাগ প্রজা চাষী, মজুর। রবীন্দ্রনাথ তাদের কথা ভাবেন। তাঁর চিন্তা, কি করে প্রজারা ভাল থাকবে, ভাল পরবে, এ ছিল কবিগুরুর লক্ষ্য। তাই তিনি এক সমবায় সমিতি গড়েন। কি আশ্চর্য তাঁর পরিকল্পনা। তাই না?

তারপর? সবাই মিলে মিশে বাস করবে, সবাই এক সঙ্গে কাজ করবে, গ্রামের যাতে ভাল হয়, সবাই তাই করবে এই ছিল সমিতির কাজ। আর তার সঙ্গে যাতে আয়ের টাকা থেকে কিছু সঞ্চয় হয় তার জন্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এক ব্যাঙ্ক।

রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের জন্যে অনেক কাজ করেছেন। তাদের মঙ্গলের জন্যে মন প্রাণ দিয়ে তিনি চিন্তা করেছেন। শুনলে অবাক হবে চাষবাসের অনেক বিষয় তাঁর জানা ছিল। ক্ষেতের কোন্ কোন্ মাটিতে কী ফসল ভাল ফলতে পারে, তাও তিনি চাষীদের বলে দিতেন। কোন চাষে কী লাভ হতে পারে, তারও সন্ধান তিনি দিতেন।

তাঁর কথা, চাষীরাই দেশের সব। তাদের উন্নতি না হলে দেশের কল্যাণ কিছুই হবে না।

এই পল্লীর সমাজসেবক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কবি সমাজকল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেন।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো প্রাচীনকালে আমাদের দেশে ঋষিদের আশ্রম ছিল। সে আশ্রমে ছেলেরা লেখাপড়া শিখতে আসত। এই আশ্রমই ছিল সব। কবিগুরু সেই প্রাচীনকালের ঋষিদের আশ্রমের মত দূর পল্লীতে গড়ে তুললেন—শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী।

কবির সেই শ্রীনিকেতন আজ কুটিরশিল্পের একটি বড় কেন্দ্র। আর সে সঙ্গে পল্লীর স্বাস্থ্য সেবা বিভাগও রয়েছে।

সেই প্রাচীনকালের প্রাণ পেয়েছে কবির শান্তিনিকেতন।

সমাজসেবা বলতে যা বুঝি তার সত্যিকারের রূপ দিয়েছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, নিজের হাতে করে দেখিয়েছেন—শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যে দিয়ে।

সমাজ সেবায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দেশের পুরোহিত। তাঁর তপস্যা, তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সাধনা আজ প্রাণ পেয়েছে।

'বিশ্বভারতী' আর 'শান্তিনিকেতন' তাঁর অমর সৃষ্টি যা থাকবে যুগ থেকে যুগে, কাল থেকে কালে।

এক বুড়ো নাবিকের কাহিনী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীমতী সাধনা কর

কিন্তু এ কী কাণ্ড! হাওয়া নেই একফোঁটা, পালের জাহাজ অত দ্রুত চলছে কী করে। জোয়ারও নেই, জাহাজ যে তবু সোজা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। দিনের শেষে পশ্চিম সমুদ্রে তরল আগুন জ্বলছে। জ্বলন্ত সূর্য নিশ্চল হয়ে আছে। সেই কালো জাহাজটা সূর্য আর আমাদের জাহাজের মধ্যে এসে থামল। সেটা সত্যিকারের জাহাজ বলে মনে হল না। সূর্যের আলোতে কি তার পাল দুলছে, না, ওগুলো মাকড়সার জাল। লোহালক্কড় দড়িদড়া যেন ডুবন্ত সূর্যের রোদে উনুনের শিকের মতো লাগছে। জাহাজ চালাচ্ছে যত সব মৃত্যু-দূতী প্রেতিনীর দল। তাদের ঠোঁট আগুনের মতো রাঙা, হলুদ বরণ চুল, চোখ চকচক করছে। চামড়া যেন কুষ্ঠরোগীর চামড়ার মতো পাংশুটে। তাদের ভীষণ মূর্তি দেখে রক্ত চলাচল থেমে যাবার উপক্রম হল। সেই প্রেতের জাহাজে বসে পাশা খেলা করছে জীবন আর মৃত্যু। জাহাজটা আমাদের জাহাজের পাশে এসে লাগল। মৃত্যুদূতী পাশায় দান ফেলে চেঁচিয়ে উঠল—খেলা শেষ, আমি জিতেছি, আমি জিতেছি।

বলেই তিনবার হুইসিল বাজিয়ে দিল। অমনি দেখতে দেখতে সূর্য ডুবে গেল, অন্ধকার ঘনিয়ে এল, চারপাশে সমুদ্রের মধ্যে যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত মূর্তি দেখা দিতে লাগল। আমার মাথায় রক্ত ছলকে উঠতে লাগল, বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। আকাশে চাঁদ উঠল, সে আবছা আলোয় চারদিক আরো রহস্যময় হয়ে উঠল। এক এক করে নাবিকরা ধপ ধপ করে শুয়ে পড়ল। একটি শব্দ করল না, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললে না। তাদের মুখে কেবল অসহ্য মৃত্যু-যন্ত্রণা, তাদের চোখ আমাকে ভীষণ অভিশাপ দিতে লাগল। তারপরে কাদার দলার মতো তারা ধপ ধপ করে মরে পড়ে যেতে লাগল; তাদের আত্মা আমার পাশ দিয়ে সন সন বেগে ধেয়ে চলে যাচ্ছে আমি স্পষ্ট যেন শুনতে পেলাম। সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল।

সে বর্ণনা শুনতে শুনতে বিয়ের নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন—থামো, তুমি থামো। তোমাকেই আমার ভয় লাগছে। তুমি কি মানুষ। অমন চেহারা কেন, অমন হাড্ডিসার শিরা বের

কন্না হাত্ত, লালচে লালচে চোখ! কী চোখ, বাপরে,··নিশ্চয় মানুষ নও, কে তুমি?

বুড়ো নাবিক শুকনো হাসি হেসে বললে—ভয় পেয়ো না। আমি মরিনি, একমাত্র আমিই বেঁচে ছিলাম আর কেউ নয়। জাহাজের একটি প্রাণীও বেঁচে রইল না। উঃ সে কী যন্ত্রণা, কে বুঝবে সে কষ্ট। সেই অসীম সমুদ্রে সেই অসংখ্য অদ্ভুত সব জীব জন্তু সাপ কুমীর ভূত প্রেতের মধ্যে একা আমি বেঁচে রইলাম আর চারপাশে যত মরা নাবিকের দল। সমুদ্রের দিকে তাকাতে ভয় হয়, জাহাজের দিকে তাকাতে আরো আতঙ্ক হয়; আকাশের দিকে তাকিয়ে যে ভগবানের নাম করব, সে নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারি না। আমার অন্তর শুকিয়ে উঠল। চোখ বুজতে চাইলাম, জোর করেও বন্ধ করতে পারলাম না। চোখের তারা বলের মতো ঘুরছে, তার মধ্যে কেবল ভেসে বেড়াচ্ছে নিঃসীম অতল সমুদ্র, বিরাট শূন্য আকাশ আর পায়ের কাছে পড়ে থাকা প্রাণহীন নাবিকের দল। মনে হতে লাগল তাদের খোলা নিস্পন্দ চোখের অভিশপ্ত দৃষ্টি যেন রূপ ধরে আমাকে ঘিরে আছে। একদিন নয়, দুদিন নয়, সাতদিন সাত রাত ধরে সেই বীভৎস অভিশপ্ত দৃষ্টি দেখলাম, তবু আমার মরণ হল না। সে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ শতগুণে ভালো। বেঁচে থেকে কেবল দেখলাম মৃত্যুর রূপ, মৃত্যুর বিভীষিকা। দিন যায়, রাত্রি আসে, চারপাশে কত জলজন্তু তাদের চিকণ মসৃণ রঙ বেরঙের দেহ নিয়ে সেই জলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, নীল সবুজ কালো হলুদের ঝলক খেলে যায়, তাদের অপরূপ সৌন্দর্য, অবর্ণনীয় রহস্য। আমি বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হতে লাগল ওরা কী সুন্দর, ওরাও কত সুখী, আমি কী দুর্ভাগা! ওদের দেখে দেখে সেই মৃত্যুর রাজ্যে আমার মন খুসীতে ভালোবাসায় ভরে উঠল। সেই মুহূর্তে আমার মুখে ভগবানের নাম এসে গেল, আর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া মরা সমুদ্রের পাখিটা আমার গলা থেকে খসে নীচে পড়ে গেল। দেখতে দেখতে একটা অপূর্ব ঘুমে আমার চোখ আপনি বুজে এল। যেন স্বর্গের সুষমা বয়ে নিয়ে এ ঘুম আমার চোখে নেমে এসেছে, আমার হৃদয় মন শান্ত-স্নিগ্ধ হয়ে গেল। স্বপ্ন দেখতে লাগলাম জাহাজের যে বালতিগুলি এতদিন শুকনো খটখটে ছিল, তা যেন শিশিরের জলে ভরে গেছে। ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, বৃষ্টি হচ্ছে। ঠোঁট ভিজিয়ে জিভ ভিজিয়ে প্রাণভরে শীতল বৃষ্টির জল খেলাম। সমস্ত কাপড় ভিজিয়ে নিলাম। শরীর এমন হাল্কা হয়ে গেল যে মনে হল ঘুমের মধ্যেই মরে গিয়ে আমি আর-একজন হয়ে গেছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা হুড়োহুড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। জাহাজের যত দড়িদড়া পাল মাস্তুল নড়ে উঠল, আকাশের তারাগুলি কেঁপে উঠল, একখণ্ড মেঘের থেকে ঝরঝর ক'রে ঝরে পড়ল এক পশলা বৃষ্টি। হাওয়া বইতে লাগল, জাহাজ নড়েচড়ে উঠল, আর সমস্ত মৃত নাবিকের দল কী ক'রে বেঁচে দাঁড়িয়ে উঠল, দাঁড়ী দাঁড় ধরল, মাঝি হাল ধরল, সবাই মিলে আমার আশেপাশে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে জাহাজ চালাতে লাগল, দড়িদড়া টানা-হেঁচড়া ক'রে পাল খাটাতে গুটাতে লাগল। কিন্তু কারো মুখে একটি কথা নেই।

শ্রোতা ভদ্রলোক আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—থামো থামো, সত্যি বল তুমি কি মানুষ!

বুড়ো নাবিক বলে উঠল—চুপ, শোনো আমার কথা শোনো। জাহাজ চলতে লাগল, চারপাশে কত রকমের গান শুনতে লাগলাম। দেবদূতেরা কি গান গেয়ে বেড়াচ্ছে? নয়তো বুঝি গ্রীষ্মের দুপুরে নির্জন বনে এক মধুর সুরের রণন বেজে উঠেছে—সেই সুর শুনে শুনে জাহাজ নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। কখন সে সুর থেমে গেল, জাহাজ নিশ্চল হল, ছুটতে ছুটতে ঘোড়াটা হঠাৎ থামতে গিয়ে যেমন লাফিয়ে ওঠে, তেমনিভাবেই জাহাজটা লাফিয়ে উঠল। আমার শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় ছলকে ছুটে এল, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। কতক্ষণ পড়েছিলাম জানি না, এক সময় মনে হল যেন দুটি স্বর শুনছি। একজন বললে—এই সে, এই লোকটিই সেই নিরীহ সমুদ্রের পাখিটাকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল।

আরেকজন মধুর কোমল স্বরে বললে—তার শাস্তি ও ভোগ করেছে।

আরো কি কি সব কথা তারা বলাবলি করলে, আমি জেগে গেলাম। দেখলাম মৃত নাবিকের দল তখনো খাড়া দাঁড়িয়ে দাঁড় টেনে জাহাজ বেয়ে চলেছে। তাদের পাথরের মত নিথর চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ রয়েছে। কী কঠিন সে চোখ, কী ভয়াবহ। আমি সমুদ্রের নীলজলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাদের দিকে তাকাতে সাহস হল না। আমি যেন ঘুমের ঘোরে রাস্তা হেঁটে চলেছি, হেঁটেই চলেছি, পিছনে তাকাতে ভয় হচ্ছে, স্পষ্ট জানি, পিছনে একটা ভূত তাড়া করে আসছে। একটু-পরেই একটা হাওয়া বয়ে গেল। নিঃশব্দ হাওয়া। সমুদ্রের জলে তার ছোঁয়া লাগল না, জলে ঢেউ উঠল না, কেবল বসন্ত-বনের হাওয়ার মতো সে হাওয়া আমার গালে কপালে চুলে স্নেহস্পর্শে বুলিয়ে দিয়ে গেল। বড় ভয়-ভয় লাগল, ভালোও লাগল খুব।

ধীরে ধীরে জাহাজ এগিয়ে চলছে, অতি মৃদু বাতাস বইছে। মধুর স্বরের মতো দূরে আলোঘর দেখা গেল। দেখা গেল সমুদ্রের তীরের পাহাড়, পাহাড়ের উপর গীর্জাটি—আমার জন্মভূমি! আমাদের জাহাজ বন্দরের সীমানায় এসে গেল, আমি কেঁদে উঠলাম—ভগবান, হয় আমার এ স্বপ্ন ভাঙিয়ো না, নয়তো চিরকালের মতো মৃত্যুর বুকে ঘুমিয়ে পড়তে দাও।

বন্দরটি পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল, চাঁদের আলোছায়া খেলছে। পাহাড় সাদা ধব ধব্ করছে, গীর্জাটি চোখে ভাসছে, জোৎস্নাতে বন্দরের আলোগুলি লালচে আভা মেলেছে। দূরে দূরে আলোর নীল সবুজ রেখা। আমি জাহাজের দিকে চোখ ফেরালাম, সেখানে ভয়াবহ দৃশ্য। প্রত্যেকটি মৃতদেহ নিথর নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। প্রত্যেকটি মৃতদেহের পাশে দেবদূতেরা দাঁড়িয়ে আছে। তারা হাত নাড়াতে লাগল, তীরের দিকে সঙ্কেত করতে লাগল, কিন্তু একটি শব্দ করল না। সেই নৈঃশব্দ যেন গানের মূর্ছনার মতো আমার প্রাণের তারে তারে বাজল। একটু পরেই আমি দাঁড় টানার শব্দ শুনতে পেলাম। পাইলটদের গলার আওয়াজ ভেসে এল। তীর থেকে পাইলটদের নৌকা আসছে জাহাজের দিকে। পাইলট আর তার সঙ্গের ছোট ছেলেটির কথা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার হতভাগ্য সঙ্গীরা আর চীৎকার ধ্বনিতে আনন্দরোল তুলতে পারল না। পাইলটদের সঙ্গে আরেকজনের গলাও শোনা গেল। সে একজন সাধু, সে বন্দরের পাশে পাহাড়টিতে থাকত যে সব জাহাজ আসত, তাদের শ্রান্ত-ক্লান্ত নাবিকদের সে সান্ত্বনা দিত, স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে

মনে দিত আনন্দ। সাধুটি পাইলটদের নৌকায় গান করতে করতে আসছিল, কাছে এলে তার গান বন্ধ হয়ে গেল। তারা বলাবলি করতে লাগল—এ কী অদ্ভুত। জাহাজে কত সুন্দর সুন্দর আলো জলছিল, কোথায় গেল সে সব। সব যে অন্ধকার। সাধুটি বললে—ওরা কেন আমাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না? জাহাজটা যেন ভুতুড়ে, পালগুলো ছেঁড়াখোঁড়া, শীতের দিনের শুকনো হলদে পাতা বরফে ঢেকে থাকলে যেমন দেখায়, জাহাজটাকে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে।

পাইলটরা বলে উঠল—কী জানি, কেমন একটা ভয়ে বুক দুরুদুরু করছে। চল ফিরে যাই। সাধুটি বললেন—না না সে কী কথা। নৌকা এগিয়ে নাও, দেখা যাক্ কী ব্যাপার।

নৌকো কাছে আসতে লাগল। আমি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে দেখছি, একটি আওয়াজ মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না। জাহাজের তলা থেকে কেমন একটা গুমগুম চাপা শব্দ শোনা যেতে লাগল। যেই নৌকাটা জাহাজের গা ঘেঁসে এল, অমনি জল যেন উথলে উঠল, হুড়হুড় গুরগুর করে অসম্ভব আওয়াজ উঠল, আচমকা জাহাজটা তলা থেকে ফেটে ভেঙে চুরমার হয়ে তলিয়ে গেল। একটা প্রচণ্ড ঢেউয়ের আলোড়ন আকাশে লাফিয়ে উঠল। আমি যে কেমন ক'রে ছিটকে এসে পাইলটদের নৌকায় পড়লাম তা নিজেই জানি নে। জলের ঘূর্ণাবেগে নৌকাটা কতক্ষণ ঘুরে ঘুরেই চলল। আমি কথা বলতে যেই পাইলটদের দিকে মুখ ফেরালাম, পাইলট নিদারুণ আতঙ্কে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল। সাধুটি আকাশের দিকে চোখ তুলে ভগবানের নাম জপতে লাগল। আমি বেগতিক দেখে হাল ধরলাম। পাইলট-বালকটি আধপাগলের মতো হয়ে দাঁড় টানতে লাগল, আর কেবলই বলতে লাগল—শয়তান নৌকাতে ভর করেছে, হাল ধরেছে—হা হা হা।

কোনোরকমে তীরে এসে পৌঁছলাম। কতদিন পরে যে মাটিতে পা দিলাম! সাধুটি ঠকঠক করে কাঁপছিল, দাঁড়াতে পারল না। চারপাশে ভগবানের চিহ্ন এঁকে বললে—তুমি কে? শীগগির বলো, মানুষ না শয়তান?

অত্যন্ত কষ্টে তাকে আমার হৃদয়-বিদারক ঘটনা বললাম, আমার মন হালকা হয়ে গেল।

কিন্তু সেই যন্ত্রণা যখন তখন পাথরের মতো আমার মন চেপে ধরে, আমার অন্তর জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়। আমি দেশে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ালাম, কত লোককে আমার কাহিনী শুনালাম। লোকের মুখ দেখলেই আমি বুঝতে পারি কে আমার সমব্যথী হয়ে আমার কথা শুনবে, আমার মন বুঝবে। কিন্তু আমার মন শান্ত হল না।

* * * *

এমনি সময় বিয়ের উৎসব শেষে অতিথি নিমন্ত্রিতদের দল হৈ হল্লা করে বাইরে বেরিয়ে এল। বরকনেকে নিয়ে সবাই বাইরের ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

বুড়ো নাবিক বললে—এবার তুমি যাও, উৎসবে যোগ দাও গে। উৎসবে কত আনন্দ, গীর্জায় দল বেঁধে গিয়ে উপাসনা করতে কত শান্তি, মা-বাপের হাত ধরে ছোট ছোট বাচ্চারা ঘুরে বেড়ায়, কত কিশোর-কিশোরী হেসে খেলে আনন্দ করে বেড়ায়, তাদের কত আনন্দ। আমি পারি নে। আমার কেবল সেই সমুদ্রের স্মৃতি মনে পড়ে সেইটাই একমাত্র সত্যি হয়ে রয়েছে। ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে পর্যন্ত আমার শঙ্কা লাগে। ভগবান যেন আমাকে ত্যাগ করেছেন। আমি যে পাপী, খেলার ছলে নিষ্ঠুর হয়ে তার সৃষ্ট সমুদ্রের পাখিটাকে মেরে ফেলেছি, তারই ফলে আমার জাহাজের অতগুলি নাবিক অসহ্য মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে প্রাণ দিয়েছে। সে কী আমি ভুলতে পারি। যারা প্রতিটি জীব, পশু-পাখি, ফুল-পাতা সমস্ত কিছুকে ভালবাসে তারাই প্রকৃত ভগবানকে ভালোবাসে। আর যে ভগবানের সুন্দর সৃষ্টিকে এমন নিষ্ঠুরের মতো ধ্বংস করে সে এমনি শাস্তি ভোগ করে।

বলতে বলতে সেই বুড়ো নাবিক ছুটে সেখান থেকে কোথায় চলে গেল, আর তাকে দেখা গেল না।

বিয়ের নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক অভিভূতের মতো কতক্ষণ বসে থেকে ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে গেল। পরদিন সকালে তার মনে হতে লাগল—বিয়ের সভায় বসে কী সে দুঃস্বপ্ন দেখছিল।

হাবুলের মামা

বন্দনা গুপ্ত

হাবুলের মামাকে কি চেনো তোমরা?
দিনরাত মুখখানা যার গোমরা!
একদিন মামাবাবু হাবুলকে ডাকলো
কান ধরে কাছে টেনে আনলো,
গম্ভীর স্বরে জোরে বললো:
দিনরাত হৈ হৈ
রোদ্দুরে টৈ টৈ
আমগাছে জামগাছে লাফালাফি
এ বাগান—সে বাগান দাপাদাপি!
যত সব বদমাস—ননসেন্স
গুরুজনে সেবা নেই—হোপলেস্!
তোল্ দেখি পাকাচুল চটপট্
টান্ দেখি আঙুল ঝটপট্,
কুঁজো থেকে জল আন্ ঠাণ্ডা
দেরী হলে দেবো এক ডাণ্ডা!
হাওয়া কর, পা টেপ—বোকা গাধা ক্যাবলা!
ভয়ে ভয়ে ভ্যাং করে কেঁদে ফেলে হাবলা!

ভগীরথের শঙ্খধ্বনি

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

এক

বাঙলার সৃষ্টি

সগর রাজার নাম শুনে থাকবে। খুব বড় রাজা সগর। পৃথিবীর সব রাজা হার মেনেছিলেন তাঁর কাছে। তাঁর ছিল ষাট হাজার ছেলে। সগর রাজা ঠিক করলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। একবার, দু'বার নয়, একশ'বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে স্বর্গের রাজা হওয়া যায়। অশ্বমেধ যজ্ঞ কেমন জানো? একটা বেশ তাজা মোটাসোটা ঘোড়াকে মন্ত্র পড়ে কপালে তার জয়টীকা এঁকে ছেড়ে দেওয়া হোত। ঘোড়াটার পিছনে থাকত একদল অজেয় সৈন্য। ঘোড়াটা একবছর

তবে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। কেউ যদি আটকাত ঘোড়াটাকে, পিছনের সৈন্যরা যুদ্ধ করে ঘোড়াটা নিয়ে আসত। এক বছর বাদে তাকে এনে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হোত। তোমাদেরও শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি ?

নিরানব্বইটা অশ্বমেধ যজ্ঞ হয়ে গেল সগর রাজার। বাকী মাত্র আর একটা। মাত্র একটা। তাহলেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি হবেন স্বর্গের রাজা। একশ' নম্বর ঘোড়া ছুটল। খট খট। খটা খটা। ছুটে চলেছে ঘোড়া। পিছনে তার সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে। তাদের কথাবার্তার বাতাসে জেগেছে তুমুল কোলাহল।

ইন্দ্র। স্বর্গের রাজা। অন্তর তাঁর কেঁপে উঠল ভয়ে। এবার তাঁকে নেমে যেতে হবে স্বর্গের সিংহাসন থেকে। ছেড়ে চলে যেতে হবে বৈজয়ন্ত প্রাসাদ। নন্দনকাননে বেড়াতেও আর পাবেন না তিনি। অমরাবতীর সীমানা ছেড়ে চলে যেতে হবে তাঁকে। ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবা আর হবে না তাঁর। কি করা যায় ?—গালে হাত দিয়ে ভাবতে থাকেন ইন্দ্র। হাত নেড়ে নিজের মনে তিনি বলেন, থাক্। একটা মতলব এসেছে মনে। তাঁর বিষাদক্লিষ্ট মুখে খেলে যায় ম্লানহাসি একখানা। সগর রাজার ষাট হাজার ছেলের এক অসতর্ক মুহূর্তে ঘোড়াটাকে চুরি করে পাতালে কপিল-মুনির আশ্রমে রাখলেন লুকিয়ে।

এক বছর ফুরিয়ে এল। ঘোড়ার সন্ধান নেই। সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে খুঁজে চলেছে পৃথিবীর প্রতিটি অংশ, আনাচ কানাচ। ঘুরতে ঘুরতে একদিন পাতালে এসে হাজির তারা। দেখে, কপিল মুনি বসে আছেন তপস্যায়, আর তাঁরই পিছনে বাঁধা তাদের ঘোড়া। তারা মনে করল, কপিল মুনিই চোর। কপিল মুনির প্রতি তারা কটূবাক্য-প্রয়োগ করতে লাগল। মুনির তপস্যা গেল ভেঙ্গে। খুব রেগে গেলেন তিনি। যেই তাদের দিকে কটমট করে তাকালেন, অমনি তাঁর চোখ থেকে আগুন বেরিয়ে এসে তাদিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

অনেক দিন কেটে গেল। তবু ছেলেরা এল না দেখে সগর রাজা পাঠালেন তাঁর পৌত্র অংশুমানকে। অংশুমান পাতালে এসে সব জানলেন। তিনি কপিলমুনিকে স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট করলেন। কপিলমুনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিলেন, আর বললেন, স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে এনে তাঁর জলস্পর্শে হবে সগর বংশের উদ্ধার।

অংশুমান সগর রাজাকে গিয়ে সব কথা বললেন। সগর রাজা স্বর্গের রাজা হবার আর চেষ্টা না করে অংশুমানকে সিংহাসন দিয়ে গেলেন গঙ্গাকে আনতে। কিন্তু গঙ্গাকে আনতে পারলেন না তিনি। তাঁর পর অংশুমান ও অংশুমানের ছেলে দিলীপ গঙ্গাকে আনতে চেষ্টা করেন। বিফলতায় পর্য্যবসিত হয় তাঁদের সমস্ত চেষ্টা।

দিলীপের ছেলে ভগীরথ। তিনি শুনলেন, গঙ্গা বেরিয়েছেন বিষ্ণুর পা থেকে। ভগীরথ বিষ্ণুর তপস্যা করলেন। বিষ্ণু তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে। ভগীরথ তখন ব্রহ্মার তপস্যা করলেন। ব্রহ্মা বললেন, গঙ্গা নামবেন, কিন্তু তাঁর বেগ ধারণ করতে পারে, এমন তো কাকেও দেখছি নে, একমাত্র মহাদেব ছাড়া। ভগীরথ এবার তপস্যা করলেন মহাদেবের। মহাদেব ভোলানাথ, অল্পতেই তুষ্ট হন তিনি ; তাই ভগীরথের তপস্যায় সহজেই রাজী হলেন।

গঙ্গা স্বর্গ থেকে মহাদেবের মাথা দিয়ে নেমে এলেন পৃথিবীতে। ভগীরথ আগে আগে চললেন শাঁখ বাজিয়ে, পিছনে তাঁর গঙ্গা চললেন এঁকে বেঁকে। সগর রাজার ষাট হাজার ছেলেকে মুক্তি দিয়ে গঙ্গা ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিশাল জলধি বঙ্গোপসাগরের কোলে।

পুরাণে এই গল্প আছে। মিথ্যে নয় এ কাহিনী। আজকের বৈজ্ঞানিক এ কথাই বলেন। তবে বৈজ্ঞানিক যা বলেছেন কথায়, পুরাণ সেকথা বলেছে কাহিনীতে।

তোমরা আজ ভূগোলে পড়ে থাক, গঙ্গা হিমালয় থেকে বেরিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলেছে। নদীর তিনটে কাজ—প্রথমে, যখন সে পাহাড়-পর্বত থেকে বেরোয়, তখন সে পাহাড়ের গা বেয়ে নামবার সময় পাহাড়ের গা থেকে পাথর খসায় ; তারপর সেই সব পাথরকে বয়ে নিয়ে যায় তার স্রোতের সঙ্গে ; আর সবার শেষে সমুদ্রে মিশে তার বয়ে-নিয়ে আসা পাথরগুলো জমায়। গঙ্গাও হিমালয় থেকে নামবার সময় খসালো অনেক পাথর ; তারপর সেগুলো বয়ে নিয়ে এল তার স্রোতের সঙ্গে ; আর শেষে জমাল মোহানায়। মোহানায় পাথর জমানো চলল বছরের পর বছর ধরে। কেটে গেল হাজার হাজার বছর। মোহানা থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল একটু সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ভূখণ্ড।

সকাল হতেই সূর্য্য আকাশের কোল থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখতে পেল নতুন এক ভূখণ্ড। যেন, এক মেয়ে। মাথায় তার কাঞ্চনজঙ্ঘার রজত শুভ্র মুকুট। বাঁ হাতে তার 'কমলার ফুল, ডাহিনে মধুকমালা।' সাগরের জলে তার পা দু'টি ডোবানো। সূর্য অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। অন্য অন্য দেশ সবও তাকিয়ে থাকল তার দিকে। কে সে ? তাদের জিজ্ঞেসা-ভরা চোখ।

তোমাদেরও জানতে ইচ্ছে হচ্ছে না, কে সে, যার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সূর্য, তাকিয়ে থাকে সারা পৃথিবী ;

—সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরই বাংলা রে ! [ক্রমশঃ।

শেয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা

পৌর মোদক

বাঁশবনে মাঝরাতে পাঠশালা বসে
ছাগলের ছানাগুলো বসে আঁক কষে।
বাঘ পড়ে বাংলা, ইতিহাস খরগোস,
ভালুক ভূগোল, আর ব্যাকরণ বুনো মোষ।
ব্যাঙেরা সুর করে পড়ে যায় পদ্য,
কখন বা একটানা পড়ে তারা গদ্য।
শেয়াল পড়ায় তাদের হাতে নিয়ে ছড়ি,
কত কি যে লেখে সব দিয়ে সাদা খড়ি।
ছাত্রদের বোঝায় শেয়াল কি করে হয় শস্য,
চোখে দিয়ে চশমা আর নাকে দিয়ে নস্য।
সবদিকে শেয়ালের আছে কড়া দৃষ্টি,
পাঠশালায় দেয় না, হতে অনাসৃষ্টি।
সিংহের পো ভাল ছেলে পেলো সেবার বৃত্তি,
শেয়ালের পাঠশালায় রেখে গেছে কীর্ত্তি।
বাঁদরেরা ডালে বসে পড়ে ধারাপাত,
পাঠশালা বাঁশবনে চলে সারারাত।

কবি কর্ণপুর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৭। পিতৃদেবকে লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—"আপনারা সকলেই সূর্য্যসন্তান এবং ঈশ্বর-প্রতিম। তাঁদের মতই আপনারা প্রতাপী। তাঁদের মতই সুখচ্ছন্দী আপনাদের চারিত্র্য। তবুও আশ্চর্য্যের বিষয়, কোথায় যেন লক্ষিত হচ্ছে বিচার-বাহুল্যের সামান্ত একটু অভাব।

জন্তু জন্মায়, বেঁচে থাকে, লয় পায়, কিন্তু এই ক্রিয়ানিষ্পত্তিগুলির সর্ব্বপ্রধান উপায় হচ্ছে··কর্ম্ম। যখন যে কর্ম্ম আচরিত হয় তখন সেই কর্ম্ম-ই দেবতা। সাধু-সন্তেরাও তখন বরণ করে নেন না অন্ত কোনো দেবতাকে।

৮। মানুষ ভাল-মন্দ উভয় কর্ম্মই করে থাকে ; কিন্তু যে দেবতা অতিরিক্ত ফল-দানে অসমর্থ তাঁর কাছে কি কেউ ভিক্ষা চাইতে যায় ? যাঁরা অশক্ত তাঁরাই কেবল আবেগের প্রবণতায় মেনে চলেন কর্ম্মাতিরিক্ত দেবতাকে।

৯। অন্তর্যামীও যে ক্রিয়ায় প্রেরণা যোগান না, আশ্চর্য্য সেই ক্রিয়াই সাধন করে বসে জন্তু ; বস্তুত: এইটেই তার স্বভাব ; নিজের ইচ্ছাশক্তিকেই পোষণ করে সে চলে এবং হিতাহিত আচরণ করে। নিয়ামকরূপে সে ক্ষেত্রে এক অন্তর্যামীর শুভ আবির্ভাব কল্পনা করা কি সমীচীন ?

১০। ঈশ্বরই যে কেবল জগৎ উৎপাদন করছেন, বিপাদন করছেন, বিশিষ্ট ভাবে পালন করছেন, এমন কথা নি:সন্দেহে বলা চলে না, যখন দেখা যায় এই জগতের উৎপাদক বিপাদক এবং বিপালকরূপে বর্ত্তমান রয়েছে রজ: তম: এবং সত্ত্ব। ঐ যে মেঘদল···এই জগতেরই তারা এক রজোঘন প্রকাশ। অভিবর্ষণ তাদের স্বভাব।

১১। বর্ষাকালেই ভুবন-মোক্ষ-বিধায়িনী বৃষ্টিধারা নামে ; নমুচি-সূদন ইন্দ্রদেব কেন তার প্রেরক হতে যাবেন ? আরাধিত হয়ে তিনি কেমন করেই বা দূর করে দেবেন প্রার্থীদের মনঃপীড়া ?

১২। ঐ পর্ব্বত, ঐ সমুদ্র, এঁরা তো কেউ জল-দরিদ্র নন। এঁরা কি কেউ আরাধনা করেছিলেন ইন্দ্রদেবকে ? এঁদের উপর তাহলে কেন বর্ষণ করে থাকেন মেঘদল ? অতএব আমার বিশ্বাস, নিরর্থক এই ইন্দ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান।

১৩। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্ম-ধনে ব্রতী থেকে বরণীয় কর্ম্ম করেন : রাজন্তেরা শোভা পান রাজধর্ম্মের আনুকূল্যে ; কৃষি প্রভৃতির সৌকর্য্যে বিশোভিত হন বৈশ্যেরা ; বরবর্ণদের সেবা মূলে উজ্জ্বল হন অবরবর্ণ শূদ্রেরা। এই হচ্ছে চতুর্বর্ণের অবস্থা। এই অবস্থান-ব্যবস্থায় প্রজাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে চারটি বৃত্তি-সত্তা,··কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য ও কুসীদ।

১৪। আমরা ব্রজবাসী। আমাদের বৃত্তি হচ্ছে গোরক্ষা-তৎপরতা। আজকের নয়, পুরাকালের নয়, শালিক্ষেত্রাদির সুনিশ্চিত সৃষ্টিকাল থেকেই প্রচলন এই বৃত্তির। স্বাভাবিক আমাদের এই পাহাড়-পর্ব্বতে বনে-অরণ্যে বিচরণ। ইন্দ্রযজ্ঞ কল্পনায় আমাদের কিসের এত প্রয়োজন ? আমাদের সম্মুখে রয়েছেন গিরি-গোবর্দ্ধন, নামেই নন, সত্যই ইনি সার্থক গো-বর্দ্ধন। আমার কথায় বিশ্বাস করুন, ধ্বস্ত হবে সমস্ত বিপদ। ক্ষোভ না রেখে আপনাদের এখন কর্ত্তব্য, ইন্দ্রযজ্ঞের জন্ত সমাহৃত সমস্ত সামগ্রী-সম্ভার দিয়ে নিপুণভাবে সসম্মানে এই গিরিবরের উদ্দেশ্যে উৎসব বিধান করা।

১৫। দোহন করা হোক ব্রজের সমস্ত গাভী, ভারে ভারে দুগ্ধ বহন করে রন্ধন করা হোক পরমান্ন। রচিত হোক রম্য শস্কুলী। ঘৃত মধু ও পানকের বিরচিত হোক পুষ্করিণী দীর্ঘিকা সরোবর।

১৬। সৃষ্টি করা হোক মথিতের সমুদ্র, দধির মহাসমুদ্র। পর্ব্বত সৃষ্টি করা হোক নবীন নবনী-র শ্বেতশর্করার। শিখরিণীর সরস পানীয়ে রসস্নিগ্ধ করা হোক দিগন্ত। ধাবক-রা দৌড়ে যাক, নিমন্ত্রণ করে আসুক ব্রাহ্মণদের ; তাঁরা আসুন, ভোজনমূলে ভুলে যান স্বর্গসুখ, উপহাস করুন সুধাস্থর সুরদের।

১৭। ঋত্বিকেরা আসুন, জ্বলে উঠুক হোমানল। গোধন দক্ষিণা দিয়ে সযত্নে ব্রাহ্মণ-ভোজন করান দক্ষিণাশয় ব্রজবাসীরা। এবং ব্রাহ্মণগণ তুষ্ট ও হৃষ্ট হয়ে, মুদগাদি-সুপ-সুরভিত নানাবিধ ব্যঞ্জন সজ্জিত করে, পিষ্টক-পুষ্ট পায়সের সুমিষ্ট কুণ্ড দিয়ে ঘেরাও করে, আনন্দলড্ডুকের মোহন-কূট বিরোচন করে, যথাচারে পাদ্যাদির উপচারে উপকল্পনা করুন গিরীন্দ্রপূজন। এবং প্রত্যেককে, ···তা তিনি কুক্কুর-শাবকই হোন্ বা চণ্ডালই হোন্··বিতরণ করুন প্রদান করুন পূর্ণ-ভোজন। ভূত-যজ্ঞের এই ব্যবস্থা হলে, আশা করি আপনারা শুনতে পাবেন,··দিগন্তব্যাপী চারণদের কলগান, বেদবিদ্বানদের উদার-মধুর প্রগায়োৎসব নান্দী, এবং বিপুল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টিকারী ভেরী-ভাঙ্কার, শঙ্খ-স্বনন্ নিষ্পঙ্ক ঢক্কা-রব এবং দুন্দুভির আনন্দ-হুঙ্কার।

তারপরে আশা করি আপনারা সকলে অধিমঙ্গলগুলির নিধি-স্বরূপ বিদ্বান দ্বিজশ্রেষ্ঠদের উদ্দেশ্যে বিধান করবেন বিধিবৎপূজা এবং তাঁদের সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করে, পরার্ধ-জীবন দেবেশদের স্পর্দ্ধা করতে করতে সাড়ম্বরে পরিক্রমা করবেন পর্ব্বতেন্দ্রকে। বিস্মিত-নয়নে তখন আপনারা দেখতে পাবেন,··আপনাদের সঙ্গে পরিক্রমা করছেন উজ্জ্বল পুরুষেরা, অবাক হবেন তাঁদের অলঙ্কারের ঝঙ্কারে, অম্বরের আড়ম্বরে দেখবেন পরিক্রমা করছেন বধূত্তমাগণ ; তাঁদের মৃদু হাস্যে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছেন দেবতারা ; আর তাঁদের সঙ্গে রথারোহণ করে দলে দলে নাচতে নাচতে চলেছেন নর্ত্তক-নর্ত্তকী, বাজছে বীণা, বাজছে বেণু মৃদঙ্গের বোলের সঙ্গে সঙ্গে ফুটছে মঙ্গল গানের মঞ্জুরী।

১৮। মনেও স্থান দেবেন না, কেমন করে একটি পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ

অভীষ্ট-দাতা হয়ে আহ্বাকর হতে পারে ? দ্বিতীয় গিরীশের মত এই গিরীশই দেখবেন, শোভার নির্ম্মলতায় আপনাদের মধ্যে সম্বর বিতরণ করছেন সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আমার সমীহিত এই মঙ্গলময় অভিপ্রায় যদি আপনাদের রুচিকর হয়, তাহলে আশা করি গৃহীত হবে সেই পথ।"

১৯। পিতৃদেবের মুখের দিকে চেয়ে শ্রীকৃষ্ণ সমাপ্ত করলেন তাঁর ভাষণ। সকলের মনেই ধীরে ধীরে সঞ্জাত হল শ্রদ্ধা, তাঁরা কান দিলেন কথায়, প্রণিধান করলেন মনোরথ-সিদ্ধির আবশ্যকতা।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের হাতে এই যজ্ঞের আচার্য্যত্ব এসে যাওয়া এবং ইন্দ্রদেবের পক্ষেও ক্রুদ্ধ হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। এবং অস্বাভাবিকও নয় ব্রজগোপেদের মধ্যে একটি পরমোৎকণ্ঠার আবির্ভাব হওয়া। তাই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বাক্যানুসরণ করে আনুপূর্ব্বিক অনুষ্ঠান করতে লেগে গেলেন মহোৎসব।

দেখতে দেখতে বিভিন্ন শব্দগ্রামকে গ্রাস করে দিগদিগন্তে লাফিয়ে উঠল ব্রজঘোষদের মঙ্গল-তূর্য্যঘোষ এবং ব্রাহ্মণদের বেদধ্বনির ধ্বনি-পরম্পরা। ব্রজবাসীদের গিরি-মহোল্লসিত অন্তঃকরণগুলির সে কি উদ্দাম আনন্দ কম্পন! দেখে মনে হল, আনন্দ-কন্দলিত হয়ে উঠেছেন মহাকাল।

পুংস্কোকিলদের হৃদয়েও হঠাৎ উৎকণ্ঠা জাগালো পুরন্ধ্রীদের নীরন্ধ্র মঙ্গলগানের তরঙ্গিত ধ্বনি। সেই ধ্বনি কানে এসে লাগতেই যেন কম্পিত হয়ে উঠল শ্রোতার শ্রুতিফল।

গাভীরাজ্যেও অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটে গেল। কিঙ্কিনী-জালের রত্নমালায়, চীনাংশুকে, কাঞ্চন-শৃঙ্গকোষে এবং মুক্তামালায় এমন বিভূষিতা করা হল গাভীদের যে তাদের আকৃতির বদল হয়ে গেল ; এত বদল হয়ে গেল যে বাছুরেরাও চিনতে পারল না তাদের। তাদের চোখ যেন বলে উঠল,—"এই কি মোদের মা ?"

২০। মহারাজ শ্রীনন্দও কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। শৈলপ্রাসাদ থেকে তাঁর আদেশে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতে যখন সমানীত হতে লাগল পূজার উপহার ও পাত্রাদির বিরচন, তখন কৌতুক ভরে তিনিও সৃষ্টি করিয়ে ফেললেন পর্ব্বত-প্রমাণ এমন একটি স-চূড় অন্নকূট যে কম্পান্বিতা হয়ে উঠলেন মেদিনী।

অবিস্মরণীয়···সেই অন্নকূটের গোবর্দ্ধন-শিখরের মত কর্পূর-গৌর শোভা গণ্ড শৈলমালার মত, অন্নকূটের গাত্রে নানারুচি পিষ্টকের সেকি উদ্ধত সমারোহ! প্রত্যন্ত-শৈলমালার মত তার মূলে দধি ও পায়সের কুম্ভশ্রেণীর সেকি অজস্রতা! এবং তারও মূলে সূপ-মুখ্য সরস ব্যঞ্জনের অহো পদাবলী।

অবিস্মরণীয়···সেই অন্নের পর্ব্বত পাদমূলে কর্পূর, এলা লবঙ্গ প্রভৃতির ঘ্রাণ-সন্তর্পণ গন্ধ! কৈলাসের মত শিখর থেকে কনকধারার মত তার উৎকৃষ্ট ঘৃত প্রবাহ।

ফলফুল দিয়ে সুসজ্জিত অন্নকূটের এই মোহন দৃশ্য দেখে প্রীত হয়ে উঠল ব্রজনাথের মন। নাঃ, গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের উপযুক্তই হয়েছে বটে এই অন্নকূটের নির্ম্মিতি।

২১। অন্নকূট নিরীক্ষণ করতে করতে শ্রীকৃষ্ণও হেসে ফেললেন তাঁর অতি খুশীর একটি হাসি। বিস্মিত পরিজনদের প্রত্যয় জন্মিয়ে অবাধে পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হল তাঁর কৌতুক-শতদল যখন তিনি পর্ব্বতের শিখরে পরিকল্পনা করলেন ইন্দ্র-তাপন অন্ত একটি লাবণ্য-টলটল বিশিষ্ট রূপ। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ রূপের ছটায় যেন খলিত হয়ে পড়ল সহস্র সূর্য্যের সাহসিকতা। ক্ষণকাল চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করে রসিকশেখর বললেন,

"পূজ্যপাদগণ, নয়ন মেলে আপনারা দেখুন। আপনাদের কল্যাণ-প্রযত্ন সফল হয়েছে। আপনাদের শ্রদ্ধাবদ্ধ ত্রুটিহীন পূজা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ঐ দেখুন, অনুগ্রহ-গ্রহ-গৃহীতের মতই প্রকটিত হয়েছেন মূর্ত্তিমান ধরাধর-ধুরন্ধর শ্রীগোবর্দ্ধন।

২৩। যাঁর স্ফার-স্ফীত গভীর কন্দরগুলিই মুখ বলে প্রসিদ্ধ, তাঁর সেই মুখেই দেখুন চন্দ্রসমান শোভা। বৃক্ষপ্রায় যাঁর ভুজ, তাঁরই ভুজযুগে দেখুন কিরণ ঠিকরোচ্ছে রত্নাঙ্গদ। যিনি পাষাণ-দেহ বলে বিখ্যাত, তাঁরই দেহে আজ ঝরে পড়ছে মধুর কোমলতা। স্থাবর-বিগ্রহের উপরে ঐ দেখুন তাঁর পরিস্পন্দী চলমান বিগ্রহ।

মরকত-শিলাপট্টের মত শ্লাঘ্য ওঁর প্রকাণ্ড বক্ষঃদেশ। শিখর-কান্তির মত সুন্দর ওঁর মাণিক্য-দন্তাবলী। ধাতু-প্ররোহ-বিড়ম্বিনী ওঁর অধরোষ্ঠের আভা। ঐ রাজমূর্ত্তি···নিজের উপমা নিজে।

আর ঐ দেখুন, তিনি স্বয়ং আপনাদের ভক্তির উৎকৃষ্টতায় মুগ্ধ হয়ে, বুভুক্ষুর মত দ্রুত প্রসারিত করেছেন নিজের স-মণিবলয় দোর্দণ্ডের অগ্রভাস। সিদ্ধ হয়েছে আপনাদের কামনা। নমস্কার করুন, নমস্কার করুন।"

এই বলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নমস্কার করলেন তাঁকে।

২৪। 'নমোনমোনমঃ' ধ্বনি তুলে তখনি শেখর-বদ্ধাঞ্জলি প্রণাম করলেন সকলে। বহ্নির মত কী জাজ্বল্যমান রূপ! বিপুল পুলকে আকুল হয়ে উঠলেন কুলনারীগণ, কুলবৃদ্ধাগণ তাঁরা আপন আপন সৌভাগ্যের বর্ণনা করতে করতে লুটোপুটি খেতে লাগলেন ভক্তি শ্রদ্ধায়। তারপরে এল এঁদের মূর্ত্তিমান পর্ব্বতরাজকে সন্তুষ্টির মাল্য-দান।

২৫। পথে পথে, দেবপ্রতিমার প্রতি পীঠে পীঠে, বেজে উঠল মঙ্গলবাদ্য। স্থানে স্থানে মত্ত হয়ে নাচতে লেগে গেলেন নর্ত্তকীরা। গীতের কমনীয়তায় গগন ছেয়ে ফেললেন কিংপুরুষেরা। এঁরা কি সত্যিই পুরুষ মানুষ···স্থির করে উঠতে পারলেন না প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞেরাও। কৌতুকের প্রবাহ যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাঁদের স্মৃতি।

২৬। ···"পর্ব্বত-মহোৎসবের কি অপূর্ব্ব মহিমা!

···এমন মন-ঝলসানো আনন্দ আগে কখনও উপভোগ করেনি মানুষে।

···অদ্ভুত কাণ্ড অদ্ভুত কাণ্ড!

···অনুরূপ রূপ ধরে পর্ব্বতরাজ যে শুধু এসেছেন তা নয়, আশ্চর্য্য, নিজেও সংগ্রহ করে ফেলেছেন ব্রজরাজের সশ্রদ্ধ উপহার!"

নববোধ-দুর্গম এই-হেন এক জনরব সর্ব্বদেশে ছড়িয়ে পড়ে হেতু হয়ে উঠল পৃথিবীর দুঃখ-ত্রাণের।

২৭। তারপরে যখন সমাপ্ত হয়ে গেল মহোৎসবের ভোজন-পর্ব্ব এবং অতিতৃপ্ত হয়ে উঠলেন গায়কেরা বাদ্যকরেরা বালকেরা চণ্ডালেরা এমন কি পতিতরাও, তখন তাঁরা সকলে মিলে দিব্যাম্বর মণিময় অলঙ্কার প্রভৃতির ছটায় দিগবলয় উদ্ভাসিত করতে করতে, পর্ব্বত-পর্ব্ব-তরল মনের সরসতা নিয়ে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে দিলেন গিরি-গোবর্দ্ধন।

প্রথমে চললেন বাদকের দল। তাঁদের শত শত হস্তের জাগ্রৎ পটিমায় মন্থর বাজতে লাগল পটহ ; তাঁদের সহস্র মুখের মরুৎ তাড়নায় প্রৌঢ় ভাঙ্কার দিয়ে বেজে উঠল ভেরী ; তাঁদের শত-সহস্র যষ্টির আঘাতে টঙ্কার দিয়ে হিক্কা তুলতে লাগল ঢক্কা। গম্ গম্ করে উঠল চক্রবাল।

পিছনে পিছনে ধেনুদের চালনা করতে করতে লগুড়-হস্তে চললেন নির্ভীক আভীরেরা ! কুঙ্কুম-দিগ্ধ তাঁদের মুখ তাঁদের অঙ্গ। চমকাতে লাগল মণি, চমকে উঠল সোনা।

তাঁদের পশ্চাতে এলেন বীণা-বেণু-প্রবীণাদের দল। নর্ত্তকদের নাচের তালে তালে, গায়কদের গানের সুরে সুরে বাজতে লাগল তাঁদের বীণা, বাজতে লাগল তাঁদের বেণু। তারপরে এলেন গোপীরা। স্বর্ণ-বিমানের 'মত শত শত শকটিকায় আরোহণ করে তাঁরা গান করতে করতে চললেন গোপেশ্বর-সুতের গোপন কীর্ত্তিগাথা।

এমনকি প্রত্যূহ ব্যূহহারী শ্রীহরিও চললেন। সঙ্গে তাঁর সুপ্রশস্ত বয়স্তের দল,··প্রস্তার একদিকে অনুবন্ধ যাঁদের আত্মা, অন্যদিকে হাস্তে ও উপহাসে উল্লসিত যাঁদের গতিরাগ। তাঁদের পশ্চাতে এলেন আভীররাজ-প্রমুখ হাস্তমুখ মুখ্য আভীরবর্গ। তাঁদের উদার বক্ষে আমোদি-মন্দার-দামের উদ্দাম আলোলতা !

২৮। বিপ্রদের যথাবিহিত দক্ষিণান্তের পর যখন সমাপ্ত হয়ে গেল গিরি-প্রদক্ষিণ, তখন তাঁরা সকলেই যেন আনন্দ রাখবার আর প্রমোদস্থান খুঁজে না পেয়ে প্রমোদের মধ্যেই বিলীন করে দিলেন নিজেদের আনন্দ।

২৯। পরের দিনটি দ্বিতীয়া। যম-যমুনার বড় প্রিয়, দ্যুলোকে ভূলোকে অত্যন্ত সমাদৃতা এই অদ্বিতীয়া কান্তি-রক্ষিণী দ্বিতীয়া, অর্থাৎ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। তাই দ্বিতীয়ায় যমুনায় প্রাতঃস্নানের উদ্দেশ্যে প্রতিপদেই যমুনাতটে সমাগত হলেন নিখিল ব্রজবাসী।

৩০। উৎসবময়ী রজনী প্রভাত হতেই মন্ত্রণ-চতুরা উপনন্দ-কন্যার নিকট থেকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে অবিলম্বে উপস্থিত হয়ে গেল ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার বিশেষ নিমন্ত্রণ। জগন্মোহন ভগিনী-বাৎসল্যের অনুরোধে বিরোধ-বিরহিত হয়ে উপস্থিত হয়ে গেলেন ভগিনী-ভবনে। সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁর হাস্যরস-প্রিয় বটুটিকে। কুঞ্চিত-মাংস উদর বাজাতে বাজাতে সহচরেরাও উপস্থিত হয়ে গেলেন সেখানে। হলীও কুতূহলী হয়ে এলেন। দয়াস্বরূপিনী উপনন্দ-কন্যার বিগলিত হয়ে গেল চিত্ত। তিনি সকলকেই পরিবেশন করলেন, যে যেমনটি চায় তেমন, অতিস্বুরস পিষ্টকাদি মিষ্টান্ন এবং মোদক পানাদি বহুবিধ বহুরস আমোদন। তত্তঃপর সে কী বিরাট ভোজন, বিপুল হাস্য, বচনবিনোদে নবীন ব্রাহ্মণবটুর সে কী রসমিশ্র অনর্গল কৌতুকালাপ ! শেষে আর থাকতে না পেয়ে কৃষ্ণকে বললেন,—

৩১। "বলি ও অঘাসুরের হন্তা, হায় হায় হায় ! সাধে কি বলি বেধা দুর্মেধা। এতগুলি তিথিকে হায় হায় তিনি অতিথি বানালেন না কেন ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ছন্দে হে শ্রীবৎসলাঞ্ছন, হে জগদেকমোহন, বৎসরের দিন-সংখ্যার সংখ্যায় আপনারা হায় এ হায় এমন ভোজনসুখ-বিধায়িনী দয়া শরীরিণী তিনশো পঁয়ষট্টি ভগিনীই বা হলেন না কেন ?

৩২। যদি দুটির একটিও হোতো, তাহলে আহা আমাদের কি সুখটাই না হোতো। এত অন্নকূট খেলুম পর্ব্বত-পার্বণে, কিন্তু আজকের মত এমন রসিয়ে-খাওয়া এর আগে আর প্রভু খাইনি।"

বলতে বলতে চলতে লাগল হাসি উপহাসি, আর পেটের মধ্যে মোদকাদির আহরণ। আহরণের গোড়ে গোড় মিলিয়ে সকলের মনগুলিকেও হরণ করে নিতে লাগলেন মনোজ্ঞচরিত শ্রীঘোষরাজ-যুবরাজ।

৩৩। আহারান্তে উপনন্দ-কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণ যখন পরস্পর পরস্পরকে সাদরে উপহার দিলেন পরার্দ্ধমণি স্বর্ণালঙ্কার এবং বসনাদি, তখন কৌতুক-রসের যেন এক প্রীতি-স্রোত বয়ে গেল সকলের মধ্য দিয়ে।

[ক্রমশঃ]

নীলকর

চিত্তেন

হোলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্ত্তা, ঘটে সর্ব্বনাশ।
কাল সাপ কি কোন কালে,　　দয়াতে ভেকে পালে,
টপাটপ অমনি করে গ্রাস।
বাঙালী তোমার কেনা,　　এ কথা জানে কে না ?
হয়েছি চিরকেলে দাস।
করি শুভ অভিলাষ।
তুমি মা কল্পতরু,　　আমরা সব পোষা গরু,
শিখি নি সিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল,　　বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা,　　তুলে মামলা,
গামলা ভাঙে না,
আমরা ভুষি পেলেই খুসি হব,
ঘুষি খেলে বাঁচব না।—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

সিক্ত যূথীর মালা

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

আঠারো

শর্মিষ্ঠা বলেছিল শুভজিতের জোর নেই।···এখন বিপরীত অভিযোগ করবার বাসনা রাখে।

···জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস এসে ধাক্কা দিয়েছে তার নিভৃত সত্তায়, প্লাবন এনেছে।···শুভজিতের জোরের তোড়ে ভেসে গেছে শর্মিষ্ঠা।

ক'টা দিন যেন ঘূর্ণি-হাওয়ার ধাক্কায় কেটে গেল।···শুভজিতের পাল্লায় পড়ে কত যে ঘুরেছে তার ঠিক নেই। আজকাল কলকাতার কোলাহল-মুখর এলাকা ছাড়ালেই জনবিরল পথ মেলে না। একটানা নির্জন রাস্তায় স্পীডোমিটারের কাঁটাটাকে উর্ধ্বগামী করে তোলার ইচ্ছেটা সহজে সফল হবার নয়। কলকাতার চারপাশ ঘিরে বসতি বাড়ছে ক্রমেই, ক্রমেই ভীড় বাড়ছে পথে।···ফাঁকা পাবার আশায় ঝোঁক করে এক-একদিন বহুদূর এগিয়েছে এরা। পেয়েছে যেটুকু, লোভীর মত তাকে উপভোগ করতে করতে আবার বসতির মধ্যে এসে পড়েছে এক সময়···আবার তাকে অতিক্রম করে যাবার নেশায় মত্ত হয়ে সামনের দিকে আরও এগিয়েছে।···এগিয়েছে যখন খেয়ালও করেনি কত দূর এল। খেয়াল হয়েছে ফেরবার সময়, পথ আর ফুরোয় না।···ফল হয়েছে এই, বেড়ানোটা অধিকাংশ সময়ই গন্তব্যস্থলের তোয়াক্কা রাখেনি, কোন এক সময় রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে গাড়ী ঘুরিয়েছে শর্মিষ্ঠা, আর শুভজিতের গাড়ী চালানো শেখা অনেকখানি এগিয়েছে।···বিনিময়ে প্রতিশ্রুত আছে বাঁশী বাজাতে শেখাবে শর্মিষ্ঠাকে। বাঁশী শুভজিৎ সত্যি ভাল বাজায়।

কাশীপুরে বাগানবাড়ীর পুকুরঘাটে বসে শুভজিতের বাঁশী শুনেছে শর্মিষ্ঠা। তন্ময় হয়ে কোনদিন বাজালে বহুক্ষণ কেটে যায়।

বাজানোর শেষে একদিন হেসে বলেছিল, "প্রথম কার কাছে বাঁশী বাজাতে শিখেছিলাম জানো? জমাদারের কাছে—স্কুল-বোর্ডিঙের জমাদার।"

একটু থেমে আবার বলেছিল, "একটি ছেলে ছিল, তার হোম-টাসকের অংকগুলো কষে দিলে খাওয়াতো। কষে দিয়ে টিফিনের পয়সা বাঁচাতাম বাঁশী কিনব বলে—অবস্থা থাকত যখন! তখন দারুণ ঝোঁক ছিল।"

টুকরো কথা···অতীতের ছেঁড়া ছবি···তুচ্ছ কোন ঘটনা···কোন মহতী আশার কাহিনী। সময় বয়ে যায়। দু'হাতের ওপর চিবুকের ভর দিয়ে ঝুঁকে বসে থাকে শর্মিষ্ঠা, পুকুরের নিস্তরংগ জলের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে স্বভাব-সুলভ চাপল্যটুকু প্রকট নয় খুব। গভীর দুটি চোখের চাওয়ায় পুকুরের ঐ কালো জলের ছায়া বুঝি।···

বর্ষার এলোমেলো বাতাসে নারকোল গাছের পাতাগুলো শিরশির করে ওঠে মাঝে-মাঝে। শর্মিষ্ঠার কণ্ঠস্বর সে শব্দেও ডুবে যায়, এত মৃদু। বারাসাতের অভিজ্ঞতার কথা কোন সূত্রে কখন যে বলতে শুরু করেছে খেয়ালও করেনি। কি বলছে, বহু বিনিদ্র রজনীর, বহু কাজ-ভোলা দ্বিপ্রহরের চিন্তায় কতখানি যে প্রকাশ হয়ে পড়ছে তাতে, তাও না। সে চিন্তা চিত্রধর্মী যতটা, তার চেয়ে বেশী আত্মবিশ্লেষণী। বারাসাতের মৈত্র-বাড়ীর প্রতিটি পরিবেশে, প্রতিটি চরিত্রে শর্মিষ্ঠা মৈত্রকে বসিয়ে দেখেছে সে চিন্তা, দেখেছে কেমন দেখায়।···অথবা বলা চলে শর্মিষ্ঠার অন্তরের একাংশ যেন নিরপেক্ষ দর্শকের মত এক পাশে দাঁড়িয়ে তুলনা করে দেখেছে শর্মিষ্ঠা মৈত্র যা হয়েছে—কে শর্মিষ্ঠা মৈত্র যা হতে পারত-র সংগে। পথিক যেমন কিছুটা পথ চলে এসে ঘুরে দাঁড়িয়ে আর একবার তাকিয়ে দেখে পিছনে ফেলে আসা শহরটার দিকে।···নন্দিতাকে একদিন তার এই উপলব্ধির আভাস দিয়েছিল, কিন্তু বারাসাতের জ্যোৎস্নার মধ্যে আপনার হতে পারত বর্তমানকেই শুধু দেখেনি সে। ভুলে-যাওয়া শৈশবকে দেখেছিল শিশুদের ভীড়ে, অনুভব করেছিল কিশোর-কিশোরীর দল চলমান বর্তমানের অংশ না হয়ে তার অতীত স্মৃতির পৃষ্ঠা হতে পারত। একা জ্যোৎস্নার মাঝেই তার এক কালের সম্ভাব্য বর্তমান তো মূর্ত হয়ে ছিলই, জ্যাঠাইমা পিসিমাদের মধ্যে কালের হাতের পরবর্তী রঙের পোঁচও।···সব ক'টি ছবি কখন যে মেলে ধরেছে শুভজিতের সামনে, কেমনই বা, নিজেরই হুঁশ নেই।···এই সব ছবির ভীড়ে আর একটা ছবি কখন যেন সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পেয়ে গেল।···এ ছবিখানা ব্যতিক্রমের, বারাসাতের প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম।···অথচ ছবিখানা ওপর থেকে দেখলে বিশিষ্টতা কিছু নেই কোথাও—তরুণী একটি বৌ···বিয়ে-বাড়ীর জাঁকজমকে পরণে তার আধ-ময়লা শাড়ী, হাতে গরম দুধের বাটি আঁচল দিয়ে ধরা, ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির আভাস! তবু তাকে ভোলেনি শর্মিষ্ঠা, কোনদিনও ভুলবে না। টুকুন তার কাছে নাও থাকত যদি, তেমন পরিস্থিতি যদি না হত কোনদিন, তবুও না।···কিন্তু তার সংগে আর কোনদিন দেখা হবার কোন সম্ভাবনা নেই, জীবনের গতিপথে হঠাৎ ওলোট-পালোট না হয়ে গেলে অন্তত'। তাকে কোনদিনও বলা যাবে না, তোমায় ভুলিনি আমি। যে তোমাকে আমি দেখেছিলাম বিরুদ্ধ পরিবেশ তাকে বেশীদিন বাঁচতে হয়তো দেবে না তবু আমার মনে বেঁচে থাকবে তুমি টুকুনের মধ্যে—শুধু টুকুনের নামটাই যথেষ্ট সেজন্যে।···তা বলে তাকে জানানো যাবে না টুকুন কেমন আছে এখন, কতটা সুস্থ হয়েছে। গৃহকর্তা ইন্দুভূষণ মৈত্রের বৈঠকখানা ঘরেই ডাকের যত চিঠি গিয়ে জড়ো হয় আজও আর তাঁর নীচেও আরও বহু কর্তা আছেন বাড়ীতে। এখান-সেখান থেকে মেয়েছেলের নামে চিঠি আসা পছন্দ করেন না তাঁরা!

একদিন ডাক্তার শুভজিৎকে বারাসাতের মৈত্র-বাড়ী সংক্রান্ত অনেক কথা বলেছিল, টুকুন কি পরিবেশে ছিল তাই বোঝাতে।

কিন্তু অত কথার মধ্যেও সেদিন ঐ তরুণী বৌটির স্থান ছিল না কোথাও—বড় জোর হয়তো বলেছিল, "ওরই মধ্যে একটি ছেলেমানুষ বৌ যত্ন করত একটু, সুযোগ পেলে নিজে দুধ নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আসত।" আর আজ হঠাৎ তার কথাই প্রধান হয়ে উঠেছে। কাল-চক্রের আবর্তনে মানুষের কত বিচিত্র রূপই ধরা পড়ে!

দীপংকর-নন্দিতা ফিরে এল।

সমাচার জেনে নন্দিতা উৎফুল্ল, দীপংকর অভিভূত।

নন্দিতা সহজ হতেও সময় দিল না তাকে।

কোমরে দু' হাত দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, "ফেল বাজির টাকা, নিউ মার্কেটে ঘুরে আসি একবার। যা সব ফাইন কাঁচের বাসন দেখে এসেছি দিদিকে নিয়ে গিয়ে—পর্দার কাপড়ও কিনতে হবে।"

শুভজিতের প্রতি সন্দেহ নন্দিতার অনেক দিনের।

প্রথম প্রকাশ করেছিল শর্মিষ্ঠার কাছে। সেই যেদিন হঠাৎ ননদের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন থেকে এক বেলা অব্যাহতি পেয়ে গিয়েছিল, সেদিন। বলবে ভেবে ঠিক করে যে গিয়েছিল তা নয়, হঠাৎ শুরু করেছিল।···শুভজিৎ নিজেকে প্রকাশ করেনি কোনদিন, সদাজাগ্রত প্রহরায় লৌহ আবরণের অন্তরালে লুকিয়েছিল। তবু নন্দিতার চোখেও ধরা কেবল সেই পড়েছিল।···আবাল্য পরিচিত শর্মিষ্ঠাকে মুহূর্তের জন্যও কোন সন্দেহ করবার অবকাশ পায়নি নন্দিতা। শর্মিষ্ঠার সাবলীল সহজতায় ছায়া পড়েনি কোনদিন, কোন গোপনতার অস্তিত্ব টের পায়নি কেউ, নন্দিতাও না।

এ প্রসংগের অবতারণায় সংকোচ ছিলই তাই। সংশয় ছিল বলেই ছিল।···তবু মরিয়া হয়ে শুরু করেছিল শুভজিতের প্রতি প্রীতিবোধে। শর্মিষ্ঠার উদাসী মনটাতে নাড়া দেবার সদিচ্ছা ছিল।

সেদিনই প্রথম শর্মিষ্ঠার মনটাকে দেখতে পেয়েছিল। শুরুতেই। অথবা শর্মিষ্ঠাই নিজের মনটাকে মেলে ধরেছিল স্বেচ্ছায়। ভেতর-ভেতর মনটা তার হয়তো নির্ভরই চাইছিল একটা।

একটুখানি·ভূমিকা করে বক্তব্যটাকে গুছিয়ে নিতে না নিতেই শর্মিষ্ঠা হাসতে লাগল, "নন্দা, এটা কি স্বতঃপ্রবৃত্ত ওকালতি? আমিও যে একটা উকিল ধরবার কথাই ভাবছিলাম।"

শর্মিষ্ঠার ঈষৎ বঙ্কিম হাসিতে ধরা পড়েছিল অনেক কিছু।

চমকে ছিল বটে, তবে বুঝতেও সময় লাগেনি নন্দিতার।

কৃত্রিম ক্রোধের আবরণে নিজেকে ঢেকে রেখেছিল তখনকার মত, "আমায় বলিসনি কেন?

আবারও হেসেছিল শর্মিষ্ঠা, "বলব-বলব করছিলাম।"

—"হুঁ! এখন সামনে বই খুলে চুপ করে বসে কি ভাবছিলি শর্মি?"

এবার শর্মিষ্ঠা শুধুই হেসেছিল। উত্তর দেয়নি।

দীপংকর কিন্তু বিশ্বাস করেনি।

মন খারাপ করে শুয়ে শুয়ে শুভজিতের কথা ভাবছিল। এমন সময় নন্দিতা এল। শর্মিষ্ঠার কাছে কথা দিয়ে এলেও এত বড় সংবাদটা দীপংকরের কাছে গোপন রাখতে পারবে এমন ভরসা নিজের ওপর ছিল না। তার ওপর বন্ধুর জন্য দীপংকরের চিন্তার ঘটা। হুটোয় মিলিয়ে নন্দিতার প্রতিজ্ঞা ভেসে গেল।

তখন কল্যাণী এসে পড়ায় বাধা পড়ল বটে, রাত্রে শুয়ে দীপংকরকে বলেছিল সব। শর্মিষ্ঠার সংগে এতক্ষণের আলোচনার আভাস মাত্র না দিয়ে গম্ভীর ভাবে বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করেছিল, ভাবটা যেন সবটাই ওর নিজের আবিষ্কার—অদূর ভবিষ্যতে মিলিয়ে দেখে যেন দীপংকর।

যতই বিস্মিত হোক, শুভজিৎ যে শর্মিষ্ঠাকে ভালবেসেছে এ কথাটা তবু বিশ্বাস করতে পেরেছিল দীপংকর।

তাবলে শর্মিষ্ঠা ?···অসম্ভব !

নন্দিতা যতই জোর দিয়ে বোঝাল, দীপংকর মাথা নেড়ে অস্বীকার করল ততই।

নন্দিতার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাই স্বাভাবিক, "কেন অসম্ভব জানতে পারি ?"

—"কেন তা তোমার শর্মি জানে, আমি কেমন করে বলব ! ওর কাণ্ডকারখানা একবিন্দুও বুঝি না আমি। আগে আগে ভাবতাম বোধ হয় দেবুর সংগে বিয়ের ঠিক আছে ওর—"

শেষ করার আগেই নন্দিতা বাধা দিল, "এমন অদ্ভুত কথাই বা ভাবতে কেন ? ঠিক যেন শর্মির জ্যাঠামশাই !"

নন্দিতা চটেছে দেখে দীপংকর হাসতে লাগল, "অদ্ভুত বলছ, বাধা কি ছিল ?"

—"দাদা-শর্মিতে এত কম ছোট বড় বাবা-মা কোনদিন কল্পনাও করেননি এ কথা। তোমার মত উর্বর মস্তিষ্ক আর ক'জনের বল !"

—"লাভ ম্যারেজ ?"

নন্দিতা এবার তাচ্ছিল্যভরে হাসল, "বলে চিরদিন দাদাকে স্নেহের চোখে দেখে শর্মি, কেউ কোনদিন দেবুদা বলাতে পারলে না, সে 'লাভে' পড়ল কবে ! তিনজনে একসংগে খেলাধূলা করে বড় হলাম, আমার সংগে শর্মির তফাৎ কোথায় ! যেহেতু ওরা ভাই-বোন নয় সে হেতু বড় হয়ে প্রেমে ওদের পড়তেই হবে, কেমন ! তার ওপর আবার দাদা ! যে এখনও তপুর সংগে ক্যারাম খেলতে বসে ঝগড়া করে। আরও পাঁচ সাত বছর যাক, লাফালাফিটা একটু যদি কমে তো প্রেম করলে হয়তো মানাবে তখন !"

তবুও দীপংকর বিশ্বাস করেনি। বলেছিল, "তুমি যদি এখন কল্পনা কর বসে বসে ! কেউ কোনদিন বুঝতে পারল না কিছু—"

হাসি চেপে নন্দিতা তখন চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, "বাজি—"

মোটা অংকের বাজি ধরতে দ্বিধা করেনি দীপংকর।···

দেবাশীষ এখনও ফেরেনি বিলাসপুর থেকে, তবে অল্পদিনের মধ্যেই ফিরবে আশা করা যায়।

খবর পেয়েই চিঠি দিয়েছে শর্মিষ্ঠাকে।

শর্মিষ্ঠা সহাস্যে শুভজিৎকে পড়তে দিল সেটা, "এ যে রাইভ্যালের চিঠি।"

সরস অভিনন্দন জানিয়ে দেবাশীষ লিখেছে···"ডাক্তারকে বোল ভাবে না যেন আমার জন্যে বনবাসে গিয়েছিল বলে আমি ওর মহত্ত্বে অভিভূত হয়ে পড়েছি। বরং বলব, তোমায় অমন মানস-প্রতিমার আসনে বসিয়ে ধ্যান না করে আমায় খোলাখুলি বলত যদি তো আর এ দুর্ভোগ ভুগতে হ'ত না ! সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। আরও বোল, "আত্মবৎ সর্বভূতেষু" নীতির অত বড় বাস্তব রূপায়ন শাস্ত্রকাররাও আশা করেন নি। কিন্তু আমার সম্বন্ধে এত ভাবনা-চিন্তার আগে লোকে তো আমার মতামতটাও নেয় !···আমার বয়ে গেছে এমন জাঁহাবাজ মেয়ে বিয়ে করতে। আমার বৌ হবে নরম-সরম—কলাবৌয়ের মত ঘোমটা দিয়ে ঘুরঘুর করবে ভাঁড়ার ঘরে ···ছোট্ট দুটি পায়ে থাকবে আলতা, নীলাম্বরী শাড়ীর আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা ঘুরতে-ফিরতে ঝনঝন করে বাজবে, নাকে নথ দুলবে দুলদুল করে। রাঙা টুকটুকে চতুর্দশী বৌ চাই আমার, বলে দিও খুঁজতে শুরু করে যেন। নন্দা আর তোমার মতে তো আর পাঁচ-সাত বছর পরেই বিয়ে করবার যোগ্যতা অর্জন করব আমি।···দেখ যেন আমার সাক্ষীর অপেক্ষা না রেখেই তোমায় বিয়ে করে ফেলতে না চায় ডাক্তার ! যা দিনকাল পড়েছে, সবই সম্ভব ! আমি ফেরবার আগেই হয়তো কোনদিন তোমায় রেজেষ্ট্রী অফিসে নিয়ে তুলবে। অত বেশী স্বার্থান্বেষী না হয়ে মনোযোগটা আমার পাত্রী অন্বেষণে দেয় যেন।···"

বৈকালিক প্রসাধন সেরে শর্মিষ্ঠা শোবার ঘরে ঢুকেছিল কি করতে। দেখল টুকুন উঠে বসেছে নিজের কটের ওপর, দিবানিদ্রা সুসম্পন্ন। শর্মিষ্ঠার ঘরে আলাদা কটে শোয় সে। চারপাশ থেকে তার প্রথম বছর দেড়েকের জীবনটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, একটা অভ্যাস শুধু রয়ে গেছে আশ্চর্য্য ভাবে। শোবার সময় কাউকে চায় না সে, শর্মিষ্ঠাকেও না। একা একা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কেউ কোলে শুইয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করলে বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে, আজকাল ব্যাপারটা যেন উপভোগ করে হাসেও মৃদু মৃদু, কিন্তু ঘুমোয় না। সুষমা বা ভুবনের কাছে একাধিকবার ঘটেছে এমন। শুধু ঘুম ভেঙে ঘরে কাউকে দেখতে না পেলে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে।

আজ ঘুম ভেঙে ঘরে কেউ নেই উপলব্ধি করার আগেই শর্মিষ্ঠা ঢুকেছে। কান্নার পরিবর্তে এক ঝলক হাসি তাই। শর্মিষ্ঠা কাছে এসে কোলে তুলে নিল।

ওকে খাইয়ে-সাজিয়ে অনেকখানি সময় কাটল। কালুর সংগে পার্কে বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়ে বই নিয়ে বসেছিল বারান্দায়, টুকুন ফিরেও ওর কাছেই এল। আগের মত ম্রিয়মাণ আর নেই এখন, প্রথমেই হাত বাড়িয়ে বইখানা কেড়ে নিল, দুহাত বাড়িয়ে দিল তারপর কোলে উঠবে বলে।

সন্ধ্যা যখন উত্তীর্ণপ্রায়, ফোনটা বাজল। নিশ্চয় শুভজিৎ। ক'দিন সাড়াশব্দ নেই বিশেষ। অবশ্য দিন ক'য়েক আগেই দীপংকর-নন্দিতার সংগে দু'জনেই সিনেমায় গিয়েছিল তবু ক'দিন ধরেই শুভজিৎ অন্যমনস্ক হয়ে আছে।

শর্মিষ্ঠা এসে ফোন ধরল।

শুভজিতের গলা পাওয়ামাত্র নিজে থেকেই বলল, "কাশীপুরে যেতে আমি পারব না।"

মুহূর্তখানেক চুপচাপ। দেখতে না পাওয়া যাক, ও প্রান্তের ভাবটুকু অনুভব করতে পারে।

মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল তারপর, "কেন ?"

—"পেট্রোলের দাম বাড়ছে—পঁচিশ নয়া পয়সা বেড়েছিল, আরও পাঁচ নয়া পয়সা বাড়ল।"

—"বাড়ুক, আমি না হয় দিয়ে দেব।"

—"চাই নে। আমি যাব না।"

—"তাহলে অন্য জায়গার নাম কর।"

—"বড় জোর চৌরংগী-পার্কষ্ট্রীটের মোড়ে অপেক্ষা করতে পারি।"

—"আচ্ছা, ভাই। আমার পৌঁছোতে একটু দেরী হয় তো অপেক্ষা কোর।"

শর্মিষ্ঠা গাড়ী নিয়ে বেরোল। চৌরংগী-পার্কষ্ট্রীটের মোড় পেরিয়ে এসে পার্ক ষ্ট্রীটে রাখল গাড়ী। শুভজিৎ আসেনি এখনও। চেম্বার থেকেই ফোন করছিল মনে হয়, নিশ্চয় ডাক্তার ব্যানার্জি ছিলেন না। না হলে তখনই বেরিয়ে পড়ে থাকলেও চেম্বার থেকে এখানে আসতে এত সময় লাগবার কথা নয়।···কাজ তাহলে বোধহয় শেষ হয়নি তখনও।

খুব বেশীক্ষণ অবশ্য অপেক্ষা করতে হ'ল না। শুভজিৎ এগিয়ে আসছে লম্বা লম্বা পা ফেলে।

দূর থেকেই দেখতে পেয়েছে গাড়ীটা, কাছে এসে হাসল একটু, "অনেকক্ষণ ?"

—"না, এই তো একটু আগে।" শর্মিষ্ঠা শুভজিৎকে লক্ষ্য করে দেখল। সারাদিনের পরিশ্রমে একটু ক্লান্তির ছাপ মুখে পড়েছে হয়তো, সেটা এমন কিছু নয়। কিন্তু অন্য একটা ছায়া প্রকট বেশ, শুভজিৎ বেশ একটু বিষন্ন।···সেজন্য শর্মিষ্ঠার দিক থেকে বিস্ময়ের আভাস মাত্র নেই। যেন আশাই করেছিল এমন দেখবে, সেই ভাবেই মাথা দোলালো আপন মনে। ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতে দেখে বিজ্ঞ ব্যক্তি মাথা নাড়েন যেমন।

বাঁদিকের দরজা খুলে শুভজিৎ উঠে বসেছে পাশে। খেয়ালও করেনি শর্মিষ্ঠা তাকে লক্ষ্য করছিল।

সোজা পার্ক ষ্ট্রীট ধরে ড্রাইভ করতে শুরু করেছে শর্মিষ্ঠা।

একবার প্রশ্ন করল তাকে, "কি ব্যাপার! কোথায় যাচ্ছি আমরা ?"

—"হোটেলে। ক্ষিদে পেয়েছে।"

ম্যাগনোলিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল গাড়ী। শুভজিৎও নীরবেই নামল।···শর্মিষ্ঠার রহস্যময় নীরবতায় যে ক্ষুন্ন হয়েছে এমন বোধ হয় না, লক্ষ্য করেছে কিনা সন্দেহ। নিজেই অন্যমনস্ক বেজায়, অন্তরে কি একটা ভাঙাগড়ার খেলা চলছে, তারই প্রস্তুতিতে মনটা ব্যাপৃত।

দুজনে ভেতরে ঢুকল।

এয়ার-কনডিশানড্ হলে মৃদু শীতল আমেজ। ভীড় নেই খুব, ডিনার টাইম এখনও হয়নি।

পরিবেশটা শান্ত মোটের ওপর।

তবু হোটেলের সান্ধ্য চাকচিক্যটুকু আছে।

সন্ধ্যাটা একটা বিশেষ কিছু। তাই যে রেডিওগ্রামটা এই বিকেল অবধিও বিদেশী অর্কেষ্ট্রা আর গানের রেকর্ড বাজিয়ে চলেছিল আপনমনে তাকে দিয়ে কাজ চলবে না এখন। সন্ধ্যায় অতিথিদের বিশেষ আপ্যায়ন চাই।···সন্ধ্যায় আসে মাইনেকরা সুরস্রষ্টারা··· নির্দিষ্ট ডায়াসে এসে বসে যে যার জায়গায়। তরুণী এ্যাংলো মেয়েটি প্রসাধন-চর্চিত মুখে হাসি টেনে এনে দাঁড়ায় মাইকের সামনে, নিজেই সেটা ফিট করে নেয় প্রয়োজনমত···ঘাড় ফিরিয়ে পিয়ানো-বাদকের দিকে তাকায় একবার, কি গান বাজাবে তারই ইশারা করতে বোধ হয়।

আজও তারা এসে গেছে।

একপ্রান্তে কোণের একটা টেবিলে বসল শর্মিষ্ঠা।

শুভজিৎ চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে আয়েস করে বসে সিগারেট ধরিয়েছে। তেমনই গম্ভীর, অন্যমনস্ক।

শর্মিষ্ঠা খাবারের অর্ডার দিল।···শুভজিৎকে চেয়ে চেয়ে দেখল খানিক।···কিসের প্রতীক্ষায় চুপ করে বসে রইল একটুক্ষণ।

দু'হাত টেবিলের ওপর রেখে ঝুঁকে বসল তারপর, "আমি ভেবেছিলাম আমার সংগে দরকারী কথা আছে বুঝি।"

শুভজিৎ বোধ হয় চমকালো একটু। একটু পরে ইতস্তত করে বলল, "সত্যি আছে।"

—"তাহলে শুরু করা দরকার, থটরিডিং জানিনে আমি।"

শুভজিৎ চুপ আবার।

এ্যাংলো মেয়েটি গান শুরু করল, সাময়িক বিরতি চলছিল বোধ হয়। মুহূর্তে সারা হলটা গম্‌গম্ করে উঠল।

শর্মিষ্ঠা ঘাড় ফিরিয়ে ডায়াসের দিকে তাকাল, তন্বী গায়িকাটিকে নিরীক্ষণ করে দেখল একটু। ডান হাতে মাইকের রডটা ধরেছে, বাঁ হাতে গানের ভাষার মৃদু অভিব্যক্তি···গান যেমন হোক, মেয়েটির গলাটা মন্দ না।···আনুষংগিক বাজনাগুলো এক এক সময় অসংগত রকম জোরে।

হাসিমুখে শুভজিতের দিকে চাইল, "আর ভাবনা কি! ও যা জগঝম্প শুরু হ'ল ওর আড়ালে যা খুশী বলে নেওয়া যেতে পারে—প্রেমালাপও চালাতে পার, নির্ভয়ে।"

শুভজিৎ চেয়ে দেখল একবার, মৃদু হাসল শুধু। উত্তর দিল না।

শর্মিষ্ঠা অপেক্ষা করে বসে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর শুভজিতের চোখের দিকে তাকাল সোজা, "তাহলে তোমার হয়ে আমিই শুরু করি, কি বল ?"

শুভজিৎ জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইল।

—"ফ্ল্যাট নেবে তো ? তাহলে চেষ্টা কর, ফ্ল্যাট পাওয়া তো খুব কঠিন আজকাল। বসে বসে সিগারেট টানলেই পাবে নাকি ?"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে সোজা হয়ে বসল শুভজিৎ। শর্মিষ্ঠার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল একটুক্ষণ, বোধ হয় থটরিডিং সত্যি জানে কিনা দেখতে চেষ্টা করল তাই। অথবা মনেই ছিল না শর্মিষ্ঠার ক্ষণপূর্বের উক্তিটা।

গম্ভীর গলায় বলল, "তার মানে ?"

শর্মিষ্ঠা হাসল, সপ্রতিভ হাসি, "মানে আবার কি ? ফ্ল্যাটের কথা ভাবনি তুমি ?"

—"তুমি জানলে কি করে ?"

—"বা:, আমারই তো জানবার দাবী সর্বাগ্রে। থাকব তো আমিই।"

শুভজিৎ অসহিষ্ণু হয়ে আর প্রশ্ন করছে না দেখে হেসে নিজেই বলল আবার, "কি করব, তোমার বন্ধুটি একটি স্ত্রৈণ, যা ঘটে এসে বৌকে বলেন। বৌটি আবার একটু বন্ধুবৎসলা, তাই আমি শুনতে পাই।"

শুভজিৎ নীরব।

প্রসংগটা সেদিন হঠাৎ উঠেছিল। আর কেউ ছিল না, শুধু সে আর দীপংকর। দীপংকরই তুলেছিল কথাটা। কি একটা

কথা বলছিল, ধরেই নিয়েছে বিয়ের পর শুভজিৎ শর্মিষ্ঠার কনভেন্ট রোডের বাড়ীতেই থাকবে, সেই ভাবেই বলে গেল কথাটা।

শুভজিৎ এর আগে ভেবে দেখেনি। দীপংকরের কথায় খেয়াল হ'ল প্রথম, কিন্তু ভাল লাগল না মোটেই। আত্মসম্মানে লাগছে।···প্রতিবাদ করল।

দীপংকর যে খুব অবাক হ'ল তা নয়। যুক্তি দিয়ে বলতে গেলে কনভেন্ট রোডের সাজানো সুন্দর বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র থাকার বিরুদ্ধে বক্তব্য যতই থাক, নিজেকে দিয়ে অনুভব করছে পৌরুষের যুক্তির কাছে হার মানবে সব। শুভজিতের দিকে থেকে তাই স্বাভাবিক।

তবুও দ্বিধাবোধ করেছিল। বিশেষত: নন্দিতাকে বলতে ও পক্ষীয় যুক্তিগুলো স্পষ্ট হল আরও। সমস্যাটার সহজ সমাধান হওয়া শক্ত। শর্মিষ্ঠার পক্ষে কিছু নিজের বাড়ীর কর্তৃত্ব, নিজের বাড়ীর অভ্যস্ত পরিবেশ ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়! শুভজিৎ তাকে সব রকম সুযোগ-সুবিধে দেবার চেষ্টা করবে ঠিকই, কিন্তু এই মুহূর্তে কতটা পারে শুভজিৎ? নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী রোজগার করলেও শুভজিৎ অপব্যয়ও করে প্রচুর। ব্যাংকে এত টাকা জমেনি যে এখনই বাড়ী কিনে ফেলতে পারে কলকাতায়, বাড়ীর মত বাড়ী। রোজগার যা করে তাতে অনেক বিলাসবহুল নিত্য প্রয়োজনও মিটতে পারে, কিন্তু সেটা বড় জোর ভাল কোন ফ্ল্যাটে, তার বেশী নয়। কিন্তু নিজস্ব বাড়ী থাকতে ফ্ল্যাটে গিয়ে ওঠার মানে হয় না কিছু।··· নিজের বাড়ীতে একা থাকে শর্মিষ্ঠা, সেখানকার সর্বময়ী কর্ত্রী সে। শুভজিৎ যে পরিবেশে যে গৃহ দিতে পারে তাকে, শর্মিষ্ঠার যা আছে যদি তার সমতুল্যই হয় তাহলেও তাকে স্থানচ্যুত করে আনা উচিত কি হবে?

নন্দিতার সংগে আলোচনান্তে দীপংকর শুভজিৎকে সব কথাই বলেছিল। রাগারাগি-তর্কাতর্কি নয়, চিন্তিত ভাবে বলেছিল সব, অনুরোধ করেছিল সংকল্পটা ত্যাগ করতে।

শুভজিৎ স্থির হয়ে শুনেছিল।

দীপংকরের কথাগুলো অযৌক্তিক নয় জানে। শর্মিষ্ঠার ওপর দুর্বলতাও অবিদিত নেই নিজের কাছে। যার সব যুক্তির কথা ছেড়ে দিয়েও শুধু সেই জোরেই এ ভাবনাটাকে মন থেকে ছেঁটে ফেলতে পারলেই সমস্যাটা থাকে না আর, তাও বোঝে।···তবুও নিজের মনের চিন্তাটাকে কিছুতেই সরিয়ে ফেলতেও পারছে না। হঠাৎ কথা প্রসংগে সেদিন যেমন দীপংকর কনভেন্ট রোডে থাকার কথা বলেছিল, অনুমান করা কঠিন নয় যে শুধু সে নয়, আশপাশের পরিচিত মহল সবাই ধরে নেবে এটাই।···বোধ হয় সেই জন্যই ভাবছে যত অনমনীয় জেদটাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তত।

মনে মনে লড়াই চলছে সেই থেকেই।···যুক্তিবাদী মনটা বুঝছে সবই, জেদী পুরুষ মনটা মানতে চাইছে না।

শর্মিষ্ঠার সংগে এ প্রসংগে কথা হয়নি কোনদিন। অথচ তার সংগে বোঝাপড়া হওয়াটাই দরকার। আর সেজন্য উদ্যোগী হয়ে এ প্রসংগ উত্থাপন করা প্রয়োজন।

সেটাই হয়ে ওঠেনি আজও। কোথায় যেন বেধেছে।

এক এক করে দিন কেটে চলেছে···শুভজিৎ শুধু ভাবছে। স্বপক্ষের যুক্তিগুলো জোরালো করবার চেষ্টা করছে, বিরক্ত লাগছে বিপক্ষীয় কোন যুক্তিটা হঠাৎ নিজের কাছেই জোরালো হয়ে উঠলে।

বলা অবধি এগোয়নি কিন্তু। শর্মিষ্ঠার পক্ষের যুক্তিগুলো কাটিয়ে উঠতে পারছে না যত ততই বলার সংকল্পর ভিত্তিতে নাড়া লাগছে।

রোজকার মত আজও সারা দিনে অনেকবার ভেবেছিল শর্মিষ্ঠার সংগে এ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করবে। ফোন করল যখন, তখনও সংকল্পটা বজায় ছিলই বলা চলে। তবু এখন হোটেলের চৌকো টেবিলে স্বল্প ব্যবধানে মুখোমুখি বসে আবারও পিছু হঠছিল মনটা।

আজও হয় তো বলা হত না।

শর্মিষ্ঠা যে নিজে হতে এমন কথা বলবে, কল্পনাও করেনি।··· খুসী হতে গিয়েও খুসী হতে পারছে না তবু। কি একটা বাধা।

শর্মিষ্ঠা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আর হাসছে মৃদু মৃদু।

শুভজিৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল তাকে, "ঠাট্টা করছ?"

—"ঠাট্টা কিসের। আমার কোন আপত্তি নেই।"

—"তোমার বাড়ীটা কি হবে?"

—"কি আবার হবে! ভাড়াই তো দিয়ে দিতে পারি, সৌখীন সখের জিনিষগুলো নিয়ে যাব···কিছু ফার্ণিচার আপাতত একটা ঘরে পুরে চাবি দিয়ে রাখা যায়।"

—"সত্যি ফ্ল্যাটে থাকতে পারবে?"

—"কি মুস্কিল। ব্যাপারটা কি খুব পরিশ্রমসাধ্য?···তবে ফ্ল্যাট পছন্দ করব আমি, বলে রাখলাম। মেসেও থাকিনি, বাগানবাড়ীর হলে থাকারও বাসনা নেই—তোমার পছন্দ ভরসা করতে পারব না।"

শুভজিৎ এবার সরবেই হেসে উঠল।

টেবিলে খাবার দিয়ে গেছে একটু আগে। কি যে অর্ডার দিয়েছিল শর্মিষ্ঠা, জানেও না। মনোযোগ এবার সেইদিকেই দিল।···ছোট হয়ে আসা সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে ছাইদানে ফেলে বসল সোজা হয়ে।···ক্ষিদেটা ভাল রকমই পেয়েছে।

ফ্ল্যাট দেখা হ'ল কয়েকখানা। চারজনে গিয়ে দেখে এল, মানে দীপংকর-নন্দিতা অবধি। ফ্ল্যাট নেওয়ায় নন্দিতার বিশেষ আপত্তি ছিল। শর্মিষ্ঠার কাছে বলেও ছিল সেকথা। কিন্তু শর্মিষ্ঠার আপত্তি নেই দেখে আর বিশেষ কিছু বলেনি। শর্মিষ্ঠার জেদকে টলাতে পারবে না জানে, যা করছে করুক। মনটা অবশ্য খারাপই হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। তবে তাতে সোৎসাহে সবার সংগে ফ্ল্যাট দেখতে যাওয়ায় বা সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশে ব্যাঘাত ঘটেনি। কিন্তু অমরনাথ-সুষমাকে বলা যায়নি এখনও কনভেন্ট রোডের বাড়ীতে শর্মিষ্ঠা আর থাকবে না! শর্মিষ্ঠা সাহস পায়নি বলতে। ভেবে রেখেছে কার্যকালে যা হয় হবে। ফ্ল্যাট দেখতে যাওয়ার খবরও রাখেন না তাঁরা।···ওরাও এখনও কোন ফ্ল্যাট মনোনীত করতে পারেনি, দেখাই চলছে ক'দিন ধরে।

দিন কয়েক পরে শুভজিৎ হঠাৎ একটা নতুন ফ্ল্যাটের খোঁজ পেল দীপংকরের কাছে। দীপংকরের এক মাড়োয়ারী মক্কেল আছেন। এ পর্যন্ত তাঁর তিন-চারখানা বিরাট ফ্ল্যাট বাড়ীর কনট্রাক্ট পেয়েছে ওদের ফার্ম, এখনও কাজ চলছে। তাঁকে ফ্ল্যাটের কথা বলেছিল দীপংকর, তিনিই সন্ধান দিয়েছেন। তাঁরই একটা ফ্ল্যাট খালি হয়েছে সম্প্রতি। দীপংকর শুভজিতের হাসপাতালে জানাল ফোন করে।

সেদিনই দুপুরে চেম্বারে যাবার পথে শুভজিৎ একাই গেল দেখতে। ভালই ফ্ল্যাট, পজিসনও ভাল, পছন্দই হল। ভাবল আজই সন্ধ্যায় শর্মিষ্ঠাদের এনে দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তাহলে নেবে কি নেবে না কালই বলে দেওয়া যাবে। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দীপংকরের কাছে বিনম্র আবেদন জানিয়েছেন ফ্ল্যাটটা ওরা নেবে কিনা মেহেরবাণী করে তুরন্ত, স্থির করে ফেলতে, এসব ফ্ল্যাটের চাহিদা আছে, ফেলে রাখলে তাঁকে বালবাচ্চা নিয়ে পথে বসতে হবে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, শুভজিৎ শর্মিষ্ঠার বাড়ী এল।

নীচের তলায় কোন ঘরে বোধ হয় টুকুন খেলা করছে, তার হাসি আর কালুর গলার আওয়াজ থেকে আন্দাজ করা যায়। শুভজিৎ থমকে দাঁড়াল একবার। এগিয়ে গিয়ে একবার দেখে আসবে টুকুনকে? ···বাতিল করেই দিল ইচ্ছেটা, দেখলে আর ছাড়তে চাইবে না।··· ভারি খুসী হয় মেয়েটা: ওপর দিকে ছুড়ে দিয়ে লুফে নিলে। কোলে নিলেই ইসারা করবে ওকে ছুড়ে দিতে। কথাবার্তা খুব বলে না এখনও, যেটুকু বলে তাও দুর্বোধ্য। শর্মিষ্ঠা ছাড়া আর কেউ বোঝে বলে মনে হয় না, নন্দিতাও বোধ হয় কিছুটা বোঝে।

টুকুনের কথাই ভাবতে ভাবতে ওপরে উঠে আসছে। কেউ কোথাও নেই। এদিক-ওদিক তাকাল শর্মিষ্ঠার খোঁজে।

সেকেণ্ড কয়েক বোধহয় চুপ করে দাঁড়িয়েই ছিল, এমন সময় বুনো বেরিয়ে এল লাইব্রেরী ঘর থেকে। দরজার সামনে পিঠ টান করে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল।···শর্মিষ্ঠা তাহলে লাইব্রেরীতে নিশ্চয়।

এগোবার আগেই বুনো দেখতে পেয়েছে তাকে। লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল মন্থরগতিতে। শুভজিৎ আদর করল তাকে।

লাইব্রেরী ঘরের খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ঘরের একধারে একটা মস্ত বড় আলমারির সামনে শর্মিষ্ঠা দাঁড়িয়ে। ঘাড় উঁচু করে দেখছে কি, ওপরের তাকের বইগুলোর নাম পড়তে চেষ্টা করছে বোধ হয়···অথবা শুধুই তাকিয়ে আছে। অন্যমনে কিছু ভাবছিল বোধ হয়···মাথাটা মৃদু সঞ্চালিত করে হয়তো কোন সিদ্ধান্ত করল নিজের মনে।

শুভজিৎ সাড়া দেয়নি, দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

শর্মিষ্ঠার পরনে ঘরোয়া শাড়ী, পরিবেশটাও নিতান্তই গন্ধময়। চারদিকে বইয়ের আলমারি, তারই মাঝে দাঁড়িয়ে আছে অন্যমনস্ক ভাবে—মুখের ওপর ষাট পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্বের আলো এসে পড়েছে।

অভিনবত্ব কোথাও কিছু নেই।

তবু অভিনব রূপে শর্মিষ্ঠাকে দেখছে শুভজিৎ।

ওকে কি চেনে সে?···ওকেই কি সে কামনা করেছে প্রিয়ারূপে··· বধূরূপে?

চেনা শর্মিষ্ঠার সংগে সব মিলের মধ্যে কোথায় যেন মস্ত একটা অমিল ধরা পড়েছে আজ।

কিসের অমিল বোঝা যায় না।···কেন লাগছে এমন? ষাট পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্বের আলোয় শুভজিৎ কি কোনদিন দেখেনি শর্মিষ্ঠাকে?···
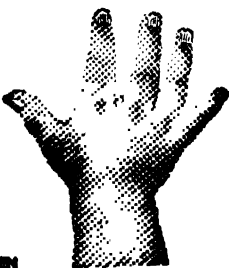
শর্মিষ্ঠা ফিরে তাকাল। টের পেয়ে তাকায়নি বোধ হয়, এমনই ফিরতে গিয়ে নজরে পড়ে থাকবে। অথবা যে অনুভূতি নিয়ে পিছনে কেউ এসে দাঁড়ালে পিছন ফিরে না চেয়েও বোঝা যায়, কিংবা কেউ একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে টের পাওয়া যায় চোখ তুলে না তাকিয়েও, তারই প্রভাবে।

অন্যমনস্ক ভাবটা তিরোহিত মুহূর্তেই। হেসে অভ্যর্থনা করল।

ঘরে পা দিয়েই শুভজিৎ বলল, "তোমার সংগে দরকারী কথা আছে।"

গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে শর্মিষ্ঠা সকৌতুকে হাসল, "উন্নতি হয়েছে দেখছি। দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিতে হল না, প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট পুড়ল না···বেশ সহজেই ঘোষণা করতে পারলে সংবাদটা! "বোস, চা খাবে?"

—"না, বোস এখানে।" একধারে জানলার কাছে একটা ছোট টেবিলের চার পাশে গোটাকতক চেয়ার সাজানো। তারই একটায় বসে শর্মিষ্ঠার জন্য আর একটা চেয়ার নির্দেশ করে দিল।

শর্মিষ্ঠা বসল, একটু বিস্মিত, "মোষ্ট সিরিয়াস দেখছি, চায়ে পর্য্যন্ত বীতরাগ! আমি তো ভাবছিলাম ফ্ল্যাট দেখতে নিয়ে যাবে বুঝি, বা ডাঃ ব্যানার্জির সংগে আলাপ করিয়ে দিতে।···যাব যাব করে আজ অবধি তো যাওয়া হ'ল না।"

শুভজিৎ পূর্ণ চোখে শর্মিষ্ঠার মুখের দিকে তাকাল। ডাঃ ব্যানার্জির কাছে নিয়ে যাবার কথাটা অন্তর অবধি পৌঁছয়নি বলেই মনে হয়, ভাবছে নিজের অজ্ঞাতেই শর্মিষ্ঠা তাকে ফ্ল্যাট দেখতে নিয়ে যাবার কথা মনে করিয়ে দিল।···এই মুহূর্তে আর এখানে আসবার কারণটা মনেও ছিল না!

···চিন্তাস্রোত ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করেছে।···আলোড়িত মন।···

সোজাসুজি নিজের বক্তব্য শুরু করল, "সেদিন হোটেলে আমায় ফ্ল্যাট খুঁজতে বলার আগে ভেবে দেখেছিলে ভাল করে?"

—"নিশ্চয়ই।"

—"মন খারাপ হবে না এ বাড়ী ছেড়ে যেতে?"

শর্মিষ্ঠা হাসতে লাগল, "তুমি সহজ মনে অকারণেই আসতে পার, কোন দরকারী ছুতোর দরকার নেই। আমি হাসব না কথা দিচ্ছি।"

শুভজিৎও হাসল, গম্ভীর হল পরক্ষণেই, "না ঠাট্টা নয়, বল।"

—"সেদিন তো জিগেস করনি, হোটেলে?"

শুভজিৎ চুপ করে রইল একটু, "করিনি, সেটা অন্যায়! অবচেতন মন নিশ্চয়ই উত্তরটাকে ভয় পেয়েছিল, প্রশ্নটাকে সামনে আনতে দেয়নি তাই।"

—"আর আজ?"

—"আজ চেতন মনটাকে সবল করেছি।"

—"ভালো।" একটু থেমে সহজ ভংগীতে মাথা দোলালো শর্মিষ্ঠা, "তা মন খারাপ হবে বৈকি।"

—"সেটা জানা কথা, তুমি অস্বীকার করলেও বিশ্বাস করত না কেউ। তা হলে ফ্ল্যাটের কথা বললে কেন? কোন আলোচনা অবধি না করে আমার মতটাই বা মেনে নিলে কেন চোখ বুজে?"

শর্মিষ্ঠার ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির ছোঁয়া লাগল, "আত্মসমর্পণ প্রবৃত্তিটা মেয়েদের সহজাত জান না।"

শর্মিষ্ঠার মুখের হাসিটুকু শুভজিৎ স্থির চোখে দেখল তাকিয়ে, "সেই প্রবৃত্তির তাগিদে কাজ কর তুমি এমন কথা ইন্দুভূষণ মৈত্র থেকে ভুবন অবধি কেউ বলবে না। হঠাৎ আমার বেলা সেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল কেন?"

—"অত 'কেন'র উত্তর আমি ভেবে রাখিনি···উঠল—উঠল।··· এমনও তো হতে পারে ব্যক্তি বিশেষের ওপর নির্ভরতা এল, তাই।" নিরাসক্ত মুখে শর্মিষ্ঠা বাইরের দিকে তাকাল।

নিরুত্তরে শুভজিৎ বসে রইল খানিক।

উঠে উত্তেজিত ভাবে সারা ঘরখানা বার দুই পায়চারি করে সামনে এসে দাঁড়াল আবার, "অত নির্ভরতায় আমার লোভ নেই শর্মি···আর ওটা তোমায় মানায় না মোটেই।···তুমি হেসে সবার সংগে ফ্ল্যাট দেখতে যাবে, আর সন্ধ্যেবেলা লাইব্রেরী ঘরে দাঁড়িয়ে ভাববে এত বড় বড় আলমারি ভর্তি বই এখানে ফেলে রাখতে হবে, বসবার ঘরে দাঁড়িয়ে ভাব নিশ্চয় কোন্ কোন্ জিনিষ নিয়ে যাবে সংগে, নিজের ঘরে শুয়ে কি যে ভাব তা তুমিই জান!···আমায় কিন্তু কেউ অনুরোধ করলেও নিজের বাড়ী ছেড়ে যেতাম না!"

শর্মিষ্ঠা বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিল।

বলল, "না হয় একটা বাড়ীই ভাড়া নাও, সব কিছু নিয়ে গিয়ে তুলি। কিন্তু এখানেও তো যেমন আছে সব থাকবে, অসুবিধে কি? আসব, দেখব, পরিষ্কার করাবো"—

সমর্থনের ভংগীতে মাথা নাড়ল শুভজিৎ, "আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবব"—অস্থির পায়ে সারা ঘরটা ঘুরে এল আর একবার।

নীরবে শর্মিষ্ঠাকে দেখল একটুক্ষণ।

—"ঠিক আছে, তুমি যেখানে খুসী থাকতে পার, আমি এখানেই থাকব।"

শর্মিষ্ঠা সবিস্ময়ে তাকিয়েছিল শুভজিতের দিকে। তার বক্তব্য শেষ হয়ে যাবার পরেও। স্বভাবটা মিলিয়ে দেখছিল বোধহয় মনে মনে।···কোন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে সেইমত কাজ শুরু করে দিতে বিশেষ সময় লাগে না তার, ভাবনা চিন্তার তোয়াক্কা রাখে না।

নিজের পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসে পড়েছে আবার। সামনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে।

···আকাশে ক'দিন মেঘের লেশমাত্র নেই।

···গাঢ় নীল আকাশে আজ জ্যোৎস্নার প্লাবন।

উত্তেজনা প্রশমিত।

ঘাড় ফিরিয়ে শর্মিষ্ঠার দিকে তাকাল।

···তার চোখ দুটো হাসছে।···

সে হাসিতে ছায়া ফেলেছে ঐ নীলাকাশের চাঁদের আলো।

সমাপ্ত

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বই

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র

আলোচ্য গ্রন্থটি গবেষণামূলক, 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' নামটিই গবেষণার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এক পরিচ্ছন্ন ধারণা বিকাশী। শ্রীকান্ত চরিত্রসৃষ্টি করতে গিয়ে লেখক শরৎচন্দ্র অনেক সময়ই তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন এই একাত্মতাকেই নিপুণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক, লেখক শরৎচন্দ্র ও ব্যক্তি শরৎচন্দ্র এই দ্বিবিধ সত্তারই পূর্ণ পরিচয়ে প্রোজ্জ্বল তাঁর রচনা। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের মাধ্যমে এমন একটি ভাব জগতের দুয়ার তিনি খুলে ধরেছেন বাঙ্গালী পাঠকের সামনে যা এতদিন অনাবিষ্কৃতই ছিল। 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র'কে বুঝতে গিয়ে বোদ্ধা পাঠক যেন এই মহান ঔপন্যাসিকের সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হন। গবেষণা পুস্তকের ভাণ্ডারে আলোচ্য গ্রন্থখানি এক উল্লেখ্য সংযোজন। গ্রন্থটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—মোহিতলাল মজুমদার প্রকাশক—বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিঃ, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ মূল্য—দশ টাকা।

শতাব্দীর শত কবিতা

বলা বাহুল্য গল্প-উপন্যাসের মত কবিতার চাহিদা নেই, সাহিত্যের বাজারে প্রথমোক্ত দুটি বস্তু লেখক ও প্রকাশককে যে পরিমাণ বস্তু তান্ত্রিক সাফল্য এনে দিতে পারে কবিতার সে ক্ষমতা নেই, আর সেজন্যই কাব্যগ্রন্থের রচনা ও প্রকাশ করেন যাঁরা তাঁদের একটি বিশেষ সাধুবাদ প্রাপ্য থেকে যায়। আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্য সংকলন, শত বৎসরাবধি যে কাব্যধারার বিকাশ ঘটে আসছে তারই একটা সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায় এতে। সৌন্দর্যবোধ ও উপলব্ধির গভীরতায় নিহিত রয়েছে প্রকৃত কাব্যের নিশানা, বর্তমান সংকলনের রচয়িতা সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন বলেই আলোচ্য কাব্য সংকলনটি সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠতে পেরেছে। কাব্য প্রিয় পাঠক সংকলনটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলেই আমরা আশা করি। বইটির আঙ্গিকেও কোন ত্রুটি নেই। সম্পাদনা—সমরেন্দ্র ঘোষাল প্রকাশক—মণ্ডল বুক হাউস ৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা—৯মূল্য—পাঁচ টাকা।

তিন প্রহর

প্রখ্যাত কথাশিল্পীর অধুনাতম রচনাটি হাতে নিয়ে অনেকেই খুসী হয়ে উঠবেন। ঐশ্বর্য্য বিলাসের পাপচক্রে শৃঙ্খলিত এক মানবাত্মার করুণ আকুতিই বর্তমান রচনার মূল বক্তব্য, নায়ক জীবনের স্তরে স্তরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল তা তিক্ত হলেও সত্য, পূর্বপুরুষের পাপের ঋণ থেকে নিষ্কৃতি পেলো না সে, জীবনের শেষ পর্যায়ে সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়েই পথে নামল, আর তখনই হল তার মুক্তি, জীবনের পরম পাওয়া অনাবিল শান্তি শুধু তখনই ধরা দিল তার কাছে, প্রশান্তিতে ছেয়ে গেল তার অন্তর, করজোড়ে ভাগ্য বিধাতাকে প্রণাম জানালো সে। শক্তিমান লেখকের রচনা ভঙ্গী সবলে আকর্ষণ করে রাখে পাঠকমনকে, কোথাও এতটুকু ক্লান্তিকর ঠেকে না। রচনাটি পাঠক সমাজে আদৃত হবে বলেই আমরা আশা রাখি। প্রচ্ছদ ও অপরাপর আঙ্গিক যথাযথ। লেখক—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশক—গ্রন্থ প্রকাশ ৫-১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। মূল্য—তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

এলেম নতুন দেশে

স্বর্গত সাহিত্যিকের এই রচনাটি নানা কারণেই উল্লেখ্য, বিষয়বস্তু খুব মৌলিক না হলেও জনপ্রিয়তায় চিহ্নিত হওয়ার মতই যে একথা খুব সহজেই বলা চলে। ধনী সন্তানের আদর্শবাদী প্রকৃতি তাকে প্রেরণা দিল ছদ্মবেশে নীচের তলা অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে আর সেখানেই পেল সে শুধু জীবনেরই নয়, জীবনসঙ্গিনীরও পরিচয়। নিম্নমধ্যবিত্ত কন্যা অঞ্জনাই পেল তার গলায় মালা দেওয়ার অধিকার। খুব একটা কিছু গভীরতার পরিচায়ক না হলেও বলবার গুণেই গল্পটি তরতর করে এগিয়ে যায়, লেখকের আদর্শবাদও যে আন্তরিক, সেটুকুও বোঝা যায়। হাল্কা সুরে লেখা রচনাটি পড়তে পাঠক ক্লান্তিবোধ করেন না কোথাও, আর এটুকুই এ রচনার পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা। ছাপা বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। লেখক—জ্যোতির্ময় রায়, প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাঃ লিমিটেড, কলিকাতা-১২। মূল্য—দুই টাকা।

বাহাদুর শার সমাধি

সাহিত্যের আসরে বর্তমান গ্রন্থের লেখক আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। আলোচ্য গ্রন্থখানির পটভূমি সুন্দর ব্রহ্মদেশ, কিন্তু এর নায়ক-নায়িকা আমাদের কাছের মানুষ, যে সহজ মানবিক আবেদন বর্তমান লেখকের রচনার মূল বৈশিষ্ট্য এই রচনাও আগাগোড়া তারই দ্বারা অনুপ্রাণিত। মোগল সাম্রাজ্যের শেষ অধীশ্বর বাহাদুর শাকে অতি কৌশলে পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে লেখক সাবলীল ভঙ্গীতে তাঁর কাহিনীর জাল বুনে গেছেন। নরনারীর স্বাভাবিক মন দেওয়া নেওয়াই কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য, জীবনকে তিনি দেখেন অতি স্বচ্ছন্দ দৃষ্টিকোণ থেকে আর সেজন্যই তাঁর রচনা কোন ইজম্ প্রচারের বাহক না হয়ে সহজেই পাঠকের মনে ঘা দিতে পারে। চরিত্র সৃষ্টিতেও তাঁর নৈপুণ্য লক্ষণীয় তাই তাঁর প্রত্যেকটি চরিত্রই সম্পূর্ণ মহিমায় আত্ম-উদ্ঘাটন করে। উপন্যাসটিকে হৃদয়গ্রাহী বললে বড় বেশী বলা হয় না, আমরা এর সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ অতি মনোরম, অপরাপর আঙ্গিক যথাযথ! লেখক—বারীন্দ্রনাথ দাশ, প্রকাশক—সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড। ১ রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—পাঁচ টাকা।

বাতাসী বিবি

অজিতকৃষ্ণ বসু 'অকুব' নামে যে খ্যাতি অর্জন করেছেন তা তাঁর পাগলা গারদের কবিতা এবং তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ রচনার জন্য। কিন্তু তাঁর কয়েকখানি উপন্যাসও আছে! প্রজ্ঞাপারমিতা, শকুন্তলা স্যানাটোরিয়াম, শানাই প্রভৃতি উপন্যাসের পরে তাঁর বর্তমান উপন্যাসখানি সম্পর্কে স্বভাবতঃই পাঠকের মনে কৌতূহল জাগ্রত হয়। বিশেষ করে এই উপন্যাসখানির নাম, অঙ্গসজ্জা এবং প্রথম পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্তসারটুকু পাঠককে নিঃসন্দেহে সচেতন করে তোলে। বাতাসী বিবি এক স্বাধীন জেনানা, রূপের জৌলুসে, বুদ্ধির প্রাচুর্যে এবং শারীরিক শক্তিতে সে অতুলনীয়া। সমাজবিরোধী কারবারে লিপ্ত এক গুপ্ত সমিতির সে সর্বাধিনায়িকা। এই বাতাসী বিবির জীবনের সকল সাফল্য, সকল প্রাচুর্যের মধ্যেও যে বুভুক্ষু নারী হৃদয় ছিল তারই সুমুখে পড়ল তার কোচোয়ানের কচি ছেলে—সুলতান। সুলতানকে বাতাসী বলেছিল অনেক কথা, যে কথা বলেনি তার ইঙ্গিতগুলি আরও আকর্ষণীয়। বাতাসী বিবির আখ্যায়িকা যে বৃহৎ পটভূমিকার উপর অঙ্কিত সে তুলনায় কাহিনী কিছু ক্ষীণকায় মনে হয়, কিন্তু যেটুকু আছে তাই যেন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'স্বর্ণমুষ্টি'। পাঠককে অনেক অতৃপ্তির মধ্যে এনে ফেলে বলেই যেন আরও বেশী করে নাড়া দেয়। এই কাহিনীতে 'অকুব' বাংলা উপন্যাসে যাদুকরের জীবন বোধ হয় সর্বপ্রথম প্রবর্তন করলেন। সার্কাসও তিনিই এনেছিলেন বাংলা উপন্যাসে। নিত্য নতুন নতুন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা ও নতুনভাবে নতুন দৃষ্টিতে সনাতন বস্তুকে দেখার মধ্যেই 'অকুব'র সার্থক শিল্পী পরিচয়। আকৃতিতে নাতিবৃহৎ হলেও বাতাসী বিবি তাই সর্বশ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন করতে পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। অজিতকৃষ্ণ বসু, প্রকাশক—রূপা, কলিকাতা—১২। মূল্য—চার টাকা।

জলভ্রমি

আলোচ্য বইখানি একটি ছোট গল্প সংকলন। মোট নয়টি গল্প সংগৃহীত হয়েছে এতে, যার প্রায় সবগুলিই সুপাঠ্য। লেখকের বাস্তববোধ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়ে এই রচনাকটি সমুজ্জ্বল, সামান্য বিষয়বস্তুকেও আপন শক্তিতে তিনি অসামান্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। 'মহিলা ইনচার্জ' 'দাম্পত্য সীমান্তে' 'দুই অপরাধী' প্রমুখ গল্পগুলি মনে রীতিমত নাড়া দিয়ে যায়। ছোট গল্পের আঙ্গিক সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান সত্যই বিস্ময়কর, তাঁর পরিমিতি বোধও প্রশংসনীয় আর এজন্যই গল্পগুলি প্রকৃত ছোট গল্পের প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে। লেখকের ভাষারীতি সহজ ও সাবলীল। বইটির আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন। লেখক—সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য—তিন টাকা

ঘরে চলো

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্তা সম্বন্ধে একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। জীবনের সব ফেনিল উচ্ছ্বাস, তরঙ্গভঙ্গের অন্তরালে প্রাণসত্তা যখন চাপা পড়ে তখনই ধ্বনিত হয় তার কানে এক আকুল আহ্বান "ঘরে চলো" অর্থাৎ নিজেকে চেনো জাগো, এই আহ্বানই মানুষের—প্রাণে তার অন্তরাত্মার সর্বোত্তম আবেদন, স্বধর্মচ্যুত মানবাত্মাকে জাগাবার সর্বোত্তম পন্থা, "ঘরে চলো" অর্থাৎ আত্মস্থ হও নিজেকে উপলব্ধি কর, সাধক লেখক অতি সাবলীল ভাবায় এই আহ্বানকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক মনে যা বিশেষ স্বাক্ষর রেখে দেয়। বইটির আঙ্গিক বিষয়োচিত। লেখক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ—প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির, আলমোড়া, পরিবেশক – মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

বাংলা শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে তথ্যনিষ্ঠ গবেষণা গ্রন্থের অভাব আছে আর সেজন্যই আলোচ্য গ্রন্থটির আবির্ভাব নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য। অত্যন্ত শ্রমের সঙ্গে লেখিকা বর্তমান পুস্তকটিকে যথার্থরূপেই প্রামাণ্য করে তুলেছেন, বাংলা শিশু সাহিত্যের সূচনা তার ক্রমবিকাশ ও তার বর্তমান পরিণতি সবই বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে শিশু সাহিত্যের সূচনা তার মূল পর্য্যন্ত লেখিকা পাঠকের সামনে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, ইউরোপের প্রভাবই যে তার গোড়াকার কথ, নানা তথ্য প্রমাণাদির সাহায্যে সেটাও সপ্রমাণিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শিশু সাহিত্যের এক প্রামাণ্য ইতিহাসরূপেই বর্তমান গ্রন্থটিকে উল্লেখ করা যায়। বাংলা শিশু সাহিত্যের পুরোধাগণের এক ধারাবাহিক পরিচয়ও এতে পাওয়া যায় এবং এই প্রসঙ্গে আরও অনেকের নাম দেখা যায় শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাদের অমূল্য অবদান থাকা সত্ত্বেও বিস্মৃতির অন্ধকারে যাঁরা আজ বিলুপ্ত প্রায়। এঁদের পাঠক মানসের সামনে টেনে এনে লেখিকা নিঃসন্দেহে এক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করেছেন। গবেষণা গ্রন্থের ভাণ্ডারে বর্তমান পুস্তকটিকে এক মূল্যবান ও উল্লেখ্য সংযোজন। লেখিকা—আশা দেবী, এম, এ, ডি-ফিল, প্রকাশক—ডি, এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ মূল্য—আট টাকা।

দোটানা

আলোচ্য উপন্যাসটি দিলীপকুমারের পূর্বতম রচনার অধুনাতম সংস্করণ। দিলীপকুমারের রচনার যা প্রধান বৈশিষ্ট্য সেই মনোধর্মী বিশ্লেষণে রচনাটি সমুজ্জ্বল, মানুষের মন যে কত বড় বৈচিত্র্যের বাহক এই সত্যই এর ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুটিত। নায়ক প্রদীপ একই সঙ্গে ভালবাসে দুটি নারীকে, এই ভালবাসা দেহজ কামনা মাত্র নয়, অন্তরের পূর্ণ স্বাক্ষরেই উদ্ভাসিত, নিজের বহুবল্লভ প্রকৃতি বিস্ময় জাগায় তার নিজের মনেও অথচ সত্যনিষ্ঠ সন্ধানে নিজেকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এ সত্য স্বীকার করে নেয় সে। আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়ে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বে কত বিক্ষত হয়ে পড়ে সে তবু সত্যকে অস্বীকার করার প্রবৃত্তি হয় না তার। নায়কের মানসিক দোটানার সংঘাতময় ইতিহাস নিপুণভাবেই পরিবেশন করেছেন লেখক। দিলীপকুমারের রোমাণ্টিক শৈলী রচনাটির অন্যতম সম্পদ, তাঁর ভাষারীতি শুধু সমৃদ্ধই নয় মোহ বিস্তারীও! বইটি রসজ্ঞ পাঠককে পরিতৃপ্ত করার দাবী রাখে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ লেখক—দিলীপকুমার রায়। প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯, মূল্য—তিন টাকা।

Gertrude Stein

ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটা, মডার্ণ আমেরিকান লেখক সমূহের পরিচিতিমূলক যে পুস্তিকা প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আলোচ্য পুস্তিকাটি তারই অন্যতম। গার্ট্রুড ষ্টেইন তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে সাহিত্যে যে স্বাক্ষর দিয়েছেন তার প্রায় সমস্ত দিকই এই সংক্ষিপ্ত রচনায় আলোচিত হয়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও সাহিত্য মানসকেও চুলচেরা বিশ্লেষণে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে। বিশ্ব-সাহিত্যে অনুরাগী পাঠকমাত্রেরই কাছে তাই এ ধরণের রচনা সমাদৃত হওয়ার যোগ্য। এই অনুবাদ পুস্তিকাটিকে সেই কারণেই মূল্যবান বলা চলে। Gertrude Stein by Frederick J. Hoffman University of Minnesota Press. Minneapolis, Price 65 cents.

কিশোর-কাহিনী

আলোচ্য বইখানির লেখক শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, বর্তমান রচনা তাঁর সে খ্যাতিকে সমৃদ্ধতর করবে। আমাদের পুরাণের বিখ্যাত পাঁচটি কাহিনী সুন্দর ও সহজ ভাষায় মনোরম ভঙ্গীতে তিনি পরিবেশন করেছেন যার নায়কবৃন্দও শিশু বা বালক। কাহিনীগুলির মাধ্যমে আমাদের কিশোর পাঠক সমাজ শুধু যে প্রমোদিতই হবে তা নয় এদের আদর্শমূলক প্রভাব তাদের কোমল চিত্তে কল্যাণের, সুন্দরের, সত্যের একটা সুদূর প্রসারী ছাপ ও মেরে দেবে আর সেটাই এই রচনার প্রকৃত পরিচয়। শিশু-সাহিত্যের আসরে এ ধরণের রচনা সর্বতোভাবেই সমাদৃত হওয়ার যোগ্য। লেখক—শৈলেন্দ্র বিশ্বাস। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ. ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

The Fundamentals of Vedanta Philosophy.

প্রগাঢ় জ্ঞান আর অনন্যসাধারণ চিন্তাশক্তির এক অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে যে বিদগ্ধ পুরুষদের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী তাদেরই একজন। বেদান্তদর্শনের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ইংরাজী ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থখানি তাঁর ক্ষুরধার পাণ্ডিত্যের এক অসামান্য নিদর্শন। গ্রন্থখানি স্বামীজীর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বারোটি বক্তৃতার গ্রন্থরূপ। বেদান্তদর্শনের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থে যথেষ্ট সারবান আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। স্বামীজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় বেদান্তদর্শনের মূলসূত্রটি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। তাঁর সহজ ব্যাখ্যায় এবং প্রাঞ্জল বিশ্লেষণে অতীব দুরূহ তত্ত্বগুলি সাধারণের কাছে সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত বেদান্তদর্শনের বিভিন্ন দিকগুলিও যথাযথ আলোচিত হয়েছে। স্বামীজীর রচনায় বেদান্তদর্শনের বিরাটত্ব গভীরতা ও ব্যাপকতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটি নানা ভাবে তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করছে এবং গ্রন্থটি প্রণয়নে যে অসাধারণ শ্রম ও অধ্যবসায় ব্যয়িত হয়েছে—তা পরিপূর্ণ সফলতার মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে। এই যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রন্থটি পণ্ডিত সমাজে তার প্রাপ্য আসন লাভ করবে এ বিশ্বাস আমরা পোষণ করি। লেখক—Swami Pratyagatmananda Saraswati, Published by Ganesh & Co. (Madras) Private Limited, Madras 17. Price Rs. 15·00 only.

চীনের সিংহ-নৃত্য

চীনের সব চেয়ে বেশি জনপ্রিয় লোকনৃত্যগুলির অন্যতম হচ্ছে সিংহ-নৃত্য—আজ হাজার বছরের বেশি দিন ধরে এ জনপ্রিয়তা ভোগ করছে সিংহ-নৃত্য। বসন্ত উৎসব ও অপরাপর উৎসব-অবকাশ আয়োজনকে আনন্দমুখর করে তুলতে সহায়তা করে সিংহ-নৃত্য; করে তার দেহগত বলিষ্ঠতা ও সাবলীলতা দিয়ে, তার কৌতুক রসের জারক দিয়ে। চীনের নৃত্যকুশলীরা সম্প্রতি সিংহ-নৃত্যকে নতুন রূপ দিয়েছেন, নতুন ভাবে তার বিন্যাস বিধান করেছেন, তার উৎকর্ষ বিধান করেছেন।

স্থানভেদে যেমন আচার আচরণ, রীতিনীতি বদলায়, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলের সিংহ-নৃত্যেরও নিজস্ব বিশিষ্টতা দেখা যায়। সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিংহ-দেহগুলি তৈরি হয় কাপড় দিয়ে—শুধু একজন মাত্র লোক থাকেন; তিনি নৃত্য করেন। তাঁর মুখ্য কাজ হচ্ছে সুকৌশলে সিংহের মাথাটি দোলানো, বিভিন্ন ভংগীতে তাকে নাড়ানো। কিন্তু একই সিংহের অঙ্গ হিসেবে যখন দুজন নৃত্যশিল্পীকে অভিনয় করতে হয়, নৃত্য করতে হয় তখন প্রয়োজন হয় সংগতিবিশিষ্ট নৃত্য-গতি, নৃত্য-অনুষ্ঠান ক্রিয়া। একজন শিল্পী নাচেন সিংহ-দেহের সম্মুখ-অংগ হিসেবে, অন্যজনের নৃত্য পশ্চাদ্ভাগ হিসেবে। এককশিল্পী-সিংহের নৃত্য-অনুষ্ঠানের কলানৈপুণ্য সঞ্জাত ভাবগুণের থেকে যুগ্মশিল্পী-সিংহের নৃত্যনৈপুণ্য ও তার ভাবগুণ অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও আবেগ ব্যঞ্জনাময়। লম্ফ ঝম্প তো করেই; হুনান প্রদেশের সিংহগুলি কিন্তু আবার জিব দিয়ে কেশর লেহন করে, থাবা দিয়ে গায়ের চামড়া আঁচড়ায়, মাটিতে গড়াগড়িও দেয়। কুয়াংতুং প্রদেশের সিংহগুলি আবার উঁচু মই বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে যেতে পারে, এক টেবিল থেকে লাফিয়ে অন্য টেবিলে যেতে পারে, এমন কি "সাঁকো"ও পার হতে পারে। ইয়াংসি নদীর উত্তর তীরের সিংহগুলি কিন্তু "চুয়ান ওসোংসে" নৃত্যকৌশলও দেখায়। এ নৃত্য কৌশলে পাঁচটি টেবিল সাজিয়ে রাখা হয়—একটির উপরে একটি। আর সেই পাঁচতলা টেবিল বেয়ে উপরে উঠে যায় এ অঞ্চলের সিংহগুলি। হোনান প্রদেশের সিংহ-নৃত্যে পাঁচটি সিংহ থাকে—একটি সিংহী আর চারটি তার শাবক। ক্রীড়াচ্ছলে তিড়িং তিড়িং নৃত্য করে সিংহী-মা আর প্রাণচঞ্চল তার চারটি শিশু। আর পিকিং-সিংহ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে ডিগবাজিখাওয়া ও পিছলে পড়ার কলাকৌশল প্রদর্শনে।

সিংহ-নৃত্যে প্রায়শই একটি "সিংহ সর্দার" থাকেন। নৃত্যআসরে উপস্থিত থাকেন তিনি একটি রঙীন গোলোক হাতে নিয়ে, সিংহদের সংগেই থাকেন। কোথাও কোথাও "সিংহ সর্দার" কিন্তু মুখোস পরেন। তবে হোপেই প্রদেশের পাওতিং অঞ্চলের "সিংহ সর্দার" মুখোস না পরে কৃষকের সাজ নিয়ে আসরে আসেন। হাতের রঙীন গোলোকটি ঘুরিয়ে সিংহদের তিনি উত্তেজিত ও প্রলুব্ধ করে তোলেন—বহুভংগীতে নাচে সিংহগুলি।

চীনের সিংহ-নৃত্যের সংগে বাজে বিরাট ডঙ্কা আর বড় বড় গং-ঘণ্টা; সিংহের প্রকৃতির সংগে এই বাদ্যই খাপ খায়। এ বাদ্যঝঙ্কারে সারাটি পরিবেশকে প্রাণবন্ত ও উল্লাসমুখর করে তোলে। গং-ঘণ্টা আর ডঙ্কার তালে তালে মিশে যায়, অপরূপভাবে মিলে যায় "সিংহ সর্দারের" অভিনয়-আচরণ এবং সিংহদের সাবলীল নৃত্যের গতি ও ভংগী; বলিষ্ঠ প্রাণরসধারায় দৃপ্ত ও দীপ্ত হয়ে ওঠে সিংহ-নৃত্য।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

চার

॥ খ ॥

টালীর নালা যেখানে এসে বড় গঙ্গার মুখে মিশেছে সুন্দরম সেইখানেই তার নৌকা নোঙর ফেলল।

এমামুল্লা শুধায়, এইখানেই কি রাত্রে নাও থাকবে সাহেব ?

হ্যাঁ, আপাতত এইখানেই থাকবো আমরা। সুন্দরম্ জবাব দেয়।

এমামুল্লা আর সুন্দরমকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করে না। সে ভারী নোঙর জলে নামিয়ে দিয়ে ভাল করে নৌকা বেঁধে ফেলল।

ইতিমধ্যে চারিদিকে ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার চাপ বেঁধে উঠেছে। গঙ্গায় জোয়ার আসতে আর বেশি দেরি নেই। একটু পরেই হয়তো জোয়ার আসবে। মাল্লারা চুল্লী জ্বালিয়ে রাত্রির রন্ধনের জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকে।

সুন্দরম এসে নৌকার কামরার মধ্যে প্রবেশ করল।

কামরার মধ্যে ইতিমধ্যে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল মাল্লারা। ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটা দুলছে সেই সঙ্গে বাতিটাও দুলছে মৃদু মৃদু।

দড়ির পালঙ্কে শয্যায় শায়িতা মৃন্ময়ী। শায়িতা মৃন্ময়ীর চোখে মুখে ও দেহে আলো পড়েছে। সুন্দরমের পদশব্দে মৃন্ময়ী চোখ মেলে তাকাল।

রুগ্না শীর্ণা মৃন্ময়ী। বাসি ফুলের মতই যেন মৃন্ময়ীর ক্ষুদ্র কুসুমবৎ মুখখানি শুকিয়ে ছোট হ'য়ে গিয়েছে। মাথার তৈলহীন রুক্ষ কেশরাশি উপাধানের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে! একটা হাত ও একটা পা অবশ—নাড়াচাড়া করতে পারে না। কথাও জড়ানো অস্পষ্ট। কথা অবিশ্যি বলেই না মৃন্ময়ী একপ্রকার।

সুন্দরম এসে মৃন্ময়ীর শয্যার শিয়রের ধারে রক্ষিত চৌকিটার উপর বসলো। মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকায় সুন্দরম। তারপর একসময় ডান হাতটা তার ধীরে ধীরে মৃন্ময়ীর মাথার রুক্ষ কেশের 'পরে রাখে।

মৃন্ময়ী যেমন নিঃশব্দে তাকিয়েছিল, তেমনি করেই তাকিয়ে থাকে সুন্দরমের মুখের দিকে। সুন্দরম নিঃশব্দে তার মোটা মোটা রুক্ষ আঙুলগুলো চালাতে থাকে মৃন্ময়ীর রুক্ষ কেশের মধ্যে। মৃন্ময়ীর কেশ বিলি করতে করতে অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে যায় সুন্দরমের।

একবার রাত্রে মাঝ দরিয়ায় ঝড়ের মুখে পড়ে সে দিগভ্রান্ত হয়েছিল।

দুর্যোগ কেটে গিয়ে যখন প্রসন্ন আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো, দেখলে কোথাও তীরের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

শুধু দিগন্তবিস্তৃত নীলাম্বুরাশি। দুর্যোগ থামলেও হাওয়ার প্রকোপে আথালি-পাথালি করছে। শুধু জল, জল আর জল।

সুদূর জাভা থেকে নাও নিয়ে ফিরে আসছিল সুন্দরম বাংলা দেশে। দিগভ্রান্ত হ'য়ে নাও নিয়ে অথৈ সমুদ্রের মধ্যে দশ-পনের দিন ঘুরতে ঘুরতে সঙ্গে যা সঞ্চিত খাদ্যসামগ্রী ছিল সব তখন নিঃশেষ।

মাঝি মাল্লা নিয়ে গুনা পনের লোক। ক্ষুধার জ্বালায় সব ছটফট করছে। মাথার উপরে অগ্নিবর্ষী নীল আকাশ আর নীচে যতদূর দৃষ্টি চলে লোনা জলের চোখ-ধাঁধান নীল রূপ। চোখই ধাঁধায়—তৃষ্ণা মিটায় না।

সেই সময় সহসা এক ঝাঁক সাগরপাখী মাথার 'পরে উড়তে দেখে নৌকার পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে হাতের বন্দুক ছুঁড়েছিল।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহ, ঝাপসা দৃষ্টি তবু একটা পাখী গুলিবিদ্ধ হয়ে জলে এসে পড়ল। সাগরের নীল জলের খানিকটা সাগরপাখীর লাল শোণিতে রক্তাভ হয়ে ওঠে।

ঝুঁকে পড়ে জল থেকে তুলে নেয় পাখীটা সুন্দরম। দেহের কোথাও গুলি লাগেনি, লেগেছিল ডানায়। শাদা ধবধবে পাখার পালক রাঙা হয়ে উঠেছিল রক্তে। কি নরম—যেন একরাশ তুলোর মতই পাখীটা মনে হয় হাতের মধ্যে সুন্দরমের।

সুন্দরমের শক্ত কঠিন মুঠোর মধ্যে ধৃত পাখীটা তখন তার ছোট ছোট গোল গোল রক্তাভ দুটি বোবা চোখের দৃষ্টি দিয়ে যেমন করে চেয়েছিল সুন্দরমের মুখের দিকে, সুন্দরমের মনে হয় ঠিক তেমনি করেই যেন চেয়ে আছে মৃন্ময়ী নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে। সেদিনকার সেই আহত রক্তাক্ত অসহায় গুলিবিদ্ধ সাগর পাখীটার মতই যেন মৃন্ময়ী তার দিকে চেয়ে আছে বোবা দৃষ্টিতে।

সে যাত্রা পাখীটার মাংস দিয়ে দীর্ঘ দিনের ক্ষুন্নিবৃত্তি করবার প্রয়োজন হয়নি সুন্দরমের। কারণ অচিরাৎ অদূরেই সে সেদিন ডাঙ্গার দেখা পেয়েছিল। উত্তেজনার মধ্যে সে ভুলে গিয়েছিল নচেৎ তার জানা উচিত ছিল সাগর-পাখীরা তীর থেকে বেশী দূরে উড়ে যায় না। তীরভূমির কাছাকাছিই তারা সাগর-আকাশে উড়ে উড়ে বেড়ায়। তীরভূমি থেকে কখনো তারা বেশী দূর উড়ে যায় না।

শুধু তাই নয় আরো একটা কথা যেন অকস্মাৎ মনে হয় সুন্দরমের মৃন্ময়ীর চুলে আঙুল চালাতে চালাতেও তার মুখের দিকে অপলক

দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে। মৃন্ময়ী যেন তার কত আপনার। ঐ মৃন্ময়ীর জন্য বুঝি সে পৃথিবীর চরমতম দুঃখও বরণ করে নিতে পারে সানন্দে।

মৃন্ময়ী যেন তার আত্মার আত্মা। কিন্তু অমন করে নিশ্চল হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। মৃন্ময়ীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোন নিরাপদ, নিশ্চিন্ত স্থানে যত শীঘ্র সম্ভব সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

উঠে পড়ল সুন্দরম।

অরিন্দম সরকারের বাগান বাড়িটা পাওয়া যায় কিনা তাই একবার চেষ্টা করে দেখবে। অরিন্দম সরকার লোকটা ধনী হলেও অর্থের লেন-দেনের ব্যাপারে একটু কঠিন। তা হোক তবু সুন্দরমকে অরিন্দম সরকার যে ভয় করে তা জানত সুন্দরম। সুন্দরম কামরার ভিতর থেকে বের হয়ে এলো।

রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ প্রায়। কৃষ্ণপক্ষের রাত। কালো আকাশে হীরার কুচির মত এক রাশ তারা ঝিকমিক করছে। অন্ধকার বিচিত্র একটা শব্দ তুলে একটানা গঙ্গার জল স্রোত বয়ে চলেছে। গলুইয়ের এক পাশে পাটাতনের উপর চুল্লী জ্বলছে, তার উপরে হাঁড়িতে বোধ হয় ভাত ফুটছে। তারই গন্ধ বাতাসে। তারই সামনে বসে মাঝি এমানুল্লা অন্ধকারেই মশলা পিষছিল।

এমানুল্লা।

সাহেব। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় এমানুল্লা সসম্ভ্রমে।

আমি একটু ডাঙ্গায় যাচ্ছি। সাবধানে থেকো। ফিরতে হয়ত রাত হতে পারে।

খানা খাবেন না সাহেব।

না—দোকান থেকেই কিছু খেয়ে নেবো'খন।

এমানুল্লা আর কিছু বললো না।

কোমরে কটিবন্ধের মধ্যে গোঁজা গাদা-পিস্তলটা একবার হাত দিয়ে দেখে নিল সুন্দরম, তারপরই নৌকা থেকে পা বাড়িয়ে জলে নামল। প্রায় একহাঁটু জল। জায়গাটায় দু' একঘর জেলের বাস ছাড়া জন মানবের বড় একটা বসতি নেই। গঙ্গার ধারটা ঘন আগাছা আর কাঁটা-ঝোপে ভর্তি। অবিশ্যি তারই ধার দিয়ে দিয়ে জেলেদের একটা সরু পায়ে চলার পথ বরাবর বসতির দিকে চলে গিয়েছে।

এবং দিনের বেলা লোকজন হাঁটলেও সন্ধ্যার পর থেকে কেউ বড় একটা সে পথে হাঁটে না। সাপের ভয়ে রীতিমত বিপদসংকুল।

কিন্তু সুন্দরমের কোন দিনই ভয় ডর বলে কিছু নেই। তাছাড়া পায়ে তার সর্বদা চামড়ার ভারী বুট জুতো থাকে। নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্তেই সুন্দরম হন্ হন্ করে সেই পথ ধরে হেঁটে চলে।

অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।

তা হোক, মৃন্ময়ীর একটা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সুন্দরম সুস্থির হ'তে পারছে না।

কুমোরটুলীতে অরিন্দম সরকারের বাড়িতে এসে যখন পৌঁছাল সুন্দরম তখন বেশ রাত হয়েছে। দীর্ঘ পথ বেশ দ্রুতই একটানা

হেঁটে একটু যে পরিশ্রম হয় নি তার তা নয়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গিয়েছিল।

অরিন্দম সরকারের অর্থের ব্যাপারে যতই দুর্নাম থাক এবং চোরা কারবার করে প্রচুর অর্থাগম হলেও লোকটার দান ধ্যান ছিল।

বার বার দুইবার বিবাহ করেছিল অরিন্দম সরকার কিন্তু সন্তানাদি হয় নি একটিও। কিন্তু বাড়ি ভরতি ছিল আত্মীয় পরিজন। বহু আশ্রিত জন তার গৃহে থেকে ও খেয়ে কাজ কর্ম করতো ও পড়াশুনা করতো অনেক দুঃস্থ পরিবারের ছেলেরা।

সরকার বাড়িতে ঐ সব দুঃস্থ আশ্রিত পুরুষদের থাকবার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল বহির্মহলের একটা বড় অংশ। তাদেরই সেখানে ভিড় ছিল।

বহির্মহলেরই একটা অংশে ছিল অরিন্দম সরকারের গদি।

রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত চেতলার আড়ং থেকে ফিরে এসে অরিন্দম সরকার ঐ গদিতে বসতো এবং সেই সময়ই তার চলত চোরাই মালের বেচা কেনা।

চোরাই মালের ক্রেতা ও বিক্রেতারা ঐ সময়ই এসে গদিতে তার সঙ্গে বেচা কেনা করত।

বহির্মহলের পুব দিকে এক কোণে নিরিবিলিতে অপরিসর একখানি ঘর।

মাঝারী গোছের একটি তক্তাপোষের 'পরে ফরাস বিছান। ফরাসের' পরে বসে বেচা কেনা করতো অরিন্দম সরকার। সামনে থাকতো একটি টীনের ছোট পেটিকা, পেটিকা ভর্তি থাকত টাকা।

অরিন্দম সরকারের কাছে চোরাই কারবারের ব্যাপারটা ছিল নগদা নগদি।

সুন্দরম ব্যাপারটা জানত।

সকলের অবিশ্যি সে ঘরে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না। বন্ধ দরজায় একেবারে সামনেই বসে থাকত জগা হাড়ি।

জগার অনুমতি ব্যতীত গদি ঘরে কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। একটা গুলবাঘের মতই যেন থাবা পেতে দরজার গোড়ায় একটা জল-চৌকীর উপর বসে বসে পাহারা দিত জগা যতক্ষণ গদি ঘরে অরিন্দমের বেচা কেনা চলত।

জগার চেহারাটা সত্যিই একটা গুলবাঘের মতই ছিল। বেঁটে খাটো এবং অতীব পেশীবহুল ও বলিষ্ঠ মানুষটাকে ঘাড়ে গর্দানে একটা বীভৎস জানোয়ারের মতই মনে হতো হঠাৎ দূর থেকে দেখলে।

গোলাকার মুখখানি।

চ্যাপটা বসা নাক। খুদে খুদে চক্ষু। নির্লোম ভ্রূ। এবং কপাল ও মুখ ভর্তি ছোট ছোট আব, পুরু ওষ্ঠ—নোংরা হরিদ্রাভ আঁকা বাঁকা দাঁত। হঠাৎ দেখলে ভয় পাবারই কথা।

চেহারাটা যেমন ছিল জগার, দৈহিক আসুরিক শক্তিও ছিল তেমনি। তেমনি ছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতি। কোথা থেকে, কবে এবং কেমন করে যে ঐ মানুষটাকে জোগাড় করেছিল অরিন্দম সরকার, কেউ জানে না।

বগলে একটা তেল চক্ চকে হাতখানেক লম্বা লাঠি নিয়ে সর্বদা যেন ছায়ার মত ফিরত জগা অরিন্দম সরকারের সঙ্গে সঙ্গে।

কেউ জানত না জগার ইতিহাস, অরিন্দম সরকার কোথা থেকে ঐ অসুরটাকে জোগাড় করেছিল এবং একথাটাও কেউ জানতো না, খর্বাকৃতি অরিন্দম সরকারকে কেন ঐ অসুরটা যমের মত ভয় করতো।

এককালে প্রথম যৌবনে লাঠি ও সড়কী চালনায় অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিল অরিন্দম সরকার এবং পরবর্তী কালে লাঠি ও সড়কী দুটোর একটারও অভ্যাস না থাকলেও একদিন যৌবনের সেই দক্ষতাই তাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

হাঁটা পথে শান্তিপুর থেকে হালি শহরে ফিরছিল অরিন্দম সরকার। একা মানুষ, সম্বল ও ভরসা ছিল মাত্র হাতে একটি লাঠি। সেই সময়টা ঐ পথে প্রায়শঃই ঠ্যাঙ্গাড়েদের অত্যাচারের কথা শোনা যেত। সঙ্গে কিছু টাকাকড়ি ছিল, অনেকেই নিষেধ করেছিল ঐ ভাবে তাকে একা একা যেতে কিন্তু একগুঁয়ে প্রকৃতির অরিন্দম সরকার কারো কথাতেই কর্ণপাত করেনি।

দ্বিতীয় রাত্রে এক প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে যখন আপন মনে গুন্ গুন্ করে গান গেয়ে গেয়ে চলেছে অরিন্দম সরকার, অদূরবর্তী কতকগুলো বাব্‌লা ঝোপের আড়াল থেকে অকস্মাৎ বিদ্যুৎগতিতে একটা কাঁপড়া ছুটে এলো অরিন্দমের দিকে। ঐ সময়টা জোরে হাওয়া বইছিল। সেই কারণেই হোক বা অন্য কোন কারণে হোক অরিন্দম সরকারের ডান পা ছুঁয়ে অদূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো।

কিন্তু সেই ছোঁয়াতেই যে আঘাত পেয়েছিল অরিন্দম সরকার, তাকে মাটিতে বসে পড়তে হয়েছিল। আক্রমণকারী ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। সে ভেবেছিল মোক্ষম আঘাত, শিকার যথারীতি মাটি নিয়েছে আর তাই সে পরম নিশ্চিন্তেই ছুটে এগিয়ে এসেছিল ভূপাতিত শিকারের সামনে।

ততক্ষণে অরিন্দম সরকার নিজেকে সামলে নিয়ে বসা অবস্থাতেই যন্ত্রণা ভুলে হাতের লাঠিটা শক্ত করে চেপে ধরেছে মুঠোর মধ্যে এবং আক্রমণকারী সামনে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে লক্ষ্য করে লাঠি চালায়।

অস্ফুট একটা চিৎকার করে লাঠির সেই প্রচণ্ড আঘাতে লোকটা তার ডান হাতটা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ে।

সেই লোকটাই জগা হাড়ি।

একটি আঘাতেই জগা বুঝেছিল কঠিন পাল্লায় সে পড়েছে।

লাঠি হাতে অরিন্দম এসে জগার সামনে দাঁড়াল, হাঁকাবো নাকি আর একটা। দিই মাথাটা দু ফাঁক করে।

মিটি মিটি তাকাচ্ছে তখন জগা অরিন্দমের দিকে।

আকাশের এক প্রান্তে ইতিমধ্যে এক ফালি চাঁদ উঠেছে, তারই মৃদু আলোয় সমস্ত প্রান্তরটায় আবছা আবছা আলো ছায়া।

কিরে শালা, কথা কইচিস না কেন। হাঁকাবো আর একবার।

তবু নিরুত্তর জগা।

চল শালা, তোকে চৌকীদারের জিম্মা করে দেবো।

কাঁধের উড়নী দিয়ে হাত দু'টো বেঁধে ফেললো জগার শক্ত করে, তারপর সঙ্গে করে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল।

চৌকীদারের হাতে তুলে দেয়নি জগাকে অরিন্দম সরকার। শেষ পর্যন্ত সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল জগাকে। সেই থেকেই জগা অরিন্দম সরকারের কাছে আছে।

সুন্দরম এসে দরজায় সামনে দাঁড়াতেই জগা উঠে দাঁড়াল।

সুন্দরমের যে গদি-ঘরে যাতায়াত আছে পূর্বেই সেটা দেখেছিল জগা। অপরিচিত মানুষ নয়।

সরকার মশাই গদি-ঘরে আছেন নাকি। সুন্দরম শুধায়।

আছেন।

আর কেউ আছে ?

না।

সুন্দরম আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে ভেজানো দরজাটা ঠেলে গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। চার হাত লম্বায় এবং তিন হাত প্রস্থে ছোট ঘরটি।

ফরাসের উপর টিনের বাক্সটার সামনে বসে সেজবাতির আলোয় অরিন্দম সরকার আলবোলায় তামুক সেবন করছিল।

ঘরে সুন্দরমকে প্রবেশ করতে দেখেই ভ্রূ-কুঁচকে চোখ তুলে তাকাল এবং সুন্দরমকে দেখে তার শকুনের মত শুকনো মুখখানা মৃদু হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

আরে সুন্দর সাহেব যে। এসো, এসো—বোস। তারপর—অনেক দিন পরে কি খবর ?

সুন্দরম গদীর এক পাশে বসে।

মাল-টাল কিছু আছে নাকি ?

না সরকার মশাই—এতক্ষণে কথা বলে সুন্দরম।

তবে। আগমন কেন সাহেব হঠাৎ।

একটু বিশেষ প্রয়োজনেই এসেচি।

বুঝতে পারচি। তা সেই বিশেষ প্রয়োজনটা কি ?

সরকার মশাই।

বল।

কুলীর বাজারে গঙ্গা তীরে আপনার একটা বাগান-বাড়ি আছে—

তাতো আছে—

সেটা আমি ভাড়া নিতে চাই।

কেন বলত সাহেব !

কেন আর কি—থাকবো। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি আছে—

উঁহু। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে খুলে বলত সাহেব।

বললাম তো থাকবো।

তাতো শুনলাম কিন্তু জল ছেড়ে একেবারে ডাঙ্গায় আসবে। জলের প্রাণী তোমরা।

জলে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি।

বল কি সাহেব। তাহলে তোমার কাজ কারবার।

নতুন কারবার শুরু করবো ভাবছি।

নতুন কারবার।

হ্যাঁ—আপনি একসময় বলেছিলেন কাঠের বা চালের ব্যবসা করলে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন—

শুধু কি তাই সাহেব।

তাই।

কিন্তু সে ব্যবসা কি তোমার পোষাবে।

দেখি—তাছাড়া—

বল, থামলে কেন সাহেব।

আমি বিয়ে করেছি—

বল কি! বিয়ে।

হ্যাঁ—

তা পাত্রীটি কোথা থেকে জোগাড় হলো! দান না লুণ্ঠন ?

আপনি আমাকে বাড়িটা দিতে পারেন কিনা বলুন।

নেয্য ভাড়া পেলে দেবো না কেন ?

কত চান বলুন ?

সে আর তোমার মত লোককে কি বলবো সাহেব! তুমিই বল না কত দিতে পারো ?

আমার কথা ছাড়ুন। আপনি যা চান তাই পাবেন।

তবে আর কি! তা কবে থেকে ভাড়া চাও !

আজ রাত থেকেই।

আজ থেকেই।

হ্যাঁ—কথাটা বলে কুর্তার জেব থেকে এক মুঠো টাকা বের করে অরিন্দম সরকারের সামনে রাখলো সুন্দরম।

পিট পিট করে তাকায় টাকাগুলোর দিকে অরিন্দম সরকার।

চাবিটা দিন বাড়ির।

বোস, আমি চাবি নিয়ে আসছি—

অরিন্দম সরকার ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘর থেকে বের হতেই জগা উঠে দাঁড়ায়।

জগা।

কর্তা।

একটা কাজ করতে হবে।

বলেন।

সুন্দর সাহেব আমার কুলীর বাজারের বাড়িতে যাচ্ছে—তার পিছু পিছু গিয়ে সব দেখে শুনে আসবি।

যে আজ্ঞে—

কিন্তু খুব সাবধান। জানিস তো ওকে—

জগার কুৎসিত মুখে ততোধিক কুৎসিত একটা চাপা হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

[ক্রমশঃ।

চাঁপা ফুল

শ্রীমতী হাসি গঙ্গোপাধ্যায়

চাঁপা ফুল, চাঁপা ফুল অভিমানিনী,
লাজে কিগো রহে চাপা তোমা গুণখানি ;
সুবাসে মধুর তুমি বনানীর রাণী,
সাথী মলয়েরি সনে কয় কানাকানি।

চাঁপা ফুল, প্রিয় ফুল অভিমানিনী,
তোমার গোপন কথা নিয়েছি যে জানি।
অনাদি কালের কত অকথিত বাণী,
গুপ্ত তোমার বুকে অভিমানিনী।

চাঁপা ফুল, চাঁপা ফুল, গৌরীর বালা,
আপনার রূপে কর বনানী আলা।

প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত এখানকার সমুদ্র অগভীর—জলের তলায় কোন জোয়ার নেই যে, আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে। ঐ যে ঢেউ আসছে; ঢেউএর-মাথায় শরীরটি ভাসিয়ে দিন, এবার সাঁতার কাটুন—উপভোগ করুন স্নানের আনন্দ। যদি সাঁতার না জানেন নুলিয়ার সাহায্য নিন; বেপরোয়া কাজ করে নিজের অযথা বিপদ ডেকে আনবেন না।

ঐ দেখুন জেলের দল সব মাছ ধরতে বেরিয়েছে। জেলে-নৌকা নিয়ে ওরা বহু দূর পর্য্যন্ত চলে যায়, তীর থেকে ওদের আর দেখাও যায় না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার ঢেউএর মাথায় চড়ে ওরা ঠিক ফিরে আসবে—জালভর্ত্তি সামুদ্রিক মাছ নিয়ে। দীঘার ছোট বাজারটিতে বসে কেউ কেউ এ মাছ বেচবে—বেশীর ভাগই জেলে দু' পয়সা কামাবার আশায়, সহরাঞ্চলে মাছ চালান দিয়ে দেয়।

দীঘার নৈসর্গের অপরূপ বিস্তার শুধু মন ভোলায় না, মানুষকে পাগল ক'রে তোলে। সরকারী প্রচেষ্টায় ও বেসরকারী উদ্যোগে—দীঘার রূপ ধীরে ধীরে পাল্টাচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাজার হাট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও দীঘায় গড়ে উঠেছে। ধর্ম্মোপাসনার জন্যে আছে দুটি মন্দির একটি মসজিদ।

এখন চলুন কাছাকাছি যে সব দর্শনীয় স্থান আছে একে একে দেখে আসি।

প্রথমেই চলুন রাজবাড়ীটা দেখে নিই। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাড়ীটা কি চমৎকার রূপ নিয়েছে দেখুন। সুন্দর সুন্দর গাছপালা, রঙবেরঙের ফুলের মধুময় বাগিচা, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত উদ্যান বেশ ভালই লাগবে। দ্বারোয়ানের অনুমতি নিয়ে ভিতরে ঘুরে দেখে আসতে পারেন।

দীঘা থেকে ২৭ মাইল দূরে জনপুরা সৈকতে একটু বেড়িয়ে আসবেন? রিক্সা একটা ভাড়া করুন। টাইগার হিলে দাঁড়িয়ে হিমালয়ে সূর্য্যোদয়ের শোভা দেখেছেন, এই জোনপুরা সৈকতে দাঁড়িয়ে সূর্য্যোদয়ের শোভা দেখুন। ঐ দেখুন সমুদ্রের ঢেউএ অজস্র রূপের প্লাবন সৃষ্টি করে সূর্য্যদেব উঠছেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার বাহার দেখেছেন, এখানে দেখুন সমুদ্রের বাহার! ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে এ রূপ দেখেও মন ভরে না।

পূর্ণিমার রাতে একবার যদি এখানে আসতে পারেন—দেখবেন আর এক রূপের বাহার, জায়গাটা নির্জ্জন—সহরের মানুষের একটু গা ছমছম করবে এ সব জায়গায়।

আজ চলুন চন্দনেশ্বর ঘুরে আসি। বেশী দূরে নয়, মাইল চারেক হবে; হেঁটে হেঁটেই যাই চলুন। চন্দনেশ্বরের শিবমন্দির বিখ্যাত। এই তো সেদিন চৈত্রসংক্রান্তিতে এখানে বড় গাজনের মেলা হয়ে গেল। অনেকদিন ছিল মেলাটি। মেলা অবশ্য দীঘার সমুদ্র সৈকতেও বসে—সেদিনটি হল পৌষ সংক্রান্তি।—মকর সংক্রান্তিতে বহু পুণ্যার্থী দীঘায় সমুদ্রে স্নান করে যান—ফেরার পথে মেলা থেকে সওদা করে নিয়ে যেতে তারা ভোলেন না।

দীঘায় আর দর্শনীয় কিছু নেই; নুন তৈরী কেমন করে হয় তা যদি দেখার আগ্রহ থাকে ১৬ মাইল দূরে দাদন পাত্রবাড় লবণ কারখানা দেখে আসুন। আর দেখার মতো আছে রামনগরে মাদুর তৈরীর কারখানা। দীঘা থেকে ৫ মাইল দূরে এই শিল্প কেন্দ্রটি।

আসলে সময় কাটাবার আর মনে যাতে এক ঘেঁয়েমী না আসে তারই জন্যে এ সব জায়গায়—যাবার কথা বললুম। তা নাহলে দীঘাই সব। দীঘায় যা আছে তা আপনার শরীর, স্বাস্থ্য ও মনের পক্ষে যথেষ্ট। অফুরন্ত কান্তি আর শান্তির ভাণ্ডার দীঘা, বিপুল বৈচিত্র্যের মালায় গ্রথিত অপরূপ লীলাভূমি দীঘা, স্বাস্থ্যান্বেষী ও ভ্রমণ-বিলাসীদের তীর্থক্ষেত্রে এ দীঘা সপরিবারে কয়েকদিন থাকুন এখানে; পয়সা খরচ সার্থক হবে—অনাবিল আনন্দ নিয়েই ঘরে ফিরবেন।

[পরের বার দুর্গাপুর চলুন]

শ্রদ্ধাহার

শ্রীকালীপদ কোঙার

এই প্রভাতে নাই তুমি আজ
এমন কথা মানব না
দিনে রাতে ছড়িয়ে আছে
তোমার কথার আল্পনা।

বাংলাদেশের ষড়ঋতুর
শতেক রূপের ব্যঞ্জনা
শীত, শরতে, বসন্তেতে
আজো করে উন্মনা।

যেথায় হাসি সেথায় আছ
কান্না যেথায় সেই খানেও—
শিকল ছেঁড়ার আন্দোলনে
সেই প্রেরণার যোগানেও।

বন্ধু তুমি, সখা তুমি
ঋষি তুমি প্রার্থনার
মৃত্যুঞ্জয়ী, জন্মদিনে
পরাই তোমায় শ্রদ্ধাহার।

কবি, তোমার গানে গানে
ছড়িয়ে আছ সকল খানে;
বিশ্বকবি, ছড়িয়ে আছ
বিশ্ববাসীর সব প্রাণে।।

হারিয়ে গেছ আজকে তুমি
এমন কথা মানব না
যেখানে প্রাণ সেথায় তুমি
মুক্ত-জীবন দ্যোতনা।

টিকটিকি ও আরসোলা

অসিত গুপ্ত

এই একবছর হলো শান্তনুর পৃথিবীটা চার দেওয়ালের মাঝে গুটিয়ে ছোট হয়ে এসেছে। কখনো শুয়ে, কখনো বসে, আবার ইচ্ছে হলে কখনো পায়চারি করতে করতে এখান থেকেই—এই চারতলা বাড়ির চার দেওয়ালওলা ঘরখানা থেকেই সব দেখে সে—দেখে আর তাচ্ছিল্য দেখায়।

তাচ্ছিল্যটা অবশ্য পৃথিবীর দিকেই ছুঁড়ে দেয় শান্তনু। বাইরের সব ঘটনার দিকে, আর সেই ঘটনার পুতুল মানুষগুলোর দিকে।

শান্তনু নিজেকে আর মানুষ ভাবে না। ভাবতে পারে না।

কেন না সে শীগগিরই মারা যাবে।

কেন না তার যক্ষ্মা হয়েছে।

আজকাল তার দাড়ি কামাতে ভাল লাগে না। চুলে তেল দিতেও না। মাঝে মাঝে মাড় দেওয়া, কড়া করে ইস্ত্রী করা ধুতি-পাঞ্জাবী পরতে ইচ্ছে যায়। আর, খুব দূর থেকে ভেসে-আসা গীর্জার ঘণ্টা শুনতে ইচ্ছে করে। যদিও সে জানে, ধর্ম হচ্ছে মানুষের কাছে আফিঙের নেশা এবং বাকুনিন বলেছিলেন, গীর্জা ভেঙে উড়িয়ে দিতে।

কিন্তু যেহেতু সে এখন আর নিজেকে মানুষ বলে ভাবতে পারে না, সেহেতু পুরনো, মানুষোচিত অনেক বিশ্বাস, মতবাদ সে ইদানীং অনায়াসেই আমল দিচ্ছে না।

আমল দিয়ে কি হয়? যা পড়া-শোনা, বিশ্বাস করা যায়, যে নীতি নিয়ে দলাদলি হয়, লড়াই বাধে তার কতটুকু জীবনের হিসেবে মেলে? কতটা কাজে লাগে?

শান্তনু ইদানীং সব বুঝে ফেলেছে। সব রহস্য। তাই তার হাসি পায়। মানুষের দাপাদাপি, মাতামাতি দেখলে তাই তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়। ভাবে, এরা কি বোকা আর মূর্খ! কত সহজে নিজেদের ভুলিয়ে রাখতে পারে! কত নির্বোধ আশ্বাস দিয়ে দিয়ে ক্রমাগত নিজেদের ঠকিয়ে চলে এরা। এ সব মানুষদের জন্যে খানিকটা করুণাও জমা হয় শান্তনুর মনে।

করুণা হয় ওরা বোকা বলে, সে যে-সব জিনিস সহজে বোঝে, ওরা সে-সব জিনিস বুঝতে পারে না বলে। মৃত্যু ওর কাছাকাছি আসতে ও নিজে 'জ্ঞান' ও 'আলোকে'র কাছাকাছি আসতে পেরেছে। অথচ ওরা ওই বোকা মানুষগুলো না জীবনকে জানতে পারছে, না মৃত্যুকে—শুধু অজ্ঞানের অন্ধকারে ছটফটিয়ে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছে। তাই তাদের করুণা করা ছাড়া আর কি-ই বা গত্যন্তর থাকছে।

এই একবছর ধরে, চারতলা বাড়ির চার দেওয়ালওলা এই ঘরখানা থেকে শান্তনু অনেক কিছু দেখেছে—জন্ম দেখেছে, মৃত্যু দেখেছে, এ্যাক্সিডেন্ট দেখেছে, মানুষের ব্যস্ততা দেখেছে, কলহ দেখেছে, ষাঁড়ের লড়াই দেখেছে, তরুণী সুবেশা মেয়েদের ঝিরঝিরে হাসি দেখেছে, রাস্তার মোড়ে বক্তৃতারত নেতার হাতের আস্ফালন দেখেছে।

কিন্তু কিছুই ওকে তেমন করে স্পর্শ করে নি। সব কিছু দেখা, শোনা ও বোঝার পেছনে একটা নিদারুণ নিরাসক্তি, একটা 'এমনটি হবে আগেই জানতাম'—গোছের ভাব কাজ করেছে।

আজকাল ওর কথা পর্যন্ত বলতে ইচ্ছে যায় না। আর বলবেই বা কার সংগে? এই অসুখটা না হলে পৃথিবীর অনেক কিছু অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় তার অজানা থেকে যেত।

শান্তনু জানে, তার বাবা, মা, ভাই, বোন সকলেই আজ কি আশ্চর্য ভাবে ছলনার আশ্রয় নিয়ে চলেছে! এ অবস্থায় তাদের সংগে কথা বলতে তার ঘেন্না হওয়াই উচিত। কারণ যত পরমাত্মীয়ই হোক্ না কেন, তারা স্বার্থের বশ।

মানুষ মাত্রেই স্বার্থের বশ। পাছে শান্তনুর নোংরা অসুখটার তাদের ছোঁয়া লাগে সেইজন্যে তারা কি উৎকটভাবেই না নিজেদের দূরে দূরে রাখে! কিন্তু মুখে উদ্বেগ আর সোহাগ প্রকাশ করতে কসুর করে না।

অথচ, এক সময় শান্তনু যখন সক্ষম ছিল কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা এনে দিত সংসারে তখন তার কি খাতিরই ছিল। ভাই-বোন থেকে বাবা মা পর্যন্ত সবাই তার যত্নে শশব্যস্ত থাকত।

এইটাই শান্তনুকে সবচেয়ে পীড়া দেয় চিরকাল। কেন, মানুষ এত ছল ধরে, এত কপটতার আশ্রয় নেয়? স্বার্থে একটু ঘা পড়লে কেন এমন বিশ্রীভাবে তাদের চেহারা পাল্টায়?

তার চেয়ে এই ভাল। এই একটা ঘরের ভেতরে সমস্ত পৃথিবীটাকে গুটিয়ে নিয়ে আসা, একটা মনের মধ্যে সব জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোকে জ্বালিয়ে তোলা। এখানে ছলনা নেই, বঞ্চনা নেই,—সবটুকুই নিজের মধ্যে নিজের করে পাওয়া।

খুব সম্প্রতি দুটো মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছে শান্তনু। আর তাতে তার ভাবনার কিছু খোরাক বেড়েছে।

দিনকয়েক আগে একদিন সন্ধ্যাবেলায় একটা টিকটিকির খিদে মেটাতে একটা আরসোলাকে জীবন দিতে দেখল।

শান্তনু চৌকির ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে শুয়ে নিজেই নিজের সংগে মনে মনে কথা বলছিল। নিজেই একটা প্রশ্নকে তুলে ধরে, নিজেই

তার উত্তর করে। চোখটা ছিল দেওয়ালের গায়ে। দু'টো হাত মাথার নীচে পাতা। বাঁ পা'টা মুড়ে উঁচু করে রাখা আর ডান পা'টা লম্বালম্বি করে তার ওপর শোয়ান। ডান পায়ের কাপড়টা উরু পর্যন্ত নেমে গিয়ে ফর্সা অংশটা উদ্ভাসিত হওয়ায় কেমন একটু যৌনক্ষুধার ভাব আসছিল।

সেই সময় দেখল একটা টিকটিকি তার লাল জিব বার করে একটা আরসোলার দিকে এগোচ্ছে। একটু এগিয়ে থামল টিকটিকিটা, তার পর হঠাৎ তেড়ে গিয়ে খপ করে ধরে ফেলল আরসোলাটাকে। কিছুতেই বাগে এবং জিবের আগে আনতে পারছিল না আরসোলাটাকে। তবু টিকটিকিটা একটু একটু করে চরম কৌশলের সংগে অত বড় একটা জীবকে তার মুখের গহ্বরে ঢুকিয়ে ফেলল। আর আরসোলাটা তার শরীর ঝাপটাতে ঝাপটাতে অত্যন্ত প্রতিবাদের সংগে ক্রমশ টিকটিকির হাঁয়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

শান্তনু একটু পরে দেখল, খাওয়া সেরে টিকটিকিটা একবার ঠোঁট বার করল, দু'বার এদিক-ওদিক ঘাড় ফেরাল আর তার পেটের কাছটা একটু উঁচু হয়ে উঠল।

'প্রতি জীবের বাচ্চা হবার সময় এ-রকম হয়'—শান্তনু ভাবল। 'সে-ও তো এক রকমের ক্ষিধে মেটানোর পরিণতি'। খুব একটা বিজ্ঞের মতো সরু করে হাসল শান্তনু।

আরেক দিন ওই সামনের বড় রাস্তায় একটা নেড়ী কুত্তাকে গাড়ি চাপা পড়তে দেখেছিল। তখন সকাল দশটা হবে। শান্তনু পাশের বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাটের ছত্রিশ বছর বয়সের বউটিকে দেখছিল এক মনে। আজকাল বউটিকে সে অসীম কৌতূহলের সংগে লক্ষ্য করে থাকে।

হঠাৎ একটা গাড়ির ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আর কুকুরের কেঁউ-কেঁউ শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল খানিকটা চাপ-চাপ রক্ত আর দলিত মাংসপিণ্ডে একটা কুকুরের সব-শেষ। সাদা-কালো রঙের গায়ের চামড়াটা পাশেই চ্যাপটা হয়ে পড়ে আছে। খানিকটা রক্ত আর ডেলা ডেলা মাংস দূরে ছিটকে পড়েছে।

শান্তনুর মনটা সেদিন খুব প্রসন্ন হয়েছিল। কারণ মৃত্যুকে যত ও প্রত্যক্ষ করছিল, জীবনের রঙীন রঙীন স্বপ্নে বন্দী হয়ে থাকার নেশা থেকে ও ততই মুক্ত হতে পারছিল। ও ততই নিজের মৃত্যুকে নির্ভয়ে চুমু খাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

চুমু!

মৃত্যু সম্পর্কে ওই শব্দটাই কেন যে হঠাৎ মনে পড়ল, শান্তনু তা জানে না। তবে চুমুর কথায় পাশের বাড়ির তিনতলার ছত্রিশ বছরের বউটিকে স্মরণে এল।

কয়েক বছর হলো, বউটির স্বামী মারা গেছে। দু'টি মাত্র ছেলে মেয়ে। শান্তনু শুনেছিল, বউটি কিছু পড়াশুনা করেছিল, স্বামী মারা যাবার পর চাকরীর নানা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। সংসারের সম্বল বলতে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কিছু টাকা ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু আজ এক বছর হলো, শান্তনু লক্ষ্য করছে বউটির অবস্থা ফিরে গেছে। সন্ধ্যাবেলা ঘরে টিউবলাইট জ্বলে, রেডিওগ্রাম বাজে। চারদিকে একটা নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব।

বউটির চেহারাও কত পালটে গেছে। রূপে জৌলুস লেগেছে। সব সময় একটা খুশী খুশী আরামের ছাপ পড়ে চেহারায়। সব কথার সংগে হাসি মিশিয়ে মিশিয়ে একটা বিশেষ কমনীয়তা সৃষ্টি করে বউটি এখন। কিন্তু শান্তনু জানে। বন্ধ্যা আজ শুধু তারই হয়নি—অনেক ঘরে ঘরেই হয়েছে।

নিখিলেশের (বউটির মৃত স্বামী) অফিসের পাঞ্জাবী বড় সাহেব গত এক বছর ধরে এ বাড়িতে রোজ সন্ধ্যাবেলায় কষ্ট করে পায়ের ধুলো দিচ্ছে। দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে একটা অমায়িক, উদার হাসিকে জাগিয়ে রেখে সে স্মৃতির (বউটির নাম) ছেলেমেয়েদের হাতে নিত্য নতুন উপহারের ঠোঙা তুলে দেয়। ছেলেমেয়েরা তাদের পাঞ্জাবী 'মেসোমশাই'য়ের এই ঔদার্যে বিস্মিত এবং মুগ্ধ হয়। ততোধিক খুশী হয় স্মৃতি নিজে।

সন্ধ্যার আগে থেকেই সে তার চেহারাকে প্রসাধনে প্রসাধনে তীক্ষ্ণ করে। মুখে একটা মিষ্টি হাসি আলতো ভাবে ছড়িয়ে রাখে সারাক্ষণ। রেডিওটা খুলে দিয়ে, দু'হাত জড়ো করে একটা ইজিচেয়ারে বসে। দোল খায়। হঠাৎ উঠে গিয়ে জানলার কাছ থেকে রাস্তা লক্ষ্য করে। ছোট মেয়েটা কাছে এসে দাঁড়ালে, নীচু হয়ে তার চুলের ক্লিপটা, ঠিক করে এঁটে দেয়। তারপর পিঠে হাত দিয়ে তাকে পাশের ঘরে যেতে বলে। আবার চেয়ারে গিয়ে বসে একটা ম্যাগাজিন তুলে পটপট করে একটা একটা পাতা ওলটায়।

বোঝা যায়, সে নিজের চাঞ্চল্যকে ঢাকতে চাইছে। শান্তনু এসবই লক্ষ্য করেছে। একটা প্রহসনের প্রতিটি দৃশ্য অভিনীত হতে দেখেছে সাগ্রহে। পৃথিবীর আর কেউ না জানলেও শান্তনু জানে, এই প্রতীক্ষা কিসের জন্যে, কিসের মূল্যে!

প্রায় একবছর ধরে একই সময়ে আসছে লোকটা। শুভানুধ্যায়ীর ছদ্মবেশে। এক অসহায় ভদ্রবধূর উপকার করার নেশায়। লোকটির অসীম ধৈর্য এবং জাল-বিছানোর অপার কৌশল দেখে অবাক হয়েছিল শান্তনু।

প্রথম প্রথম শুধু নমস্কার করা, বিনীত হাসি আর কিছু কুণ্ঠিত আলাপ। তারপর শান্তনু লক্ষ্য করেছে, ঘনিষ্ঠ হবার ইচ্ছের ভদ্রলোক একটু একটু করে নিজেকে মেলে ধরেছে। তখন—শান্তনু জানে, বেশ ভাল করেই জানে যে, স্মৃতির মুখের ছড়ান হাসিতে কি এক অজানা ভয় যেন চমকে উঠেছে! হয়ত দু'চোখের তারায় বেদনার ছায়াও থমকে থেকেছে।

টাকা প্রথম থেকেই দিয়ে যেত লোকটি। স্মৃতি আপত্তি করত :—(আনুমানিক) 'না, না, ওসব কি, আপনি দিচ্ছেন কেন?'

—(আনুমানিক) 'আরে—আরে কি হয়েছে। আমাকে আপনার বন্ধু বলে ভাববেন। 'নিখ.লেশ বাবু' থাকলে কি আর এসব দিতাম। তিনি নেই বলেই তো—তাছাড়া, আপনি এখন তকলিফে আছেন, এসময় যদি আপনার 'উপ.কারেই' না-লাগলাম তাহলে আর মানুষ কি!'

স্মৃতি মাথা নীচু করেছে তারপর একসময় টাকা ক'টা তুলে নিয়ে মুঠো বন্ধ করেছে।

শান্তনু তার চারতলা বাড়ির চার দেওয়ালওলা ঘরের জানলা থেকে ওদের সে সব কথার একটাও শুনতে পায় নি, পাবার কথাও নয়। তবে তাদের ভাব-ভঙ্গী দেখে সে মনে মনে সম্ভাব্য সংলাপগুলি তৈরি করে নিয়েছে। যা হতে পারে আর যা হওয়া উচিত।

ইদানীং শান্তনু লক্ষ্য করছিল, ভদ্রলোকের চোখে মুখে আস্তে আস্তে একটা প্রবল তৃষ্ণা পরিষ্কার হয়ে উঠছে। স্মৃতি হয়ত সেটা অনেকদিন আগেই টের পেয়ে ভয় পেত। তবে, এরমধ্যে হাতের মুঠোর কাগজের নোটের উত্তাপ অনুভব করে করে ভেতরে ভেতরে তার অনেক কিছুই ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। অনেক পুরনো ধ্যান-ধারণা বদলে গিয়ে নতুন নতুন আশা-আশ্বাস জন্ম নিচ্ছিল।

একদিন।

—(আনুমানিক) 'আপনার সামনে এখন গোটা জীবনটা পড়ে রয়েছে আপনি কেন নিজেকে এমন বঞ্চিত রেখেছেন ?'

'——'

স্মৃতিকে মুখ নীচু করতে আর ভদ্রলোকের চেহারায় একটা আগ্রহ ফুটে উঠতে দেখে শান্তনু অনুমান করল, এমন কিছুই বলা হয়েছে।

—(আনুমানিক) 'সমরতি।' (অবাঙালীরা 'স্মৃতি' উচ্চারণ ওইভাবেই করে।)

'——'

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আস্তে আস্তে স্মৃতি বিস্ফারিত চোখ তুলে তাকাল ভদ্রলোকের দিকে। শান্তনু বুঝল, ভদ্রলোক অত্যন্ত আন্তরিক স্বরে তার নাম ধরে ডেকেছে।

শান্তনুর ঘরে তখন আলো নেভানো। ওদের ঘরের আলো জ্বলছে। ঠিক যেন সে থিয়েটার-ঘরের অন্ধকার দর্শক আর ওরা মঞ্চের আলোকিত নট-নটী।

শান্তনু দেখল, পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ধীরে ধীরে নিজের একটা হাত স্মৃতির হাতের ওপর রাখল। স্মৃতি প্রতিবাদ করল না। অনুমোদন করল কি না তা-ও ভাল বোঝা গেল না।

সেদিন এইটুকু দেখেই হাঁপিয়ে পড়ল শান্তনু।

টিকটিকিটা ক্রমশ আরসোলার দিকে এগোচ্ছিল।

এরপর থেকেই বউটির দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করল শান্তনু। ঘোড়ার গায়ে পোকা বসলে, ঘোড়া যেমন সবেগে, অত্যন্ত দ্রুত লেজ চালিয়ে সেই পোকা তাড়ায়—স্মৃতিও তেমনি, তারপর থেকে, খুব দ্রুত এবং সবেগে তার জীবন থেকে দুঃখ-কষ্টের পোকাকে তাড়াতে চেয়েছে। ভেতরে ভেতরে অন্য পোকা বাসা বাঁধল কিনা তা-ও পর্যন্ত ভাববার অবসর পায় নি।

বড় ছেলেটা শুধু মাঝে মাঝে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছে। তার বয়স বছর দশেক। সে বুঝতে পারে নি একই সংগে, মা'র চেহারা-বদল এবং সংসারের চেহারা-বদলের গুপ্ত রহস্যটি কি—কোন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের বাহুতে তাদের এই সৌভাগ্য সম্ভব হয়েছে!

আরেক দিন!

শান্তনু দেখল স্মৃতি প্রসাধন শেষ করে ইজিচেয়ারে অপেক্ষা করছে। নীচের তলায় গাড়ির শব্দ হলো। ছুটে জানলার ধারে গেল স্মৃতি। সাউদার্ণ এভিন্যুকে চমকে দিয়ে পাঞ্জাবী লোকটির প্রকাণ্ড বুইক এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির সামনে।

লোকটি ওপরে উঠে প্রতিদিনকার মতো প্রশান্ত হাসি হাসল, ছেলেমেয়েদের ডেকে উপহারের ঠোঙা দিল। একটু আদর করল। স্মৃতি ওদের অন্য ঘরে চালান করে দিয়ে এসে এ ঘরে খাটের ওপর বসল।

লোকটি কি একটা কথা (শান্তনু অনুমান করতে পারল না) বলতেই স্মৃতি অসংকোচে হাসতে লাগল। হাসতে গিয়ে তার চোখ ছোট হয়ে গেল, সাদা দাঁতগুলো আলোয় ঝকঝক করতে লাগল আর জামা কাপড়ে ঢাকা শরীরের অনেক জায়গা জ্যান্ত হয়ে উঠে পাঞ্জাবী লোকটির চোখকে তীব্র আকর্ষণ করল।

—(আনুমানিক) 'সমরতি'। বোধ হয় উদ্দেশ্যপূর্ণ গলায় ডাকল লোকটি।

—(আনুমানিক) 'যাঃ'! স্মৃতি সলজ্জ ভ্রূকুটি হানল।

লোকটি স্মৃতির মধুর প্রতিবাদকে গ্রাহ্যেই না-এনে নিজের মুখটাকে চুমু খাবার মতো করে ঘনিষ্ঠ করতে চাইল।

স্মৃতি উঠে পড়ল খাট থেকে। ঘর থেকে বেরিয়ে কি যেন দেখে এল।

তারপর রেডিওগ্রামে একটা রেকর্ড চড়াল? একটা চড়া সুরের ইংরাজী বাজনা। শান্তনুর দিকের জানালার পর্দাটা ভাল করে টেনে দিল। দরজাটা বন্ধ করল।

তারপর আলোর সুইচে হাত দিয়ে ৺নিখিলেশের অফিসের বড় সাহেবের দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জা-মধুর হেসে ঘরটাকে অন্ধকার করে দিল।

সরে এল শান্তনু জানলা থেকে। ঘরের আলোটা জ্বেলে দিল। মুখে তার একটা সরু, সবজান্তা বিজ্ঞের হাসি।

টিকটিকি আবার আরসোলাকে খেয়েছে।

বার্ধক্যে

বারানসী

নীলকণ্ঠ

একুশ

নিজের দেহখানি তুলে ধরেছেন বিজয়কৃষ্ণ বারবার, দেবালয়ের প্রদীপ করতে হয়েছেন উন্মুখ। সেই দেহ-প্রদীপে ভক্তির তেল হয়েছে ঢালা; জ্ঞানের সলতে রয়েছে পাকানো। তবুও অন্ধকারে জ্বলেনি আলো সেই জ্যোতির্ময়ের। দুরন্ত তৃষ্ণায়, মাতালের মতো জল ভেবে মুখ থুবড়ে পড়েছেন মরীচিকায়। চোখ যায় যতদূর ধূ-ধূ করছে বালি আর রোদ্দুর। বালির অর্থে সমুদ্দুর! যাকে মনে করেছেন আলো অনেক দূর থেকে, কাছে গিয়ে দেখছেন সে আলেয়া। ব্রাহ্মোপাসনার মন্দিরে ধরে নিয়ে গেছেন সাধুকে। ব্রহ্মোপাসনা কেমন লাগলো শুধিয়েছেন তাঁকে। সাধু বলেছে: সবই সুন্দর! বেদবাণীও সেই চরমের পরম সুন্দর উক্তি! তবু বিজয়কৃষ্ণের প্রশ্ন নিরুত্তর থেকে যায়: প্রাণের অশান্তি যাবে কিসে? এই অশান্তির বিষের যন্ত্রণা কিসে যাবে বলো? সন্ন্যাসী হাসে প্রশান্ত হাসি। অনন্ত গগন-উদ্ভাস সেই হাসিতে সীমাহীন বেদনার নীলাঞ্জন ছায়া আর অসীম আনন্দের রৌদ্রাভা ছিটিয়ে দিচ্ছে করুণ-মধুর রামধনুর রং! হাসতে হাসতে বলে সন্ন্যাসী: গুরু ছাড়া কে করবে আর এই গুরুতর সমস্যার সমাধান? আপন গুরুকো পুছো—

গুরুকে মানেন না ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ। জগদ্‌গুরু ছাড়া আর কোনও গুরুকে করেন না স্বীকার। সন্ন্যাসীকেও বলেন সে কথা। বলা মাত্র অগ্নির মুখে যেন উচ্চারিত হয় আহুতির ভাষা! আগ্নেয়গিরির সম্মুখে আবির্ভূত হয় পাবকবাণী: ইস্ ওয়াস্তে সব বিগড় গিয়া! আসমানসে ইমারৎ বনানে কোই নহি সক্‌তা! গুরু করনেই হোগা!

গুরু করতেই হবে তোমাকে! জগদ্‌গুরুর কাছে পৌঁছতে হলে! সুরে সুরে তালে তালে যত বাঁধো সেতার, সে তার যাবে ছিঁড়ে! গুরু-ই সেতু তোমার আর তাঁর মধ্যে বিরহের পারাপার দেখতে না পাওয়া দুস্তর পারাবারে। ঘুড়ি উড়বে কি করে আকাশে, কেউ যদি না ধরে লাটাই?

খুলে যায় বন্ধদ্বার! অন্ধচোখে এসে পড়ে আলো! পথ আর কত দূর! সেবারে আলেয়াকে মনে করেছিলো আলো; এবারে আবার আলো-কে সন্দেহ হয় আলেয়া বলে। সুদূর মানস-সরোবরে পেয়েছেন তাঁর ধ্যানের ধন, গুরুকে। স্মরণ করলেই, শরণ নিলেই তিনি এসে পড়েন। 'কারণ যোগক্ষেম বহাম্যহং',—কেবল জগদ্‌গুরুর কথাই নয়; জগতের সমস্ত সদ্‌গুরুর কথাও তাই। গুরু-র উদয়েও সন্দেহের উদয় যায় না অস্ত। জিজ্ঞেস করেন বিজয়কৃষ্ণ: অণিমা, লঘিমা, শাস্ত্রোক্তি সত্য?

শিষ্যের হাত ধরে গুরু নিয়ে যান সন্দেহের অতীত লোকে। বিজয়কৃষ্ণের সন্তোলব্ধ গুরু মানসসরোবরের পরমহংসজী তাঁকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন পাহাড়-পার দুর্গম অরণ্যে পড়ে থাকা, একটি মৃতদেহ; সূক্ষ্মসত্তায় প্রবেশ করলেন বিজয়কৃষ্ণের গুরু সেই মৃতদেহে। সংগে সংগে নড়ে উঠলো অনড়; মৃতদেহ হলো 'অ-মৃত'-দেহ আবার। বিজয়কৃষ্ণ কেন সন্দেহ করেছিলেন নিঃসন্দেহকে কে জানে! কারণ বিজয়কৃষ্ণের নিজের ক্ষেত্রেই এর চেয়ে অনেক, অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেছে, আবার অনেক ঘটন-অঘটনের নায়ক স্বয়ং বিজয়কৃষ্ণেরই হবার পরম সৌভাগ্য হয়েছে।

বিজয়কৃষ্ণ সেদিন ঢাকায়; শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে। ঈশ্বরধ্যান-নিমগ্ন বিজয়কৃষ্ণের সামনে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন দক্ষিণেশ্বরের সাধক। বিজয়কৃষ্ণ তখনও সন্দেহ করছেন, স্বপ্ন দেখছেন না তো। সন্দেহ নিরসনের জন্যে রামকৃষ্ণ মূর্তিকে স্পর্শ করলেন বিজয়কৃষ্ণ; টিপে টিপে দেখলেন। না, সন্দেহের নেই; রামকৃষ্ণ-দেহেরই উপস্থিতি ঘটেছে সেখানে।

কিন্তু এই একবার কি? জীবনে কতবার? বারবার অঘটন-ঘটন পটীয়সীর লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন; নরদেহে অমরদেহীর লীলা। নিজেও ঘটিয়েছেন কতবার অঘটন; বাঁচিয়েছেন শিষ্যকে কত দুর্ঘটনের দুরন্ত বিপদ থেকে। যখন সাধনা করতে করতে সিদ্ধ হয়ে গেছেন প্রভুপাদ, যিনি নাকি গুরুতে বিশ্বাস করতেন না একদা, সেই তিনি যখন নিজেই দীক্ষা দিচ্ছেন গুরু-চালিত হয়ে, তখন একদিন বিজয়কৃষ্ণের এক শিষ্য,—মহেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর নাম, বিজয়-নির্দেশেই কলকাতায় যান। সারাদিন রৌদ্ররুক্ষ রাজপথে ভ্রমণরত ক্লান্ত ক্ষুধিত শিষ্যের সম্বল চারটি পয়সা। দুধ কিনে খাবেন পয়সা দিয়ে, —এমন সময় প্রার্থী এসে হাত পাতে। চারটি পয়সা, শেষ সম্বল তুলে দেন তাঁর হাতে।

ঢাকায় ফেরা মাত্র বিজয়-গুরু বলেন মহেন্দ্রনাথকে: দুধ খাবার পয়সা চারটি প্রার্থী সাধুকে দিয়েছেন বলেই মহেন্দ্রনাথ বেঁচে গেলেন; কারণ যে দুধ তিনি খেতে যাচ্ছিলেন, সে দুধ তাঁর মৃত্যুপীড়ার বীজ বহন করছিলো!

মহেন্দ্রনাথ বুঝলেন এ সাধু কোন সাধুর নির্দেশে সেদিন হাত পেতেছিলো তাঁর কাছে! হাত পাতেনি সেই সাধু। স্বয়ং শ্রীগুরু বিজয়কৃষ্ণ বুক পেতে দিয়েছিলেন বহুদূরে থেকেও মৃত্যুদূতের পথরোধ করতে। মৃত্যুদূত ফিরে গিয়েছিলো ভগবানের দূতকে দেখে।

এহ বাহ্য। আরও কতবার! সতীশ কাঁপছেন কাম তাপে।

যৌবনের নানা রঙের দিনে কামনার রঙীন পাখা তাঁর পুড়েছে কতবার রূপের আগুনে ; তারপর অপরূপের অনলে শোধন করেছেন তাঁকে সদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণ কেমন করে, সে ঘটনা লেখা যায় কিন্তু উপলব্ধি করা যায় না। সাধনায় অনেক দূর অগ্রসর হয়েও দেহ-কামনায় অস্থির হন সতীশ। রমণীরের ধ্যানচিন্তার আসনে আসে রমণের কালচিন্তা ; উত্তেজনায় উঠে পড়েন সতীশ। অভিমানে প্রতিজ্ঞা করেন : 'আর সাধন করিব না, গোঁসাইয়ের কাছেও আর যাইব না।' সংগে সংগে নদীর অভিমানের উত্তরে উড্ডীন হয় সমুদ্রের সুনীল উত্তরীয়। হতাশায় চরম মুহূর্তেই তো আশার আশ্চর্য আলো আকাশে জাগে। দ্রৌপদী যতক্ষণ কাপড়ের খুঁট চেপে ধরে আছে, ততক্ষণ নয় ; যখনই কাপড় ছেড়ে হাত তুলে দিয়েছে ওপরে, 'হা কৃষ্ণ' বলে তখনই তো লজ্জা নিবারণ করতে বস্ত্রহরণ করেছিলো যে গোপীদের করেছিলো লজ্জাহরণ, সে আসে এবার বস্ত্রবিতরণ করতে। রামকৃষ্ণ যখন রামপ্রসাদ যাঁর দেখা পেয়েছিলেন তাঁর দেখা না পেয়ে তুলে নেন খড়্গ,—মরবেন বলে, তখনই তো জগদম্বা ধরবেন সেই আত্মহত্যার উদ্যত হাতকে। 'আত্ম'-হত্যা থেকে 'আত্ম'-জ্ঞানে। যাঁকে খুঁজছো তুমি, 'তুমি'-ই 'সে'-ই, সাধনের রাস্তায় এসেই কেউ একথা বলতে পারে না। পুঁথিতে নয়, শাস্ত্রে নয়, প্রণামে নয়, প্রাণায়ামে নয় ; রাগের উত্তর আসে অনুরাগে। মাকে যে কাঁদায়,—বলে, হয় তোমাকে পাব, নয় তো মাকে-ই দেব প্রাণ। চলতে চলতে, নদীর নৃত্য যখন থেমে আসে, পাথরের বুক চিরে রৌদ্ররুক্ষ মাটির বুক ধনধান্যে ভরে দিয়ে, তলিয়ে দিয়ে বসুন্ধরা, অতল থেকে তুলে এনে নতুন জনপদ, তার ওপরে যখন ক্লান্ত নদী বলে না আর, চলে না আর অনংগ চরণ তার, তখনই সিন্ধুর ডাক আসে দুয়ার হতে অদূরে।

সতীশ সেই প্রতিজ্ঞা করেন, গোঁসাইয়ের কাছেও আর যাবেন না তিনি, তখনই গোঁসাই-এর ভংগ হয় কঠোরতর প্রতিজ্ঞা। সতীশ কাছে আসতেই বলেন : সতীশ, আমার মাথায় একটু তেল ঘষে দাও ; সতীশের অন্তর-বাহির পুড়ে যাচ্ছে আগুনে, আর গোঁসাই চাইছেন স্নিগ্ধ হতে। সন্দিগ্ধ সতীশ নিঃসন্দিগ্ধ স্বরে বলেন : না ; পারব না। হাসেন বিজয়কৃষ্ণ। সেই হাসি,—বারবার যে হাসি হাসেন ভগবানের বৃত্তেরা, 'পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে, সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে'। সে হাসি বলে : পারব না বললে, আমি পারব কেন ?

তেল দেয় মাথায় গোঁসাইয়ের অনুরোধে, একান্ত অনিচ্ছায় সতীশ। আর সংগে সংগে চোখের সামনে আবির্ভূত হয়। যাদের পাবার ইচ্ছায় কামোন্মত্ত হয়েছিলেন সতীশ সেই রূপসীর দল। তারা উলংগ কামের স্থূল মূর্তি ধরে এসে দাঁড়ায় সতীশের সামনে। না। দাঁড়ায় না। চলে যায় পাশ কাটিয়ে ; একের পর এক। সব তেল শুষে নিলে বিজয়কৃষ্ণের মস্তক, তিনি বলেন : তা'হলে যাও !

তেল নয় খেল। সতীশের কাম শুষে নিলেন বিজয়কৃষ্ণ। গণ্ডূষে শুষে নিলেন কামনার সিন্ধু। এই খেলা রাম এবং কৃষ্ণ থেকে সুরু করে রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণে এসেও সারা হয়নি। কাশী, কাঞ্চী, কোথায় এই খেলা আজও নয় অব্যাহত ! [শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ : খণ্ড ১ : পৃঃ ১১৯-১২০]

রামকৃষ্ণও বলেছিলেন, কামের মুখ ঘুরিয়ে দে ; কামে দেখ 'মা'-কে !

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কেবল মানুষের মধ্যে অলৌকিকের লীলা দেখেননি। স্থানের মধ্যেও দেখেছিলেন ; দেখিয়েছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন বটগাছ। বৃন্দাবনের নিত্যলীলার সাক্ষী সেই বৃক্ষ ; লীলাসংগী সে। সেই বৃক্ষমাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ বলছেন, রাধাবাগে একটি গাছের নীচে একদিন বসে আছি ; এমন সময় অদ্ভুত শব্দে আকৃষ্ট হয়ে দেখি, গাছ নয়, ভক্ত বৈষ্ণব দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, তিনি বৃক্ষরূপে আছেন এখানে অনেক কাল।

কেবল বৃক্ষের মধ্যে বোধিকে নয়। কৃষ্ণের জীবের মধ্যে কৃষ্ণকে দেখেছিলেন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ।

শান্তিপুরের সন্নিকট বাকলা। সেইখানে সংকীর্তনে বেরিয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ। সংগে চলেছে গৃহপালিত কুকুর, কেলে। ধর্ম স্বয়ং চলেছেন ধর্ম-সংকীর্তনে। ধর্মরাজ ছিলেন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের শেষ যাত্রায় সংগী। গোঁসাইজীর ধর্ম-সংকীর্তন যাত্রায় সংগী হলেন ভক্তরাজ কেলে। এক জায়গায় এসে কেলে মাটি আঁচড়ায় কেবলি। গোস্বামী প্রভু সে জায়গা তৎক্ষণাৎ খোঁড়ালেন। এবং মাটির অন্ধকার গর্ভ থেকে উঠে এলো শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নামযুক্ত খড়ম। খড়ম মাথায় করে বিজয়কৃষ্ণ আবার সংকীর্তনমত্ত হলেন। সংকীর্তন শেষে দেখা গেল ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ জ্ঞানহারা ; কুকুর কেলে-ও নিস্পন্দ। ভক্তের কানে ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে করতে প্রভুপাদ বললেন : তোমার কাজ শেষ। এবার অশেষকে লাভ কর ; গঙ্গালাভ কর তুমি।

পরের দিন সকালে দেখা গেল ভক্তরাজ কেলে গংগার কোলে ভাসছেন ! ঠিক যখন সংশয়ের তিমির অন্ধকার সাঁতরে, পূর্বদিগন্ত অপূর্ব আলোয় উদ্ভাসিত করে উঠে আসছেন জবাকুসুমসংকাশ মহাদ্যুতি দিবাকর !

বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম, না হিন্দু, বিজয়কৃষ্ণ রামকৃষ্ণের কাছে নত হয়েছিলেন, না, রামকৃষ্ণের চেয়ে তিনি বড়,—এই অসার, অন্তঃসারশূন্য বাক-বিতণ্ডায় যারা বাদ-প্রতিবাদের কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের ভূমিকায় অবতীর্ণ তাদের ধিক ! এর চেয়ে অধিক অসম্মান রামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণের করা অসম্ভব। আলো এবং বাতাস, কে বলবে এর মধ্যে কে বড় ? আকাশ আর মাটি, কে বলবে এর মধ্যে কাকে নাহলে অচল, বসুন্ধরা-জননী সিন্ধু আর বসুন্ধরার প্রহরী আকাশস্পর্শী পর্বত, কে বলবে কার কাছে আছে অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তর ! ব্রাহ্ম আর হিন্দু, মুসলমান আর খৃশ্চান তো নদীর নাম মাত্র ; গংগা আর যমুনা, সিন্ধু আর টেমস ! উত্তরণ তো সকলেরই সেই মহাসাগরে,—সেখানে যাবার জন্যে বহির্গত নদকে সাধ্য কার ঠেকাবার। সুরুতে এবং শেষে সব নদী, সব সাধক এক ; যাবার পথ পাবার পাথেয় হোক যত আলাদা ! সিন্ধু থেকে উৎসারিত নদ ; সিন্ধুগামী কেউ গেছে সোজা, কেউ বেঁকা, কেউ মরুভূমি বুজিয়ে, কেউ চড়াই উজিয়ে ! সিন্ধুতে গিয়ে শেষ হয়েছে যাত্রা। সুরুতে আর সারাতে বিজয়কৃষ্ণ আর রামকৃষ্ণে কোনও তফাৎ নেই। মাঝখানে কেউ দক্ষিণেশ্বরে বিলিয়েছেন নিজেকে, কেউ শান্তিপুরে টেনেছেন অন্তকে। যেখানে শেষ সেখানে রাম নেই ; বিজয় নেই ; আছেন কেবল কৃষ্ণ !

বিজয় আর রাম নয় ; বলো, জয় কৃষ্ণ ! জয় কৃষ্ণ !

মাটি আর পাথর। চুন আর সুরকি। বালি আর সিমেন্ট। লোহা আর ইট দিয়ে গড়া,—এই যদি দেখো কাশীকে, তবে কাশীতে,

একাশিতে মারা গেলেও শিবলোকে যাবে না ; যাবে 'শিবা'-লোকে। জন্মাবে আবার ! আবার শিয়াল কুকুর কাঁদবে তোমার দুঃখে। ইট আর কাঠ ; কারু-করা কবাট,—কাশীর মাহাত্ম্য সেজন্যে নয়। কাশী সে কেবল আরেকটি প্রদেশ মাত্র নয়। বিপ্র দেশ, সে ওই শংকর আর তৈলংগের জন্যে ; হরিশ্চন্দ্রের কারণে। ভারতাত্মা কাশী ! ভারতবর্ষের এমন কোনও মহাত্মা নেই যাকে না যেতে হয়েছে কাশীতে ! কারণ কাশী কেবল তীর্থক্ষেত্র নয় ; জীবনযোগী তৈলংগ থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত। তাঁদের আগে এবং তাঁদের পরে। সকল মুক্ত পুরুষের সতীর্থক্ষেত্র কাশী।

জহুরী না হলে যদি জহর থেকে যায় অচেনা, তবে তীর্থের মহিমা বুঝবে কে, তীর্থংকর ছাড়া।

বৃন্দাবনের মাটিতে মাহাত্ম্যের সন্ধান না পেয়ে দুঃখিত একজন, ম্রিয়মাণ। গোস্বামী বললেন: কৃষ্ণনাম করে গড়াগড়ি' করুন ভূমিতে,—একবার ; তারপর দেখুন আপনার উপলব্ধি হয় কি না, যে এ মাটি,—মাটি নয় ; স্বয়ং 'মা'-টিই এ মাটি ! প্রভুপাদের কথায় লুটিয়ে পড়েন অবিশ্বাসী ব্রজভূমে ! চোখে আসে জল ; বুকে থামে বন্ধুর রথ ! ভূমি যে ভূমা, এ বিশ্বাস সনাতন, সৃষ্টির ঊষাকালে উদ্ভূত ভারতের ; আর ভারতীয় সাধকের।

প্রাচীন ভারত বলেছে, মধুঃ ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মধু ক্ষরিত হচ্ছে আকাশে, বাতাসে, আলোয়, অন্ধকারে। শুধু পৃথিবীর ধূলি, তৃণ, বৃক্ষ, সমুদ্র নয় মধুময়, নবীন ভারতের সাধকের দিব্যতনু দিয়েও সেই মধু ক্ষরণ, সেই মধুর ক্ষরণ ঘটেছে ভাগ্যবানদের চোখের সামনে। বিজয়কৃষ্ণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিচ্ছেন কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। বলছেন, মধুলোভী মৌমাছির দল ঠাকুরের দিব্যদেহকানন জুড়ে গুনগুন করছে, অলস অপরাহ্ন বেলায়। পিঠ মুছিয়ে দিতে দিতে বিস্মিত বিস্ফারিত দৃষ্টি কুলদানন্দের স্বীকৃতি: 'মানুষের শরীরে ঘর্মাকারে মধু বাহির হয়—কোথাও শুনি নাই, কোনও পুস্তকে পড়ি নাই।'

'জীবন যখন শুখায়ে যায় করুণাধারায় এসো' ! বিষয় চিন্তায়, লোভ, লালসা, স্বার্থে কুটিল, তর্কে জটিল ধরণী যখন মরুভূমির মতো ধূ-ধূ-ময়, তখন এসো, রাম আর কৃষ্ণ ! রামকৃষ্ণ আর বিজয়কৃষ্ণ !,—তোমরা যারা মধুময় !

কিন্তু অন্তরের সুধায় যাঁরা বসুধায় দেন ভরে, তাঁরা নিজেরা পান করেন গরল। হিন্দুর যিনি দেবাদিদেব,—তিনি অমৃত বিলোন ; পান করেন বিষ। যাঁর ঘরণী অন্নপূর্ণা, অন্নভিক্ষা করেন তিনি ! মুহূর্তে যিনি ইন্দ্র বরুণ, চন্দ্র, সূর্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারেন, তিনি বাস করেন শ্মশানে। যাঁর কণ্ঠে মাল্য দিয়েছেন উমা, তাঁর গলা জড়িয়ে আছে সাপ ; আর সাপের বিষে কণ্ঠ হয়েছে নীল। জীবন্ত শংকরভাষ্য হচ্ছে এই ভারতবর্ষ। এই ভাষ্য, যে বুঝতে পারেনি, শংকরের ভাষায় গ্রহণ করতে পারেনি মর্ম সে বোঝেনি শংকরক্ষেত্র কাশীকে। যিনি বুঝেছেন, তিনি কেবল তিনিই বলতে পেরেছেন, যে ভোলানাথ প্রতিদিনের তুচ্ছ সুখের কাঙাল নন ; প্রত্যহের অতীত আনন্দের অধিকারী। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য সবাই ব্যস্ত সিংহাসন রক্ষায়। স্বর্গ, মর্ত্যলোকে কেউ সাধনায় বসলেই তাই কাঁপিতে থাকে ইন্দ্রের বুক ; যদি টলে যায় ইন্দ্রের আসন। তাই আসে অপ্সরী লোভের বেশে ; ভয়ের ছদ্মবেশে দেখা দেয় মার। যাতে,—সাধনায় বিঘ্ন ঘটে ; নিরাপদ থাকে ইন্দ্রের আসন। কিন্তু সব দেবের মধ্যে যিনি আদিদেব, তাঁকে দেখো একবার। তাঁকে ডাকো একবার। বেলপাতা মাথায় দিয়ে বলো: যার মাথায় হাত দেব, তার মাথা তখনই চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে,—আশীর্বাদ দাও এই। সংগে সংগে মঞ্জুর করেছেন তোমার প্রার্থনা আশুতোষ। খেয়াল নেই যে এই অসুরহস্তস্পর্শে জটাজালজড়িত ধূর্জটিমস্তকও ধূলিসাৎ হবে মুহূর্তে ; কারণ এ-হাত তাঁর বরে বরীয়ান।

ইনিই সেই কাল, যাঁর মন্দিরা দুহাতে বাজে। ফুলে বাজে কাঁটায় বাজে। সুখে বাজে দুখে বাজে। আলোছায়ার জোয়ার ভাঁটায় সকাল সাঁঝে ভালোয় মন্দে আশায় শংকায় বাজে তাঁর ডবুকা। কাশী সেই মহাকালের আবাসস্থল সেখানে ষণ্ড, পাষণ্ড, ভণ্ডের সঙ্গে আছেন এমন সাধু যিনি চোখের পলক পড়বার আগে লণ্ডভণ্ড করতে পারেন সৃষ্টি। সতীর সংগে পতিতা, জন্ম হবে না যার তার সংগে জন্মের ঠিক নেই যার, সে, এই কাশীর গলিতে আছে গলাগলি করে কোন্ অনাদিকাল থেকে তা জানেন ওই দেবাদিদেব কাল ! কাশী কেবল শংকরভূমি নয় ; সংকর ভূমিও বটে।

কেবল শংকর নন, শংকরভূমি এই ভারতে এসেছেন যাঁরা ভগবানের দূত, তাঁরাও গ্রহণ করেছেন গরল। বিলিয়েছেন অমৃত। কেবল এদেশে নয় ! কোন্‌দেশে নয় ? যীশু রক্তাক্ত হয়েছেন তাঁদের হাতেই যাদের উদ্দেশে বলেছেন: Forgive them ! সক্রেটিশ বিষপাত্র গলাধঃকরণ করতে করতে বলেছেন ; যাদের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ, আমাকে হত্যাকরাই তাদের যুক্তিযুক্ত। অতএব এ আমার পুরস্কার ! রামকৃষ্ণের গলায় যদি ক্যান্সার না হয় তাহলে আমাদের ক্ষত নিরাময় হবে কেন ? সার-বস্তু বিলোতে পারেন তিনিই, ক্যান্সার যার দেহকে মৃত করে ; বসুন্ধরাকে করে অমৃত।

রাম আর কৃষ্ণ ! রামকৃষ্ণ আর বিজয়কৃষ্ণ সকলেই হাস্যমুখে অদৃষ্টের পরিহাস করেন বারবার। জগন্নাথক্ষেত্রে ঘনিয়ে আসে জীবনের সন্ধ্যা বিজয়কৃষ্ণের। সেই বিজয়কৃষ্ণ যাঁকে হনুমানের মতো বুক চিরে দেখাতে হয়নি ইষ্টদেবতাকে। ইষ্টদেবতা যাঁর বুকের ওপরেই হয়েছেন আবির্ভূত। পুরীর সমুদ্রতীরে যেতে অসমর্থ বিজয়কৃষ্ণ বসে থাকেন ঘরে ; বাইরে থেকে লোক ঘরে এসে দেখে,—বিজয়কৃষ্ণের জটা দিয়ে জল ঝরছে সমুদ্রের।

[বিজয়]-কৃষ্ণের ডাকে যদি সিন্ধু ঘরে না আসে তাহলে কৃষ্ণের নাম হবে কেন কৃপাসিন্ধু ? এই পুরীতেই, জগন্নাথক্ষেত্রেই, জগতের যত অনাথের উদ্ধারকল্পে, কৃষ্ণের কথা ; 'সম্ভবামি যুগে যুগে', —রাখতে এসেছিলেন যে বিজয়কৃষ্ণ, তাঁকে ঈর্ষাতুর সত্য-ভীত কাপুরুষরা তুলে দেয়, বিষমিশ্রিত প্রসাদী নাড়ু। অন্তর্যামী বিজয়কৃষ্ণ, হেসে, ভালোবেসে মুখে তুলে দেন সেই গরল। গরল নয় ; প্রসাদ ! মুখে তুলে নেন সেই প্রসাদ সকলের সম্মুখে বিজয়কৃষ্ণ ! ইষ্ট যাঁর সহায় তাঁর দেহের অনিষ্ট করতে পারে বিষ ; কিন্তু তাঁর অমৃত বিনষ্ট করে কে ?

সকালবেলার ভৈরবী যেমন, সন্ধ্যাবেলার এই পুরবীও তেমনি সুরভিতে ভরে দেয় জীবনের শেষ,—অশেষ সন্ধ্যাকে।

রাম যান ; আসেন কৃষ্ণ ! রাম-কৃষ্ণ দুই যান ; আসেন রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ যান ; আসেন বিজয়কৃষ্ণ। বিজয়কৃষ্ণ যান ; কিন্তু কৃষ্ণ-বিজয় আজও অব্যাহত এই ভারতভূমিতে ! কারণ বিজয়কৃষ্ণের মুখে কৃষ্ণের কথাই পুনরুক্ত ; সম্ভবামি যুগে যুগে। [ক্রমশঃ]

সংগীত ও সমাজ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীজ্যোতির্ময় মৈত্র

অত্থকামোসি মে যক্‌খ হিতকামসি দেবতে,
করোমি তুযহং বচনং আচরিয়ো মম।
উপেমি বুদ্ধং সরণং ধনমঞ্চাপি অনুত্তরং,
সংঘঞ্চ নরদেবস্‌স গচ্ছামি সরণং অহং।

[অর্থকামী আমার যক্ষ, হিতকামী হে দেবতা, শুনব তোমার কথা, তুমি আমাদের শিক্ষাদাতা, বুদ্ধের শরণে যাব, অনুত্তর ধর্মের। শরণে সংঘের আর যাব নর-দেবেশের কাছে] ॥

এছাড়া আরেকটি ধ্রুপদে প্রাণিহত্যা থেকে যে ক্ষিপ্রতা, উত্তেজনা তা থেকে বিরত থাকব, অমত্তপ হ'ব, মিথ্যাকথা বলব না, তুষ্ট থাকব নিজ দারে নিরত থেকে। এই সকল কথা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন—

পাণাতিপাতা বিরামামি খিপপং লোকে অদিন্নং পরিবজ্জয়ামি,
অমজ্জপো নো চ মুসা ভণামি সকেন দারেন চ হোমি তুট্‌ঠো তি।

আর একটি ধ্রুপদে বর্ণিত হয়েছে স্থিত যে দেবতা তুমি কান্তবরণে উদ্ভাসিত হয়ে দশদিক তারা ওষধিরে (ফলপাকান্ত উদ্ভিদ, যে গাছ একবার ফল দিয়ে মরে যায় যেমন ধান, কলা প্রভৃতি) ভূলোকেতে প্রবর্তন করে পুণ্য করেছ। সেই কথাই হে প্রভাবশালী দেব তোমাকে শুধাই।

অভিক্কন্তেন বণ্ণেন যা ত্বং তিট্‌ঠসি দেবতে,
ওভাসেন্তি দিসা সব বা ওসধী বির তারকা;
পুচ্ছামি তং দেব মহানুভাব মনুস্‌সভূতো কিমকাসি পুঞ্‌ঞং ॥

আর একটি ধ্রুপদে বলছেন—সুপ্রসন্ন মনে যদি কোন লোক কিছু বলে বা কাজ করে তাহলে ছায়া যেমন মানুষের সংগে সংগে থাকে তেমনি সুখ তার সাথে সাথী হয়ে কাছে কাছে ঘোরে।

মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া,
মনসা চে পসন্নেন ন ভাসতি বা করোতি বা;
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়াব অনপায়িনী

আর একটি ধ্রুপদ গাথায় প্রকাশ পেয়েছে, যাঁহারা বাহ্য শোভা দেখে বিহরণ করেন, ছয় ইন্দ্রিয়ে অসংযত, মাত্রাহীন ভোজনে রত, অলস উত্তমহীন যাঁর আচরণ, সেই রকম লোক বাত্যাহত গাছের মতন মার তাহাদের বিনাশন করে। [মার কথার অর্থ প্রহার কিন্তু মার অর্থে মদনকেও বোঝায়। ইনিও নাকি একবার বুদ্ধদেবের তপস্যায় বিঘ্ন করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ভুল বুঝতে পেরে অনুগামী হন]

সুভানুপস্‌সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু অসংবুতং,
ভোজনম্হি অমত্তঞ্ঞুং কুসীতং হীনবিরিয়ং,
তং বে পসহতি মারো বাতো রুক্‌খং ব দুব্বলং।

এর পরে আরেক ধ্রুপদ গাথায় বর্ণিত হয়েছে, এই মার তাহাকে পরাজিত করতে পারে না। এই তাহাকে বলতে বলছেন—যে সুন্দর বাহ্য শোভা, না দেখে অন্তর দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে বিহরণ করেন। ইন্দ্রিয়ে সুসংযত শ্রদ্ধারত বীর্য্যযুত, বুঝে মাত্রাজ্ঞানী হয়ে সর্বদা ভোজন করেন তিনি ঝড় জলে পর্বত যেমন নড়ে না তেমন আয়ুষ্মান হতে পারেন।

অসুভানুপস্‌সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু সুসংবুতং,
ভোজনম্হি চ মত্তঞ্ঞুং সদ্ধং আরদ্ধ বীরিয়ং,
তং বে নপ্পসহতি মারো বাতো সেলংব পব্বতং।

আর একটি ধ্রুপদ গাথায় পাওয়া যায় ধর্মরক্ষা ও ধর্মাচারণ যাঁরা করেন। এই ধর্মাচারিগণ সুখে বিহরণ করেন তাঁরা দুর্গতি প্রাপ্ত হন না এই হল' ধর্মাচারণ।

ধম্মো হবে রক্‌খতি ধম্মচারিং
ধম্মো সুচিন্নো সুখমাবহাতি,
এসানিসংসো ধম্মে সুচিন্নে,
ন দুগ্‌গতিং গচ্ছতি ধম্মচারী।

আর ধ্রুপদ গাথায় বর্ণিত হয়েছে নানাগন্ধপুষ্প একস্থানে সমাবেশ করে ফুলের আসন রচনা করে বলেন ওহে বীর! রচিয়াছি তোমার উপযুক্ত আসন এই ফুলের আসনে উপবেশন করে আমার হৃদয়কে তৃপ্ত কর।—

নানাপুপ্‌ফঞ্চ গন্ধঞ্চ সন্নিপাতে ত্বা একতো,
পুপ্‌ফাসনং পঞ্ঞপেত্বা ইদং বচনমব্রবি।
ইদং মে আসনং বীর পঞ্ঞত্তং তবরহছবিং,
মম চিত্তং পসাদেন্তো নিসীদ পুপ্‌ফমাসনে।

আর একটি ধ্রুপদগাথায় বর্ণিত হয়েছে ইহলোকে পরলোকে কৃতপুণ্য জন, উভয় লোকেতে হন প্রমুদিত মন। নিজের কাজে বিশুদ্ধি দেখে শান্তি, ও আমোদ-প্রমোদ অনুভব করেন।

ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপুঞ্ঞো উভয়ত্থ মোদতি,
সো মোদতি সো পমোদতি দিস্বা কম্মবিসুদ্ধিমত্তনো

এই সকল চর্যা-ধ্রুপদ একপ্রকার প্রবন্ধ। আজকাল ধ্রুপদ গানে যেমন স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ এই চারটি কলি থাকে, বর্ণিত প্রবন্ধ গানে তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। মধ্যযুগের গৌড়ীয় প্রবন্ধ গানেও চারটি কলির প্রয়োগের প্রকাশও জানা যায়।

পূর্বে উল্লিখিত অনুরাধাপুর সিংহলের ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীগুলির মধ্যে প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম শহর, সে কালের এই শহর দশ কিলোমিটার

জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। এখানকার পবিত্র 'বোধিবৃক্ষ' যাহা আসল বোধি যে বৃক্ষের নিকটে বুদ্ধ জ্ঞান চর্চা করে আলো আর পথ দেখেছিলেন সেই গাছের কলমের চারা দুই হাজার বছরের পুরাতন এবং সেই রকম অন্যান্য স্মৃতিস্তম্ভগুলিও বিরাজ করছে। এখানে অনেক বৌদ্ধ পাঠ মন্দির এবং ঘণ্টাকৃত Shirin নিরেট ইঁটের রহিয়াছে এইগুলি পবিত্র ভস্মাবশেষের উপর নির্মিত। ইহাদের মধ্যে বৃহত্তম যেটি সেটিতে কুড়ি 'মিলিয়ান' কিউবিক ফিট ইঁট রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। (The Jetawanarama Dagoba) যাহার দ্বারা দশ ফুট উঁচু এবং এক ফুট চওড়া একটি দেওয়াল যাহার বিস্তৃতি ধরুন লণ্ডন থেকে এডিনবরা পর্যন্ত করা যেতে পারত। এই সকল ইঁট নরম কাদা, কোয়ার্টজ পাথর, আংশিক ভাবে শুকনো তৃণ, মধু এবং বেল ও শিরিষ একত্রে মিশ্রিত করে হাতি দিয়ে পিষ্ট করে তাহার পরে সেঁকে নেওয়া হত। বৃহৎ প্রাকৃতিক বিশ্ববিদ্যাবিহারটি চার হাজার ফিট ছিল উচ্চতায় সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে। এই সকল বিহার শান্তি-মানবতা, সেবা, রোগমুক্তির গবেষণার ধারক ও বাহক থেরা সমাজের সম্পাদক কাশ্যপ-এর প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়ে ছিল। এই সকলের সংগে যুক্ত সংঘের বিখ্যাত ফ্রেসকো চিত্রকলার রংগুলি পনের শত বছর আগে যেমন ছিল এখন তেমনই আছে। এই সকল দেখতে সমতল ভূমি থেকে ৪০ ফুট লম্বা একটি মই প্রয়োজন হয়।

এই সকল সংঘে চিন্তাশীল মহামানবগণের মতবাদ আদর্শ সংগীতে প্রকাশ পেত। এই ঘরাণা গৌড়ীয় সমাজ থেকে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েছিল। বর্তমান যুগে গৌড়-রাষ্ট্রের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তবে ময়নামতির গান, মহাযানী, মহাজন-পদকীর্তন, বাল্মীকির গান, গীতগোবিন্দ-গান, কৃষ্ণ-কীর্তন, পাওয়া যাচ্ছে। গায়কিতে সেকালে টপ্পার প্রভাব খুব বিস্তৃত ছিল তার অনুমান মালদহের গম্ভীরা, বাঁকুড়ার টুসুগান, আর গাজনের গায়ন ভংগীতে প্রভাবান্বিত। কিন্তু বৈদিক-সংগীতের অনুশীলন যখন প্রভাবিত হয়েছে এই সাধন দর্পণ গানে, তখনই আবার টপ্পার প্রভাব কমে গিয়েছে।

নজরুলের কয়েকটি গানের উৎস

আব্দুল আজীজ আল্-আমান

নজরুল-সংগীতকে যাঁরা জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ রূপে প্রচলিত ও প্রিয় করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম—সুরশিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদ। আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠেই নিখিল বাংলায় নজরুল-গীতি অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বিশেষ করে ইসলামী সংগীত আর পল্লীগীতিগুলি শিল্পীর কণ্ঠের আকুতি ও আন্তরিকতায় চাষী-চাকুরে সবার কাছে জল-হাওয়ার মত একান্ত আপন হ'য়ে উঠেছিল।

সংগীত রচনার ক্ষেত্রে নজরুল বিস্ময়কর রেকর্ডের অধিকারী। কেউ এসে অনুরোধ জানাল আধুনিকের, কেউ পল্লীগীতির, কেউ কীর্তনের, কেউ জারি গানের, কেউ মুর্শিদীর, কেউ ইসলামী সংগীতের, কেউ বা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ওপর ছোট্ট একটি নাটিকার। ঠিক আছে। কারো আশা ভঙ্গ করবেন না কবি। এক বাটা পান আর কেটলীখানেক গরম চা নিয়ে দারুণ প্রতিকূল অবস্থায় কবি সংগীত রচনায় আত্মনিয়োগ করতেন। সংগীত রচনার সময় পান তাঁর চাই-ই। এক সময় কবিরা বাসাবাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন পান বাগান লেনে। সে সময় প্রায়ই তিনি হাস্য রসিকতা করে বলতেন: "থাকি আমি পানবাগানে—গান বা পান আমার চাই।"

পানের বাটা শেষ করে হাটের মাঝ থেকে যথাসময় নিষ্ক্রান্ত হ'লেন কবি। হাতে পাণ্ডুলিপি—ভিন্নজাতীয় বার খানা উৎকৃষ্ট গান রেকর্ডিং-এর অপেক্ষায়। রচনার সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপিও তৈরী করে ফেলেছেন।

প্রকৃতপক্ষে নজরুলের সৃষ্টির শেষ অধ্যায় সুরলোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এ সময় তাঁর কবিতার অস্থায়িত্বের কথা উল্লেখ করে অনেকেই অনেক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন কিন্তু তাঁর সংগীত সম্পর্কে এ ধরণের কথা উঠলে তিনি রীতিমত ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠতেন। প্রতিবাদে বলতেন, "আমার কবিতা নিয়ে তোমরা যা' ইচ্ছে তাই" বলতে পার কিন্তু সংগীত সম্বন্ধে নয়।" হুজুগের মাথায় সমসাময়িক ঘটনাবলীকে অবলম্বন করে অনর্গল কবিতা লিখলেও প্রকৃতপক্ষে সংগীত ছিল কবির জ্ঞানলোকের সামগ্রী।

এখন বিভিন্ন জাতীয় সুরের স্বী-করণ ও সংগীত রচনায় অসামান্য তৎপরতার বিষয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক্।

মেগাফোন কোং-এর রিহার্সাল রুমে একদিন মরহুম গায়ক আব্বাসউদ্দীন আহ্মদ (ইনি ১৯৫৯ খৃঃ ৩০শে ডিসেম্বর, বুধবার,

সকাল ৭-২০ মিঃ পরলোকগমন করেছেন) পূর্ববঙ্গের একটি ভাওয়াইয়া গানের সংবিশেষ সুর-সহযোগে গেয়ে অবসর বিনোদন করছিলেন। গানের কলিটি এই :

"নদীর নাম সই কচুয়া
মাছ মারে মাছুয়া
মুই নারী দিচোং ছেকাপাড়া"—

ভাওয়াইয়া হ'ল পল্লীগীতি। এর সুরের একটি বিশিষ্টতা আছে। সুরটা কাজী কবির অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। আব্বাসউদ্দীন গান থামাতেই তিনি এসে বললেন—"আমি যতক্ষণ না তোমাকে থামতে বলি—ততক্ষণ তুমি একটানা গেয়ে যাও গানটা।" আব্বাসউদ্দীন বুঝলেন ব্যাপারটা। তিনি গেয়ে চললেন একটানা। হঠাৎ এক সময় কবি বললেন "থাম।" হাতে তাঁর পাণ্ডুলিপি। বললেন, "এবার অবিকল ঐ সুরে গেয়ে যাও এই গানটি।" ক' মিনিট-ই বা, কবি ইতিমধ্যে রচনা করেছেন তাঁর সেই বিখ্যাত পল্লীগীতি :

নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা
পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি।
আমি যাব না আর অঞ্জনাতে
জল নিতে সখী লো
ঐ আঁখি কিছু রাখিবে না বাকী।"

গানটি পরে আব্বাসউদ্দীন রেকর্ড করেন।

কবি-বন্ধু জনাব মঈনুদ্দীন তাঁর "যুগ-স্রষ্টা নজরুল" গ্রন্থে কবির আর একটি উল্লেখযোগ্য সংগীতের জন্মেতিহাস বর্ণনা করেছেন।

মিশর থেকে সে সময় কলকাতায় আসেন ফরিদা বেগম—মিশরের বিখ্যাত নর্তকী ও গজল গাইয়ে। মহাত্মা গান্ধী রোড ও কলেজ স্ট্রীটের সংযোগ স্থলের নিকট ছিল অ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চ। এই রঙ্গমঞ্চে নৃত্য পটীয়সী ফরিদার নৃত্যকলার একটি অপূর্ব অনুষ্ঠান হয়। কবি এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নৃত্যের পর বসে তাঁর গজল গানের আসর। এই মহিলার কণ্ঠে একটি উর্দু গজল গান শুনে কবি অত্যন্ত মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন এবং গজল গানের সুর অনুকরণ করে তিনি সেদিনই রচনা করেন "মাসে বসন্ত ফুল বনে, নাচে বনভূমি সুন্দরী।" গানটি ১৩৩৩ সালের পৌষ সংখ্যা সওগাতে প্রকাশিত হয় এবং সম্ভবতঃ দিলীপকুমার রায় এ সংগীতে কণ্ঠ যোজনা করেন।

বাংলা-সংগীতের ইতিহাস নজরুলের সব থেকে বড় অবদান তাঁর গজল গান। নজরুল কেবল গজল গানের উৎসমূল খুলে দেননি—বরং দু' কূল প্লাবী ভাব-বন্যায় তাকে প্রাচুর্যেও প্রাণবন্ত করে গেলেন। কবির এই গজল গান রচনার উৎস কি সে সম্পর্কে যথেষ্ট মতদ্বৈধতা র'য়েছে। কবি-বন্ধু শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত সরকার গজল গান রচনার প্রাথমিক সূচনা হিসেবে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের একদিন ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ তথ্যটি সম্ভবতঃ সঠিক নয়। প্রথমত নজরুল যখন সৈনিক হয়ে যুদ্ধে গমন করেন (১৯১৭ খৃঃ) তখনই তিনি হাফিজ ওমরের

[illegible]

রুবাইয়াৎ ও গজল গানের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরার (১৯২০ খৃঃ প্রথম দিক) অব্যবহিত পর হতেই "মোসলেম ভারত" "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা" ইত্যাদিতে কবিতার সাথে তাঁর কিছু কিছু গজল গানও মুদ্রিত হ'তে থাকে। তৃতীয়ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নজরুল যে দিন বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে কলেজ ষ্ট্রীটে জনাব মুজফ্ফর সাহেবের বাসায় এসে ওঠেন সেদিন অন্যান্যদের অনুরোধে নজরুল "পিয়া বিনা মোর হিয়া না মানে বদরী ছাইরে" এই হিন্দুস্থানী গজল গানটি গেয়ে শোনান। সুতরাং নলিনীবাবু গজলগানের উৎস হিসেবে যে ঘটনাটির কথা উল্লেখ করেছেন সেটি সঠিক নাও হ'তে পারে। আমাদের মনে হয় সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করার পর যে পাঞ্জাবী মৌলভী সাহেবের কাছে কবি উর্দ্দু এবং ফার্সী পড়া আরম্ভ করেন তাঁর কাছ থেকেই তিনি গজল গানের রসাস্বাদন করেন। যাক—গজল গান রচনার উৎস-ভূমি যাই হোক নলিনীবাবু যে ঘটনাটির কথা উল্লেখ করেছেন তা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসেবে একাধারে তা সত্য এবং নজরুল-রচিত রচনার উপাদান হিসেবে সবিশেষ মূল্যবান। এই ঘটনাটির মধ্যেও কবির বিখ্যাত গজলগান "নিশি ভোর হলো জাগিয়া, পরাণ পিয়া" এর উৎস লুকিয়েছিল।

নলিনীবাবুর বিবরণই তুলে দিলাম : "এই সময় নজরুল রয়েছেন একদিন আমাদের বাড়ীতে। দু'টি হিন্দুস্থানী পথচারী ভিখারী—একজন পুরুষ, অপরটি নারী হারমোনিয়ামের সঙ্গে উর্দ্দু গজল গেয়ে উর্দ্ধ মুখে চলেছে সারা পল্লীতে মধুবর্ষণ করতে করতে। নজরুলের আগ্রহে আমার বৈঠকখানায় তাদের ডেকে এনে গান শোনার ব্যবস্থা হ'ল। অনেকগুলো গান শুনিয়ে তারা বিদায় নিল। নজরুল তক্ষুনি বসলেন গান লিখতে। তাদের "জাগো প্রিয়া" গানটির রেশ তখনও আমাদের কানে যেন ধ্বনিত হচ্ছে। এই গানের সুর অবলম্বন করে নজরুল কয়েক মিনিটের মধ্যে লিখে ফেললেন—"নিশি ভোর হ'লো জাগিয়া, পরাণ পিয়া" গানটি। তাঁর গজল গান লেখার শুরু এখান থেকে।"

এক উৎকৃষ্ট আধুনিক গানের জন্মেতিহাসের যে কৌতুককর বিবরণ জনাব আব্বাসউদ্দীন আহমদ তাঁর "আমার শিল্পী-জীবনের কথা"য় দিয়েছেন সেটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

একদিন গ্রামোফোন কোম্পানীতে আব্বাসউদ্দীন এবং তৎকালীন অন্যান্য অনেক খ্যাতনামা গাইয়ের দল বসে খোশ গল্পে মেতে উঠেছিলেন। এমন সময় একটা প্রশ্ন উঠল : "লটারীতে যদি সবাই লাখ খানেক করে টাকা পাও তবে তোমরা তোমাদের প্রিয়া বা স্ত্রীকে কে কি ভাবে সাজাতে চাও।" প্রশ্ন করলেন কাজী কবি। কলরব বন্ধ হ'ল। কিন্তু ক্ষণিক। একটু পরেই মতামত বর্ষাতে লাগল অবিরল ধারায়। কেউ বললে "আমি এখনই চলে যাব কমলালয় ষ্টোর্সে" কেউ বা বললে, "ওয়াসেল মোল্লা"য়। নানা জনের আরো নানা কথা, মন্তব্যের শিলাবৃষ্টি। এবার কবি এগিয়ে এলেন। হারমোনিয়াম নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'ল তাঁর প্রিয়াকে সাজানোর কাজ। বলাবাহুল্য গগনচারী উদ্দাম কল্পনার সাহায্যেই তিনি বিনা পয়সায় সাজালেন তাঁর অনন্ত প্রিয়াকে। সৃষ্টি হ'ল বাংলার আধুনিক সংগীতের একটি নিত্যকালীন সম্পদ :

মোর প্রিয়া হ'বে এসো রাণী দেব খোঁপায় তারার ফুল।
কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তীথির চৈতী চাঁদের দুল।
কণ্ঠে তোমার পরাবো বালিকা
হংস-সারির দোলান মালিকা
বিজলী জরির ফিতায় বাঁধিব মেঘ রং এলো চুল।
জোছনার সাথে চন্দন দিয়ে মাখাব তোমার গায়।
রামধনু হ'তে লাল রং ছানি আলতা পরাব পায়।
আমার গানের সাত সুর দিয়া
তোমার বাসর রচিব যে প্রিয়া
তোমারে ঘিরিয়া গাহিবে আমার কবিতার বুল বুল।

আমার কথা (৮৫)

সাগর সেন

অফুরন্ত সম্ভাবনা আর প্রাণপূর্ণ প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে তরুণের দল আজকের দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেছেন শক্তিমান সুরশিল্পী শ্রীসাগর সেন তাঁদের অন্যতম। প্রতিভা ও নিষ্ঠায় আজ তাঁকে রসিক সমাজে এক বিশেষ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শুধু প্রতিভা ও মেধাই তাঁর আয়ত্তাধীন নয় এক পরম সৌজন্যবোধ ও বিনম্র বিনয়ী মনোভাবেরও তিনি অধিকারী। ফরিদপুরের এক বিশিষ্ট জমিদার পরিবারে এঁর জন্ম। জন্মেছেন ক'লকাতায়। ১৩৩২ সালের ১৫ই মে তারিখে। শ্রীবিজয়বিহারী সেনের চতুর্থ এবং কনিষ্ঠ পুত্র ইনি। বালিগঞ্জের তীর্থপতি ইনষ্টিটিউশানে এঁর বিদ্যারম্ভ। ১৯৪১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হলেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে। আই, এস, সি, পাশ করেন ঐ কলেজ থেকেই।

গানের চর্চা তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। রাত্রির তপস্যা ছবিটিকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্রের নেপথ্য-কণ্ঠশিল্পী হিসাবে তাঁর যোগাযোগের সূচনা। রাত্রির তপস্যায় অবশ্য তিনি একক গান নি, সমবেত সঙ্গীতে অংশ নিয়েছিলেন। সাগর সেন রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও অন্যান্য সঙ্গীতেও যথেষ্ট পারদর্শী, বিভিন্ন সঙ্গীত তাঁর কণ্ঠ থেকে এক অপূর্ব
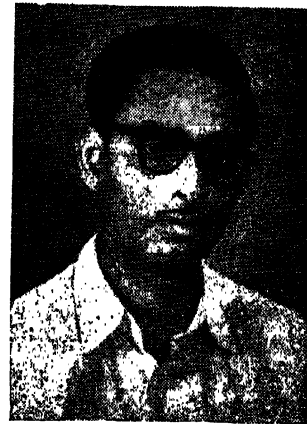
সাগর সেন

মাধুর্যে গরিমমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতে এঁর গুরু দ্বিজেন চৌধুরী, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সুখেন্দু গোস্বামী ও ওস্তাদ আলী আকবর খান সাহেবের কাছে ইনি শিক্ষালাভ করেন। জলজঙ্গলে নিত্যানন্দ প্রভু, নদের নিমাই, কালামাটি প্রভৃতি ছবিগুলির কণ্ঠসঙ্গীতে ইনি অংশ নিয়েছেন। এঁর আপাততঃ শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি শান্তি, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান 'চরণ ধরিতে দিও গো আমারে' শিল্পীর কণ্ঠে এক অভিনব রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯৫১ সাল থেকে বেতার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এঁর যোগাযোগ। বেতারের মাধ্যমে ইনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ভজন পরিবেশন করে থাকেন। শিল্পী হিসেবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, মালতী ঘোষাল, রবিশঙ্কর, আলী আকবর, কণ্ঠে মহারাজ, পালুশকার প্রভৃতি সাগর সেনের শিল্পীমনে এক অমলিন স্বাক্ষর বিদ্যমান। কর্মজীবনে তিনি কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত।

সাগর সেনের মতে গানকে অন্তর দিয়ে ভালবেসে তার সাধনা করলে সে সাধনা ফলবতী হবেই, তার সফলতা অপ্রতিরোধ্য। শিল্পী হওয়ার সাধনার প্রকৃত মূলধন কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন—আন্তরিকতা এবং সততা। আকাঙ্খা তো আছেই, আকাঙ্খা না থাকলে মানুষ বড় হতে পারে না। কিন্তু যে কোন সাধনায় আন্তরিকতা এবং সততাই সিদ্ধিলাভের সহায়ক। তিনি আরও বলেন যে, গর্ব ও দলাদলি এরা প্রকৃত পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আজকের দিনে সঙ্গীত জগতের পরিবেশ সম্বন্ধে শিল্পীর মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানান যে, আবহাওয়া ক্রমশঃ বাণিজ্যিক হয়ে উঠছে, শিল্পের স্পর্শ যেন ক্রমশঃই পাওয়া যাচ্ছে না, একটা বাণিজ্যিক মনোভাবের চিহ্ন যেন ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে।

এ প্রসঙ্গে পাঠক সমাজে একটি সুখবর নিবেদন করি। রেঙ্গুণের টেগোর সোসাইটির আমন্ত্রণে সাগর সেন আগামী ১৪ই মে রেঙ্গুণ যাত্রা করছেন। ইতিপূর্বে ভারতের নানা স্থানে তিনি গান শুনিয়েছেন। কিন্তু ভারতের বাইরে তাঁর অভিযান এই প্রথম। বৃহত্তম পটভূমিতে পদক্ষেপের এই সূচনা। তাঁর সামনে বৃহত্তর জগতের প্রবেশপথের সিংহদ্বারের অর্গলমোচন শুরু হ'ল। বিদেশে বাঙালী শিল্পী বাঙলার গৌরব বৃদ্ধি করে জয়মাল্য নিয়ে ফিরে আসুন সর্বান্তঃকরণে এই কামনাই করি।

তার সর্বোত্তম সঙ্গীত

সুকণ্ঠী পাপিয়ার কলগীতি থেমে গেছে চিরদিনের মতই। নগরীর সহস্র নন্দিতা সুন্দরী গায়িকা আজ চিরনিদ্রার কোলে শায়িতা। শোকস্তব্ধ পুরবাসীরা এসেছেন তাকে শেষ অভিবাদন জানাতে, সমবেত হয়েছেন ধর্ম্মমন্দিরে শোকানুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য।

মৌন গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে জনতা যাজক মহাশয়ের ভাষণ শুনছে, তিনি বলে যাচ্ছেন মৃতার জীবন কথা, সুখে দুঃখে কেমন অদম্য মনোবল বজায় থাকত তার, কি ভাবে সে অব্যাহত রেখেছিল তার প্রাণ প্রিয় গানকে সকল পরিস্থিতির মধ্যেও।

জনতা শুনছে সংহত মনোযোগে, অন্তরে কিন্তু তাদের একই প্রত্যাশা, কখন তারা শুনতে পাবে তাদের অতিপ্রিয় সঙ্গীতটি? স্বর্গতা গায়িকার সেই বিখ্যাত রেকর্ড?

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই অপার্থিব সুরসমৃদ্ধ মধুর সঙ্গীতটি অনুসরণ করে ফিরেছিল গায়িকাকে, তার নাম করলেই লোকের স্মৃতিতে বিশেষ ভাবে জেগে উঠত ওই বিশেষ গানটিরই কথা, গায়িকার সমস্ত সত্তা যেন একীভূত হয়েছিল ওই বিশেষ সঙ্গীতটির প্রাণসত্তায়।

অথচ শোকমুগ্ধ জনতার একাংশ অন্তত জানতেন এই জনপ্রিয় সঙ্গীতটির প্রকৃত কাহিনী, মৃতা গায়িকার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচিতির ফলেই সে কথা জানার অধিকার পেয়েছিলেন তাঁরা একদা।

তাঁদের স্মরণের তীর বেয়ে ভেসে আসে সে দিনের বিস্মৃতপ্রায় বিস্ময়কর ঘটনাবলীর কথা, মনে পড়ে যায় এই গানটি সম্পর্কে প্রথমাবধিই গায়িকার কি যে অসীম বিতৃষ্ণা ছিল।

সঙ্গীত প্রযোজক যখন নতুন গানটি তাকে পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করেন তখনই সে চমকে ওঠে, "অসম্ভব এ গান গাওয়া আমার কর্ম্ম নয়, আমি কক্ষণই গাইবো না এ গান।"

কি অদ্ভুত বিতিকিচ্ছি সুর, ঠিক মনে হয় যেন সুর নিয়ে একটা নেংটি ইঁদুর খেলায় মেতেছে।"

প্রযোজক মহাশয়ের অবিরাম কাকুতি মিনতিতে অবশেষে সম্মত হয়েছিল সে গানটি গাইতে ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও। স্তম্ভিতা হয়ে গিয়েছিল গায়িকা, প্রথম রজনীতেই গানটির অসামান্য সাফল্য দেখে।

প্রথম দিনই জনতা তাকে ছাব্বিশ বার গানটি গাইতে বাধ্য করেছিল পাদপ্রদীপের সামনে, অসংখ্য করতালিতে উৎসাহ দিয়েছিল তাকে—বার বার।

একরাত্রির মধ্যেই ওই সঙ্গীতটির মাধ্যমেই বিখ্যাতা হয়ে গেল সে, সঙ্গীতটির মধ্যেই ডুবে গেল ওর সমস্ত অস্তিত্ব। যে কোন জায়গায় ওকে দেখলেই লোকে ভিড় করে আসত ওই বিশের গানটি শোনার আশায়, কোন হোটেল বা রেস্তোরাঁয় ওর আবির্ভাব মাত্রই সেখানকার অর্কেস্ট্রায় বেজে উঠত ওই সঙ্গীতেরই সুর, যেখানেই ও থাক না কেন ওই সঙ্গীত যেন অশরীরী হয়ে অনুসরণ করত ওকে।

জীবনে আরও অনেক গান সে গেয়েছে কিন্তু সে সবই যেন ব্যর্থ হয়ে গেল এই একটি মাত্র গীতের ব্যঞ্জনায়।

পুরোহিত মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হয়ে গেল, প্রত্যাশী চোখে ধর্ম্মালয়ের সঙ্গীতমঞ্চের প্রতি দৃষ্টিপাত করে উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল শ্রোতৃবর্গ, কিন্তু না তাদের সকল প্রত্যাশা ব্যর্থ, সুর উঠল না মূক বাদ্যযন্ত্রের ভিতর, অনড় রইল গায়কবৃন্দ, উপাসনার সঙ্গেই সমাপ্তি ঘটেছে শোকানুষ্ঠানের, শেষযাত্রার ধর্মানুষ্ঠানে তাদের প্রিয়তমা গায়িকার স্মৃতিচারণ হল না তারই বিখ্যাত গীতটির সুরমাধুরী দিয়ে।

বিস্ময়বিমূঢ় জনতার মনে তখন শুধু একটাই প্রশ্ন কেন ওরা তার গানটি বাজাল না, কেন কেন কেন?

তারা জানত না যে বহু বছর ধরে ওই গানটির বিরুদ্ধে গায়িকার মনে কি সে ক্ষমাহীন বিদ্বেষ তিলে তিলে পুঞ্জীভূত হয়েছিল, ওরা জানত না যে মৃতার শেষ নির্দ্দেশ অনুসারেই তার শোকানুষ্ঠানে ওই সংগীত বর্জ্জিত হয়েছিল সম্পূর্ণ ভাবেই।

একমাত্র মৃত্যুর দ্বারাই গায়িকা 'ফ্রিজি শোক' শুরু করে দিতে পারল তার সামগ্রিক সত্তাগ্রাসী ওই সঙ্গীতকে শেষ পর্য্যন্ত।

মোহনবাগানের অষ্টমবার হকি লীগ লাভ

জনপ্রিয় মোহনবাগান এবার প্রথম ডিভিসন হকি লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে অষ্টমবার এই সম্মানের অধিকারী হয়। ১৯৩৫ সালে তারা প্রথম হকি লীগ লাভ করে। তারপর ১৯৫১, ১৯৫২ ও ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্য্যন্ত এক নাগাড়ে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরবের অধিকারী হয়। এর পর তাদের এবারকার সাফল্য।

কলকাতার অপর জনপ্রিয় দল ইষ্টবেঙ্গল এবার অপরাজিত ভাবে "রাণার্স আপ" হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে তারা ১৯৫৭ থেকে হকি লীগে অপরাজিত আছে।

এ বছর প্রথম গ্রুপ প্রথায় লীগের খেলা হয়। কুড়িটি দলকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়। ফিরতি খেলারও ব্যবস্থা থাকে। "এ" গ্রুপে মোহনবাগান ও "বি" গ্রুপে ইষ্টবেঙ্গল প্রথম স্থান লাভ করে। দু' গ্রুপের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী কাষ্টমস্ ও মহমেডান স্পোর্টিং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় তারা মূল প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা অর্জ্জন করে।

হকি খেলায় বিশেষ করে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের চ্যাম্পিয়নশিপ নির্দ্ধারক খেলার যেরূপ ভিড় দেখা গেছে—তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কলকাতার দু' প্রধান মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল হকির দিকে নজর দেওয়ায় ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে খেলার আকর্ষণটা বেশ বাড়ছে বলে মনে হয়। কিন্তু যখন দু দলের খেলোয়াড়দের তালিকার দিকে তাকান যায়, তখন দুঃখবোধ করতে হয়। কৈ বাঙ্গালী খেলোয়াড় তো নেই? মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের পরিচালকমণ্ডলী এদিকে একটু নজর দিবেন—এটাই সকলে আশা করেন।

পাঁচটি টেষ্টেই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয়লাভ

বিশ্ব ক্রিকেট ইতিহাসে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল এক নতুন সম্মান লাভ করে। শেষ টেষ্টে ভারতকে তারা পরাজিত করে পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচেই জয়ী হবার গৌরব অর্জ্জন করে। এর আগে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া এই গৌরবের অধিকারী হয়েছে। ভারত ১৯৫৯ সালেও ইংলণ্ডের কাছে পাঁচটি টেষ্টে পরাজিত হয়েছিল।

ভারত পাঁচটি টেষ্ট ও প্রথম শ্রেণীর তিনটি ম্যাচের মধ্যে একটিতে পরাজিত হয়েছে। দুটি খেলা অমীমাংসিত থাকে। তবে তারা সফরের শেষ খেলায় উইণ্ডওয়ার্ড ও লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ দলকে পরাজিত করে একমাত্র জয়লাভের অধিকারী হয়।

এবারকার টেষ্ট পর্য্যায়ের খেলায় ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যান ও [illegible] [illegible] পলি উম্রীগড় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন। এ পর্য্যন্ত তিনি ৫১টি টেষ্ট ম্যাচ খেলেছেন। এই সফরে উম্রীগড় ৪৪৫ রাণ করায় ব্যাটিং-এর গড়পড়তা দাঁড়ায় ৭৪'৪৪ এবং বোলিং-এ ৯টি উইকেট পাওয়ায় গড়পড়তা দাঁড়ায় ২৭'৬৬।

শেষ টেষ্ট ম্যাচে পিঠের মাংসপেশীতে টান ধরা সত্ত্বেও উম্রীগড় যে ভাবে ব্যাটিং করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। চতুর্থ টেষ্ট থেকে তাঁর খেলায় বিশেষ করে ব্যাটিং-এ বিশেষ উন্নতি দেখা যায়।

ভারতীয় দলের অধিনায়ক নরী কণ্ট্রাক্টর ভারতে ফিরে এসেছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন যে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সে যদি ক্রিকেটের উন্নতিকল্পে "বাম্পার" বল বন্ধ করা তাঁরা প্রয়োজন মনে করেন তা হলে তাঁরা তা করতে পারেন। তবে তিনি আহত হয়েছেন বলে "বাম্পার" বল বন্ধ করার জন্য তিনি কোন অভিযোগ করবেন না।

ভারতীয় দল সম্পর্কে কণ্ট্রাক্টর বলেছেন যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে পরাজিত হলেও ব্যাটিং মোটামুটি ভাল হয়েছে এবং তাঁরা দ্রুত রাণ তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের "স্পিন" বোলাররাও উল্লেখযোগ্য ফলাফল প্রদর্শন করেছেন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল ভারতীয় দল সম্পর্কে বলেছেন যে দলটি বেশ ভালই তবে হল-ভীতিই তাদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ।

ভারতের এবারকার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরের অভিজ্ঞতা তাদের ভবিষ্যত ক্রিকেট অনেকখানি আগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে হয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের কাছে তারা পরাজিত হয়েছে। এতে অমর্য্যাদার কোন কারণ নেই। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বর্ত্তমানে ভারতের খেলোয়াড়দের শিক্ষা দানের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে নিশ্চয়ই তা ফলপ্রসূ হবে। নিম্নে পঞ্চম টেষ্টের সংক্ষিপ্ত রাণ দেওয়া হলো :—

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস ২৫৩ (জি, সোবার্স ১০৪, কানহাই ৪৪, ম্যাকমরিস ৩৭; বসন্ত রঞ্জনে ৭২ রাণে ৪ উই: ও বাপু নাদকর্ণি ৫০ রাণে ৩ উই:)।

ভারত—১ম ইনিংস ১৭৮ (বাপু নাদকার্নি ৬১, দুর্ব্বি ৪১, উম্রীগড় ৩২; কিং ৪৬ রাণে ৫ উই: ও গিবস ৩৮ রাণে ৩ উই:)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—২য় ইনিংস ২৮৩ (ওরেল নট আউট ৯৮, সোবার্স ৫০, ম্যাকমরিস ৪২, কানহাই ৪১; দুর্ব্বি ৫৬ রাণে ৩ উই: ও দুরাণী ৪৮ রাণে ৩ উই:)।

ভারত—২য় ইনিংস ২৩৫ (উম্রীগড় ৬০, দুর্ব্বি ৪২, মাঞ্জরেকার ৪০, বিজয় মেহেরা ৩৯; সোবার্স ৬৩ রাণে ৫ উই: ও হল ৪৭ রাণে ৩ উই:)।

ভারত ১২৩ রাণে পরাজিত।

চারজন "ফাষ্ট" বোলারকে ভারতে আনার চেষ্টা

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের খ্যাতনামা "ফাষ্ট বোলার" চেষ্টার ওয়াটসন, ডেভিড হোয়াইট, চার্লি স্টেয়ার্স ও লেস্টার কিং ভারতের আগামী ক্রিকেট মরশুমের সময় পেশাদার হিসাবে ভারতে আসিয়া রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ ও "ফাষ্ট" বোলিং সম্পর্কে শিক্ষা দিবার জন্ম চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। এবারের ভারত-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট টেষ্ট পর্য্যায়ের তাঁহারা সকলেই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে বল করিয়াছেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের "ফাষ্ট" বোলারদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওয়েসলে হলকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানান হয়; কিন্তু তিনি আগামী মরশুমে অষ্ট্রেলিয়াতে শেফিল্ড শীল্ডে খেলবেন বলে আগেই ঠিক হয়ে আছে। হল ভারতের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করছেন। তবে অষ্ট্রেলিয়া মরশুম শেষ করে তিনি যাতে ভারতে আসেন তার চেষ্টা হচ্ছে।

এতগুলি "ফাষ্ট" বোলারকে ভারতে আনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ভারতের ব্যাটসম্যানদের প্রত্যেককে "ফাষ্ট" বোলিং-এ খেলার সুযোগ দেওয়া ও অভিজ্ঞতা লাভ। এইভাবে খেলোয়াড়দের "ফাষ্ট" বোলিং-এর বিরুদ্ধে খেলবার সাহস ও ভবিষ্যত টেষ্ট খেলায় ভারতের ব্যাটসম্যানদের "ফাষ্ট" বোলিং-এর বিরুদ্ধে শোচনীয় ব্যর্থতা প্রদর্শন করতে দেখা যাবে না।

ভারতের ক্রিকেট পরিচালকদের এই প্রচেষ্টাকে সকলেই সাধুবাদ জানাবেন। কিন্তু সকলের মনে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফর ঠিক করার সময় সেখানকার "ফাষ্ট" বোলার সম্পর্কে ভারতের ক্রিকেট পরিচালকদের কিছুই অজানা ছিল না। তাঁদের এই বিষয়ে পূর্ব্ব থেকে একটু সতর্কতা অবলম্বন করলে ভারতীয় ক্রিকেট দল এবারকার সফরে এতখানি হাস্যাস্পদ হতেন না। এবারকার শিক্ষা ভারতের ভবিষ্যত সফর সম্পর্কে কাজে লাগবে— সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সফর সম্পর্কে গোলাম আমেদ

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ম্যানেজার গোলাম আমেদ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফর সম্পর্কে বলেছেন, যে বোলাররা বল "ছোঁড়েন" ক্রিকেটে তাঁদের যোগদান নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স পরবর্ত্তী অধিবেশনে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। সর্ব্বস্তরের বিশেষ করে টেষ্ট ক্রিকেটে এই সকল বোলাররা সত্যই অবাঞ্ছনীয়। যাঁর বলে ভারতের অধিনায়ক নরী কনট্রাক্টর আঘাত পেয়েছিলেন— সেই গ্রিফিথ প্রসঙ্গে গোলাম আমেদ বলেছেন যে তাঁর মতন বোলারের খেলায় যোগদানে কোন অধিকার নেই। কারণ তিনি বল ছোঁড়েন। কোন জাতীয় "বাম্পার" বোলারদের বিধি-সম্মত অস্ত্র হিসাবে বিবেচিত হবে—সে সম্পর্কে গোলাম আমেদ ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সে সুস্পষ্ট নির্দেশের দাবী জানিয়েছেন। তাঁর মতে দু'তিন ওভারে, এমন কি প্রতি ওভারে একটি করে "বাম্পার" ফাষ্ট বোলারদের ন্যায় সঙ্গত অস্ত্র বলে বিবেচিত হবে। তবে "বাম্পারের" সস্তা প্রয়োগ ব্যাপারে এই অস্ত্রকে ব্যাটস্‌ম্যানদের ভয় করাবার জন্ম কখনই ব্যবহার করা হবে না।

ভারত ডেভিস কাপের পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইন্যালে উন্নীত

সম্প্রতি জয়পুরে ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের সেমি-ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সহজেই ৪—০ খেলায় ইরাণকে পরাজিত করে ফাইন্যালে উন্নীত হবার যোগ্যতা লাভ করে। একটি খেলা বৃষ্টির জন্ম শেষ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় নি। ভারত ফাইন্যালে ফিলিপাইনের সঙ্গে খেলবে। ভারতের সেরা খেলোয়াড় রমানাথ কৃষ্ণণ ইরাণের বিরুদ্ধে খেলেন নি। তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। ফিলিপাইনের বিরুদ্ধে ফাইন্যালে খেলার জন্ম ভারতের রমানাথ কৃষ্ণণ, প্রেমজিৎ লাল, জয়দীপ মুখার্জ্জী ও আখতার আলি মনোনীত হয়েছেন। নিম্নে সেমি-ফাইন্যাল খেলার ফলাফল প্রদত্ত হলো:

সিঙ্গলস্‌

প্রেমজিৎ লাল (ভারত) ৬-১, ৬-২ ও ৬-০ সেটে রেজা আকবারীকে (ইরাণ) পরাজিত করেন।

জয়দীপ মুখার্জ্জী (ভারত) ৬-০, ৬-২ ও ৬-৪ সেটে ত্যাগী আকবারীকে (ইরাণ) পরাজিত করেন।

আখতার আলী (ভারত) ৬-০, ৬-২ ও ৬-২ সেটে রেজা আকবারীকে পরাজিত করেন।

ডাবলস্‌

প্রেমজিৎ লাল ও জয়দীপ মুখার্জ্জী (ভারত) ৬-৩, ৬-২ ও ৬-২ সেটে আরশাম ইয়াসি ও ত্যাগী আকবারীকে (ইরাণ) পরাজিত করেন।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আজাদ ট্রফি লাভ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের খেলাধূলায় উৎসাহিত করার জন্ম নিখিল ভারত ক্রীড়া-পরিষদ স্বর্গত মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নামে ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে একটি ট্রফির ব্যবস্থা করেছেন।

জাতীয় আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতায় যে বিদ্যালয়ের থেকে সর্ব্বাধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যোগদান করেন—তাকেই এই ট্রফি দেওয়া হয়।

১৯৬০-৬১ সালে খেলাধূলায় কৃতিত্বের জন্ম পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় আবুল কালাম আজাদ ট্রফি লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে। এই সম্মান তাদের প্রথম নয়। এর আগেই তারা দু'বার ট্রফি লাভ করেছে। পাঞ্জাব ১৯ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম, বোম্বাই ১৩ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। দিল্লী ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১১ পয়েন্ট পেয়ে উভয়েই তৃতীয় স্থান লাভের অধিকারী হয়।

নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের এই প্রচেষ্টাকে সকলেই সাধুবাদ জানাবেন। কিন্তু স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেওয়ার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কারণ স্কুল ও কলেজই উপযুক্ত স্থান যেখান থেকে সত্যিকারের খেলোয়াড় তৈরী হবে।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ইংলণ্ড সফর

পাকিস্তান ক্রিকেট দল ইংলণ্ড সফরে গেছে। ১৮ জন খেলোয়াড় নিয়ে পাকিস্তানী দলটি গঠিত হয়েছে। তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় জাভেদ বার্কি দলের অধিনায়ক। তিনি সর্ব্ব প্রথম দলের সঙ্গে ইংলণ্ড সফরে গেছেন। তবে তিনি ১৯৫৭ সালে ইংলণ্ডে প্রথম যান ছাত্র হিসাবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯৫৮, ১৯৫৯ ও

১৯৬০ সালে অক্সফোর্ডের খেলোয়াড় হিসাবে খেলার তাঁর সৌভাগ্য হয়েছে। ১৯৬০ সালে লর্ডস মাঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাতেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন। পাকিস্তান দলের অপর খেলোয়াড়দের মধ্যে হানিফ মহম্মদের ইহা দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড সফর। ইমতিয়াজ আমেদেরও এর পূর্ব্বে ইংলণ্ড ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে. পাকিস্তান দলের খ্যাতনামা বোলার ফজল মামুদকে এবার দলভুক্ত করা হয়নি। কিন্তু ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান যে ইংলণ্ড দলকে পরাজিত করেছিল, তা ফজল মামুদের জন্ম সম্ভবপর হয়েছিলো।

ডেক্সটারের অধিনায়কত্বে ইংলণ্ড দলের পাকিস্তান সফরে পাকিস্তান বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। তারই ভিত্তিতে পাকিস্তান দলের এবারকার ইংলণ্ড সফরে খেলা আরম্ভ হবার আগে থেকেই ব্রিটিশ ক্রিকেট সমালোচকরা দল সম্পর্কে অনেক কিছু মন্তব্য করেছেন। কোন আন্তর্জ্জাতিক দলের সফর আরম্ভ হবার আগে কোন সমালোচনা করা উচিত নয়। এতে দলের খেলোয়াড়রা নিরুৎসাহ হন। যাই হোক তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় লইয়া গঠিত পাকিস্তানী দলটি ভালই খেলবে বলে মনে হয়। নিম্নে পাকিস্তান দলের ভ্রমণকারী খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হলো :—

জাভেদ বার্কি (অধিনায়ক), হানিফ মহম্মদ (সহ-অধিনায়ক), ইমতিয়াজ আমেদ, আলিমুদ্দিন, সৈয়দ আমেদ, মুস্তাক মহম্মদ, ওয়ালিশ ম্যাথিয়াস, ইজাজ বাট, নাসিমুল গণি, হাসিব আসান, আফাক হোসেন, ইন্তিখাব আলাম, মহম্মদ ডি সুজা, মুনীর মালিক, মামুদ হোসেন, সহিদ মামুদ ও আসিফ আমেদ।

[টেষ্ট খেলার তারিখ]

ইংলণ্ড সফরে পাকিস্তান দল মোট ৩৩টি ম্যাচ খেলবে। তার মধ্যে পাঁচ দিনব্যাপী পাঁচটা টেষ্ট আছে। নিম্নে পাঁচটি টেষ্ট খেলার তারিখ দেওয়া হ'লো :—

প্রথম টেষ্ট—৩১শে মে থেকে—এজবাষ্টনে।
দ্বিতীয় টেষ্ট—২১শে জুন থেকে—লর্ডসে।
তৃতীয় টেষ্ট—৫ই জুলাই থেকে—লীডসে।
চতুর্থ টেষ্ট—২৬শে জুলাই থেকে—ট্রেন্টব্রীজে।
পঞ্চম টেষ্ট—১৬ই আগষ্ট থেকে—ওভালে।

খেলাধুলার উন্নতিকল্পে সরকারের প্রচেষ্টা

দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে ক্রীড়া কংগ্রেস অধিবেশন বসে। ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে এরূপ অনুষ্ঠান এর পূর্ব্বে হয়নি। বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় তিন শত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে, এল, শ্রীমালী এই সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেন যে দেশের বিভিন্ন খেলাধুলার পরিচালনার কর্তৃত্ব গ্রহণের ইচ্ছে ভারত সরকারের নেই। জাতীয় ফেডারেশন ও এসোসিয়েশনগুলি যথারীতি তাঁদের নিজ নিজ ক্রীড়া বিভাগ পরিচালনা করবে। তাঁদের এই স্বাধীনতায় সরকার হস্তক্ষেপ করবে না। ভারত সরকার নিখিল ভারত ক্রীড়া-সংস্থার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এসোসিয়েশন এবং ফেডারেশনগুলিকে খেলাধুলার উন্নতিকল্পে আর্থিক এবং বিশেষজ্ঞ নিয়োগ সম্পর্কে সাহায্য করবেন। তবে কোন প্রতিষ্ঠানের কার্য্য পরিচালনায় যদি ত্রুটী কিংবা শৈথিল্য প্রকাশ পায় তা হলে ভারত সরকার নিশ্চয়ই এরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করবেন। তিনি আরও বলেছেন যে ভারত ক্রীড়াক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি প্রকাশ করেছে সত্য, তবে আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারত এখনও বিশেষ পিছিয়ে আছে। ভারতে খেলাধূলার উন্নতি করতে হলে—কলেজ ও স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীদের উৎসাহ দিতে হবে এবং বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে খেলাধূলার প্রসার যাতে বাড়ে সেদিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

ডাঃ শ্রীমালীর বক্তৃতাটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে দেশের বিভিন্ন খেলাধূলার পরিচালনার কর্তৃত্ব গ্রহণের ইচ্ছে ভারত সরকারের নেই। কিন্তু যে ভাবে ভারতে খেলাধূলা পরিচালনা হয়—তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি আধিপত্য বিস্তার করে আছেন। দেশের খেলাধূলার উন্নতি অপেক্ষা তাঁরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ম ব্যস্ত। তাই আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্র ভারতের এই দুরবস্থা। ভারত সরকারের সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার সাধন করা দরকার। দেশের খেলাধূলার স্বার্থে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা দরকার মনে হলে—সরকারকে সেটা করতে হবে।

ভারতীয় সাঁতারুদের মান নির্দ্ধারণ

জাকার্ত্তায় এবার চতুর্থ এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান হবে। ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন টোকিও ক্রীড়ানুষ্ঠানের দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর সময় অনুযায়ী ভারতীয় সাঁতারু প্রেরণ করবেন বলে ঠিক করেছেন। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে এক শিক্ষাশিবিরের পর এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের তালিকা প্রস্তুত করা হবে। নিম্নে সাঁতারুদের নির্দ্ধারিত মানের তালিকা দেওয়া হলো :—

খেলার মাঠে সত্যজিৎ রায় ও অসিতবরণ

[পুরুষ বিভাগ]

১৫০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল নির্দ্ধারিত সময় ১৮ মি: ১৮'৮ সে:, ৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল নির্দ্ধারিত সময় ৪মি: ৩৬'১ সে:, ২০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল নির্দ্ধারিত সময় ২মি: ৮'৩ সে:, ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল নির্দ্ধারিত সময় ৫৮'৮ সে: ২০০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোক নির্দ্ধারিত সময় ২মি: ২৬'৮ সে:, ১০০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোক নির্দ্ধারিত সময় ১মি: ৭'৪ সে:, ২০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক নির্দ্ধারিত সময় ২মি: ৪৭'৩ সে:, ১০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক নির্দ্ধারিত সময় ১মি: ১৬'৮ সে:, ২০০ মিটার বাটার ফ্লাই নির্দ্ধারিত সময় ২মি: ২৪'২ সে:, ১০০ মিটার বাটার ফ্লাই নির্দ্ধারিত সময় ১মি: ২'২ সে:।

[মহিলা বিভাগ]

৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল নির্দ্ধারিত সময় ৫মি: ১৬'৩ সে:, ২০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল নির্দ্ধারিত সময় ২মি: ৩২'২ সে:, ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল নির্দ্ধারিত সময় ১মি: ৬'৪ সে:, ১০০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোক নির্দ্ধারিত সময় ১মি: ১১'৩ সে: ২০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক নির্দ্ধারিত সময় ৩মি: ২'৬ সে:, ১০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক নির্দ্ধারিত সময় ১মি: ২১'৭ সে: ও ১০০ মিটার বাটার ফ্লাই নির্দ্ধারিত সময় ১মি: ১৭'১ সে:

আগা খাঁ কাপ হকি প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি

ভারতের অন্যতম প্রাচীন হকি প্রতিযোগিতা আগা খাঁ কাপের খেলা সম্প্রতি বোম্বাইতে হয়ে গেল। এবারকার প্রতিযোগিতা ৬৬-তম অনুষ্ঠান এবার মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি ১-০ গোলে বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা দল টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত করে প্রথম এই ট্রফি লাভের কৃতিত্ব অর্জন করে।

টাটা স্পোর্টস ক্লাব এর পূর্ব্বে ১৯৫০, ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালে উপর্য্যুপরি তিনবার আগা খাঁ কাপ লাভ করেছিল। টাটা স্পোর্টস ক্লাব এবার নিয়ে তিনবার "রাণার্স আপ" হয়েছে। টাটা স্পোর্টস ছাড়া বেলায়ার রেজিমেণ্ট ও বোম্বাই কাষ্টমসের আগা খাঁ কাপ লাভের "হ্যাট্ ট্রিক" করার সুযোগ হয়েছে। এর মধ্যে বোম্বাই কাষ্টমস্ ১৯৩৪, ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালে জয়লাভের "হ্যাট্ ট্রিক" সহ মোট ছয়বার আগা খাঁ কাপ লাভ করে।

এবারকার ফাইন্যালে বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা দল টাটা স্পোর্টস্ দলকে পরাজিত করার জন্য মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি দল সত্যই কৃতিত্বের দাবী করিতে পারে। মারাঠা দলের জয়সূচক গোলটি করে খেলোয়াড় শান্তারাম "সর্ট কর্ণারের" সুযোগ থেকে।

বিশ্ব শিশুমেলা—ছবিতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির ১৭টি শিশুমুখ দেখা যাচ্ছে। সানফ্রান্সিসকো'র শিল্পী ওয়াল্টার কিয়ানে ছবিটি এঁকেছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘ আন্তর্জ্জাতিক শিশু জরুরী তারিখের নিউইয়র্কস্থিত সদর কার্য্যালয়ে এইটি টাঙানো থাকবে।

ধারাবাহিক আত্মকাহিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পরিমল গোস্বামী

১০

আরও ভূত। এবং চোর

যে সব ভূতের কথা আমরা বাইরে থেকে পাই তারা অত্যন্ত নিরীহ এবং ভালমানুষ ভূত। অন্যের উপকার করার জন্য তারা সব সময় ব্যগ্র। এবং প্রত্যেকটি ভূত তার আত্মীয়ের একটি মাত্র উপকার করেই অদৃশ্য হয়, আর কখনও ফিরে দেখা দেয় না।

কোনো ভূত ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসে, নিজের মারা যাবার পর অন্য যারা বেঁচে আছে, তাদের উপকারের জন্য। কোনো ভূত গুপ্তধনের সন্ধান দেয়। কোনো ভূত তার আত্মীয়কে কোথাও যাওয়া নিষেধ করে, কারণ গেলেই তার অনিষ্ট হবে, এবং তা সে তার ভূত-জীবনের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ক্ষমতায় দেখতে পায়।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এ সব ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে। অথচ আমাদের দেশে ভূতের ভয় সম্ভবত সব চেয়ে বেশি। কেন এই ভূতের ভয়? হাজার হাজার লোক হাজার হাজার ভূত দেখছে, এবং সে সব ভূতের প্রত্যেকে সচ্চরিত্র, নীতিজ্ঞানসম্পন্ন, কর্তব্যপরায়ণ এবং প্রত্যেকের ঘাড়ে একটি ক'রে সংকাজ করার দায় চাপানো আছে, এবং সেই সংকাজটি তার করা হয়ে গেলেই সে আর ফিরে আসে না। আমার মনে হয় বাঙালীরা জীবিত থাকতে তার মনুষ্যত্ব ভুলে থাকে, কিন্তু ম'রে ভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়। এ রকম ভৌতিক জীবন আমাদের প্রত্যেকেরই কাম্য হওয়া উচিত। সংসারে যত মানুষ, অনন্ত তত ভূত যদি থাকত, তা হলে সংসার থেকে অনেক দুঃখ দূর হয়ে যেত। কারণ ভূতেরা তাদের আত্মীয় বা বন্ধুদের জন্য যে সংকাজটি করে তা সামান্য নয়। তাদের জীবনের সব চেয়ে বড় সঙ্কটটি থেকেই তাদের তারা উত্তীর্ণ ক'রে দেয়। আমি সে জন্য বলেছি, প্রত্যেকেরই একটি ক'রে ব্যক্তিগত ভূত থাকা দরকার।

কিন্তু হায় রে! সংসারে সব জিনিসটাই যদি আমাদের মনের মতো হত, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি। সব মনের মতো পাওয়া যায় না, মাত্র সামান্য একটুখানি পাওয়া যায়। তাই দেখি, এত চরিত্রবান ভূত থাকা সত্ত্বেও হিংস্র ভূত অনেকগুলো বেশ নিশ্চিন্ত মনেই এদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যদিও তারা সব সময় দেখা দেয় না। তারা দুর্লভ, তারা আত্মাভিমানী। তারা ভাল ভূতের মতো পরোপকার করে না, তাদের পথ সরল পথ নয়, যদিও তারাও আর এক ভাবে পরোপকার করে। চরিত্রবান সদ্ভূত যেমন আপনা থেকেই দেখা দেয়, এরা তা করে না, এদের ডেকে আনতে হয়। এরা হিংস্র, কিন্তু তবু এদেরও ভূতসমাজে একটা বড় স্থান আছে।

"বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না" পর্য্যায় যখন আরম্ভ করি, তখন থেকেই আমি এদের সবার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে প্রবৃত্ত হই এবং এই বিশ্লেষণের ফলে এক অদ্ভুত জিনিস আমি আবিষ্কার করেছি। আমি দেখেছি ভূতেরা মোটামুটি ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত। এই বিভাগটি তাদের সমাজ-চেতনার দিক থেকেই করেছি। এই সমাজ-চেতনা কথাটির একটুখানি ব্যাখ্যা দরকার। এর মানে হচ্ছে মানুষের সমাজ সম্পর্কে ভূতের চেতনা। দুই জাতীয় ভূতের দুই জাতীয় চেতনা, অথচ দুইই সদুদ্দেশ্যমূলক।

আমি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর হিংস্র ভূত সম্পর্কে পত্রান্তরে কিছু আলোচনা করেছিলাম। এই ভূত মানুষকে সুখে থাকতে দেয় না। কিন্তু কেন দেয় না? সে কি ভূতের দোষ? ভূত কি সত্যিই অন্যকে অসুখী ক'রে সুখী হয়? আমি যে আলোচনা করেছিলাম (বসুধারা, ১৯৫৮) তার মর্ম হচ্ছে এই—

কোনো মানুষ সুখে আছে এটা কি ভূতের পক্ষে অসহ্য? তাই কি সে তাকে সুখের গণ্ডি থেকে বা'র ক'রে দুঃখের সীমানায় এনে ছেড়ে দেয়? মানে, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়? অথবা এ কথার মানে কি এই যে সুখে থাকতে ভাল লাগছিল না বলেই দুঃখকে ডেকে আনা হ'ল?

এই প্রশ্নটি আমার মনে জাগতেই মনের মধ্যেই মূল সত্যটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মনে হল এ ভূত মানুষের মনের মধ্যে বাস করে। অর্থাৎ মানসিক সুখের পাশেই এর বাস। তাকে একটুখানি ডাকলেই সে মত্ত হস্তীর মতো সুখের পদ্মবনে এসে ঢোকে।

তাই, মানুষের সুখ দেখলেই যে-ভূতের ঈর্ষা হয়, কেউ সুখে আছে দেখলে যে-ভূত কিল মারতে আসে, সে-ভূত ভূতসমাজে আদৌ আছে কি না, সেই বিষয়েই আমার মনে সন্দেহ জাগল। আরও চিন্তা ক'রে দেখলাম, হিংস্রতা ভূতের স্বভাবধর্ম নয়। হ্যামলেট নাটকে হ্যামলেটের পিতৃ-ভূত রাজার লোকের হাতে মার খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ মানুষই হিংস্র, কিন্তু ভূত তার মতো হিংস্র নয়।

আমার মনে হয় সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় এই কারণে যে, মানুষ নিজেই নিজের অনাবৃত পিঠটি ভূতের সামনে পেতে দিয়ে বলে "ভাই, এবারে কিলোতে থাক।" এ লোভ ভূতের পক্ষে সংবরণ করা কঠিন, কেন না ভূতেরা সাধারণত হীনতাভাব বা inferiority complex-এ ভোগে। ওদের সামনে পিঠ পেতে দিয়ে লোভ দেখাতে থাকলে তাই ওরা তা.সামলাতে পারে না। পথে টাকা প'ড়ে থাকতে দেখলে যেমন যে-লোকটি চোর নয় সেও সাময়িকভাবে চোর হয়, এও তেমনি। ভূত এই জন্যই সুখী মানুষের পিঠে কিল মারে! সুখী মানুষ নিজেই এটি চায়। সুখে থাকতে ভূতের কিল খেতে সে চায়।

এর কারণ আর কিছুই না, মানুষ যখন সুখে থাকতে চায় তখন' সে বুঝতে পারে না যে এ সংসারে বিশুদ্ধ সুখ ব'লে কোনো উপভোগ্য বস্তু থাকতেই পারে না। বিশুদ্ধ সুখ আর বিশুদ্ধ দুঃখ একই জিনিস, এরা সে ধারণা করতে পারে না। দুঃখের স্বাদ পেলে তবে সুখের স্বাদ পাওয়া সম্ভব, এবং সুখের স্বাদ পেলে তবেই দুঃখ কাকে বলে বোঝা যায়। তাই মানুষ যখন কিছুকাল একটানা সুখের মধ্যে থেকে হাঁফিয়ে ওঠে, সুখের আতিশয্যে ছটফট করতে থাকে, তখন তাঁর একমাত্র মুক্তি ভূতের হাতে কিল খাওয়া। সুখের মধ্যে কিছুকাল বাস করলে বোঝাই যায় না যে সুখের মধ্যেই বাস করা হয়েছে! তাই সুখের বোধ জাগাতে হলে প্রত্যেকটি মানুষেরই মাঝে মাঝে একবার ক'রে ভূতকে ডাকতে হয়। বেঁচে থাকতে হ'লে যেমন খাওয়া পরা চাই, সুখে থাকতে হলে তেমনি প্রত্যেকটি লোকের অন্তত একটি ক'রে ব্যক্তিগত ভূত থাকা চাই। মানুষ যখন সুখের মধ্যে থেকে সুখের বোধ হারায় তখনই তাকে গা থেকে জামা খুলে ব্যক্তিগত ভূতের সামনে কিল খাবার জন্য গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

এই ভূতকেই জনসমাজে হিংস্র নামে চালানো হয়েছে। অথচ একটু ভাবলেই বোঝা যাবে এরাও সমাজের উপকারই করে, এবং মনে হয় এরাই বেশি করে। অতএব হঠাৎ মনে হয় ভূতের ভয় বাংলা দেশ থেকে দূর হওয়া উচিত। অবশ্য এ এমন একটি জটিল জিনিস যে, এটি দূর 'হলে সমগ্র সমাজজীবনই হয় তো ভেঙে পড়বে। তার মানে হচ্ছে এই যে, আগে যেমন বলেছি সুখে আছি বুঝতে হ'লে ভূতের সামনে পিঠ পেতে দাঁড়াতে হয়, তেমনি সমস্ত জীবনে নির্ভীকতার স্বাদ মাঝে মাঝে পেতে হলে পাশাপাশি কিছু ভয় থাকা দরকার। চোরের ভয়, ডাকাতের ভয়, দুর্ঘটনার ভয়, বজ্রপাতের ভয়, অসুখের ভয়, আত্মীয়জনের মৃত্যু ভয়, নিজের মৃত্যু ভয়, এবং তার সঙ্গে ভূতের ভয়। আমার মনে হয় এই রকম নানাজাতীয় ভয় আছে বলেই সমাজ-জীবনে আমরা এত সুখে আছি, জীবনের অর্থ বুঝতে পারি, সৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারি। এই সব ভয়ের মূল ভিত্তি হচ্ছে ভূতের ভয়। যদি সমাজজীবনকে একটি প্রাসাদের সঙ্গে তুলনা করি তা হলে এই সমস্ত ভয়কে সেই প্রাসাদের স্তম্ভ ব'লে মনে হবে। প্রধান স্তম্ভটি হচ্ছে ভূতের ভয়ের স্তম্ভ। এই স্তম্ভটি যদি ভেঙে দেওয়া যায়, তা হলে সমস্ত ভয়ের স্তম্ভ একে একে ভেঙে পড়বে, এবং প্রাসাদটি আর খাড়া থাকতে পারবে না।

আগেই বলেছি ভূতের ভয় দূর করার কথায় হঠাৎ উৎসাহ জাগতে পারে। কিন্তু একটি দূর হ'লে তার সঙ্গে আর সব ভয়ও যে দূর হয়ে যাবে। সমাজজীবনে এত বড় ট্র্যাজিডি আর হতে পারে না। তাই দ্বিতীয়বার চিন্তা করলে এ কাজে আর উৎসাহ জাগবে না। আমি সেই জন্যই ভূতকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলাম একটি পৃথক বিভাগ খুলে। কিন্তু প্রশ্রয় পেয়ে ভূতেরা নিজেদেরই সর্বনাশ ঘনিয়ে আনছে। দলে দলে এত সচ্চরিত্র ভূত এলে 'সং'-এর একঘেয়েমিতে পাঠকেরা বিরক্ত হয়ে উঠবেন, সম্ভবত ইতিমধ্যেই হয়েছেন। সে জন্য অসচ্চরিত্র, গুণ্ডা এবং অমার্জিত স্থূল ভূত কিছু আনা দরকার। জানি এ রকম ভূত ভূত-সমাজে কম আছে, কিন্তু মানুষের পাল্লায় পড়লে যে-কোনো সদভূতের অসদভূতে রূপান্তরিত হ'তে বেশি দেরি হবে না।

কিন্তু কেউ সে চেষ্টা করছেন না। মানুষ সম্ভবত কল্পনাতেও ভূতের কাছে হীন হতে রাজি নয়।

এর পরিণাম স্পষ্ট।

কয়েক বছর আগে, ভূতের আবির্ভাবের আগে, আর একটি বিভাগ খোলা হয়েছিল—"প্রতারককে এড়িয়ে চলুন।" তার পরিণাম যা হয়েছিল ভূতের পরিণামও তাই হবে সন্দেহ নেই।

প্রতারকের স্বরূপ উদঘাটনের জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে নির্দেশ দেওয়া গেল। আশু তখনও যুগান্তরে সাময়িকী বিভাগে যোগ দেয়নি। সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি দিচ্ছিল সে ভবিষ্যৎ সৃষ্টিমূলক সাহিত্যরচনার পটভূমি খুঁজতে। বহু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই তাকে আজ উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হয়েছে জনপ্রিয় কথাশিল্পী রূপে। তার প্রাসাদপুরী কলকাতা, প্রতারককে এড়িয়ে চলুন এবং নিষিদ্ধ বই। এ সবই তার অভিজ্ঞতাকে বিস্তার করতে সাহায্য করেছে।

প্রতারককে এড়িয়ে চলুন পর্যায়টির পরিকল্পনা করেছিলাম সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে। ভাল লোকেরা যাতে লোভে প'ড়ে আর না ঠকেন সেজন্য প্রতারণার কৌশল ও প্রতারিতদের ইতিহাস সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল তাকে। এবং সে এসব নিয়মিত সংগ্রহ করছিল পুলিস বিভাগ থেকে। কিন্তু বেশি দিন তাকে এ কাজ করতে হয়নি, কেননা অল্পদিনের মধ্যেই প্রতারিতরাই নিজেদের কাহিনী লিখতে আরম্ভ করলেন। (আহা, ভূতেরাও যদি এই রকম করত!)

প্রথমে সাধারণ প্রতারণা দিয়েই আরম্ভ করা হয়েছিল। মনে হয়েছিল এর একটা সীমা আছে, এবং খুব বেশি দিন এ বিভাগটি চালানো যাবে না। কিন্তু ক্রমে দিন যেতে লাগল, আর দেখতে পেলাম প্রতারক, প্রতারিত এবং প্রতারণা-কৌশলের দিগন্ত, ছোট্ট একটি চক্র থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমেই পৃথিবীর দিগবলয় রেখার সঙ্গে এককেন্দ্রিক ও একপরিধিসম্পন্ন হয়ে পড়ছে। প্রতারকের সংখ্যা কে গুনবে?

তার মানে হচ্ছে, প্রতারকের সংখ্যা আদৌ কোনো সীমায় এসে শেষ হয়নি, দেখা গেল ক্রমে তার চক্রের মধ্যে সকল মানুষ এসে প্রবেশ করছে। শেষে আমরা নিজেরাও যেন তার মধ্যে গিয়ে পড়ছি এমন সন্দেহ ক্রমেই মনে ঘোর হয়ে আসতে লাগল। অবশেষে প্রতারকের বৈচিত্র্য-গতি এত বেগ পেল যে তার সঙ্গে তাল রেখে চলা আর সম্ভব হল না। ঠিক আলোর গতির মতো। আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮০,০০০ মাইল বেগে ছুটছে। কোনো বস্তু আলোর গতির চেয়ে বেশি দ্রুত ছুটতে পারে না, এইটি বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন। আমাদের ঐ 'প্রতারককে এড়িয়ে চলুন' এর ব্যাপারটাও ঠিক তাই

হ'ল। এর গতিকে অতিক্রম ক'রে তার বাইরে নিজেদের ধ'রে রাখা গেল না। এর সঙ্গে তাল রাখতে গেলে শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেরাও প্রতারক, এ কথা ছাপার অক্ষরে কবুল করতে হয়, তাই আর ও পথে গেলাম না। নিজেরা প্রতারক-চক্রের একটুখানি বাইরে না থাকলে মান থাকে না, সে জন্য ঐ পর্যায়টি বন্ধ হয়ে গেল আপনা থেকেই।

ভূতের বেলাতেও তাই হবে ব'লে মনে হচ্ছে প্রথমবারে আমি চেষ্টা করেছিলাম ভূত না নামিয়ে অন্য কোনো দুর্বোধ্য বা রহস্যময় ঘটনায় অবতারণা করাতে, এবং দু চারটি তেমন রচনা প্রকাশও করা হয়েছিল কিন্তু ভূতেরা সংখ্যাগুরু হওয়াতে অন্যেরা হেরে গেল। প্রতারকদের মধ্যে অবশ্য দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রবেশ করেনি, তবে প্রাচীনপন্থী বা কনভেনশনাল রীতির প্রতারক ও আধুনিক নব্য রীতির প্রতারকদের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য তা স্বীকার করা হয়েছিল।

তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভূতই হোক বা প্রতারকই হোক, দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীব হলেও দুয়ের মধ্যে একটা বিষয়ে মিল আছে। সেটি হচ্ছে এদের কৌতুকের দিক। সচ্চরিত্র ভূতের যে কল্পনা আমাদের মনে আছে, তার মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতসারেই কিছু কৌতুকের অংশ আছে। ভূতের গল্পে সে জন্য আমরা বেশ একটা মজা অনুভব করি অনেক সময়। এরও কারণ, এদের প্রতি আমাদের মনে একটা কৃপামিশ্রিত করুণা আছে।

আমার তো ভূতদের প্রতি বেশ একটা সহানুভূতি আছে। ওদের মতো নিরীহ জীব সংসারে আর কেউ নেই। তাই ওদের কথা বলতে বা ওদের সম্পর্কে কিছু লিখতে আমার ভাল লাগে। তার আরও একটা কারণ, চমক সৃষ্টিতে, অথবা অসাধ্য সাধন করাতে, অথবা কল্পনা যথা ইচ্ছা খেলাতে, ওরা উপকরণ হিসাবে অতুলনীয়। কিন্তু ওদের সম্পর্কে বিশুদ্ধ রিপোর্টের কোনো সার্থকতা নেই।

চোর সম্পর্কেও মানুষ মাত্রেরই মনের গোপন কোণে একটা সহানুভূতি আছে। ওদের কথা ভাবতে গেলেই মনে করুণা জাগে। ভূতের মতোই ওরাও বড় অসহায়। যে চুরির ইচ্ছা প্রতি মানুষের মনেই সুপ্ত থাকে, তাকে ওরা জাগিয়ে তুলে তাকে একটা শিল্পের স্তরে তুলেছে। সেজন্য বহু রকম মনস্তত্ত্বও তাদের জানতে হয়েছে। প্রয়োগ কৌশলটা তাদের উচ্চস্তরের মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়া। অথচ অলক্ষ্যে তাদের কাজ যদি দেখা যেত তা হলে এর কমিক দিকটি নিশ্চয় সবাই উপভোগ করত। ক্রমশঃ।

ফরিয়াদ

উত্তর বসু

একটা তো বুক মোটে, কত আর যন্ত্রণার আলো
বইব আকাশ হয়ে, কতকাল রোরুদ্য হিমের
প্রপাত ঝরাব চোখে; মৃতা—ঘরে ঘরণী ঘুমাল,
রূপ-কথাও।

শিয়রে ম্লান-আলো এক পিদিমের
শিখা কাঁপে। হে ঈশ্বর, কৃষ্ণপক্ষ রাত ঘরে এনে
আমাকে আঁধারে বেঁধে কারা ওই শতাব্দীর পাশে
শূন্যে উপবিষ্ট হ'ল; আমার ব্যথার জাল বোনে?
প্রতিবাদে আজ আমি উপনীত তোমার সকাশে।

পরিমিত এক বুক, কত আর লাঞ্ছনার বোঝা
সে বুকে চাপাবে বল, কতকাল পুতুল-পাহারা
স্তোক দেবে দেহে মনে খুলে রেখে শত্রুর দরজা;
দিনগুলি চলে যায় পাগলের মত দিশেহারা।

সই সুখ, যারা ছিল এ হৃদয়ে তোমার প্রণামী
অঞ্জলি বিযুক্ত হয়ে আজ তারা পথে নিরুদ্দেশ,
আমিও তথৈবচ; এই আমি, তোমার যে আমি,
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যাকে দেবে বলে আলোর আশ্লেষ।

সে-আলো কী ওই আলো, মহাশূন্যে আঁধারের পাশে
রেখেছ নিবিড় যাকে কম্পমান রূপালী তারায়?
হে আমার রাতের ঈশ্বর, অন্ধকার ঘন হয়ে আসে,
কান পাতো, রাজপথে হরিধ্বনি কারা হেঁকে যায়।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের গতিপথে—

আমাদের এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্য্যন্ত জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের এক মাস হইয়া গিয়াছে। এই এক মাস সময়ের মধ্যে অগ্রগতির পথে এই সম্মেলন একটুকুও অগ্রসর হইয়াছে, এ কথা বলা চলে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন নিজ নিজ নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব সম্মেলনে উত্থাপন করিয়াছেন। সর্ব্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির মুখবন্ধ সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন একমত হইতে পারিয়াছে, ইহা একটা শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু চুক্তির সর্ত্তাবলী সম্পর্কে উভয় পক্ষের একমত হওয়ার পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে। রাশিয়া প্রস্তাবে পরমাণু অস্ত্র বহনের সকল রকম উপকরণ ধ্বংস করার, বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটিগুলি উচ্ছেদের, সমস্ত রকম রকেট, পাইলটহীন বিমান প্রভৃতি নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ করার এবং তিনটি পর্য্যায়ে চারি বৎসরে সর্ব্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের কথা আছে। রাশিয়া আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণের বিরোধী এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আন্তর্জ্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শকগণ ঐ সকল কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন, রাশিয়ার প্রস্তাবে এ কথা আছে। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণের কোন নির্দ্দিষ্ট স্তরে যে-সকল সামরিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হইবে না সেইগুলির পরিদর্শন সম্পর্কেই রাশিয়ার আপত্তি। রাশিয়ার প্রস্তাবকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে: (১) অস্ত্র শস্ত্র ধ্বংস করা, (২) অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ নিয়ন্ত্রণ, (৩) অবশিষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র পরিদর্শন। আমাদের বিশ্বাস, এই শেষের অংশটি লইয়াই গুরুতর বাধার সৃষ্টি হইয়াছে।

মার্কিণ রাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্ক বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে পরিদর্শন ব্যবস্থায় সম্মত আছে, কিন্তু অস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা পরিদর্শনেই তাহার আপত্তি। সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ জোরিন বলিয়াছেন যে, বার্লিন সমস্যা এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের সমর আয়োজনের জন্য রাশিয়াও কতগুলি সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কোন বাহিরের লোককে সে-ব্যবস্থা তাঁহারা দেখাইতে পারেন না। নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক পরিদর্শনের ব্যাপারে রাশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদটা কোথায় উল্লিখিত আলোচনা হইতে কতক পরিমাণে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এ সম্পর্কে কোন মীমাংসা সম্ভব কিনা, সে-সম্পর্কে এখনও কিছুই অনুমান করা সম্ভব নহে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে যে-প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহাতে প্রথম পর্য্যায়েই পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করার কথা আছে এবং পরমাণু অস্ত্রের ধ্বংসের উপায় সম্পর্কে বিবেচনার জন্ত একটি বিশেষজ্ঞ দলের নিয়োগের কথাও উহাতে আছে। পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করার গুরুত্ব সম্পর্কে দ্বিমত নাই। পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ না হইলে সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ অর্থহীন। সর্ব্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হইলে কি ভাবে এবং কত দিনে তাহা সম্ভব হইবে, সে-সম্বন্ধে অনুমান করা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু উহা যে সময়সাপেক্ষ সে-কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আপাততঃ পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার চুক্তি সম্পাদনই মুখ্য প্রশ্ন। কিন্তু এ সম্পর্কেও চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনা অদূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হইতেছে না। এই চুক্তি সম্পাদনের অগ্রগতি আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার চড়ায় আটকাইয়া গিয়াছে।

পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ সত্যই বন্ধ রাখা হইয়াছে কিনা সে-সম্পর্কে পরিদর্শনের জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গ আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দাবী করিয়াছেন এবং এই দাবীতে তাঁহারা এখন অচল অটল রহিয়াছেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরোধী। রাশিয়া মনে করে, উহা একরকম গোয়েন্দাগিরি ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ আর্থার ডীন অবশ্য বলিয়াছেন যে, আন্তর্জ্জাতিক কমিশনে কোন গুপ্তচর থাকা সম্ভব নয়। রাশিয়া এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট নয়। রাশিয়ার যুক্তি এই যে, পরমাণু অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটানো হইয়াছে কিনা তাহা ধরিবার জন্য বিভিন্ন দেশে যে সকল যন্ত্রপাতি আছে তাহাই যথেষ্ট। বিস্ফোরণ ঘটানো হইলে ঐ সকল যন্ত্রপাতিতেই তাহা ধরা পড়িবে, উহার জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নাই। বায়ুমণ্ডলে বিস্ফোরণ ঘটানো হইলে বিভিন্ন দেশের যন্ত্রপাতিতে তাহা অবশ্যই ধরা পড়িবে সন্দেহ নাই। কাজেই উহাকে পরমাণু অস্ত্রের বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার চুক্তি সম্পাদনের অন্তরায় বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভূগর্ভে বিস্ফোরণ বন্ধ রাখা হইয়াছে কিনা তাহা ধরিবার প্রশ্ন লইয়া সমস্যা রহিয়া গিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যুক্তি এই যে, ভূমিকম্পের ভূকম্পন এবং ভূগর্ভে বিস্ফোরণ ঘটানো জনিত ভূকম্পনের পার্থক্য বুঝিয়া উঠিবার উপায় নাই। উহার জন্য প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী গত ২১শে মার্চ্চ সাংবাদিক সম্মেলনেও এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন," We cannot make a distinction by seismic means between an earthquake, of which there may be three or four hundred a year from the Soviet Union, and a nuclear explosion withont an actual inspection." অর্থাৎ বৎসরে তিনশত বা চারিশত বার ভূমিকম্প হয়। কাজেই

রাশিয়ার ভূমিকম্পের কম্পন এবং পরমাণু অস্ত্রের বিস্ফোরণের কম্পন তাহার পার্থক্য যন্ত্রপাতি দ্বারা বুঝিবার উপায় নাই।' সুতরাং ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না যে, ভূগর্ভে বিস্ফোরণের প্রশ্নেই জেনেভা সম্মেলনের ভরাডুবী ঘটিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ভূগর্ভে বিস্ফোরণের উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে কেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

ভূগর্ভে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ হইতে যে ফলাফল পাওয়া যায় তাহার মূল্য খুবই সীমাবদ্ধ। এইজন্য বায়ুমণ্ডলে বিস্ফোরণের জন্য মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছে। বায়ুমণ্ডলে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ফলাফলের মূল্যই যখন খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং রাশিয়ার বায়ুমণ্ডলে যে-সকল বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে সেগুলি সমস্তই যখন ধরিতে পারা গিয়াছে তখন বায়ুমণ্ডলে বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণ কোন সমস্যা বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। একান্ত প্রয়োজন হইলে উহা ধরিবার জন্য বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ ঘাঁটি স্থাপন করা যাইতে পারে। বৃটেনের পক্ষ হইতে একটা আপোষমূলক প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই প্রস্তাবের মূল কথা এই যে, আন্তর্জ্জাতিক পরিদর্শন ব্যবস্থা ন্যূনতম করা হইবে এবং রাশিয়ার ভূমিতে স্থায়ী ভাবে কোন আন্তর্জ্জাতিক পরিদর্শন ব্যবস্থা রাখা হইবে না। রাশিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট কেনেডী এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলন মঃ ক্রুশ্চেভের নিকট এক পত্রে আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ জানান এবং সেই সঙ্গে ইহাও তাঁহারা জানাইয়া দেন যে, নতুবা এপ্রিল মাসেই প্রশান্ত মহাসাগরের বায়ুমণ্ডলে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা অনুযায়ী বিস্ফোরণ আরম্ভ করিবে। এই চিঠিতে কোন ফল হয় নাই। রাশিয়ার দৃষ্টিতে এই পত্রে বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গ আন্তরিকতা অপেক্ষা জমকই বেশী দেখাইয়াছেন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন চলিতে থাকার সময়ে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার জন্য মঃ ক্রুশ্চেভ যে অনুরোধ করিয়াছিলেন পশ্চিমী শক্তিবর্গ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ সম্পর্কে বিশেষ করিয়া ভূগর্ভে বিস্ফোরণ সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক পরিদর্শন ব্যবস্থার প্রশ্নে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার চুক্তিও সম্পাদিত হইতে পারিল না। উহার পরিণতি যে অত্যন্ত গুরুতর তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বায়ুমণ্ডলে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ পুনরায় আরম্ভ করিবে। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, গত আগষ্ট মাসে রাশিয়া যে বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে তাহা দ্বারা পরমাণু শক্তিতে রাশিয়া অগ্রগামী তাহা প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু রাশিয়া যদি আবার নূতন করিয়া পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ আরম্ভ করে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চেষ্ট থাকে, তাহা হইলে রাশিয়া অগ্রগামী হইয়া পড়িবে। তাঁহার যুক্তি সম্পর্কে এই কথাই শুধু বলা যায় যে, উভয় পক্ষই যদি বায়ুমণ্ডলে বিস্ফোরণ বন্ধ রাখে তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণুশক্তি ক্ষুণ্ন হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরীক্ষা আরম্ভ করিলেই পরমাণু অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে। ইহাতে বায়ুমণ্ডল দূষিত হওয়ার আশঙ্কা তো আছেই তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামও নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠিবে। আপাততঃ ভূগর্ভে বিস্ফোরণ সম্পর্কে চুক্তি করার প্রশ্ন মুলতুবী রাখিয়া বায়ুমণ্ডলে বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার চুক্তি সম্পাদন করাই শ্রেয়, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। হয়ত আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরের বায়ুমণ্ডলে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ আরম্ভ করিবে।

ব্রহ্মদেশে সামরিক শাসন—

ব্রহ্মদেশেও সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। গত ২রা মার্চ্চ প্রাতে ব্রহ্মদেশের সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নে উইন বেতারযোগে সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতা দখলের সংবাদ ঘোষণা করেন। ক্ষমতা দখলের পর প্রথম ঘোষণায় বলা হয় যে, দেশের অবস্থায় যে ব্যাপক অবনতি ঘটিয়াছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতেই সেনাবাহিনী ভার গ্রহণ করিয়াছে। এই ঘোষণার মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই। যখনই কোন দেশে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে তখনই এই অজুহাত দেখানো হইয়া থাকে। দেশের অবস্থা পূর্ব্বে যেমন ছিল সেনাবাহিনী কর্ত্তৃক ক্ষমতা দখলের পর সেইরূপই চলিতে থাকে। একথা অবশ্য সত্য যে, কাচিন, কারেন, শান ও চিন রাজ্য ফেডারেল শাসন ব্যবস্থার দাবী উত্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু উহার সমাধানের জন্য

সামরিক শাসনই একমাত্র অব্যর্থ উপায় হইল মনে করিবার কোন কারণ নাই। জেনারেল নে উইন ইতিপূর্ব্বে একবার রাজনৈতিক ক্ষমতার আস্বাদ পাইয়াছেন। ১৯৫৮ সালে এন্টি ফ্যাসিষ্ট পিপলস ফ্রিডম লীগের মধ্যে গুরুতর বিরোধের ফলে প্রধান মন্ত্রী উ নু সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেন। জেনারেল নে উইন আঠারো মাস দেশ শাসন করেন এবং ১৯৬০ সালে সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এই নির্ব্বাচনে উ নু'ই পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন। সুতরাং জেনারেল নে উইন যদি রাজনৈতিক ক্ষমতার 'লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হয় না।

ব্রহ্মদেশে পুনরায় সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উ নু সরকার ব্রহ্মের প্রাইভেট আমদানী ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়াত্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উহার পক্ষে যুক্তি ছিল এই যে, বৈদেশিক স্বার্থ ব্রহ্মের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং বহু ব্রহ্মদেশীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাহাদের আমদানী লাইসেন্স বিদেশী কোম্পানীগুলির নিকট হস্তান্তর করিতেছে। ব্যবসায়ীরা আমদানী ব্যবসা রাষ্ট্রায়াত্ত করার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাছাড়া কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা এবং সামরিক বিভাগ উহার বিরোধী ছিলেন। গত ১লা মার্চ্চ আমদানী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার তারিখ ছিল। উহা রোধ করাই সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক ক্ষমতা দখলের অন্যতম প্রধান কারণ ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। উ নু ব্রহ্মদেশকে কম্যুচীনের বড় বেশী কাছাকাছি আনিয়া ফেলিতেছেন, সৈন্যবাহিনীর নেতাদের মধ্যে এইরূপ একটা আশঙ্কাও জাগিয়াছিল। উহা রোধ করাও সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক ক্ষমতা দখলের কারণ হওয়া আশ্চর্য্য নয়! ব্রহ্মদেশে সামন্ত-তান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক শক্তিরই প্রাধান্য। ব্রহ্মদেশে সামরিক অভ্যুত্থান হইতে ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সামরিক শক্তি উ নুর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শক্তির সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে তৃতীয় সাধারণ নির্ব্বাচন পর্য্যবেক্ষণের জন্য উ নু এক উচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই প্রতিনিধি দল ব্রহ্মদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই সেখানে গণতন্ত্রের অবসান ঘটিল।
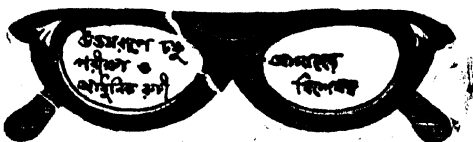
সিরিয়ায় আবার সামরিক অভ্যুত্থান—

গত ২৮শে মার্চ্চ (১৯৬২) সৈন্যবাহিনী এক আকস্মিক অভ্যুত্থানে সিরিয়ার শাসন ক্ষমতা দখল করিয়াছে। ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৬১) সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে সিরিয়া যখন সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তখন অসামরিক শাসন কর্ত্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ই অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিল যে, সিরিয়া হয়ত আবার সামরিক ক্যুপের যুগে ফিরিয়া যাইতে পারে। এই আশঙ্কা যে কতক পরিমাণে সত্যে পরিণত হইয়াছে সন্দেহ নাই। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে সিরিয়ার সামরিক অভ্যুত্থানের পর সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিতেছিল। আবার সেই অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে কি না তাহা বলা কঠিন। ভূমিসংস্কার ও শ্রমিকদের সম্পর্কে সরকারের দ্বিধাগ্রস্ত নীতি সামরিক মহলে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করিতেছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। একথা অবশ্যই সত্য যে, গত সেপ্টেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থানের পর যাঁহারা সরকার গঠন করেন তাঁহারা সকলেই বিত্তশালী ভূম্যধিকারী পরিবারের লোক। সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁহারা পূরণ করিবেন, ইহা আশা করাও দুরাশা। কেহ কেহ মনে করেন সম্প্রতি সীমান্তে যে ইসরাইল-সিরিয়া সংঘর্ষ ঘটিয়াছে তাহাই সামরিক অভ্যুত্থানকে ত্বরান্বিত করিয়াছে। গ্যালেলি সাগরে ইসরাইলের মাছ ধরা নৌকা এবং পুলিশ পেট্রোলের নৌকা সিরিয়ার দিক হইতে কয়েক দফায় আক্রান্ত হওয়ায় ইসরাইল সিরিয়াতে হানা দেয়। ইসরাইলদের পক্ষে কথা এই যে, সিরিয়ার একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি ধ্বংস করাই এই হানা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু জাতিপুঞ্জের যুদ্ধবিরতি পরিদর্শকের মতে উক্ত সুরক্ষিত ঘাঁটির অস্তিত্বের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইসরাইল-সিরিয়া সংঘর্ষ ইসরাইলের বিরুদ্ধে আরব জগতকে ঐক্যবদ্ধ করিবে, সিরিয়া এই আশা করে।

সিরিয়ায় নাসেরের নীতি পরস্পর বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। সিরিয়ার উপর মিশরের আধিপত্য সিরিয়াবাসীর মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। সিরিয়ায় নাসেরের আরব সমাজতন্ত্র নীতি প্রয়োগের ফলে যে ভূমিসংস্কার করা হইতেছিল এবং শিল্প বাণিজ্যে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতেছিল তাহার ফলে ভূম্যধিকারী এবং শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মনে ভীতির সঞ্চার না হইয়া পারে নাই। উহাই ছিল গত সেপ্টেম্বর মাসের সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ। কিন্তু নাসেরের নীতি সিরিয়ার কৃষক-শ্রমিকদের অবস্থার যে-টুকু উন্নতি করিয়াছিল, সিরিয়া মিশর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর নূতন সরকার একে একে বিলোপ করিতে আরম্ভ করেন। গত ২৮শে মার্চ্চের অভ্যুত্থান তাহারই পরিণতি। এই সামরিক অভ্যুত্থানের নেতারা মিশরের সহিত সংযুক্তি এবং নাসের যে-সকল ভাল কাজ করিয়াছেন তাহার বিরোধিতার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এই অভ্যুত্থানের পর সমস্যাটা জটিল আকার ধারণ করে। অভ্যুত্থানকারীদের মধ্যে একদল আছেন নাসের পন্থী। তাঁহারা উত্তর অঞ্চলের এলেপ্পো সহর দখল করিয়া মিশরের সহিত পূর্ণ সংযুক্তি দাবী করেন। কয়েকদিন ধরিয়া অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত অভ্যুত্থানকারীদের দুই দলের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসা হয়। স্থির হয়, মিশরের

সহিত সংযুক্তি প্রশ্ন সম্পর্কে গণভোট গ্রহণ করা হইবে, প্রেসিডেন্ট নাজেম অল কোদি পুনরায় তাঁহার পূর্ব্ব কাজে বহাল হইবেন এবং পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইবে। সামরিক অভ্যুত্থানের নেতাদের মধ্যে সাতজন সিরিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যেও যে একটা উদ্দেশ্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গণভোট কবে গ্রহণ করা হইবে তাহা কিছুই স্থির হয় নাই। মিশরের সহিত সিরিয়াকে পুনরায় সংযুক্ত করা বাঞ্ছনীয় কি না, এবিষয়ে সিরিয়ার জাতীয়তাবাদীরা দ্বিধাবিভক্ত। কাজেই গণভোট গ্রহণের ফল কি হইবে তাহা অনুমান করা অসম্ভব। নাসেরবাদ যে আরব জগতে পরস্পর বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করিয়াছে সে-কথা অস্বীকার করা যায় না।

আলজেরিয়া ও গণভোট—

আলজিয়ার্সে যখন সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ অব্যাহত ভাবে চলিতেছিল, সেই সময় গত ৭ই এপ্রিল আলজিয়ার্স হইতে ৩৪ মাইল দূরবর্ত্তী 'রোচের নোয়ের' (Rocher noir) অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে অস্থায়ী শাসন পরিষদ আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই শাসন পরিষদে আছেন নয় জন মুসলমান এবং তিন জন ইউরোপীয় সদস্য। অনুষ্ঠানের পর শাসন-পরিষদের প্রেসিডেন্ট আব্দার রহমান ফায়েস বলিয়াছেন, 'আলজেরিয়া কখনই কঙ্গোতে পরিণত হইবে না।' এই শাসন-পরিষদ আলজেরিয়ার অন্তর্বর্ত্তী-কালীন শাসন কার্য্য পরিচালন করিবেন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত গঠন গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন। এই শাসন পরিষদের সম্মুখে গুপ্ত সৈন্যবাহিনীর প্রবল বাধা রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আলজেরিয়ায় অবস্থিত ফরাসী সৈন্যবাহিনীর আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এই বাধা অতিক্রম করিয়া আলজেরিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য গত ৮ই এপ্রিল (১৯৬২) আলজেরিয়ার শান্তিচুক্তি সম্পর্কে ফ্রান্সে যে গণভোট গৃহীত হইয়াছে তাহাতে বিপুল সংখ্যক ভোটে এই চুক্তি সমর্থিত হওয়ায় ফরাসী সৈন্য বাহিনী সহজেই বুঝিতে পারিয়াছে যে এই চুক্তি সাফল্যের সহিত কার্য্যকরী করাই ফরাসী জনগণের অভিপ্রায়। শতকরা ৭৫ জন ভোটার ভোট দিয়াছেন এবং যাঁহারা ভোট দিয়াছেন তাঁহাদের শতকরা ৯১ জনই উক্ত চুক্তির অনুকূলে ভোট দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আলজেরিয়াকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়ার প্রশ্ন সম্পর্কে গত বৎসর জানুয়ারী মাসে যে-গণভোট গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে উক্ত অধিকার দেওয়ার পক্ষে শতকরা ৭৫টি ভোট হইয়াছিল। গত ৮ই এপ্রিলের গণভোট সম্পর্কে একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

উল্লিখিত গণভোট গ্রহণের সময় প্রত্যেক ভোটারকে দুইটি করিয়া ব্যালট পেপার দেওয়া হয়। একটিতে লেখা ছিল 'হাঁ' (Oui) এবং একটিতে লেখা ছিল 'না' (Non)। এই দুইটি ব্যালট

পেপারের যে-কোন একটি ভোটদাতাকে ব্যালট বাক্সে ফেলিয়া দিতে হইয়াছিল। প্রত্যেক ব্যালট পেপারে কৌশলপূর্ণ উপায়ে দুইটি প্রশ্ন এক সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। একটি প্রশ্ন ছিল শান্তিচুক্তি সম্পর্কে এবং উক্ত চুক্তি প্রয়োগের জন্য দ্য'গলকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া সম্পর্কে ছিল দ্বিতীয় প্রশ্ন। প্রশ্ন দুইটি পৃথক ভাবে করা হইলে দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে অধিক সংখ্যক 'না' উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। প্রশ্ন দুইটি এক সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া দ্য'গল এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়াছেন। আলজেরিয়ার শান্তি-চুক্তির সমর্থনের সঙ্গে নিজের অপ্রতিহত ক্ষমতা লাভের সমর্থনও পাইয়াছেন। দ্য'গল জানিতেন যে, বামপন্থীরা তাঁহার বিরোধী হইলেও আলজেরিয়ার শান্তিচুক্তি তাহারা বানচাল করিয়া দিতে চাহিবেন না। ভবিষ্যতে তাহারা দ্য'গলকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার সুযোগ পাইবেন কিনা তা অবশ্য বলা সহজ নয়। কিন্তু গণভোট তাঁহাকে যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়াছে তাহাতে আলজেরিয়া সমস্যার সমাধানের পর ফ্রান্সকে আবার একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করিতে তাঁহার স্বপ্ন সফল করিবার সুযোগ হয়ত পাইতেও পারেন। গণ-ভোটের পর প্রধান মন্ত্রী দেবরে এবং তাঁহার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন এবং মঃ পম্পিদো নিযুক্ত হইয়াছেন প্রধান মন্ত্রী। মঃ দেবরেও দ্য'গলের অনুরক্ত অনুগামী। তবু তাঁহার স্থলে মঃ পম্পিদোকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করায় বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। মঃ পম্পিদো দ্য'গলের উপদেষ্টা হিসাবে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। তিনি এক ব্যাঙ্কার, কিন্তু তাঁহার কোন রাজনৈতিক অনুগামী নাই। কাজেই দ্য'গলের পক্ষে তাঁহার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না। মঃ পম্পিদো তাঁহার রবার ষ্ট্যাম্প হইয়া থাকিবেন।

আলজেরিয়া সম্পর্কে ফ্রান্সের গণভোটের রায় দেখিয়া আলজেরিয়া স্থিত ইউরোপীয়গণ হয়ত বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। কিন্তু আলজেরিয়ার শান্তিচুক্তি তাহাদের কোন অধিকারই এতটুকুও ক্ষুণ্ণ করে নাই। তাহারা হয়ত ইহা বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু সমস্যা তাহাদেরও কম নয়।

গুপ্ত সৈন্যবাহিনী শুধু আলজেরিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধেই সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ গ্রহণ করে নাই, যে সকল ইউরোপীয় তাহাদিগকে সমর্থন করিবে না তাহাদেরও উহারা রেহাই দিবে না। ইউরোপীয়রা গুপ্ত সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করিলে ভবিষ্যতে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারে, আবার সমর্থন না করিলে গুপ্ত সৈন্য-বাহিনীর লোকের হাতে নিহত হওয়ারও আশঙ্কা আছে। এইজন্য অনেক ইউরোপীয় আলজেরিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। গুপ্ত সৈন্যবাহিনীর সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ জঘন্য ভাবে হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে। হাসপাতালে প্রবেশ করিয়া দশজন মুসলমান রোগীকে হত্যা করিতেও তাহারা দ্বিধা করে নাই। কিন্তু ফরাসী সৈন্যবাহিনী এবং আলজেরিয়ার ইউরোপীয়দের সহযোগিতা যদি তাহারা না পায়, তাহা হইলে তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং একদল দুর্ব্বৃত্ত ও গুণ্ডা ছাড়া আর কিছু বলিয়া তাহারা গণ্য হইবে না।

ল্যাটিন আমেরিকা ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—

ল্যাটিন আমেরিকা যে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন অঞ্চল সে-কথা কাহারও অজানা নাই। ঐ দেশগুলিকে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার রাষ্ট্র বলা হয় না বটে, কিন্তু পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলির উপর হইতে কম্যুনিষ্ট প্রভাব বিলুপ্ত হইলে রাশিয়ার যে সমস্যা হইবে তাহা অপেক্ষাও কঠিন সমস্যা দেখা দিবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মুখে যদি ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি মার্কিণ প্রভাবের বাহিরে চলিয়া যায়। কিউবা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের বাহিরে চলিয়াছে। ল্যাটিন আমেরিকায় তাহাকে একঘরে করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রাজিল ও আর্জ্জেণ্টিনা যে সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তাহার গুরুত্ব কম নয়।

উরুগুয়ের অন্তর্গত পুণ্টা ভেল এষ্টে মার্কিণ রাষ্ট্র সংস্থার পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের যে-সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে উক্ত সংস্থা হইতে কিউবাকে বহিষ্কৃত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় শুধু কিউবারই নয়, পশ্চিম গোলার্দ্ধের ইতিহাসেও এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই সম্মেলনে কিউবাকে উক্ত সংস্থা হইতে বহিষ্কৃত করিবার সিদ্ধান্তটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই। প্রস্তাবের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট হইয়াছিল। ব্রাজিল, মেক্সিকো, চিলি, বলিভিয়া, ইকুয়েডর এবং আর্জ্জেণ্টিনা ভোট দেয় নাই। পরে আর্জ্জেণ্টিনা সমর নেতাদের চাপে কিউবার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। উক্ত সম্মেলনে গত ১লা ফেব্রুয়ারী যে-প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কাষ্ট্রো শাসিত কিউবা মার্ক্সিষ্ট-লেনিনিষ্ঠ পন্থা গ্রহণ করায় ঐ রাষ্ট্র আর আমেরিকান রাষ্ট্র সংস্থার সদস্য থাকার যোগ্য নয়, তাহাকে এই সংস্থা হইতে বহিষ্কৃত করা হইল।
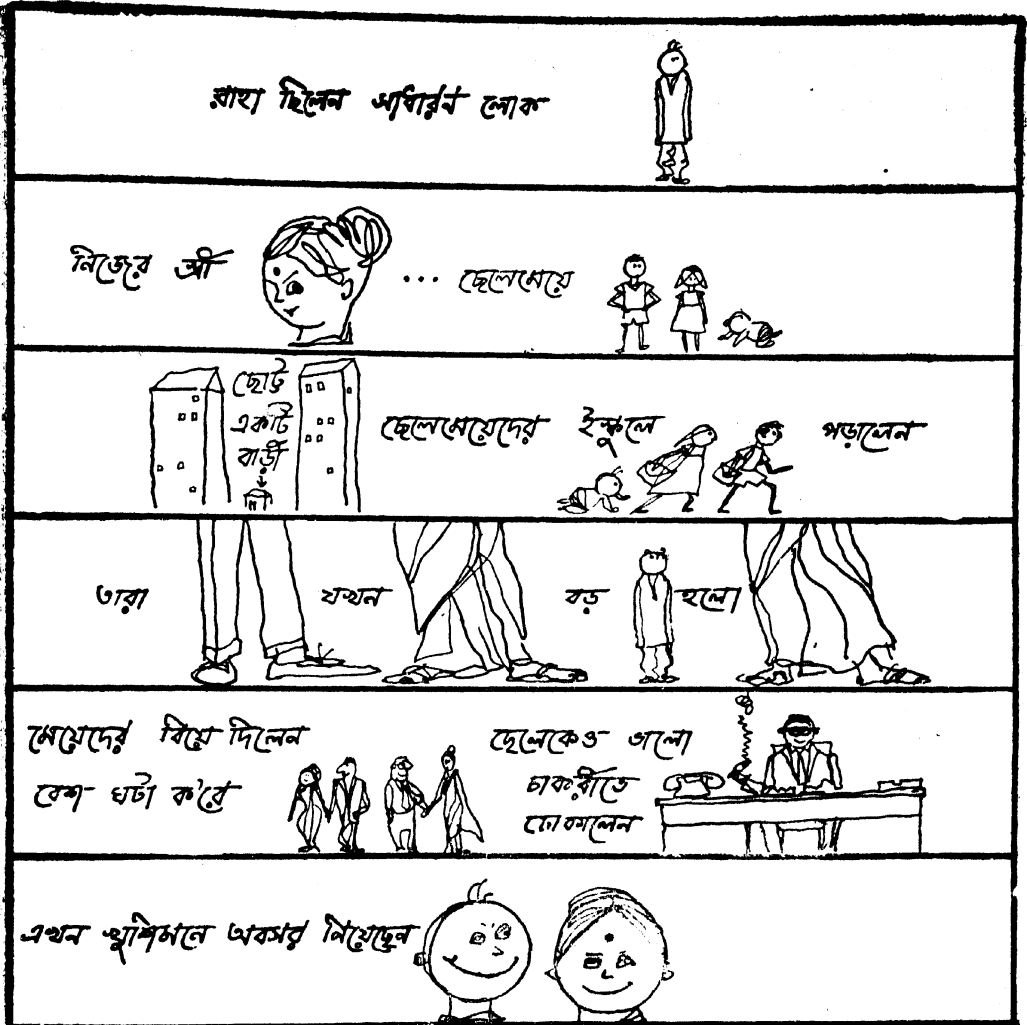
কেমন করে? ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজে তাঁর একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল তাই। রাহা তাঁর অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন মাত্র ৫৲ টাকা দিয়ে। তাঁর আসল টাকা তো নিরাপদই ছিল, তার ওপর বার্ষিক শতকরা ৩৲ টাকা হারে সুদও জমছিল। রাহা প্রতিমাসেই নিয়মিত টাকা জমাতেন এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বেশ মোটা টাকা জমে গেল। তিনি একজন বুদ্ধিমান লোক। তিনি ভবিষ্যতের জন্যে, তাঁর নিজের পরিবারের জন্যে সঞ্চয় করতেন যাতে ভাবী দিনগুলি সুখেস্বচ্ছন্দে কাটে ···

কখনো আপনি নিজের পরিবারের জন্যে সঞ্চয়ের কথা ভেবেছেন কি?

ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

যুক্তরাজ্যে সমিতিবদ্ধ; সদস্যদের দায়িত্ব সীমিত

কলিকাতাস্থিত শাখাসমূহ: ১৯, নেতাজী সুভাষ রোড; ২৯, নেতাজী সুভাষ রোড, (লয়েড্‌স ব্রাঞ্চ); ৩১, চৌরঙ্গী রোড; ৪১, চৌরঙ্গী রোড (লয়েড্‌স ব্রাঞ্চ); ৬, চার্চ লেন; ১৭, ব্র্যাবোর্ন রোড; ১বি, কনভেন্ট রোড, ইণ্টালী; ১৭ এসডি, ব্লক এ, নলিনী রঞ্জন এভিনিউ, নিউ আলিপুর; ১৬০, রাসবিহারী এভিনিউ।

NGB/6C-BEN

বিপ্লবের মধ্য দিয়া ফিডেল কাস্ট্রো ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী বাটিষ্টার স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের উচ্ছেদ করিয়া কিউবার শাসন ক্ষমতা দখল করেন। তিনি ভূমি সংস্কারের যে নীতি গ্রহণ করিলেন, তাহার প্রচণ্ড আঘাত পড়িল কিউবার মার্কিণ শর্করা শিল্পপতিদের স্বার্থের উপর। তারপর কিউবা রাশিয়া হইতে সস্তা দরে যে তৈল ক্রয় করিল মার্কিণ ও বৃটিশ তৈল কোম্পানীগুলি তাহা ব্যবহার করিতে রাজী হইল না। কিউবা সরকার বাধ্য হইয়া মার্কিণ ও বৃটিশ তৈল কোম্পানী রাষ্ট্রায়াত্ত করিলেন। ইহার পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে কিউবা কম্যুনিষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। কাস্ট্রোর উপর চাপ দিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কিউবা হইতে চিনি ক্রয়ের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস করিল এবং কিউবার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন করিল। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কিছুই ফল হইল না। তখন আমেরিকান রাষ্ট্রসংস্থার মাধ্যমে কাস্ট্রোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগী হইল। পশ্চিম গোলার্দ্ধের ২১টি রাষ্ট্র লইয়া ১৯৪৮ সালে এই সংস্থাটি গঠিত হয়। কেবল কানাডা উহার সদস্য নহে। ১৯৪৭ সালের রিও চুক্তি এবং এই সংস্থার সনদ অনুসারে আক্রমণ বা আক্রমণের হুমকীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে ব্যবস্থা (Collective action) গ্রহণের কথা আছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টা সত্ত্বেও কিউবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কিউবার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার ব্যাপারে ল্যাটিন আমেরিকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে গভীর মতভেদ দেখা যায়। কিউবার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ যখন রকেট দিয়া সাহায্য করিবার হুমকী দিলেন তখন আমেরিকান রাষ্ট্র সংস্থা পশ্চিম গোলার্দ্ধে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কিউবার নীতির নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিতে তাঁহারা রাজী হন নাই। অতঃপর গত এপ্রিল মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে কিউবার কাস্ট্রো-বিরোধীদের এক অভিযান হয়, কিন্তু উহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই পুণ্টডেল এষ্টে আমেরিকান রাষ্ট্র সংস্থার অধিবেশন হয়। আমেরিকান রাষ্ট্র সংস্থা হইতে কিউবাকে বহিষ্কৃত করিয়া কাস্ট্রোকে জব্দ করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। আবার কাস্ট্রো-বিরোধী অভিযানের জন্য কোন আয়োজন করা হইবে কিনা তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়।

গত আগষ্ট মাসে (১৯৬১) ব্রাজিল গৃহ যুদ্ধের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট কোয়াড্রসের আকস্মিক পদত্যাগের পর ভাইস প্রেসিডেণ্ট গৌলার্ট প্রেসিডেণ্ট হওয়ায় নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় একটা সমাধান সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ব্রাজিলের পররাষ্ট্র নীতি এবং একটি প্রাদেশিক গবর্ণর কর্ত্তৃক মার্কিণ ও কানাডার মূলধনে গঠিত টেলিফোন কোম্পানী রাষ্ট্রায়াত্তকরণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গভীর বিক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল। ব্রাজিলের প্রেসিডেণ্ট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাইয়া ঐ দুইটি বিষয় মার্কিণ অসন্তোষ প্রশমিত করিতে পারিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন যে, স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির অর্থ কোন রাজনৈতিক সামরিক জোটে যোগদান না করা। কিন্তু যে গণতান্ত্রিক নীতি পশ্চিমী রাষ্ট্র সমূহের ঐক্যের ভিত্তি, ব্রাজিল সেই গণতান্ত্রিক নীতির সমর্থক। বিদেশী মূলধনে পরিচালিত টেলিফোন কোম্পানী রাষ্ট্রায়াত্ত-করণের জন্য প্রেঃ গৌলার্ট ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হইয়াছেন। প্রেঃ কেনেডী জানাইয়াছেন ঐ ক্ষতিপূরণের অর্থ ব্রাজিলেই শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় নিয়োগ করা হইবে।

আর্জেণ্টিনায় গত ১৮ই মার্চ্চ (১৯৬২) যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়াছে তাহাতে পেরণপন্থীরা জয়লাভ করায় সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে। সামরিক অফিসারগণ পেরণপন্থীদিগকে এবং তাহাদের শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করিবার জন্য দাবী করিয়াছেন। পেরণপন্থী নহেন এইরূপ অসামরিক জনগণ এই দাবী সমর্থন করেন না। পেরণপন্থীরা জানাইয়া দিয়াছেন যে, যদি তাহাদের সদস্যদিগকে আইনসভায় আসন গ্রহণ করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে বিপ্লবাত্মক সাধারণ ধর্ম্মঘট আহ্বান করা হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কা এই যে, পেরণপন্থী এবং বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা কাস্ট্রোর প্রতি সহানুভূতিশীলদের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে। সামরিক নেতারা মার্চ্চ মাসের শেষের দিকে প্রেঃ ফ্রণ্ডিজিকে অপসারণ ও বন্দী করিয়াছে এবং জোস মেরিয়া গুইডোকে প্রেসিডেণ্ট করিয়াছে। কিন্তু তিনি ক্ষমতাহীন শোভা মাত্র। তবে শাসনতন্ত্রের বিধান রক্ষিত হইয়াছে বটে। কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান হইবে না নির্ব্বাচনের ফল যদি কার্য্যকরী করা না হয়।

পাওয়ার্সের মুক্তি—

মার্কিণ ইউ—২ গোয়েন্দা বিমানের চালক ফ্রান্সিস গ্যারী পাওয়ার্সকে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী রাশিয়া মুক্তি দিয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র রুডলফ আবেলকে মুক্তি দিয়াছে। আবেল গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে দণ্ডিত হয়। এই মুক্তি দান আসলে যে বন্দী বিনিময় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ফ্রেডারিক প্রায়র নামক একজন মার্কিণ ছাত্রকে পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এই মুক্তি দান যে ঠাণ্ডা-যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাসেরই প্রয়াস ইহা অবশ্যই মনে করা যাইতে পারে। ১৯৫৯ সালে রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফর এবং প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত আলোচনার ফলে বার্লিন সম্পর্কে রাশিয়ার চরম দাবী স্থগিত রাখা হয় এবং পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিবর্গ শীর্ষসম্মেলনে সম্মত হয়। ফলে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু মার্কিণ ইউ—২ গোয়েন্দা বিমান সমস্তই বানচাল করিয়া দেয়। ১লা মে (১৯৬০) রাশিয়া এই বিমানটিকে ভূপাতিত করে এবং চালক পাওয়ার্স বন্দী হন। উহারই প্রতিক্রিয়ায় প্যারীতে ১৬ই মে যে শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল তাহার ভরাডুবী হইল। ইহার পর হইতে ঠাণ্ডাযুদ্ধের তীব্রতা আরও ভয়ানক বাড়িয়া গেল। মিঃ কেনেডী মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হওয়ার পর ঠাণ্ডা-যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস সম্পর্কে আশার সঞ্চার হইলেও কেনেডী ক্রুশেভ সম্মেলনের পর সে-আশাও বিলুপ্ত হয়। বার্লিন সমস্যা আবার তীব্র আকার ধারণ করে। এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাওয়ার্স ও আবেলের মুক্তিকে বিবেচনা করা আবশ্যক। এই মুক্তি ঠাণ্ডা-যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাসের একটা উদ্যোগপর্ব্ব মাত্র, এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না।

চলচ্চিত্রে ফ্রয়েডের জীবনকাহিনী

বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিকপাল পথনির্দেশক হিসেবে জগতের ইতিহাসে যাঁরা অমরত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ফ্রয়েড তাঁদেরই একজন। স্মরণীয় তাঁর নাম, অবিস্মরণীয় তাঁর কীর্ত্তি। যৌনশাস্ত্র ছিল তাঁর বিষয়বস্তু। যৌনশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর অপরিমাপ্য প্রতিভা সারা জগতে সুবিদিত এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যৌনশাস্ত্রবিদ্ হিসেবে তিনি স্বীকৃত। যৌনশাস্ত্রের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ঘটিয়েছে তাঁর রচনা, তাঁর সারগর্ভ সুচিন্তিত রচনা যৌনশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞতা, অস্পষ্টতা ও জটিলতা দূর করেছে। তাঁর সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল বিশ্লেষণে যৌনশাস্ত্রের স্বরূপ সাধারণ পাঠকের কাছে আজ অনুদ্‌ঘাটিত নয়। তাঁর সুগভীর প্রতিভার পরিচয় বহন করে যৌনশাস্ত্রের তত্ত্বাদির বিশদ, সুবিস্তৃত এবং সুবিন্যস্ত ব্যাখ্যা।

এই পথিকৃতের বিচিত্র এবং ঘটনাবহুল জীবনীকে চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। জীবনীচিত্র নির্ম্মাণের ক্ষেত্রে হলিউডের গৌরব অনস্বীকার্য। একটি জীবনীচিত্র নির্ম্মাণে তাঁরা যে বিরাট শ্রম স্বীকারের এবং ধৈর্য্যের পরিচয় দেন তা সত্যিই বিস্ময়কর, সর্বোপরি তাঁরা সমগ্র প্রচেষ্টাটিকে যে ভাবে যত্নের সঙ্গে রূপ দেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য। তাঁদের শিল্পী-নির্বাচন থেকে শুরু করে সমগ্র কাহিনীর প্রয়োগনৈপুণ্য প্রশংসার দাবী রাখে। আলোচ্য যুগটিকে তাঁরা পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত করেন কাহিনীর মধ্যে, দর্শক ভুলে যান সে সময়, যে তাঁরা কোন যুগে বাস করছেন—ছবির কাহিনীর সঙ্গে তাঁরা তখন একীভূত হয়ে যান। এইখানেই সৃষ্টির চমৎকারিত্ব।

ফ্রয়েডের জীবনকাহিনী চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়ার ভার নিয়েছেন জন হাউষ্টন। হলিউডের প্রখ্যাত ও সুদক্ষ পরিচালকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর চলচ্চিত্রায়ণকর্ম বৈশিষ্ট্যের স্পর্শবাহী। ফ্রয়েডের জীবন কাহিনীর চিত্ররূপ যে তাঁর হাতে এক অভিনব বৈশিষ্ট্য ও সারবত্তায় পরিপূর্ণ হয়ে দর্শক সমাজে দেখা দেবে, এ বিষয়ে বলাই বাহুল্য।

নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন হলিউডের এক স্বনামধন্য শিল্পী। তাঁর নাম মণ্টোগোমারী ক্লিফট্। সাধারণ্যে মণ্টি ক্লিফট নামে তিনি সুখ্যাত। হলিউডের চিত্রজগতে তিনি একজন জনপ্রিয় শিল্পী। শিল্পী হিসেবে শুধু জনপ্রিয়ই নন, শক্তিমানও। ১৯২০ সালে জন্ম। অভিনয় শুরু করেন প্রথমে রঙ্গমঞ্চে। প্রথম ছবি দি সার্চ। তারপর ফ্রম হিয়ার টু ইটার্নিটি, রেনট্রি কাউণ্টি, প্লেস ইন দ্য সান, এয়ারেস, মিসফিটস প্রভৃতি চিত্রের তিনি প্রশংসিত শিল্পী। ফ্রয়েডের ভূমিকায় তাঁর অবতরণ তাঁর শিল্পী-জীবনের এক নতুন ও বিশেষ অধ্যায় রচনা করবে, এ আশা আমরা রাখি।

ওথেলোর ভূমিকায় পল রোবসন

বিশ্বের সঙ্গীতপিপাসুদের দরবারে পল রোবসন আজ এক বিশেষ সম্মানিত আসনের অধিকারী। এই কৃষ্ণকায় শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্য ও দক্ষতা রসিকসমাজে তাঁকে এক গৌরবের আসনে করেছে অধিষ্ঠিত। পল রোবসনের খ্যাতি সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে প্রচারিত হলেও অভিনেতা হিসেবেও তিনি অনন্যসাধারণ। তাঁর অভিনয় প্রতিভাও অনস্বীকার্য। সম্প্রতি লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে তিনি আবির্ভূত হয়ে দর্শকসমাজকে হতবাক করে দিয়েছেন তাঁর অভিনয়কুশলতায়। মহাকবি সেক্সপীয়রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি "ওথেলো দ্য মুরের" নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন ষাট উত্তীর্ণ পল রোবসন। ডেসডেমোনার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছেন স্বনামধন্যা অভিনেত্রী মেরী উরি। পারিবারিক জীবনে ইনি তরুণ চিত্রনাট্যকার জন অসবোর্ণের সহধর্মিণী।

শুধু মঞ্চে নয়, টেলিভিসন ও চলচ্চিত্রেও মেরী যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। তবে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেই মেরী সবচেয়ে বেশী আনন্দ পাবে। ঊনত্রিশ বছর আগে গ্লাসগোয় এঁর জন্ম। "লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার"কে কেন্দ্র করে এঁর প্রতিভা সাধারণ্যে প্রকাশ পায়। ওথেলো ও ডেসডেমোনার ভূমিকায় অভিনয়রত এঁদের একটি আলোকচিত্র এই সংখ্যার 'রঙ্গপট বিভাগে' প্রকাশ করা হল। চিত্রটি গ্রহণ করেছেন রাজকুমারী মার্গারেটের স্বামী আর্মষ্ট্রং জোনস এখন যাঁর পরিচয় হিজ রয়াল হাইনেস দ্য আর্ল অফ স্নোডন।

বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক সিগমণ্ড ফ্রয়েডের জীবনী-চিত্রের পরিচালক জন হাউস্টন দৃশ্য গ্রহণের প্রাক্কালে নাম ভূমিকাভিনেতা মণ্টোগোমারী ক্লিফটকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

শিউলিবাড়ী

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন বিরাট সাফল্যের মূলে জড়িয়ে থাকে এক করুণ উপাখ্যান অর্থাৎ জীবনের অগ্রগমনের পথে রূঢ় কঠোর আঘাতও অনেকখানি প্রেরণা দেয়। এই পটভূমি ভিত্তি করেই "শিউলিবাড়ী" ছবিটি গড়ে উঠেছে। প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের "নাগলতা" উপন্যাসটিকে অবলম্বন করে এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন চিত্র পরিচালক তপন সিংহ। ছবিটি পরিচালনা করেছেন পীযূষ বসু। শিউলিবাড়ীর কাহিনী একটি মানুষের বিচিত্র জীবনের আনন্দ বেদনা নিয়ে রূপ পেয়েছে। শক্তিমান কথাশিল্পীর বলিষ্ঠ রচনার মর্যাদা চলচ্চিত্রে অক্ষুণ্ণ থেকেছে। নায়ক বিজু দু'-একজন ছাড়া ছেলেবেলা থেকেই জীবনে পেয়ে এসেছে কেবলমাত্র লাঞ্ছনা আর অনাদর অথচ এর কারণের জন্যে সে বিন্দুমাত্র দায়ী নয়, আঘাত যখন অনতিক্রম্য হয়ে ওঠে তখন সে গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে অজানার উদ্দেশে। সেইখান থেকেই তার প্রকৃত জীবননাট্যের শুরু। ধীরে ধীরে তার নেতৃত্বে একটি অনুন্নত অঞ্চল পরিণত হল এক সুসমৃদ্ধ শিল্পনগরীতে। পথঘাট হল, ষ্টেশান হল, ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রপাত হল এবং এর ফলে সেখানকার জমিদার থেকে শুরু করে প্রতিটি মানুষ পরম সমাদরে একান্ত আপনজন বলে টেনে নিল তাকে। বিজু একদিন নিজের ঘর বাঁধল, বাল্যকালের ক্রীড়াসঙ্গিনীকে খুঁজে বার করে তাকে অকাল বৈধব্যের এবং শ্বশুরবাড়ীর অসহনীয় পরিবেশের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে সম্মান দিল জীবনসঙ্গিনীর। জনপ্রিয়তার শীর্ষে যখন বিজু, চুলে তখন তার পাক ধরেছে, যৌবনের দিনগুলো তখন হারিয়ে গেছে, জগৎ যখন একটু একটু করে তার কাছে ধূসর হয়ে আসছে তখন আবার তার জীবন জুড়ে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে, সে মেঘও কেটে যায় তার জীবনের ভাগ্যাকাশ আবার হয়ে ওঠে প্রসন্ন নির্মেঘ।

সমগ্র ছবিটির মধ্যে এক সৃষ্টিধর্মী মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পরিচালক কাহিনী উপস্থাপনে প্রয়োগকুশলতায়, ঘটনাবিন্যাসে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। পরিচালকের রসবোধ এবং শিল্পরুচি প্রশংসনীয়। কাহিনীর গতি শৈথিল্যমুক্ত। কাহিনীর দৈর্ঘ্যও সীমিত অযথা দীর্ঘায়িত করে দর্শকের বিরক্তি উৎপাদন করানো হয়নি। ছবিটি যেমনই বলিষ্ঠ বক্তব্যপূর্ণ তেমনই

সিগমণ্ড ফ্রয়েডের জীবনীচিত্রে ফ্রয়েডের বিবাহদৃশ্য। এই ছবিতে অভিনেতা মন্টি ক্লিফটকে চিনতে পারছেন কি?

পরিচ্ছন্ন। আলোকচিত্র গ্রহণে দীনেন গুপ্ত চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করেছেন। সঙ্গীত পরিচালনায় অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

অভিনয়াংশে উত্তমকুমার ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় অনবদ্য। তাঁদের অভিনয় নায়ক-নায়িকার চরিত্র দুটিকে জীবন্ত করে তুলেছে। তাঁদের অভিব্যক্তি ও বাচনভঙ্গী সাধুবাদার্হ। ছবি বিশ্বাসের অভিনয় অপূর্ব। তাঁর স্বল্প আবির্ভাব দর্শকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। বীরেশ্বর সেন, দিলীপ রায় ও রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও দর্শককে আনন্দ দান করে। মিহির ভট্টাচার্য, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, মণি শ্রীমানী, চন্দন রায়, খগেন পাঠক প্রভৃতি শিল্পীরাও আপন আপন চরিত্রের যথাযথ রূপদান করেছেন।

ষ্টারে শেষাগ্নি

মহানগরী কলকাতার অভিনবত্বম শীতাতপানয়ন্ত্রিত ষ্টার রঙ্গালয়ের শ্রেয়সীর পর নতুন অবদান শেষাগ্নি যুগপৎ ভাবে বৈশিষ্ট্য ও বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর সমৃদ্ধ হয়ে মুক্তিলাভ করেছে।

একটি পরিবারের বিভিন্ন পুরুষের মধ্যে যেখানে ভিন্নধর্মী মনোভাব দানা বেঁধে ওঠে সেখানে সেই বিভিন্নতার সমন্বয় ভাল বা খারাপ যে কোন একটি বিরাট পরিবর্তনকে ডেকে আনে তার উপর একটি যুগের অবলুপ্তি এবং আর একটি যুগের আবির্ভাবের সান্ধিক্ষণে সেই পরিবর্তন ব্যাপক ভাবে প্রকাশ পায়। ষ্টার রঙ্গালয়ের বর্তমান নাট্যোপহার শেষাগ্নির গল্পাংশের মধ্যে এই সত্যেরই প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর 'শেষনাগ' উপন্যাস অবলম্বনে কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন স্বনামধন্য নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। নাটকটি পরিচালনার গৌরবও তাঁরই প্রাপ্য।

দামোদরের তীরবর্তী জনপদের ভূস্বামী আচার্য পরিবার। ভুবন আচার্যের সময়ে তাঁদের পরিবারের সৌভাগ্যসূর্য উদিত হয়, কন্দর্প আচার্য তাঁর পুত্র। তিনি গেলেন ভিন্নপথে, সর্ব প্রকার দুষ্কার্যের অধিনায়ক তিনি। ওয়াগন লুট হয় তাঁর নেতৃত্বে। কন্দর্পের পুত্র মানব উচ্চশিক্ষালাভ করে, স্বভাবতঃই তার চিন্তাধারা কন্দর্পের সঙ্গে একেবারে মেলে না। সংঘাত শুরু হয় পিতাপুত্রে। পৌত্রের পক্ষ নেন অন্ধ পিতামহ। এই তিনপুরুষকে কেন্দ্র করেই কাহিনী রূপ নিয়েছে।

নাটকটি সর্বতোভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ধারাবাহিকতা পারম্পর্যরক্ষার দিক থেকে বিচার করলে এ নাটক ত্রুটি বিমুক্ত। কোথাও রসবিচ্যুতি ঘটেনি। নাট্যকার উপন্যাসটির নাট্যরূপ দানে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকটির পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি প্রভূত দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনা সংস্থাপনে ও কাহিনীবিন্যাস প্রশংসার দাবী রাখে। নাটকটির মধ্যে এক যুগোপযোগী বক্তব্য এবং বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে। সর্বোপরি কর্তৃপক্ষের একজন আধুনিক লেখককে এই সুযোগ দান আমাদের আনন্দ দিয়েছে। শিল্পনির্দেশক অনিল বসুর শিল্পকর্ম অভিনন্দনীয়। সুরকার দুর্গা সেনও তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

অভিনয়াংশে কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতা দে অভিনয় অনবদ্য। আশীষকুমার, অনুপকুমার, বীরেশ্বর সেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, চন্দ্রশেখর দে, অপর্ণা দেবী, লিলি চক্রবর্তী, সাধনা রায়-চৌধুরী, বাসবী নন্দী প্রভৃতি শিল্পিবর্গ অভিনয়ে চরিত্রগুলির আশানুযায়ী রূপদানই করেছেন। এঁরা ছাড়া শ্যাম লাহা, প্রীতি মজুমদার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সুখেন দাস, আশা দেবী, প্রিয়া চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

সংবাদবিচিত্রা

গত ২৪এ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত নাটক আকাদামীর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বছরের সম্মান প্রাপকদের নাম ঘোষিত হয়েছে। এ বছর হিন্দুস্থানী কণ্ঠ সঙ্গীতে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী, যন্ত্রসঙ্গীতে (সেতার) পণ্ডিত রবিশঙ্কর, কর্ণাটকী কণ্ঠ সঙ্গীতে শ্রীমতী ডি, কে, পটম্মল, তামিলী অভিনয়ে টি, কে, ষণ্মুখম এবং বাঙলা অভিনয়ে শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র আকাদমীর সম্মান পেলেন। এ বছর যাঁরা আকাদামীর সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উদয়শঙ্কর ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাঙলার বাইরে যে তরুণ বাঙালী শিল্পীর দল প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছে, সুবীর সেনের নাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। অবাঙালী মহলেও এঁর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। সম্প্রতি ইনি পূর্ব আফ্রিকা এবং মরিসাসে এক ব্যাপক পরিক্রমা শেষ করে দেশে ফিরে এসেছেন। সেখানকার বিভিন্নস্থানে সর্বসমেত পঞ্চান্নটি অনুষ্ঠানে তিনি কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। আনন্দের কথা যে কেবলমাত্র প্রাচ্যদেশীয় নয়, পাশ্চাত্যদেশীয় সঙ্গীতেও তাঁর নৈপুণ্য সেখানকার রসিক সমাজে যথাযথ স্বীকৃতিলাভ করেছে। শিল্পীর সাফল্যে আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

জানা গেছে যে ভারত সরকার যে মাসের শেষভাগে পোল্যাণ্ডে

ওথেলো নাটকের নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় দুই জন বিখ্যাত নায়ক: পৃথিবীখ্যাত গায়ক পল রোবসন। নায়িকা; স্বনামধন্যা অভিনেত্রী শ্রীমতী মেরী উরি।

ভারতীয় ছায়াছবির এক প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন। ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট চিত্র এই প্রদর্শনীতে পোল্যাণ্ডের অধিবাসীদের সামনে প্রদর্শিত হবে। ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে পোল্যাণ্ডের জনসাধারণের এইভাবেও অনেকখানি পরিচয় ঘটবে বলে আশা করা যায়।

ফিল্মস ডিভিসানের সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে শ্রী ভি, শিবাজীর শূন্য আসন পূর্ণ করলেন শ্রীবিজয়রাঘব রাও। ভারত থেকে রাশিয়া তথা ইয়োরোপে যে সাংস্কৃতিক মিশনটি প্রেরিত হয় ইনি সেই দলেরই অন্যতম সদস্য ছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যাতেও ইনি যথেষ্ট পারদর্শী। পণ্ডিত রবিশঙ্কর এঁর শিক্ষাগুরু।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিখ্যাত শিল্পস্রষ্টা চার্লস চ্যাপলিনকে সম্মানাত্মক ডি, লিট উপাধি দ্বারা সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত করেছেন। চ্যাপলিনের এই উপাধিলাভ পৃথিবীর চিত্ররসিক সমাজে নিঃসন্দেহে একটি আনন্দ বারতা। চলচ্চিত্রজগতের ইতিহাসে চ্যাপলিন এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর প্রতিভা ও সৃজনীশক্তি চলচ্চিত্রলোককে যে কতখানি সমৃদ্ধ করে তুলেছে তার তুলনা নেই। চলচ্চিত্রলোক নানাভাবে তাঁর অবদানে ভরে উঠেছে এ কথার উল্লেখই বাহুল্যমাত্র। বিশ্ববরেণ্য শিল্পীকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়।

প্রখ্যাতনাম্নী চিত্রাভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলরের (৩১) বিবাহবন্ধন শিথিল হয়ে এসেছে। বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন উপস্থাপিত হয়েছে। প্রখ্যাত শিল্পী এডি ফিসার ছিলেন তাঁর চতুর্থ স্বামী। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ বিচ্ছেদে পর্যবসিত হয়। তাঁর তৃতীয় বিবাহের পরিণতি বৈধব্য। বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে তাঁর সঙ্গী হিসেবে অভিনেতা রিচার্ড বার্টনকে দেখা যাচ্ছে, হলিউড মহলে এই নিয়ে নানা জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। লিজ বর্তমানে বহুল প্রচারিত 'ক্লিওপেট্রা'র নাম-ভূমিকায় অভিনয়রতা, রিচার্ড ঐ ছবিতে এ্যাণ্টনীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন।

সম্প্রতি হলিউডের বার্ষিক অস্কার রজনীর অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়ে গেল। এ বছর ম্যাক্সিমিলিয়ান শেল ও সোফিয়া লোরেন যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর অস্কার লাভ করলেন। ওয়েষ্ট সাইড ষ্টোরি ছবিটি বছরের শ্রেষ্ঠ ছবির অস্কারলাভ করেছে। এ বছরের অস্কার বিতরণে একটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষণীয়। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর অস্কার যাঁরা পেলেন হলিউডের কাছে তাঁরা

পরিচালক রাজেন তরফদার এবং নবাগতা শর্মিষ্ঠা

দুজনেই বিদেশী। ১৯৩১ সালের পর হলিউডের ইতিহাসে এই ঘটনা এই প্রথম ঘটল। সেবারে এই সম্মানে বিভূষিত হয়েছিলেন রবার্ট ডোনাট এবং ভিভিয়েন লি।

জাপানের মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশনের রপ্তানী পরিষদের এক বিবরণীতে জানা গেছে যে গত ফেব্রুয়ারী মাসে জাপান এক লক্ষ একত্রিশ হাজার আটশ' এক ডলার মূল্যের ছায়াছবি রপ্তানী করেছে।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

প্রবীণ পরিচালক প্রফুল্ল রায়কে দীর্ঘকাল পরে আবার চিত্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখা যাবে। বীণা ফিল্মসের "ছক্কা পাঞ্জা" ছবিটি তাঁরই পরিচালনাধীনে গড়ে উঠছে। প্রচুর নাচ-গানে পূর্ণ এই ছবিটির কাহিনী রহস্যমূলক। বিশেষ ভূমিকাগুলির রূপ দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, পদ্মা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি।

শান্তিনিকেতনের শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাহিনী অবলম্বনে "গৃহসন্ধানে"র চিত্ররূপ গড়ে উঠেছে। চিত্রনাট্য রচনা করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। পরিচালনার ভার নিয়েছেন চিত্ত বসু। সুরযোজনা করছেন অমল মুখোপাধ্যায়। রূপায়ণে আছেন ছবি বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার সন্ধ্যারাণী প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ।

প্রযোজক আর, ডি বনসালের আগামী চলচ্চিত্র অবদানগুলির মধ্যে এক টুকরা আগুন অন্যতম। এর কাহিনীকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। চিত্রনাট্যও তাঁরই রচনা। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন বিষ্ণু বর্ধন। বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন পাহাড়ী সান্যাল, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, সুচরিতা দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

কলাকুশলী সৌমেন মুখোপাধ্যায়, সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার

সমরেশ বসুর পুতুলের খেলা অবলম্বনে "ছুই নারীর" চিত্র গ্রহণের কাজ বর্তমানে শুরু হয়েছে। জীবন গঙ্গোপাধ্যায় এই ছবির পরিচালক অভিনয়াংশে আছেন নির্মলকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কাজল গুপ্ত, হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।

শব্দযন্ত্রী সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও নবাগতা শর্মিষ্ঠা

শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী অবলম্বনে "কুমারী মন" ছবিটি পরিচালনা করেছেন চিত্ররথ গোষ্ঠী। কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক, কণিকা মজুমদার, সন্ধ্যা রায় প্রমুখ তারকাবৃন্দ। সুর যোজনা করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।

সৌখীন সমাচার

কালের যাত্রা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখনীধন্য 'কালের যাত্রা' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন রূপকার গো মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চে। এই রূপকাশ্রয়ী সংকেত-ধর্মী নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন বঙ্কিম ঘোষ, হরিশনারায়ণ চক্রবর্তী, অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, ভবরূপ ভট্টাচার্য, প্রদ্যোত চট্টোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, অসিত মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর মিত্র, অনন্ত পাল, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ বাগল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রজত সেন প্রভৃতি।

সাজাহান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অবিস্মরণীয় নাটকগুলির মধ্যে 'সাজাহান' এক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বর্তমানে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন বিচিত্রা গোষ্ঠী, বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ঠাকুরদাস মিত্র, সুধীর মুস্তাফী, নলিনী জয়, শিবনাথ ভট্টাচার্য, বিমল চট্টোপাধ্যায়, আধারেন্দ্র ঘোষ, শাশ্বতী রায়, শেফালি দে, প্রভৃতি। নাটকটি পরিচালনা করেন সুধীর মুস্তাফি।

ধৃতরাষ্ট্র

ফিলিপস ক্লাব (রেডিও ফ্যাক্টরি)র সদস্যরা ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'ধৃতরাষ্ট্র' নাটকটির অভিনয় করলেন। অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে মুকুল দাশগুপ্ত, বাণী মুখোপাধ্যায়, দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলচন্দ্র রায়, অর্ধেন্দুশেখর দত্ত, চন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হিমাংশু মুখোপাধ্যায়, মায়া বসু, সুধাংশু সেনগুপ্ত, সুরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার দত্ত, বিকাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতির নাম উল্লেখনীয়।

ময়ূরমহল

হাওড়ার টেলিকম রিক্রিয়েশান ক্লাবের সদস্যদের দ্বারা ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের "ময়ূরমহল" নাটকটি অভিনীত হল। বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন রণবীর বসু, পাঁচু বিশ্বাস, অমিয় মিত্র, অরুণকান্তি মৌলিক, অসীম বসু, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়, রুবী দেবী ইত্যাদি শিল্পিবৃন্দ।

এ কি হল

শিক্ষার্থী নাট্যসংস্থা অনিলবরণ দত্তের 'এ কি হল' নাটকটি সম্প্রতি অভিনয় করলেন। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন চিত্ত দাস, সমর চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, তুহিন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ সিংহ, 'দীপালি' ঘোষ, সবিতা দাস এবং নাট্যকার স্বয়ং।

'রূপক'-এর প্রযোজনায় "বসন্ত"

গত ২১শে ফাল্গুন মহাজাতি সদনে 'রূপক'-এর শিল্পিবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের "বসন্ত" নৃত্যনাট্য শ্রীহরেন চৌধুরীর সঙ্গীত ও শ্রীরঞ্জিত রায়ের নৃত্য পরিচালনায় মঞ্চস্থ ক'রলেন। 'বসন্ত'র সঙ্গীতাংশে

দৃশ্যগ্রহণের প্রাক্কালে পরিচালক রাজেন তরফদার

ভারতীয় ছায়াছবির এক প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন। ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট চিত্র এই প্রদর্শনীতে পোল্যাণ্ডের অধিবাসীদের সামনে প্রদর্শিত হবে। ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে পোল্যাণ্ডের জনসাধারণের এইভাবেও অনেকখানি পরিচয় ঘটবে বলে আশা করা যায়।

ফিল্মস ডিভিসানের সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে শ্রী ভি, শিবালীর শূন্য আসন পূর্ণ করলেন শ্রীবিজয়রাঘব রাও। ভারত থেকে রাশিয়া তথা ইয়োরোপে যে সাংস্কৃতিক মিশনটি প্রেরিত হয় ইনি সেই দলেরই অন্যতম সদস্য ছিলেন। সঙ্গীতবিভাতেও ইনি যথেষ্ট পারদর্শী। পণ্ডিত রবিশঙ্কর এঁর শিক্ষাগুরু।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিভালয় বিশ্ববিখ্যাত শিল্পস্রষ্টা চার্লস চ্যাপলিনকে সম্মানাত্মক ডি, লিট উপাধি দ্বারা সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত করেছেন। চ্যাপলিনের এই উপাধিলাভ পৃথিবীর চিত্ররসিক সমাজে নিঃসন্দেহে একটি আনন্দ বারতা। চলচ্চিত্রজগতের ইতিহাসে চ্যাপলিন এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর প্রতিভা ও সৃজনীশক্তি চলচ্চিত্রলোককে যে কতখানি সমৃদ্ধ করে তুলেছে তার তুলনা নেই। চলচ্চিত্রলোক নানাভাবে তাঁর অবদানে ভরে উঠেছে এ কথার উল্লেখই বাহুল্যমাত্র। বিশ্ববরেণ্য শিল্পীকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়।

প্রখ্যাতনাম্নী চিত্রাভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলরের (৩১) বিবাহবন্ধন শিথিল হয়ে এসেছে। বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন উপস্থাপিত হয়েছে। প্রখ্যাত শিল্পী এডি ফিসার ছিলেন তাঁর চতুর্থ স্বামী। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ বিচ্ছেদে পর্যবসিত হয়। তাঁর তৃতীয় বিবাহের পরিণতি বৈধব্য। বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে তাঁর সঙ্গী হিসেবে অভিনেতা রিচার্ড বার্টনকে দেখা যাচ্ছে, হলিউড মহলে এই নিয়ে নানা জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। লিজ বর্তমানে বহুল প্রচারিত 'ক্লিওপেট্রা'র নাম-ভূমিকায় অভিনয়রতা, রিচার্ড ঐ ছবিতে এ্যাণ্টনীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন।

সম্প্রতি হলিউডের বার্ষিক পুরস্কার রজনীর অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়ে গেল। এ বছর ম্যাক্সিমিলিয়ান শেল ও সোফিয়া লোরেন যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করলেন। ওয়েষ্ট সাইড ষ্টোরি ছবিটি বছরের শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কারলাভ করেছে। এ বছরের পুরস্কার বিতরণে একটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষণীয়। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার যাঁরা পেলেন হলিউডের কাছে তাঁরা

পরিচালক রাজেন তরফদার এবং নবাগতা শর্মিষ্ঠা

দুজনেই বিদেশী। ১৯৩১ সালের পর হলিউডের ইতিহাসে এই ঘটনা এই প্রথম ঘটল। সেবারে এই সম্মানে বিভূষিত হয়েছিলেন রবার্ট ডোনাট এবং ভিভিয়েন লি।

জাপানের মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশনের রপ্তানী পরিষদের এক বিবরণীতে জানা গেছে যে গত ফেব্রুয়ারী মাসে জাপান এক লক্ষ একত্রিশ হাজার আটশ' এক ডলার মূল্যের ছায়াছবি রপ্তানী করেছে।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

প্রবীণ পরিচালক প্রফুল্ল রায়কে দীর্ঘকাল পরে আবার চিত্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখা যাবে। বীণা ফিল্মসের "ছক্কা পাঞ্জা" ছবিটি তাঁরই পরিচালনাধীনে গড়ে উঠেছে। প্রচুর নাচ-গানে পূর্ণ এই ছবিটির কাহিনী রহস্যমূলক। বিশেষ ভূমিকাগুলির রূপ দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, পদ্মা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি।

শান্তিনিকেতনের শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাহিনী অবলম্বনে "গৃহ১,ন্ধানে"র চিত্ররূপ গড়ে উঠেছে। চিত্রনাট্য রচনা করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। পরিচালনার ভার নিয়েছেন চিত্ত বসু। সুরযোজনা করছেন অমল মুখোপাধ্যায়। রূপায়ণে আছেন ছবি বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার সন্ধ্যারাণী প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ।

প্রযোজক আর, ডি বনসালের আগামী চলচ্চিত্র অবদানগুলির মধ্যে এক টুকরা আগুন অন্যতম। এর কাহিনীকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। চিত্র-নাট্যও তাঁরই রচনা। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন বিষ্ণু বর্ধন। বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন পাহাড়ী সান্তাল, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টো-পাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, সুচরিতা দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

কলাকুশলী সৌমেন্দু মুখোপাধ্যায়, সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার

সমরেশ বসুর পুতুলের খেলা অবলম্বনে "দুই নারীর" চিত্র গ্রহণের কাজ বর্তমানে শুরু হয়েছে। জীবন গঙ্গোপাধ্যায় এই ছবির পরিচালক অভিনয়াংশে আছেন নির্মলকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কাজল গুপ্ত, হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।

শব্দযন্ত্রী সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও নবাগতা শর্মিষ্ঠা

শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী অবলম্বনে "কুমারী মন" ছবিটি পরিচালনা করেছেন চিত্ররথ গোষ্ঠী। কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক, কণিকা মজুমদার, সন্ধ্যা রায় প্রমুখ তারকাবৃন্দ। সুর যোজনা করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।

সৌখীন সমাচার

কালের যাত্রা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখনীধন্য 'কালের যাত্রা' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন রূপকার গো মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চে। এই রূপকাশ্রয়ী সংকেত-ধর্মী নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন বঙ্কিম ঘোষ, হরিশনারায়ণ চক্রবর্তী, অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, ভবরূপ ভট্টাচার্য, প্রদ্যোত চট্টোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, অসিত মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর মিত্র, অনন্ত পাল, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ বাগল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রজত সেন প্রভৃতি।

সাজাহান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অবিস্মরণীয় নাটকগুলির মধ্যে 'সাজাহান' এক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বর্তমানে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন বিচিত্রা গোষ্ঠী, বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ঠাকুরদাস মিত্র, সুধীর মুস্তাফী, নলিনী গুহ, শিবনাথ ভট্টাচার্য, বিমল চট্টোপাধ্যায়, আধারেন্দ্র ঘোষ, শাশ্বতী রায়, শেফালি দে, প্রভৃতি। নাটকটি পরিচালনা করেন সুধীর মুস্তফি।

ধৃতরাষ্ট্র

ফিলিপস ক্লাব (রেডিও ফ্যাক্টরি)র সদস্যরা ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'ধৃতরাষ্ট্র' নাটকটির অভিনয় করলেন। অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে মুকুল দাশগুপ্ত, বাণী মুখোপাধ্যায়, দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলচন্দ্র রায়, অর্ধেন্দুশেখর দত্ত, চন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হিমাংশু মুখোপাধ্যায়, মায়া বসু, সুধাংশু সেনগুপ্ত, সুরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার দত্ত, বিকাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতির নাম উল্লেখনীয়।

ময়ূরমহল

হাওড়ার টেলিকম রিক্রিয়েশান ক্লাবের সদস্যদের দ্বারা ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের "ময়ূরমহল" নাটকটি অভিনীত হল। বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন রণবীর বসু, পাঁচু বিশ্বাস, অমিয় মিত্র, অরুণকান্তি মৌলিক, অসীম বসু, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়, রুমী দেবী ইত্যাদি শিল্পিবৃন্দ।

এ কি হল

শিক্ষার্থী নাট্যসংস্থা অনিলবরণ দত্তের 'এ কি হল' নাটকটি সম্প্রতি অভিনয় করলেন। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন চিত্ত দাস, সমর চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, তুহিন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ সিংহ, 'দীপালি' ঘোষ, সবিতা দাস এবং নাট্যকার স্বয়ং।

'রূপক'-এর প্রযোজনায় "বসন্ত"

গত ২১শে ফাল্গুন মহাজাতি সদনে 'রূপক'-এর শিল্পিবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের "বসন্ত" নৃত্যনাট্য শ্রীহরেন চৌধুরীর সঙ্গীত ও শ্রীরঞ্জিত রায়ের নৃত্য পরিচালনায় মঞ্চস্থ ক'রলেন। 'বসন্ত'র সঙ্গীতাংশে

দৃশ্যগ্রহণের প্রাক্কালে পরিচালক রাজেন তরফদার

ছিলেন শ্রীহরেন চৌধুরী, শ্রীমতী আরতি বসাক (বড়), নির্মলা শীল, লতিকা দাস, কুমারী রেখা চৌধুরী এবং অঞ্জলি বসাক। নৃত্যাংশে রূপদান করেন শ্রীরঞ্জিত রায়, কুমারী গোপা ঘোষ, চন্দ্রা চৌধুরী, আরতি, ভারতী, লিলি ও শিশু-শিল্পী শ্যামলী বসাক। একক সঙ্গীতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই নিপুণ শিল্পী। এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী নির্মলা শীলের, শ্রীহরেন চৌধুরীর, শ্রীমতী আরতি বসাকের এবং লতিকা দাসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। নৃত্যে স্মরণীয় দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন কুমারী গোপা ঘোষ, শ্যামলী বসাক ও শ্রীরঞ্জিত রায়।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে

শ্রীমতী তপতী ঘোষ

Samsonর লেখা "An artist of the first rank accepts tradition and enriches it, an artist of the lower rank accepts tradition and repeats it and an artist of the lower rank rejects tradition and strives for originality এই বাক্যটি যদি সত্য হয় তা হলে বাংলার খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী শ্রীমতী তপতী ঘোষ যিনি চলচ্চিত্রের অতীত ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে দিন দিন তার গৌরব বৃদ্ধি করে চলেছেন তিনিও যে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী তা স্বীকার করতেই হবে। তাই চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানবার জন্যে এক বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। Telephoneএ অবশ্য আমার যাওয়ার কথাটা আগেই জানিয়ে দিলাম। যাওয়া মাত্র প্রভুর একান্ত সহচরী বিরাট এ্যালসেসিয়ান কুকুরটি নিজস্ব ডাক ছেড়ে অভ্যর্থনা জানাল। সভয়ে দু পা পিছিয়ে এসেছি এমন সময় শ্রীমতী ঘোষ নিজে এসে নিয়ে গেলেন তাঁর ড্রইংরুমে। হেসে বললেন, কিছু মনে করবেন না, ওটা বড় অবাধ্য অচেনা কাউকে আসতে দেখলেই এমন হৈ হৈ করে ওঠে।

এবার বলুন, কি জানতে চান। কথাটা বলে শ্রীমতী ঘোষ আমার মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

নবাগতা শর্মিষ্ঠা, দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও অনুপকুমার

আমার প্রথম প্রশ্ন, কিছুদিন আগে B. M. P. E. Aর ডাকে চলচ্চিত্রে নিয়োজিত এক শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে যে ধর্মঘট হয়ে গেল তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আপনাদের কি কোন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

চিত্রাভিনেত্রী বাসবী নন্দী ও মঞ্জুলা সরকার···ছায়াছবি নয়।

এখুনি হয়তো তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি তপতী দেবী বললেন, কারণ যে contractগুলি করা ছিল তা strikeএর আগের। তবে অদূর ভবিষ্যতে বেশ ক্ষতি হবে বলে মনে করি। কারণ মালিক-পক্ষের এই যে খরচটা বেড়ে গেল তা তাঁরা আমাদের উপর দিয়েই তোলার চেষ্টা করবেন। বড় গাছে যেমন ঝড় আটকায় না তেমন দু চারজন মাত্র নায়ক-নায়িকা আছেন যাদের গায়ে এর আঁচটিও লাগবে না। কিন্তু একটা বইকে সম্পূর্ণ করতে গেলে ঐ দু' চারজন বাদে যে আরো বহুজন থাকেন এ কথা কেউ প্রায় স্মরণ রাখেন না। কয়েক জনের প্রয়োজনমাফিক টাকা মিটিয়ে বাকী যে কজন থাকেন তাদের 'যা হোক' করে বিদায় দেন। অথচ এমনই আশ্চর্য্য যে, এর বিরুদ্ধে বলার কেউ নেই।

কেন? কথার মধ্যেই প্রশ্ন করলাম আমি। আপনারা কি এর বিরুদ্ধে কোন সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন না?

কে করবে বলুন? আবেগ ভরে বললেন শ্রীমতী ঘোষ। অভিনেতৃ সঙ্ঘ বলে একটা সঙ্ঘও আছে কিন্তু তা সক্রিয় নয়। যার জন্যে আজ বহু শিল্পীকেই যারা বহুদিন ধরেই এই লাইনের গৌরব বৃদ্ধি করে এসেছেন, খুব দুঃখের মধ্যে দিয়ে তাঁদের আজ কাটাতে হচ্ছে। নাম আমি করতে চাই না তবে জেনে রাখুন তাঁরা প্রত্যেকেই প্রথিতযশা। আর শুনেছেন কি, শিল্পীকে অভুক্ত রেখে তাদের কাছ থেকে বেশী কাজ আদায় কোন দেশে করা হয় কি না। যাক অনেক কথাই আবেগের বশবর্তী হয়ে বলে ফেললাম, কিন্তু এত কথা লিখবেন কি?

কথা দিলাম। আর মনে মনে ভাবলাম নিজে একজন শিল্পী হয়ে অপর শিল্পীর জন্য এমন মমত্ববোধ, বুক ভরা দরদ এবং এমন নির্ভীক সত্য কথা ক'জন বলতে পারেন?

শ্রীমতী ঘোষের কাছে আমার অনেক কিছুই প্রশ্ন করার ছিল কিন্তু দু একটি করে আর করতে পারলাম না কারণ চলচ্চিত্রের আসল যে দিকটা সকলের অজ্ঞাত রূপালী পর্দার উপর কাহিনীর বিন্যাস ও শিল্পীদের চমকপ্রদ অভিনয় দেখেই যাঁরা খুশী তাঁদের কাছে একজন প্রথিতযশা শিল্পীর অন্তরের গভীর বেদনার কাহিনী জানালাম। আমার মনে হয় এ কাহিনী শুধু একজনের নয় দু' চার জনকে বাদ দিলে প্রায় সকল শিল্পীরই এই হচ্ছে মনের কথা।

আচ্ছা, অভিনয় করছেন তো আপনি বেশ কয়েক বছর তাই না?

একটু ভেবে নিয়ে তপতী দেবী বললেন, হ্যাঁ, তা প্রায় ন'বছর। ধরুন না কেন, ১৯৫৩ সালে মহাপ্রস্থানের পথে প্রথম নামি, ক'বছর হয়?

ঠিকই। কিন্তু এই যে এত বছর অভিনয় করছেন, পেলেন কি? আগের প্রশ্নের জের টেনে বললাম।

কি পেলাম, সে তো আগেই বলেছি। তবে হাঁ, স্নেহ ভালবাসা ও প্রশংসা বহু দর্শক ও সমালোচকের কাছ থেকে পেয়েছি যা আমার অনাগত দিনের সম্বল।

নিজের অভিনয় দেখতে আপনার কেমন লাগে?

ভালই। কখনও রাণী, সহচরী, প্রেমিকা আবার কখনও বা কুটিলা কোন নারীর ভূমিকায় রূপ দিতে হয়। সময়ে সময়ে হাসিও পায়।

রেডিও, থিয়েটার অথবা সিনেমা এর মধ্যে কিসে আপনি বেশী আনন্দ পান?

আমার এ প্রশ্নের উত্তরে তপতী দেবী বললেন, আনন্দ পাই সব জায়গাতেই তবে রেডিওতে বেশী একথা বলতে পারেন।

এবার আমার শেষ প্রশ্ন, আপনি আপনার বাকী জীবনটা কি ভাবে কাটাতে চান।

দেখুন, শ্রীমতী ঘোষ বললেন, জীবনের প্রায় অর্দ্ধেক অভিনয় করে কাটিয়ে দিয়েছি। বাকীটাও ঐ ভাবে কাটাবার আশা রাখি।

শ্রীমতী তপতী ঘোষ

তবে যে কোন দিন মত বদলাতে পারি। মাসিক বসুমতীর সাথে বহুদিনের যোগাযোগ আমার আছে ও থাকবে কাজেই পরবর্তী জীবনের কথা পরেও জানাতে পারি।

—জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

[এই সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলির (প্রথম তিনটি ব্যতীত) জানকী বন্দ্যোপাধ্যায়, মোনা চৌধুরী ও চিত্ত নন্দী কর্তৃক এবং উক্ত আলোকচিত্রগুলির চতুর্থ হইতে অষ্টম এই পাঁচখানি 'অগ্নিশিখা' চিত্রটির নির্মাণকালে গৃহীত হইয়াছে।]

স্বাগতম্ হে নূতন

শান্তশীল দাশ

অনেক আঁধার-ঘেরা ধরণীর বুকে আরবার
এলে তুমি হে নূতন, সাথে নিয়ে কী নব সম্ভার,
জানি না তো! আছে কিছু বেদনার দুঃখহরা দান?
কিছু হাসি, কিছু আলো তিমিরবিনাশী, কিছু গান,
কিছু স্নিগ্ধ শ্যামলতা, জীবনদায়িনী কিছু সুধা,
হরে নিতে দীর্ঘদিন-জমে-ওঠা বঞ্চনা ও ক্ষুধা?

অথবা বেদনা আরো, আরো দুঃখ, যন্ত্রণা-দাহন,
এনেছ ধরণীবক্ষে, যেথা নিত্য মুমূর্ষু জীবন
ধীরে ধীরে সুনিশ্চিত নিঃশেষের পথে অগ্রসর?
কিছু তো জানি না তুমি কী এনেছ—অভিশাপ? বর?
আশাহত বারে বার, তবু মন আশাশূন্য নয়,
আঁধারের বুকে বসে স্বপ্নে দেখে আলোর সঞ্চয়।

এস তুমি হে নূতন, সুন্দরের হও বার্ত্তাবহ,
এখানে অনেক ব্যথা, এখানে যে জীবন দুঃসহ।

দুর্গেশচন্দ্র তরফদার

(গোয়া মুক্তি যুদ্ধের প্রথম শহীদ)

কান্তা দাশ

পর্তুগীজের অত্যাচারের ছিঁড়ে কাঁটার তার
'অঞ্জন দ্বীপে' প্রথম ওদের ভাঙলে অহঙ্কার
মন হোতে শুধু, মুছেই সব, মিথ্যা জীবন ভয়
নীল আকাশে শপথের এক রাখতে প্রত্যয়।
এগিয়ে ছিলে তাই কি তুমি, নৌ-সৈন্যের বেশে
মুক্তি মাগা, অশ্রুঝরা' ভারত কন্যার দেশে!
তাই কি ওদের, হিংস্র হাতের, হিংস্র মেসিন গানে
ঝাঁঝরা করে পাঁজর তোমার, রক্ত ঝরা বানে?
শুনে যাও বন্ধু তুমি! তোমার জীবন নয় তো হীন
রক্ত তোমার দিয়েছে সেথায়, হাসি মাখা নতুন দিন।
ওই দিন শুধু, প্রহরে প্রহরে, হবে আরও উজ্জ্বল
ভীরু বুকেতে আমাদের দেবে, নতুন শপথ-বল।
যুগে যুগে, শ্বেত কপোতীরা, তোমার কথাই কবে
মুঠো মুঠো ঘাসে, তোমার জীবন, ইতিহাস হোয়ে রবে।

চৈত্র, ১৩৬৮ (মার্চ্চ-এপ্রিল, '৬২)

অন্তর্দেশীয়—

১লা চৈত্র (১৫ই মার্চ্চ) : পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত বিধান সভায় প্রবল হট্টগোল—রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্ককালে বিরোধী সদস্যদের উত্তেজনা।

"নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানে বহু প্রশ্নের মীমাংসা হইবে'—রাজ্য সভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

২রা চৈত্র (১৬ই মার্চ্চ) : 'ভারতীয় এলাকা হইতে চীনা সৈন্যের অপসারণ দ্বারাই শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ভিত্তিরচনা সম্ভবপর'—নয়াচীন সরকারের নিকট ভারতের প্রস্তাব।

৩রা চৈত্র (১৭ই মার্চ্চ) : কেন্দ্রীয় সচিব অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর কর্ত্তৃক রবীন্দ্র-ভারতীতে সারা ভারত শিল্পী সম্মেলনের উদ্বোধন।

৪ঠা চৈত্র (১৮ই মার্চ্চ) : মহানগরীর (কলিকাতা) মাষ্টার প্ল্যানের রূপায়ণ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত বিশ্ব ব্যাঙ্ক অর্থনৈতিক কমিশন সদস্যদের আলোচনা।

৫ই চৈত্র (১৯শে মার্চ্চ) : 'দেশের সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন সরকারের বিবেচনাধীন আছে'—রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর বিবৃতি।

দীর্ঘ সাত বৎসর পর আলজিরিয়ায় যুদ্ধ বিরতিতে শ্রীনেহরুর আনন্দ—আলজিরীয় জাতীয়তাবাদীদের অতুলনীয় সংগ্রামের প্রশংসা।

৬ই চৈত্র (২০শে মার্চ্চ) : বিজ্ঞানসাধক ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহের (৫৮) লক্ষ্ণৌ-এ জীবনাবসান।

রাজ্যসভায় গোয়া, দমন ও দিউ'র ভারতভুক্তি সংক্রান্ত বিল গৃহীত।

৭ই চৈত্র (২১শে মার্চ্চ) : হাফলং-এর নিকট (নাগাভূমি সীমান্ত) বিদ্রোহী নাগাদের অব্যাহত উৎপাত—আগুন লাগাইয়া দুইটি গ্রাম ধ্বংস করার সংবাদ।

৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ্চ) : ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বোম্বাই দলের পর পর চারবার রণজি ট্রফি লাভের কৃতিত্ব অর্জন।

৯ই চৈত্র (২৩শে মার্চ্চ) : 'রাষ্ট্রাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র যতদূর সম্ভব সম্প্রসারণ করাই সরকারী নীতি—'পশ্চিমবঙ্গ বিধান-পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় কর্ত্তৃক সরকারী শিল্প নীতি বিশ্লেষণ।

১০ই চৈত্র (২৪শে মার্চ্চ) : 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পর্য্যায়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রয়োজন'—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বক্তৃতা।

১১ই চৈত্র (২৫শে মার্চ্চ) : বিশ্ববিদ্যালয়ের (কলিকাতা) সমাবর্ত্তন ভাষণে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের দাবী—উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী ভাষার স্থান অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজন রহিয়াছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেলের (উ থাণ্ট) নিকট সহস্রাধিক গোয়াবাসীর স্মারকলিপি প্রেরণ—পর্ত্তুগীজ কবলমুক্ত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ।

১২ই চৈত্র (২৬শে মার্চ্চ) : আমেরিকা কর্ত্তৃক ভারতকে আরও প্রায় ২৫৭ কোটি টাকা ঋণদানের ব্যবস্থা—দিল্লীতে ভারত-মার্কিণ চুক্তি স্বাক্ষরিত।

পাক সরকার কর্ত্তৃক বে-আইনীভাবে কর্ণফুলী পরিকল্পনার রূপায়ণ পাকিস্তানের নিকট ভারত সরকারের প্রতিবাদ।

১৩ই চৈত্র (২৭শে মার্চ্চ) : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্য-সরকারের ১৯৫৯-৬০ সালের অডিট রিপোর্ট পেশ—সরকারী অর্থের যথেচ্ছ অপচয় সম্পর্কে রিপোর্টে মন্তব্য।

১৪ই চৈত্র (২৮শে মার্চ্চ) : 'পাট সমেত সকল কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য বহাল রাখার প্রশ্ন সরকারের বিবেচনাধীন আছে'—লোকসভায় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রী এস্ কে পাতিলের বিবৃতি।

হিলি সীমান্তে পাক্ হানা প্রতিরোধে রাজ্য সরকার (পশ্চিমবঙ্গ) কর্ত্তৃক সর্ব্বরকম ব্যবস্থা অবলম্বনের ঘোষণা।

১৫ই চৈত্র (২৯শে মার্চ্চ) : পিমপিতে (পুণার সন্নিকটে) শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ত ষ্ট্রেপটোমাইসিন কারখানার উদ্বোধন।

প্রখ্যাত মার্কিণ লেখিকা শ্রীমতী পার্ল বাকের কলিকাতা উপস্থিতি ও সম্বর্দ্ধনা লাভ।

১৬ই চৈত্র (৩০শে মার্চ্চ) : 'সীমান্ত বিরোধ প্রশ্নে নিকট-ভবিষ্যতে চৌ এন্ লাই-এর (চীনা প্রধান মন্ত্রী) সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর উক্তি।

১৭ই চৈত্র (৩১শে মার্চ্চ) : ১৯৬২ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৬৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৬৫টি পণ্যের আমদানী হ্রাস কিংবা নিষিদ্ধ—কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক বার্ষিক আমদানী নীতি ঘোষণা।

১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল) : সমগ্র ভারতে (পশ্চিমবঙ্গ সমেত) মেট্রিক পদ্ধতি চালু—বাজারে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি।

১৯শে চৈত্র (২রা এপ্রিল) : ৪টি রাজ্যে (মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান ও বিহার) নূতন রাজ্যপাল নিযুক্ত—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালপদে শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু বহাল।

২০শে চৈত্র (৩রা এপ্রিল) : শ্রীনেহরু পুনরায় কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা নির্ব্বাচিত।

২১শে চৈত্র (৪ঠা এপ্রিল) : আনুষ্ঠানিক পদত্যাগের পর শ্রীনেহরু আবার ভারতের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত—রাষ্ট্রপতি ভবন (নয়াদিল্লী) হইতে ঘোষণা।

২২শে চৈত্র (৫ই এপ্রিল) : ভারতের প্রতি রাজ্যে একটি করিয়া পরিকল্পনা বোর্ড সংস্থাপনের প্রস্তাব—রাজ্যসরকারগুলির নিকট পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ।

২৩শে চৈত্র (৬ই এপ্রিল) : মহানগরীর (কলিকাতা) সংলগ্ন কয়েকটি গ্রামে 'পকেট' দুগ্ধ কলোনী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা—রাজ্য সরকারের নবতম উদ্যম।

২৪শে চৈত্র (৭ই এপ্রিল) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পত্র—কলেজের অধ্যাপকদের নির্দ্দিষ্ট বেতনের হার চালু রাখার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন।

২৫শে চৈত্র (৮ই এপ্রিল): অবিলম্বে আন্তর্জাতিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের দৃঢ় দাবী—জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের উদ্দেশ্যে নয়া দিল্লীতে নিখিল ভারত শান্তি সম্মেলনের প্রস্তাব।

২৬শে চৈত্র (৯ই এপ্রিল) সতের জন পূর্ণ মন্ত্রী লইয়া শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন।

২৭শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল): রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অপর মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ।

২৮শে চৈত্র (১১ই এপ্রিল): 'ম'নাহর কঁহালিয়া' নামক হিন্দী পুস্তককে কেন্দ্র করিয়া মহানগরীতে (কলিকাতা) একালে মুসলমানদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ—রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও হামলা—১৫০ ব্যক্তি গ্রেপ্তার।

মালদহে হিন্দুদের গৃহে দুর্ব্বৃত্তদলের অগ্নিসংযোগ—৫ ব্যক্তি নিহত।

২৯শে চৈত্র (১২ই এপ্রিল): বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোত্তম ও উন্নয়ন প্রকল্প ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা।

৩০শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল) হরিদ্বারে কুম্ভমেলা উপলক্ষে ২০ লক্ষাধিক নরনারীর পুণ্যস্নান।

বহির্দেশীয়—

১লা চৈত্র (১৫ই মার্চ): নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের (জেনেভা) সূচনাতেই সোভিয়েট-মার্কিণ পরস্পর বিরোধী প্রস্তাব পেশ।

নূতন পাক্ শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদে এবং পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে ঢাকায় পুনরায় ছাত্র ধর্মঘট।

৩রা চৈত্র (১৭ই মার্চ): গ্যালিলি সাগরতীরে ইস্রায়েলী ও সিরীয় সৈন্য বাহিনীর মধ্যে ৭ ঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধ—উভয় পক্ষে' বহু সৈন্য হতাহত।

৪ঠা চৈত্র (১৮ই মার্চ): ফরাসী-আলজিরীয় অস্ত্র সম্বরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত—আলজিরিয়ায় সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের অবসান।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্ব্বত্র সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

৫ই চৈত্র (১৯শে মার্চ): আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ আলোচনা পুনরারম্ভে রাশিয়ার সম্মতি—জেনেভায় সাংবাদিক বৈঠকে সোভিয়েট প্রতিনিধি জোরিনের ঘোষণা।

৭ই চৈত্র (২১শে মার্চ): মহাশূন্য সংক্রান্ত গবেষণায় রুশ-মার্কিণ সহযোগিতা ব্যাপারে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের আগ্রহ—মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট কেনেডির নিকট পত্র প্রেরণ।

ত্রিশক্তি আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ বৈঠকের (জেনেভা) সূচনাতেই অচলাবস্থা।

৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ): 'পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান পৃথক হইয়া পড়িলে সমগ্র পাকিস্তানেরই বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিবে'—পাকিস্তান দিবস উপলক্ষে পাক্ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের সতর্কবাণী।

৯ই চৈত্র (২৩শে মার্চ): নূতন পাক্ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব্ব পাকিস্তানে গণ-আন্দোলন বিস্তার—কুষ্টিয়ায় ছাত্রবিদ্রোহ দমনে লাঠিচার্জ্জ ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ—বহু ছাত্র গ্রেপ্তার।

১০ই চৈত্র (২৪শে মার্চ): ঢাকায় বিক্ষোভকারী ছাত্রদলের উপর আর একদফা লাঠিচালনা ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ।

আলজিয়ার্সে ফরাসী বাহিনীর সহিত গুপ্ত সামরিক বাহিনীর ইতস্ততঃ সংঘর্ষ—গুপ্ত বাহিনীর ঘাঁটি সরকারী সৈন্যদল কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত।

১২ই চৈত্র (২৬শে মার্চ): জেনেভায় সপ্তদশ রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ বৈঠক পুনরারম্ভ।

১৩ই চৈত্র (২৭শে মার্চ): 'আমেরিকা আণবিক পরীক্ষা পুনরারম্ভ করিলে রাশিয়াও পরীক্ষা চালাইবে'—সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকোর ঘোষণা।

১৪ই চৈত্র (২৮শে মার্চ): সিরিয়ায় আবার সামরিক অভ্যুত্থান—জঙ্গী পরিষদ কর্ত্তৃক শাসনক্ষমতা দখল।

নয়া পাক্ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব্ব পাকিস্তানে ছাত্র বিক্ষোভ অব্যাহত।

১৫ই চৈত্র (২৯শে মার্চ): আর্জ্জেণ্টিনার প্রেসিডেণ্ট মিঃ ফ্রান্দিজি পদচ্যুত—সৈন্যবাহিনীর আকস্মিক কার্য্য ব্যবস্থা।

১৬ই চৈত্র (৩০শে মার্চ): কর্ণফুলী বাঁধ নির্ম্মাণ সম্পর্কে ভারতের প্রতিবাদ পাকিস্তান কর্ত্তৃক নাকচ—একতরফা কাজ হয় নাই বলিয়া পাক্ সরকারের ঘোষণা।

সেনর গুইদো আর্জ্জেণ্টিনার নূতন প্রেসিডেণ্ট হিসাবে নিযুক্ত।

১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল): ওয়েগিঙ্গ দ্বীপ (পশ্চিম ইরিয়ানের সন্নিহিত) ওলন্দাজ কবল হইতে মুক্ত—জাকার্তা বেতারে ঘোষণা।

১৯শে চৈত্র (২রা এপ্রিল): সিরীয় বিদ্রোহী সামরিক কমাণ্ডের পরিবর্ত্তিত সিদ্ধান্ত—মিশরের সহিত সিরিয়ার পুনর্মিলনে প্রস্তুত।

২১শে চৈত্র (৪ঠা এপ্রিল): প্রশান্ত মহাসাগরের খৃষ্টমাস দ্বীপ (বৃটিশ) এলাকায় আমেরিকার আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা চালনার সিদ্ধান্ত।

২২শে চৈত্র (৫ই এপ্রিল): 'ভারত পারমাণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ বা আমদানী না করার প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত'—উ থাণ্টের (রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল) লিপির উত্তরে ভারত সরকারের বক্তব্য পেশ।

২৩শে চৈত্র (৬ই এপ্রিল): মধ্য ভিয়েৎনামে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান।

২৫শে চৈত্র (৮ই এপ্রিল): নেপালে বিদ্রোহীদের তৎপরতা বৃদ্ধি—থিবাংচপু ও মিমিং (নেপাল-সিকিম সীমান্তবর্ত্তী) অঞ্চল বিদ্রোহী দল কর্ত্তৃক দখল।

২৬শে চৈত্র (৯ই এপ্রিল): ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সুকর্ণের সতর্কবাণী—শান্তির পথে পশ্চিম ইরিয়ান উদ্ধার না হইলে ইন্দোনেশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে—পশ্চিম ইরিয়ান ত্যাগ করিয়া যাইতে ৮ মাসের সময় প্রদান।

ফরাসী প্রেসিডেণ্ট দ্যগলের আলজিরীয় যুদ্ধবিরতি চুক্তি বিপুল ভাবে সমর্থিত—ফ্রান্সে সংশ্লিষ্ট গণভোটের ফলাফল ঘোষণা।

২৭শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল): পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষায় আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে রুশিয়ার মনোভাব পরিবর্ত্তনের দাবী—ক্রুশ্চেভের নিকট কেনেডি (আমেরিকা) ও ম্যাকমিলানের (বৃটেন) যৌথ লিপি প্রেরণ।

৩০শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল): জেনেভায় সপ্তদশ রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা চলার কালে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ রাখিতে রুশিয়া প্রস্তুত—ভারতের আনীত প্রস্তাব গ্রহণে সোভিয়েট সরকারের সম্মতি।

পশ্চিম বাঙলার দাওয়াই

"সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত ঔষধের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যদপ্তর উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। এই সংবাদে আমরাও উদ্বিগ্ন হইয়াছি। কিন্তু কেন পশ্চিমবঙ্গে ঔষধ প্রস্তুতের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইল, তাহাই প্রধান বিবেচনার বিষয়। বর্ত্তমানে বোম্বাই রাজ্যে প্রস্তুত ঔষধই নাকি ভারতের ঔষধের বাজারের বহুলাংশই নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। কিন্তু বোম্বাই-এ প্রস্তুত ঔষধের সহিত প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত ঔষধ পারিয়া উঠিতেছে না। এই প্রতিযোগিতা কি শুধু মূল্যের প্রতিযোগিতা? রোগীর রোগ আরোগ্যের জন্য, তাহার প্রাণ রক্ষার জন্যই লোকে ঔষধ ক্রয় করে। সেখানে ঔষধের দাম অপেক্ষা গুণাগুণই প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যদি ঔষধ খাইয়া ফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে দাম কমের জন্য সেই ঔষধ কেহই কিনিবে না। যদি ফল পাওয়া যায়, তাহা হইলে দাম বেশী হইলেও বিভিন্ন ঔষধের দোকান খুঁজিয়া রোগীর আত্মীয়স্বজন সেই বেশী দামের ঔষধই কিনিবেন। ঔষধের গুণাগুণ বা মানের উপরেই উহার জনপ্রিয়তা নির্ভর করে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত ঔষধের মান পরীক্ষা করিয়া দেখার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। ঔষধের মান যাহাতে উন্নত হয়, প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য আইন প্রণয়নও করিতে হইবে।" —দৈনিক বসুমতী।

হিন্দীমে মাৎ বলিয়ে

"'হিন্দীমে বলিয়ে' ধ্বনি হাঁকিয়া অ-হিন্দীভাষার বক্তৃতায় বাধা প্রদান করা শুধু গর্হিত অশিষ্টতা নহে, তাহা অন্য ভাষার মর্যাদার উপর আক্রমণমূলক আচরণ। পরিতাপের বিষয় এই যে, হিন্দী ভাষার অত্যুৎসাহী প্রচারকের এই মত্ততার প্রভাব লোকসভার আসরেও আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সদস্য শ্রীচতুর্বেদী ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিতে শুরু করিলে একদল হিন্দীভাষী সদস্য 'হিন্দীমে বলিয়ে' ধ্বনি করিয়া তাঁহার বক্তৃতায় বাধা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচতুর্বেদী স্বয়ং হিন্দীভাষী; হিন্দীভাষায় বক্তৃতা করিতে তাঁহার কোন অসুবিধা ছিল না। তবু তিনি 'হিন্দীমে বলিয়ে' ধ্বনির আপত্তি গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি উত্তরপ্রদেশের লোক বলিয়াই ইংরাজীতে বক্তৃতা করিবেন; অহিন্দীভাষীর উপর হিন্দীভাষা চাপাইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে, এমন ধারণার সৃষ্টি হইতে দেওয়া উচিত নহে। শ্রীচতুর্বেদীর মনোভাব প্রশংসনীয়। কিন্তু মনে হয়, দু-একজন হিন্দীভাষীর এ ধরণের সংযত মনোভাব এবং সতর্ক হিন্দী-প্রীতিতে আর কোন কাজ হইবে না। হিন্দীকে অহিন্দীভাষীর উপর চাপাইয়া দিবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা এখন আক্রমণের পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। এই অশোভন ও অশিষ্ট 'হিন্দীমে বলিয়ে' ধ্বনি স্তব্ধ না হইলে লোকসভার শান্তি ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া আশংকা করিতেছি। এবং তাহারও শেষ পরিণাম কোথায় গিয়া ঠেকিবে, তাহা ভাষা-উন্মাদ হিন্দী-প্রচারকেরা উপলব্ধি না করুক, কেন্দ্রীয় সরকার কেন উপলব্ধি করিবেন না?" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

ডাক্তারের প্রয়োজন

"বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীতে প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় ১৫ লক্ষ ডাক্তারের অভাব রহিয়াছে। পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী ডাক্তার রহিয়াছে ইস্রায়েলে। ইহার পরই ডাক্তারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হইতেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং অষ্ট্রিয়ায়। যে সমস্ত দেশে ডাক্তারের সংখ্যা অপ্রতুল তার মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। আমাদের দেশে প্রতি পাঁচ হাজার জনের জন্য একজন ডাক্তার আছেন। সব চেয়ে শোচনীয় অবস্থা আফ্রিকার কতকগুলি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রে। দীর্ঘদিন পর-শাসনে থাকিবার ফলেই যে এইরূপ শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ ভারতের মতো দেশে দূর গ্রামাঞ্চলগুলির অবস্থার কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই। এ্যান্টিবায়োটিকের কল্যাণে রোগ প্রতিষেধের ক্ষমতা মানুষের আয়ত্ত হইলেও গ্রাম-প্রধান ভারতবর্ষে এখনও জনসাধারণের জন্য উপযুক্ত ডাক্তার কিংবা হাসপাতালের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। দরিদ্র দেশে সরকারী অর্থে পরিচালিত হাসপাতালের উপরই মানুষ নির্ভর করে। ভিজিট দিয়া ডাক্তার দেখাইবার ক্ষমতা কয়জনের আছে? তা ছাড়া শিক্ষিত ডাক্তারদের মধ্যে অনেকেই গ্রামে যাইতে চান না। এর ফলে শহরে হোমরা-চোমরা চিকিৎসকদের ভীড় বাড়িতেছে। কিন্তু তদনুপাতে গ্রামগুলি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুযোগ সুবিধা লাভ করিতে পারিতেছে না। ডাক্তারের সংখ্যা যেমন বাড়ানো দরকার তেমনি তরুণ ডাক্তারেরা যাহাতে গ্রামে গিয়া জনসাধারণের সেবা করিতে পারেন তার ব্যবস্থাও সরকারের করা উচিত।" —যুগান্তর।

অশীতিপরা বৃদ্ধার প্রশ্ন

"অসহায় বিধবাকে বিলুপ্ত করিয়া কি কংগ্রেসের স্বপ্নরাজ্য রচিত হইবে? প্রশ্নটি উপস্থিত করিয়াছেন বীরভূম জেলার মল্লারপুর গ্রামের অশীতিপরা বৃদ্ধা নৃপবালা দাসী। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার নিকট প্রেরিত তাঁহার চিঠিটি গত ২৭শে এপ্রিল তারিখের 'স্বাধীনতা' পত্রিকার চিঠিপত্র স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজ্য সরকার ময়ূরেশ্বর থানা কৃষি-ফার্মের আদর্শ বীজাগার স্থাপনের জন্য নৃপবালা দাসীর জীবিকা নির্বাহের একমাত্র নির্ভর জমি দখল করিয়া লন। ইহা চার বৎসর আগেকার ঘটনা। চিঠিতে প্রকাশ, বৃদ্ধাকে অদ্যাবধি জমির ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হয় নাই। স্থানীয় উর্দ্ধতন কর্তা-উপকর্তাদের দরজায় বহুবার আবেদন-নিবেদনেও কোন ফল হয় না। প্রকাশিত চিঠিটিতে নৃপবালা দাসী জানিতে চাহিয়াছেন যে "পাঁচটি বেকার, অর্দ্ধবেকার পোষ্য—প্রায় আশি বছরের বৃদ্ধা আমি কি করিব?" কিছুদিন আগে খুব ঘটা করিয়া প্রচার করা হইয়াছিল যে, এই রাজ্যের সত্তর বৎসর বয়স্ক ও তদূর্দ্ধ সকল ব্যক্তির জন্য রাজ্য সরকার নাকি নিয়মিত পেনশনদানের একটি স্কীম করিতেছেন। নৃপবালা দাসীর

ক্ষেত্রে কোন দানের প্রশ্ন নাই। প্রশ্ন হইতেছে সরকারের নিকট তাঁহার ন্যায্য পাওনার। নৃপবালা দাসীর এবং এই ধরনের আর যে সব ক্ষেত্রে অন্যায় দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হইয়াছে আগে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া তাহার পর জনসেবার নূতন নূতন স্কীম প্রচার করা হইলেই কী দেখিতে শুনিতে শোভনীয় হয় না? আর উক্ত ধরনের পুঞ্জীভূত অন্যায়ের পরিমাণ নেহাৎ কম হইবে না।" —স্বাধীনতা।

কৈফিয়ৎ নাই

"একটি খুনের মামলায় সেসন আদালতের আসামী জেল হাজতে ছিল। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে মামলা আরম্ভ করিতে গেলে দেখা যায়—আসামীকে আলিপুর কোর্টে আনা হয় নাই। বিচারক-ব্যবহারজীবীগণ ১০॥ দশটা হইতে ১টা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ১টার সময় আসামীকে আদালতে হাজির করা হয়। বিচারক এই বিলম্বের জন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন এবং এই বিসদৃশ ব্যাপারের প্রতি কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, যাহাতে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের শৈথিল্যে বা গাফিলতিতে এই ভাবে আদালতের সময় নষ্ট না হয়। জেল হইতে কোর্টে আসামী লইয়া আসা এমন কিছু জটিল সমস্যা নহে। এইরূপ অবাঞ্ছিত ব্যাপারের জন্য যে বা যাহারা দায়ী তাহাদের কৈফিয়ৎ কিছু নাই বলিয়াই মনে করি।" —জনসেবক।

অবিচার

"রিয়ার এডমিরাল অজিতেন্দু চক্রবর্তী পদত্যাগ করিয়াছেন। ১৯৫৮ সনে তাঁহাকে বাদ দিয়া ভাইস এডমিরাল কাটারিকে চীফ অব নেভাল ষ্টাফ বা নৌবিভাগীয় সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। এই বৎসর তিনি দ্বিতীয় বার উপেক্ষিত হইয়াছেন। কার্য্যকাল ও যোগ্যতার বিচারে শ্রীযুত চক্রবর্ত্তীর দাবী অগ্রগণ্য। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে রিয়ার এডমিরাল বি, এস, সোমান চীফ অব নেভাল ষ্টাফ হিসাবে পদোন্নতি লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী ইহার পর সসম্মানে পদত্যাগের পথ বাছিয়া লইয়াছেন। শ্রীযুত কৃষ্ণমেনন দেশরক্ষা বিভাগে যে গোল পাকাইতেছেন, তাহার প্রতিবাদে লোকসভায় যথেষ্ট আলোচনা হয়। নেহরুজী সে সময় সব দিক হইতেই তাঁহাকে রক্ষা করেন। কিন্তু দেশরক্ষা-মন্ত্রী শোধরাইবার নহেন। বরঞ্চ, তিনি অধিকতর উৎসাহের সহিত নিজেদের কাজ করিয়া যাইতেছেন। প্রবীণতম রিয়ার এডমিরালের পদত্যাগ যে সরকারের পক্ষে সম্ভ্রমহানিকর, ইহা পণ্ডিত নেহরু এবং শ্রীকৃষ্ণমেনন উপলব্ধি করেন না। লোকসভায় এই বিষয়ে আলোচনা হইবে, কিন্তু সরকারী তরফ ইহার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিবেন, এমন কোনও আশা নাই। বিশেষ চাপে পড়িলে প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবেন এবং প্রধান মন্ত্রী আসরে নামিবেন।" —লোকসেবক।

মানিনী লোকসভা

"ভূতপূর্ব স্পীকার অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার লাট সাহেব হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। এতদিন প্রধানমন্ত্রী তাঁহাকে কুর্ণিশ করিয়া ঘরে ঢুকিতেন, এখন তিনি প্রধানমন্ত্রীকে কুর্ণিশ করিয়া ধন্য হইবেন। লাট ভবনের বিলাসিতার টান সহজ নয়। কিন্তু একটি কাজ তিনি অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। ষ্টেটসম্যান ইতালিয়ান কোম্পানীর সহিত তৈলচুক্তির সর্ত প্রকাশ করাতে লোকসভার মান ভাঙিয়া পড়িয়াছিল এবং স্পীকার আয়েঙ্গার তাহা জুড়িয়া দেওয়ার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজ সম্পূর্ণ না করিয়া তিনি সরিয়া গিয়াছেন। নূতন স্পীকার হুকুম সিংকে দিল্লী প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকেরা এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি ভাসা ভাসা উত্তর দিয়াছেন। পার্লামেন্ট সদস্যদের প্রিভিলেজ বস্তুটি কি তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশের ব্যবস্থা করিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ তিনি দেখান নাই। হাউস অব কমন্সের নকলনবিশীর দোহাই দিয়া এক অবাস্তব এবং অবাঞ্ছিত ক্ষমতা পার্লামেন্ট সদস্যেরা হাতে রাখিতে চাহিতেছেন। লোকসভায় কে, ডি, মালব্য যখন বলিলেন—ইতালিয়ান কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তির সর্ত তিনি জানাইবেন না, তখন কিন্তু লোকসভার কোন সদস্য উঠিয়া বলিলেন না যে, বৈদেশিক বা দেশরক্ষা বিষয়ে মন্ত্রী অবশ্যই কোন তথ্য গোপন রাখিতে চাহিতে পারেন কিন্তু বাণিজ্য সম্পর্ক গোপনে কেন হইবে? বিশ্বময় টেণ্ডার চাহিয়া তৈল চুক্তি করা যাইত। উহা গোপনে করা নীতিবিগর্হিত, কারণ গোপনতার সুযোগে মন্ত্রী ক্ষতিকর সর্তেও সম্মতি দিতে পারেন। এত বড় একটি ঘটনা সাংবাদিকেরাই বা উপেক্ষা করিলেন কিরূপে তাহা আরও আশ্চর্য্য।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

রেলওয়ে বাজেট

"এবারে যে রেলওয়ে বাজেট পেশ হইয়াছে এবং ঘাটতি পূরণের জন্য যে পন্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা দেখিয়া সকলের সহিত আমরাও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। রেলের টিকিটের ও মাশুলের হার যে হারে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে তাহাতে প্রতিটি গরীবের পকেটে জোর টান পড়িবে। এই বর্দ্ধিত হার আগামী ১লা জুলাই হইতে চালু হইবে। রেলওয়ে সরকারের আয়ত্বাধীন। ইহা সরকারের একচেটিয়া ব্যবসা। ইহার সুযোগ লইয়া সরকার যখন তখন হার বৃদ্ধি করিতেছে। সাধারণ ব্যবসাদাররা যদি কোন দ্রব্যের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি করে তবে তাহাদিগকে মুনাফাখোর ও মজুতদার বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং সরকার সেই দ্রব্যের উপর কনট্রোল ব্যবস্থা চালু করেন। হায় রে কপাল! এখানে যে রক্ষক সেই ভক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে! রেলওয়ে ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট এমন একটি লোক সমগ্র ভারতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। রেলওয়ের ভাড়া ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে কিন্তু যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বিন্দুমাত্র বাড়ে নাই—পুরা ভাড়া দিয়াও যাত্রীদিগকে হাঁস-মুরগীর খোঁয়াড়ে থাকার মত ঠাসাঠাসি এবং দুর্গন্ধপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে যাইতে হয়। রেলে মাল চালান দিলে অধিকাংশক্ষেত্রে মাল পাওয়া যায় না—যাহাও পাওয়া যায় তাহাতে ইট, পাথর কিম্বা লিখিত জিনিষ পরিমাণে কম পাওয়া যায়। ক্লেমস অফিসে বছরের পর বছর ধর্ণা দিয়াও সুরাহা হয় না উপরন্তু রেল অফিসের কেরাণীবাবুদের শ্লেষবাক্য উপরি-পাওনা হিসাবে পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়াই চলিয়াছে—সেই অনুপাতে মানুষের রোজগার বাড়িতেছে না। সরকার আজ পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা করিতেছেন—কিন্তু কি জন্য? যে পরিকল্পনায় সাধারণ মানুষের দুঃখের লাঘব হয় না সে পরিকল্পনা দিয়া কিছু কনট্রাক্টরের এবং কিছু সাদা কলারের অফিসারদের লাভ হইতে পারে কিংবা বিদেশে চাক

পিটাইয়া কংগ্রেসী সরকারের গুণ কীর্তন হইতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষ এই বাহ্যাড়ম্বরের ফলে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। এই করুণ অবস্থার অবসানের দিনটির জন্ত চাহিয়া আছি।"

— মল্লভূম (বাঁকুড়া)।

অন্যায়

"উপমন্ত্রী শ্রীমতী রাধারাণী মহতাব গত শনিবার বর্দ্ধমান আসিয়াছিলেন এবং তিনদিন তাঁহার নির্ব্বাচনী এলাকা সফরে ব্যস্ত ছিলেন। গত ১৬ই এপ্রিল জোৎরামে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলের অধিবাসীরা জোৎরামে এক সভায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং অঞ্চল-প্রধান এক মানপত্র পাঠ করেন। আসলে ইহা মানপত্র নয় অভাব অভিযোগের একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা মহারাণীর সম্মুখে পেশ করা হয়। এই তালিকায় কোন কিছু বাদ যায় নাই। ক্যানাল, জনস্বাস্থ্য, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, কর্ম্মসংস্থান, এমন কি খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল নিবারণ পর্য্যন্ত ছিলো। মহারাণী কি উত্তর দিয়াছেন বলিতে পারিব না। কিন্তু তিনি এই অভাব অভিযোগের দীর্ঘ ফিরিস্তি দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলা যায়। লোকের ধারণা জন্মিয়াছে যে মন্ত্রীরা সব কিছুই করিতে পারেন। অথচ মজার কথা এই যে লোকে দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করেন এবং বাজেটের হিসাবও দেখিয়া থাকেন। তাহা যদি যথাযথ বিচার করিয়া দেখা হয় তাহা হইলে জানা যাইবে কোথায় কি হওয়া যায় ও সম্ভব। সম্বর্দ্ধনা সভায় অহেতুক অন্ত বিষয়ের অবতারণা করিয়া মাননীয় অতিথিকে বিব্রত না করাই উচিত অন্ততঃ মন্ত্রী বা উপমন্ত্রীর অফিসে উপস্থিত হইয়া একটা স্মারকলিপি পেশ করাই শোভন এবং ন্যায়সঙ্গত হইত।"

—বর্দ্ধমান বাণী।

সাম্প্রদায়িক জঘন্যতা

"ভারতে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করিয়াছেন ইংরেজ শাসক গোষ্ঠি তাহাদের নিজস্ব স্বার্থে, আর সেই সাম্প্রদায়িকতার পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে কংগ্রেস। সেই মুস্লীম লীগের পরোক্ষ সহায়ক ছিলেন যিনি তিনিই ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। ভারতের চরম দুর্ভাগ্যবশতঃ যে মুস্লীম লীগ ভারতের সর্ব্বতোমুখী সর্ব্বনাশ করিয়াছে, স্বাধীন ভারতেও সে মাথা জাগাইয়া উঠিতে ও আরও সর্ব্বনাশের সুযোগ পাইতেছে পণ্ডিত নেহরুর অমার্জ্জনীয় দুর্ব্বলতা ও নির্লজ্জ তোষণে। একটি মানুষের খাম-খেয়ালী দেশের কত ক্ষতি করিতে পারে তার জীবন্ত পরিচয়ই বোধ হয় পণ্ডিত জহরলাল। তাই একটা বাজে ছুতা ধরিয়া সম্প্রতি কলিকাতা ও মালদহে দেশ শত্রুদের সাগ্রহ প্রচেষ্টায় সাম্প্রদায়িক কার্য্যাবলীর যে জঘন্যরূপ পুনরায় দেখা যাইতেছে, তাহা সম্ভব হইয়াছে। ভারতে যদি ভারতের কঠোর নীতির কোন প্রধানমন্ত্রী থাকিতেন, তাহা হইলে ভারতের বুকে এই পশু তাণ্ডব আর কখনও সম্ভব হইতে পারিত না। এই জন্তই জনসঙ্ঘ শক্তি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেছে। এ বিষয়েও সন্দেহ নাই যে, কংগ্রেসই যখন চিরদিন ভারতের ভাগ্যবিধাতা থাকিবেন এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের শক্তি বৃদ্ধি হইবেই। সুতরাং ভারতের সামগ্রিক কল্যাণ কখন সম্ভব হইবে?"

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

শোক-সংবাদ

ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ

সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ গত ৬ই চৈত্র ৫৮ বছর বয়েসে আকস্মিক ভাবে লক্ষ্ণৌতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১৯০৪ সালে এঁর জন্ম। ছাত্রজীবন থেকে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে ইনি যুক্ত ছিলেন। সেইজন্তে গবেষণার জন্তে প্রথমে ইংল্যাণ্ড যাওয়ার সঙ্কল্প করলে ইংরেজ সরকার এঁকে পাসপোর্ট দিতে অস্বীকৃত হন। পরে এই পাসপোর্ট তিনি লাভ করেন এঁর শিক্ষাগুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রচেষ্টায়। লণ্ডনে অবস্থানকালে ইনি মার্কসবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। মার্কসবাদী চিন্তানায়ক বলে রাশিয়ায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তিনি কোনদিন রাজনৈতিক জীবন গ্রহণ করেন নি। শিক্ষা সমাপনান্তে দেশে ফিরে এসে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অধীনে গবেষণা ও অধ্যাপনা শুরু করেন। ভিটামিন 'সি' সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক গবেষণা তাঁকে আন্তর্জ্জাতিক বৈজ্ঞানিক সমাজে একটি বিশেষ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতে প্রাণী রসায়নের গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের উপদেষ্টার আসনে ইনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাগিনের এবং অধ্যক্ষ জীতেশ গুহের অনুজ ছিলেন। প্রখ্যাতনাম্নী সমাজ সেবিকা ডক্টর শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ তাঁর সহধর্মিণী।

সত্যপ্রিয় বিশ্বাস

স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ সত্যপ্রিয় বিশ্বাস ২১শে চৈত্র ৬৮ বছর বয়েসে দেহান্তরিত হয়েছেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে ইনি স্কটিশ চার্চ কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ঐ কলেজের দর্শন-বিভাগের প্রধান ছিলেন। অধ্যাপক হিসেবে ইনি বিপুল শ্রদ্ধা ও জনপ্রিয়তার অধিকারী ছিলেন। নানাবিধ সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্য্যে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। ক্রীড়াজগতের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ইনি বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের একজন সভ্য ও য়্যাডভান্স পত্রিকার কিছুকাল ক্রীড়া-সম্পাদক ছিলেন। তাঁর অভাব ছাত্রসমাজে গভীর ভাবে অনুভূত হবে।

অয়স্কান্ত বক্সী

প্রখ্যাত নাট্যকার অয়স্কান্ত বক্সী গত ২৭শে ফাল্গুন ৬২ বছর বয়েসে পরলোকগমন করেছেন। অভিনেতা হিসেবেও ইনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। নটগুরু শিশিরকুমারের সঙ্গে ইনি সাধারণ রঙ্গালয়ে কয়েকটি নাটকে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। সীতা, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কয়েকটি বাঙলা সবাক চিত্রেও ইনি অভিনয় করেন। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে "ভোলা মাষ্টার" ও "ডক্টর মিস কুমুদ"এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পত্রিকা সমালোচনা

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,
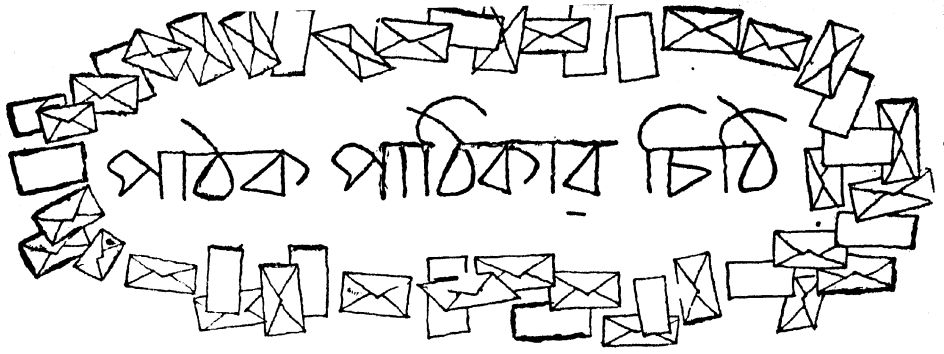
মাসিক বসুমতীর চিঠি পত্রের পাতায় 'পতিতাবৃত্তি' বিষয়ে প্রবন্ধ ও তার সমালোচনা পড়লাম—এতে আমাদের দেশীয় বৃদ্ধ ও সমাজপতিদের বর্তমান মনোবৃত্তির যে ছবি দেখছি তাতে হতাশা বোধ করছি। পতিতাবৃত্তি নয়—এই উপলক্ষে আমাদের সমাজ বৃদ্ধদের বর্তমান চিন্তাধারার বিষয়ে দু একটা কথা জানাবার জন্য এ চিঠি লেখা। পতিতাবৃত্তি চিরদিন ছিল, বর্তমানে আছে এবং হয়তো ভবিষ্যতে থাকবে। এর কারণ, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ—সমাজ বিজ্ঞানী ও মনস্তাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় কিন্তু সমাজের যে কোন ব্যবস্থার জন্য প্রগতি বিরোধী তথাকথিত এক শ্রেণীর "বৃদ্ধদের" যুবক যুবতীদের নিন্দা করার এক বাতিক ঘটেছে। পতিতাবৃত্তি আধুনিক শিক্ষা, সহশিক্ষা, ও সিনেমার জন্য বেড়েছে কিনা তা আলোচনা করব না—তবে পতিতাবৃত্তির জন্য যুব সমাজকে দায়ী করা যায় না কোন মতে। ভাবতে দুঃখ হয় আমাদের সমাজ আজও কূপমণ্ডূকের মত সীতা সাবিত্রী নামের আফিংএর গুলি খেয়ে ঝিমিয়ে আছে। পৃথিবী কোথায় যাচ্ছে, মানুষ কি করে মহাকাশে উড়ছে—বিশ্বের দরবারে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা কেমন করে এগিয়ে চলেছে তা তাঁদের দেখবার কথা নয়—এক বাক্যে আধুনিকতার নিন্দা করে, সীতা সাবিত্রীর নাম নিয়ে যুব সমাজের মুণ্ডপাত করে আত্ম-সন্তোষ বোধ করছেন। গত হাজার বছরের ভারতের ইতিহাস আমাদের পরম লজ্জার বিষয়—চৈতন্য, নানক, কবীর, তুলসীদাস জাতীয় মানুষদের বাদ দিলে আমাদের ঘর শূন্য। বিদেশীরা এসেছে, লুঠ করেছে, ধর্ষণ করেছে, আর আমাদের সমাজপতিরা বসে গেছেন পাঁতি খুঁজে ধর্ষিতাদের সমাজচ্যুত করতে। সীতা হরণ করে—রাবণকে মরতে হয়েছিল বংশে। কিন্তু আমাদের এ যুগের সীতাহরণের পর—সবাই বসে ন রামের গোষ্ঠীর ধোপা-নাপিত বন্ধ করতে। আমরা অনেক দেখছি, ভাবছি কবে এই সীতা-সাবিত্রী নামের উদাহরণ বন্ধ হবে। দেশের মুসলমানরা কাবুল কান্দাহার থেকে আসেনিন।—তারা আমাদের সমাজেরই অনাচারের সাক্ষী। পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে হিন্দু সমাজের হীন ব্যবস্থার জন্য। একথা তো সকলের জানা। মানুষের যৌনক্ষুধা তার দেহগত ধর্ম। তার উল্লেখে নাকে কাপড় দিয়ে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া সুস্থ সমাজের লক্ষণ। প্রাচীন ভারতের যুগে সে স্বীকৃতি ছিল বলেই সেদিনকার সমাজ এগিয়ে গেছে পিছিয়ে পড়েনি। যে সমাজ নারীকে বাঁচবার অধিকার দেয় না—বাধ্য করে উদরান্নের জন্য পতিতা হতে—যে সমাজে একদিন কৌলিন্যের দোহাই দিয়ে একজন ষাট বার বিয়ে করেছে, পিশাচের আনন্দে বালবিধবাকে 'সতীদাহ' করেছে—এবং বৃদ্ধদের লালসার জ্বালায় মেয়েদের ঘর ছাড়তে হয়েছে—কোন লজ্জায় কোন অধিকারে তারা আজ যুব সমাজের নিন্দা করে? গত দু'শো বছরের বাংলার ইতিহাস, বাংলার নাটক, উপন্যাস ও কাব্য তার সাক্ষ্যে ভরা। বোধহয় মাইকেলের "বুড়ো শালিক" তার চ্যাম্পিয়ান।—তাঁরা ভুলে যান যে সাবিত্রী সত্যবানকে নিজে দেখে বিয়ে করেছিলেন—এবং শকুন্তলার গান্ধর্ব বিয়ে হয়েছিল এবং সেদিনের সমাজে তার স্বীকৃতি ছিল। পয়সার জোরে কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যার সম্মতির জন্য ধনী বৃদ্ধদের অভাব ঘটেনি এ সমাজে। কুলীন পঞ্চানন কি আমাদের সমাজ থেকে লোপ পেয়েছে?—তাদের কুসংস্কার, আর হিংস্র লোভের জন্য বাংলার মেয়েরা অনেক দিয়েছে, বাংলার মেয়েদের চোখের জলে বাংলার মাটি আজও ভিজে আছে। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মত মহাপুরুষদেরও এদের হাতে কম কষ্ট পেতে হয়নি। ভারতের কৃষ্টি, ভারতের বৈদিক সভ্যতা আজও বিশ্বে নতুন আলো আনতে পারে, সারহীন, আত্মকেন্দ্রিক এই পশ্চিমের সামাজিক বিধান ভারতের মাটিতে অচল, কিন্তু সেজন্য চোখ বুজে অন্ধের মত আমরা ৫০০০ বছরের পুরানো সীতা সাবিত্রীর গল্পে মেতে থাকবো, এটা ঠিক নয়। পৃথিবী এগিয়ে চলেছে—ভাল বা মন্দ হোক ভারতকে আজ সামনে এগিয়ে যেতে হবে আর সকলের সঙ্গে। পিছনের দিকে দৃষ্টির ফলে আমরা ৭০০ বছর মুসলমান ও ২০০ বছর ইংরেজের অধীনে থেকেছি—দারিদ্র্যে আর অনাহারে আমরা পৃথিবীর সকলের পিছনে। নতুন যুগে সামনে চলার প্রধান বাধা আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ও অন্ধ দৃষ্টিভঙ্গী। যুবক-যুবতীরা বাইরে আসবে—কাজ করবে—দেশ গড়বে—সমাজের হাজার বছরের আবর্জনা সাফ করবে—তখন পতিতাবৃত্তি করার কোন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। —যেমন রাশিয়াতে আজ নেই। ধর্মশিক্ষার ধূয়ো তুলে লাভ নেই, ধর্মশিক্ষার নামে পৃথিবীতে অনেক অধর্ম আচরণ ঘটেছে। যে মেয়েরা পতিতা হয়, বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে—তার অধিকাংশই আসে সামাজিক অনাচারের জন্য। মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার—শিক্ষা এবং আর্থিক সংস্থান থাকলে কোন মেয়েই পতিতা থাকবে না। বালবিধবাকে আমরা সারাজীবন বিনে মাইনের ঝি করে রাখবো, কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যার বিয়ে হবে না পণের ভারে—অথচ সামাজিকতায় ভুল করলে তাদের আমরা ছুঁড়ে ফেলে দেব রাস্তায়—কন্যাহীন, ক্লীব ও পঙ্গু এই সমাজের প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্যই পতিতারা প্রস্তুত

দাড়িয়ে থাকে সবটুকু জালা বুকে নিয়ে।—পতিতাবৃত্তির কারণ যৌনশিক্ষা বা ধর্মশিক্ষার অভাব নয়। আজ আমাদের চোখ খুলে দেখতে হবে, বুঝতে হবে এবং কঠিন আঘাতে হাজার বছরের আবর্জনা সাফ করতে হবে। মেয়েরা যেদিন শিক্ষায়, দীক্ষায় বড় হবে, আর্থিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হবে—যেদিন তারা উদরান্নের কাঙাল থাকবে না—সেদিন পতিতাবৃত্তি আপনা থেকে উঠে যা ব। শুধু সমাজকে নিন্দে করে লাভ নেই—তাদের সামনে আজ সেই নতুন জীবনের আদর্শ তুলে ধরতে হবে—তাদের আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হবে—তারা নতুন দেশ ও সমাজ গড়ার প্রেরণায় মেতে উঠবে, সেদিনই মিলবে 'পতিতাবৃত্তি' নিবারণের সত্যিকারের উপায়—তার আগে নয়। ইতি—ডাঃ অনিলকুমার সরকার। পিট্সফিল্ড জেনারেল হস্পিটাল, পিট্সফিল্ড, মাসাচুসেট্স, (ইউ, এস, এ,)।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রী এন, সি রায়, অবধারক—পরিচালক ষ্টোর পারচেজ ডি, এন, কে, প্রোজেক্ট, পোঃ কোরাপুট, উড়িষ্যা * * * সাধারণ সচিব, বান্দ্রা বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশান ৩৪/১৮২৫, গভর্ণমেণ্ট হাউসিং কলোনী, বান্দ্রা পূর্ব, বোম্বাই-৫১ * * * শ্রীসনাতন মুর্মু, অবধারক—লাবুরাম মুর্মু, গ্রাম—ভরতপুর পোঃ বাগরী কৃষ্ণনগর, জেলা-মেদিনীপুর * * * শ্রীব্রজগোপাল বরাক, অবধারক—শ্রীগোপাল অ্যাণ্ড কোং, ৩৯ গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ * * * শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী ভঞ্জ, অবধারক—শ্রীসুধীরচন্দ্র ভঞ্জ, পোঃ চাইবাসা, জেলা সিংভূম * * * শ্রীমতী তারাচরণ রায়, কোয়ার্টার নং ই ৫৮, ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, নয়াদিল্লী-১২ * * * শ্রীমতী রসিদা বারি, বি, এ, অবধারক—শ্রী এ, বারি, মোউনান মঞ্জিল, গ্রীন রোড, ঢাকা-৫, পূর্ব পাকিস্তান * * * শ্রীঅরুণকুমার কোঙার, কীর্তনখোলা, বারাহাট, (বজবজ হয়ে), জেলা ২৪ পরগণা * * * শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চন্দ, গ্রাম পশ্চিম সরপাই, পোঃ অনলবেড়িয়া, জেলা মেদিনীপুর * * * শ্রীমতী ভারতী ঘোষ, ১১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ * * * ডক্টর পি এম চৌধুরী, খৃষ্টীয় সেবা নিকেতন, পোঃ সরেনগা, (বাঁকুড়া) * * * শ্রীমতী লীলা ঘোষ, ২, মোতিলাল নেহরু রোড, কলিকাতা-২৯ * * * শ্রীমতী শিবরাণী দেবী। অবধারক—শ্রীউমানন্দ মুখোপাধ্যায়, পোঃ পাটকাবাড়ী, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ) * * * শ্রীতড়িৎমোহন সেনগুপ্ত, অবধারক—শ্রী এ, কে, সেনগুপ্ত, সেকসান-১৬, কোয়ার্টার নং এফ/ই ৩/২৫, সেক্টার—এক, এম, টি পাল রোড, পোঃ দুর্গাপুর—৪ (বর্দ্ধমান) * * * শ্রীমতী মাধবী বটব্যাল, ১৭৬ ব্যালেনগঞ্জ, এলাহাবাদ, ইউ, পি * * * শ্রীঅনিলকুমার বিশ্বাস, আই, কে সুগারমিল, পোঃ লক্ষ্মীগঞ্জ, দেওরিয়া * * * শ্রীগিরিশচন্দ্র রায় বর্ম্মণ, গ্রাম—কুকটিকাটা, পোঃ কানফাটা, (মাথাভাঙ্গা হয়ে) জেলাঃ কুচবিহার * * * অবৈতনিক সচিব, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউসান। ডাকঃ গ্রাম—হাতীথীরা, জেলা—কাছাড়, * * * সচিব, পি, ডি, এল, এন লাইব্রেরী, পোঃ হলদিবাড়ী জেলা—কুচবিহার পঃ বঙ্গ, * * * সচিব, খড়িবাড়ী ক্লাব লাইব্রেরী, পোঃ খড়িবাড়ী, জেলাঃ দার্জিলিং * * * শ্রীমতী সি, দাশগুপ্তা। লেডি প্রিন্সিপাল [illegible] গার্লস হাইস্কুল [illegible] স্কুল, পোঃ চাপরা, জেলাঃ সারণ।

Sending Rs. 15/- please enroll me as a subscriber to the Masik Basumati for the current Bengali year—Dr. S. K. Roy. M/s. Associated Cement Co. Ltd. P.O. Khabari, Palamou.

১৫৲ পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন।—শ্রীমতী ইলা ব্যানার্জী, বেরিলি, ইউ, পি।

Please find herewith Rs. 15/- as the full settlement of your bill for the supply of the Magazine. District Librarian, Silchar.

Sending herewith Rs. 15/- by M. O. in payment of subscription of one year. Please acknowledge receipt. General Secretary, Ra[illegible]nagar Colliery Institute, Rajnagar Collie[illegible] Shahdol, (M. P.)

Remitting herewith Rs. 15/- being the annual subscription of the Monthly Basumati for the year 1369. Librarian, Indian Statistical Institute, Hazaribagh.

১৫৲ চাঁদা বাবদ পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন। মাসিক বসুমতীর উন্নতি কামনা করি।—শ্রীমতী রুমা দত্ত, নিউ দিল্লী।

১৫৲ পাঠাইলাম। বৈশাখ মাস হইতে গ্রাহিকা শ্রেণিভুক্ত করিয়া লইবেন।—শ্রীমতী মাধবী বটব্যাল, এলাহাবাদ, (ইউ, পি,)

১৩৬৯ সালের বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠাইবেন।—চণ্ডীচরণ সাহানা, হাজারিবাগ।

বর্ত্তমান বর্ষের বার্ষিক মূল্য বাবদ ১৫৲ পাঠাইলাম। মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠাইবেন। উন্নতি কামনা করি। শ্রীমতী র[illegible] ঘোষ। "কান্ত কুটির" চাঁদনি চক, কটক।

Please accept my subscription of Rs. 15/- fo[r] the year 1962-'63—Sri Subhra Bose, C/o Sj Sris Chandra Bose, P. O. Chandnichawk, Cuttack-2.

১৩৬৯ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত এক বৎসরের মাসি[ক] বসুমতীর চাঁদা ও রেজিষ্ট্রী খরচ বাবদ ২১৲ টাকা পাঠাইলাম সংবাদ দিয়া বাধিত করিবেন—শ্রীমতী উষারাণী ঘোষ, শিলিগু[ড়ি] দার্জিলিঙ।

Sending herewith Rs. 15/- as yearly subscri[p]tion of the Masik Basumati for the year 1369 B. [S.] Please acknowledge the same and arrange to se[nd] the Monthly Basumati regularly—N. K. Ro[y] Naba Bitan, Jalpaiguri.

Sending Rs. 15/- being the annual subscripti[on] of the Monthly Basumati.—Mrs. P. K. Chatterj[ee] Allahabad.

Remitting annual subscription of Rs. 1[5/-] Please acknowledge receipt.—Sm. Maya Mit[ra] C/o Mr. P K. Mitra, Lucknow.

Sending herewith Rs. 15/- only being [the] annual subscription of the Monthly Basumati [for] the year 1369 B. S.—Secretary, "Pragati Sang[ha]" P. O Kokrajhar. Goalpara, Assam.

Subscription to Masik Basumati for the y[ear] 1369 B. S. Secretary, Coochbehar District Libr[ary] Association, Coochbehar.